ত্রৈমাসিক সূচীপত্র

৯ম বর্ষ : ২য় খন্ড

১৩—২৫ সংখ্যা

শুক্রবার, ১৬ শ্রাবণ, ১৩৭৬—শুক্রবার, ১৪ কার্তিক, ১৩৭৬

Friday, 1st August, 1969 — Friday 31st October, 1969.

অমৃত

লেখক	বিষয় ও পৃষ্ঠা
॥ গ ॥	
শ্রীগজানন্দ বোড়ে	দাবার আসর ৭৯, ১৬০, ৩১৯, ৪০০, ৪৮০, ৭২০, ৮০০, ৯৫৯, ১০৪০;
শ্রীগিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়	হে মৃত্যু (কবিতা) ৫৭২;
শ্রীগোপাল সামন্ত	খাট (গল্প) ৬৫৩
শ্রীগোলকেন্দু ঘোষ	তাপের ছবি (আলোচনা) ৬৮৪;
শ্রীগৌর বিশ্বাস	নীলাদের হালচাল ও আমি (গল্প) ১০১২;
শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক	গাড়ি ছাড়ার সময় হলে একটুখানি স্বেচ্ছাচারী (কবিতা) ৪৪৪;
শ্রীগ্রন্থদর্শী	বইকুণ্ঠের খাতা ৯০২;
॥ চ ॥	
শ্রীচণ্ডী মণ্ডল	মেঘমুক্ত (গল্প) ৬২২;
× × ×	চিঠিপত্র ৪, ৮৪, ১৬৪, ২৪৪, ৩২৪, ৪০৪, ৪৮৪, ৫৬৪, ৬৪৪, ৭২৪, ৮০৪, ৮৮৪, ৯৬৪;
শ্রীচিত্ররসিক	প্রদর্শনী পরিক্রমা ১৪৭, ৩০৩, ৫৩২, ৭০০, ৮৬৫, ৯৩৮;
শ্রীচিত্রলেখ	যেন ভুলে না যাই ৭১, ১৫৪, ২৩৪, ৩১৪, ৪৭৫, ৬৩৫, ৭৯৪;
শ্রীচিত্রসেন	রাজপুরে জীবন-সন্ধ্যা (কাহিনী-চিত্র) ৫৭, ১৪০, ২১৭, ৩০১, ৩৮৪, ৪৬০, ৫৪১, ৬২১, ৬৯৭, ৭৭৩, ৮৬৪, ৯৩০;
শ্রীচিত্রাঙ্গদা	জলসা ১৫০, ২২৩, ৩০৭, ৩৮৮, ৪৬৯, ৫৫৩, ৭০৪, ৭৮৭, ৯৪২, ১০৩৩;
× × ×	চুম্বন ও নগ্নতা ৪৭০, ৫৪৪, ৬২৭, ৭০৬, ৭৮৮, ৮৬৯, ৯৪৫, ১০২৫;
॥ জ ॥	
শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী	এই সব অন্ধকার (কবিতা) ১১২;
শ্রীজীবনকৃষ্ণ গোস্বামী	সাপ (আলোচনা) ৩৬৭;
॥ ত ॥	
শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব (আলোচনা)
॥ দ ॥	
শ্রীদর্শক	খেলাধুলো ৭৭, ১৫৮, ২৩৯ ৩১৭, ৩৯৮, ৪৭৮, ৫৫৯, ৬৩৯, ৭১৮, ৭৯৮, ৮৭৮, ৯৫৬, ১০৩৮;
শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	সকালে-বিকেলে (কবিতা) ৪৪৪;
শ্রীদিলীপ মৌলিক	আলোর বৃত্তে ৬১, ২১৯, ৪৬৬, ৫৫৫, ৭০৩, ৭৮৫, ৯৩৯;
শ্রীদিলীপ মালাকার	সাগরপারের খবর ২১৫, ৬৯০;
শ্রীদিলীপ বসু	চাঁদে মানুষ (আলোচনা) ১৩;
শ্রীদীপেন রায়	স্বপ্নের নামে (কবিতা) ২১৪;
শ্রীদুর্লভ চক্রবর্তী	ফটো তোলার কথা (আলোচনা) ৩৭৪; পরচর্চা (আলোচনা) ৬৮৬;
শ্রীদেবল দেববর্মা	অন্ধকারের মুখ (উপন্যাস) ৯৮৭;
× × ×	দেশে-বিদেশে ৮, ৮৮, ১৬৮, ২৪৮, ৩২৮, ৪০৮, ৪৮৮ ৫৬৮, ৬৪৯, ৭২৮, ৮০৮, ৮৮৮, ৯৬৮;

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেণ্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৯ম বর্ষ
২য় খণ্ড

১৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 8th August 1969 শুক্রবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৭৬ 40 Paise

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

বেতারশ্রুতি প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ১৯ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বেতারশ্রুতি' খুব ভালো লাগলো। 'ফলশ্রুতি' সম্পর্কে যে আলোচনা শ্রবণক করেছেন, ভাষাতত্ত্বের ছাত্রদের তা ভাবিয়ে তোলে।

তবু, দু-একটা সমস্যার সমাধানের জন্য শ্রবণকের কাছে বিনীতভাবে উপস্থিত হতে চাই, কারণ ৫৪ লাইনে বিধৃত 'ফলশ্রুতি'-র আলোচনা আমাকে বিব্রত করার পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়েছে। আমার সমস্যাগুলো এইভাবে রাখা যায় :

১। 'প্রতিশ্রুতি'-কে ভাঙলে দাঁড়ায়—প্রতি।শ্রুতি (ভা) : 'প্রতি' অব্যয়, প্রধানত উপসর্গরূপে ব্যবহৃত হয় ; আরো জানি, বিভিন্ন উপসর্গযোগে ধাতুর অর্থ পরিবর্তন ঘটে ; কিন্তু 'প্রতিশ্রুতি' কী সমাস হবে? অব্যয়ীভাব নিশ্চয় নয়।

২। Window =গবাক্ষ ; a sort of sweet meat সন্দেশ ; father-in-law শ্বশুর—ভুল নয় তো?

৩। শ্রবণক 'ফলশ্রুতি'-র যে অর্থ দিয়েছেন, তা ছাড়াও এ-অর্থটাও হয় কিনা—'কোন বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য-পাঠে মনের উপরে মোটামুটি যে ফল হয়।'

৪। সমীভবনের নিয়ম কি সব জায়গায় খাটবে? এবং সমীভবনের নিয়ম অনুযায়ী উচ্চারণের পরিবর্তন হবে, না কোনো শব্দের উচ্চারণে conjunct consonant -এর স্থলে double consonant এসে গেলে তাকে সমীভবন বলা হবে?

৫। লক্ষ্মণ সেন ও সুলক্ষণ রায় নাম দুটোর ইংরিজি বানান যথাক্রমে Lakshman Sen ও Sulakkhan Roy কিনা, এবং সে স্থলে একজন অভারতীয় বা অবাঙালী কি উচ্চারণ করবেন? যদি ভিন্ন উচ্চারণ করেন, তবে কি ধরে নিতে হবে সমীভবন বা assimilation -এর নিয়ম শুধু মাতৃভাষার বেলায় খাটে?

[এই প্রশ্নটির কি উত্তর হবে, আমার মোটামুটি একটা ধারণা আছে, তবে শ্রবণকের মতো একজন শ্রদ্ধেয় বৈয়াকরণের যুক্তির সঙ্গে নিজের যুক্তিকে মিলিয়ে তাকে পাকা করে নিতে চাই।]

৬। শ্রবণক 'অনুষ্ঠান পর্যালোচনা'র এক জায়গায় 'গম্ভীরতা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পরীক্ষায় যদি 'গম্ভীর' শব্দের পদপরিবর্তন করতে দেওয়া হয়, এবং আমি যদি 'গম্ভীরতা' লিখি, পুরো নম্বর পাবো তো?

—সামসুল হক
কলকাতা—২০

লেখকের উত্তর

এই পত্রের উত্তর দেবার আগে আমার দুটি কর্তব্য আছে। প্রথম, পত্রলেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো ; দ্বিতীয়, স্পষ্ট করে বলা যে, আমি মোটেই বৈয়াকরণ নই, আমি একজন সাধারণ সাংবাদিক এবং সাংবাদিকের দৃষ্টিতেই সমগ্র বিষয়টি বিচার করেছিলাম। পত্রলেখক আমার কাঁধে ব্যাকরণের জোয়াল চাপিয়েছেন, ঠেলে ফেলার উপায় নেই, তাই সাধ্যমতো টানার চেষ্টা করব। যদি কোথাও থমকে দাঁড়াই, অপরাধ মার্জনা করবেন।

পত্রলেখকের ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে বলি : প্রার্থী প্রথমে কিছু প্রার্থনার কথা শোনায়, তার উত্তরে দাতা তাকে কিছু দেবে বলে যে কথা শোনায়, তাকে বলে প্রতিশ্রুতি। ঠিক যেমন—প্রত্যুত্তর ও প্রতিপ্রশ্ন। ব্যাকরণে এই প্রসঙ্গে সূত্র আছে, যার উদ্দেশে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় সে হ'ল প্রথম প্রার্থী এবং সে প্রথম প্রার্থনার কথা শোনায়, এবং সেই পূর্ব কার্যের কর্তায় প্রতি পূর্বক শ্রু ধাতুর প্রয়োগে চতুর্থী বিভক্তি ব্যবহারের রীতি আছে। সূত্রটি হচ্ছে 'প্রত্যাঙ্ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্বস্য কর্তা।'

প্রতিগতা শ্রুতি এইরূপে প্রতিশ্রুতিকে প্রাদি তৎপুরুষ সমাস বলা যায়।

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর : গো অক্ষি থেকে গবাক্ষ। আগেকার দিনে গোরুর চোখের মতো ছোটো ছোটো জানালা হত। তাই গবাক্ষ। জানালা এখন বড়ো হলেও গবাক্ষ নামটা রয়ে গেছে। জানালা আর গবাক্ষ সমার্থক শব্দ। সুতরাং Window গবাক্ষ ভুল নয়।

সন্দেশ শব্দের মূল অর্থ সংবাদ। আগেকার দিনে সুসংবাদের সঙ্গে মিষ্টান্ন পাঠানোর রীতি ছিল। এখন বাংলায় সন্দেশ অর্থে এক ধরনের মিষ্টান্নই বোঝায়, এবং মিষ্টান্ন অর্থই বহুল প্রচলিত। তাই সন্দেশকে a sort of sweetmeat বললে মোটেই ভুল হয় না।

আর father-in-law অর্থ শ্বশুর ভুল হবে কেন? এই অর্থই তো সর্বজনস্বীকৃত। যেমন sister-in-law শালী বা ননদ।

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর : না, ও অর্থ হয় না। শাস্ত্রে যেভাবে আছে তাতে ফলের উল্লেখ থাকতেই হবে এবং তা শুনতেই হবে। ইংরেজীতে বলতে পারি—declaration of result of consequence of the act.

ঐ declaration-টা বড়ো কথা। ওটাকে বাদ দেওয়া চলবে না, এবং declaration থাকলেই শোনা থাকবে। শুধু result বা consequence কখনও ফলশ্রুতি হতে পারে না। সেটা ফল, শুধু ফল।

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর : না, সমীভবনের নিয়ম সব জায়গায় খাটবে না ; যেমন—শ্মশান, স্মিত প্রভৃতি শব্দকে সমীভূত করা যাবে না। এ থেকেই দেখা যাচ্ছে, সমীভবন না হলেও উচ্চারণের পরিবর্তন ঘটে। আসলে বাংলায় ধরাবাঁধা কোনো কঠোর নিয়ম নেই, উচ্চারণসৌকর্য ও শ্রুতিসৌকর্যের উপর ভিত্তি করেই একটা রীতি গড়ে উঠেছে, এবং শিক্ষিতসমাজে প্রায় সকলেই সেই রীতি অনুসরণ করে থাকেন।

সমীভবন কাকে বলে সে বিষয়ে আমার পূর্বের রচনায় উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে। পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর : লক্ষ্মণ যদি Lakshman লেখা হয় তাহলে সুলক্ষণ লেখা উচিত Sulakshan, Sulakkhan নয়। আর সেক্ষেত্রে অভারতীয় বা অবাঙালীদের উচ্চারণ হবে লক্ষ্মণ ও সুলক্ষণ। অভারতীয় ও অবাঙালীদের মুখে লক্খন ও সুলক্খনও শুনেছি—তবে সে বাঙালীর অনুসরণে।

হ্যাঁ, সমীভবনের নিয়ম আমাদের মাতৃভাষার বেলাতেই খাটে।

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর : হ্যাঁ, গম্ভীরতা লিখলে পুরো মার্কই পাওয়া উচিত ; গাম্ভীর্য ও গম্ভীরতা দুই-ই হয়, যেমন ঔদার্য ও উদারতা দুই হয়। তা যোগ করে অনায়াসেই পদপরিবর্তন করা যায়।

পত্রলেখক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি 'পুরো নম্বর' না লিখে 'পুরো মার্ক' লিখেছি। আমি ইচ্ছে করেই তা লিখেছি। কারণ, যদি তিনি কোনো প্রশ্নপত্রের মাথার দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন, লেখা আছে Full marks, Full numbers নয়। তাছাড়া মার্কশীটে কি থাকে। মার্ক, না নাম্বার (নম্বর)?

আমি জানি, মার্ক স্থলে নম্বর বহুলপ্রচলিত, বহু পণ্ডিত ব্যক্তিও নম্বর বলে থাকেন, এবং এই বলা আর রোধ করা যাবে না। আমি সে চেষ্টাও করব না।

—শ্রবণক
কলকাতা—১৯

সিনেমার হল-এ অশান্তি

বাংলা ছবি ছাড়া অন্য ছবি আমি বড় একটা দেখি না। তাওও ভীড় এড়িয়ে ছবি শুরু হবার ২।৪ সপ্তাহ কেটে যাবার পর বিশেষ বিশেষ ছবি দেখতে যাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়— গত কয়েকটি ছবি দেখতে গিয়ে ছবি দেখার আনন্দ থেকে বিরত হয়ে বরং বিরক্ত হয়েই বাড়ী ফিরতে হয়েছে।

কারণ স্বভাবতই সহ-দর্শকগণ ২।৪ জন মিলে ছবি দেখতে গেলে মাঝে মাঝে একে অন্যের সঙ্গে এক আধটা কথা বলা হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই কথা বলা হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই কথা বলা যখন বেতারে ধারাবিবরণীর পর্যায়ে পেঁছিয় তখন চিন্তাশীল দর্শকদের যে কি অবস্থা হয় তা সহজেই অনুমেয়। কেউ কেউ আবার এতেই ক্ষান্ত নন তাঁরা তাঁদের সামনের আসনকে পাদানি হিসাবে ব্যবহার করেন। আসনে দর্শক থাকলেও। তাঁরা ভুলে যান যে আশেপাশের দর্শকদের তাতে বিরক্তির কারণ ঘটতে পারে। অতি সম্প্রতি দক্ষিণ কোলকাতার কোন একটি চিত্রগৃহে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিটি দেখতে গিয়ে চরম অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। পেছনের আসনের একজন শিক্ষিত, মার্জিত (অবশ্য দেখে তাই মনে হোল) ভদ্রলোক তো প্রতিটি দৃশ্য ব্যাখ্যা করে, পরবর্তী দৃশ্য কি এবং তার পরিণতিই বা কি—তার শেষ দৃশ্য পর্যন্ত বিবরণ দিয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গিনীকে। ভদ্রলোকের ভাষাদানে মনে হোল ছবিটি তাঁর পূর্বে দেখা। তাঁর ভাষা আমাদের কানে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তিনি এক সেকেন্ডের জন্যও ভাবলেন না যে তাঁর ভাষ্য-দানে অন্য দর্শকদের বিরক্তির কারণ ঘটতে পারে। এবং ছবির ঘটনা আগে থেকে বলে দেওয়ায় তার আকর্ষণ কমে যেতে পারে। এটা কিন্তু খুব পরিচিত ঘটনা। এই ধরনের দর্শকদের এতটুকু সৌজন্য বোধ নেই যে অন্য লোক যেখানে আনন্দ পাবার জন্য গিয়েছেন সেখানে উনি বা ওঁরা কতটা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছেন। এই ব্যাপারে হাউস কর্তৃ-পক্ষের কি কোন দায়িত্ব নেই। আমার মনে হয় 'ধূমপান নিষেধ'-এর যে রকম স্লাইড দেখানো হয় সেইরকম হল-এ কথা বলে অন্য দর্শকদের অসুবিধার সৃষ্টি না করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে মূল ছবি শুরু হবার ঠিক আগে স্লাইড দেখাবার ব্যবস্থা করা যায় না?

সুকুমার রায়
কলকাতা—২৫

চৈতন্য লাইব্রেরীর আবেদন

উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীটে অবস্থিত 'চৈতন্য লাইব্রেরী' নামটি আশা করি বাংলার সংস্কৃতিবান মানুষের অজানা নেই। বহু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সুবর্ণ ভাণ্ডার (এমন কি ন্যাশনাল লাইব্রেরীতেও যা পাওয়া যায় না), বিশাল এর পুস্তক সংখ্যা এবং গত যুগের বাংলাদেশের মহামনীষীদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সংস্পর্শে এই লাইব্রেরী বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও নবজাগরণের এক জীবন্ত প্রহরী। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্র-নাথ, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যুগস্রষ্টাগণ এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বড় আশা ছিল—চৈতন্য লাইব্রেরী বাংলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হোক। কিন্তু অপ্রিয় হলেও একথা আমরা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করি—এ আদেশ আমরা কার্যকর করে উঠতে পারি নি এতকাল নানা কারণে। এই বৎসর সীমিত স্থান ও সুযোগের মধ্যেও আমরা কবিগুরুর আদেশ পালনের চেষ্টা করছি, কারণ এত কেবল এই যুগ-স্রষ্টা মহাপুরুষের আদেশ নয়, এ'ত আমা-দেরও প্রাণের কথা। আমরা চাই এখানে সাহিত্য সভা হোক, বাংলাদেশের গুণী-জ্ঞানীরা আসুন, আমাদের পথ নির্দেশ করুন, এখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি নিষ্কলুষ আবহাওয়া চিরস্থায়ী হয়ে বিরাজ করুক। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই বৎসর আমাদের সাহিত্য সভায় বহু উৎসাহী শ্রোতার সামনে এসেছিলেন—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রামেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, ডকটর অজিতকুমার ঘোষ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আমরা বাংলার বরণীয় সাহিত্যিকদের (কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, শিল্পী, সাংবাদিক, নাট্যকার ও সমালোচক প্রভৃতি) এবং বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উৎসাহী জনসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা এখানে আসুন, অংশ নিন। চৈতন্য লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ-ব্যাপারে যোগাযোগ করলে কর্তৃপক্ষরা নিজে-দের ধন্য মনে করবেন। এই লাইব্রেরীতে কোন রকম রাজনীতির স্থান নেই, বাংলা-দেশের যে-কোন সৎসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উৎসাহী লোকের জন্য চৈতন্য লাইব্রেরীর দরজা সব সময় খোলা থাকে।

নমস্কারান্তে
অধ্যাপক সুজিতকুমার সেনগুপ্ত
কলকাতা-৭

হীরামনের হাহাকার

আমি 'অমৃত' পত্রিকার একজন নিয়-মিত পাঠক। শ্রীঅদ্রীশ বর্ধনের লেখা 'হীরামনের হাহাকার' উপন্যাসটি পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। এর আগেও অনেক রহস্য-উপন্যাস পড়েছি, কিন্তু এত আনন্দ আর কোনও উপন্যাস পড়ে পাইনি। তিনি এই উপন্যাসে যেমন রহস্যের পরিবেশন করেছেন, তেমনি করেছেন হাস্যরসেরও। তাই উপ-ন্যাসটি হয়েছে আরও সুন্দর। পড়তে পড়তে অনেক সময় অট্টহাস্য করে উঠেছি। যেমন শুটিং-এর সময় নায়ক 'নন্দজিৎ'এর উদ্দেশ্যে ডিরেকটরের চিৎকার। এই শুটিং-এর নায়কের নাম স্থানভেদে 'নন্দজিৎ' অপূর্ব মানানসই হয়েছে। আবার আরেকটি জায়গাতে রসিকলাল দারোগার ভঙ্গিতেও অনেকক্ষণ হেসেছিলাম 'প্রাইভেট কেন, পাবলিক ডিটেকটিভ হলেও কি আসে-যায়'। এমনি আরও অননক মজার কথা।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে অখণ্ড-নারায়ণের সঙ্গে কল্পনায় বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আবার কখনও নিজেকেই অখণ্ড-নারায়ণ ভেবেছি। বিশেষ করে অখণ্ডের সঙ্গে ভ্রমরের সাক্ষাৎকারের সময়।

চিঠিপত্র বিভাগে এই উপন্যাসের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে লেখা চিঠিগুলি পড়েছি। লেখক যদি বিপক্ষের লেখা চিঠি পাবার পর তাঁর উপন্যাসের ধারা বদলাতেন, তাহলে আমিও প্রতিবাদ করতাম। যাহোক লেখক তা না করে ঠিকই করেছেন। নূতন স্বাদের উপন্যাস সবাই চায়। লেখক শ্রীবর্ধনকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাবেন। আপনার 'অমৃত'-এর কাছ থেকে আরও ভালো ভালো উপন্যাসের আশায় রইলাম। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য
অনামিকা
গৌহাটি-১১

কেয়াপাতার নৌকো

শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' 'অমৃত'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার জন্য ধন্যবাদ। দেশভাগের এক বছর আগে আমার জন্ম। পূর্ববাংলাকে আমার মনে পড়ে না। মা, ঠাকুরমার মুখে দেশের কথা শুনে এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল দেশ দেখবার। 'কেয়াপাতার নৌকো' পড়ে যেন তা অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে। লেখকের সরস লেখনীর সজীব চরিত্রচিত্রায়নের মধ্য দিয়ে আমি যেন সেই আমার কল্পলোকের পূর্ব-বাংলাকে জীবন্তরূপে পেয়েছি। পড়তে পড়তে কখন যেন সুধা, সুনীতি, বিনু, হেমনাথ, লালমোহন, যুগল প্রভৃতি প্রতিটি রাজদিয়ার মানুষের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছি। 'কেয়াপাতার নৌকো' পড়ে কতখানি আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায় পূর্ববাংলায় যাঁদের দেশ তাঁরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করবেন।

স্বপ্ন মুখার্জী,
কলকাতা—২৫।

সাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে যা নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করে। বৃহস্পতিবার বারবেলায় উত্তেজিত, উচ্ছৃঙ্খল পুলিশের বিধানসভা আক্রমণ, ভেতরে ঢুকে তান্ডবলীলা, এবং সবার উপর জনপ্রতিনিধিদের মারধর সকল মানুষকেই যুগপৎ বিস্মিত ও আতঙ্কিত করে তুলেছে। এ ঘটনা ইতিহাসের ইতিহাস। তবে এই 'সিপাহী বিদ্রোহ' সেই সিপাহী বিদ্রোহ নয় যা স্মরণ করে মানুষ এখনও শ্রদ্ধাবনত হয়। এই বিদ্রোহ দীর্ঘদিনের অবিচ্ছিন্ন দানবীয় ক্ষমতার অধিকারী সিপাহীদের মদমত্ততা।

শহীদ পুলিশের মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রার অধিকার যুক্তফ্রন্ট সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল। এই বীভৎস হত্যাকান্ডের জন্য সরকার শুধু দুঃখ প্রকাশ করে নি, অধিকন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী এই লোমহর্ষক কাহিনীর নায়কদের যথাযোগ্য শাস্তি বিধানের কথাও ঘোষণা করেছিলেন। তা সত্ত্বেও স্বীকার করি, পুলিশের বিক্ষোভ করবার অধিকার আছে—প্রতিবাদে তাঁরা গর্জেও উঠতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সেই প্রতিবাদ সেই বিক্ষোভের ফলে বৃহস্পতিবার যে ভয়ংকর কান্ড ঘটল তা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে একটি চ্যালেঞ্জ ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের প্রত্যেক গণতান্ত্রিক মানুষকে মুহূর্তের জন্যও সময় নষ্ট না করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, জনতার সরকার চলবে, না পুলিশের রাজত্ব চলবে। যুক্তফ্রন্টের আমলে এই ঘটনা ঘটেছে বলে কেউ যদি অলক্ষ্যে হাসবার চেষ্টা করেন, তবে তিনি ঐতিহাসিক ভুল করবেন। ফ্রন্ট এবং কংগ্রেসকে যুক্তভাবেই এই ক্রমবর্ধমান পুলিশী উন্মত্ততাকে রুখতে হবে। নয়তো গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিধানসভার ভেতরে অভিযান করার সাহস যাঁরা রাখেন, মহাকরণেও দক্ষযজ্ঞ বাধাতে তাঁদের কুণ্ঠা হবে না। এমন কি জনপ্রতিনিধিদের বা মন্ত্রীমহাশয়দের গৃহে গৃহে হানা দিয়ে অত্যাচার করতেও তাঁরা চক্ষুলজ্জা বোধ করবেন না। কারণ, তাঁরাও বুঝেছেন, বন্দুকের নলই শক্তির উৎস আর সেই অনলবর্ষণকারী যন্ত্র হাজারে হাজারে তাঁদেরই কাছে গচ্ছিত আছে। অতএব, তাঁদের জাতভাইয়ের উপর আক্রমণ হলে, তাঁরা গণতন্ত্র পদদলিত করবেন এবং সমস্ত আইনশৃঙ্খলা, যার রক্ষক বলে তাঁরা দাবী করেন, এক লহমায় চুরমার করে দিয়ে সবার উপরে পুলিশ সত্য এই মত প্রতিষ্ঠিত করে ছাড়বেন। এর নড়চড় হবার যো নেই—বৃহস্পতিবারের ঘটনা তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশ বাহিনীর এক শ্রেণীর মানুষকে এই চিন্তা আচ্ছন্ন করে তুলছিল। অবশেষে সেই অপরিচ্ছন্ন ভাবধারার নগ্ন প্রকাশ ঘটাতে মঙ্গলই হল। কারণ, রাজনৈতিক নেতারা ঘটনার পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে তার পূর্বাভাষ পেলেন।

যুক্তফ্রন্টের প্রায় সকল শরীকই এই পুলিশী তান্ডবকে 'এক বৃহৎ চক্রান্তের অংশ মাত্র' বলে অভিহিত করেছেন। জিজ্ঞাসা করি, এই চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করবার জন্য অদ্যাবধি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে? কোন রাজনৈতিক দলের শোভাযাত্রা বা বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হওয়ার কথা উঠলেই ইন্টেলিজেন্স বিভাগের কর্মকর্তারা যাঁদের ইন্টেলিজেন্স কতোটা আছে বলা শক্ত, তাঁরা আগেই মিছিলের উৎপত্তিস্থল, গতিবিধি সম্পর্কে 'সমস্ত তথ্য' সংগ্রহ করে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ক্ষেত্রে এই বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কি খবর ছিল? যদি কিছু না থেকে থাকে তবে অপদার্থতা ও অযোগ্যতার জন্য এঁদের বরখাস্ত করা উচিত কিনা? যদি থেকে থাকে তবে কি জাতভাইদের বিপদে না ফেলার উদ্দেশ্যে কিম্বা যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় করার জন্য খবর চেপে রাখা হয়েছিল? উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুকে জনতার কাছে এই সম্পর্কে স্পষ্ট কথা জানাতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বিধানসভার মর্যাদা রক্ষার জন্য যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন সেই কথা চিন্তা করেই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আমজনতাকে সমস্ত বিষয় ওয়াকিবহাল করতে হবে। জনতা তাঁদের এই অপমান হেলায় মাথা পেতে নিতে পারেন না।

শহীদ পুলিশকে নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে বৃহস্পতিবার যদি ঐ পুলিশ মিছিল সত্যাগ্রহ করত, তবে তাদের শত দোষকে উপেক্ষা করেও জনসাধারণ তাদের পাশে থাকত। কিন্তু যে নারকীয় ঘটনা তাঁরা সংগঠিত করলেন তা ক্ষমার অযোগ্য। কারণ, পুলিশ বাহিনীর একথা ভুললে চলবে না, তাঁরা জনতার দাসানুদাস মাত্র। বন্দুক হাতে আছে বলেই তাঁরা মনিব নন, কিম্বা ঈশ্বরপ্রেরিত মহামানবের দলও নন। অতীতে বহু মানুষ পুলিশের গুলিতে নগরে গ্রামান্তরে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু পুলিশ বাহিনীকে জিজ্ঞাসা করি, কত মানুষ মিছিল করে এসে বিধানসভার ভেতরে ঢুকে প্রলয় নাচন নেচেছেন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে যদি ইঁটপাটকেল ছুঁড়েছেন তাহলে ত তাঁরা গুলির শিকার হয়েছেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিধানসভা ভবনের এবং চৌহদ্দির সেই শক্ত লৌহ-কপাট অনর্গল মুক্ত করে কি করে পুলিশ এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করার সুযোগ পেল? বেতার যন্ত্র সম্বলিত আর টি ভ্যান কোথায় ছিল? হা-রে-রে করে বিধানসভা ভবনের ভিতর ঢুকবার কয়েক সেকেন্ড আগে পর্যন্তও কেন মন্ত্রিসভার সদস্যরা এ রহস্যের খবর পান নি? এর উত্তর কে দেবে? আগে তো দেখা গেছে, হিংস হয়েছে কি না হয়েছে অমনি পুলিশের গুলি ছুটেছে জনতাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু বৃহস্পতিবারের সেই চরম মুহূর্তেও কৈ কারও বন্দুকের নল ত গর্জে উঠল না? গণতন্ত্রের মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন কিম্বা রাষ্ট্রশক্তির অর্থ কি, কিম্বা আইনসভার অর্থ কি, এই সমস্ত বুনিয়াদি তথ্যের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন একজনও পুলিশ বা অফিসার কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না যিনি প্রাণ দিয়েও পবিত্র দায়িত্ব রক্ষার জন্য অগ্রণী হতে পারেন? জনতা কি ধরে নেবেন যে এই পুলিশের মধ্যে বড় বড় খেতাবধারী সকলেই অজ্ঞ, আজ্ঞাবহকারী মাত্র!

এই সমস্ত প্রশ্ন অবতারণার উদ্দেশ্য হচ্ছে, গণতন্ত্র কোন্ পথে—জনতার সামনে এই বুনিয়াদি বক্তব্যটা পেশ করা। এ কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, গণতান্ত্রিক অধিকার মানে উচ্ছৃঙ্খলতা বা যথেচ্ছাচার নয়। এটা জীবনপ্রবাহের এক সাবলীল গতিছন্দ মাত্র। ন্যায্য দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য এই গণতন্ত্রের প্রয়োগবিধির রূপরেখা কি হবে, একথা সকলেই উপলব্ধি করতে পারেন। এর জন্য ফরমুলা তৈরির দরকার হয় না। ফরমুলা তৈরি করতে হলেই বুঝতে হবে বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ ঘটেনি। চিন্তাশক্তি পল্লবিত হয়ে ওঠেনি। সভ্যতার সংজ্ঞা বোঝার ক্ষমতা অর্জিত হয়নি। অবশ্য, একথাও বলা যেতে পারে যে, অজ্ঞতার ভান করে স্বার্থ আদায়ের অপচেষ্টায় মত্ত হয়েও গণতান্ত্রিক অধিকারের অপব্যবহার করার বাসনা জাগে। পুলিশের মধ্যেও এহেন ভান-করা অজ্ঞতার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তাই যুক্তফ্রন্টের সদিচ্ছার সুযোগ নিয়ে তাঁরা অধিকারের অপপ্রয়োগে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মনে রাখা উচিত, এই উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁদের জনতা থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করবে মাত্র।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পুলিশের ওই উন্মত্ত আচরণের উৎস কোথায়? এর কারণ অনুসন্ধান আজ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এই প্রশ্নের উত্তর সেদিনই দিয়েছেন। যুক্তফ্রন্টের সহস্র সহস্র দরদী সেদিন যখন

বিধানসভা অভিমুখে পুলিশী হামলার মোকাবিলা করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সংযত হতে অনুরোধ করে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা যদি সব শরিক সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারি, তবে কোন শক্তি নেই আমাদের গদী থেকে বিচ্যুত করতে পারে।' সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হবেন এই আশা করা যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী পরোক্ষভাবে অকুতোভয়ে একটি সত্য উদ্ঘাটন করেছেন।

শরিকী লড়াই-এর ভয়াবহতা শুধু যুক্তফ্রন্টকে দুর্বল ও হেয় করছে এমন নয়, সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের মধ্যেও এ বিষ যথেচ্ছভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ফ্রন্ট অংশীদাররাই একথা জোর গলায় বলে বেড়াচ্ছেন। যেখানে শরিকদের মধ্যে ঐক্যের অভাব, সেখানে স্বার্থান্বেষীরা সুযোগ বুঝে পক্ষ সমর্থন করে মাৎস্যন্যায়ের অবস্থা সৃষ্টি করবেন, এ আর নতুন কি। শক্ত, সবল শাসক না হলে ইতিহাসে যুগে যুগে যে অবস্থার নজীর পাওয়া যায়, তার পুনরাভিনয় ঘটবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। কি পুলিশ, কি অফিসার, কি কেরানী, কি বেয়ারা সকলেই এ অবস্থায় বেপরোয়া হয়ে উঠতে বাধ্য। কারণ, তাঁরা জানেন, কেউ ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টি নিয়ে তাকালেই অন্যজনের কাছে আশ্রয় পাওয়া যাবে। কাজেই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে তথাকথিত স্বাধীনতার আস্বাদ উপভোগ করতে দোষ কি। পশ্চিমবঙ্গে শরিকী লড়াই প্রায় নৈরাজ্য অবস্থার সৃষ্টি করে ফেলেছে।

যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ এই ভয়ংকর অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত দলীয় স্বার্থের উপরে উঠতে পারেন নি। তাই সভার পর সভা বসছে। কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও বারবার যথাযথ রূপায়ণ করার কথা উঠছে। কিন্তু কথায় ও কাজে একমত একপথ হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হতে পারছেন না। একটার পর একটা বাধা নতুন করে সামনে আসছে। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সেই বাধাও আবার শরিকী লড়াই-সঞ্জাত।

জমি উদ্ধারের আন্দোলন নিশ্চয় পুলিশের সঙ্গে লড়াই-এর আন্দোলন নয়। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, জমি উদ্ধারের আন্দোলন দল বিস্তারের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। এবং এই মনোভাব অবচেতন মনে আছে বলেই শরিকী সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আর তা ব্যাপ্তিলাভ করে কোথাও কোথাও পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে রূপান্তরিত হচ্ছে। 'সমদর্শী' দীর্ঘদিন আগেই এই বিপদের ইঙ্গিত দিয়ে জনতার কল্যাণে গণশক্তিকে সংযতভাবে লড়াইয়ের ময়দানে যুক্তভাবে সমাবেশ করার কথা বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, একথাও সেদিন বলা হয়েছিল যে এ হেন ঘটনা দীর্ঘদিন ঘটতে থাকলে ফ্রন্টে ফাটল ধরবে। আর যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জানুষ ফ্রন্টকে গদীতে আসীন করেছিল তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। জনতা হতাশায় নিমজ্জিত হবে।

বিপদের আশঙ্কা বুঝে পঞ্চবাম মিলিত হয়ে এই শরিকী লড়াই থামাবার জন্যে অনেক বৈঠক করে অবশেষে এক দাওয়াই ঠিক করলেন। সব অংশীদারকে নিয়ে আলোচনাও চলল। কিন্তু ঐক্যমত আর হয় না। গণশক্তিকে শ্রেণীশক্তির শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার ব্যাপারে একমত হয়েও তাঁরা এগুতে পারছেন না। আবার কোলকাতায় যদিও বা সহযাত্রার উদ্যোগ চলছে, তবু গ্রামাঞ্চল থেকে আরও প্রচণ্ডতম লড়াইয়ের সংবাদ আসছে।

ঘটনার ক্রমবিকাশ থেকে মনে হয় যেন প্রত্যেক দলই নিজেকে বেশী বিপ্লবী প্রমাণিত করার এক অঘোষিত ধর্মযুদ্ধে ব্যাপৃত আছে! কোন একটা বিশেষ অঞ্চলে আমজনতা নিয়ে জমি দখল করে ভারতবর্ষে কেউ যদি বিপ্লব আমদানী করতে পারবেন বলে মনে করেন তবে তাঁরা ভুলই করছেন। ঐ এলাকার জনসাধারণ থেকে বিশেষ করে ভূমিক্ষুধাকাতর মানুষের কাছ থেকে একটু সাময়িক বাহবা কুড়ানো যেতে পারে বটে, তা আখেরে সামগ্রিক বিপ্লবের সহায়ক হবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

বরং ফ্রন্টের মধ্যে থেকে অন্য শরিককে টেক্কা দিয়ে অতিবিপ্লবী সাজবার অপচেষ্টা যে মারাত্মক পরিণতি লাভ করতে পারে পুলিশি প্রতিবাদ তারই স্বাভাবিক ফল। এবং এই অশুভ কর্মপন্থাই আজ ফ্রন্টের অস্তিত্ব প্রায় বিপন্ন করে তুলেছে! কেউ সহমত না হলেও না হতে পারেন। কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে দেখলে বুঝতে পারবেন, এই মন্তব্যের মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে। কাজেই সময় থাকতে সাবধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

অবিমৃষ্যকারিতার জন্য কোন সরকারের পতন ঘটল কি ঘটল না—এটা বড় কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে—ঐ সরকারের কার্যকলাপের ফলে সমাজের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল তাই বিবেচ্য বিষয়। কাজেই, ফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ করতে পারা বা না পারার উপর বিশেষ কিছু নির্ভর করছে না। ফ্রন্ট আমলে পুলিশ যে এমন এক অশ্রুতপূর্ব কাহিনী রচনা করার সাহস পেল সেই ঘটনা মানুষের কাছে এক নয়া জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। জানি বরখাস্ত, সাময়িক বরখাস্ত ইত্যাদি নানাবিধ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হয়ত গৃহীত হবে। কিন্তু এই সমস্ত ব্যবস্থা কি পুলিশের মনে উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার এবং যা খুশী তা অবলীলাক্রমে করে যাওয়ার প্রবৃত্তি সমূলে উৎখাত করতে পারবে? না এই যে বীজ উপ্ত হল তা যে-কোন সময় মহীরুহে রূপায়িত হবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে? দেখা গেছে, এ জিনিস বিনাশ শক্ত। কথায় আছে, একবার হাত খুললেই হল। যতক্ষণ হাত খুলছে না ততক্ষণ ভাল। এবার মনে হচ্ছে পুলিশের হাত খুলতে চাইছে। তাদের আব্রু ভেঙে যাচ্ছে। এ বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত না করলে কেবল যে আইনশৃঙ্খলারই দফারফা হবে তা নয়, গণতন্ত্রেরও নাভিশ্বাস উঠবে।

কংগ্রেসের তরফ থেকে সেদিন বিধানসভায় এ অবস্থার মোকাবিলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁদের নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। কারণ, বিরোধীপক্ষ হলেও শ্রীরায় পুলিশের এই জঘন্য আচরণের সঠিক মূল্যায়নে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু অভিযোগ শোনা যাচ্ছে বিধানসভার কিছু কিছু সদস্য নাকি পুলিশদের সঙ্গে করমর্দন করে তাঁদের এই অপূর্ব কীর্তিকাহিনীর জন্য অভিনন্দনও জানিয়েছেন। যদি কোনো সদস্য এই কাজ করে থাকেন, তাঁরা শুধু নিন্দার্হ নন তাঁরা বর্জনীয়ও বটেন। কারণ কোন রাজনীতিক জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ একাজ করতে পারে না। জনতা যদি একাজ করত হয়ত তার সমর্থনে যুক্তি হাজির করলে ভৎর্সনার অবকাশ হতো না। কিন্তু এ'রা যে পুলিশ; সরকারের বেতনভুক কর্মচারী এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বিশেষ কায়দায় শিক্ষাপ্রাপ্ত আরক্ষক। এটা জেনেশুনেও যদি কেউ বাহবা দিয়ে থাকেন তাঁরা যুক্তফ্রন্টের ক্ষতি করতে পারেন নি, করেছেন গণতন্ত্রের। এসব শিশুসুলভ আচরণের জন্য এ'দের ধিক্কার দিলে শুধু চলবে না, রাজনীতির রেজিস্টার থেকে এ'দের নামও কেটে দিতে হবে। কারণ, রাজনীতি, গণতন্ত্র, পুলিশরাজ বা একনায়কত্ব ইত্যাদি সাধারণ আভিধানিক জ্ঞান থেকেও এ'রা এখনও বঞ্চিত! এ'রা মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণে অসমর্থ। এ'রা জনতার অযোগ্য প্রতিনিধি।

পুলিশি তাণ্ডবের ফলে দেশের রাজনীতিতে নতুন সমস্যার সূত্রপাত হল। পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টকে তথা জনসাধারণকে এই পুলিশি প্রলয় এক অশুভ ইঙ্গিত দিয়ে গেল। শুধু অহেতুক লাভ হল আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট নিকসন সাহেবের। যুক্তফ্রণ্ট যে প্রচণ্ডতার সঙ্গে নিকসন-বিরোধী বিক্ষোভ সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন তাতে তাঁরা পুরোপুরি সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। যেটুকুও বা করেছিলেন তাও অবশেষে অনেকক্ষণের জন্য ফ্রণ্ট সরকার রক্ষার ব্যাপারে নিয়োজিত রাখতে হয়েছিল। কাজেই বোঝা যাচ্ছে নিকসন সাহেবের স্টার ভাল যাচ্ছে। আর যাবারই কথা, কারণ ভারতদর্শনের পরই তিনি রুমানিয়ায় পবিত্র মাটি স্পর্শ করবেন। যদি ম্যাকনামারায় মত সোভিয়েট দেশ ঘুরে ভারতে আসতেন তবে হয়ত নিকসন সাহেবের গ্রহফল অন্যরকম হয়েও যেতে পারত।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

সংবিধান—ধ্বংস অথবা বদল

যে বিতর্ক শুরু হয়েছিল কেরলের যুক্তফ্রণ্টের শরিকানা কলহের পরিপ্রেক্ষিতে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে মতান্তরের আকারে সেই বিতর্কই এখন নয়াদিল্লীর সঙ্গে ত্রিবান্দ্রমের নতুন আর একটি বিরোধের আকার নিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদকে দিল্লীতে তলব করেছিলেন; কিন্তু শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ সেই তলব অগ্রাহ্য করেছেন।

শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ও শ্রী এ কে গোপালন, দুজনই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির মুখ্য নেতা, দুজনই পার্টির পলিট ব্যুরোর সদস্য। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ কেরল বিধানসভার এবং শ্রীগোপালন লোকসভার সদস্য। শ্রীগোপালন বলেছেন, তাঁরা দুজন বারবার পাঁচবার ভারতের সংবিধানের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে শপথ নিয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে, তাঁরা একথা বলতে পারেন কিনা যে, সংবিধানের চৌহদ্দীর মধ্যে থেকে সংবিধান ভাঙাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এই নিয়ে কেরল প্রদেশ কংগ্রেস উত্তেজিত, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিক্ষুব্ধ, ভারত সরকার উদ্বিগ্ন।

অথচ, মজা এই যে, শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ও শ্রীগোপালন তাঁদের এই বিতর্কিত যুক্ত বিবৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশে দেন নি। তাঁরা প্রথমে যখন ঐ বিবৃতি দেন তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সি-পি-আইয়ের তরফ থেকে যে সমালোচনা করা হয়েছিল তার জবাব দেওয়া। আসলে বিতর্কটির সূচনা হয়েছিল অন্য একটি বিবৃতিকে ঘিরে। সেই বিবৃতি দিয়েছিলেন আর একজন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রী বি টি রণদিভে। বুখারেস্ট থেকে দেশে ফেরার পথে শ্রীরণদিভে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। খবর বেরোয় যে, তিনি সেখানে বলেছেন, "ভাল একটা গভর্নমেণ্ট চালাবার জন্য কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় বসেন নি। এই দুই রাজ্যের মন্ত্রিসভার কাজ হচ্ছে জনসাধারণের অসন্তোষের অভিব্যক্তি দেওয়া, জনসাধারণকে সাহায্য দেওয়া নয়।"

পশ্চিমবঙ্গে শ্রীরণদিভের এই বিবৃতির কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। প্রতিক্রিয়া দেখা গেল কেরলে, যেখানে আগে থেকেই যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে দুই কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। কেরল মন্ত্রিসভার সি-পি-আই সদস্যরা শ্রীরণদিভের এই বিবৃতির প্রতিবাদ করলেন। শ্রী টি ভি টমাস বললেন, এই যদি সি-পি-এম-এর মনোভাব হয় তাহলে তাঁদের উচিত "যুক্তফ্রণ্টের নামে এই ছলনা" ছেড়ে দেওয়া।

সি-পি-আই সদস্যদের এই সমালোচনার উত্তরেই শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ও শ্রীগোপালন তাঁদের যুক্ত বিবৃতি দিলেন গত ৭ জুলাই তারিখে। ৮ জুলাই তারিখে মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকায় তাঁদের এই বিবৃতির যে বয়ান বেরোল তাতে দেখা গেল, তাঁরা বলেছেন, "আমরা যাতে ভিতর থেকে সংবিধান ভাঙতে পারি" (ইংরেজীতে "ব্রেক" কথাটি ব্যবহার করা হয়) "সেভাবে সংবিধান প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণ ব্যবহার করাই আমাদের উদ্দেশ্য। যুক্তফ্রণ্টের অন্যান্য দল এই নীতি সমর্থন করে কিনা তাতে আমরা কিছু পরোয়া করি না।"

এই যুক্ত বিবৃতি বেরোন মাত্র যেন আগুনে ঘি পড়ল। বিতর্কটা আর সি-পি-আই—সি-পি-এম চৌহদ্দির মধ্যে রইল না। প্রথম প্রতিক্রিয়া এল তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম করুণানিধির কাছ থেকে। তিনি এই বিবৃতির সমালোচনা করে বললেন, সংবিধান ভাঙার কথা বলার অধিকার সি-পি-এম নেতাদের নেই। তিনি আরও বললেন, সরকার নিজেই যদি হিংসার পথ সমর্থন করেন তাহলে সেটা হবে ভস্মাসুরকে বর দেওয়ার সামিল।

ঠিক এই সময়েই বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হচ্ছিল। সেখানে এই যুক্ত বিবৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বললেন, সরকারের উচিত এই বিবৃতির উপর গভীর গুরুত্ব আরোপ করা। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীচাবনও এই বিবৃতি সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন।

ইতিমধ্যে শ্রী এ কে গোপালন ঐ যুক্ত বিবৃতির সমর্থন করে বিবৃতি দিলেন। তিনি বললেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভাঙার জন্যই কংগ্রেস ঐ আইনের সুযোগ গ্রহণ করার কথা ঘোষণা করেছিল। সেদিন কংগ্রেস যদি তা করতে পেরে থাকে তাহলে আজ সি-পি-এম সেই একই কথা বললে দোষ কি হল? তিনি আরও বললেন যে, সংবিধানের নামে শপথ গ্রহণ করে সংবিধান বদল করা যদি অন্যায় হয় তাহলে এতবার সংবিধান সংশোধন করা হত না।

পরে লোকসভায় এই নিয়ে যখন ঝড় উঠল তখন স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবিদ্যাচরণ শুক্ল বললেন, ঐ যুক্ত বিবৃতি ‘সংবিধানের মূল নীতির বিরোধী এবং এতে যে তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়েছে তাতে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে যায়।" সি-পি-এম-এর পক্ষ থেকে লোক-সভায় বলা হল, পার্টির নেতাদের বিবৃতির যে বয়ান খবরের কাগজে বেরিয়েছে সেটি ঠিক নয়। পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রামাণ্য বয়ান উপস্থিত করা হল।

লোকসভায় জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের বক্তারা তাঁদের সমালোচনায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকেও যুক্ত করলেন। উভয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবীও উঠল। সরকারপক্ষ সেই দাবী অগ্রাহ্য করে বললেন, এই বিবৃতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে নয়াদিল্লীতে ডেকে পাঠাবেন।

ঐ তলব ইতিমধ্যে ত্রিবান্দ্রমে এসে পেঁছেছে। কিন্তু কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁর দিল্লীতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকার কি করবেন? তাঁরা কি বিষয়টি অনুসরণ করবেন, না, এখানেই ব্যাপারটা চাপা পড়বে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে, হাওয়া যতদূর বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় না যে, ভারত সরকার এখনই এই বিষয়ে কোন চরম পন্থা অবলম্বন করবেন।

আর একজন কেনেডির দুর্ভাগ্য

যে দুর্ভাগ্য, বিপর্যয়, দুর্ঘটনা আমেরিকার কেনেডি পরিবারের নিত্যসঙ্গী সেই ঐতিহাসিক অভিশাপ, এবার মনে হচ্ছে, সর্বকনিষ্ঠ ও একমাত্র জীবিত কেনেডি ভ্রাতা এডওয়ার্ড মুর কেনেডি ওরফে "টেড"কে আঘাত করল। "আমাদের এক ভাই গেলে আর এক ভাই আসবে, দাদা জো-র জায়গায় এসেছিলাম আমি, আমি গেলে আসবে ববি (রবার্ট কেনেডি) আর ববি-র পর আছে টেড"—জন ফিটজেরাল্ড কেনেডির এই কথার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই যেন ই-এম-কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে মার্কিন কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটিক দলের চীফ হুইপ পদে দলের প্রবীণ নেতা রাসেল লংকে হারিয়ে জয়ী হওয়ার পর থেকেই ৩৬ বৎসর বয়স্ক এডওয়ার্ড কেনেডি আমেরিকার রাজনৈতিক আকাশে আর একটি উদীয়মান তারকারূপে

গণ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি একটি রহস্যজনক মোটর দুর্ঘটনা সেই উদীয়মান তারকাটির উপর অনিশ্চয়তার কৃষ্ণ ছায়া ফেলেছে এবং হোয়াইট হাউসে কেনেডি পরিবারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অনেক ম্লান করে দিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস্ রাজ্যে বোস্টন বন্দর থেকে কিছু দূরে ছোট বড় কতকগুলি দ্বীপ আছে। গ্রীষ্মের সময় ছুটি কাটাতে, রোদ পোহাতে, নৌকা বাইচ খেলতে অনেক আমেরিকান এইসব দ্বীপে আসেন। এইরকম পাশাপাশি লাগোয়া দুটি দ্বীপ—একটির নাম মার্থাজ ভাইনইয়ার্ড আর একটির নাম চাপাকুইডিক। দুই দ্বীপের মাঝখানে সংকীর্ণ একটি সমুদ্রের খাড়ি। প্রথমটিই আকারে বড় এবং ঐ দ্বীপের প্রধান শহর এডগারটাউন সেখানে অবস্থিত। এডগারটাউনে সেদিন ছিল পালতোলা নৌকার রেস। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক একজন মার্কিন সিনেটর এলেন ঐ নৌকা বাইচে যোগ দিতে। এই নৌকা বাইচ দেখতে যাঁরা সেখানে উপস্থিত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সিনেটরের পূর্বপরিচিতা ২৮ বছর বয়সের এক সুন্দরী, বুদ্ধিমতী তরুণী। এক শুক্রবার রাত্রে চাপাকুইডিক দ্বীপে একটি পার্টিতে দেখা হল সিনেটরের সঙ্গে সেই তরুণীর। মধ্যরাত্রি নাগাদ কোন এক সময়ে সেই সিনেটর ও তাঁর বান্ধবী একটি ওল্ডসমোবিল গাড়ীতে বেরিয়ে পড়লেন। দুজনই ফিরবেন এডগারটাউনে—নিজের নিজের হোটেলে। সিনেটর গাড়ী চালাচ্ছিলেন। এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাবার পথে ফেরি পার হতে হবে। কিন্তু যেভাবেই হোক, গাড়ী চলে গেল ভুল পথে, পাকা সড়ক ছেড়ে কাঁচা রাস্তা ধরে। একটা কাঠের পুলের উপর উঠতে গিয়ে গাড়ী বেসামাল হয়ে পড়ে গেল নোনা জলের পুকুরে। সিনেটর কোনক্রমে গাড়ী থেকে উঠলেন, কিন্তু তাঁর বান্ধবী ডুবে মারা গেলেন। সেই রাত্রে সেখানকার লোকজন অবশ্য কিছুই টের পান নি। কেননা, দুর্ঘটনার পরই সিনেটর ঘটনাস্থল থেকে প্রস্থান করেছিলেন কাউকে কিছু না জানিয়ে। টের পাওয়া গেল পরদিন সকালে যখন স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ এল, দমকলের লোক এলো, ডুবুরি নামল এবং লাশসহ মোটর গাড়ী উদ্ধার হল।

এমনিতে ঘটনাটা নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ার কারণ ছিল না। শুক্রবার বেশী রাত্রের পার্টি, সেই পার্টির শেষে বান্ধবী নিয়ে গাড়ীতে ফেরা এবং ফেরার পথে দুর্ঘটনায় পড়া—এ আমেরিকার আকচারই হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন একজন সিনেটর। এবং গাড়ীর নম্বর প্লেটেই প্রকাশ পেল, কেনেডি পরিবারের অনুরাগিণী, ডেমোক্র্যাটিক দলের কর্মী, রবার্ট কেনেডির সহকারিণী মেরি জো কোপেকনের মৃত্যুর জন্য দায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি।

এই দুর্ঘটনাই সম্ভবত কাল হল। এডগারটাউনের আদালতের বিচারে এডওয়ার্ড কেনেডি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এবং তাঁর দুমাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে। জেলের মেয়াদ অবশ্য তাঁকে খাটতে হবে না—যদি না ভবিষ্যতে তিনি অনুরূপ কোন অপরাধ আবার না করেন। বিচারক আসামীর মর্যাদা ও তাঁর অতীত আচরণ বিচার করে কারাদণ্ডের আদেশ মুলতুবী রেখেছেন।

কিন্তু জেলে যেতে না হলেও এই একটি কালো দাগ তাঁর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক জীবনকে কলঙ্কিত করবে বলে মনে হচ্ছে।

যে কারণে টেড কেনেডি আইনের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন শুধু সেই কারণের জন্যই নয়, এই দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকটি সন্দেহজনক পরিস্থিতির জন্যও তাঁর রাজনৈতিক জীবনে দাগ লাগবে। কেনেডি দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর না দিয়ে পরের দিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন কেন? কেনেডি তাঁর কৈফিয়তে বলেছেন, তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি যদি এত ক্লান্ত ও বিচলিত হয়ে থাকেন তাহলে তিনি ঐ দুর্ঘটনাস্থল থেকে যেখানে পার্টি হচ্ছিল সেখানে গেলেন কি করে? কেনেডি বলেছেন, ঐ মাইলখানেক পথ তিনি হেঁটে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কি তিনি ঐ দুর্ঘটনার কথা বলেছিলেন? যদি বলে থাকেন তাহলে তাঁরাই বা পুলিশে খবর দেন নি কেন? তারপর অত রাত্রে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর, কেনেডি এডগারটাউনে তাঁর হোটেলে ফিরলেন কি করে? কেউ কি তাঁকে নৌকায় পার করে দিয়ে

এসেছিলেন? গাড়ীতে কি শুধু কেনেডি ও মিস কোপেকনেই ছিলেন, না, আরও কেউ ছিলেন? তৃতীয় যদি আর কেউ না থাকবেন তাহলে উদ্ধার করা গাড়ীর ভিতর থেকে আর একজন মহিলার ব্যাগ পাওয়া গেল কি করে? তাছাড়া, প্রশ্ন হচ্ছে, যে পাকা সড়ক সোজা ফেরিঘাটের দিকে এগিয়ে গেছে সেই রাস্তা ছেড়ে টেড কেনেডি কাঁচা রাস্তায় নেমেছিলেন কেন? এইসব অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট তাঁর অচেনা থাকার কথা নয়। 'নিউজ উইক' পত্রিকায় লেখা হয়েছে, টেড কেনেডির অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যাস সম্পর্কে তাঁর বন্ধুরা ইদানীং আশঙ্কা প্রকাশ করছিলেন। আরও লেখা হয়েছে যে, সুন্দরী তরুণীদের প্রতি তাঁর আকর্ষণের কথাও সকলেই জানেন। প্রশ্ন উঠেছে, চাপাকুইডিক দ্বীপের পার্টিতে টেড-এর স্ত্রী জোয়ান তাঁর সঙ্গে ছিলেন না কেন? টেড বলেছেন, তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। (পরে জানা গেছে, জোয়ান সন্তানসম্ভবা।) প্রশ্ন উঠেছে, টেড কেনেডির বিরুদ্ধে অসতর্কভাবে মোটর চালিয়ে একজনের মৃত্যু ঘটাবার অভিযোগ দায়ের করার চেষ্টা না করে শুধু দুর্ঘটনার খবর সময়মত না জানাবার অপেক্ষাকৃত হাল্কা অভিযোগ আনা হল কেন? ম্যাসাচুসেটস্ কেনেডি পরিবারের নিজের এলাকা, সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডির নিজের নির্বাচন কেন্দ্র। ম্যাসাচুসেটস্ রাজ্যের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের অনেকেই কেনেডি পরিবারের অনুগৃহীত। সেই জন্যই কি টেড কেনেডি অল্পে পার হয়ে গেলেন?

তাঁর বিরুদ্ধে আদালতের রায় প্রকাশিত হবার পরই সিনেটর কেনেডি টেলিভিসনে বলেছেন যে, তাঁর সঙ্গে মিস কোপেকনের অবৈধ সম্পর্কের রটনা অসত্য এবং তিনি মদের ঘোরে গাড়ী চালাচ্ছিলেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে, এই ঘটনার পর তাঁর সিনেট থেকে ইস্তফা দেওয়ার যে দাবী উঠেছে তার কারণ তিনি উপলব্ধি করছেন। এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য তাঁর নির্বাচকমন্ডলীর সাহায্য প্রার্থনা করে তিনি বলেছেন, 'আমার প্রার্থনা এই যে, সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সাহস যেন আমার হয়। আমি আশা করব যে, এই মর্মান্তিক ঘটনাকে পিছনে ফেলে আমি আমার রাজ্য ও মনুষ্যজাতির জন্য আরও কিছু অবদান রাখতে সমর্থ হব।'

যে বিচারক সিনেটর কেনেডিকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন তিনি তাঁর রায়ে বলেছেন, "আমরা এখানে তাঁকে যে শাস্তি দিতে পারব, তার চেয়ে অনেক বেশী শাস্তি পেয়েছেন ও পাবেন।" হোয়াইট হাউসে কেনেডি পরিবারের পুনর্প্রতিষ্ঠানের ভেঙে-যাওয়া স্বপ্নই হবে সম্ভবত টেড কেনেডির কঠিনতম শাস্তি।

●

ইউরোপের কতকগুলি রাজবংশীয় অভিজাত পরিবার গত ১৬টি প্রজন্ম ধরে একটি বিচিত্র ব্যাধিতে ভুগছেন। যাঁরা এই ব্যাধির শিকার হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন জীবিত ইউরোপীয় অভিজাত ব্যক্তিও আছেন। এই রোগের নাম 'পরফাইরিয়া'। সূর্যালোক সম্পর্কে গায়ের চামড়ার অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা থেকে শুরু করে প্রচণ্ড পেটের যন্ত্রণা, শরীরের অংগপ্রত্যংগের অবশতা ও মস্তিষ্কবিকার পর্যন্ত এই রোগের লক্ষণ হতে পারে। ইউরোপের রাজপরিবারগুলি এই ব্যাধি পেয়েছিলেন 'মেরি, কুইন অব স্কটস'এর কাছ থেকে।

এই খবর দিয়েছেন ডাঃ ম্যাকআলপাইন ও তাঁর পুত্র ডাঃ রিচার্ড হান্টার। 'বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নাল'-এ এই দুজন মানসিক রোগের চিকিৎসকদের ঐ কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। (সাপ্তাহিক 'টাইম' থেকে উদ্ধৃত।)

রাজ্য-নৈরাজ্য

পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুই সম্ভবত এই রাজ্যে সবচেয়ে উদ্বিগ্ন, বিড়ম্বিত এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি। স্বরাষ্ট্র দফতরের যেমন মহিমা আছে, তার ঝামেলাও অনেক। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা এবং শান্তিরক্ষার দায়িত্ব তাঁর। তিনি তাঁর বিরাট পুলিশ বাহিনী দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করেন। এ বছরে বাজেটে তিনি পুলিশ-সিপাই গয়রহ রক্ষীবাহিনীর জন্য কুড়ি কোটি টাকার ব্যয়বরাদ্দ পাশ করিয়েছেন। সুতরাং এদের ভরণ-পোষণের খরচ যেমন বাড়ছে এদের দায়-দায়িত্বও সমানভাবেই বাড়বে, এটা আশা করা খুব অযৌক্তিক নয়।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, পুলিশের জন্য খরচ বাড়লেও সে তুলনায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকছে না। গত কয়েক সপ্তাহে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় জোত-জমি নিয়ে মারাত্মক রকম সংঘর্ষ হয়ে গেছে। চব্বিশ পরগণার হাড়োয়া, মধুসূদনপুর, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তী. ওদিকে উত্তরবঙ্গের কাঁকি. ইসলামপুর, রায়গঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় এত প্রচন্ড রকম মারামারি এবং খুন-খারাবি হয়ে গেছে যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিধানসভায় এর জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। কে জোতদার, কে কৃষক, কে প্রগতিশীল, কে প্রতিক্রিয়াশীল এ-ধরণের প্রশ্ন নিয়ে চুলচেরা বিচারে না গিয়েও বলা যায় যে, সংঘর্ষে মানুষের প্রাণহানি কোনো সরকার বা তার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাধারণ ঘটনা হিসাবে নিতে পারেন না। যে-সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার চেষ্টা করছেন এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলো ৩২ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে যা সমাধানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার দায়িত্ব অসংগঠিত, উত্তেজিত এবং বিপথে চালিত জনতার দ্বারা পালনের আশা করা যায় না। তার ফলে রামের অপরাধে শ্যাম ঠেঙানি খাচ্ছে। ছোট চাষীর জমির উপর উদ্বাস্তুরা ভাগ বসাতে গিয়ে কাঁকিতে তো একটা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাই হয়ে গেল। পাথরপ্রতিমা এলাকায় জোতদার-কৃষকের সংঘর্ষের পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এগুলো হত্যাকান্ড ছাড়া কিছু নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এ-ধরণের ঘটনা চলতে থাকলে পুলিশকে অবাধ ক্ষমতা দেবার কথা চিন্তা করতে হবে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই উক্তি থেকেই বোঝা যায়, ঘটনা কতদূর গড়িয়েছে। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য জনতাকে ভুল পথে চালিত করছে। জনতার ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য সরকার যে-সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিংবা করতে যাচ্ছেন, এই ধরনের উন্মত্ততা এবং বিপ্লবীয়ানা তা প্রকারান্তরে ব্যর্থ করে দেয়। তাতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি বাড়ে এবং জনসাধারণের মনে আসে ভীতি ও হতাশা।

ঘটনা গড়াতে গড়াতে এমন অবস্থায় এসে পোঁছেচে যে আইন ও শৃঙ্খলারক্ষাকারী পুলিশ দলের মধ্যেও দেখা দিয়েছে চরম ঔদ্ধত্য ও কর্তব্যচ্যুতি। গত সপ্তাহে একদল পুলিশ যেভাবে সমস্ত কান্ডজ্ঞান হারিয়ে বিধানসভা ভবনের উপর হামলা করেছিল তার বর্বরতা তুলনারহিত। পুলিশ অনেক কুকর্মের জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেছে। কিন্তু এমন গুন্ডামী পুলিশের কলঙ্কিত ইতিহাসেও নজীরবিহীন। আমরা ভেবেই পাই না যে, বিধানসভা ভবনের উপর হামলা চালাবার এই জঘন্য চক্রান্ত কার মাথায় এলো। পুলিশের মত্ততা দেখে স্পীকার মহোদয়কে নিরাপত্তার জন্য কক্ষ ছেড়ে জানালা দিয়ে স্থানত্যাগ করতে হয়। এম-এল-এ-দেরও বাদ দেওয়া হয়নি। প্রভূত সরকারী সম্পত্তি এই পুলিশনামধারী গুন্ডাদের দ্বারা নষ্ট হয়েছে। আমরা এই ঘটনায় স্তম্ভিত। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি মানুষই পুলিশের এই আচরণে গভীর উদ্বেগ বোধ করবেন। আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য জনসাধারণের একাংশের মধ্যে যে-প্রবণতা দেখা দিয়েছে পুলিশবাহিনীর মধ্যে তার অশুভ প্রতিক্রিয়া যে এমন ভয়াবহ আকার নেবে তা কেউ আশঙ্কা করতে পারেনি। এটা গভীর চিন্তার কথা। কোনো সরকারই পুলিশের এই বিদ্রোহী মনোভাব বরদাস্ত করতে পারে না। বিরোধী দলের নেতা শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় একে 'বিদ্রোহ' বলেই আখ্যা দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন। পুলিশবাহিনীকে কে বা কারা উস্কানি দিয়ে এই বর্বর আচরণে লিপ্ত করেছিল তাদের খুঁজে বের করতে হবে। গোয়েন্দা দফতর আগে থাকতে সরকারকে এ সম্পর্কে কেন অবহিত করেনি তাও রহস্যাচ্ছন্ন। সরকারকে যদি রাজ্য চালাতে হয় তবে এই নৈরাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নতুবা দেশের সমূহ বিপদ।

—কুলটি-বরাকর-বরাকর - কল্যাণেশ্বরী —এ বাবু! জলদি। জলদি!

যান্ত্রিক একটা শব্দ ওঠে-ক্যারক্যারে গলার হাঁকটা একনাগাড়ে চলেছে—নিরামতপুর-লছিপুর-কুলটি!

মাঝে মাঝে ঘন্টিটা বাজায় আর চীৎকার করে চলে। ভিড়ের মধ্যে দেখা যায় একটা ছেলে বাদুড়ের মত বাসের রড ধরে একটা পা কোনরকমে পাদানিতে ঠেকিয়ে ক্রমাগত চীৎকার করে চলেছে। ঠাসবোঝাই বাস। যাত্রীদের দাঁড়াবার জায়গা নেই। তবু ছেলেটা প্রতি স্টপেজ থেকেই যাত্রী তুলে ঠিক ভেতরে চালান করছে।

—এ বাবু, 'থোড়া হটিয়ে'। এ মা—থোড়া উধার যা! কুলটি—অ্যা…চলো!

—কোথায় তুলবি অ্যাই ছোড়া? কোন যাত্রী ধমকে ওঠে। অবশ্য ছেলেটার সেদিকে কান নেই। কান দেবার প্রয়োজন বোধ করে না। গাড়ির গতিবেগে ধনুকের মত বেঁকে গিয়েও সে সমানে চীৎকার করছে।

—ধানবাদ-রামগড়-চাষনালা-রাঁচী!

কনডাকটার ভিতরে টিকিট কাটছিল, ওই সব জায়গার নাম করতে দেখে সে ছোঁড়াটাকে সাবধান করে।

এ বাস ওদিকে যাবে না। তবু ছোঁড়া জানে এইবাসে বরাকরে নেমে নদী পার হয়ে গেলে চিরকুন্ডা থেকে ওদিকে যাবার গাড়ি মিলবে। তাই সব একাকার করে দেয় সে।

গলার শির ফুলে ওঠে বেদম হাঁকতে হাঁকতে। জি টি রোড ধরে ছুটে চলেছে গাড়িটা। সাঁ সাঁ করে মাল বোঝাই লরী প্রাইভেট কার যাতায়াত করছে। সাইড দিতে হবে। টং টং করে ঘন্টা বাজিয়ে ড্রাইভারকে হুসিয়ার করে দেয়। ধরাবাঁধা তাকে বরাকরে পৌঁছতে হবে। এক মিনিট টাইমের মধ্যে যাত্রী তোলা-নামা করে দেরী হলেই বিপদ। ফাইন দাও। লাভের গুড় পিপড়েয় খেয়ে যাবে। ছোড়াটা এরই মধ্যে এসব শিখে গেছে।

পিছনে ফেলে আসছে চড়াই উৎরাই। পিছনের গাড়ি দেখা যায় না।…ওরা যাত্রীই তুলছে।

হঠাৎ ছোঁড়াটা চলতি বাসের পিছনের সিঁড়ি দিয়ে বাসের ছাদে উঠে পিছনে দেখে চীৎকার করে।

—এ বাগা, বাগালো ইয়ার। পিছুবালা আগিয়া!

পিছনের গাড়ি এসে গেছে। যাত্রী তোলা বন্ধ রেখে ড্রাইভার গাড়ির গতি বাড়ায়। শোঁ শোঁ শব্দে উৎরাই এর বুকে নেমে চলেছে গাড়িটা মসৃণ পিচের রাস্তা ধরে। সামনের চড়াই-এর উপর ছায়াসবুজ কুলটির শিল্পনগরী।…

—লে বে! বরাকরে এসে কয়েক মিনিট অবসর মেলে। গাড়ি ছেড়ে ওরা ঢুকেছে চায়ের দোকানে।

—এ টৌনিয়া! লে-

ছোড়াটার আসল নাম ওই ড্রাইভার রূপলালও জানে না। কনডাকটার পেয়ারী-লালই কোত্থেকে জুটিয়েছে ওকে। ওরই চেনা-জানা বোধহয়। খেতে পাচ্ছিল না—আস্তানা নেই। তাই ওকে দয়া করে এনেছে এই বাসের মালিক বলে কয়ে।

পুরো একজন কনডাকটার রাখতে গেলে তাতে অনেক লাগবে। এখানে ডেলি রেট দু'টাকা আর জলপানির পয়সা এই কুড়োনো প্যাসেঞ্জার থেকেই জুটে যাবে। নামও নেই। এখন পরিণত হয়েছে সে টৌনিয়াতেই। অর্থাৎ ট্রেণিং কনডাকটার।

ক'দিনেই ছেলেটার মুখ-চোখের ছিরি বদলে গেছে। খেতে পেয়েছে তাই সতেজ হয়ে উঠেছে এখন। মুখচোখে বোল ফুটেছে। টৌনিয়াও চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে আর আলতো করে কামড় বসায় একটা সিঙাড়ায়।

রূপসিং ওকে শুধোয়—এ লৌন্ডা আউর চায় পিয়েগা?

ছোড়াটা জানে ওই কথাটার অর্থ। রূপসিং যেন তাকে একটু বেশীই পেয়ার করছে। ছোঁড়াটা ওর দিকে চেয়ে হাসল। প্রথম প্রথম রাগই হতো মন্টার। পরে দেখেছে তার মত অনেক টৌনিয়াই আসান-সোল বাস ষ্ট্যান্ডে বেকার ঘুরছে! পেটের দায়েই এই নামটাকে সহ্য করে। তাছাড়া কেমন একটু মজাই লাগে। রূপসিং এর কথায় জবাব দিল টৌনিয়া,

—চায় নেই—পিছু রোটি খায়ে গা!

হাসছে রূপসিং—বহোৎ বদমাস তুম! ঠিক হ্যায়!

কল্যাণেশ্বরী! আবার হাঁকতে থাকে—মায়ি থান! চলিয়ে বাবু!

সারাদিন, সেই ভোর থেকে চলে। দুপাশ তার চেনা হয়ে গেছে।

অর্জুন মহুয়া গাছের মাথায় ভোরের আঁধার জমে থাকে—ঠান্ডা হাওয়ায় ঘুম আসে, টৌনিয়া বের হয়। দুপুরের প্রখর রোদে এই পথের রূপ বদলে যায়। গরমে পিচ গলে টায়ারে লাগে। চট চট শব্দ ওঠে। ওদের ট্রিপ কিছুক্ষণের জন্যে থামে। কল্যাণেশ্বরীর ছায়ানামা ঝরণার জলেই নেমে পড়ে।…ধুলো-মবিল গ্রিজের গন্ধমাখা দেহটাকে সাফ করার চেষ্টা করে। খিদেও লেগেছে।

—লে বে! রূপসিংই খাওয়াচ্ছে তাকে।

রুটি তড়কা আর কাঁচা পেয়াজের কিছুটা ঝাল চাটনী। তাই অমৃত বোধ হয়। আসানসোলের রেলপারের ঝুপড়িটার কথা মনে পড়ে। কোনরকমে রোজের টাকার কিছুটা ধরে দেয় একমাত্র বোন মুনিয়াকে …রাতের খানা বানাবে।

ভাই-বোনের আশ্রয় ওই ঝুপড়িই। বাবাকে মনে পড়ে না। ছিল কিনা জানে না। মা ছিল।…মনে পড়তো মা রেল সাইডিংএ মাঝে মাঝে কয়লা আনতে যেত। মন্টা তখন ছোট—বোন মুনিয়াও।

খিদের জ্বালায় কাঁদতো সে।…কোনদিন জুটতো দুখানা পোড়া রুটি। কোনদিন ষ্টেশনের দিকে চলে আসতো ভাই-বোনে, না হয় বাস-রাস্তার ধারে ফলের গুদামের দিকে।…ঝড়তি পড়তি যা পেতো পচা আম-কাঁটালের ভূতি তাই চিবোতো।

আজ তবু খেতে পাচ্ছে!…রুটিটার স্বাদ বেশ মিষ্টি। তড়কার প্লেটটা চাটছে।

…জলও এখানকার মিষ্টি। কালো পাথরের বুক চিরে ঝর্ণাটা বয়ে চলেছে ঝর ঝর শব্দে। মন্দিরের একদিকে অনেক বাড়ি উঠেছে। ভিড় বেড়েছে যাত্রীদের। রূপ বদলেছে জায়গাটার।

বটগাছের নীচে বাঁধানো চত্বরে ছায়া-নামা জায়গায় রূপসিং শুয়ে আছে। …টৌনিয়ার এই কাজটাও বাড়তি। তবু কিছু উপরি বকশিস জোটে।

—জোরসে! অ্যাই লৌন্ডা!

ওর পিঠ গা মালিশ করছে ছেলেটা। সামনের পাহাড়গুলোয় ছায়া নেমেছে। …শির শির হাওয়া ভেসে আসে। ওদিকে দেখে মেয়েরা পুজো দিয়ে বের হচ্ছে মন্দির থেকে। সঙ্গে ছেলে-মেয়েও রয়েছে। ছোড়াটার হারানো মায়ের কথা মনে পড়ে।

দুনিয়ায় কিছুই তার নেই। মা-বাবা অমনি কেউ। ওই বোনটাই তার সব। মুনিয়াকে একা ফেলে রেখে আসতে মন চায় না। পাশের ঝুপড়ির শিউমামাকেই বলে আসে। পয়সা-কড়ি কিছু জমালেই ওরও সাদী দিয়ে দেবে। বাজনা বাজবে রোশনাই জ্বলবে। নোতুন শাড়ি পরে নিজের ঘরে চলে যাবে মুনিয়া। মা থাকলে কেমন হতো! কিন্তু মাও নেই।

ক বছর আগেই রেল ইস্টিশানের কোন এক খালাসির সঙ্গে কোথায় পালিয়ে গেছে। থুঃ…একচাপ থুথু উঠে আসে কথাটা ভাবলে। গা ঘুলিয়ে যায়। মা!…তাদের দুই ভাই-বোনকে ফেলে সে নিজে পালিয়ে গেল। তাজ্জব। ঝরনার ধারে বসে সেই মেয়েটি তার ছেলে-মেয়েকে ফল সন্দেশ খেতে দিচ্ছে। ওদের দিকে চেয়ে থাকে মন্টা। তার মা অমনি করে কোনদিনই খেতে দেয়নি। কেবল গালাগালই দিয়েছে যাচ্ছেতাই বলে।

থুঃ! থুথুটা ফেলে মন্টা সর্দারজীর বিশাল দেহের মাংসগুলোকে ময়দার মত ডলতে থাকে। মা!…ওটা যেন রাম-শ্যাম মন্টার মতই একটা নাম। কোন অনুভূতিই নেই ওই সম্বন্ধে তার মনে। আছে শুধু-মাত্র বিরক্তি আর ঘৃণা।

বৈকালের ছায়া নামছে। আবার উঠল তারা। গদিটা বাসের সামনে তুলে দিয়ে আবার চীৎকার সুরু করেছে সে। বরাকর-কুলটি-নিয়ামতপুর।

সন্ধ্যা নামছে। দূরে দিগন্তের এদিক-ওদিকে আলো জ্বলে ওঠে, কোন কোলি-য়ারীর আলো। দূরে মাইথান [illegible] নীলাভ জোরালো আলোগুলো জ্বলে [illegible]

দূরে আকাশের বুকে সঞ্চরণশীল টুকরো মেঘগুলো রঙীন হয়ে ওঠে- বার্ণপুরের লোহা কারখানার স্ল্যাগব্যাঙ্কের আভায়। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মণ্টা ঝুপড়ির দিকে ফিরছে। ক'মাস পার হয়ে বছর ঘুরতে চলল। মণ্টা ইতিমধ্যে বেশ কিছু জমিয়েছে, ...মনে মনে আশা করে বোনটার বিয়ে দিয়ে দেবে সে। পাত্রও জুটবে। তার চেনাজানা কোন টেনিয়াকেই ধরবে।...

সেও আর ক বছর পর পুরোপুরি কনডাকটার হবে পিয়ারীলালের মত। মাসে নিদেন বাইরের রোজকার নিয়ে দুশো টাকা কামাই করবে।

ভদ্দর লোক!...টেনিয়া নাম ছেড়ে ভদ্দর লোকই হবে তখন।

দেখেছে বাসে-রাস্তায় ছোঁড়া-ছুঁড়িদের কান্ড। আর পোষাকও তেমনি ওদের।

বুক, পিঠ, পেট সবই দেখানোর জন্যই যেন ওই জামা শাড়ি পরা।

অ্যাই মণ্টা। মণ্টা কার ডাকে দাঁড়াল। রেলব্রিজের নীচেই ওদের আস্তানা। রোদের তাপ আর বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচা যায় এখানে। ওরই মত অনেকেই এদিকে আস্তানা গেড়েছে।

—একটা বিড়ি দেনা রে?

...মণ্টা বিড়ি খায় না। সরদারজী বলে —কালজা জবল যায় উস্‌সে!...

তাই ওদের জবাব দেয় মণ্টা—নাই! ওরা হাসছে—টেনিয়া বন গিয়া। দারু পিতা হ্যায়। বিড়ি তো থোড়াই যে? আউর রাণ্ডীবাজী করতা হ্যায়!

মণ্টা চটে ওঠে। তবু চুপ করেই সরে এল। ওদের চটাতে চায় না সে।

ঝুপড়ির এক কোণে মাটিটা খুঁড়ে গর্তমত করা, তার নীচে একটা মুখবন্ধ

জুতো হবে
ছিমছাম ও
আরামভরা
এই যাঁরা চান
তাঁদের জন্য
গোল্ডিপ ক্যাজুয়াল
২৮.৯৫
আপনি কি চান জুতো হবে ছিমছাম ছিপছিপে ও আরামভরা?
আপনি কি চান আপনার জুতোর নকশা আর উপকরণ
হবে পুরুষোচিত? তাহলে এই দেখুন আপনার মনের মতো
জুতো—আপনার রুচির কথা মনে রেখেই এরা
তৈরি। এদের গঠন বলিষ্ঠ, নির্মাণ বিজ্ঞানসম্মত,
কারিগরি নিপুণ ও কুশলী। আগাগোড়া বাছাই
উপকরণ: অভিনব ওপরচামড়া, মসৃণ সুখতলা,
নমনীয় তলি, আর এমন ধাঁচের গোড়ালি
যা দৃঢ় পদক্ষেপের সহায়। আর, আরামনিয়ম
নির্মাণপ্রণালী, যার ফলে দীর্ঘভ্রমণেও
পথশ্রম মনে হয় তুচ্ছ, পথচলা হয়ে উঠে
উপভোগ্য। আজই আসুন বাটার দোকানে—
নিজেকে উপহার দিন একজোড়া।
গোল্ডিপ ডার্বি
২৮.৯৫
Bata
গোল্ডিপ
২৬.৯৫
ওয়াকমাস্টার
ডার্বি ৩৪.৯৫
ওয়াকমাস্টার
ক্যাজুয়াল ৩৪.৯৫
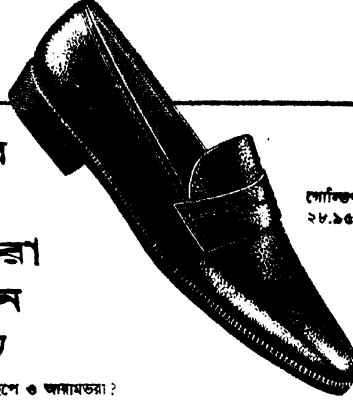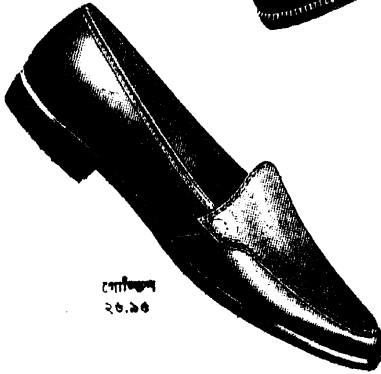
ভাঁড়ে তার সওদাগুলো রাখে। সিকি আর আধুলিতে ভরে উঠেছে সেটা, আর একটা বড় ভাঁড়ই আনবে মণ্টা।... হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ফিরে চাইল। ঢুকছে মুনিয়া। ওর দেহের বাঁধন এরই মধ্যে নিটোল হয়ে উঠেছে। পরনে রঙীন শাড়ি আর জামাটাকে অনেক ছোটই বোধ হয়। হাঁপাচ্ছে মেয়েটা। বোধহয় অন্য কোথাও ছিল। হঠাৎ খেয়াল হয়েছে দাদার ফেরার সময় হয়েছে তাই দৌড়ে এসেছে।

—কোথায় ছিলি এতক্ষণ! এই রাতে!

মেয়েটা একটু ঘাবড়ে যায়। ইদানীং সেও বিব্রত বোধ করে। ভজুয়ার দোকানে রুটি আনতে গিয়েছিল। ভজুয়ার ওখানে অনেক ট্রাক ড্রাইভার-কনডাক্টারও খেতে আসে। দোকানের লোকটা এমনিতে ভালবাসে তাকে। আটখানা রুটির জায়গায় দুখানা আরও বেশীই দেয়। মাটির ভাঁড়ে তরকারীর বদলে দুহাতা মাংস তুলে দিয়ে আড়ালে বলে—

—নিয়ে যা। মাংস আছে।

আবছা অন্ধকারে লোকটা ওর গাল টিপে দেয়।—অ্যাই! চটে ওঠে মুনিয়া। তবু যেন ভালো লাগে ওই গুরুচরণকে। ...তাগড়া যোয়ানটা তার কাছে কেঁচোর মত হয়ে যায়।

সন্ধ্যার পর ওদিকটা নির্জন হয়ে আসে। পিছনের অশথ গাছের নীচে থমথমে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে মুনিয়া। আজ রুটি মাংস দিয়ে ওই লোভী মানুষটা ওকে সবলে জড়িয়ে ধরেছিল। মুনিয়ার সারা শরীরে যেন ঝড় বয়। ওই নিবিড় স্পর্শে তার সব শক্তিটুকু হারিয়ে যায়। অন্ধকারে যেন তলিয়ে যাচ্ছে সে।

—অ্যাই! জবাব দে! কোথায় ছিলি? গর্জাচ্ছে মণ্টা।

মেয়েটা জানতো না তার দেহের কোষে কোষে এতো ক্ষুধা, এতো তৃষ্ণা লুকিয়ে আছে। নিজেকে সে মুক্ত করতে চায় নি—কি দুর্বার নেশার মদির স্পর্শে মেয়েটাও সব ভুলে গিয়েছিল।

—প্রচণ্ড একটা চড় মেরে বসে মণ্টা। মুনিয়ার দুচোখে জল নামে। ...এতক্ষণ যেন নেশার ঘোরেই ছিল সে। ওই প্রচণ্ড আঘাতে ছিটকে পড়ে মুনিয়ার হাত থেকে রুটি আর মাংসের ভাঁড়। ...মণ্টা হাঁপাচ্ছে।

—ফের যদি দেখেছি রাতে কোথায় গেছিস, খুন করে ফেলবো। নষ্টামি!...আবার বাহার করে সাজা হয়েছে। শাড়ি জামা পরা হয়েছে।

মুনিয়া কাঁদছে! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেয়েটা।

রাত কত জানে না। ঝুপড়ির কলরব চীৎকার মদ্যপ কণ্ঠের খিস্তীও থেমে গেছে। ক্লান্ত মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। তখনও মুনিয়া কাঁদছে। ওর মনে হয়, সব কিছু তার হারিয়ে গেছে। ...মা-বাবাকেও মনে পড়ে না। কোন সম্বন্ধও নেই। এতবড় দুনিয়াতে ওরা একা। মুনিয়াও দেখেছে বাইরের জগতকে। রেলপাড়ের কোয়ার্টারের মেয়েদের দেখেছে। আর সে কি পেয়েছে তাদের তুলনায়!

মনে হয়েছে তার কোথাও কোনো আশ্রয় আশা নেই। সারাটা দিন একাই পড়ে থাকে। এদিক ওদিক ঘোরে। ওই দোকানের গুরুচরণের কথাই মনে পড়ে। আজ মনে হয়, গুরুচরণই তার একমাত্র সান্ত্বনার ঠাঁই। কাঁদছে মেয়েটা।

—মুনিয়া!... মণ্টা মেরেধরে নিজেই দুঃখ পায়। খাওয়াও হয়নি। ও জানে না কত ভালবাসে ওই বোনটাকে। মণ্টার কাছে ওইই একমাত্র অবলম্বন। তাই ওর জন্য ভয় হয় মণ্টার। ও দেখেছে এই দুনিয়াকে। এখানের মানুষকে। ওদের পাল্লায় পড়লে মেয়েটা শেষ হয়ে যাবে। তার জন্য তাই ভাবনাতে পড়েছে মণ্টা। দুঃখও হয়। শুধোয় সে

—খাবি না?

—না! খিদে লাগেনি। মেয়েটা একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আজ তার কাছে এই প্রহারটা বেজেছে গভীরভাবে। শুধুমাত্র শাসনই করবার মালিক ও। টাকাপয়সা রোজকার করে আর তাকে দেয় সেই আট আনা হিসাবে। শাড়ি-জামা-ভালো তেল—একটু সাবান চেয়েও পায়নি। মণ্টা সব পয়সাই বাঁচাচ্ছে! দেখেছে মেয়েটা।

গুরুচরণই তাকে শাড়ি জামা দিয়েছে। কপালের পাশটা কেটে গেছে। বোকা মেয়েটা আজ কি বিচিত্র স্পর্শে যেন মেতে উঠেছে। মণ্টা ওর দিকে চাইল। বলে—দুনিয়াটাকে চিনিস নি মুনিয়া। মানুষ আর নাই। বিলকুল শয়তান বনে গেছে। তাই বলছিলাম হুঁশিয়ার থাকিস।

চুপ করেই রইল মুনিয়া। মণ্টার খিদে পেয়েছে। সারাদিন চীৎকার করেছে আর বাসের ধকল পুইয়েছে। এবার আর সানু নেই। গা-গতর টাটাচ্ছে। দেখেছে মণ্টা অন্য আর সকলকে। রূপসিং—পিয়ারীলাল আর দুএকটা বাসের টৌনিয়াদের। রাতে ফিরে, গাড়ি গ্যারাজ করে ওরা দেশী মদ আর মাংস নিয়ে বসে। গুপীকে দেখেছে রাতের বেলায় পড়ে থাকে কোন খারাপ পাড়ায়। তারই রসাল গল্প করে। বিচিত্র সেই জগতের সবকিছু আনন্দ আর উন্মাদনা থেকে মণ্টা নিজেকে সরিয়ে রেখেছে শুধুমাত্র ওই মেয়েটার জন্যই। ওর বিয়ে দেবে। নিজে কনডাক্টারী করে তবু কোন রুট করবার চেষ্টা করবে। আদিত্যও তাই ছিল। এককালের টৌনিয়া আজ বাসের মালিক। নিজেই চালায় সেই গাড়িটা মাথা উঁচু করে।

তার দিকেই চেয়ে দেখেছে মণ্টা! সেও অমান করে স্টিয়ারিং ধরবে।

খাবি না? গর্জায় মণ্টা; মাথা গরম হয়ে গেছে তার ওই মেয়েটার একগুঁয়েমিতে।

ওকে শাসন করতে ও পারবে না সে? মেয়েটা রুখে ওঠে।

—না! তুই খাগে ওই পিণ্ডি!

মণ্টা ওর মুখেই একটা থাপ্পড় কষেছে প্রচণ্ড জোরে! ...রাগ! রাগলেই তার মাথার ঠিক থাকে না। মেয়েটা কাঁদল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—ক্যা রে! এতনা দের কাহে?

ওরা ট্রিপ ছাড়বার জন্য তৈরী হয়েছে। ভোরের আলোয় সকালের আভাস জাগে। টৌনিয়া হাঁকছে—বরাকর—কুলটি আইয়ে...

বাদুড়ের মত ঝুলতে ঝুলতে হাঁকছে সে। মনটা ভালো নেই। কাল রাতে খেতে পারেনি। রূপলাল বলে—ক্যারে লৌণ্ডা, জোরসে চিল্লাও। খানা নেহি মিলা?

...গলাটা শুকিয়েছিল। বুকের ভেতর একটা ভয় আর সংকোচ মনে হয় মণ্টার। ও বোধহয় হেরেই যাবে, তবু শেষ চেষ্টা করবে সে। পিয়ারীই বলে চা খেতে খেতে বোনটা সাচ্চা না ঝুটা আছে রে! বল তাহলে আমিই সাদী করবো।

রূপ সিং দাড়িভরা মুখখানায় বিকট হাসির সরগোল তুলে পিয়ারীর কাঁধে একটা থাপ্পড় কসে—সচ্! অব তু বোনাই বন যা টৌনিয়াকো! জোরসে খানা। রোশনী লাগাও। মালিক কো বল দেগা—সাতরোজ ছুট্টি পুরা মাহিনা।

দুপুরের এই আলোটা যেন ঝকমক করছে গেরুয়াডাঙ্গায়। মণ্টা একথা ভাবেনি। এ তার সৌভাগ্যই, দুনিয়া বেইমান নয়। বোনের বিয়েতে সে খরচও করবে। রোশনী, রেলপারের ব্যাগপাইপও আনবে। মনটা অনেক হালকা হয়ে যায় তার। আজ ফুর্তিতে সে হাঁক দেয়।

—নিয়ামতপুর-কুলটি-বরাকর-মায়িথান! এ সিংজী। বাগালো, পিছুবালা আরাহি হ্যায়! জোরসে—অ্যাই য়ো—

গাড়িখানা ছুটে চলে, ওর গলায় আজ সুর ওঠে। বাদুড়ের মত ঝুলতে ঝুলতে সে সুর ধরে—বাহারো ফুল বর্ষাও।

মণ্টা সন্ধ্যার পরই ঝুপড়ির দিকে ফেরে। আজ নিজেই রুটি মাংস আর আম কিনে এনেছে। কাল মুনিয়াকে মারার পর মনটা ভালো নেই। তাছাড়া আর ক'দিন। পিয়ারীলালের মুর্গাসোলের ঘরে চলে যাবে মুনিয়া। থমথমে আঁধার ছায়া-ঢাকা রেল কলোনীর পথ দিয়ে আসছে, আবছা অন্ধকারে দুটো মেয়েকে দেখা যায়। বোধহয় বেলাল্লাপনা করতেই পথে বের হয়েছে। হাসাহাসি করছে বিশ্রীভাবে দু' একটা ছেলের সঙ্গে।

ভদ্দরলোক! গজগজ করে মণ্টা। দুনিয়া শয়তানের ভিড়ে ভরে গেছে। কেবল দমকা পয়সা লুটছে আর মজা লুটছে। ঘেন্না ধরে গেছে তার। তার নাকি মা ছিল এককালে। কোন একটা লোকের সঙ্গে ভেগে গেল। ধ্যাত্তোর!

মণ্টা তাদের চেয়ে অনেক ভালো। মুনিয়ার বিয়ে দেবে। তারপর নিজেই কনডাকটারি করে বাস পারমিট দেখবে। সাহেবদের পায়েই ধরবে তবু একটা পারমিট তার চাইই।

ঝুপড়িতে অন্ধকার নেমেছে ...মুনিয়া। ...এ মুনিয়া!

চমকে ওঠে মণ্টা। দরজাটা খোলা। ঘরের মেজেটা কে তছনছ করে খুঁড়ে সেই জমানো টাকা আধুলির ভাড়টাকেও নিয়ে গেছে। রাগে গর্জন করে ওঠে সে—মুনিয়া!...

কোন সাড়া নেই। ওপাশের ঝুপড়ি থেকে শিউরতন বের হয়ে আসে।

—মণ্টা!

—মুনিয়া কোথায়? খুন করে ফেলবো আজ তাকে।

শিউরতনই খবরটা দেয়। মুনিয়া নেই। আজ সকালেই বের হয়ে গেছে, ভজুয়ার দোকানের সেই ছোড়াটাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। সেও নাকি ভজুয়ার বেশ কিছু টাকা নিয়ে পালিয়েছে। গুরুচরণ আর মুনিয়া ভেগে গেছে কোথায়।

স্তব্ধ হয়ে যায় মণ্টা। সারা শরীর ওর কাঁপছে রাগে আর উত্তেজনায়। সামনে পেলে ওদের খুনই করে ফেলতো। কিন্তু ওরা নেই। মণ্টার দুচোখে আগুন বের হচ্ছে। অনেকদিন আগেকার হারিয়ে যাওয়া আর একজনের কথা মনে পড়ে। ওদের দুজনকে ফেলে চলে গিয়েছিল সেই মেয়েটা। তবু বুক দিয়ে মানুষ করেছিল বোনটাকে, বিয়ে দিতো। বাঁচবার পথ করে দিতো। কিন্তু তা হল না।

ওরা তবু হারিয়ে যায় আর হেরে যায়।

।। চোদ্দ ।।

ব্যক্তিসত্যাগ্রহ অবশ্য যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো সময় করতে পারেন, কিন্তু গণসত্যাগ্রহ হলো বিপ্লবের মতো অপৌরুষেয়। লেনিন বা গান্ধী তার নিমিত্তমাত্র। তাঁদের কান পেতে থাকতে হয় কখন জনগণের জীবনে জোয়ার আসবে। জোয়ার না এলে জনগণকে ডাক দেওয়া বৃথা। তারা সাড়া দেবে না। তেমনি জোয়ার এসে চলে গেলে, ভাঁটা পড়লে, জনগণকে ঝাঁপ দিতে বলা নিষ্ফল। তারা অসাড়।

গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহ ১৯৩০ সালে বিস্ময়কররূপে সফল হয়েছিল, কারণ সেটা ছিল জোয়ারের সময়। কিন্তু ১৯৩২ সালে অপ্রত্যাশিতরূপে বিফল হলো, কারণ ততদিনে ভাঁটা শুরু হয়ে গেছে। সময় বা জোয়ার কারো জন্যে সবুর করে না। মহাত্মার জন্যেও না। যা করবার তা সময় থাকতেই করে নিতে হয়।

গান্ধী আরউইন চুক্তি একদিক থেকে একটা জয়। আরেকদিক থেকে একটা ছেদ। অবশ্য গণসত্যাগ্রহ অব্যাহতভাবে চলতে থাকলেও যে পূর্ণ স্বরাজের ঘাটে পেঁছে দিত তা নয়। ওকে দমন করবার শক্তি ভারত সরকারের ছিল। শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছিল শাঠ্য। ডিভাইড অ্যান্ড রুল। গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকে যোগ না দিলেও সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ যথাকালে ঘোষিত হতো। জনগণ ভিন্ন হয়ে যেত।

এ সমস্যা লেনিনের দেশে ছিল না। ব্রিটিশ সরকার জানতেন যে তুরুপের তাস সব সময় তাঁদের হাতে। যাবার সময়ও হিন্দু মুসলমানের কান ধরাধরি করিয়ে দিয়ে যেতেন। তখন তাঁরাই মধ্যস্থ হয়ে যাকে যা দিয়ে যেতেন তাই তার পাওনা। তার বেশী নয়।

হরিজন পরিক্রমার সময় গান্ধীজীর কল্পনা ছিল নতুন কিছু না ঘটলে তিনি এক বছর বাদে জেলে ফিরে যাবেন। ব্যক্তিসত্যাগ্রহ চলতে থাকবে।

হঠাৎ ঘটে গেল বিহারের ভূমিকম্প। দক্ষিণের হরিজন সফর আধখানা ফেলে রেখে মহাত্মাকে ছুটতে হলো বিহারে। সেখানে যখন তিনি সেবাকর্মে ব্যাপৃত তখন দিল্লীতে এক বৈঠক সেরে পাটনায় উদয় হন ডাক্তার আনসারী, ডাক্তার বিধান রায় ও ভুলাভাই দেশাই। গান্ধীজীকে এঁরা বোঝান যে বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মীর মতে আরেকবার স্বরাজ পার্টি গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সামনেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন। কিন্তু পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার পূর্বে আইন অমান্যের প্রোগ্রাম পরিত্যাগ করতে হবে। নইলে গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসকে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন না। নির্বাচনে কংগ্রেসের জনবলের সাহায্য পাওয়া যাবে না। স্বরাজ পার্টি কী করে জিতবে? এখন মহাত্মা যদি দয়া করে আইন অমান্যের প্রোগ্রাম তুলে নেন সরকার আবার কংগ্রেসকে আইনসংগত প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করবেন।

এর পরে রাঁচীতে আরো অনেক নেতা তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আরো পরিষ্কার হয় যে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামের খাতিরে গণসত্যাগ্রহ তো বন্ধ করতে হবেই, ব্যক্তিসত্যাগ্রহও চলতে দেওয়া হবে না। এমন কি

অন্নদাশঙ্কর রায়

মহাত্মা যে কংগ্রেসের নামে বা কংগ্রেসের তরফ থেকে একক সত্যাগ্রহ করার স্বাধীনতা হাতে রাখবেন তাতেও সরকারের আপত্তি হতে পারে।

গান্ধীজী শেষকালে উপলব্ধি করেন যে কংগ্রেস একই কালে আইনসঙ্গত প্রতিষ্ঠান ও আইন অমান্যকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। গান্ধীজীকে তার নামে ও তার তরফ থেকে একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা দিলে সরকারের দৃষ্টিতে তার কার্যকলাপ বেআইনী বলে প্রতিভাত হবে। তখন একজনের অপরাধে সমগ্র প্রতিষ্ঠান বেআইনী বলে ঘোষিত হবে। সেটা কংগ্রেসের পক্ষে অস্তিত্বহানি। বিশেষত যদি সে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে থাকে।

আইনসভায় যাওয়া নিয়ে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত মত অসহযোগের সময় যেমন ছিল এখনো তেমনি। কিন্তু কংগ্রেসের বহুসংখ্যক কর্মীর মত অন্যরূপ। তাঁদের সঙ্গে সেবারেও তিনি যেমন রফা করেছিলেন এবারেও তেমনি করলেন। কিন্তু এবারকার রফার বৈশিষ্ট্য হলো তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও রইলেন না। একেবারে কংগ্রেসের বাইরে চলে গেলেন।

কী দুঃখের কথা! গান্ধীহীন কংগ্রেস! শিবহীন যজ্ঞ! এ কি কখনো ভাবা যায়! কিন্তু এ না করে তাঁর উপায় ছিল না। গবর্নমেণ্ট জেদ ধরে বসেছিলেন যে কংগ্রেসকে তার অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। কোনোরকম আইন অমান্য চলবে না। না গণসত্যাগ্রহ, না ব্যক্তিসত্যাগ্রহ। আইন অমান্য চলতে থাকলে বা তার সম্ভাবনা থাকলে কংগ্রেসকে পার্লামেণ্টারি কাজ করতে দেওয়া হবে না। প্রতিষ্ঠানের একটা বড়ো অংশ এখন পার্লামেণ্টারি প্রোগ্রামে কৃতসংকল্প। এঁরা যদি আইনসভায় যাবার জন্যে কংগ্রেস ত্যাগ করেন তবে কংগ্রেস ভেঙে যাবে। বেআইনী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেঁচে থাকা না থাকা সমান।

তা হলে কি গান্ধীজীও কংগ্রেসের মতো অস্ত্র সমর্পণ করবেন? না, কিছুতেই না। তার চেয়ে কংগ্রেস থেকে নাম কাটিয়ে নেবেন। একজন সদস্য কংগ্রেস ত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানের তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু সেই একজন সদস্য যদি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে অহিংসার অস্ত্র সমর্পণ করেন তবে দেশেরও ক্ষতি, জগতেরও ক্ষতি, কারণ হিংসার উপরে অহিংসার জয় প্রমাণ করা হয় না। বরং তিনি যদি কংগ্রেস থেকে সরে থাকেন তা হলে কংগ্রেসকেও একদিন আপনার দিকে টানতে পারবেন। আর যদি নিতান্তই তা না পারেন তবে তাঁর একক সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা তো থাকছেই। তা ছাড়া থাকছে উপযুক্ত সময়ে গণসত্যাগ্রহের ডাক দেবার অবাধ স্বাধীনতা। কংগ্রেস ত্যাগ মানে গণসত্যাগ্রহ ত্যাগ নয়। বরং গণসত্যাগ্রহ রক্ষা।

তা ছাড়া আরো গভীর কারণ ছিল। গণসত্যাগ্রহ দিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করতে চাননি, চেয়েছিলেন বিদেশী শাসকদের অন্তঃপরিবর্তন ঘটাতে। সেই সঙ্গে স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদেরও। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন কোনো পক্ষেরই অন্তঃপরিবর্তন হয়নি। হিংসার সঙ্গে অহিংসার দ্বন্দ্ব হিংসার অন্তরে ভাবান্তর আনেনি। গান্ধীজী যে রণনীতির জন্যে পৃথিবীতে এসেছেন সে রণনীতি এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। কংগ্রেস তাঁকে যতটা সাহায্য করবার করেছে, এখন থেকে তিনি তাঁর একার উপর নির্ভর করতে চান। তিনি সরাসরি জনগণের কাছে যাবেন, কংগ্রেসের মধ্যস্থতায় নয়। তাঁর বাণী

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মারফৎ বিকৃতভাবে পৌঁছয়, তাই জনগণ ভুল বোঝে। একক সত্যাগ্রহী হয়েও তিনি অনেকদূর যেতে পারবেন, তাঁর বাণী অনেকের কানে পৌঁছে দিতে পারবেন। কংগ্রেসের বাইরে গেলেই বরং তাঁর আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়বে। তাঁর কর্মের স্বাধীনতাও। তাঁর যখন ইচ্ছা তখন সত্যাগ্রহের সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, কংগ্রেসের সমর্থনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না। তিনি প্রতিষ্ঠানের ভারমুক্ত হতে চান; বিশেষত কংগ্রেসের মতো প্রতিষ্ঠানের, যে গঠনকর্মে মনোযোগী নয়, সুতরাং অহিংসা সম্বন্ধে সীরিয়াস নয়। গঠনকর্ম বিনা অহিংসা হয় না, অহিংসা বিনা সত্যাগ্রহ হয় না, সত্যাগ্রহ বিনা স্বরাজ হয় না। কংগ্রেস কি বোঝে এ যুক্তি? মানে এর যথার্থতা? গঠনকর্মই সেই নিত্যকর্ম যা সত্যাগ্রহীকে সংযুক্ত রাখে জনগণের সঙ্গে। সংযোগ ভিন্ন শক্তি নেই। শক্তিহীনের সত্যাগ্রহ কারো অন্তর স্পর্শ করে না। না বিদেশী শাসকদের। না স্বদেশী সন্ত্রাসবাদীদের।

তার চেয়েও গভীর কারণ ছিল। বিশের দশকে কংগ্রেসে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই মোটের উপর গান্ধীপন্থী। যদিও তাঁদের একদল তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বে পার্লা-মেণ্টারি কর্মপন্থায় আগ্রহী। কিন্তু ত্রিশের দশকে কংগ্রেসের ভিতরে এমন বহু কর্মীর সমাগম হয় যাঁরা গান্ধীজীর গণসত্যাগ্রহের চেয়ে লেনিনের শ্রেণীসংগ্রামেই অধিকতর আস্থাবান, সেইজন্যে গান্ধী নেতৃত্বে অনাস্থাবান। এঁরা চান গণসত্যাগ্রহ যাতে শ্রেণীসংগ্রামের দিকে মোড় নেয়। গান্ধী সেটা কিছুতেই হতে দেবেন না। তেমন সংগ্রাম কিছুতেই অহিংসার সঙ্গে খাপ খেতে পারে না। অথচ কংগ্রেসের মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে এঁদেরও স্থান আছে। হয়তো এঁরাই হবেন সংখ্যায় ভারী। গান্ধীজী যদি কংগ্রেসে থাকেন তাঁকে এঁদের সঙ্গে ভোটদ্বন্দ্বে নামতে হতে পারে। এঁদের অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হওয়াও বিচিত্র নয়। এঁদের কাছে হেরে গেলে এঁদের বিরোধীপক্ষ হিসাবেও কাজ করতে হতে পারে। তার চেয়ে কংগ্রেসের থেকে নাম কাটিয়ে নেওয়া শ্রেয়। বাইরে থেকেই বরং তিনি কংগ্রেসকে আরো বেশী কাছে টানতে পারবেন।

সত্যি তাই হলো। সন্ন্যাসী কমলীকে ছাড়লেন, কিন্তু কমলী সন্ন্যাসীকে ছাড়ল না। তাঁর উপর কংগ্রেসের আস্থা বহুগুণ বেড়ে গেল। কংগ্রেসের বম্বে অধিবেশনে তিনি যখন উপনীত হন তখন আশী হাজার সভ্য ও দর্শক একসঙ্গে উঠে দাঁড়ান। তাঁর নেতৃত্বের উপর আস্থাসূচক প্রস্তাব একবাক্যে গৃহীত হয়। যাঁর পরি-চালনায় লক্ষ লক্ষ লোকের জেল জরিমানা বেত্রদণ্ড সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো, কারো কারো প্রাণ গেল, শেষ পর্যন্ত কী এনে দিলেন তিনি? পূর্ণ স্বরাজও নয়, আংশিক স্বরাজও নয়। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ নেই কারো। সকলেই দুঃখিত যে তিনি কংগ্রেস সদস্য থাকবেন না।

আসলে গণসত্যাগ্রহ ছিল এমন এক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যে তাতে অংশ গ্রহণ করাটাই পরম সৌভাগ্য। যেমন স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান। সেই মহামূল্য অভিজ্ঞতা যিনি এনে দিয়েছেন তাঁর কাছে মানুষ এমনিতেই কৃতজ্ঞ।' সিদ্ধি এনে দিলেন কি না সেটা অতিরিক্ত। সিদ্ধি কি কেবল একজনের উপর নির্ভর? আর ব্যর্থতার নিরিখ কী? লক্ষ লক্ষ নরনারীর এই যে আত্ম উপলব্ধি এটা কি আর কোনো উপায়ে হতো? এটা কি সার্থকতা নয়?

পরাজয়ও পরাজয় নয়, যদি সৈন্যদলের সংগঠন অটুট থাকে, মনোবল অটুট থাকে, যদি সেনাপতির উপর সৈন্যদলের আস্থা অটুট থাকে, আনুগত্য অটুট থাকে। গান্ধীজীর অস্ত্র তাঁর আপনার হাতেই রয়ে গেছে, আর কারো হাতে সমর্পণ করা হয়নি। তিনি আর একদিন লড়বেন বলেই বেঁচে আছেন। তার আগে প্রাচীরগুলো ভালো করে সারাবেন। কংগ্রেসকে পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থা নিয়ে দ্বিমত হতে দেবেন না, বিভক্ত হতে দেবেন না। যখন যে কর্মপন্থা নেওয়া হবে তখন সেটা একমত হয়ে নেওয়া হবে, শৃঙ্খলার সঙ্গে মানা হবে। তিনি নিজে ভিন্নমত পোষণ করলেও আপাতত পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থাকেও একটা সুযোগ দেবেন অন্যান্য নেতাদের খাতিরে।

পার্লামেণ্টারি কর্মপন্থা সম্বন্ধে এই যে নরমভাব এটার আরো একটা গূঢ় কারণ ছিল। সেটা তখন কেউ জানতেন না। পরে জানা গেল। সরকারী নিপীড়ন কংগ্রেসের সহায় হলো। নিপীড়িত জনগণ কংগ্রেসকেই ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল। যেসব প্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলো সে সব প্রদেশে কি কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করবে? যদি গ্রহণ করে তবে গভর্নররা কি তাঁদের অঙ্কুশ প্রয়োগে বিরত থাকবেন? এ দুটি প্রশ্ন পরস্পরনির্ভর। গান্ধীজীই কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে বলেন। প্রায় মাস ছয়েক ধরে সরকারপক্ষের সঙ্গে বিতর্ক চলে। ইতিমধ্যে অন্যান্য প্রদেশে অন্যান্য দলের মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হয়ে যায়। নতুন শাসনসংস্কার আইন অনুসারে ছ' মাসের মধ্যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা চাই, নয়তো গভর্নরের শাসন। নতুন শাসনসংস্কার আইনের প্রণেতারা সেটা পরিহার করতে বাঞ্ছ। তাই একটা ফরমুলো পাওয়া গেল যাতে দু'পক্ষের মানরক্ষা হয়।

কংগ্রেস মন্ত্রীদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হবে না। বাধা পেলে তাঁরা পদত্যাগ করতে পারবেন। কিন্তু গভর্নরের সঙ্গে গুরুতর মতভেদ না ঘটলে সে রকম উপলক্ষ জুটবে না। এর পরে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হয়। মন্ত্রীরা শুধু অফিস লাভ নয়, পাওয়ার লাভ করেন। তখন যাদের উপর নিপীড়ন হয়েছিল তারা জেলে থাকলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়, তাদের জমি বাজেয়াপ্ত হয়ে থাকলে বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেওয়া হয়, তারা বরখাস্ত হয়ে থাকলে সে বরখাস্ত রদ হয়। এককথায় গান্ধী যাদের বিপদে ফেলেছিলেন গান্ধীই তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। কংগ্রেসের জন্য যারা রাজরোষে পড়েছিল কংগ্রেসই তাদের রক্ষা করে। গান্ধী-উইলিংডন চুক্তি হয়ে থাকলে যেটা চুক্তির দ্বারা হতো সেটা এইভাবে হয়। ততদিনে এসেছেন লর্ড লিনলিথগাউ। তিনি স্বচক্ষে দেখেন যে গান্ধী নত হয়েই জিতেছেন। মুখোমুখি যুদ্ধে তাঁকে হারানো শক্ত।

গান্ধী ছিলেন বিদেশী পুরাণের সেই ফিনিক্স্ পাখী, যে পাখী আগুনে পুড়ে

ছাই হয়ে যায়, তারপর ভস্মের ভিতর থেকে তরুণ রূপ নিয়ে উঠে আসে।

ইংরেজরা কেউ ভাবতেই পারেননি যে কংগ্রেস ছ'টি প্রদেশে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে একদলীয় মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবে ও গভর্নরদের অঙ্কুশ অকর্মণ্য হবে। ভারতীয়রাও কেউ ভাবতে পারেননি যে ছ'টি মন্ত্রীমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করবেন তিনজন কংগ্রেসনেতার একটি ত্রয়ী—যার চলতি নাম কংগ্রেস হাইকমান্ড। বল্লভভাই পটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ ছিলেন গান্ধীর তিনখানি হাত। গান্ধীর থেকে তাঁদের পৃথক করা যেত না। আইন-সভায় গিয়েও কংগ্রেস তার সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিল। এর একমাত্র তুলনা সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি। সেখানেও প্রচ্ছন্ন ছিল স্টালিনের বেপরোয়া মারণশক্তি। না মানলে নির্মম লিকুইডেশন। কিন্তু বিশুদ্ধ নৈতিক শক্তি দিয়ে সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা ইতিহাসে এই প্রথমবার লক্ষিত হলো।

এটা কিন্তু গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য নয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাসে এর কোনো নজির নেই। মন্ত্রীরা দায়ী হবেন পার্লামেন্টের কাছে, পার্লামেন্ট তাঁদের ইচ্ছা করলে সরাতে পারবে, এই তো নিয়ম। কিন্তু এদেশে কেউ তাঁদের গায়ে হাত দিতে পারে না, যতক্ষণ তাঁরা তাঁদের পার্টি হাই-কমান্ডের বিশ্বাসভাজন। অপরপক্ষে হাই-কমান্ডের বিরাগভাজন হলে আর তাঁদের রক্ষা নেই। বড়লাট যেমন সর্বশক্তিমান, হাই-কমান্ডও তেমনি সর্বশক্তিমান। বড়লাটের পেছনে যেমন ব্রিটিশ বড়কর্তা, হাইকমান্ডের পেছনে তেমনি গান্ধী।

যে কোনো মুহূর্তে পদত্যাগ করতে হতে পারে, কিংবা পদচ্যুত হতে পারে, এরকম একটা সম্ভাবনা মাথার উপর খড়্গের মত ঝুলছিল। তাই গান্ধী ও হাই-কমান্ড, ওয়ার্কিং কমিটি তথা পার্লামেন্টারি নেতারা মিলে এ ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা একপ্রকার আপৎকালীন ব্যবস্থা। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলগুলি এক একটি দুর্গ। অন্য পার্টির লোককে সেখানে নিলে যৌথ দায়িত্ব পালন করা শক্ত। তবে কোয়ালিশন একেবারে অনভিপ্রেত নয়, যদি কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য থাকে। তা হলে আবার স্বকীয় দলের প্রতি আনুগত্য থাকে না।

যে প্রদেশে একাধিক সম্প্রদায় বাস করছে সে প্রদেশে মাইনরিটিও ক্ষমতার স্বাদ চাইবে। এটাই তো স্বাভাবিক। সেইজন্যে নতুন শাসনসংস্কার আইনে এমন কথাও ছিল যে মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করার সময় গভর্নর মাইনরিটি থেকেও মন্ত্রী নেবেন। কিন্তু কংগ্রেস এর ব্যাখ্যা করল এই বলে যে, সে দায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলের যৌথ দায়িত্বের অন্তর্গত। যে ব্যক্তি অন্য দলের প্রতি অনুগত, কংগ্রেসের প্রতি নয়, কংগ্রেস তাঁকে নিলে যৌথ দায়িত্ব অসম্ভব হয়। যৌথ দায়িত্বই তো ব্রিটিশ ক্যাবিনেট সিস্টেমের গ্রন্থিবন্ধন। মাইনরিটি থেকে মন্ত্রী নিতে হবে, এর কংগ্রেসী ব্যাখ্যা হলো আইনসভার কংগ্রেস দলের ভিতর থেকেই নিতে হবে। আইনসভার কংগ্রেস দলে বহু মুসলমান ছিলেন বিহারে, যুক্তপ্রদেশে। কিন্তু খুব কম ছিলেন মাদ্রাজে, মধ্যপ্রদেশে। একেবারেই ছিলেন না বম্বেতে, ওড়িশায়। বম্বেতে একজন স্বতন্ত্র মুসলমানকে মন্ত্রীমণ্ডলে নেওয়া হয়। ওড়িশায় কাউকেই না।

এখন প্রশ্ন হলো এঁরা কাদের প্রতিনিধি? আইনসভায় বিস্তর অকংগ্রেসী মুসলমান ছিলেন। এঁরা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রতিনিধি নন। তাঁদের পেছনে যে নির্বাচক-মণ্ডলী তাদেরও প্রতিনিধি নন। আবার একই প্রশ্ন দেখা দিল বাংলাদেশের মন্ত্রী-মণ্ডলের হিন্দু মন্ত্রীদের বেলা। এঁরা ব্যক্তি হিসাবে সকলেই উপযুক্ত, কিন্তু প্রতিনিধিত্ব আর ব্যক্তিত্ব দুই আলাদা জিনিস। কোয়ালিশন হলে প্রতিনিধিত্বের সমস্যার সমাধান হতো, কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলের একভাগ কংগ্রেস হাইকমান্ডের আজ্ঞাধীন, আরেক ভাগ মুসলিম লীগ সভাপতি জিন্না সাহেবের অনুগত হলে সঙ্কট চরমে উঠত।

কোনোখানেই মাইনরিটি সমস্যার মিটমাট হলো না, তবে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দল ছিল হিন্দু, মুসলমান, শিখ সম্প্রদায়ের বিস্তর প্রতিনিধি নিয়ে গড়া। সিকন্দর হায়াৎ খান ছিলেন সকলের আস্থাভাজন।

কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলগুলো থাকতে আসেনি, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়নি, কিন্তু পরে দেখা গেল আরো দুটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়েছে, তার জন্যে কংগ্রেসের বাইরে থেকে লোক নিতে হয়েছে, কংগ্রেসকে মান্য করার অঙ্গীকার-নামা সই করিয়ে। এতে কংগ্রেসের ছত্রতলে এল আটটি প্রদেশ, বাইরে রইল তিনটি। ইংরেজ সরকারের একটা অদৃশ্য ব্যালান্স ছিল। হিন্দু ছয়, মুসলমান পাঁচ। আসামকেও তর্কের খাতিরে মুসলিম বলে ধরা হতো। বাংলার মতো সেখানেও ইউরোপীয় স্বার্থ সমধিক। তেমনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক। আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত কংগ্রেসের ছত্রতলে দেখে ইংরেজের ব্যালান্স নড়ে যায়। তেমনি মুসলিম লীগেরও একটা ব্যালান্স ছিল সেটা প্রকাশ্য। সেটাও নষ্ট হয়। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রে কংগ্রেসপ্রার্থী দাঁড় করিয়ে লীগকে হারিয়ে দিয়ে কংগ্রেস শত্রু করেছিল। এবার ব্যালান্স নাশ করে চিরশত্রু করল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

দিল্লী স্টেটসম্যান পত্রিকার আবাসিক সম্পাদক কুলদীপ নাইয়ার একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক। বর্তমানে একটি দৈনিক পত্রের সম্পাদক হলেও একসময় তিনি লাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর জনসংযোগরক্ষক ছিলেন, স্পোকসম্যান কথাটিকে অবশ্য মুখপাত্র বলা হয়, কিন্তু তাঁর কর্মটা মুখ্যত জন-সংযোগের। হিন্দুস্থান টাইমসের প্রধান সম্পাদক ভারগিসও এই সেদিন পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর একান্ত সচিব ছিলেন। এইসব কাজের একটি ভারী সুবিধা অনেক হাঁড়ির খবর জানা যায়, এবং সেই হাঁড়ি যথাকালে হাটে ভাঙলে রীতিমত তুল-কালাম কান্ড ঘটে যেতে পারে। কিন্তু চাকরীতে বহাল থাকাকালে মন্ত্রগুপ্তির বালাই আছে, চাকরী ছুট হলে আজকাল জেনারেল থেকে শুরু করে র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলরাও একএকখানি গোপন কথা রচনা করছেন তা অনটোলড বা না বলা কাহিনী হলেও আনসোলড বা অবিক্রীত থাকে না। ঘটনা অবশ্য সবসময় অবিকৃত থাকে না, একটু অতিরঞ্জনের গরম মশলা সংযুক্ত না থাকলে কেচ্ছা জমবে কেন। ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কুলদীপ নায়ারের গ্রন্থ-ভুক্ত কিছু অংশ নিয়ে ললিতা শাস্ত্রী ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে পত্রালাপ হয়েছে, উভয়েই বলেছেন এমন অনেক কথা শাস্ত্রীজীর মুখে বসানো হয়েছে যা তাঁর নয়। তারপর কুলদীপ নায়ারের কোনো প্রত্যুত্তর আমাদের নজরে পড়েনি। এইসব সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত ফল্গু অপসারণ করে গ্রন্থবর্ণিত কিছু সারবস্তু পাঠকদের অব-গতির জন্য পরিবেশন করছি। একথা এই সূত্রে বলা ভালো যে গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠান পরিবেশিত প্রায় তিন কলমব্যাপী একটি 'স্টোরী' সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তার ভিতর নেহরুর সিংহাসনের উত্তরাধিকার ও চীন যুদ্ধের প্রসঙ্গে কিছু কথা আছে।

এই গ্রন্থটিতে (১) উত্তরাধিকারের সংগ্রাম, (২) রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে পার্লা-মেন্টারি কমিটির আলোচনা, (৩) ১৯৬৬ মুদ্রামাণ অবনমন, (৪) ১৯৬৮তে পাকি-স্থানকে সোভিয়েট কর্তৃক অস্ত্র উপহার, (৫) ভারত-চীন সংঘর্ষ ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহ। বলা বাহুল্য, এই পাঁচটি প্রসঙ্গই বেশ মুখরোচক।

নেহরুর মৃত্যু। শাস্ত্রীজির মৃত্যু ও ইন্দিরার সিংহাসন অধিকার—এই কয়টি ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সবাই জানেন, এই ঘটনা-গুলিকে কেন্দ্র করে ঘন ঘন পট-পরিবর্তন ঘটেছে।

কামরাজ প্ল্যানের বলি হয়ে শাস্ত্রীজি ক্যাবিনেট থেকে ইস্তফা দেন, কিন্তু পরে ভুবনেশ্বরে নেহরুজীর সেই অসুস্থতার পর ১৯৬৪-র জানুয়ারী মাসে তাঁকে আবার গদীতে আসীন করানো হল, কিন্তু নেহরুজীর অসুস্থতার ঘোর একটু কাটতেই যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র সরাসরি তাঁর কাছেই পাঠানো হত এবং শাস্ত্রীজি অনেক পরে ডেপুটি বা জয়েন্ট সেক্রেটারি মারফৎ সেই সংবাদ জানতে পারতেন। তিনি নাকি প্রায়ই সখেদে বলতেন—

"I am only a glorified clerk—"

স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি অপমানিত বোধ করতেন এবং পদত্যাগের সংকল্প করলেও তা করতে পারেন নি দুটি কারণে, প্রথমত পর্যায়ানুসারে চার নম্বর হলেও সিন্ডিকেট তাঁর পদত্যাগ অনুমোদন করতেন না এবং দ্বিতীয়ত তিনি স্থির করলেন — যে সহে সে রহে।

কুলদীপ নাইয়ার লিখছেন—

"Many people at that time said —and told him so—that Nehru's behaviour was influenced by Indira Gandhi's 'hostility' towards him. First he would never encourage such talks but later he used to go out of the way to find out it that was true And in due course he became convinced that he was not uppermost in Nehru s mind as his successor There was somebody else"

নাইয়ার শাস্ত্রীজির কাছে জানতে চেয়েছিলেন নেহরুর এই মনোনীতটি কোন্ ব্যক্তি। তার জবাবে শাস্ত্রীজি বললেন—তাঁর কন্যা—তবে সেটা সহজ হবে না। এই কথায় নাইয়ার নাকি বলেছিলেন—লোকে মনে করে যে আপনি এমনই অন্ধ নেহরু ভক্ত, যে প্রস্তাবটা আপনার কাছ থেকেই আসবে। শাস্ত্রীজি তার জবাবে বলেন—

"I am not that much of a 'sadhu' as you imagine me to be."

(প্রসঙ্গত বলা উচিত যে এই অংশটি নিয়েই ললিতা শাস্ত্রী আপত্তি তুলেছেন।)

নাইয়ার বলেছেন নেহরুর মৃত্যুর পর শাস্ত্রীজি নাকি প্রস্তাবটা সর্বজনগ্রাহ্য করার প্রয়াসও করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের ডি পি মিশ্রকে দিয়ে মোরারজীর কাছে প্রস্তাবটি পাঠানো হয়। মোরারজী রাজী হন নি তিনি বলেছিলেন ইন্দিরার চেয়ে শাস্ত্রীই তাঁর কাছে অনেকটা গ্রহণযোগ্য।

এই উত্তরাধিকার নাট্যে কামরাজজীর ভূমিকাও অনুল্লেখ্য নয়। শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি ইন্দিরাকে সুপ্রতিষ্ঠ করার জন্য যে-ভাবে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন তার পিছনে ছিল এক পুরাতন প্রতিজ্ঞা। কাম-রাজ শাস্ত্রীকে ক্যাবিনেটে প্রবেশ-দ্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে নেহরুজীর কাছে আবেদন জানালেন যে ইন্দিরাকেও এইবার ক্যাবিনেটে নিয়ে নিন, ওর বেশ আগ্রহ। নেহরু চিন্তা করতে লাগলেন—তারপর বললেন :

"No. not yet. Indu. probably later".

সেইদিন অঘটন ঘটনপটু কামরাজ মনে মনে স্থির করলেন পহলে শাস্ত্রী, পিছাড়ি

পর্দার অন্তরালে

ইন্দু—ঠিক নেহরু যে ক্রমজনুসারে বলেছেন এবং তিনি সেই বাসনা পূর্ণ করেছেন।

মুদ্রামূল্যের অবনমনের প্রসঙ্গটি যতবার প্রকাশ পেয়েছে সরকার ততবার তা মাথা নেড়ে অস্বীকার করেছেন। অথচ মুদ্রামূল্য হ্রাস করার বাসনা অনেক দিনের। সম্প্রতি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রসঙ্গেও এমনই কান্ড ঘটেছে—একথা উল্লেখ করা যায়। এই সেদিন ১৭ জুলাই তারিখে দেশাইজীর হাত থেকে অর্থদপ্তর স্বহস্তে গ্রহণ করেন ইন্দিরাজী। ১৭ তারিখেরই সংবাদপত্রে পি টি আই পরিবেশিত একটি সংবাদ বক্স করে ছাপা হল :

> "A sopkesman of the Finance Ministry to-night denied that an ordinance was being brought forward to nationalise banks. A rumour to this effect is going round the capital".

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকতে পারে যে, এই গুজবই শনিবার (দুদিন পরে) ১৯ তারিখে সত্যে পরিণত হয়েছে।

কুলদীপ নাইয়ার যা বলেছেন তার দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়েছে যে সরকার সত্য কথা বলেন না এবং তার ফলে মিথ্যাবাদী রাখালের উক্তির মত পালে বাঘ যখন সত্যিই একদিন পড়ে তখন আর কেউ বিশ্বাস করে না।

চীনা আক্রমণের সময় সরকারের কর্মকর্তারা একটি অতিশয় দায়িত্বজ্ঞানহীন কান্ড নাকি করেছিলেন। নাইয়ার তাঁর ডায়েরীর ২৮ নভেম্বর ১৯৬২ তারিখের বৃত্তান্তে লিখেছেন—

> "Nobody in the Home Ministry right from the Minister to the under Secretary, saw the list of persons to be arrested. It turns out that Director of Intelligence had supplied the list and it was sent as it was to the States, which, although knowing that some of the people listed were not pro-China, had to arrest them because of Centre's order".

পাঠকবর্গ আমার বাচালতা মার্জনা করবেন, এই সূত্রে সেই গান্ধর্ব সেনের মৃত্যুর কাহিনীটি মনে পড়ছে। সংক্ষেপে কাহিনীটি এই : একদিন এক রাজসভায় শোকের প্লাবন বয়ে গেল গান্ধর্ব সেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। রাজা কাঁদছেন, মন্ত্রী কাঁদছেন, পাত্র কাঁদছেন, মিত্র কাঁদছেন—হায় হায় করে বুক চাপড়াচ্ছেন। অনেক পরে একজন অর্বাচীন সভাসদ সবিনয়ে প্রশ্ন করল—আচ্ছা এই গন্ধর্ব সেনটি কে? তখন সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকেন, তাইত গন্ধর্ব সেন কে? সংবাদসূত্রের একেবারে তলায় গিয়ে জানা গেল গন্ধর্ব সেন একটি ধোপার গাধার নাম, ধোপাকে কাঁদতে দেখে একজন অমাত্য কারণ জিজ্ঞাস করলে সে বলেছিল গন্ধর্ব সেন মর গয়া—অমাত্য কে এই গন্ধর্ব সেন সেই প্রশ্ন না করে ভাবলেন, এমন নাম যাঁর তিনি একজন কেউকেটা হবেন, এই ভেবেই কেঁদেছেন এবং সেই কান্না শেষ পর্যন্ত রাজাকেও স্পর্শ করেছে। তাই রাজামশাই কাঁদছেন, সঙ্গে পাত্র-মিত্র সবাই।

কেন্দ্রের কর্তাদেরও প্রায় সেই অবস্থা। প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র সচিবকে বললেন ক্রমক্রমে কয়েকজনকে ধরা হয়েছে। শাস্ত্রী নিজেও অনুভব করছিলেন এইভাবে পাইকারী হারে ধরপাকড় ভ্রমাত্মক। প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে লিখলেন এইভাবে এলোপাতাড়ি গ্রেপ্তার কম্যুনিস্ট দেশসমূহে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

নাম্বুদ্রিপাদকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন নাকি তিনি চীনা আক্রমণের নিন্দা করে নিউ এজের জন্য একটি সম্পাদকীয় রচনা করছিলেন। ডাঙ্গে মস্কো যাচ্ছিলেন নয়াদিল্লীর মনোভঙ্গী সেইখানে সমবেত এক কম্যুনিস্ট সমাবেশের আমন্ত্রিতদের কাছে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশে। তাঁর সেই যাত্রা স্থগিত করতে হল, তিনি এই গ্রেপ্তারের সংবাদ জেনেই যাত্রার বাসনা পরিত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর অভিমত জানালেন। কয়েকজন কম্যুনিস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে চেপে ধরলেন তাঁদের সহকর্মীদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। শাস্ত্রীজি অপ্রস্তুত। তিনি তা গোপন না রেখে জানালেন কিছু ছাড়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীদের এক সম্মেলনে তিনি স্বীকার করলেন বিরাট ভুল হয়েছে এলোপাতাড়ি ধর-পাকড়ের ফলে। এর জন্য যাঁরা ভারতবর্ষের মনোভঙ্গী সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাঁরা বিরূপ হয়ে বিচ্ছিন্ন হলেন। সবাইকে ছাড়াটা বিসদৃশ্য তাই একে একে কিছু কম্যুনিস্টদের ছাড়া ঠিক হল, যাতে ভুল সংশোধন করা হচ্ছে তা বোঝা না যায়।

নাম্বুদ্রিপাদকে অরুণা আসফ আলীর অনুরোধে সংবাদপত্র দেওয়া হত, বেশী করে সাক্ষাৎকারের সুবিধাও দেওয়া হত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদের গ্রেপ্তারের জন্য বিবেক দংশনে জ্বলছেন। কে ডি মালবীয় এক চিঠিতে জানালেন অনেক মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ভ্রমাত্মক গ্রেপ্তারের কথা বলেছেন। চারদিক থেকে এইভাবে চাপ পড়ায় কিছু কম্যুনিস্টকে মুক্তি দেওয়া হল। নাইয়ার ১৭৯—৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

> "It has been decided to set E M S free. Surprisingly, Renu Chakrabarty, a Communist woman leader from West Bengal gave Shastri the impression that she was not opposed to the detention of E. M S".

সরকারের অনেক ত্রুটির জন্য দায়ী তাঁদের অধঃস্তন সেক্রেটারী আর অন্ডার সেক্রেটারীর দল—এরাই তাঁদের কর্মে ও আচরণে সরকারকে অপদস্থ করেছেন। ২৩১ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি যে চমকপ্রদ একথা বলা যায়।

—অভয়ঙ্কর

BETWEEN THE LINES: By Kuldip Nayar: Allied Publishers Private Ltd: 13/14-Asaf Ali Road: New Delhi—1. Price Rupees Sixteen only.

সাহিত্যের খবর

সম্প্রতি কলকাতা পৌরসভা মানিকতলা মোড় থেকে উল্টোডাঙ্গা সেতু পর্যন্ত পথটুকু কবি নজরুলের নামে চিহ্নিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সাহিত্যরসিক মাত্রেই এই সংবাদ শুনে খুশী হবেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষের মনে যে উদ্দীপনা নজরুল সাহিত্য সঞ্চার করেছিল তারই স্বীকৃতি হিসেবে এই নামকরণ। অবশ্য কোন কোন মহল থেকে দাবী উঠেছে, শুধু এটুকু রাস্তাই নয়, সম্পূর্ণ রাস্তাটাই নজরুলের নামে চিহ্নিত করার জন্য। প্রখ্যাত কবি-লেখকদের নামে নামকরণের রেওয়াজ প্রতি দেশেই আছে। তবে সাধারণত এই নামকরণ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জীবনান্তের পর হয়ে থাকে। তবে এর ব্যতিক্রমও অনেক আছে। নজরুলের ক্ষেত্রে এই ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পৌরসভা সততারই পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া নজরুল জীবিত থাকলেও স্বসম্বিতে প্রতিষ্ঠিত নেই। তাই তাঁর নামে রাস্তার নাম চিহ্নিত করার মধ্যে পৌরসভার রীতিনীতি ভঙ্গ করা হয়েছে এমন অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়।

ভারতীয় সাহিত্য

ভারতে উর্দু ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা-কল্পনা চলছে। যদিও উর্দু ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত ষোলটি ভাষার মধ্যে অন্যতম, তবু ভারতে কেবলমাত্র উর্দু ভাষা ব্যবহার করা হয় এমন রাজ্য নেই। একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যভাষা হিসেবে এর স্থান স্বীকৃত। কিন্তু ভারতের আরও কয়েকটি প্রদেশে এর যথেষ্ট চর্চা ও প্রচার আছে। এই প্রদেশগুলো হল উত্তরপ্রদেশ, বিহার, দিল্লী হায়দরাবাদ ও কলকাতা। ১৯৬১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গেছে, ভারতে যাঁরা উর্দু ভাষায় কথা বলেন, তাঁদের সংখ্যা ২৩,৩০০ জন। উর্দু ভাষা ভারতের অনেক কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হয়। ১৯৬৭ সালের এক হিসেবে দেখা গেছে, ভারতে ৮৩টি উর্দু দৈনিক প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৭টি কলকাতা থেকে। এছাড়া ৩৪১টি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় উর্দুতে। সরকারী উদ্যোগেও কয়েকটি উর্দু পত্রিকা নিয়মিত চলছে। এই পত্রিকাগুলি হল, দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'আজকাল' লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত 'নয়াদুয়ার', চন্ডীগড় থেকে প্রকাশিত 'পাঞ্জাব', হায়দরাবাদ থেকে প্রকাশিত 'অন্ধ্রপ্রদেশ', পাটনা থেকে প্রকাশিত 'বিহার কি খবরে' এবং কলকাতা

থেকে 'আগাজিব বন্দাজ'। উর্দু লেখকদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে জাফর হোসেন খান, ডঃ আবিদ হোসেন, ডঃ খজা আহম্মদ ফারুকী, জিগর মোরাদাবাদী, ফিরাক গোরখপুরী, আনন্দনারায়ণ মোল্লা, রাজিন্দর সিং বেদী, ইমতিয়াজ আলি আরশি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারতে উর্দুভাষী সাহিত্যিকদের মধ্যে একটা নতুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনার ভাব লক্ষ্য করা যায়। পুরনো ভাবধারায় যাঁরা লিখছিলেন, তাঁরা ছাড়াও আরও অনেক নতুন কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব হল উর্দু সাহিত্যজগতে। এঁদের মধ্যে সিকান্দর আলি ওয়াজিদ, আলি জাওয়াদ জিন্দি, জগন্নাথ আজাদ, সাঘর নিজামি, নাজুর ওয়াডি, সর্দার জাফরি, মাখদুম মহীউদ্দীন, কাজী সালিম, আলি আব্বাস, হুসাইনি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও অনেক নতুন ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হয়েছে। বিশেষ করে রামলাল, জিলানি বানু, গ্যায়ন্স আহম্মদ গদ্দি, ইকবাল মাতিনের লেখা উপন্যাসগুলি অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে। অন্যান্য বিভাগের তুলনায় যদিও সমালোচনা সাহিত্যের অগ্রগতি উল্লেখ্য নয়, তবু ডঃ মহম্মদ হাসান, শামসুল রহমান, নিশার আহম্মদ ফারুকী, আলি নবাব জিন্দি অশলিশ আহম্মদ প্রমুখের রচনা উর্দু সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও উর্দু সাহিত্যের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য।

'গীতগোবিন্দে'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ এ সপ্তাহের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সংবাদ। অনুবাদ করেছেন মণিকা বার্মা। এর আগেও 'গীতগোবিন্দে'র কয়েকটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুবাদটি এক্ষেত্রে একটি নতুন সংযোজন। যাঁরা মূল ভাষা জানেন না, অথচ ভারতের প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহ আছে, এই গ্রন্থটি তাঁদের প্রভূত সাহায্য করবে। 'রাইটার্স ওয়ার্কশপ' গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। অনুবাদ স্বচ্ছ ও সাবলীল।

কয়েকদিন আগে ঢাকায় প্রখ্যাত ভাষা-তত্ত্ববিদ ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব পরলোক-গমন করেছেন। তাঁর এই মৃত্যুসংবাদে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতির এক সভায় গত ১৪ই জুলাই গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন বক্তা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে ভাষণ দেন। সভায় গৃহীত এক শোকপ্রস্তাবে বলা হয়েছে—ডঃ শহীদুল্লার মধ্যে পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যরসের যে সমন্বয় ঘটে-ছিল তার নজীর বিশ্বসাহিত্যে বিরল। সুদীর্ঘকাল ধরে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার এবং বাংলার জনসাধারণের প্রতিও প্রস্তাবে সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

বিদেশী সাহিত্য

দু'শ বছর আগে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ছাপা হয় স্কটল্যান্ডের এডিন-বার্গ শহরে। ব্রিটানিকার ক্রেতার সংখ্যা ছিল তিন হাজার। প্রতিবার ছাপা হতো চার পৃষ্ঠা করে। তিন বছরে তার পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় দু'হাজার ছ'শ উননব্বই। শহরের একজন চর্মকার ক্রেতাদের সংগৃহীত পৃষ্ঠাগুলি চামড়ায় বাঁধিয়ে দিতো। কিছুকাল আগে চার্লস ট্রেলেন নামে জনৈক ইংরেজ ব্যবসায়ী ব্রিটানিকার প্রথম প্রকাশিত তিনটি খন্ড কিনেছেন ছ'শ কুড়ি পাউন্ড মূল্য দিয়ে।

সম্প্রতি ব্রিটানিকার দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রীতি-ভোজের আয়োজন করেন। খবরে প্রকাশ, গত ১৫ মে থেকে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ব্রিটানিকার দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে একটা লেকচারারশিপ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোন গ্রন্থের নাম বা প্রকাশনা উপলক্ষে অনুরূপ কোনো চেয়ার কিংবা লেকচারার-শিপ প্রবর্তন করেছেন বলে আমরা জানি না।

গত বছরের শেষদিকে ইংলন্ড-আমেরিকায় কয়েকটা অনুষ্ঠান হয়ে গেছে এই উপলক্ষে। ব্রিটানিকার প্রকাশক উইলিয়াম বেন্টন এনসাইক্লোপিডিয়ার প্রথম সংস্করণের একটি হুবহু পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করেন সম্প্রতি। তার দাম ঠিক করা হয়েছে আশি ডলার।

মার্কিনী সাংবাদিক ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক নরম্যান মেইলার সম্প্রতি ন্যুয়র্কের মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে স্থির করেছেন। কিন্তু তার জন্যে টাকা পাবেন কোত্থেকে? ইলেকশন ক্যাম্পেন কেবল মুখের কথায় চালানো যায় না, অর্থের দরকার হয়। গত বছর তিনি দাঙ্গার ওপর একটা বই লিখে রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছেন।

তাঁর অনুগামীদের ধারণা, মেইলারকে টাকার জন্য আদৌ কষ্ট পেতে হবে না। অ্যাপেলো-১১-র ওপর তিনি যে নতুন বইটি লিখবেন বলে স্থির করেছেন, তার জন্যে লিটল ব্রাউন সংস্থার কাছ থেকে আট লক্ষ ডলার অগ্রিম রয়ালটি তিনি পেয়ে গেছেন। মেইলারের ইচ্ছে, কেপ কেনেডিতে রকেট ওড়ার এমন কিছু চমক-প্রদ খবরাখবর উপন্যাসটিতে দেবেন, যা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এখনো জানে না।

শোনা যায়, বইটির একটা সংক্ষিপ্ত-সার শীঘ্রই ছবিসহ লাইফ পত্রিকায় বেরোবে। লেখা শেষ হলে চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হবে এর মূল কাহিনীটি। তাতেও লেখকের অর্থাগম নেহাৎ কম হবে না।

একটি প্রশ্নের উত্তরে মেইলার বলেন, "আমি এখন যা লিখছি, তার জন্যে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থই কেবল এই নির্বাচনের প্রচারে ব্যয়িত হবে।"

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানী এবং অস্ট্রিয়ার দশজন তরুণ সাহিত্যিক আলোচনার জন্য মিলিত হয়েছিলেন লোয়ার সেকসনির দুদারস্টেড-এ। উদ্দেশ্য হলো আঙ্গিক, সময়চেতনা, এবং সাহিত্যের প্রগতি সম্পর্কে যৌথপ্রয়াসের সম্ভাবনা নির্ণয়। পশ্চিম জার্মানীর কলোন বেতার-কেন্দ্র ছিলেন এ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। আলাপ-আলোচনা চলে পুরো দশদিন।

কলোন বেতারকেন্দ্র এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করেন। তাঁদের মতে, পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রয়াস ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে গণ্য হবার মতো যোগ্য বিষয়। ভবিষ্যতে অনুরূপ আরো সাক্ষাৎকারের আয়োজন করতে তাঁরা আগ্রহী।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একজন (ইউই হার্মস) বলেন : "বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে পলায়নের এ হলো সার্থক উদ্যম।" ডাইওয়েলট কাগজে অপর একজন অংশ-গ্রহণকারী একটি ক্রেসমান লিখেছেন : "সংক্ষেপে বলতে গেলে এ হলো ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টিকে জানার শ্রেষ্ঠতম উপায় নিজের নেতিবাচক ভাবমাচিন্তার পরিবর্তে অন্য ভাষার বৈশিষ্ট্য ও টেকনিককে উপলব্ধি করার একমাত্র মাধ্যম।

খবরে প্রকাশ, ন্যু-ইয়র্ক শহরে নাকি একটা অশ্লীলতা-বিরোধী সংস্থা গড়ে উঠেছে। দেশের সাহিত্যসংস্কৃতির পরি-মন্ডলকে সুস্থ সামাজিক রাখাই হবে এই সংস্থার অন্যতম প্রধান কাজ। এজন্যে ৯৮২ নম্বর ব্রডওয়েতে একটি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। অশ্লীলতা এবং অপ-রাধ বিষয়ক বই ও রিপোর্ট থাকবে এই লাইব্রেরীটিতে। এসব দুনিয়াজোড়া যে অশ্লীল সাহিত্যের মহোৎসব চলছে, তার বিরুদ্ধে যদি কারো কোনো বক্তব্য থাকে, তাহলে তাঁরা উক্ত ঠিকানায় লিখে জানাতে পারেন। নাম 'অপারেশন ইয়র্ক ভিল'।

PALESTINE : a symposium. The League of Arab States Mission, 27 Sardar Patel Road, New Delhi-11. Rs. 3.50.

ইসরাইল রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এবং প্যালেস্টাইন সমস্যা বিশ্ব রাজনীতিকে বার-বার বিপদের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। ইহুদী এবং আরব দু জাতির সহাবস্থান যে কতো কঠিন—দুটি বৃহদায়তন যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণিত। '৬৭ সালের যুদ্ধের পর আরব রাষ্ট্রগুলি বেশ অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। বিরাট আরব ভূখণ্ড ইসরাইলের দখলে। সমগ্র প্যালেস্টাইন দখলের পর বিরাট সংখ্যক উদ্বাস্তু আজ আরব রাষ্ট্রগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা প্রথম থেকে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ এবং গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ইসরাইলী কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করে তুলেছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের দিকে এগোচ্ছে না। ক্রমশ তা জটিল এবং ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। বেশ কিছুকাল আগে আরব রাষ্ট্রগুলির বক্তব্য প্রচারের জন্য 'দি লীগ অব আরব স্টেটস মিশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁদের দপ্তর আছে বিভিন্ন মিত্র রাষ্ট্রে। দিল্লী অফিস থেকে এঁরা বিভিন্ন তথ্য ও তথ্যমূলক পুস্তিকা প্রচার করে থাকেন। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে প্যালেস্টাইন এ সিমপোজিয়াম।' প্যালেস্টাইন সমস্যা যে কত জরুরী এবং তার আজ সমাধান না হলে যে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হোতে পারে—তার সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই বই-এ। বিশ্বশান্তির স্বপক্ষে যাঁরা তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই এর গুরুত্ব রয়েছে। অধিকাংশ নিবন্ধ অ-আরব আর ইহুদীদের রচনা। বহু বক্তব্য যদিও মিশনের আদর্শের পরিপন্থী, তবুও ঘটনার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য সব রচনাই প্রকাশ করেছেন এঁরা। ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকে আরব-দের প্রতিরোধের প্রচেষ্টা স্পষ্ট। সম্প্রতি-কালে জন্ম নিয়েছে আলফাতা আন্দোলন। প্যালেস্টাইনবাসীরা সংগঠিতভাবে নৃশংস প্রতিরোধের পথে এগিয়ে গেছে কিভাবে জনৈক 'আলফাতা' ভাষাকারের বক্তব্যে অস্পষ্ট। অবশ্য তাঁরা বলছেন প্যালেস্টাইনবাসীরা চায় ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে। জয়প্রকাশ নারায়ণ, আর্নল্ড ইয়েনবি, আইজাক ডয়েটশার, মোশে মেশুহিন, তালিব এল সাবিব, জন ন্যাকক্লেন, সালামা অল খালিলি এবং আরো কয়েকজনের রচনা সংকলিত হয়েছে। পরিশিষ্টে নাসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, রাজা হোসেনের একটি ভাষণ, গোলডা মীরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বিশেষ মূল্যবান। চারটি মূল্যবান মানচিত্র এবং কয়েকটি আলোকচিত্র আছে। এই সব আলোকচিত্রে ইসরাইলী নৃশংসতার চেহারা এবং আলফাতা আন্দোলনের রূপটি পরিষ্কার বোঝা যায়।

●

গডফ্রে মরগান :(উপন্যাস)—জুল ভার্ন। অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সিগনেট বুক শপ। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—পাঁচ টাকা।

প্রশান্ত মহাসাগরের নির্জন দ্বীপ স্পেন্সার আইল্যান্ড চল্লিশ লক্ষ ডলারে কিনে গিয়েছিলেন উইলিয়াম ডব্লিউ কোল্ডেরূপ। কোল্ডেরূপ এমন ব্যক্তি, যিনি তাঁর ডলার গোনেন কোটির অঙ্কে। দ্বীপটি কেন যে কিনলেন নিজেও তা তিনি জানেন না। আর একজন ধনী টাস্কিনার ছিলেন কোল্ডেরূপের প্রতি-দ্বন্দ্বী। দ্বীপটি তারও কেনার ইচ্ছা ছিল খুবই। কিন্তু হিসাবে বেশী দাম দিতে না পারায় কেনা আর তাঁর হোল না। কোল্ডেরূপ নিঃসন্তান। ভাগনে গডফ্রে মরগান আর পালিতা কন্যা ফিনা হলানেকে মানুষ করছেন তিনি। ইচ্ছে দুজনের বিয়ে দিয়ে যাবতীয় সম্পত্তি দিয়ে যাবেন তাদের। বিয়ের আগে দুবছর পৃথিবী একা ঘুরে দেখতে চাইল মরগান।

কোল্ডেরূপ রাজী হলেন। তাঁর জাহাজ 'স্বপ্নে' চেপে সমুদ্র যাত্রা করল মরগান একদিন। সঙ্গে গেল নৃত্যশিক্ষক টার্টলেট। কয়েকদিন পরে সমুদ্রে শুরু হোল ঝড়-বৃষ্টি। জাহাজ প্রায় ডুবুডুবু। জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়ল মরগান। অতিকষ্টে সাঁতরে গিয়ে উঠল এক দ্বীপে। জ্ঞান হওয়ার পর আর সে জাহাজের চিহ্ন দেখতে পেল না। কিন্তু দ্বীপে একমাত্র অচেতন টার্টলেটকে খুঁজে পেল। এই নিঃসঙ্গ দ্বীপে গাছের ফল, বুনো মুরগীর ডিম খেয়ে দিন কাটায় তারা। গডফ্রে দ্বীপটির নাম রাখে ফিন আইল্যান্ড। হঠাৎ একদিন সমুদ্রের ধারে এক বাক্স জামা-কাপড়, বাসনকোসন, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র পেয়ে তাদের উল্লাস ধরে না। আগুন না থাকার সমস্যা মুক্ত হয়ে তারা নানা ধরনের খাবার তৈরি করে খাওয়া শুরু করলে। একটা গাছের গুঁড়ির গর্তে তাদের সৌখীন আবাসগৃহ। সেখানে সব সময় থাকেন টার্টলেট। আর গডফ্রে শিকার করে আনে। একদিন একদল আদিবাসীর কাছ থেকে কারেফিনোতুকে উদ্ধার করে আনে তারা। তাদের নিঃসঙ্গ জীবন অনেকটা স্বাভাবিক মনে হয়। যদিও লোকটি একবর্ণ ইংরেজি বোঝে না। বাঘ, ভালুক আর সাপের হাতে পড়ে তিনজনের নির্ভয় জীবন ভয়ার্ত হয়ে ওঠে। যবের চাষ করা, মুরগী ধরা, ছাগলের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকার জীবনকে দুর্ধর্ষ বর্ষা আর বন্য জন্তুদের আক্রমণে আতঙ্কিত করে তোলে। এক নিদারুণ বর্ষার রাতে যখন দ্বীপটি প্রায় তছনছ হয়ে যাওয়ার জোগাড়, বাইরে অসংখ্য হিংস্র জন্তুর হুংকার তিনটি মানুষকে প্রায় জীবন্মৃত করে ফেলেছে। ওপর থেকে পড়ছে বাজ। এমন সময় বাইরে গুলির আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে তারা। আবছা আলোয় দেখা যায় লোকজন। কোল্ডেরূপ, ফিনা আর তার সঙ্গীরা। তাঁরা উদ্ধার করেন এদের। ক্রমে জানা গেল সব ঘটনাটাই পরিকল্পিত। এই দ্বীপটি কিনেছিলেন কোল্ডেরূপ। জাহাজটি ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে যায় ওদের এখানে। কিন্তু ঐ জন্তু জানোয়ার। জানা গেল হিংসাবশত টার্সকিনার বহু অর্থ ব্যয়ে ওগুলি কিনে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে গেছেন দ্বীপে।

এই হোল কাহিনী। জুল ভার্ণের আশ্চর্য কল্পনাশক্তি ও অ্যাডভেঞ্চার জ্ঞানের জন্য একটি গতিবেগ যেমন রয়েছে কাহিনীতে তেমনি অসাধারণ এর আকর্ষণের ক্ষমতায় কোথাও মনে হয় না একটা সাজান ঘটনা। এত বছর পরেও বইখানি পড়তে এতটুকু ক্লান্তিবোধ হবে না। তাছাড়া অতি স্বচ্ছ এবং সাবলীল বাঙলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীমানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নামগুলো বাদ দিলে, বইয়ের কোন অংশই বিদেশী বলে মনে হয় না। মুদ্রণ এবং প্রচ্ছদ সুরুচিপূর্ণ।

কস্তুরী-কৌশিক (উপন্যাস) — শাশ্বত। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস, ৩০।১, কলেজ রো, কলকাতা—৯। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

গল্প বলা একটা আর্ট। এ আর্ট সব লেখকের সহজাত নয়। পরিশীলিত পরিচর্যায় তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়। সাহিত্যে নবাগত শাশ্বত-এর প্রথম লেখা উপন্যাসখানি পড়েই মনে হল তিনি কুশলী কথক—গল্প বলতে জানেন, এই বলতে পারার প্রসাদগুণে সাধারণ কাহিনীকে আশ্চর্য সুন্দরভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন ঘটনার আলোছায়াভরা টানাপোড়েনে। বলার গুণে বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে এবং কাহিনীর বিস্তারে ও বিন্যাসে বইখানি পাঠকমনকে খুশী করবে।

প্রধাসিন্ধ হিরণ্য উদ্ধার (কাব্যগ্রন্থ)—শ্যামলকুমার ঘোষ। সাময়িকী প্রকাশনী, ৪এফ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা—৯। দাম : দু টাকা।

তীব্র ক্ষোভ ক্রোধ ও অস্থিরতার ভেতরেও সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার একটি ধারা নিজস্ব পথনির্মাণের সিদ্ধিতে পৌঁছতে নিরন্তর প্রয়াসী। শ্যামলকুমার ঘোষ এই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় তাঁর আবেগকে মূলত অনুসন্ধানের কাজেই ব্যাপৃত রেখেছেন। কোনো কবিতায় তাঁর আকাঙ্ক্ষার স্ফূর্তি উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছতর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তবে অধিকাংশ কবিতাই এখনো অপরিণত। ছাপা বাঁধাই নিম্নশ্রেণীর। প্রচ্ছদ মন্দ নয়।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

শুকসারী [ষষ্ঠ বর্ষ, বর্ষা সংখ্যা ১৩৭৬] —সম্পাদক মিহির আচার্য, ১৭২।৩৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৪।। দাম : এক টাকা।।

প্রায় ছ বছর ধরে শুকসারী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ছোট গল্পের একটি শ্রেষ্ঠ ত্রৈমাসিক হিসেবে পত্রিকাটি এর মধ্যে জনস্বীকৃতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিক গল্পকারদের পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক রচনার প্রকাশেও সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গি উদারতম। সস্তা, সুলভ নাম কেনার প্রতি পত্রিকাটির কোনো মোহ নেই বলেই মনে হয়। প্রায় বছর তিনেক আগে শুকসারীর একটা অনুবাদ সংখ্যা বেরিয়েছিল। তাতে বাঙালি গল্পকারদের সামনে বিদেশী সাহিত্যের ফলাফলকে তুলে ধরবার সম্পাদকীয় প্রয়াস ছিল। পরে পূর্ববাংলার গল্পসংখ্যা প্রকাশ করেও পত্রিকাটি গভীর দায়িত্ব বোধের পরিচয় দিয়েছে। তিন বছর পর শুকসারীর বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে 'বিশ্ব গল্পসংখ্যা'রূপে। পৃথিবীর এগারোটি ভাষায় প্রকাশিত বারোটি নতুন ধরনের গল্প অনুবাদ করেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, অমিতাভ ঘোষ, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিশির মজুমদার ও আলাউদ্দিন আল আজাদ। সম্পাদক শ্রীমিহির আচার্য লিখেছেন : "এবারকার পরিকল্পনায় বিশেষত্ব এই যে অধিকাংশ গল্পই যুদ্ধোত্তর পটভূমিকার ওপর লিখিত।...বর্তমান চলমান পৃথিবীতে সংকীর্ণ অর্থে আঞ্চলিক সাহিত্য বলতে কিছু নেই। য়ুরোপের মানুষ যে-সকল আত্মিক সমস্যায় জর্জরিত, এই ভারতবর্ষেও সে সমস্যাগুলি কম-বেশি একই ধরণের।" বাঙালি পাঠক এই সংখ্যাটির মারফৎ সংক্ষেপে বিশ্ব পরিক্রমা করে আসতে পারবেন।

Galaxy (Vol. I, No. 2) Editor : Anup Basak, 1A, Surjya Dutt St., Calcutta 6. Price 50 Paise.

ইংরেজীতে প্রকাশিত শিল্প-সাহিত্যের ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে। বর্তমান বিশেষ সংখ্যাটিতে স্থান পেয়েছে নজরুল সম্পর্কে কয়েকটি সুন্দর আলোচনা। লিখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুজাফফর আহমদ, প্রবোধকুমার সান্যাল, কাজী অনিরুদ্ধ, বসুধা চক্রবর্তী, শংকর মজুমদার। নজরুলের কয়েকটা কবিতা অনুবাদ করেছেন সুন্দর মজুমদার, ইন্দ্রজিৎ দাশ, শান্তনু ধর এবং অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। 'জাগো অনশন বন্দী'র একটি স্বরলিপি মুদ্রিত হয়েছে কাজী অনিরুদ্ধর ব্যবস্থাপনায়।

অনুষ্টুপ [তৃতীয় বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা]—সম্পাদক অনিল আচার্য।। ৫১ বলদ রায় লেন, কলকাতা-১০।। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গত দু বছর অনিয়মিত প্রকাশের পর বর্তমান সংখ্যায় অনুষ্টুপ সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নিয়ে বেরিয়েছে। প্রচ্ছদে আগের সেই হেলাফেলার ভাবটা আর নেই। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা দু'রঙের একটা ছবি ছাপা হয়েছে ওপরের মলাটে। লেখা নির্বাচনেও সম্পাদকের দৃষ্টিভঙ্গি পালটে গেছে। পাবলো নেরুদা এবং পূর্ববাংলার সাহিত্যের ওপর লেখাগুলি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন কাব্য নাটকের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। 'লেখক ও এসটাব্লিশমেন্ট' প্রসঙ্গে অসীম রায়ের নিবন্ধটি পাঠককে ভাবিত করবে। তাছাড়া গল্প-কবিতার নির্বাচনে সম্পাদক আধুনিক জীবন দৃষ্টির পরিচয় গোপন করেন নি।

একালীন (চৈত্র-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫-৭৬)—সম্পাদিকা কুমকুম দে। ৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। দাম : ৬২ পয়সা।

বেশ ছিমছাম পত্রিকা হয়েছে একালীনের বর্তমান সংখ্যাটি। পাঁচটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন অমিতাভ দাশগুপ্ত, বিমল রায়চৌধুরী, রামেন্দ্র দেশমুখ্য, পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং অমিতাভ। গল্প, কবিতা এবং একাঙ্ক নাটকও ছাপা হয়েছে।

একটু থেমে স্বয়ং নায়কের অসম্পূর্ণতার কথা তুলে বললেন, আমার অস্থিরতাই এর জন্যে দায়ী। কি হবে বেশি লিখে। ফেলে রেখেছিলাম রি-রাইট করবো ভেবে। বই বেরোবার সময় তাও আর হল না। আমাকে যাঁরা চান, তাঁরা তাতেও হতাশ হবেন না। আমার বৈশিষ্ট্য সবাই পাবেন তার মধ্যে। আমি তো পপুলার লেখা লিখি না। ১৯৬৩ থেকে '৬৬ পর্যন্ত প্রায় কিছুই লিখিনি। ঠিক করেছিলাম, আর লিখব না। এখন মনে হয়, আমাকে লিখতেই হবে। ইচ্ছে করলেও লেখা ছাড়তে পারব না।

আপনার আর কোনো উপন্যাস কি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে?

—'জল দাও' অর্ধেক লেখার পর আমেরিকায় চলে গিয়েছিলাম। বাকি অংশ সেখান থেকে লিখে ডাকে পাঠাই। ১৯৬৬-র 'দেশ' শারদীয়ায় তা বেরোয়।

আপনি কি মনে করেন আপনার সাংবাদিক জীবন সাহিত্য-সৃষ্টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে?

—না। এটা একটা বাধা নয়। উৎসাহ থাকলে সময় করে নেওয়া যেতো। আসলে আমি উৎসাহ পাই না। যদি চারদিকের তাগাদা থাকতো তাহলে হয়তো আরো লিখতে পারতাম।

আমি কথার ফাঁকে ফাঁকে ভাবছিলাম তার অতীত-জীবনের কথা। কিছুটা তাঁর মুখে শোনা। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের, বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের এমন আশ্চর্য মিল ঘটাতে পেরেছেন বাংলাদেশের আর কয়জন লেখক? ফরিদপুরের রাজবাড়িতে তাঁর জন্ম, কিন্তু যোগাযোগ কলকাতার সঙ্গে। বাংলার আমবাগান, বাঁশবাগান ও বর্ষণমুখর প্রকৃতিকে তিনি উপলব্ধি করেছেন পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে। অবকাশ পেলেই এখনো তিনি সেখানে চলে যান স্বপ্নের রেলগাড়িতে। বাস্তবজীবনেও এই রেলগাড়িই তাঁকে পেঁৗছে দিয়েছিল নগরজীবনের প্রাণকেন্দ্রে। সেজন্যেই দেখি, তার অধিকাংশ উপন্যাসে নাগরিক জীবনের সংবাদ, বৈদগ্ধ্য ও যন্ত্রণার উচ্চারণ এবং অতীতচারণার স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত। তাঁর কোনো দেখাই দূর থেকে নয়। বিষয়ের সঙ্গে জড়িত না হয়ে কিছুই লিখতে পারেন না তিনি। বস্তুর গভীরে প্রবেশ করে, তার সারসত্যকে প্রকাশ করেছেন বারবার।

ভাবতে ভাবতে আমি স্বয়ং নায়কের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। ১২৩ পৃষ্ঠার শেষ তিন পংক্তির দিকে নজর পড়ল। তিনি লিখেছেন, 'সমব্যথীর মত আমি এগিয়ে গেলাম। খুব নিচু গলায় ওর নাম ধরে ডাকলাম। ও চোখ তুলল, এখনও ওর চোখ টলমল। আমি ওর কান্না ছুঁলাম। সেই সময়, সেই মুহূর্তে আমি সর্বাণীকে আবিষ্কার করলাম।'

এই কান্না ছোঁয়া তো জীবনকে স্পর্শ করারই নামান্তর। প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেছেন নতুনভাবে, নতুনতর পটভূমিতে। কত কিছুই তো ঘটে যাচ্ছে প্রাত্যহিক। তাকে দেখার চোখ সকলের থাকে না সন্তোষকুমার ঘোষ সেই দুর্লভ দৃষ্টিশক্তির অধিকারী। শব্দের ব্যবহারে সতর্ক, নিপুণ, এবং আত্মউন্মোচনে সর্বদা ব্যাকুল সন্তোষবাবুকে আমি আমার হৃদয়ের অত্যন্ত কাছাকাছি মানুষ বলেই জেনে এসেছি সেদিন। বিশেষ করে তাঁর কাব্যভাষা ও সংলাপের অভিনবত্বে আমি রীতিমতো উল্লাস বোধ করি। বিষণ্ণ বোধ করি, তাঁর নস্টালজিক অনুভূতিতে: 'আমরা যে জীবনে আছি, তাকে চাই না, পুরনো জীবন ফিরে পাই না।'

জিজ্ঞেস করলাম, আপনার লেখায় পূর্ববর্তী কার কার প্রভাব আপনি স্বীকার করেন?

—রবীন্দ্রনাথ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র। রবীন্দ্রনাথকে আমি ঈশ্বরের মতো শ্রদ্ধা করি। স্কুল-জীবনের লেখায় শরৎচন্দ্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপ আছে বিশেষ করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের ফর্ম ও টেকনিক অসাধারণ। তা আমাকে প্রভাবিত করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

—মানিকবাবু বাংলা সাহিত্যের সব চাইতে পাওয়ারফুল লেখক না হলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারার লেখক। তিনি লিখেছেন একেবারে আলাদা মানুষের কথা। তাঁর ভাষার চোটপাট কম। অথচ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কত নতুন—কত অভিনব। তিনিই উদ্ঘাটন করলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ভণ্ডামি, সাধুর মধ্যে যে ভণ্ডামি, বাবা-মায়ের সম্পর্কের নতুন দিক। আমাদের গ্রাম এবং শহরজীবনকেও নতুনভাবে উপলব্ধি করি তাঁর মধ্যে। যেমন বাংলাসাহিত্যে মাইকেল, বঙ্কিম নতুন, রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র—তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ র‍্যাশনাল এবং অসম্ভব নতুন।

বিদেশী-সাহিত্যিকদের মধ্যে কারো প্রভাব কি আপনার ওপরে লক্ষ্য করা যায়?

—আমার প্রথম জীবনের লেখায় সমরসেট মম ও গ্রেনের প্রভাব আছে। বার্নার্ড শ পড়েছি, কিন্তু কখনো প্রভাবিত হইনি। বরং গলসওয়ার্দির প্রভাবকে আমি স্বীকার করি। তা ছাড়া ভালো লাগে ট্রুম্যান কাপোর্ট, এবং কাফকার লেখা। লরেন্স ও আপটন সিনক্লেয়ার আমার খুব প্রিয় লেখক। তাঁদের প্রভাব থাকতেও পারে।

আলোচনা শেষ করে আমি রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। প্রথমে ঘরে ঢুকে দেখেছিলাম সাংবাদিক সন্তোষকুমার ঘোষকে। একটি বড় পত্রিকার অন্যতম প্রাণপুরুষ। ফেরার সময় নিয়ে এলাম আরেক মানুষের স্মৃতি, যাঁর জীবন অভিজ্ঞতা এবং শিল্পদৃষ্টি শুধু অনন্য নয়, স্বতন্ত্র, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সম্পর্ক আবিষ্কারে যিনি নিরলস। স্বয়ং নায়কে'ও পাওয়া যাবে সেই সন্ধানের গভীরতম স্বাক্ষর। লেখক বললেন, এর নায়ক আসলে তিনি নিজেই। কিন্তু লেখায় গুণে হয়ে উঠেছে তা এই বিক্ষুব্ধ প্রশ্নাতুর যুগেরই স্বপ্ন-প্রতীক।

—নিজস্ব প্রতিনিধি

নিমাই ভট্টাচার্য

(দুই)

ইউরোপের সবচাইতে গরীব দেশ পর্তুগালে আইন আছে, রাজধানী লিসবনে সবাইকে জুতো পরতে হবে। পয়সা কোথায়? লিসবনে হাজার হাজার মানুষের জুতো কেনার সামর্থ নেই। তবুও জুতোর মতই একটা কিছু পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই হতভাগ্য মানুষের দল। দূরে থেকে পুলিশ দেখলেই পায় পরে নেবে। আবার পুলিশ একটু দূরে চলে গেলেই খুলে পকেটে রেখে দেয়।

চোখ মেলে চারদিক দেখলেই এমন দেখা যায়, জানা যায়। টুরিস্টদের মত শুধু বাহ্যিক চোখের দেখাই ডিপ্লোম্যাটদের কাজ নয়। আরো অনেক কিছু দেখতে হয়, জানতে হয় এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে হয়। দশটা-পাঁচটায় চাকরি করলে ডেপুটি সেক্রেটারীর দায়িত্ব শেষ হয়, কিন্তু কেনসিংটনে বা ফিফথ্ এভেনিউতে ককটেল পার্টিতে গিয়ে ছ' পেগ আট পেগ হুইস্কী খাবার পরও ডিপ্লোম্যাটকে সতর্ক থাকতে হয় গোপনে খবর জানার জন্য। হাজার হোক ডিপ্লোম্যাটরা মর্যাদা-সম্পন্ন ও স্বীকৃত গুপ্তচর ছাড়া আর কিছুই নয়। ফ্রেন্ডসিপ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং শুধু বুকনি মাত্র। রোজ কালচারাল টাইস্ তেল দিয়ে খবর জোগাড় করার কায়দা মাত্র। অন্যান্য দেশের মতিগতি বুঝে নিজের দেশের সুবিধা করে দেওয়া অর্থাৎ স্বার্থ রক্ষাই ডিপ্লোম্যাসীর একমাত্র ধর্ম। এসব কথা সারা পৃথিবীর সমস্ত ডিপ্লোম্যাটরা জানেন। ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরাও জানেন।

সব জেনেশুনেও চলছে এই লুকোচুরি খেলা। এক-এক দেশে এক-এক রকমের লুকোচুরির খেলা চলে। মস্কো বা ওয়াশিংটনের যে কোন ডিপ্লোম্যাটিক মিশনে যান। দেখবেন, কেউ কোন ঘরে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করছেন না। বাইরে বরফ পড়ছে, তবু পরোয়া নেই। ভেতরের গার্ডেনেই কথাবার্তা হবে। কেন? কেন আবার, জুজুর ভয়! কোথা দিয়ে কে সব কিছু টেপ্ রেকর্ড করে নেয়! আজকাল তো পয়সা দিলেই ওয়াচ্ রেকর্ডার পাওয়া যায়। ডিপ্লোম্যাটদের পিছনে টিকটিকি ঘোরাঘুরি করেই। টেলিফোনে কথাবার্তাও নিরাপদ নয়। বড় বড় দেশের অনেক সামর্থ্য, কত কিছুই তারা করতে পারে। কিন্তু ঐ ছোট্ট দেশ আফগানিস্থান! এমনই জুজুর ভয় যে কাবুলে বহু ডিপ্লোম্যাটেরই টেলিফোনের প্লাগ খুলে রাখতে দেখা যাবে।

আরো কত কি আছে! তবুও এরই মধ্যে হাসি মুখে কাজ করে যান ডিপ্লোম্যাটরা। সুন্দরী যুবতী আর মদের প্রতি পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষেরই দুর্বলতা। বিশেষ করে উপঢৌকন হিসেবে, সৌজন্য হিসেবে যখন এসব আসে, তখন অনেক মানুষই লোভ সম্বরণ করতে পারেন না। মদ বা মেয়েদের বর্জন করে ডিপ্লোম্যাসী করা অনেকটা কলের জলে কালী-পুজো করার মত। কাজকর্মের তাগিদেই রোজ সন্ধ্যায় ডিপ্লোম্যাটদের ককটেল লাউঞ্জ স্যুট পরে মদ খেতে হয়, মেয়েদের সঙ্গে নাচতে হয়, খেলতে হয়, হাসতে হয়। বারুদ নিয়ে খেলা করলেও বারুদের আগুনে পুড়তে পারেন না ডিপ্লোম্যাটরা। আরো অনেক সতর্কতা দরকার! পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বা সিভিল সাপ্লাই অফিসার বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ঘুষ খেলে ক্ষতি হয় কিন্তু দেশ রসাতলে যায় না। ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের থার্ড সেক্রেটারী বা একজন অতিসাধারণ অ্যাটাচি ঘুষ খেলে কিন্তু দেশের মহা সর্বনাশ হতে পারে। এভাবে বহু দেশের বহু সর্বনাশ হয়েছে, ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই হবে।

বড় বড় দেশের তুলনায় ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের মাইনে অ্যালাউন্স অনেক কম। সারা দুনিয়ার ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মেলামেশা করতে হয় ও'দের। চারদিক থেকে প্রলোভন কম আসে না।

ইউনাইটেড নেশনস্-এর করিডরে বা ক্যাফেতে মাঝে মাঝে দেখা হতো দুজনের। 'হাউ ডু ইউ ডু' 'ফাইন, থ্যাংক ইউ' পর্যায়েই পরিচয়টা সীমাবদ্ধ ছিল। কদাচিৎ কখনও ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে দেখা হতো, সামান্য কথাবার্তা হতো। এর বেশী নয়।

কিছুকাল পরে আর্ট সেন্টার অফ দি ওরিয়েন্টের আমন্ত্রণে যশস্বিনী ভারতীয় নর্তকী কুমারী পদ্মাবতী আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে এলেন নিউইয়র্ক। ইন্ডিয়ান মিশনের উদ্যোগে ও নিউইয়র্ক সিটি সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় এই যশস্বিনী নর্তকীর নাচ দেখাবার ব্যবস্থা হলো।

পরের দিনই ভদ্রলোক ইউনাইটেড নেশনস্-এ মিঃ নন্দাকে ধরলেন। 'ইন্ডিয়ান মিউজিক, ইন্ডিয়ান ডান্স আমার ভীষণ ভাল লাগে। যদি কাইন্ডলি মিস পদ্মাবতীর প্রোগ্রাম দেখার...।'

মিঃ নন্দা বল্লেন, 'নিশ্চয়ই। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য এত করে বলবার কি আছে?'

ভাল করে আলাপ পরিচয়ের সেই হলো সূত্রপাত।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঘন-ঘটা দেখা দিল। একটা আমেরিকান প্লেন ইউনাইটেড নেশনস্-এর ডিউটি দেবার সময় উত্তর কোরিয়ার আকাশ থেকে উধাও হয়ে গেল চীনাদের গুলী খাবার পর। আরোহীও বিমান-চালকদের সম্পর্কে কিছু জানা গেল না। প্রায় এক বছর পর খবর পাওয়া গেল ১১জন বিমান-চালক ও তাঁদের সঙ্গীরা গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন।

শুরু হলো মারাত্মক স্নায়ুযুদ্ধ। আশঙ্কা দেখা দিল বিশ্ব-যুদ্ধের। ইউনাইটেড নেশনস্-এ ঝড় বইতে লাগল।

এমন সময় ইউ-এন ক্যাফেতে নন্দার সঙ্গে ভদ্রলোকের দেখা।

'আপনি বলেছিলেন আপনার কাছে সেতারের অনেক রেকর্ড আছে...।'

'হ্যাঁ, আছে।'

বেশী কিছু নয়, সামান্য টেপ করার অনুমতি চাইলেন। অনুরোধটা ঠিক পছন্দ না করলেও ভদ্রতার খাতিরে না বলতে পারলেন না মিঃ নন্দা। বল্লেন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তবে কদিন একটু ব্যস্ত......

'কারেন্ট ক্রাইসিস নিয়ে ব্যস্ত বুঝি?'

যাই হোক কদিন পর ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই টেপ রেকর্ডার নিয়ে নন্দার ফিফটি সিক্স ইস্টের ফ্ল্যাটে হাজির হলেন। ডাইরেক্ট রেকর্ডিং চ্যানেলে টেপ রেকর্ডারটা ফিট করে খোস-গল্প শুরু করলেন। বেশ কিছুক্ষণ আজে-বাজে কথাবার্তা বলার পর এলো সেই প্রশ্ন, 'এতবড় ক্রাইসিসে তোমরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে নেই?'

নন্দা বল্লো, 'আর সবার মত আমরাও চিন্তিত।'

'দ্যাটস্ ট্রু বাট তোমাদের তো একটা স্পেশ্যাল পজিশন আছে। বোথ আমেরিকা আর চীনের বন্ধু হচ্ছ একমাত্র তোমরা।'

'আরো অনেক দেশ আছে।'

'তবুও...!'

'ওয়ার্ল্ড ওয়ার হলে আমাদের এরিয়ার অনেক দেশের ক্ষতি হবে। তাই আমরা চাই ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যাক।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন, 'ইউ আর পারফেক্টলি রাইট মিস্টার

নন্দা। আমি সিওর তোমরা চুপচাপ বসে থাকবে না। তাই না?'

উদাসীন ভাবে মিঃ নন্দা উত্তর দিলেন, 'জানি না। আমার মত চুনোপুঁটি ডিপ্লোম্যাট কি এসব খবর জানতে পারে?'

নন্দা যে ইণ্ডিয়ান মিশনের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করছিলেন, এ খবর ভদ্রলোক নিশ্চয়ই জানতেন। তা না হলে ওদের মিশনের পার্টিতে নন্দাকে এতবার করে যাবার কথা কেউ বলতো না এবং ভদ্রলোকও সীটার রেকর্ড করার জন্য ওর ফ্ল্যাটে যেতেন না।

অবস্থা আরো জটিল হলো। ওয়াশিংটনের হুমকি আর পিকিংয়ের অবজ্ঞা চলল সমান তালে। তাড়াহুড়ো করে আমেরিকা ফরমোজার সংগে সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করল, মার্কিন নৌবহরের সেভেনথ ফ্লীট চীনের চারপাশে মহড়া দিতে শুরু করল। তবুও চীন বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে বার-বার বল্লো, হুঁশিয়ার আমেরিকা।

ডালেস-ম্যাকার্থীর মতবাদের জোর যখন কমতে শুরু করেছে ঠিক তখন এই আন্তর্জাতিক ঘন-ঘটায় আমেরিকা আবার ক্ষেপে উঠল। ভারতবর্ষ সত্যি চিন্তিত হলো। এশিয়ার শান্তি বিঘ্নিত হবার আশংকায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিন্তিত বলে দুনিয়ার খবরের কাগজে খবর ছাপা হলো। অনেকেই আশা করছিলেন ইউনাইটেড নেশনস্-এ ভারত কিছু করবে ও পিকিং-এর সংগে দিল্লীর নিশ্চয়ই কথাবার্তা হয়েছে।

মিসিসিপি-ইয়াংসী নদীর জল আরো গড়াল। ইউনাইটেড নেশনস্-এর সেক্রেটারী জেনারেল দাগ হ্যামারশীল্ড গেলেন পিকিং। জানুয়ারী মাসের প্রাণান্তকর শীতের মধ্যেও হাসিমুখে চীনা নেতাদের সংগে দিনেরপর দিন কথাবার্তা বল্লেন। এক ফাঁকে ছ' মাইল দূরে দুঃসাহসিকা মহারাণী জু সীর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক 'সামার প্যালেস' দেখলেন। এই প্যালেসের পাশে ঐ সুন্দর লেকের স্বচ্ছ জলে হ্যামারশীল্ড হয়ত নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখার অবকাশ পাননি। যদি সে প্রতিবিম্ব দেখতে পেতেন তবে হয়ত অন্তরের অস্থিরতা বুঝতে পারতেন। সেক্রেটারী জেনারেল শূন্য হাতেই ফিরে গেলেন নিউইয়র্ক। তবে কেউ কেউ বল্লেন, আশা পেয়েছেন। আমেরিকাকে আর একটু শিক্ষা দিয়ে চীনারা ঐ আটক বিমানচালকদের মুক্তি দেবে।

এবার সারা পৃথিবীর দৃষ্টি পড়ল দিল্লীর 'পর।

ঠিক এমন সময় নন্দা বদলী হলেন আমাদের হংকং মিশনে। 'সীটার' প্রেমিকের মত কিছু ডিপ্লোম্যাট অনুমান করলো, স্পেশ্যাল অ্যাসাইনমেন্টে নন্দা হংকং যাচ্ছে।

সহকর্মীদের সহযোগিতায় ঘর-বাড়ী দেখে সংসার পাতার আগে নন্দা কয়েকদিনের জন্য হোটেলে আশ্রয় নিলেন। মান্দারিন বা হংকং হিল্টনে থাকার মত ট্যাকের জোর কোন ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটেরই নেই। নন্দারও ছিল না তাইতো তিনি আশ্রয় নিলেন উইনার হাউসে।

পর পর কদিন রাত্রে ডিনার খাবার সময় পাশের টেবিলে এক ভদ্রলোককে দেখেই নন্দার সন্দেহ হলো। পরে ইণ্ডিয়ান মিশনের এক সহকর্মীর সংগে কাম্ লিঙ্ কান্টিনিজ রেস্টুরেন্টে গিয়েও এক কোণায় ডাইনিং হলের ঐ ভদ্রলোককে দেখল। আবার একদিন উইনধাম স্ট্রীটে মার্কেটিং করার সময় মহাপ্রভুর পুনর্দর্শন হওয়ায় নন্দার আর সন্দেহ রইল না।

নন্দা সতর্ক হয়ে গেলেও বুঝতে দিল না। মিশনের দু' একজনকে ঘটনাটা জানিয়ে রাখল। তারপর একদিন ডিনার টেবিলে ভদ্রলোকের সংগে আলাপ হলো।

'তোমাদের ইণ্ডিয়ার মত চার্মিং ও ফ্রি সোসাইটির কোন তুলনা হয় না।'

'মেনী থ্যাংকস্ ফর দি কমপ্লিমেন্টস'।

'সত্যি বলছি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড চালাতে গিয়ে কত দেশই ঘুরলাম কিন্তু ইণ্ডিয়া ইজ ইণ্ডিয়া।'

চিকেন-ফ্রায়েড রাইস আর পোর্ক শেষ করে কফির পেয়ালায় হাত দিতেই রাজনীতি এসে গেল।

'আই অ্যাম সিওর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে ইণ্ডিয়া ইউনিক রোল প্লে করবে।'

নন্দা ছোট্ট উত্তর দেয়, 'আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আজকাল সব দেশই...।'

দিন কয়েকের মধ্যেই দুজনের আলাপ বেশ জমে উঠল ও একই সময় ডিনার খাওয়া শুরু হলো।

একদিন ভদ্রলোক যেন একটু তাড়াহুড়ো করে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে উঠে গেলেন। 'এক্সকিউজ মী, সিংগাপুর থেকে একটা টেলিফোন আসার কথা।'

ভদ্রলোক চলে যাবার পর নন্দার খেয়াল হলো সিগরেট, লাইটার আর পার্স ডিনার টেবিলে পড়ে আছে। কফি খাওয়া শেষ করে নন্দা তিনটিই হাতে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের ঘরে গিয়ে ফেরৎ দিল।

'মেনি, মেনি থ্যাংকস্। পার্সে অনেকগুলো ডলার আছে। অন্য কোথাও ফেল্লে আর উপায় ছিল না।'

নন্দা জানত, দিল্লী থেকে পিকিং-এ ও পিকিং থেকে দিল্লীগামী ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের দেখাশুনা ও লেনদেনের দায়িত্ব যে কূটনীতিবিদদের পর থাকবে, তাঁকে এমন টোপ অনেকেই গেলাতে চাইবে।

প্রলোভন কি শুধু বাইরে থেকে আসে? বিদেশ-বিভুঁইতে সব মানুষেরই কিছু কিছু শৈথিল্য দেখা দেয়। সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। পটুয়াটোলার গিরীশবাবুর মত লোকও পূজোর ছুটিতে সপরিবারে বেনারস বেড়াতে গেলে দু-একদিন গান-বাজনা শোনার জন্য রাত করে ধর্মশালায় ফিরতেন তাতে কেউ কিছু মনে করত না। কারুর বা আহার-বিহারের তীব্র শাসনে শৈথিল্য দেখা যায়। কলকাতায় যারা চা-সিগারেট খায় না, তারাই বিলেতে গিয়ে বাঁদরের মত মদ গেলে। পরিচিত সমাজজীবন থেকে মুক্তি পেলে সব মানুষই বেশ একটু পাল্টে যায়। প্রথম প্রথম ফরেন পোস্টিং পেলে অনেক ডিপ্লোম্যাট আত্ম-গরিমায় বিভোর হয়ে পড়ে, শৈথিল্য দেখা দেয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে। শৈথিল্য দেখা দেয় আরো অনেক কারণে। তবে সুন্দরী যুবতীর খপ্পরে পড়লে কথাই নেই।

'মে আই কাম ইন?'

দরজাটা একটু ফাঁক করে একজন ছিপছিপে সুন্দরী ভারতীয় মেয়ে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রশ্ন করতে চমকে গেল থার্ড সেক্রেটারী সেনগুপ্ত। মুহূর্তের জন্য মনের মধ্য দিয়ে একটা আনন্দ-তরংগের ঢেউ খেলে গেল।

একঝলক দেখে নিয়ে সেনগুপ্ত উত্তর দিল, 'ইয়েস প্লিজ।'

মেয়েটি ঘরে ঢুকে হাত থেকে বড় ট্রাভেলিং ব্যাগটা নামিয়ে রেখে প্রশ্ন কয়ল, 'এক্সকিউজ মী, আর ইউ মিঃ সেনগুপ্ত?'

'দ্যাটস্ রাইট।'

এবার পরিষ্কার বাংলায়, 'নমস্কার।'

সেনগুপ্ত চেয়ারে বসে রইল কিন্তু মনটা আনন্দে উল্লাসে, উচ্ছ্বাসে নেচে উঠল। ছত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বলল, 'নমস্কার।'

মেয়েটি একটু হাসল। বল্লো, 'বসতে পারি?'

সৌজন্য দেখাতে ত্রুটি হবার জন্য লজ্জিত হলো ডিপ্লোম্যাট সেনগুপ্ত। 'আই অ্যাম সরী, বসুন, বসুন।'

ইউরোপে এই হচ্ছে সেনগুপ্তের প্রথম পোস্টিং। রেঙ্গুনে থাকার সময় ভারতীয়-দের সান্নিধ্য-লাভ এত দুর্লভ ছিল না কিন্তু বেলজিয়ামে এই একটা বছর ভারতীয় সান্নিধ্য লাভ প্রায় একেবারেই হয়নি। লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান হাই-কমিশনে যাঁরা চাকরি করেন, তাঁরা ভারতীয় দেখলে বিরক্ত হন। ব্রাসেলস্, দি হেগ বা স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ার অন্যত্র যাঁদের চাকরি করতে হয়, তাঁরা ভারতীয় দেখলে খুশী হন। বাঙালী বা বাংলা কথা জানা লোক তো দূরের কথা। বেলজিয়ামের স্পেশ্যাল স্টীল কেনার জন্য যে ডেলিগেশন এসেছিল তাতে একজন বাঙালী ছিলেন। ব্রাসেলস্-এর ইণ্ডিয়ান এম্বাসিতে কাজ করতে গিয়ে আর কোন বাঙালীর সাক্ষাৎ পায়নি সেনগুপ্ত। বহু-দিন বাদে একজন বাঙালী মেয়ের আবির্ভাবে সেনগুপ্ত সত্যি নিজেকে ধন্য মনে করল।

'কতদিন পর বাংলায় কথা বললাম জানেন?'
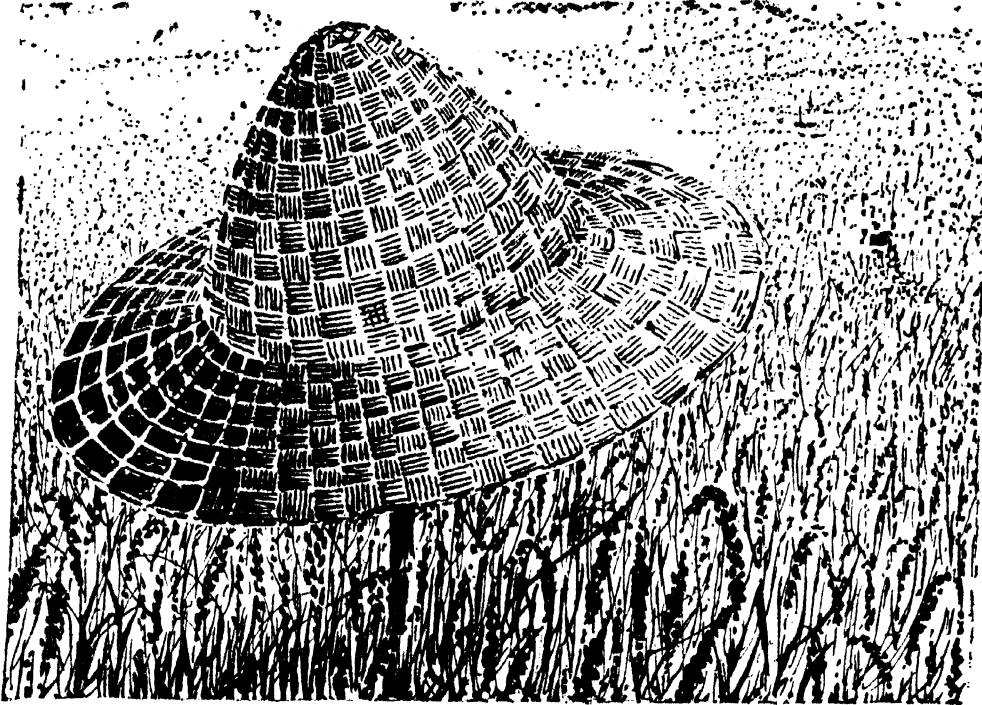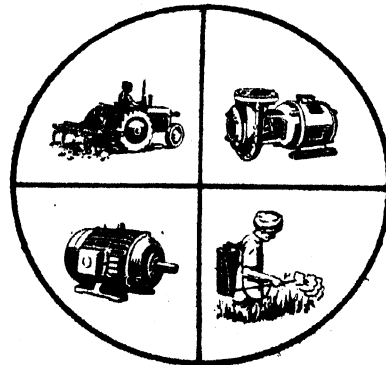
সেনগুপ্তের সাধারণ বুদ্ধির জোরেই একথা জানা উচিত ছিল যে এ প্রশ্নের উত্তর মেয়েটির পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তবুও।

'অনেকদিন, পর ?'

'অ্যাট-লিস্ট ছ' মাস হবে।'

'কেন, ব্রাসেলস্-এ বাঙালী নেই ?'

'শুনেছি কয়েকজন আছেন, তবে এখনও কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি', আক্ষেপ করে সেনগুপ্ত জানাল।

সেই হলো শুরু। তারপর। অসংখ্য ভারতীয় যুবক-যুবতীর মত চিত্রলেখা সরকারও পড়াশনা করার আশায় লণ্ডন গিয়ে শেষ পর্যন্ত চাকরি নিল। দেখতে দেখতে বছর তিনেক কেটে গেছে লণ্ডনে। গত বছর একদল ইণ্ডিয়ান ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 'কোচে' করে কন্টিনেন্ট ঘুরেছে কিন্তু ঠিক মন ভরেনি। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী দেখেই ফিরে গিয়েছে। তাছাড়া এমন গ্রুপে নানা ধরণের বিচিত্র ছেলেমেয়ে থাকেই ও দু-চারজনের ব্যবহার সহ্য করাই দায়। বিশেষ করে মিউনিকে বেভেরিয়ান ফোক্ ডান্স দেখতে গিয়ে প্রদীপ সরকার, বড়াল ও রায়চৌধুরীর......

'বিশ্বাস করুন মিঃ সেনগুপ্ত, ওদের ঐ বড় বড় জাগে করে দু-তিনবার বিয়ার খাবার পর এমন বিশ্রী অসভ্যতা শুরু করল যে কি বলব!'

হাসতে হাসতে এক গাল সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সেনগুপ্ত বল্লো, 'আপনাদের মত ইয়ং অ্যাণ্ড এ্যাট্রাকটিভ মেয়েরা সঙ্গে থাকলে বেভেরিয়াতে গিয়েও ছেলেরা একটু মাতামাতি করবে না?'

সিগারেটের ধোঁয়া গোল গোল পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় মিলিয়ে গেল। হঠাৎ নটরাজন ঘরে ঢুকে সেনগুপ্তকে একটা চিঠি দিয়ে বল্লো, 'হিয়ার ইজ এ ক্লোজড লেটার ফর ইউ।'

'ক্লোজড লেটার বাট ইউ কান্ট একস্পোজ এনি থিং', হাসতে হাসতে পাল্টা জবাব দেয় সেনগুপ্ত।

নটরাজন কথার মোড় ঘুরিয়ে বলে, 'এ্যাম্বাসেডর কাল এগারায় আমাদের মিট করছেন জান তো?'

'জানি।"

নটরাজন বিদায় নিল।

চিত্রলেখা বল্লো, 'একটু সাহায্যের জন্য এম্বাসীতে এসে আপনার নেমপ্লেট দেখে ঢুকে পড়লাম।'

'বলুন না কি করতে হবে?'

'আমার এক পুরোন বন্ধুকে স্টেশনে এক্সপেক্ট করছিলাম কিন্তু আসেনি। স্টেশন থেকে টেলিফোন করে জানলাম ও আর ওখানে নেই। অথচ...!'

'নতুন ঠিকানাও জানা নেই, এবং যদি এম্বাসীতে লোক্যাল ইণ্ডিয়ানদের ঠিকানা থাকে, তাহলে?'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে চিত্রলেখার।

'আই অ্যাম প্লিজড্ টু ইনফর্ম ইউ মিস সরকার, ইণ্ডিয়ান এম্বাসীতে সব খবর পাওয়া যায়, শুধু ইণ্ডিয়া আর ইণ্ডিয়ানদের বিষয় ছাড়া।' চরম সত্যি কথাটা হাসতে হাসতে বল্লো সেনগুপ্ত।

মিস সরকার কত আশা নিয়ে এসেছিলেন এম্বাসীতে কিন্তু এমন মর্মান্তিক দুঃসংবাদ এত সহজে জানতে পারবেন, ভাবতে পারেননি। বেশ মুষড়ে পড়লেন। মুষড়ে পড়ারই কথা। সারা বছর পরিশ্রম করে মাত্র দু' সপ্তাহের ছুটি। সামান্য সঞ্চয় নিয়ে মিস সরকারের মত অনেকেই বেরিয়ে পড়েন দেশ দেখতে। এদের পক্ষে হোটেলে বা মটেলে থাকা অসম্ভব। সেনগুপ্ত সেসব জানে। একটু ভাবল, একটু দ্বিধা করল। হয়ত মনে মনে একটু বিচারও করল।

সেনগুপ্ত বল্লো, 'যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রস্তাব করতাম।'

'না, না, মনে কি করব।'

'যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আমার ফ্ল্যাটে থাকতে পারেন। কোন অসম্মান বা অসুবিধা হবে না।'

সেনগুপ্তের কথাটা শেষ হবার আগেই মিস সরকার বল্লেন, 'তাতো আমি বলছি না, তবে......!'

হাসতে হাসতে সেনগুপ্ত বল্লো, 'জাগ্, জাগ্ বেভেরিয়ান বিয়ার খেয়ে বেভেরিয়ান ফোক্ ডান্স দেখাব না। তবে আমার হাতের রান্না খেতে হবে।'

কলকাতা শহরে এমন প্রস্তাব করা বা গ্রহণ করা শুধু অন্যায় নয়, অসম্ভবও। কিন্তু ব্রাসেলস্ শহরে এমন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা সহজ নয়। তাছাড়া বছর তিনেক বিদেশ বাস করার পর আমাদের দেশের মেয়েদেরও পুরুষের সঙ্গে মিশতে অ্যালার্জি হয় না।

চিত্রলেখা মিঃ সেনগুপ্তের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সমস্যা দেখা দিল রান্না করা নিয়ে। চিত্রলেখা বল্লো, 'আমি থাকতে আপনি রান্না করবেন? অসম্ভব। তা কিছুতেই হতে পারে না।'

'দু'একদিনের জন্য আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করায় আপনাকে খাটিয়ে নেব? অসম্ভব। তা কিছুতেই হতে পারে না।'

তর্কবিতর্কের পর ঠিক হলো কেউই রান্না করবে না, বাইরে রেস্তোঁরায় খাওয়া হবে। চিত্রলেখা আর সেনগুপ্ত গ্রান্ড প্লেসে ঘুরে বেড়াল, অপূর্ব গথিক্ স্থপতি দেখল, টাউন হলের সিঁড়িতে বসে গল্প করল। ব্রাসেলস্-এর বিশ্ববিখ্যাত ওপন-এয়ার ফ্লাওয়ার মার্কেটে ঘুরল ঘন্টার পর ঘন্টা আর রেস্তোরাঁয় মহানন্দে বেলজিয়ামবাসীদের প্রিয় হুইস্কী সস্ দিয়ে গলদা চিংড়ি ও ওয়াটারজুই—চিকেনের ঝোল খেল।

ব্রাসেলস্ ত্যাগের আগের দিন সন্ধ্যায় চিত্রলেখা নিজে হাতে রান্না করে সেনগুপ্তকে খাইয়েছিল। খাবার পর সেনগুপ্ত বলেছিল, 'কেন অভ্যাসটা নষ্ট করে দিলেন বলুন তো।'

চিত্রলেখা বলেছিল, 'আপনি কি আমার কম ক্ষতি করলেন?'

'তার মানে?'

'আত্মীয়-স্বজন ছাড়া বিদেশ-বিভুঁইতে একলা একলা বেশ ছিলাম। এই আত্মীয়তা করে কেন আমার মনটাকে খারাপ করে দিলেন বলুন তো?'

আর সেনগুপ্তের? সত্যি নিজের আত্মীয়-বন্ধু সমাজ-সংসার ছেড়ে একলা একলা বিদেশ-বাস যে কত দুঃখের, কত কষ্টের, সময় সময় কত মর্মান্তিক তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। দূরে থেকে মনে হয় ডিপ্লোম্যাটরা কত সুখী! কত অফুরন্ত আনন্দের সুযোগ! কিন্তু সত্যিই কি তাই? ওদের কি ইচ্ছা করে না সাধারণ মানুষের হাসি-কান্নায় ফেটে পড়তে? কত কি ইচ্ছা করে।

তাইতো দুটি দিনের কাহিনী দুটি দিনেই শেষ হলো। দুদিনের স্মৃতির সুর কানে বাজতে লাগল দুজনেরই। ডিপ্লোম্যাটকে কতরকমের হঠকারিতা করতে হয় কিন্তু নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা, হঠকারিতা করা যে কত বেদনার, কত দুঃসহ তা সেনগুপ্তের মত নিঃসঙ্গ ডিপ্লোম্যাট ছাড়া কেউ বুঝবে না।

হাজার হোক হিউম্যান মেটিরিয়্যাল, মানুষ নিয়েই ডিপ্লোম্যাট ও ডিপ্লোম্যাসী। তাইতো মাঝে মাঝে মনটা উড়ে যায় চান্সেরী বিল্ডিং থেকে অনেক দূরে, দূরে বেড়ায় টুকরো টুকরো স্মৃতির রাজ্যে। চিত্রলেখার চিত্রকে ঘিরে।

তরুণ এসব জানে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। আগ্নেয়গিরির আগুন যেমন সবার চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, ডিপ্লোম্যাটদেরও মনের দুঃখ প্রাণের আক্ষেপ নজরে পড়ে না। স্মৃতির জ্বালায় দগ্ধ হবে কিন্তু কতব্যে ত্রুটি হলে ক্ষমা নেই, মার্জনা নেই। হয়ত একটা গোপন খবর বেফাঁস বেরিয়ে যেতে পারে, একটা গোপন সংবাদ জানতে পেরেও ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে ভুলে যেতে পারে। হতে পারে অনেক কিছু, কিন্তু শিকার ফসকে গেলে ডিপ্লোম্যাটের ক্ষমা নেই।

এই সব অন্ধকার ॥ জগন্নাথ চক্রবর্তী

এই সব অন্ধকার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা প্রয়োজন।
লোভের আঙুরগুলি দাঁত দিয়ে কাটা হয়ে গেলে
নিরাসক্ত মনে এসো পাপের মন্দিরে
এই সব অন্ধকার ছুঁয়ে দেখো, দেখা প্রয়োজন।

এই সব বিপরীত, এই সব নেগেটিভ ফটো,
যুবকের শাদা চুল, যুবতীর বিকলাংগরেখা,
এই সব অন্তরাগ, নিষ্কাকালি নিষ্প্রদীপ দেশ,
নিরুত্তর এইখানে ভয়াবহ জিজ্ঞাসা অশেষ।

এই সব ঘৃণাগুলি অন্ধকার আবেগে ভাস্বর
পাদপ্রদীপের সান্নে ছুঁড়ে দেয় প্রেমিকার শির
ছুরি দিয়ে তারপর অন্যমনে ছোঁয় প্রিয় বুক,
গোলাপের স্রোতে ভাসে যতক্ষণ দিনের শরীর
ততক্ষণ প্রাণ বলো গান বলো, সবি আগন্তুক।

দেওয়ানেওয়াহীন এই সব ক্লান্ত কলরব
শব্দ থেকে শব্দে নেয় হতমান খ্যাতিমান শব,
পাপ বলো পুণ্য বলো সমুদ্রের ভিতরে শাহারা
কালাহারি অন্ধকার ছুঁয়ে দেখো, দেখা প্রয়োজন।

স্মৃতিমহলের জায়গা নেই ॥

শিশির ভট্টাচার্য

মহাকাশ থেকে খসে পড়া যতো
উল্কার চোখে শেষ আলোটুকু
দু হাত বাড়িয়ে পৃথিবীকে চায়
সূর্যমুখীরা তবু অটল।

কারণ এখুনি ভোরের পাখিরা
ডেকে উঠবেই পুব দেউড়িতে
লাঙলের ফালে চষা ক্ষেতে ক্ষেতে
উপচীয়মান সোনার ঢেউ।

এখানে এখনো পাপড়ির ছোঁয়া
শিশুর নরম হাতের স্পর্শ
সবুজ বনের ছায়ায় কোথাও
স্মৃতিমহলের জায়গা নেই।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এটা ব্যবসা, রোজগার করতে গেলে ফিলনথ্রফিস্ট হওয়া চলে না। তা, আমি জানি; তাছাড়া অপরের দয়া বা অনুকম্পার উপর আর যার লোভ থাক আমার নেই, একথা আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি।

কেতকী সনতের দিকে তাকাল। লক্ষ্য করল, তার চোয়ালের মাংসপেশী টান হয়ে গিয়েছে, চোখ দুটো সঙ্কুচিত হয়ে কপালের ওপর রেখা সৃষ্টি করেছে অনেকগুলো। এ জিনিসটা কিন্তু সরিতের মধ্যে কোনদিন লক্ষ্য করে নি কেতকী। হয়ত কাজের চাপে বিরক্ত হয়েছে সরিৎ কিন্তু তার অভিব্যক্তিটা ভিন্নধরনের। এই একটা জায়গায় দু ভাই-এর মধ্যে বৈলক্ষণ্য বেশ সুপরিস্ফুট বলে মনে হল তার কাছে।

শেষ চুমুক দিয়ে কফির কাপটি টেবিলের উপর রাখল সনৎ। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল আমার মতামতটা একটু জোর দিয়েই আমি ঘোষণা করে থাকি, কিছু মনে করবেন না। মালতীর ছেলে সম্বন্ধে কি যেন বলছিলেন?

না, এমন কিছু নয়। তবে আমি ওকে পছন্দ করি না। এবার আমায় উঠতে হবে—উঠে দাঁড়াল কেতকী, অনেকক্ষণ সে বসে আছে। প্যাসেজ পেরিয়ে হলটার মুখেই কেতকী, বাবলু দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেল। পরনে চোঙা প্যাণ্ট, আর টেরিলিনের সার্ট। মাথার চুলগুলো এলোমেলো। প্যান্টের দু পকেটে হাত দিয়ে একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেতকীকে দেখে এগিয়ে এল বাবলু। একটা চোখ ছোট করে বলল — ও ল্যাংড়াটা কে বলুন ত?

সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল কেতকীর, প্রচণ্ড রাগটা দমন করে সে বলল, আপনি এখানে এসেছেন কেন?

এই দেখুন, আপনি খামাখো বোমকে যান। আমি একটা ভাল কথা জিজ্ঞেস করলাম বলে—।

কোন কথা জিজ্ঞেস করার দরকার নেই আপনার। আর আপনি যদি এভাবে বিরক্ত করেন তাহলে আমি ডাক্তারদের জানাতে বাধ্য হব। কথাটা বলে আর দাঁড়াল না কেতকী, সোজা হলঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। দু হাত কোমরে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বাবলু, তারপর দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে বলল—আচ্ছা দেখে নোবো। এখন চিনবে না—।

ঘরের আলো নিভিয়ে সনৎ চুপ করে বসেছিল। কিছুক্ষণ আগে সে আজ অফিস থেকে ফিরেছে। সুপর্ণা আজ অফিসে যায় নি, প্রথমে তার মনে হয়েছিল, বাড়ী গিয়ে খোঁজ করবে কিনা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না। অন্য কোন কারণ ছিল না। ইচ্ছেটা নিশ্চয়ই প্রবল ছিল না তাই আলস্য এসেছিল হয়ত। অনেক চিন্তা ভিড় করে এসেছে সনতের মাথায়। তার জন্যে কেতকীর চিন্তাই বেশী। কেতকী যে তাকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে, সেটা সনতের দৃষ্টি এড়ায় নি। কফি দেওয়ার মধ্যে সাধারণ ভদ্রতা বা শিষ্টাচার ছাড়া আরও যেন কিছু ছিল। এমন একটা মাধুর্য মেশানো ছিল তাতে যেটা সে স্পষ্টই অনুভব করে আনন্দ পেয়েছে — সেকথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু সেটা না হয়ে তার বিকলাঙ্গের জন্যে মমতা বা সমবেদনার ভাবও হতে পারে। কথাটা মনে পড়তেই সনৎ অকস্মাৎ বিচলিত হয়ে পড়ল। চোয়ালের মাংসপেশী টান হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সনৎ জানে কেতকী নার্স হিসেবে সরিতের সঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছে। সরিতের সঙ্গে তার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল বলেই সে শুনেছে। আবার সেই একই প্রশ্ন—ডাঃ সরিৎ মুখার্জি। সবল, একাধারে স্বাস্থ্যবান আর বিত্তবান, একসঙ্গে সুন্দরী স্ত্রী আর নার্স তার দু পাশে। আশ্চর্য হল না সনৎ। সে জানে এইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু পোলিও তার না হয়ে ডাঃ সরিৎ মুখার্জির হলে কি হত? দীনার মত সুন্দরী স্ত্রী পাওয়া দূরের কথা ডাক্তারই হতে পারত কিনা সন্দেহ। কথাটা চিন্তা করেও ভাল লাগল তার। ডাঃ সরিৎ মুখার্জির দুর্দশা মনে মনে কল্পনা করে সনৎ প্রচুর আনন্দ উপভোগ করল।

নারানদাস অ্যাডভানী দিল্লীর একজন নামজাদা ব্যবসায়ী। কাপড়-জামার কয়েকটা দোকান ছাড়া তাঁর লগ্নীর কারবারও আছে। দেশবিভাগের পর সিন্ধু থেকে স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র রাকেশকে নিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় তাঁকে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু তাতে ভেঙ্গে পড়েন নি নারানদাস। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর ব্যবসা জাঁকিয়ে বসলেন দিল্লীতে তারপর ধীরে ধীরে সেটা ছড়িয়ে পড়ল অন্যান্য প্রদেশে। নারানদাস, সুনাম যেমন করেছেন লাভও তেমনি প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি ইদানীং চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাঁর নিজের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। অবসর নেওয়ার মত অবস্থা অবশ্য নয় কিন্তু এখন সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করছেন। ঠিক সেই কারণে তাঁর কলকাতায় ছুটে আসতে হয়েছিল। পাটনা, ধানবাদ হয়ে ফিরতি পথে এই বিপর্যয়। অ্যাকসিডেন্ট না হলে তিনি বুঝতে পারতেন, কলকাতার নিউ মার্কেটের মত জায়গায় তাঁর দোকান 'অ্যাডভানী ক্লোথস' লোকসান দিচ্ছে কেন। মনে মনে তিনি আশা করেছিলেন এত ধাক্কার পর নিশ্চয় রাকেশের চৈতন্য হয়েছে। রাকেশ তাঁর একমাত্র ছেলে এবং ভরসাস্থল। কিন্তু দিল্লীর আবহাওয়া তাকে ছোটবেলাতেই অমানুষ করে দিয়েছে। অল্পবয়স থেকেই সে অনেক বদ অভ্যাস আয়ত্ত করেছে। জুয়া খেলতে, নেশা করতে আর লোক ঠকাতে দিল্লীতে তার সমকক্ষ আর কেউ নেই বলেই মনে হয় নারানদাসের। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নারানদাস, তারপর চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন ঘরের চতুর্দিকে। এখনও দুর্ঘটনার রূঢ় আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি তিনি। তাঁর দুটো পা, বাঁ হাত আর পাঁজরের তিনটে হাড় ভেঙ্গেছে বলে শুনেছেন তিনি। কিন্তু মনে হচ্ছে, তাঁর সর্বাঙ্গই যেন চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত দেহটাই প্রায় প্লাস্টার করা। অনড় অচল অবস্থায় কতদিন থাকতে হবে কে জানে? তিনদিন হল তিনি এ অবস্থায় রয়েছেন। খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু রাকেশের আসার ফুরসৎ হয় নি এখনো। ক্লান্ত হয়ে আবার চোখ বন্ধ করলেন নারানদাস। দেহ আর মনের দুটো যন্ত্রণাই তাঁকে অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছে।

একটু পরেই দরজাটা নিঃশব্দে খুলে ঘরে ঢুকল রাকেশ।

বাবুজী—চমকে উঠেছেন নারানদাস রাকেশের কণ্ঠস্বরে।

তুমি এসেছ বস। ভাল করে ছেলেকে দেখে নিলেন নারানদাস। চেহারায় সেই রকমই সুন্দর আছে, এত অনিয়মেও মালিন্য আসে নি।

আমি, আমানুল্লোদের আখাড়ায় গিয়েছিলাম তাই—দেরী হবার কৈফিয়ৎ পেশ করল সে।

আমি জানতাম যে তুমি দোকান ছেড়ে অন্য কোথাও যাও না—ভ্রূ কুঞ্চিত করে রইলেন তিনি—অন্তত তুমি আমায় সে কথাই দিয়েছিলে—।

কিন্তু অনেক টাকা বাকী পড়ে আছে সেগলের কাছে।

তার জন্যে শর্মা আছে, তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।

এখন ওসব কথা থাক বাবুজী—বাধা দিতে চেষ্টা করল রাকেশ।

না, এসব কথা বলতেই আমি কোলকাতা এসেছি। প্রথমে তুমি বল, দোকানের এত লোকসান হচ্ছে কেন।

একটু চুপ করে রাকেশ উত্তর দিল—এখন বাজার মন্দা তাছাড়া যাদের ধার দেওয়া হয়েছিল তারা টাকা ফেলে রেখেছে।

তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। কোলকাতায় এসে তুমি আরও উচ্ছন্নে গেছ বলে শুনেছি।

কে বললে? উত্তেজিত হয়ে উঠল রাকেশ—নিশ্চয়ই শর্মা।

না, শর্মা নয়; আমি বোকা নই রাকেশ; এই কয়েক মাসে তুমি তিরিশ হাজার টাকা উড়িয়েছ।

দরজা ঠেলে ডাক্তার অসীম ব্যানার্জি আর সরিৎ ঢুকল।

কেমন আছেন মিঃ অ্যাডভানী?

ভালই। এ আমার ছেলে, রাকেশ। আর এ'রা ডাঃ অসীম ব্যানার্জি আর সরিৎ মুখার্জি।

শেষের নামটা খুব চেনা বলে মনে হল রাকেশের। এত পরিচিত যে ভাবতে গিয়ে সে যেন একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। সকলের অলক্ষ্যে বাইরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রাকেশ। তামাকের ধোঁয়াতে তার আঙ্গুলে হলদে ছোপ ধরেছে। সিগারেট-ধরা আঙ্গুলগুলো উত্তেজনায় কাঁপছে তার। রাকেশের মনে পড়ল কলকাতার ডাঃ সরিৎ মুখার্জির সঙ্গে দীনা স্বরূপের বিয়ে হয়েছে। আর দেরী করল না সে, বাবাকে না জানিয়েই ফিরে গেল নিউ মার্কেটের দোকানে।

টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে সহজেই দীনার ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার পেয়ে গেল। রাকেশ অ্যাডভানী খুশী হল। বাবার কথা মিথ্যে নয়। এ ক' মাসেই সে তিরিশ হাজারের বেশী টাকা উড়িয়েছে। পন্থাগুলো অবশ্য পুরানো — জুয়া, স্ত্রীলোক আর মদ এ ছাড়া সে ভাল থাকে না, বিমর্ষ আর প্রাণহীন হয়ে পড়ে। আর তাছাড়া নারানদাস অ্যাডভানীর একমাত্র ছেলে সে। তার পক্ষে মিতব্যয়ী হওয়ার প্রশ্নই আসে না। তার বরাত ভালই তা না হলে যখন টাকার টান পড়ল তখনই দীনা স্বরূপের ব্যাপারটা এসে পড়ল কি করে! যোগাযোগটা শুধু লাভজনকই হবে না, এটা তার কাছে সোনার খনির মত। বুঝেসুঝে

সুবিধামত যখন খুশি সে ব্যবহার করবে। আনন্দের আতিশয্যে রাকেশ বিচলিত হয়ে পড়ল। দোকানের ভিতর গিয়ে রাকেশ পিছন থেকে একটা বোতল বের করে কিছুটা গলাধঃকরণ করল সে। একটু পরে অনেকটা সুস্থবোধ করে টেলিফোনে দীনার নারসিং হোমের নম্বরটা ডায়াল করল।

হ্যালো, ডাঃ দীনা মুখার্জি আছেন?

আছেন, আপনি কে কথা বলছেন;—কেতকী ফোন ধরেছে।

বলুন, একজন রুগীর বিষয়ে কথা বলব। ফোনটা রেখে দীনাকে ডাকতে গেল কেতকী। অপারেশন থিয়েটারেই দেখা পেল তার। দীনা একটা এক্স-রে প্লেট ভিউবকসে লাগিয়ে দেখছিল। খবরটা পেয়ে সে এগিয়ে চলল টেলিফোনের দিকে।

হ্যালো, হ্যাঁ আমি ডাঃ দীনা মুখার্জি। কে কথা বলছেন?

আমি রাকেশ অ্যাডভানী—স্পষ্ট করে নামটা উচ্চারণ করল সে।

কে! শরীটা যেন অসাড় হয়ে গেল দীনার।

এরই মধ্যে ভুলে গেলে? মেয়েরা এরকমই হয়।

হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। কি খবর, এত-দিন পরে হঠাৎ—দীনা জোর করে নিজের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনল।

যাক চিনতে পেরেছে তাহলে—হেসে উঠল রাকেশ।

হ্যাঁ, পেরেছি, তা দরকারটা কি? নিজের অজান্তে স্বরটা একটু রুক্ষ হয়ে গেল দীনার।

আমি ভেবেছিলাম আমার নাম শুনে তুমি একটু খুশী হবে। পুরোনো বন্ধুত্বের কথা তুমি হয়ত ভুলে গেছ!

না, ভুলি নি—একটু থেমে থেমে উত্তর দিল দীনা।

কুতুবের তলায় পিকনিক, ডিপ্লমেটিক এনক্লেভের মাঠে বেড়াতে যাওয়া আর—

তোমার বাবা কেমন আছেন? প্রসঙ্গটা পাল্টাবার চেষ্টা করল দীনা।

সেখান থেকেই ত তোমার পাত্তা পেলাম—অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলোক—আবার হেসে উঠল রাকেশ।

তোমার বাবাকে দেখতে যাব ভাব-ছিলাম।

ধন্যবাদ, বাবার চেয়ে এখন ছেলেকে দেখার প্রয়োজন হয়েছে।

তার মানে?

মানেটা পরে দেখা হলে বলব। এখন বল কবে দেখা করব।

আমার সঙ্গে দেখা হবে না—আচ্ছা—

না, না, লাইনটা কেটে দিও না—ওতে লাভ নেই—তাহলে আবার লাইনটা ধরতে হবে—না হয় সোজা তোমার ড্রীমল্যাণ্ডে হানা দিতে হবে। বাঃ নামটা চমৎকার হয়েছে—ড্রীমল্যাণ্ড,— তুমি যেখানে সেখানে ত—।

স্টপ টকিং রট—ধমকে উঠল দীনা—।

বাঃ তোমার ত এখনও বেশ ঝাঁঝ আছে। একেবারে বাঙ্গালীন হয়ে যাও নি তাহলে। যাক, তুমি আমায় সঙ্গে কবে দেখা করছ, দিনটা ঠিক করে বল।

দেখা—আমি—করব—না— দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল দীনা।

দীনা, দরকারটা আমার নয় তোমার।

তার মানে?

তোমার লেখা গোটা-কতক চিঠি আমার কাছে রয়ে গিয়েছে। সেগুলো ফেরত দিতে চাই—আস্তে আস্তে কথাগুলো উচ্চারণ করল রাকেশ অ্যাডভানী।

স্কাউণ্ড্রেল, তুমি ব্ল্যাকমেল করতে চাও। লাইনটা কেটে দিল দীনা।

সুপর্ণা সনতের ভাবান্তর লক্ষ্য করে চিন্তিত হয়েছে। ভদ্রলোক অকস্মাৎ যেন নিস্তেজ আর নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়েছেন। সনতের মনের কিছু অংশের খবর সে রাখে। সাহিত্যিক আর কবি-শ্রেণীর লোকেরা একটু স্পর্শকাতর বলেই তার ধারণা। সনতের ক্ষেত্রে তার মাত্রাধিক্যে অবশ্য বিচলিত হবার মত কিছু নেই। ভদ্রলোক বড় অসহায়। তার তবু বাবা, মা, ভাই আছে কিন্তু ও'র কেউ নেই। অফিসের পর আজ একটু আগেই কাগজ-পত্তর নিয়ে সুপর্ণা সনতের টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সনৎ একটা লম্বা-চওড়া ফর্মে কি লিখছিল। মুখ তুলে তাকাল সে। বলল—কি খবর, কাজ শেষ হল?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি ত এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্ট্যাটিস্টিকটা শেষ করছি।

কাল করবেন; চলুন এখন দরকার আছে।

রাস্তায় বেরিয়ে সুপর্ণা বলল—চলুন একটা ট্যাক্সি নেওয়া যাক।

হঠাৎ ট্যাক্সি কেন, আমার চলতে অসুবিধা হবে না।

আপনার জন্য নয়—কেমন যেন খরচ করতে ইচ্ছে করলে আমার।

লটারী পেয়েছেন নাকি—।

না, তবে কাল টিউশনির টাকা পেয়েছি—হাসল সুপর্ণা।

চলন্ত একটা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে উঠে পড়ল ওরা।

আমাদের বাড়ীতে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু আমি অন্য লোকের সামনে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে যাই। দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল সনৎ।

বাবার কাছে গেলে কিন্তু হবেন না। সে যাক। কিন্তু আজকাল যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন আপনি।

কি রকম আবার—মৃদু হাসল সনৎ।

আপনি ত আমার সঙ্গে আর দেখাই করেন না—অভিমান হল সুপর্ণার।

বড়লোকদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি।

কি রকম।

দাদার নারসিং হোমের অ্যাকাউণ্টস পরীক্ষা করছি।

তাতে উদাসীন হবার মত কি আছে।

না, উদাসীন হই নি, তবে কতকগুলো সমস্যা এসে পড়েছে তাই একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

অযথা চিন্তা করবেন না। আপনিই ত আমাকে কত উপদেশ দেন।

বাড়ীতে ভবতোষবাবু ছিলেন। বাইরের ঘরে তিনি বসে কার কোষ্ঠী বিচার করছিলেন একমনে। সুপর্ণা সনৎকে পরিচয় করিয়ে দিল বাবার সঙ্গে।

ভবতোষবাবু একবার তাকালেন সনতের দিকে তারপর বললেন—বসুন, আপনার কথা সুপর্ণার মুখে প্রায়ই শুনি।

সনৎ বসল সামনের চেয়ারে। সুপর্ণা ভেতরে চলে গেল।

শুনেছি আপনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব ভাল বলতে পারেন—সনৎ বলল।

ওটা আমার একটা হবি বলতে পারেন। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন ভবতোষবাবু।

আমার সম্বন্ধে কিছু বলবেন—সনতের কৌতূহল হল।

বলব কিন্তু কি জানেন অনেক সময় ভবিষ্যদ্বাণী অপ্রিয় হয়, তাতে অনেকে দুঃখিত হয়।

আমি হব না—বলল সনৎ। কারণ এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে...একদিকে পঙ্গু অপর দিকে কেরানী।

ভবতোষবাবু তার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন কিছুক্ষণ তারপর নিঃশব্দে বসে রইলেন। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সনৎ। তার এখানে বিন্দুমাত্র আসার ইচ্ছা ছিল না। সুপর্ণাই তাকে ধরে এনেছে। মনে মনে সে ঠিক করেছিল যে, সকাল সকাল বাড়ী ফিরে কেতকীর সঙ্গে নারসিং হোমে দেখা করবে। অফিসে কাজের মধ্যেও ঐ চিন্তাটাই তাকে আঁকড়ে-ছিল সারাক্ষণ। বারবার সে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, ভুলতে চেয়েছে চিত্তভ্রমকারী অসম্ভব ভাবনাকে। তার মত পঙ্গুকে
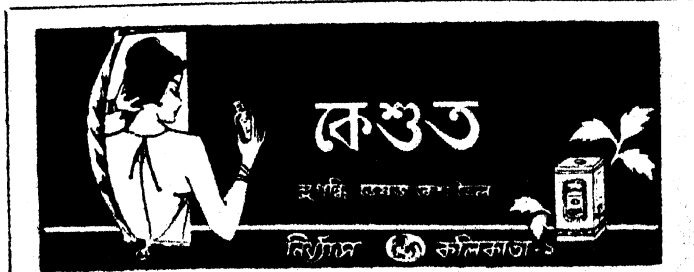
কেতকী কোনদিনই ভালবাসতে পারবে না তা সে প্রায় ঠিক করে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও তার দুর্নিবার আকর্ষণটা সনৎ কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারছে না।

এত চিন্তা কেন—ভবতোষবাবুর গলার স্বরে তার চিন্তার জাল ছিন্ন হল।

নিজের কথাই ভাবছি—সনৎ অস্পষ্ট-ভাবে উচ্চারণ করল কথাটা।

না নিজের কথা ভাবেন নি, ভাবছেন একটা মেয়ের কথা, কি ঠিক না?

হ্যাঁ তাই,—সত্য গোপন করল না সে।

তবে ও ভাবনায় না যাওয়াই ভাল। রহস্যের ভঙ্গীতে ভবতোষবাবু বললেন।

কেন?

তাহলে বিপদে পড়বেন।

বিপদ কিসের?

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা মানে পুলিশের খপ্পরে পড়বেন। কথাটা বলে অকস্মাৎ চুপ করে গেলেন ভবতোষবাবু।

সনৎ তারপর কয়েকটা প্রশ্ন করেও উত্তর পেল না কিছু। একটু পরে সুপর্ণা দু কাপ চা আর কয়েকটা বিস্কুট এনে রাখল তার পাশে। আমারও চা এনেছ—উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভবতোষবাবুর চোখ দুটো। চা খেতে তিনি খুব ভালবাসেন। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে তিনি সুপর্ণাকে বললেন—এঁকে কিছু মিষ্টি দিলে না।

না আমি মিষ্টি খাই না—সনৎ উত্তর দিল।

কেন মোটা হবার ভয়ে।

না, আমার ডাইবেটিস আছে। তার জন্য রোজ আমায় ইনসুলিন ইঞ্জেকসন নিতে হয়।

কি মুস্কিল, রোজ ইঞ্জেকসন! আমায় একবার কলেরায় হিড়িকে এরা জোর করে ইঞ্জেকসন দিয়েছিল। তাতে হিতে বিপরীত হল। এমন তোড়ে জ্বর এল যে নাড়ী ছেড়ে দেবার জোগাড়। কথাটা বলে জোরে হেসে উঠলেন ভবতোষবাবু।

চা খাওয়া শেষ হলে সনৎ ভবতোষ-বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে এলো। সঙ্গে সঙ্গে সুপর্ণাও এসে দাঁড়াল তার পাশে।

আপনার হয়ত সময় নষ্ট হল—সুপর্ণা তাকাল সনতের দিকে। সনৎ যেন একটু অনামনস্ক হয়ে রয়েছে বলে মনে হল তার।

না, ভালই লাগল এখানে এসে। অন্তত আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ হল।

এতটুকু সময়ের মধ্যে বাবার সঙ্গে আলাপ করে আপনার ভাল লাগবে না হয়ত, কিন্তু কয়েকদিন যাওয়া-আসা করলে অন্তত চিনতে পারবেন ঠিক করে। আসল কথা, বাবা খুব খেয়ালী। এক-এক সময় এক-এক রকমের মুড হয় ও'র। অবশ্য শেষপর্যন্ত সামলাতে হয় আমাকেই।

সনৎ সুপর্ণাকে ভাল করে লক্ষ্য করল। ইতিমধ্যে সুপর্ণা বেশ পরিবর্তন করে নিয়েছে। একটা হালকা রঙের প্রিণ্ট শাড়ী আর স্লিভলেস ব্লাউজ পড়েছে সে। চুলটা খুলে মেলিয়ে দিয়েছে পিঠের উপর। মুখে প্রসাধনেরও ছাপ রয়েছে সুস্পষ্ট। ভাল লাগল সনতের। অফিসের সুপর্ণাকে যেন আর চেনা যায় না। অল্প সাজের তফাতে মেয়েদের সমস্ত সত্তাটাই যেন পালটে যায়। সুপর্ণাকে একটা নতুন রূপে দেখতে পেল সে। স্নিগ্ধ লালিত্যের আভাস তার সর্বাঙ্গে।

সেদিন গানের ফাংসানে গেলেন না কেন? অনুযোগের স্বর সুপর্ণার।

হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়ে পড়ল এমন—মিথ্যে কথা বলল সনৎ। ড্রীম-ল্যাণ্ড নার্সিং হোমে সেদিন গল্প করে কাটিয়েছে সে কেতকীর সঙ্গে।

আপনার জন্য আমার গানটাই বাজে হয়ে গেল। ডায়াসে গান গাইতে বসে আমি কেবল আপনাকে ভিড়ের মধ্যে বারবার খোঁজবার চেষ্টা করেছি। অন্যমনস্ক হলে কি গান ভাল হয়!

না তা হয় না। সত্যি আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে।

তা অবশ্য বলছি না, কিন্তু আপনি গেলে খুব ভাল হোত। দুজনে ধীরে ধীরে ট্রামরাস্তার দিকে এগিয়ে চলল। হঠাৎ সুপর্ণার কাঁধটা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল সনৎ—

কি হল, ব্যস্ত হয়ে তাকাল সুপর্ণা।

আবার কি হবে, সেই পুরোনো রোগ, পায়ের ব্যথা। সুপর্ণার কাঁধে ভর দিয়ে রইল সনৎ।

চিকিৎসা করলে ভাল হয় না।

না, এ চিকিৎসার বাইরে—ম্লান হাসল সনৎ। তারপর বলল—সে-চেষ্টাও করেছি—একে পঙ্গু, তার ওপর রোগ বাসা বেঁধেছে শরীরে। আমি কিন্তু ডাইবেটিসের কথা জানতে দিইনি কাউকে, আপনিই প্রথম শুনলেন।

আপনার দাদা-বৌদিও জানেন না।

না, রোগ মানুষের দুর্বলতা। অন্য লোকের কাছ থেকে সেটা লুকিয়ে রাখাই ভাল। তা না হলে তারা সহানুভূতি দেখাবার ছলে আনন্দ পাবে হয়ত।

আমার কিন্তু সামান্য কিছু হলেই সকলকে জানাই, তা না হলে স্বস্তি পাই না।

নির্ভর করার মত লোক থাকলে বলতে অসুবিধে নেই। আমার বেলা কিন্তু সে-কথা খাটে না—সনতের স্বরে তিক্ততার আভাস।

কিন্তু রোগ কেন লুকিয়ে রাখব?

আপনার মুখে যদি একটা কাটা দাগ থাকত, কি করতেন?

নিশ্চয় মুখোশ পরতাম না—সুপর্ণার কথাগুলো স্পষ্ট।

বলা সহজ। হলে কি করতেন তা এখন বলবেন কি করে।

তা নয়। আমার মনে হয় কে দুর্বলতাই লুকিয়ে রাখা যায় না।

কেন, আমি ত বেশ লুকিয়ে রেখেছি দাদা, বৌদি কেউ জানে না যে আমার ডাইবেটিস হয়েছে।

কিন্তু আপনি যে রোজ ইনজেকসন নেন।

সে অন্য ডাক্তারের পরামর্শে। আর ইন-জেকসন আমি নিজেই নিই।

বলেন কি, তাতে কোন অসুবিধে হয় না?

কিছু না, ওটাও অভ্যাসের ব্যাপার।

কিন্তু যদি কমবেশী হয়?

কম ডোজ হলে অসুখ সারল না আর বেশী হলে ত কথাই নেই।

তার মানে?

তার মানে পরলোকযাত্রা। একেবারে এক্সপ্রেস সার্ভিস। আরও মজার ব্যাপার আছে।

কিরকম?

আপনাকে যদি আমি ইনসুলিন ইন-জেকসন করি, তাহলে কেউ ধরতে পারবে না মৃত্যুর কারণ কি।

পোস্টমর্টেম করলেও—

না, কোন চিহ্নই থাকবে না। মানে যাকে বলে পার্ফেক্ট ক্রাইম।

দুজনেই হাসল ওরা।

সনৎ চলে গেলে সুপর্ণা ফিরতি পথে হাঁটতে শুরু করল। সনৎকে তার ভাল লাগে। হয়ত সহানুভূতি থেকে তার উৎপত্তি। কিন্তু তার চরিত্রের একটা নতুন দিক আজ সুপর্ণার নজরে পড়ল। সনৎ যে সহজ এবং স্বাভাবিক নয়, তার কিছুটা আভাস সে পেয়েছে। নিজের দুর্বলতার কথা কেউ জাহির করে না, তা সে জানে। তাই বলে শারীরিক অসুস্থতাকে লুকিয়ে রাখার মনোবৃত্তিকেও সে সমর্থন করতে নারাজ। তাছাড়া সনৎ যেন সর্বদা নিজেকে একটা সুরক্ষিত প্রাচীরের অন্তরালে রাখতে চায়। একটা অভেদ্য বর্ম দিয়ে সে যেন নিজেকে অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টা করে চলেছে প্রতি-নিয়ত। সনৎ যেন সর্বদাই শঙ্কিত হয়ে রয়েছে, ভাবছে এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই হয়ত সবলতার লক্ষণ আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। কিন্তু সুপর্ণার মনে হয় সনৎ শুধু যে নিজেকে বঞ্চনা করছে তা নয়, নিজের মনকেও বিষিয়ে তুলছে সেই সঙ্গে। সঙ্কুচিত করছে তার পরিধিকে তিল তিল করে। সনৎ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত বলে মনে হল তার কাছে। সনতের পঙ্গুতা তার শারীরিক অসুস্থতার চেয়ে তার মানসিক বিকার সুপর্ণাকে বিচলিত করল বেশী। সনতের চিন্তা কেন তাকে পেয়ে বসল।

(ক্রমশঃ)

মানুষ গড়ার ইতিকথা

এদেশে নতুন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক কারা এ প্রশ্নের উত্তরে সর্ববাদীসম্মত উত্তর নিঃসন্দেহে মিলবে—মিশনারীরা! বলতে গেলে প্রায় একই জাহাজে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিশনারীরা এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের রথ দেখা ও কলা বেচার বাই-প্রোডাক্ট হিসাবে আমাদের ভাগ্যে ফাউ হিসেবে জুটেছিল আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা।

পলাশীর যুদ্ধ মিটে যাওয়ার পর ক্লাইভ, হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিশ ও ওয়েলেসলীর জবরদস্ত শাসনে কোম্পানী-রাজ যখন কায়েমী হয়ে উঠেছে তখন বিদেশী শাসকদের টনক নড়ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাতে কোনদিন অস্থায়ী হয়ে না ওঠে তার জন্য শাসক ও শাসিতের মাঝে সংযোগ-সেতু গড়ে তোলা দরকার। এই সংযোগ-সেতুর প্রধান উদ্দেশ্যই হবে ইংরেজীতে যোগাযোগ করা। সরকারী উদ্যোগ নানা কারণে সে যুগে সংকুচিত ছিল। সংকুচিত সরকারী উদ্যোগের বদলে কিছু বেসরকারী প্রচেষ্টার অঙ্কুরোদ্গম দেখা দিয়েছিল। জনকয়েক ফিরিঙ্গি কলকাতার নানা জায়গায় ইংরাজী স্কুল খুলেছিলেন—যেমন চীৎপুরে ফিরিঙ্গি শেরবারণ, আমড়াতলায় মার্টিন বৌল।

বেসরকারী ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশা-পাশি সে যুগে মিশনারীরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন স্কুল খোলায়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল একটিই—খৃস্টধর্ম প্রচার করা। এই উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়েই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের খৃস্টান মিশনারীরা নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে স্কুল খুলে চললেন। এই ভাবেই সেদিনকার কলকাতায় একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্কটিশ চার্চ স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, সেন্ট লরেন্স স্কুল, সেন্ট পলস স্কুল।

চারটির মধ্যে প্রথম ও শেষেরটি প্রটেসটান্টদের ও মাঝের দুটি রোমান ক্যাথলিকদের, বিশদভাবে বলতে গেলে জেসুইটদের। প্রায় শ' দেড়েক বছর আগে পনেরো কুড়ি বছরের ব্যবধানে এই চারটি স্কুল কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপিত হয়েছিল। আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁর স্কুল (স্কটিশ চার্চ) খুলেছিলেন চীৎপুরে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে। সেন্ট জেভিয়ার্সের সূত্রপাত মুরগীহাটায় পর্তুগীজ চার্চ স্ট্রীটে। সেন্ট লরেন্স স্কুলের আদি বসত বৈঠকখানা গির্জা। সেন্ট পলস স্কুল আমহার্স্ট স্ট্রীটে। সেন্ট পলস ছাড়া অন্য তিনটি স্কুলেরই হয় আদি নাম না হয় ঠিকানা বা উভয়ই গত দেড়শো বছরে পাল্টেছে। পাল্টায়নি শুধু চার্চ মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত স্কুলের নাম ও ঠিকানা।

তাই খুব সহজেই খুঁজে পেলাম। আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড় ছাড়িয়ে উত্তরে শুধু একটি স্টপ। বাস থেকে নামলেই রাস্তার বাঁহাতে পড়বে মাড়োয়ারী হাসপাতাল। উল্টোদিকে সেন্ট পলস স্কুল। রাস্তা পার হয়ে ডানহাতি ফুটপাথে উঠতেই সামনে পড়ল গেট। গেটটা কমন, স্কুল ও কলেজের। বলতে গেলে প্রায় একই কমপাউন্ড। অথচ অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। মেন গেট পেরোতে না পেরোতেই ডানহাতি তিনতলা বিল্ডিংয়ের গা ঘেঁষে একফালি লোহার গেট। উপরে গোটা গোটা হরফে লেখা সেন্ট পলস স্কুল। তলায় স্থাপনাবর্ষ হিসাবে লেখা রয়েছে : ফাউণ্ডেড —১৮২২। দুই সারির মাঝে সেন্ট পলের সিম্বলটুকু লোহার ফলকে খোদাই করা—খোলা বই ও তরোয়াল।

ধর্মে ইহুদী, জন্মে রোমান নাগরিক যে মানুষটির যৌবনের সখ ছিল খৃস্টানদের ধরে ধরে জেলে পোরা বা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া, হঠাৎ কোন দিব্যদর্শন তাঁর জীবন-দর্শনে ঘটাল আমূল পরিবর্তন—সলের রূপান্তর হল পলে। শুধু পল নন, সন্ত পল। খৃস্টানদের আরাধ্য মহামানব। সেই মহামানবের পুণ্যস্মৃতি ধারণ করে যে প্রতিষ্ঠান প্রায় দেড়শো বছর ধরে এই শহরের বুকে জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছে, তারই আঙিনায় প্রবেশ করে মনে হল পেছনে

সেন্ট পলস স্কুল

ফেলে এসেছি সব অন্ধকার—সামনে শুধু আলো।

এই আলো জ্বালাতেই একদিন মিশনারীরা এদেশে এসেছিলেন। এই উদ্দেশ্যেই এসেছিলেন উইলিয়ম কেরী। ১৭৯৯ খৃঃ। কেরী যে বছর এদেশে এলেন সে বছরই ইংলণ্ডে গঠিত হয়েছে চার্চ মিশনারী সোসাইটি। গঠিত হওয়ার পর বেশ কিছুদিন ঘর গুছোনোর কাজে ব্যস্ত ছিল সোসাইটি। আট বছর বাদে বাংলাদেশে মিশনের কাজ শুরু করার জন্য বিলেত থেকে টাকা পাঠান হল।

কাজ শুরু হয়ে গেল। কাজের প্রসারে খুশী হয়েই এক যুগ বাদে হেডকোয়ার্টার্স নির্দেশ পাঠাল, এবার কলকাতায় একটি খৃস্টান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের থাকবে নিজস্ব মিশন বাড়ি, একটি চার্চ, একটি সেমিনারী বা বিদ্যালয় এবং বই ছাপানো ও বাঁধাইয়ের আয়োজন। নির্দেশ অনুযায়ী সোসাইটির কলকাতা সমিতি ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। প্রথমেই দরকার কিছু জমি। নেহাৎ অল্প-স্বল্প হলে চলবে না। তাই খুঁজে পেতে শেষ পর্যন্ত ন বিঘা জমি সমেত এক বিশাল বাড়ি পাওয়া গেল মির্জাপুরে। জায়গাটি এক মুসলমান বিধবার। ট্যানারী ছিল ঐ জায়গায়। জনশ্রুতি, ট্যানারীর আগে জায়গাটি ছিল মুসলমানদের গোরস্থান। মিশন ঐ ন বিঘা জমি সমেত বাড়িটি ২০,৪০০ টাকায় কিনে নিল, অকটোবর, ১৮২১। এই বাড়িতেই মিশনের তরফ থেকে খোলা হল একটি স্কুল, যেখানে পঠন-পাঠনের মাধ্যম ছিল বাংলা। ঐ সেই আদি বাড়ি। তর্জনী তুলে ধরলেন সামনে ইতিহাসের শিক্ষক প্রণবকুমার ঘোষ। ছাত্রদের প্রণববাবু। পরনে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী, পাতলা ছিপছিপে গড়ন। একগাল দাড়ির আড়ালে সারাটা মুখ জুড়ে ছড়ানো আনন্দময় হাসি। নীচু, নরম গলার স্বর, অথচ দৃঢ়তার কোন অভাব নেই। ঐ বাড়িতেই বাংলা স্কুল চালু হয়েছিল। ইতিহাস শিক্ষকের অঙ্গুলি নির্দেশ অনুসরণ করে সামনে চাইতেই চোখে পড়ল অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়ানো পুরোনো ধাঁচের দরজা দোতলা বাড়ি। সামনে থামের আড়ালে পোর্টিকো। পোর্টিকো পেরিয়ে দরজা ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখের সামনে জেগে উঠল বিশাল এক হলঘর। সারি সারি ডেস্ক ও নীচু বেঞ্চিতে সাজানো। হলের পশ্চিমে কাঠের পাটাতনে উঁচুমতন ডায়াস। ডায়াসের পেছনে দেওয়াল জোড়া অনার বোর্ড।

অনার বার্ডের কালো গায়ে সাদা হরফে বিভিন্ন সময়ের অধ্যক্ষ, শিক্ষক, কৃতী ছাত্রদের নাম লেখা আছে। এই নামের অরণ্যেই লুকিয়ে আছেন ডিরোজিওর ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যমণি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, নীলদর্পণের পাদ্রী লং, ভূতের ওঝা ক্লার্ক। একটু আগে যখন হারফোরড ব্লকের দোতলায় টিচার্স রুমে বসে মাস্টারমশাইদের সঙ্গে স্কুলের অতীত ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখনই কথা-প্রসঙ্গে এই অনার বোর্ডের কথা উঠেছিল। অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার শশাঙ্কবাবু বার বার বলছিলেন আর কিছু না হোক ঐ অনার বোর্ডটা দেখবেন ভাল করে। অন্তত স্কুলের প্রথম একশ বছরের ইতিহাস খুঁজে পাবেন ঐ তালিকায়।

সেই তালিকার সামনেই দাঁড়িয়ে আমি। প্রণববাবু যেন কথক ঠাকুর। বোর্ডের নীরব নামগুলির অতীত কীর্তিকলাপের কাহিনী গড়গড় করে বলে যাচ্ছেন। দু কান ভরে আমি শুনছি।

বাংলা স্কুল ছ মাসেই উঠে গেল। কেন উঠে গেল? কারণ সবাই তখন ইংরেজী শিখতে চায়। ইংরেজী জানলে দিশী সমাজে জোটে খাতির আর বিলিতি সমাজে মিশবার ছাড়পত্র। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই শহরের মানুষ খেপে উঠেছিল ইংরেজী শিখবে বলে। সে সময় স্কুলে স্কুলে নামতা পড়ার মত পড়ুয়ারা ইংরাজী শব্দ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখস্থ করত :

ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লোম্যান—চাষা। পমকিন — লাউকুমড়ো, কুকুম্বার — শশা॥

ইংরাজীর যখন এত গুণ তখন জেনেশুনে কোন বাপ তাঁর ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে না দিয়ে বাংলা পাঠশালায় পড়তে পাঠাবে। ফলে চার্চ মিশনের বাংলা স্কুলের ছাত্রসংখ্যা মাসে মাসে কমতে লাগল। এ স্কুল ছেড়ে অন্য স্কুলে ছেলেরা ছুটল ইংরেজী শিখবে বলে। ততদিনে চীৎপুরে হিন্দু কলেজ, পটলডাঙ্গায় হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া সোসাইটিও কোন বিশুদ্ধ জ্ঞানের কেন্দ্র গড়ে তুলতে চান নি, চেয়েছিলেন খৃস্টধর্ম প্রচার করতে। স্কুল হবে প্রচারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। কিন্তু ছেলেই যদি না জোটে তো ধর্মপ্রচার হবে কি করে? তাই তাড়াহুড়ো করে ছ মাসের মধ্যেই মিশন বিল্ডিংয়ের অফিসঘরের সামনের অংশটুকু ঝাড়পোঁছ করে সেখানেই খুলে দেওয়া হোল আর একটি স্কুল। ইংরেজী স্কুল, এপ্রিল, ১৮২২। নতুন স্কুলের প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট হলেন জনৈক জার্মান মিশনারী জে এ জেটার।

মাস কয়েকেই স্কুল বেশ গুছিয়ে নিলেন জেটার সাহেব। এপ্রিলে স্কুল খোলা হোল আর নভেম্বরে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াল ষোল। বছর বছর ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল। দ্বিতীয় বছরে চল্লিশজন ও তৃতীয় বছরের নভেম্বরে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়াল পঞ্চাশ। স্কুলের অল্পদিনেই বেশ সুনাম হয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষার সময় শহরের মান্যগণ্যরা উপস্থিত থাকতেন। একবার তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ইস্ট পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলেন।

স্কুলের নাম হয়েছে, ছাত্রসংখ্যাও বাড়ছে দেখে সোসাইটিও আশান্বিত হয়ে উঠলেন। ভবিষ্যতে আরো অনেক জায়গার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া শহরের চেহারা তখন দিন দিনই পাল্টাচ্ছে। কিছু বাড়তি জায়গা কিনে রাখা প্রয়োজন। এর পর জায়গা পাওয়াই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে। ইতিমধ্যে আমহার্স্ট স্ট্রীট তৈরী হয়ে গেছে। এই নতুন রাস্তার গা ধরেই স্কুলের পশ্চিমদিকের জায়গাটুকু লটারী কমিটির কাছ থেকে মিশন ২৪১৮২ টাকায় কিনে নিলেন। এসব ১৮২৬ সালের কথা।

একনিঃশ্বাসে চার্চ মিশনারী সোসাইটির গোড়া পত্তন থেকে স্কুলের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত প্রায় সাতাশ বছরের ইতিহাস বর্ণনা করে একটু থামলেন প্রণববাবু। তারপর অনার বোর্ডের গায়ে আঙুল দিয়ে অনেকগুলি নাম ব্রাকেটস্থ করে বললেন : জেটার সাহেবের পর ও রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহনের আসার আগে এঁরা পর পর প্রিন্সিপাল অর্থাৎ হেড-মাস্টার হিসাবে এ স্কুল চালিয়েছেন। জেটারের পর রাইথহার্ড, রেভা আই উইলসন জে ল্যাথাম, রেভা জে ম্যাককুইন ও জে ডানসমুইর। দেখতে দেখতে দশটা বছর কেটে গেল।

এই দশ বছরে দেশের চেহারা অনেকটা পাল্টে গেছে। হিন্দু কলেজ তখন নবযুগের শিক্ষা আন্দোলনের পীঠস্থান। পীঠের জাগ্রত দেবতা স্বয়ং হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন ঠিক সেই বছর সেই মাসেই (মার্চ ১৮২৮) লর্ড আমহার্স্ট দেশে ফিরে গেলেন। নতুন বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তখন ভারতের পথে জাহাজে। মাত্র তিন বছর ডিরোজিও হিন্দু কলেজে পড়িয়েছেন। এই তিনটি বছরে প্রায় তিন যুগ এগিয়ে দিয়েছেন নবশিক্ষা আন্দোলনকে। গড়ে তুলেছেন তাঁর বিখ্যাত ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপ, যার মধ্যমণি ছিলেন ঝামাপুকুরের রামজয় বিদ্যাভূষণের নাতি কৃষ্ণমোহন। নৈকষ্য কুলীন বামুনের ছেলে কৃষ্ণমোহন ডিরোজিওর শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোর হিন্দুধর্মদ্বেষী হয়ে ওঠেন। এই স্বধর্মবিরোধিতাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধর্মান্তরণের পথে ঠেলে দেয়। ১৮৩২ সালের ১৭ অকটোবর তিনি খৃস্টধর্মে দীক্ষা নেন। দীক্ষাদাতা স্বয়ং আলেকজান্ডার ডাফ।

দীক্ষাগ্রহণের সময় কৃষ্ণমোহন স্কটিশ চার্চের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু খুব শীগগির স্কটিশ চার্চ ছেড়ে তিনি অ্যাংলিকান চার্চ অর্থাৎ চার্চ মিশনারী

...সাইটির শরণ নিলেন। এর পরই তাঁকে ...রা পাই সেণ্ট পলস স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ...যে। কৃষ্ণমোহনই প্রথম ভারতীয় যিনি মিশন পরিচালিত স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল পেয়েছিলেন। সে সময়ে এধরনের ঘটনা স্বাভাবিক ছিল না।

কৃষ্ণমোহনের সময়েই স্কুলের হোস্টেল ...লা হয়। এই হোস্টেলে শুধুমাত্র খৃশ্চান ...রাই ঠাঁই পেত। কৃষ্ণমোহন বেশীদিন স্কুলে থাকেন নি। তাঁর জায়গায় যিনি স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন তিনি ...মোহনেরই বন্ধু মহেশচন্দ্র ঘোষ। ...শচন্দ্র একই সময়ে কৃষ্ণমোহনের সঙ্গে ...ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণমোহন ও ...শচন্দ্র দু বন্ধুতে প্রায় আট বছর এই ...ন অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন।

দেখতে দেখতে এসে গেল চল্লিশের ...। মহেশচন্দ্রের জায়গায় স্কুলের ...সপ্যাল হয়ে এলেন পাদ্রী জেমস লং।

সেই লং সাহেব যিনি নীলদর্পণের ...মা করার অপরাধে আদালতে শাস্তি ...েছিলেন। প্রায় কুড়ি বছর এই স্কুলে ...া ছিলেন। ইসলিংটনের বিখ্যাত ছাত্র ও ভাষাবিদ (ন'টি ভাষা জানতেন) পাদ্রী সুনির্দিষ্ট আদর্শ নিয়েই কর্মভার গ্রহণ ...ছিলেন। ধর্মপ্রচার ছাড়াও ছাত্রদের মনে ...র প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও জানার আগ্রহ ...য়ে তোলাই ছিল তাঁর আদর্শ। তখন ... পলসে পড়ানো হোত গ্রীক, রোমান ও ...শ ইতিহাস, ইংরাজী সাহিত্য, ...ণিত, বীজগণিত, পাটীগণিত, হাইড্রো-...ষ্টিকস, নিউ টেস্টামেণ্ট, এভিডেনসেস খৃস্টানিটি ও বাংলা। পাদ্রী লংয়ের ...লে সেণ্ট পলস শহরের অন্যতম সেরা ...ে পরিণত হয়। পুরোনো রেকর্ড থেকে ... যায় যে ১৮৪৩ সালে দুশো তিরিশটি ... পড়ত এই স্কুলে।

শিক্ষক হিসাবে, প্রশাসক হিসাবে ...কতায় জ্বলন্ত প্রতিভূ পাদ্রী লং বিদায়-... একটি বিষয়ে দুঃখ করে বলেছিলেন ...চার যুগে মাত্র দুটি ছাত্রকে মিশন ...ন্তরিত করতে পেরেছে। ১৮৩৪ সালে ...থ ঘোষ ও ১৮৪৭-এ ভবানীচরণ ...রী। স্কুল প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যের চরম ব্যর্থতার দিকে মিশন কর্তৃপক্ষের ... আকর্ষণ করতে চেয়ে তিনি বলেছিলেন হিন্দুদের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব ঘটাবার ...াই যেন আমরা আশা না করি যে দলে ছেলে বুড়ো সব খৃস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণে ...হী হয়ে উঠবে।

ব্যাপারটা সোসাইটিও বুঝতে পেরে-...ন। তাই গোড়ার ধর্মপ্রচারের নামাবলী ... জড়িয়ে কাজে নামলেও ধীরে ধীরে ... খুলে ফেলে ঝুলিতে ভরে ফেলেন। ...প্রচারের কেন্দ্র হয়ে ওঠে ক্রমশ বিশুদ্ধ চর্চার কেন্দ্র। এই পরিবর্তন একদিনে ...ঠাৎ করে হয় নি। ধীরে ধীরে লোক-...র আড়ালে ঘটেছে এই পরিবর্তন সবার ...ক্ষেত।

সেই পরিবর্তনের কাহিনীই প্রণববাবু ...র শোনাচ্ছিলেন। লং সাহেব চলে ...ন। তাঁর জায়গায় এলেন স্টুয়ার্ট। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের বিখ্যাত স্নাতক রেভা ই সি স্টুয়ার্ট স্কুলের দীর্ঘদিন প্রচলিত একটি ব্যবস্থা বদলে দিলেন। জেটায় থেকে লং প্রায় চল্লিশ বছর সেণ্ট পলস ছিল অবৈতনিক স্কুল। মিশন স্কুলের সব খরচ-খরচা মেটাতেন। কিন্তু চল্লিশ বছরের পরিশ্রমের ফসলের পরিমাণ দেখে বোধহয় মিশন কর্তৃপক্ষও আঁৎকে উঠেছিলেন—চল্লিশ বছরে মোটে দুটি কনভার্ট! তাই স্টুয়ার্টের আমলে সর্বপ্রথম টিউশন ফি আদায় করা শুরু হোল। ছাত্র-পিছু মাসিক চার আনা। প্রথম বছরে প্রায় সাড়ে সাতশো টাকা আদায় হয়েছিল ছাত্র-বেতন থেকে।

স্টুয়ার্টের প এলেন রেভা জন। জন সাহেবের পর স্কুলের অধ্যক্ষপদে আমরা পর পর দুজন বাঙালীকে নিযুক্ত হতে দেখি। প্রথমজন হলেন ট্রিনিটি চার্চের প্যাস্টর রেভা পি এম রুদ্র। দ্বিতীয়জন পার্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় কুড়ি বছর এইভাবে কেটেছে স্কুলের বিভিন্ন অধ্যক্ষের পরিচালনায়। এরই মাঝে স্কুলের সুবর্ণ-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে ১৮৭২ সালে। স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে নতুন একটা দোতলা বাড়ি তোলা হল। নাম দেওয়া হল জুবিলী ব্লক। জুবিলী ব্লকের দোতলায় হোল ছাত্রদের উপাসনাকেন্দ্র, একতলায় ডাইনিং হল। প্রায় একশ বছর ধরে এই ব্যবস্থা চলে আসছে। বিগত শতবর্ষে কত হাজার হাজার ছাত্র এই জুবিলী ব্লকের উপাসনাকেন্দ্রের প্রার্থনায় যোগদান করেছে। আজও যেন ঐ বাড়িটির আঙিনায় দাঁড়ালে শুনতে পাওয়া যাবে রেভারেন্ড ব্রাডবার্ন, কি রেভারেন্ড ক্লার্কের স্তোত্রপাঠ।

কে রেভা ব্রাডবার্ন? জিজ্ঞাসা করলাম প্রণববাবুকে। ঈষৎ হেসে ইতিহাস শিক্ষক বললেন: পার্বতীবাবুর পর গত শতাব্দীর আশীর যুগের গোড়ায় স্কুলের অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন বার্লিন ইউনিভার্সিটির কৃতী ছাত্র রেভারেন্ড বাউম্যান। বাউম্যান সাহেবের পরেই এলেন রেভা ব্রাডবার্ন। ছিয়াশী সাল থেকে চার বছর প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে এই স্কুল চালিয়েছেন ব্রাডবার্ন সাহেব। তাঁর আমলেই সরকারী সাহায্যে ও বেসরকারী বদান্যতায় এবং ছেলেদের ব্যক্তিগত শ্রমে স্কুলের সুইমিং পুল তৈরী হয়েছিল। বলতে বলতে জুবিলী ব্লক পেছনে রেখে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রণববাবু। ঐ যে দেখছেন রাস্তার উপর পশ্চিমদিকে বড় বড় দুটো তেতলা বাড়ি, দেওয়ালে নাম লেখা আছে বিপিন অরবিন্দ ব্লক ও হিউম্যানিটিজ ব্লক এখানেই ছিল আমাদের সুইমিং পুল। দশ বছর আগে, আপগ্রেডিংয়ের সময় জায়গার অভাবে নতুন বিল্ডিংয়ের প্রয়োজনে ঐ পুকুর বুজিয়ে দেওয়া হয়। আজ থেকে একাশী বছর আগে ঐ পুকুর খোঁড়া হয়েছিল। এ ব্যাপারে গভর্নমেণ্ট সাহায্য হিসাবে দিয়েছিল ছ'শো টাকা।

সাঁতারের আয়োজন করে দিয়ে গিয়ে-ছিলেন ব্রাডবার্ন সাহেব। ছ' বছর পরে ভূতের ওঝা ক্লার্ক সাহেবের আমলে খেলা-ধুলোয় স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়ল সারা বাংলাদেশে। ১৮৯৪ সালে রেভারেন্ড সি বি ক্লার্ক সেণ্ট পলসের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসেন। ১৮৯০ সালে কেম্ব্রিজের যে চব্বিশজন ছাত্র মিশনারী ব্রত গ্রহণ করেন, ক্লার্ক তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর সময়ে সমস্ত দিক থেকেই স্কুলের প্রচণ্ড উন্নতি হয়।

গড় গড় করে অতীত ইতিবৃত্ত আওড়ে যাচ্ছিলেন প্রণববাবু। বাধা দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, রেভা ক্লার্ক সাহেব মানুষ, কেম্ব্রিজের ছাত্র, ভূতের ওঝা হলেন কবে? ও তাইতো—সেই গল্পটাই আপনাকে বলা হয়নি! ইতিবৃত্ত বর্ণনা বন্ধ হয়ে শুরু হোল ভৌতিক কাহিনীর পরিবেশন। ক্লার্ক সাহেবের আমলে হঠাৎ ভূতের উপদ্রব শুরু হোল স্কুলে! জানেনই তো এক সময় নাকি এই জায়গাটা ছিল গোরস্থান। একদিন এক দারোয়ান জানাল, স্কুল-বাড়িতে ভূত আছে; সে নাকি নিজের চোখে দেখেছে। ব্যাপারটা বেশী চাউর হয়ে গেলে পাছে ছেলেরা স্কুল ছেড়ে পালায়, তাই প্রিন্সিপ্যাল দারোয়ানকে ডেকে খুব কড়া করে ধমক লাগিয়ে বললেন: দ্বিতীয়বার ভূত দেখলে পত্রপাঠ তোমায় বিদায় নিতে হবে স্কুল থেকে। ধমকে না হয় দারোয়ানের মুখ বন্ধ করা গেল, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের মুখ বন্ধ করা যায় কিভাবে? দারোয়ান দেখেছিল একটি কারিয়া পিরেত, একজন মাস্টারমশাইয়ের চোখে পড়ল জোড়া কারিয়া পিরেত। পিরেত বাবাজীরা রীতিমত ঢ্যাঙা, তাদের আপাদ-মস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা এমন বর্ণনাও মিলল। গোড়া থেকেই সাহেবের কেমন সন্দেহ ছিল। বর্ণনা শুনেই ছুটলেন তিনি ক্লাসে। ক্লাস টেনে ঢুকে দুটি ছেলেকে ডেকে নিলেন! তারপর তাদের বলে দিলেন —আর যেন এরকম না হয়। এরপর এই স্কুলে আর কেউ কখনো ভূত দেখেনি।

ভুত শুরু করেই ক্লান্ত হননি ক্লার্ক। ঘরকুনো ছেলেদের টেনে নিয়ে গেছেন খেলার মাঠে। যতদিন প্যাশের কলেজ-মাঠ পায়নি ছেলেরা, খেলেছে মার্কাস স্কোয়ারে। ব্যক্তিগত জীবনে রীতিমত স্পোর্টসম্যান ক্লার্ক চেয়েছিলেন দেহেমনে সুস্থ নাগরিক গড়ে তুলতে। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় গড়ে উঠল স্কুলের ফুটবল টীম, অ্যাথলেটিক দল। সেণ্ট পলসের ফুটবল টীমের সে-যুগে কদর ছিল। ক্লার্ক যে-বছর এই স্কুলে এলেন, সে-বছর ইলিয়টের রানার্স-আপ হল সেণ্ট পলস। দু' বছর বাদে স্কুল টীম শীল্ড ঘরে নিয়ে এল।

ফুটবলের সঙ্গে শুরু হয়ে গেল অ্যাথলেটিক্স। চ্যাম্পিয়ন সব অ্যাথলেট সে-যুগে এই স্কুল থেকে বেরিয়েছে। সে-সময় ক্যালকাটা অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে এই স্কুলের ছেলে পি কে বিশ্বাসের নাগাল পাওয়ার মত কোন প্রতিযোগী ছিল না। আজ থেকে ছেষট্টি বছর আগে পাঁচ ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি লাফিয়ে পি কে বিশ্বাস যে-রকর্ড করেছিলেন, বহুদিন সে-রেকর্ড অক্ষুণ্ণ ছিল।

ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স ছাড়াও ক্রিকেট ও হকির সূচনা হয় এই সময়ে। আর একটি খেলা ক্লার্ক তাঁর স্কুলে চালু করে-ছিলেন। সেটি হল ফাইভ খেলা। এ-খেলার জন্য ছোট দুটি মাঠও তিনি করে দেন। আজও সেণ্ট পলসের ছেলেরা ফাইভ খেলে। তারা কি জানে আজ থেকে পাঁচাত্তর বছর আগে ক্লার্ক সাহেব এই খেলাটি তাদের স্কুলে চালু করেছিলেন?

ন' বছর ক্লার্ক সাহেব এই স্কুলে প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে কাজ করেছেন। এই সময়ের মধ্যে পড়াশুনা ও খেলাধুলার পাশাপাশি ছেলেদের ব্যবহারিক জ্ঞানের জন্য স্কুলের মধ্যে একটি কারপেণ্ট্রি সেকশনও খুলেছিলেন। স্কুলের জিমনাসিয়ামও নতুন চেহারা পেল তাঁর হাতে। লাইব্রেরীও সুন্দরভাবে গড়ে তুললেন। গড়ে তুললেন ফুলের বাগান আর প্রাক্তন ছাত্রদের সংসদ। ছেলেদের ড্রিল শেখানোর ব্যবস্থাও করে-ছিলেন। তাঁর অনুরোধে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে ওয়ারেণ্ট অফিসাররা আসতেন ড্রিল করাতে। বলতে গেলে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর স্কুলের যা যা দরকার সবকিছুরই আয়োজন ক্লার্ক সাহেব করেছিলেন। বলতে ভুলে গেছি, ছেলেদের জন্য একটা মিউজিয়ামও তিনি গড়তে শুরু করেছিলেন।

শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। শেষ করেছিলেন পরবর্তী প্রিন্সিপ্যাল রেভাঃ এ এফ এল্যাণ্ড। তিন সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর বছর পর্যন্ত একটানা এগারো বছর এই স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন এল্যাণ্ড। বোর্ডার ছাত্রদের জায়গার অভাব দূর করার জন্য তিনি চেয়ে-ছিলেন নতুন আর একটি বাড়ি তুলতে। কিন্তু ইচ্ছাকে কাজে রূপদান করবার আগেই তিনি বিদায় নেন। তাঁর জায়গায় আসেন শেষ ইউরোপীয় প্রিন্সিপ্যাল রেভাঃ বি ডাব্লিউ বীন।

পনেরো বছর এই স্কুলে ছিলেন বীন সাহেব। যখন এলেন, তখন ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ রীতিমত ঘোরালো হয়ে উঠেছে। স্কুলে এসেই তিনি এল্যাণ্ড সাহেবের ইচ্ছাটুকু সার্থক করে তোলায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে স্কুলের মেন বিল্ডিংয়ের পেছন দিকে উঠল নতুন একটা তিনতলা বিল্ডিং। ছেলেদের হোস্টেল হল এই নতুন বাড়ি—এল্যাণ্ড হোস্টেল। হোস্টেল সমস্যা মিটতেই বীন সাহেব হাত দিলেন স্কাউট দল গড়ায়। সারা ভারতে প্রথম স্কাউট দল তৈরী হয়েছিল এই সেণ্ট পলস স্কুলে, ১৯১৭ সালে।

বীন সাহেবের সময়েই স্কুলের শত-বার্ষিকী উদযাপিত হল। গতবর্ষে এই স্কুল অজস্র কৃতী ছাত্র উপহার দিয়েছে দেশকে। এই স্কুলের ছেলেরা কি এনট্রান্স, কি ম্যাট্রিক সব পরীক্ষাতেই বরাবর ভাল ফল দেখিয়ে এসেছে। ক্যালকাটা ইউনি-ভার্সিটির মেডিসিনের প্রাক্তন ডীন ডঃ এল এম ব্যানার্জি, ইণ্ডিয়া পাকিস্তান সিলোন ও বর্মার প্রথম মেট্রোপলিটান ডঃ অরবিন্দ মুখার্জি, প্রথম ভারতীয় বিশপ রেভাঃ এস কে তরফদার ও অধ্যক্ষ এইচ কে ব্যানার্জি এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন।

শতবার্ষিকী উদযাপনের চার বছর পরেই স্কুলের উঠোনে আর একটি নতুন বাড়ি উঠল। দোতলা এই বাড়ীটি হার-ফোরড ব্লক নামে পরিচিত। বীন সাহেবের সমসময়ে বছর-চারেক রেভাঃ এইচ ডি বি হারফোরড তাঁর অনুপস্থিতিতে স্কুলের দায়িত্ব বহন করেছিলেন। হারফোরড ব্লক উঠবার তিন বছর পরেই বীন সাহেব বিদায় নিলেন। বীন সাহেবের স্বদেশে প্রত্যা-বর্তনের সমসময়ে মিশন একটি নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই স্কুলের যাবতীয় সম্পত্তি ও দায়-দায়িত্ব তুলে দেওয়া হোল কলকাতার বিশপের হাতে। সোয়াশো বছর ধরে যে-সংস্থা এই স্কুল চালিয়ে এসেছে, নবযুগের সন্ধিক্ষণে যোগ্য উত্তরসূরীর হাতে দায়িত্ব-ভার তুলে দিয়ে, এদেশ হতে চিরতরে বিদায় নিল। এই নতুন সিদ্ধান্তের ফলেই আর একটি পরিবর্তন সূচিত হোল স্কুলের ইতিহাসে। পূর্ব প্রথানুযায়ী এই স্কুলের প্রিন্সিপ্যালপদে ইউরোপীয়রাই সাধারণত নিযুক্ত হতেন। এবার থেকে ভারতীয়রা সেই সুযোগ পেলেন। ভারতীয় তবে খৃশ্চান হতে হবে।

নতুন নিয়মে যিনি সর্বপ্রথম এই সুযোগ পেলেন, তিনি এই স্কুলেরই দীর্ঘ-দিনের শিক্ষক, বীন সাহেবের আমলে সহকারী প্রধান শিক্ষক, মানিকচন্দ্র বিশ্বাস। ছ' বছর এই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। ঐ ছ' বছরে স্কুলের উন্নতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল, বললেন প্রবীণ শিক্ষক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৯ সাল থেকে এই স্কুলে পড়াচ্ছেন সুরেনবাবু। চল্লিশ বছর পরেও মানিকবাবুর স্মৃতি আজো অম্লান তাঁর হৃদয়ে। সব চেয়ে আছে সে-আমলের কথা সুরেনবাবুর। ম্যাট্রিক পাশ করে মাত্র পঁচিশ টাকা মাইনের এই স্কুলে ঢুকেছিলেন। তখনকার দিনে সাহেব প্রিন্সিপ্যালের মাইনে ছিল হাজার টাকার ওপর। প্রিন্সিপ্যালের মাইনে আসত মিশন থেকে। বাকী মাস্টারমশাইদের বেতন যোগাত স্কুল। প্রিন্সিপ্যালরা সাজানো-গোছানো কোয়ার্টার পেতেন। মেন বিল্ডিং-এর দোতলায় ঐ কোয়ার্টার (আজও সেই ব্যবস্থা বহাল আছে)। এছাড়া পেতেন বিলেতে যাওয়া-আসার প্যাসেজ-মানি। অন্যান্য শিক্ষকরা কত পেতেন?—আমার এই প্রশ্নের জবাবে সুরেনবাবু বললেন ঃ মনে আছে শশধরবাবু পেতেন পঞ্চান্ন টাকা। শশধর সাহা এম-এ পাশ করেই স্কুলে পড়াতে এসেছিলেন। আরো বললেন সুরেনবাবু যে ত্রিশের যুগে জনা-বারো মাস্টারমশাই পড়াতেন এই স্কুলে। তখন ছাত্রই বা আর কত। লোকে বলত সেণ্ট পলস অ্যাণ্ড হিজ টু হানড্রেড।

মানিকবাবু মারা যান পঁয়ত্রিশ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তাঁর মৃত্যুর পর এন ঘোষ ও রেভাঃ মিলফোর্ড (ছ' মাস) বছর কয়েক প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে কাজ করেন। চার বছর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখে প্রিন্সিপ্যাল হলেন এম আর দে। এর মাঝে স্কুলের আর একটা বাড়ি উঠেছে। জিমনা-সিয়াম আর জুবিলী ব্লকের মাঝে দোতলা মানিক ব্লক। মানিকবাবুর পুণ্যস্মৃতি ধারণ করেই বিজ্ঞান বিভাগের জন্য এই নতুন বাড়ীটি গড়ে ওঠে। ত্রিশের যুগের শেষা-শেষি ইউনিভার্সিটির নতুন নিয়মে স্কুলে স্কুলে বিজ্ঞানচর্চার ধুম পড়ে যায়। সেই প্রয়োজন মেটাতেই উঠেছিল মানিক ব্লক। যেমন স্কটিশ চার্চ স্কুলে এ-সময় তৈরী হয়েছিল হেনসম্যান ব্লক। তবে মানিক ব্লকের প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে। হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থায় নতুন করে বিজ্ঞান বিভাগ খুলতে হয়েছে স্কুলকে।

সেই নতুন যুগের নতুন ইতিহাস শুনলাম শশাঙ্কবাবুর মুখে। তিপ্পান্ন সাল থেকে এই স্কুলে পড়াচ্ছেন শশাঙ্কশেখর সিংহ। তিনি আসার দু' বছর আগে স্কুলের প্রিন্সিপ্যালপদে লোক বদল হয়েছে। বারো বছর একটানা কাজের পর এম আর দে রিটায়ার করেছেন। তাঁর জায়গায় প্রিন্সিপ্যাল হয়েছেন শশধর সাহা। স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনি-রিয়ান ছিলেন শশধরবাবু, বললেন শশাঙ্ক সিংহ, তাঁর আমলে স্কুলের ডিসিপ্লিন ভাঙার সাহস ছিল না কারুর। প্রায় ষোল বছর তিনি আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, কোনদিনও দেখিনি কোন ছাত্র শিক্ষকের আদেশ অমান্য করেছে। কোথায় যেন অভি-মানের একটা খোঁচ লুকিয়ে ছিল শশাঙ্ক-বাবুর কথার মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আজকাল কি স্কুলের ডিসিপ্লিন শিথিল হয়ে পড়েছে? শশাঙ্কবাবু জবাব দেওয়ার আগেই উপস্থিত অন্যান্য মাস্টারমশাইরা সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ আগের দিনকাল আর নেই।

জানতে চাইলাম আগের সেইসব দিনের কথা, সেণ্ট পলস অ্যাণ্ড হিজ টু হানড্রেডের বিপুলে পরিবর্তনের ইতিহাস। শশধরবাবুর

আজকে আটান্ন সালে হাই স্কুল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে রূপান্তরিত হয়। শুরু হয় সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ স্কীম নিয়ে। স্কুলের নবরূপায়ণের প্রয়োজনেই অনেক পরিবর্তন এল স্কুলের বাইরের চেহারায়। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কীম চালু করার আগেই সাতান্ন সালে পুরোনো দোতলা হারফোরড ব্লক তেতলা করা হল। শুধু তাই নয়, সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজের জন্য নতুন বাড়ি তোলার প্রয়োজনে সুইমিং পুল বুজিয়ে দেওয়া হোল। সে-জায়গায় উনষাট সালে বিশপ অরবিন্দ সায়েন্স ব্লকের তিনতলা বাড়ি। একষট্টিতে সায়েন্স ব্লকের পাশে উঠেছে তেতলা হিউম্যানিটিজ ব্লক।

স্কুলের বহিরঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যাও বেড়েছে প্রচুর। চল্লিশ বছর আগে যে-স্কুলে পড়ত মোটে টু হানড্রেড, আজ সেখানে শুধু প্রাইমারী সেকশানেই পড়ে ছ'শো ছেলে। সেকেণ্ডারীর ছাত্র-সংখ্যা সাড়ে সাতশোরও বেশী। অতীতের বারোজন শিক্ষকের সংখ্যা কালের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় আজ পরিণত হয়েছে আটত্রিশজনে। শুধু যে ছাত্র বা শিক্ষক-সংখ্যাই বেড়েছে তা নয়, টিউশন ফীর হারও বেড়েছে বহুগুণ। কারণ এই স্কুল সরকারী সাহায্য নেয় না, মিশনের সাহায্যও পায় না এক পয়সাও। সম্পূর্ণ ছাত্র-বেতন নির্ভর এই স্কুল। অথচ অতীতের তুলনায় খরচ বেড়েছে শতগুণ। তাই একশো বছর আগে যে-স্কুলের বেতন ছিল ছাত্রপিছু মাত্র চার আনা, আজ সেখানেই ইনফ্যাণ্ট থেকে ক্লাস ফোর পর্যন্ত টিউশন ফির রেট মাসে আট টাকা। ফাইভ টু এইট দশ টাকা। আর হায়ার সেকেণ্ডারীতে হিউম্যানিটিজে বারো টাকা, সায়েন্সে ষোল টাকা।

আজকের দিনে কলকাতার নামী বে-সরকারী স্কুলগুলির পাশে সেণ্ট পলসের ছাত্র-বেতনের হার কম বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, এই স্কুলের সাড়ে তেরোশো ছাত্রের মধ্যে শত-করা পঁচাত্তর ভাগই আসছে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে। অতি ধনী বা অতি দরিদ্র উভয় সম্প্রদায়ই প্রায় অনুপস্থিত। এই বিশাল মধ্যবিত্ত ছাত্র সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই স্কুল কর্তৃপক্ষ পুরোনো লাই-ব্রেরীকে নতুন করে সাজিয়েছেন। চার হাজারের ওপর বই আছে স্কুল-লাইব্রেরীতে। সপ্তাহে গড়ে প্রায় ছ'শো বই ছাত্ররা নেয়। লাইব্রেরীর ব্যাপারে ছাত্ররা যে কত উৎসাহী সে-কথা বলতে গিয়ে সুরেনবাবু বললেন: এক সপ্তাহ বই না পেলে ছেলেরা মাথা খেয়ে ফেলে। প্রতি বছর শুধু লাইব্রেরীর জন্য ব্যয় হয় গড়ে হাজার দুই টাকা। এর পাশে সরকারী স্কুলের হিসাব যদি তুলে ধরি, নিশ্চয়ই তাতে সরকার আনন্দিত হবেন না। লাইব্রেরীর জন্য এদের ব্যয়ের এক-দশমাংশও ব্যয় হয় না হিন্দু বা হেয়ার স্কুলে।

শুধু লাইব্রেরী নয়, সায়েন্সের ল্যাবরে-টরী দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। বিশপ অরবিন্দ ব্লকের তিনটি তলায় থাকে থাকে সাজানো ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির ল্যাবরেটরী। ফিজিক্সের মাস্টারমশাই জগংজ্যোতি ঘোষের মুখে শুনেছি বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহের কথা। ক্লাস নাইনের আর্য পাল নিজে রেডিও বানিয়েছে। মাস্টারমশাইকে শুনিয়ে গেছে তার রেডিওর আওয়াজ।

লাইব্রেরী বা ল্যাবরেটরী এত সব স্কুলেই থাকে বা আছে—স্কুলের প্রয়োজনে। কিন্তু ছাত্রদের নিজস্ব ছোটখাট টুকিটাকি বানানোর সখের ভেতরে যে সৃজনী প্রতিভা লুকিয়ে থাকে, সেদিকে নজর দিতে তো বেশী দেখা যায় না এদেশে। কিন্তু সেণ্ট পলসে মাস্টারমশাইরা ছেলেদের সেই বিশেষ অভাবটুকু পূরণ করেছেন। ছেলেরাই গড়ে তুলেছে তাঁদের মাস্টারমশাইদের সক্রিয় সহযোগিতায় 'হবি ওয়ার্লড'। এই হবি ওয়ার্লডে কুটুম-কাটুম থেকে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকের পরিচয় নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিমত মাটি, কাঠ, লোহার পাত ইত্যাদির সাহায্যে ছেলেরা বানিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র, বর্তমানে শিক্ষক এ জে বাইসন (জাতে বাঙালী, বর্ধমানে বাড়ি, ধর্মে খৃশ্চান) সগর্বে দেখালেন ছেলেদের হাতে তৈরী সেসব জিনিস। দেখে বেরিয়ে আসছিলাম। মিঃ বাইসন একটা খাতা সামনে মেলে ধরে বললেন, এটা দেখবেন না? খাতার মলাট দেখে মালুম হোল ওটা মতামতের খাতা। উল্টেপাল্টে দেখছিলাম মতামতের খাতা, হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকে গেল। পড়ে দেখি আমাদের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায় গত এপ্রিল মাসে এই প্রদর্শনী দেখে খুশী হয়ে লিখছেন: "প্রদর্শনীতে সেণ্ট পলস স্কুলের ছাত্রদের হাতের কাজ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ছাত্রদের মধ্যে রহিয়াছে সৃজনী প্রতিভা। এই সৃজনী প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ ছাত্রদের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়াই হইল শিক্ষাজগতের বিশেষ কাজ।"

সেই কাজই করছেন সেণ্ট পলসের শিক্ষকরা। তাঁরা চান ছাত্রদের আরো অনেক বেশী সুযোগ দিতে। কিন্তু কোথায় জানি অসুবিধার বাধা বার বার ঠেলে ঠেলে উঠছে। পরিষ্কার করেই বলা যাক আসল বাধা কোথায়। সেণ্ট পলস স্কুলের নিজস্ব বিশেষ সংবিধানের মধ্যেই রয়েছে ঐ বাধা—খৃশ্চান ছাড়া স্কুলের অধ্যক্ষের পদে অন্য ধর্মের কাউকে নিয়োগ করা যাবে না। তাই উপযুক্ত অ-খৃশ্চান শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও ম্যানেজিং কমিটি বাইরের লোককে নিয়োগ করবেন, তবু ভেতরের লোক পাবেন না সে-সুযোগ। ফলে শিক্ষকদের মনের কোণে যে অসন্তোষ রয়েছে, আমি বাইরের লোক হয়েও তা অনুভব করেছি, আর কর্তৃপক্ষ কি সেটা জানেন না। গত বিশ বছরে গোটা কুড়ি অ্যামেণ্ডমেণ্ট যদি ভারতীয় সংবিধানের হতে পারে, তাহলে সেই দেশেরই একটি স্কুলের সংবিধানের একটি ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধনে আপত্তি কি? না কি ভারতীয় সংবিধানের চেয়েও পবিত্র সেণ্ট পলস স্কুলের সংবিধান — ধরাছোঁয়ার বাইরে। স্কুল-সংবিধানের প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখাতে গিয়েই আজ স্কুলে ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। শশধরবাবু রিটায়ার করেছেন ছেষট্টিতে। গত তিন বছরে তিনবার স্কুলের প্রধান পদে লোক পাল্টেছে। ষোল বছরের জবরদস্ত শাসনের পর হঠাৎ বার বার প্রিন্সিপ্যাল পদে লোক পরিবর্তনে স্কুলের ছন্দোবদ্ধ নিয়মশৃঙ্খলা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছে। এই শিথিলতা দূর হোক—এই-টুকুই শুধু মাস্টারমশাইদের কাম্য। কারণ, এই শৈথিল্য দূর না হলে ভবিষ্যতে স্কুলের ফলাফল খারাপ হবেই, কেউ রোধ করতে পারবে না।

ফলাফলের কথা উঠতেই জানতে চাইলাম স্কুলের গত কয়েক বছরের রেজাল্ট। যা জেনেছি, তা হোল এই যে, ছেচল্লিশ থেকে একান্ন সাল এই ছ' বছরে মোট একশ' সাতাশটি ছেলে ম্যাট্রিক দেয়। ফেলের সংখ্যা মোটে আঠারোটি। স্কুল ফাইন্যালের ন' বছরে মোট দুশো পঁচাশীটি ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ করেছে দুশো ছেয়াত্তর জন। হায়ার সেকেণ্ডারীর গত আট বছরে পাশের হার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ। রেজাল্ট দেখে বলতে ইচ্ছে হল—সাবাস! সেণ্ট পলস অ্যাণ্ড হিজ টু হানড্রেড শ্লোগানটির মূল সুর এযুগের ছেলেদেরও জানা আছে। যুগের পরিবর্তনে স্কুলের বাইরের চেহারা হাজার পাল্টালেও তার মান আজও অপরিবর্তিত।

এই মান বজায় রাখার জন্য যাদের সবটুকু কৃতিত্ব প্রাপ্য, সেণ্ট পলসের সেই আটত্রিশজন শিক্ষকের কথা সবচেয়ে বেশী করে আজ মনে পড়ছে। কারণ, এঁরাই বহন করছেন কৃষ্ণমোহন, ক্লার্ক, বীন, মানিকচন্দ্র ও শশধর-বাবুর ঐতিহ্য। সত্যি সত্যি যে সেই ঐতিহ্য এঁরাই বহন করছেন, তার প্রমাণ সেদিন আমি পেয়েছি। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ার প্রায় চারঘণ্টা পরে রাত্রির অন্ধকার যখন নেমে এসেছে স্কুলের মাঠে, দূরে বহুদূরে মাড়োয়ারী হাসপাতালের গায়ে-লাগানো দেবদেউলে সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনিও স্তব্ধ হয়ে গেছে, তখনও তাঁরা সবাই স্কুলে ছিলেন। যাঁরা যেটুকু জানা আছে, তাই নির্ভর করেই তাঁরা আমায় সাহায্য করেছেন। পাছে কোন তথ্য বাদ যায় বা ভুল জেনে যাই। তাঁদের কারুর বাড়ি পাইকপাড়া, কেউ থাকেন ঠাকুরপুকুর। স্কুলকে ভাল না বাসলে, তার ঐতিহ্য মর্মে মর্মে অনুভব না করলে, শুধুমাত্র বেতনের বিনিময়ে যে খাঁটি শিক্ষক কোন স্কুল পেতে পারে না—এ-সত্যটুকু সেণ্ট পলস স্কুলে না গেলে কোন-দিনই বুঝতে পারতাম না। এই অনুভূতি-টুকুর জন্য ঐ আটত্রিশটি মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ।

—[illegible]

[illegible]

আগের ঘটনা

[গ্রাম চেনবার নেশা ছিল বিকাশের। শহুরে যুবক প্রয়োজন নিয়েই এল তাই পাড়াগাঁর ব্যাঙ্কে। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্ককাকার বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে অন্ধকারে এক আলোর বিন্দু। বিস্ময়ের আশ্রয়। মনীষা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত মনীষায়, দ্বিতীয় উপস্থিতি।

চারদিকে টানাপোড়েন। চোরাবালি। ক্ষোভে ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছে সবাই। মূল্যবোধও বিপর্যস্ত। ঘুনপোকা।

গ্রাম্য রাজনীতির বীভৎসতা।

সোনালির প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ। বিকাশের চোখেও সে যেন দেখতে পেল নির্ভরতার আলো। অথচ মনীষা তার অস্তিত্ব জুড়ে।

সে পালাও ফুরলো। মনীষা হারিয়ে যেতে চাইল।

একা।

বিকাশ বিপর্যস্ত। অফিসেও অশান্তি। একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে লেগে তুলকালাম। বিকাশের ক্ষমা প্রার্থনা। বিষিয়ে রইল মন। শূন্যতার খাঁচায় বন্দী। ফিরল অফিস থেকে। সোনালির মুখোমুখি।

শশাঙ্ক নিয়োগীর আসল চেহারাটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সুনুর কাছেই জানা গেল তার ছোটমাসীর আত্মহত্যার কারণ।

পরদিন। অফিসে পা দিতেই ঝড়ের সংকেত আবার। সহকর্মী প্রিয়গোপালকে পি ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সকলের সন্দেহ বিকাশই ধরিয়ে দিয়েছে কানাই পালের সহযোগিতায়। ওদিকে শশাঙ্ক নিয়োগী রটিয়ে বেড়াচ্ছেন 'বিকাশ বলেছে কানাই পাল ধরিয়ে দিয়েছে পি-ডি-অ্যাক্টে।' বিকাশ এর মোকাবিলা করতে চাইল। অস্বস্তিকর পরিস্থিতি।

বিকাশ ভাবল পালিয়ে যেতে হবে, পালাতে হবে এই ষড়যন্ত্রের সীমানা পেরিয়ে।

রাত হয়েছে। হঠাৎ আবিষ্কার করল বিকাশ, শশাঙ্ক নিয়োগীর রক্তাক্ত শরীর রাস্তার ওপর।]

।। সাতাশ ।।

রাতটা যেন দুঃস্বপ্ন।

চিৎকার, ডাকাডাকি, লোকজন। ধরাধরি করে রক্তমাখা শশাঙ্ককে বাড়ী নিয়ে যাওয়া। কাত্যিমা মিঃশব্দে পড়ে গেলেন সিঁড়ির ওপর, ডুকরে কেঁদে উঠল সুনু, ছাইয়ের মতো মুখে চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল বাচ্চাগুলো।

শুধু মেজদার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; হয়তো কোথাও বসেছিল জংলা আমবাগানের ভেতরে, মুখ গুঁজে ছিল ভাঙা বাড়ীতে তার ধ্বংসশেষ লাইব্রেরীর মধ্যে; কিংবা অঘোরে ঘুমুচ্ছিল সেই অন্ধকার সিঁড়িটার তলায়। আর চারদিকের নিয়োগীপাড়া থেকে—অন্য সময়ে যে-পাড়া প্রায় নির্জন মনে হয়—দলে দলে লোক এসে জুটে গিয়েছিল শশাঙ্কর বাড়ীতে, গোটা পঁচিশেক লণ্ঠনের আলোয় উঠোন, সিঁড়ি, দোতলা, নীচের দালান আলো হয়ে গিয়েছিল। সেই আলোয় আর কোলাহলে পোড়ো মহলের পায়রাগুলো জেগে উঠেছিল আতঙ্কে—ইতস্তত ওড়া-উড়ি করছিল তারা।

নিয়োগীপাড়া তোলপাড়। শশাঙ্কর মাথায় লাঠি পড়া মানেই পাড়ার ইজ্জতে ঘা পড়া। উঠোনে দাঁড়িয়ে বাঁকাবাবু বক্তৃতা করছিলেন : 'আমি জানি—অনেকদিন থেকেই পালপাড়ার ছোঁড়াগুলো তাক করছে। সেই পঞ্চায়েতের মীটিঙের পর কানাই পাল—'

কলারওলা গেঞ্জী আর চোঙা প্যান্টুপরা রোগামতন তেইশ-চব্বিশ বছরের একটা ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল : 'দেখে নেবো সালা পালপাড়াকে!'

বিকাশের এ-সব শোনবার সময় ছিল না, উৎসাহও না। একটা সাইকেল নিয়ে সে ছুটল প্রভাকরকে ডাকতে।

আর একজন ডাক্তারও এসে পড়েছিলেন নিয়োগীপাড়া থেকে। ব্যাপারটা যতখানি গুরুতর ভাবা গিয়েছিল তা নয়। মাথাটা একটু ফেটেছে, কিন্তু ভয়ের কিছু নেই। যারা মেরেছে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল শশাঙ্ককে বেশ করে উত্তম-মধ্যম দেবার। ঠিক সেই কাজটিই তারা করেছে।

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধবার সময়েই শশাঙ্কর জ্ঞান এল। প্রথমে উঃ করে উঠলেন, তারপর বেশ স্পষ্ট গলায় বললেন, 'শালা!'

প্রভাকর বললে, 'কেমন আছেন এখন?'

শশাঙ্ক চোখ মেললেন। চেয়ে দেখলেন চারদিকে। চোখ মিটমিট করলেন বারকতক, যেন সবটা অনুধাবন করে নিতে চাইলেন। কিন্তু মাথা তাঁর পরিষ্কার, নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছাড়াও পরের মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির করে বেড়ানো তাঁর পেশা, অতএব মগজের ভেতরে ধোঁয়াটা তাঁর বেশিক্ষণ রইল না।

বিকট মুখ করলেন একবার। তারপর আবার স্বগতোক্তি।

'ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিল শালারা। পাঁচ-ছ'টা একসঙ্গে। যদি মুরোদ থাকত, সামনা-সামনি এসে—উঃ, ডান হাতটা যেন ভেঙে দিয়েছে একেবারে।'

ভাঙেনি বিশেষ কিছুই। কিন্তু মাথার ঘা শুকোতে আর গায়ের ব্যথা সারতে দিন পনেরো সময় লাগবে অন্তত।

'ওই কানাই পাল—' এবার কয়েকটা অকথ্য গালাগালি বেরিয়ে এল : 'যদি ওকে আমি বাস্তুছারা না করি—'

ব্যাগ গুছিয়ে উঠে পড়েছিল প্রভাকর। বিকাশের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বাইরে। বারান্দায় তখনো উত্তেজিত নিয়োগীদের জটলা। প্রভাকর বিকাশকে নিয়ে একেবারে চলে এল বাইরের উঠোনে।

স্ট্যামিনা দেখেছিস একবার লোকের? এমন ঠ্যাঙানি খেয়েছেন, কোথায় ঝিম মেরে পড়ে থাকবেন—তা নয়, জ্ঞান হতে না হতেই খিস্তির বান ডাকিয়েছেন। একেই বলে প্রাবার এনার্জি—বুঝেছিস? এ তোদের শহুরে ব্যাপার নয় যে, এক ঘা খেতে না খেতেই বাপ্রে বলে চিৎ হয়ে পড়া, তারপরেই হাত-পা একেবারে ঠান্ডা! এখানকার মানুষের—' একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বাঁকা হাসি হেসে প্রভাকর বললে, 'এখানকার মানুষের গলাটা কেটে নে—তারপর সেই মুখ থেকে যে শেষ কথাটা শুনতে পাবি, সেটি একটি মোক্ষম খিস্তি!'

'এ অবস্থায় তুই ঠাট্টা করছিস প্রভাকর?'

'ভুলে যাচ্ছিস কেন বিকাশ, দেশ ছাড়া হলেও এই নিয়োগীদেরই ছেলে আমি। আর এদের হাড়ে হাড়েই চেনা আছে আমার। কিচ্ছু ভাবিসনি—এরকম এক-আধটু বীররস, দুটো-একটা পতন ও মূর্ছা না হলে এখানকার নাটক ঠিক জমে ওঠে না। যতদূর মনে হচ্ছে, শ্রাদ্ধ এরপরে আরো গড়াবে।'

গড়াবে যে, তাতে বিকাশেরও সন্দেহ নেই কোনো। বাঁকাবাবু বারান্দার কোনায় ক'জন ভীষণ মুখ ভদ্রলোককে নিয়ে কী সব সলা-পরামর্শ করে চলেছেন। একটু আগেই চোঙা প্যান্ট পরা ছেলেটি হাত তুলে প্রায় শ্লোগান দিচ্ছেন : 'সাল্লা পালপাড়াকে দেখে নেব।'

বিস্বাদ ক্লান্ত গলায় বিকাশ বললে, 'এ সব থাক প্রভাকর, আমার ভালো লাগছে না। এখানকার কোনো নাটকেই কোনো উৎসাহ নেই আমার। চল্ তোর সঙ্গে যাই। কিছু ওষুধপত্র দিবি তো দে।'

'ওষুধের দরকার হবে না। একটা ইন্জেক্শন দিয়েছি, তাই যথেষ্ট আপাতত। যদি জ্বর-টর কিছু হয়, তা হলে দেখা যাবে কাল। কিন্তু তুই কী ডিসাইড করলি?'

'কিসের?'

'ভুলে গেলি? কাল সকালে তো আমার কোয়ার্টারে তোর চলে আসবার কথা। অমলা তোর ঘর গুছিয়ে রেখেছে এর মধ্যেই।'

ঠিক কথা। এই ডামাডোলের ভেতরে মনেই ছিল না। বিকেলবেলা শশাঙ্ক যখন তাঁর সব নখ-দাঁত বের করে মেজদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখনই বিকাশ বুঝেছিল এখানে আর এক সেকেন্ডও থাকা চলে না, এর চাইতে সুন্দরবনের জঙ্গলও ভালো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পটার শেষ কয়েকটা লাইনই মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

এখানে থাকা যায় না, কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না এর ভেতরে। তবু কি চলে যাওয়া যায় এই সময়—এই বিপদের মধ্যে? প্রভাকরের দৃষ্টিতে এটা নাটক ছাড়া কিছু নয়, পতন এবং মূর্ছা থেকে আর একটু ধাতস্থ হলে শশাঙ্ককাকা গদা হাতে আবার আসরে নেমে পড়বেন তাও ঠিক, কিন্তু সারা জীবন ধরে যে সুধাময়ী দেবী একটু একটু করে মরে যাচ্ছেন, তিনি? তাঁর করোটির মতো বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বলা যাবে একথা—আমি চলে যাচ্ছি? যে বাচ্চাগুলো ঘরের কোনায় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের ফেলে যাওয়া যাবে? যে সুনুর চোখদুটো অতলান্ত ভয়ের মধ্যে ডুবে আছে এখন, বলা যাবে তাকে একথা?

প্রভাকর বললে, 'কী ভাবছিস?'

'দু-একটা দিন থেকে যাই বরং। কাকা একটু সুস্থ হলে'—

'সুস্থ হয়েই রয়েছেন উনি'—প্রভাকর আবার বাঁকা হাসি হাসল : 'এখন বিছানায় শুলেও ও'র পলিটিক্স্ চলতে থাকবে, বরং আরো উৎসাহের সঙ্গেই চলতে থাকবে। গালাগালের নমুনাটা দেখিস্ নি?'

'তুই সিনিক্ হয়ে গেছিস প্রভাকর।'

'সিনিক নয় ভাই, বাস্তববাদী। তোকে ও'র জন্যে কিছু ভাবতে হবে না বিকাশ, নিজের ভার নিজেই নিতে পারবেন উনি। সেই গেঁয়ো গল্পটা জানিস?—প্রভাকর সিগারেটের ধোঁয়া ছড়ালো : 'হরিনাম শুনতে শুনতে—মরবার ঠিক আগে বুড়ো কর্তা চোখ মেলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বললেন, আমাকে কোথায় দাহ করবি, জানিস তো? ঠিক রাস্তার ধারে—বাঁশ ঝাড়ের পাশে। ওখানেই ভূত হয়ে থাকব। রাত-বিরেতে অন্য শরিকের লোকজন যখন ওখান দিয়ে যাবে, তখন ঘাড় মটকে দেব এক-একটাকে ধরে।'

অন্য সময় হলে হেসে ওঠা যেত, কিন্তু হাসির অবস্থা ছিল না এখন। বিকাশ ভ্রূকুটি করে চেয়ে রইল।

প্রভাকর বললে, 'কোনো ভাবনা নেই তোর। চলে আয় এই নরক থেকে।'

'সেটা ঠিক হবে না প্রভাকর।'

'আমি ডাক্তার, আমি বলছি এমন কিছু নয়। আছাড় খেয়ে পড়েও এর চাইতে

বেশি ইনজুরি হতে পারে মানুষের। তাছাড়া তুই যা ভাবছিস তা নয়। দেখার লোক এখন বিস্তর জুটে যাবে নিয়োগী-পাড়া থেকে।'

'সবই হতে পারে, প্রভাকর। কিন্তু আমার একটা কৃতজ্ঞতা আছে।'

'অল রাইট—স্টে অন'—একটু গম্ভীর হল প্রভাকর : 'তবে এখন এ-সবের বাইরে থাকলেই বোধ হয় ভালো করতিস তুই। সে যাক—যখন সুবিধে হয়, আমার ওখানে চলে আসিস তুই। আমার দরজা সব সময়েই খোলা রইল তোর জন্যে।'

প্রভাকরের একটা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে বিকাশ বললে, 'জানি।'

সাইকেলে উঠে প্রভাকর চলে গেল। পুকুরটার পাড় থেকে ডাক দিয়ে বললে, 'ভদ্রলোক কেমন থাকেন কাল খবর দিস আমাকে।'

'নিশ্চয় দেব।'

প্রভাকর যাই বলুক, গায়ের ব্যথায় রাত্রে ভালো ঘুমুতে পারছিলেন না শশাঙ্ক। মধ্যে মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ছিলেন, আবার পাশ ফেরবার চেষ্টা করতে গিয়েই কাতরে উঠছিলেন তিনি।

'উঃ—ডান হাতটা ভেঙে দিয়েছে একেবারে। মাথাটা গেল!' তার পরেই এক-একটা বিশ্রী গাল বেরিয়ে আসছিল তাঁর মুখ দিয়ে। কাকিমা অনেক বার বলে-ছিলেন, 'তুমি শুতে যাও বাবা, আমরা তো আছি।'

'সময় হলে শুতে যাব কাকিমা, আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

তারপর এক সময় ঘরের টাইমপীসটাতে দুটো বাজল। নীচে যে বড়ো ওয়াল ক্লকটা রয়েছে—প্রায় মাস দুয়েক এ বাড়ীতে থেকেও যে ঘড়িটাকে বিকাশ কখনো দেখে নি অথচ যার গম্ভীর জড়ানো গলার আওয়াজ সন্ধ্যায় কিম্বা মাঝরাতে কোনো রহস্যময় পাতাল-কুঠির ধ্বনির মতো মনে হয়েছে তার, সেই ঘড়িটা থেকেও দুটো শব্দ যেন অনেক নীচের একটা কুয়ো থেকে উঠে এল। তখন কাকার পায়ের কাছে বসে থাকতে থাকতে এক সময় সারাদিনের ক্লান্ত শরীরটাকে ঘুমের মধ্যে এলিয়ে দিলেন কাকিমা। কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন নিজেও টের পেলেন না।

মেজেতে বাচ্চারা এলোমেলোভাবে ঘুমিয়ে, কোনোমতে তাদের খাইয়ে দেওয়া হয়েছে, তারপরে আর তাদের দিকে কেউ তাকিয়ে দেখে নি। অন্যদিন তারা বড়ো খাটটাতেই একসঙ্গে শোয়—আজ শশাঙ্ককে বিরক্ত করা হবে মনে করে মেজেতে যেমন-তেমন করে বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে একটা। বুড়োর মাথা থেকে বালিশ সরে গেছে, সুনু উঠে গিয়ে সেটা ঠিক করে দিয়ে এল।

শশাঙ্ক একটু শান্ত হয়েছেন এতক্ষণে—তাঁরও বড়ো বড়ো ঘুমন্ত নিশ্বাস পড়ছে। শুধু সুনুর চোখে ঘুমের চিহ্ন নেই। সন্ধ্যাবেলার চোখের জলের দাগ এখনো গালের পাশে চকচক করছে তার, আর হাত দুটো একটা যন্ত্রের মতো পাখাটা নেড়ে চলেছে একটানা।

'সুনু, এবার তুমি রেস্ট্ নাও একটু। হাত-পাখাটা দাও আমাকে।'

পাখা নামিয়ে রেখে সুনু বললে, 'আর দরকার নেই বিকাশদা। বাতাস ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন। আপনি বরং যান, শুয়ে পড়ুন একবার।'

'তুমি বসে থাকবে একা?'

'আমার কোনো অসুবিধে হবে না। আপনি যান।'

বিকাশ একটু হাসল : 'রাত জেগে নার্স করবার অভ্যেস আমার আছে, তোমার চাইতে বেশিই আছে। আমার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

'আমার ভারী খারাপ লাগছে বিকাশদা।'

'তা লাগুক'—কথাটা বলবার মতো সময় এ নয়, অবস্থাও নয়, তবু বিকাশ বলে ফেলল : 'আরো ভালো লাগছে এই কথা ভেবে যে সবাই যখন ঘুমিয়ে, তখন তুমি আর আমি দু'জনেই কেবল জেগে আছি।'

সহজভাবে কথাটা এল না, সহজভাবে বাজল না। সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল সুনুর মুখের রঙ।

আর তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হল বিকাশ।

'তুমি বোসো, আমি জল খেয়ে আসি একটু।'

নিজেকে সামলে নিয়ে, ব্যস্ত হয়ে উঠল সুনু।

'জল তো এ ঘরেই রয়েছে। দিই আমি।'

'তোমাকে দিতে হবে না, আমার ঘরের কুঁজো থেকে খেয়ে আসছি।'

'না-না-আমিই—'

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

'তুমি বোসো, আমি আসছি।'

জল খাওয়ার দরকার দিল না, এক বিন্দু তেষ্টা ছিল না তার। বিকাশ বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

এতক্ষণে বোঝা গেল, নিদারুণভাবে ধরেছে মাথাটা। দপ-দপ করছে কপালের দু পাশে, মাথা আর ঘাড়ের সন্ধিতে একটা বোবা যন্ত্রণা স্তম্ভিত হয়ে আছে। রেলিঙে কনুই রেখে, কপাল টিপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল বিকাশ।

পোড়ো মহল নিঃসাড়। পায়রারা ঘুমন্ত। আজ অনেক রাত পর্যন্ত বহু লোকের ভিড় ছিল বলে, বারান্দার দুদিকে প্রহরীর মতো দুটো লন্ঠন জ্বলছে বলে হয়তো ভাম এসে হানা দেয় নি; অথবা এর মধ্যে কখন এসে সে নিঃশব্দে তার হত্যাকান্ড ঘটিয়ে গেছে—চারদিকের এইসব গোলমালের মধ্যে তা টেরও পাওয়া যায় নি।

বিকাশ মাথা তুলল। সামনে পশ্চিমের আকাশে নেমে আসছে চাঁদটা। অদ্ভুত লাল দেখাচ্ছে চাঁদের রঙ—যেন রক্তমাখা। সেই রাঙা বীভৎস আলোতে পোড়ো বাড়ীর বিকট চেহারা—ছন্নছাড়া গাছপালার ভুতুড়ে রূপ—সব হিংস্র আর দন্তুর হয়ে উঠেছে। চাঁদকে, রাতকে, ভাঙা বাড়ীর স্তূপকে, জংলা বাগানকে—একটা আকাশ-জোড়া ঘাতকের মতো মনে হল তার।

বিকাশ চমকে উঠল।

যে ভামটা পায়রা চুরি করে খেয়ে যায় তাকে বিকাশ কোনোদিন দেখে নি। কিন্তু আর একটা—আর একটা ভয়ঙ্কর ভাম এগিয়ে আসছে সে টের পাচ্ছিল। তার দুটো জ্বলন্ত কপিশ চোখ দেখা যায়, অথচ কোথাও দেখা যায় না; তার পায়ের শব্দ কোথাও নেই, অথচ তা শোনা যায়; তার ধারালো দাঁতগুলো আরক্তিম জ্যোৎস্নার রক্ত মেখে ঝিক-ঝিক করছিল।

সে ভামটা ঝাঁপ দিয়ে পড়তে যাচ্ছে সুনুর ওপর।

'বিকাশদা।'

বিকাশ কেঁপে উঠল একবারের জন্যে। ঠিক এই সময় সুনুর জন্যে সে তৈরী ছিল না।

সুনু পাশে এসে দাঁড়ালো। লাল জ্যোৎস্না তার মুখে। আকাশের হিংস্র রক্তটা রঙ বদলেছে। সুনুর গালে কপালে এখন কে যেন মুঠো মুঠো করে আবীর ছড়িয়ে দিয়েছে, তার সরু কুমারী সিঁথিতে যেন সিঁদুরের দাগ পড়েছে একটা। যেন আবির্ভাবের মতো মনে হল, চারদিকের সমস্ত কুটিল নিষ্ঠুরতাকে দু-হাতে দূরে সরিয়ে দিয়ে আনন্দের মতো, আর একটা আলোর মতো, এসে দাঁড়ালো মেয়েটি।

সেতারের সুর রিণ-রিণ করে উঠল সুনুর চাপা গলায়।

'খুব মাথা ধরেছে, না বিকাশদা?'

'টের পেলে কী করে? ইনস্‌টিংক্‌ট?'

'বা-রে, তা কেন? আমি যে ঘর থেকে দেখছিলুম, কপালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আপনি।'

খেয়াল হল, পেছনের দরজাটা খোলা রয়েছে এবং সুনু সেখানে বসেছিল, সেখান থেকে এই বারান্দাটা দেখা যায়।

'না, ঠিক মাথা ধরেনি—' একটু অপ্রতিভ হয়ে জবাব দিল : 'এই এম্‌নিই—'

'মাথা ধরার তো দোষ নেই, যে-ভাবে কাটল এতক্ষণ। আপনি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন এবারে।'—সুনুর স্বরে আবার

সেতারের তার রিণরিণ করে উঠল : 'তার ইচ্ছে করছে—আপনার মাথা টিপে কপালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে আসি, কিন্তু বাবাকে—'

বলতে বলতে সুনু থেমে গেল—বাজনার রেশটা একটু একটু করে যেমন মিলিয়ে যায়, তেমনিভাবে হারিয়ে গেল স্বরটা। আর দপ দপ করতে লাগল বিকাশের কপালের শিরা দুটো, রক্তের ভেতর দিয়ে ঢেউ বয়ে চলল।

মুঠো করে রেলিংটা চেপে ধরল বিকাশ। এখন কিছু বলা যায় না। বলা উচিত নয়।

সুনু দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে একেবারে পাশটিতে—হাতটা একটু বাড়িয়ে দিলেই ছোঁয়া যায় ওকে। এই মুহূর্তে ওকে সম্পূর্ণ অধিকার করে নেওয়া যায়, কেড়ে নেওয়া যায়, ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এই পিশাচেপাওয়া বাড়ীটার রাক্ষুসে গ্রাস থেকে। বিকাশ জানে, সুনু প্রতিবাদ করবে না, করতে পারবে না—এত ভীরু, এত ছোট, এত পবিত্র যে সঙ্গে সঙ্গে সেই আকর্ষণের মধ্যে হারিয়ে যাবে, একেবারে তলিয়ে যাবে সে।

রেলিঙের ওপর বিকাশের হাতটা থাবা হয়ে উঠল। নিজের সঙ্গেই এখন লড়তে হচ্ছে তাকে। একটু আগেই যে ভামটার কথা সে ভাবছিল, সেটা কি তার নিজের মধ্যেই নখে শান দিচ্ছে এখন?

সুনু বললে, 'আমার কলকাতার কথা মনে পড়ছে বিকাশদা। ভীষণ ভালো লেগেছিল।'

কথাটা আগেও বলেছে সে। কিন্তু আজ আরো কিছু থেকে গিয়েছিল কথার ভেতরে।

তারপর—হঠাৎ :

'বিকাশদা, আমি মরে যাব।'

'সে কি!'

'আমি জানি, বিকাশদা। ছোট মাসী আমায় ডেকে গেছে। সবাই বলে, মরা মানুষের ডাক ভীষণ খারাপ। যাকে ডাকে তাকে ঠিক নিয়ে যায়। আমি জানি, ছোট মাসী এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যায়নি।'—সুনুর স্বর কাঁপতে লাগল : 'আমাকে ভীষণ ভালোবাসত, সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।'

একটু আগেকার উচ্ছৃঙ্খল ভাবনাটার রেশ একটা বড় ধাক্কায় মিলিয়ে গেল।

বিকাশ বললে, 'ছিঃ সুনু, এ-সব আবোল-তাবোল ভাবতে নেই। মরবার পরে মানুষের আর কিছু থাকে না। ওগুলো সব বাজে কুসংস্কার।'

'না, বিকাশদা, আপনি জানেন না। আপনি তো ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, বাবা ঘুমোচ্ছে, মা ঘুমুচ্ছে আমারও বুঝি একটু ঝিমুনির মতো এসেছিল—' তেমনি কাঁপতে লাগল সুনুর গলা : 'হঠাৎ শুনতে পেলুম, পেছনের বন্ধ জানলাটার খড়খড়ির ওপার থেকে ফিসফিস করে ছোট মাসী আমায় ডাকছে : এই সুনু, বাগানে যাবি? ঝড়ে অনেক আম পড়েছে রে।

এমনভাবে বলল যে একবারের জন্যে বিকাশও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। চাঁদটা আবার হিংস্র হয়ে উঠছে—আবার আরক্তিম আলোয় ভাঙা বাড়ী, গাছের মাথা সব দস্তুর। সুনুর মুখ থেকে সরে গেছে আবীরের রঙ—মুছে গেছে কুমারী সিঁথের সিঁদুর, আবির্ভাবের দৈবী আলোটা হারিয়ে গিয়ে আবার রাক্ষসী মায়া ছড়িয়েছে, সুনুর গায়ে পড়েছে রক্তের ছোপ।

তখন, খুব স্বাভাবিকভাবেই, সামনের একটা গাছে ঝপাং করে বাদুড় পড়ল। নিদারুণভাবে চমকে উঠল সুনু, নিজের ভয়ের কুহকেই চাপা চীৎকার করল একটা—দু-হাতে, প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল বিকাশকে।

সেই শরীর—ছোঁয়া—কয়েক সেকেন্ডের জন্যে সব হারিয়ে দিল। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে চিরকালের অনুভূতিতে অবগাহন করল বিকাশ, তারপর একটা হাত নামাল সুনুর মাথায়। চুলের ভেতরে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে নিঃশব্দতম গলায় বললে, 'ভয় নেই সোনালি, আছি—আমি আছি।'

ঘরের ভেতর কাতরে উঠলেন শশাঙ্ক।

চকিতে নিজেকে সরিয়ে নিলে সুনু, ছুটে গেল ঘরের ভেতর। বিকাশও প্রায় টলতে টলতে চলল তার পেছনে।

কাকিমা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন।

'ছি—ছি, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম? আমাকে ওঠাসনি কেন সুনু? যাও বাবা বিকাশ, তুমি শুতে যাও।'

এবার শুতে যেতেই হবে। কাকিমার দিকে চোখ তুলে তাকাবার তার আর সাহস নেই এখন।

দুদিন পরে, অফিসে আসবার সময় ভারী একটা অস্বস্তিতে মন ছটফট করছিল তার।

এ-সব ব্যাপারে—যেমন নিয়ম—অবধারিতভাবে পুলিশ এসেছিল। বিকাশ বাড়ীতে ছিল না, সেই ফাঁকে শশাঙ্ককাকা বলে দিয়েছেন, যারা শশাঙ্ককে মেরেছে—বিকাশ তাদের দৌড়ে পালাতে দেখেছে। তাদের অন্তত তিনজনকে সে চেনে। তারা পালপাড়ার চিরঞ্জীব, কেতু আর নীলু।

বিকাশ আকাশ থেকে পড়ল।

'সেকি কাকা! আমি তো কাউকেই দেখিনি।'

শশাঙ্ক বিছানায় উঠে বসেছিলেন। ব্যান্ডেজবাঁধা মাথার তলায় চোখদুটো প্রায় ঢাকা, তবু তারই মধ্যে দিয়ে বিশেষ একটি তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

'তুমি দেখোনি, আমি দেখেছি। তা হলেই হল।'

'কিন্তু মিথ্যে কথা বলব কী করে?'—আঁতকে উঠল বিকাশ।

'মিথ্যে কথা মানে?'—শশাঙ্ক ভ্রূকুটি করলেন : 'আমাকে মেরেছে সেটাও মিথ্যে নাকি বাবাজী?'

'না-না, তা মিথ্যে হবে কেন? ওরাই হয়তো মেরেছে। কিন্তু—' বিকাশ গোটা দুই খাবি খেলো :

'আমি তো ওদের দেখিনি। তা ছাড়া ওদের কাউকে আমি চিনিই না।'

'তোমায় চিনতে হবে না, সে আমি ম্যানেজ করব এখন। বুঝেছ, ওই চিরঞ্জীব আর কেতুটাকেই আমার আগে ফাঁসানো দরকার। ও দুটো কানাই পালের দুহাত।'

'কিন্তু আমাকে তো আইডেন্টিফাই করতে হবে। কেস হলে কোর্টে যেতে হবে। আমি কি তখন সামলাতে পারব? ধরা পড়ে, একটা কেলেঙ্কারী হয়ে—'

'কিস্সু হবে না, কিস্সু হবে না, একটা শিক্ষিত ইয়ং ম্যান না তুমি?'—মাথার ব্যান্ডেজ আর মুখের খোঁচা-খোঁচা দুকুঞ্চা দাড়িতে শশাঙ্ককাকাকে বিকট দেখালো : 'এত মামলা চরিয়ে বেড়াই, সব আমি ম্যানেজ করে নেব। দারোগা আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ একবার তোমায় থানায় যেতে বলেছে—স্টেটমেন্ট নেবে। অফিস থেকে সেখানে যেয়ো। কিচ্ছু ভাবনা নেই বাবাজী—আমি আছি।'

এ লোকের সঙ্গে তর্ক চলে না, কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গেছে। সুনুর ভাবনা নয়, কারো ভাবনা নয়—এবার তাকে পালাতেই হবে। এ যে একটু একটু করে শয়তানের জালে জড়িয়ে পড়ছে সে! এ-ও সম্ভব!

অফিসে গিয়ে—নিজের বিভ্রান্ত শরীর-মনটাকে চেয়ারের ওপর ছেড়ে দিতে গিয়েই সামনে একটা চিঠি। খ্যামের ঠিকানায় লেখা।

প্রত্যেকটা অক্ষর তীরের ফলার মতো জ্বলে উঠল। মনীষার চিঠি।

(ক্রমশঃ)

কি এবং কেন (৫)

টেলিভিশন

চন্দ্রপৃষ্ঠে পৃথিবীর মানুষের প্রথম পদার্পণের স্মরণীয় দিনে গত ২১ জুলাই মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং এবং তারপর অলড্রিন যখন চাঁদের বুকে পা রাখেন তখন তাঁদের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার দৃশ্য ৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরে পৃথিবীতে বসে টেলিভিশনের মাধ্যমে বহুলোক প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তারপর চন্দ্রপৃষ্ঠে নেমে তাঁরা যেসব কাজ সম্পাদন করেন তার দৃশ্যও পৃথিবীবাসী দেখতে পান।

সুদূর চন্দ্রলোক থেকে টেলিভিশনের সাহায্যে এইসব দৃশ্য কিভাবে দেখা গেল তা জানতে অনেকেরই আজ কৌতূহল জেগেছে। রেডিও বা বেতারের কৌশল যদি আমাদের জানা থাকে, তাহলে টেলিভিশনের কার্যকারিতা বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমরা জানি, বেতার প্রেরক-যন্ত্রের সামনে কোন শব্দের সৃষ্টি হলে বায়ুর চাপের যে তারতম্য ঘটে সেই অনুযায়ী মাইক্রোফোনের ভিতরে বৈদ্যুতিক বর্তনীর অংশবিশেষ নড়তে থাকে। ফলে ঐ অংশের বৈদ্যুতিক গুণও অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয় এবং বর্তনীতে শব্দতরঙ্গের প্রতিকৃতিস্বরূপ একটি বিদ্যুৎতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এরপর বিদ্যুৎতরঙ্গটিকে পরিবর্ধিত করে একটি বাহক বিদ্যুৎতরঙ্গের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বাহক তরঙ্গটি শব্দতরঙ্গের তুলনায় অনেক দ্রুত স্পন্দনশীল। সমগ্র বিদ্যুৎতরঙ্গটি এরিয়েলের সাহায্যে বেতারতরঙ্গরূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে ঐ বেতারতরঙ্গ গৃহীত হয় এবং তখন বিদ্যুৎতরঙ্গে তার রূপান্তর ঘটে। সেই বিদ্যুৎতরঙ্গ থেকে বাহক-তরঙ্গটিকে এরপর বাদ দেওয়া হয় এবং মূল বিদ্যুৎতরঙ্গকে পরিবর্ধিত অবস্থায় গ্রাহকযন্ত্রের লাউডস্পীকারে পাঠানো হয়ে থাকে। লাউডস্পীকারে একটি চুম্বকের কাছে তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ঐ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ফলে কুণ্ডলীটি কাঁপতে থাকে। লাউডস্পীকারের সামনে বায়ুতে এর ফলে শব্দতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ শব্দ প্রেরকযন্ত্রের মাইক্রোফোনের সামনে শব্দের অনুরূপ। এভাবে বেতারে দূরদূরান্তের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। টেলিভিশন বা দূরেক্ষণের ক্ষেত্রেও একই ধরনের কৌশলে শুধু শব্দ নয়, ছবিও পাঠানো হয়ে থাকে। তবে ছবির বেলায় শব্দতরঙ্গের পরিবর্তে আলোকতরঙ্গ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

আমরা জানি, কোনো বস্তু বা দৃশ্য থেকে প্রতিফলিত আলোকতরঙ্গ যখন আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় তখনই আমরা সে বস্তু বা দৃশ্য দেখতে পাই। কোনো দৃশ্যের ছবি টেলিভিশনে পাঠাতে হলে টেলিভিশনের প্রেরকযন্ত্রের ক্যামেরা দৃশ্যটির সামনে রাখা হয়। দৃশ্যটি থেকে আগত আলোকতরঙ্গ ক্যামেরার ভেতর একটি লেন্সের সাহায্যে বিশেষ ধরনের এক পর্দার ওপর প'ড়ে সেখানে একটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি করে। এই পর্দার বৈশিষ্ট্য এই যে, তার যে অংশে যে পরিমাণ আলো প'ড়ে সেই অংশ থেকে সেই অনুপাতে ইলেকট্রন নির্গত হয়। এখন যেহেতু ইলেকট্রন কণিকা ঋণাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন, সে কারণে পর্দার ঐ অংশ ইলেকট্রন হারাবার ফলে ধনাত্মক বিদ্যুৎসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এভাবে ক্যামেরার সামনের দৃশ্যটির একটি বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতি পর্দার ওপর গড়ে ওঠে। পর্দাটির গঠনবৈশিষ্ট্যের ফলে ঐ প্রতিকৃতি অনেকগুলি অংশে বা উপাদানে বিভক্ত হয়। ক্যামেরার অন্যদিক থেকে ইলেকট্রনগুচ্ছকে পর্দার ওপর ফেলা হয় এবং যখন যে উপাদানের ওপর ইলেকট্রনগুচ্ছ এসে পড়ে তখন সেই উপাদানের বিদ্যুৎশক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একের পর এক পর্দার সমস্ত উপাদানগুলির ওপর ইলেকট্রনগুচ্ছকে ফেললে সমগ্র প্রতিকৃতির বিভিন্ন অংশের বিদ্যুৎশক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎতরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

এই প্রক্রিয়ায় যে ক্যামেরার কথা উল্লেখ করা হলো তাকে বলা হয় 'আই কোনোস্কোপ' ক্যামেরা। টেলিভিশনে যতরকম ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়, ঐতিহাসিকভাবে এটি হচ্ছে তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। এই ক্যামেরা নির্মাণ করেন মার্কিণ বিজ্ঞানী জোরিকিন। এখন যে ক্যামেরা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তার নাম 'ইমেজ অর্থিকোন'। এই ক্যামেরায় দৃশ্যের আলো অনুযায়ী ক্যামেরার বিশেষ পর্দা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হলে আর একটি 'টার্গেট প্লেট' বা লক্ষ্যপাতের ওপর সংহত করা হয় এবং টার্গেট প্লেটে দৃশ্যের যে বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতি গড়ে ওঠে, ইলেকট্রনগুচ্ছের সাহায্যে সেই অনুযায়ী বিদ্যুৎতরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

তারপর বেতার প্রক্রিয়ার মতোই ক্যামেরা থেকে বহির্গত বিদ্যুৎতরঙ্গকে পরিবর্ধিত করে একটি বাহক বিদ্যুৎতরঙ্গের ওপর চাপানো হয় এবং এরিয়েলের সাহায্যে সমগ্র বিদ্যুৎতরঙ্গটি বেতারতরঙ্গরূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাহকযন্ত্রের এরিয়েলে বিদ্যুৎতরঙ্গটি গৃহীত হলে বিদ্যুৎতরঙ্গে তার রূপান্তর ঘটে। ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গ থেকে বাহকতরঙ্গটিকে এরপর বাদ দেওয়া হয় এবং মূল তরঙ্গকে পরিবর্ধিত অবস্থায় পিকচার টিউবে বা চিত্র-নলে প্রেরণ করা হয়।

পিকচার টিউবের একধারে থাকে একটি পর্দা, যার ওপর টেলিভিশনের ছবি এসে পড়ে। অন্য ধার থেকে ইলেকট্রনগুচ্ছ এসে পর্দাটির ওপর পড়ে। পর্দাটির ভেতরের দিকে লাগানো থাকে 'ফসফর' নামে একটি প্রতিপ্রভ পদার্থ। ঐ পদার্থটির বৈশিষ্ট্য হলো, তার ওপর ইলেকট্রন এসে পড়লে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও গতির অনুপাতে তা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। পিকচার টিউবে যে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রেরিত হয়, তা ইলেকট্রনগুচ্ছের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিদ্যুৎতরঙ্গ অনুযায়ী আলো পিকচার টিউবের পর্দা থেকে নির্গত হয়। প্রেরকযন্ত্রের ক্যামেরায় দৃশ্যের বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতির উপাদানগুলিকে বিদ্যুৎতরঙ্গে রূপান্তরের জন্যে যেভাবে নির্বাচন করা হয় (এই নির্বাচন পদ্ধতিকে বলা হয় স্ক্যানিং), সেই একই ক্রমানুযায়ী পিকচার টিউবের ইলেকট্রনগুচ্ছকে পর্দার বিভিন্ন অংশে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। ফলে পিকচার টিউবের পর্দায় দূরস্থিত ক্যামেরার সামনের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। টেলিভিশনের কার্যকৌশলের মূল কথা আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করলুম। শাদা-কালোয় পরিস্ফুট ছবির কথাই এখানে বলা হলো। আজকাল রঙীন টেলিভিশনও সম্ভব হয়েছে, যাতে প্রত্যেক বস্তুকে স্বাভাবিক রঙে দেখা যায়। তার কার্যপ্রণালী একটু ভিন্ন ধরনের।

সব দেশের বেতারবার্তা যেমন সব দেশে শোনা যায় না, তেমনি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসূচীও এক দেশ থেকে প্রচারিত হলে অন্য সব দেশে তা দেখা যায় না। মহাকাশ অভিযানের ফলে আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিরাট অগ্রগতি হয়েছে তাতে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে একদেশের টেলিভিশনের অনুষ্ঠান অন্য দেশে দেখানো সম্ভব হয়েছে। আর এইভাবেই চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণের টেলিভিশনসূচী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচারিত হয়ে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশে, এমন কি আমাদের দেশের দিল্লী শহরেও দেখা গেছে। মহাকাশ অভিযানে টেলিভিশন যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা এ থেকেই উপলব্ধি করা যায়।

চন্দ্রপৃষ্ঠে রক্ষিত দু'টি বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান

২১ জুলাই-এর স্মরণীয় দিনে মহাকাশচারী আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চন্দ্র-পৃষ্ঠে অবতরণ করে বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানের কাজে প্রায় তিনঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন। তাঁরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যেমন পাথর ও মাটি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্যে এনেছেন, তেমনি চন্দ্রপৃষ্ঠে দু'টি তথ্যানুসন্ধানী যন্ত্র রেখে এসেছেন। তাঁরা চন্দ্রলোক ছেড়ে চলে আসার পরও সে দু'টি যন্ত্র সেখানে তথ্যানুসন্ধানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এই দু'টি যন্ত্রের একটি হচ্ছে চন্দ্রের কম্পন পরিমাপের জন্যে রক্ষিত সিস্‌মো-মিটার এবং অপরটি হচ্ছে পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে সঠিক দূরত্ব নির্ধারণের জন্যে রক্ষিত লেসার রেঞ্জিং রেট্রো-রিফেল্‌কটার। উভয় যন্ত্রই স্বয়ংক্রিয় এবং তাদের সামগ্রিক ওজন হচ্ছে ১৭০ পাউন্ড। সিসমোমিটার যন্ত্রপাতি আছে মোট চারটি। তার মধ্যে তিনটি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরে কাজ করবে এবং একটি স্বল্পমেয়াদী। চন্দ্রপৃষ্ঠে উল্কাপাতের প্রতিক্রিয়া এবং চন্দ্রের কম্পন নির্ধারণের জন্যে এই চারটি যন্ত্র রেখে আসা হয়েছে। ভূকম্পনের মতো চন্দ্রপৃষ্ঠেও মাঝে মাঝে কম্পন অনুভূত হয়। ইতিমধ্যেই এই যন্ত্র চন্দ্রের ১৮টি কম্পনের সংবাদ পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। চন্দ্রের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে জানার কাজে চন্দ্রের এই কম্পন বিশেষভাবে সাহায্য করবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চন্দ্রের এই কম্পন বিশ্লেষণ করে জানা যাবে ভূগর্ভের মতো চন্দ্রের অভ্যন্তর-ভাগও বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত কিনা। চন্দ্রের কম্পনসংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের প্রধান পর্যবেক্ষক হচ্ছেন লেমণ্ট ভূতাত্ত্বিক গবেষণা-গারের ডঃ গ্যারি লেথাস।

লেসার যন্ত্রে যে প্রতিফলক ব্যবহৃত হয়েছে তা গলিত সিলিকা কিউব দিয়ে গঠিত। পৃথিবী থেকে লেসার রশ্মি চন্দ্র-পৃষ্ঠে পাঠিয়ে এই প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে আবার উৎসস্থানে ফিরে আসবে। এ থেকে পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যকার দূরত্ব, চন্দ্রের গতি, চন্দ্রের ব্যাসার্ধ নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হবে। এই তথ্যানু-সন্ধানের প্রধান পর্যবেক্ষক হচ্ছেন মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ সি ও অ্যালি।

আমরা জানি, চন্দ্রপৃষ্ঠে দিনেরবেলায় তাপমাত্রা যেমন প্রচণ্ড গরম তেমনি রাত্রি-কালে ঠাণ্ডাও প্রচণ্ড। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় চন্দ্রের কম্পন পরিমাপক যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি বিকল হয়ে যেতে পারে। একারণে চান্দ্র-রাত্রিতে এই যন্ত্রকে উত্তপ্ত রাখার জন্যে একটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় 'হিটার' বা উত্তাপক। এই উত্তাপকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়াম—২৩৮। তেজস্ক্রিয় ভাঙনের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়ে থাকে। দিনেরবেলায় চন্দ্রপৃষ্ঠে কোনো কম্পন সংঘটিত হলে সিসমোমিটার সে তথ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করবে। ৩৪০ ঘণ্টাব্যাপী চান্দ্ররাত্রিতে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী ফারেন-হাইটের নিচে ২৭৯ ডিগ্রীতে নেমে যায়। এই অতি নিম্ন তাপমাত্রায় সিসমোমিটার বিকল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তেজস্ক্রিয় উত্তাপক ১৫ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে শূন্য ডিগ্রীর নিচে ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ-মাত্রায় সিসমোমিটারকে গরম রাখে। এতে যন্ত্রের ক্ষতি হয় না। দিনেরবেলায় এই যন্ত্রকে চালু রাখার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন তা পাওয়া যায় দু'টি সৌর প্যানেলের মাধ্যমে সৌরশক্তি থেকে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—এই তেজস্ক্রিয় উত্তাপক নিয়ে মহাকাশ-চারীরা তো নাড়াচাড়া করেছেন, তেজস্ক্রিয় বিকিরণে তাঁদের ক্ষতি হয় নি? তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে রক্ষার জন্য এই উত্তাপককে বিশেষভাবে আবরণ দিয়ে ঢাকা হয়। আবরণ হিসাবে যেসব জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে ট্যানটালাম—টাংস্টেন সংকর ধাতু, প্লাটিনাম—রোডিয়াম সংকর ধাতু, টাইটেনিয়াম, কার্বন তন্তু এবং গ্রাফাইট। আবরণের বহিঃস্তর হচ্ছে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত বা স্টেনলেশ স্টীলের। এই উত্তাপক যন্ত্র চন্দ্রযানে পাঠাবার আগে পৃথিবীতে বিকিরণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

অ্যাপোলো-১১ অভিযানে মহাকাশ-চারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ স্থানের কাছা-কাছি এই দু'টি তথ্যানুসন্ধানী যন্ত্র রেখে এসেছেন। এর পরবর্তী অ্যাপোলো-১২ অভিযানে মহাকাশচারীরা আরও বেশি যন্ত্রপাতি নিয়ে যাবেন এবং অবতরণ স্থান থেকে দূরে এই সব যন্ত্রপাতি স্থাপন করে বিস্তৃততর তথ্যানুসন্ধান করবেন।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ফিয়োডোর লিনেন

১৯৬৪ সালে শারীরবিদ্যা ও ভেষজ-বিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী জার্মান অধ্যাপক ফিয়োডোর লিনেন সম্প্রতি ওষুধ প্রস্তুতকারকদের এক সম্মে-লনে যোগ দেওয়ার জন্য ভারত সফরে এসেছিলেন। অধ্যাপক লিনেন ১৯২১ খৃঃ ৬ এপ্রিল মিউনিখে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে কারিগরী বিদ্যালয়ে তাঁর বাবা অধ্যাপনা করতেন। ১৯৩০ খৃঃ থেকে অধ্যাপক থিয়োডোর লিনেন মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং '[illegible] দি ভেথকাপ' গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ নিয়ে স্নাতক হন। অধ্যাপক হাইনরিক ভাইল্যান্ডের কাছে গবেষণা করে তিনি ১৯৩৭ খৃঃ ডক্টরেট উপাধি পান। অধ্যাপক ভাইল্যান্ড রসায়ন-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯২৭ খৃঃ। তিনিই অধ্যাপক লিনেনকে ডাইনামিক বায়োকেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ করে দেন। যিনি ১৯৫৪ খৃঃ ম্যাকসপ্ল্যাঙ্ক ইন্সটিটিউটের সেল কেমিস্ট্রির ডিরেকটর পদে উন্নীত হয়েছিলেন সেই অধ্যাপক লিনেন ১৯৪২ খৃঃ মিউনিখে একজন লেকচারার হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং ১৯৪৭ খৃঃ অধ্যাপকপদে বৃত হন।

অধ্যাপক হাইনরিক ভাইল্যান্ডের গবেষণাগারেই লিনেন তাঁর প্রথম গবেষণার কাজ শুরু করেন। পরবর্তী অধ্যায়ে গবে-ষণার যে বিষয়টি তাঁকে গবেষণাক্ষেত্রে সুপরিচিত করে তা হচ্ছে : দি প্রবলেম অব অ্যাসেটিক অ্যাসিড মেটাবলিজম। সকল জীবের রূপান্তর ক্ষেত্রে অ্যাসেটিক অ্যাসিড একটি প্রধান ভূমিকা নেয়। কোষের অভ্যন্তরে অসংখ্য পুষ্টিকর পদার্থের যখন জৈবিক পচনক্রিয়া চলতে থাকে তখন এই অ্যাসিড এক মধ্যবর্তী উৎপন্ন হিসেবে কাজে লাগে। পচনের কাজে এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় জটিল অণুর উদ্ভবে সহায়তা করে। এইভাবে অধ্যাপক লিনেনের গবেষণা জীবকোষে পচন ক্রিয়ার বিস্তৃত রাসায়নিক পদ্ধতির এবং পচনকে নিয়ন্ত্রিত করণের সম্পর্কে সংযুক্ত। কো-এনজাইম-এ সক্রিয় অ্যাসেটিক অ্যাসিডের রাসায়নিক গঠন নিরূপণে লিনেন সফল হয়েছেন। সক্রিয় অ্যাসেটিক অ্যাসিড হচ্ছে আসলে অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও কো-এনজাইম-এ-এর মিশ্রিত অবস্থা। এই আবিষ্কারের বাস্তব প্রয়োগ কি আজকের যুগের সবচেয়ে বিপদজনক রোগ হচ্ছে আর্টারিও-স্ক্লে-রোসিস —রক্তের মধ্যে অতিরিক্ত চর্বি জমে অথবা কোলেস্টেরল বেশী হয়ে গেলে এই রোগ হয়। বহু চিকিৎসকের অভিমত কোলেস্টেরলের আধিক্যের ফলে করনারি থ্রম্বসিস রোগের উৎপত্তি। করনারি থ্রম্ব-সিস একালের আরেকটি সাংঘাতিক রোগ। যে সমস্যা আমাদের অতিক্রম করতে হবে সে সম্বন্ধে লিনেনের বক্তব্য হচ্ছে : চর্বিযুক্ত অ্যাসিড কো-এনজাইম-এ এর মধ্যে মধ্যে অ্যাসিটিল কো-এ-কার্বোক্সিল-ল্যাসিস জাতীয় কোন পদার্থের সন্ধান যদি আমরা করতে পারি এবং সেই পদার্থ যদি সাধারণ চর্বিতে বা কলকাতাইটিসে অনুপস্থিত হয় তবে চর্বিযুক্ত অ্যাসিডকে ওষুধে সমন্বিত করা সম্ভব হবে।
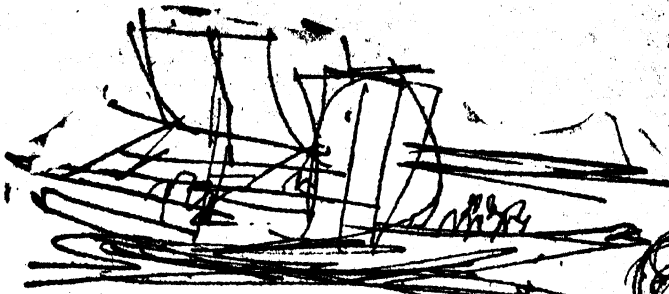
জন কোম্পানী

ও হুগলীর পরমেশ্বর দাস

হুগলীতে তখন শীত বেশ জমিয়ে পড়েছে। নভেম্বরের শেষাশেষি। হুগলী গঞ্জ-বাজারে ঢি-ঢি করে ঢ্যাঁড়া পড়তে শুরু করল। কার ঢ্যাঁড়া? না, নবাবের ঢ্যাঁড়া। শেঠ বুলচাঁদের ঢ্যাঁড়া। যদি আবাঙ্ লোকের মত কেউ প্রশ্ন করে বসে—শেঠ বুলচাঁদ আবার কে?—লোকে তাকে নির্ঘাৎ 'দণ্ড' দেবে। আরে, শেঠ বুলচাঁদকে জানো না ত হুগলীর গঞ্জ-বাজারও তোমার অজানা। বুলচাঁদ মানেই ও তখন বাঙলা দেশ। জানি, জানি। বলবেন, ঢাকার নবাব শায়েস্তা খাঁ আছে। দিল্লীতে সম্রাট আরঙজেব আছে। আছে ত আছে, তাতে আর কি? হুগলী বলতে শেঠ বুলচাঁদ। আর বুলচাঁদ বলতে বশংবদ পরমেশ্বর দাস। আর তাকে নিয়েই সেদিনের ঢ্যাঁড়া।

ঢিম্...ঢিম্...ঢিম্— বাজারে বাজারে ঘুরে ঘুরে ঢুলী গলায় শিরা ফুলিয়ে বলে বেড়াচ্ছিল—যদি কারও কোন পাওনা থাকে পরমেশ্বর দাসের কাছে, অবিলম্বে তারা যেন শেঠজীর বাড়ী হাজি...র...হয়। শেঠজী তাদের পাওনা পাই-পয়সা মিটিয়ে দেবেন— ঢিম্...ঢিম্...ঢিম।

এবং খবর পাওয়ার যা অপেক্ষা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেঠ বুলচাঁদের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ অন্ততপক্ষে তিন হাজার লোকে ভরে গেল। সবাই পাবে। কেউ দশ। কেউ বিশ। আর শেঠ বুলচাঁদ যেন কল্পতরু। প্রার্থীরা যে যা পায়, প্রত্যেকেরই সব মিটিয়ে দিচ্ছেন। সামনে বসে কাজী সাহেব। বুরুক বুরুক করে আলবোলা টানছেন। তাঁর সামনে শেঠ বুলচাঁদ সেদিন তাঁর খাস নায়েব পরমেশ্বর দাসের যতকিছু অপকীর্তির রোকশোধ করে দিতে চান।—'যে যা' পাও, একটি পয়সা কারও বাকি রাখব না বাপু।' কাঁচাপাকা গোঁফ চুমড়ে শেঠজী বার বার এই কথাটা তাঁর খাজাঞ্চীকে বোঝাতে চাইলেন। আর তামাক টানতে টানতে কাজী সাহেব বলে উঠলেন—'বহুৎ খুব।' 'বহুৎ খুব।' বাইরে

নারায়ণ দত্ত

প্রতীক্ষমান আর জনতা শেঠজীর জয়ধ্বনি করে উঠল।

কিন্তু শেঠ বুলচাঁদই কেন হঠাৎ নিগৃহীত রায়বাবার দুঃখে ব্যথিত হয়ে উঠলেন। কেনই বা তাড়াতাড়ি তাদের পাওনা টাকা মিটাতে তার যথাসাধ্য উদ্যত হয়ে গেল। তাঁর নায়েবের অপহৃত অর্থ প্রত্যর্পণ করার জন্যে কেনই বা তাঁর এই ব্যাকুলতার অভিনয়? অবশ্য এই ঘটনাটাকে পুরোপুরি একটা মস্ত তামাশা বলার মধ্যে কোন অন্যায় নেই কেন না সমসাময়িক এক বিবরণে জানা যায় শেঠ বুলচাঁদ ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বাজার সরগরম করলেও, হাজার দুয়েকের বেশি টাকা পরমেশ্বর দাসের পাওনাদারদের সেদিন ঠেকাননি তিনি! যদিও কারও কারও মতে সেদিনের সেই উত্তমর্ণ সমারোহের মোট পাওনা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা!

অবশ্য এই বিবরণ শেঠ বুলচাঁদের প্রতিপক্ষের লেখা। এবং শেঠজীর ক্রিয়া-কলাপ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর স্বধর্মীয় বা তাঁর স্বদেশবাসীরা কেউই লিখে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। এবং সেই কারণেই ব্যাপারটা একতরফাই রয়ে গেছে। তবু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়—বুলচাঁদ কি আগ বাড়িয়ে মুক্তহস্ত মনিবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে পরমেশ্বর দাসের দেনা মেটাতে গেলেন? আরে তাকি কেউ যায়, না গেছে কখনও? এই ঘটনার নেপথ্যে আর একটা বিরাট ষড়যন্ত্র কাজ করছিল। যার ফলস্বরূপ, সেদিন সকালে, সেই পাঁচই নভেম্বরের শিশিরভেজা ঘুমভাঙা শান্ত সকালে নবাবের পাঞ্জা নিয়ে যে ঘোড়সওয়ার ঢাকা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে হুগলীর কাছারীতে এসে যে নান্দীপাঠ করে গিয়েছিল অপরাহ্নে নাটক তারই রূপায়িত। পরমেশ্বর দাসকে আর বাঁচাতে পারলেন না শেঠ বুলচাঁদ। তাকে সোজা বরখাস্ত করলেন চাকরী থেকে। আর আত্মসাতের প্রাপ্য টাকা, তাও কড়াক্রান্তি

মিটিয়ে দিলেন—যা কম্ম যায় সেবার আস্তনয় করলেন?

কিন্তু ঢাকার নবাবেরই বা এত মাথা-ব্যথা কেন পরমেশ্বর দাসকে নিয়ে? সেকথা বলতে গেলে সেই আশ্চর্য কাহিনীটা বলতে হয়, যাতে দেখা যাবে এক অর্বাচীন বঙ্গ-তনয় পরমেশ্বর দাস কি করে দুর্ধর্ষ জন কোম্পানীর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়েছিল!

ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম। জন কোম্পানীর কুঠির মধ্যে কুঠি তখন মাদ্রাজ। ফোর্ট সেন্ট জর্জ। তারই তাঁবে তাবৎ ভূভারতের সব ইংরাজ। সবকিছু কুঠি—সুরাট থেকে সুতানুটী। বালেশ্বর থেকে কাশিমবাজার—মায় হুগলী-ঢাকা-মালদা—সব, সব। এখন মাদ্রাজের চোখে ত আর দূরবীন নেই। এতদূর সব দেখে কি করে? হালহদ্দ পায় কোন পথে? এদিকে বাঙলা দেশের কুঠির কাজ বাড়ছে। চালানের পর চালানে কাজ-কারবার দিনে দিনে ফেঁপে উঠছে। একেবারে শশীকলাবৎ প্রতিপদ থেকে পূর্ণিমা। কাজেই, লন্ডনে লিডেনহল স্ট্রীটের বড়-কর্তারা ঠিক করলে বাঙলার জন্যে পৃথক একটা কাউন্সিল। আর তারই সর্বময় কর্তা হয়ে এলেন উইলিঅম হেজেস। বেশ গণ্য-মান্য লোক। সেকালে তাঁর দাপট ছিল। মুরুব্বি ছিল। ছিল না যেটা সেটা তাঁর ভাগ্য। তা' নয়ত কি? নয়ত ভদ্রলোক হুগলীতে পা দিতে না দিতে সেখানকার কুঠিয়াল ভিনসেণ্ট সাহেব কেঁদে পড়বেন কেন—'হুজুর, কাজকারবার ত যাবার দাখিল। একটা বিহিত করুন।'

হেজেসকে খিতু হয়ে দু' দন্ড নিশ্বাস ফেলে বসতে দিলেন না ভিনসেন্ট। কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে দিলে। বুঝিয়ে দিলে, বাঙলার কত্তামিকরা সোজা নয় চাঁদ। মুকুট নয় এটা কাঁটার মুকুট। বোঝ ঠ্যালা।

সালটা ষোলশ' বিরাশি। দিল্লীর তখত-ই-তাউসে তখন সম্রাট আরঙ্গজেব। বাঙলার মসনদে মাতুল শায়েস্তা খাঁ। রাজ-ধানী তাঁর ঢাকা। হুগলীতে তাঁর ফৌজদার শেঠ বুলচাঁদ। মাসটা আষাঢ়। আকাশে কিন্তু মেঘ নেই। ক'দিন আগেই একপ্রস্থ জোর বর্ষা হয়ে যাবার পর এখন আকাশটা বেশ ধরে গেছে। কেবল সেই ভারী বর্ষার ঢল নেমেছে গঙ্গায়। হুগলী নদীতে। ভাগী-রথীতে। তার দুকূল ভরে টলটল করছে ঘোলা জল। এই জল কেটে তীরবেগে একটা পানসী সেদিন পেঁছল হুগলীতে। কে এল? কে এল?—না সুবে বাঙলার জন কোম্পানীর নয়া বড়কর্তার দূত। তিনি তত্ক্ষণে শিবপুর-বোটানিক্যাল গার্ডেন, সেকালের থানা অবধি পেঁছে গেছেন। 'গুড হোপ' জাহাজ থেকে হেজেস সাহেবের চিঠি এনেছে লোকটা : হুজুর আসছেন। হুজুর আসছেন!!

এবং তাঁকে সম্বর্ধনা করার জন্যে তাড়া-হুড়ি যেন লোকলস্কর পাঠান হয়। ডাওয়াল-পিনিস-নৌকো পাঠান হয়। সাঙ্গপাঙ্গ স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে তাঁর প্রায় জনাষাটেক লোক সঙ্গে। সেজন্য সবরকম ব্যবস্থা যেন কায়েম করা হয়। আর—? চন্দননগরে যথা

থেকে সাহেব ত সাফ্ সাফ্ জানিয়ে দিয়ে-ছিলেন—যে অব বেঙ্গলের দন্ডমুন্ডের কর্তা হয়ে যাচ্ছি।—'দি অনারেবল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী হ্যাভ থট গুড টু মেক দি সেভারেল ফ্যাকটরিস্ ইন দি বে অব বেঙ্গল অ্যান এজেন্সী ডিস্টিংক্ট অ্যান্ড ইন্ডি-পেন্ডান্ট ফ্রম দ্যাট অফ ফোর্ট সেন্ট জর্জ।...' কাজেই খাতিরের ব্যবস্থা করো বাপু। অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয়।

হয়নি। একেবারে ভোর হয় কি না হয়। দূরে মুঘল ফৌজদারের প্রাসাদে রাত পাহারার লোক তখনও 'ওয়াচ টাউআর' ছেড়ে নেমে যায়নি। হুগলী কুঠির এক কর্তা গভর্নর হেজেসকে তাঁর বোটে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। আর বেলা দশটা নাগাদ স্বয়ং কুঠিয়াল দি ওঅরশিপফুল ম্যাথিআস ভিনসেন্ট এসে হেজেসের কাছে 'বাউ' করলে। সঙ্গে নৌকা আর বজরার ছড়াছড়ি। এক আধটা নয়—পঁয়ত্রিশজন বন্দুক উঁচিয়ে বরকন্দাজ। আরও পঞ্চাশ-জন পাগড়ীবাঁধা রাজপুত সেপাই।—যাকে বলে সেকালের খাস ভি-আই-পি ট্রিটমেন্ট। ভিনসেন্ট একেবারে আভূমি কুর্নিশ করে হেজেসকে বললে, হুগলী তাঁকে অভ্যর্থনা করতে তৈরী। খানাপিনার ইলাহী কান্ড!

সে জায়গাটাকে সেকালে বলত ডাচ গার্ডেন। বেশ খোলামেলা জায়গা। বাহারও কম নয়। কিন্তু তা' না হয় হ'ল। খানাপিনা না হয় রাজসূয়। চর্বচুষ্যলেহ্যপেয়—রাজ-সিক আয়োজন। একটু বা মুঘলাই ধরনে নৃত্যচঞ্চল চরণের ঘুঙুরের সুরেলা আলাপ। একটু বা রোশনাই। এবং এমনিতর ব্যবস্থায় সাহেব যখন মশগুল, মশলার ভুরভুর গন্ধে বাতাসের সঙ্গে সাহেবেরও মেজাজ শরিফ—বেরসিকের মত হুগলীর ইংরেজ কুঠিয়াল ভারতবর্ষের শ্যামল স্বর্গে শয়তানের অস্তিত্বের কথা জানালেন। 'মি লর্ড, বেঙ্গলের কাজকর্ম চালান যে কি ঝামেলার কাজ কি বলব।' হেজেসকে বেশি কথা বলতে হল না। খানাপিনার স্বাদ সাহেবের কাছে কেমন যেন তিক্ত হয়ে গেল। ডাচ গার্ডেন থেকে সাহেব যখন জাহাজে ফিরে গেলেন, ভিনসেন্টের দেওয়া দুঃসংবাদটা তাঁর মনে কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধতে লাগল। বাঙলার ইংরেজ কুঠী অত্যাচারে জরজর। আর কে সেই দুর্বৃত্ত, যে নাকি এইসব চক্রান্তের পিছনে দাঁড়িয়ে কলকাঠি নাড়ছে। কে সেই শয়তান যে ইংরেজদের এই স্বর্ণ-স্বর্গে ঘোবল বসাতে চায় বারবার?

সেই বঙ্গজ ব্যক্তিটির নাম পরমেশ্বর দাস। সাকিম—হুগলী। তার ওপর ইংরেজ-দের ভারী ক্রোধ। কিন্তু দাসমশায় একেবারে সামান্য ব্যক্তি। দাসানুদাস। বাঙলা দেশের এদিককার আসল মালিক তখন বুলচাঁদ। নিবাস মুর্শিদাবাদ। তাঁরই গোমস্তা বল গোমস্তা, নায়েব বল নায়েব—এই পরমানন্দ দাস। নবাবের শুল্ক আদায়ের ভার তাঁর ওপর। কাজেই ইংরেজরা বলত—'কাস্টমার অ্যাট হুগলী'। এবং এই বৈষ্ণববিনয়সম্পন্ন বঙ্গসন্তান কিভাবে ক্ষুরধার বুদ্ধি ইংরেজ-দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের নাস্তানাবুদ

করেছিল, ইংরেজরা বারবার সখেদে তাই নিয়ে বিলাপ করেছে।

না করে করবে কি? উপায়টা কি? বুল-চাঁদের প্যাঁচ, পরমেশ্বরের ক্ষুরধার পাটো-য়ারী বুদ্ধি পদে পদে ইংরেজদের নাজেহাল করছিল, এবং তিতিবিরক্ত হয়ে কলকাতা কাউন্সিলের প্রথম গভর্নর হেজেস সাহেব বললেন, তিনি ঢাকায় যাবেন। খাস ঢাকার দরবারে তিনি এর বিহিত প্রার্থনা করবেন। বলবেন—নবাবকে, খাস দিল্লী থেকে পাওয়া ফরমানের জোরেই না তাঁরা বাঙলায় ব্যবসা চালাচ্ছেন। তাঁদের কর দেবার কথা বাৎসরিক তিন হাজার মুদ্রা। সেটা ত তাঁরা ঠিক নিয়মমত কোষাগারে জমা দিয়ে আসছেন। ব্যাস, আবার নিত্যি নিত্যি এসব হামলা কেন বাপু? এ দাও, সে দাও। এত দাও তত দাও। আমরা ত অবাধে বাণিজ্য করব। কারও কোন শুল্ক মাশুল আমাদের জন্যে নয়। জন কোম্পানীর পতাকা উড়িয়ে যে জাহাজ যাবে ভাগীরথীর বুকে হাজারো ঢীড়ের আলপনা কেটে—তাকে রোখ কোন আইনে?

কিন্তু সেসব যুক্তিতে কর্ণপাত করার বান্দা নয় পরমেশ্বর দাস। *নবাবের রাজ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করবে আর মাত্র তিন হাজার টাকা ঠেকিয়ে পার পাবে, ইংরেজকে এহেন গুরুঠাকুর হিসেবে মানতে দাসমশায় সত্যিই নারাজ। তিনি চলেন তাঁর নিজের আইনে।* দিব্যি ইংরেজ জাহাজ ধরেন—আর অন্যসব জাহাজ যে হারে শুল্ক দেয় কানমলে সেই হারে মাশুল আদায় করে ছেড়ে দেন। নালিশ মকদ্দমা যা হয় ঢাকায় গিয়ে কর। মুর্শিদাবাদে আমার নামে লাগাও গে যাও। দাসমশায় নির্বিকার। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ইংরেজরা যে ফাঁকি না দেয় তা নয়। তবে সে কাজ শক্ত। কেননা পরমেশ্বর দাসের চারচোখ। নজর এড়ান শক্ত।

এতে কার না রাগ হয়। ইংরেজরা মুখ লাল করে কল্প দেয়। আর ঢাকায় তাদের উকিলকে বলে নবাবের দরবারে নালিশ করতে। কিন্তু অভিযোগ করলেই সব যে নবাবের কানে উঠবে, মুঘল দরবার সে পাঠ পড়েনি। ইংরেজ উকিল ক্রুদ্ধ কুকুরের মত গরগর করতে থাকে রাগে।

এহেন যখন সঙ্গীন অবস্থা, হেজেস এলেন কলকাতায়। এবং আগে ত বলাই হয়েছে, ঠিক করলেন, ওসব উকিল-টুকিল নয়, তিনি স্বয়ং যাবেন নবাবের দরবারে বিচার প্রার্থনা করতে। কিন্তু যাব বললেই কি যাওয়া হয়? পরমেশ্বর দাস রয়েছেন না? তাঁকে ত জানাতেই হবে। কেননা, নবাবের দরবারে ত শুধুহাতে যাওয়া যায় না। কিছু ভেট সঙ্গে নিতে হবে। আর বিনা শুল্কে সেগুলি নিয়ে যাবার পরোয়ানা দেবে কে? —সেই বজ্জাতের পরমেশ্বর দাস না?

কিন্তু পরমেশ্বর দাস ব্যবহারে পরম বৈষ্ণব। নবাবের দরবারে যে হেজেস সাহেব তার বিরুদ্ধে লাগাতে যাচ্ছেন, সেটুকু বুঝতে তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হ'ল না। কিন্তু সেদিকে গেলেনই না। বললেন, কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য। খাস গভর্নর সাহেব যাবেন

নবাব-দর্শন করে' ধন্য হতে, এরচেয়ে ভালো কথা আর কি হতে পারে? এই মহৎ কাজে পরমেশ্বর দাস সাহায্য করবে না, এ কখনো হতে পারে। কক্ষনো না। কক্ষনো না। তোবা। তোবা। পরমেশ্বর দাসকে ইংরেজ ফ্যাক্টরীর লোক গিয়ে বলতেই তিনি তক্ষুনি রাজী হয়ে গেলেন। শরতের এক প্রসন্ন সন্ধ্যায় আকাশে তখন দুটো-একটা করে' তারা দেখা দিয়েছে। গঙ্গার বুকে তাদের ছায়া পড়তে শুরু হয়েছে। অদূরে কোন নাম-না-জানা গ্রামের এক শান্ত নিস্তব্ধ কুটীরে রেড়ীর তেলের প্রদীপের আলোয় একটা মিষ্টিস্বপ্নের জন্ম হচ্ছে। ঠিক এমনি সময়ে, দুটি বজরা আর কয়েকটা ছোট্ট পানসী নৌকোয় তেইশজন গোরা, পনেরজন কালা রাজপুত বরকন্দাজ নিয়ে কোম্পানীর বড়কর্তা হেজেস ঢাকার পথে হুগলীর 'ইংলিশ গার্ডেনে'র উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

আর বজরা গিয়ে তীরে ভিড়তেই একজন ভদ্রলোক বজরার সামনে সেলাম করে দাঁড়ালো। গায়ে পিরান। মাথায় পাগড়ী। কপালে ফোঁটাকাটা। পরনে মালকোচামারা কাপড়। সাহেব বজরা থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কি চাও?

লোকটা আভূমি কুর্নিশ করে' বললে, অধীনের নাম মথুরো দাস। দাসমশায়ের ভৃত্য। হুজুরকে নিয়ে যেতে পাল্কী এনেছি। পরমেশ্বর দাস মশায় বলে পাঠিয়েছেন, হুজুরদের সঙ্গে যতকিছু গোলমাল সবকিছুই হুজুরের সঙ্গে আলোচনা করে' মিটিয়ে ফেলা হবে।

হেজেস ফার্সী জানত। কাজেই দিশি-লোকের এই ফার্সী বিনয়নম্রবচনে বোধকরি গলে গিয়ে থাকবেন। বললেন, বহুৎ আচ্ছা। আমি যাব। অপেক্ষা কর।

কয়েক দণ্ড গেল না। তৈরী হয়ে নিয়ে সাহেব বেরিয়ে এলেন। এবং বেশ কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ সমভিব্যাহারে, পাল্কীর দুলুনিতে কিঞ্চিৎ তন্দ্রা উপভোগ করতে করতে অচিরে পরমেশ্বর দাসের বাগানে গিয়ে হাজির হলেন। পরমেশ্বর দাস সেখানে সেলাম করতে করতে হাজির।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, পরমেশ্বর দাস হেজেস সাহেবের সঙ্গে সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে' একটা মিটমাট করে ফেললেন। কিন্তু আশ্চর্যমতঃ-পরং! ঠিক হল, বেশি নয়, অতিরিক্ত দুটি হাজার তঙ্কার বিনিময়ে কোম্পানী তাদের মালপত্র বিনা বাধায়, বিনা শুল্কে আমদানি-রপ্তানি করতে পারবে। তবে হাঁ, কথা আছে। এই চুক্তি দুই মাস বলবৎ। এর মধ্যে কোম্পানীকে একটা কাজ করতে হবে। দিল্লীর ফরমান এতদূরে বাপু কাজ হবে না। ঢাকার নবাবের কাছ থেকে বিনা শুল্কে ব্যবসার পরোয়ানা এর মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে কোম্পানীকে!

কাজকর্ম মিটে যেতেই একটু আনন্দের আয়োজন। সেদিন দাসমশায়ের বাগানে তবকাওয়ালীর বিলোল কটাক্ষে, তার চপল ঘুঙুরের বোলে, তার মিঠিগলার ফার্সী গজলের আমেজে হেজেস সাহেবের চিত্ত একেবারে প্রসন্ন হয়ে গেল। তাঁর মনটন সত্যিই আনন্দে লাফাচ্ছিল কেননা, পরমেশ্বর দাস এও স্বীকার করেছেন তাঁর লোক-লস্করেরা ইংরেজদের বিলটি চোখবুজে মেনে নেবে। দেখবেও না, কি মাল যাচ্ছে। ওজনও করবে না কতটা যাচ্ছে। যাকে বলে একেবারে স্বরাজ!

কিন্তু রাতের মুক্তো দিনের আলোয় একবারে ঝুটো বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। তখনও আঁধারের ঘোর কাটেনি হুগলীর প্রশস্ত বন্দরে। আম-জাম-জামরুলে ঘেরা দিকচক্রবালের কোলে কোলে তখন রাত্রির রেশ রয়েছে। দু'একটা বক বালিচরে উড়ে উড়ে এসে বসতে সুরু করেছে মাছের প্রত্যাশায়। এমনই সময়ে হেজেস সাহেবের বজরায় এসে 'নক' করলে জন বিয়ার্ড' ধড়মড় করে উঠে বসে হেজেস বললে, 'ইয়েস, হোয়াট হ্যাপনড্?'

—আর হ্যাপনড্? যা ঘটবার নয়, তাই ঘটে গেছে। কালরাত্রে ইংরেজরা যখন দাসমশায়ের আতিথ্যে আপ্যায়িত হচ্ছিলেন, আনন্দাতিশয্যে বিগলিত হচ্ছিলেন, সেই অবকাশে ইংরেজদের একটা কাপড় বোঝাই নৌকা দাসমশায়ের অনুচররা গায়েব করে নিয়ে গেছে। বিয়ার্ড উত্তেজিতকণ্ঠে অবস্থাটা বিবৃত করে থাকবেন। সাহেবের যেন প্রত্যয় হ'ল না। চোখ রগড়ে আবার বললেন, 'হোয়াট ডু য়ু মিন?'

মানেটা সরল। কেবল সাহেব যে কার পাল্লায় পড়েছেন সেটাই তিনি তখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এবং যখন বুঝলেন, তখন এও বুঝলেন যে যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল না হলে চলবে না। এবং ইংরেজরা এদেশে দাওয়াই বলতে বুঝত বন্দুকের জোর। কাজেই সাহেব ফস্‌করে একেবারে অস্ত্রের শরণ নিয়ে ফেললেন। দুজন কর্মচারীকে সসৈন্যে পাঠালেন হুগলী বন্দরের 'মীর-বহর' বা শুল্ক অধিকর্তার কাছে। তার হারানো নৌকা উদ্ধার করতে।

ইংরেজরা যে অত তাড়াতাড়ি দুম্‌করে একেবারে তলোয়ার বার করে ফেলবে, পরমেশ্বর দাস বোধহয় ততটা আঁচ করেননি। কাজেই ইংরেজরা যখন তাদের নৌকটা মীরবহরের কাছ থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেল, কেউই তাদের পারত-পক্ষে বাধাই দিলে না। তবে হেজেসও আর হুগলীতে কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করলে না। সেদিনই বজরা ছেড়ে দিলে। মন্দ মন্দ শরত পবনে নৌকা ভেসে গেল রঙ্গে।

কিন্তু সেই বা কতটুকু। একটু-একটু করে' বেলা পড়তে না পড়তেই মাঝিরা হঠাৎ লক্ষ্য করল ধুলো উড়িয়ে ঘোড়-সওয়ার আসছে গঙ্গার বেলাভূমি দিয়ে। একটি নয়। দুটি নয়। অনেক। এবং আর্ত-বিস্ময়ে লক্ষ্য করল নক্ষত্রবেগে কতকগুলো দ্রুতগামী ছিপ আসছে উজান বয়ে। কানা-কানি করে তারা বলাবলি করতে লাগল, 'নবাবের প্যায়দা, নবাবের প্যায়দা...'

কথা তারা শেষ করতে পারেনি। জলে কুমীর। ডাঙ্গায় বাঘ। নবাবের সৈন্য একেবারে ছেয়ে ফেলল ইংরেজ বহর। ইংরেজরা বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। দাস-মশায়ের পেয়াদাদের হাতে বর্শা। উভয়-পক্ষই নাছোড়বান্দা। হেজেস ভেবেছিলেন বন্দুকের নল দেখেই এরা পিঠটান দেবে। কিন্তু তা'ত দিলই না। উপরন্তু ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে দেখা গেল—কাজীর নায়েব, মীরবহরের সহকারী আর চুঁচুড়োর ওলন্দাজ ডিরেক্টরের উকিল—সবাই এসে হাজির। ভাটারটানে ফেরৎ যেতে হবে উজানে যতটুকু এগিয়েছিলেন!

হেজেস তাঁর রোজ নামচায় লিখেছেন—উপস্থিত সবাই তাঁকে দিব্যি কেটে ঈশ্বরের নামে বলেছিল, সাহেব যেন পরমেশ্বর দাসকে আর একবার তাঁর ভুল শোধরাবার সুযোগ দেন। সাহেবের বন্ধুত্ব, সাহেবের সখ্যতা ছাড়া আর কি কাম্য আছে দাস-মশাইয়ের? হেজেস যে একটা ভুল ধারণা নিয়ে ঢাকায় যাবেন, এটা কি কথার মত কথা নাকি? সাহেব অবশ্য স্বীকার করেছেন ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিইবা গত্যন্তর ছিল তাঁর। কেননা, যতই না বন্দুক উঁচিয়ে ধরুন তাঁরা, এটা তো ঠিক কোনক্রমে যদি নবাবী সৈন্যের রক্তপাত হত সেদিন, তাহলে কি আর নবাবী কোপ তাদের আস্ত রাখত নাকি? তার ফলে বাংলাদেশে তাদের ঘাঁটিবাটি গুটোতে যে হ'ত না, তাই বা কে বলতে পারে?

কাজেই সাহেব পরমেশ্বর দাসের ব্যূহ ভেদ করার সংকল্প ত্যাগ করলেন। ইংরেজ বজরা মুখ ফেরাল। আকাশে সেদিন অজস্র জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে। হাজার তারার চুমকি দেওয়া শরতের নিষ্কলঙ্ক নীল-রাত্রি একসময়ে গাঢ় হয়ে এল। এবং সেই মোহিনী রাতটা হুগলীর নদীবক্ষে কাটিয়ে সকাল সূর্যের আলোয় সুবোধ বালকের মত হেজেসের বজরা তীরে গিয়ে ভিড়ল। বারই অক্টোবর। ষোলশ' বিরাশি।

আর ঘাটে নামতেই মথুরো দাস। আর কাজীর নাহার। তারা বললে, হুজুর আজকের দিনটা ইংলিশ গার্ডেনেই অবস্থান করুন। কাল প্রাতে পরমেশ্বর দাস তাঁর শ্রীচরণে হাজির হবে। সাহেবই বা করবেন কি? রাস্তা ত বন্ধ। উইলিঅম হেজেস হুগলী কুঠীতেই গিয়ে উঠলেন এবং সেখানকার ফ্যাক্টরী সাহেবদের সঙ্গে জোর সলাপরামর্শ সুরু করে দিলেন। কর্তারা সব পাঁচমাথা এক করে কর্তব্য নির্ধারণে ব্রতী হ'ল। একসময় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হ'ল, বিকেল ফুরিয়ে রাত। হুগলীর গঞ্জের সারাদিনের প্রাণচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে একেবারে শান্ত হয়ে এল; আকাশের চাঁদ পশ্চিমে হেলে পড়ল: তখন ঠিক হ'ল যদি সোজাপথে ঢাকা যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা করে পরমেশ্বরের লোকেরা, অন্য কোন পথে খড়ো বা জলঙ্গী নদী ঘুরে তারা ঢাকা যাবে। কিন্তু ঢাকা তারা যাবেই। সহ্যের একটা সীমা আছে ত! এবং যে কথা সেই কাজ। পরদিনও যখন পরমেশ্বর দাস হেজেসের সঙ্গে দেখা করলেন না, সাহেব বজরার

চেপে গিয়ে বসলেন। উদ্দেশ্য ত ঠিকই আছে। কিন্তু দেখা গেল, পরমেশ্বর তা' জানেন। কয়েকদিন টালবাহানা করে' ইংরেজদের সহ্যের সীমাটা বেশ খানিকটা পরখ করে দাসমশায় একদা হেজেসের বজরায় গিয়ে এত্তেলা দিলেন : 'হুজুর দাস হাজির।' ক্রুদ্ধ হেজেস ত বুনো শুয়োরের মত 'ঘোৎ' 'ঘোৎ' করে উঠল। কিন্তু কতক্ষণই বা। মানুষকে কব্জা করতে পরমেশ্বর দাস অদ্বিতীয়। পরমেশ্বর এতদিন কেন যে সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার ফুরসৎ পাননি, সেদিক দিয়েও গেলেন না। বললেন, সাহেব, বজরায় কি কথা হয় নাকি? তীরে চলুন। কুঠীতে ফিরে চলুন। দাসমশায় সবিনয়ে বোঝাতে চাইলেন, গেলে জন কোম্পানীর ভাল বই মন্দ হবে না। কেননা, অতিথি সৎকারের মূল্য হিসেবে তারা হেজেসের সোজাপথে ঢাকা যাবার সব বন্দোবস্ত করে দেবে। এবং চাই কি, তাদেরই হয়ে তার মুনিব মুর্শিদাবাদের শেঠ বুলচাঁদের কাছে একটা অভিজ্ঞানপত্র—'লেটার অব ইন্ট্রোডাকসন'ও লিখে দেবে!

এ টোপ ফস্কাল না। সাহেব নিমরাজী হয়ে শেষে বজরা ছেড়ে পরমেশ্বরের হাত-ধরে ইংরেজ কুঠীর পথ ধরলেন। দাস-মশায়ের সঙ্গে তাঁর কয়েকশ' পাইক-পেয়াদা। আর সাহেবের সঙ্গে তাঁর পিছনে হুগলীর যাবতীয় ইংরেজ ভেঙে পড়েছে। এখানে হেজেসকে পৌঁছে দিয়ে যাবার সময় পরমেশ্বর দাস বলে গেলেন, 'কাল সকালে হুজুর গরীবখানায় একজন নফরকে পাঠিয়ে দেবেন। তার হাতে দিয়ে চিঠিখানা দোব। কথাটাও পাকাই হয়ে গেল।'

পরদিন সকালে সাহেব কুঠীর রাত্রিবাস শেষে শুনলেন আর এক কান্ড! কুঠীর যেসব দিশি কর্মচারী দাসের লোকজন তাদের শুধু ধরেই নিয়ে যায়নি, কয়েক-জনকে ধরে বেধড়ক পিটিয়েছে। কাউকে বেঁধে রেখেছে। কারও বাড়ী থেকে ছেলে-বউকে ডেকে এনে শাসিয়েছে— খবরদার বলছি, সাহেবদের কাছে চাকরি করতে মানা করবে কর্তাকে। নয়তো বুঝবে ঠ্যালা। এমন কি ঢিপ ঢিপ করে ঢাঁড়া পড়েছে গ্রামে গ্রামে—'সাহেবদের কাছ থেকে যে ক্রীতদাস পালাবে তাকে আর দাস হয়ে থাকতে হবে না। সে মুক্ত।'

হেজেস সব শুনলেন। বুঝলেন। কিন্তু গরজ বড় বালাই। মুখে যতই গর্জান না কেন, আসলে ত এক বেনে জাতের প্রতিনিধি। ব্যবসাপত্তর ফলাও না করতে পারলে লিডেনহল স্ট্রীটের বড়কর্তারা ত' আর মুখে গুড় দেবে না! কাজেই এমন-ভান করলেন, ঐসব কিছুই তাঁর কানে আসেনি। মানসম্মানের মাথা খেয়ে পরদিন সকালবেলা ঠিক তাঁর লোক পাঠালেন পরমেশ্বর দাসের কাছে। সেই যে দাসমশায় বলেছেন ইংরেজদের হয়ে বুলচাঁদের কাছে একটা চিঠি লিখে দেবেন—সেই চিঠির প্রত্যাশায় তীর্থের কাকের মত হেজেস সাহেবের লোকটা দাসমশায়ের দরবারে ঠায় বসে রইল!

আরে, পরমেশ্বর দাসের সেইটেই ত তুরুপের তাস। একেবারে সেই আদ্যি-কালেও বঙ্গসন্তান পরমেশ্বর দাস ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজদের আসল দুর্বলতাটা কোথায়? দাসমশায় জানতেন, এরা আসল বেনের জাত। মানসম্মান সুবিধে-অসুবিধের চেয়ে বেশি বোঝে ব্যবসা। তার জন্যে না পারে হেন কাজ নেই। আর সেই টোপেই মাছ গেঁথে ইংরেজদের তিনি দিব্যি খেলাচ্ছিলেন! আর সেই কারণেই, অতক্ষণ আটকে রেখে হেজেস সাহেবের লোককে তিনি ফিরিয়েই দিলেন। ভাবখানা এই অত সহজে, এত বড় দাঁও কি হয় বাছা। এযে ছেলের হাতে মোয়া! ঘোর দু-চারদিন। তবে ত!

লোক ফিরে এসে গোমড়ামুখে হেজেস সাহেবকে জানালেন, দাসমশাই বড় শক্ত ঠাঁই বলেই ত মনে হচ্ছে। মনে ত হয় না, ইংরেজদের সুবিধার জন্যে পরমেশ্বর দাস আদপেই বুলচাঁদকে কিছু লিখে দেবে। হেজেস সাহেব এতক্ষণ মন দিয়ে শুনে-ছিলেন হুগলীর সেই ফ্যাক্টরটার কথা। আর বুঝিবা ভাবছিলেন বেঙ্গলের এই বিচিত্র 'কাস্টমার'টা আচ্ছা লোক ত!

হুগলীর ইংরেজ ফ্যাকটরটা তখনও বলে চলেছে—ইয়েস মি লর্ড। শেষবেশ পরমেশ্বর তাকে কি বলেছে জানেন—দাস তাকে সাবধান করে দিয়েছে — ইংরেজদের নৌকা 'সার্চ' না করা পর্যন্ত সেগুলি যেন হুগলী ত্যাগ না করে। একটু যা 'হুমকি দিয়েছে—দেখ বাপু, কথা না শুনে যদি উজানে নৌকা ছাড়, ত্রিবেণী পেরোতে পারবে না। সেখানে থানা আছে। এবং সেখানে আমরা জানিয়ে রেখেছি।

এইবার হেজেসের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। উটের পিঠে যেন শেষ খড়গাছি। কি এতবড় স্পর্ধা। আমার নৌকা খানাতল্লাসী। ভেবেছে কি পরমেশ্বর। কালবিলম্ব না করে হেজেস রাত্রির অন্ধকারে নৌকা ছাড়বার হুকুম দিয়ে দিলেন। সবার আগে গেল মালপত্র বোঝাই নৌকা নিয়ে জনসন সাহেব। তারপর চলল কোম্পানীর ফৌজ। তারপর স্বয়ং হেজেসের বজরা। সবশেষে একটা হালকা পানসি করে একজন ইংরেজ আর একজন 'স্প্যানিয়ার্ড' সেপাই!

রাত্রি তখন প্রায় দুটো বাজে। আকাশের বুকে তারা আর ধরে না। আর তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ যেন গঙ্গার ধারে ধারে আম-কাঁঠালের ডালপালা জুড়ে। সেখানে লক্ষ জোনাকীর রাজত্ব। মাঝে মাঝে কোন রাতচরা পাখীর পাখসাটের খবর এসে মিশছে দাঁড়টানার ছপ্‌ছপ্ শব্দের সঙ্গে। তাছাড়া, সারা প্রকৃতি যেন নিশ্চল। সময়ের একটা স্তব্ধ কালো গুহার ভেতর দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে পালটানা ইংরেজ নৌকা-গুলো।

হঠাৎ পানসিতে সেই স্প্যানিয়ার্ড সেপাই-এর চোখজোড়া সন্ধানী কুকুরের মত জ্বলে উঠল। অনতিদূরে দিকচক্রবালে এক সশস্ত্র লোকবোঝাই ছিপ নৌকা কোত্থেকে যেন ভেসে উঠল। এতই নিঃশব্দে, এতই দ্রুত এসেছে ছিপটা, কেউই জানতে পারেনি। যখন পারল, চমকে উঠল। নৌকা একেবারে কাছে এসে গেছে। স্প্যানিয়ার্ড সেপাই চিৎকার করে উঠল—কে যায়?

—তোর বাবা।

সাহেব সেপাই-এর এদেশে বেশ কিছু-দিন কেটেছে। ঐ ভাষা তার রপ্ত। বললে—'সামহালকে'। খবরদার আর এক পাও যেন নৌকা না এগোয়।' কে কার কড়ি ধারে। নৌকাটা দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। সিপাহীটা আর দেরী করলে না। তার গাদা বন্দুক জলের দিকে তাগ করে' 'দুম্' 'দুম্' করে দেগে দিলে। ভাগী-রথীর দুইকুলে তার প্রতিধ্বনি ভয়ঙ্কর-তর হয়ে ভাসতে লাগল অনেক-ক্ষণ। আগন্তুক ছিপের আরোহীরা বুঝল সুবিধে হবে না। ছিপের সঙ্গে পানসীর দূরত্ব বাড়তে লাগল।

রাত গড়াতে লাগল। ইংরেজবহর তখন ত্রিবেণী পেরোচ্ছে। আবার দিগন্তরেখায় ভেসে উঠল সেই কালো নৌকা। সেই সশস্ত্র মানুষগুলো। আবার চিৎকার। হাঁকা-হাঁকি। হৈ-চৈ। আবার হুমকি। আবার বন্দুক। এবং সেই পশ্চাদপসারণের পুনরা-বৃত্তি। বাকি রাতটা কিন্তু ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। চোদ্দই অকটোবর। ষোলশ' বিরাশি। এবং শুধু বাকি রাতটাই নয়, বাকি পথটাও। ঢাকা যাবার বাকি পথটা। সত্যি শক্তের ভক্ত কে নয়!

●

কিন্তু এত করেও পরমেশ্বর দাসের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল না। এরপর কটা দিনই বা কেটেছে। কাবাবই বা যাতায়াত করেছেন হেজেস সাহেব ঢাকার দরবারে। একটা দুঃসংবাদ গেল হুগলী থেকে। নভেম্বরের দোসরা। ঢাকায় তখন শীত পড়-পড়। দেওয়ান হাজি সফি খানের কাছে বহু বাঞ্ছিত পারোয়ানার জন্য দরবার করে ইংরেজ উকিল জেমস প্রাইস সদ্য ফিরেছে কুঠীতে। হেজেস সাহেব তারই সঙ্গে বসে শুনছিলেন সারাদিনের রিপোর্ট, এমনসময় একজন ফ্যাক্টর 'বাউ' করে দাঁড়াল। হেজেস জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়েস, হোয়াট ডু-য়ু ওয়ান্ট।

এ লেটার ফ্রম হুগলি।

হেজেস হাত বাড়িয়ে দিলেন। জন বিয়ার্ড লিখেছে হুগলী থেকে। ইংরেজ উকিল রামজীবনকে ডেকে পাঠিয়েছিল পরমেশ্বর দাস। এবং নবাবের কাছারীতে রামজীবনের পৌঁছাতে যা' দেরী। পাইক-পেয়াদারা হুড়মুড় করে এসে তাকে বেঁধে ফেললে। তারপর তাকে গারদে পুরে ফেললেন দাসমশাই। শুধু তাই নয়। কাছারীর একগঙ্গা লোকের সামনে জুতিয়ে লম্বা করে দিলে জন কোম্পানীর কর্মচারীকে। এবং এইখানেই শেষ নয় হেন-স্থার। পরদিন বিকেলে আবার তাকে গারদ থেকে কাছারীতে হাজির করা হল। ঐদিন হ'ল দুদ্দাড় লাথি মারার আদেশ। পরদিন আবার নির্যাতন। এবার চাবুক। চতুর্থদিন আর এই নির্যাতন সহ্য করা সম্ভব হল না

রামজীবনের। সেই বছর—অর্থাৎ ষোল শ' বিরাশি সালে কোম্পানীর আমানত করা রুপোর জন্যে শুল্ক হিসেবে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা তমশুক লিখে দিয়ে তবে রেহাই পেয়েছে। সেই খতখানা ইংরেজ কুঠীর ব্রান্ড সাহেবকে পাঠিয়ে দিয়ে পরমেশ্বর দাস লিখেছে—খতের টাকাটা অবিলম্বে যদি নবাবের কোষাগারে না পাঠান হয়, রামজীবনের জীবন সংশয়। বিয়ার্ড সেই বৃত্তান্ত লিখে পাঠিয়েছেন। হুগলী থেকে ঢাকা। হেজেসের কাছে। বিহিতের জন্যে। হেজেস ত বিষম খাপ্পা। এতদিন ত রেগেই ছিলেন, এবার অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। কিন্তু করবেন কি? পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত বার কয়েক পায়চারি করলেন ঘরে। তারপর মনের রাগ মনে চেপে প্রাইসকে বললেন, পালকী ঠিক করতে বল।

চার বেহারার ঝালর দেওয়া ঝকঝকে পালকী চেপে হেজেস গেলেন অপর এক বঙ্গসন্তান রায় নন্দলালের বাড়ী। ঢাকার দরবারে তাঁর প্রভূত প্রতাপ। কিন্তু বিধি বাম। হেজেসের পালকী রায়বাড়ীর দেউড়ী পেরোতে হ'ল না। খবর এল রায়মশায়ের অসুখ। বাঙালী গোমস্তা খাগের কলম-কানে গুঁজে সবিনয়ে জানালে, এখন ত হুজুরের সঙ্গে মোলাকাৎ হবে না।

নন্দলাল রায়ের গোমস্তা ত বলেই খালাস। কিন্তু উইলিঅম হেজেসকে ত কিছু একটা করতেই হয়। চুপ করে বসে থাকলে ত একদিন চুপিচুপি বাঙলাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটোতে হবে। অগত্যা ঢাকার দেওয়ান হাজি সফি খাঁর ছেলে সফেদ মহম্মদের সঙ্গে ইংরেজদের যে আলাপ ছিল, সেইটেই ঝালাতে গেলেন হেজেস। বাঁচোয়া, সফেদ মহম্মদ বাড়ী ছিলেন। হেজেস তার সঙ্গে দেখা করে সবরকম কুশল বিনিময় করে একথা সেকথার পর আসল কথায় এসে পড়লেন। সফেদ বললে, চল সাহেব, বাবাকে গিয়ে বলি। দেখি কি হয়।

দুটো পালকী আগাপিছু করে' সেদিনের প্রসন্ন অপরাহ্নে হাজির হ'ল হাজি সফি খাঁর দরবারে। হেজেসকে বার-বাড়ীতে বসিয়ে সফেদ দেওয়ানজীর খাস কামরায় ঢুকে গেল। দুপুরের ঘুমটুকু শেষ করে দেওয়ানজী সদ্য আলবোলার নলটি মুখে তুলেছিলেন, সফেদ গিয়ে এত্তেলা দিলে। তারপর পিতাপুত্রে গুজ-গুজ ফুসফুস করে কি যে কথা হ'ল, এক-সময়ে বিমর্ষ পুত্র ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুখখানা কালো করে হেজেসকে বললে, না সাহেব, কিছুই হ'ল না। কৈফিয়ৎ-এর সুরেই অনেকটা বললে, আমার বাবা ত আর ঢাকায় থাকছে না। নতুন দেওয়ান আসছে। কাজেই আমার বাবার কথা ত আর চলবে না!

সাহেবের ত দয়ে মজার অবস্থা। অনেক আশা নিয়ে গিয়েছিল দেওয়ানের কাছে। বাড়া ভাতে ছাই পড়ল। সাহেব অনেকক্ষণ ভাবলে। সফেদের সঙ্গে দু' একটা আরও কথা বলতে, তার কেমন যেন ধারণা হ'ল, এর মধ্যে রহস্য আছে। দেওয়ান যে কিছু করতে চাইছে না, তার পিছনে অকথিত কিছু কারণ আছে। সফেদকে সাহেব পল্টা-পাল্টি জিগ্যেস করে বসল, খোলসা করে বল ত সাহেব, আসল কারণটা কি? না তোমরা আমাদের এই বিপদে না কিছু করতে চাইছ, না ব্যবস্থা করছ আমাদের ফরমানের। ঐ বৈরাগ্যের উদ্দেশ্যটা কি?

হেজেস সাহেবের ঢাকা আসার প্রধান কারণ এই ফরমান। হেজেস চাইছিলেন, বাঙলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার ফরমানটার মেয়াদ আরও সাতমাস বাড়িয়ে নিতে। ইতোমধ্যে তারা দিল্লী থেকে খাস বাদশাহী হুকুমৎ আবার নতুন করে আনিয়ে নেবে। নয়ত পরমেশ্বর দাসের জ্বালায় তারা ত মারা যাবার দাখিল।

সেদিন ঢাকার বুকজুড়ে শীতের সন্ধ্যা আরব্যরজনীর নিশাচরীদের মত তার কালো বোরখা পড়ে নেমে এসেছিল। বান্দা এসে রেড়ীর তেলের সেজ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আর সেই অপ্রশস্ত আলোয় সফেদ মহম্মদ বাঙলার ইংরেজ কুঠীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তাকে না রেখে ঢেকে সাফ বলে দিলে, দেখ সাহেব, বুলচাঁদ শেঠ মুর্শিদাবাদ থেকে খবর দিয়েছে, এই সাত মাস যদি শুল্কে ছাড় দেওয়া হয়, সাত মাস পরে কি আর তোমরা এদেশে থাকবে? তল্পিতল্পা গুটিয়ে ত হাওয়া দেবে। মাঝখান থেকে নবাবী তোষাখানায় এতগুলো করকরে টাকা হাতছাড়া। কাজেই সাত মাস শুল্কে রেয়াতের ফরমান দেবে—নবাব কি এতই বেকুফ নাকি? হেজেস দেখলে সমূহ বিপদ। কিন্তু ইংরেজদের এই একটা মস্ত গুণ বিপদে যেন তাদের বুদ্ধি বেশি খোলে। হেজেস মাথা ঠিক রেখে এমন একটা চাল চেলে দিলে যে বুলচাঁদ-পরমেশ্বর কোম্পানী একেবারে মাৎ হয়ে গেল। হেজেস হেসে বললে, খাঁ সাহেব, ইংরেজরা আপনাদের সখ্য কামনা করে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় তাদের আপনারা বিশ্বাস করতে পারছেন না। যাই হোক, আমরা জামিন দেব। ঢাকার বণিকরা আমাদের হয়ে জামিন দাঁড়াবে। তাহলে আর আপনাদের টাকা মার যাবার ভয় নেই! সফেদ খাঁ যুক্তিটা ফেলতে পারলে না। বললে, আচ্ছা, কাল আসবেন। বাবাকে প্রস্তাবটা বলে দেখব।

কিন্তু ইংরেজরা ব্যাপারটা ফয়সালা না করতে করতে পরমেশ্বর দাস একটা মোটা দাঁও মেরে নিলেন। ঢাকার জন্যে ত হুগলী বসে থাকতে পারে না। পরমেশ্বর জন বিয়ার্ডের কানমলে করকরে চার হাজার টাকা আদায় করে নিলে—সাময়িক একটা রফা হিসেবে।

হেজেস খবর পেয়ে আর একটু ক্ষিপ্ত হলেন এবং দেওয়ান সাহেবও তদীয় পুত্রের মনভেজাবার জন্যে নজরানার বহর একটু বা বাড়িয়ে দিলেন। এবং একদা দেখা গেল, কাজ হয়েছে। ঠাকুরের ফুল পড়েছে। ঢাকার সালংকৃত দরবারে কুর্ণিশ করতে করতে হাজির হয়েছেন প্রেসিডেন্ট অব দি ইংলিশ কাউন্সিল ইন বেঙ্গল উইলিঅম হেজেস।। সিংহাসনে আসীন রণকুশলী মুঘল কূটনীতিবিদ শায়েস্তা খাঁ। ষোল শ' বিরাশি। আঠারই নভেম্বর।

নবাবের পাকাদাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। দাড়ি-গোঁফ চুমরে একটু আতরের গন্ধ নিয়ে, নবাব বাহাদুর বললেন, দেখ বাবা, জামিন যদি দাও, মাশুল নেওয়া কয় মাসের জন্যে না হয় স্থগিত রাখতে পারি, তবে এ কথাও বলে রাখছি দিল্লী বড় শক্ত ঠাঁই। সেখানে সূঁচ গলান শক্ত। ফরমান পাওয়া ভারী কঠিন। নবাবের মেজাজ নরম দেখে হেজেস এই অবকাশে তাঁর মনের বহুদিনের পুরনো ঝাল মিটিয়ে নিতে চাইলেন। আরও একটা আর্জি শায়েস্তা খাঁ সমীপে পেশ করে থাকবেন। 'হুজুর পরমেশ্বর দাসের হাত থেকে আমাদের অব্যাহতি দিন। শেঠ বুলচাঁদের এই নফর আমাদের হাড়মাস কালি করে ছাড়লে। না মানে আইন, না মানে কানুন। জোর করে টাকা আদায় করে। বাধ্য হয়ে আমরা দিই। সেগুলো যাতে ফেরৎ হয় তারও একটা ব্যবস্থা হোক হুজুর।'

প্যাঁচ আগে থেকেই সাহেব কষে রেখেছিলেন। ঢাকার যে মুঘল সবি—খোদাবক্স খাঁ, নবাবের বকসী মির্জা মজুফা, রায় নন্দলাল, আরও দু'চারজন তাবড় তাবড় লোককে আগে থেকেই বেশ ভিজিয়ে রেখেছিলেন হেজেস। বৃদ্ধ নবাব শায়েস্তা খাঁ খুশমেজাজে অর্ধনিমিলিত নেত্রে বললেন, ঠিক হ্যায়। এবং যথাবিহিত-ভাবে ক'দিন পরেই ডিসেম্বরের দশই নবাবের পাঞ্জা বসে গেল পরোয়ানায়—পরমেশ্বর দাসের চাকরী খতম। টাকাকড়ি যা জোর করে গিলেছিল, সব ওগরাতে হবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং পরদিন কাকডাকা সকালে নবাবী পরোয়ানা নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে লস্কর চলে গেল মুর্শি-দাবাদ-কাশিমবাজার — শেঠ বুলচাঁদের কাছে। তারই নকল গেল হুগলী। ইংরেজ কুঠীতে। বিয়ার্ড সাহেবের অব-গতির জন্য।

●

ডিসেম্বরের শেষ হয়ে এল প্রায়। বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। হেজেস ঢাকার তাঁবু উঠিয়ে বজরায় চেপে বসলেন। হুগলীর উদ্দেশে বহর পাল তুলে দিলে। পথে পেলেন শেঠ বুলচাঁদের আমন্ত্রণ। মুর্শিদাবাদ থেকে। হেজেস সাহেব যেন শেঠজীর গরীবখানায় একবার পায়ের ধুলো দেন। আর সেখানে তার বহর দেখে কে? এলাহী ব্যাপার! সাহেবের পালকী শেঠজীর দেউড়ীতে এসে ঢুকতেই বুলচাঁদ শশব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন কাছারী থেকে। পালকী থেকে নামতেই তাকে জড়িয়ে ধরলেন শেঠজী : আসুন, আসুন। আসতে আজ্ঞে হোক। তারপর কুশল বিনিময়। ঢাকা থেকে আসতে পথে তকলিফ হয়নি ত? মেজাজ-শরীফ? শরীর কুশল? মেম-সাহেব—ছেলেমেয়েরা?

সে মানুষই নয় শেঠ বুলচাঁদ যাঁর গোমস্তা পরমেশ্বর দাসের কল্যাণে ইংরেজদের ব্যবসাপত্তর লাটে ওঠার দাখিল। আলবোলার নলটা এগিয়ে দিয়ে হেঁকে বললেন, ওরে কে আছিস, এক্ষুনি একটা পরোয়ানা জারী করে দে মহলে মহলে, ইংরেজ জাহাজ কোনভাবেই যেন বেআইনীভাবে আটক না পড়ে। জন কোম্পানীর ব্যবসার কোন ক্ষতি না হয়। তারপর একথা সেকথা পাঁচ কথা। তারপর খানাপিনার আয়োজন। অথিত মানুষ ত!

কথায় কথায় কত কথা। ঢাকার গোলাপ রায়কে ইংরেজরা জামিন দিয়েছে—সে খবর শেঠ বুলচাঁদের অজানা নয়। খুব ভালো কথা। তবে শেঠজী নিজেই যাচ্ছেন ঢাকা। ক'দিনের মধ্যে। এবং দিল্লী থেকে ইংরেজদের পরোয়ানা যাতে সহজেই হয়ে যায়, তার জন্যে অবশ্যই তদ্বির করবেন। বন্ধুকৃত্য বলে একটা কথা আছে ত।

কিন্তু এ সবই যে কথার কথা, অবশেষে সেটা প্রকাশ পেল। শেঠজী নবাবী ফরমান পেয়েছেন পরমেশ্বরকে বরখাস্ত করার জন্য। কিন্তু কি জান সাহেব, বুলচাঁদ ব্যক্ত করলেন, দাস আমার খুব পাকাপোক্ত লোক (ইংরেজরা ত সেটা হাড়ে হাড়ে জেনেছে!) এই হুগলীর বিরাট মহলের সবকিছুই তাদের নখ-দর্পণে। কাজেই, তাকে সরালে, কাজকম ত সব অচল হয়ে যাবে। ইংরেজদের মাল-বহরের তালিকা দেখার জন্যে না হয় অন্য লোক নিয়োগ করবেন তিনি। এবং সাহেব অমত না করলে দাসের চাকরীটা রেখেই দেন তিনি।

মিষ্টিকথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু মন ভেজে। অন্ততঃ অমন জবরদস্ত সাহেব—উইলিঅম হেজেস দিব্যি ভিজে-ছিলেন। তার বোধকরি কারণও ছিল। কয়মাস এদেশে কাটিয়ে হেজেস বুঝে-ছিলেন, এদেশের পরমেশ্বরেরা সব পারে। আজ রাজী না হলে, ইংরেজের গণেশ যে কোন সময়ে উল্টে দেবার কিস্মত রাখে। কাজেই জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কাজেই হাতে পেয়েও পরমেশ্বরকে তিনি ছেড়েই দিলেন।

কিন্তু এই নিয়ে ঘোঁট পাকাতে লাগল হেজেসের নিজের লোকজনেরা। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জব চার্ণক তার বিলেতের চিঠিতে জানিয়ে দিলে হেজেসের ঢাকাদৌত্য একটা পরম পরিহাস। চার্ণক তার চিঠিতে লিখল—বাট টু দিস ডে উই নো, পরমেশ্বর দাস ইজ নট ডিস-প্লেসড। অ্যান্ড মাচ ফিয়ার—নান অফ দি মানি ইজ ইএট রিসিভ।' অর্থাৎ আমরা যতদূর জানি, পরমেশ্বর দাস এখনও বহাল তবিয়তে কাজ করছে আর ভয় হয়, আমাদের পাওনা টাকা কিছুই আদায় পাওয়া যাবে না।

এবং এদিকে যথা পূর্বং তথা পরং! আবার সেই পরমেশ্বর দাস। কবে যেন তাঁর নামে কি একটা নবাবী পরোয়ানা বেরিয়েছিল, কে আর সে সব মনে রাখে। বিনা শুল্কে ব্যবসা, ওসব হবে না বাপু। ফেল কড়ি। মাখ তেল। দুঃসহ অবস্থা। অসহায় হেজেস কি করেন, ঢাকার উকিল জেমস প্রাইসকে লিখে পাঠালেন নবাবের গোচরে আন, তাঁরই রাজত্বে তাঁর হুকুম কায়েম হয় না। এ কি কান্ড!

ইংরেজরা কাঠখোট্টা জাত। নবাবকে কুর্নিশ করে একদিন বলেই ফেললে। আর শায়েস্তা খাঁর মুঘল রক্ত মাথায় চড়ে গিয়ে থাকবে। বৃদ্ধ স্থবিরবৎ জরাজীর্ণমুখে শিরাগুলো ফুলে উঠে থাকবে। আর তারই কিছুক্ষণ পরে এক নবাবী ফৌজ টগবগে পারশি ঘোড়ায় চেপে ঢাকার মুঘল দরবার থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হয়ে গিয়ে থাকবে ধুলো উড়িয়ে। আর সেই ধাবমান ধূলিজালের দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঢাকার আম-জনতা বোধকরি আন্দাজ করে থাকবে—কার বুঝি গর্দান গেল।

তা গর্দান যাওয়া নয়ত কি? ঢি-ঢি ঢ্যাঁড়া পড়ল। গঞ্জে গঞ্জে। অমন চাকরীটা গেল দাসমশায়ের। এর চেয়ে মাথা যাওয়া কি বেশি দুঃখের? এবং পরমেশ্বর দাস যেমন দুঃখ পেলেন, ততোধিক আনন্দ পেলেন ইংরেজ কুঠীতে উইলিঅম হেজেস। প্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল ইন বেঙ্গল। সাহেব তখন নাকি খানা-টেবিলে। মেম-সাহেব, ছেলেমেয়েদের নিয়ে। উত্তরকালের কলকাতার গভর্ণর ভাইপো তরুণ রবার্ট হেজেসও ছিলেন বোধহয়। তখন টানাপাখা কোথায়? পাখাবরদারে তালপাতার পাখায় বাতাস করে। মাঝে মাঝে খাস বিলেত থেকে পেটিকয়েক মদ আসে—বীয়ার কিংবা ক্লারেট, স্যাক কিংবা মদিরা—তা যা' একটু সুখ। নয়ত এত ঠান্ডাতেও সাহেব ঘেমে ওঠেন। পাখার হাওয়ায় গরম কাটে না। মনে মনে দিশি আবহাওয়া আর পরমেশ্বর দাসকে একই সঙ্গে অভি-শাপ দেন। এমন সময় এক কাশিম-বাজারের ডেসপ্যাচ। আর পড়তে পড়তে খুশিতে একেবারে ডগমগ হয়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট! অ্যাট লাস্ট, অ্যাট লাস্ট!

কৌতূহলী মেমসাহেব হয়ত বলে থাকবেন —ইয়েস উইলিঅম। উজ্জ্বলচোখে হেজেস বর্ণনা করে থাকবেন, কি করে তাঁর এতদিনের চেষ্টা সফল হল। দ্যাট ভিলেন ইজ গন!' কিন্তু মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী। সাহেবের আনন্দ অধিবাসে টিকল না। দুটো পুরো দিনও কাটল না। খবর এল : সেই ঢ্যাঁড়া, সেই বরখাস্ত, সেই ঋণশোধ—সবটাই একটা মস্ত প্রহসন। দুদিন পরেই পরমেশ্বর দাসকে একটা দামী শিরোপা দিয়ে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন বুলচাঁদ। শুধু তাই নয়। যারা টাকা উসুল নিয়েছিল, কয়েদ করে গলায় গামছা দিয়ে সেই সব টাকা আদায় করে নিলে পরমেশ্বর। অথচ কাজীর সামনে এসে গুটি গুটি তারা লিখে দিয়ে গেল, তাদের সব প্রাপ্য বুঝে পাইয়া সুস্থ মনে এই রসিদ লিখিয়া দিলাম। বঙ্গাতলয় পরমেশ্বর দাসের সঙ্গে কূটনৈতিক লড়াইয়ের শেষ দৃশ্যে দেখা গেল উইলিঅম হেজেস একেবারে 'নকড্ আউট।'

কিন্তু পরমেশ্বরের বোড়ের চাল তখনও বাকী ছিল। হেজেস ভাবতেই পারেননি, জন কোম্পানীর কি সর্বনাশ করে দিলেন হুগলীর এই সামান্য বাঙালীটি। জন কোম্পানীর বিনা শুল্কে বাণিজ্যের বিরুদ্ধে আর একদল ইংরেজ—যারা কোম্পানীর পাঞ্জা ছাড়াই বাঙালাদেশের দরিয়ায় বাণিজ্য-লক্ষ্মীর আরাধনা করতে এসেছিল, নাক সিঁটকে জন কোম্পানী যাদের বলত 'ইন্টারলোপার' তাদের ওপর কৃপা করলেন দাসমশায়। তাদের একটা হিল্লে করে দিলেন। এরা শতকরা পাঁচ টাকা শুল্ক দেয়। উপরি টাকা দিতে কার্পণ্য করে না। বাঙলাদেশের বাণিজ্যের ওপর কোন একচেটিয়া অধিকার চায় না। বাঙালী পরমেশ্বর তাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না কেন?

ইতিমধ্যে কাপ্তেন অ্যালি বলে একজন 'ইন্টারলোপার'কে বুলচাঁদের দরবারে নিয়ে গেছেন তিনি। ফৌজদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। স্থানীয় দাদনী বণিকদের তার সঙ্গে ব্যবসা করার জন্যে ফৌজদারকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে দিয়েছেন। এবং বহু টানাপোড়েনের মধ্যে এমনি একটা অবস্থা সৃষ্টি করে তুলেছেন, যাতে অনতিকাল পরে—এই ঘৃণ্য ইন্টারলোপারদের সঙ্গেই আঁতাত করে নতুন কোম্পানীর ভিত ফাঁদতে হয়েছিল জন কোম্পানীকে,—কয়েকটা বছর পরেই' ওস্তাদের মার শেষ রাতেই সেরে গেলেন পরমেশ্বর!

কিন্তু কে এই পরমেশ্বর দাস? কি তাঁর পরিচয়? এ'ত হেজেসের একতরফা বিবৃতি। তাঁর বক্তব্য কি? বাঙলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্র-বিপ্লবে সারা দেশটা যখন উথালপাথাল হয়ে গেল তখন কোথায় ছিলেন তিনি? তাঁর কি কোন ভূমিকা ছিল? কে সেই ভাবীকালের ঐতিহাসিক এই সব পরমেশ্বর দাসদের বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে টেনে এনে তাঁদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবেন। বাঙলাদেশের সেই নতুন ইতিহাস কবে রচিত হবে?

কে জানে? বাঙলাদেশের ভাগ্যবিধাতা এই পোড়া দেশের প্রায়ান্ধকার রঙ্গমঞ্চের জন্য যে এক বিচিত্র নাটকের খসড়া করে-ছিলেন, হুগলীর এই অখ্যাত বঙ্গতনয়ের জন্যে তাতে রোমাঞ্চকর একটা মস্ত ভূমিকা দিয়ে ফেলেছিলেন। দেখা গেল, বিধাতার সেই গুরুদায়িত্ব তিনি শুধু সুষ্ঠুভাবে পালনই করেননি, যবনিকা পড়ার সময়ে একেবারে মাৎ করে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখ এই, পাদপ্রদীপের আলো নিবতেই, সেই যে মিলিয়ে গেলেন, কেউ আর তার কোন হদিশ পেল না।

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ও'রা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের খবর, চোখে আতংকের ছায়া। জিনিসপত্রের দামও আকাশছোঁয়া।

এমন সময় এল সেই মারাত্মক সংবাদ। জাপানীরা বোমা ফেলেছে বর্মায়। সেখান থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে ভারতে। রাজদিয়াতেও জান নিয়ে ফিরে এসেছে একটি পরিবার। পরদিন। সকলেই ছুটল ত্রৈলোক্য সেনের কাছে। শুনল রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে আসার মর্মান্তিক কাহিনী। সময় এগোল যথানিয়মেই। দেখতে দেখতে যুদ্ধের হাওয়া এসে লাগল রাজদিয়াতে। সৈন্য আসতে শুরু করেছে।]

।। সাতচল্লিশ ।।

কয়েকদিনের ভেতরেই দেখা গেল সেটেলমেন্ট অফিসের পেছন দিকে যে বিশাল ফাঁকা মাঠখানা পড়ে ছিল, তারকাটা দিয়ে সেটা ঘিরে ফেলা হয়েছে। এবং তার মধ্যে সৈন্যদের জন্য সারি সারি অসংখ্য তাঁবু উঠেছে।

শুধু তাই নয়, বরফ-কল এবং মাছের আড়তগুলোর ও-ধারে একেবারে নদীর ধার ঘে'ষে মাইলের পর মাইল নীচু জমি পড়ে ছিল। বর্ষায় জায়গাটা জলে ডুবে যায়; অন্য-সময় কাদায় থক-থক করে। তার ওপর জল-সেঁচি আর বিশল্যকরণীর বন উদ্দাম হয়ে বাড়তে থাকে। কাদাখোঁচা আর পাতি-বকের দল নরম মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে জলসেঁচির বনে কী যেন খুঁজে বেড়ায়।

মিলিটারির নজর পড়ল জায়গাটার ওপর। কোত্থেকে ঠিকাদাররা এসে গেল। চারধারের গ্রাম-গঞ্জ থেকে, নদীর ধু-ধু চর থেকে মোটা মজুরির লোভ দেখিয়ে হাজার দুই-তিন লোক জুটিয়ে ফেলল তারা। কানের কাছে কাঁচা পয়সার ঝনঝনানি চলতে থাকলে কতক্ষণ কে আর ঘরে বসে থাকতে পারে।

মজুরদের প্রায় সকলেই ভূমিহীন কৃষাণ। অন্যের জমিতে ধান কেটে, হাল দিয়ে এবং আরো হাজারটা উঞ্ছবৃত্তিতে তাদের দিন কাটত। বছরের বেশির ভাগ সময়ই তাদের জীবনে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে।

ঠিকাদাররা প্রথমে তাদের মাটি ভরাটের কাজে লাগাল। নীচু জমিটাকে রাস্তার সমান উঁচু করতে হবে।

সারাদিন কাজ তো চলেই, রাত্তিরেও নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। আলো জ্বালিয়ে মাটি ফেলা হচ্ছে তো হচ্ছেই।

স্কুলে যাবার পথে সময় হয় না। তবে টিফিনে কি ছুটির পর শ্যামলকে সঙ্গে নিয়ে বিনু ওখানে চলে যায়। দু-তিন মাইল জায়গা জুড়ে হাজার কয়েক লোক ঝোড়া বোঝাই করে এনে মাটি ফেলছে। সকলের ব্যস্ততা, ঠিকাদারের লোকদের ধমক, খিস্তি, চিৎকার, চেঁচামেচি—সব মিলিয়ে বিরাট ব্যাপার।

বিনু বলে, 'ওখানে কী হবে বলতে পার?'

শ্যামল বলে, 'কি জানি—'

ঠিকাদারের লোকেরা, যারা মজুর খাটায়—জিজ্ঞেস করলে বলে, 'দ্যাখ না, কী হয়।' বলেই ব্যস্তভাবে চলে যায়।

একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সেই লোকগুলোকে দেখতে পেল বিনু—তাহের, বছির, বুড়ো খালেক। ওরা সবাই চরের মুসলমান। প্রতি বছর ধানকাটার সময় চুক্তিতে কাজ করতে আসে। এবারও অঘ্রান মাসে এসে তারা বিনুদের ধান কেটে গেছে।

বছরে মাসদুয়েকের মতো বছিররা রাজদিয়ায় এসে থাকে। আসে অঘ্রানের মাঝামাঝি; মাঘ মাস পড়তে না পড়তেই চলে যায়। কোন কোন বার অবশ্য দেরিও হয়; যেতে যেতে মাঘের শেষ কিংবা ফাল্গুনের শুরু।

ধানকাটার মরসুম বাদ দিলে বছরের অন্য সময় বছিরদের রাজদিয়ায় দেখা যায় না। এবারটা কিন্তু ব্যতিক্রম। এই তো সেদিন ধান কেটে গেল ওরা; এর মধ্যেই আবার মাটি ভরাটের কাজে ফিরে এসেছে।

বিনুকে এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে হল না। মাটি ফেলতে ফেলতে বছিররাই তাকে দেখে ফেলল। দেখামাত্র বছির আর তাহের লম্বা লম্বা পা ফেলে কাছে এল। খুশী গলায় বলল, 'বাবুগো পোলা না?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

বিনুর হাতে বই খাতা-টাতা ছিল। বছির বলল, 'ইচ্‌কুল (স্কুল) থনে আইলেন বুঝিন?'

'হ্যাঁ। একটু আগে ছুটি হল।'

'হ্যামকত্তায় ভাল আছে?'

'হ্যাঁ'

'জামাই কত্তায়?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ির অন্য সগলে?'

'সবাই ভাল। তোমরা?'

'খোদা যেমুন রাখছে।'

একটু নীরবতা। তারপর বিনু শুধলো, 'এখানে কদিন কাজ করছ?'

বছির হিসেব করে বলল, 'দশ দিন।' একটু চুপ করে থেকে উজ্জ্বল উৎফুল্ল মুখে আবার বলল, 'বাহারের কাম ছুটো-বাবু!'

বিনু উৎসুক সুরে জানতে চাইল, 'কিরকম?'

'রোজ নয় সিকা কইরা মজুরি। তা হইলে হিসাব কইরা দ্যাখেন দশ দিনে কত টাকা পাইছি। বাপের জন্মে এত টাকার মুখ আর দেখি নাই।' বলে তাহেরের দিকে তাকাল বছির, 'না কি কও তাহের ভাই।'

দেখা গেল তাহেরের এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই। জোরে জোরে মাথা নেড়ে সে বলল, 'সত্য কথা।'

বছির বলতে লাগল, 'হেই ইনামগঞ্জ, নিশিন্দার চর, চরবেউলা, গিরিগঞ্জ, কেতুগঞ্জ, ডাকাইতা পাড়া—যেইখানে যত কিষাণ আছে সগলে মাটি কাটার কামে আইছে। আইবে না ক্যান? এত মজুরি, এত টাকা পাইব কই? শুনতে আছি—'

'কী?'

'সুজনগঞ্জেও নিকি মাটি কাটার কাম শুরু হইব।'

'কে বললে?'

'পরস্পর কানে আইল।'

'ওখানে মাটি-কাটা হবে কেন?'

'সৈনাগো পেয়োজন (প্রয়োজন)।'

ওখানেও সৈন্য যাবে?' বিনু অবাক।

বছির বলল, 'হেই তো শুনতে আছি।'

বিনু চুপ করে থাকল।

বছির উৎসাহের গলায় বলতে লাগল, 'এইরকম কাম যদি মিলে (মেলে), কিষাণরা আর চাষ-বাস করব না। জমিন ফালাইয়া সগলে যুদ্ধের কামে দৌড়াইত।'

তাহের বলল, 'ভাগ্যে যুদ্ধ বাধছিল। দুইখান পহা নাড়াচাড়া করতে পারি; পোলামাইয়ারে দুই বেলা প্যাটভরা ভাত দিতে পারি। হায় রে আল্লা, জন্ম ইস্তক কি দিনই না গেছে!'

বছির বলল, 'মাইনষে কয়, যুদ্ধ নিকি মোন্দ; আমরা কই যুদ্ধ ভাল। যুদ্ধের কালানে (কল্যাণে) বউ-পোলার মুখে হাসি ফুটছে।'

আরো কিছুক্ষণ হয়তো গল্প-টল্প করত বছিররা; তা আর হল না। ঠিকাদারের একটা লোক শকুনের চোখ নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে প্রায় তাড়া করে এল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে লোকটা অশ্লীল খিস্তি দিল প্রথমে। তারপর বলল, 'সুমুন্দির পুত, গপ (গল্প) মারণের জায়গা পাওনা। দুই ঝোড়া মাটি ফেলাইয়া নয় সিকা পহা পাইনা লইতে বড় সুখ। আইজ শালা তোগো মজুরি যদি না কাটি তো নাম ফিরাইয়া রাখিস।'

বছির আর তাহেরের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বিষন্ন সুরে তারা বলল, 'যাই ছুটোবাবু, অখন আর খাড়নের সময় নাই।'

বিনু বলল, 'একদিন এসো আমাদের বাড়ি।'

'আমু।'

●

দেখতে দেখতে নদীপারের নীচু জমি উঁচু হল। তার ওপর সারি সারি সুদৃশ্য ব্যারাক উঠল মিলিটারিদের জন্য।

শুধু কি তাই, রাজদিয়ায় আগে বিজলী আলো ছিল না। মিলিটারির কল্যাণে, যুদ্ধের কল্যাণে রাতারাতি তা এসে গেল। অবশ্য বিজলী আলোটা সাধারণ মানুষের জন্যে না, শুধু মিলিটারিদের জন্য। রাজদিয়ার একমাত্র বড় রাস্তাটাকে দ্বিগুণ চওড়া করে পীচ-টীচ ঢেলে চেহারা একেবারে বদলে দেওয়া হল। নতুন নতুন আরো অনেকগুলো কনক্রীটের রাস্তাও তৈরী হল। সব চাইতে মজার ব্যাপার যেটা হল তা এইরকম। এখানকার যত তালগাছ, তাদের মাথা কেটে আলকাতরা দিয়ে কালো রঙ করে দেওয়া হল; সেগুলোকে এখন এ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট্‌ কামানের মতন দেখায়। অনেকগুলো নকল কামানকে নদীর ধারে ধারে আবার হেলিয়েও রাখা হয়েছে।

এখন সারাদিন সারারাত রাজদিয়া জুড়ে কাজ চলছে। শত শত ঠিকাদার, হাজার হাজার মজুর শুধু খেটেই যাচ্ছে। রোড রোলার এবং নানারকম যন্ত্রের শব্দে জায়গাটা আজকাল সরগরম।

রাজদিয়ার গায়ে যেন ময়দানবের ছোঁয়া লেগেছে। এতকাল জায়গাটা যেন ঘুমিয়ে ছিল। শতাব্দীর অতল নিদ্রা থেকে সে আচমকা জেগে উঠেছে।

ক'দিন আগেও এখানকার জীবন ছিল স্তিমিত, বেগবর্ণহীন, নিস্তরঙ্গ। তিরতিরে স্রোতের মতন যুগ-যুগান্তের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে, চুপিসাড়ে, অতি সঙ্গোপনে সে বয়ে যেত। রাজদিয়ার সেই শান্ত অচঞ্চল জীবনযাত্রায় হঠাৎ যেন জলোচ্ছ্বাসের বেগ এসেছে।

আগে আগে সারাদিনে গোয়ালন্দের একখানা স্টিমার আসত। আজকাল যাত্রীবাহী স্টিমার তো আসেই। তাছাড়া সপ্তাহে একবার করে মিলিটারিদের সেই স্টিমারটাও সৈন্যসামন্ত লরী-ট্রাক-জীপ এবং অসংখ্য সরঞ্জাম নিয়ে আসছে। মিলিটারিদের স্টিমারটা এলে জেটিঘাটা থেকে নতুন ব্যারাকগুলো পর্যন্ত রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। কাছাকাছি কারোকে এগোতে পর্যন্ত দেওয়া হয় না। সাধারণ পুলিশ-টুলিশ না, কয়েক শ' মিলিটারি পুলিশ জায়গাটাকে ঘিরে ফেলে। তারপর কি সব জিনিসপত্র ঢাকাঢুকি দিয়ে সবার অলক্ষ্যে ব্যারাকের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

আড়ালে রাজদিয়ার বাসিন্দারা ফিসফিস করে, 'কী আনছে কও দেখি?'

'ক্যামনে কই?'

'আমার মনে হয়, কামান আর গোলাগুলি।'

'হইতে পারে। ঢাইকা-ঢুইকা আনে ক্যান?'

'কি জানি। যুদ্ধো বুঝি গুপেন (গোপন) রাখা নিয়ম।'

বিনু লক্ষ্য করেছে, প্রথম দিন স্টিমারটা এসেছিল দুপুরবেলায়। আজকাল বেশির ভাগ আসে রাত্রের দিকে। রাত্রিবেলা কখন আসে টের পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত ওখানে থেকে কী করে, কে বলবে। তবে সকাল হলেই রাজদিয়া-বাসীরা দেখতে পায় স্টিমারটা জেটিঘাট ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আগে ফীটন আর কদাচিৎ দু-একখানা সাইকেল ছাড়া এখানে অন্য কোনরকম গাড়িটাড়ি ছিল না। ইদানীং সমস্ত দিনরাত রাজদিয়ার হৃৎপিন্ড কাঁপিয়ে মিলিটারিদের ট্রাক-জীপ ছুটতে থাকে। শোনা যাচ্ছে এখানে নাকি একটা এরোড্রোমও তৈরী হবে।

মিলিটারি ব্যারাক, রাস্তাঘাট, বিজলী আলো—এত কিছু হয়েছে রাজদিয়াতে তবু যেন কাজের শেষ নেই। ব্যারাকের উল্টোদিকের ফাঁকা জায়গাগুলোতে কাঁচা বাঁশের চালা তুলে ঠিকাদার আর মজুরদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আগে রাজদিয়াতে চায়ের দোকান একটাও ছিল না। দোকান দূরের কথা, চা খাওয়ার রেওয়াজই ছিল না। রাজদিয়ার মোট সাতটি বাড়ীতে চা ঢুকত। আজকাল মজুরদের অস্থায়ী আস্তানাগুলোর গায়ে কম করে কুড়িটা দোকান বসেছে।

●

এক ছুটির দিনের সকালে পুবের ঘরের দাওয়ায় বসে হেমনাথরা আসর জমিয়েছিলেন। স্কুল-কলেজ বন্ধ; রান্না-বান্নার তাড়া ছিল না। সকাল থেকেই দিনটার গায়ে যেন আলস্য মাখানো। স্নেহলতারা পর্যন্ত রান্নাঘর ছেড়ে গল্প করতে বসেছেন।

কথা হচ্ছিল এই রাজদিয়া নিয়ে। খুব চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'কী জায়গা ছিল আর এখন কী দাঁড়িয়েছে!'

অবনীমোহন বললেন, 'আমরা এসেও যা দেখেছি তা আর নেই। রাতারাতি সব বদলে গেল।'

'তা বদলাক। রাস্তাঘাট হয়েছে। ইলেকট্রিক আলো এসেছে; এখন অবশ্য মিলিটারির জন্য। দুদিন পর আমাদের ঘরেও আসবে। কিন্তু—'

'কী?'

'একটা বড় সাঙ্ঘাতিক খবর শুনেছি অবনীমোহন—'

'কি খবর মামাবাবু—'

'মিলিটারিরা জবরদস্তি করে রামকেশবদের গ্রামের দিকে হামলা করছে। সেদিন

নাকি অতুল নাহাদের বাড়ি ঢুকেও পড়েছিল।'

'আমিও শুনেছি।'

'সন্ধ্যেবেলা মেয়েদের নিয়ে রাস্তায় বেরুনো এখন নিরাপদ না। পরশুদিন রাত্তিরে দুটো মাতাল টমি রুদ্রবাড়ির আরতিকে তাড়া করেছিল। ভাগ্য ভাল, সেই সময় মিলিটারি পুলিশের একটা জীপ এসে পড়ে। তাইতে মেয়েটি বেঁচে যায়। বেশ শান্তিতে ছিলাম আমরা, কি উৎপাত শুরু হল বল দেখি—'

সুরমা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। শিউরে উঠে বললেন, 'সুধা-সুনীতির কলেজও তো ওদিকে। আমি ওদের আর পাঠাব না। কোনদিন কী বিপদ হয়ে যাবে—'

হেমনাথ কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বাইরের উঠোন থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'হ্যামকত্তা—'

হেমনাথ সেদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কে রে?'

'আমি নিত্য—নিত্য দাস—'

'আয়—আয়—'

একটু পর নিত্য দাস পুবের ঘরের দাওয়ায় এসে উঠল। সুজনগঞ্জের হাটে আগেই তাকে দেখে বিনু। গলায় তিন-কণ্ঠি তুলসীর মালা, মুখে বসন্তের কালো কালো দাগ। পরনে খাটো ধুতি আর

ফতুয়া। দেখতে দেখতে এ চেহারা মুখস্থ হয়ে গেছে বিনুর।

নিত্য দাস দাওয়ার এক ধারে মাটির ওপরেই বসে পড়ল।

হেমনাথ বললেন, 'তোদের খবর-টবর কী?'

নিত্য দাস বলল, 'আপনেগো আশীর্বাদে ভালই।'

'বাড়ির সবাই কেমন আছে?'

'ভাল।'

একটু ভেবে হেমনাথ এবার বললেন, 'তারপর এত সকালবেলা কী মনে করে রে?'

নিত্য দাস বলল, 'একখান কামে আইতে হইল। ভাবলাম, সুজনগঞ্জ থনে যখন আইলামই, হ্যামকত্তা আর বৌ-ঠাইনের চরণ দর্শন কইরা যাই।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি কাজের মানুষ; শুধু শুধু যে আস নি বুঝতে পেরেছি। তা কাজটা কী?'

'এছ-ডি-ও সায়েবের বাংলায় (বাংলো) একবার যাইতে হইব।'

'কেন রে?'

'ক্রাচিন (কেরোসিন), চিনি আর কাপড় কনটোল হইয়া যাইতে আছে।'

হেমনাথ বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'কনট্রোল!'

'হ—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল নিত্য দাস, 'তিনটা জিনিস বাইরে আর মিলব না। গরমেন্ট (গভর্ণমেন্ট) লাইছেন (লাই-সেন্স) দিয়া কনটোলের দোকান খুলব। গরমেন্ট মাথাপিছু একটা হিসাব ঠিক কইরা দিব। তার বেশি চিনিটিনি পাওয়া যাইব না। এছ-ডি-ও সায়েবেরে ত্যাল দিয়া দেখি একখান লাইছেন পাই কিনা—'

'কনট্রোল যে হবে এ খবর তুই কোথায় পেলি?'

'কয়দিন আগে ঢাকায় গেছিলাম, হেই-খানেই শুইনা আইছি।'

'কবে নাগাদ কনট্রোল হবে, কিছু জানিস?'

'দিন তারিখ জানি না, তবে শিগ্‌গিরই হইব।'

হেমনাথ এবার আর কিছু বললেন না। তাঁর কপালে দুশ্চিন্তার রেখাগুলি গভীর রেখায় ফুটে উঠতে লাগল।

নিত্য দাস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে চাপা গলায় বলল, 'এছ-ডি-ও সায়েবের কাছে তো যাইতে আছি। শুনছি তেনার বড় খাই।'

চমকে হেমনাথ শুধালেন, 'কিসের খাই?'

'ঘুষের। পরস্পর শুনলাম বিনা ঘুষে লাইছেন বাইর করা যাইব না। হেই লেইগা—'

'কী?'

'পাচ শ টাকা আনছি। পাচ শ'তে হইব না হ্যামকত্তা?'

'কী করে বলি? আমি তো আর এস-ডি-ও সাহেবের অন্তর্যামী না।'

'আপনে কত কি দেখছেন, শুনছেন। কত কি জানেন। একটা আন্দাজ যদি দিতেন—'

সে কথার উত্তর না দিয়ে হেমনাথ বললেন, 'কি এমন লাভের কারবার যাতে পাঁচ শ' টাকা ঘুষ দিতে চাইছিস?'

রহস্যময় হেসে নিত্য দাস বলল, 'লাভ আছে হ্যামকত্তা, লাভ আছে। যদি না হইব এই সক্কালবেলা সুজনগঞ্জ থনে দৌড়াইয়া আসুম ক্যান? এছ-ডি-ও'র বাংলায় গিয়া দেখুম আমার আগে আরো কয়জন বইসা আছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমাগো এইদিকে এখনও কনটোল হয় নাই; কিন্তু ইনামগঞ্জে রসুলপুরে হইয়া গেছে। কনটোলের দোকান দিয়া একেকজন লাল হইয়া গেল।'

'লাল কি করে হবে, বুঝতে পারছি না।'

'তার পথ আছে হ্যামকত্তা। আপনে তো আর ব্যবসায়ী না, তা হইলে বুঝতে পারতেন।'

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকলেন।

নিত্য দাস আবার বলল, 'শুধু কাপড়-চিনি-ক্রাচিনের লাইছেন নিতেই আসি নাই হ্যামকত্তা। আরো একখানা কামেও আইছি—'

'কী?'

'উই যেইখানে মিলিটারিগো থাকনের বাড়ি-ঘর উঠছে, তার উল্টাদিকে মদের দোকান খোলনের লাইছেন দিব গরমেন্ট।'

হেমনাথ চমকে উঠলেন, 'রাজদিয়াতে মদের দোকান খোলা হবে!'

'হ।'

'তুই তার লাইসেন্স নিবি নাকি?'

'হেইরকমই ইচ্ছা—'

হেমনাথ এবার প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'না, কিছুতেই না।'

হেমনাথ ধীর স্থির অচঞ্চল মানুষ। কোন ব্যাপারেই তাঁকে অসহিষ্ণু বা বিচলিত হতে দেখা যায় না। হঠাৎ তাঁকে এরকম চেঁচিয়ে উঠতে দেখে সবাই অবাক, কিছুটা বা চিন্তিত।

নিত্য দাস ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কাঁপা গলায় বলল, 'আইজ্ঞা—'

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তুই না ধর্মকর্ম করিস! নারায়ণ সেবা না করে জল খাস না! তোর এত অধঃপতন হয়েছে! মদের দোকান খুলে এখানকার মানুষের সর্বনাশ করতে চাইছিস!'

'কিন্তুক—'

'কী?'

'এয়া তো ব্যবসা; ধম্মের লগে এয়ার সম্পক্ক কী?'

'সম্পর্ক নেই?'

'থাকলেও আমি বুঝতে পারতে আছি না। হে ছাড়া—'

'আবার কী?'

'আমি যদি মদের দোকানের লাইছেন না নেই অন্য কেউ নিয়া নিব—'

'যে খুশি নিক, তুই নিতে পারবি না; এই বলে দিলাম—'

নিত্য দাস উত্তর দিল না। শীতল চোখে হেমনাথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ নামাল। একটু পর চলে গেল সে।

●

নিত্য দাস যা বলেছিল, তা-ই। দেখতে দেখতে খোলাবাজার থেকে চিনি কাপড় এবং কেরোসিন উধাও হয়ে গেল। সুজন-গঞ্জের দোকানদারদের কাছে ধর্না দিলে জোরে জোরে দু' হাত নেড়ে তারা শুধু বলে, 'নাই, নাই—'

চিনি না হলে তবু চলে। কিন্তু কেরোসিন আর কাপড় ছাড়া সংসার অচল। রাজদিয়া, কেতুগঞ্জ, ইসলামপুর, ডাকাইতা পাড়া—সারা তল্লাটের লোক কাপড়-কেরোসিনের জন্য দিগ্বিদিকে ছোটা-ছুটি করতে লাগল।

এই ডামাডোলের ভেতর একদিন দেখা গেল, রাজদিয়াতে কাপড়-কেরোসিন-চিনির জন্য তিনটে কনট্রোলের দোকান বসেছে। একটা কেতুগঞ্জের রায়েবালি শিকদারের, একটা ইসলামপুরের আখিল সাহার। আর তৃতীয়টি নিত্য দাসের।

একজন যাতে বার বার কেরোসিন-টেরোসিন না নিতে পারে সেজন্য পরিবার-পিছু রেশন কার্ডও হল। রেশন কার্ড দেখালে তবেই ঐ দুর্লভ বস্তুগুলো পাওয়া যায়।

আরো কিছুদিন পর রাজদিয়াবাসীরা দেখল, মিলিটারি ব্যারাকের উল্টোদিকে একটা মদের দোকান খোলা হয়েছে। দোকানটার মালিক আর কেউ না স্বয়ং নিত্য দাস।

নিত্য দাস মদের দোকান খুলেছে: এই খবরটা এল দুপুরবেলা। শুনে তক্ষুনি হেমনাথ ছুটলেন। স্নেহলতা বারণ করে-ছিলেন, 'এখন বেরুতে হবে না।'

অবাক বিস্ময়ে হেমনাথ বলেছিলেন, 'বেরুব না, বল কী!'

'বেরিয়ে কী হবে! তার চাইতে দু দণ্ড বিশ্রাম কর।'

'তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হল স্নেহ। মদের দোকান দিয়ে হারামজাদা সারা রাজদিয়াকে জাহান্নামে পাঠাবে, আর ঘরে বসে আমি বিশ্রাম করব!'

ভয়ে ভয়ে স্নেহলতা বলেছিলেন, 'ওখানে গিয়ে তুমি কী করবে?'

শান্ত অথচ কঠিন গলায় হেমনাথ বলেছিলেন, 'যাতে এখানকার সর্বনাশ না করতে পারে, গোড়াতেই তার ব্যবস্থা করব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'এটা ওর ব্যবসা—'

'যে ব্যবসা লোকের ক্ষতি করে তা চালাতে দেওয়া উচিত না। এ ব্যাপারে আমার কর্তব্য আছে।'

হেমনাথকে আটকানো যায় নি; দুপুরের সূর্য মাথায় নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন।

কিছুক্ষণ পর হেমনাথ ফিরে এলেন। এখন আর তাঁর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সমস্ত রক্ত বুঝি মুখে গিয়ে জমা হয়েছে। চোখ দুটো বুঝি ফেটেই যাবে।

উদ্বেগের গলায় স্নেহলতা শুধোলেন, 'কী হয়েছে?'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

স্নেহলতা কাছে এগিয়ে এসে আগের স্বরেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে, বলছ না কেন?'

হেমনাথ এবার বললেন, নিত্য আমাকে অপমান করেছে।' অসহ্য আবেগে তার ঠোঁট এবং কন্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

'অপমান!'

'তা ছাড়া কী?' হেমনাথকে অত্যন্ত উত্তেজিত দেখাল. 'আমি নিত্যকে বললাম দোকান বন্ধ করে দে; কিছুতেই সে শুনল না।'

বিনু - ঝিনুক - অবনীমোহন - সুরমা, হেমনাথকে ফিরতে দেখে সবাই ছুটে এসেছিলেন। কেউ কিছু বললেন না। স্নেহলতাও চুপ করে থাকলেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'সারা জীবন মানুষের হিত ছাড়া অহিত চিন্তা করিনি। যাকে যা বলতাম সে তা-ই শুনত; সেই-মতন চলত। কিন্তু এই শেষবয়সে নিত্য দাস আমার কথাটা রাখল না; আমাকে অমান্য করল।' দুঃখে অভিমানে তাঁর গলা বুজে এল।

আবেগের গলায় স্নেহলতা বললেন, 'তখনই তো তোমাকে বললাম যেও না—'

উত্তর না দিয়ে হেমনাথ ঘরের ভেতর চলে গেলেন; তারপর দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে আচ্ছন্নের মতন বসে থাকলেন।

বিনু দাঁড়িয়ে ছিল। আস্তে আস্তে এক সময় দরজার কাছে এসে উঁকি দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে হেমনাথ যেন একেবারে ভেঙেচুরে গেছেন। তাকে ক্লান্ত, পরাভূত, মলিন দেখাচ্ছে।

দাদুর অবস্থা খানিকটা যেন অনুমান করতে পারছিল বিনু। রাজদিয়াকে ঘিরে বিশ-প'চিশ মাইলের মধ্যে যত গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ, সব কিছুর ওপর ঈশ্বরের মতন ব্যাপ্ত হয়ে আছেন হেমনাথ। তিনি আঙুল দেখালে চারদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে। সবাই তাঁকে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে।

যে মানুষ এতকাল শুধু সম্মানই কুড়িয়েছেন, যাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল সম্রাটের মতন, জল-বাঙলার এই জায়গাটুকু জুড়ে সহস্র হৃদয়ে যাঁর সিংহাসন পাতা, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সেই হেমনাথ আজ প্রচন্ড আঘাত পেয়েছেন। নিত্য দাস অবাধ্য হবে হেমনাথের পক্ষে তা ছিল অকল্পনীয়। এই একটি আঘাতে তাঁকে একেবারে চুরমার করে দিয়েছে।

অবনীমোহনরা এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। স্নেহলতা হঠাৎ ফিসফিস গলায় বললেন, 'কী লক্ষ্মীছাড়া যুদ্ধ যে বাধল! মানুষকে একেবারে বদলে দিচ্ছে! ঐ নিত্য দাস আগে আগে এ বাড়িতে পড়ে থাকত। একটা পয়সা ছিল না তার। তোমার মামাবাবু টাকা দিয়ে ব্যবসায় বসিয়ে দিলে। সেই থেকে তার উন্নতি। এখন তার আড়তে সব সময় দু-তিন হাজার মণ ধান মজুত থাকে; যখন-তখন দশ-বিশ হাজার টাকা বার করে দিতে পারে। যার জন্যে এত, তার কথাটাই রাখল না নিত্য দাস।'

অবনীমোহন কিছু বললেন না, বিব্রত মুখে তাকিয়ে থাকলেন।

●

দিন কয়েক পর সন্ধ্যার সময় যথা-রীতি খবর-কাগজ পড়ার আসর বসেছে। ইচু মন্ডল হাচাই পালরা অন্ধকার নামতে না নামতেই এসে হাজিরা দিয়েছে।

অবনীমোহন পড়ছিলেন, 'রেঙ্গুনের পতন। মাত্র কয়েকদিন আগে সিংগাপুর অধিকার করিবার পর জাপ বাহিনী আজ রেঙ্গুন দখল করিয়াছে। মিত্রসেনারা সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিতেছে।'

'জাপানী আক্রমণের আতঙ্কে কলিকাতা সন্ত্রস্ত। মহানগরী ত্যাগ করিয়া বহু লোকের নানা দিকে পলায়ন—'

হঠাৎ পড়া থামিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'কলকাতায় ইভাক্যুয়েসন শুরু হয়ে গেল মামাবাবু—'

এর ভেতর সেদিনের সেই আঘাতটা অনেকখানি সামলে নিয়েছেন হেমনাথ। বললেন 'তাই তো দেখছি। আমার মনে হয়, রাজদিয়ার লোক যারা কলকাতায় থাকে, তারাও চলে আসবে।'

হেমনাথ যা অনুমান করেছেন তা-ই। দু-একদিনের ভেতর দেখা গেল স্টিমার বোঝাই হয়ে রাজদিয়ার প্রবাসী সন্তানরা জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে চলে আসছে। দেখতে দেখতে নাহাপাড়া, গুহ-পাড়া, দত্তপাড়া, আদালতপাড়া, কলেজ-পাড়ার ফাঁকা বাড়িগুলো ভরে গেল।

কলকাতা থেকে যারা এসেছে তাদের মুখে চমকপ্রদ সব খবর পাওয়া যাচ্ছে। জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতন কল-কাতার লোকেরা নাকি যে যেদিক পারছে পালাচ্ছে। রেলওয়ে বুকিং অফিসগুলোতে দু মাইল লম্বা 'কিউ' পড়েছে। কিন্তু টিকিট মিলছে না; ন্যায্য দামের সঙ্গে দুগুণ তিনগুণ ঘুষ দিয়েও না। হাওড়া আর শিয়ালদা স্টেশনে ঢোকবার উপায় নেই। একেক ট্রেনে দশটা ট্রেনের যাত্রী উঠছে। বেঞ্চির তলায় পা রাখবার জায়গা নেই। সেখানে মানুষ। ক্যান্টিন, পা-দানী, এমন কি ছাদের ওপর উঠেও মানুষ পালাচ্ছে। ছাদে যারা ওঠে তাদের মধ্যে কত লোক যে ওভার ব্রীজে ধাক্কা খেয়ে মরেছে, হিসেব নেই।

মারোয়াড়ী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটিরা জলের দরে বাড়ি বেচে দিচ্ছে। রেলের আশায় তারা কলকাতায় বসে থাকছে না। স্রেফ পা দু-খানার ওপর ভরসা করে গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড ধরে পাড়ি জমাচ্ছে। বাঙালীরা বেশির ভাগ যাচ্ছে গ্রামের দিকে। যাদের অনেক পয়সা তারা মধুপুর, গিরিডি, ঘাটশিলাতে গিয়ে টপাটপ বাড়ি কিনছে। প্রাণের মায়া বড় কঠিন মায়া।

ত্রৈলোক্য সেনরা আসার পর সমাচার খবর শুনবার জন্য রাজদিয়াবাসীরা তাঁর কাছে ছুটত। বর্মা সম্বন্ধে উৎসাহ মলিন হয়ে গেছে। এখন কলকাতার খবর শুনতে এখানকার লোকরা নাহাপাড়ায়, আদালত-পাড়ায়, দত্তপাড়ায় ছুটছে।

সব শুনে অবনীমোহন সুরমাকে বলেন, 'এখানে জমিজমা কিনে বুদ্ধিমানের কাজই করেছিলাম, না কি বল?'

সুরমা বলেন, 'ভাগ্যিস কিনেছিলে। নইলে এ সময় কোথায় যে যেতাম!'

ঝিনুকও কলকাতা থেকে লোক পালানোর খবর শুনেছিল। এ সব কথা যখন হত, অসীম আগ্রহে সে গিলতে থাকত।

একদিন সবার আড়ালে ঝিনুক বলল, 'আচ্ছা বিনুদা—'

বিনু বলল, 'কি?'

'কলকাতা থেকে লোক তো পালাচ্ছে—'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ঝুমারাও আসবে?'

ঝুমাদের কথা অনেকদিন ভাবে নি বিনু। ঝিনুকের কথায় হঠাৎ চকিত হয়ে উঠল। তাই তো, কলকাতা থেকে সবাই চলে আসছে। ঝুমারা তো এখনও এল না!

(ক্রমশঃ)

রমেশ দত্তের
রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (২১)
চিত্রকল্পনা- প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে- চিত্রসেন

আপনি কী নাটকীয় আচরণ করেন?

অনেকে আছেন, চলাফেরা বসা দাঁড়ানো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে খুব সযত্নে চেষ্টা করেন এবং ঐভাবেই ব্যক্তিত্বের রূপকে সজীব প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তোলার আগ্রহ বোধ করেন।

এই চেষ্টা, এই আগ্রহ যদি অত্যধিক পরিমাণে পোষণ করা হতে থাকে, তাহলে আপনি পাঁচজনের কাছে এমন একটি মানুষ হয়ে দাঁড়াবেন, যেন আপনি সবসময়ে সবার মনে একটা ছাপ রেখে যাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

আমাদের মধ্যে এই যে নাটকীয় আচরণ করবার ঝোঁক আছে, এটা যদি ঠিকমতো বুঝতে পারি এবং সেটাকে সংযত করে বুঝেসুঝে কাজে লাগাই, তাহলে কোনো ক্ষতি নেই।

তবে, এই ঝোঁকটা যখন খুব প্রবল হয়ে উঠে আমাদের স্বাভাবিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করে, তখনই মনে হয় নিজেকেই ঠকাচ্ছি আর প্রায়ই লোকের কাছে হাসির খোরাক হয়ে দাঁড়াই। এবং এটা বন্ধুবান্ধবদের বিরক্তিরও সৃষ্টি করে, তাই না?

নিচের টেস্ট দিয়ে নিজেকে একবার চেক করে দেখে নিন। প্রশ্নগুলিতে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিতে থাকুন। শেষে পয়েন্ট হিসাবের নিয়ম দেওয়া আছে, সেটি পরে দেখবেন এবং আপনি কতো পেলেন কষে দেখে নেবেন।

১। আপনি যাঁদের প্রশংসা করেন, তাঁদের পোষাক-আশাক, ভাবভঙ্গী নকল করেন কি?

২। নিজের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে জানলে—যেমন সুশ্রী, গম্ভীর, রূপসীসুলভ ইত্যাদি—তাহলে কি ঠিক সেই মতো পোষাক পরে সাজেন এবং সেইমতো আচরণ করেন?

৩। আয়নায় আপনি কি নিজেকে দেখেন এবং নিজের ভাবভঙ্গী আচরণ …নটা কেমন জুতসই হচ্ছে, তা যাচাই করেন?

৪। ঐসব ভাবভঙ্গী আচরণগুলি আপনি প্রকাশ্যে পাঁচজনের সামনেও ইচ্ছে করে করেন?

৫। নিজে কথা বলে নিজেই শুনতে ইচ্ছে হয় কি আপনার?

৬। কোনো পার্টিতে বা অনুষ্ঠানের মধ্যে লোক দেখিয়ে প্রবেশ করতে আপনার কি বেশ ভালো লাগে?

৭। কোথাও যাবার কথা থাকলে সেখানে দেরী করে যাওয়াই কী আপনার ঝোঁক—যাতে সকলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন?

৮। পাঁচজনের ব্যাপারে মাথা না গলিয়ে আপনি কি নিজের ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন?

৯। যখন কেউ সকলের আগ্রহ আকর্ষণ করে নেয়, সবাই তার দিকেই মন দেয়, তখন কী আপনার খুব বিশ্রী লাগতে থাকে?

১০। আপনার মতো অতটা সুশ্রী, জনপ্রিয়, কিংবা চালাক-চতুর নন যাঁরা, তাঁদের কী আপনি বন্ধু হিসাবে বেশি করে পেতে চান?

১১। আপনার তোষামোদী এবং প্রশংসা শুনলে আপনি কী পরমাগ্রহে তার স্বাদ উপভোগ করেন?

১২। যখন লোকে আপনাকে একবার দেখার পর আবার ফিরে তাকায়, আড়চোখে কিংবা হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে থাকে, জিগ্যেস করে আপনি কে—তখন কী আপনি পুলক অনুভব করেন?

১৩। আপনি কী নিজের কথা, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ, হতাশা-ব্যর্থতা—এসব নিয়ে খুব সিরিয়াসলি ভাবেন?

১৪। আপনাকে যারা গুরুত্ব দিতে চায় না, আপনি কী তাদের অপছন্দ করেন?

১৫। আপনার ভাব-আবেগ এবং যৌন-অনুভূতি সম্পর্কে খুব তীব্রতা বোধ করেন কি?

১৬। আপনি কী সুখ-তৃপ্তির চরম শিখরে বিচরণের নেশা কিংবা বিষন্নতার সুগভীর নরককুন্ডে নেমে যাওয়ার রুদ্ধশ্বাস হতাশা অনুভব করেন?

১৭। আপনার কি মাঝে মাঝে মনে হয় জগতের কেউ আপনাকে বোঝে না?

১৮। লোকে যখন আপনার প্রতি সহানুভূতি দেখায়, আপনি কী তখন নিজের কথা খুব বেশি করে বলতে থাকেন?

১৯। আপনি কী নিজের আচরণকে হঠাৎ সবার কাছে প্রকট করে তোলেন অর্থাৎ যাকে বলে 'সীন ক্রিয়েট' করেন—যেমন, ঝগড়া-তর্কাতর্কি হওয়ার পর দড়াম করে দরজা বন্ধ করা, কেউ আপনাকে অপদস্থ করলে তার কাছ থেকে উঠে চলে যাওয়া, বিয়ে বাড়ীতে কিংবা পার্টিতে অনুষ্ঠানে হঠাৎ মেজাজ দেখিয়ে ফেলা?

২০। আপনি কী কখনো কোনো কাজ হাসিল করার জন্যে জেনে-শুনে ইচ্ছে করে নিজের গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলি জাহির করেন এবং অভিমান করে মেজাজ দেখান, যাতে লোকে আপনাকে ভালো বলে কিংবা আপনার জন্যে মনে কষ্ট পায়?

প্রত্যেকটি 'হাঁ' জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন।

হিসেব করে সামঞ্জস্য রেখে একটু-আধটু নাটকীয় আচরণ করলে আমাদের ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যই বাড়ে। এই কথা বিবেচনা করেই বলা যেতে পারে, ৫০ পয়েন্ট পেলেই ভালো; এরই একটু বেশি ৬০ এবং একটু কম ৪০ পয়েন্ট পেলেও সন্তোষজনক।

যদি ৬০ পয়েন্টের বেশি পান, তাহলে খুব সাবধান হয়ে লক্ষ্য করুন—লোকে হয়তো আপনার আচরণকে ভণিতা-ভড়ং মনে করছে, আপনার মধ্যে খুব সম্ভব লোক-দেখানো স্বভাব এবং অহঙ্কার জাগছে।

যদি আপনি ৪০ পয়েন্টেরও কম পেয়ে থাকেন, তাহলে বলবো, খুব সম্ভব আপনার কল্পনাশক্তি বড়ই অল্প এবং আপনি এতো বৈচিত্র্যহীন মানুষ যে, ভালো-মানুষটির মতো নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে অহেতুক জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা আপনার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

শোকের ছবি

নির্মলেন্দু গৌতম
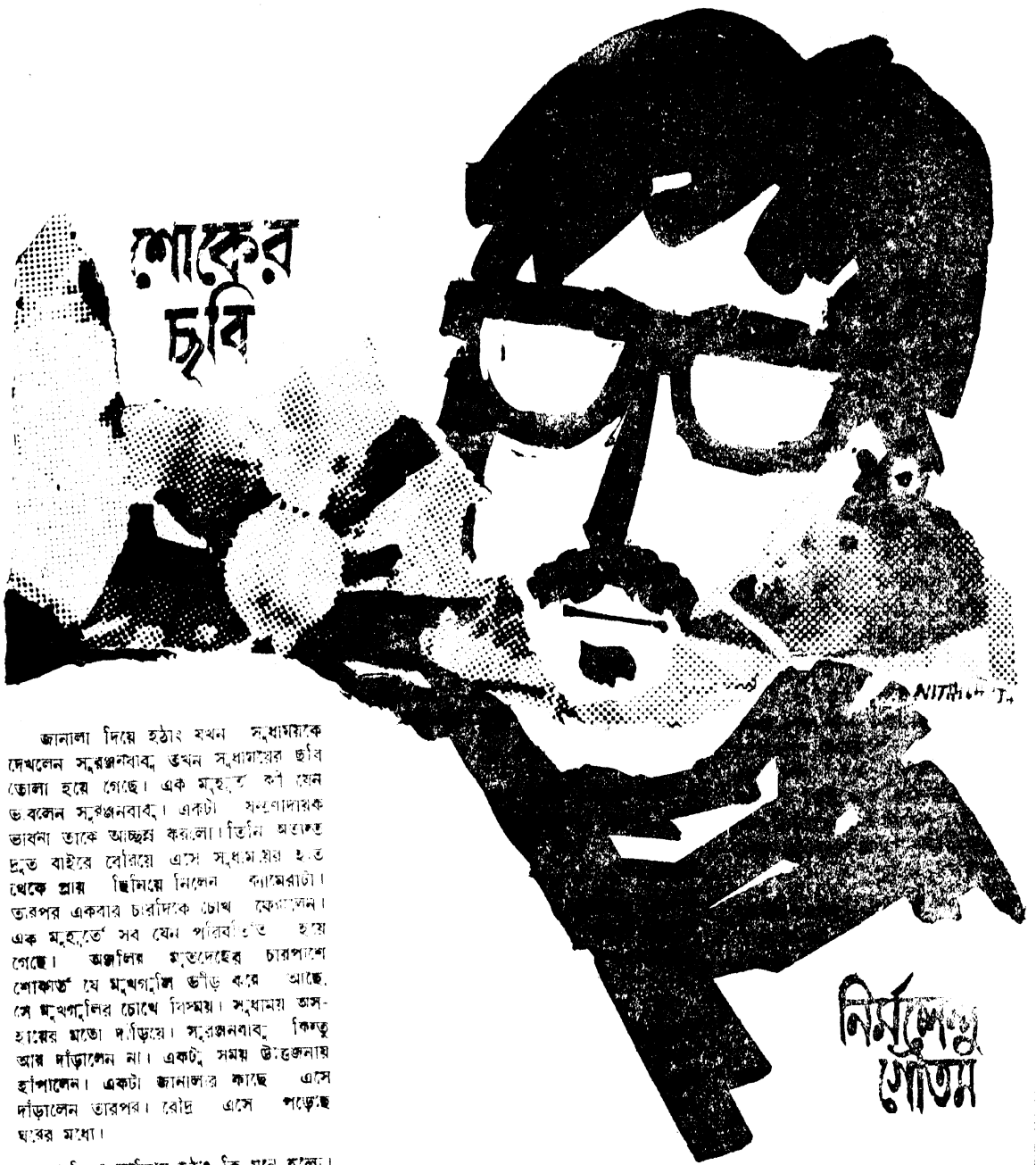
জানালা দিয়ে হঠাৎ যখন সুধাময়কে দেখলেন সুরঞ্জনবাবু তখন সুধাময়ের ছবি তোলা হয়ে গেছে। এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন সুরঞ্জনবাবু। একটা যন্ত্রণাদায়ক ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করলো। তিনি অত্যন্ত দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে সুধাময়ের হাত থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন ক্যামেরাটা। তারপর একবার চারদিকে চোখ ফেরালেন। এক মুহূর্তে সব যেন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অঞ্জলির মৃতদেহের চারপাশে শোকার্ত যে মুখগুলি ভীড় করে আছে, সে মুখগুলির চোখে বিস্ময়। সুধাময় অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে। সুরঞ্জনবাবু কিন্তু আর দাঁড়ালেন না। একটু সময় উত্তেজনায় হাঁপালেন। একটা জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন তারপর। রৌদ্র এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে।

সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ কি মনে হলো। এগিয়ে এসে জানালার গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন তিনি। গনগনে সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে। একবার সেই দিকে তাকিয়ে তিনি ফিল্ম না ঘুরিয়ে ক্যামেরার সাটার টিপলেন। আর কিছু ভাবলেন না, ভাবতে পারলেনও না। অবসন্ন পায়ে ঘরের মধ্যে কেবল পায়চারি করতে থাকলেন।

সময় গড়িয়ে এক সময় অন্ধকার হলো। এর মধ্যে সুরঞ্জনবাবু অজস্র কান্নার শব্দ শুনেছেন। দরজা ঠেলবার শব্দ শুনেছেন অনেকবার। তার নাম ধরে অনেকবার যে অনেকে ডেকেছে তাও শুনেছেন। জানলায় ছায়া-ছায়া কিছু মুখও দেখেছেন তিনি।

কিন্তু সুরঞ্জনবাবু তবুও দরজা খোলেন নি, সাড়াও দেন নি। তাঁকে কে যেন চৈতন্যের গভীরে ঠেলে দিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সেখান থেকে কিছুতেই উঠতে পারছিলেন না।

ঘরের মধ্যে যখন অন্ধকার আরো গভীর হলো তখন জানালা দিয়ে শীলার কণ্ঠস্বর শুনলেন তিনি। সম্ভবত সাড়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে।

শীলা কান্নায় অবরুদ্ধ গলায় বললো, 'তুমি একবার দরজাটা খুলে দাও বাবা।'

সুরঞ্জনবাবু একটু স্থির হয়ে রইলেন। নিজেকে গুটিয়ে নিলেন খানিকটা। তারপর অন্ধকারের মধ্যে দরজাটা খুঁজলেন।

শীলার সেই গলা আবার শুনতে পেলেন সুরঞ্জনবাবু। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারের হাতলের ওপর ক্যামেরাটা রেখে দরজার দিকে এগিয়ে এলেন। প্রায় একবারেই খুঁজে পেলেন সিটকিনিটা।

দরজা খুলতেই খানিকটা আলো পড়লো

ঘরের মধ্যে। সেই আলোয় পা রেখে বাইরে এলেন সুরঞ্জনবাবু।

শীলা ভাঙাগলায় বললো, 'তুমি সারাদিন অমনি করে আছো বলে তোমার জন্যেও আমাদের ভাবনা হচ্ছে বাবা।'

শীলার শেষের দিকে কথা কান্না হয়ে ঝরলো।

সুরঞ্জনবাবু কোনো কথা বললেন না। নিঃশব্দে আলোর দিকে ফিরে চোখ কুঁচকে রইলেন।

শীলা সুরঞ্জনবাবুকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকলো। শীলার চেহারা খানিকটা অঞ্জলির মতো। সুরঞ্জনবাবুর গলায় একটা ব্যথা দলা পাকিয়ে উঠলো। হাত দুটো অসহায়ভাবে মুঠো করলেন তিনি।

সুইচ অন করবার শব্দ শুনলেন সুরঞ্জনবাবু। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতরটা আলোয় ভরে উঠলো অনুভব করতে পারলেন। ফিরে দাঁড়ালেন তিনি। আলোকিত ঘরের মধ্যে শীলা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। শীলাকে খানিকটা না নাড়ালে শীলা হয়তো সত্যি সত্যি পাথর হয়ে যাবে। সুরঞ্জনবাবু অনুভব করলেন। একটু দ্রুত এগিয়ে এসে তিনি শীলার কাঁধে হাত রাখলেন। শীলা নড়ে উঠলো। মৃদু এবং সংযত স্বরে সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'আলোটা জ্বলেই থাক।'

শীলা ভাঙাগলায় বললো, 'তোমার জন্যে খানিকটা দুধ নিয়ে আসি বাবা।'

সুরঞ্জনবাবু কিছু বললেন না। শীলা চলে গেল দুধ আনতে।

ক্যামেরাটা এবার ড্রয়ারে রাখলেন সুরঞ্জনবাবু। নিজের হাতে চাবি দিলেন ড্রয়ারে। ফের বসলেন। অঞ্জলির কথা ভাবলেন। সে আর নেই। তার শরীর এখন একরাশ ছাই হয়ে নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছে।

সুরঞ্জনবাবু ইজিচেয়ারে মাথা ঝুঁকিয়ে শীলার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন।

দিন কয়েক সুরঞ্জনবাবুর এমনি স্বেচ্ছা-নির্বাসনে কাটলো। কেবল শীলা সময় করে এসে তার পাশে বসে থেকেছে। শীলার চোখের দিকে তাকিয়ে সুরঞ্জনবাবুর মনে হয়েছে, সে বড়ো হচ্ছে ক্রমশ, বিস্তৃতও হচ্ছে। নিঃসঙ্গও হচ্ছে সেই সঙ্গে।

এ দু'দিন আর কেউ সুরঞ্জনবাবুর ঘরের কাছেও আসে নি। হয়তো আসতো, কিন্তু তিনি জানেন শীলাই কাউকে আসতে দেয় নি। এ নির্বাসন যে সুরঞ্জনবাবুর হৃদয়ের বিশেষ খানিকটা অংশের নির্বাসন, শীলা নিশ্চয়ই সে কথা অনুভব করেছে।

তৃতীয় দিন বিকেলে শীলাই তাকে জোর করে নিয়ে বের হলো। বাড়ি থেকে বেরিয়ে শীলার পাশে পাশে সোজা হাঁটতে থাকলেন সুরঞ্জনবাবু। চারদিকের সমস্ত দৃশ্য, শব্দের মধ্যে সুরঞ্জনবাবুর নিজেকে যথার্থই বেদনার্ত এবং বিষণ্ণ মনে হলো, কিন্তু তবু সেই বেদনা তাকে নির্বাসন দিলো না। বরং ক্রমশ তাকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে থাকলো। তিনি যেন শিশুর মতো টলতে টলতে ফিরতে থাকলেন নির্বাসন থেকে।

শীলা বেশী কথা বললো না। শুধু কিছুটা হাঁটবার পর শুধালো, 'হাঁটতে তোমার ভালো লাগছে তো বাবা?'

সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'হুঁ।'

শীলা ফের বললো, 'পার্কটা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসবো আমরা কি বলো?'

'আচ্ছা।'

নিঃশব্দে হাঁটতেই থামলো দু'জন। পার্কটা আর বেশী দূরে নয়। পার্কের মোড়ে জ্বলতে থাকা রেডলাইটটা সুরঞ্জনবাবু এখন দেখতে পাচ্ছেন।

তিনি সুধাময়ের কথা ভাবলেন। অবশ্য ভাববার কারণ আছে। আলোয় ঝলমল একটা ফটোর দোকানের পাশ দিয়ে তাঁরা হেঁটে এলেন এই মাত্র।

সুরঞ্জনবাবুর কাছে ক্যামেরাটা নিতে আসে নি সুধাময়। এ বাড়িতে তারপর দু'দিন যার দুয়েক করে এসেছে সে। তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সে ক্যামেরা চাইতে আসে নি। বাড়ির আর কেউ এ সম্পর্কে সুরঞ্জনবাবুকে কিছু বলেও নি। শীলাও না। সবাই নিশ্চয়ই এ-ব্যাপারটাকে তার খ্যাপামি বলে ধরে নিয়েছে। সেজন্যে হয়তো অনেকটা পরে, অনেক কৌশলে তার কাছে ক্যামেরা'র কথা শুনতে চাইবে। মনে মনে হাসলেন সুরঞ্জনবাবু।

অথচ তিনি নিজেই এবার সুধাময়কে ডেকে দিয়ে দেবেন ক্যামেরাটা। ফিল্মটা গুটিয়ে রেখে দিয়েছেন তিনি। একটা ছবিই মাত্র তোলা হয়েছিল সেই ফিল্মটাতে। অঞ্জলির মৃত শরীরের ছবি।

সঙ্গে সঙ্গেই তো সুরঞ্জনবাবু ক্যামেরা কেড়ে নিয়েছেন।

পার্কের কাছাকাছি আসতেই শীলা বললো, 'একটু ভেতরে বসবে নাকি বাবা?'

সুরঞ্জনবাবু একটু সময় ভাবলেন। তারপর মৃদুগলায় বললেন, 'বসবো।'

দুজন সোজা পার্কের ঘাসের ওপর এসে বসলেন। ভেতরে বেশ ভীড় ছিলো। ভীড়ের মধ্যেই বসতে ভালো লাগছে সুরঞ্জনবাবুর। শীলাও ভীড়টাকে পছন্দ করছে বলে সুরঞ্জনবাবুর মনে হলো।

'তোমার শরীর খারাপ লাগছে না তো বাবা?'

'না। বরং ভালোই লাগছে।'

'সেজন্যেই তোমায় নিয়ে এলাম আজকে।' শীলা বললো, হাঁটুর ওপর আলগোছে তার থুতনি রেখে। সুরঞ্জনবাবু দেখলেন, শীলা শিশুর মতো খানিকটা খুশী হয়ে উঠলো। তাকে খুশী করবার জন্য শীলা আশ্চর্যভাবে চেষ্টা করছে। সুরঞ্জন-বাবু অনুভব করলেন। এই মুহূর্তে অঞ্জলির জন্য তীব্র একটা শোক সুরঞ্জন-বাবুকে দহন করতে থাকলো।

পার্কের মধ্যে অনেকক্ষণ শীলার সঙ্গে বসলেন সুরঞ্জনবাবু।

এক সময় শীলা হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, 'এবার উঠতে হবে বাবা। নাহলে বাড়িতে সবাই ভাববে।'

সুরঞ্জনবাবু নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লেন। বললেন, 'চলো।'

শিথিল পায়ে দুজনে পার্কের ঘাস মাড়িয়ে বাইরে এলেন। ফুটপাথ জুড়ে লোক চলেছে। রাস্তায় ট্রাম-বাসের ছুটো-ছুটি, ঝোড়ো শব্দ। সুরঞ্জনবাবু শীলাকে পাশে রেখে এই সমস্ত শব্দ এবং দৃশ্যের মধ্যে বিস্তৃত হতে হতে হাঁটতে থাকলেন।

দু'দিন পর বাড়ির ভেতর থেকে সুধা-ময়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন সুরঞ্জনবাবু। তার কথাই সুরঞ্জনবাবু ভাবছিলেন। আজ ক্যামেরাটা ফিরিয়ে দেবেন সুধাময়কে। ক্যামেরাটা নিয়ে যাক সুধাময়। মিছিমিছি ওর কাজের জিনিসটাকে আটকে রেখে লাভ কি! সুরঞ্জনবাবুর তো কেবল ফিল্মটার দরকার ছিলো।

ড্রয়ার খুলে ক্যামেরাটা বের করলেন সুরঞ্জনবাবু। বেশ দামী ক্যামেরা। অসম্ভব সৌখিন এই সুধাময়। ছবি তোলা ওর নেশা। অঞ্জলির ছবিও নিজেই তুলতে এসেছিলো। বাড়ি থেকে আর কে ওকে ছবি তুলতে বলে আসবে?

সুধাময়কে যদি ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে ঢুকে দেখতেন সুরঞ্জনবাবু তাহলে নিশ্চয়ই এমন একটা ঘটনা ঘটতো না।

অঞ্জলিকে যখন বাইরে আনা হয়েছিল তখন সুরঞ্জনবাবু ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে বসেছিলেন। বাইরে, অঞ্জলির মৃত শরীরের সামনে দাঁড়াতে পারছিলেন না কিছুতেই। নিজেকে তার ভেঙে চৌচির হয়ে যাওয়া মনে হচ্ছিল। সুতরাং সুধাময়ের প্রবেশ তার চোখে পড়বার কথা নয়।

সুধাময় বোধহয় চলে যাচ্ছে। সুরঞ্জনবাবু দ্রুতপায়ে দরজার সামনে এলেন। লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে যাচ্ছে সুধাময়।

সুরঞ্জনবাবু তাড়াতাড়ি ডাকলেন, 'সুধাময়।'

সুধাময় ফিরে দাঁড়ালো দরজার সামনে পৌঁছে।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে আমার।'

দরজা থেকে ফিরে এলো সুধাময়।

সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'তোমার ক্যামেরাটা নিয়ে যাও।'

সুধাময় অবাক চোখে তাকালো।

সুরঞ্জনবাবু সুধাময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তার অবাক হওয়াটুকু দেখলেন। কাছে এসে বললেন, 'তোমার দরকারী জিনিসটা আমি আটকে রেখেছি।'

সুধাময় কিছু একটা বলতে চাইলো, কিন্তু বলতে পারলো না। হাত বাড়িয়ে ক্যামেরাটা নিলো শুধু। তারপর ক্যামেরার দিকে একবার তাকিয়ে বললো, 'ফিল্মটা খুলে নিয়েছেন?'

সুরঞ্জনবাবু সংক্ষেপে বললেন, 'হুঁ।'

ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে সুধাময় বললো, 'আমি যাই এবার।'

সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'এসো।'

সুধাময় চলে গেল। সুরঞ্জনবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে সুধাময়ের চলে যাওয়া দেখলেন।

সুধাময় কি ভাবলো সুরঞ্জনবাবু তা ভাবতে চেষ্টা করলেন। তবে সমস্ত

ব্যাপারটা সুধাময়ের কাছে অস্পষ্ট নিশ্চয়ই। বস্তুত সুরঞ্জনবাবু নিজের সমস্ত ব্যাপারটাকে গুছিয়ে ভাবতে পারছেন না।

সুরঞ্জনবাবু ঘরের মধ্যে এলেন। রোদ পড়ে আসছে। যতোটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে, তাতোটুকুই স্নিগ্ধ নীল। মনটা অসম্ভব বিষণ্ণ হলো সুরঞ্জনবাবুর। তিনি অঞ্জলির জন্য শোকার্ত্ত হলেন। বুকের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভব করলেন খানিকটা। অসম্ভব একটা নিঃসঙ্গবোধে পীড়িত হলেন।

ইজিচেয়ারটাতে পিঠ ঠেকিয়ে বসে এবার তিনি একটা সিগারেট ধরালেন। নিঃসঙ্গ বোধটুকু থেকে উত্তীর্ণ হতে আন্তরিক চেষ্টা করতে লাগলেন তারপর। কিন্তু পারলেন না। অঞ্জলি যে তার একমাত্র সঙ্গিনী ছিলো, সে নেই বলেই কথাটাকে অনুভব করতে পারছেন তিনি।

অঞ্জলির বিশেষ কিছু মুহূর্তের মুখ মনে পড়লো তার। বিশেষ করে তার ক্লান্ত ভঙ্গীটুকু। ক্লান্ত হলে অঞ্জলির মুখ বিষণ্ণ কিছু রেখায় ভরে যেতো। ঘরের মধ্যে এসে বসতো অঞ্জলি। সুরঞ্জনবাবু স্পষ্টই অনুভব করলেন রেখাগুলো বিস্তৃত হয়ে বিচ্ছিন্ন রেখার মতো চতুর্দিকে ছড়াতো। তারই মধ্যে কখন যে সুরঞ্জনবাবু আবদ্ধ ত তিনি জানতেন না।

আশ্চর্য, এখনও, এই মুহূর্তে সুরঞ্জনবাবু সেই রেখাগুলোকে তার ঘরের মধ্যে অনুভব করলেন। কান্নার একটা মৃদু শব্দ তাঁর চৈতন্যের গভীরে শুরু হলো। সেই শব্দ তাকে অসম্ভবরকম দুর্বল করলো। অথচ সেই দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য তিনি চেষ্টা করতে পারলেন না। অঞ্জলি যেন ঘনিষ্ঠভাবে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে খানিকটা সময় প্রার্থনা করছে করজোড়ে।

এমনি আচ্ছন্নের মতো সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইলেন সুরঞ্জনবাবু। তারপর উঠে আলো জ্বাললেন। সুটকেশ থেকে শার্ট আর কাপড় বের ক'রে পরলেন। বেদনার একটা তীব্র প্রবাহে নিজেকে তার সমস্ত কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন মনে হবার এই অনুভূতি থেকে উত্তীর্ণ হতে চাইলেন না তিনি। কারণ অঞ্জলিকে যেন আর বেদনার স্রোতের মধ্যে ছাড়া তিনি ফিরে পাবেন না।

শীলা ঘরে এলো। তাকে জামাকাপড় পাল্টাতে দেখেই সম্ভবত এলো। শীলাকে নিঃসঙ্গ দেখায় আজকাল। মৃত্যুটা এখন গোটা সংসারের মধ্যে বাস করছে। সুরঞ্জনবাবু তা স্পষ্টই অনুভব করতে পারেন।

'তুমি বাইরে যাচ্ছো নাকি?' শীলা শুধালো।

সুরঞ্জনবাবু শীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। আজ তো সারাদিন ঘরের মধ্যে আছি।

শীলা বললো, 'একটু তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।'

সুরঞ্জনবাবু বুঝতে পারলেন, শীলার কথাটার মধ্যে নিজের উদ্বিগ্ন মনটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। কারণ এমন কোনো কারণই নেই, যাতে সুরঞ্জনবাবুর একান্ত তাড়াতাড়ি ফেরা প্রয়োজন। ভেতরে ভেতরে আশ্চর্য একটা সুখে সুরঞ্জনবাবু প্লাবিত হলেন।

বললেন, 'আচ্ছা।'

শীলা তার খুলে রাখা জামাকাপড় গুছোচ্ছে। সুরঞ্জনবাবু টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই পকেটে ভরে ঘর থেকে বেরুলেন। বেরুবার আগে আরেকবার দেখলেন শীলাকে।

বাইরে গলির মধ্যে নেমে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। আলোর তলায় গলিটা অসম্ভব স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হয়ে আছে। দিনের বেলাতেও গলিটা এতো স্পষ্ট নয়। সুরঞ্জনবাবুর মনে হলো। সিগারেটটা দু আঙুলের ফাঁকে ধরে রেখে ধীরপায়ে সুরঞ্জনবাবু গলিটা অতিক্রম করে বড়ো রাস্তায় এলেন।

একটু এগিয়ে বাসস্টপ। সুরঞ্জনবাবু সিগারেটটা দ্রুত ফুরিয়ে ছুঁড়ে দিলেন রাস্তার ওপর। তারপরে বাসস্টপে এসে দাঁড়ালেন।

বাসস্টপের ভীড়টাকে উপচে ওঠা মনে হলো হঠাং। সুরঞ্জনবাবু খানিকটা সরে দাঁড়ালেন।

মাত্র গোটা চারেক স্টপ তাঁকে যেতে হবে। চারটা স্টপ তিনি হেঁটে যেতেও পারেন। তাঁর শরীর, বয়স এবং মন বাসে উঠবার পক্ষে অত্যন্ত অসমর্থ বলে মনে হলো তাঁর।

কাজে কাজেই ফের একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন। ঘড়ি দেখলেন। শীলা তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে। অঞ্জলির মৃত্যুর পর শীলা আশ্চর্যভাবে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। শীলার চোখ সবসময় সুরঞ্জনবাবুর চতুর্দিকে। আশ্চর্য চোখ শীলার। চোখ দুটো অসম্ভব কোমল, অসম্ভব ভীরু। ঠিক মায়ের মতো চোখ শীলার। শীলা তার মা হয়ে গেছে।

স্ত্রীর মৃত্যু এবং মেয়ের মা হয়ে যাবার কথাটা বিষণ্ণ একটা সুখে ভরে দিলো সুরঞ্জনবাবুকে। ফুটপাথের আলো, ঠাসাঠাসি ভীড়, অজস্র শব্দ ইত্যাদির মধ্যে কেমন একা হয়ে গেলেন তিনি। আস্তে আস্তে সিগারেট টানতে টানতে খানিকটা ঝুঁকে কেবলমাত্র ফুটপাথের দিকে হাঁটতে থাকলেন।

অমলের ছবির দোকানের সামনে এসে থেমে গেলেন সুরঞ্জনবাবু। অমল একটু ব্যস্ত। ফুটপাথ থেকে দোকানের মধ্যে উঠে এলেন ধীর পায়ে। বুকের মধ্যে তীব্র একটা উত্তেজনা অনুভব করলেন সুরঞ্জনবাবু।

অমল ব্যস্ততার মধ্যেও বললো, 'বসুন কাকাবাবু।'

একটা চেয়ারে বসলেন তিনি।

গতকাল এখানে এসেছিলেন ফিল্মটা নিয়ে। সেটা রেখে গেছেন। একটাই ছবি তোলা হয়েছিলো ফিল্মটাতে। অঞ্জলির মৃত শরীরের ছবি। সে ছবি নিশ্চিতই নষ্ট হয়ে গেছে। সুরঞ্জনবাবু গনগনে সূর্যের দিকে ক্যামেরার মুখ ফিরিয়ে ফিল্ম না ঘুরিয়ে সাটার টিপেছেন। অবশ্য অমলকে সে কথা বলেন নি। কেবল ধুতে দিয়ে গেছেন ছবি।

সুধাময় কি ভেবেছে ক্যামেরাটা নেবার সময় অমলের ছবির দোকানে বসে ফের তা ভাবতে চেষ্টা করলেন সুরঞ্জনবাবু। সুধাময় একটা বিস্মিত রহস্যে নিশ্চয়ই বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

অথচ সুরঞ্জনবাবু যে কারণে ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়েছেন তার মধ্যে কোনো রহস্য নেই। কোনো বিষয়ও নেই। সুধাময় অঞ্জলির ছবি তোলেনি, তুলেছে দুঃসহ একটা শোকের ছবি। অঞ্জলির ছবি সে আগে আরো অনেক তুলেছে। অ্যালবাম খুললেই সেসব ছবি চোখে পড়ে। সুতরাং অঞ্জলির মৃত্যুর পরে তার ছবি তোলা মানেই একটা দুঃসহ শোকের ছবি তোলা। কিন্তু এই শোক, এই মৃত্যু তো সংসারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। মৃত্যু শোক ইত্যাদির অনিবার্য একটা প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ছবির মধ্যে মৃত্যুর শোকটা ক্রমে ফিকে হবে, তারপর একদিন সুরঞ্জনবাবু নিশ্চিতই অন্যান্য ছবির মতো এই ছবিটাকেও ছবি বলেই ভাববেন। অথচ মনের মধ্যে সেই ছবিখানিই মুক্তোর মতো একটুকরো বেদনাকে ধ'রে রাখবে।

ভীড় কমে গেছে দোকানের। অমলের কন্ঠস্বরে সুরঞ্জনবাবুর আত্মমনস্ক ভাবটা কেটে গেলো।

অমল বললো, 'আপনার সেই ছবি কিন্তু হয়নি। নষ্ট হয়ে গেছে। প্রিন্ট করিনি সেজন্যে। নেগেটিভখানা দেখবেন?'

অধৈর্যভাবে সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'দেখি, দাও তো।'

একপাশে রাখা খামের মধ্য থেকে একখানা খাম বের করলো অমল। তার ভিতর থেকে সেই ছবির নেগেটিভখানা বের করে দিলো সুরঞ্জনবাবুর হাতে।

সুরঞ্জনবাবু উঁচু করে চোখের সামনে ধরলেন নেগেটিভখানা। স্পষ্টই তার মধ্যে গনগনে একটা সূর্যকে। অনুভব করলেন। তারই আলোয় সুধাময়ের তোলা ছবিখানা যতো দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, ততো দ্রুত সে মনের মধ্যে ছাপা হয়ে মুক্তোর মতো এক টুকরো বেদনা হয়ে যাচ্ছে।

ভূমিকা এবার স্বাতন্ত্র

চাকর থেকেই নাকি চাকরি কথাটার উদ্ভব। সেজন্যই অনেকদিন পর্যন্ত চাকরির উপর আমাদের খুব একটা অনুরাগ ছিল না। সবাই স্বাধীন থাকতে চাইতাম। তাই ব্যবসাই ছিল অবলম্বন। সম্পূর্ণ স্বাধীন জীবিকা। চাষবাস করে বরং বেঁচে থাকা অনেক ভাল। তবু অপরের দাসত্ব নয়। এই মনোভাব অনেকদিন অক্ষুণ্ণ ছিল।

কিন্তু ঘটনাচক্র মোড় নিল। চাকরির মোহ আমাদের পেয়ে বসলো। ব্যবসা আর স্বাধীন জীবিকার ঝুঁকি আর অতশত অনিশ্চয়তার চেয়ে মাসান্তে এই বাঁধা মাইনের বন্দোবস্ত অনেকেরই মনে ধরলো। দলে দলে আমরা এসে চাকরির খাতায় নাম লেখাতে শুরু করলাম। সেদিন থেকেই বলতে গেলে ব্যবসায় আমাদের পতন। তারপর কখন যে আমরা পুরোপুরি চাকরিজীবী হয়ে পড়েছি তা আর খেয়াল নেই।

খেয়াল হলো সেদিন যখন আমাদের কাছে চাকরির মোহমুক্ত হয়ে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগের আহ্বান এলো। তখনই আমরা হঠাৎ উপলব্ধি করলাম, স্বাধীন ব্যবসার চিন্তায় আমরা একেবারে দেউলিয়া বনে গেছি। এখানে-ওখানে টিমটিমে আলো যা জ্বলছে, তার স্থায়িত্বও খুব বেশি নয়। এদিকের দুরবস্থায় আমাদের মন আরো ভেঙে পড়েছে। চাকরির মোহ-অজগরও এতদিনে বেশ জড়িয়ে গিয়েছে। সে-প্যাঁচ খোলার মধ্যেই জীবন-মরণের প্রশ্ন। ব্যবসার মত মানসিক প্রস্তুতিও তখন আমাদের নেই। চাকরির পাকা সড়কে দিনগুলো ভালই কাটছিল। একে উৎপাত ভেবে অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিলেন।

তবু আমাদের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করানোর জন্য নিরন্তর আহ্বানের বিরাম নেই। কোন কথা বারবার বলার নিশ্চয়ই মূল্য আছে। এবারও তা প্রমাণ হলো। কেউ কেউ ব্যবসায়ে এগিয়ে এলেন। তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় একটা নতুন চিন্তার ঢেউয়ে আমরা ওঠানামা করতে লাগলাম। চাকরের নির্দিষ্ট মাইনের সঙ্গে সঙ্গে যদি একটা ছোটখাট ব্যবসা চালানো যায়। কে বলতে পারে, এই ব্যবসাতেই দুদিন পরে হয়তো আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুলে যাবে। সারাজীবন কলম পিষে যা হয়নি, এতদিনে তাই হলো। এবং তা ব্যবসারই দৌলতে।

চাকরির মোহ যে পুরোপুরি আমরা চুকিয়ে-বুকিয়ে দিতে পেরেছি তা নয়। চাকরির জন্য এখনো আমরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই। এরই মধ্যে যেটা শুভ লক্ষণ, তা হলো ব্যবসায়ে আমাদের নতুন আসক্তি। ইদানীং আমাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবসা করছে অথবা এ-নিয়ে ভাবছে। আরো স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, মেয়েরাও ব্যবসাক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। কিছুদিন আগেও কদাচিৎ কোন মহিলা স্বাধীন ব্যবসার দুঃসাহস করতেন। তাঁদের ব্যবসার আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা রূপ দিতেন সমচিন্তার আরো কয়েকজনকে নিয়ে। অবশ্য এভাবেই ক্রমে তারা স্বাধীন ব্যবসায় উদ্বুদ্ধ হন।

শ্রাবণী বসু

আজকাল শহরে এঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। চাকরির মোহ নয়, ব্যবসার প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে জীবিকার দিক নিরূপণের ক্ষেত্রে এঁরা নেমে পড়েছেন।

এঁদেরই একজন শ্রীমতী শ্রাবণী বসু। চলচ্চিত্রের নায়িকা হিসাবেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। প্রথমদিকে ফিল্মের দিকেই ঝুঁকেছিলেন। অভিনয়-ক্ষমতাও ছিল। কিন্তু সবকিছুর ওপর ছিল ব্যবসা করার মন। তাই অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার নেশাও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। চলচ্চিত্র প্রযোজনায় মন দিলেন। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা সফল হলো। লাল পাথর চিত্রের প্রযোজনায় আত্মপ্রকাশ করলেন শ্রীসুভাষ বসু। তাঁর স্বামী। আর তিনি করলেন অভিনয়। মোটামুটি সফলও হলেন। অর্থ এবং অভিনয় দুদিক থেকেই তাঁদের উদাম স্বীকৃতি পেল। উৎসাহ বাড়লো। নতুন ফিল্ম হাতে নিলেন। দোলগোবিন্দের কড়চা। এবার কিন্তু উৎসাহ অটুট রইলো না। বেশ মার খেলেন এই ছবিতে। অর্থের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত।

সাময়িকভাবে এখান থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিলেন। কিন্তু ব্যবসার চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও মন থেকে ছুটি পায়নি। নতুন করে ভেবেছেন। ব্যবসার হালচাল জানার চেষ্টা করেছেন। বাজার বুঝে কিভাবে আরম্ভ করা যায় এজন্য কিছুদিন সময় নিয়েছেন। অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন, বিশেষত ভক্তেরা, শ্রাবণী বসু আবার নতুনভাবে ফিল্ম লাইনে ফিরে আসার তোড়জোড় করছেন। কিন্তু তিনি ততদিনে ফিল্ম ছেড়ে অন্যকিছুর কথা ভাবতে শুরু করেছেন। ভাবতে ভাবতে একটা পথও পেয়ে গেলেন।

একজন মহিলার চুল বাঁধা তদারক করছেন শ্রাবণী বসু

হয়তো সেদিন তিনি মনের আনন্দে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ইউরেকা, ইউরেকা। কথাটা অবশ্য স্বীকার করলেন না।

অনেকদিন থেকেই শ্রীমতী শ্রাবণীর শখ ছিল, লোককে সাজানোর। ড্রেস-ডিজাইনিং-এ তাঁর আবাল্য আগ্রহ। নানারকম শিল্পকাজেও তিনি বেশ সুরুচির ছাপ রেখেছেন। তাঁর এসব গুণপনা দেখে বাড়ির লোকেরা ধরে নিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে তিনি এ-পথেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করবেন। ফিল্ম থেকে ফিরে এসে এবার তিনি এদিকে চিন্তা খাটালেন। কিছুদিন বিরতি দিয়ে শুরু হলো তাঁর নতুন আত্মপ্রকাশ।

লেক মার্কেটের উল্টোদিকে সাজানো-গোছানো একটি বিউটি পার্লার। একে ঘিরেই শ্রীমতী শ্রাবণীর যত স্বপ্ন-কল্পনা। নাম নীলা। হেয়ার স্টাইলের উদ্দেশ্য নিয়েই এর যাত্রা শুরু। ভাবছেন অনেকদিন থেকেই। কিন্তু সে-ভাবনা রূপে পেয়েছে অতি সম্প্রতি। মাত্র বছরখানেক বয়স এই ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের। গত বছর মহালয়ায় যাত্রা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে এই বিউটি পার্লার বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। সব সময়ই খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে। আর সকলের অভ্যর্থনায় হাসিমুখে এগিয়ে আসেন শ্রীমতী বসু। ত ছাড়া প্রত্যেকটি খদ্দেরের তত্ত্বাবধান করেন তিনি নিজে। মাঝে মাঝে নিজেই হাত চালান। সব সময়ের তিনজন মহিলা-কর্মী নিযুক্ত আছেন। এঁদের দু'জন চাইনীজ এবং একজন বাঙালী।

কথায় কথায় শ্রীমতী বসু জানালেন, ব্যবসা বেশ ভালই চলছে। বাঙালী-অবাঙালী সবরকমেরই খদ্দেরে বিউটি পার্লার গমগমিয়ে থাকে। ইদানীং আবার চুল বাঁধার শখও অনেক বেড়েছে। হেয়ারস্টাইল ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। তাই আমাদের মত প্রতিষ্ঠানেরও কদর বাড়ছে। পাঁচ-সাত বছর আগে কিন্তু অবস্থা ছিল ঠিক এর বিপরীত। সেদিন আমাদের মেয়েদের অনেকেই ঘরে বসে এ-পাট চুকিয়ে ফেলতেন। অবস্থার এখন অন্য বিন্দুতে অবস্থান। পোশাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে সঙ্গে সাজসজ্জার ব্যাপারেও পরিবর্তন এসেছে। তাই অনেক মেয়েই নানা উপলক্ষে এখানে এসে মনের মতো চুল বেঁধে যায়। তাই আমাদের জনপ্রিয়তা বাড়তির মুখে এ-কথা বলা ভুল হবে না।

কথার জের টেনে তিনি বলে চললেন, খদ্দেরের দিকে সব সময় নিজে নজর রাখি। প্রয়োজন না হলে হাত লাগাই না। তবে পুরোপুরি তদারকি করি। খদ্দেরের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। কথা-বার্তা বলি। কোন অসুবিধা হলে জানার চেষ্টা করি। এতে খদ্দেরও খুশি হয়। এই বিউটি পার্লার করার আগেও আমি অনেক মেয়েকে সাজিয়েছি। এমনকি বিয়ের কনেকেও। গোড়া থেকেই এদিকে আমার উৎসাহ থাকায় বাড়ির লোকজনের কোন আপত্তি আসেনি। বরং তাঁরা সহানুভূতিই দেখিয়েছেন।

জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, এতদিনের শখ পূরণে এত দেরি হলো কেন? সে-কথার জবাব মিললো। তিনি জানালেন, এ-কাজের সুযোগ-সুবিধা কতটা আছে সেটা জানার জন্য অনেকখানি সময় ব্যয় করতে হয়েছে। ব্যবসা শুরু করে পরে না পস্তাতে হয় সেজন্যই এই সতর্কতা। সেই সঙ্গে কিছু নতুনত্বের ইচ্ছাও মনে ছিল। চৌরঙ্গীপাড়া থেকে আমাদের কাজে যাতে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে, সেদিকে নজর দিয়েছি। গতানুগতিকতায় গা ভাসানোর আমি বিরোধী। ডেভেলপমেণ্ট যা-কিছু সব আমি নিজের চেষ্টায় করেছি।

হেয়ার স্টাইলের যে কদর বেড়েছে, শহরের দিকে একনজর তাকালেই তা বোঝা যায়। এ-ধরনের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এবং সবকটিই বাঙালী মহিলা পরিচালিত। এর ফলে প্রতিযোগিতা বেড়েছে। তাই সবাই নিজের নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখায় তৎপর।

শ্রীমতী বসু শুধু নিজের বিউটি পার্লারেই বসে থাকেন না। ডাক পড়লে বিয়ে-বাড়িতে ছোটেন। কনে সাজানোর পুরো দায়িত্ব নেন। এ-ব্যাপারে তিনি রীতিমত উৎসাহী। বাঙালী মেয়ে কনে সাজাতে পারলে আর কি চায়।

শ্রীমতী বসুর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও আছে। শুধু বিউটি পার্লারেই নিজেকে আটকে রাখার ইচ্ছে তাঁর নেই। ছেলেবেলা থেকেই তিনি শিল্পের ভক্ত। স্কুল-কলেজ থেকেই এই ধ্যান তাঁর মনে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কিছু আভাস দিয়ে বললেন, ইণ্টিরিয়র ডেকরেশন, ড্রেস ডিজাইনিং, বাটিক এবং ফেব্রিক প্রিণ্টিং-এর একটি কেন্দ্র খোলারও ইচ্ছে তাঁর আছে। এগুলো অবশ্য সময়সাপেক্ষ। যেটা আরম্ভ করেছেন, তার স্থায়িত্বের উপরই নির্ভর করছে আগামী দিনের ভাবনা-চিন্তার সার্থক রূপায়ণ। বর্তমানের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব বজায় থাকলে শ্রীমতী বসু সার্থকতার আশা রাখেন। তখন হয়তো তাঁর আরো স্বপ্ন দেখাও সফল হবে।

বর্তমান প্রসঙ্গ সেরে আবার ফিল্মের কথায় আসি। চলচ্চিত্র দিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু। শ্রীমতী বসু জানালেন, চলচ্চিত্রে প্রযোজনায় অসুবিধা অনেক। তবু চেষ্টা করেছেন। ঝক্কি-ঝামেলা এত বেশি যে, অনেকটা বাধ্য হয়েই সেখান থেকে ফিরে এসেছেন। আবার অন্য লোকের ছবিতে অভিনয়ের সুযোগও সীমিত। তবে অভিনয়ের ইচ্ছা এখনো আছে। সুযোগ সুবিধা হলে আবার তিনি রূপোলী পর্দায় নিজেকে ফুটিয়ে তুলবেন। কিন্তু সেদিনও ব্যবসার চিন্তাই থাকবে তাঁর মুখ্য। কারণ, এতো শুধু তাঁর নিজের প্রয়োজন নয়, বাঙালী মেয়েদের আত্মবিকাশেরও অনেকখানি পথনির্দেশ।

—প্রমীলা
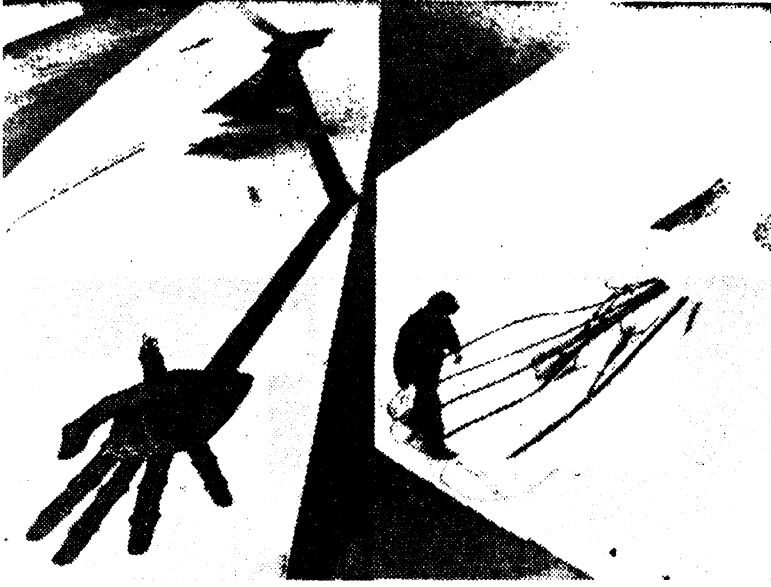
জার্মানীর শিল্পী মাইকেল ওল্ট্-ওয়ালটের বৃহৎ ছবি অভিমানবের মূর্তি। দন্ডায়মান মানুষের মূর্তি থেকে ছবির মাপ বোঝা যায়।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

পরিতোষ সেন তাঁর প্যারিস যাত্রার াক্কালে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে একটি একক দর্শনীর আয়োজন করলেন। ১৫ থেকে ১শে জুলাই অবধি অনুষ্ঠিত এই বৃহৎ দর্শনীতে তাঁর ছোট-বড় মিলিয়ে ১৩খানি তৈলচিত্র এবং ছোট মাপের পঞ্চাশখানির উপর সূক্ষ্ম ও বলিষ্ঠ ড্রয়িং ও গুয়াশ ণ্টিং প্রদর্শিত হয়। এ-ধরনের সুসজ্জিত প্রদর্শনী সচরাচর দেখা যায় না। শুধুমাত্র িয়ংগুলির ফ্রেমিংয়েই শিল্পী যতটা যত্ন য়েছেন, অনেক বড় প্রদর্শনীর আয়ো-কেরা ছবি টাঙানোর ব্যাপারেই অনেক ময় ততখানি যত্ন নিতে অপারগ হন।

বিগত পঁচিশ বছরের শিল্পচর্চার পর সেন বর্তমানে নিজেকে আর নিছক ঙ্গিক ও ফর্মাল সমস্যার মধ্যে আবন্ধ খতে চান না। বর্তমান প্রদর্শনীতে তাই ছক অ্যাবস্ট্র্যাকশন বা নিছক ফিগারেটিভ িতির কালোয়াতী নমুনা তিনি উপস্থিত তে চাননি। এটা সম্ভবত নিজেকে কোন কটা রীতির চর্চাকারী হিসেবে ছাপ দিয়ে াতে না চাওয়ার বাসনা থেকে হয়ে কতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেক শিল্পীর াই সমসাময়িক যুগের মূল্যবোধ সম্পর্কে জস্ব মতামত প্রকাশের একটা ইচ্ছা দেখা এবং সেটা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবাদের গ্রহণ করে। সেই প্রতিবাদের সুর এই র্শনীর অনেক ছবিতেই হয়ত খুঁজে ওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, শ্রীসেনের কাভঙ্গে এই প্রতিবাদ বিশেষভাবেই াট্য হয়েছে। তাঁর 'পোর্ট্রেট অব অ্যান নিম্যাল' কোন এক মানুষেরই অমানুষিক র্ণতি বলে ধরে নিতে অসুবিধে হয় না। 'ফিগার ইন রু'-তে যুক্তকরে উপবিষ্ট মানবমূর্তি কিসের জন্যে যেন প্রার্থনা জানায়। ছবিগুলির মনুমেণ্টাল স্কেল অনেক সময় নাটকীয়তাকে পরিষ্কারভাবে উপস্থিত করেছে। প্রায় অ্যাবস্ট্র্যাক 'ডিসেন্ডিং ফিগারের' কোমল রক্তিম ও হরিদ্রাভ বর্ণের কিছুটা করুণ আবেদন এবং 'অ্যাসেন্ডিং ফিগারের' ঘোর নীল শ্বেত ও হরিদ্রার অশান্ত উচ্ছ্বাসে তাঁর কাজের পরিধি দেখা গেল। বড়ে গোলাম আলি খাঁর সঙ্গীত নিয়ে আঁকা দুখানি ছবি (একটিতে নীলের প্রাধান্য ও অন্যটি বিভিন্ন ধূসর বর্ণ-প্রধান) তাঁর জাতীয় প্রদর্শনীর ছবির চাইতে অনেক বেশী আকর্ষণীয় হয়েছে। দুখানি ছোট মুখ (কতকটা এক্সপ্রেসানিস্টিক কাজ) বর্ণ ও গঠনের বলিষ্ঠতায় অনেক বড় মাপের ছবির চাইতে বেশী চোখে ধরল। এখানেও মানুষ ও অমানুষের মাঝামাঝি একটা ফর্মকে তুলে ধরা হয়েছে। একটি গ্রুপ পোর্ট্রেটে তাঁর শিল্পীর স্বাধীনতা ও প্রতিকৃতির সাদৃশ্য-যোজনা এই উভয়ের ভারসাম্য সুন্দরভাবে ফোটানো হয়েছে। কিন্তু মিঃ এইচ-এর প্রতি-কৃতিতে মুখের বাস্তবতার সঙ্গে দেহ ও পটভূমিকার ডিজাইন-ঘেঁষা কাজ কোথায় যেন চিত্রপটের মধ্যে একটা অসঙ্গতি রচনা করেছে। তাঁর সর্ববৃহৎ কাজ হল দিল্লীর গান্ধী-গৃহের দেওয়াল-জোড়া মুরাল। ছবিটি এখনো অসমাপ্ত এবং দেওয়ালে লাগাবার পর এটি শেষ করা হবে। এখানে শিল্পী একদিকে পতিত মানব ও অন্যদিকে ধ্বংসের রূপের মধ্যে একটি শিশুকে বসিয়ে জীবনের অবিচ্ছেদ্যতা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। এরই মধ্যে ওপরে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী মানবাত্মার রূপের মধ্যে মানুষের সবকিছুকে ছাড়িয়ে ওঠার প্রয়াস দেখানো হয়েছে এবং বাঁদিকের ঊর্ধ্বাংশে একটি টেরোড্যাকটিল সারি সারি দাঁত বার-করা মুখ নিয়ে ছুটে আসছে। এই টেরোড্যাক-টিলটিই হল অশুভের প্রতীক। বেচারা টেরোড্যাকটিল। মানুষ জন্মাবার অনেক আগেই হয়তো সে পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তবু অশুভের প্রতীক হিসেবে তাকেই আজ খাড়া করা হল। একেই বোধহয় বলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

●

১৭ থেকে ২৩ জুলাই অ্যাকাডেমির শিশু-শিক্ষার্থী বিভাগের দুই শিক্ষার্থী চিত্রলেখা ও অঞ্জনা মুখার্জির আঁকা ছবির প্রদর্শনী হল। দুজনেরই বয়েস দশ এবং উভয়েই প্রধানত প্যাস্টেলে কাজ করেছে। কতকগুলি মুখমন্ডল একটি হাতির ছবি ও জলরঙে আঁকা একটি নৌকা প্রশংসনীয়।

●

জার্মানীর ৪২ বছরের শিল্পী মাইকেল ওল্টওয়াল্ট একটি বিরাট ছবিতে হাত দিয়ে-ছিলেন। ছবিটির মাপ হল ২৩৬ ফুট লম্বা ও ৪০ ফুট চওড়া। ক্ষুধার্ত মানবের এক প্রতিকৃতি হচ্ছে তার বিষয়বস্তু। বিশ্বের যুদ্ধ ও হানাহানির প্রতিবাদের রূপ হিসাবে এই ছবির পরিকল্পনা। এটি নীলামে তোলা হবে এবং প্রাপ্ত অর্থ আর্তত্রাণে দেওয়া হবে। পরে এটি ইওরোপা সেন্টারের সামনে সর্ব-জনের দৃষ্টিপথে টাঙাবার ব্যবস্থা হবে।

—চিত্ররসিক

কলকাতা কেন্দ্রের শ্রোতাদের অসমাপ্ত গান শোনা এখন অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে। ঘোষক-ঘোষিকাদের বিলম্বিত এবং ঢিলেঢালা ঘোষণা, অথবা রেকর্ডিংয়ে সময় লঙ্ঘনের ফলে প্রায়ই শেষদিকের গানখানা পুরো বাজানো যায় না, একথা বহুবার বলা হয়েছে। এবং বললেই ঘোষক-ঘোষিকারা নিউজের দোহাই দেন। বলেন, পরে নিউজ থাকে বলে আগের গান কেটে দিতে হয়।

কিন্তু পরে নিউজ না থাকলেও আগের গান কাটা পড়ে, এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এবং নিউজ থাকলেই যে গান কাটতে হবে এটা কোনো যুক্তি নয়, কারণ রেডিওর সবকিছুরই সময় নির্দিষ্ট থাকে আর সবকিছুই ঘড়ি ধরে চলে। অনেক ঘড়ি রেডিওর স্টুডিওর, এবং ঘড়িগুলো দু-চার সেকেণ্ডের বেশি হেরফের হয় না বড়ো। সুতরাং টেপ রেকর্ডে কিংবা গ্র্যামোফোন রেকর্ডে বিশ-পঁচিশ সেকেন্ড অথবা তারও বেশি গান থাকতে নিউজের দোহাই দিয়ে গান কেটে দেওয়া কোনো মার্জনীয় অপরাধ নয়—বিশেষ করে, এই অপরাধ যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অবাধে উদ্ধতভঙ্গিতে চলতে থাকে।

থাক এ কথা। এ নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। ফল কিছু হয় নি। শ্রোতাদের এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। শ্রোতারা এটা মেনে নিয়েছেন।

কিন্তু শ্রোতাদের এখনও অভ্যাস হয় নি, শ্রোতারা এখনও মেনে নিতে পারেন নি এমন আর একটা ব্যাপার আছে এই কেন্দ্রে। এটা আগেও ছিল, কিন্তু এখন বড়ো বেশি ব্যাপক হয়েছে, যখন তখন হচ্ছে—যত দিন যাচ্ছে তত বেশি হচ্ছে। গ্র্যামোফোন রেকর্ডের ক্ষেত্রেই এটা হচ্ছে।

কলকাতা কেন্দ্রে গ্র্যামোফোন রেকর্ডের মস্ত ভূমিকা। সমগ্র অনুষ্ঠানের একটা বৃহৎ অংশ এই রেকর্ডে প্রচারিত হয়। পুরো সময়ের একটা বড়ো অংশ এই রেকর্ডের অধিকারে। কিন্তু তার জন্য রেকর্ডগুলো যেরকম যত্নে রাখা উচিত সেরকম রাখা হয় না; রাখা হয় অযত্নে, অবহেলায়। একটা রেকর্ড লাইব্রেরি অবশ্য আছে গ্র্যামোফোন রেকর্ড আর স্টুডিও রেকর্ড রাখার জন্য (টেপ রেকর্ড রাখার জন্য আলাদা লাইব্রেরি), কিন্তু সেখানে সবকিছু তালগোল অবস্থা, রেকর্ডগুলোর চরম দুর্দশা, আস্ত রেকর্ড আর কাটা রেকর্ডের সহাবস্থান। দেখার কেউ নেই, আপত্তি করারও কেউ নেই।

তার প্রমাণ প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি। রেকর্ড চলতে চলতে হঠাৎ কাটা জায়গায় পড়ে পাক খেতে লাগল, একই কথা বার তিন-চার করে শোনা যেতে লাগল, তারপর বন্ধ হয়ে গেল, শেষে ঘোষণা হল, "অনুষ্ঠান প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখিত।" ব্যস, এইটুকু। আবারও সেই একই জিনিসের আবৃত্তি, ঘন ঘন আবৃত্তি, এবং আবারও সেই দুঃখ-প্রকাশের ঘোষণা। দৃষ্টান্ত দেখার খুব দরকার আছে বলে মনে হয় না, কারণ প্রায়ই এমন দৃষ্টান্ত আহরিত হচ্ছে। তবু আলোচনার খাতিরে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

২৫শে জুলাই বেলা সাড়ে ১২টায় গ্র্যামোফোন রেকর্ডে শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান ছিল। শেষদিকে একখানা রেকর্ড কাটা থাকায় কয়েকবার পাক খেয়ে একই কথা শোনাল। তারপর ঘোষকের নজরে পড়ায় তিনি সেটা বন্ধ করে দিয়ে পরে ঘোষণা করলেন, "অনুষ্ঠান প্রচারে মাঝখানে বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখিত।"

আবার ২৭শে জুলাই বেলা আড়াইটায় অনুরোধের আসরের শেষদিকে একখানা কাটা রেকর্ড পর পর তিন জায়গায় পাক খেয়ে তিনবার বিঘ্ন ঘটাল। ঘোষক ঘোষণা করলেন, "মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এই গানটির প্রচারে বিঘ্ন ঘটায় আমরা দুঃখিত।"

উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রথম দিনের বিঘ্নে যে ঘোষক ছিলেন, দ্বিতীয় দিনের বিঘ্নেও তিনি ছিলেন। তাই বলে কেবল এই ঘোষককেই দোষ দেওয়া ঠিক হবে না, অন্য ঘোষকরাও আছেন, ঘোষিকারাও আছেন। দোষটা সমষ্টিগত। এবং চলছে নির্বিবাদে।

এত সমালোচনার পরেও যেমন নির্বিবাদে গান কাটা চলছিল তেমনি নির্বিবাদে চলছে তা: কী করে এমন নির্বিবাদে চলতে পারছে সেইটেই আশ্চর্য। এসব দেখার কি কেউ নেই এত বড়ো একটা স্টেশনে? স্টেশন ডিরেকটর বাঙালী না হতে পারেন এবং বাংলা না বুঝতে পারেন, কিন্তু রেকর্ড অসমাপ্ত রয়ে গেল কিংবা কাটা রেকর্ড বাজানো হল তা-ও কি বোঝেন না? ঘোষক-ঘোষিকারা না হয় সমালোচনার প্রতিরোধক্ষমতা অথবা ইমিউনিটি গড়ে তুলেছেন, কিন্তু এঁর তো একটা বিরাট দায়িত্ব আছে! ইনি কি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গান টেপ রেকর্ড করার এবং গ্র্যামোফোন রেকর্ড প্রচারের আগে বাজিয়ে দেখে নেবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন না?

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

হুগলী নদীর পাইলট সার্ভিসের ৫০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ১২ই জুলাই রাত ৮টায় একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হল। অনুষ্ঠানটি যতখানি প্রাণবন্ত হবে বলে আশা করা গিয়েছিল ততখানি হয়নি। তার কারণ মনে হয়, দ্রুততা। অনুষ্ঠানটি যেন অতি দ্রুত প্রস্তুত করা হয়েছে। এবং এই প্রস্তুতির জন্য যেন পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। ধীর চিন্তাও না। এইরকম একটি অনুষ্ঠানে যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন ছিল তার পরিচয় পাওয়া গেল না কোথাও। যেন ঘাড়ে পড়ে গেছে, উপলক্ষ্যটা অনুপেক্ষণীয়, একটা কিছু করে মান বাঁচাতে হবে, তাই করা। এই অনুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ, উৎকণ্ঠা আর উদ্দীপনা সঞ্চার করা যেতে পারত, কিন্তু করা হয়নি। যে পরিমাণ ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করলে অনুষ্ঠানটি চিত্তাকর্ষী হতে পারত

তা-ও না। ইতিহাস কিছু ছিল, কিন্তু উৎসাহিত হবার মতো নয়।

এইদিন রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে, "কাব্যাঞ্জলি" নামে একটি অনুষ্ঠান শোনা গেল—মনে হয়, গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান। ঘোষণায় কিছু বলা হয়নি, তাই অনুষ্ঠানের প্রকৃতি দেখে অনুমান করা ছাড়া উপায় নেই।

অনুষ্ঠানটিতে গান্ধীজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কয়েকজনের কবিতা বা কবিতার "নির্বাচিত অংশ" আবৃত্তি করে শোনানো হল। বেশ লাগল। কিন্তু আবৃত্তি ছাড়া এতে মহিলাকণ্ঠে যে প্রার্থনা পাঠ ছিল তার ভাষার তরলতা ও উচ্ছলতা, উচ্চারণের কৃত্রিমতা ও অকারণ দীর্ঘতা শ্রুতিকটু লেগেছে, অনুষ্ঠানটির সৌকর্যহানি করেছে।

অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা কিন্তু প্রশংসনীয়।

কলকাতার কলেজগুলিতে স্থানাভাবের দরুন ছাত্র-ভর্তির যে তীব্র সঙ্কট প্রতি বছর দেখা দেয়, এবারও দিয়েছে, ১৬ই জুলাই রাত সাড়ে ৮টার সংবাদ বিচিত্রায় তা বেশ তীক্ষ্ণভাবে ফোটানো হয়েছে। ছাত্র আর অভিভাবকদের এক দুয়ার থেকে আর এক দুয়ারে ধর্ণা দেওয়া, ছাত্রদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা, অভিভাবকদের হতাশা আর অনিশ্চয়তা, এবং পরিশেষে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের অসহায়তা বেশ ভালোভাবেই ফুটেছিল এই অনুষ্ঠানে। অধ্যক্ষরা সমস্যা সমাধানের কিছু উপায়ও নির্দেশ করেছিলেন। সব উপায় নতুন কিছু নয়। তা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরকারীভাবে চিন্তা শুরু হয়ে গেছে—বিভিন্ন কলেজে শিফ্‌ট্‌ ব্যবস্থার প্রবর্তন আর নতুন কলেজ স্থাপন।

অনুষ্ঠানটি শুনে অভিভাবক আর ছাত্ররা সান্ত্বনা পেয়েছেন কিনা জানি না,—সান্ত্বনা দেওয়া তো সংবাদ বা সংবাদ বিচিত্রার কাজ নয়, কাজ হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরা। তা এতে যথার্থভাবেই হয়েছে। সেইদিক দিয়ে অনুষ্ঠানটি সার্থক।

এইদিন সকাল ৮টায় ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার পরিবেশিত লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠানটি বেশ ভালো লাগল। লোকসঙ্গীতের ধারাটি এঁরা আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়।

সূর্য যে অমিতশক্তির উৎস, পৃথিবীর বর্তমান শক্তির উৎসগুলি শেষ হয়ে গেলে মানুষকে যে সৌরশক্তির উপরই নির্ভর করতে হবে, ১৭ই জুলাই রাত ৮টায় একটি কথিকায় বেশ সুন্দর করে সে কথা বুঝিয়েছেন শ্রীসমরজিৎ কর। সৌরশক্তি কিভাবে এখনই আমরা কাজে লাগাতে পারি, কিভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা হচ্ছে তা-ও তিনি বেশ প্রাঞ্জলভাবে বলেছেন। সাধারণ, বিজ্ঞান-না-জানা লোকেদেরও বুঝতে কোথাও বিশেষ কষ্ট হয়নি। তবু তিনি কয়েকটি জিনিস যদি আর একটু ব্যাখ্যা করে বলতেন তাহলে ভালো হত। বিলিয়ন কথাটা রেডিওর সংবাদ বিভাগের কল্যাণে অনেকেই শুনেছেন, কিন্তু অনেক উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিরই জানা নেই লক্ষ-কোটির হিসাবে এটা কত হয়। তাই এই কথিকায় বিলিয়ন শুনে অনেক শ্রোতাই যে হোঁচট খেয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বক্রতল আয়নার চেহারাও বিজ্ঞান-না-জানাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া শুধু বক্রতল বললে ঠিক বলা হয় না, কারণ একাধিক রকমের বক্রতল হতে পারে। নির্দিষ্ট করে বলা দরকার কনকেভ, না কনভেক্স। এমনি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক কথা একটু ব্যাখ্যা করে দিলে কথিকাটি আরও মনোজ্ঞ হত।

২০শে জুলাই বেলা ১টার নাটক "কল্লোল"। রচনা শ্রীইন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, প্রযোজনা শ্রীসরল গুহ।

নাটকটি একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল। কয়েক জায়গায় সেন্টিমেন্ট বাস্তবতা ছাড়িয়ে গেছে। ছবিকে ছেলে কল্পনা করে দুঃখবোধ করার জায়গাটা অস্বাভাবিক, তেমনভাবে চিত্তস্পর্শ করে না। বড়ো বেশি কাল্পনিক যেন।

এমনিতে নাটকটি জমেছিল ভালো। অভিনয়ও ভালো।

অ্যাপোলো—১১কে অ্যাপোলো একাদশ না বলে অ্যাপোলো এগার বললেই বোধহয় ভালো হয়, কিন্তু অ্যাপোলো—১১র চন্দ্রাভিযানের সময় কলকাতা থেকে প্রচারিত সংবাদে প্রায় প্রতিবারই অ্যাপোলো একাদশ বলা হয়েছে। ২০শে জুলাই অনেকবারই বলা হয়েছে।

২০শে জুলাই রাত ১০টা ৫ মিনিটের খবরে "মিয়ামিতে" বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার কথা বলা হল, কিন্তু জায়গাটার নাম মিয়ামি নয়—মায়ামি। মায়ামি সমুদ্রোপকূলে এই সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

২৪শে জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় শ্রীমতী মল্লিনা মজুমদারের কণ্ঠে লোকগীতি ভালো লাগল, কিন্তু ঘোষণায় লোকগীতির আগে "প্রাচীন" কথাটি ভালো লাগল না। একাধিকবার এই বেতারশ্রুতির আলোচনায় কারণসহ বলা হয়েছে যে, লোকগীতি কখনও প্রাচীন হয় না, প্রাচীন লোকগীতি বলে কিছু নেই। তবু এখনও সে সম্মানে "প্রাচীন লোকগীতি" প্রচার করা হচ্ছে সেটাকে "আমরা যা করছি ঠিক করছি, তোমরা যতইচ্ছে চেঁচাও, আমরা তা-ই করে যাব" গোছের মনোভাব ছাড়া আর কিছু বলা চলে না।

—শ্রবণক

গুজরাটি-গরবানৃত্য

সম্প্রতি কলামন্দিরে মঞ্চস্থ গুজরাটি গরবানৃত্যের দু'ঘন্টাব্যাপী এক অনুষ্ঠানে একাধারে চিত্তরঞ্জন এবং গুজরাটি নৃত্যের সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্যজ্ঞান উভয় বিচারেই এক প্রশংসনীয় উদ্যম। উদ্যোক্তা সঙ্গীত-কলামন্দিরের সভাবৃন্দ।

কলকাতার গুজরাটি সমাজের সকল সৌখীন দলগুলিই এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। পশ্চিম ভারতের লোকনৃত্য কেন্দ্র এই অনুষ্ঠানের সাঙ্গীতিক ঐশ্বর্য এবং ছন্দ সৌকর্ষ লক্ষ্য করবার মত। দেড় ঘন্টাব্যাপী নৃত্যের বিষয়বস্তু দ্বিবিধ-গরবা এবং রাস।

উভয় নৃত্যই সম্মিলিত নৃত্য। তবে গরবা প্রধানতঃ মেয়েদের নাচ। এই নৃত্য দিয়েই এ'রা নবরাত্রি উৎসব পালন করেন। তাছাড়া শক্তিপূজারও অঙ্গ গরবানৃত্য। রাসনৃত্য ইষ্টদেবতা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের একটি অনুরাগ ও প্রণতি, হাসি, কৌতুক, লাস্য ও অভিমানে উদ্বেলিত।

গরবানৃত্যে তালে-তালে করতালি ছাড়া হাতের কাজ কিছু নেই রাসনৃত্য ও ব্রতচারী ঢঙে ছড়িহাতে নৃত্য। কিন্তু এই বৈচিত্র্যহীনতার ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছে রকমারী তালবাদ্যের বিভিন্ন ছন্দের আনন্দ দোল; সাজ-সজ্জার চোখজুড়ানো বর্ণসুষমা এবং একই সঙ্গে বহু নৃত্যশিল্পীর পদক্ষেপের বিদ্যুৎ ও চিত্রোপম সামগ্রিক সু-সঙ্গতি। এর ওপর শিল্পীদের প্রাণোচ্ছল আনন্দ এবং আদি অকৃত্রিম ভঙ্গীতে গাওয়া দেহাতী সৌন্দর্যের আকর্ষণ ত আছেই।

সঙ্গীত কলামন্দিরের সম্পাদক ও সভাপতি মিঃ মিশ্র ও মিঃ বিনানীর কাছে জানা গেল এ বছর রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গুজরাটি নৃত্যের প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে গুজরাটি মহিলামণ্ডল এবং জ্যোৎস্না মন্ডল।

ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্ট সেন্টার

লেকটাউনে ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্ট সেন্টারের তথা মহিলাদের জন্য উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে এক সঙ্গীতাসর আয়োজিত হয়েছিলো। এই অনুষ্ঠানে সত্যিকারের এক উদীয়মান শিল্পীকে দেখা গেল পণ্ডিত রবিশংকরের শিষ্য সলিল চক্রবর্তী। ছোটর মধ্যে আলাপ সুবিন্যস্ত, গতের বন্ধেজ সযত্নরক্ষিত তানের সঙ্গে রেওয়াজ ও শিক্ষার স্বাক্ষর আছে। বিশেষ করে শেষের 'ধুন'টি রবিশংকরের 'পথের পাঁচালী'কে মনে করিয়ে দেয়। নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থাকলে এই শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাদীপ্ত।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের 'বেহাগ' জমে উঠেছিল মহম্মদ সগীরুদ্দিনের সারেঙ্গী ও ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁর তবলাসঙ্গতে। বিলম্বিতের বিস্তার সঙ্গে শিল্পীর অনুশীলনী ও দক্ষতা আকর্ষণীয় তবে তানের সঙ্গে বৈচিত্র্য না থাকায় মাঝে মাঝে একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল। তবে সাপট তান অসম্ভব তৈরী এবং সুরেলা এবং উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতে শিল্পীর অগ্রগতির পরিচয়বাহী।

মানু পালের কথকনৃত্য পরিচ্ছন্ন সুন্দর। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কাজল দাস (কণ্ঠসঙ্গীত) ভি জি যোগ (বেহালা)। এ'দের অনুষ্ঠান শোনা হয় নি।

'রাহগীর'এর একটি গান

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত এবং তরুণ মজুমদার পরিচালিত 'রাহগীর'-এর শুধু একটি গানের কথা লিখব, ছবি শেষ হয়ে যাবার পরও যার রেশ মন থেকে মিলোয় না। গানটি হোলো, 'ময় নেহি দোষ দো বন্ধু' 'হিন্দী ভাষার অনভিজ্ঞতা-বশতঃ কথার ত্রুটি যদি হয় মাপ চাইছি)। এ গানটি যেন নায়কের জীবন-দর্শনকে সুরের আকৃতিতে ব্যক্ত করেছে।

নায়কের এখানে ওখানে অকারণ আলো বিলিয়ে গান গেয়ে এবং দুঃখ বরণ করে জীবনের অবসান—এর কারুণ্য, বেদনা এবং বেপরোয়া নির্ভীকতা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সংবেদনশীল গায়কীতে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উচ্চগ্রামী সুরই যেন মর্মভাবকে পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছে। এ গান রেকর্ড হলে হেমন্তবাবুর হিট সংএর তালিকা বৃদ্ধি হবে।

ডিস্কে ছড়ার মালা

পাঁচখানি ই পি রেকর্ডে খেলার ছন্দে শিশুমনে সৌন্দর্যের ধ্যানলোক উদ্ভাসিত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা গেল গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রয়াসে।

প্রথমেই আকৃষ্ট করে যে রেকর্ডখানি সেটি হোলো ৪৫, আর পি এম এ হিমাংশু বিশ্বাসের 'সুরের ঝর্ণা'। কভারে অঙ্কিত পাল্কী, তরোয়াল হাতে শিশু, দস্যু ও দুই দরজার ফাঁকে দৃশ্যমান ত্রস্তা জননীর মুখ সব মিলিয়ে কবিগুরুর 'বীরপুরুষ' কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়। অর্কেস্ট্রার সুবিন্যস্ত সুরের ধারাও সেই ধারণাকেই দৃঢ় করে যদিও কোথাও ঐ নাম ঘোষণা করা নেই।

শিশুমনের আকাশচারী কল্পনার এক সুরময় আলেখ্য 'সুরের ঝর্ণা'—শুরু [illegible] আহির ভৈঁরো রাগ দিয়ে। শ্রীবিশ্বাসের উদ্যমের বাঁশীর সুরের ইঙ্গিতে প্রভাতী আকাশ গ্রাম্যপথ ও পাল্কীচলার গতি চিত্রকল্প সৌন্দর্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে টোড়ি থেকে শুরু করে সারং-এর পথ বেয়ে কখন যে পুরিয়া-ধানশ্রী রঙিন আলোর গোধূলী লগ্নে মন পৌঁছে গেছে বুঝতেই পারি নি। ক্লাইমেকস ধনার বখন মালকোষের দীপ্ত ঝঙ্কার ঘোষিত শিশুর তরোয়ালের সঙ্গে দস্যুদলের লড়াই ও পরাজয়ের পরই অর্কেস্ট্রার সুরে 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, গানটির সুগভীর ব্যঞ্জনা বেজে ওঠে। এই সুন্দর সমাপ্তিতে যথার্থ শিল্পী-মনের পরিচয় মুদ্রিত। বেশ কয়েক বছর আগে অর্কেস্ট্রায় পণ্ডিত রবিশঙ্করের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম—কিন্তু তা ডিস্ক-বদ্ধ না হওয়ায় জনমানসের চিরন্তন উপভোগের উৎস হয়ে উঠতে পারে নি। সেই চিন্তাধারার ক্রম-প্রসারণ হিমাংশু বিশ্বাসের এই রেকর্ডে কয়েকটি উজ্জ্বল মুহূর্ত রচনা করেছে তা সঙ্গীতরসিকের কাছে চিরন্তন সম্পদ হয়ে থাকবে। শুধুমাত্র সুরের ভাষায় গল্প রচনা রেকর্ডে এই প্রথম এবং সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারল।

আর এক অভিনব অবদান শিশু-রংমহলের 'চলতে পথে' ও 'সহজ গানের পাঠ'। প্রথমটিতে পথিক গাঁয়ের বধূ এবং প্রাত্যহিক জীবনের পথচলা মানুষ যেন শিশুমনের রঙিন কল্পনায় মিশে স্বপ্ন-লোকের বাসিন্দা হয়ে উঠেছেন। সমর চট্টোপাধ্যায়ের রচনার মুন্সিয়ানাকে সার্থক করেছেন শিশু-রংমহলের শিল্পী অতসী ঘোষাল, মঞ্জীরা মুখোপাধ্যায়, কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রাণী সেন, ডালিয়া দাশগুপ্ত, লালি ঘোষ ও শ্রাবণী পত্তনবীশ।

'সহজ গানের পাঠ' ছড়ার ভাষায় কেমন করে 'সরগম' ও পাল্টা সাধা যায় তারই এক মনোজ্ঞ উদাহরণ। শৈলেন চক্রবর্তীর পরিচালনায় মণীন্দ্র চক্রবর্তীর কথা ও সুরকে রূপ দিয়েছেন অতসী ঘোষাল, মঞ্জীরা মুখার্জি, ইন্দ্রাণী সেন, কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়, ডালিয়া দাশগুপ্ত, পাপিয়া দাশগুপ্ত, সর্বাণী পত্তনবীশ।

একটি নতুন সম্ভাবনাদীপ্ত কণ্ঠ শোনা গেল। শিল্পী মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাস্কর বসু রচিত এবং শৈলেন মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত, এ'র গাওয়া গান দুটি হোল 'শুভ জন্মদিন' ও 'হুলুদ বনের মনে'। পূরবী চট্টোপাধ্যায় গীত 'ফড়িংবাবুর বিয়ে' এবং 'আমি যদি ছুটি পাই'—ছড়া-গানের পর্যায়ে এক উল্লেখযোগ্য যোজনা।

—চিত্রাঙ্গদা

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র সমালোচনা

পথই আমার সাথী

রুমা গুহঠাকুরতার মুখের সেই ঝুমুর গানখানিকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না : মন যে আমার কেমন কেমন করে। গানটি ছিল অনুপকুমার অভিনীত অসাধারণ জনপ্রিয় ছবি "পলাতক"-এর বহু মিষ্টি মনোহর গানের অন্যতম। এই 'পলাতক'-এরই হিন্দী সংস্করণ, গীতাঞ্জলি-চিত্রদীপ নিবেদিত রঙীন "রাহগীর"-এ এই ঝুমুর গানের সুরে বাঁধা গান "দৈয়া কসম শরম লাগে" হিন্দী ছবির দর্শকদের কাছে কি পরিমাণে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবার বিষয়।

পাঠকের কাছে বাঙলা 'পলাতক' বা হিন্দী 'রাহগীর'-এর কাহিনী অপরিচিত নয়। রতনপুরের জমিদারবংশের ছেলে বসন্তর নেশা হচ্ছে পথে পথে ঘোরা এবং মাঠে-ঘাটে-গঞ্জে-বাজারে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে মেশা। প্রাণের আনন্দে সে গান গায়, আর পথ চলে; কখনও দূরগামী গরুর গাড়ীতে চেপে বসে, কখনও বা নৌকোয়। যাত্রা বা রামলীলার দলে মিশতে যেমন তার বাধে না, তেমনই বাধে না ঝুমুর বা নৌটংকীর দলে মিশতে। তার সান্নিধ্যে এলে মেয়েরা মুগ্ধ না হয়ে পারে না। কিন্তু সে কোথাও ধরা দিতে চায় না। এমন কি, বৈদারাজের মেয়ে মোতিয়া, স্রেফ কন্যাদায় উদ্ধারের জন্যে যাকে সে বিবাহ করেছিল, সেই সুন্দরী তরুণী মোতিয়াও তাকে সোহাগভরা ভালোবাসা দিয়ে বাঁধতে পারেনি; নৌটংকী দলের গুলাবী ও সরবতী তাদের ব্যবসা ছেড়ে দিতে রাজী ছিল তার জন্যে, তবু সে ধরা দেয়নি। পথকে ভালোবেসে সে শেষ পর্যন্ত ক্ষয়রোগে

গুরু বাগচী পরিচালিত তীরভূমি মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়

আক্রান্ত হয়েছে; কিন্তু তবু সে ঘরের ভিতরে মরতে পারেনি, নদীবক্ষে ভাসমান নৌকোর পাটাতনের ওপর সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে।

আমরা যারা বাঙলা 'পলাতক' দেখেছি, তাদের মনে স্বভাবতই বাঙলার সঙ্গে হিন্দী "রাহগীর"-এর একটা তুলনামূলক আলোচনার কথা জাগবে। প্রথমেই বলি, বাঙলা সংস্করণের সঙ্গে হিন্দীর কাঠামোর বিশেষ একটা গরমিল নেই, শুধু রতনপুরের জমিদারবাড়ীর সংলগ্ন মাঠে জমিদার-বালকের নেতৃত্বে গ্রাম্য ছেলেদের গান ও খেলাধুলো ছাড়া। ইস্টম্যান কলারে রঞ্জিত হওয়ার ফলে হিন্দী "রাহগীর" হয়েছে ঢের বেশী ঝলমলে, জাঁকজমকপূর্ণ। তবে রঙের প্রতিফলন সর্বত্র সমান নয়; যেমন, আকাশের চাঁদে নীলের ছাপ।

সন্ধ্যা রায় বোধকরি এই প্রথম হিন্দী ছবির নায়িকারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। কিন্তু অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ তাঁর আন্তরিক অভিনয়; প্রথম আবির্ভাবের জড়তা কোথাও নেই। বহু হিন্দী ছবিতেই বিশ্বজিৎ নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। কিন্তু রতনপুরের নীলমু চৌধুরীর ঘর পালানো ভাই বসন্ত চৌধুরীবেশে তিনি যে প্রাণঢালা মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছেন, এমনটি এর আগে কখনও দেখিনি। নৌটঙ্কী দলের প্রধানা গুলাবীর ভূমিকায় শশীকলার অভিনয়ে একজন অভিজ্ঞ আর্টিস্টের দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে অবলীলাক্রমে। কিন্তু আমাদের বিস্মিত করেছেন শ্রীমতী পদ্মা সরবতী বাঈয়ের ভূমিকায় তাঁর বহুমুখী নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়ে। তাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব ততখানি শ্রীমণ্ডিত না হলেও অর্থব্যঞ্জক চাহনি দ্বারা তিনি একাধারে যৌন আবেদন, প্রেমাসক্তি ও ব্যথাবেদনাকে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। এ ছাড়া বসন্ত চৌধুরী (হেমন্ত ওরফে নীলমু চৌধুরী), কানহাইয়ালাল (রামলীলার দলপতি বৈদ্যরাজ), নিরূপা রায় (নীলমু চৌধুরীর স্ত্রী), জহর রায় (নৌটঙ্কীর দলের অধিকারী), পাহাড়ী সান্যাল (রামলীলা দলের সহানুভূতিপরায়ণ গ্রাম্য ব্যক্তি) প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকাভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

"রাহগীর" ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। সর্বাপেক্ষা দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল দৃশ্যপটাদির গঠনে। ছবির গতি বেশী ভাগ সময়েই শ্লথ। সম্পাদকের কাঁচি আরও কিছু তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত ছিল। ছবিতে দশখানি গান আছে। এদের মধ্যে বেশী ভাগই হিন্দী চিত্রজগতে সুরের দিক দিয়ে অভিনবত্ব দাবি করতে পারে। কিন্তু বে কয়েকখানিতে লয় দ্রুততর হওয়ার অবকাশ ছিল। যাকে বলে আতিয়ে তোলা, সে মাতনের সৃষ্টি করতে পারেনি গানগুলি।

হিন্দী ছবির রাজ্যে ট্র্যাজিডির দর্শন পাওয়া দুর্লভ। গীতাঞ্জলি-চিত্রদীপ নিবেদিত "রাহগীর" সেই দুর্লভ বস্তু পরিবেশন করে একটি স্মরণীয় শিল্পকীর্তি রূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কলকাতার মেট্রো সিনেমায় এই প্রথম একটি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভের সৌভাগ্য অর্জন করল।

বিবিধ সংবাদ

"তাসের দেশ"

সঙ্গীত শিক্ষায়তন রবিতীর্থের ত্রয়োবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগামী ১০ ও ১৬ আগস্ট রবীন্দ্র সদনে "তাসের দেশ" নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করা হবে। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন চৌধুরী।

২৪ আগস্ট রবিবার, 'কলা-মন্দিরে' দক্ষিণীর শিশুশিল্পীরা রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' মঞ্চস্থ করবে।

সিনে সেন্ট্রাল ও ভারত-জাপান মৈত্রী সংঘের উদ্যোগে অপেরা সিনেমায় ১ থেকে ৭ আগস্ট—সাতদিন ধরে একটি জাপানী চলচ্চিত্রোৎসবের অনুষ্ঠান চলছে। এই উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, জাপান যে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকেই চলচ্চিত্রজগতে অগ্রণী, তা নয়, কুরুসোয়া, ওজু প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালকদের নেতৃত্বে জাপান আজ জীবননিষ্ঠ, শিল্পসম্মত চলচ্চিত্রাবলী জগৎকে উপহার দিচ্ছে। আমরা বারান্তরে এই উৎসবে প্রদর্শিত ছবিগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

৮ জুন রবিবার সন্ধ্যায় ব্যারাকপুরের 'রবি সংসদ' সঙ্গীতায়তনের সমাবর্তন উৎসব সাফল্যের সঙ্গে উদযাপিত হল। সভাপতিত্ব করেন 'উদীচী' অধ্যক্ষ শ্রীশৈলেশ ভড়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন 'রবীন্দ্র-সঙ্গীত আমাদের জাতীয় জীবনে এক অমূল্য সম্পদ। এর প্রচার ও প্রসার যত বিস্তৃতি লাভ করবে জনজীবন ততই উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে।' প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপিকা ডক্টর সুপ্তি সেন বলেন, 'আমাদের আত্মিক উন্নতির

মেট্রো সিনেমায় **রাহগীর** চিত্রের প্রিমিয়ার শো-এ বিশ্বজিৎ, প্রসেনজিৎ, সন্ধ্যা রায়, পরিচালক তরুণ মজুমদার, শশিকলা, নিরুপা রায়, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ফটো: অমৃত

একমাত্র মাধ্যম রবীন্দ্রসঙ্গীত। আত্মোপলব্ধির এমন সহজ পন্থা আর নেই। অনুষ্ঠানে কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত সুন্দরভাবে গেয়ে শোনান অতিথি শিল্পী শ্রীসুশীল মল্লিক ও শ্রীতপন সিংহ। সবশেষে শ্রীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় শিক্ষায়তনের ছাত্র-ছাত্রীরা 'ঋতুরঙ্গ' নৃত্য বিচিত্রা পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন।

৩১ মে শনিবার সন্ধ্যায় ৭ম বার্ষিক সম্মেলন 'বঙ্গীয় যুব পরিষদ' শ্রীশ চৌধুরী লেনে ঋতুরঙ্গ নাট্য অভিনয় হয়। প্রযোজনায় ছিলেন—নৃত্যছন্দ ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সুবল সাহা। নৃত্য পরিচালনায় ছিলেন—শ্রীতপেন সোম ও সঙ্গীতে ছিলেন শ্রীপ্রেমাংশু বোস। নৃত্যাংশে অংশ নেন—কুমারী রত্না সেমা, ভাস্বতী সেন, বন্দনা ভট্টাচার্য, চন্দ্রিমা দাসগুপ্ত, তপতী সাহা, ...দা চট্টোপাধ্যায়, অরুন্ধতী রক্ষিত। অনুষ্ঠানে সুবল সাহা কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওলার' একক মূকাভিনয়—আকর্ষণীয় হয়। সবশেষে মঞ্চস্থ হয় শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্য রচিত 'বোধন' নাটক বঙ্গীয় যুব পরিষদের প্রযোজনায়। পরিচালনায় ছিলেন—শ্রীশ্যামাকান্ত দাস।

সম্প্রতি 'বন্ধুমহলে'র প্রযোজনায় ...টালি গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টারের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে 'সুলতানা রিজিয়া' নাটক অভিনীত হয়। কয়েকটি চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন সুলেখা মুখার্জি, শঙ্কর ব্যানার্জি, রামপ্রসাদ মাইতি, কৃত্তিবাস জানা, ...দেব মণ্ডল, মাধব দাস, বনমালী দাস।

নিউদিল্লী বেঙ্গলী ক্লাব কর্তৃক আয়োজিত সর্বভারতীয় নাট্যোৎসবে 'নান্দনিক' সম্প্রদায় কর্তৃক আগামী ১৫ আগস্ট এ্যাইফ্যাকস হলে বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত 'রজনীগন্ধা' নাটক অভিনীত হবে।

মেরি পিকফোর্ড

অসামান্য জনপ্রিয়তার মূলে যদি কোন ঐশীশক্তি থেকে থাকে এবং তার ফলে কোন চিত্রতারকা অমরত্ব লাভ করেন তাহলে বলতে হবে চলচ্চিত্রের দেবী মেরি পিক-ফোর্ড নিঃসন্দেহে সেই ধরনেরই একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তাঁর অসাধারণ জন-প্রিয়তা পৌরাণিক কাহিনীর মতই শাশ্বত। তাঁর নায়িকা জীবনের ইতিকথা চলচ্চিত্রানু-রাগীদের কাছে স্মৃতি হয়ে আছে। সেদিনের দর্শকরা মেরি পিকফোর্ডকে কিছুতেই ভুলে যেতে পারবেন না। মেরির সেই সরল, নিষ্পাপ মুখখানা আজও যেন চোখের সামনে ভাসে। আমরা তাঁকে কিশোরীরূপে বহু ছবিতে দেখেছি। কোঁকড়ানো চুলের সেই 'ছোট্ট মেয়ে' হয়ে আজও মেরি পিক-ফোর্ড অযুত-নিযুত দর্শকদের মধ্যে বেঁচে আছেন। তাঁর নাম চলচ্চিত্র-ইতিহাস থেকে মুছে যায় নি। আমরা তাঁকে ভুলি নি।

কানাডার পিকফোর্ড পরিবারে ১৮৯৩ সালে মেরি পিকফোর্ডের জন্ম। মেরির আসল নাম ছিল গ্ল্যাডিজ স্মিথ। অভিনয়-জগতে প্রবেশ করার সময় আমেরিকার অনুষ্ঠান এবং থিয়েটার পরিচালক ডেভিড বেলাস্কো স্মিথের নামকরণ করেন মেরি পিকফোর্ড। ছোটবেলা থেকেই মেরি বাবাকেই বেশি পছন্দ করতেন। তাই বাড়ির সবাই মেরিকে 'বাবার মেয়ে' বলে খেপাত। কিন্তু বেশি দিন মেরির পিতৃস্নেহ কপালে সইল না। মেরির বাবা হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। তখন মেরির বয়স মাত্র পাঁচ বছর। পিতৃবিয়োগের ফলে সংসার রাতা-রাতি অচল হয়ে পড়ল। মেরির মা কোন-রকমে বাড়িভাড়া দিয়ে সংসার চালাতে লাগলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এতেও তেমন সুরাহা হল না। বাধ্য হয়ে অর্থ রোজগারের জন্য মা এবং ভাই-বোনেদের সঙ্গে মেরি পিকফোর্ডও মঞ্চাভিনয়ে যোগ দিলেন। বেলাস্কোর ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারেই বহু বছর ধরে অভিনয় করতে থাকলেন মেরি।

মেরি পিকফোর্ড পনেরো বছর বয়সে আমেরিকার ব্রডওয়ে থিয়েটারে যোগ দিলেন। এই সময় হলিউডের চলচ্চিত্র-পরিচালক ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ, যিনি আজ চিত্রজগতের প্রথম প্রতিভাবান প্রয়োগ-শিল্পী বলে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, তাঁর সঙ্গে মেরির পরিচয় হল। মেরির জীবনে গ্রিফিথ হলেন প্রথম চিত্র-পরিচালক। বায়গ্রাফ স্টুডিওয় যখন প্রথম গ্রিফিথের সঙ্গে মেরি পিকফোর্ডের আলাপ হয় তখন তিনি মেরিকে দেখেই বলেছিলেন, তোমার বয়স খুবই অল্প এবং দেখতেও বেশ মোটাসোটা। তোমাকে একটা কাজ দেব।

১৯০৯ সালে ডেভিড ওয়ার্ক গ্রিফিথ তাঁর 'পিপ্পা আসেস' ছবির জন্য মেরি পিকফোর্ডকে মনোনীত করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিপ্পার চরিত্রে মেরির অভিনয় করা হল না। কারণ গ্রিফিথ দেখলেন যে, মেরি খুব বেশি মোটা হয়ে গেছে। সুতরাং এই চরিত্রে তাকে নামালে বেমানান লাগবে। গ্রিফিথের এই সিদ্ধান্তে মেরি খুবই দুঃখ পেলেন। তাই ক্রোধবশত তিনি চলচ্চিত্রা-ভিনয় ছেড়ে আবার মঞ্চে যোগদান করলেন। বেলাস্কোর থিয়েটারে আবার ফিরে গেলেন।

কিন্তু একটা বছর যেতে না যেতেই মেরি পিকফোর্ড আবার চলচ্চিত্রে ফিরে এলেন। এই হঠাৎ পুনরাবির্ভাবের পেছনে কি তাঁর প্রতিহিংসা, উচ্চাশা কিম্বা অর্থ-লিপ্সা রয়েছে? না মঞ্চের মত চলচ্চিত্রেও মেরি পিকফোর্ড জনপ্রিয় অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন! জানি না মেরির মনে কি ছিল, হয়তো অহঙ্কার, অর্থলাভ বা অন্য কিছু। যাই হোক মেরি ১৯১৬ সালে চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত প্রযোজক জুকর-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন ছবিতে অভিনয় করার জন্য। মেরি পিকফোর্ডকে সব রকমের সুবিধা দিলেন জুকর সাহেব। সপ্তাহে দশ হাজার শিলিং পারিশ্রমিক ছাড়াও তাঁকে যাতায়াতের জন্য একটি নিজস্ব গাড়ি দেওয়া হল। শুধুমাত্র মেরির অভিনয়ের জন্য রাতারাতি নিউইয়র্ক স্টুডিও তৈরী হয়ে গেল। এখানে মেরি পিকফোর্ড অভিনীত ছবি ছাড়া অন্য কোন সিনেমার স্যুটিং করা চলত না। তাই এক সময় এটি মেরি পিকফোর্ড স্টুডিও নামে পরিচিত হল। এই সময় থেকে মেরির অসাধারণ জনপ্রিয়তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বলতে গেলে চলচ্চিত্রে মেরি পিক-ফোর্ডের যুগ শুরু হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে অনেক ছবিতে তিনি কিশোরী-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করলেন। যেমন : টেস অব

দি স্টর্ম কানট্রি, হার্টস এড্রিফট, দি ইগলস নেস্ট, এ রোমান্স অফ দি রেডউডস, স্টেলা ম্যারিস, পোল্লেয়ানা, ড্যাডি-লঙ-লেগস, স্প্যারোজ দি ব্যাক ডোরস, লিটল লর্ড ফন্টলেরয়, লিটল অ্যানি রুনি, কোকেট, দি টেমিং অফ দি শ্রু, সিক্রেটস, কিকি প্রভৃতি ছবিতে মেরি পিকফোর্ড অভিনয় করেছেন।

এইসব ছবিতে মেরি পিকফোর্ড যখন অভিনয় করেন তখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, এই বয়সে তিনি প্রায় অধিকাংশ ছবিতে বারো থেকে পনেরো বছরের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মাৎ করেছিলেন। এমনকি ৩২ বছরের মেরি 'লিটল অ্যানি রুনি' ছবিতে ১২ বছর বয়সের মেয়ের চরিত্রে নিখুঁত অভিনয় করতে পেরেছিলেন। আসলে এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর আকৃতির জন্য। মেরি পিকফোর্ডকে দেখতে খুবই ছোটখাট লাগত। তার দৈহিক কাঠামোই তাঁকে চির-কিশোরী করে রেখেছিল। খুব বেশি লম্বা-চওড়া ছিলেন না। তিনি উচ্চতায় মাত্র পাঁচ ফুট ছিলেন। তাঁর চেহারায় চিরতারুণ্য ছিল বলেই বরাবরই মেরি পিকফোর্ডকে কিশোরীর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গেছে। কখনও তাঁর আসল বয়স ছবির চরিত্রে ধরা পড়েনি। সত্যি, এ এক আশ্চর্য দৈহিক গঠন! যাঁরা মেরি পিকফোর্ডের এইসব ছবি দেখেননি তাঁদের পক্ষে এসব গল্পকথা বলে মনে হতে পারে। আর যাঁরা মেরির অভিনয় দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন। মেরির বয়স যখন বত্রিশ তখন বারো বছরের মেয়ের পোশাক পরে অভিনয় করার সময় স্টুডিওর লোকেরা অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতেন। সে-দৃশ্য ভোলার নয়।

এই বয়সে মেরি পিকফোর্ড অবশ্য প্রাপ্তবয়স্কা নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দর্শকরা তাঁর এ ইচ্ছায় সাড়া দেয়নি। দর্শকদের অভিমত জানার জন্য মেরি 'ফটোপ্লে' সিনেমা পত্রিকার পাঠকদের কাছে সে সময় আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। এ আবেদনে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। মেরি পিকফোর্ডের প্রিয় কুড়ি হাজার পাঠকরা তাদের মতামত জানিয়েছিল। সব চিঠি পড়ে দেখা গেল বেশির ভাগ পাঠকই মেরিকে চিরদিন শৈশব-চরিত্রে অভিনয় করে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে। মেরি পিকফোর্ডকে কিশোরীরূপে দেখতেই তাদের সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। বিশেষ করে মেরির ছেলেবেলা-চরিত্র তাদের সবার প্রিয়।

মেরি পিকফোর্ড তো অবাক! পাঠকদের কি আব্দার! বয়স হয়েছে অথচ নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করা চলবে না! মেরি শেষ পর্যন্ত পাঠকদের বুঝিয়ে পত্রিকায় একটা চিঠি ছাপলেন। লিখলেন, ইতিমধ্যে আমি সিন্ডেরেলার চরিত্রে অভিনয় করেছি। এখন আর সামান্য ছেঁড়া পোশাক পরে শিশু সাজতে ভাল লাগে না। ফ্যাশানদুরস্ত টেফাট পোশাকে প্রেমিকার চরিত্রে অভিনয় করতে চাইছি। আমার মনে হয়, এই বয়সে আর কিশোরী হওয়া যায় না। তাই এখন থেকে নায়িকা চরিত্রে আমার অভিনয় করা উচিত।

দর্শকদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে মেরি পিকফোর্ড ১৯২৯ সালে 'কোকেট' ছবিতে এক উচ্ছৃংখল নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করলেন। প্রাপ্তবয়স্কার চরিত্রে মানানসই চেহারা আনার জন্য মেরি তার কোঁকড়ানো চুল পর্যন্ত ছেঁটে ফেললেন। তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয়ের জন্য এ ছবিতে মেরি পিকফোর্ড অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলেন বটে কিন্তু দর্শকদের মন জয় করতে পারলেন না। দর্শকরা কিছুতেই মেরির এই নতুন চরিত্রকে পছন্দ করল না। মেরিকে তারা কিশোরী-রূপেই দেখতে চায়। তাই মেরির কোঁকড়ানো চুল কেটে ফেলা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মেরি পিকফোর্ড সহজে দমলেন না। তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্বামী ডগলাস ফেয়ার-ব্যাংকস, সিনিয়র-এর সঙ্গে নায়িকা চরিত্রে 'দি টেমিং অফ দি শ্রু' এবং 'কিকি' ছবিতে অভিনয় করলেন। তারপর নায়ক লেসলি হাওয়ার্ড-এর বিপরীতে 'সিক্রেটস' ছবিতে নামলেন। এইসব ছবিতে মেরি খুব ভাল অভিনয় করা সত্ত্বেও দর্শকরা তাঁকে নায়িকা চরিত্রে গ্রহণ করল না। ফলে মেরি পিকফোর্ড তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই নিরাশ হলেন। ভেঙে পড়লেন। অকৃতকার্যতার জন্য তিনি চলচ্চিত্র থেকে অবসর নেবেন বলে ঠিক করলেন।

মেরি পিকফোর্ড তাঁর ভুবনবিদিত খ্যাতি থেকে সরে দাঁড়ালেন। তিনি দর্শকদের সঙ্গে কিছুতেই সন্ধি করলেন না। বরং চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নিয়ে তৃতীয় স্বামী চার্লস রজার্স-এর সঙ্গে সংসার পাতলেন। মেরি সংসারী হয়ে প্রথমেই তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা জানিয়ে বললেন, আমার মৃত্যুর আগেই সব ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলা হোক, কারণ ছবির বিভীষিকা থেকে আমি একটা সুন্দর স্মৃতি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে বাঁচতে চাই।

মেরি পিকফোর্ড আজও দর্শকদের কাছে স্মৃতি হয়ে আছেন। তিনি বিস্মৃত নন। আমার মনে হয়, মেরি দর্শকদের কথা না শুনে জীবনে সবচেয়ে বেশি ভুল করেছেন। তাঁর উচিত ছিল দর্শকদের ইচ্ছা পূরণ করা। তাহলে এত তাড়াতাড়ি তাঁকে চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নিতে হত না। তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত অভিনয় করতে পারতেন। কারণ তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা তাঁকে এক মোহময়ী অভিনেত্রী হিসেবে বিশ্ববন্দিত করেছিল। মেরি পিকফোর্ড একজন সত্যিকারের প্রতিভাময়ী শিল্পী ছিলেন। তাই বোধহয় শেষ পর্যন্ত দর্শকদের কাছে তিনি বশ্যতা স্বীকার করলেন না। তিনি অপরাজিতা হয়ে রইলেন।

—চিত্রলেখ
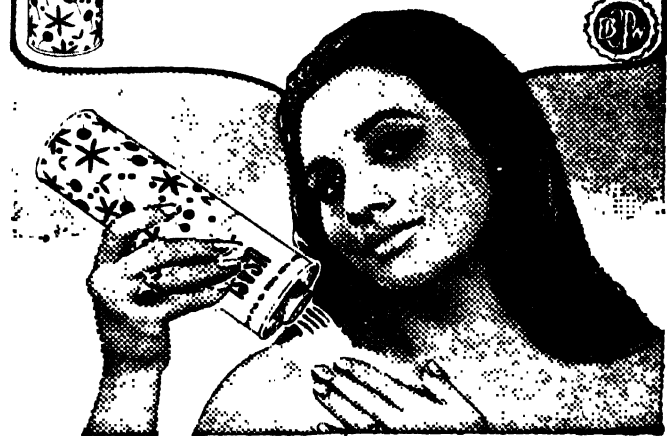
বসন্তের ফুলসাজ পড়েছে খসে। সারারাত্রি গন্ধ বিলিয়ে ক্লান্ত ফুলের দল ঠাঁই নিয়েছে ঘুমের কোলে। যেন উৎসব শেষে নিভে গেছে রাতের উজ্জ্বল দীপাবলী। এ ক্লান্তি, এ বিশ্রাম কিন্তু ক্ষণেকের। দিনের আলো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার আয়োজন ফুল ফোটানোর, দীপ জ্বালানোর। এই হচ্ছে এখন যাত্রাপাড়ার দৃশ্য। সেখানে এখন এক মরশুম শেষে, চলছে আরেক মরশুমের প্রস্তুতি। সে প্রস্তুতি শিল্পী সংগ্রহের, পালা নির্বাচনের ও তা সংগঠনের।

গত কয়েক মরশুম ধরেই দেখা গেছে, কল্পলোকের স্বপ্ন ছেড়ে যাত্রা তার পালার কাহিনী সংগ্রহ করছে বাস্তবের মাটি থেকে। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও আগেকার সোচ্চার অভিনয় ধারা ত্যাগ করে অনুসরণ করছে স্বাভাবিক সংযত ধারাকে। আর এরই ফলে, আমরা পাচ্ছি মঞ্চের সফল নাট্যকারদের পালাকার হিসেবে, চিত্র ও মঞ্চের শিল্পীদের যাত্রা শিল্পী হিসেবে। ফলে মঞ্চ, চিত্র ও যাত্রার মধ্যে এক ধরনের একাত্মতা গড়ে উঠছে।

এ মরশুমে বিভিন্ন যাত্রাদলগুলি যে সব পালা নির্বাচন করেছেন, তার বেশীর ভাগই জীবনীমূলক এবং এ জীবনও হচ্ছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানীদের। শুধু তাই নয়, বিদেশী নায়কদের জীবনও এবার পরিবেশিত হবে পালাকারে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে কিছু সমস্যামূলক, কিছু কাল্পনিক নাটকও থাকছে। এইসব নতুন নাটক এবং সংগৃহীত নতুন ও প্রবীণ শিল্পী নিয়ে প্রতিটি যাত্রা সংস্থাই এখন জোর মহড়া চালিয়ে তৈরী হচ্ছে। জমজমাট যাত্রাপাড়ার বাছাই করা কয়েকটি যাত্রা সংস্থার প্রস্তুতির কথা এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

সত্যম্বর অপেরা : এবার এঁদের আয়োজনকে জোরদার করবার জন্য মঞ্চের প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায় এই সর্বপ্রথম লিখলেন একটি ঐতিহাসিক যাত্রাপালা। পালাটির নাম [illegible]। মঞ্চের আরেক নাট্যকার উৎপল দত্ত এঁদের জন্য লিখেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক রক্তক্ষয়ী অধ্যায় অবলম্বনে 'জালিয়ানওয়ালাবাগ'। আর তরুণ যাত্রাপালাকার ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত [illegible] এঁদের অন্যতম আকর্ষণ। এছাড়া গত বছরের সফল পালাগুলিও এই সঙ্গে পরিবেশিত হবে। বেশীর ভাগ তরুণ শিল্পী সমন্বয়ে গঠিত সত্যম্বর অপেরার বিশিষ্ট নট ও নটীরা হচ্ছেন তপনকুমার, রবীন মজুমদার, গোরাশশী মণ্ডল, মাখন সমাদ্দার, জয়শ্রী মুখার্জি, অসীম কুণ্ডু, বাণী দাশগুপ্ত, রবি চক্রবর্তী, মিতা চ্যাটার্জি, ভোলা পাল প্রভৃতি। এঁদের নাট্যোপদেষ্টা হচ্ছেন ডঃ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

জনতা অপেরা : এঁদের নাট্যতালিকায় এবার রয়েছে আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক 'ফাঁসির মঞ্চে', বাস্তবধর্মী নাটক 'কলঙ্কিত সতী' ও শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত 'হুমায়ুন'। এঁদের শিল্পী তালিকায় রয়েছেন পান্নালাল চক্রবর্তী, চিত্রা মল্লিক, শক্তি ভট্টাচার্য, গোকুল দে, বীণা ভট্ট, বিমল রাণী, ভারতী সিংহ, সাহানা ঘোষ। সঙ্গীতে থাকছেন গুরুদাস ধাড়া।

নিউ গণেশ অপেরা : দু'বছর বন্ধের পর এঁরা এবার নট ও নাট্যকার আনন্দময়ের 'মরেও যারা মরে না' পালাটি নিয়ে যাত্রা শুরু করছেন। এঁদের দলে এবার অভিনয় করবেন গোপাল চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি ঘোষ, মধুছন্দা, দীপ্তি ঘোষ, আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ পাল। সংগীতে থাকবেন সুধীর ধাড়া (ভজা)।

অম্বিকা নাট্য কোম্পানী : বরাবরই পালা নির্বাচন ও অভিনয়ে এঁরা জনমনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছেন। এবার এঁরা গত মরশুমের 'চণ্ডীতলার মন্দিরের' সঙ্গে নতুন সংযোজন করেছেন প্রখ্যাত পালাকার ব্রজেন দে'র 'কালাপাহাড়'। এঁদের শিল্পী তালিকায় আছেন অমিয় বসু, শৈল দেবী, নিতাই দাস, চণ্ডী ব্যানার্জি, দেবেন নাথ, বীণা ঘোষ, বিজলী মুখার্জি প্রভৃতি।

শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানী : এঁদের এ মরশুমের নতুন নাটক হচ্ছে প্রসাদ ভট্টাচার্যের 'জলদস্যু', সত্যপ্রকাশ দত্তের 'জব চার্ণক', জিতেন বসাকের 'সন্ন্যাসী সন্তান'। এঁদের শিল্পী তালিকায় আছেন বিমল [illegible], বীরেন চ্যাটার্জি, জ্যোতি দত্ত, প্রতিমা ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা দাস, গীতা অধিকারী প্রভৃতি।

নিউ আর্য অপেরা : এবার এঁরা যাত্রার আসরে অভিনয় করবেন [illegible] দে'র 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র'। এঁদের শিল্পী তালিকায় রয়েছেন [illegible] সুনীল কুমার, [illegible] দাস, মিনতি মজুমদার ও সমর দত্ত প্রভৃতি।

ভারতী অপেরা : এই মরশুমে এঁদের নতুন পালা [illegible] 'সূর্য সেন'। নাটকটির নামভূমিকায় আছেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়। [illegible] তপন সেন, সুরেশ দত্ত, [illegible] বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন [illegible] পাঠক, [illegible] বিমল বসুমল্লিক, শচী মণ্ডল, [illegible] চ্যাটার্জি, মায়া পাল, গীতা দত্ত, মিস [illegible] প্রভৃতি।

নব রঞ্জন অপেরা : এই দলটির এবারের নতুন পালা [illegible] 'রক্তলেখা'। অভিনয়ে আছেন স্বপনকুমার, চপলা দেবী, ফাল্গুনী চাটুজ্জী, মধু মল্লিক, প্রাণকুমার, নারায়ণ সাহা প্রভৃতি। সঙ্গীতে আছেন ক্ষিতীশ রায়।

তরুণ অপেরা : হিটলারের পর এবার এঁরা আসরস্থ করছেন শম্ভু বাগের 'লেনিন', 'নেপোলিয়ান' ও সৌরেন মুখার্জীর 'রামমোহন'। এঁদের শিল্পী তালিকায় রয়েছেন শান্তি গোপাল, শিবু ভট্টাচার্য, বর্ণালী ব্যানার্জি প্রভৃতি এঁদের গত বছরের সুখ্যাত শিল্পীদল।

—নন্দলাল ভট্টাচার্য

সোবার্স আর পারছেন না

একটানা ১৭ বছর ক্রিকেট খেলে গারফিল্ড সোবার্স আজ ক্লান্ত। আর তিনি তেমন খেলতে পারছেন না। দেশের এক-প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটোছুটি, নানা আবহাওয়ার মধ্যে খেলে বেড়িয়ে, বলতে দ্বিধা নেই—দলের আগা-অন্ত সামলে বেড়ান আর তাঁর সাধ্যে কুলোচ্ছে না। এই সেদিন লর্ড'স টেস্টে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি শূন্য রান করায় দলের সমস্ত ক্ষতি হয়েছে। সোবার্স যে আর পারছেন না, একথাটা ভাবতেও ক্রীড়া-রসিকদের মন উতলা হয়ে পড়ছে। সোবার্স পারেন না এমন কাজ নেই—এই কথাটাই এতকাল সবাই জেনে এসেছেন। অর্থাৎ ব্যাট, বল, ফিল্ডিং এবং ক্রিকেট সুলভ মনোভাব সব দিক থেকেই সোবার্স সবাইয়ের ওপরে। আর অধিনায়কত্ব, সেটা ত তাঁর সমস্ত ভূমিকা। বিখ্যাত ক্রিকেট সমালোচক রন রবার্টস বলেছেন—"এ এক অদ্ভুত ব্যাপার যে-কোন অবস্থায় যে-কোন ক্রিকেটের প্রসঙ্গ পাড়লেই একবার না একবার সোবার্সের নাম আসবেই। আর সব ব্যাপারে যতই মত-বিরোধ থাকুক না কেন, সবাই একবাক্যে সোবার্সের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নেবে।'

কিছুদিন আগে আমাদের মনে জেগে-ছিল ওরেলের যোগ্য উত্তরাধিকারী সোবার্স কিনা! সেই ধারণার অবসান বহুদিন হয়েছে। বলার মত কথা, জীবনের প্রথম অধিনায়কত্ব পেয়ে অস্ট্রেলিয়ার মত জাত-ক্রিকেট দলকে হারিয়ে দেওয়া—"রাবার" জয় করা কম কৃতিত্বের পরিচয় নয়।

সোবার্সকে যেদিন প্রথম দেখলাম, সেটা ১৯৫৮ সাল। ইডেনের গ্যালারীতে বসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের খেলা দেখ-ছিলাম। ব্যাট করছিলেন রোহন কানহাই এবং গারফিল্ড সোবার্স। সেদিনকার এই কানহাই-সোবার্স জুটির খেলা ইডেন উদ্যানে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে—এবং থাকবেও। কানহাইয়ের দুশো রান নিয়ে সেদিনের ইডেন ছিল মুখর। প্রত্যেকটি লোকের মুখে কানহাইয়ের দুর্ধর্ষ মারের প্রশংসা। দেখছিলাম, শুনছিলাম আর ভাব-ছিলাম যে এই কানহাইকে কি রোখা সম্ভব নয়? এঁর খেলার কি কোন ফাঁক নেই? ফাঁক ছিল ভয়ে ভয়ে বলছি যে, আমি যদি বোলার হতাম কানহাইকে আউট করতে না পারলেও তাঁর মারমুখী রানের গতি রোধ করতে পারতাম। এবং প্রত্যেক ক্রিকেটার মাত্রেই স্বীকার করবেন রানের গতি আটকান মানে ব্যাটসম্যানের ধৈর্যচ্যুতি ঘটা—আর সেটা সামলে রাখলে তাঁকে আউট করা শক্ত হয় না। কিন্তু অপর প্রান্তে সোবার্সের ছোট ছোট মার আর খুচরো রান ঠেকান যে অসাধ্য ব্যাপার। এবার অবশ্য সোবার্সের খুচরো রানে বোলারদেরই বুদ্ধিভ্রম ঘটার কথা। সোবার্স যে কত বড় ব্যাটসম্যান সেকথা বুঝতে সেদিন আমার কষ্ট হয়নি। কিন্তু তবু সেদিন কানহাই ছিলেন সকলের মাথার মণি। এক্ষেত্রে সেদিন মনের কথা আর কাউকে বলা হয়নি। বোলার যদি এক-জন সত্যিকারের ব্যাটসম্যানকে বল করে তখন তার কর্তব্য ব্যাটসম্যানকে আটকে রাখা—তারপর বোলিংয়ের মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করে ব্যাটসম্যানকে আউট করা। ব্যাটসম্যান যদি এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পালিয়ে যায় তবে তাকে আউট করা সম্ভব নয়। আজ কিন্তু দ্বিধাহীন চিত্তে আমি আমার গোপন কথা বলে রাখছি। সেদিন কানহাইয়ের চেয়ে সোবার্সকে এই কারণেই বড় ব্যাটসম্যান বলে মনে করেছিলাম। বছর দশেক আগেকার কথা বলছি। এই হেন কানহাই-সোবার্সের খেলা নিয়ে যখন ক্রিকেট-অনুরাগীরা নানান মত পোষণ করছেন, তুলনামূলক বিচারে যখন সবাই মহাব্যস্ত, কানহাইয়ের ব্যাটিংয়ের হিসাব নিয়ে সোবার্সের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছেন, তখন আমরা একবারও সোবার্সের নির্ভুল, নির্ভেজাল সুন্দর খেলাটাকে চেয়ে দেখিনি। তাহলে সে ভুল বুঝতে আমাদের এত দেরী হত না।

এই ১৯৫৮ সালেই ইডেনের টেস্ট খেলা শেষ হলে কর্তা-ব্যক্তিদের আমন্ত্রিত এক ভোজসভায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলটাই আসর গরম করে তুললেন। সোবার্সও সে আসরের একচ্ছত্র নায়ক। গানে-গল্পে-নাচে তিনি মাতোয়ারা হয়ে রইলেন। সোবার্সকে জব্দ করার ইচ্ছা না সামলাতে পেরে কেউ চুপ-সাড়ে এক বিদেশিনী সুন্দরী মহিলাকে আসরে ভিড়িয়ে দেন গান গাইবার অছিলায়। কথামতই মহিলাটি এক কঠিন নাচের সুরে গান ধরলেন। আর তাঁর গানের সঙ্গে নাচতে অতিথিদের আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু সোবার্স ছাড়া আর কেউ আসতে সাহস করলেন না। সেই দ্রুত লয়ে সোবার্সের নাচ আজও আমার মনে আছে।

ভোজসভায় যখন পানীয় নিয়ে সবাই মত্ত, ঠিক সেই অবসরে লনের বাইরে এসে দেখি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কলিন স্মিথ ও রোহন কানহাই নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। গায়ে পড়ে জানতে চাইলাম হান্টের কথা।—বললাম—"হান্ট এত চুপচাপ কেন, এত ধীর স্থির কেন?"—দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন—'কে হান্ট? ওযে আমাদের বিগ্ বস্। খুব বুদ্ধি ধরে। আর কোন কাজ আমরা ওকে না জানিয়ে করি না।' কথাটার জের টেনেই বললাম—"হোয়াট এ্যাবাউট সোবার্স! এমন স্ফূর্তি-বাজ মানুষও কখনও দেখিনি। নাচেও তিনি কম এক্সপার্ট নন!" কানহাই হেসে ফেললেন—'দেখুন না ওকে সব ব্যাপারে পাবেন।' স্মিথ কানহাইয়ের কথাটায় যোগ করলেন—'একটা প্রবাদ আছে, জ্যাক্ অব অল ট্রেডস বাট মাস্টার অব্ নান্।' কিন্তু সোবার্সের বেলায় সেকথাটা খাটে না। সোবার্স হোল—জ্যাক্ অব অল ট্রেডস এ্যান্ড দি মাস্টার অব দি লট।' কথা শেষ করলেন রোহন কানহাই—'দেখুন, সোবার্সের মস্ত গুণ। ও যেটা একবার ভুল করে তা আর দ্বিতীয়বার করে না।' স্মিথ সে কথায় সায় দিলেন।

কানহাই আর স্মিথকে ধরে নিয়ে গেলেন সভার উদ্যোক্তারা। আবদার ধরলেন কানহাইকে আরও পানীয় খাবার জন্যে। কিন্তু কানহাই বেঁকে বসলেন। অনুরোধ সত্ত্বেও না। সোবার্স সেটা লক্ষ্য করে-ছিলেন। সভা থেকে বিদায় নেবার জন্যে সোবার্সের কাছে কানহাই অনুমতি চাইতে আসতেই তিনি বললেন—'অবশ্যই যাবে বৈকি। তবে তার আগে ঐ পানীয়টা শেষ করে যাও। উদ্যোক্তাদের খুশী কর। তুমি দলের সেরা খেলোয়াড় আর এই সামান্য আব্দার রাখতে এত নারাজ!'—'স্যারী!' কানহাই খেদ জানালেন। অর্থাৎ আর খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না' 'তবু তুমি যখন বলছো তখন আমাকে খেতেই হবে।'...

স্থান ইডেন উদ্যান। সেমুর নার্স ব্যাট হাতে প্যাভেলিয়ন থেকে বেরিয়ে পড়লেন খেলার জন্যে। মাঠে পা বাড়াবার পথে সোবার্সের ঠোঁটের ফাঁক থেকে টেনে নিলেন জ্বলন্ত সিগারেট। শেষ মেজাজীর টান দিয়ে নার্স যথারীতি সোবার্সের ঠোঁটে সিগারেটটি গুঁজে দিলেন। সোবার্স এত-টুকু বিচলিত নন। শুধু চোখের ইসারায় নার্সকে খেলায় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বললেন। সেদিন দলীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে অধিনায়কের প্রীতির সম্পর্ক দেখে কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলাম।

সোবার্সের সম্বন্ধে ভারতীয় মাটিতে শেষ কথা বলে যান বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় পরলোকগত স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। মাদ্রাজের টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন প্রায় পর্যুদস্ত—সাত সাতটা উইকেট খুইয়ে একমাত্র অধিনায়ক সোবার্স যখন চার্লি গ্রীফিথের সঙ্গে শেষ লড়া লড়তে চলেছেন—তখন সমস্ত দর্শকরাই ভেবেছিলেন অধিনায়ক সোবার্সের এ চেষ্টা বৃথা। এ পরাজয় রোধ করা একেবারেই অসম্ভব। ধারা-বিবরণীর মাঝখানে স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের বাণী ফুটে উঠল—"আমি জানি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এ পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবু বলছি—সোবার্স যতক্ষণ উইকেটে রয়েছে ততক্ষণ কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। কারণ ও যাদু জানে।" বলা বাহুল্য ওরেলের এ বাণী ব্যর্থ হয়নি। ম্যাচ জেতা ভারতের পক্ষে সম্ভব হয়নি শুধু সোবার্সের জন্যে।

মনে পড়ে খুবই শক্তিমান খেলোয়াড়রাও একটানা চারদিন খেলার পর একটু না একটু পরিশ্রান্ত হবেনই। কিন্তু সোবার্স কখনও বিশ্রাম চাননি। খেলতে পারলে আর কিছু চান না। ১৯৬০-৬১ সালে ত্রিনিদাদে ভারতের বিপক্ষে তিনি খেলতে এলেন পর-পর চারদিন অস্ট্রেলিয়ার শেফিল্ড শীল্ডে খেলে। একটানা বল করে ৯টা উইকেট পান ১২৩ রানের বিনিময়ে। তারপর খেলা সেরেই বিমানপথে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরলেন ত্রিনিদাদে। মাঠে নেমেই পর পর দুটি নিখুঁত ক্যাচ ধরে আউট করলেন পলি উমরিগড় এবং নরী কনট্রাকটরকে।

—কমল ভট্টাচার্য
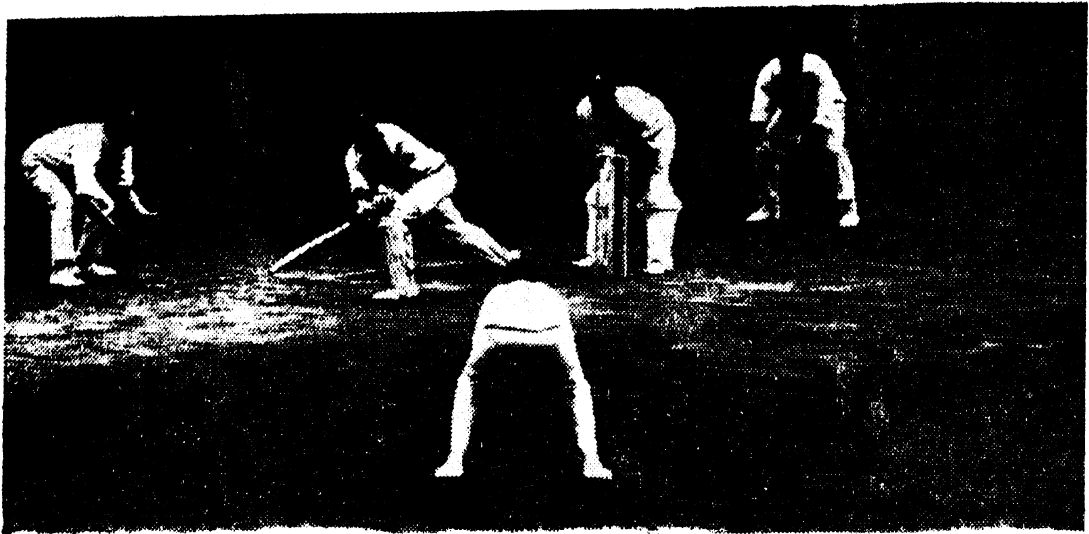
লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় নিউজিল্যান্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান গ্লেন টার্নার দ্বিতীয় ইনিংসে আন্ডারউডের বল খেলেছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত ৪৩ রান করে নট-আউট থেকে যান, যা নিউজিল্যান্ডের পক্ষে প্রথম নজির সৃষ্টি করেছে।

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড
প্রথম টেস্ট ক্রিকেট

ইংল্যান্ড : ১৯০ রাণ (ইলিংওয়ার্থ ৫৩ রান। টেলর ৩৫ রানে ৩ উইকেট)।

ও ৩৪০ রান (এডরিচ ১১৫, নাইট ৪৯, বয়কট ৪৭ এবং শার্প ৪৬ রান। হাওয়ার্থ ১০২ রানে ৩ এবং টেলর ৬২ রানে ৩ উইকেট)

নিউজিল্যান্ড : ১৬৯ রান (ডাউলিং ৪১ এবং কংডন ৪১ রান। আন্ডারউড ৩৮ রানে ৪ এবং ইলিংওয়ার্থ ৩৭ রান ৪ উইকেট)

ও ১৩১ রান (টার্নার ৪৩ নট আউট: আন্ডারউড ৩২ রানে ৭ এবং ওয়ার্ড ১৮ রানে ২ উইকেট)

ঐতিহাসিক লর্ডস মাঠের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ড ২৩০ রানে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। এই দুই দেশের ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজের আর দুটি টেস্ট খেলা বাকি। লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে এ নিয়ে যে ৬টি টেস্ট খেলা হল তার ফলাফল : ইংল্যান্ডের জয় ৩টি এবং খেলা ড্র ৩টি।

এখানে উল্লেখ্য, লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ডের কাছে নিউজিল্যান্ড তিনটি খেলায় এইভাবে পরাজয় বরণ করেছে : ১৯৫৮ সালে এক ইনিংস ও ১৪৮ রানে, ১৯৬৫ সালে ৭ উইকেটে এবং ১৯৬৯ সালে ২৩০ রানে। ১৯৫৮ সালে নিউজিল্যান্ডের শোচনীয় পরাজয়ের মূলে ছিল ইংল্যান্ডের লক এবং লেকারের মারাত্মক বোলিং। এই খেলায় লক ২৯ রানে ৯টা এবং লেকার ৩৭ রানে ৫টা উইকেট পেয়েছিলেন। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ৪৭ রানে এবং দ্বিতীয় ইনিংস ৭৪ রানে শেষ হয়েছিল। লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় আজও আর কোন দেশের এক ইনিংসের খেলা ৪৭ রানে অথবা তার কম রানে শেষ হয়নি। লর্ডস মাঠে ইংল্যান্ড নিউজিল্যান্ডের টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের পক্ষে ৮টি এবং নিউজিল্যান্ডের পক্ষে ৩টি সেঞ্চুরী হয়েছে। উভয় দলের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ

জন এডরিচ (ইংল্যান্ড) নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরী (১১৫) করেছেন।

রানের রেকর্ড : নিউজিল্যান্ডের এম পি ডোনেলর ২০৬ রান (১৯৬৫ সাল)। লর্ডস মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের কোন খেলোয়াড় এক ইনিংসের খেলায় 'ডাবল' সেঞ্চুরী করতে পারেননি।

প্রথম দিনেই ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৯০ রানে নামিয়ে দিয়ে নিউজিল্যান্ড যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল: ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ৫৩ রানের মাথায় ৫ম উইকেট পড়ে যায়। ইংল্যান্ডের স্কোর ছিল—লাঞ্চের সময় ৬৮ রান (৫ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৮১ রান (৭ উইকেটে)। দলের অতি সংকট অবস্থায় ৬ষ্ঠ উইকেট জুটি ডি'ওলিভেরা এবং ইলিংওয়ার্থ এক সময় ৫১ মিনিটে ৫০ রান তুলেছিলেন। এঁদের ৬ষ্ঠ উইকেটের জুটিতে ৬১ রান উঠেছিল। ৭ম উইকেটের জুটিতে বেরী নাইট এবং ইলিংওয়ার্থ ৪১ রান তুলেছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ১৯০ রানের মধ্যে অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থের ৫৩ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিনের বাকি সময়ে নিউজিল্যান্ড কোন উইকেট না-খুইয়ে ৫ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস ১৬৯ রানের মাথায় শেষ হয়—ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ১৯০ রানের থেকে ২১ রান কম। ইংল্যান্ডের দুই স্পিন বোলার ইলিংওয়ার্থ (৩৭ রানে ৪) এবং আন্ডারউড (৩৮ রানে ৪) নিউজিল্যান্ডকে বিপর্যস্ত করেছিলেন। লাঞ্চের সময় নিউজিল্যান্ডের স্কোর ছিল ৭১ রান (১ উইকেটে)। নিউজিল্যান্ডের টার্নারকে ধরাশায়ী করে ইংল্যান্ডের উইকেট-কিপার এ্যালান নট তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৫০ জনকে ধরাশায়ী অর্থাৎ আউট করার গৌরব লাভ করেন। এইদিন ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসের কোন উইকেট না খুইয়ে ২১ রাণ সংগ্রহ করে ৪২ রানে এগিয়ে যায়।

তাদের হাতে দ্বিতীয় ইনিংসের ১০টা উইকেটই জমা থাকে।

তৃতীয় দিনে ইংল্যান্ডের ২য় ইনিংসের খেলায় ৩০৯ রান দাঁড়ায় (৯ উইকেটে)। ফলে তারা ৩২২ রানে এগিয়ে যায়। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ৯০০ (কোন উইকেট না-পড়ে)। ইংল্যান্ডের ধীর গতিতে রান সংগ্রহের বহর দেখে মাঠের দর্শকরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ২০৮ (২ উইকেটে)। প্রথম উইকেটের জুটিতে জিওফ বয়কট এবং জন এডরিচ দলের ১২৫ রান সংগ্রহ করে খেলার ভিত খুবই শক্ত করেছিলেন। জন এডরিচ সেঞ্চুরী (১১৫ রান) করেন—টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে তাঁর এই ৭ম সেঞ্চুরী, অপরদিকে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২য় সেঞ্চুরী। ইংল্যান্ডের ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম উইকেট দলের ২৫৯ রাণের মাথায় পড়ে যায়।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৪০ রাণের মাথায় শেষ হয়। ইংল্যান্ডের শেষ উইকেট জুটী বেরী নাইট (৪৯ রান) এবং নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় এ্যালান ওয়ার্ড (নট আউট ১৯ রান) দলের মূল্যবান ৩৯ রান সংগ্রহ করে দেন। খেলার এই অবস্থায় নিউজিল্যান্ডের জয়লাভের জন্যে ৩৬২ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু চতুর্থ দিনেই খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা আগে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস ১৩১ রাণের মাথায় শেষ হলে ইংল্যান্ড ২৩০ রানে জিতে যায়। ফলে পঞ্চম দিনের খেলাটা মাঠে মারা যায়। ইংল্যান্ডের এই জয়লাভের মূলে ছিল প্রধানতঃ দুজন খেলোয়াড়ের কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য। অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থের ১১৫ রাণ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ডেরেক আন্ডারউডের ৩২ রাণে ৭ উইকেট।

শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার

ইংল্যান্ডের স্লো লেফট-আর্ম বোলার ডেরেক আন্ডারউড বোলিংয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়ে ১০০ স্টার্লিং পাউন্ড পুরস্কার লাভ করেছেন। আন্ডারউড দ্বিতীয় ইনিংসে ৩২ রানের বিনিময়ে ৭টা উইকেট পান এবং প্রথম টেস্ট খেলায় ১১টা উইকেট পান ৭০ রানে।

ব্যাটিংয়ে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য ১০০ স্টার্লিং পাউন্ড পুরস্কার লাভ করেছেন ইংল্যান্ডেরই জন এডরিচ। তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৫ রান করেছিলেন।

দ্বিতীয় পুরস্কার—৫০ স্টার্লিং পাউন্ড করে পেয়েছেন নিউজিল্যান্ডের দুজন খেলোয়াড়—ব্যাটিংয়ে গ্লিন টার্নার এবং বোলিংয়ে হেডলে হাওয়ার্থ।

বিশেষ কৃতিত্ব

নিউজিল্যান্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান গ্লিন টার্নার দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩ রান করে শেষ পর্যন্ত খেলায় অপরাজিত থেকে যান। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নিউজিল্যান্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যানের পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় 'নটআউট' থাকার নজির এই প্রথম। এখানে উল্লেখ্য, টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ওপনিং ব্যাটসম্যান এক ইনিংসের খেলায় নটআউট থেকেছেন এমন নজির আছে ১৭টি। ওপনিং ব্যাটসম্যানের পক্ষে এই বিশেষ কৃতিত্ব (অর্থাৎ এক ইনিংসের খেলায় নটআউট থাকা) দুবার লাভ করেছেন মাত্র এই দুজন খেলোয়াড়—অস্ট্রেলিয়ার উইলিয়াম উডফুল এবং ইংল্যান্ডের স্যার লিওনার্ড হাটন। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট খেলায় যে সাতটি দেশ (ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান) যোগদান করে থাকে তাদের মধ্যে শুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই কোন ওপনিং ব্যাটসম্যান এই বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেননি।
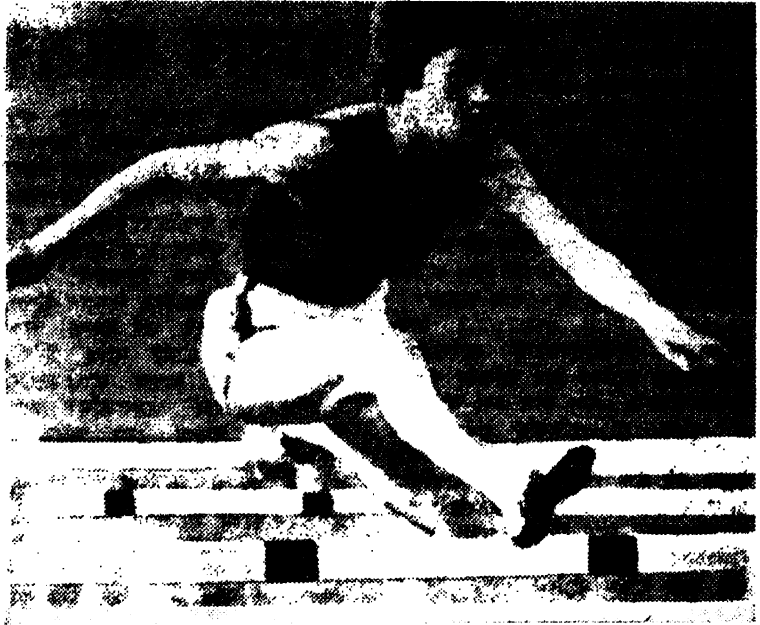
শ্রীমতী কারিন বালজার (পূর্ব জার্মানী) : গত ২৭শে জুলাই লিপজিগের এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে ১০০ মিটার হার্ডলস ১৩ সেকেন্ডে শেষ করে নতুন বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে কারিন বালজার ৮০ মিটার হার্ডলসে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন।
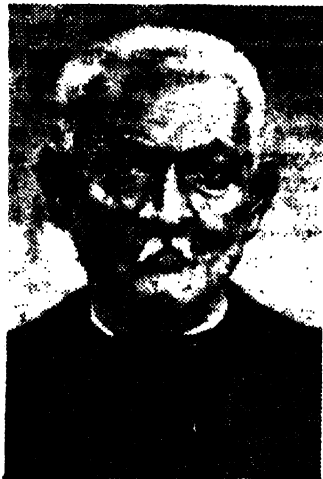
নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী

ভারতীয় ফুটবল খেলার জনক

গত ২৭শে জুলাই 'ভারতীয় ফুটবল খেলার জনক' স্বর্গত নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছে। ১৮৬৯ সালের ২৭শে জুলাই কলকাতার ওয়েলিংটন স্ট্রীটের বাসভবনে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মেজর জেনারেল ডাঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহে'র সংস্পর্শে খ্যাত হয়ে আছেন। নগেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন পিতার পঞ্চম পুত্র।

১৮৭৮ সালের কথা। নগেন্দ্রপ্রসাদের বয়স তখন মাত্র ৯ বছর। ময়দানে গোরাদের রাগবি খেলায় আকৃষ্ট হয়ে হেয়ার স্কুলের সহপাঠীদের নিয়ে তিনি এক ফুটবল ক্লাব তৈরী করেন—নাম হেয়ার স্কুল এফ-সি। ফুটবল খেলায় তাঁদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উপদেষ্টা ছিলেন প্রেসিডেন্সী

কলেজের অধ্যাপক বি ভি স্ট্যাক। এখানে উল্লেখ্য, নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত হেয়ার স্কুল এফ সি ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম ভারতীয় ফুটবল ক্লাব। এর আগে সারা ভারতবর্ষে স্পোর্টস ক্লাব বলতে ছিল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব, যার জন্ম ১৮৭২ সালে এবং যেখানে ফুটবল খেলা সম্পূর্ণ বাতিল করে শেষ পর্যন্ত রাগবী খেলাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ঠিক এই অবস্থায় নগেন্দ্রপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত হেয়ার স্কুল ফুটবল ক্লাবের ভূমিকা খুবই গু[illegible]লাভ করেছে!

১৮৮৫ সালে শোভাবাজার রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় নগেন্দ্রপ্রসাদ শোভাবাজার ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে উল্লেখ্য, ট্রেডস কাপ এবং আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার প্রথম যুগে শোভাবাজার ক্লাব ছাড়া আর কোন ভারতীয় দলের এই দুই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল না। নগেন্দ্রপ্রসাদের নেতৃত্বে শোভাবাজার ক্লাব ট্রেডস কাপে বৃটিশ রেজিমেণ্ট ইস্ট সারে দলকে পরাজিত করে। এই সূত্রে বৃটিশ ফুটবল দলের বিপক্ষে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রথম জয়লাভের নজির শোভাবাজার ক্লাবই সৃষ্টি করেছিল।

ডেভিস কাপ

বুখারেস্টে আয়োজিত ১৯৬৯ সালের ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনালে রুমানিয়া ৪—০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে জোন-ফাইনালে উঠেছে।

খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

প্রথম দিনের খেলা : আয়ান তিরিয়াক ৬—২, ৬—৩ ও ৬—২ গেমে প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে নাস্তাসে ৬—২, ৬—৪, ৪—৬, ৪—৬ ও ৬—১ গেমে জয়দীপ মুখার্জিকে পরাজিত করলে রুমানিয়া ২—০ খেলায় অগ্রগামী হয়।

দ্বিতীয় দিনের খেলা : ইলি নাস্তাসে এবং তিরিয়াক ৬—২, ৬—২ ও ৬—৩ গেমে জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলালকে পরাজিত করেন। ফলে রুমানিয়া ৩—০ খেলায় অগ্রগামী হয়ে ইণ্টার-জোন ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করে।

তৃতীয় দিনের খেলা : পেত্রে মারমুরিয়ানু ৬—২, ৬—২ ও ৬—৩ গেমে গৌরব মিশ্রকে পরাজিত করেন। এস দ্রোণ বনাম আনন্দ অমৃতরাজের শেষ সিঙ্গলস খেলাটি বৃষ্টির দরুণ অসমাপ্ত থেকে যায়। দ্রোণ ৬—৩, ৬—২ ও ৮—১০ গেমে অগ্রগামী ছিলেন। পরে খেলা পরিত্যক্ত হয়।

অপরদিকের ইণ্টার-জোন সেমিফাইনালে ইংল্যাণ্ড ৩—২ খেলায় ব্রেজিলকে পরাজিত করে ইণ্টার-জোন ফাইনালে রুমানিয়ার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

দাবার আসর

শ্রীমহেশচন্দ্র ব্যানার্জি দাবার একটি বিস্মৃত নাম। কিন্তু এ-নামকে বিশেষভাবে মনে রাখবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। আধুনিক গ্র্যাণ্ডমাস্টারগণ যে-কয়েকটি বহুল প্রচারিত পদ্ধতিতে দাবা খেলা শুরু করে থাকেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পদ্ধতি হল কিংস ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স, কুইন্স ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স, নিমজো ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ইত্যাদি। এই সমস্ত বিখ্যাত ডিফেন্সগুলির নামের সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান' কথাটি জড়িয়ে যাবার মূলে মহেশচন্দ্র ব্যানার্জির অবদান অনেকখানি। সুতরাং তাঁকে ভুলে যাওয়া চরম অকৃতজ্ঞতারই সামিল।

মহেশচন্দ্র ব্যানার্জি ঠিক কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তা জানা যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম হবে। দাবা খেলা শেখার পর তিনি নিজের এবং আশেপাশের গ্রামের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন; কলকাতায় আসার আগে গ্রামের বাইরে বেশী দূরেও কোথাও যাননি। দাবার সূত্রেই প্রথম কলকাতায় আসেন ১৮৪৮ সালে। তখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে।

সেই সময় কলকাতায় একটি দাবা ক্লাব ছিল—নাম 'ক্যালকাটা চেস্ ক্লাব'। ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন জন কক্রেন নামে এক সাহেব। কক্রেন ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নামী বিলাতী খেলোয়াড়, স্টনটনের সমসাময়িক। এই ক্লাবের একজন হঠাৎ এক সুদূর গ্রামাঞ্চলে গিয়ে মহেশ ব্যানার্জিকে আবিষ্কার করেন। তিনিই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং কক্রেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কক্রেন সাহেব নিজে একজন ভাল খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু তিনি এবং ঐ ক্লাবের সভ্যরা সকলেই আন্তর্জাতিক নিয়মে খেলতেন; মহেশ ব্যানার্জি খেলতেন ভারতীয় নিয়মে। আন্তর্জাতিক নিয়ম শিখে নিয়ে তিনি কক্রেনের সঙ্গে খেলতে শুরু করেন কিন্তু গোড়ার দিকে তাঁর কাছে হেরে যান। যাই হোক, নতুন নিয়মে মহেশ ব্যানার্জি দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে গেলেন এবং ক্রমে খেলায় কক্রেনকেও ছাড়িয়ে যান। ফলে, ক্লাবের খেলোয়াড়দের খেলার মান আরো উন্নত করার জন্যে কক্রেন মাইনে দিয়ে মহেশ ব্যানার্জিকে ক্লাবে রেখে দেন।

বহুকাল থেকেই ভারতীয় দাবা খেলোয়াড়দের একটি প্রিয় কায়দা হচ্ছে খেলার গোড়াতেই গজকে ঘোড়া ২ ঘরে তুলে খেলা। আজকাল সমস্ত গ্র্যাণ্ড-মাস্টারই বড়ে রাজাঘোড়া ৩, গজ ঘোড়া ২ এই কায়দায় খেললে এর সঙ্গে বড়ে মন্ত্রী ৩ চালটাও দিয়ে থাকেন। অথবা, বড়ে মন্ত্রীঘোড়া ৩, গজ ঘোড়া ২ চাল সঙ্গে সঙ্গে বড়ে রাজা ৩ চালটাও থাকেন। মহেশ ব্যানার্জিও এই ক খেলতেন। মহেশ ব্যানার্জির সঙ্গে কক্রেন নিশ্চয়ই এইভাবে গুটি সাজ কার্যকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছি কারণ তিনি বিলেতে ফিরে গিয়ে এই গুটি সাজানোর প্রথা চালু করেন। প্রাক্তন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন ভীলহেলেম নাইট্জ এই প্রথার নাম দেন 'ইণ্ডি এই 'ইণ্ডিয়ান' ডিফেন্সগুলি খেলা থাকে সাদা মন্ত্রীর বড়ে দু' ঘর এ খেলা শুরু করলে। কিন্তু মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আর একটি পুরনো ভারতীয় ছিল ঘোড়া রাজাগজ ৩, বড়ে মন্ত্রী ৩ বড়ে রাজা ৪ করে খেলা। মহেশ ব্যান এই কায়দাতেও খেলতেন। নামকর সুবিধার জন্যে এই কায়দাকে আজকাল হয়ে থাকে ওল্ড ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স। রাজা ঘোড়া ২ ঘরে উঠে খেললে বলা হয় ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স; মন্ত্রীগজ ঘোড়া ২ উঠে খেললে বলা হয় কুইন্স ইণ্ড ডিফেন্স।

মহেশ ব্যানার্জির একটি খেলাই অ সংগ্রহ করতে পেরেছি। সেই খেলাটি এর দিলাম। আজকাল যাকে ওল্ড ইণ্ডি ডিফেন্স বলা হয়, এ-খেলাটিকে পূর্বসূরী বলা যেতে পারে।

সাদা — জে কক্রেন
কালো — মহেশ ব্যানার্জি

(১) ব—রা ৪ : ব—ম ৩ (২) ব—ম : ঘ—রা গ ৩ (৩) ঘ—ম গ ৩ : ব—রা (৪) ব×ব : ব×ব (৫) ম×ম+ : রা (৬) গ—রা ঘ ৫ : গ—রা ২ (৭) ০—০ ০+ : রা—রা ১ (৮) ব—রা ন ৩ : ব ন ৩ (৯) গ—ন ৪ : ব—রা ঘ ৪ (১০) গ—ঘ ৩ : গ—ম ৩ (১১) ঘ—গ ৩ ম ঘ—ম ২ (১২) গ—ঘ৫ : রা—রা (১৩) গ×ঘ : ঘ—গ (১৪) ঘ—ম ৫+ : রা রা ৩ (১৫) ব—গ ৪ : ব—ম গ ৩ (১৬) ঘ—রা ৩ : ব—গ ৩ (১৭) ঘ—গ ৫ : গ গ ৪ (১৮) ন—ম ৩ : ব—ঘ ৪ (১৯) ব×ব : ব×ব (২০) রা ন—ম ১ : ঘ—ঘ (২১) ব—ম ন ৩ : গ—ঘ ২ (২২) ন—ঘ : গ (ঘ ২) ×ব! (২৩) ব×গ : গ (২৪) ন×গ : ম ন—ম গ ১ (২৫) ঘ—রা : ন×ব+ (২৬) রা—ঘ ১ : রা ন—ম গ (২৭) ঘ—ম ২ : ন—গ ৬ (২৮) ন×ন ন×ন (২৯) ঘ—গ ২ : ব—গ ৪ (৩০) ব—গ ৩ : ব—ম ন ৪ (৩১) গ—গ ২ ঘ—ম ৪ (৩২) ব—ঘ ৪ : ব—ঘ ৫ (৩৩) ব×ঘ ব : ব×ম ঘ ব (৩৪) ব×ব+ : রা× (৩৫) রা—ঘ ২ : ন—ম ৬ (৩৬) গ—রা : রা—গ ৫ (৩৭) রা—গ ১ : ব—ঘ (৩৮) ঘ—ন ১ : ন—রা ৬ (৩৯) গ—গ : ন—রা ৭ সাদার হার স্বীকার কারণ (৪০) গ—গ ৫ : ব—ঘ ৭+ (৪১) রা× : ন+ঘ+ ইত্যাদি।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ
২য় খন্ড

১৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 15th August, 1969 শুক্রবার, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৭৬ 40 Paise

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পান্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সুচীপত্র

প্রচ্ছদ—সুব্রত ত্রিপাঠী

মানুষ গড়ার ইতিকথা

আপনাদের পত্রিকার এই সংখ্যায় (২৩শে শ্রাবণ, ১৩৭৬) 'সন্ধিৎসু'—লিখিত 'মানুষ-গড়ার ইতিকথায় আমাদের স্কুলের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের সংগে আলোচনায় 'সন্ধিৎসু'র যে প্রখর অনুসন্ধিৎসা ও ও গভীর ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি, তাতে মুগ্ধ হয়েছি। এই সুপ্রাচীন বিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাস, মহান ঐতিহ্য ও সুনামকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন ও যে অনবদ্যভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন, তার জন্য আমরা খুবই আনন্দিত ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমাদের বিশ্বাস এই ইতিকথা শেষ হলে বাংলাভাষায় একটি মূল্যবান দলিল-গ্রন্থে পরিণত হবে। এই প্রসংগে আমাদের স্কুলের ইতিহাসে দু'একটি সামান্য তথ্যগত ভুল ও একটি বক্তব্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তথ্যগত ভুল দুটি যে নিতান্তই অনবধানতাবশত তা বলা বাহুল্য। অপর বক্তব্যটি সম্বন্ধে মনে হয় 'সন্ধিৎসু' শিক্ষকদের সংগে আলোচনার সময় এই বিষয়ে শিক্ষকদের বক্তব্যটি ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। নীচে সেই বিষয়গুলির উল্লেখ করলাম :—

(১) সেণ্ট পলস স্কুলের নিজস্ব কোন সংবিধান নেই। সরকার সমস্ত মিশনারী স্কুলগুলিকেই বিশেষ সংবিধান মঞ্জুর করেছেন। আমাদের স্কুলও সেইরকম বিশেষ সংবিধান দ্বারা পরিচালিত।

(২) ডঃ অরবিন্দ মুখার্জী প্রথম মেট্রোপলিটন নন। তাঁর আগেও অন্যান্য মেট্রোপলিটন ছিলেন। ডঃ অরবিন্দ মুখার্জী **প্রথম ভারতীয়** মেট্রোপলিটন।

(৩) অ-খৃস্টান শিক্ষকরা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হতে পারেন না বলে ক্ষুব্ধ নন। তাঁদের বক্তব্য যোগ্য লোককেই যেন অধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়। বিদ্যালয়ের সুনাম, শৃংখলা ও গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য যেন বজায় থাকে—এইটাই তাঁরা চান।

শশাঙ্কশেখর সিংহ
সহকারী প্রধান শিক্ষক, সেণ্ট পলস স্কুল
কলকাতা—৯

(২)

আপনার সুবিখ্যাত 'অমৃত' পত্রিকার গত ২রা শ্রাবণ সংখ্যায় 'সন্ধিৎসু' লিখিত 'মানুষগড়ার ইতিহাস' পর্যায়ে 'শ্যামবাজার এ ভি স্কুল' আলোচনাটির জন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আলোচনাটি যেমন সুখপাঠ্য, তেমনই তথ্যবহুল।

কিন্তু এই আলোচনার এক স্থানে কিছু ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। সেই সংশোধনের উদ্দেশ্যেই এই পত্র লিখছি।

'সন্ধিৎসু' লিখেছেন, "আজ যে জায়গায় মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ দাঁড়িয়ে আছে, বছর পঞ্চাশ আগেও সেখানে ছিল পুরোনো রাজবাড়ি।"

এই বাড়ী পঞ্চাশ বৎসর আগে কেন, কোন কালেই রাজবাড়ী ছিল না। সেটি ছিল মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্মগৃহ। বলা বাহুল্য, তিনি তখন মহারাজা হন নি। কলকাতায় কাশিমবাজার রাজের তৎকালীন রাজবাড়ী ছিল ৩৭৪নং লোয়ার চিৎপুর রোডে (বর্তমানে ২৬৩নং রবীন্দ্র সরণী)।

১৯৪১ খৃস্টাব্দে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জন্ম-গৃহেই তাঁর নামাঙ্কিত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। তার কয়েক বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে সেই পুরাতন গৃহের স্থলে বর্তমান নতুন ভবনের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়।

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
কাশিমবাজার ভবন, কলকাতা-১

জাতীয় সংগীতের অমর্যাদা

আপনার সম্পাদিত পত্রিকায় আমার নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রকাশ করলে বিশেষ বাধিত ও সুখী হব।

সাম্প্রতিক একটি খবর আমাকে অত্যন্ত স্তম্ভিত ও মর্মাহত করেছে। প্রখ্যাত কংগ্রেসী নেতা শ্রীএস কে পাতিল কোন এক ভোজসভায় ভারতীয় জাতীয় সংগীত 'জনগণমনকে' ভারতের সংস্কৃতির পক্ষে অযোগ্য এবং পরিবর্তনসাপেক্ষ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। হঠাৎ দীর্ঘ কুড়ি বৎসর পর পাতিল সাহেব একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবিষ্কার করে নিজেকে কি ভারতের একজন মহামান্য বিজ্ঞ ব্যক্তি বলে প্রচার করার চেষ্টা করছেন, না বঙ্গ সংস্কৃতিদ্বেষী হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন? তিনি বা তাঁর মতো ব্যক্তিরা নিজেদের যতই ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির মহারক্ষক বলে ভাবুন না কেন, তাঁর এই জাতীয় স্বার্থবিরোধী মন্তব্যটি অজ্ঞতা, অন্ধবিচার ও উগ্র হিন্দীপ্রেমের পরিচায়ক। উক্ত স্বার্থপর নেতাদের জানা থাকা উচিত, এইরকম জাতীয় স্বার্থবিরোধী বা জ্ঞানহীন বক্তব্য প্রচার করে তাঁরা দেশের ভিতরে আর একটি নতুন অশান্তির আগুনে ইন্ধন যোগাচ্ছেন। এবং জাতীয় সংহতির ফাটল সৃষ্টি করে জাতীয় ঐক্যকে কলুষিত করবার চেষ্টা করছেন। এইরকম নেতাদের জ্ঞান থাকা উচিত, যাঁরা সত্যকার চিন্তাশীল ব্যক্তি ও জাতীয় কল্যাণপ্রত্যাশী, তাঁরা কখনই কোন জাতির গৌরবময় কীর্তির প্রতি বিরূপ মন্তব্য করেন না। দেশের ঐতিহ্য ও গৌরবময় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ভাব দেখালে কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সুস্থমস্তিষ্ক নাগরিকই তা সহ্য করতে পারবে না! এইরকম নির্বুদ্ধিতা বা দুরভিসন্ধিপূর্ণ মন্তব্যের জন্য তাঁকে ত্রুটি স্বীকার করে সুনাগরিক হিসেবে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। নয়তো আমরা শুধুমাত্র মামুলি প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত থাকব না, প্রয়োজন হলে উক্ত স্বার্থপর নেতা ও তাঁর মতো বিবেচনাহীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলব।

সঞ্জিত দেব
করিমগঞ্জ, আসাম।

গেজেটিয়ার প্রসংগে

অমৃতে প্রকাশিত 'ভারতীয় গেজেটিয়ার' আলোচনাটি পড়লাম। বেশ গোছান লেখা। এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। কয়েকটি কথা এ প্রসংগে জানাতে চাই। লেখক গেজেটিয়ারকে ভৌগোলিক অভিধান বলছেন কিন্তু গেজেটিয়ারকে আজ আর শুধু ভৌগোলিক অভিধান বলা ঠিক নয়। গেজেটিয়ারও এখন এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর সাহিত্য। জন-জীবনের রূপ এর মধ্যে স্পষ্ট। শুধু লোকগণনা, গ্রামের পরিচয়, খেত-খামারের খবরই যথেষ্ট নয়, আজ এর সংগে মিলেছে সামাজিক ইতিবৃত্ত, বৈষয়িক পরিসংখ্যান, জীবনযাত্রার মূল্যায়ন।

লেখকের সঙ্গে আমিও একমত যে, জেলা প্রশাসনের সুবিধার দিকে তাকিয়েই গেজেটিয়ার লেখা হোত। জেলাকে জানতে হবে। না জানলে দেশকে শাসন করা যাবে না। গেজেটিয়ারে দেশের চেহারা এমন স্পষ্ট করে তুলতে হবে যাতে মাটি থেকে জল গাছপালা মানুষ পর্যন্ত চেনা যায়। একটা কথা বারবার মনে হয়, বিদেশী শাসকরা কি শুধু এরই জন্য এত অর্থব্যয়, এত পরিশ্রম করেছিলেন?

স্ট্যাটিস্টিকাল হ্যান্ডবুক রচনা করলেও তো তাঁদের কাজ চলে যেত। কোন প্রকার প্রশাসনিক কাজের অসুবিধা ঘটত না। উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল আরও বৃহৎ স্বার্থগত। বৃটিশ পুঁজিপতিদের, শিল্পমালিকদের ভারতের প্রতি আকৃষ্ট করা। কোথায় অর্থ বিনিয়োগ করতে কি পরিমাণ মুনাফা সম্ভব, শ্রমিকের মজুরি কোথায় শস্তা, কাঁচামাল শস্তাদরে পাওয়া যাবে কোথায়, এসব খবরও জোটাত গেজেটিয়ার। সেইভাবেই এঁরা অর্থ বিনিয়োগ করতেন।

বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার লেখা শুরু হয় ১৮৩৮ খৃঃ। হরচন্দ্র ঘোষের লেখা

'টোপোগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্কেচ অফ বাঁকুড়া' সে বছর প্রকাশিত হয়। বাঁকুড়া জেলার রাস্তাঘাট জলবায়ু, ঘর-বাড়ির নিখুঁত ছবি এই বইখানি। এরপর লেখা হয় 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যান্ড ডিসট্রিক্ট অফ বাঁকুড়া।' জে ই গ্যাসট্রেলের লেখা এই বইখানি ১৮৬৩ খৃঃ। গ্যাসট্রেল বাঁকুড়াকে দেখেছিলেন অন্য চোখে। নতুনভাবে বাঁকুড়ার আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে এর ভূতাত্ত্বিক গঠন নিয়ে গ্যাসট্রেল মূল্যবান আলোচনা করেছেন। যেকোন জেলাকেই দেখা যায়, পুরুষ-পরম্পরায় জমির হস্তান্তর ঘটে থাকে। মালিকানার পরিবর্তনও হয়। গ্যাসট্রেল নিদারুণ পরিশ্রমে এই ভূতত্ত্বগত মূল্যবান তথ্য বর্ণনা করেছেন। গ্যাসট্রেলের অনন্য-কীর্তি বিষ্ণুপুর রাজ-দেওয়ানের কাছ থেকে বিষ্ণুপুরের প্রথম রাজার কাহিনী আবিষ্কার। হান্টারের অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল বেরোয় ১৮৬৮ খৃঃ। ১৮৭৬ খৃঃ প্রকাশিত তাঁর স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বাঁকুড়ায় ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে বাঁকুড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। হান্টার এই বই লেখবার উপাদান পেয়েছিলেন সরকারী রেকর্ড এবং প্রকাশিত নানা ধরনের বই থেকে। তাছাড়া বিভিন্ন জেলার কর্তৃপক্ষ তাঁকে নানান উপাদানও পাঠিয়েছিলেন। সমকালীন বিদগ্ধসমাজ হান্টারের এই প্রয়াসকে সফল করার জন্য নানানভাবে সাহায্য করেছিলেন। ১৯০৮ খৃঃ ওম্যালীর 'বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার'। ১৮৭৬ খৃঃ থেকে ১৯০৮ খৃঃ। এর মধ্যে বাঁকুড়ার পরিবর্তন ঘটেছে নানা দিক থেকে। হান্টারের সংগৃহীত তথ্যের নতুনভাবে সংস্কার করবার প্রয়োজন পড়েছিল। ওম্যালী সেই কাজ করলেন। তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন এই কালসীমার মধ্যে প্রকাশিত রিপোর্ট এবং গ্রন্থাবলী থেকে।

জেলা হ্যান্ডবুক সিরিজ সম্পর্কে আরও তথ্য জানবার আছে। স্বাধীনতার পর গেজেটিয়ারগুলির সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া জেলাগুলিরও পুনর্বিন্যাস ঘটে। শ্রীঅশোক মিত্র যখন সেনসাস সুপারিন্টেন্ডেন্ট, তখন জেলা প্রতি একখানি হ্যান্ডবুক রচনার পরিকল্পনা হয়। হ্যান্ডবুক এবং গেজেটিয়ার দুটি প্রকাশের অনেক কারণ আছে। সেনসাসের জেলাওয়ারী পরিসংখ্যান থাকে হ্যান্ডবুকে। এই হ্যান্ডবুকে পরিচায়িকা ও পরিসংখ্যান দুটি অংশ থাকবে। ১৯৫৩ খৃঃ বেরোয় বাঁকুড়া জেলা হ্যান্ডবুক। শ্রীমিত্র আগেকার গেজেটিয়ার-গুলো থেকে যেমন সাহায্য পান, তেমনি ১৯২৬ খৃঃ প্রকাশিত রবার্টসনের সেটেলমেন্ট রিপোর্টটিও প্রয়োজনবোধে অনুসরণ করেন। এই অংশের পরিশিষ্টে যেসব বিশেষ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে ১৮৭১ খৃঃ—১৯৪৫ খৃঃ পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার ভূমি বিন্যাসের বিবর্তন সম্পর্কের তথ্যাবলী সব থেকে মূল্যবান। এই গেল হ্যান্ডবুকের একটি অংশ দ্বিতীয় অংশে থাকবে ১৯৫১ খৃঃ সেনসাস অনুযায়ী সংগৃহীত তথ্যের বিষয়ানুযায়ী পরিসংখ্যান। ১। উদ্বাস্তু, ২। জনবসতি, ৩। জীবিকা, ৪। জন্ম ও মৃত্যু, ৫। জনস্বাস্থ্য, ৬। কৃষি, ৭। গ্রাম-বিবরণী, ৮। পরিবহন, ৯। পালাপার্বণ, ১০। প্রাচীন দেব-দেউল, ১১। বয়স, ১২। শিল্প ও আমোদ-প্রমোদ, ১৩। স্বায়ত্তশাসন, ১৪। প্রশাসন, ১৫। সমাজ ও সংস্কৃতি।

সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা গেজেটিয়ার বা হ্যান্ডবুক সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের কত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে অযথা কালক্ষেপ করা ঠিক নয়। এই কাজ যতো ত্বরান্বিত করা যায়, ততই বাংলা-দেশের মঙ্গল। সময়োচিত নিবন্ধটি প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

চিন্ময়ী রায়
কলিকাতা-২০

'ভয়' প্রসঙ্গে

আপনার বহুল প্রচারিত ১১ই আষাঢ় অমৃত পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅতী পারুল ভট্টাচার্যের 'ভয়' গল্পটি পড়লাম। ওই গল্পটি প্রসঙ্গে আমার সামান্য ক'টি কথা আপনার পত্রিকায় প্রকাশের সুযোগ পেলে বিশেষ খুশি হবো।

অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে পড়ে সাধারণ মানুষের নৈতিক জীবনযাত্রার মান আজ কোথায় নেমে এসেছে 'ভয়' গল্পটি তার একটি নিখুঁত দলিল-চিত্র। 'দেশ' 'জনগণ' 'সমাজকল্যাণ' তথা 'স্বাধীনতা', 'সমাজতন্ত্র' 'গণতন্ত্র' প্রভৃতি নানা তন্ত্রের দামামা নিনাদিত যুগেও কেবলমাত্র অর্থনৈতিক চাহিদার চাপে পড়ে একটি গৃহস্থ কুলবধূকে তার ব্রত পার্বণ লক্ষ্মীপূজা কথকতা পরিবেষ্টিত সুস্থ সবল ও সুখী সংসার জীবনের পরিমন্ডল থেকে ছিটকে পড়তে হয়েছে এক ঘৃণ্য ক্লিন্ন কলুষিত পঙ্কিল অন্ধকারে, যেখানে দাঁড়িয়ে শুধু শোনা যায় অনেক কণ্ঠস্বর কিন্তু কাউকেই দেখা যায় না।

এ গল্প শুধু গল্প নয়। আজ বিশ বছর ধরে দেশের কানে সমাজতন্ত্রের মন্ত্র পড়ে যাঁরা মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন তা আজ আবার নতুন করে গঠনতন্ত্রের মন্ত্র পড়ে নতুনতর মোহ সৃষ্টির প্রয়াস যাঁরা করছেন, এ গল্প তাঁদেরই জিজ্ঞাসার চিহ্ন। রাষ্ট্রনায়ক তথা সমাজের চিন্তাবিদরা এর জবাব দেবেন কি?

শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়
বালেশ্বর

চাঁদের বিষয়ে

আমি 'অমৃতে'র একজন নিয়মিত পাঠক। এই সপ্তাহে অর্থাৎ শুক্রবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৬-এ প্রকাশিত অমৃতে (৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩শ সংখ্যা) 'টুকরো খবর' (২৪ পৃষ্ঠা) শীর্ষকনামায় চন্দ্রাভিযান সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। বলাবাহুল্য তথ্যগুলি সম্বন্ধে অনেকেই অবগত নন, এবং সেইজনাই 'অমৃতে' এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি প্রকাশ করাতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথমেই যে তথ্যটি প্রকাশ করা হয়েছে সেটিতে একটি বিরাট ভুল চোখে পড়লো। লেখা হয়েছে—"চাঁদে মানুষ পাঠাবার জন্য আট বছরের প্রস্তুতিতে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা (নাসা) এ যাবৎ খরচ করেছেন ২৪০০ কোটি ডলার অর্থাৎ ১৮০০ কোটি টাকা"—('অমৃতে'রই ভাষা তুলে দিলাম)। আমার বক্তব্য হলো ২৪০০ কোটি ডলারের অর্থ ১৮০০ কোটি টাকা নয়। ওটি হবে ১৮০০০ কোটি টাকা। এটা কি ছাপার ভুল, না যিনি এই তথ্য পরিবেশন করেছেন তাঁর হিসেবের ভুল?

ঈশা বসু
কলকাতা—২৯

[ছাপার ভুলই বটে। এবং সেজন্যে আমরা দুঃখিত। অঃ সঃ]

দাবার আসর

আমরা আপনাদের সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। এই পত্রিকার 'দাবার আসর' বিভাগটি পড়ে আমরা দারুণ খুশী ও উপকৃত হয়েছি। প্রতি সপ্তাহে এই নতুন বিভাগটি পড়বার জন্য আমরা সকলে ভীষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকি। এই-ভাবে দাবা খেলায় উৎসাহিত করবার জন্য আপনাদের ও গজানন্দ বোড়ে মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের অনুরোধ এই আসরটিকে চালু রেখে আরও আনন্দ দেবেন।

আমরা ক'জন
পশ্চিম খামাপুর
জব্বলপুর

সাদা চোখে

বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়তে শুরু করে। আবার শীতের মরশুমের শুরুতেই বাড়তি দামে কিছুটা পড়তি ভাব দেখা যায়। অবশ্য যে হারে জিনিসপত্রের দর আকাশচুম্বী হয় সে হারে নিম্নগামী ভাব দেখা দেয় না। কিছুটা কমে বটে। এই যে উঠতি-পড়তি ভাব বর্তমানে পশ্চিম বাংলার জনজীবনে, এটা একটা স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে দেখা দিয়েছে। কংগ্রেস এল গেল, যুক্তফ্রণ্ট গেল—কিন্তু আবার এল, কিন্তু এই নিয়মের কোন রদবদল ঘটল না। যুদ্ধোত্তর অবস্থার অনিবার্য ফল হিসাবে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই এই যে এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এখনও সেই ট্রাডিসান সমানে চলছে। অনেকেই মাঝে মাঝে হুংকার দিয়েছেন, আপ্তবাক্য বলেছেন, কিন্তু সংকটের সমাধান হয় নি। বরঞ্চ ধীরে ধীরে সংকটের গভীরতা বেড়েছে এবং বর্তমানে তা মানুষের ধৈর্যের উপর আঘাত হানছে। প্রতিকারের আভাষ এখনো পাওয়া যায় নি।

কংগ্রেস মন্ত্রীরা যা করতেন যুক্তফ্রণ্টের বিদায়ী খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমারও বিরক্ত হয়ে সেইভাবে হুংকার দিয়েছিলেন। শ্রীকুমার সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, যদি তিন সপ্তাহের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম না কমে যায় তবে তিনি কালোবাজারী, মুনাফাখোর এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের এক হাত দেখে নেবেন। কিন্তু অভাজন বাঙালীর এই যুব-খাদ্যমন্ত্রীর রণকৌশল দেখার সৌভাগ্য হল না। যদিও-বা তাঁর চরমপত্রের তিন সপ্তাহ অতিক্রম করে গেল, তবু কুমার মহাশয় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পেলেন না। তাঁকে পদত্যাগপত্র পেশ করতে হল মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য। যে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি ইনাম হিসাবে শ্রীকুমারকে খাদ্যদপ্তরের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই মার্কসবাদী দলও একটি আসন ছেড়ে দিয়ে ত শ্রীকুমারকে বিধানসভার সদস্যপদে নির্বাচিত করতে পারতেন। তা হলে খাদ্যমন্ত্রীকে অকালে বিদায় নিতে হ'ত না। তিনি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে খাদ্যদপ্তরের ভার নিয়েছিলেন, তার হয়ত কিয়দংশ পালন করে মার্কসবাদীদের মুখরক্ষা করতে পারতেন এবং নিজেকেও প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। শুধু দলীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে যুক্তফ্রণ্টের শরিকরা শ্রীকুমারের প্রতি অবিচার করলেন। মার্কসবাদীদের ব্যাপার ত বলতে গেলে আগাগোড়াই দুর্বোধ্য। কারণ তাঁরা শ্রীকুমারকে যে ইনাম দিয়েছিলেন তার যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্য সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

শ্রীকুমার অবশ্য বিধানসভায় পুনর্নির্বাচিত হয়ে আসার জন্য দলের কাছে অর্থাৎ বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন। কিন্তু তার ফল হয়েছে বিপরীত। তাঁরই দলের দুজন সদস্য শ্রীঅনাদি দাশ ও জনাব মকশেদ আলী শ্রীকুমারকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়লেন। দাশ ও আলী ফ্রণ্ট থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন বটে,কিন্তু ফ্রণ্টকে শ্রীকুমারের বিরুদ্ধে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়েছে। শ্রীকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি জনাব মকসেদ আলীকে তাঁর আসন থেকে পদত্যাগ করাবার জন্য মন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনাব মকসেদ আলীর বিরুদ্ধে কিছু "ভিত্তিহীন" কুৎসামূলক ঘটনার রটনা করেছিলেন। এই অভিযোগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এই যে, শ্রীকুমার নাকি জনাব মকসেদ আলীকে শাসানি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জনাব মকসেদ আলী যদি পদত্যাগ না করেন, তবে যে সমস্ত নজীর, দলিল-দস্তাবেজ শ্রীকুমারের হস্তগত আছে সেই সমস্ত প্রমাণের জোরে জনাব মকসেদকে পাকিস্তানের গুপ্তচর বলে প্রতিপন্ন করা মোটেই অসুবিধে হবে না। মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি করে এই ব্যাপারে অনুসন্ধানের কথা হয়েছিল, এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই নাটকীয় ঘটনার তদন্তের ফলাফল কি তা জানা যায় নি। তবে এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে যে শ্রীকুমার পদত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এর পরও কি তদন্ত হবে? হবে না তা মনে করবার কোন কারণ নেই। সরকার যখন ফ্রণ্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তখন অনুসন্ধান হবেই। আর শ্রীকুমার নিজেই এর জন্য হয়ত চাপ দিতে পারেন। কারণ তাঁর চরিত্রহননের ব্যাপার এই অভিযোগের সঙ্গে জড়িত আছে।

কিন্তু সে যাই হোক, শ্রীকুমারকে এভাবে বিদায় দেওয়া বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। বাংলা কংগ্রেস ভিনদেশী কৃষ্ণমেননকে লোকসভার আসন যদি ছেড়ে দিয়ে উদারতা দেখাতে পারেন, তবে কেন ফ্রণ্ট শরিকরা শ্রীকুমারের জন্য একটি আসন খালি করে দিতে পারলেন না? এরকম নগ্নভাবে দলীয় স্বার্থ রক্ষার প্রয়াস যুক্তফ্রণ্টের ভাবাবেগের পরিপন্থী। জনতার সামনে শ্রীকুমার তাঁর কৃতিত্ব ও আন্তরিকতার সার্থক প্রমাণ রেখে যেতে পারলেন না। হয়ত শ্রীকুমার আত্মমর্যাদার জন্যে কিম্বা অভিমান বশে কোন দলের কাছে আসন ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানান নি। কিন্তু তা জানাবেনই বা কি করে? যখন তাঁর নিজের কমরেডরাই তাঁকে পথে বসিয়ে দিলেন, তিনি কোন্ মুখে অন্যদলের কাছে আসন চাইবেন? কিন্তু একথা ভুললে চলবে কেন, শ্রীকুমার নিষ্ঠার সঙ্গে ফ্রণ্টের আহ্বায়কের কাজ সম্পন্ন করেছেন। মন্ত্রী হিসাবেও যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য ফ্রণ্টের তাঁকে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

গুণী পাঠকেরা প্রসঙ্গান্তর নিশ্চয়ই নিজগুণে ক্ষমা করবেন এই আশা করা যেতে পারে। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রীর বিষয়ে আদ্যন্ত সবকিছু উল্লেখ না করে উপায় ছিল না। কারণ তাঁর সম্পর্কে [illegible] রিপোর্ট পেশ করতে হলে সব ঘটনাই [illegible] জনতার সমক্ষে হাজির করার প্রয়োজন [illegible] আছে।

বিধানসভায় [illegible] ভাষণে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীনকুমার [illegible] করেছেন, পশ্চিম বাংলায় খাদ্যের অভাব নেই। খাদ্য বলতে বঙ্গবাসী কি বোঝেন তার বিশদ ব্যাখ্যা শ্রীকুমার করেন নি। তবে একথা সকলেই জানেন ভেতো বাঙালী খাদ্য বলতে 'মা লক্ষ্মী'কেই বোঝেন। অর্থাৎ ধান-চালের কথাই বোঝেন। কংগ্রেসী খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনও খাদ্যের অভাব নেই এই বাণী বারংবার শুনিয়েছেন। সত্যিই খাদ্য বলতে চাল বুঝায় না। চালের ঘাটতি পূরণ করার জন্য শ্রীসেন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের উপর জোর দিয়েছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, জোর করে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনও করিয়েছেন। শ্রীকুমাররা তখন তার বিরোধিতা করলেও তাঁর এই ছয় মাসের রাজত্বকালে তিনি তার সুফল পেয়েছেন। আর সত্যিই ত খাদ্যের অভাব কোন দিনই হয় না। চেঙ্গিস খাঁ—সেই ইতিহাসবিশ্রুত চেঙ্গিস খাঁ—তাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে যখন দুর্গম রাশিয়া আক্রমণ করেছিল তখন খাদ্যাভাবের কবলে পড়েনি। বিপুল সৈন্যবাহিনী অশ্বরক্ত পান করে শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করে নি অধিকন্তু শত্রুর রুধিরে রণপিপাসা পর্যন্ত মিটিয়ে নিয়েছিলেন। শ্রীপ্রফুল্ল সেন যদি কাঁচকলা খাওয়ার কথা নিবেদন না করে অশ্বরক্ত পানের কথা বলতেন হয়ত তাঁর এ-দশা হত না। যা হোক শ্রীকুমার বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন। তিনি খাদ্যের অভাব নেই বলে উল্লেখ করেছেন, তবে বঙ্গবাসী খাদ্য বলতে যা বোঝে সেই তণ্ডুল ভরপেট খেতে পাবে কিনা সে কথা বলেন নি। শ্রীকুমারকে আরও বুদ্ধিমান মনে হয়েছে কারণ সত্যিকারে বামপন্থীর মত তিনি একথাও বলেন নি যে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়ে বাঙালীর 'হা অন্ন হা অন্ন' করা উচিত নয়। বলেন নি যে যুগধর্মের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক মানসিকতা সৃষ্টি করে সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য দু'বেলা ভাত খাওয়ার লোভকে পরিহার করতে হবে। তিনি শুধু বলেছেন, খাদ্যের অভাব নেই। কাজেই বলতে হবে শ্রীকুমার প্রথম চালেই এক প্রস্থ বাজীমাৎ করেছেন! এটা শ্রীকুমারের একটা অ্যাচিভ্‌মেন্ট বৈকি!

খাদ্যমন্ত্রী তাঁর জবাবী ভাষণে স্বীকার করেছেন তিনি ফ্রণ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী এখনও সুস্পষ্ট খাদ্যনীতি অনুসরণ করতে পারেন নি। অর্থাৎ খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসার দিকে এগোতে পারেন নি। কারণ হিসাবে বলেছেন, খাদ্যশস্য সংগ্রহের মরশুমের অনেক পরে এই গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণ করার ফলে এহেন ব্যবস্থা অবলম্বনের সুযোগ হয় নি। তাই তাঁর খাদ্যনীতির মধ্যে শ্রীপ্রফুল্ল সেনের ভাবচ্ছবি

প্রতিবিম্বিত হয়েছে। খাদ্যসংগ্রহের ব্যাপারেও শ্রীকুমার পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তিনি অকপটে এই সমস্ত ত্রুটি স্বীকার করে ভালই করেছেন। কারণ দোষ ঢাকবার চেষ্টা না করে স্বীকার করা সাহসিকতার লক্ষণ। তাঁর অকৃতকার্যতার কথা কংগ্রেস যতই বলুক না কেন, জনসাধারণ ত কিছু বলে নি। এবং জনতা যে বলেনি তার প্রমাণ আমি আপনি সকলেই জানেন। 'খাদ্য চাই', 'জিনিসের দাম কমাতে হবে' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে কোন মিছিল এ পর্যন্ত বেরিয়েছে কি? খাদ্যের জন্য সমাবেশ বা মিছিল না হওয়ার মধ্যেই সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে—খাদ্যমন্ত্রী কৃতকার্য হয়েছেন। খাদ্যের কোন সমস্যা নেই; সহমত হন বা না হন এটাই হচ্ছে সত্যি কথা। অবশ্য বলতে পারেন যাঁরা মিছিলভক্ত তাঁরা ত সকলেই ফ্রন্টের সমর্থক। তা হলেও বেতন বৃদ্ধি, ছাঁটাই, বদলীর আদেশ প্রত্যাহার এমনি আরও কত কি দাবীদাওয়া নিয়ে অকাতরে মানুষ মিছিল করেছে।

তারপর ধরুন, রেশনে চালের বরাদ্দ কম হতে পারে। কিন্তু বাজারে চালের সরবরাহ কি কম। অলি-গলিতে পথে-ঘাটে সর্বত্রই চালের বাজার চলছে—চলবে। চোরাকারবারীরা হয়ত এর পেছনে আছে। কিন্তু এই পথে-ঘাটে চালের চোরাকারবার, তা যারা করছে সেই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সমাজের একেবারে নীচুতলাকার মানুষ। শ্রেণীসংগ্রামের স্তম্ভবিশেষ। এই কালোবাজার বন্ধ করবার জন্য খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে সখেদে শ্রীকুমার পুলিশ ঠিকমত কাজ করছে না বলে বহুবার অভিযোগ করেছেন। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। অবশেষে তিনি খাদ্যদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পুলিশ বাহিনী সৃষ্টিরও ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই বাহিনী ময়দানে নামবার আগেই তিনি মন্ত্রী হিসেবে বিদায় নিচ্ছেন। তবে, চোরাকারবার দমন করতে পারেন নি বলে শ্রীকুমারের দুঃখ করবার কোন কারণ দেখছি না। স্মরণ থাকতে পারে, কংগ্রেস আমলে এই গণ-চোরাকারবারীদের সঙ্গে রেল পুলিশ এবং অন্যান্য আরক্ষকদের প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটত। ফলে, প্রায় দিনই রেল চলাচল বন্ধ হ'ত। আর অসংখ্য নাগরিক নাজেহাল হয়ে কংগ্রেসকে অভিশাপ দিত। কিন্তু শ্রীকুমারের ছয় মাসের রাজত্বকালে এ ধরনের একটি ঘটনাও ঘটেনি। কাজেই যাত্রীরা ফ্রন্টকে অভিশাপ দেওয়ার সুযোগও পায় নি। অতএব, এটাও একটি পরোক্ষ অ্যাচিভ্মেন্ট বলে উল্লেখ করলে নিশ্চয় কোন গুণীজন ব্যাজস্তুতি বলে অপরাধ নেবেন না।

তা'ছাড়া বলতে গেলে বলা উচিত খাদ্যমন্ত্রী বলে এদেশে কোনো পদ নেই। মন্ত্রী বলে যিনি আখ্যাত হন তিনি সংগ্রহকারী মাত্র। দেশ, বিদেশ—যেখানে যা পাওয়া যায় এই বুভুক্ষাপীড়িত নিরন্ন দেশের জন্য তাঁকে তাই সংগ্রহ করে আনতে হয়। মান, সম্মান ইত্যাদির কথা না তোলাই ভালো। কিন্তু এই ব্যাপারেও শ্রীকুমারের ক্ষেত্র সীমিত। দিল্লী আর পশ্চিমবঙ্গ এই দু' জায়গা থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেই জনসাধারণকে খাওয়াবার দায়িত্ব ছিল তাঁর হাতে। আর ছয় মাসের রাজত্বকালে উৎপাদনের সুযোগও করে গেছেন। তারই ফসল নিয়ে শ্রীকুমারকে কাজ চালাতে হয়েছে। অতএব, এটিও যদি হয়ে থাকে সেটা স্বাভাবিক। অধিকন্তু, কৃষি উৎপাদনের ভার তাঁর হাতে নেই। কিন্তু কৃষিমন্ত্রী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন তাঁর কোন কৃষিনীতি নেই। অর্থাৎ অদ্যাবধি কোন কৃষিনীতি তিনি স্থির করতে পারেন নি। এই ঘোষণা থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, রাজর্ষি জনকের আমল থেকে যেভাবে কৃষিকার্য চলছে আপাতত তাই চলবে। চট করে তাতে পরিবর্তন হচ্ছে না। কাজেই শ্রীকুমারের বিদায় শাপে বর হল। কৃষি উৎপাদনে যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে না তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। তাই মন্ত্রিত্বের গদীতে আসীন থাকলে খাদ্যের দরবার করার জন্য শ্রীকুমারক অধীর হয়ে হিল্লি দিল্লি করতে হত। হেনস্তা হওয়ারও আশংকা ছিল সমধিক। কাজেই মন্ত্রিত্ব থেকে সরে যাওয়া তাঁর পক্ষে শুভই হ'য়েছে।

খাদ্যমন্ত্রীর 'আলটিমেটাম্কে' বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে—বাড়বে। তিনি হয়ত নিজেও উপলব্ধি করেছিলেন যে এ জিনিস রোধ করা যায় না। আর এই পণ্যমূল্যের স্বেচ্ছাচারিতা চিরতরে স্তব্ধ করতে হলে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগ্রহণের প্রয়োজন তা শ্রীকুমারের অর্থাৎ যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে করা অসম্ভব। রাজ্য-কেন্দ্র একমত হলেই একমাত্র সেই সমস্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে তাঁর হুমকি দেওয়ার মূলে কেবল মাত্র একটা উদ্দেশ্যই ছিল যে যুক্তফ্রণ্ট ভলাণ্টিয়ারদের সতর্ক নজরের ভয়ে যদি কিছুটা দাম কমে। কিন্তু একটি কথা ভুললে চলবে না। বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন তেল, ডাল, মরিচ-মশলা ইত্যাদি বেশীর ভাগই ভিন্নরাজ্য থেকে পশ্চিম বাংলায় আমদানী হয়। কাজেই অন্য কিছু দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হলেই ব্যাপারীরা মাল আমদানী বন্ধ করে দেবেন। গুদামে বা দোকানে মাল না থাকলে ত পীড়াপীড়ি করে কিছু লাভ হবে না। কাজেই শ্রীকুমার ঐ বাগাড়ম্বর না করলেও পারতেন। এখন স্বমত চলে যাচ্ছেন বলে তাঁকে জবাবদিহি করতে হল না। যদি গদীতে থাকতেন তবে তাঁকে সম্ভবত নাজেহাল হতে হত। কারণ, চোরাকারবার দমনের শক্তি তাঁর কেন, যুক্তফ্রণ্ট ঐক্যমত থাকলেও আসবে বলে মনে হয় না। অতএব, শ্রীকুমার মন্ত্রীত্বের পদ থেকে রেহাই পেয়ে ভালই হল। তাঁর রাজনীতিক জীবনের পক্ষে এটা একটি শুভ ঘটনা।

ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি স্বভাবতই গণমনে উষ্মার সৃষ্টি করে। তারপর এই বর্ষাকালে যে ইলিশ মাছের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গসন্তানের রসনা রসসিক্ত হয়ে উঠে সেই বঙ্গবাসী আজ তাঁদের সেই প্রিয়বস্তু থেকে প্রায় বঞ্চিত। বাজারে যেটুকু সরবরাহ আছে, তারও দাম এত চড়া যে শুধু সাধারণ কেন প্রায়অসাধারণ বাঙালীর পক্ষেও রসনা তৃপ্ত করা কঠিন। শুধু ইলিশ নয়, অন্য সমস্তরকমের মাছের দামও প্রায় আকাশ-ছোঁয়া। অতএব, মাছ যদি বাঙালীর প্রিয় খাদ্য হয়ে থাকে তবে কি খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনারা শ্রীসুধীন কুমারকে দায়ী করবেন? নিশ্চয় না—কারণ খাদ্য হলেও এর জন্য মৎস্যমন্ত্রী আছেন। ভেড়ীর মাছ কমে গেছে, বাইরে থেকে চালান মন্দীভূত। অতএব, মাছ পাওয়া যাবে কোথায়? ফলে সরবরাহ না থাকলে চাহিদার চাপে দাম বাড়বেই। কিন্তু খাদ্যমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করা অর্থহীন।

আবার, প্রয়োজনমত দুধ না পান তাহলেও খাদ্যমন্ত্রীকে কিছু বলা চলবে না। কারণ, দুধের জন্যেও আলাদা মন্ত্রী আছেন।

অতএব, এ সমস্ত দুষ্প্রাপ্য ও মহামূল্য জিনিস যদি খাদ্যের তালিকাভুক্ত না করা হয়, তবে পশ্চিম বাংলায় খাদ্যসমস্যা কোথায়? চালের অভাব? পয়সা ছাড়ুন, কত চাল চাই—কত রকমের চাই? রোগীর জন্য পুরানো, পোলাওয়ের জন্য মিহি, না টেবল রাইস্—কি চাই বলুন? এক মুহূর্তের মধ্যে বাড়ীতে ডেলিভারি পাবেন। যদি খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে থাকেন তবে গমের অভাব নেই। যদি লুচি খান, তবে অঢেল ময়দা পাবেন। অবশ্য, সবকিছুর জন্য ট্যাঁকে পয়সা চাই। কিন্তু খাদ্যের অভাব আছে একথা বলা চলবে না। শ্রীকুমারও তাই খাদ্যাভাব আছে একথা স্বীকার করেন নি। অভাব হচ্ছে সংগ্রহের, বণ্টনের নিয়মের আর নেতৃত্বের। কিন্তু ফ্রণ্টে কোন শরিকই শ্রীকুমারকে এই অনিয়মগুলো দূর করবার সুযোগ পর্যন্ত দিলেন না। তাঁর দল দুর্বল হতে পারে, কিন্তু শ্রীকুমার ত দুর্বল মানুষ নন। শক্তহাতে দাপটের সঙ্গে যুক্তফ্রণ্টের তরীর হাল ত তিনি ধরেছিলেন। বিধান পরিষদ থাকলে শ্রীকুমার নির্বাচিত হতে পারতেন। কিন্তু তখনও অবশ্য শুধু তাঁর দলের সদস্যদের ভোটের জোরে তিনি নির্বাচিত হতে পারতেন না। হয়তো অন্যান্য শরিকরা ত এগিয়ে আসতেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে তাঁরা পিছিয়ে যাচ্ছেন কেন? ছোট দলগুলি যদি বড়দের কাছ থেকে কিছুই সুযোগ-সুবিধা না পায়, তবে যুক্তফ্রণ্টের অর্থ কি? শুধু শ্রীকুমার যাবেন না। তাঁকে অনুসরণ করবেন পর্যটন মন্ত্রী শ্রীবরদা মুকুটমণি। তাঁরও একই দশা। পর্যটনের উন্নয়নের জন্য গদীতে বসতে না বসতেই শ্রীমুকুটমণি সারা বাংলাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোথায় কি করলে দু'জন বাইরের লোক এই অভাগা বাংলাদেশে আসেন আর রাজ্যসরকারের দুটো পয়সা হয়। শুধু বাংলা নয় ভারতের অন্যান্য স্থানেও শ্রীমুকুটমণি ছুটেছেন কোন্ রাজ্য কি ভাবে ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করছেন তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য। কিন্তু এত উদ্যোগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যেতে হবে। কারণ তাঁর জন্যও আসন খালি নেই। এত কষ্ট করে একজোট হয়ে কংগ্রেসকে গদীচ্যুত করা সত্ত্বেও আখেরে তাঁদের গদী হারাতে হচ্ছে। দুঃখের কথা বইকি!

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

ইন্দিরা বনাম সিণ্ডিকেট

১৬ আগস্ট পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে হল না। ঐ তারিখেই স্থির হবে ভারতবর্ষের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কে হবেন—কংগ্রেসের সিণ্ডিকেটের মনোনীত শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি অথবা বামপন্থীদের সমর্থিত শ্রীবেঙ্কটগিরি বরাহ গিরি অথবা মাঝখান থেকে শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বেরিয়ে যাবেন কিনা। ভারত সরকার বড় বড় ১৪টি ভারতীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কংগ্রেসের ভিতর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সিণ্ডিকেটের যে বিরোধ কতকটা যেন চাপা পড়েছিল সেই বিরোধ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর এই ছিল পর্যবেক্ষক-দের কারও কারও অনুমান। ঐ ১৬ আগস্ট তারিখটিকে ঘিরে অনেক জল্পনা-কল্পনাও ছড়াচ্ছিল—ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর সিণ্ডিকেটের যেসব শিরোমণি মাথা নীচু করে থাকতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা নিজেদের মনোমত রাষ্ট্রপতিকে গদীতে বসিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবেন, এমন কি তাঁর মন্ত্রিসভার পতন ঘটাবারও চেষ্টা হবে ইত্যাদি। কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত বলেছেন, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি রাষ্ট্রপতি হলে তিনি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বিলে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে প্রধানমন্ত্রীকে বেকায়দায় ফেলবেন।

কিন্তু ঐ তারিখের আগেই আবার বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। জনসভায়, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টিতে এবং এমন কি লোকসভায়ও এই বিরোধের প্রকাশ ঘটছে নানাভাবে। এবং এমন কি আবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতেও এই প্রসঙ্গ উঠতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সিদ্ধান্ত শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁর প্রতিপক্ষের তুলনায় যে সুবিধা দিয়েছে সেই সুবিধা তিনি হাত-ছাড়া করতে চাইছেন না। সেইজন্য তিনি তাঁর আক্রমণাত্মক ভঙ্গী বজায় রেখে চলেছেন। এই আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি একটি নতুন মন্ত্র বেছে নিয়েছেন। নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে ইতিমধ্যে দুটি জনসমাবেশ হয়ে গেছে। এই দুটি জনসমাবেশ হয়েছিল শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁর ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সিদ্ধান্তের জন্য অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে। গত ৪ আগস্ট দিল্লী প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে তাঁর বাসভবনের সামনে যে সমাবেশ হয় সেখানে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, ১৫ বছর আগে কংগ্রেস দলের নেতারা যে কার্যসূচী দিয়েছিলেন সেটা তিনি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য কিছু লোক তাঁকে 'ডিক্টেটর' আখ্যা দিচ্ছেন। 'এই সব লোকের যদি হিম্মৎ থাকে তাহলে তাঁদের তখনই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের কর্মসূচীর বিরোধিতা করা উচিত ছিল।' শ্রীমতী গান্ধী বলেন, সামনাসামনি বিরোধিতা না করে তাঁরা কানে-কানে ফিস-ফিস করছেন কেন?

ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করার সপক্ষে জনমতের যে অভিব্যক্তি হয়েছে তাকে নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে কাজে লাগাবার চেষ্টায় শ্রীমতী গান্ধী ঐ জনসমাবেশে আরও বলেন যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে মুষ্টিমেয় কয়েক-জনের তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ তারই সূচনা।

পরদিন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে আর একটি জনসমাবেশ হয়। ঐ জন-সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিলেন ত্রিশটি ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য সংগঠন। নাগরিক মিছিল নাম দিয়ে হাজার দুয়েক কৃষক, শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ী, শিক্ষক, আইনজীবী, ডাক্তার প্রভৃতির শোভাযাত্রা নিয়ে আসা হয়েছিল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্ত সমর্থন করার জন্য। অন্যান্যদের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টি, এস-এস-পি এবং আর-এস-পি-ও এই মিছিলের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিল। জনসমাবেশে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কংগ্রেসের বামঘেঁষা নেতা শ্রীকে ডি মালব্য এবং আর দুজন নির্দলীয় বামপন্থী শ্রীকৃষ্ণ মেনন ও শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি।

ঐ জনসমাবেশেও শ্রীমতী গান্ধী অনু-রূপ একটি বক্তৃতা দিলেন। তিনি বললেন যে, তিনি কাউকে ভয় দেখাতে চান না। কিন্তু যাঁরা তাঁকে ভয় দেখাতে চাইছেন তাঁদের জবাব তিনি দিতে চান। তিনি বললেন, যখন তিনি তাঁর দলের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন তখন সেটাকে তাঁর দুর্বলতা বলে মনে করা হয়েছে। আর যখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন তখন সেই লোকগুলি বিচলিত হয়ে উঠলেন। প্রধান-মন্ত্রী সেই জনসমাবেশে বললেন, ব্যাঙ্ক-গুলিকে সরকারের আয়ত্তে আনার ব্যাপারটা হল এর পরবর্তী আরও কতকগুলি পদক্ষেপের সূচনা। এই সূচনাতেই যদি এমন সোরগোল তোলা হয় তাহলে এর পরবর্তী ধাপগুলিতে না জানি কি হবে। ধনীর সঙ্গে দরিদ্রের লড়াই শুরু হয়েছে, এই লড়াইয়ে তিনি দরিদ্রের পক্ষে।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দিক থেকে এই আক্রমণের মুখে তাঁর প্রতিপক্ষের শিবিরকে এই মুহূর্তে কতকটা ছত্রভঙ্গ ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় বলে মনে হচ্ছে। আকারে-ইঙ্গিতে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে অভিযোগ আনা হচ্ছে সেটা হল এই যে, তিনি কংগ্রেসের মধ্যে কম্যুনিস্টদের অনু-প্রবেশের সুযোগ করে দিলেন অথবা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের আসনটি পাকা করে রাখছেন। শ্রীকামরাজ তামিলনাড়ুর কুম্ভালোর শহরে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

গত এক সপ্তাহের মধ্যে একাধিকবার শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বিরুদ্ধে এই অভি-যোগের জবাব দিয়েছেন। গত ৫ তারিখে তাঁর বাসভবনের সামনে যে জনসমাবেশ হয় সেখানে তিনি বলেছেন যে, তিনি যদি কম্যুনিস্ট হতে চাইতেন তাহলে তাঁকে কেউ আটকাতে পারত না। কিন্তু তিনি বরাবরই কংগ্রেসে আছেন এবং এখনও তাই। বেল-জিয়াম, স্পেন, সুইডেন ও ফ্রান্সের ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যদি সেসব দেশে কম্যুনিজম না এসে থাকে তাহলে ভারতবর্ষেই বা কম্যুনিজমের ভয় দেখান হচ্ছে কেন? আমেরিকায় ম্যাককার্থির আমলে যেভাবে সব কিছুর মধ্যে কম্যুনিজমের ছায়া দেখার রেওয়াজ তৈরী হয়েছিল সেকথা স্মরণ করে রাজ্যসভায় শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন যে, ম্যাককার্থিবাদের উদ্ভব যে দেশে সে দেশ ঐ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে আর ভারতবর্ষে সেই মতবাদকে জীইয়ে তোলা হচ্ছে, এটা আশ্চর্যের বিষয়।

শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যে অভিযোগটি খাড়া করবার চেষ্টা হচ্ছে সেটা এই যে, তিনি রাষ্ট্রপতির পদে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে জয়ী করবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন না। প্রথমে চেষ্টা হয়েছিল যাতে শ্রীমতী গান্ধী শ্রীরেড্ডিকে জয়ী করাবার জন্য নির্বাচকমণ্ডলীর উদ্দেশে একটি আবেদন প্রচার করেন। শ্রীমতী গান্ধী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন; কেননা, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য

বিশেষ একজন প্রার্থীর সমর্থনে আবেদন প্রকাশ করার আইনগত অসুবিধা আছে। গতবার তিনি এই ধরনের আবেদন প্রচার করায় বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। শ্রীমতী গান্ধীর ঐ আপত্তির পর স্থির হয় যে, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির এক সভায় তিনি সংসদের কংগ্রেস সদস্যদের উদ্দেশে আবেদন জানাবেন যাতে তাঁরা শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির পক্ষে ভোট দেন।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির ঐ বৈঠক হয়েছে বটে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সেই বৈঠক ডাকা হয়েছিল তার বিশেষ কিছু সুরাহা হয় নি, বরং ঐ বৈঠক উপলক্ষে কংগ্রেসের ভিতরকার দ্বন্দ্ব আরও বিশ্রীভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশ যে, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড রাষ্ট্রপতির পদের জন্য যাঁকে মনোনীত করেছেন তাঁকে তিনি সমর্থন করবেন, মাত্র এইটুকুর বেশী আর কিছু শ্রীমতী গান্ধী বলতে রাজী হন নি, কিন্তু অপরপক্ষে, সিণ্ডিকেটের অন্যতম সমর্থক শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বৈঠকে তীব্র ভৎসনার সম্মুখীন হন তাঁর একটি লেখার জন্য। ঐ লেখায় শ্রীমতী সিংহ বলেছিলেন যে, শ্রীমতী গান্ধী কম্যুনিস্টদের 'অত্যন্ত কাছাকাছি' এসে পড়েছেন। তিনি বলে-ছিলেন যে, ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত মনে করে শ্রীমতী গান্ধী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এখন থেকে তাঁর নিজের প্রধানমন্ত্রিত্ব পাকা করে রাখার চেষ্টা করছেন। শ্রীমতী গান্ধীর সম্পর্কে এই ধরনের অপ্রিয় মন্তব্য করার জন্য কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে শ্রীমতী সিংহের বিরুদ্ধে কয়েকজন সদস্য তীব্র আক্রমণ করেন। শ্রীমতী সিংহ ও তাঁর কয়েকজন সমর্থকও জোর গলায় বলার চেষ্টা করতে থাকেন যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কম্যুনিস্টদের হাতে তুলে দিতে তাঁরা দেবেন না। ফলে এমন একটা ভয়ঙ্কর গোলযোগের সৃষ্টি হয় যার কোন নজীর কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির অধিবেশনের ইতিহাসে নেই। স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজ-লিঙ্গাপ্পাও সেই অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সদস্যদের শান্ত করতে পারেন নি।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির এই বৈঠকে প্রকারান্তরে শ্রীমতী গান্ধী দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সিণ্ডিকেটের আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর হয়ে লড়াই করার লোক পার্টির মধ্যে কম নেই।

ইতিমধ্যে আর একটি নজীরছাড়া ঘটনা ঘটে গেছে লোকসভায় এবং সেখানেও কংগ্রেসের ভিতরকার অনৈক্য প্রকাশ পেয়েছে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে। লোকসভায় শ্রীমধু লিমায়ে অভিযোগ এনেছিলেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে। অভিযোগটা ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অন্যায় প্রভাব বিস্তার সম্পর্কিত। কোন কোন সংবাদপত্রে এরকম সংবাদ বেরিয়েছিল যে, বিহারে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের বলেছেন, বিধানসভায় যতজন সদস্য সংগ্রেসকে সমর্থন করছেন বলে দাবী জানান হচ্ছে ততগুলি ভোট যদি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির পক্ষে পড়ে তাহলে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন তুলে নিয়ে কংগ্রেসকে সরকার গঠন করতে দেওয়া হবে। এই সংবাদ উদ্ধৃত করে লোকসভায় শ্রীলিমায়ে অভিযোগ করেছিলেন যে, কংগ্রেস সভাপতি বিহার বিধানসভার সদস্যদের প্রলুব্ধ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করছেন। শ্রীনিজ-লিঙ্গাপ্পা ইতিপূর্বেই বিবৃতি দিয়ে ঐ সংবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন। তৎসম্পর্কেও

শ্রীগিমায়ে ও অন্যান্য কয়েকজন লোকসভায় প্রসঙ্গটি আলোচনা করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কয়েকজন সদস্য এতে প্রবল আপত্তি জানান। কিন্তু ডেপুটি স্পীকার শ্রীআর কে খাদিলকর সেই আপত্তি অগ্রাহ্য করে দেন এই বলে যে, এরকম একটা গুরুতর অভিযোগ খণ্ডন করার সুযোগ তিনি কংগ্রেসকে দিতে চান। স্পীকারের এই নির্দেশের প্রতিবাদে শ্রীএস কে পাতিলের নেতৃত্বে কংগ্রেসী সদস্যদের একাংশ সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যান। তাঁরা যখন বেরিয়ে যান তখন দলের অন্যান্য সদস্যরা কিন্তু যার যার জায়গায়ই বসেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে, এরকম একটা ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতির সুনাম রক্ষা করার জন্য কংগ্রেস পক্ষে সকলে সমান আগ্রহী নন।

এই ঘটনার আর একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক এই যে, ডেপুটি স্পীকার শ্রীখাদিলকর যখন তাঁর ঐ নির্দেশ দেন তার আগেই শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির শূন্য স্থানে স্পীকার পদের জন্য কংগ্রেস মনোনয়ন হয়ে গেছে এবং শ্রীজি এস ধীলন ঐ পদের জন্য মনোনীত হয়েছেন। যদিও স্পীকার পদের জন্য শ্রীখাদিলকরের নাম একবার উঠেছিল তাহলেও শেষ পর্যন্ত তিনি দলের মনোনয়ন পান নি এবং তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, শ্রীধীলনের অধীনে তিনি আর ডেপুটি স্পীকারের কাজ করবেন না।

সুতরাং এরপর একজন নতুন ডেপুটি স্পীকার খুঁজবার জন্যও কংগ্রেস দলকে মনোযোগ দিতে হবে। শুধু ডেপুটি স্পীকারই নয়, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদেও নতুন লোকের সন্ধান করতে হবে বলে মনে হচ্ছে। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলেই রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। শ্রীগিরি পদত্যাগ করায় উপ-রাষ্ট্রপতি তথা চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য হয়েছে। রাজ্যসভার বর্তমান ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা ঐ পদে প্রমোশন পেয়েছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড তাঁর দাবী অগ্রাহ্য করে মহীশূরের বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীগোপালস্বরূপ পাঠককে উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী আলভা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যদিও তিনি শ্রীভি ভি গিরি ও ডাঃ জাকীর হোসেনের অধীনে সানন্দে ডেপুটি চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করেছেন, কিন্তু শ্রীপাঠকের অধীনে ডেপুটি চেয়ারম্যান হয়ে থাকার অভিপ্রায় তাঁর নেই। অর্থাৎ শ্রীমতী আলভাও পদত্যাগ করছেন এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদটিও শূন্য হচ্ছে।

এদিকে ১৬ আগস্ট তারিখটি যতই এগিয়ে আসছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তোড়-জোড় ততই বাড়ছে। এর আগে আর কখনও এই নির্বাচনের জন্য এমন তিনজন বড় বড় প্রার্থী দাঁড়ান নি এবং এর আগে আর কখনও এই নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন দলের প্রতি সাজ সাজ রব পড়ে যায় নি। শ্রীগিরি নিজে বিভিন্ন রাজ্যে সফর করে নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করছেন, শ্রীদেশমুখ ও শ্রীরেড্ডিও নির্বাচনী সফরে বেরোবেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা শ্রীরেড্ডিকে 'জাতীয় প্রার্থী' বলে অভিহিত করে তাঁকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর চার হাজার সদস্যের প্রত্যেককে পত্র দিয়েছেন। জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে দেখা করে তিনি আবেদন জানিয়েছেন যে, যাতে তাঁদের দলের সদস্যদের অন্তত দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোটটি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির পক্ষে পড়ে তার জন্য তাঁরা যেন নির্দেশ দেন।

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি নিজেও একটি আবেদন প্রচার করেছেন। তিনি নির্বাচিত হয়ে এলে শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা হবে অথবা তিনি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বিলটি আটকে দেবার চেষ্টা করবেন, এই জল্পনা-কল্পনা লক্ষ্য করেই সম্ভবত শ্রীরেড্ডি তাঁর আবেদনে বিশেষ করে একথাটা বলেছেন যে, ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র, তাঁর নিজের কোন নীতি বা কার্যসূচী থাকতে পারে না।

স্বাধীনতার স্বাদ

দেখতে দেখতে স্বাধীনতার বয়স বাইশ পূর্ণ হল। সে এখন সক্ষম যুবক। তার অনেক আশা বুকে, চোখে অনেক স্বপ্ন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট বা তার কাছাকাছি সময়ে যারা জন্মেছে তারাই এই দশকের যুবক। কলেজ থেকে বেরোবার সময় হল তাদের। তারা স্বাধীন ভারতবর্ষকে যে-চোখে দেখবে অগ্রজরা সে-চোখ দিয়ে দেখবেন না। স্বাধীনতার দাবি তরুণদের যত বেশি অন্যদের তত নয়। কারণ, এই স্বাধীনতার দায়-দায়িত্ব এখন তাদের বহন করতে হবে। অগ্রজরা স্বাধীনতা তাদের জন্য উপার্জন করেছেন রক্ত দিয়ে, শ্রম দিয়ে। স্বাধীনতার পরবর্তী দুই দশকে তাঁরা দেশকে একভাবে নিজেদের সাধ্যমত গড়তে চেয়েছেন। গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে দেশের মানুষের বৈষয়িক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের যে-প্রয়াস হয়েছে এ যুগের তরুণেরা তার এখন হিসাব-নিকাশ চাইবে, এ তো স্বাভাবিক কথা।

বহু দিনের সংগ্রামে ভারতবর্ষ ইংরেজের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। দেশকে পরশাসন থেকে মুক্ত করবার জন্য বহু প্রাণ উৎসর্গ করা হয়েছে। উপনিবেশিক শাসকদের চোখে স্বাধীনতার সংগ্রামীরা ছিল রাজদ্রোহী সন্ত্রাসবাদী। দেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল অশিক্ষিত, অজ্ঞ, দারিদ্র্যে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। দেশের গোটা সমাজকে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশীদার করে তোলার কাজে এই আত্মপ্রত্যয়ী নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের দল নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-সাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা বা প্রাণ কোনো কিছু বিসর্জন দিতেই কুণ্ঠিত হননি। আজ আমরা তাঁদের ক'জনকেই বা স্মরণ করি। কিন্তু তাঁরা আমাদের জন্যই সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির সংগ্রামে।

বহু মূল্য দিতে হয়েছে দেশের মানুষকেও। সম্ভবত তার সবচেয়ে কঠিন মূল্য হল দেশবিভাগ। ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই। কিন্তু দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে দেশ। তার ফলে প্রতিবেশীর সঙ্গে মিত্রতার বন্ধন সৃষ্টির চেষ্টা আজ পর্যন্ত সফল হয়নি। পাকিস্তানে এমন এক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হল যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। আমরা দুই প্রতিবেশী যদি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে পারতাম তাহলে উভয় দেশের সাধারণ মানুষেরই কল্যাণ হত। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য যে, তার দিক থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিবেশীর শাসকগোষ্ঠি একটা না একটা অজুহাতে ভারতের বিরুদ্ধে বৈরিভাই বজায় রেখে চলেছে।

ভারতবর্ষের সাধ ছিল এমন একটি জগৎ সৃষ্টির যেখানে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার মধ্যে হবে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান। শান্তি ও মৈত্রীর এই আদর্শ স্থাপনের জন্য ভারতের দিক থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিরলস প্রচেষ্টা করা হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে। যুদ্ধের বিভীষিকা যাতে মানুষের ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করতে না পারে তার জন্য ভারতবর্ষ আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য বিশ্বের জনমত গঠনে আত্মনিয়োগ করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির এটাই হল মূল কথা। শক্তিশিবিরের দ্বন্দ্বে ভারত যোগ দেয় নি। বরং যাতে এই দ্বন্দ্বের অবসান হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে তার জন্য রাষ্ট্রসংঘে ভারত শান্তির আবেদন জানিয়ে আসছে গত দুই দশক ধরে। পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ এবং পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য ভারতবর্ষের মুখ্য ভূমিকা আজ স্বীকৃত। ঔপনিবেশিকতাবাদের কবল থেকে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলোকে মুক্ত করবার জন্য ভারতবর্ষ আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বহু দেশের মানুষকে দিয়েছে প্রেরণা। কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কঙ্গো, সাইপ্রাস প্রভৃতি দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের পক্ষে ভারতবর্ষ রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে শান্তির সৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ভারতবর্ষের মানুষের কাছে এই স্বাধীনতা তাই গৌরবের। প্রতিটি দেশপ্রেমিক এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। অবশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়। স্বাধীন দেশের মানুষ নিজেদের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিটি মানুষের জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তুলতে যত্নবান না হলে স্বাধীনতার কোনো মূল্যই থাকে না। আমাদের দেশে সমস্যার অন্ত নেই। সাধারণ মানুষের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবিকার দায়-দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা এখনও পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। এই সত্য স্বীকার করে নিয়েই আমাদের স্বাধীনতার পুণ্য দিনে দলমতনির্বিশেষে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে, দেশকে সকল দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য। সকলের জীবনে শান্তি ও সমৃদ্ধি আসুক। স্বাধীন ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হোক বিশ্বের জাতিসভায়। এই আমাদের প্রার্থনা।

১৫ আগস্ট *
*পিছনের এক বছর

পর পর দু'বছর খরা ও অজন্মার পর গত বছর ভারতে ভালো ফসল হয়েছে, অঙ্কের হিসাবে যার পরিমাণ ন' কোটি টন। আরো আশার কথা, এই উৎপাদন বৃদ্ধি যে শুধু প্রাকৃতিক আনুকূল্যেই সম্ভব হয়েছে, তা নয়, খাদ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রের অন্যান্য শীর্ষ-ব্যক্তিরা দাবী করেছেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে দুর্লংঘ্য বাধাগুলো ছিল, এতদিন পরে আমরা তা অতিক্রমে সমর্থ হয়েছি এবং এই জন্যই ভারতের প্রায় সর্বত্র গত বছর যে সবুজের সমারোহ দেখা গেছে, তাকে তাঁরা 'সবুজ-বিপ্লব' রূপে নামাঙ্কিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী মাত্র কয়েকদিন আগে প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে ভারত সফররত এক মার্কিন টেলিভিশনের প্রতিনিধির কাছে ভারতে ফসল উৎপাদনে ২৩ শতাংশ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, বছর দুয়েকের মধ্যেই ভারত খাদ্যে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হবে এবং বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী বন্ধ করা সম্ভব হবে।

ফসল ভাল হওয়ায় খাদ্য কর্পোরেশন এবার দেশের মধ্যে ২৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহে সমর্থ হয়েছে। এদের সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল ২৮ লক্ষ টন। কর্পোরেশনের আশা, বাকী ৪ লক্ষ টনও বর্তমান বর্ষা-ঋতুর শেষে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও বেশ আশাপ্রদ। এদের সংগ্রহের লক্ষ্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টনের মধ্যে ৪ লক্ষ ২৩ হাজার টন ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে।

কৃষিতে ভাল বীজ ও সারের যেমন দরকার, তেমনি উন্নততর যন্ত্রপাতির প্রয়োজনও সমধিক। এই অভাব পূরণের জন্য সরকারের উদ্যোগে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সহ ১৪টি রাজ্যে কৃষিশিল্প কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। যৌথ কোম্পানী আইনানুসারে রেজিস্ট্রিকৃত এই সংস্থাগুলি কৃষিজীবীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বিদেশ থেকে আমদানী ট্রাকটর বণ্টনের ভারও এই সব সংস্থার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ট্রাকটরের ব্যবহার বৃদ্ধি

এই প্রসঙ্গে ভারতে ট্রাকটর বা যন্ত্রলাঙগলের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারও বিশেষ উল্লেখনীয়। ১৯৫৬ থেকে '৬১ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরের হিসেবে দেখা গেছলো, ভারতে ট্রাকটরে ব্যবহার বছরে দু' হাজার করে বেড়েছে। ১৯৬৬ সালে ভারতের আটটি রাজ্য—অন্ধ্র, আসাম, গুজরাট, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে ট্রাকটরের ব্যবহারের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র ভারতের জন্য যে গড় হিসাব তৈরী করা হয়, তাতে দেখা যায় যে, ১৯৬১ থেকে '৬৬ সালের মধ্যে দেশে ট্রাকটরের ব্যবহার প্রতি বছরে ৬,২৫০টি হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পর ১৯৬৭-র এপ্রিল থেকে ১৯৬৮-র মার্চ পর্যন্ত যে হিসাব নেওয়া হয়, তাতে দেখা যায় যে, ঐ বছরে ভারতে মোট ১২,০২১টি ট্রাকটর বিক্রী হয়েছে।

কৃষির মত শিল্পেও

কৃষির মতো শিল্পেও ভারত কয়েক বৎসরব্যাপী একটানা মন্দার পর সুদিনের মুখ দেখতে শুরু করেছে। তৃতীয় যোজনার মাঝামাঝি সময় থেকেই ভারতে লগ্নীর বাজারে মন্দার আভাস দেখা দেয়—সরকারী বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই লগ্নীর পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। তৃতীয় যোজনার পর থেকে প্রায় তিন বছরকাল একান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো ছাড়া যোজনার কাজ বন্ধ রাখা হয়। সরকারী শিল্প ক্ষেত্রে লগ্নীর পরিমাণ এইভাবে হ্রাস পেলে দেশের মধ্যে শিল্পদ্রব্যের চাহিদাও গুরুতর রকমে কমে যায় এবং বহু কলকারখানায় কাজ মাত্র আংশিকভাবে চালু থাকে।

সুধীরকুমার সেন

১৯৬৮ সালের শেষাশেষি ভারতের শিল্পগুলো এই মন্দার ভাব কিছুটা উত্তরণে সমর্থ হয়, যদিও লগ্নীর পরিমাণ আশানুরূপ না হওয়ায় এই অগ্রগতি খুব মন্থর। বর্তমানে যোজনার কাজ পাঁচসালা ভিত্তিতে রচিত না হয়ে বরং বাৎসরিক ভিত্তিতেই রচিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য, শিল্পোৎপাদনে পুরোনো গতিবেগ ফিরে আসা নির্ভর করবে প্রধানত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর। এর ভেতর আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের চেয়েও বৈদেশিক সাহায্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

কয়েকটি শিল্পে উৎপাদন

১৯৬৮ সালের গোড়া থেকেই শিল্পে মন্দার ভাব কেটে যাওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। এই বছর জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম ন' মাসে শিল্পোৎপাদনের সূচক-সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৫৯-৩ অর্থাৎ পূর্বের দু'বছরের তুলনায় ৫ থেকে ৬ শতাংশ বেশী।

আলোচ্য বছরে কতকগুলো শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭ সালে যে-সব শিল্পে মন্দার কবলিত হয়েছিল, তার মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং ও মূলধনী যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্পই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলোচ্য বছরে যে-সব শিল্পে উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা হচ্ছে : চিনি কলের যন্ত্রপাতি, ড্রিলিং-এর যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম, গ্যাস সিলিন্ডার, পাম্প ও কাগজ তৈরীর সরঞ্জাম, ওষুধ তৈরীর যন্ত্রপাতি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও রেফ্রিজারেশনের যন্ত্র ও সরঞ্জাম, তামাক তৈরীর যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক মোটর ও ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি। এমন কি মন্দার ফলে যে-সব শিল্পে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যেমন রেলওয়াগন, ভারী কাঠামো, বাণিজ্যিক যানবাহন ও জিপ এবং ইস্পাতের ঢালাই প্রভৃতি শিল্পেও উন্নতির সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

সরকারী উদ্যোগে ৮৩টি সংস্থা

ভারতে সরকারই এখন সবচেয়ে বড় নিয়োগকর্তা, ১৯৬৮ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৩টি, খাটছে ৩০০০ কোটি টাকা। এই ৮৩টি সংস্থার মধ্যে ৫৫টিই শিল্প প্রকল্প। এর মধ্যে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন, ভারতীয় তেল কর্পোরেশন, এয়ার ইন্ডিয়া, ভারত ইলেকট্রনিকস, ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন, শিপিং কর্পোরেশন, টেলিফোন ইন্ডাস্ট্রিজ, স্টেট ট্রেডিং কর্পোঃ, হিন্দুস্থান এরোনটিকস, ভারত আর্থমুভার্স, মিনারেল ও মেটাল ট্রেডিং কর্পোঃ, কোচিন রিফাইনারিজ, হিন্দুস্থান কেবলস প্রভৃতি সংস্থায় প্রভূত লাভ হচ্ছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত সংস্থাগুলির মধ্যে ৩৯টি নীট লাভ করেছিল ৩৯ কোটি টাকা। ২৮টি সংস্থার লোকসান হয়। এর মধ্যে রয়েছে হিন্দুস্থান স্টিল, হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোঃ, নেভেলি লিগনাইট কর্পোঃ, হেভি ইলেকট্রিকালস ও ভারত হেভি ইলেকট্রিকালস।

ইস্পাত শিল্প

তবু ভারতের ইস্পাত শিল্পের অবস্থা এ পর্যন্ত খুব আশাপ্রদ নয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পুরোনো ভারতের এই শিল্পে বর্তমানে ১১০ কোটি টাকা খাটছে। ১৯৫৫ সাল থেকে এই শিল্পের যে সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে, তাতে এর উৎপাদন

পাঁ

১৫০০০ টন থেকে বেড়ে তৃতীয় যোজনার শেষাশেষি ৮০,০০০ টনে দাঁড়ায়। ফলে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই লগ্নীর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হয়ে এর উৎপাদন সামর্থ্যও দ্রুত বাড়ানোর ব্যবস্থা হয়, যার ফলে ১৯৬৪ সাল থেকে ৪ বছরে ঢালাই কারখানাগুলোর মোট উৎপাদন সামর্থ্য ৫৯,০০০ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৮ সালে দেড় লক্ষ টনে দাঁড়ায়।

কিন্তু গত বছর এর উৎপাদন ৫৪,০০০ টন থেকে হ্রাস পেয়ে ৫০,০০০ টনে পৌঁছেছে, যার ফলে কারখানাগুলোর মোট উৎপাদন-সামর্থ্য ৯১-৭ শতাংশের মধ্যে মাত্র ৩৩-৩ শতাংশকে কাজে লাগানো যাচ্ছে।

পেট্রল

পেট্রল উৎপাদন শিল্পে অবশ্য আমরা অনেক এগিয়েছি, যার ফলে একালের আমদানী-নির্ভরতা কেটে গিয়ে পেট্রলের দিক থেকে আমরা বহুলাংশে স্বনির্ভর হতে পেরেছি। এক্ষেত্রে রেলে পেট্রল পরিবহনের হিসেব থেকেই আমাদের প্রগতির মাত্রার আভাস পাওয়া যাবে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতীয় রেলওয়েগুলো মাত্র ২০ লক্ষ ২৫ হাজার টন পেট্রল স্থানান্তরে প্রেরণের ভার পেয়েছিল। গত বছর রেলপথে পেট্রল পরিবহনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৮০ লক্ষ ৩০ হাজার টন।

১৯৬৭-৬৮ সালে আর কতকগুলো শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ ছিলো নিম্নরূপ :

কয়লা—৭ কোটি ১০ লক্ষ ১৪ হাজার টন, আকরিক লোহ—১ কোটি ৮০ লক্ষ ৯০ হাজার টন; আকরিক ম্যাঙ্গানিজ—১১ লক্ষ ৫০ হাজার টন; সিমেন্ট—১ কোটি ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টন।

প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম

প্রতিরক্ষার সরঞ্জাম নির্মাণেও ভারত অনেকখানি এগিয়েছে। ১৯৬৮ সালে ভারতের অস্ত্র-কারখানাগুলোতে ১০৭ কোটি টাকার যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তৈরী হয়েছে। ভারতে বর্তমানে জেট চালিত বিমান তৈরী হচ্ছে! যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণেও ভারত অনেক এগিয়েছে। বোম্বাই-এর মাজাগাও ডকে ইতিমধ্যেই একখানি লিন্ডার শ্রেণীর ফ্রিগেট তৈরী হয়েছে। বর্তমানে আর একখানিও তৈরীর কাজ চলছে। মাদ্রাজের কাছে আবাদীর কারখানায় ভারতীয় স্থলবাহিনীর জন্য ট্যাঙ্ক তৈরীর কাজ পুরোদমে চলছে। এই কারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের প্রায় ৯ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে। ১৯৬২ সালের পরে ভারতে ৭টি নতুন অস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে আরো ৩টির নির্মাণকার্য চলছে।

রেলওয়ে

ভারতীয় রেলপথগুলোতে গত বছর ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টন মাল পরিবহন করা হয়েছে! এদিক থেকে ভারতে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে রেল পরিবহনের সামর্থ্য কিভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তার তুলনা দেখানো যেতে পারে। ১৯৫১ সালে ভারতে শিল্পোৎপাদনের সূচক সংখ্যা ছিল ৫৪·১। ১৯৬৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫১·৬, অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৭৬·৬ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে রেল পরিবহণের সামর্থ্য টন কিলোমিটারের ভিত্তিতে ১৬৯·৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

বিশ্বের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে সোভিয়েট রেলওয়ের পরই ভারতীয় রেলওয়ের স্থান। দিনে এর আয় আড়াই কোটি টাকা, প্রতিদিন মাল বহন করে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন, ৬২ লক্ষ লোক প্রতিদিন রেলে চড়ে। এই প্রতিষ্ঠানে কর্মীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তের লক্ষ এবং এ ছাড়াও স্টেশনগুলোর পোর্টার, ভেণ্ডার, কণ্ট্রাক্টরদের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিক প্রভৃতি অসংখ্য লোকের জীবিকা এই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল।

ভারতীয় রেলওয়ে কারখানাগুলো এখন নিজ প্রয়োজন মেটানো ছাড়াও হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, ইরান, তুরস্ক, বর্মা, সিংহল এবং দঃ পূঃ এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার বহু দেশে রেলের সাজসরঞ্জাম রপ্তানী করে থাকে।

গৃহনির্মাণ অনেক পিছিয়ে

ভারতে বাসগৃহের অভাব এখন ৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ইউনিট বলে ধার্য হয়েছে। এর মধ্যে ১ কোটি ১৯ লক্ষ শহরাঞ্চলে এবং ৭ কোটি ১৮ লক্ষ গ্রামাঞ্চলে। বছর বছর এই অভাবের সঙ্গে আরো ২০ লক্ষ ইউনিট করে যুক্ত হবে। এই অভাব পূরণে বছরে আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী খাতে মিলিয়ে যে বাসগৃহ নির্মিত হচ্ছে তা তিন লক্ষ ইউনিটের বেশী নয়। অপরপক্ষে প্রথম যোজনায় যেখানে মোট সরকারী ব্যয়ের ১·৬ শতাংশ বরাদ্দ ছিল গৃহনির্মাণ বাবদে সেখানে বরাদ্দের হার চতুর্থ যোজনায় কমে এসে ০·৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এইজন্য কিছুদিন আগে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত গৃহনির্মাণ মন্ত্রীদের সম্মেলনে স্থির হয় যে আগামী ৪।৫ বছরের মধ্যে ২০০ কোটি টাকা নিয়ে আবর্তনশীল একটি তহবিল গঠিত হবে

এখানে গড়ে উঠছে হলদিয়া বন্দর

এর ফলে আমাদের মোট রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও, যেসব দেশ আমাদের পুরোনো খরিদ্দার সেগুলোতে রপ্তানী বাড়েনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে গুরুতররূপে হ্রাস পেয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ভারতীয় পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার বৃটেনে আমাদের রপ্তানী ১৯৬৮-৬৯ সালে পূর্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় ২৫ কোটি টাকা হ্রাস পায়। আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও আমাদের রপ্তানী উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। পণ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে, আমাদের দুটি পুরনো শিল্প—পাটজাত দ্রব্য ও চা বিদেশের বাজারে কঠোর প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে আমাদের পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী গুরুতরভাবে হ্রাস পেয়ে ২১৮ কোটি টাকায় নেমে আসে। পূর্ব বৎসরে ভারত থেকে বিদেশে পাটজাত দ্রব্য পাঠানো হয়েছিল ২৪৮ কোটি টাকার। '৬৮-'৬৯ সালে ভারত থেকে চায়ের রপ্তানী হয়েছিল ১৫৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার। পূর্ব বৎসর চায়ের রপ্তানীজাত আয় ছিল ১৮০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বৃটেনে ভারতীয় বস্ত্রের যে বাজার ছিল তাও সংকুচিত হওয়ার উপক্রম দেখা দিয়েছে বৃটেনে আমদানী বিদেশী বস্ত্রের ওপর উচ্চহারে সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য হওয়ার ফলে।

ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের কার্যকলাপও এই ব্যাপারে আশানুরূপ নয়। ১৯৬৮ সালে রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডে আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী ও হাঙ্গেরীতে রপ্তানী বাড়েনি। এমনকি, যুগোশ্লাভিয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে দেশেও রপ্তানী বাড়ানো সম্ভব হয়নি। লোকসভায়ও কয়েকবার হিসাব কমিটির রিপোর্টে স্টেট ট্রেডিং কর্পোরেশনের শৈথিল্য প্রভৃতির জন্য সমালোচনা করা হয়েছে। ধাতু ও খনিজ দ্রব্য বিপণন সংস্থার কাজও আশানুরূপ নয়, যার ফলে বিদেশে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর বাজার ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে।

যা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে গৃহনির্মাণের জন্য নিজ থেকেই নতুন মূলধন সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে। এই মূলধনের সাহায্যে বস্তী অপসারণ পরিকল্পনাও কার্যকরী করা সম্ভব হবে।

রপ্তানী বেড়েছে

যোজনায় লগ্নীর সামর্থ্য বৃদ্ধির একটা প্রধান পন্থা হচ্ছে রপ্তানী বৃদ্ধি। গত আর্থিক বছরে ভারতের বৈদেশিক রপ্তানী ১৩ শতাংশ বেড়েছে। গত বছর পৃথিবীর কয়েকটা বড় বড় দেশ ক্রমাগত যে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, সেই বিবেচনায় আমাদের রপ্তানীক্ষেত্রে এই সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে আরো উল্লেখনীয় যে ভারত থেকে সাধারণত বিদেশে যে সব দ্রব্য রপ্তানী করা হয়, সেগুলোর পরিমাণ না বাড়লেও গত বছরে আমরা ভারতের কতকগুলো নতুন পণ্যের জন্য বিদেশে বাজার আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছি এবং বৃদ্ধির যে হার তা এই সব পণ্যের দিক থেকেই।

তবুও রপ্তানী বৃদ্ধি, যা দেশে বৈদেশিক মুদ্রা আমদানীর সহায়ক এবং যোজনাকে রূপদানে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর আমাদের নির্ভরতা কমাবে—তা কোন ক্রমেই আশানুরূপ নয়। আমাদের তুলনায়—এশিয়ার অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলির রপ্তানীর প্রসার অনেক ক্ষেত্রে বেশী। দৃষ্টান্ত হিসেবে ঃ ১৯৬০ থেকে '৬৫ সালের মধ্যে রিপাবলিক অব কোরিয়ার রপ্তানী বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হিসাব ছিলো ৩৯ শতাংশ, তাইওয়ানের ২২ শতাংশ এবং হংকং-এর ১০·৬ শতাংশ। এমনকি, ইরান, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া, আফগানিস্থান, ফিলিপিন ও পাকিস্থানেরও রপ্তানী ঐ সময়কালের মধ্যে বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতে রপ্তানী বৃদ্ধির পথে বাধা অনেক। রেলওয়ে ও অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা, বন্দরে সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব, জাহাজের স্বল্পতা ও অত্যধিক মাশুল, কাঁচামালের অভাব এবং উৎপাদনে বাহুল্যিকা রপ্তানী বৃদ্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে আছে।

১৯৬৬ সালে ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাসের ফলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যজাত আয় বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়। পরবর্তীকালে মন্দা দেখা দেওয়ায় দেশের ভিতর চাহিদা হ্রাস পায় এবং এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের কিছুটা প্রসার সম্ভব হয়। আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের ফলে সুয়েজের পথ বন্ধ হওয়ায় আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের পথ কিছুটা সুগম হয়।

বেকার সমস্যা

কৃষি ও শিল্প প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেই অনিবার্যভাবে কর্মসংস্থান প্রসঙ্গ এসে পড়বে, কারণ এ দুটোরই পিছনে মূল নজর রয়েছে কর্মসংস্থানের প্রসার।

ভারতে শিল্পে মন্দা আসার ফলে গত তিন বছর যাবত শিল্প কারখানায় কর্মসংস্থানে অবনতি দেখা দিয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের অবস্থা আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ। ভারতে মাথাপিছু জমির স্বল্পতা এবং ফলনের কম হারের দরুণ বহুলোকের পক্ষেই কৃষি অর্থকরী নয়। সম্প্রতি অবশ্য উন্নততর কৃষিপ্রথা প্রবর্তন ও উচ্চ ফলনের বীজ সরবরাহের ফলে এই অবস্থার কিছুটা

পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সেচ-ব্যবস্থার প্রসারের ফলে এখন বহু জমিতে বছরে দু'বার চাষের ব্যবস্থা করাও সম্ভব হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে জমিতে বছরে দু'বার ফসল দেওয়ার ব্যবস্থার যতো প্রসার হবে, কৃষি-জীবীদের মধ্যে বেকারী ও অর্ধবেকারী উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার পথও তত সুগম হবে। এছাড়া বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে শিল্পক্ষেত্রেও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়বে।

কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে বেকারী, অর্ধ-বেকারীর চেয়েও উদ্বেগের কথা হয়েছে বিগত তিন বছরে কলকারখানা প্রভৃতিতে কর্মসংস্থানের গুরুতর সংকোচন। বলা বাহুল্য, গ্রামাঞ্চলে বেকারীর ফলে প্রতি বছরই কৃষিক্ষেত্র থেকেও বহু লোক সরে এসে শহরে ভিড় করে এবং বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এইজন্য শুধু চলতি কলকারখানাগুলো চালু রাখাই বড় প্রশ্ন নয়, লগ্নী বাড়িয়ে সেগুলোর উৎপাদন-ক্ষমতার প্রসার এবং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠাও দরকার। তৃতীয় যোজনার মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই সমস্যা এতো প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু তৃতীয় যোজনার শেষাশেষি সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই লগ্নীর পরিমাণ হ্রাসের সূচনা হওয়ায় কর্মসংস্থানের সমস্যা ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠতে থাকে।

শিক্ষিতদের বেকারী

শিল্পক্ষেত্রে এই কর্মসংস্থানের সংকোচন শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে আরো মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৬৭ সালে ভারতের কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলোর চালু রেজিস্টারে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিলো নয় লক্ষ। ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দশ লক্ষেরও অনেক বেশী ওপরে উঠে গেছে। প্রথম পাঁচসালা যোজনাকালে শিল্পক্ষেত্রে লগ্নীর স্বল্পতার দরুণ শিক্ষিত যুবক বিশেষভাবে যন্ত্রশিল্পীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের বিশেষ সুযোগ পায়নি। কিন্তু দ্বিতীয় যোজনাকালে বিভিন্ন নদী ও অন্যান্য প্রকল্পগুলোর জন্য দেশে ইঞ্জি-নীয়ারিং ছাত্র ও যন্ত্রশিল্পীদের চাহিদা আশাতীত বৃদ্ধি পায়, যার ফলে বহু ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্র শিক্ষাসমাপ্তির পূর্বেই কর্মে নিয়োগের সুযোগ পায়। এমনকি বহু সরকারী ও বেসরকারী কলকারখানায় পর্যাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাবে বহু যন্ত্রশিল্পীর পদ খালিও থেকে যায়। এই সময় অন্যান্য শিক্ষিত যুবকদের কর্ম-প্রাপ্তির সুযোগও বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে এবং গ্রাজুয়েট, আন্ডার-গ্রাজুয়েট এমনকি ম্যাট্রিকুলেটদের পক্ষেও চাকুরী পাওয়া অসুবিধা হয়নি।

কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধির ফলে দ্বিতীয় যোজনাকালে ইঞ্জিনীয়ারিং ও যন্ত্রশিল্পে শিক্ষাদান ব্যবস্থারও যথেষ্ট প্রসার ঘটে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার-গুলি বহু নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরি-বিদ্যা শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। কর্মলাভে সুযোগ বৃদ্ধির দরুণ যুবকদের দৃষ্টিও এইসব সংস্থার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হয়। ফলে তৃতীয় যোজনার সূচনাকালে ইঞ্জি-নীয়ার ও যন্ত্রশিল্পীর অভাব কোনোভাবে অনুভূত হয়নি। কিন্তু যোজনার শেষাশেষি লগ্নীর পরিমাণ যতো হ্রাস পেতে থাকে তত এই ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে বেকারী ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। পরে তিন বছরকালের জন্য যোজনার কাজ প্রকৃতপক্ষে বন্ধ থাকায় এই সমস্যা এতো গুরুতর হয়ে পড়েছে যার ফলে সরকার ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্র সংকুচিত করতে বাধ্য হয়েছেন। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে বহু ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্র কেরানীগিরির চাকুরী গ্রহণকেও বরণীয় মনে করছেন। গ্রাজুয়েট-দের মধ্যে কর্মসংস্থানের অবস্থা ত আরো খারাপ এবং আন্ডার-গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ততোধিক।

জনবৃদ্ধির বাহুল্য

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাহুল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মসংস্থানের সমস্যা দিন-দিনই ভয়াবহ হয়ে উঠবে যদি না দুদিক থেকে একে আঘাত করা যায়—প্রথমত কর্ম-লাভের সুযোগ বাড়িয়ে এবং দ্বিতীয়ত জনবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। আজকের বিশ্বে জনবৃদ্ধি একটা বিরাট সমস্যা। কিন্তু ভারতের মতো দেশ, যার আয়তন সমগ্র বিশ্বের স্থলভাগের ২·৪ শতাংশ মাত্র, অথচ যে দেশে বিশ্ব-জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ লোকের বসতি—সে দেশের পক্ষে এটা একটা গুরুতর সমস্যা। এবং এই সমস্যা আরো মারাত্মক বলে মনে হবে যখন দেখা যাবে যে আমাদের দেশে এই জনসংখ্যা বছরে শতকরা ৪ শতাংশ হারে বাড়ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে সমস্যাকে আজ অত্যন্ত গুরুতর বলে বিবেচনা করা হচ্ছে আমাদের দেশের সরকার গোড়ার দিকে সে সম্পর্কে খুব সজাগ ছিলেন না। আমাদের প্রথম যোজনায় পরিবার পরি-কল্পনা বাবদ বরাদ্দ হয়েছিল মাত্র ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। দ্বিতীয় যোজনায় ব্যয় হয় ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় যোজনার কালেই সরকার অকস্মাৎ সজাগ হয়ে ওঠেন। এই পাঁচ বছরে এই বাবদ বরাদ্দ ছিল ২৪ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এর বাবদে বরাদ্দ হয় ৭০ কোটি টাকা। চতুর্থ যোজনার জন্য ধার্য হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা।

চতুর্থ যোজনার মধ্যে সরকারের পরি-কল্পনা হচ্ছে ভারতে জন্মহারকে হাজার প্রতি ৩৯ থেকে কমিয়ে ৩২ করা। এইভাবে যোজনার পাঁচ বছরে প্রায় দু' কোটি শিশুর জন্মরোধ করা সম্ভব হবে।

১৯৬৮-৬৯ সালের আর্থিক বছরে পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভারতের প্রগতি একেবারে কম নয়। এই বছর ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার লোককে নির্বীজকরণ অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। ৪ লক্ষ ৮০ হাজার মহিলা লুপ গ্রহণ করেছেন। ৮ লক্ষ ৫০ হাজার লোককে চিরাচরিত গর্ভনিরোধক দ্রব্য ব্যবহারে আগ্রহী করে তোলা হয়েছে। এভাবে আলোচ্য বছরে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক পরিবার পরিকল্পনার কোন না কোন পদ্ধতি অনুসরণ করছেন।

জননিয়ন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গ

জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভারতের যে সব রাজ্য বিশেষ অগ্রসর তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। ১৯৬৮-৬৯ সালে নির্বীজকরণ অস্ত্রোপচারে মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের পরই ছিলো পশ্চিমবঙ্গের স্থান।

আলোচ্য বছরে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের অস্ত্রোপচার হয়েছে ১ লক্ষ ৭২ হাজারেরও বেশী। তার সঙ্গে জন্ম-নিরোধক সরঞ্জাম ও খাবার বড়ি ব্যবহারের পরিমাণও বেড়েছে। আগে শুধু লুপই নির্বীজকরণের বিকল্প ছিল। কিন্তু ১৯৬৮-৬৯ সালে নিরোধক দ্রব্যাদি ও খাবার বড়ির ব্যবহার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের একটা বছর

গত বছর সারা ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে, পশ্চিমবঙ্গও তার অংশীদার। কাজেই, চলতি বছরে রাজ্যের

এ

দুর্গাপুর স্টীল প্রোজেক্ট

খাদ্যাবস্থা মোটামুটি ভালই, সরকারের শস্যসংগ্রহও প্রায় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছে। এই সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রে মন্দা ধীরে ধীরে অপসৃত হওয়ার যে আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তাকে যদি আমরা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে রাজ্যে কর্ম-সংস্থানের চিত্র বিশেষ উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ক্রমাগত শিল্পক্ষেত্রে অশান্তির ফলে এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলছে এবং নতুন কলকারখানা হওয়ার জন্য লগ্নীর বাজারে যে স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়া অত্যাবশ্যক তাতেও সুস্পষ্টভাবে ভাঁটা পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার-পরিচালিত শিল্পগুলোর অবস্থাও গত বছর খুব আশাপ্রদ ছিল না। ট্রামওয়ে রাষ্ট্রীয়করণের আগে কোম্পানীর মাসে যে পরিমাণ লোকসান হচ্ছিল এখন তা অনেক বেড়ে মাসিক দশ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের খাতেও সরকারকে মাসে ১৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি সামলাতে হচ্ছে।

দুর্গাপুর

নতুন শিল্পনগরী হিসেবে দুর্গাপুর যে সম্ভাবনা নিয়ে এ রাজ্যের মানুষদের কাছে এককালে দেখা দিয়েছিল আজ তাও ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে। দীর্ঘদিন ধরে শিল্পক্ষেত্রে গুরুতর অশান্তি দুর্গাপুরের ইস্পাত ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক শিল্পের সম্প্রসারণের পথেও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ইস্পাত ও ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের মন্ত্রী সি এম পুনাচা গত কয়েকদিন আগে লোকসভায় যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি শ্রমিকদের ঘেরাও ও কাজে ঢিলামির নীতিকেই প্রধানত এর জন্য দায়ী করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে দুর্গাপুরে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের অবস্থিতি, গরিষ্ঠ ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদান প্রভৃতি প্রশ্নও ওঠে। কিন্তু পুনাচা এই সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন তার সারাংশ এই যে এই অবস্থার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বই বেশী, যদিও তা সব সময়েই শ্রমিকদের পক্ষে কল্যাণকর নয়।

দুর্গাপুরের ইস্পাত শিল্পে উৎপাদন হ্রাসের মূল কোথায় তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। জনৈক সদস্য এই প্রশ্ন করেছিলেন যে, বৃটিশ কোম্পানীগুলো দুর্গাপুরে যে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করেছে তা নিম্নমানের হওয়ার দরুনই উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে কি না। পুনাচা উত্তরে এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন যে, যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ আসলে যথানিয়মে হচ্ছে না। এইজন্য একটি স্টাডি টীম বৃটেনে গেছেলেন সংশিলষ্ট বৃটিশ কোম্পানীগুলোর সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। তাঁরা এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির জন্য একটা স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন। এর পর একটি বৃটিশ স্টাডি টীম দুর্গাপুরে উৎপাদনের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য এখানে আসবেন। যে কার্যবিধি নির্দিষ্ট হবে তা উভয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর কাজ শুরু হবে।

বোদরার সম্ভাব্য তৈল-শিল্প

পশ্চিমবঙ্গের আর একটি যে বিরাট শিল্পসম্ভাবনা পোর্ট ক্যানিং-এর অন্তর্গত বোদরার তৈলসমৃদ্ধ এলাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছিল তারও আপাতত সমাধি রচিত হয়েছে। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী সদস্যরা এই রকম অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে বোদরায় তৈলসন্ধান বন্ধের পিছনে রয়েছে রাজনৈতিক কারণ এবং বিদেশী কোন রাষ্ট্রের চাপ। কিন্তু পেট্রোলিয়াম দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বোদরায় তৈল অনুসন্ধান আপাতত বন্ধ হওয়ার যে কারণ তিনি হাজির করেছেন তা হচ্ছে এই : এখানে তৈল অনুসন্ধানের জন্য যে ড্রিলিং চলছিল তা ৪,১৯৭ মিটার বসানোর পর প্রস্তরসদৃশ পদার্থে আটকে যায়, পরে আর বসানো সম্ভব হয়নি। যতখানি বসানো হয়েছিল তারও ফল খুব উৎসাহজনক নয়। এর পর তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন স্থির করে যে সিস্মিক তথ্যাদি সংগ্রহ না করে তৈলানুসন্ধানের কাজে অগ্রসর হওয়া আর উচিত নয়। এই তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য যে যন্ত্রাদি দরকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে তা আমদানী করতে ৬০ লক্ষ টাকা লাগবে।

বোদরায় তৈলানুসন্ধানের ব্যাপারে অবশ্য তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের পূর্বে সিদ্ধান্ত ও রুশ বিশেষজ্ঞদের এই সুপারিশ ছিল যে, অন্ততপক্ষে ৫টা কূপ খনন করে ৫ হাজার মিটার পর্যন্ত পাইপ বসানোর আগে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত হবে না। কিন্তু তার পরিবর্তে বোদরায় মাত্র একটা কূপে পাইপ বসানো হয় এবং তাও ৫ হাজার মিটার নয়। তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন কাজ শুরু করার আগে ভূতাত্ত্বিক ও অন্য যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছিল তাতে বোদরায় খুব উচ্চ চাপের গ্যাসের অস্তিত্ব অনুমিত হয়েছিল।

যে কারণেই হোক, বোদরায় তৈলানুসন্ধান পরিত্যক্ত হওয়া এই রাজ্যের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং ভবিষ্যতে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার অন্ততপক্ষে সাময়িকভাবে সমাপ্তি ঘটলো। এবং আরো দুঃখের বিষয় যে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন ও রুশ বিশেষজ্ঞদের পূর্ব সুপারিশ অনুযায়ী ৫টি কূপ খননের আগেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মাত্র ৬০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতির অভাবে বর্তমানে অনুসন্ধান কার্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তও খুব যুক্তিসঙ্গত বলে অনেকেই মনে করবেন না। বোদরায় কূপ খনন কার্যে নিযুক্ত পাঁচশত লোক যে কর্মহীন হয়ে এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করলো সেটাও কম খেদের কথা নয়।

।।এক।।

শিবকুমার প্রথম-প্রথম তার স্ত্রী শ্রীমতী জবাকে বলত, তুমি আমার জন্য এতটা খেটো না, তোমার অসুখ করবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

এখন আর বলে না। তাছাড়া এই তিন বছরের বিবাহিত জীবনে সে জবার এত সেবা পেয়েছে যে, ওটা এখন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এমনকি ভালই লাগে এখন, কারণ বাড়ির মধ্যে জবাই এখন তার মালিক। তার কথায় ওঠে, বসে। তবু একবার ভুল করে বলে বসেছিল, 'এতটা কেন যে কর!' অফিস থেকে আসামাত্র পায়ের জুতো খুলে দেবে জবা, এর আর ব্যতিক্রম নেই। এই কথাই শিবকুমার তাকে বলেছিল একদিন ভুল করে। সেদিন অভিমান করে জবা একবেলা খায়নি। আরো একদিন শিবকুমারের পায়ে ফুল রেখে (এটিও প্রতিদিনের কর্তব্য) প্রণাম করতে গেল শিবকুমার বলেছিল, আমাকে এমনভাবে দেবতা বানালে আমার মানুষের মতো চালচলন ক্রমেই বন্ধ হয়ে যাবে যে!

এ কথার উত্তর জবা মুখে দেয়নি, অতএব তা কানেও শোনা যায়নি। যে উত্তর সে পেয়েছিল তা শিবকুমারের পা টের পেয়েছিল শুধু। দু ফোঁটা চোখের জলের উত্তর। এরপর আর সে কিছু বলেনি। সেদিন সে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে পথে এসে কিছু মুক্তির হাওয়া নিশ্বাসের সঙ্গে বুক-ভরে টেনে নিয়ে কিছু আরাম পেয়েছিল।

দুদিকে দুই মালিক। অফিসে এক, বাড়িতে এক। তবু অফিসে তার কিছু স্বাধীনতা থাকে, বাড়িতে একেবারে না। অফিসে হাজার কাজের মধ্যেও এমন একটা আনন্দ পাওয়া যায়, যা বাড়িতে সে কখনো পায় না। কারণ বাড়ির সীমানায় তার কোনো কাজ নেই। স্বামীসেবা শেষ হলে তবে জবার শান্তি। সেবা নয় তো সেবার জাল। শিবকুমার সে জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা।

এ সব খবর পাড়ায় কিছু কিছু প্রচারিত আছে। আদর্শ স্ত্রীর কথা উঠলেই, জবা। এমন সতীলক্ষ্মী অথচ কলেজে পড়া! এ যুগে সতী এই একটি মাত্রই ছিল, সে এখন শিবকুমারের চরণাশ্রিতা। এ যখন চলে যাবে তখন বাংলা দেশের শেষ সতীর বিদায়।

জবার জন্য পাড়ার অনেক স্ত্রীরই কিছু অসুবিধার কারণ ঘটেছে। স্বামীরা যে-কোনো উপলক্ষে স্ত্রীদের উপর কিছু শাসন চালাতে হলে জবার কথা তুলে স্ত্রীদের কাবু করে ফেলে। বলে, দেখে এসো, স্বামীকে কেমন করে ভালবাসতে হয়। দেখে এসো লক্ষ্মী বৌ কাকে বলে। বৃদ্ধেরা বলে, মুখের কথায় তো সতী চেনা যায় না, থাকত সতীদাহ আর হত জবা বিধবা, তাহলে জোর করেই বলছি, সে স্বামীর চিতায় গিয়ে উঠত। এ যুগে কেবল ফাঁকা প্রমাণ মানতে হয়।

জবা যে-বাড়িতে যায় সে বাড়ির সবাই তার দিকে কেমন যেন একটা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। অনেকের হিংসে হয়। কেউ বা একটু দূরত্ব রেখে চলে। কিন্তু তবু মনে মনে নিজেদের ছোট মনে করে। জবার স্বামীনিষ্ঠা অন্য স্ত্রীদের মনে একটা হীনতা বোধ জাগিয়ে দিয়েছে। তার মানে, নিষ্ঠার সম্মান এখনো আছে। সতীত্বের মহিমা এখনো লোপ পায়নি। আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ নারী—জবা। তার প্রশংসায় পাড়ার হাওয়া ভারী।

।।দুই।।

এদের বাড়ি থেকে সামান্য কিছু দূরে রমাপতির বাস, রমাপতির মতো আদর্শ পতি বাঙালীর মধ্যে বিরল। স্ত্রী শ্রীমতী করুণার সৌভাগ্য মাত্র দু বছর আগে সে নববধূটি সেজে এসেছিল এ বাড়িতে। মনে

কত সন্দেহ, কত ভয়, সে কি তার স্বামীকে খুশি করতে পারবে? সে কি স্বামীর ভালবাসা পাবে?

কিন্তু এর কয়েকদিনের মধ্যেই রমাপতি যে কত উদার তা বুঝতে দেরি হল না তার। ক্রমে সে স্বামীর প্রভুর পদে উঠে গেল। প্রশ্রয় পেল, স্বামীর সেবা পেল, নিষ্ঠা পেল। করুণার নির্দেশ ছাড়া রমাপতি এক পা চলে না। আর শুধু কি তাই? করুণার সামান্য মাথা ধরলেও তার অফিসে যাওয়া বন্ধ হয়। সে পাশে বসে তার মাথা টিপে দেয়। স্ত্রীর জন্য এমন স্বার্থত্যাগ এ যুগে বড় একটা দেখা যায় না। বাড়ির অনেক কাজই যা করুণার করা উচিত, তা রমাপতি করে। করুণা একটু দুঃখ পেলে রমাপতির মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

করুণার একবার দীর্ঘমেয়াদি জ্বর হয়েছিল। রমাপতি দুটি সপ্তাহ ধরে অক্লান্তভাবে তার বিছানার পাশে বসে তার সেবা করেছে। নিজহাতে ওষুধ খাইয়েছে, পথ্য খাইয়েছে। টেমপারেচারের হিসাব রেখেছে, রাত্রে ঘুমোয়নি। এভাবে নিজের উপর অত্যাচার করেও করুণাকে বাঁচিয়ে তুলেছে রমাপতি। একবার সে নিজে শয্যাশায়ী হয়েছিল, কিন্তু করুণাকে সে পুরোপুরি রোগীসেবা করতে দেয়নি। করুণা তার জন্য খেটে মরবে, তার জন্য রাত জাগবে, এ কল্পনা তার কাছে অসহ্য মনে হয়েছে। ভাবতে গিয়ে চোখে জল এসেছে। যেটুকু নেহাৎ না করলে নয়, তার বেশি সে তাকে কিছুই করতে দেয়নি। করুণা জোর করলে সে বলেছে তা হলে সে অসুখ বাড়িয়ে নেবে। অর্থাৎ করুণা সুস্থ-রমাপতির মালিক হলেও রোগী-রমাপতির মালিক হতে পারল না কিছুতেই। হেরে গেল।

রমাপতির এই স্ত্রী-প্রীতির কথা সবাই জানে। বন্ধুরা মুখ টিপে হাসে। কেউ প্রকাশ্যে ঠাট্টা করে। কিন্তু তার স্বভাবের বদল হয় না।

।। তিন ।।

প্রৌঢ়দের একটা আড্ডা আছে পাড়ায়। বর্তমান কালের বিরুদ্ধে বহু জাতীয় আলোচনা। সোনার যুগ অস্ত, এখন নকল ধাতুর যুগ। ধর্ম শিকেয় উঠেছে। সতীত্ব, স্বামীর প্রতি নিষ্ঠা, এ সবও সেকেলে হয়ে গেছে।

একজন শ্রীমতী জবার কথাও তুলেছিলেন। নামটি শোনামাত্র ধর্মপ্রাণ রিটায়ার্ড বৃদ্ধের চোখে জল এসে গেল, তিনি অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে জবার গুণকীর্তন আরম্ভ করলেন। আহাহা! এমন নিষ্ঠা আর তো দেখা যাবে না, এমন স্বামীসেবা, এমন তদ্গতপ্রাণ, এমন কলেজে-পড়া লক্ষ্মী প্রতিমাটির কথা যখনই ভাবি আনন্দে চোখের জল রাখতে পারি না।

আড্ডার এক পাশে রমাপতির কথাও উঠেছিল। রমাপতির নাম শোনামাত্র বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে শ্রীমতী জবার কথা শেষ না করেই বলে উঠলেন, ঐ ব্যাটা স্ত্রৈনের নাম আর উচ্চারণ করো না তোমরা, শুনলে হাড় জ্বলে যায়।
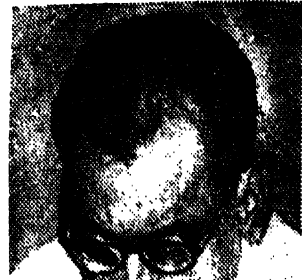
* আচার্য সুনীতিকুমার *

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য আকাদমির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এ সংবাদে আমরা আনন্দিত, ভারতবাসী মাত্রই গৌরবান্বিত। যোগ্য ব্যক্তির হাতে সাহিত্য আকাদমির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আচার্য সুনীতিকুমারকে আমরা অন্তরের সাদর অভিনন্দন জানাই।

সুনীতিকুমার ১৮৯০ সালের ২৬ নভেম্বর হাওড়া জেলার শিবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্বের প্রতি গভীর আকর্ষণ বোধ করেন। তাঁর জীবনচেতনার সঙ্গে মানুষের উচ্চারণভঙ্গির আদি-পরিচয় কবে ঘটেছিল বলা যায় না। তবে কিশোর বয়স থেকেই লক্ষ্য করা যায় এ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ এবং কৌতূহল। ধ্বনি ও শব্দতত্ত্বের কঠোর নিয়মকানুনকে অনুসরণ করে ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কারে তিনি বরাবরই ছিলেন উৎসাহী। সম্ভবত সারা ভারতের মধ্যে তিনিই হলেন এ ব্যাপারে প্রথমতম উদ্যোগী পুরুষ। তাঁর এই স্পৃহা, দূরদৃষ্টি এবং কৌতূহল শেষ পর্যন্ত নিজস্ব পথনির্মাণে তাঁকে সাহায্য করেছে। দীর্ঘস্থায়ী গবেষণা ও অনুশীলনের ভেতর দিয়ে তিনি ভারতীয় আর্যভাষার একটা সহজবোধ্য রূপরেখা তৈরী করতে সক্ষম হন। তাঁর এই প্রয়াসের ফলশ্রুতি হিসেবে স্মরণ করা যায় দুটি অসাধারণ গ্রন্থের নাম : (১) 'দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলাপমেণ্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গুয়েজ', (২) 'ইন্দো-এরিয়ান অ্যান্ড হিন্দী'। প্রথমটি বেরোয় ১৯২৬ সালে, দ্বিতীয়টির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬০ সালে। বিভিন্ন প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং মনোগ্রাফেও তাঁর গবেষণা ও অনুশীলনের প্রমাণপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এককথায় বলা যায়, ভারতীয় ভাষাসমূহের তুলনামূলক এবং ঐতিহাসিক আলোচনার সূত্রপাত করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৯২৭ সালে এশিয়াটিক জার্ণালে জুলে ব্লক তাঁর সম্বন্ধে লেখেন, 'দি ল্যান্ড অব পানিনি হ্যাজ অ্যাটলাস্ট প্রোডিউস্‌ড্‌ এ ট্রু লিঙ্গুইস্টিক স্কলার।' প্রখ্যাত চেক পন্ডিত কামিল ঝেলেবিল তাঁকে আখ্যা দেন "দি নেস্টার অব মডার্ন ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিকস" অর্থাৎ ভীষ্ম পিতামহ।

একজন দক্ষ ধ্বনিতত্ত্ববিদ এবং লন্ডনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডানিয়েল জোনস-এর ছাত্র হিসেবে সুনীতিকুমার ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের চর্চা ও গবেষণায় ধ্বনিতত্ত্বের পঠন-পাঠনকে অপরিহার্য করে তোলেন। ভারতীয় আর্য ভাষার প্রসারে দন্ত্যবর্ণের উচ্চারণ ও প্রভাব সম্পর্কে তিনিই প্রথম সিদ্ধান্তে আসেন যে, পূর্ব-প্রাকৃতে 'র' এবং 'ল'-এর উচ্চারণ পরস্পর সন্নিহিত। মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার প্রগতিতে তিনিই ফর্তুনাটোভের নিয়মকে আরো পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যায় "সম্প্রসারিত" করেন। আর্যভাষার তিনটি স্তর—প্রাচীন ভারতীয়-আর্য (বৈদিক ও সংস্কৃত) মধ্যভারতীয় আর্য (পালি ও প্রাকৃত) এবং আধুনিক ভারতীয়-আর্য—এই স্থূল বিভাজন যদিও রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, জন বীমস, জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন, জুলে ব্লক প্রমুখ কয়েকজন করেছিলেন, তবুও সুনীতিকুমারই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই বিকাশকে সময়চিহ্নিত করে, তার গতিপ্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। তাঁরই চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়, মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষা এবং আধুনিক ভারতীয়-আর্য ভাষায় অর্ধতৎসমের বিভিন্ন সূত্র। জুলে ব্লক যেমন মারাঠি ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক, তেমনি তাঁরই সমান্তরাল স্রষ্টা হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলাভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখে। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার উত্থানভূমি ও প্রস্থানকাল সম্পর্কেও তিনি একই কারণে সমান আগ্রহী। চতুর্দশ শতকের মৈথিলী পন্ডিত জ্যোতিরিশ্বর ঠাকুরের "বর্ণ রত্নাকর"-এর ওপর চমৎকার টীকা লেখেন তিনিই। স্বর্গত পন্ডিত বাবুয়া মিশ্রের (কৃষ্ণ মিশ্র) সঙ্গে বইটি সম্পাদনা করেন সুনীতিকুমার। দ্বাদশ শতাব্দীর আওয়াধী (অবধি) ভাষায় লেখা দামোদরের "উক্তি-ব্যক্তি-প্রকরণ"-এর ওপরেও তিনি কাজ করেন। মধ্য এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষায় তদ্ভব, তৎসম, অর্ধ-তৎসম, দেশী, বিদেশী উপাদানের সঠিক প্রকৃতিকে তিনি বিশ্লেষণ করেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ও আলোচনায়। জাঁ প্রাজিলুস্কি ভারতীয়-আর্যভাষায় অস্ট্রিক উপাদানের আলোচনা প্রসঙ্গে সুনীতি-কুমারের কাছ থেকেই সাহায্য নিয়েছেন। ভারতীয় কোল (মুণ্ডা)-দের সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রখ্যাত সাঁওতাল বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ওপর ইন্দো-ভারতীয় প্রভাবের প্রশ্নে তিনি "কিরাত-জন-কীর্তি" নামে একটি মনোগ্রাফ প্রকাশ। তার আগে বিষয়টি ছিল প্রায় সকলের কাছেই উপেক্ষিত। নেপালের নেওয়ারদের সম্পর্কে তাঁর তথ্যবহুল আলোচনা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তা ছাড়া আসাম, মণিপুর এবং উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল অপরিসীম। তামিল এবং দ্রাবিড়ীয়ান ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছেও তাঁর পথ, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রেরণাস্বরূপ। প্রাচীন, প্রাচীনতর ও আদি দ্রাবিড়ীয়দের সম্পর্কে তাঁর গবেষণা সকলের কাছেই আদর্শ হিসেবে বিবেচিত। ১৯৬৫ সালে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেন তাঁর "দ্রাবিড়ীয়ান" নামে একটি বই। তামিল পন্ডিতদের মধ্যে তিনি 'নাম্বেরী-মুরুগান' নামে পরিচিত।

ভারতীয় সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর মৌল

প্রবণতার মধ্যে একটা ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের প্রচার ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন বৃহত্তর ভারতের পরিধি। প্রায় এক হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে মহাভারতের গল্প সিন্ধী থেকে অনূদিত হয় আরবী ভাষায়। এবং আরবী থেকে পার্শীতে। হিন্দী ভাষার প্রকৃতি ও ইতিহাসের ওপর তাঁর আলোচনা এখনো নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

১৯২২ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে প্রতিষ্ঠা করেন "বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ"। অবশ্য তাঁর সঙ্গে সহযোগী ছিলেন অনেকেই। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোধা। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দোচীনের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন তিনি এই সংস্থার মাধ্যমে। ১৯২৭ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয়, ইন্দোনেশিয়া এবং শ্যামদেশে তিন মাস পরিভ্রমণ করেন। ফলশ্রুতিতে লিখলেন, 'দ্বীপময় ভারত' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। সম্প্রতি তার দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছে "রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময়-ভারত ও শ্যামদেশ" নামে।

আচার্য সুনীতিকুমার বিশ্বমানবতায় বিশ্বাসী। তাঁর মানবতাবোধ প্রধানত রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের অনুপন্থী। এই বোধ তাঁকে সমগ্র মানব সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশ্বের যেখানে মানুষ যাই করুক না কেন --তার প্রতিই সহানুভূতি বোধ করেছেন তিনি। প্রাচীন ভারতীয় দর্শন বা বেদান্তের প্রেক্ষিতে তিনি আধুনিক য়ুরোপীয় মানবতাবাদ, প্রাচীন গ্রীক, চীনা তাওবাদ ও ইসলামিক সুফি মতবাদের সম্পর্ক নির্ণয় করেন।

গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর তিনটি প্রখ্যাত গ্রন্থ। আফ্রিকান ব্যক্তিত্বের ওপর 'আফ্রিকানিজম' নামে একটি বই ছাপা হয়, ১৯৬০ সালে। শুধু স্বদেশের নয় বিদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাঁর গভীর অনুসন্ধিৎসার স্বাক্ষরে বইটি অনন্য। বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকার নিগ্রো-সংস্কৃতি ও বিশ্বে তার গুরুত্বের পরিচয় ফুটে উঠেছে বইটির পাতায় পাতায়।

১৯৬১ সালে বেরোয় ভারত-চীন প্রাচীন সম্পর্কের ওপরে একটা মনোগ্রাফ "হোয়াট ইণ্ডিয়া রিসিভড ফ্রম চায়না"। ১৯৫৯ সালে বেরোয় রাশিয়ান ধ্রুপদী কাব্য 'শ্লোভো ও পুলকু ইগোরেভে'র ওপর পর্যালোচনা। প্রাচীন শ্লাভ এবং ইন্দো-য়ুরোপীয় বীররসাত্মক কবিতার একটি দলিল হিসেবে গণ্য করা যায় এই পর্যালোচনাটিকে। আর্মেনিয়ান বীররসাত্মক উপাখ্যান ডেভিড সুসানের ওপর একটি মনোগ্রাফ বেরোয় ১৯৬১ সালে। ১৯৬৬ সালে ইরানবিদদের এক বিশ্ব সম্মেলনে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শীঘ্রই সেটি বেরোচ্ছে "ইরানিজম : দি ইমপ্যাক্ট অব ইরানিয়ান কালচার আপঅন দি ওয়ার্লড, ফ্রম আর্মেনিয়ান টাইমস" নামে। তাঁর আরেকটি বইও প্রকাশের অপেক্ষায়। ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত-জর্জিয়ার কবি শোথা রুস্থভেলির আটশত জন্মদিনে যে ভাষণ তিনি দেন, তাই প্রকাশিত হবে "শোথা রুস্থভেলি, দি ন্যাশনাল পোয়েট অব জর্জিয়া" নামে। গত জুন মাসে বেরিয়েছে "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইথিওপিয়া, ফ্রম সেভেনথ সেঞ্চুরী বি, সি," নামে একটি বই, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় আরেকটি গ্রন্থ। তার নাম : "বাল্টস অ্যাণ্ড এরিয়ান্স, ইন দেয়ার ইন্দো-ইউরোপীয়ান ব্যাকগ্রাউণ্ড"।

অন্তর্নিহিত প্রবণতায় আচার্য সুনীতি-কুমার নিরন্তর আত্ম-উদ্ঘাটনের পক্ষপাতী। নিজের কথায় তিনি "অ্যাগ্নস্টিক ইন হিজ ইনটেলেক্ট, অ্যাণ্ড এ মিস্টিক ইন হিজ ইমোসানস"। বাইরের জন্য তাঁর হৃদয়ের দরজা-জানলা সর্বদাই খোলা। তিনি নতুন আলো খুঁজে বেড়ান চতুর্দিকে। সমালোচকের ভাষায় : "স্পার্ক ফ্রম হেভেন টু ফল"। আইনস্টাইন যাকে বলেন, 'র‍্যাপচারাস অ্যাসেজমেণ্ট', সুনীতিকুমারও নিজের জীবনে তাকেই উপলব্ধি করেন প্রকারান্তরে, যাকে বলা যায় আনন্দ বা রভসানুভূতি। তিনি বলেন, য়ুরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর যে অনুরাগ, তাই তাঁকে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠায় আস্থাবান করে তুলেছে। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ানিজম অ্যাণ্ড দি ইণ্ডিয়ান সিনথেসিস" গ্রন্থে তিনি ভারতীয় আদর্শ ও জীবনাচরণের কথাই লিখেছেন।

সাহিত্যের আলোচনায় তিনি দশটি সাহিত্যিক-জোটকে সমগ্র ধারার নিয়ন্ত্রক বলে মনে করেন।

১। ঋক এবং অথর্ববেদের অংশ, উপনিষদ, সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত এবং কালিদাসের রচনাবলী।

২। ঈলিয়াড-ওডিসি, হেসয়েদের রচনাবলী, গ্রীক-ট্র্যাজেডিসমূহ।

৩। ওল্ড টেস্টামেন্ট (হিব্রু লিপি), অ্যাপোক্রাইফা।

৪। আরব্য রজনীর গল্প।

৫। পারশ্যের শাহনামা।

৬। আদি ওয়েলস, ব্রেটন, ফ্রান্স, ইংরেজ, জার্মান, ল্যাটিনে লেখা রাজা আর্থারের রোমান্সধর্মী লেখা।

৭। শেকসপীয়ারের নাটক ও কবিতাবলী।

৮। গ্যেটের রচনাসমূহ।

৯। টলস্টয়ের উপন্যাস, ছোটগল্প এবং অন্যান্য রচনা।

১০। রবীন্দ্রনাথের গদ্যপদ্য সমগ্র রচনা।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় আইরীশ সাহিত্য, প্রাচীন জার্মান এপিক ও অন্যান্য কবিতা, চীনা জাপানী, লিথুয়ানিয়ান, প্রাক-ইসলামী আরবী কবিতা প্রভৃতি সম্পর্কেও তিনি বিশেষ আগ্রহবোধ করেন। আলফ্রেড হোয়াইটহেড প্রদত্ত সংস্কৃতির সংজ্ঞায় তিনি আস্থাশীল। বিশ্বাস করেন আত্মউন্মোচন, বিশ্বমানবতা, এবং সংস্কৃতির মৌলসত্তার অনুসন্ধানে।

ব্যক্তি-জীবনে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একজন অমায়িক ও বৈঠকী মানুষ। নানা-রকম গালগল্প করে আসর জমিয়ে রাখতে তাঁর জুড়ি বয়স্ক লোকের মধ্যে পাওয়া ভার। সামাজিক জীবনে ও বন্ধুবান্ধব মহলে এজন্যে তিনি খুবই জনপ্রিয়। জীবনে দু'-একবার কঠিন আঘাতের মুখোমুখি হয়েছেন, কখনো ভেঙে পড়েন নি। ১৯১৪ সালে তিনি কমলা দেবীকে বিয়ে করেন। পঞ্চাশ বছর বিবাহিত জীবনযাপন করে তিনি মারা যান ১৯৬৪ সালে। সুনীতি-কুমারের জীবনে এ একটি বড়রকমের দুর্ঘটনা।

১৯৫২ সালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ সময়ে তিনি বিধান পরিষদের চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছিলেন। দীর্ঘ তের বছর (১৯৫২-৬৫) তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। জাতীয় অধ্যাপক হবার পর তিনি চেয়ারম্যানের পদ ত্যাগ করেন।

তাঁর অন্যতম প্রধান পরিচয়, তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় দক্ষ শিক্ষক। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। সারা ভারতের বহু ভাষাতাত্ত্বিক তাঁর উপদেশ ও তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেছেন। ১৯১৪ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাঁর ভাবনাচিন্তার বিকিরণে ভারত ও বহির্ভারতের বহু মনীষী উপকৃত হয়েছেন। আজও তিনি নিজস্ব পথে নিরলস, অক্লান্ত কর্মী।

বাংলা গদ্যে তিনি তাঁর স্বকীয় রীতিতে সাহিত্যপাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছেন। হিন্দী সাহিত্যে অমূল্য কাজের জন্য তিনি 'সাহিত্য বাচস্পতি' উপাধিতে সম্মানিত হন। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ভাষাচার্য' উপাধিটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া।

১৯৫৫ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬৩ সালে পান তাঁর চাইতেও উচ্চতর সম্মান 'পদ্মবিভূষণ'।

ভারতবর্ষ ও বিশ্বের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন তিনি। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য রয়েছেন দীর্ঘকাল। বারানসীর নাগরী প্রচারিণী সভার অবৈতনিক সদস্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন এখনো। তা ছাড়া পুনার 'ভাণ্ডার-কর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট', বিকানীরের 'সাদুল রিসার্চ ইনস্টিটিউট', মণিপুরের 'আত্মযাপু রিসার্চ সেণ্টার'-এর সদস্য।

১৯৩৮ সালে সুনীতিকুমার 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট অব পোল্যাণ্ড'-এর সদস্য হন। ১৯৬৪ সালে নির্বাচিত হন 'সোসায়েতে এশিয়াটিক অব পারী'র সদস্য। ১৯৪৭ সালে হন 'আমেরিকার ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি'র অনারারি মেম্বার।

তা ছাড়া হল্যাণ্ড, নরওয়ে, সিংহল, পাকিস্তান, টোকিও প্রভৃতি নানাস্থানের বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি জড়িত।

১৯৫৫-৫৬ সালে তিনি ভারত সরকারের রাষ্ট্রভাষা কমিশনের সদস্য হন। সংস্কৃত কমিশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ১৯৫৬-৫৭ সালে। ডক্টর জাকির হোসেন রাষ্ট্রপতি থাকার সময় তিনি সাহিত্য আকাদমির সহসভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬১ সালে রোম বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, ওসমানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টরেট' উপাধিতে সম্মানিত করেন ১৯৬৮ সালে।

আচার্য সুনীতিকুমার চলতি বছরে নির্বাচিত হয়েছেন লণ্ডনের 'ইণ্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যাসোসিয়েশান'-এর প্রেসিডেণ্ট। ভাষাতাত্ত্বিক হিসেবে উচ্চতম স্বীকৃতির নিদর্শনরূপেই এ সম্মান গণ্য হয়ে থাকে। তাঁর গুরু অধ্যাপক ডানিয়েল জোনস-এর মৃত্যুতে পদটি শূন্য হয় গত বছর। গুরুর আসনে উপবিষ্ট হলেন উনাশি বছর বয়স্ক জগদ্বরেণ্য শিষ্য।

মাতৃভূমির মুখউজ্জ্বলকারী এই সুসন্তানের নতুন সম্মাননায় আমরা গৌরবান্বিত।

—বিশেষ প্রতিনিধি

॥ পনেরো ॥

প্রাদেশিক স্তরে ব্যালান্স হানি হলো বলে যারা মনে মনে মহাক্রুদ্ধ কেন্দ্রীয় স্তরে তারা প্রাণ থাকতে ব্যালান্স হাতছাড়া করবে? না, মানুষ অত ভালোমানুষ নয়। কেন্দ্রীয় স্তরেও মেজরিটি রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে কংগ্রেসকে একজোড়া যুদ্ধ জয় করতে হতো। একটা তো সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সঙ্গে, আরেকটা সম্প্রদায়বাদী মুসলমানদের সঙ্গে।

যুদ্ধ অবশ্য অহিংস পদ্ধতিতেও হতে পারত, কিন্তু কতটুকুই বা আমাদের অহিংসায় বিশ্বাস, কতটুকুই বা ট্রেনিং, কতটুকুই বা মৃত্যুবরণের প্রস্তুতি। হাতে অস্ত্র নেই বলেই আমরা অহিংস, অস্ত্র থাকতে তো নয়।

কংগ্রেস যখন আটটি প্রদেশ গণতান্ত্রিক উপায়ে হস্তগত করে তখনি বুঝতে পারা যায় যে, বাকী তিনটি প্রদেশ কোনো মতেই সে উপায়ে লাভ করা যাবে না, যদি না মুসলিম নির্বাচক মণ্ডলীতেও কংগ্রেস জয়ী হয়। তেমন সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না যে তা নয়। কিন্তু তার জন্যে জেল, জরিমানা ইত্যাদি নয়, অন্য পন্থায় ত্যাগ স্বীকার করতে হতো। জমিদারকে ছাড়তে হতো জমিদারি, মহাজনকে মহাজনী। অন্তত বহু পরিমাণে খাজনা মাফ করতে হতো, সুদ মকুব করতে হতো। বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু তিন প্রদেশেই শোষক শ্রেণীর লোকেরা ছিল হিন্দু, শোষিত শ্রেণীর লোকেরা মুসলমান। বাংলার আইন সভায় রায়ত আর খাতকদের বোঝা হালকা করার জন্যে যেসব আইন আসে সেসব আনে মুসলিমরা, তাতে বাধা দেয় হিন্দুরা। হাঁ, কংগ্রেসের হিন্দুরা। সেইদিনই বোঝা গেল বাংলা দেশে কংগ্রেসরাজ হবার নয়। হতে পারে কোয়ালিশন, কিন্তু কংগ্রেস হাইকমাণ্ড তাতে রাজী হবেন না। তাহলে আবার কংগ্রেস ছাড়তে হয়। যারা কংগ্রেসের স্রষ্টা তারাই কংগ্রেস ছাড়বে? কংগ্রেস ছাড়লে স্বাধীন হবে কাকে সংগ্রামের সৈন্যদল করে?

কংগ্রেস নেতারা জানতেন বাংলার জন্যে তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারছেন না, তাঁদের হাতে প্রাদেশিক সরকার নেই। কোয়ালিশনেও তাঁদের অনিচ্ছা। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতি পদে বরণ করে তাঁরা বাঙালীকে একপ্রকার ক্ষমতার স্বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র কিছুদিন পরে টের পান যে সভাপতি হলেও তিনি আসলে হর্তাকর্তা নন, হর্তাকর্তা হচ্ছেন বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আবুল কালাম আজাদ। কংগ্রেস মন্ত্রীরা এঁদের কাছ থেকেই নির্দেশ নেন, এঁরাই তাঁদের কাজকর্মের পরিদর্শক। বলতে গেলে আটটি ক্যাবিনেটের উপর এঁরাই একরকম সুপার-ক্যাবিনেট। অথচ এ সুপার-ক্যাবিনেট কংগ্রেস সভাপতির নয়। যাঁকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি তিনি প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতাহীন। তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট। তাঁর স্টালিন হচ্ছেন বল্লভভাই।

মহাত্মাজীর মুঠোয় গণসত্যাগ্রহ, সর্দারজীর মুঠোয় পার্লামেন্টারি শাসনক্ষমতা, তাঁদের দুজনেরই বাছা বাছা সহকর্মীদের

অন্নদাশঙ্কর রায়

মুঠোয় পার্টি মেশিন। কংগ্রেস সভাপতির মুঠোয় তাহলে কী? শূন্যগর্ভ রাষ্ট্রপতি মর্যাদা? সে রাষ্ট্রও তাঁর নয়, বড়লাটের মুঠোয়। সুভাষচন্দ্রের মতো স্বভাববিদ্রোহী পুরুষ এ রকম ভাগ-বাঁটোয়ারায় সন্তুষ্ট হতে পারেন না। অন্তত পার্টি মেশিনটা তাঁর চাই। তিনি ওটাকে গড়ে-পিটে সংগ্রামের উপযোগী করতে ইচ্ছা করেন। কয়েক বছর আগে ভিয়েনায় থাকতে বিঠলভাই প্যাটেল ও তিনি একটি বিবৃতি দিয়ে বলেন,

> "The latest act of Mahatma Gandhi in suspending civil disobedience is a confession of failure We are of opinion that the Mahatma as a political leader has failed. The time has come for a radical reorganisation of the Congress on new principles with a new method for which a new leader is essential, as it is unfair to expect the Mahatma to work a programme not consistent with his lifelong principles."

নতুন নেতা, নতুন নীতি, নতুন কর্মপদ্ধতি, এই তিনটিকে ঘিরে কংগ্রেসের শিকড়শুদ্ধ টেনে পুনর্গঠন। এই যদি হয় লক্ষ্য তবে পুরাতন নেতা, পুরাতন নীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতির স্থান হবে কোথায়? কংগ্রেসে না কংগ্রেসের বাইরে? গান্ধী মানে মানে কংগ্রেসের বাইরে সরে গিয়ে পুনর্গঠনকামীদের একটা বিষয়ে নিষ্কণ্টক করেছিলেন। নেতৃত্ব নিয়ে ভাববার সময় তাঁরা তাঁকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারতেন। বাকী থাকে নীতি আর কর্মপদ্ধতি। এই দুই বিষয়ে দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব পুরাতনের সঙ্গে নতুনের।

যাঁরা পুরাতন নীতি ও পুরাতন কর্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করতে অনিচ্ছুক তাঁদের প্রতিপক্ষরা তাঁদের নাম দিলেন দক্ষিণপন্থী। আর নিজেদের নামকরণ করলেন বামপন্থী। এর একটা সঙ্গত কারণও ছিল। দুনিয়ার সব দেশেই তিনটে বড়ো বড়ো আইডিয়াল দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠছিল। ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রাসী, সোশিয়াল জাস্টিস। সোশিয়াল জাস্টিসের প্রকারভেদ ছিল সোশিয়ালিজম বা কমিউনিজম বা অ্যানার্কিজম। আবার তার শত্রু ছিল ফাসিজম। ভারতবর্ষ দুনিয়ার বার নয়। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ন্যাশনালিজম ও

ডেমোক্রাসী তার আদর্শ হয়েছে। তবে সোশিয়াল জাস্টিস অপেক্ষাকৃত নতুন। স্বয়ং গান্ধীজীই তাকে বহন করে আনেন, কিন্তু টলস্টয়ের শিষ্যরূপে, কার্ল মার্কসের শিষ্যরূপে নয়। অথবা ফেবিয়ানদের একজন হিসাবে নয়। বিশের দশকের কংগ্রেসীরা তাতে প্রেরণা পেলেও ত্রিশের দশকের একদল কংগ্রেসী তার চেয়ে সোজাসুজি সোসিয়ালিজম পছন্দ করেন। ফরাসী কেতায় এঁরাই হলেন বামপন্থী। দক্ষিণপন্থীদের হাতে মন্ত্রীত্ব ছিল, বামপন্থীদের হাতে ছিল না। বামপন্থীরা ধরে নিলেন যে মন্ত্রীর দল অত সাধের মন্ত্রীত্ব ছেড়ে স্বেচ্ছায় আসবেন না। গদী আঁকড়ে পড়ে থাকবেন ও আরো উঁচু গদীর জন্যে বৃটিশ কর্তাদের সঙ্গে আপস করবেন। আপস ফেডারেশন হাসিল হলে আর সংগ্রামের দিকে মন যাবে না। অথচ সংগ্রাম না করে স্বাধীনতা লাভ কোনো দেশে কোনো কালে ঘটে নি। ফেডারেশন একটা মরীচিকা।

সুভাষচন্দ্রের প্রথমবারের নির্বাচনে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। তাঁর মতবাদ জানা সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থীরা অন্তরায় হন নি। গান্ধী তো সুভাষচন্দ্রকেই চেয়েছিলেন। এক বছরের মধ্যে এমন কী ঘটল যার দরুন সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচন করতে তাঁদের অসম্মতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ নিল? সকলে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র আবার সভাপতি হলে পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে বিদায় দিতেন, সেই সঙ্গে পুরাতন নীতি ও কর্মপদ্ধতিকেও খারিজ করতেন। বৃটিশ কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা তো বন্ধ হতোই, ইউরোপে মহাযুদ্ধ বাধবার আগেই মন্ত্রীদের অকালে পদত্যাগ করতে হতো, গণসত্যাগ্রহের অনুকূল জোয়ার আসবার আগেই কংগ্রেস কর্মীদের অকালে জেলখানায় যেতে হতো। গান্ধীজীর ইচ্ছায় নয়, সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছায়। তেমন অবস্থায় কংগ্রেসের যে অংশটা গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিশ্বাস রাখত সে অংশটা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেত। কংগ্রেস দু ভাগ হয়ে যেত। ফলে জনগণও দু' ভাগ হয়ে যেত।

দক্ষিণপন্থী যাদের বলা হতো আসলে তাঁরা পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামে নিযুক্ত কংগ্রেসকর্মী। আর হাইকম্যান্ড যাকে বলা হতো সেটা পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামের পাহারাদার। গভর্নরদের হস্তক্ষেপ থেকে যাতে কংগ্রেস মন্ত্রীরা রক্ষা পান এটাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া দেশের জনমত বুঝে মন্ত্রীরা যাতে কাজ করেন, আইনসভাগুলো যাতে তাঁদের সহায়তা করে, এদিকেও তাঁদের দৃষ্টি। কংগ্রেস যদি পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম প্রত্যাহার করে তাহলে 'ইনি দক্ষিণপন্থী' বলে কাউকে চিনিয়ে দেওয়া শক্ত। কারণ সকলেই জাতীয়তাবাদী, সকলেই সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী, সকলেই গান্ধীনেতৃত্বে আস্থাবান। মাদ্রাজ বেড়াতে গিয়ে আমি তো দেখেছি তথাকথিত দক্ষিণপন্থী মন্ত্রীরা চাষীদের সুবিধের জন্যে জমিদারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছেন। বামপন্থীরা মন্ত্রী হলে তার চেয়ে বেশী আর কী করতেন? তবে তাঁদের মেজাজখানা এরকম যে, আমরা যখন মন্ত্রী হচ্ছিনে তোমরাই বা মন্ত্রী হবে কেন? পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামটাই বাতিল করা হোক।

পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম হচ্ছে দিল্লীকা লাড্ডু। যে খায় সেও পশতায়, যে খায় না সেও পশতায়। যে খায় সে জানে যে সে কেবল ঈর্ষার পাত্র হচ্ছে, চারদিকে শত্রু সৃষ্টি করে তুলেছে। আর যে খায় না সে পায় না বলেই খায় না। পেলে সেও যে না খেত তা নয়। যাঁরা পেলেও খেতেন না তাঁরাই সত্যিকার গান্ধীবাদী। তাঁরা আর ক'জন!

সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করলে গান্ধীজী বলেন তিনিও পরাজিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আনন্দিত। তাঁর বিবৃতিতে ছিল—

> "Subhas Babu, instead of being president on the sufferance of those whom he calls rightists, is now president elected in a contested election. This enables him to choose a homogeneous cabinet and enforce his programme without anything that may possibly be affected by the change is the parliamentary programme. The ministers have been chosen and the programme shaped by the erstwhile majority — It matters little to them whether they are recalled on an issue in which they are in agreement with the Congress policy or whether they resign because they are in disagreement with the Congress."

এই বিবৃতির কিছুদিন পরে আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তিনি বামপন্থী ও সুভাষচন্দ্রের পক্ষপাতী। জানতে চাই ওয়ার্কিং কমিটিতে তিনি থাকছেন কি না। তাঁর প্রদেশ থেকে তাঁরই তো থাকার কথা।

'এই বছরই মহাযুদ্ধ বাধবে।' তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর দেন। 'দক্ষিণপন্থী বামপন্থী ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কংগ্রেসকে এখন এক হয়ে দাঁড়াতে হবে। সুভাষচন্দ্রকে আমরা বলে এসেছি তিনি যেন মহাত্মার সঙ্গে দেখা করে মিটিয়ে ফেলেন।'

পরে বোঝা গেল সুভাষচন্দ্রেরও সেই ইচ্ছা। ত্রিপুরী কংগ্রেসে তো গোবিন্দবল্লভ পন্থের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল যে, গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে সুভাষচন্দ্র যেন তাঁর ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করেন। মহাত্মা যাঁদের যাঁদের নিতে বলবেন তাঁদের নিতে রাজী ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

কিন্তু মহাত্মাই তাঁকে ঐ প্রস্তাবের দায়মুক্ত করে দিয়ে তাঁর আপনার ইচ্ছামতো সদস্য মনোনয়ন করতে বলেন। গান্ধী তাঁর উপর ইচ্ছা খাটাবেন না। কারো নাম দেবেন না।

সুভাষচন্দ্র দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁরা যদি আসেন পুরো-পুরি আসবেন, আধাআধি আসবেন না। হয় পুরোনো ওয়ার্কিং কমিটিকে সমগ্রভাবে পুনর্নিয়োগ করতে হবে, নয় সমগ্রভাবে বাতিল করতে হবে। দক্ষিণপন্থী ও বাম-পন্থী জগাখিচুড়ি ক্যাবিনেট চলবে না।

প্রথমটাই যদি হলো তবে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরকারটা কী ছিল? আর দ্বিতীয়টাই যদি হয় তবে শুধুমাত্র বাম-পন্থীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হয়। তেমন কমিটি সমগ্র কংগ্রেসকে প্রতি-ফলিত করবে না। গান্ধীজীর আশীর্বাদ পাবে না। যুদ্ধের সময় কোন কাজে লাগবে, যদি গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে? যুদ্ধ না বাধলে তো সামাজিক ন্যায় নিয়ে কংগ্রেস মন্ত্রীদের সঙ্গেই ঠোকাঠুকি বেধে যাবে। তাঁরা বামপন্থী হাইকম্যান্ড মানবেন কি? আর তাঁরা যদি বামপন্থী হাইকম্যান্ডের নির্দেশের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন তাহলে কি নতুন মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা হবে বাম-পন্থীদের দিয়ে? না আদৌ কোনো মন্ত্রী-মণ্ডল থাকবেই না? সরকারকে ছ' মাসের আলটিমেটাম দিয়ে গণসত্যাগ্রহ শুরু করা হবে? সে গণসত্যাগ্রহ যখন গান্ধী অনু-মোদিত নয় তখন তাতে গান্ধীবাদীরা বা দক্ষিণপন্থীরা কেউ যোগ দেবেন কি? পারবেন বামপন্থীরা একা সে সংগ্রাম চালাতে?

সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী কমরেডরা বারো রাজপুত। তাঁদের সবাইকে একত্র করে নির্বাচনে জেতা যায়। কিন্তু সবাইকে একমত করে ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করা যায় না, হাই কমান্ডও না, আটটা প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলও না। তা হলে কী করা যায়? গণসত্যাগ্রহ? না, তাতেও তাঁরা সবাই রাজী নন। গান্ধীজীকে পুরোভাগে না রেখে, দক্ষিণ-পন্থীদের সঙ্গে না নিয়ে গণসত্যাগ্রহ শুধু মাত্র বামপন্থীদের দিয়ে হবার নয়। হতে পারে বিপ্লব বা বিদ্রোহ, কিন্তু তার জন্যে কংগ্রেসকে নিয়ে টানাটানি কেন? আর বিপ্লব বা বিদ্রোহ যদি হবার থাকে তো বিনা আল-টিমেটামেই হবে। শত্রুকে ছ'মাস নোটিশ দিয়ে বিপ্লব বা বিদ্রোহ বাধাতে গেলে শত্রুই আগে থেকে প্রস্তুত হবার সময় পায়।

সভাপতি পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করবার জন্যে সুভাষচন্দ্রকে টেলিগ্রাম করে-ছিলেন গান্ধীজী। নিশ্চয়ই গুরুতর কারণ ছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বামপন্থীরা জয়ী হতে পারেন, কিন্তু গান্ধীজীর দ্বারা পরিচালিত ও দক্ষিণপন্থীদের দ্বারা সমর্থিত নয় যে সংগ্রাম তেমন কোনো সংগ্রামে অসময়ে ঝাঁপ দিতে গেলে নিজেরাও মজবেন, দেশকেও মজাবেন। আর যদি সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার অভিপ্রায় না থাকে তবে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রাম ছাড়া আর কী কর্মসূচী আছে তাঁদের? তাই যদি তাঁরা চালিয়ে যান তবে তাঁরাও তো দক্ষিণপন্থী বনে যাবেন।

সুভাষচন্দ্রকে অবশেষে সভাপতির পদ থেকে সরে যেতেই হলো। কংগ্রেসের ইতিহাসে এটা একটা শোচনীয় অধ্যায়। যেমন অনম-নীয় গান্ধীজী, তেমনি অনমনীয় পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটি, নমনীয় কেবল সুভাষচন্দ্র আর তাঁর বামপন্থী বান্ধবরা। কিন্তু আর কত নুইবেন? একটা পয়েন্ট পর্যন্ত নোয়া যায়। তারপর আর না। তাই পদত্যাগই শ্রেয়।

নতুন নেতা, নতুন নীতি, নতুন কর্ম-পদ্ধতি, কোনোটাই হলো না। কংগ্রেসের পুনর্গঠনও না। অথচ কংগ্রেসের পুনর্গঠনের সত্যি দরকার ছিল। গান্ধীজীর মতে—

> "I would go to the length of giving the whole Congress organisation a decent burial, rather than put up with the corruption that is rampant."

আমার কংগ্রেসী বন্ধুরা আমাকে বলতেন, 'গান্ধীজী বুড়ো হয়ে গেছেন, নয়তো কংগ্রেস ছেড়ে আরেকটা নতুন দল গড়তেন। কী করবেন, সাধ্য নেই, তাই কংগ্রেসকে সহ্য করতে বাধ্য।'

যে কংগ্রেস কণামাত্র ক্ষমতা হাতে পেয়েই বেসামাল সে কেমন করে একটা স্বাধীন দেশের সর্বময় ক্ষমতার অপরিসীম দায়িত্ব বহন করবে? আকণ্ঠ ডুবে আছে যে আপন দুর্নীতির পাঁকে কে তার কাছে আশা করবে প্রশাসনিক শুদ্ধি, রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিপুল প্রলোভনের মুখে সততা? ক্ষমতাই তো সব নয়। তার সঙ্গে থাকা চাই অথরিটি। নৈতিক শক্তি ছাড়া অথরিটি আসে না। কংগ্রেস যদি ক্ষমতা পায়, কিন্তু অথরিটি হারায় তা হলে লোকের আস্থা হারাবে। তখন ক্ষমতাও কি রাখতে পারবে?

গান্ধীজী সেইজন্যে চেয়েছিলেন সর্বাগ্রে নৈতিক শক্তি, যার থেকে আসবে অথরিটি। কংগ্রেস নেতারা কিন্তু রাজনীতির বাইরে দৃষ্টিপাত করেন না। তাঁদের প্রার্থিত বস্তু ক্ষমতা। ক্ষমতা পেলেই তাঁরা সর্বার্থ পেলেন, অথরিটি কোনখান আসবে, লোকের আস্থা কেমন করে থাকবে এসব ভাবনা তাঁদের নয়। গান্ধীজীর।

গান্ধীজীর চিন্তাধারায় ও কংগ্রেসের চিন্তাধারায় একটা মূলগত বিভেদ ফুটে ওঠে। তিনি যা চান তা আরো ক্ষমতা নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিত্ব নয়, তা পেলে তো কংগ্রেস আরো বকে যাবে। না, ক্ষমতার পরিধির প্রসারণ নয়, সংকোচনই গান্ধীজীর লক্ষ্য। আগে কংগ্রেসের পঙ্কোদ্ধার, তারপরে দেশোদ্ধার। কংগ্রেসকে এখন আত্মসংশোধন করতে হবে। অথরিটি গড়ে তুলতে হবে। তার জন্যে চাই আরো ত্যাগ, আরো তপস্যা।

কংগ্রেসকে বরণ করতে হবে পাণ্ডবদের মতো অরণ্যবাস বা অজ্ঞাতবাস। ক্ষমতার রাজনীতির থেকে দূরে থাকতে হবে। আর সত্যাগ্রহের সুসময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। জোয়ার না এলে তো সংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়া যায় না।

মহাত্মা নিজে মনঃস্থির করেন যে আপনি কোনোদিন ক্ষমতার আসনে বসবেন না, ক্ষমতা নিয়ে নাড়াচাড়া করবেন না। ক্ষমতার সঙ্গে খানিকটে হিংসা জড়িয়ে থাকবেই। রাষ্ট্রকে যতদিন না অহিংস করে তুলতে পারা যাচ্ছে ততদিন ব্রিটিশ রাষ্ট্রের উত্তরাধিকারী কংগ্রেস রাষ্ট্রও হিংসামুক্ত হতে পারবে না। কংগ্রেস নেতারা ক্ষমতা চান, তাঁরা শাসনের জন্যে যেটুকু হিংসার দরকার সেটুকু প্রয়োগ করবেন। না পারলে পদত্যাগ করবেন। কিন্তু গান্ধীজী কোনো অবস্থায় হিংসার প্রয়োগ করবেন না। সব অবস্থায় অহিংস থাকবেন।

ওদিকে মুসলিম লীগ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রশ্রয় দিয়ে কংগ্রেস সরকারগুলিকে বাধ্য করেছিল হিংসার প্রয়োগ করতে, পুলিশ ব্যবহার করতে। কোয়ালিশনের সম্ভাবনা অতিক্ষীণ দেখে লীগ নেতারাও মনঃস্থির করেন যে কংগ্রেস যেদিন ইংরেজের শাসন থেকে মুক্ত হবে লীগও সেইদিন কংগ্রেসের শাসন থেকে মুক্ত হবে। এই ধাঁধার জবাব এককথায় পার্টিশন বা পাকিস্তান।

ইদানীং বিশ্বসাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাঙালী সাহিত্যপাঠকের মনে জেগেছে। পশ্চিমের সাহিত্যভাবনা নিয়ে যে ধরনের গ্রন্থাদি এখন প্রকাশিত হয় আগে তেমন প্রচেষ্টা দেখা যায়নি।

কথা সাহিত্য ও কাব্য সাহিত্য এই দুটি ধারার জনপ্রিয়তা অসীম, তাই বিচ্ছিন্নভাবে হলেও এই দুইটি বিভাগ নিয়ে অনেক আলোচনা ও কিছু আলোচনা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের নাটক বিভাগটি যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করলেও—বিশ্ব-নাট্যভাবনা বিষয়ে আলোচনা বাংলা ভাষায় বিরল। শ্রীঅশোক সেন স্বনামে এবং ছদ্মনামে কিছু মূল্যবান আলোচনা করেছেন, তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানা নেই। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় 'আধুনিক বিশ্ব-নাট্য প্রতিভা' এই নামে বিশ্বনাট্য বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, ঠিক এই কালেই এমন একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল।

বাংলা দেশে নব-নাট্য আন্দোলনের ধারা বেশ দানা বেঁধেছে, অল্প কিছুকালের মধ্যে ইবসেন থেকে শুরু করে সার্ত্রের নাটক পর্যন্ত হয় অনূদিত নয় অনুসৃত হয়ে বাংলা ভাষায় নাটক রচিত হয়েছে ও মঞ্চস্থ হয়েছে। রুশ, জার্মান, ইতালীয়, মার্কিন প্রভৃতি সকল দেশের নাট্যকারের মঞ্চসফল নাটক এদেশের রসিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অনুবাদ বা অনুসরণে লিখিত নাটক রঙ্গমঞ্চে কি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে তা কারো আর অজানা নেই। এই কারণে, স্যামুয়েল বেকেট, ইউজিন ইউ-নেস্কো, পিরানদেল্লো, শেখভ, টেনিসি উইলিয়াম, আর্থার মিলার, ব্রেশট প্রভৃতির নামের সঙ্গে বাঙালী নাট্যরসিকের পরিচয় ঘটেছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে তাই ব্রেটল্ট ব্রেশট, স্যামুয়েল বেকেট, অ্যানুই, সার্ত্রে, জাঁ ককতো, জেনে, কামু, কাফকা, বুন্দান বেন, জন অসবোর্ন, হ্যারল্ড পিটার, অ্যান জেলিকো, শেখভ, গোর্কী, স্টানিস্লাভস্কি, নোয়েলকাওয়ার্ড, সমরসেট মম, টেনেসী উইলিয়াম, মিলার ও ইউজিন ওনীল প্রভৃতির সঙ্গে ইবসেন, পিরানদেল্লো, আগস্ট স্ট্রীন্ডবার্গ প্রভৃতিকেও যুক্ত করে এক অনন্যসাধারণ আলোচনা করেছেন।

এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

'আধুনিক মানে বলাবাহুল্য, সাম্প্রতিক নয়, তাই হাল আমলের অনেকের কথাই নেই। আসলে বিশশতকের প্রতিনিধিস্থানীয় নাট্যকারদের প্রতিনিধিস্থানীয় নাটকই আমার বিষয়বস্তু। সব নাট্যকারদের সব নাটক নয়।'

এই আলোচনা থেকে তিনি বার্নার্ড শ'কে দূরে রেখেছেন—'নানা কারণে'। অবশ্য খুব দূরে রাখতেও পারেন নি, কারণ, শেকসপীয়রের পর যাঁর সর্বাধিক উল্লেখ এই গ্রন্থে তাঁর নাম বার্নার্ড শ। মনে হয়, বার্নার্ড শ'র নাট্যপ্রতিভা ও নাটকের আলোচনা একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের বিষয়বস্তু হতে পারে সেই কারণে তিনি বার্নার্ড শ'কে স্পর্শ করেন নি। অসকার ওয়াইল্ডও এই আলোচনায় অনুপস্থিত।

লেখক গ্রন্থটিকে কোনো বিশেষ পর্ব বা কালচিহ্নিত করেন নি, মোটামুটিভাবে আধুনিকতার উৎপত্তি এবং নাট্যচিন্তায় যে মৌল পার্থক্য গত ষাট-সত্তর বছরের মধ্যে ঘটেছে তার সূত্র সন্ধান করেছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, তিনি বলেছেন—

'বইটির রচনার যা মূল উদ্দেশ্য—বাংলার সাধারণ নাট্যরসিকদের মনে মূল নাটকগুলি পড়ার জন্য ঔৎসুক্য সৃষ্টি করা।'

একথা অস্বীকার করা যায় না বাংলা সাহিত্যের আধুনিক নাটক শাখাটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অতীতে বাংলা নাটকে বিদেশী প্রভাব যথেষ্ট ছিল, বিদেশী নাট্যধারার অনুসরণে শক্তিমান নাট্যকারদের প্রতিভাবলে বাংলা নাটক একটি মর্যাদার আসন লাভ করেছিল। বর্তমানে বিদেশী প্রভাব বাংলা নাটকে যথেষ্ট, বলে এবং না-বলে নেওয়া নাটক অজস্র রচিত হচ্ছে, শৌখীন বা আধা-শৌখীন দল তার অভিনয় করছেন কিন্তু এখনও সেই নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেনি যাঁর প্রতিভায় বাঙালী গর্ববোধ করতে পারে।

এই দুর্বল নাট্যশাখাকে সঞ্জীবিত করার প্রয়োজনেই বিদেশী ইনজেকসন আমদানী করতে হচ্ছে এবং তা করতে গিয়ে ইবসেন থেকে শুরু করে ব্রেশট, ইওনেসকো বা সার্ত্রের শরণাপন্ন হচ্ছি।

বিশ্বনাট্য প্রসঙ্গ

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী নাট্য-রসিকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করে তাঁর এই আলোচনা গ্রন্থে মূলত সেইসব নাট্যকার ও নাটকের পরিচয় দিয়েছেন যাঁরা আজ এই দেশে অপরিচিত নন এবং যাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে আমরা একটা বিশেষ ধারা আবিষ্কারে ব্রতী।

নাট্য সাহিত্যে আধুনিক ভঙ্গীর পথিকৃৎ হেনরিক ইবসেনকে নিয়ে এই গ্রন্থ শুরু হয়েছে। ইবসেন আধুনিকতার জনক। লেখক বলেছেন—'ফরাসী অস্তিবাদীরা সার্ত্রের নেতৃত্বে আধিবিদ্যক দর্শনের সঙ্গে ইবসেন-বাদের রসায়ন মিশিয়ে অনেক নাটক পরিবেশন করেছেন। এই রসায়নে আছে সেই কির্কেগাদীয় 'আইদার-ওর', ইবসেন যার তত্ত্ব একশ বছর আগে 'ব্রান্ড' ও 'পীয়র জিন্ট'-এ ব্যবহার করেছিলেন। মার্কিন নাট্যজগতে শুধু থর্নটন ওয়াইলডার, সারোয়ান ও ম্যাক্সওয়েল অ্যান্ডারসনকে বাদ দিলে (যাঁদের নাটকে শীলার ও এলিজাবেথীয় নাট্যরীতির প্রভাবই বেশী) আর সকলের কাছে ইবসেনই ধ্রুবপদ।'

লেখকের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। ইবসেনের নাট্যপ্রতিভার এবং বিশ্বনাট্য আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে যথাযোগ্য আলোচনা আজো হয়নি। ইবসেন আজো তাই অনাবিষ্কৃত। ইবসেনের চেষ্টায় চলতি ভাষা নাটকের উপযোগী হল আর সেই চলতি ভাষার সঙ্গে 'সুষ্ঠু সাঙ্গীকরণ হল বাস্তবানুগ পর্যবেক্ষণ ও ক্ষুরধার মন বিশ্লেষণের।' ইবসেন তাই আধুনিক নাট্যআন্দোলনের পথিকৃৎ। সংক্ষিপ্ত হলেও লেখকের ইবসেন প্রশস্তি প্রশংসনীয়।

এরপর তিনি আগস্ট স্ট্রীন্ডবার্গের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে 'ইবসেন ও স্ট্রীন্ডবার্গ যেন আধুনিককালের সোফোক্লেস ও য়ুরিপিডিস।' এঁরা দুজনে ধ্রুপদী প্রথা থেকে নাটকের মুক্তি ঘটিয়েছেন। স্ট্রীন্ডবার্গের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রতিভাবিকাশের ধারাবাহিকত্ব। লেখক 'স্বভাববাদী' এই বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন স্ট্রীন্ডবার্গ সম্পর্কে, হয়ত ইংরাজী 'ন্যাচারালিস্ট' কথাটির পরিভাষা হিসাবে। পরিভাষাটা সুষ্ঠু হয়েছে মনে হয় না। তিনি বলেছেন—'ন্যাচারালিজম ও এক্সপ্রেসানইজম্ এই দুই আঙ্গিকের প্রাণসঞ্জীবনীর জন্য য়ুরোপীয় নাট্য-ইতিহাস স্ট্রীন্ডবার্গের ছাপ্পান্নটি পূর্ণাঙ্গ নাটক ও কিছু একাঙ্কের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে। আধুনিক অ-বাস্তব মনস্তাত্ত্বিক নাটক রচনারও পথিকৃৎ ছিলেন তিনি।' লেখকের এই মন্তব্যটুকুও উল্লেখযোগ্য।

স্ট্রীন্ডবার্গের প্রতিভা ইবসেন স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ইবসেন ও স্ট্রীন্ডবার্গ যে বার্নার্ড শ'কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন তার প্রমাণ তাঁর অনেক রচনার মধ্যে পাওয়া যায়।

এর পর লেখক এনেছেন লুইজি পিরানদেল্লোকে। পিরানদেল্লো নাটকে এক নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন। লেখক বলেছেন—'রঙ্গমঞ্চে তিনি এমন এক দিগন্তরেখা দেখালেন যেখানে দর্শন ও মনোবিজ্ঞান একাকার হয়ে গেছে।'

এই তিনজন নাট্যকার আধুনিক নাট্য-সাহিত্যকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন।

এরপর বের্টল্ট ব্রেশট্ ও বিচ্ছিন্নতা বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তারপর ইংরাজী কাব্য-নাটক ও কাব্যনাট্য ও এলিয়ট বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কাব্য-নাট্য প্রসঙ্গে এই ধারায় আলোচনা ইতিপূর্বে আর হয়েছে মনে হয় না, অথচ কাব্য-নাট্য বাংলা সাহিত্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। একাধিক আধুনিক কবি বাংলা কাব্যনাটক রচনায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

'অ্যাবসার্ড নাটক' বা উদ্ভট নাটক আজকাল এদেশে জনপ্রিয় হতে চলেছে। অ্যাবসার্ড নাটকের দুঃসাহসিক পরীক্ষায় জয়যুক্ত হয়েছেন দুই প্রতিভাধর নাট্যকার—স্যামুয়েল বেকেট ও ইউজিন ইওনেস্কো। কাফ্কার 'ট্রায়াল' এই উদ্ভট নাটকের পূর্বাভাস। লেখক বলেছেন—'অ্যাবসার্ড নাটকের মর্মবাণী মানবদ্বেষী নৈরাশ্যবাদ বা বে-পরোয়া বিপ্লববাদ নয়।' বস্তু ও ছায়ায় গড়া এক জ্যোতির্লোকের অন্বেষা। এছাড়া টেনেসি উইলিয়ামস, প্রকাশবাদী ইউজিন ও'নীল, বৃন্দাদেন, লরকার ট্র্যাজিক নায়িকারা, জন অসবোনের কথা, হ্যারল্ড পীটার, অ্যান জেলিকো প্রভৃতি প্রসঙ্গে এক একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছেদ ব্যয় করেছেন লেখক। মেসফিলড, নোয়েল-কাওয়ার্ড, সমরসেট মম এই তিনজন ইংরাজ নাট্যকারের কথা বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সিনজ, গলসওয়ার্দি, ওয়াইলড প্রভৃতিকে দূরে রেখেছেন লেখক। মার্কিন নাট্যকার টেনেসি উইলিয়ামস ও আর্থার মিলরের সঙ্গে ইউজিন ও'নীলের আলোচনা আছে আর আছে রুশী নাট্যকার শেখভ, গোর্কী, স্টানিস্লাভস্কি প্রসঙ্গ। ফরাসী নবনাট্যকার অ্যানুই, কক্তো, সার্ত্র, জেনে কামুর প্রসঙ্গে একটি পরিচ্ছেদ আছে আর একটি পরিচ্ছেদে কাফ্কার 'বিচার' সম্পর্কে সুন্দর আলোচনা করেছেন লেখক। এছাড়া বিশ শতকের চীনা নাটক, জাপানী নাটকের কথাও বাদ যায়নি আর সেই সঙ্গে আছে রবীন্দ্রনাটকে ভারতীয় চেতনা।

বলাবাহুল্য এই সুবৃহৎ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা ক্ষুদ্র নিবন্ধে হওয়া সম্ভব নয়, সামান্য পরিচয় মাত্র দেওয়া গেল। অধ্যাপক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি নাট্য-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

—অভয়ঙ্কর

আধুনিক বিশ্বনাট্য প্রতিভা

(আলোচনা)— জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতি প্রকাশন, ১০, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা—১। দাম ঃ দশ টাকা।

সাহিত্যের খবর

আগামী পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রুমানিয়ায় একটি জাতীয় নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করা যায়, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশের প্রতিনিধিই এই উৎসবে যোগ দেবেন। ঐ সময়ে ১৯৬৮-৬৯ সালের শ্রেষ্ঠ রুমানিয়া নাটকগুলি মঞ্চস্থ হবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক কমিটি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে বিশেষ পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

গত জুন মাসে পিয়াক্র শহরে অনুষ্ঠিত হয় অল্পবয়স্ক ছেলে-মেয়েদের জন্য লেখা নাটকের উৎসব। এর আগে রুমানিয়ায় এ ধরনের উৎসব আর কখনো হয় নি।

এ ছাড়াও কনস্টানটায় আরেকটি মজার নাট্যাভিনয় হয়ে গেছে ওখানে। তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'সিসাইড উইক অব পাপেট থিয়েটার'। রুমানিয়ার নাট্যকারদের লেখা নাটকের অংশ নানা ভঙ্গিতে অভিনয় করাই ছিল এ অনুষ্ঠানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বিদেশী সাহিত্য

পি ই এন নামে কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার ও সম্পাদকের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা বেশ কিছুকাল ধরে নানারকম কাজ-কর্ম করে যাচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় ষাটটি দেশের লোক তার সদস্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। গত মার্চ মাসে কার্যকরী সমিতির সভাপতি নির্বাচনের কথা ওঠে। তাই নিয়ে নানা বিতর্ক। পূর্ব ও পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলির মধ্যেই সাধারণত এতদিন কর্মকর্তা ভাগাভাগি হয়ে থাকে। এবারও তার কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। মূল ঝগড়াটা হলো কে সভাপতি হবেন—তাই নিয়ে। ইতালীর প্রখ্যাত সাহিত্যিক ইগনাৎসিও সিলোন দাঁড়িয়েছেন একজন প্রার্থী হিসেবে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন ব্রাজিলের জনৈক সমাজতত্ত্ববিদ জোসুয়ে দ্য কাসত্রো। অনেকে সিলোনকে নিয়ে রীতিমতো বিব্রত বোধ করছেন। এককালে তিনি ছিলেন কম্যুনিস্ট, এখন দলত্যাগী। সেজন্যে, তাদের আশংকা, হয়তো সিলোনকে সভাপতি করলে পূর্ব য়ুরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলি বিরক্ত হবেন। অনেকে পি ই এন-এর সদস্যপদেও ইস্তফা দিতে পারেন। অবস্থাদৃষ্টে সিলোন পাল্টা প্রস্তাব করেন, তিনি তাঁর প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত, যদি কাসত্রো তাঁর নাম প্রত্যাহার করতে সম্মত হন। খবরে প্রকাশ, এই শর্তে কাস্ত্রো রাজী হয়ে নিজের নাম তুলে নিয়েছেন। শূন্যস্থান পূরণের জন্য নতুন নামও প্রস্তাবিত হয়েছে। দেখা যাক, কার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে।

নতুন বই

শরৎচন্দ্র (৩য় খণ্ড) — গোপালচন্দ্র রায়। সাহিত্য সদন। এ-১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলকাতা—১২। দাম কুড়ি টাকা।

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় দীর্ঘকাল শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর কাজ করছেন। অনেক কিংবদন্তী, অনেক রহস্যকথা প্রচারিত আছে, শরৎচন্দ্রকে ঘিরে। সুদীর্ঘ দিনের পরিশ্রমে শরৎচন্দ্রের জীবনকথার নানান স্বার মুক্ত করেছেন শ্রীরায়। এর আগে প্রকাশিত দুটি খণ্ডে শরৎচন্দ্রের জীবন, সাহিত্য এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা আছে। বর্তমান খণ্ডটি চিঠি-পত্রের সংকলন। প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত চিঠির এই বৃহৎ খণ্ডটি থেকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেই অনেক কিছু জানতে পারবেন।

যে ঘরোয়া ভাষা, এবং অকৃত্রিম মানব-প্রেম শরৎচন্দ্রকে একসময় বাঙলা দেশের সর্বজনপ্রিয় করেছিল, চিঠিপত্রের মধ্যে তার পরিচয় স্পষ্ট। চিঠিপত্রে যে কোন মানুষকে জানা যায়, অনেক কাছের থেকে। রবীন্দ্র-নাথের অসংখ্য চিঠিপত্রে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় যেমন স্পষ্ট—শরৎচন্দ্রের চিঠিতেও সেই একই উপাদান রয়েছে। বহু উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ বা কোন সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে পরিচিত জনকে যে চিঠি লিখতেন, তার মধ্যেও শরৎচন্দ্রের রসিকমনের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান সুবৃহৎ সংকলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, মণিলাল গঙ্গো-পাধ্যায় সুধীরচন্দ্র সরকার, কাজী নজরুল ইসলাম, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশ-চন্দ্র সেনগুপ্ত, রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, দিলীপকুমার রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, কুমুদশঙ্কর রায়, রমেশ-চন্দ্র মজুমদার, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, জলধর সেন, চারু-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনেকের কাছে লেখা এক বা একাধিক চিঠি আছে। রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে কবির প্রতি তাঁর ভক্তি-শ্রদ্ধা, মান-অভিমান স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। মানুষ দুজন যে কত কাছের ছিলেন, অথচ একটা গোপন অভিমান যে কত দূরে সরিয়ে রেখেছিল তাঁদের তা লক্ষ্য করে বিস্মিত হতে হয়।

শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকার সম্পাদক, প্রকাশক বা মুদ্রাকরকে চিঠি লিখতেন। তাঁর পরিচিতের সমাজে ছিলেন রাজনীতিবিদ, স্বদেশকর্মী থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী। এঁরা প্রত্যেকেই তাঁর কাছের জগতের মানুষ। দূরের থেকে লেখা চিঠিতে এঁদের অনেক কিছু জানিয়েছেন শরৎচন্দ্র। কখনও পরামর্শও চেয়েছেন। স্ত্রীকে এবং আত্মীয়-পরিজনকে লেখা বেশ কিছু সংগৃহীত হয়েছে।

সম্পাদক সমস্ত চিঠিপত্র মোটামুটি তিনটি ভাগ করেছেন—শরৎচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের দিকে তাকিয়ে। এই তিনটি ভাগ হোল—রেঙ্গুনের চিঠি, শিবপুরের চিঠি এবং সামতাবেড়ে ও কলকাতার চিঠি। কয়েকখানি ইংরেজিতে লেখা চিঠিও আছে। শরৎচন্দ্রের লেখা অথচ না-পাঠান কিছু চিঠি বর্তমান খণ্ডে শ্রীরায় রেখে, চিঠিগুলির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে-ছেন। শ্রীরায় দীর্ঘদিন বহু পরিশ্রমে এই চিঠিপত্র সংগ্রহ করেছেন। সংগ্রহ সময়কার বিচিত্র অভিজ্ঞতার রমণীয় বর্ণনা দিয়েছেন মুখবন্ধে। কঠোর পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান হওয়ার ফলেই এই বৃহদায়তন গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ সম্ভব হয়েছে মাত্র একজন মানুষের পক্ষে। পরিশিষ্টে চিঠিপত্রে উল্লিখিত আনুষঙ্গিক বিষয়নির্দেশ এবং বিলম্বে পাওয়া কয়েকটি চিঠিও আছে। শরৎ-প্রেমিক যাঁরা, বাঙলা সাহিত্যকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের প্রত্যেকেই বইখানি সাদরে গ্রহণ করবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

Statistical Elucidations For District Administration in (West) Bengal — Ramendra Narayan Nag. Classic Press. 3/1A, Shyamacharan Dey St., Calcutta-12. Price Rs. 10.00.

পলাশী যুদ্ধের পর এদেশের কর্তৃত্ব-ভার হাতে নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামনে সবথেকে বড় সমস্যা দেখা দিয়ে-ছিল দেশশাসন, কর আদায়, জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করা। সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে দেশটাকে ভাগ করতে হয়েছিল কয়েকটি জেলায়। একের পর এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ শুরু হয়। কিন্তু শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও শাসন করতে পারছিল না তারা। কারণ এদেশ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। প্রয়োজনে দেখা দিল যাবতীয় খবরা-খবর সংবলিত পুস্তিকার। তাছাড়া ওরা ব্যবসায়ী বাণিজ্য বাড়াতে হবে। দেশব্যাপী শাসনক্ষমতা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর আরাধনায় ওরা তৎপর হয়ে উঠল। তাই শাসন কাজ এবং বাণিজ্যপ্রসার দু দিকেই লক্ষ্য রেখেই গেজেটিয়ারের সৃষ্টি। সেকারণে গেজেটিয়ার শুধুমাত্র ভৌগোলিক বিবরণ-পূর্ণ হোল না। একটি জেলার সামাজিক পরিচিতি, জনবিন্যাসের খবরও পাওয়া গেল। কাঁচা মাল এবং শ্রম কোথায় কিভাবে আছে শাসকগোষ্ঠীর সামনে তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কোর্ট ডিরেকটরস-এর নির্দেশে প্রথম থেকেই এ ব্যাপারে এদেশের প্রশাসকরাও তৎপর হয়ে ওঠেন। প্রথমে কাজ শুরু করেছিলেন বুকানন। তারপর হ্যামিলটন। এঁদের দেখানো পথেই পরবর্তী কালে অনেক গেজেটিয়ার লেখা হয়েছে। হান্টারের কাজই ছিল সব থেকে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান বইয়ের লেখক অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাষায় গেজে-টিয়ার রচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। অল্প জায়গায় এমন বিস্তৃত বিশ্লেষণের নজীর খুব কমই চোখে পড়ে। হান্টারের প্রতি সম্মান জানিয়েছেন শ্রীনাগ তাঁর সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র আলোচনায়।

হান্টারের স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল, বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার্স ইস্ট বেঙ্গল অ্যাণ্ড আসাম ডিস্ট্রিকট গেজে-টিয়ার এবং বহু অন্য তথ্য ও গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন শ্রীনাগ পরিশিষ্টে।

বর্তমান বইয়ে একটি মূল্যবান অংশ হোল বুকানন এবং হান্টারের তথ্য অনু-সন্ধান বিষয়ের প্রশ্নাবলীর সংযোজন। খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর যে তাঁদের দৃষ্টি কত গভীর ছিল তা স্পষ্ট এর মধ্যে। সেই সঙ্গে আছে নতুন ভারতীয় গেজেটিয়ার সম্পর্কিত নির্দেশিকা। পরিশিষ্টই বইটির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম সাব-ডিভিশন গঠনের তথ্য আছে। ১৭৫৭ খৃঃ থেকে ১৯৬১ খৃঃ মধ্যে বিচার বিভাগীয় এবং জেলাভিত্তিক পরিবর্তনের সংগৃহীত তথ্য একালের প্রশাসক ও জিজ্ঞাসু পাঠকের প্রয়োজন মেটাবে। ১৯৫৬ খৃঃ রাজ্য পুনর্গঠনের পর জেলা-গুলির কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে শ্রীনাগ সে সম্পর্কেও তথ্য দিয়েছেন। বিভিন্ন জেলার আয়তন, জনসংখ্যা, গৃহসংখ্যা, গ্রাম ও শহর, সাবডিভিশন, ব্লক, অঞ্চল ও গ্রামপঞ্চায়েৎ, থানা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জেলাভিত্তিক হার, নারী ও পুরুষ, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, কর্মী ও বেকার, শিক্ষিতের হার, বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ এবং আরো অনেক তথ্য পাওয়া যাবে পরিশিষ্টে। বহু পরিশ্রমসাধ্য এই ছোট আকারের বইখানিতে মূল্যবান উপাদান যেভাবে সংগ্রহ করেছেন শ্রীনাগ—তা নিঃসন্দেহে স্বীকৃতি পাবে।

রাণীবাঈ : হরেন্দ্র সেন। বিচিত্রা প্রকাশনী, নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা ৯। মূল্য ৩॰ মাত্র।

উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনন্য শিল্পী রাণী-বাঈ, অপূর্ব সুন্দরীও। কণ্ঠে সুর, দেহে রূপ, যৌবন, কিন্তু মন? বাস্তব জীবনের বিচিত্র ঘটনার ছায়ায় ছায়ায় মন তার আচ্ছন্ন। একই আশ্রয়ে পাশাপাশি দুটি প্রকৃতি, একটি শিল্পী অন্যটি নারী। উভয়ের সংঘাতে রাণীবাঈ-এর যৌবন চঞ্চল, কিন্তু পরিণতিতে দুটি সত্তার আশ্চর্য সমন্বয়। অসাধারণ লিপিকুশলতায় লেখক রাণী-বাঈ-এর চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। মনস্তত্ত্ব-চর্চার কেতাবী ভংগিতে নয়, হৃদয়বৃত্তির স্বতস্ফূর্ত বিকাশের সহজ ও সাবলীল আঙ্গিকে। ভিন্ন ভিন্ন এপিসোড মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবে পাশা-পাশি এগিয়ে গেছে।

উলঙ্গ আত্মা (উপন্যাস) — বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। বিদ্যাভারতী। ৮সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা—৯। দাম : নয় টাকা।

ক্ষুধার কাব্যের কবি বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর আরেকটি উপন্যাস ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সম্ভবত উলঙ্গ আত্মা তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসটিতে আছে সাম্প্রতিক সমাজের ছবি। সুধন্য রায় আজ মহাধনী, একটি কোম্পানীর একছত্র মালিক, কিন্তু একদা তাকে আরপুলি লেনের স্যাঁতসেঁতে একতলার ঘরে দিনাতি-পাত করতে হয়েছে। সে চিঠি লিখছে চক্রবর্তীকে অর্থাৎ লেখককে, একদা আর-পুলি লেনের সহযাত্রী। আজ সুধন্য নিউ আলিপুরের অভিজাত পরিবেশেও ঘুমাতে পারছে না। প্রকাশক রায়-ব্যানার্জীর মালিক সুধন্য রায় একজন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক। তিনি অহংকারের জ্বালায় জ্বলছেন —একধারে তিনি মহৎ সাহিত্যের প্রকাশক আর একদিকে জ্বলন্ত প্রদীপসম উপন্যাসকার সুধন্য রায়। চক্রবর্তীর উপ-ন্যাস পড়ে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন। সুধন্য বিয়ে করেছেন নমিতাকে—কিন্তু সেটা নিছক একটা চাল। সুধন্য মানুষ হিসাবে নীচ, ভন্ড, বিবেকবিহীন, আদর্শ-ভ্রষ্ট মানুষ। না না নেশায় তার নার্ভ শুকিয়ে যায়—সে একদিন উলঙ্গ অবস্থায় ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার উদ্যোগ করেছিল—সে এখন শিশুর মতো, খেতে দিলে খায়, স্নান করালে স্নান করে। জীবনের নানা গলিঘুঁজি পার হয়ে সে আবার মৃত্তিকা পিন্ডে পরিণত। রাজ-নীতির পেয়ালায় চুমুক দিলেও সে রাজ-নীতিকে রোমান্সের আকর্ষণে গ্রহণ করে-ছিল তার বেশী নয়। এই উপন্যাসটি সুন্দর কাব্যধর্মী ভাষার গুণে এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে সুখপাঠ্য। কিঞ্চিৎ পরিমার্জনা করলে সম্পূর্ণ শিল্পসম্মত হতে পারত। পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ প্রদসেনীর।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

চিকিৎসক সমাজ (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ সংখ্যা) — সম্পাদক ডাঃ অমল ঘোষ হাজরা। হেড অফিস ১৫১, তারকদত্ত-হারকার রোড, কলিকাতা-৩৪, ...সিটি অফিস ১১৬ শরৎ বসু রোড, কলিকাতা —২৯। দাম প্রতি সংখ্যা কুড়ি পয়সা মাত্র। বার্ষিক তিন টাকা।

চিকিৎসক সমাজের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদীয় সকল শ্রেণীর চিকিৎসকদের একই শিবিরে স্থান করানো বড় সহজ কর্ম নয়, সম্পাদকমন্ডলী সেই অসাধ্য সাধন করে-ছেন। তারাশংকর বন্দোপাধ্যায় এঁদের অভি-নন্দন জানিয়ে বলেছেন : চিকিৎসার একমাত্র ধর্ম বা অর্থ হল—মানবদেহে ও জীবনে রোগ নিরাময় করা। পদ্ধতি অনেক আছে। সেই পদ্ধতি দেশভেদে ও কালভেদে আবিষ্কৃত হয়েছে ও বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে। সকল ধর্মের একমাত্র লক্ষণ হল যেমন ঈশ্বর তেমনি ভাবে সকল চিকিৎসার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হল : নিরাময়, মানব জীবনের সুস্থতা। পত্রিকাখানি ছোট কিন্তু নগণ্য নয়। তারাশংকরের এই উক্তি বিশেষ মূল্যবান। চিকিৎসক সমাজের প্রতিটি সংখ্যায় চিকিৎসা বিষয়ে (বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে) আলো-চনার সঙ্গে থাকে সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক সংবাদ। সম্পাদনার মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। আমরা পত্রিকাটির দীর্ঘজীবন কামনা করি।

খামখেয়ালী—রবীন্দ্র সংখ্যা। ১৩৭৬। সম্পাদক—রাজেন্দ্রকুমার মিত্র। ১১-এ, গোকুল মিত্র লেন, কলকাতা—৫। দাম—এক টাকা।

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। আলোচ্য সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে কবির উপর বেশ কিছু চিত্তাকর্ষক ও অভিনব আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়াও ধারাবাহিক কিছু রচনা আছে। লেখকদের মধ্যে আছেন গৈরিকা ঘোষ, বীণকর শর্মা, সুনীল রায়, প্রতিভা ঘোষ, বিমান মিত্র, শৈলেন ভদ্র, হৃষীকেশ রায় ইত্যাদি। পত্রিকাটি পাঠকদের তৃপ্ত করবে।

প্রবন্ধ সঞ্চয় (আলোচনা) — শিশিরকুমার মাইতি। আশাবরী পাবলিকেশন, ২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন, সাঁত্রাগাছি, হাওড়া। দাম : দু টাকা।

আধুনিক সাহিত্যের জনপ্রিয় অংশ সংবাদপত্রের আশ্রয়ে লালিত। সাংবাদিক জীবনের গালগল্প অনেক সময় উপন্যাসের মতো চমকপ্রদ হয়ে থাকে। শ্রীশিশিরকুমার মাইতি অবশ্য গল্প শোনাবার আকর্ষণে এই গ্রন্থ রচনা করেন নি। সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র হিসেবে তাঁর মনে জাগে নানারকম প্রশ্ন এবং সমস্যা। তিনি তাদেরই রূপ দিয়েছেন এই সংকলনের বিভিন্ন প্রবন্ধে। মোট দশটি নিবন্ধ ছাপা হয়েছে। সর্বশেষ প্রবন্ধে তিনি বাংলা সাময়িকপত্রের রূপ-রেখা দেবার চেষ্টা করেছেন।

জোনাকী [কাব্যগ্রন্থ] — নিখিলরঞ্জন মাইতি। কলিকাতা পুস্তকালয় ও শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—৯। দাম দু টাকা।

বেশ মিষ্টি রোম্যান্টিক কবিতার সংকলন। মনে হয়, ভদ্রলোক নগর জীবনের সংস্পর্শে কখনো আসেন নি। এক ধরণের গ্রামীন সরলতা ও বিশ্বাসের সততা নিয়ে প্রায় প্রতিটি কবিতা লেখা। অনেকের কাছেই ভালো লাগবে।

গ্রন্থপরিক্রমা (৬ষ্ঠ বর্ষ দ্বাবিংশ সংখ্যা)— সম্পাদক : অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা— ১২। দাম : এক টাকা।

সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে গ্রন্থ-পরিক্রমা দীর্ঘকাল নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সদাপ্রকাশিত গ্রন্থ ও সাহিত্যের মৌল সমস্যা সম্পর্কে মূল্যবান নির্দেশ দিতে পেরেছে। এ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে সংবাদ ও সাময়িকপত্রে মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের নানা দিক সম্পর্কে আলোচনা। লিখেছেন ধীরেন মিত্র (ভারতে সংবাদপত্রের ও বিজ্ঞা-পনের শৈশব), নারায়ণ চৌধুরী (গান্ধীজীর সংবাদপত্র সেবা), মণি চক্রবর্তী (পণ্যের বাজার সন্ধান ও বিজ্ঞাপন), অমূল্য দাশ-শর্মা, বিনয় দত্ত, কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পান্নালাল দাশ-গুপ্ত এবং আরো কয়েকজন।

আধুনিক সাহিত্য (দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা)—রণজিৎ দেব। ১ ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহার। দাম : এক টাকা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য মারা গেছেন সম্প্রতি। ব্যক্তি ও কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ওপর কবিতা-প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার, কবিরুল ইসলাম, বাসুদেব দেব, পরেশ সোম, বিনোদ বেরা এবং আরো অনেকে।

চতুর্মাত্রিক (মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬) — সম্পাদক মুকুল চক্রবর্তী। ইয়ারী বৈঠক ১সি লাইম স্ট্রীট, কলকাতা—১৫। দাম : এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

গতানুগতিক প্রবন্ধের পত্রিকা নয়। রীতিমতো ভাবিয়ে তোলার মতো আলোচনা লিখেছেন মিহিরকুমার গৌতম, দীপক মুখোপাধ্যায়, পুরোষোত্তম তালুকদার ও বাদলকুমার গিরি। এ পত্রিকার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ।

নিমাই ভট্টাচার্য

তিন

এর আগে যখন কায়রো এয়ারপোর্টে কয়েক ঘণ্টা থেকে আবার বিদায় নিয়েছে, তখন তরুণ ভাবতে পারে নি পরের বার এমন পরিবর্তন দেখবে। এই কায়রো এয়ারপোর্ট ? এত বড়, এত চমৎকার ?

এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনটা কায়রো এয়ারপোর্টের দীর্ঘ রানওয়ে পার হতে হতেই তরুণ জানলা দিয়ে অবাক বিস্ময়ে শুধু এয়ারপোর্ট টার্মিন্যাল বিল্ডিংটাই দেখছিল। বিস্ময় যত বেড়েছে, টার্মিন্যাল বিল্ডিং তত কাছে এসেছে। সুন্দর স্যান্ডস্টোনের অপূর্ব আধুনিক বিল্ডিং। লম্বায় প্রায় এসপ্লানেড-ধর্মতলার মোড় থেকে পার্ক স্ট্রীট হবে। স্ফিংকস-পিরামিডের দেশ যে এমন করে সারা দুনিয়াকে চমকে দেবে, কেউ ভাবতে পারেনি।

ইতিহাসের কাছে ভাল-মন্দ বলে কিছু নেই। মানুষের আসা-যাওয়ার কাহিনী চিরন্তন। নিত্য ঘূর্ণীয়মান পৃথিবীতে কিছুই নিত্য নয়। কায়রো রওনা হবার আগে তরুণ তিন-চার সপ্তাহ এক্সটারন্যাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রীর হিস্টোরিক্যাল ডিভিশনে কাজ করেছে। শুধু মিশর বা নাসেরের নয়, সারা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ঘাটাঘাঁটি করেছে। স্তম্ভিত হয়ে গেছে ইতিহাসের দ্রুত পট-পরিবর্তনে। ভূমধ্য সাগরের চারপাশে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের চার আনা ঘটনা ঘটেছে। ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি ছাড়াও কত রাজা-উজীরের আবির্ভাব ও বিদায়, কত শত শক্তিশালী শক্তির উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী এই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর ভূমধ্য সাগর। সব কিছুর পরিবর্তন হয়েছে, হয়নি শুধু মানুষের আর প্রকৃতির। আমাদের দেশে পচা ভাদ্দরের পর আশ্বিনের হাসি আর শিউলির খেলা দেখান প্রকৃতি, তেমনি লীলা আছে ভূমধ্য সাগরের চারপাশে। মৃত্যুর মত শুষ্ক বালুকাময় অনন্তবিস্তৃত মরুপ্রান্তরের শেষ সীমায় ভূমধ্য সাগরের কোল ঘেঁষে পাওয়া যাবে মিষ্টি মাতাল হাওয়া, গাছে গাছে আছে ফল-ফুলের নিত্য সম্ভার। কেন, মানুষগুলো ? পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা তো ভূমধ্য সাগর বা নীল নদীর জলে খেলা করেছেন যুগে যুগে।

মরুভূমির দেশগুলো যেন কেমন হয় ! মরুপ্রান্তরে কোন প্রাসাদই যেন চিরকালের জন্য নয়। শুধু পিরামিড আর প্রাণহীন মমিগুলোই যেন উত্তরকালের জন্য একমাত্র উপহার !

দিল্লীতে ব্রিফিং-এর সময় জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ রঙ্গস্বামী বলেছিলেন, অতীত জানবে কিন্তু অতীত দিয়ে বর্তমানকে বিচার করো না সব সময়। আলিবাবার চিচিং ফাঁক আর পাবে না মিডল ইস্টে। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে ঠিক মত বর্তমানকে জানাই ডিপ্লোম্যাটদের প্রধান কর্তব্য।

রঙ্গস্বামী আরো বলেছিলেন, দেখ তরুণ, আমাদের মত ডিপ্লোম্যাটদের কাছে সব ভাল, কেউ খারাপ নয়। ইণ্ডিয়া তো বিগ পাওয়ার নয় যে নিজেদের ভাল-মন্দ অপরের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেবে ! আলখাল্লা পরা আরবদের ভালবাসবে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, শ্রদ্ধা করো ওদের অতীত ইতিহাসকে।

হিস্টোরিক্যাল ডিভিশনের একজন ডেপুটি ডাইরেক্টর বলেছিলেন, সুয়েজ খাল শুধু পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের যোগসূত্র নয়, কায়রো হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম পীঠস্থান।

সত্যি তাই ! ঐ বিরাট বিরাট পিরামিডগুলো যেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির আর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সিংহদ্বার ! নীল নদ পাড়ের ঐ বিরাট সিংহ মূর্তি যেন পাশ্চাত্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে সতর্ক সংকেত ! কিং ফারুকের ঐ বিরাট দেহটা যেন অচলায়তনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি ছিল। তিন কোটি মানুষকে পশুর মত অবজ্ঞা করে মদির ছিলেন ক্লিওপেট্রার স্বপ্নে। নীল নদীর জল যে গড়িয়ে গড়িয়ে চুইয়ে চুইয়ে প্রাসাদের তলায় এসে পৌঁছেছিল, তা টের পান নি এই মূর্খ সম্রাট !

ইতিহাস বরদাস্ত করল না ! যেমন বরদাস্ত করেনি নেপোলিয়ন বা মুসোলিনী বা হিটলারকে। মরুপ্রান্তরে ঝড় উঠল, অতীতের বেদুইনদের মত বালির তলায় হারিয়ে গেলেন সম্রাট ফারুক।

তরুণ মুগ্ধ হয়ে দেখেছে ইতিহাসের এই নিঃশব্দ শোভাযাত্রা। যে তিন কোটি মানুষ একদিন অভুক্ত থেকেও পিঠে পাথর টেনে প্রাসাদের পর প্রাসাদ গড়েছে, তিলে তিলে মৃত্যুকে কাছে টেনে নিয়েছে, সভ্য পাশ্চাত্যের কাছে যারা উপহাসের পাত্র ছিল, আজ তারাই বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের অন্যতম নায়ক। নীল নদীর দেশের সুন্দরীদের নিয়ে যে পাশ্চাত্যের মানুষ ছিনিমিনি খেলেছে যুগ যুগ ধরে, আজ তারাই মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের নায়িকা ! ভাবলেও, দেখলেও ভাল লাগে। কায়রোয় গিয়ে বেলি ডান্স দেখাই যেন একমাত্র কাজ ছিল এই অনাহূত অতিথিদের। আজ কায়রোর রাস্তায় সেই পশ্চিমীরাই নায়েব-গোমস্তার মত আরবদের মোসাহেবী করছে। দেশটাই শুধু স্বাধীন হয়নি অতীতের অত্যাচার অবিচার থেকে, মানুষগুলোও স্বাধীন হয়েছে। সভ্যতার আদিমতম সুপ্রভাত থেকে ইতিহাসের পাতায় পাতায় মিশরের উল্লেখ, কিন্তু মিশরের আরবরা এই প্রথম আত্মমর্যাদার স্বাদ পেল।

ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর কন্সুলার অফিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাটাচি জোসেফ রসিকতা করে বলে, ভারতবর্ষ স্বাধীন কিন্তু ভারতবাসীরা পরাধীন।

মজা করে বল্লেও কথাটা সত্যি। জোসেফ আবার বলে, লালকেল্লায় তেরাঙ্গা চড়াবার পরই তো আমাদের দেশের মানুষ সাহেব-সুবাদের পূজা করতে শুরু করল।

আর কায়রোয় ? আলখাল্লা পরা আরবদের দেখলে সাহেবের দল রাস্তা ছেড়ে দাঁড়াবে। কলকাতায় রবীন্দ্র জয়ন্তীতেও অনেক দেশের ভাইস-কন্সালকে সভাপতিত্ব করতে দেখা যাবে, আর কায়রোয় অমন অনুষ্ঠানের ইনভিটেশন পেলে অ্যাম্বাসেডরের দল আনন্দে নাচতে থাকেন।

কায়রোকে কোনদিন ভুলবে না তরুণ। কাজ করার এমন আনন্দ খুব বেশী দেশে পাওয়া যায় না। লন্ডন-ওয়াশিংটন-প্যারিস-রোম বা টোকিও'র ইণ্ডিয়ান মিশনে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই অভারতীয় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে। কথায় কথায় নিজের দেশের মানুষকে অবজ্ঞা দেখান একদল ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের প্রায় ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পেনসেলভিনিয়া এভিনিউর ইণ্ডিয়ান চান্সেরীতে সারা সপ্তাহে একজন

আমেরিকানের আগমন হবে না, কিন্তু যে দু-চারজন ভারতীয় আসেন তাঁদের সংগেও কথা বলার ফুরসৎ হয় না ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের। কায়রোর ইণ্ডিয়ান মিশনে কালো আদমীদেরই পুজো করা হয়।

জোসেফ বলত, অল গ্লোরি টু নাসের?

ঐ আড্ডাখানায় কে হঠাৎ বলে উঠত, কেন?

জোসেফ নাটকীয় ভঙ্গীতে চিৎকার করে উঠত, মাই ডিয়ার বেবিজ! তোমরা জান না আমি বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আমাদের মিনিস্ট্রীর ক্যান্টিন কমিটির সেক্রেটারী পর্যন্ত হতে পারিনি, আর আমাদের ডিয়ার ডার্লিং নাসের চৌত্রিশ বছর বয়সে পৃথিবী নাচিয়ে দিল!

ডিয়ার ডার্লিং নাসেরই বটে! শুধু মিশরে নয়, সারা আরব দুনিয়ায় যৌবনের প্রতিমূর্তি নাসের। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নারী-পুরুষের হৃদয়ে তাঁর আসন। পৃথিবীর অন্যতম ঘৃণিত মানুষদের সে যে সারা দুনিয়ার সামনে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। তাই তো আরব দেশে কালা ভারতীয়দেরও মর্যাদা।

কায়রোর কূটনৈতিক জগতে ইণ্ডিয়ান মিশন সত্যি এক অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। বড় বড় দেশে ইণ্ডিয়ান মিশনকে থোড়াই কেয়ার করে। প্যাঁচে না পড়লে ইণ্ডিয়ার সংগে শলা-পরামর্শ করার প্রশ্নই ওঠে না। কায়রোয় তা নয়। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নাসের ভারতের সংগে পরামর্শ করবেনই। আন্তর্জাতিক পরিবারের মধ্যে ভারত-মিশর পরমাত্মীয়।

কায়রোকে ভুলতে পারে না আরো অনেক কারণে।

ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর একদল ডিপ্লোম্যাট ও তাঁদের স্ত্রীরা সেদিন দল বেঁধে 'কায়রো টাওয়ার' রিভলবিং রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে গিয়েছিলেন। মিঃ অ্যান্ড মিসেস কলহান, মিঃ অ্যান্ড মিসেস পুরী, মিঃ অ্যান্ড মিসেস সিং, মিঃ অ্যান্ড মিসেস মিশ্র, দিল্লীর নর্দার্ন টাইমসের স্পেশ্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ ও তাঁর স্ত্রী সুনীতা এবং আরো তিন-চারজন মিলে মহানন্দে ডিনার খাওয়া হলো। স্টীমড মিট আর জোসেফের কমেন্টারী—দুই-ই এক সংগে উপভোগ করলেন সবাই।

ডিনার খাওয়ার পর ইজিপসিয়ান ব্ল্যাক কফি খাবার সময় মিঃ পুরী কফির পেয়ালা তুলে প্রপোজ করলেন, 'আগামী জয়েন্ট ডিনারের আগে তরুণের বিয়ে করতেই হবে, নয়ত......।'

জোসেফ ফোড়ন কাটল, 'নয়ত ইণ্ডিয়ান ফরেন পলিসি বরবাদ হবেই।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরুবার পথে মিঃ কলহান হঠাৎ একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'হাউ আর ইউ হাসান?'

'ফাইন, থ্যাংক ইউ স্যার', হাসান উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে দেয়।

সৌজন্যমূলক দুটো একটা কথা বলার পর মিঃ কলহান জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাসান, হ্যাভ ইউ মেট আওয়ার নিউ কলিগ মিত্র?

কই না তো।' বাঙালীর সংগে দেখা করার লোভে হাসান টেবিল ছেড়ে একটু এগিয়ে এসে বল্লো, উনি আছেন নাকি আপনাদের দলে?

মিঃ কলহান আলাপ করিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'দুই বাঙালী এক হয়েছ, এবার তো তোমরা সারা দুনিয়া ভুলে যাবে। সো ক্যারি অন মাই বয়েস! গুড নাইট!'

ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে বাঙালী যেমন দুর্লভ, পাকিস্থান ফরেন সার্ভিসে বাঙালীর প্রাচুর্য ঠিক তত বেশী। এর কারণ অবশ্য পাকিস্থানের সামরিক একনায়কদের বাঙালী-প্রীতি নয়; বরং ঠিক তার উল্টোটাই সত্য। বাঙালী সিনিয়র অফিসারদের দেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা রাওলপিণ্ডির পাঠান বীরেরা খুব নিরাপদ মনে করেন না। সেজন্য পাকিস্থানের কৃষি, মৎস্য, পরিবার কল্পনা বা রেডিওতেও কিছু ছোট বড় বাঙালী অফিসার পাওয়া যাবে। সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টও বাঙালী হতে পারে কিন্তু তারপর খবরদার! জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা এস-পি বা হোম মিনিস্ট্রীর গোয়েন্দা বিভাগে বা দেশরক্ষা দপ্তরে? নো অ্যাডমিশন ফর ইস্ট পাকিস্থানিজ! তাইতো পাকিস্থানের ফরেন সার্ভিসে কিছু বাঙালীকে ভর্তি করে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে এবং রাওলপিণ্ডি স্ট্যাটিসটিক্স প্রচার করে বাঙালী-প্রীতির ঢাক বাজাচ্ছে।

যাই হোক, পাকিস্থান মিশনে বাঙালী দেখা যায়। চাকরির খাতিরে যাই করুন না কেন, পশ্চিমবঙ্গের কোন বাঙালীকে কাছে পেলে এঁরা সারা দুনিয়া ভুলে যান। রাজনীতির চাইতে পদ্মার ইলিশ মাছের বিষয় আলোচনা করাই পাকিস্থানের বাঙালী ডিপ্লোম্যাটরা বেশী পছন্দ করেন। ইণ্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে যে সব বাঙালী আছেন, তাঁরাও এঁদের পেলে আর কাউকে চান না। তরুণও চায় না। এইত রেংগুনে আব্বাস-উদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে কি আনন্দই করেছে!

সেও এক দুর্ঘটনা! রেংগুন চিড়িয়াখানায় সেদিন লোকে-লোকারণ্য। স্নেক-কিসিং—শংখচূড় কোবরা সাপকে সাঁপুড়ে চুমু খাওয়ার খেলা দেখাবে বলে ভীষণ ভীড়। আমেরিকান টুরিস্টরা তো ভয়ের চোটে কাছেই এগুলো না। একদল বর্মী ছেলেমেয়ের সঙ্গে কিছু ভারতীয়, কিছু চীনা লোকই সামনের দিকে ভীড় করেছিল। সাপকে চুমু খাওয়ার খেলা দেখতে দেখতে আব্বাসউদ্দীন মুগ্ধ হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই বাংলায় বলে উঠল, বাপরে বাপ!

ব্যস! ঐ বাংলা শুনেই তরুণ আলাপ করেছিল আব্বাসের সংগে। আলাপের শেষে 'থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ' বলেই তরুণকে ছেড়ে দেয়নি সে। হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাড়ী নিয়ে গিয়ে চীৎকার করে আম্মাজানকে জানিয়েছিল বাঙালী ধরে এনেছে।

ঐ প্রথম দিনের পর আম্মাজানের স্নেহের আকর্ষণে তরুণ নিজেই যেত। ছুটির দিনে তরুণকে রান্না করে খেতে হয়নি কোনদিন। আম্মাজানের কড়া হুকুম ছিল, ছুটির দিনেও যদি আমার এখানে খেতে না পার তবে আর আসতে হবে না। আমাকেও আম্মাজান বলে ডাকবে না, বুঝবে।

তরুণ মুখে কিছু উত্তর দেয়নি, মুখ নীচু করে মুচকি হেসেছিল।

বেশ কেটেছে রেংগুনের দিনগুলো। কখনও কিচেনের দোর-গোড়ায় চেয়ার টেনে নিয়ে আম্মাজানের সংগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে, কখনও আবার আব্বাসের লুঙি পরেই সোফায় শুয়ে শুয়ে টেপ রেকর্ডারে ভাটিয়ালী গান শুনেছে।

হাসান পরিবারের সংগেও তরুণের হৃদ্যতা হতে সময় লাগল না।......

'দেশের কথা ব'লো না ভাই, শুনলে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যায়', প্রায় ছল ছল চোখে তরুণ হাসানকে বলতো।

মন খারাপ হবে না? ঢাকা-উয়াড়ীর অলিতে গলিতে যে ওর জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় স্মৃতি মিশে আছে। পোগোজ স্কুলে পড়া, পুরনো পল্টন, রমনা বা বুড়ীগংগার পাড়ে বিকেলবেলা ঘুরে বেড়ান, খেলাধুলো করা, আড্ডা দেওয়ার কথা মনে পড়লে আর কিছু ভাল লাগে না। লণ্ডন, মস্কো, ওয়াশিংটনও ভাল লাগে না। নাইল হিলটনের ডিনার খাবার চাইতে মণি কাকিমার হাতের নারকেলের গংগাজলি বা ঢাকাই পরটা অনেক অনেক বেশী ভাল লাগত।

হাসানের স্ত্রী রাবেয়া কারমায়েসা স্কুলেরই ছাত্রী! কারমায়েসা স্কুলের কথা মনে হলেই যে মনে পড়ে যায় আরেক জনের কথা! মুহূর্তের মধ্যে মনটা যেন পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরী-বুড়ীগঙ্গার মত মাতলামী শুরু করে দিল।......

উয়াড়ীর রামকৃষ্ণ মিশন রোডের প্রায় মোড়ের মাথাতেই ছিল তরুণদের বাড়ী। বুড়োরা বলতেন, বরদা উকিলের বাড়ী। অল্প বয়সীর দল বলতেন, কানাই উকিলের বাড়ী। তরুণের দাদু বরদাচরণ মিত্র সেকালের নামকরা নামজাদা উকিল ছিলেন। ফৌজদারী মামলায় ঢাকা-ময়মনসিংএ বরদা মিত্তিরের জুড়ী ছিল না কেউ। বড় বড় মামলায় চট্টগ্রাম—সিলেট থেকেও ডাক পড়ত।

বরদাচরণের সাধ ছিল তিন ছেলেকেই ওকালতি পড়ান। তা হয়নি। বড় দুই ছেলে কোর্ট-কাছারির ধার দিয়েও গেলেন না। বড় ছেলে পোস্টাফিসে ও মেজ ছেলে রেল কোম্পানীতে চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। বরদা উকিলের সাধ পূর্ণ করলেন ছোট ছেলে কানাইবাবু। বাপের মত পসার বা নাম-ডাক না হলেও উয়াড়ীর মধ্যে ইনিও বেশ গণমান্য ব্যক্তি ছিলেন।

বাবা কানাইবাবুর মত তরুণও পড়ত পোগোজ স্কুলে, খেলত রমনার মাঠে। বাকি সময় কাটাত টিকাটুলির রায় বাড়ীতে। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের সন্ধিক্ষণের মিষ্টি মধুর সোনালী দিনগুলোতে রায় বাড়ীই ছিল তার প্রধান আকর্ষণ। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে বলেই মানুষ পৃথিবীতে আছে, নয়ত কোথায় সে চলে যেত। প্রত্যেক মানুষের জীবনেও এমনি একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করে—যে শক্তি তাকে প্রেরণা দেয়, শক্তি জোগায়। যার জীবনে এই অদৃশ্য শক্তির প্রেরণা নেই, সে মহাশূন্যে বিচরণ করে।

টিকাটুলির রায় বাড়ীর ইন্দ্রাণীকে ঘিরেই তরুণের জীবনের সব স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠেছিল। সে কাহিনী কেউ জানত, কেউ জানত না। কিন্তু ওরা দুজনে জানত, বিধাতা-পুরুষ ওদের বিচ্ছিন্ন করবেন না, করতে পারেন না। বুড়ীগঙ্গার জল শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু তরুণের জীবন থেকে ইন্দ্রাণী বিদায় নিতে পারে না বলেই সেদিন মনে হতো।

মনে তো কত কিছুই হয়। ভেবেছিল কি অমন সর্বনাশ দাঙ্গায় সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? কোর্টে অতবড় মামলায় জেতার পর তরুণের মার জন্য অমৃতি কিনে বাড়ী ফিরছিলেন কানাইবাবু। সেই অমৃতি আর খাওয়া হলো না তরুণের মার। একটা ছোরার আঘাতে সব আনন্দ চিরকালের মত শেষ হলো তাঁর।

সারা ঢাকা শহরটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কত সংসারে যে আগুন লাগল, তার ইয়ত্তা নেই! কত নিরপরাধ মানুষের রক্তে যে বুড়ীগঙ্গার জল লাল হলো, সে হিসাবও কেউ রাখল না।

বাবার মৃতদেহ কোনমতে দাহ করে বাড়ী ফিরে এসে ঐ লাইব্রেরী ঘরে পাথরের মত বসে রইল তরুণ। যখন হুঁস হলো তখন সারা টিকাটুলি প্রায় শ্মশান হয়ে গেছে। পাগলের মত চীৎকার করে সারা টিকাটুলি ঘুরেও ইন্দ্রাণীর হদিশ পেল না তরুণ।...

টিকাটুলির শ্মশানের আগুন আজো তাঁর মনের মধ্যে অহরহ জ্বলছে। মাকে হারাবার পর নিঃসঙ্গতা যত বেড়েছে ইন্দ্রাণীর কথা তত বেশী মনে পড়েছে।

হাসানের স্ত্রী রাবেয়ার কথায় তাই তো তরুণ হারিয়ে ফেলে নিজেকে। হাজার হোক ডিপ্লোম্যাট। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, দিদি, ওসব কথা আর বলো না। তার চাইতে মাংসের গরম গরম পাকোড়া খাওয়াও।

পাকোড়ার পর কফি খেতে খেতে হাসান বলে, রাবেয়া, অন্নদাশঙ্করের কবিতা পড়েছ?

রাবেয়ার উত্তর পাবার আগেই হাসান আবার বলে—

ভুল হয়ে গেছে
বিলকুল
আর সব কিছু
ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল
অ্যান্ড হাসান অ্যান্ড তরুণ......

তরুণের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বল্লো, উহুঃ! হলো না।

হাসান জিজ্ঞাসা করল, হলো না আবার কি?

হবে—নজরুল অ্যান্ড রাবেয়া অ্যান্ড...

রাবেয়া মুচকি হাসতে হাসতে হাসানকে বল্লো, হেরে গেলে তো আমার ডিপ্লোম্যাট দাদার কাছে।

হাসান আর হারতে পারে না। 'তুমি, যদি অকে ডিপ্লোম্যাট কও, আমি হালা কমু।'

কি আনন্দেই কেটেছে কায়রোর দিনগুলো। রাজনৈতিক-কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অহর্নিশি ইন্ডিয়ান-পাকিস্থান এম্বাসীর লড়াই চলত।—ভারতবর্ষে মুসলমান নির্যাতনের অলীক কাহিনী প্রচার করে পাকিস্থান এম্বাসী আরবদের মন জয় করার চেষ্টা করত। আর অতীতের পশ্চিমী আধিপত্য ও শোষণের বিরুদ্ধে আরবদের জয়যাত্রাকে প্রতি পদক্ষেপে স্বাগত জানাত ইন্ডিয়ান এম্বাসী। বোম্বে থেকে জাহাজ বোঝাই করে হজযাত্রীরা মক্কা যান। অনেক স্পেশ্যাল প্লেনও যায় বোম্বে থেকে। ওমান উপসাগরের মুখে এমনি হজযাত্রী একটা ভারতীয় জাহাজের নজরে পড়ল দূরের একটা পাকিস্থানী কার্গো জাহাজ। কার্গোর ক্রেটগুলো সন্দেহ হয়েছিল ভারতীয় জাহাজের কয়েকজন অফিসারের। ক্যাপ্টেন একটা কোড মেসেজ রেডিও মারফত পাঠিয়ে দিলেন বোম্বে। কয়েকদিন পর কাবুল রেডিওর একটা ছোট্ট খবরে সন্দেহটা আরো দৃঢ় হলো। ইতিমধ্যে আম্মান থেকে একটা ডিপ্লোম্যাটিক ডেসপ্যাচে জানা গেল কদিন আগে একটা ডিপ্লোম্যাটিক পার্টিতে জর্ডন ফরেন মিনিস্ট্রীর একজন সিনিয়র অফিসার ইজরাইল আরব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে মন্তব্য করেছেন যে বন্ধু মুস্লিম রাষ্ট্রও যদি ওদের হেলপ করে তাহলে কি করা যাবে? এই সব বিন্দু বিন্দু খবর যখন এক করা হলো তখন আর সন্দেহ রইল না। এসব খবর কায়রোর ইন্ডিয়ান এম্বাসীতে পৌঁছতে দেরী হয়নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরব দেশে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল। পাকিস্থান ও পাক এম্বাসী কি ফাঁপরেই না পড়েছিল!

কায়রোয় ভারত-পাক এম্বাসীর মধ্যে রাজনৈতিক-কূটনৈতিক মেঘ জমে উঠেছে, কখনও গর্জন—কখনও বর্ষণ হয়েছে, তখনও বেসুরো সুরে হাসান আর তরুণ গেয়েছে—

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।।
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।

রাবেয়া পাশের ঘর থেকে প্রায় তেড়ে এসে বলেছে, এমন গর্দভ রাগিণীতে রবীন্দ্র-সঙ্গীত হয় না।...চল, চল তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও। সিনেমায় যাবে না?

আড্ডা দিতে দিতে হাসান আর তরুণের খেয়ালই ছিল না কায়রো প্যালেসের টিকিট কাটা আছে।

তিনজনে দল বেঁধে সিনেমায় গেছে, ওমর খৈয়ামে ডিনার খেয়েছে ও অনেক রাতে তিনজনে বাড়ী ফেরার পথেও অল-তারির স্কোয়ারে বসে গল্প করেছে।

ভোলা যায় কি সেসব স্মৃতি? তরুণ ভুলতে পারে না কায়রোকে। ভুলবে কেমন করে? কারমায়েসা স্কুলের ছাত্রীকে দেখেই তো মনের মধ্যে অতীত দিনের ঝড় উঠেছিল। ইন্দ্রাণীর স্মৃতির আগুনে ঘৃতাহুতি পড়েছিল এই কায়রোতেই।

কি এবং কেন ? (৬)

সেমিকণ্ডাক্টর

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে সেমিকণ্ডাক্টর একটি নতুন অবদান। আজকাল আমরা যে ট্র্যানজিস্টর-রেডিওর এত ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাই তার মূলে রয়েছে এই সেমি-কণ্ডাক্টর। কিন্তু সেমিকণ্ডাকটর বলতে কি বোঝায় তা আমাদের অনেকেরই জানা নেই।

এতদিনে আমরা বিদ্যুৎশক্তি পরিবহনের দিক থেকে দু'রকম বস্তুর কথা জেনেছি : (১) বিদ্যুৎ পরিবাহক, (২) বিদ্যুৎ-অপরিবাহক বা অন্তরক। পরিবাহক ও অপরিবাহক বস্তুর মাঝামাঝি আর একরকম বস্তুর সন্ধান বিজ্ঞানীরা বহুদিন থেকে করছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে সেই বস্তুটির সন্ধান পাওয়া গেল এবং তাকে বলা হলো সেমিকণ্ডাক্টর বা স্বল্পপরিবাহক। তা হলে যাবতীয় পদার্থকে এখন তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) পরিবাহক, (খ) অপরিবাহক, (গ) স্বল্পপরিবাহক।

পরিবাহকের মধ্য দিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ সহজেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে। এই পরিবাহকে ইলেকট্রনগুলি পরমাণুর সংগে আলগাভাবে বাঁধা থাকে। তা ছাড়া, পরিবাহকে কতকগুলি ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। আমরা জানি, কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রীন থেকে বিভিন্ন দূরত্বে বিভিন্ন কক্ষপথে সাজানো থাকে। কেন্দ্রীন থেকে যত দূরের কক্ষপথে যাওয়া যায়, ততই কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রনের বন্ধন-শক্তি কমে যায়। অতি দূরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলি স্বভাবতই আলগাভাবে বাঁধা থাকে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগে মুক্ত ইলেকট্রনগুলিকে একমুখী করে পরিচালন করা যায়। ইলেকট্রনের একমুখী স্রোত বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। সাধারণত ধাতব পদার্থগুলি সুপরিবাহক। উত্তাপ, তীব্র আলোক রশ্মি প্রভৃতির দ্বারা ধাতব পদার্থ থেকে ইলেকট্রন নির্গত করানো যায়।

অপরিবাহক বা অন্তরকের মধ্য দিয়ে তাপ বা বিদ্যুৎ একস্থান থেকে আর এক-স্থানে সহজে যেতে পারে না। এই জাতীয় পদার্থে ইলেকট্রনগুলি পরমাণুর মধ্যে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। তা ছাড়া, অন্তরকের পরমাণুতে কোনো মুক্ত ইলেকট্রন থাকা সম্ভব নয়। তাই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগে এদের ইলেকট্রনগুলিকে সহজে বিচ্যুত করা যায় না। এরা বৈদ্যুতিক চাপ সহজেই সহ্য করতে পারে। সাধারণত অধাতব পদার্থগুলি অপরিবাহক।

পরিবাহক ও অপরিবাহক বা অন্তরকের মধ্যবর্তী আর এক জাতীয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের বলা হয় সেমিকণ্ডাক্টর বা স্বল্প পরিবাহক। জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদি মৌলগুলি এর অন্তর্গত। এই সেমিকণ্ডাক্টর পরিবাহকের মতো তাপ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহক নয়, আবার অন্তরকের মতো কুপরিবাহকও নয়।
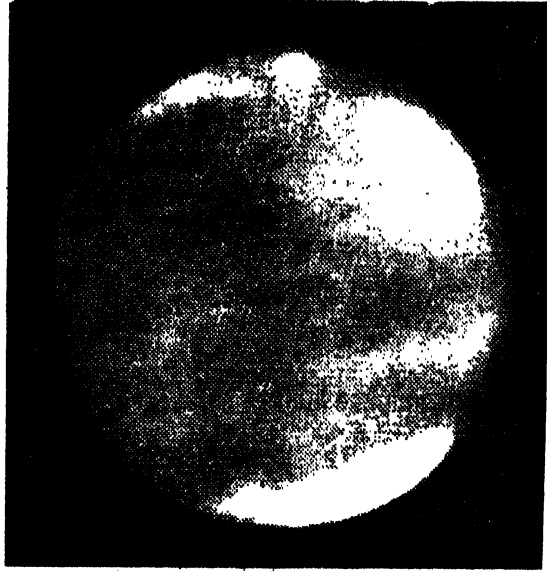
জার্মেনিয়াম সেমিকণ্ডাক্টরের কথা ধরা যাক। জার্মেনিয়াম একটি মৌলিক পদার্থ এবং এর পারমাণবিক সংখ্যা ৩২ অর্থাৎ এর বাইরের যে কক্ষে পূর্ণ সংখ্যক ইলেকট্রন নেই, তাতে শুধু চারটি ইলেকট্রন রয়েছে। জার্মেনিয়ামের সংগে কোনো পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় শুধু এই চারটি ইলেকট্রন অংশ গ্রহণ করতে পারে বলে একে বলা হয় 'ভ্যালেন্স' বা যোজ্যতা ইলেকট্রন। জার্মেনিয়াম কেলাসে একটি পরমাণু আরও চারটি পরমাণু দ্বারা একটি 'কো-ভ্যালেন্ট' বন্ধনে আবদ্ধ। মধ্যবর্তী পরমাণুর চারটি যোজ্যতা —ইলেকট্রনের প্রত্যেকটি অপর চারটি পরমাণুর একটি করে যোজ্যতা ইলেকট্রনের সংগে আদানপ্রদানের দ্বারা পারস্পরিক বন্ধনসূত্রে আবদ্ধ থাকে। এভাবে কেলাসের অণুগুলি পরমাণুর দ্বারা একটি সুন্দর বিন্যাসে সাজানো থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইলেকট্রনগুলি তাপশক্তির প্রভাবে কেলাসের অভ্যন্তরে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। এক্ষেত্রে কোনো মুক্ত ইলেকট্রনের অস্তিত্ব থাকে না এবং যেহেতু মুক্ত ইলেকট্রনই কোনো বস্তুতে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সৃষ্টি করে, কাজেই কেলাসটি বিদ্যুৎপরিবাহী হয় না।

এখন যদি এর ওপর বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তা হলে মুক্ত ইলেকট্রনগুলি ধন-তড়িৎদ্বারের দিকে নিয়মিতভাবে চালিত হয়। একে ইলেকট্রন-বাহিত বিদ্যুৎপ্রবাহ বলা হয়।

মঙ্গল গ্রহ—ওপরের দিকে মেরু মুকুট

আবার যে ইলেকট্রন যোজ্যতা বন্ধনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুক্ত হয়, সেটি কেলাসে একটি শূন্যস্থান বা 'হোল' সৃষ্টি করে। এই অবস্থায় নিকটস্থ একটি ইলেকট্রন এসে শূন্য স্থানটি পূরণ করে। কাজেই হোলটি আর একটি স্থানে অবস্থান্তরিত হয়। আবার আর একটি ইলেকট্রন এসে হোলটি পূর্ণ করে এবং এভাবে প্রক্রিয়াটি পর পর অগ্রসর হয়। এখন একবার একটি হোল সৃষ্টি হলে সেটি মুক্ত ইলেকট্রনের মতো কেলাসের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে হোলগুলি ধনতড়িৎদ্বারের দিকে চালিত হয় এবং একে হোল-বাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহ বলা হয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামে ইলেকট্রন ও হোল এই দুরকম বাহকের দ্বারা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এ ক্ষেত্রে সর্বদাই সমসংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন ও হোল বিরাজ করে এবং তাদের সংখ্যা উষ্ণতা বৃদ্ধির সংগে সংগে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের সংগে খুব সামান্য পরিমাণ আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি বা ফসফরাস ধাতুর খাদ মেশালে সেমিকণ্ডাক্টরে ইলেকট্রন

ও হোম বাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহের বাহকের ঘনত্ব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়।

চান্দ্র শিলার প্রাথমিক পরীক্ষার ফল

অ্যাপোলো-১১ অভিযানের মহাকাশচারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যে উপলখণ্ড ও মাটি সংগ্রহ করে এনেছে তা হিউস্টনের গবেষণাগারে বর্তমান নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রাথমিক পরীক্ষার ফল সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তা থেকে বলা যায় চান্দ্র শিলা পৃথিবীর উপলখণ্ড বা মহাজাগতিক উল্কাখণ্ডের মতো নয়।

প্রাথমিক পরীক্ষক দলের অন্যতম সদস্য ডঃ রবিন ব্রেট চান্দ্র শিলাকে তৃতীয় এক নতুন শ্রেণীর শিলা বলে বর্ণনা করেছেন। এই শিলা এত নরম যে মানুষের হাতের মুঠোয় ধরে চাপ দিলে তা সহজে গুঁড়িয়ে যায়। যে দুরকমের শিলা তাঁরা সনাক্ত করেছেন তাকে চন্দ্রের আগ্নেয়শিলা বলে তাঁরা মনে করেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে এই শিলার সৃষ্টি হয়েছে এবং গলিত পদার্থ ক্রমশ ঠাণ্ডা হওয়ায় শিলার বহির্ভাগে বড় বড় দানা জমাট বেঁধেছে। এই চান্দ্র শিলা লোহা ও ম্যাগনেশিয়াম ধাতুতে সমৃদ্ধ বলে প্রাথমিক পরীক্ষায় জানা গেছে।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে নতুন তথ্য

চন্দ্রের রহস্যভেদের উদ্দেশ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণের ঐতিহাসিক অভিযানের বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গ্রহ সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল জেগে উঠেছে। সে গ্রহটি হচ্ছে মঙ্গলগ্রহ। এতদিন মঙ্গলগ্রহকে ঘিরে নানা জল্পনা-কল্পনা ছিল। মঙ্গলপৃষ্ঠে দাগ দেখে (দূরবীনের সাহায্যে) অনেকে মনে করতেন, সেগুলি পৃথিবীর খালবিলের মতো এবং সেখানে মানুষের মতো কোনো জীবের সন্ধান হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মঙ্গলগ্রহ অভিমুখে প্রেরিত দুটি মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার—৬ এবং মেরিনার—৭ সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি গিয়ে যে সব তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে তা থেকে এই ধারণার সমর্থন মেলে নি।

ক্যালিফোর্নিয়ার পাসাডেন গবেষণাগারে মেরিনার—৬ এবং মেরিনার—৭ প্রেরিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলগ্রহের বিষুবরেখা অঞ্চলে নীলাভ মেঘপুঞ্জের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় নি। সেখানে নদীনালা, খালবিল নেই, সমুদ্র নেই, পাহাড় নেই এবং কোনোদিন ছিল না। মঙ্গলের সারা অঙ্গ জুড়ে আছে শুধু গভীর-অগভীর খাদ। মঙ্গলপৃষ্ঠে তৃণলতা বা গুল্মেরও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

পৃথিবীতে জীবন বলতে আমরা যা বুঝি তার মৌল উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন। কিন্তু নাইট্রোজেনের বিন্দুমাত্র অস্তিত্বও মঙ্গলের বাষ্পমণ্ডলের ঊর্ধ্ব বা মধ্য স্তরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে নিম্নতর বাষ্পস্তরে জলীয় বাষ্প এবং জমাট জলের অতি ক্ষীণ প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মেরিনার—৬ মঙ্গলের বিষুবরেখা এলাকার উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে, কিন্তু সেখানে কোনো মেঘ দেখতে পায়নি। পৃথিবী থেকে দূরবীনে মঙ্গলের চার পাশে যে নীলাভ মেঘচ্ছায়া দেখা যায়, কাছে গিয়ে তার কোনো অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মঙ্গলের সারা দেহ জুড়ে খালের মতো যে সব অস্পষ্ট দাগ দেখা যায়, মাত্র দু হাজার মাইল দূরে থেকে সেগুলি দেখে মেরিনার—৬ জানিয়েছে সেগুলি মঙ্গলপৃষ্ঠে রঙিন ছায়ামাত্র।

মঙ্গলের বেতার-চিত্র গবেষণার ভারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী রবার্ট লেটন বলেছেন, মঙ্গলে খাল বিল নদীনালা নেই, পাহাড় নেই, উপত্যকা নেই, আছে শুধু গভীর-অগভীর গোলাকার খাদ। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন মঙ্গলগ্রহ কোনোদিনই জলে ঢাকা ছিল না।

মেরিনার—৭ মহাকাশযানও মঙ্গলের আকাশে পৌঁচেছে। কিন্তু একটি উল্কার আঘাতে তার কর্মশক্তি কিছু কমে গেছে। তা সত্ত্বেও সে মঙ্গল সম্পর্কে তথ্যাদি পৃথিবীতে পাঠাচ্ছে।

মেরিনার—৬ এবং মেরিনার—৭ মহাকাশযান কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে এতদিন যে ধারণা মানুষ পোষণ করে এসেছিল তা মিথ্যা।

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা সভা

সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইঞ্জিনীয়ার্স-এর সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে দুদিন ব্যাপী আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাহিত্যের সমস্যা, উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে দুদিন আলোচনা হয়, প্রথম দিন ইংরেজিতে এবং দ্বিতীয় দিন বাংলা ভাষায়। প্রথম দিনের সভায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী ইউ পি মল্লিক, বলরাম বসু, সুধাংশু চৌধুরী ও অমূল্যধন দেব এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীক্ষোনীশ রায়। দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রামদুলাল চক্রবর্তী, সুধাংশু চৌধুরী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি কে খাঁ ও সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করেন শ্রীনারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)। দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় অধিকাংশ বক্তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং কারিগরী বৃত্তিতে নিযুক্ত অল্প শিক্ষিতদের জন্যে বাংলা ভাষায় প্রযুক্তিবিদ্যার নানা শাখার পুস্তক প্রকাশের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানে কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা এবং যন্ত্রপাতি ও বাড়িঘরের নকশা বাংলা ভাষায় তৈরী করার যে শুভ প্রচেষ্টা চলছে তা উল্লেখিত হয়।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডাঃ সরিৎ মুখার্জি অস্থিবিশারদ অসীম ব্যানার্জীর সঙ্গে নারানদাস অ্যাডভানীর কেসটা করছে। অ্যাকসিডেণ্ট কেসে এ-ধরনের চোট অনেক হয়ে থাকে। কিন্তু নারানদাসের কেসটা একটু অন্য ধরনের। নারানদাসের শুধু হাড় ভাঙেনি, তার সঙ্গে তার মনও ভেঙেছে। বয়স হলে দেহের সঙ্গে মনের জোরও কমে যায়—সে-কথা নারানদাস বা ডাক্তারদের অগোচর নয়। কিন্তু এছাড়া নারানদাসের আরও একটা পুরানো ব্যাধি আছে—হাঁপানি। যে-কারণে অস্থিবিশারদ ছাড়া ডাঃ সরিৎ মুখার্জিকেও রোজ হাজির হতে হয় নারানদাসের শ্বাসকষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে। নারানদাস আজ একটু সুস্থবোধ করছেন। সরিৎ ঘরে ঢুকতে তাকে আহ্বান জানালেন। বললেন, আসুন ডাক্তারসাব। আজ আমি অনেক ভাল আছি। আপনাদের চেষ্টার সুফল পেয়েছি। এইজন্যই সারা ভারতবর্ষেই বাঙালী ডাক্তারদের সুনাম আছে। তাঁদের মাথা যেমন সাফ, হৃদয়ও তেমনি কোমল। কথাটা শুনে হাসল সরিৎ। তারপর বলল—আমার স্ত্রী কিন্তু সে-কথা মানেন না। তিনিও দিল্লীর মেয়ে।

বাঙালী?

না, পাঞ্জাবী, দীনা স্বরূপ।

কি নাম বললেন? উত্তেজিত হয়ে উঠলেন নারানদাস অ্যাডভানী।

দীনা স্বরূপ—আবার নামটা বলল সরিৎ—চেনেন?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন নারানদাস, তারপর সরিতের একটা হাত ধরে শান্তকণ্ঠে বললেন, দীনা, আমার মেয়ের চেয়েও আপনার। সে যে আমার কি তা আপনাকে কি করে বোঝাব।

আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন—জিজ্ঞাসা করল সরিৎ।

মাথা নাড়লেন নারানদাস। তারপর স্নিগ্ধস্বরে বললেন—না, এতবড় আনন্দ-সংবাদ আমি অনেকদিন পাইনি। দীনাকে কতদিন দেখিনি। তাকে একবার সময়মত পাঠিয়ে দেবেন?

দেব। আপনি একটু শান্ত হয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আমি আসছি।

সরিৎ ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা টেলিফোন বুথে ঢুকে নার্সিং হোমে ডায়াল করল।

রাকেশ অ্যাডভানীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা শেষ করার পর দীনা হঠাৎ অসুস্থ বোধ করল। ডাক্তার হিসাবে তার শিক্ষা আর কাজ দুটোই তাকে সংযত থাকার মত শক্তি দিয়েছে। সমস্ত জিনিসই সে স্থিরভাবে ভাবতে বা করতে শিখেছে বটে কিন্তু এক্ষেত্রে তার মানসিক আলোড়নের প্রচণ্ডতা তাকে অকস্মাৎ বিচলিত করে তুলেছে। তাই কথা শেষ করার পরই সে অপারেশন থিয়েটারের পাশে ছোট ঘরটায় গিয়ে সরিতের ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা হচ্ছে তার। দেহের ঠিক কোন্ জায়গায়, তা সে বুঝতে পারছে না। সমস্ত মাথাটা প্রকাণ্ড সাঁড়াশি দিয়ে কে যেন সবলে টিপে ধরে কাছে। বুকের ভেতর থেকে একটা কম্পনের স্রোত গলা দিয়ে উঠে আসতে চাইছে ওপরের দিকে। অক্ষি-কোটরের তীব্র যন্ত্রণাটা তার দৃষ্টিশক্তিকে ব্যাহত করছে অনবরত। দুর্দমনীয় বমনেচ্ছায় তার অন্ত্র আর পাকস্থলী প্রচণ্ড সঙ্কোচনে শ্বাসরুদ্ধ করে তুলল। তাড়াতাড়ি বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বাথরুমে যাবার মত অবসর পেল না সে। মুখেচোখে অঞ্জলি ভরে জল দিল দীনা। মুখটা পাশে টাঙানো তোয়ালেতে মুছতে লাগল ধীরে ধীরে। সরিৎ এই তোয়ালেটা ব্যবহার করে। শেভিং-ক্রীম আর আফটার শেভ লোশনের মৃদু গন্ধটা হঠাৎ নাকে এল দীনার। তোয়ালেটা মুখে লেপটে ধরে রইল সে। সরিৎকে যেন সে অন্তরঙ্গভাবে নিকটে পেয়েছে। সরিতের বলিষ্ঠ বাহু তাকে যেন ঘিরে রয়েছে নিবিড় বন্ধনে। তার স্পর্শের উত্তাপটা অনুভব করল দীনা। কয়েকবার

জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে মুখ থেকে তোয়ালেটা সরিয়ে নিল সে। দেয়ালে টাঙানো আরশির দিকে তাকিয়ে কি মনে করে হেসে ফেলল ডাঃ দীনা মুখার্জি। এখনও ক্লান্তি রয়েছে, তার হাত-পায়ের স্বাভাবিক জোর ফিরে আসেনি। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে নিজের কানের মধ্যে বারবার। আবার ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল সে। ফোনটা বেজে উঠল আবার তীব্র ঝনৎকারে। দীনা সোজা হয়ে উঠে বসে পড়ল। তার সর্বাঙ্গের মাংসপেশী এক নিমিষে টান হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে রাকেশ অ্যাডভানীর শাসানীর হিংস্র হিস্-হিস্ শব্দটাও শোনা গেল যেন।

একটু পরেই কেতকীকে দেখা গেল। দূরে থেকে আসছে সে।

আবার কি?

আপনাকে ডাঃ মুখার্জি টেলিফোনে ডাকছেন—বললে কেতকী।

যাচ্ছি, আমায় একগ্লাস জল খাওয়াবে কেতকী। গলার স্বরে তফাৎ লক্ষ্য করে দীনার মুখের দিকে ভাল করে দেখল কেতকী। তারপর স্নিগ্ধ মুখে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল দীনাকে দিয়ে বলল—

শরীর খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ, একটু যেন মাথাটা ঘুরে উঠল। বোধহয় গ্যাসট্রাইটিস—হাসিমুখে তাকাল দীনা। তারপর চেয়ার থেকে উঠে বলল—তুমি বারো নম্বরকে রেডি কর—আমি আসছি।

টেলিফোনটা কানে তুলে দীনা বলল—

হ্যালো, আমি দীনা।

এত দেরী হ'ল যে, কি করছিলে?

তোমার ধ্যান।

বিশ্বাস করি না, সেটা বছর খানেক আগেই শেষ হয়েছে। হাসি মুখে উত্তর দিল সরিৎ।

না, এখনও বিপদে পড়লে করি। ও কথা থাক, হঠাৎ ফোন করলে কেন, লাঞ্চে আসবে ত।

যাব, তবে তার আগে তোমায় একবার এখানে আসতে হবে।

এখানে মানে?

ডাঃ ব্যানার্জীর নারসিং হোমে। দিল্লীর নারানদাস অ্যাডভানী-কে একবার দেখতে এস। ভদ্রলোক তোমায় খুব স্নেহ করেন।

একটু চুপ করে রইল দীনা তারপর বলল—আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

তাহ'লে আমি এখানে অপেক্ষা করছি। এক সঙ্গে ফেরা যাবে, কেমন? কি, চুপ করে কেন?

কেমন, কেমন, একটা ভাল কথাও বলতে জানো না, হাঁদা—কপট রাগে রিসিভারটা রেখে দিল দীনা। এই সময়ে একটু প্রীতিসম্ভাষণ পেলে, ভাল লাগত দীনার।

সরিৎ টেলিফোন করে ফিরে এসে নারানদাসের কাছে বসল। হঠাৎ তাকে যেন খুব আপনার বলে মনে হ'ল তার।

আপনি হয়ত আশ্চর্য হয়েছেন আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে। কিন্তু একটি ছোট মেয়ে অপরের সংসারকে কিভাবে বাঁচিয়েছে তার ইতিহাস শুনলে আপনি হয়ত কিছুটা বুঝবেন,

দেশবিভাগের তাণ্ডবের পর—নারানদাস বলতে শুরু করলেন—আমরা যখন দিল্লীর ক্যাম্পে মাথা গোঁজার মত জায়গা পেলাম তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। কিন্তু দয়ার অন্ন আর কতদিন খাওয়া যায়। তাই কিছুদিন পরেই বেরিয়ে পড়লাম ভাগ্যের অন্বেষণে। একটা চাকা লাগানো বাক্সে কাপড় নিয়ে বিক্রী করতে আরম্ভ করে দিলাম। প্রথমে একটু অসুবিধা হয়েছিল তারপর সহ্য হয়ে গেল। ধীরে ধীরে অল্প থেকে শুরু করে আর একটা বড় ব্যবসা মানে কাপড়ের একটা ছোট দোকান দিলাম। এখন আমাদের সংসারে তিনজন প্রাণী—আমি, আমার স্ত্রী আর এক ছেলে রাকেশ। তখন ওর বয়স প্রায় কুড়ি বছর। আমি আশা করেছিলাম, যে ও আমায় সাহায্য করবে কিন্তু তা করল না। কুসংসর্গে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল একেবারে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁফিয়ে পড়লেন নারানদাস। সরিৎ বলল—আপনার কষ্ট হচ্ছে—আপনি বরঞ্চ একটু চুপ করে বিশ্রাম নিন। সে-কথায় কান না দিয়ে নারানদাস বলতে লাগলেন, তারপর ক্যাম্প থেকে একটা ছোট বাড়ীতে উঠে গেলাম। তার পাশেই দীনাদের বাড়ী। ঠিক এই সময় আমার স্ত্রীর অসুখ হল, সাংঘাতিক অসুখ। রাকেশের সঙ্গে আমাদের তখন প্রায় সম্পর্ক নেই বললেই চলে। কখন সে বাড়ীতে আসে, কখন যায়, কি করে কিছুই জানি না। তবে সেই সময় থেকেই তার নিষ্ঠুর স্বভাবের পরিচয় পেলাম। আমাদের শুধু যে অগ্রাহ্য করত তা নয়, নানাভাবে লাঞ্ছিত করত পদে পদে। রুগ্ন মায়ের সেবা করা দূরের কথা, রোগশয্যায় তাকে যন্ত্রণা দিয়ে পৈশাচিক আনন্দ পেত সে। ইতিমধ্যে সব কদর্য অভ্যাসই রাকেশ আয়ত্ত করেছে বলে শুনেছি। আমার জমানো টাকা, মায়ের গহনা সবদিকেই তার নজর গেল। রোজগারের জন্য আমায় কঠিন পরিশ্রম করতে হত, তার ওপর ঘরে রুগ্ন স্ত্রী। কোন্‌দিকে দেখব, কি করব কিছুই ঠিক করতে পারলাম না—একেবারে দিশাহারা অবস্থা—এমন সময় ছোট্ট মেয়ে দীনা এল—ভগবানের আশীর্বাদের মত। সব ভার তুলে নিল নিজের ছোট কাঁধের ওপর।

বাবুজী, দীনা এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে।

দীনা, বেটী—নারানদাস অশক্ত হাতটা বাড়ালেন তার দিকে। চোখের কোণে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

কেতকীর পেটের যন্ত্রণাটা আজকাল প্রায়ই হচ্ছে। একটু আগেই সে যন্ত্রণা-নিবারক ট্যাবলেট খেয়েছে। তাতেও বিশেষ ফল হয়নি। অথচ একটু পরেই তাকে অপারেশন থিয়েটার'র সাজসরঞ্জাম সাজিয়ে ফেলতে হবে, তা না হলে অপারেশন পিছিয়ে যাবে। দেরী হলে শুধু রোগীর ক্ষতি নয় তাকেও ছোট হয়ে যেতে হবে সরিতের কাছে। তার জীবনে এইটেই সবচেয়ে বড় সম্পদ। তার নিখুঁত কাজের মূল্য নিরূপণ একমাত্র সরিৎই করতে পারে। দীনাও নয়, এমনকি অন্য কোন সার্জনও নয়। অপারেশনের সময় প্রয়োজনের সামান্য তারতম্য সে বুঝতে পারে। সার্জনকে বলে দিতে হয় না কোন্ যন্ত্রের বদলে কোন্‌টা এগিয়ে দিতে হবে। সরিৎ তার কাজের সুখ্যাতি করে না। শুধু তার দিকে একবার তাকায়। অপারেশনের সময় তারা সকলই মুখে আর নাকে মাস্ক পরে থাকে। তাই সরিতের হাসিটা সে লক্ষ্য করতে পারে না, তবে হাসিটা তার খুব পরিচিত। সরিৎ যখন হাসে, তখন গালের দুপাশে ছোট্ট টোল পড়ে মেয়েদের মত। থুতনির ঠিক মাঝেও ঐ ধরনের চাপা ভাব আছে তার। সনতের মুখটাও মনে পড়ে গেল কেতকীর। সনতের মুখের গঠনও একই ধরনের। দুই ভাই-এর অত সাদৃশ্য, অথচ কত তফাৎ! সরিৎ ডাক্তার হতে পারল অথচ সনৎ কেন সামান্য চাকুরে হয়ে জীবন কাটাচ্ছে। বিকলাঙ্গ বলে? কিন্তু সেটা ত এমন কিছু মারাত্মক নয়। সনতের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটা কেতকীর মনে পড়ল আবার। কেতকী আরশিতে নিজের প্রতিচ্ছবি ভালভাবে নিরীক্ষণ করল। তার মুখটা একটু শীর্ণ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ লক্ষ্য করল কেতকী তার যন্ত্রণাটা আর সে অনুভব করছে না। একটু হাসল সে। সরিৎ আর সনতের কথা ভাবতে ভাবতে তার দৈহিক ক্লেশের কথা সে একদম ভুলে গিয়েছে। পাটভাঙা শাড়ীটা নিখুঁত ভাঁজ দিয়ে পরে নিল সে। তারপর শক্ত ইস্তিরি-করা অ্যাপ্রন আর মাথার টুপি পরে তার পরিপাটী সজ্জা আর প্রসাধন শেষ করল সাচ্ছন্দ্য ভঙ্গীতে। আবার বড় আরশির সামনে দাঁড়াল কেতকী। ভালই লাগল নিজেকে। সে দীনার চেয়েই বা কম কি? দীনার মতই গায়ের রং আর লম্বা ধরনের গড়ন তার। কিন্তু পাঞ্জাবী মেয়ে বাঙালীর লালিত্য পাবে কোথায়? দীনার মত সাচ্ছন্দ্য, পরিচর্যা আর অনায়াসলব্ধ বিলাসের আরাম পেলে তার চেহারার চটক অনেককেই ছাড়িয়ে যেত। কেতকীর মনে পড়ল—অনেকদিন আগে দীনা সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় একটা শাড়ী পরেছিল। হাল্কা সবুজের উপর ফুলের প্রিণ্ট। খুব পছন্দ হয়েছিল কেতকীর। ঠিক ঐ ধরনের একটা শাড়ী সে কিনবে। সামনের মাসে ড্রিমল্যাণ্ড নারসিং হোমের অ্যানিভারসারী ডে। সেদিনই তার শাড়ীটার প্রয়োজন। সুন্দরভাবে সেজে সে দেখিয়ে দেবে দীনার চেয়ে সে কিছু কম নয়। একজন সাধারণ নার্সও ডাক্তারের সমকক্ষ হতে পারে। মনে মনে সনতের সঙ্গে নিজের তুলনা করল কেতকী। সনতেরও তারই মত অবস্থা। বড়লোক কৃতী ডাক্তার ভাই-এর পাশে থেকে কেতকীর মত যন্ত্রণা পায় অহরহ। সমস্ত জিনিসটা তার চোখের সামনে ছায়াছবির মত ফুটে উঠল স্পষ্টভাবে। এক নিমেষে কেতকীর সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে উঠল, মুখ রক্তবর্ণ হয়ে নাসারন্ধ্র স্ফীত হল—বিষের যন্ত্রণায় কেতকীর চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দাঁতে দাঁত চেপে কিছুক্ষণের জন্য স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর পাশের চেয়ারে গিয়ে বসে রইল চুপ করে।

একটু পরে সম্বিৎ ফিরতে কেতকী ঘরের দরজাটা বন্ধ করে নারসিং হোমের দিকে এগিয়ে গেল: লনের পাশ দিয়ে যাবার সময় অদূরে সনৎকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে তাকে সাদর সম্ভাষণ করল।

আপনার কথাই ভাবছিলাম—বলল কেতকী।

আমার কথা! কেতকীর উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখ দেখে পুলকিত হল সনৎ।

হ্যাঁ। আজ কোন্ ডিউটি, অফিসিয়াল, না স্পাইং? কপট গাম্ভীর্যে প্রশ্ন করল কেতকী।

হেসে ফেলল সনৎ। তারপর নিম্নস্বরে বলল—সত্যি কথা বলতে কি, আজ আমার কোন ডিউটিই নেই।

খুব ভাল, আপনি ওপরে গিয়ে বসুন, আমি মালতীদির সঙ্গে একবার দেখা করে এখুনি যাচ্ছি। কেতকী চলে গেল কিচেনের দিকে, কয়েকটা স্পেশাল ডায়েটের কথা বলার আছে তার। মিসেস্ পোচকানওয়ালা আবার ঝামেলা লাগিয়েছেন, হোটেলের খাবারও তাঁর ভাল লাগছে না এখন। কয়েকটা এয়ারলাইনসের মেনু থেকে অদ্ভুত অদ্ভুত নামের খাবারের বায়না দিয়েছেন তিনি। মালতীদি কিংবা কেতকী কেউই তার হদিশ করতে পারেনি। দীনা কিন্তু শেষ-পর্যন্ত ম্যানেজ করেছে জিনিসটা। মিসেস্ পোচকানওয়ালাকে আকাশে তুলে দিয়ে দিশী খাবার রকমফের করে তাঁর অনুমোদন আদায় করেছে শেষপর্যন্ত। কেতকী সেটার তদ্বির করতে চলে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সনৎ কেতকীর কথাই ভাবছিল। কেতকীর মনমাতানো হাসির সৌন্দর্য সনৎকে বিহ্বল করে করে তুলেছে। এ-ধরনের অনুভূতি তার জীবনে এই প্রথম। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল সনতের। এদিন সে শুধু কেতকীর কথাই চিন্তা করেছে—শুধু চিন্তা নয়, তাকে যেন কেতকী মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছে এই অল্প সময়ের মধ্যে। সনৎ ওপরের ছোট ঘরের পাশে করিডরে চেয়ারে গিয়ে বসল। তার পায়ের আওয়াজটা আজ একটু জোরেই শুনতে পেল সকলে। অন্যদিন সে খুব সন্তর্পণে চলে যাতে তার পঙ্গুতার নিদর্শন কেউ ধরতে না পারে। সেই সতর্কতার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেনি আজ সে। একটু পরে কেতকী উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে। সনৎ মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেতকীর দিকে। কাছে এসে কেতকী মৃদুস্বরে বলল—একটু বসুন, আমি আসছি। কথাগুলো এত অন্তরঙ্গভাবে উচ্চারণ করল কেতকী যেন সে কোন গোপন কথা বলছে। অভিভূত হয়ে পড়ল সনৎ মুখার্জি। কফির পেয়ালা হাতে একটু পরেই ফিরে এল কেতকী। তারপর সনতের দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল, আজ আমি ভাবিনি, আপনি আসবেন।

কেন? সনৎ তাকাল তারদিকে।

আজও অফিস আছে আপনার, তাই না?

হ্যাঁ তা আছে, কিন্তু—

ফাঁকি দিয়েছেন এই তো। সঙ্গে সঙ্গে বলল কেতকী।

তা দিয়েছি। বিব্রতভাবে হাসল সনৎ।

কামাই করার কারণটা কেতকী ধরে ফেলেছে বলে মনে হল তার।

আজ তা হলে অনেক গল্প করা যাবে, কেমন? কেতকীর মুখে দুষ্টু হাসি। নারসিংহোমের কাজ বন্ধ করে?

না, তা কেন, আপনি নীচে অফিসে বসে ততক্ষণ কাজ করুন, অপারেশন হয়ে গেলে আবার উঠে আসবেন। তার আগে এক কাপ কফি খেয়ে নিন। কথাটা শেষ করে কেতকী হাসিমুখে ছোট ঘরটায় ঢুকল। অভিভূত হয়ে পড়ল সনৎ। এ ক'দিন আগেই কেতকীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। কিন্তু এ ক'দিনের মধ্যেই এ ধরনের পার্থক্য সে কল্পনাও করতে পারেনি। অনেক লোকের সঙ্গে কেতকী মিশেছে। সুতরাং মানুষের মনের খবর তার কাছে গোপন করে রাখা শক্ত। ডাক্তারের মত নার্সেরও সে সুবিধা আছে। কিন্তু হঠাৎ তার মত একজন নিঃস্ব পঙ্গু লোকের সঙ্গে কেতকী হৃদ্যতা করছে কেন, সে কথা চিন্তা করতে সনৎ ভয় পেল। কিছুক্ষণ পরে কেতকী ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সনৎ বলল, কি হয়েছে আপনার? কোন উত্তর দিল না কেতকী শুধু মাথাটা নেড়ে জানাল যে তার কিছু হয়নি। একটু পরেই সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল হলের দিকে। সনৎ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। কফিটা শেষ করে সে অফিস ঘরে নেমে গেল ধীরে ধীরে। বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে সনৎ।

যন্ত্রণাটা কেতকীর মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আবার। এত ঘন ঘন যন্ত্রণা তার আগে হত না। যন্ত্রণার মধ্যে বিরতি থাকত তখন। তার মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিত। কফি তৈরী করার সময়ই ব্যথাটা আবার শুরু হয়েছিল কিন্তু গ্রাহ্য করেনি সে। ভেবেছিল একটু পরেই আবার মিলিয়ে যাবে সেটা। তাই সাহস করে সে আবার এগিয়ে এসেছিল সনতের দিকে, কিন্তু তা হয়নি। কেতকী যন্ত্রণার বজ্রনিষ্পেষণে অস্থির হয়ে পড়েছিল অকস্মাৎ। শ্বাসরুদ্ধ করে সে অপারেশন থিয়েটারের ভিতর ঢুকে ছোট টুলের উপর বসে পড়ল। ঘামে চুলের একটা গুচ্ছ আটকে রইল কপালে—যন্ত্রণায় মুখটা নীল হয়ে হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। অ্যাপ্রনের পকেট থেকে দুটো ট্যাবলেট একসঙ্গে মুখে দিল সে। দীনার গাড়ীর আওয়াজে তার সম্বিৎ ফিরল। সামনের টেবিলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল কেতকী। সমস্ত শরীরটা তার তখনও ঝিমঝিম করছে কিন্তু ব্যথাটা কমে আসছে মন্থরগতিতে। হাত ধুয়ে স্টেরি-লাইজড যন্ত্রগুলো সাজিয়ে ফেলল কেতকী পরিপাটিভাবে। এতে তার ভুল হয় না, কোন খুঁত থাকে না। কোন্ কেসে কোন্ যন্ত্রের প্রয়োজন তা সে মুহূর্তের মধ্যে রেডি করে দিতে পারে।

দীনা ড্রাইভারকে কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে করিডরে উঠে অফিসঘরের দিকে তাকাতেই সনৎকে দেখতে পেয়ে একটু আশ্চর্য হল।

ছোড়দা—ডাকল দীনা, তুমি আজ অফিস যাওনি?

না; শরীরটা কেমন যেন—আমতা আমতা করল সনৎ।

হেসে ফেলল দীনা, তারপর বলল—তোমার শরীরে অসুখের কোন চিহ্ন নেই, তবে মনে যদি সেটা থাকে তাহলে আলাদা কথা। তবে তুমি যে অফিস পালিয়েছ তার জন্য আমি খুশী হয়েছি।

কেন?

তোমার জন্য আরবী পাকোড়া রাঁধব, তারপর দুজনে বেড়াতে যাব—শেষের কথাটা খুব আস্তে উচ্চারণ করল দীনা।

বৌদি—সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সনৎ। হেসে উঠল দীনা, বলল—এনগেজমেণ্ট আছে বুঝি, দুজনে অফিস পালিয়ে যাবে কোথাও।

না—না—না—তোতলা হয়ে যায় সনৎ।

তোমার সঙ্গে কথা বললে মনটা হালকা হয়ে যায় ছোড়দা, এতক্ষণ ভারী হয়েছিল বুকটা। কথাটা বলে ওপরে উঠে গেল দীনা, অপারেশন আছে তার। ওপরতলায় উঠে হঠাৎ তার চোখ পড়ল অপারেশন থিয়েটারের ভেতর। কেতকী স্থির হয়ে বসে রয়েছে টুলের উপর।

কী হয়েছে কেতকী? জিজ্ঞাসা করল দীনা।

না, কিছু নয়, শরীরটা ভাল লাগছে না।

আমিও লক্ষ্য করেছি কিছুদিন হল তুমি যেন রোগা হয়ে যাচ্ছ।

খাওয়া কমিয়েছি তাই—ব্যথার কথাটা সে দীনাকে বলবে না কিছুতেই।

স্লিম হচ্ছ?

—ক্রমশঃ

মানুষগড়ার ইতিকথা

জানেন বেহালা শিক্ষায়তন নামে কোন স্কুল বেহালায় নেই। বেহালা মিউনিসিপ্যালিটি আছে, অবশ্য পুরোনো নামে—সাউথ সাবারবন মিউনিসিপ্যালিটি। অথচ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোথাও ঐ স্কুলটির নাম আমি পাই নি ১৯৬১ সালের ২৪ পরগণা ডিসট্রিকট সেনসাস হ্যান্ডবুকে। কত দামী দামী তথ্যে হ্যান্ডবুক ঠাসা—যেমন মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা মোট ৯১·৭৩ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা এক লক্ষ পঁচাশী হাজার আটশো এগারো, বাড়ির সংখ্যা ত্রিশ হাজার তিনশো ছেষট্টি, শিক্ষিত পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা যথাক্রমে ছেষট্টি হাজার সাতশো একান্ন ও একচল্লিশ হাজার তিনশো ষোল। এছাড়াও মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় ওয়ার্ড অনুযায়ী বিভিন্ন হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা বর্ষ ও অনুমোদন তারিখ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। নেই শুধু কয়েকটি স্কুলের নাম, যাদের জন্ম এ শতাব্দীতে নয় গত শতাব্দীতে, যার মধ্যে দুটি বয়সে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়েও পুরোনো। সেই হতভাগ্য স্কুলগুলির নাম তাবৎ বেহালাবাসী জানেন, জানতেন না শুধু একষট্টির সেনসাস গণনাকারীরা। হয়তো এও হতে পারে যে সেনসাস গণনাকারীদের এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে শুধুমাত্র বর্তমান শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির নাম ধাম যোগাড় করলেই চলবে, মান্ধাতার আমলের পুরোনো স্কুলগুলির প্রয়োজন দ্রুত অপসৃয়মান কালের সঙ্গেই ফুরিয়েছে বলে তাদের নাম উল্লেখ করার মত জায়গা আর হ্যান্ডবুকে হয় নি। কিন্তু বড়িশা হাইস্কুল, বেহালা হাইস্কুল বা বেহালা শিক্ষায়তন শুধুমাত্র কয়েকটি স্কুল নয়, আধুনিক বেহালা-বড়িশার জন্মবীজ নিহিত ছিল এই স্কুলগুলির ভেতরে। এ সত্যটুকু জানা ছিল বলেই হ্যান্ডবুকের ৬৪৭তম পৃষ্ঠার সংখ্যাতত্ত্বেই হতাশ না হয়েই ছুটে গিয়েছিলাম বেহালায়—বেহালা শিক্ষায়তনে।

তারাতলা ছাড়িয়ে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে খানকয়েক স্টপ দক্ষিণে গেলেই কনডাক্টরের গুরুগম্ভীর সতর্কবাণী যাত্রীদের কানে ভেসে আসে—থানা, বেহালা থানা। নাম নাম এখানেই নাম। বাস থেকে নেমে জলকাদার হাত থেকে বাঁচার জন্য রাস্তার উপর উপচে পড়া পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানের ঝাঁপির তলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। দোকানের পাশেই বেহালা থানা। উত্তর দক্ষিণ যে দিকেই তাকাই অন্তহীন নরক। বর্ষাকালে তারাতলার মোড় থেকে বেহালা ট্রাম ডিপো এই পথটুকু হেঁটে পার হওয়ার মত কোন দুঃসাহসী ডিউক-পিনাকীকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে। অথচ বেহালা মিউনিসিপ্যালিটির মেরুদণ্ড এই রাজপথ। মেরুদণ্ডের যদি এই হাল হয় তাহলে মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা আজ কি অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু ছিয়ানব্বই বছর আগে অবস্থা এমন ছিল না। তখন সদ্য গড়ে ওঠা মিউনিসিপ্যালিটির চেষ্টা ছিল, ইচ্ছা ছিল। তখন অন্তত বেহালা অঞ্চলের জন্য টাকা ব্যয় করতে মিউনিসিপ্যালিটির যে আগ্রহ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতে : "আমি সোমপ্রকাশের কার্যভার হাতে লইয়াই দেখিতে পাইলাম যে, রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি গ্রামগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তী বেহালা প্রভৃতি গ্রামের সহিত এক মিউনিসিপ্যালিটিতে আবদ্ধ হইয়াছে। তদবধি প্রায় দশ বৎসরকাল হরিনাভি, রাজপুর, চাঙ্গরিপোতা প্রভৃতি গ্রামের প্রজাগণ রীতিমত মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে, যথাসময়ে ট্যাক্স না দিলে তাহাদের ঘটিবাটি নিলাম হইতেছে, কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের অনেক রাস্তাতে একমুঠা মাটি পড়ে নাই; এমন

বেহালা শিক্ষায়তন

কি এই দীর্ঘকালে অনেক নরদামা হইতে একমুঠো মাটি তোলা হয় নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে বেহালা ও তৎসন্নিকটবর্তী স্থানের লোক অধিক হওয়াতে, অধিকাংশ টাকা সেইদিকেই ব্যয় হইতেছে।"

তবু তো একশো বছর আগে বড় ছেলের ভাগেই মাছের মুড়ো পড়ত, একান্নবর্তী পরিবারে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু হলেও অন্তত রোজগেরে বড় ভাই যাতে খেয়ে পরে স্বাস্থ্য বজায় রাখে সেদিকে পরিবারের কর্তাদের নজর ছিল। কিন্তু একশো বছরে জয়েন্ট ফ্যামিলি যেমন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছে, রাজপুর, হরিনাভি, চাঙ্গরিপোতা, গার্ডেনরীচ, টালিগঞ্জ সব আলাদা হয়ে যাওয়ায় বেহালারও হাল-হালৎ গেছে বদলে। মজার ব্যাপার বেহালার আপাত অপরিচ্ছন্নতার পঙ্কেই ফুটেছে শিক্ষার শতদল পদ্ম। সেই পদ্মের বীজ আজ বেহালার প্রতিটি ঘরেই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রথম কে বা কারা সেই বীজ পুঁতেছিলেন?

চোখ থেকে পুরু চশমাটা খুলে টেবিলে রাখলেন প্রশান্তবাবু। প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়, বেহালা শিক্ষায়তনের বর্তমান প্রধান শিক্ষক। সাতচল্লিশ সাল থেকে এই স্কুলে পড়াচ্ছেন প্রশান্তবাবু। আজ থেকে বাইশ বছর আগে তদানীন্তন হেডমাষ্টার গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আদেশে মাত্র চৌদ্দ টাকা মাইনে আর ছ টাকা মহার্ঘভাতা সম্বল করে পড়াতে এসেছিলেন প্রশান্তবাবু। আদেশ কেন? বা! গোপালবাবুর কাছেই যে উনি পড়েছেন এই স্কুলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুর বছরগুলিতে। তিনি আদেশ করবেন না ত কে করবেন? বিশ বছরে যে স্কুলে ঢুকেছিলেন সেখানেই কেটেছে আরো বাইশ বছর। এই বাইশ বছরে এই স্কুল তাঁর অস্থি-মজ্জা-শোণিতে মিশে গেছে। কারণ এই শিক্ষাই তিনি ও তাঁর পুরোনো সহকর্মীরা পেয়েছিলেন গোপালবাবুর কাছে। ধুতি পাঞ্জাবির আড়ালে পাতলা ছিপছিপে মানুষটাকে দেখলে আন্দাজ করা যায় না যে কতখানি ভালবাসা ঐ কৃশদেহে লুকিয়ে আছে এই স্কুলের জন্য। আমার প্রশ্নের জবাবে সেই ভালবাসার নদী যেন উত্তাল হয়ে উঠল। শুরু হোল স্কুলের ইতিহাস পরিক্রমা।

সোয়াশ বছর আগের কথা। তখন এদেশে কোম্পানীরাজ কায়েমীভাবে রাজত্ব চালাচ্ছে। রাজধানী কলকাতা তখন জমজমাট। কলকারখানা, অফিস-কাছারী, স্কুল-কলেজ রোজই বাড়ছে মহানগরীতে। অথচ দুয়ার হতে অদূরে বেহালায় তখন যেন নিষ্প্রদীপের মহড়া চলছে। স্কুল কলেজ দূরের কথা, সামান্য পাঠশালার অস্তিত্বও সে সময় এখানে খুঁজে পাওয়া যেত না। পল্লীর এই দুরবস্থা দূর করতেই এগিয়ে এসেছিলেন পণ্ডিত হরিহর শাস্ত্রী। নিজে পাঠশালা খুলে সেখানে গাঁয়ের ছেলেদের পড়াতেন। এভাবেই চলছিল। কিন্তু বেশীদিন নয়। কারণ অদূরে মহানগরীতে শিক্ষা আন্দোলন তখন এক নতুন মোড় নিয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার কোটালে বানের মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন আধুনিক বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মযোগী বিদ্যাসাগর। অনাদৃত অবহেলিত বাংলা শিক্ষার মরা গাঙে বান ডাকানোর মন্ত্র তিনি জানতেন। তিনি জানতেন ভিৎ শক্ত না হলে একদিন সামান্য ঝড়-ঝাপটায় পঞ্চাশ বছর ধরে গড়ে তোলা ইংরাজী শিক্ষার সাতমহলা বাড়ি ভেঙে পড়বেই। তাই তাঁরই পরামর্শে বাংলাদেশের প্রথম ছোটলাট হ্যালিডে এগিয়ে এসেছিলেন বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির কাজে।

হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে চিনতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই শিক্ষা সংসদের অধিকাংশ সদস্যের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়েই বিদ্যাসাগরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন বাংলা মডেল স্কুল খোলার ভার। ছোটলাটের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে ডি পি আই বিদ্যাসাগরকে ডেকে পাঠান এবং তাঁর সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। হ্যালিডের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির সহকারী ইনসপেকটরের পদে নিযুক্ত করা হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কাজ ছাড়াও, ১ মে ১৮৫৫ থেকে তিনি এই কাজের জন্য ২০০্ টাকা উপরি মাসিক বেতন পেতে থাকেন।

বাংলা শিক্ষা মানে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। পাঠসূচী বিদ্যাসাগরই স্থির করেছিলেন। যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে এই আদর্শ সামনে রেখেই নির্ধারিত হয়েছিল পাঠসূচী। ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান ছিল এই পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যাসাগর দায়িত্ব পেয়েই হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় কাজ শুরু করলেন। বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ শুরু করার তিন বছর পরে তিনি তাঁর রিপোর্টে লেখেন : "বাংলা দেশের মডেল-স্কুলগুলি প্রায় তিন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে স্কুলের বেশ আশাপ্রদ উন্নতি হয়েছে। ছাত্ররা সব বাংলা পাঠ্যপুস্তক পাঠ করেছে। বাংলা ভাষায় তাদের বেশ দখল আছে দেখেছি। প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ে তারা বেশ জ্ঞানলাভ করেছে।

যখন এই কাজ আরম্ভ করা হয় তখন অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে গ্রামের লোকেরা মডেল-স্কুলের মর্ম বুঝতে পারবে না। কিন্তু স্কুলের সাফল্য সেই সন্দেহ দূর করেছে। যে-সব গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সব গ্রামের ও তার আশপাশের গ্রামবাসীরা স্কুলগুলিকে আশীর্বাদ বলে মনে করে, এবং তার জন্য তারা সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। স্কুলগুলির যে যথেষ্ট সমাদর হয়েছে ছাত্রসংখ্যা দেখলে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।"

তার চেয়েও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়, বাংলার গ্রামাঞ্চল বিদ্যাসাগরীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তা ঐ সময়ে হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের বাইরে অন্যান্য জেলায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির সংখ্যা থেকে। বিদ্যাসাগরের এই রিপোর্ট পেশ করার দু বছর আগে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বছর আগে "বেহালা গ্রামের কতিপয় উৎসাহী কর্মীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইংরাজী ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু বিদ্যালয়' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।" স্কুলের শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকায় আজ থেকে তেরো বছর আগে তৎকালীন সম্পাদক বলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্কুলের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে এই লাইনটি লিখেছিলেন। হরিহর শাস্ত্রীর পাঠশালা যে অভাব পূরণে অসমর্থ ছিল, সেই অভাব মেটাতেই প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু বিদ্যালয়।

এই হিন্দু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল হোতা ছিলেন ব্রাহ্মনেতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'প্রিয়জন' বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। চাটুজ্যে মশাই তাঁর এই কাজে সহযোগী হিসাবে সেদিন যাঁদের পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়। চার চাটুজ্যের আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন বেহালার পুরোনো জমিদার হালদাররা। বর্তমান ডায়মণ্ডহারবার রোড ও বনমালী নস্কর রোডের মোড়ে বেহালা থানার উল্টোদিকে কালী ও শিবের মন্দির দুটির পাশে কয়েক কাঠা জায়গা তাঁরা স্কুলের জন্য দান করলেন। ঐ জমিতে চালাঘরে তিনজন ছাত্র ও চারজন শিক্ষক নিয়ে হিন্দু বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হল। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, ১৮৫৬-৫৭ সালে গোটা চব্বিশ পরগণায় সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরেজী ও বাংলা স্কুলের সংখ্যা সে সময় ছিল মোটে আটত্রিশ। এই আটত্রিশটি স্কুলে তখন পড়ত চার হাজার একচল্লিশটি ছাত্র। শুরুতে স্থানীয় অধিবাসীদের দানে স্কুলের ব্যয়ের একটা বড় অংশ নির্বাহ হত। বাকিটা আসত ছাত্র-বেতন থেকে। খুব পুরোনো রেকর্ড থেকে জানা যায় এ সময় ছাত্রপিছু মাসিক বেতন ছিল চার আনা।

দেখতে দেখতে চার-চারটে বছর কেটে গেল। এ সময়ের মধ্যে এদেশের শিক্ষা জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এনট্রান্স পরীক্ষা চালু হয়েছে, বিদ্যাসাগর স্পেশাল ইনসপেকটরের পদ ত্যাগ করেছেন। ডি পি আইয়ের সাহায্যের হাত শহর ছেড়ে গ্রামবাংলার স্কুলগুলোর দিকেও সামান্য প্রসারিত হয়েছে। হিন্দু বিদ্যালয় সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন পেশ করল। আবেদন মঞ্জুর হল তবে একটি শর্তে— স্কুলের নাম বদলাতে হবে। নামে কি এসে যায়। আগে স্কুল বাঁচুক, গাঁয়ের ঘরে ঘরে শিক্ষার সলতে জ্বলে উঠুক, তাহলেই প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। তাই তাঁরা সেদিন অতিসহজেই সরকারী শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। স্কুলের নামের আদি শব্দটি পাল্টে গেল। নতুন নাম হল বেহালা জ্ঞানাঙ্কুরার স্কুল। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে এই সাহায্যের পরিমাণ কত? তাহলে বলব মাত্র ছটি টাকা। মনে রাখা দরকার এই ছটি টাকার মূল্য তখন

নেহাৎ কম নয়। সে সময় সারা চব্বিশ পরগণায় মাত্র পঁয়ত্রিশটি বাংলা স্কুল এই সাহায্য পেত। স্কুলের সেক্রেটারী তখন যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যদুনাথ পাঁচ বছর সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁর পর স্কুলের সেক্রেটারী হন কেদারনাথ। বছর চারেক কেদারনাথ এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬৬ সালে যখন তিনি এই দায়িত্ব স্কুলের অপর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামের হাতে তুলে দেন তখন স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে বাহাত্তর। পাঁচজন শিক্ষক স্কুলে পড়াচ্ছেন।

সরকারী অনুমোদন ও সাহায্যপ্রাপ্তির পর প্রায় ষোল বছর কেটে গেছে। তখন স্কুলের সেক্রেটারী স্বয়ং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। বেচারাম ১৮৭৪ সালে শ্রীরামের কাছ থেকে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের দু বছরের মাথায় মাথায় ভার্নাকুলার স্কুল সরকারী অনুমোদন পেয়ে পরিণত হল মিডল ভার্নাকুলার স্কুলে. অর্থাৎ এবার থেকে ক্লাস সিকস পর্যন্ত ছেলেরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করবে। শিক্ষান্তে তারা বাংলা মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বসতে পারবে। এই নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের নাম আর একবার পাল্টাল। বেহালা ভার্নাকুলার স্কুলের নাম হল বেহালা মিডল ভার্নাকুলার স্কুল। চার শব্দের এই গালভরা নামটি কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে মুখে অনেক ছোট হয়ে উচ্চারিত হত—বাংলা স্কুল।

বাংলা স্কুলের ছাত্রসংখ্যা তখন অনেক বেড়েছে। প্রতিষ্ঠার কুড়ি বছর পরে ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে চার গুণেরও বেশী। চালাঘরে এত ছেলের জায়গা হয় না। তাই নতুন উদ্যোগ শুরু হল। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা এবার মন দিলেন স্কুলের নবরূপায়ণে। গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে—ভুল হল বেহালা তখন আর গ্রাম নয়। ভার্নাকুলার স্কুল মিডল ভার্নাকুলার স্কুলে পরিণত হওয়ার সাত বছর আগেই বেহালা, বড়িশা, রাজপুর, হরিনাভি, চাংগরিপোতা, গার্ডেনরীচ, টালিগঞ্জ নিয়ে গঠিত হয়েছে সাউথ সাবারবন মিউনিসিপ্যালিটি। তাই মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স পেয়ারদের বাড়ি ঘুরে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহ করে বেড়াতে লাগলেন বেচারাম। ছ বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠল। ১৮৮০ সালে হালদারদের দেওয়া জমির উপর পুরোনো চালাঘর ভেঙে উঠল তিনটি পাকা হলঘর। স্কুলের নতুন বাড়ির ছাত্রসংখ্যা তখন দেড়শো. শিক্ষক-সংখ্যা তখনো সেই পাঁচেই অপরিবর্তিত রয়েছে।

স্কুলের নিজস্ব বাড়ি হয়েছে. ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে। বেহালার প্রায় প্রতি ঘর থেকেই তখন ছেলেরা আসছে পড়তে এই স্কুলে। স্কুলের এই বাড়-বাড়ন্তের মধ্যে বেচারাম বিদায় নিলেন। বেচারামের পরিত্যক্ত শূন্যপদ পরবর্তী দু যুগ ধরে যাঁরা অলংকৃত করেছেন তাঁরা হলেন চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রাজেনবাবু ১৯০১ সালের জুলাই মাসে এই দায়িত্বভার যাঁর কাঁধে চাপিয়ে দেন তিনি হলেন ডাক্তার সিদ্ধিনাথ চট্টোপাধ্যায়। সিদ্ধিনাথ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে। সে সময় বেচারামবাবুর আর এক ছেলে হৃদয়নাথ এই স্কুলে পড়াতেন। তখন পৌনে দুশো ছেলে পড়ে এই স্কুলে, শিক্ষকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছয়ে।

স্কুল যত বাড়ছে মিউনিসিপ্যালিটির আয়তন কিন্তু বিপরীতভাবে ততই সঙ্কুচিত হচ্ছে। সোমপ্রকাশের সম্পাদনার দায়িত্বভার মামা দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের হাত থেকে নিয়ে ১৮৭৩-৭৪ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রিকার পাতায় যে আন্দোলনের রব তুলেছিলেন তারই পরিণতি হিসাবে কয়েক বছরের মধ্যেই রাজপুর, হরিনাভি, চাংগরিপোতা মিউনিসিপ্যালিটির আওতা থেকে মুক্ত হয়ে গেল। নতুন শতাব্দী শুরু হওয়ার তিন বছর আগে গার্ডেনরীচও গেল আলাদা হয়ে। সিদ্ধিনাথ যে বছর স্কুলের সেক্রেটারী হলেন সেই বছরই টালিগঞ্জ বেরিয়ে গেল মিউনিসিপ্যালিটি থেকে। পড়ে রইল শুধু বড়িশা ও বেহালা। ১৯১১ সালে বড়িশে-বেহালার লোকসংখ্যা ছিল একত্রিশ হাজার। আয়তনে সংকুচিত হলেও শিক্ষার পরিধি তখন গোটা তল্লাটে বিস্তৃত। নতুন নতুন স্কুল, পাঠশালা গড়ে উঠেছে। বড়িশে-বেহালার লোকের শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য সে সময় এখানে যত স্কুল ছিল তার মধ্যে তিনটি প্রধান—বেহালা শিক্ষায়তন, বড়িশা হাইস্কুল ও বেহালা হাইস্কুল।

এই তিন প্রধানের অন্যতম বেহালা শিক্ষায়তন অর্থাৎ বেহালা মিডল ভার্নাকুলার স্কুল তখন রীতিমত সুপ্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠার পেছনে সম্পাদকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়াও ছিল শিক্ষকদের অপরিসীম নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতা। বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত শিক্ষক যে স্কুলে পড়িয়েছেন তার সুনাম যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পায় নি এই স্কুলের ছেলেরা এমন বছর কোনদিনই স্কুলের জীবনে আসে নি। বৃত্তিপ্রাপক ছাত্রতালিকা থেকে অন্তত দুটি নাম এখানে উল্লেখ করা দরকার। রায়বাহাদুর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ও ডাক্তার অক্ষয়কুমার পাল এই স্কুল থেকেই বাংলা মধ্যছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে পাশ করেছিলেন। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সহ-সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ রায় এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন।

স্কুলের দীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস সরকারের অজানা ছিল না। তাই স্কুলের তরফ থেকে যখন ইংরেজী পড়ানোর অনুমতি চাওয়া হল, তখন এককথায় সেই আবেদন মঞ্জুর করলেন গভর্নমেন্ট, ১৯১৫ সালে। ফলে স্কুলের নাম আবার বদলাল, বেহালা এম ভি স্কুল হল বেহালা এম ই স্কুল। তখন এই স্কুলে পড়ে একশো একাশীজন ছাত্র। শিক্ষক-সংখ্যা সাত। প্রাক্তন সম্পাদক বেচারামবাবুর সবচেয়ে ছোট ছেলে হৃদয়নাথবাবু তখন হেডমাস্টার। স্কুল-অন্তপ্রাণ হৃদয়নাথের অপরিসীম নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রসঙ্গ বর্ণনাক্রমে শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকার এক জায়গায় সম্পাদকমশাই লিখছেন : 'ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাদানে (ইংরেজী) অনুমতি পাওয়ায়...হৃদয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রদিগের বৃত্তি লাভের জন্য বিশেষ যত্নসহকারে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং ১৯১৫—১৮ এই চারি বৎসরে উপর্যুপরি ছাত্রদের বৃত্তি অর্জনে সফল হন।'

দু ভাই মিলে তখন স্কুল চালাচ্ছেন। একজন সম্পাদক, অন্যজন শিক্ষক। সিদ্ধিনাথ আর হৃদয়নাথ। চারদিকে স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলেরা বছর বছর বৃত্তি পাচ্ছে। সবাই চায় এই স্কুলে তার ছেলেকে পড়াতে। কিন্তু এত ছেলের জায়গা হবে কি করে ঐ তিনটি মাত্র হলঘরে। তাই স্কুলের জায়গার অভাব মেটানোর জন্য সম্পাদক শিক্ষক দুজনে মিলে ঠিক করলেন আর একটা তলা বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে ঠিকই, কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে. কিভাবে? বেচারামের ছেলেরা কিন্তু উপায় ঠাউরাতে গিয়ে মুষড়ে পড়েন নি। কারণ তাঁদের বাবাই তো পথ দেখিয়ে গেছেন। এই স্কুল সকলের. সকলেই নিশ্চয় সাহায্য দেবে স্কুলকে। সিদ্ধিনাথ হৃদয়নাথ সেদিন বেহালার ঘরে ঘরে ঘুরে চাঁদা তুলেছেন। চাঁদার তালিকায় ধনী জমিদার থেকে স্কুলের ঝি কেউ বাদ পড়ে নি।

বাবুরা স্কুলে বাড়ির জন্য বাড়ি বাড়ি চাঁদা চেয়ে ফিরছেন খবর শুনে স্কুলের পুরোনো ঝি প্যারীসুন্দরী দাসী গিয়ে হাজির হল হৃদয়নাথের কাছে। তার সামান্য আয় থেকে তিল তিল করে জমানো সারা জীবনের সঞ্চয় দুশোটি টাকা মাস্টারবাবুর হাতে তুলে দিয়ে সে বলেছিল : এ কটা টাকা নিন। সেতুবন্ধনে যে কাঠবিড়ালীর সাহায্যও তুচ্ছ নয় একথা ত আমাদের মহাকাব্যেই লেখা রয়েছে। সব জেনেও হৃদয়নাথ সেদিন ফেরাতে পারেননি প্যারীসুন্দরীকে। তাঁর দান মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। সবার সব দানের সঞ্চিত অর্থে উঠল স্কুলের দোতলা, ১৯১৭ সালে। আজও স্কুলের একতলা থেকে দোতলায় উঠবার সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দেয়ালে আঁটা একটি ট্যাবলেটে লেখা আছে এই দুটি লাইন : শ্রীমতী প্যারীসুন্দরী দাসী, দান দুইশত টাকা। পরের বছরই মারা গেলেন হৃদয়নাথ।

হৃদয়নাথ ছিলেন স্কুলের হৃদয়। তাঁর অবর্তমানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল, তা হয়তো কোনদিনই ঘুচত না, বেহালা এম ই স্কুল আজকের বেহালা শিক্ষায়তনে কোনদিনই পরিণত হত না, যদি সেদিন গোপালবাবুর মত শিক্ষক এ স্কুলে না আসতেন। হৃদয়নাথের মৃত্যুর পর ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বছর খানেক এই স্কুলের পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সে সময়ই স্কুলের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ধীরেনবাবু এক বছর পর এই স্কুল ছেড়ে চলে যান। তাঁর জায়গায় প্রধান শিক্ষক হলেন গোপালচন্দ্র।

১৯১৯ থেকে ১৯৫২, তেত্রিশ বছর গোপালবাবু এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত

লেন। তেত্রিশ কেন তেতাল্লিশ এমন কি পঞ্চাশ বছর ধরে একই স্কুলে পড়িয়েছেন ন শিক্ষক এদেশের পুরোনো স্কুলগুলোতে বিরল নয়। বিরল শুধু গোপালচন্দ্রর মত লোকেরা। সারাটা জীবন কোন দুর দিকে তাকান নি। অর্থ, মান, যশ কিছুই চান নি, চেয়েছিলেন শুধু মানুষ গড়তে। হাজার হাজার ছাত্র মানুষ করেছেন গোপালচন্দ্র। সর্বদিক থেকেই তিনি ছিলেন এজন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর। বেহালার লোকেদের বড় প্রিয়, বড় আপনারজন ছিলেন তিনি। লোকে বলত মাস্টারমশাই। রোগা, লম্বা, ঝাঁটা গোঁফ, প্রায় ছোট ছোট চুল সামনের দিকে চড়ানো, ঈষৎ ভাঙা গালের উপর তাঁর অনুসন্ধানী চোখ দুটি ঢেকে স্টীল ফ্রেমের চশমা পরা এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করত না এমন মানুষ বোধহয় সারা বেহালা খুঁজলেও মিলত না। ছাত্ররা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত, ভয়ও পেত। কারণ তারা জানত এই মানুষটির জীবন-অভিধানে মিথ্যা শব্দটি অনুপস্থিত। গোপালচন্দ্র আজ আর নেই কিন্তু তিনি আজও বেঁচে আছেন তাঁর অগণিত ছাত্রের হৃদয়ে।

পুরোনো মাস্টারমশায়ের কথা বলতে গিয়ে হেডমাস্টারমশায়ের গলা কেমন ভারী হয়ে উঠেছিল। বোধহয় কিছু একটা চোখের কোনোর জন্য টেবিলে রাখা চশমাটা তুলে নিলেন চোখ ঢাকার জন্য। হাইপাওয়ারের চশমার কাঁচের আড়ালে দু-একটি অশ্রুবিন্দুর শুভ্রতা সেদিন আমি ঝিকমিকিয়ে উঠতে দেখেছি। মানুষ তো নন দেবতা ছিলেন আমাদের মাস্টারমশাই। কোথাও কোনদিন শুনেছেন ভোর চারটের সময় উঠে পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলেদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে পড়তে বসতে বলেন কোন শিক্ষক। মাস্টারমশাই তাই বলতেন। বলতে বলতে বোধহয় কোন মজার কথা মনে পড়ে গেল প্রশান্তবাবুর। হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে। জানেন একদিন বড় মজা হয়েছিল। মাস্টারমশাই ভোর রাতে আমাদের ডেকে দিয়ে চলে আসতেন স্কুলে। তাঁর পোশাক-টোশাকের কোন বালাই ছিল না। পোশাক ত ভারী। ধুতি আর ফতুয়া। কাঁধে চাদর। সেদিন এমনিভাবে আমাদের ডেকে দিয়ে স্কুলে চলে এসেছেন। স্কুল আরম্ভ হয়ে গেছে। দুপুর প্রায় শেষ হয় হয়। মাস্টারমশাই ভীষণ ব্যস্ত। তাঁর দম ফেলার ফুরসৎ নেই। এদিকে কিন্তু আমরা, তাঁর সহকর্মীরা সবাই আড়ালে মুখ টিপে-টিপে হাসছি। কিন্তু কারুর সাহস নেই যে, সামনে গিয়ে বলবে। শেষ পর্যন্ত একটি ছেলে অনেক কষ্টে সাহস করে এগিয়ে বলল : মাস্টারমশাই আপনি বোধহয় এখনো বাড়ি ফেরেন নি? একবার বাড়ি ঘুরে আসুন। কেন? — স্কুলের কাগজপত্রের খুঁটিনাটি অনুসন্ধানে ব্যস্ত স্টীল ফ্রেমের চশমা টেবিল থেকে ঘুরে তাকাল। ছেলেটির মুখে আর কথা সরে না। শুধু আঙুল দিয়ে মাস্টারমশায়ের গায়ের জামাটা দেখিয়ে দিয়েই সরে পড়ল। আর তক্ষুনি মাস্টারমশাই ছুটলেন বাড়ি। ভোর রাতে কারুর ঘুমের যাতে ব্যাঘাত না হয় তাই আলো না জ্বালিয়ে হাতের কাছে যা পেয়েছেন তাই পরে বেরিয়ে পড়েছেন। খেয়াল নেই যে, সেদিন ফতুয়ার বদলে স্ত্রীর ব্লাউজ তাঁর গায়ে।

এই সেই গোপালচন্দ্র। তিনি এই স্কুলে যে বছর এলেন তার পাঁচ বছর বাদে সিদ্ধিনাথ সেক্রেটারীর দায়িত্ব তুলে দেন সুরেনবাবুর হাতে। সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চব্বিশ থেকে পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত একটানা ছাব্বিশ বছর এই স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন। এই ছাব্বিশ বছরে স্কুলের চেহারা প্রচণ্ডভাবে পাল্টে গেছে।

পঁচিশ সালে এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল দুশো ছত্রিশ। মাস্টারমশাই ছিলেন আটজন। এর পর থেকে প্রতি বছরই ছাত্র ও শিক্ষকসংখ্যা বেড়ে চলেছে। ছাত্রসংখ্যা এত বেড়ে চলল যে, সাতচল্লিশ সালে দোতলা বাড়িতে তিলধারণের জায়গা হয় না। পুরোনো বাড়ি আর না বাড়ালে চলছে না। সুরেন্দ্রনাথ ও বেহালার জনপ্রিয় সমাজসেবী বেচারাম মুখোপাধ্যায় উঠে-পড়ে লাগলেন কাজে। বছর খানেকের চেষ্টায় তিনতলার একটি অংশ গড়ে উঠল।

দেশ বিভাগের পর এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। পঞ্চাশ সালে এই স্কুলে পড়ত সাতশো ছেলে। স্কুল তখনো এম ই পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু অভিভাবকদের অনুরোধে ও শিক্ষা বিভাগের অনুমতিক্রমে একান্ন সাল থেকে এই স্কুলে ক্লাস সেভেন ও এইট খোলা হল। তখন স্কুলের সেক্রেটারী বলাইচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এক বছর আগে অসুস্থতার জন্য সুরেনবাবু সেক্রেটারীর দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চান। অনেক বছর এই স্কুলের সেবা করেছেন। এবার একটু বিশ্রাম নেবেন। গোপালচন্দ্রের অনুরোধে বলাইবাবু সেক্রেটারী হতে রাজি হলেন। বলাইবাবু সেক্রেটারী হলেন, তার পরের বছরই স্কুল হল হাইস্কুল। বোর্ডের অনুমোদনের সংগে একটি অনুরোধ ছিল— স্কুলের নাম পাল্টাতে হবে। সেই অনুরোধ রক্ষা করে বেহালা এম ই স্কুলের নাম পাল্টে রাখা হল বেহালা শিক্ষায়তন, ১৯৫৩ সালে।

প্রতিষ্ঠার ছিয়ানব্বই বছর পরে হিন্দু বিদ্যালয় একটি পরিপূর্ণ স্কুলে পরিণত হল। স্কুল প্রতিমার খড়ের কাঠামোয় মাটি দিয়ে, রং চাপিয়ে, চোখ এঁকে শেষ পর্যন্ত যিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন, সেই গোপালচন্দ্র কিন্তু তখন বিদায় নিয়েছেন। একটানা তেত্রিশ বছরের অবিরাম অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল যখন ঘরে উঠল, তখন আর গৃহকর্তার সামর্থ্য নেই যে, সে ফসলে গোলা সাজাবেন। নতুন যুগের সারথীদের হাতে রথের দায়িত্ব হাসিমুখে তুলে দিলেন গোপালচন্দ্র। কোনদিন কারুর কাছে নিজের প্রয়োজনে কখনো হাত পাতেন নি তিনি। শুধু দিয়েই গেছেন। যদি প্রশ্ন তোলা যায় সারা জীবনের এই দানব্রতের বিনিময়ে অর্থের অঙ্কে কতটুকু তিনি পেয়েছেন, তাহলে বলতে হবে যে, বাহান্ন সালে রিটায়ার করার সময় তাঁর বেতন হয়েছিল একশ টাকা।

বেতন তাঁর যাই হোক শত শত কৃতী ছাত্র তিনি উপহার দিয়েছেন এদেশকে— তেত্রিশ বছরে। তাঁর সময়ে এমন একটি বছরও যায় নি যেবার এই স্কুলের ছেলেরা বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পায় নি। ১৯৩৪ সালে এই স্কুলেরই ছাত্র মণীন্দ্রনাথ সরকার প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছিলেন। ছাপান্ন সালে বেহালা হাইস্কুলের যে ছেলেটি স্কুল ফাইন্যালে প্রথম হয়েছিল, সেই নিতাইচরণ মুখোপাধ্যায় একান্ন সালে শিক্ষায়তন থেকে বৃত্তি পরীক্ষায় পশ্চিমবংগের মধ্যে ফার্স্ট হন। তিপ্পান্ন সালে এই স্কুলেরই ছাত্র নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত বৃত্তি পরীক্ষায় পশ্চিমবংগে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এই সব ছাত্রই যুগে যুগে স্কুলের সুনাম বাড়িয়েছেন। এই সুনামের ফলেই চুয়ান্ন সালে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে এগারোশ। এত ছেলের জায়গা স্কুলের

আড়াইতলা বাড়িতে হয় না। তাই বলাই-বাবু চুয়ান্ন সালে স্কুলের ইনকমপ্লিট তেতলা কমপ্লিট করে তুললেন। এর দু বছর পরেই স্কুলের শতবার্ষিকী উদযাপিত হল, ১৯৫৬ সালে।

শতবার্ষিকী উৎসবের আলোর দীপ্তি নিভে আসার আগেই স্কুল পরিচালনায় দেখা দিল প্রচন্ড অস্থিরতা। বিশেষভাবে সাতান্ন সালে বলাইবাবু দায়িত্বভার ছেড়ে দেওয়ার পর থেকেই। বছর দুয়েকে বার-তিনেক সুপারসেশনের পর বোর্ড ম্যানিজিং কমিটি বাতিল করে সেখানে এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করলেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষায়তনের পরিচালনাভার বোর্ডের এড-মিনিসট্রেটররা চালিয়ে আসছেন।

চালিয়ে আসছেন ঠিকই, কিন্তু এ যেন অনেকটা ঠেকায় পড়ে চালানো। কেন এই মন্তব্য করলাম তার কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার। সাতান্ন সালে হায়ার সেকেন্ডারী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার সময় বেহালার প্রাচীনতম স্কুল বলে শিক্ষায়তন অফার পেয়েছিল আপগ্রেডিংয়ের। কিন্তু তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটি হায়ার সেকেন্ডারীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ আশাবাদী ছিলেন না বলে ঐ সুযোগ তখন গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তাঁদের ভুল ভাঙতে দেরী হয় নি বিশেষ। যখন তাঁরা দেখলেন সব গার্জেনই চায় তার ছেলেকে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে পড়াতে তখন বুঝলেন ভুলটা কোথায়। বেহালার অন্যান্য অনেক স্কুলে আজ হায়ার সেকেন্ডারী কোর্স চালু রয়েছে। লোকাল ভাল ছেলেরা সব ছুটছে ঐ সব স্কুলে। বাড়ির কাছে হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল থাকতে কেন তারা আসবে হাইস্কুলে পড়তে? তাই শতবার্ষিকী বর্ষে যে স্কুলে প্রাইমারী সেকেন্ডারী মিলিয়ে এগারোশ আশীটি ছেলে পড়ত আজ সেখানে দুটি সেকশন মিলিয়ে পড়ে মাত্র নশো পাঁচটি ছেলে।

অতীতে ম্যানেজিং কমিটি যে ভুল করে গেছেন সে ভুল কি এডমিনিস্ট্রেটররা শোধরাতে পারতেন না? গত দশ বছরে চারজন প্রশাসক এই স্কুল পরিচালনা করে-ছেন। এর মধ্যে প্রথম দুজন ছিলেন ২৪-পরগণার এডিশন্যাল ডিসট্রিক্ট ইন্সপেকটর অব্ স্কুলস। তাঁদের সামান্য সদিচ্ছায়, স্কুলের অতীত সুনাম নিশ্চয়ই দাবী করতে পারত আপগ্রেডিংয়ের সুযোগটুকু।

. কিন্তু স্কুলের পক্ষে ব্যাপারটা জরুরী। কারণ ভাল ছাত্র আসছে না। আর আসছে না বলেই রেজাল্ট বছর বছর নেমে যাচ্ছে। গড়ে শতকরা পঞ্চাশটি ছাত্র মাত্র পাশ করে স্কুল ফাইন্যালে। পঁয়ষট্টি সালে পাশের হার দাঁড়িয়েছিল শতকরা চৌত্রিশে। নিশ্চয়ই স্বর্গবাসী হৃদয়নাথ বা গোপাল-চন্দ্রের স্মৃতির পূর্ণ মর্যাদা এই রেজাল্ট আজ বহন করে না। আঁধারে আলোর মত টিম-টিম করে তবু এখনো প্রাইমারী সেকসনে বাতি জ্বলছে। পয়ষট্টি, ছেষট্টি ও সাতষট্টি এই তিন বছরে প্রাইমারীর ফাইন্যাল পরীক্ষায় দুশো পঁয়ত্রিশটি পরীক্ষার্থী ছাত্রের মধ্যে ফেল করেছে শুধু একজন। প্রাইমারীর প্রধান শিক্ষক আজ গোপালচন্দ্রেরই আত্মজ হরিপ্রসাদ ও তাঁর বারোজন সহকর্মী। হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রাইমারীর রেজাল্ট অম্লান রেখেছেন। কিন্তু সেকেন্ডারীর একুশজন মাস্টারমশাই তাঁদের শত পরিশ্রমেও সার্থক হতে পারছেন না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি অপরিসীম ক্লান্তি ও হতাশার ছাপ তাঁদের সারা অবয়বে। জানেন তাঁদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হচ্ছে।

ব্যর্থ হচ্ছে জেনেও তাঁরা হাল ছাড়েন নি। ছেলেদের সঙ্গে পড়াশুনায়, খেলা-ধুলায় অভিনয়ে, বিতর্কে তাঁরা মেতে আছেন। সগর্বে অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার অজিত রায়চৌধুরী বললেন: আমাদের স্কুল থেকে বহু কৃতী খেলোয়াড় বেরিয়েছে। এই স্কুলেরই ছাত্র ইস্টবেঙ্গলের শ্রীকান্ত ব্যানার্জি, কালীঘাটের বলাই ব্যানার্জি, স্পোর্টিং ইউনিয়নের সমর চ্যাটার্জি। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের ছেলেরা খেলে কোথায়? কারণ স্কুলের চৌহদ্দী ত কাঠা-খানেকের মধ্যেই সীমা-বদ্ধ। বেশীর ভাগ জুড়ে স্কুলের তেতলা বিল্ডিং। আর দু কোণে দুটি মন্দির। প্রশ্ন করে নিজেই কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম। যে স্কুলে ছেলেদের পড়ার জায়গা হয় না, মাথার উপরে কাঁচা বাঁশের সিলিং, একটা বড় ঘরকে ভাগ ভাগ করে ক্লাস হয়, এক ক্লাসের পড়ানো অন্য ক্লাসে বসেও অক্লেশে শোনা যায়, সেখানে খেলার মাঠ কোথায় পাবে স্কুল? প্রশান্তবাবু, অজিত-বাবু দুজনেই কেমন অপ্রস্তুত বোধ করলেন। জবাব এল চটপট স্কুলের এন সি সি অফিসার নৃপেনবাবুর কাছ থেকে: ছেলেরা কে এফ মাঠ (কালিঘাট ফলতা রেলওয়ে মাঠ) আর বি জি কলোনী মাঠে (বেহালা গভর্নমেন্ট কলোনী মাঠ) খেলে। দেখতেই তো পাচ্ছেন আমাদের কোন বাড়তি জায়গা নেই।

বাড়তি জায়গা নেই কিন্তু উৎসাহের কোন কমতি দেখিনি শিক্ষকদের। ফি বছর সরস্বতী পুজোর সময় যে এগজিবিশন হয়, ছেলেদের দিয়ে মাস্টারমশাইরা তা অর্গানাইজ করেন। বললে বিশ্বাস করবেন না, অজিত-বাবু বললেন আমাদের ছেলেদের এই এগজিবিশন দেখতে গোটা বেহালা ভেঙে পড়ে। কি সাহায্যই বা পায় ছেলেরা স্কুল থেকে। বাড়ি থেকেই বা জোটে কতটুকু। যে স্কুলের প্রায় সব ছাত্রই আসছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র ঘর থেকে তারা কিন্তু সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মাথা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতে চাইছে এই পৃথিবীতে। সাতষট্টির এগজিবিশনে ক্লাস সেভেনের রণদীপ ভট্টাচার্য একটা সিনেমা প্রজেক্টর বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। আর সুকুমার সরকার? সে তো শুকনো কলমী বা কচুরীপানায় শুকনো ঘাস দিয়ে যেসব ছবি আঁকে তা তো আজ দুর্মূল্য বিদেশী মুদ্রা ঘরে আনছে।

প্রশান্তবাবু, অজিতবাবু ও অন্যান্য মাস্টারমশাইরা সবাই বললেন: আমরা চাই ছেলেদের আরো সাহায্য দিতে। কিন্তু পারি না। বছর বছর ছাত্রসংখ্যা কমে যাচ্ছে। অথচ স্কুলের টিউশন ফি কত জানেন? — ক্লাস ফাইভে সাড়ে চার আর টেনে সাড়ে পাঁচ টাকা। এই মাইনেই আদায় হতে চায় না। ফি বছরই বেশ বড় একটা অ্যামাউন্ট ছেড়ে দিতে হয়। নিজেদের আয়ে কুলোয় না, সরকারী সাহায্য নিতে হয়। গড়ে বছরে দশ থেকে বারো হাজার সরকারী মুদ্রা স্কুলের কপালে জোটে। এই সামান্য আয় থেকেই স্কুল প্রতি বছর শতকরা চার ভাগ ছেলেকে ফ্রীশীপ দিয়ে আসছে। ফি বছর গড়ে তিনশো টাকার বই কিনছে লাইব্রেরীর জন্য। কিন্তু চাহিদার তুলনায় এই সংখ্যাগুলি অতি নগণ্য।

সবকিছুই যে সংখ্যার নিক্তিতে মাপা যায় না, সেই অনুভূতিটুকু নিয়েই সেদিন শিক্ষায়তন থেকে বিদায় নিয়েছি। সারাটা দিন স্কুলে ছিলাম। কখনো প্রধান শিক্ষকের ঘরে, কখনো স্কুলের অপরিসর আঙিনায়। কখনো বা দূর থেকে ক্লাসগুলো দেখেছি, কখনো বা খুব কাছ থেকে। বেহালার প্রধান রাজপথের উপর যে স্কুলে সেকেন্ডারী সেকশনে সাড়ে পাঁচশো ছেলে পড়ে, সেখানে ঐ দীর্ঘ উপস্থিতির সময়টুকুতে কোন শব্দ আওয়াজ বা চেঁচামেচি আমার কানে আসে নি—ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, লরি, রিকসার বিচিত্র ধ্বনিপ্রবাহ ছাড়া। কখনো মনে হয়েছে স্কুল কি ছুটি হয়ে গেছে? তখুনি ক্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখি ক্লাস চলছে। ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা আজ প্রায় সব স্কুলেরই মাথা-ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শিক্ষায়তন সেই ভার মুক্ত। বেচারাম, হৃদয়-নাথ, গোপালচন্দ্রের স্কুলে অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতি অন্তত একটি জায়গায় আজও অম্লান রয়েছে—ডিসিপ্লিন পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে এই স্কুলে। অন্তত এখনো যে এদেশের কোন কোন স্কুলে শৃঙ্খলা বজায় আছে, এটুকুই তো আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

—সম্বিৎসু

পরের সংখ্যায়: হুগলী কলেজিয়েট স্কুল।

সংশোধন

৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩শ সংখ্যা (১৬ শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) অমৃতে মানুষ গড়ার ইতিকথায় আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয় প্রসঙ্গে এক জায়গায় ছাপা হয়েছে: 'তাই হ্যালিডে-পরিকল্পনা রূপায়ণের তিন বছর পরেই বিদ্যাসাগর তাঁর কাজে ইস্তফা দিলেন, ১৮৫৭ সালে।' আসলে বিদ্যাসাগর কাজ ছেড়ে দেন ১৮৫৮ সালে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[কলকাতার ছেলে বিকাশ এল পাড়াগাঁর ব্যাঙ্কে। প্রমোশন নিয়েই। চোখে তার গ্রাম চেনার নেশা। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্কবাবুর বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে, এক আশ্চর্য আলোর বিন্দু। আর মনীষা কাঙ্ক্ষিত প্রতিমা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত। সমাজের চারদিকে টানাপোড়েন। ক্ষোভ-ক্রোধের মিছিল। গ্রাম্য রাজনীতির বীভৎসতা।

বিকাশের চোখে সোনালির নেশা, মনীষার অস্তিত্ব। কিন্তু সে পালাও যেন ফুরোচ্ছে, হারিয়ে যেতে চাইল মনীষা।

আপিসেও অশান্তি। মাঝে মাঝেই বিক্ষোভের ঝড়। কর্মচারীদের সন্দেহে বিকাশ আহত।

ভাবল পালিয়ে যাবে সে। ছাড়বে চাকরি। ষড়যন্ত্রের হাত থেকে পাবে রেহাই।

গ্রাম্য-রাজনীতি ঘোরালো হয়ে উঠল। শিকার হল তার শশাঙ্ক নিয়োগী। আহত হয়ে শয্যাশায়ী।

এমন সময় এল মনীষার চিঠি। প্রত্যেকটা অক্ষর তীরের ফলার মতো জ্বলে উঠল। মনীষার চিঠি।]

।। আটাশ ।।

হাসপাতাল থেকে কেবল একটা অপারেশন শেষ করে ফিরেছে প্রভাকর। তোয়ালে কাঁধে স্নান করতে যাচ্ছিল, বিকাশের আসবার খবরে দ্রুত পায়ে ছুটে এল সে।

'কী ব্যাপার রে! এখন—'

বলা শেষ হল না। দেখল বিকাশের চোখমুখ শাদা হয়ে গেছে, চশমার আড়ালে দুটো ঘোলাটে চোখ সম্পূর্ণ নিবে গেছে তার।

'বোস-বোস—টলছিস যে? শরীর খারাপ নাকি?'

'না, শরীর খারাপ নয়'—বেতের টেবিলের একটা কোনা শক্ত করে চেপে ধরে কয়েকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিকাশ উচ্চারণ করল: 'এই চিঠিটা একটু পড়। মনীষার চিঠি।'

বাঁ হাতে চিঠিটা কাঁপছিল।

'কী হয়েছে বিকাশ, কিসের চিঠি?'

'পড়লেই বুঝবি।'

'আমি পড়ছি, তুই বোস আগে।'

অন্ধের মতো বিকাশ বসে পড়ল চেয়ারে। চোখ দুটো প্রায় দেখা যায় না। হাত থেকে চিঠিখানা আপনিই টেবিলের ওপরে খসে পড়ল।

কয়েক সেকেন্ড প্রভাকর দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তাকিয়ে দেখল বিকাশের দিকে। একবার ভাবতে চেষ্টা করল মনীষার চিঠিটা তার পড়া উচিত কিনা।

প্রাণপণে মুখে একটা হাসির ভঙ্গি ফোটাতে চেষ্টা করল বিকাশ।

'কিছু ভাবিস নি, প্রাইভেট-পার্সোন্যাল বলে আমার আর কিছু নেই। চিঠিটা তোরই পড়া উচিত।'

আর একটু দ্বিধা করে খামটা খুলল প্রভাকর। প্রথম দুটো প্যারাগ্রাফে তার দেখবার কিছু ছিল না—সেখানে মনীষার যন্ত্রণা, বিকাশকে সে কিছু দিতে পারল না, তারই জন্যে চোখের জল। প্রভাকরের জানবার কথাগুলো এসেছে তারপর।

'কিডনিতে হয়তো স্টোন আছে, হয়তো নেই। কিন্তু আমার আসল রোগটা আমি জানতুম—অনেকদিন থেকেই জানতুম। ডাক্তারই আমাকে বলে দিয়েছিলেন।

আমার রক্তে ক্যানসার। লিউকোমিয়া।

যা ঝড়ের মতো আসে, সঙ্গে সঙ্গে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সে জাতের নয়। ডাক্তার বলেছিলেন, প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে বিন্দু বিন্দু করে শেষ করে আনবে, দিন যাবে, মাস যাবে, দুটো-একটা বছর যাবে, তারপর ফুরোতে ফুরোতে একেবারে আমি হারিয়ে যাব। আমার সময়ের সীমা বাঁধা হয়ে গেছে।

ডাক্তার কয়েকটা ওষুধপত্র খেতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনিও জানতেন, আমিও জানতুম—কী হবে খেয়ে?

মৃত্যু দু-দিন পিছিয়ে যেতে পারে, না-ও যেতে পারে। দু'দিন—দু-মাস কিংবা বড়ো জোর এক বছর বেঁচে কী লাভ, যদি জীবন শুরু করবার আগেই আমায় ফুরিয়ে যেতে হয়?

কতদিন, কতবার তোমাকে বলতে চেয়েও বলিনি, দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিয়েছি। তুমি দুঃখ পাবে, যন্ত্রণা পাবে—ডাক্তার ডাকাডাকি করবে, পয়সা খরচ করবে—অথচ কোনো অর্থ নেই, কিছুই হবে না। আমি তো যাবই, আমার যন্ত্রণা আমারই থাক—তোমাকে আর তার মধ্যে টেনে আনতে চাইনি।

কলকাতার বাইরে যখন তুমি ট্রান্সফার নিয়ে এলে, তখন আমায় বলেছিল, 'মণি, তুমি যদি বলো, তা হলে থেকে যাই হেড-অফিসেই।' আমি বলেছি, 'না-না, উন্নতি হবে, এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।' উন্নতি হোক, তার জন্যে শুধু নয়। আমি ভেবেছি—আর অভিনয় করতে পারি না, তুমি কাছে এলে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি না—আমার জন্যেই তোমার সরে যাওয়া দরকার।

শেষবার যখন তুমি কলকাতায় এলে, তখন মনে হল, আর আমি নিজেকে রাখতে পারব না। আমার দিনগুলো আঙুলে গোনা হয়ে গেছে এখন। লোভ হল, দারুণ লোভ হল। কিছুই পাব না, যাওয়ার আগে একেবারে কিছুই নিয়ে যাব না তোমার কাছ থেকে? ভাবলুম—অন্তত একটিবার সিঁদুর পরে নিই তোমার আঙুল থেকে, অন্তত ক'টা দিন তোমার কাছ থেকে যতটুকু পারি জীবনটাকে ভরে নিই।

কিন্তু সে তো আমারই স্বার্থপরতা। তাতে কেবল তোমাকেই দুঃখ দেওয়া হত।

হ্যাঁ, আমি বর্ধমানে চলে গিয়েছিলুম। কোনো দরকার ছিল না, কোনো কাজ ছিল না—সারাটা দিন ঘুরেছি এখানে-ওখানে,

বসে থেকেছি স্টেশনের ওয়েটিং রুমে, শেষ ট্রেনে ফিরে এসেছি কলকাতায়। এ না হলে সেদিন আর আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না আমার।

আমার অন্যায়ের কোনো শেষ নেই—তবু একটা অনুরোধ রেখো। তুমি আর আমার সঙ্গে দেখা কোরো না। তাতে আমার দুঃখই বাড়বে। কাল আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম আর একবার। আর কতদিন বাঁচব সে-কথা জানবার জন্যে নয়, আর ক'টা দিন আমায় থাকতে হবে সেই খবরটাই দরকার ছিল। ডাক্তার দেখে চমকে গেলেন। বললেন, এক ফোঁটাও যে ভাইটালিটি আর অবশিষ্ট নেই, বেঁচে আছো কী করে? ইমিডিয়েটলি—আজই হস্‌পিট্যাল যাওয়া দরকার।

হস্‌পিটাল! তার মানে, ডাক্তারদের কখনো আশা ছাড়তে নেই। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে পর্যন্তও না।

এখন চলাফেরা করতেও কষ্ট হয়। এইবার বিছানা নেব। ছুটি নিচ্ছি আজ থেকে। লিখতে ইচ্ছে করছিল, 'ডেথ্ লীভ'—কিন্তু ওরকম কোনো ছুটি লীভ-রুলসে আছে কিনা জানি না।

দোহাই, তুমি দেখা কোরো না, লোভ দেখিয়ো না—দুঃখ বাড়িয়ো না। নিজের মনকে আমি বশে এনেছি—এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দাও আমাকে। সংসারের ভাবনা আর ভাবছি না—ভেবে কী করব? কিছুই তো আটকে থাকে না, হয়তো একরকম করে চলে যাবে। তাছাড়া সামান্য ইনশিয়োরেন্স আছে আমার—প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক'টা টাকা—'

ডাক্তার বলেই প্রভাকর এই পর্যন্ত তারপর চিঠিটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখল টেবিলে।

বিকাশ তেমনি বসেছিল চেয়ারটার ভেতরে। তার দিকে চাইতে পারল না প্রভাকর। দৃষ্টিটা মেলে দিলে সামনের দিকে—নারকেল গাছগুলোর মাথা দুলছে, দুপুরের রোদ ঝকঝক করছে মরা ঘাসের জমির ওপর—দূরের রাস্তায় একটা কালো-সবুজ লরী পোড়া গ্যাসোলিনের ঘূর্ণি তৈরী করতে এগিয়ে যাচ্ছে।

সম্পূর্ণ অকারণ জেনেও বিকাশ জিজ্ঞেস করল : 'কিছু করবার নেই—না?'

প্রভাকর নীচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরল একবার। একটু সময় নিল জবাব দিতে।

'নাঃ। অন্তত মেডিক্যাল সায়ান্সে নেই। মানুষ যে কত হেল্‌প্‌লেস্!'

আবার মিনিটখানেক দূরের দিকে চেয়ে রইল প্রভাকর। বসন্তের একটা হাওয়ার ঝলক উঠে এল মাঠ থেকে, মনীষার চিঠির তিনটে পাতলা কাগজ খসখস করে উঠল, বিকাশ শুনতে লাগল একটা অস্পষ্ট ফিসফিসানি—কলকাতা থেকে—মোহনলাল স্ট্রীট থেকে—আরো অনেক দূরের আকাশ থেকে, না-দেখা সমুদ্র, না-চেনা বনের ওপার থেকে মনীষা বলে চলেছে : দোহাই তোমার, দেখা কোরো না, দুঃখ বাড়িয়ো না—লোভ দেখিয়ো না।

বিকাশ চোখ বুজল। ঠোঁট নড়তে লাগল তার। নিঃশব্দে বলতে লাগল : 'না মণি, দেখা করব না, লোভ বাড়াব না—আর দুঃখ দেব না।'

কিছু একটা বলা দরকার—প্রভাকর ভাবল। কিন্তু কী বলা যায়?

'এখানে চলে আসবি বিকাশ?'

বিকাশ চোখ ফেলল।

'কী হবে?'

অন্তত শশাঙ্কর জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে সে। অন্তত বীভৎস একটা মিথ্যে সাক্ষী দেবার জন্যে তাকে চাপ দিতে পারবেন না শশাঙ্ক। কিন্তু বিকাশ এখন শশাঙ্কর কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। এই মুহূর্তে ওই আলোচনাটার অর্থ নেই কোনো।

'বিকাশ?'

'উঃ?'

'কলকাতায় যাবি একবার?'

'কোনো দরকার নেই—' বিকাশ মনীষার চিঠিটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে সেগুলোকে মুঠোর মধ্যে প্যাকিয়ে ফেলল।

তারপর এতক্ষণ পরে—খুব সহজভাবে, প্রায় নিরাসক্ত দার্শনিকের মতো জিজ্ঞেস করল : 'একালে মনীষাদের এইভাবেই মরে যেতে হয়—না ডাক্তার?'

ডাক্তার প্রভাকর এতক্ষণ স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু বিকাশের কথার ভঙ্গিতে চোখে জল এসে গেল তার। মুখ ফিরিয়ে নিলে সে।

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'চলি।'

'তোর খাওয়া হয়েছে বিকাশ?'

'ব্যাঙ্কে এসেই চিঠিটা পেয়েছি।'—তারপর আর একবার—স্বগতোক্তির মতো তার গলা শোনা গেল :

'কিছুই আর করা যায় না—না প্রভাকর?'

প্রভাকর জবাব দিল না।

বিকাশ পা বাড়ালো সিঁড়িতে। পেছন ফিরে হাসতে চেষ্টা করল একটু।

'যাক, ভাবনা মিটল একটা। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে ব্যাঙ্কে ফেরা যায়। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

প্রভাকরের সাড়া এল না। বিকাশের রিক্‌সাটা দাঁড়িয়েই ছিল, কোনোদিকে না তাকিয়ে উঠে পড়ল সেটায়, রিক্‌সা বড়ো রাস্তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রভাকর দাঁড়িয়ে রইল একভাবে।

ব্যতিব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এল অমলা।

'বিকাশবাবু চলে গেলেন?'

'হুঁ।'

'আমার আন্দাজ করে বেরুতে একটু দেরী হয়ে গেল। আমি যে ওর জন্যে নেবুর শরবং—'

নীচের ঠোঁটটা আবার দাঁত দিয়ে চেপে ধরে বিরস গলায় প্রভাকর বললে, 'নেবুর শরবং আর একদিন হবে। কিন্তু অমলা, মানুষ কী হেল্‌প্‌লেস্!'

কিছু না—কিছু না—ভুলতে পারলেই ভালো। শুধু মনীষা মরছে না—বাংলাদেশে অসংখ্য মনীষা মরে যাচ্ছে, তুমি তো তা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামাও নি। মৃত্যুর রোল উঠছে ঘরে ঘরে, হাসপাতালের একটা বেড খালি হয়ে গেলে পরদিন পরম নিরাসক্তিতে আর একজনকে জায়গা দিচ্ছে সে, শ্মশানের একটা চুল্লী খালি হতে না হতে আর একটা চিতার কাঠ সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে—নতুন কবরের পাশে কোনো পুরোনো কবরের মাটি থেকে কান্না উঠতে শোনা যায় না।

কিছু না—কিছু না। মাটি ভুলছে, নদী ভুলছে, জীবন ভুলছে। মৃত্যুকে ভোলবার দিন-রাত্রির চেষ্টাই তো জীবন। সেই জীবনকে প্রতিদিন চালিয়ে নিয়ে চলে কাজ—অসংখ্য কাজ।

মনে পড়ছে এক সহকর্মীর কথা—বছর তিনেক আগে। মেসে থাকত, হঠাৎ চলে গেল ইনটেস্টাইন্যাল অবস্ট্রাকশনে। কলকাতায় এক কাকা থাকতেন, খবর পেয়ে এসে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন, ভাইপোকে যে কত ভালোবাসতেন, তাঁর উদ্দাম শোক দেখেই বোঝা গিয়েছিল সেটা। কিন্তু যত দেরী হচ্ছিল মড়া পুড়তে, ততই অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন, ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন হাতের ঘড়ির দিকে—স্পষ্ট করে বলেই ফেললেন আজ সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় একটা পার্টির সঙ্গে হেভি ইনশিয়োরেন্সের ব্যাপারটা ফাইন্যালাইজড্ হওয়ার কথা।

সেই মুহূর্তে বিশ্রী লেগেছিল বিকাশের, মনে হয়েছিল লোকটা একেবারে নকল, একটু কান্নাকাটি না করলে ভালো দেখায় না—তাই নিতান্তই ভদ্রতা করছিলেন খানিকটা। কিন্তু এখন নতুন করে মনে হল, মৃত্যুকে ভোলবার জন্যেই কাজকে দরকার, অফুরন্ত—অসংখ্য কাজ। নইলে মানুষ পাগল হয়ে যেত, আত্মহত্যা করতে থাকত,—যে জীবনে এত বেশি হয়ে—এত অপরিহার্য হয়ে—এতখানি জায়গা জুড়ে নিয়ে এতকাল ছিল, সে কোথাও নেই—তাকে আর কখনো পাওয়া যাবে না—এই শূন্যতার বোধ কিছুতেই সহ্য করা যেত না, কেউ বাঁচতে পারত না, কেউ না। তাই একমাত্র ছেলেকে হারাবার পরেও—বিধবা মাকে উঠে দাঁড়াতে হয়, দেখতে হয় থানপরা ছেলেমানুষ পুত্রবধূকে, তার সিঁথের যে সিঁদুরের আভাটুকু অনেক চেষ্টাতেও মুছে যায় নি—

করে দেখতে হয় সেদিকে, তার জন্যে
ষোর ব্যবস্থাও করতে হয়!
সেই মারও কাজ। অনেক কাজ।
তিন-চারটে দিন প্রায় পাগলের মতো
রইল কাজের ভেতর। যেটা একবার
লে হয়, তিনবার করে দেখল সেটা। বেলা
য় এসে ব্যাঙ্কে বসল, কাজ করতে লাগল
টা-আটটা অবধি। সবাই কখন উঠে
গেল, একা বসে রইল বিকাশ আর
রায়ান দেওয়ালে বন্দুক ঠেসান দিয়ে—
ল বসে বিরক্ত হয়ে ঝিমুতে লাগল।

বাড়ী ফিরতে লাগল আরো দেরী
—ন'টায়, সাড়ে ন'টায়। কোনো লক্ষ্য
—কোনো উদ্দেশ্য নেই—সব ভাবনাগুলো
তার ভোঁতা হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কের সেই
ারটা নয়, শশাঙ্ক নিয়োগী নয়, কানাই
নয়—কিছু নেই, কোথাও নেই। শুধু
তে হাঁটতে চলে যাওয়া—স্কুলের খেলার
টা—যেখানে আসবার পরেই স্পোর্টসে
ট্র্যাক-জাজ হয়ে গিয়েছিল—সন্ধ্যার পরে
া নির্জন হয়ে গেলে কখনো তার
খানে চুপ করে বসে থাকা, আকাশের
াগুলো কিংবা এক-আধটা উলকাকে
ট যেতে দেখা। কিংবা আরো দূরে হেঁটে
ল যে-কোনো একটা ক্যালভার্ট, বাতাসে
তের গন্ধ, শুকনো ঘাস-পাতা-মাটির
জলের গন্ধ, ব্যাঙ-ঝিঁঝি—পোকা-
ড়ের ডাক।

তার মধ্যে মনীষা এসে দাঁড়ায়।

'আসতে দেরী হল বলে রাগ করেছ?
ার কাটা ওষুধ কিনতে হল বলে—'

'কিচ্ছু করা যায় না—না প্রভাকর?'

'নাঃ, অন্তত মেডিক্যাল সায়েন্সে নেই।'

কলকাতা নয়, মোহনলাল স্ট্রীট নয়—
ান নয়, আরো অনেক দূরে সরে যায়
ষা। পার হয় রাত্রির মাঠের পর মাঠ,
য়ে যায় অচেনা বনের পর বন যে
দ্রের ওপার থেকে কেউ ফিরে আসেনি—
আকাশে একবার চলে গেলে আর ফেরা
না—সেখান থেকে পাতা ঝরবার শব্দের
, কয়েক টুকরো কাগজের খস-খসানির
া মনীষার স্বর শোনা যায়ঃ 'আমাকে
তে চেয়ো না—লোভ জাগিয়ো না আর—
দুঃখ দিয়ো না—'

শীর্ণ, ক্লান্ত মুখ। চোখ দুটোতে
ার চিহ্ন নেই। আঙুলগুলো মুঠোর
টেনে নিলে কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা বলে
হয়! এই মনীষা তো কোনোদিন কিছুই
ন—শুধু দিয়েছে, দু হাতেই দিয়েছে।
ষার কোনো লোভ ছিল? জীবনের
এতটুকুও দাবি ছিল তার? বিশ্বাস
না—কিছুতেই বিশ্বাস হয় না!

কিছু ভাবতে চায় না—অথচ এই
াগুলো সঙ্গে সঙ্গে ফেরে—বুকের
রে ছিঁড়ে খেতে থাকে। বাড়ী ফিরে
সব আরো নির্জন, নিয়োগীপাড়ার
পথটায় পুরোনো গাছগুলোর ছায়া,
চার শব্দ, শেয়ালের পালানো, কুকুরের
—সব আরো বেশি করে মৃত্যুমগ্ন হয়ে
থাকে।

তারপর বাড়ী। সিঁড়ি। অন্ধকারে
নের ম্লান আলোর ভ্যাংচানি। নিজের
ঘর। জামা-কাপড় ছেড়ে বিছানায় বিমূঢ় হয়ে
বসে থাকা। তারপরে কাকিমার ডাক,
'বিকাশ, খেতে এসো বাবা।'

অসুস্থ শশাঙ্কর ঘর বন্ধ। আগেই
খেয়ে শুয়ে পড়েন। হয়তো বিকাশ দেরী
করে ফিরে আসে বলেই সাক্ষীর কথাটা মনে
করিয়ে দিতে পারেন না। কিংবা—কিংবা
ভেবেছেন, মিথ্যে সাক্ষী দিতে রাজী
হবে না, বরং উলটো ফল হবে তাতে, তার
চাইতে তাকে না ঘাঁটানোই ভালো।

আর সুনু—

সুনুকে মার পাশে দেখা যায়, খাবার
এগিয়ে দিতে দেখা যায়, অথচ ভালো করে
দেখা যায় না। সেই রাতটার পর। বিকাশের
বুকের ভেতরে ধরা দেবার পর থেকে সে
অনেকখানি দূরে সরে গেছে। বুঝেছে
অনেকখানিই বুঝেছে। যে-কিশোরী মনে
তার এতটুকু ছায়াও কোথাও ছিল না,
সেখানে পাপের একটা ছোপ ধরিয়ে দিয়েছে
সে।

কখন বিকাশের গলায় ভাতগুলো
আটকে যেতে থাকে। খিদে আজকাল টেরই
পাওয়া যায় না বলতে গেলে, খেতে হয়
সেইজন্যেই খাওয়া, কিন্তু এক-একটা সময়
সব যেন বিষাক্ত আর তেতো হয়ে যায়।

মনীষা মরছে—বিন্দু বিন্দু করে
মরছে। আর সেই মৃত্যুকে এই বিশ্বাসের
সুখ দিয়ে সে ভরে রেখেছে যে বিকাশ
তাকে ভালোবাসে, শুধু তাকেই ভালোবাসে।
কিন্তু বিকাশ সেদিন থেকেই ঠকাতে শুরু
করেছে তাকে—যেদিন সম্পূর্ণ অকারণে সে
সুপর্ণার নাম দিয়েছে সোনালি, তারপর—
তারপর তার মন চোরের মতো একটু একটু
করে মনীষার বিশ্বাসে সিঁদ কেটেছে,
দিনের পর দিন সুনুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে,
মেজদার পাগলামিকে একান্ত লোভের সঙ্গে
প্রশ্রয় দিয়েছে নিজের স্বপ্নে, আর—

'উঠে পড়লে যে বাবা, আজ তো কিছুই
খেলে না।'

'অনেক খেয়েছি কাকিমা, আর পারছি
না।'

'না বাবা, আজ পাঁচ-ছদিন ধরে তুমি
একেবারে খাচ্ছ না। এমন করে শরীর
টেঁকে?' —কাকিমার গলায় আন্তরিক
মমতা, এই নিষ্ঠুর বাড়ীটার ভেতরে কয়েক
বিন্দু অবিশ্বাস্য করুণার মতো ঝরতে
থাকেঃ 'কোনো অসুখ-বিসুখ হয়নি তো
তোমার?'

'না কাকিমা, আমার কিছু হয়নি।'

কাকিমার পেছনে ছায়ার মতো সুনুকে
দেখা যায়, দেখা যায় না। নীল শাড়ীর
নীচে দু টুকরো শাদা পা, দুটি ছোট হাতে
দু গাছা সোনার চুড়ির ঝলক, তাইতেই চোখ
যেন জ্বালা করতে থাকে। প্রায় অন্ধের মতো
বিকাশ আবার দোতলায় উঠে যায়, সেই না
দেখা ঘড়িটার অদ্ভুত আওয়াজ আসে,
আচমকা রাত্রির স্তব্ধতা ছিঁড়ে গাঁজাখোর
পাগল মেজদা গেয়ে ওঠে :

> 'ডুব দে রে মন কালী বলে,
> হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে—
> তুমি দম-সামর্থ্যে এক ডুবে দাও
> কুলকুণ্ডলিনীর কূলে— কালী-কালী!'

আবার ঘর। কিছুক্ষণ চিৎ হয়ে পড়ে
থাকা। আবার ভাবনা, আবার যন্ত্রণা।
বেহালাটা মনে পড়ে— ইচ্ছে করে বাজাতে,
একদিন তো ওর জন্যেই তার মুক্তি ছিল।
কিন্তু হাতে তুলেই আর বাজাতে ইচ্ছে করে
না, একবার ছড় টানতেই মনে হয়, যেন কার
হৃৎপিণ্ড ছেঁড়া তার থেকে একটা চিৎকার
বেজে উঠল ওর ভেতর থেকে। সেই
পাগানিনির অদ্ভুত গল্পটা বুকের ভেতরে
বিদ্যুৎ ছড়ায়। কার হৃৎপিণ্ডের কান্না?
মনীষার? সুনুর?

'বিকাশদা!'

সুনু। একেবারে বিছানার পাশে।

কয়েক সেকেণ্ড বিকাশ শক্ত হয়ে রইল।

'এত রাতে কী চাই সুনু?'

সুনু পিছিয়ে গেল হঠাৎ। বিকাশের
এই গলাটা তার অচেনা ঠেকল।

ভয় পেয়ে সুনু বললে, 'আমি দেখতে
এসেছিলুম মশারিটা—'

বিকাশ জোর করে চোখ বন্ধ করে
রাখল। জোর করে নিজের ভেতরে জাগাতে
চাইল অন্ধ, যুক্তিহীন নিষ্ঠুরতাকে। তারপর
কেটে কেটে কঠোরভাবে বললে, 'দরকার হলে
মশারি নিজেই ফেলে নেব আমি, তোমাকে
ব্যস্ত হতে হবে না। তুমি শুয়ে পড়ো
গে, আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না।'।

চোখ বুজেই বিকাশ ঘরময় কয়েক
মুহূর্তের জন্যে পাথরের স্তব্ধতা অনুভব
করল। তারপর যেন কোথাও একটা চাপা
কান্নার ঢেউয়ের মতো ভাঙল, কে যেন ছুটে
পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

বর্বর—বর্বর। কখন ঠোঁটটা নির্মমভাবে
কামড়ে ধরেছিল, নোনা রক্তের স্বাদ লাগল
জিভে। তোমরা এই পারো। নিজেকে চাবুক
মারতে পারো না,—নিজেকে দণ্ড দিতে পারো
না, তাই সবচেয়ে যে নিরীহ, যে নিরুপায়—
আঘাত করতে পারো তাকে, বুনো জন্তুর
নখ দিয়ে তাকে ছিন্ন-ছিন্ন করে দিতে
পারো! মনীষার কাছে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত
করতে পারো সুনুকে নিয়ে ছিনিমিনি
খেলে!

কে খুন করে? আত্মহত্যা করতে যে
ভয় পায়, সেই-ই।

পোড়ো মহলের বারান্দায় আবার
পায়রার ঝটপটানি। ভাম এসেছে তার
দৈনন্দিন হত্যাকাণ্ডে। এমনি মৃত্যুযন্ত্রণা
হয়তো সুনুরও শুরু হয়েছে। কাটা ঠোঁট
থেকে এখনো জিভে নোনা রক্তের স্বাদ
লাগছিল তার, মনে হল ওটা পায়রার রক্ত।

(ক্রমশ)

অসীম মুখোপাধ্যায়

পোড়ামাটির অলংকরণে সজ্জিত বাংলা-মন্দির বাংলার লোকশিল্পের এক অত্যাশ্চর্য এবং অবিস্মরণীয় অবদান। সামান্য মাটি, প্রতিভা, অভিজ্ঞতা, ধৈর্য ও নিষ্ঠার মিলন, মিশ্রণে যে কত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে, কত বিমূর্ত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারে, কত কল্পরাজ্যের দুয়ারের কুলুপ খুলে দিতে পারে, তা' যারা এই মন্দির দেখেছেন, তারাই উপলব্ধি করতে পারেন। ভক্তের চোখে মন্দির শুধু দেবতার নিভৃত আলয়। সেখানে অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভগৃহে, প্রদীপের ম্লান আলোকে সে মোক্ষপথের ঠিকানা খুঁজে ফেরে। কিন্তু যে যুক্তিনির্ভর, সে কেবল বিগ্রহ দর্শন করে না, শিল্পীকেও স্মরণ করে। সংস্কারকে আশ্রয় করে না সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে। স্বর্গরাজ্যের বাসনা তার নেই, মন্দির তার চোখে দেশ, কাল ও পাত্রের বিবর্তনের সাক্ষী। ইঁটের বুকে সে পাঠ করে ইতিহাসের অধ্যায়, মহাকাব্যের পর্ব, ইঁটের বুকে সে শোনে জাতির উত্থান ও পতনের সঙ্গীত।

কিন্তু এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী একান্তই বিরল। অন্যথায়, গ্রামবাংলার বুকে অনাদর ও অবহেলায় পরিত্যক্ত অসংখ্য মন্দির আজ এক মূল্যবান উত্তরাধিকার বলে গণ্য হোত, সযত্নে সংরক্ষিত হোত তার বিস্ময়সৃষ্টিকারী অলংকরণ।

সংরক্ষিত মন্দির সংখ্যায় নেহাৎই নগণ্য। সরকার এবং জনগণ উভয়েই মনে করেন বাঁকুড়া, বীরভূম বা বর্ধমান ব্যতীত অন্যত্র সুদৃশ্য মন্দির নেই। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত এবং অযৌক্তিক। মন্দিরময় গ্রামবাংলার পথে-পথে, বাঁকে-বাঁকে মন্দির! পূর্ববাংলার ধনুকা (ফরিদপুর), নলডাঙ্গা (যশোহর), হাদুয়াল (পাবনা), পুটিয়া (রাজশাহী), মুহম্মদপুর (যশোহর), দিনাজপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান তার সাক্ষ্য বহন করছে। আর পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ জেলা সম্পর্কেও এই এক কথাই বলা যায়। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলী এবং হাওড়ায় উল্লেখযোগ্য বহু মন্দির আজও দন্ডায়মান। প্রকৃতির বিরোধিতা, গ্রামবাসীর অজ্ঞতা, সরকারের ঔদাসীন্য এই মূল্যবান সম্পদকে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের মুখে তুলে ধরছে!

হাওড়া জেলার একটি থানার নাম আমতা। এই আমতার গ্রামে বহু উল্লেখযোগ্য মন্দির আছে। কয়েকটি মন্দির তে অলংকরণের নৈপুণ্যে নিঃসন্দেহে বাঁকুড় বীরভূম প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ মন্দিরের সমগোত্রীয় আমতার স্থানীয় লোকশিল্পীরাই ছিলে এইসব অসামান্য সৃষ্টির স্রষ্টা। ঝিঁকিড়া রাউতাড়া, বিনোলা, কৃষ্ণবাটীর নগণ্য কুঁড়ে ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন অনেক বটিচেল্লী অনেক ডোনাতেল্লো, অনেক রাফায়েল কিন্তু সৃষ্টি আর স্রষ্টা উভয়ের স্মৃতি আজ ম্লান!

আমতার অধিকাংশ মন্দির আটচাল শৈলীর অন্তর্ভুক্ত। নবরত্ন ও সমতল ছাদ-বিশিষ্ট মন্দিরও কিছু আছে, পঞ্চরত্নের ব্যবহার দুই-এক স্থানে হয়েছে, কিন্তু এক বাংলা এবং জোড়-বাংলা সম্ভবতঃ নেই।

আটচালার প্রাচীনতম উদাহরণ হিসাবে দুটি মন্দির অলোচনার দাবী রাখে। একটি আমতার মেলাইচন্ডীর মন্দির, অপরটি গড়ভবানীপুরের গোপীনাথ জীউ'র আলয়। মেলাইচন্ডীর মন্দিরে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠালিপি অনুসারে ঐ মন্দির নাকি ১০৫৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৬৪৯ খৃঃ নির্মিত হয়। কিন্তু আকৃতিগত তেমন কোনও প্রমাণ আজ আর নেই। বোধ হয় বারংবার সংস্কারের ফলে ঐ চিহ্নগুলি লুপ্ত হয়েছে। আসন, আচ্ছাদন, মূল প্রাচীরের দৈর্ঘ্য, কোথাও কোনও কালনির্দেশক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান নেই। অলংকরণ ছিল কিনা তাও বলা কঠিন, অন্ততঃ বর্তমান অবস্থা দেখে তো কিছুই বলা যায় না।

গড়ভবানীপুরের গোপীনাথ মন্দির আজ জরাজীর্ণ এবং পরিত্যক্ত। আয়তনে এই মন্দির মেলাইচন্ডী অপেক্ষা বৃহৎ ছিল এবং আজও তার প্রমাণ অনেক আছে। রেখাচিত্রটির সাহায্যে মন্দিরের আসন পরিকল্পনার একটি ধারণা করা যায়। পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণে প্রবেশপথ, তারপর অলিন্দ্য। মনে হয় অলিন্দ্যগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিমের ভগ্ন অলিন্দ্যপথ এখনও তার প্রমাণ বহন করে। যেমন, দক্ষিণ ও পশ্চিম অলিন্দ্য দুটির মিলনস্থলে একটি জানালার অস্তিত্ব এখনও দৃশ্যমান। সম্ভবতঃ আলো ও বাতাসের জন্য জানালাটি নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্যগত ছন্দ রক্ষার্থে নিশ্চয় পূর্ব ও দক্ষিণ অলিন্দ্যের সংযোগস্থলে অনুরূপ আরও একটি জানালা নির্মিত হয়। ডেটিং
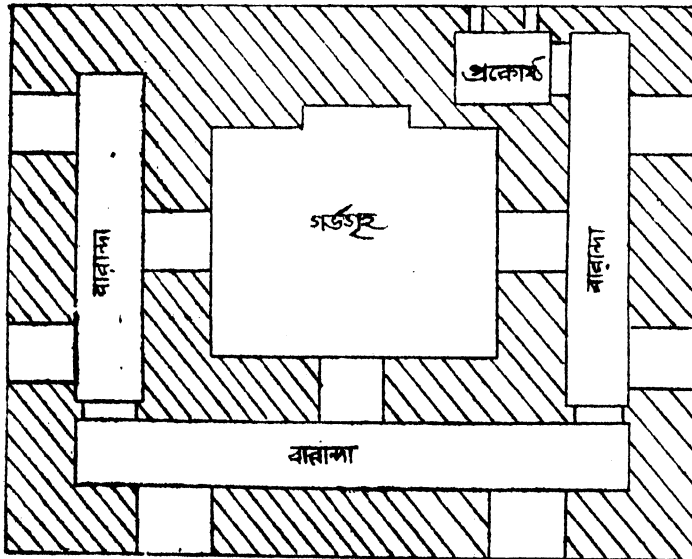
গোপীনাথ মন্দির-হাওড়া (গড় ভবানীপুর)। পরিকল্পনা ও অংকন প্রদীপ ভট্টাচার্য

কাচ্চিয়ন মনে করেন যে, এই মন্দিরে
হে ব্যতীত দুটি পার্শ্বকক্ষও ছিল
উপরে আরও কক্ষের চিহ্ন দেখা যায়।
ঘোষও ধারণা করেন যে, গোপীনাথ
রের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় তলেই
কক্ষ ছিল। কিন্তু লেখকের বিশ্বাস,
হে ব্যতীত, প্রথম তলে দুটি অতি
দুয়ারবিহীন কুঠরী ছিল। এইগুলিকে
বলা যায় না। অবশ্য কি প্রয়োজনে এই
ী দুটি নির্মিত হয় তা অনুমান-
ক্ষ। দক্ষিণে, মন্দিরের দ্বিতীয় তলে
কক্ষের চিহ্ন আজও আছে। তবে এই
আরও কক্ষ সেখানে ছিল কিনা তা
সম্ভব নয়। অন্ততঃ, মন্দিরটির আকৃতি
এত কক্ষের অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়
শ্রীযুক্ত ঘোষ লিখেছেন যে, এই দেবা-
একটি কৌতুকজনক নকশা তিনি
ছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে মন্দিরের
ন ও নকশার মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলে
হয় না। উত্তর দিক থেকে লক্ষ্য করলে
আকৃতি রত্ন অপেক্ষা আটচালার
ই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়।

গোপীনাথের মন্দির একদা সুঅলংকৃত
প্রাচীরগাত্রে এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত
স্তূপের মধ্যে দু-একটি অলংকরণ
ও পাওয়া যায়। মেলাইচণ্ডী অপেক্ষা
মন্দির প্রাচীনতর কিনা তা গবেষণা
ক্ষ। তবে স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য, অলং-
এবং ভূরশুট রাজবংশের প্রাচীন দলিল-
পরীক্ষা করে মনে হয়েছে যে, এই
য় নিঃসন্দেহে সপ্তদশ শতাব্দীর
। ভূরশুটরাজ নরনারায়ণের মৃত্যুর
১১৯ বঙ্গাব্দে গড়ভবানীপুর বর্ধমান-
কর্তৃক অধিকৃত হয়। মনে হয় নর-
ণের রাজত্বকালের (১০৯৮—১১১৯)
ই গোপীনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমতায়
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আটচালা
নির্মিত হয়। যেমন রাউতারা গ্রামের
ী-রায়বাড়ীর দামোদর-মন্দির (১৬৭৯
মহিষামুড়ি গ্রামের ভুবনেশ্বরী-মন্দির
.৯ খৃঃ), জয়পুর-সাঁতরাবাড়ীর মতি-
মন্দির (১৬৮৪ খৃঃ), ঝিঁকিড়া
বাড়ীর শ্যামসুন্দর মন্দির (১৬৯১
ব্দ)।

রাউতারার দামোদর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-
১৬০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৯ খৃঃ।
দনের তলে আজও প্রতিষ্ঠালিপিটি
ন। ম্যাক্‌কাচ্চিয়ন যে তারিখ সংগ্রহ
ন তা ভুল। আকৃতিগত তেমন কোনও
টা না থাকলেও দামোদর মন্দিরের
মূল প্রাচীর এবং চালা বা আচ্ছাদন,
তন প্রধান অংশের মধ্যে সমতা আছে।
রণের বিষয়বস্তু হিসাবে ঘনীভূত
তা, পদ্ম ও পদ্ম কোরকের ব্যবহার
। অন্য কোনও বিষয়বস্তু স্থান পায়
কারুকার্য অতি সূক্ষ্মতরের।

মহিষামুড়ির ভুবনেশ্বরী-মন্দির আম-
তার প্রাচীন আটচালা মন্দিরগুলির অন্যতম।
আয়তনে মন্দিরটি রাউতারার দামোদর-
মন্দির অপেক্ষা কিছু বড়। আসল ও মূল
প্রাচীর একরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আচ্ছাদন
আসনকে প্রায় সম্পূর্ণ আবৃত করেছে। কিন্তু
আকৃতিগত যে ত্রুটিটি লক্ষণীয় তা হোল
আচ্ছাদনের ঊর্ধ্বগতি। আচ্ছাদন চার ধার
থেকে খাড়াভাবে উপরে উঠে গেছে এবং তার
চারটি শিরাই স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। অপেক্ষা-
কৃত ধীরগতিতে আচ্ছাদন নির্মাণ করলে
এই ত্রুটি প্রকাশ পেত না। মহিষামুড়ির
মন্দিরটি দক্ষিণমুখী এবং এই দিকের
প্রাচীর গাত্রেই রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন
কাহিনী অলংকরণ হিসাবে স্থান পেয়েছে।
খিলানশীর্ষে রাম ও রাবনের যুদ্ধ এবং
প্রাচীরের নিম্নদেশে কৃষ্ণলীলা অতি যত্ন ও
নিষ্ঠার সঙ্গে উৎকীর্ণ হয়েছে। পশ্চিম
প্রাচীরেও কিছু অলংকরণ ছিল। বর্তমানে,
সেখানে চুনের গজলক্ষ্মী মূর্তি শোভা
পাচ্ছে।

জয়পুর গ্রামের সাঁতরাবাড়ীর দামোদর
মন্দিরটি ১৬০৬ শকাব্দ বা ১৬৮৪ খৃঃ
নির্মিত হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মন্দিরটির
তলভাগের কিছু অংশ ভূপ্রোথিত হয়েছে তাই
আকৃতিগত সৌন্দর্য আর নেই। কারুকার্য
যথেষ্ট সূক্ষ্মতরের ছিল। বর্তমানে প্রবেশ
পথের বামপ্রান্তে কয়েকটি অবতার মূর্তি
দেখা যায়, অন্যান্য অলংকরণ বিভিন্ন কারণে
বিনষ্ট হয়েছে।

ঝিঁকিড়া মল্লিকবাড়ীর শ্যামসুন্দর
মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬১৩ শকাব্দ
অর্থাৎ ১৬৯১ খৃঃ। গঠন সাধারণ কিন্তু
অলংকরণের বিষয়বস্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
খিলানশীর্ষে একটি গণেশমূর্তি এবং তার
নিম্নে কল্পলতা ও প্রস্ফুটিত পদ্ম। প্রবেশ-
পথের উভয় পার্শ্বে, প্রাচীরের তলদেশ
স্পর্শ করে উৎকীর্ণ রয়েছে বহু শোভা-
যাত্রীর দৃশ্য। তৎকালীন বাংলার সমাজে
ইউরোপীয়দের অনুপ্রবেশের ফলে সাধারণ-
মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল
মন্দিরশিল্পীরা তাকে তাঁদের শিল্পকর্মের
মাধ্যমে ভাবীকালের জন্য ধরে রেখেছিলেন।
বিদেশী জলদস্যু কর্তৃক দেশীয় নরনারী
অপহরণ এবং দাস-ব্যবসায়ের জন্য তাদের
জাহাজযোগে বিদেশে প্রেরণের দৃশ্যগুলি
পোড়ামাটির বুকে সুন্দর ফুটে উঠেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আম-
তার বিভিন্ন অঞ্চলে আরও কয়েকটি উল্লেখ-
যোগ্য আটচালা মন্দির নির্মিত হয়। এই
মন্দিরগুলি হোল, রাউতারা গ্রামের ঘোষ-
বাড়ীর সীতারাম মন্দির (১৭০০ খৃঃ),
অমরাগড়ি গ্রামের গজলক্ষ্মী মন্দির (১৭২৯
খৃঃ), ঝিঁকিড়ার জয়চণ্ডী মন্দির (১৭৫০
খৃঃ), অমরাগড়ির দধিমাধব (১৭৬৪ খৃঃ),
ঝিঁকিড়ার মণ্ডলপল্লীর দামোদর মন্দির
(১৭৬৯ খৃঃ), গাজীপুরের শিবমন্দির
(১৭৭৫ খৃঃ), সিংটী গ্রামের লক্ষ্মী-জনার্দন
মন্দির (১৭৭৭ খৃঃ) এবং শীতলা মন্দির
(১৭৭০-৭৫ খৃঃ)।

উল্লিখিত মন্দিরগুলির মধ্যে রাউতারার
সীতারাম, অমরাগড়ির গজলক্ষ্মী ও দধি-
মাধব, গাজীপুরের বুড়োশিব এবং সিংটীর
লক্ষ্মীজনার্দন সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

রাউতারার সীতারাম মন্দিরটি ১৬২২
শকাব্দের (১৭০০ খৃঃ) ১৬ই মাঘ তারিখে
প্রতিষ্ঠিত হয়। গোপাল নামধারী জনৈক
শিল্পী মন্দিরটি নির্মাণ করেন। দক্ষিণাস্য
এই মন্দিরে রামায়ণের বিভিন্ন দৃশ্য যে কত
সুন্দর, কত নয়নাভিরাম হয়ে ধরা দিয়েছে
তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। অশোকবনে
সীতা, রাম কর্তৃক সপ্তশাল ভেদ, ত্রিশিরার
যুদ্ধযাত্রা ইত্যাদি কয়েকটি দৃশ্য এই
মন্দিরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। তবে অলংকরণের
সৌন্দর্য মন্দিরটির আকৃতিতে উপস্থিত
নেই।

অমরাগড়ির গজলক্ষ্মী মন্দিরের অলং-
করণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খিলানশীর্ষে
পদ্ম ও কল্পলতা উৎকীর্ণ। খিলানবাহী
স্তম্ভগুলি অধিষ্ঠান থেকে বোধিকা পর্যন্ত
কৃষ্ণলীলা, হংসমিথুন, বনাহরিণ ইত্যাদি
বিষয়বস্তু দ্বারা সুসজ্জিত। দক্ষিণ ও বাম
প্রান্তে ভিত্তিভূমির কিছু ঊর্ধ্বে পত্রগাত্র

গাজীপুরের ভগ্ন মন্দির

ও মুঘলদের যুদ্ধযাত্রার দৃশ্য উৎকীর্ণ। বামপ্রান্তে পর্তুগীজ সৈন্যরা বন্দুক হাতে ধাবমান, দক্ষিণ প্রান্তে মুঘলরা যুদ্ধযাত্রা করেছে। তাদের হাতে ঢাল ও তরোয়াল, সঙ্গে বাদকবৃন্দ। ক্ষমতায় আসীন মুঘল সরকারের সঙ্গে ক্ষমতালিপ্সু ইউরোপীয়দের সংঘর্ষের চিত্রটি সুন্দর রূপায়িত হোয়েছে অন্যান্য ইটের বুকে। গর্ভগৃহের সম্মুখভাগও অলংকৃত কিন্তু বিষয়বস্তু কেবল পদ্ম ও লতা। মন্দিরটির আকৃতি গতানুগতিক।

অমরাগড়ি তথা আমতার আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য মন্দির হোল দধিমাধবের আটচালা। আয়তনের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও অলংকরণের অনির্বচনীয় সুষমার জন্য এই কথাও মনে হবে যে, এই মন্দিরটি বীরভূম বা বাঁকুড়ার সমকালীন শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সমগোত্রীয়।

আচ্ছাদনের তলেই আছে প্রতিষ্ঠালিপি। ১৬৮৬ শকাব্দ বা ১১৭১ বঙ্গাব্দের (১৭৬৪ খৃঃ) ২৩শে বৈশাখ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গর্ভগৃহের সামনে একটি অলিন্দ, অলিন্দের সম্মুখভাগ তিনটি পত্রাকৃতি খিলান দ্বারা সজ্জিত। এই খিলানগুলির উপরভাগ রাম ও রাবণের যুদ্ধের নানা দৃশ্য দ্বারা পূর্ণ। কয়েকটি মৃৎফলকের কারুকার্য এবং তার সূক্ষ্মতা এত উচ্চস্তরের যে দেখামাত্রই দর্শকদের বিস্মিত হতে হবে। অশোকবনে সীতা শক্তিশেলের আঘাতে লক্ষ্মণের পতন, হনুমানের বিশল্যকরণী আনয়ন ইত্যাদি দৃশ্য এবং কয়েকটি পুষ্পলতাশোভিত ফলক রীতিমত বিমূর্ত সৌন্দর্যের পরিবেশ সৃষ্টি
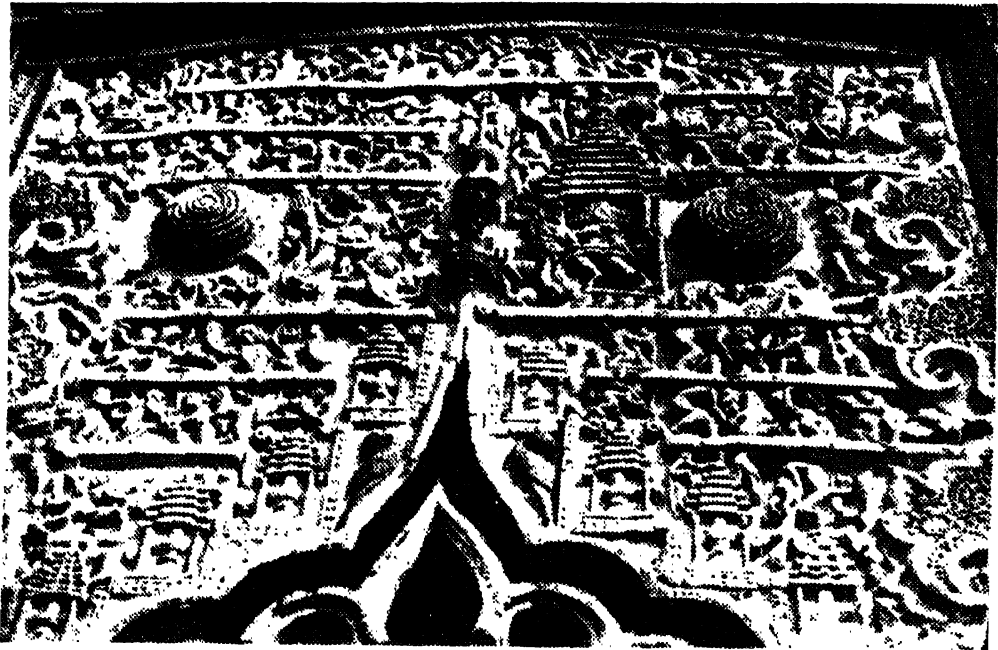
অলংকৃত খিলান শীর্ষ/ভুবনেশ্বরী মন্দির

অলংকৃত স্তম্ভ/দধিমাধব মন্দির
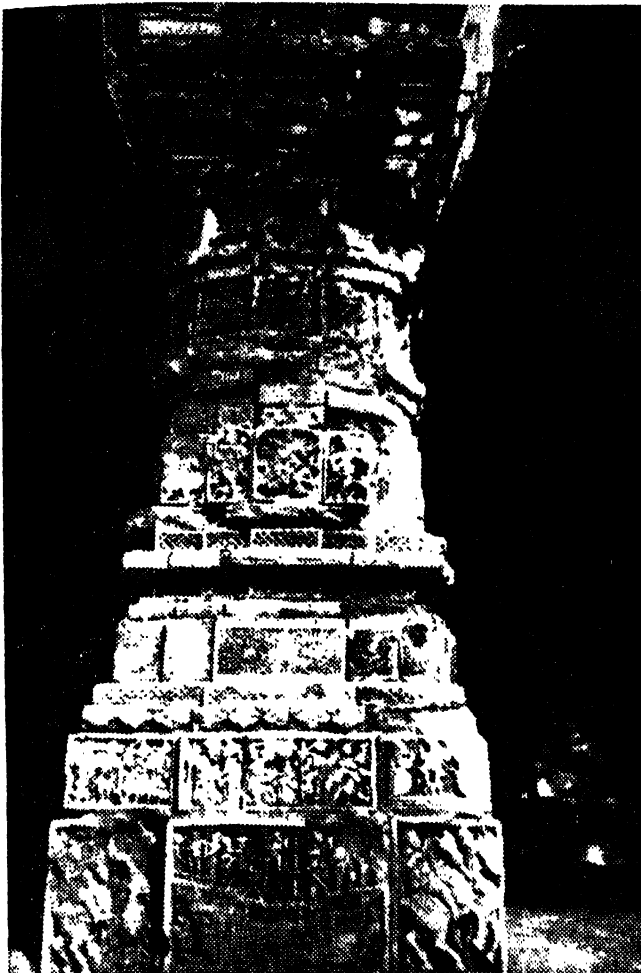
। খিলানবাহী স্তম্ভগুলিও সু-
ত! কৃষ্ণের জন্ম, গোপ-লীলা, কালীয়-
মথুরা যাত্রা, কংসবধ ইত্যাদি কৃষ্ণ-
বিষয়ক দৃশ্যগুলি স্তম্ভগাত্রে স্থান
ছ। স্তম্ভের পাদদেশে সেকালের
বাসী-ইউরোপীয়দের জীবনযাত্রা প্রতি-
ত হয়েছে। ইউরোপীয়দের দাস-
। মৃগয়াযাত্রা, নারীনিগ্রহ ইত্যাদি
লাপ মৃৎ-ফলকের বুকে শিল্পীরা
মনযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে
চেয়েছেন। প্রাচীরের উভয়প্রান্তে,
ভূমির কিছু উপরে মুঘলদের জীবন-
দৃশ্যও উৎকীর্ণ হয়েছে। গর্ভগৃহের
পথের উপরভাগেও কয়েকটি উল্লেখ-
দৃশ্য। যেমন, রাম কর্তৃক হরধনু
সূর্পণখার দুর্গতি, সেতুবন্ধন
দৃশ্যমান! প্রবেশ-পথের দুই পাশে
পাড়ামাটির দ্বারপাল স্থাপিত।

জীপুর গ্রামের আটচালা শিব-
ট আজ ভগ্ন ও পরিত্যক্ত অবস্থায়
ান। পূর্বদিকের প্রাচীরে, আচ্ছা-
দনের ঠিক নীচেই একটি লিপি আছে।
তা থেকে জানা যায় যে, ১৬৯৭ শকাব্দ বা
১৭৭৫ খৃঃ হরিচারণ দাস নামক জনৈক
শিল্পীর দ্বারা এই মন্দির নির্মিত হয়।
মন্দিরটির আকৃতি উল্লেখনীয় নয়। আমতার
অন্যান্য আটচালার ক্ষেত্রে যেমন সামনে
একটি অলিন্দ্য থাকে, এই মন্দিরটির তাও
ছিল না। মনে হয় যথাসাধ্য কম ব্যয়ে
মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল কিন্তু অলং-
করণের উৎকর্ষতার বিচারে, যে ফলকগুলি
আজও প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন আছে তাদের
কারুকার্য নিশ্চয় মনে রাখার মত। বিভিন্ন
পুরাণ, মহাকাব্যের দৃশ্য এবং লতা-পুষ্পের
ব্যবহারে দক্ষিণ ও পশ্চিমের প্রাচীরগাত্র
একদিন সুসজ্জিত ছিল। তার প্রমাণ আজও
একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি।

সিংটীর আটচালা লক্ষ্মী জনার্দন
মন্দিরটিও একদা তার অলংকরণের জন্য
আকর্ষণীয় ছিল, কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণ
ব্যবস্থার অভাবে মন্দির ও তার কারুকার্য
উভয়ই দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

উনিশ শতকেও আমতায় কয়েকটি আট-
চালা মন্দির নির্মিত হয়েছে। যেমন, জয়-
পুর গ্রামে, জয়চণ্ডীতলায় শ্রীধর মন্দির
(১৮১৯ খৃঃ), ঝিঁকিড়াগ্রামে, হরিনারায়ণ
মল্লিকের আটচালা (১৮৯২ খৃঃ), জয়পুর
উত্তরপাড়ায় রাধাকৃষ্ণ মন্দির (১৯২৯ খৃঃ)।
এই মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রীধর মন্দিরটিই
সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। নাতিপ্রসস্ত অলিন্দের
সম্মুখভাগ, খিলানবাহী স্তম্ভ, প্রাচীরের
তলভাগ গতানুগতিক মহাকাব্য ও পুরাণের
দৃশ্যে অলংকৃত। কারুকার্য নিম্নস্তরের
এবং গতিহীন। উপরে আলোচিত মন্দির-
গুলির অলংকরণের সঙ্গে শ্রীধর মন্দিরের
অলংকরণ তুলনীয় হতে পারে না।

আটচালা মন্দিরের একটি পরিবর্ধিত
রূপ বারচালা। আমতায় এই শ্রেণীর
মন্দিরের একটি মাত্র উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত
দৃষ্টিগোচর হয়েছে। মন্দিরটি রাউতারা
গ্রামে আদিত্য রায়ের গৃহপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়-
মান। প্রতিষ্ঠালিপি পাঠ করে জানা যায়
যে, ১৬৮৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৬২ খৃঃ
শুকদেব নামধারী জনৈক শিল্পী মন্দিরটি
নির্মাণ করেন। মন্দিরটির সম্মুখভাগ
সম্পূর্ণ অলংকৃত। ডেভিড ম্যাককাচ্চিয়ন
মন্দিরটিকে আটচালা মনে করেছেন। প্রকৃত-
পক্ষে গঠন অনুযায়ী মন্দিরটি বারচালাই।
প্রধান চারচালা আচ্ছাদনের উপর অপেক্ষা-
কৃত ছোট একটি চারচালা থাকলে মন্দিরটিকে
আটচালা বলা হয়। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় চার-
চালার উপরে যদি আরও ক্ষুদ্র একটি চার-
চালা থাকে তবে মন্দিরটি হয় 'বারচালা'।
মন্দিরটির তৃতীয় শিখরটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র
এবং ক্ষুদ্রত্বের জনাই সম্ভবতঃ
ম্যাককাচ্চিয়ন এইরূপ ধারণা করে থাকবেন।
কিন্তু 'বাংলা-মন্দিরের' স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য
অনুযায়ী তৃতীয় শিখরের উপস্থিতির জন্য
মন্দিরটি বারচালা হিসাবেই গণ্য হবে।

আটচালা মন্দির আমতায় যথেষ্ট
নির্মিত হলেও অন্যান্য শৈলীগুলির ব্যব-
হার তেমন হয় নি, চৌচালা, দোচালা,
জোড়বাংলা, শিখর-চালা ইত্যাদি শৈলীগুলি
সম্ভবতঃ একেবারেই অনুপস্থিত। বার-
চালার একটিমাত্র উদাহরণ লেখক সংগ্রহ
করতে পেরেছেন। তবে, কয়েকটি নবরত্নের
দৃষ্টান্ত বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে আছে, পঞ্চ-
রত্নের ব্যবহারও খুব কম ক্ষেত্রেই হয়েছে,
এবং তা দোলমঞ্চের আচ্ছাদনেই সীমিত।
অথচ এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই
যে, আমতার মন্দিরশিল্পীরা কেবল একটি
শৈলীতেই পটু বা অভ্যস্ত ছিলেন। আজও
আমতার বিভিন্ন গ্রামে অনেক সূত্রধর শিল্পী
বাস করছেন যাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের
মন্দিরশিল্প চর্চা একেবারে বিস্মৃত হন নি।
এরা মাত্র কিছুদিন আগেও বিভিন্ন শ্রেণীর
মন্দির নির্মাণ করেছেন। আজও মৃত ব্যক্তির
সমাধির উপর ক্ষুদ্রাকৃতি স্মৃতিমন্দির
নির্মাণ করা এদের একটি প্রধান জীবিকা।
এইসব সমাধিমন্দিরের মধ্যে আটচালা,
পঞ্চরত্ন, নবরত্ন তিনটি শৈলীই উপস্থিত।
সুতরাং, স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই
সূত্রধর শিল্পীদের পূর্বপুরুষেরা, যাঁরা

আমতার আটচালা মন্দিরগুলি নির্মাণ করেছিলেন, তাঁরা রত্নশৈলীতেও অভ্যস্ত ছিলেন। তবে, কি কারণে রত্নশৈলী অধিক অনুসৃত হয় নি তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। লেখকের ধারণা এই যে, হাওড়া জেলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য পার্শ্ববর্তী হুগলী জেলার মন্দিরশিল্পের অনুপ্রসারের ফল এবং হুগলীর বহু মন্দির আটচালার গঠন অনুযায়ী নির্মিত।

আমতার নবরত্নগুলির মধ্যে উল্লেখনীয় হোল :—আসন্দা গ্রামের শ্রীধর মন্দির (১৭৮৯ খৃঃ), ঝিঁকিড়া গ্রামের গড়চণ্ডী-মন্দির (১৭৯৫ খৃঃ), চিংড়াজোলের দামোদর মন্দির (১৮৯১ খৃঃ), ঝিঁকিড়া হাজরা-বাড়ীর শ্রীধর মন্দির (১৮৯৭ খৃঃ), পশ্চিম-পাড়ায় রায়বাড়ীর শ্রীদামোদর মন্দির (?)।

আসন্দার শ্রীধর মন্দিরটি সম্ভবতঃ আমতার রত্নমন্দিরগুলির মধ্যে বৃহত্তম। মন্দিরটি ১৭১১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৯ খৃঃ নির্মিত হয়। মন্দিরের সম্মুখভাগ রামায়ণের যুদ্ধের দৃশ্য দ্বারা অলংকৃত, তবে কারুকার্য সূক্ষ্মতরের নয়।

গড়চণ্ডী মন্দিরটি নির্মিত হয় ১৭১৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৯৫ খৃঃ। পোড়ামাটির পরিবর্তে অলংকরণের সুদৃশ্য কল্পলতা, পদ্ম ইত্যাদি খতের সঙ্গে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমানে তা বিবর্ণ। বাংলার মন্দিরশিল্পের বিবর্তন ও ক্রমা-বনতির সূত্র সন্ধান করতে হলে ঝিঁকিড়া পশ্চিমপাড়ায় শ্রীদামোদরের নবরত্ন মন্দিরটি অবশ্য দ্রষ্টব্য। আকৃতি এবং আয়-তন, কোনও দিক থেকেই মন্দিরটি উল্লেখ-যোগ্য নয়। কিন্তু অলংকরণের ক্ষেত্রে কিছু অভিনবত্ব আছে এবং তা লক্ষ্যণীয়। মন্দিরটির সম্মুখ ভাগে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী আচ্ছাদনের নীচে এবং আচ্ছা-দনের নীচ থেকে ভিত্তিভূমি পর্যন্ত লম্ব-ভাবে, বহু সারি বর্তমান। ঐসব সারি-গুলিতে বিভিন্ন খোপে বিভিন্ন পৌরাণিক দৃশ্য প্রদর্শিত হচ্ছে। কিন্তু কোনও মূর্তি বা কোনও লতা-পুষ্পই পোড়ামাটির নয়, সবই চুনের দ্বারা নির্মিত। কেন এমন হোল? এর উত্তরে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দী বা তার কিছু পূর্ব থেকেই পোড়া-মাটি শিল্পের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে এবং দক্ষ মন্দিরশিল্পীর সংখ্যাও কমে যায়, সেই সঙ্গে ইউরোপীয়দের মাধ্যমে দেশীয়-দের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। বলা বাহুল্য স্থাপত্য, ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পোড়ামাটি শিল্পের অবনতি এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভা-বিত মন্দির প্রতিষ্ঠার পরিবর্তিত রুচি, এই উভয় কারণে মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির পরিবর্তে চুনের ব্যবহার প্রচ-লিত হয়। কেবল তাই নয়, ইউরোপীয় গ্রীক, গথিক প্রভৃতি স্থাপত্যরীতির বিভিন্ন প্রতীক মন্দিরগাত্রকে অলংকৃত করে। 'ফেস্টুন', 'এগ', 'সোয়াগ', 'ফ্যান লাইট', ইত্যাদি এবং 'ডোরিক', 'টাসকান', 'করিন-থিয়ান', 'আইওনিক' প্রভৃতি স্তম্ভ দেবালয় বাসগৃহ উভয় ক্ষেত্রেই বহুল পরিমাণে নির্মিত হয়। শ্রীদামোদর মন্দিরটি মন্দির-শিল্পের পতন এবং বিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত।

সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দির আমতায় খুবই কম। কি স্থাপত্য, কি ভাস্কর্য, কোনও দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে, অনু-সন্ধিৎসু পাঠকের জন্য কয়েকটি মন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, গাজীপুর গ্রামের গোবিন্দ মন্দির (১৭১৪ খৃঃ), জয়-পুর মণ্ডলপাড়ায় ভগ্ন মন্দির (১৭৫০ খৃঃ), রাউতারা কেরাণী-রায়বাড়ীর দ্বিতল মন্দির (১৭৫৯ খৃঃ) এবং ঐ গ্রামেই যশোদা রায়ের দ্বিতল লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির (বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক?)।

কেরাণীবাড়ী ও যশোদা রায়ের মন্দির দুটি চুনের অলংকরণের জন্য নিশ্চয় দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ঐ সময়ে পোড়ামাটি শিল্পের পতন অপেক্ষা মন্দিরস্থাপয়িতাদের রুচি অধিকতর দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। নতুবা চুনের প্রলেপের উপর অত সুন্দর অলংকরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হোত না। প্রতিভাবান শিল্পী তখনও কিছু ছিলেন এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাতা তথা বিত্তবানদের রুচির সঙ্গে তাঁরা তাঁদের শিল্পকর্মকেও নতুন ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করছিলেন।

আমতার অধিকাংশ মন্দিরই আজ নানা কারণে প্রতিমুহূর্তে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হচ্ছে। অথচ বাংলার লোকশিল্পের এক অন্যতম অবদান, পোড়ামাটির অলংকরণে মন্দিরগুলি সুশোভিত এবং এই বিশিষ্ট শিল্পটি আজ একরূপ লুপ্ত হয়েছে বলা চলে। বাংলার লোকশিল্পের স্মরণীয় অবদান হিসাবে আমতার এই মন্দিরগুলি সংরক্ষণ করার জন্য সরকার এবং জনগণ উভয়কেই এগিয়ে আসতে হবে।

আগের ঘটনা

[চাল্লশের পরে বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুরে বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসার ঝিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের গভীর দেখা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ার বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ার থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ও'রা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে!

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের খবর, চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিনিসপত্রের দামও আকাশছোঁয়া।

এমন সময় এল সেই মারাত্মক সংবাদ। জাপানীরা বোমা ফেলেছে বর্মায়। সেখান থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে ভারতে। রাজদিয়াতেও জান নিয়ে ফিরে এসেছে একটি পরিবার। পরদিন। সকলেই ছুটল ত্রৈলোক্য সেনের কাছে। শুনল রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে আসার মর্মান্তিক কাহিনী। সময় এগোল যথানিয়মেই। দেখতে দেখতে যুদ্ধের হাওয়া এসে লাগল রাজদিয়াতে। সৈন্য আসতে শুরু করেছে। কিছুদিন বাদেই খবর পাওয়া গেল রেঙ্গুনের পতন। কলকাতা থেকেও লোক পালাচ্ছে।]

(আটচল্লিশ)

লকাতা থেকে লোক পালাবার হিড়িক হয়েছে। ফলে শুধু রাজদিয়াই নয়, পাশের গ্রাম-গঞ্জ-জনপদ দ্রুত ভরে । চারধারের গ্রামগুলোই কি শুধু? বে সারা জলবাঙলায় হয়তো মানুষে ছেয়ে যাচ্ছে।

তাদিন রাজদিয়ার বাড়ি বাড়ি ঘুরে আনছিলেন হেমনাথ। ইদানীং কিছু- রে চারপাশের গ্রামগুলোতে যাচ্ছেন। বলা ঘুম থেকে উঠেই তিনি বেরিয়ে ফরতে ফিরতে বিকেল কিংবা সন্ধ্যে। কোনদিন বলেন, 'আজ কেতুগঞ্জে লাম। শুধু কলকাতারই লোক।' ন বলেন, 'আজ গিয়েছিলাম বাজিত- সেখানেও এক অবস্থা।' কোনদিন 'ভাগ্যিস যুদ্ধটা বেধেছিল, আর ী ব্যাটারা বার্মায় বোমা ফেলেছিল! । ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরে এসেছে। কানদিন এখানে আসত না, এখানকার চুকিয়ে কলকাতবাসী হয়েছিল, কল্যাণে দেশের বাড়ির জন্য তাদেরও কেঁদে উঠেছে।'

●

ানিসপত্রের দাম আগে থেকেই বাড়- কলকাতায় ইভাক্যুয়েশেন শুরু হবার হু করে চড়ছে। এখন সব নরই সকালে এক দর, দুপুরে এক ন্ধ্যায় আরেক দর। দরটা কখন কতগুণ চড়বে, আগে তার কোন পাওয়া যায় না। বাজার এখন বড্ড ।

তবু যত দামই বাড়ুক, কলকাতার তুলনায় তো অনেক কম।

আজকাল হাটে গেলে মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়। কলকাতার বাবুরা হঠাৎ এই সস্তাগন্ডার দেশে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। যে জিনিস দ্যাখেন তাই কিনে ফেলেন, দরদস্তুর কিছুই করেন না, যা দাম চাওয়া যায় ঝনাৎ করে ফেলে দেন। আর কথায় কথায় বলেন, 'ড্যাম চীপ—

সেদিন অবনীমোহন আর হেমনাথের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল বিনু। সেখানে চমকপ্রদ একটা ব্যাপার ঘটল।

একজন মুসলমান ব্যাপারী কটা গাছ- পাকা পেঁপে নিয়ে বসেছিল। সব চাইতে বড় ফল দুটো বেছে নিয়ে অবনীমোহন বললেন, 'দাম কত?

ব্যাপারী বলল, 'একখান আধলি লাগবে বাবু।'

জলবাঙলায় আসার পর প্রথম প্রথম দরদাম করতেন না অবনীমোহন। আজকাল এখানকার হালচাল বুঝে গেছেন। যে জিনিসের দাম চার পয়সা ব্যাপারীরা হাঁকে দু আনা। কাজে দরটর না করলে কি চলে।

অবনীমোহন বললেন, 'বল কি, ঐ দুটো পেঁপের দাম আট আনা।'

'হ বাবু। এক দর। সিকি আধলাও কমাইতে পারুম না।'

'ন্যায্য দাম বল, নিয়ে যাই।'

'চাউলের মণ বাইশ ট্যাকা, বাগুনের স্যার ছয় পহা, ঝিঙ্গার তিন পহা। দুইটা বড় পাউপার (পেঁপে) দাম আট আনা চাইয়া অলেহ্য (অন্যায়) চাই নাই।

'শোন ব্যাপারী, তোমার কথাও থাক, আমার কথাও থাক। ছ-আনা দিচ্ছি। দিয়ে দাও।

ব্যাপারী এবার উত্তর দিল না; মুখ ঘুরিয়ে পাশের মরিচ-ব্যাপারীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

অবনীমোহন বললেন, 'কি হল, আমার কথাটা শুনতে পেলে না।'

মুখ না ফিরিয়েই ব্যাপারী বলল, 'শুনছি।'

'আমি যা বললাম সেই দামে দেবে কি দেবে না, কিছু বললে না তো?'

একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারী বলল, 'আপনার কাম না বাবু—'

অবনীমোহন অবাক, 'কী আমার কাছে নয়?'

'আমার পাউপা (পেঁপে) কিনন (কেনা)। আপনের কাছে তো আষ্ট গন্ডার পয়সা চাইছি। 'ড্যাম্পি' বাবুরা (ড্যাম চীপ) আইলে এক ট্যাহা দিয়া লইয়া যাইব।'

সত্যিই তাই। তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে এক কলকাতার বাবু এসে ছোঁ মেরে পেঁপে তুলে নিল। দাম বাবদ একটি টাকা আদায় করে গেঁজেতে পুরতে পুরতে সগর্বে হাসল ব্যাপারী, 'দেখলেন তো?'

এ নিয়ে তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি বাধানো যেত। অবনীমোহন কিছুই করলেন না। মুখ লাল করে মাছ-হাটার দিকে চলে এলেন।

সুজনগঞ্জে এসেই হেমনাথ ধানের আড়তগুলোর দিকে চলে গিয়েছিলেন। অবনীমোহন আর বিনু গিয়েছিল বাড়ির জন্য সওদা করতে।

যাই হোক মাছের বাজারে এসে প্রায় একইরকম অভিজ্ঞতা হল।

এক চেনাশোনা মাছ-ব্যাপারী, নাম তার গয়জদ্দি নিকারী, এক কোণে দোকান সাজিয়ে বসেছিল। সুজনগঞ্জে প্রথম যেদিন এসেছিলেন, সেদিন থেকেই গয়জদ্দির কাছে মাছ কিনছেন অবনীমোহন। গয়জদ্দি তাঁর বাঁধা ব্যাপারী।

গয়জদ্দি আজ ভাল ভাল লোভনীয় মাছ এনেছে। তার সামনে দুটো বড় বড় বেতের চ্যাঙারি, চ্যাঙারির ঢাকনার ওপর পেট লাল গরমা, কালবোস, কাজলি এবং কুলীন জাতের চকচকে পাবদা মাছ সাজানো।

এই জলের দেশে যেখানে অঢেল মাছ, সেখানে এরকম পাবদা দুর্লভ। মাছগুলোর লালচে রুপোলি শরীর এত চকচকে যে মনে হয়, পালিশ করা।

অবনীমোহন বললেন, 'ক' কুড়ি পাবদা আছে গয়জদ্দি—'

গয়জদ্দি বলল, 'তিন কুড়ি।'

'দাম কত নেবে?'

'পাবদাগুলান আপনেরে দিমু না জামাইকর্তা—'

অবনীমোহন অবাক হলেন, 'কেন হে!'

গয়জদ্দি বলল, ঐ গুলানের অন্য গাহেক (খদ্দের) আছে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে কৌতুকের গলায় অবনীমোহন বললেন, 'ড্যাণ্ডিবাবুরা নাকি?'

গয়জদ্দি একগাল হাসল, 'হ। ড্যাণ্ডি-বাবুরা একেবারেই মুলায় (দরদাম) করে না। যা কই তাই দিয়া যায়। এই সুযুগে দুইখান পহা কইরা লই।'

অবনীমোহন বললেন, 'পাবদা না দাও, কালবোসটা দাও—'

'কালিভাউসটাও (কালবোস) ড্যাণ্ডি-বাবুগো লেইগা রাখছি।'

অগত্যা তুলা বোঝাই করে কাজলি মাছই কিনলেন অবনীমোহন।

এখন সুজনগঞ্জের হাটে 'ড্যাণ্ডি' বাবু-দেরই জয়জয়কার।

●

বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তাদের ছেলেমেয়েরা রাজ-দিয়ার স্কুল-কলেজে ভর্তি হতে লাগল।

বিনুর ক্লাসেই দশ-বারোটা ছেলে ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে সবচাইতে চমকদার হল রুদ্র বাড়ির অশোক। প্রথম দিন স্কুলে এসেই সে সবার মনোহরণ করে ফেলল। বিনু আর শ্যামল তো রীতিমত তার ভক্তই হয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। হবার মতন যথেষ্ট কারণও রয়েছে।

অশোক স্কুলে আসে সাইকেল করে। ঝকঝকে নতুন সাইকেল তার। স্কুলের সামনের মাঠটায় বোঁ করে একটা পাক দিয়ে সাইকেলটা যখন সে থামায় সেই বিস্ময়কর দৃশ্যের দিকে অন্য ছেলেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এত সুন্দর সাইকেল সারা রাজদিয়াতে আর কারো নেই।

সাইকেলের নানারকম খেলাও জানে অশোক। একটু আগে এলে সে-সব দেখায়ও সে। হ্যাণ্ডেল না ধরে অশোক সাইকেল চালাতে পারে। চলন্ত অবস্থায় সীটে বসে ভাঙাচোরা পরতে পারে।

বিনু আর শ্যামলের চাইতে অশোক বেশ বড়; অন্তত তিন চার বছরের তো বটেই। ফেরতা দিয়ে কাপড় পরে সে, লম্বা জুলপি রাখে। ঘাড়ের কাছে জামার কলারটা সবসময় খাড়া হয়ে থাকে। বুকের কাছে একটা মোটে বোতাম আটকানো, বাকি দুটো খোলা। ফলে ভেতরের গেঞ্জি দেখা যায়। ছোকরার ঠোঁটের ওপর সরু সৌখিন গোঁফ। যখন কায়দা করে হাঁটে পায়ের চটিটা দু ফুট আগে আগে চলে। কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চমৎকার শিস দিতে পারে সে।

একেক দিন একেক রকম করে চুল আঁচড়ে আসে অশোক। একদিন হয়তো ব্যাকব্রাশ করে এলো, একদিন এল এ্যালবার্ট কেটে কিংবা চুলে ঢেউ খেলিয়ে।

কোনদিন এসে অশোক বলে, 'কার মতন চুল আঁচড়েছি বলতো?'

সারা ক্লাস চারদিক থেকে সাগ্রহে সমস্বরে শুধায়, 'কার মতন?'

'রবীন বিশ্বাসের।'

বিনু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, রবীন বিশ্বাস কে ভাই?'

রবীন বিশ্বাসের নাম জানে না, এমন ছেলে হয়তো এই প্রথম দেখল অশোক। অবাক বিস্ময়ে সে বিনুর দিকে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'রবীন বিশ্বাসকে চেন না!'

রবীন বিশ্বাসকে না চেনার লজ্জায় মাথা আপনা থেকেই নুয়ে পড়ে বিনুর।

অশোক আবার বলে, 'স্টাইল যদি শিখতে হয় রবীন বিশ্বাসের সিনেমা দেখতেই হবে।'

বিনু এতক্ষণে বুঝতে পারে, রবীন বিশ্বাস একজন অভিনেতা।

কোনদিন এসে অশোক বলে, 'আজ ছবি মজুমদারের স্টাইলে চুল আঁচড়েছি।' কোনদিন বলে আজ অতীন ব্যানার্জির মতন আঁচড়েছি।'

জামাও অশোক একরকম পরে না। বেশিরভাগ দিনই কলারওলা অথচ হাতা-হীন পাঞ্জাবী পরে আসে। বলে, 'কি একটা বইয়ে মনে পড়ছে না, অমলেশ বড়ুয়া এই-রকম জামা পরেছিলেন।

ছোটদি আর বড়দির মুখে অমলেশ বড়ুয়ার নাম শুনেছে বিনু। কাজেই তার সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না।

কিন্তু এসব অতি সামান্য ব্যাপার। ছেলেদের নিশ্বাস বন্ধ করে দেবার মতন আরো অনেককিছু জানে অশোক। হেন সিনেমা নেই যা সে দ্যাখে নি। শুধু সিনেমা দেখাই নাকি, ছায়ালোকের তাবত কিন্নর-কিন্নরীকেও সে চেনে। অশোক বলে—স্টার, চিত্রতারকা। কলকাতায় থাকতে সে নাকি তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সে লীলা-রাণীকে দেখেছে, কনকবালাকে দেখেছে, ছবি মজুমদারকে দেখেছে। জহর চৌধুরী, অমলেশ বড়ুয়া, মহীন্দ্র গাঙ্গুলি কাকে না চেনে সে? কাকে না দেখেছে?

ক্লাসে, ক্লাসের বাইরে সারাক্ষণ সিনেমার নানা গল্প করে যায় অশোক। ফাঁকে ফাঁকে গান। কত গানই না সে জানে।

'এসো যৌবন,

এসো যৌবনমত্ত গো
মধুমাস এলো কি—
সাগরের কল্লোল ধ্বনি তব বক্ষে,
বিজলির ঝিলিমিলি আনিয়াছ চক্ষে।'

কিংবা

'কাহারে যে জড়াতে চায় দুটি বাহুলতা—
কে শুনেছে প্রেমের কামনার নীরব
ব্যাকুলতা।'

কিংবা

'আমার ভুবনে এল বসন্ত
তোমারই তরে
আঁখি দুটি তব রাখো,
রাখো মোর আঁখির পরে।'

ছায়ালোকের এত অজস্র জ্ঞানে বোঝাই হয়ে যে এসেছে তার ভক্ত না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের।

ক্লাসের সব ছেলেই অশোকের ভক্ত। তবু তাদের মধ্যে বিনু আর শ্যামলের তুলনা হয় না। অশোকের দিকে সর্বক্ষণ তারা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। অশোক যা বলে অভিভূতের মতন শুনে যায়। একই কথা বার বার শুনেও ক্লান্তি নেই। অশোককে একবার পেলে তার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। গুড়ের গায়ে মাছির মতন বিনু আর শ্যামল তার গায়ে লেগেই আছে।

এমন ভক্ত পেলে কে না খুশী হয়। অশোকও সবার ভেতর থেকে বিনুদের বেছে বার করেছে। তাদের সঙ্গেই সে বেশি মেশে, বেশি গল্প করে, বেশি ঘোরে। মোট কথা তাদের ওপরেই অশোকের বেশি অনুগ্রহ।

আগে জামা-কাপড় পোশাক-টোশাকের দিকে নজর থাকত না বিনুর। ছেঁড়া হোক, ময়লা হোক—একটু কিছু পরতে পেলেই হত। জুতো পায়ে দেবার বিশেষ বালাই ছিল না। এসব ব্যাপারে একেবারে উদাসীন ছিল সে।

অশোক আসবার পর সাজটাজের দিকে মন গেছে বিনুর। আজকাল আর ময়লা জামা-প্যান্ট পরতে চায় না। পোশাকটি ধবধবে হওয়া চাই, তাতে কড়া ইস্তিরির থাক চাই। জুতোটা চকচকে ঝকমকে না হলে আজকাল আর চলে না।

প্রায় কান্নাকাটি করে একটা পাঞ্জাবি কিনেছে বিনু, কলারওলা হাতাহীন পাঞ্জাবি বানিয়েছে। অশোকের মতন কায়দা করে ফেরতা দিয়ে আজকাল ধুতি পরে সে বাড়িতে অবশ্য করে না, রাস্তায় বেরুলে। জামার কলার উল্টে দেয়। চটিটা সামনের দিকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে হাঁটে।

এ তো গেল পোশাকের কথা। এ ছাড়াও অশোককে আরো নানা দিক থেকে অনুকরণ করছে বিনু। তার মতন স্টাইল করে চুল আঁচড়ায়; সরু করে শিস দেওয়া প্র্যাকটিশ করে। আর গান তো আছে। দিন রাত গুনগুন করেই যাচ্ছে সে।

'শত জনমের কামনা বাহিয়া
রূপ ধরে আজ এসেছ কি প্রিয়?
যত ভালবাসা তত যদি আশা,'

বিনুর এই হঠাৎ পরিবর্তন সুধা-সুনীতির চোখে পড়েছে। এত দ্রুত বদলে গেলে না পড়ে উপায় কী। সুনীতি গালে হাত দিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'ও বাবা, দিন দিন ছেলে স্টাইল শিখছে দেখ না!'

সুধা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'ছোঁড়া একেবারে ঝুনো হয়ে উঠছে। ঐ রুদ্রবাড়ির অশোকটা আসবার পরই পাকামো শুরু হয়েছে। হ্যাঁ রে বিনু, লুকিয়ে বিড়িটিড়ি খাচ্ছিস নাকি?'

সুধার কথা শেষ হবার আগেই লঙ্কাকান্ড বেধে যায়। বিনু তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঝিনুক অবশ্য অন্য কথা বলে, 'তুমি এমন গুনগুন কর কেন বিনুদা? গলা ছেড়ে গাইতে পার না? কি সুন্দর গলা তোমার।'

●

যত জ্ঞানের জাহাজ হয়েই আসুক, তার তো শেষ আছে। একদিন সিনেমার গান আর গল্পের ঝুলি ফুরিয়ে গেল অশোকের। ফুরোবার পর আবার নতুন করে সবগুলো শোনাল। তারপর আবার, আবার, আরো অনেকবার।

শুনতে শুনতে সব গান মুখস্থ হয়ে গেছে বিনুর। যত রোমাঞ্চকর আর যত চমকপ্রদই হোক না, একই গল্প কতবার আর শুনতে ভাল লাগে। আজকাল যখন অশোক চক্রবেরকাদের গল্প নিয়ে বসে, বিনু বা শ্যামল ততটা আগ্রহ নিয়ে শোনে না।

ভক্তদের বিস্ময় আর মুগ্ধতা যে কমে আসছে তা লক্ষ্য করে একদিন অশোক বলল, 'চল, মিলিটারিদের ব্যারাক থেকে ঘুরে আসি।'

মিলিটারির কথায় ভয় পেয়ে গেল বিনু। বলল, 'না-না, ওখানে গিয়ে দরকার নেই।' নদীর পারে ব্যারাকগুলো যখন তৈরী হচ্ছিল তখন ঘুরে যেত বিনু। নিগ্রো আর আমেরিকান টমিরা ওখানে আসার পর আর যায় না।

অশোক বলল, 'যাবে না কেন?'

'ওরা যদি ধরে রেখে দ্যায়?'

'ভীতু কোথাকার, আমরা কলকাতায় ও মিলিটারির সঙ্গে মিশেছি। কই আমাদের তো ধরত না।'

বিনু বলল, 'কলকাতায় এখন বুঝি খুব মিলিটারি!'

অশোক মাথা নাড়ল, 'মিলিটারি ছাড়া কলকাতায় এখন আর কিছু নেই। রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারি ট্রাক আর জীপ। লালমুখো আমেরিকান টমি আর নিগ্রো সোলজার। লেকের দিকে কখনো গেছ?'

'অনেকবার।'

'সেখানে এখন মিলিটারিদের ছাউনি পড়েছে। ওদিকে যেতে কেউ সাহস পায় না! কিন্তু আমি ঠিক যেতাম—' বলে সগর্বে তাকাল অশোক।

আর বিনু শ্যামল অবাক হয়ে গেল।

অশোক আবার বলল, 'শুধু যেতামই না। ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে চকোলেট, টফি, ড্রাই ফ্রুট, টিনের মাছ—কত কি আদায় করতাম!'

বিনুরা সবিস্ময়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তাই নাকি!'

অশোক বলল, 'হুঁ-হুঁ—' তারপর হঠাৎ কী মনে পড়তে তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, 'ধরে রাখার কথা বললে না তখন—'

'হ্যাঁ।'

'ধরে তোমাকে ঠিকই রাখত। যদি—'

'যদি কী?'

'তুমি মেয়ে হতে।'

'মেয়ে হলে ধরে রাখবে কেন?'

ঠোঁট টিপে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ বিনুকে দেখল অশোক। তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিস-ফিস করে কী বলল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখ লাল হয়ে উঠল বিনুর, কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল।

হাসতে হাসতে অশোক বলল, 'তুমি একটা ভোঁদা তোমাকে মানুষ করতে অনেক সময় লাগবে।' বলে একরকম টানতে টানতে মিলিটারি ব্যারাকের দিকে নিয়ে গেল।

ব্যারাকের সীমানা তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা। কয়েক মাইল জুড়ে এই সীমানা। অবশ্য মাঝে মাঝে কাঠের গেট রয়েছে। সেখানে মিলিটারি পুলিশ রাইফেল কাঁধে ফেলে পাহারা দিচ্ছে।

বিনুরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছুলো, প্রথম গেটটা থেকে কিছু দূরে তারকাঁটার ওপর একটা করে পা রেখে পাঁচ-ছ'টা লালমুখো টমি দাঁড়িয়ে আছে। এবং সীমানার বাইরে একদম আধ-ন্যাংটো কালো কালো ক্ষুধার্ত মানুষ জড়ো হয়ে রয়েছে তাদের লুব্ধ করুণ চোখ টমিগুলোর দিকে। মনে হয়, ওরা প্রায়ই এখানে আসে। টমিগুলোর সঙ্গে তাদের পরিচয় আছে।

অশোক বিনুদের নিয়ে বাইরের জনতার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বলল, 'এখানে দেখছি অনেক খদ্দের। এই কালো কালো জানোয়ারগুলো এসে জুটেছে। কলকাতায় আমরা দু-চারজন মোটে যেতাম।' বলেই টমিদের দিকে ফিরে বলল, 'হ্যালো জো—'

টমিরা ভুরু বাঁকিয়ে তাকাল, কিছু বলল না।

অশোক আবার বলল, 'ইউ আর ভেরি কাইন্ড। প্লীজ গিভ আস চকোলেট, টফি। হ্যালো জো—'

টমিরা নিজেদের ভেতর কী বলাবলি করল। তারপর পকেট থেকে মুঠো মুঠো চকোলেট আর টফি বার করে ছুঁড়তে লাগল। নিমেষে বাইরের জনতার ভেতর চিৎকার-চেঁচামেচি মারামারি কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে গেল। অশোকও তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিনু আর শ্যামল অবশ্য দাঁড়িয়ে রইল।

একটা টমি উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে চেঁচাতে লাগল, 'গো অন ফাইটিং ইউ ডগ, স্ন্যাচ স্ন্যাচ—বাইট দ্যাট সোয়াইন—পুশ দ্যাট ব্যাস্টার্ড—'

আরেকটা টমি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল 'ব্লাডি ইন্ডিয়ানস—বেগারস ক্লাস অফ বীচেস—'

বাকি টমিগুলো কিছুই বলল না, ক্যামেরা বার করে টকাটক ছবি তুলতে লাগল।

কাড়াকাড়ি করে অনেকগুলো চকোলেট কুড়িয়েছে অশোক। সেগুলো নিয়ে বিনুদের কাছে এসে বলল, 'আচ্ছা ছেলে তো তোমরা, চুপচাপ হাঁদার মতন দাঁড়িয়ে রইলে! তোমরা কুড়োলে আরো কত চকোলেট পাওয়া যেত।'

বিনু হঠাৎ বলে ফেলল, 'টমিরা কী বলছিল জানো?'

'কী?'

'ব্লাডি বেগারস, ডগস, সোয়াইনস—এমনি আরো কত কী। এসব শুনবার পরও ওদের জিনিস কুড়োতে যাব!'

অশোক গ্রাহ্য করল না। গা থেকে গালাগালগুলো ঝেড়ে ফেলে বলল, 'বলুক গে। গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ছে না। ওদের চকোলেট খেয়ে দেখ, জীবনে এমন জিনিস আর কখনও খাও নি। খাস আমেরিকায় তৈরি।' শুধু টমিদের জন্যে জাহাজে করে আসে। বলে একটা বড় চকোলেট এগিয়ে দিল।

বিনু কিন্তু নিল না।

মিলিটারি ব্যারাকে সেই একদিনই গেল না বিনুরা। অশোক প্রায় রোজই তাদের ধরে নিয়ে যেতে লাগল।

টমিরা তারকাঁটার বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে রোজ শুধু চকোলেটই ছোঁড়ে না। এক-আধদিন বিস্কুটের টিন, ড্রাই ফ্রুটের টিন ছোঁড়ে। মাঝে মাঝে মুঠো মুঠো রেজগিও ছুঁড়ে দ্যায়। পয়সা যেদিন ছড়ায় মারামারিটা সেদিন সাংঘাতিক রকমের ঘটে যায়।

প্রথম প্রথম বিনু ওদের কোন জিনিসই ছুঁত না। অশোকদের দেখাদেখি কবে থেকে যে সে কাড়াকাড়ি করতে শুরু করল, নিজেই জানে না। (ক্রমশ)

ঘুমিয়ে আছে সে ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

ঘুমিয়ে আছে সে ঃ আমি জাগাবো না তাকে।

তুমি কেন ঘুম থেকে তুলছ না তাকে?

এ যে আমার দুর্ভাগ্য, এ আমার স্বস্তি।
তাকে জাগাতে না পেরে আমি এমন অসুখী,
তার কুটিরের জ্বলন্ত চৌকাটে পা রাখতে ব্যর্থ হ'য়ে,
তার গৃহের রাস্তার খোঁজ জানা নেই ব'লে,
কোন্ দিকে রাস্তা যায় জানা নেই ব'লে,
তার কাছ থেকে দূরে আরো দূরে সর্বদাই স'রে যাই ব'লে,
বৈশাখী বাতাসে যেন হীনবল পাতা,
তার গাছ থেকে ক্রমাগত দূরে যায় চ'লে,
আরও ওই গাছের উপর ছিলাম না আমি কোনো দিন,
আমি বৈশাখী হাওয়ায় পর্ণ, কিন্তু বৃক্ষ থেকে নয়।
—তাকে জাগাতে না পেরে আমি সুখী।

কী করবো আমি যদি জেগে ওঠে সে,
সে তার বিছানা থেকে উঠে পড়ে যদি,
যদি আমি উঠি আমার শয়ন থেকে
সিংহ তার গুহা হ'তে,
এবং আমার ত্রস্ত কানে ফেটে পড়ে আমার গর্জন?

ধানের নামে ॥

দীপেন রায়

ধানের নামে বুক ভাসছে অন্ধকারে হঠাৎ আলোর
হাজার হাতে ছড়িয়ে দেখা, আমরা কজন,
এই জলেতে লুকিয়ে আছে আমার সেকি তোমার কিনা
বাপ-দাদাদের লক্ষ্মীকড়ি সোনাদানার
স্মৃতির স্মৃতি পৌষ-ফাগুন শিবের গাজন।

হয়তো আছে আমার দেখা সোনা বৌয়ের
নতুন কাপড় ঘর গেরস্থ পুরনো শাঁখ—
হাজার দেখা চেনা-জানার মেলার মানুষ
মুখ খুলেছে বুকের পাটা হাতের চেটো
উজিয়ে যাওয়া নদীর জলে ভরাটে প্রাণ।

সাগর পারের খবর

সুইডেনের লুন্ডে হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ায় এমনি বই বোঝাই গাড়ী

দিলীপ মালাকার
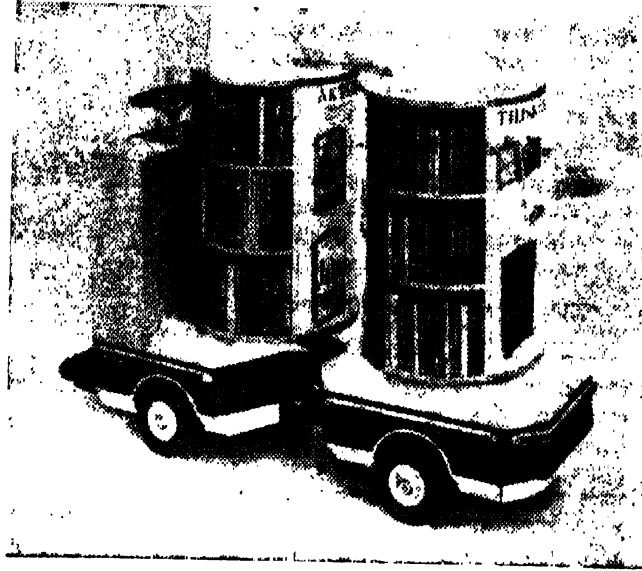
লাইব্রেরী সম্বন্ধে সাধারণ বাঙালীর ধারণা এখনও পরিষ্কার নয়। অনেক পরিবার এখনও মনে করে যে তাদের সন্তানরা যেন পরীক্ষা পাশ করার জন্যে পাঠ্যপুস্তক মনোযোগ দিয়ে পড়ে। তবে মাঝে মাঝে 'আউট নলেজ' বাড়াবার জন্যে লাইব্রেরী থেকে দু' একটা বই নিয়ে এসে পড়া চলতে পারে। অনেক পরিবার এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, বাইরের বই অর্থাৎ লাইব্রেরীর বই বেশী পড়লে লেখাপড়া হবে না। ছেলে বখে যেতে পারে। পরীক্ষায় কোনো রকমে পাশ করে একটা চাকরি পাওয়াই বড় কথা। চাকরি-বাকরি ও সংসার-সংসার পেতে তারপর জ্ঞান বাড়ালেই হল।

আমাদের দেশে প্রথমত অক্ষরজ্ঞান ও শিক্ষিতের সংখ্যা মাত্র শতকরা ত্রিশজন। তার ওপর বই কেনা ও পড়ার অভ্যাস নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে লাইব্রেরীর যে কি শোচনীয় পরিস্থিতি তা না বলাই ভাল। ইস্কুল-কলেজের লাইব্রেরী র অ-সম্পূর্ণ ও অ-সমাপ্ত। অসুস্থ ও হাসপাতালে পঙ্গু রুগীদের জন্যে বিশেষ ধরনের লাইব্রেরীর কথা চিন্তা করা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। ইউরোপ-আমেরিকার বহু দেশে আজকাল হাসপাতালে পঙ্গু ও শয্যাশায়ী রুগীদের জন্যে বই পড়ার যান্ত্রিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। যারা বিছানায় উঠে বা শুয়ে পড়তে অক্ষম, যাদের দৈহিক অসুবিধা রয়েছে বিস্তর, কিন্তু মনটা সুস্থ, তাদের মানসিক খোরাক জোগাবার জন্যেই ওই সব দেশের দরদী নেতারা নতুন নতুন ব্যবস্থা করেছেন। রোগীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। যেমন আমাদের দেশে অনেকে করে থাকেন। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দুস্থ মানুষের সেবা। সেটা মানবতাবাদের একটি অঙ্গ।

হাসপাতালের রোগী ও পঙ্গুদের মানসিক খোরাক জোগাবার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী ও তার যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশে, তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে ওখানকার সরকার ও লাইব্রেরী বিশেষজ্ঞরা।

লাইব্রেরী পরিচালনা বিদ্যা আজকাল বিজ্ঞানুশীলনের আওতায় পড়ে। লাইব্রেরীতে বই গুছিয়ে রাখা, তার শ্রেণী বিভাগ, বই-এর বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রন্থ তালিকা ইত্যাদি হল গ্রন্থাগার শিক্ষণের প্রাচীন অধ্যায়। ইলেকট্রনিকের যুগে আজকাল বই-এর লেনদেন চলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে। বহু পুরোতন বই-পাণ্ডুলিপি মাইক্রোফিল্মে ধরে রাখা হয়। ইচ্ছে মতন যন্ত্রে লাগিয়ে কাঁচের পর্দায় পড়া যায়।

হাসপাতালে রোগী ও পঙ্গুদের জন্যে বই বাছাই করার জন্য লাইব্রেরিয়ানদের সর্ব-বিশেষ অধ্যয়ন করতে হয়। রোগী বুঝে যাতে কোনো উত্তেজনা না আসে তেমনি বই বেছে দেওয়ার দায়িত্ব তাদের। তারপর রয়েছে জখম হওয়া রোগী, যিনি হয়ত পাশ ফিরে শুতে বা নড়তে-চড়তে পারেন না, তাদের জন্যে যন্ত্রপাতির সাহায্যে বই পড়ার সুযোগ-সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি বৃটিশ ও সুইডিশ হাসপাতালে।

যিনি হয়ত বই-এর পাতা ওল্টাতে পারেন না তাঁর জন্যে বই-এর পাতা ওল্টান যন্ত্র নির্মাণ করে একটি বৃটিশ হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে। আরেকটি সুইডিশ হাসপাতালে মাইক্রোফিল্ম সহযোগে বই পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে রোগী বিছানায় নড়ে-চড়ে বসতে পারে না, শুয়ে-শুয়ে বই পড়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই। তিনি একটি মাত্র ছোট্ট যন্ত্রের বোতাম টিপে বই-এর পাতা পড়বেন। বই-এর পাতা মাইক্রোফিল্মে তোলা। তার ছায়াচিত্র প্রতি-ফলন হবে সামনের একটি বড় কাঁচের পর্দায়। এমনি ধরনের বহু যন্ত্রপাতি আজ-কাল ব্যবহৃত হচ্ছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে, পশ্চিম জার্মানী, বৃটেন ও সুইডেনে।

সুইডেনের লুন্ড শহরের লাইব্রেরী ওখানকার হাসপাতালের জন্যে ছোট্ট ইলেকট্রিক গাড়ীতে বই সাজিয়ে হাস-পাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে রোগীদের বেডের কাছে গিয়ে তাদের পছন্দ মতন বই-এর জোগান দেয়। আর যাঁরা অনেকটা সুস্থ চলে-ফিরে বেড়ান তাঁদের জন্যে হাসপাতালে থাকে প্রশস্ত পাঠগার। সেখানে বসে তাঁরা ইচ্ছে মতন বই-পত্তর পড়তে পারেন। অবশ্য এই ধরনের লাইব্রেরী রয়েছে ইউরোপের প্রতিটি দেশের হাসপাতালে। তেমনি লাইব্রেরী আমি নিজে দেখেছি পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের বহু হাসপাতালে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক স্টেটের নিউপোর্ট শহরের একটি হাসপাতালে গ্রীষ্মকালে তাদের বাগানে কাঁচে-ঢাকা ঘরে লাইব্রেরী খোলা হয়। হাসপাতালের রোগীরা বিকেলে বেড়াতে এসে লাইব্রেরীতে বসে পড়তে পারেন। বই পড়ে শুধু মনটা ভাল রাখা উদ্দেশ্য নয়, এই প্রগতির যুগে জ্ঞানার্জনও উদ্দেশ্য।

হাসপাতালে লাইব্রেরী প্রচলন আন্দোলন শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের একটি উদ্দেশ্য ছিল পুরোন রোগীদের সমাজে নতুন করে জীবন শুরু করায় সাহায্য করা।

পুরোন বা ঘনঘন রোগে ভোগে এমন সব রোগীদের চিকিৎসার একটি অঙ্গ হিসেবে লাইব্রেরীর সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন মানসিক রোগে রুগ্ন রোগীদের জন্যে, আধ-পাগলা, অন্ধ বা বিকলাঙ্গদের চিকিৎসার সুবিধার জন্যে। চিকিৎসার পর তাঁরা যাতে আবার সুস্থ-সবল জীবন যাপন করতে পারে সমাজে সেই উদ্দেশ্যে বই পড়িয়ে তাদের নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এরাই আবার রোগীদের সুবিধার জন্যে বই পড়ার যন্ত্রপাতির নক্সা ইত্যাদি করে দেয় বা যন্ত্রবিশেষজ্ঞদের উপদেশ দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়ে নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে হাসপাতালে ব্যবহারের জন্যে শিক্ষা পদ্ধতি।

বই-এর কথায় যখন আসা গেছে তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের গ্রন্থ প্রকাশনার কয়েকটা কথা বলা চলে। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ বই প্রকাশিত হয় সোভিয়েট ইউনিয়নে। প্রতি বছরে ছাপা হয় ১০০ কোটি কপি। প্রতি মিনিটে ছাপা হয় ২,৪০০ বই, দৈনিক গড়ে তা দাঁড়ায় ৩,৫০০,০০০ কপি। ২২২টি বিভিন্ন প্রকাশ ভবন এই সব বই প্রকাশ করে। সোভিয়েত আমলে এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ টাইটেলের বই, এগুলির সর্বমোট সংস্করণ সংখ্যা ৩০০ কোটি কপি। ১৯৫৮—৬৬ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত হয় ৫,৬৯৬টি বৈজ্ঞানিক গবেষণা গ্রন্থ, এগুলির সর্বমোট সংখ্যা ছিল ১৪,০০০,০০০ খণ্ড। বার্ষিক সর্বমোট প্রকাশিত বই-এর মধ্যে আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ হল প্রযুক্তি-বিদ্যা, শ্রমশিল্প, যোগাযোগ ও পরিবহন সংক্রান্ত বই ও পুস্তিকা।

১৯৬৬ সালে কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে ৫,৩৩০টি বই ও পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এগুলির সর্বমোট সংস্করণ সংখ্যা ছিল ৩৫,২০০,০০০ কপি। বর্তমানে শিক্ষা সংক্রান্ত বই প্রকাশিত হয় সর্বমোট বই প্রকাশের ৩০ শতাংশ।

প্রতি বছরে বিশ্বের ৫২টি দেশে ১০ লক্ষেরও বেশী সোভিয়েত পাঠ্যপুস্তক রপ্তানী করা হয়। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় ৪,৬২৯টি টাইটেলের পাঠ্যপুস্তক এগুলির সর্বমোট সংস্করণ সংখ্যা ছি[illegible] ৩১,৫০০,০০০ কপি। দেশের উচ্চ[illegible] শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ৪০ লক্ষ ছাত্রছা[illegible] এই সব পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বার্ষিক সর্বমো[illegible] বই প্রকাশের এক-দশমাংশ হল উপন্যাস [illegible] কথাসাহিত্য, এগুলির সংস্করণ সং[illegible] বার্ষিক সর্বমোট বইয়ের সংস্করণ সংখ্যা[illegible] এক-তৃতীয়াংশ। গড়ে এই সব বই-এ[illegible] সংস্করণ সংখ্যা হয় ৫৯,০০০ কপি[illegible] ১৯৬৬ সালেই প্রকাশিত হয় ৭,০০[illegible] উপন্যাস ও কথাসাহিত্য। এগুলির সর্বমো[illegible] সংস্করণ সংখ্যা ছিল ৪১৯,১০০,০০[illegible] কপি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে রুশ ভাষা ছা[illegible] আরও ৮৮টি ভাষায় বই-পত্র ছাপা হয়[illegible] এর মধ্যে এমন ২৫টি জাতি-অধিজাতি[illegible] ভাষা রয়েছে ১৯১৭ অক্টোবর বিপ্লবে[illegible] আগে যাদের কোনো লিখিত হরফই জা[illegible] ছিল না। বিদেশী বই-এর অনুবাদ প্রকাশনায় বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে[illegible] স্থান শীর্ষে। বিগত পাঁচ বছরে বিদে[illegible] লেখকদের প্রকাশিত বইয়ের সংস্করণ সং[illegible] ছিল সর্বমোট ৩৫৩,০০০,০০০ কপি। এ[illegible] বিদেশী লেখকরা প্রধানত হলেন :

শেক্সপীয়র—	৩১৬	সংস্করণ—	৫,৮০০,০০০	কপি—২৮টি	ভাষায়
মার্কটোয়েন—	৩১৪	”	—১৬,৩০০,০০০	” —২৮টি	”
বালজাক—	২৮৩	”	—২২,৬০০,০০০	„ —২৮টি	”
রবীন্দ্রনাথ—	৭৬	”	— ৪,৭৫৯,০০০	” —২২টি	”
সার্ভান্তেস—	১১৪	”	— ৫,৬০০,০০০	” —১৬টি	”
শিলার—	১৩৬	”	— ২,২০০,০০০	” —১৯টি	”
হাসেক—	১০৬	”	— ৬,৪০০,০০০	” —১৭টি	”
ফুচিক—	৭৫	„	— ২,৬০০,০০০	” —৩৫টি	”
মিসকেভিচ—	৬৮	”	— ১,৪০০,০০০	” —১২টি	”

সুইডেনের হাসপাতালে রোগীদের লাইব্রেরী

সোভিয়েত ইউনিয়নে এখন প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৭,৯৬৭টি। এগুলির মোট প্রচার সংখ্যা হল ১১০,০০০,০০০ কপি। এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ১৯৬৬ সালে ছিল ৪,৩৪২ এরও বেশী। ৪০১,০০০,০০০টি কপি ছিল ১৬৭ রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থনৈ[illegible] পত্রিকার এবং ৫৩১,০০০,০০০ কপি প্রকাশিত হয় ১৪৪টি সাহিত্য-শি[illegible] পত্রিকা।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (২২)

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন

কুইজ

শক্তি সামর্থ্যের অপচয় করেন কি ?

জীবনে কে কতোটুকু কৃতী হতে পেরেছি, সেটা নির্ভর করে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য যার মধ্যে যতোটুকু আছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার কে কেমনভাবে করতে পেরেছি, তারই ওপর। তাই নয় কি?

ভালভাবে নিজের শক্তি-সামর্থ্যকে গুছিয়ে কাজে লাগাতে পারলে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি। আর, তা যদি না পারি, তাহলে আমাদের অনেক লেখা-পড়া জানা থাকলেও, দক্ষতা এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও জীবনে সাফল্য খুব কমই আসতে দেখা যাবে।

অবশ্য, আমাদের কর্মক্ষমতার একটু-আধটু অপচয় আমরা একেবারে এড়িয়ে চলতে পারি না। তবে, এই অপচয় যতো কম হয়, সেদিকে আমরা নজর দিতে নিশ্চয়ই পারি।

নীচের মনোপ্রশ্নচর্চাটিতে প্রত্যেক প্রশ্নে নিশ্চিন্ত মনে 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' জবাব দিয়ে চলুন। তারপরে সবশেষে হিসাবের নিয়ম দেখুন।

১। আপনার জীবনের সুস্পষ্ট আদর্শ-লক্ষ্য ঠিক করা আছে কি?

২। আপনি যখন নানা ধরনের কাজ মেটাতে হাত লাগান, তখন কি সেগুলির প্রয়োজন অনুপাতে পর পর করতে থাকেন?

৩। যে-কাজ করছেন, সে-কাজে কি আপনি গভীর আগ্রহ বোধ করেন?

৪। সামান্য ব্যাপার নিয়ে হৈ-চৈ করা আপনি কি অপছন্দ করেন?

৫। ইতস্তত না করে, আপনি কি কোনো বিষয়ে খুব চটপট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন?

৬। আপনি কি সুন্দরভাবে প্ল্যান করে আপনার কাজকর্মে নামেন, যাতে আপনি সব সময়ে বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন কোনটার পর কোনটা করতে হবে?

৭। আপনি কি খুব কম তাস খেলেন?

৮। আপনার স্বাভাবিক মেজাজ কি বেশ প্রাণোচ্ছল, এবং আপনি কি বিষণ্নতা-মুক্ত?

৯। সকালবেলা থেকেই আপনি কি চটপট কাজকর্মে হাত লাগাতে পারেন?

১০। যতক্ষণ আপনি কাজ করতে পারছেন, ততক্ষণ কি হাতের কাজ সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করেন?

১১। সকালবেলা ঘুম ভেঙে গেলে টপ করে উঠে না পড়ে আপনি কি বিছানায় গড়াতে থাকেন?

১২। পেট ঠেসে ভুরিভোজন করা কিংবা বেশ প্রচুর পরিমাণে মদ খাওয়ার দিকে আপনার কি ঝোঁক আছে?

১৩। আপনি কি রোজ ঘণ্টা-দেড়েকেরও বেশী রেডিও শোনেন?

১৪। খবরের কাগজে বাজার দর কিংবা রেসের বই নিয়ে আপনি কি অনেক সময় কাটান?

১৫। চা-কফি জলখাবার খেতে বসে আপনি কি বেশ খানিকটা সময় কাটিয়ে দেন?

১৬। আপনার মনোযোগ কি একটুতেই অন্যদিকে চলে যায়?

১৭। যে-কাজ আপনার করা একান্ত দরকার বলে আপনি মনে করছেন, সে-কাজের সময়টা ব্যয় করে আপনি কি এমন কোনো কাজ করেন, যেটা করতে আপনার ইচ্ছে হয়েছে?

১৮। বয়োজ্যেষ্ঠ ওপরওলা মানুষের সঙ্গে আপনি কি মাঝে মাঝে ঝগড়া করেন?

১৯। দুর্ভাগ্য, ব্যর্থতা এবং ভুল-ত্রুটি নিয়ে আপনি কি অনবরত ভাবনা-চিন্তা করতে থাকেন?

২০। কোনো নতুন কাজ আপনাকে করতে বলা হলে, সে-কাজের প্রয়োজন কতটুকু কিংবা সে-কাজের জন্যে আপনি সময় পাবেন কিনা, সেকথা ভালভাবে যাচাই না করেই কি আপনি কাজটা করতে সহজেই রাজী হয়ে যান?

প্রথম দশটি প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' জবাব দিলে প্রত্যেকটির জন্য পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন এবং ১১নং থেকে ২০নং প্রশ্নের জবাবে 'না' বলে থাকলে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন। তারপর যোগ করে ফেলুন পয়েন্ট-গুলো।

৭৫ পয়েন্টের বেশী পেলে বুঝতে হবে আপনার শক্তি-সামর্থ্য গুছিয়ে কাজে লাগানোর অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে। কিন্তু একটা বিপদের সম্ভাবনাও রয়ে গেছে—হয়তো এই দক্ষতার ফলে আপনি খুব বেশি মেশিনের মতো হয়ে পড়তে পারেন। মাঝে মাঝে একটু সময় করে নিয়ে প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে দেখুন—'ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো, দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো।' উপকার পাবেন।

৬৫ থেকে ৭৫ পেলে ভালোই। ৫০ থেকে ৬০ মন্দ নয়।

৫০ পয়েন্টের কম পেলে ভাবতে হবে আপনি হয়তো আপনার অনেক সুযোগের অপব্যয় করছেন। কি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, সে-বিষয়ে আপনাকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে এবং সত্যিকারের কাজের মতো কাজকর্মেই বেশি করে মনোযোগ দিতে হবে, নিবিষ্ট হতে হবে। সময়ের ব্যাপারে নিজেকে আরও হিসেবী করে তুলুন। একটা দিন কিভাবে কাটালেন, সময় হিসাব করে তা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করুন। লক্ষ্য করুন, সারা দিনের মধ্যে কতোখানি সময় আজেবাজে কাজে এবং অদরকারী আমোদ-আহ্লাদে কেটে গেছে।

আপনার তরুণ মনের চঞ্চলতাকে এবং হাল্কা ধরনের ছেলেমানুষী কাজকর্ম সব কেটে-ছেঁটে বাদ দিতে বলছি না। আপনাকে যা করতে হবে, তা হলো—হাল্কা কাজ আর দরকারী কাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখতে হবে, সময় হিসাব করে। তবে একটা কথা বোধহয় আপনার খুব কাজে লাগবে—সামাজিক মেলামেশার হৈ-হুল্লোড়-হুজুগ, অসংখ্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এসব যদি অর্ধেক কমিয়ে ফেলতে পারেন, তাহলে উপকার পেতে পারেন।

আর একটা কথা, যদি এখনো আপনার বই-পড়া অভ্যাস তৈরী না হয়ে থাকে, তাহলে চেষ্টা শুরু করুন যাতে প্রতি মাসে অন্তত একখানাও ভালো বই পড়ে ফেলার সুনিয়মে নিজেকে অভ্যস্ত করতে পারেন।

বাণীরূপা

বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষ্যে পর পর কবার গানের জলসা হবার পর কয়েক- নাটক-পাগল ছেলে উদ্যোক্তাদের কাছে ৎসাহে বলে উঠলো—'এবার আর গান নাটক হোক।' প্রস্তাবটি অবাক করলো াকে। তাঁরা প্রশ্ন করলেন—'সে কি? বর তো জলসাই হয়। সেইটেই তো ম'। ছেলেরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলো— ম ভাঙতে হবে। কি আছে ঐ আধুনিক র হিন্দী গানের প্যানপ্যানানিতে। াদিন খেটেখুটে স্টেজ করবো, আর রের শিল্পীরা এসে সেখানে অনুষ্ঠান চলে যাবে সেটি হবে না। আমাদের জা, আমাদের বিজয়া, আমরা এখানে কিছু করবো।' উত্তর এলো—'বেশ গান জানো তো গান গাও, চান্স করে ছ্য'। ওরা বললো—'গান নাই বা জানলাম। তিনেক রিয়েসাল দিয়ে একটি নাটক করতে পারি। আর তা জলসার চেয়ে আকর্ষণীয় হবে না। আর তা ছাড়া াই তো হবে একান্তভাবে আমাদের ষ্ঠান।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন লাভ হোল চিরাচরিতভাবেই জলসাই হোল। াহী ছেলেরা ভাবলো, আর কোনমতেই করা উচিত নয়; নিজেদেরই চেষ্টা ত হবে। নিজেদের পথ তৈরী করতে নিজেদেরই। প্রাণের মধ্যে আন্তর ূতির যে আন্দোলন তাকে প্রতিহত কে। তাই এক বিহ্বল মুহূর্তে র স্বপ্ন রূপ নিলো বাস্তবের আলোয়। কাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে বাঁশ- ীতে গড়ে উঠলো একটি নাট্যগোষ্ঠী। হোল 'বাণীরূপা।' সময়টা ছিল ৬০-এর ১লা জুন। নাট্যানুরাগী দের উৎসাহ হোল সীমাহীন। নাটকের যাতে স্থানীয় লোকদের আগ্রহ বেড়ে সেদিকেই এরা নজর রাখলো প্রথম।

কাজ শুরু হোল সোৎসাহে। প্রথম ক হোল কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা' নাটক অভিনয় করতে গিয়ে 'বাণীরূপা'র রা বলেছে: 'কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়ই আসল উদ্দেশ্য নয়, এর মাধ্যমে মান বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ- খের কথা দর্শক সমক্ষে তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। তাই প্রথম নাটক হিসেবে রো ঘণ্টা' বেছে নেওয়া হয়েছে। চব্বিশ ার হয় এক দিন কিন্তু বারো ঘণ্টায় হয় টি নাটক—যে নাটকে আমরা প্রতিটি ষ প্রতিদিন অভিনয় করছি, হাসছি, ছি।' নাটকটি অভিনীত হোল বিজয়া মলনীতেই।

এর পরের নাটক হোল "ফিঙ্গার প্রিন্ট" 'ডাইভোর্স।' এই দুটি নাটকের অভিনয় সবাইকে মুগ্ধ করলো, বিশেষ করে 'ডাই- ভোর্সে'র অভিনয় নাট্যসমালোচকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলো। হাল্কা হাসির মধ্যে নাট্যকার এই নাটকের মধ্যে একটি ক্ষুরধার বক্তব্য রেখেছেন। আইন বনাম মন। বিবাহ- বিচ্ছেদ আইন পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক জর্জরিত জীবন আইনের সহায্যে মুক্তি পেয়েছে ঠিক, কিন্তু এই আইনেও অনেক সুখী দাম্পত্য জীবনও কি নষ্ট হচ্ছে না। এই দুটো নাটকের অভিনয়ের পর জলসা পক্ষের অনেক সমর্থক নাট্য- গোষ্ঠীতে এসে যোগ দিলেন। স্থানীয় লোকের মনে নাট্যচর্চার একটি উৎসাহ দেখা দিল। সবাই এদের অভিনন্দন জানালেন। সেই অভিনন্দনে এঁরা আরো দুর্বার বেগে এগিয়ে চলার গতি পেলো। শুধু একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ থেকে নাট্যাভিনয় নয়, বিভিন্ন স্থানে নাটক মঞ্চস্থ করতে হবে। এবং নাটককে সমাজকল্যাণ কাজে লাগাতে হবে।

বহু ঘটনার প্রবাহকে পিছনে ফেলে এলো ১৯৬৪। রাজনৈতিক আকাশে জমেছে কালো মেঘ। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ আবার শুরু হয়েছে তখন। 'বাণীরূপা'র শিল্পীরা সমরেশ বসুর 'আদাব' ছোটগল্প অবলম্বন করে একটি নাটক মঞ্চস্থ করলো। আশাতীত সাফল্যের সঙ্গে এ নাটক অভিনীত হোল। সমসাময়িক পরিস্থিতির সঙ্গে যোগ রেখে এমন ধরনের নাটক প্রযোজনা নিঃসন্দেহে একটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত প্রচেষ্টা। এর পরের নাটক শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ।' নাটকটিকে বলা যেতে পারে ব্যঙ্গ-নাটক। আজকের বাংলা দেশের শিক্ষিত বাঙালী বেকার যুবকের যে শোকাবহ অবস্থা তা তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকের মধ্যে। চাকরী খুঁজতে গিয়ে প্রতিপদে ব্যর্থতা জমেছে এদের মনে, বিভ্রান্তির অন্ধকারে হারিয়ে ফেলেছে এরা পথ। নাট্যকার হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে প্রশ্ন তুলেছেন— কিন্তু কেন? তবে কি মরেই যাবে এরা? সহজ সত্যের পথ যাদের বাঁচার নিশানা দেখায় নি—'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' যাদের বেঁচে থাকার পথ করে দেয় নি—তারা এসেছে 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে', বাঁচার তাগিদে, শুধু বেঁচে থাকবে বলে। হাল্কা হাসির উচ্ছলতায় নাটকটির এই গভীর বক্তব্যটি মূর্ত হয়ে উঠেছে মঞ্চে। এই নাটকটি 'বাণীরূপা'র একটি উল্লেখ- যোগ্য প্রযোজনা। তেইশটি রজনীর বেশী এ নাটক অভিনীত হয়েছে এবং বহু নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার এ প্রযোজনা অর্জন করেছে। এই নাট্য প্রযো- জনার সূত্র ধরে 'বাণীরূপা'র খ্যাতি 'বাঁশ- দ্রোণী' থেকে বহু দূরে ব্যাপ্ত হোল।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এর পর 'মাস্টারমশাই' অভিনীত হোল 'থিয়েটার সেন্টার' মঞ্চে। রবীন্দ্রনাথের এই ছোট- গল্পটির নাট্যরূপ দিলেন গোষ্ঠীর পরি- চালক বালু দাশগুপ্ত। ইতিমধ্যে শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ঝুমুর' ও 'ক্যাম্প থ্রী' সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হোল। এ নাটক দুটির অভিনয় আজও চলছে। 'ঝুমুর' প্রধানত ঘটনাবৈচিত্র্যে প্রধান ও চরিত্রচিত্রণে মুখর। বক্তব্য এখানে প্রখর নয়। শুধু কোন একটা শ্রেণীর অনাবিল জীবনযাত্রার মাঝের কোন একটি দিনের বা সময়ের একটি ছোট্ট মুহূর্তকে ধরে রাখা হয়েছে এই নাটকে।

এর পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হবার জন্য প্রায় মাস তিনেক নাটক বন্ধ রইলো। পাকিস্তান আর ভারতের সীমান্ত বিরোধ নিয়ে সঙ্ঘর্ষ। তিন মাস পর আবার নাটক শুরু হোল। সৌরীন সেনের 'আখের স্বাদ নোনতা'র ভোলা দত্ত- কৃত নাট্যরূপ 'আবর্ত' পরিবেশিত হোল রবীন্দ্রসরোবর ও 'মুক্ত-অঙ্গন' মঞ্চে। কিউবা বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত এ নাটক প্রযোজনা করে 'বাণীরূপা' বাংলা দেশে নাট্যানুরাগীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করলো। এই নাটকটিও বহু প্রতিযোগিতার পুরস্কার আনতে সক্ষম হয়েছে। এর কিছু দিন আগে 'রবীন্দ্রভারতী'র অনুমোদন লাভ করলো 'বাণীরূপা'। শিল্পীদের নাট্যচর্চার পথ থেকে অপসারিত হোল একটি প্রতিবন্ধকতা।

'বাণীরূপা'র আরও দুটি স্মরণীয় নাট্যপ্রযোজনা হোল বাবলু দাশগুপ্তের

'কেন এই অবক্ষয়?' ও 'যখন বৃষ্টি নামলো' একাঙ্ক দুটি। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর নতুনত্বে ও পরীক্ষামূলক প্রয়োগপরিকল্পনায় সমৃদ্ধ এ দুটি একাঙ্ক বাংলার নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে সত্যি এক স্মরণীয় সৃষ্টি। 'কেন এই অবক্ষয়'-এর নাট্যকার একটি প্রশ্ন তুলেছেন—মানুষ অমৃতের পুত্র হয়েও মানুষের সমাজে এই দৈনিক ও সামাজিক অবক্ষয় কেন? এর জন্য দায়ী কে? এর উত্তরও এ নাটকে আছে। এর জন্য দায়ী মানুষের লোভ। প্রতিটি মানুষের মধ্যে আছে দুটি সত্তা—একটি দেব অন্যটি দানব। দেবশক্তি যতক্ষণ দানবশক্তিকে পরাভূত করে রাখে ততক্ষণ সে মানুষ। যখন দানব সেই দেবশক্তিটাকে হারিয়ে দেয় তখন সে হয় পশু। মানুষের ভেতরকার দেবশক্তিটা হারে তখনই যখন লোভ এসে বাসা বাঁধে তার মধ্যে। এই লোভকে জয় করতে হবে। এ অবক্ষয় রোধ করতে হবে।

'যখন বৃষ্টি নামলো' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'হতাশা আর নৈরাশ্যের আর এক নাম যদি হয় জীবনবিমুখতা—তবে এই নাটকের মূল চরিত্র কিংশুক কি?...জানি অনেক বাধা আসবে থমকে দাঁড়াবো—কিন্তু থেমে থাকবো না। অনেক বিপদ আসবে লড়াই করবো—দুমড়ে-মুচড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবো—তবু পিছিয়ে পড়ব না। এগিয়ে যাবো। চরৈবেতি। এগিয়ে যাও। কারণ কিংশুকদের মতো ভাগ্যহতদের জীবনাকাশে শুধু মেঘই জমে—বৃষ্টি নামে না। তবু এগিয়ে যেতে হবে। রাত্রি শেষ হবে। ভোর হবে। বৃষ্টি নামবে!...বৃষ্টি নামলো—'যখন বৃষ্টি নামলো' তখন?'...'কেন এই অবক্ষয়' ও 'যখন বৃষ্টি নামলো' একাঙ্ক দুটি বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ত্রিশটি পুরস্কার এনেছে। 'বাণীরূপা'র পরবর্তী প্রযোজনা হল বাবলু দাশগুপ্তের 'সুর যেখানে ছন্দ খোঁজে'।

'বাণীরূপা'র শিল্পীরা বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শুধু পুরস্কারই অর্জন করে নি, সেখানকার নাট্যানুরাগীদের সঙ্গে একটি আন্তর সেতুবন্ধন রচনা করেছে।

প্রতিযোগিতা ছাড়াও বাংলা দেশের নানা প্রান্তে যেমন হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম ও ২৪-পরগণায় বিভিন্ন স্থানে 'বাণীরূপা' পরিবেশন করেছে অনেক নাটক। এই ব্যাপক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গোষ্ঠী হয়েছে নবনাট্য আন্দোলনের এক অন্যতম শরিক। নাটক অভিনয় ছাড়া শিল্পীরা মহড়ার ফাঁকে ফাঁকে বাংলার সাম্প্রতিক নাটকের গতি-প্রকৃতির ওপর আলোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে 'বাণীরূপা'র নিজস্ব একটি মহড়াকক্ষ ও পাঠাগার আছে। এই পাঠাগারে নাটকের বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থের সমাবেশ আছে।

'বাণীরূপা'র শিল্পীরা বিশ্বাস করে যে স্থানীয় জনসাধারণের সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া কোনপ্রকারেই গোষ্ঠী এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম হোত না। এদিক দিয়ে এ'রা প্রতিটি মানুষের কাছেই কৃতজ্ঞ। এ'রা স্থানীয় সবকটি নাট্যসংস্থার সঙ্গে প্রীতির সূত্রে জড়ানো রয়েছেন। যদি কো[ন] সংস্থার কোন বিপর্যয় দেখা দেয়, তখন এ'[রা] সামগ্রিকভাবে বাংলার নাট্যআন্দোলনের কথা চিন্তা করেই এগিয়ে আসেন বিপর্য[য়] দূর করতে। নাটক নিয়ে এবং বাংলা[র] অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠীদের সুবিধার্থে যেখানে যে সংগ্রাম হয়েছে 'বাণীরূপা' সেখানে তার প্রত্যাশিত ভূমিকা নিতে দ্বি[ধা] বোধ করে নি।

অনুবাদ নাটক সম্পর্কে এ'দের বক্তব্য হোল : বিদেশী নাট্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য এর প্রয়োজন আছে কিন্তু কৃতী অনুবাদকেরও মৌলিক নাট[ক] রচনার দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত। কা[রণ] আমরা জেনেছি তাঁদের ক্ষমতা আছে—ত[বে] কেন আমরা বঞ্চিত থাকবো।

কি ধরনের নাটক 'বাণীরূপা' অভিনয় করতে চায় এবং দীর্ঘ ন' বছরের পথ পরিক্রমায় শিল্পীরা কি পেয়েছেন, এ প্রশ্নে[র] উত্তরে জেনেছি যে গোষ্ঠী সব সময় জীবনবোধের নাটক করতে চায়। এ'রা বলে ছেন : 'ভালো নাটক উপহার দিয়ে, রুচি শীল দর্শক তৈরী করবো, এই ব্রত নি[য়ে] কাজে নেমেছিলাম। আজ ন' বছরের প[থ] পেরিয়ে পিছন ফিরে দেখি আমাদে[র] উদ্দেশ্য অনেকটা সার্থক হয়েছে। ত[বে] আরও এগিয়ে যেতে হবে। আমরা যাবে[া]। সেদিন হয়তো আমরা একা ছিলাম—কি[ন্তু] আজ আমাদের সঙ্গী অনেক। তাই প[থ] যতো দুর্গমই হোক আমাদের ভয় নেই। মঞ্চের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে এ'রা বলেছেন 'আরো মঞ্চ চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজ[ন] ব্যাপক সরকারী উদ্যোগ।'

আজকের সামাজিক জীবনের 'নে[ই] আর নেই'-এর তমিস্রায় 'বাণীরূপা' নাটক এর মধ্য দিয়ে কোন উপদেশ প্রচার করে না। শিল্পীদের স্বপ্ন হোল, বাংলা নাট[্য] মানুষের মুখের অনেক দিন আগে ম[রে] যাওয়া হাসি বা কান্নার মাংসপেশীগুলোকে একটু পুনরুজ্জীবিত করুক।

—দিলীপ মৌলি[ক]

জীবতত্ত্ববিৎরা বলেন, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব হাসতে
নে না। স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিবিবেচনার পরিচয় ইতর প্রাণীর
ধ্যও পাওয়া যায়, কিন্তু হাসি কেবল মানুষেরই গৌরব।

রসপিপাসু ব্যক্তিরাও এই মতে সায় দেন। ক্লাটন ব্রক প্রভৃতি
সক সমালোচকদের মতে স্বর্গেও হাস্যরস নেই। হাস্যরস
ধাতার কাছেও অভিনব।

চিকিৎসাশাস্ত্রে নাকি বলে, রোজ এক ঘন্টা করে হাসতে
রলে কোনো রোগ হতে পারে না।

হাসতে পারলে মনে কোনো কালিমা থাকতে পারে
—সমস্ত গ্লানি, সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।
ষে যখন হাসে তখনই সে সুন্দর। শিশু হাসে বলেই সুন্দর,
পাপ। ফলস্টাফ হাসির জন্যই কাপুরুষোচিত বা পাষণ্ডোচিত
রণ করেও সর্বজনপ্রিয় হয়ে নৈতিক বিচারের বহু উর্ধ্বে
গেছে।

মানুষের আত্মার স্বাধীনতা, অনন্ত সৃষ্টির ক্ষমতা ও তার
র্যকে ক্ষুণ্ণ করে রেখেছে সত্য বলে একটা নিষ্ঠুর সংস্কার।
বৈচিত্র্যহীন, অরুচিকর সংকীর্ণ সত্যের হাত থেকে বাস্তব
নে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হাসি। হাসি আমাদের বেঁচে
র জন্য একান্ত দরকার।

তাই যাঁরা হাসাতে পারেন না তাঁরাও হাসেন। হাসাতে
ন, এমন লোক দেখলে তাঁর চারপাশে ভিড় জমে যায়।
র্থ হাসির ছবি দেখার জন্যও সিনেমার হলে ভিড় থামে না।

...কিন্তু জীবনে যে হাসির দরকার আছে, বেতার কর্তৃপক্ষ
বিষয়ে তাঁদের সচেতনতার পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে মনে
না। এই যে সকাল ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত তিনটে
বেশনে তিরানব্বইটা প্রোগ্রাম, এর মধ্যে হাসির প্রোগ্রাম থাকে
? এই বিরাট যজ্ঞে হাসির স্থান কতটুকু?

হাসির প্রোগ্রাম বলতে প্রতি মাসের শেষ রবিবারে বেলা
। রূপ ও রঙ্গের আসর। এটা নিয়মিত প্রোগ্রাম এবং
কৌতুকের প্রোগ্রাম। আধ ঘন্টার এই প্রোগ্রামের গোড়ায় থাকে
একটা কৌতুক নাটিকা বা নকশা, আর শেষে বিরূপাক্ষের
থেকে পাঠ। বিরূপাক্ষের লেখা থেকে পাঠ করে শোনান
রেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

এত বড়ো একটা বেতারকেন্দ্রে এতগুলো শ্রোতার কাছে
র প্রোগ্রাম বলতে মাসে আধ ঘন্টার এক রূপ ও রঙ্গের
। এটাই যেন এক হাসির বিষয়, হাসির প্রোগ্রাম। এই
ও রঙ্গের আসর হাস্যকৌতুকের আসর হলেও হাস্যকৌতুক
করতে পারে না সব সময়—জ'লো হয়ে যায়, লঘু হয়ে যায়,
গ্রাম্য হয়ে পড়ে।

গোড়ার "কৌতুক" নাটিকা বা নকশায় আকর্ষণ সৃষ্টি হয়
ব সময়, হয় বিকর্ষণ। কারণ, হাসা যত সহজ, হাসানো তত
বং হাসির নাটিকা-নকশা লেখার লোকই যেন বেতারে
। এবং লেখাও যেন সহজ।

বেতার কর্তৃপক্ষ যদি বাংলাদেশের হিউমার ও স্যাটায়ার
দের নিয়ে হাসির প্রোগ্রামের জন্য একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা
করেন তাহলে বোধহয় ভালো হয়। যে-সব খ্যাতনামা
র ও স্যাটায়ার লেখক এখন গত হয়েছেন তাঁদের কালজয়ী
। নাট্যরূপ দিয়ে বেশি করে প্রচার করা যেতে পারে,
বিদেশের দেশজয়ী রচনাও অনুবাদ করে শোনানো যেতে পারে। আসলে হাসির নাটিকা ও নকশার জন্য একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা দরকার, যা হাতে এল নির্বিচারে তা-ই প্রচার করে শ্রোতাদের প্রতি আন্তরিকতা দেখানো যায় না।

বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন, প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানে না হলেও সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানে অন্তত কিছুটা হাসির আয়োজন করুন। তাঁরা—হাসির গল্প, হাসির নকশা, হাসির ফীচার, হাসির যা হয় একটা কিছু।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২৪শে জুলাই সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে 'বাংলার গ্রাম' এই পর্যায়ে বেলডাঙ্গা সম্পর্কে একটি কথিকা পড়লেন শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়। গ্রামটির একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া গেল এই কথিকায়—তার কৃষি শিল্প বাণিজ্য শিক্ষা আচার আচরণ উৎসব প্রভৃতির চিত্র। বেশ লাগল। পড়াটা যদি বলার মতো হ'ত তাহলে আরও বেশ লাগত।

২৮শে জুলাই বেলা আড়াইটেয় 'বিদ্যার্থীদের জন্য' অনুষ্ঠানে তাজমহলের গল্প বললেন শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পটা ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ এবং বিদ্যার্থীদের জ্ঞাতব্য। বলাটা আর একটু স্বচ্ছন্দ হলে গল্পটা আরও চিত্তাকর্ষী হত।

১লা আগস্ট ছিল লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের মৃত্যুবার্ষিকী, রেডিওর লোকেরা সেদিন তাঁকে তিলক পরিয়েছেন। সকাল ৭টা ১০ মিনিটে অনুষ্ঠান পরিচিতিতে বলা হয়েছে, রাত ৮টা ৫০ মিনিটে 'লোকমান্য তিলক ও বাংলা দেশ' সম্পর্কে বলবেন ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিন্তু রাত ৮টা ৫০ মিনিটে ঘোষক ঘোষণা করলেন, ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত 'লোকমান্য টিলক ও বাংলা দেশ' সম্পর্কে বলছেন। ডঃ গুপ্ত বললেনও তাই। বলা শেষে ঘোষক আবার টিলক বলেই ঘোষণা করলেন। রাত সাড়ে ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরেও ঘোষিকা তিলক শোনালেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, আকাশবাণীর ঘোষক-ঘোষিকাদের মধ্যে মিল নেই মোটে, যাঁর যা খুশি বলেন। দেখার কেউ নেই, দেখাবারও না।

লোকমান্য এই ব্যক্তিটি যে তিলক নন, টিলক—কেন যে রেডিওর লোকেরা এটা বুঝতে চান না বলা কঠিন। ইংরেজী 'টি' দেখলেই তাকে নির্বিচারে বাংলায় 'ত' করা চলে না। রেডিওর লোকেরা যদি এমনিতে বুঝতে না চান তাহলে একবার একটু কষ্ট করে হাজরা রোডে মহারাষ্ট্র নিবাসের প্রবেশদ্বারের ফলকটা দেখে আসুন। সেখানে লেখা আছে 'লোকমান্য টিলক সভাগৃহ'—

অবশ্য বাংলা হরফে নয়, তবু বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হবে না।

ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের কথিকাটি যেমন ঐতিহাসিক তথ্যভারাবনত তেমনি মনোগ্রাহী। বলার ভঙ্গিটিও মধুর ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। সারাক্ষণ মন আকর্ষণ করে রেখেছিল।

৩রা আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় 'শিশুমহলে' গল্প শোনালেন শ্রীবিদ্যুৎকুমার সাহা—'হিংসুটে চিল।' গল্পটা মজার, সেই সঙ্গে শিক্ষাপ্রদ। 'অতি লোভে তাঁতী নষ্ট' বলে যে কথাটা আছে, এতে তারই ভিন্ন রূপ বর্ণিত হয়েছে। এক বৃদ্ধ চিল, তার লোভ হয়েছিল অনেকদিন বেঁচে অনেক খাবে। ভগবানের কাছে সে নিত্য প্রার্থনা জানাত। ভগবান তার নিত্য প্রার্থনায় বিরক্ত হয়ে একদিন তাকে একটা ওষুধ দিয়ে বললেন, এই ওষুধের অর্ধেকটা খেলে সে তার ছেলেদের মতো পূর্ণ যৌবন লাভ করবে। চিলটা লোভ করল, ভাবল পুরোটা খেলে সে তার নাতিদের মতো বাল্যাবস্থা লাভ করবে, ফলে আরও বেশিদিন বেঁচে আরও বেশি খেতে পারবে। তাই সে পুরো ওষুধটা খেল। সঙ্গে সঙ্গে তার চার ধারে প্রাচীর গড়ে উঠল, চারধার অন্ধকার হয়ে গেল। সে ডিম্বাবস্থা প্রাপ্ত হল। তারপর সেই ডিম গড়িয়ে নিচে পড়ে ভেঙে গেল, বিড়ালের উদরে স্থান লাভ করল—তার সমস্ত লোভের অবসান ঘটল।

শ্রীসাহার গল্প বলার ভঙ্গিটি শিশুদের প্রতি আর একটু ঘনিষ্ঠ হলে ভালো হত।

ঐদিন রাত সওয়া ১০টায় সংবাদ বিচিত্রার বিষয় ছিল চারটি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের প্রতিক্রিয়া, ম্যারিন এঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কেন্দ্রীয় জাহাজী মন্ত্রী রঘুরামাইয়া, জাপানী চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী এবং দুই বাঙ্গালী তরুণের পদব্রজে কাশ্মীর পরিভ্রমণ।

প্রথমটিতে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর ব্যাঙ্কের সাধারণ কর্মচারী, আমানতকারী আঞ্চলিক ম্যানেজার, 'জনৈক মহিলা' প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোকের প্রতিক্রিয়া বিধৃত হয়েছে। পুরুষদের প্রতিক্রিয়া কোথাও প্রচন্ড নয়, ধীর শান্ত। কিন্তু 'জনৈক মহিলা'র প্রতিক্রিয়া বড়ো দ্রুত। বড়ো দ্রুত হিন্দীতে তিনি কী বললেন, ভালো বোঝা গেল না। বাংলা বেতারকেন্দ্রের বাংলা অনুষ্ঠানে হঠাৎ একজন হিন্দীভাষী মহিলার হিন্দী প্রতিক্রিয়া প্রচারের কী প্রয়োজন ছিল? বাংলাভাষী মহিলা কি হাতের কাছে পাওয়া যায় নি? না কি এখানেও কেন্দ্রীয় নির্দেশে হিন্দী প্রচারে হিন্দীর অনুপ্রবেশ?

দ্বিতীয়টিতে শুধু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ভাষণের অংশই প্রচারিত হয়েছে। অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য।

তৃতীয়টিতেও তাই—মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণের অংশ। খুব সংক্ষিপ্ত এই বিভাগটি।

চতুর্থটিতে বাংলার দুই তরুণ কল্যাণকুমার বসু ও জ্যোতিকুমার দাশগুপ্ত, যাঁরা পায়ে হেঁটে কাশ্মীর বেড়িয়ে এলেন তাঁদের সঙ্গে সংবাদ বিচিত্রার প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারটি মোটেই প্রাণবন্ত নয়, তবে তা থেকে জানা গেছে, ঐ দুই তরুণের পায়ে হেঁটে কাশ্মীর যেতে সময় লেগেছে ৪৫ দিন, পথে তাঁরা কিছু বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন, পথে ভালো-খারাপ দুই রকম ব্যবহারই পেয়েছেন তাঁরা, মনে রাখার মতো কাজও করেছেন একটা এক মৃতের শ্মশানযাত্রী হয়ে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি মনে ছাপ ফেলতে পারেনি এতটুকু গ্রন্থনা ও এডিটিং মোটামুটি, রেকর্ডিং অস্পষ্ট।

৪ঠা আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় লোকগীতি শোনালেন শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ পাল শহুরে লোকগীতি নয়, গ্রাম্য লোকগীতি ভালো লাগল।

এর পরে ৬টা ৪০ মিনিটে একটি রূপক প্রচারিত হল 'আঁধারে আলো'। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' নয়—রূপকটির আসল উদ্দেশ্যও খুব স্পষ্ট নয়, তবে কথাবার্তা শুনে অনুমান করা গেল, বয়স্ক শিক্ষার সপক্ষে প্রচার। তাই যদি হয় তাহলে ও[...] জন্য যে গল্প তৈরি করা হয়েছে তা মোটে[ই] উপযুক্ত নয়। গল্পটা হলো, হালকা এলে মেলো। বাস্তবের সঙ্গে খুব বেশি সম্পর্ক নেই তার। মনে রেখাপাত করে নি কিছু মাত্র। বড়ো ভাই ভবেশ সরকারী সাহায্য আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেনি বলে ছোট ভাই সুরেশ তাকে একেবারে ত্যাগ ক[রে] দেশান্তরী হবে, আবার দেশান্তর থে[কে] ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখে জানাবে দরকার সময় খবর দিলে সে আসবে—এ বাস্তবতার দিক দিয়ে মানতে একটু কষ্ট না হয়ে পারে না।

ভবেশের ভূমিকায় মোড়লকে [...] খুশি হওয়া যায় নি। মোড়ল, কাশীনা[থ] সদাশিব, মোহনলাল প্রভৃতি ভূমিকা আসর ও তৎসংলগ্ন সব অনুষ্ঠা[নে] সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্র—স্টক ক্যারাকটার। [...] ভূমিকায় তাঁদের মানিয়ে নিতে কষ্ট [...] তাঁরা অন্য যে ভূমিকাই নিন না কেন, [...] ভিতর দিয়ে তাঁদের পরিচিত চরিত্রই [...] ওঠে। শ্রোতারাও তাঁদের অন্য ভূমি[কা] সহজে কল্পনা করে নিতে পারেন না—[...] হয় যেন মোড়ল, কাশীনাথ, সদা[শিব] মোহনলাল প্রভৃতিই কথা বলছেন। [...] অনুষ্ঠানটির মাধুর্যই যায় নষ্ট [...] আকর্ষণক্ষমতাও যায় কমে।

এইদিন ৬টা ৪০ থেকে ৬টা[...] পর্যন্ত যাঁকে ভবেশরূপে দেখা গেল, ১০ মিনিট পরে ৭টায় তিনিই অ[...] আবির্ভূত হলেন মোড়লরূপে। দশ মি[নিট] আগে যিনি মুখ্যসুখ্য ছিলেন, 'লেখা[পড়া] শিখি নি' বলে আক্ষেপ করেছিলেন [...] এখন শিক্ষিত ও তথ্যাভিজ্ঞরূপে আত্মপ্র[কাশ] করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্যটা [...] প্রচন্ড হয়ে কানে বিঁধল। তাই পারত[পক্ষে] এই সব সুপ্রতিষ্ঠিত চরিত্রের অন্য ভূ[মিকা] গ্রহণ করা উচিত নয়। —[...]

ইন্ডিয়ান কালচারাল ফোরামের উদ্যোগে কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত দূরতীর্থ পরিবেশিত চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে সুস্মিতা সিংহ, মধুশ্রী দাস, শুক্লা দাস, শুভ্রা অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় এবং অনিমেষ কুমার। —ফটো : অমৃত।

সৌরভের উৎসব সন্ধ্যা

সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান "সৌরভ"-এর পক্ষ
থেকে ২রা আগস্ট নৃত্যনাট্য ও মার্গ
সঙ্গীতের এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ
য় রবীন্দ্র সদনে। বটুক নন্দী এবং
সম্প্রদায় গীটারে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও শ্রীনন্দীর
নজস্ব এক রচনা সুরেলা পরিবেশনার
গুণে প্রশংসিত হয়।

এর পর শ্রীমতী নমিতা চট্টোপাধ্যায়ের
পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে "সৌরভ" এর
শিক্ষার্থীশিল্পীরা "মেঘদূত" নৃত্যনাট্যে
অংশগ্রহণ করেন। রাগসঙ্গীতের সঙ্গতে কথক
মণিপুরী ভিত্তিক নৃত্যে কবি কালিদাসের
কল্পনাসমৃদ্ধ কাব্যের এক চিত্রগ্রাহী রূপ
তাঁরা মেলে ধরতে পেরেছেন। বিভিন্ন
দেশের লোকনৃত্য সু-প্রযোজ্য। বিশেষ
উপভোগ্য শিশুশিল্পীদের বলাকানৃত্য।

শ্রীখগেন দাসগুপ্তের পরিচালনায়
সঙ্গীতের ধারা বজায় রেখেছিলেন শিবানী
চট্টোপাধ্যায়, ঊষা সরকার, সুকৃতি মেহতা,
সাধনা গান্ধী, কলাবতী জাভেরী, দিনমণি
ভট্টাচার্য। কাজী সব্যসাচী, নীলাদ্রিশেখর
বসু এবং বাদল রায়ের বর্ণনা ভারসাম্য
রাখতে পেরেছে।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসর শুরু হয়
শ্রীমতী কল্যাণী রায় ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের
যুক্ত সেতার ও হারমোনিয়ম বাদন দিয়ে।
রাগ বেহাগ। আপনাপন ক্ষেত্রে উভয় শিল্পীর
সুপরিকৃতি প্রদর্শিত। শ্রীমতী কল্যাণীর
পরিশুদ্ধতা ও জ্ঞানবাবুর পাণ্ডিত্য
পরিলক্ষিত। কিন্তু হার্মোনিয়ম ও
সেতার—দুটি বিভিন্ন জাতের যন্ত্র বলেই
বোধ হয় এই সমন্বয় মনে কোনো দীর্ঘস্থায়ী
রেশ রাখতে পারেনি। সঙ্গতে ছিলেন
ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ।

অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘটে শ্রীমতী সুনন্দা
পট্টনায়কের কণ্ঠসঙ্গীত দিয়ে। ইনি গান
"জয়ন্ত-মল্লার"। জয়জয়ন্তী ও মল্লারের
স্বধর্ম ও রাগভাব যথাযথভাবে বিশ্লেষণ
করে উভয়ের মিলনকে শিল্পীজনোচিত
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন শ্রীমতী পট্টনায়ক।
তার ওপর অসাধারণ কণ্ঠলাবণ্য এবং
আবেগ ত আছেই। এইসবের সম্মিলনে এই
সঙ্গীতসুন্দর অনুষ্ঠান গুণীজনের অকুণ্ঠ
সাধুবাদ অর্জন করেছে। তবলা ও
সারেঙ্গীতে ছিলেন ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ
মহম্মদ সগীরুদ্দিন।

ডান্সেস্ অফ্ ইন্ডিয়া

৩রা আগস্ট ইন্ডিয়ান কালচারাল
ফোরাম নিবেদিত "ডান্সেস অফ ইন্ডিয়া"—
রূপ-পরিসরের পক্ষপুটেও এক উজ্জ্বল
সন্ধ্যা রচনা করেছিল। উচ্চাঙ্গ ও লোক-
নৃত্যের এই চিত্তহারী সমাবেশ সুরতীর্থের
পক্ষ থেকে প্রযোজনা করেন ডাঃ নীহারকণা
মুখোপাধ্যায়।

কথাকলি আঙ্গিকে মন্দিরা, ভারত-
নাট্যমের আলারিপু, স্বরচিত "চণ্ডালিকা"
নৃত্যনাট্যের অংশবিশেষ এবং বিভিন্ন দেশের
লোকনৃত্য ছিল এঁদের পরিবেশিতব্য
বস্তু। মুহূর্তকাল অপচয় না করে বিদ্যুৎ-
গতিতে বিভিন্ন নৃত্যের উপস্থাপনা, সুষ্ঠু
রূপায়ণ এবং শিল্পীদের প্রাণপ্রাচুর্যের এমন
উচ্ছল প্রবাহ অনুষ্ঠানটিতে যেমন সামগ্রিক
সার্থকতা এনেছে তেমনই উপভোগ্য করেছে
প্রতিটি মুহূর্ত। কোনো নৃত্যই অযথা
বিলম্বিত নয় এবং বিষয়বস্তুর মর্মবাণীকে
নিমেষে দর্শকদের কাছে প্রাঞ্জল করে
তুলেছে! এইখানেই শিল্পীগোষ্ঠী এবং
রূপকার অনিমেষ বক্সী ও কৃষ্ণা গাঙ্গুলীর
সমান কৃতিত্ব।

সমবেতভাবে সকল শিল্পীরা সমান
যোগ্যতার সঙ্গে অনুষ্ঠান রসোত্তীর্ণ
করেছেন। বিশেষভাবে যাঁদের কথা মনে
আসে তাঁরা হলেন বটু, বিরাজ, মধুশ্রী ও
আরতি। নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে তমসা
(মারাঠা লোকনৃত্য) সঙ্গীত ও নৃত্যে মিলে
এক অবর্ণনীয় মাধুর্য সৃষ্টি করে।
'ব্রজলীলা' নৃত্যের নেপথ্যগায়িকা মঞ্জুশ্রী
চক্রবর্তীর গান গায়ন-শৈলীর গুণে সকলের
প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। উচ্চাঙ্গ-
শিক্ষাই হয়ত এ কৃতিত্বের অন্যতম কারণ।

"সৃজন" সৃজিত ঋতুপত্র

"সূর্য ওঠে, অস্ত যায়, আকাশের রঙ
ফেরে পাতা ঝরে। সেই চেয়ে দেখার জগৎকে
আমরা প্রতিদিন দ্রুত হারিয়ে ফেলেছি।
ঋতুচক্রের সেই বৈচিত্র্যকে আপনাদের
অভিজ্ঞতা ও অনুভবের কাছে পৌঁছে
দেবার চেষ্টা করেছি এই "ঋতুপত্রে"।
অবশ্যই এই চেষ্টার পুরোভাগে যিনি
রইলেন তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ"।

এই ভূমিকার মধ্যেই 'সৃজনের' বক্তব্য
সুপরিস্ফুট। কবিগুরুর ছিন্নপত্র অবলম্বনে
ঋতুচক্রের আবর্তন, তার সৌন্দর্যবৈচিত্র্যের
লীলাকে নৃত্যে, সঙ্গীতে ও রঙিন আলো-
ছায়ার ভাষায় রসিকজনের মর্মগোচর করার
প্রচেষ্টা এঁদের অবশ্যই অভিনন্দনীয় এবং

গানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে এই উদ্যম সার্থক। প্রধানতঃ বর্ষা, শরৎ, শীত ও বসন্তের রূপ ও ভাব ছিল "সৃজন" এর শিল্পীদের উপজীব্য বিষয়। নৃত্যনাট্যের আগে দেবব্রত বিশ্বাসের একক সঙ্গীত 'ঋতুপত্রে'র থেকে স্বতন্ত্র হলেও মূল ভাবের সঙ্গে সংহতি রেখেছে। শ্রীবিশ্বাস শোনান তিনটি গান 'বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল' "কে দিল আবার আঘাত আমার দুয়ারে" এবং "আমার যেদিন ভেসে গেছে"। তিনটি গানই বর্ষণমুখর সন্ধ্যার ছন্দে মেলানো এবং শিল্পীর ভাবুক কণ্ঠের আবেগ ও মাধুর্যে মিলে এক অপরূপ ভাবাবেশ বিছিয়ে দিয়েছে শ্রোতাদের চিত্তে। যে কোনো শিল্পীর মেজাজের গান শোনবার সুযোগ পাওয়াটা শ্রোতাদের পরম সৌভাগ্য এবং এই দুর্লভ অবকাশ সেদিন মিলেছিলো এইটেই হচ্ছে সেই সন্ধ্যার স্মরণযোগ্য সংবাদ।

'ঋতুপত্র'র সঙ্গীত পরিবেশনার প্রসঙ্গে প্রথমেই যাঁর কথা মনে আসে তিনি হলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। দ্বিজেনবাবু স্বনামধন্য কিন্তু সেদিন তাঁর কণ্ঠ যেন নিটোল সুরে বাঁধা ছিল, আত্মপ্রকাশের উচ্ছলতা ছিল তাঁর আর বিষয়বস্তুর মর্যাদা-গাম্ভীর্য ত ছিলই। সব মিলিয়ে যে কটি গান গেয়েছেন (এই আকাশে আমার মুক্তি, পূর্ণ চাঁদের মায়া, এই যে তোমার) উদার ঔদাস্যে, মুক্তির আনন্দে এবং সৌন্দর্যমায়ায় যেন ঝলমল করে উঠেছে।

অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে স্বপন গুহর গানের পরিণত শুদ্ধতা ও ভাবতন্ময়তা তার গুরু দেবব্রত বিশ্বাসকে মনে করিয়ে দিয়েছে। অঘ্য সেন, ধীরেন বসু, বন্দনা সিংহ, পূর্ণেন্দু রায় আপনাপন মান বজায় রেখেছেন।

পরিকল্পনা, সঙ্গীত ও নির্দেশনার কৃতিত্ব পূর্ণেন্দু রায়ের।

সঙ্গীতের তুলনায় নৃত্যাংশ দুর্বল। সাধন গুহ ও পলি গুহ ছাড়া কেউই মনে রেখাপাত করতে পারেনি। তবে নৃত্যরচনা ও সুশৃংখল পরিচালনায় এ ত্রুটি ঢাকা পড়েছে। দীপ হাতে সন্ধ্যার কল্পনা সুন্দর। প্রদীপ ঘোষের সুললিত ভাষ্যপা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

পরিকল্পনার অভিনবত্ব চিত্তগ্রাহী- বিশেষ "তোরা পারবি ফিরে যোগ দিতে" পরিসমাপ্তি।

পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ লোকান্তরিত

পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজ তাঁর বেনারসস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন ১ আগস্ট মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০। গ ছ' মাস ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। প্রাচী ঘরাণার এই একনিষ্ঠ সাধক সঙ্গীত, নাট আকাদমি পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র কিরণ মহারা প্রথিতনামা তবলা বাদক। বাংলাদে বিশ্বনাথ বসু, নানকু মহারাজ তাঁর শিষ্য।

●

প্রখ্যাত নটশিল্পী ছবি বিশ্বাসে ৬৯তম জন্ম উৎসব উপলক্ষে টালীগ সম্প্রতি শ্রীমতী অঞ্জলি সিংহের পরিচালন একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হ কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী সাগ সেন, কল্যাণ মুখার্জি, স্বপ্না ভট্টাচার্য, ম পাকড়াশী প্রমুখ। রাজবল্লভপাড়া ব্যা সমিতি সাংস্কৃতিক শাখা কর্তৃক শ্রীপ্রভ ঘোষের পরিচালনায় 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' গী আলেখ্য পরিবেশিত হয়। অংশ গ্রহণ ক সর্বশ্রী মীরা, মালবিকা, শর্মিষ্ঠা, ঝুমা, কৃ রুবী, বেবী, দীপালী, সুষম, তুড়তু জয়া, মন্দিরা, নলনী করণ, কানাইলাল ঘে অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেম দাস। ছ বিশ্বাসের সহধর্মিণী শ্রীমতী নী বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে ও নাট্য পরিচা শ্রীসুধীর মুস্তাফীর সুব্যবস্থায় স অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

—চিত্রাপ

আসন্ন পুজোয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্যা রাণু মুখোপাধ্যায় পপ্‌সঙ-এর একটি রেকর্ড করেছেন। বাঙলা রেকর্ডে পপ্‌ সংগীতের অবতারণা এই প্রথম।

:প্রেক্ষাগৃহ

ভূমি খোঁজে নাবিকহৃদয়
। সংসারে

ংরেজ দুহিতা রোজি ভালোবেসে
ছল প্রবাসী ভারতীয় যুবক তপন
কে: এমন ভালোবেসেছিল যে, সর্ব-
তপনের উপযুক্ত স্ত্রী হবার জন্যে সে
বাঙলাই শেখে নি, ভারতীয় আদশ-
নে-প্রাণে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছিল
নজের নাম পর্যন্ত বদলে সুজাতা
হণ করেছিল। কিন্তু পিতার দারুণ
ত রোজির আশাকে ফলবতী হতে
ন। তাই যখন মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং
নাফল্যের সংগে শেষ করে তপন
ন্য একাই ভারতে ফিরতে বাধ্য হল,
সে জানতেও পারল না যে, রোজি
সুজাতা ইতিমধ্যেই সন্তানসম্ভবা।
র পরে দীর্ঘ পঁচিশ বছর কেটে
ক্যাপ্টেন তপন মুখুজ্জে তাঁর কর্ম-
শেষ করে সহকর্মীদের কাছ থেকে
ও ভালোবাসাপূর্ণ বিদায়-অভিনন্দন
ন্ত ভিজাগাপট্টমের বাড়ীতে ফিরে
ই কলকাতায় রওনা হওয়ার জন্যে
জাড় করছেন, এমন সময়ে তাঁর
এসে হাজির হল সোমা, রোজির
ীয় আদর্শে গড়া মেয়ে। সে এসেছে
দেখতে নিজের বাবাকে দেখতে।
মুখুজ্যের মাথাটা ঘুরে উঠল; তিনি
া রোজিকে ভুলেছিলেন, সে যে তাঁরই
নর জননী হয়েছে, তাও জানতেন না।
দিকে তিনি ভারতে ফিরে বিবাহ
ন; পুত্র গৌতমের বয়স পনেরো
। প্রথম সন্তান কন্যা মিলি—যে
জন্যে বাসন্তী নামটা খুব বেশী
করেছিল,—সেই দশ বছরের মেয়ে
বছর সাতেক আগে মারা গেছে।
ুনিক স্ত্রী নেলি ওরফে নীলিমা
র মুখ থেকে সোমার সম্পূর্ণ পরিচয়
পরে তাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে
ন না—তপন মুখুজ্যের সংসারে ঝড়
এই ঝড় কতখানি উত্তাল হয়ে উঠে-
এবং এর পরসমাপ্তিই বা ঘটেছিল
ব তাই নিয়েই সদ্যমুক্তিপ্রাপ্ত চিত্-
ী প্রোডাকসন্সের নিবেদন 'তীরভূমি'
র বেশীর ভাগ অংশ গড়ে উঠেছে।
কদিকে আধুনিকা স্ত্রী নীলিমা, অন্য-
অবৈধ প্রণয়জাত সন্তান সোমা—
নিয়ে সদ্যঅবসরপ্রাপ্ত জাহাজী
ন তপন মুখুজ্যের যে ব্যক্তিগত
. তাকে সকল পাঠক বা দর্শককে
ণ করবার একটা সার্বজনীন রূপ
রীতিমত কঠিন ব্যাপার। চিত্রনাট্যকার
। রায় শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
ীটিকে পর্দায় উপস্থাপিত করবার
বহু নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টির

ইয়াকীন/শার্মিলা ঠাকুর ও ধর্মেন্দ্র

প্রয়াস পেয়েছেন বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে হৃদয় স্পর্শ করবার ক্ষমতা সামান্যই। এ ছাড়া চরিত্রচিত্রণেও অসংগতি দেখা যায়। নেলী যদি আধুনিকাই হবে, তাহলে সে সোমাকে খুশীমনে গ্রহণ করবে না কেন? আর যদি বলা হয়, তার খোলসটা আধুনিকা, আসলে সে সংকীর্ণমনা, তাহলে সে নিজের মায়ের পরামর্শ অনুসারে সোমাকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেও পারছে না, এইটিই দেখানো উচিত ছিল কিনা? নিজের অভিশাপবাণী ফলে যাওয়ার জন্যেই কি তার মস্তিষ্কবিকার, কিংবা অন্যকিছু, যা পরিষ্কারভাবে বলা হয় নি?

অভিনয়ে মাধবী মুখোপাধ্যায় (সোমা), বিকাশ রায় (তপন মুখুজ্যে), জ্যোৎস্না বিশ্বাস (সোমার জাঠতুতো বোন সুমনা), মঞ্জু দে (নীলিমা), অনিল চট্টোপাধ্যায় (অনুপম—সোমার প্রতিবেশী ও পরে স্বামী), রবি ঘোষ (হাল্কা চরিত্র অভিজিৎ বসু) এবং রমা গুহঠাকুরতা (অনুপমের বৌদি) কাহিনীটির প্রধান প্রধান চরিত্রে যথোপযুক্ত নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। কয়েকটি অপ্রধান চরিত্রে জীবেন বসু (তপনের মেজদাদা), ক্ষিতীশ ঘোষ (তপনের সহকর্মী), সীতা মুখোপাধ্যায় (নীলিমার মা), অজন্তা কর (তপনের মেজবৌদি) প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখযোগ্য। মাস্টার শংকর গৃহীত গৌতম চরিত্রটি কি পরিকল্পনা, কি অভিনয়, উভয় দিক দিয়েই ব্যর্থ।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষ করে দৃশ্যপটাদির পরিকল্পনা এবং উপস্থাপনে শিল্পনির্দেশক রামচন্দ্র সিন্ধে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্রগ্রহণের কাজেও গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিতে তিনখানি গান আছে। তার মধ্যে 'তীরভূমি খোঁজে নাবিকহৃদয়' হচ্ছে কাহিনীর বক্তব্যবোধক অর্থাৎ থীম সঙ। এটিকে পরিচয়লিপির সংগে একবার এবং ছবির শেষে আংশিকভাবে একবার ব্যবহার করা হয়েছে। আধুনিক সমবেত নৃত্যের সংগে পপ-সঙ্গীতরূপে ব্যবহৃত হয়েছে 'এই তো জীবন হুররে।' 'জানি না পথের সীমা' হচ্ছে প্রাণের আকুতি-পূর্ণ প্রার্থনা-সংগীত। সুরসংযোজনের

দিক থেকে তিনটি গানই সার্থক। পরিস্থিতি অনুযায়ী আবহসঙ্গীতকে আরও দীর্ঘায়িত করবার অবকাশ ছিল।

নূতনতর স্বাদে ভরা সূর্যের দেশের চলচ্চিত্র

গেল ১ থেকে ৭ আগস্ট স্থানীয় অপেরা সিনেমায় সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা, ইন্ডো-জাপানীজ অ্যাসোসিয়েশন এবং কনসুলেট জেনারেল অব জাপান-এর যৌথ উদ্যোগে যে-জাপানী চলচ্চিত্রউৎসব অনুষ্ঠিত হল, তাতে ছখানি পূর্ণদৈর্ঘ চিত্র দেখাবার কথা ছিল। কিন্তু বেঙ্গল মোশান পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সদ্য-পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে গেল ৫ আগস্ট কলকাতার সকল চিত্রগৃহ বন্ধ থাকায় এইজো সুগাওয়া পরিচালিত 'তাইফো টু জাকুরো' (টাইফুন অ্যান্ড পমিগ্র্যানেড সিজন) ছবিখানি দেখানো সম্ভব হয় নি।

দ্বিতীয় দিনে প্রদর্শিত 'আন্ডারসেন মোনোগাতারি' (টেল অব অ্যান্ডারসন) ছবিখানি ওয়াল্ট ডিজনে প্রবর্তিত ধারায় নির্মিত রঙীন কার্টুন চিত্র। হ্যান্স ক্রিশ্চান অ্যান্ডারসন রচিত 'রেড সুজ' ছবিটির প্রধান উপাদান হলেও বালক অ্যান্ডারসনের গ্রাম ও তাঁর রচিত উপকথা থেকে বহু কাল্পনিক চরিত্রকে নিয়ে এই বিচিত্র ছবিটি তৈরী হয়েছে। 'অ্যানিমেশন পিকচার' তৈরী করার ব্যাপারেও যে জাপান পিছিয়ে নেই, তার প্রমাণ হচ্ছে এই ছবি।

পাঁচখানি প্রদর্শিত ছবির মধ্যে 'ইকিরু' বা 'টুলিভ' ছবিখানি হচ্ছে বিশ্ববিশ্রুত জাপানী পরিচালক আকিরো কুরুসাওয়ার সৃষ্টি। সম্প্রতি কুরুসাওয়া তাঁর দেশের সামাজিক ত্রুটি-গ্লানি, স্বার্থপরতা, নীচাশয় প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা শুরু করেছেন তাঁর ছবিগুলির মাধ্যমে। 'ইকিরু' ছবিতে তিনি শহরের পৌর-প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মচারীদের নিষ্ক্রিয়তা, আলস্য ও গতানুগতিকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর কাহিনীর নায়ক কাঞ্জি ওয়াতানাবে আগে ঐ গতানুগতিকভাবেই কাজ করতেন। কিন্তু যেদিন তিনি জানলেন, দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগ তাঁর মৃত্যুর দিনকে ত্বরান্বিত করে আনছে, সেইদিনই তিনি তাঁর সংযত জীবনযাত্রাকে বিদায় দিয়ে জীবনের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে মদ্যপান, রেস্তোরায় খাওয়া, হোটেলের উন্মত্ত উদ্দীপক নৃত্যাদিতে মেতে উঠলেন এবং সেই সঙ্গে বহুদিনের দূষিত আবর্জনাপূর্ণ ডোবা ভরাট করবার দরখাস্তটিকে যতশীঘ্র সম্ভব মঞ্জুর করিয়ে সেখানে শিশুদের জন্যে একটি ক্রীড়া-উদ্যান রচনার কাজে সমগ্র উদ্যম ব্যয় করতে লাগলেন। যেদিন ঐ উদ্যানের উদ্বোধন হল, সেই রাত্রেই শীতের মধ্যে ঐ উদ্যানে ছেলে-মেয়েদের জন্যে খাটানো একটি দোলায় দুলতে দুলতে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। তাকাশি শিমুরা নায়ক ওয়াটানাবের জীবনস্পন্দনকে মূর্ত করে তুলেছেন। ছবির প্রতিটি দৃশ্যে, প্রতিটি শটে কুরুসাওয়ার বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তবু বলব, নায়কের মৃত্যুর পরে তাঁর শোকসভার দৃশ্যটিকে দীর্ঘায়িত করার ফলে ছবির ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে বলেই আমাদের ধারণা।

প্রবীণ পরিচালক যাসুজিরো ওজুর 'আকিবিয়োরি' বা 'লেট অটম' জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের সঙ্গে চিরাচরিত প্রথাগত বিশ্বাসের সংঘর্ষের একটি সুন্দর, সুনিপুণ প্রকাশ। বিধবা মা ও মেয়ে—দুজনে একসঙ্গে পরস্পরের সাথী হয়ে থাকে। মেয়ের বিয়ের কথা উঠলে মেয়ে আপত্তি করে; সে বলে—বেশ তো আছি, মনে-মনে ভাবে—আমি স্বামীর ঘর করতে গেলে মায়ের কি হবে? মায়ের পরলোকগত স্বামীর বন্ধুরা ভাবে ভদ্রমহিলার এখনও যথেষ্ট রূপ-যৌবন রয়েছে, তাঁরও আবার বিবাহ করা উচিত। একজনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবও ওঠে। মেয়ের কানে যায় কথাটা। সে ভুল বোঝে; ভাবে, মা তাকে না জানিয়েই তলে-তলে নিজের বিবাহের বন্দোবস্ত করছেন। মার ওপর রাগ করে সে তার বান্ধবীর কাছে গিয়ে ওঠে। সেখানে তার মুখ থেকে সব কথা শুনে বান্ধবী তার ছেলেমানুষী, স্বার্থপরতাকে দোষ দেয়। মা এদিকে স্তম্ভিত; তিনি তো আবার বিয়ের কথা ভাবতেই পারেন না এবং কখনও কারুর সঙ্গে আবার বিয়েতে মত দেওয়া দূরে থাকুক, এমন প্রস্তাবও তাঁর কাছে আসে নি। শেষে অবশ্য মেয়ের বান্ধবী মারফৎ আসল ব্যাপারটা তিনি বুঝতে পারেন এবং মেয়ে যে কেন বিবাহ করতে চায় না, তাও বোঝেন। তখন তিনি নিজেও বিবাহ করতে সম্মত, এই মিথ্যা অভিনয় করে মেয়ের বিবাহ সুসম্পন্ন করেন। পরে কিন্তু এই মিথ্যার ছলনাটুকু প্রকাশ করে বলেন স্বামীর স্মৃতিতে তাঁর জীবন এমনই ভরাট যে সেখানে অন্য কোন পুরুষের স্থান হতে পারে না।

ওজু পরিচালিত এই ছবিটিতে একটি স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্নতা লক্ষণীয়। মনে হয়, স্থির প্রশান্তির ভাব রাখতে গিয়ে গতিশীলতার কিছুটা অভাব ঘটেছে।

ধনজ্যোৎস্না/শমিত ভঞ্জ এবং মীনাক্ষী দত্ত

হাইডিয়ো ওহবা পরিচালিত 'ওন-ই' বা 'এনর‍্যাপচাড' ছবিখানি আগেও নো হয়েছিল। নৃত্যশিক্ষকের প্রতি ীর আসক্তিকে উপজীব্য করে ছবিটি গড়ে ছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিক্ষকের হীনতার কথা জেনেও ছাত্রী তার এমন রক্ত হয়ে পড়ে যে, অন্যায় জেনেও সে কে সংযত রাখতে পারে না। অবশ্য পর্যন্ত সে বাপের সুপরামর্শে নিজের কলার প্রতি মনোনিবেশ করে এবং ক অধ্যাপককে বিবাহ করে। কিন্তু তার লোর মুহূর্তে সে তার শিক্ষকের দর্শন না করেছে। প্রেমাসক্তি বিষয়বস্তু হওয়া ও ছবিটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। যেখানেই বিষয়ক কোনো দৃশ্য আছে, সেখানেই ছায়াশ্রয়ী এবং ইঙ্গিতধর্মী।

বিস্ময়কর ছবি হচ্ছে কোয় কুমায় রচালিত 'কুরোবে নো তাইয়ু' বা 'এ ল টু দি সান'। একটি উঁচু পাহাড়ের র একটি ড্যাম তৈরীর পরিকল্পনা ও তার ব রূপায়ণ হচ্ছে ছবিটির বিষয়বস্তু। দর্শককেই ছবি শেষ হবার পরে বলতে লাম, এ তো একটা ডকুমেন্টারী ছবি িৎ তথ্যচিত্র। এ কী কম প্রশংসার কথা! ন বিশ্বস্তভাবে এই বিরাট বস্তুনিষ্ঠ টি তৈরী করা হয়েছে যে, দর্শকদের হয়েছে এটা একটা ডকুমেন্টারী। টি উঁচু, খাড়া পাহাড়ের বুক ভেদ করে ম তৈরীর পরিকল্পনা, তার সম্ভাব্যতা-সম্ভাব্যতা বিচার, তর্ক-বিতর্ক, প্রাথমিক িয়ে বহু প্রাণহানি, অসাফল্যের ভয়াবহ দর্শন, হতাশা, আবার দ্বিগুণ উদ্যম য় এগিয়ে যাওয়া এবং শেষপর্যন্ত ফলালাভ ও তজ্জনিত উল্লাস, আবার ঐ াসের মধ্যেই নেতার একমাত্র কন্যা-বিয়োগের বেদনা প্রভৃতিকে এমন চমৎকার-বে গেঁথে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, মাত্র কিছুটা পৌনঃপুনিকতা ও তারই না কিছুটা অযথা দৈর্ঘ্য ছাড়া ছবিটিকে কটি অসামান্য শিল্পনিদর্শন বলে অভিনন্দিত করা চলে।

জাপানী ছবি সম্বন্ধে সমগ্রভাবে বলতে হয় যে, কলাকৌশলের চরম উৎকর্ষসমন্বিত জাপানী ছবিগুলির এমন একটা প্রাচ্য দৃষ্টি-ভঙ্গী আছে যা একান্তভাবে আমাদের প্রাচ্য ভূখণ্ডেরই নিজস্ব বস্তু; সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলির ভিতর থেকে জাপানের অগ্রগতি, তার সমাজ, সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতি, দৈনন্দিন জীবন প্রভৃতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

স্টুডিও থেকে

প্রায় বছর কুড়ি আগে প্রণববাবু (এখন গীতিকার) একদিন আমায় বললেন, 'চলো, আমার ছবির স্যুটিং দেখবে।' শ্রীরায় তখন 'অনুরাধা' নামে একটা ছবি করছিলেন। চিত্রপরিচালক শ্রীস্বদেশ সরকারের সেই থেকে স্টুডিওয় নিয়মিত যাতায়াতের শুরু। তখন অবশ্য শুধুমাত্রদর্শক হয়েই, 'মাঝে মাঝে অবশ্য টুকটাক কাজের ফরমাশ পেতাম। কি আনন্দ তখন।' শ্রীসরকার কথাগুলো বলতে বলতে যেন সেই কুড়ি বছর আগে ফিরে যেতে চাইছিলেন।

তারপর শ্রীরায়েরই পরবর্তী ছবি 'প্রার্থনা'য় কাজ পেলেন সেকেন্ড অ্যাসি-স্ট্যান্ট হিসাবে। একটা কথা বলতে ভুলেছি, শ্রীঅজয় কর তখন ক্যামেরাম্যান হিসাবে বাংলা ছবির মাঝ আকাশে। দুজনের পরিচয় এই কাজ করতে এসেই। স্বদেশবাবু বললেন, 'অজয়বাবুর কাছে আমার কাজের হাতেখড়ি আর যা কিছু শিখেছি তার অনেকটাই তাঁর কাছ থেকে।'

অবশ্য পরিচয়ের প্রথমেই তাঁর সঙ্গে স্বদেশবাবুর কাজ করার সৌভাগ্য হয়নি। ইতিমধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সতী

দিবারাত্রির কাব্য/মাধবী মুখোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী এবং ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণ চক্রবর্তী।
ফটো: অমৃত

বেহুলা', বিকাশ রায়ের 'সূর্যমুখী' ছবিতেও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসাবে কাজ করেছেন।

অজয় করের প্রথম সহযোগী পরিচালক হবার আগে অবশ্য 'বামুনের মেয়ে', 'মেজদিদি', 'অনন্যা' ইত্যাদি ছবিতে সেকেণ্ড অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসাবে কাজ করেছেন।

ব্রেক এল তাঁর 'সপ্তপদী' ছবি হবার আগে।

'যোগাযোগ হয়ে গেল, অজয়বাবু বললেন ওঁর সঙ্গে কাজ করতে। সঙ্গে সঙ্গে রাজী আমি।' উত্তেজনায় স্বদেশবাবুর ঠোঁট কেঁপে উঠল।

তারপর থেকে প্রায় সব ছবিতেই অজয়বাবুর সহকারী হিসাবে শ্রীসরকার কাজ করেছেন। অবশ্য 'শুন বরনারী'র পর অজয়বাবুও কিছুদিন ছবি করেননি। স্বদেশবাবুরও অবশ্য বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এদিক ওদিক ঘুরেছেন বহু। তারপর আবার সেই 'যোগাযোগ'। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ মিলল 'অভিযান' ছবিতে। ঐখানে আটক থাকার জন্য তখন অজয়বাবুর একখানা ছবিতে কাজ করতে পারেননি স্বদেশবাবু।

কিছুদিন বাদে আবার ফিরে এসেছেন 'সাত পাকে বাঁধা'য়। একে একে 'বর্ণালী', 'প্রভাতের রং', 'পরিণীতা'য় কাজ করেছেন।

শুধু অজয়বাবুর ছবিতেই নয়। অজয়বাবুর ইউনিট ছেড়ে যখন হীরেন নাগ স্বাধীনভাবে ছবি করতে শুরু করলেন তাঁর ইউনিটেও কাজ করেছেন স্বদেশবাবু। 'থানা থেকে আসছি', 'জীবনমৃত্যু' ও 'চেনা অচেনা'র পর নিজেই স্বাধীনভাবে পরিচালক হলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পটা বেছে নিয়েছেন তিনি। অবশ্য এর আগেই তাঁর কাজের সুযোগ মিলেছিল 'জীবন সৈকতে' নামে একটা ছবি করার। প্রাথমিক কাজ সব তৈরীই ছিল। কথা ছিল সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় প্রযোজনা করবেন আর প্রধান ভূমিকায় থাকবেন সৌমিত্র ও সাবিত্রী।

কিন্তু হল না। 'শাস্তি'র শুরুতে বাধা এসেছিল অনেক। এখন সব কাটিয়ে উঠেছেন। ছবির কাজ প্রায় শেষ। তমলুকে কিছু আউটডোরের কাজ বাকি।

স্বল্পবাক, সাধাসিধে স্বদেশবাবু নিজের সম্পর্কে বেশী কিছু বলতে নারাজ। তবুও জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ধরনের ছবি করতে আপনি ইচ্ছুক?'

—বিশেষ কোনো ধরনের কথা বলতে পারি না। তবে সাধারণ দর্শকের ইমোশান বা সেণ্টিমেণ্টের ওপর ছবি করতে পারলে তা নিশ্চয়ই তারা নেবে আর তাহলে আমারও সাফল্য।

: দর্শক তো বদলেছে, তাই শুধু সেণ্টিমেণ্টে আঘাত দিয়ে ছবি চলে কি, যদি বাস্তব কিছু না থাকে?

—না না, সে তো ঠিকই। অকারণ সেণ্টিমেণ্টে খোঁচা দিলে নিজেকেই আঘাত খেতে হবে।

বুঝলাম সত্যজিৎ রায়, অজয় করের কাছে স্বদেশবাবুর কাজ শেখা নিষ্ফল হবে না। বাংলা চিত্রজগৎ আরেকজন সম্ভাবনাপূর্ণ পরিচালককে পাচ্ছে। এ পর্যন্ত যত ছবির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন তার সবকটাই 'হিট' ছবি বলতে বাধা নেই।

আগামী পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'দেখি 'জীবন সৈকতে' যদি আরম্ভ করতে পারি'।

●

বর্তমানের বঞ্চনা—ভবিষ্যতের স্বপ্নকে ভিত্তি করে আধুনিক যুগযন্ত্রণার ছা[illegible] জয়া চিত্রের 'মায়া' সেন্সরের ছাড়প[illegible] পেয়ে মুক্তির দিন গুনছে। কাহিনী, চি[illegible] নাট্য ও তত্ত্বাবধানে আছেন নির্মল সর্বজ্ঞ পরিচালনা করেছেন অরিন্দম নামে একটি নলিষ্ঠ গোষ্ঠী। অমল চট্টোপাধ্যায় সু[illegible] দিয়েছেন। প্রধান চরিত্রে আছেন—সুমিত্র সান্যাল, অসিতবরণ, অজয় গাঙ্গুলী সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষাল, অপর্ণা দেবী, শিখা ভট্টাচার্য, সীতা দেবী, চি[illegible] মণ্ডল ও পারিজাত বসু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মানব মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মি[illegible] এর কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ নিয়েছেন। ছবিখানি পরিবেশন দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীশংকর চিত্রম।

নবগঠিত 'রামায়ণ চিত্রম'-এর প্রথ[illegible] চিত্রার্ঘ বাঙলার আদিকবি রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাসের পুণ্যময় জীবনী অবলম্বনে রচিত 'মহাকবি কৃত্তিবাস' 'লবকুশ'খ্যাত পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবিটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে। বিজনবালা ঘোষদস্তিদারের সুরে মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গোপী কিষণের কিছু নৃত্যাংশও ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে।

ছবির প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছেন
দ্দ চট্টোপাধ্যায়। ফুলিয়া, গৌড়
ত প্রাচীন বাঙলার কিছু কিছু ঐতিহা-
স্থান বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্যে
চিত হয়েছে।
নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন অসীম-
।। শ্রীরাজেং পিকচার্স ছবিটির বিশ্ব-
বেশক।

প্রতিটি ভারতবাসীর প্রিয় নায়ক শ্রীকৃষ্ণ।
শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংস বধ পর্যন্ত
সব অংশই বলাকা পিকচার্স প্রযোজিত
পরিচালিত জাঁকজমকপূর্ণ গীতিবহুল
লীলা'য় গৃহীত হয়েছে। বহু অর্থব্যয়ে
া প্রেম-ভক্তির এই স্বর্গীয় চিত্রখানি
ছ মাসে শহর ও শহরতলীর একাধিক
হে মুক্তিলাভ করবে। ছবিটির কণ্ঠ-
তে আছেন : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
বসু, শিপ্রা বসু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
ত মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়
দোম বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত "আরোগ্য
তন"-এর রচয়িতা হচ্ছেন জ্ঞানপীঠ
স্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য কথাশিল্পী তারা-
র বন্দ্যোপাধ্যায়। বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা
েপে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বিজয়ী
রোগ্য নিকেতন" ছবিটি "রাজা
মাহন" প্রভৃতি উচ্চমার্গের চিত্রনির্মাতা
রা-র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবিটি পরিচালনা
ছেন স্বয়ং এ ছবির চিত্রনাট্যকার
নী নিবেদিতা', 'রাজা রামমোহন'-খ্যাত
় বসু। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরারোপিত
বির নেপথ্যসংগীতে কণ্ঠ দিয়েছেন
ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
। মুখোপাধ্যায় এবং আরতি মুখো-
ায়। ছবিটির চিত্রগ্রহণ, শিল্পনির্দেশনা
ম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী,
ন রায়চৌধুরী এবং বিশ্বনাথ মিত্র।
় বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন
শ রায়, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা,
দেবী, দিলীপ রায়, শুভেন্দু চট্টো-
ায়, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, রমা দাস,
ী সরকার, ইন্দিরা দে, জহর গাঙ্গুলী
সন্ধ্যা রায়। অরোরা ফিল্ম কর্পো-
ন ছবিটির পরিবেশক।

নবগঠিত এম, বি, প্রোডাকসন্স-এর
। চিত্রার্ঘ 'প্রতিদান' সম্প্রতি মুক্তির
গুনছে। যাঁরা নিজেদের নিঃস্ব করে
া যুগে কালে কালে নিজেদের ভবিষ্যত
কার করে জাতির ভবিষ্যত গড়ে তোলার
ন ব্রত উদযাপন করেন আমাদের দেশের
সবচেয়ে অবহেলিত শিক্ষক সমাজের
শরিকাকে কেন্দ্র করে এই ছবির
হনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন
প্রতিক বাঙলা ছবির একচেটিয়া সফল
চালক অজিত গাঙ্গুলী। ছবিটির
চালনাও তাঁরই। এ ছবির সুররচয়িতা
দন মুখোপাধ্যায়।
সংবেদনশীল এ ছবির চরিত্রগুলি
দের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে পর্দায়,

তাঁরা হলেন—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল
চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল
গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, মলিনা দেবী, জহর
রায়, প্রীতি মজুমদার, অনুভা গুপ্তা,
কালী চক্রবর্তী, রুমা গুহঠাকুরতা, পঞ্চানন
ভট্টাচার্য এবং নবাগতা সুচেতা বন্দ্যো-
পাধ্যায়। এ ছবির পরিবেশনায় আছেন
দেবালী পিকচার্স।

মহাভারতের অনবদ্য প্রেমোপাখ্যান
"নল দময়ন্তী" অবলম্বনে রচিত দীর্ঘ-
প্রতীক্ষিত পৌরাণিক ছবি "নলদময়ন্তী"
বর্তমানে আসন্ন মুক্তিপথে। জয়দেব চক্রবর্তী
ও সমীরণ মজুমদার প্রযোজিত জে, এম,
প্রোডাকসন্স-এর উক্ত ছবিটি পরিচালনা
করেছেন গোপালকৃষ্ণ রায়। ছবিটির চিত্রনাট্য
রচনা করেছেন মণি বর্মা। পুলক বন্দ্যো-
পাধ্যায় রচিত এবং কালীপদ সেন
সুরারোপিত এ ছবির সঙ্গীতাংশ সমৃদ্ধ
হয়েছে মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়,
আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, গীতা
দাস এবং গঙ্গা দে-র কণ্ঠমাধুর্যে। চিত্রগ্রহণ,
শিল্পনির্দেশনা এবং সম্পাদনায় আছেন যথা-
ক্রমে দিব্যেন্দু ঘোষ, সুনীল সরকার এবং
বিশ্বনাথ নায়ক। কেমেশকুমার ছবিটির
নৃত্য পরিকল্পক। "নলদময়ন্তীর" ভূমিকা-
গুলি চিত্রিত করেছেন অসীমকুমার, সাবিত্রী
চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়,
কালীপদ চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, গঙ্গাপদ
বসু, গীতা দে, লীলাবতী দেবী (করালী),
গোপী চক্রবর্তী, মণি শ্রীমানী প্রভৃতি।
পারফেক্ট ফিল্ম ছবিটির পরিবেশক।

মঞ্চাভিনয়

বিজন ভট্টাচার্যের নতুন নাটক : গর্ভবতী জননী

বাংলা নাটককে বিদেশী নাটক ও তার
প্রযোজনার রীতি নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে,
কিন্তু তাই বলে এ ধারণাও সত্য নয় যে
সার্থক নাটক রচনার কোন সংঘাতমুখর

মস্কো চিত্র উৎসবে যোগদানের পর অরুন্ধতী দেবী দমদম বিমানঘাঁটিতে পৌঁছলে কে এল কাপুর প্রোডাকসনের কর্মকর্তা মিঃ মালহোত্রা তাঁকে সংবর্ধিত করছেন।

মুহূর্তে বাংলার সমাজজীবনে খুব ব্যাপক আকারে নেই। সত্য বাংলার নবনাট্য আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠছে তা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। আর শুধু শহরজীবনের মুখরতায় নয়, শহর থেকে দূরে গ্রামজীবনের সংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যেও সার্থক নাটকের স্পন্দন অনুভব করা যায়। এই অভিজ্ঞতাকে যিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশের আলোয় দ্যুতিময় করে আসছেন তিনি হোলেন বিজন ভট্টাচার্য, যাঁর 'নবান্ন' বাংলা নাটকের ইতিহাসে এক পরিণত আন্দোলনের পথ চিহ্নিত করেছে। সম্প্রতি 'ক্যালকাটা থিয়েটার' তাঁর নতুন নাটক 'গর্ভবতী জননী' পরিবেশন করে প্রমাণ করেছে যে বাংলার দূরতম অঞ্চলে যেখানে অনুভবের বহু অন্ধকার, সেখানেও জীবনের কল্লোল শোনা যায় এবং তা দিয়ে বলিষ্ঠ নাটক গড়ে উঠতে পারে।

বাদা অঞ্চলের আদিবাসী বেদেদের বিচিত্র সংস্কারে ভরা জীবন নিয়েই 'গর্ভবতী জননী' নাটক প্রকাশের পথ পেয়েছে। এই বেদেরা শেকড়-বাকড় ভেষজ ওষুধ, জড়িবুটি, তাগা-মাদুলি, ঝাড়ফুঁক তন্ত্রমন্ত্র নিয়েই জীবন কাটায়। জীবিকার্জনের আর কোন পথ এদের জানা নেই, তবু এরা এরই মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ খুঁজে নিতে চায়। এদের সহজ সরল জীবনে বহুবার সুযোগ সৃষ্টি করে তারা, যাদের কাছে এরা এই সব ওষুধপত্র সব সাধারণ-ভাবে বিক্রি করে। কিভাবে এরা নিজেদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে তা নাট্যকার দেখিয়েছেন। অত্যাচারে, অবিচারে ক্লান্ত হোলেও এরা মাঝে মাঝে নতুন করে বাঁচবার স্বপ্ন দেখে, রীতিমত বলিষ্ঠ হয়ে উঠে এরা অত্যাচারীদের বেশ কিছুটা আঘাত দিতে চায়। 'সুধন্য' ও 'কম্ব'—এরা হোল সরল জীবনের প্রতীক।

নাটকের মূলে কাহিনী ও গতি দুর্বার হয়ে উঠেছে 'সুধন্য'র স্ত্রীর গর্ভবতী হবার ব্যাপার নিয়ে। শেষ পর্যন্ত 'সুধন্য'র স্ত্রী একটি সন্তান প্রসব করলো, কিন্তু পৃথিবীর আলো তার চোখ মেলে দেখা হোল না। মা ও সন্তান দুজনেরই মৃত্যু হোল। কিন্তু তবু ওঝা ডাকা হোল এবং নানারকম মন্ত্র উচ্চারণ করা হোল। দেখা গেলো মার দুটি আলতা রাঙা পা দর্শকের দিকে ছড়ানো আছে এবং সেখানে গোঁজা রয়েছে কিছু ধানের গুচ্ছি। নাটকের মধ্য দিয়ে যে সত্যকে রূপ দিতে চেষ্টা করা হয়েছে তা হোল মা-ই তো মাটি, আর সেই মাটি আবার গর্ভবতী জননী। জননী চিরকাল সন্তানবতী, এ সত্য তার চিরন্তন।

নাটকে বিক্ষিপ্ত ঘটনা আছে অনেক। প্রতিটি ঘটনা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, কিন্তু সবটা মিলে একটা সংহতি আরো বেশি দানা বেঁধে উঠলে ভালো হত। নাটকের মধ্যে একটি যাত্রার দৃশ্য আছে যার মধ্য দিয়ে বেদেদের জীবনচর্চার আর একটি দিক প্রতিভাত হোতে পেরেছে।

সুসংবদ্ধ অভিনয় 'গর্ভবতী জননী' নাটকের একটি অমূল্য সম্পদ। প্রতি চরিত্রই সুঅভিনীত। বহু শিল্পী সমাবেশেও যে একটি নাটকের প্রযোজনা [illegible] অসাধারণ হোতে পারে তা প্রমাণ করেছে নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য।

'মামা'র ভূমিকায় নাট্যকার শ্রীভট্টাচা[র্য] যে অবিস্মরণীয় নট-নৈপুণ্যের স্বাক্ষ[র] রেখেছেন তার তুলনা সত্যিই বিরল। কা[...] চরিত্র বিজয়া চক্রবর্তীর অভিনয়ে নতুন প্র[...] পেয়েছে। শোভন মজুমদার ও অমিত দে[...] 'মথরো' ও 'সুধন্য' দুটি উল্লেখযোগ্য চা[...] চিত্রণ। আর কয়েকটি ভূমিকায় চরিত্রপযো[...] অভিনয় করেন—সমীর ভট্টাচার্য, শ[...] চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ সেন, ছন্দা চ্যাটা[র্জি] অঞ্জু গুহ, আলপনা গুপ্ত ও না[...] বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চসজ্জায় সূক্ষ্ম শি[ল্প] বোধের পরিচয় রেখেছেন দেবব্রত মু[খো]পাধ্যায়।

●

গত ১৮ই জুলাই গড়পার যুবকব[...] শিল্পীরা বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে তা[...] দ্বিতীয় নিবেদন জনপ্রিয় বহু অভি[...] নাটক 'কেদার রায়' অতি সাফল্যের স[...] অভিনয় করেন। নাটক মিশ্র শিল্প। [...] তাকে দলগত সার্থক প্রচেষ্টার মা[...] প্রাণবন্ত ও উপভোগ্য করে তোলেন শিল্পীগোষ্ঠী। কার্ভালোর ভূমিকায় অ[...] মিত্রের অভিনয় সত্যি অপূর্ব। এ[...] ধীরেন বিশ্বাস (চাঁদরায়), পার্থপ্রতিম [...] (কেদাররায়), ত্রিদিব চ্যাটার্জি (ঈশা[...] প্রবীর দত্ত (শ্রীমন্ত), রঞ্জন বসু [...] সর্দার), মোহন দাস (কিলমেক খাঁ), [...] দত্ত (ওসমান খাঁ)—এঁদের অভিনয় স[...] চরিত্রানুগ ও আকর্ষণীয়। সোনা ও

চতুর্মুখ অভিনীত জলৈকের মৃত্যু নাটকে চিত্রিতা মণ্ডল ও অসীম চক্রবর্তী
ফটো : অম

সুচেতা রায় ও শাশ্বতী মুখার্জির চমৎকার। অন্যান্য চরিত্রে সুজিত রাচাঁদ দাস, পার্থ বসু, প্রণব দত্ত, মুখার্জি, রবীন চক্রবর্তী, সুধীন দীপেশ মিত্র, অমর বসু, মালা া রায়চৌধুরী ও অন্যান্য।
ব ঘোষের সুদক্ষ পরিচালনার জন্যে গতিসম্পন্ন হলেও দু'খানি ব্যাটল টকের গতিকে ব্যাহত করেছে। ীত, মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত য়।

বিদ্যালয় ছাত্র তরুণ নাট্যকার চক্রবর্তী রচিত 'অনাহূত নায়িকা' মঞ্চস্থ করলেন রানার নাট্য সংস্থা, জুন, আড়িয়াদহে। এক কথায় বলা রের এটা এক সার্থক প্রযোজনা। াজ সুন্দর। অভিনয়ে বিশেষভাবে চক্রবর্তী, গৌতম মুখার্জী, কল্যাণ য়, রবীন দে প্রভৃতি যথেষ্ট দক্ষতার দয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন— গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল ঘোষ, সুদ- র্তী, নিমাই দাস, শম্ভু দত্ত, সমীর র্মগ্রক সাফল্যে নাট্যকার পরিচালক চক্রবর্তীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। াটক হলেও 'অনাহূত নায়িকা' া ও নাটকীয়তার এক সুন্দর ও দর্শন।

৩০ জুন নেতাজী সুভাষ ইন্সটি- ও কার্তিক মল্লিকের নবতম নাটক ' কৃতিত্বের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেছিল পুলিস কোর্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের শিল্পীবৃন্দ। এই অনুষ্ঠানে তিথির আসন অলংকৃত করেন ঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীদীপনারায়ণ নাটকটির বিষয়বস্তু কাল্পনিক াজ্য কীর্তিগড়কে ঘিরে। কীর্তি- গরাজার স্বাধীনতা স্পৃহা, মন্ত্রী নের ষড়যন্ত্র, স্বৈরিনী মহারাণী, একদল বিপ্লবীর আবির্ভাবে নাটকীয় ঘটনার রুদ্ধশ্বাস মুহূর্তে আখ্যানভাগ। অভিনয়ের কথা লে মহারাণী সুনন্দা দেবীর ভূমি- নী গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত অভি- শংযোগ্য। এক বিশেষ চরিত্রে সুধীর নীর। মহারাজ ভূপেন্দ্র সিংহের নির্মাল্য ভট্টাচার্য ও মন্ত্রী সফরু- ভূমিকায় বারীন রায়ের অভিনয়ও র্ণনীয় নয়। অন্য যাঁরা অভিনয় স্বাক্ষর রেখেছেন তারা হলেন চক্রবর্তী, আরতি ঘোষ, সন্তোষ রায়, প্রণবেন্দু চাকী, প্রশান্ত সেন, চক্রবর্তী, শচীন চক্রবর্তী, নির্মল ও নিরঞ্জন সেনগুপ্ত। সংলাপের ও ঘটনা প্রবাহের স্বচ্ছন্দগতি াট্যকার-পরিচালকের মুন্সিয়ানা ও দৃষ্টিভঙ্গি নাটকীয় রসসৃষ্টি ও সাফল্যের অন্যতম করেন।

বিবিধ সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় চারশ' চিত্রগৃহের কর্মিবৃন্দের একমাত্র প্রতিনিধি সংস্থা বেঙ্গল মোশান পিকচার এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের প্রখ্যাত সাধারণ সম্পাদক হরিপদ চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগবার পরে গেল ৪ আগস্ট, সোমবার রাত্রি ৯-৩০ নাগাদ পরলোকগমন করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি চিত্রগৃহের সংঘবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-পি প্রমুখ ব্যক্তিদের সহায়তায় এই বি এম পি ই ইউ সংস্থাটি গড়ে তোলেন। ১৯৪১ সালে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হন এবং যখন কম্যুনিস্ট পার্টি ভেঙে দুটি দল হয়, তখন থেকে তিনি সি পি আই (এমের) সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছর। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত স্ত্রী ও পুত্র দুটির প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

গেল ৬ আগস্ট নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী ডি-লিট চুয়াত্তর বছর বয়সে পদার্পণ করেছেন। ঐ দিন বৈকালে তাঁর দীর্ঘ সুস্থ জীবন কামনা করবার জন্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্রছাত্রী এবং শৌভনিক গোষ্ঠীর কৃষ্ণ কুণ্ডু প্রমুখ অভিনেতা নট-সূর্যের সকাশে মিলিত হন এবং শুভেচ্ছা নিবেদন করেন।

পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি জি ডি খোসলার নেতৃত্বে গঠিত ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটির রিপোর্টটি গেল ৬ আগস্ট সংসদে পেশ করা হয়। সেন্সরের ব্যাপারে কমিটি যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের সুপারিশ করেছেন, তা যদি সরকার মেনে নেন, তাহলে চলচ্চিত্রকাররা তাঁদের চিন্তাপ্রকাশের অধিকতর সুযোগ পাবেন বলে বিশ্বাস। আদিরসাত্মক ব্যাপার

সম্পর্কিত দৃশ্যাবলীতে চুম্বন দেখাবার অধিকার যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে হিন্দী ছবিতে বর্তমানে অনুসৃত অযথা দীর্ঘ নাচগান, লম্বঝম্ফ ইত্যাদি বহুল পরিমাণে কমে গিয়ে দৃশ্যগুলি ঢের বাস্তবানুগ হবে বলেও আশা করা যেতে পারে। অবশ্য এগুলি এখনও পর্যন্ত ভবিষ্যতের কথা। সরকার কেমনভাবে খোলসা কমিটির রিপোর্টকে গ্রহণ করেন, তারই ওপর সব নির্ভর করছে।

গত ২০ জুলাই নৃত্য ও গীতের প্রতিষ্ঠান 'নূপুর ও মন্দিরা'র বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট মঞ্চে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। এ উপলক্ষে 'গঙ্গাবতরণ' এবং 'কচ ও দেবযানী' নৃত্যনাট্য দুটোর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। অভিনয় এবং উপস্থাপনার গুণে সকলের কাছেই নাটক দুটো প্রশংসিত হয়। 'গঙ্গাবতরণ'-এ শর্মিলা রায়ের অভিনয় আকর্ষণীয়। একক নৃত্যেও তিনি সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। তাছাড়া নৃত্যে ও বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জনা রায়, কুন্তলা দাস, অম্বরীতি মজুমদার, লোপা শ্রীমানি প্রমুখ।

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে তরুণ সংগীত শিল্পী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। যেসব নতুন উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পী সম্মেলনে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাঁদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। যোগ্যতা উল্লেখ করতে হবে। সম্পাদক : তরুণ সংগীত শিল্পী সম্মেলন, ৯।৪এ, ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪।

সম্প্রতি রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অশীতিবর্ষীয় প্রখ্যাত যাত্রাশিল্পী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'অর্ধশতকের অভিনয়' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রেক্ষাগৃহে। অনুষ্ঠানে

বিগত যুগের খ্যাতনামা যা[...] শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সভানেত্রী উপাচার্য ডক্টর রমা চৌধ[...] ছাড়াও অধ্যাপক ডঃ সাধন ভট্টাচ[...] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট স[...] সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ গে[...] ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রভারতীর বহু অধ্যাপক ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। কোনও বি[...]বিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার সম্মান এক যাত্রাশিল্পী এই প্রথম লাভ করলেন।

গত ৩ আগস্ট, 'অভিযাত্রী পাঠাগা[...] বার্ষিক উৎসব 'সরলা রায় মেমোরিয়াল' অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ডঃ আশু[...] ভট্টাচার্য মহাশয় ও সভাপতি শ্রীবলা[...] পাল মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সভা পরিচা[...] হয়। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের পরে শ্রীস[...] সরকারের পরিচালনায় 'ফাঁস' (শ্রীশৈ[...] গুহ নিয়োগী) নাটক পাঠাগারের সদ[...] কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

ডেপুটির ভূমিকায় পরিচালক স্বয়ং তাঁর স্ত্রী তরলার ভূমিকায় শ্রীমতী [...] চক্রবর্তী দর্শকদের মন জয় করেন। অ[...] কুমার সাহা, রমানাথ রায় (কাপল[...] তাদের চটকদারী হাসির অভিনয়ে দর্শ[...] প্রচুর আনন্দ দান করে।

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা [...] নাট্য সংসদের সপ্তম বার্ষিক [...] উপলক্ষে আসছে ১৫ আগস্ট নবব[...] নাটমন্দিরে শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য [...] 'বাঁশের কেল্লা' নাটকটি যাত্রাভিনয় কর[...] অংশ গ্রহণ করবেন সংসদের কুশলী শি[...] নির্দেশনায় আছেন শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ[...]

গত ৩ আগস্ট গোপাল জীউ পরিচালিত পঞ্চমবার্ষিক রবীন্দ্র সম্মে[...] বার্ষিক উৎসব দৌলতরাম [...] বিদ্যালয় মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। অন[...] বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ অংশ নেন। মুকা[...]

ভ মজ্মদারের অভিনয় আকর্ষণীয়। শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মায়া সেন, শ্রীপিন্টু ভট্টাচার্য ও জৈন সমবেত যন্ত্রসংগীতে ছবি অর্কেস্ট্রা এই অনুষ্ঠানটিকে একটি মর্যাদা এনে দেয়।

ষদের ঊনবিংশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও ন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আবৃত্তি ত্র'—সুকুমার রায়), রবীন্দ্রসংগীত লি কাব্য ও ব্রহ্মসংগীত), অতুল- গান, খেয়াল, ধ্রুপদ, আগমনী গান, রবীন্দ্রসংগীত অবলম্বনে), চিত্রাঙ্কন গে আমার প্রিয় দৃশ্য এবং গে গান্ধীজীর প্রতিকৃতি, ও প্রবন্ধ চোখে গান্ধীজী বিষয়ে প্রতি র আয়োজন করা হয়েছে। সতের স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা প্রতিযোগি- গদান করতে পারবে।

প্রতি বাগবাজার তরুণ পাঠাগার নেতা শ্রীকাশীনাথকে সম্বর্ধনা জানিয়ে হাতে 'মানপত্র' প্রদান করেন। ন প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅখিল ী। শিল্পী কিছুদিন আগে কলকাতায় লকাতার বাইরে কয়েকটি আকর্ষণীয় য় অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

য়ন আসর আসছে চব্বিশে আগস্ট কা নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করছেন। নায় আছেন সন্তোষ সেনগুপ্ত। ীতে আছেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র, কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোরা কারী।

ীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা সর নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করতে ত সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়কে দেখা যায় ই বেলেঘাটার নবীন নাট্যসম্প্রদায় কটি অভিনয় করে সাহসের পরিচয় ন। গত ২৭ জুলাই সন্ধ্যায় বিশিষ্ট রাগীদের উপস্থিতিতে 'শেষের মঞ্চস্থ হয়।

লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা র সর্বভারতীয় সাংবাদিকতা সম্মেলন ১ ও ১২ জুলাই আশুতোষ হলে ত হয়। এ উপলক্ষে ঐ দু'দিন সন্ধ্যায় নোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়ো- ন হয়েছিল। আবৃত্তিতে প্রদীপ ঘোষ, দ সেনগুপ্ত ও তরুণ ঘোষ সুখ্যাতি করেন। পূর্ণদাস বাউল, অর্ঘ্য সেন, গুপ্ত, দীপক মজুমদার, চন্দনা াধ্যায় ও হিমাদ্রী ভট্টাচার্য ও ভট্টাচার্য সংগীতে অংশগ্রহণ করেন। ভ মজুমদারের মূকাভিনয় দর্শকদের করে। শেষ দিনের অনুষ্ঠানের অন্য- বশেষ আকর্ষণ ছিল সাংবাদিকতার র্তৃক অভিনীত অজিতেশ বন্দ্যো- য়র 'নানা রং-এর দিন'। তরুণ পরিচালনায় দুটি চরিত্রের এই টি দর্শক কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হয়। এ দুই চরিত্রে দীপক মজুমদার নাথ) ও পরিচালক স্বয়ং (রজনী জ) সুঅভিনয় করেন।

গীতালি সঙ্গীত শিক্ষায়তন আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগে যাঁরা প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তাঁরা হলেন —শীলা রায়চৌধুরী, কল্যাণী মিত্র (ধ্রুপদ), শীলা রায়চৌধুরী (ধামার), মঞ্জুশ্রী চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা গাঙ্গুলী, চিত্রিতা গাঙ্গুলী (খেয়াল) প্রীতি গুহ, মহাশ্বেতা গাঙ্গুলী (রাগপ্রধান), শিখা ব্যানার্জি, মহাশ্বেতা গাঙ্গুলী, কল্যাণী মিত্র (ভজন), অধীরচন্দ্র দাস, শিখা ব্যানার্জি, মঞ্জুলা গুহ, বন্দনা ব্যানার্জি (আধুনিক), ওয়াহিদুর রহমন শিখা সরকার, মঞ্জুলা গুহ (লোকসঙ্গীত), মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শ্যামলী মিত্র, কল্যাণী দাশগুপ্তা, লোপামুদ্রা শ্রীমানী (রবীন্দ্রসংগীত), শাস্ত্রীয়—শিবনাথ সাহা, ইলা গোস্বামী, শান্তা ঘোষ (গীটার), সুতপা বসু, মধুমিতা রায় (কত্থক), সুতপা বসু (ভারতনাট্যম) রবীন্দ্রনৃত্যে — মঞ্জুলা সান্যাল, শ্রাবণী আচার্য, লোকনৃত্যে—সুপতা বসু, শর্মিলা দাশগুপ্তা ও সেতারে— বিমল দাস।

বি বি সি (লন্ডন)-র অধুনালুপ্ত জনপ্রিয় বাংলা অনুষ্ঠান 'বিচিত্রা'র অনুরাগী শ্রোতা এবং শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা কলকাতায় এক প্রতিবাদ সম্মেলনে একত্রিত হচ্ছেন। 'বিচিত্রা'র শ্রোতাদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করবার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছেন শ্রীসুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সেক্রেটারী, 'বিচিত্রা' লিশনার্স ক্লাব, ৬।এ, যতীন দাস রোড, কলিকাতা-২৯।

সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার এক ঘরোয়া আসরে গোরা সর্বাধিকারীর রবীন্দ্রসংগীত শুনলাম। এর আগে রবীন্দ্র-সদনের কয়েকটি অনুষ্ঠানে এঁর গান শুনেছি। ধ্রুপদী-রীতির উচ্চাঙ্গ-রবীন্দ্রসংগীত থেকে সুরু করে ভক্তিগীতি এবং ভাবপ্রধান গানও ইনি সমান দক্ষতায় পরিবেশন-ক্ষমতার অধিকারী। ২২ শ্রাবণ উপলক্ষ্যে এঁর দুটি গানের রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানী ডিস্ক করেছেন বলে জানা গেল।

স্পেনসার ট্রেসি

একক কিন্তু অনন্য। এক কিন্তু অভিন্ন। শুধুমাত্র রোমান্টিক নায়ক হিসেবে নয়, সবরকমের চরিত্রে তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় আমরা পেয়েছি। কখনো দেখেছি তাঁকে সমাজনেতা, কখনো যোদ্ধা, কখনো দলের সর্দার, কখনো বা পিতারূপে। একই মানুষের মধ্যে কত চরিত্রের সমাবেশ। যেন একই জমিতে নানা জাতের ফসল। নানান প্রাচুর্য। এই মাটি আর মানুষের কথা যিনি বলতে পারেন তিনিই প্রকৃত শিল্পী। এবং শিল্পী বলেই একই জীবনে বহু জীবনের হাসি-কান্নার ফুল ফোটাতে পারেন।

যেমন পেরেছিলেন স্পেনসার ট্রেসি। এই অসামান্য অভিনেতা স্পেনসার ট্রেসির জীবন কিন্তু অভিনয়ের মাধ্যমে শুরু হয়নি। স্কুল-জীবনের পাঠ শেষ করে তিনি ডাক্তারী পড়তে শুরু করেছিলেন। কিন্তু অভিভাবকের এ ইচ্ছে বেশিদিন ধোপে টিঁকল না। স্পেনসার ট্রেসিরও এ শখ অল্পদিনের মধ্যেই মিটে গেল। ডাক্তারী ছেড়ে অভিনয়-শিক্ষার কলেজে ভর্তি হলেন। এবং দেখতে দেখতে অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। প্রথম মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে স্পেনসার ট্রেসি যে নাটকটিতে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন তা হল 'দি লাস্ট মাইল'। এ নাটকটি ব্রডওয়ে থিয়েটারে অনেকদিন চলেছিল। মঞ্চের এই সফলতার পরেই চলচ্চিত্রে তাঁর যোগাযোগ ঘটল। চলচ্চিত্রাভিনয় হল। ১৯৩০ সালে 'আপ দি রিভার' ছবিতে তিনি অভিনয় করলেন। একই বছরে রোল্যাণ্ড ব্রাউন পরিচালিত টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স-এর 'কুইক মিলিয়নস' ছবিতে এক ডাকাত দলের সর্দারের ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্রথম জনপ্রিয় হলেন। এবং এই জনপ্রিয়তার ফলে তিনি একটার পর একটা ছবিতে কাজ করে যেতে লাগলেন। ১৯৩৩ সালে মাইকেল কার্টিজের 'টোয়েনটি থাউজেন্ড ইয়ার্স' ইন সিঙ্গ সিঙ্গ' ছবিতে স্পেনসার ট্রেসির অভিনয় দেখে দর্শকরা অভিভূত হয়ে পড়লেন। এ ছবির নায়িকা বেটি ডেভিসের বিপরীতে অপরাধীর বিশেষ চরিত্রটি ট্রেসি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা প্রশংসা না করে পারা যায় না। এমন দুর্ধর্ষ অভিনয় এর আগে এমন চরিত্রে কাউকে দেখা যায়নি। তাই স্পেনসার ট্রেসি গ্যাংস্টারের চরিত্রে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তারপর একে একে 'দি ম্যাড গেম', 'ফেস ইন দি স্কোয়ার', 'সাংহাই ম্যাডাম' প্রভৃতি ছবিতে ট্রেসি খুবই দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করলেন।

গ্যাংস্টার বলতে শুধু কঠোর এবং নির্দয় মানুষই বুঝব তা নয়, তারও যে সৎ উপলব্ধি ও দয়ালু মনের পরিচয় থাকতে পারে সে-মহত্ত্বের স্বাদ 'ম্যানস ক্যাসল' ছবিতে প্রথম আনলেন স্পেনসার ট্রেসি। ১৯৩৪ সালে এটি মুক্তি পায়। লোরেটা ইয়ং এ ছবিতে জনপ্রিয় হন। এরপর ট্রেসি তাঁর অভিনয়ে নতুনত্ব আনবার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সংগীতপ্রধান 'বটমস আপ' ছবিতে অভিনয় করলেন। দর্শকদের ভাল লাগলেও চিত্র-সমালোচকেরা কিন্তু ট্রেসির এ ছবি দেখে খুশি হলেন না। তাঁদের কাছে ট্রেসির অভিনয় গতানুগতিক মনে হল। যাইহোক স্পেনসার ট্রেসি সমালোচকদের এই মন্তব্যের জন্য দমে যাননি। বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ১৯৩৫ সালে তিনি মেট্রোগোল্ডেন মেয়ারের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই চিত্রপ্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তিনি টিম হুইলানসের পরিচালনায় 'মার্ডার ম্যান' ছবিতে ক্রাইম-রিপোর্টারের ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতিলাভ করলেন।

স্পেনসার ট্রেসির জীবনে ১৯৩৭ সাল একটি স্মরণীয় বছর বলতে পারেন। ভিক্টর ফ্লেমিং পরিচালিত 'ক্যাপটেনস ক্যারেজাস' ছবিতে অভিনয় করে ট্রেসি 'শ্রেষ্ঠ অভিনেতা'র সম্মান আন্তর্জাতিক অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। এ ছবির পর 'দি অ্যাকট্রেস' এবং 'দি ওল্ডম্যান এণ্ড দি সি' ছবি দুটিতেও স্পেনসার ট্রেসি অসাধারণ অভিনয়ের একক প্রতিভা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। স্পেনসারের সে-অভিনয় কিছুতেই ভোলা যায় না। ঠিক এমনি অভিনয় দেখেছি ফ্রাঙ্ক বোরজেজের 'বিগ-সিটি' এবং 'ম্যানেকিন' ছবি দুটিতে। এরপর ১৯৩৮ সালে ক্লার্কগেবল অভিনীত প্রথম ছবি 'টেস্ট পাইলট'-এ ট্রেসিকে আমরা সমানভাবে অভিনয় করতে দেখেছি।

অভিনয় জীবনে স্পেনসার ট্রেসি এমন সব চরিত্রে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যে উন্নীত হতে পেরেছিলেন যা অনেক অভিনেতার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ক্যারেকটার-অ্যাকটর অর্থাৎ চরিত্র-শিল্পীরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন। যে কোন চরিত্রে, যে কোন পরিবেশে তিনি অনবদ্য অভিনয় পারতেন। তিরিশ থেকে ষাট সাল সুদীর্ঘ তিন দশক পর্যন্ত স্পেনসার বহু ছবিতে একাধিক চরিত্রে নিখুঁত অ করেছেন। অভিনয়ের এই বিচিত্র পরিক্রমায় তিনি ছিলেন একচ্ছত্র সম্রাট। পৃথিবীর প্রত্যেক দর্শকের মন জয় পেরেছিলেন।

শুধু জীবন দর্শনের নিজস্ব স্ব নয়, রস-সৃষ্টির মহিমায় স্পেনসার ছিলেন অনন্য। ১৯৩৯ সালে হেনরী পরিচালনায় 'স্ট্যানলি এণ্ড লিভ ছবিতে স্ট্যানলির ভূমিকায় চারশো বেশি একটানা সংলাপ দুশো অভিন ট্রেসি চলচ্চিত্র-ইতিহাসে একটি রেকর্ড করেছেন। এই স্মরণীয় সংলাপ মাত্র তিনটি অংশে গ্রহণ করা হ 'লাইফ অফ এমিল জোলা' ছবির প বড় দীর্ঘ সংলাপ এই ছবিতেই প্রথম গেল। এ ছবির অভিনয় দেখে অ ধারণা হয়েছিল স্পেনসার ট্রেসি 'অস্কার' পুরস্কারে ধন্য হবেন। কি পর্যন্ত দর্শকদের এ ইচ্ছা পূরণ এই সময় অর্থাৎ ১৯৪০ সালে 'অ দিস ওম্যান' ছবিতে অভিনয় করার প সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি চরিত্রে দি ম্যান' ছবিতে অভিনয় করলেন। এই অবিস্মরণীয় বৈজ্ঞানিকের ব চরিত্রটিকে তিনি যেভাবে ফুটিয়ে তু তা দেখে মনে হয়েছিল স্বয়ং এডিস নিজেই নিজের চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনয় করার ক্ষমতা ছিল স্পেনসার

আজ দু বছর হল অর্থাৎ ১৯ স্পেনসার ট্রেসিকে মৃত্যু এসে আমাদে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। তাই অ ছবিতে তিনি অনুপস্থিত। কিন্ত শারীরিক উপস্থিতি চিরদিনের জন্য গেলেও স্পেনসার ট্রেসির নাম কো চলচ্চিত্রের অভিনয়-জগৎ থেকে হারিয়ে না। তাঁর সৃষ্টির মধ্যেই তিনি যু ধরে বেঁচে থাকবেন। তাঁর ক্ষয় নেই নেই।

বাধীনতা যুগের

জীবনের অত্যন্ত কাছের এবং র মাধ্যম হচ্ছে যাত্রা।

হাস বলে, সেই পৌরাণিক কাল -রাজা, মহারাজা আর ধনীর অঙ্গনে াট্যাভিনয়। সেসব উপভোগ করতেন ার তাদের পাত্র-মিত্র, পরিজন এবং বরা সাধারণের সেখানে ছিল না ধকার। দূরে থেকে দেখত, শুনত মানুষ। ওখানে ওদের প্রবেশ র নেই। এক না পাওয়া, না দেখা র অভাবে তাদের অন্তরটা উঠত য় কেঁপে। নিজেদের সামর্থ্যের মধ্যে, রই জন্য অনুরূপ নাট্যাভিনয়ের নের জন্য কাজ করতে থাকে তাদের রা। এবং সবশেষে ওই চিন্তাধারা, াবেগই সৃষ্টি করে নাট্যাভিনয়ের রূপ 'যাত্রাভিনয়।'

কালের জীবন এবং মানসিকতার পূরণ করতে গিয়ে যাত্রা এগিয়ে র্মীয় আর পৌরাণিক কাহিনী আশ্রয় এইভাবে একই ধরনের কাহিনীকে করে যাত্রা নাটক রচিত হতে থাকায়, একসময় আসে বৈচিত্র্যের অভাব। র আনন্দের উৎসে পড়ে ভাঁটা। অষ্টাদশ শতাব্দী। ওই সময় কবি- খ্যামটা, খেউড়ের প্রভাবও পড়তে যাত্রার ওপরে। যাত্রার রুচি হয় মী। সাধারণ ভদ্রজনও তখন এর এড়িয়ে যেতে চাইতেন। ফলে যাত্রা খন এক বদ্ধজলাশয়ে আবদ্ধ থেকে নের' আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে।

ত্রার এই বন্ধনমুক্তির জন্য কৃষ্ণকমল ী থেকে শুরু করে আরো অনেকেই করলেও, সফল হলেন মতিলাল রায় ৯—১৩১৫ সাল)। তিনি শুধু স্বমহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত করেন না, র্তত রাজনৈতিক পটভূমিকায় নিজে- রাধীন অবস্থার কথা স্মরণ করে, যাত্রা পালাগুলিতে প্রচ্ছন্নভাবে শকতার বাণী প্রচার করতে থাকেন। ণক্ষা তথা প্রচারের মাধ্যমটিকে সঠিক- কাজে লাগানোর এই প্রচেষ্টা দেখে বস্ময়ে অবাক হতে হয়।

তিলাল রায়ের দলে তাঁরই লেখা পালা অভিনীত হতো, তার ই রচিত হয়েছিল পৌরাণিক ধর্মীয় ীকে কেন্দ্র করে। আর এরই মধ্যে আশ্চর্য কৌশলে স্বদেশ প্রেরণার সন্নিবেশ করে গেছেন। সমকালীন তিক আন্দোলন আর ইংরেজের দমন-নীতি তাঁকে চঞ্চল করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঠিক পথের কথা চিন্তা করতে গিয়ে, তাঁর এই দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল যে, ভারতবাসীর ঐক্যহীনতাই তার পরাধীনতার অন্যতম কারণ। এবং ঐক্যের পথেই আবার আসবে স্বাধীনতা। তাই ওই ঐক্যের বাণী সোচ্চার হয়েছে তাঁর 'গয়াসুরের হরিপদ্মলাভ' পালায়। ওই পালায় তিনি শনির মুখ দিয়ে বলেছেন, 'দুঃখের কথা বলবো কি, আমাদের ঘরে ঐক্য নাই। একতা থাকলে কি কখন কোন কষ্ট পেতে হ'তো?......যারা চিরকাল অধীন তাদের মত হতভাগা আর নেই।' আবার আরেক জায়গায় বলেছেন, 'আমাদের কোন সাধ্য নাই, অথচ স্বাধীন হব বলে চেঁচিয়ে মরি—ঐক্য হও, বিপক্ষ যাতে দুর্বল হয়, তা কর। যেমন নিদ্রাকালে নাক ডাকে কোন উপকারই নাই, বরং নিকটস্থ ব্যক্তিগণকে বিরক্ত করে, তস্করগণকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, আমি খুব ঘুমুচ্ছি, তেমনি তোমাদের চেঁচামেচিতে কোন ফল নাই, কেবল বিপক্ষ-গণের আরও ক্রোধ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। হচ্ছেও তাই: বিপক্ষ পক্ষ ক্রমে ক্রোধমত্ত হয়ে আমাদের অনিষ্টই করছে, আমাদের ঘরে ঘরে ঐক্যও হবে না, পরাধীনতার শৃঙ্খলও আর মুক্ত হবে না।' অবশ্য মতিলালের দেশ ও জাতির কল্যাণ চিন্তা আবর্তিত হয়েছে একটি বিন্দুকেই কেন্দ্র করে—সেটি হচ্ছে ঈশ্বর ভক্তি। আস্তিক্য-বোধই আমাদের স্বাধীনতা দেবে, এটাই তিনি প্রচার করেছেন তাঁর বিভিন্ন পালার মধ্য দিয়ে।

মতিলালের পর তাঁর পুত্র ধর্মদাস রায়ও তাঁর বিভিন্ন পালার মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করে গেছেন। 'মথুরা বর্জন' পালায় নারদ বলেছে 'ভাইয়ে ভাইয়ে যারা একপ্রাণ হতে পারে, তারাই মাতার দুর্গতি দূর করতে সমর্থ।' শুধু তাই নয়, ধর্মদাস হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজনের কথাও মন-প্রাণ দিয়ে বুঝেছিলেন। তাই সব সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে ওই একই পালায় নারদকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'তুমি আমাকে স্পর্শ করলে অপবিত্র হবে কেন? তুমি যবন আর আমি হিন্দু বলে? বলি, হিন্দু আর যবনে পার্থক্য কি? হিন্দুগণ যে জল পান করেন, যবনেও সেই জলপান করেন, হিন্দুগণও যে অন্ন ভোজন করেন, যবনেও সেই অন্ন ভোজন করেন, তোমরাও যাঁকে ঈশ্বর বল, আমরাও তাঁকে ঈশ্বর বলি; তবে ভাষাগত প্রভেদ, তোমরা আল্লা বল, খোদা বল, রহিম বল, আর আমরা দুর্গা বলি, হরি বলি, বিধাতা বলি।' কি সুন্দর বিশ্লেষণ ভাবলেও অবাক হতে হয়।

এরপর মতিলাল রায়ের আরেক পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণও তাঁর বিভিন্ন পালায় স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করেন। তবে তুলনায় ভূপেন্দ্রনারায়ণের বক্তব্য ছিল আরও সোচ্চার। স্বদেশের পরাধীনতা মুক্তি এবং তার প্রধান উপায় জন-জাগরণই ছিল ভূপেন্দ্রনারায়ণের প্রধান লক্ষ্য। অনেক সময়ই তিনি প্রচ্ছন্নতার আড়াল সরিয়ে, সরাসরি স্বদেশ প্রেমের কথা প্রচার করেছেন। 'মণিপুর গৌরবে' অঙ্গদকে দিয়ে বলিয়েছেন, ভাই! স্বদেশ সকলের পক্ষেই সোনার। যে যে দেশে জন্মেছে তার পক্ষে সেই দেশের জল বায়ুর তুল্য সুন্দর যেন আর কোথাও নাই।' আবার বভ্রুবাহনকে দিয়ে আরেক জায়গায় বলিয়েছেন, 'এমনই স্বদেশের আনন্দময় আকর্ষণ। এতেই শাস্ত্রে বলে যে দেশের কুকুরও ভাল, তথাপি বিদেশের ঠাকুরও ভাল নয়। স্বদেশ প্রেমিকই বিশেষ বরণীয় হয়। যে দেশের দুঃখকে নিজের দুঃখ জ্ঞান করে, দেশের উন্নতিতে আপন উন্নতি উপলব্ধি করে, সেই প্রকৃত স্বদেশভক্ত সেই ত্যাগী, সেই কর্মবীর।' আবার যাঁরা বিদেশী ভাবধারায় পরিচালিত হয়ে স্বদেশবাসীকে হেয় মনে করতেন তাঁদের দিকে তাঁর শ্লেষাত্মক উক্তি 'রাজর্ষি মনোজবের মহামুক্তি' পালায় মনোজবের সংলাপে, 'দাঁড় কাকের ময়ূর পুচ্ছ ধারন যেমন হাস্যাস্পদ, তেমনি আপনার ছেলে পরের ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়াও লজ্জা-জনক। দেশের মঙ্গল কামনা করতে হলে আপনাদের সকলকেই প্রাণপণ যত্ন করতে হবে।' আবার নারী জাতির প্রতিও আহ্বান জানিয়ে তিনি ওই পালায় মনোজবকে দিয়েই বলিয়েছেন, 'মা ভাল হলে পুত্রও

ভাল হয়। যে দেশের মাতৃমণ্ডলী উন্নতা, সে দেশও উন্নত। অরুন্ধতী, সীতা, কুন্তী, দ্রৌপদী, ভদ্রা এই ভারতে জন্মলাভ করে-ছিলেন বলেই ভারতের এত উন্নতি হয়েছিল।... যেদিন আবার এই দেশে তোমার মত সব মাতা জন্মগ্রহণ করবেন, সেইদিন আবার ভারতের গৌরব রবি দ্বিগুণ উজ্জ্বল হয়ে উদিত হবেন।' আবার 'রোষণ ঘর্ষণ বধ' পালায় দেশবাসীকে নির্ভয়ের সাধনা করতে বলে বলেছেন, 'ভয় ছাড়, নির্ভয়ে ভগবানকে ডাক, দাসত্ব দূরে নিক্ষেপ কর।......যতক্ষণ হৃদয়ের দুর্বলতা, ততক্ষণই দুঃখ।' (নারদ) ওই পালায়ই আরেক জায়গায় দ্রোণবসুর মুখে বলেছেন, 'গৃহে গৃহে তোমার মত আর্যনারী হতাশ্বাস আর্যসন্তানের হাত ধরে তুলুক। নব শক্তির নব উদ্বোধনে ভারতের সন্তান নতুন করে সাধনায় রত হউক। ভারত মাতার নয়নাশ্রু প্লাবিত বিবর্ণ গণ্ড যুগল আনন্দের রক্তিম রাগে রঞ্জিত করুক, আনন্দময়কে বৈকুণ্ঠের সিংহাসন হতে নামিয়ে আনুক। মাতৃশক্তি না জাগলে শাশ্বত হিন্দু জাগবে কেন?'

শুধু তাই নয়, মহাত্মা গান্ধীর প্রেম ও অহিংসার মন্ত্রও ভূপেন্দ্রনারায়ণকে প্রভাবিত করেছিল। তাই বোধহয় তিনি 'রাজর্ষি মনোজবের মহামুক্তি' পালায় চন্দ্রকান্তর মুখ দিয়ে এক জায়গায় বলিয়েছেন, 'পরান পাইতে চাও,—তবে দাও আগে প্রাণ,—প্রেমেই গঠিত বিশ্ব, প্রেমেই অধিষ্ঠান। জীবকে বশীভূত করতে হলে শাসনে হয় না—প্রেমেই তা সম্ভব। অহিংসাই মানবকে দেবত্ব দান করে, সমাজের ভক্তি আনিয়ে দেয়,—দেশের পূজনীয় করে।'

মতিলাল রায়, ধর্মদাস, ভূপেন্দ্রনারায়ণ যাত্রা পালার মধ্য দিয়ে স্বদেশ প্রেম প্রচারের যে ধারা অনুসরণ করেন, তাকে অনুসরণ করতে এগিয়ে আসে আর যাত্রাকাররা। তারই ফলে আমরা দেখি ১৯০৭ সালে ভূষণ দাসের দলে অভিনীত হলো কুঞ্জ গাঙ্গুলীর পালা 'মাতৃপূজা'। পালাটিতে দৈত্যদের স্বর্গবিজয়, পরাজিত দেবতাদের অবস্থা ও স্বর্গোদ্ধারের কাহিনী বলা হয়েছে। এতেই রূপকচ্ছলে সে সময়ের ভারতের চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। নাটকের গানগুলির ক্ষেত্রে এই ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট। যেম 'ঘুম ঘোরে কেন ভাই অচেতন?/কি জাগরণ, শক্তি আবাহন/হবে না হবে : পাপদানবদল দলন। 'যা' আর কর্তা অধীন জীবনে এ দুঃখ যাতনা সহিব রে দৈত্যের আদেশ মাথায় ধরিয়ে কর্তাদ আর বহিব রে।' কিংবা 'আর আমরা পরে মাকে মা বলিয়ে ডাকব না/জয় জনন জন্মভূমি, তোমার চরণ ছাড়ব না পালাটিতে কংগ্রেস প্রদর্শনীতে ২১ ব আসরস্থ হয়। পরে পালাটির অন্তর্নিহি ভাবধারায় জনগণের হৃদয়ে যে চাঞ্চল্য দে দেয় তা বুঝতে পেরে বৃটিশ সরকার এ অভিনয় বন্ধ করে দেন।

ওই সময়েই যাত্রাকে অপেরা রূপান্তরিত করে মথুর সাহা দল চালা থাকেন। তাঁর দলে হরিপদ চট্টোপাধ রচিত 'রণজিতের জীবন যজ্ঞ' পালা আসরস্থ হয়। এটিতে বর্ণিত হয় পাঞ্জ কেশরী রণজিত সিংহের জীবন কাহিন এ পালাটিও জনজীবনে বেশ উদ্দীপন সৃষ্টি করে।

প্রায় ওই সময়ই ১৯২৩-২৪ সা শশীভূষণ অধিকারীর দলে বহু আড়ম্ব অর্থ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে 'প্রতাপাদিত্য' পাল খোলার আয়োজন করা হয়। পালা লেখক ছিলেন অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ কিন্তু এ পালাটিও ইংরাজের রুদ্ররো আসরস্থ হতে পারেনি। ফলে দলটি লোকসানও দিতে হয় প্রচুর।

এছাড়া ও সময়ের অন্যান্য উল্লেখযো জাতীয় চেতনা উদ্দীপক পালার তালিব পড়ে ভোলানাথ কাব্যশাস্ত্রীর 'জরাসং গণেশ অপেরার এ পালাটিতে রূপকের ছ জরাসন্ধ কর্তৃক ধৃত রাজাদের অন করার ইঙ্গিত দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর অস যোগ ও অনশনের প্রচার করা হয়। ফণ ভূষণ বিদ্যাবিনোদও ভাণ্ডারী অপেরার জ অনশনক্লিষ্ট মানুষ অত্যাচারের শেষ প্রা পৌঁছে শাসক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রো করবে, এই ইঙ্গিত দিয়ে 'মুক্তি' নাম পালাটি লেখেন। এ পালাটিও রাজরো পরে অভিনয় বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়।

পেশাদারী যাত্রাদলগুলি যখন এইভা যাত্রার মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার প্রচ করছেন সে সময় স্বদেশী যাত্রাকার মুকুন্দ দাস তাঁর দল নিয়ে গ্রামের পর গ্রা যাত্রাভিনয়ের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রেমের অগ্নি বন্যা বইয়ে দেন। ইংরাজ সরকার তাঁ কারারুদ্ধ করেন, কিন্তু মুক্তিলাভের প আবার তিনি যাত্রাগানের মধ্য দিয়ে আবা স্বাদেশিকতা প্রচার করতে থাকেন। ত পালাগুলির মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এ প্রেরণাও জোগায় 'মাতৃপূজা', 'পথ', 'সাথী 'পল্লীসেবা', 'সমাজ', 'ব্রহ্মচারিণী', 'কর্ম ক্ষেত্র' প্রভৃতি পালা। মুকুন্দদাসের পিতৃদ নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর দে। তাঁর জন্ম হ ১২৮৫ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে বানারি গ্রামে। ১৩৪১ সালের ৪ জ্যৈ তাঁর মৃত্যু হয়।

—নন্দলাল ভট্টাচা

অজয় বসু

উইম্বলেডনে আর এক দিন

একচল্লিশ বছরের প্রবীণ পাঞ্চো [illegible]লেস বনাম পঁচিশ বছরের জোয়ান [illegible] প্যাসারেলের চুলোচুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবারের উইম্বলেডন টেনিসে একটি নজীর সৃষ্টি হয়েছে।

দু'দিনে বিস্তৃত পাঁচ ঘন্টা তেরো মিনিট [illegible]বী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গুনে গুনে [illegible]টি গেম খেলা হয়েছে, যা উইম্বলেডনে কোনদিন হয় নি। ১৯৫৩ সালে [illegible]শলাভ ড্রবনি ও বাজ পেট্টি তিরা[illegible]টি গেম ভাগ-বাঁটোয়ারা করে যে রেকর্ড [illegible]ছিলেন গনজালেস-প্যাসারেল, গুনে[illegible] মিলে সে রেকর্ডটি গুঁড়িয়ে দিয়ে[illegible] পাঞ্চো গনজালেস বা চার্লি প্যাসারেল [illegible]এবার উইম্বলেডন জয় করতে পারেন [illegible] প্যাসারেল হারেন ওই খেলাতেই [illegible]লেসের হাতে। আর পাঞ্চো পরের [illegible]ডে নিগ্রো তরুণ আর্থার অ্যাসের [illegible]। তবু হেরে গিয়েও তাঁরা নিজেদের [illegible] উইম্বলেডনের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় [illegible] দিতে পেরেছেন।

সব খেলার মতো টেনিসেও হার-জিত [illegible]। থাকবেও। জয়-পরাজয় তো নিত্য-[illegible]ই ঘটনা এবং স্বাভাবিক। স্বাভাবিক [illegible]ই হার-জিতের সব বৃত্তান্ত কেউই মনে [illegible] না। কিন্তু যে হার ও জিত সাধারণ [illegible]র ঊর্ধ্বে উঠে অসাধারণ আখ্যায় [illegible]হত হয়, সেই দৃষ্টান্তের আঁচড় কিন্তু [illegible]মনেই চিরস্থায়ী দাগ রেখে যায়। [illegible] নেই, গনজালেস বনাম প্যাসারেলের [illegible]রের খেলার বিবরণ এমনিই এক [illegible]ধারণ কাহিনী।

উইম্বলেডন টেনিসের দীর্ঘ ইতিহাসের [illegible] ওলটালে এমন অসাধারণ ঘটনার [illegible] কিছু কিছু নজীর নজরে পড়বে। [illegible]টির কথা আজ স্মরণ করছি, যাতে অংশ [illegible]ছিলেন ওই গনজালেসের মতোই টেনিস [illegible]র আর এক কিংবদন্তী—উইলিয়াম [illegible]ডেন।

একালের গনজালেস ও সেকালে টিল-[illegible]। দুজনেই আন্তর্জাতিক টেনিসের মহানায়ক। সর্বকালের নিরিখে, তাঁরা নিঃসন্দেহে সর্বোত্তমের স্বীকৃতি পাবার দাবীদার। ওঁদের ক্রীড়াগত উৎকর্ষ, ওঁদের মেজাজ ও ব্যক্তিত্ব এবং সমকালীন ও উত্তর-পর্বের টেনিসে ওঁদের সংশয়াতীত প্রভাব, সবই স্মরণীয়।

এবারের উইম্বলেডনে প্যাসারেলকে হারিয়ে নতুন নজীর সৃষ্টির ফাঁকে গনজালেস জিতেছিলেন। কিন্তু আমি যে খেলাটির কথা নতুন করে মনে করতে চাইছি, তাতে কিন্তু টিলডেন জিততে পারেন নি। গনজালেস হারতে হারতে জিতেছেন এবার। আর

হেনরী কোশে

টিলডেন সেবার জিততে জিততেই হেরে গেলেন তাঁর অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হেনরি কোশের হাতে।

আজ থেকে বিয়াল্লিশ বছর আগেকার সেই কাহিনী। ঘটনাস্থল উইম্বলেডনেরই কেন্দ্রীয় কোর্ট। ১৯২৭ সালের এক অপরাহ্নে ওখানে সিঙ্গলস সেমিফাইনালে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন টিলডেন ও কোশে।

দীর্ঘকায় টিলডেনের চোখে-মুখে সেদিন দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। বয়স চৌত্রিশ হলো, তবু আকৃতি তাঁর রীতিমতো আঁটোসাঁটো। চৌত্রিশে পা দিয়ে টিলডেন ফুরিয়ে যেতে বসেছেন, একথা তখন অনেকেই বলাবলি করছেন। তাঁদের অনুমান যে ভুল তাই বোঝাতেই যেন টিলডেন কোর্টের মাঝখানে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী কোশের নজরে পড়ার মতো ব্যক্তিত্ব নেই। অতিসাধারণ আকৃতি, চোখের চাউনিও ইঙ্গিতপূর্ণ নয়। ভাবখানা এই রকম যে, খেলতে হয় তাই কোর্টে নামা। কিন্তু এই মিটমিটে চাউনির গভীরে লুকানো ছিল যে অপরাজেয় খাত তার হদিশ জানাতে কোশে সেদিন কোনো ভুল করেন নি।

সুদূর আমেরিকা থেকে এসে ১৯২০ সালে টিলডেন মার্কিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম উইম্বলেডন টেনিস জয় করেছিলেন। পরের বছরও তাঁর উইম্বলেডনে জয়জয়কার। তারপর আর তিনি বছর-পাঁচেক উইম্বলেডনে আসেন নি। তবে এই ফাঁকে বিশ্বের অন্য প্রান্তের সবকটি প্রথম সারির প্রতিযোগিতা জয় করে টিলডেন আন্তর্জাতিক টেনিসে অবিস্মরণীয় নেতৃপদ অধিকার করে ফেলেছেন।

টিলডেন যে ক'বছর উইম্বলেডনে অনুপস্থিত ছিলেন সেই ক'বছরে ইউরোপীয় টেনিসে ফরাসী শক্তির অভ্যুদয় ঘটে যায় জ্রাঁ বরোত্রা, জ্যাক্‌স বুগনন, হেনরি কোশে ও রেনে লাকস্টের আবির্ভাবে। এই চারজন ফরাসী তরুণকে বলা হোত 'ফোর মাসকেটিয়ার্স'। ১৯২৬ সালে ডেভিস কাপের খেলায় লাকস্টে ছ' বছরের মধ্যে টিলডেনকে সর্বপ্রথম হারতে বাধ্য করিয়েছিলেন।

এই হারের বদলা নিতেই যেন টিলডেন ১৯২৭ সালে আবার ইউরোপে ফিরে আসেন। উদ্দেশ্য, উঠতি ফরাসীদের উচিত শিক্ষা দেওয়া। বয়স যতোই বাড়ুক না কেন, এখনও টিলডেনের স্বীকৃতি বিশ্বের পয়লা নম্বর হিসেবে। এই স্বীকৃতির মর্যাদা বজায় রাখায় ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ডিঙিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর সংকল্প।

ইউরোপে ফিরে টিলডেন সেবার প্রথমে খেললেন ফরাসী টেনিস প্রতিযোগিতায়। কোশের সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে দাঁড়াতেই দিলেন না, জিতলেন ৯-৭, ৬-৩, ৬-২ সেটে। কিন্তু ফাইনালে লাকস্টের হাতে হেরে গেলেন। তবে এই হার স্বাভাবিক নয়। লাকস্টের সঙ্গে ফাইনাল খেলার দিন পঞ্চমাঙ্কে ৯-৮ সেটে এগিয়ে থাকার সময় টিলডেনের জোরালো ড্রাইভের পর বল কিন্তু সাইড লাইন ছুঁয়ে লাকস্টকে হার মানিয়েছিল। টিলডেন এবং সব দর্শকের ধারণা, বলটি কোর্টের মধ্যে পড়েছে এবং টিলডেন জিতেছেন। কিন্তু লাইন্সম্যানের ধারণা, অন্য রকম। তিনি রায় দিলেন, আউট। সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ হারিয়ে ফেললেন টিলডেন। আর সেই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সেট এবং ম্যাচটি হারাতেও তিনি দেরী করেন নি।

যে লাইন্সম্যানের 'আউট' হাঁক শুনে টিলডেন সেদিন নিজেকে হারিয়ে বসে-ছিলেন, তিনি কে জানেন? অন্য কেউই নন, স্বয়ং ওই হেনরি কোশেই!

সুতরাং দিন-কয়েক পর উইম্বলেডনের কেন্দ্রীয় কোর্টে সেমিফাইনাল খেলতে যেদিন কোশে টিলডেনের সামনে দাঁড়ালেন সেদিনের উত্তেজনা সহজেই অনুমান করা যায়। দর্শকদের জিজ্ঞাসা, বুড়ো বয়সে টিলডেন কি তাঁর পয়লা নম্বরের স্বীকৃতি ধরে রাখতে পারবেন? আর টিলডেনের নিরুচ্চার প্রতিজ্ঞা, এই সেই কোশে, যাঁর জন্যে ফরাসী টেনিসে তাঁকে হারতে হয়েছে। অতএব নির্দয় হাতে ওঁকে ধ্বংস করতেই হবে।

সত্যিই ধ্বংসের মন্ত্র আউড়েই যেন টিলডেন শুরু করলেন খেলা। পর পর দুটি সেটে ১২৪ মাইল বেগে সার্ভিসে আগুন জ্বালিয়ে টিলডেন যেন কোশের প্রতিরোধকে পুড়িয়ে মারতে চাইলেন। কোশে দাঁড়াতেই পারলেন না। টিলডেন প্রথম দুটি সেট হাতালেন ৬-২, ৬-৪ গেমে।

তৃতীয় সেটের শুরুতেও টিলডেনের হাতের কায়দায় মাঝ কোর্টে সেই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডই ঘটে যেতে লাগলো। এক এক করে পাঁচটি সেট এলো হাতে, বাকী একটি গেল কোশের অনুকূলে।

৫-১ গেমে এগিয়েছেন টিলডেন। কোশের আর কোনো আশা নেই। এই ভেবেই দর্শকেরা যখন আসন ছেড়ে উঠে যাচ্ছেন, এমন সময় যা ঘটলো তা যেন 'ইতিহাস যাহা শোনে নাই কোনোকালে'!

আর মাত্র একটি গেম পেলেই টিলডেন বাজীমাৎ করে দিতে পারেন যখন ঠিক তখনই কোশে বেস লাইন ছেড়ে মাঝ কোর্টে এগিয়ে এসে পাল্টা আক্রমণ শানাতে লাগলেন। নতুন কায়দায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় কোশে বুঝি গুপ্তমন্ত্রের সন্ধানও পেয়ে গেলেন। পরের কটি মুহূর্তে খেলার গতির কি আশ্চর্য পরিবর্তন! যে টিলডেন এতোক্ষণ কোশেকে কোণঠাসা করে রেখেছিলেন, এবার তিনিই কোর্টের এক কোণে জায়গা নিতে বাধ্য হলেন। আর কোশেও যেন হাসতে হাসতে এক নাগাড়ে পয়েন্টের পর পয়েন্ট সংগ্রহ করে তৃতীয় সেটটি ছিনিয়ে নিলেন। ৭-৫ এতে তৃতীয় সেটটি হাতিয়ে নিতে কোশে ওই মুহূর্তে একটানা সতেরোটি পয়েন্ট সংগ্রহ করে-ছিলেন।

তৃতীয় সেটের সায়াহ্নে খেলার বাঁক ফিরেছিল যেদিকে সেইদিকে অবিচল লক্ষ্য রেখে কোশে চতুর্থ সেটেও এগোতে লাগলেন। প্রথম দিকে কোশের অগ্রগমন ৪-২ গেমে। টিলডেন অনেক চেষ্টায় ফলাফল সমান সমান (৪-৪) করে দিলেন বটে, কিন্তু তারপরই আবার কোশে এলেন উজ্জীবিত ভূমিকায় ফিরে। চতুর্থ সেটে টিলডেন আর কোনো গেম পান নি। ফলে কোশে চতুর্থ সেট পেলেন ৬-৪ গেমে।

সাময়িক বিরতির পর পঞ্চম বা শেষ সেটের খেলা যখন শুরু হল তখন গ্যালারী আবার দর্শকে দর্শকে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। টিলডেন সর্বশক্তি ঢেলে নতুন করে আরম্ভ করলেন। যতো রকম অস্ত্র ছিল তূণে সবগুলিই প্রয়োগ করতে লাগলেন। স্লাইস, ক্যানন, টুইস্ট, তিন ধরনের সার্ভিস টিল-ডেনের হাতে পোষা ছিল, সেগুলি উজাড় করে দিলেন। সাধারণত তিনি জোরে হিট করে খেলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু জোরালো ড্রাইভগুলি বন্ধ দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে দেখে টিলডেন কোশের মাথা টপকে বল পাঠাবার চেষ্টা করলেন। তাতে কিছু পয়েন্ট এলো বটে, কিন্তু কোশের প্রত্যা কি ফাটল ধরানো গেল? গেল না।

কোশে তখন এক আশ্চর্য বোঝাপড় সঙ্গে সন্ধি পাতিয়ে ফেলেছেন। কিছুতে তাঁর গতি ছন্দ ব্যাহত হচ্ছে না। যেখা বল সেইখানে তিনি। কোশে খুব জো সার্ভিস করছেন না। তেমন ব্যাকহ্যাণ্ নেই। তবু খেলার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে তি তখন রীতিমতো পরিপাটী। নিখুঁত।

যতো সময় যাচ্ছে ততোই কো খেলার মহিমা প্রতিভাত হচ্ছে। মনো বাড়ছে, প্রত্যয়ের শক্ত মাটিতে উঠে দাঁড়িয়ে। দেখতে দেখতে টিলডে জাঁহাবাজ ব্যক্তিত্বও যেন চুপসে গেল। প সেটে টিলডেন ৩-২ পয়েন্টে এগিয়েছিলে কিন্তু তারপরই সবশেষ। চৌত্রিশ বছ প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে পঁচিশ বছ তরুণ কোশে প্রমাণ করে দিলেন যৌ ফরাসী শক্তি আর অবহেলার বস্তু। চূড়ান্ত ফল কোশের অনুকূলে ২-৬, ৪ ৭-৫, ৬-৪, ৬-৩।

হারতে হারতে জিতে গিয়ে কো মুখে ক্ষণিকের জন্যে স্মিত হাসির ছিল। আর টিলডেনের অবস্থা? একে শেষ সময়ে কোশের কোণাকুণি ড্র ফেরাতে গিয়ে কোর্টের মধ্যেই পা পি পড়ে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ মাটি উঠতেই পারেন নি। এই পদস্খলন দৃ এক বিরাট মহীরুহের পতনেরই মত যেন কোর্টের কিংবদন্তীর ওইখানেই ই

তবু শেষ সেইখানেই নয়। গা দিয়ে উঠে টিলডেন বিড়বিড় করে ব থাকেন 'হেরেছি আমি আমারই দোষে' স্বগতোক্তি নিছক আত্মম্ভরিতাও তাই সেই দোষ ঢাকার চেষ্টায় আরও বছর পর টিলডেন যখন আবার উইম্বলে ফিরে আসেন তখন তাঁর নিজের সাঁয়ত্রিশ। তবু 'প্রায়-বৃদ্ধ' টিলডে ১৯৩০ সালে কেউ রুখতে পারেন ফরাসী 'ফোর মাসকেটিয়ার্স' হাজির সত্ত্বেও টিলডেন তৃতীয় বারের জন্যে উই লেডন জয় করে যান।

টিলডেন টিলডেনই! তাঁর জুড়ি ভার। বয়সের ভারও সেদিন তাঁর বোঝা হয়ে উঠতে পারে নি।
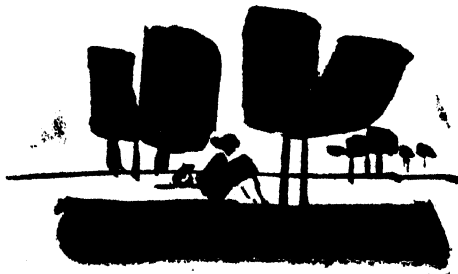
দর্শক

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

১৯৭০ সালে মেক্সিকোতে নবম বিশ্ব [illegible]বল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের [illegible] এবং নকআউট খেলার আসর বসবে। [illegible]কোর চূড়ান্ত পর্যায়ের লীগ প্রতি[illegible]গতায় ১৬টি বাছাই দেশ অংশ গ্রহণ [illegible]ব। এই ১৬টি দেশ চারটি গ্রুপে সমান [illegible] হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। [illegible]পর প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান দেশ [illegible]ভাবে নকআউট প্রথায় খেলবে—[illegible]র্টার-ফাইনাল, সেমি-ফাইনাল এবং [illegible]নাল।

প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের [illegible] অবশ্য ষোলর অনেক বেশী। প্রতি[illegible]গিতায় যোগদানকারী দেশগুলিকে [illegible]ক্সিকো এবং ইংল্যান্ড বাদে) ১৬টি গ্রুপে [illegible] করা হয়েছে। এই ১৪টি গ্রুপের লীগ [illegible]ম্পিয়ান দেশই শেষ পর্যন্ত মেক্সিকোর [illegible]ন্ত পর্যায়ের লীগ খেলায় যোগদানের [illegible]যোগ লাভ করবে। এখানে একটা কথা, [illegible] ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ [illegible]ক্সিকো এবং গতবারের (১৯৬৬) জুল [illegible] কাপ বিজয়ী দেশ ইংল্যান্ডকে [illegible]মিক পর্যায়ের লীগে খেলতে হবে না, [illegible] সরাসরি মেক্সিকোর চূড়ান্ত লীগ [illegible]য়ে খেলবে। প্রতিযোগিতার নিয়মানু[illegible] উদ্যোক্তা দেশ এবং শেষ জুলে রিমে [illegible] বিজয়ী দেশকে এই বিশেষ সুবিধা [illegible] হয় (বর্তমান ক্ষেত্রে যেমন মেক্সিকো [illegible] ইংল্যান্ড পেয়েছে)। মেক্সিকো এবং [illegible]ন্ড বাদে আর কোন ১৪টি দেশ [illegible]ক্সিকোর চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ে খেলবে তা [illegible] নির্ধারিত হয়নি। প্রাথমিক লীগ [illegible]য়ের খেলা গত মে মাস থেকে শুরু [illegible]ছে এবং লীগের এই খেলা চলছে [illegible]তে গেলে সারা পৃথিবী জুড়ে। [illegible]কোতে যে ১৬টি দেশ চূড়ান্ত লীগ [illegible]য়ে খেলতে যাবে তাদের মধ্যে ইউরোপ [illegible]কই যাবে ৯টি দেশ।

১৯৭০ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতি[illegible]গিতার ফলাফল সম্পর্কে পণ্ডিত মহলের [illegible]ষ্যদ্বাণী, 'ইউরোপ এবং দক্ষিণ [illegible]মেরিকার অন্তর্গত দেশই প্রথম, দ্বিতীয় [illegible] তৃতীয় স্থান লাভ করবে। বিগত [illegible]টি বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় জুলে [illegible] কাপ জয়ী হয়েছে—ইউরোপ ৪-বার [illegible] দক্ষিণ আমেরিকা ৪-বার। ইউরোপের [illegible] কাপ জয় করেছে ইতালী (২ বার), [illegible]ম জার্মাণী (১ বার) এবং ইংল্যান্ড [illegible]বার)। অপরদিকে দক্ষিণ আমেরিকার

জুলে রিমে কাপ

পক্ষে কাপ জয়ী হয়েছে উরুগুয়ে (২ বার) এবং ব্রেজিল (২ বার)। রানার্স-আপ হয়েছে ইউরোপ ৬ বার এবং দক্ষিণ আমেরিকা ২ বার। ইউরোপ থেকে রানার্স-আপ হয়েছে—জার্মাণী (২ বার), হাঙ্গেরী (২ বার), সুইডেন (১ বার) এবং চেকোশ্লো-ভাকিয়া (১ বার)। অপরদিকে দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত দেশ রানার্স-আপ হয়েছে—আর্জেন্টিনা (১ বার) এবং ব্রেজিল (১ বার)।

প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলা থেকে অব্যাহতি পাওয়া ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে; যেমন স্বদেশের মাটি, জল-বায়ু এবং অতি পরিচিত দর্শক সমাগম। খেলায় প্রাধান্য বিস্তারের পক্ষে এই সুযোগ-গুলি খুবই কাজ দেয়। গত আটটি প্রতিযোগিতার ফলাফলের হিসাব নিলে দেখা যাবে, প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা স্বদেশের মাটিতে খেলার সুযোগ পেয়ে জুলে রিমে কাপ জয়ী হয়েছে ১৯৩০ সালে উরুগুয়ে, ১৯৩৪ সালে, ইতালী এবং ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ড। আর এই সুযোগের দৌলতে রানার্স-আপ হয়েছে ১৯৫০ সালে ব্রেজিল এবং ১৯৫৮ সালে সুইডেন।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ১৯৩০ সালে। প্রতি চতুর্থ বছরে প্রতি-যোগিতার আসর বসে। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ফলে দুবার (১৯৪২ ও ১৯৪৬) প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকে। উপর্যুপরি দুবার জুলে রিমে কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে ইউরোপের ইতালী (১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে) এবং দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল (১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে)। একই বছরের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান (অর্থাৎ জুলে রিমে কাপ জয়) এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে ইউরোপ চারবার (১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৫৪ ও ১৯৬৬) এবং দক্ষিণ আমেরিকা দুবার (১৯৩০ ও ১৯৫০)। প্রতিযোগিতার ফাইনালে এ পর্যন্ত ইউরোপের বিপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকা খেলেছে দু'বার (১৯৫৮ ও ১৯৬২) এবং এই দুবারই দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত দেশ ব্রেজিল ইউরোপের সুইডেন এবং চেকোশ্লো-ভাকিয়াকে পরাজিত করেছে।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা
ফাইনাল খেলার ফলাফল

বছর	স্থান	বিজয়ী	রানার্স-আপ
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা
১৯৩৪	ইতালী	ইতালী	জার্মাণী
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালী	হাঙ্গেরী
১৯৫০	ব্রেজিল	উরুগুয়ে	ব্রেজিল
১৯৫৪	বার্ণে	পঃ জার্মাণী	হাঙ্গেরী
১৯৫৮	সুইডেন	ব্রেজিল	সুইডেন
১৯৬২	চিলি	ব্রেজিল	চেকোঃ
১৯৬৬	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড	জার্মাণী

ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কাপ

নওগাঁর (আসাম) এন সি সি মাঠে আয়োজিত ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং দল ৪-০ গোলে গত বছরের বিজয়ী এরিয়ান্স দলকে পরাজিত করে। মহমেডান স্পোর্টিং দলের পক্ষে প্রতিযোগিতায় যোগ-দান এই প্রথম। কলকাতার এই দুই দলের ফাইনাল খেলা উপলক্ষে মাঠে প্রায় ত্রিশ হাজার দর্শক সমাগম হয়েছিল। বিজয়ী মহমেডান দলের পক্ষে গোল দেন—পাম্পানা (২), সর্দার খাঁ এবং রামানা।

জাতীয় স্কুল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

কলকাতার আর্মেনিয়াল্স কলেজ প্রাঙ্গণে পঞ্চম জাতীয় স্কুল মুষ্টিযুদ্ধ এবং চতুর্থ জাতীয় জুনিয়ার মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। জাতীয় স্কুল মুষ্টিযুদ্ধ প্রতি-যোগিতায় ১ম স্থান লাভ করেছে বাংলা (৩৭ পয়েন্ট), ২য় স্থান রাউরকেল্লা (২৬ পয়েন্ট) এবং ৩য় স্থান মধ্যপ্রদেশ (২০ পয়েন্ট)। স্কুল বিভাগে শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধার পুরস্কার লাভ করেছেন বাংলার বংশী শীল

মোহনবাগান বনাম বি এন আর দলের সুপার লীগ খেলায় রেলদলের গোলরক্ষক বি সাধুখাঁ মোহনবাগানের নয়িমুদ্দিনের কাছ থেকে একটি অবধারিত গোল রক্ষা করছেন। মোহনবাগান ২—০ গোলে জয়ী হয়।

(প্রখ্যাত ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধা স্বগীয় জে কে শীলের পুত্র)।
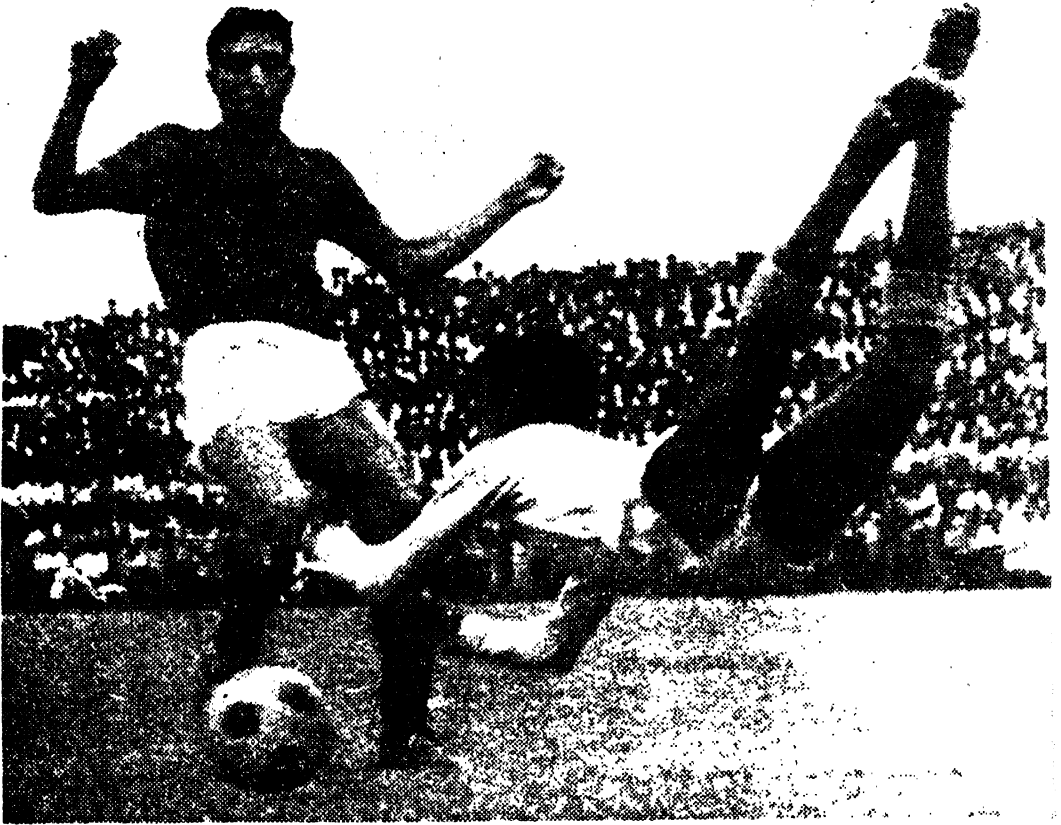
জাতীয় জুনিয়র মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতার সাতটি খেতাব চারটি দল এইভাবে পেয়েছে: জামসেদপুর ৩টি, জব্বলপুর ২টি, বার্ণপুর ১টি এবং এস ও পি সি ১টি। ফাইনালে বাংলা রানার্স আপ হয়েছে ৩টি বিভাগে (হুগলী ২টি এবং কলকাতা ১টি)।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের লীগ খেলা (সুপার লীগ) গত ৪ঠা আগস্ট সুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতার শেষ খেলা (মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল) হবে ১৬ই আগস্ট। এ পর্যন্ত (১০ আগস্ট) যে খেলা হয়েছে তার ফলাফলের ভিত্তিতে মোহনবাগান ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে লীগ তালিকার প্রথম স্থান পেয়েছে। মোহনবাগান ২-০ গোলে বি এন আর এবং ৪-০ গোলে পোর্ট কমিশনার্স দলকে পরাজিত করেছে। লীগ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল দুটো খেলায় ৩ পয়েন্ট। ইস্টবেঙ্গল বনাম পোর্ট কমিশনার্স দলের খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র গেছে। সুপার লীগের খেলায় পাঁচটি দলের মধ্যে এখনও অপরাজিত আছে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। এখানে উল্লেখ্য, প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের ১৬টি খেলায় একমাত্র ইস্টবেঙ্গল দলই অপরাজিত ছিল।

ম্যারাথন দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড

প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাক্সল ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ডের রন হিল প্রথম এবং অস্ট্রেলিয়ার ডেরেক ক্লেটন দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন। নির্দিষ্ট দূরত্ব পথ অতিক্রম করতে হিলের সময় লাগে ২ ঘন্টা ১৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ড। অপরদিকে ক্লেটন ২ ঘঃ ১৫ মিঃ ৪০ সেঃ সময় নিয়েছিলেন। হিলের বয়স ৩০ বছর এবং তিনি ক্লেটনের থেকে চার বছরের বড়। ১৫ এবং ২০ মাইল দৌড়ে হিলের বিশ্ব রেকর্ড আছে। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকের ১০,০০০ মিটার দৌড়ে ৭ম স্থান পেয়েছিলেন। এই প্রতিযো[illegible] অস্ট্রেলিয়ার ক্লেটনের প্রথম স্থান পা[illegible] কথা ছিল। দু মাস আগে এক আন্ত[illegible] ম্যারাথন দৌড়ে ক্লেটন ২ ঘঃ ৮ ৩৩-৬ সেকেন্ড সময়ে দূরত্ব অতিক্র[illegible] যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা অক্ষুন্ন আছে। আলোচ্য প্রতিযোগি[illegible] ২০০ জন দৌড়বীর অংশ গ্রহণ কর[illegible] তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম: ম্যারাথন চ্যাম্পিয়ান বিল এ্যাডকক্স, ওয়েলথ গেমসের ম্যারাথন চ্যাম্পিয়ান অল্ডার (স্কটল্যান্ড) এবং মেক্সিকো[illegible] থনে রৌপ্যপদক বিজয়ী জাপানের কিমিহারা।

ব্যাডমিন্টন কোচ বিশু ব্যানার্জি

পশ্চিম বাংলার অবৈতনিক ব্যা[illegible] কোচ শ্রীবিশু ব্যানার্জি ভারতীয় ব্যা[illegible] এসোসিয়েশনের আম্পায়ার নিযুক্ত হ[illegible] এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিমবাংলা থেকে এই সম্মানজনক পদ প্রথম পেলেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন। এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে !

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

লিনটাস-L. 51-140 BG

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১ 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২ প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩ রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন ঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১ম বর্ষ
২য় খণ্ড

১৬শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 22nd August, 1969. শুক্রবার—৫ই ভাদ্র, ১৩৭৬ 40 Paise

সুচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীশৈলেন সাহা

ভারতীয় ভাষায় কোষগ্রন্থ

গত ৯ই শ্রাবণ (১৩৭৬) সংখ্যা অমৃতে অভয়ংকর লিখিত 'ভারতীয় ভাষায় কোষগ্রন্থ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিভিন্ন ভাষার কোষগ্রন্থের খবর পরিবেশন করেছেন। এই তথ্যপূর্ণ লেখাটি আগ্রহসহকারে পড়েছি। এই প্রবন্ধে যেসব নামোল্লেখ করা হয়েছে তাদের সংগে আর একটি নামের উল্লেখ থাকলে ভাল হত। সেই নামটি হচ্ছে শ্রীযুক্ত রংগলাল মুখোপাধ্যায়। যে বিশ্বকোষ লিখে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু অমর হয়েছেন সেই কোষটি নাকি রংগলালই আরম্ভ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর অভিধানে লিখেছেন—'বিশ্বকোষ বাংলা অভিধান গ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যমহাবিদ্যার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত ও খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত। রংগলাল মুখোপাধ্যায় এই অভিধান আরম্ভ করিয়া দুইটি খন্ডমাত্র প্রকাশিত করেন।

অভয়ংকরের বহু তথ্য সংবলিত প্রবন্ধটিতে রংগলালের নাম সংযোজিত হলে এটি সম্পূর্ণতা লাভ করতো, অবশ্য যদি তাঁর সম্বন্ধে সুবলচন্দ্রের কথা সত্য হয়।

এই প্রসংগে রংগলালের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করলে বোধহয় তা বাহুল্য হবে না। রংগলাল মুখোপাধ্যায় একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর মুখে মুখে কবিতা রচনা ও পাদপূরণ করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

চব্বিশ পরগণাস্থ নৈহাটির অধীন রাহুতা গ্রামে ১২৫০ সালের ১৪ই আষাঢ় রংগলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। রংগলালের জীবন শিক্ষকতা ও সাহিত্যকার্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। তিনি শরৎশশী, বিজ্ঞান দর্শক, চিত্তচৈতন্য উদয়, হরিদাস সাধু প্রভৃতি বই লিখে একসময় যশস্বী ও সমাদৃত হন। বিশ্বকোষের প্রতিষ্ঠাতা ইনি। এর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ ইনিই সম্পাদনা করেন। এঁরই আরব্ধ কাজ নগেন্দ্রনাথ সুসম্পন্ন করেন।

অনিলকুমার দাশগুপ্ত,
কলিকাতা—১৬।

মানুষগড়ার ইতিকথা

আপনার 'মানুষগড়ার ইতিকথা'র আমি একজন নিয়মিত পাঠক। পড়ে অতি আনন্দ পাই।

অমৃতের প্রতি সংখ্যায় খুঁজি, শৈশবে আমি যে স্কুলটিতে পড়েছিলাম, তার বিবরণ বেরোচ্ছে কিনা। স্কুলটি অতি প্রাচীন এবং একসময়ে খুবই বিখ্যাত ছিল। এই স্কুলে মাইকেল (মধুসূদন দত্ত) একদিন পড়েছিলেন। তখন স্কুলটি ছিল শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বিল্ডিং-এ। নাম বিশপস কলেজ স্কুল। ঐ শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগৃহের দরজা জানলার ওপর খিলানগুলি সবই গথিক স্থাপত্যের অনুকরণে, অতি প্রাচীন। পরে, স্কুলটি লোয়ার সার্কুলার রোড ও বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মিলনস্থানে বিরাট কম্পাউন্ড নিয়ে প্রাচীরে ঘেরা স্থানটিতে উঠে আসে। ভিতরে বাগান, সুইমিং পুল, ইয়োরোপিয়ান প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসার, রেক্টর এঁদের বাসগৃহ। ভিতরেই চার্চ, তার বেদী শুনেছি অতুলনীয়। তখন কলেজ ও স্কুল দুটিই ছিল। কলেজে পড়ান হত বি ডি অর্থাৎ ব্যাচেলার অব ডিভিনিটি। লর্ড বিশপ এই স্কুলের পেট্রন ছিলেন। স্কুলগৃহটি একতলা। ছাত্রসংখ্যা বেশী ছিল না। খৃস্টান ছাত্রদের জন্য হস্টেলও ছিল।

এখন স্কুলগৃহটি দোতলা হয়েছে, কিন্তু স্কুল ওখানে নেই এবং তার ঐতিহ্যপূর্ণ নামটিও নেই। এলগিন রোডে সেন্ট জনস ডায়োশেসন স্কুলগৃহের পশ্চিমে সেন্ট মেরীজ স্কুল ছিল। এই সেন্ট মেরীজ স্কুল ও বিশপ কলেজ স্কুল এক হয়ে এখন ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল। বর্তমানে ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত বসু। ইনি অনেককিছু পূর্ব ইতিহাস জানেন।

আমি অধুনালুপ্ত বিশপ কলেজ স্কুল থেকেই ১৯১৯ সালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর আগে, প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করি। এখানে আমারই এক সতীর্থ তিনি হলেন ডঃ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজের জিওলজি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান। আর একজন হলেন ডাঃ মোহিতকুমার পাকড়াশী এখন উত্তরপ্রদেশের ডেপুটি ডাইরেকটর অব পাবলিক হেলথের পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জিও এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন।

আমার সময়ে স্কুলের রেকটর ছিলেন মিঃ জে আর রবসন। (পরে রেঃ ও ক্যানন হন। রবসন সাহেব আমাদের ইংরাজী সাহিত্য পড়াতেন।

আমাদের তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রীসতীনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন দেবতুল্য। প্রতিটি ছাত্রই যেন তাঁর প্রিয় সন্তান। অংকশাস্ত্রে ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অসাধারণ।

আমার ছেলেরাও এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে। আমার নাতি এইবারে পাশ করেছে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা ক্যাথিড্রাল মিশন হাই স্কুল থেকে। ঐতিহ্য বজায় রেখেছি তিন পুরুষে। আশা করি অমৃতের পাতায় তাড়াতাড়ি দেখতে পাব মনোমুগ্ধকর বর্ণনা এই ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন মিশনারী স্কুলটির।

ললিতকুমার পাকড়াশী,
কলিকাতা—১৯।

আলোকপর্ণা

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক আমি। আপনারা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে চলেছেন শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'আলোকপর্ণা' উপন্যাসটি। নারায়ণবাবু উপন্যাসটির চরিত্রচিত্রণ করেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর স্বাক্ষর প্রতি ছত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং নিপুণ হাতে নারায়ণবাবু তাঁর 'আলোকপর্ণা'কে এঁকেছেন। বড় ভালো লাগছে এই উপন্যাসটি পড়তে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক শৈল্পিক রসের আস্বাদে ভরপুর 'আলোকপর্ণা' নিঃসন্দেহে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করবে বাস্তবভিত্তিক উপন্যাসের জগতে।

সত্যি কথা বলতে কি, এত সুন্দর তৃপ্তিকর অনুভূতি খুব কম উপন্যাস পড়েই পাওয়া যায়। তাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই লেখক এবং 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকে।

গৌতম সেনগুপ্ত
কলকাতা—২৯

যেন ভুলে না যাই

ইংরেজীতে বলে, পাস্ট ইজ গোল্ডেন। সত্যিই তাই, পুরনোকালের কথা অমৃতসমান। আজ যা বাস্তব, আগামীকাল তা গল্প, ইতিহাস। তাই পুরনোকালের ঘটনার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই সৃষ্টি করেছে গালগল্পের প্রতি আকর্ষণ। অমৃত পত্রিকায় পুরনো যুগের চলচ্চিত্রের সংগে যুক্ত সাগরপারের নায়ক-নায়িকাদের অভিনয় ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে রচনা স্বল্প-পরিসরে শ্রীচিত্রলেখ উপহার দিচ্ছেন, তা খুবই আকর্ষণীয়। স্কুলজীবনে যখন সাগরপারের শিল্পীদের আলোচনা বড়দের মুখে শুনতাম তখন তাঁদের অভিনয় ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানার এক দুর্বার কৌতূহল অনুভব করতাম। বয়স্কজীবনে পুরনো যুগের ইংরেজি ছবি যদিও কিছু কিছু দেখেছি, কিন্তু পর্দার আড়ালে নায়ক-নায়িকাদের জীবন, তাঁদের আচার-আচরণ, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছুই ছিল অজানা। 'অমৃতের

মাধ্যমে তাঁদের পরিচিতি পেয়ে সে সাধ কিছুটা মিটছে। সেজন্যে আপনাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে এলো। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-শিল্প অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করেছে। আমাদের চলচ্চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত পুরনোকালের নায়ক-নায়িকাদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ এ যুগের সিনেমারসিকদের থাকা স্বাভাবিক। তাই তাঁদের সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ এ বিভাগে তুলে ধরলে মন্দ হোত না। আশা করি 'অমৃত' কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটি ভেবে দেখবেন। নমস্কারান্তে।

প্রমথেশ ভট্টাচার্য,
সন্ধ্যা ভট্টাচার্য,
গোপবন্ধুনগর, ভুবনেশ্বর।

চন্দ্রলোক জয়ের পর

চন্দ্রে মানুষের পদার্পণ নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব। এই অকল্পনীয় সাফল্যের অভিনন্দন প্রাপ্য আর্মস্ট্রং, কলিন্স ও অলড্রিন তিন অভিযাত্রীর, আর অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই সেই বৈজ্ঞানিকদের যে জ্ঞানতাপসদের প্রতিটি দিনরাত্রির নিরলস সাধনায় সার্থকতায় উদ্ভাসিত হয়েছে গ্রহজয়ের স্বপ্ন।

গ্রহ হতে গ্রহান্তরে এই জয়যাত্রার অমৃতলগ্নে আশা করবো, বিজ্ঞানের আশ্চর্য সম্পদ শুধু অজানা রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচনেই সীমিত থাকবে না; এই গ্রহে, এই মাটির পৃথিবীতে যে কোটি কোটি মানুষের জীবন ডুবে আছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যের অন্ধকারে তাদের জীবন থেকে এই অভিশাপ চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসবেন সারা বিশ্বের বিজ্ঞান সাধকেরা। সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে সেই হবে পরমলগ্ন; মহত্তম মুহূর্ত।

রথীন্দ্রনাথ সেন,
কলিকাতা—১৯

বেতারশ্রুতি ও ফলশ্রুতি

গত ২রা শ্রাবণ সংখ্যা 'অমৃতে' দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে বলেছেন ফল' অর্থে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ভুল প্রয়োগ অনেক বাঘা বাঘা সাহিত্যিকদের রচনাতেও দেখা যায়, এবং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ফলশ্রুতি শব্দের বিকল্প অর্থ ই অথবা প্রচলিত অর্থই দাঁড়িয়েছে ফল, একথা খুবই সত্যি। বাঘা বাঘা সাহিত্যিক কেন, বাঘা বাঘা সম্পাদক মহাশয়েরাও সম্পাদকীয়তে এই শব্দের প্রয়োগ করে থাকেন, তার একটি সাম্প্রতিক নজীর তুলে ধরছি।

১৬ই শ্রাবণ সংখ্যায় অমৃত সম্পাদক মহাশয় তাঁর সম্পাদকীয়তে লিখেছেন, 'মহাকাশযাত্রা শুরু হয়েছিল সামরিক বিজ্ঞানের ফলশ্রুতি হিসেবে। অন্য একটি বড় দৈনিক কাগজের দৃষ্টান্তও হাতের কাছে আছে।

কাজেই 'শ্রবণক' মহাশয়ের ব্যাকরণের যুক্তিতর্ক আজ অচল। ফল অর্থে ফলশ্রুতির প্রয়োগ অনেকদিন ধরে চলে এসেছে, চলছে এবং চলবেও। একে আর এখন আটকানো যাবে না।

অনিল সোম,
জামসেদপুর ৫।

বেতারশ্রুতি

আমরা অমৃতের নিয়মিত এবং একনিষ্ঠ পাঠিকা এবং বলা বাহুল্য 'বেতারশ্রুতি' বিভাগটিও আমাদের একান্ত প্রিয়। অনুরোধের আসরের প্রতি তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা আমাদের বক্তব্য পেশ করছি।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ সাং শুক্রবার সংখ্যায় 'বেতারশ্রুতি' বিভাগে "শ্রোতাদের অনুরোধের চিঠি পড়েই দেখা হয় না। অনুরোধের আসরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী তার খুশীমতো গান নির্বাচন করে মনগড়া গানের তালিকা পেশ করেন," এই লাইন কটি পড়ে আমরা আমাদের দাবী জানানোর ইচ্ছা সামলে রাখতে পারলাম না। আকাশবাণীকে অনুরোধ করে করে হয়রান হয়ে যাওয়া মনটা এই লাইন কটির উপর চোখ বুলিয়ে একটু আশান্বিত হলো। অনুরোধ করা গান শুনতে পাবো এই আশায় নয়, মনের এই হতাশাকে একটু ব্যক্ত করতে পারবো এই জোরে।

অনুরোধের আসরে শ্রোতাদের নির্বাচিত প্রিয় শিল্পীদের গান শোনানো হয় জেনেই আমরা আমাদের প্রিয় গানগুলি শুনতে চেয়েছিলাম। একবার নয়, অনেকবার। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই বিশেষ দিনের বিশেষ সময়গুলো আমাদের মনে আজকাল আর চাঞ্চল্য জাগায় না বরং বিরক্তিরই উদ্রেক করে।

আমাদের জিজ্ঞাসা, অনুরোধের আসরের নাম করে এই লোক-ঠকানোর অর্থ কি? অনুরোধের আসরে এই নামকে শিখণ্ডীর মত খাড়া করে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কি হঠকারিতা করছেন না! বেতার কর্তৃপক্ষকে তাই সবিনয়ে জানাচ্ছি অনুষ্ঠানটির নাম অনুরোধের আসর না রাখলেই হতো। তাহলে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীও পত্রাঘাত থেকে বেঁচে যেতেন।

শীলা ভট্টাচার্য,
সাথী ভট্টাচার্য।
শিলচর—১, আসাম।

সাহিত্যের সঙ্গী প্রসঙ্গে

১২শ সংখ্যায় (৯ শ্রাবণ, ১৩৭৬) শিশিরকুমার সিংহ মহাশয়ের 'সাহিত্যের সঙ্গী' শীর্ষক পত্রখানি আমরা দেখলাম। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, বিশ্বভারতী প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ডে ২৯৫ পৃষ্ঠার সম্মুখে সাহিত্যের সঙ্গী নামে ছবিখানি যে ক্রম অনুযায়ী সাজানো আছে তা-ই ঠিক। অর্থাৎ বাঁ দিক থেকে প্রথমে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পরে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারপরে জ্যোতিরিন্দ্র-পত্নী কাদম্বরী দেবী, মধ্যে বসে আছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই ক্রম বিশ্বভারতী-প্রকাশিত সচিত্র ইংরেজী মার্ট মর্যহুড ডেইজ গ্রন্থেও অনুসৃত হয়েছে।

কাদম্বরী দেবীর একক চিত্র বিশ্বভারতী প্রকাশিত ছেলেবেলা (শোভন সংস্করণ) গ্রন্থের (১৩৬৮) ৬৫ পৃষ্ঠার সম্মুখে মুদ্রিত আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অংকিত কাদম্বরী দেবীর একটি প্রতিকৃতি বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' গ্রন্থেও দেওয়া আছে।

—রণজিৎ রায়,
অধ্যক্ষ বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ।
কলকাতা—৭

বি বি সি'র বিচিত্রা

আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই পত্রটি প্রকাশ করে আশা করি আমাদের সাহায্য করবেন।

বিলাতের বি-বি-সি প্রচারিত 'বিচিত্রা' নামে যে সুন্দর প্রোগ্রাম প্রতি শনিবার রাত্রে বহু শ্রোতা আগ্রহ সহকারে শুনতেন তা গত ১লা জুন থেকে পরিবর্তন করে 'প্রবাহ' নামে দৈনিক একটি প্রোগ্রাম বি-বি-সি প্রচার করছেন। আমাদের ক্লাবের সভ্যরা কেউই এই প্রোগ্রাম শুনে খুশী হচ্ছেন না। তাঁরা এবং অন্য অনেক 'বিচিত্রা' শ্রোতা আবার 'বিচিত্রা' প্রোগ্রামের ব্যবস্থার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করেছেন। প্রতি শনিবারের 'বিচিত্রা' এত প্রিয় ছিল যে তাঁরা বহু কাজ থাকলেও এই প্রোগ্রাম শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। 'প্রবাহ' তাঁদের এই আগ্রহ জন্মাতে পারে নি। বহু বৎসরের এই 'বিচিত্রা', শ্রোতাদের কিছু না জানিয়ে বন্ধ করাতে সকল শ্রোতাই দুঃখিত হয়েছেন। শ্রোতাদের অভিযোগ, জনমতকে বি বি সি উপেক্ষা করেছেন। বিশেষ করে যখন গত জানুয়ারী মাসে বি-বি-সি বাংলা বিভাগের সংগঠক মিঃ ডেভিড বারলো কলিকাতায় এসে বিচিত্রা শ্রোতাদের আমন্ত্রণ করে বিচিত্রার উন্নতির ও প্রচারের জন্য আলোচনা করেছিলেন এবং পরামর্শ চেয়েছিলেন, তারপর বিচিত্রা তুলে দেওয়া দুঃখের কারণই বটে।

সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক
'বিচিত্রা' লিসনার্স ক্লাব,
কলিকাতা—২৯

সাদা চোখে

ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারী ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টে মতানৈক্য তীব্রতর হয়েছে। ফ্রন্টের দুই শরিক মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ও আর এস পি হাসপাতালের কর্মচারীদের এই ধর্মঘটকে ফ্রন্ট-বিরোধী কাজ বলে ঘোষণা করেছেন। শুধু এই ঘোষণা করে ক্ষান্ত থাকেন নি, অধিকন্তু এই ফ্রন্ট-বিরোধী ও গণ-বিরোধী কার্যকলাপকে দমনের জন্যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট ও আর এস পির পৌরসভার দুজন সদস্য শোভাযাত্রা বের করে ধর্মঘটীদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সোজাসুজিভাবে বলতে গেলে এই 'অন্যায়' ধর্মঘট ভেঙে দেওয়ার জন্য আমজনতাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা হাসপাতালের দরজা অবধি এগিয়ে গিয়েছিলেন। ধর্মঘটী ও শোভাযাত্রীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। হাসপাতালের বাইরে রাস্তায় যেমন ইঁট পাথর, সোডার বোতলের ভগ্নাংশ দেখতে পাওয়া গেছে, সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে দেখা যায় হাসপাতালের অভ্যন্তরেও ইত্যাকারের মালমশলার ছড়াছড়ি। অতএব ঘটনাদৃষ্টে প্রমাণ হয়, দুদলের মধ্যে মারপিট হয়েছিল। এবং ঐ সংঘর্ষের ফলে হাসপাতালের কয়েকজন নার্স যে জখম হয়েছিলেন, খবরের কাগজের ছবিতে তার প্রমাণ আছে। আর যেহেতু কেউ ঐ ছবিকে সাজানো ব্যাপার বলে মনে করেন নি বোধহয় সেজন্যই কেউ প্রতিবাদও করেন নি। শুধু শকে একজন রোগী মরে যাওয়ার ব্যাপারটিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাভাবিক মৃত্যু বলে বিধানসভায় বিবৃতি দিয়েছেন। শোভাযাত্রীদের নেতারা বলেছেন, ধর্মঘটীরাই তাঁদের আক্রমণ করেছিল। অবশ্য তাঁরা কোন প্রত্যুত্তর দিয়েছেন কিনা সে বিষয়ে বিবৃতিতে উল্লেখ ছিল না। কিন্তু অবস্থার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধর্মঘটীদের উপরও আক্রমণ চলেছিল। এবং বোধহয় হাসপাতালে যে প্রতিক্রিয়াশীলদের দুর্গ গড়ে উঠেছিল হয়ত তাকেই চূর্ণ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হয়েছিল প্রত্যাক্রমণ।

হাসপাতালের এই ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে মন্ত্রিসভায় বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। এমন কি বিবেচ্য ৪১টি বিষয়সূচীর মধ্যে মন্ত্রিসভা সেদিন তিনটির বেশী দফা আলোচনা পর্যন্ত করতে পারেন নি। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট ও আর এস পি-র সদস্যরা এক-জোট হয়ে অন্যান্যদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছেন। কম্যুনিস্ট, অবশ্য দক্ষিণপন্থী, সদস্যরা বিশেষ করে সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সরকারকে এই বলেও নাকি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, সরকারের তরফ থেকে যদি কোন বড়রকমের আঘাত হানবার চেষ্টা করা হয় তবে তিনি স্বয়ং হাসপাতালের ধর্মঘটীদের সামনে দাঁড়িয়ে সরকারী আক্রমণ প্রতিরোধ করবেন। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট এম-এল-এ ডাঃ এম এন গনি, পৌরসভার কাউন্সিলার ডাঃ কে পি ঘোষ এবং এস এম পির সদস্য ডাঃ ভূপাল বসু এক যুক্তবিবৃতিতে ধর্মঘটীদের উপর নগ্ন আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বিবৃতির লড়াইয়ের পর পুলিশ ধর্মঘটীদেরই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে 'কারা দোষী' তা সাব্যস্ত করে দিয়েছেন। আর যাঁরা শোভাযাত্রা করে গিয়েছিলেন পুলিশ যখন তাঁদের মধ্যে থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করেনি তখন স্বাভাবিক বলতেই হবে যে তাঁরা দোষী ছিলেন না। বিশ্বনাথবাবুরা হয়ত বলতে পারেন পুলিশ পক্ষপাতিত্ব করেছে। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব করলে পুলিশমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ত আর চুপ করে থাকতেন না। তিনি ত নিশ্চয় এই গর্হিত কাজের জন্য পুলিশকে শাসাতেন। অতএব, এই যে অভিযোগ উঠেছে এতে বিশেষ সত্যতা নেই।

যাহোক, তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধর্মঘট করার পর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়েছে। এবং ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয় সেদিন যেদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ঘোষণা করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী রোগীদের সরিয়ে আনার কথা বলেছিলেন। তবে কি ভাবে সরিয়ে আনবেন কিংবা আনবার জন্য পুলিশের সাহায্য নেবেন কিনা এসব সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। অবশেষে ধর্মঘট মিটল। আমজনতা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কিন্তু এই ধর্মঘট হল কেন? ধর্মঘটের সঙ্গে সকল কর্মচারী যুক্ত ছিলেন কি? হরতালকারীদের দাবী-দাওয়া থেকে দেখা যাচ্ছে, ডাঃ লাহিড়ী নামে একজন ডাক্তারকে ঐ কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট-প্রিন্সিপালের পদে সাময়িকভাবে নিয়োগের প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই এই তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল। ডঃ লাহিড়ী অনেক সিনিয়রকে ডিঙিয়ে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ইউনিয়ন এই নিয়োগের বিরোধিতা করেছিল এবং অবিলম্বে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে নিয়োগের দাবী জানিয়েছিল। তাঁদের এই অনুরোধ রক্ষিত না হওয়াতেই ধর্মঘটের সূচনা। যে সমস্ত ডাক্তারদের দাবীকে অবহেলা করে এই সাময়িক নিয়োগ পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যদপ্তর করেছিলেন, সেই ডাক্তারদের ধর্মঘটে সমর্থন নেই একথা জোর করে বলা চলে না। যদি না থেকে থাকে তবে বলতে হবে যে ঐ ডাক্তাররা অতিমানুষ। কারণ, চাকরীতে প্রমোশনের চেষ্টা স্বাভাবিক। সেই প্রমোশন না পেলে চাকুরেরা 'মা ফলেষু কদাচন' বলে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করবে এমন কথা ভাববারও অবকাশ নেই। আবার ঐ কলেজের ছাত্রদেরও একটি বিশেষ অংশের সমর্থন যে শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘটের পিছনে ছিল তাঁদের মিছিল ও যুক্ত বিবৃতি থেকে তা প্রমাণিত হয়।

কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে তাঁরা অবিলম্বে নূতন লোক নিয়োগের চেষ্টা করছেন। অতএব, ধর্মঘট চালু রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। আর তদন্ত করে শ্রমিকদের সমস্ত অভিযোগের মূলে সত্যতা আছে কিনা তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী এমন কি মুখ্যমন্ত্রীও নাকি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ধর্মঘটীরা নাকি এই অলিখিত প্রতিশ্রুতিতে কর্ণপাত করেন নি। এর পরও দীর্ঘদিন ধর্মঘট চলেছে।

সমস্ত বিষয় আলোচনা করলে দেখা যায় সরকার ধর্মঘটীদের বিষয় বিবেচনা করতে প্রস্তুত ছিলেন এক শর্তে যদি হরতাল আগে প্রত্যাহৃত হয়। না হলে এই ২৩ দিনের ধর্মঘট চলাকালে একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট খুঁজে পাওয়া যায় নি একথা ভাবাও কঠিন। অর্থাৎ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মর্যাদার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে বোধহয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। যুক্তফ্রন্টের শরিকদের, যাঁরা এই ধর্মঘটের পেছনে ছিলেন, তাঁদের বোঝা উচিত তাঁদের একজন মন্ত্রী যদি অন্যায় কাজও করেন ফ্রন্টের খাতিরে তাঁকে জনসমক্ষে কোন মতেই হেনস্তা করা উচিত নয়। কিন্তু এই ধর্মঘটের ফলে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ও আর এস পি শ্রমিক পক্ষ ত্যাগ করে একজন অফিসারের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এ হেন এক অস্বস্তিকর অবস্থায় দুটি শরিককে ঠেলে দিয়ে

অন্যান্যরা ফ্রন্ট-বিরোধিতা করলেন কেন? অবশ্য একথাও বোঝা কঠিন কেন এই দীর্ঘদিনের মধ্যে আর একজন নতুন লোক খুঁজে পাওয়া গেল না। আর ডাঃ লাহিড়ীই যদি যোগ্যতম ব্যক্তি হন তবে তাঁকে সরাবার প্রশ্নও আসে কি করে? কিছু ডাক্তারী-শাস্ত্রে অনধিকারী শ্রমিক-কর্মচারী যদি একটা অন্যায় আবদার করেন তাকেই কি মেনে নিতে হবে?

সরকারী বিজ্ঞাপন ও বক্তব্য থেকে অবশ্য দেখা যায় ডাঃ লাহিড়ীকে সরকার খুব জোরদার সমর্থন জানান নি। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু দুর্গাপুরের ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত শেষ করিয়ে পুলিশদের বরখাস্ত পর্যন্ত করে দিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্রী একজন প্রিন্সিপাল খুঁজে পেলেন না, কিংবা শ্রমিকদের অভিযোগের তদন্তের কোন প্রাথমিক ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে পারলেন না —এ কেমন কথা! অবশ্য শ্রমিকরা তাঁর কথার দাম না দেওয়ার ফলে তিনি যদি ক্ষুব্ধ হয়ে রাগবশত চুপ করে থাকেন সে কথা আলাদা।

আরও তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই ধর্মঘটের জন্য একটি কো-অর্ডিনেশান কমিটি গঠিত হয়েছিল। আর সেই কমিটির সভাপতি ছিলেন পৌরসভার কাউন্সিলার এবং মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা শ্রীহরপ্রসাদ চ্যাটার্জি। ধর্মঘট শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরেই শ্রীচ্যাটার্জি সত্য উপলব্ধি করতে পারেন এবং এই ফ্রন্ট-বিরোধী কার্য-কলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করেন। শুধু মুক্ত করেছেন এমন নয়, নিজে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর পুরনো ত্রুটি অপনোদনের চেষ্টা করেছেন। যদি ধর্মঘটের মধ্যে চক্রান্ত না থাকত তবে শ্রীচ্যাটার্জি কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশান কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করে যেতেন কি? যতই শ্রমিকদরদী হন না কেন, যে শ্রমিক যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করছে তাদের সঙ্গে শ্রীচ্যাটার্জি থাকেন কি করে? সেইজন্যই পদত্যাগ করেছিলেন।

আরও একটি বিশেষ প্রশ্ন এই ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। শ্রমিকরা কলেজের কে প্রিন্সিপাল হবেন না হবেন এ বিষয়ে মাথা ঘামাবেন কেন? তাঁরা তাঁদের নির্ধারিত কাজ করে যাবেন এবং দরকারমত মাইনাকড়ি বাড়াবার জন আন্দোলন করতে পারেন। কিন্তু কেন এই অনধিকার চর্চা তাঁরা করতে গেলেন? অনেকে হয়ত বলবেন, শ্রমিকরা যদি কারখানার অংশীদার হতে পারেন এবং সর্বত্র পরিচালক সমিতির অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন এবং তাতে সমাজবাদের সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেন, তবে এই হাসপাতালের কর্মচারীরা প্রিন্সিপাল নিয়োগের ব্যাপারে মাথা গলাতে পারবেন না কেন? দাবীটা যুক্তিসহ বটে, আবার যুক্তিহীনও বটে। যদি কংগ্রেসী সরকার গদীতে থাকত তবে ধর্মঘটীদের আচরণকে ঠিক বলে পরিগণিত করা যেত।

এমন কি স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেও একজন সরকারবহির্ভূত নেতা হিসাবে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। কিন্তু ধর্মঘটীদের গোড়ায় গলদ হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় আছেন। ফ্রন্ট তার শ্রমনীতি ঘোষণা করে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অতএব, এ হেন অবস্থায় সরকারী হাস-পাতালে লড়াই করে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে কিভাবে এগিয়ে গেছেন তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। যুক্তফ্রন্ট গদীতে আছে বলেই ত পুলিশ তবু পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে শান্তি স্থাপন করেছেন। যদি ফ্রন্ট সরকার না থাকত তবে কি ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোরতর ব্যবস্থা নিত না? অতএব, এ সমস্ত পটভূমিকা জানা সত্ত্বেও ধর্মঘটীরা কি উচিত কাজ করলেন? আর বিশ্বনাথবাবুরাও যে কিভাবে এই শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বন করলেন তা বোঝা মুশকিল। যেখানে শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিরা সরকারী ক্ষমতায় আসীন রয়েছেন, সেখানে শরিক হয়ে তিনি কিভাবে সরকারবিরোধী এই কাজের মদৎ দিলেন তা ভাবা যায় না। অধিকন্তু যেখানে মানুষের জীবনমরণের প্রশ্ন—সেই হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বিশ্বনাথবাবুরা কিভাবে লড়াইয়ের কথা বললেন?

হরতালকারী অনেকে দুঃখ করে বলেছেন, তাঁরা যুক্তফ্রন্টের একান্ত সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁদের দাবীর যৌক্তিকতা থাকা সত্ত্বেও কেউ তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। তাঁরা যেন যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী অন্য কোন শক্তি, এইভাবেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইত্যাদি নেতাগণ তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করলেন। ধর্মঘটী শ্রমিকদের যাঁরা নেতা তাঁদেরই একথা আগে বোঝা উচিত ছিল যে কারা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে পারে। সব শ্রমিক আন্দোলন ত আর জেনুইন হতে পারে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দল আবার যখন ধরে নিয়েছেন যে তাঁদের বেকায়দায় ফেলবার জন্য কিছু শরিক, বিশেষভাবে বিশ্বনাথবাবুরা, সচেষ্ট আছেন তখন ত আর কথাই চলে না। আবার মার্কসবাদীরা যখন সমর্থন জানিয়েছেন, তখন আর এস পির কর্মপন্থা যে যথার্থ একথা নিঃসন্দেহ। আর কয়েকটা দিন চললেই বাংলা কংগ্রেসের শ্রীসুকুমার রায় হয়তো মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করতেন। আর মার্কসবাদীরা যখন আছেন তখনই আর সি পি আই আর ওয়ার্কার্স পার্টিও নিশ্চয় এসে যেত। অতএব, সোজাসুজি ফ্রন্ট দুভাগ হয়ে যেত। কাজেই এহেন ঝুঁকি না নিয়ে ধর্মঘটীদের যাঁরা কাজে যোগদানের বুদ্ধি দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ। তাঁরা শুধু জনতার জীবন-মন্দির যা অচল হয়ে গিয়ে-ছিল তাকে রক্ষা করেন নি, ফ্রন্টকেও একটি উদ্বেগজনক পরিস্থিতি থেকে বাঁচিয়েছেন।

আবার এই অভিযোগও উঠেছে যে সেই ডাঃ লাহিড়ী নাকি মন্ত্রিসভার কারও নিকট আত্মীয়। তবে ধর্মঘটীরা যদি এই কথা সত্যও হয় তা কাজে না লাগিয়ে ভালই করেছেন। এটা একটা শুভবুদ্ধির পরিচায়ক, কেননা ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার যাঁরা সদস্য তাঁদের সকলেরই আত্মীয়স্বজনকে কোন না কোন চাকরী করতেই হবে—তা সরকারী হোক কি আধা-সরকারী হোক, কিংবা বেসরকারী হোক। তাঁদের মধ্যে অনেকেই টেলেন্টেড থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। অতএব, তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা মন্ত্রীত্বে আছেন বলে তাঁরা প্রমোশান পাবেন না এ কেমন কথা। আর আজকাল সিনিয়রিটির একটা কথা উঠেছে। শুধু ঐ গুণটাই যদি প্রমোশানের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে ধরে নিতে হয় তবে যোগ্যতা দক্ষতা—যা বিশেষ করে প্রয়োজন—সে সমস্ত গুণাবলী একেবারে অকালেই চাপাচাপা পড়ে যাবে। অতএব, কোন মন্ত্রীর আত্মীয় হলেই তার ইহকাল-পরকাল নষ্ট হতে হবে এমন কোন কথা আছে কি? তাছাড়া ধর্মঘটীদের স্মরণ থাকা উচিত ছিল ডাঃ লাহিড়ী কারও নিকট আত্মীয় একথা মন্ত্রিসভায় কেউ স্বীকার করে নেন নি। কাজেই তাঁদের আগেই জানা উচিত ছিল যে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীরা কখনো আত্মীয়পোষণ করতে পারেন না।

যাহোক, ধর্মঘট মিটে গেলেও তখনও তার জের রয়ে গেছে। যুক্তফ্রন্টের সভায় নাকি ধর্মঘটীদের যাঁরা ধর্মঘটে প্রবৃত্ত করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবী উঠবে। যে বা যাঁরা এই দাবী তুলুন না কেন—তা শরিকী কোন্দল বাড়াবে বই কমাবে না। আর যাঁরা ধর্মঘটী তাঁদেরও বলি—স্বাস্থ্যমন্ত্রী যখন এতজনের তুলা থেকে ডাঃ লাহিড়ীকে উপরে উঠিয়েছেন তখন নিশ্চয় একটা কিছু কারণ আছে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সবদিক বিবেচনা করেই এই কাজ করেছেন। অতএব, শ্রমিকদের উচিত, যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের উপর আস্থা রাখা। তাঁদের ধর্মঘট ভেঙে দিন, কিংবা বরখাস্ত করুন বা অন্য যে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করুন না কেন, একথা শ্রমিকদের ভুললে চলবে না যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীরা মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি। তাঁরা স্বেচ্ছাকৃত ভুল করতে পারেন না। অন্য কোন যুক্তি দিয়ে লাভ নেই যে যুক্তি ধোপে টেকা মুশকিল।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

রাজধানীর নাটক

রাজধানী নয়াদিল্লীতে রাজনীতির নাটক এত দ্রুত ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যে, ২৪ ঘণ্টা পরে সেই নাটকের কোন্ নতুন দৃশ্যের অবতারণা হবে বলা কঠিন। সুতরাং, এই লেখা প্রকাশিত হওয়ার আগেই সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, একটা চাঞ্চল্যকর সপ্তাহে যা হয়ে গেছে সেটা পরবর্তী সপ্তাহের চাঞ্চল্যকর ঘটনার সামনে তুচ্ছ ইতিহাসে পরিণত হতে পারে। তবে, এটা সম্ভবত নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে বলা যায় যে, ঘটনার গতি আর পিছনে ফিরবে না, অনিবার্যভাবেই সামনের দিকে চলবে।

শ্রীমতী গান্ধী যেদিন তাঁর উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের হাত থেকে অর্থ দপ্তরের ভার নিয়েছিলেন এবং তার প্রতিবাদে শ্রীদেশাই মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন সেই দিনটির কথা মনে আছে? সেটা ছিল রথযাত্রার দিন। জগন্নাথের রথের রশিতে সেই যে টান পড়েছে তারপর রথ চলছেই, কখনও গড়িয়ে গড়িয়ে, কখনও বেগে। ঝড়ের হাওয়ায় ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের তিনটি মাথা উড়ে গেছে—রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি ও স্পীকারের পদ খালি হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবসের ২২তম বার্ষিকী যখন এগিয়ে আসছে তখন রাজনীতির কোন কোন পর্যবেক্ষক এমনকি প্রথম ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি শুনেছেন।

নয়াদিল্লীর ক্ষমতার স্বর্গ থেকে শ্রী দেশাইয়ের বিদায়ের তারিখটি আরও একটি কারণে স্মরণীয়। ঐ একই তারিখে অ্যাপোলো-১১-এর তিন নভশ্চর চাঁদের পথে যাত্রা করেছিলেন। সেও এক রথযাত্রা। মহাকাশের পথে রথযাত্রা। অ্যাপোলো-১১ যেমন একটা নতুন ইতিহাসের সূচনা, শ্রী দেশাইয়ের বিদায় কি তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা? ঘটনার গতি দেখে অন্তত তাই মনে হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপার নিয়ে দলের মধ্যে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল তার ভিতরে মোরারজী ও ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রসঙ্গটা এসেছিল কতকটা প্রক্ষিপ্তভাবে—যদিও সন্দেহ নেই যে, দলের ভিতরে যে ক্ষমতার লড়াই আরম্ভ হয়েছে তারই জের হিসাবে এই সব ঘটনা ঘটছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রতিপক্ষকে নিশ্বাস ফেলার সময় দেন নি। বাঙ্গালোরে শ্রীমতী গান্ধী প্রকাশ্য সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন যে, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ড তাঁর আপত্তি অগ্রাহ্য করে শ্রী সঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন। 'সিন্ডিকেট' গোষ্ঠী যখন তাঁর এই বিবৃতির মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের ইঙ্গিত খুঁজছিলেন তখন শ্রীমতী গান্ধী মোরারজী দেশাইকে মন্ত্রিসভা থেকে বিদায় দিলেন। আবার সিন্ডিকেট যখন শ্রীদেশাইয়ের বিদায় নিয়ে সোরগোল তুলছেন তখন শ্রীমতী গান্ধী আনলেন ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের অর্ডিনান্স।

শ্রীচাবন, শ্রীকামরাজ প্রভৃতি যাঁরা মোরারজী প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে ছিলেন অথচ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রসঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে তাঁরা নিজলিঙ্গাপ্পা, পাতিল, দেশাই প্রভৃতির সঙ্গ ত্যাগ করলেন এবং আর বাড়াবাড়ি করে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস পেলেন না। শ্রীমতী গান্ধী ধূর্ততার সঙ্গে সিন্ডিকেট গোষ্ঠীকে আরও নিরস্ত করলেন এই বলে যে, কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে রাষ্ট্রপতির পদের জন্য তিনি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে সমর্থন করবেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিতান্ত মামুলিভাবে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নিজলিঙ্গাপ্পা ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিজেদের মধ্যে কথা বলে মোরারজী প্রসঙ্গটি মিটিয়ে নিল, এটুকু অভিমত ব্যক্ত করেই ব্যাপারটা চাপা দিয়ে রাখেন। ওয়ার্কিং কমিটির সেই নির্দেশ কার্যকর না করেই কংগ্রেস সভাপতি ছুটি কাটাতে চলে গেলেন ডালহৌসির পাহাড়ে।

ছুটি কাটিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এমন একটি কাজ করলেন যাতে শ্রীমতী গান্ধীর শিবির একটি নতুন অস্ত্র হাতে পেলেন এবং কংগ্রেসের ভিতরকার সংকট একটা নতুন চেহারা পেল। কংগ্রেস সভাপতি স্বতন্ত্র নেতা শ্রীএন জি রঙ্গের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। শুধু শ্রীরঙ্গ নয়, স্বতন্ত্র দলের আরও দুজন নেতা শ্রীমিনু মাসানি ও শ্রীদান্ডেকরের সঙ্গেও তিনি দেখা করলেন। পরে জনসংঘ নেতা শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী ও শ্রীবলরাজ মাধোকের সঙ্গেও তাঁর কথা হল। যদিও বলা হয়েছে যে, শ্রী নিজলিঙ্গাপ্পা ঐ দুই দলের সদস্যদের কাছ থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দ্বিতীয় পছন্দের ভোট পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন তাহলেও শ্রীমতী গান্ধীর অনুরাগীরা ও অন্যান্য অনেকেই এই সাক্ষাৎকারের ঘটনাটিকে ততটা নির্দোষ বলে গ্রহণ করতে পারছিলেন না।

অন্যদিকে, শ্রীমতী গান্ধী ইতিমধ্যে কয়েকটি কাজ করলেন যাতে তাঁর সম্পর্কে তাঁর প্রতিপক্ষ ভীত হতে আরম্ভ করলেন। প্রধানমন্ত্রীর সমর্থনে কম্যুনিস্ট পার্টি ও পার্টির অনুগামীরা সহ বিভিন্ন মহল দিল্লীতে মিছিল ও জনসমাবেশ করতে লাগলেন। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে অনুষ্ঠিত এই ধরনের জনসমাবেশে শ্রীমতী গান্ধী পর পর কয়েকদিন বক্তৃতা দিলেন। এইসব বক্তৃতায় শ্রীমতী গান্ধী অত্যন্ত চড়া সুরে ও প্রায় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গীতে কথা বললেন।

একদিকে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার চেষ্টা স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘের সঙ্গে হাত মেলান আর একদিকে শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থনে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থীদের এগিয়ে আসা, এই দুটি সমান্তরাল ঘটনার বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল ৬ আগস্ট তারিখে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির সভায়। এই সভা ডাকা হয়েছিল শ্রীমতী গান্ধীকে দিয়ে পার্টির সামনে শ্রীরেড্ডির সমর্থনে কবুল করিয়ে নেওয়ার জন্য। শ্রীমতী গান্ধী খুবই ভাসাভাসাভাবে শ্রীরেড্ডির নাম না করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়ার কথা বললেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পারও এই সভায় কংগ্রেস সদস্যদের উদ্দেশে আবেদন জানাবার কথা ছিল। কিন্তু বক্তৃতা করতে ওঠার আগেই সম্পূর্ণ ভিন্ন আর একটি প্রসঙ্গে পার্টির সভায় তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল। মধ্যপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত একজন ইন্দিরা-সমর্থক সদস্য শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের একটি লেখা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললেন। বোম্বাইয়ের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধে শ্রীমতী সিংহ বলেছেন যে, শ্রীমতী গান্ধী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের গদী রক্ষার চেষ্টা করছেন। এই প্রসঙ্গ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির মধ্যে ইন্দিরা-সমর্থক ও ইন্দিরা-বিরোধী শিবিরের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির এই বৈঠকের পর রেড্ডি প্রসঙ্গ ও মোরারজী প্রসঙ্গ, দুইই কতকটা দূরে সরে গেল, সামনে এল শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ বিচারে নতুন প্রশ্নটি।

সপ্তাহখানেক এভাবেই কাটল। শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিপক্ষ এখনও জানেন না যে,

কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী শ্রীরঘু রামাইয়া কলকাতার গার্ডেনরিচ কারখানায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই মাটিকাটা জাহাজকে ('কালরুণ') জলে ভাসান।
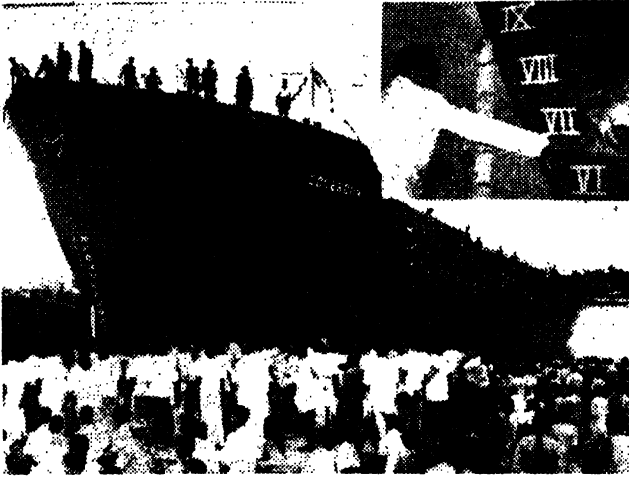
আরও একটি অস্ত্র শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরে মজুত আছে। পার্টির বৈঠকের ছয়দিন পরে ১১ আগস্ট তারিখে সেই অস্ত্র ছাড়া হল। শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভায় দুজন প্রবীণ সদস্য শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ও শ্রীজগজীবনরাম কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নিজলিঙ্গাপ্পাকে পত্র দিয়ে জানতে চাইলেন, তিনি কেন ও কি পরিস্থিতিতে স্বতন্ত্র ও জনসংঘ নেতাদের সংগে দেখা করেছিলেন?

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শ্রীআহমেদ ও শ্রীরামের এই পত্র হচ্ছে শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরের আর একটি আক্রমণাত্মক চালের মুখবন্ধ। শ্রীআহমেদ ও শ্রীরাম বললেন যে, কংগ্রেস সভাপতি স্বতন্ত্র ও জনসংঘ নেতাদের সঙ্গে কথা বলায় কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক চরিত্র বিপন্ন হয়েছে এবং শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে যে ভিত্তিতে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সেই ভিত্তিই নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁরা দাবী করলেন, প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যকে বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হোক, একমাত্র তা হলেই কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন বন্ধ হতে পারে। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পার্টির আরও অনেক সদস্য এই দাবীতে যোগ দিলেন। স্বাধীন ভোটের অধিকার দাবী করে এক পক্ষ এবং দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার দাবী করে আর এক পক্ষ কংগ্রেস এম-পিদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে দিলেন। যাঁরা স্বাধীন ভোটাধিকার চান তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং দলের নেত্রী, শ্রীমতী গান্ধী। কংগ্রেস সভাপতির কাছে লিখিত এক পত্রে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা সরাসরি দাবী না করেও তিনি বললেন যে, তিনি শ্রীরেড্ডিকে ভোট দেওয়ার জন্য দলের সদস্যদের কাছে আবেদন জানাবেন না।

১৯৪৭ সালের ১৪-১৫ আগস্ট মধ্য রাত্রে যে কংগ্রেস দল বিদায়ী বৃটিশ শাসকের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা তুলেছিল সেই দল ২২ বছর পরে আর একটি মধ্যরাত্রিতে এই ধরনের একটা প্রকাণ্ড বিভেদ ও অনিবার্য সংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

চণ্ডীগড়ে সাগরিকা, কলম্বোতে ঝড়

ভারত সরকারের একটি বৃত্তি নিয়ে কুমারী সাগরিকা সিংহল থেকে এসেছিলেন চণ্ডীগড়ে ডাক্তারি পড়ার জন্য।

এটা খবরের কাগজের কোন খবরই হত না যদি না কুমারী সাগরিকার পিতা সিংহলের শিক্ষামন্ত্রী হতেন এবং এই বৃত্তি পাওয়ার ব্যাপারে সে দেশের পার্লামেণ্টে কিছু কথা না উঠত।

ব্যাপারটা নিয়ে কলম্বোতে এমন ঝড় উঠেছে যে, সিংহলী শিক্ষামন্ত্রী মিঃ আই এম আর এ ইরিয়াগোল্লির মন্ত্রিত্ব নিয়ে টান পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং তিনি চণ্ডীগড়ে এসে মেয়েকে নিয়ে গেছেন।

শুধু তাই নয়, ব্যাপারটা ভারত-সিংহল সম্পর্কের উপর ছায়াপাত করতে পারে বলেও আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে।

ঘটনাটা হচ্ছে এইরকম :—

কয়েক মাস আগে ভারত সরকার এদেশে এসে স্নাতক পর্যায়ে পড়াশুনা করার জন্য সিংহলী ছাত্রছাত্রীদের পাঁচটি বৃত্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। যে কয়েক শ' আবেদন পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে একটি ছিল কুমারী ইরিয়াগোল্লির। যেসব ছাত্রছাত্রীকে

ইণ্টারভিউয়ের জন্য ডাকা হয়েছিল তাঁদের মধ্যেও কুমারী সাগরিকার নাম ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, এই সময়ে কুমারী সাগরিকার পিতার দপ্তর অর্থাৎ সিংহল সরকারের শিক্ষা বিভাগ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। কুমারী সাগরিকাকে ইণ্টারভিউ দিতে দেওয়া হল না। [এই বৃত্তিগুলি সিংহল সরকারের শিক্ষা বিভাগের মারফৎই দেওয়া হচ্ছিল।] তারপর মেয়েটি কলম্বোস্থিত ভারতীয় হাই-কমিশনার শ্রীগুণদেবিয়াকে একটি পত্র লেখে। তাতে সে নাকি লেখে যে, তার বাবা তাকে এই বৃত্তি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে দেয় নি? সে প্রশ্ন করে, তার বাবা রাজনীতি করে, এটা এমন কি অপরাধ যেজন্য সে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এইরকম একটা বৃত্তি-লাভের জন্য চেষ্টা করতে পারবে না?

এই চিঠি পেয়ে শ্রীগুণদেবিয়া নয়াদিল্লীতে পত্র লেখেন। যে পাঁচটি বৃত্তি আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল তার উপর ষষ্ঠ আর একটি বৃত্তি শ্রীমতী সাগরিকা ইরিয়াগোল্লিকে মঞ্জুর করতে শ্রীগুণদেবিয়া নয়াদিল্লীকে রাজী করান। ঐ বৃত্তি নিয়েই সাগরিকা চণ্ডীগড়ে প্রি-মেডিক্যাল কোর্সে ভর্তি হন। এই ব্যবস্থায় সকলেই খুশী হলেন। শ্রীমতী সাগরিকার ইচ্ছা পূরণ হল, তার পিতাও নিজেকে এই বলে প্রবন্ধ করতে পারলেন যে, তিনি তাঁর মেয়ের বৃত্তিলাভের জন্য কোনরকম তদ্বির করেন নি, আর ভারত সরকারও প্রতিবেশী দেশের সরকারের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে খুশী করার সুযোগ পেলেন।

কিন্তু যেহেতু সিংহলের রাজনীতিতে মিঃ ইরিয়াগোল্লির শত্রুর অভাব নেই সেহেতু তিনি বিপদে পড়লেন। মিঃ ইরিয়াগোল্লি একজন সুবক্তা এবং মুখফোঁড় লোক। একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর হিসাবে জীবন আরম্ভ করে তিনি অনুবাদক, লেখক ও রাজনীতিক হিসাবেও সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁর কটু মন্তব্যের দ্বারা তিনি সিংহলের প্রভাবশালী বৌদ্ধ মহলকেও চটিয়েছেন। সিংহলের পার্লামেণ্টে তাঁকে চেপে ধরলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী ফেলিকস ডিয়াস বন্দরনায়েক। তিনি অভিযোগ করলেন যে, ভারতীয় হাই-কমিশনার ও শিক্ষামন্ত্রীর কন্যার মধ্যে "একটা গোপন চুক্তি" হয়েছিল এবং সেই চুক্তির বলেই শ্রীমতী সাগরিকা বৃত্তি নিয়ে ভারতে যেতে পেরেছে। ভারতীয় হাই-কমিশনারের অফিসের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল, সাগরিকাকে বৃত্তি দেওয়ার আগে তাঁরা নিয়ম অনুযায়ী সিংহল সরকারের পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা বিভাগের অনুমোদন নিয়েছেন কিনা। হাইকমিশনারের অফিস থেকে বলা হয়েছে যে, তাঁরা ভেবেছিলেন, শিক্ষা বিভাগই মামুলিভাবে পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা বিভাগের অনুমোদন সংগ্রহ করেছেন।

এই ব্যাপার নিয়ে ইতিমধ্যে সিংহলী সংবাদপত্রগুলিতে এমন কিছু মন্তব্য বেরোচ্ছে যা ভারতের পক্ষে বিড়ম্বনাকর।

কিন্তু মিঃ ইরিয়াগোল্লি নিজে ভারতবর্ষে এসে বলেছেন, এই বৃত্তির ব্যাপারে অন্যায় যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে সেই অন্যায় করেছেন তাঁর দপ্তর, ভারতীয় হাই-কমিশনার অন্যায় কিছু করেন নি, তিনি সাগরিকাকে সাহায্য করারই চেষ্টা করেছেন।

মিঃ ইরিয়াগোল্লি ও তাঁর স্ত্রী ভারতবর্ষে এসেছিলেন তাঁদের মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাবা-মায়ের সঙ্গে শ্রীমতী সাগরিকা চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে গেছেন। নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ইরিয়াগোল্লি বলেছেন, তাঁর মেয়ে সিংহলেই পড়াশুনা করবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও তারপর

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের ভেতরে এক প্রচন্ড আদর্শের সংঘাত ঘটে গেল। কংগ্রেস দলের পক্ষে এই সংঘাত শুভ নয়। কংগ্রেসের ইতিহাসে দেখা গেছে এটি একটি সংকীর্ণ দলের মতো কাজ না করে বৃহৎ প্ল্যাটফর্মের মতো বহু ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে যাঁরা মোটামুটিভাবে দলের নীতির অনুগামী হলেও, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে যাঁদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্যও ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এই ধরনের মতপার্থক্য খুব একটা নজরে আসত না। কারণ, দেশের স্বাধীনতা অর্জনই ছিল তখন সকলের মুখ্য লক্ষ্য।

গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে, স্বাধীনতার পর নতুন পটভূমিকায় কংগ্রেসকে কাজ করতে হবে। তাই তিনি কংগ্রেসকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কংগ্রেস একটি অরাজনৈতিক লোকসেবক সংঘে পরিণত হবে। গান্ধীজীর কথা কংগ্রেস নেতারা শোনেননি। তাঁরা কংগ্রেসকেই পার্টি হিসাবে সংগঠিত করে দেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন। স্বাধীনতার কয়েকমাস পরেই গান্ধীজী আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন। কংগ্রেস শাসনভার গ্রহণ করে যেভাবে রাজ্য চালাতে লাগলেন তার সঙ্গে অনেক প্রবীণ সদস্য একমত হতে পারলেন না। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সোস্যালিস্ট দল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে নতুন দল গড়লেন। আচার্য কৃপালনীর নেতৃত্বে গান্ধীবাদীরা বেরিয়ে গিয়ে প্রথমে গড়লেন কৃষক মজদুর পার্টি। পরে তা রূপান্তরিত হল প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিতে। বিনোবাজীর মতো গঠনকর্মী গান্ধীবাদীরা পৃথক হয়ে গেলেন। কমিউনিস্টরা তো অনেক আগেই কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসকে দিয়ে দেশে সমাজতান্ত্রিক ধারায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে হলেন বদ্ধপরিকর। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কথা কংগ্রেস স্বাধীনতালাভের আগেই ঘোষণা করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর সুস্পষ্টভাবে সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে নেহরুজীকে ১৯৬৪ সালের গোড়ায় ভুবনেশ্বর কংগ্রেস অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এর আগে আবাদী কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের কথা মাত্র উল্লেখ করা ছিল।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নেহরুজীর ব্যক্তিত্ব এবং জনপ্রিয়তা কংগ্রেসের ভেতরকার আদর্শের দ্বন্দ্ব চাপা দিয়ে রেখেছিল, তা বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি। তার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে রক্ষণশীল এবং প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর মতভেদ এতটা প্রকাশ্য হয়ে উঠতে পারেনি। নেহরুর শেষ জীবনে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মানুষের সর্বশ্রেণীর উন্নতি সাধন করতে হলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার চেষ্টা মৃদুগতিতে হলে চলবে না। গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ব্রতী হতে হবে। কংগ্রেস পার্টি সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রতিবারের অধিবেশনেই তা পুনর্ঘোষিত হয়।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর দেখা গেল ভারতবর্ষে কংগ্রেসের আর একচ্ছত্র শাসনাধিকার নেই। সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস কয়েকটি রাজ্যে শাসনক্ষমতা হারাল বামপন্থীদের কাছে। উত্তর ভারতে দক্ষিণপন্থী, রক্ষণশীল স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ এবং অকালীরা কংগ্রেসের কাছ থেকে অনেক আসন ছিনিয়ে নিল। সুতরাং কংগ্রেসের সামনে চ্যালেঞ্জ এল দুইদিক থেকে—বিপ্লববাদী কমিউনিস্ট ও বামপন্থী যুক্তফ্রন্টের কাছ থেকে এবং রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী স্বতন্ত্র, জনসংঘ এবং সংকীর্ণতাবাদী ডি এম কে-র কাছ থেকে। ১৯৬৯ সালে মধ্যবর্তী নির্বাচনেও কংগ্রেস তার হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। নীতিগত দৌর্বল্য তো বটেই, গোষ্ঠীগত অন্তর্দ্বন্দ্বও কংগ্রেসকে এমন ছত্রভঙ্গ করতে কম আঘাত দেয়নি।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গেও এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। কংগ্রেসকে মনে রাখতে হবে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব তার হাতে থাকলেও রাজ্যসমূহে তার কর্তৃত্ব আর প্রশ্নাতীত নয়। শুধু ঐতিহ্যের জের টেনে সে আর চলতে পারবে না। তাকে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হতে হবে বলিষ্ঠ কর্মনীতির দ্বারা যা জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হবে। অন্তর্দ্বন্দ্ব, বলা বাহুল্য, তার কাজের প্রতিবন্ধকতাই করবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পর্বের পর আশা করি কংগ্রেস সঠিক পথে নিজের ভবিষ্যতকে চালিত করতে বদ্ধপরিকর হবে।

নচিকেতার জন্য ॥

হরপ্রসাদ মিত্র

অগ্নে বীতরাগ কেন নচিকেতা? এ অনীহা ছাড়ো।
নাচে গানে অপ্সরায় আবেদন নেই অনুভবে?
চলেছ আলোর দিকে? কোটি কোটি নক্ষত্রের দিকে?
জেনেছ শরীর মন আত্মা সবই সমান ব্যাকুল?

বৃষ্টিতে বিষণ্ণ ভোরে আমি এই ছাদের বাগানে
দেখি ভিজে জুঁই, — নীচে নীল নীল ধোঁয়ার কুন্ডলী,
গৃহস্থের গৃহকর্ম শুরু হয় ম্লান ঘরে ঘরে।
বিরক্তি আমার ব্যাধি, বৈরাগ্য তোমার নামাবলী।

লোকাদি-অগ্নির তত্ত্ব গুহায় নিহিত, নচিকেতা।
কখনো তা ভিজে জুঁইয়ে কখনো তা অপ্সরার চোখে—
যতোটুকু দৃশ্যমান ততোধিক সকলি অধরা।
আমি বেঁচে আছি মাত্র, — তুমি জাগো কঠোপনিষদে।

তোমার পথের থেকে ॥

মণিদীপা বিশ্বাস

তোমার পথের থেকে দূরে যেতে গিয়ে
প্রভাতে শোনাবে বলে রেখেছিলে সব মৌন গানের উৎসব
তার সুর কণ্ঠে বেঁধে পথ ধরে হাঁটি
পথপাশে প্রতি বৃক্ষতলে
যে নামে ডাকতে তুমি তার রেশ রেখে রেখে
যে ফুলে সাজাতে তুমি তার পাপড়ি হাওয়ায় ছড়িয়ে
যেতে যেতে দেখি
তোমার মুখের মত স্তব্ধ বনতল
ঢেকে দিল এ পথের ধূলি
আকাশে ভাসুক তবে ম্লান রোদ হয়ে
সেই সব অনন্ত গোধূলী
যা আমার যা তোমার
হাতে হাত রেখে সেই জলের ওপারে চেয়ে থাকা
সবি আজ জলের অতলে ভেসে যাক
আরো যত কথা ছিল চোখে চোখে ফুটেছে নির্বাক
তারো শেষ রেশটুকু ঝোড়োমেঘে উড়িয়ে উড়িয়ে
পথ ধরে যেতে যেতে দেখি
চোখের [illegible]
সে স্বচ্ছ দর্পণে যেন ঐ মুখ কেঁপে ভেঙে যায়।

দুবার বেল টিপতেই দরজা খুলে গেল। অলকা শমিতের দিকে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, একি, আপনি!

শমিত বলল, খুব অবাক হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

—অবাক হব না? একেবারে বিনা নোটিশে—আসুন, ভিতরে আসুন—

অলকা এক পাশে সরে গিয়ে শমিতকে ভিতরে ঢোকার পথ করে দিল।

শমিত ভিতরে ঢুকতেই দরজার খিল দিতে দিতে অলকা বলল, যাক, শেষ পর্যন্ত এলেন তা হলে!

—কেন, আসব না ভেবেছিলেন নাকি?

—বলা যায় না ত! আপনারা আবার কাজের লোক।

শমিত একটু হেসে বলল, ওহ, এই কথা।

অলকা শমিতের প্রায় গা ঘেঁষে এগিয়ে গেল। বলল, ঘরে আসুন।

শমিত ওর পিছনে পিছনে ঘরে গিয়ে ঢুকল। অলকা বোধহয় খুব বেশীক্ষণ আগে স্নান করেনি। ওর চুল থেকে এক ধরনের সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

ঘরটার মাঝখানে এসে শমিত দাঁড়িয়ে পড়ল।

অলকা একটা সোফা দেখিয়ে বলল, বসুন।

শমিত তবু দাঁড়িয়ে রইল।

—কি হল? অলকা শুধোল।

—একটা সুন্দর গন্ধ পাচ্ছি যেন।

—ওহ এই ব্যাপার। অলকা ডান হাত দিয়ে আলুলায়িত কেশগুচ্ছ বুকের উপর নিয়ে এল। বলল, সুগন্ধি কেশ তৈলের গন্ধ পাচ্ছেন।

—খুব দামী বুঝি?

—হুঁ। দেশী নয় বিদেশী—বুঝলেন?

এ বাড়ীটা ফ্ল্যাট বাড়ী। সি-আই-টির ফ্ল্যাট। দুখানা ঘর, কলঘর আর রান্নাঘর

নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। ডাইনিং স্পেসটুকুও বেশ প্রশস্ত। চেয়ার টেবিল সরিয়ে দিব্যি দু-তিনজন লোকের শোয়ার জায়গা হতে পারে।

শমিত দেখছিল পাশের ঘরটায় আবছা অন্ধকার। জানলাগুলো বোধহয় বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দরজার উপর মেরুন রঙের একটা পরদা।

—বাচ্চাটি কোথায়?

—পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে।

—আর বাচ্চার বাবা?

—সে তার ব্যবসার কাজে ভোর সাতটায় বেরিয়ে গেছে।

—ফেরে কখন?

—ঠিক নেই। কোনদিন সন্ধ্যে নাগাদ। আব ক্লাব হয়ে এলে রাত দশটা-এগারোটা হয়ে যায়।

ক্লাবের কথা উঠতেই শমিত বলল, আপনি কাল রিহার্সালে যাননি কেন?

অলকার মুখে অপরাধীর হাসি। বলল, এমনি। শরীরটা ভালো ছিল না।

শমিত বলল, ডাহা মিথ্যে কথা। বলুন দুজনে মিলে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন।

অলকা বলল, সত্যি কথা বলব? কাল অনেকদিন পর বাগবাজারে গিয়েছিলাম। মা অনেকদিন টুটুনকে দেখেনি। তাই মায়ের ওখান থেকে বেড়িয়ে এলাম।

শমিত অলকার এই কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গিটি দেখে বেশ কৌতুক অনুভব করল। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে অলকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। বেশ দেখাচ্ছিল অলকাকে। একটা সোফার উপর দু-হাতের ভর রেখে দাঁড়িয়েছিল অলকা। পরনে একটা হালকা সবুজ রঙের আটপৌড়ে শাড়ী। মিহি কাপড়ের হাত-কাটা শাদা ব্লাউজটা গায়ে যেন এ'টে বসেছে। ওর দুটি সম্পূর্ণ নিরাবরণ পুষ্ট হাত রমণীয় বলে মনে হচ্ছিল। কাঁধের দুটো দিক ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সিঁথির কাছে সিঁদুরের ক্ষীণ রেখা। কপালে সবুজ রঙের টিপ পরেছে। ওর পানের মত মুখে তা মন্দ দেখাচ্ছে না। অলকার গায়ের রঙ ফর্সা নয়, শ্যামবর্ণ। কিন্তু তার রূপে একটা স্নিগ্ধতা আছে।

—কি দেখছেন অমন করে?

অলকার সকৌতুক প্রশ্ন শুনে শমিত একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। বলল, আপনাকে কিন্তু ফাইন দেখাচ্ছে। এ পোশাক আপনাকে বেশ মানিয়েছে।

—এটা কি কমপ্লিমেন্ট?

—নিশ্চয়ই।

—আপনিই কেবল আমার রুচির প্রশংসা করলেন।

—কেন, নারায়ণবাবু করেন না?

অলকার মুখটা যেন কি রকম ম্লান হয়ে গেল। বলল, একসময় করত। এখন আর করে না।

—এই ত একটা ডাহা মিথ্যে কথা বললেন।

—কেন, আপনার মিথ্যে বলে মনে হল কেন?

এবার শমিতের অপ্রস্তুত হবার পালা। সে বুঝল অলকা এখন আর হালকা মেজাজে নেই। সুতরাং তারই ভুল হয়েছে। নিজের অজ্ঞাতসারে সে অপ্রিয় প্রসংগে চলে এসেছে। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্য সে সপ্রতিভভাবে চলতে শুরু করল, আমার এরকম মনে হবার কারণ এই যে আমি যতদূর জানি আপনি এবং নারায়ণবাবু দুজনে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন—

—তাতে কি হল? চিরকাল সবার একই জিনিস ভালো লাগবে এমন কোন কথা আছে?

শমিত বলল, তা হয়তো নেই। কিন্তু তার জন্য ত কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। আপনারা ত যতদূর জানি মাত্র পাঁচ বছর হল বিয়ে করেছেন।

—আপনি বোধহয় বিয়ে করেননি, না?

হঠাৎ এরকম প্রশ্নে শমিত একটু অবাক হল। বলল, না। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

—বিয়ে করলে বুঝতেন স্ত্রী পুরোনো হয়ে যাওয়ার পক্ষে পাঁচটা বছর খুব কম সময় নয়।

শমিত এ কথার আর কোন উত্তর দিতে পারল না। সে নিজের নিবুদ্ধিতায় নিজের উপরই রাগ করছিল। অলকার সংগে বেশ লঘু ভঙ্গিতে কথাবার্তা হচ্ছিল। হঠাৎ সে নিজেই অলকার এমন একটা আপন ক্ষতে আঘাত দিয়েছে যে তার জন্য এখন সে অনুতাপ করছিল। আবার একথা ভেবে অবাকও হচ্ছিল যে নারায়ণবাবু এবং অলকাকে তার যতটা সুখী-দম্পতি বলে মনে হয়েছিল আসলে তারা ততটা সুখী নয়! আশ্চর্য ব্যাপার। বাইরে থেকে মানুষকে দেখে কতটুকুই বা বোঝা যায়? নারায়ণবাবু এবং অলকাকে দেখে সে কি কখনও ভাবতে পেরেছিল ওরা সুখী নয়? সর্বদাই হাসি-খুশি। ক্লাবে যাচ্ছে। আড্ডা মারছে বন্ধু-বান্ধবদের সংগে। নিয়মিত রিহার্সাল দিচ্ছে। অভিনয় করছে। পিকনিকে গিয়ে হৈ-চৈ করছে। দুজনে একসংগে বেড়াতে যাচ্ছে। অথচ—

এমন সময় পাশের ঘরে বাচ্চাটা ঘুমের মধ্যে কে'দে উঠল। অলকা তার পূর্বের বিষণ্ণভাব কাটিয়ে উঠে ঈষৎ হেসে বলল, আপনি বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি।

অলকা মেরুন রঙের পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। অলকার গমন-পথের দিকে শমিত তাকিয়ে রইল। অলকার হাঁটার ভঙ্গিটি খুব ভালো। ওর শরীরের বাঁধুনি এখনও আছে। খুব মোটা নয় আবার রোগাও নয়। মাঝারি গোছের চেহারা। সাধারণ বাঙালী মেয়ের মতই উচ্চতা। শমিত ভাবল, নারায়ণবাবু নিশ্চয়ই অলকাকে খাওয়া-পরায় কষ্ট দেন না। ভদ্রলোক ব্যবসায় ভালোই উপার্জন করেন বলে সে শুনেছে। সব সময়ে দামী সুট পরে থাকেন। অলকা যে সব শাড়ী পরে তাও কম দামী নয়।

শমিত পায়ের জুতো খুলে দুটো পা-ই সোফার উপর তুলে বসল। যদিও ট্রাউজার পরার জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু এভাবে বসে সে বেশ আরাম বোধ করল। আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সে জানলা দিয়ে দুপুরের আকাশটার দিকে তাকিয়ে রইল। এখন ভাদ্রের শুরু। হালকা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। আকাশে শরতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অনেকগুলো এলোমেলো ভাবনা শমিতের মাথায় ভীড় করে এলো। অলকার সংগে ক্লাবে প্রথম আলাপের দিন মনে পড়ল। শমিত এ ক্লাবে যোগ দেবার অনেক আগেই অলকা-নারায়ণবাবু ক্লাবের সভ্য হয়েছেন।

মনে আছে প্রথম যেদিন শমিত ক্লাবের সেক্রেটারী তার বন্ধু প্রশান্তর সংগে রিহার্সাল রুমে এসে হাজির হয় তখন 'বিসর্জনে'র রিহার্সাল হচ্ছিল। অলকা অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করছিল। সেদিন অলকার অনাড়ম্ব, স্বচ্ছন্দ এবং প্রাণবন্ত অভিনয় শমিতকে মুগ্ধ করেছিল। জয়-সিংহের ভূমিকায় যে ভদ্রলোক অভিনয় করছিলেন তিনি অলকার পাশে দাঁড়াতেই পারছিলেন না।

হঠাৎ প্রশান্ত বলল, শমিত তুই জয়-সিংহের রোলটা কর দেখি।

শমিতের তখন মনে হচ্ছিল, প্রশান্ত তাকে এ কি সংকটে ফেলল? ইতিপূর্বে সে পাড়ায় বা কলেজে কয়েকবার অভিনয় করেছে ঠিকই। কিন্তু সেসব নাটক ছিল স্ত্রীভূমিকাবর্জিত। কোন মহিলার সংগে তার কখনো অভিনয় করবার সুযোগ হয়নি।
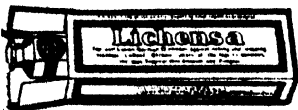
তাই প্রশান্তর এ প্রস্তাবে সে একটু নার্ভাস হয়ে পড়ল। সে বলল, যিনি করছেন তিনিই করুন না।

—তুই এ রোলটা করতে পারবি কিনা বল। এবার প্রশান্তর গলার স্বরটা একটু চড়া বলেই মনে হল।

শমিত এই এতগুলো অপরিচিত লোকের মধ্যে মহা ফ্যাসাদে পড়ল। সে যদি প্রশান্তর প্রস্তাবে অসম্মতি জানায় তাহলে কেউ কেউ তার অভিনয়-ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে পারেন। তাতে অবশ্য শমিতের খুব একটা যায় আসে না। কিন্তু একজন ভদ্রলোক যে রোলে অভিনয় করছেন তাঁকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় আর একজনকে দিয়ে সেই রোলে অভিনয় করানো তার কাছে খুব অস্বস্তিকর বলে মনে হচ্ছিল। এতে যেন ভদ্রলোককে অপমান করা হয়। প্রশান্তকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সে কথা বলতেই সে বলল, ও, এইজন্য সংকোচ হচ্ছে! তাহলে জেনে রাখ রবীন বিসর্জনে অন্য রোলে অভিনয় করছে। ও এ রোলটায় আর একজনের হয়ে প্রক্সি দিচ্ছিল। সুতরাং তোর সংকোচের কোন কারণ নেই।

এরপর আর আপত্তি করা যায় না। সুতরাং সেদিন শমিতকে জয়সিংহের ভূমিকায় রিহার্সাল দিতে হয়েছিল। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ওর আবৃত্তি করার অভ্যেস ছিল। সুতরাং সংলাপ বলায় ওর খুব অসুবিধে হয়নি। অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে সংলাপ বলতে প্রথম প্রথম খুব লজ্জা করছিল। কিন্তু অলকার হাসিতে আচরণে এমন একটা অভয় লুকিয়েছিল যে কয়েক মিনিট পরে সে আর অলকার মুখের দিকে স্পষ্টভাবে তাকিয়ে সংলাপ বলতে লজ্জা পায়নি। এমন কি অলকার দু-কাঁধে তার দুটো হাত রাখতেও কোন সংকোচ হয়নি।

শেষ পর্যন্ত জয়সিংহের ভূমিকায় শমিতই নির্বাচিত হয়েছিল। তারপর বহুদিন বিভিন্ন নাটকে শমিত অলকার অভিনয় দেখেছে। কিন্তু প্রথম দিন বিসর্জনের রিহার্সালে অলকার অভিনয় সে আজও ভুলতে পারেনি। অথচ ঐ নাটকেই নারায়ণবাবু রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অভিনয় শমিতের বিশেষ মনে নেই। শুধু এটুকু মনে আছে, ভদ্রলোক মন্দ অভিনয় করেননি।

সেদিন রিহার্সালের পর শমিত অলকা এবং নারায়ণবাবুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ গিয়েছিল। অলকা বলেছিল, একদিন যাবেন আমাদের বাড়ীতে।

শমিত বলেছিল, নিশ্চয়ই যাবো। যেদিন কোন কাজ থাকবে না—

অলকাকে সেদিন প্রথম দেখে শমিতের ভালোই লেগেছিল।

তারপর কয়েক মাস পার হয়ে গেছে। অলকার বাড়ীতে শমিতের আর যাওয়া হয়নি। ক্লাবে অবশ্য প্রায়ই দেখা হয়েছে। অলকা ঠাট্টা করে বলেছে, খুব গেলেন ত।

শমিত অপরাধীর মত বলেছে, এইবার দেখবেন, একদিন ঠিক চলে যাবো।

অলকা বলেছে, থাক, আর গিয়ে কাজ নেই।

শমিত নারায়ণবাবুর দিকে তাকিয়ে অসহায় ভাবে বলেছে, দেখুন ত মশাই। সংসারে পুরুষমানুষের যে কত কাজ তা এই ভদ্রমহিলাকে কি করে বোঝাই।

নারায়ণবাবু সিগারেটে টান দিতে দিতে বলেছেন, সে চেষ্টা করবেন না। আমিও ওকে বোঝাতে পারিনি—

শেষ পর্যন্ত শমিত বলেছিল, আচ্ছা দেখবেন এবার যাবোই--

—কবে যাবেন বলুন। অলকা যেন জোর করে দিন আদায় করে নেবে!

শমিত বলেছিল, কবে যাবো ঠিক বলতে পারছি না। তবে দু-চার দিনের মধ্যেই যাবো।

তারপর দিন দশ-বারো পার হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ স্কুলে হাফ হলি-ডে হওয়ায় শমিত অলকাদের বাড়ীতে আসবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল।

পাশের ঘর থেকে অলকার গলায় ঘুম-পাড়ানি-ছড়া শোনা যাচ্ছে। ওর এই স্নেহ-শীলা জননী রূপটি শমিতের খুব ভালো লাগছিল।

হঠাৎ শমিতের মনে হল অলকার বাড়ীতে এই ভর-দুপুরে তার একা আসা উচিত হয়েছে কি? একে অলকা বিবাহিতা, তাছাড়া এই দুপুরে যখন তার স্বামী বা অন্য কেউ বাড়ীতে নেই, তখন তার বাড়ীতে আসাটা কি ভালো দেখায়? অলকা ছাড়া এ বাড়ীতে আর যে আছে সে নিতান্তই শিশু। তার কোন বোধ-বুদ্ধিই নেই। ওদের পাশের ফ্ল্যাটে যাঁরা থাকেন তাঁরাই বা কি মনে করবেন? স্বয়ং নারায়ণবাবু জানলেই বা কি মনে করবেন? কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তাকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে। শমিত ভাবল, এভাবে আসাটা তার ভালো হয়নি।

একটু পরে অলকা এ ঘরে এল। বলল, আপনার খুব খারাপ লাগছিল না? এভাবে একা-একা চুপচাপ বসে থাকা।

শমিত বলল, না, বেশীক্ষণ ত একা বসতে হয়নি।

অলকা শমিতের উল্টোদিকে একটা সোফার হাতলের উপর বসল। বলল, এবার আপনার খবর কি বলুন।

—আমার আবার কি খবর থাকবে!

—কোন খবর নেই? অলকা যেন শমিতের উত্তর পেয়ে খুশি নয়।

শমিত বলল, না, কোন খবর নেই। স্কুল-টিউশনি-ক্লাব করতে করতেই সারাটা দিন কেটে যায়। অন্য কথা ভাববার সময় কোথায়!

—আপনি দেখছি সত্যিই কর্মব্যস্ত। অলকার মুখে পরিহাসের হাসি।

—আপনি আমার সম্বন্ধে কি ভেবেছিলেন? খাই-দাই আর নাটক করে বেড়াই, না?

—না, তা ভাবিনি। তবে আপনাকে দেখে মনে হয়নি যে আপনাকে সারাদিন এত পরিশ্রম করতে হয়।

শমিত ডান হাতের পাঁচটি আঙুল দেখিয়ে বলল, আমার আয়ের উপর পাঁচজন মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে জানেন?

এতক্ষণ অলকার মুখে যে পরিহাসের হাসি লেগেছিল সেটা অপসৃত হল। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় বলল, আজ স্কুল ছিল না? এলেন কি করে?

—হাফ হলিডে হয়ে গেল। ভাবলাম কি করা যায়। তারপর মনে পড়ল আপনাকে কথা দেওয়া আছে। তাই চলে এলাম।

অলকা একটা হাই ছাড়ল।
শমিত বলল, ঘুম পাচ্ছে?

—পেলেও উপায় কি! একজন ভদ্রলোককে বসিয়ে রেখে ত আর ঘুমোনো চলে না। অলকা আবার পরিহাসের সুরে বলল।

—একথা আগে বললেই হত। আমি চলে যাচ্ছি—বলেই শমিত কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—আরে, আপনি সত্যি সত্যি চললেন নাকি—বলতে বলতে অলকা শমিতের কাছে চলে এল।

শমিত হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল, না, আপনি ঠাট্টাও বোঝেন না।

অলকা লজ্জা পেল। বলল, আপনি যেরকম রেগে-মেগে উঠে দাঁড়ালেন! আমি ভাবলাম এই চললেন বুঝি।

শমিতের খুব কাছে এখন অলকা দাঁড়িয়ে আছে। হাতের নাগালের মধ্যে। অলকার কাঁধের আঁচল একটু সরে গেছে। ওর গ্রীবা এবং কাঁধ বেশ মসৃণ। ওর মাথায় চুল থেকে সেই মিষ্টি গন্ধটা এখন আরও বেশি করে নাকে এসে লাগছে। শমিতকে কি রকম একটা নেশা আচ্ছন্ন করছিল। কিন্তু সে কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তারপর সে নিজেই সমস্ত পরিবেশটাকে লঘু করে দেবার জন্য বলল, আপনি পাগল হয়েছেন? আমি বামুনের ছেলে। কারো বাড়ী থেকে কিছু না খেয়ে যেতে পারি না।

অলকা এবার খুব লজ্জা পেল। বলল, ছি-ছি কথায় কথায় সব ভুল হয়ে গেছে। কি খাবেন বলুন। চা না কফি?

এবার শমিতের লজ্জা পাবার পালা। সে বলল, আপনি বসুন ত। আমার খিদে পায়নি।

—বাঃ আপনি স্কুল থেকে এসেছেন। আমার নিজেরই আগে খেয়াল করা উচিত ছিল।

শমিত বলল, এবার তাহলে আমি সত্যি সত্যি চলে যাবো।

অগত্যা অলকা আর ও প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করল না। সে সোফায় বসে পড়ল। শমিত আর একটা সিগারেট ধরাল। অলকার দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করে বলল, চলবে?

অলকা বলল, আপনাদের পাল্লায় পড়ে দেখছি সব নেশাই ধরতে হবে।

শমিত প্যাকেটটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, কেন, আর সব নেশা করা হয়ে গেছে নাকি!

—নেশা নয়, তবে স্বাদ গ্রহণ হয়েছে।

শমিত কৌতূহলী হয়ে উঠল। বলল, কিসের স্বাদ গ্রহণ হয়েছে?

—অমৃতের। অলকার ঠোঁটে ম্লান হাসি।

শমিত বিস্মিত হল। বলল, মদ খেয়েছেন আপনি? কতটা?

—বেশী খাইনি। মাত্র এক পেগ ব্র্যান্ডি খেয়েছি।

—কবে খেলেন?

—এই ত পরশু ওর এক বন্ধু এসেছিল আসানসোল থেকে। রাত্রে এখানে ছিল। সেই নিয়ে এসেছিল এক বোতল।

—আপনি খেলেন? ভয় করল না?

—কি করব বলুন। স্বয়ং পতিদেবতা গ্লাসটা হাতে তুলে দিলেন। বললেন, আজকাল নাকি উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক মেয়েই মদ খায়। এটাই নাকি এখন ফ্যাশন।

শমিত উত্তেজিত ভাবে বলল, সেজন্য আপনাকেও খেতে হবে?

—না খেলেই বরং আমি ব্যাক-ডেটেড হয়ে যেতাম।

শমিত ভাবল, নারায়ণবাবু খুব অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ত! বাইরে থেকে ভদ্রলোককে দেখে তার ভালোই লেগেছিল। বেশ মিশুকে। শিক্ষিত। মার্জিত রুচির লোক। অথচ তিনিই স্ত্রীর হাতে মদের গ্লাস তুলে দেন!

কি ভাবছেন? অলকা শমিতের দিকে একটু ঝুঁকে শুধোল।

শমিত একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, না, কিছু না।

—আপনি কোনদিন মদ খেয়েছেন?

—না।

—কেন?

—আমার ভালো লাগে না। শমিত সত্যি কথাই বলল।

—তাছাড়া আপনার বাড়ীর লোকেরা জানলেই বা কি বলবে, না?

—হ্যাঁ, তাও ঠিক। তারপর একটু ঠাট্টার সুরেই বলল, আমার বাড়ীর লোকেরা ত আপার ক্লাশের লোক নন। নিতান্তই নিম্ন মধ্যবিত্ত।

অলকা বলল, আমাকেও আপনি আপার ক্লাশের লোক ভাববেন না। আমার মা-বাবাও আপার ক্লাশের লোক নন। নিম্ন মধ্যবিত্ত।

—কিন্তু আপনার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা ত তা নন।

অলকার মুখটা যেন কি রকম বিষণ্ণ হয়ে গেল। বলল, হ্যাঁ, আর সেজন্যই ত আমাকেও সেই সোসাইটির একজন হবার জন্য চেষ্টা করতে হচ্ছে।

শমিত পরিহাস করে বলল, ভালোই ত। আপনার প্রমোশন হচ্ছে।

—তার জন্য যে চড়া দাম দিতে হচ্ছে সে খবরটা কেউ রাখে না।

শমিত বলল, না বললে জানবো কি করে। আমরা ত মুনি-ঋষি নই।

অলকা প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যই যেন বলল, আপনার এসব না শোনাই ভালো। তারপর একটু থেমে বলল, আসলে আমাকে নিজেরই ভুলের মাশুল দিতে হচ্ছে।

শমিত ভাবল, অলকা কি নারায়ণবাবুকে বিয়ে করাটা ভুল বলতে চাইছে? অথচ এই অলকাই একদিন বাড়ীর অমতে নারায়ণবাবুকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল।

হঠাৎ সমস্ত পরিবেশটা যেন বিষণ্ণ হয়ে এল।

অলকা উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনি বসুন। আমি আপনার জন্য চা করে নিয়ে আসি।

শমিত এবার আর বাধা দিল না। একা বসে বসে কিছুক্ষণ খবরের কাগজটায় মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু মন বসল না। বারবার একটা কথা মনে হচ্ছিল, অলকা এত অসুখী? অথচ ক্লাবে বা অন্যত্র যেখানেই তার সঙ্গে অলকার দেখা হয়েছে সে কি মুহূর্তের জন্যও ভাবতে পেরেছে যে অলকা অসুখী? সব সময় সে এত উচ্ছল, প্রাণবন্ত যে তাকে দেখে ক্ষণিকের জন্যও মনে হয়নি যে তার এই হাসির পিছনে অশ্রুজল লুকিয়ে আছে। আর চশমা-চোখে ছিপছিপে চেহারার লাজুক স্বভাব নারায়ণবাবুকে দেখে ত আদৌ কিছু বুঝবার উপায় নেই।

শমিতের এভাবে একা বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। সে উঠে ঘরটার চারপাশে একটু ঘুরে বেড়াল। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারগুলোর দিকে তাকাল। সব কটিই বিদেশী কোম্পানীর। প্রত্যেকটিই সুদৃশ্য। নারায়ণবাবুর রুচির প্রশংসা করতেই হয়। উত্তর দিকের দেয়ালে নারায়ণবাবু এবং অলকার একটা ফটো টাঙানো আছে। বোধহয় সদ্য বিয়ের পর ফটোটা তোলা হয়েছে। তখন দুজনেরই বয়স আরও কম ছিল। ফটোটা দেখে শমিতের ঠোঁটে একটা হাসি উঠেই মিলিয়ে গেল। পূবে দিকের দেয়ালেও কয়েকটা ফটো টাঙানো আছে। অধিকাংশই ওদের একমাত্র সন্তান টুটুনের। টুটুনের অন্নপ্রাশনের সময়ের কয়েকটা ফটো টাঙানো আছে। একটাতে টুটুন মাথায় টোপর দিয়ে বসে আছে। মুখে কপালে চন্দনের ফোঁটা। আর একটাতে টুটুন মাথায় টোপর দিয়ে চেলি পরে মায়ের কোলে বসে আছে। এ ছাড়া আছে টুটুনের বিভিন্ন বয়সের তোলা কতকগুলি ছবি। কোনটায় টুটুন হামাগুড়ি দিচ্ছে, কোনটায় মুখের মধ্যে একটা আঙুল পুরে বসে আছে। কোনটাতে টুটুন

জন্মদিনের পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে। আবার কোনটাতে হালআমলের বাচ্চাদের মত টুটুন সৈনিকের পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় টুপি, হাতে খেলার বন্দুক। একটা ছবিতে নারায়ণবাবুকে দেখা গেল। টুটুনকে কোলে নিয়ে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

ফটো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে শমিত বুক-কেসটার দিকে তাকাল। বুক-কেসটাতে নামী এবং দামী ইংরেজী উপন্যাসের পাশে সাম্প্রতিক কালের খ্যাতনামা লেখকের বাংলা উপন্যাসও মিলে মিশে আছে। দুটো হাতির দাঁতের তৈরী বক বুক-কেসটার উপরে দেখা গেল। টিপয়ের উপরে একটি ঝিনুকের অ্যাসট্রে শমিতের নজরে পড়ল।

—এই, এদিকে আসুন।

অলকা একটা প্লেটে কয়েকখানা লুচি বেগুনভাজা এবং একটা কাচের বাটিতে ডিমের তরকারি এনেছে।

শমিত বলল, করেছেন কি! এত খাবে কে! এ যে দেখছি এলাহি ব্যাপার!

অলকা ওর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে টিপয়টার উপর লুচির প্লেট আর তরকারির বাটিটা রাখতে রাখতে বলল, আপনি খান। আমি কফি নিয়ে আসছি।

তারপর শমিতকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

শমিত ওকে শোনাবার জন্য জোরে জোরেই বলল, আপনার প্লেট কোথায়? আমি রাক্ষসের মত একা-একা এত খেতে পারবো না।

অলকা রান্নাঘর থেকে জবাব দিল, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। লুচিগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

শমিত বলল, আপনি না খেলে আমিও খাবো না।

টিপয়ের উপর খাবার পড়ে রইল। শমিত একটা বিলিতি সিনেমার ম্যাগাজিন টেনে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টাতে লাগল।

একটু পরেই অলকা দু কাপ কফি নিয়ে এ ঘরে ঢুকল। টিপয়ের উপর কাপ দুটো রেখে শমিতের মুখোমুখি একটা সোফার উপর বসে একটা কাপ নিজের দিকে টেনে নিল। শমিত কিন্তু তখনও পত্রিকার পাতা ওলটাচ্ছিল।

—লুচিগুলো কি ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য তৈরী করা হয়েছে? অলকা নিজের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে বলল।

শমিত তখনও পত্রিকার পাতা থেকে মুখ না তুলে বলল, আমি ত বলেছি, আপনি না খেলে আমি খাব না।

—আমার খিদে পায়নি। অলকার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

—তাহলে আমারও খিদে পায়নি। শমিত পত্রিকার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই জবাব দিল।

—আপনি বড্ড জ্বালান— বলে অলকা কাপটা রেখে উঠে দাঁড়াল। এবার শমিত অলকার দিকে না তাকিয়ে পারল না। অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে সে ওর প্রকৃত মনোভাবটা বোঝবার চেষ্টা করল। কিন্তু অলকার মুখ স্পষ্টভাবে দেখা গেল না। তার আগেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

একটা প্লেটে দু-খানা লুচি এবং বেগুনভাজা নিয়ে অলকা ফিরে এল। তারপর শমিতের সামনের সোফায় বসে বলল, নিন্, এবার খান।

শমিত বলল, আপনার জন্য তরকারি আনলেন না?

—আমি ডিম খাই না—

—কেন?

—এলার্জি আছে।

অগত্যা শমিত আর কথা বাড়াল না। সে লুচির প্লেটটা টেনে নিল। তার সত্যি খুব খিদে পেয়েছিল।

এক সময় কফি খাওয়া শেষ হয়ে গেল। শমিত আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। অলকা চুপচাপ বসে ছিল।

শমিত বলল, আজ ক্লাবে যাবেন না?

—না। অলকা সংক্ষেপে উত্তর দিল।

আবার কিছুক্ষণ দুজনে নিঃশব্দে বসে রইল। বাইরে বেলা পড়ে আসছে। রোদের তেজও কমে আসছে। সারাটা দুপুর ঝিম মেরে থাকার পর গোটা শহরটা যেন জেগে উঠেছে।

হঠাৎ অলকা নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, গান শুনবেন? রেডিওগ্রামটা চালাবো?

শমিত ঈষৎ হেসে বলল, শুনতে পারি। কিন্তু একটা শর্তে—

অলকা সুন্দরভাবে হেসে বলল, কি?

—আপনি যদি গান শোনান তাহলে শুনতে পারি।

—আমি গাইতে জানি না। অলকার মুখে দুষ্টুমির হাসি, দৃষ্টিতে চপলতা।

শমিত প্রায় ধমক দেবার ভঙ্গিতে বলল, ফের মিথ্যে কথা! আমি আপনার গান শুনিনি?

অলকা বিস্মিতের ভান করে বলল, তাই নাকি? কোথায় শুনলেন?

—ক্লাবের ফাউণ্ডেশন ডে-তে। রামমোহন লাইব্রেরী হলে।

অলকা এবার হার মানল। তার মুখ দেখে বোঝা গেল যে, সে ধরা পড়ে গেছে। সে পরিহাসের ভঙ্গিতে বলল, আপনার আব্দার কম নয়! আপনাকে একা শোনাবার জন্য আমাকে গান গাইতে হবে!

শমিত সোফার পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে বলল, তা বিশেষ কাউকে আনাতে গেলে আলাদাই শোনাতে হয়। ভীড়ে চলে না।

অলকা চোখ দুটো বড় করে বলল, আচ্ছা! তাই নাকি! তারপর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, বেশ শোনাবো। কিন্তু একখানা।

—আগে শুরু করুন ত। তারপর কখানা হয় দেখা যাবে।

অলকা বিনয় প্রকাশ করে বলল, গাইছি। কিন্তু ভালো না লাগলে হাসতে পারবেন না।

শমিত এ কথার কোন উত্তর দিল না।

অলকা মিনিট দুয়েক চুপ করে রইল। বোধ হয় কোন্ গানটা গাইবে তা ঠিক করে নিল। তারপর শুরু করল, ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই। অলকা প্রথমে শুরু করল আস্তে আস্তে কিন্তু কিছু দূর এগোতেই ওর গলা যেন খুলে গেল। শমিত সোফার গায়ে হেলান দিয়ে দৃষ্টিটা জানলার বাইরে প্রসারিত করে দিল। শরতের নীল আকাশ, আকাশের বুকে খণ্ড খণ্ড হাল্কা শাদা

মেঘ, পড়ন্ত রোদের মরা-আলো—এসব তার চোখে পড়ছিল। কিন্তু সে কিছুতেই মনোনিবেশ করতে পারছিল না। সে নিবিষ্ট মনে অলকার গান শুনছিল।...আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া তোমারে পরানু বাস......আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি তোমার পুরাতে আশ। গান শুনতে শুনতে শমিত ভাবছিল, আচ্ছা, অলকা এ গানটা বেছে নিল কেন? আরও কতো গান ত ওর জানা আছে। এ গানটা যেন পরিবেশকে বড় বিষন্ন করে তোলে। শমিত শুনছিল অলকা গাইছে......হেরো মম প্রাণ মন যৌবন নব...করপুট তলে পড়ে আছে তব...ভিখারি আমার ভিখারি, হায়, আরো যদি মোরে কিছু দাও, ফিরে আমি দিব তাই......ওগো কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ আরো কী তোমার চাই...।

গান শেষ হলে অলকা বলল, কেমন লাগল?

শমিত আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, ফাইন। এক্সেলেণ্ট।

—যাঃ। আপনি মিথ্যে বলছেন।

শমিত সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, বিশ্বাস করুন। একটি অক্ষরও মিথ্যে নয়।

অলকা এই অপ্রস্তুত প্রশংসায় বিমূঢ় হয়ে গেল। সে কোন কথা না বলে চুপ করে রইল।

—কিন্তু ম্যাডাম, একখানা গান শুনে ত আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না।

—তেমন ত কথা ছিল না।

শমিত বলল, গান গাইতে বসে কেউ হিসেব করে? যা মনে আসে গেয়ে যাবেন। দুখানা হক, তিনখানা হক—যা ইচ্ছে।

অলকা বলল, আমি আর একখানা গাইছি। কিন্তু এই-ই লাস্ট্।

—আপনি বড্ড হিসেবী।

অলকা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে বলল, হবে। মেয়েদের স্বভাবইত হিসেব করে চলা।

তারপর সহজ ভঙ্গিতে বলল, কি গাইবো বলুন।

শমিত এবার বিপদে পড়ল। সে বলল, দেখুন আমি কমার্সের মাস্টার। গানের কথা আমার মনে থাকে না। শুনতে ভালো লাগে—তাই শুনি। তারপর ভুলে যাই।

অলকা বলল, বেশ তাহলে শুনুন। একটু ভেবে অলকা শুরু করল, আমার নয়নভুলানো এলে।

শমিত মুগ্ধ হয়ে সমস্ত গানটা শুনল। তারপর গান শেষ হবার পর বলল, আপনার বিরুদ্ধে আমার একটা সিরিয়াস অভিযোগ আছে।

অলকা বিস্মিত হয়ে বলল, কি অভিযোগ?

আপনার এত ভালো গানের গলা। আপনি গানের চর্চা ছেড়ে দিলেন কেন?

—ও, এই অভিযোগ। অলকা বিষয়টা লঘু করে দিতে চাইল।

—না ব্যাপারটা আপনি যত সহজে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। আপনি আবার গান শেখা শুরু করুন।

অলকার মুখটা করুণ হয়ে গেল। সে বলল, শমিতবাবু আপনি ত বিয়ে করেন নি। বিয়ে করলে দেখবেন একজনের ইচ্ছে অনুযায়ী সব কাজ চলে না। যে ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মত নেই সেখানেই গণ্ডগোল বাধে। সংসারে অশান্তি হয়। গান শেখা নিয়ে যদি পারিবারিক অশান্তি বাড়ে তাহলে কে আর সেধে অশান্তি বাড়াতে চায়।

শমিত সব কথা বুঝল। সে আর কথা বাড়াতে চাইল না। এই মুহূর্তে অলকার মুখটা তার খুব করুণ আর বিষন্ন মনে হচ্ছিল।

সমস্ত ঘরটায় এখন বিকেলের ম্লান আলো। এতক্ষণ রোদের যে ক্ষীণ আভাটুকু ঘরে আসছিল এখন তাও নেই। বিকেল। বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। শমিত হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল পাঁচটা বেজে গেছে।

—আমাকে এখন উঠতে হবে।

—এত তাড়াতাড়ি। কোথায় যাবেন?

—টুইশনি আছে।

—কত আয় করেন? বড়লোক হয়ে যাবেন যে?

শমিত জুতোয় ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলল, আছেন সুখে। কত ধানে কত চাল তা বুঝবেন কি করে?

অলকা একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল, হুঁ, খুব সুখে আছি।

শমিত উঠে দাঁড়াল। বলল, চলি।

অলকা শমিতকে এগিয়ে দেবার জন্য ওর পিছু পিছু দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এল। বলল, আপনাকে টুইশনি কামাই করে কি করে আড্ডা দিতে বলি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে দু-তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে টেরও পাইনি।

শমিতের গলাও আবেগে যেন জড়িয়ে এল। বলল, আমিও কি টের পেয়েছি! এরকম আড্ডা ছেড়ে যেতে আমারও মন চাইছে না। কিন্তু কি করব বলুন, ছেলে পড়াতে না গেলে চাকরি থাকবে না।

অলকা সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল, সত্যি, আপনাদের খুব কষ্ট, না? সারাদিন স্কুলে পড়িয়ে তার পর আবার টুইশনি—

—একেই বলে জীবন-সংগ্রাম— বুঝলেন?

—আজ ক্লাবে যাবেন না?

—দেখি যদি টুইশনি সেরে সময় পাই তাহলে যাবো।

দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া এ ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। অলকা এখন শমিতের বড় কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এত কাছে যে ওর প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধটাও নাকে এসে লাগছে।

—আসবেন কিন্তু মাঝে মাঝে। সারাটা দিন একা থাকতে হয়, এত খারাপ লাগে—

শমিত তখনও সেই মিষ্টি গন্ধটায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। আর ভাবছিল, মাঝখানে এক হাতেরও ত ব্যবধান নেই। অথচ সেটুকু ঘুচিয়ে দেওয়া কি এতই কঠিন?

—কই, কিছু বলছেন না যে। কথা দিন আসবেন—

হঠাৎ শমিতের ইচ্ছে হল অলকাকে বুকের ভিতর টেনে নেয়। তারপর তার শরীরটাকে দলে-পিষে তছনছ করে দেয়।

নিজের অজ্ঞাতসারেই শমিত হাতটা প্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন সময় পাশের ঘর আর এ ঘরের মাঝের পরদাটা নড়ে উঠল। আর একটু পরেই পরদা সরিয়ে দু চোখ রগড়াতে রগড়াতে টুটুল এ ঘরে এসে দাঁড়াল। অস্ফুট স্বরে ডাকল, মা-মণি।

টুটুল এ ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শমিতের বিমূঢ় চেতনা যেন আবার জেগে উঠল। সে যেন ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠল।

আমার খিদে পেয়েছে মা-মণি। টুটুনের কথার মধ্যে আব্দারের ভংগি আছে।

—এই ত সোনা। তোমাকে এক্ষুনি খেতে দেবো।

অলকা টুটুনকে কোলে তুলে নিল। এখন তার সম্পূর্ণ অন্য রূপ। একটু আগের অলকাকে যেন চেনা যায় না।

শমিত দরজা খুলে প্যাসেজে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, চলি। অলকা টুটুনকে কোলে নিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল।

—আচ্ছা, আসবেন কিন্তু।

শমিত সংক্ষেপে উত্তর দিল, আসবো।

—টুটুন, কাকুকে টা-টা করে দাও।

টুটুন সদ্য ঘুম থেকে ওঠা চোখে শমিতকে দেখছিল।

অলকা বলল, টা-টা করে দাও কাকুকে।

এবার টুটুন ডান হাতটা ঈষৎ উঠিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, টা-টা—

অলকা বলল, বলো, আবার এসো।

টুটুন মায়ের কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, আবার এসো।

শমিত টুটুনের গালে আদরের ভংগিতে হাত বুলিয়ে বলল, আচ্ছা, আসবো।

রাস্তায় পা দিয়েই শমিত প্রথমেই সংকল্প করল যে, সে আর কোনদিন দুপুরে অলকার সঙ্গে একা দেখা করতে আসবে না। তার মনে হল, সে যেন একটা প্রকাণ্ড অতলস্পর্শী খাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর একটু হলেই সে সেই খাদটার মধ্যে পড়ে যেত। কিন্তু টুটুন এসে তাকে মহা-পতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এর পর দুপুরে যদি সে অলকার সঙ্গে একা দেখা করতে আসে, সেদিন যে টুটুনের ঘুম ভাঙবেই এ কথা কে বলতে পারে? যদি টুটুনের ঘুম না ভাঙে তখন?

॥ ষোল ॥

কংগ্রেসের তথাকথিত দক্ষিণপন্থী নেতাদের ধারণা ছিল আটটি প্রদেশের গভর্ণমেন্ট যেভাবে হস্তগত হলো কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টও সেইভাবে কুক্ষিগত হবে। গভর্নরদের মতো বড়লাটও হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবেন। মুসলিম লীগকে গোটাকয়েক আসন ও দপ্তর ছেড়ে দিলেই চলবে। তা বলে তার হাতে ভীটো থাকতে দেওয়া হবে না। ভোটাভুটিতেও তাকে সমান ওজন দেওয়া অসম্ভব। কাস্টিং ভোট বড়লাটের হাতে কিছুতেই নয়।

কী মধুর স্বপ্ন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্বপ্ন ছিল যে অত সহজে ওসব হবার নয়, ওর জন্যে আবার একটা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। যার নেতা মহাত্মা গান্ধী। যাঁর নীতি অহিংসা। যাঁর পদ্ধতি সত্যাগ্রহ। অথবা যেতে হবে সম্ভবপর এক মহাযুদ্ধের ভিতর দিয়ে। যার একপক্ষে ব্রিটেন ও তার ডোমিনিয়ন-সমূহ। ডোমিনিয়ন না হলেও ভারত যার পক্ষভুক্ত। স্বাধীনতার প্রশ্নে বোঝাপড়া হলে কংগ্রেসও যার সঙ্গে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ। মহাত্মা কিন্তু আবদ্ধ নন।

একদিন সত্যি সত্যি মহাযুদ্ধ বেধে যায় ও ব্রিটেনের মতো ভারতও যুদ্ধঘোষণা করে। কিন্তু সে কোন ভারত? ভারতীয় প্রজাপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বৈদেশিক রাজপুরুষদের দ্বারা শাসিত ব্রিটিশ সরকারের পলিসিবাহক ভারত।

গান্ধী ভালো করেই জানতেন যে যুদ্ধকালে ব্রিটেন এমন কোনো পরিবর্তনে সম্মত হবে না যার ফলে পলিসিটাই যুদ্ধবাদী না হয়ে শান্তিবাদী হতে পারে, সহিংস না হয়ে অহিংস হতে পারে। ইংরেজদের বদলে ভারতীয়দের দিয়ে যুদ্ধকালীন সরকার গঠন করা অসম্ভব নয়, কিন্তু তার অনিবার্য শর্ত হবে যুদ্ধকার্যে সক্রিয় সহযোগিতা। ধন জন রসদ জোগানো। পরিবর্তে দেশের লোক কী পাবে? স্বাধীনতা? ব্রিটেন যদি যুদ্ধে হেরে যায় ভারতও তো হেরে যাবে। তখন স্বাধীনতার প্রশ্ন আবার সাত হাত জলে। জিতলেও কি ব্রিটেন কথা রাখবে।

ব্রিটেনের বিপদে সহানুভূতি জানানো এক কথা, আর বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করা আরেক। কে জিতবে কে হারবে কেউ সেটা বলতে পারে না। নাৎসীবাদ যদি হারে সাম্রাজ্যবাদ জিতবে। সাম্রাজ্যবাদ যদি হারে নাৎসীবাদ জিতবে। একটা মন্দের জায়গায় আরেকটা মন্দ জিতবে। মন্দের বদলে ভালোর জয় কোথায় যে ভারতের ছেলেদের প্রাণ দেওয়া সার্থক হবে। ভালোর জয় না হয়ে পরাজয় হলে তার জন্যে মরে সার্থকতা আছে। গান্ধীজী তাই সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ত হন। সহযোগিতার আশ্বাস দেন না। অপরপক্ষে যুদ্ধরত সরকারকে বিব্রত করতেও কুণ্ঠিত হন। সত্যাগ্রহের আভাস থাকে না তাঁর কথায়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

সহযোগও নয়, সত্যাগ্রহও নয়, বিশুদ্ধ অসহযোগ এই যদি হয় গান্ধীনীতি তবে এতে কংগ্রেসের বাম দক্ষিণ উভয় অঙ্গের আপত্তি ছিল। যুদ্ধকালে যুদ্ধ না করে তাঁরা ছাড়বেন না। হয় সেটা হিটলারের সঙ্গে সশস্ত্র সমর, নয় সেটা ইংরেজের সঙ্গে নিরস্ত্র সংগ্রাম। হয় তাঁরা নাৎসীদের গ্রাস থেকে দুনিয়াকে রক্ষা করবেন, নয় তাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে ভারতকে উদ্ধার করবেন। যুদ্ধকালে শান্তিতে থাকবেন না, শান্তিতে থাকতেও দেবেন না।

বলা বাহুল্য হিটলারের সঙ্গে সশস্ত্র সমর চালাতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারটা হাতে আনা চাই তাহলে প্রথম কাজই হয় সাম্রাজ্যবাদীদের হটানো। কিন্তু তাহলে যে আবার উল্টো বুঝলি রাম। ওরা বুঝবে যে এরা আসলে হিটলারেরই পঞ্চম বাহিনী। আর গান্ধীজীও তেমন কর্মে নেতৃত্ব দেবেন না। যুদ্ধকালে ইংরেজকে তাড়াতে গেলে ওরাও প্রতিশোধ নেবে।

কংগ্রেস কর্তারাও ভারত সরকারকে ঘাঁটাতে চান না। তাঁরা চান এমন একটা বন্দোবস্ত যাতে সাপও মরে লাঠিও না ভাঙে। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা নিজেদের তাস হাতে রেখে ব্রিটেনকেই বলেন তার তাসখানা দেখাতে। সে কি সাম্রাজ্যবাদ ত্যাগ করবে? সে কি গণতন্ত্র প্রবর্তন করবে? সে কি যুদ্ধশেষে ভারতীয়দেরকে তাদের ইচ্ছামতো সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেবে? সে কি যুদ্ধকালে ভারতীয় স্বাধীনতার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দেখাবে? সে কেন যুদ্ধ করছে, কী তার উদ্দেশ্য সেটা ঘোষণা করবে কি?

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির স্টেটমেন্ট যে কোনো স্বাধীন দেশের পক্ষে গৌরবজনক একটি সাহিত্যকীর্তি। জবাহরলালের সেই সৃষ্টি দেখে গান্ধীজী বলেন ওর স্রষ্টা একজন আর্টিস্ট। গান্ধীজীও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিবেচনার জন্যে একটি স্টেটমেন্ট খসড়া করেছিলেন। কিন্তু জবাহরলালেরটি তাঁর এত পছন্দ হয়ে যায় যে

নিজেরটি তিনি প্রত্যাহার করেন। শিষ্যাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ম। শিষ্যের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করবে।

অমন যে চমৎকার ইংরেজী ওর ফল হলো ব্রিটিশ কর্তাদের দিক থেকে কয়েকটা পিঠ চাপড়ানি ভাষণ ও বিবৃতি। কাজের কথা শুধু এইটুকু যে যুদ্ধকালে বড়লাট একটা পরামর্শ পরিষদ গঠন করবেন, তাতে ভারতীয় নেতারা থাকবেন, কেমন করে যুদ্ধ চালানো হবে সে বিষয়ে তাঁদের পরামর্শ নেওয়া হবে। যুদ্ধশেষে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ করে মাইনরিটিদের মতামত জেনে, ভারতশাসন আইনের সংশোধন করা হবে। হাঁ স্টেটাসই লক্ষ্য।

ঘোষণাপত্র পড়ে কংগ্রেস নেতাদের চক্ষুঃস্থির। ওটা মুসলিম লীগকে চোখের সামনে রেখে তৈরি। লীগ বলে রেখেছিল তার অমতে যেন শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি না হয়। সাম্রাজ্যের পর রামরাজ্য আসবে ওতে কৈকেয়ীর আপত্তি।

বেশ বোঝা গেল সংখ্যালঘু প্রশ্নের উত্তর না দিলে স্বাধীনতার প্রশ্নের উত্তর মিলবে না। সংখ্যালঘু প্রশ্নের উত্তর কংগ্রেসের হাতে নয়। লীগের হাতে। লীগ মেহেরবানী না করলে ব্রিটেন মেহেরবানী করবে না। এক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ অবান্তর। হিটলারের আক্রমণ অবান্তর। সহযোগিতা অবান্তর। কিছুতেই কিছু হবে না। তা তুমি যতই বন্দুক ঘাড়ে করে উত্তর ফ্রান্সে না উত্তর আফ্রিকায় যাও। যতই জান মাল রুপেয়া সরকারের পায়ে ঢালো।

কংগ্রেস নেতারা হতাশ হলেন বইকি। অমন চমৎকার একখানি সাহিত্যসৃষ্টি বিলকুল বৃথা গেল। ইংরেজের প্রাণে এতটুকুও সাড়া তুলল না। ওদের ধারণা কংগ্রেস ভারী তো সহযোগিতা করবে! তার জন্যে তাকে দিতে হবে যুদ্ধের পর কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আর ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের উপর সর্দারী। ওদিকে পাঞ্জাবের মুসলমানরা যদি চটে যায় তো যুদ্ধের জন্যে রংরুট হবে কারা। মুসলমানরা রংরুট না হলে শিখরা কি হবে? শিখরা রংরুট না হলে হিন্দুরাও কি হবে?

ইংরেজরা এ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশী নির্ভর করেছিল সিকন্দার হায়াৎ খানের ইউনিয়নিস্ট পার্টির উপর, তাঁর পাঞ্জাব সরকারের উপর। তাঁর সৈনিক সংগ্রহের কৌশল ছিল অসাধারণ। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ নাৎসীবাদ উৎসাদনের জন্যে যুদ্ধ ইত্যাদি বললে একজনও জওয়ান নাম লেখাবে না। বলতে হবে, 'ভাই শিখ, তুমি যুদ্ধে না যাও মুসলমান যাবে, সেই উপায়ে হাতিয়ার জোগাড় করবে, সেই হাতিয়ার দিয়ে পাঞ্জাব দখল করবে ও পাকিস্তান হাসিল করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার জোগাড় করো। তারপর একদিন পাঞ্জাব কেড়ে নেবে। আবার রণজিৎ সিংহের রাজত্ব।'

তেমনি মুসলমানকে বলতে হবে, 'ভাই মুসলমান তুমি যদি যুদ্ধে না যাও শিখ যাবে। সেই উপায়ে হাতিয়ার হাত করবে। তাই দিয়ে পাঞ্জাব দখল করে রণজিৎ সিংহের রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে। তুমিও চল। হাতিয়ার হাত করো। তারপর একদিন পাকিস্তান হাসিল করবে। আবার সেই মোগল রাজত্ব।'

তেমনি হিন্দু ডোগরাকে, রাজপুতকে। মুসলমানের আগে, শিখের আগে ওরাই তো পাঞ্জাবের মালিক ছিল। আবার হবে। হাতিয়ার সংগ্রহ করাটাই তো সমস্যা। রংরুট বনে যাও। সমস্যার সমাধান জলের মতো সহজ।

দেখা গেল গোড়ায় যাদের অনিচ্ছা ছিল তারা হিন্দু মুসলিম শিখ নির্বিশেষে রংরুট হয়ে বন্দুক ঘাড়ে করে চলল। মুখে তাদের 'আল্লা হো আকবর', 'সৎ শ্রী আকাল' ও 'দুর্গা মাইকী জয়'। যুদ্ধে যদি বাঁচে তো পাঞ্জাবের জন্যে পরে গৃহযুদ্ধে মারবে ও মরবে।

চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কর্ম হয় না। যুদ্ধে সহযোগিতাও একটা চালাকি। যখন দেশবাসীকে কোনোমতেই বোঝাবার জো নেই যে হিটলার কেবল ব্রিটেনের শত্রু নয় ভারতের শত্রু। সত্যি কথা বলতে কী, হিটলারের পক্ষেও সেদিন বহুলোক ছিল। তারা মনে মনে বলছিল, যা শত্রু পরে পরে। হিটলার ব্রিটেনকে হারিয়ে দিক, রাশিয়াও হিটলারকে কাহিল করুক, বাকীটুকু আমরাই পারব। তার জন্যে যুদ্ধে সহযোগিতা করতে হবে কেন? কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব এমন কী মূল্যবান যে তার জন্যে অত বেশী দাম দিতে হবে?

সেদিন ইংরেজ শাসন ও কংগ্রেস শাসন দুটোই একই রকম অন্তঃসারশূন্য ঠেকছিল। ওপথে যাই আসুক নূতন শৃঙ্খলা আসবে না। বামপন্থীরা বরং ছল খুঁজছিলেন দুটোকেই একসঙ্গে সরাবার। লেনিনের মতো বিপ্লব করবার। তাঁদের অনেকেরই বিশ্বাস দেশ প্রস্তুত, নেতারাই প্রস্তুত নন। জোয়ার এসে গেছে, তার সুযোগ নিতে হবে, নইলে সে বৃথা ফিরে যাবে। ইংলন্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ।

বিপ্লবের লক্ষণ কী কী সে বিষয়ে আমাদের বামপন্থীদের গুরু লেনিনের উক্তি স্মরণীয়।

> "When a revolutionary party has not the support of a majority either among the vanguard of the revolutionary class, or among the rural population, there can be no question of a rising. A rising must not only have this majority, but must have: (1) the incoming revolutionary tide over the whole country; (2) the complete moral and political bankruptcy of the old regime, for instance, the Coalition Government; and (3) a deep-seated sense of insecurity among all the irresolute elements"

এসব লক্ষণ কি মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কোনখানে ছিল। ছিল হয়তো বামপন্থী নেতাদের ভক্তজনের মধ্যে। ছিল হয়তো সভাস্থলে। কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। থাকলে থাকত ওই কংগ্রেস প্রদেশগুলোতে, কিন্তু সেখানে যে বিক্ষোভ জড়ো হচ্ছিল সেটা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। কংগ্রেস মন্ত্রীরা ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতায় স্বাধীনতার প্রশ্নের সমাধান হবে না বুঝতে পেরে হাই-কমান্ডের নির্দেশে যেই পদত্যাগ করলেন, অমনি সব বিক্ষোভ এক মুহূর্তে জল হয়ে গেল। বামপন্থীরা তখন আর ওর মধ্যে বিপ্লবের লক্ষণ খুঁজে পেলেন না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটেনের মতিগতি জানতে চেয়েছিলেন। জানতে পেরেই কংগ্রেস মন্ত্রীদের আটটি প্রদেশ থেকে পশ্চাৎ অপসরণ করতে বলেন। অভূতপূর্ব সামরিক শৃঙ্খলা ও বাধ্যতার সঙ্গে আটটি প্রদেশ একই কালে মন্ত্রীশূন্য হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই অমান্য করতে

পারতেন কেউ কেউ। কিন্তু সেটা হতো বিশ্বাসঘাতকতা। জনমত ক্ষমা করত না। বলা বাহুল্য মন্ত্রীরা এক মুহূর্তেই বীর-পুরুষ বনে গেলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবার গান্ধীজীর উপরেই সমস্ত ভার অর্পণ করেন। যা করবার তিনিই করবেন। না করার দায়িত্বও তাঁর। এতকাল অপেক্ষার পর কংগ্রেসের পরিপূর্ণ নেতৃত্ব মহাত্মার হাতে এলো। তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর ফিরে পেলেন।

গান্ধীজী এককালে বিশ্বাস করতেন যে সহযোগিতার পথেই স্বরাজ আসবে। সহযোগিতারই একটা অঙ্গ যুদ্ধে সহযোগিতা। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি তাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। প্রথম দিকে খাস ইংলণ্ডের মাটিতে, পরে ভারতভূমিতে। জনমতও সে সময় সহযোগিতার অনুকূলে ছিল। যদিও সেকালের চরমপন্থীরা তখনি বলতে শুরু করেছিলেন যে ইংলণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ। কেউ কেউ সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে অস্ত্র সংগ্রহ করতে সাগর পাড়ি দেন। মহাত্মার কাজ হলো হিংসা নামক উপায়টাকে অচলিত করে তার জায়গায় অহিংসা নামক অপর এক উপায়কে জনগণের সামনে তুলে ধরা। যুদ্ধ থামতে না থামতে তার উপলক্ষও জুটে যায়। দেশের লোক সহযোগিতার পরিণাম দেখে অসহযোগের নীতি অবলম্বন করে। গান্ধীই হন তাদের নেতা। সেই থেকে তিনি অসহযোগের প্রবর্তক। অহিংসার প্রোফেট।

মাঝে মাঝে দেশকে দম নেবার অবকাশ দিলেও অসহযোগ নীতি ত্যাগ করে সহযোগিতার নীতি তিনি পুনর্গ্রহণ করবেন, এমন কী ঘটেছে? আর একটা মহাযুদ্ধ? না, তার জন্যেও নীতি পরিবর্তন করা যায় না। এমন কি স্বরাজের জন্যেও নয়, ওটা যদি শর্তাধীন স্বরাজ হয়। যদি হয় এই শর্তে স্বরাজ যে মহাযুদ্ধে সহযোগিতা করতে হবে। তাঁর কাছে তেমন স্বরাজ মূল্যহীন। তিনি চান জনগণের জন্যে স্বরাজ। জনগণের স্বার্থ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়া নয়। যুদ্ধবিগ্রহের মূলে শান্তি স্থাপন করা। ভারত যদি স্বাধীন হয় তবে তা বন্দুক ঘাড়ে করে হিটলারের সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে নয়। গান্ধীজীর মতে ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে হিটলারের সাম্রাজ্যপিপাসাও দূর হবে. কারণ ব্রিটেন যখন সাম্রাজ্য রাখতে পারল না, জার্মানীও কি পারবে?

ভারতের স্বাধীনতা যদি যুদ্ধকালে আসে বিশ্বশান্তিও দু'দিন আগে আসবে আর যদি যুদ্ধকালে না আসে তা হলেও ক্ষতি নেই। ভারত অপেক্ষা করবে। ইতি মধ্যে স্বাধীনতার দিকে আরো কয়েক প. এগিয়ে যাবে। সেটা যোদ্ধাদের বিব্রত না করে। অহিংস ভাবে। মোটকথা গান্ধীজী অসহযোগ ত্যাগ করবেন না, কংগ্রেসকেও ত্যাগ করতে দেবেন না। অথচ সরকারী যুদ্ধোদ্যমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন না। তাঁর বক্তব্যটা যেন এই যে, তোমরা যুদ্ধ করতে চাও করো, আমরা অসহযোগ করতে চাই করি, আমরা তোমাদের পথে কাঁটা দেব না, তোমরাও আমাদের পথে কাঁটা দেবে না। কেমন? এটাই কি ফেয়ার গেম নয়?

ইতিহাসে কেউ কখনো দেখেনি যে, রাজারা করছেন যুদ্ধ আর প্রজারা করছে অসহযোগ। যেটা দেখা যায় সেটা সেই 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়'। এই প্রথম শোনা গেল উলুখাগড়া বলছে সেও অসহযোগ করবে। উলুখাগড়া অসহযোগ করলে রাজারা যুদ্ধ করবেন কী করে? ভারতের প্রজাদের দেখাদেখি অন্যান্য দেশের প্রজারাও যদি অসহযোগ করে তবে যুদ্ধই বা চলতে পারে কদ্দিন! তখন যে শান্তি আপনি আসবে।

মহাত্মার যুদ্ধকালীন অসহযোগ নীতি প্রকারান্তরে শান্তিবাদীদের যুদ্ধবিরোধী নীতি। টলস্টয় বেঁচে থাকলে গান্ধীকে আশীর্বাদ করে বলতেন, তুমিই মানবজাতির আশা-ভরসা। আর তোমার দেশ যদি তোমার সঙ্গে থাকে, তবে সে-ই বয়ে আনবে বিশ্বশান্তি।

বোধহয় এই সময় কিংসলি মার্টিন তাঁর নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখেন যে, গান্ধীর নীতি হচ্ছে যুদ্ধকালে লেনিনের নীতি। এরই নাম বৈপ্লবিক পরাজয়বাদ। রেভলিউশনারি ডিফিটিজম। মার্টিন আরো কী কী লিখেছিলেন ঠিক মনে নেই। তবে তার মর্ম ছিল কতকটা এইরকম যে, গভর্নমেন্টকে পরাজিত হতে দেওয়াই বিপ্লবকে সফল হতে দেওয়া।

বার্নার্ড শ' এমনি এক সময় বলেন যে গান্ধীর স্ট্রাটেজী ঠিক আছে। তার মানে, তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি ও হবেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁর কর্তব্য নয়।

গান্ধী-সেবাসঙ্ঘের সম্মেলনে যোগ দিতে গান্ধীজী যখন মালিকান্দায় যান তখন কুমিল্লা থেকে আমিও যাই তাঁকে দর্শন করতে। ফ্রান্সের পতনের পর আমার মনের ভিতর একটা মন্থন চলছিল। ফ্রান্স যে শুধু একটা মহাশক্তি তাই নয়, তার প্রস্তুতিও ছিল ইংলণ্ডের চেয়ে বেশী। কিন্তু ক'টা দিনের মধ্যেই সে কাবু। অস্ত্র কেড়ে নিলে যে এত অসহায় তাকে মহাশক্তি বলি কী করে? হিংসার উপরে নির্ভর করে যুদ্ধে নামার চেয়ে অহিংস প্রতিরোধ শ্রেয়। এই কথাটাই গান্ধীজীকে নিবেদন করে আসি। তিনি ধরা-ছোঁয়া দেন না। মুচকি হাসেন।

সেই সময় লক্ষ করি তিনি অসাধারণ গম্ভীর। দেশের গুরুভার বইতে হচ্ছে তাঁকে। শুনতে হচ্ছে বিদেশেরও নিন্দাবাদ। যুদ্ধকালে অসহযোগ নাকি শত্রুপক্ষের মনোবলবর্ধক। মন্ত্রীরা সরে যাওয়ায় দক্ষিণপন্থীরা ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু মুসলিম লীগ এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সেই বর্তে গেছে। তার প্রতিজ্ঞা সে এর পরে মন্ত্রীদের ফিরতে দেবে না। মন্ত্রীরাও ফেরার জন্যে ব্যাকুল।

কংগ্রেস তখন এমন একটা পার্টি যে একই কালে সহযোগিতাও করবে, অসহযোগও করবে। হিটলারের সঙ্গেও লড়বে, ইংরেজের সঙ্গেও লড়বে। হিংসাও মানবে, অহিংসাও মানবে। মহাত্মার মাথাব্যথা কংগ্রেসকে নিয়ে, যেমন বুদ্ধের মাথাব্যথা সংঘকে নিয়ে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

গান্ধী শতবার্ষিকী বৎসরে গান্ধীজীর জীবনী অনেক রচিত হবে এবং ইতিমধ্যেই যা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে তার সংখ্যাও কম নয়। গান্ধীজী স্বয়ং আত্ম-জীবনী রচনা করে গেছেন। প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ছটি দিন নিয়ম করে প্রার্থনান্তিক ভাষণ দান করেছেন। নিয়ম করে তাঁর নিজস্ব সংবাদপত্র 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' 'নব-জীবন', 'হরিজন' প্রভৃতির জন্য অজস্র লিখেছেন। জীবন-চরিতকারের পক্ষে উপাদানের অভাব নেই তবে পরিবেশনে কৃতিত্ব থাকা প্রয়োজন। গান্ধীজী সচল ইতিহাস, তাঁর জীবনকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ভারতবর্ষের এক উল্লেখ-যোগ্য যুগের চলতি ইতিহাস।

ভাবাবেগমুক্ত হয়ে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারের প্রয়োজন যথেষ্ট আছে, এক শ্রেণীর ইতর লেখক যুক্তির অভাবে অনেক ক্ষেত্রে নিছক গালি-গালাজ প্রয়োগ করে নিজেদের বক্তব্যকে জোরালো করার চেষ্টা করেন, বলা বাহুল্য—সেইসব প্রচেষ্টা অশ্রদ্ধেয়, একটা বিশেষ গোষ্ঠী বা সমাজের কাছে তার জন্য করতালি পাওয়া গেলেও বিদগ্ধ সমাজে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। অতিরিক্ত ভক্তি এবং ভাবাবেগ যেমন উপেক্ষণীয় তেমনই তুচ্ছ বস্তু—একপেশে বক্তব্য।

সম্প্রতি কিছুসংখ্যক বিদেশী ঐতি-হাসিক গান্ধীজী এবং তাঁর সমসাময়িকদের সম্পর্কে কিছু কিছু বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার সামগ্রিক বক্তব্য আমাদের কাছে প্রীতিপ্রদ না হলেও—ইতিহাসের দিক থেকে তার সার্থকতা অনস্বীকার্য। এমনই একখানি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছেন স্যার পেণ্ডেরেল মুন। উনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের প্রাক্তন কর্মী এবং বিদেশী শাসকচক্রের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতবর্ষে বেশ কিছুদিন কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রায় পঁচিশ বছর আগে তাঁর "স্ট্রেন জাপ ইন ইণ্ডিয়া" নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশেষ সাড়া পড়ে যায় এবং তাঁর খ্যাতি বৃদ্ধি হয়। ভারতের প্রথমতম গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের কথা লিখে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর সেই প্রতিষ্ঠা "গান্ধী অ্যাণ্ড মডার্ণ ইণ্ডিয়া" প্রকাশের পর শত-গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি চাকুরে হলেও তিনি ঐতিহাসিক এবং তাঁর বিশ্লেষণও তাই ইতিহাসের মাপকাঠিতে। তিনিই এক-মাত্র ইংরাজ যিনি স্বাধীনতার পরও ভারত-সরকারে কাজ করেছেন। ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় এবং পরিকল্পনার ব্যাপারে তাঁর অবদান স্মরণীয়।

স্যার পেণ্ডেরেল ছিলেন ভারতীয় ইতি-হাসের ক্রমবিকাশের ধারা সম্পর্কে সদা সচেতন। তাঁর সিদ্ধান্ত কিংবা অনেক মন্তব্য ভারতীয়দের কাছে মনোরম মনে হবে না, এমন অনেক ভারতীয় লেখক এবং চিন্তাবিদ আছেন, যাঁরা গান্ধীজী প্রসঙ্গে নিছক ভক্তি বা আবেগের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য সীমিত রাখতে পারেননি। গান্ধীজীর জীবন, কর্ম, নেতৃত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন স্যার পেণ্ডেরেল মুন এবং তাঁর সেই আলোচনার কলম ভক্তিরসের কালিতে রঞ্জিত নয় বলেই 'গান্ধী অ্যাণ্ড মডার্ণ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থটি এক উল্লেখযোগ্য গান্ধী-ভাষ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে গান্ধীজীর জীবন-ধারা গড়ে উঠেছে, যে সব কারণে তাঁর রণ-কৌশল সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে আবার ব্যর্থ হয়েছে তার বিশ্লেষণ করেছেন স্যার পেণ্ডেরেল। তাঁর সৌভাগ্য যে গান্ধী-জীবনের অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। গান্ধী-জীবনের যে সব উপাদান তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে সেই সব উপাদান তিনি গ্রহণ করেছেন এবং যেটুকু বাহুল্য মনে করেছেন তা বর্জন করেছেন। গান্ধীজীর জীবন ভারতবর্ষীয় সাধু-সন্তদের সমগোত্রীয় বলে গণ্য হয়েছিল এবং সাধুত্ব যাকে আমরা 'মহাত্মা' আখ্যা দিয়েছি তার পিছনের ইতিহাস বিশ্লেষণ তিনি করেছেন, যেসব সদগুণ তাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম রাজনৈতিক নেতা ও সংস্কারক করে তুলেছিল সেই সব গুণাবলীর ব্যাখ্যা করেছেন স্যার পেণ্ডেরেল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী যে জন-সংগ্রাম ও সংগঠন করেছিলেন উত্তরকালে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে গান্ধীজীর জীবনের এই পর্বটি বিশেষ সহায়তা করেছে। সত্যা-গ্রহ কথাটির উদ্ভব এই দক্ষিণ আফ্রিকায়, পদ্ধতি ও প্রকরণ সেইখানেই স্থিরীকৃত হয়। প্রসঙ্গত বলা যায় যে গান্ধীজীর এই 'সত্যাগ্রহ' বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধপদ্ধতির প্রেরণা জুগিয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সের লেখা 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' উপ-ন্যাসের ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্র। এই দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী তলস্তয়ের আদর্শে গড়েছিলেন 'ফিনিক্স স্কুল' যা পরে সবর-মতী, ওয়ার্ধার আশ্রমে রূপান্তরিত হয়েছে।

আধুনিক ভারত ও গান্ধীজী

সকল প্রকার রাজনৈতিক মতবাদের ভিত্তিতে থাকা চাই সততা ও নৈতিক সংস্কার। আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে ১৯০৯ খৃঃ গান্ধীজী সত্যাগ্রহীর পক্ষে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন সেই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। জেনারেল স্মাটের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন গান্ধীজী তার পিছনে ছিল জন-মানসের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান। গান্ধীজী একজন উচ্চশ্রেণীর সাংবাদিক ছিলেন, সাংবাদিকতার এই জ্ঞান তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। নিজস্ব মতবাদ প্রচারে, বক্তব্য জনসমাজে পেশ করতে বা বিবৃতি দিয়ে নিজের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করার জন্য যে সব প্রবন্ধ বা পুস্তিকা লিখতে হয়েছে তা তিনি নিজেই লিখেছেন। আফ্রিকায় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' পত্রিকার স্তম্ভে তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে তিনি নিজস্ব বক্তব্য পেশ করেছেন। ভারতবর্ষের ভূমিতে যখন গান্ধীজী ফিরে এলেন, তখনই তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

গান্ধীজীর মনে দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে অস্ত্র হিসাবে 'সত্যাগ্রহ' অতিশয় মূল্যবান হাতিয়ার আর উপবাসের দ্বারা আত্মশুদ্ধি একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ। জেনারেল স্মাটের সঙ্গে তাঁর যে সংঘর্ষ হয়েছিল তার ভিতরেই দেখা গেল নেতৃত্বের ভারগ্রহণের তিনি উপযুক্ত। সবরমতী আশ্রম গড়া হয়েছিল চরকার দ্বারা বয়নকে জনপ্রিয় করা এবং অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য। পরবর্তীকালে এই দুইটি কর্ম গান্ধীদর্শনের মৌল উপাদান হয়ে উঠেছিল। চম্পারণ এবং কইরার আন্দোলনের ফলে 'সত্যাগ্রহ' যে হাতিয়ার হিসাবে বেশ জোরালো তা প্রমাণিত হল। এর পর এল জালিয়ানওয়ালাবাগ, গান্ধীজী এতদিন ইংরাজ শাসকের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন কিন্তু এতদিনে তাঁর রাজভক্তি একটু টলে গেল, বিশেষ করে রৌলাট অ্যাকটের ধারাগুলি তাঁর কাছে পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসে স্মরণীয় পর্ব জালিয়ানওয়ালাবাগ। এই জালিয়ানওয়ালাবাগ একটি বিশিষ্ট পথচিহ্ন রাজনৈতিক চিন্তাধারা এই কাল থেকেই একটা নতুন পথ গ্রহণ করেছে। ভারতের জনগণ ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ধিক্কার দিয়ে উঠলেন ব্রিটিশ শাসকের এই অত্যাচারকে। এর পর অমৃতসরে কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়, গান্ধীজী এই কংগ্রেসের অধিবেশনে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। নেহরু বলেছিলেন—"অমৃতসরের এই কংগ্রেস হল প্রকৃতপক্ষে গান্ধী কংগ্রেস।"

দক্ষিণ আফ্রিকার কাল থেকে রৌলাট অ্যাকটের বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত পর্বটি স্যর পেণ্ডেরেল বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেন সামগ্রিক ভাবে কোনো কিছু নিয়ে গান্ধীজী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন নি। তিনি বিশেষ একটি সমস্যাকে সামগ্রিক আন্দোলনে পরিণত করেছেন, যেমন 'লবণ সত্যাগ্রহ'। অমৃতসরের কংগ্রেসের কালে ভারতবর্ষে তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ঘটেছে এবং শুধু 'মহাত্মা' এই সম্ভ্রমসূচক বিশেষণ নয় তাঁকে ভারতের 'জনগণমন অধিনায়ক' হিসাবেই সারা ভারতের মানুষ গ্রহণ করেছে।

স্যর পেণ্ডেরেল কিভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা বিরোধ সৃষ্টি হল তার বিশ্লেষণ করেছেন। ধীরে ধীরে দুটি সম্প্রদায় পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, অশ্রদ্ধা আর অবিশ্বাসে দুদিকের মন কলঙ্কিত হয়েছে। গান্ধীজী মনটেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার গ্রহণ করেছিলেন, স্বীকার করেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবাসীর উপকার হয়েছে, কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে অংশগ্রহণ করে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের কার্যকলাপের সমালোচনা শুরু করলেন। স্যর পেণ্ডেরেল লিখেছেন যে ১৯১৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯২০-এর আগস্টের মধ্যে গান্ধীজীর মানসিকতায় যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মেলে না। স্যর পেণ্ডেরেল মনে করেছেন এই পরিবর্তনের পিছে আছে ভাবাবেগ। প্রথম মহাযুদ্ধে গান্ধীজী ব্রিটিশের সাহায্যে একটি ক্ষুদ্র অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী সংগঠন করেন—কিন্তু প্রথমে জালিয়ানওয়ালাবাগ ও পরে কয়েকটি ঘটনার পর তাঁর অন্তরে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয় এবং জাতীয়তাবাদী সংঘাত সেইখানেই শুরু। স্যর পেণ্ডেরেল বলেছেন—

> "Events were now set in train that left a greater imprint on Indo-British relations than anything. Gandhi had gained a hold on population greater than that of any former national leader and had successfully organised a wide-spread resistance to British authority unparalleled since the Mutiny of 1857"

স্যর পেণ্ডেরেল গান্ধীজীর সম্পর্কে বলেছেন—

> The confirmed crank and eccentric that was Gandhi"

এই মন্তব্য না করলে গ্রন্থটির মূল্য আরো বৃদ্ধি পেত। জালিয়ানওয়ালাবাগের দাওয়াই তাঁর মতে—

> "This drastic remedy was effective—"

এই সব মন্তব্য রীতিমত ইংরেজ-ইংরেজ। এ সব সত্ত্বেও সমগ্র গ্রন্থটি একটি তথ্যপূর্ণ রিপোর্টাজ, তাই পড়তে ভালো লাগে।

—অভয়ঙ্কর

GANDHI AND MODERN INDIA By PENDEREL MOON: Published by English Universities Press Ltd: Price-15 Shillings:

সাহিত্যের খবর

শ্রীমতী ভেরা নভিকভার নামের সঙ্গে বাংলা দেশের পরিচয় দীর্ঘদিনের। যে কয়জন বিদেশী বাংলা ভাষাকে বিদেশীয় ভাষায় প্রচারের জন্য অগ্রণী হয়েছেন, শ্রীমতী নভিকভা তাঁদের মধ্যেও অন্যতম। রুশ ভাষায় বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ এবং বাংলা সাহিত্যের উপর রুশ ভাষায় তিনি যে পরিমাণ গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেছেন, এমন আর কোন বিদেশী করেছেন কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি তাঁর লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একটি মূল্যবান গ্রন্থ রুশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে তাঁর রুশ ভাষায় বাংলা সাহিত্যের উপর প্রায় ২৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে শ্রীমতী নভিকভার আগ্রহের ইতিহাসও খুব বিচিত্র। যখন তাঁর বয়স মাত্র সতের বৎসর, তখন লেনিনগ্রাদ শহরে ভারতীয় বিপ্লবী প্রমথনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। শ্রীদত্ত তখন দাউদ আলি দত্ত, এই ছদ্মনাম নিয়ে সেখানে নির্বাসিত জীবন-যাপন করছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই শ্রীমতী নভিকভা প্রথম রবীন্দ্রসাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে জানেন। সেই সময়েই লেনিন গ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও

ভারতীয় সাহিত্য

সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা পড়বার জন্য কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে তাঁর পড়া অসমাপ্ত রেখেই দেশে চলে যান। যুদ্ধের পর আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর গবেষণা আরম্ভ করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই ক্যানডিডেট অব সায়েন্স সম্মানে ভূষিত হন। বর্তমানে তিনি লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক। বঙ্কিম সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ দিক নিয়ে তার একটি গ্রন্থ রচিত। মোট ২১০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তিনি বঙ্কিম সাহিত্য সম্বন্ধে এমন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, যা চিন্তার দিক থেকে সম্পূর্ণ মৌলিক। বইটির জ্যাকেটে প্রথমেই আছে বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তিনটি ছবি বইটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এর মধ্যে প্রথম দুটি ছবি হল বঙ্কিমচন্দ্রের এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির। কিন্তু তৃতীয় ছবিটি নিয়ে পাঠকরা ভাবিত হবেন। 'রজনী' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ। উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতের লেখা। সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত

কাউকে দিয়েছিলেন গ্রন্থটি। বইটিতে এমন আরো অনেক তথ্য ছড়িয়ে আছে। বাংলা ভাষী মাত্রই তাঁর কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে।

পৃথক তেলেংগানা রাজ্য গঠনের দাবীতে যে আন্দোলন চলছে, তাতে কবিরাও পিছিয়ে নেই। খবরে প্রকাশ, প্রখ্যাত তেলুগু কবি শ্রীকাপোজীনারায়ণ রাও প্রজা সমিতির আহ্বানে সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে গত ১০ আগস্ট ওরাংগলে কারাবরণ করেন। এ ছাড়াও আরও কয়েজন কবি ও লেখক এর মধ্যে কারাবরণ করেছেন।

গত ৯ আগস্ট হাওড়ায় বংগীয় তামিলিয়ন এসোসিয়েশন প্রখ্যাত তামিল কবি দশনের জন্মদিন পালন করে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন বক্তা দশনের কবি প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর কবিতা পাঠ করেন। দশন তাঁর কবিতায় জাতিভেদ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গত ৯ আগস্ট কুচবিহারে স্থানীয় জেলা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের তথ্য কেন্দ্রে 'সাহিত্য সভার' প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মজুমদার। অনুষ্ঠানের অপর একটি আকর্ষণ ছিল নজরুল সাহিত্যের উপর আলোচনা। কয়েকজন তরুণ কবি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রীবিনয়ভূষণ রায় সকলকে স্বাগত জানান।

মাদ্রাজ থেকে প্রায় দশ বৎসর যাবৎ 'পোয়েট' নামে একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সম্প্রতি এই পত্রিকার তিনটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যাগুলি হল যথাক্রমে 'ওয়েলশ', 'আলাবামা' ও 'আন্তর্জাতিক সংখ্যা।' আন্তর্জাতিক সংখ্যায় কিন্তু ভারতীয় কবিতার স্থান নেই। পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন ডঃ কৃষ্ণ শ্রীনিবাস।

বিদেশী সাহিত্য

আমেরিকার অন্যতম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব আর্টস অ্যান্ড লেটার্স'-এর নির্বাচন হয়ে গেল কিছুকাল আগে। লেখক, গায়ক ও শিল্পীরাই সাধারণত এই সংস্থার সদস্য হতে পারেন। এবার নির্বাচিত হয়েছেন ঔপন্যাসিক ও গল্পকার ওয়ালেস স্টেগনার, পিটার দ্য ভ্রাইজ, পিটার টেইলার, কবি-সমালোচক কেনেথরথ, গায়ক এনডরু ইমরি ও শিল্পী জন হেলিকার। গত মে মাসে ইনস্টিটিউটের বার্ষিক উৎসবে তাঁদের অভিনন্দন জানান কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি শিল্প-সাহিত্যের একটা ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন উক্ত সংস্থা। নানা রকম পুরস্কার বিতরণ, শিল্পীদের সাহায্য দান প্রভৃতিও তাঁদের কার্যাবলীর অন্যতম অংগ।

খবরে প্রকাশ, শিক্ষামূলক বেতার অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য এবার রামেন ম্যাগসেসে পুরস্কার পাচ্ছেন জাপানের অন্যতম প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক মিতোদি নিশিমোতা। ব্যক্তিজীবনে নিশিমোতা একজন অধ্যাপক।

পশ্চিম জার্মানীর ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য আকাদমি গত জুন মাসের শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে নির্বাচন করেছেন একটি কাব্য-সংকলন। বইটির নাম 'সেনসিবল ওয়েজ'। লেখক রেইনার কুনজ পূর্ব জার্মানীর মানুষ। বয়স ছত্রিশ বছর। রেখটিয়ান শব্দ ব্যবহারে তাঁর দক্ষতা এখন জনশ্রুতির বিষয় হয়ে উঠেছে। এই কাব্য-সংকলনের কবিতাগুলির আকার আয়তনে ছোটখাট, ভাব প্রকাশে সংযত এবং ইমেজারির অকারণ ব্যবহার থেকে মুক্ত। সমালোচকের ভাষায়, এ সংকলনের কবিতাগুলি লিখে রেইনার কুনজ কাব্যজগতে একটি নতুন ভূমির সন্ধান দিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক চার্লস ওয়েব-এর বয়স এখন উনত্রিশ বছর। কয়েক বছর আগে তিনি 'দি গ্র্যাজুয়েট' নামে একটা উপন্যাস লেখেন। কিন্তু পাঠক মহলে সাড়া জাগাতে পারে নি বইটি। পরে চলচ্চিত্রের দৌলতে সকলের নজরে পড়ে যান ওয়েব।

সম্প্রতি তাঁর নতুন উপন্যাস "লাভ, রোজার" বেরিয়েছে বেশ হাঁকডাক করে। সাহিত্যিক মহল তাঁর প্রতিভায় বিস্মিত। নিজস্ব এক ধরনের আংগিকে তিনি আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা করেন। ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত তীক্ষ্ম এবং চরিত্র নির্মাণে উদ্ভট লক্ষণাক্রান্ত।

ফিলিপ রথ, এলকিন, বেলো এবং রুসের পর অদ্ভুত ধরনের নায়ক-চরিত্র সৃষ্টিতে বার্নার্ড মালামুদ বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মালামুদ নিজেও অনেকটা ঐ একই ধারার লেখক। তিনি আবিষ্কার করেছেন তাঁর নিজস্ব 'মিশ্র অ্যান্টি হীরো'—দি সুক্রেমিয়েল সেন্ট, যার দৃষ্টি সর্বদাই স্বর্গের দিকে কিন্তু পা দুটো কলার ভেলায় সংস্থাপিত। তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসে এই চরিত্রটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বিভিন্ন নামে।

সম্প্রতি মালামুদ লিখেছেন 'পিকচার্স অব ফিডেলম্যান' নামে একটা উপন্যাস। তার নায়ক ফিডেলম্যান একজন অর্ধ-ট্র্যাজিক ও অর্ধ-সিরিয়াস মানুষ। এ ধরনের দ্বৈতব্যক্তিত্বের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় গত দশ বছরে লেখা তাঁর প্রায় প্রতিটি রচনায়।

ফিডেলম্যান একজন ব্যর্থ শিল্পী। বিবাহিতা তরুণীর পেছনে বিস্তর টাকা ঢেলেছে সে ভালোবাসা চেয়ে। এক ধরনের আন্তর্জাতিকতা বোধ এবং আত্মসমালোচনার অভিপ্রায় প্রায় সব সময় উপস্থিত ছিল তাঁর চিন্তা-ভাবনায়।

●

পশ্চিম জার্মানীর প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক গুন্টের গ্রাস বরাবরই রাজনীতির সংগে জড়িত মানুষ। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি হিটলারের যুব সংস্থার সদস্য হন। বর্তমানে তিনি গণতন্ত্রের সমর্থক। তাঁর মতে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে, তার প্রত্যক্ষ প্রচারে এগিয়ে আসা দরকার। জার্মানীর আসন্ন নির্বাচনে তিনি সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের সমর্থনে একটি সমিতি গঠন করেছেন। তার নাম দিয়েছেন 'ভোটার্স ভলান্টারি অ্যাকশন ফর দি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটস'। লেখাপত্রে, মৌখিক ভাষণে ও বেতার-টেলিভিশনে গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করাই নাকি উক্ত সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, বুলগেরিয়ার সাহিত্য ও সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি ইদানী জীবনের বিভিন্ন স্তরে, এবং সমাজের রুচি ও প্রগতিতে বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে বর্তমানে বুলগেরিয়ায় যাদুঘরের সংখ্যা ১৩৫। প্রতিদিন ক্রমবর্ধমান হারে মানুষ সেই সব যাদুঘর দেখতে যায়। ওখানকার গ্রামাঞ্চলে আছে প্রায় ৫০০ বিশেষ পাঠ সংস্থা, যার নিয়মিত পাঠক হলো দশ লক্ষের কিছু বেশি। সাহিত্যসংস্কৃতি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় বেতার ও টেলিভিশন মারফৎ। দৈনিক ও সাহিত্যপত্রিকগুলি শহর গ্রামাঞ্চলে উন্নত জীবনযাত্রা সহায়ক হিসেবে কাজ করছে।

পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ —জে এলিসন রেমন্ড। অনুবাদ : রেবা চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—বাক সাহিত্য। ৩৩ কলেজ রো। কালকাতা-১২। দাম : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গ্রন্থটি মিস রেমন্ডের 'হাফ দি ওয়ালর্ডস পীপল' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ। এই পৃথিবীর অর্ধেক অধিবাসী নারী, এ-গ্রন্থ তাদের প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত। পৃথিবীর নারীকুলের চিন্তা ও উদ্বেগ আধ্যাত্মিক শক্তি শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ, জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত প্রতিবন্ধক, ব্যক্তিগত ও জনজীবনে নৈতিক শুচিতা ও চারিত্রিক সততা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে। এই গ্রন্থটি দুই খন্ডে সম্পূর্ণ প্রথম খন্ডে আছে কি কি করা সম্ভব এবং দ্বিতীয় খন্ডে সেই সব কর্ম কি উপায়ে করা উচিত সেই বিষয়ে আলোচনা আছে। প্রথম খন্ডে সেকাল ও একাল, পরিবার ও পুরুষ, ভোট ও সরকারী পদ, গোষ্ঠী জীবনে নারী এবং দ্বিতীয়াংশে আপনি কি দিতে পারেন কি করা প্রয়োজন নেত্রী হতে পারেন কি প্রভৃতি অধ্যায়গুলিতে যথেষ্ট চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটির অনুবাদ স্বচ্ছন্দে এবং সহজ। বর্তমান কালে নারীদের জীবনের সমস্যা যেমন প্রবল হয়ে উঠেছে আগে কখনও তেমনটি ছিল না। মিস রেমন্ড আন্তর্জাতিক সংযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত, নারী ও শিশু কল্যাণের কাজে যুক্ত এই মহিলার প্রচেষ্টা আজ সর্বজন প্রশংসিত। তাঁর গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ উন্নয়নশীল দেশের নারী সমাজের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে আশা করা যায়।

●

লেনিন ও ভারতবর্ষ (আলোচনা) চিন্মোহন সেহানবীশ, কালান্তর প্রকাশনী। ১৯, ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা। দাম ৩০ পয়সা।

মহামতি লেনিনের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হবে আগামী বছর। সেই উপলক্ষে জাতিসংঘ একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। ভারত সরকারও লেনিনের শত-বার্ষিক জন্মোৎসব যথাযোগ্য গরিমার সঙ্গে উদ্‌যাপনের জন্যে ব্যবস্থা করছেন। বাংলা দেশে ইতিমধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকা এবং যুগান্তরে গত এপ্রিল মাসে লেনিনের উপর বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশ করে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য অজস্র প্রতিষ্ঠানও যে যথাযোগ্য লেনিন শত-বার্ষিকীর জন্যে উৎসবমুখর কার্যক্রম গ্রহণ করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু লেনিনের প্রতি এই শ্রদ্ধা নিবেদন যে শুধু মানবিক কর্তব্য পালনের জন্যেই নয়, ভারতবাসী হিসাবে যে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা বিশেষ দায়িত্বও আছে তারই পরিচয় পাওয়া গেল আলোচ্য পুস্তিকা থেকে। জার-শাসিত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত এক রক্তক্ষরা সংগ্রামে লিপ্ত থেকেও লেনিন বরাবরই সহানুভূতি পোষণ করেছেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি। ঔপনিবেশিক বন্ধন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের প্রত্যেকটি কার্যক্রমকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায়। এবং অনেকেরই হয়তো মনে আছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের পর লেনিনের পক্ষ থেকে অমৃতবাজার পত্রিকাতে প্রেরিত সেই তারবার্তাটি যাতে তিনি জানিয়েছেন, 'ভারতীয় ভাইদের ন্যায্য আদর্শের প্রতি সোভিয়েত সরকারের পূর্ণ সহানুভূতি।'

সমগ্র ৩১ পৃষ্ঠার এই ছোটো পুস্তিকাটি তৈরি করতে শ্রীযুক্ত চিন্মোহন সেহানবীশ যে বিপুল পরিশ্রম করেছেন তা বইটি না দেখলে বোঝাই যাবে না। লেনিনের বিপুল রচনাবলী মন্থন করে যেখানে যেটুকু ভারত সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য এবং মতামত পেয়েছেন তা শ্রীসেহানবীশ সযত্নে আহরণ করেছেন। এবং সব থেকে যা বড় কথা, প্রত্যেকটি ঘটনার আনুষঙ্গিক পটভূমিও পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। কাজটি নিঃসন্দেহেই যে একটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণার মতো জটিল ও দুরূহ তা বলাই বাহুল্য। শ্রীসেহানবীশ অসীম ধৈর্য ও মনীষার সঙ্গে তা উদ্‌যাপন করে কেবল যে ভারতবাসীর পক্ষে যুগনায়ক লেনিনকে ভালো করে চেনার সুযোগ করে দিলেন তাই নয়, ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীরও একটি নতুন সংযোগসূত্র রচনা করলেন।

শ্রীসেহানবীশের ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং স্বচ্ছ। তার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক প্রসাদগুণ যুক্ত হ'য়ে বইটি হ'য়ে উঠেছে খুবই হৃদয়গ্রাহী। শেষের দিকে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে লেনিনের যোগাযোগের বিবরণ এবং লেনিনের গ্রন্থাগারে রক্ষিত ভারত সম্পর্কিত ও ভারতীয় লেখকদের দ্বারা রচিত বইগুলির একটি তালিকা দেখে ভারতবাসী মাত্রই গৌরব বোধ করবেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

উত্তরকাল [শ্রাবণ ১৩৭৬]—সম্পাদক শিবেন চট্টোপাধ্যায়।। ৭ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৯।। দাম : পঁচিশ পয়সা।

সংবাদ-সাময়িকীর আকারে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাটি মূলত শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত খবরাখবর ও সংবাদে পূর্ণ থাকে। বাংলাদেশে এরকম পত্রিকা এর আগে আর কখনো বেরোয়নি। প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাটি পাঠকমহলে সাড়া জাগাতে পেরেছে! এ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে বিষ্ণু দে-র ষাট বছর বয়স পূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। তা ছাড়া পুস্তক সমালোচনা, সাহিত্যসংস্কৃতি সংবাদ ও চিত্র সম্পর্কিত আলোচনায় পত্রিকাটি সমৃদ্ধ। আমরা সুসম্পাদনার জন্যে সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই।

●

উদিতি [বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬]—সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ নন্দী। আগরতলা, ত্রিপুরা। দাম : এক টাকা।

প্রচ্ছদ মন্দ লাগছে না। আকারে-আয়তনে বেশ বড় পত্রিকা। লেখা নির্বাচনে মফস্বলী গন্ধ বর্তমান। লিখেছেন হীরেন্দ্রনাথ নন্দী, বীরেন রায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাস, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অনিলকুমার নাথ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

●

পার্থসারথী : ১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭৬। সম্পাদক শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ। ৫এ অক্ষয় বোস লেন, কলকাতা—৪। দাম : ৫০ পয়সা।

পত্রিকাটি ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী মাসিক পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যায় ধর্ম ও জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত। তার মধ্যে 'বাঙালী কোন্ পথে, সাহিত্য সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সৃষ্টি, এবং 'শ্রীঅরবিন্দের যোগসমন্বয়' প্রবন্ধ তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ম্লান হাসল কেতকী তারপর উঠে টেবিলে সাজান অস্ত্রগুলি দেখতে লাগল একদৃষ্টে। দীনার যখন ড্রেস পরা শেষ হয়েছে তখন রিং এসে পৌঁছুল। সরিতের সেট অপারেশন থিয়েটারেই রাখা আছে। সে এ্যাপ্রন, টুপি আর মাস্ক পরে নিল। কেতকী অ্যাপ্রনের ফিতেগুলো বেঁধে দিচ্ছে এক-এক করে। তার মাথাটা সরিতের পিঠের কাছে। কেতকীর দুর্দমনীয় ইচ্ছে হল সরিতের পিঠের ওপর তার মাথাটা রাখতে।

হল,—দীনা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, চমকে উঠল কেতকী।

রাকেশ অ্যাডভানী আরও জড়িয়ে পড়েছে। শুধু বাজারে দেনার অংকই বাড়েনি সম্প্রতি সে একটা জুয়ার আড্ডায়ও মিশেছে বিপজ্জনকভাবে। কড়েয়া অঞ্চলে একটা জুয়ার আড্ডায় ইদানীং সে খুব যাতায়াত করেছে। তার ফলে সেখানেও প্রচুর ধার পড়ে গিয়েছে। এরা মহাজনশ্রেণীর লোক নয়। টাকা আদায়ের পদ্ধতি এদের ভিন্ন ধরনের কিন্তু ফলপ্রসূ। চিঠিপত্রের ধার ধারে না এমনকি তাগাদার জন্যও লোক পাঠায় না, তারা শুধু একটা খবর

দিয়ে দেয় যে, একটা নির্দিষ্ট দিনে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকাটা চাই,—তা না হলে। তা না হলে যে কি হয় সেই চিন্তাটাই রাকেশকে অস্থির করে তুলেছে। ওদের টাকা আদায়ের প্রণালীটা তার কাছে একেবারে অজ্ঞাত নয়। ভয় পেয়েছে রাকেশ অ্যাডভাণী। ভয় পেলে মানুষ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। হিতাহিত জ্ঞান অবশ্য রাকেশের কোনদিনই ছিল না. সুতরাং ওদিক দিয়ে তার মানসিক চাঞ্চল্যের কোন কারণ ঘটেনি। তবে টাকা-পয়সার সহজ উপায়-গুলো সে মনে মনে চিন্তা করছিল। দোকানের মাল বেশীর ভাগই সে কম দামে বিক্রী করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। মাত্র সামান্য কিছু কাটা-কাপড় পড়ে আছে, তার দামও বেশী নয়। কয়েকটা মূল্যবান ফার্নিচার অবশ্য আছে কিন্তু সেগুলো বিক্রী করতে গেলে গোটা দোকানটাই তুলে দিতে হয়। তাতে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু কলকাতায় বাবা এসে পড়াতে সেদিক দিয়ে বিপদ হ'ল তার। নিজের বলতে রাকেশের ঘড়ি আর হীরের টাই-পিন আছে। তাতেই বা কি হ'বে। রাকেশ তার সুন্দর চেহারাটা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছে। বড়লোকের ছেলেদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নানারকমের সুযোগ নিতে কসুর করেনি। ওদিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা হয়নি। পাঞ্জাবী বা সিন্ধী কয়েকজনের সঙ্গে তার হৃদ্যতা হয়েছে বটে তবে টাকার দিক দিয়ে কোনরকম সচ্ছলতা তার আসেনি। বাঙালী মেয়েরা বড় চালাক। সহজে টোপ গেলে না। অনেক রকম যাচাই করে তারা। সুতরাং ওদিক দিয়েও রাকেশ নিরাশ হয়েছে। বাবা যদি অ্যাকসিডেন্টে মারা যেত তাহ'লে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত। একমাত্র ছেলে হিসাবে তার উত্তরাধিকারীস্বত্ব কেউ কেড়ে নিতে পারত না। কিন্তু সেখানেই ভগবান বাদ সাধলেন। অতবড় একটা অ্যাকসিডেন্টে ওই বয়সে আর অত চোটেও লোকটা দিব্যি বেঁচে রইল। রাগে রাকেশের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাসট্রের উপর অনাবশ্যক জোরে টিপে নিভিয়ে দিলে সে। একটাই উপায় আছে—দীনা স্বরূপ, এখন আর স্বরূপ নয় মুখার্জি। কোথা থেকে একটা বাঙালী ডাক্তারকে বিয়ে করে বসে রইল। কলকাতার মত নরকে যেখানে থাকবার জায়গা নেই, খাবার নেই, ছারপোকার মত কুৎসিত লোক-গুলো পিলপিল করে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে অনবরত সেখানে দীনার মত মেয়ে কি করে বাসা বাঁধল চিরদিনের জন্য। কি করে সহ্য করল এই অসম্ভব নরক-যন্ত্রণা। ওকে বিয়ে করলে দীনার কি ক্ষতি হ'ত? বাবা তাকে ভুল বুঝেছে, কিন্তু দীনা কেন তাকে ওভাবে যাচাই করে, তাচ্ছিল্য-ভরে প্রত্যাখ্যান করল অসীম ঘৃণায়। দোষ তার আছে সে জানে, কিন্তু কার নেই? এত লোকের সঙ্গে সে মিশেছে, কিন্তু শুকদেব বা বিশ্বামিত্র তার চোখে এখনও পড়েনি। সে না-হয় ধরা পড়েছে, ধরা না পড়ে কত লোক তার চেয়ে হীন কাজ করে সমাজের মাথায় চড়ে বসে আছে, তার খবর রাখে ক'জন। তাছাড়া দীনা তাকে বিয়ে করতে রাজী হ'লে তার সমস্ত জীবনটাই হয়ত পালটে যেত। নিশ্চয় সে নিজের দুর্বলতাগুলো জয় করতে পারত। আর না পারলেও হয়ত এভাবে পালিয়ে বেড়াতে হ'ত না, এত দুরবস্থার মধ্যেও পড়তে হ'ত না। একজন সুন্দরী ডাক্তার স্ত্রী যে লোভনীয় মূলধন, একথা কেউ অস্বীকার করবে না। রাকেশের সমস্ত রাগটাই দীণার উপর গিয়ে পড়ল। সেদিনের টেলিফোনের কথা তার মনে আছে। সে ভেবেছিল পুরানো প্রেম-পত্রের কথা উল্লেখ করলেই দীণা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে ভয়ে। তাকে কাকুতি-মিনতি করবে সেগুলো ফিরে পাবার জন্য। কিন্তু দীনার তেজ তেমনিই আছে। তার দম্ভ যে এতটুকুও কমেনি, তা সে বুঝেছে। রাকেশ অ্যাডভাণী মনে মনে ঠিক করল দীণাকে তার কব্জায় কোনপ্রকারে নিয়ে আসতে হবে। তাহলেই তার দুশ্চিন্তার অবসান হবে। প্রথমে দীণার স্বামীর কাছে যাবার কথাই সে ভেবেছিল, কিন্তু তাতে অনেক বিপদ আছে। সেখানে যে সাদর অভ্যর্থনা পাবে না, তা সে ভালভাবেই জানে। তবে স্ত্রীর গোপন প্রেমপত্রের বদলে টাকা ঢালতে রাজী হবে বলেও মনে হ'ল না রাকেশের। কিন্তু যে কোন প্রকারে তাকে টাকা নিতে হবে। তা সে দীণার কাছ থেকেই হোক, বা তার স্বামীর পকেট থেকেই হোক। তাতে বিশেষ কিছু তফাৎ হবে না তার কাছে।

রাকেশ এবার আর টেলিফোন করল না। সোজা গিয়ে উপস্থিত হ'ল ড্রীম-ল্যাণ্ড নার্সিং হোমের সামনে। পার্ক স্ট্রীট পেরিয়ে রডন স্ট্রীটে ড্রীমল্যাণ্ড নার্সিং হোম খুঁজে নিতে দেরী হ'ল না তার। নার্সিং হোমের অপর দিকে ফুটের ওপর দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ লক্ষ্য রাখল বাড়ীর ওপর। লনের পাশে একটা গাড়ী দেখে অনুমান করল যে দীণা নিশ্চয়ই উপস্থিত আছে সেখানে। কি উপায়ে সে দীণার সঙ্গে দেখা করবে, তাই চিন্তা করতে লাগল মনে মনে। একটার পর একটা সিগারেট খেয়েও তার মগজ পরিষ্কার হ'ল না। একটু পরে সে লক্ষ্য করল একটা প্যাণ্ট পরা ছোকরা বেরিয়ে আসছে। তার পিছু নিল রাকেশ। একটু এগিয়ে তাকে ডেকে বলল, লেডি ডক্‌টর আছেন কিনা জানেন। বাবলু রাকেশকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিল তারপর বলল,—আপনার রুগী আছে? পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

না, আমার অন্য কাজ ছিল—উত্তর দিল রাকেশ। সিগারেট খান? খুব খাই—একটা সিগারেট নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল বাবলু—গোল্ড ফ্লেক। সাধারণতঃ সে চারমিনার খায়, এসব বাবু সিগারেটে তার নেশা জমে না। রাকেশ তার সিগারেট ধরিয়ে দিল সুদৃশ্য লাইটারের সাহায্যে। মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বাবলু বলল, আমি ওখানেই আজ করি। তাহ'লেত খুবই ভাল। কোথায় যাচ্ছেন—এখন আত্মীয়ের মত জিজ্ঞেস করল, রাকেশ।

যাচ্ছি, ঐ মোড়ের দোকানে একটু চা খেতে।

বেশ ত চলুন না, আমার সঙ্গে পার্ক স্ট্রীটের হোটেলে।

আই বাপ। ওখানে আমি কি করে যাব। চোখ কপালে তুলল বাবলু।

কেন, আমায় কি দোস্ত ভাবা যায় না?

নিশ্চয়, চলুন। আনন্দের আতিশয্যে বাবলুর গলার স্বর বন্ধ হয়ে এল। কার মুখ দেখে যে বাবলু আজ উঠেছে তাই ভাবছিল সে। নার্সিং হোমে মা রান্নার কাজ করে আর তারই সুপারিশে বাবলু একটা আশি টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছে। কিন্তু তাতে কি হবে? কলোনি থেকে অবশ্য তার রোজগার এখনও কিছু আছে, তবে টি বি রোগ ধরে তাকে জখম করে দিয়েছিল কিছু-দিন। এখন অবশ্য ইনজেকশন নিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। না তার প্রতিপত্তি কলোনি কেন গাড়িয়া অঞ্চলেও এখনও ঠিক তেমনিই আছে। বাবলুকে চেনে না এমন লোক ওপাড়ায় নেই বললেই চলে। তার দলের অবশ্য কয়েকজন ধরা পড়ে গিয়েছে ইতি-মধ্যে কিন্তু তার ধারে কাছে এখনও কেউ ঘেঁষতে পারেনি। আরও একটা দল আছে, তারা শুধু ছিনতাই করে, অন্য দিকে কিছু নয়। তাদের সঙ্গেও বাবলুর দলের বখরা নিয়ে সংঘর্ষ হয়ে গিয়েছে। তাতে ওদের তিনজন আর বাবলুর দলের একজন জখম হয়েছিল। বাবলু সবদিক দিয়েই ওস্তাদ। বোমা তৈরী করতে, ছুরি চালাতে, গুণ্ডামী করতে তার জুড়ি ওপাড়ায় মেলা শক্ত। কিন্তু একেবারে পার্ক স্ট্রীটের হোটেলে—বাবলু গদগদ হয়ে উঠল। তাকে নিয়ে রাকেশ অ্যাডভাণী ছোট একটা হোটেলে ঢুকল।

কি, কি খাবে—সব চলে ত? রাকেশ আরও ঘনিষ্ঠ হ'ল।

খুব, তবে দিশীই চালাই—এসব মাল পাব কোথায়? এ-ধরনের হোটেলে বাবলু কখনও আসেনি। দু পেগ হুইস্কি নিয়ে শুরু করল ওরা।

কি কাজ কর ওখানে—রাকেশ প্রশ্ন শুরু করল একটু পরেই। ছাই, কিসসু না—স্রেফ ছুঁড়ি দেখি আর গাড়ো দিই। ওষুধ, ব্যান্ডেজ, সিরিঞ্জ, যন্ত্রপাতি যা পাই নিয়ে বাইরে ঝেড়ে দিই। যা হয়—বুঝলে না দোস্ত। বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হয়ে এল কয়েক পেগের পর। আর ঐযে মেয়ের কথা কি বলছিলে—রাকেশ উৎসুক হ'ল সব জানতে। একটা নার্স আছে। একেবারে এক নম্বর—দুটো আঙ্গুল জোড়া করল বাবলু।

সত্যি—ইচ্ছে করেই চোখ দুটো বড় করল রাকেশ। অনেক সুন্দরী নিয়ে সে নাড়াচাড়া করেছে। এতে খুব বেশী সে ইন্টারেস্টেড নয়। তার লক্ষ্য অন্য দিকে।

হ্যাঁ সত্যি, নার্সটার নাম কেতকী। গ্লাসে একটা বড় চুমুক দিয়ে বলল বাবলু। কতদূর এগোল?

কই আর, ছুঁড়িটা খালি স্লিপ দিচ্ছে মাইরি—তাছাড়া ল্যাংড়াটা জুটে মহা ঝামেলায় ফেলেছে। দোব শালার আর একটা ঠ্যাং খোঁড়া করে তখন বুঝবে।

ল্যাংড়া আবার কে?

ডাক্তারের ছোট ভাই। শালা ল্যাংড়ার আবার প্রেম করার শখ হয়েছে। রোজ ঠক ঠক করে লেংড়ে এসে ছুঁড়িটার সংগে গুজ গুজ করে।

ছুঁড়িটা কি বলে?

কি বলে, তা-কি আমি শুনতে গেছি—বিরক্ত হ'ল বাবলু।

আরে না না, তা বলছি না। আমি জিজ্ঞেস করছি, নার্সটাও কি ওর দিকে ঝুঁকেছে।

হ্যাঁ, তাই ত মনে হয়। রোজ কফি তৈরী করে দেয়, হেসে হেসে কথা বলে ঢং করে আর মাইরি, আমাকে দেখলেই বোম্‌কে যায়। কেন, আমি কি কম নাকি। বুকে একটা হাত দিয়ে বাবলু তাকাল রাকেশের দিকে।

না, তা তো নয়ই।

তুমি কলোনিতে খোঁজ নাও, গড়িয়াতে গিয়ে বাবলু মন্ডলের নাম বল, দেখবে তোমার খাতিরটা। আমায় চেনে না। বেশী বাড়াবাড়ি করলে একদিন ঝাড়ব শালা এক বোমা, ব্যাস ঠান্ডা হয়ে যাবে। আবার সেদিন ছুঁড়িটা আমায় শাসিয়েছে—কি আস্পর্ধা?

কি বলেছে?

বলে, যদি এরকম বিরক্ত করেন তা হ'লে ডাক্তারদের বলে দেব।

তার আগেই তুমি এক কাজ কর না—বলল রাকেশ।

কি?

তুমি গিয়ে ডাক্তারদের আগেই বলে দাও ওদের ব্যাপারটা।

দূর, তাতে কি হবে, হয়ত ছুঁড়িটাকে তাড়িয়ে দেবে। তাতেও লোকসান হবে আমার। এ বেশ এক জায়গায় থেকে দেখা-শুনা চলছে। চলে গেলে সব ভেস্তে যাবে দোস্ত।

কিন্তু যদি তোমার কথা ডাক্তারদের বলে দেয়, তাহ'লে।

তারও দাওয়াই আছে, এমন বদলা নেব যে বুঝবে ঠেলাখানা।

কি আর করবে?

বেশী কিছু দেখলে ছুঁড়িটাকেই সাবড়ে দেব। সাবাস, তুমি ত তাহ'লে শের আছ। রাকেশ উৎসাহ দেয় বাবলুকে। আচ্ছা বাবলু, তোমাদের লেডী ডাক্তারটি কেমন?

আই বাপ, ওর নাম নেবেন না, জান কয়লা করে ছেড়ে দেবে।

কেন?

ভারি তেজ, একেবারে যেন স্টিম ইঞ্জিন। হোস-ফোঁস করেই আছে।

ভয় কর তাহ'লে?

না, ভয় বাবলু মন্ডল কাউকেই করে না তবে ঝুট-ঝামেলায় আমি যাব কেন, আমার ত' নজর অন্যদিকে।

তা ঠিক, কিন্তু—চুপ করে গেল রাকেশ।

কিন্তু কি? ঝেড়ে কাশো দোস্ত, অমন লুকোচুরি করছ কেন?

ঐ আমার পুরোনো—একটা চোখ টিপল রাকেশ আডভানী।

আই বাপ, হায় হায়, কি বলছ মাইরি—আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠল বাবলু।

ঠিক বলেছি, দিল্লীতে থাকতে আমাদের বিয়ের কথা পর্যন্ত হয়েছিল, কিন্তু হ'ল না।

কেন, বিগড়ে গেল?

ডাক্তারকে বিয়ে করে কলকাতায় চলে এল।

একেবারে কারবারে কেরোসিন মাইরি, বাবলু হেসে উঠল।

আমিও পিছু নিয়েছি, ছাড়ব না কিছুতেই, রাকেশ বলল।

তাহ'লে দোস্ত, তোমার আমার একই হাল—দুজনেই ঝুলছি।

তাই, আচ্ছা ওকে ধরা যায় কোথায় বল ত?

এখন সময়ের কিছু ঠিক নেই, এই আসছে, এই যাচ্ছে, মাঝে কি একটা ফাংশন হবে তাই খুব ব্যস্ত।

কি ফাংশন?

নারসিং হোমের অ্যানিভারসারী আছে। খুব খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান হবে। আসবে নাকি?

কি করে আসব, আমায় বলেনি এখনও।

আরে কি মুস্কিল, তাহলে দোস্ত হয়েছি কেন? তুমি এসে দেখো, আমি ম্যানেজ করব ঠিক। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দু-এক পাত্তর টানা যাবে, কি রাজী?

খুব।

এবার উঠল ওরা। বাবলু বেসামাল হয়ে গিয়েছে। তার পা টলছে দস্তুরমত। রাকেশের দু-এক বোতলেও কিছু হয় না, এ ত মাত্র কয়েক পেগ। বাবলুর বাহুটা শক্ত করে ধরে হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াল রাকেশ আডভানী।

আমি বাড়ী যাব কি করে—গলার স্বর বিকৃত হয়ে এসেছে বাবলুর।

ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দোস্ত—ঘাবড়াচ্ছ কেন? একটা ট্যাক্সি ডেকে বাবলুর হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে ড্রাইভারকে কলোনির নির্দেশ দিয়ে দিল রাকেশ। তারপর ট্যাক্সি চলে যেতে সে হাঁটতে শুরু করল নারসিং হোমের দিকে। সে বাবলুর মত মাতাল হয়নি বটে তবে তার মগজ কিছুটা সাফ হয়েছে পেটে হুইস্কি পড়াতে। রাকেশ ঠিক করল সে দীপার সঙ্গে আর দেখা করবে না, এমনকি টেলিফোনও করবে না। তার পন্থা হবে অন্য ধরণের। নারসিং হোমের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে লাগল একটার পর একটা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অভীষ্ট সিদ্ধ হল তার। দীপা এসে গাড়ীটায় উঠে বসল। ড্রাইভার গাড়ী গেট থেকে বার করতেই দীপা তাকে দেখতে পেল। রাকেশ এইটাই চেয়েছিল। দীপা শুধু তাকে দেখুক, তা হলেই কাজ হবে। তার পরের দিনও রাকেশ ঠিক ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে আর দীপাও তার সামনে দিয়ে গাড়ী করে চলে গেল। এইভাবে কয়েকদিন পর পর দীপা রাকেশকে নারসিং-হোমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। প্রথমে দীপা ভেবেছিল এটা সে অগ্রাহ্য করবে তারপর ঠিক করল সে নিজেই রাকেশকে ডেকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কারণটা জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু তা করলে লোকটা আরও প্রশ্রয় পাবে বলে মনে হল তার। তাই শেষ পর্যন্ত তার সংগে কথা বলল না দীপা। রাকেশ কিন্তু পরের দিন নারসিং হোমের সামনে না দাঁড়িয়ে দীপার বাড়ীতে টেলিফোন করল। ফোনটা ডাঃ সবিৎ মুখার্জি ধরেছিল। এইটাই চেয়েছিল রাকেশ। তাই সে খুশী হয়ে বলল, কি খবর, বাবা কেমন আছেন? জিজ্ঞাসা করল সবিৎ।

ভালই আছেন। মিসেস মুখার্জি আছেন নাকি?

না, কিছুক্ষণ আগেই বেরিয়ে গেছেন, কিছু বলতে হবে?

এমন কিছু নয়, আপনি যদি দয়া করে একটা মেসেজ দেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়, বলুন কি মেসেজ।

শুধু বলবেন, আমি ফোন করেছিলাম, আর কিছু নয়।

বেশ বলব।

ফোনটা ছেড়ে দিল রাকেশ।

দীনা যেন একটু ক্লান্ত। সরিৎ তার দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল। তার পাশে এসে বসল দীনা। তারপর মাথাটা সরিতের বাহুর উপর রেখে চোখ দুটো বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

কি হল, মাথা ধরেছে। সরিতের স্নেহের স্বর।

একটু। হাসল দীনা।

তুমি অ্যানিভারসারীর জন্য বড্ড বেশী খাটছ। একে নারসিং হোমের কাজ তার ওপর আবার এইসব হাঙ্গামা নিজের ঘাড়ে নিলে কেন।

তবে কে নেবে?

কেন, এত লোক রয়েছে, বিধুবাবু বাবলু, কেতকী।

উঠে বসল দীনা, তারপর বসল, বিধুবাবুর দ্বারা কিছুই হবে না। হি ইজ টু ওল্ড। বাবলু একটা বখাটে চোর। আর কেতকী—একটু থেমে দীনা বলল, আচ্ছা কেতকীর চেহারাটা কিরকম হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য করেছ।

কিরকম আবার—সরিৎ তাকাল দীনার দিকে।

আশ্চর্য, তোমার চোখ দুটো থাকে কোথায়।

তোমার উপর।

না, আজকাল তাও থাকে না। তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ। পুরানো হয়ে যাচ্ছ—হাসল সরিৎ।

দীনা পাতলা ঠোঁটের মধ্য দিয়ে জিবের একটু অংশ বার করে চোখ দুটো কুঞ্চিত করল। এটা তার আদর করার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী। তারপর নীচে নেমে সনতের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পর্দাটা নাড়াল।

এসো বৌদি।

এলাম। দীনা সোজা ডিভানের উপর গিয়ে বসল। সনৎ স্নান সেরে—একটা গেঞ্জি পরে বসে আছে তার চেয়ারে। সরিতের চেয়ে সনতের স্বাস্থ্য ভাল। পায়ের দুর্বলতাকে সে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে তার দেহের অন্যান্য মাংসপেশীকে সবল করে। এর জন্য সে নিয়মিত ব্যায়াম করে থাকে। দীনা তার ব্যায়ামপুষ্ট দেহের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল, ছোড়দা, তুমি আমার জন্য কি করতে পার?

সব। সোজা সোজা উত্তর দিল সনৎ। একটুও ভাবতে সময় লাগল না তার।

না ছোড়দা, এটা সিরিয়াস ব্যাপার—দীনার গলার স্বরে তরলতার অভাব।

কি হয়েছে বৌদি? সনৎ উৎসুক হয়ে তাকাল দীনার দিকে। একজন বড় জ্বালাতন করছে, বিরক্ত করছে নানাভাবে। কি করা যায় বল ত।

খুব সহজ উপায় আছে।

মানে লড়াই? স্ট্যান্ড আপ অ্যান্ড ফাইট?

তাই।

কিন্তু তার হাতে ধারাল অস্ত্র থাকে আর তুমি যদি নিরস্ত্র হও তা হলে।

তা হলেও। বলতে দেরী হল না সনতের। চুপ করে বসে থাকলে অপর পক্ষের সাহস বেড়ে যাবে, তাতে তোমারই ক্ষতি।

থ্যাংক ইউ ছোড়দা। এইটেই যাচাই করে নিলাম তোমার কাছে।

কিন্তু যাচাই করার তোমার কি আছে। আমায় শুধু নামটা বলে দাও তারপর যা করার আমিই করব। সনতের মাংসপেশী কঠিন হয়ে উঠল নিজের অজ্ঞাতে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভটা বার করার আশায় সে যেন হিংস্র হয়ে গেল এক মুহূর্তে। তার দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ আর কঠোর হয়ে সাইড টেবিলে রাখা বীভৎস তিব্বতী মুখোশগুলোর উপর এসে স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ছোড়দা। ভয় পেয়েছে দীনা। সনতের পরিবর্তন যেমন আকস্মিক তেমনি ভয়াবহ। সমস্ত সত্তাটা তার এক নিমেষে যেন পালটে গেল।

কি হল? স্বাভাবিক হয়ে এল সনৎ। দীনার ডাকে তার সম্বিৎ ফিরেছে।

না। কিছু নয়। কিন্তু তুমি এমনভাবে তাকালে যে আমার ভয় হল।

অনেক সময় আমার ওরকম হয়। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সনতের। তুমি কিন্তু নামটা এখনও বললে না বৌদি।

বলব ভাই তবে এখন নয়। আগে নারসিং হোমের অ্যানিভারসারীটা হয়ে যাক তারপর একটা ব্যবস্থা করা যাবে। বাই দি ওয়ে ছোড়দা, গানের জন্য একজনকে ঠিক করতে হবে তোমায়।

কি মুস্কিল, আমি পাইয়ে পাব কোথায়? চিন্তিত হল যেন সনৎ।

কেন, তোমার সেই সোনালী স্বর্ণা মানে সুপর্ণা—দীনার কথা বলার ভঙ্গী দেখে হেসে ফেলল সনৎ, বলল—

বলব, কিন্তু আসতে পারবে কিনা বলতে পারছি না।

হ্যাঁগো, আসবে, তুমি বললে ঠিক আসবে। দেখেছ ছোড়দা কেমন তোমায় 'গো' বললাম। সরিতকে বললে কিন্তু রেগে যায়, বলে আমার মুখে নাকি ওকথা মানায় না।

ভুল, তোমার মুখে সব মানায়—দীনার মুখের দিকে, প্রতিক্রিয়াটা লক্ষ্য করতে তাকাল সনৎ। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল দীনা, তারপর বাইরে যেতে যেতে বলল, তুমি একবার চোরটার সামনে কথাটা বলো ত, জব্দ হবে। সনৎ হাসিমুখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

দীনা উপরে উঠে দেখল সরিৎ ইতিমধ্যে জামা-কাপড় ছেড়ে পাজামা আর ঢিলে কুর্তা পরে বসে আছে। দীনা পাঞ্জাবীকে কুর্তা বলে। পাঞ্জাবী বলতে সে নারাজ। কুর্তার নাম যদি পাঞ্জাবী হয় তাহলে সালোয়ারের নাম বাঙ্গালী বললে কেমন শোনায়? সে লক্ষ্য করল সরিতের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন সে কাগজ পড়ছে মনযোগ দিয়ে। সরিতের পিছনে দাঁড়িয়ে তার দু গালে হাতের তালু দুটো রাখল দীনা তারপর বলল—এই চোর আমায় ফেলে নিজে চা খেয়েছ যে।

ঠান্ডা হলে তুমিই রাগ করতে—হাতের কাগজটা রাখল সরিৎ। চুল কেটেছ কবে? সরিতের ঘাড়ের গন্ধটা শুঁকল সে নাক ঠেকিয়ে আজই। এই কি হচ্ছে—ওরকম করলে সরিতের সুড়সুড়ি লাগে তা দীনা জানে।

তোমার ঘাড়টা একটু কামড়াব—আনন্দ হলে দীনা সরিৎকে দংশন করে তার ছোট ছোট দাঁত দিয়ে। এটা তার উচ্ছ্বাস প্রকাশের একটা বিশেষ ভঙ্গী। জামার হাতা তুলে সরিৎ বাহুটা দেখাল—বলল, সেদিনের দাগ এখনও রয়েছে। জায়গাটায় তখনও কালচে দাগ হয়ে আছে। ও আর এমন কি, এই ঘাড়ে একটা ছোট্ট করে। হাতের আঙ্গুলে দুটো এক করে, কামড়ের সামান্য পরিমাণটা জানায় সে।

উঃ—সরিতের সম্মতির আগেই দীনা কামড় দিয়েছে হাততালি দিয়ে একপাক ঘুরে গেল দীনা।

কারা কামড়ায় জান? সরিতের হাসি মুখ।

জানি, কুত্তা। দীনা এখনও কুকুর বলে না কুকুরের অনুকরণে সে ডেকে উঠল তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সোফাটায় সরিতের কোলে মাথা রেখে।

তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। বলল সরিৎ—

কি কথা? চোখ বুজে দীনা বলল—সারপ্রাইজ আছে কিছু?

না, তা নয়, তোমায় একটা মেসেজ দিয়েছে।

কে?

রাকেশ আডভানী। নামটা শুনে উঠে বসল দীনা, তারপর উৎসুক হয়ে তাকাল সরিতের দিকে। অদ্ভুত লোকটা। টেলিফোনে শুধু বললে, মিসেস মুখার্জিকে বলবেন আমি ফোন করেছি। একটু চুপ করে থেকে দীনা বলল—লোকটা একটা স্কাউন্ড্রেল। এমন খারাপ কাজ নেই যা ও করতে না পারে।

ওর বাবার মুখ থেকে শুনেছি কিছু কিছু। বলল সরিৎ।

(ক্রমশঃ)

একোগ্রাম-এর সাহায্যে মস্তিষ্কের টিউমার রেখা চিত্রের নিচে মধ্যরেখা বাঁদিকে স্থানান্তরের দ্বারা ধরা যায়।

কি এবং কেন (৬)

সেমিকণ্ডাক্টর

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মূলে সেমিকন্ডাক্টরের (জার্মেনিয়াম) সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণ অন্য কোনো ধাতু (অ্যান্টিমনি, আর্সেনিক বা ফসফরাস) খাদ হিসাবে (প্রতি ১০ লক্ষ জার্মেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে একটি মাত্র অন্য পরমাণু) মেশালে সেমিকন্ডাক্টর ইলেকট্রন বা হোল প্রবাহের বাহকের ঘনত্ব পরিবর্তিত হয়। আমরা জানি, অ্যান্টিমনি আর্সেনিক ও ফসফরাসের পরমাণু পঞ্চযোজী অর্থাৎ এদের পাঁচটি করে যোজ্যতা ইলেকট্রন আছে। এই পরমাণুগুলি জার্মেনিয়াম পরমাণুর প্রায় সমান আকারের এবং এরা জার্মেনিয়াম পরমাণুর দখলীকৃত স্থানে অবস্থান করতে পারে। খাদ পরমাণুর সংখ্যা অতি অল্প হওয়ার দরুণ জার্মেনিয়াম পরমাণুর দ্বারা ঘেরা থাকে। তখন কাছাকাছি চারটি জার্মেনিয়াম পরমাণু পাঁচটি যোজ্যতা-ইলেকট্রনের চারটির সঙ্গে যোজ্যতা-বন্ধনীতে যুক্ত হয়, কিন্তু পঞ্চম যোজ্যতা-ইলেকট্রনটি একলা পড়ে থাকে। এটিকে মূল খাদ-পরমাণু থেকে সামান্য শক্তির দ্বারাই বিচ্ছিন্ন করা যায়। তখন মুক্ত পঞ্চম যোজ্যতা ইলেকট্রনটি কেলাসের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করে। কিন্তু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ধন-তড়িৎদ্বারের দিকে চালিত হয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে।

খাদ-পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হলে পরমাণুটি ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়। এই ধনাত্মক আয়ন নিশ্চল, কারণ এটি পাশের জার্মেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে চারটি যোজ্যতা-বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত হয় এবং সেজন্যে বিদ্যুৎ পরিবাহিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে না। যেহেতু খাদ-পরমাণু মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি বা দান করে, সেজন্যে একে 'ডোনার' বা দাতা বলা হয়। যে সেমিকন্ডাক্টরে ডোনার থাকে তাকে 'এন-টাইপ' বা ঋণাত্মক সেমিকন্ডাক্টর বলা হয়।
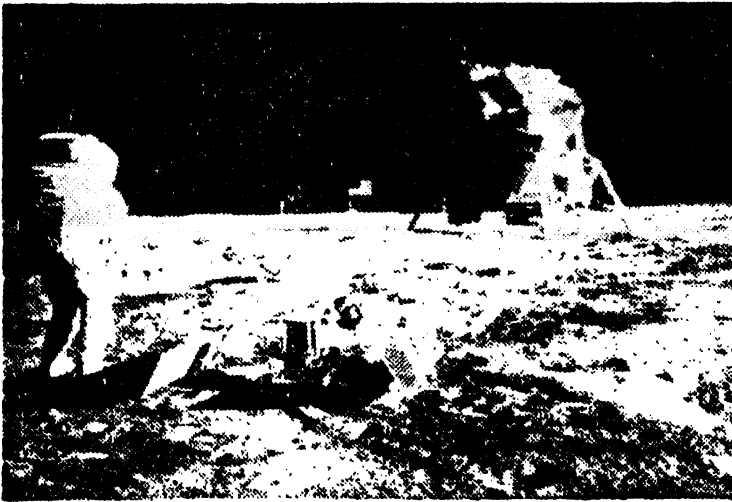
২১ জুলাই চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণের পর আর্মস্ট্রং কর্তৃক গৃহীত সিসমোমিটার সমেত অলড্রিনের ছবি। পিছনে চন্দ্রযান ইগেল।
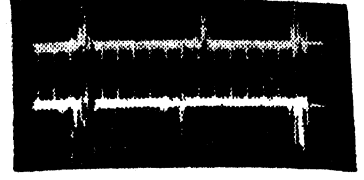
আবার যদি খাদ বা ইমপিউরিটি পরমাণু বোরন, অ্যালুমিনিয়ম, গ্যালিয়াম বা ইন্ডিয়ামের মতো ত্রিযোজী হয়, তাহলে সেমিকন্ডাক্টরে 'হোল' বিদ্যুৎ প্রবাহের বাহক হিসাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে কাছের তিনটি জার্মেনিয়াম পরমাণু ত্রিযোজী পরমাণুর তিনটি যোজ্যতা ইলেকট্রনের সঙ্গে যোজ্যতা বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত হয়। জার্মেনিয়ামের চেয়ে ত্রিযোজী পরমাণুর একটি ইলেকট্রন কম থাকে। এই ইলেকট্রনশূন্য স্থানটিও অর্থাৎ হোলটি পাশের জার্মেনিয়াম পরমাণু থেকে এসে পূরণ করে। এভাবে প্রক্রিয়াটি এগিয়ে চলে এবং হোলটি কেলাসের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলে হোলটি ঋণ-তড়িৎদ্বারের দিকে বাহিত হয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে খাদ-পরমাণুটি একটি ইলেকট্রন আহরণ করার ফলে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হয় এবং বিদ্যুৎ পরিবাহিতায় অংশ গ্রহণ করে না। এই খাদ-পরমাণুকে 'অ্যাকসেপটর' বা গ্রহীতা বলা হয়। যে সেমিকন্ডাক্টরে গ্রহীতা থাকে তাকে 'পি-টাইপ' বা ধনাত্মক সেমিকন্ডাক্টর বলা হয়।

বর্তমানে বিভিন্ন রকম সেমিকন্ডাক্টর বহুবিধ ব্যবহারিক কাজে প্রয়োগ করা হচ্ছে। দেখা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধাতব পদার্থের চেয়ে সেমিকন্ডাক্টর বিশেষভাবে কার্যকর। উষ্ণতার পরিমাপ নির্ধারণে, তাপীয় শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করণে, উত্তপ্ত ও শীতলীকরণে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহারে, পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহকে অপরিবর্তী প্রবাহে রূপান্তরিতকরণে, উচ্চ কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন ও পরিবর্ধনে, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির একীকরণে, শব্দকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরে এবং বিদ্যুৎশক্তিকে শব্দশক্তিতে রূপান্তরে সেমিকন্ডাক্টরের বিশেষ কার্যকারিতা দেখা গেছে। এছাড়া অতি বেগুনী রশ্মিকে সাধারণ আলোকে পরিবর্তনে, এক বর্ণের আলো-কে অন্য বর্ণের আলোতে রূপান্তরিত করণে, সূর্যরশ্মি ও পরমাণু-

শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরে এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনু ঘটকের কাজ ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপারে সেমিকন্ডাকটরের অশেষ কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বলা বাহুল্য আজকাল ঘরে-বাইরে ট্রানজিস্টার রেডিওর যে এত প্রচলন তার মূলেও রয়েছে সেমিকন্ডাকটরের অবদান।

রোগনির্ণয়ে শ্রুতিপারের শব্দ

অতি ক্ষীণ শব্দ আমরা যেমন শুনতে পাই না, তেমনি অতি উচ্চ কম্পনাঙ্কের শব্দও আমরা শুনতে পারি না। অতি উচ্চ কম্পনাঙ্কের এই শব্দকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'আলট্রা-সোনিক' বা শ্রুতিপারের শব্দ।

আমরা জানি, বাতাসে বা অন্য কোনো মাধ্যমে শব্দের কম্পন আমাদের কর্ণপটাহে আঘাত করলে আমরা সে শব্দ শুনতে পাই। কিন্তু অতি উচ্চ কম্পনাঙ্কের (সেকেণ্ডে ২০ হাজার কম্পনাঙ্ক বা তার বেশি) শব্দ আমরা কানে শুনতে পাইনি। কিন্তু মনুষ্যেতর কয়েকটি প্রাণী, যেমন বাদুড়, কুকুর, উচ্চ কম্পনাঙ্কের শব্দ অনুভব করতে পারে। অন্ধকার রাত্রে দ্রুত ডানা নেড়ে বাদুড় ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ চিনে যেতে পারে। আমরা নীরব সংকেতে কুকুরকে ইশারা করলে সে তা বুঝতে পারে।

এই উচ্চ কম্পনাঙ্কের শব্দ বা শ্রুতিপারের শব্দকে আজকাল বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হচ্ছে। নৌ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রুতিপারের শব্দের সাহায্যে একরকম বিশেষ ধরনের গ্রাহক-যন্ত্রের দ্বারা সমুদ্রের গর্ভে সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ কোথায় রয়েছে তা ধরা যায়। এই শ্রুতিপারের সাহায্যে অসিলোস্কোপ যন্ত্রের পর্দায় কম্পন দেখে শল্য-চিকিৎসক দেহাভ্যন্তরে অস্ত্রোপচার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন, মানুষের দেহের বিভিন্ন বস্তু থেকে শ্রুতিপারের শব্দতরঙ্গ বিশিষ্ট সংকেত প্রতিফলিত করে। এর ফলে মানুষের রোগ-নির্ণয়ে একটি অভিনব যন্ত্র উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা জানি, আমাদের দেহাভ্যন্তরের সংবাদ সংগ্রহে এক্স-রশ্মি বিশেষ কার্যকর। কিন্তু এক্স-রশ্মির সাহায্যে দেহাভ্যন্তরের অস্থি, তরল পদার্থ ও টিস্যু বা কলার পার্থক্য সব সময় ধরা যায় না। তা ছাড়া, এক্স-রশ্মি বার-বার ব্যবহারের একটা অসুবিধাও আছে। এক্স-রশ্মি দেহের ওপর বার-বার প্রয়োগ করলে বিকিরণজনিত অপকারিতা দেখা যায়। কিন্তু শ্রুতিপারের শব্দের সাহায্যে দেহাভ্যন্তরের সংবাদ সংগ্রহে এইরকম অসুবিধা বা অপকারিতা দেখা দেয় না।

মানুষের মস্তিষ্কে টিউমার বা অবুদ নির্ণয় করা একটা জটিল সমস্যা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা আজকাল শ্রুতিপারের শব্দের সাহায্যে এই জটিল সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছেন। শ্রুতিপারের শব্দ দিয়ে মস্তিষ্কে ক্ষণকালের জন্যে স্পন্দন পাঠানো হয়। সেই স্পন্দন টিস্যু থেকে প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রতিফলিত স্পন্দনের প্যাটার্ণ বা বিন্যাস যন্ত্রের পর্দায় ফুটে ওঠে। এই প্যাটার্ণ বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করা যায়, যে বস্তু থেকে এই স্পন্দন প্রতিফলিত হয়ে আসছে, সেটি স্বাভাবিক বৃদ্ধি না টিউমার জাতীয় অপকারক বৃদ্ধি। স্বাভাবিক বৃদ্ধি হলে প্রতিফলিত স্পন্দন-বিন্যাস যে রকম হবে, তা থেকে ভিন্ন রকমের স্পন্দন-বিন্যাস দেখা যাবে টিউমারের ক্ষেত্রে। এই স্পন্দন-বিন্যাসের আলোকচিত্র গ্রহণ করে স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা রোগ নির্ণয় করা হয়। শ্রুতিপারের শব্দের সাহায্যে এই রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতি 'একোগ্রাম' নামে অভিহিত। শুধু মাত্র মস্তিষ্কের টিউমার নির্ণয়ে নয়, দেহাভ্যন্তরে রক্তজাতীয় তরল পদার্থের রোগ নির্ণয়ে এই পদ্ধতির বিশেষ কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। তাই শ্রুতিপারের শব্দের সাহায্যে রোগ নির্ণয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাছে আজ একটা মস্ত বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের পদার্পণের ঐতিহাসিক টেলিভিশন—চিত্র

গত ২১ জুলাই অ্যাপোলো-১১র মহাকাশচারী নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে যেসব কাজ সম্পাদন করেছিলেন, তার ঐতিহাসিক চিত্র টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশ্বের নানা স্থানের লোকেরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই টেলিভিশন চিত্র গ্রথিত করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা সম্প্রতি একটি ফিল্ম তৈরী করেছেন।

গত ১১ আগস্ট কলকাতার মার্কিণ তথ্যকেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে এই চলচ্চিত্রটি সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান লেখকদের দেখানো হয়। আমরা এই ঐতিহাসিক চিত্রটি দেখে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। কেপ কেনেডির উৎক্ষেপণ মঞ্চ থেকে অ্যাপোলো—১১ মহাকাশযান তিন পর্যায়ের রকেটের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কিভাবে ধাপে ধাপে রকেটগুলি খসে পড়ল, মহাকাশ যান চন্দ্রের কক্ষপথে প্রবেশ করল, তারপর মূল যান থেকে চন্দ্রযান বিচ্ছিন্ন হয়ে কিভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করল, তার ধারাবাহিক চিত্র আমরা দেখার সুযোগ পেলুম এই চলচ্চিত্রটিতে। চন্দ্রযান থেকে প্রথমে আর্মস্ট্রং এবং তারপর অলড্রিন কিভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করলেন, বিচরণ করলেন, চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে উপলখণ্ড ও মাটি সংগ্রহ করলেন, চন্দ্র-কম্পন পরিমাপের জন্যে সিসমোমিটার এবং পৃথিবী ও চন্দ্রের দূরত্ব নির্ণয়ের জন্যে লেসার প্রতিফলক যন্ত্র স্থাপন করলেন এবং সব শেষে চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করে পৃথিবী অভিমুখে যাত্রা—সে সব ঐতিহাসিক দৃশ্য আমরা এই চলচ্চিত্রে দেখতে পেয়েছি। অবশ্য টেলিভিশন-চিত্র বলে এই দৃশ্যগুলি সুস্পষ্ট নয়, তবে সব কিছুই বোঝা যায়। আর্মস্ট্রং এবং অলড্রিন চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করে যেসব আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন তার ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে। সেই চলচ্চিত্রটি আরও ধারাবাহিক ও আকর্ষণীয় হবে বলে আমরা শুনেছি। আগামী সেপ্টেম্বর-অকটোবর মাসে সেই চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হবার সম্ভাবনা এবং সর্বসাধারণ তখন সেই ঐতিহাসিক চিত্র দেখার সুযোগ পাবেন।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষগড়ার ইতিকথা

হুগলী কলেজিয়েট স্কুল
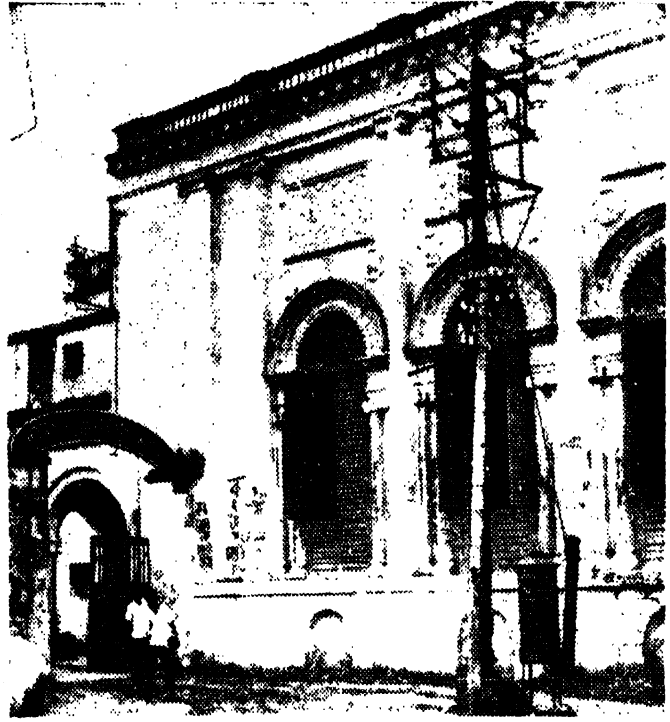
ঘন ঘন ঘণ্টা বাজিয়ে, যাত্রী তুলে নামিয়ে, নাগরদোলার মত নাচাতে নাচাতে 'রাজেশ্বরী' এক সময় গন্তব্যে পেঁৗছে গেল। একেবারে ডেড্ স্টপ। এবার দানা-পাণি—জল, মবিল, তেলের ব্যবস্থা হবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাওয়া দাওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই মোট ঘাটের মত আমাদের ঘড়ির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে হাঁপাতে হাঁপাতে পিচ রাস্তার ধারে এক নম্বরের আস্তানায় লাইন লাগাল। আর আমি হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির বুকের উপর ঘড়ির মোড়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে রুটচার্ট ঠিক করে নিতে লাগলাম। এই মোড় থেকেই বাসে চেপে সামান্য উত্তরে গেলে পড়বে হুগলীর ইমামবারা। পশ্চিমে চুঁচুড়া স্টেশন থেকে এলাম। দক্ষিণে আমার চোখের সামনে চুঁচুড়া কোর্ট। কোর্ট ছাড়িয়ে জেলা এসোসিয়েশনের সবুজ চতুর্ভুজগুলির মাঝ বরাবর যে রাস্তা সোজা বিখ্যাত ষণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির ষণ্ডেশ্বরতলার দিকে গেছে, সে পথ ধরে মিনিট আটেক হাঁটলেই রাস্তার ধারে পড়বে হুগলী কলেজ ও তারপর হুগলী কলেজিয়েট স্কুল।

আমি তো যাব হুগলী কলেজিয়েট স্কুল। থাক পড়ে ইমামবারা, কলেজে গিয়েও কাজ নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে গেল অমরবাবুর কথাগুলো। কি কথা? কে অমরবাবু? অমরবাবু, অমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কলেজিয়েট স্কুলের বর্তমান হেডমাস্টার। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল, ধুতি-পাঞ্জাবির আড়ালে ছিম-ছাম গড়নের মাঝারি মাথার মানুষটি চোখ থেকে চশমা খুলে রুমালে মুছতে মুছতে দাঁতের ফাঁকে চুরুটটা চেপে ধরে চিবিয়ে বলেছিলেন, ঐ ইমামবারাতেই তো কলেজিয়েট স্কুলের শুরু। আর ইমামবারা যিনি বানিয়েছিলেন তাঁর নাম তো সকলেরই জানা, হাজী মহম্মদ মহসীন। ঐ মানুষটির দানে আধুনিক হুগলীর আধুনিকতার বনেদ গড়ে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল হুগলী কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল ও মাদ্রাসা। এ-সব গত শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। তারও আগে ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস থেকেই শুরু হোক। ইতিহাসের বিবর্ণ বিশীর্ণ শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে শত শত বছরের সময়-সরণী অনুসরণ করে এক সময় আমরা ঠিকই পেঁৗছে যাব পেরণ সাহেবের বাংলোয়। তার আগে ফিরে যাই জেনারেল সামপ্রায়োর সময়ে।

১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ। পর্তুগীজরা হুগলী দখল করে। তখন সুবে বাংলার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র সাতগাঁও। হুগলী দখল করে পর্তুগীজ জেনারেল সামপ্রায়ো গঙ্গার পাড়ে খোলঘাটে, হুগলী জেলের কাছে একটা দুর্গ বানালেন। দিশী-বিদেশী বণিকদের সপ্তডিঙ্গা লুট করে জলদস্যু হার্মাদরা তাদের ঘাঁটিতে এসে চট করে লুকিয়ে পড়ত। ওদের চাল-চলন বেপরোয়া। কোন শাসকের কাছে নিশ্চয়ই বিদেশী লুটেরারা আদরের বস্তু নয়। বিশেষ করে পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে সুবে বাংলার গোটা দক্ষিণাঞ্চল তখন অস্থির হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা আকবর, জাহাঙ্গীরের জানা থাকলেও কোন সুরাহা হয় নি। সুরাহা হল শাহ জাহানের আমলে। তার কারণ অবিশ্যি পুরোনো অপমানের প্রতিশোধ। তখনো পৃথিবীর অধিপতি হন নি যুবরাজ খুরম। বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে হুগলীর পর্তুগীজদের সাহায্য চেয়েছিলেন। পর্তুগীজরা যুবরাজকে সেদিন এক কথায় ফিরিয়ে দিয়েছিল—কোন সাহায্য হবে না, ১৬২১ খৃষ্টাব্দ। খুরম সে অপমান ভোলেন নি। তাই দিল্লীর মসনদে বসেই বাংলার সুবেদারের রিপোর্ট পেয়ে, পর্তুগীজ ঠ্যাঙ্গাড়েদের ঠ্যাঙ্গানোর আদেশ জারী করলেন। মুঘল বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে না পেরে প্রায় একশো বছরের গড়ে তোলা সাধের হুগলী ছেড়ে পর্তুগীজরা চম্পট দিল, ১৬২৯ খৃষ্টাব্দ।

তখন সরস্বতী নদী প্রায় মজে এসেছে। সাতগাঁওয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। সাতগাঁও ডুবতে লাগল, ভেসে উঠল হুগলী। মুঘল শাসনে জমে উঠল হুগলীর ব্যবসা-বাণিজ্য। ঠিক সেই সময়ে ১৬৪০-৪২ সালে ইংরেজরা ফ্যাক্টরী বানাল হুগলীতে। দক্ষিণ বঙ্গে ইংরেজদের প্রথম ফ্যাক্টরী। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ইংরেজরা সুখে শান্তিতে ব্যবসাপত্তর চালিয়েছিল।

এর মধ্যে শাহী ফরমানের জোরে হুগলীর ঘাটে তাঁদের জাহাজ ভিড়েছে। হুগলী হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান ঘাঁটি। ঠিক এমন সময় ঢাকে কাঠি পড়তেই কাজিয়ার বাজনা বেজে উঠল। মুঘল-ইংরেজে প্রথম লড়াই। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দ। তখন দিল্লীশ্বর স্বয়ং আওরঙ্গজেব। বঙ্গেশ্বর শায়েস্তা খাঁ। মার খেয়ে কোম্পানীর বড় কুঠিয়াল পালিয়ে গেল সুতানুটিতে। গড়ে উঠতে লাগল সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা। আর হুগলী? পর্তুগীজদের হুগলী, সুবে বাংলার অন্যতম প্রধান বন্দর হুগলী, ইংরেজদের বড় কুঠিয়ালের হেড অফিস হুগলী স্বত্ব-আত্তি হারিয়ে, তেল সাবানের অভাবে, গরমে ধুলো শীতে খড়ি-ওঠা গায়ে কেমন অনাদরে, অবহেলায় গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে পড়ে রইল অনেক অনেক দিন। তারপর যবনিকা উঠছে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুতে। সেই শুরুর কথাগুলো বলবার আগে হুগলীর পিঠোপিঠি ভাইয়ের কথা একটু বলে নেওয়া দরকার।

শ্যাম দেশীয় যমজের মতই হুগলী-চুঁচুড়া। গায়ে গায়ে লাগানো শহর দুটি গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে। উত্তরে হুগলী, দক্ষিণে চুঁচুড়া। পর্তুগীজরা হুগলীর দখলদারী নেওয়ার শতখানেক বছর পরে ডাচরা চুঁচুড়া দখল করে। প্রায় পৌনে দুশ বছর ডাচদের তাঁবেয় থাকার পর ১৮২৫ সালে মালিকানার বদল হল। জাভার বিনিময়ে চুঁচুড়ার দখলীসত্ত্ব ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়ে ডাচরা বিদায় নিল। ইতিমধ্যে মুকসুদাবাদের নওয়াবী প্রাসাদে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। সুবে বাংলার রাজধানী তিনশো বছরে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ঘুরে কলকাতায় এসে স্থায়ী হয়ে বসেছে। কলকাতা তখন কোম্পানীর, শুধু কোম্পানীর কেন, গোটা ভারতের হেড কোয়ার্টার। জাভা চুঁচুড়া বিনিময়ের সময় দেশের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড আমহার্স্ট। লর্ড আমহার্স্ট এদেশে আসার প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। লর্ড ওয়েলেসলী তখন বড়লাট।

ইংরেজ · মারাঠা যুদ্ধের অন্যতম বড় সেপাই, মারাঠীদের দীর্ঘদিনের বন্ধু জেনারেল পেরণ হঠাৎ পদচ্যুত হয়ে হুগলীতে এসে চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি বানালেন। জাতে ফরাসী, পেরণ বেশীদিন এদেশে থাকেন নি। ১৮০৫ সালের ১০ অক্টোবর ক্যালকাটা গেজেটে একটা বিজ্ঞাপন বেরুল : গঙ্গার পাড়ে চুঁচুড়ায় একটা বাড়ি বিক্রী হবে, বিক্রেতা জেনারেল পেরণ। বিজ্ঞাপনের খবর পেয়ে 'হুগলীর স্বনামধন্য জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার এই ভবন ক্রয় করেন। তিনি নোট জাল করিবার অপরাধে ধৃত হইয়া ১৪ বৎসর কারাবাস করেন এবং চুঁচুড়ার অবসর প্রাপ্ত জেলা জজ ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের নিকট হইতে উক্ত ভবন বন্ধক রাখিয়া তিনি টাকা ধার করেন। হালদার মহাশয় টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কোর্ট হইতে বাটি বিক্রয় হয় এবং ব্রজেন্দ্র বাবু উহা ক্রয় করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বাটি বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিলে.............. ' (হুগলী জেলার ইতিহাস : সুধীরকুমার মিত্র)।

পেরণ সাহেবের বাংলো বাড়ি বিক্রি করলেন ব্রজেনবাবু। কিনলেন কে? কে কিনলেন সে কথা বলার আগে জানা দরকার কেন কেনার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই প্রয়োজনের ইতিহাস-চুম্বকটুকু, ছড়িয়ে আছে হান্টার সাহেবের 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অফ বেঙ্গল' সুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার ইতিহাস' ও সমাচার দর্পনের পাতায় পাতায়। সেই ছড়ানো-ছিটানো তথ্যগুলো জুড়ে দিলেই মালা গাঁথা সারা হবে।

পেরণ সাহেব ১৮০৫ সালে তাঁর বাড়ি বেচে দিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। ঠিক তার দু-বছর আগে এক অতি সামান্য অবস্থার অতিবৃদ্ধ মানুষের জীবন হঠাৎ লটারীর টিকিটে লাখ লাখ টাকা পাওয়ার মতই ফিরে গিয়েছিল। সেই সামান্য অবস্থার মানুষটিই প্রাতঃস্মরণীয় হাজী মহম্মদ মহসীন। এ সময় তিনি তাঁর বড় বোনের যশোর জেলার সৈয়দপুর জমিদারীর এক চতুর্থাংশের মালিকানা পেলেন উত্তরাধিকারী হিসেবে। ধর্মপ্রাণ অকৃতদার মহসীন এই বিপুল সম্পত্তি যাতে ভোগব্যয়ে নষ্ট না হয় তাই উইল করে ট্রাস্টের হাতে তুলে দিয়ে যান। তখনকার দিনেই এই সম্পত্তির বাৎসরিক আয় ছিল সাড়ে চার হাজার পাউনড। এই ট্রাস্ট-ফান্ডের টাকাতেই গড়ে উঠল হুগলীর বিখ্যাত ইমামবারা। মহসীন মারা যান ১৮১২ সালে। তাঁর মৃত্যুর সম-সময়ে ইমামবারাতে একটি স্কুল খোলা হয়। এ স্কুলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছেলেরাই পড়ত। অমরবাবু স্কুল ম্যাগাজিনে নিজের স্কুলের ইতিহাস একটি ছোট্ট প্রবন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন : '১৮১২ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের জন্ম এই বিশ্বাস সাধারণভাবে প্রচলিত হলেও ঠিক ঐ সাল সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য আমি এখনো পাই নি। ...... সমসাময়িক রচনা ফিশারস মেমোয়ার থেকে জানা যায় যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইমামবারার সঙ্গে একটি বিদ্যালয় সংলগ্ন ছিল। সম্ভবত এর কিছুকাল পূর্ব থেকেই এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল। এই বিদ্যালয়ই হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের আদিরূপ এবং ফিশারস মেমোয়ার— এই এর প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ বলে মনে করা যেতে পারে।......১৮২৬ খৃষ্টাব্দে হুগলীর জজ ম্যাজিস্ট্রেটের একটি রিপোর্টে জানা যায় যে ঐ সময়ে এই বিদ্যালয়ে ৮৩ জন ছাত্র অধ্যয়ন করত। এদের মধ্যে ১৬ জন আরবী, ৭ জন ফার্সী এবং ৬০ জন ইংরাজী পড়ত।'

মহসীন ট্রাস্টফান্ডের টাকায় ইমামবারা হয়েছে, স্কুল খোলা হয়েছে, তবু সাধারণ লোক তুষ্ট নয়। তাদের ধারণা সম্পত্তির এই বিপুল আয়ের যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে না। রাতের আঁধারে বহু সাদা টাকা কালো টাকায় রূপান্তরিত হচ্ছে। অভিযোগ গেল সরকারের কাছে। গোড়ায় অভিযোগে কান না দিলেও শেষ পর্যন্ত গভর্ণমেন্টকে এগিয়ে আসতে হল। সরকার ট্রাস্ট বাতিল করে নিজের ঘাড়ে সব দায়-দায়িত্ব তুলে নিলন। সরকারী হস্তক্ষেপে খেপে গিয়ে ট্রাস্টীরা মামলা ঠুকে দিলেন। কিন্তু এদেশের কোর্ট ও ইংলন্ডের প্রিভি কাউন্সিলে সরকারী সিদ্ধান্তই বহাল রইল। তখন বোর্ড অফ রেভিনিউ দু জন সদস্যের একটি ট্রাস্ট গঠন করে তার হাতে তুলে দিলেন পরিচালন-দায়িত্ব। ঠিক হল যশোরের কালেক্টর দেখবেন ট্রাস্টের আয়-ব্যয়ের হিসাব; একজন মুসলমান ভদ্রলোকের উপর ন্যস্ত হল ইমামবারা পরিচালন-দায়িত্ব।

কিন্তু মামলা-মকদ্দমা চলাকালীন দীর্ঘ পনেরো বছরে প্রায় ছিয়াশী হাজার পাউনড জমা পড়েছে সম্পত্তির আয় হিসাবে। কথা উঠল এই বিপুল টাকা দিয়ে কি করা যায়? ঠিক হল মহসীনের পুণ্যস্মৃতির স্মরণে ঐ টাকায় একটা কলেজ খোলা হবে হুগলীতে। এই কলেজে পঠন-পাঠনের মাধ্যম হবে ইংরেজী কারণ ইংরেজী তখন রাজভাষা। ততদিনে লর্ড আমহার্স্টের জায়গায় এদেশে বড়লাট হয়ে এসেছেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। আইন সচিব উইলিয়াম বেবিংটন মেকলে সাহেবের পরামর্শে বেন্টিঙ্ক ১৮৩৫ সালে ঘোষণা করলেন যে ভারতে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হবে ইংরেজী। প্রাচ্যপন্থী বনাম পাশ্চাত্যপন্থীদের দীর্ঘদিনের লড়ায়ের অবসান হল এই সরকারী ঘোষণায়। সরকারী ঘোষণাকে সার্থক করে তোলবার জন্য পরের বছরই সরকারী ব্যবস্থাধীনে খোলা হল হুগলী কলেজ। টাকা এল মহসীনের ট্রাস্ট ফান্ড থেকে।

১৮৩৬ সালের জুলাই, সেকালের সমাচার দর্পণে 'হুগলীর নূতন পাঠশালা' শিরনামায় একটি ছোট্ট সংবাদ প্রকাশিত হল : 'কলিকাতার সম্বাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হুগলীর নূতন বিদ্যালয়ে ইঙ্গলণ্ডীয় ও এতদ্দেশীয় শিক্ষকেরা নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব আগামি আগস্ত মাসের ১ তারিখে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হইবে। বিদ্যার্থি ছাত্রেরা ঐ পাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাক্তার উয়াইস সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিলেই ইষ্ট সিদ্ধ হইবে।'

দু সপ্তাহ বাদে ৬ আগস্ট ঐ পত্রিকায় আর একটি সংবাদ প্রকাশিত হল : 'হুগলি কলেজ।—গত সোমবার ১ আগস্ত তারিখে হুগলির কালেজের কার্য আরম্ভ হইল। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হওয়া গেল যে প্রথম দুই দিবসের মধ্যেই এক সহস্র বালক কালেজে ভর্ত্তি হইল।'

কলেজ বলতে আজ আমরা যা বুঝি, সে যুগে তা ছিল না। তখনো ক্যালকাটা ইউনি-

ভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে আমলে স্কুল কলেজের শিক্ষায় আজকের মত সুনির্দিষ্ট ভেদরেখা ছিল না। একই ইনস্টিটিউশনে ছেলেরা স্কুলের ও কলেজের পড়া পড়ত। হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক উনিশ বছর আগে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দু কলেজের মডেলেই গড়া হল হুগলী কলেজ। গোটা কলেজ আঠারোটা ক্লাসে বিভক্ত ছিল। পাঠ্যসূচী নির্ধারিত হল ইতিহাস, ইংরাজী সাহিত্য (গদ্য ও পদ্য) নীতিশাস্ত্র, ত্রিকোনমিতি জ্যোতিষ প্রভৃতি এবং সেই সঙ্গে ইংরাজী বাংলা, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও রচনা। ইংরেজী পঠন পাঠনের পাশাপাশি আরবী ও ফার্সীও পড়ানো হত। এজন্য দশজন মৌলবী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ঐ বছরের ১০ সেপ্টেম্বরের সমাচার দর্পণ থেকে জানা যায় যে তখন কলেজের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ষোলশ। এই ষোলশ ছাত্রের পড়াশোনার নিয়মের ব্যাপারে দর্পনে যা বেরিয়েছিল তা এখানে তুলে ধরছি : 'উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের লিখন পঠন বিষয়ে আপাতত এতন্নিয়ম সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে যে বেলা দশ ঘন্টা সময়ে ছাত্রবর্গ উপস্থিত হইয়া চারিঘন্টা পর্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিবেন এতন্মধ্যে আধ ঘন্টা লিখিবেন। এবং অর্ধ ঘন্টা জন্য একবার অবকাশ পাইবেন মাত্র।' টিউশন ফির হার ধার্য হল '১ মুদ্রা অবধি ৩ মুদ্রা।' মাইনে কিন্তু ক্লাস অনুযায়ী ধার্য হয় নি, ছাত্রদের অবস্থানুসারে বেতন নেওয়া হত। গরীব ছাত্রের বেলায় একটাকা, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরের ছাত্রদের দিতে হত তিন টাকা।

সাত আটমাস পরে কলেজে পড়াশোনা কেমন চলছে তাই দেখতে ও পুরস্কার বিতরণী উৎসবে যোগদান করতে পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন কমিটির তরফে কলকাতা থেকে এলেন স্যার এডোয়ার্ড রয়ন, স্যার বেনজামিন ম্যালকিন মিঃ সেক্সপীয়র, মিঃ ট্রেভেলিয়ান, মিঃ সাদারল্যান্ড, মিঃ ডেভিড হেয়ার, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাবু রসময় দত্ত ও ক্যাপ্টেন জনসন। সেদিন পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন কমিটির মেম্বাররা যে কলেজের পড়াশোনার ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়েই ফিরেছিলেন তার প্রমাণ পরের ঘটনাতেই পাওয়া যাবে।

কলেজ শুরু হয়েছিল ভাড়া বাড়িতে। মাসিক একশো চল্লিশ টাকা ভাড়া। কলেজের ছাত্রসংখ্যা বিপুল। তিন তিনটে ইনস্টিটিউশন চলছে তখন কলেজের নামে— কলেজ, 'ইমামবারা সংলগ্ন' সেই পুরোনো স্কুল ও মাদ্রাসা। ফান্ড যখন একই তখন আলাদা অস্তিত্ব বজায় না রেখে পুরোনো স্কুল কলেজের স্কুল সেকশনের সঙ্গে মার্জ করে গেছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন হুগলীর সিভিল সার্জন ডঃ টমাস ওয়াইজ সমাচার দর্পণের ভাষায় শ্রীযুত ডাক্তার উয়াইস।

ওয়াইজ সাহেবের অনুরোধে পাব্লিক ইনস্ট্রাকশন কমিটি গভর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিল কলেজের জন্য নিজস্ব একটি বাড়ি তৈরী করতে। তৈরী করার অনেক ঝামেলা তাই যে বাড়িতে কলেজ প্রায় বছরখানেক ধরে মাস ভাড়া গুনে এসেছে সেটিই সরকার কিনে নেবেন স্থির করলেন। খবর গেল অবসরপ্রাপ্ত জজ ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের কাছে। পেরণ সাহেবের বাংলো, প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাগানবাড়ি, ব্রজেন্দ্রকুমার শীলের নীলামে ডেকে নেওয়া বাড়ি, সরকার কুড়ি হাজার টাকায় কিনে নিলেন, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে। কলেজের এই বাড়ি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৮৪০ সালের ১ ফেব্রুয়ারী সমাচার দর্পণে লেখা হয় : 'বোধহয় মুর্শিদাবাদের শ্রীযুক্ত নওয়াব সাহেবের নূতন রাজবাটী ভিন্ন কলিকাতার বাহিরে এমত উৎকৃষ্ট বাটী আর কুত্রাপি নাই।'

গঙ্গার পাড়ে রাজেন্দ্রলাল সাধু রোডের উপর হুগলী মহসীন কলেজের সেই বাড়ি আজও আছে। কিন্তু কৈ স্কুল তো নেই সেখানে। আজ ঐ বাড়িতে শুধু কলেজের ক্লাসই বসে। স্কুল তবে কোথায়? ঘড়ির মোড় ছাড়িয়ে, বাঁয়ে কোর্ট রেখে, ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সবুজ চতুর্ভুজগুলি 'পাঁচরাস্তার আড়াআড়িভাবে পার হয়ে দক্ষিণে ষণ্ডেশ্বর তলার দিকে এগুতে গিয়ে বাঁয়ে পড়ল পেরন সাহেবের বাংলো। হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তবে কি ভুল ঠিকানায় এসেছি? কিন্তু অমর বাবু তো চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে আছেন মাস্টার মশাইরা। আর আমি শুধু ইতিহাসের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছি। বেশী ঘুরতে হয় নি। একটু এগুতেই মোড় পড়ল। রাজেন্দ্রলাল সাধু রোড আর কলেজ রোডের মোড়। ঐ মোড় ছেড়ে দক্ষিণমুখে শখানেক গজ এগুতেই যেখানে কলেজ রোড এসে থমকে দাঁড়িয়েছে সেখানে অনেক প্রাচীন এক বিশাল জমিদার বাড়ির সামনে দেখি দাঁড়িয়ে আছেন হেডমাস্টার মশাই। হেসে বললেন : তাহলে এসে গেছেন। আসুন। সহৃদয় অভ্যর্থনার প্রশান্ত উদার হাস্য যেন মনে হল অদূরের গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসা এক ঝলক পবিত্র স্নিগ্ধ বাতাসের মত আমায় বুকে জড়িয়ে ধরল। হুগলী জেলার প্রাচীনতম শিক্ষায়তনের প্রবীণ কর্ণধারের পেছন পেছন আমি প্রবেশ করলাম এক অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন প্রাসাদে। মুহূর্তে মনে হল আমি যেন সরাসরি ইতিহাস ও বর্তমানের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছি। এখানেই প্রোথিত রয়েছে আধুনিক হুগলীর, মহম্মদ মহসীনের হুগলীর সাতমহলা অট্টালিকার ভিত্তিপ্রস্তর। এখন শুধু ভিতের মাল মশলা জানতে হবে —তাহলেই জানা যাবে সাতমহলার মহলগুলো কেমন করে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

আজকের হুগলী জেলা বলতে আমরা যা বুঝি একশো তিরিশ বছর আগে তার ভৌগলিক চেহারা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম। তখন হুগলী রীতিমত বড় জেলা। যে বছর কলেজ কর্তৃপক্ষ পেরণ সাহেবের বাংলো কিনলেন সে বছরই হুগলীর ম্যাজিসট্রেট ই এ স্যামুয়েলস একটি সমীক্ষার আয়োজন করেন। ঐ সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, তখন হুগলী জেলার আয়তন ছিল ২৫০৯ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা পনেরো লক্ষ। শুধু হুগলী থানার লোক সংখ্যাই ছিল সত্তর হাজার এবং চুঁচুড়ার দশ হাজার। এই মোট আশী হাজার লোকের জন্য তখন গোটা এলাকায় মাত্র দুটি ইংরেজী স্কুল ছিল— একটি হুগলী কলেজের স্কুল (চুঁচুড়ায়) অন্যটি হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল (হুগলীতে)।

ধীরে ধীরে কলেজকে আশ্রয় করে স্কুল বেড়ে চলল। শুধু যে বেড়েছে তাই নয়, পরিবর্তনের বিচিত্র প্রক্রিয়ায় পাক খেয়ে পেয়েছে বর্তমান চেহারা। সেই চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে অমরবাবু তাঁর প্রবন্ধের আর একটি জায়গায় বলেছেন : '১৮৪৬ সাল পর্যন্ত হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হুগলী কলেজেরই নিম্নতর শ্রেণীগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ বৎসরই এই বিদ্যায়তনের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় উচ্চতর দুইটি শ্রেণী কলেজ এবং নিম্নতর শ্রেণীগুলি কলেজিয়েট স্কুলরূপে পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়। স্কুল অংশে সাতটি শ্রেণী ছিল, নিম্নমানের চারটি এবং উচ্চমানের তিনটি। স্কুল থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররা কলেজ শ্রেণীতে ভর্তি হত। ১৮৪৯ সালে কলেজের দুই শ্রেণীকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং ১৮৫৬ সালে স্কুল বিভাগে উচ্চ এবং নিম্নমানের পার্থক্য তুলে দেওয়া হয়। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৎসরই হুগলী কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করে।'

কলেজের স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলও পেল এনট্রান্স পরীক্ষায় ছাত্র পাঠানোর অনুমতি। সে বছর এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল চারশো ছাত্রিশ। এর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা চারশো তেইশ ও মুসলমান আট। পাঁচ বছর পরে এই সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশো চুরানব্বইতে। আঠারোশ সত্তর-একাত্তর সালে এই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল তিনশো তিরানব্বই। সংখ্যাগুলো উল্লেখ করলাম, কারণ স্কুল যখন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তখন কলেজেরই আর একটি শাখা মাদ্রাসার বড় শোচনীয় অবস্থা। গত শতাব্দীর ছাপ্পান্ন-সাতান্ন সালে মোট সাতষট্টিটি ছেলে পড়ত মাদ্রাসায়, চৌদ্দ বছর পরে সত্তর সালে এই সংখ্যা নেমে আসে চুয়ান্নতে।

স্বভাবতই স্থানীয় মুসলমানরা আদৌ খুশী হন নি মাদ্রাসার জনপ্রিয়তা হ্রাসে। তাঁরা বরং রেগেই ছিলেন। ১৮৬১ সালে মৌলবী আব্দুস লতিফের একটি পুস্তিকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষোভ ফেটে পড়ল। লতিফ সাহেব এই পুস্তিকায় মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা হ্রাসের কারণ দেখাতে গিয়ে বলেছিলেন মহসীন ট্রাস্টের পূর্ব-নীতি অনুসারে দরিদ্র মুসলিম ছাত্ররা বিনা বেতনে থাকা খাওয়ার সুযোগে আগে পড়তে আসত।

সরকার সে সব সুযোগ বন্ধ করায় আগের মত ছাত্ররা আর পড়তে আসছে না মাদ্রাসায়। তিনি সরসরি দাবী জানালেন যে পূর্ব-নীতি সরকার পুনরায় অনুসরণ করুন। ব্যাপারটা গভর্ণমেন্টের চোখ এড়ায় নি। বিক্ষোভ দানা বেধে ওঠার আগেই ঠিক হল আগের মত মাদ্রাসা'র ছাত্রদের জন্য বিনা বেতনে খাওয়া থাকা ও পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে। সেই উদ্দেশ্যেই পেরণ সাহেবের বাংলোর পাশে আর একটা বাড়ি গভর্ণমেন্ট কিনলেন। এই বাড়িটি হল মাদ্রাসার ছাত্রদের বোর্ডিং হাউস।

আমি মাদ্রাসার বোর্ডিং হাউসে বসে কথা বলছিলাম মাস্টার মশাইদের সঙ্গে। অংশত দোতলা এই বিশাল বাড়িটি অতীতে ছিল বোর্ডিং, বর্তমানে কলেজিয়েট স্কুলের স্থায়ী আস্তানা। কিন্তু এই বাড়িটি কার? কবে তৈরী হয়েছিল? কবেই বা স্কুল পেরণ বাংলো ছেড়ে দিয়ে এই বাড়িতে উঠে এল? আমার প্রশ্নগুলির জবাবে যা উত্তর পেয়েছি তা হল: বাড়িটি ঠিক কবে তৈরী হয়েছিল বা আদিতে কার ছিল জানা যায় না। তবে অনুমান পেরণ বাংলোর মত এই বাড়িটিরও এক সময়ে মালিক ছিলেন নোট জালিয়াত প্রাণকৃষ্ণ হালদার। ধনী জমিদার প্রাণকৃষ্ণ হালদার পেরণ বাংলোর বাগানে পারসিয়ান আতর ছড়িয়ে, কাশ্মীরী শাল বিছিয়ে ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে স্ফূর্তির ফোয়ারায় মশগুল হয়ে থাকতেন। ফোয়ারার উৎস যাতে কখনো না শুকিয়ে যায় তাই পাশের এই বাড়িটির গোপন কুঠরীতে নোট জালের নিপুণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। দিনের বেলায় টর্চ জেলে অমরবাবুর পেছন পেছন ঢুকলাম প্রাণকৃষ্ণ হালদারের নোট জালিয়াতির গোপন কুঠরীতে। যে বাড়ির প্রতিটি ঘর প্রায় হলঘরের মত বড়, যার সিলিং কলকাতার যে কোন দোতলা বাড়ির চেয়েও উঁচু তারই আনাচে-আনাচে লুকিয়ে রয়েছে দম বন্ধ করা ঘুলঘুলি দেওয়া খুব ছোট ছোট খান কয়েক কুঠরী। এতে ঢুকতে হলে যে সরু প্যাসেজে পা দিতে হয় তাতে একটি মানুষও সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। আড়াআড়ি ভাবে ঢুকতে হবে। অন্ধ-বদ্ধ ঘরগুলির তলা দিয়ে একদিন যে সুড়ঙ্গপথ সোজা চলে গিয়েছিল গঙ্গার ঘাটে তার প্রমাণ আজও দেখতে পাওয়া যায়। সুড়ঙ্গগুলো এখন বোজানো। হয়তো একদিন এ পথেই দেড়শো বছর আগে হালদার মশায়ের কর্মচারীরা জাল নোটের বস্তা নিয়ে নেমে যেতেন রাতের অন্ধকারে গঙ্গার ঘাটে। তারপর নৌকোয় সেই টাকা চালান যেত বঙ্গের বন্দরে বন্দরে, রাজধানী কলকাতায়। হয়তো একদিন এ পথেই চোরাই ব্যবসায় মত্ত প্রাণকৃষ্ণ হালদার কোম্পানীর পুলিশের ভয়ে পালাতে গিয়ে ঘাটে লাগানো নৌকোয় পা দিয়ে দেখেন চারপাশে পুলিশ। তারপর? পরের ইতিহাস তো আগেই বলেছি। এই বাড়িতেই মাদ্রাসার বোর্ডিং হস, ১৮৭১ সালে।

আঠারো শ' ছত্রিশ থেকে একাত্তর, পঁয়ত্রিশ বছরে হুগলী জেলার ভূগোল ও ইতিহাস পাল্টেছে বিস্তর। ১৮৭২ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী হুগলীর আয়তন ছিল ১৪৮২ই বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১,৪৮৮,৫৫৬। এই সেনসাস গণনার ছ বছর আগেই হুগলী ও চুঁচুড়া শহর দুটিকে একসঙ্গে নিয়ে গঠিত হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটি। সে সময় গোটা জেলার প্রধান সাতটি স্কুলের মধ্যে—কলেজিয়েট স্কুল ও ব্রাঞ্চ স্কুল ছিল এই মিউনিসিপ্যালিটিতে।

১৮৭১-৭২ সালের এনট্রান্স পরীক্ষায় জেলার উনিশটি হাইস্কুল থেকে মোট একশটি ছেলে পাশ করে। এর মধ্যে কলেজিয়েট স্কুলের পাশকরা ছাত্রসংখ্যা ছিল সাতাশ। এই সাতাশ জনের মধ্যে ৬ জন ফার্স্ট ডিভিশনে, ১৫ জন সেকেন্ড ডিভিশনে ও ৬ জন থার্ড ডিভিশনে পাশ করে। সরকারী পরিদর্শকের মতে কলেজিয়েট স্কুলের রেজাল্ট এত ভাল হওয়ার কারণই ছিল অসামান্য শিক্ষকতা।

কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকভাগ্য চিরকালই সুপ্রসন্ন। যুগে যুগে যে সব শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বহন করেছেন তাঁদের মধ্যে এই কয়েকজনের নাম চিরকাল স্কুল সগর্বে মনে রাখবে—মি. টোয়েন্টিম্যান, মি, গ্রেভস, মি, গুড়, ঈশান ব্যানার্জী, রাধাগোবিন্দ দাস, মি, ক্যানটোফার, শিবচন্দ্র সোম, নন্দলাল দাস, হরিপ্রসাদ ব্যানার্জী ও রসময় মিত্র। এ'রা প্রত্যেকেই গত শতাব্দীতে কোন না কোন সময়ে কলেজিয়েট স্কুলের পরিচালন-দায়িত্ব বহন করেছেন। বর্তমান শতাব্দীতে যাঁরা স্কুলের হেড মাস্টার হিসাবে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে ক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, কৈলাশ ভট্টাচার্য, বরদাপ্রসাদ ঘোষ, মহম্মদ আজিজুল হক ও হরিপ্রসাদ ব্যানার্জীর নাম কোনদিনই স্কুল বিস্মৃত হবে না।

বিস্মৃতির কোন সুযোগ নেই। কারণ এ'দের হাতে যে সব ছাত্র তৈরী হয়েছেন, সে সব ছাত্র পেলে যে কোন স্কুলই নিজেকে ধন্য মনে করবে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, জাস্টিস আমীর আলী গত শতাব্দীতে এই স্কুলেই তাঁদের জীবন গড়ার প্রাথমিক পাঠ সাঙ্গ করেন। ১৮৭২ সালে কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র বিপিনবিহারী গুপ্ত এনট্রান্সে ফার্স্ট হয়েছিলেন। বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিংশ শতাব্দীর সূচনা দশকে বছর দুয়েক এই স্কুলে পড়েছিলেন।

শিক্ষক ও ছাত্রের মণিকাঞ্চনযোগে বিংশ শতাব্দীর সূচনায় কলেজিয়েট স্কুল বাংলাদেশের শিক্ষা-মানচিত্রে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুনামের তরঙ্গ-শীর্ষে অবস্থান সময়ে স্কুলের ঠিকানা বদল হল, ১৯১৩ সাল। ১৮৩৬ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত স্কুল ও কলেজ একই সঙ্গে বসেছে পেরণ বাংলোয়। কিন্তু নামী স্কুলে ছাত্র-ভর্তির জোয়ারে স্কুলের বরাদ্দ জায়গায় আর কুলোয় না। জায়গা নেই কলেজেও। তাই স্থান সমস্যা মেটানোর জন্যই সাতাত্তর বছরের পুরোনো ভিটে ছেড়ে স্কুল উঠে গেল মাইলখানেক দূরে চুঁচুড়া বড়বাজারে গঙ্গার লঞ্চঘাটার পাশে ভূদেব ভবনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটে এই ভূদেব ভবন।

স্কুল পাল্টাল তার ঠিকানা। ইতিমধ্যে জেলার ঠিকানাতেও কিছু অদল বদল ঘটে গেছে। ১৮৭২ সালের সেনসাসে হুগলীর আয়তন বলা হয়েছিল ১৪৮২ই বর্গমাইল; তখন হাওড়া ছিল হুগলীর ভেতর। ১৯১১র সেনসাসে দেখা গেল হুগলীর আয়তন দাঁড়িয়েছে ১১৮৯ বর্গমাইল; হাওড়া আলাদা জেলায় পরিণত হয়েছে। তখন হুগলীর জনসংখ্যা প্রায় এগারো লক্ষ। এই এগারো লক্ষ লোক যে কয়েকটি স্কুলের দিকে সর্বদাই তাকিয়ে থাকতেন তাদের অন্যতম ছিল কলেজিয়েট স্কুল।

জেলার অন্যতম সেরা স্কুল কলেজিয়েট স্কুল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভূদেব ভবনে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় এ আর পি'র প্রয়োজনে ভূদেব ভবন ছেড়ে দিতে হল। বাস্তু হারিয়ে স্কুল কিন্তু নিরাশ্রয় হয় নি। চুঁচুড়া কোর্টের পাশে মাদ্রাসা বিল্ডিংয়ে যুদ্ধের কটি বছর স্কুল জায়গা পেল। যুদ্ধ মিটতে আবার ফিরে এল ভূদেব ভবনে। কিন্তু তাও মোটে বছর দুয়েকের জন্য। সাতচল্লিশ সালে রেশনিং অফিসের জন্য স্কুলকে ছেড়ে দিতে হল ভূদেব ভবন। ছেড়ে দিয়ে ফের স্কুল উঠে এল মাদ্রাসা বিল্ডিংয়ে। এখানেই কেটেছে পরের চারটি বছর।

ঠিক এই সময়ে স্থানীয় অধিবাসীদের বিক্ষোভ দানা বেধে উঠেছিল মাদ্রাসার ছাত্রাবাসকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ দীর্ঘ-দিনের। মাদ্রাসার ছাত্রদের উচ্ছৃংখল আচরণ নাকি স্থানীয় বাসিন্দাদের শান্তিভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার সেই অভিযোগের কিনারা হল। ছাত্রাবাস তুলে দিয়ে ছাত্রাবাসের বাড়িতে কলেজিয়েট স্কুলকে এনে বসানো হল, ১৯৫১ সাল। সেই থেকে স্কুল বসেছে এই বাড়িতে।

এই বাড়িতেই গত আঠারো বছরে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে স্কুলের ইতিহাসে। সাতান্ন সালে আপগ্রেডিংয়ের সময় পশ্চিম-বঙ্গের যে কটি স্কুল প্রথম হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে পরিণত হয়েছিল তার অন্যতম এই কলেজিয়েট স্কুল। হিউ-ম্যানিটিজ, সায়েন্স ও টেকনিক্যাল—তিনটি স্ট্রীম নিয়েই হায়ার সেকেন্ডারী সেকশন চালু হল। সায়েন্স ও টেকনিক্যাল স্ট্রীমের প্রয়োজনে ঐ বছরই মেন বিল্ডিংয়ের দক্ষিণে গঙ্গার পাড়ে উঠেছে পাখির মত

ডানা মেলে দেওয়া দোতলা সায়েন্স ব্লক ও উত্তরদিকে একতলা দুটি টিন শেড। কয়েক বিঘা জমির উপর ছড়ানো মেন বিল্ডিং, সায়েন্স ব্লক, টিনশেড ও মাঝে সবুজ ঘাসের গালচে পাতা মাঠ, পাশে বয়ে গেছে গঙ্গা—সব যেন ছবির মত। বাইরের, শহরের কোন গন্ডগোল এখানে এসে পৌঁছোয় না। নিরিবিলি, শান্ত। পড়বার ও পড়াবার আদর্শ জায়গা যদি কেউ আমাকে কখনো খুঁজতে বলেন তাহলে একমুহূর্ত না ভেবেই আমি বলব সে জায়গা এই হুগলী কলেজিয়েট স্কুল।

শুধু কি শান্ত, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন প্রচ্ছদ দেখেই আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছি? না—তা নয়। স্কুলের রেজাল্ট রেকর্ডই আমার উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে। ষাট থেকে ঊনসত্তর, এই দশ বছরে স্কুলের পাশের হার শতকরা পঁচানব্বই। একষট্টি সালে শিবাজী চক্রবর্তী ও পঁয়ষট্টিতে পীযূষবন্ধু বিশ্বাস যথাক্রমে নবম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে হায়ার সেকেন্ডারী সায়েন্স স্ট্রীমে। হিউ-ম্যানিটিজে তেষট্টিতে সেকেন্ড হয়েছিল এই স্কুলেরই ছেলে প্রদীপ গুপ্ত। সাতষট্টিতে সুসীম ব্যানার্জী এই স্কুল থেকেই হিউ-ম্যানিটিজে সেকেন্ড হয়ে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে। গত বছর টেকনিক্যালে ইলেভেনথ স্ট্যান্ড করেছিল এই স্কুলেরই ছাত্র বেণুবিলাস ঘোষাল। মেরিট স্কলারশিপ আর ন্যাশনাল স্কলারশিপ তো এ স্কুলের ছেলেদের কাছে মুড়ি মুড়কির মত।

শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলা অভিনয়, বিতর্কে কলেজিয়েট স্কুলের ছেলেরা রীতিমত চৌখস। ফুটবলে ডিসট্রিক্ট টীমে এই স্কুলেরই অনেক ছেলে খেলেছে। নিখিল বঙ্গ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সাতষট্টিতে হায়ার সেকে-ন্ডারী হিউম্যানিটিজে সেকেন্ড স্ট্যান্ড করা ছেলে সুসীম সেকেন্ড হয়েছিল। ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র সঞ্জয় ধর গত বার জেলা রচনা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

শিবাজী, প্রদীপ, পীযূষ, সুসীম, বেণু, সঞ্জয়ের মত ছশো ছেলের ভবিষ্যত যারা গড়ে তুলেছিল, তাঁরা কিন্তু সমস্ত নাম খ্যাতির প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে নীরবে তাঁদের ব্রত পালন করে চলেছেন। আমি কলেজিয়েট স্কুলের প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী আটত্রিশজন শিক্ষকের কথা বলছি। যুগে যুগে এঁরাই দেশ ও জাতিকে উপহার দিয়েছেন শত শত কৃতী ছাত্র। কিন্তু কৃতী ছাত্র গঠনের কৃতিত্ব যাদের পাওনা সেই অমরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, অনিলকুমার পাঠক, অমৃতকুমার দেব, সুধীরচন্দ্র পাল, বিনয়গোবিন্দ চৌধুরী, শৈলেন দে, নিমাই চাঁদ কুন্ডু, অসিতকুমার ভট্টাচার্য, শৈলজাকান্ত মুখার্জি, সমরেন্দ্র কিশোর দত্ত দে-র কথা উল্লেখিত না হলে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁরাই তো কাদা-মাটির তাল ছেনে মূর্তি গড়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। দেব দেউলে সকাল সন্ধ্যায় নিত্য পূজার্চনার পূজারী এঁরাই। এঁরাই আমাদের মানুষ গড়ার কারিগর। এদের স্নেহ প্রেম প্রীতি মমতায় সিক্ত হয়ে শিশুরা একদিন মানুষ হয়ে ওঠে।

কিন্তু শিক্ষকদের আন্তরিক চেষ্টার সাথে সরকারী বদান্যতার শুভ মিলন ছাড়া সব যত্নই যে ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে স্কুলের লাইব্রেরীতে আট হাজারের ওপর বই আছে, আছে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি, সে স্কুলে যদি লাইব্রেরীয়ান না থাকে তাহলে কি অবস্থাটা ঢাকিহীন ঢাকের মত দাঁড়ায় না? যে স্কুলের জন্য গড়ে বছরে সরকার প্রায় সোয়া দু লাখ টাকা ব্যয় করেন তার জন্য আর সামান্য কিছু ব্যয়ে একটি লাইব্রেরীয়ানের পোস্ট স্যাংশন করতে আপত্তি কি? এ প্রশ্ন শুধু আমার নয়, হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের ছশো ছাত্র ও আটত্রিশজন শিক্ষকেরই এই জিজ্ঞাসা সরকারের কাছে। আমি শুধু প্রশ্নটি কাগজে কলমে তুলে ধরলাম।

আর কোন প্রশ্ন নয়। স্কুলের ইতিহাস ভূগোলের ফিরিস্তি জানার পালা এবার শেষ হল। নমস্কার জানিয়ে অমরবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামলাম। পায়ে পায়ে পেছনে ফেলে এলাম গঙ্গার ঘাট, কলেজিয়েট স্কুল, পেরণ সাহেবের বাংলো, মাদ্রাসা, কোর্ট। সামনেই ঘড়ির মোড়।

ফিরতি পথে দেখা হল রাজেশ্বরীর সাথে। আসার মত যাওয়ার বেলায় আবার দোলাতে দোলাতে, ঘোরাতে ঘোরাতে নাচাতে নাচাতে, নাগরদোলায় পাক খাইয়ে খাইয়ে রাজেশ্বরী যখন নামিয়ে দিল স্টেশনে তখন দূরে বহুদূরে বন মাঠ পথ প্রান্তর মাড়িয়ে দেখি ছুটে আসছে নীরস সরীসৃপ। এর কোটরেই এবার আশ্রয়। এবার ঘরে ফেরার পালা।

—অশিবংসু

পরের সংখ্যায়ঃ হাওড়া জিলা স্কুল

অলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[কলকাতার ছেলে বিকাশ এল পাড়াগাঁর ব্যাংকে। প্রমোশন নিয়েই। চোখে তার গ্রাম চেনার নেশা। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্কবাবুর বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে, এক আশ্চর্য আলোর বিন্দু। আর মনীষা, কাঙ্ক্ষিত প্রতিমা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত। সমাজের চারদিকে টানাপোড়েন। ক্ষোভ-ক্রোধের মিছিল। গ্রাম্য রাজনীতির বীভৎসতা।

বিকাশের চোখে সোনালির নেশা, মনীষার অস্তিত্ব। কিন্তু সে পালাও যেন ফুরোচ্ছে, হারিয়ে যেতে চাইল মনীষা।

আপিসেও অশান্তি। মাঝে মাঝেই বিক্ষোভের ঝড়। কর্মচারীদের সন্দেহে বিকাশ আহত।

ভাবল পালিয়ে যাবে সে। ছাড়বে চাকরি। ষড়যন্ত্রের হাত থেকে পাবে রেহাই।

গ্রাম্য-রাজনীতি ঘোরালো হয়ে উঠল। শিকার হল তার শশাঙ্ক নিয়োগী। আহত হয়ে শয্যাশায়ী।

এমন সময় এল মনীষার চিঠি। প্রত্যেকটা অক্ষর তীরের ফলার মতো জ্বলে উঠল। মনীষা মরছে। লিউকোমিয়া তার।

।। ঊনত্রিশ ।।

তিনটে দিন। তিনটে দিন যে কিভাবে কেটে গেল, বিকাশ টেরও পেল না। মনের এইরকম একটা অবস্থা কখনো কখনো আসে, স্নায়ুগুলো নিঃসাড় হয়ে যায়—একটা বোবা যন্ত্রণা মস্তিষ্ককে স্তব্ধ করে দেয় একেবারে। কিছু ভাববার থাকে, না—করবারও নয়। চোখের সামনে সব কিছু ছায়ার মিছিল হয়ে এগিয়ে যায়, তাদের দেখা যায়—দেখা যায় না, তারা সুদূর—তারা অনাবশ্যক, জীবনে কোথাও কোনো যোগ নেই তাদের সঙ্গে।

ঠিক তিনটে দিন ধরে এই ছায়া-মিছিল বয়ে গেছে বিকাশের সামনে দিয়ে। সেই মিছিলে সুনু আছে—যে বিকাশের সামনে আর কখনো আসে না, এই জীর্ণ গন্ধভরা বিকট বাড়ীটার কোনায় কোথায় লুকিয়ে বসে থাকে, জীবনের প্রথম বঞ্চনা চোখের জলের বোবা স্বাদ বয়ে আনে তার ঠোঁটে, সেই মিছিলে দেখা যায় শশাঙ্ককাকাকে—মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে খাটে হেলান দিয়ে বসে—তাঁর সঙ্গে গভীর আলাপে মগ্ন নাকাবাবু এবং নিয়োগীপাড়ার আরো কজন। কাকিমার একটা রক্তহীন মুখ আসে যায়—চোখ দুটো যেন তাঁর কোথাও নেই, একেবারে অন্ধকারে ঢাকা। নারকেল গাছের নীচে বসে মেজদা রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাখীদের খাওয়ায়, থেকে থেকে চেঁচিয়ে ওঠে: 'কালী—কালী!' অফিসে ধনঞ্জয় দত্ত আসে, প্রদীপ মুস্তৌফি আসে—কাজ সেরে চলে যায় নিজের জায়গায়। এদের কারো সঙ্গে তার যোগ নেই—এরা তার কেউ নয়।

এই নির্বেদের ভেতরেও যন্ত্রণার একটা কেন্দ্র আছে তার। থেকে থেকে সেখানে যেন বিদ্যুৎ চমকায়। তখন একটা কিছু ভাঙচুর করতে ইচ্ছে হয় তার—কাচের গ্লাসটা। কুঁজোটা—ঘরের লণ্ঠনটা—এমন কি বেহালাটাও। আশ্চর্য, কেন সে ওই বেহালাটাকে সঙ্গে করে এনেছিল? এখানে আসবার পরে তিনটে দিনও ওটাতে সে হাত দিয়েছে কিনা সন্দেহ।

বেহালা নয়, সুর নয়, সুনু নয়—কিছু সে চায় না, কিছুরই দরকার নেই তার। মনীষা। মনীষা তার সব কিছুকে ফাঁকা করে দিয়েছে—কোনো মানে হয় না, কোনো জিনিসেরই মানে হয় না এখন।

'তুমি আমার সঙ্গে দেখা কোরো না, তা হলে—'

তা হলে বাঁচবার জন্যে লোভ আসবে? দুঃখ আসবে, কান্না আসবে? কিন্তু মনীষার কোনো লোভ ছিল কখনো? এমন কি ভালোবাসারও? বিকাশের সন্দেহ জাগত কতদিন।

'কিছুই করা যায় না—না প্রভাকর?'

'না, অন্তত মেডিক্যাল সায়েন্সে—'

যন্ত্রণার বিদ্যুৎটা ছড়িয়ে পড়ে মাথার প্রত্যেক প্রান্তে, প্রতিটি কোষ যেন জ্বলে যেতে থাকে। নিজের ক্লীব অক্ষমতা নিজেকে আঘাত করে, যা হোক একটা কিছু আছড়ে ভেঙে ফেলবার দানবীয় আকাঙ্ক্ষা জাগে—মনে হয় ঝনঝন একটা ভয়ঙ্কর শব্দে অন্তত তার প্রতিবাদটাও বেজে উঠুক।

'দেখা কোরো না—দেখা কোরো না আমার সঙ্গে—'

'প্রভাকর, কিছুই করবার নেই?'

কিছুই করবার নেই। মহাকর্ষ ছাড়িয়ে অনন্ত আকাশে ডানা মেলবার প্রচণ্ডতম শক্তিতেও না। পৃথিবীতে আজো ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি।

স্কুলের মাঠ—সন্ধ্যার ক্যালভার্ট—শনিবারের একদিন হাঁটতে হাঁটতে—সেই অনেক দূরে কানাই পাল যেখানে মন্দিরটা দেখিয়েছিলেন, সেখানে চলে যাওয়া। কাঁটা বনে ভরা সে মন্দিরে কোনো বিগ্রহ নেই, কোন্ কালাপাহাড় হাতুড়ির ঘায়ে কবে তাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে, পোড়ো ইটের পাঁজায় তার শ্যাওলা, বিছুটি আর বুনো ওলের জঙ্গল। কিন্তু সামনে দীঘিটায় এখনো অনেকখানি লালচে জল, কলমী, পদ্মপাতা, শালুক-পদ্মের শুকনো নাল, ফড়িং, জলপিপি—জলের ভেতর মোটা মোটা ঢোঁড়া সাপের সাঁতার: সেইখানে—ভাঙা ঘাটের বড়ো বড়ো পাথরের যে-কোনো একটায় বসে পড়ে—মরা চোরকাঁটার মধ্যে পা ডুবিয়ে বিকাশের ভাবা: এইখানে—এই নির্জনতায় অনায়াসেই একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটে যেতে পারে, ভাঙা মন্দিরের দেবতা দেখা দিতে পারেন হঠাৎ, আসতে পারেন জটাধারী কোনো আকস্মিক সন্ন্যাসী—একটা ওষুধ কিংবা শিকড় তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলতে পারেন: 'এইটে খাইয়ে দাও কালই ভালো হয়ে যাবে তোমার মনীষা।'

ননসেন্স—বিশুদ্ধ ননসেন্স।

না—এইসব পোড়ো মন্দিরে দেবতা কিংবা সন্ন্যাসীরা কখনো আসেন না। গাড়ী নিয়ে কানাই পাল আসতে পারেন, তাঁর মনে কাব্য জাগতে পারে—সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন নিদেনপক্ষে একটা বীয়ারের বোতল। বিকাশেরা এখানে এলে কেবল আরো হিংস্র হয়ে ওঠে—এই নির্জনতা কেবল আত্মহত্যার প্রেরণা দেয়, জীবনটাকে আরো বেশি দেউলিয়া করে দেয়।

তার চেয়ে ব্যাঙ্ক ভালো। তার চেয়ে কাজ ভালো। একটা জন্তুর মতো প্রত্যেকটা দিনের বোঝা টেনে টেনে পরের দিনটার দিকে এগিয়ে যাওয়া ঢের ভালো।

কিন্তু কাজের বোঝাটাও একদিন ভার হয়ে উঠল।

ব্যাঙ্কের আবহাওয়া গরম। আলোচনা ভয়ানক রকমের উত্তেজিত। বিকাশ এসে নিজের চেয়ারে বসতেই চঞ্চলভাবে তার দিকে এগিয়ে এল প্রদীপ মুস্তৌফি।

এতদিন প্রায় তার সঙ্গে অসহযোগ চলছিল এদের। কিন্তু আজ প্রদীপ মুখ খুলল উৎসাহিতভাবেই।

'জানেন স্যার, কী হয়েছে?'

'কী?'

'এই একটু আগেই—বাজারের ভেতর দিয়ে কানাই পাল যখন গাড়ী করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর গাড়ীতে একটা মাঝারি সাইজের ক্র্যাকার'—

নিজের যন্ত্রণার ঘোর থেকে বিকাশ চমকে উঠল : 'ক্র্যাকার! এখানেও ক্র্যাকার!'

'কোথায় নেই?'—প্রদীপ হাসল : 'ওটা কি কলকাতারই একচেটিয়া বলে মনে করেন আপনি? কিন্তু কানাইবাবুর গাড়ীতে লাগে নি, পাশে পড়ে ফেটেছে।' লাগলেই ভালো হত।'

বিকাশ চুপ করে রইল। এখানে এমন কিছু আর ঘটবে না, যার জন্যে নতুন করে আশ্চর্য হওয়া চলে।

প্রদীপ বললে, 'নিয়োগীপাড়া আর পালপাড়া। তাদেরই রেষারেষির ফল। এর পরে দু-একটা ছোরাছুরিও চলবে হয়তো—কানাই পালই কি আর ছেড়ে কথা বলবে? দরকার হলে কলকাতা থেকে ভাড়াটে লোক নিয়ে আসবে। এই দুটো পাড়াই হল রি-অ্যাকশনারীদের ঘাঁটি। একদল ফিউডাল, আর একদল ক্যাপিটালিস্ট। শুধু মানুষের রক্তই শুষে খেতে জানে। এরাই দেশশুদ্ধ ছেলেগুলোকে গুন্ডা তৈরী করে নিজেদের স্বার্থে, ধেনো মদের পয়সা জুটিয়ে দেয়—খুন-জখম-দাঙ্গার উস্কানি দেয়।' —প্রদীপের চোখ জ্বলতে লাগল : 'এদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ শেষ না হলে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন আমাদের কোথাও নিয়ে যাবে না।'

এ-কথাগুলো বিকাশও জানে, নতুন করে কিছু শোনবার নেই তার। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা বিরস কৌতুক এগিয়ে এল তার ঠোঁটের কোনায়। বলতে ইচ্ছে করল : 'আমাকে এ-সব শোনানো কেন, আমি তো ওই রি-অ্যাকশনারীদেরই একজন, তাদের এজেন্ট।'

বক্তৃতার ভঙ্গিতে প্রদীপ আরো কিছু বলছিল, কিন্তু বিকাশের মনের সামনে আবার সেই শূন্যতাটা ঘনিয়ে আসছে। প্রদীপের কথাগুলো ক্রমে অবোধ্য হয়ে যাচ্ছে—সে শুনতে পাচ্ছে, অথচ মানে বুঝতে পারছে না। আর এই সময় চিঠিটা এল। হেড অফিসের চিঠি। চিঠি তার নামে, ওপরে ছাপ-বসানো : ইম্পর্ট্যান্ট।

'একটু সাবধান হয়ে চলা-ফেরা করবেন স্যার'—বলে নিজের টেবিলে ফিরে গেল প্রদীপ। বিকাশ চিঠিটা খুলল।

একবার পড়ল, দু-বার পড়ল। কপালে হাত রেখে বসে রইল কয়েক সেকেন্ড। তারপর ডাকল : 'প্রদীপবাবু!'

গলার স্বরটা অন্যরকম। প্রদীপ আশ্চর্য হল।

'কিছু বলছেন?'

'একটু আসুন এদিকে।'

প্রদীপ ফিরে আসতে বিকাশ হাসল।

'আমার নামে হেড অফিসে সিরিয়াস কমপ্লেন পৌঁছেছে। আমি এফিশিয়েন্ট নই, অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে সর্বদা ঝগড়া করি, ব্যাঙ্কে কনস্ট্যান্ট ট্রাবল, লোক্যাল পলিটিক্স নিয়ে হবনবিং করি, রেসপেক্টেবল পেট্রনদের অপমান করে থাকি। হেড অফিস জানাচ্ছে আমার সম্পর্কে তাদের অত্যন্ত ভালো ধারণা ছিল, কিন্তু একটা নতুন ব্রাঞ্চ থেকে অত্যন্ত রেসপনসিবল সোর্সে কেন এ ধরনের কমপ্লেন যায়, সেটা ব্যাখ্যা করবার জন্যে ইমিডিয়েটলি গিয়ে একবার দেখা করতে হবে।'

প্রদীপ থমকে গেল। গলার শিরা কাঁপতে লাগল তার।

চিঠিটা তার সামনে এগিয়ে দিয়ে বিকাশ বললে, 'পড়ুন।'

প্রদীপ মুস্তৌফি চেয়েও দেখল না চিঠিটা। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'স্যার, আপনি কি মনে করেন, এ চিঠি আমরা লিখেছি?'

নিঃশব্দে বিকাশ চেয়ে রইল প্রদীপের মুখের দিকে। প্রদীপের মুখে রঙ বদলাতে বদলাতে লাল হয়ে উঠল ক্রমশ।

'আমরা যদি লড়াই করি কখনো'—বলতে বলতে গলা বুজে এল তার : 'খোলাখুলিই করব। আমাদের দাবি সোজা, ভাষাও সোজা। এমন সাপের মতো লুকিয়ে আমরা ছোবল দিই না। এ চিঠি এখানে লিখতে পারে মাত্র দুজন, একজন শশাঙ্ক নিয়োগী, আর একজন কানাই পাল!'

ছোট ব্যাঙ্ক, অল্প জায়গা—প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেকের কানে যাচ্ছিল। কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। প্রদীপের পাশে এসে দাঁড়ালো ধনঞ্জয় দত্ত, চিঠিখানা তুলে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল তার ওপরে।

ধনঞ্জয় বললে, 'না—শশাঙ্ক নিয়োগী নয়। ব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তাঁর একটা উড়ো চিঠিকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টার ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। এই ব্যাঙ্কে সবচাইতে বেশি ডিপোজিট কানাই পালের, কলকাতার হেড অফিসে তাঁর মস্ত অ্যাকাউন্ট, বলতে গেলে তাঁরই জন্যে এখানে ব্রাঞ্চ খোলা। সেই সম্রাটের চিঠিতেই হেড অফিস টলমল করে উঠেছে, জরুরি তলব পড়েছে আপনার।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারল না কেউ।

বিকাশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।

'আচ্ছা নমস্কার, আপনারা কাজ করুন।'

'আপনি চললেন নাকি স্যার?'

'হ্যাঁ, জরুরি তলব। আজই যেতে হবে কলকাতায়।'

'কিন্তু এখন যাবেন কোথায়?'—প্রদীপ আশ্চর্য হয়ে বললে : 'ট্রেন তো রাত আটটার আগে আর নেই।'

'জানি। কিন্তু বোধ হয় এ ব্রাঞ্চে আর আমাকে ফেরৎ পাঠাবে না, ফেরৎ পাঠালেও আমি রিজাইন করব।'—বলতে বলতে বিকাশ আবার বসে পড়ল : 'কিন্তু চার্জটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আসুন সতীনাথ-বাবু—' মাঝবয়েসী এক ভদ্রলোককে বিকাশ ডাকল : 'অফিশিয়্যালী আপনিই নেকস্টম্যান—বুঝে নিন।'

রিকশ করে নিয়োগীপাড়ায় ফিরতে ফিরতে ধনঞ্জয় দত্তের শেষ কথাগুলো মনে পড়ছিল।

'আমরা আপনাকে ঠিক বুঝিনি স্যার, অনেক অন্যায় করেছি, অকারণ অসম্মান করেছি। পারেন তো সেজন্যে আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলব। এখানে এসে আপনি কোনো দলে যোগ দেন নি, নিরপেক্ষ হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। তাই সব দলের কাছ থেকে আপনি মার খেয়েছেন। এ যুগে কোথাও নিরপেক্ষের জায়গা নেই, বাঁচতে হলে একটা দল তাকে বেছে নিতেই হবে।'

'জানি না। কিন্তু প্রিয়গোপালবাবু ফিরে এলে একটা কথা বলবেন তাঁকে। আপনাদের কারো চাইতে আমি তাঁকে কম শ্রদ্ধা করতুম না, আমি তাঁর কোনো ক্ষতি করি নি।'

'ছি-ছি-ছি, ও-কথা মনে করিয়ে আর লজ্জা দেবেন না।'

কিন্তু নিরপেক্ষ? কেউ থাকতে পারে না? কেউ বলতে পারে না, আমি নির্ভর করব আমার বুদ্ধি আর বিচারের ওপর, আমি যাকে সত্য বলে জানব যুক্তি দিয়ে—হৃদয় দিয়ে—তাই আমার পথ? দরকার হলে তাতে আমি একাই চলব? তার নাম

দেওয়া হবে বিচ্ছিন্নতা? কিন্তু আমি তো সেভাবে সকলের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে কূপমণ্ডুকের মতো বাঁচতে চাই না। আমি সব সত্যিকারের দাবিতে অংশ নেব, সব সত্যিকারের সংগ্রামে শরিক হবো। কিন্তু আমার বুদ্ধি, আমার মন, আমার হৃদয়কে যদি আমি প্রভাবিত করে না রাখি, যদি কোনো দলকে আমি মাত্র আনুগত্যেই অনুসরণ না করে যাই, তা হলে কোথাও আমার জায়গা হবে না?

হয়তো তাই। হয়তো জায়গা হওয়া উচিত নয়। তোমার নিজের বুদ্ধি-যুক্তিই যে শেষ কথা—তা কে বলেছে তোমাকে? তুমি কি নিশ্চিত জানো যে পথ দেখাবার দিশারী না থাকলে নিজের পথ নিজেই চিনতে পারো তুমি? কোথায় পেলে তুমি এত আত্মবিশ্বাস, কোথা থেকে এল তোমার এতবড়ো অহমিকা?

ঠিক হয়েছে। নিজের পাওনাই তুমি পেয়েছ।

তাই তোমার কেউ রইল না। তুমি নির্বোধ, নিঃসঙ্গ, বিতাড়িত। যেখানে তোমার শেষ জোরটুকু ছিল, যে ভালোবাসার মাটিতে ছিল তোমার অবলম্বন, সেই মনীষাকেও তুমি হারালে।

আড়ষ্ট পায়ে বিকাশ উঠতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে। কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। কিন্তু ফিরে গিয়ে আরো অসহ্য হবে কলকাতা, দিনগুলো আরো ভারী হয়ে উঠবে, ক্লান্তির সীমা থাকবে না। মোহনলালের স্ট্রীটের বাড়ীতে, অথবা হয়তো শেষের দিকে কোনো হাসপাতালে ধীরে ধীরে মনীষার চোখ থেকে আলো নিবে যাবে, অথচ বিকাশ একবারও তাকে দেখতে যাবে না। তা হলে দুঃখ বাড়বে মনীষার, বাঁচবার সাধ জাগবে তার, অথচ তাকে বাঁচানো যাবে না, বিজ্ঞান আজো সে সঞ্জীবনী আবিষ্কার করতে পারে নি।

তার মৃত্যুটা তারপরে নেমে আসবে তার নিজের ভেতরে। কয়েক বছর ধরে মনীষার মধ্যে যেমন দেখেছে, তেমনি করে তারও কোনো লক্ষ্য থাকবে না, আনন্দ থাকবে না; শুধু কাজের জন্যে কাজ, শুধু একটা দিনের পর আর একটা দিনের পুনরাবৃত্তি। আর তাকে ঘিরে ঘিরে শ্রান্ত স্থাবির কলকাতা আরো শ্রান্ত হতে থাকবে, গড়ের মাঠে গুলমোহরের পাপড়ি আর শুকনো শালপাতা একসঙ্গে উড়তে থাকবে হাওয়ায়।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথা নিয়ে—আধ ঢাকা চোখে শশাঙ্ক খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিকাশকে ঢুকতে দেখে মিটমিট করে তাকালেন। একটা উজ্জ্বল আভা দেখা দিল তাঁর মুখে।

'ওহে, শুনেছ একটা খবর? কানাই পালের গাড়ীতে একটু আগেই নাকি কারা বোমা মেরে দিয়েছে। তবে লোকটার কপাল ভালো, লাগে নি।'

শুকনো গলায় বিকাশ বললে, 'শুনেছি।'

'যা পাজী লোক, শত্রু তো ওর চারদিকে। কিছু শিক্ষা ওর হওয়া উচিত। তবে কি জানো'—শশাঙ্ক একটু উদার হতে চেষ্টা করলেন: 'বোমা-টোমা ছোড়া কোনো কাজের কথা নয়। এ-সব বোমবাজী খুব খারাপ।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

কানাই পালের ব্যাপারে মশগুল ছিলেন বলে এতক্ষণ খেয়াল হয় নি শশাঙ্কর। এইবারে মনে পড়ল তাঁর।

'তা বাবাজী, এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে? ব্যাঙ্ক বন্ধ নাকি আজকে?'

'আজ্ঞে না, বন্ধ নয়। আমাকে চলে আসতে হল।' —তেমনি শুকনোভাবে বিকাশ বললে, 'আপনার সঙ্গে কথা ছিল একটু। ব্যাণ্ডেজের আড়ালে ডানদিকের পিটপিটে চোখ দুটো কুঁকড়ে প্রায় অদৃশ্য হল, বাঁ-চোখে ফুটে বেরুল খরধার সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে কথা বলবার জন্যে অফিস থেকে অসময়ে চলে এসেছে বিকাশ? কাগজটা সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন শশাঙ্ক।

'বোসো বোসো বাবাজী, দাঁড়িয়ে কেন?'

বিছানার পাশে চেয়ারটায় বসে পড়ল বিকাশ।

একটু পাশে ঝুঁকে পড়ে শশাঙ্ক জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা হে?'

'আমি আজ চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'বাসা বদলাচ্ছ? কেন বাবাজী, এখানে তোমার—'

'আজ্ঞে না, বাসা বদল নয়। আমি কলকাতায় চলে যাব।'

'ছুটি নিচ্ছ?'

'না—ছুটি নয়। হেড অফিস থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। মনে হচ্ছে, আর কোথাও ট্রান্সফার করে দেবে আমাকে। খুব সম্ভব আর আমি ফিরে আসব না।'

আরো সংকীর্ণ হল শশাঙ্কর চোখ। কয়েকটা রেখা পড়ল কপালে।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। এই তো সেদিন মাত্তর এলে এখানে। এর মধ্যেই বদলী? উঁহু বাবাজী, কিছু একটা ব্যাপার আছে এর ভেতরে।'

ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। আর সেটা জানতেও বেশি সময় লাগবে না শশাঙ্কর। তাই সে আলোচনাটা তোলবার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি অনুভব করল না বিকাশ।

'ওদের মর্জি।'

'না হে, মর্জি নয়। গোলমাল আছে কোথাও।'

ক্লান্তভাবে বিকাশ বললে, 'জানি না। কিন্তু কাকা, আমি একটা রিকশা নিয়েই এসেছি। এখনই জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাব এখান থেকে। তাই আপনাকে আর কাকিমাকে প্রণাম করতে এলুম।'

'এখনি যাবে কি হে।' —শশাঙ্ক উৎকণ্ঠিত হলেন: 'কলকাতার গাড়ী তো সেই রাত সাড়ে আটটায়। তাছাড়া মেয়ে-দুটো স্কুলে, তাদের সঙ্গেও তো দেখা হবে না।'

এতক্ষণে বিকাশ বুঝতে পারল, তার মনের আড়ালে এত তাড়াতাড়ি এই বাড়ী ছেড়ে যাবার প্রেরণাটা এসেছে কোথা থেকে। যাওয়ার আগে সুনুকে সে এড়িয়ে যেতে চায়, তার চোখের দিকে তাকাবারও সাহস তার নেই।

বিকাশ শশাঙ্কর কথার জবাব দিল না। বললে, 'আমি এখন চলে যাব প্রভাকরের বাসায়, কিছু কাজ আছে ওর সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলায় সেখান থেকেই রওনা হবো স্টেশনে।'

কাকিমা ঘরে এসে পড়েছিলেন। শশাঙ্ক বললেন, 'ওগো শুনছ, বিকাশ বাবাজী বদলী হয়ে গেল। আজ মাত্রই চলে যাবে এখান থেকে। আর জিনিসপত্র নিয়ে এখুনি যাচ্ছে প্রভাকরের বাসায়।'

সুধাময়ীর বিবর্ণ হলদে মুখ বিবর্ণ হল একটু।

'এখুনি চলে যাবে বাবা?'

বিকাশের মাথা নেমে এল: 'আমাকে যেতেই হবে কাকিমা।'

শশাঙ্ক বললেন, 'হাঁ হাঁ, যেতেই হবে বইকি। কাজ থাকলে নিশ্চয় যেতে হবে। তা বাবাজী—' শশাঙ্ক একটু কাশলেন:

'মেয়েটার ব্যবস্থা কী করে যাবে?'

বিকাশ চমকালো, কাকিমা চমকালেন।

বেশ প্রসন্নভাবে হাসলেন শশাঙ্ক।

'ফাল্গুন তো সবে পড়েছে। এ মাসের শেষের দিকেই দিন-টিন একটা ঠিক করা যায় বোধ হয়।'

'কিসের দিন?' —কাকিমাই সবার আগে বলে উঠলেন আগে: 'কী বলছ তুমি?'

'আহা গিন্নী—' শশাঙ্ক সেই হাসিটা টেনে রাখলেন মুখের ওপর: 'মেয়েমানুষ হয়েও চোখে ঠুলি এঁটে বসে থাকো নাকি তুমি? বাবাজীর সুনুকে মনে ধরেছে, সুনু তো বিকাশদার নামে অজ্ঞান। বয়সে অবিশ্যি ন'-দশ বছরের তফাৎ হবে, কিন্তু তাতে কিছু আটকায় না, বেশ ভালো মানাবে। তাছাড়া আমার মেয়ে ঘরে নিয়ে তুমি ঠকবে না বাবাজী—রূপে-গুণে লক্ষ্মী মেয়ে।'

একথা বিকাশ নিজেও বলতে পারে, এই অন্ধকার—মৃত-বীভৎস বাড়ীটার ভেতরে সুনুর চোখেই সে সূর্যমুখীর আভাস দেখেছিল, দেখেছিল এই মেয়েটিই আলোর পর্ণ মেলবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তারও চোখে ঘোর লেগেছিল,

মনীষার ওপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করে সে কতদিন এই মেয়েটিকে নিয়ে নেশায় ভোর হয়ে থেকেছে, কতদিন ভেবেছে এই বন্দিনী আলোর রেখাটুকুকে এখানকার নিশ্চিত মৃত্যু থেকে সে কি উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে না?

কিন্তু এখন—এই মুহূর্তে যখন জীবনের সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে, মনীষার জন্যে যন্ত্রণায় যখন তার সমস্ত মস্তিষ্ক শরবিদ্ধ তখন সমস্ত জিনিসটা যেন একটা কুৎসিত চক্রান্তের রূপ নিল তার কাছে।

বিকাশ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে।

'আমাকে মাপ করবেন কাকা। বিয়ের কথা এখন আমি ভাবতে পারছি না।'

'পারছ না বুঝি?' —হঠাৎ ফণা তুললেন শশাঙ্ক : 'প্রেম করবার কথা তো বেশ ভেবেছিলে। এখন বুঝি লীলে শেষ করে পালানোর চেষ্টা।'

একটা অস্পষ্ট শব্দ করল বিকাশ, কাকিমা চীৎকার করে উঠলেন।

'কী বলছ তুমি এ-সব? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার?'

'চুপ কর হারামজাদী।' —শশাঙ্কের হুঙ্কারে গলা ডুবে গেল কাকিমার : 'এত আদর, এত মাখামাখি, বিনি পয়সায় সেতার, বাজনা-শেখানো, মাঝরাত্তিরে জড়াজড়ি—'

কাকিমা পড়ে যাচ্ছিলেন, বিকাশের চোখের সামনে গোল হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল ঘরটা। পাপ। বাইরে বেশি ছিল না, কিন্তু মনের ভেতরে যা জমে উঠেছিল তাকে তো লুকিয়ে রাখা যায় নি। কোনো অন্যায় কথা বলেন নি শশাঙ্ককাকা, একটি অভিযোগও তাঁর মিথ্যে নয়, সত্যিই সে সুনুকে অশুচি করে দিয়েছে। এই অপমানের তার প্রয়োজন ছিল।

খাটের কোনা ধরে নিজেকে সামলে নিলেন কাকিমা। বিকাশকে বললেন, 'তুমি আর এক মিনিটও এখানে দাঁড়িয়ো না বাবা। এরা তোমায় মেরে ফেলবে—তুমি পালাও—পালাও এখান থেকে।'

'চুপ করে থাক শা—' অভব্যতম গাল দিয়ে শশাঙ্ক আবার ঘর ফাটিয়ে দিলেন : 'শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল। পালাবে—কোথায় পালাবে। আমার মেয়েকে কলঙ্কিনী করে—আমার মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে পালাবে। যদি ঘাড়ে ধরে আমি এই বদমাস লোচ্চাকে—'

কানে আঙুল দেবারও সময় পেলো না বিকাশ, তার আগেই খাট থেকে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন শশাঙ্ক। হয়তো লাফিয়ে পড়তেন বিকাশের ওপর, কিন্তু মাথার চোট শুকোয় নি—হুড়মুড় করে মেজেয় উলটে পড়ে গেলেন।

তটস্থ হয়ে বিকাশ এগিয়ে আসতে চাইল সেদিকে, কিন্তু দু-হাতে কাকিমা ঠেলে ঘর থেকে বার করে দিলেন তাকে তাঁর রোগা হাতে যেন দানবের শক্তি দেখা দিয়েছে হঠাৎ। তারপর বিকাশের মুখের সামনে দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, 'ও'র জন্যে কিছু ভেবো না বাবা, কিছু হয় নি ও'র—আমি ও'কে দেখব। তুমি পালাও, এ বাড়ী থেকে এখুনি পালাও—'

সশব্দে হুড়কো পড়ল দরজায়।

কিন্তু সত্যিই কিছু হয় নি শশাঙ্কর। বন্ধ ঘর থেকেও অশ্রাব্য গালাগালির তরঙ্গ আসছিল তখন।

কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিকাশ। নিজের মাথায় বারকয়েক ঝাঁকুনি দিতে চাইল, যেন পাথরের মতো জমে আছে সেটা। তারপর এগিয়ে গেল ঘরে, অনুভূতিহীন দেহ-মন নিয়ে বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিলে, রিকশাওলাকে ডেকে আনল ওপরে, জিনিসগুলো নামিয়ে দিলে সব।

কাকার ঘরের হুড়কো বন্ধ। সব স্তব্ধ। কে জানে, অসুস্থ শরীর নিয়েও কাকা এখন ঘাতকের নিপুণতায় কাকিমার গলা টিপে খুন করছেন কিনা।

পাদুটো একবারের জন্যে অসাড় হয়ে গেল, তারপর জুতোর তলায় হাওয়ায় উড়ে আসা পায়রার একটা রক্তমাখা পালক মাড়িয়ে সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল। চোখে পড়ল, রেলিংয়ে এক কোনায় জড়ো-সড়ো হয়ে দুটো বড়ো বড়ো কাতর চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিগাস্তকুমার নিয়োগী।

তার ছোট্ট মাথায় একবার আঙুল ছুঁইয়ে বিকাশ বললে, 'চললুম বুড়ো।'

বুড়ো জবাব দিল না।

রিক্শায় উঠতে যাচ্ছে, তখন কোথায়—কোন অচেনা অন্ধকার কোনা থেকে অদ্ভুত জড়ানো গলায় দুটো বাজালো সেই অলক্ষ্য ঘড়িটা। আর বাগানের কোথায় লুকিয়ে থেকে মেজদা সমানে চীৎকার করে বলতে লাগল : 'পালাচ্ছিস? সুনুকে মেরে ফেলে, তার বুকের শিরা দিয়ে বেহালা বেঁধে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিস? কোথায় পালাচ্ছিস—এই রাস্কেল, কোথায় পালাচ্ছিস?'

বিকাশ রিকশওলাকে বললে, 'একটু তাড়াতাড়ি চলো, জরুরি কাজ আছে আমার।'

এখন মাথাটা জমাট একটা কংক্রীটের পিন্ড। কিছু ভাববারও শক্তি নেই আর।

প্রভাকর বলেছিল, 'সেই ভালো—চলেই যা। মুক্তি হোক তোর।'

কিন্তু মুক্তি? যে ঋণ সে রেখে গেল সুনুর কাছে, তার কাছ থেকে তার মুক্তি মিলবে কোনোদিন?

আর জল এসেছিল অমলার চোখে'

'আদমি নেই এখানে। এখানকার সব বড়লোকগুলো জানুবর।'

এতবড়ো ধিক্কার বিকাশ দিতে পারে না। সে নিজেই বা কোন দৃষ্টান্ত রেখে গেল এখানে? সেও তো নিজের সঙ্গে কাউকে মিলিয়ে নিতে পারল না। তার চেনা এইসব মানুষের বাইরে আরো বড়ো বাংলাদেশ ছিল, আরো অনেক হৃদয় ছিল, তাদের সুখ-দুঃখের সহজ ছন্দ ছিল। সে কানাই পাল আর শশাঙ্কর বাইরে কাউকে দেখল না, নিজের মন নিয়ে ছটফট করল, তারপর সুনুর জীবনে অকারণে কান্না জাগিয়ে দিয়ে, তাড়া খেয়ে পালালো এখান থেকে।

এই-ই হওয়া উচিত ছিল। এর বেশি তার আর পাওনা ছিল না।

এবার আর এক রিক্শা। স্টেশনের পথে। গঞ্জ-বাজার থেকে স্টেশন একটু দূরে, মাঝখানে একদিকে মাঠ আর একদিকে গাছের সার। পথে আলো-আঁধারি। বসন্তের হাওয়া। আমের মুকুল, সজনে ফুলের গন্ধ। দিনের আলো থাকলে শিমুলেরও রঙ দেখা যেত এখন।

আর কিছু ভাববার নেই। নির্ভাবনায় বসে থাকাই ভালো।

কিন্তু নির্ভাবনায় থাকা গেল না। একটু নির্জন জায়গায় পাঁচ-সাতজন ছোকরার একটা দল সিগ্রেট টানছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। রিকশাটা সেখানে আসতেই একজন চেঁচিয়ে উঠল : 'এই রিক্শ—থাম শিগ্গীর।'

থামবারও তর সইল না। তার আগেই তারা টেনে নামালো বিকাশকে।

একজন শক্ত হাতে ঘাড় ধরে ঝাঁকানি দিলে তার।

'একটা মেয়ের সর্বোনাশ করে কোথায় পালাচ্ছিস শলা?'

'বাবুরা কী করছেন—' রিকশওলা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু একজন একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলে তার গালে। আর একজন রিক্শাটাকে ঠেলে বাক্স বিছানা-শুদ্ধ নামিয়ে দিলে পথের ঢালে হুড়মুড় করে সেটা নীচের নালায় গিয়ে পড়ল। 'হায় হায়' করে সেদিকে ছুটল রিকশওলা।

শলা, পরের মেয়েকে নষ্ট করতে ভারী মজা লাগে না?' —একটা তাককরা ঘুষি এসে পড়ল মুখের ওপর।

'দে সব কলকাত্তাই চালকে আচ্ছা মতো ধোলাই করে—' এবার পেটে একটা লাথি।

নিয়োগীপাড়ার ছেলেরা বদলা নিচ্ছিল। কানাই পালের গাড়ীতে বোমাটা লাগে নি, তার শোধ তোলা হচ্ছিল বিকাশের ওপর দিয়ে।

বিকাশের চোখের সামনে কয়েক হাজার তারা ঝলকে উঠেই অতল অন্ধকারে নিবে গেল সমস্ত। মস্তিষ্কটা কংক্রীটের মতো জমাট বেঁধে ছিল—সেটা এখন টুপ করে ডুবে গেল সেই অন্ধকারের ভেতরে।

সেই তখন—উলটো দিক থেকে একটা লরীর জোরালো আলো এসে পড়ল তাদের ওপর।

(আগামী সংখ্যায় শেষ হবে)

দ্পেশী প্রতিবেশী

কাঠমাণ্ডুয় কয়েকদিন

বাগমতী তীরে রাজধানী কাঠমাণ্ডু। আর কাঠমাণ্ডুকে ঘিরে রাজাধিরাজ বাবা পশুপতিনাথ ও রাজরাজেশ্বরী মা গুহ্যেশ্বরী। মা-বাবা আছেন বাগমতীর এপার-ওপার।

ওপারে বাবা পশুপতিনাথকে দেখে এলাম। এপারে মা গুহ্যেশ্বরীকে দেখতে চলেছি। সামনেই গুহ্যেশ্বরী। অপরূপ আর এক দেব-দেউল ঠিক সামনেই।

বাগমতী পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠি। ওপর বলতে পাহাড়, খাড়া পাহাড়।

সিঁড়িগুলোও খাড়া, বেশ খাড়া। এক একটি আট-দশ ইঞ্চি করে উঁচু তো হবেই, বেশিও হতে পারে। তা হোক। তবু বলবো, সুপরিকল্পিত ওরা। খানিকদূর উঠে উঠে ওরা থেমে গেল সমতল এক একটি চত্বরে আমাদের পৌঁছে দিয়ে। আর আমরা সেই চত্বরগুলো পেরোবার সময় জিরোবার অবকাশ পেলাম।

লক্ষ্য করেছি, জিরোবার বিশেষ-ব্যবস্থাও আছে ওখানে। জায়গায় জায়গায় সিঁড়ির গা-ঘেঁষে আছে বসবার আয়োজন। সান-বাঁধানো মজবুত আসন আছে; এবং যে কেউ প্রাণ চাইলেই সে আসনে বসতে পারেন।

বসলাম একবার আমরাও। ছায়ায়-ঢাকা সেই সিঁড়িপথে বসে বিচিত্র সব পাখির কলকাকলী শুনলাম। সে পথে পাখি অনেক আছে। ছায়াও আছে অনেক। কিন্তু ছায়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন যিনি, সেই জং বাহাদুর আজ আর নেই; ছায়ার সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে গেছেন। সেই কবে নদী বাগমতীর জলে ভেসে গেছে তাঁর ছাই। ভাসতে ভাসতে কবে হারিয়ে গেছে।

কিন্তু তবু জং বাহাদুরকে অনেকেই ভোলে নি আজও। আজও অনেকেই মুক্ত-কণ্ঠে তারিফ করে তাঁর। কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য উজাড় করে দিয়ে বলে,—হ্যাঁ, পৃথ্বীনারায়ণ শা'র পরাক্রান্ত ও পরোপকারী সেনাপতি রামকৃষ্ণের যোগ্য পৌত্র ছিলেন তিনি। প্রজানুরঞ্জনের শুভবুদ্ধি পিতামহের কাছ থেকে তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। তা না হলে গুহ্যেশ্বরী-মন্দিরে যাবার এই সুন্দর পথটুকু নেপালের জনসাধারণকে তিনি উপহার দিতেন না। পার্বতীপুরী গুহ্যেশ্বরীকে তিনি সুগম্য করতেন না।

সত্যি, পার্বতীপুরী আজ সুগম্য। আজ নেহাৎ দুর্বল ও পঙ্গু না হলে যে কেউ ওখানে যেতে পারেন।

দেখলাম, যাচ্ছেনও অনেকেই। বুড়ো-বুড়ী যাচ্ছেন। ছেলে কোলে নিয়ে যাচ্ছেন মায়েরা।

এক মায়ের কথা মনে পড়ে। ছোট্ট এক ছেলের বায়নাক্কা সহ্য করতে না পেরে অতিষ্ঠ সে। ছেলেকে সে ভয় দেখাচ্ছে। সিঁড়ির ওপর তাকে বসিয়ে রেখে একাই এগোচ্ছে।

ওদিকে ছেলেটিও কম যায় না। মা সরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশফাটা আর্তনাদ শুরু করে সে।

আর্তনাদ শুনে থমকে দাঁড়াই আমরা। ছেলেটির দিকে ভালো করে তাকাই।

ছেলেটিও তাকায় আমাদের দিকে। চকিতে আমাদের একবার দেখে নিয়েই সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করে। আমরা চীৎকার করে উঠি, গেল গেল।

কিন্তু তার আগেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে ও। সিঁড়ি-বরাবর বেশ খানিকটা গড়িয়ে গেছে। আমরা ছুটে গিয়ে ওকে ধরি এবার। দেখি, আঘাত মারাত্মক কিছু নয়; জায়গায় জায়গায় বেচারার হাতমুখ ছড়ে গেছে শুধু।

এদিকে মা-ও এসে গেছে এতক্ষণে। বলতে গেলে ঝড়ের বেগে এসেছে।

কিন্তু এ কী! ঝড়ের পাশেই কে উনি? ঝড়বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র? দেবরাজ বজ্রপাণি?

মনে হল, হ্যাঁ, দেবরাজই বটে। এই বটে ছেলেটির বাবা। আর মনে হল, এই দেবরাজটি চাষবাস করে কায়ক্লেশে সংসার চালান। কিন্তু আপাততঃ সংসারধর্মকে

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ভুলে গেছেন উনি, অসুর-নিহন্তা আসল দেবরাজের মতো মহা-ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন। সন্তানকে ফেলে রেখে এগিয়ে যাবার জন্যে মা-টিকে শাস্তি দেবেন বলে প্রস্তুত হয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত গুহ্যেশ্বরী-মন্দিরের ওই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে-থাকা ইন্দ্রটির হাত থেকে মাকে রক্ষা করা গেল না। কিল চড় চাপড় তার ওপর যে হারে বর্ষিত হল, অতি বড় দুর্যোগের দিনেও পৃথিবীর ওপর সে হারে শিলাবর্ষণ হয় না।

মা সিঁড়ির ওপর পড়ে গোঙাতে লাগল। আর আমরা অসহায় দর্শক সেজে স্ট্যাচু'র মতো নির্বাক, নিথর ও নীরব হয়ে রইলাম।

নীরবতা প্রথমে ভাঙলেন সহযাত্রী প্রদীপবাবু। বললেন, ছেড়ে দিন। ওদের ব্যাপার, ওরাই ফয়সালা করুক। আমাদের ও নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।

বললাম, ঠিক! ঠিক বলেছেন। মাথা না ঘামানোই ভালো। ঘামাতে গেলে শেষ পর্যন্ত আমাদের মাথাগুলোই......

প্রদীপবাবু বাকী অংশটা পূর্ণ করে দিয়ে বললেন, গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। অতএব—

অতএব আমরা কাউকে কিছু না বলে এগিয়ে চললাম আবার। আবার ছায়ায়-ঢাকা পাখি-ডাকা পথটা আমাদের অভ্যর্থনা করল এবং দূরের কোন হিমবাহকে ছুঁয়ে-আসা কনকনে উত্তুরে হাওয়া জানিয়ে দিয়ে গেল, শীত আসতে আর দেরী নেই।

ভাবলাম দেরী তো নেই-ই। বেলা এগারোটার রোদকেও মিঠে মনে হচ্ছে বলে দেরী নেই। আশেপাশের ওই বুনো গাছ-গুলো পাতা ঝরাতে শুরু করেছে বলে দেরী নেই। গাছের ছায়া এক একবার শীতের হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে বলে দেরী নেই।

কিন্তু কোথায় শীত। ওপরে উঠে দেখি, ভরা-শরৎ তার ভরা-দাক্ষিণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। দেখি উত্তুরে হাওয়ার ছিটেফোঁটা নেই, অথচ রসবতী শরতের আমেজটুকু আছে। দেখি পাতা ছড়াবার উন্দামতা নেই, অথচ ফুলে ফুলে চারিদিক ছেয়ে রাখার আয়োজন আছে।

ভাবলাম এ কেমন হল। একই জায়গায় একই ঋতুলগ্নে পিছনে রিক্ততা আর সামনে পূর্ণতা নিয়ে এ কেমন পথ-চলা হল।

মনে পড়ে এই 'কেমন'-এর কথা ভাবতে ভাবতেই পথ চলি সেদিন। চলি প্রায়-সমতল এক প্রান্তর ধরে। চলতে চলতে হঠাৎ—আমাদের সামনেই একেবারে হঠাৎ দেখি, গুহ্যেশ্বরী মন্দির। দেখি, একেবারে কাছেই পবিত্র পার্বতীপুরী।

পুরাণে পাই, পার্বতী যিনি, তিনিই আবার সতী। তিনিই শিবজায়া। তিনি দেহত্যাগ করলে একবার, শিব তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন এবং তারপর যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্বরা খবর পেলেন একদিন, সতীর দেহ ছিন্ন হয়েছে: খণ্ড খণ্ড হয়ে লুটিয়ে পড়েছে দেশ-দেশান্তরের নানা জায়গায়।

সেই জায়গাগুলোরই একটিতে আজ গুহ্যেশ্বরী মন্দির।

এই গুহ্যেশ্বরী সম্বন্ধে বহু প্রবাদ, বহু কিংবদন্তী আছে নেপালে এবং নেপালের জনসাধারণ আজও এদের পরম সমাদরে রক্ষা করছে।

এই সব কিংবদন্তীরই একটিতে পাই, শোভাবতী থেকে নেপালে তীর্থ করতে এসেছেন কণক মুনি বুদ্ধ। আর বারাণসী থেকে এসেছেন কাশ্যপ বুদ্ধ।

কণক মুনি মুগ্ধ হলেন নেপালের দেবদেউল দেখে স্বয়ম্ভুনাথ ও গুহ্যেশ্বরীর মহিমা দেখে। তাই পরবর্তীকালে বাংলার রাজা প্রেমচাঁদ দেবকে নেপালে পাঠালেন তিনি। বললেন যাও ওই আশ্চর্য দেশে; গিয়ে জাগ্রত ওই দেবদেবীর বন্দনা কর।

প্রেমচাঁদ বন্দনা করার জন্যে মনে মনে তৈরী হয়েই ছিলেন। তাই কণক মুনির নির্দেশে সাড়া দিতে তার সময় লাগল না। ভিক্ষুর বেশে নেপালের পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেও তাঁর কষ্ট হল না এতটুকু। অবশেষে ভিক্ষুর বেশেই একদিন তিনি গুহ্যেশ্বরীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু

তখন রাজরাজেশ্বর প্রেমচাঁদকে কেউ জানে না; সবাই জানে শান্তিকরশ্রী নামে এক সংসারবিরক্ত ভিক্ষুকে।

হ্যাঁ, শান্তিকরশ্রী নামেই নেপালের ইতিহাসে গৈরিক নিশান উড়িয়েছেন প্রেমচাঁদ এবং সে নিশানের দিকে তাকিয়ে আজও অনেককে বলতে শোনা যায়, প্রেমচাঁদ সংসারের রঙ্গমঞ্চে খেলা শেষ করে কবে চলে গেছেন; কিন্তু শান্তিকরশ্রী যেতে পারলেন না আজও; আজও গুহ্যেশ্বরীর পুণ্যতীর্থে গৈরিক নিশানটি হাতে নিয়েই থেকে গেলেন।

গুহ্যেশ্বরীর ইতিহাসে গৈরিক নিশানের খুব কাছাকাছি উড়ছে রাঙা নিশান। শেষের নিশানটি প্রতাপ মল্ল উড়িয়েছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরকে নতুন করে গড়ে তুলেছেন এই রাজা।

কিন্তু রাজার কি রুদ্রাক্ষ ও রক্তাম্বর প্রিয় ছিল? তন্ত্রের আলোকে পথ চিনে-নেয়া অভ্যেস ছিল?

লোকে বলে, ছিল বোধ করি। তা না হলে সমগ্র মন্দিরটিকে তিনি তান্ত্রিক যন্ত্রের আকার দেবেন কেন? আর কেনই বা সেই যন্ত্রটিকে দেখে সন্তানদায়িকার অঙ্গ-বিশেষের কথা মনে হবে? মনে হবে, মহামায়ার এক মন্ত্রাঙ্গনে তন্ত্রসাধনার এক রহস্যপুরীতে এলাম?

পুণ্যপুরীটি বড় বিচিত্র। গুহ্যেশ্বরী মন্দির বড় অদ্ভুত ও রহস্যময়। মন্দিরের শীর্ষদেশে শোভা পাচ্ছে ধাতুতে গড়া চকচকে চারটি সাপ। সাপ চারটি মন্দিরের চূড়াটিকে ঠিক যেন একটা মুকুটের মতো ধারণ করে আছে। আর সাপগুলোকে ধারণ করে আছে যে ছাদ, তা যেন তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর এক সাধন বেদী। যেন সবই প্রস্তুত ওখানে। সন্ন্যাসী এলেই সাধনা আবার নতুন করে শুরু হবে।

কিন্তু কোথায় সন্ন্যাসী? রক্তাম্বরধারী, ত্রিশূল-পাণি, জটাজুট-বিলম্বিত যোগী কোথায়? গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে গৃহী লোকেরই যে আনাগোনা দেখছি। দেখছি, কামনা-বাসনায় উচ্ছ্বসিত এক একটি প্রস্রবণকে পার্বতী-পাদপীঠের দিকে এগিয়ে যেতে।

এদিকে দেখতে দেখতে যন্ত্র-প্রতিম মন্দিরটির অন্দরমহলে প্রবেশ করি আমরা। সারি সারি বিশ্রামালয় পরিবেষ্টিত এক রহস্যপুরীর প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াই। প্রাঙ্গণটির একেবারে মাঝখানে দেবী পার্বতীর লীলাভূমি। তাই তাঁকে ঘিরে ভক্তদের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। ধূপে-দীপে, সিঁদুরে-চন্দনে, পুষ্পে-মাল্যে ভক্তরা সেখানে পার্বতীর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত, সেখানে দেবী গুহ্যেশ্বরীর প্রসাদ-প্রার্থনায় নিমগ্ন সবাই।

কিন্তু আমরা কিসে নিমগ্ন? দেবী গুহ্যেশ্বরীর কাছে সেদিন কোন্ প্রার্থনা জানিয়েছিলাম আমরা?

জানি না। সেদিন যেমন আজও তেমনি জবাব পাচ্ছি, জানি না।

জানবো কী করে? খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছি যখন, তখন কী করে জানবো সে কুটোটি ডাঙার কোথায় গিয়ে লাগলে বা কোন্ ঘাটে গিয়ে ঠেকলে প্রার্থিতের হদিস মিলবে!

কত প্রার্থনা এখানে! যুগে যুগে এই গুহ্যেশ্বরী মন্দিরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কত খড়কুটোর নিরুদ্দেশ-যাত্রা!

শুনেছি, রাজারা যুদ্ধে হেরে গিয়ে আশ্রয় নিতেন এখানে। এখানকার শান্ত স্নিগ্ধ বনচ্ছায়াতলে একটুক্ষণ জিরিয়ে নিতেন। এবং তারপর সুরু করতেন যুদ্ধ, হঠাৎ একটা উল্কার মতো শত্রু-পক্ষের ওপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন! কিন্তু এখান থেকে ছুটে-যাওয়া উল্কারা সুবিধে করতে পারেন নি মোটে। শত্রুকে আঘাত হানবার আগেই ওরা জ্বলেপুড়ে নিঃশেষিত হয়ে গেছেন।

নিঃশেষিত কেন হবেন না? কেন ছাই হবেন না পুড়ে? গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের সুরম্য পরিবেশে মানুষকে সে স্তব্ধ করে দেবার যাদু আছে। সেই যাদুর কবল থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পিছিয়ে-পড়া স্তব্ধ মানুষ আর কি পারে যুদ্ধ জিততে? পারে নতুন করে শত্রুপক্ষকে আঘাত করতে?

বোধকরি পারে না। যদি পারত, তবে নেপালের ইতিহাস আজ অন্য রকমের হত। তবে বিজয়ী রাজাদের কৃতজ্ঞতার দৌলতে গুহ্যেশ্বরী মন্দিরের দেওয়ালগুলো আজ সোনার হত।

কিন্তু তা তো হয় নি। গুহ্যেশ্বরী আগে যেমন এখনও তেমনি পাষাণপুরীই থেকে গেছে। ঠিক আগের মতোই এখনও গম্ভীর ও স্তব্ধই থেকে গেছে।

মন্দিরটি থেকে ফিরে আসবার সময় বারবার ভাবছিলাম এসব। ভাবছিলাম, আর কতকাল গুহ্যেশ্বরী তার গাম্ভীর্যকে রক্ষা করবে? কতকাল আর অরণ্যে ধ্যাননিমগ্ন সন্ন্যাসীর মতো তার স্তব্ধতাকে সে অটুট রাখবে?

বেশিদিন রাখবে না বোধ করি। কারণ, জনপদ তো ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। বাগমতীর তীরে গড়ে-ওঠা মহল্লাগুলো ধীরে ধীরে হাত বাড়াল তার দিকে।

মনে পড়ে, গুহ্যেশ্বরী থেকে ফিরে আসার সময় সেই হাতগুলোকে যেন দেখলাম একবার। যেন একবার স্পষ্ট মনে হল, প্রয়োজনের অক্টোপাশ তার রাক্ষুসে শুঁড়গুলোকে মেলে ধরে আরণ্যক শান্তিকে পিষে ফেলবার আয়োজন করছে।

কিন্তু তবু অরণ্য এখনও আছে গুহ্যেশ্বরীর আনাচেকানাচে; এবং আমরা সেই আরণ্যক পথ ধরেই ধীরে ধীরে নীচে নামলাম। সিঁড়ি বেয়ে আবার চলে এলাম বাগমতীর তীরে।

এখন পশুপতি মন্দির থেকে তিন ফার্লং আন্দাজ দূরে আছি আমরা এবং আছি বাগমতীর বাম তীরে। বাগমতী কলমুখরা। কলকল খলখল করতে করতে দুষ্টু কোনো পাহাড়িয়া মেয়ের সঙ্গে ছুটছে সে।

ভাবলাম, এবার আমাদেরও বুঝি ওই তালে ছুটতে হবে। কারণ, ঘড়িতে এখন একটা; আর পশ্চিমাকাশে সূর্য এখন হেলান দিয়েছে।

সেদিন ছত্রপটিতে আমাদের আস্তানায় পৌঁছুতে বেলা তিনটে বেজে গেল। কাঠমান্ডু থাকতে প্রায়ই হত এমন। প্রায়ই আমরা ঘুরতে বেরোতাম সাত-সকালে; আর ঘরে ফিরতাম পশ্চিমাকাশে হেলান-দেয়া সূর্যকে মাথায় নিয়ে। মনে পড়ে, স্বয়ম্ভুনাথ দেখবার দিনেও ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল; মধ্যাহ্ন আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেল অপরাহ্নের সিংহদ্বার অবধি।

স্বয়ম্ভুনাথকে আজও দেখতে পাই। আজও স্পষ্ট মনে আনতে পারি। একটা মেঠো পথকে। ছত্রপটির এক প্রান্ত থেকে বেরিয়ে পথটা স্বয়ম্ভুনাথ-বরাবর জ্যামিতির একটা সরলরেখার মতো চলে গেল।

তবে পথ একটাই নেই স্বয়ম্ভুনাথে যাবার; আছে একাধিক। রাজপথ আছে একটি, যা হনুমান ঢোকা থেকে বেরিয়ে মোলটি হোটেল ও নেপাল মিউজিয়াম হয়ে স্বয়ম্ভু-চিহ্নিত পাহাড়ের দিকে এগোল এবং তারপর পাহাড়টিকে অতিকায় একটা সাপের মতো বেষ্টন করতে করতে উঠল পুণ্যতীর্থের দিকে। তীর্থভূমি স্বয়ম্ভু-স্তূপের প্রায় দরজা অবধি গেল রাস্তাটা এবং গিয়ে হঠাৎ যেন অরণ্যের গায়ে মিশে গেল। যাঁরা গাড়ি নিয়ে স্বয়ম্ভুনাথে যেতে চান, তাঁদের জন্যে এই রাস্তা; আর যাঁরা চান পায়ে হেঁটে, জ্যামিতির সরলরেখার মতো মেঠো পথটি তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমরা পদযাত্রী। তাই অপেক্ষমান মেঠো পথটির অভ্যর্থনা অকৃপণভাবেই আমাদের ওপর বর্ষিত হল। আমরা ভোরের আলো গায়ে মাখতে মাখতে, ভোরের হাওয়ায় স্নান করতে করতে এবং পথের দু'পাশে ফুটে-ওঠা রাশি রাশি বুনো ফুলের সুবাসে সাঁতার কাটতে কাটতে স্বয়ম্ভুনাথের দিকে এগোলাম। অদূরবর্তী দেবদারুরা আমাদের অভ্যর্থনা করল; আর আশেপাশে চারিদিকে লক্ষ পাখির কলকাকলী আমাদের জানিয়ে দিল, আমরাও আছি।

আমরাও আছি,—জানিয়ে দিল একদল কৃষক। লাঙ্গল-কাঁধে চাষবাস করতে চলেছে ওরা। চলেছে আমাদের চেয়ে তিন গুণ জোরে।

একটি কৃষককে দেখলাম। চলতে চলতে হঠাৎ থামল সে এবং তারপরেই পথের ধারে গিয়ে কয়েকটা বুনো ফুল কুড়িয়ে নিল।

ভাবলাম, কেন কুড়োল ও বুনো ফুল? কৃষক-বধূকে দেবে বলে? না কি দেবে বলে দেবতাকে?

ভালো করে তাকাতেই দেখি, দেবতা তো কৃষকটি নিজেই। ও নিজেই সেদিন দেবরাজ ইন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল না? ইন্দ্রের মতোই শিলাবর্ষণ করছিল না ও সর্বংসহা ধরিত্রীরূপ ওর বধূটির গায়ে? ওর কিল-চড়-চাপড়ের মাহাত্ম্য সেদিন গুহ্যেশ্বরী মন্দিরে যেতে কি দেখি নি?

মনে হল,—হ্যাঁ, ওকেই দেখেছি বটে। কিন্তু ও বেচারী কি ভগবৎমহিমা হারিয়ে ফেলল এখন? হারিয়ে ভক্ত সাজল ভগবতী-রূপী বধূটিকে পুষ্প-অর্ঘ্য নিবেদন করবে বলে?

জানি নে। তবে অনুমান করি শুধু, যে অর্ঘ্যটা বড় রকমের না হলে সেদিনের সেই আঘাতের চিহ্নগুলো মুছে যাবার কথা নয়।

কিন্তু অনুমান কেন আর! কয়েক সেকেণ্ড যেতে না যেতেই দেখি, আঘাতের সব চিহ্ন মুছে ফেলে শরৎকালের সহাস্য প্রভাতের মতো সেদিনের সেই কৃষক-বধূটিও হাজির।

এবার দয়িতার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল দয়িত এবং তারপর কী হল, দয়িতার খোঁপায় ক'টা ফুল শোভা পেল আর ক'টা ফুল মাটিতে পড়ল, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, সেদিনের সেই দেবরাজের হাত থেকে ফুল উপহার পেয়ে বধূটি যখন হাসিতে লুটিয়ে পড়ল, তখন মেঘমুক্ত আকাশতলে হঠাৎ যেন একঝলক বিদ্যুৎ-চমক অভিভূত করল আমাকে। তখন হঠাৎ আমার মনে হল, সেদিন গুহ্যেশ্বরীর পথে বধূটির যে চোখের জল ঝরেছিল সে-জলই শিশির হয়ে এসে এই ফুলগুলোকে ফুটিয়েছে।

আজ ভাবি, ফুল ফোটাবার খেলা জগৎ জুড়ে ঠিক এমনি করেই চলে বুঝি। শিশির চোখের জল থেকে জন্ম না নিলে ফুল বুঝি ফোটে না। বুঝি কান্না হাসি হয়ে ঝরে না।

কিন্তু ওদিকে কী ঝরছিল সেদিন? ওই স্বয়ম্ভু স্তূপের দিকে? তাকাতেই মনে হল বাঁশি বাজি হাসি বুঝি। বুঝি সোনালী শরতের প্রভাত আলোককে নীলাম করে কাঠমাণ্ডু অধিদেবতা ওদিকে সহাস্য হয়ে উঠেছিলেন।

অধিদেবতার পীঠস্থানটিকে বেশ খানিকটা দূরে থেকেই দেখতে পাচ্ছি আমরা। আমরা স্পষ্ট অনুভব করছি, অনতিউচ্চ একটি পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা স্বয়ম্ভুপুরী মহিমায় ও গৌরবে এভারেস্টকেও ছাড়িয়ে গেল।

এদিকে দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম আমরা। শহর কাঠমাণ্ডুকে পিছনে ফেলে সোজা পশ্চিম দিকে এগোলাম। কাঠমাণ্ডুর ঘরবাড়িগুলোকে প্রায়-ভুলে-যাওয়া স্মৃতির মতো ঝাপসা মনে হল; আর মনে হল, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে যে স্বয়ম্ভু-পাদপীঠ, তার চেয়ে সত্যি বস্তু পৃথিবীতে আর বুঝি কিছু নেই।

শুনেছি, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপগুলোর মধ্যে এটি একটি। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং এখানে এসেছিলেন। কিন্তু সে আসার আর আজকের রূপালিপ্সু পুণ্যলোভাতুরদের আসায় কত তফাৎ! আজ কত সহজে স্বয়ম্ভু-পাহাড়ে যাওয়া যায়। কত নিশ্চিন্তে পাহাড়টির চূড়ায় পৌঁছুনো যায়। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে ওপরে উঠলেই হল আজ, হাত বাড়ালেই স্বয়ম্ভু-স্তূপের নাগাল পাওয়া যাবে।

ওপরে উঠি আমরাও। স্বয়ম্ভু-পাহাড়ের গা বেয়ে এগোই।

এগোতে কষ্ট নেই। সিঁড়ি সোজা চলে গেছে পুণ্যতীর্থ বরাবর। কিন্তু তীর্থ-যাত্রীরা কোথায়? গোটা সিঁড়ি-পথটা খাঁ খাঁ করছে যে। সিঁড়ির ওপর পড়ে থাকা ঝরা-পাতায় খস খস শব্দ উঠছে।

ভাবি, শব্দ তো উঠবেই। জনমানবহীন এই অরণ্যপুরীতে ঝরা-পাতার দীর্ঘশ্বাস তো কানে আসবেই। তাছাড়া শরৎ এলো এখন; এখন তো পাতা ঝরবেই।

এদিকে দেখতে দেখতে ওপরে উঠে আসি আমরা। দুশো ফুটেরও বেশী উঁচু স্বয়ম্ভু-পাহাড়ের মাথায় এসে দাঁড়াই।

দাঁড়াতেই হাঁফ ধরে একবার। মনে হয়, শ'পাঁচেক সিঁড়ি ভাঙার পরিশ্রম আমার হৃৎপিণ্ডটাকে নিয়ে যেন লোফালুফি শুরু করেছে। যেন পায়ের গাঁটগুলো আলগা হয়ে গেছে আমার; আর যেন কপালের শিরাগুলো বেলুনের মতো ফুলে উঠেছে। মনে হল, এই বুঝি ফাটে বেলুন। শিরা এই বুঝি ছেঁড়ে। কিন্তু না, কিছুই হয় না। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই আবার চাংগা হয়ে উঠি। চোখে পড়ে, ঠিক সামনেই হাজার হাজার বছরের পুরাতন স্বয়ম্ভু-স্তূপ তার পরিপূর্ণ মহিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

স্বয়ম্ভু নামের মহিমা কে না জানে আজ! কাঠমাণ্ডুর কে আজ খবর রাখে না যে, এ অঞ্চলটা যখন হ্রদ ছিল, তখন এক দিন ঠিক এখানেই আবির্ভূত হন স্বয়ম্ভু; পদ্মফুল এখানেই ফোটে এবং এই ফুল থেকেই ঠিকরে বেরোয় স্বয়ম্ভুর পাঁচটি রঙীন জ্যোতি।

—সেই জ্যোতি নেই আজ, লোকে বলে,—কিন্তু জাগ্রত স্বয়ম্ভু ঠিক নাকি তেমনি আছেন। পদ্মের জায়গায় পাষাণ-বেদীটিকে ঘিরে ঠিক তেমনি বিভূতি ছড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি।

বেদীটি চোখে পড়ে। অর্ধবৃত্তাকার একটি বিরাট বেদী,—ইঁটে মাটিতে পাথরে গড়া, সিমেন্টের আস্তরণ দেয়া।

লোকে বলে, এই নাকি গর্ভ। সৃষ্টির ভ্রূণ এখানেই নাকি বিকশিত। বলে, সৃষ্টির আদি-অন্ত খুঁজে পাও না বলে হাহাকার কেন! আদি তো এখানেই, এখানে ঠিক তোমার সামনেই। আজকের উন্মীলিত বিশ্ব-চরাচর এখানেই তো একদিন ভ্রূণ হয়ে নিমীলিত ছিল।

আজ অবাক লাগে ভাবতে। অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক মনে হয় এসব কথা। কিন্তু সেদিন এরাই কত সত্যি হয়ে উঠেছিল। স্বয়ম্ভু-স্তূপ যেন হাজার বছরের ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল সেদিন। সে যুগ হারিয়ে গেছে, সে কাহিনী বিশ্বাসের পরীক্ষায় বাতিল হয়ে গেছে, তারাই যেন সেদিন কত বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল।

মনে পড়ে, বিশ্বাসীর দৃষ্টি নিয়েই তাকিয়ে আছি রহস্যময় স্বয়ম্ভু-স্তূপের দিকে। স্তূপটিকে ছাপিয়ে-ওঠা বর্গাকার স্তম্ভটি থেকে সোনালী আভা উৎসারিত হচ্ছে আর স্তম্ভের ঠিক গায়েই আছে বুদ্ধের যে দুটি চোখ, তা থেকে উৎসারিত হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক করুণাধারা। চোখ দুটিতে লাল, সাদা আর কালো রঙের ত্রিবেণীসঙ্গম। স্তম্ভের চার পাশে দুটি দুটি করে মোট আটটি চোখ আছে এখন।

বর্গাকার স্তম্ভটির উপরিভাগ শঙ্কু-আকারের। সেই শঙ্কুটি আবার চক্রবেষ্টিত। চক্ররা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেল উপরের দিকে এবং সবশেষে একটি চন্দ্রাতপকে মেলে ধরল। সেই চন্দ্রাতপও সোনালী। সোনালী আভা তা থেকেও ঠিকরে বেরোচ্ছে।

কে যোগাল এত সোনা? প্রাগৈতিহাসিক রহস্যময়কে এই সোনার বরণ কে দিল?—সেদিন স্বয়ম্ভু-স্তূপের দিকে তাকিয়ে ভাবি।

কিন্তু সেদিন এর কোন জবাব পাই নি। জবাব পেয়েছি আজ। জেনেছি, সোনা দিয়েছেন এক ঋষি। তাঁর সঞ্চিত রত্ন-ভাণ্ডারকে ওখানে উজাড় করে দিয়েছেন তিনি।

স্বয়ম্ভুনাথে সোনা উজাড় করলেন ঋষি, আর শিল্পী উজাড় করলেন তাঁর প্রতিভা।

ইতিহাসে পাই, একদিন অনেক শিল্পী এসেছিলেন এখানে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে একদিন চীন থেকে এখানে এসেছিলেন সেরা চিত্রকররা। নেপালের তৎকালীন শাসনকর্তা জঙ বাহাদুর ডেকে এনেছিলেন ওদের। উনি হুকুম দিয়েছিলেন, যত টাকা লাগে লাগুক; যত খরচ হয় হোক; নেপালের বৌদ্ধ-বিহার ও চৈত্য-গুলোকে সুন্দর করে গড়ে তোল।

জঙ বাহাদুরের হুকুম তামিল করা হল অচিরেই; এবং অচিরেই দেখা গেল, হিন্দু ও বৌদ্ধরা স্বয়ম্ভু-স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, ভগবানের পাদপীঠ শিল্পীর হাতে নবজন্ম লাভ করল।

কিন্তু হায়! কে শিল্পী, আর কে ভক্ত! কে রাজা, আর কে প্রজা! শিল্পী এখানে এসে ভক্ত হয়ে ওঠেন, রাজা হয়ে ওঠেন প্রজাদেরই একজন তা না হলে চৈনিক শিল্পীরা স্বয়ম্ভুনাথের কাজ সেরে বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে দেশে ফিরবেন কেন! আর কেনই বা রাজা জ্যোতির্মল্ল শৈব হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ-স্তূপ স্বয়ম্ভুনাথকে উদ্ধার করার জন্যে ব্যাকুল হবেন।

জ্যোতির্মল্লের কথা নেপালের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। ওখানে পাই, ১৪১৩ খৃস্টাব্দে পিতা স্থিতিমল্লের মৃত্যুর পর নেপালের সম্রাট হলেন তিনি।

কিন্তু সম্রাট হয়ে তিনি কী করলেন?

ইতিহাস বলে, তিনি যা করলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম রাজাই তা করেছেন। তিনি নিজে শৈব হয়েও বৌদ্ধ মন্দিরকে রক্ষা করলেন এবং নিজে অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে বললেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

মাত্র চার বছর রাজত্ব করেছিলেন জ্যোতির্মল্ল। কিন্তু এই চার বছরেই স্বয়ম্ভু-

নাথে যে পরিমাণ ভক্ত-সমাগম হয়েছিল শতাব্দীর চার যুগেও তা হয় না।

কিন্তু যুগ তো স্বয়ম্ভুনাথের সামনে বুদ্বুদের মতো, ক্ষণস্থায়ী একটা মুহূর্তের মতো, চোখের একটা পলকের মতো। তাই যদি না হবে তো কোথায় গেল সব? এত প্রার্থনা, এত প্রেম, এত অর্ঘ্য, এত আরাধনা, যুগ যুগ ধরে এত শত ভক্তের এত আকুল নিবেদন,—এত সব কোথায় গেল? লিখি-লিখছি করতে করতে এদের কথা লিখে রাখতে ভুলে গেলেন বুঝি ঐতিহাসিকেরা? নাকি 'লিখবো' বলে কলম হাতে নিয়েও লিখবার আর সময় পেলেন না ও'রা? বুদ্বুদ হয়ে ওরা নিজেরা যেমন, ওদের দেখা ঘটনাগুলোও তেমনি হারিয়ে গেল?

বুদ্বুদ, সবাই বুদ্বুদ আমরা, সেদিন মনে হল একবার। মনে হল, আমাদের ভিতরকার কামনা-বাসনাগুলোও বুদ্বুদ হয়ে স্বয়ম্ভুস্তূপের গায়ে আছড়ে পড়ছে।

কিন্তু স্তূপের পাশেই কে উনি? বুদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন?

ভালো করে তাকাতেই দেখি, এক বৌদ্ধ ভিক্ষু। গৈরিক বসন পরে আমাদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

—কিছু চাইছি। পরিষ্কার বাংলায় ভিক্ষুটি বলেন।

—কিন্তু আমরা কিছু দিচ্ছি না, আমাদের সহযাত্রী প্রদীপবাবুরও পরিষ্কার জবাব।

বৌদ্ধ ভিক্ষুটি হাল ছাড়েন না তখনও। আমার কাছে এসে হাত পাতেন আবার, কী? কিছু পাবো?

প্রদীপবাবু আমার হয়ে জবাব দেন,—বললাম যে, এখানে সুবিধে হবে না।

ভিক্ষু কোন জবাব দেন না প্রদীপবাবুর কথায়। বুদ্ধমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ধীরে ধীরে চলে যান।

আমি শুধাই লোকটা কে?

প্রদীপবাবু বলেন,—কে তা কেউ জানে না।

কেউ বলে, ভারতীয় ভাষার সঙ্গে নেপালী ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে ও উন্মাদ হয়ে গেছে। আবার কেউ বলে, সব বুজরুকি, সব! আসলে ও একটা খুনী; আইনের হাত এড়াবার জন্যে ভারত থেকে পালিয়ে নেপালে এসেছে।

—প্রথম অনুমানটা যদি সত্যি হয়, এবারে টিপ্পনি কাটি আমি,—তবে ওকে পয়সা না দিয়ে অন্যায় করেছি।

এদিকে ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে যাকে নিয়ে এত বাগবিতণ্ডা, তার কণ্ঠ ভেসে আসছে খানিকটা দূর থেকে।

—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, — উদাত্তকণ্ঠে বলে চলেছেন তিনি।

ধম্মং শরণং গচ্ছামি, তার কণ্ঠস্বরে যেন অধর্ম অনুরণিত হচ্ছে একবার।

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, পরমুহূর্তেই বিশ্বাস বলে মনে হচ্ছে ওকে।

কিন্তু হায় রে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস! স্বয়ম্ভুনাথে এসে অতি বড় বিশ্বাসেরও কি মাথা নত হয়ে যায় না? আবার অতি বড় অবিশ্বাসেরও কি মনে হয় না, অজ্ঞানের আঁধার ভেদ করে আলোকিত সত্যকে খুঁজে পাচ্ছি?

জানি নে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস আর আঁধার-আলোর 'ফ্যালাসি'। জানি শুধু এই যে, স্বয়ম্ভুনাথ বহু বিপরীতের মিলনক্ষেত্র, একদিকে বহু বৌদ্ধের এবং অপর দিকে বহু শৈবের পুণ্যতীর্থ।

স্বয়ম্ভুনাথের মূল স্তূপটির আশে-পাশেই চোখে পড়ে ছোটখাট আরও অনেক দেবদেবী, অনেক পুণ্যস্তম্ভ এবং অনেক পবিত্র-মন্দির।

মন্দিরগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ শীতলাদেবী। স্বয়ম্ভুনাথের প্রধান চৈত্যটির খুব কাছেই আছে এটি এবং এটির গায়ে আছে অপরূপ সব কারুকার্য।

কিন্তু কারুকার্য বড় কথা নয় এখানে, বড় কথা শৈব দেবতা শীতলার অধিষ্ঠান, বসন্ত রোগবাহিকা ও বসন্ত-বিনাশিনীর অবস্থান।

বসন্তরোগ ছাড়াও আরও অনেক মহামারীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা রয়েছেন এখানে। এখানেই রয়েছেন কাঠমাণ্ডু উপত্যকার শিশুদের অভিভাবিকা দেবী হারাতি।

এই হারাতি-মন্দিরটি প্যাগোডার ছাঁচে গড়া।

কিন্তু প্যাগোডা নয়, স্তূপ নয়, স্তম্ভ নয়, দেবীমূর্তি নয়, সেদিন যা আমাকে সবচেয়ে বেশী স্তম্ভিত করেছিল তা হল স্বয়ম্ভুনাথে বিপরীত দুই ধর্মের সহাবস্থান, বিপরীত দু শ্রেণীর দেবদেবীর দ্বৈত অধিষ্ঠান।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীরা ঠিক এমনি করেই পাশাপাশি অধিষ্ঠিত নেপালে। নেপাল-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই এই। হিন্দু-ধর্মকে যেমন বৌদ্ধধর্মকেও তেমনি সে গ্রহণ করেছে এবং উভয়কে মিলিয়ে সে গড়ে তুলেছে আশ্চর্য এক সমন্বয়ধর্মী সভ্যতা।

স্বয়ম্ভুনাথ নেপালের এই সমন্বয়-ধর্মিতার প্রতীক। অথবা আরও সংক্ষেপে বলতে গেলে, নেপাল-আত্মার প্রতীক। তবে কি স্বয়ম্ভুনাথই নেপাল, নেপালই স্বয়ম্ভুনাথ?—বারবার নিজেকেই প্রশ্ন করি সেদিন। স্বয়ম্ভু পাহাড়ে ঘুরতে ঘুরতে নিজের কাছেই জানতে চাই, তবে কি স্বয়ম্ভুনাথই নেপাল?

ওদিকে দূরে নেপাল-মধ্যমণি কাঠ-মাণ্ডুকে চোখে পড়ছে। অনেকটা উঁচু থেকে এবং বেশ খানিকটা দূর থেকে দেখছি বলে একসঙ্গে সবটুকু চোখে পড়ছে কাঠমাণ্ডুর।

কাঠমাণ্ডু তখন আলো-ঝলমল। শরৎ-সূর্যের বন্দনা করতে করতে সে তখন মধ্যাহ্নের সিংহদ্বারে উপনীত। আর আমরা উপনীত হাজার বছর আগেকার শান্ত স্তব্ধ একটা যুগে। আমাদের চারদিকে বুদ্ধমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে যেন। যেন প্রতিধ্বনি এসেছে দূর-দূরান্তর থেকে।

দেখতে দেখতে স্বয়ম্ভু-স্তূপের চারি-দিকে ধর্মচক্রগুলো ঘুরতে লাগল। বৌদ্ধ-সাধনার বিচিত্র সব মুদ্রা প্রকটিত হল আমাদের সামনে। জ্ঞান-মুদ্রা, তর্জনী মুদ্রা, অভয় মুদ্রা ও ধর্মচক্র মুদ্রা দেখতে দেখতে আমরা যেন হঠাৎ পিছু হটে অদ্ভুত ও আশ্চর্য একটা যুগে ফিরে গেলাম। সে যুগ প্রার্থনার যুগ, আত্মনিবেদনের যুগ, প্রেম-প্রীতি ও অহিংসার যুগ। সে যুগে মঞ্জুশ্রী সত্য, অবলোকিতেশ্বর সত্য, সত্য বজ্রপাণি। সে যুগে পথেঘাটে একটিই মন্ত্র উচ্চারিত হয়; এবং সে মন্ত্র হল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,—একটু আগে দেখা সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুটি আবৃত্তি করে চলেছে তখনও।

ধম্মং শরণং গচ্ছামি,—তখনও তার উচ্চারিত বুদ্ধমন্ত্র স্পষ্ট কানে আসছে।

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি,—তারই উচ্চারিত সঙ্ঘ-স্তুতি শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকি আমরা।

নামতে সময় লাগে না বেশি; কিন্তু হাঁটুতে ব্যথা ধরে। দারুণ ব্যথা। মনে হয়, এই বুঝি পা দুটো দেহ থেকে আলগা হয়ে যাবে।

প্রদীপবাবু পরামর্শ দিলেন, অভয়-মুদ্রায় বসবেন নাকি একবার? একটুক্ষণ জিরিয়ে নেবেন?

আমি বললাম,—না থাক। মুদ্রাটা বাড়িতে ফিরে গিয়ে প্র্যাকটিস করা যাবে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেদিনও বেলা হল অনেক। সেদিনও সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলান দিল।

কিন্তু কাঠমাণ্ডুর আকাশটা কতটুকু? দূরের ওই পাহাড়গুলো অবধি?

আজ ভাবি, আরও অনেক দূর অবধি বোধ হয়।

বোধ হয় ওই পাহাড় ছাড়িয়েও আছে নেপালের যে মালভূমি, উপত্যকা আর তরাই, কাঠমাণ্ডুর আকাশ সেখানেও আলো ছড়ায়, সেখানেও রাজধানী কাঠমাণ্ডু দুঃখ-সুখের মায়াজাল বোনে।

মায়াজাল রাজধানীর পথে পথেও কত যে! কত যে পথিক আজ কাঠমাণ্ডুর পথ ধরে চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়! শতাব্দী-প্রাচীন ইমারতগুলোর দিকে স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে ভাবে, এ কোন্ দেশে এলাম? এই ইমারতরা কোন্ যুগের কথা বলছে? মহাকালের কোন্ গহ্বর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে এরা? ইতিহাসের কোন অধ্যায়ের কতটুকু জায়গা এদের নিয়ে হাহাকার করছে?

—জানি নে। ইমারতের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার ভাবে পথিক, জানি নে।

কাষ্ঠমণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে আমিও ভাবি একদিন, জানি নে।

জানলাম পরে। কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে চোখ ফিরিয়ে কাঠমাণ্ডুর ইতিহাসের দিকে তাকালাম যেদিন, সেদিন জানলাম এই মণ্ডপ থেকেই রাজধানীর নাম হয়েছে কাঠমাণ্ডু। আর মণ্ডপটি তৈরী হয়েছে একটিমাত্র গাছের কাঠ থেকে।

ইতিহাসে পাই, রাজা লক্ষ্মী নরসিংহ মল্লের আমলে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে তৈরী হয়েছে এই মণ্ডপ। তবে এ মণ্ডপ তৈরীর পিছনে রাজার প্রত্যক্ষ কোনো অবদান ছিল কিনা ঐতিহাসিকদের মধ্যে তা নিয়ে সংশয় আছে।

সংশয় থাকবারই কথা। কারণ, রাজা লক্ষ্মী নরসিংহ, যিনি নিজের পায়ে নিজে কুঠার চালিয়ে ভীম মল্লের মতো বিশ্বস্ত মন্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন এবং যিনি ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন কিছুটা বিকৃত-মস্তিষ্ক, তিনি আর যা কিছুই হোক না কেন, কাষ্ঠমণ্ডপের মতো সুন্দর একটা মন্দির-গড়ার স্বপ্ন যে দেখতে পারেন না, এ-কথা এক রকম জোর করেই বলা যায়।

হ্যাঁ, জোর করেই বলা যায় যে, এমন কি কাষ্ঠমণ্ডপের ঐশ্বর্য ও অকৃতজ্ঞ লক্ষ্মী নরসিংহের পাপকে ঢেকে রাখতে পারল না; সুযোগ্য মন্ত্রী ভীম মল্লের সঙ্গে যে বেঈমানী করেছিলেন তিনি, তা মুছে দিতে পারল না। ভীম মল্ল কাষ্ঠমণ্ডপের চেয়েও অনেক বেশী ঐশ্বর্য নিয়ে নেপালের ইতিহাসে সোনার হরপ হয়ে রইলেন, আর নেপালের পথে-প্রান্তরে গুঞ্জরিত হল তার কথা।

লোকে বলল, ভীম মল্লের মতো বুদ্ধিমান এদেশে খুব অল্পই জন্মেছেন। আর শুধু এদেশে কেন, বিদেশেও বোধ করি তাঁর মতো বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী খুব অল্পই জন্মে থাকেন। একদিকে তিব্বতের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব স্থাপন করেছেন তিনি, আর অপরদিকে কাঠমাণ্ডুর পথে পথে পণ্যশালা গড়ে তুলে দেশকে বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির সিংহদ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু মূর্খ ও বিকৃতমস্তিষ্ক সম্রাট লক্ষ্মী নরসিংহ এত কিছু বুঝলে তো! তিনি বুঝলে তো যে ভীম মল্ল দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করেই প্রতিবেশী রাজা তিব্বতের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছেন!

লক্ষ্মী নরসিংহ উল্টো বুঝলেন বরং। তিনি ভাবলেন, ভীম মল্ল সিংহাসন থেকে তাকে হটিয়ে দিয়ে নিজে রাজা হতে চায়। অতএব—

লোকে বলল, অতএব নির্বোধ রাজা মারলেন নিজের পায়ে নিজের কুড়োল। ভীম মল্লের রক্তাক্ত শির একদিন কাঠমাণ্ডুর রাজপথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অট্টহাসিতে লুটিয়ে পড়লেন।

—কিন্তু একি! বলাবলি করে সবাই একি! রাজার হাসি যে আর থামে না! রক্ত শুকিয়ে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ভীম মল্ল, কিন্তু রাজার হাসি থামে না যে!

—থামবে কী করে! বলাবলি করে পারিষদরা, কী করে থামবে! রাজা কী আর রাজা আছেন! উন্মাদ হয়ে গেছেন যে!

—উন্মাদকে তাহলে গারদে পোরো, পরামর্শ দিল শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

শোনা যায়, শেষ অবধি গারদেই পোরা হল রাজাকে। এবং দীর্ঘ ষোল বছর ধরে গারদের প্রহরীরা উন্মাদ রাজার অট্টহাসি শুনল।

—রাজার অনুতাপ হচ্ছে রে! প্রহরীরা গুনগুন করল এক-এক সময়। বলল, বন্ধু ভীম মল্লকে মেরে রাজা একেবারে ক্ষেপে গেছে।

আজ আশ্চর্য লাগে ভাবতে, ওই ক্ষ্যাপা রাজা লক্ষ্মী নরসিংহের আমলেই একদিন গড়ে ওঠে কাষ্ঠমণ্ডপ। শহরের একেবারে মাঝখানে গড়ে ওঠে.

ওই মণ্ডপটিকে দেখা যায় এখনও। এখনও স্পষ্ট মনে করতে পারি, শহর কাঠমাণ্ডুর পুরণো রাজমহল হনুমান-ঢোকার খুব কাছেই মূর্তিমান একটি রহস্যময়ের মতো দাঁড়িয়ে অপরূপ এক প্যাগোডা।

প্যাগোডাটি তিনতলা। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, মন্দির এ নয়; এ বুঝি পথের পাশে সুরম্য কোনো আশ্রয়-শিবির। পথ চলতে চলতে ক্লান্ত যে কেউ যে কোনো সময় এখানে আশ্রয় পেতে পারে।

শোনা যায়, এক সময়ে পথিকরা আশ্রয় পেত এখানে। অন্ততঃ একটি রাত্তিরের জন্যেও এখানে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেত।

কিন্তু আজ দিনবদল হয়েছে। কাষ্ঠমণ্ডপে ঠাঁই পাবার কথা আর কেউ কল্পনাও করে না। কারণ, আজ দেবতা গোরখনাথ ওখানে থাকেন। স্বয়ং দেবতা পাষাণ প্রতিমার মধ্য দিয়ে ওখানে নাকি আলো ছড়ান।

কাষ্ঠমণ্ডপে দাঁড়িয়ে পাষাণ-প্রতিমাটির দিকে তাকাই। বারবার নিরীক্ষণ করি গোরখনাথের মূর্তিটিকে। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও কোনো আলো খুঁজে পাই না সেখানে। বরং বারবার খুঁজে পাই সামনের রাস্তা থেকে ভেসে-আসা কলকোলাহল। স্পষ্ট শুনি সাইকেল-রিকসার ক্রীং ক্রীং আর মোটর গাড়ীর পোঁ-পোঁ।

গাড়ি অনেক চলে ওদিকে। অনেকেই কাষ্ঠমণ্ডপের একেবারে দরজা অবধি গাড়ি নিয়ে যান।

দরজার ঠিক সামনেই আছে ফুট ছয়েক উঁচু বেড়া। মণ্ডপটিকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। অতএব, যে যত বড় রথে চড়েই ওখানে যান না কেন, সবাইকে বেড়ার গা-ঘেঁষে দাঁড় করাতে হবে।

আমরা রথী নই। গাড়ি বা সাইকেল-রিকসার কোনোটাই আমাদের কাষ্ঠমণ্ডপে পৌঁছে দেয় নি। আমরা মণ্ডপে গেছি পায়ে হেঁটে। এবং গেছি বলেই কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাঠমাণ্ডুই শুধু নয়, কান্তিপুরকেও বোধ করি খুঁজে পেয়েছি আমরা।

হ্যাঁ, পেয়েছি খুঁজে কান্তিপুরকে। কাষ্ঠমণ্ডপে যাবার সময় সহযাত্রী প্রদীপবাবুর কাছ থেকে শুনেছি তার কথা। শুনেছি কিছু; কিছু আবার নানা জায়গা থেকে সংগ্রহ করেছি। এবং সেইসব কিছু মিলিয়ে কান্তিপুরের একটা ছবি এঁকেছি মনে মনে। ছবিটা প্রায় হাজার বছর আগেকার এক শহরের। শহরটি পত্তন করেন সম্রাট গুণকাম দেব। আজ যেখানে কাঠমাণ্ডু ঠিক সেখানেই নতুন এক জনপদের পত্তন করেন তিনি।

গুণকামদেব সম্বন্ধে নেপালের ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই বড় বেশি মিতভাষী। একটি দুটি মাত্র বিশেষণ প্রয়োগ করে তাকে বোঝাতে চেয়েছেন প্রায় সবাই। প্রায় সবাই একবাক্যে বলেছেন, তিনি ছিলেন সত্যিকারের এক পরাক্রান্ত ও সম্পদশালী রাজা। কিন্তু তিনি যে সুন্দরের পূজারীও ছিলেন, সে-কথা প্রায় কেউই বলেন নি।

এদিকে আমি কান্তিপুরের যে ছবি এঁকেছি মনে মনে, সেখানে পরাক্রান্ত ও সম্পদশালী রাজরাজেশ্বরের চেয়ে সৌন্দর্য-রসিক সহজ মানুষ গুণকামদেবই বেশি উজ্জ্বল। সেখানে বাগমতী ও বিষ্ণুমতী নদীর সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা রূপদর্শী একটি ব্যক্তিই বেশি উজ্জ্বল।

রূপদর্শীটিকে দেখতে পাই যেন। যেন স্পষ্ট চোখে পড়ে, বাগমতী যেখানে এসে বিষ্ণুমতীর সঙ্গে মিলল, ঠিক সেখানেই কান পেতে বসে নেপালের হৃদস্পন্দন শুনছেন তিনি। শুনতে শুনতে বিস্ময়ে স্তব্ধ হচ্ছেন বারবার। বলছেন,—এখানেই ঠিক এখানেই পত্তন করো রাজধানী। এই দুই নদীর তীর ঘেঁষে, দূরের ওই পাহাড়ীয়া বনভূমিকে সাক্ষী রেখে রাজধানী পত্তন করো। আর এত সুন্দর এই জায়গা! এখানকার এই নদী, পাহাড় আর অরণ্য এত সুন্দর! এর নাম দাও কান্তিপুর; অর্থাৎ শ্রীভূমি নাম দাও এর। নাম দাও গৌরব-নিকেতন।

সেই থেকে কান্তিপুর নাম হল রাজধানীর: এবং তারপর কাষ্ঠমণ্ডপ থেকে হল কাঠমাণ্ডু।

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজোও শেষ হল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয় বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ওঁরা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের খবর, চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিনিসপত্রের দামও আকাশছোঁয়া।

এমন সময় এল সেই মারাত্মক সংবাদ। জাপানীরা বোমা ফেলেছে বর্মায়। সেখান থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে ভারতে। রাজদিয়াতেও জান নিয়ে ফিরে এসেছে একটি পরিবার। পরদিন। সকলেই ছুটল ত্রৈলোক্য সেনের কাছে। শুনল রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে আসার মর্মান্তিক কাহিনী। সময় এগোল যথানিয়মেই। দেখতে দেখতে যুদ্ধের হাওয়া এসে লাগল রাজদিয়াতে। সৈন্য আসতে শুরু করেছে। কলকাতা থেকেও লোক পালাচ্ছে। বিনুর নতুন বন্ধু অশোক। মিলিটারি ব্যারাকে গেল তারা একদিন।]

॥ উনপঞ্চাশ ॥

আমেরিকান টমিদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ানো আজকাল বিনুদের নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। টমিদের খোঁজে এখন আর ব্যারাক পর্যন্ত যেতে হয় না। রাজদিয়ার রাস্তায় রাস্তায়, স্টিমারঘাটে, নদীর পাড়ে ঝাউবনের দিকটায় সবসময় টমিগুলো টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

একদিন বিনুরা দেখতে পেল, তাদের বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে সেই কাঠের পুলটার ওপর দুই টমি একটা প্রকাণ্ড পাকা কাঁঠাল নিয়ে বসে আছে। খানিকটা দূরে মুসলমান চাষীদের এক জনতা উদগ্রীব দাঁড়িয়ে; মাঝে মাঝে টমি দুটোকে দেখিয়ে ফিস-ফিস গলায় নিজেদের ভেতর কি বলাবলি করছে।

বিনুরা প্রথমে চাষীদের কাছে গেল। শ্যামল শুধলো, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

একটি জোয়ান চাষী জনতার মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'সায়েবগো কাছে আমরা একখান কাঠল বেচছি। কত দাম করছি জানেন?'

'কত?'

'চাইর ট্যাকা।'

'তাই নাকি!'

'হ। কাঠলটা দাম বড়জোর আট আনা। নগদ সাড়ে তিন ট্যাকা লাভ করলাম।' এক কাঁঠাল সাড়ে তিন টাকা লাভ করা দিগ্বিজয়ের সমান। গর্বে ছোকরার বুক ফুলে উঠছিল।

আরেকটা মধ্যবয়সী চাষী বলল, 'হালারা যে কই থন আইছে! যা দাম চাই তাই দিয়া দ্যায়। ট্যাকা-পয়সার উপুর দয়া-মায়া নাই। একখান কাঠল বেইচা চাইর ট্যাকা পাওন যায়—বাপের জন্মে এমুন কথা শুনি নাই।'

আরেক জন বলল, 'যা দ্যাখে হালারা হেই কিনে। হেই দিন আমি তো আড়াই ট্যাকা নিয়া একখান কুমড়া বেচছিলাম।'

তারপর দেখা গেল, শুধু কুমড়োই না, অবিশ্বাস্য অকল্পনীয় দামে আরো অনেকে অনেক কিছু সৈন্যদের কাছে বিক্রি করেছে।

অশোক এই সময় বলে উঠল, 'কাঁঠাল তো বেচেছ; আবার দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?'

সেই জোয়ান চাষীটি বলল, 'সায়েবরা আমাগো কী জানি কইতে আছে; বুঝতে পারি না।'

মধ্যবয়সীটি বলল, 'এমুন তরাতরি এংরাজি কয় য্যান ছাগলে নাইদা (নেদে) যায়। কার সাইধ্য বোঝে!' ভাবখানা এই, তাড়াতাড়ি না বলে ধীরে-সুস্থে বললে সে ইংরেজি ভাষাটা অক্লেশে বুঝে ফেলত।

অশোক কি বলতে যাচ্ছিল সেই সময় টমি দুটো ডাকল, 'ইউ বয়—'

বিনুরা ফিরে তাকাতে টমিরা হাতের ইশারায় ডাকল।

টমিদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সাহস বেড়ে গিয়েছিল; এখন আর তাদের ভয় করে না বিনুরা। অশোক বলল, 'চল ব্যাটারা কী বলছে শুনে আসি।'

বিনু, শ্যামল আর অশোক—তিনজনে পায়ে পায়ে পুলটার ওপর গিয়ে উঠল। উৎসুক জনতা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকল।

একটা টমি শুধলো, 'নো ইংলিশ?' অর্থাৎ অশোকরা ইংরেজি জানে কিনা?'

অশোক বলল, 'ইয়েস।'

কাঁঠালটা দেখিয়ে এবার টমিটা বলল 'উয়াটস্ দিস?'

প্রথমে খুব চাপা গলায় অশোক বাঙলায় বলে নিল, 'ব্যাটারা কী কিনেছে তাই জানে না।' তারপর ইংরেজিতে বলল 'ফ্রুট।'

'খায়?'

'নিশ্চয়ই।'

'কেমন করে খেতে হয়?' বলে দূরে জনতাকে দেখিয়ে টমিরা বলল, 'ব্লাডি গুলোকে জিজ্ঞেস করছি, কিছু বলছে না

অশোক বলল, 'ওরা ইংরেজি জানে না তাই তোমাদের কথা বুঝতে পারে নি।'

'দ্যাট মে বী—'

এবার কাঁঠালটা ভেঙে খাওয়ার কায়দা দেখিয়ে দিল অশোক। একটা করে কোয়া মুখে পুরতে যেই স্বাদটা টের পাওয়া গেল আর যাবে কোথায়? দুই টমি চার হাতে কোয়া খুলে টপাটপ খেতে লাগল খাওয়াটা সত্যিই দর্শনীয়। নিশ্বাস ফেলা যেন সময় নেই। বিচিশুদ্ধ কোয়াগুলো মুখে পুরে চিবোতে চিবোতেই বিচিগুলো গালের পাশ দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

দেখতে দেখতে কাঁঠালটা শেষ হয়ে গেল, পড়ে রইল মাঝখানের মোটা বোঁটা আর কর্কশ কাঁটাওলা ছালটা।

খাওয়া তো হল। তারপরেই দেখা দিল আরেক সমস্যা। কাঁঠালের আঠায় হাত-মুখ গাল-গলা, নাক-ভুরু, এমন কি জামা পর্যন্ত মাখামাখি হয়ে গেছে। টমিরা যত ঘষে ঘষে তুলতে চাইছে ততই আঠা লেগে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত বিব্রত হ

আবার অশোকের শরণ নিল তারা, 'এ বয়—'

অশোক বলল, 'ইয়েস—'

'স্লাক্তি আঠা তো তুলতে পারছি না।'

অশোক চৌখস ছেলে। বিন্দুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শালাদের টাঁক কিছু খসাচ্ছি।' তারপর থেমে থেমে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে টমিদের উদ্দেশে বললে, আঠা তুলে দিতে পারি; পাঁচ টাকা লাগবে।'

'ও, ইয়েস—' হিপ পকেট থেকে এক মুঠো রেজগি আর নোট বার করে একটা টমি অশোকের হাতে দিল, গুনল না পর্যন্ত।

অশোক অবশ্য গুনল—প্রায় সাত টাকার মতন। টাকাটা পেয়েই সে বিন্দুকে বলল, 'তোমাদের বাড়ি তো কাছে। শিশিতে করে সরষের তেল নিয়ে এসো তো। একটু বেশি করেই এনো।'

সরষের তেল এলে তিন বন্ধু ডলে ডলে টমিদের গা থেকে কাঁঠালের আঠা তুলে ফেলল।

টমি দুটো বেজায় খুশী। মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, কাম অন—' বলে তিনজনের হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে কাঁধের জোড় প্রায় আলগা করে ফেলল।

উচ্ছ্বাস খানিকটা স্তিমিত হলে টমি দুটো বলল, 'সিট ডাউন। তোমাদের সঙ্গে গপ্প করি।'

বিন্দুরা বসল।

দুই টমি জড়ানো জড়ানো উচ্চারণে কত কথা যে বলতে লাগল। ক্লাস নাইনের ইংরেজি বিদ্যেয় তার সামান্যই বুঝতে পারল বিন্দু, বেশিটা দুর্বোধ্য থেকে গেল। অশোক অবশ্য টমিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে 'ইয়েস' 'নো' করে যেতে লাগল। তবে একটা কথা জানা গেল, রাজদিয়া আসার আগে টমি দুটো কলকাতায় ছিল।

অনেকক্ষণ গল্পটল্প করার পর একটা টমি হঠাৎ বলে উঠল, 'হেঃ গায়—'

অশোক জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী?'

একটি চোখ কুঁচকে আরেকটা চোখ ইঙ্গিতপূর্ণ করে চাপা গলায় টমিটা বলল, 'বিবি হাউস মালুম?' কলকাতায় থাকার ফলস্বরূপ দু-চারটে হিন্দি শব্দও তারা শিখে এসেছে।

একটু ভেবে অশোক বলল, 'ইয়েস—'

'ইউ গুড গায়। আমাদের নিয়ে চল—

'টেন রুপীজ—' অশোক বলল। অর্থাৎ দশটি টাকা দিলে তবেই 'বিবি হাউসে'র দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

'ইয়া-ইয়া—' হিপ পকেট থেকে আবার এক মুঠো নোট-টোট বার করে অশোককে দিল টমিটা।

'বিবি হাউসে'র ব্যাপারে টমি দুটোর প্রচণ্ড উৎসাহ। টাকা দিয়েই লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে তারা এবং অশোকের হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে।

অগত্যা অশোকদের উঠতেই হল। এই সময় বিন্দু অশোকের কানে ফিস-ফিস করে বলল, 'বিবি হাউস কী?'

অবাক চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অশোক বলল, 'জানো না!'

'না।' বিন্দু বিমূঢ়ের মতন মাথা নাড়ল।

অশোক বলল, 'পরে বলব।' তারপর আঙুল কামড়াকে কামড়াতে গলাটা নামিয়ে দিল, 'বিবি হাউসের নাম করে তো দশ টাকা আদায় করলাম। এখন ব্যাটাদের কোথায় নিয়ে যাই?'

তারপরেই কী মনে পড়তে তার চোখের তারা নেচে উঠল, 'হয়েছে—'

বিন্দু শুধলো, 'কী?'

'ব্যাটাদের এক জায়গায় নিয়ে যাব।'

'কোথায়?'

'চলই না। গেলেই বুঝতে পারবে।'

অশোক টমিদের নিয়ে দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরল।

পুলের তলায় জনতা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মাঝবয়েসী সেই মুসলমানটি ভিড়ের মধ্য থেকে বলে উঠল, 'বাবু কাঠলের আঠা তোলনের লেইগা কত নিলেন?'

অশোক বলল, 'সাত টাকা।'

'তাইলে এক কাঠল খাইতে এগার ট্যাকা লাইগা গেল।'

উত্তর না দিয়ে অশোক হাসল।

লোকটা আবার শুধলো, 'সৈন্য দুইটা আরো ট্যাকা দিল না আপনেরে?'

দ্বিতীয়বার টাকা দেওয়াও সে তা হলে লক্ষ করেছে। ব্যাপারটা স্বীকার করতেই হল অশোককে।

মাঝবয়েসী চাষীটা বলল, 'এই ট্যাকাটা পাইলেন কোন খাতে?'

খানিক চিন্তা করে অশোক বলল, 'সে তোমাকে পরে বলব।'

'অখন অগো নিয়া চললেন কই?'

'শ্বশুরবাড়ি দেখাতে।'

দক্ষিণ দিকে খানিকটা যাবার পর অশোকরা পুবে ঘুরল। তারপর কোণাকুণি কিছুক্ষণ হেঁটে বাংলো মতটা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকেই অশোক বলল, 'যাও ভেতরে যাও—' বলেই পেছন ফিরে বিন্দুদের নিয়ে ছুট। মুহূর্তে এর রান্নাঘর, ওর বাগান, তার ঢেঁকিঘরের ওপর দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

বিন্দুরা থামল একেবারে তাদের পুকুর-পাড়ে এসে। ঘাটে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে তিনজন অনেকক্ষণ হাঁপাল।

তারপর বিন্দু বলল, 'যেখানে টমি দুটোকে দিয়ে এলে ওটা তো পুলিশের বড়সাহেব মিস্টার রজার্সের বাড়ি—'

যেন বিরাট এক কীর্তি করেছে; ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কায়দা করে কিছুক্ষণ হাসল অশোক। তারপর বলল, 'ইচ্ছে করেই তো দিয়ে এলাম। একটু পর খোঁজ নিলে জানতে পারবে বাছাধনদের হাড়-মাংস আলাদা করে রজার্স সাহেব মিলিটারি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। উল্লুকেরা বাঙলা দেশে এসে বিবি হাউস খুঁজছে!

টাকিতে সেই কুয়াটা, মুখে লাগে যেন বিন্দুর। বলল, 'বিবি হাউস মানে কী, বললে না তো?'

কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী বলল অশোক। শুনতে শুনতে নাক-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল বিন্দুর। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল।

কলকাতা থেকে জ্ঞানবৃক্ষের অনেক ফল নিয়ে এসেছে অশোক; একটা একটা করে বিন্দুকে খাওয়াতে শুরু করেছে সে।

●

দিনকয়েক পরের কথা।

বিকেলবেলা স্কুল থেকে ফিরছিল বিন্দুরা। স্টিমারঘাটের সামনে আসতেই চোখে পড়ল একটা পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানে ভিড় জমেছে।

কৌতূহলের বশে বড় বড় পা ফেলে কাছে আসতেই বিন্দুরা দেখতে পেল একটা টমি একের পর এক সিগারেটের প্যাকেট কিনছে; তারপর সেগুলো খুলে হরির-লুটের মতন ছড়িয়ে দিচ্ছে।

চার পাশের মানুষগুলো যেন চোখ-মুখ শানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; সিগারেট ছড়ালেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

বিন্দুরা একপাশে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

হঠাৎ টমিটার চোখ বোঁ করে ঘুরে এসে পড়ল বিন্দুদের ওপর। দেখেই বোঝা গেল, মদে চুর হয়ে আছে সে। তারই মধ্যে হিপ পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বার করে মাঝে মাঝে গলায় ঢালছে।

আচমকা টমিটা চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউ ব্লাডি সোয়াইন—'

বিন্দুরা ভয় পেয়ে গেল।

টমিটা ছুটে এসে অশোকের কলার চেপে ধরে চেঁচাল, 'ইউ আর স্ট্যাণ্ডিং—'

অমন যে তুখোড় ছেলে অশোক, সে-ও একেবারে তোতলা হয়ে গেল, 'ইয়ে-এ-এ-এস স্যার—'

'ওয়াই?'

'ফর নাথিং সায়েব, ফর নাথিং—'

টমি গর্জে উঠল 'নো—'

মাতালটা ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল অশোক। ভয়ে তার হাত-পা কাঁপতে লাগল; চোখের তারা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

হঠাৎ টমিটা ধাক্কা দিয়ে অশোককে দশ হাত দূরে সরিয়ে দিল। তারপর সিগারেট কিনে ছড়াতে ছড়াতে বলল, 'টেক—টেক—

এতক্ষণে বোঝা গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে চলবে না; সবার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে হরির লুটের সিগারেট নিতে হবে। কি আর করা, সিগারেট কুড়োতেই হল।

বিন্দু আর শ্যামল দাঁড়িয়ে ছিল। টমির ভয়ে তাদেরও সিগারেট কুড়োতে হল। কুড়িয়েই যদি মুক্তি পাওয়া যেত! দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে টমিটা চিৎকার করল, ইউ ব্লাডি—স্মোক—'

বিন্দু ভাবল, একদিন আশু দত্ত রুস্তম আর পতিতপাবনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই নদীর পাড়ে স্টিমারঘাটের আশে-পাশে এমন কেউ নেই যে তাকে বাঁচাতে পারে।

সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। ভয়ে গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল বিন্দুর; হাতের আঙুলগুলো থর-থর করছিল। মনে হচ্ছিল, মাথা-টাথা ঘুরে পড়েই থাকে।

টমির আরেকটা হুংকারে সিগারেট ধরিয়ে টান লাগাল বিন্দু।

সেই যে একটা নিষিদ্ধ রাজ্যের দরজা খুলে গিয়েছিল তারপর থেকে নদীর পাড়ে ঝাউবনের ভেতর ঢুকে দুই বন্ধুর সঙ্গে সিগারেট খেতে লাগল বিন্দু। সিগারেট টমিরাই বেশি যোগাত, মাঝে মাঝে তারা নিজেরাও কিনত।

এ ব্যাপারে ভয় আছে, পাছে কেউ দেখে ফেলে। তবু লুকিয়ে লুকিয়ে নিষিদ্ধ কিছু করার ভেতর বিচিত্র এক উত্তেজনাও রয়েছে। সিগারেট টানতে টানতে বিন্দুর মনে হতে লাগল, সে যেন আর বাচ্চাদের দলে নেই ; সিগারেটের ধোঁয়ায় চড়ে হঠাৎ অনেক বড় হয়ে গেছে।

সিগারেট খেয়ে চোরের মতন বাড়ি ফেরে বিন্দু। চনমন করে সবাইকে লক্ষ করে; সহজে কারো কাছে ঘেঁষতে চায় না। তার আশঙ্কা এই বুঝি কেউ ধরে ফেলল; এই বুঝি তার মুখ থেকে কেউ সিগারেটের গন্ধ পেল।

মোটামুটি এইভাবেই চলছিল।

হঠাৎ এক ছুটির দিনের বিকেলবেলা বিন্দু বেরুচ্ছে ঝিনুক কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'বেড়াতে যাচ্ছ?'

শ্যামল আর অশোক স্টিমারঘাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে। বিন্দু সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ—' দিয়েই ব্যস্তভাবে উঠোনে নেমে গেল।

পেছন থেকে ঝিনুক ডাকল, 'বিন্দুদা—'

বেরুবার মুখে বাধা পড়ায় বিন্দু বিরক্ত। পেছন ফিরে রুক্ষ গলায় বলল, 'কী বলছ?'

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'পরে শুনব।'

'না, এক্ষুনি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝিনুকের কাছে ফিরে এল বিন্দু। চোখ-টোখ কুঁচকে বলল, 'কী বলবে, তাড়াতাড়ি বল—'

ঝিনুক হাসল, 'অত তাড়া কেন? বন্ধুরা বুঝি দাঁড়িয়ে আছে?'

শ্যামল আর অশোক যে তার সব-সময়ের সঙ্গী, একথা জানতে আর কারো বাকি নেই। বিন্দু কিছু বলল না; তার চোখ আরো কুঁচকে যেতে লাগল।

ঝিনুক একটু ভেবে বলল, 'তুমি আজকাল একটা জিনিস খাচ্ছ?'

'কী?'

'তুমিই বল না—'

'বুঝতে পারছি না।'

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে খুব চাপা গলায় ঝিনুক বলল, 'সিগারেট।'

পলকে মুখখানা একেবারে কাগজের মতন সাদা হয়ে গেল। ভাল করে কথা বলতে পারল না বিন্দু। তোতলাতে তোতলাতে কোনরকমে বলল, 'কে বললে! মিথ্যে কথা।'

তার চোখে চোখ রেখে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝিনুক বলল, 'মিথ্যে কথা?'

'নিশ্চয়ই—' বিন্দু খুব জোর দিয়ে বলতে চাইল বটে, কিন্তু গলার ভেতর থেকে সরু দুর্বল একটা আওয়াজ বেরুল মাত্র।

'তা হলে তোমার পকেট থেকে সিগারেট বেরুল কেমন করে?'

'আমার পকেট থেকে!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই।'

বিন্দু কিছু বলতে চেষ্টা করল; পারল না। তার বুকের ভেতরটা ঢাকের আওয়াজের মতন গুরগুর করতে লাগল।

ঝিনুক আবার বলল, 'ধোপাবাড়ি পাঠাবার জন্যে মাসিমা আমাকে তোমার ময়লা জামা-টামা আনতে বলেছিল। পকেট-টকেটগুলো দেখে নিচ্ছিলাম, যদি পয়সা-কড়ি কিছু থাকে। পয়সার বদলে ও মা, একেবারে সাপ বেরিয়ে পড়ল—'

বিন্দুর এবার মনে পড়ে গেল, সেদিন টমিদের কাছ থেকে অনেকগুলো সিগারেট যোগাড় করেছিল। ঝাউবনে বসে কয়েকটা টেনেছিল; ক'টা রেখেছিল পকেটে। ভেবেছিল, পরে ফেলে দেবে। অসাবধানে ফেলে দিতে ভুলে গেছে।

শ্বাস আটকে আসছিল বিন্দুর। নাকের ডগাটা ঝিঁঝিঁ করছিল। সমস্ত শরীর যেন অসাড় হয়ে আসছে। কোনরকমে সে বলতে পারল, 'মাকে সিগারেট দেখিয়েছ নাকি?'

আস্তে মাথা হেলিয়ে দিল ঝিনুক, 'হুঁ—'

বিন্দুর হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এল যেন, 'সত্যি!'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ঝিনুক। তারপর মাথাটা ধীরে ধীরে দু ধারে নাড়ল। অর্থাৎ বলে নি।

'সত্যি বলছ?'

'সত্যি।'

'আমাকে ছুঁয়ে বল।'

বিন্দুর গায়ে আঙুল ঠেকিয়ে ঝিনুক বলল, 'হল তো?'

এতক্ষণে সহজভাবে শ্বাস টানতে পারল বিন্দু। একটু হেসে বলল, 'বাঁচালে।'

'এই প্রথম, এই শেষ। এর পর খেলে আর বাঁচাব না; ঠিক মাসিমাকে বলে দেব।'

'আর খাবই না।'

'শ্যামলদা আর অশোকদার সঙ্গে মিশে মিশে তুমি খুব খারাপ ছেলে হয়ে যাচ্ছ।'

বিন্দু একথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'সিগারেটগুলো কোথায়?'

ঝিনুক বলল, 'আমার কাছে।'

বিন্দু মুখ কাচুমাচু করে অনুনয়ের গলায় বলল, 'আমাকে দিয়ে দাও না—'

ঝিনুক বলল, 'উঁহু—'

'দাও না, দাও না—'

'না। ওগুলো আমার কাছে থাকবে।'

'সিগারেট দিয়ে তুমি কী করবে?'

'তুমি যদি আমার কথা না শোন, মাসিমাকে-দাদুকে-দিদাকে সবাইকে দেখাব।'

কি সাংঘাতিক মেয়ে! বিন্দুর মনে পড়ল, ঝুমার সঙ্গে কাউফল পাড়তে গিয়ে মাঠের জলে ডুবে গিয়েছিল। সেই কথাটা মাকে বলে দেবে—এই ভয় দেখিয়ে অনেকদিন ঝিনুক তাকে অস্থির করে রেখেছে; এক মুহূর্তও সুখে থাকতে দ্যায় নি।

জলে ডোবার ব্যাপারটা মলিন হতে আসার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে সিগারেট বেরুল। আর কি আশ্চর্য, যত কুকীর্তি সবই কিনা ঝিনুকের হাতে ধরা পড়ছে! ভাগ্যিস ঝিনুক ধরেছে। অন্য কারো হাতে পড়লে কী যে হত! ভাবতে সাহস হয় না বিন্দুর।

যাই হোক বিন্দু আর পীড়াপীড়ি করল না। শুধু বলল, 'সিগারেটগুলো একটু লুকিয়ে রেখো; কেউ যেন দেখে না ফ্যালে।'

'সে তোমাকে বলতে হবে না। এমন জায়গায় রেখেছি, কারো সাধ্যি নেই খুঁজে পায়।'

একটু চুপ করে থেকে বিন্দু বলল, 'আমি তা হলে এখন যাই।'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকাল ঝিনুক, 'উঁহু—' এভাবে মাথা ঝাঁকানো তার কত-কালের অভ্যাস।

'যাব না তো, এখন কী করব?'

'আমার সঙ্গে ক্যারম খেলবে।'

নদীর পাড়ে ঝাউবনে, কি স্টিমারঘাটায় কি মিলিটারি ব্যারাকে কোথায় অশোকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, তা নয়। বাড়িতে বসে থাকো। করুণ গলায় বিন্দু বলল, 'ক্যারম!'

'হ্যাঁ। নতুন বন্ধু পেয়ে আজকাল বাড়িই থাকো না। আজ আমার সঙ্গে খেলতেই হবে।'

জলে ডোবার পর নতুন এক জ্বালা পেয়ে গেছে ঝিনুক। নাঃ, মেয়েটার হাত থেকে কোনদিনই মুক্তি নেই।

বিষণ্ন মুখে ক্যারম খেলতে বসে গেল বিন্দু।

●

ঝিনুকের কাছে ধরা পড়বার পর অশোকদের এড়িয়ে চলতে লাগল বিন্দু।

আজকাল টিফিনের সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে স্কুলের পেছন দিকের সোনাল ঝোপে গিয়ে একা একা বসে থাকে। ছুটি হলেই চোখ-কান বুজে বাড়ির দিকে ছোটে।

কিন্তু ক'দিন আর। একদিন ছুটির পর চারদিক দেখে ছুটতে যাবে, তার আগেই অশোকেরা ধরে ফেলল।

শ্যামল বলল, 'কি ভাই, আজকাল যে আমাদের সঙ্গে মিশতেই চাও না।'

বিনু আবছা গলায় বলল, 'না, মানে পরীক্ষা এসে গেল। তাই—'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অশোক বলল, 'হঠাৎ গুড বয় হয়ে গেলে যে! পরীক্ষা বুঝি আমাদের নেই?'

'না, মানে—'

'বারবার মানে মানে কী করছ? এসো—'

'কোথায়?'

'বা রে, তুমি দেখছি এ ক'দিনে সব ভুলে গেছ! ছুটির পর আমরা কোথায় যাই? সেখানেই যাব। স্টিমারঘাটে, টমিদের ব্যারাকে, ঝাউবনে—'

তীব্র আকর্ষণও বোধ করছিল, আবার ভয়ও লাগছিল। শেষ পর্যন্ত ভয়ের দিকটাই ভারী হয়ে দাঁড়াল। বিনু বলল, তোমরাই যাও ভাই, আমার বাড়িতে একটু কাজ আছে।'

'কিছু কাজ নেই।'

জোর করে বিনুকে টানতে টানতে অশোকেরা ঝাউবনে নিয়ে গেল। গাছের আড়ালে বসে অশোক পকেট থেকে সিগারেট বার করল।

দেখেই বিনু হাত নেড়ে ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি কিন্তু ভাই সিগারেট খাব না।'

'কেন?'

ঝিনুকের কাছে যে ধরা পড়ে গেছে তা আর জানাল না বিনু। শুধু বলল, 'এমনি।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আঙুলের ডগায় বিনুর থুতনিটা নাড়তে লাগল অশোক। ঠাট্টার গলায় বলল, 'সিগারেট তো খাবে না, তা হলে কী খাবে? দুধ? কচি খোকা।' বলতে বলতে একটা সিগারেট বিনুর ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে ফস করে দেশলাই ধরাল।

কয়েক দিনের জন্য ঝিনুক বিনুকে ফিরিয়ে ছিল ঠিকই কিন্তু অশোকদের টান এত প্রবল, নিষিদ্ধ দেশের আকর্ষণ এত তীব্র যে আবার সে ভেসে যেতে লাগল।

অশোকদের সঙ্গে আবার ঘুরতে শুরু করেছে বিনু; আবার লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। বুদ্ধি লাগবার পর পূর্ব বাঙলার হৃদয়ের গভীরে লুকনো এই মায়াবী রাজদিয়াকে ঘিরে যে উদ্‌ভ্রান্ত ঘূর্ণি ঘুরে চলেছে তা যেন হাজার হাতে তাকে টানতে লাগল। বিনুকে ফেরাতে পারে তেমন শক্তি ঝিনুকের ক্ষুদ্র দুর্বল বাহুতে নেই।

অশোকদের পাল্লায় পড়ে সিগারেট টানে বটে, তবে আগের চাইতে অনেক বেশি সাবধান হয়ে গেছে বিনু। বাড়ি ফেরার সময় ভাল করে পেয়ারা পাতা চিবিয়ে নেয়, যাতে মুখে গন্ধ না থাকে। পকেট-টকেটগুলো অনেকবার করে দেখে নেয়।

মোটামুটি এইরকম চলছিল।

হঠাৎ একদিন অঘটন ঘটে গেল। সেদিন আর ঝাউবনে বসে সিগারেট খাচ্ছিল না বিনুরা। সাহস দেখাবার জন্য বড় রাস্তা দিয়ে তিন বন্ধু বুক ফুলিয়ে হাঁটছিল; তাদের ঠোঁটের একধারে সিগারেট। ভাবখানা এই, কারোকে পরোয়া করি না।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যখন তারা আদালতপাড়ার কাছে এসেছে, সেই সময় বিনু টের পেল একটা কর্কশ শক্ত হাত তার কান সাঁড়াশির মতন চেপে ধরেছে।

চমকে পেছন ফিরতেই বিনু দেখতে পেল, মজিদ মিঞা। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে সব রক্ত যেন নেমে গেল; ঠোঁট থেকে সিগারেট খসে পড়ল। ভয়ে চোখের তারা স্থির; হাত-পা একেবারে জমে গেছে।

মজিদ মিঞাকে চেনে না অশোক। একটি অপরিচিত মুসলমান ভদ্রলোককে বিনুর কান ধরতে দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল সে; তার পরেই রুখে উঠল, 'আপনি ওর কান ধরেছেন যে?'

মজিদ মিঞা বলল, 'বেশ করছি।'

'আপনি কি ওর গার্জেন?'

'গার্জেন-গুর্জেন, ঐ সগল এংরাজি বুঝি না। অর কানটা যদি ছিড়াও ফালাই কেউ কিছু কইব না। কানটা তো পরথমে ছিড়ুমই, হের (তার) পর ভাইবা দেখুম, আর কী করুণ দরকার—' বলে বিনুর কানে প্রচণ্ড এক মোচড় দিল মজিদ মিঞা।

অশোক এবার ধমকের গলায় বলল, "ভাল চান তো শিগগির ওর কান ছেড়ে দিন।'

'ছ্যামরা তর কথায় নিকি"

'হ্যাঁ আমারই কথায়।'

'মোচের র‍্যাখ (রেখা) পড়ে নাই, গলায় টিপ্পি দিলে (টিপলে) মায়ের দুধ উইঠা আইব। ওই বয়সে সিক্রেট খাও, আবার চোখ লাল কর। র ছ্যামরা, তরে দেখাই।' বিনুর কানটা ডান হাতে ধরা ছিল; বাঁ হাত দিয়ে ঠাস করে অশোকের গালে এক চড় কষিয়ে দিল মজিদ মিঞা। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ঘুরে পড়ল অশোক।

মজিদ মিঞা একাই ছিল না; তার সঙ্গে একটা লোকও ছিল। অশোক পড়ে যেতেই মজিদ মিঞা সঙ্গীকে বলল, 'ধর্ তো ছ্যামরারে, কত বড় ওস্তাদ হইছে একবার দেখি।'

মজিদ মিঞার মুখ থেকে কথা খসবার আগেই লোকটা বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে অশোককে ধরে ফেলল। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে শ্যামল এই সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

পেছন থেকে মজিদ মিঞা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'তোমারে আমি চিনি বাসী, ত্রৈলোক্য স্যানের নাতি তুমি। দৌরাইয়া (দৌড়ে) পলাইবা কই; যাইতে আছি তোমাগো বাড়িত্।'

এদিকে অশোককে টানতে টানতে সেই লোকটা সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। মজিদ মিঞা তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাগো বাড়ির পোলা তুমি?'

অশোকের অবস্থা অবর্ণনীয়। এত যে তুখোড় সে, এত চৌকস, চোখমুখে যার কথার খই ফোটে, একটু আগেও যে রুখে রুখে উঠছিল, এখন তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখ জলে ভরে গেছে।

মজিদ মিঞা ধমকে উঠল, 'কী হইল, মুখ দিয়া দোখ রাও (শব্দ) বাইর হয় না।'

কাঁদো কাঁদো মুখে অশোক বলল, 'আর কক্ষনো করব না।'

'কান্‌তে (কাঁদতে) আরম্ভ করলা দেখি। গজ্জন-তজ্জন গেল কই? কান্দনে আমি ভুলুম না। কোন্ বাড়ির পোলা আগে কও—না কইলে কিলান ল্যাঠা আছে।'

ভয়ে ভয়ে অশোক এবার বলল, 'রুদ্র-বাড়ির—'

'তোমার বাপের নাম কী?'

'অনন্তকুমার রুদ্র।'

হঠাৎ রেগে গেল মজিদ মিঞা। অশোকের গালের কাছে চড় নিয়ে এসে চিৎকার করে উঠল, 'হারামজাদা বান্দর, বাপেরে সেম্মান দিতে জান না! নামের আগে শিরিযুক্ত বাবু বসাইতে মানে লাগে!'

মুখ নামিয়ে চুপ করে রইল অশোক।

মজিদ মিঞা এবার তার সঙ্গীকে বলল, 'কাশমা, তুই ঐ ছ্যামরারে রুদ্রবাড়ি লইয়া যা। আমি হ্যামকত্তার বাড়িত্ থনে আইতে আছি।'

কাশমা অর্থাৎ কাশেম অশোককে নিয়ে চলে গেল। আর মজিদ মিঞা বড় রাস্তার ওপর দিয়ে বিনুর কান ধরে বাড়ি নিয়ে এল। তার এমন ভয়ানক চেহারা আগে আর কখনও দেখেনি বিনু।

(ক্রমশঃ)

অঙ্গনা

প্রমীলা

জয়যাত্রায় জয়িতা

ভাই-বোনদের মধ্যে জয়িতাই ব্যতিক্রম। খেলাধুলোয় তার খুব আগ্রহ। সেই ছোট-বেলা থেকেই। মেট্রোপলিটান স্কুলে অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে তিনি মধ্যমান। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নাচের তালিম। লেখাপড়ায়ও পিছে নয়।

বাবা নরেন্দ্রনাথ সেন তাই অত্যন্ত উৎসাহী। খেলাধুলোয় তার আজীবন অনুরাগ। নিজে তিনি ওয়াই এম সি-এর খেলাধুলো এবং বাংলা দেশের স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। তাঁর ছেলে-মেয়েরা খেলাধুলোয় উৎসাহ প্রকাশ করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সবাই তাঁকে হতাশ করেছেন। তিনিও নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। ছোট মেয়ে জয়িতা যেদিন মাঠময় ছোটাছুটি করে সবাইকে অবাক করে দিলেন সেদিন নরেনবাবুর স্বস্তি। উত্তরাধিকার দিয়ে যাবার লোক পেলেন এবং পাত্রী তাঁরই মেয়ে। এরচেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে! সেদিন থেকেই তিনি মেয়ের পেছনে লেগেছিলেন। নিজে তাঁকে সব শিখিয়েছেন। জয়িতার একের পর এক সাফল্যে তিনি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন। ধৈর্য এবং পরিশ্রমে মেয়ের সাফল্য সুনিকট করতে চেয়েছেন। তিনি জানতেন, জয়িতা ভবিষ্যতের বিরাট প্রতিশ্রুতি। খেলাধুলোয় এ মেয়ে বাংলার মুখ উজ্জ্বল করবে।

মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়ার সময় থেকেই জয়িতা রীতিমত স্পোর্টসম্যান। খেলাধুলোর সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক কসরত প্রয়োজন। না হলে যথার্থ অ্যাথলেট হওয়ার অনেক অসুবিধা। তাই সময়সুযোগে তিনি চোরবাগান তরুণ সংঘ ব্যায়ামাগারে গিয়ে তিনি ছুরি-লাঠি খেলায় হাত পাকিয়েছেন।

এতদিন পর্যন্ত অ্যাথলেটিক স্পোর্টস এবং আনুসঙ্গিকেই জয়িতা সকলের নজর কেড়েছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিলেন, জয়িতা খেলাধুলোর মানদণ্ডে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশের আগামী দিনের আশা। তাঁদের সে আশা পূরণ হয়েছে। কিন্তু অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে নয়। জয়িতা খেলাধুলোর আর এক আঙিনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। এটা আমাদের পক্ষে সমান আনন্দের।

স্কুল পেরিয়ে জয়িতা এলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। শরীর ফিট রাখতে হবে। নাম লেখালেন এন-সি-সিতে। হাতে পেলেন রাইফেল। জয়িতার রক্তে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাঁর অনেকদিনের সাধ, না বলা আকাঙ্ক্ষা রাইফেল হাতে পাওয়া। গোপনে গোপনে এতদিন এই ইচ্ছাটি তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল। কাউকে বলেননি। বলার সুযোগও হয়নি। একা একা ঘরে বসে বড় বড় রাইফেল স্যুটারদের ছবি দেখেছেন। আর ভেবেছেন, কোনদিন যদি রাইফেল হাতে পান তো অসাধ্যসাধন করবেন। কিন্তু স্কুলের গণ্ডীতে সে সুযোগ কোথায়! তাই হা-হুতাশই সার হয়েছে। এবার সে সুযোগ এসেছে।

নরেনবাবু ভাবছেন, মেয়ে বড় হয়ে নামকরা অ্যাথলেট হবে। হয়তো তিনি সেরা সেরা অ্যাথলেটদের কথা ভাবতেন। আর একবার আবছা ভেবে মেয়েকে সেখানে নামানোর চেষ্টা করতেন। খেলাধুলোর নিজের সব বিদ্যা তিনি জয়িতাকে দিয়েছেন। কিন্তু জয়িতা যখন রাইফেল হাতে নিলেন এবং রাইফেল স্যুটিং-এ ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করলেন তখন নরেনবাবু আর বেঁচে নেই।

লক্ষ্য সন্ধানে জয়িতার বাহাদুরী খুব। ঠিক ঠিক লক্ষ্যে গুলী ছুঁড়ে অফিসারদের পর্যন্ত তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। জয়িতার নতুন কৃতিত্বে সবাই খুশি। তাঁর সুযোগ আরো বেড়ে গেল। এবার ট্রেনিংয়ের স্থান হলো ফোর্ট উইলিয়ম। এন-সি-সি অফিসাররাই ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে

তাঁর প্রথম লক্ষ্য সন্ধানে সবাই তাঁর মধ্যে এক নতুন বিস্ময় খুঁজে পেলেন। তাঁরা উৎসাহ দিয়ে বললেন, হাত তোমার খুব ভাল। দৃষ্টিও স্থির। এমনিভাবে এগিয়ে যাও। সফল একদিন তোমার করায়ত্ত হবে।

এ হলো ১৯৬৫ সালের কথা। সে বছরই তাঁর হাতে ধরা রাইফেলে আরো অনেক অবাক করা কাহিনী লুকিয়ে ছিল। জাতীয় স্যুটিং-এর আসর বসেছে ভুবনেশ্বরে। অনেকদিনের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখে জয়িতা চললেন ভুবনেশ্বর। এন-সি-সি ক্যাডেট হিসেবেই তাঁর এই যোগদান। প্রথম জাতীয় স্যুটিং-এ যোগদানের আনন্দেও তিনি সঙ্কল্পে অটল।

ডাক এলো লক্ষ্য সন্ধানের। স্থির দৃষ্টিতে অকম্পিত হাতে গুলী ছুঁড়লেন জয়িতা। বিচারকরা খুশি। সকলের অভিনন্দন। ওপেন সাইটে জয়িতা জুনিয়র এন-সি-সি চ্যাম্পিয়ন। আবার ছেলে-মেয়েদের ওপেন জুনিয়র ইভেন্টে তৃতীয়। খুব খুশি হয়ে জয়িতা ভুবনেশ্বর থেকে ফিরলেন। তাঁর অনেকদিনের স্বপ্ন এবার সাফল্যের প্রথম ধাপে।

কিন্তু সাফল্যের সূচনায়ই ব্যাঘাত। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাপ। রাইফেল হাতে তোলার আর সুযোগ হয় না। জয়িতা নিজের মনেই গুমরে কাঁদে, সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে বসেছে। কি করবেন স্থির করতে পারেন না। আবার সংসারের চাপও অস্বীকার করতে পারেন না। এমনি করে বিরাট মানসিক অস্বস্তিতে কাটালো পুরো দুটি বছর। এরপর জয়িতা অনেকখানি রিলিভড হলেন। শুরু হয়ে গেল পুরোদমে প্র্যাকটিশ। স্বপ্ন দেখা এবার আরো দুরন্ত। সামনেই জাতীয় স্যুটিং-এর আসর।

মাদ্রাজ। জাতীয় স্যুটিং-এর আসর। জয়িতা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। দু'হাত ভর্তি সোনা, রূপো আর ব্রোঞ্জের পদক। এর বেশির ভাগ এসেছে এন-সি-সি'র লেডিজ ইভেন্টস থেকে। তা বলে তাঁকে খাটো করে দেখলে চলবে না। স্ট্যান্ডার্ড এবং ফ্রি রাইফেলের ওপেন ইভেন্ট-এও অনেক পুরস্কার কুড়িয়েছেন।

এবার খুশি আরো বেশি। জয়িতার আশা আরো বাড়ে। রাইফেল হাতে পেয়ে যদি স্বপ্ন দেখাই সার্থক না হলো তবে আর কি! তাই প্র্যাকটিসে জয়িতা নিরলস। সামনেই আসছে ভুপালে জাতীয় স্যুটিং। নিজেকে তৈরি করলেন তিনি। কিন্তু এক একটা সাফল্যের পরই এক একটা বাধা তার জন্য ও'ৎ পেতে রয়েছে। ভুবনেশ্বরের পর দু'বছর গেছে পড়াশোনা ও সংসারের চাপে। আবার মাদ্রাজের পর আর এক বিপদ।

আগেই বলেছি, নাচেও জয়িতা তালিম নিচ্ছিলেন। আর জয়িতার তালিম মানেই পুরো শিক্ষা। রাইফেল চালানোর সঙ্গে সঙ্গে নাচেও বেশ সুনাম হয়েছে। নানা জায়গা থেকে নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণের আহ্বান আসে। সেবার 'পদ্মিনী' নৃত্যনাট্যের মহড়া চলছিল। নামভূমিকায় জয়িতা। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে মহড়া দিচ্ছেন। দেহমনের একাগ্রতায় পদ্মিনীর ব্যঞ্জনা মূর্ত হয়ে উঠছিল। সময় এলো জহরব্রতের। সখীদের দিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে রাজপুত রমণীর মান বাঁচাতে হবে। ঝাঁপ দেবার মুহূর্তে পড়ে গেলেন। অনেকক্ষণ কেউ বুঝতে পারেননি। মহড়া যে এত সিরিয়স হয় তা ও'রা ভাবতে পারেননি। বুঝতে পেরে, সবাই তুললেন। বাঁ হাতে গুরুতর চোট। জয়িতা কান্নায় ভেঙে পড়েন আর কি। যত না হাতের ব্যথায় তারচেয়ে বেশি ভুপালের জাতীয় রাইফেল স্যুটিং-এর আসরের কথা ভেবে। ওখানে যে তাঁর অনেক আশা।

ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। আঘাত গুরুতর। ফ্রাকচার। প্লাস্টার করতে হবে। স্যুটিং এখন পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হবে। কোন উপায় নেই। জয়িতা দমে যায়। সামনের স্বপ্ন শিকেয় তোলার উপক্রম হয়। হাতে প্লাস্টার বেঁধে চললো দেড় মাস। ইতিমধ্যে রাইফেলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। একদম প্র্যাকটিশ করতে পারেননি কিন্তু দমলেন না।

যোগদান করলেন জাতীয় স্যুটিং-এ। ভেলকি খেলে গেল। আটটি সোনা আর তিনটি ব্রোঞ্জ পদকে জয়িতা হাসিতে ঝলমল। সঙ্গে জুটলো বিশেষজ্ঞদের সপ্রশংস মন্তব্য। ওরা জানালেন, জয়িতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরো উজ্জ্বল। ভাঙা হাত নিয়ে জয়িতার সাফল্য মনের দুর্দম বাসনারই জয়।

এবার আসা যাক জয়িতার নিজের কথায়। বি-এ পাশ করেছেন। ভিজিলেন্স কমিশনে চাকরিও করছেন। বিয়ের ব্যবস্থাও পাকা। হবু স্বামীও নামকরা রাইফেল চালক। আগামীবার জাতীয় স্যুটিং-এ উভয় এক সঙ্গেই যাবেন আশা করা যায়। জয়িতা আর তাঁর স্বামী রাইফেল স্যুটিং-এ যে নতুন কীর্তি রচনা করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

আরো একটা কথা জানাতে ভুলে গেছি। জয়িতা ১৯৬৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবসেরা রাইফেল চালক। এই সম্মান তিনি পেয়েছেন অনেককে পেছনে ফেলে। সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর এই সম্মানের স্বীকৃতি মিলবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত স্বর্ণপদকে। জয়িতাকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

সংবাদ

ছাত্রীর কৃতিত্ব

মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায় এ-বৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ইনি কুইন স্টেশনারী স্টোর্স প্রাঃ লিঃ-এর কর্মচারী খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা।

●

সম্প্রতি পূর্ব জার্মানীর মহিলা অ্যাথলীট কেরিন ব্যালজার ১৩ সেকেন্ডে ১০০ মিটার হার্ডল পার হয়ে বিশ্ব-রেকর্ড করেছেন। এই রেকর্ড হয়েছে লেপজিগ আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠানে।

কিরে, একা একা চল্‌লি কোথা? চোখে রহস্যের রেখা টেনে মীনা বলল। তোদের সংগ আর ভাল্লাগে না, একটু একা ঘুরে আসি। নতুন জায়গা, নতুন মুখ, অচেনা রাস্তা-ঘাট হারিয়ে যেতে কেমন ভাল লাগে—অন্যমনস্কের মত বন্দনা উত্তর দিল। রেবা খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে উঠল, শুনলি কথাটা মীনা, বলে আমাদের আর ভাল্লাগে না। কি ক'রবো সখি, তোমার যে যক্ষের মত অবস্থা হ'ল।

মীনা বলল, যক্ষের বদলে আমাদের বিরহিণী যক্ষ-পত্নী নির্বাসিত হয়েছেন। বন্দনা ওদের এই রসিকতার মধ্যে আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রল।

অতিথি

সমর দত্ত

ওরা তিন বান্ধবীতে বেড়াতে এসেছে দার্জিলিঙ-এ। তিনজনেই এক অফিসে কাজ করে। তিনজনেই অবিবাহিতা। এই মিল ওদের খুব। ছেলেরা দল বেঁধে বেড়াতে পারে, আর ওরা পারে না? ওরা যুক্তি ক'রে ছেলেদের দেখিয়ে দিল ওরাও ইচ্ছা ক'রলে কাশ্মীর-দার্জিলিং ঘুরে আসতে পারে। এখানে এসে এই হোটেলে ওরা দু-দিন হ'ল উঠেছে। স্টেশনের ধারেই হোটেল। নামটাও ভারি সুন্দর, হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। হ্যাঁ, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এখান থেকে দেখা যায়। দেখাই যায়, কিন্তু ওরা এখনও কেউ দেখেনি। এখনও হাতে দশদিন সময় আছে। মনে-প্রাণে চাইলে কাঞ্চনজঙ্ঘা কি কুয়াসা আর মেঘের আড়ালে থাকতে পারবে? একদিন-না-একদিন তার ঘোমটা খ'সে প'ড়বে—সেদিন ওরা তিনজোড়া চোখ দিয়ে বেশ ক'রে চোখের লেন্স দিয়ে দেখে নেবে।

বন্দনা কল-ঘরে কিন্তু দরজা বন্ধ ক'রে একটা গোপন চিন্তায় ডুবে রইল। ওর সংগে রবির হঠাৎ দেখা হ'য়ে গিয়েছিল কাল। রবি ওর পরিচিত বলা যায় একটু ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কলকাতায় সে ঘনিষ্ঠতা দানা বেঁধে ওঠার আগেই রবি কোথায়

হারিয়ে গেল। না-চিঠি, না-খবর। বন্দনার একটু কষ্ট হয়েছিল। একটা পরিচিত মুখ কিংবা একটু ভাললাগা সান্নিধ্যকে ভুলতে কার না কষ্ট হয়? সেই রবিকে ও-যে দার্জিলিঙ-এ এইভাবে দেখবে কল্পনা করতে পারে না। কাল ওরা সবাই মিলে যখন মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে হোটেলে ফিরছিল, তখন কি একটা কারণে বন্দনা একটু পিছিয়ে পড়েছিল। ওরা যখন প্ল্যাট-ফর্ম পার হ'য়ে হোটেলের গেটের কাছে বন্দনা তখন প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়ে হাঁটছিল। আর ঠিক সেই সময়—একটা মিষ্টি গলার মত ডাক শুনল, এই বন্দনা।

বন্দনা স'রে এসেছিল হুইলাবের দোকানের দিকে। তুমি মানে আপনি?

রবি হেসে উঠে ব'লেছিল, এক বছরেই আপনি, তারপর দেবতা—।

বন্দনা ব'লছিল, বান্ধবীরা হোটেলের গেটে অপেক্ষা করছে। তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছ?

রবি ব'লল, হ্যাঁ, কাজ নিয়ে বেড়াতে এসেছি। আমিও ব্যস্ত আছি—এই নাও ঠিকানা লেখা কার্ড আছে। বাসাবাড়ির ঠিকানা পিছনে লেখা আছে। কাল সকালে পারো তো এসো একবার।

বন্দনা কার্ডখানা পড়েই ব্যাগের গোপন কোণায় রেখে বলল, আমরা হোটেল কাঞ্চন-জঙ্ঘায় উঠেছি—থাকব আর দিন-দশেক। তুমি ভালো আছো তো?

হ্যাঁ, ভীষণ ভাল, জবাব দেয় রবি।

বন্দনা ব'লল, আর নয়, চলি। কাল চেষ্টা করব যেতে।

সেই রবির কাছে আজ সকালে যাবে। তাই একা একা বের হ'তে হবে ওকে। বান্ধবীদের কাছে একটা জবাব তাকে দিতে হবে—সেই জবাব দিতে গিয়ে ও আজে-বাজে অনেক কিছু ব'লে, একরকম ধরা পড়ার ভয়েই কলঘরে ঢুকেছে।

ঘরে এসে বন্দনা কাপড়-চোপড় ছেড়ে বাইরে যাওয়ার মত একটা কাপড় পড়ে নিল। চুল ভিজে আছে ব'লে, সামান্য একটু চিরুনি বুলিয়ে পিঠে ছড়িয়ে দিল। প্রসাধন কিছু করল না। কেবল চোখে সামান্য কাজল দিয়ে একটা টিপ প'রে নিল।

মীনা অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলল, সখি, কখন তুমি ফিরবে?

বন্দনা ছদ্ম গাম্ভীর্য এনে বলল, অত ঠাট্টা কেন? একটু একা বের হতে নেই?

রেবা বললে, না-না, যাবে বই-কি? এই বিশাল পর্বতমালার মধ্যে বন্দনা দেবী একটু ঘুরে বেড়াবেন—এতে বাধাটা কোথায়? তবে হারিয়ে যেও-না যেন, প্লীজ, তাহলে অফিসে গিয়ে মুখ দেখাতে পারবো না।

মীনা ব'লল, শুধু মুখ? ভটচাজকে জবাবদিহি করতে হবে না?

বন্দনা ব'লল, আমি কারও বিয়ে করা বউ নই যে সজলবাবুর কাছে তোমাদের জবাব দিতে হবে।

সজল ভটচাজকে নিয়ে ওরা এ-রকম তামাসা করে। অফিসে কাজ ক'রলে—এরকম দু-একজন একটু গায়ে প'ড়ে ভাব-ভালো-বাসার চেষ্টা করে। ওটুকু মানিয়ে দুরত্ব বজায় রাখতে হয়। জলে নামলে কুমীরের সংগে মিতালি পাতাতে হয়। বন্ধু বলে একসংগে সাত-পা হাঁটতেও হয়। বন্দনা ব্যাগটা বুকের উপর চেপে নিয়ে বের হ'য়ে পড়ল। ঠাণ্ডার আমেজ আছে—তবে তেমন শীত করছে না। একটু হাঁটলে শরীর গরম হয়ে যাবে—তাই ও গরমের কোন জামা নিল না।

বাইরে এসে স্টেশনের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে রবির দেওয়া কার্ডটা গোপন একটা চিঠির মত খুলে দেখল। ঠিকানাটা মুখস্থ ক'রে আবার ঢুকিয়ে রাখল। মোড়ের মাথায় একটা নেপালী পুলিশকে জিজ্ঞেস ক'রল ঠিকানাটা। না, সে কোনও উত্তর দিতে পারল না। আরও একটু এগিয়ে একটা খাবারের দোকানে জিজ্ঞেস ক'রল. তারা যে নিশানা দিল—তাতে সঠিক কিছু পাওয়া গেল না—তবে ওকে হেঁটে আরও কিছু নিচের দিকে নেমে যেতে হবে।

স্টেশন থেকে অনেকটা নিচে এসে ও এল্ জে স্যানেটোরিয়ামের পাশে এসে দাঁড়াল। আবার জিজ্ঞেস ক'রল এবং এবার ও নিশানাটা বুঝতে পারল, চাই কি বাড়ীটাও দেখতে পেল। বাড়ীটা দেখছে কিন্তু যাওয়ার পথটা ঠিক আবিষ্কার করতে পারল না। ওর নীচ দিয়ে তখন মেঘ ভেসে আসছে, ছেঁড়া ছেঁড়া নিঃসঙ্গ মেঘের টুকরো। বড় ভালো লাগল। শেষে যখন 'মানসী কটেজে'র সামনে এল—তখন সত্যি বলতে কি ওর বুকটা দুরু-দুরু করে উঠল।

একটা ছেলেকে দেখতে পেয়ে বন্দনা জিজ্ঞেস ক'রল, রবি রায় ব'লে এক ভদ্রলোক এখানে কোথায় থাকেন ব'লতে পারো?

ছেলেটি বলল, কোথায়ও কাজ করেন ভদ্রলোক?

বন্দনা ব'লল, হ্যাঁ, কাজ করেন, তবে কোথায় ঠিক মনে আসছে না।

ছেলেটি ব'লল, ঠিক আছে, আপনি এই সিঁড়ি দিয়ে নেমে সামনের বাড়ীটার ঐ ফুল বাগানের গায়ের ঘরটায় খোঁজ নিন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই, রবি বের হয়ে এল ঘর থেকে। পরনে ওর স্লিপিং ট্রাউজার। গায়ে সেই রঙেরই একটা ফুল সার্ট। বন্দনা তাড়াতাড়ি ওর ঘরে ঢুকে পড়ল। ফুলের বাগানটা জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাঁচের জানালা। ঘরের মধ্যে একটা সিঙ্গল বেডে'র খাট। তার উপর রঙিন একটা বেড্‌শীট পাতা। দেওয়ালে ছবি টাঙানো। বেশ গোছালো। ওদিকে চেয়ার-টেবিল। টেবিলের উপর ফুল রয়েছে ফুলদানিতে। মরশুমী ফুল। ও-ফুলের নাম জানে না বন্দনা। বন্দনা খুঁটিয়ে ঘরটা দেখতে লাগল।

রবি ব'লল, কই, বোসো?

সলজ্জ হেসে বন্দনা ওর বিছানার উপরে ব'সে ব্যাগটা রেখে বলল, সত্যি, তোমার সংগে যে দেখা হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।

রবি ব'লল, তার মানে দেখা হয়ে যাওয়াটা খুব একটা সুখের হয়নি?

বন্দনা ব'লল, তা কেন, বরং ভালই লাগল। বিদেশে বেড়াতে এসে চেনা পরি-চিতের সংগে দেখা হওয়াটা লাভের।

রবি ব'লল, তুমি একা এলে যে? বান্ধবীদের নিয়ে এলে না কেন?

বন্দনা ব'লল, আহা, ওদের আনলে অনেক জবাব দিতে হবে। তার চেয়ে একা আসাই ভাল। একটু থেমে ব'লল, কেন ওদের বুঝি তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে?

রবি হেসে উঠে ব'লল, তা আর কলবে না। তোমার বান্ধবী তারা নিশ্চয়ই আমার বান্ধবী হওয়ার দাবী রাখে। সে যাক্ গে, বিয়ে-থা করোনি কেন?

বন্দনা একটু থেমে ব'লল, সে-কথা তো তোমাকেও বলা যায়।

রবি ব'লল, আমায় এখানে কে বিয়ে দেবে, বলো? বাড়ি থেকে একরকম রাগা-রাগি ক'রে সেই যে চ'লে এসেছি—ফের যাইনি। চিঠি আসে আমিও চিঠি দিই—নিজে যাইনি আর। তবে টাকা পাঠিয়ে কর্তব্যটুকু ক'রে যাই, এই মাত্র।

বন্দনা উদাস সুরে বলে, রাগ হ'য়েছে? কার উপর রাগ? একটু থেমে ব'লল, জানো এক সময় আমিও খুব রাগ করতাম। এই সংসারে, সবচেয়ে কাছের যারা, বাবা-মা, ভাই-বোন, তাদের ভালো বাসতাম। তারপর দেখলাম এদের সংগে আমার একটা মাত্রই সম্পর্ক। আমি কতটুকু তাদের প্রয়োজনে লাগছি। যতদিন তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারবো—ততদিন আমি তাদের স্নেহ-ভালোবাসার অধিকারী। তারপর সব শূন্য।

ঠাট্টার সুরে রবি বলল, বয়সের তুলনায় কথাগুলো বড্ড শোনাচ্ছে।

হ্যাঁ, তাই শোনায়। কারণ বয়সের তুলনায় সংসারের ভারটা যখন বড় বেশী ব'লে মনে হয়—তখন অভিজ্ঞতাটা তো আর বয়সের মাপা-রাস্তায় আসে না।

রবি ব'লল, হুঁ-উ—কোথায় যেন একটা খুব হতাশা বাসা বেঁধেছে তোমার মনে। কোথাও ব্যর্থ হয়েছ নাকি?

বন্দনা হাসল সামান্য, বুকের কাপড়টা গুছিয়ে রেখে বলল—আমাদের মত অফিসে কাজ করা মেয়েদের আবার ব্যর্থতা। কেউ মেয়ে দেখতে এলে যখন শোনে অফিসে কাজ করি—তখনই কেমন নাক সিঁটকোয়। যেন অফিসে যে-সব মেয়ে কাজ করে—

তারা ঘর-সংসার গ'ড়তে জানে না। তাই বলছিলাম।

রবি ব'লল, এই দেখ, কথায় কথায় তোমায় কেমন আবার তোমার কয়েকদিনের জন্যে ফেলে আসা পুরোনো চিন্তায় ডুবিয়ে দিয়েছি। বোসো একটু, তোমায় চা খাওয়াই।

বন্দনা ব'লল, সেকি, তুমি চা করে খাওয়াবে নাকি? দাও, আমি ক'রে দিচ্ছি তোমায়।

রবি 'না' বলল না। বন্দনা ওকে অনেকদিন চা-ক'রে খাইয়েছিল। শুধু তাই নয়, বন্দনা খাওয়াতে ভালোবাসে। ওর খাবার-দাবার দেওয়ার কেমন যেন একটা মিষ্টি স্নেহ ঝরে। রবি বসে রইল। হিটারে জল গরম হল। বন্দনা চায়ের কাপ আর অন্যান্য সরঞ্জাম হাতের কাছে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রবির ঘরে ওর পরিচিত মেয়ে এই প্রথম এল। রবির ভাল লাগছে। এই ভাল লাগার সঙ্গে একটা অস্পষ্ট বেদনা অনুভব ক'রল। এক সময় ব'লল, বন্দনা তুমি যে ক'দিন আছ, সকালের দিকে এসে মাঝে মাঝে চা ক'রে দিয়ে যেও।

বন্দনা চোখ পাকিয়ে ব'লল, ইস্, কি আনন্দ! আমি আসব ওকে চা করে দিয়ে যেতে। কেন, একটা বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে এসো না। কেমন আদর-যত্ন ক'রবে—। কথাগুলো ব'লতে ব'লতে কেটলি থেকে চা ঢালতে লাগল বন্দনা। রবি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ওর কথা মোটেই শুনছিল না। রবি ওর হাতের দিকে দেখছিল ওর বসার ভঙ্গি দেখছিল। এক সময় বন্দনা রবির দিকে চেয়ে কাপড়টা ঠিক ক'রে টেনে কোমরের একদিকে গুঁজে দিল। রবি বুঝতে পেরে চোখ ফিরিয়ে নিল। চায়ের সংগে বিস্কুট দিয়ে ওরা দুজনে মুখোমুখি ব'সে চা খেল।

রবি ব'লল, চল বন্দনা একদিন বেড়িয়ে আসি।

কোথায়? বন্দনা প্রশ্ন করে—

এই কালিম্পং না-হয় গ্যাংটক—যেখানে খুশি।

বড় আনন্দ, নয়? আমার বান্ধবীরা আছে না সঙ্গে?

তাদেরও নিয়ে চল?

আহা, কি কথাটাই না ব'ললে। আমি তোমার সঙ্গে হাসবো গল্প ক'রব—পরিচিতের মত ব্যবহার ক'রব—আর ও বেচারীরা আমাদের দিকে শুধু চেয়ে থাকবে, তা-ও আবার হয় নাকি?

হয় না, নয়? কথাটা রবি যেন আপন মনেই ব'লল।

বন্দনা আবার ব'লল, শীতের সময় তুমি এখানে থাকো?

কাজ করি শুনছো—কাজ ফেলে যাবো কি ক'রে? তবে বেশ কষ্ট হয় থাকতে।

বন্দনা পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বলল—এবার তুমি অফিস যাবে নিশ্চয়ই।

রবি ব'লল, হ্যাঁ, তবে আজ একটু দেরী ক'রে যাব বলে এসেছি।

বন্দনা আবার চুপ করে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ও কেবল ঘরের পাশের বাগানটা যতটা দেখা যাচ্ছিল, সেই দিকে চেয়ে রইল। কথায় কথায় রবি কখন বন্দনার ব্যাগটা হাতে নিয়েছে। তারপর চেন খোলার শব্দ হ'তেই বন্দনা মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল। তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে ব'লল, মেয়েদের ব্যাগের ভিতর খুলে দেখার অভ্যাসটা এখনও ছাড়োনি দেখছি?

অভ্যাস কি সহজে যায়—।

না, এটা ভাল নয়। মেয়েদের ব্যাগের মধ্যে উঁকি মারা কেন? আমরা তো কই তোমাদের পকেটে হাত দিয়ে দেখতে যাই নি?

রবি ব'লল, পকেটে হাত দিতে গেলে আমাদের বুকে হাত দিতে হবে—শরীর স্পর্শ করতে হবে। তোমাদের ব্যাগে হাত দিলে তো আর শরীরে হাত দেওয়া হ'চ্ছে না?

বন্দনা ব'লল, তা নাই বা হ'ল। মেয়েদের ব্যাগের মধ্যে অনেকরকম জিনিস থাকতে পারে, যা ছেলেদের দেখা মোটেই সমীচীন নয়।

রবি ব'লল, রাগ ক'রলে নাকি?

না, করিনি এখনও, এবার করবো, ব'লে চোখ ঘুরিয়ে দেখল বন্দনা।

মেয়েদের ব্যাগের ভিতরটা অনেক সময় মেয়েদের মনকে জানতে সাহায্য করে—রবি উদাস স্বরে কথাটা ব'লল।

বন্দনা ব'লল, ইস্ একেবারে ফ্রয়েড্ এলেন। তারপর ঘড়িটা দেখে বলল, আমি কিন্তু এবার উঠে পড়বো—ওদিকে একটা মিথ্যে ব'লে এসেছি।

রবি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, সত্যিই চলে যাবে?

কেন, থেকে গেলে খুব মজা হ'ত না? যদি বলি হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাহ'লে কি থেকেই যেতে—?

না, কারণ ও-মজা মনে রাখতে হয়—বাইরে দেখাতে গেলেই সংঘর্ষ বাধে।

রবি বলল, তুমি চুল বাঁধো নি?

না, যখন বের হই হোটেল থেকে তখন ভিজে ছিলো কিনা? তারপর এদিকে-ওদিকে কি যেন খুঁজল। শেষে জিজ্ঞেস ক'রল—আয়না-চিরুনি আছে?

আছে, তবে চিরুনিটা মেয়েদের হবে না, তাতে চ'লবে?

বন্দনা ব'লল, খুব চলবে। চুলটায় একটা বিনুনি দিয়ে নেব। এই বলে বন্দনা উঠে দাঁড়াল। ব'সে থাকার জন্যে ওর বুকের কাপড় যেমন কিছু শিথিল হয়েছিল, তেমন পায়ের কাপড় কিছু উঠে গিয়েছিল।

তাই দাঁড়িয়ে বুকের কাপড় ঠিক করে এক হাত দিয়ে নিচের কাপড় টেনে টেনে নামিয়ে দিল। রবি বন্দনার সেই পুরোনো দিনের ভাব-ভঙ্গীগুলোকে আস্তে আস্তে মনে করার চেষ্টা ক'রছিল। আয়নাটা দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল—তার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনি বুলিয়ে চুলের গোছাগুলোকে আরও মসৃণ আর গুছিয়ে তুলল। রবি বলল, বন্দনা, তোমার চুলগুলি কিন্তু ভারী সুন্দর।

এ-ই চুল সুন্দর ব'লতে নেই, তাহলে উঠে যায়—বন্দনা ধমকে ওঠে।

রবি ব'লল, ঠিক আছে আর ব'লব না।

ঘরের দরজার ভারি রঙিন পর্দাটা একবার দুলে উঠল। রবি সেদিকে চেয়ে দেখল কেউ ঢুকছে নাকি। তারপর উঠে দাঁড়াল। বন্দনা ওর দাঁড়ানোটা দেখতে পায়নি। ধীরে ধীরে বন্দনার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রবি আস্তে বলল,—এই! আবার কবে আসবে?

বন্দনা একটু চমকে উঠেছিল। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ব'লল, দেখি কবে আসতে পারি।

রবি ব'লল, এক কাজ করো—রবিবার দিন এসো। আমি ফ্রী থাকবো ঐদিন।

বন্দনা ব'লল, ঠিক কথা দিতে পারি না। কারণ, ওদের কাছে মিথ্যে ব'লে বের হ'তে হবে তো। দেখি—।

বান্ধবীদের কাছে আমার পরিচয়টা দিতে পারতে—

বন্দনা ব'লল, না, আমার ভীষণ লজ্জা করে। ততক্ষণে চুলের একটা মোটা বেণী হয়ে গেছে বন্দনার। ফিরে বেণীটা হাত দিয়ে পিঠের উপর ছুঁড়ে দিয়ে রবির মুখোমুখি দাঁড়াল। অপরিচিত জায়গা—বা একান্ত একটা ঘর, ভালো লাগা একটি ছেলের এত সামনে এর আগে সে কখনও মুখোমুখি দাঁড়ায়নি। রবির পাশে অনেক জায়গা থাকা সত্ত্বেও বন্দনা ব'লল—সরো, আমায় হোটেলে ফিরতে হবে।

রবি সরে একেবারে দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। ঐভাবে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যটা বন্দনা ঠিক বুঝতে পারল না। তারপর যখন দরজার কাছে এসেছে তখন দেখল, রবি পর্দাটা হাত দিয়ে ধরে ওর বেরিয়ে যাওয়াটা সহজ ক'রে দিল।

(দুই)

শনিবার থেকেই বন্দনা একটু চঞ্চল হ'ল। মাঝে মাঝে উদাস ভাব। কখনও গুন্-গুন্ করে গান গাইল। একসময় মীনা ব'লল, সখি, তুমি কি চিঠি পেয়েছ?

বন্দনা অবাক হয়—রবি কি তাকে এই হোটেলে চিঠি দিয়েছে নাকি? ব'লল, কই, না-তো?

শনিবার বিকেলে ওরা ম্যালের দিকে বেড়াতে গেল। ওখান থেকে মহাকালের

মন্দির দেখতে গিয়ে—বৃষ্টি নামল। বোকার মত ছাতা না নিয়ে বের হয়েছিল। একরকম ভিজেই সবাই হোটেলে ফিরে এল।

ভেজা কাপড়-জামা প'রে রাস্তা দিয়ে আসতে বেশ লজ্জা করছিল। বন্দনা ওর চাদরটা বুকের ওপর দিয়েছিল বলে রক্ষে হ'য়ে গেছে। তা না হ'লে ওর যা অবস্থা হয়েছিল সে-কথা বলার নয়। ওরা ফেরার পথে পোস্ট-অফিসের পাশ দিয়েই এল। বন্দনা জানে রবি এখানেই কোথায় কাজ করে। রবিবার-বন্দনা দুপুরে একবার বের হবে ওদের জানিয়ে দিল। কারণটা আর কিছু নয়, বাড়ীর জন্যে দু-একটা জিনিস কিনতে হবে ঘুরে ঘুরে। আর দুপুরেই বৃষ্টি নামল। বন্দনা প্রথমটায় ভাবল, বৃষ্টি বেশীক্ষণ স্থায়ী হবে না। কিন্তু তার ধারণা ঠিক নয়। বৃষ্টি চ'লল বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে। মাঝে একবার যদিও বা থামল—আবার কিছুক্ষণ পরে নামল। বন্দনা বিরক্ত হ'ল। শেষে রাগ ক'রে বিছানায় শুয়ে প'ড়ল। কাল ভিজে মীনা আর রেবা দুজনেই রেগে গেছে খুব। রেবা ব'লছিল তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবো।

এখন আবার মীনাও তার সুরে সুর মিলিয়েছে। বিছানায় শুয়ে বন্দনার অসহ্য লাগল। ঘুম আসতে চায় না চোখে। স্পষ্ট দেখতে পেল, রবি ওর জন্যে পর্দাটা সরিয়ে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। না, বন্দনাকে যেতেই হবে। কবে ব'লতে ক'বে ওরা যাওয়ার টিকিট কেটে ব'সে থাকবে—তখন তো আর 'না' ব'ললে চলবে না।

দুপুর গড়িয়ে গেছে। বন্দনা ছাতাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আর কিছুদূরে আসতেই বৃষ্টি থামল। মেঘ পরিষ্কার হয়ে গেল। বন্দনার মনে হ'ল ভারি মজার জায়গা তো? ও যখন রবির ঘরের পর্দা ঠেলে ঢুকল—তখন দেখল ও ঘুমুচ্ছে। রবি যে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল—এটা বেশ বোঝা যায়। তা না হ'লে দরজা খোলা রেখে এইভাবে কেউ ঘুমায় না।

বন্দনা ওর ঘুম ভাঙ্গালো না। হীটারের প্লাগ লাগিয়ে জল চড়িয়ে দিল। অগোছালো ঘরটা সন্তর্পণে গোছালো। ফুলদানির ফুলগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ে গন্ধ নিয়ে দেখল—কোন গন্ধই নেই। বন্দনার ভাল লাগছিল। ভাল লাগছিল এই ভেবে যে এখনই রবিকে জাগিয়ে দিয়ে সে গল্প করতে পারে। কিংবা এক-কাপ চা দিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে চমকিয়ে দিতে পারে। আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ও মুখটা পরিষ্কার ক'রে নিল। তারপর চা তৈরী ক'রে টেবিলটার উপর সাজিয়ে রবির হাতটা ধ'রে একটু টান দিল। রবির ঘুম ভেঙ্গে গেল। বন্দনাকে দেখে একটু হাসল—আবার চোখটা এমনভাবে বোজালো—ভাবখানা যেন আমি জানি তুমি ঠিক আসবে। তারপর চোখ বুজিয়ে ব'লল, এই বুঝি সময় হ'ল?

বন্দনা ব'লল, কি করবো তোমাদের দেশে এমন পাগলা বৃষ্টি নামে—সব কাজ পণ্ড ক'রে দেয়।

খুব বৃষ্টি হচ্ছিল?

হ'ল না? তুমি কখন থেকে ঘুমোচ্ছ বলো তো? নাও ওঠো চা ক'রেছি—।

রবি বিছানা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল, চা ক'রেছো? সত্যি বন্দনা তোমায় কি বলে যে ধন্যবাদ দেব। আমি চোখ বুজিয়েই ধবল ভাবছিলাম, যদি একটু চা করে খাওয়াও তাহলে বড় ভাল হয়।

বন্দনা বলল, থাক ঢের হয়েছে। জানো আমরা বোধহয় তাড়াতাড়ি কলকাতা ফিরবো।

রবি ব'লল, কেন, ভাল লাগছে না, তোমাদের?

আমাদের ব'লতে—আমার অন্য দু' বান্ধবীর ভাল লাগছে না। আবার ফরসা আকাশটা মেঘে ময়লা হ'ল। ঘর অন্ধকার হ'ল। রবি ব'লল, আলোটা জ্বালাবো নাকি? বন্দনা ব'লল, থাক, দরকার হবে না। তুমি কেবল সার্সির পর্দাগুলো একটু সরিয়ে দাও।

রবি ব'লল, আজ ফেরার তাড়া নেই ত'?

বন্দনা ব'লল, সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে। না হ'লে ওরা কি ভাববে।

ক'লকাতাতেও তোমার মুখে এই কথাই বার-বার শুনেছি। 'ওরা কি ভাববে'—'আর 'ওরা দেখে ফেলবে' কথাগুলো আমার ভাল লাগে না মোটে—অনুযোগ করে রবি।

বন্দনা বলে, আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করে। লোকে একটা কথা বলবে—কি আমায় নিয়ে হাসাহাসি করবে, সেটায় আমার ভারি লজ্জা। কি জানি কেন ছেলেবেলা থেকেই আমার এমন একটা সংকোচ আছে।

রবি আর কথা বাড়ালো না। সেলফ্ থেকে কি একটা বোতল পেড়ে গেলাসে ঢেলে খেল। তার মিষ্টি গন্ধ এসে নাকে লাগল বন্দনার। ব'লল, কি আছে তোমার বোতলে?

রবি নিস্পৃহ কণ্ঠে বোতলটা আলমারির মধ্যে ঢুকিয়ে ব'লল, ব্র্যান্ডি।

বন্দনা ব'লল, তুমি বুঝি এসব খেতে খুব অভ্যস্ত হয়েছ?

আগে অভ্যাসটা ছিল না। এখানে এসে একরকম প্রয়োজনেই ধরতে হয়েছে। তাছাড়া শরীরও ভাল থাকে।

বন্দনা ব'লল—তোমার মুখটা ঐ জন্যে লালচে দেখাচ্ছিল।

না, সেজন্যে নয়। এখানকার আব-হাওয়াই এমন—যারাই এসে এখানে থাকবে, তাদের মুখে লাল-আভা লাগবে। হাতের বা পায়ের পাতার রঙ লালচে হ'য়ে যাবে।

বন্দনা অবাক হয়ে ব'লল—সত্যি?

থেকেই দেখ না। রবি উত্তর দেয়।

বন্দনা ব'লল, তুমি এই যে ব্র্যান্ডি খেলে তোমার নেশা হয় না?

বেশী খেলে নেশা হবে। পরিমিত খেলে নেশার বদলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

কি জানি আমার কিন্তু দেখলেই কেমন মাথা ঘোরে—আপন মনেই বন্দনা বলে।

রবি বলে—একটু খাবে নাকি? দেখবে শরীর কেমন ঝরঝরে হোয়ে গেছে।

বন্দনা হাসতে হাসতে ঘাড় নাড়ে—অর্থাৎ ও খাবে না—রবি যতই অনুরোধ করুক।

বৃষ্টি এল না বটে—তবে একরাশি মেঘ এসে ঘিরে ধরল দার্জিলিং পাহাড়টাকে। বন্দনা সার্সির ভিতর দিয়ে অনেক দূর দেখার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হ'ল। শেষে ব'লল—জানো, এখনও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাইনি।

রবি ব'লল, টাইগার হিল গিয়েছিলে নাকি?

যাইনি এখনও। তবে ক'লকাতা যাওয়ার আগে ওটা দেখে নেব এমন একটা ইচ্ছে আছে।

রবি অনেকক্ষণ পরে বন্দনার শরীরের দিকে চেয়ে দেখল। আজ ওর শাড়ি জামা সবের মধ্যে কেমন একটা মিল আছে। গায়ের জামাটা শরীরের সঙ্গে টান-টান ক'রে ব'সে আছে। শাড়ীটা নতুন ব'লে মনে হচ্ছে। হাতটা সুডোল বলে জামাটা ওর শরীরের সঙ্গে ভাল মানিয়েছে। চোখ দুটো ওর ছোট হ'লে কি হবে—মুখের সংগে মানান-সই বলা যায়। কাজলের ঈষৎ টানে সেটাকেও খুব একটা ছোট ব'লে চোখে লাগে না। বন্দনা চিরকালই মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। শরীর সম্পর্কে বড় সতর্ক। রবি কোন জায়গায় স্থির হয়ে বেশীক্ষণ বসতে পারছে না। কখন ফুলদানিটা একজায়গা থেকে সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখছে, কখনও চিরুনিটা অকারণ চুলে লাগিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াচ্ছে। রবি যেন কি একটা কথা ব'লতে চায়। কিংবা রবি কি-চায় সেটা ঠিক স্পষ্ট নয়। বন্দনা রবির এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেছে। এই ঘর, এই একাকীত্ব, এই মেঘলা আকাশ বন্দনার মনের উপর অকারণ একটা ভয়-মিশ্রিত ভালোলাগা ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বন্দনা সহজ হওয়ার জন্যে ব'লল, এই, তুমি অত ছটফট ক'রছো কেন, বোসো—তোমার কথা কিছু বলো।

রবি বললে, আমার কথা খুব সামান্য। দেখছো তো, একটা ঘর আর আমায় নিয়ে একটা রাজত্ব। সেই রাজ্যে তুমি দু'দিনের অতিথি হ'য়ে এসেছ। তারপর চ'লে যাবে। রাজ্য আর রাজত্ব মিলিয়ে গিয়ে একটা ছবি টাঙানো থাকবে কেবল মনের দেওয়ালে। হয়ত ক'লকাতা গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেলে ব'লবে—বেচারী, বড় একা-একা আছে।

বন্দনা হেসে উঠেছে। হঠাৎ উঠে পড়ে সার্সির সামনে গিয়ে ব'লল—এই দেখো, কি সুন্দর একটা প্রজাপতি।

রবি ব'লল—সত্যি সুন্দর। অবশ্য তোমার চেয়ে নয়।

বন্দনা মুখটা তুলে ওর দিকে চেয়ে ব'লল, নয় কেন? আমি কি ওর মত হলুদ-রঙের নাকি? আমার রং বেশ ময়লা, জানো?

না, সেজন্যে বলছি না। বলছি, প্রজাপতিটা বন্ধ সার্সির বাইরের দিকে আর তুমি ভিতরের দিকে, মানে আমার খুব কাছে—।

বন্দনা একটু সরে গেল। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বন্দনা হাত দিয়ে টেবিলের কাগজটা ঘষতে ঘষতে আরও কথা খুঁজতে লাগল—কারণ এই ঘরের নীরবতা সে মোটেই পছন্দ করছে না।

ঘরটা সত্যিই অন্ধকার হয়ে গেছে। সূর্য হয়ত ডুবে গেছে। ঘড়িতে দেখল পাঁচটা। রবি ঘরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। মনের অন্ধকার বা ধোঁয়াটে ভাবটা অনেকটা যেন সরে গেল। বন্দনা আবার বিছানায় গিয়ে সহজ হ'য়ে বসল।

রবিকে ব'লল, নাও কাপড়-জামা পরে আমায় একটু এগিয়ে দিয়ে আসবে।

রবি ব'লল, আজ তুমি না ব'ললেও দিয়ে আসতাম। তবে আর একটু বোসো কিছু খাবার আনাই। শুধু চা খেয়ে খেয়ে চ'লে যাবে—মনের কাছে জবাব দিতে হবে না?

রবি বাইরে গেল। মিনিট দশেক পরে খাবার নিয়ে এসে দেখল ওর বিছানায় উপুড় হ'য়ে শুয়ে বন্দনা একটা বই পড়ছে। রবি ওর মাথার দিকে ব'সল। বন্দনা চিবুকটা নামিয়ে বালিশে রাখল। কারণটা রবির কাছে স্পষ্ট। শরীরের সতর্কতা। বইটা হাত থেকে নিতে যেতে বন্দনার আঙুলের উপর একটু চাপ দিল। বন্দনা কিছু ব'লল না। রবি ব'লল—এবার ওঠো—খাবারগুলো প্লেটে নিয়ে খাও।

তা নিচ্ছি ব'লে—বন্দনা ঐ অবস্থায় উঠতে গেল। হয়ত বন্দনা অসতর্ক, বন্দনার ওঠার ভঙ্গির দিকে চাইতে গিয়ে রবি ওর বুকের জামার ঝুলে পড়া অংশটা দিয়ে রহস্যময় একটা অন্ধকারকে দেখল। রবির সমস্ত শরীরটা কেমন ঝিম-ঝিম ক'রে উঠল। শুধু বন্দনা নয়, মেয়েদের অনাবৃত বুক দেখলে ও যেন কেমন হ'য়ে যায়। শুয়ে থাকার জন্যেই বোধহয় বন্দনার কাপড় কিছুটা আলগা হ'য়ে গেছে। পিছন ফিরে ও গুছিয়ে নিল নিজেকে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ। আর এক প্রস্থ চা ক'রতে গিয়ে বৃষ্টি নামল। রুপোলি আকাশটায় মুহূর্তে কালি ঢেলে দিলো যেন কে। অন্ধকার হ'য়ে গেল বাইরেটা। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের ছোঁয়া লাগল।

রবি খুব খুশি মনে ব'লল,—আজ আর যাওয়া হচ্ছে না।

বন্দনা ব'লল, তোমার এখানে রাত্রি কাটাতে হবে নাকি?

রবি কাছে এসে দাঁড়াল। বন্দনার কেমন অস্বস্তি লাগল। তাড়াতাড়ি দুটো কাপে চা ঢেলে বন্দনা হাতে পেয়ালা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রবি বিছানায় গিয়ে ব'সল। চায়ে চুমুক দিয়ে রবি গম্ভীর হ'য়ে গেল। বন্দনা হাসছে। তারপর নিজেও চায়ে চুমুক দিয়ে মুখটা বিকৃত করে ব'লল—তোমার চায়ে চিনি হয়েছে?

রবি গম্ভীর হ'য়ে বলল, আদৌ হয়নি।

বলোনি কেন? বেশ যা-হোক। বন্দনা উঠে গেল চিনি আনতে। বন্দনা হোস্টেলে ফেরার জন্যে ব্যস্ত হ'ল খুব। রবি বলল—আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো—এ-বৃষ্টি থেমে যাবে। বন্দনা সে-কথা শুনতে রাজি নয়। হোটেল থেকে সে বের হয়েছে টুকি-টাকি জিনিস কিনবে ব'লে। জিনিসপত্র কিছুই কেনা হয়নি। শূন্য হাতে ফেরৎ গেলে ঠিক ওরা সন্দেহ করবে। তাই ওকে যে-কোন প্রকারে যা-হোক কিছু জিনিস কিনে ঢুকতে হবে।

রবি বলল, চলো তাহলে তোমাকে নিয়ে একটু বের হই। তুমি এক কাজ কর—একটা ওয়াটার প্রুফ আছে, ওটা পর—আমি তোমার ছাতাটা মাথায় দিয়ে যাই।

বন্দনা ব'লল, তা কেন হবে। তুমি ওয়াটার প্রুফ নাও—আমি ছাতা নিচ্ছি।

তোমাদের ছাতায় মাথা আর খোঁপা ছাড়া সব ভিজে যাবে।

বন্দনা বলল—তোমারও তো সব ভিজে যাবে। না, তা হয় না। তুমি ভিজবে আর আমিই ছেলেদের ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়ে রাস্তা হাঁটি।

রবি ব'লল—সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তোমায় কে আর চেনে বলো এখানে? কাল ভিজেছো একবার যেন বলছিলে আজ আবার ভিজে যাবে—যদি জ্বর-টর হয়?

ভয় নেই, মেয়েরা অত সহজে মরে না—বন্দনা ঠাট্টা করল।

মেয়েরা মরলে কিন্তু পৃথিবীর অনেক ক্ষতি—রবি জবাব দিল।

ইস্, পৃথিবীর ক্ষতি না হাতি। তোমরা বরং বাঁচো—তোমাদের চিনি না?

রবি বলল, আমার কষ্ট সবচেয়ে বেশী। এক কাপ চা যদিও বা জুটছিল, তাও বন্ধ হ'য়ে যাবে।

সে-তো মরার আগেই বন্ধ হয়ে যাবে। থাক, বেঁচে থেকে আর মৃত্যু-প্রসঙ্গ ভাল লাগছে না। তারচেয়ে বেরিয়ে পড়ি। দোকানে যেতে হবে। রবি ওর প্যান্ট আর সার্ট চাপিয়ে কোটটাও পড়ল। কারণ, জলের ছিটে কোটের উপর দিয়ে যাবে—শরীরে স্পর্শ ক'রতে পারবে না।

বন্দনাকে ও নিজে হাতে ওয়াটার প্রুফটা পরিয়ে দিয়ে বোতাম এঁটে দিল। বুকের বোতামটা লাগাতে গিয়ে কতবার হাতটা ওর শরীর স্পর্শ করার চেষ্টা করল—কিন্তু পারল না। কিংবা হয়ত ও সত্যিই স্পর্শ করেছে—উত্তেজনার মুহূর্তে সে ধারণাটুকু হয়ত তার লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। রবি আগের মতই তার শরীর থেকে যেন কিছু চাইছে, বন্দনা বুঝতে পারছে কিন্তু কিছুই করার নেই তার। সে চিরকালই এই রকম—কোথায়ও সে নিজেকে সর্বাংশে সমর্পণ করতে পারে না। তার সংযত চলা-ফেরা, কথাবার্তার শক্ত রাজপথ থেকে সে কোনোদিন মুহূর্তের জন্যে ছিটকে যেতে পারেনি। তাই রবি অনেকদিন ঘন হ'য়ে এসেও ওর শরীরকে হাত দিয়ে ছুঁতে পারেনি। বন্দনা কিছুই চায় না ব'ললে ভুল হবে। সে যখন একান্ত অসহায়ের মত সমস্ত শরীর থেকে কান্না শুনতে পায় তখনও কেউ তাকে স্পর্শ করে মুহূর্তের জন্যেও দুর্নাম কুড়োতে রাজি হয়নি। তাই ও-কান্না তার রক্তে মিশে গেছে—ও-চাওয়া তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ধুয়ে গেছে।

বাইরের পর্দাটা ঠেলে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির বেগটা অনুভব করল বন্দনা। তারপর ভিতরে এসে বলল বেশ ঠাণ্ডা বাইরে।

রবি রেন-শু পরে উঠে দাঁড়াল। ব'লল—তুমি এক ডোজ ব্রাণ্ডি খেয়ে নাও।

বন্দনা নিষেধ ক'রল—না, না, যদি নেশা হয়?

ধোৎ, একটুখানি। আমিও তো খেয়েছি—আমার মধ্যে কিছু দেখতে পেলে নাকি?

বন্দনা চোখ পাকিয়ে ঠোঁট টিপে বলল—হুঁ, তোমার বেশ নেশা হ'য়েছে।

তৎক্ষণে আলমারি থেকে বোতলটা টেনে নিয়ে গেলাসে ঢালল কিছুটা রবি। বন্দনা ব'লল, আবার খাচ্ছো?

ভিজতে হয় যদি, ঠান্ডা লাগবে না-খেলে—তাই একটু—রবি খেয়ে গেলাসটা ধুয়ে আবার একটু ঢালছে দেখে বন্দনা পিছিয়ে গেল।

রবি সামান্য একটু ঢেলে ওর দিকে এগিয়ে এল। তুমি ও-রকম করছ কেন? তোমার ক্ষতি হবে মনে ক'রলে—তোমাকে নিশ্চয়ই খাওয়াতাম না। এইটুকু খেয়ে নাও, দেখবে বেশ চাঙ্গা হ'য়ে গেছ। বৃষ্টিতে ভিজলেও কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

লাল গোলাপের পাপড়ির মত রঙ। দেখলেই অবশ্য খেতে ইচ্ছে করে। বন্দনা আর নিষেধ করল না। কারণ রবি বেজায় জেদি। তাছাড়া এইটুকু খেলে কি-ই বা হবে। এই ভেবে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিল। ব'লল, মুখে গন্ধ ছাড়বে না? রবি ঘাড় নেড়ে না বললে।

বন্দনা প্রথমবার চুমুক দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটা রবির দিকে বাড়িয়ে দিল। রবি বলল, প্রথমবারে একটু গরম ভাব লাগে—আর লাগবে না—এবার খাও।

সুন্দর মিষ্টি গন্ধ হলে কি হবে—বুকের মধ্যে যেন এক ঝলক আগুন ঢুকে গেল বন্দনার। খেয়ে নিল ও সবটা। তারপর ওরা বের হয়ে পড়ল। ঝড় আর বৃষ্টি সমানে চ'লছে।

দোকান পর্যন্ত আসতে রবি বেশ ভিজে গেল। বন্দনা বার-বার সতর্ক ক'রে দিল। তুমি হয় আমার পাশ দিয়ে হাঁটো—ঝাপটা যা লাগবার আমার গায়ে লাগুক।

রবি ব'লল, আমার অসুবিধে হচ্ছে না। মাথাটা না ভিজলেই হ'ল।

দোকানে ঢুকে বন্দনা কতকগুলো পুঁতির মালা কিনল। কিছু পাথর কিনল। রবি দর-দস্তুর ক'রে সব কিছুর দাম কমালো বেশ। একটা ঝোলানো লকেট দেখে বন্দনা হাত বাড়িয়ে সেটা দেখল। রবিকে ব'লল, পাথরটা কত বড় দেখেছ?

হ্যাঁ, ওটার নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। রবি উত্তর দেয়।

বন্দনা হেসে ওঠে—সত্যি? হ্যাঁ, ঐ-রকম একটা নাম শুনেছিলাম বটে। দোকানদারকে দাম জিজ্ঞেস করে রেখে দিল।

রবি ব'লল, পছন্দ যদি হয় নিয়ে নিতে পারো। দার্জিলিং-এর একটা স্মৃতি থাকবে। চাই-কি পরে অফিস ক'রতে পারো। ক'লকাতা যা শহর—সোনা-দানা পরে তো ট্রাম বাসে ওঠা রিস্কি।

বন্দনা ব'লল, ইস্, ক'লকাতার ট্রাম-বাসের কথা আর ব'লো না। ইতিমধ্যে দোকানী এসে ঝোলানো হার সুদ্ধ লকেটটা দেখিয়ে ব'লল—নিয়ে নিন্ দিদিমণি জিনিসটা ভাল।

রবি দর-দাম ক'রে দু-তিন টাকা কমাতেও দশ টাকার মত পড়ল।

রবি ব'লল,—একটা কথা বলবো, রাখবে?

কি?

এই লকেটটার দাম আমি দিয়ে দিই।

না—

কেন? দিই না কোনদিন তো কিছুই নাও না—রবি অনুরোধ করে। রবি কিছুতেই ছাড়ল না। ওটা বন্দনাকে ঐখানেই প'রে নিতে হল।

ওয়াটার প্রুফটা হাতে নিয়েছিল বন্দনা। লকেটটা পরতে ওকে ভালই দেখাল। গলায় ওর কোন হার ছিল না। পরে আসেনি হয়ত ইচ্ছে করে। ওরা আবার দোকান থেকে বের হয়ে পড়ল। এখন বৃষ্টি কমেছে কিন্তু একরকম মেঘ এসে চারিদিক অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে দিয়েছে। দার্জিলিঙ-এর এরকম চেহারা বন্দনা এর আগে দেখেনি। রবি ওর পাশেই ছিল, ব'লল—অদ্ভুত ওয়েদার হয়েছে, দ্যাখো—।

হ্যাঁ, এ-এক অদ্ভুত ব্যাপার। সমতল ভূমিতে বৃষ্টির সময় এমনটি তুমি দেখবে না। কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে কি আছে তুমি বুঝতেই পারবে না। জীপ আর মোটর গাড়ি আস্তে চলছে—ফগ্-লাইট জেলে।

বন্দনা আক্ষেপ করল, সত্যি বড় দেরী হয়ে গেল। ওরা কি ভাবছে কে জানে?

ভাবাভাবির কি আছে? ব'লবে বেড়াচ্ছিলাম। বৃষ্টি এল—দোকানে আটকা পড়লাম। কিংবা রাস্তা হারিয়েছি। কত কি বলার আছে।

বন্দনা হেসে উঠল খিল-খিল করে—আর কিছু না?

ওরা ল্যাডেন্-লা রোড-এর পাশ দিয়ে ঢালু রাস্তাটা বেয়ে নিচে নেমে এসে স্টেশান রোডটা ধরল।

বন্দনা ব'লল, এখনও হোটেল অনেক দূরে—তাই না?

রবি হেসে ব'লল, এই-তো স্টেশন এসে গেছি—তার পরই তোমার হোটেল।

চারিদিক নির্জন হ'য়ে গেছে। দূর থেকে স্টেশনটা ধোঁয়াটে দেখাল। কাছে গিয়ে দেখল লোকজন নেই। একটা কুকুর কুন্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। তার পাশে দুটো লোক খুব ঘন হয়ে ব'সে আছে। শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। ওদিকে দু'টো লাইনে খালি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুকিং কাউন্টারের কাছে দেখল বেঞ্চে কয়েকজন লোক বসে ধূমপান ক'রছে। বন্দনাকে দেখে কেউ চিনতে পারবে না। ইলেকট্রিকের আলোগুলো ম্লান আর নেশাগ্রস্ত মনে হ'ল। আরও এগিয়ে স্টেশনটা শেষ হ'লেই ওদের হোটেল। এ-দিকটায় নির্জনতা খুব। তবে বাতাস তত জোরে লাগছে না। কারণ দু-দিকেই খালি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার দরজা-জানালা সব বন্ধ। রাতে এখানে এই ভাবে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে বন্দনা। আজ ব্যতিক্রম, লোকজন নেই একটিও। বন্দনা ব'লল, তুমি এবার ফিরে যেতে পারো— আমি এসে গেছি।

রবি ব'লল—ওটা?

হেসে ফেলেছে বন্দনা, তাই-তো ওয়াটার প্রুফটা যে খুলতে হবে। সত্যি তুমি বেশ ভিজেছো।

রবি ব'লল—তেমন কিছু কষ্ট হচ্ছে না।

স্টেশন প্রান্তে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে ওয়াটার প্রুফের বোতামগুলো একটি একটি ক'রে খুলল বন্দনা। রবি লুব্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল। তারপর দু'টো হাত পিছন দিকে নিয়ে গিয়ে, হাতাটা ধ'রে টানতে যাবে—তখন রবি আরও এগিয়ে এসে ব'লল, আমি একটু সাহায্য করি।

ওর ওয়াটার প্রুফটা সমস্তটা খুলে নেওয়ার পর রবির মনে হ'ল—অন্য এক বন্দনা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পরে কি যে হ'ল রবিও ঠিক বুঝতে পারল না। কখন উন্মত্তের মত বন্দনাকে বুকের মধ্যে দু-হাতে জড়িয়েছে—তারপর ওর মুখটা মুখের সামনে তুলে ধ'রে নিচের ঠোঁটটাকে নিজের মুখের মধ্যে গভীর আবেশে টেনে নিয়েছে—সে এক বিচিত্র স্বাদ। এক অনাস্বাদিত অনুভূতির মধ্যে ধীরে ধীরে রবি যেন হারিয়ে গেল—বলা যায় ফুরিয়ে গেল। বন্দনা বুঝতে পারেনি প্রথমটায়। তারপর কখন উত্তপ্ত ভাললাগা আর একটা অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক আবেষ্টনীর মধ্যে তার গোপন সুরক্ষিত দেহটার কোষে কোষে যেন তীব্র ঘন্টাধ্বনি শুনল। প্লাট-ফর্ম, মেঘে জড়ানো বাতাসের ঝাপটা, রবির দীর্ঘ চুম্বনের মধ্যে সব যেন কেমন হ'য়ে গেল। শেষে বলল—লক্ষ্মীটি এবার ছাড়, যদি কেউ এদিকে এসে পড়ে—।

রবি ছেড়ে দিয়েছে। রবি ওকে নিয়ে আরও কিছুটা এগিয়ে হোটেলে ঢুকবার মুখ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে প'ড়ল—তারপর অস্ফুটে বলল—এই, রাগ করলে?

বন্দনা পিছন ফিরে চাপা গলায় ব'লল, ভীষণ—।

'সত্যি?' রবির শেষ কথা শুনে বন্দনা কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ছুটে হোটেলের বারান্দায় উঠে গেল।

(তিন)

বন্দনা সেদিন ওদের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা ব'লেছিল। ব'লেছিল আজ আমি আর কিছু খাবো না। ঘুরে ঘুরে পায়ে ব্যথা ধরে গেছে। কতদূর যে গিয়েছিলাম—বোকার মত। শহর শেষ হ'য়ে শুধু পাঁচের রাস্তা চলে গেছে। শেষে ভয় ক'রতে লাগল। ফিরে এসে গভর্ণর হাউসের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা উল্টো দিকে ঘুরে আবার ম্যালে এসে মিশেছে—সেই রাস্তার ধারে বসার জায়গায় ক্লান্ত হ'য়ে প্রায় এক ঘন্টা বসেছিলাম। একটি মেয়ের সংগে দেখা হ'ল—আমাদের পাড়ায় থাকে—। এমনি সব বানিয়ে বানিয়ে ও কত কথা বলল। ও ভাবতেই পারেনি যে এত মিথ্যে ও এমন সহজ ভাবে বলে যেতে পারবে।

আর তার পরেই তার ছুটি মিলল। ওরা দু-জনে খেতে চ'লে গেল।

কাপড়-জামা ছেড়ে ও রাতের শাড়ি-খানা গায়ে কোনমতে জড়িয়ে বিছানায় পড়ল।

বাইরে বৃষ্টি থেমেছে। কেমন যেন একটা হ'য়ে রইল সমস্ত শরীর। রাতে ঘুমের ঘোরে রবিকে কতবার যে কত ভাবে দেখল তার ইয়ত্তা নেই।

তার পরদিন সকালে বন্দনার মনে হ'ল, ও একটা নতুন মানুষ হয়ে গেছে। সেই এক-ঘেয়েমি ভাবটা কেটে গেছে। শ্রীমা আর রেবাকে আগের চেয়ে অনেক সুন্দর ব'লে মনে হল। বাথরুমে গরম জলে স্নান করতে গিয়ে নগ্ন দেহটা ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল। স্নান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নীচের ঠোঁটটায় আঙুল দিয়ে টিপে অস্পষ্ট একটা ব্যথা অনুভব ক'রল। কে-যে কখন এই কাজটি ক'রল, বন্দনা কিছুতেই

খেয়াল করতে পারল না। রবি ওকে কাছে টেনে নিয়েছিল না ও রবির বুকের মধ্যে এগিয়ে গিয়েছিল—কিছুতেই ওর মনে পড়ছে না। ঘরের জানালা দিয়ে স্টেশন প্লাটফর্মের সেই জায়গাটা ও দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু সকালের আলোয় মনেই হ'ল না, ঐ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে এইভাবে কেউ একে অন্যের দেহের সংগে মিশে যেতে পারে। বন্দনার লজ্জা হ'ল না কিছু—শুধু রবির কাছে সকাল বেলাই একবার যেতে ইচ্ছে ক'রল।

যাবো-যাবো ক'রে ও বের হ'তে পারল না। ঘরের মধ্যেই নানান খুঁটি-নাটি কাজে সময়টা কাটিয়ে দিল। দুপুরের দিকে টেনে ঘুম। আর বিকেলে ওদের নিয়ে বের হ'তে যাবে—এমন সময় রেবার নামে একটা চিঠি এল। নিশ্চয়ই সত্যাসিন্ধু দিয়েছে। রেবা ঘর ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিঠিটা পড়ল। তারপর খুলে বাক্সতে দেখিয়ে ব'লল, কিরে তোরা আবার বসলি কেন—চল্ যাবি যে?

বন্দনা বলল, দেখলি মীনা, চিঠিটা পড়বার জন্যে আমাদের কাছ থেকে ছিটকে দূরে চ'লে গেল—এখন আবার উল্টে আমাদেরই দোষ দিচ্ছে।

মীনা ব'লল—কে দিয়েছে রে—সত্যাসিন্ধু—

না, রেবা ঠোঁট টিপে উত্তর দিল।

বন্দনা ব'লল—আহা, এতে লুকোবার কি আছে? আমরা কি তোর সত্যকে নিয়ে টেবল্-টেনিস্ খেলব?

মীনা হাততালি দিয়ে ব'লল—ঠিক বলেছিস বন্দনা—রেবাটা না ভীষণ চাপা।

রেবা ছাড়ল না—আর নিজে?

ওরা রাস্তায় নেমে এল। রেল লাইন পার হ'য়ে প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াল। বন্দনা এবার জায়গাটা চিনতে পারল। রেবা ব'লল—চল্ কাউন্টারে দেখি কবেকার রিজার্ভেশন আছে?

বন্দনা আঁৎকে উঠে বলল, কবে যাবার ঠিক করলি?

মীনা বলল, ভয় নেই, ঠিক এখনও হয়নি—কাউন্টারে গিয়ে ঠিক ক'রব।

ওরা দু-দিন পরের টিকিট আছে জানতে পারল। তাই কাটিয়ে নিই, কি বল, বন্দনা? রেবা ওর দিকে চেয়ে বলল কথাটা।

বন্দনা ব'লল, আরও একদিন থাকলে হতো না? আমার তো জায়গাটা বেশ ভাল লাগছে। তবে দ্যাখ্ তোদের যদি তাড়া থাকে।

মীনা এর সমাধান ক'রে বলল—তাই তিনদিন বাদ দিয়ে টিকিট কেন। বন্দনার যদি ভাল লেগে থাকে—ওর জন্যে না-হয় আমরা একদিন থেকেই যাবো। সত্যি বলতে কি আবার কবে আসা হয়—কি-না-হয়।

বন্দনা মনে মনে খুশি হলেও মুখে বলল, না-না, রেবার আবার অসুবিধে যদি হয়। সদ্য চিঠি এল। হয়ত সত্যাসিন্ধু দিন গুনছে। রেবা ওকে হাত তুলে ঘুষি দেখিয়ে কাউন্টার থেকে ফর্ম চেয়ে নিল। তারপর তাড়াতাড়ি নামগুলো লিখে কাউন্টারে ফিরিয়ে দিল।

টিকিট কাটাতে বেশ কিছুটা সময় গেল। একটি ছোকরা টিকিটের বিষয়গুলি জানিয়ে দিচ্ছিল। তারপর ওখান থেকে স্লিপ নিয়ে বিপরীত দিকের কাউন্টার থেকে রিজার্ভেশনের জন্য দাঁড়াতে হ'ল। ছেলেটি রেবাকে দেখে মীনাকে দেখে। ওরা অস্বস্তি বোধ করে। বন্দনাকে ছোকরাটি দেখতে পায়নি। বন্দনা তখন প্লাটফর্মের ধারে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কি যেন দেখছে। কখনও দূরের পাহাড় কখনও প্লাটফর্মের শেষপ্রান্ত কখনও নিজের মুখ স্পর্শ করছে। টিকিট কেটে ওরা আবার বেরিয়ে পড়ল। ঘুরল অনিশ্চিতের মত। আর কটা দিন। দু-তিন দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। টিকিট কাটার পর রেবারও যেন দার্জিলিঙ-এর উপর বেশী মায়া পড়ে গেল। মীনা বলল, এখন যদি আরও ভাল লেগে যায় তবুও আমাদের বৃহস্পতিবারই চলে যেতে হবে।

বন্দনা বলল, যদি আমাদের মধ্যে কেউ এখানকার কোন ছেলের সঙ্গে প্রেমে পড়ে যায় তাহ'লে তার কি অবস্থা হবে বল্ তো?

রেবা বলল, আমি তাহ'লে যাচ্ছি না আর।

মীনা রসিকতা করল, তাহলে আমিও যাবো না।

রেবা বলল, আদিখ্যেতা, আমি এখানে প্রেমে পড়লে তোর না-যাওয়ার কি আছে?

ইস্, সেখানে সত্যাসিন্ধুকে কে রুখবে বল? মীনার জবাবে ওরা তিনজনেই হাসতে লাগল।

ঘুরেফিরে ওরা যখন হোটেলে এল তখন সন্ধ্যে সাতটা।

তার পরদিন বন্দনা আর থাকতে পারল না। এইতো তারা এবার চলে যাবে। রবি নিশ্চয়ই তাদের হোটেলে আসবে না। তাই ওকেই যেতে হল। তবে ওর ঘরে আজ আর বসল না। ওকে নিয়ে বার্চ হিলের ঐদিকে চলে গেল। ওদিকটা নির্জন। চিড়িয়াখানা দেখা হয়নি বন্দনার। বন্দনা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, সেদিন তোমার কি হয়েছিল?

রবি বলল, কবে?

কবে আবার? রববার রাতে প্লাটফর্মের উপর—চোখ পাকিয়ে চাইল বন্দনা।

রবি ছদ্ম গাম্ভীর্য নিয়ে বলল, কিছুই মনে পড়ছে না তো—বন্দনা আর কথা বাড়ালো না। ওরা ঘুরল দুজনে। বন্দনাই বলল—বৃহস্পতিবার আমরা সকালের গাড়ীতে চলে যাচ্ছি।

রবি এর উত্তরে কোন কথা বলল না। বন্দনা আবার বলল—রবি তবুও নিরুত্তর। কি হ'ল, কোন কথা বলছ না যে? বন্দনা প্রশ্ন করে। রবি বলল, বলার কি আছে? তোমরা কয়েকদিনের জন্যে এসেছিলে—আবার চ'লে যাবে।

তুমি কিছুই বলবে না?

কলকাতা গিয়ে আমার কথা ভুলে যেও—কেমন একটা নির্বিকার জবাব দেয় রবি। বন্দনা ওর কথা শুনে রাগ করল। শেষে বলল, যারাই কলকাতায় থাকে তাদের উপরেই তোমার রাগ

তা কেন হবে, তোমার মনের কথাটাই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম।

বেশ—বলে একরকম হঠাৎ চুপ করে গেল বন্দনা।

রবি কিছুক্ষণ পরে বলল, রাগ হ'ল বুঝি? মনে রাখতে চাও রাখবে। মেয়েরা বড় অল্পে ভুলে যায়—তাই ও-কথাটা বলেছি।

আর ছেলেরা বুঝি অনেকদিন মনে রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—বন্দনা ফুঁসে ওঠে।

তা হয়ত নয়। এইতো আমায় কিছুক্ষণ আগে কত কি বললে। 'সেদিন কি হয়েছিল' —এখন আবার আমার কথায় রাগ করছ কেন?

বন্দনা এতক্ষণে কারণটা বুঝতে পারল। বলল, তা বলবো না? একা পেয়ে অন্ধকারে একটি মেয়েকে কাছে টেনে নিয়েছিলে—প্রতিবাদ করব না?

রবি এ-কথার কোন উত্তর দিল না। কেবল হাসল। একটু পরে বলল, তাই বুঝি আমার দেওয়া লকেটটা খুলে রেখে এসেছ আজ?

বন্দনা গলায় হাতটা দিয়ে দেখে হেসে ফেলল। কারণ কথাটা মোটেই সত্যি নয়। আজ সকালে ও খুলে ওটা একবার মীনাকে দেখিয়েছিল। তারপর আর ফেরৎ নেওয়া হয়নি। বন্দনার খেয়াল ছিল। কিন্তু ওর কাছে চাইতে গিয়ে দেখল গলায় পরে বসে আছে। একজন শখ করে কিছুক্ষণের জন্যে পরেছে—সেটা তার গলা থেকে বন্দনা খুলে নিতে পারল না। মেয়েরা অন্তত পারে না। তবু বন্দনা এসব কথা ওকে বলল না। তাড়াতাড়ি রবিকে ছেড়ে দিয়ে ও একাই ফিরে এল হোটেলে। হোটেলে এসে দেখল রেবা আর মীনা ঘরে নেই। নিশ্চয় ওরা কোথায়ও বাজার করতে গিয়েছে।

আজ অকারণ ও রবির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এসেছে। প্রয়োজন ছিল না। ভালো লাগার কথাটাই ও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জানাতে গিয়ে কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে গেল। আর হয়ত ওর সঙ্গে দেখা হবে না। যদি না দেখা হয়। নাঃ বন্দনা নিজের উপর বিরক্ত হল। তারপর কখন ওর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে জল গড়িয়ে পড়ল গালে খেয়াল নেই।

একটু পরেই ওরা ফিরল। ঘরে বন্দনাকে শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হল। মীনা বলল, কখন এলি তুই বল্‌তো?

বন্দনা সোজা বলে দিল—ঘন্টাখানেক হবে।

রেবা বলল, কি করে হয়? আমরা তো তোকে আধঘন্টা আগে দেখলাম উপরের এক রাস্তা দিয়ে একটা ছেলের সঙ্গে যাচ্ছিস্? বন্দনা আরও গম্ভীর হয়ে বলল—ধোৎ—অন্য কাউকে দেখেছিস্। মীনা রেবাকে বলল—তখনই তোকে বললাম—ও বন্দনা নয়। আসলে শাড়ীটা ঠিক বন্দনার মত ছিল।

ওরা আর কথা বাড়াল না। বন্দনা মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নাম করতে থাকল। ওদের অন্যমনস্ক করার জন্যে বন্দনা বলল—দেখি তোরা কেমন মালা কিনলি?

মীনা বলল, তোর মত মালার খোঁজ করলাম—পেলাম না।

বন্দনা বলল। হ্যাঁ, ও-রকম মালা সে-দোকানটায় একটাই ছিল।

তুই কোথা থেকে কিনলি? প্রশ্ন করে মীনা।

বন্দনা বলে—নেহরু রোড থেকে। তোরা ঐদিকে গিয়েছিলি?

রেবা বলল, না আমরা বাজারের উপরের একটা রাস্তা থেকে নিলাম। নাম-টাম মনে থাকে না।

বন্দনা আর যেতে পারল না রবির কাছে। তবে রবিকে ও হোটেলের সামনের রাস্তায় যখন হোক একবার আশা করেছিল। বুধবার বিকেলের দিকেও ও বের হয়নি। শরীর খারাপ বলে ঘরে বসে ছিল। সত্যি বলতে কি রবির জন্যে অপেক্ষা করছিল। ওর মনে হ'ল—রবি নিশ্চয়ই হোটেলের বাইরের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করবে। কারণ রবি জানে ওরা এদিকের ঘরে থাকে। ঘর থেকে রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়। বুধবার সমস্ত বিকেল রাস্তা দেখে কাটাবার পর বন্দনার রাগ হল খুব। বিকেলে বাড়ীতে বসে না থেকে রবির বাসায় গেলেই হত। যাওয়ার আগের দিন একবার দেখা করা উচিত ছিল। রবিও যদি রেগে গিয়ে থাকে? দুজনেই রাগ করে বসে রইল। ক্ষতিটা কার হল?

ওরা ফিরে এসে বাঁধা-ছাঁদায় মন দিল। বন্দনাও ওর জিনিসপত্র গুছিয়ে সুটকেশ-বন্দী করল। অন্তত ভোর চারটের সময় উঠতে হবে। গাড়ীতে নাকি বসতে জায়গা পাওয়া যাবে না। যদিও রিজার্ভেশন আছে—তবুও এখানকার ছোট গাড়ীতে ও-সবের বালাই নেই। রিজার্ভেশন পাবে সেই নিউ জলপাইগুড়ি থেকে। তার মানে একেবারে সমতলভূমিতে নেমে যে গাড়ীতে চড়বে [illegible]।

[illegible] থেকে আসার দিন কি উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে বাক্স সাজিয়েছিল। দার্জিলিঙ থেকে ফেরার দিন কি কষ্ট কি বেদনা বুকে নিয়ে ও বাক্সর সামনে বসল। কেন এমন হয়? কেন এমন হল? বারবার সে নিজেকে দোষ দিতে লাগল। রাত্রি হয়েছে—সে কি আর আসবে? যদি আসে, যদি নাটকীয়ভাবে নাম পাল্টিয়ে খবর পাঠায় উপরে, বন্দনা দেবী কে আছেন? তাঁকে নিচে এক ভদ্রলোক ডাকছেন? বন্দনা তাহলে ঠিক ম্যানেজ করে দেবে। উপরে নিয়ে আসবে না। বলবে, জামাইবাবুর ভাই এসেছেন। যদিও সাতজন্মে তার কোন দিদি নেই।

সুটকেশ থেকে দু-একটা জিনিস নিয়ে হাত-ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে রবির দেওয়া ঠিকানা লেখা কার্ডটা ওর হাতে ঠেকল। কার্ডটা বের করে আবার একবার পড়ল। সেই প্রথম দিন ওর ঘরে যাওয়ার আগে প্লাটফর্মের পাশে দাঁড়িয়ে যেমন ভাবে ঠিকানাটা দেখেছিল—তেমনভাবে দেখে আবার ব্যাগের এক কোণায় রেখে দিল। রাত হল। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে ওরা শুয়ে পড়ল। হোটেলের ম্যানেজার বললেন, আমি ব্যবস্থা করে দেব আপনাদের ঘুম ভাঙাবার। মীনা আর রেবা শুয়ে পড়েছে। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়েছে বন্দনা। এই শীতের দেশেও তার ঘুম আসছে না। দূরে কোথাও কেউ বাঁশী বাজাচ্ছে। আকাশটা পরিষ্কার আজ। বন্দনার দুচোখ ভরে জল এল। রবির জন্যে তার কষ্ট হল—দুঃখ হল। বন্দনা কলকাতা ফিরে যাবে—ওর বাবা-মা বন্ধু-বান্ধবীদের মাঝে। রবি কোথাও যাবে না। ওর আত্মীয়স্বজন থেকে অনেক দূরে একা-একা দিন কাটাবে। হয়ত ভাববে, বন্দনা ঠিক আগের মতই আছে। বিরক্ত হলে যেমন মুখ লুকিয়ে থাকত—দেখা পর্যন্ত করত না, আজও তেমনি আছে। সত্যি বলতে কি বন্দনা আগে ঐ-রকমই ছিল। এখন আর ও সেরকমটি নেই। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। রবির কথা তার যে মনে পড়েনি কলকাতায়—তা নয় মোটেই। ভালো তাকে এর আগেও যে দু'একজন বাসেনি—এমন নয়। রবি কিন্তু এদের থেকে স্বতন্ত্র। কিংবা বন্দনা এদের মধ্যে রবিকে একটা আলাদা আসন দিয়েছিল। সেই রবি হারিয়ে গিয়েছিল। কেন আবার তাকে এই পার্বত্যভূমিতে সে আবিষ্কার করল? না, ক্ষতি তার কিছুই হয়নি। শুধু—

ঘুম যখন ভাঙলো তখন চারটে। চোখের পাতা দুটো কিছুতেই খুলতে পারছিল না বন্দনা। জ্বালা-জ্বালা করছে। তবু উঠতে হল। বিছানাটা বাঁধতে হবে। একটা নেপালী মেয়ে কুলি এসে পরিপাটি করে তিনটে বিছানাই এক জায়গায় বাঁধল। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা। স্বাস্থ্যও ভাল। এখানে মেয়েরাই বেশী বাইরের কাজ করে। মীনা আর রেবা সাজতে বসে গেল। বন্দনা সাজল না। মীনা বলল, ওকি সখি, বিরহ-বেশে তুমি হিমালয় ছাড়বে নাকি?

ভাল্লাগে না রে। আবার সেই দীর্ঘ পথ, রাতজাগা চোখ বন্দনা [illegible] প্রকাশ করল। আকাশ [illegible] পরিষ্কার [illegible] বোধহয়—কিন্তু বাইরে বড় কুয়াশা। অন্তত কুয়াশার মত মনে হল। মেঘও হতে পারে। অত ভোরে আর চা কোথায় হবে? সাজগোজ করতে একটু যা দেরী হল। বের হবার আগে মীনা একবার বাথরুমে গেল। যাবার সময় বন্দনাকে বলল—ক'টা বাজে দেখত?

বন্দনা বলল—সাড়ে পাঁচটা। গাড়ীটা কটায় ছাড়বে জানিস?

রেবা বলল—সাড়ে ছটায় বলছিল। যখন হোক ছাড়ুক আমরা এবার বেরিয়ে পড়ব।

বন্দনা তো এখন বললে এখনই বের হবে। ওরা মুখে বললেও ওদের তখনও দেরী আছে কিছু দেখল। একটু পরে নেপালী মেয়েটা ঘুরে এল। বেডিংটা পিঠের উপর কায়দা করে ঝুলিয়ে কপালে একটা মোটা ফিতে দিয়ে তার ভারটা রাখল। বন্দনা ওদের মাল বইবার কায়দাটা দেখল। মেয়ে কুলিটা বেডিংটা নিয়ে বের হয়ে গেল। রেবা বলল, ওর সঙ্গে একজনকে যেতে হবে স্টেশনে।

বন্দনা বলল, ঠিক আছে, তোরা আয়, আমি এগোচ্ছি।

বাইরে এসে দেখলো বন্দনা কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার। এমনকি স্টেশনটাও দেখা যাচ্ছে না। এত অন্ধকার? লালা পাহাড়, জলা পাহাড় পিছনদিকে সেদিকেও কিছু দেখা গেল না। স্টেশনের উল্টোদিকে ঢালু হয়ে অনেক নীচে নেমে গেছে এখন কিন্তু শুধু কুয়াশায় ঢাকা। প্লাটফর্মে এসে দু-তিনটে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বন্দনা। কিন্তু কোন গাড়ীটায় তারা যাবে, সঠিক বুঝতে পারল না। একটা রেলের লোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করতে—সে দেখিয়ে দিল গাড়ীটা। দরজা তখনও বন্ধ, বন্দনা উঠতে পারল না। দরজায় বোধহয় চাবি দেওয়া। প্লাটফর্মটা এদিকওদিক সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না। তাদের আগেই কিছু যাত্রী এসে বেডিও নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রেবা আর মীনা এল, সুটকেশ সঙ্গে নিয়ে। সুটকেশগুলো সেই মেয়ে কুলিটাই আবার গিয়ে নিয়ে এল। গাড়ীর মধ্যে বেডিং সুটকেশ নিয়ে ওরা জানালার ধারে প্লাটফর্মের দিকে মুখোমুখি বসল। বন্দনা মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখছিল। অপ্রস্তুত হয়ে যায় পাছে তাই বলল, একটু চা খেলে হোতো রে।

রেবা বলল এখানে এখন কি আর চা পাবি? তার চেয়ে কার্শিয়ঙ-এ গিয়ে খাব।

বন্দনা বিরক্ত হয়ে বলল—দূর, এখানে নিশ্চয়ই কোথাও পাওয়া যায়। গাড়ী ছাড়তে দেরী আছে তো বেশ।

রেবা বলল—আর নামানামি করিস না, যদি ছেড়ে দেয় গাড়ী?

বন্দনা তবু নেমে পড়ল। একজন রেলের লোককেই জিজ্ঞেস করল—ক'টায় গাড়ীটা ছাড়বে বলুন ত?

সে ভদ্রলোক বললেন, সাড়ে ছ'টার আগে নয় নিশ্চয়ই।

বন্দনা অকারণ বলল, না, মানে একটু চা খাওয়ার ইচ্ছে আছে তাই বলছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ স্বচ্ছন্দে খেয়ে আসতে পারেন —বলে ভদ্রলোক নিজের কাজে চলে গেলেন।

খাওয়া তো যায়, কিন্তু কোথায় চায়ের দোকান? ওদের হোটেলের উল্টোদিকে স্টেশনের পাশে রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান দেখেছিল। তাই ফিরে এসে মীনার কাছ থেকে ফ্লাস্কটা চেয়ে নিল। বলল, আমি দেখি যদি একটু চা পাওয়া যায়। তাহলে তোদের জন্যেও নিয়ে আসব। গাড়ী ছাড়তে আধ ঘন্টারও বেশী দেরী আছে। মীনা জানালা দিয়ে বলল, আমি শুধু যাবো?

দরকার নেই বলে বন্দনা মুখ ফিরিয়েই একটু দূরে কাকে যেন দেখতে পেল। বোধহয় দেখার ভুল। তবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে দেখল রবি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

বন্দনা বলল—ওমা, তুমি? কতক্ষণ এসেছ?

বেশীক্ষণ নয়, এই দশ-পনেরো মিনিট হবে।

চলো না, একটু চা খাবো। দ্যাখো না, প্লাটফর্মে একটাও চায়ের দোকান নেই—বন্দনার গলা দিয়ে মিনতি ঝরে পড়ে।

রবি ওর সংগে রাস্তায় নেমে বাজারের দিকে চলল। বন্দনা ভয় পেয়ে একবার পিছন দিকটা দেখে নিল। নাঃ, ওরা কেউ দেখতে পাবে না—কুয়াশায় ঢাকা হয়ে আছে চারিদিক। একটু হাঁটতেই ওরা প্লাটফর্ম থেকে সম্পূর্ণ দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। পাশাপাশি ঘন হয়ে হাঁটছে দুজনে। রবি একটা হাত ধরল বন্দনার। বন্দনা কিছু বলল না। রবি হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে খেলা শুরু করল। বন্দনা বলল, কাল একবার আসতে পারলে না বুঝি?

রবি বলল, এসেছিলাম, পাছে তুমি কিছু ভাব তাই দেখা করিনি। শেষে মনে হল, এমনও তো হতে পারে—তুমি আমার বাসায় গিয়েছ। তাই তাড়াতাড়ি বাসায় চলে গিয়েছি—তারপর অন্ধকার হয়ে গেল।

একসময় বন্দনা বলল, সব দোকান বন্ধ দেখছি—নাঃ আর এগোবো না যদি গাড়ী ছেড়ে দেয়?

রবি বলল, গাড়ী ছাড়বে ছ'টা চল্লিশ মিনিটে। চল আর একটু এগোই। চা না খেলেই বা থাকবে কি করে?

একটা চায়ের দোকান সবে খুলে আঁচে কেটলি দিয়েছে দেখে সেখানেই ওরা ঢুকে বসল। অন্ধকার ঘরে পাশাপাশি চেয়ারে বসল। দুজনেই চুপচাপ। বন্দনা চঞ্চল হল, তারপর টেবিলের উপর রাখা রবির হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বলল—এই তুমি রাগ করেছো?

রবি হেসে বলল—না-না, কে বললে?

আহা। তাহলে তুমি এত গম্ভীর কেন? জানো, কাল— বলে বন্দনা চুপ করে গেল। ওর গলাটাও সামান্য কেঁপে গেল।

রবি বলল—কাল কি হয়েছে?

বন্দনা বলল—না, কিছু নয়। রবি ওর মুখের দিকে চেয়ে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করল। দু'কাপ চা দিয়ে গেল বেয়ারা। বন্দনা ফ্লাস্কটা এগিয়ে দিয়ে বেয়ারাকে বলল,এর ভিতর তিন কাপ চা ভরে দাও।

ওরা পাশাপাশি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে চা খেল। বন্দনা মাঝে মাঝে আড়চোখে রবির দিকে চাইল।

বন্দনা বলল—চলে যাচ্ছি, তুমি কিছু বলবে না তো?

রবি বলল—আবার এসো। অবশ্য যদি তোমার ভালো লাগে।

বন্দনা কিছু কথা বলল না। বেয়ারাটা বাইরে বোধহয় দোকানের আশপাশগুলো ঝাঁট দিচ্ছে। বন্দনার চিবুকটা হাত দিয়ে রবি একটু তুলে ধরতেই বন্দনা চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলল। রবি আস্তে ওর ঠোঁটটা বন্দনার গালে একবার মৃদু স্পর্শ করল। তারপর বলল—আজ হারটা পরে এসেছ দেখছি?

বন্দনা তবুও কিছু বলল না। ফ্লাস্কটা দিয়ে গেল বেয়ারা। ওরা দাম দিয়ে উঠে পড়ল। বন্দনা অকারণ কাপড়টা গোছালো। মুখটা মুছতে গিয়ে কি ভেবে রুমালটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। বাইরের কুয়াশা অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। ওরা তাড়াতাড়ি হাঁটল। বন্দনা রবির হাতটা মুঠো করে ধরে রাখল ফেরার পথে। বন্দনা প্লাটফর্মে উঠে বলল, ক'টা বাজলো দেখো তো?

রবি বলল, ছ'টা পঁচিশ।

আর বোধহয় আসতে পারবো না। চলি, কেমন? বলে মিষ্টি একটু হাসল বন্দনা। রবি কেবল উদাসভাবে ঘাড় নাড়ল। বন্দনা চলে যাচ্ছে। পিছন থেকে রবি ওর চলার মধ্যে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য বুঝতে পারল। কিছু এগিয়ে একটা কম্পার্টমেন্টের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ফ্লাস্কটা এগিয়ে দিল বন্দনা। ওদের কি যেন বলল—রবি কিছুই বুঝতে পারল না। ওরা বোধহয় বন্দনাকে কামরায় উঠতে বলল। বন্দনা প্লাটফর্ম থেকে রবির দিকে একবার চাইল। কুয়াশা আরও পাতলা হয়ে গেছে। রবি দূরে থেকে বন্দনাকে দেখল কেমন আচ্ছন্নের মত। তারপর বন্দনা উঠে গেল কামরার মধ্যে। গাড়ীটা এবার ছাড়ার উদ্যোগ করছে।

মীনা আর রেবা চা পেয়ে খুশী। ওরা বন্দনাকে একটা বিলিতী ধন্যবাদ জানাল। বন্দনাকে জানালার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে মীনা বলল, প্লীজ, বন্দনা আমি এখানে বসবো।

বন্দনা বলল, তুই-ই বসবি। আমি ট্রেন ছাড়ার পরই উঠে বসবো। কুয়াশা যখন কাটতে শুরু করল—তখন তাড়াতাড়ি চারদিক ফরসা হয়ে গেল। কে বোলবে এই আধঘন্টা আগে ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল। বন্দনা মুখ বাড়াতে গিয়ে চমকে উঠল—রবি একেবারে ওদের কম্পার্টমেন্টের কাছাকাছি এসে গেছে। ইঞ্জিনটা গাড়ীতে এই লাগল বুঝি—একটা ধাক্কা খেল ওরা। মীনা বলল—বন্দনা ভাগ্যিস্ তাড়াতাড়ি এল—নইলে ছেড়ে দিত।

বন্দনা মীনার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমি না হয় থেকে যেতাম।

আহা! কি মজার কথাই বললি—রেবা ঠোঁট টিপে উত্তর দিল।

গাড়ী এবার ছাড়বে। ইঞ্জিনে হুইসল হ'ল দুটো। মীনা বন্দনার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বাইরের দিকে কি দেখাল। বন্দনা সুযোগ পেল—বাইরে একবার চেয়ে মীনার দিকে ফিরে বলল—কি দেখাচ্ছিস্।

মীনা ফিস্‌ফিস্ করে বলল—দেখ, ঐ লোকটা তোকে যেন চোখ দিয়ে গিলছে।

বন্দনা বলল, কোন্ লোকটা? মীনা চোখ দিয়ে ইশারা করল। ততক্ষণে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। বন্দনা না-চেনার ভান করে জানালা দিয়ে চেয়ে রইল রবির দিকেই। দৃষ্টি ওর করুণ। রবি আরও গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বন্দনা জানালা দিয়ে তখনও দেখতে পাচ্ছে।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (২৩)

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন
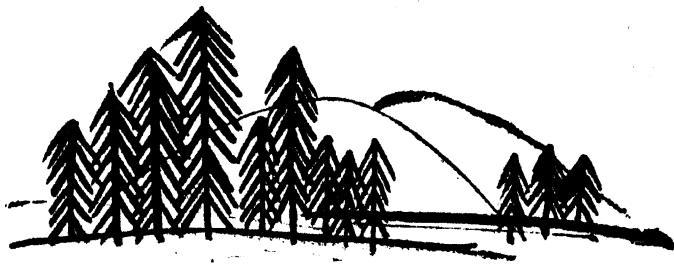
আপনার মূল্যবোধ কি ধরনের?

'মূল্যবোধ' কথাটা খুব ভারী কথা, দার্শনিক কথা বলে মনে হয়, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে আমরা প্রত্যেকেই এই মূল্যবোধের অলংপাতে সুখ-দুঃখ আহরণ করে চলেছি।

সত্যিকারের মূল্যবোধ আমাদের আমা-ব্যক্তিগত জীবনেও অত্যন্ত দরকারী।

যেমন, বাইরের ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে সুখশান্তি বিসর্জন দিয়ে বসতে পারি, কখনো বা সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে তোলার আগ্রহ সৃষ্টি না করার ফলে নিজের চারিপাশে ভালো বন্ধুর সংখ্যা কমে যেতেও দেখি। হয়তো সমালোচনার মানসিক পীড়নে নিজের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলি, কিংবা, তার ঠিক উল্টোটাও ঘটতে দিই—নিজেই নিজেকে এতো চমৎকার মানুষ বলে ভাবতে থাকি যে, অন্য কাউকে আর গ্রাহ্যই করি না।

এসব কেন হতে থাকে জানেন?...মূল্যবোধ সম্পর্কে একটা ভুল ধারণার জন্যে।

নীচের মনোপ্রশ্নচর্চাটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যাতে আপনি নিজের মূল্যবোধ যাচাই করে নিতে পারেন। প্রত্যেক প্রশ্নে "হ্যাঁ" কিংবা "না" জবাব দিন এবং সবশেষে পয়েন্ট হিসাব করে দেখুন।

১। যখন কোনো ভালো কাজের জন্যে আপনাকে চাঁদা দিতে বলা হয়, তখন অন্য লোকে আপনার চেয়ে বেশি চাঁদা দিচ্ছে দেখে বিব্রতবোধ না করে, আপনি কী আপনার সাধ্যমত চাঁদা দিয়ে থাকেন?

২। বলতে পারেন, পাড়া-প্রতিবেশিরা যেভাবে থাকেন, ঠিক সেইভাবে বা তাঁদের চেয়েও ভালোভাবে থাকতে পারেন, সেটা প্রমাণ করবার জন্যে আপনি প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন কিনা?

৩। খরচপত্রের বিল মেটাতে গেলে নিজের দরকারী কয়েকটা জিনিস কেনা বাদ পড়ে যাবে, একথা বোঝা সত্ত্বেও আপনি কী বিলপত্তর ঠিকমতো শোধ করে দেন?

৪। যখন আপনি কম দামের সীটে বসে সিনেমা বা থিয়েটার দেখেন, তখনও কী বেশ তৃপ্তি উপভোগ করেন?

৫। কোনো নাটক বা ফিল্ম দেখবার জন্যে কতো লোক লাইন দিয়েছে কিংবা কতোজন সেরা নায়ক-নায়িকা তাতে নেমেছেন, তার মাপকাঠি দিয়ে নাটকটি বা ফিল্মটির বিচার না করে, আপনি নিজে কতোখানি তৃপ্তি-আনন্দ তা থেকে পেয়েছেন, তাই ভেবেই কী বিচার করে থাকেন?

৬। লোকজন এলে তাদের জন্যে উঁচু ধরনের আপ্যায়ন জানিয়ে ভালো মনোভাব সৃষ্টি করতে গিয়ে প্রাণান্তকর চেষ্টা না করে, আপনি নিতান্ত ঘরোয়া আপ্যায়ন জানান কি?

৭। আপনি হয়তো ঘর পরিষ্কারের কাজে ব্যস্ত, তখন লোকজন দেখা করতে এলে যে-মজা সৃষ্টি হয়, আপনি কী সেদিকেই মন দেন?

৮। কোনো অপরিচ্ছন্ন আদবকায়দাহীন লোক পাঁচজনের সামনে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এলে আপনি কি অস্বস্তি বোধ না করে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারেন?

৯। সন্ধ্যাবেলাটুকু আড্ডায় বা সিনেমায় গিয়ে যে তৃপ্তি আপনি পান, ঠিক তেমনি তৃপ্তি এবং হয়তো তার চেয়েও বেশি তৃপ্তি কী আপনি বোধ করেন। বাড়ীতে শান্তভাবে ঐ সময়টুকু কাটালে?

১০। আপনি কী বিশ্বাস করেন, সাফল্য অর্জন করার চেয়ে সুখ-শান্তি অর্জন করার দরকার বেশি?

১১। প্রশংসা এবং সাধুবাদ না পেয়েও কী আপনি সুখী থাকতে পারেন?

১২। অন্য পাঁচটা লোকের চেয়ে আপনি বেশি ভালোও নন, বেশি খারাপও নন—এই রকম একজন সাধারণ মানুষ বলে কী আপনি নিজেকে মনে করেন?

১৩। মনের মধ্যে রাগ অথবা বিষন্নতা কোনটাই সৃষ্টি না করে আপনি কী আপনার সম্পর্কে কোনো সমালোচনা যাচাই করতে পারেন?

১৪। যাঁকে কাজে লাগাবি, তাঁকে বন্ধু বলে গ্রহণ করার চেয়ে, যাঁকে আপনার ভালো লাগে, তাঁকে বন্ধুরূপে স্বীকার করতে কী আপনার ইচ্ছে হয়?

১৫। অপদস্থ বা ব্যর্থ হলেও আপনি কী বন্ধুর পাশে থাকেন?

১৬। ভালোভাবে বিবেচনা করার পর যে সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি কাজ করছেন, তার জন্যে লোকে আপনাকে বোকা বলে ভাবলেও কী আপনি ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারেই চলতে থাকেন?

১৭। আপনার ভুল-ত্রুটি হলে আপনি হাসতে কী পারেন?

১৮। আপনার কি কি কর্তব্য, সেই সঙ্গে কি কি অধিকার, সে-বিষয়ে কী আপনি সচেতন?

১৯। যৌনতা সম্পর্কে এবং আপনার নিজের যৌন আচরণ সম্পর্কে আপনার মনোভাব কী এমন, যাতে মনে হয়, আপনার কাছে যৌন ব্যাপার একান্ত দরকারী নয়?

২০। পুজো-পার্বণ, প্রার্থনার জায়গায় আপনি কী যান?

প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ' জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে হিসাব করুন। ৭০ পয়েন্ট ভালো, ৬০ থেকে ৭০-এর মধ্যে পেলে বেশ সন্তোষজনক। ৫০ থেকে ৬০ পেলে মন্দ নয়। ৫০-এর নীচে পেলে ভালো নয়, এবং যিনি এই কম পয়েন্ট পাবেন, তাঁর উচিত, ওপরের প্রশ্নগুলিতে যেসব বিষয়ে আভাস দেওয়া হয়েছে, সেগুলি অনুসরণ করে এখুনি তাঁর মূল্যবোধের মাত্রা শুধরে নেওয়া।

কোনটা আদর্শ, এবং সমাজে তার কতোখানি মূল্য আছে ঠিকমতো যিনি তা বুঝতে পারেন, বলবো, তাঁরই উচিতমতো মূল্যবোধ আছে।

মনে হয়, জোর করে কোনো জিনিসে মূল্য আরোপ করতে গেলে তার মর্যাদা কমে যায়। স্বাভাবিকভাবে যা কিছু করা যায়, তারই মূল্য সম্ভবতঃ সমাজে সবার কাছেই বেশি। তাই নয় কি?

এমন কি, একথাও অনেকে বলতে পারেন—সামাজিক মর্যাদা লাভের লোভে আমরা যখনই আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ আচরণে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করতে থাকি, তখনই মূল্যবোধের লক্ষ্য অনুভূতিটা ভোঁতা হয়ে পড়ে। অস্বীকার করতে পারবেন কি?

প্রদর্শনী পরিক্রমা

ক্রিয়েটিভ আর্টস-এর কাঠের কাজ
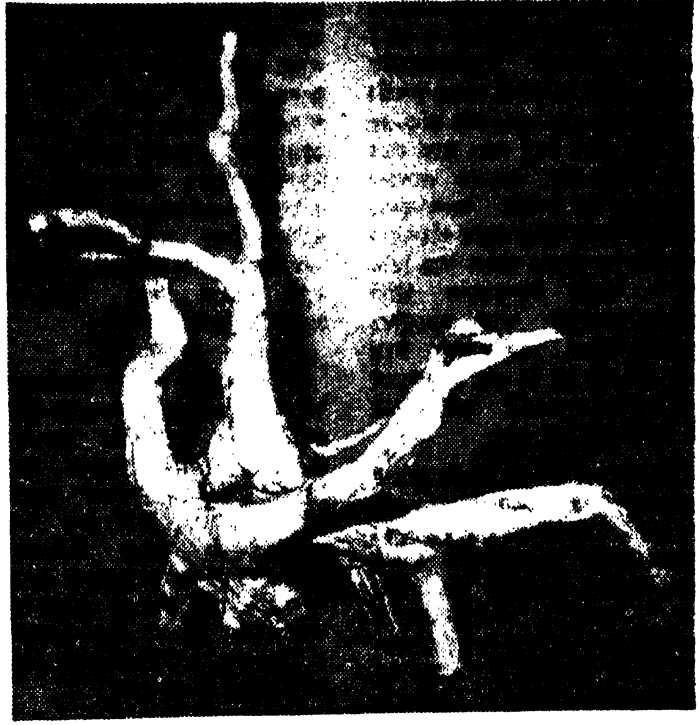
শিল্পীগোষ্ঠী নামে নতুন একটি তরুণ শিল্পী সংস্থা কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে ৩১ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট তাঁদের ড্রয়িং ও জলরঙের একটি যৌথ প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। চারজন শিল্পীর ৩২খানি ছবির মধ্যে তাঁদের পরিণতির চাইতে প্রচেষ্টাটুকুই ধরা পড়েছিল বেশী। শিল্প-শিক্ষা সমাপনের জন্যে যতটুকু ন্যূনতম সময় দেওয়া দরকার তার বেশ কিছু আগেই যেন এঁরা প্রদর্শনীর আয়োজন করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন।

শিল্পী নীতীন বিশ্বাস যে প্রতিকৃতির ড্রয়িংগুলি উপস্থিত করেন অতিরিক্ত ঘসামাজির ফলে তার মধ্যে এক ধরনের রোমাইড এনলার্জমেন্টের ভাব এসেছে। একটির মাথায় লাল সিঁদুর পরিয়ে এই ভাবটি যেন আরো বেশী পরিস্ফুট করা হয়। চায়ের দোকান বা গরুর জলরঙের ছবিগুলিতে ড্রয়িং-এর দুর্বলতা ও কম্পোজিশনের দুর্বলতাও পরিস্ফুট।

স্বপন ভট্টাচার্যের কিছুটা আধুনিক ঘেঁষা কম্পোজিশনগুলিও নয়নমনোহর হয় নি। 'লাইফ' সিরিজের প্যাস্টেল ও জলরঙের কাজে সেন্টিমেন্টালিটি প্রচুর, কিন্তু চিত্রপট সজ্জার প্রচেষ্টা ততখানি নয়। বিভিন্ন ধরনের শ্রমিকদের ছবি তিনি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তার মধ্যে ঠেলাওয়ালার ছবিটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

শ্রীমতী পেলটো বিশ্বাসের 'সরস্বতী' এবং 'ডিজাইন' নিছক ডেকরেটিভ কাজ। চন্দ্রশেখর আচার্য দশখানি জলরঙের ছবিতে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মানব জীবনের পরিবর্তনশীল অবস্থাকে ধরে তোলবার চেষ্টা করেছেন। শিল্পীর আকাঙ্ক্ষা যতদূর কর্মকুশলতা দুর্ভাগ্যের বিষয় ততখানি এগোতে পারে নি। তিনি কখনো আধা-ফিগারেটিভ কখনো বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট রীতির সাহায্য নিয়েছেন এবং নানা রকম প্রতীকের ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টি ও প্রসবের বেদনা একটু স্থূল প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে। মাতা ও সন্তান ছবিটি মন্দ হয় নি। কয়েকটি শাদা বন্ধনী রেখার মধ্যে হস্ত-পদ বিস্তার করা নরদেহ এঁকে জীবনযুদ্ধ বোঝানো হয়েছে। দুটি বিভিন্ন বর্ণের ক্ষেত্র পরস্পর যুক্ত করে বোঝানো হয়েছে প্রেম। তরুণ শিল্পীদের কাছ থেকে আরেকটু সবল ও সতেজ ছবি দেখতে পেলে আনন্দিত হওয়া যেত।

●

আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এ ছয় থেকে ১২ আগস্ট একজন ভাস্করের ১৮টি শিল্প-কর্মের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কিছুকাল

শর্মিলা। শিল্পী : বিপুলকান্তি সাহা
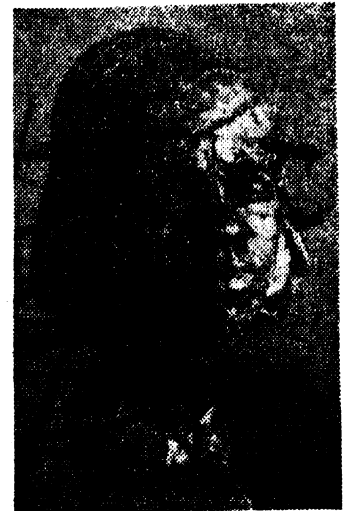
নাগাভূমির সরকারের শিল্প উপদেষ্টা ছিলেন। বেশ কিছুকাল পূর্বে কলকাতায় তাঁর একটি ছোট একক প্রদর্শনী হয়ে গিয়েছিল। তার দু-একটি ছবিও এখানে দেখা গেল। আটখানি জলরঙ ও চারটি তেলচিত্রের মধ্যে তাঁর আধা-ফিগারেটিভ এবং ডেকরেটিভ ফ্যান্টাসির সাক্ষাৎ মিলল। জলরঙের কাজগুলি সূক্ষ্ম পেন ড্রয়িং-এর ওপর স্বচ্ছ ওয়াশ দিয়ে করা। মাঝে মাঝে গ্রাফিক প্রিন্টের মত এফেক্ট এসেছে। তাঁর দুই ও আট নম্বরের কম্পোজিশনে এই ভাবটি একটু অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট। উপজাতীয় শিল্পকর্মের আভাস নিয়ে তিনি কিছু সুদৃশ্য কম্পোজিশন সৃষ্টি করেছেন। তেলরঙের কাজে নাগাভূমির উপজাতীয় জীবনে খৃষ্টের স্থান নিয়ে একটি ছবি মন্দ হয় নি এবং নয় নম্বরের ছবির উপজাতীয় কয়েকটি প্রতীক নিয়ে করা কম্পোজিশন মন্দ নয়।

বিমানবিহারী দাস যে ছয়খানি কাঠ ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য উপস্থিত করেন তার মধ্যে একটি পোড়ামাটির লাইফ স্টাডি ছাড়া সবগুলিই অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দু-একটি কাজ ইতি-পূর্বে সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছিল। কাঠের আপ-রাইট ফর্ম-এর টেক্সচার এবং পাঁচ ও ছয় নম্বর টেরাকোটা ফর্ম দুটির গঠনপারি-পাট্যে মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

●

বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে অল্প দিন হল 'ক্রিয়েটিভ আর্টস' নামে একটি শিল্পী সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ'রা কিছু সুদৃশ্য শিল্পদ্রব্য গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে প্রদর্শন করছেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ শিল্পীদের মধ্যে বন্টন করা হয় বলে জানা গেল। পাঁচ থেকে এগারো আগস্ট পার্ক স্ট্রীটের 'ক্যালক্যাটা ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনে' এ'দের শতাধিক শিল্পবস্তুর একটি প্রদর্শনী করা হয়। প্রধানতঃ এ'রা গাছের ডাল কেটে তার থেকে বিভিন্ন জীবজন্তু, মানুষ ও পাখির ফর্ম সৃষ্টি করেছেন—কতকটা অবনীন্দ্র-নাথের কুটুম-কাটামের অনুকরণে। তবে অনেকগুলি কাজ একটু যাকে বলে অগোছালো ঠেকল। কিন্তু ১৫।২০টি ছোট ছোট জীবজন্তু ও মানুষের ফর্ম সুদৃশ্য হয়েছিল। এছাড়া ছবির সঙ্গে এ ধরনের গাছের ডাল জুড়ে যে ডেকরেশন সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি বিশেষ সুদৃশ্য বলা যায় না। তবে কয়েকটি পুষ্পাধার রূপে ব্যবহার যোগ্য কুটুম-কাটাম প্রশংসনীয়।

●

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ ৮ থেকে ১৪ আগস্ট অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে একটি মাঝারি মাপের চিত্র ভাস্কর্য ও গ্রাফিকসের প্রদর্শনী করলেন। নয়জন শিল্পীর ৪৭খানি শিল্পকর্মে আধুনিক রীতির প্রভাবটাই প্রধান দেখা গেল। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন শিল্পরীতির থেকে এ'রা বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। শিল্পকর্মের মধ্যে জলরঙের চাইতে তেল-রঙের চর্চাই অধিক এবং ডেকরেটিভ ও অ্যাবস্ট্রাক্ট রীতির নমুনাই সবচেয়ে বেশী দেখতে পাওয়া গেল।

অরুণ পালের পাঁচখানি তেলরঙের কাজে কিছুটা সুর-রিয়্যালিস্টিক আমেজ দেখা যায়। নৃত্যরত পোষাক ও অ্যানিমেটেড পাঞ্জাবি মন্দ লাগে না। পাঁচ নম্বর ছবির ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পটভূমিকায় কয়েকটি রঙের টুকরো জোনাকির মত সজ্জিত। ধর্ম-নারায়ণ দাশগুপ্ত তান্ত্রিক প্রতীক নিয়ে কাজ করেছেন। ঘোর লাল জমিতে কখনো কালো সবুজ বা বিভিন্ন ধূসর বর্ণের ওপর রঙীন কাঁচের টুকরো সাজিয়ে এবং অক্ষর মালার ডেকরেশন দিয়ে যে ছবিগুলি তিনি সৃষ্টি করেছেন সে ধরনের চিত্রের চর্চা একেবারে নতুন নয়। শচীব্রত দেবের জল-রঙের ওপর ম্যাস্টিক ভার্নিশ লাগানো উজ্জ্বল ছবিগুলিতে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-চর্চার আমেজ পরিস্ফুট, 'ব্লু বার্ড' এবং 'ফেস ১' ছবি দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তনু ভট্টাচার্যের লিথোগ্রাফগুলির প্যাটার্ন সুদৃশ্য। তবে তাঁর একবর্ণের কাজ 'লেজি ম্যান' অত্যন্ত সংযত এবং একটি সুন্দর মুড সৃষ্টি করেছে। তাঁর জলরঙের "পীকক"-এর ক্যালিগ্রাফি লক্ষণীয়। অমিত রায় এক রঙা প্যানেলে ফিগার ও গাছপালার সাহায্যে কতকটা ম্যুরাল ধর্মী ছবি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মুন্সীয়ানার অভাবে ছবিগুলি জমে নি। পার্থপ্রতিম দেব ফ্ল্যাট রঙের প্রয়োগে যে ফিগার ও অ্যাবস্ট্রাকশন উপস্থিত করেন তার মধ্যে "রোমান্স" ছবির সরল রঙের বাহার মন্দ হয় নি। তবে সব কটি ছবিই গ্রাফিক মাধ্যমে বোধহয় আরো সুন্দর হত। চিন্ময় রায়ের গ্রাফিকগুলি বহু-বর্ণের। তার মধ্যে লোকশিল্প প্রভাবিত 'টয় ২' কাজটির ডিজাইন পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

ভাস্কর্য বিভাগে বিপুল সাহার 'দি আর্টিস্ট' 'সুশীলদা' ও 'শর্মিলা' নামে তিনটি রামকিঙ্করের স্টাইলে করা প্রতিকৃতি বেশ জোরালো কাজ। অতুল বড়ুয়ার তিন টুকরো অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম নিয়ে তৈরী 'কম্পোজিশন ইন উড' প্রশংসনীয় কাজ। তাঁর সিমেন্টের বড় কাজ 'সাইলেন্স ইন কেয়স' অনেকগুলি ফিগারের গ্রুপ নিয়ে তৈরী এবং একটু ভিন্ন আস্বাদের সন্ধান দেয়।

—চিত্ররসিক
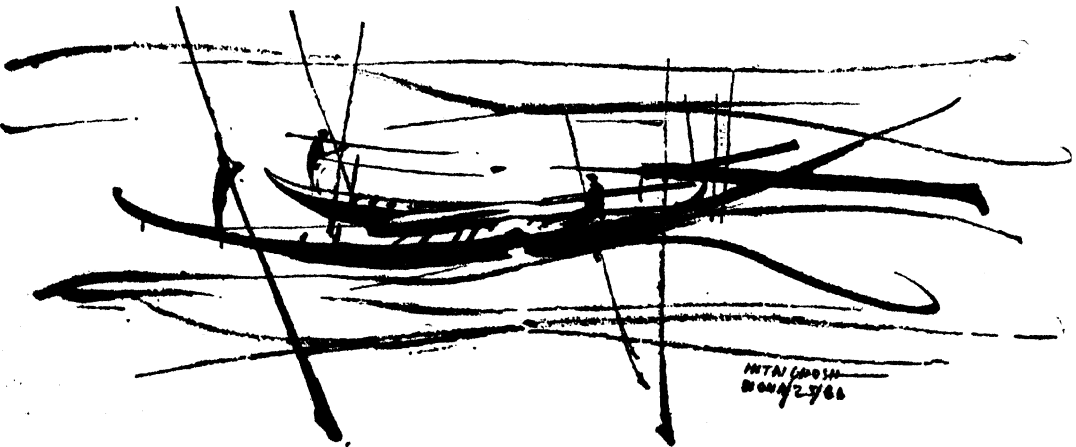
সকালে রেডিও আরম্ভ হয় শানাইয়ের মাঙ্গলিক সুরে বাজিয়ে। তারপর বন্দেমাতরম্ গান। তারপর জ্ঞানীগুণী মানুষদের রচনা থেকে পাঠ। তারপর সঙ্গীতাঞ্জলি।

সঙ্গীতাঞ্জলি ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান, সঙ্গীতাঞ্জলিকে ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠান বলেই ঘোষণা করা হয়ে থাকে। গানের মূলে ভক্তি থাক বা না থাক, ঐ ভক্তিমূলক ঘোষণাটা শুনতে ভালোই লাগে।

এই সঙ্গীতাঞ্জলির অনুষ্ঠান যখন হয় তখন শ্রোতারা অনেকে বিছানা ছেড়ে উঠেছেন, অনেকে উঠি উঠি করছেন, অনেকে তখন উঠবেন না বলে পণ করে শুয়ে আছেন। সকালের এই অকারণ আলসেমিটা তাঁদের সারা দেহমনের উপর চেপে বসে একটা রমণীয় আরাম দেয়। ইচ্ছে করে, ঈষদুষ্ণ এক কাপ চা আসুক। মন চায়, নম্রকণ্ঠে একটু গান হোক।

বিবিধ ভারতীর পসাময় হালকা চটুল হিন্দী গানের পরম ভক্ত যাঁরা, তাঁরাও তখন ভক্তিমূলক গানে অভিভূত না হয়ে পারেন না। এমনই সকালের পরিবেশ এমনই সকালের মন।

সঙ্গীতাঞ্জলি অনুষ্ঠানটি সুচিন্তিত সময়োচিত—এ কথা স্বীকার করেও এই অনুষ্ঠানের রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদের গান, দ্বিজেন্দ্রগীতি এইসব ছাড়া অন্যান্য গানের প্রশংসা করা যায় না। না কথার, না সুরের—না গানের। অনেক সময় মনে হয়, ঐ যে রাস্তা দিয়ে খঞ্জাল বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে নকল সাধু, যে গানের শিক্ষা পায় নি, দীক্ষা নেয় নি ভিক্ষার জন্য গানকে করেছে আপন —তার গানের চেয়েও এই গান বেশি নিকৃষ্ট। তার ভাবের চেয়েও এর ভাব কম। তার আন্তরিকতার চেয়েও এর আন্তরিকতা কম।

কিন্তু কেন? কেন এমন হয়? এই অনুষ্ঠানের গানগুলি তো গ্রামোফোন রেকর্ডের নয় যে, সহজে দায়িত্ব এড়ানো যাবে! এগুলি স্টুডিও রেকর্ডের গান, অর্থাৎ তার ভালোমন্দের জন্য দায়ী রেডিওরই ভারপ্রাপ্ত কর্মিগণ। রেডিওর ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা যদি আরও যোগ্য গীতিকারদের দিয়ে গীত রচনা করান, আরও যোগ্য সুরকারদের দিয়ে সুরসংযোজনা করান ও আরও যোগ্য গায়ক-গায়িকাদের দিয়ে গাওয়ান—এবং শ্রোতাদের উপর দিয়ে এঁদের কারও প্রীতি উৎপাদনের চেষ্টা না করেন আর রেকর্ডিংয়ের সময় নিজেরা একটু বেশি করে আন্তরিক হন তাহলে এই অনুষ্ঠানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেতে পারে, শ্রোতারা খুশি হতে পারেন।

এই প্রস্তাব নতুন কিছু নয়, রেডিওর কর্মীদের অজানাও নয়—এই প্রস্তাবে শুধু কর্তব্যে অবহেলার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হচ্ছে, কর্তব্যটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ভারতের বড়ো বড়ো চোদ্দটি ব্যাঙ্ক "ন্যাশন্যালাইজ" করা হয়েছে, "নেশনাইজ" করা হয়েছে এমন কথা কোথাও বলা হয় নি। তবু রেডিও থেকে অবিরাম "রাষ্ট্রীকরণ" বলা হচ্ছে। মনে হয়, একটি বাংলা সংবাদপত্রের অনুকরণেই তা হচ্ছে, এবং প্রকৃত অর্থ না বুঝেই। একটিমাত্র বর্ণ সংক্ষেপ করার জন্য এমন অর্থবিকৃতি কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

"ন্যাশন্যালাইজেন"-য়ের বাংলা বহুকাল থেকে "রাষ্ট্রীয়-করণ" বা "জাতীয়করণ" চলে আসছে—যদিও "রাষ্ট্রায়ত্তকরণ" বললেই অর্থ বেশি সুস্পষ্ট হয়। হঠাৎ এই প্রচলিত শব্দের পরিবর্তনের কী জরুরী প্রয়োজন হল বোঝা মুশকিল। কোনো প্রচলিত শব্দের পরিবর্তন যদি অনিবার্য হয়ে ওঠে তাহলে একটু চিন্তা করে সেই পরিবর্তন করা উচিত, লক্ষ্য রাখা উচিত অর্থেরও যেন পরিবর্তন না হয়।

একটিমাত্র বর্ণ সংক্ষেপ করে রেডিওর যে সময় বাঁচে তাতে কোনোক্রমেই আর একটি খবর বলা যায় না, ছোট্ট খবরও না—পরিশ্রমও বিশেষ কমে না। তাহলে এই সংক্ষেপের প্রয়োজন কী? নতুন কিছু করার আনন্দ? শ্রোতাদের চমকে দেওয়া?

এইরকম চমকে দেওয়ার মতো আর একটি শব্দ "নভচর"। "অ্যাস্ট্রোনট" আর "কসমোনট" বলে দুটি কথা আছে, দুটিরই একই অর্থ। আমেরিকানরা বলে অ্যাস্ট্রোনট, আর রাশিয়ানরা কসমোনট। বাংলায় দুটিকেই মহাকাশচারী বলা হয়, অথবা নভশ্চর। নভঃ+চর=নভশ্চর নভচর নয় কোনো মতে। কিন্তু রেডিও থেকে অবিরাম নভচর বলা হচ্ছে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৪ঠা আগস্ট সকাল ৭টা ৪৫ মিনিট ও রাত ১০টা ৩০ মিনিটে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী পূর্বা সিংহ। শিল্পীর কণ্ঠ মার্জিত, উচ্চারণ স্পষ্ট—ভাবিব্যং প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। সকালের চেয়ে রাত্রের অনুষ্ঠানটিই তাঁর বেশি সুন্দর।

এইদিন রাত ৭টা ৪৫ মিনিটের সমীক্ষায় নৃত্যকলা বিষয়ে বললেন শ্রীমতী অমলাশঙ্কর। প্রায় চার মিনিটের এই সমীক্ষায় বেশ সংক্ষেপে, সুন্দর করে ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাস, তার ভাবধারা, তার আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির একটা পরিচয় দিলেন তিনি। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠে

এই পরিচয় বেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। ...ভালো লেগেছিল।

রাত ৮টায় "বাংলা কাব্যের ধারা" এই পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সমকালীন সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলেন শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। শুধু আলোচনাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ কবির কবিতাও পাঠ করে শোনালেন তিনি। ...আলোচনা প্রাঞ্জল, কবিতা পাঠ মধুর। এমন সহজবোধ্য মনোজ্ঞ সাহিত্যিক আলোচনা খুব সুলভ নয় রেডিওয়। পূর্ব পাকিস্তানের তরুণ কবিদের রচনার প্রতি গভীর মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে এই আলোচনায়, আর কবিতা পাঠে আন্তরিকতা।

৬ই অগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বিচিত্রা-নুষ্ঠানে প্রচারিত হল রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন" নাটকটি। প্রযোজনা করলেন অনুশীলন সম্প্রদায়, পরিচালনা শ্রীমমতাজ আমেদ খাঁ।

নাটকটি জমেনি মোটে। অভিনয় মনে রেখাপাত করে নি, অভিনয় বলেই মনে হয় নি। মনে হয়েছে, শিল্পীরা বই দেখে পদ্য পড়ছেন। পড়ায় প্রাণের আবেগ ছিল না, হৃদয়ের অনুভূতি না—চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াসও না।

তবু তারই মধ্যে রঘুপতির ভূমিকায় শ্রীবীরেশ্বর সেনের অভিনয় কিছুটা উল্লেখ্য। রঘুপতির জিঘাংসার ভাবটা ফুটিয়ে তোলায় তাঁর চেষ্টাটা বোঝা গেছে। জয়সিংহের ভূমিকায় শ্রীমমতাজ আমেদ খাঁ অতি সাধারণ। গোবিন্দমাণিক্যের ভূমিকায় শ্রীঅশোক ঘোষালও তাই।

নাটকটির আবহসংগীত অত্যন্ত বেমানান—এবং বিরক্তিকর। এই নাটকে আবহসংগীতেও যে একটা বড়ো ভূমিকা আছে সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

এইদিন রাত ৮টায় সাহিত্য বাসরে স্বরচিত গল্প পড়ে শোনালেন শ্রীপ্রভাত দেব সরকার ও শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রভাত-বাবুর সরল, অনাড়ম্বর গল্পটিতে সমাজের একটা সমস্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে, সমস্যাটাকে তিনি নতুন করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। তাঁর গল্প পড়ার ভঙ্গিটা যদিও খুব মনোগ্রাহী নয়, তবু বক্তব্যটা স্পষ্ট। ...শ্যামলবাবুর রচনাশৈলী প্রশংসনীয়। পড়ার ভঙ্গিটাও ভালো। যতিচিহ্নের মান রেখে ছোটো ছোটো কথায় তাঁর গল্পটা শুনতে ভালোই লেগেছে। কিন্তু এ শুধুই গল্প, তার বেশি কিছু নয়—মনে রাখার মতো নয়।

৭ই অগস্ট সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটে "পল্লী উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ" এই বিষয়ে বললেন শ্রীকমলাকান্ত ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ যে কেবল নাগরিক কবি নন, পল্লীর মানুষের অব্যক্ত বেদনাও যে তাঁর রচনায় ভাষা পেয়েছে, তাদের দুঃখদুর্দশাও যে তাঁর মনে বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে; তিনি যে তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য ভেবেছেন, পরিকল্পনা করেছেন, কাজ করেছেন—সেই কথাই এই কথিকায় সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। বেশ সুন্দর করেই হয়েছে। ...কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়নে শ্রীনিকেতনের ভূমিকাটি অনুক্ত রইল কেন? শ্রীনিকেতনকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা কি সম্পূর্ণ হয়?

৮ই অগস্ট রাত ৮টার নাটক "ডাকঘর"। রচনা রবীন্দ্রনাথ। এই সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথের দুটি নাটক শোনা গেল, একটি "বিসর্জন", আর একটি "ডাকঘর"। "বিসর্জনে" অ্যাকশন আছে, কিন্তু অভিনয়ের দোষে জমে নি। "ডাকঘরে" অ্যাকশন কম, নাটকটা দাঁড়ায় অভিনয়ের জোরে, অভিনয়ের জোরেই নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবটা ফুটে ওঠে, কিন্তু এই অভিনয়ে নাটকে বেগ সঞ্চারিত হয় নি, ভাবটাও বড়ো করে ফোটে নি।

তবু "বিসর্জনের" তুলনায় "ডাকঘরের" অভিনয় ভালো। অমলের ভূমিকায় শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় ভালো অভিনয় করেছে। সুধার ভূমিকায় রত্নাও ভালো (রত্নার পুরো নামটা বলা হয় নি)। অন্য সকলের অভিনয় নিরুত্তাপ। তারই মধ্যে পিসেমশায়ের ভূমিকায় শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায় ও প্রহরীর ভূমিকায় শ্রীসতীশ চক্রবর্তীর অভিনয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিরাজ শ্রীনৃপেন মুখোপাধ্যায় মোটামুটি, মোড়ল শ্রীসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও তা-ই। গুরুত্বপূর্ণ ঠাকুরদার ভূমিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর অভিনয়ে খুশি হওয়া যায় নি। ঠাকুরদা তাঁর অভিনয়ে স্বরূপে ধরা পড়েন নি।

এইদিন রাত ১০টা ১৫ মিনিটে ইংরেজী নিউজ রীলটি বেশ প্রাণবন্ত, গ্রন্থনা নাটকীয়তাপূর্ণ। কিন্তু বিষয়গুলি খুব সংক্ষেপে সারা হয়েছে—বিশেষ করে, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের পাইলট শ্রীমতী দুর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়টি। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বৈমানিক জীবনের সবচেয়ে উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্মরণীয় ঘটনা বাগডোগরা থেকে দমদম আসার সময়ে বিমানের একটি এঞ্জিনে আগুন লাগার ঘটনা। এই ঘটনায় এক সেকেণ্ড তাঁর কাছে এক ঘণ্টা বলে মনে হয়েছিল, পথ আর ফুরোচ্ছিল না। শ্রোতারা গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাহিনী শুনছিলেন—কিন্তু কাহিনীটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় নিউজ রীলের প্রতিনিধির কাছে এই কাহিনী কতখানি বলেছিলেন জানা নেই, কিন্তু এই রকম অসম্পূর্ণ কাহিনী যে বলতে পারেন না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। মনে হয় এডিটিংয়ে পারম্পর্যহীনভাবে সংক্ষেপ করা হয়েছে, অসম্পূর্ণ রাখা হয়েছে—সমস্ত অনুষ্ঠানটির সৌন্দর্যহানি করা হয়েছে।

—শ্রবণক

জলসা

ইউরোপ সফররত ইমরাত খাঁ

বিলায়েত-ভ্রাতা ইম্‌রাত খাঁর দুমাস-ব্যাপী ইউরোপ-সফর সম্পূর্ণ প্রায়। সম্প্রতি মাইকেল জীন্‌স ডিরেকসন (লণ্ডন) প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে জানা গেল, ইংল্যাণ্ডে কুইন এলিজাবেথ হলে তিনি ১৫টি অনুষ্ঠানে এবং রয়েল কলেজে দুটি অনুষ্ঠানে বাজিয়ে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন।

কুইন এলিজাবেথ হলে কৃতিত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের পর রেডিওতে তিনি তিনটি অনুষ্ঠানে বাজাবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। শুধু কি তাই? বি বি সি থেকে সান্ধ্য-অনুষ্ঠানের টেলিভিশন অনুষ্ঠানে ইমরাৎ সাদরে আমন্ত্রিত হন। স্বল্প দু-একজন শিল্পীছাড়া এ সম্মান বিশেষ কেউ পাননি বলে মিঃ মাইকেল জীন্‌স জানিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত তবলা-সঙ্গত করে প্রশংসা অর্জন করেছেন মহাপুরুষ মিশ্র। ওদেশের সংবাদপত্র মিউজিক অ্যাণ্ড মিউজিশিয়ান বলছেন, "বিভিন্ন ভারতীয় যন্ত্রের মধ্যে সেতারই যে এদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সে কৃতিত্ব নিশ্চয় শঙ্করের। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে ওস্তাদ ইমরাৎ খাঁন পরিবেশিত সুরবাহার ২৭ মে এলিজাবেথ হলের শ্রোতাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে।......গায়কী অঙ্গে পরিবেশিত মর্যাদামণ্ডিত রাগ দরবারী কানাড়ার অলঙ্কার ও মীড়ের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে অভিভূত না হয়ে থাকা যায় না। ......তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিলায়েৎ রচিত চাঁদনী কল্যাণ-এর রোমান্স গভীর ভাব ও আবেদন সৃষ্টিশীল পর্দা-সমন্বয়ে অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে ওঠে।"

বি বি সি-তে পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র এবং শ্যামল লোধের সঙ্গে ওস্তাদ ইমরাত খাঁ

রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ "শ্যামা"

১৩ আগস্ট রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ "ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ ব্যালে ট্রুপে পরিবেশিত 'শ্যামা' সঙ্গীতসম্পদে সমৃদ্ধ এক আবেগ-রঙিন অনুষ্ঠান। সঙ্গীত নাট্য ও নৃত্য এই তিনটি বস্তুর এক মর্মস্পর্শী সমন্বয় "শ্যামা" জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী। সেদিনের অনুষ্ঠানে এই ত্রি-ধারার প্রতি যথোপযুক্ত আলোকপাত করার প্রয়াসের আন্তরিকতা সুপরিলক্ষিত। তবু বলব তুলনামূলক বিচারে নাচ, ততটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি যতটা হয়েছে গান। সঙ্গীতপরিচালনায় ছিলেন ধীরেন বসু। বজ্রসেন ও শ্যামা চরিত্রের সঙ্গীতে কন্ঠদান করেন যথাক্রমে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। বজ্রসেনের চারিত্রিক দৃঢ়তা, শৌর্যদৃপ্ত প্রণয় ও পৌরুষ, হেমন্তবাবুর সুগম্ভীর কন্ঠে যথাযথরূপে অভিব্যক্ত। 'শ্যামা'র রাজকীয় আভিজাত্য, ব্রীড়ামধুর প্রণয়, কৌতুক-সরস কারুণ্য দুর্বার আবেগ ও আত্মনিবেদন— কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবগম্ভীর অলঙ্কৃত কন্ঠে অপরূপ হয়ে উঠেছে। এজন্য শুধু শিল্পীর সহজাত কন্ঠ-সম্পদই নয় শান্তিনিকেতনে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অবদানও স্বীকার্য। উত্তীয়ের কিশোর-চিত্তের প্রকাশ-ভীরু প্রেম ও 'মধুর মরণে' সমর্পিত প্রাণের আনন্দ ও বেদনা—ধীরেন বসু মূর্ত করে তাঁর নিষ্ঠা ও শিল্পবোধ সম্বন্ধে সেদিনের শ্রোতাদের সচেতন করে তুলেছেন। বিশেষ করে উচ্ছল আবেগে গাওয়া "জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া"—গানটি অনেকদিন মনে থাকবে, যদিও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের কন্ঠে একাধিকবার এ গান শোনার সুযোগ হয়েছে এবং তা রসোত্তীর্ণও হয়েছে। এইখানেই তরুণ শিল্পীর স্বকীয়তা এবং তা রসিক শ্রোতার সুকন্ঠ তারিফ আদায় করে নিয়েছে। কোটালের নাটকীয়তার দায়িত্ব তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় পালন করেছেন। গোরা সর্বাধিকারীর গান সু-গীত।

নৃত্যাংশ সু-রচিত এবং অনাদিপ্রসাদের অভিজ্ঞতার ও মুন্সীয়ানার স্পর্শও অনুভূত। কিন্তু গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্পকৃতি তিনি দেখাতে পারেননি। তাঁর নৃত্য-মান নামের উপযোগী হলেও বজ্রসেনের ভূমিকায় যেন বেমানান। 'শ্যামা'—চরিত্রে করবী রায়চৌধুরীর নৃত্যে শিক্ষার অভাব ছিল না—তবে নায়িকা-জনোচিত ব্যক্তিত্ব স্বাক্ষরিত নয়। কোটালের ভূমিকায় শম্ভূ ভট্টাচার্য চরিত্রানুগ। সখীদের নৃত্যে লোকনৃত্যের অঙ্গ স্বাভাবিক এবং প্রাণবন্ত। উচ্চাঙ্গ-নৃত্যে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব দৃষ্টিতে পীড়িত করেছে। আলোক, সজ্জা সব মিলিয়ে 'শ্যামা' উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। নৃত্যনাট্যের আগে দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-সংগীত ছিল বিশেষ আকর্ষণ। একাধিক গানের দাক্ষিণ্যে শ্রোতাদের চিত্ত এ'রা ভরে দিয়েছেন। দেবব্রত বিশ্বাসের 'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে', সুচিত্রা মিত্রের "অশ্রুনদীর সুদূর পারে"—দ্বিজেনবাবুর "রাত্রি এসে যেথায় মেশে" এবং চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের 'সেদিন ভেসে গেছে' সেদিনের যাকে বলে 'হিট্‌-সং' ছিল।

—[illegible]

শ্যামা নৃত্যনাট্যে কণ্ঠদানকারী শিল্পীরা

প্রেক্ষাগৃহ

লীনা / মনকামীত

চিত্রসমালোচনা

সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি ভালবাসা

লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের নির্দেশকে রদ করবার জন্যে সারা বাঙলায় যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, উত্তরকালে তার থেকেই জন্ম নিয়েছিল বাঙালীর মনে বৈপ্লবিক চেতনা। এই বৈপ্লবিক চেতনাই বহু সংখ্যক বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সন্ত্রাসবাদিতার পথে এগিয়ে যেতে, বোমা-রিভলবার-বন্দুক-বারুদের সাহায্যে বিদেশী ইংরেজের অপসারণ ঘটিয়ে ভারতভূমিকে পরাধীনতা-শৃংখল থেকে মুক্ত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে। দেশের লোক এঁদের নাম দিয়েছিল—স্বদেশীবাবু, আর এঁদের প্রচেষ্টাকে বলত—স্বদেশী আন্দোলন। পদস্থ ইংরেজ রাজকর্মচারী ও পুলিসের বড়কর্তাদের প্রাণহানি ঘটানো ছিল এঁদের প্রথম ও প্রধান কাজ এবং দলের খরচ-খরচা নির্বাহের জন্যে সুযোগমত ডাকাতি করা ছিল এঁদের দ্বিতীয় কাজ। এই সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়েই ক্ষুদিরাম, কানাইলাল ফাঁসি বরণ করেছিলেন, ১৯৩০-এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনও এই সন্ত্রাসবাদী কার্যেরই শেষ অধ্যায়ভুক্ত।

—এই প্রস্তাবনাটুকুর প্রয়োজন আছে সঞ্চয়িতা ফিল্মস নিবেদিত দীনেন গুপ্ত পরিচালিত এবং রূপবাণী, অরুণা ভারতীতে মুক্তিপ্রাপ্ত **'বনজ্যোৎস্না'** ছবির কাহিনীর নায়ক মহীতোষের গোষ্ঠীটির কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। অবশ্য ছবিতে এই দলটিকে অর্গলবদ্ধ কক্ষে নেতার মুখের বক্তৃতা শোনা ছাড়া কোনও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায় না। ছবির পরিচয়-পুস্তিকা থেকে জানা যায় যে, "সামান্য কয়েকটি রিভলবারের সাহায্যে পুরো রেজিমেণ্টের সঙ্গে লড়াই করা অর্থহীন"; তাই দলনেতা অরবিন্দের নির্দেশক্রমে এরা আত্মগোপন করে রয়েছে। কিন্তু তবু নিস্তার নেই। "আহত পশুর মত পুলিসবাহিনী এদের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে" এদের জীবিত বা মৃত গ্রেপ্তার করবার জন্যে। ফলে মাঝে মাঝেই সংঘর্ষ বাধে। এমনই এক সংঘর্ষের সময়ে কাহিনীর নায়ক মহীতোষ গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে থাকে জলঢাকা নদীর পাড়ে। প্রাক্তন সৈনিক পাহাড়ী কুলদীপের যুবতী মেয়ে শিউকুমারী মহীতোষের জ্ঞান ফিরিয়ে এনে তাকে সাবধানে নিয়ে যায় নিজেদের আস্তানায় এবং সেখানে তাকে লোকচক্ষের আড়ালে রেখে সেবা-শুশ্রূষা করে ভালো করে তোলে। মহীতোষের মনও যেন তার দিকে ছুটে যেতে চায়। কিন্তু বিপ্লবী ছেলে মহীতোষের এই গোপনবাসের কথা কাঠের ব্যবসায়ী মিঃ ঘোষের স্ত্রী মায়ার বায়নোকুলার-আঁটা চোখে ধরা পড়ে যায়। মিঃ ঘোষের কামনালোলুপ মন বহুদিন থেকেই ঘোরাঘুরি করছিল শিউকুমারীর যৌবনদৃপ্ত দেহের পিছনে পিছনে। ঘোষ শিউকে ভয় দেখাল, যদি সে দেহ দান না করে, তাহলে মহীতোষকে সে পুলিশে ধরিয়ে দেবে। বাঙালীবাবুর নিরাপত্তার জন্যে শিউ অনেক ভেবে ঘোষসাহেবের বাংলোয় যায় তাঁর কামনার বলি হবার জন্যে। কিন্তু দৈব তাকে বাঁচিয়ে দিলেও

মহীতোষকে তার নিরাপদ আশ্রয় থেকে টেনে বার করেন প্রথমে তার দলনেতা অরবিন্দই। এবং এরই ফলে দলপন্থে মহীতোষ আবার পুলিশদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। মহীতোষ জখম হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে তার ক্ষতবিক্ষত দেহের নিকটবর্তী হতে গিয়ে শিউকুমারীও পুলিশের গুলির আঘাতে আহত হয় এবং শেষনিশ্বাস ফেলে মহীতোষের প্রাণহীন দেহকে মমতাভরে স্পর্শ করে।

বিপ্লবী মহীতোষের জন্যে পাহাড়ী মেয়ে শিউকুমারীর দরদভরা ভালোবাসা "বনজ্যোৎস্না" চিত্রকাহিনীর উপজীব্য। শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত এই কাহিনীতে যে চলচ্চিত্রের উপাদান যথেষ্টই ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সামিত ভঞ্জের নাট-নৈপুণ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমান ছবিতে তাঁদের কাছ থেকে চিত্রনাট্যের চাহিদা ছিল সামান্যই। তবুও চরিত্রানুগ অভিনয়ে দুজনেরই প্রাণবন্ত। শিউকুমারীর প্রতি কামনা-লোলুপ মিঃ ঘোষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কামু মুখোপাধ্যায়। তিনি চরিত্রটিতে আরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। মিসেস মায়া ঘোষের পূর্বতন বন্ধু (প্রণয়ী?) বিমলের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দিলীপ ভট্টাচার্য। কাজল গুপ্ত (মিসেস মায়া ঘোষ), পদ্মা দেবী (মহীতোষের মা), সবিতা বসু (মহীতোষের বৌদি) প্রভৃতির অভিনয় চরিত্রানুগ। নবাগতা মীনাক্ষী দত্ত ছাবর নায়িকা পাহাড়ী মেয়ে শিউকুমারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বলতে পারা যায় চরিত্রটির অন্তরকে তিনি বোঝবার চেষ্টা করেছেন এবং তাকে রূপ দেবার যথাসম্ভব প্রয়াসও পেয়েছেন। প্রথম চিত্রাভিনয়ে তাঁর ক্ষমতার পরিচয় স্পষ্ট। সুন্দর লেগেছে রত্না গোস্বামী অভিনীত নর্তকীর ছোট্ট ভূমিকাটি "যারে যা পাখী" গানের সঙ্গে তার সভঙ্গী নৃত্য যথার্থই চিত্তহারী।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মধ্যম মানের। বহু সময়েই সংলাপ পরিষ্কারভাবে শোনা যায়নি। পরিচয়-পুস্তিকায় মুদ্রিত পাঁচটি গানের মধ্যে তৃতীয়টি 'হৃদয়দোলার সুরে'—গানখানি হয়ত শেষ পর্যন্ত বাদ গেছে। বাকী গান চারখানির মধ্যে একখানি রবীন্দ্র-রচনা (ও আমার দেশের মাটি) এবং তিনটি নবাগত সঙ্গীতপরিচালক নীহার রায়ের রচনা। রচনা ও সুর-যোজনায় শ্রীরায় যথেষ্ট অভিনবত্ব ও মনোহারিত্ব দাবি করতে পারেন; 'বিশেষ ক'রে 'যারে যা' গানখানি রীতিমত উপভোগ্য।

ফরাসী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উৎসব

ভারত-ফ্রান্স সাংস্কৃতিক বিনিময় সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৬৯ ২২ মে তারিখে স্বাক্ষরিত কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উদ্যোগে যে ফরাসী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উৎসব ১১ জুলাই নয়াদিল্লীতে শুরু হয়, তাই বাঙ্গালোর, লক্ষ্ণৌ ও বোম্বাই পরিক্রমা ক'রে আমাদের এই কলকাতা শহরে এসে উপস্থিত হয়েছে ১৫ আগস্ট, ভারতের ২৩তম স্বাধীনতা দিবসে। স্থানীয় লাইট-হাউস সিনেমায় ১৫ থেকে ২১ আগস্ট, এই সাতদিনে সাতখানি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ফরাসী কাহিনীচিত্র প্রদর্শনীর জন্য অগ্রিম টিকিট বিক্রয় শুরু হয় ১২ তারিখ এবং তৃতীয় দিন সকালের মধ্যেই সকল শ্রেণীর টিকিট নিঃশেষিত হয়ে যায়। লাইট হাউসের কর্মকর্তাদের মতে কলকাতার মতো শহরে একখানি ফরাসী ছবির মাত্র তিনটি প্রদর্শনী ব্যবস্থা প্রয়োজনের অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

কিন্তু কেন এই চাহিদা? চলচ্চিত্রের কলিকাতাবাসী দর্শক সাধারণ কি সকলেই আর্টভক্ত হয়ে উঠেছেন? কিংবা ফরাসী চলচ্চিত্রের প্রতি আমাদের অত্যধিক অনুরাগের অন্য কোনও সঙ্গত কিংবা অসংগত কারণ আছে?

স্টুডিও থেকে

কিছুদিন ধরে এখানকার পরিচালকরা নতুন মুখের খোঁজে ফিরছেন। পেয়েছেন কিছু, কিন্তু ধরে রাখা যাচ্ছে না তাঁদের। পুরোনোর মোহ ছেড়ে নতুনের প্রতি এই আকর্ষণ সবার ক্ষেত্রেই যে নতুন আবিষ্কারের লোভ তা নয়। বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক বুদ্ধিই কাজ করে বেশী। একমাত্র প্রথম শ্রেণীর দু'একজন পরিচালক চরিত্রানুযায়ী শিল্পী নির্বাচন করেন। আর এ'দের কাছ থেকেই নতুন কিছু পাওয়া যায়। সম্প্রতি সেরকম ক'জন নজরে এসেছেন।

সত্যজিৎ রায় 'গুপী গাইন'-এর গুপীকে খুঁজছিলেন অনেকদিন ধরেই। অনেকের ইন্টারভিউও নিয়েছিলেন। তারপর অতর্কিতে একদিন লাইট হাউসের সামনে আবিষ্কার করলেন গুপীকে ওরফে তপেন চট্টোপাধ্যায়কে।

দুজনের পরিচয় ছিল আগে থেকেই। কিন্তু যোগাযোগ ছিল না। 'মহানগর' ছবির সেই ব্যাঙ্কের কেরানী হারিয়ে গিয়েছিল সত্যজিৎবাবুর মন থেকে। এক পলক দেখায় পরই সেদিন বিকেলে তাই বলেছিলেন তপনকে—'কাল একবার সন্ধ্যের দিকে বাড়িতে এসো।'

তারপর ঘটনার জাল ছড়িয়ে গেছে অনেকদূরে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরজা পেরিয়ে সত্যিই তপেন যখন পাড়ি জমালো সুদূর রাজস্থানের দিকে, তখনও তিনি ভেবে উঠতে পারেননি ছোটবেলা বাবার বকুনি খাওয়া 'বিচ্ছু' ছেলে সিনেমার 'হিরো' হবে!

কালীধন ইনস্টিটিউটে পড়ার সময় সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' নাটকে তপেনের প্রথম অভিনয়। তিনি খুব আনন্দের সুরে বলে উঠলেন—'জানেন, তখন একটা রুপোর মেডেল পেয়েছিলাম।' আর তখন থেকেই অভিনয়ে ঝোঁক এল। অবশ্য সে সময়ে যেসব নাটকে অভিনয় করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

'গুপী গায়েনে' যা কাজ দেখিয়েছেন

পান্না-হীরে-চুনী/সুখেন দাস এবং অনুপকুমার

উনি তা থেকে এটা নিশ্চিত যে অভিনয়ের ব্যাপারে ওঁর ক্ষমতা অনেক নতুনের চাইতে বেশী। সরল গ্রামের ছেলের ঐ বোকা-বোকা চরিত্রে এক দু'দে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি (শুনেছি এঁরা নাকি সপ্রতিভ হন!) তপেন অমন সুন্দর কাজ করলে কি করে তা ভাববার ব্যাপার।

সত্যজিৎবাবুও শুনেছি কথা-প্রসঙ্গে কাউকে বলেছেন, 'তপেন আমাকে যতখানি ট্রাবল দেবে ভেবেছিলাম, দেয়নি।' স্বয়ং পরিচালকের কাছ থেকে এধরনের সার্টিফিকেট পাওয়া নিঃসন্দেহে অনেক পাওয়া।

তপেনকে নেওয়ার আগেই সত্যজিৎবাবু বলেছিলেন—'দেখো, গান আছে খান-সাতেক। সেগুলি রপ্ত করা কিন্তু একটু কঠিন কাজ। গান সম্পর্কে একটু আইডিয়া না থাকলে অসুবিধে।' সে অসুবিধে তপেনের পার হয়েছে। ছবি দেখতে বসে একটিবারের জন্যও দর্শক ক্লান্ত বোধ করেনি। প্রথম ছবিতে এমন সুন্দর কাজ খুব কমই পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে তপেনের নিজেরও সীমাবদ্ধতা আছে কিছু। কাজ করে তিনি আনন্দ পেয়েছেন খুব, তার ওপর আবার সত্যজিৎবাবুর মত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা কম আনন্দের কথা নয়, 'তবে মাঝে মাঝে একটা শট দেবার পর মনে হত 'বোধহয়' ঠিক পারলাম না।' সত্যজিৎবাবুকে সেকথা জানাতে তিনি কিছু বলতেন না, আবার রিপিট করাতেন।

সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় উত্তরে জানালেন—'আনন্দ পেয়েছি যথেষ্ট শুধু তাই নয়, শিখেছিও অনেক কিছু।' মাঝখানে শেখর চট্টোপাধ্যায় বা গীতা মুখোপাধ্যায়ের দলে (গ্রুপ থিয়েটার) থাকাকালীন অভিনয়ের ব্যাপারে মোটামুটি হাতেখড়ি তো হয়েছিল। তাই কোন অসুবিধে হয়নি।

বছর দেড়েকের মধ্যে যেসব নতুন নতুন মুখ চোখে এসেছে তাদের অনেকেই এখন স্টারের পর্যায়ে প্রায় উঠে গেছেন। সমিত ভঞ্জ এখন রীতিমত 'নায়ক'। স্বরূপ দত্তর কমতি কোথায়! তপেনবাবু অবশ্য বেশ ছবি করেন নি। এখন নাটক করছেন রা[illegible] ঘোষের 'চলাচলে'।

নাটক ওঁর ভালো লাগে, আর তাছাড়া অভিনয়ে শেখার যা তাতো মঞ্চেই শিখতে হয়—এ বিশ্বাস তপেনের আছে, তাই মঞ্চ এখনও ওঁকে টানে। বাংলা দেশের দর্শক পরিচালক সবাই-ই নতুনকে স্বাগত জানান সমাদরে। স্টার সিস্টেম থাকলেও পাশাপাশি এ-ধরনের মনোভাব থাকা অবশ্য প্রয়োজন। তপেনবাবুকে দর্শকরা নিয়েছেন বেশ আদরের সঙ্গেই। আশায় রইলাম নতুন পরিচালক তাঁর শিল্পী-সত্তার আরো বিকাশ ঘটাবেন, বাংলা চিত্রজগৎ পাবে আরেকজন শিল্পীকে, 'স্টার' নয়।

●

খোসলা কমিটির রিপোর্ট বেরিয়েছে কিছুদিন আগে। কমিটি সিনেমায় বাস্তবের খাতিরে চুম্বনের দৃশ্যকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং আরো এক ধাপ এগিয়ে সুপারিশ করেছেন শিল্পসৃষ্টির তাগিদে ছবিতে নগ্ন-দৃশ্যও দেখানো যেতে পারে।

এ রিপোর্ট বেরোনোর পর থেকেই স্টুডিও পাড়া সরগরম এ আলোচনায়। নায়ক নায়িকা পরিচালক প্রযোজক সবাই কেউ পক্ষে কেউ বিপক্ষে। তবে সবার কথা থেকে এটুকু বোঝা যাচ্ছে শিল্পসৃষ্টির তাগিদে চুম্বন বা নগ্নদৃশ্যে আপত্তি অনেকের নেই। তবে, মুশকিল হলো কোন দৃশ্যে শিল্পসৃষ্টির তাগিদে বা কোনটা ব্যবসার তাগিদে তা বিচার করবেন কে? —এখন প্রশ্ন সেটা। শ্লীল-অশ্লীলের ব্যাপার নিয়ে শুধু আমাদের দেশে নয়, পশ্চিমেও অনেক জল ঘোলা হয়েছে, হচ্ছে। এখনকার হিন্দী ছবি যা দেখায় তার চাইতে চুম্বন দৃশ্য অনেক বেশী সহনীয় ঠিকই, কিন্তু সাধারণ দর্শক তা কি সহ্য করবে? কলকাতার কোনো কোনো শিল্পী ও-ধরনের দৃশ্যে অভিনয় করতে গররাজি নন। একজন তো আবার বলেছেন, 'সমাজের গতির সঙ্গে তাল রেখে যেতে হবে তো?' এঁদের

বিপক্ষও আছেন। তাঁরা বলছেন—'আমরা বাঙালী সংস্কার এখনও এড়াতে পারেনি।'

যাই হোক্ চুম্বন বা নগ্ন দৃশ্য ছবিতে এলেও এটা নিশ্চয়ই আখ্যা করা অন্যায় হবে যা যে সেগুলো শিল্প সৃষ্টির খাতিরে আসবে। অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। বাংলা দেশের দর্শক যথেষ্ট চিন্তাশীল। তাঁরা অসামাজিক কিছু বরদাস্ত করবে না।

●

'সুভাষচন্দ্র' খ্যাত পরিচালক শ্রীদীপক গুপ্ত এখন নিও ফিল্মসের 'রক্তের রং লাল' ছবির কাজে ব্যস্ত। বাংলার তিন বীর সন্তান বিনয়, বাদল, দীনেশ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যে সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তারই এক রক্তরাঙা অধ্যায় অবলম্বনে শ্রীগুপ্ত চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ছবির মূল কাহিনীকার শ্রীশৈলেশ দে। মুখ্য চরিত্রগুলোতে নতুন মুখ দেখা যাবে।

●

"পান্না হীরে চুনী"র মুক্তির পর পরিচালক অমল দত্তের পরবর্তী ছবি আবিরে রাঙানো। প্রগতি চিত্রমের পতাকাতলে এই ছবিটি তৈরী হবে। নাটক, নাট্যকার ও নাটকে দলের উত্থান পতন ও অগ্রগতি কেন্দ্র করে মধু ব্যানার্জি রচিত একটি ছোট গল্প অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক শ্রীদত্ত স্বয়ং। নতুন শিল্পী সুচন্দ্র পাল, অনিল মুখার্জি, নিপন গোস্বামী সলিল ঘোষ, দেব প্রসাদ এবং "নট নটী" নাট্য সংস্থার শক্তিমান অভিনেত্রীরা এর মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন। এছাড়া কয়েকজন প্রখ্যাত শিল্পী এর বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন।

মঞ্চাভিনয়

নাট্যআন্দোলনের নাম করে বিগত কয়েক বছর ধরে অনেক খ্যাত অখ্যাত নাট্যগোষ্ঠী নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য কতটা এগিয়ে যেতে পেরেছেন তা বোধহয় তর্কসাপেক্ষ। তবু কয়েকটি দলের নাট্যপ্রযোজনার দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করলে নির্দ্বিধায় বলা যায় এঁদের প্রচেষ্টা যেমন নির্ভীক তেমনই প্রযোজনায় সফলতার চিহ্নও অত্যন্ত স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে পথিক নাট্যগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক প্রযোজনা বিশ্ববিশ্রুত ম্যাক্সিম গোর্কি'র 'মা' নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। গত ৮ আগস্ট বিশ্বরূপায় এ নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হল। জার-তন্ত্রের অত্যাচারে লাঞ্ছনাময় নিপীড়িত শোষিত মানুষের নতুন দিনের আশায় উদ্দীপ্ত জাগরণ উপন্যাসের বক্তব্যকে সার্থকতার সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে নাট্যরূপান্তরের মাধ্যমে। স্বল্প দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে বৃহৎ উপন্যাসের সারাংশে অতি সচেতনার সঙ্গে গ্রথিত করে তাকে নাটকের আকারে বিশ্লেষণ নাট্যকার বিষ্ণু চক্রবর্তী'র অসামান্য কৃতিত্ব। ঘটনার পারম্পর্য বজায় রেখে ধীরে ধীরে নাটকের সুষ্ঠু উত্তরণ 'মা' নাট্যরূপের অন্যতম সম্পদ। অন্ধকারে নির্বাসিত মানুষগুলো যখন নানা ঘটনার উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে প্রথমে ইয়েগর এবং পরে পাভেল ও আন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে আন্দোলনের পথে পা বাড়ায় নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য তখন ম্যাক্সিম গোর্কি'র জীবনমূল্যে অর্জিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত হয়। তারই প্রতিফলন আমরা দেখেছি 'পথিকের' প্রযোজনায়। মঞ্চসজ্জা থেকে শুরু করে অভিনয়ের ধারাবাহিক বিন্যাস তৎকালীন জার শাসনের চিত্রকে পরিস্ফুট করে তুলতে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে। প্রথম অভিনয় রাত্রে যে সামান্য ত্রুটি ধরা পড়েছিলো তার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলেছেন নাট্যনির্দেশক জ্যোতিপ্রকাশ। সামগ্রিক অভিনয়-পদ্ধতি এমনই একটি চড়া পর্যায়ে প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিলো তাতে দর্শকমণ্ডলী নিশ্চল পাথরের মত নাটকটির শেষ পর্যন্ত মঞ্চের পাত্র-পাত্রীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষ বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহ থেকে উত্তেজনার স্বর শুনতে পাওয়া গিয়েছিলো। ইনস্পেকটর, ইশাই, রিবান প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েকটি চরিত্রের যথাক্রমে নির্মমতা, কুটিলতা ও সংবেদনশীলতা সুধী দর্শকের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অডিটোরিয়মে। অভিনয় প্রসঙ্গে কাউকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার অর্থ অপর একজনের প্রতি অবিচার করা। টিম ওয়ার্ক এতো সুসংবদ্ধ এবং সংযত সচরাচর চোখে পড়ে না। নাট্যনির্দেশকের তীক্ষ্ণ সচেতনতা এর একমাত্র কারণ বলে ধরে নিতে পারি। মুখ্য চরিত্রগুলির সঙ্গে অন্য ছোট চরিত্রগুলির পারস্পরিক সমঝোতা নাটকের ঈপ্সিত সুরকে দর্শকমনে রেখাপাত করতে প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্ষম হয়েছে। তবু যাঁরা বিশেষভাবে দর্শকমনে স্থায়ী আসন করে নিতে পেরেছেন তাঁরা হলেন গোপাল দে, মণি মানী, সুনীল সুর, সুধাংশু চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ কর্মকার, অনুপম বাগচী, শ্যামাসত্য মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তিময় রায়চৌধুরী, সনৎ বসু। পাভেল, আন্দ্রে, নিকোলাই চরিত্রে যথাক্রমে জয়ন্ত মতিলাল, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহজ, সাবলীল ও প্রাণবন্ত। গীগর চরিত্রে রজত

পূর্ণিমা পিকচার্স-এর মৃগয়া-র সংগীত গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। অরুন্ধতী দেবীর পরিচালনায় অরূপ গুহঠাকুরতা এবং অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে গান রেকর্ড করা হচ্ছে। ফটো : অমৃত।

সেন কিছুটা স্তিমিত হলেও অনুল্লেখ্য নয়। শেফালী দে 'মা' চরিত্রে সার্থক। সরলতা ও মমতার প্রতিমূর্তি 'মা'র ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যবনিকার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটি স্মরণীয় চরিত্র-চিত্রণ। দীপা হালদার ও মন্দিরা দাসের রূপারোপ এক কথায় সুন্দর। পুস্তিকায় ইয়েগর চরিত্রে রথীন দের নাম থাকা সত্ত্বেও কোন কারণে নির্দেশককে তাঁর নিজস্ব ভূমিকা রিবীন এবং ইয়েগর দুটি চরিত্রেই অভিনয় করতে হয়েছে। দুটি চরিত্রের ভিন্ন সত্তাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা জ্যোতিপ্রকাশের পক্ষে সম্ভব হয়েছে একমাত্র তাঁর একনিষ্ঠতার জন্য। তাঁর অভিনয়প্রতিভার স্বাক্ষর আমরা বহুবার পেয়েছি কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর চরিত্র-চিত্রণ বিগত অভিনয়ের কৃতিত্বকেও বোধহয় ম্লান করে দিয়েছে। মঞ্চসজ্জাকে বাস্তবতার ইমেজ সৃষ্টিতে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকসম্পাত উঁচুদরের। আবহসংগীত সত্যিই উপভোগ্য ও নাটকসম্মত। পরিশেষে, এ নাটকটির বহুল অভিনয় আমরা আন্তরিকভাবে আশা করব।

বিবিধ সংবাদ

তরুণ অপেরা এবৎসর প্রখ্যাত নাট্যকার সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত রাজা রামমোহন নাটকখানিকে বেছে নিয়েছে। যুগন্ধর পুরুষের চরিত্র-চিত্রণ করবেন শান্তিগোপাল। হিটলারের সাফল্যময় অভিনয়ে মুগ্ধ বহু সংস্থার অনুরোধে বর্তমান লেনিন জন্ম-শতবার্ষিকীতে আর একটি বলিষ্ঠ নাট্য প্রযোজনায় ব্রতী এই তরুণ অপেরা। সে মহান অক্টোবর বিপ্লবের পট-ভূমিকায় রচিত লেনিন। রচনা করেছেন শম্ভু বাগ। রূপায়ণে শান্তিগোপাল। এই দুই ক্লাসিক নাটকের প্রয়োগ-নৈপুণ্য ও তরুণ অপেরা তার পূর্ণ ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে। কারণ পরিচালনায় রয়েছেন রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমর ঘোষ। রামমোহন নাটকে সুরারোপ করছেন অজিত বসু এবং লেনিন নাটকে সুরারোপ করছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সুরকার হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

বিগত ৩ জুনের হিটলারের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুস্থ শিল্পীর পরিবারদের হাতে তুলে দেওয়া হবে আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে হিটলার পুনরাভিনয়ের পূর্বে। এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমাদের ভারতে রঙীন কাঁচা ফিল্ম তৈরী করার ব্যাপারে উটেকামাণ্ডে অবস্থিত হিন্দুস্থান ফোটো ফিল্ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে ইংলণ্ড, ইতালী এবং পূর্ব জার্মানী—এই তিনটি দেশের তিনটি সংস্থা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এ'দের প্রস্তাব বিবেচনা ক'রে দেখছেন।

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ কর্তৃক গত ১৫ আগস্ট নব-বৃন্দাবন নাট-মন্দিরে শ্রীপ্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত 'বাঁশের কেল্লা' নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। এ'দের সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এই যাত্রাভিনয়ের আসরে কলকাতার বহু প্রখ্যাত কলারসিক, শিল্পী ও নাট্যরসজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসুশীলকুমার মিত্র উপস্থিত সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। সংসদের সচিব শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গিরিশ নাট্যাভিনয় ও সাহিত্য প্রসারে সংসদ যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তার বিবরণ দেন। এর পর অভিনয়ানুষ্ঠান হয়।

সাবিত্রী সত্যবান চিত্রের দৃশ্য

প্রতিটি দৃশ্যে আগাগোড়া শিল্পীরা যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। উঁচু সুরে বাঁধা এই দেশাত্মবোধক নাটকের প্রতিটি চরিত্র সেদিন সু-অভিনয়গুণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীসমীর ব্যানার্জি। অভিনয়ে অংশ নেন—শ্রীধীরেন চক্রবর্তী, শ্রীসুরেশ পাল, শ্রীনরেশ রায়, শ্রীগৌরচন্দ্র পাল, শ্রীরঞ্জিৎকুমার চ্যাটার্জি, শ্রীকৃষ্ণকুমার সিংহ, শ্রীশশাঙ্কশেখর চ্যাটার্জি শ্রীমান সুব্রত, শ্রীমান অমূল্য, শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীশ্যামল দত্ত, শ্রীনিমাইচন্দ্র দে, শ্রীনিখিলকুমার দাস, শ্রীগঙ্গালাল ঘোষাল, শ্রীমতী সুলেখা ব্যানার্জি, শ্রীমতী আশা দত্ত, শ্রীমতী স্বপ্না মুখার্জি, শ্রীমতী মন্দিরা দাস, শ্রীমতী সন্ধ্যা বর্মণ ও শ্রীসমীর ব্যানার্জি।

ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত মৃণাল সেন পরিচালিত হিন্দী ছবি "ভুবন সোম"কে স্বর্ণপদক দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে। এবারের উৎসবে বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব ছবি প্রতিযোগিতা করতে আসে, তাদের প্রথম, দ্বিতীয় ক্রমানুসারে না সাজিয়ে কয়েকটি ভালো ছবিকে বেছে নিয়ে তাদের প্রত্যেককেই স্বর্ণপদক দ্বারা পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একক অভিনয়ে শুধু কোলকাতায় নয়, সারা বাংলায় সাহাদৎ হোসেনের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এই শিল্পী চারটি থেকে পনেরটি চরিত্র একই মঞ্চে একাই বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে ও বিভিন্ন স্বরে অভিনয় করে থাকেন। এই নতুন নাটক দেখে সকল দর্শক আত্মহারা ও বিহ্বল হয়ে যান। একই শিল্পীকে যে এতগুলি চরিত্র ফুটিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য, না দেখলে বোঝা যায় না।

এক অভাবনীয় নতুন ফিচার নিয়ে সম্প্রতি মূকাভিনেতা হিরন্ময় উপস্থিত হন হিন্দী হাইস্কুল হলে। এই নতুন ফিচারটির নাম "ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া"। ছটি ফিচার সমন্বয়ে এই পরিকল্পনা। যেমন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা, যখন মানব আদিম ছিল। জানতো না কি করে আগুন জ্বালাতে হয়। তাই তারা পশুর কাঁচা মাংস ও ফল মূল খেয়ে থাকত। আস্তে আস্তে আগুনের ব্যবহার শিখলো, সভ্যতার ক্রমবিকাশ শুরু হল। তারপর রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ রামায়ণে পেলাম পিতৃআজ্ঞা ও পতিভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন। মহাভারতে—ধর্মযুদ্ধে অধর্মের বিনাশ। বৌদ্ধযুগ—এ যুগ শান্তি ও মৈত্রের প্রতিফলন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর পীড়িত মানবের মুক্তির পথ দেখালেন বুদ্ধদেব। মোগল যুগ হিংস্রতার প্রকট নিদর্শন। ব্রিটিশ যুগ এ যুগের পরিচয় পেলাম ব্রিটিশের হিংস্রতা ও শোষণ, এল '৪২' এর আন্দোলন ও মন্বন্তর। নিপীড়িত মানুষের মুক্তি কামনা। শেষ ফিচারটি ছিল 'স্বাধীন যুগ' পরাধীনতার মুক্তির আনন্দ নতুন উৎসাহে ভারত গঠনের স্বপ্ন। অনেক পরিকল্পনা হচ্ছে কিন্তু বেকার বেড়েই চলেছে। শিক্ষিত বেকারের দুরবস্থা দিয়েই শেষ হয়েছে। "ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া" শিল্পী হিরন্ময় অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রতিটি ফিচারকে উপস্থিত করতে পেরেছেন। অভিব্যক্তির প্রকাশ নিখুঁত। আলোকসম্পাতে শ্রীবিমল দাশ।

গত ১০ আগস্ট রবিবার স্বর্গীয় পান্নালাল ঘোষের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়।

সর্বপ্রথমে সম্পাদক শ্রীসুনীল ঘোষ মহাশয় ভাষণদান করেন। তিনি বলেন, সকল সঙ্গীতানুরাগীদের নিকট একান্ত প্রার্থনা যে তাঁরা যেন এই সোসাইটির উদ্দেশ্যগুলি সাফল্যমণ্ডিত করতে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন ইত্যাদি। এর পর উদীয়মান শিল্পী শ্রীমনোজশঙ্কর সেতারে দেশরাগ (বিলম্বিত ও দ্রুত) বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তাঁর সঙ্গে তবলা সঙ্গত করেন শ্রীদুলাল রায়। এই অনুষ্ঠানটি অতি মনোহর হয়েছিল। এর পরে প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী নট বেহাগ রাগে তাঁর স্বকীয় ভঙ্গীতে খেয়াল গান করে শ্রোতাদের আনন্দ দান করেন।

সংশোধন

১৫ সংখ্যা অমৃতে ২৩০ পৃষ্ঠায় ওপরের ছবিটি নীচে এবং নীচের ছবিটি ওপরে হবে। এই মুদ্রণ-প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

যেন ভুলে না যাই

মারলিন ডিয়েট্রিশ

ছায়ার মায়া এই ছায়ামুখ মানুষকে তার সৃষ্টির দিন থেকেই যাদু করেছে। এ জগতের ইতিহাস ঠিক আরব্যোপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। বিশেষ করে 'চিত্র-তারকা'-র মোহিনী সৌন্দর্য দর্শকদের চিরদিনই মুগ্ধ করেছে। ছবির আকাশে 'স্টার' হিসেবে নায়ক-নায়িকারা আজও দেদীপ্যমান। প্রথম প্রথম চলচ্চিত্রপটে অভিনয় করাটা অভিনেতৃদের কাছে তেমন সম্মানের ছিল না। তাই বেশির ভাগ শিল্পীরা তাদের আসল নাম গোপন রেখে বেনামীতে অবতীর্ণ হতেন। যেমন হয়েছিলেন মারলিন ডিয়েট্রিশ। তাঁর আসল নাম ছিল মারিয়া ম্যাগডালিন।

মারলিন ডিয়েট্রিশের জন্ম পূর্ব জার্মানীর বার্লিন শহরে। তাঁর জন্ম সালের সঠিক তারিখ নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবে এক রাশিয়ান সাংবাদিক লিখেছেন, মারলিনের জন্ম ১৯০২ সালে। ছোটবেলা থেকেই মারলিনকে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে মানুষ হতে হয়েছিল। কারণ তাঁর বাবা ছিলেন প্রাশীয়দেশীয় সৈন্য দলের অফিসার। যাইহোক শাসনের মধ্যে থেকেও তাঁর অভিনয়-প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেন নি এ পরিবারের অভিভাবকেরা। ম্যাকস রিনহার্ডটস থিয়েটার-স্কুলে অভিনয় শেখার পাঠ শুরু করেন মারলিন ডিয়েট্রিশ।

১৯২৯ সালে কমেডিক থিয়েটারে যখন মারলিন ডিয়েট্রিশ অভিনয় শুরু করেছেন তখন থেকেই জার্মান দেশের চলচ্চিত্র-পরিচালক যোসেফ ভন স্টার্নবার্গ তাঁর প্রতি বিশেষ নজর রেখেছিলেন। মারলিনের গান এবং অভিনয় স্টার্নবার্গকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি মারলিনকে নিয়ে একটা ছবি করবেন বলে জানালেন। মারলিন কিন্তু এ প্রস্তাবে তেমন সাড়া দিলেন না। কারণ ইতিমধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি জার্মান ছবিতে অভিনয় করেছেন, কিন্তু কোনটাতেই তাঁকে ক্যামেরায় ভালভাবে আনা হয় নি। দেখতে খুবই খারাপ লেগেছে। যাইহোক মারলিনকে ক্যামেরায় ভালভাবে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্টার্নবার্গ ওঁকে ছবিতে অভিনয় করতে রাজি করালেন।

যোসেফ ভন স্টার্নবার্গ পরিচালিত প্যারামাউন্টের 'দি ব্লু এঞ্জেল' ছবিতে সর্বপ্রথম অভিনয় করে মারলিন ডিয়েট্রিশ বিখ্যাত চিত্র-তারকারূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এ ছবিতে তিনি ক্যাবেরা-মেয়ে লোলা-লোলা-চরিত্রে অভিনয় করে ভুবনবিখ্যাত হন। এই জনপ্রিয়তার মূলে যোসেফ ভন স্টার্নবার্গের দান অপরিসীম। একথা অবশ্য স্বীকার করেন মারলিন ডিয়েট্রিশ। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আমার এই সাফল্যের মূলে ছিলেন যোসেফ ভন স্টার্নবার্গ। তিনিই আমাকে জার্মানীতে প্রথম আবিষ্কার করে উপযুক্ত চরিত্রে চলচ্চিত্রাভিনয়ে সুযোগ দেন। তাঁর ঐকান্তিক সাহায্য না পেলে আমি কোনদিনই বড় শিল্পী হতে পারতাম না। অভিনয় কি করে করতে হয় তা তিনিই আমাকে প্রথম শিখিয়েছেন। তিনিই আমাকে অভিনেত্রী করেছেন।

১৯৩০ সালের পয়লা এপ্রিল মারলিন ডিয়েট্রিশের জীবনে এক স্মরণীয় দিন। এই বিশেষ দিনেই 'দি ব্লু এঞ্জেল' ছবিটির শুভ উদ্বোধন হয় বার্লিনে। এই শুভ দিন থেকেই মারলিনের যুগ শুরু। তারপর স্টার্নবার্গের দ্বিতীয় ছবি 'মরোক্কো'-য় গ্যারি কুপারের বিপরীতে মারলিন ডিয়েট্রিশ অভিনয় করে হলিউডে বিখ্যাত হলেন। স্টার্নবার্গের লেখা তৃতীয় ছবি 'ডিজঅনার্ড'-এ মারলিন অভিনয় করেন। ১৯৩৫ সালে নির্মিত স্টার্নবার্গের 'দি ডেভিল ইজ এ ওম্যান' ছবিতে মারলিন ডিয়েট্রিশ শেষ অভিনয় করেন। এর পর যোসেফ ভন স্টার্নবার্গের আর কোন ছবিতে মারলিনকে অভিনয় করতে দেখা যায় নি। সামান্য এক ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার নিয়ে স্টার্নবার্গের সঙ্গে মারলিনের মনোমালিন্য হয়। এই মতবিরোধের কারণটা খুব সামান্যই ছিল। 'দি ডেভিল ইজ এ ওম্যান' ছবির একটি দৃশ্যে মারলিন যেখানে ফুঁ দিয়ে একটা মোমবাতি নিভিয়ে দিচ্ছেন সেখানে তাঁর মুখের ভাবপ্রকাশ ঠিকমত হচ্ছিল না দেখে স্টার্নবার্গ এই দৃশ্যটি তোলবার জন্য প্রায় আটষট্টি বার মারলিনকে দিয়ে অভিনয় করান। এর ফলে মারলিন ডিয়েট্রিশ ভীষণ অপমানিতবোধ করেন। তিনি কিছুতেই ভেবে পেলেন না, একটা সামান্য দৃশ্যের জন্য স্টার্নবার্গ কেন এত জেদ ধরলেন। এত খুঁতখুঁতে হলে যে কাজ করা চলে না—এ কথাটাই জানিয়ে দিলেন মারলিন। অথচ স্টার্নবার্গ কিছুতেই বোঝাতে পারলেন না যে পরিচালক যা চাইছেন তা মারলিন আনতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের মীমাংসা হল না। একজন অপরজনকে হারালেন। অথচ দীর্ঘ ছ' বছর ধরে স্টার্নবার্গের সঙ্গে মারলিন কাজ করে আসছিলেন। মতিভ্রম না হলে এমন একটা জুটি ভেঙে যাবে কেন!

যোসেফ ভন স্টার্নবার্গের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর ১৯৩৬ সাল থেকে মারলিন ডিয়েট্রিশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পরিচালকের বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করলেন। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি হল : দি গার্ডেন অফ আল্লা, নাইট উইদাউট আরমার, দি জয়েসাস স্ট্রাট, ব্লন্ড ভেনাস, অ্যারাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ এবং জাজমেন্ট অ্যাট নুরেনবার্গ।

শুধু অভিনয় নয়, গান গেয়েও মারলিন ডিয়েট্রিশ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রায় প্রতিটি ছবিতেই তাঁর অনবদ্য গান শোনা গেছে। অভিনয়ের চাইতে গান গাইতে বেশি পছন্দ করতেন মারলিন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি ছবিতে অভিনয় করে কোন রকম তৃপ্তি পাই নি। কোনদিন অভিনেত্রী হতে চাই নি। শুধু গান করার সময় যেটুকু অভিনয় করেছি। গান গাওয়া ছাড়া আর কিছুতেই আমি সে রকম তৃপ্তি পাই নি।

মারলিন ডিয়েট্রিশ এখন অভিনয় প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। অভিনয় করে তিনি আর আনন্দ পান না। বরং মাঝে মধ্যে ক্যাবেরেয় গান গেয়ে থাকেন। এখনও সমানভাবে গাইতে পারেন। কণ্ঠের মাধুর্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। এত সুদীর্ঘকাল ধরে অভিনয় এবং গান করে দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে বেঁচে থাকা খুব কম শিল্পীর ভাগ্যেই সম্ভব হয়েছে। মারলিন ডিয়েট্রিশের মত মোহিনী অভিনেত্রী চলচ্চিত্র-গগনে উদ্ভাসিত হতে খুব কম দেখা গেছে। তিনি আশ্চর্য এক আকর্ষণ। যাদুকরী তাঁর ক্ষমতা। অবিস্মৃত তাঁর স্মৃতি। অবিনশ্বর তিনি।

—চিত্রলেখ

শংকরবিজয় মিত্র

দৌড়ানিয়া র‍্যালফ ডুবেল

বিশ্ব এ্যাথলেটিকসে মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যখন কোন অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত এ্যাথলিট্ বহু প্রশংসিত ও বিজয়ের প্রত্যাশাযুক্ত ব্যক্তিদের পরাজিত করে জয়মাল্য বক্ষে দুলিয়ে বেরিয়ে আসে। ক্রীড়ারসিক ও সমালোচকদের বিস্ময়কে বিস্ফোরিত করে তারা রাতারাতি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করে। ১৯৬৮ সালে মেকসিকো ওলিম্পিকে এমনি গুটিকয়েক ভাগ্যবানের মধ্যে ৮০০ মিটার দৌড়ের স্বর্ণপদক বিজয়ী রালফ ডুবেল হলেন একজন। ১৯৬৮ সালে এ্যাথলেটিকসের বিভিন্ন বিভাগের ক্রীড়াকৃতির জন্যে ক্রমপর্যায়ের যে তালিকা রচিত হয়েছিল, তাতে ৮০০ মিটার দৌড়ের তালিকায় রালফ ডুবেলের নাম ছিল অনেক অনেক নীচে। সম্ভবতঃ গোটা একুশ দৌড়ানিয়ার পরে। কাজেই অস্ট্রেলিয়ায় এই তরুণ দৌড়ানিয়ার দিকে কারও প্রত্যাশাপূর্ণ দৃষ্টি পড়েনি, আর এত নীচের দিকের প্রতিযোগীর জন্যে কারই বা আশা থাকে। ডুবেল নিজেও কিংবা তাঁর শিক্ষক ফ্রাঞ্জ স্ট্যাস্কোলও এতবড় উচ্চ আশা পোষণ করেননি। আমেরিকার উইলিয়াম বেল, কেনিয়ার কিপ্রুগাট, পশ্চিম জার্মানীর এডামস্ কিংবা পূর্ব জার্মানীর ফম প্রভৃতি দৌড়ানিয়াদের মধ্যে এই বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তাঁদেরই মধ্যে কোন একজনের জয়লাভের কথা ক্রীড়ারসিকরা ধরেই রেখেছিলেন। তবে মজার কথা এই যে, সামর্থ্যপূর্ণ অজ্ঞাত দৌড়ানিয়ারাই এরকম ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারে। কারণ নামজাদা দৌড়বীরেরা পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলেন, এই অখ্যাত ব্যক্তিদের তাঁরা আমলে আনেন না। ফলে, সকলের অলক্ষ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগোতে এগোতে তাদের সামর্থ্যে আস্থা বেড়ে যায় এবং প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়ের পাল্লায় তারাই সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেয়।

রণক্ষেত্রে আর ক্রীড়াক্ষেত্রে পূর্ণ সামর্থ্য ও স্থিরবুদ্ধি প্রয়োগ সকলের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না, অনেকের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। তাই কর্ণের মত মহারথীও প্রবলতর সংগ্রামের সময় তাঁর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রাদি প্রয়োগ করতে বিস্মৃত হয়েছিলেন; বুদ্ধি স্থির রাখতে পারেননি বলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে যুদ্ধের নিপুণ ছক তিনি গড়ে তুলতে পারেননি। গুরু-দত্ত অস্ত্র ও কৌশলের কথা তাঁর স্মৃতিপটে উদিত হয়নি।

ডুবেলের ক্ষেত্রে ঘটেছে তার বিপরীত। মেকসিকো ওলিম্পিকের আগের ছ' মাসে কোন উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় শিক্ষাগুরু ফ্রাঞ্জ স্ট্যাস্কোলের কথা তিনি যথাসময়ে স্মরণ করে পরিকল্পিত ছকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে যান। এই স্থির বুদ্ধিই তাঁকে মেকসিকো ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক এনে দেয়। অস্ট্রিয়ার প্রখ্যাত কোচ্ স্ট্যাস্কেল তাঁর শিক্ষার্থীদের এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতেন বারে বারে যে, শারীরিক সামর্থ্যের দিকটা ত আছেই, কিন্তু এর চেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে মাথা ঠিক রেখে ছক গড়ে নেওয়া এবং আস্থা ও সাহসের সঙ্গে তাকে কার্যে পরিণত করা, এর চেয়েও বড়া কথা হচ্ছে 'জিতবোই' বলে সংকল্প নেওয়া। অনেক বড় বড় এ্যাথলিটই মিঃ স্ট্যাস্কেলের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন —ব্যানিস্টার, চ্যাটাওয়ে, ব্রেশার, হিউসন, ক্লার্ন্ডি প্রভৃতি এবং দৌড়বীর হিসেবে এদের অনেকেই সাফল্যের শিখরে উঠেছেন। আর সেই সাফল্যের মুখে রয়েছে তাঁদের শিক্ষাদাতা ফ্রাঞ্জের অমূল্য উপদেশ—"দৌড়ের সময় কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যেতে হবে। দমফেটে বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হলেও এগোতে হবে, অঙ্গের প্রতিটি পেশী ব্যথায় টনটনিয়ে উঠলেও হতাশ হওয়া চলবে না। জেতার সংকল্প জয়ের বরমাল্য এনে দিতে পারে।" এই সংকল্পই ডুবেলকে এই অপ্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিয়েছিল মেকসিকোর ওলিম্পিক প্রাঙ্গণে।

মেলবোর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক ডুবেলের চব্বিশ বছর বয়স পূর্ণ হয়েছে গত ফেব্রুয়ারী মাসে। প্রায় ছ' ফুট লম্বা এই তরুণটির জীবনে প্রথম আধ মাইল দৌড়ের সুযোগ আসে স্কুলে। খেলাধুলোর অন্যান্য বিভাগে কোন দক্ষতা দেখাতে না পারলেও ১৭ বছর বয়সে তাঁর আধ মাইল দৌড়ে সময় লেগেছিল ১ মিনিট ৫৯·৬ সেকেন্ড। ১৯৬৮ সালে অকস্মাৎ তাঁর প্রতিভা প্রকাশ পায় ৮০০ মিটার দৌড়ে, তাতে তাঁর সময় লাগে ১ মিনিট ৪৯·৮ সেকেন্ড। পরের বছরেই তিনি এ-বিভাগে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় চ্যাম্পিয়ানসিপ অর্জন করেন। এক মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রথম বারেই তাঁর সময় লাগে ৪ মিনিট ১১ সেকেন্ড এবং এই প্রতিযোগিতায় তিনি ডেরেক ক্লেটনকে পরাজিত করেন। ম্যারাথন দৌড়ে ক্লেটন এখনও পর্যন্ত দ্রুততম দৌড়ানিয়া বলে স্বীকৃত।

১৯৬৫-৬৬ সালেই ডুবেলের ক্রীড়াকৃতি সারা অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়ানুরাগীদের স্বীকৃতি পায় এবং অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম এ্যাথলিট হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। এই বছরই তিনি আটশো মিটার দৌড়ে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় রেকর্ড করেন এক মিনিট ৪৭·৭ সেকেন্ডে ঐ পথ অতিক্রম করে। ৮৮০ মিটার দৌড়েছেন এক মিঃ ৪৮·৫ সেকেন্ডে। এর পরেই ১ মিনিট ৪৭·৩ সেকেন্ডে ৮৮০ মিটার দৌড়ে বিশিষ্ট দৌড়ানিয়া নোয়েল কাদকে পরাজিত করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানসিপ অর্জন করেন। জুলাই মাসে লস এ্যাঞ্জেলসে আমেরিকা—কমনওয়েলথ ক্রীড়া দ্বন্দ্বে ৮০০ মিটার দৌড়ে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন ১ মিনিট ৪৬·২ সেকেন্ডে এই প্রতিযোগিতা শেষ করে। বিখ্যাত মার্কিণ দৌড়বীর জিম রিউনের ঠিক পরেই তিনি আপন স্থান করে নেন। আমেরিকা ও কমনওয়েলথ দেশগুলি সেরা সেরা দৌড়বীরদের সঙ্গে পাল্লায় চতুর্থ স্থান অধিকার করায় স্বভাবতই ক্রীড়া মহলের নজর পড়ে ডুবেলের ওপর এবং তার সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা আশা করে অস্ট্রেলিয়ার কর্তৃপক্ষ মহল খানিকটা যে উৎফুল্ল না হয়েছিলেন এমন নয়।

তবে প্রতি খেলোয়াড়ের জীবনেই জোয়ার ভাটা আসে এবং ডুবেলের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জ্যামাইকার কিংসটন নগরে কমনওয়েলথ গেমসে ৮০০ মিটার দৌড়ে জয়ী হন নোয়েল কাদ। ডুবেলোর স্থান হয় পাঁচজনের পর ইংলন্ডের ক্রিস চার্টারের কয়েক ফুট পেছনে। ষষ্ঠস্থান পেয়ে ডুবেলের খানিকটা মন খারাপ হয়ে যায়। এদিকে লন্ডনের হোয়াইট সিটি ষ্টেডিয়ামে এক মাইল দৌড় প্রতিযোগিতাতে ৪ মিনিট ·০০৫ সেকেন্ড মাত্র সময় নিয়েও ডুবেল কেনিয়ার কিপচোক কেইনোর প্রায় ৪৫ গজ পেছনে থেকে যান। অবশ্য

এর পরই স্বদেশে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানসিপের প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে ডুবেল আবার তাঁর মনোবল ফিরে পান। এক হাজার মিটার দৌড়ে কেনিয়ার অন্যতম বিশিষ্ট দৌড়ানিয়া কিপ্রুগোটকে তিনি পরাজিত করতে সমর্থ হন, ৪৪০ গজ দৌড়ে ৪৭·৩ সেকেন্ডে সময় নিয়ে নিজের সময় সীমা উন্নত করেন।

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টোকিওতে বিশ্ব ছাত্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে তাঁর প্রতিদ্বন্দিতার সামর্থ্য ও ওলিম্পিকে যোগদানের সম্ভাবনার বিষয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এখানে ৮০০ মিটার দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ডুবেল ইউরোপীয় রেকর্ডধারী পশ্চিম জার্মানীর ফ্রানজ জোসেফ কেম্পারকে পশ্চিম জার্মানীর আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী বোডো টুমলারকে, ব্রিটেনের ডেভিড কুপারকে, আমেরিকার ওয়েড বেলকে পরাজিত করেন ১ মিনিট ৪৬·৭ সেকেন্ডে ঐ দূরত্ব অতিক্রম করে। স্বদেশে ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ভাল সময় রেখে ডুবেল আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হন। এর পর আমেরিকায় প্রায় এক মাস ব্যাপী পর্যটনে ডুবেল যে ছ'টি প্রতিযোগিতাতে যোগ দেন তার সব কটিতেই বিজয়ী হন। এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় তাঁর সামর্থ্য ও সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে এবং ডুবেল নিজ সাফল্য সম্পর্কে আস্থাবান হয়ে ওঠেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও তিনি তাঁর খ্যাতিকে অম্লান রাখতে সমর্থ হন।

এর পর এক দৌড়ের সময় পায়ের শিরা ছিঁড়ে যাওয়ায় ডুবেলকে পুরো বিশ্রাম নিতে হয়। ফলে মেক্সিকো ওলিম্পিকের আগে প্রায় ছ'মাস তাঁর প্রশিক্ষণ বন্ধ থাকে। এতে অনেকের মনে ডুবেলের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়। ডুবেলের নিজের মনেও খানিকটা দ্বিধার ভাব এসেছিল। তবে অস্ট্রেলিয়ার ওলিম্পিক মনোনয়ন পেয়ে তাঁর মনোবল আরও বেড়ে যায়। এ সম্পর্কে ডুবেলের নিজের মুখের কথাতে এ ব্যাপারে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার আভাস পাওয়া যায়। "পায়ের পেশীর শির ছিঁড়ে যাওয়ার দরুণ মেক্সিকোতে যাবার আগে পুরো ছ' সপ্তাহ দৌড় বন্ধ হয়েছিল—তবে ধীরে ধীরে লম্বা পাল্লার দৌড় অভ্যাস করতাম। বিমানে প্রায় কুড়ি ঘন্টার ট্রিপে পায়ে আবার টান ধরে, আমার ত ভয়ই হয়েছিল, তবে এর পরে আর কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় নি।"

ওলিম্পিক দলে মনোনয়নের পর অবশ্য একটা প্রচণ্ড ট্রেনিং নেবার সুযোগ ডুবেলের হয়েছিল এবং তখন তাঁর কোচ স্ট্যান্জেকলের নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। এই সময় তাঁর শিক্ষণের সময় ছিল সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দৈনিক দুবার। সকালে প্রায় তিন-চার মাইল, বিকেলে বিভিন্ন দফায় গড়ে প্রায় মাইল দশেক ঃ ২০×৪০০, ১০×৮৮০, ৩০×২২০ কিংবা ৫০×১০০ মিটার। শুক্রবার বিশ্রাম। শনি ও রবিবার একবার মাত্র শিক্ষণ গ্রহণ। এই শিক্ষণের সময়ই ডুবেলের সাফল্যের সোপান রচিত হয়। পায়ের আঘাতের ফলে এমনি প্রবল ট্রেনিং বন্ধ থাকলেও আঘাত সেরে যাবার পর আস্তে আস্তে দৌড়ে শরীরকে তিনি যন্ত্রের মত সবল করে রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনোবল বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওলিম্পিক অনুষ্ঠানের মাসখানেক আগে ডুবেল মেক্সিকোতে আসেন। এখানে অনুশীলনের সময় ২০০ মিটার দৌড়ান ২১·৬ সেকেন্ডে, ৪০০ মিটার দৌড়ান ৪৬·৪ সেকেন্ডে এবং ৬০০ মিটার দৌড়ান ১ মিনিট ১৬·৫ সেকেন্ডে। অনুশীলনের সময় ডুবেল খালি ভেবেছেন এর চেয়ে আরও ভাল অর্থাৎ আরও কম সময়ে দৌড়ান সম্ভব। কারণ টোকিও বিশ্ব ছাত্র ক্রীড়ানুষ্ঠানে যে ৬০০ মিটার দৌড়েছেন ১ মিনিট ১৪·৭ সেকেন্ডে সেখানে এখন তার সময় লাগলো ১ মিনিট ১৬·৫ সেকেন্ড।

এই ডুবেলই মেক্সিকো ওলিম্পিকের ৮০০ মিটার দৌড়ের সোনার মেডেলটা গলায় ঝুলিয়েছেন। বিশ্বের তাবড় তাবড় দৌড়বীরদের সঙ্গে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হয়ে এবং ১ মিনিট ৪৪·৩ সেকেন্ডে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে তিনি পিটার স্নেলের বিশ্ব রেকর্ডকে স্পর্শ করেছেন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ছ'বছর স্নেলের রেকর্ড কেউ ছুঁতেই পারেন নি। ডুবেলের এই সাফল্য তাই একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। মনেমনে আশা পোষণ করলেও এবং নিজের উপর অটুট আস্থা খ্যাতনামা দৌড়বীরদের হারিয়ে প্রথম হওয়া খুব সহজসাধ্য ছিল না এবং খুব সহজলভ্যও হয় নি। ওলিম্পিক হিটের প্রথম রাউণ্ডের চিত্রটা দেখলেই তা অনুমান করা খুব কঠিন হবে না। এই প্রাথমিক পর্যায়ের পাঁচটা হিটের মধ্যে দ্বিতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম হিটেই ভাল সময় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হিটে পূর্ব জার্মানীর ডি ফ্রুম ১ মিনিট ৪৬·৯ সেকেন্ডে, চতুর্থ হিটে ডুবেল ১ মিনিট ৪৭·২ সেকেন্ড এবং পঞ্চম হিটে কেনিয়ার উইলসন কিপ্রুগোট প্রতিযোগিতা শেষ করে ছিলেন ১ মিনিট ৪৬·১ সেকেন্ডে। এই হিটের ফলাফল সম্পর্কে ডুবেলের নিজের মুখের কথা হচ্ছে—"হিটে কি হয় সেই চিন্তাটাই প্রথমে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। এল—সালভেন্ডরের মত বেঁটে দৌড়ানিয়ার জন্যে আমি ত প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়েই যাচ্ছিলাম। সে যে কি করছিল তা নিজেই জানে না। আমাকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় এবং মনে হয় যে আমাকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে এবং আমার সময় লেগে যায় ১ মিনিট ৪৭·২ সেকেন্ড (এলসালভেডরের এই প্রতিযোগীটির নাম কিউঁথিয়াস, ২ মিনিট ৭·৭ সেকেন্ড নিয়ে সে চতুর্থ দলে অষ্টম বা শেষ স্থান অধিকার করে)।

এর পরে সেমিফাইনাল। এতে দুদলে ভাগ করে হিট হয়, প্রথম দলে পূর্ব জার্মানীর ফ্রুম, পশ্চিম জার্মানীর এডামস প্রভৃতি ছ'জন এবং দ্বিতীয় দলে ডুবেল, কেনিয়ার কিপ্রুগোট, আমেরিকার ফেরেল প্রভৃতি আটজন। সেমিফাইনাল সম্পর্কে ডুবেল বলেছেন—"সেমিফাইনাল নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। যে সব প্রতিযোগী আমাদের দলে ছিল তাদের কাউকে পরাভূত করা সহজ নয়। আগের দিন তাই দুশ্চিন্তায় রাত্রি দুটো পর্যন্ত ঘুমোতে পারি নি। দৌড় সুরু হল, শরীর খুব খারাপ লাগছে। প্রথম ১০০ মিটারে আমি প্রায় ২৫ গজের ব্যবধানে পড়ে গেলাম। বলতে লজ্জা নেই সকলের পেছনে পড়ে আছি। তখন একটু চেষ্টা করে একটা যুক্তিসংগত জায়গায় নিজের স্থান করে নিই। দ্বিতীয় বা তৃতীয় হবার জন্যে একটা চেষ্টা করব বলে ভেবে নিই। পরে দেখি কি যে আমি 'কিপ'এর (কিপ্রুগোট) পাশাপাশি দৌড়াচ্ছি। তারপর তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি। কিপও আমাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে আসছে। নিজের সামর্থ্যের প্রতি যেন আস্থা বেড়ে গেল। প্রথম হয়ে বেরিয়ে এলাম। এই পথ অতিক্রম করতে আমার সময় লাগলো ১ মিনিট ৪৫·৭ সেকেন্ড। কিপ হল দ্বিতীয়। তার সময় লাগলো ১ মিনিট ৪৭·৮ সেকেন্ড। সেমিফাইনালের দ্বিতীয় হিটে যে ৮০০ মিটারের সেরা দৌড়ানিয়ারা ছিলেন তা এই হিটের ফলাফল থেকেই বোঝা যায়। এই হিটের প্রথম থেকে চতুর্থ স্থানাধিকারীরা প্রত্যেকেই প্রথম হিটের প্রথম স্থান অধিকারীর চেয়ে কম সময়ে এই প্রতিযোগিতা শেষ করে ছিলেন। ফাইনালেও প্রথম তিনটি স্থান এই হিটের প্রতিযোগীদের হাতে আসে।

এর পর এলো তাঁর জীবনের পরম দিনটি। ডাক পড়লো ৮০০ মিটার দৌড়ের ফাইন্যালের। প্রতিযোগিতার আগে থেকেই ডুবেল মনে মনে একটা ছক এঁকে নিয়েছিলেন। সেমিফাইনালে সকলের সেরা সময় রাখায় এবং বিশেষ করে কিপ্রুগোটের মত দুরন্ত দৌড়ানিয়াকে পরাজিত করায় ডুবেল স্বভাবতই স্বর্ণপদক জয়ের আশা করেছেন। শিক্ষাগুরুর উপদেশ মনে মনে স্মরণ করে সংকল্পও নিয়েছেন। ছক সম্পর্কে ডুবেলের মন্তব্য "গোড়ার দিকে খুব সহজভাবেই দৌড়াব বলে স্থির করেছিলাম। মনে মনে এটাও ঠিক করে রেখেছিলাম প্রথম ল্যাপে (চক্করে) একেবারে খুব পৌছিয়ে পড়াও সমীচীন হবে না। প্রতিযোগিতার প্রথম দিকে আমি পঞ্চম বা অষ্টম স্থানে ছিলাম। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে আমি 'কিপ'এর নাগাল ধরবার চেষ্টা করি। 'কিপ'এর সাত আট গজের মধ্যে আসতে খুব কষ্ট হয় নি। দুশো মিটার বাকী থাকতে আমি কিপ'এর সংগে সমানে সমান পাল্লা দিয়ে দৌড়তে থাকি। তারপর খানিকটা আগু পিছু হয়। ৮০ মিটার

বাকী থাকতে আবার আমরা একই সঙ্গে দৌড়াতে থাকি। ত্রিশ মিটার আমরা সমানে সমান পাল্লা দিয়েছিলাম। তারপর মনে হলো আমি কিপকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছি। ত্রিশ মিটার যখন আমি কিপের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছিলাম তখন খুব নিশ্চিত হতে পারি নি যে তাকে আমি ছাড়িয়ে যেতে পারবো। পেছনে ফিরে দেখি কি সকলেই আমাদের পিছনে কিপকে পিছনে ফেলতে পারলে আমি সকলের আগে যেতে পারবো। তাই যখন আমি তাকে অতিক্রম করে গেলাম তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—ভগবান আমি যেন জিততে পারি, আমি যেন জিততে পারি। শেষ পর্যন্ত আমি জিতে গেলাম। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভে আনন্দের আতিশয্যে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। বিজয় বেদীতে দাঁড়িয়ে মনে হল সত্যি ফ্র্যাঙ্কের শিক্ষায় ও অটুট সংকল্পের জোরেই আমি জিতেছি। আমার দেশ অস্ট্রেলিয়ার কথাও মনে পড়ে যায়।"

ডুবেল দৌড় শেষ করেছিলেন ১ মিনিট ৪৫.৩ সেকেণ্ডে। সময়টা পিটার স্নেলের বিশ্ব রেকর্ডের সমান। সাত বছর আগের পিটারের এই রেকর্ড এ পর্যন্ত আর কেউ স্পর্শ করতেই পারে নি। সেদিক থেকেও ডুবেলের কৃতিত্ব বড় কম নয়। সময়ের দিক থেকে এই কৃতিত্বে ডুবেল খুব বেশি উৎফুল্ল নয়। তাঁর মতে ৮০০ মিটার দৌড়ের ব্যাপারে সমতলে বা উঁচু জায়গার মধ্যে তুলনা না করাই ভাল। সমতলে ডুবেলের নিজের সময় হচ্ছে ১ মিনিট ৪৬.২ সেকেণ্ড। কাজেই মেক্সিকোতে এই সময় ১ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড থেকে ১ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডের মধ্যেই হওয়া উচিত ছিল। মেক্সিকোর মত উঁচু জায়গায় সমানভাবে দৌড়ানো যায়। এখানে ১ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড সময় করা খুবই সম্ভব। তবে মেক্সিকোতে দৌড়াবার আগে ডুবেল কখনও ১ মিনিট ৪৪ সেকেণ্ডের কথাও চিন্তা করতে পারেন নি, ১ মিনিট ৪২ সেকেণ্ড ত দূরস্থান।

কলেজের সাধারণ ছাত্র হিসেবে ডুবেল তাঁর এ্যাথলিট জীবন সুরু করে ওলিম্পিকের স্বর্ণ স্বীকৃতি নিয়ে পরম সাফল্যের পথে এগিয়ে গিয়েছেন। অবিচল নিষ্ঠা, সুপরিকল্পিত পথে অগ্রগতি ও অটুট সংকল্পই ছিল তাঁর সাফল্যের মূলমন্ত্র। দৌড়বিদরূপে যে সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল, অনুকূল পরিবেশ তাঁকে তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। মেক্সিকোর ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে তাঁর এই সাফল্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে তাঁর অনবদ্য দৌড়সৌষ্ঠবের জন্যে। এ সম্পর্কে জনৈক ক্রীড়াসমালোচকের মন্তব্য হচ্ছে "মেক্সিকোতে যে সব এ্যাথলীট স্বর্ণ-পদক জয় করেছেন তাঁদের কেউই ৮০০ মিটার দৌড়ের বিজয়ীবীর র‍্যালফ ডুবেলের মত ক্লাসিক স্টাইল দেখাতে সমর্থ হন নি।

খেলাধুলা

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড : ২৯৪ রান (ব্রায়ান হেস্টিংস ৮৩, বিভান কংডন ৬৬ এবং হেডোল নট আউট ৩৫ রান। ওয়ার্ড ৬১ রানে ৪ উইকেট)

ও ৬৬ রান (১ উইকেট)

ইংল্যান্ড : ৪৫১ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। এডরিচ ১৫৫, শার্প ১১১ এবং ডলিভেরা ৪৫ রান। হেডলি ৮৮ রানে ৪)

নটিংহামের ট্রেন্টব্রিজে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ডের ২য় টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, খেলা ড্র গেছে। এই ফলাফলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বৃষ্টি। রাত্রির বৃষ্টিতে পিচ ডুবে যাওয়াতে তৃতীয় দিনের খেলা একঘণ্টা দেরীতে আরম্ভ হয় এবং ২০ মিনিট খেলার পর মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে তৃতীয় দিনের খেলা সম্পূর্ণ ভন্ডুল করে দেয়। তৃতীয় দিনে মাত্র পাঁচ ওভার খেলা হয়েছিল। পঞ্চম অর্থাৎ শেষদিন বৃষ্টির দরুন একঘন্টারও কম সময় খেলা হয়।

নিউজিল্যান্ড টসে জিতে প্রথমেই ব্যাটিংয়ের দান নেয় এবং প্রথম দিনের খেলায় ৬ উইকেটের বিনিময়ে ২৩১ রান সংগ্রহ করে। তাদের লাঞ্চের সময় রান ছিল ৬৮ (২ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ১৬১ (২ উইকেটে)। চা-পানের পরই ৪টে উইকেট খুব তাড়াতাড়ি পড়ে যায়। ৩য় উইকেটের জুটিতে কংডন এবং হেস্টিংস ২০৫ মিনিট ব্যাট করে দলের অতিমূল্যবান ১৫০ রান সংগ্রহ করে দেন।

দ্বিতীয় দিনে নিউজিল্যান্ডের ১ম ইনিংস ২৯৪ রানের মাথায় শেষ হয়। এইদিন তারা ৯৫ মিনিট খেলে বাকি ৪ উইকেটে আরও ৬৩ রান তুলেছিল। নিউজিল্যান্ড দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হেডলি (স্কুলশিক্ষক) ৩৫ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত থেকে যান।

ইংল্যান্ড এইদিন তাদের ১ম ইনিংসের একটা উইকেট খুইয়ে ২২৭ রান সংগ্রহ করেছিল। জন এডরিচ (১১৭ রান) এবং ফিল শার্প (১০৩ রান) সেঞ্চুরী করে অপরাজিত থাকেন। ইংল্যান্ডের ওপনিং ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কট কোন রান না করেই খেলা থেকে বিদায় নেন। টেস্টের উপর্যুপরি চারটি ইনিংসের খেলায় বয়কট এই নিয়ে তিনবার 'গোল্লা' করলেন—ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩য় টেস্টের ২য় ইনিংসে, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১ম ও ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসের খেলায়। তাঁর উপর্যুপরি চার ইনিংসের খেলায় রান দাঁড়িয়েছে : ০, ০, ৪৭ ও ০।

জন এডরিচ (ইংল্যান্ড) ২য় টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরী (১৫৫ রান) করেছেন

আলোচ্য খেলায় জন এডরিচ যে সেঞ্চুরী রান করেন তা তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের ৮ম সেঞ্চুরী। অপরদিকে শার্পের সেঞ্চুরী তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের ১ম সেঞ্চুরী।

তৃতীয় দিনে বৃষ্টির জন্যে মাত্র পাঁচ ওভার খেলা হয়েছিল। এই পাঁচ ওভারের খেলায় ইংল্যান্ডের ১৪ রান উঠেছিল। ইংল্যান্ডের ১ম ইনিংসের রান দাঁড়ায় : ২৪১ (১ উইকেটে)। এডরিচ ১২৮ রান এবং শার্প ১০৬ রান করে অপরাজিত থাকেন।

চতুর্থ দিনে ইংল্যান্ড ১ম ইনিংসের ৪৫১ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে দেয়। এইদিন ইংল্যান্ড আরও ৭টা উইকেট খুইয়ে ২১০ রান যোগ করেছিল। ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় লাঞ্চের সময় ৩১০ (৩ উইকেটে) এবং চা-পানের সময় ৪১৬ (৭ উইকেটে)। চা-পানের সময় ইংল্যান্ড ১২২ রানে এগিয়ে ছিল এবং হাতে জমা ছিল ১ম ইনিংসের আরও তিনটে উইকেট। ২য় উইকেটের জুটিতে এডরিচ এবং শার্প ২৪৯ রান তুলে দিয়েছিলেন। এডরিচ ৩৫০ মিনিট খেলে তাঁর ১৫৫ রানের মাথায় আউট হন। তিনি ১৯টা বাউন্ডারী করেছিলেন। নিউজিল্যান্ড ১৫৭ রানের পিছনে পড়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ৪র্থ দিনের খেলার বাকি সময়ে কোন উইকেট না-খুইয়ে ৩৭ রান তুলেছিল।

পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে এক ঘন্টারও কম সময় খেলা হয়েছিল। বৃষ্টির ফলে নিউজিল্যান্ডের ২য় ইনিংসের ৬৬ রানের (১ উইকেটে) মাথায় খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়।

প্রদর্শনী ফুটবল

দিল্লীতে আয়োজিত প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াং জি ক্লাব ৪-০ গোলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে পরাজিত করার গৌরব লাভ করে। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে খেলা ভাঙ্গার নির্ধারিত সময়ের ১৩ মিনিট আগে খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। প্রথমার্ধেই ৪টি গোল দিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াং জি ক্লাব অগ্রগামী ছিল। দলের খ্যাতনামা লেফট আউট জং একাই তিনটি গোল দিয়েছিলেন—১ম, ৩য় ও ৪র্থ গোল।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ইয়াং জি ক্লাবের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা যোগদান করেন নি। তাঁদের শূন্যস্থান উঠতি খেলোয়াড় দিয়ে পূরণ করা হয়েছিল। লেফট আউট জং, যিনি এই খেলায় দলের চারটি গোলের মধ্যে তিনটি গোল দিয়েছিলেন তিনিও দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় খেলতে নামেন নি।

দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়াং জি দলের খেলার পদ্ধতি এবং খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য খুবই উপভোগ্য হয়েছিল—দ্রুতগতি, মাটিঘেঁষা সট, তৎপরতার সঙ্গে স্থান পরিবর্তন, বল আদান-প্রদানে নিখুঁত বোঝাপড়া এবং সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক খেলা। দক্ষিণ কোরিয়ার খেলোয়াড়দের বলিষ্ঠ দৈহিক গঠন ফুটবল খেলার পক্ষে খুবই উপযোগী।

এখানে উল্লেখ্য, গত ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ কোরিয়ার জাতভাই উত্তর কোরিয়া কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী পর্তুগালের কাছে ৩-৫ গোলে পরাজিত হলেও তাদের সে পরাজয় অগৌরবের হয়নি। উত্তর কোরিয়া ৩-০ গোলে অগ্রগামী ছিল এবং তাদের খেলার পদ্ধতি দর্শকদের চমৎকৃত করেছিল।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

কলকাতায় আই এফ এ পরিচালিত ১৯৬৯ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান লীগ চ্যাম্পিয়ান আখ্যা লাভ করেছে। এইই নিয়ে মোহনবাগান মোট ১৪ বার লীগ চ্যাম্পিয়ন হল। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার ইতিহাসে মোহনবাগানই সর্বাধিকবার (মোট ১৪ বার) লীগ চ্যাম্পিয়ান খেতাব জয়ের রেকর্ড করেছে। মোহনবাগানের এই ১৪-বারের লীগ জয়ের মধ্যে উপর্যুপরি জয় আছে—৩ বার (১৯৫৪—৫৬) এবং ৪ বার (১৯৬২—৬৫)। ১৯৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গল দলের লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার ফলে মোহনবাগান উপর্যুপরি ৫-বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার দুর্লভ গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়। এখানে উল্লেখ্য, এই প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় একমাত্র মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব উপর্যুপরি ৫ বার (১৯৩৪—৩৮) লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের সুপার লীগ খেলায় মোহনবাগানের হবিবের কাছ থেকে ইস্টবেঙ্গল দলের থঙ্গরাজ বল ছিঁনিয়ে নিচ্ছেন। এই খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা ১৮৯৮ সালে। সেই সময় থেকে এপর্যন্ত এই ৪টি ভারতীয় দল মোট ৩৩ বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—মোহনবাগান ১৪ বার, মহমেডান স্পোর্টিং ১০ বার, ইস্টবেঙ্গল ৮ বার এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে ১ বার। ভারতীয় দলের পক্ষে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় লীগ চ্যাম্পিয়ান খেতাব পাওয়ার প্রথম গৌরব লাভ করে মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪ সালে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৩৩ সালের পর ইউরোপীয় অথবা গোরা দলের পক্ষে লীগ জয় সম্ভব হয়নি।

১৯৬৯ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা দুটি পর্যায়ে ভাগ করে খেলানো হয়েছিল—প্রাথমিক লীগ এবং সুপার লীগ খেলা। সুপার লীগ খেলার ফলাফলের উপর লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ নির্ধারিত হয়েছে। প্রাথমিক লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকার প্রথম পাঁচটি দলই সুপার লীগ খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অপরাজিত অবস্থায় প্রাথমিক লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকায় শীর্ষস্থান পেয়েছিল—১৬টা খেলায় ২৯ পয়েন্ট। অপরদিকে রানার্স আপ হয়েছিল মোহনবাগান—১৬টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট। এই দুই দল ছাড়া সুপার লীগে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছিল পোর্ট কমিশনার্স, বি এন আর এবং বাটা স্পোর্টস ক্লাব। সুপার লীগ খেলায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে মোহনবাগান (৪টে খেলায় ৭ পয়েন্ট)। ইস্টবেঙ্গল তাদের বাকি একটা খেলায় এক পয়েন্ট সংগ্রহ করলেই রানার্স-আপ হবে।

মোহনবাগানের লীগ বিজয়

সাল	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	পঃ
১৯৩৯	২৪	১৬	৭	১	৩১	৭	৩৯
১৯৪৩	২৪	১৬	৭	১	৩৫	৬	৩৯
১৯৪৪	২৪	১৮	৪	২	৩৯	৮	৪০
১৯৫১	২৬	২০	৪	২	৪৭	৫	৪৪
১৯৫৪	২৮	১৯	৮	১	৩৮	৭	৪৬
১৯৫৫	২৬	১৫	৮	৩	৩৯	১২	৩৮
১৯৫৬	২৬	১৯	৫	২	৫৫	৯	৪৩
১৯৫৯	২৮	২১	৬	১	৪৯	৪	৪৮
১৯৬০	২৮	২২	৫	১	৬১	১০	৪৯
১৯৬২	২৮	১৬	৮	৪	৪৭	১৮	৪০
১৯৬৩	২৮	২১	৫	২	৫৯	৮	৪৭
১৯৬৪	২৮	১৯	৯	০	৪৭	৬	৪৭
১৯৬৫	২৭	২৪	৩	০	৫১	৩	৫১
১৯৬৯ প্রথম পর্যায়ের লীগ							
	১৬	১২	৩	১	৩০	৪	২৭
সুপার লীগ							
	৪	৩	১	০	৯	১	৭

উল্লেখযোগ্য লীগ বিজয়

মোহনবাগান (১৯ বার—রেকর্ড) : ১৯৩৯, ১৯৪৩-৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪-৫৬ (উপর্যুপরি ৩ বার), ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২-৬৫ (উপর্যুপরি ৪ বার), ১৯৬৯।

মহমেডান স্পোর্টিং (১০ বার) : ১৯৩৪-৩৮ (উপর্যুপরি ৫ বার—রেকর্ড), ১৯৪০-৪১, ১৯৪৮, ১৯৫৭ ও ১৯৬৭।

ক্যালকাটা এফ সি (৮ বার) : ১৮৯৯, ১৯০৭, ১৯১৬ ১৯১৮, ১৯২০, ১৯২২-২৩ এবং ১৯২৫।

ইস্টবেঙ্গল (৮ বার) : ১৯৪২, ১৯৪৫-৪৬, ১৯৪৯-৫০, ১৯৫২, ১৯৬১ ও ১৯৬৬।

ডালহৌসী (৪ বার) : ১৯১০, ১৯২১ ও ১৯২৮-২৯।

ডারহামস (৩ বার) : ১৯৩১-৩৩ (উপর্যুপরি ৩ বার)।

পূর্ববর্তী লীগ চ্যাম্পিয়ান
(১৯৩০ সাল থেকে)

সাল	দল
১৯৩০	রয়েল রেজিমেন্ট
১৯৩১-৩৩	ডারহামস এল আই
১৯৩৪-৩৮	মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৩৯	মোহনবাগান
১৯৪০-৪১	মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৪২	ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৩-৪৪	মোহনবাগান
১৯৪৫-৪৬	ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৭	পরিত্যক্ত
১৯৪৮	মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৪৯-৫০	ইস্টবেঙ্গল
১৯৫১	মোহনবাগান
১৯৫২	ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৩	পরিত্যক্ত
১৯৫৪-৫৬	মোহনবাগান
১৯৫৭	মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৫৮	ইস্টার্ণ রেলওয়ে
১৯৫৯-৬০	মোহনবাগান
১৯৬১	ইস্টবেঙ্গল
১৯৬২-৬৫	মোহনবাগান
১৯৬৬	ইস্টবেঙ্গল
১৯৬৭	মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৬৮	অসমাপ্ত

ডেভিস কাপ

১৯৬৯ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার ইন্টার-জোন ফাইনালে রুমানিয়া ৩-২ খেলায় বৃটেনকে পরাজিত করে চ্যালেঞ্জ রাউন্ড অর্থাৎ মূল প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমেরিকার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে কমিউনিস্ট দেশের পক্ষে রুমানিয়ার এই প্রথম খেলা।

রুমানিয়া বনাম বৃটেনের ইন্টার-জোন ফাইনালে খেলাটি খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক হয়েছিল। প্রথম দিন খেলার ফলাফল সমান (১-১) দাঁড়ায়। দ্বিতীয় দিনের ডাবলস খেলায় রুমানিয়া জয়ী হয়ে ২-১ খেলায় এগিয়ে যায়। তৃতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলস খেলায় বৃটেনের জয়লাভে খেলার ফলাফল পুনরায় সমান (২-২) দাঁড়ায়। শেষ সিঙ্গলস খেলায় নাস্তাসে ৩-৬, ৬-১, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে বৃটেনের মার্ক কক্সকে পরাজিত করে স্বদেশকে জয়যুক্ত করেন।

দাবার আসর

বাংলাদেশে অনেকেই আছেন যাঁরা দাবা খেলা জানেন না, কিন্তু শিখতে চান। তাঁদের অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেছেন দাবা খেলার সমস্ত রকম নিয়মাবলী, চাল লিপিবন্ধ করার প্রণালী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। সুতরাং এই সংখ্যা থেকে দাবা খেলার একেবারে মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা সুরু হচ্ছে।

দাবার ছক :—দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান এমন ৬৪টি ঘরবিশিষ্ট ছকে দাবা খেলা হয়ে থাকে। সমস্ত ছকটা আটটি সারিতে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি সারিতে আটটি করে ঘর থাকে। ঘরগুলো পর্যায়ক্রমে সাদা এবং কালো রঙের হয়; অর্থাৎ সারির যে ঘরটি কালো, তার পরের ঘরটিকে সাদা হতেই হবে। ঠিক আক্ষরিক অর্থে সাদা-কালো নয়। মোট কথা, একটি ঘর হবে পাতলা রঙের, তার পাশেরটি হবে গাঢ় রঙের।

খেলার শুরুতে ছকটি এমনভাবে বসাতে হবে যাতে খেলোয়াড়ের ডান দিকে কোণের ঘরটি সাদা ঘর হয়। সুতরাং ছকের চিত্রটা হবে এই রকম—

ছকের ঘরগুলিকে তিনভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ে থাকে:—র‍্যাঙ্ক, ফাইল এবং ডায়াগোনাল। লম্বালম্বি সারিগুলিকে বলে ফাইল, পাশাপাশি সারিগুলির নাম র‍্যাঙ্ক। ঘরগুলিকে কোনাকুনিভাবে দেখলে বলা হয় ডায়াগোনাল। সুতরাং লম্বালম্বিভাবে দেখলে ছকে আটটা ফাইল আছে, পাশাপাশিভাবে আছে আটটা র‍্যাঙ্ক। র‍্যাঙ্ক এবং ফাইলের ঘরগুলি পর পর সাদা কালোয় ভাগ করা। কিন্তু ডায়াগোনালগুলি সব সময়েই এক রঙের হয়।

একটিমাত্র ঘুটি (ঘোড়া) বাদ দিলে, দাবা খেলার সমস্ত ঘুটিই র‍্যাঙ্ক, ফাইল, কিম্বা ডায়াগোনাল দিয়ে চলাফেরা করে।
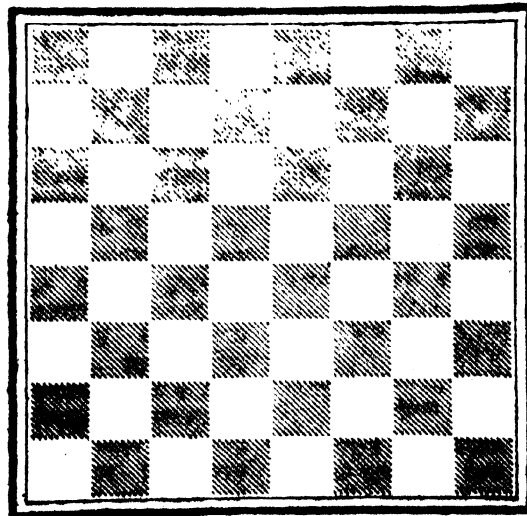
দাবার ছক পাতার পদ্ধতি

ছকের উপর দিকে কালো ঘুঁটির খেলোয়াড় এবং নীচের দিকে সাদা ঘুঁটির খেলোয়াড় বসেছে। লক্ষ্য করুন যে উভয় খেলোয়াড়েরই ডানদিকের কোনের ঘরটি সাদা।

খেলার ঘুঁটি:—প্রতি দলে খেলার শুরুতে ১৬টি করে ঘুঁটি থাকে। ঘুঁটিগুলি ছয় রকমের। ঘুঁটির নাম, সংখ্যা, সংক্ষিপ্ত নাম এবং প্রতীক চিহ্ন নীচে দেওয়া হোল।

রাজা:—উভয় পক্ষেই একটি করে রাজা থাকে। সমস্ত ঘুঁটির মধ্যে রাজাই সাধারণতঃ দীর্ঘতম হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা হয় 'রা'। ইংরাজীতে রাজাকে বলে 'কিং'।

মন্ত্রী:—প্রতি দলে একটি করে মন্ত্রী থাকে। সংক্ষেপে 'ম'। ইংরাজীতে বলে 'কুইন'।

নৌকা—প্রতি দলে দুটি করে নৌকা থাকে। সংক্ষেপে 'ন'। ইংরাজী—রুক্।

ঘোড়া—প্রতি দলে দুটি করে ঘোড়া থাকে। সংক্ষেপে 'ঘ'। ইংরাজী—নাইট্।

গজ—প্রতি দলে দুটি করে গজ থাকে। সংক্ষেপে 'গ'। ইংরাজী—বিশপ্।

বড়ে—প্রতি দলে আটটি করে বড়ে থাকে। সংক্ষেপে 'ব'। ইংরাজী—পন্।

খেলার শুরুতে ঘুঁটিগুলির অবস্থান কি হবে তা পাশের ছকে দেখুন।

ঘুঁটি সাজানোর নিয়ম

খেলা সুরু হওয়ার আগে এইভাবে ঘুঁটিগুলি সাজিয়ে নিতে হবে। ছকে যে যে ঘরে নৌকা, ঘোড়া, গজ, রাজা, মন্ত্রী এবং বড়েগুলি বসেছে, খেলা সুরুর সময় ঠিক এইভাবে সেই ঘরগুলিতে রাজা, মন্ত্রী, গজ ইত্যাদি বসিয়ে নিতে হবে।

পাঠক লক্ষ্য করবেন সাদা মন্ত্রী সাদা ঘরে এবং কালো মন্ত্রী কালো ঘরে বসেছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের দিক থেকে দ্বিতীয় র‍্যাঙ্কে বসেছে বড়েগুলি। খেলোয়াড়ের নিকটতম র‍্যাঙ্কের একেবারে কোণের ঘর দুটিতে দুটি নৌকা বসেছে। দুটি নৌকার পাশে বসেছে দুটি ঘোড়া, দুটি ঘোড়ার পাশে আছে দুটি গজ। সাদা রাজা সব সময় কালো ঘরে বসে, কালো রাজা সাদা ঘরে।

এইভাবে বল সাজিয়ে খেলা শুরু করা হয়। সব সময়ই সাদার প্রথম চাল হয়। সাদা কালো দু'জন খেলোয়াড়কেই পর্যায়-ক্রমে চাল দিয়ে যেতে হবে। কেউই ইচ্ছে করে চাল না দিয়ে থাকতে পারবে না। কোন ঘুটিকে একটি ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত করাকে চাল দেওয়া বলে।

জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতা

আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে বাঙ্গালোরে ৮ম জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ 'এ' প্রতিযোগিতা সুরু হচ্ছে। প্রতিযোগিতাটি লীগ প্রথায় হবে। এতে অংশগ্রহণ করছেন মোট ১৬ জন খেলোয়াড়। এ'দের মধ্যে ১০ জন গত মে-জুন মাসে বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ 'বি' প্রতি-যোগিতা থেকে বাছাই হয়ে এসেছেন। বাকী ৬ জন খেলোয়াড় সরাসরি 'এ' প্রতিযোগিতায় খেলবেন। এই প্রতি-যোগিতার বিজয়ী খেলোয়াড়ই ভারতের জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়ন খেতাব পাবেন। ১৬ জনের মধ্যে যে ৬ জন খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় প্রথম ৬টি স্থান দখল করবেন, তাঁরা আগামী বারের (১৯৭১ সালের) জাতীয় 'এ' প্রতিযোগিতায় সরাসরি খেলবার অধিকার অর্জন করবেন।

এই ১৬ জনের মধ্যে আছেন ভারতের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শ্রীনাসির আলি। আর আছেন শ্রীম্যানুয়েল এ্যারন যিনি অনেক প্রখ্যাত গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়ে অর্জুন পুরস্কার লাভ করেছেন এবং বিশ্ব দাবা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার আখ্যাও পেয়েছেন। সুতরাং প্রতিযোগিতাটি যে আকর্ষণীয় ও উচ্চ মানের হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নীচে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াদের নাম দেওয়া হোল। যে ৬ জন খেলোয়াড় সরাসরি এই প্রতিযোগিতায় খেলছেন, তাঁদের নাম প্রথমে দেওয়া হোল।

(১) নাসির আলি (উত্তরপ্রদেশ), (২) এম, এ্যারন (মাদ্রাজ), (৩) মহম্মদ হাসান (অন্ধ্র), (৪) আর, বি, সাপ্রে (মহারাষ্ট্র), (৫) এস, সাখালকার (মহারাষ্ট্র), (৬) ফারুক আলি (অন্ধ্র), (৭) এস, দেবগন (দিল্লী), (৮) এম, আর, ওয়াহি (দিল্লী), (৯) এম, ভাছা (অন্ধ্র), (১০) আর, কে, গুপ্তা (দিল্লী), (১১) এস, হাসান (মহারাষ্ট্র), (১২) আর, দান্ডেকর (মহারাষ্ট্র), (১৩) এস, শালিগ্রাম (মহারাষ্ট্র), (১৪) এন, খালিব (অন্ধ্র), (১৫) কে, কে, শুক্লা (উত্তরপ্রদেশ), (১৬) দেবব্রত শেঠ (বাংলা)।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনায় সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০·০০	টাকা ২২·০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০·০০	টাকা ১১·০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫·০০	টাকা ৫·৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি' লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৯ম বর্ষ ২য় খন্ড

১৭শ সংখ্যা মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 29th August, 1969 শুক্রবার—১২ই ভাদ্র, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীদীপক

আলোকপর্ণা

'অমৃতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আলোকপর্ণা' নিয়মিত পড়ছি। খুব ভালো লাগছে। কোনো গ্রন্থের বিশেষ করে উপন্যাসের সবটুকু না পড়ে হয়ত-বা কোন মন্তব্য করা উচিত হবে না। কিন্তু 'আলোকপর্ণা' সম্পর্কে এই আটাশ কিস্তি পাঠ করে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হওয়া যেতে পারে। কারণ ঔপন্যাসিক তাঁর কাহিনীকে এবার দ্রুত পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছেন।

একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতিনিধি শশাঙ্ক নিয়োগী, অপর দিকে উঠতি বণিকতন্ত্রের প্রতিনিধি কানাই পাল। আর এই দুয়ের সংঘর্ষের টানাপোড়েনে ঘোলা রাজনীতির জটিল আবর্ত—এরই মাঝখানে কোলকাতার ছেলে আধুনিক যুবক বিকাশের জীবন-সমস্যা ও মানসিক দ্বন্দ্বকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করে চলেছেন শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়। কাহিনীর পরিবেশ সৃজনে ও নায়কের মানস-দ্বন্দ্ব রূপায়ণের সহায়তা করছে তাঁর আশ্চর্য সুন্দর ব্যঞ্জনাধর্মী ও কাব্যিক ভাষা। বিকাশ যেন এই দশকের যন্ত্রণাদগ্ধ যুব-মানসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ যে তথাকথিত 'জীবন যন্ত্রণা'য় সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস জর্জরিত—তার বিন্দুমাত্র স্পর্শ 'আলোকপর্ণা'য় নেই এবং শ্রীগঙ্গোপাধ্যায়ই হালের বাংলা সাহিত্যে অন্যতম সাহিত্যিক যিনি তাঁর লেখায় 'যন্ত্রণা'র আর্তনাদ শোনাচ্ছেন না ও কাহিনীর মধ্যে নারী-মাংসের চাট দিয়ে আদি রসের 'ককটেল' পরিবেশন করছেন না। 'আলোকপর্ণা' এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। উপন্যাসটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হলে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সংযোজন হিসেবে স্বীকৃত হবে বলে বিশ্বাস করি।

নুরুল ইসলাম মোল্লা
অধ্যাপক : বাংলা বিভাগ : ডি. এন. কলেজ
অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ

ড্রীমল্যান্ড

আমরা 'অমৃত'র বহু দিনের পাঠিকা। অমৃত আজকাল নতুন নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে আমাদের এক আগ্রহের সামগ্রী হয়েছে। অমৃতর জন্য সপ্তাহের একটি দিন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। তাই অমৃতর দীর্ঘায়ু কামনা করে আপনাকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। 'ড্রীমল্যান্ড' পড়তে পড়তে সত্যই বোধহয় স্বপ্নরাজ্যে চলে যাচ্ছি। এত অপূর্ব লাগছে। তাই লেখককে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই। নিমাই ভট্টাচার্য আবার লিখছেন দেখে খুব খুশী হয়েছি। নমস্কার রইল।

শীলা দাস ও অপর্ণা মুখার্জি
ইস্ট গোটানগর, গৌহাটি—১১

'বৈকালী-নাচঘর' প্রবোধ গুহ প্রসঙ্গে

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে জংলী-দা'কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের বিভ্রান্তি নিরসন করেছেন বলে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দলের মুখপত্র হিসেবে 'বৈকালী' পত্রিকা প্রকাশের বিস্তৃত ইতিহাস আমাদের জানা ছিল না। এবং এও জানা ছিল না যে, একদা 'বৈকালী' শিশির-সম্প্রদায়ের সপক্ষে প্রচারকার্য চালাতো এবং এই ব্যাপারে স্বয়ং হেমেন্দ্র-কুমার রায়ের লেখনী সবচেয়ে বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। উল্টে হেমেন্দ্রকুমার যখন 'নাচঘর'-এর সম্পাদনা করছিলেন, তখন বহুবার তাঁর মুখ থেকে আমরা 'বৈকালী'র অন্যায় শিশির-বিরোধিতার নিন্দাই শুনেছিলুম। বিংশ দশকের সব কথা আজ পুরোপুরি মনে থাকা সম্ভব নয়। তবে যেন মনে হচ্ছে, প্রবোধচন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে আসবার কিছুদিন বাদেই 'বৈকালী' তার রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং আর্ট থিয়েটারের প্রচারপত্র বলে পরিগণিত হয়; এ ছাড়াও যেন মনে হয়, 'বৈকালী' প্রথমে জংলীদাদের আমলে দৈনিক থাকলেও পরে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য স্মৃতির ওপর নির্ভর করেই একথা বলছি।

নান্দীকর

বেতারশ্রুতি

আমি বেতারশ্রুতি বিভাগের একজন আগ্রহী ও নিয়মিত পাঠক। কোনরূপ উদ্দেশ্য না নিয়েই নিছক আমার মনের কয়েকটি কথা বলতে চাই। আপাতদৃষ্টিতে পত্রটি 'শ্রবণক' মহাশয়ের প্রশংসামূলক হলেও যাঁরা বেতারশ্রুতির নিয়মিত পাঠক তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন আশা-করি।

শ্রবণক মহাশয় যেভাবে আকাশ-বাণী কলকাতা কেন্দ্রের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও নানান দিক নিয়ে আলোচনা করছেন তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি-সম্পন্ন। তাঁর লেখার সঙ্গে আমি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখকের লেখার লেখার মিল দেখছি। তিনি হলেন মুখোশের পরিচয়ের শ্রীনিরপেক্ষ।

আকাশবাণী, কলকাতার বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে তিনি যেভাবে আলোচনা করছেন তা সত্যই সাহসিকতাপূর্ণ ও অনুধাবন-যোগ্য। অনেক বিষয়ে তাঁর আলোচনার আগে আমার মনে হত যদি অমুক বিষয়টি আলোচিত হত তাহলে আকাশ-বাণীর কর্মকর্তাদের স্বগরিমা ও আত্ম-তৃপ্তির লাঘব হতে পারে। শতং বদ মা লিখ এই নীতিবাক্য মানলে আর যাই হোক পাঠকের মনের দর্পণস্বরূপ জনপ্রিয় বা নামকরা পত্রপত্রিকা যে হতে পারে না তা অনেকেই স্বীকার করবেন। শ্রবণকের লেখনী যে কী নির্ভীক তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করতে চাই। গত ২৫।৪।৬৯ তারিখে বেতারশ্রুতি বিভাগে তিনি লিখেছেন—

এই বিশাল ভারতবর্ষে গান্ধীজী ছাড়া আর কি মনীষী নেই? গান্ধীজী শান্তি মৈত্রী আর প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন চৈতন্যদেব কি কিছু কম করে-ছিলেন? গান্ধীজী বিশ্বের দরবারে ভারতের আধ্যাত্মিকতার রূপটি তুলে ধরেছিলেন বিবেকানন্দ কি কিছু কম করেছিলেন? গান্ধীজী বিশ্বসভায় ভারতের আসন সু-প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ কি কিছু কম করেছিলেন? গান্ধীজী দেশের স্বাধী-নতার জন্যে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন সুভাষচন্দ্র কি কিছু কম করেছিলেন?

তাহলে বাংলা দেশের বেতারকেন্দ্র থেকে এঁদের সম্বন্ধেই বা 'শাশ্বতবাণীর' মতো অনুষ্ঠানে প্রচারিত হবে না কেন? আমার মতে আকাশবাণীর বর্তমানে প্রচারিত অনু-ষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অনাবশ্যক দুটি। একটি উক্ত 'শাশ্বতবাণী' এবং অপরটি 'দেশবন্দনা' এই দেশবন্দনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে শ্রবণক মহাশয় গত ২০।৬।৬৯ তারিখের বেতারশ্রুতি বিভাগে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেছেন। আকাশবাণীর অনুষ্ঠানসূচী লক্ষ করলে দেখা যায় এই কেন্দ্রে আধুনিক এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতেরই প্রাধান্য। এই দুটি সঙ্গী-তের এতই শ্রোতা যে এরজন্যে বেতারশিল্পী-দের অনুষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে অনুরোধের আসর রাখতে হয়েছে। এই অনুরোধের আসরে আবার অ-প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের আধুনিক গানের অত্যধিক ছড়াছড়ি অথচ জনপ্রিয় শিল্পীদের সব-রকমের সঙ্গীতসম্বলিত আধুনিক গান-সমৃদ্ধ "বাংলা ছায়াছবির গান"-এর অনুষ্ঠান নগণ্য ও সন্দেহজনকভাবে অব-হেলিত। আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, বাংলা ছায়াছবি-মার্কা গানের অনুরোধের আসর যতটা জনপ্রিয় অন্যান্য অ-ছায়াছবি-মার্কা গানের অনু-

রোধের আসর ততটা জনপ্রিয় কি? আমি তো আমার চাকুরীজীবনে আট-নটি শহরে বসবাস করবার সময় লক্ষ্য করেছি যে, বাংলা ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠানের চাহিদা একমাত্র মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

কলকাতা শহরে ট্রামে-বাসে কথ্য হিন্দী ভাষার বাহুল্য দেখে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ বোধহয় মনে করেছেন, বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠানসূচীতে বাংলা গানের জন্যে ৪৫ মিনিট সময়-ই যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা ছাড়াও যে শহর আছে এবং শহর ছাড়াও যে গ্রাম আছে—আর এই শহর ও গ্রামের বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা যে কলকাতার তুলনায় বহুগুণ বেশী, তা কি তাঁরা জানেন না? যদি তাঁদের এটা জানা থাকে, তবে আমরা মফঃস্বলের অধিবাসীরা হিন্দী ছবির গানের জন্যে যে সময় দেওয়া হয়েছে, সেই সময়ের অন্তত অর্ধেক সময়ও কি বাংলা ছায়াছবির গানের জন্যে আশা করতে পারি না? অনুরোধের আসরে প্রায়ই শোনা যায়, কয়েকজন বিশেষ শিল্পীর গান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাজছে। আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ হয়ত প্রমাণ করতে চান এঁরা ছাড়া আর জনপ্রিয় শিল্পী কোথায়? অথচ ঐসব শিল্পী এখনও ততটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া তো একটি ফ্যাশনে দাঁড়িয়েছে। যাঁর কণ্ঠে ঐ সঙ্গীত বেমানান বা উচ্চারণ অস্পষ্ট, তিনিও আমাদের ঐ সঙ্গীত শুনিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথকে না জানলে হয়ত সাহিত্য-বাসরে যোগ দেওয়া অসম্ভব, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত না জানলেও যে একজন নামকরা সংগীতশিল্পী হওয়া সম্ভব একথা কে বোঝাবে।

প্রতিকারের জন্যে আকাশবাণীতে লিখে কোনও ফল হয় না। তাঁদের প্রশস্তি যে পত্রে থাকবে মাসে-পত্রের উত্তর পাওয়া যায় না। তাই আপনাদের কাছে লিখলাম।

সুদামচন্দ্র কংসবণিক
চুঁচুড়া, হুগলী

(২)

অমৃতে শ্রবণকের 'বেতারশ্রুতি' একটি আকর্ষণীয় বিভাগ। তবে ৮ই আগস্টের ১৪শ সংখ্যায় শ্রীসামসুল হকের একটি প্রশ্নের জবাব আপ টু দি মার্ক মনে হল না। এখানে তাঁকে 'পুরো নম্বর' দিতে দিতে আমাদের সঙ্কোচবোধ করছি। ফুল মার্ক, ফুল নাম্বার সব ঠিক, কিন্তু 'পুরো মার্কের' উৎকর্ষ-বিচারে নম্বরের সাহায্য অপরিহার্য। আপ টু দি মার্ক বলতে বোঝায়—'যে পরিমাণে থাকলে ভাল বলে গৃহীত হতে সে পরিমিত।' এখন এই পরিসীমা মাপা হয় নম্বর দ্বারা। একশ নম্বরের 'ফুল মার্ক'। কাজেই 'নম্বর' জানতে চেয়ে কেউ যদি তাঁর কৃতিত্বের উৎকর্ষ যাচাই করতে চান তবে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করবেন না। সেক্ষেত্রে শ্রবণক-এর পক্ষে পণ্ডিত ব্যক্তিদের 'নম্বর বলা' রোধের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হওয়া বিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

সতীন্দ্রকুমার মিত্র
কলকাতা—৩২

যেন ভুলে না যাই

৯ শ্রাবণ সংখ্যার অমৃতে 'যেন ভুলে না যাই' বিভাগে ক্যাথরিন হেপবার্ণ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জাতিস্মর একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। এক স্থানে তিনি লিখেছেন—'ক্যাথরিন হেপবার্ণের শেষ ছবি আপনারা হয়ত অনেকেই দেখেছেন।...ছবির নাম গেস হুজ কামিং টু ডিনার।' কিন্তু একথা ঠিক নয়। গেস হুজ কামিং টু ডিনারের পর শ্রীমতী হেপবার্ণ 'দি লায়ন ইন উইন্টার' ছবিতে কাজ করে অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া তিনি 'দি ম্যাড ওমেন অফ শ্যালো' এবং অন্যান্য অনেক বইয়ে কাজ করেছেন ও করছেন।

প্রতীক রায়
নয়াদিল্লী

দাবার আসর

আমি অমৃতের পাঠক ও গ্রাহক। এতদিন যাবৎ যে বিষয়টি সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলাম, সেই বিষয়টি কিছুদিন যাবৎ অমৃতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দেখে খুব আনন্দিত হয়েছি। দাবা সম্বন্ধে আমি খুব আগ্রহী। আমি 'গজানন্দ বোড়ে'র কাছে দাবার পাঠ নিতে উৎসুক। আপনি যদি অনুগ্রহ করে তাঁকে এ বিষয়ে বলে আমাকে তাঁর ঠিকানা দিলে বিশেষ উপকৃত হব।

শ্রীবিশ্ববন্ধু সরকার
পেয়ারাবাগান, হুগলী

(১৬ সংখ্যা থেকে দাবার নিয়মকানুন ধারাবাহিকভাবে বেরোচ্ছে। অঃ সঃ)।

বইকুন্ঠের খাতা

গত কয়েক মাস থেকে আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠক। 'সাদা চোখে', 'আনন্দ গড়ার ইতিকথা', 'কুইজ', 'বৈকুন্ঠের খাতা' আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে।

গত সংখ্যার (৩০শে শ্রাবণ) ১৫ অগস্ট 'পিছনের এক বছর' পড়ে বেশ ভাল লাগল।

একটা কথা, যদি 'অমৃতে' নিয়মিত সংবাদের একটি বিভাগ খোলা হয় তাহলে কেমন হয়? অবশ্য সিনেমা সম্বন্ধে বিবিধ সংবাদ, বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ মাঝে মাঝে অমৃতের পাতায় দেখতে পাই। ঐ বিভাগগুলি ছাড়াও যদি দেশ-বিদেশের প্রয়োজনীয় 'কারেন্ট' সংবাদ আমরা অমৃতের পাতায় নিয়মিত পাই তাহলে আমরা অমৃতের পড়ুয়ারা আরও বেশী উপকৃত হব। এর সপক্ষে বা বিপক্ষে (যদি থাকে) আপনার মতামত জানবার অপেক্ষায় রইলাম।

সমরকুমার দত্ত
জামালপুর, বর্ধমান

আগমনী গান

আপনার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যদি কারও নিম্নলিখিত তিনটি গান জানা থাকে তাঁরা এই তিনটি গানের সম্পূর্ণ পদ আমাকে জানালে আমি অনুগৃহীত হব।

১। গিরি। গৌরী আমার এসেছিল
২। যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
৩। এবার আমার উমা এলে

শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা—২০

হিন্দীর দাপট

২রা জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত অমৃতে আপনার সম্পাদকীয় পাঠ করে মুগ্ধ হলাম। অহিন্দী রাজ্যগুলোতে হিন্দীকে জোর করে চালাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে জঘন্য স্বার্থপরতার পরিচয় দিচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে ঘৃণ্য। দিল্লীর এক শ্রেণীর নেতাদের এই 'ক্লিক' দমন করা আশু প্রয়োজন। পূর্বাঞ্চলে বিশেষত আমাদের বাংলা দেশে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। 'হিন্দী হটাও' আন্দোলনকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ, নীরব প্রতিবাদে কিংবা রেলস্টেশনে হিন্দী নাম মুছে দিল্লীর নেতাদের মত বা পথ পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আন্দোলন না করলে 'কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা যাবে যে পররাষ্ট্র দপ্তরে ও সর্বভারতীয় চাকুরীতে অহিন্দীভাষী এলাকার অধিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব কমে প্রায় শূন্যের অংকে এসে দাঁড়িয়েছে।' বাঙালীরা কি দিল্লীর নেতাদের নির্লজ্জতার কোন প্রতিবাদ জানাবে না?

অমিতাভ ঘোষ
চন্দননগর, হুগলী।

সাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পে অশান্তির একটি কারণ যে ঘেরাও এ বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট শরিকরা ভিন্নমত পোষণ করেন না। তবে ঘেরাও সম্পর্কীয় কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন যে, শ্রমিক-মালিক বিরোধের মাত্রাতিরিক্ত তিক্ততা থেকেই ঘেরাও উদ্ভব হয়েছে। ফ্রন্ট শরিকরা জোরের সঙ্গে বলেছেন, শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির জন্যে মালিক পক্ষের অনতিবিলম্বেই এগিয়ে আসা উচিত। তাঁরা আরও বলেছেন যে, সমস্ত কিছু পুরনো দাবি-দাওয়ার সমাধানের জন্যে আর দেরি না করে মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হওয়া দরকার। এবং এ-সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্যে যুক্তফ্রন্ট মনে করে ত্রিপাক্ষিক আলোচনাই শ্রেয়। আর এ পন্থার কার্যকারিতা আছে কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

শ্রম-বিরোধ মীমাংসার জন্যে এই পথ-নির্দেশ করেও ফ্রন্ট শরিকরা বলেছেন যে, শ্রেণী সংঘর্ষের মাধ্যম হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীকে তাঁরা সমর্থন জানাবেন, যখন তাঁরা ধনবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। অবশ্য যুক্তফ্রন্ট শ্রমিক শ্রেণীর এই লড়াইয়ের একটি রূপরেখা এঁকে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর কঠোর শ্রম-লব্ধ অধিকারগুলি রক্ষার গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে যুক্তফ্রন্ট শ্রমিকদের পক্ষেই থাকবেন।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সত্ত্বেও ফ্রন্ট একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি যে ক্ষেত্রবিশেষে কিছু-কিছু লোক সামান্য অজুহাতেও শ্রমিকদের ঘেরাও করতে প্ররোচনা দিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন এবং মাত্রাতিরিক্তভাবে ক্ষমতার ও সুযোগের অপব্যবহার ঘটেছে। এই সমস্ত ঘটনা যুক্তফ্রন্ট মনে করে সার্বিক শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র নষ্ট করে এবং আখেরে আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। প্রমাণ আছে যে, ফ্রন্ট-বিরোধী শক্তিগুলিও সুযোগ বুঝে যুক্তফ্রন্টকে নাজেহাল করবার জন্য ঘেরাও করেছেন। প্রতিক্রিয়াশীলরাও এর সুযোগ নিয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট শ্রমিক নেতৃবৃন্দের নিকট আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, এ ধরনের দুষ্ট প্রভাবকে রুখতে হবে। না হলে শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষতি হতে বাধ্য।

এই সাবধানবাণী উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্ট একথাও বলেছে যে, ঘেরাও-এর ফলে শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হয়েছে। ফ্রন্ট-শরিকরা এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে রাজি নন। তাঁরা মনে করেন, সুদীর্ঘ কংগ্রেস শাসনের ভুল শ্রম ও শিল্পনীতি শুধু উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি অধিকন্তু এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়নকেও শ্লথ করে দিয়েছে। এবং এই ভুল নীতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবে এসেছে, ছাঁটাই, লক-আউট শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবার মানসিকতা। এ সমস্ত অবস্থা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এক অস্বস্তিকর অসহনীয় পরিবেশ। ঘেরাও সেই পরিস্থিতিরই ফলশ্রুতি মাত্র।

ঘেরাও সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই করোনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে। এই প্রস্তাব রচিত হয়েছে ফ্রন্ট নিয়োজিত এক তিন-সদস্য বিশিষ্ট কমিটি দ্বারা। আর এই কমিটি প্রস্তাব রচনার মালমশলা নিয়েছেন ফ্রন্ট-শরিকদের দীর্ঘ সময়ের আলোচনার মধ্য থেকে। এই প্রস্তাব ফ্রন্টের সমস্ত শরিকেরই অনুমোদন লাভ করবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা প্রত্যেক দলেরই বক্তব্য এই প্রস্তাবের মধ্যে নিখুঁতভাবে সংযোজন করা হয়েছে।

কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে প্রস্তাবের বয়ানের সঙ্গে কেউ দ্বিমত হবে বলে মনে হয় না। দীর্ঘদিন থেকে মালিকশ্রেণী যে নীতি অবলম্বন করেছেন তার ফলে ঘেরাও যে হয়েছে একথা যুক্তফ্রন্ট স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য অনেকে বলবেন, এতদিন ধরে ত এই হারে ঘেরাও হয় নি? যুক্তফ্রন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গেই মাত্রা বাড়ল কেন? কিন্তু ভেবে দেখা দরকার যুক্তফ্রন্ট গদীতে বসার পর ঘেরাও যদি না বাড়ত তবে সেই ঘটনাই অস্বাভাবিক হত। যে যাই মনে করুন না কেন, মেহনতি মানুষের একটি বিশেষ অংশই ফ্রন্টকে যে তাঁদেরই সরকার মনে করেন একথা অনস্বীকার্য। অবশ্য আগেও যে ঘেরাও হত না তা নয়। কিন্তু মালিকের এক ডাকেই পুলিশ এসে হাজির হতো আর সেই অবস্থায় শ্রমিকরা পিছিয়ে যেতেন। কিন্তু ফ্রন্ট সরকার বর্তমানে মালিকদের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবার ফলে শ্রমিকরা কিছুটা এগিয়ে আসতে পেরেছেন। না হলে আগের মতই পড়ে পড়ে মার খেতে হত। কিন্তু ঘেরাওকে কেন্দ্র করে যে রব উঠেছিল যে দেশ গেল, শিল্প গেল —উৎপাদন না হলে সমূহ ক্ষতি হবে—এহেন আর্তনাদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেয়েও আত্মপ্রেমের উপাদান ছিল বেশী। একথা মনে রাখতে হবে যে, দেশের মধ্যে যাঁরা ধনবাদী বলে পরিচিত তাঁদের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। বিপুল জনতার যে সমাজ ব্যবস্থায় জীবনমান উন্নয়নের পরিবেশ নেই, সেই ব্যবস্থা টিঁকতে পারে না। সেই জাতি বাঁচতে পারে না। কাজেই যুক্তফ্রন্ট মালিক-শ্রেণীকে এগিয়ে এসে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বিরোধ মীমাংসার যে আবেদন জানিয়েছেন তা শুধু সময়োচিত নয় দেশের পক্ষে মঙ্গলদায়কও বটে। ইতিমধ্যেই তো পাট শিল্পে ধর্মঘট হওয়ার ফলে কয়েক কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা আয়ে ঘাটতি হয়ে গেল। কিতু ধর্মঘটের মিটমাট হয়েছে। শ্রমিকরাও তাঁদের মাসমাহিনা এক লহমায় ৩০ টাকা বাড়িয়ে নিতে সমর্থ হয়েছেন। শিল্পমালিক ও কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি না মানলেও শ্রমিকদের একটি বিশেষ দাবী ত মেনে নিলেন। কাজেই আগে-ভাগে একটি কঠোর মনোভাব গ্রহণ না করে যদি বেতনবৃদ্ধির দাবীকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে মেনে নিতেন তবে এই বিদেশী মুদ্রার লোকসান হত না। যতক্ষণ আন্দোলন করে প্রাণ বিসর্জন না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ কারও দাবির যৌক্তিকতা আছে একথা কেউ স্বীকার করতেই রাজি হন না। জানি না বুকে এই দুরারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ কত দিন থাকবে কে জানে। কিন্তু তত দিনে দেশের সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। দৃষ্টিভঙ্গী যদি পালটানো হয় তবে অনেক কঠিন সমস্যা চক্ষের নিমেষে সমাধান হতে পারে। পাটশিল্পের ধর্মঘটের মীমাংসা তারই প্রমাণ।

এখন আবার চা শিল্পে সার্বিক ধর্মঘট চলছে। এখানেও বিদেশী মুদ্রার আয়ের প্রশ্ন জড়িত। এই নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার আগেই হয়ত ধর্মঘটের মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু দেয়া-নেয়ার মনোভাব নিয়ে যদি শ্রমিকদের দাবী বিবেচনা করা হত তবে ধর্মঘট হয়ে লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকত কি? কেন অহেতুক এই শক্তি পরীক্ষা?

কাজেই যুক্তফ্রন্ট মালিকদের এগিয়ে এসে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আবেদন জানিয়ে এমন কিছু নতুন কথা বলে নি। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে যাঁরা পারবেন না তাঁরা দেশকে শিল্পায়নেও সাহায্য করতে পারবেন না। কারণ খিলবন্ধ মন নিয়ে বাস্তবকে উপলব্ধি করা যায় না। উপরন্তু বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ব্যবহারিক নীতি নির্ধারিত করতে না পারলে কালের রথচক্রে পিষ্ট হয়ে যাবেন। এ একেবারে অবধারিত সত্য।

যুক্তফ্রন্ট যেটা নতুন নীতি নিয়েছেন, তা হচ্ছে পুলিশের ভূমিকা বিষয়ে আগে মালিকরা টেলিফোন তুললেই পুলিশ হাজির হতো। যুক্তফ্রন্ট সেটা বন্ধ করে দিয়েছেন। পুলিশের এই ভূমিকা পালটানো দরকার ছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের মধ্যরাত্রি থেকেই। কারণ স্বাধীনতা ভারতের প্রত্যেক মানুষের জন্যই এসেছিল। কোন শ্রেণী-বিশেষের জন্যে নয়। যে নীতির ফলে আর এক শ্রেণীর কাছে স্বাধীনতার দ্বার বন্ধ ছিল সেই দরজাই ফ্রন্ট উন্মুক্ত করে দিলেন মাত্র। যুক্তফ্রন্ট নিশ্চয়ই এর জন্য প্রশংসার দাবি করতে পারে।

কিন্তু কারণ বিশ্লেষণের যে অংশের সঙ্গে সকলে একমত হতে পারবেন না তা হচ্ছে, তবু প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্রন্ট-বিরোধীরাই সুযোগ বুঝে ঘেরাও সমস্যাকে

কঠিনতর করে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষতি সাধন করেছে, এ বক্তব্য সম্পূর্ণ নয়। তারা ত আছেই। তারা ঐ অপকর্ম সংগঠিত না করলে বরং অস্বাভাবিকই মনে হত। কিন্তু ফ্রন্ট শরিকরা যে কথা বলেন নি সেটা হচ্ছে শ্রমিকবাদের উপর দলীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য শরিকী সংঘর্ষের কথা। এই শরিকী লড়াই জমির ক্ষেত্রে কিম্বা অন্য ক্ষেত্রে কি-ভাবে বন্ধ করে ফ্রন্টকে ঐক্যবদ্ধভাবে তার কর্মসূচী রূপায়ণের কাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার আলোচনা হয়েছে। পথ নির্দেশও ফ্রন্ট দিয়েছে। কিন্তু ঘেরাও-এর মাধ্যমে অনেক সময় দলীয় প্রভাব বিস্তারের যে প্রচেষ্টা হয়েছে একথা স্বীকার করে নিলে কিছু দোষ হত না। কারণ চৌদ্দটি দল যেখানে একাত্মভাবে এক বৃহৎ যজ্ঞের সম্পাদনে ব্রতী হয়েছে সেখানে ভুল ত্রুটি হওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশ্য আন্তর্দলীয় সংঘর্ষ নির্ধারণের জন্য যে ব্লু-প্রিন্ট রচিত হয়েছে সেটা শ্রমিক-ইউনিয়নগুলির ক্ষেত্রেও যে প্রযোজ্য হবে সে সম্পর্কে আশা পোষণ করা যেতে পারে।

কিন্তু একটি কথা। ঘেরাও সম্পর্কে কি সংজ্ঞা ফ্রন্ট দিয়েছেন তা এখনও পরিষ্কার-ভাবে জানা যায় নি। মনে হয় ঘেরাও-এর সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ, দেখা যায় যে, ঘেরাও নয়, তাও অনেক সময় ঘেরাও বলে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি ধর্ণা, অবস্থান ইত্যাদি-কেও ঘেরাও বলে অনেক সময় চালানো হয়েছে। ঘেরাও বলতে সাধারণত যে অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হচ্ছে কোন এক ব্যক্তিকে কিছু সংখ্যক লোক পরিবেষ্টন করে থাকা। এর ফলে ঐ ব্যক্তির স্বাধীন চলাফেরায় বাধা ঘটে। আবার যদি কিছু শ্রমিক তাদের কোন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অফিসকক্ষের সামনে অবস্থান করেন এবং সে অফিসারের অন্য পথে বেরিয়ে যাবার উপায় না থাকে, তাকেও ঘেরাও বলা চলে না। কারণ, অবস্থান সাময়িকও হতে পারে। যদি না শ্রমিক একথা ঘোষণা করে যে, সেই অফিসারকে দাবি-দাওয়া মেনে না নেওয়া পর্যন্ত বাইরে যেতে দেওয়া হবে না, তবে তা ঘেরাও নয়। কিন্তু দেখা গেছে, অনেক সময় সাময়িক অবস্থানও ঘেরাও বলে চিহ্নিত হয়েছে। ঘেরাও যত না হয়েছে তার চেয়ে আতঙ্কের ভাব ঘটেছে বেশী। এবং গুজব, নেপথ্য প্রচার ইত্যাদি এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেক আজগুবি কাহিনীর সৃষ্টি করেছে। কোন ক্রমেই এটা সুস্থ সামাজিক চরিত্রের লক্ষণ নয়। যুক্তফ্রন্টের এদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত।

ঘেরাও-এর ফলে শ্রমিক বন্ধুদের লাভ কতটুকু হয়েছে জানি না। তার কোন সঠিক অংকও নেই। কিন্তু ঘেরাও-এর অলৌকিক মহিমা আজ সর্বস্তরে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে গুণাগুণ বিচার না করেও অনেক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ঘেরাও-এর কথাই এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাইছি। শিল্পে ঘেরাও হলে যে ক্ষতি হয় তা কাঁচা-মালের উৎপাদনের। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ঘেরাও চলতে থাকলে ক্ষতি হবে মনের, মানসিকতার। এ শিল্পে যে কাঁচামালের প্রয়োজন তা অনুশীলন করে মননশীলতার মাধ্যমে উৎপাদন করতে হয়। এটা জন্মে মনের কারখানায়। মাঠে, ঘাটে বা অন্য আধারে হয় না। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে ঘেরাও-এর বাড়াবাড়ি ঘটলে মনের ক্ষতি হবে, জ্ঞানেরও ক্ষতি হবে।

অবশ্য একথা বলা হচ্ছে না যে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে দুর্নীতি নেই। কিম্বা শুধু ছাত্ররাই এর জন্য দায়ী, শিক্ষকমশায়রা এর জন্য দায়ী নন। খুঁটিয়ে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় সমাজের দুষ্ট ক্ষতেরই এ আর এক প্রতিচ্ছবি মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যেভাবে শ্রমিক তার দাবি আদায়ের জন্যে লড়াই করে, ছাত্রদের সংগ্রাম ঠিক সেভাবে হওয়া উচিত কি?

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

শ্রীগিরির গলায় জয়মাল্য

"আমি সম্মানের সবচেয়ে উঁচু আসনে বসেছি। আমার আর কোন মোহ নেই। আমি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক।" —এই সেদিন কলকাতায় যে মানুষটি একথা বলে গিয়েছিলেন তাঁর আরও একটি উচ্চ সম্মানের পদ পাওয়া বাকী ছিল। শ্রীবরাহগিরি বেঙ্কট গিরির আগেও দুজন উপ-রাষ্ট্রপতির পদোন্নতি হয়েছিল। ডাঃ রাধাকৃষ্ণান এবং ডাঃ জাকির হোসেন, দুজনই আগে উপ-রাষ্ট্রপতি, পরে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। শ্রীগিরি যদি এই শেষের ধাপ অতিক্রম না করতে পারতেন তাহলে সেটা হত একান্তই একটা ব্যতিক্রম।

কংগ্রেস নেতৃত্বের যে অংশ এই ব্যতিক্রম ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁরা শ্রীগিরিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি, কিন্তু সেই চেষ্টা করতে গিয়ে তাঁরা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে একটা প্রচন্ড আলোড়ন এনেছেন এবং কংগ্রেসকে একটা ভাঙনের সম্মুখীন করেছেন।

২০ আগস্ট লোকসভার ৬২ নম্বর কক্ষ থেকে এই ঐতিহাসিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়ে যাওয়ার পর অনেক দিন পর্যন্ত যে এই রাজনৈতিক আলোড়নের জের চলবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি গিরি রাষ্ট্রপতি হলেন, এতে অতীতের একটা নজীর রক্ষা হল বটে, কিন্তু অনেক দিক দিয়েই এটা ছিল নজীর-ভাঙা নির্বাচন। আনুষ্ঠানিকভাবে যাঁকে কংগ্রেসের প্রার্থী বলে ঘোষণা করা হয়েছে, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যাঁর মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে তাঁর পরাজয়বরণ করতে হল, এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটল। এই প্রথম কংগ্রেসের একটি অংশ দলের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার নির্দেশ অগ্রাহ্য করলেন ও সেই বিদ্রোহী অংশের নেতৃত্ব করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এই প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন তীব্র হল যে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও নিশ্চিত বোঝা যাচ্ছিল না, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি জিতবেন, না শ্রীভি ভি গিরি জিতবেন। এই প্রথম ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় প্রেফারেন্সের ভোট গুনতে হল। এত কম ভোটের ব্যবধানে এর আগে আর কেউ রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন নি। দ্বিতীয় প্রেফারেন্সের ভোট নিয়ে শ্রীগিরি পেয়েছেন মোট ভোটের ৫০·২৩ শতাংশ। তাঁর আগে যাঁরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা শতকরা ৫৬·২ থেকে শতকরা ৯৮টি পর্যন্ত প্রথম প্রেফারেন্স ভোট পেয়েছিলেন।

ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ১১টি রাজ্যে শ্রীগিরি শ্রীরেড্ডির চেয়ে বেশী ভোট পেয়েছেন। ঐ ১১টির ভিতরে কংগ্রেস শাসনাধীন অন্ধ্র প্রদেশ, হরিয়ানা, কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশও আছে। শ্রীগিরির পক্ষে অন্য রাজ্যগুলি হচ্ছে বিহার, নাগাল্যান্ড, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল। সংসদে যেখানে কংগ্রেস সদস্যদের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৪৩২ সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী রেড্ডির পক্ষে ভোট পড়েছে মাত্র ২৬৮ জনের। গোপন ব্যালটের এই ভোটে ঠিক কতজন কংগ্রেস সদস্য দলের নির্দেশ অমান্য করেছেন তা বলা সম্ভব নয়, তবে যদি ধরে নেওয়া যায় যে, কংগ্রেস দলের বাইরের একটিও প্রথম প্রেফারেন্স ভোট
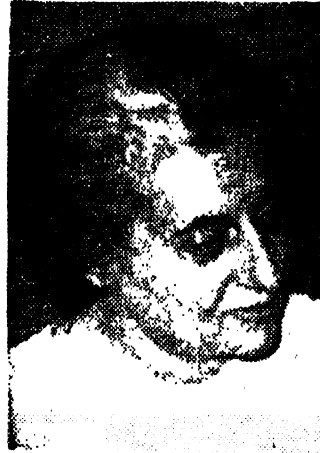
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

পান নি (যে-অনুমান আদৌ ঠিক নয়) তাহলে কংগ্রেস দলের মধ্যে এই "বিদ্রোহের" ব্যাপকতা সম্পর্কে কতকটা আন্দাজ করা যেতে পারে। লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিয়ে মোট ৪৩২ জনের ভিতরে ২৬৮ জন যদি শ্রীরেড্ডিকে ভোট দিয়ে থাকেন তাহলে সংসদে "বিদ্রোহী" কংগ্রেসীদের অনুপাত দাঁড়াল প্রায় ৩৮ শতাংশ। সবগুলি রাজ্য মিলে যেখানে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ১৬০২ সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী রেড্ডিকে ভোট দিয়েছেন ১২৩৫ জন। অর্থাৎ "বিদ্রোহীদের" অনুপাত শতকরা ২৩। গুজরাট মহীশূর ও মহারাষ্ট্র ছাড়া এমন একটিও রাজ্য দেখা গেল না যেখানে সমস্ত কংগ্রেস সদস্য একজোট হয়ে নির্দ্বিধায় দলীয় প্রার্থীকে জেতাবার চেষ্টা করেছেন।

নিঃসন্দেহে এই নির্বাচন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর নীতির জয় ও কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা তাঁর বিপক্ষে রয়েছেন তাঁদের সামনে একটা চ্যালেঞ্জ। স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসঙ্ঘের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী করার জন্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা যে চেষ্টা করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস সদস্যদের "বিবেকের নির্দেশ" অনুযায়ী ভোট দেওয়ার অধিকার দিতে বলেছিলেন। ঘটনায় প্রমাণ হল যে, কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে যাঁদের বিবেকের রায় সিন্ডিকেটের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে গেছে তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। ঘটনায় শ্রীমতী গান্ধীর একথাও সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সিদ্ধান্তের ফলে ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রতিশ্রুতির ফলে কংগ্রেসের ভূমিকা সম্পর্কে দেশের মানুষের মধ্যে একটা নূতন আশার সঞ্চার হয়েছে ও কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের নূতন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই নির্বাচন উপলক্ষে সারা দেশে যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তার একটা কারণ এই যে, দেশের মানুষ শ্রীগিরিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর অর্থনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিল।

এই প্রায়-অভাবিত সাফল্যের পর শ্রীমতী গান্ধীর সুর কতকটা নরম হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। যাঁরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন তাঁদের কাউকে কাউকে তিনি বলেছেন, তিনি কংগ্রেসের ঐক্যের জন্য কাজ করে যাবেন, যদিও তার জন্য তিনি সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের সহযোগিতার উপর নির্ভর করবেন।

কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনের যাঁরা কর্ণধার, দলীয় শৃঙ্খলার প্রশ্নটি যাঁদের কাছে বড় তাঁরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবেন কিভাবে? শ্রীগিরি নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা যে বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে যদি কোন ইঙ্গিত নিতে হয় তাহলে বলতে হয় যে, এই নির্বাচনের ফলাফল দেখে তাঁরা দমবেন না। কংগ্রেস এম-পি শ্রীঅর্জুন অরোরাকে ইতিমধ্যে দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, শ্রীফকরুদ্দীন আলি আহমেদ, শ্রীজগজীবন রাম, উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী, পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীজইল সিং ও বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীএ পি শর্মার কৈফিয়ত তলব করা হয়েছে। "বিদ্রোহী"-দের শাস্তি দেওয়ার প্রশ্নটি বিবেচনা

করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটগণনার রাত্রে কংগ্রেস সভাপতি সাংবাদিকদের বলেছেন যে, শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তিনি দৃঢ়সংকল্প।

শ্রীগিরিকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা যে বিবৃতি দিয়েছেন তার মধ্যেও তাঁর সেই সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন, "নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি যে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের আনুগত্য, সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু আমি দুঃখিত, বহু কংগ্রেস সদস্য তাঁদের কর্তব্য করেন নি। তাঁরা দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। এই ঘটনা দুঃখজনক এবং কংগ্রেসের এত বছরের ঐতিহ্যের পরিপন্থী।... নির্বাচনী ফলাফল যাই হোক না কেন, দলের মধ্যে শৃংখলা বজায় রাখতে হবে।"

কিন্তু ক্রমেই এটা পরিষ্কার হয়ে আসছে যে, বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের "শৃংখলাভঙ্গকারী"দের শাস্তি দিতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে দলের মধ্যে গুরুতর ভাঙনের ঝুঁকি নেওয়া। ইতিমধ্যে দিল্লীর একদল কংগ্রেস কর্মী কংগ্রেস সভাপতির বাড়ীর সামনে বিক্ষোভ করে তাঁকে হুশিয়ারি দিয়ে এসেছেন যাতে তিনি শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা না করেন। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার পদত্যাগের দাবীও উঠেছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির নেতৃত্ব থেকে শ্রীমতী গান্ধীকে ভোটের জোরে সরান সম্ভব হবে না। পার্টির নিয়ম হল, অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়ে দলের নেতাকে সরাতে হলে অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা চাই। সংসদে শ্রীগিরির ২৬৮টি ভোট পাওয়া থেকে প্রমাণ হয় যে, শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সম্ভব নয়।

কংগ্রেসের এখন পরিষ্কার দুই তরফ। দুই তরফেরই মুখের বুলি দলের ঐক্য। এক তরফ বলছেন আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যের কথা আর এক তরফ বলছেন শৃংখলার ভিত্তিতে ঐক্যের কথা। শ্রীযশোবন্তরাও চ্যবন এখনও যে চেষ্টা করে চলেছেন তাতে দুই তরফের দুই ধরনের ঐক্যের চাহিদার মধ্যে আদৌ কোথাও সামঞ্জস্য হবে কিনা এই মুহূর্তে বলা কঠিন।

শ্রীগিরির এই জয়ে দেশের বামপন্থী দলগুলি স্বভাবতই বিশেষ উৎফুল্ল। তারা এই জয়কে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল শক্তির জয় বলে গণ্য করছে। ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি দীর্ঘকাল ধরে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের প্রগতিশীল অংশের সাহায্য নেওয়ার যে তত্ত্ব প্রচার করে এসেছে, শ্রীগিরির জয়ে পার্টি তাদের সেই তত্ত্বেরই সার্থক প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছে। নিজের দলের ভিতরকার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর

আমাদের রাষ্ট্রপতি

ভি ভি গিরি
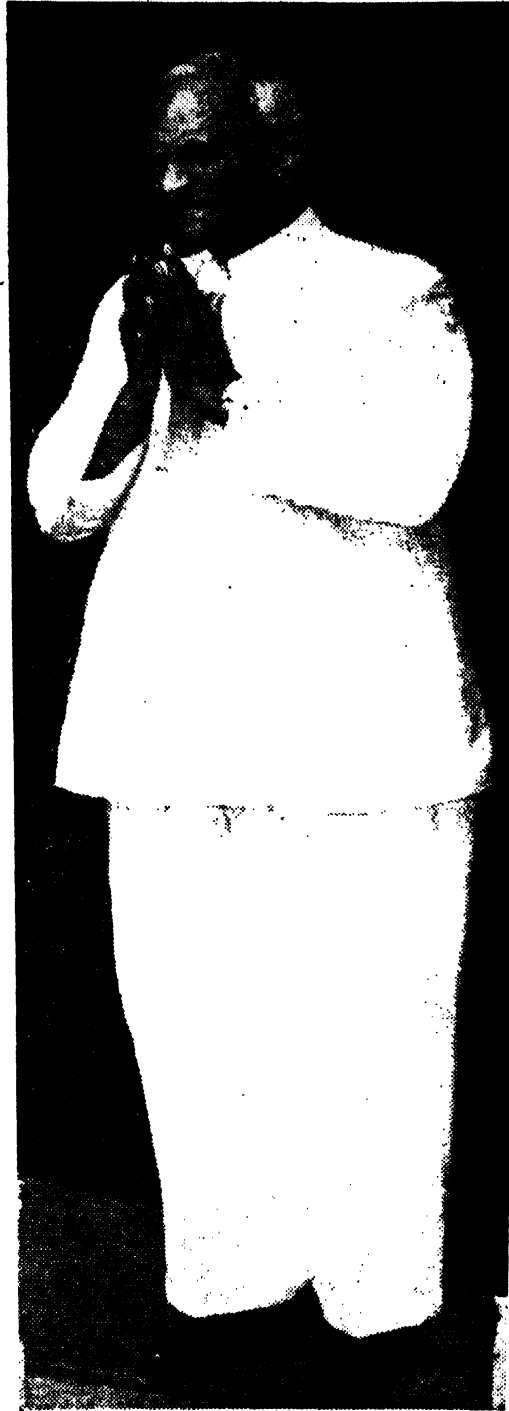
আন্তর্জাতিক সংবাদ

সরকারকে যদি বাইরের সাহায্য নিতে হয় তাহলে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি যে সেই সাহায্য নিয়ে নির্দ্বিধায় এগিয়ে আসবে তাতে সন্দেহ নেই। বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি যদিও ততখানি আগাম প্রতিশ্রুতিতে নিজেদের আবদ্ধ করে নি তা হলেও নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধী তাদের সমর্থনের উপর ভরসা করতে পারেন বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীভি ভি গিরি ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে রাষ্ট্রপ্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তিন বছর পরে সাধারণ নির্বাচন। দেশের শাসনে কংগ্রেসের একাধিপত্য ক্রমে ক্রমে লোপ পাওয়ার যে প্রক্রিয়া কিছুদিন আগেই শুরু হয়েছে আগামী নির্বাচনের শেষে সেই প্রক্রিয়া তীব্রতর হবে এবং কেন্দ্রে কোন একটি দলের একার পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব হবে না। সেই অবস্থায় স্থায়ী সরকার পরিচালনার উপযুক্ত কোন জোট গঠনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ভাগ্যের বিধান ও নির্বাচকমন্ডলীর রায় এই দেশের জন-জীবনের একজন পরীক্ষিত নেতাকে সেই ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দিল।

১৮৯৪ সালের ১০ আগস্ট গঞ্জাম জেলার বহরমপুরে এই ইতিহাসপুরুষের জন্ম। সে সময়ে বহরমপুর মাদ্রাজ প্রেসি-ডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন সেটি ওড়িষ্যার অন্তর্গত। (শ্রীগিরি যদিও তেলুগু-ভাষী তা হলেও তিনি নিজেকে উৎকলী বলে গণ্য করেন)। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি ডাবলিনে আইন পড়তে যান। আয়ারল্যান্ডের মানুষ তখন ইংল্যান্ডের অধীনতা থেকে মুক্তি-লাভের জন্য লড়াই করছিলেন। তরুণ গিরি সেখানে আইরিশ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯১৬ সালে আয়ার-ল্যান্ডে সামরিক আইন জারী হওয়ার পর বৃটিশ সরকারের আদেশে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। এর আগে ১৯১৪ সালে লন্ডনে গান্ধীজীর সঙ্গে শ্রীগিরির যোগাযোগ হয়। কিন্তু তখন শ্রীগিরি হিংসার পথে বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটানোতে এবং যুদ্ধরত বৃটিশ সরকারকে যে কোনভাবে সম্ভব বিব্রত করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতের বনিবনা হয় নি।

আয়ারল্যান্ডের অভিজ্ঞতাই জাতীয়তা-বাদী শ্রীগিরিকে শ্রমিক আন্দোলনের পথে টেনে এনেছিল। আয়ারল্যান্ডে তিনি দেখে-ছিলেন, কিভাবে রেলওয়ে, পরিবহণ ও ডক শ্রমিকদের ধর্মঘট ইংরেজ সৈন্যদের চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আইরিশ বিপ্লবীদের সুবিধা করে দিয়েছিল। তখনই তিনি স্থির করেছিলেন, দেশে ফিরে তিনি শ্রমিক সংগঠন করবেন এবং সেই সংগঠনকে বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কাজে লাগাবেন। দেশে ফিরে এসে ১৯১৭ সাল থেকে নিজেকে পুরোপুরি শ্রমিক সংগঠনের কাজে নিয়োজিত করেন। রেলওয়ে কর্মীদের দেশব্যাপী সংগঠন তিনিই প্রথম গড়ে তোলেন।

শ্রীগিরি দুবার নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন, ১৯২৭ সালে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি হয়ে জেনিভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মে-লনে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে।

১৯৩৭ সালে মাদ্রাজের বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে শ্রীগিরি শ্রম ও বাণিজ্য দপ্তরের ভার পেয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের মে মাস থেকে কিছুকাল তিনি সিংহলে ভারতের হাই কমিশনার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু তাঁকে শ্রম দপ্তরের ভার দেন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার ব্যাঙ্ক ট্রাইব্যুন্যালের রায় পুরোপুরি মেনে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত করলে শ্রীগিরি মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৫৭ সালে তাঁর নির্বাচন আদালতের রায়ে বাতিল হয়ে যায়। এর পর তাঁকে কেরল, মহীশুর ও উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৬৭ সালের ৬ মে তিনি ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন এবং এর পরে ৩ মে ডাঃ জাকির হোসেন মারা গেলে তাঁর জায়গায় অস্থায়ী রাষ্ট্র-পতিরূপে কাজ চালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গত ১৩ জুলাই রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির নাম ঘোষিত হওয়ার পর শ্রীগিরি জানালেন, তিনি নির্দল প্রার্থী হিসাবে এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ২০ জুলাই তারিখে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থলাভিষিক্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার থেকেও নিজেকে মুক্ত করলেন। পদত্যাগ করার আগে তাঁর শেষ দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মন্ত্রিসভা থেকে শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণ ও ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের অর্ডিন্যান্সে স্বাক্ষর দান।

পর্বান্তর ও নতুন অধ্যায়

রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরির নির্বাচন কংগ্রেসের রাজনীতির পর্বান্তর ও নতুন অধ্যায়ের সূচনার সংকেত বহন করে এনেছে। কিছুদিন আগেও শ্রীগিরি ছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেসের আজীবন কর্মী ও নেতা। এর আগে প্রতিটি ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির শূন্য স্থানে উপরাষ্ট্রপতিকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। শ্রীগিরির ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটায় তিনি উপরাষ্ট্রপতি এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ করে নির্দল প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি বোর্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতারা মনোনয়ন দেন প্রাক্তন স্পীকার শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে। এই মনোনয়ন নিয়ে কংগ্রেস পার্টির পার্লামেণ্টারি শাখার সঙ্গে সংগঠন শাখার যে মতানৈক্য দেখা দেয় তার পরিণতিতেই প্রধানমন্ত্রীসহ কংগ্রেস সদস্যদের একাংশ বিবেক অনুযায়ী স্বাধীনভাবে ভোট দেবার দাবি তোলেন।

এই বিরোধ মীমাংসিত হয়নি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে এবং ভোটের ফল ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিরোধ হয়ে ওঠে প্রকাশ্য এবং তীব্র। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দুই প্রবীণ সহকর্মী শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীফকরুদ্দিন আলী আহমেদের কাছে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এর জন্য কৈফিয়ৎ তলব করেছেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এর ফয়সালা হবে। এটা আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের ভেতরে যে আদর্শের সংঘাত চলছে তা কার্যত এই প্রাচীন ও সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে ভাঙনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। একদিকে দলীয় শৃংখলারক্ষার দাবি, অন্যদিকে কংগ্রেসের ঘোষিত আদর্শ অনুযায়ী কর্মসূচী রূপায়ণের দাবি—এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকায় আজ কংগ্রেসের সামনে এত বড় সংকট।

এই নির্বাচনের ফলে কংগ্রেসপ্রার্থীর পরাজয়কে সংগঠন নেতারা সহজে মেনে নিতে চাইছেন না। তাঁরা প্রধানমন্ত্রীসহ দলের অন্যান্য সদস্য যাঁরা শৃংখলাভঙ্গ করেছেন তাঁদের শায়েস্তা করার হুমকী দিয়েছেন। এ জন্য যদি দল ভেঙে যায় তাহলেও তাঁরা পিছপা হবেন না, এমন একটি অনমনীয় মনোভাব নিয়ে তাঁরা বসে আছেন। বলা বাহুল্য, কংগ্রেসের পক্ষে আজ বড় দুর্দিন। কারণ, এই নির্বাচনে একজন বা দুজন সদস্যই কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দেননি। দলের একটি বৃহৎ অংশ দলীয় প্রার্থীর কাছ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সুতরাং একে নিছক দলত্যাগ বা ডিফেকশান বলে গণ্য করা নিজেকে চোখঠারার মতোই নির্বুদ্ধিতা বা একগুঁয়েমি। কংগ্রেসের এই সংকটে সংগঠনের নেতারা তা করবেন কিনা তা অল্পদিনের মধ্যেই জানা যাবে। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য হল, দলের বৃহৎ অংশের মতামতের মূল্য না দিয়ে সংগঠন নেতাদের একটি গোষ্ঠি যা তথাকথিত সিণ্ডিকেট নামে পরিচিত বরাবর প্রধানমন্ত্রীকে উপেক্ষা করে এসেছেন। দলের নীতি কার্যকর করার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর এবং দলের পার্লামেণ্টারি শাখার। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করে কিংবা তাঁর মতকে মর্যাদা না দিয়ে যদি গোষ্ঠিস্বার্থে দল এমন প্রস্তাব গ্রহণ করে যা দলের বা দেশের পক্ষে হানিকর তবে তার বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড়াতেই হবে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। তা ছাড়া শ্রীগিরির মতো একজন গান্ধীবাদী নেতার প্রতি সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেস সদস্যরা কোনো অন্যায় করেননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি শ্রীগিরির নির্বাচনকে গ্রহণ করা না হয় তাহলে কংগ্রেস দল হিসেবে জনসাধারণের কাছ থেকে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে।

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস বহু রাজ্যে হীনবল ও তার আদর্শ জনসাধারণের কাছে ম্লানজ্যোতি হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন যে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে এবং শ্রীগিরিকে সমর্থন জানিয়ে তিনি জনসাধারণের কাছে কংগ্রেসের হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেছেন। ১৯৭২ সালের নির্বাচনের কথা মনে রাখলে প্রধানমন্ত্রীর এই দাবিকে অসঙ্গত বলা যায় না। কংগ্রেসের সংগঠন-নেতারা কি দেওয়ালের লিখন এখনও পড়তে পারছেন না? কংগ্রেসের ভিতরে যে মতানৈক্য আছে তা দূর করার পথ হল দলের ভাঙন নয়, ঐক্যের সূত্রগুলোর ওপর জোর দেওয়া। এই ঐক্যের জন্যই আজ চেষ্টা করা উচিত। প্রতিশোধ নয়, কলহ ভুলে গিয়ে নতুন অধ্যায়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে আজ কাজ করতে হবে।

কংগ্রেস যে আদর্শ ঘোষণা করে তাকে কার্যে রূপায়িত করতে দ্বিধা করার জন্যই বহু রাজ্যে তার মর্যাদা নষ্ট হয়েছে, ক্ষমতা হয়েছে হাতছাড়া। ইয়োরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতেও সামাজিক কাঠামোতে যে অর্থনৈতিক সমতা আনবার চেষ্টা হয়েছে ভারতে সেই কাজটুকু করতে এত দ্বিধা কেন? কংগ্রেসকে যাঁরা বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষ স্বার্থের মুখপাত্র করতে চান তাঁরা কংগ্রেসের ক্ষতি করছেন। এখনও ভারতবর্ষে কংগ্রেসই সর্ববৃহৎ দল। তার বিকল্প দল এখনও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠেনি। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী এই সংকট সময়ে যে-নেতৃত্ব দিয়েছেন তাকে অস্বীকার না করে কংগ্রেস সংগঠনের নেতাদের উচিত হবে এই নেতৃত্বকে নৈতিক ও সর্ববিধ সমর্থন দিয়ে জাতীয় ঐক্যের পথ প্রশস্ত করা। তা না হলে কংগ্রেসের ও দেশের দুর্দিনকেই ডেকে আনা হবে।

সময়, দুঃসময়॥

তরুণ সান্যাল

হঠাৎ ইঁদুর দৌড়ে ঝুলে পড়ে ডায়ালে কাঁটায়
স্থির একা নিরুপায় পেণ্ডুলাম দোলে
সময় কি ঢিল দেয় অলক্ষ্য হাঁটায়
বালি ঝরে যায়
বালি ঝরে যায়
বুকের মধ্যের দরজা খোলে বন্ধ হয়
ফের খোলে

কেন খোলে?

চোখ বুজলে শুনতে পাই, যেন দেখতে পাই
হুস হুস এঞ্জিন যায় ঐ স্টেশন ছেড়ে কোন দূরে
দাঁড়ায় না রঙন-ঝোপের লাল-ঝলক টালির ইস্টিশনে
আমি দেখতে পাচ্ছি কথা লোফালুফি খেলছি মনে মনে
ক্রোধ হিংসা ভালোবাসা বিকীর্ণ জানলার মুখে
উদ্ভাসিত উচ্চারণ
বুকের স্পন্দনে
যাই, যাচ্ছি, যাই
ফিরে আসবে, যাই
ব্রিজের মাথায় সিটি
ঘুম ঘুম চোখে আড়মোড়া ভাঙে দূরের জংশন।

চমকে জেগে মধ্যরাতে বালিশে উদ্‌গ্রীব কান
ঢিবঢিব ঢিবঢিব
দূর থেকে ভেসে আসে হঠাৎ করুণ একা
ট্রেনের হুইশিল
চোখের ভিতরে আছো দৃশ্যাতীত
ওহে দৃশ্যো পরিদৃশ্যমান
বুকের স্পন্দন থেকে দূরতম নক্ষত্রনিখিল,

স্ফীতপালে একা স্পেসশিপ
এবং তরঙ্গ ভঙ্গে যুগ যায়, ডোবে ভাসে
সোনার টোপর সিঁথি-মৌ
শ্মশান চুম্বন ফুল
চুম্বন শ্মশান ফুল
ফুল ও চুম্বন-বা শ্মশান
সিনেমার পুল-গাঁথা জীবন-সংসার, আর
প্রভাতে সন্ধ্যায় দেখা দিগন্তে পরায় লাল ফোঁটা
অদৃশ্য আঙুল
সময় থিক থিক বালি
পেয়ালা পিরিচে বিছানায়
সময় ঝিকমিক ঢেউ
দুলে দুলে রৌদ্রপাতে যায়

কার পায়ে
কার পায়ে
আমিও শুধাই
হে সময়, হে দুঃসহ নিরবধি
হে চলেছো
হে না-থামা
হে রক্তের ব্যাদিত হাঁ-মুখ ঢেউয়ে
ক্ষণে ক্ষণে চূর্ণ প্রতিবিম্ব হয়ে
মন্দির বন্দর হাসি উৎসব
হে নদী—

গুমগুম্ ব্রিজের বুকে কালসন্ধি
মেঘে মেঘে বিদ্যুতের লাফ
টং
ক্লকে ছটফটায়, তাপ
নাকি সেতারে আলাপ।।

এ কেমন রসিকতা॥

পিনাকেশ সরকার

সবচেয়ে দূরে যাবে বলে সবচেয়ে কাছে আসো
অধোমুখী সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে

এ কেমন রসিকতা?
মাথার ওপরে ছাদ দুঃশীলা বধূর মতো
চেপে বসে থাকে...
ছাদের ওপারে নীল নক্ষত্রসুরভি
বিশীর্ণ হাতে শেষ কারুকলা
ভিতরে বাঁধতে চায় যেন জন্মদাস।

তবুও তো কথা বলি
আলোকস্তম্ভের কাছে গিয়ে স্বপ্ন যেন
ব্যর্থ ঠোঁট ঝিরঝির কাঁপে ঝাউপাতা।

এখন সভার থেকে বহুদূর অন্তরাল
অস্থির চৌকাঠে শুভ সন্ধিক্ষণ
এ সময়ে তুমি......
দূরযানী প্রতিনিধি, কী ভেবে? হঠাৎ কেন
সারাদিন এই রসিকতা?

বিতর্কিত আলোচনা

ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটি সম্প্রতি সংসদে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে বলা হয়েছে, ভারতীয় ছবিতে চুম্বন এবং নগ্নদেহের দৃশ্য আপত্তিকর নয়। শিল্পের শর্তে কিংবা গল্পের প্রয়োজনে চলচ্চিত্রে নায়ক-নায়িকার চুম্বন এবং নগ্নতা উপস্থিত করা হলে তা হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। কারণ কমিটি লক্ষ্য করেছেন বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র চলচ্চিত্র সেনসর করার ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেক উদার নীতি অবলম্বন করা হচ্ছে—বিশেষ করে আদিরসাত্মক বিষয়ে। তাছাড়া কমিটি মনে করেন, চলচ্চিত্রে চুম্বন এবং নগ্নতার স্বাধীনতা থাকলে মননশীল পরিচালকের পক্ষে শিল্পচিত্রনির্মাণের কাজ সহজতর হবে।

এই ধরণের সুপারিশ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অভিনব হলেও যে মোটেও অভিনন্দনযোগ্য নয় তা সোচ্চারে বলতে পারি। একজন ভারতীয় হয়ে কোন মতেই ভাবতে পারি না কী করে ফিল্ম সেনসরশিপ তদন্ত কমিটির কর্তাব্যক্তিরা এই সুপারিশকে সমর্থন করলেন! বিশেষ করে এই কমিটির সভাপতি শ্রীডি জি খোসলা অভাবনীয় এই পরিকল্পনায় কি করে রায় দিলেন তা ভেবে আরও আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি। শ্রীখোসলা একদা পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। অভিজ্ঞ এই মাননীয় বিচারকমহাশয় একবার ভেবে দেখলেন না যে দেশে বসে তিনি এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মত দিতে চলেছেন সে-দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিহাস কি বলে? ভারতের সভ্যতা তো দু'দিনের নয়। এর সনাতনী সৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি নানান শাখার ঐতিহ্য চিরদিন যেখানে 'সত্যম-শিবম-সুন্দরম' হয়ে সারা বিশ্বে এক বিশেষ মর্যাদা পেয়ে আসছে সেখানে কি করে সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় মাধ্যম চলচ্চিত্রে এই অশালীন চুম্বন এবং নগ্নতার দৃশ্য অনুমোদিত হতে পারে! সেনসর বোর্ডের এই ভয়াবহ রিপোর্ট পড়ে শংকিত এবং বিস্মিতবোধ করছি।

চলচ্চিত্রজগতের মারফৎ আমরা কোথায় নেমে এসেছি তা একবার ভেবে দেখা দরকার বিশেষ করে সেনসর বোর্ডের বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও হিন্দী 'সেক্স ফিল্ম' এবং 'ক্রাইম-ফিল্ম' আজ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে একবার ফিল্ম সেনসরশিপ তদন্ত কমিটির সদস্যদের ভেবে দেখতে বলি। ফিল্মী সংস্কৃতির চটুল চালচলন এবং হাল্কাঙেবের গানগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা যেভাবে ধীরে ধীরে তরুণ-তরুণীকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিমুখ করে তুলছে তা কি তাঁরা দেখেও দেখছেন না? আজকের চলচ্চিত্র যেন চুরি-ডাকাতি, খুন-জখম এবং যৌন অপরাধ সম্পর্কে পাঠ নেবার একটা পাঠশালায় পরিণত হয়েছে। সিনেমায় বর্ণিত খুন-জখম-মারামারি-যৌনকামনা প্রভৃতি অসামাজিক সুড়সুড়ি সমাজকে কি ক্ষতিগ্রস্ত করছে না?

আজকের সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। চলচ্চিত্রের সঙ্গে জনরুচির যে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা একটু চোখ ফেরালেই দেখা যায়। আজকের মেয়েরা কি ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে দিবা দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেটা লক্ষ্য করেছেন কি? গায়ের জামা-কাপড় কত সংক্ষিপ্ত হচ্ছে! এইসব অশালীনতা চলচ্চিত্রেরই প্রভাব। নায়ক-নায়িকাদের অনুকরণে আজকের তরুণসমাজ কতদূর এগিয়ে এসেছে। হিন্দী ছবির কুৎসিত নাচ এবং গানের মহড়া পুজো-পার্বণে দেখা যায় না কি? তাছাড়া চিত্রতারকা এবং জনপ্রিয় সংগীত-শিল্পীদের সশরীরে দেখবার জন্য কি ভীড় কি মারামারি চলেছে তাও কি বলে দিতে হবে। সাম্প্রতিক রবীন্দ্রসরোবরের ঘটনা থেকেও আমরা কি বুঝব না সিনেমার দৌলতে আজকের তরুণরা ভারতীয় আদর্শ ভুলে কোথায় নেমে যাচ্ছে।

এর পরেও যদি প্রকাশ্যে 'চুম্বন' এবং 'নগ্নতা' পর্দায় দেখা যায় তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াবে তা একবার কল্পনা করে দেখেছেন? আমাদের দেশের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের তফাত অনেক। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, ভারতের অধিকাংশ লোকের আয় যৎসামান্য। সুতরাং সস্তা চিত্তবিনোদনের জন্য চলচ্চিত্রে সবাই ঝুঁকেছেন। ফলে এইসব কুরুচিপূর্ণ ছবিগুলি দেখে সমাজের বৃহত্তর অংশ এই স্বল্পায়ী ব্যক্তিদের পারিবারিক অবস্থা আরও অবনতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এমনি এক অবক্ষয়ের সময়ে চলচ্চিত্রে যদি চুম্বন ও নগ্নদেহের দৃশ্য দেখান হয় তাহলে সমাজের যারা মেরুদণ্ড সেই সব কিশোর-কিশোরীরা যে 'পারভারটেড' হতে শুরু করবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চুম্বন এবং নগ্নতার মধ্যে কোন রকম শিল্পের তাগিদ থাকতে পারে একথা মনে করার কারণ কী! এতে চলচ্চিত্র-ব্যবসার আরও উন্নতি হতে পারে হয়তো হবেও, কিন্তু শিল্পের নয়।

সিনেমাতে চুম্বন ও নগ্নদেহ দেখান শুরু হলে তার প্রভাব সমগ্র সমাজের ওপর বর্তাবে। যেমন আজ ইংলন্ড কিম্বা আমেরিকায় দেখা দিয়েছে। তাছাড়া আর একটা কথা পরিবারপরিকল্পনার জন্য সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন সেই পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সংযত জীবনযাপনের প্রয়োজন আছে। সর্বত্র এইসব অশালীন দৃশ্য দেখে মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হতে পারে। ফলে পরিবার পরিকল্পনাও হয়ত বা ব্যর্থ হতে পারে।

আদিরসাত্মক বিষয়ে বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র চলচ্চিত্রে সেনসর করার ব্যাপারে অনেক উদার নীতি অবলম্বন করছেন বলে যে কথা তদন্ত কমিটি জানিয়েছেন তা আমাদের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হবে? ভারতীয় সমাজের সংস্কৃতিতে কি এতই দৈন্য যে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে আমাদের বাঁচতে হবে! আমাদের কি নিজস্ব ঐতিহ্য নেই! রামায়ণ-মহাভারতের ভারতবর্ষের কি আজ ন্যুব্জ, কুব্জ, অচল অবস্থা! আমাদের অতি প্রাচীন সংস্কৃতি সেই শিক্ষাই কি দেবে!

ভাবতে অবাক লাগে, এখনও কত কাজ বাকি! আমরা স্বাধীনতা পেয়েও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারি নি। আমাদের অধিকাংশ লোকেরা যেখানে নিরক্ষর, দরিদ্র সেখানে কত কাজ করার রয়েছে। গ্রামকে এখনও আমরা উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারি নি। গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করে তুলতে পারি নি। সুতরাং এ অজ্ঞানতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনটা ভাল কোনটা খারাপ বোঝার আগেই যদি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চুম্বন এবং নগ্নতার দৃশ্য দিয়ে ছবির জগৎ ভরিয়ে তুলি তাহলে সাধারণ সরল মানুষের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে সেটা অনুমান করতে পারছেন!

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট নিয়ে চলচ্চিত্র মহলেও বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বহু চলচ্চিত্রকার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের অভিমতটি তুলে ধরা যাক। তিনি বলেছেন, 'কোনটা শিল্পের প্রয়োজনে আর কোনটা নয়, সে বিচার করবেন কে? ফলে আসল সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে। অন্য দিকে আবার কিছু কিছু চলচ্চিত্রকার 'বক্স-অফিস'-এর কথা ভেবে পর্নগ্রাফির দিকে ঝুঁকে পড়বেন, অন্যায় সুযোগ নিতে চাইবেন হয়ত।' শ্রীরায়ের বক্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

আমরা তাই খোসলা-কমিটির কাছে একান্তভাবে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন চলচ্চিত্রে 'চুম্বন' এবং 'নগ্নতা' অবাধভাবে চলতে দিয়ে ভারতের গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতিকে বিনষ্ট না করেন।

—বিশেষ প্রতিনিধি

বুলি তখন তারের খেলা দেখাচ্ছে। ওর হাতে রঙীন ছাতা, মাটি থেকে ছ' ফুট উপরে তারের উপর মনোরম ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ফোকাসের আলো এসে পড়েছে মুখের উপর। তারের উপর ওর শুধু একটামাত্র পা। পরনে নীল রঙের ঘাগরা, মাড় দেওয়া শক্ত ঝালর চারদিকে গোল হয়ে ফুলে রয়েছে। তেল-না-দেওয়া লালচে চুল ফিতে দিয়ে পনি-টেল করে বাঁধা। ব্যাণ্ডের তালে তালে রঙীন ছাতা দুলে উঠছে। ফোকাসের আলোয় অপরূপ করে তুলেছে বুলিকে। বুলি ওরফে বুলবুলিই এখন গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ।

মাটিতে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়েছিল শেখর। কালো কোটের বুকে অনেকগুলো মেডেল আঁটা। গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের সর্ব-ময় কর্তা শেখর মাস্টার।

অপলক চোখে বুলির খেলা দেখছে শেখর। নিজের হৃৎপিন্ডের শব্দও বোধহয় শুনতে পাচ্ছে সে। রঙীন ছাতা নাড়তে নাড়তে বুলি তারের উপর পা মুড়ে বসল। আবার উঠে দাঁড়াল। তারপর এক লাফে ঘুরে দাঁড়াল তারের উপর। তারটা দুলে উঠল। ফোকাশের আলোয় ওর নীল ঘাগরা ঝকঝক করে উঠল। বুলি যেন পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল। চারধারের হাততালিতে তাঁবু কেঁপে উঠল।

আত্মগর্বে অপলক তাকিয়ে রইল শেখর। শাবাশ শিক্ষা! পড়ে যেতে যেতে সামলে নেওয়ার এই অভিনয়টুকুও নিখুঁত। খেলা শেষ হতে তারের কাছে গিয়ে দু' হাত বাড়াল শেখর। তারের উপর থেকে শেখরের বাড়িয়ে রাখা ব্যগ্র হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বুলি। তাকে মাটিতে নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল শেখর মাস্টার।

বুলির হাত ধরে রিং-এর সামনে এল। মাথা নীচু করে অভিবাদন করে পিছন ফিরল। হাততালির শব্দে তাঁবু ফেটে পড়ছে।

হাত ছেড়ে দিয়ে বুলির সঙ্গে পাশাপাশি রিং-এর বাইরে আসছিল মাস্টার। রিং-এর পিছন দিকে বেরোবার পথের পর্দার উপরে চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল। পর্দার ও-পাশে নবীন দাঁড়িয়ে। তারপরে প্রতিদিনের সেই ঘটনার আবার পুনরাবৃত্তি ঘটল মাস্টারের চোখের সামনে। বুলিকে দেখেই নবীনের চোখমুখ হেসে উঠল। বুলিও হেসে পর্দার দিকে এগিয়ে গেল।

দাঁতে দাঁত ঘষল শেখর মাস্টার। তারপর পিছন ফিরল। এসে দাঁড়াল রিং-এর মাঝখানে, আলোর সমারোহে। তাঁবুর চারদিকে তাকাল। কোথাও এতটুকু জায়গা খালি নেই। লোকে এখন অবাক হয়ে শেখর মাস্টারকেই দেখছে। ফোকাশের আলোয় ওর বুকের মেডেলগুলো ঝকঝক করছে। বুকটা ভরে গেল মাস্টারের।

তারপরেও বুলি আরো অনেকেবার রিং-এর মধ্যে এলো।

উজ্জ্বল সবুজ সাটিনের সালোয়ার কামিজ পরে বুলি দর্শকদের অভিবাদন জানাল। এবারেও শেখর মাস্টার তার পাশে।

বুলি আস্তে আস্তে তরঙ্গিত ভঙ্গিতে এগোল। একটা প্লাইউডের বোর্ডের সামনে দাঁড়াল দর্শকদের দিকে ফিরে। তার মুখে হাসি। দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রয়েছে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের পরবর্তী খেলা দেখার জন্যে। কেবল ব্যান্ড বাজছে।

বোর্ডের সামনে হাত দশেক দূরে বুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শেখর মাস্টার। বিস্ময়াহত অপলক চোখ বুলির উপর থেকে সরাতে পারছে না সে। বুলি সুর্মা-টানা বড় বড় চোখে মাস্টারের দিকে চেয়ে হাসছিল।

মাস্টারের হাতে অনেকগুলো ছুরি ফোকাশের আলোয় ঝকমক করছে। এক টুকরো কাঠ নিয়ে রিং-এর চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখাল মাস্টার। তারপর দর্শকদের সামনে সেই ছুরিগুলো দিয়ে কাঠের টুকরোটা কুচিকুচি করল অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে। ছুরিতে ভীষণ ধার।

বুলির দিকে ফিরল মাস্টার। সে তখনও হাসছে। ওর গাঢ় সবুজ রঙের কামিজের দিকে চেয়ে মাস্টারের প্রায় শ্বাসরোধ হয়ে এল। সে তাড়াতাড়ি ছুরিগুলো গুছিয়ে নিলে।

বুলির দিকে একটা একটা করে ছুরিগুলো ছুঁড়ে মারল শেখর মাস্টার। বুলির শরীরের চারপাশে। ফোকাশের আলোয় বাতাসে বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়ে ছুরিগুলো বুলির শরীরের চারপাশে মাত্র-ইঞ্চিখানেকের ব্যবধানে বোর্ডের উপর গেঁথে গেল। প্রতিটি ছুরির সঙ্গে দর্শকদের হৃৎপিন্ড একবার করে লাফিয়ে উঠল। প্রত্যেকটি ছুরি গেঁথে গেল বোর্ডের উপরে। মাস্টারের হাতে আর ছুরি নেই। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে নীচু হয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানাল। চারধারে প্রচন্ড হাততালি।

বুলির দিকে ফিরল মাস্টার। তার শরীরের চারপাশে ছুরিগুলো ঝকঝক করছে। হঠাৎ শেখরের মনে হ'ল বুলির চোখ দুটোও দুটো ধারাল ছুরি। মাস্টারকে বিঁধে মারছে।

বোর্ড থেকে ছুরিগুলো টেনে তুলতে তুলতে শেখর ভাবল—দেব একটা ছুরি শালা নবার বুকে গেঁথে। সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। সেদিনের ছোঁড়ার সাহস কত! শেখর মাস্টারের সঙ্গে পাল্লা দিতে নেমেছে! মনে মনে হাসল শেখর।

শেষ খেলার সময় ব্যাপারটা আবার চোখে পড়ল মাস্টারের। ট্রাপিজে পা আটকে মাথা নীচু করে দুলছিল শেখর। হঠাৎ দেখলে ও-পাশের ট্রাপিজের উপর দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসছে নবীন। ট্রাপিজের দোলায় অন্য দিকে সরে গিয়ে দেখল বুলিও হাসছে। তখনই মাথায় রক্ত চড়ে গেল মাস্টারের। দেব আজ ফেলে। নিজের ট্রাপিজ ছেড়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে যখন আমার দিকে হাত বাড়াবে তখন ধরব না। গোঁত্তা খেয়ে একেবারে সোজা নীচে গিয়ে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। অসহিষ্ণুভাবে তিন-চার বার হাততালি দিল শেখর মাস্টার।

বুলি চমকে তাকাল মাস্টারের দিকে। সংগে সংগে তৈরি হয়ে নিল। মনে যাই-হোক, খেলায় কোন ভুল-চুক হবে না। বহুদিনের অভ্যাসে সহজে তাল কাটে না।

ট্রাপিজে দুলতে দুলতেও নবীনের মুখে বিরক্তির রেখাটা চোখ এড়ালো না মাস্টারের। মনে মনে আর একবার গজরাল সে। একেবারে খতম করে দেব শালাকে। আজই।

কিন্তু নবীন যখন তিন-চার বার দোলার পর শূন্যে ঝাঁপ দিল, শেখর ঠিক হাত বাড়িয়ে ধরল। শেখরের হাতে দু'বার দুলে আবার নিজের ট্রাপিজে ফিরে গেল নবীন।

তার পরেই বুলি বাতাস কেটে শেখরের দিকে এগিয়ে এল। শেখর তাকেও অকম্পিত হাতে শক্ত করে ধরল। ওকে দোলাতে দোলাতে মাস্টার একবার নীচের দিকে তাকাল। রিং খালি। এই মুহূর্তে বুলিকে ছেড়ে দিলে ও ছিটকে নীচে পড়বে, ঐ লাল কাঁকর ছড়ানো রিং-এর উপর। তারপর...ততক্ষণে শেখর বুলিকে তার নিজের ট্রাপিজে ফিরিয়ে দিয়েছে।

কয়েকবার ট্রাপিজ বদলা-বদলি করে যে যার নিজের জায়গায় ফিরে এল।

শেখর ট্রাপিজে পা আটকে মাথা নীচু করে নবীনের পা ধরে দোলাতে লাগল। সেই অবস্থাতেই নবীন বুলির হাত ধরে দোলাতে লাগল। তিনজনে মিলে চেন। নীচে থেকে হাততালির তরঙ্গ উপরে উঠে আসছে। শেখর ওদের দোলাতে দোলাতে ভাবল, এখন যদি ছেড়ে দিই, দু'টোতেই শেষ হয়ে যাবে। সাঁ করে নীচে গিয়ে পড়বে। সব শান্তি। শেখরের বুকের জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু বুলি, নবীন একে একে যে যার ট্রাপিজে ফিরে গেল। তিনজনে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে 'বো' করল। খেলা শেষ।

নিজের তাঁবুতে ফিরতে ফিরতে মাস্টার ভাবল আজও একবারও শেখর মাস্টারের হাত ফসকালো না!

তাঁবুতে ফিরে কোনরকমে জামা-কাপড় ছেড়েই বসে পড়ল সে। মাঘ মাসের রাতেও সে ঘামছে। বাক্স খুলে বোতল বার করল। শিরাগুলো কেমন যেন দপদপ করছে। তাঁবুর বাইরে গাঢ় কুয়াশা।

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে বুলি এসে দাঁড়াল তার তাঁবুর সামনে।

ঃ আজ কি আর খাওয়া-দাওয়া হবে না?

চমকে তাকাল মাস্টার।

বুলির পরনে শাদা সালোয়ার, আধ-ময়লা ছিটের কামিজ। তার উপরে একটা পশম উঠে যাওয়া খয়েরী গরম কোট। অন্ধকারে, কুয়াশার মধ্যেও বুলির চোখ দুটো চকচক করছে। এক মুহূর্ত তাকিয়েই জবাব দিল মাস্টার।

ঃ না।

ঃ কেন? কি হল আবার?

বুলির গলায় নিরাসক্ত কৌতূহল। কোন উত্তর নেই। মাস্টার আবার নিজের চিন্তার মধ্যে ডুব দিয়েছে।

তাঁবুর মধ্যে ঢুকল বুলি।

মাস্টারের সামনে এসে দাঁড়াল। শস্তা পাউডারের পরিচিত কড়া গন্ধটা নাকে লাগতেই মাস্টারের মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে গেল।

বুলি একবার চোখের কোণ দিয়ে তাকাল বোতলটার দিকে।

ঃ আবার ওই সব খাচ্ছ তুমি?

ঃ বেশ, করেছি।

এক মুহূর্ত থামল বুলি। তারপরই তার চোখে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল।

ঃ আমাকে বলেছিলে না, আর কখনো খাবে না?

তাঁবুর ভিতরে বুলির নিটোল গলার স্বর কেঁপে উঠল। মাস্টারের বুকের ভিতরে মোচড় দিলে। চোয়াল শক্ত করল সে।

ঃ বলেছি তো হয়েছে কি? সে কি বেদবাক্য নাকি? গর্জন করে উঠল মাস্টার।

বুলির দু' চোখ জ্বলতে লাগল। অপলক তাকিয়ে রইল শেখরের দিকে। ধীর পায়ে এগিয়ে মাস্টারের পাশে খাটিয়ায় বসল সে। বোতলটা আস্তে আস্তে নিজের হাতে নিয়ে বাক্সের উপরে সরিয়ে রেখে মাস্টারের হাত ধরল বুলি।

ঃ কি হয়েছে মাস্টার?

মাস্টারের কানের কাছে, গাঢ়, কোমল স্বরে জিজ্ঞেস করল বুলি। ওর উষ্ণ নিশ্বাস পড়ছে মাস্টারের ঘাড়ের উপর। মাস্টারের গা শির-শির করে উঠল। বুকের মধ্যে সেই ব্যথাটা আবার মোচড় দিয়ে উঠল।

বুলি আরো কাছে এল।

ঃ কেন এমন করছ মাস্টার? কি হয়েছে?

অন্তরঙ্গ স্বরের কথাটা বাতাসে মিলিয়ে যেতে যেতে বুলি মাস্টারের কাঁধে মাথা রাখল।

নিজের বুকটা চেপে ধরল মাস্টার। একটু আগে এই বুলিকেই তো সে ট্রাপিজের উপর থেকে ফেলে দেওয়ার কথা ভাবছিল! তার কান্না পেল। কিন্তু গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের শেখর মাস্টার কাঁদতে শেখে নি, তাই কাঁদতে পারল না। সে বুলিকে আরো কাছে টানল।

ঃ কিচ্ছু হয় নি আমার।

সব কিছু উড়িয়ে দিতে চাইল মাস্টার। এমন কি বুকের ভিতরের সেই মোচড় দেওয়া কান্নাটাকেও।

বুলি হাত দিয়ে শেখরের মুখটা তার দিকে ফেরাবার চেষ্টা করল।

ঃ তবে এমন করে বসে আছ কেন?

ঃ ও এমনি।

বুলিকে একটু আদর করল মাস্টার।

বুলি তখনও মাস্টারের চোখের মধ্যে তাকিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মাস্টার তাকে কিছু জানবার সুযোগ দিল না। বুলিকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ঃ চল খাই গে।

অন্ধকার তাঁবুতে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ভাবছিল শেখর মাস্টার। নিজের চেষ্টায় একটু একটু করে এই সার্কাসের দল গড়ে তুলেছে সে। আজ তার বুকে কতগুলো মেডেল। গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের খেলা দেখতে দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকেও লোক ছুটে আসে। অথচ প্রথম দিকে কী কষ্টটাই না সে করেছে!

তখন নবীন ছিল না, এমনকি বুলবুলিও নয়। কেবল তার খেলা দেখবার জন্যেই লোকে ভিড় করত। তার কতো পরে বুল-বুলি এসেছে। আর নবীন তো এই সেদিন এল।

বারো বছরের বুলবুলি শেখর মাস্টারের দলে ভর্তি হয়েছিল। মেয়েটার গড়ন ভাল' মাস্টার ভাবল শিখিয়েপড়িয়ে নিলে মন্দ হবে না। কিন্তু শেখাতে গিয়ে দেখলে তার ধারণা ভুল। মেয়েটা ভীষণ ছটফটে। খেলা শিখতে গেলে যে মনোযোগের দরকার তা একেবারেই নেই। তারের উপর উঠবে কি, হেসেই খুন। সাতদিন ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করেও কিছু হল না। পরের দিন সকালে শেখানোর আগেই মাস্টার শাসিয়ে দিলে। খবরদার, হাসবি না। সবসময় হি-হি করে হাসলে কিছু শেখা যায়? ওতে মন অন্য-মনস্ক হয়।

কিন্তু মেয়েটা টুলের উপর উঠবার আগেই হাসতে শুরু করলে। মাস্টার সেদিন মাথার ঠিক রাখতে পারেনি। ডান-হাতে সজোরে একটা চড় মেরেছিল বুল-বুলির গালে। ঘুরে পড়ে গিয়েছিল সে। ভয়ে নীল হয়ে গিয়েছিল মুখ। সার্কাস-মাস্টারের কড়াপড়া হাতের চড়ে গালে দাগ উঠেছিল, তবু কাঁদেনি। তারপর থেকেই অদ্ভুত তাড়াতাড়ি শিখে ফেললে বুলবুলি। আর মাস্টারের মুখে ছেঁটেকেটে তার নাম হয়ে গেল বুলি।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বালিশের নীচে হাতড়ে হাতড়ে একটা বিড়ি ধরাল মাস্টার। দেশলাইয়ের আলোয় তাঁবুর ভিতরের অন্ধকার একবার চমকে উঠেই আবার গাঢ় হল।

সেই বুলিই এখন গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের প্রধান আকর্ষণ। শেখর মাস্টারও তার কথায় ওঠে বসে। দলের পুরনো লোকেরা মাঝে মাঝে মাস্টারকে দেখে বাঁকা হাসি হাসে, আড়ালে চোখ নাচিয়ে নানা কথা বলে, কিছুই মাস্টারের অজানা নয়। যতদিন তার দল আছে, আর বুলি আছে তার সঙ্গে, ততক্ষণ কারো হাসি টিটকিরির কেয়ার করে না শেখর মাস্টার। কিন্তু সেই বুলিই আজ......

উঠে বসল মাস্টার। হাত বাড়িয়ে বাক্সের উপর থেকে বোতলটা টেনে নিয়ে গলা ভেজাল।

এরকম হবে জানলে নবীনকে দলেই নিত না মাস্টার। কিন্তু ওই রোগাপটকা ছোঁড়াটার পেটে পেটে যে এত তা আর কে জানত। শেখর মাস্টারও জানত না। এখন আর কোন উপায় নেই। ওর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে। আর তাছাড়া……, ভাবতেই বুক হিম হয়ে গেল মাস্টারের। ওর সঙ্গে সঙ্গে বুলিও যদি……! অবিশ্যি বুলির সঙ্গেও গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের চুক্তি আছে। কিন্তু চুক্তি দিয়ে এখন আর ওকে বাঁধা যাবে না, মাস্টার সেটা বেশ অনুভব করতে পারে।

ভাবতে ভাবতে বুকটা আবার জ্বলে উঠল। ওই নবাটাকে সরাতেই হবে। যেমন করে হোক। শেখর মাস্টারের হাত আজ বিশ বছরে একবারও সিলিপ করে নি! কিন্তু করলে দোষ কি? নবাটা যদি ট্রাপিজের উপর থেকে সোজা রিং-এর উপর আছড়ে পড়ত আজ, তাহলে বুলির জন্যে এই জ্বালাটা এখন আর বোধ করত না মাস্টার। বরং এই শীতের রাতে বুলি হয়তো এখানেই……।

কম্বলটা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল মাস্টার। মাথার ভিতরটা দপ্‌দপ্‌ করছে। বাইরে একটু ঘুরলে মাথা ঠান্ডা হবে ভেবে তাঁবুর বাইরে এল। চারদিক নিস্তব্ধ। কুয়াশায় কোনকিছু ভাল করে দেখা যায় না। দূরে কোতোয়ালীতে রাত দুটোর ঘণ্টা পড়ল। কনকনে বাতাস চোখে-মুখে লাগতে একটু আরাম বোধ করল। মনটা যেন একটু হালকা হল। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল মাস্টার।

পায়ের শব্দ পেল মাস্টার। কারা যেন কথা কইতে কইতে এদিকে আসছে। কিন্তু একটার বেশী ছায়া দেখতে পেল না মাস্টার। কে কথা কইছে? কার সঙ্গে? থমকে দাঁড়াল মাস্টার, অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে চোখ তীক্ষ্ন করে দেখবার চেষ্টা করল। অল্পক্ষণ এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থেকেই ব্যাপারটা বুঝতে পারল মাস্টার। ছুরির ফলার মত সেই যন্ত্রণাটা আবার মাস্টারের বুকের মধ্যে গেঁথে গেল। উত্তেজনায় নিজের বুকটা চেপে ধরল মাস্টার। নবীনের চাদরের মধ্যেই নিজেকে একসঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে বুলি, তার মাথা নবীনের কাঁধের উপর। অন্ধকারে দুজনাকে আলাদা করে বোঝবার উপায় নেই। ছায়া-মূর্তি একটাই মোটে। গাঢ় কুয়াশার মধ্যে বুলির ফরসা মুখটা চকচক করছে বলে চিনতে অসুবিধে হল না মাস্টারের। ওদের কথাগুলো একটাও বুঝতে পারল না মাস্টার, তার কানের মধ্যে মাথার মধ্যে এক-সঙ্গে অনেক রেলগাড়ি ঝমঝম করছে।

: শয়তানী! নিজের মনেই দাঁতে দাঁত ঘষে উচ্চারণ করল মাস্টার। ঘণ্টা দেড়েক আগেই ঠিক অমনি করে আমার কাঁধে মাথা রেখে বসেছিল! উঃ! দুহাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরে তাঁবুর মধ্যে ফিরে এল মাস্টার। বোতলটা উপড়ে করে ধরল মুখের উপর। গলা, বুক সব জ্বলে উঠল। একে-বারে শেষ হতে বোতলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খাটিয়ার উপরে আছড়ে পড়ল সে।

কালই সব খেলা শেষ করে দেব। শুয়ে শুয়ে মনে মনে বলতে লাগল মাস্টার। আমার দশটা ছুরির একটাও কাল বোর্ডের উপর গাঁথবে না। গাঁথবে তোর বুকের উপর, মুখের উপর, গলার উপর। তোর শয়তানীর খেলা আমি শেষ করে দেব। কাল তোর শেষ খেলা।

মাস্টারের চোখ বুজে এল।

সে দেখল বুলি বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে। ফোকাশের আলোয় সবুজ কামিজে তার শরীরের ওঠানামায় আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে। মাস্টারের প্রথম ছুরিটা সোজা তার বুকে মাঝখানে বিঁধল। কিন্তু বুলি তো কোন শব্দ করল না। ওর বড় বড় চোখ দুটো কেমন অবাক হয়ে চেয়ে রইল মাস্টারের দিকে। পরের ছুরিটা ছুটে গিয়ে সোজা পেটের মাঝখানে গেঁথে গেল। চার-ধারে কোন শব্দ নেই। ব্যান্ডের শব্দও থেমে গেছে। একে একে বুলির গলা, হাত, পা মুখ সব মাস্টারের ছুরির ঘায়ে বোর্ডের সঙ্গে গেঁথে গেল। রক্তে ওর সবুজ কামিজটা কী ভয়ানক দেখাচ্ছে, রিং-এর মাটি ভিজে গেছে। আশ্চর্য, বুলি তো কাঁদছে না, ওর চোখদুটো অপলক মাস্টারের দিকে চেয়ে রয়েছে। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, শেখর মাস্টারের হাত শ্লিপ করে প্রত্যেকটা ছুরি আজ ওকে বিঁধেছে। মাস্টারের কেমন যেন কান্না পেল, বুলি, তার বুলি…… নিশ্বাস ফেলল মাস্টার।

বালিশটা আঁকড়ে উপুড় হয়ে শুল মাস্টার, তার নিশ্বাসের তালে তালে তাঁবুর ভিতরের অন্ধকার কাঁপতে লাগল।

মাস্টার যখন চোখ খুলল তখন মাঘ মাসের রোদও কড়া হয়েছে। কিছুক্ষণ চোখ মেলে শুয়ে থাকার পর বেলা কত হয়েছে বোঝবার চেষ্টা করল। তারপর পাশ ফিরে শুল।

সে যখন খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সূর্য তখন ঠিক মাথার উপরে। মাস্টার নিজের চুলগুলো দুহাতের মুঠোয় ধরে টানল। মাথাটা বিশ মন ভারি। তাঁবুর বাইরে আসতেই রোদে চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

কলাই-এর গ্লাসে চা খেতে খেতে মাটির দিকে চেয়ে বসেছিল। আকাশের দিকে তাকাতে পারছে না। স্থির হয়ে কিছু ভাবতেও পারছিল না। মাথাটা এমন ভারি, সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

বুলি এদিকে এল। তার স্নান হয়ে গেছে। এখন শাড়ি পরেছে। ওর চোখ দুটো হাসছে।

: বাবা! মাস্টারের ঘুম বটে! ঠিক দুক্কুর বেলায়—সকাল হ'ল! হাসতে হাসতে বললে সে।

উত্তরে জ্বলন্ত চোখে তাকাল মাস্টার।

: ও কি গো? ভস্ম করবে নাকি? এ্যাঁ! বুলির চোখমুখ, সর্বশরীর যেন হাসছে।

জ্বলন্ত চোখে বুলির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মাস্টার ভাবল কী সুন্দর, কী স্নিগ্ধ বুলি! তারপরেই আবার চোয়াল শক্ত করল।

: অত হাসবার কি হ'ল? জ্বলন্ত চোখের সঙ্গে মাস্টারের গলার স্বরও ধারাল হয়ে উঠল।

: ও বাবা! চোখ মেলেই আগুন! তবে এখন পালাই।

সর্বশরীরে ঢেউ তুলে চলে গেল বুলি। মাস্টার একবার ভাবল ওর হাত ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাকে বুঝিয়ে বলে। তার পরেই মনের মধ্যে গর্জন করে উঠল। আজই সব শেষ করে দেব। তোর ওই হাসি একেবারে থেমে যাবে। দাঁতে দাঁত ঘষল শেখর মাস্টার।

সারাদিনে একবারও বেরোল না মাস্টার। কোনরকমে গায়ে মাথায় জল ঢেলে আবার তাঁবুতে এসে শুয়ে পড়ল। পণ্টু খাওয়ার জন্যে ডাকাডাকি করে পালাল। তারপরে একসময় আস্তে আস্তে তাঁবুর ভিতরে এসে মাস্টারের বাক্সের উপরে খাবারের থালা রেখেই একছুটে পালিয়ে গেল। কিছুক্ষণ বাদে উঠে বসল মাস্টার।

: পণ্টা, পণ্টা!

দুবার ডাকতেই পঞ্চু এসে হাজির। ছোট ছোট চোখে তাকাল মাস্টারের দিকে।

: এ্যাই, এদিকে আয়। মাস্টার হাঁক পাড়ল।

: আমার মেডেলগুলো সব পালিশ কর। কোটটা পরিষ্কার কর পেট্রল দিয়ে। আমার ব্যাটনটা কই? ছুরিগুলোতে ভাল করে ধার দে। সব ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। বলতে বলতে চোখ চকচক করে উঠল মাস্টারের।

সন্ধ্যের আলো জ্বলার পরে রিং-এর চারপাশে একটু একটু করে দর্শকের ভিড় বাড়ছে। তখনও রিং-এর সব আলো জ্বলেনি। শেখর মাস্টার ব্যস্ত হয়ে তদারক করছে। দলের লোকেরা অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছে। মাস্টারকে তারা অনেকদিন এইভাবে প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখেনি।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

বাঁদরের খেলার পরেই বুলি রিং-এর ভিতরে এল রঙীন ছাতা হাতে। তারের উপর উঠল, পরনে সেই নীল ঘাগরা। এক পা পিছনের দিকে বাড়িয়ে, সামনে ঝুঁকে ব্যালেন্স করার সময়, বুলিকে ঠিক পরীর মত দেখাচ্ছিল। খেলার শেষে বুলি নিয়মমত মাস্টারের কোলে ঝাঁপিয়ে নামল। মাস্টারের বুকের ওঠানামা কি সে শুনতে পেল? তাকে মাটিতে নামাতে নামাতে মাস্টার ভাবল, কী উষ্ণ, কী নরম বুলি।

যথাসময়ে বোর্ড এল। রাখা হল রিং-এর ঠিক মাঝখানে। শেখর মাস্টারের বুকের মধ্যে তখন কোতোয়ালীর ঘড়ি পিটছে। চারধারের দর্শকদের একাগ্র দৃষ্টিতে এতদিন পরে আজ শেখর মাস্টার অস্বস্তি বোধ করল।

বুলি এল। সেই গাঢ় সবুজ রঙের সালোয়ার কামিজ। ওর চোখমুখ হাসছে। ফোকাশের আলোয় সবুজ কামিজে শরীরের ওঠানামার আলোছায়া। দর্শকদের 'বো' করে বুলি বোর্ডের সামনে দাঁড়াল। শেখর মাস্টারের দিকে চেয়ে হাসছে। ওর লাল ঠোঁটের ফাঁকে শাদা দাঁতের আভাস।

মাস্টার অস্বস্তি বোধ করল। কোটটা বড় আঁট। হাত-পা নেড়ে নিজেকে স্বচ্ছন্দ করবার চেষ্টা করল। তারপরে নিয়মমাফিক কাঠের টুকরো কেটে ছুরির ধার দেখালে দর্শকদের। রিং এর চারদিকে ঘুরে ঘুরে। কাঠটা একেবারে শোলার মত অনায়াসে কেটে গেল। পঞ্চুটা চমৎকার ধার দিয়েছে, কঠিন মুখে ভাবল মাস্টার।

বুলির মুখোমুখি দাঁড়াল। উত্তেজনায় শেখর মাস্টারের চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। বুলি এখনও হাসছে, মাস্টারের দিকে চেয়ে। বাঁ হাতে ফুলের তোড়ার মত ছুরিগুলো ভাল করে গুছিয়ে ধরল। এক পা বাড়িয়ে, সোজা দাঁড়াল মাস্টার। বুলি হাসছে। কাঁপা হাতে ছুরি ছুঁড়ল মাস্টার।

ছুরিটা ঝলসে উঠে বুলির ঠিক মাথার উপরে বোর্ডে গেঁথে গেল। দর্শকদের উত্তেজনায় নিশ্বাসে চারপাশে হিশ্ করে শব্দ উঠল। কিন্তু বুলির মুখে একটুও ভয় নেই।

ও নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। পরের ছুরিটা গাঁথল বুলির ডান হাতের পাশে, তারপরে বাঁ হাতের পাশে। একে একে দশটা ছুরি চারধার থেকে বুলিকে ঘিরে ধরল, কিন্তু একটাও তার শরীর স্পর্শ করল না। ফোকাসের আলোয় তার সবুজ কামিজের ওঠানামার চারপাশে ছুরিগুলো ধারাল হাসি হাসছে।

কোটের তলায় শেখর মাস্টারের জামাটা ভিজে একেবারে শপশপ করছে। গলায় হাত দিয়ে সেটাকে একবার ঠিক করে নিলে সে। একটু আলগা করতে পারলে ভাল হত। ছুরিগুলো বোর্ডের উপর থেকে খুলবার সময় বুলির সেই শস্তা পাউডারের কড়া গন্ধটা পেল মাস্টার। বুলি তার দিকে চেয়ে হাসছে। বুলিকে অপ্সরীর মত দেখাচ্ছে। বোর্ড থেকে ছুরিগুলো খুলে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল শেখর মাস্টার।

দর্শকদের দিকে তার চোখ পড়ল। মনে মনে বলল, তোমরা পয়সা খরচ করে উত্তেজনা উপভোগ করতে এসেছ। এবারে আমি এমন উত্তেজনার আয়োজন করেছি যা কখনো কোন সার্কাসে হয়নি। তোমাদের চোখের সামনে একটা একটা করে ধারাল ছুরি বিঁধবে ওই মেয়েটির শরীরে, ওর রক্তে রিং-এর মাটি ভিজে যাবে। দেখতে দেখতে তোমাদের চোখের পাতা পড়বে না, মুখ হাঁ হয়ে যাবে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবে, তোমরা বুক চেপে ধরবে।

হাতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিল শেখর মাস্টার।

বুলি এবারে চুলটা ঠিক করে নিয়ে পাশ ফিরে দাঁড়াল বোর্ডের গা ঘেঁষে। তারপর আস্তে আস্তে হাত নীচের দিকে করে শরীর নীচের দিকে বাঁকাল। ওর মুখটা এখন হাঁটুর প্রায় কাছাকাছি।

মোট সাতটা ছুরি ওর শরীরের চারদিকে ঘিরে থাকবে। চেষ্টা করলেও বুলি আর সোজা হতে পারবে না, তখন বাকি তিনটে ছুরি ওর শরীরের দুভাঁজের মাঝের জায়গায় বিঁধবে। শেষ ছুরিটা বুলির পেটের ঠিক নীচে গেঁথে যাওয়া মাত্রই দর্শকদের হাততালিতে তাঁবু ফেটে পড়ে।

বুলি দাঁড়াল ঠিক হিসেবমত। শেখর মাস্টার ভাবল এবার আর বুলির মুখটা দেখতে পাব না, ওর হাসি, লাল ঠোঁট চকচকে চোখ, দেখব না। এবারে আর নিস্তার নেই। চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত ঘষল মাস্টার। তার কাঁপা হাত থেকে প্রায় একই সঙ্গে পরপর চারটে ছুরি ছুটে গেল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। সমস্ত রিংটা যেন চমকে উঠল। বুলিও বুঝি একটু চমকে উঠল। চোখের কোণে একবার মাস্টারের দিকে দেখল। কিন্তু একটা ছুরিও তার শরীর স্পর্শ করল না।

শেখর মাস্টারের চারধারে তাঁবুটা দুলতে শুরু করল। তার হাত কাঁপতে লাগল। বুলির মুখের দিকে একবার তাকাল সে। পাশ থেকে যতটুকু দেখা গেল, বুলি হাসছে। ওর চোখে মুখে কোথাও ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই।

প্রায় একই সঙ্গে আরো তিনটে ছুরি ছুটে গেল বুলির দিকে। কিন্তু এবারেও একটা ছুরিও বুলিকে স্পর্শ করল না। ভয় পেয়ে গেল মাস্টার। বুলির হাসিই কি মাস্টারের হাতের লক্ষ্যকে তার শরীরের উপর থেকে সরিয়ে দিচ্ছে? নাকি, এ সবই তার অভ্যাসের ফল। আশ্চর্য, এত ঘৃণাও তার অভ্যাসকে জয় করতে পারছে না। আমার বুকের জ্বালা নিশ্চয় অভ্যাসকে জ্বালিয়ে দেবে। হাতকে কঠিন করবে। দৃষ্টিকে আরো তীক্ষ্ন করবে, লক্ষ্যের উপর স্থির করে গেঁথে রাখবে।

মন, চোয়াল শক্ত করল মাস্টার। হাতের পেশী কঠিন। আর মাত্র তিনটে ছুরি বাকি। এবারে শেষ করতেই হবে।

পরের ছুরিটা বুলির হাতের আঙুলগুলোকে যেন আলতো করে স্পর্শ করে রইল, কিন্তু বিঁধল না।

এবারে কাছাকাছি গেছে। মাস্টার দাঁতে দাঁত চাপল। কোটের হাতায় কপালের ঘাম মুছল। পরের ছুরিটা ওর মুখের উপরে দেব।

ফোকাশের আলোকে চমকে দিয়ে ছুরি ছুটল। বিস্ফারিত চোখে মাস্টার দেখল, ছুরিটা বুলির মুখের আর হাঁটুর মাঝের জায়গায় বোর্ডের উপর গেঁথে রয়েছে।

তাঁবুটা কি চারধারে ঘুরছে! শয়তানীটা এখনও হাসছে! ও জানে না, এক্ষুনি এই ধারালো ছুরিটা সোজা ওর পেটের উপর বিঁধবে। রক্তে রিং-এর মাটি ভিজে উঠবে। হাসি শেষ হবে।

জিব দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিল মাস্টার। মাটিতে পা ঘষল বার কয়েক। ডান পা বাড়িয়ে সোজা দাঁড়িয়ে, বোর্ডের মুখোমুখি। শূন্য বাঁ হাত একটু উঠে রয়েছে। ডান হাতের শক্ত আঙুলে শেষ ছুরি।

চোখের সামনে বুলির বাঁকানো শরীরের পেটের কাছে কামিজের ভাঁজ। সমস্ত রিং এমনকি বুলিও মাস্টারের চোখে ঝাপসা, তার পেটের কাছের সবুজ কামিজ দেখতে পাচ্ছে সে।

বিদ্যুতের ঝলক তুলে ছুরিটা ছুটে গেল বুলির দিকে।

মাস্টার দুহাতে চোখ ঢাকল। সব শেষ। মাথার মধ্যে একসঙ্গে অনেক ড্রাম গুড় গুড় করে উঠল।

তারপরেই কানে এল প্রচণ্ড হাততালি।

হাত নামিয়ে বিহ্বল, অপলক চোখে মাস্টার দেখল, তার শেষ ছুরিটা বুলির পেটের কাছে কামিজটা ছিঁড়ে দিয়ে বোর্ডের উপর বিঁধে রয়েছে। বুলি খিল খিল করে হাসছে। হাততালির শব্দে রিং-এর মাটি কেঁপে উঠছে, তাঁবুটা ফুলে ফুলে উঠছে।

দর্শকরা অবাক হয়ে দেখল শেখর মাস্টার বোর্ডের থেকে ছুরিগুলো না খুলেই, দর্শকদের 'বো' না করেই, পাগলের মত দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরে, এলোমেলো পায়ে দৌড়তে দৌড়তে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

এইচ. ই. বেটস একালের একজন সুপ্রতিষ্ঠ ইংরাজ কথাসাহিত্যিক। ছোট-গল্পের ক্ষেত্রে তিনি সমরসেট মমের-পর এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। এদেশে তাঁর রচনাদির বেশী অনুবাদ হয়নি। কিছুকাল আগে 'অমৃতে'র পৃষ্ঠায় তাঁর একটি বড়ো গল্প 'কিমোনো' অনূদিত হয়েছে। এই গল্পটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বেটসের অসামান্য লিপিকুশলতার পরিচয় পেয়েছেন। তিনি প্রায় চল্লিশখানি জনপ্রিয় গ্রন্থের লেখক। বেটস্ সুন্দরের পূজারী, বরাবর যেসব কাহিনী রচনা করেছেন তার মধ্যে মানবজীবনের সুন্দর রূপটিই তুলে ধরেছেন। কিন্তু কিছুকাল আগে প্রকাশিত উপন্যাস "দি স্কারলেট সোর্ড" এক ব্যতিক্রম। দেশবিভাগের পর পাকিস্তানীরা ১৯৪৭-এ দলে দলে কাশ্মীর আক্রমণ করল, তাদের সেই অভিযানের মধ্যে যে নৃশংস বর্বরতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল তার সামান্যতম অংশই এতাবৎ লিপিবদ্ধ হয়েছে। নারীধর্ষণ, লুঠতরাজ, খুন, রাহাজানি ইত্যাদির অবাধ স্রোতে ভূস্বর্গ কাশ্মীর উপত্যকা কলঙ্কিত হয়েছিল। বেটস সেই সময় কাশ্মীরে ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ রিপোর্টাজের মাধ্যমে পরিবেশন না করে তিনি "দি স্কারলেট সোর্ড" এই নামে রচিত উপন্যাসটির মাধ্যমে সেই ভয়ংকর দিনের কিছু পরিচয় দিয়েছেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে কাশ্মীর যখন আক্রান্ত হল তখন একটি মিশন কনভেণ্টের অভ্যন্তরে দশদিন কি ঘটেছিল এই উপন্যাসে তা বর্ণনা করেছেন লেখক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রণালী ও রীতিনীতির যে সব বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তার ফলে উপন্যাসটি প্রায় সত্য ঘটনার মত সুখপাঠ্য ও নির্ভর-যোগ্য হয়ে উঠেছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বেদনাময় ইতিহাস আছে তা অধিকতর তীব্র হয়েছে।

ইয়র্কসায়ারের অধিবাসী ফাদার অনেস্ট পর্বতশিখরে অবস্থিত এক নির্জন ক্যাথলিক মিশনের অধিকর্তা। তাঁর সহায়তা করেন তরুণ যাজক ফাদার সিম্পসন। তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ, সুরসিক এবং সরল মানুষ। বোম্বাই শহর থেকে একজন ইংরাজ সংবাদ-পত্র প্রতিনিধি মিঃ ক্রেন এক রবিবার প্রাতে এসে হাজির হলেন কাশ্মীরের ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করতে, তিনি মিশনে এসে উঠলেন। নদীতীরে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন ফাদার সিম্পসন। মিশনের পথে পাকিস্তানের অভিযানের নানাবিধ গুজব শোনাতে লাগলেন, এইসব তথ্য সমর্থন করলেন প্রাক্তন গুপ্ত তথ্য বিভাগের অফিসর কর্নেল ম্যাথীসন। ম্যাথীসন এইখানেই খামার বানিয়ে বসবাস করবেন স্থির করেছেন। সম্প্রতি মিশনে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

মিশনে এসে পা দিতেই ফাদার আনেস্ট জানালেন যে আক্রমণকারী পাঠানরা কাশ্মীর আক্রমণ করেছে এবং যেখানে যাকে পাচ্ছে কচুকাটা করছে। মিঃ ক্রেন এবং কর্নেল ম্যাথীসন দুজনে সারাদিন ধরে পরিখা বা ট্রেঞ্চ খুঁড়তে লাগলেন আর মাঝে মাঝে বিশ্রামের অবসরে আতংকমুক্ত হওয়ার প্রয়াসে হাসি-ঠাট্টা করতে থাকেন। কাজ শেষ হল, মিসেস ম্যাথীসন মিসেস ম্যাকসটেড ও মিস ম্যাকসটেডের সঙ্গে পানাহারে বসলেন সবাই। শেষোক্ত মহিলারা ইংলণ্ডে ফিরে যাবেন। তাঁরা অপেক্ষা করছেন মিঃ ম্যাকসটেডের জন্য। তিনি শহরে গেছেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়পত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে আনতে।

ডিনার শেষে ক্রেন মাদার সুপিরিয়র ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মাদার সুপিরিয়রের সঙ্গে দেখা করলেন। মিশনে অনেক নান বা খৃীস্টান সন্ন্যাসিনী এবং সেই সঙ্গে আছেন কিছু হিন্দু ও শিখ মহিলা আর তাঁদের শিশুসন্তানের দল। ডাঃ বারেটা নাম্নী জনৈক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা মিশনের চিকিৎসাকর্মে নিযুক্ত, তিনিও স্বামীর সঙ্গে এই মিশনেই থাকেন।

মধ্যরাত্রে মিশনের দোরগোড়ায় শোনা গেল কয়েকটি বন্দুকের আওয়াজ। সবাই আতংকিত হয়ে উঠে পড়ল। মিশনের সেই শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিত হল, শুরু হল নৃশংস হানাহানি। হানাদার দল এসে পৌঁছেচে—তারা রক্তপাগল। কর্নেল ম্যাথীসন চীৎকার করছেন যে তাঁর স্ত্রীকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রেন দেখলেন যে দুজন মাসুদ একজন আতংকিত ভারতীয় রমণীকে আক্রমণ করেছে। ক্রেন শুনতে পেলেন স্ত্রীলোকটির মাথায় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করা হল আর তিনি চীৎকার করছেন। মাসুদরা তাকে তুলে ধরল এবং

"Slit down her clothing and were on top of her"

ক্রেন এর পর দেখলেন জুলিকে, তাকে একটা ঝুলন্ত দ্রাক্ষালতার আড়ালে লুকিয়ে রাখলেন। যে সব 'নান' এবং অন্যান্য স্ত্রীলোক ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের সেখান থেকে টেনে নিয়ে মাসুদরা ঘরের দিকে নিয়ে গেল।

নার্স সিস্টার ম্যাকঅলিস্টার সব মেয়েকে এক জায়গায় রেখে তাদের সামলাচ্ছেন। চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে সেই দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে উন্মাদিনীর মত আতংকিত চীৎকারে ছুটতে থাকে। একটা পাঠান তাকে জড়িয়ে ধরল। সিস্টার ম্যাক-অলিস্টার উত্তেজিত হয়ে তাকে গাল গাল করতে থাকেন, তার ফলে পাঠানটা মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে সিস্টারকেই ধরল। তারপর—

"He ripped her cloak at the front, skinning her like an animal, and bit her neck"

ফাদার সিম্পসন এতক্ষণ চ্যাপেলের অগ্নি নিবারণে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক সেই সময় একজন মাসুদ রাইফেল দোলাতে দোলাতে এসে ঢুকল। ফাদার সিম্পসনের দেহটা অতিকায়। তিনি হোঁচট খেয়ে পড়লেন পাঠান সহ; এবং তার রাইফেলটা কেড়ে নিলেন। তাঁর মনে তখন ফাদার আর্নেস্ট ও মাদার সুপিরিয়রকে নিরাপদ স্থানে রাখার বাসনা প্রবল।

কর্নেল ম্যাথীসন তাকে দেখতে পেয়ে রাইফেলটা নিয়ে নিলেন। অবশেষে যখন রক্তাক্ত অবস্থায় ফাদার আর্নেস্টকে পাওয়া গেল তিনি বললেন যে মাদার সুপিরিয়র একজন হিন্দু শিশুকে নিয়ে এসেছিলেন, পাঠানরা তাঁকে গুলি করে মেরেছে। যে

কাশ্মীর—১৯৪৭

মাসুদটাকে ফাদার সিম্পসন পর্যুদস্ত করেছিলেন সে মিসেস ম্যাকসটাইডকে গুলী করেছে। ফাদার সিম্পসন তাঁর ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে একটি হিন্দু মেয়ের ওপর পরিচর্যার ভার দিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে দুজন পাঠান

"leapt like dark panthers at the Hindu girl, one at each arm, flinging her fifteen feet up the aisle between the beds..She was lying flat on her face still in her body when Father Simpson went to find her..When he laid her on the bed next to Mrs. Maxt, the two pathans came rushing down the aisle. One kicked him on the back pitching him forward. And when he got to his knees again, the Hindu girl had gone..Most of the women stopped shrieking. They were huddled together along the wall like a crowd of beaten dogs. .. Father Simpson strode down the ward. Halfway down, a Pathan rose from a bed and ran reaping like a hurdler. On the bed, a woman, naked from the waist down writhed, rocking from side to side"

ফাদার সিম্পসনকেও হিড়হিড় করে টেনে আর সব মেয়ের সংগে দাঁড় করানো হল। উপজাতি আফ্রিদিদের অফিসর সিকান্দার শাহ পিছিয়ে পড়েছিলেন। এতক্ষণে এসে পৌঁছলেন মিশন ভবনে। প্রবেশদ্বারেই একজন পালাচ্ছিল দেখে তাকে গুলি করলেন। ক্রেন তাঁকে চীৎকার করে অনুরোধ জানালেন এইসব পাশবিক অত্যাচার বন্ধ করুন।

সিকান্দার শাহ বড়ঘরের ছেলে। বাল্যে কনভেণ্টে পড়েছেন। তিনি ক্রেনের সংগে গিয়ে যেখানে মেয়েদের বেঁধে রাখা হয়েছিল সেইখানে গেলেন। আদেশ দিলেন এদের মুক্ত কর এখনই। সেই সংগে তিনি একথাও জানালেন যে মিশনটা তাঁর হেড কোয়ার্টার্স হবে আর সমস্ত আহত পাঠানকে মিশনের ওয়ার্ডে নিয়ে এসে রাখো। ডাঃ বারেটোকে ডাকা হল একজন আহত আফ্রিদি সৈনিককে ড্রেস করার জন্য। বারেটোর স্বামীকে আফ্রিদিরাই ধরে নিয়ে গেছে।

এর পর মিশনে শান্তি নেমে এল। দুজন ফাদার, কর্নেল ম্যাথীসন এবং ক্রেন পর্যালোচনা করলেন ঘটনাপরম্পরার। মিসেস ম্যাথীসনকে মৃত পাওয়া গেল। ডাঃ বারেটোর স্বামী এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট মাদার সুপিরিয়রকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরদিন প্রাতে মিসেস ম্যাথীসনকে কবরস্থ করে ফাদার সিম্পসন সেকেন্দার সাহেবের কাছে আবেদন জানালেন যে মিশন থেকে নারী ও শিশুদের সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হোক, এখন ত' মিশনটাই হেড কোয়ার্টার্স। অফিসর জানালেন এই ব্যাপারে তিনি কোনো ট্রাক দিতে পারবেন না।

সেই রাত্রে ডাঃ বারেটো একজন পাঠানকে ড্রেস করার সময় জানতে চাইলেন যে তার যন্ত্রণা হচ্ছে কিনা। পাঠান জবাবে বলে—

"I eat raw meat. I like it"

ফাদার সিম্পসন, ক্রেন আর ম্যাথীসন একদিন রাতে ওয়ার্ডে কথা বলছেন এমন সময় চারজন পাঠান আলো হাতে ঝড়ের মত এসে হাজির—বলে—

"Where are your women?" The father said — "There were no women. Get out"

তৃতীয় দিনে এল একটা ভারতীয় স্পিট ফায়ার। মিশনের কাছাকাছি পাকিস্তানি ট্রাকে বোমা পড়ল। সিকান্দার শাহ আহত হলেন, ডাঃ বারেটো তার পা-টি কেটে বাদ দিলেন, আর বিনিময়ে সিকান্দার তাঁর মুখে থুতু দিলেন।

ফাদার সিম্পসন গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে বারেটোর স্বামী ও অ্যাসিস্ট্যান্ট মাদার সুপিরিয়রকে খুঁজতে গেলেন। অনেক সন্ধানের পর পেলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট মাদার সুপিরিয়রকে। তাঁর চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। নির্বাক, নিস্পন্দ। অতিশয় ক্লেশের সংগে তিনি বললেন—ডাঃ বারেটোর স্বামীকে ঠ্যাঙ ধরে সামনের পাতকোয় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

সিকান্দার শাহ ফাদার সিম্পসনকে খুঁজে বার করার জন্য দুজন শান্ত্রী পাঠালেন, ফাদারের কেমন বাসনা হল ওদের চোখে ধুলো দিয়ে পালাবার।

একজন পাঠান যাজককে ধরে তাঁর শিরদাঁড়ায় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়ে, তাঁর ট্রাউজার ছিঁড়ে দিল। ফাদার সিম্পসন অর্ধচেতন অবস্থায় মিশনে ফিরলেন। সিকান্দার শাহ তখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলছেন। ফাদার সিম্পসন জ্বালা ভুলে প্রার্থনা করলেন তাঁর মৃত্যুশয্যায়। ঠোঁটে ক্রুশ স্পর্শ করালেন।

কর্নেল ম্যাথীসন কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেছেন. তিনি কিছু কার্তুজ আর একটা রাইফেল নিয়ে বাইরে বসলেন। সবাই তাঁকে অনুনয় করলেন। তিনি উঠবেন না, এমন সময় একটা ভারতীয় বিমানের গুলির আঘাতে কর্নেলের মৃত্যু হল। জুলি আহত হয়েছিল, তার সংগে মিঃ ক্রেনের ভালোবাসা জন্মেছে। ডাঃ বারেটো তার শুশ্রূষা করলেন, আর সারারাত ধরে বসে রইলেন মিঃ ক্রেন। ওষুধপত্র ফুরিয়েছে।

এর পরদিন আবার রবিবার। ভারতীয় সেনাদল আসছে। একজন ভারতীয় মেজর মিশনে এলেন। ফাদার সিম্পসন তখন কি ভারতীয় কি পাকিস্তানি কোনো রকমের সৈন্যবাহিনীকেই সহ্য করতে পারছেন না। কিন্তু মেজর তাঁকে বললেন—তিনি কিছু ওষুধ দিতে এসেছেন। এখানকার অসুস্থদের জন্য পেনিসিলিন প্রভৃতি দিলেন। দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটল.

সমগ্র উপন্যাসটি অসামান্য দক্ষতায় রচিত। মনে হয় ১৯৪৭-এর কাশ্মীর আক্রমণের কালে বরমুলা ক্রিশ্চান মিশনে যেসব কান্ড ঘটেছিল তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। সমকালীন ইতিহাসের এক অত্যাশ্চর্য আলেখ্য এই মহৎ উপন্যাসটি।

—অভয়ঙ্কর

THE SCARLET SWORD—By H. E. BATES: Published by Michael Joseph. London. Price 18 Shillings Only.

সাহিত্যের খবর

গত ১৫ আগস্ট অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর পরলোকগমন করেছেন। সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানত রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত থাকায় তাঁর সাহিত্যজীবন সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে ধারণা অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলা কবিতা ও সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর অবদান অনুল্লেখ্য নয়। আধুনিক বাংলা কাব্য জগতে তিনি এক সময়ে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থের মধ্যে 'সাথী' ও 'স্বপ্নসাধ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় তাঁর একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। সেটির নাম 'নদ ও নারী'। পূর্ব পাকিস্থানে এই বইটি চলচ্চিত্রে রূপায়িতও হয়েছে। বাংলা সাহিত্য বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবার প্রয়াসেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলা ছোটগল্পের ইংরেজি অনুবাদ সংকলন 'গ্রীন এন্ড গোল্ড' নামক গ্রন্থটির তিনিই সম্পাদনা করেন। বিদেশের বহু বিদ্যালয়ের ভারতীয় বিভাগে গ্রন্থটি পাঠ্যবই হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী থেকেও তাঁর সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় সাহিত্য

এই কবিতাগুলি তিনি ছাড়াও আরো অনেকে অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও দেশে-বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যের উপর অনেক বক্তৃতা করেন। সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান বোধ করি 'শরৎ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব।' সম্পাদক হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব ঈর্ষণীয়। প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি 'চতুরঙ্গ' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছেন। ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নাউ' এবং বাংলা সাপ্তাহিক 'নয়া বাংলা' পত্রিকা দুটি প্রকাশনা ব্যাপারেও তাঁর উদ্যোগ ছিল। বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, জর্মণ ও ফরাসী ভাষায় তিনি সুপন্ডিত ছিলেন। তিনি ইংরেজি ভাষায় হেগেলের যে অনুবাদ করেন তা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখ্য সংযোজন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই অনুদিত গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। কান্টের উপর একটি বাংলা বইও তিনি প্রকাশ করেন। মালয়ালম ও তামিলে কোরাণ অনুবাদ এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের 'তরজমানুল কোরাণের' ইংরেজি অনুবাদেও তাঁর হাত ছিল। ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত 'রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী' অনুষ্ঠানের তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। 'সাহিত্য আকাদমি', 'সংগীত-কলা ললিত

আকাদামি' প্রভৃতির পরিকল্পনা ছিল তাঁরই। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য তার একজন একনিষ্ঠ সেবকের সেবা থেকে বঞ্চিত হল।

আর্জেন্টিনার করডোবা থেকে 'ইজিতুর' নামে একটি কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত এই পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন এ কুলের। এই পত্রিকার দশম সংখ্যাটি হবে ভারতীয় কবিতার। মোট পনেরজন ভারতীয় কবির কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া থাকবে ভারতীয় কবিতার উপর একটি আলোচনা। এই ধরনের প্রয়াস আর্জেন্টিনায় এই সর্বপ্রথম। জানা গেছে, মোট পনেরজন কবির মধ্যে বাংলা ভাষা থেকেই সাতজন প্রবীণ ও নবীন কবির কবিতা অনূদিত হয়েছে।

চিকিৎসাবিদ্যা বা ভূতত্ত্ব বিদ্যার উপর সারগর্ভ আলোচনা না হলেও মাঝে মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্য এই বিষয়ের উপর কিছু কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনের দিক থেকে এই সব গ্রন্থকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সম্প্রতি এরকম বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে শ্রী বি জি এন কর্তৃক লিখিত এবং বিজ্ঞান প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত 'ক্যানসার', ডঃ আর বিশ্বনাথম কর্তৃক লিখিত এবং 'কারেন্ট টেকনিক্যাল লিটারেচার' কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাচীন যুগের চিকিৎসাবিদ্যার সমস্যা' এবং শ্রী পি কে দাস লিখিত 'মনসুন' গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ক্যানসার' বইটিতে ক্যানসার গবেষণার উপর কোন নতুন তত্ত্ব বা এই বিষয়ে কোন সারগর্ভ আলোচনা হয়নি। সাধারণের এই বিষয়ে জ্ঞানলাভে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি লেখা। অন্য গ্রন্থ দুটির উদ্দেশ্যও অনুরূপ। ভারতীয় ভাষায় যখন বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার অভাব খুব বেশি, তখন এই প্রয়াসগুলিকে সবাই অভিনন্দন জানাবে বলে আশা করি।

প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরাস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ৬—১২ এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সংস্থার সভাপতি অধ্যাপক এ এল ভাসাম এশিয়ার ভাষাতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকদের এই সম্মেলনের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বই পাড়ায়

কলেজ স্ট্রীটের সংকট

কফি হাউসের চারপাশে অনেকগুলি রাস্তা, ছোটবড়ো অলিগলি। নিতান্ত নির্জন নয়, প্রায়ই দেখা হয়ে যায় দু'চারজন কবি সাহিত্যিকের সঙ্গে, ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যান গম্ভীরমুখ অধ্যাপক। সর্বত্রই ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়।

এ দৃশ্য একদিনের নয়, প্রতিদিনের।

সাধারণত কলেজ স্ট্রীট বলতে যে রাস্তাটা বোঝানো হয় প্রকৃত কলেজ স্ট্রীট তার থেকে স্বতন্ত্র, বইপাড়া নামেই তার সমধিক প্রসিদ্ধি। একটা রাস্তা নয়, মধ্য কলকাতার একটা অঞ্চলই এখন ঐ নামে চিহ্নিত। বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির যোগাযোগ এবং প্রচারকেন্দ্র বলা যায় সমগ্র অঞ্চলটিকে। রাস্তার ধারে ছোট বড়ো দোকান নিয়ন-সজ্জিত না হলেও শো-কেসে নানারকম বইয়ের প্রচ্ছদ এবং ঘরের মধ্যে রাশি রাশি বই নজরে পড়ে সকলেরই। পথচলতি মানুষ চোখ বুলোয়, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বইয়ের নাম মুখস্থ করে, কৌতূহলী হয় : কি বই বেরোল এ মাসে? কেউ কেনে, কেউ কেনে না। গ্রাম-গ্রামান্তরের দোকানীরা আসে। কলেজ স্ট্রীটের ফসল এমনি করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

'সেই কলেজ স্ট্রীট এখন বিপন্ন, সংকটের মুখোমুখি' বললেন, কলেজ স্ট্রীটের এক প্রকাশক সংস্থার কর্ণধার।

জিজ্ঞেস করলাম, এ সংকটের কারণ কি? আপনাদের অস্তিত্বের ওপর বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি যে অনেকটা নির্ভরশীল?

বললেন, গত কয়েক বছর ধরেই বইয়ের ব্যবসা মন্দা যাচ্ছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হবার পর তা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। পাকিস্তান ছিল আমাদের সোনার বাজার। লাইব্রেরীতে বই কেনাকাটা প্রায় হয় না। সৌখীন ভদ্রলোক-লোকদের কথা ছেড়ে দিন। তাঁরা বই কেনেন ঘর সাজাবার জন্যে। বইয়ের প্রকৃত পাঠক নিম্নবিত্তের মানুষ। পাকিস্তান থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা বিভিন্ন জায়গায়, কলোনীতে ছোটখাট লাইব্রেরী করেছেন। কিন্তু বইয়ের দাম এখন যে-পরিমাণ বেড়ে গেছে, তাতে তাঁরাও ঠিকমতো বই কিনতে পারছেন না। ফলে গল্প-উপন্যাসের বাজার একদম পড়ে গেছে। সিরিয়াস বই-ও আর কেউ সহজে প্রকাশ করতে চান না।

একটু থেমে, খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললেন, সংকটটা এবার অন্যদিক থেকেও এসেছে। আমরা যারা গল্প-উপন্যাসের বই প্রকাশ করি, তারাও শুধু বেঁচে থাকার তাগিদেই কিছু কিছু স্কুলপাঠ্য বই বের করে থাকি। না হলে আমাদের চলে না। স্কুলপাঠ্য বইয়ের ব্যবসা চলে মূলত দু-তিন মাস। কুইক 'রটার্ণ' আসে। যা বিক্রী হয় জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যেই। অন্য সময় কেনাবেচা সামান্যই। এ-বছর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কেমিস্ট্রি বায়োলজির একটা সিলেবাস দিয়েছেন কিছুকাল আগে। গত কয়েক বছর ধরেই এমনি তাড়াহুড়ো করে বই ছাপাতে হয়। এবার আমাদের বই সাবমিট করার শেষ তারিখ ১৫ই অক্টোবর। আমরা বুঝতে পারছি না, এত অল্প সময়ের মধ্যে, কিভাবে দুটো গুরুত্বপূর্ণ বই উপযুক্ত শিক্ষাবিদকে দিয়ে লেখানো ও ছাপানো সম্ভব। তাড়াতাড়ি করতে গেলে ভুলভ্রান্তি থাকবেই। ছেলেমেয়েরা ভুল শিখবে। সেজন্যেই অনুমোদিত বইতেও নানারকম দোষত্রুটি থেকে যায়।

বললাম, এ নিয়ে আপনারা প্রতিবাদ করেননি?

—করেছি। কখনো ও'রা সহানুভূতির সংগে কথা বলেন, কখনো বলেন না। যে এন মল্লিক প্রেসিডেন্ট থাকার সময় আমরা বহু চিঠি দিয়েছি। প্রায়ই তিনি উত্তর দিতেন না। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, দরকার হলে উত্তর দিই। বেশিরভাগ চিঠিই তাঁর কাছে উত্তর দেওয়ার উপযুক্ত মনে হতো না। প্রাক্তন সেক্রেটারী ডি মজুমদারের কাছ থেকেও প্রায় অনুরূপ ব্যবহারই পেতাম।

এবারের সিলেবাস নিয়ে আপনারা শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়কে কিছু জানাননি?

—জানিয়েছি। তিনি আমাদের সংগে সহানুভূতিসূচক কথাবার্তাই বলেছেন। শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক এখনো বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁকে বলতেই, তিনি উত্তর দেন লিখিত নিয়ে আসুন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বোর্ড একটা অটোনোমাস সংস্থা, আমি সরাসরি লিখে দিতে পারি না, আইনে আটকায়। ফলে, বিষয়টার কোনো সুরাহা হলো না, ১৫ই অকটোবরের মধ্যেই বই সাবমিট করতে হবে।

আপনারা আর কারো সংগে কথাবার্তা বলেননি?

হেড মাস্টারি অ্যাসোসিয়েসনের সংগে কথা বার্তা হয়েছিল। দু-তিনজন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, বোর্ডের মিটিংয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। পরে তাঁরা অনেকেই ব্যাপারটায় উচ্চবাচ্য করেননি। আমাদের সম্পর্কেও কিছু বলেননি কোথাও। মনে হয়, স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের চাপ আছে। তবে বর্তমান সেক্রেটারী নির্মল সিংহের সংগে আলোচনা করেছি। তিনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কিন্তু বোর্ডের ডিসিশান না হলে কিছুই করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, ইনডিভিজুয়ালি আমি কিছুই করতে পারি না। যা করবার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করতে হবে।

আপনাদের মূল দাবীগুলি কি?

—আমরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে একটা মেমোরেন্ডামে সবই জানিয়েছি। আমাদের সামনে অনেক সমস্যা। টিঁকে থাকার সমস্যা। সরকার শিক্ষাকে অবৈতনিক করছেন। আমরাও তাতে আনন্দিত। এবার তাঁরা প্রাইমারীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বই নিয়ে নিচ্ছেন। সিংগল টেক্সট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। যাঁরা কেবলমাত্র নিচু ক্লাসের বই ছাপেন ও বিক্রী করেন, তাঁরা এ ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি। অনেকে গতবারের অনুমোদিত বই সম্পূর্ণ বিক্রী করতে পারেননি। আগে থেকে জানা থাকলে হয়তো অনেকে হয়তো বেশি বই ছাপতেন না। সাধারণত এতদিন একবার অনুমোদিত হলে সে বই পরের বছরও আবার রি-অ্যাপ্রোভ করা হতো। তাছাড়া, মনোপলি বিজনেস হলে বইয়ের ব্যবসা অচল হয়ে পড়বে। লেখকরা নতুনভাবে বই লেখার উৎসাহ পাবেন না। ছোটখাট প্রকাশকরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। কোনো বই অ্যাপ্রুভড না হলে, তার ফলাফল জানা যায় না। ইংরেজ আমল থেকেই এমনটি চলে আসছে। ভুলত্রুটি জানা থাকলে সংশোধন করা সম্ভব। তা না হলে, বারবার সে ভুলই থেকে যায়। সেজন্যে আমরা প্রস্তাব করেছি :

১। কোনো বই অ্যাপ্রুভ্যালের জন্য চাওয়া হলে, তা লেখবার জন্য উপযুক্ত সময় দিতে হবে। এবং তা কম করেও এক বছর হওয়া উচিত। ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথামেথিকস প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ক বই হলে আরো বেশি সময় প্রয়োজন।

২। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ সিলেবাস দিয়েছেন গত মার্চ মাসে। ১৯৭০ সালের জন্য কেমিস্ট্রি, বায়োলজির বই এত কম সময়ে নিখুঁতভাবে তৈরী করা সম্ভব নয়। তা ১৯৭১ সালের জন্য নির্ধারিত হলে ভালো হয়। এ সময়ের মধ্যে কোনো লেখক যেমন ভালো বই লিখতে পারেন না, তেমনি তাড়াহুড়োতে ও'দের স্ক্রুটি-উয়াররাও উপযুক্ত বই নির্বাচন করতে পারবেন না।

৩। তাছাড়া বোর্ড যে সিলেবাস দিয়েছেন তার মধ্যে নানা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে। সেসব বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বোর্ড তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা না দিলে লেখকরাও চূড়ান্তভাবে পান্ডুলিপি তৈরী করতে পারছে না।

৪। বোর্ড সিলেবাস দিয়েছেন, পৃষ্ঠাসংখ্যা বেঁধে দেননি। এর ফলে আয়তন বড় ছোট হতে পারে। এটা আকাঙ্ক্ষিত নয়। শিক্ষাবিদদের মনেও এই প্রশ্ন জেগেছে। বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা বেঁধে দেওয়া উচিত।

আমরা বুঝতে পারি না, এতে বোর্ডের অসুবিধা কোথায়? ছেলেরা নির্ভুল বই পাবে, লেখকরা নিশ্চিত হয়ে লিখতে পারবেন। এ ছাড়াও তো সমস্যা আছে। ভালো ছাপা এবং ভালো ছবি দেওয়া দরকার। সে সবের জন্য উপযুক্ত সময় না পেলে চলে না। বিভিন্ন প্রেস এখন ব্যস্ত। সামনে শারদীয়া সংখ্যার প্রস্তুতি চলছে। লেবার-ট্রাবল তো আছেই। গত ১৯ আগস্ট আমরা একশজন প্রকাশক একটা ডেপুটেশনে গিয়েছিলাম। বোর্ড প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিষয়টি সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করবেন। এবারের মতো কাড়াটি হয়তো অফিসিয়্যালি ও'রা ডিক্ল্যার করেননি, অবশ্য আমরা এতে খুব খুশি হয়েছি।

জিজ্ঞেস করলাম, কলেজপাঠ্য বইয়ের ব্যাপারে কি আপনারা অনুরূপ কোনো সংকটবোধ করছেন?

—করছি। ইংলণ্ড-আমেরিকার বহু বই এখন আমাদের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে। আমরা প্রতিযোগিতায় ও'দের সংগে পেরে উঠি না। তার কারণ, ওসব বইয়ের পেছনে সরকারী অর্থ আছে। আমাদের সরকার যদি উপযুক্ত সাবসিডি দিতেন, তাহলে আমরাও কম দামে বই দিতে পারতাম। তা ছাড়া, গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের বই ছেপে লোকসান হয়। দীর্ঘদিন লাগে আসল টাকা তুলতে। সরকারী সাহায্য পেলে আমরা উৎসাহ পেতাম।

বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতি থেকে উনি একটা মেমোরেন্ডামের কপি আনালেন। তাতে দেখলাম, জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান অনুসারে সিরিয়াস বইয়ের প্রকাশ কমে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরের তুলনায়, এখন কেউ আর তেমন প্রবন্ধের বই বের করতেই চান না।

স্কুলপাঠ্য বই ছাড়া কি আপনাদের টিঁকে থাকার উপায় নেই?

—আছে হয়তো। সে কজনই বা আর ওভাবে টিঁকে থাকতে পারবেন? সরকার শিক্ষা জাতীয়করণ করলেও যদি ভালো বই লিখিয়ে দেন, কিংবা আমরা ও'দের নির্দেশ মতো লিখিয়ে নিই এবং ও'রা প্রকাশের অনুমতি দেন তা হলে হয়তো কিছুটা টিঁকে থাকতে পারবো। একই সিলেবাসে লেখা বিভিন্ন বই বিভিন্ন জেলার জন্য অনুমোদিত হতে পারে। কোনো একজন প্রকাশককে সমস্ত দায়িত্ব না দিয়ে একেকজন প্রকাশককে একেকটি বইয়ের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলেও হয়তো আমরা বেঁচে থাকতে পারবো। কারণ, তখন তো আর প্রতিযোগিতা ক্যানভাসিংয়ের ঝামেলা থাকলো না। আমরা বইয়ের প্রকাশ ও পরিবেশন সংক্রান্ত দোষত্রুটির জন্য কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য থাকবো। অনেকে স্কুলপাঠ্য বই ছাপাতে ছাপাতে দু-চারখানা সদগ্রন্থও প্রকাশ করেন। ভবিষ্যতে সেসব বইও তাহলে আর বেরোবে না।

কথায় কথায় বললেন, বটতলার প্রকাশকরা এখন কলেজ স্ট্রীটে দোকান খুলেছেন। ও'রা ফিফটি সিকসটি পার্সেন্টে বই বিক্রী করে আমাদের ব্যবসা মাটি করে দেন। জানি, বেশিদিন এসব চলবে না। কাগজের দাম যা হয়েছে, তাতে এত কমিশনে বই দিলেও লোকসানই হবে।

—বিশেষ প্রতিনিধি

নতুন বই

ভিয়েৎনামের স্পন্দন (গল্প সংকলন) **নাম কাও।। অনুবাদ : অবন্তীকুমার সান্যাল।। কথাশিল্প ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা—১২।। দাম : ছয় টাকা।**

আধুনিক ভিয়েতনামী সাহিত্যের প্রবর্তক হিসেবে নাম কাও আজ শুধু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নয়, সারা পৃথিবীতে পরিচিত। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য লেখা-পড়া করতে পারেন নি বেশিদূর। কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে মিশতে পেরেছিলেন গ্রাম ছাড়া উদ্বাস্তু, রবার বাগানের কুলি, বেকার তাঁতি আর নিচের তলায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে। স্বগ্রাম ও স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা ছিল তাঁর অপরিসীম। গভীর মমতার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন ভিয়েৎনামের গ্রামপ্রকৃতির ঐশ্বর্য ও তার সারল্যকে। সেজন্যেই তাঁর লেখায় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে ওখানকার গ্রামের নদী, পারঘাটা, ধানক্ষেত, আর সকাল সন্ধ্যার রূপালেখ্য।

শ্রীযুক্ত অবন্তীকুমার সান্যাল এই সংকলনে নাম কাও-এর বিখ্যাত নয়টি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। প্রথম গল্প 'চি ফেও' প্রথম ছাপা হয় ১৯৪১ সালে। অনেকে বলেন, এই গল্পটির প্রকাশ-তারিখের সঙ্গে ভিয়েতনামী সাহিত্যের বাস্তবতার জন্মকাল এক ও অভিন্ন।

দ্বিতীয় গল্প 'বুড়ো হাক' চাষী জীবনের আশ্চর্য দলিল। ১৯৪৭ সালে লিখলেন 'চোখ' নামে আরেকটা বিখ্যাত গল্প। তখন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অরণ্যে পর্বতে। ফরাসীদের সঙ্গে স্বাধীনতার সংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম পুরুষ। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে নাম কাও নিহত হন ফরাসী আততায়ীর হাতে।

সংকলনটি পড়তে পড়তে আনন্দিত হয়েছি। শ্রীযুক্ত সান্যালের চমৎকার গদ্য-ভাষা ও সাহিত্য রসবোধে। ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেন নি তিনি, মূল ফরাসী থেকে বাংলাভাষায় রূপান্তরের সময় তিনি বাঙালির সহজাত শব্দোচ্চারণের বিষয়টিকে পর্যন্ত মান্য করে চলেছেন প্রায় সর্বত্র। কথাভাষার ইডিয়মকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন সাবলীলভাবে।

নাম কাও-এর সাহিত্যজীবনের আয়ু মাত্র দশ বছর। ছাব্বিশ বছর বয়সের সময় প্রকাশিত হলো তাঁর প্রথম গল্প, আর শেষ লেখা লিখলেন তিনি ছত্রিশ বয়সে। মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে লেখা এই গল্পটির নাম "শত্রুর ঘাঁটি থেকে চার কিলোমিটার দূরে"। এ গল্পের নায়ক লেখক নিজেই।

অনুবাদ শ্রীযুক্ত অবন্তীকুমার সান্যাল ও প্রকাশক নীহাররঞ্জন রায়কে এই মূল্যবান সংকলনটি উপহার দেবার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন শ্রীখালেদ চৌধুরী।

●

দশটি গল্প **"শেখর বসু" ' এই দশক', ৬ সাহাপুর মেইন রোড, কলকাতা-৩৮। দাম তিন টাকা।**

চলতি বাংলায় যাঁদের 'ষাটের লেখক' বলা হয়, শেখর বসু তাঁদের অন্যতম। বাংলা গল্পের একেবারে হালফিল আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কিন্তু তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি কখনো ডগ্‌মা দ্বারা আচ্ছন্ন হননি, কোনো কিছু প্রমাণ করবার জন্য তিনি গল্পের মধ্যে হাতুড়ি ব্যবহার করেন না। বরং শ্রীবসুর মিহি কাজগুলো আমাদের বেশি আকর্ষণ করে। তাঁর প্রতিটি গল্পেই একটা কাঠামো আছে, অথচ পাঠকের কৌতূহল দমন করার জন্য তিনি কখনো কৃত্রিমতার আশ্রয় নেন না। ঋজু এবং সংযত গদ্য ব্যবহারের ফলে তিনি অনিবার্যভাবেই ইঙ্গিতধর্মিতায় পেঁৗছে যান, কিন্তু গল্পের গতি কোথাও শ্লথ হয়ে পাঠককে অমনোযোগী করে না। ফলে, তাঁর গল্পে প্রচলিত অর্থে কোনো শুরু অথবা 'শেষ' নেই। তাঁর ডিটেলের কাজ কত সুন্দর 'শেষে' গল্পটি পড়লেই তা বোঝা যায়। 'অথচ' গল্পটির তীব্র উৎকণ্ঠা খুব নাটকীয় হতে পারত, কিন্তু লেখক লোভ সংবরণ করতে জানেন। 'সার্সি' গল্পটির আবহ পাঠককে নাড়া দেবে। অন্য গল্পের মধ্যে 'কৌবন' 'মুখ' উল্লেখযোগ্য। তবে তুলনায় 'অসময়ে' একটু পুরনো লাগে। আর 'টুকটুকে হলুদ'এ দু'একটি ব্যবহার যেন বেশি সাজানো মনে হয়। কিন্তু মোটের ওপর গল্পসংকলনটি পড়ে উৎসাহিতই হবেন পাঠক।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

আগামী [শ্রাবণ ১৩৭৬] —সম্পাদক **কৃষ্ণা দত্ত ও প্রসূন বসু।। ৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।। দাম প'চাত্তর পয়সা।**

বাংলা ভাষায় কিশোর-কিশোরীদের জন্য পত্রিকা আছে। 'তরুণ' বলতে যাদের বোঝায় তাদের জন্য বোধ হয় একমাত্র পত্রিকা 'আগামী'। রহস্য-রোমাঞ্চ কিংবা ভৌতিক গল্প না ছেপে পত্রিকাটি শিক্ষা-মূলক রচনা প্রকাশে অধিকতর আগ্রহী। এ সংখ্যায় প্রকাশিত কয়েকটি সুন্দর লেখা হলো কৃষ্ণ ধরের 'মে-কবি আনন্দকে খুঁজছেন', জ্যোতিভূষণ চাকীর 'প্রতি-শব্দকোষ' প্রভৃতি। অন্যান্য রচনারও স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট।

●

ইসারা [**ত্রয়োদশ সংকলন ১৩৭৬**]—**সম্পাদক সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।। ৪০।৪, উপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৫৪।**

বর্জাইস টাইপে ছাপা কবিতার কাগজ। সম্ভবত বাংলাদেশে এত ছোট হরফে আর কোনো পত্রিকা ছাপা হয় না। কোনোরকম আলোচনা-সমালোচনা নেই। কবিতা লিখেছেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখো-পাধ্যায়, দীপেন রায়, তরুণ সেন, সত্য গুহ, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সনৎকুমার প্রমুখ কয়েকজন।

●

একাল (৪র্থ-৬ষ্ঠ সংখ্যা) — **ভরতকুমার সিংহ কর্তৃক ২৪ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলকাতা—৩৭ থেকে প্রকাশিত। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।**

এ সংখ্যায় সমরসেট মম-এর ওপর একটি প্রবন্ধ লিখেছেন নারায়ণ ভট্টাচার্য। গল্প লিখেছেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, ভরত সিংহ, অজয় মুখোপাধ্যায়, সমীরকান্তি বিশ্বাস। ছোটগল্পের একমাত্র দ্বিমাসিক হলেও পত্রিকাটি নিয়মিত বেরোয় না।

বইকুণ্ঠের খাতা

ইতিহাসের আলোয় গদ্যসাহিত্যের সূচনা ও নারীপ্রগতি

শোনা যায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও নাকি বহুবার ফরমায়েসী লেখা লিখতে হয়েছে। কিন্তু মর্যাদাভ্রষ্ট হন নি কবিগুরু।

তাঁর কাছে অনুরোধটা ছিল উপলক্ষ্য মাত্র। লেখায় হাত দেবার পর ফরমায়েসের কথা বিস্মৃত হতেন তিনি। লিখে যেতেন সৃষ্টির আনন্দে। সেদিক থেকে তিনি ছিলেন সর্বদাই আত্ম-অবিক্রীত মানুষ, সত্যিকারের সৃজনশীল সাহিত্যিক।

বাস্তব-জীবনে এমন ঘটনার মুখোমুখি হতে হয় অনেককেই। কথাটা মনে পড়ল, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সদ্য-প্রকাশিত একটি বই হাতে নিয়ে। বইটির নাম ঃ "বিদ্যাসাগর—বাংলা গদ্যের সূচনা ও নারীপ্রগতি"। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আমন্ত্রণ জানান "বিদ্যাসাগর বক্তৃতা" দেবার জন্য। এই গ্রন্থ সেই বক্তৃতাসমূহেরই মুদ্রিত সংকলন।

একদিন ডঃ মজুমদারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তো বিবেকের কাছে কখনো নতিস্বীকার করেন নি। চিরকাল মাথা উঁচু করে চলেছেন। তা হলে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরমায়েসী বক্তৃতা দিতে গেলেন কেন?

স্পষ্ট তিরস্কারের মতো শোনালো ডঃ মজুমদারের কণ্ঠস্বর। শান্ত কঠিনভাবে বললেন, ও'রা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বক্তৃতা দেবার জন্য, বিষয়-নির্বাচন করেছি আমি। ওটা আমার পছন্দের ব্যাপার। আমি বইয়ের ভূমিকায় তা উল্লেখ করেছি। চিঠি পাওয়ার দশ বারো দিন পরেই আমার পাঁচটি বক্তৃতা দেবার কথা। দিতে পারি নি। এত অল্পসময়ে দেওয়া সম্ভবও ছিল না। প্রথম বক্তৃতা দিই ১৯৬৭ সালের ২৯শে জুলাই। বাকি চারটি বক্তৃতা দিয়েছি ১৯৬৮ সালের ২১, ২২, ২৩ ও ২৬ ফেব্রুয়ারী।

বললাম, আপনি তো মূলত ঐতিহাসিক। সাহিত্যের বিষয় বেছে নিলেন কেন?
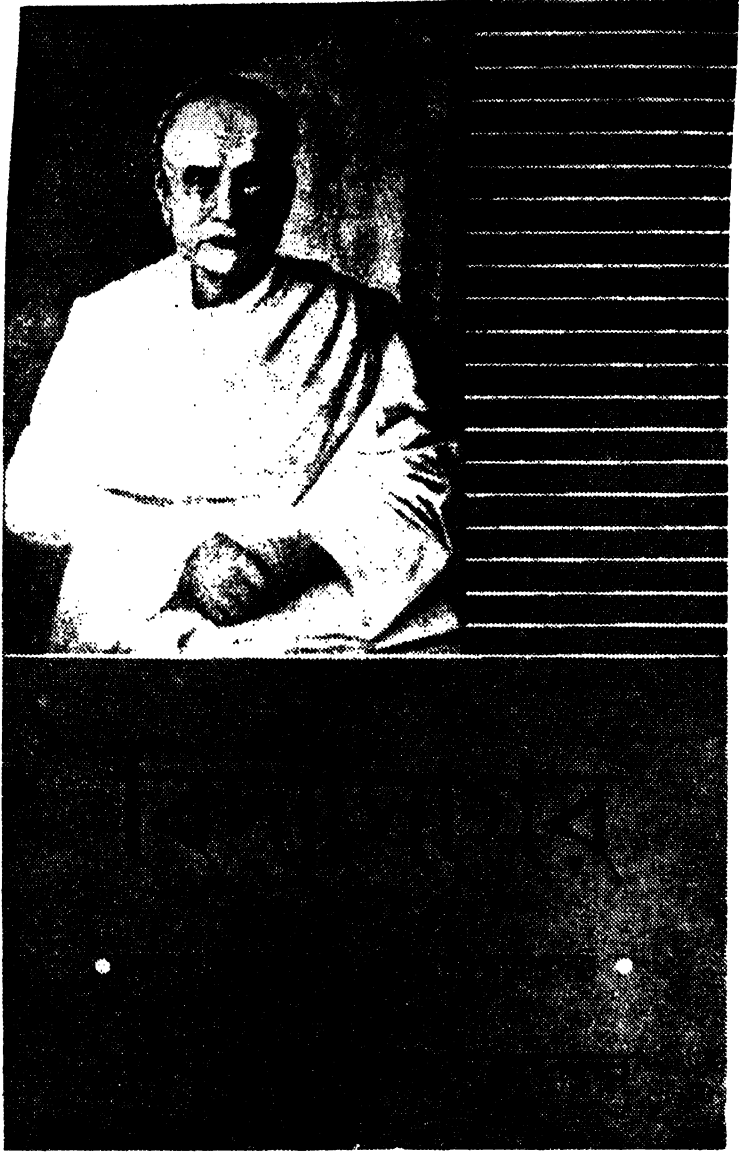
—আমি বিদ্যাসাগরের পূর্ববর্তী সময়ের বাংলা গদ্য কি রকম ছিল তাই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কোনো রকম বিশ্লেষণ করি নি। অনেকে বিদ্যাসাগরকে গদ্য-সাহিত্যের জনক বলে থাকেন। আমি ফ্যাক্‌টস দিয়ে তাই বুঝিয়েছি। এ গ্রন্থের প্রথম বক্তৃতাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরের চারটি বক্তৃতা একই পর্যায়ের। ধারাবাহিক।

আপনি নারীপ্রগতি বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন? ভারতীয় সমাজে নারীর স্থান কি রকম ছিল?

—বৈদিক যুগে ভারতীয় নারীর সামাজিক মর্যাদা ছিল উচ্চে। ঋগ্বেদের সময়ে ষোল-সতেরো বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে হত না। গৃহকর্মের সঙ্গে তাদের শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। তাদের উপনয়ন হত। যজ্ঞ করবার অধিকারী ছিল তারা। ঋগ্বেদের অনেক সূক্ত স্ত্রীলোকের রচনা। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তারা অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

আমি ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারকে ফিরে পেলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র, প্রেমচাঁদ রায়-চাঁদ স্কলার ও গ্রিফিথ পুরস্কারবিজয়ী সেই মেধাবী শিক্ষককে নয়—'গ্রেটার ইণ্ডিয়া' 'হিন্দু কলোনীজ ইন দি ফার ইস্ট' 'অ্যানসেন্ট ইণ্ডিয়া' "ইনস্ক্রিপশনস অব কম্বোজ", 'অ্যানসেন্ট ইণ্ডিয়ান কলোনীজ ইন দি ফার ইস্ট' চম্পা ও সুবর্ণ দ্বীপ) 'ক্লাসিক্যাল অ্যাকাউন্টস অব ইণ্ডিয়া' আর 'কর্পোরেট লাইফ ইন অ্যানসেন্ট ইণ্ডিয়া'র ঐতিহাসিককে। আমি শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

তিনি নারীসমাজের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ঘাটন করছিলেন আমার সামনে। আমি উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি অতীতচারণা করছিলেন।

বললেন, বৈদিক যুগে মেয়েরা বেশ স্বাধীন ছিলেন। পুরুষদের সঙ্গে তাঁদের অবাধ মেলামেশা হত। ঋগ্বেদে 'বিদথ' নামে একটি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার প্রকৃত অর্থ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। রথ, হুইটনি ও লাডউইকের মতে এটা এক ধরনের সভা বা সমিতি। সাংসারিক ব্যাপার, ধর্ম ও যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা হত এখানে। স্ত্রীলোকেরা তাতে অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা সভা-সমিতিতেও যোগ দিতেন। ঋগ্বেদে আরেকটা শব্দ পাওয়া যায় 'সমন'। তার অর্থ হল, মেলা বা উৎসব। এখানে কবি, ও ধনুর্বিদরা উপস্থিত হতেন। ঘোড়দৌড় প্রভৃতি হত। মেয়েরা আসতেন বিশেষভাবে সাজসজ্জা করে। অনেকে প্রার্থিত বরলাভের চেষ্টা করতেন। প্রাচীন গ্রীস দেশেও অনুরূপ উৎসব হত এবং সেখানে অপরিচিত যুবক-যুবতীদের মিলনও অসম্ভব ছিল না। এমন কি গণিকারাও এ উৎসবে যোগ দিত। ঋগ্বেদের কালে ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেম-বিনিময় ও পরিণামে বিয়ের কাহিনী পাওয়া যায়।

অবশেষে ডঃ মজুমদার সিদ্ধান্ত করেছেন, অন্যান্য প্রাচীন সভ্যজাতির তুলনায় ঋগ্বেদের যুগে ভারতীয় নারীর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা সব দিক দিয়েই উন্নত ছিল। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীর সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে নারীর অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকেই গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ সময় থেকে ভারতীয় নারীর এই মর্যাদাচ্যুতি শুরু হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

—হিন্দু যুগের শেষভাগ, বিশেষ করে স্মৃতিশাস্ত্রের যুগ থেকে। মনে হয়, এই অবনতির মূল কারণ তিনটি—(১) স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে একটি অনুদার ভাবের উৎপত্তি (২) শিক্ষার অবনতি (৩) বাল্য-বিবাহ। হিন্দু যুগের শেষভাগে এই অবনতির লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে প্রকট হয়েছিল। মনুস্মৃতিতে বলা হয়, "নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মে ব্যবস্থিতিঃ। নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োঽনৃতমিতি স্থিতিঃ।" অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রাদি সহকারে যে-সব জাতক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়, তাতে স্ত্রীলোকের অধিকার নেই। স্ত্রীলোকেরা নিরিন্দ্রিয় ও মন্ত্রহীন, সুতরাং অসত্যের ন্যায় অশুভ।

ডঃ মজুমদার বললেন, মধ্যযুগে স্ত্রীজাতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। পর্দাপ্রথা সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিশিষ্ট মর্যাদার নিদর্শন বলে পরিগণিত হয়। মোঘল আমলে মেয়েরা তো প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সামাজিক ক্ষেত্রে মেলামেশাও ছিল সীমাবদ্ধ। হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হত, বাল্যকালে। মনুস্মৃতির নবম অধ্যায়ের প্রথম কয়েকটি শ্লোকের মর্মার্থ: দিনরাত স্ত্রীলোককে পুরুষের অধীনে রাখতে হবে। কুমারী অবস্থায় পিতা, বিয়ের পর স্বামী এবং বুড়ো বয়সে ছেলেরা তাকে রক্ষা করবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই স্ত্রীলোকের স্বাধীন চলাফেরার অধিকার থাকবে না—"ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"। কারণ, স্ত্রীলোক সর্বদাই অসৎ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়। পর-পুরুষের রূপ বা বয়স বিচার করে না। শয্যা, আসন ও অলংকারের প্রতি আসক্তি এবং কাম, ক্রোধ, অসাধুতা, হিংসা ও কুচর্চা প্রভৃতি উপাদান দিয়ে ঈশ্বর স্ত্রীলোককে সৃষ্টি করেছেন। স্ত্রীলোকের এই বিধিদত্ত স্বভাব জেনে পুরুষ স্ত্রীলোককে হুঁশিয়ার হয়ে পাহারা দেবে। ভারতীয় নারীদের এই অসহনীয় অবস্থা ছিল মোটামুটি উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে এসে নারীসমাজ জাগ্রত হয়েছে। এ বিষয়ে রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম বক্তৃতা দেন ডঃ মজুমদার গত বছর ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী। বিষয়: উনিশ শতকে বাঙালি নারীজাগরণ। সেই বক্তৃতা আমি শুনিনি। যাঁরা শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল জানি না। আমি মুদ্রিত ভাষণটি পড়েই রীতিমত বিস্ময় বোধ করছি। অধুনা অপ্রকাশ্য-প্রায় বহু তথ্যসমাবেশ করেছেন তিনি পুরোনো দিনের কাগজপত্র ঘেঁটে। ১৮৩৫ সালের ১৪ মার্চ 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত একটি চিঠি উপহার দিয়েছেন আমাদের। লেখিকা 'কস্যচিৎ শান্তিপুর নিবাসিনী'। তার কয়েকটি পংক্তি:

"ইংরেজ রাজ্যের অনেক স্থলেই বিধবাদের পুনরায় বিবাহ হয়। কেবল বাঙ্গালীর মধ্যে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ কন্যা বিধবা হইলে পুনরায় বিবাহ হয় না এবং কুলীন ব্রাহ্মণের শুদ্ধ সমমেল না হইলে বিবাহ হয় না। যদি ঐ স্ত্রীলোক উপপতি আশ্রয় করে, তবে কুলোদ্ভবা সে-কুল নষ্ট হয়। কিন্তু বিশিষ্ট কুলোদ্ভব মহাশয়েরা অনায়াসে বেশ্যালয়ে গমন-পূর্বক উপপত্নী লইয়া সম্ভোগ করেন তাহাতে কুল নষ্ট হয় না।... কেবল স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সমন্বয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ... প্রাচীনকালে রাণীরা পতি অভাবে উপপতি লইয়া সম্ভোগ করিয়াছেন তাহাতে ধর্মবিরুদ্ধ হয় নাই। অদ্যাপিও তাহাদের নাম উচ্চারণে এবং স্মরণে পাপ ধ্বংস হয়। এইক্ষণে ঐ সকল পুরুষদিগের ধর্ম-বিরুদ্ধ হয় না। কেবল স্ত্রীলোকের সুখসম্ভোগ নিষেধার্থ কি ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণতন্ত্র সৃজন হইয়াছিল?"

আরেকজন চুঁচুড়া নিবাসিনী মহিলা তার সপ্তাহখানেক পরে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তাও ঐ 'সমাজ দর্পণ'-এই প্রকাশিত হয়। তার প্রধান দাবী হল:

১। সভ্যদেশীয় স্ত্রীগণের যেমন বিদ্যাধ্যয়ন হয়, সেইরূপ আমাদিগের কেন হয় না?

২। অন্যদেশীয় স্ত্রীলোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমাদিগকে তদ্রূপ করিতে দেন না কেন?

৩। বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমাদিগকে কি নিমিত্ত পরহস্তে দান করেন? আমরা কি নিজেরা বিবেচনা-পূর্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না?...

৪। আপনারা কেহ কেহ টাকা লইয়া আমাদিগকে বিবাহ দিতেছেন। তাহাতে যাহার মূল্য অধিক ডাকেন তাঁহারাই আমাদের স্বামী হন এবং আমরা তাহাদের ক্রীত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হই?

৫। যাহাদের অনেক ভার্যা আছে তাহাদের সঙ্গে কেন আমাদের বিবাহ দিতেছেন? যাহার অনেক ভার্যা আছে তিনি প্রত্যেক ভার্যা লইয়া সাংসারিক যেমন রীতি ও কর্তব্য তাহা কিরূপে করিতে পারেন?

৬। ভার্যার মৃত্যুর পরে স্বামী পুনর্বিবাহ করিতে পারে। তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিতে না পারে? পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই? এই অস্বাভাবিক বিরুদ্ধ নিয়মেতে কি দুষ্টতার দমন হয়?

এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই উনিশ শতকীয় নারীজাগরণের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বিদ্যমান।

রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা বিবাহের প্রবর্তন এবং সতীদাহ প্রথা রদ করা সম্ভব হয়। বিদ্যাসাগর লিখেছেন : "বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।"

ঐ মানসিকতা থেকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি, বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে পাশ হয় নতুন আইন। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মহিলারা কৃতিত্বের পরিচয় দেন। জাতীয় আন্দোলনের সময়ে অনেকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। লর্ড রিপনের অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল ত্রিশ-চল্লিশ জন ছাত্রী। আবার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারা-দণ্ডে কালো ব্যাজ ধারণ করেছিল ছাত্রীরাই। মনে পড়ে, অ্যানি বেসান্ট-এর স্মরণীয় উক্তি। কংগ্রেসের সাধারণ অধি-বেশনে কাদম্বিনী দেবী পাঁচ হাজার দর্শকের সামনে দাঁড়িয়ে সভাপতিকে ধন্যবাদ জানান। "হাউ ইন্ডিয়া রট ফর ফ্রিডম" গ্রন্থে এই ঘটনাটির উল্লেখ করে বলেন, "ভারতের স্বাধীনতা যে ভারতীয় নারীর মর্যাদা কতদূরে উন্নত করবে--এ তারই প্রতীক।"

ডঃ মজুমদারকে জিজ্ঞেস করলাম, আজকের মেয়েদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? অনেকে বলেন, স্ত্রী-স্বাধীনতার ফলে এখন সামাজিক জীবনে জটিলতা বেড়েছে। আপনিও কি তাই মনে করেন?

--আজকের মেয়েরা শিক্ষার দিক থেকে উন্নত হয়েছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও অনেক স্বাধীন। তাতে জটিলতা বাড়বে বৈকি? একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে যাচ্ছে এবং যাবে। সে তো ভালই। মেয়েদের দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্বাধীন মতাবলম্বী হলে বিরোধ হওয়াই সম্ভব।

আমি একাশি বছর বয়স্ক একজন ঐতিহাসিকের কাছে এ উত্তর আশা করিনি। কেমন সংস্কারহীন, স্বচ্ছ তাঁর কণ্ঠস্বর। বললেন, সময়ে সবই পাল্টায়। হিন্দু সমাজে আগে বিবাহ-বিচ্ছেদ হত না। ডিভোর্স আইন পাশ হবার পর আমাদের চোখ খুলল। এতদিন আমরা অন্ধ ছিলাম। উপায় থাকলে আগেও মেয়েরা স্বামীর ঘর করতে অনেকেই চাইত না। এখন উপায় হয়েছে। সেজন্যেই আমরা বিবাহ-বিচ্ছেদ দেখতে পাচ্ছি। আমি মা-ঠাকুরমা, স্ত্রী, মেয়ে ও পুত্রবধূকে দেখেছি। কিন্তু তাঁরা কি সকলে একই সমাজের মহিলা? বিভিন্ন সময়ে ও সমাজ পরিবেশে তাঁরা জন্মেছেন। আমার মা, ঠাকুমা, স্ত্রী ও মেয়ে কিংবা পুত্রবধূ আলাদা প্রকৃতির নারী, ভিন্নসমাজের বাসিন্দা।

একটু থেমে বললেন, পুরুষ এখন আর মেয়েদের শাসন করতে পারছে না বলেই নানা গোলযোগ। তাছাড়া দৃষ্টি-ভঙ্গিও পাল্টেছে অনেকের। রামমোহন রায়ের দেশপ্রেম ও বিশ শতকের স্বদেশী আন্দোলন কি একরকম? শোনা যায় রাম-মোহন রায় মন্দিরে গিয়ে শিখ-মারাঠা যুদ্ধের সময় ইংরেজদের জয় কামনা করে-ছিলেন। ঊনিশ শতকের শেষভাগে কোনো স্বদেশী কি এমনটা করতে পারত। তখন ইংরেজরা বলত, আগে ভারতবাসীরা ভাল ছিল, এখন খারাপ হয়ে গেছে। শাসন না মানলেই এমন কথা মুখ থেকে বেরোয়। মেয়েরা এখন স্বাধীনতা চাইছে বলে পুরুষদের অহমিকায় বাধছে। তাই বলে তো নারী-প্রগতি বন্ধ করা যায় না! তারা স্বাধীন হবে এটাই তো কাম্য।

অনেকে বলেন, অবাধ মেলামেশার ফলে মেয়েরা চরিত্রভ্রষ্ট হচ্ছে। তাতে কি সাংসারিক জীবনে ভাঙন দেখা দিচ্ছে না?

--আগে যে মেয়েদের নৈতিক চরিত্র খুব ভাল ছিল, তা তো মনে হয় না। অবাধ মেলামেশা থাকলে স্খলন-পতন অসম্ভব নয়। মধ্যযুগে গৌরীদান হত। সেজন্যে বিয়ের আগে তেমনটি হত না। কিন্তু বিবাহিতা কিংবা নারীদের সম্পর্কে এমন অভিযোগ তো আগেও ছিল। বৈদিক যুগে মেয়েদের সেকসুয়াল মর্যালিটি খুব উন্নত ছিল না। একটি ঘটনায় জানা যায়, যজ্ঞাসনে উপবিষ্ট পুরোহিত নারীকে জিজ্ঞেস করেন, স্বামী ছাড়া আর ক'জন পুরুষের সঙ্গে তিনি সহবাস করেছেন। নারী উত্তর দেন, পাঁচ জন। এই স্বীকৃতির ফলেও কিন্তু সে-নারী সমাজচ্যুত হননি।

আপনার এ বইটির নাম 'বিদ্যাসাগর' রাখলেন কেন? বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গটি তো আপনার লেখায় সব চাইতে কম?

--আসলে বইটির নাম হওয়া উচিত "বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী-প্রগতি"। 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতামালা'র সংকলন বলেই প্রকাশক ঐ নামটি দিয়েছেন। আমি দিইনি।

কথায় কথায় বিদ্যাসাগর ও রামমোহন প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। সম্পূর্ণ নতুন কথা শোনালেন ডঃ মজুমদার। বললেন, উভয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য রামমোহন যুক্তিবাদী, শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাকে উড়িয়ে দিতেন বিনা দ্বিধায়। স্মৃতি-শ্রুতির ধার ধারেন নি কখনো। ব্রাহ্মসমাজ গঠনের মধ্য দিয়ে নতুন যুক্তিবাদী চিন্তাধারার সূত্রপাত করলেন তিনি। কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন শাস্ত্রীয় মানুষ। তাঁর মানবতা বোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর। সমাজসংস্কার করতে গিয়েও শাস্ত্রীয় সমর্থন আদায়েরই চেষ্টা করে-ছেন। কখনো শাস্ত্রের বিরোধিতা করেননি। সেজন্যেই হিন্দু সমাজের ওপর তাঁর প্রভাব সর্বাধিক। হিন্দুরা তাঁর প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু কখনো তাঁকে অস্বীকার করেনি। রামমোহন শাস্ত্রবিরোধিতা করতে গিয়ে সমাজ-বহিষ্কৃত হলেন। তাঁর অনুরাগীরা বাধ্য হলেন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করতে। পরবর্তীকালে তাঁর অনেক কথাই হিন্দুরা মেনে নিয়েছে, কিন্তু রামমোহনকে স্বীকার করেনি। এদিক থেকে বিদ্যাসাগরের ছিল 'মোর কারেক্ট ওয়ে অব অ্যাপ্রোচিং'।

আপনি আর কোনো বইতে কি এই নারীপ্রগতি সম্পর্কে কিছু লিখেছেন?

--আমার সবচাইতে বড় কাজ হল, 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দি ইন্ডিয়ান পিপল'। তার দশম খণ্ডে একটি চাপটার আছে সোস্যাল রিফর্মস নামে। তাতে আমি নারীজাগরণের কথা কিছুটা বলেছি।

আপনাকে নিয়ে অতীতে কখনো বিতর্ক হয়েছে কি?

--হয়েছে। 'দি হিস্ট্রী অব দি ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া' লেখার সময় খুব বিতর্ক হয়। ভারত সরকার বইটির কিছু অংশ আমাকে লিখতে বলেন। আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। ফলে, আলাদা বই লিখি। তিন খণ্ডে ছাপা হয়েছে। আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অনেকেই এখন বিখ্যাত হয়েছেন। বিজ্ঞানী সত্যেন বসু, রাধাগোবিন্দ বসাক, ও-সি গাঙ্গুলী, ক্ষিতীশ সেন, বসন্ত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অনেকের সঙ্গে আমার মতের মিল হত না। তাতেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলতাম, চৈতন্য জাতিভেদ মানতেন না। বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ সেন প্রভৃতি অনেকে বলতেন, মানতেন। এ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে। আমি বলতাম, প্রাচীন যুগে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ ছিল না, মধ্যযুগে ছিল। ওঁরা তার প্রতিবাদ করতেন। তাঁদের মতে, হিন্দু সমাজে চিরকালই জাতিভেদ ছিল। একবার আমি ভারতবর্ষে একটা প্রবন্ধ লিখি ১৯৪৮ সালে। প্রবন্ধটার নাম 'ভারতের স্বাধীনতা'। তাতে আমি ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে গান্ধী হিটলার সুভাষ-চন্দ্রের অবদানের কথা বলেছিলাম। আমার মতে, গান্ধী জনজাগরণের মারফৎ, সুভাষ-চন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও হিটলার প্রচণ্ড শক্তিতে ইংরেজদের দাবিয়ে রেখে-ছিল। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই প্রবন্ধটি অনুবাদ করে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। ফলে, আমার নাম ব্ল্যাকলিস্টে উঠে যায়। কোনো সরকারী কাজের দায়িত্ব সেজন্যেই আমি আর পাইনি।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন্ কোন্ সূত্র থেকে এ বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

--প্রতিটি ভাষণের শেষে ফুট নোট হিসেবে আমি সেসব বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি। দেখে নেবেন। আমি বিভিন্ন বই থেকে ফ্যাক্টস্ সংগ্রহ করেছি, মতামত ধার নিইনি।

আমি কান দিয়ে তাঁর কথা শুনে-ছিলাম। আর মন দিয়ে উপলব্ধি করছিলাম কালবিকৃত মানবসমাজ সম্পর্কে তাঁর সংস্কার-মুক্ত চিন্তাধারা। বর্তমানের পরি-বেশে লালিত হয়েও তিনি আসক্তিহীন, ইতিহাস-সচেতন, নিরপেক্ষ স্বচ্ছন্দ,স্থির অধিকারী। অতীত সম্পর্কে যেমন কৌতূহলী, বর্তমান সম্পর্কেও তেমন। তিনি বিচারক নন, চিরকালীন ইতিহাসের দর্শক--মোহহীন, নিরাসক্ত, উদাসীন।

--বিশেষ প্রতিনিধি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমার মুডটা খারাপ করে দিলে তুমি। দীপা চুলটা ঠিক করে নিল। সরিৎকে এখন কিছু বলবে না বলেই ঠিক করল সে। দীপা পাঞ্জাবী মেয়ে। অত সহজে ভয় পেলে তার লজ্জার কথা হবে। তাছাড়া সনৎ রয়েছে। দরকার হ'লে তার সাহায্য সে নিতে পারবে।

কেতকীর পেটের যন্ত্রণা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যে তার জানা সব ওষুধই সে ব্যবহার করেছে কিন্তু ফলটা আজকাল সাময়িক হয়। রোগের চিকিৎসা এখনও সে শুরু করে নি। ডাক্তার এবং রোগীদের সঙ্গে থেকে নিজের ব্যাধিকে তাচ্ছিল্য করার মত শক্তি পেয়েছে বলে তার অবচেতন মনে হয়ত একটা বিশ্বাসের শিকড় গেড়ে বসেছিল। এটা তার মনে হ'ল নারসিংহোমের উৎসবের কয়েকদিন আগে। সুতরাং কেতকী ঠিক করল যে, ডাঃ সেনকে সে দেখাবে। ডাঃ সেনের বয়স হয়েছে। সার্জন হিসাবে তার যথেষ্ট সুনাম আছে তাছাড়া তিনি কেতকীকে স্নেহ করেন তাও সে জানে। অনেক অপারেশনে কেতকী তাঁকে সাহায্য করেছে। প্রসাধন শেষ করে যাবার মুখে সে একবার আয়নাতে দেখে নিল নিজেকে। এখনও সুন্দর লাগছে তাকে নিজের চোখে। গতরাত্রে তার বিশেষ ঘুম হয় নি। প্রথমতঃ একটা এমার্জেন্সী অপারেশন ছিল তাতে অ্যাটেন্ড করতে হয়েছিল। তাছাড়া পেটের ব্যথা যেন তার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তবুও কেতকীকে সুন্দরী বলবে লোকে। কিন্তু তাতে কি লাভ হ'ল তার! কথাটা ভেবে মনটা অবসাদে ভেঙে পড়ল, শিথিল হয়ে গেল তার সর্বাঙ্গ, বসে পড়ল সে পাশের চেয়ারটায়। নার্স না হয়ে যদি সাধারণ মেয়ের মত তার ভাগ্যে স্বামী সন্তান আর সংসার জুটত তাহ'লে আর যাই হোক এ ধরণের শূন্যতা তার জীবনকে ভরে থাকত না। এভাবে ব্যর্থ হ'ত না সে। নিঃশেষে ফুরিয়ে যেত না অকালে। স্বাধীনতা হয়ত কিছুটা খর্ব হ'ত তার, হয়ত নিজের পছন্দমত চলতে ফিরতে অসমর্থ হ'ত কিন্তু নির্ভরযোগ্য একটা জায়গা থাকত, একথা ঠিক। কেতকীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা। মেডিকেল কলেজের সরিৎ কত তফাৎ ছিল! কেতকীর মনে পড়ল, কাজে, অকাজে, সময় অসময় সরিৎ তার কাছে আসত। কথা বলত অন্তরঙ্গভাবে, মেলা-মেশা করত পরম আত্মীয়ের মত। ছোট

ছোট বিষয়ও তার সঙ্গে আলোচনা করতে, পরামর্শ করতে তখন সরিতের বাধতো না, মনে আছে। কিভাবে সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ভালোবাসার স্তরে এসে পেঁৗছাল তা সে নিজেই জানতো না। শুধু সে নয় তখন সকলেই অনুমান করেছিল শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়ে হবে নিশ্চয়। আনন্দের উচ্ছ্বাসে, ভালোবাসার নেশায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল তার। তা না হলে ওকথায় সে বিশ্বাস করেছিল কিসের জোরে। ভালোবাসার? মনে মনে হাসল কেতকী, লোকের মুখে মুখে কথাটা এত বেশী ব্যবহার হয়েছে যে জিনিসটার কোন মূল্য আছে কিনা সন্দেহ! খালি ফাঁকা আওয়াজ ওটা। আজ যাকে ভালোবাসা যায়, কাল সে থাকে কোথায়? কাল যে চোখের মণি ছিল আজ সে ধুলোয় লুটোয় কেন? সে সময় সরিৎ তাকে নাম ধরেই ডাকত। মনে পড়ল বিলেত যাবার কিছুদিন আগে সরিতের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল কেতকী। সেদিনটা সে ভুলবে না জীবনে। তাকে একটা রিস্টওয়াচ দিয়েছিল সরিৎ বলেছিল, কেতকী তোমায় যাবার আগে ঘড়ি দিলাম কেন জান।

না, কি করে জানব তোমার মনের কথা—উত্তর দিয়েছিল কেতকী। আসার সময় গুনবে। আর এক বছর সময় আমার ঘড়ির গুণে তোমার কাছে অনেক কম বলে মনে হবে।

তোমার ঘড়ি কি মন্ত্রপূত?
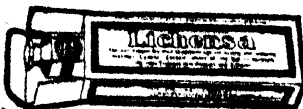
দুজনে হেসেছিল ওরা প্রাণভরে।

সে হাসি এখন কোথায়। সরিৎ তাকে এখন নার্স বলে ডাকে। 'নার্স আমার মাস্ক'—সরিৎ খুঁজে পায় না হয়ত। টেবিলের উপরেই আছে সেটা খুঁজে দিয়ে যায় কেতকী।

ফিলিং টায়ার্ড এক কাপ কফি হবে—কফির প্রয়োজন হলে সরিৎ বলে। নিশ্চয় একটু ওয়েট করুন এক্ষুনি দিচ্ছি—কেতকী কফি করে দেয়। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে তার। তাদের সম্পর্ক কে যেন তাদেরই অজ্ঞাতে ছিন্ন করে দিয়েছে। একটু একটু করে ক্লোরোফরমের ঘোরে কেতকী তার যন্ত্রণাটুকুও অনুভব করতে পারে নি। ধীরে ধীরে একটু একটু করে সরিৎ সরে গিয়েছিল তার কাছ থেকে। সে বুঝতেও পারে নি সরিৎ পাঞ্জাবী মেয়ে দীপার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন। পুরুষের সততার কথা সে জানে। সুযোগ পেলেই বঞ্চনা করবে, সে নিজের স্বার্থের খাতিরে। সেখানে অন্য কোন প্রশ্ন আসে না, মনের কথাত নয়ই। সেটাকে তখন হাস্যকর দুর্বলতা বলে উপহাস করতে বাধে না ওদের। নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হ'ল কেতকীর। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। দ্রুত শ্বাস পড়তে লাগল তার। নিষ্ঠুর হয়ে উঠল কেতকী এক মুহূর্তে। নখে করে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল সে অকৃতজ্ঞ পৃথিবীর বুকটা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। তারপর এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেতে লাগল সে একটু একটু করে।

সরিৎ আজ একটু সকালেই নারসিং-হোমে এসে গিয়েছে। অপারেশনের আগে তার কাজ শুরু হয়। রোগীকে অজ্ঞান করার পর তার অনুমতি নিয়ে তবে সার্জন ছুরি ধরেন। সুতরাং সরিৎকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় তার ব্যবহারের যন্ত্রপাতি এবং ওষুধগুলোর ওপর। ক্লোরোফরম বা ইথার ছাড়া তাকে অক্সিজেন বা নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের সাহায্যও নিতে হয়। এগুলো রুগীর মুখ এবং নাকের উপর মাস্ক রেখে তার ভিতর দিয়ে শ্বাসের সঙ্গে চালিত করতে হয় এবং তার ফলেই জ্ঞানলোপ পায় রুগীর। এছাড়া শিরার মধ্যে পেন্টোথ্যাল জাতীয় ওষুধ ইনজেকসন করারও প্রথা আছে। এতে মাস্কের কোন প্রয়োজন হয় না। ওষুধটা রুগীর রক্তের সঙ্গে মিশতে সুরু করলে প্রথমে নেশার মত হয় তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞান লোপ পায়। অসাড় হয়ে যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

সরিৎ আজ একজনকে পেন্টোথ্যালের সাহায্যে অজ্ঞান করবে। সেই কারণে ওষুধটা আছে কিনা তাই খোঁজ করতে এসেছে। রুগীদের কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করে ও কুশল সংবাদ নিয়ে সে অপারেশন থিয়েটারে ঢুকল। নূতন কেনা বয়েলস্ অ্যাপারেটাসটা একটু নাড়া-চাড়া করে সে পাশের ছোট আলমারীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আলমারীটা চাবি দেওয়া। এটা তার খেয়াল ছিল না। একটা চাবি দীপার কাছে আর একটা কেতকীর কাছে থাকে। নিজের উপর বিরক্ত হ'ল সরিৎ। আসার সময় দীপার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে এলেই হাঙ্গামা চুকে যেত। কিন্তু তা না করে এখন সে বিপদে পড়ল। যদি পেন্টোথ্যাল না থাকে তাহ'লে আনিয়ে নিতে হবে অন্যথায় দেরী হয়ে যাবে। আজ তাকে কয়েকটা নারসিংহোমে অ্যাটেন্ড করতে হবে। অনেক কেসে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্জন অপারেশন শেষ করতে পারে না। সুতরাং একটা কেসে দেরী হ'লে পর পর সবকটাতেই দেরী হয়ে যায়। তাই ব্যস্ত হয়ে উঠল সরিৎ। একটু অপেক্ষা করে সে একজন বেয়ারার খোঁজে নীচে নেমে গেল।

কেতকী লনের পাশ দিয়ে রান্নাঘর দিয়ে উপরে উঠে এল। সরিতকে সে দেখতে পায় নি। এমনকি তার আসার কথাও সে শোনে নি। ধীরে ধীরে কেতকী দোতলায় উঠল। সাধারণত সে এভাবে চলে না। তার চলার ভঙ্গীটা দ্রুত। ছোট ছোট পা ফেলে বেশ তাড়াতাড়িই সে চলতে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ সে যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে। অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে সে অ্যাপ্রনের পকেট থেকে ওষুধের আলমারীর চাবিটা কোনমতে বার করল। কেতকীর সারা দেহ যন্ত্রণায় কাঁপছে থর থর করে। মুখ পাংশু আর ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছে। একটা জ্বলন্ত সাঁড়াশি দিয়ে তার পেট কে যেন সজোরে টিপে ধরেছে বজ্রমুষ্টিতে। কোনরকমে চাবি লাগিয়ে কেতকী খুলে ফেলল ওষুধের আলমারীটা।

সরিৎ রবিবারেও বিছানায় বেশীক্ষণ শুয়ে থাকে না। বেশী শুয়ে থাকলে আলস্য এসে তার শরীর আর মনকে নির্জীব করে দেয় তা সে অনুভব করেছে। আজ সে একটু সকালেই উঠেছে। দাঁত-মাজা তার কাছে অত্যাবশ্যক আর নিষ্ঠার জিনিস। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে তার দাঁতের পরিচর্যা করতে। প্রথমে তার প্রয়োজন একটা শুকনো খটখটে ব্রাশ। এরজন্য তার অনেকগুলো ব্রাশ লাগে। এমনকি সেলোফেন কাগজে মোড়া নতুনও কয়েকটা আছে। যথেষ্ট শুকনো নাহ'লে একটা নতুন ব্রাশ ব্যবহার করে থাকে। টুথপেস্ট সম্বন্ধেও সে যথেষ্ট সচেতন। বাজারের নামজাদা সবকটা টুথপেস্টই তার

বাথরুমের র‍্যাকে সাজানো থাকে একের পর এক। এছাড়া গলা এবং মুখশুদ্ধির জন্য থাকে হরেক রকমের লোশন আর মাউথ ওয়াশ। তার বাথরুমের ভিতরে গেলে মনে হয় যেন একটা ছোটখাটো স্টেশনারী দোকানের মধ্যে ঢোকা হয়েছে। সনৎ প্রথমে একবার দাঁতের পাটিটা আরশিতে ভালভাবে নিরীক্ষণ করে নিল। তারপর একটা ব্রাশ বেছে নিয়ে তার উপর একটা পছন্দসই টুথপেস্টের টিউব থেকে ঠিক আধ ইঞ্চি পরিমাণ পেস্ট নিয়ে দাঁতমাজা শুরু করল ধীরে ধীরে—উপর থেকে নীচ আর নীচ থেকে উপরে ব্রাশটা উঠতে নামতে লাগল ক্রমাগত। প্রথমে আলতোভাবে তারপর বেশ জোরের সঙ্গে সেটা একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে যাওয়া-আসা করতে লাগল সচ্ছন্দগতিতে। প্রায় মিনিট দশেক পরে থামল সনৎ। এবার ব্রাশটা সযত্নে ধুয়ে তুলে রেখে কুলকুচো করল কয়েকবার। তারপর দাঁতের চেহারা দেখল আরশিতে। কোন খুঁত চোখে পড়ল না। ঝকঝক করছে সব দাঁতগুলো। খুশী হ'ল সনৎ। সনৎ লক্ষ্য করেছে সকালে তার মন যদি প্রফুল্ল থাকে তাহ'লে সারাদিনটাই বেশ ভাল কাটে। অন্যথায় সামান্য কারণে বিরক্তি এসে পড়ে আর একবার মনে গুমোট জমলে তাকে সরানো খুবই শক্ত হয়ে ওঠে। সনতের মন অল্পতেই খুশী বা বিরক্তি হয়। দাঁত পরিষ্কার হ'ল বলে আজ যেমন তার মন খুশী, তেমনি চায়ের স্বাদের তারতম্য হলে বা প্রয়োজনমত গরম না থাকলে বিরক্তি এসে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে।

মুখধোয়াপর্ব শেষ হ'লে সনৎ ঘরে এসে ব্যায়াম করল কিছুক্ষণ। তারপর আরশির সামনে দাঁড়িয়ে গুন গুন করে একটা গানের কলি গাইতে লাগল মনের আনন্দে। একটু পরেই তার চা টেবিলে রেখে গেল বেয়ারা। আজকে চাও ভাল লাগল সনতের। প্যাণ্ট আর সার্ট পরে নিয়ে তার উঁচু হিল দেওয়া বুট দুটো ব্রাশ করল ভালভাবে। এবার সে বার হবার জন্য প্রস্তুত হ'ল। বেয়ারার কাছে সনৎ শুনেছে এখনও মেমসাব বা সায়েব ওঠে নি। আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে গেল গেটের বাইরে। প্রথমেই তাকে সুপর্ণার বাড়ী যেতে হবে। আগে থেকে বলে না রাখলে হয়ত সামনের রবিবার তাকে নারসিংহোমের ফাংসানে নাও পাওয়া যেতে পারে। আজকাল গাইয়েদের চাহিদা বেশ বেড়ে গিয়েছে। সুপর্ণাদের বাড়ীতে যখন সনৎ গিয়ে পৌঁছল তখন সুপর্ণা বাইরে দাঁড়িয়ে কি যেন কিনছিল একটা ফেরি-ওয়ালার কাছ থেকে। সনৎকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে। অকারণে মুখটা লাল হয়ে উঠল তার। এখনও সে সাজসজ্জা কিছুই করে নি। চুলগুলো তার এলোমেলো হয়ে রয়েছে। একটা আধময়লা শাড়ী আর ব্লাউজ পরে সে ফেরিওয়ালার ডাকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল খেয়ালের বশে। তার সলজ্জ ভাবটা কিন্তু ভাল লাগল সনতের। সে বলল—আপনার কাছেই এসেছি।

কি ব্যাপার এত সকালে?

আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে—হাসিমুখে বলল সনৎ। স্তব্ধ হয়ে গেল সুপর্ণা। এক নিমেষে যেন পাথর হয়ে গেল সে।

কিসের নিমন্ত্রণ? জিজ্ঞাসা করল সুপর্ণা ক্ষীণ স্বরে।

গান গাওয়ার। আপনি কি ভেবে-ছিলেন আমার বিয়ের? একটা খোঁড়া লোকের বিয়ে কি সহজ নাকি? হেসে উঠল সনৎ।

ওকথা বলবেন না, এতে আমি কষ্ট পাই—সুপর্ণার মুখ থেকে কথাটা যেন তার নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে গেল। অসতর্ক আর দুর্বল মুহূর্তে একটা রূঢ় আঘাত থেকে বাঁচার ফলেই যেন মনের বাঁধন আলগা হয়ে গেল সুপর্ণার। অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে রইল সে তারপর বলল—চলুন ভেতরে বসবেন। ঘরের ভিতরে বসে সনৎ জিজ্ঞাসা করল—বাবা কোথায়?

বেরিয়েছেন, কোথায় জানেন?

কোথায়?

মাছ ধরতে। প্রত্যেক রবিবার বাবা মাছ ধরতে যান ভীষণ নেশা। শনিবার অফিস থেকে ফিরে মশলা গুঁড়ো করে আমাকেই সব ব্যবস্থা করে দিতে হয়—তাছাড়া আর কে করবে—। সুপর্ণার মুখে হাসির আমেজ।

ভারি বদনেশা কিন্তু।

—বাবার সামনে ওকথা বললে ভীষণ রেগে যাবেন।

—কিন্তু ওসব ব্যবস্থা করতে আপনার ত পরিশ্রম হয়।

—তা হয় নিশ্চয়। কিন্তু বাবার কাজ করতে খুব ভাল লাগে আমার। বাবা ভয়ানক খেয়ালী। শুধু তাই নয়, অনেক সময় এমন দুর্বোধ্য—ব্যবহার করে বসেন যে লজ্জায় পড়তে হয়।

—আশ্চর্য লোক ত। আমার সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী সেদিন করেছিলেন।

—কিন্তু নিজের লোকের সম্বন্ধে কিছুই বলবেন না। আমি কতবার জিজ্ঞাসা করেছি নিজের সম্বন্ধে, কিন্তু ও প্রশ্ন করলেই বাবা এড়িয়ে যান। আমল দেন না কিছুতেই। আচ্ছা আপনি ওসব বিশ্বাস করেন? সুপর্ণা তাকাল সনতের দিকে।

—না আমার তেমন কোন আস্থা নেই জিনিসটাতে।

—আপনি একটু বসে কাগজটা পড়ুন আমি আসছি।

সনতের হাতে খবরের কাগজটা তুলে দিয়ে সুপর্ণা ভিতরে গেল। সনৎ কাগজটা উলটে পালটে দেখে নিল একবার। কাগজ পড়তে মন নেই তার। সুপর্ণাকে কথাটা বলে সে আজ একটু সকালেই কেতকীর সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করেছিল। তাকে এত সকালে দেখে কেতকী নিশ্চয় অবাক হয়ে যেত। কেতকীর বিস্ময়প্রসূত চোখদুটোর কথা ভেবে সনৎ মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠল। তাকে দেখে সুপর্ণাও আজ আশ্চর্য হয়েছিল। সনৎ নিজেকে অক্ষম বললে সুপর্ণার দুঃখ হয়, এটা সে আজ বুঝেছে। কিন্তু এটা, সুপর্ণার কোমল মনের জন্য বলেই মনে হ'ল তার কাছে। একটু পরেই সুপর্ণা এক কাপ চা এবং কয়েক টুকরো পাঁপড় ভাজা এনে রাখল তার সামনে।

—একি আবার কষ্ট করে এসব করতে গেলেন কেন—সনৎ তাকাল তার দিকে।

—না কষ্ট আর কি. সুপর্ণা কাপড়টা ইতিমধ্যে গুছিয়ে পরে নিয়েছে।

—সামনের রবিবার আপনাকে গান গাইতে হবে—সনৎ চায়ের কাপে চুমুক দিল।

—ওমা, কোথায়? সুপর্ণা সনতের নিমন্ত্রণে অবাক হ'য়েছে।

—ড্রীমল্যান্ড নার্সিংহোম— বৌদির বিশেষ অনুরোধে আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।

—কাল অফিসে জানালেই ত হোত।

—তা কি করে হয়? নিমন্ত্রণ লোকের বাড়ী গিয়ে করতে হয়, তা না হ'লে সাদর নিমন্ত্রণ হবে কি করে?

—আমি কিন্তু আপনাদের নার্সিং-হোমটা চিনি না। সুপর্ণা একপাশে বসল।

—তাতে আটকাবে না, দাদার গাড়ী এসে আপনাকে নিয়ে যাবে ঠিক সময়ে।

—আর কে গাইবে, নামজাদা কাউকে আনছেন নাকি?

—বোধহয় নয়—উত্তর দিল সনৎ, এটা একটা ঘরোয়া ব্যাপার—ডাক্তার, নার্স, পেসেন্ট আর বন্ধুদের নিয়ে ছোটখাটো উৎসবের আয়োজন।

—নামজাদা গাইয়েদের আসরে গাওয়ার বিপদ আছে। সময় কাটাবার জন্যে আমাদের মত গাইয়েদের ডায়াসে বসিয়ে দেয় আর শ্রোতাদের বিদ্রূপ আর হাত-তালির চোটে নেমে আসতে হয় তাড়া-তাড়ি। সুপর্ণার বলার ভঙ্গীতে হেসে উঠল দুজনেই। চা শেষ করে উঠে পড়ল সনৎ তার সমস্ত মনটা পড়ে আছে ড্রীমল্যান্ডে। তাকে উঠতে দেখে সুপর্ণা বলল—আর একটু বসবেন না।

—না বাড়ীতে কয়েকটা কাজ আছে, মিথ্যে বলল সনৎ।

—ঠিক বলেছেন। আমিও সারা সপ্তাহ রে ঠিক করে রাখি রবিবারে কি কি করব। অবশ্য বেশীর ভাগই রবিবার আমার কাছে লক্ষ্মি ডে।

আর দেরী করল না সনৎ উঠে পড়ল। তারপর যতদূরে সম্ভব জোরে এগিয়ে চলল ট্রাম রাস্তার দিকে। নার্সিংহোমের কাছে এসে দেখল তার মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য জেগেছে। নার্স আর বেয়ারা এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। সনৎ অফিস ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল সেখানে কেউ আসে নি তখনও। কেতকী যে সকলের আগে আসে তা সে জানে। অপারেশন থিয়েটারের কাজ শেষ না হ'লে সব কাজই পিছিয়ে পড়বে। সনৎ খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। তার ভারী বুটের আওয়াজে কেতকী যাতে বুঝতে না পারে তার আসার সংবাদটা। কেতকীকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চায় সনৎ। করিডর পার হয়ে ছোট ঘরটায় ঢুকে অপারেশন থিয়েটারের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ স্থানুর মত দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বিস্ময়ের আকস্মিক আঘাতে তার সর্বাঙ্গ যেন পাথর হয়ে গেল এক নিমেষে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে সারা শরীর শিথিল হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। তার মাথায় কে যেন অকস্মাৎ প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করেছে! পাশের দেয়ালটা ধরে সনৎ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে চলল নীচের দিকে।

বাড়ীতে ফিরে সনৎ ঘরে চেয়ারে বসে রইল কিছুক্ষণ মুহ্যমান হয়ে। সর্বশরীর তার তখনও কাঁপছিল। হৃৎপিণ্ডটা যেন সজোরে আঘাত করছিল তার বুকের মধ্যে। একটু একটু করে মনটা তার স্থির হয়ে এল। এতক্ষণে সে সব জিনিসটা ভাবতে বসল মন স্থির করে। এক গ্লাস জল খেয়ে তার লজেন্সএর কৌটোটা থেকে একটা লজেন্স নিয়ে মুখে দিল। গলাটা তার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কেতকী যে এ ধরনের মেয়ে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। নার্স হিসাবে তাকে অনেক ডাক্তার, ছাত্র বা অন্যান্য লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে হৃদয়ঘটিত ব্যাপার হয়ে থাকবে হয়ত। কিন্তু তাকে এতখানি নীচ, সে ভাবতে পারে নি। সরিতের সঙ্গে কেতকীর গোপন সম্পর্কটা অবিশ্বাস্য বলে ঠেকছে তার কাছে। কিন্তু কি নির্লজ্জ ওরা! দরজা বন্ধ থাকলেও তার পাল্লা-দুটো যে কাঁচের সে কথাই ওরা ভুলে গিয়েছিল। দুজনে নির্লজ্জের মত ধস্তা-ধস্তি করছে দিনের আলোয় তা সে স্বচক্ষে দেখেছে। স্তম্ভিত বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল সনৎ। সে সময় যদি কেতকীকে তার সামনে পেত তাহ'লে—চিন্তা করতেও ভয় পেল সে। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

দীপার ঘুম ভাঙতে তার পাশে সরিৎকে দেখতে পেল না। তখনও ঘুমের নেশা কাটেনি তার। একটু পরেই মনে পড়ল গতরাত্রের একটা কথা। সরিৎকে সে মেদবৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে বলেছিল যে তার ওজন যদি এই রেটে বাড়তে থাকে তাহলে শোবার জন্য আর একটা বেড জোড়া দিতে হবে নিশ্চয়। কথাটা মনে পড়তেই দীপার মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সরিৎ নিশ্চয় হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে ভোরে উঠেই। তার কথায় যে কাজ হয়েছে একথা ভেবে খুশী হল দীপা। সরিতের শুধু দেহে নয় মনের দিক দিয়েও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। পুরুষদের একটু হাসি আদর বা সমবেদনার জন্য যে মেয়েরা লালায়িত একথা বোকা-গুলো কিছুতেই বুঝবে না। একটা মিষ্টি কথা বললে যেখানে সহজেই কাজ হয় সেখানে উপদেশ দেবার চেষ্টা করে গোমড়া-মুখে করে। দীপা লক্ষ্য করেছে, সরিৎ যেন তার দিকে আগের মত আর তাকায় না। আগে যেমন লুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকত সরিৎ এখন যেন সেটা প্রায় ভুলেই গিয়েছে। এটা বোঝে না যে একটু চেহারার প্রশংসা করলে বা সাজসজ্জার তারিফ করলে মেয়েদের কত ভাল লাগে! সরিতের স্পর্শটাও যেন আজকাল র‍্যাশনড্ আর্টিকেলের পর্যায়ে পড়ে গিয়েছে। পিঠের বা হাতের ওপর হাত রাখলে, পাউডারের অতিরিক্ত প্রলেপটা নিজে মুছিয়ে দিলে তার মনে যে আনন্দ হয় এটাও ভুলে গেছে বেকুবটা। দীপার হাতের রান্নার সুখ্যাতি তার মুখে ধরত না। প্রায়ই পাকোড়া, আলুকা পরোঠা খেতে চাইত যখন তখন। এখন কেবল টাকা টাকা করে সব ভুলেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল দীপা। দাঁড়িয়ে আগে নাইলনের নাইটির কোমর-বন্ধটা হাল্কাভাবে কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে নিল। তারপর নিজের তলপেটের উচ্চতা হাতের তালু দিয়ে অনুভব করল। এখনও সেখানে মেদ বেড়ে যায়নি বিসদৃশভাবে। মনে মনে খুশী হল ডাঃ দীপা মুখার্জি। এবার বাথরুমে ঢুকল দীপা। বাথরুমটা তার নিজের সৃষ্টি। অনেক ভেবেচিন্তে তৈরী করিয়েছে সেটা। বাথরুমটা বেশ বড়। দেয়াল আর মেঝের রঙ হাল্কা নীল। এক পাশে তার প্রসাধনের সাজসরঞ্জাম রাখার জন্য লম্বা ধরনের কাবার্ড, তার গায়ে লাগানো একই মাপের আয়না। কাবার্ডের ওপর সব সময় হরেকরকমের টয়লেট সাজানো থাকে। অদ্ভুত আকৃতির শিশিতে ভরা বাথ সল্ট, স্যাম্পু। বিভিন্ন গন্ধের হেয়ার লোশন, কয়েক রকমের ফেস ও ভ্যানিসিং ক্রীম, হরেক রকমের ট্যালকাম পাউডার, থরে থরে সাজানো আছে।

(ক্রমশঃ)

অন্নদাশঙ্কর রায়

।। সতেরো ।।

ফ্রান্সের পতনের পর যে জিজ্ঞাসা আমার মনে জেগেছিল ও যেকথা আমি মহাত্মার সমক্ষে মুখ ফুটে নিবেদন করেছিলাম মাস কয়েক পরে দেখি তিনি সেটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের বিবেচনা করতে বলেছেন। ভারতের পরিস্থিতি যদি ফ্রান্সের অনুরূপ হয় তবে ভারতীয়রা কি হিংসা দিয়ে দেশরক্ষা করবে, না অহিংসা দিয়ে?

যদিও ঠিক সেই মুহূর্তে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না তবু বলা তো যায় না। ভবিষ্যতে দেশ আক্রান্ত হতে পারে। ইতোদিনে যদি কংগ্রেসের উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব এসে থাকে তবে কংগ্রেস কীভাবে দেশরক্ষা করবে? যেভাবে সকলে করে থাকে সেইভাবে? না গান্ধী যেভাবে করতে বলেন সেইভাবে? সৈন্যবল দিয়ে না গণসত্যাগ্রহ দিয়ে?

ওয়ার্কিং কমিটি গভীরভাবে চিন্তা করেন। খান আবদুল গফর খান ভিন্ন আর সকলের সিদ্ধান্ত হলো, অহিংসা দিয়ে দেশোদ্ধার হতে পারে, কিন্তু অহিংসার নীতি দেশরক্ষার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা যায় না। তার বেলা হিংসার নীতি অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কংগ্রেস নেতারা প্রয়োজনমতো কখনো অহিংস কখনো সহিংস। যখন যেটা কার্যকর। ফ্রান্সের দশা দেখেও তাঁদের শিক্ষা হয়নি। গান্ধীজী নিরাশ হন।

ইতিমধ্যে রামগড় কংগ্রেস স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে ভারতের জন্যে চাই পূর্ণ স্বাধীনতা আর সংবিধান রচনার জন্যে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি। যুদ্ধের জন্যে কংগ্রেস তার দাবী খাটো করবে না, তার সংগ্রাম বন্ধ করবে না। গান্ধীজীর উপরেই ভার দেবে। তিনিই সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। তিনি সবাইকে প্রস্তুত হতে উপদেশ দিয়েছেন, কিন্তু আপাতত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দেবেন না।

ওদিকে বড়লাটও চিন্তা করছিলেন কংগ্রেসকে কী করে সহযোগিতায় সম্মত করা যায়। আটটি প্রদেশ কেবল যে মন্ত্রীশূন্য ছিল তা নয়, মেজরিটি অনুপস্থিত থাকায় আইনসভাও অকেজো হয়েছিল। মাইনরিটিও বাধা হয়ে বেকার। সুতরাং ক্রুদ্ধ।

মুসলিম লীগ ইতিমধ্যে পার্টিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করে রাজনৈতিক সমাধানকে আরো জটিল করে তুলেছে। তার আশঙ্কা যুদ্ধের ঠেলায় ব্রিটেন কংগ্রেসের সঙ্গে আপস করবে, তখন মুসলিম লীগ তার ভাগ থেকে বঞ্চিত হবে। তাই তার বখরাটা সে পৃথক রাষ্ট্ররূপে পেতে চায়। না পেলে অন্য কোনো সমাধানে সন্তুষ্ট হবে না।

দেশরক্ষা অহিংসা দিয়ে হবে না এই সিদ্ধান্ত নেবার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আবার দেশরক্ষার অনুরোধে দাবী করেন যে কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট গঠন করা হোক। কংগ্রেস তা হলে পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করবে। যাতে দেশরক্ষা ব্যবস্থা আরো ফলপ্রদ, আরো সুশৃঙ্খল হয়।

বড়লাট কংগ্রেসের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলে কংগ্রেস নেতারা আর সত্যাগ্রহের প্রয়োজন দেখতেন না। সুতরাং গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে যেত। তিনি একলা চলতেন ও বিবেকের নির্দেশ পেলে একাই সত্যাগ্রহ করতেন।

কংগ্রেসের মতিগতি দেখে তিনি আবার নতুন করে সরে দাঁড়ান। তবে বেশীদিন সরে থাকতে হলো না। বড়লাট জানিয়ে দিলেন যে তাঁর শাসন পরিষদ পুনর্গঠিত হবে না, কিন্তু পরিবর্ধিত হবে। অর্থাৎ ইংরেজ সদস্যরা যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, ভারতীয় সদস্য যে দু' একজন আছেন তাঁরাও তেমনি থাকবেন, অধিকন্তু যুক্ত হবেন কংগ্রেস ও লীগ নেতারা। যুদ্ধের পরে ভারতীয়রা তাঁদের ইচ্ছামতো সংবিধান রচনার সুযোগ পাবেন, তবে দুটি শর্তে। ব্রিটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। আর সংখ্যালঘুদের সম্মতি থাকা চাই।

বড়লাটের জবাব পেয়ে কংগ্রেস নেতাদের দেশরক্ষায় সহযোগিতার সাধ সঙ্গে সঙ্গে মিটে যায়। অন্তত তখনকার মতো। আবার তাঁরা গান্ধীজীর শরণ নেন। অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ ভিন্ন গতি নেই। অন্তত যতদিন না বড়লাট আবার ডাক দেন।

হয় পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা নয় পুরো শক্তি দিয়ে যুদ্ধোদ্যম পণ্ড করা, এই দুই চরমপন্থার মধ্যপন্থা তাঁরা মানতেন না। মহাত্মা কিন্তু সেই সংকটকালে কোনোরকম চরমপন্থার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর পন্থা ছিল ক্ষুরধার পন্থা। ব্রিটেন যুদ্ধে বিশ্বাস করে যুদ্ধ কেমন করে করতে হয় তা জানে কেন তাকে বিরত করা? তার দিকেও তে বহু ভারতীয় রয়েছে। যোদ্ধার দলকে যু করতে দাও। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশে লোককে জাগাও, জাগিয়ে বল যে যুদ্ধ বিগ্রহে তোমাদের বিশ্বাস নেই, অন্ততপক্ষে বর্তমান যুদ্ধ তোমাদের দেশের স্বাধীনতা পোষক নয়। তোমাদের স্বাধীন উক্তির জন্য যদি তোমাদের কারাদণ্ড হয় তো যা কারাগারে। যুদ্ধকালটা কাটিয়ে দা সেখানে।

এরই নাম ব্যক্তিসত্যাগ্রহ। এর ইসু হা যুদ্ধকালে সত্যকথনের স্বাধীনতা। স আগ্রহ। যুদ্ধকালে কোথাও কাউকে বলতে দেওয়া হয় না। যুদ্ধের প্রথম হচ্ছে সত্য। পৃথিবীতে অন্তত এ দেশের রাজনৈতিক কর্মীরা সত্য ব গিয়ে দণ্ডবরণ করুন। ইতিহাসে থাকবে। জনগণকে সেইভাবে নেতৃত্ব তারা গণসত্যাগ্রহের জন্যে প্রস্তুত হবে।

গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে সা করেন। বড়লাট বিবেকচালিতদের করবেন, কিন্তু তাঁদের প্রচারকার্য করবেন না। কোনো গভর্নমেণ্ট করেন নতুবা যুদ্ধোদ্যম বাধা পাবে। নিঃ ফেলতে না পারলে যেমন মানুষ বাঁ তেমনি মন খুলে কথা বলতে না স সভ্য মানুষ। গণতন্ত্রের প্রাথমিক হচ্ছে বাক্যের স্বাধীনতা আদায় করা অক্ষুণ্ণ রাখা। নইলে গণতন্ত্রই থাকে সিভিল লিবার্টি হচ্ছে ভিত্তিশিলা।

উপর দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের সৌধ। যুদ্ধকালে যারা সিভিল লিবার্টি হারায় তারা গণতন্ত্রও রাখতে পারে না। গণতন্ত্র যাদের নেই তাদের সিভিল লিবার্টি থাকলে সেটা আরো বেশী করে আঁকড়ে ধরতে হয়।

সেজন্যেই এ প্রশ্নে গান্ধীজী বড়লাটের সঙ্গে একমত হতে পারেন না। বড়লাটও গান্ধীজীর সঙ্গে। বড়লাটের শঙ্কা যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারকার্য যোদ্ধাদের মনোবল ভঙ্গ করবে। যুদ্ধে যাবার জন্যে সৈনিক পাওয়া যাবে না। রংরুট না জুটলে যুদ্ধ চলবে কী করে?

ওটা এমন একটা ইস্যু যে যুদ্ধবাদীতে শান্তিবাদীতে আপস হতে পারে না। এমন কি কংগ্রেস যদি যুদ্ধে যোগ দিত তার সঙ্গেও গান্ধীজীর আপস হতো না। তিনি একাই যুদ্ধবিরোধী ভাষণ ও লেখা দিয়ে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে রাখতেন। তাঁকে তাঁর সেই প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তিনি কারাবরণ করতেন বা অনশনে দেহত্যাগ করতেন।

সিভিল লিবার্টির ইস্যুতে যুদ্ধকালীন ব্যক্তিসত্যাগ্রহ যাতে ব্যাপক না হয় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। আসলে ওটা একটা প্রিন্সিপল্ নিয়ে আন্দোলন। আর সেই প্রিন্সিপল ছিল নৈতিক। তবে তার সঙ্গে রাজনীতিরও সম্পর্ক ছিল। প্রথম সত্যাগ্রহী মনোনীত হন বিনোবাজী। তিনি রাজনীতির লোক নন। তাঁর যুদ্ধবিরুদ্ধতা রাজনৈতিক কারণে নয়। তিনি যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী। কংগ্রেস যুদ্ধে যোগ দিলেও তিনি বিরুদ্ধতা করতেন।

আন্দোলনটাকে শুধুমাত্র বিনোবাজীর মতো নীতিনিপুণদের মধ্যে নিবদ্ধ রাখতে পারতেন গান্ধীজী, যদি কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায় তাঁর উপর না বর্তাত। কংগ্রেস কর্মীদেরও আন্দোলনে যোগদানের সুযোগ না দিলে নয়। যদিও তাঁদের প্রতিরোধ কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সেইজন্যে দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী মনোনীত হন জওহরলালজী। নীতিনিপুণ ও রাজনীতি-নিপুণ দুরকমের কর্মীকেই মনোনয়ন দেওয়া হয়। অমনি করে প্রায় সব ক'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে ও তাঁদের সমর্থক আইন-সভার সদস্যকে জেলখানায় পাঠানো হয়। বাইরে যে ক'জন পড়ে থাকেন তাঁরা হয় অসুস্থ নয় যুদ্ধবিরোধী প্রচারে অনিচ্ছুক। সেটা জেলের ভয়ে নয়। তাঁদের মতে সহযোগিতাটাই ঠিক, বিরোধিতাটাই ভুল। যুদ্ধটাকে এককথায় সাম্রাজ্যবাদী বলে খারিজ করতে তাঁরা নারাজ। তাঁরা যখন সত্যাগ্রহের মনোনয়ন চান না তখন পান না। মনোনয়ন দিয়ে বাছা বাছা কর্মীদের সত্যাগ্রহ করতে দেওয়া গান্ধীজীর বহু-দিনের কামনা। সত্যাগ্রহ তা হলে সংখ্যাগত না হয়ে গুণগত হয়। আর তাতেই বেশী প্রভাব। সত্যি সত্যি কয়েক মাসের মধ্যে জেলের ভয় ভেঙে গেল। লোকে খোলাখুলি-ভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলতে লাগল। তবে ছাপাখানা কড়া হাতে নিয়ন্ত্রিত বলে যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখে ছাপতে পারল না। তার দরকারও হলো না। কারণ যুদ্ধে আর চাঁদা উঠছিল না, পাঞ্জাবের বাইরে রংরুটও জুটছিল না। তবে যাদের ইচ্ছা বা প্রয়োজন তারা অবাধে যোগ দিচ্ছিল। কংগ্রেস বাধা দিচ্ছিল না। প্রচারকার্যের চেয়ে জোরালো কিছু করা গান্ধীজীর বারণ ছিল। তিনি সরকারী যুদ্ধোদ্যমকে অচল করে দিতে চাননি। চাইলে তাঁকে নিশ্চয় গ্রেপ্তার করা হতো, দণ্ড দেওয়া হতো। সত্যাগ্রহ পরি-চালনার জন্যে এবার তিনি মুক্ত থাকতে মনস্থ করেছিলেন।

ব্যক্তিসত্যাগ্রহ কি স্বরাজ এনে দিল? না স্বরাজ তার লক্ষ্য ছিল না। তার লক্ষ্য গণ-সত্যাগ্রহের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ক্ষেত্র মানুষের মন। অন্য কোনো উপায়ে সেটা সম্ভব হতো না। তার আরো একটি লক্ষ্য ছিল দুনিয়াকে জানানো যে ভারতের জন-সাধারণ এ যুদ্ধের পক্ষভুক্ত নয়। ভারতের নামে লড়াই চললেও লড়ছে যারা তারা বিদেশী সরকারের বেতনভুক সৈনিক। ভারতীয়রা তবে কি হিটলারের পক্ষে? না, তেমন কথাও বলা যায় না। কারণ তারা সরকারী যুদ্ধোদ্যমে ব্যাঘাত ঘটাতে চায় না। সরকার বলে কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যাদের নিয়ে যাচ্ছেন তাদের যাওয়ার অধিকার কেউ অস্বীকার করছে না। কিন্তু জোরজুলুম করলে প্রতিবাদ করছে।

তবে জোর জুলুমও কোথাও তেমন শোনা যাচ্ছিল না। বড়লাট লিনলিথগাউ জানতেন যে জোর জুলুম গান্ধীজী সহ্য করবেন না। জোর জুলুম হলে বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। গান্ধীজীও সমস্তক্ষণ সজাগ ছিলেন সরকার পক্ষ থেকে জোর জুলুম যাতে না হয়। খবর পেলে নিষ্ক্রিয় থাকতেন না। বড়লাটের সঙ্গে তাঁর একটা অলিখিত বোঝাপড়া হয়েছিল যে কোনো পক্ষই সীমা লঙ্ঘন করবেন না। বড়লাটও করবেন না কন্‌স্ক্রিপসন, গান্ধীজীও করবেন না ব্যাপক সত্যাগ্রহ। দাবাখেলার এই দুই খেলোয়াড় পরস্পরের চাল জানতেন। তাই খেলাটা চলেছিল ভালো। শেষের দিকে তো যুদ্ধবিরোধী প্রচারের জন্যে পুলিশ কারো গায়ে হাত দিত না। ফলে প্রচারকার্যও আপনা থেকে থেমে এসেছিল।

দেশকে শান্ত রেখেছিলেন বলে বড়লাট গান্ধীজীর কদর বুঝেছিলেন। তাঁকে ঘাঁটাননি। তিনিও নিজের জন্যে বা কংগ্রেসের জন্যে ক্ষমতার আসন চাননি। ফলে বড়লাটের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। কিন্তু সেটা দেশের খরচে নয়। দেশ স্বাধীনতার অভিমুখে মার্চ করে চলেছিল। গণতন্ত্রের বেদীনির্মাণ করছিল। গুণগত সত্যাগ্রহ নাটকীয় নয় বলে নিষ্ক্রিয় নয়। আর কোনো দেশের নাগরিক যুদ্ধকালে এদেশের নাগরিকের মতো স্বাধীন ছিল না। ব্যক্তি-স্বাধীনতায় আমরাই ছিলুম অগ্রগণ্য। নিরপেক্ষ দেশগুলি বাদে।

ওদিকে হিটলারের সৈন্য মার্চ করে চলেছিল সোভিয়েট রাশিয়ার বুকে। আমাদের সকলেরই সহানুভূতি রাশিয়ার প্রতি। কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করা এক জিনিস আর 'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ' বলা আরেক। অমন করলে নিজেদের দেশের জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। ওরা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে গণসত্যাগ্রহ করতে গেলে দেখবে ওদেরি এক ভাগ রাশিয়ার কথা ভেবে সত্যাগ্রহবিমুখ ও যুদ্ধে সহযোগী। যুদ্ধটা নাকি 'জনযুদ্ধ'।

কমিউনিস্টরা কংগ্রেসের বাইরে। তাঁদের পলিসির উপর গান্ধীজীর হাত নেই। কিন্তু পরে দেখা গেল জাপান আর আমে-রিকাও যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছে ও জাপান এক লম্ফে সিঙ্গাপুর অধিকার করেছে। পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হবে কেউ ভাবতে পারেনি। আরো ঘোরালো হলো যখন মালয় আর বর্মা জাপানের অধিকারে চলে গেল। ব্রিটেনের দোরগোড়া যেমন বেলজিয়াম ভারতেরও দোরগোড়া তেমনি বর্মা। বেলজিয়াম আক্রমণ করলে যেমন ব্রিটেনকেও আক্রমণ করা হয় তেমনি বর্মা আক্রমণ করলে ভারতকেও। আমরা সকলেই নিজেদের জন্যে শঙ্কিত হয়ে উঠি। এবার অপরের প্রতি সহানুভূতি নয়। এবার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। ভারত আক্রমণ এমন শুধু একটা সুদূর সম্ভাবনা নয়, সেটা অল্পদিনের মধ্যেই ঘটবে।

ইংরেজদের আচরণেও বোঝা গেল যে সিঙ্গাপুরের পতনের পর ও'দের ডিফেন্স সিস্টেম বিকল হয়েছে। সেটাকে যতদিন না সারাতে পারা যাচ্ছে ততদিন শত্রুর আক্রমণের মুখে অপসরণই ও'দের নীতি। সরকার থেকে আমাদের কাছে সার্কুলার আসছিল অপসরণের জন্যে প্রস্তুত থাকতে। অনেক সরকারী আফিস সমুদ্রকূল থেকে সরানো হচ্ছিল। বর্মার পর আসাম ও বঙ্গ, এটা একরকম ধরেই নেওয়া হয়েছিল। ইংরেজ সামরিক কর্মচারীদের কারো কারো সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি তাঁরা বাংলার আশা ছেড়ে দিয়ে রাঁচীতে লাইন টানছেন। সেই লাইন রক্ষা করবেন। আমার এক বন্ধু বিহারে চাকরি করতেন। তাঁকে তাঁর প্রাদেশিক সরকার জানিয়ে রেখেছিলেন যে যথাকালে তিনি বার্তা পাবেন, "বেঙ্গল কামিং।"

হাসিকর কথা নয়। বাংলার পাঁচ কোটি লোক অবশ্য বিহারে মামার বাড়ী যেত না, অধিকাংশই জাপানীদের অধীনে বাস করত। কিন্তু আইনে যাকে 'বেঙ্গল' বলে সে কলকাতা থেকে বিহারে গিয়ে হাজির হতো। 'বর্মা' যেমন হাজির হয়েছিল সিমলায় না মসৌরীতে। আমার কাছে যে সার্কুলার এসেছিল তা পড়ে আমার বুঝতে বাকী ছিল না যে ইংরেজরা যদি যুদ্ধ করতে না পারে বা করা নিরর্থক মনে করে তবে বাংলাদেশ থেকে বিহার প্রভৃতি প্রদেশে সরে যাবে। তখন ইংরেজ পক্ষের প্রতিনিধিরা জাপানী পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে শাসন-ভার সঁপে দেবেন। বিধিমতো নয়, কার্যত। কিন্তু ভারতীয় পক্ষের প্রতিনিধিদের হাতে নয়। অর্থাৎ বাংলাকে বাঙালীর হাতে সঁপে দিয়ে যাবেন না। পরাধীনকে স্বাধীনতা দেবেন না।

(ক্রমশঃ)

কি এবং কেন (৭): ট্র্যানজিস্টর

আজকাল শহরে গ্রামে ঘরেবাইরে সর্বত্র ট্র্যানজিস্টর-রেডিওর খুব প্রচলন দেখা যায়। এই ট্র্যানজিস্টর সেমি-কন্ডাটারেরই এক বিশেষ রূপ, যা রেডিও-ভাল্‌ভের অনুরূপ কাজ করে। সাধারণ ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভ, যা বেতার-যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়—বেশি নাড়াচাড়া করলে অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া, ভাল্‌ভের ক্যাথোডকে গরম করবার জন্যে একটা বাড়তি বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়: অতি সূক্ষ্ম গঠনের জন্যে ভাল্‌ভের আকার ছোট করবারও বিশেষ অসুবিধা আছে। বাড়িতে ব্যবহারে জন্যে রেডিও বা টেলিভিশন ভাল্‌ভের আকার বড় বা ছোট হলে তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কিন্তু বিমান, রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদিতে ব্যবহারের জন্যে বেতারযন্ত্র আকারে ও ওজনে যত কম হবে, ততই তার উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। এই অসুবিধা দূরীকরণে ট্র্যানজিস্টর যুগান্তর এনেছে।

ডায়োড বা দ্বিপদী, ট্রায়োড বা ত্রিপদী ইত্যাদি ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের যা কাজ অর্থাৎ বেতার-তরঙ্গ নির্ধারণ, একমুখীকরণ, বিবর্ধন, স্পন্দন-উৎপাদন ইত্যাদি সেমি-কন্ডাক্‌টরে তৈরী ট্র্যানজিস্টর করতে সক্ষম। উপরন্তু এতে অ্যানোড, ক্যাথোড বা গ্রিডের কোনো পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নেই। এমনকি, এক্ষেত্রে সাধারণ ভাল্‌ভের মতো ক্যাথোডকে গরম করবার জন্যে বাড়তি কোনো বিদ্যুৎ-শক্তিরও প্রয়োজন হয় না।

ট্র্যানজিস্টর সাধারণত দুরকমের—পয়েন্ট কন্‌ট্যাক্‌ট বা স্পর্শ-বিন্দু ট্র্যানজিস্টর এবং জংশন বা সংযোগ ট্র্যানজিস্টর। জংশন ট্র্যানজিস্টর ঠিক একটা স্যান্ডউইচের মতো—মাঝে থাকে ০·১ মিলিমিটার পরিমিত বেধের একটি পি-টাইপ সেমি-কন্ডাকটর এবং দুপাশে দুটি এন-টাইপ সেমি-কন্ডাকটর যুক্ত থাকে। বিপরীতভাবেও অর্থাৎ মধ্যে এন-টাইপ ও দুপাশে পি-টাইপ সেমি-কন্ডাকটর যুক্ত করা যায়। মাঝের অংশটিকে বলা হয় 'বেস' এবং দুপাশের একটিকে 'এমিটার' ও অপরটিকে 'কলেকটার' বলা হয়। এমিটার ক্যাথোডের এবং কলেকটর অ্যানোডের কাজ করে। এমিটার-বেস এবং বেস-কলেকটর দুটি জংশন-ডায়োডের মতো কাজ করে। একটি ট্র্যানজিস্টর বেসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমিটারকে 'ফরওয়ার্ড' এবং কলেকটরকে 'রিভার্স' বায়াস' যুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এন-পি-এন ট্র্যানজিস্টরে বেসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমিটারকে ঋণাত্মক ও কলেকটরকে ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত করা হয় (পি-এন-পি ট্র্যানজিস্টার হয় এর বিপরীতভাবে)। জংশন-ট্র্যানজিস্টরকে এমনভাবে তৈরী করা হয়, যাতে কলেকটরে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা বেসের চেয়ে কম ও বেসের পরিবাহিতা এমিটারের চেয়ে কম হয়। ট্র্যানজিস্টর বিবর্ধক ও অসিলেটরের কাজ করতে পারে।

পয়েন্ট কনট্যাক্ট ট্র্যানজিস্টরে একটি এন-টাইপ সেমি-কন্ডাক্‌টর কেলাসের ওপর দুটি সূচালো টাংস্টেন তার খুব কাছাকাছি রাখা হয়। টাংস্টেন তার দুটির ঠিক নিচেই পি-টাইপ সেমি-কন্ডাকটর থাকে। দুটি তারের একটিকে এমিটার ও অপরটিকে কালেকটর এবং কেলাসকে বেস বলা হয়। অর্থাৎ সব কিছু মিলিয়ে জিনিসটি একটি জংশন-ট্রায়োডের মতো কাজ করে।

অতি ক্ষুদ্র আকারের সেমি-কন্ডাকটর ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভের মতো গুণসম্পন্ন হওয়ার দরুণ বেতার-যন্ত্রকে আকারে ছোট করার অনেক অসুবিধা দূর হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে বেতারযন্ত্রের অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস অর্থাৎ অ্যান্‌টিনা, আবেশ-কুন্ডলী, কন্ডেন্‌সার ইত্যাদিও আকারে যথাসম্ভব ছোট করা প্রয়োজন। এই ব্যাপারেও সেমি-কন্ডাকটর সাহায্য করেছে। 'ফেরাইট' নামে একটি জিনিস (অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, জিংক ইত্যাদির অক্‌সাইড) সামান্য চৌম্বক ক্ষেত্রেও অতি দ্রুত চৌম্বকিত হতে পারে এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চৌম্বকত্বও দ্রুত পরিবর্তিত হয়। সাধারণত ট্রান্স্‌ফরমার, কোর, তড়িৎচুম্বক ইত্যাদিতে যেখানে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন, সেখানে আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল ইত্যাদি ফেরোম্যাগনেটিক জিনিস ব্যবহার করা হয়। কিন্তু উচ্চ-কম্পনাঙ্কের বিদ্যুৎ তরঙ্গের ক্ষেত্রে ফেরোম্যাগনেটিক পদার্থ বিশেষ কার্যকর হয় না। ফেরাইটের আপেক্ষিক রোধ বেশি এবং উচ্চ কম্পনাঙ্কের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে সামান্যমাত্র আবিষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে। সেজন্যে শক্তিক্ষয় কম হয়। আজকাল ফেরাইটের তৈরী তারের দ্বারা একটি পেনসিল বা দেশলাই কাঠির মতো ক্ষুদ্র আকারের অ্যানটিনা তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। উপরন্তু ট্রান্সফরমার, নিরোধকুন্ডলী ইত্যাদির কোর হিসাবে ফেরাইট ব্যবহার করলে সুন্দরভাবে কাজ করে এবং সেগুলিকে অতি ক্ষুদ্র আকারে তৈরী করাও সম্ভব।

আজকাল পকেট-ডায়েরী বা তার চেয়েও ছোট আকারের ট্র্যানজিস্টর রেডিও তৈরী হচ্ছে। এই যন্ত্রে যে ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়, তার আকারও খুব ছোট। বর্তমানে অ্যাটমিক ব্যাটারি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে—যা ২০ বছর পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য থাকতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি একরকম 'ট্র্যানজিস্টার সোলার রেডিও' সিগারেট কেসের আকারে তৈরী হয়েছে, যা সূর্যের আলোয় কিছুক্ষণ রেখে দিলে অন্ধকারেও ৫০০ ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যক্ষম থাকে।

ভারতে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ

মহারাষ্ট্রের পুনা থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে পুনা-নাসিক সড়কের ওপর একটি ছোট্ট গ্রাম অরভি। এখানে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্যে ভারতের প্রথম ভূকেন্দ্র স্থাপিত হবে।

গত ২৫ জুন ভারত মহাসাগরের ওপরে বিষুবরেখার কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হয়। এই কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে অরভির ভূকেন্দ্রটি বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ চালাবে। প্রায় ৩৫ হাজার কিলোমিটার দূরের কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহটি স্থাপন করা হয়েছে। এই দূরত্ব থেকে ভূ-পৃষ্ঠের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা উপগ্রহটির আওতায় আসবে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পশ্চিমে ইংলন্ড থেকে পূর্বে জাপান পর্যন্ত উপগ্রহটি দেখা যাবে। এর আগে প্রশান্ত মহাসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর আরও দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে। এই তিনটি উপগ্রহের মাধ্যমে শীঘ্রই সমগ্র বিশ্বে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হবে।

অরভি ভূকেন্দ্রটি একটি আদর্শ ভূকেন্দ্র। সমস্তরকম শিল্পকোলাহল থেকে এটি সম্পূর্ণ মুক্ত। মাইক্রোওয়েভ বা হ্রস্ব তরঙ্গ ব্যবস্থার মাধ্যমে অরভি ভূ-কেন্দ্রটিকে বোম্বাই-এ দেশের প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র বিদেশ সঞ্চারভবনের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। প্রায় ২৩ একর পরিমিত এলাকায় অরভির ভূ-কেন্দ্রটি ছড়িয়ে আছে। ভূ-কেন্দ্রের টেকনিক্যাল এলাকার একটি ভবনে রয়েছে অ্যান্‌টিনা। ভবনটি তিন-তলা। অ্যানটিনার আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জামও এই ভবনে রয়েছে। এছাড়া একটি

একটি কারিগরী এবং প্রশাসন ভবনও আছে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই কৃত্রিম উপগ্রহবাহিত আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে খরচ পড়বে প্রায় ২০ কোটি মার্কিন ডলার। এর প্রায় ০·৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা খরচ পড়বে ভারতের পক্ষে। এছাড়া ভূকেন্দ্র তৈরীর খরচ প্রত্যেক দেশকে স্বতন্ত্রভাবে বহন করতে হবে। এই সম্পর্কে ১৯৬৪ সালে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ভূকেন্দ্র স্থাপনের প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে দেশেই যাতে কারিগরী কৌশল পাওয়া যায় তার জন্যে ভারতের পরমাণু শক্তি দপ্তরকে এই প্রকল্পের ভার দেওয়া হয়েছে। ১৯৭০ সালের গোড়ার দিকে ভূকেন্দ্র নির্মাণের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়। প্রথম থেকেই আন্তর্জাতিক টেলিভিশন প্রচারে সুযোগসুবিধা দেওয়া ছাড়াও ভূকেন্দ্রটি টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলেক এবং রেডিও-ফটো ব্যবস্থার জন্যে ৪৮টি ভয়েস চ্যানেল যোগাবে। অতিরিক্ত ১৩২টি চ্যানেলের ব্যবস্থা সহজেই করা যাবে। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে এই যোগাযোগ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এটি বিশ্বের সর্বাধুনিক আন্তর্জাতিক টেলিকম্যুনিকেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

পরলোকে প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক পাওয়েল

প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক সিসিল ফ্র্যাংক পাওয়েল গত ১০ আগস্ট ইতালির মিলান শহরে অবকাশ-যাপনের সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন।

মহাজাগতিক রশ্মি এবং মৌলিক কণার গবেষণার ক্ষেত্রে ডঃ পাওয়েল একটি স্মরণীয় নাম। ১৯০৩ সালের ৫ ডিসেম্বরে পাওয়েলের জন্ম। কেন্টের টনব্রিজের স্কুলে তিনি শিক্ষাজীবন শুরু করেন এবং সেখান থেকে কেম্ব্রিজের সিডনী সাসেকস্ কলেজে যোগদান করেন। তখন কেম্ব্রিজ পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে পরম প্রেরণার উৎস। কারণ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড রাদারফোর্ড তখন কেম্ব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ গবেষণাগারে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং গবেষণাগারের অধ্যক্ষ। সেখানে ১৯১৯ সালে তিনি পরমাণুর বিভাজন সম্পন্ন করেন এবং আলফা কণিকার দ্বারা নাইট্রোজেনের কেন্দ্রীনকে অভিঘাত করে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনে রূপান্তরিত করেন। পাওয়েল যখন কেম্ব্রিজে ছাত্র ছিলেন তখন অ্যাস্টন, ব্ল্যাকেট, কককুফট, চ্যাডউইক এবং সি আর উইলসন প্রমুখ প্রখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন।

অধ্যাপক সিসিল ফ্রাংক পাওয়েল

পাওয়েল কেম্ব্রিজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ট্রাইপোস পরীক্ষার উভয় অংশে প্রথম শ্রেণীর অনার্সে উত্তীর্ণ হন। উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠের প্রখ্যাত সি টি আর উইলসনের অধীনে তিনি প্রথম গবেষণা করেন। ১৯২৮ সালে তিনি ব্রিস্টলে অধ্যাপক এ এম টিনডলের সরকারী গবেষকরূপে কাজ করেন এবং ১৯৩১ সালে সেখানে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। এই সময় তিনি বিশুদ্ধ গ্যাসের মধ্যে ধনাত্মক আয়নের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন।

লর্ড রাদারফোর্ড কর্তৃক পরমাণুর বিভাজনের যুগান্তকর গবেষণা এবং ১৯৩২ সালে ককক্রফট ও ওয়ালটনের কাজ অনুসরণ করে সে সময়কার পদার্থবিজ্ঞানীরা পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয় এবং পরমাণু বিজ্ঞানে নতুন নতুন দিক খুলে যায়। পাওয়েলও এই গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে মৌলিক কণার পথ সনাক্তীকরণের চিত্র গ্রহণের অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন। উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠ (যা ইতিপূর্বে মৌলিক কণার পথ সনাক্তীকরণের জন্যে ব্যবহৃত হত) ব্যবহারের পরিবর্তে পাওয়েল সাধারণ আলোকচিত্র প্লেটের অবলম্বে তাদের পথ সনাক্তীকরণের এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

এই সময় (১৯৩৫) প্রখ্যাত জাপানী পদার্থবিজ্ঞানী য়ুকাওয়া কল্পিত ইলেকট্রনের চেয়ে ভারী কিন্তু প্রোটনের চেয়ে হালকা একটি মৌলিক কণার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কণিকাটির নাম দেওয়া হয় 'মেসন'। এই ক্ষেত্রে অধ্যাপক পাওয়েল এবং তাঁর সহযোগীরা তাঁদের আলোক-চিত্র পদ্ধতির সাহায্যে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

কয়েক বছর ধরে তাঁরা সাধারণ আলোকচিত্র প্লেট নিয়ে গবেষণা চালান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে ইলফোর্ড কোম্পানী মৌলিক কণার পথ সনাক্তীকরণের বিশেষ উপযোগী এক বিশেষ ধরনের অবলম্ব সমন্বিত প্লেট উদ্ভাবন করেন। ১৯৪৭ সালে অধ্যাপক পাওয়েল এবং তাঁর সহযোগী গবেষকরা এই নতুন ধরনের প্লেটের সাহায্যে তাঁদের গবেষণার ফল প্রকাশ করেন। তাঁরা পর্বতশীর্ষে এই প্লেট ধরে দু রকম মেসন কণিকার অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

১৯৪৯ সালে অধ্যাপক পাওয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা কোডাক গবেষণাগারে উদ্ভাবিত উন্নত ধরনের প্লেটের সাহায্যে ইলেকট্রনের চেয়ে এক হাজার গুণ ভারী একটি মেসন কণিকার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এইকণিকার নাম দেওয়া হয় 'কে-মেসন'।

পদার্থবিজ্ঞানে অধ্যাপক পাওয়েলের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে ১৯৫০ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি বহু আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত ছিলেন এবং দেশ-বিদেশের নানা সম্মাননা লাভ করেন। ১৯৬৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমী অধ্যাপক পাওয়েলকে তাঁদের সর্বোচ্চ সম্মান লোমোনোসফ্ স্বর্ণপদক প্রদান করেন। তিনি ব্রিটেনের বিজ্ঞান-গবেষণা সংস্থার পরমাণু পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতিপদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৯৬৮ সালে সেই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা—বিশেষ করে এই ব্যাপারে সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিমী দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের জন্যে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।

পরমাণু-বিজ্ঞানী এবং মৌলিক কণিকা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থের তিনি ছিলেন রচয়িতা। তাঁর মৃত্যুতে পরমাণু-বিজ্ঞানের একজন পুরোধার তিরোধান ঘটলো।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিমাই ভট্টাচার্য

ভাইকাউন্টের চারটে ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। পাখাগুলো বন-বন করে ঘুরতে শুরু করল। তারপর কোন এক ফাঁকে প্লেনটা পালামের মাটি ছেড়ে উড়তে শুরু করল। কাবুলের ইন্ডিয়ান এম্বাসীর সেকেন্ড সেক্রেটারী-ডেজিগনেট তরুণ মিত্রের মনটাও হঠাৎ উড়তে শুরু করল অতীত আকাশের কোলে।......

সেই কোন সুদূর অতীতে আর্যরা এই পথ দিয়েই এসেছিলেন ভারতবর্ষে। কোথা থেকে এসেছিলেন, কে জানে। কেউ বলেন, পামির থেকে; কেউ বলেন, মধ্য ইউরোপ বা জার্মানী থেকে। মানব সভ্যতার প্রায় আদিমতম সুপ্রভাতে আর্যরা আফগানিস্থানে বসেই লিখেছিলেন বেদ—ঋগ্ বেদ। কলকাতার রাস্তায় ঐ পাগড়ী পরা কাবুলীওয়ালাদের দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে, এ'দের ঘরের দাওয়ায় বসে আমাদের আর ও'দের পূর্বপুরুষ লিখেছিলেন বেদ। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে আর্যদের কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদের কাহিনী। সভ্য আর্যদের বংশধর বলে গর্ব অনুভব করি আমরা কিন্তু বাইরের জগতে আর্য বলে প্রচার করতে কত কুণ্ঠা আমাদের। আর ঐ কাবুলীরা? মুসলমান আফগানরা? সারা দুনিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে বলেন ও'রা আর্য। ও'দের যেসব বিমান সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পরিচয়-পত্রে বড় বড় হরফে লেখা আছে, আরিয়ানা আফগান এয়ারলাইন্স। কাবুলের সব চাইতে প্রাচীন সরকারী হোটেলের নাম, হোটেল আরিয়ানা।...

ভাইকাউন্টের ডিম্বাকৃতি বড় জানলা দিয়ে তরুণ আর একবার নীচের দিকে তাকায়। কত গিরি-পর্বত নদী-নালা মাঠ-ঘাট পেরিয়ে এই পথ দিয়েই এসেছেন ইতিহাসের কত অসংখ্য নায়ক। আলেকজান্ডার, ইবনবতুয়া মহম্মদ ঘোরী, তৈমুর, বাবর ও আরো কত কে। এসেছিলেন কনিষ্ক, এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজকের দল। মার্কো পোলো পর্যন্ত লিখে গেছেন এই পথের কথা। হিমালয়ের এই অলিগলি ডিঙিয়েই আফগানিস্থান থেকে ভগবান বুদ্ধের বাণী ছড়িয়েছিলেন চীনে, জাপানে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আরো কত দেশে।

উল্টো-পাল্টা, ছোটবড়, শাদা-কালো মেঘের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে ভাইকাউন্টটা। তরুণের চিন্তার ধারাটাও ওলট-পালট হয়ে যায় মাঝে মাঝে। তাতে কি আসে যায়? তাতে কি ইতিহাসের গুরুত্ব কমে? নাকি কম রোমাঞ্চ লাগে? ইরাণের বিখ্যাত কবি তো বলে গেলেন, মা খি আযায খি আনজাম-ই-জাহান বে-খবর-ইম, আওয়াল-ও-আখের ই-ইন্ কুহনা কেতাব উফ্‌তাদ আস্ত। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিকথার প্রথম ও শেষ পাতাটাই খোয়া গেছে, তাইতো আদি-অন্তের হিসেব-নিকেশ পাওয়াই দুষ্কর। ভাইকাউন্টের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে উল্টো-পাল্টা চিন্তা করতে করতে সান্ত্বনা পায় তরুণ।

মিঃ যোগীকে টোকিও থেকে কাবুলে বদলী করা হয়েছিল। বদলীর অর্ডার পাবার পর প্রায় মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম। টোকিও থেকে কাবুল। বোয়িং সেভেন-জিরো-সেভেন চড়ার পর সাইকেল রিকসা। কমপ্যাশানেট গ্রাউন্ডে যোগীসাহেব আপীল করলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে, স্ত্রীর স্বাস্থ্য, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া গোল্লায় যাবে। দোহাই আপনাদের।

শুধু যোগীসাহেব নয়, ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসের অনেকেরই এই মনোভাব। লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, প্যারিশ, রোম বা টোকিও ছাড়া সারা দুনিয়াটা যেন মনুষ্য-বাসের অনুপযুক্ত। মস্কো বা ইউরোপের অন্য কোন রাজধানীতে খুব জোর দু-তিন বছরের একটা টার্ম চললেও চলতে পারে কিন্তু তাই বলে এশিয়া-আফরিকায়? কল্পনা করতে পারেন না এ'রা। কিছু কিছু ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাট আছেন যাঁরা অতীত দিনের প্রভুদের সমাজে মর্যাদা পাবার লোভে অথবা যৌবনের কোন দুর্বল মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গিনীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছেন। এখন এসব মেমসাহেবের দল মাইশোর সিল্কের শাড়ী পরেন, ইন্ডিপেনডেন্স ডে রিসেপশনের সময় স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে 'নমসটে' করেন সত্য, কিন্তু ইন্ডিয়াতে থাকার কথা ভাবতেও গাটা শিউরে ওঠে। কি বিশ্রী ক্লাইজ! মসকুইটো! বেগার! নেকেড সাধুস্!

বরিশাল ঝালকাঠির পোলা হয়েও সরকারসাহেব এমনি এক মেমসাহেবের খপ্পরে পড়ে এক নাগাড়ে ষোল বছর ইন্ডিয়ার বাইরে বাইরেই কাটিয়ে দিলেন। ইন্ডিয়ার নন-অ্যালাইনমেন্ট ও অ্যাফরো-এশিয়ান প্রেমের নীতি রক্ষা করার জন্য একবার দু'বছরের জন্য কলম্বো ছিলেন। ব্যস! সরকারসাহেব সাউথ ব্লকে এসে প্রাইম মিনিস্টারের ঘরটা চিনলেও ফরেন সেক্রেটারীর ঘরে যেতে হলে বেয়ারা-চাপরাশীদের জিজ্ঞাসা না করে পারবেন না।

সরকারসাহেবের কথা তরুণ জানে। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করত না। ফরেন মিনিস্ট্রীর মোটা মোটা নিয়ম-কানুনের বইতে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে। তিন বছর পর বদলী হতে হবে। একই রিজিওনে পরপর পোস্টিং হবে না। দুটো টার্মের বেশী এক সংগে বিদেশে থাকা চলবে না এবং আরো কত কি। কিছু ডিপ্লোম্যাট ডিপ্লোম্যাসী করেন, কিছু ডিপ্লোম্যাট তৈল মর্দন করেন, কিছু আবার কাশ্মীরে শ্বশুরবাড়ী বলে এসব নিয়মকে এড়িয়ে চলছেন বেশ হাসিমুখে।

কেন মিঃ জোহর? বাইশ বছরই বিদেশে। মাঝে মাঝে তাজমহল দেখার জন্য সরকারী পয়সায় ইন্ডিয়া আসেন কিন্তু ইন্ডিয়াতে পোস্টিং? জোহরসাহেবকে সে কথা বলার সাহসও কারুর নেই। কেউ বলেন, মিসেস জোহরের স্বর্গত পিতা আর উচ্চস্তরে কেউ নাকি বন্ধু ছিলেন। কেউ বলেন, ওসব বাজে কথা। অন্য এক কর্তাব্যক্তির ছেলেকে জোহরসাহেব নিজের কাছে ভি আই পি সমাদরে রেখে ব্যারিস্টারী পড়িয়েছেন বলেই......। কেউ আবার ফিস-ফাস করেন, মিসেস জোহর এককালের নামকরা অভিনেত্রী। এখনও বহুজন তাঁর সাহচর্যে দু-এক পেগ স্কচ পেলে ধন্য মনে করেন।

নানা মুনির নানা মত। কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা, তা তরুণ জানে না। জানতে চায়ও না। তবে সে বেশ বুঝতে পারে, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত জোহরসাহেবের কিছু আন্ডার গ্রাউন্ড কানেকশন আছে। আমাদের টপ এ-ওয়ান অ্যাম্বাসেডররা পর্যন্ত মিঃ ও মিসেস জোহরকে যেভাবে মর্যাদা দেন, মেলামেশা করেন, তা দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই।

যাকগে সেসব। যোগীর অত হাই কানেকশনস নেই। তবে তৈল মর্দন! জাপানী ট্রানজিস্টার, হংকং-এর ফ্রি পোর্ট, তো আছে।

ইন্দ্রকার তিন বছরের জন্যে কাবুলে গিয়েছিল। ছ'বছর পরেও বদলী হতে চায় নি সে। ইন্দ্রকার তরুণের সমসাময়িক একই ব্যাচের ছেলে ওরা। দুজনের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব। দুজনে পৃথিবীর দুপ্রান্তে থাকলেও নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলে। ছাত্রজীবনে ইতিহাস পড়ে নয়, ইন্দ্রকারের চিঠি পড়েই আফগানিস্থান সম্পর্কে তরুণের মনে গভীর আগ্রহ জন্মায়। তাই তো অনেক দিন আগে একবার সুযোগ মত এক জয়েন্ট সেক্রেটারীকে বলেছিল, স্যার, শুনেছি কাটমাণ্ডু-কাবুলে অনেকেই পোস্টিং চান না। আই উইল বী গ্ল্যাড ইফ আই গেট এ চান্স টু সার্ভ দেয়ার।

জয়েন্ট সেক্রেটারী মনে রেখেছিলেন তরুণের অনুরোধ। তাইতো মিনিস্ট্রীর ট্রান্সফার-পোস্টিং কমিটির মিটিং-এ যোগীর অপীলের বিষয় উঠলেই তরুণের নাম উঠল।

যোগীর বদলে কাবুল চলেছে তরুণ মিত্র। হিন্দুকুশ দেখবে, বামিয়ানে পৃথিবীর বৃহত্তম বুদ্ধমূর্তি দেখবে, গজনী যাবে, কান্দাহার যাবে। আরো কত কি দেখবে সে। খুব খুশী। তারপর আছে বীণাদি।

'মে আই হ্যাভ ইওর অ্যাটেনশন প্লিজ!'

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ভাইকাউন্ট এসে গেল কাবুল।

বিমান থেকে বেরিয়ে আসতেই ফাস্ট সেক্রেটারী মিঃ মেটাকে দেখে অবাক হয়ে গেল তরুণ। হাজার হোক সিনিয়র অফিসার! কৃতজ্ঞতা জানাল বারবার, সো কাইণ্ড অফ ইউ......।

'ডোন্ট বী টু ফরম্যাল টরুণ! তুমি আসছ আর আমি এয়ারপোর্টে আসব না?'

থার্ড সেক্রেটারী, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কমার্শিয়াল অ্যাটাচি ও আরো তিন-চারজন এসেছিলেন অভ্যর্থনা জানাতে। আলাপ-পরিচয় হলো সবার সঙ্গে।

যাঁরা দেশ-বিদেশ ঘুরে থাকেন তাঁরা এয়ারপোর্ট দেখেই সেই দেশ সম্পর্কে বেশ একটা ধারণা করে নিতে পারেন। লণ্ডন ও নিউইয়র্ক—দুটি এয়ারপোর্টই বিরাট ও অত্যন্ত কর্মচঞ্চলও আধুনিকতমও বটে। তবু বেশ বোঝা যায় যে, দুটি দেশের মাঝখানে রয়েছে অ্যাটলান্টিক। ফ্রাঙ্কফুর্ট ও মস্কো এয়ারপোর্টও বিরাট ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক মুহূর্ত দেখলেই দুটি দেশের জনজীবন সম্পর্কে একটা ধারণা করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না।

মস্কোর তুলনায় কাবুল এয়ারপোর্ট অনেক ছোট হলেও বেশ সুন্দর। রাশিয়ার সাহায্যে তৈরী কাবুল এয়ারপোর্ট মস্কো এয়ার পোর্টের মতই প্রায় প্রাণহীন। তবু ভাল লাগল তরুণের। কাবুল এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মনে পড়ল দমদম, পালাম......। কোন তুলনাই হয় না।

এম্বাসী থেকে তরুণের জন্য কোয়ার্টার ঠিক করা হয়েছিল কিন্তু মিঃ মেটা কিছুতেই ছাড়লেন না। 'বীণা উইল কিল মী, যদি তোমাকে বাড়ী না নিয়ে যাই।'

তরুণ এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে বেরুবার সময় হাসতে হাসতে বললো, দ্যাট আই নো। তবে কি জানেন, একবার বীণাদির খাতির-যত্ন পেতে শুরু করলে কি আর কোন দিন নিজের কোয়ার্টারে যাব?

গ্ল্যাড অ্যাটাচি ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ নিয়ে চান্সেরীতে চলে গেলেন। অন্যান্যদের কেউ চান্সেরী কেউ বাড়ী গেলেন।

পাখতুনিস্থান এ্যাভিনিউ ধরে মিঃ মেটার গাড়ীতে যেতে যেতে তরুণের মনে পড়ল অনেক দিন আগেকার কথা।...বীণাদি আর তরুণ একই সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেছিল। বিয়ের পর বীণাদি যেদিন মিঃ মেটার সংসার করা শুরু করেন, তরুণও সেইদিন প্রথম ফরেন পোস্টিং পেয়ে কাজ শুরু করে। একই প্লেনে দুজনে দিল্লী থেকে রোম গিয়েছিল কিন্তু তখন পরিচয় ছিল না। রোম এয়ারপোর্টে মিঃ মেটা একই সঙ্গে দুজনকে অভ্যর্থনা করেন।

ফরেন সার্ভিসের অফিসার বা তাদের পরিবারকে নিয়ে সাধারণ মানুষের বিচিত্র ধারণা। অনেকের ধারণা ও'রা বোধ হয় দিনরাত্রি কেবল মদ খান, চরিত্র বলে কোন পদার্থ ও'দের নেই। সমাজ সংসারের বন্ধনহীন এই মেয়েপুরুষরা শুধু স্ফূর্তি করেই দিন কাটায়। কথাটা যে সর্বৈব মিথ্যা নয়, তা তরুণ বা বীণাদি জানে। কিন্তু তাই বলে কি ও'রা মানুষ নয়? ফরেন সার্ভিসের অফিসার বা তাঁদের পরিবারের লোকজন তো রক্ত-মাংসের মানুষ। তাঁদেরও হৃৎপিণ্ড আছে, মন আছে; আছে দয়া-মায়া—ভালবাসা। আর আছে মনুষ্যত্ব।

একে লোয়ান্টের মানুষ, তারপর ভবনগর রাজ কলেজের ভূতপূর্ব লেকচারার। মিঃ মেটা নিতান্তই একজন শান্ত-শিষ্ট ভদ্রলোক। কিন্তু রোমের হাওয়া আর ইতালীর মাটি কেমন যেন সবাইকে চঞ্চল করে তোলে। তারপর বীণাদির মত সুন্দরী ও বিদুষী ভার্যা। মিঃ মেটা সত্যি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মারলোত, বা মার্টিনীর বোতল উজাড় না করেও মেটাসাহেব বেশ একটু মদির হয়ে উঠলেন। বীণাদিকে কেন্দ্র করে তাঁর স্বামীর এই রোমান্টিক উন্মাদনা তাঁরও নিশ্চয়ই ভাল লাগতো। হাজার হোক কাকাবিল্লা লেক—আপেন্না বন্দর থেকে ভূমধ্য সাগরের পাড়ে ইউরোপের আনন্দ-উৎসবের অনাস্বাদিত প্রাঙ্গণে এসে মিঃ মেটার মত স্বামী পেলে যে কোন ভারতীয় মেয়ের পক্ষেই অমন হওয়া স্বাভাবিক।

উইক-এণ্ডে দুজনে মিলে ঘুরে বেড়ালেন ফ্লোরেন্স সান মারিনো, ভেনিস, জেনোয়া, মিলান, পাডুয়া, পিসা ও আরো কত জায়গা। চড়লেন আলপসে, ভেসে বেড়োলেন সমুদ্রে।

তারপর একদিন বীণাদিই বল্লেন, চলুন মিঃ মিত্র, ক্যাপরী বেড়িয়ে আসি।

তরুণ মনে মনে হাসে বীণাদির আকস্মিক পরিবর্তনে। বুদ্ধিমান কূটনীতিবিদ। একটু চিন্তা করেই কারণটা খুঁজে পায়। ইতালীয় মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চায়। আমেরিকানরা অর্থের নেশায় পাগল, ইংরেজরা কর্তৃত্ব বিস্তার করতে মত্ত, জার্মানরা শক্তি-সামর্থ্য দেখাতে ব্যস্ত, কিন্তু ইতালীর মানুষ জীবনের সমস্ত রস আহরণ করতে চায়। ছেলে-ছোকরা বুড়ো-বুড়ী যেই হোক, সবাই চায় প্রাণভরে হাসতে, কাঁদতে। শুধু হাসতে-কাঁদতে নয়, পৃথিবীর মধ্যে বোধ করি একমাত্র এরাই পারে প্রাণ-মন দিয়ে ঝগড়া করতে। দর্শক হতে এরা জানে না, প্রতিদিনের জীবনযাত্রার প্রতিটি ঘটনায় এরা অংশ গ্রহণ করবে। রোম বা মিলানের রাস্তায় ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হলে এরা কলকাতার মানুষের মত শুধু ভীড় করে না, মতামত দেয়, ঝগড়া করে, মারামারি করে। পরে আবার হাসতে হাসতে দলবেঁধে কোর্ট-কাছারিও যাবে। বিচিত্র এই দেশ। বিচিত্রতর এর মানুষ। এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতে, হৃদয়-নিংড়ে চোখের জল ফেলতে আর কেউ পারে না।

বীণাদিও কি এই দেশে এসে এদেরই মত জীবন-উৎসবে মেতে উঠেছে?

তরুণ ড্রাই মার্টিনীর গেলাসে চুমুক দিয়ে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মিঃ মেটাকে কথাটা বল্লো। মিঃ মেটা একটু লজ্জিত হলেন। কথার মোড় ঘোরাল তরুণ ক্যাপরী গিয়ে কি হবে? তার চেয়ে চলুন গ্রাণ্ড-সুইপে গিয়ে গল্প করতে করতে বাদাম চিবুই।

বীণাদি বল্লেন, বাজে কথা বাদ দিন। মোট কথা জেনে রাখুন সামনের উইক-এণ্ডে আপনি আমাদের সঙ্গে ক্যাপরী যাচ্ছেন।

আত্মসমর্পণ করার আগে তরুণ বল্লো, অমন রোমান্টিক জায়গায় নিয়ে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? আই অ্যাম গিভিং ইউ দি লাস্ট চান্স টু থিংক ইট ওভার।

নেপলস্-এর পাশে ক্যাপরী দ্বীপে গিয়েছিল ওরা তিনজনে। গান আর বাজের খ্যাতি সমস্ত এই ছোট্ট দ্বীপে গিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছিল তিনজনেই। ফুল-পাতায় ভরা রং-গোছোতে ছবি তুলেছে, ছবির মত সুন্দর আনাকাপেরী গ্রামে ঘুরেছে, মোগানে খেয়েছে লবস্টার কত কিনেছে। কিন্তু শেষে মেরিনা পিকোলো বীচ থেকে ফেরার পথে এক অপ্রত্যাশিত মোটর অ্যাক্সিডেন্টে নিদারুণভাবে আহত হলেন মিঃ মেটা।

সে ইতিহাস দীর্ঘ। তবে এই দুর্ঘটনার ফলে মেটা দম্পতির জীবনে একটা পাকা-পাকি আসন হলো তরুণের। বীণাদির বিশ্বাস, তরুণের জন্যই মেটাসাহেব সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছেন। বীণাদি তাই কৃতজ্ঞ। মেটাসাহেবও ভুলে যান নি তরুণের সেবা-শুশ্রূষা তদ্বির-তদারক।

আর তরুণেন? তাঁর রুক্ষ জীবন-প্রান্তরে মেটা-দম্পতি এক পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়। বীণাদিকে সে এয়ারপোর্টে আশা করেনি। নিশ্চিত জানত সে খাবার-দাবার তৈরীতে এত ব্যস্ত থাকবে যে, এয়ারপোর্ট গিয়ে সময় নষ্ট করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

তরুণকে দেখে বীণাদি যেন হাতে স্বর্গ পেল। 'তুমি এসে বাঁচালে আমাকে।'

'কেন বীণাদি?'

'দুদিন থাকলেই বুঝবে কেন?' বীণাদি প্রায় দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন।

মিঃ মেটা বললেন, এত তুচ্ছ ব্যাপারে আমাদের কলিগরা নিজেদের ব্যস্ত রাখেন যে বীণা তা টলারেট করতে পারে না।

তরুণ আক্ষেপ করে বল্লো, এইত আমাদের রোগ।

পরে লাঞ্চ খাবার সময় বীণাদি বলে-ছিলেন, জান ভাই আজ প্রায় তিন মাস বাড়ীর বাইরে যাই না বল্লেই হয়।

কেন?

লণ্ডন, নিউইয়র্ক, রোম বা কলম্বোর মত সোসাইটি বলে কোন পদার্থ তো এখানে নেই। তোমার দাদার কলিগদের বাড়ী গিয়ে সিংগাপুর থেকে ডিউটি-ফ্রি ইমপোর্টের গল্প আর ভাল লাগে না।

সত্যি, বিচিত্র আমাদের দেশ! বিচিত্র-তর হচ্ছে ফরেন সার্ভিসের এক শ্রেণীর অফিসার। শুধু ফরেন সার্ভিস কেন? সব সার্ভিসেস'এরই এক অবস্থা। আজ যেসব আই সি এস গভর্ণর হয়েও মনে শান্তি পান না, তাঁরা যৌবনে স্বপ্ন দেখতেন ডেপুটি সেক্রেটারী হয়ে রিটায়ার করার। দেড়শ' বছরের ইংরেজ রাজত্বের মেয়াদ আর একটু বাড়লেই হয়েছিল আর কি! ওয়েলেসলী-সাজাহান-মথুরা রোডের বাংলো চোখে দেখতে হতো না, গোল মার্কেটের আশপাশের কোন অলিগলিতেই এ'দের ভবলীলা সাঙ্গ হতো। ফরেন সার্ভিসের সিনিয়রদের জীবনকাহিনী আরো চমকপ্রদ। যে পুরী সাহেব স্বপ্ন দেখতেন হাথরাশ বা গোরক্ষপুরের ডেপুটি কমিশনার হয়ে রিটায়ার করার পর ড্রইংরুমে বার লাইব্রেরীর ফেয়ারওয়েলের গ্রুপ ফটো টানাবেন, তিনি আজ লণ্ডন-ওয়াশিংটন-মস্কো-টোকিও ছাড়া পোস্টিং নেন না। কেন? উনি যে সাতচল্লিশ সালে ময়ূরের পালক পরে ফরেন সার্ভিসে জয়েন করে আজ টপ একসপার্ট।

সেই ডামাডোলের বাজারে আরো কত খাল-বিলের জল ঢুকে গেছে। মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজের কেমিস্ট্রির ডিমোনেস্ট্রেটর, লাহোর হেরল্ড'এর জুনিয়র সাব-এডিটর, আরউইন হাসপাতালের অফিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, কনটেম্পেসের ঐ ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানেজার, কেষ্ট-নগর কলেজের লাইব্রেরীয়ান ও আরো কত বিচিত্র মানুষ ইমার্জেন্সী রিক্রুটমেন্টে ফরেন সার্ভিসের প্রথম বা দ্বিতীয় সারি দখল করল।

বীণাদির কথায় তরুণ অবাক হয় না। এরা সিংগাপুর থেকে ডিউটি-ফ্রি ইমপোর্টের স্বপ্ন দেখবে, নাকি ভারত-আফগান মৈত্রীকে আরো দৃঢ় করবে?

বীণাদি বলতেন, আফগানিস্থানকে ওরা চিনবে? সে বিদ্যা-বুদ্ধি বা ইচ্ছা আছে ওদের?

মিঃ মেটা প্রতিবাদ করতেন, যত বুদ্ধি তোমার আছে।

বীণাদি দু'বছর কাবুলে আছেন। শুধু হিন্দুকুশের নতুন চ্যানেল দেখেন নি, ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর অনেক রথী-মহারথীর দুর্বলতার খবরও তিনি জানে। তাইতো মুহূর্তের মধ্যে স্বামীর কথার প্রতিবাদ জানান, তোমাদের মত বিদ্যা-বুদ্ধি না থাকতে পারে, তবে মন আছে, ইচ্ছা আছে...।

বীণাদি পলিটিক্যাল কাউন্সেলরকে কেন ড্রাই ফ্রুট কাউন্সেলার বলে ঠাট্টা করতেন, তা জানতে তরুণের সময় লাগে নি। কোন জানাশুনো লোক কাবুল থেকে দিল্লী গেলেই হলো, পলিটিক্যাল কাউন্সেলার পাঁচ কিলো কিসমিস, পাঁচ কিলো ক্যাসুনাট জয়েন্ট সেক্রেটারীর বড় মেয়ে পলির জন্য পাঠাবেনই। বেশী দিন এমন কোন প্যাসেঞ্জার না পেলে প্লেনের পাইলট মারফত কিছু না কিছু পাঠিয়েই দিল্লীতে একটা মেসেজ পাঠাবেন, পলি...সাজাহান রোড, নিউদিল্লী...প্লিজ কালেকট প্যাকেট পাইলট ফ্লাইট... ফ্রাইডে ...।

চান্সেরীর ক্লার্করা তো ওকে ডি এফ সি—ড্রাই ফ্রুট কাউন্সেলার বলেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে।

চান্সেরীতে শুধু দিনগত পাপক্ষয় করত তরুণ। কাজ করে আনন্দ পায়নি একটুও। যে চান্সেরীতে চাঞ্চল্য নেই, উত্তেজনা নেই, কোন রাজনৈতিক রেষারেষি নেই, সেখানে কি কাজ করে কোন সত্যকার ডিপ্লোম্যাট খুশী হয়। পাখতুনিস্থান নিয়ে আফগানিস্থান-পাকিস্থানের রাজনৈতিক লড়াই চলছে সেই সাতচল্লিশ থেকে। পুস্তুভাষী আফগানরা সহ্য করতে পারে না পাকিস্থানকে। আর আফগানিস্থানের শতকরা ষাট-সত্তর জনই হচ্ছে পুস্তুভাষী। তবুও পাকিস্থান কেমন টুকটুক করে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। আর ইণ্ডিয়ান এম্বাসী? স্বয়ং অ্যাম্বাসেডরই যদি উদাসীন হন, যদি ডিপ্লোম্যাটিক রিসেপসনে রাজা বা প্রাইম মিনিস্টারের পাশে দাঁড়িয়ে ফটো তোলাই তাঁর স্বপ্ন ও একমাত্র কাজ হয়, তবে এম্বাসী চান্সেরীর অন্যেরা কি করবেন? পাকিস্থান এম্বাসীর প্রচার বিভাগ কেমন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের নামে কলঙ্ক রটাচ্ছে। আর ইণ্ডিয়ান এম্বাসীর প্রেস অ্যাটাচির কৃপায় প্যারিস থেকে ছাপান ফ্রেন্চ জার্নাল ও তেহেরানে ছাপা পারসী ভাষার জার্ণালের বাণ্ডিলগুলো স্টোরের মধ্যেই বন্দী হয়ে পড়ে থাকে। কাবুলের হোটেলে, রেস্তোরাঁয়, এয়ারপোর্টে—সর্বত্র পাকিস্থানের কত কি নজরে পড়বে। কাবুল ইউনিভার্সিটির রিডিংরুমে পাকিস্থানী প্রচার পুস্তিকার বন্যা বইছে। কিন্তু কোথাও ভারতবর্ষের কোন কিছুর টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাবে না।

কি করবে তরুণ বা মেটা সাহেব? অসহায় হয়ে চাকরি করে গেছে।

চান্সেরীর বাইরে কিন্তু প্রাণভরে আনন্দ পেয়েছে, উপভোগ করেছে কাবুলবাসের প্রতিটি মুহূর্ত। এমন স্বাধীনতাপ্রিয় জাত ইতিহাসে বিরল বল্লেই চলে। সব কিছু বরদাস্ত করবে এ'রা, বরদাস্ত করবে না অন্য জাতের কর্তৃত্ব। শুধু আজ নয়, কোন দিনই করেনি। প্রায় হাঁটতে হাঁটতেই

দেশ দখল করেছেন আলেকজান্ডার, কিন্তু আফগানিস্থানে এসে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন পাঠান-শক্তির মারাত্মক স্বাদ! পরবর্তী কালে শিক্ষা পেয়েছিল সাম্রাজ্য-লোভী আরবরা। কেন ইংরেজরা? ঝড়ের বেগে এশিয়া-আফ্রিকার ডজন ডজন দেশ দখল করেছে, উড়িয়েছে ইউনিয়ন জ্যাক। একবার নয়, দু'বার নয়, তিন তিনবার বিরাট ইংরেজ বাহিনীর বিপর্যয় হয়েছে এই পাঠান বীরদের হাতে। যখন সামনা-সামনি পারেনি, তখন রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে চক্রান্ত করে খিড়কির দরজা দিয়ে কাবুলে সংসার পাততে চেয়েছিল বীরের জাত ইংরেজ। তাও পারেনি।

ইদানীংকালে আফগানিস্থান শত শত কোটি টাকা সাহায্য নিচ্ছে আমেরিকা-রাশিয়ার কাছ থেকে কিন্তু তার জন্য মাথা হেঁট করছে না সে; বরং সাহায্য নিয়ে কৃতার্থ করছে ওদের। কাবুলে ডিপ্লো-ম্যাটিক পার্টিতে আফগান সরকারের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট—হেড ক্লার্করাও নিমন্ত্রিত হন এবং তাঁরা না এলে হোস্ট অ্যাম্বাসেডররা দুঃখ পান। তরুণ ভাবে নিজের দেশের কথা! একটা ফ্রি ফিল্ম শো দেখার জন্য ভি-আই-পি'দের কি ব্যাকুলতা!

কলকাতা বা দিল্লীতে আফগানদের নিয়ে কতজনকে হাসি-ঠাট্টা করতে শুনেছে তরুণ। শুনেছে ওরা নাকি পিছিয়ে থাকা মধ্যযুগীয়।

কলকাতা-দিল্লী-বোম্বের মিল্ক বুথের মত সারা কাবুলে ছড়িয়ে আছে সরকারী 'নান'এর দোকান। সরকার লরী ভর্তি আটা পৌঁছে দেন এই সব দোকানে, কর্মচারীরা তৈরী করেন 'নান'। সেই 'নান' খেয়ে বেঁচে থাকেন কাবুলের চার লক্ষ মানুষ। দীন-দুঃখী থেকে প্রাইম মিনিস্টারের বাড়ীর ডাইনিং টেবিলে পর্যন্ত এই 'নান' পৌঁছে যায়। কোন নান'এর ওজন এক তোলা কম হবে না।

তরুণ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, একটাও ওজনের হেরফের হয় না?

সহিদুল্লা খাঁ হেসে ওঠে কথা শুনে। —ওজনের হেরফের হবে কেন?

হাসি থামলে খাঁ সাহেব বল্লেন, একবার ওজন কম দেবার দায়ে দুজনের ফাঁসি হয়। সেই থেকে.........।

ফাঁসি?

হ্যাঁ, তাইতো শুনেছি।

ক'বছর আগের কথা?

তা জানি না। তবে বেশ কিছুকাল আগে।

কিংবদন্তীর মত এসব কাহিনী ঘরে ঘরে শোনা যায়। সঠিক খবর কেউ জানে না, তবে সবাই জানে ওজন কম দেবার সাহস কারুর নেই। আরো অনেক কিছু জানে ওরা। জানে মাঝরাতে কাবুলের নির্জন পথেও নিঃসঙ্গ অর্ধনগ্ন যুবতীর গায় হাত দেবার সাহস কোন আফগানের নেই। কি বল্লেন? চুরি-ডাকাতি? ডাকাতি করলে জেশন গ্রাউন্ডে শূলে চড়ান হয়। তরুণ বহুজনকে প্রশ্ন করেছে, আপনি দেখেছেন? কেউ দেখেনি। তব সবাই জানে শূলে চড়ান হয়।

কাবুলের রাস্তায় উর্দীপরা পুলিশ ওয়ারলেশ গাড়ী নিয়ে ছুটে বেড়ায় না, অ্যান্টি-করাপশন ডিপার্টমেন্টের কৃতিত্ব সরকারী প্রেস নোটে প্রচার করার অবকাশ নেই আফগানিস্থানে। অনেক দেশের সঙ্গেই তুলনা করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় তরুণ।

মরুভূমি ও চিরতুষারাবৃত পর্বতের সমন্বয়-ভূমি আফগানিস্থান সত্যি বিচিত্র দেশ। অন্য দেশে সৎ মানুষ খেতে পায় না, কিন্তু অসৎ মানুষ জেলখানায় গিয়ে আহার-বিহার-প্রমোদ উপভোগ করে সরকারী খরচায়। আফগানিস্থানে? যে অসৎ, যে ঘৃণিত তাকে জেলখানায় পাঠায় শাস্তি দেবার জন্য। তাইতো সরকারী কোষাগার শূন্য করে কয়েদীদের সেবা-যত্ন আহার-বিহারের ব্যবস্থা নেই আফগানি-স্থানে। কয়েদীদের আহার আসে তার আত্মীয়দের কাছ থেকে। যে কয়েদীর আত্মীয়স্বজন নেই, সে হাতে-পায় হাত-কড়া পরে শুক্রবারে শুক্রবারে ভিক্ষা করবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এবং সেই ভিক্ষার পয়সায় তার দিন গুজরান হবে। এ ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ, তা জানে না তরুণ। তবে জানে এর পেছনে যুক্তি আছে, কারণ আছে।

স্নিগ্ধ-রুক্ষ প্রকৃতির সন্তান আফগানরাও কখনও শান্ত, কখনও অশান্ত; কখনও সৌজন্য-ভদ্রতার প্রতীক, কখনও নির্মম পাষাণ। শত্রু নিপাত করে এঁরা হাসি মুখে। আবার আশ্রয়প্রার্থী চরম শত্রুকেও সন্তান জ্ঞানে সমাদর করে। কিন্তু অপমানের প্রতিশোধ অপমান করেই নেবে, রামধনু গেরে নয়।

হঠাৎ ট্রান্সফার অর্ডার পেয়ে কাবুল ছাড়তে যেন তরুণের কষ্টই হচ্ছিল। সে রাত্রে সব কিছু এক সঙ্গে মনে পড়ল। বছরের প্রথম তুষারপাতের সময় আফগান-দের মত 'বরফি' খেলায় সময় কি মজাই না হয়েছিল বীণাদির সঙ্গে!

ফেয়ারওয়েল ডিনারের অতিথিরা একে একে সবাই বিদায় নিলেন। অত বড় ড্রইং রুমের তিন কোণায় তিনটি সোফায় তিন-জনে চুপচাপ বসে রইলেন কতক্ষণ, তা কেউ জানে না।

অনেকক্ষণ পর বীণাদি একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, তোমার সঙ্গে আমা-দের এতটা ঘনিষ্ঠতা না হলেই ভাল হতো! যাদের থাকা না থাকার ঠিক ঠিকানা নেই, যারা আজ কাবুলে কাল ক্যালিফোর্ণিয়ায় বা কোরিয়ায়, তারা যে কেন মানুষকে ভালবাসে, আপন করে, তা বুঝি না।

মেঃ মেটা একটু সান্ত্বনা দেন, বছর তিনেকের মধ্যেই আবার যাতে আমরা একই মিশনে থাকতে পারি......।

বীণাদি প্রায় গর্জে উঠলেন, বাজে বক্ বক্ করো না তো! তোমার ঐ ধাপ্পাবাজি অনেক শুনেছি।

এবার তরুণ কথা বলে, নিত্য নতুন দেশ দেখছি আর তোমাদের ভালবাসা পাচ্ছি বলেই তো আমি বেঁচে আছি। নয়ত আমি কি করে বাঁচি বল তো?

এতদিন যে প্রশ্ন অনেক কষ্টে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, এবার বীণাদি সেই প্রশ্নই করলেন, আচ্ছা ঢাকার কোন খবর পেলে?

অতি দুঃখেও তরুণ হাসে। বলে, আর কি খবর পাব? শেষ সর্বনাশের কনফার-মেশন?

ছি, ছি, ওকথা বলছ কেন? —বীণাদি উঠে এসে তরুণের পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনা জানান।

একটু থেমে আবার বলেন, তুমি তো কোন অন্যায় করনি তরুণ। দেখবে ভগবানও তোমার প্রতি অন্যায় করবেন না। একদিন তুমি ওকে খুঁজে পাবেই।

পরদিন সকালে কাবুল এয়ারপোর্টে ভাইকাউন্টের চারটে ইঞ্জিন আবার গর্জে উঠল, পাখাগুলো বন বন করে ঘুরে উঠল। ঝাপসা চোখেও প্লেনের জানলা দিয়ে তরুণ যেন স্পষ্ট দেখে বীণাদিকে। আর প্লেনের গর্জন স্তব্ধ করে বীণাদির শান্ত কণ্ঠ শুনতে পায়, একদিন তুমি ওকে খুঁজে পাবেই।

মানুষগড়ার ইতিকথা

হাওড়া জিলা স্কুল

আজ থেকে সাতাশী বছর পাঁচ মাস চব্বিশ দিন আগের কথা। চুঁচুড়ার বড়-বাজারের কাছে গঙ্গাঘাটার গায়ে যে বাড়িটি আজ ভেঙে চুর-চুর হয়ে ঝরে পড়েছে তারই একটি ঘরে—সামান্য সময় আগে গৃহভৃত্য ঘরে আলো জেবলে দিয়ে গেছে। রাইটিং টেবিলে খোলা পড়ে আছে ডায়েরীর পাতা। লিখতে লিখতে হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন লেখক। অনেক কথা, অনেক পুরোনো ভাবনা মাথায় ভিড় করে আছে। মনে পড়ে কত কথা— হিন্দু কলেজের পুরোনো স্মৃতি, মধুর সঙ্গে কম্পিটিশন, মনে পড়ে মোয়াট, রেলী সাহেবদের কথা। এখনো মনে আছে রেলী সাহেবের সেই উপদেশটি—'ইয়ং ম্যান, অল-ওয়েজ বিহেভ দাস অ্যান্ড ইউ উইল সাকসিড ইন লাইফ।' সাফল্যের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ, ডায়েরীর খোলা পাতার সামনে কলম বাগিয়ে বসে থাকা মানুষটি স্বয়ং মূর্তিমান সাফল্য। রেলী সাহেব উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, যাওয়ার আগে মোয়াট সাহেবের কাছে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিয়েছিলেন। মোয়াট তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। সেই ভালোবাসার সঙ্গে রেলীর প্রশংসার যোগফলেই সেদিন তিনি চাকরী পেয়েছিলেন। কোথায়? ডায়েরীর খোলা পাতার সামনে আবার ঝুঁকে পড়লেন, সাদা কাগজের গায়ে কলম তর-তর করে আঁচড় কেটে চলল : "স্বপ্ন দেখিলাম যে হাওড়া স্কুলে পড়াইতেছি।"

ছাব্বিশ বছর আগে যে স্কুল ছেড়ে এসেছেন, সেই স্কুলের স্মৃতি চিরদিন অম্লান ছিল ডায়েরী-লেখকের মনের পাতায়। তিনি বলছেন যে আজো তিনি স্বপ্ন দেখেন যে হাওড়া স্কুলে পড়াচ্ছেন। এই স্কুলকে কি সহজে ভোলা যায়? ভুলতে পারেন নি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। এ স্কুল যে তাঁর নিজের হাতে গড়া। তিনিই যে এ স্কুলের প্রথম ভারতীয় প্রধান শিক্ষক; তাই স্কুল থেকে বিদায় নেওয়ার দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর পরে কোন এক নির্জন সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে নিজের বসতবাটি 'ভূদেব ভবনে' বসে ডায়েরী লিখতে গিয়ে বারবার তাঁর মনে পড়ে যায় হাওড়া স্কুলের কথা। আঠারো শ' উনপঞ্চাশ সালের আঠারোই অকটোবর—জয়নিং ডেট। তখন তাঁর নিজেরই বা কত বয়স, আর স্কুল? সবে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে। যেবার হেড-মাস্টার হলেন সেবারই স্কুল চার পেরিয়ে পাঁচে পা দিয়েছে।

অথচ হেডমাস্টার হওয়ার পাঁচ বছর আগেও ছিলেন কলেজের ছাত্র। হিন্দু কলেজ। ক্লাসমেট মধুসূদন। সারা দেশে তখন দারুণ উত্তেজনা। বড়লাট স্যার হেনরী হার্ডিঞ্জ। বছর দশেক আগে ইংরেজী এদেশের শিক্ষার বাহন হিসাবে সরকারী ছাড়পত্র পেয়েছে। ইংরেজীর পাসপোর্ট মঞ্জুর করেছিলেন বেন্টিঙ্ক। হার্ডিঞ্জ সেই পাসপোর্টের ভিত্তি জোরালো করে তুললেন একটি সরকারী আদেশে : "বাংলা দেশের বর্তমান শিক্ষার (ইংরেজী শিক্ষা) অবস্থার কথা মনে করে এবং সেই শিক্ষাকে উৎসাহ দেবার জন্য, সরকার কৃতী ব্যক্তিদের উপযুক্ত রাজকার্যে নিয়োগ করতে সম্মত আছেন।"

খোদ বড়লাটের মনবাসনা চাউর হতেই দিকে দিকে ঢাঁঢ়া পড়ে গেল। আপামর জনসাধারণ যে সংটি সেদিন মনে মনে অনুভব করেছিলেন, তা হল এই যে ইংরেজী শিখতে পারলে চাকরীর অভাব হবে না। তাই যে ভাবেই হোক 'ইংরেজী শেখা' চাই। শহর কলকাতায় ততদিনে ইংরেজী স্কুল গড়ে উঠেছে প্রচুর। কিন্তু কলকাতার উল্টো-দিকে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে হাওড়ার খবর কি?

সে খবর মিলবে ওম্যালী ও চক্রবর্তী সম্পাদিত হাওড়া জেলা গেজেটিয়ারের পাতায়। হাওড়ার তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে সম্পাদকদ্বয় বলছেন : "এ সময়ে হাওড়া নগরীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল এবং এর বর্ধমান গুরুত্বের কথা স্মরণ করেই হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেটের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, হাওড়াকে এক স্বতন্ত্র ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে আনা হোল। ১৮৪৩ সালে মিঃ উইলিয়াম টাইলার নব-গঠিত ম্যাজিস্ট্রেসির প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হলেন। তাঁর অধীনে রইল হাওড়া, সালকিয়া, আমতা, রাজাপুর, উলুবেড়িয়া, কোতা এবং বাগনান।"

হাওড়াকে কেন্দ্র করে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠবার প্রায় সম-সময়ে যখন হার্ডিঞ্জের নতুন নীতির কথা ঘোষিত হল, তখন সারা দেশের মত হাওড়ায়

বাসিন্দাদের মনেও ব্যাপারটা যে রীতিমত নাড়া দিয়ে যায়, পরবর্তী ঘটনাই তার স্বাক্ষর। প্রায় শ' দুই অভিভাবক স্বাক্ষরিত এক আবেদন পেশ করা হল সরকারের কাছে যে ইংরেজী শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য হাওড়া শহরে একটি ইংরেজী স্কুল চাই। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে হাওড়াবাসীদের পরিচয় বহুদিনের হলেও খোদ হাওড়া শহরে কোন সরকারী স্কুল ছিল না।

এই আবেদনপত্র পেশ করার প্রায় ষাট বছর আগেই হাওড়ায় একটি ইংরেজী স্কুল চালু হয়েছিল। এদেশের অন্যান্য জায়গার মতই হাওড়াতেও ইংরেজী শিক্ষার প্রবাহ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন মিশনারীরা। ১৭৮৬ সালে বেঙ্গল মিলিটারী অরফ্যানজের সুপারিনটেনডেন্ট রেভারেন্ড ডেভিড ব্রাউন "হাওড়ার হিন্দু ছেলেদের জন্য" একটি বোর্ডিং স্কুল খুলেছিলেন—হাওড়ার প্রথম ইংরেজী স্কুল। স্কুলের জমি ও বাড়ির ব্যাপারে ব্রাউন সাহেব নিজে সে আমলে আঠারো শ' টাকা ব্যয় করেন। স্কুল চলেনি বেশীদিন। দু-বছর পরে ব্রাউন হাওড়া ছেড়ে চলে যেতেই স্কুলটিও বন্ধ হয়ে যায়। এর বছর পাঁচেক পরে শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা হাওড়া এবং সালকেতে গোটা-কয়েক "বাজার স্কুল" খুলেছিলেন। শুধু তাই নয় ১৮২০ সালে "ভারতীয় ছেলেদের নিয়মিত পড়াশোনার জন্য" তাঁরা আর একটি স্কুল খোলেন। কিন্তু পরিবর্তিত সময়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মত ক্ষমতা এসব স্কুলের ছিল না। তাই হার্ডিঞ্জ-ঘোষণার অব্যবহিত পরেই দু'শ অভিভাবকের প্রার্থনা আবেদন-পত্র মারফৎ সরকারের কাছে পাঠানো হোল।

আবেদন জানিয়েই ক্ষান্ত হননি হাওড়া-বাসীরা; সেই সঙ্গে স্কুলের বাড়ির জন্য তাঁরা চার হাজার টাকা চাঁদাও তোলেন। জনসাধারণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেই সরকার এগিয়ে এলেন তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করতে। হাওড়া ময়দানে সল্ট অফিসের পূব দিকে আড়াই বিঘা জমি স্কুলের জন্য বরাদ্দ করলেন সরকার। ঐ জমিতে স্থানীয় বাসিন্দাদের চাঁদার টাকায় গড়ে উঠল একটা একতলা বাড়ি। এই বাড়িতেই হাওড়ার প্রথম সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুলের উদ্বোধন হল, ১৮৪৫ সালে। স্কুল পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে প্রেসিডেন্ট করে স্থানীয় অধিবাসীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হল। এসব ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক যুগ আগের কথা।

বছর চারেক ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় হেডমাস্টাররা স্কুল চালালেন। উনপঞ্চাশ সালের শেষদিকে স্কুলের হেডমাস্টারের পোস্ট খালি হোল। তখন ভূদেব মুখুজ্যে মাদ্রাসায় পঞ্চাশ টাকা মাইনের সেকেণ্ড টিচার হিসাবে কাজ করছিলেন। মাদ্রাসাতে থাকার সময় মাদ্রাসার ইনসপেকটার কর্ণেল রেলী ভূদেবের কাজে ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েই বলেছিলেন: 'ইয়ং ম্যান, অলওয়েজ বিহেভ দাস অ্যাণ্ড ইউ উইল সাকসিড ইন লাইফ।' শুধু মুখে প্রশংসা করেই থামেন নি রেলী সাহেব, যাওয়ার আগে এডুকেশন কাউন্সিলের সম্পাদক ডঃ মোয়াটের কাছে ভূদেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সেসব কথা মোয়াট ভোলেন নি। সেই না-ভোলার কাহিনী এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্কুলের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের সম্মে-লনের পঞ্চম অধিবেশন উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিন 'স্মরণিকা'র একটি প্রবন্ধে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন: "কিছুদিন পরে মোয়াট সাহেবের সঙ্গে ভূদেবের সাক্ষাৎ হওয়ায় মোয়াট সাহেব রেলী প্রসঙ্গে বলেন —হাউ কুড ইউ টেম দ্যাট টাইগার? সে আমাকে দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিয়েছে যে শীঘ্র তোমাকে হেডমাস্টার করতে হবে। এর কয়েক সপ্তাহ পরে হাওড়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় ১৮৪৯ খৃস্টাব্দের ১৮ অকটোবর ভূদেব ১৫০ টাকা মাসিক বেতনে হাওড়া জিলা স্কুলের হেডমাস্টার নিযুক্ত হলেন।"

সে বছর স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল একশ ছয়। প্রধান শিক্ষক ছাড়া সাকুল্যে গোটা স্কুলের জন্য ছিলেন তিনজন শিক্ষক। মাস্টারমশাইদের বেতন ছিল পঞ্চাশ, তিরিশ ও কুড়ি টাকা। স্কুলে তখন পাঁচটি শ্রেণী। তার মধ্যে সবচেয়ে নীচু ক্লাস দুটির ছিল দুটি করে সেকশন।

সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে চারজন শিক্ষক কি করে পাঁচটি ক্লাস নিতেন। অফ পিরিয়ড দূরের কথা, প্রায়ই তাঁদের দুটো করে ক্লাস একসঙ্গে নিতে হোত। এক ক্লাসে খানিকটা পড়া বুঝিয়ে প্রশ্ন দিয়ে অন্য ক্লাসে পড়া বোঝানো ও তাদের প্রশ্ন লিখতে দিয়ে আগের ক্লাসে ফিরে এসে উত্তর দেখা —এই করেই সে যুগে মাস্টারমশাইরা স্কুল চালাতেন।

সে সময় হাওড়ার সহকারী জেলা-শাসক মিঃ হজসন প্র্যাট ছিলেন স্কুল কমিটির সেক্রেটারী। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া হাসপাতালের সিভিল সার্জেন, জেলা শাসক, সালকিয়া লবণ গোলার সুপারিনটেনডেন্ট সব কমিটি মেম্বর। তখন উত্তরপাড়া স্কুল ও হাওড়া স্কুলের মধ্যে ছিল তীব্র রেষারেষি।

সুধানন্দবাবুর প্রবন্ধে এক জায়গায় এই রেষারেষির বিবরণ কিছুটা পাওয়া যায়: "হাওড়া ও উত্তরপাড়া স্কুলের ফলা-ফল তুলনা করে স্থানীয় কমিটির সম্পাদক নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—জ্যামিতি ও বীজগণিতে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। ইহা প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বিশেষ গুণ-পনা ও যত্নের ফল। যে সকল (ছাত্র) বৎসরের প্রথমে কিছুই জানিত না বলিলেই হয়, তাহারাও এক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরাজী আবৃত্তি অতি সুন্দর। দেশীয় স্কুলে সচরাচর উচ্চারণাদি সম্বন্ধে যে সকল ত্রুটি দেখা যায় এখানে তাহা দেখিলাম না। উত্তরপাড়া স্কুলে দুজন শিক্ষক বেশী থাকিলেও তথায় এই শ্রেণীর ছাত্রগণ এ সকল বিষয়ে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। ....কেবল পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করাইয়া ছেলেদের ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয় নাই দেখিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসায় সম্পাদক এত উচ্ছ্বসিত, সেই শিক্ষা-পদ্ধতির বিবরণও পেয়েছি সুধানন্দবাবুর প্রবন্ধে: "প্রতি শিক্ষক ও ছাত্রের প্রতি ভূদেবের সমান তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। প্রত্যহ স্কুলের ছুটির পর প্রত্যেক শিক্ষককে পরদিনের পাঠ্য বিষয়ের কোথায় কিভাবে শিখাইতে হইবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।......তিনি প্রতি শ্রেণীই পরিদর্শন করতেন। যদি কোন ছেলের কোন বিষয়ে অক্ষমতা, ঔদাস্য বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হত, তখন তাহাদের অভিভাবকদের অনুরোধ করতেন সেই ছেলেদের তাঁর বাড়ীতে কয়েকদিনের জন্য থাকতে। খাওয়া, শোওয়া, পড়া, গুরুসঙ্গে কিছুদিন বেশ কাটতো। এই ব্যবস্থায় ও সৎসঙ্গে ও বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অমনোযোগীরা মনোযোগী হত, দুরন্তরা শান্ত, পাঠ্যবিষয়ে উদাসীনরা অভিনিবিষ্ট চিত্ত হত। সঙ্গে থাকার জন্য সূক্ষ্ম অনু-সন্ধানে ত্রুটিগুলি প্রকট হওয়ায় ও তাদের অভিভাবকদের ছাত্রের ত্রুটিগুলি বুঝিয়ে দিতেন। সেই সকল ত্রুটি নিজে নিবারণ করতেন বহু। ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেন, আত্মসম্মান জাগ্রত করতেন, আত্মচেতনা শিক্ষা দিতেন, ফলে পাঠাভ্যাসে জন্মাতো অধ্যবসায় ও শ্রম-শীলতা। ভূদেবের আদর্শ ছিল শুধু পুস্তকের পাঠ শিক্ষা দেওয়া নয়, ছাত্রদের চরিত্র গঠন ও আত্মনির্ভর হতে শিক্ষা দেওয়া। তিনি শুধু পুস্তকের শিক্ষক নন, বিদ্যালয়েরও শিক্ষক নন, মনের শিক্ষক, চরিত্র গঠনের শিক্ষক, এমন কি আত্মার শিক্ষক।" তাঁর সময়ে যেসব কৃতী ছাত্র হাওড়া স্কুলে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার ক্ষেত্র ভট্টাচার্য, ডেপুটি ইনস-পেকটর অব স্কুলস শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৮৫৬ সালের জুন মাসে ভূদেব হুগলী নর্মাল স্কুলের পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করে যখন হাওড়া স্কুল ছেড়ে চলে যান, তখন এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু'শো ছত্রিশ। মাত্র সাড়ে ছ' বছরে স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা দু-গুণেরও বেশী করা নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি হাওড়াবাসীদের প্রচণ্ড আস্থা ও শ্রদ্ধার মনোভাব বহন করে। তাঁর বিদায়ের দু-বছরের মধ্যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় ও এনট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া শুরু হলে এই স্কুলের ছেলেরা প্রথম থেকেই ঐ পরীক্ষায় বসতে থাকে।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে হাওড়া স্বতন্ত্র প্রশাসনিক এলাকা হলেও, ২৪-পরগনার জেলা জজের খবরদারীর আওতার মধ্যেই ছিল হাওড়া। ১৮৬৪ সালে প্রশা-সনিক ব্যবস্থার সামান্য অদল-বদলের ফলে হাওড়া ২৪-পরগনা জেলা জজের আওতা থেকে হুগলীর জেলা জজের অধীনে আসে। এ ব্যবস্থা দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকেও হাওড়া ও হুগলী একই বিচারকের বিচারাধীন ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় জটিলতার জন্য শেষপর্যন্ত হাওড়া একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয় ১৯৩৭ সালে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম জেলা এই হাওড়া।

আয়তনে ক্ষুদ্রতম হলেও শিক্ষার বিস্তার ও ঐতিহ্যে হাওড়া সারা দেশের শিক্ষার মানচিত্রে এক অতুলনীয় স্থান দখল করে আছে। ১৯০১ সালের সেনসাস থেকে জানা যায় যে শিক্ষার ব্যাপারে বাংলা দেশের সকল জেলার মধ্যে এই ক্ষুদ্রতম জেলাই শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। জেলার শতকরা সাড়ে এগারো ভাগ লোক ছিলেন শিক্ষিত। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় আঠারো হাজার লোক ইংরেজী লিখতে ও পড়তে পারতেন।

১৯০১ সালের সেনসাস অনুযায়ী গোটা হাওড়ায় শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল আটানব্বই হাজার। এই আটানব্বই হাজার শিক্ষিত জনমতের উৎস হিসাবে যদি কোন শিক্ষায়তনকে সুনির্দিষ্ট করতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে সে শিক্ষায়তন এই হাওড়া স্কুল। এতবড় সার্টিফিকেট দেওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে যে সত্যটির সম্মুখীন আমাদের হতে হয়, তা হ'ল এই যে আধুনিক হাওড়ার নব-রূপায়ণের পথিকৃৎদের প্রায় সকলেই যে স্কুলে তাঁদের জীবনগড়ার প্রাথমিক পাঠ পেয়েছেন সেই ইনস্টিটিউশন এই হাওড়া স্কুল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রায় একযুগ পরে স্কুলের হেডমাস্টার হলেন রাধাগোবিন্দ দাস। ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৭, তেরো বছর দাসমশাই এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সময়ে যেসব ছাত্র এ স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করেছেন, তার মধ্যে উজ্জ্বলতম কয়েকটি নাম এখানে তুলে ধরলাম : সে যুগের খ্যাতনামা চিকিৎসক রসিকলাল দত্ত, ডেপুটি অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল ঈশানচন্দ্র বসু, রায়বাহাদুর নরসিংহ দত্ত, প্রখ্যাত আইনজীবী অমৃত-লাল পাইন ও মতিলাল চট্টোপাধ্যায়।

কলেজ জীবনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সহপাঠী মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৩ সালে হাওড়া স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হন। যৌবনে দীর্ঘদিন মেট্রোপলিটান ইনস্টি-টিউশনে অধ্যাপনা করার পর প্রৌঢ়ত্বের সূচনায় প্রাক্তন স্কুলেই ফিরে আসেন হেড-মাস্টার হয়ে। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে এই স্কুল চালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সাল পর্যন্ত হাওড়া স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে কাজ করার পর শেষ-বয়সে হাওড়ার নরসিংহ দত্ত কলেজে যোগ-দান করেন।

মতিলালবাবুর সময়ে এই স্কুল শুধু হাওড়া নয়, সারা বাংলা দেশের অন্যতম সেরা স্কুল বলে পরিচিতি লাভ করে। এই পরিচিতির আংশিক ইতিহাস প্রাক্তন ছাত্রদের রচনার ছত্রে ছত্রে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। স্বর্গত বনোয়ারীলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় তাঁর স্কুল-জীবনের অতীত ইতিহাস বর্ণনা প্রসংগে একটি প্রবন্ধে বলছেন : "১৮৯৯ সালে হাওড়া জেলা স্কুলে সেকেন্ড ক্লাসে ভর্তি হই এবং ১৯০১ সালে সেখান হইতে এনট্রান্স এগজামিনেশন-এ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া-ছিলাম।

"হাওড়া জেলা স্কুলে যখন আমি সেকেন্ড ক্লাসে ১৮৯৯ সালে ভর্তি হই, তখন হেডমাস্টার মতিবাবু ইংলিশ পড়াতেন, রজনীবাবু সেকেন্ড মাস্টার, ম্যাথেমেটিকস পড়াতেন, জটিবাবু, হিস্টরী পড়াতেন। ১৮৯৮ বা ১৮৯৯ সালে মাখন-লাল দে ইউনিভার্সিটি এগজামিনেশনে ফার্স্ট হয়। আমার সহপাঠী ১৮৯৯ সাল হইল মনোরঞ্জন মৈত্র, বঙ্কিম দত্ত, ক্ষেত্র বাড়ুয্যে, হরেন বাড়ুয্যে, অতুল বাড়ুয্যে ইত্যাদি।......মনোরঞ্জন আমাদের ক্লাসে সবচেয়ে ভাল ছেলে ছিল এবং ইউনি-ভার্সিটি এগজামিনেশনে ফোর্থ হইয়াছিল।"

বনোয়ারীবাবুর স্মৃতি-কথনে সামান্য ভুল হয়েছে। তাঁর সহপাঠী মনোরঞ্জন মৈত্র ১৯০১ সালে এনট্রানসে সেভেনথ হয়ে-ছিলেন—ফোর্থ নন। কিন্তু সেভেনথ হওয়া তো দূরের কথা মনোরঞ্জন আদৌ পাস করতেন কিনা সন্দেহ ছিল। স্কুল-পালানো তাঁর নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই অ্যাবসেন্ট হতেন। খবরটা মতিবাবুর কানে পৌঁছেছিল। এইভাবে পালাতে গিয়েই একদিন স্বয়ং মতিবাবুর মুখোমুখি হয়ে গেলেন মনোরঞ্জন। জোর করে ধরে এনে ক্লাস-পালানো ছেলেটিকে ক্লাসে বসিয়ে দিয়ে শাসিয়ে গেলেন হেডমাস্টারমশাই, আর কখনো ক্লাস পালালে বা অ্যাবসেন্ট হলে আস্ত রাখবেন না। মতিবাবু যে এক কথার মানুষ ছাত্রের তা জানা ছিল। জানা ছিল বলেই আর কখনো সে পালাবার চেষ্টা করেনি। সেদিন যে ছেলেটির ক্লাস পালানো বন্ধ করেছিলেন মতিবাবু, সেই ছেলেটিই এনট্রানসে স্ট্যান্ড করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছিল।

সমসাময়িক একটি নাম কিন্তু বনোয়ারীবাবুর তালিকায় খুঁজে পাইনি। অবশ্য বনোয়ারীবাবুর বিস্মৃতি ইচ্ছাকৃত নয়। কারণ তালিকায় অনুল্লেখিত ছাত্রটি সে সময়ে তাঁর থেকে তিন ক্লাস নীচে পড়ত। বনোয়ারীবাবু যেবার হাওড়া জেলা স্কুলের সেকেন্ড ক্লাসে ভর্তি হন তার ঠিক এক বছর পরে এই ছেলেটি ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়েছিল, ১৯০০ সালে। ছেলেটি তাঁর নিজের স্কুলজীবন প্রসংগে এক জায়গায় বলছেন : "আমি ৪র্থ শ্রেণীর (বর্তমান ক্লাস সেভেন) বাৎসরিক পরীক্ষার ফলে একটি রৌপ্য পদক পাই। সেটি এখনও আমার কাছে যত্নে রক্ষিত আছে। স্কুলে আমাদের ফার্স্ট বয় ছিল রেণুপদ সমাদ্দার। সে একরকম গ্রন্থকীট ছিল বলিলেই হয়। আমি কিন্তু ঘরে হিন্দী, উড়িয়া, উর্দু ও ফারসী পড়িতাম। এমনকি গ্রীক ও তামিল পড়িতে শিখিয়া-ছিলাম। আরও অনেক সহপাঠী ছিল, কিন্তু তাহাদের সকলের নাম মনে নাই।...... ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে আমি প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করি এবং মুহসীন বৃত্তি লাভ করি।"

বনোয়ারীবাবুর তালিকায় অনুল্লেখিত এই ছাত্রটির নাম ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। শহীদুল্লাহ সাহেবের 'পুরাতন স্মৃতির' পাশেই তুলে ধরছি এ স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক অনিলভূষণ গাঙ্গুলীর 'পূর্বস্মৃতি'র অংশবিশেষ—"হাওড়া জিলা স্কুলে আমি পড়ি দু দফা; একবার ১৯০১ সালে যখন *মাখনলাল দে মহাশয় এবং মনোরঞ্জন মৈত্র মহাশয়ের ছাত্রজীবনের সাফল্যের কথা শিক্ষকমহাশয়েরা উঠতে বসতে বলতেন—আর একবার ১৯০৬ থেকে ১৯১০ মার্চ পর্যন্ত। প্রথম দফায় প্রধান শিক্ষক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, দ্বিতীয় পর্বে যখন রামকৃষ্ণপুর মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় থেকে এলাম তখন *যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বার-অ্যাট-ল প্রধান শিক্ষক। দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন *রজনীনাথ ঘোষ, এম-এ, তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার নামটা তত প্রচলিত ছিল না। ১৯০১ সালে উচ্চশ্রেণী-গুলিতে পড়াতেন পণ্ডিত *পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়, *নৃপালচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়, *জ্যোতিলাল দত্ত (বনোয়ারীবাবু এঁকেই 'জটিবাবু' বলে উল্লেখ করেছেন), আর বোধহয় প্রসিদ্ধ *দেবকিশোর মুখো-পাধ্যায় যিনি সাউথ সাবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন এবং যাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায় পরবর্তী-কালে হাওড়া জিলা স্কুলে প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। ১৯০৬-এর পর যখন দ্বিতীয় দফায় জিলা স্কুলে এসে ভর্তি হলাম তখন *জ্যোতিলাল দত্ত মহাশয় ছিলেন তৃতীয় শিক্ষক এবং মদীয় পিতৃদেব *বিষ্ণুপদ গংগোপাধ্যায় ছিলেন চতুর্থ শিক্ষক, পঞ্চম শিক্ষক ছিলেন *প্যারী-মোহন দে যিনি প্রথম বি-টি পরীক্ষা দিবার জন্য ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে স্কুল থেকে প্রেরিত হলেন। রজনীবাবু ছিলেন গণিত শিক্ষক, জ্যোতিবাবু ছিলেন ইতিহাসের শিক্ষক; প্যারীবাবু ছিলেন ইংরাজীর শিক্ষক। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে এত সুন্দর পড়াতেন যে তার তুলনা হাওড়া শহরের কোন বিদ্যালয়ে ছিল না, কলকাতার খুব কম স্কুলে তাঁদের মত সুদক্ষ শিক্ষক দেখেছি। মাঝামাঝি স্থান ছিল ফকিরবাবুর সংস্কৃতে ও বাংলায় নিশাপতিবাবুর ও বাংলায় বিধুবাবুর অর্থাৎ বাণীকুমারের (রেডিও) বাবা। নিশাপতিবাবু ১৯০৯ সালে *পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর হেড-পণ্ডিত হলেন এবং সেকেন্ড পণ্ডিত হয়ে এলেন *সুধীর পণ্ডিতমশাই। ১৯১০ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে আমার পিতৃদেবের

মৃত্যুর পর সেই ফ্রেম অব ভ্যাকান্সিজেতে এলেন কবি অন্নদানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুদিন পরে রজনীবাবু বদলী হয়ে পালামৌ-এ (তখন বাংলা ও বিহার একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল) চলে যাওয়াতে জ্যোতিবাবু গণিত শিক্ষক হলেন।...... ১৯০৬ সালে জে এন মুখার্জী প্রধান শিক্ষক হয়ে এলেন তখন স্কুল সরকারী স্কুল নহে, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিসট্রিক্ট বোর্ডের অধীন। তখন ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডিসট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট এবং সেক্রেটারী ছিলেন অনারেবল মহেন্দ্রনাথ রায়, সি-আই-ই (এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র)।"

পুরোপুরি সরকারী স্কুল না হয়েও হাওড়া স্কুল সে যুগে স্বতন্ত্র মর্যাদা পেত। স্বতন্ত্র মর্যাদা পাওয়ার আসল কারণই হল এনট্রান্স বা পরবর্তীকালে ম্যাট্রিকে এ স্কুলের ছাত্রদের অসামান্য রেজাল্ট। এই রেজাল্টের আকর্ষণে সারা জেলা থেকে অভিভাবকদের আর্জি পড়ত —আমার ছেলেকে নিন। এমন নয় যে সে সময় হাই স্কুলের কোন অভাব ছিল হাওড়ায়। বরং উল্টো। ১৯০৭-৮ সালের সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করতে গিয়ে গেজেটিয়ারের পাতায় সম্পাদকদ্বয় বলছেন যে সে সময় "ঊনষাটটি মাধ্যমিক স্কুল ছিল হাওড়ায়, এর মধ্যে ছটি মিডল ভার্ণাকুলার, সাতাশটি মিডল ইংলিশ ও ছাব্বিশটি হাই ইংলিশ স্কুল ছিল। জেলার আয়তন অনুপাতে সংখ্যাটি অস্বাভাবিক, কারণ গড়ে প্রতি বর্গমাইল পিছু একটি করে মাধ্যমিক স্কুল খুব কম জেলাতেই আছে। ...খোদ হাওড়া শহরেই আছে আটটি হাইস্কুল।" হাওড়া শহর ও মফস্বলের সব কটা হাই স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছেলে পড়ত হাওড়া স্কুলে—পৌনে পাঁচশো। এত ছেলের জায়গা পুরোনো একতলা বাড়িতে হত না বলে গত শতাব্দীর শেষ দশকে মেন বিল্ডিংয়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে আর একটি দোতলা বাড়ি তোলা হয়। সম্ভবত মতিলালবাবুর সময়ে গোড়ার দিকে এই বাড়িটি ওঠে।

মতিলালবাবুর পর যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (সংক্ষেপে জে এন মুখার্জী) প্রধান শিক্ষক হন প্রাক্তন ছাত্রের রচনায় সে উল্লেখ আমরা পেয়েছি। যোগেন্দ্রনাথবাবু প্রায় দশ বছর হেডমাস্টার হিসাবে কাজ করার পর প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে রাইটার্স বিল্ডিংসে বদলী হয়ে যান। তাঁর জায়গায় এলেন আদ্যনাথ রায়। রায়মশাই দু'বছর হেডমাস্টার ছিলেন। তারপর একে একে সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ব্রজকিশোর মুখোপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য ও কিরণশশী দত্ত এ স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছেন। রায়মশাই থেকে কিরণশশী দত্ত, মাঝে কেটে গেছে পনেরোটি বছর। এই পনেরো বছরে স্কুলের সুনাম দিন দিন বাড়লেও আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় যে মাঝে মাঝে অশান্তির ঝড় দেখা দিয়েছে তার আভাস মেলে এ স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষক গণপতি ভট্টাচার্যের একটি প্রবন্ধে। ভট্টাচার্য মশাই বলছেন : "আমি যে প্রথমবার অ্যাসিস্টান্ট টিচার হিসাবে হাওড়া জিলা স্কুলে এসেছিলাম সেটা হচ্ছে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে।

"স্কুলের আবহাওয়া তখন গরম। হেডমাস্টার অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে অ্যাসিস্টান্ট মাস্টার বিধুবাবুর বিরোধ অতি গুরুতর আকার ধারণ করেছে, ইন্সপেকটর এসে গেছেন এনকোয়ারীতে। তখন শীলেদের বাড়ির ছেলেরা এখানে পড়ত এইটুকু মনে আছে; তারা সাক্ষী দিয়েছে বিধুবাবুর পক্ষে ইন্সপেকটরের কাছে। শুধু শীলেদের বাড়ির ছেলে কেন, স্কুলের সব ছেলেরাই বলেছে বিধুবাবুর পক্ষে।

"এসব খবর পেয়েছিলাম কালীবাবুর কাছে; কালী আঢ্য মশাই তখন এখানকার অঙ্কের শিক্ষক, ছেলেদের মধ্যে তাঁর প্রভাব খুব বেশী; কিন্তু আশ্চর্য দেখলাম ভদ্রলোকের প্রভাব থাকলেও প্রভাব বিস্তারের কোন চেষ্টা ছিল না।...কিন্তু দাপটের চেয়ে অমায়িক ব্যবহারের জন্যই সবাই তাঁর বাধ্য হয়ে পড়তো।

"কিছুদিন বাদে আবার যখন এলাম সেবার এসে পেলাম কিরণশশীবাবুকে হেড-মাস্টার, আর প্রথম শ্রেণীর ছাত্র [প্রাক্তন] শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমান রবীন্দ্রলালকে। প্রথমেই বলি আমার বয়স তখন ২৪।২৫; ও বয়সের শিক্ষককে তখনকার দিনে প্রথম শ্রেণীতে পড়াতে দেওয়া হত না। কিন্তু একদিন ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় কোন শিক্ষকের অনুপস্থিতির জন্য, বাংলা পড়াতে যেতে হয়েছিল আমায় প্রথম শ্রেণীতে। যাবার আগে প্রধান শিক্ষকদের (সিনিয়র টিচার্স) দুর্ভাবনা দেখা গেল— ও ক্লাসে রবীন আছে। তা থাক, বলে গেছলাম আমি। রবীন অবশ্যই ছিল, প্রথম দু-চার মিনিটে মনে হয়েছিল সত্যিই রীতিমত দুরন্ত ছেলে; কিন্তু তারপরে তাকে একটু চুপ করতে বলে "কামিনীর স্বপন" কবিতাটা যখন সবিস্তারে পড়াতে আরম্ভ করলাম, তখন অত দুরন্ত ছেলে বলে যে প্রবীণের আতঙ্ক, তাকেও যেন আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এই রসবোধ, ভাল পড়ার উপর অনুরাগ, মনের উপর এই সভ্যতার ছাপ তখনকার দিনে ছেলেদের অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল।"

স্বাভাবিক ছিল বলেই এ স্কুল সুব্রত, রবীন, শৈলেন, করুণার মত ছেলেদের দেশকে উপহার দিতে পেরেছিল। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রলাল সিংহ, হাওড়া কোর্টের বিখ্যাত উকীল শৈলেন গুপ্ত ও আই-সি-এস কলকাতাতেও জেলা এই স্কুল থেকেই পাস করেছিলেন ম্যাট্রিক। এই সব দিকপালবাবুদের কথা আজো মনে পড়ে ইকবালের। এই স্কুলের প্রবীণতম কর্মী ইকবাল। ১৯২৫ সালে তেরো টাকা মাইনে আর দু টাকা টাউন অ্যালাওয়েন্স সমেত দারোয়ানের চাকরীতে যোগ দিয়েছিলেন। আজো মনে আছে তাঁর সে সময় স্কুলের কোন কম্পাউন্ড ওয়াল ছিল না। তখন সন্ধেরাতে স্কুলের উল্টোদিকে ময়দানে শেয়াল ডাকত। সুব্রত, রবীনবাবুরা যেমন লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন, তেমনি খেলাধুলায় ভাল ছিলেন আবদুল রেজ্জাক, দাশরথি মিত্র, বি কে দাস, সর্বকালের সেরা ভারতীয় ফুটবলার সামাদ, গোলাম কিবরিয়া। তখন লেখাপড়া, খেলাধুলায় কি সুনাম স্কুলের। সুনাম ছিল, কারণ ডিসিপ্লিন বজায় ছিল পুরোমাত্রায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ও কখনো এ স্কুল বন্ধ হয় নি। বন্ধ হবে কি স্বয়ং ডিসট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেট নিজে এসে রোজ স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। সাহেবের কড়া অর্ডার ছিল, তিনটি ছেলে এলেও স্কুল বসবে, বন্ধ রাখা চলবে না। পর পর তিনদিন অ্যাবসেন্ট হলে সে ছেলের নাম কাটা যাবে। আমাদের বরদাবাবু, ঐ যে উকীলসাহেব তাঁর ছেলেরও নাম কাটা গিয়েছিল। পাইন সাহেব মকদ্দমা করেও ছেলেকে আর স্কুলে ঢোকাতে পারেন নি। তাই বলছি বাবু যে অতবড় স্বাধীনতা আন্দোলনে যে স্কুলে কোন গন্ডগোল হয় নি, সেখানে পরে আর কি গন্ডগোল হবে? চুয়াল্লিশ বছর এ স্কুলে কাজ করছি, কোনদিন ছেলেদের গন্ডগোলে স্কুল বন্ধ হতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ একবার কিছুদিন স্কুল বন্ধ ছিল—ঐ বিয়াল্লিশ সালে।

নড়ে চড়ে বসলাম। মনে হল এবার ইকবাল নিজেকেই নিজে কনট্রাডিক্ট করছেন। বয়স হয়েছে, তাই একটু আগে যা বলেছেন পরমুহূর্তেই তার বিপরীত কথা বললেন। ত্রিশের যুগের স্বাধীনতা আন্দোলনে হয়তো স্কুল বন্ধ হয় নি, তাই বলে কি বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় স্কুল বসেছে? জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে বিয়াল্লিশে স্কুল বন্ধ হয়েছিল? হাঁ বাবু, উত্তর দিলেন ইকবাল, সে সময় বন্ধ ছিল। গভর্ণমেন্ট থেকে এ-আর-পি'র জন্য স্কুল বাড়ি নিয়ে নেওয়া হয়। তখন কয়েকটা দিন স্কুল বন্ধ ছিল। কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর আবার স্কুল নিয়মিত বসতে থাকে চিন্তামণি দে রোডের গোডাউনে। তখন হক সাহেব ছিলেন হেডমাস্টার। ডাঃ এম, ই, হক। হক সাহেব হাওড়ার দেবেশচন্দ্র দাসগুপ্ত গার্লস স্কুলের সেক্রেটারীকে লিখলেন তাঁর স্কুলে জেলা স্কুলের ছাত্রদের বসবার জন্য একটু জায়গা দিতে। গার্লস স্কুলের সেক্রেটারী রাজি হলেন। তখন জি, টি, রোডের ওপর গার্লস স্কুলের বাড়িতে সকালে জেলা স্কুলের ক্লাস বসত। ঐ কয়েক বছর। তারপর যুদ্ধ মিটতে

আমাদের স্কুল আবার ফিরে এল এই বাড়িতে। তখন মোহম্মদ সুফিয়ান সাহেব হেডমাস্টার।

যুদ্ধ মিটল, দেশ স্বাধীন হল। পুরোনো অনেক ব্যবস্থা পাল্টে গেল। ম্যাট্রিকুলেশন উঠে গিয়ে প্রথমে স্কুল ফাইন্যাল, পরে হায়ার সেকেন্ডারী সিসটেম চালু হোল। দেশব্যাপী এই বিশাল পরিবর্তনের জোয়ারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকেও দিন দিন স্কুল উন্নতি লাভ করেছে।

সাতান্ন সালে হাইস্কুল আপগ্রেডেড হোল। গোড়া থেকেই হিউম্যানিটিজ, সায়েন্স ও টেকনিক্যাল তিনটি স্ট্রীম চালু আছে স্কুলে। সায়েন্সের প্রয়োজনে নতুন আর একটা বাড়ি উঠল স্কুলের। মেন বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উঠল সায়েন্স ব্লক। এল প্যাটার্নের সায়েন্স ব্লকের একটি অংশ তেতলা, অপরটি দোতলা। দোতলা অংশে আছে কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স ও বায়োলজির ল্যাবরেটরী। তেতলার একতলায় লাইব্রেরী ও অন্যান্য অংশে ক্লাস রুম।

টেকনিক্যালের ওয়ার্কশপ বানানো হোল স্কুলের মেন বিল্ডিংয়ের পেছনে বাঁধানো বটতলার গায়ে। এ সমস্তই হয়েছে বীরেশবাবুর আমলে। আটচল্লিশ থেকে একষট্টি সাল, তেরো বছর এ স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন বীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। এই তেরো বছর স্কুলের ইতিহাসে অক্লেশে সুবর্ণযুগ বলে অভিহিত হতে পারে। এ সময়ে পাশের হার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ। এর মধ্যে দুবার স্ট্যান্ড করেছে জেলা স্কুলের ছেলেরা। পঞ্চান্ন সালে স্কুল ফাইন্যালে নাইনথ হয়েছিলেন শান্তিভূষণ চক্রবর্তী। তিন বছর পরে আটান্নতে শান্তিভূষণের ভাগনে বর্তমানে বি. ই. কলেজের অধ্যাপক স্বর্ণজিত রায় স্কুল ফাইন্যালে থার্ড হন। পরীক্ষার রেজাল্ট রেকর্ডের পাশে খেলার ফলাফল যদি সাজাই চমকে উঠতে হবে। পড়াশোনা ও খেলাধুলার মাঝে সাপ ও বেজীর সম্পর্কের কথাই চিরকাল শুনে এসেছি। কিন্তু হাওড়া জেলা স্কুল তার মূর্তিমান প্রতিবাদ।

আটচল্লিশ থেকে একষট্টির মধ্যে আন্ত জেলা স্কুল প্রতিযোগিতায় হকিতে দু'বার, ক্রিকেটে পাঁচবার, ফুটবলে একবার জেলা স্কুল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যেবার চ্যাম্পিয়ন হতে পারে নি সেবার কোন না কোন বিষয়ে রানার্স আপ হয়েছে। শুধু ফুটবল, ক্রিকেট বা হকি নয় এ স্কুলেরই ছাত্র অমিতাভ হাজরা চুয়ান্ন সালে শ্রেষ্ঠ রাইফেল সুটারের সম্মান লাভ করেছিলেন। পড়াশোনা, খেলাধুলার উচ্চাঙ্কিত আয়োজনের মাঝে অভিনয়, বিতর্কের আসরেও হাওড়া জেলা স্কুলের ছেলেরা যে কখনো কোনদিন পিছিয়ে পড়ে নি তারই জ্বলন্ত উদাহরণ এ যুগের অন্যতম সেরা অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। একান্ন সালে ম্যাট্রিকের লাস্ট ব্যাচের ছাত্র সৌমিত্র।

বীরেশবাবু একষট্টি সালে বদলি হয়ে যান। তারপর এলেন বিজয়মাধব দত্ত। বিজয়বাবু ছ বছর এ স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। সাতষট্টি সালে তাঁর জায়গায় বীরভূম জেলা স্কুল থেকে বদলি হয়ে এলেন উমাপতি বসু। উমাপতিবাবু স্কুলের পুরোনো নথিপত্র ঘেটে, প্রবীন সহকর্মীদের সহায়তায় সোয়াশ বছরের প্রাচীন এই বিদ্যায়তনের এক একটি অধ্যায়ের ইতিবৃত্ত আমার সামনে মেলে ধরছিলেন। সোয়াশ বছর আগে হাওড়ার দুশো বাসিন্দার আবেদনে যে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই আজ হাওড়ার অন্যতম প্রাচীন শুধু নয় সেরা স্কুলও। অতীতের মত আজও স্কুলের ফলাফল সমান উজ্জ্বল। বিজয়বাবু ও উমাপতিবাবুর সময়ে গত আট বছরে স্কুলের পাশের হার শতকরা একশ ভাগ। কিন্তু খেলার মান পড়ে গেছে। সে কথা উমাপতিবাবুও স্বীকার করলেন। বললেন খেলার জায়গাই যদি ছেলেরা না পায় তাহলে ভাল প্লেয়ার বেরুবে কোথা থেকে। শুধু খেলার জায়গা কেন, স্কুলে আজ ক্লাস নেবার জায়গার অভাব ঘটছে। গত ছ বছর ধরে মেন বিল্ডিংয়ের বারো আনা জায়গা দখল করে আছে সিভিল ডিফেন্স। স্কুলের যে হলঘরে ভূদেব, মতিলাল, কিরণশশী, বীরেশবাবুরা ছাত্রদের চরিত্র গঠনের, জাতি গঠনের কাজে বারংবার আহ্বান জানিয়েছেন, নিজের চোখে দেখেছি সেই সুমহান ঐতিহ্যমণ্ডিত হলঘর জুড়ে ছড়ানো টেবিলে আজ ফাইলের স্তূপ—আর একধারে জনৈক সিভিল ডিফেন্সের কর্মী সদর দরজার দিকে মুখ করে টেবিলে পা তুলে শেষ দুপুরে খবরের কাগজ পড়ছেন। তার প্রসারিত পায়ের সামনে দিয়ে শিক্ষকরা ও ছাত্ররা এ বিল্ডিং থেকে ও বিল্ডিংয়ে ক্লাসে যাচ্ছেন। দোষ দেব না সেই কর্মীকে। কারণ তিনি হয়তো জানেন না যে একদিন স্বয়ং ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঐ ঘরে বসতেন তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে। ঐ ঘরেই শতাব্দীকাল ধরে পড়িয়েছেন রাধাগোবিন্দ দাস, বেণীমাধব দত্ত, মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, জে, এন, মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিলাল দত্ত, শ্রী পতি ভট্টাচার্য ও অতি আধুনিক কালে বীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও সত্যব্রত গুপ্ত। এই সব সর্বজনমান্য শিক্ষকদের পায়ের তলায় বসে তাঁদের আদর্শে জীবন গড়ে নিয়েছেন রসিকলাল দত্ত, ঈশানচন্দ্র বসু, নরসিংহ দত্ত, প্রসন্নকুমার লাহিড়ী, তারাপ্রসন্ন সেন, মহেন্দ্রনাথ রায়, মনোরঞ্জন মৈত্র, চারুচন্দ্র সিংহ, সুব্রত মুখার্জী, রবীন্দ্রলাল সিংহ, শৈলেন গুপ্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁদের সহপাঠী হাজার হাজার ছাত্র। সেই স্বনামধন্য পূর্বসূরীদের অম্লিন আদর্শের উত্তরাধিকারী একালের ছাত্র ও শিক্ষকদের একটিমাত্র প্রশ্ন সরকারের কাছে—হাওড়া সহরে কি আর বাড়ি নেই যেখানে সিভিল ডিফেন্সের অফিস বসতে পারে? কেন নিজেদের হলঘর থাকা সত্ত্বেও এ স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব বাইরে অনুষ্ঠিত হবে? কেন ছেলেদের পড়বার জায়গা, মাষ্টার মশাইদের বসবার জায়গা কেড়ে নেওয়া হবে?

ফেরার পথে গেটের বাইরে এসে একবার স্কুলের দিকে ফিরে তাকালাম। পুরোনো সেনেট হলের প্যাটার্ণে তৈরী একতলা মেন বিল্ডিংয়ের সবটুকু সৌন্দর্য ঢাকা পড়েছে ব্যাফেল ওয়ালের আড়ালে। এই দেয়াল কি ভেঙে ফেলা যায় না? কোনদিন কি পূব আকাশের সূর্য এই ঘরগুলির সমস্ত অন্ধকার দূর করে দেবে না? কবে, কবে আসবে সেই দিন?

—[illegible]

পরের সংখ্যায় : বাড়শা হাইস্কুল

আলোকপর্ণা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আগের ঘটনা

[কলকাতার ছেলে বিকাশ এল পাড়াগাঁর ব্যাঙ্কে। প্রমোশন নিয়েই। চোখে তার গ্রাম চেনার নেশা। উঠল নিয়োগীপাড়ায়। শশাঙ্কবাবুর বাড়ি। জীর্ণতার গন্ধ, রহস্যের মিছিল। কেন্দ্রমণি শশাঙ্ক নিয়োগী।

এরই মধ্যে সোনালি, শশাঙ্কবাবুর মেয়ে, এক আশ্চর্য আলোর বিন্দু। আর মনীষা কাঙ্ক্ষিত প্রতিমা, সাংসারিক দায়ে ক্লান্ত। সমাজের চারদিকে টানাপোড়েন। ক্ষোভ-ক্রোধের মিছিল। গ্রাম্য রাজনীতির বীভৎসতা।

বিকাশের চোখে সোনালির নেশা, মনীষার অস্তিত্ব। কিন্তু সে পালাও যেন ফুরোচ্ছে, হারিয়ে যেতে চাইল মনীষা।

আপিসেও অশান্তি। মাঝে মাঝেই বিক্ষোভের ঝড়। কর্মচারীদের সন্দেহে বিকাশ আহত।

ভাবল পালিয়ে যাবে সে। ছাড়বে চাকরি। ষড়যন্ত্রের হাত থেকে পাবে রেহাই।

গ্রাম্য-রাজনীতি ঘোরালো হয়ে উঠল। শিকার হল তার শশাংক নিয়োগী। আহত হয়ে শয্যাশায়ী।

এমন সময় এল মনীষার চিঠি। প্রত্যেকটা অক্ষর তীরের ফলার মতো জ্বলে উঠল। মনীষা মরছে। লিউকোমিয়া তার।

বিকাশের অবস্থা আরো সঙীন। তার নানাকাজের কৈফিয়ত তলব করেছে হেড-আপিস যেতে হবে সেখানে। রাতেই কলকাতা যাবে। বাদ সাধল শশাংক নিয়োগী। সুনুর দায়িত্ব নেবার কথা সরাসরি জানাল বিকাশকে। বিকাশ বিচলিত। পালিয়ে যেতে চাইল। রাস্তায় ধরল মস্তানেরা। বিকাশ আহত অবস্থায় পড়ে রইল পথেই। বেচারি বিকাশ!]

।। ত্রিশ ।।

বিকাশের ভাগ্য ভালো, সেই সময় লরীটা আসছিল।

নিয়োগীপাড়ার বীরেরা আর দাঁড়ালো না—যেদিকে গাছপালার ছায়া, তীরবেগে তারা অদৃশ্য হল সেদিকে। আর লরীটা এসে দাঁড়িয়ে গেল সেখানে।

'কেয়া হুয়া—কেয়া হুয়া?'

সব ধোঁয়া ধোঁয়া, সব স্বপ্নের মতো। মুখে রক্তের স্বাদ। নাকের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। লরীর ড্রাইভার আর ক্লীনার মাটি থেকে টেনে তুলল তাকে।

'কেয়া হুয়া বাবু?'

'কিছু না—কিছু না, কিছু হয় নি।'

রাস্তার তলা থেকে রিক্‌শওলার চিৎকার উঠছিল: 'গুন্ডা—গুন্ডা—গুন্ডার-দল ধরেছিল বাবুকে। আমার রিক্‌শা ভেঙে দিয়েছে—ছুটে পালিয়েছে ওদিকে।'

'বাবু—চালিয়ে থানে মে।'

'কী হবে?'

না, কিছুই হবে না, কোনো দরকার নেই।

মনীষাকে ঠকিয়েছে সে, সুনুকে কালো করে দিয়েছে। এখানে এসে একটা লোকের সঙ্গে সে মিশতে পারল না, কোথাও সহজ হতে পারল না। তারই দাম দিতে হয়েছে তাকে। ধনঞ্জয় দত্তই ঠিক বলেছিল।

তবু আর একটা উল্‌টোমুখী খালি রিক্‌শা পেয়েছিল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ট্রেনটা মিস করতে হয় নি। স্টেশনে এসে নাক-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হওয়ারও সময় পাওয়া গেছে।

মুখটা ফুলেছে, নাকে অসহ্য ব্যথা, কষের দুটো দাঁতেও যন্ত্রণা। কপালে কালশিরে পড়েছে নিশ্চয়। ট্রেনে ওঠবার একটু পরেই প্রশ্ন করেছিলেন এক ভদ্রলোক।

'কী হয়েছে মশাই? ঠোঁট ফেটে গেছে, মুখ ফোলা, কপালে—ঈস্!'

'একটা অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছিল।'

'পড়ে-টড়ে গিয়েছিলেন বুঝি?'

নিঃশব্দে মাথা নাড়ল বিকাশ। কথা দিয়ে মিথ্যের জের টানতে আর উৎসাহ পাচ্ছিল না সে।

তবু বরাত যে চশমায় ঘুষি লাগেনি, তা হলে চোখটাই যেত। নিয়োগীপাড়ার বীরেরা হয়তো দয়া করেই ওটুকু রেয়াৎ করেছে তার।

আজ আর শীতের আমেজ নেই, বরং অসহ্য একটা উত্তাপ যেন উঠছে গাড়ীর কামরায়। বিকাশ জানলার শিকে মাথা রাখল। হাওয়া—কতদূর থেকে দক্ষিণ সাগরের হাওয়ার ঝড়। এই হাওয়া তার এই কয়েকটা দিনের স্মৃতিকে দূরে-দূরান্তে উড়িয়ে নিয়ে যাক; ভুলিয়ে দিক সেখানকার সমস্ত মানুষকে—সব ঘটনাকে—যেখানে সে আর কখনো ফিরে আসবে না।

সব ভোলা যায়। শুধু একজনকে ভোলা যাবে না। সুনু—সুবর্ণা-সোনালি।

তাকে ঘিরে আছে অন্ধকারের দুর্গ—জীর্ণ চুন-বালি—পুরোনো মাটির গন্ধ;

সেখানে অদ্ভুত আওয়াজ করে একটা অলক্ষ্য ঘড়ি বাজতে থাকে—যেন কাল-পুরুষের ঘন্টা; গাঁজা খেয়ে পাগল হয়ে গেছে ইতিহাসের ছাত্র যে প্রদ্যোতকুমার নিয়োগী, সেখানে নরবলির বিভীষিকা দেখতে পায় সে; সেখানে জানলার বাইরে এখনো গলায় দড়ি-দেওয়া ছোট মাসীমা এসে নিশির ডাক দেয়; বড়ো মেয়েকে কোন্ ডাকাতের ঘরে দিয়েছেন শশাঙ্ক নিয়োগী—তার না-জানা ইতিহাস যন্ত্রণায় থমকে থাকে অন্ধকারের আড়ালে—কাকিমার বুকের ভেতর। আর সন্দু—তারই ভেতরে, আলোর দিকে পাপড়ি মেলতে গিয়ে—চারদিকের বিষে, বিকাশের অশুচি-তায়, একটু একটু করে কুঁকড়ে ঝরে যেতে থাকে।

না, বিকাশেরও দোষ নেই। নিয়োগী-বাড়ীর ছোঁয়াচ তারও লেগেছিল। কাউকে বাঁচতে দেব না—সব একসঙ্গে টেনে নিয়ে যাব সহমরণে। শশাঙ্ক তার মুখ দেখেই বুঝেছিলেন সে তাঁর দলে। তাই অত আদর করে টেনে রেখেছিলেন নিজের কাছে।

'এ বাড়ী থেকে কোথায় যাবে বাবাজী? তুমি তো ঘরের লোক।'

নিঃসন্দেহ। শশাঙ্কের একেবারে আপনজন।

মুছে যাক—সমস্ত মুছে যাক। এসব কিছুই সত্য নয়। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। রাত ভোর হলে কাল কলকাতায়। তখন আবার পুরোনো জীবন, চেনা কলকাতা।

কিন্তু সেই কলকাতা?

বদলে গেছে, এই দুঃস্বপ্নটাই বদলে দিয়েছে কলকাতাকে। তার ক্লান্তি, তার ভীড়, তার দমবন্ধ করা উদয়াস্ত। তবু তার মধ্যে গঙ্গার ধার ছিল, সেখানে গাছের পাতায় পাতায় কাঁপত আলো-আঁধারি; ছিল গড়ের মাঠ—হাওয়ায় দুলত প্রথম বৃষ্টির নতুন ঘাসেরা, রাধাচূড়োর ফুল ঝরত; এক-আধটা সিনেমা, এক-একদিন একসঙ্গে চা খাওয়া; আর মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়ীটা।

'মণি, গান গাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে?'

'সময় পাই না যে।'

'কী অন্যায়! এত ভালো গলা ছিল তোমার।'

'ভালো না ছাই—হাঁড়িচাচার মতো।'

'না, ঠাট্টা নয়। গান তুমি ছাড়তে পারবে না।'

'শরীর ভালো নেই দম রাখতে পারি না।

'মণি, এ কোনো কাজের কথা নয়। নিজের ওপর তোমার আর একটু কেয়ার নেওয়া উচিত।'

'হুঁ, তুলোর বাক্সে শুয়ে থাকি আর কি।'

'তুমি সিরীয়াসলি নিচ্ছ না। অথচ আমি দেখছি দিনের পর দিন কী বিশ্রী-ভাবে পেল হয়ে যাচ্ছ তুমি। মণি, ডাক্তার দেখাও।'

'তোমার মাথা খারাপ। মেয়েরা সহজে মরে না।'

'মণি, তুমি লেখাপড়া শিখেছ, পাড়া-গেঁয়ে ঠানদির লজিক তোমার মুখে মানায় না। একটু কনসাল্ট্ কোরো কোনো ডাক্তারকে।'

'সত্যি বলছি, আমার কিছু হবে না। অফিসে দুজন ছুটি নিয়েছে, একটু বেশি পড়েছে কাজের চাপ, তাই—। কিন্তু বিশ্বাস করো আমার কথায়, মেয়েরা সহজে মরে না।'

কী আত্মবিশ্বাস।

আর সেইজন্যেই যে-পথ দিয়ে মৃত্যু এল, সেখানে কোনো প্রতিরোধ নেই। মাথা নীচু করে সরে দাঁড়ালো মানুষের সব চাইতে বড়ো অহঙ্কার মেডিক্যাল সায়েন্স।

'কিছু করবার নেই—না প্রভাকর?'

কখনো আশা ছাড়বে না, শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও না—ডাক্তারের মন্ত্রবাণী। তবু কোনো আশ্বাস দিতে পারল না প্রভাকর।

ট্রেন একবার দোলানি খেলো কোনো জোড়ের মুখে। আচমকা একটা ধাক্কা লাগল গালে। একটা যন্ত্রণা। মাথার শিরা থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত ঝিলকিয়ে বিদ্যুতের মতো একটা যন্ত্রণা। ঠোঁট ফসকে অস্পষ্ট কাতরোক্তি বেরিয়ে পড়ল একটা।

পাশের ভদ্রলোকের ঝিমুনি ধরেছিল। চমকে উঠলেন তিনি।

'কিছু বলছিলেন আমাকে?'

'না। কিছু না।'

ভদ্রলোক আবার ঝিমুতে লাগলেন।

যন্ত্রণা। শুধু মুখে নয়, নাকে নয়, সমস্ত শরীরে। কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি। কিন্তু কোন্ কলকাতায়? সেখানে গঙ্গার ধারে গাছের ডাল আর আলো-আঁধারির জাফরি কাটবে না, আর গুলমোহরের পাপড়ি উঠবে না হাওয়ায়, নীল আকাশের দিকে খুশি হয়ে উঠবে না উদগ্রালি আকাসিয়ার মঞ্জরি; সিনেমা আরো অনেক-বার দেখা হবে, কিন্তু পাশে আর মনীষা থাকবে না; আবার অনেক দিন রেস্তোরাঁয় ঢুকতে হবে, কিন্তু কেবিনের পর্দা টেনে দিয়ে হাতে হাত মেলাবার জন্যে আর কেউ থাকবে না, শুধু পেটের খিদে মেটাতে হবে কখনো, কখনো বা এক পেয়ালা চা সামনে নিয়ে নিছক সময় কাটাতে হবে।

কোন্ কলকাতা? সেই দেশবন্ধু পার্কের সামনে। একটা জরতী সন্ধ্যার আবির্ভাব। নিবে-যাওয়া চিতার রংধরা আকাশ। দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বেয়াড়া গর্তে

আছড়ে পড়ে পুরোনো লরীর আর্তনাদ; চীনেবাদামের খোলা জুতোর নীচে গুঁড়িয়ে যাওয়ার একটা দস্তুর শব্দ পাশ থেকে একটা তোলা উনুনের উত্তাপ; হাওয়ায় উড়তে একটা কাগজ এসে পায়ে জড়িয়ে ধরা—যেন সাপের খোলস একটা।

এই সন্ধ্যা—এই কলকাতায় মনীষা মরবে। চিতার রংধরা আকাশের আর অর্থ নেই কোনো; পুরোনো লরীর আর্তনাদে একটা কর্কশ কান্নার দমকা; চীনেবাদামের গুঁড়িয়ে যাওয়া খোলায় কে যেন দাঁতে দাঁতে কড়কড় করে হিংস্র রব তুলছে—তার আভাস; পায়ে জড়িয়ে যাওয়া কাগজটায় সেই শেকলের টান—যা বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিন্ডটাকে উপড়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

ট্রেন কোথায় যেন থেমেছিল, কারা উঠল, কারা নামল। ঝাপসা চোখে চেয়ে দেখল বিকাশ। মানুষগুলোর মুখ দেখা যায়—অথচ দেখা যায় না। কতগুলো ছায়া নড়ছে, দুর্বোধ্য শব্দ উঠছে কয়েকটা।

আবার চলল গাড়ীটা। আচমকা ঝাঁকুনি। আবার জানলার শিক থেকে আহত মুখের ওপর যন্ত্রণার ঢেউ।

বাইরে আলোরা সরছে। গাড়ীর গতি বাড়ছে—সব আলোগুলো একসঙ্গে মিশে কাঁপছে কয়েকটা আঁকাবাঁকা রেখায়। কিন্তু তাদের রং নীল বলে মনে হল বিকাশের। যন্ত্রণায় নীল।

'দোহাই তোমার, এ সময়ে তুমি আমার কাছে এসো না। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। তুমি এলে আমার যন্ত্রণা বাড়বে—বাঁচবার লোভ জাগবে—'

তাহলে মনীষারও লোভ ছিল। ভাবতেই পারা যায় নি কোনোদিন।

কলকাতা মনীষাকে গ্রাস করছে। দেশবন্ধু পার্কের আকাশে নিবন্ত চিতার রং। অথচ, এই কলকাতায় এসেই সোনালি আলো হয়ে উঠেছিল।

জোর করেও ভোলা গেল না—সরিয়ে দেওয়া গেল না মন থেকে। সেই শিকের ওপর মাথা রেখে, দূর সাগরের হাওয়ায় স্নান করতে করতে, বিকাশের চোখ বুজে গেল। মনীষার মৃত্যুর ছায়া থেকে পাপড়ি মেলতে লাগল আলোকপর্ণা।

এত সহজেই ছেড়ে দেবেন শশাঙ্ক-কাকা? নিয়োগীপাড়ার ছেলেদের কয়েকটা লাথি-ঘুষির ওপর দিয়েই নিষ্কৃতি আছে বিকাশের?

কালই হয়তো একটা চিঠি লিখবেন মা-কে। হয়তো আজই লিখছেন। সে চিঠি না দেখলেও জানা যায়, কী আছে তাতে। বিকাশকে তিনি বিশ্বাস করে—আপনজন ভেবে ঘরে জায়গা দিয়েছিলেন। তারই সুযোগ নিয়ে—

তারপর কতগুলো কুৎসিত অভিযোগ। মিথ্যা সেখানে সব কিছুর সীমা ছাড়িয়ে

যাবে, নিজের মেয়ের গায়ে কালি ছড়াতে শশাঙ্কর বাধবে না—যেমন বাধেনি সুধা-ময়ী দেবীকে দিয়ে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত অব্যর্থ মাদুলীর ব্যবসা করানোতে। শশাঙ্ক পরের মামলার তদ্বির করেন, মিথ্যে সাক্ষী সাজান—নিজের মামলায় জিততে গেলে সেই মিথ্যেকে কতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, শশাঙ্কর চাইতে ভালো করে তা কেউ জানে না।

মা স্তব্ধ হয়ে যাবেন। তারপর ডাকবেনঃ 'বিকাশ।'

বিকাশ দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকাতে পারবেনা মা-র দিকে।

'আমি এর একটা বর্ণও বিশ্বাস করি না, বাবা। আমার ছেলেকে আমি চিনি।' বলা যাবে, মা, ছেলেকে সম্পূর্ণ তুমি চেনো না? বলা যাবে, আমি সুন্দর মনে অশুচি ছায়া ফেলেছি?

মা আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবেন। 'এ যত বড়ো মিথ্যেই হোক, মেয়েটিকে আমি দেখেছি, বাবা। মণি তো বিয়ে করবে না—সে আমি তোকে আগেই বলেছি। শশাঙ্ক ঠাকুরপো যে এত ভয়ঙ্কর, তা আমি ভাবতেও পারি নি। তবু—মা একটু থামবেন : 'পাঁকে পদ্মও ফোটে। ওই মেয়েটিকে তুই উদ্ধার করে আন্ বাবা—আমি ওকে ছেলের বউ করব।'—মা আবার থামবেন : 'এ কথাটা তো সোজাসুজি বললেই হত, এ রকম নোংরা রাস্তা নেবার দরকার ছিল না।'

মা বলবেন এ কথা?

হয়তো বলবেন, হয়তো রাগ করবেন। 'ছি-ছি, ওই ছোটলোকের মেয়ে মিথ্যে অপবাদ দিয়ে বিয়ে দেবে? কক্ষণো না।'

তবু মা-র চোখের দিকে চাইলে অন্য-রকম মনে হয়। মা তো নিজেই আভাস দিয়েছিলেন—

আবার ঝাঁকুনি, আবার যন্ত্রণা, ঘোর ভেঙে যাওয়া। ছুটন্ত ট্রেনের বাইরে এক আকাশ তারা। তারাগুলোর রঙ নীল—যন্ত্রণায় নীল।

না, এখন নয়— এখন নয়। এখন মনীষা মরছে একটু একটু করে। এখন অন্ধকারে ঘূর্ণির মতো পাক খাচ্ছে যন্ত্রণা—বুকের শিরাগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে টুকরো টুকরো হয়ে। এখন কিছুই ভাবা যায় না।

শশাঙ্কর লজ্জা নেই। দরকার হলে কলকাতায় এসেই হয়তো হানা দেবেন তিনি।

আর সেই কুশ্রী কদর্যতায় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে আলোকপর্ণার পাপড়ি-গুলো। বিকাশ কী করবে তখন?

এখনো ভাবা যাচ্ছে না। এখনো না। মনীষা মরছে।

অন্ধকার—যন্ত্রণার অন্ধকার। তবু একটা আলোর পাপড়ি থেকে থেকে ভেসে উঠতে লাগল তার ওপর।।

(শেষ)

সাপ

জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী

সৃষ্টির আদি থেকেই নাকি ভগবানের অভিশাপে সাপ মানুষের কাছে ভয়ের বস্তু। সাপের নাম শুনলেই মানুষ আতংকে শিউরে ওঠে। বাইবেলে তো সাপকে সাক্ষাৎ শয়তান বলা হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম মানব-মানবীকে নাকি এই সাপই প্রলোভন দেখিয়ে নন্দনকাননচ্যুত করেছিল। কিন্তু এমন একটা ঘৃণিত প্রাণী যে কারে কী করে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মানুষের কাছে দেবতার মতো পুজো পেয়ে আসছিল এবং বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগেও অনেক দেশে তার দেবাসন অটুট রেখে চলেছে, এটা সত্যিই এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

'ভয়ে ভক্তি' বলে একটা কথা আছে। মনে হয় প্রাচীন যুগে মানুষের ভয় এবং অসহায়তাবোধ থেকে সর্পপুজোর উৎপত্তি হয়েছিল। তাই আমরা দেখতে পাই এক সময় পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মানুষই সাপকে দেবতা বলে পুজো করত। অনেক আদিম বন্য মানুষ আজও নাকি সর্প দেবতা ছাড়া অন্য কোন দেবতাই মানে না। তারা এই সর্প দেবতার তুষ্টিবিধানের জন্য নরবলি দিতেও কুন্ঠাবোধ করে না। প্রাচীন ইজিপ্ট ও মিশরে সাপকে মন্দিরে রেখে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করা হোত। ব্রহ্মদেশে আজও দু-এক জায়গায় সর্প-মন্দিরের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাচীন পারস্য দেশে রামধনুকে দিব্যসর্পরূপে কল্পনা করা হোত। প্রাচীন রোমে সাপকে ধরিত্রীর পালয়িত্রী দেবীরূপে মেনে নেওয়া হয়েছিল। সুইডেনে আড়াই শ' বৎসর পূর্বে পর্যন্ত সর্পপুজোর প্রচলন ছিল। সেখানে সর্প হত্যা তো দূরের কথা, সর্পকে আঘাত করাও পাপ কাজ বলে গণ্য করা হোত। আফ্রিকার বহু জাতি এবং উপজাতির ধারণা যেসব সাপ গৃহে বাস করে বা গৃহের চারদিকে বিচরণ করে তারা নব কলেবরধারী মৃত ব্যক্তিদের অবতার রূপে গৃহস্থের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। বলি ও যবদ্বীপে এখনও সর্পপুজো বিশেষভাবে প্রচলিত। কোন ক্ষত্রিয়ের মৃত্যু হলে শবের সঙ্গে শ্মশানে একটি মৃত সাপ নিয়ে একই সঙ্গে দাহ করা হয়। নেপালে আজও প্রতি বৎসর মহাসমারোহে ঘরে ঘরে নাগ-পঞ্চমীর অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়।

ভারতের বহু হিন্দুর কাছে সাপ একটা ভয়ংকর ঘৃণিত প্রাণী নয় যে তাকে দেখলেই হত্যা করতে হবে; বরং সে শ্রদ্ধা এবং পুজো পাবার যোগ্য। ভারতবর্ষের সর্প-পুজো রীতি-নীতির দিক থেকে বিশ্বের অন্যাংশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সাপ এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে যে এর থেকে মুক্তি পাওয়া সহজসাধ্য নয়। মনু সংহিতায় অন্যান্য প্রাণী হত্যার মত সর্প হত্যাতেও প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্র তো বহুবিধ সর্প-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ধ্বংসকর্তা শিবের গলদেশ অলংকৃত করে বেষ্টিত রয়েছে সাপ। পালনকর্তা বিষ্ণু ক্ষীর সমুদ্রে ভাসমান অনন্ত নাগের দেহের উপর শায়িত। সমগ্র নক্ষত্রমন্ডলকে নিচের দিকে ঝুলানো-মুখ বিশিষ্ট একটা সর্পের আকৃতির সঙ্গে কল্পনা করা হয়েছে।

সর্প-জগতের প্রধানের নাম অনন্ত। তার আছে সহস্র ফণা। প্রচলিত কাহিনী এই যে, অনন্তর ফণার উপর আমাদের এই ধরিত্রী স্থাপিত। ক্রমাগত একটি ফণার উপর পৃথিবীর ভার বহন করে করে অনন্ত যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে পৃথিবীকে অন্য ফণার মাথায় সরিয়ে নেয় এবং সেই স্থান পরিবর্তনে বিশ্বে যে ঝাঁকুনি লাগে তাকেই নাকি বলা হয় ভূমিকম্প।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে অনন্ত ছাড়া আরও সাতটি প্রধান সর্পের নাম পাওয়া যায়, যথা—বাসুকী, তক্ষক, কারকোটাকা, অব্জা, মহাম্বুজা, শংখদারা এবং কুলিকা। যখন কোনো ভূমিদান করা হোত তখন সেই দান-কর্ম শুভ হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করার জন্য অষ্টনাগের বন্দনা করা হোত।

সমস্ত সর্প কাহিনীর মধ্যে বাসুকী দ্বারা ক্ষীর সমুদ্র মন্থনের কাহিনীই বোধ-হয় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। মন্দার পর্বতকে মন্থন দন্ড করে এবং বাসুকী নাগকে দড়ি বানিয়ে অমৃত লাভের আশায় দেব-দানবের সে কী শ্বাসরোধকারী মন্থন কর্ম! বেচারা বাসুকী প্রচন্ড ঘর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিষ উদ্গীরণ করতে লাগল। বিষের বন্যায় সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হোল। অত্যন্ত ভীত হয়ে সকলে মহাদেবের স্তুতি করতে লাগলেন। শিব তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অন্য কোন উপায় না দেখে সম্পূর্ণ হলাহল নিজে পান করে নিলেন। চরম বিপদ দেখে শিবজায়া পার্বতী ভয়া-তিভূতা হয়ে দ্রুত ছুটে এসে দুই বাহু দ্বারা স্বামীর গলদেশ সজোরে বেষ্টন করে ফেললেন। সৌভাগ্যবশতঃ বিষ আর নিচে নামতে পারল না, শিবের কণ্ঠেই আটকে রইল।

অবশ্য আমাদের সকল পৌরাণিক কাহিনীই সর্প প্রশংসায় মুখর নয়। শ্রীকৃষ্ণের নির্ভীক কার্যাবলীর মধ্যে একটি ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর কৃষ্ণকায় কালীয় নাগ হত্যা। ওই কালীয় নাকি যমুনা নদীতে বাস করত এবং তার সখ ছিল নদীর যেখানে ব্রজের গরুর পাল তৃষ্ণার্ত হয়ে জল পান করতে আসত সেখানে আগে ভাগে জলে বিষ মিশিয়ে রাখা—অর্থাৎ জলপান মাত্রই যেন গরুর মৃত্যু হয়।

কিছু কিছু পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে সাপ মোটেই খারাপ স্বভাবের নিদর্শন রাখেনি; বরং তারা হিতকারীর প্রতি সময় সময় যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। নল-দময়ন্তীর কাহিনীতে রাজা নল যখন বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন অগ্নি-কুন্ডের মধ্যে পড়ে যন্ত্রণায় কাতর একটি সাপকে দেখতে পেয়ে দয়াপরবশত তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং প্রতিদানে সাপ নলকে একটা ছোবল দিয়েছিল যার ফলে নিদারুণ সর্পবিষ মুহূর্তে মধ্যে নলের সুন্দর দেহকে কালো কুৎসিত করে তুলেছিল। নল সাপের ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে-ছিলেন। কিন্তু অচিরকালের মধ্যেই তিনি সর্পের অনুগ্রহ বুঝতে পেরেছিলেন কারণ সেই নবরূপেই তাকে আশ্রয়দাতা বৈরী রাজার সামনে নিজ পরিচয় গোপন রাখতে সাহায্য করেছিল। পরে অবশ্য সেই সাপের দেওয়া একজোড়া পোষাকের সহায়তায় নল নিজের আসল চেহারা ফিরে পেয়েছিলেন।

আর একটি পৌরাণিক কাহিনীতে একটি উদ্ধারপ্রাপ্ত সর্প কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্ধর্ষ বীর কর্ণের বাণরূপে প্রতিদান দিয়েছিল। সেই সর্পবাণ কর্ণের অস্ত্রাগারে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অস্ত্র ছিল। এই সর্প-বাণকে দ্বাপরের 'অ্যাটম বোমা' বলা যেতে পারে। কারণ কর্ণের এই অস্ত্রের সংবাদ পেয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত যথেষ্ট বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন।

শুধু প্রাচীন ধর্মগ্রন্থেই নয় আমাদের বহু পুরাকাহিনীতে সর্প সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কথা লিপিবদ্ধ আছে। সর্প নাকি ধনরত্ন ভালোবাসে এবং খুব বিষধর সাপের মাথায় একপ্রকার মণিও থাকে। এই বিশ্বাস প্রাচীন জনশ্রুতির সঙ্গে মিশে আছে। খুব বিত্তশালী লোক কোনোরকম উত্তরাধিকারী না রেখে মারা গেলে মৃত্যুর পর সে সর্প-জীবন নিয়ে ফিরে আসে সম্পদ পাহারা

দিতে, যাতে অন্য কেউ তাতে হাত দিতে না পারে। সর্প পাতালপুরীতে থেকে যক্ষের মতো আমাদের গুপ্তধন রক্ষা করছে এবং পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থা নির্ধারণ করছে এই বিশ্বাস কেবল ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরে বহু দেশে আজও বদ্ধমূল হয়ে আছে।

কথিত আছে যে কোন কোন মারাত্মক সাপের চোখের মধ্যে বিষ আছে। সেই সাপের দৃষ্টি যার চোখে পড়বে তারই মৃত্যু হবে। দিগবিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের জীবনের একটি অদ্ভুত কাল্পনিক কাহিনীর সঙ্গে এর যোগ আছে। বিজয়বাহিনী নিয়ে ভারত-পারস্য সীমান্তে একটা উপত্যকার কাছে এসে সম্রাট ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখলেন যে সেই উপত্যকা প্রচুর মণি-মাণিক্যে পরিপূর্ণ এবং সেই স্থানটির সজাগ প্রহরী হচ্ছে কতগুলো সাপ যাদের চোখে রয়েছে মৃত্যুগরল। বুদ্ধিমান সম্রাট অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজ কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন হাতে অত্যন্ত পালিশ করা পিতলের দর্পণ নিয়ে উপরের দিকে চেয়ে সারিবদ্ধভাবে উপত্যকার উপর দিয়ে হেঁটে যেতে। যাত্রা শুরু হলো এবং সাপেরা যেই অত্যন্ত রাগতভাবে সেই দর্পণের দিকে চাইতে লাগল অমনি একে একে নিজের বিষে নিজেই মরতে লাগল।

এই সমস্ত পুরাকাহিনীর অনেকটাই বর্তমান যুগের মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। তবু আমাদের বহু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সাপ সম্বন্ধে একটা ধর্মীয় মনোভাব আজও নানাভাবে কাজ করে চলেছে। তাই এখনো আসমুদ্রহিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষের বহু স্থানে সর্পপূজা নানা-ভাবে প্রচলিত রয়েছে দেখতে পাই।

এক সময় বাঙালীর ঘরে ঘরে নাগ-পঞ্চমীর উৎসব পালিত হতো। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে সেই সমারোহপূর্ণ উৎসব আর যদিও চোখে পড়ে না তবু এখনো নানা স্থানে, বিশেষ করে পল্লীগ্রামে মনসা-দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়। নাগ পঞ্চমীর দিন এই দেবী এবং তার বাহনরূপী অষ্টনাগের পূজা হয়ে থাকে। মনসাদেবী প্রসন্না হলে তার বরে আয়ু, আরোগ্য এবং ধনৈশ্বর্য লাভ হয় এই বিশ্বাস আমরা রাখি। বঙ্গদেশে মনসার বা সর্পপূজার প্রচলন সম্বন্ধে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের উপাখ্যান সুবিদিত। বাংলার বেদেদের মধ্যে মনসাদেবী সর্বশ্রেষ্ঠা দেবী বলে পূজিতা হয়ে থাকেন।

পাঞ্জাবের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক সর্পপূজক এখনও আছেন। কোনো সাপের মৃত্যু হলে তাকে বস্ত্রাম্বরা আচ্ছাদিত এবং সুসজ্জিত করে দাহ করা হয়। মনু সংহিতার বিধান অনুসারে ভারতের অনেক স্থানে সর্প নিধনের জন্য বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করার রীতি আছে। মৃত সর্পের মুখে তাম্র ও রৌপ্যখণ্ড রেখে তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দাহ করে তার পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করলে পাপ খণ্ডন হতে পারে বলে প্রাচীনপন্থী অনেকের বিশ্বাস।

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত মালাবারে মানুষের জীবন সাপের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেখানে একদিকে প্রতি বৎসর সর্পাঘাতে যেমন অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারায়, অপরদিকে তেমনি সর্পের নামে উৎসর্গীকৃত অগণিত ঘরের কুলঙ্গী, মন্দির এবং কুঞ্জ সর্প-দেবতার উপস্থিতি প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়ে দেয়। বহু হিন্দু বাড়ির এক কোণে কেউ বা ছোট একটি মন্দির নির্মাণ করে, কেউ বা বট অথবা নিম গাছের কুঞ্জ রচনা করে তার মধ্যে একটি প্রস্তর নির্মিত সর্পমূর্তির প্রতিষ্ঠা করে রাখে। সেই সব প্রস্তর নির্মিত সাপের কোনোটার একটা ফণা, কোনোটার তিন, পাঁচ, সাত অথবা নয়টা ফণা। কোনোটায় আবার নাভির উপরিভাগ সম্পূর্ণ মনুষ্যাকৃতি এবং নিম্নভাগ কুণ্ডলী পাকানো সর্প। স্ত্রী সর্পের একটা ফণা থাকে। প্রতি প্রত্যূষে নিয়মিতভাবে দুধ, ফল এবং নারিকেলের ভোগ দেওয়া হয় সেই সব সর্পদেবতার স্থানে এবং সন্ধ্যায় জেলে দেওয়া হয় একটি তৈল-দীপ। কোন কলুষিত পুরুষ বা স্ত্রী-লোকের সেই সব দেবস্থানের ধারে কাছে যাওয়া নিষেধ। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস এই আদেশ অমান্য করলে অপরাধীর জীবনে পারিবারিক কোন কঠিন রোগ থেকে শুরু করে কোন সন্তানের মৃত্যু ইত্যাদি নানা প্রকার চরম দুঃখের ছায়া নেমে আসে। কেউ সর্পমন্দির অপবিত্র করলে দেবরোষে তাকে নাকি শাস্তি পেতে হয় কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দক্ষিণ এবং উত্তর ভারতের কিছু জায়গায় সাপের সঙ্গে কুমারী মেয়েদের জড়িত করে নানা গ্রাম্য গাঁথা প্রচলিত আছে। দক্ষিণ ভারতের গাঁথায় বয়োজ্যেষ্ঠরা প্রায়ই কুমারী মেয়েদের সাবধান করে তারা যেন কখনো এমন কোনো কাজ না করে যাতে সর্পদেবতা ক্রুদ্ধ হতে পারেন, কারণ তিনি কুপিত হলে নাকি কুমারী মেয়েদের জীবনে চরম অভিসম্পাত, অর্থাৎ বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। মালাবারে এমন সব কাহিনী প্রচলিত আছে যে আজও নাকি সেখানে সর্পপূজক এবং তাদের সন্তান-সন্ততি জীবন্ত গোক্ষুরা সাপের নাটকীয় হস্ত-ক্ষেপে শত্রুর হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়ে থাকে। কিছু জাতির মধ্যে গোক্ষুরা সাপ মারা একটা ভয়ংকর পাপ কাজ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। কেউ এই কাজ করলে তাকে তিন দিন পর্যন্ত অশুচি হয়ে থাকতে হয় এবং যথোচিত ধর্মীয় বিধিতে সর্পদেহ সংকার করতে হয়।

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ও'রা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে!

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের খবর, চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিনিসপত্রের দামও আকাশছোঁয়া।

এমন সময় এল সেই মারাত্মক সংবাদ। জাপানীরা বোমা ফেলেছে বর্মায়। সেখান থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে ভারতে। রাজদিয়াতেও জান্ নিয়ে ফিরে এসেছে একটি পরিবার। পরদিন। সকলেই ছুটল ত্রৈলোক্য সেনের কাছে। শুনল রেঙগুন থেকে পালিয়ে আসার মর্মান্তিক কাহিনী। সময় এগোল যথানিয়মেই। দেখতে দেখতে যুদ্ধের হাওয়া এসে লাগল রাজদিয়াতে। সৈন্য আসতে শুরু করেছে। কলকাতা থেকেও লোক পালাচ্ছে। বিনুর নতুন বন্ধু অশোক। মিলিটারি ব্যারাকে গেল তারা একদিন। ইতিমধ্যে বিনু সিগারেট ধরেছে। ধরাও পড়ল মজিদ মিঞার চোখে। কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল বাড়িতে।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হেমনাথ, অবনীমোহন, স্নেহলতা, সুরমা, সবাই বাড়িতেই ছিলেন। মজিদ মিঞা আর বিনুকে ওভাবে দেখে তাঁরা বিষণ্ণ মুখে বেরিয়ে এলেন।

হেমনাথ শুধোলেন, 'কী হয়েছে রে মজিদ?'

সংক্ষেপে সব ঘটনা বলে গেল মজিদ মিঞা। শুনতে শুনতে অবনীমোহন, সুরমা এবং স্নেহলতার নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। অবনীমোহন মাথায় হাত দিয়ে সেখানেই বসে পড়লেন। স্নেহলতা আর সুরমা কিছু বলতে চেষ্টা করলেন, গলা দিয়ে তাঁদের স্বর বেরুল না। সুধা-সুনীতি ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর কী বলাবলি করতে লাগল। আর স্তব্ধ মূর্তির মতন একধারে দাঁড়িয়ে রইল ঝিনুক।

হেমনাথ একদৃষ্টে পলকহীন তাকিয়ে ছিলেন। কথাটা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অনেকক্ষণ পর আস্তে করে বললেন, 'বলিস কী!'

'হ হ্যামকত্তা। এইর এট্টা বিহিত করেন।' মজিদ মিঞা বলতে লাগল, 'অখনও সময় আছে। পোলা চৌখের সামনে নষ্ট হইয়া যাইব, এ আমি সইতে পারুম না।'

হেমনাথ হঠাৎ রেগে উঠলেন, 'বিহিতের জন্যে আমার কাছে ধরে এনেছিস! কেন, নিজে শাসন করতে পারনি? তুমি ওর কেউ না?'

অবনীমোহন এই প্রথম কথা বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমি তো ভাবতেই পারি না, ছেলেটা এত অবাধ্য হয়ে উঠেছে!'

মজিদ মিঞা আবেগের গলায় বলল, 'হ, আমারই শাসন করা উচিত আছিল। আমি পরের লাখান (মতন) কাম করছি, এইবার আপন মাইনষের লাখান কাম করি।' বলে উঠোনের একধারে একটা খুঁটির সঙ্গে বিনুকে কষে বাঁধল। তারপর কোত্থেকে একটা কাঠের লম্বামতন টুকরো যোগাড় করে এনে সমানে মারতে লাগল।

একেকটা ঘা পড়েছে আর চামড়া ফেটে ফেটে রক্ত ছুটছে। বিনু আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল, 'আমাকে মেরে ফেলল, আমাকে মেরে ফেলল। আর কক্ষনো ও-কাজ করব না।'

দেখাদেখি ঝিনুকও কান্না জুড়ে দিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বিনুদাদাকে মেরে ফেললে গো—'

স্নেহলতাও ঝিনুকের সঙ্গে সুর ধরলেন, 'মজিদ আর ওকে মেরো না।'

অবনীমোহন বললেন, 'মারুন আপনি, মেরে শেষ করে দিন। এরকম ছেলের দরকার নেই আমার।'

সুরমাও তা-ই বললেন। হেমনাথ উঠে গিয়ে স্নেহলতা আর ঝিনুককে রান্নাঘরে দিয়ে এলেন।

একসময় মেরেটেরে মজিদ মিঞা চলে গেল।

মারের চোটে কত জায়গা যে কেটে গেছে, হাত-পায়ের আর কিছু নেই: ফুলে ডুমো ডুমো হয়ে উঠেছে; রক্ত জমাট বেঁধে কালশিরাও পড়েছে অনেক। ব্যথার তাড়সে সন্ধ্যেবেলায় জ্বর এসে গেল বিনুর—ধুম জ্বর।

জ্বর আসার খানিকক্ষণ পর হাঁড়ি-ভর্তি রসগোল্লা, মোহনবাঁশি কলার ছড়া আর একটা নতুন ফুটবল নিয়ে আবার এল মজিদ মিঞা। বাড়িতে পা দিয়েই বিনুর খোঁজ করল।

হেমনাথ বললেন, 'ওর জ্বর এসেছে।'

'জ্বর!' মজিদ মিঞা চমকে উঠল, 'বিনু কই?'

'পুবের ঘরে শুয়ে আছে।'

পাগলের মতন ছুটে পুবের ঘরে গিয়ে ঢুকল মজিদ মিঞা। তারপর বিনুর মাথার কাছে ফুটবল, মিষ্টির হাঁড়িটাড়ি রেখে তার সারা গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কাঁদতে লাগল, 'অয় রে, কী পাষাণ পরাণ আমার; দুধের শিশুরে মাইরা ফেললাম—'

কিছুক্ষণ হাত বুলোবার পর মজিদ মিঞা চলে গেল। ঘণ্টাখানেক পর লারমোরকে নিয়ে আবার এসে হাজির হল। বলল, 'দ্যাখেন লালমোহন সায়েব, পোলায় নি আমার বাঁচব!' বলে তার কী কান্না!

অবনীমোহন হেমনাথ যত বোঝান, 'জ্বর হয়েছে, সেরে যাবে—' মজিদ মিঞা শোনে না। তার কান্না বাড়তেই লাগল, 'অয় রে, কী পাষাণ পরাণ আমার—'

এরই ভেতর একদিন ঢাকা ইউনিভার্সিটির এম-এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেল। যা আশা করা গিয়েছিল, তা-ই হল —হিরণ ফার্স্ট ক্লাশ পেয়েছে।

কলেজের চাকরি ঠিক হয়েই ছিল। রেজাল্ট বেরুবার পরই রাজদিয়া এসে প্রফেসারি নিল হিরণ।

।। পঞ্চাশ ।।

এর ভেতর অবনীমোহনের সঙ্গে একদিন সুনামগঞ্জের হাটে গেল বিনু।

হেমনাথ আসেন নি। ক'দিন ধরে তাঁর খুব জ্বর ; একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন।

দু' বছর হয় বিনুরা রাজদিয়া এসেছে। এই প্রথম হেমনাথকে সে অসুস্থ হতে দেখল।

হাটে পা দিতেই বিনুদের কানে এল, সুজনগঞ্জের হাটে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। এতবড় একটা গঞ্জ, যেখানে ফি হাটে কম করে পাঁচ-দশ হাজার মণ ধান-চাল বিকি-কিনি হয়, সেখানে এক দানা শস্যও নেই! নদীর ধার ঘেঁষে সারি সারি আড়তগুলোতে তালা ঝুলছে। পুব দিকে হাটুরে চালার তলায় চারপাশের গ্রাম থেকে চাষীরা ঘরে ভানা চাল এনে বসত। চালাগুলো আজ ফাঁকা।

চাল নেই, চাল নেই।

তামাক-হাটা, বেগুন-হাটা, মরিচ-হাটা, নৌকো-হাটা—যেখানেই বিনুরা যাচ্ছে ভীত সন্ত্রস্ত গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে।

'হায় আল্লা, বাজারে চাউল নাই। নিজেরা খাই কী? পোলাপানরে বাচাই কেমনে?'

'হে ভগমান, অদিষ্টে কী যে আছে!'

বিনুরা দেখতে পেল, হাটের নানা জায়গায় থোকা থোকা ভিড় জমেছে। সবাই ভয়ার্ত, বিহ্বল, দিশেহারা, চাল ছাড়া আজ আর কেউ কোন কথা বলছে না।

ঘুরতে ঘুরতে বেগুন-ব্যাপারী গয়জদ্দির সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'হাটে কখন আইলেন জামাই কত্তা?'

অবনীমোহন বললেন, 'এই একটু আগে।'

'খপর শুনছেন?'

'হ্যাঁ, শুনলাম।'

'পঞ্চাশ ষাইট বছর বয়স হইল, চাউলের এমুন আকাল আগে আর দেখি নাই। ঘরে এক পাসারি চাউল আছে ; তিন ওক্ত কইরা খাইলে তিনদিনও চলব না। দুই ওক্ত কইরা খাইলে বড় জোর চাইর রোজ। হের (তার) পর কী করুম?'

অবাক হয়ে অবনীমোহন বললেন, 'তোমার ঘরে মোটে এক পাসারি চাল থাকবে কেন? তোমার না দশ কানি ধানের জমি!'

গয়জদ্দি কপালে চাপড় মেরে বলল, 'আর কইয়েন না, জামাই কত্তা, বুদ্ধির দোষ আর লোভ। দুইয়ে পইড়া এইবার গুষ্টিশুদ্ধ মরলাম।

'কি রকম?'

'ধান-চাউলের দর যখন চ্যাতলেও (চড়বার) মুখে হেই সময় ঘরের বেবাক ধান-চাউল দিলাম বেইচা। টাকা হাতে পাইয়া মাথা গেল গরম হইয়া। চাষীর হাতে কাঁচা টাকা ; বুঝলেন কিনা জামাই কত্তা! বড় পোলারে সাদি দিলাম। সাদির পর পনের দিন ধইরা খাওনের কি চোট। আত্ম-বান্দব মিলাইয়া চল্লিশজন, বাড়িতু বইসা খাইল। রুজ (রোজ) মাছ। এইবেলা চিতল তো ঐ বেলা কাতল। তার উপর গোস্ত, মিষ্টান্ন পাতক্ষীর। আর পোলারা কমলাঘাটের বড় গঞ্জ থনে নয়া জোতা (জুতো) কিনা আনল, পিরহান কিনা

কত জিনিস যে কিনল! অখন ঘরে চাউলও নাই, ট্যাকাও নাই। অখন খালি কপাল থাপড়াই আর পাছা থাপড়াই। সগলই বুদ্ধির দোষ।'

অবনীমোহনদের কথা বলতে দেখে আরো অনেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। যেমন মোতালেফ নিকারী, মনা ঘোষ, বৃন্দাবন ভুঁইমালী—এমনি পনের-কুড়িজন। তারাও একই কথা বলল। দর চড়তে দেখে অনেকেই ধান-চাল ছেড়ে দিয়ে কাঁচা টাকা দু-হাতে উড়িয়ে দিয়েছে।

মনা ঘোষ বলল, 'চাউলের কী করণ? একখান বুদ্ধি দ্যান দেখি জামাই কত্তা—

অবনীমোহন বললেন, 'কী বুদ্ধি দেব, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

বৃন্দাবন ভুঁইমালী বলল, 'সুজনগঞ্জে চাউল নাই। কাইল একবার মীরকাশিম, বেতকা, আউশহাটীতে যামু। দেখি পাওয়া যায় কিনা—'

মোতালেফ নিকারী এই সময় বলে উঠল, 'কুনোখানে চাউল নাই। আমার বুইনের জামাই পরশু ঘুইরা আইছে।'

'তয়?'

'তয় আর কী ; মরণ। একটা কথা শুনছ?'

'কী?'

'কাইল গিরিগঞ্জের বাজারে দুইটা দোকান লুট হইছে।'

'নিকি!'

'হ।'

'জম্ম ইস্তক চাউল লুটের কথা আর শুনি নাই।'

'প্যাটের জ্বালায় মাইনষের মাথা কি ঠিক থাকে। লুটপাট তো হপায় (সবে) আরম্ভ হইল। দ্যাখ না, কী কান্ড হয়!'

'আরেক খান কথা শুনছ?'

'কী?'

'ভাটির দ্যাশে চাউল না পাইয়া মাইনষে শাক-পাতা খাইতে আছে।'

'কী যে হইব!'

কথায় কথায় দুপুর হয়ে গেল। এখন সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর। অবনীমোহন কি বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় বিষহরি-তলার ওধারের মাঠ থেকে ঢাকের আওয়াজ ভেসে এল। চমকে বিনু দেখতে পেল, ঢ্যাঙাদাদার হরিন্দ উঁচু প্যাকিং বাক্সের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তার দুই চেলা কাগা-বগা সমানে ঢাক বাজিয়ে যাচ্ছে। এস ডি ও সাহেব একধারে চেয়ারে বসে আছেন ; একটা লোক তাঁর মাথায় ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে। চারপাশে অসংখ্য লাল পাগড়ি। নতুনদের ভেতর আজ কয়েকজন মিলিটারি অ'ফসারকে দেখা যাচ্ছে।

বিনু ফিস ফিস করে বলল, 'বাবা মিলিটারি এসেছে।'

অবনীমোহন বললেন, 'হাঁ।'

'আগে তো মিলিটারি দেখিনি।'

'তিন-চার হাট তো আসিস নি, তাই জানিস না। আজকাল ফি হাটে মিলিটারি আসছে।'

'কেন?'

'যুদ্ধের জন্যে লোক যোগাড় করছে। [illegible]'

বিনু আবদারের গলায় বলল, 'বাবা, আমি রিক্রুট করা দেখব।'

খুব একটা ইচ্ছা ছিল না অবনী-মোহনের। তবু ছেলে যখন ধরেছে তখন আর না বলতে পারলেন না। বললেন, 'চল—'

বিষহরিতলার কাছে আসতে দেখা গেল, ঝাঁকড়া বটগাছের তলায় যথারীতি তাঁর রুগীপত্তর নিয়ে বসে আছেন। এত যে ডামাডোল, আকাল, যুদ্ধ সমস্ত জল-বাঙলা জুড়ে যে এত দুর্ভিক্ষের দুর্ভাগ্যের ছায়া—সে সবের কোনদিকেই লক্ষ্য নেই তাঁর। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় এক প্রশান্ত ধ্যানের ভেতর তিনি মগ্ন হয়ে আছেন।

বিষহরিতলা বাঁয়ে ফেলে খোলা মাঠের কাছে আসতে দেখা গেল, ঢাকের বাজনা থেমে গেছে। এর ভেতর হাটের নানাদিক থেকে মানুষ গিয়ে সেখানে জমা হতে সুরু করেছে।

এস-ডি-ও সাহেব জমায়েতটার দিকে তাকিয়েছিলেন। মোটামুটি শ'-চার পাঁচেক লোক জমেছে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'যারা সৈন্যদলে নাম লেখাবেন তারা ডান দিকের ঐ ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান।'

ভিড়ের ভেতর থেকে একজন দুজন করে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে লাগল। বিনুর মনে পড়ল, তিন-চার সপ্তাহ আগে যখন সুজনগঞ্জের হাটে এসেছিল সেদিন রিক্রুটমেন্টের কথায় হাটের লোকেরা ভয় পেয়ে পিয়েছিল। এক মাসেরও কম সময়ের ভেতর কী এমন ঘটল যাতে তাদের ভয় কেটে গেছে!

হঠাৎ বিনুর চোখে পড়ল, তার ঠিক পাশে খালিল, বাছির, তাহের এবং আরো ক'জন চরের মুসলমান দাঁড়িয়ে আছে। ধান কাটার মরসুমে তারা হেমনাথের বাড়ি আসে। কিছুদিন আগেও তাদের রাজদিয়ায় মাটি ভরাট এবং মিলিটারি ব্যারাক তৈরি করতে দেখা গেছে।

বাছিরদের দেখে বিনু অবাক। বলল, 'তোমরা এখানে!'

বাছির বলল, 'যুদ্ধো নাম লিখাইতে আইছি।'

'তোমরা যুদ্ধে যাবে!'

'হ।'

এই সময় অবনীমোহন তাদের দিকে ফিরলেন। বাছিরদের শেষ কথাগুলো তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। বিস্ময়ের সুরে বললেন, 'যুদ্ধে যাবে কেন?'

বাছির বলল, 'কাম কাইজ নাই। কিছু এট্টা তো করণ লাগব।'

বিনু বলে উঠল, 'কাজ নেই কিরকম, এই তো ক'দিন আগে মিলিটারিদের ওখানে মাটি কাটছিলে। ব্যারাক তৈরি করছিলে।'

'হে আর কয়দিনের কাম। শ্যাষ হইয়া গেছে।'

খানিক ভেবে অবনীমোহন বললেন, 'আর কোথাও কোন কাজ পেলে না?'

'না জামাইকত্তা—' বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল বাছির, 'কুনোখানে কাম নাই। এদিকে ধান-চাউলও মিলে না। আগে দুই মাসের ধন্দ গেলে মানষের বাড়ি কাম

খাটতাম। অখনও কেও কামলা নেয় না। উপাস দিয়া দিয়া আর পারি না জামাই-কত্তা। পোলাপাল মরতে বইছে।'

তাহের বলল, 'শুনছি, যুদ্ধে গেলে প্যাট ভরা খাওন মিলব ; মাস মাস ট্যাকা পাওয়া যাইব। না খাইয়া মরার থনে যুদ্ধে যাওন ভাল নয়?'

অবনীমোহন কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।

তাহের আবার বলল, 'অখনে চরের কেউ আর বইসা থাকব না। সগলে যুদ্ধে যাইব গিয়া।'

খলিল বলল, 'হুদা (শুধু) আথনো চরের নিকি। চাইর দিকে যা আকাল লাগছে, যাগো ঘরে চাউল আছে তারা বাদে বেবাকে যুদ্ধে যাইব। না গিয়া উপায় নাই জামাইকত্তা। নিজেরা না খাইয়া থাকে হে এক কথা। কিন্তুক চৌখের সামনে পোলা মাইয়া প্যাটের জ্বালায় দাবাইয়া মরব, এ সয় না।

অবনীমোহন অসহায়ের মতন তাকিয়ে থাকলেন। এবারও কিছু বলতে পারলেন না।

ওদিক থেকে একটা কনস্টেবলের গলা ভেসে এল, 'যার যুদ্ধে যাইবেন, ঐ ধারে গিয়া লাইন দিয়া খাড়ন—যারা যুদ্ধে যাইবেন—'

প্রথমে এস-ডি-ও সাহেব যুদ্ধে যাবার ডাক দিয়েছিলেন। এখন তাঁর প্রতিভূ হিসেবে কনস্টেবলটা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। আর এস-ডি-ও সাহেব চেয়ারে বসে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর পাশে বসে আছেন মিলিটারি অফিসাররা।

বছিররা আর অপেক্ষা করল না। ডান দিকে যে লম্বা লাইন পড়েছে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

চোখের পলকে লাইনটা বিশ হাত বেড়ে গেল।

যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক লোকগুলির সংখ্যা যখন এক শ' ছাড়িয়ে গেছে সেই সময় এস-ডি-ও সাহেব বললেন, 'এবার বাছাইয়ের কাজ শুরু কর।'

তিন-চারটে কনস্টেবল ফিতে নিয়ে মস্ত ভাবে মাপামাপি শুরু করে দিল। একবার তারা লোকগুলোর পা থেকে মাথা পর্যন্ত মাপছে। তারপর বুকের ছাতি মাপছে।

সেনাদলে যাকে-তাকে নেয় না। সেখানে নাম লেখাতে হলে বিশেষ শারীরিক উচ্চতা এবং বুকের মাপ থাকা দরকার। তার কম হলে চলবে না।

কেউ লম্বায় ঠিক হচ্ছে তো বুকের মাপ আটকে যাচ্ছে। কারো বুকের মাপ ঠিক হচ্ছে তো লম্বায় আটকে যাচ্ছে।

এর ভেতর যারা চালাক, তারা পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দৈর্ঘ্য বাড়াবার চেষ্টা করছে। যাদের বুক রোগা পাখির বুকের মতন তারা বাতাস টেনে টেনে ফুলিয়ে রাখছে। কিন্তু কনস্টেবলদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। যারা ডিঙি মেরে লম্বা হচ্ছিল এক রুলের গুঁতোয় তাদের পেটে করে দিচ্ছে তারা। যারা বুক ফুলিয়ে রেখেছে তাদের পেটে ঘুষি মেরে হাওয়া বার করে দিচ্ছে।

যাদের মাপ মিলল মুর্গি বাছাইয়ের মতন তাদের একধারে দাঁড় করিয়ে রাখল কনস্টেবলরা, বাদ-বাকিদের ভাগিয়ে দিল। দেখা গেল শ'খানেক লোকের ভেতর অর্ধেকই বাতিল হয়ে গেছে।

বাছাইয়ের প্রথম কাজ হল দৈর্ঘ্য-প্রস্থের মাপ নেওয়া। তারপর বাক্সের মতন চৌকো একটা যন্ত্রের ওপর বসিয়ে পছন্দ-করা লোকগুলোর ওজন নেওয়া হল। ওজন করতে গিয়ে আরো কিছু লোক বাতিল হয়ে গেল।

ওজনের পর যারা টিঁকে রইল এস-ডি-ও সাহেব নিজের হাতে তাদের নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন। তারপর বললেন, 'পরশুদিন তোমরা রাজদিয়া মিলিটারি ব্যারাকে চলে যাবে।'

লোকগুলো শুধলো, 'কখন বাবু?'

'সকালবেলা। হ্যাঁ, ভালো কথা, খালি পেটে আসবে। সেদিন তোমাদের মেডিক্যাল হবে।'

'মেডিকাল কী?'

'স্বাস্থ্য পরীক্ষা।'

ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করে এস-ডি-ও সাহেব মিলিটারি অফিসার এবং পুলিশ বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন।

চরের যে মুসলমান কামলারা ধান-কাটার সময় হেমনাথের বাড়ি আসে তাদের ভেতর একজনকে মোটে পছন্দ করা হয়েছে। সে তাহের। প্রাথমিক পরীক্ষায় বাকি কারো যোগ্যতা প্রমাণিত হয়নি।

খলিল বছিররা অযোগ্যতার গ্লানি দুই কাঁধে ঝুলিয়ে হতাশ মুখে ফিরে এল। তাহেরও তাদের সঙ্গে এসেছে। অন্য কেউ যুদ্ধের চাকরি পাবে না ; সেজন্য বেচারা প্রাণ খুলে আনন্দ পর্যন্ত করতে পারছে না। যুদ্ধের লোকেরা সবাইকে বাদ দিয়ে তাকে পছন্দ করেছে, এ যেন তারই অপরাধ। খলিলদের পিছু পিছু মুখ চুন করে তাহের এসে দাঁড়াল।

বিনুরা এখনও সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

অবনীমোহন বললেন, 'তোমাদের এক-জনকে বেছে নাম লিখে নিল, দেখলাম।'

খলিল বলল, 'হ। তাহেরকে আগে পছন্দ হইছে। আর আমরা ফ্যালনা, গাঙ্গের পানিতে ভাইসা আইছি।'

অবনীমোহন চুপ করে থাকলেন।

খলিল আবার বলল, 'আমি উচায় (উচ্চতায়) খাটো হইলাম। আরে আমি যে খাটো হেয়াতে (তাতে) কি আমার হাত আছে? খোদায় যেমনে বানাইছে তেমুন হইছি। ইচ্ছা কইরা তো আর খাটো হই নাই।'

অবনীমোহন আস্তে করে মাথা নাড়লেন, 'তা তো বটেই।'

বছির এবার বলল, 'বুকের মাপে আমি খারিজ হইয়া গেলাম। ছাতির ওসার (প্রস্থ) নিকি আমার কম। কম হইব না তো কি বেশি হইব? উপাশ দিয়া দিয়া পরান যায়, ছাতি বড় হইব কেমনে? যাইচা যে আছি, হেই না কত।'

সবাই ক্ষুব্ধ, আশাহত, দুঃখিত। অবনীমোহনের উত্তর দেবার মতন কিছুই ছিল না।

খলিল বলল, 'সগলই নছীব জামাই-কত্তা। আমরা যুদ্ধে গিয়া যে দুগা (দুটি) খাইয়া বাচুম খোদাতাল্লায় তা চায় না।'

●

হেমনাথ সেই যে জ্বরে পড়েছিলেন, সারতে দশ দিন লেগে গেল। জ্বর সারলেও দুর্বলতা কাটল না। একটু হাঁটলেই পা ভেঙে আসে, মাথা ঘুরতে থাকে।

চিরকাল বয়েসকে অস্বীকার করে এসেছেন হেমনাথ। বয়েসও এতকাল উদাসীন ছিল। হঠাৎ সে তাঁর দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। এবং প্রথম সুযোগেই বিছানায় ফেলে দিয়েছে।

অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে কোথায় গিয়ে কী বিপদ ঘটাবেন, সেই ভয়ে স্নেহলতা তাঁকে বাইরে বেরুতে দেন না। পাছে বেরিয়ে যান, সেজন্য চোখে চোখে রাখছেন।

এতবড় সংসার যাঁর মাথায়, তাঁর তো এক জায়গায় বসে থাকলে চলে না। কোন দরকারে উঠে যেতে হলে ঝিনুকে কিংবা সুধা-সুনীতিকে পাহারাদার হিসেবে হেমনাথের কাছে বসিয়ে রেখে যান স্নেহলতা।

হেমনাথ চেঁচামেচি করেন, 'বসিয়ে বসিয়ে আমাকে একেবারে অথর্ব করে ফেলছ স্নেহ।'

স্নেহলতা হাসেন, 'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। দেখো, আমাকে ঠিক বাতে ধরবে।'

'তা হলে আমি খুশীই হব।'

ভ্রূকুটি করে হেমনাথ বলেন, 'খুশী হবে!'

নিতান্ত লীলাভরে ঘাড় হেলিয়ে দেন স্নেহলতা, 'হব, হব, একশবার হব।'

'কেন?'

'বাতে শুয়ে থাকলে অন্তত চরকির মতন ঘোরাটা তোমার বন্ধ হবে। এত বয়েস হল, তবু ঘোরা বাই যাচ্ছে না।'

একটু চুপ করে থেকে কৌতুকের গলায় হেমনাথ বলেন, 'তুমি তো অসুখের জন্যে আমাকে বেরুতে দিচ্ছ না। রাজদিয়ার লোক কিন্তু অন্যরকম ভাবতে শুরু করেছে।'

অস্বস্তিকর সুরে স্নেহলতা জিজ্ঞেস করেন, 'কী?'

'বুড়ো বয়েসে তোমার নাকি রস উথলে উঠেছে। দিনরাত আমাকে কোলে শুইয়ে রেখে মুখে মুখ রেখে—'

কথা আর শেষ করতে পারেন না হেমনাথ। তার আগেই স্নেহলতা মুখ লাল করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'আহা, কথার কি ছিরি! কিছুই আটকায় না মুখে!'

হেমনাথ হাসতে থাকেন।

স্নেহলতা আগের সুরে বলতে থাকেন, 'তোমার চালাকি আমি বুঝি। লোকের ওসব কথা বলতে বয়ে গেছে। বললেও তোমাকে বাড়ির বার হতে দিচ্ছি না।'

হেমনাথের বন্দিত্ব যেন আর ফুরোতে চায় না। এরই ভেতর একদিন বিকেলবেলা মীরকাদিমের রজবালি শিকদার এসে হাজির।

রজবালিকে আগে আরো বার-তিন চারেক দেখেছে বিনু। এই বাড়িতেই এসেছে সে। একদিন হেমনাথের সংগে নৌকোয় করে মীরকাদিমও গিয়েছিল। সেখানেই অবশ্য প্রথম দেখেছে।

রজবালির বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। গায়ের রঙ উজ্জ্বল। এই বয়েসেও শরীরের বাঁধুনি বেশ মজবুত। হাতের হাড় চওড়া, চোয়াল শক্ত, চিবুক ধারাল। দাড়ি এবং গোঁফ সৌখিন করে ছাঁটা। চোখদুটি সব-সময় সজাগ এবং তীক্ষ্ন। তাকে ফাঁকি দিয়ে কিছু হবার উপায় নেই। যার দিকে রজবালি তাকায় তার বুকের গভীর পর্যন্ত যেন দৃষ্টিতে বিঁধে যায়।

পরণে ডোরাকাটা সিল্কের লুঙ্গি, আর ফিনফিনে পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির তলায় জালি-কাটা গেঞ্জির আভাস। মাথায় নক্সাকরা ধবধবে টুপি। কানে আতর-মাখানো গোলাপী রঙের তুলো। পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। চোখের কোলে সুর্মার সুক্ষ্ম টান। সব মিলিয়ে মানুষটি রীতিমত সৌখিন।

মীরকাদিমের গঞ্জে রজবালির ধান চাল মুগ-মসুর তিল-তিসি ইত্যাদি নানারকম শস্যের ব্যবসা। শাল কাঠের খিলান-দেওয়া টিনের প্রকাণ্ড চারটে আড়ৎ রয়েছে তার। সব সময় সেগুলো বোঝাই, কম করে দশ পনের হাজার মণ জিনিস মজুদ থাকে। এছাড়া আছে হাঁড়ি-বাসনের দোকান, মনোহারি দোকান। সব মিলিয়ে বিরাট ব্যাপার।

হেমনাথ বললেন, 'রজবালি যে, আয়—আয়—' বিনু কাছেই ছিল। তাকে একটা জলচৌকি এনে দিতে বললেন।

জলচৌকি এলে তার ওপর বসতে বসতে রজবালি বলল, 'কেমুন আছেন হ্যামকত্তা? শরীল কেমুন যিনি দেখি। কাহিল কাহিল ঠ্যাকে।'

হেমনাথ তাঁর অসুখের কথা বললেন এবং কিছুদিন ধরে বন্দী-জীবন যাপন করছেন, তা-ও জানালেন।

রজবালি আন্তরিক সুরে বলল, 'আপনের এমুন অসুখ, খপর পাই নাই তো। পাইলে আগেই আসতাম।'

হেমনাথের মুখ দেখে মনে হল, রজবালির আন্তরিকতাটুকু খুবই ভাল লেগেছে তাঁর। মৃদু হেসে বললেন, 'তোদের খবর ভাল তো?'

'আপনেরা যেমুন রাখছেন।'

'আমরা রাখবার কে? যিনি রাখবার তিনিই রাখছেন।'

'হে যা কইছেন।'

'তারপর কী মনে করে? কোন দরকারে এসেছিস, না এমনি বেড়াতে?'

রজবালি হাসল, 'বাজসায়িক মানুষ, বিনা দরকারে কোনখানে যাওনের উপায় আছে? সময় কই?'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ।

রজবালি বলল, 'এইখানে যে মিলি-টারিরা আইছে আমি তাগো কাছে ছাপ্লাইয়ের এট্টা 'অডার' পাইছি।'

'কী সাপ্লাই?'

হাঁস-মুরগী-পাঁঠা-ডিম, চাউল-ডাইল—এই সগল।' অর্ডারের ব্যাপারটা পাকা করতে আজই আইছিলাম।'

বিনুর হঠাৎ নিত্য দাসের কথা মনে পড়ল। দেখা যাচ্ছে মিলিটারির কল্যাণে চারদিকের বড় বড় ব্যবসায়ী আর আড়ত-দাররা রাজদিয়ায় হানা দিতে শুরু করেছে।

হেমনাথ শুধালেন, 'অর্ডারের কথা পাকা হল?'

'হ।'

'কবে থেকে সাপ্লাই দিতে হবে?'

রজবালি বলল, 'পরশু থনে। ভাবতে আছি রাইজদায় এট্টা বাড়ি ভাড়া নিমু। এইখানে 'রাখি' কইরা না রাখতে পারলে রুজ রুজ ঠিক সময়ে মাল সাপ্লাই দিতে পারুম না। এরা তো এতি-পেতি লইয়া কারবার না; মিলিটারি বইলা কথা। টাইমে দিতে না পারলে ঘেটিতে মাথা থাকব না।'

রজবালি আরো জানাল, স্টিমারঘাটার কাছে মন্তাজ মিঞা যে নতুন বাড়িখানা করেছে, সেটাই ভাড়া করতে চাইছে। মোটামুটি কথাবার্তা হয়ে গেছে। কাল পরশু বাড়িটার দখল পাওয়া যেতে পারে।

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন, 'তোদের ওদিকে ধানচালের খবর কী বল—'

'জবর খারাপ হ্যামকত্তা। দশ পনের দিন ধইরা মীরকাদিমের বাজারে একদানা চাউল নাই। চাউল বইলা কথা। মাইনষে পাগলের লাখান ঘুরতে আছে।'

চিন্তিত মুখে হেমনাথ বললেন, 'খুবই বিপদের কথা। তা হ্যাঁ রে, তোর আড়তে তো অত ধান চাল ছিল। সব বিক্রি করে ফেলেছিস?'

চকিতে চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে রজবালি বলল, 'না। অত ধান চাউল কি দুই-চাইর-দশ দিন বেচা যায়। ছয় মাস ধইরা বেচলেও শ্যাষ করণ যাইব না।' একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, 'সগল বাবসায়ীকে যা করছে আমিও হেই করছি হ্যামকত্তা।'

'কী করেছিস?'

'ধান চাউল সরাইয়া ফালাইছি।'

'কেন?' বিমূঢ়ের মতন জিজ্ঞেস করলেন হেমনাথ।

রজবালি বলল, 'দর আরো চেতুক (চড়ুক)। হেয়ার পর ছাড়ুম। আমার এক কুটুম্বিদ (সম্বন্ধী) মানিকগঞ্জের ঐদিকে চাউলের ব্যবসায়ীত। হ্যায় (সে) কইছে, দর আরো চেত্তবো। যত পারি অখন য্যান ধান-চাউল 'রাখি' করি।'

হেমনাথ বললেন, 'রাখি' তো করছিস। এদিকে দেশের লোক না খেয়ে শুকিয়ে মরছে, সেদিকে খেয়াল আছে?'

কথাটা শুনেও শুনল না রজবালি। অন্যমনস্কের মতন বলতে লাগল, 'আমরা ব্যবসায়ীত। দ্যাশের মাইনষের দিকে তাকাইলে আমাগো কি চলে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনের তো মেলা জমিন। বাড়তি ধান চাউল কিছু আছে? থাকলে আমারে দিতে পারেন। ভাল দাম দিমু।'

হেমনাথ মাথা নাড়লেন, 'নেই। প্রত্যেক-বার ধান উঠবার পরই বাড়তি ধান বেচে দিই। এবারও দিয়েছি। বেশি কিছু থাকলেও তোকে দিতাম না; লোককে বিলিয়ে দিতাম।'

রজবালি কথাটা গায়ে মাখল না। হাসতে হাসতে বলল, 'আপনের লগে কার তুলুনা! আপনে নিজে না খাইয়াও মাইনষেরে খাওয়াইতে পারেন। কিন্তুক আমরা হইলাম ব্যবসায়ীত মানুষ।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

রজবালি বলল, 'অনেকক্ষণ আইছি। এইবার যাই হ্যামকত্তা।' উঠতে গিয়ে হঠাৎ কী মনে পড়তে বসে পড়ল সে, 'ভাল কথা, আপনেরে একখান খপর দেওয়া হয় নাই—'

'কী খবর?'

'আমি মুছলিম লীগে নাম লিখাইছি।'

'মুছলিম লীগ!'

'হ।' রজবালি মাথ নাড়ল: 'কয়দিন আগে ঢাকার থনে বড় মিঞারা মীরকাদিমে আইসা মীটিন্ করল। মীটিনে তেনারা কী কইল জানেন?'

'কী?'

'মুছলমানগো লেইগা একখান দ্যাশ চাই। তার নাম হইব পাকিস্থান। ভাইবা দেখলাম, কথাখান ঠিক। তেনারা আরো কইল, যেখানে যত মুছলমান আছে সগলের মুছলিম লীগে নাম লিখান দরকার। অত বড় বড় মানুষগুলা কইছে, কেও আর না কইতে পারল না। আমাগো ঐদিকের কারো আর মুছলিম লীগে নাম দিতে বাকি নাই। আমিও নাম দিছি। আইচ্ছা অখন যাই।'

একটু পর রজবালি চলে গেল।

●

কনট্রোল হবার আগেই চিনি, কেরাসিন আর কাপড় বাজার থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তারপর এই রাজদিয়ায় তিনখানা কনট্রোলের দোকান বসল। একটা নিত্য দাসের, একটা অখিল সাহার আর তৃতীয়টি রায়েবালি সর্দারের।

প্রথম প্রথম রেশন কার্ড দেখিয়ে জিনিস তিনটে পাওয়া যাচ্ছিল। তারপর কনট্রোলের দোকান থেকেই সেগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিলিটারি ব্যারাকগুলো বাদ দিলে রাজদিয়ার ঘরে ঘরে আজকাল আর হেরিকেন জ্বলে না। গন্ধক শলা কি রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে সবাই রাতের কাজ সারে। চারদিকের গ্রামগুলোর অবস্থা আরো করুণ। সেখানকার মানুষেরা বিকেল থাকতে থাকতেই খেয়েদেয়ে (যে খাবার জোটাতে পারে) ঘরে খিল লাগিয়ে দেয়। ফলে সন্ধ্যা নামতে না নামতেই গ্রামগুলো নিশুতিপুরী। সারা পূর্ব বাঙলা জুড়ে পাতালের অন্তহীন গাঢ় অন্ধকার যেন অনড় হয়ে আছে।

যাই হোক বিনুদের রেশন কার্ড পড়েছে নিত্য দাসের দোকানে। চিনি আর কেরাসিন

আনতে বিনুই সেখানে যায়। যখনই যায়, তার চোখে পড়ে, দোকানটার সামনে ভিড় লেগে আছে। শুধু নিত্য দাসের দোকানেই না, অখিল সাহা আর রায়েবালি সর্দারের দোকান দুটোরও একই হাল।

বাইরে রেশনকার্ড আর বোতল হাতে ঝুলিয়ে জনতা তীর্থের কাকের মতন তাকিয়ে থাকে। ভেতরে দেখা যায়, নিত্য দাস একটা তক্তপোষে বসে আছে। তার সামনে ক্যাশবাক্স, রসিদ বই। ডানধারে বড় বড় কেরাসিনের ড্রামগুলো শূন্য, চিনির বস্তাগুলো ফাঁকা। পেছন দিকে কাপড় রাখার জন্য যে সারি সারি কাচের আলমারি বসানো আছে সেগুলোতে কিচ্ছু নেই।

বাইরের জনতা করুণ গলায় গোঙানির মতন আওয়াজ করে ডাকে, 'অ দাস মশয়, অ দাসমশয়—'

একশ'বার ডাকলে তক্তপোষের ওপর থেকে একবার মোটে সাড়া দ্যায় নিত্য দাস, 'কী কও—'

'এট্টু ক্রাচিন দ্যান। আন্ধারে থাইকা থাইকা আর পারি না। হেইদিন রাইতে ঘরে সাপ ঢুকছিল।'

'ক্রাচিন নাই।'

'এট্টু ব্যবস্থা করেন দাসমশয়—'

'ব্যবস্থা কি আমার হাতে! ঐ দ্যাখ না, ক্রাচিনের ড্রেরামগুলান শূইন্য (শূন্য)।'

'দয়া করেন দাসমশয়—'

'দয়ার কী আছে। তোমরা ট্যাকা দিয়া মাল কিনবা। কিন্তুক ব্যাপারখান জানো?'

'কী?'

'ছাপ্লাই নাই। ছাপ্লাই না থাকলে আমি কই থনে কী করি! তোমরা বুঝমান মানুষ হইয়া বোঝো না ক্যান?'

'ক্রাচিন নাই তো এট্টু চিনি দ্যান—'

'চিনিরও ছাপ্লাই নাই। ঐ দ্যাখ চিনির ছালাগুলো (বস্তাগুলো)। শূইন্য পইড়া রইছে।'

'মিঠার লেইগা পোলাপানগুলো কাইন্দা মরে। কনটোলে চিনি পাইলে কিনতে পারি। কিন্তু বাইরে গুড়ের দর একেবারে আগুন। কাছে আউগাম যায় না।'

'ক্যান যে তোমরা এত ঘ্যান ঘ্যান কর? কইতে আছি চিনি নাই, নিজের চৌখে দ্যাখলে দেখতেও আছ। তভু বিশ্বাস যাও না।'

'চিনি না দ্যান কাপড় দ্যান—'

'কাপড়েরও ছাপ্লাই নাই' আঙুল দিয়ে সারি সারি ফাঁকা আলমারিগুলো দেখিয়ে দেয় নিত্য দাস।

জনতা বলে, 'চিনি-ক্রাচিন না দ্যান তো না দিলেন। কিন্তুক একখান শাড়ি না দিলে চলব না দাসমশয়। কাপড় বিহনে ঘরের বউ-মাইয়া বাইর হইতে পারে না। গামছায় কি লজ্জা ঢাকে। তারা কয় গলায় দড়ি দিব।'

অসীম ধৈর্য নিত্য দাসের। সবার কথা, সবার মিনতি, সবার আবেদন কান পেতে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে যায়। তারপর বলে, 'কাপড় কই পাই? ছাপ্লাই না থাকলে আমি কী করতে পারি। আমার তো আর ধুতি-শাড়ির মেচিন নাই যে বানাইয়া দিমু।'

'আপনের ভুলো কথা শুনুম না। কাপড় না পাইলে এইখানে 'হত্যা' (হত্যে) দিয়া পইড়া থাকুম।'

'হত্যা দিলে কি কাপড় মিলব! তার থনে এক কাম কর—'

'কী?'

'গরমেণ্টেরে গিয়া ধর।'

'গরমেণ্ট বুঝি না, আপনেই আমাগো সব। বাচান দাসমশয়, ঘরের বউ-ঝির ইজ্জত বাচান।'

এই সব আবেদন-নিবেদন কাকুতি-মিনতির মধ্যে হঠাৎ বিনুকে দেখতে পেলেই হাতের ইশারা করে নিত্য দাস। ভিড় ঠেলে ঠেলে বিনু দোকানের ভেতর চলে আসে।

নিত্য দাস তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে, 'কি ছুটোবাবু, ক্রাচিন নিতে আইচ?'

বিনু মাথা নাড়ে, 'হ্যাঁ।'

'যাও গা, রাইতে পাঠাইয়া দিমু।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার দোকানে তো কেরাসিন নেই।'

'থাউক না-থাউক, হে তোমার দেখতে হইব না। তুমি ক্রাচিন পাইলেই তো হইল।' নিত্য দাস বলতে থাকে, 'রাইতে যে ক্রাচিন পাঠামু হেই কথাটা গুপন (গোপন) রাইখো। একবার জানতে পারলে ঐ শকুনের গুষ্টি আমারে ছিড়া খাইব।' বলে সামনের জনতাকে দেখিয়ে দেয়।

বিনু যেদিনই কেরাসিন আনতে যায়, ঐ একই কথা বলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয় নিত্য দাস। তারপর রাত্রিবেলা তার লোক ঢাকাঢুকি দিয়ে কেরাসিনের টিন নিয়ে আসে।

ওইভাবেই চলছিল।

নিত্য দাসের যে গোমস্তা কেরাসিন দিয়ে যায় তার নাম সুচাঁদ। হঠাৎ একদিন সে হেমনাথের সামনে পড়ে গেল।

হেমনাথ বললেন, 'তুই নিত্য দাসের দোকানে কাজ করিস না?'

সুচাঁদ বলল, 'আইজ্ঞা।'

'এই রাত্রিবেলা আমার বাড়ি কী মনে করে?'

'আইজ্ঞা ক্রাচিন।'

'কেরাসিন!'

'হ—' সতর্ক চোখে চারদিক দেখে নিয়ে কাপড়ের আড়াল থেকে ছোট্ট একটা টিন বার করল সুচাঁদ।

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন বললেন. 'কী ব্যাপার! এভাবে চোরের মতন কেরাসিন নিয়ে এসেছিস! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

তাঁর বাড়িতে এভাবে গোপনে যে কেরাসিন পাঠানো হচ্ছে, হেমনাথ জানতেন না। তাঁর বিমূঢ় হবারই কথাই।

বিনু কাছেই ছিল। সে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলল'

শুনে চিৎকার করে উঠলেন হেমনাথ, 'হারামজাদার এত বড় সাহস, কেরাসিন ঘুষ দিয়ে আমাকে খুশী করতে চায়!' সুচাঁদকে বললেন, 'বেরো—বেরো আমার বাড়ি থেকে।'

সুচাঁদ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, 'আইজ্ঞা!'

উত্তেজিত সুরে হেমনাথ আবার বললেন, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছিস! কেরাসিনের টিন নিয়ে এক্ষুনি চলে যা—'

সুচাঁদ পালিয়ে গেল।

চেঁচামেচি শুনে স্নেহলতারা বেরিয়ে এসেছিলেন।

স্নেহলতা বললেন, 'কী হল, অত চেঁচাচ্ছ কেন?'

উত্তেজনা যেন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল হেমনাথের. 'ঐ নিত্য দাসের স্পর্ধা দেখেছ!'

'কেন, কী করেছে সে?'

'কী করে নি? রেশনের চিনি-কেরাসিন-কাপড় ব্ল্যাকে দশ গুণ দামে বিক্রি করছে। রাজদিয়া-কেতুগঞ্জ-রসুলপুর, চারদিকের গ্রামগুলোর কোন লোক ন্যায্য দামে এক দানা চিনি পাচ্ছে না. একফোঁটা কেরাসিন পাচ্ছে না, কাপড়ের একটা সুতো পাচ্ছে না। আর রাত্রিবেলা লোক দিয়ে আমাকে ঘুষ পাঠানো হচ্ছে! ওকে আমি পুলিশে দেব; জেলে পাঠাব।'

স্নেহলতা শুধোলেন, 'সুচাঁদ কি কেরাসিন এনেছিল?'

হেমনাথ বললেন, 'এনেছিল। আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'তাড়িয়ে তো দিলে, হেরিকেন জ্বলবে কেমন করে?'

'জ্বলবে না। গন্ধকশলা আর রেড়ির তেল দিয়ে কাজ চালাও। তা যদি না পার, অন্ধকারে থাকবে। সারা দেশে আলো নেই, আর তুমি নিজের ঘরে দেয়ালি জ্বালাবে—এ হতে পারে না স্নেহ।'

বিনু অভিভূতের মতন হেমনাথের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সিগারেট খাওয়ার জন্য মজিদ মিঞার হাতে সেই যে মার খেয়েছিল, তারপর থেকে শ্যামল আর অশোকের সঙ্গে মেশে না বিনু। হেমনাথ-অবনীমোহন-সুরমা-স্নেহলতা সবাই ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতে বারণ করে দিয়েছেন। নিষেধাজ্ঞা জারী হবার পর স্কুল ছুটির পর আর ওদের সঙ্গে বেড়ায় না বিনু; সোজা বাড়ি চলে আসে।

আজও ফিরছিল সে।

পশ্চিম আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের রঙ এখন বাসি হলুদের মতন। বিকেলের নিবু-নিবু অনুজ্জ্বল আলো গায়ে মেখে ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁস আর পানিকাউ উড়ছিল। উত্তর আকাশে তুলোর স্তূপের মত সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘ।

বরফ কল, মাছের আড়ত পেরিয়ে স্টিমারঘাটার কাছে আসতেই কে যেন ডাকল, 'বিনুদা—বিনুদা—'

চমকে ঘুরে দাঁড়াতেই বিনু দেখতে পেল, জেটির কাছে ঝুমা।

(ক্রমশঃ)

ফোটো তোলার কথা

দুর্লভ চক্রবর্তী

মানুষ নামক প্রাণীর অনেকগুলো রিপু আছে, আর সংখ্যায় তারা যে ছটি এও সকলের জানা। কিন্তু মনে পড়ল, কবে কোন অতীতে গ্রামে দেখা যাত্রার একটি দৃশ্য। দ্রৌপদীর হাত ধরে টানাটানি করতে করতে দুঃশাসন বলেছিল, এস সুন্দরী, আছে পঞ্চস্বামী, ষষ্ঠে কিবা ভয়। আমিও সেই রকম ষড়-রিপুর সঙ্গে একটি বাড়তি রিপুর নাম প্রস্তাব করতে চাই। তার নাম হল ফোটো-তৃষ্ণা।

না, ফোটো-তৃষ্ণা কথাটা কিন্তু ফোটো-ফোবিয়া, অর্থাৎ আলো সইতে না পারার বিপরীত কোনো পরিস্থিতি নয়। আমি বলছিলাম নেহাতই আমাদের সুপরিচিত সেই ফোটোগ্রাফের কথা। ফোটো তোলানো এবং ফোটো রাখার বিষয়ে আমাদের যে সর্বজনীন ব্যাকুলতা সেইটেকেই দিতে চেয়েছি আমি সপ্তম রিপুর পদবী।

অবিশ্যি সর্বজনীন কথাটায় অনেকে হয়তো আপত্তি করবেন। তাঁরা হয়তো বলবেন, সংসারে এমন লোকও আছেন, ফোটোর বিষয়ে যাঁদের আগ্রহ নেই। নিশ্চয় তা থাকতে পারেন। কিন্তু অনেক সাধু ব্যক্তিও আছেন যাঁদের মধ্যে ষড়রিপুর পয়লা রিপুটি তো বটেই, আরো দু-তিনটি যে নেই তাও আমরা অনুমান করতে পারি। তাই বলে কি একথা কেউ বলি যে ষড়রিপু উঠে গেছে? আমাদের কাজ হলো সাধারণ মানুষকে নিয়ে। তারা যেমন কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত, ফোটোগ্রাফেও তাদের তেমনি আসক্তি।

মনে পড়ে সেই ছেলেবেলার কথা, তিন-পায়ের ওপর দাঁড় করানো বিরাটকায় ফোল্ডিং ক্যামেরাকে অদ্ভুত একটি যাদু-বাক্সের মতো মনে হয়েছিল সেদিন। আর সারা বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে গ্রুপ-ফোটো তোলার সেই উত্তেজনা। মা ও জ্যাঠাইমার পায়ের কাছে সতরঞ্চির ওপর বসে সেই নির্বাক বিস্মিত প্রতীক্ষার লগ্নটির কথা স্পষ্ট মনে আছে আজো। আর ফোটোগ্রাফার যখন কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে কী দেখছিল, আর বেরিয়ে এসে সে যখন বলল, ওয়ান টু থ্রি— তখন সত্যিই তাকে মনে হচ্ছিল যেন একজন যাদুকর। সত্যিই তো যাদুকর না হলে এতদূরে বসে আছি আমি, আর আমাকেই কী করে সে বন্দী করে রেখেছে ফোটোর মধ্যে। নিজের প্রথম ফোটোর দিকে তাকিয়ে আমার সেই বিস্ময়ের ঘোর আমি আজো ভুলতে পারি নি।

কিন্তু মনে করবেন না এ আমার আলাদা কিছু ব্যাপার। সকলেরই এমন ঘটে। তবে কেউ হয়তো চেপে থাকেন, কেউ বা করেন জাহির। বাস্তবিক সম্পন্ন লোকেদের কথা বাদই দিলাম, এমন বাড়ি কি মধ্যবিত্তের সংসারে পাওয়া যাবে যেখানে একখানিও ফোটোগ্রাফ নেই? নিজের অথবা প্রিয়জনের? কিম্বা, নিজের এবং প্রিয়জনের? কবে যেন গল্প শুনেছিলাম, একটি ছোটো মেয়েকে নাকি ফোটোগ্রাফার ঠাট্টা করে বলেছিল এসেন্স দিয়ে আসতে, আর তাই শুনে মেয়েটি দৌড়ে মার কাছে যাচ্ছিল এসেন্স দিতে—তার এই ব্যগ্রতা মোটেই আজগুবি নয়। তেমনি অস্বাভাবিক নয় বিদেশে সফররত কোনো এক সংস্কৃতিবানের ব্যাকুলতা, প্রত্যেক এয়ারপোর্টে প্রত্যেক ফটোগ্রাফারের কাছে তাঁর সেই আকুল জিজ্ঞাসা, এই আমার ঠিকানা, এক কপি পাঠিও কিন্তু! পাঠাবে তো?

এ ব্যাকুলতা কীসের জন্যে? শুধুই কি নিজেকে নিজে দেখার ইচ্ছে—কেবলই কি আত্মরতি? আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমরা জানি সময়ের স্রোতে আমরা ভাসছি। কিম্বা আরো ভালো করে বলতে গেলে বলা যায়, সময় নামক সর্বশক্তিমান প্রবাহটি আমাদেরই পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে। তাই পরিবর্তনই হল সময়ের ধর্ম, বদলানো ছাড়া উপায় নেই। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে হয় আমাদেরও। আমরা বদলে যাই শরীরে এবং মনে। কিন্তু ফোটোগ্রাফ? তার তো নড়চড় নেই। চলমান সময়ের স্রোতে একটি মুহূর্তকে সে চট করে ধরে ফেলল বুকে, আর তৎক্ষণাৎ সেই মুহূর্তটি যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল চোখের সামনে। সেই মুহূর্তটি পেয়ে গেল অমরতা। কাজেই, আমার অন্তত জোরালো বিশ্বাস, অমরতার কামনাই ফোটোর দিকে আগ্রহের প্রবলতম কারণ।

বাস্তবিকই, আমি বদলে যাচ্ছি অথচ আমি স্থির আছি, বাস্তবে না হোক ছবিতে তো বটেই, এর টান কি সহজে কাটানো যায়? নিজের বিভিন্ন বয়সের ছবি, বিভিন্ন জায়গায় এবং অনুষ্ঠানে তোলা নিজের ছবি দেখলে গোটা জীবনেরই যেন একটা আলেখ্য ফুটে ওঠে চোখের সামনে। অনেকে তাই অ্যালবাম রাখেন। পরিচিত এবং অর্ধ-পরিচিত ব্যক্তিদের সেই অ্যালবাম দেখিয়ে তৃপ্তি অনুভব করেন। এক-একটা ছবির পিছনে কতো মজার ঘটনা, বেদনার স্মৃতি, অকথিত ইতিহাস। ধীরে ধীরে সেগুলো সহৃদয় কোনো শ্রোতার কাছে উদ্ঘাটিত করে যে আনন্দ সেকি উপন্যাস রচনার তৃপ্তির চেয়ে কিছু কম! আর সে ইতিহাস শুনে শ্রোতা ব্যক্তিটিরও কি মনে হয় না অ্যালবামের ভেতর মানুষটির যে পরিচয় পাওয়া গেল তা একটু গভীরতর, একটু যেন অন্তরঙ্গ!

অনেকের হয়তো এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে 'উত্তর-রাম-চরিত'-এর কথা। মহাকবি ভবভূতি সেখানে আলেখ্য দর্শনের ভেতর দিয়ে রাম এবং সীতার যে চরিত্র এঁকেছেন, তা কি একটু অন্যরকম নয়?—কবিগুরু বাল্মিকীর রচিত কাঠামোটি পুরোপুরি বজায় রেখেই তাতে কি যোজিত হয় নি একটি অন্য ডাইমেনশান? আলেখ্যের সুযোগ না নিলে সেই অন্তর্গহনের কোনো নাগাল পাওয়া যেত কি?

অবিশ্যি একথা আমার ভালোই জানা আছে, ভবভূতির আলেখ্য আর একালের ফোটোগ্রাফ এক বস্তু নয়। আলেখ্য হল চিত্রকথা, অর্থাৎ শিল্প। আর ফোটোগ্রাফ নেহাতই ফোটোগ্রাফ, তা শিল্প নয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ফোটোগ্রাফ যদি শিল্পকলা না হয় তাহলে এ যুগের বৃহত্তম শিল্পমাধ্যম সিনেমা দাঁড়াবে কোথায়? ক্যামেরার কৌশলী ব্যবহারে বাস্তবতার মধ্যেও যে কতো যাদু আবিষ্কার করা যায় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সিনেমায়। কাজেই ফোটোগ্রাফ শিল্প নয়, এ মত এখন অচল। এবং তা অচল বলেই ফোটোর এগজিবিশান আজকাল চিত্র-প্রদর্শনীর মতোই রসিক ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে।

কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে ফোটোগ্রাফ কোনো কুলীন ঘরানার শিল্পকার্য নয়, তাহলেই বা কী? ফোটোগ্রাফ যে আজকের দিনে বিজ্ঞান-চর্চার একটি প্রধান সহায় তা তো ভুলে গেলে চলবে না। সেই গরিমাই কি উড়িয়ে দেবার মতো? আমি তো বরং অকপটে কবুল করব, চাঁদের মাটিতে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে এ ফোটো দেখে আমার মনে একই সঙ্গে বিস্ময় আনন্দ এবং উত্তেজনার যে আলোড়ন বয়ে গেছে তা সেকালের গ্রেট মাস্টারদের আঁকা কোনো শিল্পকৃতি দেখার অভিজ্ঞতার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। জানি, এ শিল্প নয়, বিজ্ঞানের ফসল। কিন্তু যে দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে মানুষের দশ হাজার বছরের অতীত এবং অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তা একই সঙ্গে মাথার ভেতর দপ্ করে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা যে শিল্প এবং বিজ্ঞানের চলতি ছকের বাইরে তাই বা অস্বীকার করি কী করে? সত্যি বলতে কি, ফোটোগ্রাফের সাহায্য না পেলে এ রসাস্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত থাকতাম নাকি?

আমি তাই বলতে চাই, ফোটোগ্রাফই হল এ যুগের মহত্তম সম্ভাবনাযুক্ত আর্ট। মহত্তম এবং অন্তরঙ্গতম। কেননা ফোটোগ্রাফে কেবল চাঁদের মুখই ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে আমাদেরও চাঁদপানা মুখ। যে মুখ অনিবার্যভাবেই সময়ের স্রোতে তিথির পর তিথির ঢেউয়ে এগিয়ে চলে অমাবস্যার দিকে। কিন্তু ফোটোর মধ্যে যে-মুখে বিরাজ করে চির-পূর্ণিমা।

'দেখ্ ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি—তোর ওপর একটা টান আছে স্বীকার করি কিন্তু সেই আস্পর্দায় তুই মতি হালদারেরও মাথা কাটাবি? আর চুপ করে সইবো আমি মনে করিস! চিনিসনে তুই আমাকে?'

বদরীর একথায় ফিক্ করে একটু হেসেছিল দামিনী,—'চিনি বইকি তবে 'বগে গুন্ডা'কে নয়, 'বদু পাগলা'কে চিনি।' তারপর আবার পান খাওয়া ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল—'আর চুপ করে থাকতেই হবে এমন মাথার দিব্যি দামিনী দাসী কাউকে কোনদিন দেয় না তা সে পাগলই হোক আর গুন্ডোই হোক...হ্যাঁ!'

'বটে! তোর এত বাড় কেন বলতো শুনি?'

'তোর বাড়ের চেয়েও বেশী?'—ওর স্থির শান্ত চোখদুটো ক্রুদ্ধ বদরীর আরক্ত চোখের তারায় থেমে ছিল কিছুকাল। বদরীই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল শেষকালে। আর চোখ ফেরাতেই প্রথমেই ওর নজর পড়েছিল উঠোনের কোনায় ফেলে রাখা গরুর খড় কুচোনো ধারাল কাটারীখানার দিকে। লাফিয়ে নেমেছিল দাওয়া থেকে। কাটারীখানা তুলে নিয়ে চীৎকার করে বলেছিল, 'বারণ করেছি...তবু ফের মুখের ওপর তেজ দেখাবি! আমি গুন্ডা না? দাঁড়া তবে দেখাই তোকে...'

আলপনা আঁকা নাচদুয়োরের ডানপাশে কত বছর আগের পোঁতা ওর সখের শোভাময় ফুলন্ত কৃষ্ণ-মল্লিকার গাছটাকে নিমেষে কুপিয়ে খন্ড খন্ড করে ফেললে বদরী। আর্ত চীৎকার করে উঠল দামিনী 'গাছ কাটলে—আমার ফুলগাছ?'

'কেবল ফুলগাছ কেটেছি তোর বাপের পুণ্যি......যদি গরুটা থাকতো হাতের কাছে তবে গরুটাকেই নিকেশ করতাম!'

দামিনী নিজে ততক্ষণে নেমে গেছে উঠোনে। বদরীর কাটারী ধরা হাতখানাকে চেপে ধরেছে। অশ্রুজড়ান গলায় বলেছে 'গরু কেন? আমি ছিলাম না? আমার গলায় কোপ্ দিতে পারলিনে কাপুরুষ... গাছ কাট্‌লি আমার?' ওর চোখের জল টপ্‌টপ করে পড়তে লাগল বদরীর কাটারী ধরা হাতের পাতায়। শক্ত মুঠি নিমেষে খুলে গিয়ে ঝনাৎ করে মেঝেয় পড়ল কাটারীখানা। কপালের ঘাম মুছে পা ঝুলিয়ে ও গিয়ে উঠে বসল দাওয়ায়। আর একটা কথাও না বলে দামিনী সদর দরজার কাছ থেকে ফুলের কাটা ডাল-গুলিকে সরিয়ে এনে কোলে তুলে নিয়ে হাত বোলাতে লাগল বার বার। যেন নিজের সন্তানের গায়েই হাত বোলাচ্ছে কোনো মা, মমতাভরে কিম্বা পরম বেদনায়!

গুম্ হয়ে বসে বসে দেখতে লাগল বদরী—অনেকক্ষণ। কই ওঠে না কেন দামিনী? অবশেষে ওর কাছে গিয়ে একটু নরম, একটু অনুশোচনাপূর্ণ গলায় বললে 'ওঠ্। রাগ হয়ে গেল তাই কেটে ফেল্‌লাম বুঝলি? জানিস তো কেমন গোঁয়ার আর কোন বাপ্-মার ব্যাটা আমি?'

তা সে কথাও সত্যি বটে। জানে শুধু দামিনী কেন বউলপুর তল্লাটের সমস্ত লোক। বাপ্ ওর কৈবর্ত চাষীর ছেলে রামদাস। যেমনি নিষ্কর্মা আর তেমনি গোঁয়ার ছিল। আর মা হল ফুলু কামারনী —ডাকসাইটে মেয়েমানুষ। যেমনি গতর ছিল ওর—তেমনি মুখ! তবু দুনিয়ার আচার নিয়মের বাইরেই ওরা ঘর-সংসার করে কাটিয়ে গিয়েছে চিরটাকাল। সন্তানও এই একটাই।

গ্রামের জমিদার মদনলালবাবুর মায়ের সেবারে বদরীনাথধাম তীর্থে যাওয়ার কথা। ফুলুরও খুব সাধ হয়েছিল সঙ্গে যাবার কিন্তু সেই বছরই জন্মেছিল ছেলেটা। যাওয়া হয়নি, কিন্তু ছেলের নাম রাখবার সময় আদর করে ফুলি রেখেছিল 'বদরীদাস!' কোলে করে ছেলে দেখাতে নিয়ে যাওয়ায় বৃদ্ধা জমিদার-গৃহিণী ওর হাতে দুটি কাঁচা টাকা দিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন 'তা হ্যাঁ ফুলু নাম শুনলুম ছেলের রেখেছিস বদরিপ্রসাদ?'

ছেলের নেড়া মাথাটায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে ফুলি বলেছিল, 'পেসাদ নয় মা দাস...বদরিদাস। ওকে বদু বদু করে ডাকবো আমি।'

'ভাল করে মানুষ করিস বাপু।'

এক গাল হেসে ফুলি বলেছিল, 'ওকে নেকাপড়া শেখাবো মা ঠাকরুণ, মুরুখ্যু করে রাখবো না।'। ও বড় হলে প্যায়দা হবে হাকিমের ...কত খাতা বইবে!'

সেই ফুলির সাধের ছেলে বদরীদাস। যার সম্বন্ধে এতবড় উচ্চ আশা ছিল, সে কিন্তু মানুষ হয়েছিল অন্যরকম। ফুলির হাতে পায়ে ধরায়, গ্রামের জমিদার বদরীকে বেশ ছোটবেলাতেই ভর্তি করে দিয়েছিলেন নিজের এলাকার একটা ইংরাজী স্কুলে। বই খাতাও জোগাচ্ছিলেন নিজে। ছেলেটাও পড়াশোনায় মন্দ ছিল না, কিন্তু কেমন যেন বেয়াড়া হয়ে উঠছিল দিনকে দিন। লোকে বলত, একে মায়ের মত শরীরের শক্ত বাঁধুনী আবার বাপটাও গোঁয়ার তায় জমিদারের এত আস্পদ্দা দেওয়া—হবে না এমন তো কেমন আর হবে? কোনো সংস্কারের ধারও ওবা ধারে না, কাজেই রক্তেই যেন জমে রয়েছে মারামারীর নেশা! মধ্যে মধ্যে এমন কান্ড স্কুলেই করে বসে যে হুলুস্থূল পড়ে যায়। তবু যতদিন মদনলালবাবু জীবিত ছিলেন ওর স্কুলের পাট চোকেনি। রামদাস মারা গেলেও ফুলি বেঁচেছিল ওর মিডল্ ক্লাস অবধি পড়া পর্যন্ত। তাছাড়া রামদাস তো বেঁচে থেকেও দুনিয়ার বার ছিল। ফুলিই সংসার চালাত খেটেখুটে, জমিটা নিজেদের অন্যকে ভাগে তুলে দিয়ে কোনরকমে। সাতপাড়া ঝগড়া করে এসেও ছেলের কাছে কিন্তু নিজের হাসিমুখটিই দেখাত ফুলি। খুব ভোর-বেলাও ইস্কুল যাবার সময় 'পান্তর' বদলে মুড়ি আর গুড় ছেলের সামনে ধরে দিয়ে আদর করে বলত 'দুপুর বেলা গরম গরম ভাত করে রাখবো ধন আর শোল্ মাছের ঝোল্। ইস্কুলে নেকা যেন ভাল হয় আর কারো সঙ্গে ঝগড়া না করে বাড়ি ফিরে আসিস বাপ্!'

তখনকার ক্লাস সেভন্ বা মিডল্ ক্লাসে উঠেই সব খতম্। মদনলালবাবু মারা গেলেন। এদিকে দুমাস যেতেই মরল ফুলিও। ছেলের জন্য রোজ রোজ মাছ ধরতে যেত খালে বিলে, মরা ঝিনুকের খোলায় একদিন হাত কেটে গিয়েছিল ব্যাস্! এতেই শেষ। খুব যন্ত্রণা পেয়েছিল শেষ কদিন ফুলি সত্যি; কিন্তু শেষ মুহূর্তে বদরীর হাতের জলটুকু খেয়েছিল ও এইটুকুই পরম তৃপ্তি, করুণ জল খেয়ে চোখ বুজে বার বার বলেছিল, 'জুড়োলো রে আমার ভেতর বার সব জ্বালা জুড়োল বাপ্ বদরি হরি আমার...হরি রে...।'

সংসারের পাট চোকবার পর আর কেই বা চালায় পেট, আর কেই বা করে জমিগুলোর দেখাশোনা। ঘরে পড়ে থাকে কেবল চুপচাপ বদরীদাস।

ওদিকে ক' হাত জমি আর গোটা-কতক বকুল আর আমগাছ বাদ দিয়েই দামিনীদের ঘর। দামিনী নিজেই রেঁধে এনে ভাত জোগাতে লাগল রোজ রোজ। বাসন ধুয়ে উঠোন নিকিয়ে দিয়ে যেতে লাগল। ঘরে ঝাঁটা বুলোতে বুলোতে কোনদিন আপন মনে বলতে লাগল, 'মা মা করে এমন হেদিয়ে পড়ে থাকাটা কি ভাল হয় বদু? ব্যাটাছেলের কি এই কিতেব হয়? আর সে বন্ধুগুলোই বা গেল কোথায় এত নেশাভাঙ শিখিয়েছিল যারা?'

চুপ করে শোনে বদরী, কথা কয় না। এক এক সময় তখন মনে হয়েছে দামিনীর ওর আড্ডা টাড্ডার বন্ধুগুলো গেল কোথায় বাবা! এলেই তো পারে এক-আধবার। একদিন ভরসন্ধেবেলা রুটি ক'খানা নিয়ে এসে দেখে বদরীর বাড়ী খালি। দোর জানলা সব খোলা খাঁ খাঁ! দেখো তো কান্ড? ওর মা ফুলির তো সর্বস্ব রয়েছে ঐ তোরঙ্গোর মধ্যে আর ঐ কাঠের বাক্সোটায় কত বাসন। জমিদার-বাড়ীর ঝি ছিল ফুলি অনেক দেখে দেখে অনেক শখ করে করে করেছে কত কিছু সবই এবার যাবে চোরের পেটে! দরজা-গুলো বন্ধ করে খাবার চাপা দিল দামিনী। কলসীতে এক ফোঁটাও খাবার জল নেই। ভরে আনতে গিয়ে গাটাও ধুয়ে এল দামিনী। তারপর ভিজে কাপড়টা ছড়িয়ে দিয়ে ফুলিরই একখান কাপড় পরল ও। যা গরম পড়েছে বাপ্‌রে! চুল কটাকে মেলে দিয়ে দাওয়ারই এক-কোণে আঁচলটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল দামিনী। ও বিধবা। ওদের জাতে জোর করে বিয়ে করলে হয়তো আবার পাত্রও মেলে, বিয়েও হয় কিন্তু দামিনীর মা কোনদিন সে চেষ্টা করে নি। লোকে অনুরোধ করতে এলে বলেছিল থাক বাছা! একটা জামাই নিয়েই হাড় জ্বলে গেছিল। দুটি বছর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নেশা-ভাঙ করে মেয়েটাকেও আমার নাস্তা-নাবুদ করে মরেছে—আর না। জুড়োক হাড় জুড়োক ছুঁড়ির। যাই হোক সেই দামিনীর অপবাদ অবশ্য গ্রামের কোন লোক কোনকালে দিতে পারে নি এক এই বদরীর সঙ্গেই। এই দুষ্টিকটু ঘনিষ্ঠতা ছাড়া ওর আর কোন দোষ ছিল না। তবে বদরীও ওর ছোটবেলার বন্ধু, খেলুনে তো —জানে সবাই। গ্রামের মানুষ সহজভাবেই এটাকে দেখতে অভ্যস্তও।

আঁচল ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল দামিনী কখন। ঘুম ভাঙতে অবাক। একি আধেক রাতই কাবার নাকি? আর বদরী মুখের পানে আলো তুলে ধরে কি দেখে? ধড়মড় করে গায়ের আঁচল টেনে-টুনে উঠে বসল দামিনী—'কি রে বদু এ কি ব্যাপার? এলোমেলো ঘুমিয়ে গেছি মেয়েমানুষ তা তুই ডেকে না তুলে এভাবে দেখছিস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?'

হাতের বাতিটা দাওয়ায় নামিয়ে তাড়া-তাড়ি কথা বলেছিল বদরী। দামিনীর মনে হয়েছিল গলার স্বরটা কেমন করুণ ওর। ও বলেছিল, 'ডাকতে এসে দেখি মার কাপড়টা পড়ে শুয়ে আছিস...মা ঠিক অমনি করেই এজায়গাটায় পড়ে থাকতো রে...তাই...'

ওঃ, বদরী তার মাকে দেখছিল, ওকে নয়। হায় কপাল! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল দামিনীর কিন্তু মনটা কেমন গুমোট রয়ে গেল। কত লোকের কত লোভ ওর ওপর তা দামিনীর তো জানতে বাকি নেই। গভীর রাতে এমন দেখার মত দেখতে পেলে তারা কি...?...আর বদরির কিনা মনে পড়ে গেল আর কাউকে! কথাটা ভাল ছাড়া অবশ্য মন্দ কিছু নয়, কিন্তু তবু কেমন খাটো কাপড়ের মত টান পড়তে লাগল মনে। নিশুতি রাতেও মাকে মনে পড়ে—এমন জোয়ান ব্যাটাছেলেও তাহলে আছে এ দুনিয়ায়!

বছরগুলো কেটেছে এরপর হিজিবিজি, এলোমেলো। জমি-জায়গা বদরী দেখেনি, কিন্তু রোজগার করেছে প্রচুর। মিশেছে নানা অসদুপায়ী মানুষের সঙ্গে করেছে নেশা, খেলেছে জুয়া আর এছাড়াও যা করেছে তা ওদের মত দলের পক্ষে একেবারে অপরি-হার্য। এসবের গোড়াপত্তন যে করে থাকে তা দামিনীর সঠিক জানা ছিল না। জানল হঠাৎ একদিন—যেদিন বাগদী পাড়ার দুলালী বাগদিনীকে নিয়ে ঘটনাটা ঘটে গেল।

বৃদ্ধ ভৈরব বাগদী বাগদীপাড়ায় একজন গণ্যমান্য লোক। জমিদার মদনলাল-বাবুর বাবার আমল থেকে বেশকিছু জমি-জায়গারও দখলদার। বৃদ্ধ ভৈরবের প্রথম দুই পরিবারই ছেলে বৌ নাতি-নাতনিতে ঘর ভরিয়ে দিয়ে পর পর গত হয়ে গেছে। এবারে কোথা থেকে তৃতীয়া যুবতীটিকে জুটিয়ে এনেছে বৃদ্ধ। এই দুলালীকে! বয়স যাই হোক যৌবন যেন উপছে পড়ছে, দুলালীর সর্বাঙ্গে প্রতিটি ভঙ্গি দিয়ে আর কথায়-বার্তায় যে সম্মোহন —তাতে বৃদ্ধ ভৈরবের চারটি মধ্যবয়সী কাঠখোট্টা ছেলের চারটে মাথাই মদের কুম্ভের মত টলতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে। চ্যাঙড়াদের তো কথাই নেই, ভদ্র-পাড়ারও তেমন তেমন ব্যাটাছেলেদের কথাও উহ্য রাখাই ভাল।

বৃদ্ধ ভৈরব শাঁসালো লোক। দুলালীকে কেউ ঝি খাটাতে পারবে না সত্যি—তাই বড় আফশোস রহিম পোদ্দার, লক্ষণ নন্দী আর হরি মুখুজ্যেদের দলের। ওদের সবার স্ত্রীই অসুস্থ, আর সকলে সংসারেই নিত্য নতুন যুবতী ঝিয়েদের আনাগোনা বারোমাস চলে। কিন্তু দুলালীকে ঝি পাওয়া যাবে না—টাকা দিয়েও না।

ভৈরব বাগদীর বড় ছেলে 'সতে' বা সত্য বাগদী—মাঠে মাঠে ঘোরাই ওর এত-দিনকার প্রধান কর্ম ছিল। আচার ব্যাভার সবই চোয়াড় ধরনের বলে কাজটা মানাতোও ওকে খুব। বাপ যখন তৃতীয় পক্ষের পরি-বারকে বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ এনে ঘরে তুলল তখন প্রচণ্ড রাগে তার সেদিন সেকি দাপাদাপি! ইন্ধনও জুগিয়েছিল ওদের চার বৌই—তবু সতের বৌ আহ্লাদীই সবার চেয়ে বেশী। পাড়া ঝেঁটিয়ে লোক জড়ো হয়েছিল সেদিন ভৈরবের উঠোনে। হৈ-হল্লার অন্ত ছিল না। চরমে উঠতো আরো হয়তো—হয়তো বুড়ো বাপের গলাটাই টিপে ধরতো সত্য বাগদী সেদিন, কিন্তু গনগনে আগুনে এক কলসী জল ঢেলে দিয়েছিল ভৈরবেরই তৃতীয় পক্ষের নতুন পরিবার দুলালী সেদিন। ওর আঁচলে তখনো লেগেছিল হলুদের দাগ। সিঁদুর গলে গলে পড়া সিঁথিতে সেদিন আঁচল চাপা দেওয়া ছিল না—আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে মুক্তকুন্তলা হয়ে সোজা সতীনপোর সামনে এগিয়ে এসে খপ্ করে হাতটা ধরে ফেলেছিল ও—'হেই গো......তোর পায়ে পড়ি! মারতে হয় আমায় মার বুড়োরে ঠ্যাঙাস্ না......এক ঘাও না......!' সঙ্গে সঙ্গে উঠোনের কোণের ঝাড়ুনখানা উঁচিয়ে তেড়ে এসেছিল আহ্লাদী—'ওরে মাগি! দাঁড়া তোর......' কিন্তু হল না। সাধ পুরল না 'সতের' পরি-বারের। ভৈরবের মেজোব্যাটা কিন্তু দৌড়ে এসে সরিয়ে দিলে আহ্লাদীকে ধাক্কা মেরে। সতেও থেমে গেছে তখন। ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে দেখছে দুলালীর মুখের পানে। এবারে শুধু একটা হাত নয়, দুটো হাতই দুহাত দিয়ে ওর চেপে ধরেছে দুলালী। মাথায় তো কাপড় নেই-ই গায়েরও অলগা হয়ে গেছে কখন! ওর উগ্র যৌবনের অসীম মিনতি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে নিমেষে ঘরের মধ্যেকার সমস্ত পুঞ্জীভূত আক্রোশ আর হিংস্রতাকে। কাঁদছে দুলালী অঝোরে —বয়স্ক সতীনপোর হাত ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। 'সত্য' বাগদী হলেও পুরুষমানুষ তো? আর আহ্লাদীর যত না কেন ঝাঁটাধরা হাতই হোক তবুও তো একটি নারীর হাত-ই? সত্য শুধু নিভেই যায়নি—কেমন নিশ্চলও হয়ে পড়েছিল এরপর। আর উপস্থিত উঠোনের সব পুরুষমানুষই বোধহয়—কারণ আহা আহা রব উঠেছিল সহসাই।

ওদিকে ভৈরবের ব্যাটার বৌরাও কম জাঁহাবাজ নয়। পরিস্থিতি বুঝতে পেরেই নিমেষে ছুটে গিয়ে দুই বৌ 'আহ্লাদী' আর 'মরুনি' একজন উঠোননিকোনো গোবর-গোলা হাঁড়িটা, আর একজন ঝাঁটাগাছা নিয়ে ছুটে এসেছিল হুঙ্কার দিয়ে। কিন্তু উপ-স্থিত অলপ্পেয়ে পুরুষগুলোর জন্যেই কিছু করতে পারলে না। হাঁ হাঁ করে ওদের দুজনকে ধরে ফেললে বাড়ীর পুরুষগুলো।

এরপর ঐ দুলালী নিয়েই গ্রামে কত কাণ্ড। পুরুষরা যত সম্মোহনে মজে, নারীকুল ততই বিরূপ হয়। তাদের রসনায় বিষে বিষে জ্বলতে থাকে বাতাস দিনকে দিন। দুলালীর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। পান খাওয়া ঠোঁটে মনমজান হাসি নিয়ে ঘুরে ঘুরে কাজকর্ম করে ও। সতীন-পোদের জন্য দুবেলা যেচে গরম ভাত রাঁধে। বারণ মানে না কারো। আহা কে কবে ভেবেছিল ভদ্দর আচরণে ভদ্দর হয়ে ভৈরব বাগদীর ব্যাটা নাতীরাও গরম ভাত খেতে পাবে দুবেলা। খেতে পাবে মুড়ির সঙ্গে রোজ তিলকুটো আর নারকোলের নাড়ু! ব্যাটাছেলেদের ময়লা আর খাটো কাপড় গামছাগুলো হাসি-মুখে কেচে দেয় দুলালী রিটে আর কলার বাসন৷ ঘষে রোজ রোজ। বৌদের শত উৎপাত আর মুখঝামটা অগ্রাহ্য করে এসব করে ও। এর ওপর আবার ঐ বুড়োর সেবা। সারারাত হাঁপাবে, কাশবে। একটু পুরোনো ঘি জোগাড়ের চেষ্টায় প্রথম দামিনীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ওর। বদরীর মা ফুলি তখন গত। ফুলিরই হাঁড়িকুড়ি হাটকে পুরোন ঘিটুকু জুগিয়ে দিয়েছিল দামিনী। সেই থেকে মিতালি। উঁচুনীচু জাতের বালাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কোনদিন সখিত্বের মাঝে।

গোয়াল নিকিয়ে গরুদুটোকে ছেড়ে দিয়ে রোজই দুধ নিয়ে বামুনপাড়ার সকালে একবার করে যেতে হয় দামিনীকে। পথে দুটো গন্ধরাজ পাতিনেবু, একটা পাকা বেল কিম্বা দুডগা পুঁই ওর সংগ্রহ হয়ে যায় প্রায়ই। যেদিন যায় সেদিন ও 'গাবু-জলি'র নাবাল ডাঙা ভেঙে বাগদীপাড়ায় উঁকি দিয়ে আসে আসার সময়। হয়তো খড় কুচোয় তখন উঠোনে দুলালী—কিম্বা ঘুঁটে দেবার জন্য গোবর মাখে একমনে বসে বসে।

'কি লো, খুব যে কর্মিষ্ঠা! মনিষ্যিটা যে দাঁড়িয়ে আছি একটু গেরাজ্যি করু রাজরাণি!'

ওর রহস্যভরা কণ্ঠে চমকে উঠেই খিলখিল করে হেসে ওঠে দুলালী। হয়তো গোবরমাখা হাতটা তুলেই বলে, 'ফের যদি

তাঅশ্যা করবি বোষ্টুমীদিদি দেবো কিন্তু এই হাত মুখে মাখিয়ে হ্যাঁ!' তারপর হাত ধুয়ে আঁচল পেতে ওর উপহারগুলো নিয়ে আবার গলা খাটো করে বলেছে, 'কাল বড় নাতিটা খাগড়ে মাছ ধরেছে বিলে এই এমন এমনটি বড়......তা নিয়ে যা না বোষ্টুম-দিদি দুটো গামছে করে বেঁধে দিই?'

'আঃ মাছ কি হবে লো?'

'ক্যানে? বোষ্টুম আছো তাতে কি বদরিদাদা খায় না? পোস্তবাটা প্যাঁজ দিয়ে এঁধে দিও তেনারে।'

'কপাল। বদু কি আছে নাকি? সে তো নোড়াগেরামে গিয়ে পড়ে আছে আজ তিনদিন।'

'তা জিইয়ে রেখো ক্যানে গরুর ডাবায় জল পুরে দুদিন!'

হ্যাঁ ঐ নোড়াগ্রাম। ঐখানকার আদম আলী আর তিনু কামারই সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ করেছিল বদরীর। যেটুকু পদার্থ ছিল তাও একেবারেই শেষ করে দিয়েছিল। হুগলী জেলা হলেও কোর্ট তো ওদের চুঁচড়োয়—তা সেই কোর্টের মুখও চোখে দেখেছিল দামিনী ওদের কল্যাণে।

কতবার বাধা দিয়েছে, বুঝিয়েছে বদরীকে। একে তো গোঁয়ার মানুষ তায় ঐ ধরনের দুঃস্বভাব লোকজন সব সংগীসাথী। কাজেই বেপরোয়া দুর্বার হতে সময় লাগেনি। বউলপুরের বাজারের দুতিনটে দোকানে সেবার পর পর বেশীরকমের চুরি হয়ে গেল। একেবারে সিঁধ কেটে সাফাই হাতের চুরি। পুলিশের আনাগোনায় ছেয়ে গেল গ্রামগুলো। বদরী ঐসময় বাড়ীতেই ছিল, বাড়ীতেই রইল বেশ কিছুদিন। ঐ ধরনের মানুষ বদরী তো নয়—গ্রামের মানুষ জানে তাকে ছোটবেলা থেকে। কেউ সন্দেহ করেনি, দামিনী তো নয়ই। ওর রাঁধাবাড়া মা মরে এস্তোক দামিনীরই ঘাড়ে রয়েছে বরাবর।

সেবার ঝড় হয়েছিল খুব। চৈত্রের শেষের গাছপালা ভাঙা যে ঝড়—সেই ঝড়। মাঠে তখন আউশ বোনার তোড়জোড় চলছে। মেঘ দেখে জলের আশায় উৎফুল্ল হয়ে খাটতে লেগেছে চাষারা। কিন্তু মাটি ভেজবার মত জলও সেবার হয়নি, হয়েছিল প্রচন্ড ঝড়। দামিনীদের পুরোনো হাজারী কাঁঠালের অমন গাছটাও ভেঙে পড়েছিল সেইবার। ভেঙে পুরোপুরি পড়েছিল গোয়ালের চালাখানার ওপর। সেকি প্রচন্ড শব্দ। কিন্তু ভাগ্য ভাল দামিনীর—গরু-দুটোরই দড়ি ছিল অনেককালের পচা পুরোনো আর গোয়ালটার চালাতেও কি না সবখানে ভালমত খড়। যেটুকু ছিল ঝড়ের প্রথম দাপটে হুস করে উড়ে যেতেই ভয় পেয়ে ছটফট করেছিল গরুদুটো। তখনই ছিঁড়ে গিয়েছিল গলার দড়ি। চালাখানা গাছচাপা পড়বার আগেই মুক্তি পেয়ে প্রাণ-ভয়ে দামিনীদের শোবার ঘরের দাওয়ায় ঘিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল অবলা জীবদুটো।

ঝড় থামতে ঘুরঘুট্টি আঁধারে অনেকক্ষণ বসে থেকেছিল দামিনী। ডিবেটায় তেল রয়েছে কিন্তু কোথায় যে রেখেছে জ্বালাবার বাক্সোটা—কি জানি হয়তো বদুদের ওখানেই ফেলে এসেছে ওবেলা। মনে হয়েছে বদু ফিরেছে কিনা কে জানে। এই দুর্যোগে পথেঘাটে থেকে থাকলে বিপদ হতে বাকি থাকবে না কিছু। তাছাড়া ফিরে থাকলেও খেতে পাবে না কিছু, কেননা রাঁধেই নি দামিনী আজ। মুড়ি অবশ্য বদুর ঘরেই আছে অনেক—দামিনীই ভেজেছিল কাল, কলসীর মুখে সরা এঁটে কাপড় দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছিল চৌকির তলায়। কিন্তু খাবে কি নিয়ে বদরী? জানেই না হয়তো।

আন্দাজে এখানে সেখানে হাঁটকাতে হাঁটকাতে দেশলাইটা অবশেষে পেয়েই গিয়েছিল দামিনী। লম্ফটা জেলে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠোনে নেমেছিল—তারপর উঠোন থেকে নাচদুয়োরের ওধারে। ইস! বকুলগাছ কটির একটাও মাটির পরে দাঁড়িয়ে নেই নাকি? ডালপালার বিরাট স্তূপ নিয়ে বউল-ধরা আমগাছগুলোরও দু-একটা মাটিতে শুয়ে পড়ে আছে! আহা! কত আমই হ'ত রে। ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে অতি কষ্টে বদুর বাড়ীর কাছে যেতেই বাতিটা হাতে নিভে গিয়েছিল ফস্ করে। হাওয়ার টান ছিল তো তখনও। তা যাক্ ওতে এখন কিছু যায় আসে না।

উঠোন পেরিয়ে বাদুর ঘরে ভেজান দোরের গোড়ায় এসে পেঁচেছে গেছে ও আন্দাজে আন্দাজে। কপাটে হাতটা ঠেকাতে গেছে শুধু—ভেতরে মৃদু কথাবার্তার সাড়া পেয়েছে। তবে বদুর ঘরে কেউ আছে নাকি? ওরে বাবা ওর সেই মাতাল বন্ধু-গুলোর কেউ থাকে যদি? এত রাতে মরতে এই দুর্যোগে এখানে কেন—অলপ্পেয়ে লোকটাকে নিকেশ না করে ছাড়বে না নাকি মুখপোড়ার দল? চট করে হাত সরিয়ে নিয়েছিল দামিনী। মরুক না খেয়ে নয়তো আকন্ঠ খেনো গিলে পড়ে থাকুক মেঝেয়—ওকে দেখার দরকার নেই।

দরজাটা খুলে গিয়েছিল তখুনি—আর স্পষ্ট শুনেছিল দামিনী—খুব মৃদু কিন্তু বদরীরই গলার স্বর—'মালটা রেখেছো আমার বাড়ী একদিনের জায়গায় সাত দিন এতে কথা কইনি একটিও, কিন্তু বাঁটোয়ারার ঝামেলা এখান থেকে করা চলবে না।'

'কেন রে, তোর এখানেই তো নিরি-বিলি?'

'না না বলেছি তো, লোকের লজ্জা আছে!'

'কার লজ্জা? সেই বোষ্টুমীর না দুলালির?'

'আঃ বাজে কথা রাখো। মালের কথা বলো। কাল হোক আর পরশু তোক সরিয়ে নিয়ে যাবে এখান থেকে মাল! এই শষ্ট কথা রইলো আমার...!'

ওরা অন্ধকার উঠোনে নেমে অন্ধকারেই নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। দামিনী যে দেওয়ালের ওপাশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ তা ওরা টের পায়নি। ভয়ে বুক টিপ-টিপ করছিল দামিনীর। ফুলির পড়ে যাওয়া ঢেঁকির চালাটার ওপাশ দিয়ে ছোট্ট একটা ভাঙা বেড়া আছে—ডোবায় বাসন ধুতে যাওয়ার পথ ছিল ওটা ফুলির। ঐ ডোবার গা ঘেঁষে খানিকটা গিয়ে মিত্তিরদের নার-কোল বাগান। ওটা পেরিয়েও দামিনীদের বাড়ী একটু ঘুরপথে যাওয়া যায়। ভূতের ভয় ওর কোনদিন নেই, কিন্তু সাপ-খোপের তো আছে। তা থাক তবু ঐ পথেই পালাবে দামিনী।

তাই পালিয়ে ছিলোও। গাছভাঙা ঝড়ের পরের বাগানের আঁধার পথ—তবু যেতে পেরেছিল। কারণ তখন মেঘ সরে গিয়েছিল। আকাশের মাঝখানের খাপ্‌চা খাপ্‌চা জায়গাগুলো দিয়ে উঁকি মারছিল বার বার শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ। ঝক্‌ঝকে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। সজল হয়ে উঠেছিল কি দামিনীরও চোখ দুটি? দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করেছিল শ্রীমতী রাধারাণীকে? এ কেমন পথে টানছো তুমি ওকে? ঝরে পড়া নারকেল পায়ে ঠেকেছিল ওর কবার—কিন্তু তাও ও কুড়োয়নি।

কিছুদিন আগে মারা গেছে ভৈরব। বাড়াবাড়ি অসুখের সময় দুলালী কোথাও যেতে আসতে পারতো না। শেষকালে মহিম কবরেজের ওষুধ বাতিল করে রতন ডাক্তারের অ্যালোপেথি চিকিৎসা করিয়েছিল ছেলেরা। সবাই একবাক্যে বলেছিল [illegible] বাহাদুরী আছে গুণ করবার বটে দুলালীর!

তা ছাই অ্যালোপেথি ওষুধগুলো গ্রামের কোথাও পাওয়া যায়নি। কে আনবে হুগলী থেকে? মাঠে ওদিকে লাঙল পড়েছে সময় কোথা কারো? বদুই কবার এনে দিয়েছিল ওষুধপত্র হুগলী গিয়ে। দামিনীই যেতে বলেছিল ওকে। ভৈরব মরতে আরো কিছু হ্যাপা পুইয়েছে বদরী—কিন্তু সবচেয়ে যে ঘটনা ওকে দুলালীর সবচেয়ে কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল তা হ'ল গ্রামের বটুক সোঁর হত্যা!

সোঁয়েদের অগাধ পয়সা—আর কে না চিনতো সোঁয়েদের বাড়ির লম্পট, দুশ্চরিত্র বটুক সোঁকে? ভৈরব বেঁচে থাকতেই ও মনোযোগ দিয়েছিল দুলালীর ওপর—মারা যেতে এখন পুরোপুরিই পেছনে লেগে-ছিল। এই পেছনে লাগাই ওর কাল হ'ল অবশেষে। একদিন মৃত অবস্থায় ওকে পড়ে থাকতে দেখা গেল কইখালির পগারের ধারে। ঘন সরবনের মধ্যে শায়িত ছিল ও মাথায় লাঠির ঘায়ের চিহ্ন নিয়ে। গ্রামে আবার ছেয়ে গিয়েছিল পুলিশ। বড় দারোগা নিজে এসেছিলেন তদন্তে হুগলী থেকে। ধরা পড়েছিল ভৈরবের বড় ছেলে—সত্য বাগ্‌দী।

মামলা উঠেছিল চুঁচুড়ার কোর্টে—হত্যার মামলা। এসময় বার বার দুলালীকে সঙ্গে নিয়ে শহরে গেছে বদরীদাস—শুধু তাই নয়, নিজে যেচে সাক্ষীও দিয়েছে সত্যর পক্ষে। আর ও একাই নয়—সাক্ষী দিয়েছে নোড়াগ্রামের আদম আলি শেখ আর তিনু কামারও। সত্য ওদের গ্রামে ওদের আসরে ছিল সেদিন—যেদিন মারা গিয়েছিল বটুক সোঁ। ওদের আসরে মাখনি বাঈয়ের পাল্লায় পড়ে সারারাত নাকানি-চোবানি খেয়েছিল দেশী মদের নেশার ঘোরে।

আসলে ব্যাপারটায় কিছুটা সত্যি ছিল। সত্য বাগদী সত্যিই গিয়েছিল নোড়াগ্রামে তিনুদের আড্ডায় সেদিন ধেনোও খেয়েছিল মাখনির হাতে প্রচুর। তিনুরাই উৎসাহ জুগিয়েছিল। তারপর বেশী রাত হতে ছেড়ে দিয়েছিল হাতে একগাছা মজবুত পাকা বাঁশের লাঠি দিয়ে—বলেছিল—বাঃ, পেটে বস্তু পড়েছে এবার মাথা খাড়া করে খট্‌খটিয়ে চলে যা...গিয়ে যদি দেখিস পগাড়ের পাড়ে আজও বোটে ব্যাটা দুলির তরে ওৎ পেতে আছে, তবে দিবি বসিয়ে মাথায় পেছন থেকে এক ঘা...ডরাবি না...।'

ঐ সময় বুঝি বদু একবার জিজ্ঞেস করেছিল আড়ালে তিনুকে, 'কেন একথা শেখালি রে ওকে? তোর কি স্বার্থ?'

চোখ মটকে তিনু জানিয়েছিল 'মর বোকা! সোতের জমির গরম কত তা দেখিস না? ওর জমির টাকা কিছু হাতিয়ে ওকে শেতল করতে হবে।'

'কেমন করে হাতাবি তুই?'

'কপালে থাকলে দেখতে পাবি। চুপ করে থাক এখন।'

তা একটা হালের পুরো জমি বিক্রির টাকাটাই খরচ হয়েছিল সত্যর ঐ মামলায়। তিনুরা, যারা সাক্ষ্য দিয়েছিল ওর পক্ষে, তারা ছোট ছোট একটা করে বস্তাই পেয়েছিল টাকার। শুধু একমাত্র বদরী বাদে। ও ছোঁয়নি কিচ্ছু। কিন্তু খেটেছিল সবচেয়ে বেশী সত্যর পক্ষে দুলালীর জন্য।

অবশেষে ছাড়া পেয়েছিল সত্য। সন্দেহের অবকাশের ফাঁক দিয়ে কোনক্রমে গলে বেরিয়ে এসেছিল ও এক বছর বাদে।

(৩)

একদিন উধাও হল দুলালী। খুঁজে পাওয়া গেল না ওকে। ঢি-ঢি রব উঠল গাঁয়ে—কান পাতা যায় না। মুখে কাপড় বেঁধে যে ওকে কেউ ধরে বেঁধে নিয়ে যায়নি একথা বুঝতে বাকি রইল না কারো। কারণ দুলালীর সঙ্গেই উধাও হয়েছে ভৈরবের তিন পরিবারেরই সমস্ত গয়নাগাঁটি। সে প্রায় একটি পুঁটলিই হবে। খাড়ু ছিল সোনার—হারও ছিল দু-ছড়া, আরো সব কত কিছু। ভৈরব বাগদীদের মধ্যে বড়-লোক মানুষ। বাড়ীর মেয়েরা খুঁটেই দিক আর গরুই দোহাক, তবু রূপোর চেয়ে সোনাই পরত বেশী। আগে লাঠিয়ালের বংশ ছিল ওরা! জমিদারদের কাছ থেকেও পুরস্কারস্বরূপ পেয়েছিল বিস্তর। জ্যেষ্ঠের সম্মানে ভৈরবের স্ত্রীরাই পর-পর পরে গেছে সে সব গহনা। এই সূত্রে পেয়েছিল দুলালীও—আহ্লাদী, মরুণীরা কেউ পায়নি।

সত্যর ব্যাপারের পরই প্রায় ক্ষেপে গিছল আহ্লাদী। কান্না আর গালাগালের চোটে অতিষ্ঠ করেছিল সকলকে। এখন আঙুল মটকে দিনরাত শাপ-শাপান্ত করতে লাগল। বড় এক হাঁড়ি পোঁতা লুকোনো টাকাও ছিল নাকি ভৈরবের দুলালীরই হাতে—সেটা শুদ্ধ নে গেছে এমনি পাজি! পুলিশ দিয়ে ওকে কি বেঁধে এনে মারতে পারে না কেউ?

সত্য এসব ব্যাপারে কথাটি কয় না। কইবেই বা কেমন করে? ওর বিশ্বাস অন্য রকম — বলতে গেলে দৃঢ় বিশ্বাসই—সে সমস্ত টাকাই দুলালী খরচ করে গেছে সত্যরই বিপদের কালে। আর দামিনী? ইদানীং চিড় খেয়েছিল ওর আর দুলালীর সখিত্বের। দুলালীকে নিয়ে বদুর আচরণ বার-বার আঘাত দিয়েছে ওকে দীর্ঘ এক বছর ধরে। নম্র অন্তঃকরণ দামিনীর, তাই ছেড়ে আসতে পারেনি পুরোপুরি ওদের তবু দূরে সরে এসেছিল অনেকটা। সেই সেদিন যেদিন সত্যর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এসেছিল বদু—সেইদিন অনেক রাত অবধি জেগে বসেছিল দামিনী। বদু ফিরতে সানকিতে করে ভাত বেড়ে ধরে দিয়েছিল বদুর সামনে, লণ্ঠনটা বাড়িয়ে এগিয়ে দিয়েছিল যাতে মুখটা বেশ ভাল করে দেখা যায় বদুর! কথা না বলে—কেমন নাড়াচাড়া করছিল ভাতগুলো বদু—কেমন চিন্তাচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল ওকে। লণ্ঠনের আলো পড়ে ওর মুখের প্রতিটি রেখা যেন কথা কয়ে জানিয়ে দিচ্ছিল যে ও কিন্তু অন্যায় করেছে! অস্বস্তি গুমরে উঠছিল দামিনীর বুকেও। যে কথাটা বলবার জন্যে সারাক্ষণ আঁকুপাকু করেছে কিন্তু বলতে পারেনি—হঠাৎ সেই কাথাটাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওর—'বদু মিছে কথাগুলো শেখে বলে এলি চুঁড়োয়লা বাড়িতে গিয়ে? ছিঃ!

মুখ তুলে তাকাল বদরী—ভ্রূ কোঁচকাল, 'একথা বলছিস যে? মিছে কথা কি সত্যি কথা তা জানিস তুই?'

'সত্যেই ঠেঙিয়ে মেরেছে বোটে লোকে—জানি একথা।"

ও কেমন বিস্মিত হয়ে তাকিয়েছিল দামিনীর মুখের পানে রূঢ় গলায় বলেছিল, 'এইবার তুই নিকেব হবি দামি!'

'কে নিকেব করবে, তুই নাকি?'

'করতেও পারি, এসব কথা যদি ফের বলিস বুঝলি?'

চোখে কি জল এসেছিল তখন দামিনীর? জমাট বেদনা বিষের বাষ্প হয়ে উগরে এসেছিল কণ্ঠ দিয়ে—'নারী হত্যায় পাকা তো হবিই একদিন, তা আমাকে দিয়েই আরম্ভ কর তোর দুলি সন্তুষ্টি হোক!'

দুম্ দুম্ করে পায়ের শব্দ তুলে ও নেমেছিল উঠোনে এর পর। খড়ের পালা দুটো পার হয়ে সোজা নেমেছিল গিয়ে পথে। কানে এসেছিল দূরে থেকে ভেসে আসা ঢাকের কাঠির শব্দ। হ্যাঁ ছুতোর-পাড়ায় আজ বিশ্বকর্মা পুজো। কিন্তু যে কাঠি বোধনের আবাহন স্মরণ করিয়ে দিয়ে আনন্দ বিলোয়—সেই ঢাকের কাঠিতেই দামিনী পাচ্ছিল সেদিন বিসর্জনের বেদনা কিম্বা কান্নার সাড়া। ছেঁড়া কাপড়টায় চোখ মুছতে মুছতে নিজের ঘরে গিয়ে মায়ের তক্তাপোষটায় শুয়ে পড়েছিল ও। বাতিও জ্বালেনি, খায়ওনি সেদিন কিছু।

বদু আর বেশী বাড়ী থাকতো না এর পর। নোড়াগ্রামে তিনুর ওখানেই মাসের মধ্যে কুড়ি দিন পড়ে থাকতো। তিনু তো ফুলির কি রকমের ভাইপোও হত, কিন্তু ফুলি বেঁচে থাকতে খোঁজও নেয়নি অবীরে বিধবা আপন মামীটাকে কি কায়দায় তাড়াতাড়ি ভবপারের নৌকোয় চাপিয়ে দিয়ে 'ক' বিঘে জমি আর ধানের চালাখানা হাতিয়েছিল তিনু, ফুলির মুখেই সে বর্ণনা শুনেছিল কতবার দামিনী। আর আদম আলির বিষয়ে শুনেছিল একদিন বাজারে—এক জেলেনীর মুখ থেকে—বাপ রে, যতটা বলেছিল সে, অতটা বিশ্বাস হয়নি বটে, তবু শিউরে উঠেছিল বইকি! তা ঐখানে ওদের সঙ্গেই বাস করা শেষ পর্যন্ত পছন্দ হল বদরীর।

দুলালী অন্তর্ধান হল। গ্রামশুদ্ধ আত্মীয়কুটুম্ব ভৈরবের—প্রাণ খুলে গালাগালি দিল তারা। সত্যর মত চুপ করেও রইল কেউ কেউ কিন্তু নিস্পর হয়ে যত চোখের জল ফেললে দামিনী—ওরকম কেউ করেনি! হিংসা আর অভিমানের পাতলা আবরণটিকে সরিয়ে দিয়ে ওর অন্তরের ভেতর থেকে আবার একবার হাসিমুখটি বাড়িয়ে যেন উঁকি দিলে দুলালী। যেন বললে—'কি রে এখনও রাগ রাখবি?'

এর মাসখানেক পরই বুঝি একদিন হঠাৎ পথে দেখা হয়েছিল বদরীর সঙ্গে। আগুনী 'কার্তিক শাল' ধানের ক'খানা গাড়ী চলেছে ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে। তারই একটায় চেপে বসে আছে বদরী। ধান নোড়াগ্রামের আদম আলি শেখের—এ তল্লাটে ওর জমি আছে বিস্তর।

অনেকদিনের অদর্শনের পর বদুকে একটু ভাল করে দেখতে চেয়েছিল দামিনী—কিন্তু ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে আপনিই, মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে। নিজের জমি-জমা সব চালার দাওয়ায় গেল—উনি লেগেছেন আনার ধান সামাল দিতে—মরণ আর কি! মাথায় আবার শামলা বেঁধেছেন! চালচলনটাও কি হয়েছে ঠিক গাঁজাখোরের মতন।

কথা না কয়ে হন-হন করে এগিয়ে গিয়েছে নিজের বাড়ী। রাতে নিশ্চয় থাকবে

বদরী, কেননা ভরসন্ধ্যেবেলা ধানের গাড়ী নিয়ে বাজারে গেছে—পাঁচ-পাঁচখানা ধানের গাড়ী! আড়তে মাপ-জোপ হবে নিশ্চয়; বস্তা খুললে কাঁটার তুলবে তো! তারপর কাঁচা ধান শুখোতি যাবে কত—সে সব ঠিক হতে সময় লাগবে তো!

ওবেলার মুখুজ্যেবাড়ীতে নারকোল কুড়োতে গিয়েছিল দামিনী, অবেলায় ঘরে ফিরে চারটি ভাত রেঁধেছিল নিজের জন্যে। তা সেই কটা নিয়েই ও গেল বদরীর বাড়ি। হ্যাঁ তালাটা খোলা রয়েছে—ফিরবে রাতে ঘরে ঠিকই—শেকল খুলে ভেতরে ঢুকে থালাশুদ্ধ ভাত বেশ গুছিয়ে রাখলে দামিনী। কিন্তু ঢাকা চাপা দেবার বেতের ধামাটা গেল কোথায়? খুঁজে পেল না কোথাও! তাহলে গামছা একটা দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। কিন্তু গামছাও তো নেই। ছেঁড়া একখানা ঘরের কোনে পড়ে আছে বটে—তাও চিট ময়লা!

ফুলির তোরঙ্গে আছে বটে একজোড়া নতুন গামছা। অগত্যে নিজেকেই হবে বার করে। চৌকির তলায় ঢুকে তোরঙ্গটা টেনে বার করে খুলতেই কটা আরশুলো ফুরিয়ে পড়েছিল দামিনীর গায়ে। ওমা-গো' কেটেই দিয়েছে নাকি ফুলির সবস্ব; কাপড়গুলো সবই টেনে মেঝেয় নামিয়েছিল ও—তারপর ঝেড়ে নিয়ে তুলতে তুলতেই পায়ের কাছে ঠকাস্ করে পড়েছিল জিনিসটা! যদি নথের টানা চেন একটা তাও সোনার! আর তখনি বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল দামিনীর।

এ টানা ফুলিরই। কিন্তু ফুলি মারা যাওয়ার আগে নথশুদ্ধ দিয়ে গিয়েছিল দামিনীকে—বদুর সামনেই দিয়েছিল। বলেছিল—'আমার তো ও পাট চুকে গেছে তা তুই পরিস্।'

'আমারই কি ও পাট আছে মাসি যে পরব?'

'পরবি। এখন না হলেও যখন আবার হবে তখন পরবি।'

ফুলির কি মনে মনে ইচ্ছে ছিল যে বদুর বৌ-ই হবে ও এককালে? আহা বড্ডো ভালোবাসত ফুলি দামিনীকে।

তা সেই নথ ওর কাছে আজও আছে কিন্তু টানাটা খুলে নিয়ে ও ব্যবহার করতে দিয়েছিল আদরের সই দুলালীকে। বদুকে জানিয়েই দিয়েছিল। বড্ডো ভারি একগাছা নথ দিয়েছিল ভৈরব দুলালীকে, নাকটা ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। দামিনী বলেছিল—'এই টানাটা খুলে দিচ্ছি লো...তোর কাছে গচ্ছিত থাক্...তুই পর এখন।' তারপর ভৈরব মারা যেতে ফেরত চাইবো চাইবো করেও সঙ্কোচে ফেরত নেওয়া হয়নি। মনে করেছিল দেবে নিশ্চয় দুলালী নিজেই। কিন্তু দুলালী দেয়নি—পালিয়েছিল।

এই টানা কেমন করে এলো বদুর কাছে? 'বদ্, বদরে তুই ই কি শেষে শেষ করলি দুলালীকে?' মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে অঝোরে কেঁদেছিল সেদিন দামিনী।

বদু ফিরে এসেও দেখেছিল ওকে ঐ অবস্থায়।

'কেমন করে তুই এ-কাজ করতে পারলি বদু? পেরানেই কি মেরে ফেললি দুলিকে...বল্ বল্?'

ব্যাপারটা বুঝে গুম্ হয়ে গিয়েছিল বদু। তারপর চাপা রুদ্ধ স্বরে বলেছিল, 'যদি বলি হ্যাঁ তাই-ই, তাহলে কি করবি তুই আমার শুনি?'

'ওরে না-রে আর শুনবো না রে...

'কেন? শুনতেই তো চাস তুই! সমানে পুলিশের মত আমার পেছনে লেগে আছিস!'

ওর কান্নার বহর দেখে রাগ করে বদু বুঝি লাথিই মারতে গিয়েছিল একটা, কিন্তু পাটা তুলেও নামিয়ে নিয়েছিল শেষে। দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'দ্যাখ্ দামি তুই যত খারাপ জানিস আমাকে তার চেয়ে ঢের বেশী খারাপ হয়েছি আমি। আর শোন! ডাকাতিও করি আমি দলের সঙ্গে। পারিস তো পুলিশে ধরিয়ে দিস্—আর তা যদি না পারিস তবে ঐ মায়ের নাকের টানাটা নিয়ে সরে পড়—কোনদিন আমার সমুখে আর আসিস না। অবিশ্যি আমিও সরে পড়ছি এ গ্রাম ছেড়েই খুব হালের মধ্যেই বুঝলি!'

(৪)

বদরীদাসের জীবনপরিক্রমার দুরূহ পথ এরপর গভীর আঁধারে বিলীন হয়েছিল। যেন সন্ধ্যার পর রাত হয়ে আরো গভীরতর রাতে গ্রাস করেছিল ওকে। যেন সম্পূর্ণ ভাবে আবরিত করেছিল কিন্তু কতদিন? কোনদিনই কি ঐ অন্ধকার-পুঞ্জের ভেতর থেকে আর বের হয়ে আসতে পারেনি বদরীদাস?

গ্রাম সত্যিই ত্যাগ করেছিল ও। দামিনীর সঙ্গে ছাড়াছাড়িও হয়েছিল ঐ সময় থেকেই।

দুলালী চলে যেতে চেয়েছিল। অশান্তি তো কম হয়নি গ্রামে ওকে নিয়ে। ঘরে পরে এত অপবাদ—তার ওপর আবার ইদানীং পেছনে লোকও লেগেছিল অনেক—বেশ পয়সাওলা সব লোক। আর লোকেদেরই বা দোষ কি বদরী নিজেও তো আকর্ষণ বোধ করছিল ঠিক তেমনি আকর্ষণ, যেমনটি সন্দেহ করেছিল দামিনী। তবে?

সবার অলক্ষ্যে গ্রাম ছেড়ে যাবার ইচ্ছা বদরিকেই জানিয়েছিল দুলালী—'বড়-লোকের উৎপাত, আমায় বিশ্বনাথের ঠাঁই গে রেখে আসবে?'

'কেন কে আছে তোর পিরিতের মানুষ সেখানে?'

'ওমা গো কি ছিরি কথার! পিসি আছে গো—বাপের আপন সোদরা। তার ঠেঁয়ে গে থাকবো।'

বাপের সহদরা! পিসি! কেমন করু যেন তাকিয়েছিল ওর দিকে বদরী। বলে-ছিল, 'সাধ যায় তোকে নে-গে আমিই সংসার পাতি—দুলি!'

'এই গেরামেই?'

'না। অন্য কোথাও যাবি?'

দুলালী—চুপ্, এরপর। ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়েই ছিল কেবল।

'কি, কথা কস্‌নে যে?'

'আমি নারবো গো!'

চট করে রেগে ওঠা চিরদিনের স্বভাব বদরীর। তাই উঠেছিল, বলেছিল, 'সেদিন তালে মিছে কথা কয়েছিলি বল্? কয়-ছিলি আমিই তোর...'

'মিছে লয় গো সত্যি বলিছি...তুমিই আমার মনের মানুষ, তোর তরে পেরানটাও দিতে পারি, কিন্তু থাকতে লারবো তোমার লেগে...।'

'কেন, আমি গুন্ডা, আমি ডাকাত বলে?'

'না গো। তুমি ভালো তা জানি আমি।'

'ভালো? ভালোমানুষে কি চুরি করে না নেশা করে?'

'ও তোমায় 'আহুতে' করায় গো। তোমার 'আহু' গেরোহ চলছে নিশ্চয়। তোমার তরে কেউ একজন যদি বাঁধনে হয়, তবে ছেড়ে পালাবে 'আহু'...ভালো হবে তুমি!'

'যতো ঢংয়ের কথা তোর', বলেছিল বদরি ওর গালদুটো টিপে দিয়ে সোহাগ করে।

কাঁচা আলের পথ ভেঙে মাঝরাতে দুলালীর হাত ধরে হেঁটেছিল বদরী তিন মাইল। দুবার গাড়ী বদল করে তবে উঠে-ছিল বৃন্দাবনের গাড়ীতে। ঝুলনযাত্রার ভীড় সেই সময়—কি সে বিষম, বাপরে বগীখানা পুরোপুরিই প্রায় হিন্দুস্থানীতে ভর্তি। দুলালীকে কোনক্রমে একটা কোণে বসিয়ে নিজে উঠেছিল জিনিস রাখা তাকের মাথায়। নিজের পোঁটলা গোড়াতেই দিয়ে দিয়েছিল ওকে দুলালী, বলেছিল, 'আমার পেরানটাও তোমার, সর্বস্বও তোমার।' তা সেই পোঁটলাই মাথায় দিয়ে কোনরকমে রাতটা কাটিয়েছিল। কত সুখের রাত! এক-একবার মাথা বাড়িয়ে তাকিয়ে দেখছিল দুলালীকে। দুলালীও দেখছিল নাকি? দেখছিল, কিন্তু ওর চোখের ভাষা পড়ে লজ্জায় ঝুঁকে পড়ছিল বার বার। ওর কোলের ওপর কোন এক হিন্দুস্থানীর মোটাসোটা ছোট একটা ছেলে শুয়ে ছিল মাথাটা রেখে। সমস্ত রাতই ঘুমিয়েছিল ছেলেটা। লজ্জায় যতবার চোখ নামাচ্ছিল দুলালী ততবার কেবল পায়ের ছেলেটাকেই দেখতে পাচ্ছিল কোলের ওপর। ও ... একটাকে ... শাড়ী পরেছিল একটা। সিঁথিতে দিয়েছিল বদরিরই কিনে

...নে দেওয়া সিঁদুর। মানিয়েছিল খুব! ...রো মানাতো যদি নথটা পড়ে থাকতো ...কে, কিন্তু না—তা সম্ভব ছিল না। কারণ, ...রব মারা যেতেই নাক থেকে নথটা খুলে ... দিয়ে দিয়েছিল সতার বৌ আহ্লাদীর, ...তে। আর টাকা ছাড়া আঁচলে বেঁধে নিয়ে ...কদিন পথে গিয়ে ধরেছিল বদরীকে। ...াচল খুলে ওর হাতে দিয়ে বলেছিল, ...টা বোষ্টমী দিদির জিনিস। তা সই তো ...দিকে আর আসে না, আমি লজ্জায় তার ...ছে যেতে নারি তা তুমিই তাকে এটা দিও ...গা।' এছাড়াও আর একদিন নিজের সমস্ত ...য়নাগুলোও ও নিতে বলেছিল বদরীকে। ...ন্তু রাজী হয়নি বদরী। মনে মনে ...সেছে,—জানে না নাকি দুলালী যে কত ...কা করেছে ও নিজে? আচ্ছা চলুক সংগে ...রপর জানাবে!'

রাতটা যেন আবিল আবিল স্বপনের ...ে কেটেছিল গাড়ীর মধ্যে। বদরীর অদ্ভুত ...াল লেগেছিল আর দুলালীর তো কথাই ...ই, ও তো একবারই জীবনে রেলে চেপে-...ল মাত্র। সেই একবারই—ত্রিবেণীতে গংগা ...াইতে যাওয়ার সময়।

ভোরের আলো সবে ফুটি ফুটি তখন। ...ঘটনাটা ঘটেছিল সেই ব্রাহ্মমুহূর্তেই। ...ীবনের অন্ধকার পাথার সাঁতরে এসে এই-...র পড়েছিল গিয়ে বেদনার অসীম সাগরে ...দরী! এই সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতেই ...ায়ে ঠেকেছিল ওর অবলম্বন, চোখের ...ুখে ফুটেছিল আশ্চর্য এক আলো!

ভোরের সময়। সবাই ঘুমন্ত তখন! ...াং করে কোন এক অর্বাচীন যাত্রী তাকের ...থা থেকে ফেলে দিয়েছিল ভারি একটা ...ক্স! ফেলেছিল কার যেন মাথার ওপর! ...ম চীৎকার আর হৈ-হৈ উঠেছিল বগীটার ...ধ্যে। খুন হল খুন হল রব উঠেছিল আর তার সংগে কান্না—'আমার বাছাকে মারলে রে......ওরে আমার সর্বনাশ হল রে......

কি করি এখন ওরে বাবা রে......'

হিন্দুস্থানীতেই কান্নাকাটি কথাবার্তা সব। সারারাত জেগে ভোরবেলাতেই হয়তো বা একটু ঘুমিয়েছিল বদরী। চটকা ভেঙে বিরক্ত হয়ে বিষম জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'তোর ছেলে মেরেছে তো তুইও মার না বাপু......চেঁচাস কেন?'

হায় হায় একথা কেন বলেছিল বদরী? ও সহজভাবে বুঝেছিল—বুঝেছিল কারো শিশুকে প্রহার করেছে কেউ। প্রহারের প্রতিশোধে আবার একবার প্রহারের ইঙ্গিতই দিতে চেয়েছিল বদরী। কিন্তু উন্মত্ত মানুষ তখন বুঝেছিল অন্যরকম। বেদনায় কতদিন ধরে উন্মাদের মত ঘুরে বেড়িয়েছে বদরী—আজ কিন্তু শান্ত হয়ে গেছে ও। বুঝেছে ঘটনা মানুষের অধীন নয়, মানুষই ঘটনার অধীন।

হ্যাঁ, যে লোক তোরঙ্গটা ফেলেছিল—তার শিশুটাই তখনও শুয়ে দুলালীর কোলের ওপর। হঠাৎ দু-তিন জন মানুষে মিলে টানাটানি করতে লাগল ছেলেটাকে—তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে ওকে জানলা গলিয়ে বাইরে! শোধ নেবে হত্যার।

কিন্তু দুলালী কি দিতে পারে ঐ শিশুটাকে যে নাকি ওরই কোলে ঘুমোচ্ছে সারাটা রাত? ও দেবে না। কিছুতে ফেলতে দেবে না। উপুড় হয়ে, গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দেবে তাদের, যারা এই মুহূর্তে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বিদায় দিয়েছে বিবেক-বোধকে।

যার ধন তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে তাই দুলালী চীৎকার করেছিল। কিন্তু ওর চেঁচানিতে আরো বেশী ভুল বুঝেছিল উন্মত্ত মানুষগুলো। ভেবেছিল দুলালীই শিশুটির জননী। ঠিক আছে, নির্মূল করো খুনের ঝাড়কে। মা শুদ্ধ বিসর্জন দাও ছেলেকে। হায় ঐ কটা মুহূর্ত মাত্র—কিন্তু ঠিক সময়ে কিছুতেই নামতে পারেনি বদরী আর বাধাও দিতে পারেনি গাড়ীর আরো পাঁচটা মানুষ যারা নাকি চোখের জলও ফেলেছিল ঘটনার পরে বসে বসে।

ছেলেটাকে সমেত টানতে টানতে খোলা দরজার কাছে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু না, তবু দুলালী ফেলতে দেয়নি,—বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছিল অদ্ভুত উপায়ে বাচ্চাটাকে নিজে পড়বার মুহূর্তে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল ওকে বগীর ভেতরে।

শোক, হিংস্রতা, বিবেকহীনতা সমস্ত কিছুর ওপরে এই পরমার্থে আত্মবিসর্জন দুলালীর—একটি উজ্জ্বল আলো জেলে দিয়ে গিয়েছিল সেইদিন। শুধু বদরী একাই কাঁদেনি, কেঁদেছিল আরো শত শত মানুষজন ওর ছিন্নভিন্ন দেহটাকে দেখে। যখন জড়িয়ে ধরেছিল বদরী ওকে, ওর নিজের মুখ বুক সমস্ত মাখামাখি হয়ে গিছল লাল রক্তে। ওর দু হাতের কনুই বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছিল দুলালীর ফাটা মাথার টাটকা রক্ত। ওঃ, তবু সেদিন সহ্য করতে হয়েছিল বদরীদাসকে—মরে যেতে পারেনি দুলালীর অনুসরণে। কিন্তু সেই 'রাহু' যাকে একদিন 'আহু' বলেছিল দুলালী—সে কিন্তু সত্যিই মুক্তি দিয়ে গিয়েছিল সেইদিন থেকে। একযুগের পরে দামিনী শুনেছিল বদরীর মুখে এই সমস্ত ঘটনা। শুনে কেঁদেছিল নতুন করে।

অঙ্গনা

গ্রাউন্ড রিসেপসনিস্ট

শম্পা চট্টোপাধ্যায়
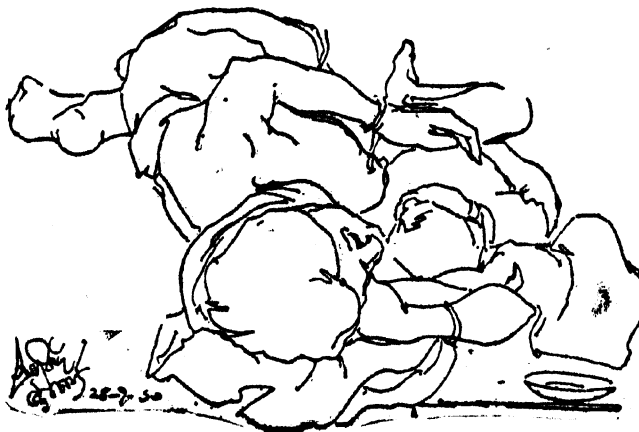
জাতীয় কর্মসংস্থান কেন্দ্রের নির্দেশ ছিল, কতগুলি কাজে একান্তভাবে মেয়েদের নিয়োগ করার। সে নির্দেশ পুরো-পুরি পালিত হয়েছে কিনা জানি না। তবে টেলিফোন অপারেটর এবং রিসেপসনিস্টের কাজে অনেক দিন থেকেই মেয়েদের দেখা যাচ্ছে। অবশ্য এই দুই কাজে মেয়েরাই যে একচেটিয়া তাও জোর দিয়ে বলার উপায় নেই। দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। এবং তাঁরাও চাইছেন কাজ-কর্মে সমান অংশ নিতে। এর প্রতিফলন সর্বত্র। তাই একান্তভাবে মেয়েদের কাজগুলি এঁদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। তাতে অন্তত মেয়েদের সমস্যা অনেকটা সমাধান হবে।

রিসেপসনিস্ট পদে মহিলার নিয়োগ একান্ত বাঞ্ছিত। মহিলা টেলিফোন অপারেটর যেমন তাঁর কণ্ঠমাধুর্যে আমাদের অনেক বিরক্তির অবসান ঘটায় তেমনি মহিলা রিসেপসনিস্টও সাদর অভ্যর্থনায় আমাদের প্রাথমিক পরিচয়ে সাহায্য করে থাকে। বিভিন্ন অফিসে ওদের হাসি হাসি মুখ আর মিষ্টি অভ্যর্থনা সেই অফিসের একটি বিরাট সম্পদ বলে পরিগণিত। এর ফলে অফিস ও গ্রাহকের মধ্যে সহজেই একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই মহিলা রিসেপসনিস্ট অপরিহার্য। ব্যবসায়িক ফায়দার দিক থেকে তো বটেই। আর আমাদের লাভ মহিলাদের কর্মসংস্থান। আজকের চাকরির দুর্লভতার দিনে যার মূল্য অনেক।

এমনি একজন রিসেপসনিস্ট শ্রীমতী শম্পা চট্টোপাধ্যায়। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। সুন্দর ছিমছাম চেহারা। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসে কাজ করেন। বর্তমান কর্মস্থল দমদম এয়ারপোর্ট। শ্রীমতী শম্পা গ্রাউণ্ড রিসেপসনিস্ট।

শ্রীমতী শম্পার কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। আমার সঙ্গে কথা বলার অবসর হচ্ছিল না। একদল বিদেশী যাত্রী এসেছেন। তাঁদের নানা কথার জবাব দিচ্ছিলেন। একাই সবাইকে অ্যাটেণ্ড করছেন। সকলের সব কথায় চটপট জবাব। এতটুকু বিরক্তি নেই। বেশ খুশি খুশি ভাব। আর সেই সঙ্গে মুখের মিষ্টি হাসিটুকু। একটু পরেই ওঁরা শহরের দিকেই রওনা হয়ে গেলেন। ওঁদের বিদায় দিয়ে শ্রীমতী শম্পা এগিয়ে এলেন। মুখের সেই হাসি তখনও সমান।

শ্রীমতী শম্পা জানালেন, এই আমাদের কাজ। সারাদিন অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়। নানা প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

জিগ্যেস করলাম, বিরক্তি লাগে না।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, মোটেই না। একাজ একেবারে আমার মনের মতো। আমার সব সময় ইচ্ছে হয় একাজে মেতে থাকি। কখনও এতটুকু ক্লান্তি আমাকে ছুঁতে পারে না।

এতক্ষণে শ্রীমতী শম্পার সঙ্গে আমার গভীর হৃদ্যতা হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছিল তিনি আমাকে অনেকদিন ধরে চেনেন। ভাবতেই পারছিলাম না, এইমাত্র কিছুক্ষণ আগে তাঁর

সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। পরে বুঝেছিলাম, তিনি প্রকৃত রিসেপসনিস্ট। অপরিচয়ের গণ্ডী ভেঙে সহজেই অচেনা-অজানাকে আপন করে নিতে পারেন।

সবেমাত্র বছর-খানেক হয়েছে শ্রীমতী শম্পা আন্ডারগ্রাউন্ড রিসেপসনিস্টের চাকরি নিয়ে দমদমে এসেছেন। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স যখন এই পদটি সৃষ্টি করে তখন তাঁর নিয়োগ। সঙ্গী ছিলেন আরো দুজন। কাজ পাওয়ার পর তাঁর মনে আনন্দ আর ধরে না। রোজ কত দেশী-বিদেশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে এই আনন্দেই তিনি মশগুল। তাছাড়া দমদম এয়ারপোর্টের মত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে চাকরি তো সৌভাগ্যের কথা।

তাই খুব খুশিমনে নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে ছুটেছিলেন ট্রেণিং নিতে। বোম্বে এবং দিল্লী মিলিয়ে মোট চার সপ্তাহের ট্রেণিং। কণ্ঠস্বরের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশি। এছাড়া আনুসঙ্গিক কিছু আছে। ট্রেণিং সমাপ্ত করেই তিনি এখানে যোগদান করেছেন। তারপর থেকে একদিনের জন্যেও একাজে তাঁর কোন বিরক্তি আসে নি। বরং বিদেশীদের যেমন অনেক কথা বলতে হয় তেমনি সুযোগে ওদের কাছ থেকেও নানা তথ্য জেনে নেওয়া যায়। পৃথিবীর যেসব দেশে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সেই অধিবাসীরা এলে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার এরকম সুযোগ আর নেই। তাই বিমানবন্দরের এই চাকরি তাঁর খুবই পছন্দ।

কাছের বা দূরের যাত্রীদের দেখা-শোনা করাই গ্রাউন্ড রিসেপসনিস্টের কাজ। শুধু যাঁরা আসছেন তাঁদেরই নয়। যাঁরা যাচ্ছেন তাঁদেরও। যাঁরা আসছেন তাঁরা যেমন অতিথি তেমনি যাঁরা যাচ্ছেন তাঁরাও বিরূপ হয়ে না ফেরেন সেদিকে এঁদের কড়া নজর। সকলকে এঁরা সমান নজরে দেখেন।

জানতে কৌতূহল হচ্ছিল কথাবার্তা এবং খোঁজ-খবর দেওয়া ছাড়া যাত্রীদের এঁরা কিভাবে সাহায্য করেন।

শ্রীমতী শম্পা নিজের কাজের ধরনের ব্যাখ্যায় ঠিক সেখানেই তখন এসে পৌঁচেছেন। একদিনের একটা ঘটনা বললেন। একজন বৃদ্ধা যাবেন বাইরে। বেশ বয়েস হয়েছে। প্লেন পর্যন্ত তো গাড়ীই পৌঁছে দিল। কিন্তু তারপর আর সিঁড়ি ভেঙে প্লেনে উঠতে পারেন না। এগিয়ে গেলাম। হাত ধরে আস্তে আস্তে উঠতে সাহায্য করলাম। বৃদ্ধা দু হাত মাথায় রেখে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি বিনীতভাবে জানালাম এটাই আমার কাজ। তিনি সেকথায় কান না দিয়ে আমাকে আবার আদর করলেন। মন ভরে উঠলো। একাজে সত্যি আনন্দ।

কাজ আছে আরো। কোন নাবালক হয়তো একা আসছে বা যাচ্ছে, তার যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়। এ দায়িত্ব অবশ্য গ্রাউন্ড রিসেপসনিস্টের একার নয়। এয়ারপোর্টের প্রতিটি কর্মীকেই এব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়। আমাদের মধ্যে সহযোগিতার কোন অভাব নেই।

শ্রীমতী শম্পার মুখে কথাটা শুনে একটু অবাক হই। সর্বত্রই তো আজকাল অসহযোগিতার কথা শোনা যায়। মনে হয়, এটাই অর্ডার অব দি ডে। কিন্তু এখানে এসে এই একটি কথায় ধারণাটা বদলে গেল। তারপর মনে হলো, সহযোগিতার অভাব নেই বলেই দেশী-বিদেশী যাত্রী আগমনের অন্যতম কেন্দ্র দমদম বিমানবন্দরে কাজ বেশ সুশৃঙ্খলভাবে হয়।

শ্রীমতী শম্পার কাজে কখনো ক্লান্তি আসে না। অথচ ডিউটি সাত ঘন্টা। তাও শিফটিং। সকাল, বিকাল বা রাত্তিরের বালাই নেই। ফিরতে অধিকাংশ দিনই দেরী হয়। কাজের চাপ খুব বেশী। তাই ডিউটি আওয়ার শেষ হবার পরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। পরবর্তীকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।

সাত ঘন্টা একটানা ডিউটি করার পরও কিছুক্ষণ বেগার দেওয়া। তবু মুখের হাসিটি একই রকম প্রোজ্জ্বল। অথচ চারদিকে তো শুনি, কেউ কাজ করতে চায় না। যার যা ডিউটি আওয়ার্স তাতেই সে অসন্তুষ্ট। মুখে অসন্তোষ প্রকাশ না করলেও বই পড়ে, গল্প করে, উল বুনে, আড্ডা জমিয়ে সবটাকেই রিসেসে দাঁড় করিয়েছে। সত্যি আনন্দের কথা, এঁরা তার ব্যতিক্রম। একটানা এতক্ষণ কাজের পরও এঁরা বিরক্ত হন না। হয়তো বিরক্ত হতেও জানেন না। যেমন হাসিমুখে ডিউটিতে আসেন তেমনি হাসিমুখেই বাড়ি যান। নিত্যদিন। প্রতিদিন।

শ্রীমতী শম্পার মতো যাঁরা বিবাহিত তাঁদের কাজ তো অফিসিয়াল ডিউটিতেই শেষ হয় না। অফিসের পরও আছে সংসার। যার এবার তম্বির-তদারক করত হবে।

সেদিকে এঁর দায়িত্ব আরো বেশী। স্বামী শ্রীমোহনকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও অপেক্ষা করে থাকে একটি কচি মুখ। চার বছরের এই ছেলেটি জানলায় বসে পথের দিকে তাকিয়ে থাকে, মা কখন আসে। এটুকুই যা শ্রীমতী শম্পার অসুবিধা। না হলে চাকুরি-জীবনে তিনি পুরোপুরি সুখী।

চাকরির পরিচয় ছাড়া শ্রীমতী শম্পা স্বামী-ভাগ্যেও গরবিনী। শ্রীমোহনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি ছোট্ট পরিচয় হলো তিনি রাইচাঁদ বড়ালের প্রধান সহকারী স্বর্গীয় হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র।

চাকরি এবং সংসার মিলিয়ে শ্রীমতী শম্পা হাসি-খুশিতেই দিন কাটান। তবে একটা জিনিস ওঁর খুব খারাপ লাগে। বিমান দুর্ঘটনার সেই ভয়াবহ দিনটির তিনি সাক্ষী। যা কিনা তিনি এখনো মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুতে তাঁর কোন ভাবনার নেই। অনেক মজার ঘটনাও ঘটে। এই এক বছরের মধ্যে তার সংখ্যাও কম নয়। এর মধ্যে কয়েকটি বেশ স্মরণীয়।

সেসব ঘটনা শোনানোর জন্য শ্রীমতী শম্পা আর একদিন আমন্ত্রণ জানালেন।

—প্রমীলা

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন
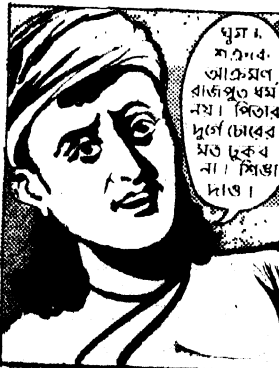
আপনি কী খুব আবেগপ্রবণ ?

এমন এক-একটা সময় আসে, যখন ...ক মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ...তে হয় এবং সেই মতো চটপট কাজ ...তে হয়।

কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েই ...ং কাজে নেমে পড়ার ব্যাপারে যদি ...বেগপ্রবণতার ওপর বেশি নির্ভর করা ...া হয়, তাহলে সেটা যে কেবল বোকামী ... নয়, এর ফলে আপনি এমন পরি-...তির মধ্যে অনেক সময়ে নিজেকে ...ড়িয়েও ফেলবেন, যা থেকে বেরিয়ে ...সতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

যথার্থ আত্মশুদ্ধ লোক আবেগপ্রবণ ... না, কারণ বেশির ভাগ কাজই—তা যদি ...লো কাজ হয়—আগে থাকতে ভালো-...বে চিন্তা করে নিয়েই তারপরে করা ...কার।

...দেখুন, নীচে একটি খুব সহজ সরল ...ষ্ট দেওয়া হয়েছে, এটির সাহায্যে আপনি ...জেনে এইখানে বসেই কয়েক মিনিটের ...ধ্যে যাচাই করে ফেলতে পারবেন—...াপনি খুব বেশি আবেগপ্রবণ কি না।

নীচের প্রশ্নগুলির জবাব দেবার সময়ে ...তি কথা বলবেন আন্তরিকভাবে সততার ...গে। আপনার এখনকার আচরণ সম্পর্কে ...াপনি নিজে যা বুঝেছেন জেনেছেন, ...ঠক সেইমতোই প্রশ্নগুলিতে 'হ্যাঁ' কিংবা ...না' জবাব দিয়ে চলুন। জবাব দেবেন ...ভবেচিন্তে, আবেগের চাপে নয় কিন্তু! ...রপরে আপনার জবাবগুলিকে মনস্তা-...ত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই ...রে চেক করে নিন।

১। আপনি ভাবনা-চিন্তা না করেই ...ামাজিক ব্যাপারে কথা দিয়ে ফেলেন, কাজ ...রে বসেন?

২। যোগ-বিয়োগ হিসেব-নিকেশ কর-...ার পরে আপনি কী সেটা একবার মিলিয়ে ...নেন?

৩। আপনি কী মাঝে মাঝে হঠাৎ কোনো ...বিষয়ে বিচার করে ফেলেন, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন?

৪। কোনো জায়গায় যাবার কথা দিলে আপনি কী সাধারণতঃ সঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছে কথা রাখেন?

৫। আপনি কী মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক না দেখে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে পড়েন?

৬। আপনাকে যেসব নিয়মকানুন মেনে চলা উচিত, আপনি কী সাধারণতঃ সেগুলি মানেন?

৭। হঠাৎ খেয়াল হলো বলে আপনি কী মাঝে মাঝে এটা-সেটা কিনে ফেলেন?

৮। চিঠিপত্র লেখার পরে আপনি কী আবার সেটা পড়েন এবং কখনো কী আবার সেটা সংশোধন করেন ডাকে দেবার আগে?

৯। আপনি যে-বিষয়ে ইতিমধ্যেই আপনার মতামত ঠিক করে ফেলেছেন, তার ওপর অন্য কেউ যদি আবার নতুন করে কিছু চিন্তার কথা বলতে থাকেন, আপনি কী তখন অস্থির হয়ে পড়েন?

১০। আপনার দৈনন্দিন কাজকর্ম কী মোটামুটিভাবে বেশ প্ল্যান করে গুছিয়ে চালান?

১১। কোনো নতুন লোকের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁর কাছে প্রথমেই কিভাবে হাজির করতে হবে, তাঁর মনে কেমন-ভাবে প্রাথমিক ছাপ রাখতে হবে, সে-বিষয়ে ভাবা দরকার বলে কী আপনি বিশ্বাস করেন?

১২। সত্যিকারের বহুদিনের বন্ধু কী আপনার অনেক?

১৩। আপনার কাজকর্মে কী সাধারণতঃ ভুল খুব কম থাকে?

১৪। মোটামুটিভাবে আপনার উৎসাহ-উদ্দীপনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা এগুলি কী একই-ভাবে অবিচল থাকে?

১৫। নীলামে কিংবা সস্তায় সেলের দোকানে গিয়ে আপনার যা যা কেনা উচিত, আপনি কী তার চেয়েও বেশি কিছু কিনে ফেলেন?

১৬। আপনি যা কিছু কেনেন, তা কেনবার সময়ে যেমন তৃপ্তিকর মনে হয়, পরেও কী সেটি ঠিক তেমনি তৃপ্তিকর হয়ে থাকে বলে লক্ষ্য করছেন?

১৭। লাইনে দাঁড়িয়ে এবং রাস্তার গাড়ীঘোড়ার ভীড়ে ট্র্যাফিক জ্যামের মধ্যে পড়লে আপনি কী খুব তাড়াতাড়ি মেজাজ খারাপ করে ফেলেন?

১৮। নিজের দাঁতের যত্ন নেওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে সবরকম খাবার হিসেব করে খাওয়া, এবং যথেষ্ট পরিমাণে ঘুমোনো—এসব ব্যাপারে আপনি কী সাধারণ বুদ্ধি অনুসারে নির্দিষ্টভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার স্বভাব গড়ে তুলেছেন?

১৯। 'দেখা যাক, কি হয়' এরকম ভেবে আপনি কী ঝুঁকি নেওয়া পছন্দ করেন?

২০। আপনার মেজাজ কী বেশ শান্ত-ভাবে বয়ে চলে?

•

এবার বিশ্লেষণ করুন :

বিজোড় সংখ্যার প্রশ্নের জবাব হওয়া উচিত 'না', এবং জোড় সংখ্যা প্রশ্নগুলির জবাবে 'হ্যাঁ' বলাই ঠিক।

প্রত্যেকটি সঠিক জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন। যত কম পয়েন্ট পাবেন, বুঝতে হবে আপনি তত বেশি আবেগপ্রবণ।

৬০ বা তারও বেশি পয়েন্ট পেলে, আপনি নিশ্চয়ই সতর্কভাবে ভেবেচিন্তে কাজ করেন বলেই মানতে হবে এবং সাধারণতঃ প্রত্যেকটি কাজ করবার আগেই বেশ খানিকটা ভেবে নেন।

৪৫ কিংবা তার চেয়েও কম পয়েন্ট পেলে বুঝতে হবে, আপনি সম্ভবতঃ খুব বেশি আবেগপ্রবণ, এবং এ থেকেই বোঝা যাবে, আপনি কেন মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতে বাধ্য হন, 'এরকম করলাম কীসের জন্যে!'

আপনার আবেগপ্রবণতা খুব বেশি আছে, একথা জানবার পরে আরও একটি বিষয়ে ব্যাখ্যা করা সহজ হয়ে পড়বে—কেন আপনি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে অসুবিধা বোধ করেন।

দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে একটুখানি সুনিয়ম অর্থাৎ ডিসিপ্লিন আনলে, এবং কাজ করবার আগে আপনি খানিকটা করে চিন্তা করার অভ্যাস করলে, আপনার জীবন অনেক বেশি সুখের হবে, অনেক জটিলতা কমে যাবে।

আমার এক অধ্যাপক আত্মহত্যা করেছিলেন। তিনি রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ছাত্রদের প্রিয় অধ্যাপক। অকৃতদার। সংসারের নিত্য অশান্তি তাঁর ছিল না। একটি ভৃত্য আর গোটা কয়েক বেড়াল আর অসংখ্য বই নিয়ে থাকতেন তিনি।

সংসারের নিত্য অশান্তি তাঁর ছিল না, কিন্তু শারীরিক অশান্তি ছিল তাঁর নিত্য। তিনি চিররুগ্ন ছিলেন। প্রায়ই বেশ কিছুদিন করে শয্যাশায়ী থাকতেন।

একবার এইরকম দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী থাকার পর প্রথম যেদিন কলেজে এলেন, সেদিন আমরা খুব খুশি হয়েছিলাম। কলেজের প্রিফেক্ট তাঁকে দেখে গভীর আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন : আপনি একেবারে সেরে উঠেছেন তো? এখন ক্লাস নিতে পারবেন?

অধ্যাপক বলেছিলেন : হ্যাঁ, এবার আমার রোগমুক্তি ঘটেছে। আজ আমি ক্লাস নেব বলেই এসেছি।

কলেজের রসায়ন বিভাগ ছিল চারতলায়। উঁচু উঁচু তলা। অনেক বাড়ির দেড়তলার সমান একতলা। চারতলায় উঠে আমরাই হাঁপাতাম। প্রিফেক্ট বললেন : আপনি সিঁড়ি দিয়ে উঠবেন না, লিফ্‌টে যান।

অধ্যাপক বললেন : না, আমি সিঁড়ি দিয়ে যেতে পারব।

তিনি সিঁড়ি দিয়েই চারতলায় উঠলেন। রসায়ন বিভাগে সহকর্মীদের সঙ্গে কুশলবার্তা বিনিময় করলেন। তারপর চলে গেলেন ল্যাবরেটরিতে। সেখানে বেয়ারারা আর অন্যরা তাঁকে অভিবাদন জানাল। তিনি ল্যাবরেটরির ভিতরে একটি পরীক্ষাগারে ঢুকলেন। একজন বেয়ারাকে ডেকে কিছু সাজসরঞ্জাম দিতে বললেন। তার মধ্যে পটাসিয়াম সায়ানাইডও ছিল। বেয়ারার মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি, কারণ তিনি যে পরীক্ষা করার কথা বলেছিলেন সেই পরীক্ষায় পটাসিয়াম সায়ানাইড অত্যাবশ্যক ছিল। পরীক্ষার প্রতিটি জিনিস তিনি চেয়ে নিয়েছিলেন, এমন কি সামান্য একটা ওয়াচ গ্লাস পর্যন্ত।

সব গুছিয়ে দিয়ে বেয়ারাটা যখন চলে যাচ্ছিল তখন তাকে পিছু ডেকে বলেছিলেন : বার্নারটা জ্বেলে দিয়ে গেলে না!

অধ্যাপক কোথাও কোনো ফাঁক রাখলেন না, কোনো সন্দেহ না। বেয়ারা বার্নার জ্বেলে দিয়ে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে এসে দেখল অধ্যাপকের নিশ্চল দেহটা ভূলুণ্ঠিত বীকারটা এক পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে তার গায়ে জলে গোলা শাদা পটাসিয়াম সায়ানাইড তখনও কিছুটা লেগে আছে। সমস্ত ঘর নিঃশব্দ, শুধু বার্নারটা জ্বলছে সোঁ সোঁ করে.....

আত্মহত্যা। ধীর স্থির সুস্থ মস্তিষ্কে। আত্মহত্যা। বাঁচার ইচ্ছা না।

কিন্তু আত্মহত্যার শেষ মুহূর্তে নাকি বাঁচার ইচ্ছা জাগে। জাগে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে একজন বিশেষজ্ঞ একটি গল্প শোনালেন। ফরাসী দেশের গল্প। একজন ফরাসী এঞ্জিনীয়ার এক নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়েছিল। তাদের প্রেম গভীর হয়েছিল। কিন্তু অবশেষে সেই নারী কোনো কারণে তাকে প্রত্যাখ্যান করল। এঞ্জিনীয়ারটি প্রচণ্ড আঘাত পেল। তার মনে হল, ব্যর্থ হয়ে গেল এ জীবন। এ জীবন আর রাখার কোনো অর্থ হয় না। তার মনে আত্মহত্যার চিন্তা জাগল।

বেশ কিছুকাল সে নিজেকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে রাখল, মানুষের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকল। ধীরে ধীরে সে আঘাত অনেকখানি কাটিয়ে উঠল, স্বাভাবিক হতে থাকল। স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে লাগল।

কিন্তু সে জানত না, তার জন্য প্রচণ্ডতর আঘাত অপেক্ষা করছে। সে যখন সেই নারীকে প্রায় ভুলেই গেছে, জীবন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে তখন সেই নারীর কাছ থেকে তার বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র এল। এবার আঘাতটা সাংঘাতিক হয়ে বাজল। তার মনের সমস্ত বাঁধ ভেঙে গেল। তার দৃঢ় ধারণা হল, এ জীবন রেখে আর লাভ নেই। সে আত্মহত্যার সংকল্প করল।

সে এঞ্জিনীয়ার। দক্ষ। শিক্ষিত। সাবধানী।... আত্মহত্যা সম্পর্কে সে গভীর সাবধানতা অবলম্বন করল। বেশি করে ঘুমের ওষুধ খেল, "গঙ্গা"র পরে সেতুর নিচে দড়ি ঝুলিয়ে গলায় ফাঁস পরাল, তারপর হাঁ করে কণ্ঠনালী লক্ষ্য করে রিভলভারের গুলী ছুঁড়ল।

আত্মহত্যার জন্য চারটে ব্যবস্থা সে করেছিল। প্রথমটা ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়টা সফল হবে দ্বিতীয়টা ব্যর্থ হলে তৃতীয়টা সফল হবে, তৃতীয়টা ব্যর্থ হলে চতুর্থটা সফল হবে। চারটে ব্যবস্থার মধ্যে একটা না একটা সফল হবেই। তার মৃত্যু ঘটবেই। অবধারিত। সুনিশ্চিত।

কিন্তু মৃত্যু তার হল না। তার চারটে ব্যবস্থাই ব্যর্থ হল। সে ভেবেছিল, ঘুমের ওষুধে তার মৃত্যু হবে; ঘুমের ওষুধ ব্যর্থ হলে গুলীতে হবে; গুলী ফসকে গেলে ফাঁসিতে হবে; ফাঁসির দড়ি ছিঁড়ে গেলে নিচে খরস্রোতা "গঙ্গা"র জলে হবে। কিন্তু একটাতেও তার মৃত্যু হল না। ঘুমের ওষুধ খাওয়ার ফলে তার শরীরে কাঁপন শুরু হয়েছিল হাত কেঁপে গিয়ে গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গালের পাশ ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল, যাবার সময় দড়িটা কেটে দিয়ে গিয়েছিল, দড়ি কেটে নিচে জলে পড়ে গেলে কয়েকজন জেলে তা দেখতে পেয়ে নৌকো নিয়ে ছুটে এসে তাকে ডাঙায় তুলে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে দিন পনের থাকার পর সে ছাড়া পেয়েছিল। বাড়ি চলে এসেছিল।... বেঁচে গিয়েছিল।

৬ই অগস্ট রাত সাড়ে ৮টায় সংবাদ বিচিত্রায় গল্পটা শোনালেন জনৈক বিশেষজ্ঞ। গল্পটা চমকপ্রদ, চিত্তাকর্ষক এবং কৌতূহলোদ্দীপক। বলার ভঙ্গিটাও সুন্দর। কিন্তু এই যে বাঁচা, এটাকে তার অবচেতন মনে বাঁচার ইচ্ছার জন্য বাঁচা, এ কথা বলা যায় কী করে? ঘুমের ওষুধে সে মরে নি সে তো তার বাঁচার ইচ্ছার জন্য নয়। শরীরে কাঁপুনি ধরায় হাত কেঁপে গিয়ে গুলী ফসকে গিয়েছিল সে তো তার বাঁচার ইচ্ছার জন্য নয়। গুলীটা যাবার সময় দড়িটা কেটে দিয়ে গিয়েছিল সে-ও তো তার বাঁচার ইচ্ছার জন্য নয়। "গঙ্গা"র জেলেরা তাকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল সে-ও তার বাঁচার ইচ্ছার জন্য নয়। সবই তো অ্যাকসিডেন্ট—আকস্মিক ঘটনা। আর ফ্রান্সে গঙ্গা এল কোথা থেকে? গঙ্গা অর্থে যে কোনো নদী? যেমন মৃগয়া অর্থে যে কোনো পশু শিকার?

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৫ই অগস্ট সকাল ৮টায় শ্রীমতী রাধারাণীর কণ্ঠে লোকগীতি শোনানো হয়েছিল, আবার ৭ই অগস্ট সকাল ৮টায় নির্ধারিত শিল্পীর পরিবর্তে তাঁরই লোকগীতি শোনানো হল—মাঝে মাত্র একদিনের ব্যবধান। এটাকে সুস্থ পরিকল্পনা বলা চলে কোন্ দিক দিয়ে?

১০ই অগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় শিশুমহলে প্রচারিত রূপকের নাম "আমার দেশ সোনার দেশ"। রচনা শ্রীবিনয়ভূষণ গুপ্ত।

রচয়িতা তাঁর রূপটিতে ভারতের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন—ভারতের নদ-নদী পশু-পাখি, পাহাড়-পর্বত, কবি-সাহিত্যিক-বিপ্লবী-স্বাধীনতা-সংগ্রামী, তীর্থস্থান-দ্রষ্টব্যস্থান প্রভৃতি নিয়ে যে ভারত তার পরিচয়। এই পরিচয়কে ছোটোদের ভূগোল ও ইতিহাসের একটা সংমিশ্রণ বলা চলে। রচয়িতার আন্তরিকতা ছিল, নিষ্ঠা ছিল।

কিন্তু রূপকটি প্রচারে ভালো মহলা হয়েছিল বলে মনে হয় না। শিল্পীরা অনেকটা স্কুলে পদ্য মুখস্থ বলার মতো বলে গেছে।

তবে সংগীতাংশ উল্লেখযোগ্য। শেষের গানটি খুব সুন্দর। এজন্য সংগীতপরিচালক শ্রীপ্রিয়লাল চৌধুরী প্রশংসা দাবি করতে পারেন।

এইদিন বেলা ১টার নাটক "সমুদ্রের স্বাদ"। রচনা শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

রসুল একজন জাহাজী, জাহাজে করে সে দেশদেশান্তরে যায়, প্রায় সারাটা বছর তার জাহাজে কাটে। দু-দশদিনের জন্য যখন বাড়ি আসে তখন হামিদাকে সে আপন করে পেতে চায়। কিন্তু যখন সে বাড়ি থাকে না তখন হামিদার দিন চলে কী করে, জীবন কাটে কেমন করে তার খোঁজ সে রাখে না। তখন হামিদার আশ্রয় সাজ্জাদ।

একবার রসুল বাড়ি ফিরে এটা লক্ষ্য করল, সাজ্জাদকে ভর্ৎসনা করল, হামিদাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। হামিদা মনে মনে রসুলকেই চায়। তাই সে তাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল, আর কখনও সে সমুদ্রে যাবে না। হামিদা পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল, রসুলকে নিয়ে ডাঙায় স্থায়ী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখল।

কিন্তু অচিরেই সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল।... নতুন জাহাজ এসেছে। লোক চাই। রসুলের এক স্যাঙাৎ এসে খবরটা দিল, তাকে ডাঙা ছেড়ে সমুদ্রে যাবার জন্য প্ররোচিত করল। রসুল সমুদ্রের স্বাদ পেয়েছিল। বাঘের বাচ্চা যেমন রক্তের স্বাদ পেলে আর ছাড়তে পারে না, রসুলও তেমনি পারল না। হামিদাকে ভাসিয়ে, কাঁদিয়ে আবার সে সমুদ্রে পাড়ি দিল।

নাটকটার আরম্ভ শুনে আশান্বিত হওয়া গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ভেঙে গেল। নাটকটা জমাট বাঁধল না। নাটকের বক্তব্যটা স্পষ্ট, কিন্তু এই বক্তব্য বলায় যে জট পাকানো দরকার ছিল তা পাকায় নি। ফলে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয় নি।

নাটকটার জন্য সময় বরাদ্দ ছিল তিরিশ মিনিট, কিন্তু একুশ মিনিটেই সব শেষ হয়ে গেল। বাকি ন মিনিট গ্রামোফোন রেকর্ড বাজিয়ে কাটাতে হল। এই ন মিনিট যদি নাটকটা পেত তাহলে তার জাল আরও বিস্তৃত হতে পারত, কাহিনী আরও পুষ্ট। এবং নাটকটাকে ঠিকমতো চালনা করে নিয়ে গিয়ে পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া যেত।

রসুলের ভূমিকায় ছিলেন শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় হামিদার ভূমিকায় শ্রীমতী মিতা চট্টোপাধ্যায় আর সাজ্জাদের ভূমিকায় শ্রীঠাকুরদাস মিত্র। অভিনয়ে চরিত্রগুলির মোটামুটি স্পষ্ট ছবি পাওয়া গেছে।

১৫ই অগস্ট সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে "গীতবিতান" পরিবেশিত রবীন্দ্রসংগীত খুশি বোধ করতে পারে নি, টিমওয়ার্কটা যেন ভালো হয় নি।... সকাল ৯টা ৫ মিনিটে শ্রীবুদ্ধদেব রায় ও তাঁর সহশিল্পিবৃন্দ পরিবেশিত লোকগীতির অনুষ্ঠানটি শুনে আনন্দ পাওয়া গেল। লোকগীতি পরিবেশনে এই সম্প্রদায়টি ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তাঁদের পরিবেশনে আন্তরিকতা থাকে, গানে মাটির সুর পাওয়া যায়।... বেলা ২টোয় "ভারত-তীর্থ" শীর্ষক অনুষ্ঠানে গ্রামোফোন রেকর্ডে দেশাত্মবোধক গানগুলি সুনির্বাচিত, সুগীত।

এইদিন বেলা ৩টেয় "মুক্তিমন্ত্র" শীর্ষক অনুষ্ঠানটি "স্বাধীনতা সংগ্রাম অবলম্বনে গানের অনুষ্ঠান।" নিবেদন শ্রীমতী কবিতা সিংহের। গ্রন্থনাংশ পাঠও তাঁর।

অনুষ্ঠানটি সুপরিকল্পিত, কিন্তু সুপরিবেশিত নয়। গানের অনুষ্ঠানে গানের চেয়ে কথার প্রতিই যেন আকর্ষণ বেশি। গানগুলি পুরো না বাজিয়ে খণ্ড খণ্ড করে বাজানো হয়েছে, এবং এইভাবে যে সময় বেঁচেছে সেই বাড়তি সময়েও কথা বলা হয়েছে—অর্থাৎ গানের অনুষ্ঠানে গানের চেয়ে কথার ভাগে সময় পড়েছে বেশি। গানগুলি পুরো না বাজাবার সঙ্গত কী কারণ থাকতে পারে বোঝা গেল না। গানগুলি চালানো হয়েছে বিকট শব্দ করে, শেষ করা হয়েছে কলি আর সুর কেটে—মানে ফেডার ওঠানোয় আর নামানোয় ঠিকমতো যত্ন নেওয়া হয় নি। গ্রন্থনা খুব চিত্তাকর্ষক না হলেও চলে গেছে।

রাত সওয়া ১০টায় ছিল সংবাদ বিচিত্রা - বাংলা অনুষ্ঠান। কিন্তু তার ভিতরেও এক ফাঁকে হিন্দী ঢুকে পড়েছিল। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বহু ছাত্রছাত্রী সেদিন স্টুডেন্টস হেলথ হোমে রক্ত দান করেছিলেন। সংবাদ বিচিত্রায় রক্তদান সম্পর্কে তাঁদের কয়েকজনের অভিমত শোনানো হয়েছিল। একজন ছাত্রের হিন্দী অভিমতও। কেন, বাংলা অনুষ্ঠানে বাংলা অভিমতের কি খুব ঘাটতি পড়েছিল? ছলেবলেকৌশলে হিন্দী প্রচার না করলেই নয়?

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূরের ভাষণটি যখন রেকর্ড করা হয়েছিল তখন তার কোয়ালিটি না হয় বোঝা যায় নি, কিন্তু পরে স্টুডিওর সংবাদ বিচিত্রাটি প্রস্তুত করার সময় যখন সেটি বাজানো হয়েছিল তখনও কি বোঝা যায় নি? খারাপ রেকর্ডিংয়ের জন্য মেয়রের ভাষণের একটি বর্ণও স্পষ্ট আসে নি, একটি বর্ণও বোধগম্য হয় নি। এই ভাষণ প্রচারের কোনো অর্থই হয় না, একমাত্র "ডিভিয়েশন" বাঁচানো ছাড়া অর্থাৎ "অনুষ্ঠানটা আমরা ক্যাভার করেছি" এই কথা বলতে পারা ছাড়া।

রাত সাড়ে ১০টায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল একটি গীতি আলেখ্য—"জয়যাত্রা"। রচনা শ্রীপ্রণব রায়, সংগীত পরিচালনা শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি মনে কোনো ছাপ ফেলতে পারে নি।

—শ্রবণক

জলসা

মেগাফোনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে উৎপলা সেন পুজোর রেকর্ড করছেন।
ফটো : অমৃত

সাংস্কৃতিকীর শেষ সাহানা

রবীন্দ্রনাথের লিপিকার 'উপসংহার' কাহিনী অবলম্বনে "শেষ সাহানা"-র এক নৃত্য-গীত-রূপ রবীন্দ্রসদনে মঞ্চস্থ করেন "সাংস্কৃতিকী"র শিল্পীবৃন্দ।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মত রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় তার বসন্ত-বর্ণিত নায়ক-নায়িকার হৃদয়-বেদনাকে মেলে ধরার কাজকে সুরে সুরে রূপময় করেছেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত-পরিবেশনায় নতুনত্ব হোল বিভিন্ন রাগ-সংগীতের সঙ্গে সমান্তরাল ধারায় রচিত রবীন্দ্রসংগীতের রূপায়ণ। এ প্রয়াস এর আগে সুমিত্রা সেন পরিচালিত "ত্রিবেণী"র অনুষ্ঠানে দেখা গেছে। অতএব বৈচিত্র্য থাকলেও তা প্রথম অনুষ্ঠানের দাবী করতে পারে না। তাছাড়া বিভিন্ন রাগ প্রসূনবাবুর শিক্ষিত কণ্ঠে সু-গীত হলেও, পরিবেশনা-পদ্ধতিতে সুবিবেচিত হয়ে উঠতে পারেনি।

আচার্য পালিত কন্যা মাধবী ও শিষ্যাদের বিভিন্ন ঠাটের রাগ শিক্ষাদানের বিন্যাস ক্লান্তিকর 'একঘেঁয়েমো'তে পরিণত না হয়ে আরো সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনাদীপ্ত হয়ে উঠতে পারত। পটভূমিকার রাগরূপের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চাঙ্গ নৃত্যের অবতারণার বিস্তৃত অবকাশ ছিল এবং তা দর্শকচিত্তে আরো বেশী দাগ কাটত। শেষের দিকের করুণ পরিসমাপ্তির কাব্যসৌন্দর্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়েছে অকারণ দীর্ঘসূত্রতার অনাবশ্যক আরোপে।

প্রথমেই কণিকা বন্দোপাধ্যায়ের অলংকারশিঞ্জিত কণ্ঠে "গানের ডালি ভরে" দেবার প্রতিশ্রুতি শিল্পী ত পূর্ণ করেইছেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "ভাঙা পথের রাঙা ধুলোয়", সুমিত্রা সেনের "সখী সে গেল কোথায়" এবং আরো অনেক সুন্দর এবং সুপরিবেশিত রবীন্দ্রসংগীত—যার তুলনা মেলা ভার। নৃত্যে ছিলেন সাধন গুহ, পলি গুহ, অলকানন্দা চাকলাদার। এঁরা সবাই আপনাপন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন এবং স্বল্প-পরিসরেও আপন উপস্থিতি সম্বন্ধে দর্শকদের সচেতন করেছেন শিবশংকরণ। আচার্যের স্নেহমধুর সরস রূপটি সুপরিস্ফুট করেছেন শম্ভু ভট্টাচার্য। অলক্ষ্যে থেকেও গহনসঞ্চারী রসের মত নাট্যভাবকে রাগলাপ ও ছন্দে চিত্তগ্রাহী করে তোলার জন্য কমলেশ মিত্রের কৃতিত্বও কিছু কম নয়। এ ছাড়া প্রদীপ ঘোষ ও বিশ্বদীপ ঘোষের ভাষ্যপাঠ, পলি গুহ পরিকল্পিত রূপসজ্জা, তাপস সেনের আলোকপাত এবং প্রদীপ গুহঠাকুরতার ব্যবস্থাপনা সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠান অবয়ব সাজিয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্যপাল শ্রী ডি এন সিংহ উদ্বোধন অনুষ্ঠানান্তে থঙ্গাশি কৃত্তির শিষ্যা কুমারী তনুশ্রী সেন "ভারত-নাট্যম"-এর আলারিপু, পদম এবং "তিলানা"র এক প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান প্রদর্শন করেন।

রবিতীর্থ প্রযোজিত তাসের দেশ

নিষ্প্রাণ প্রথার বিরুদ্ধে মুক্ত প্রাণের বিদ্রোহ, জীর্ণ বাধাকে ধূলিসাৎ করা যৌবনের দুর্বার শক্তিপ্রবাহের দুর্জয় আবেগের এক কাব্যময় রঙিন রূপভাষ্য "তাসের দেশ"-এর নৃত্যরূপ অনেক দেখেছি। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায়, গতানুগতিকতার ছন্দে বাঁধা শৃংখলমোচনের এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় সৃষ্টি করেছে ১০ ও ১৬ আগস্ট রবীন্দ্রসদন মঞ্চে পরিবেশিত রবিতীর্থের "তাসের দেশ"। শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের কল্পনার আলোয় "তাসের দেশ"-এর এক নতুন রূপ মনে রেখাপাত করতে পেরেছে শুধুমাত্র প্রচলিত নৃত্যনাট্য পরিবেশন প্রথার থেকে স্বাতন্ত্র্যতার কারণেই নয়, বিষয়বস্তুর অন্তর্গত নাটকীয়তা ও স্যাটায়ারকে ব্যঞ্জনাদীপ্তিতে হৃদয়ে ব্যাপ্ত করেছে এইখানেই এর বৈশিষ্ট্য। 'ডায়ালগ' বাহুল্যের ভার বর্জিত হয়ে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত নৃত্য-গানে-রবীন্দ্রনাথের ভাবের আকাশকে মেলে ধরার কাজে অনায়াস দক্ষতায় অর্জিত। বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্য যেটুকু সংলাপ প্রয়োজন তার বেশী একটি কথাও নেই। এই পরিমিতিবোধ রবিতীর্থের "তাসের দেশ"কে এমন আকর্ষণীয় করে তোলার অন্যতম কারণ। অনায়াসলব্ধ আরাম ও নিরাপত্তার আশ্রয় ছেড়ে রাজপুত্রের কূল কিনারাহীন সাগরে ঝাঁপ দেবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, "তাসের দেশ"-এর প্রাণীদের "নিয়মমত" চলার কৌতুকময় পরিস্থিতি, রাজপুত্রের উচ্ছল প্রাণের সোনার কাঠির স্পর্শে তাদের নব-রূপান্তর ও পরিণতির প্রত্যেকটি স্তর অসাধারণ নাট্যকুশলতায় বিস্তৃত অথচ সেটা অতিনাটকীয় হয়ে ওঠেনি এইখানেই রয়েছে শিল্পীর হাতের ছোঁয়া। শ্রীমতী মিত্রের কল্পনানুসারী সাবলীল নৃত্যরচনার কৃতিত্ব প্রাপ্য রামগোপাল ভট্টাচার্য শিবশংকরণ ও শম্ভু ভট্টাচার্যের। কোন শেড বা ডগমায় বাঁধা না হয়ে নাট্যের মূডের ছন্দে মুক্ত হয়েছে বলেই নৃত্যছন্দ এমন স্বচ্ছপ্রবাহী। একক নৃত্যে শিবশংকরণ (রাজপুত্র), জয়শ্রী লাহিড়ী (হরতনী) এবং শান্তি বসু (রুইতন)—দর্শকদের সপ্রশংসদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সমবেত নৃত্যগুলিতে রবিতীর্থের প্রতিটি শিল্পী অসামান্য দক্ষতায় ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। ভাষ্যকে স্বাভাবিক সৌন্দর্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নন্দিনী চক্রবর্তী, প্রণব দাসগুপ্ত, তুষার ভঞ্জ, সুচিত্রা মিত্র ও প্রদীপ ঘোষ। সুচিত্রা মিত্র ও দ্বিজেন চৌধুরীর পরিচালনায় সংগীত সুসংবদ্ধ। প্রথমের দিকে গানগুলি যে আশানুরূপ জোরালো হয়নি তার জন্য দায়ী মাইক নিয়ন্ত্রণের বিশৃংখলতা। কনিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত ও সুরেন চক্রবর্তীর মঞ্চ ও রূপসজ্জা সর্বাঙ্গীন সার্থকতার জন্য অনেকখানি দায়ী। ৬ সেপ্টেম্বর আবার রবীন্দ্রসদন মঞ্চে রবিতীর্থের শিল্পীরা "তাসের দেশ" পরিবেশন করবেন।

—চিত্রাঙ্গদা

সুহাসিনী মুলে

মৃণালসেনের ভুবন সোম

[ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রীমৃণাল সেনের নতুন ছবি 'ভুবন সোম' (হিন্দী) স্বর্ণ-পদক পেয়েছে। অবশ্য এবারে উৎসবে কোন বিশেষ পুরস্কার ছিল না। জুরীরা যে কটি ছবি নির্বাচিত করেছেন, তার প্রতিটিকেই স্বর্ণ-পদক দেওয়া হয়েছে। শ্রীমৃণাল সেনের এই পুরস্কার প্রাপ্তি ভারতীয় ছবির গৌরবময় পথকে উজ্জ্বল করল।]

ছবির কাহিনী : একজন কর্তব্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ রেলকর্মচারী (ভুবন সোম) জীবনের প্রায় সব সময়টুকুই কাটিয়েছেন অফিস আর বাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে। ছবির নায়ক এই প্রৌঢ় রেলকর্মী, তার জগৎ ফাইলপত্র আর কালির আঁচড়ের মধ্যেই। 'জীবন' সম্পর্কে তার নেই কোন চেতনা বা অনুভূতি। জীবনের মধ্যযামে এসে যখন সে নিজের একাকীত্বকে বুঝতে পারে, তখন ক'দিনের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শিকার করতে এক নতুন সমাজ, এক নতুন জায়গায় যাদের ভাষা সে জানে না। সে সমাজ, সেখানকার মানুষ এক নতুন জীবনের স্বাদ বয়ে আনে তার জীবনে। শিকার শেষে এ ক'দিন বাদে সে ফিরে আসে ঘেরাটোপ চৌহদ্দীতে এক নতুন জগতের অনুভূতি নিয়ে।

এই ছবি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম শ্রীসেনকে।

প্রঃ আপনি এ ছবি হিন্দীতে করলেন কেন?

শ্রীসেন ঃ সাধারণত আমি যে ধরনের ছবি করি, তার দর্শক খুবই কম। কাজেই আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ভালো দর্শক দেশের সব জায়গাতেই কমবেশী আছে। সুতরাং হিন্দীতে ছবি করলে সাফল্য সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়, আর তাছাড়া আমার ছবির বাজেটও বেশী নয়।

প্রঃ 'ভুবন সোম' গল্পের কোন দিকটা আপনাকে আকর্ষণ করেছে বেশী, যে কারণে এ গল্প নিয়ে ছবি করলেন।

শ্রীসেন ঃ প্রধান চরিত্রের যে জীবন সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা আসবে, এক ঘেরা চৌহদ্দী থেকে বিরাট জগতের বিচিত্র সমাজের সামনে এসে তার দাঁড়ানো, এটাই আমার কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে। আর তার এই নতুন পথে যাত্রা যেন আমার কাছে স্পিরিচুয়াল জার্ণি হিসেবে ধরা দিয়েছে।

প্রঃ ছবি করার সময় ভাষা কি কোনো বাধার সৃষ্টি করে নি?

শ্রীসেন ঃ হ্যাঁ নিশ্চয়ই করেছে, চিত্রনাট্য লেখার পর তা ট্রানস্লেট করিয়ে নিয়েছি অপরকে দিয়ে, সংলাপও তাই। অন্যের ওপর ভরসা করতে হয়েছে একটু বেশী হিন্দীও তো কম 'রিচ' ভাষা নয়, একটা ছোট শব্দ বা কথা যে অনুরনন আনতে পারে সেটা হয়ত আমি ঠিক ধরতে পারিনি, চেষ্টা করেছি সাধ্যমত।

প্রঃ ছবিতে সমকালীনতার অনুপ্রবেশ থাকা উচিত—এ সম্পর্কে আপনার মত কি? আগের ছবির মত এ ছবিতেও কনটেম্পোরারি সমস্যা নিয়ে কিছু বলতে চেয়েছেন কি?

শ্রীসেন ঃ শুধু ছবি কেন সব শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্রেই সমকালীন চিন্তা না থাকলে তা যথার্থ শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে না। ছবির কাহিনী যত পুরোনোই হোক না কেন তাতে কনটেম্পোরারি অ্যাটিচুড ইনভেস্ট করা দরকার। এ ব্যাপারে হয়ত মতদ্বৈত থাকতে পারে, কিন্তু আমি এ মতের পক্ষে সব সময়। ভুবন সোম লেখা হয়েছিল আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে। লেখক নিশ্চয়ই তখনকার সংস্কার ইত্যাদির বাধা ছাড়িয়ে বেশী দূরে এগোতে পারেন নি। সব ঘটনাকে অবিকৃত রেখেও ছবি করার সময় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে সমকালীন চিন্তা ও সমাজকে তাতে প্রতি-ফলিত করতে চেষ্টা করব। তার জন্য মূল লেখার অদল-বদল কিছু করার স্বাধীনতা নিশ্চয়ই শিল্পীর থাকবে। এ ছবিতেও করেছি তাই। ভুবন সোম যে নতুন জগতে গিয়েছে তার ভাষা তার পরিবেশ তার কাছে অপরিচিত। কিন্তু সেই অপরিচিতের জগতে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলো। জীবন যন্ত্রণার ঘানি টেনে সে ছিল ক্লান্ত। এ পৃথিবী যে কত সুন্দর, কত বিচিত্র মানুষ আছে মেশার তা সে বুঝলো এই নতুন জগতে গিয়ে। আসল ব্যাপার একটা বন্ধ জায়গার মানুষকে দিগন্তজোড়া খোলা মাঠের মধ্যে এনে ছেড়ে দিয়ে তার অনুভূতিকে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেছি। সোজা কথায় ভুবন সোমের কনফ্রোনেশন অফ লাইফ আমাকে টেনেছিল। তাই একটা সৎ চরিত্রকে কিছুটা 'হিউম্যান' করে অসৎ করে তুলতে চেয়েছি। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি-বিশেষের সম্পর্কের কথা এসে গেছে সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই। এ সমস্যাও নিশ্চয়ই এখনকার সমস্যা।

প্রঃ বর্তমান সেন্সর বোর্ড কোন রকম বাধা হয়েছিল কি এ ছবি করার কাজে?

শ্রীসেন ঃ না, বাধা হয় নি। আমার ছবিতে রাজনৈতিক ব্যাপারও কিছু আছে কিন্তু সেন্সরবোর্ড তাতেও কোনো আপত্তি করেন নি।

প্রঃ শুনেছি, নতুন কিছু করছেন এ-ছবিতে? তা কি রকম?

শ্রীসেন ঃ এক কথায় কি বলব? তবে কনভেনশনকে ভেঙে নতুনভাবে পরীক্ষা চালিয়েছি ট্রিটমেন্টে। নানা ধরনের টেকনিক আছে যন্ত্রপাতির, লেখক যেমন শব্দ নিয়ে লিখতে বসে ছিনিমিনি খেলতে গিয়ে নতুন কিছু তৈরী করেন, আমিও আমার শব্দ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি নিয়ে সে ধরনের কিছু করতে চেষ্টা করেছি। তারপর দর্শকরা কি বলে দেখা যাক।

প্রঃ এ ছবিতে সংগীতকে কতটা প্রাধান্য দিয়েছেন?

শ্রীসেন ঃ ছবির বক্তব্য প্রকাশে সংগীতের স্থান তো কম নয়, এখানেও কম গুরুত্ব দিই নি।

(শ্রীসেন বাইশ তারিখে রওনা হয়েছেন ভেনিসের পথে। এখানে তেরো দিন কাটানোর পর প্যারিস ও লণ্ডন হয়ে প্রায় এক মাস বাদে ফিরবেন দেশে)

—নি ঘ

এক শ্রীমান এক শ্রীমতী: ববিতা এবং শশী কাপুর

প্রেক্ষাগৃহ

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব

১৫ থেকে ২১ আগস্ট সাত দিন ধরে ...নীয় লাইট হাউস সিনেমায় ভারত সর...রের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক আয়োজিত ...রাসী চলচ্চিত্র প্রদর্শনী উৎসব' অনুষ্ঠিত ...য় গেল। বলা বাহুল্য, প্রতিদিনের প্রতিটি ...র্শনীতেই (প্রত্যহ তিনটি করে প্রদর্শনী) ...ক্ষাগৃহ পূর্ণ ছিল এবং সাত দিনে সাত...নি কাহিনীচিত্র দেখানো হয়। যত দর্শক ...বগুলি দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তার ...গুণ দর্শক প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে না ...রে বিফলমনোরথ হয়েছেন। এই প্রদর্শনী...লিকে সমষ্টিগতভাবে 'উৎসব' আখ্যা ...ওয়া হয়েছে। 'উৎসব' কথাটির নিহিতার্থ ...ল এই যে, এতে প্রদর্শিত ছবিগুলিকে ...ন্সারের ছাড়পত্র নিতে হয় নি, সেন্সারের ...চি এদের কোনোটিকেই ক্ষতবিক্ষত কর...র সুযোগ পায় নি। এবং এই প্রদর্শনী...লির টিকিট কিনতে কোনো প্রমোদকর ...তে হয়নি।

ফরাসীদের সম্পর্কে একটা প্রসিদ্ধি আছে যে, এরা হচ্ছে জাতশিল্পী। এদের আহারে, বিহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে, প্রতি-দিনের জীবনযাত্রার ধরণধারণে একটা শিল্পের ছোঁয়াচ পাওয়া যাবেই যাবে। এদের সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য, অভিনয় প্রভৃতির মতো এদের চলচ্চিত্রেও শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়ই যায়। চলচ্চিত্র শিল্পকে একটি বিরাট ব্যবসায়ে পরিণত করতে চেষ্টা করেছে হলিউড। ফ্রান্স কিন্তু চলচ্চিত্রের জন্মকাল থেকেই (লুমিয়ের ব্রাদার্স-এর প্রচেষ্টা স্মরণীয়) এর শিল্প-সত্তাটির প্রতি অধিকতর আকর্ষণ অনুভব করেছে। এবং সেই কারণেই হলিউডে চলচ্চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে প্রযোজক বা প্রোডিউসারকে সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হলেও ফ্রান্সে একটি চলচ্চিত্রের জনক হিসাবে তার পরিচালকের আসনই সকলের ঊর্ধ্বে স্থাপিত।

বর্তমান চলচ্চিত্রোৎসবেও ফরাসীদের শিল্পী মনটি সুস্পষ্টভাবেই প্রকট। ব্যব-সায়িক ভিত্তিতে নির্মিত হলিউডী ছবির মতো ফ্রান্সের ছবিগুলি কোনো বাঁধাধরা ছক ধরে অগ্রসর হয় না। প্রতিটি ফরাসী ছবিতে পরিচালকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট, প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা; এমন কি, কারুর চিত্রভাষার সঙ্গে অন্য কারুর মিল নেই। কেউ বা গুরুগম্ভীর, সিরিয়াস, আবার কেউ পরিহাসপ্রবণ। এই পরিহাস-প্রবণতায় ফরাসীরা যেন সিদ্ধহস্ত; মোলে-য়ারের জাত কিনা! তাই প্রদর্শিত সাতখানি কাহিনীচিত্রের মধ্যে যে তিনখানি সবচেয়ে বেশী উপভোগ্যতার সৃষ্টি করতে পেরেছে, পরিহাসপ্রবণতার ব্যাপারে তাদের অভি-নবত্ব রীতিমত অনাস্বাদিতপূর্ব।

প্রথমেই পিয়ের এতে'র 'দি গ্রেট লাভ' ছবিখানির কথা ধরা যাক। মনঃসমীক্ষণের এমন পরিহাসপ্রবণ চিত্র আর কখনও কি আমরা দেখেছি? নায়ক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার সময়ে ভাবছে, আরও কত না মেয়ে-কেই সে বিবাহ করবে বলে ভেবেছিল! সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক বধূবেশিনীর সারি-বন্দী হয়ে আবির্ভাব। স্ত্রী হিসেবে ফ্লোরেন্স মেয়েটি আদর্শস্থানীয়া। কিন্তু বিবাহিত জীবনযাপনের কয়েক বছর অতি-

আই লাভ ইউ ছবির একটি দৃশ্য

ক্লান্ত হবার পরেই নায়কের সময় সময় মনে হয়, ফ্লোরেন্স যেন বুড়িয়ে গেছে, তাতে এবং তার মায়েতে কোনো তফাৎ নেই। নায়কের মোটর আছে; কিন্তু বাড়ী থেকে শ্বশুরের কারখানায় কাজ করতে যাবার সময়ে সে ছাতি হাতে করে হেঁটে যেতেই ভালোবাসে। কিন্তু পাড়ার সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত বর্ষীয়সীরা তার এই হেঁটে যাওয়ার মধ্যেই উদ্দেশ্য খুঁজে বার করলেন—যাওয়ার পথে যে যুবতীটিকে বিপরীত দিক থেকে আসতে দেখে, তারই সঙ্গে তার নাকি নটঘট। এক কান থেকে আর এক কান, তার থেকে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম কান-কানাকানি হতে হতে তিল অতি দ্রুত কেমন তালের আকার ধারণ করে, তার অসামান্য উপভোগ্য চিত্র উপস্থাপিত করেছেন পরিচালক। নায়কের মন যখন নবনিযুক্ত যুবতী 'স্টেনোগ্রাফার'-এর দিকে ধাবিত হতে চাইছে, তখন তার মনের দোদুল্যমান অবস্থাটি কি বিচিত্রভাবেই না চিত্রিত হয়েছে। নায়ক ভাবছে, বছর দশেক আগে যদি ঐ 'স্টেনো'র সঙ্গে দেখা হত, অমনই নায়কের সামনে আবির্ভূত হল দশ বছর আগে 'স্টেনো'র যে বয়েস ছিল, সেই ন' বছরের খুকীটি। বেচারা নায়ক মুষড়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে উঠল হাসির হুল্লোড়। স্বামী-স্ত্রী থেকে দূরে থাকতে চায়; অতএব খাট হয়ে উঠল সচল, বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পথে এবং নায়ক সমেত খাটখানি যে কত বিচিত্র অবস্থার সম্মুখীন হল, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। শেষ পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মিলনে ছবির সমাপ্তি। বাইরের ঘটনার সঙ্গে অন্তরের চিন্তাকে চিত্রিত করে এবং কথার চেয়ে অ্যাকশনকে প্রাধান্য দিয়ে পিয়ের এতেঁ 'দি গ্রেটলাভ'কে (১৯৬৮) একটি অনবদ্য পরিহাসমুখর বর্ণসুষমা-মণ্ডিত চিত্রে পরিণত করেছেন।

পরিচালক ইভেজ রবার্ট-এর চেহারার ভিতর দিয়েই একজন পরিহাসপ্রিয় ব্যক্তিকে উঁকি মারতে দেখা যায়। তাঁর পরিচালিত রঙীন ছবি 'হ্যাপি অ্যালেকজাণ্ডার' একজন জবরদস্ত স্ত্রী দ্বারা নিদারুণভাবে উৎপীড়িত ভীমকায় স্বামীর দুঃসহ জীবনের পরিহাসমুখর আলেখ্য। ভদ্রলোক আকাশ দেখতে ভালোবাসেন, গাছ-পাখী দেখতে ভালোবাসেন মাছ ধরতে ভালোবাসেন, বিলিয়ার্ড খেলতে ভালোবাসেন। কিন্তু রায়বাঘিনী স্ত্রীর জ্বালায় তাঁর বিন্দুমাত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবার উপায় নেই, তিনি চরকীর মতো ঘুরে মরেন গাধার খাটুনী খেটে স্ত্রীর হুকুম মতো। আবার রাত্রেও যে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাবেন, তাতেও বাদ সাধবেন স্ত্রী; তিনি হঠাৎ হুকুম করে বসেন, শিগ্‌গির আমার বিছানায় এস। এ হেন স্ত্রী একদিন মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। অ্যালেকজাণ্ডার কিছুক্ষণ শূন্যমনা রইলেন। তারপর স্থির করে ফেললেন নিজের কর্মধারা। প্রতিজ্ঞা করলেন, বিছানা তিনি কিছুতেই ছাড়বেন না—যতটা পারেন ঘুমিয়ে নেবেন। স্ত্রী বেঁচে থাকতে একটি কুকুরকে বাড়ীতে আনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটবার উপক্রম হয়েছিল। সেই কুকুরই এখন তাঁর সহায় হল: সেই বাস্কেটে করে দোকান থেকে সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দেয়। প্রতিবেশীরা উঠে পড়ে লেগে গেল, আলেকজাণ্ডারকে বাড়ীর বার করবার জন্যে। দোকানের মেয়ে আগাথা আলেকজাণ্ডারের প্রেমে পড়বার ভান করল তার অগাধ বিষয়-সম্পত্তির লোভে। কুকুরকে আটকে রেখে আলেকজাণ্ডারকে শেষ অবধি বিছানা ছাড়ানো গেল। এমন কি, দোকানী মেয়ে আগাথাকে তার ভালোও লেগে গেল। বিয়ের সব ঠিকঠাক; গির্জায় বর-বধূ পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে। স্বামী-স্ত্রীরূপে মিলিত হবার জন্যে। কিন্তু গোল বাধালো কুকুর: আগাথার জন্যে কুকুরকে ছাড়তে পারে না আলেকজাণ্ডার। অতএব বিয়ের আসর ছেড়ে আলেকজাণ্ডার ছুটল কুকুরকে নিয়ে, আর তার পিছনে ছুটল গাঁশুদ্ধ লোক ভাবী-বধূকে সঙ্গে নিয়ে। —ছবির আগাগোড়া অগণিত বিচিত্র পরিস্থিতির মাধ্যমে বেদম হাসির খোরাক। কিন্তু হাসতে হাসতেও বেচারা আলেকজাণ্ডারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করে উপায় নেই। শিল্পীদের কথা বাদই দিন, কুকুর পর্যন্ত যা অভিনয় করেছে অর্থাৎ তাকে দিয়ে যা অভিনয় করানো হয়েছে, তা অচিন্ত্যপূর্ব।

ক্লড বেরী পরিচালিত শাদা-কালো ছবি 'দি ওল্ডম্যান অ্যান্ড দি চাইল্ড'ও নিশ্চয়ই প্রধানত কৌতুকরস পরিবেশন করেছে, কিন্তু সে রস কিছুটা সূক্ষ্ম ও কমনীয়। ফ্রান্স যখন নাৎসী অধিকৃত, তখন একটি দুরন্ত বালককে নিরাপত্তার জন্যে তার বাপ-মা এক দূর পল্লীঅঞ্চলে পাঠালেন এক বৃদ্ধ-দম্পতির আশ্রয়ে থাকবার জন্যে। বালকটিকে বিশেষ করে শিখিয়ে দেওয়া হল, তার গায়ে যে ইহুদী রক্ত প্রবাহিত, একথা সে যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করে। কিছুদিন থাকতে থাকতে বালক এবং বৃদ্ধের মধ্যে যে আশ্চর্য মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল, তাই ছবিটির বিরাট অংশ জুড়ে আছে এবং ছবিটিকেও মধুর উপভোগ্য করে তুলেছে। বৃদ্ধের ভূমিকায় মিসেল সিমন-এর অনবদ্য অভিনয়পটুতার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়েছে বালক অভিনেতাটি।

দর্শকসাধারণের কাছে সব থেকে উত্তেজনাপূর্ণ ছবি হচ্ছে আঁদ্রে কায়াতে পরিচালিত রঙীন ছবি 'প্রোফেসান্যাল বা অকুপেসান্যাল হ্যাজার্ড', যার আর এক নাম হচ্ছে 'অল ইন দি ডেজ ওয়াৰ্ক'। আপাত-দৃষ্টে যে পরিস্থিতিকে অত্যন্ত সহজ বিবেচনা করে মানুষ বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তা যে কতদূর পর্যন্ত জটিল হতে পারে এবং সেই কারণে বিচারও কতদূর পর্যন্ত ভ্রান্তিপূর্ণ হতে পারে, তারই এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন উপস্থাপিত হয়েছে এই ছবিটির মাধ্যমে। সদ্য বয়ঃপ্রাপ্তা তরুণী স্কুলছাত্রী হঠাৎ অভিযোগ করে বসল ক্লাশের শিক্ষক নাকি তাকে ধর্ষণ করবার চেষ্টা করেছেন। যে ব্যক্তি এতকাল আদর্শ শিক্ষক রূপে সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁরই বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ অবিশ্বাস্য। কিন্তু ছাত্রীটি অভিযোগে অটল। অভিযোগের সত্যতা অনুসন্ধান করবার সময়ে প্রকাশ পেল ক্লাশের সবচেয়ে ভালো ছাত্রীটির সঙ্গে শিক্ষকের গোপন

সম্পর্ক বিদ্যমান এবং এ ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করল সেই ভালো ছাত্রীটির নিত্যসঙ্গিনী অপর এক ছাত্রী ফলে শিক্ষকের হল কারাদণ্ড। কিন্তু শিক্ষকের স্ত্রী স্বামীকে একান্তভাবে বিশ্বাস করেন। তিনি নিজে এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত শুরু করলেন এবং একের পর এক প্রকাশিত হল যে, সব অভিযোগই মিথ্যা। —কাহিনীর ঘটনাবলীকে এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় এমন বাস্তবধর্মী য, দর্শক ছবির কাহিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে বাধ্য এবং তাঁর কৌতূহল একেবারে শেষ শট পর্যন্ত অটুট থাকে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক আলা রেনে পরিচালিত রঙীন ছবি 'আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ' (১৯৬৮) সম্পর্কে অনেকেই অভিযোগ করেছেন, এতে ঘটনাবলীর কোনো পারম্পর্য নেই, সময় সম্পর্কিত ঐক্য একেবারেই উপেক্ষিত। কিন্তু অভিযোগ যে অমূলক, তা কাহিনীটি একটু মন দিয়ে অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। এক ভদ্রলোক জগৎ সম্বন্ধে নিজের অনীহা ও নিঃসঙ্গতা বোধের হাত থেকে নিস্তার পাবার শেষ উপায় হিসেবে নিজেকে গুলিবিদ্ধ করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু ডাক্তার-বৈজ্ঞানিকেরা তাকে বাঁচিয়ে তুলে একটি ওষুধের অতীত স্মৃতি নিমিষে পুনর্জাগরিত করবার ক্ষমতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার কাজে লাগান। ওষুধ প্রয়োগের পরে তাকে একটি বিশেষভাবে নির্মিত বদ্ধস্থানে শায়িত অবস্থায় রেখে সে কোন্ কোন্ সময়ে কতক্ষণের জন্যে অতীতে ফিরে যাচ্ছে, তা পরিমাপ করা হতে থাকে যন্ত্রের সাহায্যে। তার এই অতীত বিচরণ প্রায় মানুষের স্বপ্ন দর্শনেরই অনুরূপ। সে কখনও দেখছে, সে সমুদ্রে স্নান করছে তার সঙ্গিনী সমুদ্রকূলে শুয়ে জিজ্ঞেস করছে—সে কেমন স্নান করল, কি কি দেখল, আবার কখনও দেখছে, সে আপিসের কোনো কর্মবিমুখ তরুণীর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করছে, কখনও তাকে ভালো লাগছে, কখনও লাগছে না, কোনো সময়ে সে নিজে বিষণ্ণ, আবার অন্য কোনো সময়ে কর্মচঞ্চল, কোনো সময়ে একটি মেয়ের সঙ্গ তার কাছে কাম্য হয়ে উঠছে, আবার পরক্ষণেই তাকে দূরে সরাতে পারলে সে বাঁচে এবং কোনো কোনো দৃশ্য বারে বারেই তার মনে উদিত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে সেই নিকট-অতীতের দৃশ্য দেখে, যখন সে আত্মহত্যার জন্যে নিজেকে গুলিবিদ্ধ করবার ফলে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আজকের অনিশ্চিত জগতে একজন যুবকের নৈরাশ্য ও নিঃসঙ্গতা-বোধের একটি বুদ্ধিদীপ্ত চিত্র উপহার দিয়েছেন আলা রেনে।

সাদা-কালো ছবি 'মুসে'র (১৯৬৭) পরিচালক রোবের ব্রেসোঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি অপর কারুর থেকে কম নয়। নিত্য দুঃখ ও বঞ্চনার মধ্যে বেড়ে উঠলে ছেলে-মেয়েরা মনের দিক দিয়ে কি রকম মুষড়িয়ে যায় এবং প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কতখানি পর্যন্ত মরিয়া হয়ে ওঠে, তাই অত্যন্ত দরদী মন নিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন পরিচালক ব্রেসোঁ চোদ্দ বছরের মেয়ে মুসে'র মর্মন্তুদ জীবন-নাট্যের মাধ্যমে। নিজের দৈন্য ভুলে সে কার্ণিভ্যালে ক্ষণিকের সুখ প্রচণ্ডভাবে উপভোগ করেছে, একটি যুবকের ভালো-লাগা দৃষ্টি তাকে রূপৈশ্বর্যময়ী করে তুলেছে, আবার মাতালের পশুত্বের শিকার হবার পরে তার মন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে, তার মায়ের শুশ্রূষাকারিণীর কাছ থেকে পরিচ্ছদ-গুলিকে সে গ্রহণ করেছে যন্ত্রচালিতবৎ এবং শেষ পর্যন্ত মনোমত পোশাকটি অঙ্গে জড়িয়ে সে একান্ত খেলাচ্ছলে গড়াতে গড়াতে নিজের জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছে পুষ্করিণীর গহীন জলের তলায় নিজের সমাধি রচনা করে। ব্রেসোঁর 'সাজেস্টিভ ট্রিটমেন্ট'—ইঙ্গিতধর্মী চিত্রভাষা লক্ষ্যণীয়-ভাবে চরিত্রটির জীবনস্পন্দনকে মূর্ত করে তুলেছে।

ফরাসী ছবি অ্যান ওল্ড ম্যান অ্যান্ড এ চাইল্ড

সপ্তম ছবি হচ্ছে 'দি পুল' বা 'দি সুইমিং পুল'। এ জগৎটাই বোধ করি কারুর কারুর কাছে সুখে সন্তরণ-বিহার করবার জায়গা। পরিচালক জ্যাক ডেরে তাই এই ছবিটির প্রাকৃতিক পরিবেশকে এমন লোভনীয়ভাবে সৌন্দর্যময় করে তুলেছেন, যেখানে নিশ্চিন্তে অবসর বিনোদন করা যায়। ঔজ্জ্বল্যেভরা মনোরম বাগান-বাড়ীতে জাঁ পল ও মেরিয়া পরস্পরের সঙ্গসুখ উপ-ভোগ করছিল মনের খুশীতে ভরপুর হয়ে, এমন সময়ে সেখানে এসে হাজির হল ওদের আগেকার বন্ধু হ্যারি; সঙ্গে তার তরুণী কন্যা পেনিলোপী। বাধল গোল; মেরিয়াকে নিয়ে পল ও হ্যারির মধ্যে একটা পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এবং সেইটি অনুভব করেই পল অনেকটা হ্যারিকে জব্দ করবার জন্যে পেনিলোপীর দিকে হাত বাড়াল। অন্তরে বুভুক্ষ পেনিলোপী সহজেই পলের ডাকে সাড়া দিল—তার মন নেচে উঠল, সে পলকে মেরিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে ভেবে। বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে হ্যারির পিতৃত্ব ধিক্কৃত বোধ করল। মত্ত অবস্থায় পলের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে সে সামনের পুকুরে পড়ে গেল। আর সেইক্ষণেই পলকে যেন প্রতি-হিংসা পেয়ে বসল, সে হ্যারিকে সাঁতারে ডাঙ্গায় উঠতে বাধা দিতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত অবসন্ন হ্যারিকে সে জলের মধ্যে চেপে ধরে হত্যা করল। পুলিশী

দেবী। নূতন

অনুসন্ধানে পল প্রায় ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল মেরিয়ার কৃপায়, কারণ মেরিয়া তাকে সত্যিই ভালোবাসে এবং সে হত্যাপরাধী জেনেও তার ভালোবাসা থাকে জীবন্ত। এইটিই হচ্ছে এবারের একমাত্র ছবি, যাতে ফরাসী-ছবিসুলভ কিছু যৌন-দৃশ্যের বাড়াবাড়ি, কিছু নগ্নতা স্থান পেয়েছে। কিন্তু বাকী দুখানি ছবির প্রত্যেকটি আশ্চর্যরকম পরিচ্ছন্ন, এমন কি মার্কিনী ছবিতে যার ছড়াছড়ি, সেই চুম্বনের দৃশ্যও রীতিমত অনুপস্থিত।

কাহিনী-চিত্রগুলির সঙ্গে যে আটটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে দুখানি হচ্ছে কার্টুন, একটি বোমা, অপরটি জুতো সম্পর্কে। বাকীগুলি রেখা, রং, তরঙ্গ বস্তু প্রভৃতি অবলম্বনে সম্পূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক, যেখানে চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার চূড়ান্ত দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি তো 'রিভার্স' ক্র্যাংকিং-এর নৈপুণ্যে ভরা।

চিত্র সমালোচনা

একটি সাফল্যপূর্ণ আবেগধর্মী ছবি

না। কোনো রকম ঢক্কানিনাদ নয়, কোনো রকম বাহাদুরীর চেষ্টা নয়, কোনো রকম বড়ো বড়ো নামের সমাবেশ নয়, কোনো রকম আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষাও নয়ই যে কোনো কালে লেখেনি, এমন লোকের লেখা কাহিনী এবং তাতে কয়েকটি আবেগভরা পরিস্থিতি রচনা—এরই উপর নির্ভর করে উপযোগী সংলাপসহ একটি ঝরঝরে চিত্রনাট্য। সেই চিত্রনাট্য অবলম্বনে গঠিত হয়েছে দীনেশ চিত্রম-এর সদ্য শ্রী, প্রাচী, ইন্দিরা এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি—'পান্না-হীরে-চুনি'। কাহিনীর মধ্যে এমন কোনো নতুনত্ব নেই। সেই মান্ধাতার আমলের "ঢুলী" থেকে শুরু করে ছোট গ্রাম্য গাইয়ে বাজিয়ের বড়ো হবার চেষ্টায় শহরে এসে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করার গল্প এই বাংলাদেশেই অনেক হয়ে গেছে। কিন্তু তবু ঐ গ্রাম্য যাত্রাদলের ছেলে গোপালের বিবেক সেজে গান গেয়ে জমিদারের কাছ থেকে সোনার মেডেল পাবার পরে মা-বোনকে ছেড়ে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসে চৌরঙ্গীর রাস্তায় গান গেয়ে মোটর-ক্লীনার রবিদাকে প্রথম বন্ধু হিসেবে লাভ করা এবং তার সঙ্গে ভাগ্যকে এক করে জড়িয়ে সানাই-বাজিয়ে ভোলাদার আশ্রয়ে এসে বাস করার মধ্যে এমন এক সহজ আন্তরিকতাকে প্রত্যক্ষ করা গেল, যাকে আপনার করে নিতে মনের বিন্দুমাত্র বিলম্ব সইল না। বস্তির মধ্যে বাস করার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ভোলার ছোট বোন টগরের কার্যকলাপ ও মুখের বুলিকেও অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত লেগেছে। এর পরেও কাহিনীটি যে ধারায় বয়েছে—গোপালের বাঁধা-দেওয়া মেডেলটিকে উদ্ধারের চেষ্টায় রবির চৌর্যাপরাধে জেলে যাওয়া, রবিকে পথচারীদের মারের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে গোপালের দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে অন্ধ হওয়া, ইম্প্রেসারিও নিশীথ সান্যালের লোভী মনের হীন কার্যকলাপ এবং শেষ পর্যন্ত সকল দুঃখের অবসান হয়ে ভোলা, রবি, গোপাল ও টগরের যথাযথ মিলন—তাতে খুব বেশী কিছু অসঙ্গতি নজরে পড়েনি এবং কাহিনীটি ছবির মাধ্যমে সমগ্রভাবে দর্শক সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে এবং এইখানেই কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক এবং একযোগে চিত্রনির্মাতাদের সার্থকতা।

অভিনয়ে কাহিনীর নায়ক বেশে সুখেন দাস অভিনয়ের মধ্যে একটি সহজ আন্তরিকতার ছাপ রাখতে পেরেছেন; বিশেষ করে গোপালের অন্ধ অবস্থায় তাঁর অভিনয় অন্তরস্পর্শী। গোপালের মঙ্গলকামী দুই বন্ধু রবি ও ভোলার ভূমিকায় যথাক্রমে অনুপকুমার ও দিলীপ রায়ের অভিনয় স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও স্বাভাবিক। ইম্প্রেসারিও নিশীথ সান্যালের কূট দুষ্টবুদ্ধি চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে নিরঞ্জন রায়ের অভিনয়ের মাধ্যমে। এছাড়া শৈলেন মুখোপাধ্যায় (ওস্তাদ), পঞ্চানন ভট্টাচার্য (নিবারণ চাকর), শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে কিশোরী টগরের ভূমিকায় রত্না ঘোষাল তার সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক অভিনয়নৈপুণ্যগুণে দর্শক-হৃদয় জয় করেছে। ঠিক মতো শিক্ষা পেলে তার বাণী আরও পরিষ্কার ও শ্রুতিগ্রাহ্য হতে পারত। গ্রাম্য চাঁপার ভূমিকায় জ্যোৎস্না বিশ্বাস আগাগোড়া চমৎকার সংযত অভিনয় করেছেন। গোপালের মা বেশে বাণী গাঙ্গুলীর অভিনয় সাধারণ পর্যায়ের। মিস উর্বশী সেন রূপে বেবী গুপ্তা তার ঠোঁটের গানটিকে আপন করে নিতে পেরেছেন উপযোগী ভঙ্গিমাসহ।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ অসামান্যতা দাবি করতে পারে না—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মধ্যমান রক্ষিত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অপেক্ষাকৃত নবাগত অজয় দাস। ছবিটি প্রয়োজনবশে সঙ্গীত-প্রধান। নায়ক হচ্ছে গাইয়ে এবং আধুনিক গানের জগতে জনপ্রিয় হয়ে সে নিজের ভাগ্য গড়তে চায়। একখানি গান ওস্তাদের কাছ থেকে তালিম নেওয়া সমেত তার মুখে সেইজন্যেই আছে কম করে ছখানি গান। গানগুলি রচনার দিক দিয়ে অনেকাংশে দুর্বল হলেও সুরযোজনায় নৈপুণ্যের অভাব নেই। এবং প্রতিটি গানই সাধারণভাবে শ্রোতাকে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে। তবে যে স্তরে গিয়ে পৌঁছলে একখানি গানকে 'আহা মরি' বলা যায়, তেমন

জায়গায় পৌঁছুতে কোনোটিকেই দেখলুম না। তবুও বলব, দীনেশ চিত্রম-এর 'পাম্মা-নীরে-চুনি' দর্শকসাধারণকে অতিমাত্রায় আনন্দ দেবেই দেবে।

মঞ্চাভিনয়

অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের নাট্যাভিনয়

একটানা কর্মব্যস্ততার মাঝখানে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো যখন প্রত্যাশিত ছুটির ডাক আসে, তখন সেই নিবিড় অবসরের মুহূর্তটিকে কিভাবে শিল্প-সুষমায় ভরিয়ে তুলে নিজেদের আনন্দতন্ময় চিত্তকে সবার আনন্দহিল্লোলে মিশিয়ে দিতে হয়, সেই প্রীতিস্নিগ্ধ কৌশল বোধ হয় সাংবাদিকদেরও অজানা নেই। এই সত্যটাই সেদিন পাদপ্রদীপের আলোয় তুলে ধরলেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা। 'রঙমহলে' পরিবেশিত নাটক 'সমুদ্রশঙ্খ'-এর মধ্য দিয়ে এঁরা জানাতে চাইলেন প্রতিদিন দেশবিদেশের খবর তুলে এনে জনসাধারণের কৌতূহল মেটানো যেমন তাঁদের জীবনব্রত, তেমনি আবার আকাঙ্ক্ষিত কোন মুহূর্তে শৈল্পিক আনন্দ উপভোগের সূত্রে কৌতূহলী মানুষের সঙ্গে এক নতুন সম্প্রীতির সেতুবন্ধন করা তাঁদের আর এক কর্তব্য।

'সমুদ্রশঙ্খ' নাটকটিতে নাট্যকার রতন ঘোষ ভারতীয় আদর্শের জয়গান করেছেন, দেখিয়েছেন নানারকম সমস্যার আঘাতে কিভাবে দীর্ঘকাল পোষিত আদর্শগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, এবং কিভাবে দুঃসহ বেদনার মেঘ নেমে আসে।

নাটকটির উপস্থাপনায় নির্দেশক শ্রীদিলীপ মৌলিক তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পবোধের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। আবহসঙ্গীত ও আলোকসম্পাতে তাঁকে প্রতিটি মুহূর্তে সুন্দরভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীশচীন বসু ও শ্রীকাশীনাথ পাল। অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'অমল', 'বিলাস' ও 'শান্তা'র ভূমিকায় নিশীথ বড়াল, অর্ণব ঘোষ ও গোপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব স্বাভাবিক অভিনয়। এই তিনজন শিল্পীর চরিত্রচিত্রণ সামগ্রিকভাবে নাটকটিকে যে প্রাণবন্ত করে তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাণতোষ রায়ের যন্ত্রণাকে প্রবীণ অভিনেতা গোপাল মুখোপাধ্যায় অক্লান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে মঞ্চে মূর্ত করে তুলেছেন। প্রবীর সেনের 'প্রকাশ মেহেরা' ও সমীর মিত্রের 'তড়িৎ' দুটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রচিত্রণ। 'গামা' ও 'হারানে'র ভূমিকায় প্রাণোচ্ছল অভিনয় করেন অজান্ত সিনহা ও অজিত ঘোষ। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেন দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণপদ মিত্র, অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়, ভি সুব্রাহ্মণ্যম, পার্থসারথি মজুমদার, দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, শিখা ভট্টাচার্য ও দিলীপ মৌলিক। নৃত্যে ছিলেন জয়শ্রী সরকার।

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের 'সমুদ্রশঙ্খ' নাটকের দৃশ্য।

অভিনয়ের আগে নাট্যানুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ডি এন সিংহ তাঁর ভাষণে সমাজগঠনে সাংবাদিকদের বিবিধ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি একথা উদাত্তকণ্ঠে বলেন যে সাংবাদিকদের শিল্পচর্চার মধ্যে সমাজ-গঠনের এক সুষ্ঠু প্রয়াস রূপ লাভ করা উচিত। তিনি আশা করেন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীরা এই সত্যের এক যথার্থ বাস্তবরূপ সবার সামনে উপস্থিত করতে পারবেন। অনুষ্ঠান সভাপতি যুগান্তর সম্পাদক শ্রীসুকমল ঘোষ বলেন সাংবাদিকদের এই ধরনের প্রচেষ্টা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধতর করবে। নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য তিনি সম্পাদকীয় বিভাগের প্রতিটি কর্মীকেই অভিনন্দন জানান। অভিনয়ের আগে কয়েকটি সঙ্গীতও পরিবেশিত হয়, এতে অংশ নেন—বিশ্বজিৎ রায়, জয়শ্রী রায়, গৌরীশঙ্কর মিত্র, অমিতা মিত্র, কেয়া ঘোষ, তরুণ রায়, প্রণতি মজুমদার।

রূপদক্ষর অভিনয়—আগামী ১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে রূপদক্ষের নতুন নাটক অবি সরকারের 'রঙে রেখায় নির্বাসিত'। পরিচালনায় তড়িৎ চৌধুরী।

সাঁতারের একাধিক বিষয়ে বিশ্ব রেকর্ড স্রষ্টা অস্ট্রেলিয়ার জন কোনর‍্যাডস এবং তাঁর ভগ্নী ইলসা কোনর‍্যাডস

খেলার কথা

সাঁতারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি

ক্ষেত্রনাথ রায়

যে দেশে যথেষ্ট নদ-নদী, পুকুর, দীঘি, হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় আছে সেখানের অধিবাসীদের সাঁতার কাটার সুযোগ-সুবিধা থাকবেই। কিন্তু শুধু এই সুযোগ-সুবিধা নিয়েই আন্তর্জাতিক সাঁতারে সাফল্য লাভ করা যায় না। আজ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে সাঁতারু হিসাবে বিশ্বখ্যাতি পেতে হলে সাঁতার দেওয়ার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিগুলি পরম নিষ্ঠায় আয়ত্ত করে জলে নামতে হবে। ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। নদীমাতৃক ভারতবর্ষের কোন সাঁতারু অলিম্পিক সাঁতারে আজ পর্যন্ত কোন পদকই জয় করতে সক্ষম হন নি। এমন কি কোন বিষয়ের ফাইনালেও উঠতে পারেন নি। প্রধানতঃ উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নিষ্ঠার অভাবেই ভারতবর্ষের এই শোচনীয় ব্যর্থতা। আন্তর্জাতিক এবং অলিম্পিক সাঁতারে একমাত্র জাপানই এশিয়া মহাদেশের মুখ কিছুটা রেখেছে।

অলিম্পিক এবং আন্তর্জাতিক সাঁতারে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা। নজির হিসাবে আমি এখানে সাঁতারের দুটি অনুমোদিত বিশ্বরেকর্ড তালিকা বিশ্লেষণ করছি। প্রথমটি ১৯৫৮ সালের ২২শে আগস্ট এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬৩ সালের ৯ই জুনের।

ইন্টার ন্যাশনাল এ্যামেচার সুইমিং ফেডারেশন অনুমোদিত ১৯৫৮ সালের ২২শে আগস্টের বিশ্বরেকর্ড তালিকাটি এই রকম ছিল : পুরুষ বিভাগের ২৭টি বিশ্বরেকর্ডের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ২২টি, জাপানের ২টি, রাশিয়ার ২টি এবং আমেরিকার একটি বিশ্বরেকর্ড ছিল। মহিলা বিভাগের ২৪টি বিশ্বরেকর্ডের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ছিল নয়টি, নেদারল্যাণ্ডসের ৬টি, আমেরিকার ৬টি, গ্রেট বৃটেনের ২টি এবং পূর্ব জার্মানীর ১টি। পুরুষ বিভাগের ২৭টি বিশ্বরেকর্ড তালিকায় অসাধারণ ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার তিনজন সাঁতারু জন কোনর‍্যাডস, টেরি গ্যাথারকল এবং জন মঙ্কটন। তালিকার ব্যক্তিগত বিষয়ে জন কোনর‍্যাডসের ছিল ৭টি বিশ্বরেকর্ড, জন মঙ্কটনের ৩টি এবং টেরি গ্যাথারকলের ৩টি। মহিলাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে বিশ্বরেকর্ড ছিল—কুমারী ডন ফ্রেজারের ৪টি এবং জন কোনর‍্যাডসের ভগ্নী ইলসা কোনর‍্যাডসের ২টি। ১৯৬৩ সালের ৯ই জুন তারিখে অনুমোদিত পুরুষ বিভাগের তালিকায় যে ৩১টি বিশ্বরেকর্ড ছিল তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ছিল ১৫টি, আমেরিকার ১০টি, জাপানের ৩টি এবং একটি করে ব্রেজিল, ফ্রান্স এবং আর্জেন্টিনার। এই তালিকার ব্যক্তিগত বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার জন কোনর‍্যাডসের ৪টি এবং কাইভেন বেরীর ৩টি বিশ্বরেকর্ড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহিলা বিভাগের ২৮টি বিশ্বরেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার ছিল ৯টি, আমেরিকার ৮টি, জাপানের ৪টি, পূর্ব জার্মানীর ৪টি, কানাডার ২টি এবং গ্রেটবৃটেনের ১টি। মহিলাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার ডন ফ্রেজারের ৪টি এবং ইলসা কোনর‍্যাডসের ৩টি বিশ্বরেকর্ড উল্লেখযোগ্য। এই তালিকায় জাপানের কুমারী এস তানাকার তিনটি বিশ্বরেকর্ড এশিয়া মহাদেশের মুখোজ্জ্বল করেছিল।

১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক গেমসের পরই আন্তর্জাতিক সাঁতারের আসরে অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ২৭শে আগস্টের অনুমোদিত বিশ্বরেকর্ড তালিকায় আমরা দেখতে পেলাম পুরুষ বিভাগে অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা প্রত্যেকেরই ১৪টি করে বিশ্বরেকর্ড। সর্বাধিক ৫টি বিশ্বরেকর্ড আমেরিকার ডন স্কোল্যাণ্ডের। তার পরই অস্ট্রেলিয়ার আয়ান ও'ব্রীয়েনের ৩টি এবং কেভিন বেরীর ২টি বিশ্বরেকর্ড উল্লেখ করার মত। মহিলা বিভাগে সর্বাধিক বিশ্বরেকর্ড ছিল আমেরিকার—১৪টি। অপর দিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী

ডন স্কোল্যাণ্ডার (আমেরিকা)—১৯৬৪ সালের অলিম্পিকে সর্বাধিক (চারটি) স্বর্ণপদক বিজয়ী

অস্ট্রেলিয়ার ছিল মাত্র চারটি। ব্যক্তিগত সর্বাধিক (৩টি) বিশ্বরেকর্ড ছিল এই তিনজনের—ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া), পেট্টি ক্যারাট (আমেরিকা) এবং এডা কক (নেদারল্যান্ডস)।

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিক সাঁতারে আমেরিকা যে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা নেই। তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকারী আমেরিকার মোট পদক সংখ্যা ছিল ৫৮টি—স্বর্ণ ২৩, রৌপ্য ১৫ এবং ব্রোঞ্জ ২০। আর দ্বিতীয় স্থান অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার মোট পদক ছিল মাত্র ৮টি—স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৩। আমেরিকার ১৬ বছর বয়সের স্কুল-ছাত্রী কুমারী ডেবি মেয়ার নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সময়ে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে তিনটি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। একই বছরের অলিম্পিক সাঁতারে তিনটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়ের নজির দ্বিতীয় নেই।

অলিম্পিক আসর

একই আসরে ডাবল খেতাব জয়

একজনের পক্ষে একই বছরের অলিম্পিক আসরে ১০০ এবং ২০০ মিটার দৌড় অথবা ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল

ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া)—সাঁতারে সম্রাজ্ঞী

কুমারী ডেবী মেয়ার (আমেরিকা) ১৯৬৮ সালের অলিম্পিকে তিনটি পদক জয়ের সূত্রে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন

সাঁতারে স্বর্ণ পদক জয় নিঃসন্দেহে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। এই ধরনের জয়কে বলা হয় 'ডাবল' খেতাব লাভ। ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকার মাইক ওয়েন্ডেন ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে স্বর্ণ পদক জয়লাভের সূত্রে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন। অলিম্পিকে পুরুষ এবং মহিলাদের ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে এরকম নজির দ্বিতীয় নেই।

একই বিষয়ে উপর্যুপরি তিনবার স্বর্ণ পদক

অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিশ্রুতা সাঁতারু কুমারী ডন ফ্রেজার ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) স্বর্ণ পদক জয়লাভের গৌরব লাভ করেন। এখানে উল্লেখ্য, অলিম্পিক সাঁতারের কোন একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে এইভাবে উপর্যুপরি তিনটি স্বর্ণ পদক জয়ের নজির ডন ফ্রেজার ছাড়া অপর কোন পুরুষ অথবা মহিলা সাঁতারু এ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। উপর্যুপরি দুবার করে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছেন চারজন সাঁতারু—আমেরিকার দুজন, অস্ট্রেলিয়ার একজন এবং জাপানের একজন। জাপানের যোসীজুকি ৎসুরুটা পুরুষদের ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোক অনুষ্ঠানে উপর্যুপরি ২ বার (১৯২৮ ও ১৯৩২) স্বর্ণ পদক জয় করে অলিম্পিক মানচিত্রে এশিয়ার নাম উৎকীর্ণ করেন।

একটি বিষয়ে তিনটি পদক জয়

একই বছরের অলিম্পিক গেমস আসরে একটি দেশের পক্ষে কোন একটি বিষয়ের তিনটি পদক (স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) জয় নিঃসন্দেহে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। এ বিষয়েও আমেরিকা সমস্ত দেশকে টেক্কা দিয়েছে। এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনটি দেশ এই কৃতিত্ব লাভ করেছে—আমেরিকা ১৫ বার, অস্ট্রেলিয়া ২ বার এবং জার্মানী ১ বার। আমেরিকা তার এই ১৫ বারের নজির এইভাবে গড়েছে : পুরুষ বিভাগে ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (১৯২০ ও ১৯২৪), ২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক (১৯৪৮), ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক (১৯৬৪), ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি (১৯৬৮) এবং ১০০ মিটার বাটারফ্লাই সাঁতারে (১৯৬৮)। আর মহিলা বিভাগে আমেরিকার কৃতিত্ব : ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (১৯২০, ১৯২৪ ও ১৯৬৮), ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (১৯৬৮), ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল (১৯২৪ ও ১৯৬৪), ১০০ মিটার বাটারফ্লাই (১৯৫৬), ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি (১৯৬৮) এবং ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি অনুষ্ঠানে (১৯৬৪)।

১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে আমেরিকা এই পাঁচটি বিষয়ের প্রতিটিতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয়ের সূত্রে কি অভূতপূর্ব সাফল্যেরই না পরিচয় দিয়েছে : পুরুষ বিভাগে ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি ও ১০০ মিটার বাটারফ্লাই এবং মহিলা বিভাগে ১০০ ও ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলি অনুষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক এবং অলিম্পিক সাঁতারে আমেরিকার এই বিরাট সাফল্যের প্রধান উৎস স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, যাদের অনেককেই খোকা-খুকুর পর্যায়ে ফেলা হয়।

খেলাধুলা

দর্শক

লন্ডন ক্রিস্টাল প্যালেসে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্বার্ড ট্রফি এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে বৃটেনের ডিক টেলর ১০,০০০ মিটার দৌড়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রখ্যাত বিশ্বরেকর্ডধারী দৌড়বীর রণ ক্লার্ককে পরাজিত করে সর্বপ্রথম নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করেছেন।
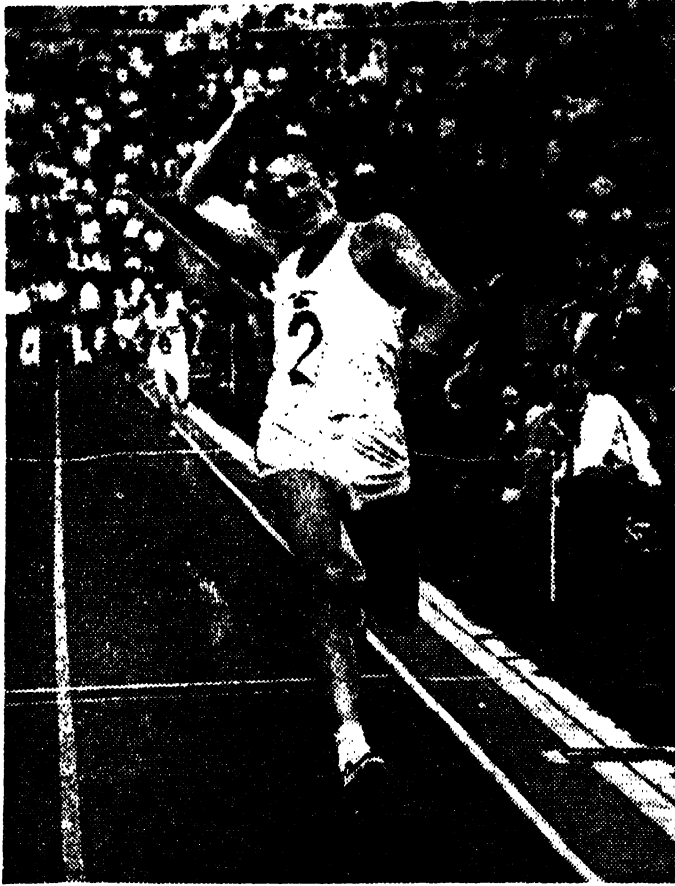
আই এফ এ শীল্ড

কলকাতার ফুটবল খেলার আসরে প্রধান আকর্ষণ এই দুটি—প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা। ১৯৬৯ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত মীমাংসা গত সপ্তাহে হয়ে গেছে। এর পর ক্রীড়ানুরাগীদের দৃষ্টি আই এফ এ শীল্ডের ওপর। ভারতবর্ষে প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই তিনটি প্রতিযোগিতার নামডাক বেশী—সিমলার ডুরান্ড কাপ, বোম্বাইয়ের রোভার্স কাপ এবং কলকাতার আই এফ এ শীল্ড। এই তিনটি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন—১৮৮৮ সালে ডুরান্ড, ১৮৯১ সালে রোভার্স এবং ১৮৯৬ সালে আই এফ এ শীল্ড। বয়সের দিক থেকে আই এফ এ শীল্ড ছোট হলেও ঐতিহ্যের মাপকাঠিতে তার স্থান অনেক উপরে। ডুরান্ড এবং রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা একমাত্র সামরিক দলের জন্যে সংরক্ষিত ছিল। সেখানে বেসামরিক ইউরোপীয় ফুটবল দলের প্রবেশও নিষিদ্ধ ছিল। এই বিধিনিষেধ বেশ কয়েক বছর পর তুলে নেওয়া হয়। আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় কোন শ্রেণী এবং জাতি-ভেদের বালাই ছিল না। প্রথম থেকেই সামরিক, বেসামরিক, ইউরোপীয় এবং ভারতীয়—সকল ফুটবল দলকেই যোগদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে আই এফ এ শীল্ড খেলার জনপ্রিয়তা প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই। কিন্তু গত দু'বছর প্রতিযোগিতা অসমাপ্ত থাকার দরুন তার জনপ্রিয়তা বেশ কিছুটা ভাটা পড়েছে। ১৯৬৭ সালে মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের ফাইনাল খেলার নিষ্পত্তি হয়নি। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলা ড্র যাওয়ার পর আর খেলা হয়নি। ১৯৬৮ সালে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে গিয়ে প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬৯ সালের প্রতিযোগিতার যে ৩০টি দল নিয়ে খেলার তালিকা তৈরী হয়েছে তার মধ্যে ১৫টি প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ক্লাব আছে। বাকি ১৫টির মধ্যে আছে দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান কুমারটুলী, হুগলী ডি এস এ, ২৪-পরগণা ডি এস এ, চন্দননগর ডি এস এ, বার্নপুর ইউনাইটেড এবং বাংলার বাইরের ১০টি দল। এই বহিরাগত ১০টি দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম—বোম্বাইয়ের স্টেট ব্যাঙ্ক এবং পাঞ্জাব এফ এ। প্রতিযোগিতার ৩য় রাউন্ডে সরাসরি খেলবে এই চারটি দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, বোম্বাই স্টেট ব্যাঙ্ক এবং পাঞ্জাব এফ এ।

ফাইনাল খেলার দিন মোটামুটিভাবে ধার্য হয়েছে আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ

কলকাতায় আই এফ এ পরিচালিত ১৯৬৯ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল—মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ান এবং ইস্টবেঙ্গল রানার্স-আপ হয়েছে। ১৯৬৯ সালের লীগ প্রতিযোগিতা প্রাথমিক এবং সুপার লীগ—এই দুই পর্যায়ে ভাগ করে খেলানো হয়েছিল। প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে খেলেছিল ২৭টি দল। প্রাথমিক লীগ খেলার চূড়ান্ত তালিকার প্রথম পাঁচটি দলকে নিয়ে সুপার লীগ খেলা হয়েছিল। মোহনবাগান প্রাথমিক লীগ খেলায় দ্বিতীয় এবং সুপার লীগ খেলায় প্রথম স্থান পেয়েছিল। অপরদিকে ইস্টবেঙ্গল প্রাথমিক লীগ খেলায় প্রথম স্থান এবং সুপার লীগ খেলায় ২য় স্থান লাভ করে। বিশেষ করে উল্লেখ্য যে, ইস্টবেঙ্গল দুই পর্যায়ের লীগ খেলায় অপরাজিত ছিল এবং এই নিয়ে তারা ১৭ বার রানার্স-আপ হল।

দূরপাল্লার সাঁতার

ভাগীরথীবক্ষে মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত দূরপাল্লার সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বৈদ্যনাথ নাথ ৭২ কিলোমিটার এবং পরমেশ দাস ঘোষ ১৯ কিলোমিটার অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান লাভ করেছেন। এখানে উল্লেখ্য, ৭২ কিলোমিটার সাঁতারে বৈদ্যনাথ নাথ এই নিয়ে উপর্যুপরি তিনবার (১৯৬৬, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯) প্রথম স্থান পাওয়ার গৌরব লাভ করলেন। ১৯৬৮ সালে এই প্রতিযোগিতাটি বন্ধ ছিল। মুর্শিদাবাদ সুইমিং এসোসিয়েশন দাবী করেন যে, পৃথিবীর আর কোথাও ৭২ কিলোমিটার দূরত্বের সন্তরণ প্রতিযোগিতা নেই।

আলোচ্য বছরে ৭২ কিলোমিটার সাঁতারে ১০ জন সাঁতারু অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অপরদিকে ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে যে ৩০ জন যোগদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মহিলা ছিলেন। কুমারী রেখা ঠাকুর মেয়েদের মধ্যে প্রথম হন।

বৈদ্যনাথ নাথ ৭২ কিলোমিটার সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকারী

ফলাফল

কিলোমিটার : ১ম বৈদ্যনাথ নাথ (ইস্টার্ন রেলওয়ে), সময় ৯ ঘণ্টা ৮ মিঃ ২৫ সেঃ; ২য় লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক (বি এন আর)—সময় ৯ ঘণ্টা ২০ মিঃ ৫২ সেঃ; ৩য় রতিকান্ত ধর (ত্রিপুরা এস এ)—সময় ৯ ঘণ্টা ২৮ মিঃ ৪৬ সেঃ; ৪থ তপন দে (নির্দলীয়)—সময় ৯ ঘণ্টা ৩০ মিঃ ২৫ সেঃ; ৫ম মধুসূদন দাস (ভি বি এস, বহরমপুর)—সময় ৯ ঘণ্টা ৪৪ মিঃ ১ সেঃ; ৬ষ্ঠ নিমাই দত্ত (নির্দলীয়)—৯ ঘণ্টা ৫৬ মিঃ ৫৫ সেঃ।

কিলোমিটার : ১ম পরমেশ দাস ঘোষ (চাতরা এস এ)—সময় ২ ঘণ্টা ১৬ মিঃ ৪২ সেঃ; ২য় সুনীল মিত্র (কলেজ স্কোয়ার এস এ)—সময় ২ ঘণ্টা ১৭ মিঃ ৩০ সেঃ; ৩য় বিশ্বনাথ ঘোষ (ভি বি এস, বহরমপুর)—সময় ২ ঘণ্টা ১৮ মিঃ ২২ সেঃ।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

২৬তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা (সন্তোষ ট্রফি) আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর গৌহাটি (আসাম) শুরু হবে। এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে ২১'টি রাজ্য দল। গতবারের চ্যাম্পিয়ান মহীশূরে এবং রানার্স-আপ পশ্চিম বাংলাকে তালিকার দুই অর্ধে স্থান দেওয়া হয়েছে। মহীশূর খেলবে প্রথম কোয়ার্টারের ২য় রাউণ্ডে এবং বাংলা প্রথম খেলবে ৪র্থ কোয়ার্টারের ২য় রাউণ্ডে।

খেলার তালিকা

প্রথম কোয়ার্টার :

প্রথম রাউণ্ড : (ক) মধ্যপ্রদেশ : হরিয়ানা; দ্বিতীয় রাউণ্ড : (খ) মহীশূর : বিজয়ী 'ক'; (গ) দিল্লী : রেলওয়ে; কোয়ার্টার ফাইনাল : (ঘ) বিজয়ী 'খ' : বিজয়ী 'গ'।

দ্বিতীয় কোয়ার্টার :

প্রথম রাউণ্ড : (ঙ) ত্রিপুরা : উত্তর-প্রদেশ, (চ) পাঞ্জাব : জম্মু-কাশ্মীর; দ্বিতীয় রাউণ্ড : (ছ) আসাম : বিজয়ী 'ঙ'; (জ) সার্ভিসেস : বিজয়ী 'চ'; কোয়ার্টার ফাইনাল : (ঞ) বিজয়ী 'ছ' : বিজয়ী 'জ'।

তৃতীয় কোয়ার্টার :

প্রথম রাউণ্ড : (ট) উড়িষ্যা : গুজরাট; দ্বিতীয় রাউণ্ড (ঠ) মহারাষ্ট্র : বিজয়ী 'ট'; (ড) অন্ধ্র : রাজস্থান ;কোয়ার্টার-ফাইনাল (ঢ) বিজয়ী 'ঠ' : বিজয়ী 'ড'।

চতুর্থ কোয়ার্টার :

প্রথম রাউণ্ড : (ণ) গোয়া : কেরালা; দ্বিতীয় রাউণ্ড : (ত) বাংলা : বিজয়ী 'ণ'; (থ) মাদ্রাজ : বিহার; কোয়ার্টার-ফাইনাল : (দ) বিজয়ী 'ত' : বিজয়ী 'থ'।

সেমি-ফাইনাল

(অ) বিজয়ী 'ঘ' বনাম বিজয়ী 'ঞ'
(আ) বিজয়ী 'ঢ' বনাম বিজয়ী 'দ'

ফাইনাল

বিজয়ী 'অ' বনাম বিজয়ী 'আ'

দাবার আসর

দাবার বিভিন্ন রকম ঘুঁটির গতিবিধির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে আমাদের প্রয়োজন প্রতিটি ঘরের পৃথক পৃথক নাম জানার। এতে ঘুঁটিসমূহের গতিবিধি বর্ণনা করতে বা বুঝতে প্রচুর সুবিধা হবে।

নামকরণের দুটি প্রধান উপায় হচ্ছে বীজগাণিতিক নোটেশন এবং ডেসক্রিপটিভ বা বর্ণনাত্মক নোটেশন। আমরা আপাততঃ বীজগাণিতিক নোটেশন নিয়েই আলোচনা করব।

আমরা আগেই দেখেছি সমস্ত ছকটা লম্বালম্বিভাবে অর্থাৎ ওপর থেকে নীচে বা নীচু থেকে ওপরে আটটা সারিতে বিভক্ত। এই সারিগুলিকে বলে ফাইল। বীজগাণিতিক নোটেশনে সাদা খেলোয়াড়ের সবচেয়ে বাঁদিকের ফাইলটার নাম 'এ' এবং সবচেয়ে ডানদিকের ফাইলটার নাম 'এইচ'। (চিত্রে সবসময়েই সাদা ঘুঁটির খেলোয়াড় ছকের তলার দিকে বসেছে ধরে নিতে হবে।) 'এ'র ডানদিকে পরপর ফাইলগুলোর নাম যথাক্রমে 'বি', 'সি', 'ডি', 'ই', 'এফ' 'জি' এবং 'এইচ'। 'এ' ফাইলের প্রতিটি ঘরের নাম 'এ'। সেইরকম 'এফ' ফাইলের প্রতিটি ঘরের নাম 'এফ'। ১নং চিত্র দেখুন।

এবারে দেখুন ছকের বাঁদিক থেকে ডানদিক বা ডানদিক থেকে বাঁদিক অর্থাৎ পাশাপাশিভাবেও ছকটি আটটি সারিতে বিভক্ত। এই পাশাপাশি সারিগুলিকে বলে র‍্যাংক। সাদার দিক থেকে সবচেয়ে তলার র‍্যাংকটির নম্বর হচ্ছে ১ (অর্থাৎ এই র‍্যাংকের প্রতিটি ঘরের নম্বর হচ্ছে ১)। ১নং র‍্যাংকের ওপরের দিকে ক্রম অনুসারে বাকি র‍্যাংকগুলির নম্বর হচ্ছে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, এবং ৮। ১নং চিত্র দেখুন।

সুতরাং ছকের প্রতিটি ঘরই ফাইল অনুসারে একটি নাম পাচ্ছে (ইংরাজী বর্ণমালা অনুসারে) এবং র‍্যাংক অনুসারে একটি নম্বর পাচ্ছে। এই নাম এবং নম্বর মিলিয়ে আমরা প্রতিটি ঘরকেই বিশেষিত করতে পারি। যাঁরা গত সংখ্যায় খেলা শুরু করার আগে ঘুঁটি সাজানোর চিত্র দেখেছেন, তাঁরা মিলিয়ে দেখতে পারেন যে আদি অবস্থায় সাদার দুটো নৌকা এ-১ এবং এইচ-১ ঘরে কালোর নৌকাদুটো এ-৮ এবং এইচ-৮ ঘরে। সাদা ঘোড়াদুটো আছে বি-১ এবং জি-১ ঘরে, কালো ঘোড়াদুটো আছে বি-৮ এবং জি-৮ ঘরে, সাদা গজ-দুটো আছে সি-১ এবং এফ-১ ঘরে এবং কালো গজদুটো আছে সি-৮ এবং এফ-৮ ঘরে। সাদা মন্ত্রী বসেছে ডি-১ ঘরে, কালো মন্ত্রী ডি-৮ ঘরে; সাদা রাজা ই-১ ঘরে এবং কালো রাজা ই-৮ ঘরে। সাদা বড়ে-গুলো আছে সমস্ত ফাইলের দ্বিতীয় ঘরে এবং কালো বড়েগুলো রয়েছে সমস্ত ফাইলের সপ্তম ঘরে।

...ঘুঁটির গতিবিধি

ছকের ঘরগুলির নামকরণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হওয়ার পরে আমরা ঘুঁটি-গুলির গতিবিধি আলোচনা করতে পারি।

রাজা : রাজা সামনে-পিছনে, পাশা-পাশি বা কোণাকুণি এক ঘর করে যায়। রাজা যে ঘরে যেতে পারে সেই ঘরে বিপক্ষের কোন ঘুঁটি বিনা জোরে থাকলে তাকে মেরে নিতে পারে। মেরে নেবার কায়দা হোল বিপক্ষের ঘুঁটি যে ঘরে অবস্থান করছে, সেই ঘরে গিয়ে বসে পড়া এবং বিপক্ষ ঘুঁটিটিকে তার ঘর থেকে তুলে নিয়ে ছকের বাইরে রেখে দেওয়া। কিন্তু বিপক্ষ ঘুঁটির আক্রমণ আছে এমন কোন ঘরে রাজা ইচ্ছে করলেও যেতে পারবে না।

২নং চিত্রে রাজা বি-৬ ঘরে আছে। এখান থেকে রাজা এ-৫, এ-৬, এ-৭, বি-৫, বি-৭, সি-৫, সি-৬ এবং সি-৭ ঘরে যেতে পারে।
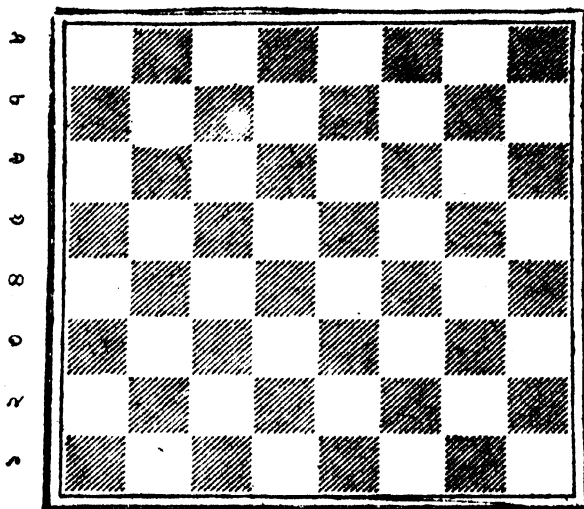
বড়ে : বড়ে সামনের দিকে সোজাসুজি মাত্র এক ঘর করে যায়; কিন্তু খেলার যে কোন অবস্থায় যে কোন বড়ে প্রথম চালবার সময় ইচ্ছে করলে ১ ঘর বা ২ ঘর যেতে পারে। কিন্তু তারপর থেকে বড়ে সোজা-সুজি মাত্র এক ঘর করেই যেতে পারবে। বড়ের ঠিক সামনের ঘরটিতে স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোন ঘুঁটি থাকলে বড়ের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। দাবার অন্য সমস্ত ঘুঁটিই এগোতে-পিছোতে পারে, কিন্তু বড়ে কেবল এগোতেই পারে, পিছোতে পারে না।

বড়ে যে ঘরে অবস্থান করে সেই ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন দুই কোণের দুই ঘরে বিপক্ষের কোন ঘুঁটি থাকলে বড়ে তাকে মেরে নিতে পারে, অর্থাৎ বড়ে চলে সোজা-সুজি, কিন্তু ঘুঁটি মারে কোণাকুণি। কোণাকুণি যে দুটি ঘরে বড়ের আক্রমণ থাকছে, সেই ঘর দুটিকে বলা হয় বড়ের মুখ। মেরে নেয়ার পর বড়ে যে ফাইলে এসে বসবে সেই ফাইলে বড়েকে আবার সোজাসুজি এক ঘর করে চলতে হবে।

২নং চিত্রে একটি সাদা বড়ে ই-২ ঘরে আছে। এখান থেকে একে ই-৩ বা ই-৪ ঘরে চালা যেতে পারে। তারপর থেকে সোজা-সুজি এক ঘর করে যাবে। এবং ই-২ ঘরে থাকাকালীন ডি-৩ বা এফ-৩ ঘরে বিপক্ষের কোন ঘুঁটিকে মেরেও নিতে পারে।

বড়ে চলতে চলতে যখন অষ্টম র‍্যাঙ্কে পৌঁছবে, সঙ্গে সঙ্গে একে অন্য কোন বড় ঘুঁটিতে রূপান্তরিত করতে হবে। অর্থাৎ বড়েটির বদলে আপনি মন্ত্রী, নৌকা, গজ বা ঘোড়া নিতে পারেন। এই-ভাবে অনেকগুলি মন্ত্রী, ঘোড়া ইত্যাদি নিয়েও খেলা চলে। বড়েকে বড় ঘুঁটিতে রূপান্তরিত করার ফলে যদি সঙ্গে সঙ্গে কিস্তি পড়ে, বিপক্ষের রাজাকে সেই কিস্তি সামলাতে হবে। কিস্তিমাত হলে ত কথাই নেই।

বড়ের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এর 'আঁ পাঁসা' বা 'চলতি বড়ের মার'। কেউ কেউ একে পঞ্চমের মার বলার পক্ষপা... প্রথম চাল দু' ঘর চালার সময় যদি ... বড়ে বিপক্ষের বড়ের মুখ অতিক্রম ... যায়, তাহলে ঠিক পরের চালে অতি... কারী বড়েটিকে এক ঘর পিছিয়ে ... বিপক্ষের বড়ে তাকে মেরে নিতে পা... এই মারার সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে ব×ব।

যেমন ধরুন ২ নং চিত্রে ই-২ ... অবস্থিত বড়েটিকে প্রথম চালার সময় ... করলে দু' ঘর অর্থাৎ ই-৪ ঘরে চালা ... পারে। কিন্তু তা চালা হলে সাদা ব... এফ-৪ ঘরে অবস্থিত কালো বড়ের ... মুখ—অর্থাৎ ই-৩ ঘরটি—অতিক্রম ... যাচ্ছে। সুতরাং ঠিক পরের চালে কা... সাদা বড়েটিকে ই-৪ থেকে ই-৩ ... পিছিয়ে নিয়ে এসে এফ-৪য়ের বড়েটি ... মেরে নিতে পারে। অর্থাৎ সাদা বড়ে... ছক থেকে তুলে নেওয়া হবে এবং কা... বড়েটি এফ-৪ থেকে ই-৩ ঘরে এসে ... যাবে। কিন্তু এক চাল অপেক্ষা করলে চ... বড়ের মার দেওয়া যাবে না।

ভ্রম-সংশোধন

গত সংখ্যার (১৬শ সংখ্যার) ... পৃষ্ঠায় দাবার ছক পাতার পদ্ধতি সম্প... যে ব্লকটি ছাপা হয়েছে তা ঠিকমত ... হয় নি। ছবির নীচে একেবারে ডান... কোণের ঘরটি ভুলক্রমে কালো দে... হয়েছে; সেটা সাদা ঘর হবে। ব্লকটি উ... বসানোর ফলেই এই বিভ্রাট ঘট... বর্তমান সংখ্যার ব্লকটি দেখলেই পাঠক... পাতার নির্ভুল পদ্ধতি বুঝতে পারে...

—গজানন্দ ...

২নং চিত্র

রাজার গতিবিধি (বাঁ-দিকে) এবং বড়ের গতিবিধি (ডান দিকে)

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

লেখকদের প্রতি

১ অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পান্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২ প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩ রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১ গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২ ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১ম বর্ষ ২য় খণ্ড

১৮শ সংখ্যা
মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 5th September, 1969. শুক্রবার ১৯শে ভাদ্র, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীশৈলেন সাহা

ভারতীয় ভাষায় কোষগ্রন্থ

বিগত ৫ই ভাদ্রের 'অমৃতে' উপরোক্ত শিরোনামে শ্রীঅনিলকুমার দাশগুপ্তের যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে তার জন্য পত্রলেখককে ধন্যবাদ জানাই। তিনি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম আমার আলোচনায় উল্লিখিত হয়নি বলে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আমার প্রবন্ধটি ভারতের বিভিন্ন ভাষার কোষগ্রন্থ প্রসঙ্গে, নগেন্দ্রনাথ বা বিশ্বকোষ প্রসঙ্গে নয়। নগেন্দ্রনাথের অবদানের উল্লেখকালে সংক্ষেপে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বিবৃত করেছি। 'বিশ্বকোষ' রঙ্গলাল ও তাঁর সহোদর 'কঙ্কাবতী'-প্রণেতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিকল্পনা। ১২৯৩ সালে উপক্রমণিকা এবং ২২টি সংখ্যা নিয়ে 'বিশ্বকোষের' প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে 'অ' বর্ণ মাত্র সম্পূর্ণ হয়। গ্রন্থের টাইটেল পেজে রঙ্গলাল এবং ত্রৈলোক্যনাথ উভয়ের নামই মুদ্রিত ছিল। রঙ্গলাল নিজেদের বাড়িতে এই জন্য একটি প্রেসও স্থাপন করেন। সংকলন করতেন রঙ্গলাল আর অন্য দিকে পরিচালনার ভার ছিল ত্রৈলোক্যনাথের ওপর। বিশ্বকোষের জন্য কিছু গ্রাহক করা হয়, এমন সময় ত্রৈলোক্যনাথ বিলাত গমন করেন। বিশ্বকোষ বন্ধ হয়ে যায়। নগেন্দ্রনাথ বসু স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রঙ্গলাল-ত্রৈলোক্যনাথের দ্বারস্থ হন। রঙ্গলাল 'আ' অক্ষরের 'আমিষ্কীয়' পর্যন্ত সংকলন করেন এবং দ্বিতীয় খণ্ডের আশী পৃষ্ঠা গ্রাহকদের দিয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ প্রথমে নগেন্দ্রনাথকে দায়িত্ব দিতে চান নি। পরে অবশ্য হাজার টাকার হ্যান্ডনোটে তাঁদের স্বত্ব লিখে দেন। নগেন্দ্রনাথ এর জন্য প্রথমে পাঁচশো টাকা দিলেন ঠাকুরমার অলংকার বিক্রি করে। বাকী টাকা দিলেন ইন্ডিয়ান প্রেসের উপেন্দ্রনাথকে। এরপর নগেন্দ্রনাথই 'বিশ্বকোষের' একমাত্র সত্ত্বাধিকারী, সংকলক ও সম্পাদক হন। বিশ্বকোষের প্রাথমিক কৃতিত্ব অবশ্য রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথের। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এত বিস্তারিত তথ্য দেওয়া সম্ভব হয় না। নগেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও কর্মশক্তির জন্যই বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হয়।

ইতি—অভয়ঙ্কর

আলোকপর্ণা

আপনার বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার আমি একজন নিয়মিত পাঠক। এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'আলোকপর্ণা' উপন্যাসটি আজ সমাপ্তির পথে।

দীর্ঘকাল পরে সত্যিই একটি চমৎকার উপন্যাস পড়বার সুযোগ পেলাম। এজন্যে শুধু লেখককেই নয়, আপনাদেরও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সুদীর্ঘ বারো বছর আগে শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা 'কৃষ্ণপক্ষ' উপন্যাসটি পাঠ করে তার বীভৎস রসে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছিলাম, আর ভেবেছিলাম—দেখতে হবে এরপর এঁর লেখনীতে আর কি বার হয়। 'আলোকপর্ণা' লেখার আগে লেখক আরও বহু উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন। কিন্তু 'আলোকপর্ণা' তাঁর অতীতের সমস্ত সাহিত্যকীর্তিকে অতিক্রম করে চলেছে। এর কাহিনী, সংলাপ, চরিত্রচিত্রণ এমন মুন্সীয়ানার সঙ্গে, এমন দরদ ও অখন্ড মনোযোগ দিয়ে, এমন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এঁকেছেন, যার তুলনা সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসজগতে বিরল। বিকাশের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নিরপেক্ষ থাকতে যাওয়ার বেদনা, কানাই পাল, শশাঙ্ক নিয়োগীর চক্রান্ত, প্রদীপ মুস্তফীদের বিক্ষোভ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে, নিজস্ব রচনাশৈলীর মাধুর্যে চমৎকারভাবে সজীব হয়ে উঠেছে। যেন চরিত্রগুলি আমাদের আশে পাশেই আছে। দুই নারী—সুনু ও মনীষার জন্য, কার না হৃদয় দ্রবীভূত হয়?

লেখকের পরবর্তী রচনার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষায় রইলাম।

নির্মলচন্দ্র নাথ
কলকাতা-২৯

মানুষগড়ার ইতিকথা

(১)

আমি আপনাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত'-এর নিয়মিত পাঠক। এটি আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দান করে এবং সকালের কাছে এর খুবই প্রশংসা করে থাকি। পত্রিকা প্রকাশের দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে কাটাতে হয় আমাকে। ২রা জ্যৈষ্ঠের সংখ্যা থেকে সন্ধিৎসু লিখিত মানুষগড়ার ইতিকথা আমাকে আরো বিশেষ আনন্দ দান করে থাকে। তাঁর লেখার গুণে সমস্ত বড় বড় বিদ্যালয়গুলির ইতিহাস আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। হয়ত বিদ্যালয়গুলি আমরা দেখে থাকি কিংবা নাম জানি, কিন্তু এগুলির সৃষ্টির ইতিহাস আমরা কিছুই জানি না। জানবার চেষ্টাও করি না বা করলেও সুযোগ হয়ে উঠে না। এই বিদ্যালয়গুলিই মানুষকে এত উন্নতির পথে এগিয়ে এনেছে। জাতির উন্নতিতে এগুলির দান অপরিসীম। কিন্তু জাতিকে ভালবাসতে হলে, দেশকে ভালবাসতে হলে দেশের এবং জাতির ইতিহাস জানা একান্ত প্রয়োজন। এসকল বিদ্যালয়ের সৃষ্টির ইতিহাসের সঙ্গে বড় বড় মহাপুরুষদের কার্যকলাপও সন্ধিৎসুর লেখায় জানতে পারছি। এতে আজকের মানুষের মনেও অনুপ্রেরণা জাগাবে এবং সকল মহাপুরুষদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যাবে। আমরা হয়ত অনেক মহাপুরুষদের নাম জানি কিন্তু তাঁরা কেন যে এত নাম করেছেন তা হয়ত জানি না। কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপ জানতে পারলে মানুষের শ্রদ্ধা তাঁদের প্রতি আরও গভীর হবে। আমরা আশা করি এভাবে অমৃত পত্রিকার মাধ্যমে আরও অনেক কথা জানতে পারবো। অমৃতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে পাঠক হিসাবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করি।

মণিরঞ্জন দেবনাথ
শান্তিপুর, নদীয়া

(২)

আপনার বহুল প্রচারিত "অমৃত" পত্রিকার গত ৩০শে শ্রাবণ ১৩৭৬ সংখ্যায় "সন্ধিৎসু" লিখিত 'মানুষ গড়ার ইতিকথা' শীর্ষক আলোচনাটিতে '...শিক্ষায়তন' সম্বন্ধে ভুল তথ্য প্রচারের জন্য অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রশান্ত মুখোপাধ্যায় "সন্ধিৎসু"কে জানিয়েছেন—

(১) ১৯৫২ সাল পর্যন্ত গোপাল বাবু প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এই স্কুল এম ই স্কুল ছিল। ছাত্রসংখ্যা মাত্র সাতশত। ১৯৫৩ সালে স্কুলটি বোর্ডের অনুমোদন পায়; ১৯৫৪ সালে ছাত্রসংখ্যা এগারশ'য় পৌঁছায়।

(২) প্রশান্তবাবু ১৯৪৭ সাল থেকে এই স্কুলে পড়াতে আসেন এবং বর্তমানে প্রধান শিক্ষক।

এই তথ্যের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে গোপালবাবুর পরেই প্রশান্তবাবু স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং প্রশান্তবাবুর প্রধান শিক্ষক থাকাকালেই স্কুলটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়।

অথচ স্কুলটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির মূলে যে প্রধান শিক্ষকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় রয়েছে তিনি হলেন প্রশান্তবাবুর পূর্বসূরী ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক নলিনীরঞ্জন মিত্র এম-এ, বি-টি, সাহিত্যরত্ন,

চিঠিপত্র

বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যসরস্বতী। দীর্ঘ পনের বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি স্কুলে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান এবং বয়স্কদের স্কুলের নৈশ বিভাগ খোলেন। মাত্র ছয় মাস পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়। ভুলে যাবার পক্ষে ছয় মাস যথেষ্ট নয়। প্রশান্তবাবু ১লা জানুয়ারী ১৯৬৮ থেকে অর্থাৎ মাত্র এক বছর আট মাস প্রধান শিক্ষক আছেন। নলিনীরঞ্জন মিত্রের পনের বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের সব কৃতিত্বটুকু প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় আত্মসাৎ করেছেন; সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে তিনি তাঁর পূর্বসূরীর নাম মুছে দিয়ে নিজে অপরের কৃতিত্বের দাবীদার হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

প্রধান শিক্ষকের যদি এই আচরণ, ছাত্রো তাঁর কাছে কি শিক্ষা পাবে।

এই সঙ্গে প্রশান্তবাবুর সই ও বেহালা শিক্ষায়তনের সীলমোহরাঙ্কিত প্রমাণ পাঠালাম দেখে রাখবেন।

শ্রীমতী ভট্টাচার্য
কলিকাতা—২৫

(৩)

অমৃতের ৯ম বর্ষ—১ম খণ্ড-১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত "শ্যামবাজার এ ভি স্কুল" লেখাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম। তাকে আমার অশেষ ধন্যবাদ। বীরপূজা আমাদের দেশে সুষ্ঠুভাবে হয় না। শ্যামবাজার এ ভি স্কুলের জমি ও বাড়ীর জন্য এই স্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীজগবন্ধু মোদক মহাশয়ের আন্তরিক ভিক্ষা, সেবা ও যত্ন—মনে হলেও শ্রদ্ধা জাগে। বলতে গেলে পণ্ডিত মহাশয়ই ছিলেন স্কুলের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু লেখাটিতে পূজ্যপাদ পণ্ডিতমহাশয়ের সম্বন্ধে দুটি কথা উল্লেখ থাকলে আরো ভাল হত। (১) তাঁর পুণ্যস্মৃতিস্মরণার্থে কলকাতা করপোরেশন একটি রাজপথের নামকরণ করেছেন—"জগবন্ধু মোদক রোড"। সেটি এক নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত। (২) পণ্ডিতমহাশয় উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৫ম—৬ষ্ঠ শ্রেণীর উপযুক্ত একখানি হৃদয়গ্রাহী কবিতা পুস্তক রচনা করেছিলেন। পুস্তকখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়ে উক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্বাচিতও হয়েছিল। আমরা বাল্যকালে আমাদের ইলসোবা-মণ্ডলাই হাই ইংলিশ স্কুলে সে বই পড়েছি। পড়ে বেশ আনন্দও পেয়েছি।

কবিতার বইটির নাম সঠিক মনে নাই। সম্ভবতঃ 'নীতিরত্নমালা' বা ঐ রকম কিছু।

তাঁর লিখিত আরও কোনও বই আছে কিনা অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এই পণ্ডিতমহাশয়ের বংশধর কেউ আছেন কিনা তাও অনুসন্ধান করা উচিত। থাকলে এই স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করা হয়েছে কিনা জানি না।

আমাদের দেশে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্যর চার্লস উড সাহেবের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এডুকেশন ডেসপ্যাচের পর বহু বিদ্যালয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে স্থাপিত হয়েছিল এ রকম দেশপ্রেমিক মহানুভব ব্যক্তিদের প্রাণপণ চেষ্টাতেই। এই সব অতি প্রাচীন বিদ্যালয়েরও ইতিহাস রচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত মনে করি। এই ধরণের বিদ্যালয়ের মধ্যে হুগলী জেলার "ইলসোবা-মণ্ডলাই হাইস্কুল" (প্রতিষ্ঠিত ১৮৫৬ খৃঃ) অন্যতম।

ক্ষিতিশচন্দ্র মোদক, ইলসোবা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন সম্পাদক।
কলিকাতা—২৫।

(৪)

বহুদিন থেকে আমি আপনাদের "অমৃত" সাপ্তাহিকের একজন অনুরাগী পাঠক। আপনাদের বিষয়বৈচিত্র্য মনকে গভীরভাবে দোলা দেয়। আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছেন শ্রীসন্ধিৎসু। তিনি কিছুদিন আগে "নতুন ঠগী" মারফত আমাদের নানাভাবে ভদ্রবেশী প্রতারকদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। নানারকম প্রলোভনের হাত থেকে অভিজ্ঞতাহীন লোকেরা সাবধান হয়েছেন।

এরপর তিনি আমাদের সামনে এলেন তাঁর নতুন অনবদ্য ফিচার "মানুষগড়ার ইতিকথা" নিয়ে। তাঁর ঝুলি থেকে একের পর এক আমাদের উপহার দিয়ে চলেছেন। প্রথম ফিচারটি থেকেই আকৃষ্ট হয়েছি। তিনি আমাদের দূরঅতীতে নিয়ে যান। স্কুল, কলেজের পুরনো ছবিগুলো স্পষ্টভাবে চোখে প্রতিফলিত হয়। জীর্ণ, নোনা-ধরা ইট, কাঠ, বালি এবং সদ্য রং করা দেওয়ালগুলোর বিচিত্র সৌরভ মনেপ্রাণে অনুভব করি। প্রতিষ্ঠাদিবস থেকে বর্তমান দিনটির নিখুঁত চিত্র জনসমক্ষে তুলে ধরেন। এই অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী শ্রীসন্ধিৎসু নিজেই। যেভাবে কষ্ট করে তিনি বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করেন, সে কষ্ট তাঁর একার নয়, তাঁর কষ্ট আমারও সমানভাবে ভাগ করে নিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। এবং এটা আমাদের কর্তব্য।

তাঁর কাছে আমার বিনীত নিবেদন, কোলকাতার আশেপাশে যেসব প্রসিদ্ধ স্কুল কলেজগুলো বর্তমানে দেখছি; তার সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করুন।

সাগ্রহে অপেক্ষা করছি সেই দিনটির জন্য, যেদিন শ্রীসন্ধিৎসু নতুন ভাবে, নতুন রূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে আমাদের আবার চমকে দেবেন।

বিনয়কুমার কর।
ধূপগুড়ি/জলপাইগুড়ি।

স্ত্রীমল্যাণ্ড

আমি আপনাদের সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত'র একজন নিয়মিত পাঠিকা। আপনার পত্রিকায় শ্রীনির্মল সরকারের উপন্যাস 'স্ত্রীমল্যাণ্ড' আমার খুব ভাল লেগেছে। তাঁর উপন্যাসে দীনা স্বরূপাকে মনে হয় যেন ক্ষণিকের আবির্ভাবে সুরভিত গন্ধ ছড়িয়ে নিমেষে হারিয়ে যায়, থাকে শুধু তার কথা বলার সুরটুকু। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। —সুভদ্রা মল্লিক কলিকাতা-১৪

বেতারশ্রুতি

আপনার পত্রিকার মাননীয় 'শ্রবণক' মহাশয়ের 'বেতারশ্রুতি' বরাবরই পড়ে আনন্দ পাই, আনন্দ পাই এই ভেবে যে, মনের কথাগুলি উনি নিষ্ঠার সঙ্গে পত্রিকার মারফৎ তুলে ধরেন। আকাশবাণী কলকাতা বেতার কেন্দ্রে দিনের পর দিন ঘোষক-ঘোষিকারা ত্রুটি করছেন অনুষ্ঠান ঘোষণায়, তার ফলস্বরূপ শ্রোতাদের বিরক্তি কতখানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনুষ্ঠানের মাধুর্য নষ্ট হচ্ছে এ কথাটা শ্রবণক মহাশয় যতই বোঝাতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কি কিছুই ভাবতে নেই এ নিয়ে? আমি সুদূর দিল্লী থেকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছি বেতার কর্তৃপক্ষকে কিন্তু কোনও ফল পাই নি। দিল্লীতে দুপুর বেলার অনুষ্ঠান একমাত্র সর্টওয়েভে শুনতে পাই, কিন্তু গত ২৭শে জুলাই 'অনুরোধের আসরে' মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গান বাজানোয় ত্রুটি থাকায় দু বার একবার দুঃখ প্রকাশ করা হল। কিন্তু অনুরোধের আসরের নির্ধারিত সূচীর থেকে একটি গান পুরো বাদ পড়াতে আমাদের মনে দুঃখ থাকাটা স্বাভাবিক। যাই হোক ২৭শে জুলাইয়ের পর আরও একবার দুবার গান বাজানোয় ত্রুটি থাকায় তার জন্য ঘোষককে দুঃখ প্রকাশ করতে হয় নি। এই ধরনের ব্যাপার দিন দিন আমার মত যারা দিল্লীর বাঙালী সম্প্রদায় যাঁরা আগ্রহ করে শোনেন তাঁরাও লক্ষ্য করছেন। কিন্তু এটা যে কত নিন্দনীয় ব্যাপার—এ ব্যাপারটি বেতার কর্তৃপক্ষকে কেউ বোঝানোর দায়িত্ব যদি নিতেন তাহলে আমার মত সকলেই খুশী হতেন। আপনি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নেবেন, এবং 'শ্রবণক' মহাশয়কেও আমার নমস্কার পাঠাচ্ছি।

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়
নানকপুর, নিউদিল্লী—২৩

সাদা চোখে—

বিগত ২৭ আগস্ট বুধবার ছিল যুক্তফ্রন্টের পক্ষে একটি স্মরণীয় দিন। ফ্রন্ট শরিকরা দীর্ঘ আলোচনার পর এই দিনই একটি পূর্ণাঙ্গ 'শান্তি দলিলে' সই করে অন্তর্বিরোধ সমূলে বিনাশ করার প্রয়াসে সচেষ্ট হলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের চৌদ্দটি দল একটি কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যমত হয়ে তাঁদের 'প্রধান শত্রু' কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে কিন্তু শরিকী লড়াই ফ্রন্টকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলছিল বলে অংশীদাররা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। অবশেষে এই রোগ নিরাময়ের জন্য এবং সর্বোপরি ফ্রন্টরক্ষাকল্পে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর এই শান্তি সনদ রচিত হল। ফলশ্রুতি কি হবে জানি না, তবে এটা যে একটি সুস্থ পদক্ষেপ একথা সকলেই অকপটে স্বীকার করবেন।

দলিলের পূর্ণবয়ান কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। বিরোধের কারণ, লড়াইয়ের পরিণতি এবং সংঘর্ষকে বন্ধ করবার জন্য কি দাওয়াইয়ের প্রয়োজন তা ফ্রন্ট শরিকরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে এই দলিল প্রস্তুত করেছেন। কিন্তু প্রস্তুতি পর্বেও ফ্রন্টকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিছু এলোপাথাড়ি সংবাদ এই সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে অবশ্য। প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি মুখ্য দল একত্রিত হয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করেন, এবং মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের উপর একটি খসড়া দলিল প্রণয়নের ভার দেন। এই খসড়া পরে ফ্রন্ট সভায় উপস্থাপিত করা হলে সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার বা এস ইউ সি এক পাল্টা দলিল পেশ করেন। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত সেই দলিল ধোপে টেঁকে নি। পঞ্চবামের সনদ নিয়েই ফ্রন্টে আলোচনা চলে এবং সামান্য অদল-বদলের পর পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়।

সনদের মুখবন্ধে স্বীকার করা হয়েছে যে বিরোধ লড়াইয়ের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে অনেক ক্ষেত্রে, এবং হত্যাও কখনো কখনো সংঘটিত হয়েছে। ফলে, যুক্তফ্রন্টের গৌরবময় ভূমিকা মসীলিপ্ত হয়েছে, আর ফ্রন্টবিরোধীরা এই অস্বস্তিকর অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করছে।

অন্তবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখনো একটি শক্তি হিসাবে বিরাজ করছে—একথা অনেক ফ্রন্ট শরিক আমল দিতে চান না, এবং কংগ্রেস যে যুক্তফ্রন্টকে ধ্বংসের জন্য এখনো সচেষ্ট—একথাও অনেকে সরাসরি স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। কংগ্রেস জানে বর্তমানে ঐ দলের পক্ষে দল ভাঙিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আর অপদস্থ করা যাবে না। তাই এবার তাঁরা কৌশল বদলিয়েছেন। ফ্রন্টের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস যুক্তফ্রন্টকে হেনস্তা করতে বদ্ধপরিকর, এবং সেই সুযোগ কংগ্রেস যাতে না পায় তার জন্যে ফ্রন্টকে সজাগ থাকতে হবে। ফ্রন্ট শরিকরা নিজ নিজ পদ্ধতিতে অন্তর্দলীয় বিরোধের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছেন, এবং অবশেষে ঘটনার উৎপত্তিগত বিষয়বস্তু সম্পর্কে সহমতও হয়েছেন। সমস্ত বিষয় অনুধাবনের পর যুক্তফ্রন্ট এই শরিকী কোঁদলের নয়টি কারণ তাঁদের দলিলে সন্নিবেশিত করেছেন।

কারণগুলি এই: (ক) কংগ্রেস, কিছু কিছু সংবাদপত্র এবং ফ্রন্টবিরোধী শক্তিগুলি তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ফ্রন্টের শরিকী বিরোধকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে এবং কোঁদলে ইন্ধন যোগাচ্ছে; (খ) এক শ্রেণীর জোতদার, মহাজন এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা বর্তমানে কায়দা করে কিছু কিছু ফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত দলের সমর্থক সেজে সত্যিকারের শ্রমিক কৃষকের দরদী বন্ধু ও সহযোদ্ধাদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে; (গ) এক শ্রেণীর আমলাতন্ত্রী ও পুলিশ ফ্রন্ট শরিকদের অন্তর্বিরোধকে আরও জোরালো করার উদ্দেশ্যে এক অংশীদারকে আর-এক অংশীদারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চক্রান্তে লিপ্ত আছে; (ঘ) সমাজবিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসের পক্ষপুটে লালিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের মধ্যে অনেকে এখন কংগ্রেসের আশ্রয়ে থাকা নিরাপদ মনে করছে না। কাজেই কোনো কোনো ফ্রন্ট শরিকের সমর্থন লাভের চেষ্টায় তারা রত, এবং সেই সমাজবিরোধীরা কোনো কোনো জায়গায় এখন সংঘর্ষ বাধাবার কাজে লিপ্ত; (ঙ) আমেরিকার সি আই এ এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল, আর বড় বড় ব্যবসায়ীদের এবং প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির হাতও ফ্রন্টে অনৈক্য স্থাপনে উৎসাহী; (চ) যুক্তফ্রন্টের সীমিত ক্ষমতা ও সঙ্গতি সত্ত্বেও তার শক্তি জনকল্যাণে নিয়োজিত করে জনতাকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উদ্দেশ্য—শুধু পশ্চিমবঙ্গের মঙ্গল নয়, সমস্ত ভারতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সংহত ও জোরদার করা। কিন্তু কিছু কিছু অংশীদারদের মধ্যে এই ঝোঁক প্রবল যে শুধুমাত্র সীমিত সঙ্গতি ও শক্তি এবং সরকারী প্রশাসনযন্ত্র কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবরকমের মানুষকে কোল দিয়ে দলীয় শক্তিবৃদ্ধি করা; (ছ) একান্তভাবে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে ও অত্যুৎসাহী হয়ে দলীয় সংগঠন বাড়াবার কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলে সহিংস উপায়ে অন্য দলকে উৎখাত করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে; (জ) সুসংবদ্ধ কর্মপ্রণালীর অভাব এবং যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীমণ্ডলীর ৩২-দফা কর্মসূচী রূপায়ণে সংহতির অভাব কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, এবং সেজন্যে অবস্থা শোষক শ্রেণী ও তাদের সহযাত্রীদের বিরুদ্ধেও লড়াই করা যাচ্ছে না; (ঝ) এবং সর্বোপরি ফ্রন্টের স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভাঁটা পড়ায় গণতান্ত্রিক মানুষের একতা গড়ে উঠছে না এবং ফ্রন্ট শত্রুদেরও বিচ্ছিন্ন করা যাচ্ছে না।

এই নয়টি কারণ নিরূপণের পর দলিলে বলা হয়েছে, অংশীদাররা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে একথা ভালো করেই উপলব্ধি করেছেন যে শরিকী লড়াই অবিলম্বেই বন্ধ করতে হবে, এবং সমস্ত বিরোধের অবসান ঘটাতে হবে। ফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়া পর এখনো তার সাধারণ শত্রু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালাতে হবে, এবং এই বুনিয়াদি তথ্যকে মেনে নিয়ে ফ্রন্ট শরিকদের অবিলম্বেই সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে এগিয়ে আসতে হবে।

এবং সেজন্যে দরকার:— (ক) ৩২-দফা কর্মসূচীর মধ্যে কিছু সংখ্যক প্রোগ্রামকে অবিলম্বে অগ্রাধিকার দিয়ে, স্তরভিত্তিক রূপায়ণের জন্য কালক্ষেপণ না করে যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নামাতে হবে; (খ) শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল যে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বেশি করে ক্ষমতা ও অর্থ, কেন্দ্রীয় কাড়ারদের রাজ্যের হাতে দেওয়া ও অন্যান্য দাবীর ভিত্তিতে লড়াইয়ের ব্লুপ্রিন্ট রচনা করে রাজ্যব্যাপী সংগ্রামের প্রস্তুতি চালাতে হবে; (গ) সমস্ত ফ্রন্ট অংশীদারকে বিরোধী শক্তির নয়া কৌশল সম্পর্কে সদা জাগ্রত থাকতে হবে। ষড়যন্ত্রীদের নজরে রাখতে হবে এবং তাদের কুকর্মকে পন্ড করবার জন্যে ফ্রন্ট শরিকদের সেইভাবে সংগঠিত হতে হবে; (ঘ) শরিকদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ দেখা দিলেই আলোচনার মাধ্যমে উৎপত্তিস্থলেই তা মিটিয়ে ফেলতে হবে; যদি তা সম্ভব না হয় তবে জেলার স্তরে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে তা নিরসন করতে হবে। এতেও যদি ব্যর্থতা আসে তবে প্রাদেশিক ভিত্তিতে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্রই যুধ্যমান শরিকদের জেলা ও প্রাদেশিক নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। বিরোধের

খবর আসার সংগে সংগেই বিবদমান দলের নেতৃবর্গকে অবিলম্বে তাঁদের কমরেডদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে নিষ্পত্তির জন্য সচেষ্ট হতে হবে; (ঙ) যুক্ত সম্মেলন, সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য ধরণের আন্দোলন কোন একটি নির্দিষ্ট ইস্যুর উপর ভিত্তি করে স্ব-স্ব এলাকায় গড়ে তুলতে হবে, এবং নিয়তই এই কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ফ্রন্টকে নিয়োজিত রাখতে হবে। এলাকাভিত্তিক যুক্ত কমিটি গঠন করতে হবে যাতে বিভিন্ন শরিকদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কমে গিয়ে শক্তি সংহত রূপ নেয়, এবং আখেরে ফ্রন্টের ঐক্যবদ্ধির কাজে সহায়ক হয়; (চ) বিশেষ করে খাদ্য, ভূমি সমস্যা, শ্রমিকের দাবী-দাওয়া, শিক্ষা ও প্রশাসন যন্ত্রের সংস্কারের দাবীতে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, এবং এর প্রস্তুতির জন্যে জেলা যুক্তফ্রন্টকে সম্মেলন ও সভার মাধ্যমে গণ-সংগঠনকে সংগঠিত করতে হবে; (ছ) অবিলম্বেই জেলা ও প্রদেশভিত্তিক সভা ও শোভাযাত্রা সংগঠিত করতে হবে মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে, এবং সঙ্গে সংগে ফ্রন্টবিরোধী কুচক্রী শক্তির মুখোশও খুলে দিতে হবে। এই সমস্ত আন্দোলনে প্রাদেশিক ফ্রন্টনেতাদের হিস্যা নিতে হবে। ফলে শুধু ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠবে না সেই সংগে গণতান্ত্রিক মানুষের রাজনৈতিক চেতনা ও নৈতিক মান উন্নীত হবে, আর ফ্রন্ট সমর্থকদেরও শক্তিশালী করবে; (জ) প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব আদর্শ ও কর্মসূচী প্রচার করার অধিকারকে মেনে নিতে হবে যাতে মানুষকে তাঁরা তাদের দলে টানতে পারেন। এবং দলের বিস্তার লাভে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু এই প্রচার যেন অসহিষ্ণুতা, প্রকট দলীয় মনোভাবের পরিচায়ক হয়ে সহযাত্রী দলকে এমন কি হিংসার মাধ্যমে উৎখাতের প্রেরণা না জোগায়। অন্য সহযাত্রী দলের সমালোচনা যেন ভ্রাতৃত্বের গণ্ডি অতিক্রম না করে; এবং সর্বশেষে (ঝ) বলা হয়েছে, ফ্রন্ট মন্ত্রীমণ্ডলীকে সহযোগিতার ভিত্তিতে সুসংহতভাবে কাজ করতে হবে, এবং যৌথ দায়িত্ব সৃষ্টির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে, যাতে একটি ঐক্যবদ্ধ দলের মত ফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কাজ করতে পারে।

যুক্তফ্রন্ট নয়টি রোগ নির্ণয় করে সমসংখ্যক দাওয়াই বাতলেছেন, এবং পরিশিষ্টে উল্লেখ করেছেন যে এই 'সনদ' যে আচরণবিধি সন্নিবেশিত করেছে তাকে বিশেষভাবে শরিকদের উপলব্ধি করতে হবে, আর মনেপ্রাণে আন্তরিকতার সংগে এই সমস্ত প্রেসক্রিপশান কার্যকর করায় সচেষ্ট হতে হবে। রাজনৈতিক আদর্শে ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও এ ধারণার সৃষ্টি করতে হবে যে ফ্রন্ট শরিকদের একমন একপ্রাণে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হবে তাঁদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে।

যুক্তফ্রন্টের সভায় সেদিন যখন এ দলিল পাকাপাকিভাবে সইসবুদ হচ্ছিল তখন কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী নাকি সখেদে বলে উঠেছিলেন—'এসব আর কেন, এসব করে লাভই বা কি!' শ্রীলাহিড়ীর আক্ষেপের কারণ ছিল। কারণ এই শান্তি-সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার অব্যবহিত আগেই ফ্রন্টের সভায় কল্যাণী ও কাঁচরাপাড়া এলাকায় দক্ষিণ কম্যুনিস্ট ও মার্ক্সিস্টদের মধ্যে এক তুমুল লড়াই-এর সংবাদ এসে নাকি পৌঁছেছিল। আর ঐ সংঘর্ষে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা নাকি বেধড়ক মার খেয়েছিল। অতএব শ্রীলাহিড়ীর পক্ষে ঐ আক্ষেপ করা যে একান্তভাবে স্বাভাবিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার সনদ স্বাক্ষরিত হওয়ার পরও নদীয়া থেকে শরিকী লড়াই-এর খবর এসেছে। সেখানে ফরওয়ার্ড ব্লক ও মার্ক্সিস্টদের মধ্যে মারপিট হয়েছে জমি দখলের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয়, সনদও থাকবে লড়াইও চলবে। তবে সনদের সূত্র অবলম্বন করে মারপিট হয়ে যাওয়ার পর মীমাংসার পথ যে সুগম হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

চুক্তি সম্পাদন করে কিম্বা আচরণবিধি প্রণয়ন করে শরিকী লড়াই থামানো যাবে বলে যাঁরা বিশ্বাস করেন, অন্ততঃ 'সমদর্শী' তাঁদের সংগে সহমত হতে রাজী নন। আন্তরিকতাই সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় বস্তু। ফ্রন্ট শরিকরা যদি এই সনদকে কার্যকর করে অন্ততঃ আগামী ধান কাটার মরশুম পর্যন্ত তাঁদের সিরিয়াসনেস প্রমাণ করতে পারেন তবে 'সমদর্শী' তাঁদের সেলাম জানাবে। অবশ্য সনদের মধ্যেও আন্তরিকতার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেদিনের সভা ভংগ হওয়ার পরই অনেক সদস্যের মুখে একথা শোনা গেছে যে একমাত্র লোকসেবক সংঘ ছাড়া অন্য কোন দলের মধ্যে এই সনদ কার্যকর করার মত মানসিকতার এখনো কোন প্রতিফলন দেখা যায় নি।

সনদের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের নেতারা যে সমস্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন বামপন্থী দলের শিক্ষিত ক্যাডার হয়ে তাঁদের অনুগামীরা এসব তত্ত্বকথা বুঝতে কেন অপরাগ হচ্ছেন তা ভাবতেও কষ্ট বোধ হয়। সাধারণ মানুষের মনে এতদিন এ ধারণা প্রবল ছিল যে বামপন্থী দলগুলির কর্মীরা আচারে, ব্যবহারে, সহবৎ শিক্ষায় এবং সামাজিক পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসাবে নিশ্চয় এক নতুন নজীর স্থাপন করবেন। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে সংঘর্ষের প্রবণতা বাড়ছে বলেই মনে হয়। আর লড়াই হচ্ছে তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা একসংগে শত্রুর মোকাবিলা করার জন্যে কিছুদিন আগেও প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না।

সনদে বলা হয়েছে শরিক দলের ভ্রাতৃত্বমূলক সমালোচনা করতে হবে। কিন্তু কোন দূর প্রত্যন্ত গ্রামে দুই শরিক লড়াই হওয়ার সংগে সংগেই কলকাতায় বসে সংশ্লিষ্ট দলের প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ নির্মম ভাষায় একে অন্যের উপর দোষারোপ করতে থাকেন। এমন কি দেখা গেছে এখনো পর্যন্ত প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কেও তাঁরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে পারেন নি। সে যা হোক, দলিলে সন্নিবেশিত তত্ত্ব ও তথ্যগুলি সম্পর্কে শরিকরা যে প্রথম থেকেই ওয়াকিবহাল একথা বলা চলে। কিন্তু যখন এই সনদ রচনায় পঞ্চবাম ব্যাপৃত ছিলেন দুঃখের বিষয় তখনো একে অপরের সংগে হানাহানি করেছেন এবং যথেচ্ছ বিবৃতি প্রকাশ করে দলীয় সতীত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। মনে হচ্ছিল সনদ তৈরী হয় নি বলেই তখন ঘটনার মূল্যায়ন করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। মোদ্দা কারণগুলি সম্পর্কে যে তাঁরা আগে থেকেই সচেতন ছিলেন বিবৃতিগুলির বিশ্লেষণ করলেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এসব ঘটনা ঘটছে কেন? তবে কি ধরে নিতে হবে যে, তাঁরা বক্তব্য ও ব্যবহারের মধ্যে ব্যবধান রেখে চলতে চান? ফ্রন্ট শরিকরাই কেবলমাত্র এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন এবং জনসাধারণ সেই উত্তরের অপেক্ষায় আছে।

ফ্রন্ট স্বীকার করেছে, মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়াতে হবে। যৌথ দায়িত্ব সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ পরোক্ষে একথা স্বীকার করা হয়েছে যে মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যরা নিজের নিজের দলের মন্ত্রীরূপেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্রন্টের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য অন্ততঃ গত ২৭ আগস্ট পর্যন্ত কোন প্রচেষ্টা করেন নি। যে আমজনতা অকৃপণভাবে ফ্রন্টের উপর মধ্যবর্তী নির্বাচনে কৃপা বিতরণ করেছিলেন তাঁদের কাছেই এই কৈফিয়ৎ ফ্রন্টকে দিতে হবে; অন্য কাউকে নয়। আর প্রতিক্রিয়াশীলরা যদি এই ত্রুটি তুলে ধরেন তবে দোষ কার? ফ্রন্টের না প্রতিক্রিয়াশীলদের? ফ্রন্ট কি মনে করেন যে প্রতিক্রিয়াশীলরা ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করার জন্যই সতত বিরাজমান থাকবেন?

যাহোক এতদিন কৈফিয়ৎ দেবার কিছু ছিল না। এখন সনদ হল। ফ্রন্টের শরিকরা এই সনদের বাণী কিভাবে কর্মীদের কাছে পৌঁছে দেন তা লক্ষ্য করার বিষয়। এবং কীভাবেই বা শান্তির সনদকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য অংশীদারগণ ভূমিকা গ্রহণ করেন তাও লক্ষ্য করার অবকাশ পাওয়া গেল। শরিকদের শুধু একটি কথাই স্মরণ রাখা উচিত যে নিজেকে ঠকানো খুবই সোজা কিন্তু গণদেবতাকে ঠকানো যায় না। কাজেই দলীয় কোঁদলে মত্ত থেকে গণকল্যাণকে যদি অবহেলা করা হয় তবে ফ্রন্টকে তার চরম মাশুল দিতে হবে। যতই দলীয় পরিধি বিস্তৃত করা হোক না কেন, কালে তা সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, এবং এমন সঙ্কুচিত হবে যে তার দৈর্ঘ্য বা বিস্তৃতি কিছুই থাকবে না। অতএব, সনদের শর্ত ফ্রন্টের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত হোক, এ আশাই বংগবাসী করবে।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

সব ভাল যার...

সব ভাল যার শেষ ভাল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসের ভিতর যে বিতর্ক ও বিরোধের ধূলিঝড় উঠেছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও' শান্তি ও' শান্তি মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই ঝড় শান্ত করে দিতে চেয়েছেন। দলের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে যেসব কংগ্রেস সদস্য নিজেদের বিবেক অনুসারে ভোট দিয়েছেন তাঁদের বে-আদপির জন্য শাস্তি দেওয়ার সংকল্প শিকায় তোলা রইল। কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা স্বতন্ত্র ও জনসংঘ নেতাদের সঙ্গে গোপনে দেখা করে একটা ভয়ংকর চক্রান্ত আঁটছিলেন, এই অপবাদের বোঝাও তাঁর মাথার উপর থেকে তুলে নেওয়া হল। দৃশ্যত, যুযুধান দুই পক্ষই সন্তুষ্ট। 'কংগ্রেসের সংকট কেটে গেছে'—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাদিক আলির সানন্দ ঘোষণা। কংগ্রেসের আশংকিত ভাঙ্গন রোধ করা গেছে, এতে দলের নীচের মহলের কর্মীরা খুশী।

কিন্তু সত্যই সংকট মিটেছে কি? পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'সন্ধি হয়েছে বটে; কিন্তু শান্তি হয়েছে কি?' এমন কি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ঐ অধিবেশন হয়ে যাওয়ার পরবর্তী কয়েক দিনেই যেসব ঘটনা ঘটেছে তা দেখে কংগ্রেসের ভিতরকার অতি বড় আশাবাদীরাও বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে, সংকটের কালো ছায়া সম্পূর্ণ সরে গেছে। এই কয়দিনের মধ্যেই কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পা বলেছেন, দলের শৃঙ্খলা যে করে হোক বজায় রাখতেই হবে। দলের মধ্যে 'ব্যক্তি-পূজার' যে মনোভাব প্রসার পাচ্ছে তার বিরুদ্ধেও তিনি দলের লোকদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও তাঁর বাসভবনের সামনে জমায়েতে দিনের পর দিন ভাষণ দিয়ে যাচ্ছেন, এবং এইসব ভাষণে আকারে-ইঙ্গিতে সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে কটু মন্তব্য করে যাচ্ছেন। তিনি জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন যে, দরিদ্রের স্বার্থরক্ষার জন্য অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে যারা বাধা দিচ্ছেন তাঁদের যেন চিনে রাখা হয়। তিনি বলেছেন, এই মানুষগুলি কারা তা তাঁর বলার দরকার নেই, কেননা সবাই এ'দের জানেন। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে, বাইরে যে আপোষই হোক না কেন, ভিতরে ভিতরে বিরোধের বাষ্প জমেই আছে এবং আবার কবে যে গর্জন-বর্ষণ শুরু হবে কেউ বলতে পারে না।

ঠিক কিভাবে এই আপোষ সম্ভব হল তার নেপথ্যকাহিনী না জানা পর্যন্ত বোঝা যাবে না, এই সন্ধিচুক্তি কতদিন স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। একটি কাহিনী এই যে, সিণ্ডিকেটের অন্যতম শক্তিস্তম্ভ শ্রীসদোবা পাতিল শেষ মুহূর্তে নরম হয়ে যাওয়ায় সিণ্ডিকেট দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং ইন্দিরা গান্ধীর মাথা চাই বলে যে আওয়াজ উঠেছিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সেই আওয়াজ তোলার আর লোক পাওয়া গেল না। শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হওয়ায় শ্রীমোরারজী দেশাই যে অভিমান পুষে রেখেছেন সেই অভিমান দূর করার চেষ্টাও কেউ করলেন না। ফলে, মোরারজী সমস্ত ব্যাপারটা থেকে তফাতেই রয়ে গেলেন। আর একটি কাহিনী এই যে, শ্রীমতী গান্ধীর শিবিরভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের একজন কংগ্রেস নেতা দিল্লীতে সিণ্ডিকেট নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের সঙ্গে কথা বলে এই আপোষের সূত্র তৈরী করেন। এই আপোষসূত্রের মূল কথা ছিল, স্বতন্ত্র ও জনসংঘ নেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী যে অভিযোগ এনেছেন সেই অভিযোগ থেকে কংগ্রেস সভাপতিকে মুক্ত করতে হবে। যদি তা করা হয় তাহলে কংগ্রেস সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুজনের মর্যাদা রক্ষা করেই একটা আপোষ প্রস্তাব তৈরী করা অসম্ভব হবে না, এই রকম একটা আভাষ পাওয়ার পরই ইন্দিরার শিবিরে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নিতে প্রস্তুত হন।

পর্দার আড়ালে যাই ঘটে থাকুক না কেন, সামনে থেকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেটা হল এই যে, সিণ্ডিকেট এখন ছত্রভঙ্গ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে শ্রীএস কে পাতিল ও শ্রীঅতুল্য ঘোষ নরম মনোভাব প্রকাশ করায় শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও শ্রীকামরাজ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের পরই শ্রীপাতিল ও শ্রীঘোষ দিল্লী ছেড়ে যথাক্রমে বোম্বাই ও কলকাতায় চলে এসেছেন। সিণ্ডিকেটের ভরসায় কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির যেসব সদস্য শ্রীমতী গান্ধীকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরাবার জন্য তোড়জোড় করছিলেন তাঁরাও হাত গুটিয়ে নিয়েছেন। যেদিকে পাল্লা ভারী সেদিকে এসে কংগ্রেস এম-পি'রা জড় হচ্ছেন। এই মুহূর্তে শ্রীমতী গান্ধীর দিকের পাল্লাই ভারী।

ঘটনার সর্বশেষে পরিণতিতে কংগ্রেসের ভিতর শ্রীমতী গান্ধীর প্রতিপক্ষ যদি ছত্রভঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে কংগ্রেস-বিরোধী বামপন্থী দলগুলিও বিভ্রান্ত। এই সব দলের হিসাব ছিল, কংগ্রেসে ভাঙ্গন হবেই, এবং সেই ভাঙ্গনের মুখে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ইন্দিরা সরকারকে বামপন্থী দলগুলির সমর্থন চাইতে হবে। সেই হিসাবে গরমিল হয়ে যাওয়ায় বামপন্থী দলগুলি এখন নিজেদের পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে কতকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন।

ভিয়েতনামের 'সবুজ টুপী'

থাই খাক চুয়েন একটি ভিয়েৎনামী নাম। এই নামের মানুষটির স্ত্রী, ভাই ও বাবা কিছুদিন আগে জানান যে, গত ১৩ই জুন থেকে চুয়েনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। চুয়েন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে একটি মার্কিণ সামরিক বাহিনীতে দোভাষীর কাজ করতেন। অন্তত চুয়েনের আত্মীয়-স্বজন তাই জানতেন।

চুয়েন যে বাহিনীতে কাজ করতেন সেটি কোন মামুলী ফৌজী বাহিনী নয়। সেটির নাম 'বিশেষ বাহিনী' বা স্পেশাল ফোর্সেস ওরফে 'গ্রীন বেরে' অর্থাৎ 'সবুজ টুপী'। এই বাহিনীতে বাছাই করা লোক নেওয়া হয় এবং গেরিলা যুদ্ধের জন্য তাদের বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হয়। আসলে এই 'সবুজ টুপী' ওয়ালাদের কাজ যতটা না লড়াই করা তার চেয়ে বেশী টাকা ছড়িয়ে, ঘুষ দিয়ে খুনজখম করে, এক কথায় যে কোনভাবে সম্ভব প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করা। এদের কাজের অনেকটাই ঢাকা থাকে গোপনতার অন্ধকারে। গোয়েন্দাগিরি এই কাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এহেন একটি বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত একজন ভিয়েৎনামীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় সাধারণভাবে বিশেষ কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। গোয়েন্দাগিরির জগতে গুমখুন হওয়ার ঘটনা কিছু অপ্রত্যাশিত নয় আর আজকের দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এ-পক্ষ ও-পক্ষের গোয়েন্দা প্রায় তরমুজের বিচির মত গিজগিজ করছে। কিন্তু পরিষ্কার জানা নেই কেন থাই খাক চুয়েনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা নিয়ে একটা দারুণ হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হয়েছে। সিয়াং নদী চষে ফেলা হয়েছে তার লাশ উদ্ধারের চেষ্টায়। কিন্তু পাওয়া যায় নি।

থাই খাক চুয়েন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি থাই খাক চুয়েনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা। এই ঘটনা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়ে দক্ষিণ ভিয়েতনামের লং বিন কারাগারে দিন কাটাচ্ছেন দক্ষিণ ভিয়েতনামস্থিত 'সবুজ টুপী' বাহিনীর অধিনায়ক কর্ণেল রবার্ট বি রল্ট এবং ঐ বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত দুজন মেজর, তিনজন ক্যাপ্টেন,

একজন চীফ ওয়ারেন্ট অফিসার ও একজন সার্জেন্ট ফার্স্ট ক্লাস। তাঁদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে খুনের অভিযোগ, জেনেশুনে একজন দক্ষিণ ভিয়েৎনামীকে হত্যা করার অভিযোগ। যদিও সরকারীভাবে বলা হয়নি, নিহত এই দক্ষিণ ভিয়েৎনামী কে, তাহলেও একথা আর জানতে বাকী নেই যে থাই খাক চুয়েনের মৃত্যু নিয়েই এত কান্ড।

কেন এবং কিভাবে থাই খাক চুয়েনের মৃত্যু হল? যে কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে সেটা হল এই :—থাই খাক চুয়েন ছিল মার্কিন পক্ষের একজন গোয়েন্দা। আর সে 'সবুজ টুপী' বাহিনীর যে ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার কাজ ছিল লাওস সীমান্তে ও কাম্বোডিয়া সীমান্তে প্রতিপক্ষের চরদের উপর নজর রাখা। এই ইউনিটে যে তিনশ জন গোয়েন্দা ছিল চুয়েন তাদেরই একজন। জুন মাসে একদিন ঐ মার্কিন গোয়েন্দা ইউনিটের হাতে একটি ছবি এসে পড়ল। ছবিটি তুলেছে আর একজন স্পাই। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কাম্বোডিয়ার সীমান্তে এক জায়গায় চুয়েন এমন একজনের সঙ্গে কথা বলছে যাকে আমেরিকানরা বিপক্ষের চর বলে জানে। চুয়েনকে 'সবুজ টুপী' বাহিনীর জেরার সম্মুখীন হতে হল। যেহেতু আমেরিকার গুপ্তচরদের দায়িত্ব সেন্টাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির (সি-আই-এ) হাতে ন্যস্ত সেহেতু 'সবুজ টুপী' বাহিনী তাদের তদন্তের ফলাফল সি-আই-একে জানিয়ে দিল—থাই খাক চুয়েন একই সঙ্গে আমেরিকা ও উত্তর ভিয়েৎনামের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করছে। সি-আই-এর জবাব এল 'চরম দাগ মেরে বরখাস্ত কর'। মার্কিন গোয়েন্দাজগতের পরিভাষায় এই নির্দেশের অর্থ কি থাই খাক চুয়েনের তা টের পেতে সময় লাগল না।

মরফিনের ইনজেকশান দিয়ে চুয়েনের দেহ অসাড় করা হল, সেই অসাড় দেহ একটি নৌকায় তুলে পিস্তলের গুলী মেরে সাবাড় করে দেওয়া হল। তারপর সেই লাশের সঙ্গে ভারী লোহার শিকল বেঁধে হয় সিয়াং নদীতে অথবা দক্ষিণ চীন সাগরে ফেলে দেওয়া হল।

মার্কিন কর্তৃপক্ষ অবশ্য চুয়েনের মৃত্যু সম্পর্কে অথবা আটজন 'সবুজ টুপী'র বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে কিছুই বলছেন না। তাঁরা মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ত চাপা পড়ত, যদি না, তাঁদের মধ্যে একজন মেজর টমাস মিডলটন তাঁর একজন অসামরিক আইনজীবী বন্ধুর সাহায্য নিতেন। মেজর মিডলটনের ঐ আইনজীবী বন্ধুর নাম জর্জ উইলফেড গ্রেগারি। ধৃত 'সবুজ টুপীদের' সম্পর্কে যে তদন্ত হচ্ছে তাতে বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য গ্রেগারি আমেরিকা থেকে উড়ে সাইগন চলে এসেছেন। তাঁর কাছ থেকেই এই কেলেংকারির অনেকটা ফাঁস হয়ে গেছে।

গ্রেগারি যেসব প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলির মধ্যে একটি হল, প্রামাণ্য সূত্রে তিনি জেনেছেন, শত্রুপক্ষের হয়েও গুপ্তচরবৃত্তি করার অপরাধে গত বছর প্রায় ১৬০ জনকে হত্যা করা হয়েছে বা হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছে। ঐসব ঘটনা সম্পর্কে যদি কেউ কোন উচ্চবাচ্য করে না থাকে তাহলে আজ এই আটজন অফিসারের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ আনা হচ্ছে কেন?

কেন তা কেউ এখন পর্যন্ত পরিষ্কার করে বলতে পারছে না। তবে এ বিষয়ে সায়গনে তিনটি জনরব শোনা যাচ্ছে—(১) সি আই এ ও মার্কিণ সামরিক বাহিনীর কলহের ফলেই এই হৈ চৈ। সি-আই-এ যাতে ভবিষ্যতে তাদের নোংরা কাজে 'সবুজ টুপী'কে খুশীমত ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য ঝিকে মেরে বৌকে শেখাবার চেষ্টা হচ্ছে। (২) চুয়েন আসলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট থিউয়ের হয়ে হ্যানয়ের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষা করছিল। (৩) ঐ আটজন অফিসারকে হয়ত ভুল করে ধরা হয়েছে।

কারণ যাই হোক, 'সবুজ টুপী'র এই কেলেংকারী ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ইতিমধ্যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, সি-আই-এর নোংরা কাজ করতে গিয়ে সামরিক বাহিনীর লোক ধরা পড়বে, আর সি-আই-এ আড়ালে থেকে রেহাই পেয়ে যাবে, এ জিনিস চলতে দেওয়া হবে কেন? ইতিমধ্যে কেউ কেউ কথা তুলেছেন, এইসব নোংরা কাজ করতে হলে লিখিত আদেশ চাই।

থাই খাক চুয়েনের লাশ পাওয়া যায় নি, কিন্তু তার ভূত আমেরিকার কাঁধ থেকে সহজে নামবে বলে মনে হচ্ছে না। ইন্দোচীন যুদ্ধের শেষ দিকে ফরাসী বাহিনীর মধ্যে যেরকম মনোবলের অভাব দেখা দিয়েছিল এবার ভিয়েতনামের মার্কিন বাহিনীর তাই হল নাকি?

স্পীকার ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র

গত সপ্তাহে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় স্পীকারের রুলিং কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে গেছে যা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পক্ষে উদ্বেগের কারণ। স্পীকারের নির্দেশ বিরোধী দলের মনঃপূত হয়নি। তার প্রতিবাদেরও পদ্ধতি আছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে বিধানসভার বিরোধী সদস্যরা বিধানসভা কক্ষেই স্পীকার মুর্দাবাদ ইত্যাদি ধ্বনি তুলে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। ফলে স্পীকার সমস্ত বিরোধী সদস্যদের বলপূর্বক বিধানসভা থেকে বহিষ্কার করে ২৬ জনকে পাঁচ দিনের জন্য সাসপেন্ড করে দেন।

বিরোধীরা এই ঘটনাকে স্পীকারের স্বৈরাচার ও গণতন্ত্র হত্যার সামিল বলে অভিহিত করেছেন। কেউ কেউ বলছেন যে, উত্তরপ্রদেশ সরকার কার্যত বিধানসভায় পরাজিত হয়েছেন। স্পীকার তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে সেই পরাজিত সরকারকে কাজ চালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিলেন। স্পীকারের প্রতি যদি বিরোধীদের আস্থা না থাকে তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিধানসভার কাজ চালানো কঠিন। স্পীকারও যদি বিরোধীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে না চলতে পারেন তাহলে গণতন্ত্রের ভিত্তিই যায় দুর্বল হয়ে। উত্তরপ্রদেশে এই ধরনের ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। কিন্তু এত ব্যাপক আকারে নয়। বিধানসভার সদস্যরা যখন স্পীকার নির্বাচন করেন তখন সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষের নেতার হাত ধরে স্পীকার তাঁর আসনে বসেন। স্পীকার নির্বাচিত হবার পর তিনি আর কোনো দলের সক্রিয় সদস্য থাকেন না। ন্যায়-নীতি ও বিধানসভা পরিচালনার বিধি অনুসারে তিনি নিরপেক্ষভাবে বিধানসভার কার্য পরিচালনা করে থাকেন। মানুষের ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে, কিন্তু তার জন্য স্পীকারের উপর কোনোরূপ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনার অর্থ হল তাঁকে আসন থেকে সরে যেতে বলা। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে এই সভার কাজ নির্বিঘ্নে চলা দুষ্কর। আরও লক্ষ্যণীয় যে, বিধানসভায় পুলিশ প্রবেশ ও মার্শালের আচরণ সম্পর্কে ডেপুটি স্পীকারও প্রতিবাদ করেছেন। ডেপুটি স্পীকার জানিয়েছেন যে সভার মার্শাল তাঁকেও জোর করে সভাকক্ষ হতে অপসারিত করেছে।

লোকসভার স্পীকার এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও বেদনা প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক সমাজে ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত। বিধানসভা গণতন্ত্রের প্রতীকী শক্তি। স্পীকার তার রক্ষক। এমন ঘটনা কিছুতেই ঘটতে দেওয়া উচিত নয় যাতে বিধানসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং স্পীকার তাঁর বিবেকবুদ্ধি ও স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী কাজ চালাতে অপারগ হন। বাইশ বছর ধরে ভারতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের পরীক্ষা চলছে। অনেক ঝড়-ঝাপ্টা তাকে সহ্য করতে হয়েছে। এখন তার কঠিন পরীক্ষার সময়। আমরা স্মরণ করতে পারি ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তনের ঠিক আগে পূর্ব পাকিস্তান বিধানসভায় এই ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল এবং বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদ ও উত্তেজনার মুহূর্তে মাইক্রোফোনের আঘাতে ডেপুটি স্পীকার নিহত হন। এই ঘটনার পর পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হয়। আজ পর্যন্ত সেই মৃত গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন হয়নি।

আজকের ভারতবর্ষে বিধানসভাসমূহে বাদানুবাদ ও বিতর্কের উত্তাপ অনেক সময়েই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এই সংকটের সময়ে সদস্যদের সংযত রাখার দায়িত্ব স্পীকারের। স্পীকারকে এমনভাবে আচরণ করতে হবে যাতে সদস্যরা বুঝতে পারেন তিনি সভার মর্যাদা রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ। পুলিশ ডেকে সভা নিয়ন্ত্রণ অতি-অস্বাভাবিক ঘটনা। এর দ্বারা পুলিশের ক্ষমতাই বাড়িয়ে দেওয়া হয়। যাঁরা জনপ্রতিনিধি, যাঁরা দেশের আইন-কানুন প্রণয়ন করেন তাঁরা নিজেদের সংযত রাখতে পারবেন না, এটা ভাবা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। লোকসভার স্পীকার গভীর বেদনার সঙ্গে বলেছেন, স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার যদি এক-মত না হন এবং পারস্পরিক সহযোগিতায় বিধানসভা পরিচালনা না করতে পারেন তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কী?

বাস্তবিকই উত্তরপ্রদেশের ঘটনা গণতান্ত্রিক পরীক্ষার সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সরকার ও বিরোধী পক্ষের ক্ষমতার লড়াইয়ে স্পীকার জড়িয়ে পড়ছেন, এমন ধারণাই গণতন্ত্রের পরিপন্থী। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিরোধী সদস্যরা সভাকক্ষ ছেড়ে যান। তাঁদের অবর্তমানেই বাজেট পাশ হয়। কংগ্রেস আমলে পশ্চিমবঙ্গেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল। অবশ্য তার লক্ষ্যস্থল স্পীকার ছিলেন না। সরকারী নীতির প্রতিবাদে বিরোধীরা বাজেট অধিবেশনে যোগ দেন নি। এর দ্বারা সদস্যরা নিজেদের দায়িত্ব কতটা পালন করেন তা বিচার্য। বিরোধী পক্ষই বিধানসভার প্রধান শক্তি। 'দি হাউস বিলংস টু দি অপোজিশন'। তাঁদের জন্যই অধিকাংশ সময় বরাদ্দ করা থাকে। এই সুযোগ যদি তাঁরা না নেন কিম্বা স্পীকারের ত্রুটিতে যদি এই সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন তাহলে গণতন্ত্রের স্বর্ণসূত্র রক্ষা করবে কে? লোকসভার স্পীকার বলেছেন যে, আগামী ডিসেম্বরে স্পীকার সম্মেলন ডেকে তিনি এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। স্পীকারকে অমান্য করে যেমন সভা চলতে পারে না তেমনি সদস্যদের পুলিশ দিয়ে বহিষ্কার করেও সভার উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। বড় কঠিন সময়ের মধ্যে আমাদের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা পড়েছে। তাকে সফল করার জন্য মাননীয় সদস্যগণ একটা পথ খুঁজে বের করুন। নইলে এই কাঠামো পুলিশ বা মার্শাল দিয়ে রক্ষা করা যাবে না।

শ্রীশ্রীরাধা

হেনা হালদার

অগ্নির যেমন জ্যোতির্বলয়, সূর্যের যেমন আলোক মেখলা, মৃগমদের যেমন সৌরভ, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যিনি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তিনি ব্রজ সীমান্তিনী মালিকার মধ্যমণি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের 'দ্বিতীয় হৃদয়'। শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনি মানুষের একান্ত আপনার জন। তাঁকে সম্বন্ধের বন্ধনে বাঁধা যায়। প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ, প্রেমই নিঃশ্রেয়স লাভের পরম উপায়, প্রেমই অমৃত। শ্রীরাধা সেই প্রেম কল্পনার পরাকাষ্ঠা, রসতত্ত্বের মূলাধার।

শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনাতেই গোপবধূ রাধা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছলে বলে কৌশলে শ্রীরাধাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। শ্রীরাধাকে সংসার সমাজ স্বজনের সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত করতে শ্রীকৃষ্ণের সুনিপুণ চাতুর্যের অন্ত ছিল না। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সবিস্তারে আছে তার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। সেই চির অভিসারিণী স্থিরযৌবনা নায়িকা চিরদিন বৈষ্ণব ভক্তের কণ্ঠে বেদনা হয়ে বেজেছেন। 'তিল তুলসী দিয়া এ-দেহ সমর্পিনু দয়া জনু ছোড়বি মোয়'—

বাঙালীর প্রাণের দেবতা রাধাকৃষ্ণ। আমাদের ছড়ায় কবিতায়, গাথায় চিত্রে নৃত্যে গীতে নাট্যাভিনয়ে রাধাকৃষ্ণ একাত্ম হয়ে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে তিনি লিখেছেন 'ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে 'রাধা' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ বৈষ্ণবাচার্যদের অস্থিমজ্জায় রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাঁরা টীকা টিপ্পনিতে পুনঃপুনঃ রাধা প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু মূলে কোথাও রাধা নাম নেই। শুধু ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধা নাম নেই। অথচ এখানকার কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গই রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নেই, রাধা ভিন্ন কৃষ্ণমূর্তি নেই, রাধা ভিন্ন কৃষ্ণমন্দির নেই। বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু রচনায় কৃষ্ণের চেয়েও রাধার প্রভাব এবং প্রাধান্য বেশী। যদি ঐসব ধর্মগ্রন্থে রাধা নাম নেই, তবে এ রাধা এলেন কোথা থেকে?' বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, রাধাকে প্রথম দেখা গেল ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। এই পুরাণটি (উইলসন সাহেব বলেছেন) পুরাণগুলির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বহু পূর্বেই বিলুপ্ত। এই পরবর্তী পুরাণটিতে নতুন দেবতত্ত্ব সংস্থাপিত হয়েছে। এখানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার নন। কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করেছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলকে। সেই গোলকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাধা। রাসের রা ও ধা ধাতুর ধা নিয়েই রাধা নাম নিষ্পন্ন। এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের ওপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করেছে।

ব্রহ্মবৈবর্তকার এক সম্পূর্ণ নতুন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্টি করেছেন। এই বৈষ্ণবধর্ম বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ভাগবত বা অন্যত্র কোথাও নেই। রাধাই এই নতুন বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। কবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নতুন বৈষ্ণব ধর্মের ধারাকে অবলম্বন ও পরিবর্ধন করেছেন। তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রমুখ পদকর্তারা কৃষ্ণকীর্তন রচনা করেছেন।

সাংখ্যদর্শন বলে পরমাত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গ-স্বভাবী। জড়জগৎ এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে এঁরা প্রকৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রকৃতিই সর্বসঞ্চালিনী এবং সর্বসংহারিণী। এই প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব থেকেই প্রকৃতি-প্রধান তান্ত্রিক ধর্মের উৎপত্তি। বৈষ্ণব ধর্মের অদ্বৈতবাদে যাঁরা সন্তুষ্ট হন নি তাঁরাই তান্ত্রিক ধর্মের সারাংশে বৈষ্ণবধর্ম সংকলন করে বৈষ্ণব ধর্মকে পুনরুজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন। রাধা সাংখ্যদর্শনের মূল প্রকৃতি স্থানীয়া। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধা প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বলেছেন 'তুমি না থাকলে আমি কৃষ্ণ, তুমি থাকলে আমি—শ্রীকৃষ্ণ।' বিষ্ণুপুরাণে কথিত শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীকে নিয়েই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। রাধাই সেই শ্রী। রাধ্ ধাতু আরাধনার্থেই ব্যবহৃত। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধিকা বা রাধা। কৃষ্ণ-রাধিকা আদর্শ গোপী।

রাধা শব্দের আর একটা অর্থ আছে: বিশাখা নক্ষত্রের আর একটি নাম রাধা। কৃত্তিকা থেকে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র। পূর্বে কৃত্তিকা থেকেই বর্ষ গণনা করা হত। কৃত্তিকা থেকে রাশি গণনা করলে বিশাখা ঠিক মাঝখানেই পড়ে। কাজেই রাসমণ্ডলের মধ্যমণি হোন বা না হোন, রাধা রাশিমণ্ডলের মধ্যবর্তিনী অবশ্যই। কিন্তু এ তো সমালোচক বা গবেষকের ভাষ্য। ভক্তের কাছে রাধার সমাদরের অন্ত নেই। বৈষ্ণব পদকর্তা বিরচিত পদাবলীতে রাধার নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে কৃষ্ণ 'রা' বলে আর ধা উচ্চারণ করতে পারেন না। ভাবাবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। "রাধা" শব্দ উল্টে ধারা হয়ে চোখ থেকে বেরিয়ে আসে।

ভক্তিরস সাধনায় প্রেমভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীরাধা হলেন নায়িকাশ্রেষ্ঠা। রতি বিভাগে সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা নায়িকার উল্লেখ আছে। সাধারণী রতির দৃষ্টান্ত কুব্জা, যিনি নিজের সুখাকাঙ্ক্ষার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণদর্শনাভিলাষিণী, সমঞ্জসা রতির দৃষ্টান্ত চন্দ্রাবলী বা রুক্মিণী, যিনি যুগপৎ নিজের এবং কৃষ্ণের সুখ সম্পাদনে উৎসুক। কিন্তু রাধাই সমর্থা রতির গৌরব অর্জন করতে সমর্থ। কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে সর্বসুখ ত্যাগ, সব দুঃখ বরণে যিনি সদাসর্বদা উন্মুখ। নিজের বলতে যাঁর কোন কিছুই নেই। প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠাই রাধা। পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য চিন্ময় সুপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ। তাঁর স্বরূপভূতা হ্লাদিনী শক্তিই রাধা। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব, রাধা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ থেকেই রাধার স্ফুরণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গেই রাধার লয়। স্বতন্ত্ররূপে রাধার কোনও অস্তিত্ব বা স্থিতি নেই। শ্রীকৃষ্ণ বিন্দু, রাধা বিসর্গ। বিন্দুর আত্মপ্রসারণে বিসর্গভাবের উদয়। বিসর্গের আত্মসঙ্কোচনে বিন্দুরূপে স্থিতি। ব্রহ্মকে জানা যেমন ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া ঠিক তেমনি রাধাকে জানতে হলে প্রেমের বিকাশের দ্বারা রাধাভাবে পৌঁছতে হয়।

রাধা, সমগ্র ভাবরাজ্যকে আপন অঙ্গে ধারণ করে একাকী সেই পরমপুরুষের অভিমুখে গমন করেন—এ মহাভিসার। রাধাসহ কৃষ্ণ মদনকে বিমোহিত করতে পারেন, রাধা ছাড়া তিনি নিজেই কামমোহিত। ভাব ও রসের এই দুটিতেই নিত্য ও লীলারহস্য। ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাব, রসের পরাকাষ্ঠা রসরাজ। ভাবের সঙ্গে রসের যে সম্পর্ক, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণেরও তাই। এই দুই রূপে এক অঙ্গে ধারণ করে প্রকটিত হয়েছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।

এই প্রবন্ধে আমি শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এবং সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছি।

নমিতা জাড় ভাঙে। বেশ কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করে তবে চোখদুটো খোলে। খোলার ইচ্ছে ছিলো না। তবু খুলতে হয়। সাপ্তাহিক দিনগুলোতে তো আর আলসেমির সুযোগ-সুবিধে নেই। সেই ভোর-সকালে উঠে মা-র করে রাখা চায়ের কাপটা প্রায় এক নিঃশ্বাসে গলার ভেতরে ঢেলে দিয়ে ঘরদোর গোছানো, টুকিটাকি সাংসারিক একাজ-সেকাজ করতে করতে অফিসে যাবার বেলা হয়ে যায়। তার ওপর রোজকার পরা শাড়িটা রোজ না ধুলেও ইস্ত্রিটা কয়েকবার চালিয়ে নিতে হয়। বাস-ট্রামের যা অবস্থা! একদিনেই পরা শাড়ির ভাঁট ভেঙে যে অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায়, তাতে দ্বিতীয় দিন অন্তত ইস্ত্রি না করে আর পরা যায় না। বেশী শাড়ি থাকলে তবু না হয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরা যেতো। দুটো তো মাত্র শাড়ি। সারাটা সপ্তাহ তাই দিয়েই কোনরকমে চালিয়ে নিয়ে রোববারে ধুয়ে নেয়। সেইজন্য রোববারে বাইরে বেরোবার ইচ্ছে থাকলেও শাড়ির কথা ভেবে নাকচ করে দিতে হয়। গত কয়েক মাস ধরেই ভেবেছিলো আরেকটা শাড়ি কিনে নেবে। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের কথা তো বলা যায় না। তখন অফিস যাওয়াটাই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সংসারের সব অভাবগুলো মিটিয়ে আর কেনা হয়ে ওঠে না। মাসের শেষের দিকটা যেভাবে চলে, তাতে শাড়ি তো দূরের কথা, সামান্য খড়কুটো কেনারও আর সামর্থ্য থাকে না।

অফিসের অপর্ণা, শিবানীদের কথা ভাবলে এক এক সময় হিংসে হয়। রোজ কিরকম চোখ-ধাঁধানো নিতানতুন শাড়ি পরে আসে। রঙবেরঙের। অবশ্য ওরা পরে আসবেই বা না কেন? ওদের মাথার ওপরে তো নমিতার মতো সংসার চালাবার দায়িত্ব নেই। অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। কলেজের পড়া শেষ করে বসে থাকবে, তাই নেহাৎ-ই সখে চাকরী করতে নেমেছে। হাতে যা পয়সা পায়, আমোদ-ফুর্তি আর শাড়ি-গয়নাতেই চলে যায়। কিন্তু নমিতার তো তা' নয়, মাইনের কড়ি প্রথম থেকে প্রতিটি হিসেব করে না চললে মাসের শেষে অথৈ জলে পড়তে হবে। যার হাতে পয়সা আছে তাকে লোক ধারও দেয়। কিন্তু নমিতাকে দেবে কেন? উপরন্তু সামনে কিছু না বললেও পেছনে হাসবে। তাতে নিজেকে যেন আরো ছোট বলে মনে হয়। তার চেয়ে

টেনেটুনে সংসার চালানোটাই ভালো। তবু পিঠ ঢাকতে গিয়ে যে বুকের আঁচলের কাপড়ে টান পড়ে।

চোখ খুলে ভালো করে তাকায় নমিতা। ওর ঘুম ভাঙার অনেক আগেই অনু বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে। ছুটির দিন ছাড়া অন্য দিনগুলোয় ওকেই ডেকে ডেকে অনুকে তুলতে হয়। ভোরের রোদটার রঙ বেলা হওয়াতে একটু গাঢ় হয়েছে। কমলা রঙের রোদের ফালিটা জানালা দিয়ে মেজেতে এসে পড়েছে।

মা রোজকার মতো সকালবেলাতেই উঠেছে। পাশের রান্নাঘর থেকে শব্দ আসছে। নমিতা বুঝতে পারে ও জাগার আগেই মা উনোনে আগুন দিয়ে সব কাজ সেরে ফেলেছে। এমনতেই মা খুব ভোরে ওঠে। সূর্য ওঠার আগে আগে। অন্ধকারের হাল্কা একটা চাদর আকাশের গায়ে বিছানো থাকতে থাকতে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ঋতুতেই। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছে নমিতা; এই দীর্ঘ বছরগুলোতে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে না পড়লে এই নিয়মের যদি এতটুকু ব্যতিক্রম হয়! সকালে উঠে স্নান সেরে উনোনে আগুন দেয়। চায়ের পাট চুকিয়ে তবে নামে সংসারের অন্যান্য কাজে। বাবা বেঁচে থাকতে মা'র সঙ্গে প্রায়ই এই সকালে ওঠা নিয়ে খিটিমিটি লাগতো। কারণ বাবার ছিল দেরী করে ওঠার অভ্যাস। কিন্তু চায়ের নেশার তাগিদে তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়তে হতো। অবশ্য তার জন্য মানুষটাকে দোষ দেওয়া যায় না। দশটা-পাঁচটার অফিস ছাড়াও সকাল-বিকেলের টিউশানি সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত ঘোর। এই অতি পরিশ্রমেই বাবার স্বাস্থ্যটা ভেঙে পড়েছিলো। নমিতা তখন কলেজে। বাবার বরাবরের ইচ্ছে ছিলো ভালো একটা ছেলে দেখে ওকে পাত্রস্থ করবেন। সেইজন্য অফিস থেকে ধার করে আর মা'র গয়না বিক্রি করে বাড়িটা শেষ করেছিলেন। নিজস্ব বাড়ি না থাকলে নাকি মেয়ের জন্য ভালো ছেলে জুটবে না। কিন্তু বাবার স্বাস্থ্যের রকম দেখে নমিতা সেই আশায় বসে থাকে নি। অনেক হাঁটাহাঁটি আর ধরাধরি করে চাকরীটা জুটিয়ে নিয়েছিলো।

ও চাকরী নেওয়াতে বাবা কষ্ট পেলেও মুখ ফুটে কিছু বলেন নি। হয়তো ও'র নিজের অক্ষমতার কথা ভেবেই কিছু বলতে পারেন নি। আজ ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দেয় নমিতা। সে সময় বিয়ের স্বপ্ন আর কলেজের ডিগ্রিটার মোহে বসে থাকলে আজ কী হতো ভাবতেও শরীরটা শিউরে ওঠে। ও চাকরী নেবার মাস কয়েক পরেই বাবার করোনারি অ্যাটাক হয়। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ। অফিসের কাছে পাওনা বাবদ গ্র্যাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ব্যাঙ্কে জমানো সামান্য টাকা আর মা'র গয়না—সর্বকিছুতেই তো বাড়ি করতে গিয়ে নিঃশেষ। সুতরাং—।

এর পরে নমিতা আর অন্য কোনদিকে মন দেয় নি। দিয়েই বা কী লাভ সমস্ত মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছে অফিসের লেজারে; নিজের জীবনের হিসেব-নিকেসের আর ফুরসত পায় নি।

তবু বাবা বাড়িটা শেষ করে গিয়েছিলেন বলে বাঁচোয়া। একতলায় দুটো ঘর, দোতলায় একটা। সামনে ছোট্ট এক টুকরো ছাদ। নমিতা একতলাটা ভাড়া দিয়ে দোতলায় ফাঁকা ছাদটুকু দরমা দিয়ে ঘিরে নিয়েছে। একটা ঘরেই দু বোন আর মা'র চলে যায়। আর ঘেরা জায়গাটায় রান্না। রান্নাঘরের পাশের একটা কোণ চট দিয়ে আড়াল করে তোলা জলে বাথরুম। স্নান, গা-ধোয়া ওখানেই সারে। পুরুষ বলতে তো কেউ নেই। কষ্ট একটু হলেও সেটা একরকম বাধ্য হয়েই স্বীকার করে নিতে হয়েছে। আজকালকার বাজারে নমিতার যা মাইনে তাতে চলা দায়। সংসার সাহারায় ভাড়ার টাকায় সব অভাব না মিটলেও কয়েক ফোঁটা জল তো বটে। বাবা বেঁচে থাকতে তবু দু-একজন আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখা যেতো। বাবা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও আর এদিক মাড়ায় না। হয়তো ওরা সাহায্য চাইবে ভয়ে। ভালোই হয়েছে। কারোর পরোয়া করে না নমিতা। যেমন করেই হোক সংসারের টলমলে নৌকোটাকে উপকূলে নিয়ে ও যাবেই। তার জন্য নিজেকে যতোখানি বঞ্চিত করতে হয় তা সে করবে। ওর জীবন তো সরল রেখা নয় যে কোন একটা বিন্দুতে গিয়ে মিলবে; তাই সে প্রত্যাশাও করে না নমিতা।

মা'কে চায়ের কাপ হাতে করে ঢুকতে দেখে নমিতা জিজ্ঞাসা করে,—মা, কটা বাজে?

—সাতটা বেজে গেছে। এর মধ্যে ক'বার এসে দেখে গেছি তুই উঠিস নি।

কথাটা শেষ করে চায়ের কাপটা ওর সামনে রেখে বলে,—দেখ তো চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল কিনা? তাহলে গরম করে দি। উনোন তো ফাঁকাই যাচ্ছে।

চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে চুমুক দিয়ে নমিতা বলে,—না মা, গরম করার দরকার নেই। গরম আছে। অনু কোথায় গেছে?

ওর জিজ্ঞাসায় মা বলে,—অনু ভোরে উঠে চা খেয়ে ওর এক বন্ধুর বাড়ি পড়তে গেছে।

নমিতার মনে পড়ে আর কদিন পরেই মেয়েটার পরীক্ষা। মাস কয়েক আগে হাবেভাবে একটা প্রাইভেট টিউটর রাখার কথা বলেছিলো ওকে। কিন্তু সামর্থ্যে কুলোবে না বলে ইচ্ছে করেই সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে নমিতা। ওকে এড়াতে দেখে অনুও সেকথা আর তোলে নি। কয়েকটা বন্ধুকে ঠিক করে তাদের সঙ্গে পড়াশুনা করে। মা চা দিয়ে চলে যাবার পর ওর সম্বিত ফেরে। সকাল থেকে কি আজেবাজে কথা একনাগাড়ে ভেবে চলেছে। অর্থহীন মনের এ বাচালতায় নিজেই যেন লজ্জা পায় নমিতা। চায়ের কাপটা শেষ করে মেজেতে রাখে। রোববারের সকালে এই একটাই বিলাসিতা। ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক কাপ চা। চাটা শেষ করে ধীরে-সুস্থে বিছানা ছেড়ে ওঠে। সপ্তাহের এই একটা দিনই বিছানা ছেড়ে উঠে কাপড়জামাগুলো সাবান জলে ভিজিয়ে রেখে বাজারে যায়। অন্যান্য দিন অফিস ফেরতাই বাজারে নেমে যা পায় নিয়ে আসে। সকালবেলা বাজারে যাবার সময় কোথায়! আর সারাটা সপ্তাহ রান্না বলতে তো নিরামিষ। দুটো আলাদা পাকের নিজের জন্য না হলেও অনুর জন্য ওকে বাজারে যেতে হয়। মাছ না হলে অনু খেতে পারে না। প্রথম দিকে একটু খুঁত-খুঁত করলেও এখন বড়ো হয়ে বুঝতে পারে। রোববারে যখন বাজারে যেতেই হয় তাই শনিবারে অফিস ফেরতা আর বাজারে নামে না নমিতা। মা নিরামিষ রান্নার পাট চুকিয়ে এলে তবে অনু যায় আমিষ রান্না করতে। ছুটির একটা দিনে উনোনের তাপে আর যেতে ইচ্ছে করে না নমিতার। তবু এক একদিন এড়াতে পারে না। অনু জেদ ধরে ওর হাতের রান্না খাবে বলে। অগত্যা ইচ্ছে না থাকলেও ছোট বোনটির মনে দুঃখ দিতে পারে না। সংসারে সত্যি তো ও ছাড়া অনুরও বা আর কে আছে! মেয়েটির জন্য এক এক সময় মনের ভেতরটা তিরতির করে ওঠে। ওর আর বেশী লেখাপড়া শেখার দরকার নেই। কোনরকমে স্কুলটা পেরোলেই নমিতা আপ্রাণ চেষ্টা করবে বিয়ে দিয়ে দেবার। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শিখে আর কী হবে? সংসারের হাল ধরার জন্য তো ও-ই আছে। অনু সিঁদুরে-হাসিতে সুখে সংসার করবে, নমিতা এইটুকুই চায়। ওর আকাশ দুপুরের প্রচণ্ড রোদে জ্বলে গেলেও অনুর আকাশে যেন রামধনু দেখা দেয়।

মা ঘর ছেড়ে বেরোবার সময় জানালাটা ভালো করে খুলে দিয়েছে। স্পষ্ট নজরে আসছে বাইরেটা। বেলা হয়ে গেলেও বিছানা ছেড়ে যেন উঠতে ইচ্ছে করে না। কী একটা আলসেমি শরীরের শিরায় শিরায় পাকে পাকে ওকে জড়িয়ে ধরে আছে।

ওদের বাড়ির পাশেই খালটা। তারপরে অনেকখানি হাতা নিয়ে একটা চার্চ, সঙ্গে অরফেন হোম। খালটায় বছরের দশ মাসই প্রায় জল থাকে না। শুধু বর্ষায় টইটুম্বুর। কতোগুলো কাদাখোঁচা মাছের আশায় সেই বুক শুকনো খালটার বুকে সাতসকালেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাল পেরিয়ে ওপারের চার্চ আর অরফেন হোমটা নিশ্চুপ। সাপ্তাহিক দিনগুলোয় একআধটু ফাঁকফোকর পেলে নমিতা এসে দাঁড়ায় জানালাটায়। অরফেন হোমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো সার বেঁধে সিস্টারের পেছন পেছন প্রভাতী উপাসনার জন্য চার্চে আসে। লর্ড যীশুর ক্রুশের সামনে হাঁটু নামিয়ে বসে সুর করে প্রার্থনা করে।

মনে পড়ে স্কুলের শেষের দিকে ওর এক বন্ধু জোর করে ওকে একদিন চার্চে নয়ে গিয়েছিলো। ইচ্ছে অতোটা না থাকলেও মরিয়মের মুখের দিকে তাকিয়ে না করতে পারে নি নমিতা। মরিয়ম ছোট-বেলাতেই এসে ঠাঁই নিয়েছিলো এই অরফেন হোমে। কোথা থেকে এসেছে, কে ওর বাবা-মা, ধর্ম কিছুই ও জানতো না। সবার মধ্যেই ওদের একজন হয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। বোঝার বয়েস হতে তাই নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েছিলো চার্চের প্রার্থনায় আর কাজে।

নমিতা মরিয়মের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মরিয়ম অন্য সবার মতো হাঁটু নামিয়ে প্রার্থনা করেছিলো। সুর করে উচ্চারণ করতে করতে মরিয়মের চোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সে কান্না দুঃখের নয়। নমিতা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলো, সে জল কারোর ওপর নির্ভর করতে পারার শান্তির। বহুদিন পর্যন্ত নমিতা ভুলতে পারে নি চার্চের সেই ঘণ্টার আওয়াজ, মনের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া প্রশান্ত নিস্তব্ধতা। আর মরিয়মের ক্রন্দনরতা নিশ্চল মূর্তি। স্কুলে ওদের সঙ্গে পড়া শেষ করে মরিয়ম আর পড়ে নি। নমিতা খোঁজখবর করে জেনেছিলো ও নাকি সন্ন্যাসীদের দলে নাম লিখিয়েছে। এখন কোথায় আছে কে জানে? হয়তো মফঃস্বলের কোন গণ্ডগ্রামে নয়তো বা কোন ছোট শহরের ভিড়ে। আজো মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন সময়ে মনে পড়ে যায় মরিয়মকে। হাজারো মানুষের ভিড়ে সাদা অ্যাপ্রোনে নিজেকে ঢেকে বুকের ওপর ঝোলানো সোনার ক্রশটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে নির্লিপ্ত প্রশান্ত মুখে একটা নেয়ে একাকী জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। —কিরে নমি উঠবি না?

মার ডাকে বিছানা ছেড়ে ওঠে নমিতা। লজ্জাও পায়। বেশী দেরী হয়ে গেলে আবার বাজারে কিছু পাওয়া যাবে না। তার ওপর রোববার। ছুটির দিনে একটু আগে আগেই বাজারে যাওয়া উচিত।

বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে যায়। মুখ ধোয়। শাড়ি বদলায়। তবু যেন সকালবেলার চিন্তাগুলো ওকে চেপে ধরে রাখে। আচ্ছন্নতার ঘোরটা যেন কিছুতেই কাটতে চায় না।

বাজার শেষ করে বাড়িতে এসে থলিটা মার হাতে দিয়ে ঘরে ঢোকে। দেখে, অনু এসেছে।

—তোর পড়া হলো অনু?

নমিতার জিজ্ঞাসায় অনু বলে,—হ্যাঁ দিদি। তুমি চা খাবে?

—দিবি?

—বোস। আমি তোমাকে চা'টা করে দিয়ে মাছগুলো কুটতে বসবো। এই ফাঁকে মার নিরামিষ রান্না হয়ে যাবে।

একটু পরে অনু চা নিয়ে আসে। নমিতা চায়ের কাপটা ওর হাত থেকে নেওয়ার ফাঁকে দেখে অনুকে। ফ্রক পরার বয়েস প্রায় ছাড়িয়ে গেলেও নমিতা শাড়ি পরার উৎসাহ দেয় নি। কারণ খরচ বাড়বার ভয়। তবে এখন ওকে ক'টা শাড়ি না কিনে দিলেই নয়। অনুর শরীরে যৌবনের প্রথম ঢল নেমেছে। নতুন বৃষ্টির জলে ভেজা ভাটার মতো মুখে চোখে সজল আভাস এসেছে। নমিতার জীবনেও তো এমনি একটা সময় এসেছিলো। আজ অবশ্য সে দিনগুলো অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। জোয়ারের পর কিন্তু ভাটার টানের আগে জলের যে নিথরতা থাকে, নমিতার যৌবন যেন ঠিক তেমনি একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। কবে অলক্ষ্যে ভাটায় টান দেবে কে জানে!

মার আর অনুর রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সংসারের টুকিটাকি কাজগুলো সেরে ফেলে নমিতা। ভর সপ্তাহে কাজ তো জমে থাকে কম নয়। হাতের কাজগুলো শেষ করে ওর শাড়ি ব্লাউজ, মার ধুতি, অনুর ফ্রক নিয়ে বাথরুমে ঢোকে। বেলা বেশ হয়ে গেছে। ওগুলো কেচে রোদে দিয়ে স্নান করে। খায়। তারপর ঘরে এসে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। ছুটির দিনে দুপুরে একটু গড়াতে না পারলে শরীরটা যেন ম্যাজম্যাজ করে। কাজের তাগিদায় অফিসের দুপুরগুলো কখন যে গড়িয়ে বিকেল হয় টেরই পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করেও ঘুম আসে

না। এতোদিন বেশ কাজ করে চলছিলো নমিতা। অফিস আর বাড়ি; বাড়ি আর অফিস। কিন্তু কয়েক মাস আগে অন্য ব্রাঞ্চ থেকে বদলি হয়ে আসা সরোজ যেন ওর এতোদিনকার পুকুরের জলের মতো শান্ত মনটায় হঠাৎ নাড়া দিয়ে দিয়েছে প্রথম প্রথম যতোদূরে সম্ভব নমিতা এড়িয়ে গেছে সরোজকে। বয়েসে ওর চেয়ে বড়ো হওয়া দূরে থাক ছোটই হবে। হাসিখুশী প্রাণবন্ত ছেলে। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। অফিসের সবার পেছনে লাগলেও সবাই ওকে ভালোবাসে। সে ওর সহজ সাদা মনটার জন্য। এর আগে অনেকে ওকে সোজাসুজি না হলেও আভাসে ইঙ্গিতে প্রপোজ করেছে। কিন্তু তাদের কাছে নমিতা সহজ হয় নি। নিজেকে কঠিন এক দুর্গের মধ্যে বন্দী করে রেখেছে। কী করে হবে? তা'হলে সংসারের নৌকোটার হাল ধরবে কে? ওর বড়ো তো কোন ভাই নেই। কিন্তু একদিন মা'ও নিশ্চয়ই সংসারের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দেবে। অনুরও বিয়ে হয়ে যাবে। ভরা সংসারের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবে। কিন্তু নমিতা?

কাল অফিস থেকে বেরোবার মুখে সরোজ ওকে পাকড়াও করেছিলো।

—আপনার কাল বিকেলে কোন কাজ আছে?

—কেন বলুন তো? মৃদু একটু হেসে সোজাসুজি তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলো নমিতা।

—না, জরুরী না হলেও আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিলো। কারণটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

—ঠিক এক্ষুনি আপনাকে কিছু বলতে পারছিনে। বুঝতে পারছেন সপ্তাহের মাত্র এই একটাই ফাঁকা দিন। কাজের কি অন্ত আছে? তবে কোথায় থাকবেন বলুন, চেষ্টা করবো আসতে।

এর বেশী আর কথা বাড়ায় নি নমিতা। বাড়িয়েই বা লাভ কী? এ জীবনের প্রতি তো ওর কোন টান নেই।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারে না নমিতা। গতকাল সরোজের কথাটার খুব একটা গুরুত্ব দেয় নি। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে সরোজের কথাগুলো যেন ওর মনের সমুদ্র-টাকে তোলপাড় করে তোলে। তবে কি সরোজ? কিন্তু যে জীবনের উঠোনে ওর পক্ষে পা রাখা সম্ভব নয়, তার দিকে এগিয়ে যাওয়া কি উচিত?

নিশ্চয়ই সরোজ নমিতাকে সঙ্গে করে রেস্টুরেন্টে যাবে। তারপর ও পাড়ার কোন সিনেমায়। অন্ধকারের মাঝে পরস্পর পাশাপাশি বসবে। সরোজের চঞ্চল আঙুল-গুলো ওকে স্পর্শ করবে।

কথাগুলো ভাবতেও দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে নমিতা। নিজেকে আর বেঁধে রাখতে পারে না। উঠে পড়ে। কলেজে ঢোকার পর বাবা ওর বিয়ের তোড়জোড় করেছিলো। একটা বেনারসী কেনার পরই অবশ্য বাবার সে উৎসাহে ছেদ পড়ে। সে বেনারসীটাও কখনো পরে নি নমিতা। স্যুটকেসের একেবারে নীচে ফেলে রেখেছিলো। আজ এতোদিন পরে হঠাৎ ওটা পরতে ইচ্ছে যায়। স্যুটকেস খুলে বার করে শাড়িটা। গা ধোয়। আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাউডার মাখে। টিপ আঁকে। দিদিকে এরকম করে সাজতে অনু কখনো দেখে নি। তাই অনুকে ওর দিকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে কোন-রকমে নমিতা বলে,—অনু, আমাদের অফিসের একটি মেয়ের আজ বিয়ে। ফিরতে একটু রাত হতে পারে। মা'কে বলিস, কেমন।

কথাগুলো শেষ করে ঘড়িতে সময় দেখে নমিতা। সরোজ হয়তো এতোক্ষণে এসে মেট্রোর নীচে পৌঁছে গেছে।

বাসটা ছুটে চলেছে। গজরাতে গজরাতে। নমিতার মনটা তারও আগে ছুটে চলে। রাস্তাঘাট, মানুষজন সব যেন আজ নুতন ঠেকে ওর চোখে।

বাস থেকে নেমে দেখে সরোজ ওর আগে এসেই দাঁড়িয়ে আছে। নমিতা এগিয়ে যায়। সরোজের কাছাকাছি এসে বলে,—লজ্জিত সরোজবাবু, আমার একটু দেরী হয়ে গেল।

—তাতে কি হয়েছে? আমিও এইমাত্র এসেছি। আমি তো ভেবেছিলাম আপনি আসবেনই না।

নমিতার চোখে আজ সরোজকে যেন অন্যরকম লাগে। প্রত্যহের সরোজ যেন ও নয়।

—চলুন কোথাও গিয়ে বসে একটু চা খাওয়া যাক।

সরোজের পাশাপাশি হাঁটতে থাকে নমিতা। কোন পুরুষের পাশে পাশে এভাবে কোনদিন পথ চলে নি। সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। নিয়ন আলোর চন্দনে সমস্ত চৌরঙ্গী যেন কনে সাজে সেজেছে।

কিছুটা হেঁটে দুজনে এসে একটা রেস্টুরেন্টে ঢোকে। মুখোমুখি চেয়ারে বসে। সরোজ বয়কে ডেকে চায়ের অর্ডার দেয়। চা এলে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সরোজ বলে,—আপনাকে একটা কথা বলার জন্য ডেকেছি।

নমিতার বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। জীবনে এ মুহূর্তের মুখোমুখি আর কোনদিন হয় নি। হাতের মুঠোটা ঘামে ভিজে ওঠে। চোখের দৃষ্টিতে সমস্ত লজ্জাগুলো এসে জড়ো হয়ে ওকে যেন সরোজের দিকে সোজাসুজি তাকাতে দেয় না।

সরোজ পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে ওর হাতে দেয়। প্রজাপতি আঁকা রঙিন চিঠিটা হাতে নিয়ে নমিতা স্তব্ধ হয়ে যায়। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় আশার প্রদীপটা যেন মুহূর্তে নিভে গেছে। চোখের সামনে উড়ে বেড়ায় একরাশ হলদে পোকা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রিটিশ অপসরণের স্বরূপ তো বর্মাতেই লক্ষ্য করা গেল। ওরা নিজেরাই নিজ রাজ্যের কলকারখানা খনি ইত্যাদি বোমা দিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে আসে। যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে শত্রুর কাজে না লাগে। একেই বলা হয় নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ। রুশদেশের লোক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নেপোলিয়নের আক্রমণের সময় রাজধানীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সেই থেকে এর নাম পোড়ামাটি। এবার হিটলারের আক্রমণের মধ্যেও রুশেরা পোড়ামাটি করে নিজেদের নাক কেটেছে ও নাৎসীদের যাত্রাভঙ্গ করেছে। নীতিটা রুশদের পক্ষে ভালো। তা বলে বর্মীদের পক্ষেও কি ভালো? তা যদি হতো বর্মীরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওটা প্রয়োগ করত, ব্রিটিশ ফৌজকে করতে হতো না। তেমনি বাংলার পক্ষে যদি ভালো হয় বাঙালীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলকাতা শহর পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ছারখার করে দেবে। ব্রিটিশ ফৌজকে ওকাজ করতে হবে না।

যেটা আক্রমণের দিন জনগণ করবে, জনফৌজ করবে সেটা কি এদেশের লোক ব্রিটিশ আর্মিকে বা তার ভারতীয় শাখাকে করতে দেবে? ভারতীয় সিপাহীরা বেতনভুক, তারা দেশের জন্যে প্রাণ দেবার জন্যে সৈন্যদলে যোগ দেয়নি। দেশরক্ষার জন্যে নতুন আর্মি সৃষ্টি করতে হবে। কে সে কাজ করবে? ইংরেজ করতে না দিলে কেমন করেই বা করবে? তার জন্যে যত সময় চাই তত সময়ই বা কোথায়? জাপানীরা কি তত সময় দেবে? তা হলে কি আমাদের কপালে আছে প্রভুপরিবর্তন ও পলায়মান প্রভু কর্তৃক কলকাতার বন্দর, হাওড়ার পুল, জামশেদপুরের ইস্পাতের কারখানা ধ্বংস? ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম বরিশালের নৌকার উপর দিয়ে হাতে খড়ি হয়েছিল। জাপানীরা যাতে খেতে না পায়। ফলে বাঙালীরাই না খেয়ে মরবে।

যুদ্ধ যতদিন বহুদূরবর্তী ছিল ততদিন যুদ্ধবিরোধী নীতি হয়তো বা সমীচীন ছিল। যুদ্ধ যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়লো তখনো কি সেই নীতি তেমনি সমীচীন হবে? যুদ্ধক্ষেত্র এখন আর বেলজিয়ামে বা রাশিয়ায় নয়, এখন বর্মায় ও এর পরেই আসামে অথবা বাংলায়। যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের স্বনির্বাচিত নয়, নির্বাচন যারা করবে তারা বিদেশী ও তাদের পক্ষে অপসরণ যেমন সহজ পোড়ামাটিও তেমনি অকাতর ও নির্মম। জাতির জীবনে এত বড়ো একটা বিপর্যয় ঘটে যাবে, অথচ জাতি পড়ে থাকবে শক্তির চরণতলে শিবের মতো অসাড়! শবের সঙ্গে যার তুলনা। দেশ কি তা হলে মৃত?

অন্নদাশঙ্কর রায়

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে চার্চিল ক্যাবিনেট ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। সত্যাগ্রহী বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধমাত্রেরই বিরোধী তাঁরা তো মুষ্টিমেয়। যাঁরা কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী তাঁরা পড়ে যান বিষম ধাঁধায়।

।। আঠারো ।।

কংগ্রেসকর্মীদের অধিকাংশের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে জাপান ভারতের মিত্র নয়, গণতন্ত্রের শত্রু। সে যদি এই ফাঁকে ঘরে ঢুকে পড়ে তাহলে ইংরেজদের যা ক্ষতি হবে তারচেয়ে শতগুণ ক্ষতি হবে ভারতীয়দের। জাতীয়তাবাদের দিক থেকে, গণতন্ত্রের দিক থেকে জাপানী অনুপ্রবেশ বা আক্রমণ একটা অশুভ সূচনা। এর বিরুদ্ধে ভারতের নিজের স্বার্থেই রুখে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং ইংরেজরাও যখন রুখতে যাচ্ছে তখন ওদের হাত মেলানোই প্রকৃষ্ট নীতি। তবে, হ্যাঁ, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের মতো নয়। মিত্রের সঙ্গে মিত্রের মতো। ক্রিপসের প্রস্তাব যদি মিত্রোচিত হয়ে থাকে তবে কেন গ্রহণ করা হবে না?

অপরপক্ষে এমন কর্মীও ছিলেন যাঁদের ধারণা জাপানের উদ্দেশ্য ভারতকে আবার পরাধীন করা নয়। সে ভারত অধিকার করতে আসে নি, সুতরাং তার সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়। শত্রুতা করতে পারে ইংরেজ, কিন্তু ভারতবাসী কেন করতে যাবে? সুতরাং ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলাতে যাওয়া সুবুদ্ধি নয়। ইংরেজরা লড়তে চায় লড়ুক। ওটা ওদের যুদ্ধ, ভারতীয়দের নয়। তা বলে ইংরেজকে বিব্রত করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। শুধু এইটুকু দেখলেই চলবে যে ওরা পোড়ামাটি করছে না। ভদ্রভাবে অপসরণ করে চলে যাচ্ছে।

আবার এমন কর্মীও ছিলেন—সাধারণত কংগ্রেসের বাইরে, যাঁরা মনে করতেন ওটা একটা মওকা। জাপান এলেই ভারত স্বাধীন হবে। জাপানের সাহায্য নিয়ে ইংরেজকে উচ্ছেদ করা যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। ক্ষতি যা হবার তা ইংরেজেরই হবে, ভারতের ক্ষতির মধ্যে হবে শিকল হারানো। জাপান কখনো এদেশকে ইংরেজের মতো দাবিয়ে রাখতে পারবে না। জাপান যাবেই, রেখে যাবে ভারতের স্বাধীনতা।

সেদিন ভারতের চিন্তাজগৎ যেমন বিভ্রান্ত বা উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিল তেমন আর কোনোদিন হয় নি। জাপানের মতো এক মহাশক্তিকে হঠাৎ প্রতিবেশীরূপে পাওয়া একটা অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। কারো মতে ওটা মন্দ, কারো মতে ভালো, কারো কারো মতে ভালোও নয়, মন্দও নয়। কেউ জাপানের বিপক্ষে, কেউ পক্ষে, কেউ নিরপেক্ষ। কেউ তার বিরুদ্ধে লড়বেন, কেউ লড়বেন না, কেউ তার সাহায্য নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধেই লড়বেন।

এই হলো ক্রিপস প্রস্তাবের পটভূমিকা। মহাত্মা সেবাগ্রাম থেকে নড়তে চান নি, নেহাৎ ক্রিপসের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুতার খাতিরে দিল্লী যান। মনে রাখতে হবে যে, গান্ধীজীকে বড়লাট ডাকেন নি, ওটা সরকারী আহ্বান নয়, কথাবার্তা বড়লাটের সঙ্গে হচ্ছে না। বড়লাট যে কী ভাবছেন তা গান্ধীজীকে জানান নি।

ক্রিপসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে মহাত্মা বললেন, 'এই যদি হয় আপনার সমগ্র প্রস্তাব তবে আমার পরামর্শ আপনি পরের প্লেনে বাড়ী ফিরে যান।'

প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এইরূপ। ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বলে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হবে। তার মর্যাদা হবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস। ইচ্ছামাত্র যে বৃটিশ কমনওয়েলথ ত্যাগ করতে পারবে। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সংবিধান সংরচক সংস্থা স্থাপন করা হবে। সে যে সংবিধান সংরচন করবে বৃটিশ সরকার তাকেই স্বীকার করে নেবেন ও সেই অনুসারে কাজ করবেন, কিন্তু দুটি শর্তে। প্রথম শর্ত, যদি কোনো এক বা একাধিক প্রদেশ সে সংবিধানে সায় না দেয় তবে সে বা তারা স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে ও বৃটেন তাকে বা তাদের ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সমান মর্যাদা দিতে পারবে। তেমনি কোনো এক বা একাধিক দেশীয় রাজ্য যদি স্বতন্ত্র সংবিধান প্রণয়ন করতে চায় তাদের বেলাও তাই হবে। সংবিধান সংরচক সংস্থায় দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিও থাকবেন। দ্বিতীয় শর্ত বৃটিশ সরকার ও সংবিধান সংরচক সংস্থার মধ্যে একটি সন্ধিপত্র সম্পাদন করতে হবে। তাতে থাকবে বৃটিশ হস্ত থেকে ভারতীয় হস্তে সমূহ দায়িত্ব হস্তান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা।

এসব তো যুদ্ধোত্তর কালে। যদি যুদ্ধে জয় হয়। যুদ্ধকালে যুদ্ধজয়ের জন্যে যা হবে তা বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয়করণ। পারিষদরা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি। কিন্তু সামরিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব থেকে যাবে জঙ্গীলাটের হাতে। তিনিও পূর্ববৎ পরিষদের সভ্য থাকবেন। আর বড়লাটও তাঁর হস্তক্ষেপের অধিকার রাখবেন।

প্রস্তাবটা এককথায় নাকচ করবার মতো হলে কংগ্রেস নেতারা পনেরো-ষোল দিন ধরে ক্রিপস মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন না। মানুষকে ভগবান ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি দেন নি। দিলে হয়তো গান্ধীজীও পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করতেন না সে প্রস্তাব। তার কোথাও কি হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের উল্লেখ ছিল? সাম্প্রদায়িক কারণে ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার কথা ছিল কি? হিন্দু মেজরিটি বা মুসলিম মেজরিটিরও [illegible] ছিল না। সেদিন যদি কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব গ্রহণ করত, তাহলে ভাবী ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন প্রথমেই রচনা করত একটি এজমালী সংবিধান। যাদের আপত্তি হতো তারা যোগ দিত না তো ঠিক, কিন্তু প্রদেশকে প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হতো না। হলে পারস্পরিক চুক্তিতে হতো। পরের মধ্যস্থতায় নয়।

আসলে যুদ্ধজয় ছিল একটা অনিশ্চিত প্রশ্ন। যুদ্ধে সহযোগিতা চোখ বুজে করলে পেড়া মাটির দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপত। বড়লাট ও জঙ্গীলাট তো নিরাপদ স্থানে অপসরণ করতেন, দেশের নেতাদেরই জাপানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতো, যেমন বর্মায়। যেটা অনিশ্চিত সেটাকে সুনিশ্চিত করতে হলে চার্চিলের মতো একজন ভারতীয় জননায়ককেই রণনায়ক করতে হয়। যেমন জবাহরলাল নেহরুকে। তিনি সে ভূমিকা নিতে ইচ্ছুকও ছিলেন। তিনি রণনায়ক হলে জনগণ তাঁর পেছনে দাঁড়াত। জাপানকে প্রাচীরের মতো রোধ করত। কিন্তু সে ভূমিকা তাঁকে দিচ্ছে কে? ক্রিপস পরিষ্কার করে বলেন যে বড়লাটের পরিষদে জঙ্গীলাটের যে ভূমিকা তার বিশেষ কোনো রদবদল হবে না।

তৎকালীন শাসনতন্ত্র অনুসারে জঙ্গী-লাট কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না। এমন কি বড়লাটের কাছেও না। তাঁর নিয়োগ ভারতবর্ষে হলেও দায়িত্ব বৃটিশ সামরিক কর্তাদের কাছে। বৃটেন থেকেই বোতাম টেপা হয়, সাম্রাজ্যের সর্বত্র সৈন্য চলাচল হয়। ইণ্ডিয়ান আর্মি আসলে বৃটিশ আর্মির একটি শাখা। মিলিটারী সীক্রেট একজন ভারতীয় সমর-সচিবকে জানতে দেওয়া হবে, এ কি কখনো ভাবতে পারা যায়? তেমন একজন ভারতীয় যদি সচিব পদে মনোনীত হন তবে তিনি হয়তো কোনো রাজভক্ত পুরুষ। জবাহরলাল নেহরু তো ননই, জীণা সাহেবও না। ভারতীয়করণ ততদূর যেতে পারে না। জাপানের ভয়েও না। ভারত বা তার একাংশ যদি জাপান কেড়ে নেয় তবে ইংরেজ পরে ফেরৎ পাবে। কিন্তু যুদ্ধ বেধেছে বলে ভারতের জিনিস ভারতকে দেওয়া হবে এটা যে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে অভাবনীয়।

ক্রিপস প্রস্তাব চার্চিল গোষ্ঠীর দিক থেকে বিরাট কনসেশন। কিন্তু কংগ্রেসের দিক থেকে স্বাধীনতার চেয়ে অনেক কম। সাম্রাজ্যবাদকে তার বিপদে সাহায্য করলে সে আরো শক্ত হয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসবে। বিপদটা অবশ্য তার একার নয়। ভারতেরও। সেই জন্যে জবাহরলাল ও আজাদ ক্রিপসের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্যে আপ্রাণ করেছিলেন। কিন্তু ওদিকে চার্চিল ও এদিকে বড়লাটের দলবল পাষাণের মতো নিরেট। যুদ্ধকালে সিভিল পাওয়ার অনেকটা ছেড়ে দেওয়া যায় কিন্তু মিলিটারী পাওয়ার কণামাত্র নয়। অথচ মিলিটারী পাওয়ার না হলে দেশরক্ষা করা যায় না। সেই নিয়ে মতবিরোধ থেকেই ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলো। যদিও যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা নিয়েও মতবিরোধ ছিল।

কংগ্রেস নেতারা আশা করলেন যে, রুজভেল্ট চার্চিলের উপর চাপ দেবেন। দিয়েও ছিলেন কিন্তু চার্চিল তাতে রুষ্ট হন। অগত্যা কংগ্রেস নেতাদের আবার সেই নাঙ্গা ফকিরের কাছে ফিরে যেতে হয় চার্চিলের সঙ্গে যাঁর উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু সম্পর্ক। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন যারা তাঁরা মহাত্মার শিবিরে গিয়ে যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহী হন। অহিংসার থেকে হিংসা, হিংসার থেকে অহিংসা একটার থেকে আরেকটায় যাওয়া-আসা কত সহজ।

সরকার পক্ষ ও কংগ্রেস পক্ষ উভয় পক্ষই ধরে নিয়েছিলেন যে সিঙ্গাপুরের পর যেমন মালয় মালয়ের পর যেমন বর্মা, বর্মার পর তেমনি আসাম ও বাংলা। অন্তত সামরিক ঘাঁটিগুলোর উপর জাপানীরা বোমাবর্ষণ করবেই, যাতে ভারত থেকে পাল্টা আক্রমণ না হয়। কলকাতাও একটা সামরিক ঘাঁটি। একটা বিরাট সামরিক ঘাঁটি। সুতরাং বিপদের আশঙ্কা শুধু যে ছিল তাই নয় বিপদ সেদিন পা টিপে টিপে আসছিল আর তার জন্যে মনটাকে আমরা বাঁধছিলুম। ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক যেখানে পারে সেখানে পালিয়ে-ছিল। পালিয়েও কি বাঁচত? পেটের খোরাকে টান পড়তই, কারণ সামরিক প্রয়োজনে খাদ্যশস্য সরকারী ভাণ্ডারে মজুত হতো ও অনটন দেখে মুনাফা-শিকারীরা বাকী ফসল গুদামজাত করত ও চোরাবাজারে বেচত।

কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে, অথচ করবার কিছু নেই, যা করবার করবে জাপানীরা আর ইংরেজরা, আমরা ভারতীয়রা সাক্ষীগোপাল বা উলুখাগড়া। এই যে নিষ্ক্রিয় মনোভাব এটা মেয়েলি হতে পারে, মনুষ্যোচিত নয়। মানুষের রক্ত আছে, সে রক্ত যদি কখনো গরম হয়ে ওঠে তো এই তার সময়। গান্ধীর সাধ্য কী যে তিনি সেই সংকটক্ষণে হাত গুটিয়ে, পা গুটিয়ে কচ্ছপের মতো খোলার ভিতরে থাকেন?

তিনি স্পষ্ট দেখতে পান যে দেশের বহু লোক জাপানীদের পক্ষে চলে যাবে ও সেটাকেই ঠাওরাবে দেশের মুক্তি। অপর পক্ষে কংগ্রেসেরই একাংশ হীন শর্তে

ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে উদ্যত হবে। ছেড়ে-আসা প্রাদেশিক গদীতে ফিরে যেতে চাইবে। এত দিনের সাধনা ব্যর্থ হবে। সময় থাকতে সত্যাগ্রহ না করলে সত্যাগ্রহের সুযোগ হয়তো আর কোনোদিন মিলবে না। কারণ জাপানী অধিকৃত এলাকায় তো আর সত্যাগ্রহ চলবে না। চলতে অবশ্য থিয়োরীর দিক থেকে বাধা নেই, কিন্তু ও জিনিস বাইরে থেকে চালানো যায় না। ওর জন্যে গান্ধীজীকে জাপানী অধিকৃত এলাকাতেই গিয়ে বসবাস করতে হবে। ওরা তা করতে দেবে কেন? তিনি গেলে ইংরেজ অধিকৃত এলাকাতেই বা সত্যাগ্রহ চালাবার ভার নেবে কে? দেশ বিভক্ত হলে কংগ্রেসও যে বিভক্ত হবে, নেতারাও হবেন বিভক্ত।

এই হচ্ছে অগাস্ট অভ্যুত্থানের পটভূমিকা। গান্ধীজী যদি কিছু না করতেন তাহলে পরে হয়তো আর করবার সুযোগ পেতেন না। বলতে গেলে ওই তাঁর শেষ সুযোগ। অথচ ওই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কিছু করতে যাওয়াও মারাত্মক। ইংরেজ কর্তারা তাঁকে ও তাঁর দলের লোকজনকে রাজদ্রোহের অভিযোগে কোর্টমার্শাল করে গুলী করে মারতেও পারতেন। গান্ধী ভিন্ন আর কেউ অত বড়ো ঝুঁকি নিতে সাহস পেতেন না। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত যেমন অসমসাহসিক তাঁর নামের মহিমাও তেমনি অসীম নৈতিক শক্তিময়। তাঁকে কোর্টমার্শাল করে গুলী করলে সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত বিপ্লব। বৃটিশ কর্তারা সে ঝুঁকি নিতেন না, তাই তিনি কিছু করতে যাবার আগেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে ও তাঁর দলবলকে। সবাইকে ধরবার আগেই কতক কর্মী ছিটকে পড়েন ও ছিটিয়ে যান। যাকে বলে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যান।

"কুইট ইন্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি" একটি মন্ত্র। উচ্চারণ যিনি করেছিলেন তিনি একজন ঋষি। শ্রবণ যাঁরা করেছিলেন তাঁরা দুই আগুনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে গ্রামকে গ্রাম শহরকে শহর শাসনমুক্ত করতেন। থাকতে দিতেন না ইংরেজের শাসনে। পড়তে দিতেন না জাপানীর শাসনে। এবারকার আন্দোলন জেলযাত্রার নয়। জেলযাত্রা অতিশয় নরম। ওর চেয়ে কঠিন কিছুর দরকার ছিল। কর্মীরা নিজেরাই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে সেটা করেন। গান্ধীজীর ঢালা হুকুম ছিল, "করো, নয়তো মরো"। মরতে বলা হয়েছিল, কিন্তু মারতে বলা হয়নি, এটা স্মরণযোগ্য।

তবে জনতা মারমুখো হয়ে বিপুল সম্পত্তি বিনাশ করেছিল। মানুষও মেরেছিল অল্পস্বল্প। সরকারপক্ষ গোড়ার দিকে সামলাতে পারেননি, কিন্তু পনেরো কুড়ি দিনের মধ্যে সামলে নেন। তারপর দারুণ প্রতিশোধ নেওয়া হয়। বন্দুকের মুখে গোলা, গ্রামকে গ্রাম ঘেরাও করে মানুষগুলোকে গুলী করে মারা হয়। গাছের ডালে লটকিয়ে দেওয়া হয়।

ওদিকে জাতীয় সরকারও নেহাৎ অহিংস ব্যাপার ছিল না। সেও মোটা লোক দেখলে মোটা জরিমানা আদায় করত, না দিলে জেলে পাঠাত। তখন শুনিনি, বছর দুতিন আগে কোনো এক স্থানের কোনো এক 'জাতীয় সরকারে'র তখনকার দিনের একজন কর্তাব্যক্তির রচনায় পড়েছি, জাতীয় সরকারও কতক লোককে ঝুলিয়েছিলেন। গাছের ডালে ঝুলন্ত শব যে কাদের ঝোলানো তা কি এতকাল পরে জানবার উপায় আছে? তখন তো আমি সরল বিশ্বাসে ধরে নিয়েছিলুম যে ওটা মিলিটারির কাজ।

"কুইট ইন্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি" বলতে এটাও বোঝায় যে কোনো পক্ষ আদালতে যাবে না, জজদের জানতে দেবে না। একপক্ষ ঝোলাবে দেশদ্রোহীদের, অপরপক্ষ ঝোলাবে রাজদ্রোহীদের। কেই বা কার কাছে নালিশ করতে যাচ্ছে! পুলিশ তো ঢুকতে পারবে না। ঢুকলে সেও তো পটোবে। যাই হোক, এ অবস্থা বেশীদিন ছিল না। তবে দুটো একটা জায়গায় 'জাতীয় সরকার' দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। বাংলার গভর্নর আমার এক বন্ধুকে বলেছিলেন, "আমি সারা বাংলার গভর্নর, বাদ রামনগর থানা।"

অহিংসা তখন প্রথম প্রশ্ন নয়, প্রথম প্রশ্ন কিছু একটা করা, করে দেখানো যে আমরা উলুখাগড়া নই, আমরাও রাজা। আমরা সবাই রাজা। হোক না কেন অরাজকতা। অরাজকতাও মন্দের ভালো তবু পরাধীনতা ভালো নয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা যদি এ নীতি মানতেন তবে অরাজকতার ভয়ে ব্রিটিশ শাসন স্বীকার করতেন না। ইংরেজ রাজত্বের পেছনে বেয়োনেট ছিল, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা অরাজকতার হাত থেকে নিস্তারের উপায় ছিল।

গান্ধীজী কেবল যে বেয়োনেটের হাত থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন তাই নয়, তিনি ইংরেজ রাজত্বের মূল প্রয়োজনের হাত থেকেও চেয়েছিলেন মুক্তি। অরাজকতার দিন লোকে নিজেরাই নিজেদের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করবে। গ্রামে গ্রামে গজিয়ে উঠবে গণপঞ্চায়েৎ। ভিলেজ রেপাবলিক। বিনা হাতিয়ারেই তারা চোর ডাকাত ও বাইরের আক্রমণকারীদের রুখবে। মরবে, তবু মানবে না। মার খাবে, তবু খাজনা দেবে না। সম্পত্তি খোয়াবে, তবু মান খোয়াবে না। এরকম সাত লক্ষ রেপাবলিক যে দেশের আছে তার কিসের ভয়? বেয়োনেট তার কী করতে পারে?

তিনি প্রথম যেবার গণসত্যাগ্রহ করতে যান সেবার সাত লক্ষ রিপাবলিকই ছিল তাঁর ধ্যান। বারদৌলির থেকে শুরু হতো পদক্ষেপের পর পদক্ষেপ। শেষ হতো কবে আর কোথায় তা ভগবানের ভাবনা। তড়িৎগতিতে গণসত্যাগ্রহ সারা হবে এমন কথা তিনি বলেননি। পরে আর তিনি ও ধরনের গণসত্যাগ্রহ করলেন না। যেটা হলো সেটা লবণ আইন ও অন্যান্য আইনভঙ্গ। অথবা বয়কট। তাই ১৯২২ সালের মনের সাধ মনেই রয়ে যায়। ঠিক বিশ বছর পরে ১৯৪২ সালে সেই পুরাতন স্বপ্নের প্রত্যাবর্তন। এবারকার গণসত্যাগ্রহ গ্রামে গ্রামে গণপঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করবে, নিচের দিক থেকে পিরামিডের মতো গড়ে উঠবে নতুন শাসনব্যবস্থা, যার অধোভাগ প্রশস্ত, ঊর্ধ্বভাগ সংকীর্ণ।

ততদিনে তিনি রক্তাক্ত অরাজকতার ভীতি কাটিয়ে উঠেছেন। চৌরী চৌরা আর তাঁকে নিবৃত্ত করবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"That is the consideration that has weighed with me all these twenty-two years. I waited and waited, until the country should develop the non-violent strength necessary to throw off the foreign yoke. But my attitude has now undergone a change. I feel that I cannot afford to wait. If I have to wait, I might have to wait till doomsday. For the preparation that I have prayed for and worked for may never come, and in the meantime, I may be enveloped and overwhelmed by the flames that threaten all of us. That is why I have decided that even at certain risks, which are obviously involved, I must ask the people to resist the slavery".
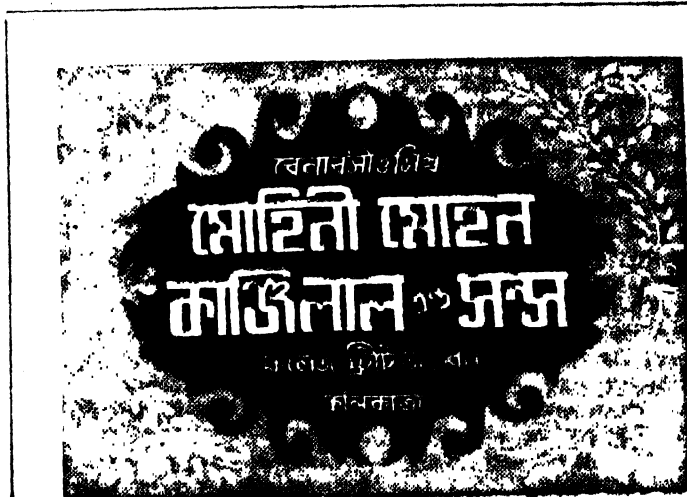
[উপন্যাস]

অনেকদিন পরে মসিনায় এসেছি।

প্রয়োজনীয় কাজের কিছু কিছু সারা হয়ে গেলে মনে হলো একবার স্বরূপ মন্ডলকে দেখে আসতে হবে। গেলেই ওর সে-কালের সব কাহিনী। লাগে ভালো। তা ছাড়া সেবারের খানিকটা যেন বাকিও থেকে গেছে। নিঃস্ব, ঋণগ্রস্ত ন্যায়রত্ন-মশাইয়ের মেয়ে 'নেত্য' বা নৃত্যকালীর ঘটা করে ছ আনি তরফের তরুণ জমিদার দেবনারায়ণের সঙ্গে বিবাহ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত শুনতেই অনেক বেলা হয়ে যাওয়ায় ছেদ টেনে দিতে হয় সেদিন। ন্যায়রত্ন-মশাইয়ের কি হলো এরপর? তাঁর বিধবা শ্যালিকা উগ্রপ্রকৃতি ব্রজঠাকরুণ, যাঁর গোপন চেষ্টাতেই বিবাহটা হোল তিনি শেষ পর্যন্ত কি করলেন? ও'দের নফর স্বরূপ এই স্বরূপই—তখন মাত্র বছর বারো তেরোর, তারই বা কি হলো? উঠল গিয়ে সে জমিদার বাড়ীতে নৃত্যকালীর শেষ ইচ্ছা-মতো? আর, সেই বাঁজা গরুটা? দুধের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, প্রাণ ধরে বিদায় করাও যায় না......সে যেন আরও টানে মনটা।

যাওয়া দরকারও একবার। এসে শুনলাম স্বরূপ তার পরিবারটিকে হারিয়েছে কিছুদিন আগে। বৃদ্ধ বয়সে এরকম বিপদপাত, দুটো সমবেদনার কথাও বলে আসতে হয়। গিয়ে দেখি, সেই আগেকার মতোই সদর একচালাটায় একটা চাটাইয়ে বসে ছোট কাতা দিয়ে একটা বাখারি ছুলছে. পাশে আরও গোটা কয়েক রাখা। গিয়ে ছেঁচের নীচে দাঁড়াতে চোখ তুলে একটু পিটপিট করে দেখল; দৃষ্টি-শক্তি নিশ্চয় আরও ক্ষীণ হয়ে গিয়ে থাকবে, তারপরও মাস আষ্টেক তো কেটেও গেল। অল্প একটু মুখটা তুলে দেখল সেকেন্ড কয়েক, পরক্ষণেই শুকনো মুখটা দীপ্ত হয়ে উঠল, বলল—'দা ঠাকুর বে। কী সৌভাগ্যি। পাতঃ পেন্নাম হই।......ওরে!' হাঁক দিয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নিজেই উঠতে যাচ্ছিল এদিক-ওদিক চেয়ে, আমি তার আগেই চালার এক কোণ থেকে মোড়াটা তুলে নিয়ে এসে বসে পড়লাম। হারটা মেনে নেওয়া গোছের করে একটু হাসল স্বরূপ বসে পড়তে পড়তে। বলল—'তা জিতবেন বৈকি শরীলে কি আর সে শক্তি আছে, না সে ফুর্তি? মাঝখান থেকে একটু অপরাধ নেয়া হেল কপালে...'

'এই দ্যাখো!'—বাধা দিয়ে বললাম—'কী, না, মোড়াটা নিজে তুলে নিয়ে এসে বসেছি!'

এই সুযোগেই সমবেদনার কথাটা এনে ফেলবার জন্য বললাম— 'শরীরটা তো আরও কাহিলই হয়ে গেছে—হবেই কিনা—যেমন শুনলাম...'

'তা হলে আবার সেই পুরনো কথা তুলতে হয় দা ঠাকুর।'—একটু গুছিয়ে, কনুই দুটা উরুতে চেপে বসল স্বরূপ, বলল—'দিদিমণির বাবা ন্যায়রত্নমশাই—মনে আছে নিশ্চয়। তানার কথা—তিনি বলতে না?—বলত—ও হচ্ছে দত্তাপহারোক—উই ওপরে বসে যে খয়রাতি করে চোখ দিচ্ছে, বগন দিচ্ছে, হাতে শক্তি পায়ে ফুর্তি—আরও এটা-ওটা ঢেলেই দিচ্ছে তো, তারপর আবার য্যাখন মর্জি হচ্ছে এক এক করে কেড়ে নিতেও তো বাধছে না গো। বাবা ঠাকুর বলতেন—ওর খয়রাতিতে বিশ্বেস করতে আছে? ও হচ্ছে দত্তাপহারোক তা লেহ্য কথাই তো বলত তিনি। পারেন তো কাটুন।'

কেমন যেন একটু ম্লান অথচ বিজয়ীর হাসি নিয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের পানে।

বললাম—'মানতে হয় বৈকি কথাটা স্বরূপ। এসেই তো শুনলাম তোমার কথাটা—কী সর্বনাশটা হয়ে গেল—এই বয়সে......'

'রও।'—থামিয়ে দিয়ে স্বরূপ একটু বিস্মিতভাবেই চেয়ে রইল আমার মুখের পানে। অবশ্য কপট বিস্ময়ই, বলল—'আপনি আবার নতুন কি সব্বনাশের কথা শুনলে গো? আমি তো বুঝে উঠতে লারলাম। চোখ যাচ্ছে, যাবেই, সেখেনে সঙ্গে নে' যাবার জন্যে পাত্তা লিখে তো দেয়নি সে, কান যাচ্ছে, যাবে, সর্ব্বনাশই হোক, যাই হোক, কিন্তুক আপনি আবার নতুন কি সব্বনাশ দেখতে পেলে?'

একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েই বললাম—'না, আমি ঐ গদাধরের মায়ের কথা—এসেই শুনলাম কিনা—'

'তাই কও, গদার-গব্ভধারিণী গেল, সেই কথা?'

—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্বরূপ, বলল—'তা ওটা তো তানার কিরপেই গো দাঠাকুর, মাঝে মাঝে তো তার ছিঁটে-ফোঁটাটাও থাকে। কেমন করে নয়, বল না আপনি? বারো বছরের একটা নোলকপরা মেয়ে এসে ঢুকল এই মন্ডলদের সংসারে। আমার থেকে আড়াই মুঠো ছোট, সেকেলের সেই হাওয়াই শাড়িখানাও গুছিয়ে পরতে পারে না; গেল তিন কুড়ির ওপর আরও সাতটা বছর চাপো, লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি পরা—গদা সদা কিনে নে এসে বলল কিনা—ভালো করে সাজো দে বুড়ি'ক—কপালে রগরগে সিঁদুর শনের নুড়ির মতন চুলের মাঝখানে, পায়ে আলতা, একপাল ছেলেমেয়ে, বৌ, নাতবৌ, নাতি-নাতনীতে ভরা সংসার গুছিয়ে রেখে ড্যাং-ডেঙিয়ে বেইরে গেল। এসেছিল যেমন ঘটা করে, আট বেয়ারার তাঞ্জামে চড়ে, গেলও তেমনি অবিশ্যি তাঞ্জাম আর কোথায় পাবে - সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, তবে ফুলে মালায় সাজানো দোলায় শুয়ে আটজন নাতি-পুতের কাঁধে চড়েই তো গেল বুড়ি। এটা কি একটা সব্বনাশের চেহারা ক'ন না কেন? আর দু'দিন বাদে এই বুড়ো টসকে গেলেই তো সব ব্যবস্থা পালটে যেত। হক কথা বলতে হবে তো?'

'তা—সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে—ওভাবে যদি নেওয়া যায়......' টেনে টেনে সায় দিতেই হল। সান্ত্বনার অনেকগুলি কথা সাজিয়ে এনেছিলাম বের করব কি কেমন যেন একটু খেলো হয়ে পড়েছি ওর কাছে, ওর এই এত বড় শোকের ব্যাপারটা হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে।

একটা কৌতূহলও জাগিয়েছে আট বেয়ারার তাঞ্জামের কথা তুলে। প্রসঙ্গটা একেবারে সেইদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম—'হ্যাঁ, কি যে বলতে যাচ্ছিলাম—তাঞ্জামটা তো বুঝলাম না স্বরূপ, আট বেয়ারার। গদাধরের মা কি তা হলে তেমনি কোন বড় ঘরের মেয়ে? ...তোমাদের আবার মোড়লদের ঘর তো......'

...'আপনি যে অবাক করে দিলে দাঠাকুর।'

—একটু নড়ে চ'ড়ে বসল স্বরূপ, বলল—'তাঞ্জামে করে বিয়ের কনে পাটোচে—হেন মোড়ল তো অদ্যাবধি চোখে পড়ল না, চার কুড়ির ওপর বয়স হয়ে গেল।'

'মেয়ের বাপের অবস্থাটা অন্তত খানিকটে তেমন না হলে...'

—আমতা আমতা করে বললাম আমি।

'এই দ্যাখো ভুল! আজকাল পদে পদেই এমনি হচ্ছে তো।...ওরে দাঠাকুর এসেছে, তামাক দিয়ে যা বামুনের হুঁকোয়!...' ভেতরের দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে কথাটুকু বলে আবার ফিরে বসল স্বরূপ। বলল—'আজকাল পদে পদেই এমনি হচ্ছে যে, না মাগী গেল তো বয়ে গেল, তবে বয়েসটা তো এদিকে......'

গলাটা হঠাৎ ধরে এল। এত সহজ নয় চাপা দেওয়া অর্ধ শতাব্দী ধরে দুজনে মিলে ছেলে-মেয়ে থেকে নিয়ে নাতিনাতকুড় পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ সংসার সৃষ্টি করা, কত সুখ-দুঃখের স্মৃতির আলো ছায়া তাতে কাপড়ের খুঁটটা তুলে চোখ দুটোর ওপর একটু টেনেও দিতে হোল স্বরূপকে। একটু যে স্তব্ধতা এসে পড়ল, তার মধ্যেই ওর এক নাতি কড়ি বাঁধা একটা হুঁকোয় তামাক সেজে এনে আমার হাতে দিয়ে গেল। থম-থমে ভাবটা কাটানোর জন্য, কয়েকটা টান দিয়েই আমি, স্বরূপের দিকে বাড়িয়ে ধরে বললাম—'নাও, ধরো।'

'হোল কোথায় সেবা?'—বলে বাঁ-হাতটা ডানহাতে ঠেকিয়ে কলকেটা তুলে নিয়ে স্বরূপ নিজের হুঁকোর মাথায় বসাতে বসাতে বলল—'তা দেন, অনেকদিন জোটেনি কপালে পেসাদটা। আর এ দা-কাটার মোহাড়া সামলানো আপনার কম্মও নয়, নরম করে দিতে হবে।'

নীরবে হ্রস্ব-দীর্ঘ টান দিয়ে আবার বেশ চাঙা হয়ে উঠল স্বরূপ। সমস্ত ব্যাপারটা যেন ধুঁয়ার কুণ্ডলীর সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে 'আসুন'—বলে কলকেটা আবার আমার হুঁকোর ওপর যথারীতি বসিয়ে দিল। তালি দিয়ে হাত দুটোও ঝেড়ে ফেলে বাখারি আর কাতাটা তুলে নিয়ে বলল—'ব্যাপারখানা তো আর কিছু নয় দাঠাকুর, ব্যাপারখানা হচ্ছে এই—তা আপনি আমি য্যাতই না কেন আঁকু-পাঁকু করে মরি...'

—ডানহাতে বাখারিটা বাড়িয়ে ধরল।

উদ্দেশ্যটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম—'ঠিক বুঝলাম না স্বরূপ, একটু ভেঙে বলো।'

'নাতি-নাতনীগুলো পুকুরে মাছ ধরবে শখ, ছিপ করে দিতে হবে।' একটু হেসে বলল—'সে বেটিরও তো তাই; উই ওপারে বসে থেকে যার এইসব নীলেখেলা তানার কথাই বলচি। শখ। কখনও চুনো পুঁটি, কখনও রুই-কাৎলা—এ যা তুললে তা একটা পাকা রুই-ই তো ক'ন না কেন?'—আবার একটু হাসল। সেটাও বুঝি অশ্রুজলে পরিণত হয় আশংকা করে আমিও একটু রহস্যের সঙ্গে হেসে বললাম—'তাঁকে একেবারে মেছুনীর মেয়ে করে দিলে স্বরূপ?'

'খেলাপ বললাম কৈ দাঠাকুর? ভক্তরাম পেসাদ য্যাখন গাইলে 'জাল গুটিয়ে নে মা শ্যামা,' ত্যাখনও তো বেটিকে কুলীন বামুনের মেয়ে বলা হল না, হোল কি?'

হাসির সুরটা ধরে রাখবার জন্যে বললাম—'তা কৈ আর হোল?...আসোল কথা কি জান স্বরূপ? মায়ের ভক্ত সন্তান, ও'রা তো খাতির করে কথা বলবার পাত্র নয়। করবেটা কি আমার যে তোমায়, এত ভয় করে চলতে হবে?'

বাঁশের বাতটা আবার ছুলতে আরম্ভ করেছে স্বরূপ, নিশ্চয় মাছ ধরার কথাতেই মনটা ওদিকে চলে গেছে, আমার কথায় মাথাটা নীচু ক'রে মিটিমিটি হাসল একটু। আবার ভাবান্তর এসে পড়ে কিনা লক্ষ্য রেখে আমিও হুঁকা টেনে যাচ্ছি ধীরে ধীরে, হঠাৎ মুখটা তুলে বলল—'তা যদি বললে আপনি দাঠাকুর, মাথা সিধে করে নিরভয়ে কাটিয়ে দেওয়া, ও তোমার মানুষই হোক বা দ্যাবতাই হোক, বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে, তো সারা জীবনে আর একটি মাত্র তেমন লোক দেখেছি। লোকে বলত ন্যায়-শাস্তোর পড়েই মাথাটা অমন হয়ে গেছল—শাস্তোরটাই তো কিছু মানেটানে না শুনেছি...হ্যাঁ, আমি দেওয়াব বিধবা বিবাহ পুরুত হয়ে, বিধবা-বিয়ে করেছিলেন সোতরাং করব বিভীষণের মন্দিরে পুরুত-গিরি।...শুধু এক বেয়াড়া শালীর পাল্লায় পড়ে...'

—একেবারে হো হো করে হেসে উঠল স্বরূপ। প্রসংগটা বেশ আপনি আপনি এসে পড়ায় আমিও আর সুযোগটা ছাড়লাম না। তাঁদের শালী ভগ্নীপোতের পুরনো কথা মনে পড়ে গিয়ে হাসির ছোঁয়াচ আমারও লেগেছে একটু। তারই মধ্যে বললাম—'হ্যাঁ, সে কথাও শুনতে হবে স্বরূপ, বেশ মনে করিয়ে দিয়েছ। বিয়ে হয়ে তোমার দিদিমণি নৃত্যকালী শ্বশুরবাড়ী চলে যেতে বাড়িতে রইলেন তো শুধু ও'রা দুজন—ন্যায়রত্ন-মশাই আর ও'র শালী ব্রজঠাকরুণ। তাঁদের শেষ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা হোল? তারপর তোমার কথাও যে অমন করে বলে গেলেন তোমার দিদিমণি বাঁজা গোরুটার কথাও...'

ছুলতে ছুলতে শুনে যাচ্ছিল স্বরূপ, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসল—'ব্যবস্থা তো ভালোই করেছেলো। কৈলে গোরুটোর তো জন্মই পালটে গেল। আর আমার কথা আমি তো সারা জীবনটা তানাদের সেবা করে জেলার ম্যাজিস্টারের মতন রিটার করে পেন্সন ভোগ করছি, জোত-জমি জাইগির যা পেলুম তা নাতি-নাতকুড় পজ্জন্ত ভোগ দখল করুক আর তানাদের নাম করুক। বাকি থাকেন দিদিমণির বাবা অনাদি ন্যায়রত্ন মশাই আর মাসি ব্রজ-ঠাকরুণ। তা নফরেরই য্যাখন এই তোয়াক্কা, আমাদের কিরকমটা হবে ধরে নিন না। কিন্তুক হবে যে, তা তানারা রাজি হলে তবে তো।'

বললাম—'বুঝলাম না তো।'

'হয় কখনও রাজি দাঠাকুর? সে ধাতের মানুষ দুজনের কেউই নয় যে। ওখানে আর থাকা কেন' ব্যবস্থা হোল দেউড়িতে এসে থাকবেন দুজনে।...'জামাইয়ের সঙ্গে এক চালার নীচে থাকব তার অন্নদাস হয়ে!!'... 'তা বেশ, আপনাদের আলাদা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দুজনেরই আলাদা বাড়ী, আলাদা চাকর-দাসীর ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, যিনি যেমনভাবে থাকতে চান।'...তাতেও রাজি নন, দুজনের কেউই নয়। রায়চৌধুরী বাড়ির নিয়মই যখন তাই, নিজেদের দেউড়িতে মেয়ে এনে বিয়ে করা, উপায় নেই, কর্তা জগ্গুসের সঙ্গে গিয়ে সেখেনেই সম্পোদান করেছিলেন দিদিমণিকে, কিন্তুক সেই যে কখন বিয়ের গোলমালের মধ্যে বেইরে এসে আবার নিজের চালায় ঢুকেছেন, আর তো নড়বার নামই নেই। একটা বিপরীত সমিস্যে দাঠাকুর, মেয়ে হোল রাজরাণী, বাপ উদিকে খড়ের চালার মধ্যে বসে একমনে পুঁথি উল্টে যাচ্ছেন। মেয়ে পার করেচি, আর ভাবনা চিন্তে তো কিছু নেই।'

প্রশ্ন করলাম—'আহারের ব্যবস্থা?'

স্বরূপ উত্তর করল—'স্বপাকে। তবে সমিস্যে আর বলছি কেন?'...ব্রজঠাকরুণ থাকলেও একটা উপায় হোত, তা তিনিও তো পরের দিনই গ্রাম ছেড়ে তানার ভেয়ের বাড়ি চলে গেল। একটা দায় এসে পড়েছিল ঘাড়ে, সেরে দিনুম, আর কেন?...জামাই এলেন বেহাই এলেন জামাইয়ের কাকা দশ-আনি তরফের স্বয়ং নিশিকান্ত রায়চৌধুরী-মশাই, কিন্তুক ঠাকুরমশাইয়ের এক কথা, মেয়ে দিয়েছি, হয়ে গেছে, জামাইয়ের অন্ন খেয়ে পেত্যেবায়ী হব কেন? দিদিমণি উদিকে কান্নাকাটি করছে, কনেবৌ, এনাদের ঠেলে তো নিজে এসে পেঁছুতে পারছে না। তিনটে সন্ধ্যে এই করে কাটল, তারপর, পাপকা বেটিই তো, দিদিমণিও নিজের পথ ধরলে।—চুপ করে গিয়ে একটু হেসে আমার পানে চাইল স্বরূপ, যেন দেখতে চায় আমি আন্দাজ করতে পারি কিনা।

প্রশ্ন করলাম—'অন্নজল ত্যাগ করে বসল?' হাতটা বন্ধ করে দিয়েছিল, আবার শুরু করে দিয়ে বলল—'আজ্ঞে, তা হলে আর বাপকা বেটিই বললুম কেন? কথায় কথায় অন্নজল ত্যাগ করবার মেয়ে তো ছেল না দিদিমণি, ছেল কি?—তা হলে অতবড় ধকোলটা যে গেল মাথার ওপর দিয়ে, আরও বেশি করে, মা ঠাকরুণ গতাসু হওয়ার পর থেকে, অন্নজল ত্যাগ করেই তো শেষ করে দিতে পারতো নিজেকে। কিন্তুক সে ধাতের মেয়েই সে নয়। শ্বশুড় বাড়িতে অত ঝি-দাসী, কাজের বাড়িতে আত্মীয় স্বজনও থৈ-থৈ করছে, এয়েছে তো সব চারিদিক থেকে, তা সল্লা-পরামর্শ সবতো এই স্বরূপের সঙ্গেই। পাঁচ দিন পরের কথা দাঠাকুর, বৌভাত, তারপর সত্যনারায়ণ—সুবচনী, পুজোটুজো হয়ে বাড়ি খানিকটে জুড়িয়ে এয়েছে, দিদিমণি উঁদিকে কান্নাকাটি চালাচ্ছেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, অন্নজল ত্যাগ করবে বলেও ভয় দেখিয়েছেন বৈকি—তা সব বন্ধ করে দিয়ে একেবারে চুপচাপ দেখে একদিন সুদোলাম তানাকে। কেমন কেমন লাগচে তো, বড় ঘরে বিয়ে হয়ে কি একেবারে বদলে গেল দিদিমণি?

আত্মীয়-স্বজনে ঘিরে রয়েচে চোপোর দিন, স্বরূপের অবারিত শ্বার, যাচ্ছি আসছি, কিন্তুক মনের কথাটা তো পাড়তে পারছিনে। তারপর সমস্ত দিন তক্কে তক্কে থেকে শেষে গিয়ে সন্ধের সময় সুবিধেটা হোল। বিকেলে রোদ পড়ে এলে এ'কবারে ওপরের ছাতে দামী গালচে পাতিয়ে সমবয়সীদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে দিদিমণি—বাড়িতে সব কুটুম সাক্ষেৎরা এয়েচে, পাড়ার মেয়েরাও আসে। সন্ধ্যে হলে ওনারা নেমে যায়, দিদিমণিও গা-ধুতে চলে যায়। তেতালাতেই তাঁর সব ব্যবস্থা। তক্কে তক্কেই ছিলুম ওনারা সব গা তুলবে দেখে অ্যাম্মো ছাতের দরজার কাছটায় গিয়ে দাঁইড়োচি, দিদিমণি জিজ্ঞেস করলে—'কী রে স্বরূপ, কিছু বলবি?

বলনু—'কৈলেশীটা...'

শেষ করতেও হোল না, যারা নেমে যাচ্ছে সব একজোটে হেসে উঠল, একজন বললেও ঠাট্টা করে—'বৌদির সেই বাঁজা কাঁপলে গাই!'

দিদিমণিও হেসে বললে—'তা কি করবে, ঘোড়ার স্বর্গে এসেও যদি ধান ভানারই অদেষ্ট হয়!'

আমার, জিজ্ঞেস করলে—'তা কি? সেও অন্নজল ত্যাগ করেছে নতুন জায়গায় এসে?'

ওদের শুনিয়ে শুনিয়ে আর কি। ওরা নেমে গেলে আমায় ডেকে নিয়ে জিগালে—'তুই গেছলি তো আজ বাবার কাছে? তাঁকে বলে যাচ্ছিস তো কান্নাকাটি করছি, অন্নজল ত্যাগ করেছি?' বলনু 'তা তো বলচি। কিন্তু কৈ, তুমি তো ত্যাগ করলোনি অন্নজল, তা ছাড়া উঁদিকে বরং কান্নাকাটিও ধরে রেখেছিলে, দুদিন থেকে তো তাও ছেড়ে দেচ।'

হাসি ঠাট্টা তামাসাই চলছিল তো এতক্ষণ, দিদিমণি কতকটা যেন সেই টোনে বলে উঠল—'হ্যাঁ, রাজবাড়িতে এসে আমি অন্নজল ত্যাগ করে বসে থাকি, আর সবাই লুটেপুটে খাক রাজভোগ!'

হেসে উঠল, যেমন স্বভাব।

মনটা খারাপই ছেল, বলার ঢঙে চোখ দুটো আমার ডবডব করে উঠল।

বুঝলেন না? হ'না হ', তাহলে সত্যিই তো রাতারাতি বদলে গেল দিদিমণি, অমন মানুষ!

দিদিমণি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাতটা রাখল, বললে—'হ্যাঁরে, তুই কাঁদছিস স্বরূপ? মনে করেচিস দিদিমণি তো বেশ আচে তাহলে। তাই কি পারি তা বলে। বাপ রেঁধে খাচ্ছে, উঁদিকে অমন মাস, সে গিয়ে আবার ভেয়ের আশ্রয়ে উঠল জানিতো কত সুখ সেখেনে, নৈলে ভগ্নীপোতের দোরে এসে ধন্নে দেয়? তারপর এই আপদটা বিদয় হতেই দুজনে...'

বলতে বলতে গলা ধরে আসতে চোখ তুলে দেখি ওনার চোখ দুটোও ডবডাবিয়ে উঠেছে। অপরুদ্ধ হয়ে গিয়ে কি বলব ভাবচি, উনিই চোখ দুটো মুছে নিয়ে ও ভাবটা সামলে নিল তাড়াতাড়ি, সে ক্ষ্যামতাও তো ছেল। বললে—'তা নয় রে, কান্নাকাটি-উপোসে মন টলবে না, দুজনের কারুরই, চিনিতো দুজনকেই। তা যেমন বুনো ওল, আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল, দেখ না, এমন এক মতলব বের করেচি, দুজনকেই যদি না বাগে আনতে পারি তো আমার নামে কুকুর পুষিস। তোর জামাইবাবুকেও বলেচি। লোকটা—বলতে নেই—তা এদিকে বেশ কি যে বলে...'

'তোমার বেশ বাধ্য আচে।'—

মনটাতে বেশ ফুর্তি এসে গেছে, উনি আমতা আমতা করতে আমি তাড়াতাড়ি জুগিয়ে দিলুম।

'মর ছোড়া! কথা শোনো! বেটা ছেলে, তায় গুরুজন, সে হবে বাধ্য!'—আমার দিকে একটু চেয়ে রইল। চোখ পাকিয়েই, তবে তারই মধ্যে কেমন যেন একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব। তারপর সে ভাবটাও কাটে। বলল—'তা বলেচিস তো বলেচিস, তোর তো আবার ভগ্নীপতি হোল, একটু-আধটু ঠাট্টা দোষেরও হয় না। যা বলছিলুম, একটা খুব লাগসই মতলব ঠাউরেছি দুজনে মিলে। আমিও ন্যায়রত্নেরই মেয়েরে, ঐ ন্যায়েরই ধাক্কা দিয়ে শায়েস্তা করতে যদি না পারি তো...!'

ভেতরে ভেতরে কি মতলব এ'টেছে, খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল—'যা তুই। আমি গা ধুয়ে নিগে। কৈলেশীর কথা সত্যিই কিছু বলবি? আচে কেমন গোরুটা?'

বলনু—'ভালই ত। ওর জন্যে আলাদা ঘরের কথা বলে দিলে দাঠাকুর।'

'কেন? আবার আলাদা কিসের জন্যে? কানা গরুর ভিন্ন গোয়াল?'

বলনু—'সদর গোয়ালের গোরুগুলো ওকে যেন বরদাস্ত করতে পারে না, ফোঁস ফোঁস করে। ওদের মতন কলসী কলসী দুধ দেয় না, অথচ ওদের ছাপিয়ে তোয়াজ যে। হিংসে।'

আবার একটু হেসে উঠল দিদিমণি। একটু যেন কি ভেবে নিয়ে বললে—'ও পোড়াকপালীর আবার এত তোয়াজ সয় কিনা দ্যাখ। কথায় বলে, কুকুরের মুগের পাতা, কুকুর বলে আমার এ কি বিপত্তি।...নে, তুই যা এখন। সব দেখতেই পাবি, এইবার এদিকের ছিড়িকটা তো কেটে এল।'

একটু নেমে এসেছি, এগিয়ে এসে ডাকতে আবার উঠে এনু। বললে—'একটা কথা স্বরূপ' আবার যেন সেইরকম একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব।

জিগোলুম—'কি গো দিদিমণি?'

একটু যেন আমতা আমতা করে বললে—'তুই আর তোদের চৌধুরীমশাইকে দাঠাকুর দাঠাকুর বলে ডাকিসনি। কেমন যেন শুনতে হয়।'

আমি সুদোলাম—'তাহলে কি বলব?'

বললে—'কেন, জামাইবাবু বলে ডাকবি। ঐ তো বললুম না তখন?'

—আবার হঠাৎ গলাটা ধরে উঠল স্বরূপের, সামলে নিয়ে বলল—'একটুও বদলায়নি দাঠাকুর, ও মানুষ কখনও বদলায়? বুঝলেন না? য্যাখন খড়ের চালের নীচে ত্যাখন দিদিমণি বলে এসেছি, ছোট ভাইয়ের মতন বুকে করে রেখেছে, এখন রাজরাণী হয়েও সেই দিদিমণিই আচে। তা, আজকালকার মতন ভগ্নীপতিকেও তো 'দাদা' বলবার রেওয়াজ ছেল না, 'জামাইবাবু' কিম্বা মুকুজ্জেমশাই, 'রায়চৌধুরীমশাই'—তা 'রায়চৌধুরীমশাই'টা তো বড় হয়ে যায়, তাই 'জামাইবাবু। খাঁটি সোনা, ও বদলাবার নয়।...দিন একবার কলকেটা, চারকুড়ি টপকে এই সাত-আট মাস যাচ্ছে, আর দম থাকে না অতটা।'

হুঁকা কাৎ করে দিতে কলকেটায় দুটো টান দিয়ে, একটু হেসে বলল—'কী টানছিলেন তাহলে এতক্ষণ?'

নাতনীকে ডেকে কলকেটা সেজে আনতে বলে একটা নতুন বাতা তুলে নিল, একটা গাঁট ছুলে নিয়ে আবার আরম্ভ করল—

'ঠিক দুদিনের দিন সকাল বেলায়। আমি ত্যাখন দুদিকেই রয়েছি, তবে বেশিটা সময় ঠাকুরমশায়ের কাছে কাটে, ওনার সব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা করে দেওয়া, একলা রয়েছেন, রেতে শুইও ওখেনেই। সকালবেলা, চাকা অনেকখানি আকাশে উঠে এসেছে, ঘড়ির আন্দাজে বোধহয় বেলা আটটা থেকে নটার মধ্যে হবে। ঠাকুরমশাই সকালে খানিকটা লেকাপড়া করে ঘোষ পুকুর থেকে চান করে এলো, এবার আহ্নিকে বসবে। এরপর উঠেই পাক করতে যাবে। আমি রান্নাঘরে সব ঠিকঠাক করে কিসের জন্যে একটু বাইরে এয়েচি, আট বেয়ারার পালকি এসে পোড়ো মন্দিরের পাশে নামল। লাল মখমলের ঘেরাটোপ। একেবারে হতভম্ব হয়ে দাঁইড়ে পড়েছি, দিদিমণি বেইরে এসে ভুঁয়ে নামল।

(ক্রমশঃ)

বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিগত শতবর্ষকালের মধ্যে অসংখ্য মনীষী যে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয়। স্মরণীয়দের প্রদর্শিত পথ ধরে তাঁদের উত্তরসূরীরা অগ্রসর হয়ে চলেছেন। ক্রমবিকাশের ধারায় বিভিন্ন ভাগ বিভিন্ন স্তর আছে। দীর্ঘদিনের নিরন্তর পরীক্ষার ফলেই একটা স্থায়ী ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। বাঙালী ভাগ্যবান, বিগত শতকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে মনীষার অভাব ঘটেনি। বাংলাদেশের অষ্টাদশ শতকের মধ্যকাল থেকে যে সব মহৎ মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা অবিচল নিষ্ঠা ও প্রচুর পরিশ্রমে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এক বিশিষ্ট মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এইসব মনীষীর অনেকেরই জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেইকালে স্মরণ ও মননের মধ্যে তাঁদের জীবন ও কর্মের নিরাসক্ত আলোচনা হয়েছে। আজ তাঁরা অনেক দূরে, মরণসাগর পারে তাঁরা অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে উত্তরকালের মানুষ যে বিচার বিশ্লেষণ করছেন তার কণামাত্রও তাঁদের স্পর্শ করবে না, তথাপি শ্রদ্ধায় স্মরণের কিছু মূল্য নিশ্চয়ই আছে আর সেই কারণেই অসীমা মৈত্র সম্পাদিত "শতবর্ষের আলোয়" সংকলন গ্রন্থটি বাংলা প্রকাশনা জগতে একটি বিশিষ্ট পথচিহ্ন। কবিতা, গল্প, রম্য রচনা, ভ্রমণকথা, জীবজন্তুর গল্প, ভৌতিক গল্প ইত্যাদি নিয়ে এ যাবৎ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু শতবার্ষিকী আলোচনার সংকলন এই প্রথম, সেই দিক থেকেও শ্রীমতী মৈত্র অভিনন্দনযোগ্য।

ভূমিকা প্রসঙ্গে সম্পাদিকা বলেছেন—

"পূর্বসূরীদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। তাই তাঁদের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এবং অন্যান্য যে সব মহাজনের মূল্যায়ন করা হয়েছে তার কিছু একত্র করে পাঠকের কাছে উপস্থিত করার বাসনা ছিল। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় এই সংকলনগ্রন্থে সংগৃহীত রচনাবলী শ্রদ্ধা কুসুমাঞ্জলির মত শতবর্ষের ব্যবধানেও যাঁদের স্মৃতি আজিও অম্লান তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।"

রামপ্রসাদ সেন, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রবীন্দ্রনাথ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রজনীকান্ত সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ বসু, সতীশচন্দ্র রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরী প্রসঙ্গে আলোচনাগুলি এই সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে।

মুখ্যত সাহিত্যকারদের প্রতি প্রদত্ত এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে কয়েকটি উল্লেখনীয় নাম বাদ পড়েছে যেমন গিরীশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি। আশাকরি পরবর্তী সংস্করণ বা খণ্ডে এই ত্রুটি সংশোধিত হবে।

এই আলোচনাগুলি যাঁরা লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিককালে গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণী রচনায় তাঁরা সকলেই প্রায় অসামান্য শক্তির অধিকারী। সুতরাং এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রতিটি রচনাই মূল্যবান ও তথ্যসমৃদ্ধ। প্রবোধচন্দ্র সেন রামপ্রসাদ সেন ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "অনেকেরই ধারণা আছে যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-৫৯) ছিলেন অনেকাংশে ভারতচন্দ্রের অনুবর্তী। সম্ভবতঃ তার মূল কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য।"

পরবর্তীকালের মন্তব্যগুলি বঙ্কিম-প্রভাবিত। প্রবোধচন্দ্র বলেছেন—"ব্যাপক আলোচনার অভাব থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্রের শিল্পাদর্শে ভারতচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতা আছে। কিন্তু তাঁর রচনায় রামপ্রসাদের প্রভাব সম্বন্ধে সে চেতনারও পরিচয় পাওয়া যায় না।" এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়নি, "অথচ ঈশ্বরচন্দ্র যে অনেক ক্ষেত্রেই রামপ্রসাদের অনুবর্তী ছিলেন তার সংশয়াতীত প্রমাণ আছে।" প্রবোধচন্দ্র তাঁর সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই দিকটি সুনিপুণ ভঙ্গীতে আলোচনা করেছেন।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'রামমোহন রায় ও বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন' তাঁর প্রবন্ধটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও যুক্তি-সমৃদ্ধ। তিনি বলেছেন যে "রামমোহন প্রতিভার সমগ্র রূপটি এবং তাঁর মনন-শীলতার প্রকৃত তাৎপর্য দেশবাসীকে বুঝিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও বিপিনচন্দ্র পাল। তাতেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে রামমোহন রায় শুধু একজন মহৎ মানুষ নন তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ।" নন্দগোপাল বলেছেন—"রামমোহনের মানবতা ধর্মভিত্তিক ছিল না, তাই তাঁর অনুপ্রেরণা থেকে দেশে জেগেছিল ইতিহাস নিষ্ঠা, বিজ্ঞান সন্ধিৎসা ও সাহিত্যপ্রীতি"। অতি সংক্ষেপে রামমোহন চরিত্রের একটি বিশেষ দিক তিনি তুলে ধরেছেন।

নমিতা চক্রবর্তী 'বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটিতে অল্প পরিসরে অনেক মূল্যবান তথ্য এবং বক্তব্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারী বাঙালীর শ্রান্তির অবকাশ, বিশ্রাম আয়োজন

শ্রদ্ধায় স্মরণ

নেই।" কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র' প্রবন্ধটিও বিশেষ মূল্যবান। তিনি মন্তব্য করেছেন—"ইতিহাসচর্চার শৈশবাবস্থায় রাজেন্দ্রলালের আবির্ভাব, তথ্য-উপাদানের অপ্রতুলতার মধ্যে তাঁকে ইতিহাস রচনার রাস্তা তৈরি করে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ফলত—তাঁর দোষ-ত্রুটি-স্খলন পথিকৃতের।"

সুশীল রায় লিখিত মধুসূদন দত্ত—নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংক্ষেপে মধুসূদনের কাব্য আলোচনা করে বিশেষ জোর দিয়েছেন মধুসূদনের স্মৃতিরক্ষার, মধুসূদনের বাসগৃহ রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর স্বদেশবাসীর এই কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

প্রমথনাথ বিশীর বঙ্কিমচর্চা বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে তাঁর প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি বলেছেন—"গীতাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে প্রয়োগ যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের একটা দান, তেমনি আর একটি দান দেশ-মূর্তি ও দেবমূর্তির সামীকরণে।" যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক লিখিত 'ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। বাংলা তথা বাঙালী সংক্রান্ত ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ এই মনীষীকে বাঙালী আজ প্রায় ভুলতে বসেছে।

নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ—শেষ অধ্যায়"। নীহাররঞ্জনের অসামান্য বিশ্লেষণী শক্তির সঙ্গে বাংলার সাহিত্য-পাঠক সুপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ অধ্যায়টি বিস্ময়কর। ১৯৩১-এ তাঁর সত্তর পূর্তি—১৯৪০-এ শুরু হল মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম আর ১৯৪১-এ দেহাবসান। নীহাররঞ্জন বলেছেন—"এই দশ বৎসর ক্রমশই তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন, মৃত্যু শুধু তাঁর জীবনেই আসছে না, মৃত্যু তার সমস্ত মারণ-যন্ত্র ও দলবল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এই ধ্বংসোন্মুখ মানবধর্মবিরোধী সভ্যতা ও সমাজব্যবস্থার অন্তিম শয্যার দিকেও।" একদিন এই সমাজব্যবস্থাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন মানবধর্ম শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে এই ভেবে। তাঁর এইকালের প্রতিটি "কবিতাই যেন সুগভীর প্রেম ও বিশ্বাসের দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করছে। এর স্বচ্ছ সবল গভীর ভাবানুভূতি কবিকে সুগভীর প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করেছে।"

আজ বাংলাদেশে ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্লাবন নেমেছে। নবীন ও প্রবীণ লেখক-বৃন্দ এই মাধ্যমটিকে বেছে নিয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস রচনা করছেন এবং পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করছেন। একদা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে যিনি একচ্ছত্র আধিপত্য করেছেন সেই হরিসাধন মুখোপাধ্যায় আজ বিস্মৃতির গহ্বরে। তাঁর শীষমহল, রঙ্গমহল, লাল চিঠি প্রভৃতি মোগল হারেমের প্রেম-স্মৃতিবিজড়িত কাহিনীগুলি আজ থেকে মাত্র ত্রিশ বত্রিশ বছর আগেও বাঙালী পাঠকের মনোরঞ্জন করেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে যুগের এই শক্তিমান লেখক প্রসঙ্গে একটি মূল্যবান কথা বলেছেন—'এলিয়ট বলেছেন যে প্রতি একশ বছর অন্তর সাহিত্যের পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন। কালাতিক্রমণের সঙ্গে সাহিত্যের রস রুচির ও জনপ্রিয়তা হ্রাসবৃদ্ধি হয়।' তিনি তাই বলেছেন—'বোধকরি জনবল্লভতার নগদ বিদায়ের সঙ্গেই বিদায় দেবার পালা-গান জড়িয়ে আছে।' বাংলা সাহিত্যে শুধু ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, পল্লী বাংলা ও শহর কলকাতার গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের গল্পও লিখেছেন হরিসাধন। অসিতকুমার বলেছেন—'শুধু গল্প পড়ার প্রতি সরস আকর্ষণ এ যুগের পাঠক হারিয়ে ফেলেছেন।' হরিসাধনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ "কলিকাতা—একালের ও সেকালের ইতিহাস" প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"হরিসাধনের কলিকাতার একালের ও সেকালের ইতিহাস" সত্যই বিরাট, ডিমাই সাইজের হাজার হাজার পাতার ওপর। আজকের দিনের অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ রম্যরচনার যুগে এই অতিকায় টিটানের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা কার-ই বা অভিপ্রেত?—"। স্বর্গত রথীন্দ্রনাথ রায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পর্কে বিশেষ গবেষণা করেছিলেন। তাঁর দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবন্ধটি এই সংকলনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। রথীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন—'দ্বিজেন্দ্র-মানস যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি বলিষ্ঠ। তবু তাঁর সাহিত্যের যথাযোগ্য সমাদর ঘটেনি।" দ্বিজেন্দ্রলাল আজও তাঁর নাট্যকার সত্তা নিয়ে বেঁচে আছেন। তাঁর কাব্য সম্পর্কে বাঙালী পাঠক উদাসীন। তিনি মূলত কবি, নাটক লিখেছেন যে কালে সেই কাল গিরীশচন্দ্রের, কিন্তু গিরীশচন্দ্রের প্রভাবে গা না ভাসিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ বলেছেন—"দ্বিজেন্দ্রলালের মনে লিরিসিজম ও স্যাটায়ার একটি যুগ্মবেণী রচনা করেছিল।" এই মন্তব্যটি বিশেষ মূল্যবান। স্বর্গত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন উপেন্দ্র-কিশোর প্রসঙ্গে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন উপেন্দ্রকিশোরকে, তাঁর সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে শ্রদ্ধা মিশ্রিত চরিত্র-চিত্রণ অপূর্ব মনে হয়। শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে অধিকারী ব্যক্তি। তাঁর 'স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ চিন্তা' প্রবন্ধটিতে স্বামীজীর জীবনের এক বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হয়েছে।

গ্রন্থটিতে প্রচুর মুদ্রণ প্রমাদ আছে, এই জাতীয় গ্রন্থে ত্রুটিমুক্ত মুদ্রণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ পরবর্তীকালে যিনি এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিদান করবেন তিনি ভুল উদ্ধৃতিই দেবেন, শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করা কঠিন হবে।

—অভয়ঙ্কর

শতবর্ষের আলোয়—(সংকলন)—অসীমা মৈত্র সম্পাদিত। প্রকাশক—চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, ২নং চাঁপাতলা লেন, কলিকাতা-৯। দাম—পনের টাকা।

সাহিত্যের খবর

মাখদুম মহীউদ্দীন আর নেই গত ২৫ আগস্ট দিল্লীতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আধুনিক উর্দু সাহিত্য যে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হল, তাতে সন্দেহ নেই। উর্দু সাহিত্যে প্রগতিশীল কাব্য আন্দোলনে যে কয়জন কবি অগ্রসর হয়েছিলেন, মাখদুম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ১৯০৮ সালে অন্ধ্র প্রদেশে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ তিনি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'সুরখ সভেরা', 'গুল-এ-জার', 'বসন্ত-এ-রাক' উল্লেখযোগ্য। তাঁর একটি গান শুনে নাকি জওহরলাল মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতার সঙ্গে মাখদুমের পরিচয় নতুন নয়। বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন। তাঁর বহু রচনা রাশিয়ান ও ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। মাত্র কয়েক দিন আগে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনি কয়েকটি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পাঠান। সম্ভবত এগুলিই তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত রচনা।

বেলগ্রেডে কিছু দিন আগে জর্মন গ্রন্থের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত লেখক গুন্টার গ্রাস এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। তিনি বেলগ্রেডে গিয়েছিলেন বেড়াতে। তাঁর আসার সংবাদ শুনে তরুণ লেখকরা বেশ কয়েকটি রচনা পাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। গুন্টার গ্রাস এইসব সভায় উপস্থিত থেকে নিজের রচনা থেকে পাঠ করে শোনান। প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন, এর অন্যতম উদ্দেশ্য হল, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে যুদ্ধোত্তর জার্মানীর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত করান। প্রদর্শনীতে যেসব বই প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম-ভাগে ছিল ১৯৪৫ সালের পরবর্তী জর্মন সাহিত্য, দ্বিতীয় ভাগে ছিল পঞ্চাশ ও ষাট দশকের সাহিত্য; তৃতীয় ভাগে ছিল নতুন সাহিত্য আন্দোলনে বয়স্ক লেখকদের অবদান; চতুর্থ ভাগে ছিল সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ এবং পঞ্চম ভাগে ছিল রাজনীতি বিষয়কগ্রন্থ। বেলগ্রেডের পিপলস্ ইউনিভার্সিটিতেও একটি সভায় গুন্টার গ্রাস তাঁর উপন্যাস 'দি টিন ড্রাম'এর কিছু অংশ এবং কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। বেলগ্রেডের বহু বিশিষ্ট নাগরিক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ইংরেজি কাব্য আন্দোলনে অস্ট্রেলিয়া যে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করছে, একথা বোধ করি এখন অনেকেই স্বীকার করবেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যে সব পোয়েট্রি ওয়ার্কসপের ব্যবস্থা করছেন, তাতে বহু তরুণ কবি যোগদান করছেন। তরুণ কবিদের কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশেও যেন একটা জোয়ার এসেছে। সম্প্রতি তরুণ কবিদের বেশ ক'টি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, ফ্র্যান্সিস ওয়েবের 'এ ড্রাম ফর বেন বয়ও' গ্রন্থটির। ফ্র্যান্সিস ওয়েবের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি দীর্ঘ কবিতা রচনার পক্ষপাতী। তাঁর ধারণা, কবিতায় ব্যাপক জীবন দর্শনকে ফুটিয়ে তুলতে হলে আঙ্গিক হিসেবে দীর্ঘ কবিতাকেই গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় যে গ্রন্থটি অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে সেটি হল 'পোয়েমস্'। রচয়িতা—গয়েন হারউড়। গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে তাঁর অপরিণত বয়সের কবিতা। দ্বিতীয় ভাগে আছে বিভিন্ন ছদ্মনামে লেখা কবিতা এবং তৃতীয় ভাগে স্বনামে লিখিত কবিতা। একদিক থেকে কবিতাগুলি এভাবে সাজানোর ফলে কবির কাব্যজীবনের বিবর্তনগুলি স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তৃতীয় গ্রন্থটির নাম 'এলিজা'স রেভেন'। কবি হল পোর্টার। উপরে বর্ণিত দুজন কবির তুলনায় তাঁর কবিতাগুলি অনেক ম্লান। এছাড়াও আরো অনেক কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আশা করা যায়, অচিরেই অস্ট্রেলিয়া কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে নিজস্ব স্থান অধিকার করে নিতে সমর্থ হবে।

প্রখ্যাত মারাঠি ছোটগল্প লেখক চন্দ্রকান্ত কল্যাণ দাস কাকোদকার বোম্বাই হাইকোর্ট কর্তৃক অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্ট তাঁকে সেই অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। শ্রীকাকোদকরের 'শ্যামা' নামে একটি ছোটগল্প মারাঠি পত্রিকা 'রম্ভা'য় প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হবার পরেই চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যায়। অনেকেই গল্পটিকে অশ্লীল বলে অভিযোগ করেন এবং গ্রন্থটি প্রকাশ বন্ধের দাবী জানান। জনৈক পাঠকের অভিযোগক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

জার্মান আকাদমী অব ল্যাংগুয়েজ এন্ড লিটারেচারের একটি সম্মেলন সম্প্রতি কলিঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই সম্মেলনে অধ্যাপক হ্যানস এগার 'বিশ শতকের ভাষা ও সমাজ' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন যে, বিশ শতকে ভাষা ক্রমশ সরলীকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি এই গতিকে অভিনন্দন জানান। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনার মূল অসুবিধাগুলির উল্লেখ করেন। এই সম্মেলন উপলক্ষে অনুবাদ কাজে কৃতিত্বের এডওয়ার্ড গোল্ডস্টিকারকে পুরস্কৃত করা হয়।

আমারে এ আঁধারে : কল্যাণকুমার বসু। অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির; ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম—দশ টাকা।

'আমারে এ আঁধারে', কবি ও গীতিকার অতুলপ্রসাদ সেন-এর জীবন-বৃত্তান্ত। তবে ঠিক সন-তারিখের কাঁটায় কণ্টকিত, তথ্যের বোঝায় ভারাক্রান্ত গতানুগতিক কোনো জীবনী এ নয়; একে বরং অতুলপ্রসাদের জীবন-উপন্যাস বলা যেতে পারে।

উপন্যাসেরই মতো ভাষা ও বর্ণনারীতি এখানে। এছাড়া চরিত্রদের আসা-যাওয়া এবং ঘটনার ক্রম-পরিণতিতেও এখানে উপন্যাসেরই পদধ্বনি।

তবে এই ধ্বনি সর্বত্র সমানভাবে সোচ্চার হয় নি। গ্রন্থটির গোড়ার দিকে যতটা, শেষের দিকে ততটা অক্ষুণ্ণ থাকে নি উপন্যাসের ভাবমূর্তি।

অবিশ্যি না থাকলেও যায়-আসে না বিশেষ কিছু। কারণ, উপন্যাস হিসেবে লেখক এ গ্রন্থটিকে দাবী করেন নি। দাবী করেছেন অতুলপ্রসাদের 'সাহিত্য-জীবন; তাঁর কাব্য-জীবন; তাঁর সুরের জীবন-কথা' বলে।

লেখকের এই দাবী যে পুরোপুরি সঙ্গত, এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমাদের। কেন না, অতুলপ্রসাদের কবি-প্রতিভার উৎস-সন্ধানে বেরিয়ে তিনি আধুনিক বাংলা গানের অন্যতম বিশিষ্ট রূপকারকে সার্থকভাবেই তুলে ধরতে পেরেছেন। ব্রহ্মসংগীত, দেশাত্মবোধক সংগীত এবং প্রেম ও প্রকৃতি-বিষয়ক সংগীতের মধ্যে এই রূপকারের বিষণ্ণ-করুণ আত্মনিবেদনের ভাবটুকু তিনি প্রমূর্ত করতে পেরেছেন সুন্দরভাবেই। এছাড়া অতুলপ্রসাদের সহজ-সরল ভাষায় মর্মস্পর্শী আবেদনের কথাও বার বার এসেছে এখানে। এসেছে তাঁর রচনায় বাউল, কীর্তন ও হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রভাবের কথা।

কিন্তু তবু বলবো, শুধুমাত্র গীতিকার অতুলপ্রসাদ নয়, তাঁর সমগ্র জীবনচিত্রই উপস্থাপিত এখানে। বাল্যের পিতৃহীন অতুলপ্রসাদ, দাদু কালীনারায়ণের পালিত অতুলপ্রসাদ, কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নরত এবং বিলাত-প্রবাসী ও লক্ষ্ণৌ-নিবাসী অতুলপ্রসাদ এখানে জীবন্ত।

বলা বাহুল্য, তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে লেখক যদি আন্তরিক না হতেন, যদি নিজে কিছু নতুন তথ্য সংগ্রহ না করে শুধুমাত্র প্রচলিত মাল-মশলাগুলোকে নিয়েই তৃপ্ত থাকতেন, তবে এই জীবন-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হ'ত না কোনো মতেই। কোনো মতেই এ বইটি শেষ করার অনেক পরেও আমাদের কানের কাছে বারবার গুঞ্জরিত হ'ত না,

আমারে এ আঁধারে
এমন করে চালায় কে গো?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি,
বুঝতে নারি কিছুই যে গো!

অন্তরীণ [কাব্যগ্রন্থ] — অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়। সুরভি প্রকাশনী ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯।। দাম : তিন টাকা।

প্রায় দু দশক ধরে অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় কবিতা লিখে আসছেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কৃষ্ণকলি' আমেরিকান নিগ্রো কবিতার সংকলন। নিজস্ব কবিতার বই 'বিষুবরেখা' বেরোয় প্রায় এক দশক আগে। এ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেকগুলো সত্যিকারের ভালো কবিতা, যা সময়ের ব্যবধানেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে দীর্ঘকাল। 'অন্তরীণ'এর শেষের দিকে ছাপা হয়েছে সেরকম কয়েকটি কবিতা। প্রথম দিকের লেখালেখি, কালের বিচারে কিছুটা পুরনো, মেজাজের দিক থেকে রোম্যান্টিকধর্মী। এই পর্যায়-বিভক্তিতে সর্বাধিক সুবিধা হয়েছে পাঠক-পাঠিকার। কবিমানসিকতার জাগরণ ও অগ্রগতি উপলব্ধি করা সহজ হবে এই বিভাজনে।

প্রথম পর্যায়ের লেখায় কবি ছন্দোময় এবং আবেগপ্রাণ। মাঝে মাঝে বৈষ্ণব-পদাবলীর চিরায়ত প্রেমে আবিষ্ট। উল্লেখ করা যায় 'বর্ণনা' কবিতার শেষ চার পংক্তি : 'কদম্বে কোন্ সজল পদাবলী/জলকীর্তন বাজায় বৃক্ষপাতা/শিথিল সিক্ত পথের পদাবলী ভিজায় পদ্মপাতা।' এই পর্বের রচনায়, ক্রিয়াপদের ব্যবহারে, তিনি প্রায়শ পুরনো ডিকশন মেনে চলেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়কে চিহ্নিত করেছেন তিনি 'অন্তরীণ' নামে। এই পর্বের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'অন্তরীন', 'বলাৎকার', 'অকাল', '১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ' প্রভৃতি। 'বিষুবরেখা'র কবি এবং 'কৃষ্ণকলি'র অনুবাদককে একই সঙ্গে অনুভব করা যায় এইসব কবিতায়। কলকাতাকে অস্বীকার করতে পারেন না তিনি। নাগরিক বৈদগ্ধের অস্থিরতায় লক্ষ্য করেছেন : "কলকাতা কখনো আর গলা কেটে দেবে না জ্যোৎস্নায়/উজ্জ্বল নামের কোনো যুবকের মিহিন জামায়/মদির মৌসুমী বেগ কাঁপবে না কখনো আর রমণীরা হাত রাখলেই।" কেননা—"হাসপাতালে রক্ত নেই,/রক্তের কণিকা নেই,/রক্ত নেই। —শীতে/কমলালেবুর মতো রৌদ্রের অভাব।"

কখনো কখনো কবি আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত, মুক্তিতে উন্মুখ এবং কালবিস্তৃত জিজ্ঞাসায় ভ্রাম্যমাণ। 'অন্তরীণ' কবিতায় লিখেছেন : "আমি সে অমল, যার পিতামহ ছিলেন নিশ্চিত এক মহাবাউণ্ডুলে/যার রক্তে বয় সেই রক্তধারা বংশক্রমে অন্ত-অনাদি/একদা অত্যুৎসাহী আমি সেই ক্ষয়প্রাপ্ত যুবা/যার মাংস-মজ্জা-হাড়ে/কোনে" এক অচিন আগ্নেয় হ্রদে বেজে যায় মত্ত দিলরুবা। / হে স্বদেশ, ভুল করে এনেছিল মূল রাস্তা ভুলে।"

এই সমাজজাগৃতি এবং উন্মোচনের পরিবেশেই অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় শুধু নিজেকে দেখেন না, প্রতিটি মানুষ এবং সমকালকে পুনরাবিষ্কার করেন কঠিন মৃত্তিকার ওপর দাঁড়িয়ে। বিষয়কে অবিকৃত রেখেই তিনি ভাবনাকে কাব্যায়ত করেন অপ্রতীকী শব্দব্যবহারে। একালের কোনো তরুণ কবির পক্ষে এই স্বাতন্ত্র্য, রীতিমতো শ্লাঘার বিষয় বলেই মনে হবে।

রবীন্দ্রনাথের কালান্তর (প্রথম ভাগ) (আলোচনা) : রবীন্দ্রনাথ মাইতি, তপতী পাবলিশার্স, ৫।১এ কলেজ রো, কলকাতা—৯। দাম : চার টাকা।

লেখকের নিজেরই স্বীকৃতি—"রবীন্দ্রনাথের কালান্তর নামক গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে এই গ্রন্থটি......লিখিত হয়।" অনুসন্ধিৎসু পাঠক বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' নামক প্রবন্ধ-সংগ্রহ সম্পর্কে কোন তথ্যালোচনা পাবেন না। কারণ এটি লেখকের মূল ভূমিকা মাত্র। এই ভূমিকা-গ্রন্থটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক উপক্রমণিকায় লিখেছেন—"আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনামত একজন সাহিত্যিকের সাহিত্য-কৃতি সম্বন্ধে আলোচনার ধারা কিরূপ হওয়া উচিত—তাহারই দিগদর্শন করিতে গিয়া বর্তমান গ্রন্থের অবতারণা।" এই লক্ষ্য মনে রেখে গ্রন্থটি পাঠ করলে সাহিত্য-আলোচনার একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রবর্তন এবং রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের গঠন, পরিপুষ্টি ও বিবর্তনের ধারাটিকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। তবে পদ্ধতিটি লেখকের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনা থেকে যে সম্পূর্ণ উদ্ভূত হয়নি—তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। বিশেষত মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিক সম্পর্কে যাঁদের সামান্যতম জ্ঞান আছে—তাঁদের বুদ্ধি ও বিবেচনায় লেখকের সাহিত্য-আলোচনার পদ্ধতিটির সঙ্গে মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিকের সেতু-বন্ধনের ব্যাপারটি সহজেই উপলব্ধি হবে। মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিকে অবলম্বন করেই লেখক উনিশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও শিক্ষা-নৈতিক দ্বন্দ্ব ও অগ্রগতির বিস্তৃত আলোচনা করে পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যার সঙ্গে অনেকেই হয়তো একমত হবেন না। তবে, মার্ক্সীয় দর্শনের ছাত্ররা সাহিত্যআলোচনার ক্ষেত্রে মার্ক্সীয় ডায়ালেকটিকের এই প্রয়োগ-প্রচেষ্টাকে নিশ্চয়ই স্বাগত জানাবেন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

সারস্বত (বৈশাখ-আষাঢ় : ১৩৭৬)—সম্পাদক : অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। ২০৬ বিধান সরণী, কলকাতা—৬। দাম—এক টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'সারস্বত' একটি স্বতন্ত্র মান ও মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। গল্প, প্রবন্ধ, কবিতায় সুনির্বাচিত এই পত্রিকাটিতে সংস্কৃতিচর্চার বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। বর্তমান সংখ্যাটিতে পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সিদ্ধেশ্বর মন্দির, কলকাতার গানের আসর এবং বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ তিনটি বেশ মূল্যবান। দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গল্পের অনুবাদ আছে। দুটি গল্প লিখেছেন চিত্ত ভট্টাচার্য এবং তপোবিজয় ঘোষ। কয়েকটি সুনির্বাচিত কবিতা লিখেছেন রাম বসু, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বসু এবং অন্যান্য।

দর্শক (৯ম বর্ষ, ১৮ সংখ্যা)—সম্পাদক : রবি মিত্র এবং দেবকুমার বসু। ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

মূলত শিল্পবিষয়ক পত্রিকা হলেও দর্শক সংস্কৃতিচর্চার বিভিন্ন প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছে। বর্তমান সংখ্যায় লেনিনের সাহিত্যচিন্তাবিষয়ক আলোচনাটি সব থেকে মূল্যবান। তাছাড়া কয়েকটি নাটক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দুটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখেছেন বিজন ভট্টাচার্য এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

গল্পপত্র—(জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৬)—সম্পাদক রমেন্দ্র রায় ও দুলেন্দ্র ভৌমিক। ১৯ অক্রুর দত্ত লেন, কলকাতা ১২। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

কবিতার মতো ইদানীং গল্প নিয়েও নানারকম উত্তেজিত প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে চতুর্দিকে। ফর্ম, টেকনিক ও কনটেন্ট-এর বিচিত্রতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, প্রতীকী ব্যবহার এবং বিষয় নির্বাচনের টানাপোড়েনে সকলেই স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত 'গল্পপত্র' পত্রিকার দ্বিতীয় সংকলনটি পড়ে সেই প্রবণতার আভাস পাওয়া যায়। 'প্রথম পান্ডব' ও 'ঈশোপনিষদ' নামে দুটি নতুন ধরনের গল্প লিখেছেন সমরেশ মজুমদার ও মানব সান্যাল।

রহস্যময় গতিপ্রকৃতির উদ্ঘাটনে দুজন লেখকই শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। রমেন রায় ও দুলেন্দ্র ভৌমিক লিখেছেন অন্য দুটি গল্প। সকলেরই ভালো লাগবে।

অমৃত সূর্য (কবিতা) — শঙ্কর মিত্র। মিত্রাণী। ৩৮ বাগবাজার স্ট্রীট, কলিঃ—৩ মূল্য—এক টাকা।

'অমৃত সূর্য' শঙ্কর মিত্রের প্রথম কবিতার বই। চৌদ্দ পৃষ্ঠায় মোট ষোলটি কবিতা নিয়ে এই সংকলন। সমাজ-সচেতন বলিষ্ঠ বক্তব্য ও নতুন যুগের স্বপ্ন কয়েকটি কবিতায় স্পষ্ট।

উইলিয়ম ব্লেক

অনেকেই তাঁকে পাগল ভেবে উপহাস ক'রত, কখনো করুণা কিংবা ব্যঙ্গ কিন্তু ব্লেকের কাছে এ-সবের কোন অর্থই ছিল না। চারদিকের বাস্তব নিয়ম-কানুনের রূঢ় প্রত্যক্ষ জগতের নাগরিক তিনি কোনকালেই ছিলেন না—এই দ্রষ্টা মানুষটি প্রবল মুক্তিস্পৃহায় নিজের অন্তর্জীবনকেই সত্য ভেবেছিলেন, মনের মধ্যে পৃথিবীর থেকেও বড় যে মুক্ত-মেলা ব্লেক সেই প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। এ-জীবনটা তাঁর কাছে এত সত্য যে নিত্য-নৈমিত্তিকের জগৎটাকে তিনি মানিয়ে চলতেই পারতেন না। সকলের সঙ্গে এক-মাটিতে তাই তাঁর পা মিলত না, গলার স্বর শোনাত অন্যরকম, চোখের চাউনি অন্যকোথাও চলে যেত। সবাই তখন তাঁকে পাগল তো ভাববেই। রবার্ট সাউদে ব্লেককে স্পষ্টতই উন্মাদ ভাবতেন। বলেছেন, ব্লেকের দিকে তাকালে, কথা বললে ও'র চোখ-মুখে পাগলের উদভ্রান্তি যে-কেউ স্ফুটে উঠতে দেখত। কিছুক্ষণ ও'রদিকে তাকিয়ে থাকলে করুণা আর মায়ায় বুকটা ভারি হয়ে আসে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বুঝেছিলেন, এই উন্মাদ মানুষটি আসলে নিয়ম-ভাঙ্গা সেই দ্রষ্টা যাঁর খেয়াল-খুশির জীবন একটি গভীর রহস্যময় মুক্তির অভিনব অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাই বলেছিলেন, ব্লেকের পাগলামো স্কট কিংবা বায়রনের বিচক্ষণতার থেকে আমাদের মনকে অনেক বেশি আন্দোলিত করে। ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে রোমান্টিক যুগের প্রবর্তক, অত্যুজ্জ্বল লিরিক কবি, প্রফেট, দীর্ঘ কবিতা আর নাটকের প্রচুর শিল্প-সম্ভারে হিরণ্ময় প্রতিভার অধিকারী হয়েও জীবদ্দশায় দেশবাসীর কাছ থেকে ব্লেক তেমন কোন স্বীকৃতিই পাননি। অথচ সেকসপীয়র, মিল্টন, ব্রাউনিং, ইয়েটসকে বাদ দিলে ব্লেকের সমতুল্য কবি ইংরেজি সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে চিত্রশিল্প এবং এনগ্রেভিং-এও তিনি অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। 'বুক অফ জব' এবং 'ডিভাইন কমেডির' জন্য তার এনগ্রেভিং আর রঙিন ছবিগুলো তাঁর এই বিপুল শক্তির রূপ ধারণ করে আছে। প্রাণোচ্ছলতার উদ্বেল আলোড়নে, কল্পনার অক্লান্ত প্রবাহে, রেখা ও বর্ণের ছন্দোময় বিচ্ছুরণে তাঁর চিত্রশিল্পের জগৎটি সত্যিই অসামান্য। তাঁর প্রতিভার এ-দিকটিও সমকালে শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি পায়নি। নিদারুণ অর্থসংকট, ক্ষমতার অস্বীকৃতি শেষদিন পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করেছে। ১৮২৭ খৃস্টাব্দের ১২ই আগস্ট বানহিল ফিল্ডসে নিঃস্ব ভিখারিদের মতো এই দুর্লভ শিল্পীকে কবর দেয়া হল। সেই সামান্য কটি পয়সাও কবির কাছে ছিল না যাতে তাঁর সমাধিক্ষেত্রে পাথরে নাম লেখা যায়। কোথায় তাঁর সমাধিক্ষেত্র বানহিল ফিল্ডস-এ কেউ খুঁজে পায় না। ব্লেক দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু সেদিনের ইংরেজ জাতির চিত্তের এতবড় দারিদ্র্যের ঘটনা আর ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

ব্লেক তার স্বভাবের অনুকূলেই স্ত্রীকে পেয়েছিলেন। পঁচিশ বছর বয়সে এক মালীর মেয়ে ক্যাথরিন সোফিয়া বুচারকে বিয়ে করেন। ও'দের প্রণয়-পর্বে তেমন আড়ম্বর ছিল না। একদিন ব্লেক ক্যাথরিনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে তোমার মায়া হয়?' ক্যাথরিন বলেছিল, 'দারুণ মায়া লাগে তোমাকে।' ব্লেক ওর মুখের দিকে প্রসন্ন চেয়ে থেকে বললেন—'তাহলে আমি তোমাকে ঠিক ভালোবাসি, ভীষণ ভালোবাসি।' এর এক বছর পরেই ওদের বিয়ে হয়ে গেল মেয়েটি ছিল নিরক্ষর। রেজিস্ট্রি-বিয়ের খাতায় নিজের নামের জায়গায় সে ছোট্ট করে একটা 'ক্রস' দিয়েছিল। কুড়ি বছরের সোফিয়া, —গভীর ঘন চোখ, মিষ্টি সুঠাম গড়ন।

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

মুক্তের স্বভাবে ব্লেকের নিঃস্ব সংসারে চিরটা-কাল অশান্তি ঢুকতে দেয়নি। ব্লেক ও'কে ছবি আঁকা শেখালেন, লেখাপড়ায় কিছুটা তৈরী করে নিলেন। ব্লেকের আঁকা ছবিতে ক্যাথরিন বসে বসে রঙ লাগাতো। অর্থ-কষ্টের চাপে সংসারটা নুয়ে পড়লেও এই সহিষ্ণু, শান্ত, বিচক্ষণ বউটি ব্লেককে কোন-কালে অসুখী থাকতে দেয়নি। ল্যামবেথের পল্লী পরিবেশে ছোট্ট বাড়িটায় উঠে এসে ও'রা দুজন কিন্তু চমৎকার কাটিয়েছেন। বাগানভরা নানা রঙের অজস্র ফুলে, আঙুর-লতা ঝুলে আছে। জীবনের রসে আঙুর-গুলো যেন পূর্ণ—ব্লেক তাই একটা আঙুরও ছিঁড়তেন না। রাত্রিতে অফুরন্ত জ্যোৎস্না চারদিকের নির্জনতাকে আলো করে তুলত। বাস্তবের অনুশাসনে বীতশ্রদ্ধ ব্লেক এক অভিনব মুক্তির ডাক শুনতেন তখন। জ্যোৎস্নার মতোই নিরাবরণ হতে চাইতেন। বিশুদ্ধ আদিম সৌন্দর্যের নেশায় মগ্ন হয়ে উঠত তাঁর আত্মা। শরীরের পোশাকগুলোকে মনে হতো সভ্যতার রূঢ় শৃংখল।

ব্লেকের স্বপ্নের সঙ্গী ছোটভাই রবার্টের মৃত্যু ও'র জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা। ভাই-এর মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে ব্লেকের এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা ঘটেছিল। এই অলৌকিক দৃষ্টির মানুষটি হঠাৎ দেখলেন মৃত রবার্টের আত্মা ওর দেহ ছেড়ে স্বর্গের দিকে উঠে যাচ্ছে। রবার্ট মরে গেলেও ব্লেকের সঙ্গে তাঁর প্রত্যেক দিন দেখা হোত। ব্লেক ওর জন্য অপেক্ষা করতেন। রবার্টের আত্মা নির্জনে ব্লেকের কাছে আসত ব্লেক কি লিখবেন কেমন করে কি আঁকবেন রবার্টই নাকি তাকে বলে দিত—ব্লেক পরম বিশ্বাসে একথা স্বীকার করেছেন। ব্লেক ছবি আঁকার যে মৌলিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তার কৌশলও রবার্টের কাছ থেকে শোনা।

ব্লেকের 'সঙস্ অফ ইনোসেন্স' বইটি এই অভিনব মুদ্রণ-পদ্ধতির দৃষ্টান্ত। বইটি কেউ ছাপতে চায়নি। তাই বাধ্য হয়েই অবশ্য এক অদ্ভুত ছাপানোর কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় ব্লেককে। বইটির সমস্ত ডিজাইন এবং অক্ষর ব্লেক অ্যাসিডপ্রুফ কালিতে ধাতু-খন্ডে খোদাই করে নিল। তারপর অ্যাসিডে ডুবিয়ে দিলেন। অক্ষর আর অলংকরণ ছাড়া বাকি অংশ অ্যাসিডে খেয়ে গেল। এভাবে তৈরী এনগ্রেভিং-এ ব্লেক আর সোফিয়া রঙ লাগান। ভাবতে অবাক লাগে সবগুলো অক্ষরই ব্লেককে উল্টো করে লিখতে হয়েছে। এভাবেই ব্লেক তাঁর অধিকাংশ বই ছেপেছেন। নিজেরাই বাঁধাই করে নিয়েছেন। এ-এক আশ্চর্য খেলা।

কবি হিসেবে ব্লেক উপেক্ষিত হয়েছেন। ছবি আঁকতে গিয়েও স্বীকৃতি পাননি। দারিদ্র্যের চাপে প্রায় না খেয়ে মরবার অবস্থাও তাঁর হয়েছে। কিন্তু কখনোই তাঁর সৃষ্টির উৎসাহ মন্থর হয়নি। সত্তর বছরের জীবনে ছবি আর কবিতার অফুরন্ত সমা-রোহ, তাঁর জীবন ঘিরে কল্লোল তুলেছে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পোয়েটিকাল স্কেচেস'-এ নিজস্ব পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী তেমন গঠিত ও সোচ্চার নয়। কিন্তু তাঁর 'সঙস্ অব ইনোসেন্স' এবং 'সঙস্ অব এক্সপিরিয়েন্স' গ্রন্থ দুটিতে ব্লেকের জীবন-ভাষ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুময় পৃথিবীর নিয়ম ও যুক্তি আত্মার বিপ্লবী উচ্ছ্বাসে ধূলিসাৎ করে এখানে অন্তর্লোকের নাগরিক কবি ব্লেক আবির্ভূত হন। তাঁর 'দি বুক অব ইউরিজেন', 'দি বুক অব আনিয়া' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি তাঁর নিজস্ব পুরাণ বা উপকথার জগৎ নির্মাণ করেছেন।

ব্লেক এই অন্তর্লোকের নাগরিক ছিলেন বলেই সম্ভবত মাটির পৃথিবী তাঁর কবর স্পষ্ট চিহ্নে ধরে রাখতে পারেনি। পাথরের মতো শক্ত শরীরের মানুষটি ক্রমশ অসুখে ক্ষীণ ক্ষীণতর হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ছিলেন যোদ্ধা। যুদ্ধই সম্ভবত তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সারমর্ম। বাস্তবের স্বৈরাচার, সমাজের দুঃশাসন, দারিদ্র্যের বেত্রাঘাত সব কিছুকে প্রতিবাদে উপেক্ষা করে স্বপ্নের রঙিন পতাকা তিনি উড্ডীন রেখেছেন। পৃথিবীর সঙ্গে কোনমতে মানিয়ে চলা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। তাই তাঁর কথা অদ্ভুত, নিঃশ্বাস অনৈসর্গিক, পদক্ষেপ অর্ধোন্মাদ আগন্তুকের মতো। তাঁর সংলাপ স্বপ্নের মতো অবাস্তব বলেই নিষ্ঠুর ও প্রখর বাস্তব। ব্লেকের রচনায় তরুণ খৃস্টের হাতে তরবারি ছিল। যোদ্ধা ব্লেক এই তরবারি সমগ্র জীবন ধরে শানিত করেছেন—এই তরবারি কখনো অস্ত্র কখনো জ্যোৎস্নায় স্তম্ভিত তীব্র আলো।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে বাঙলায় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে নির্মিত প্রথম গৃহ
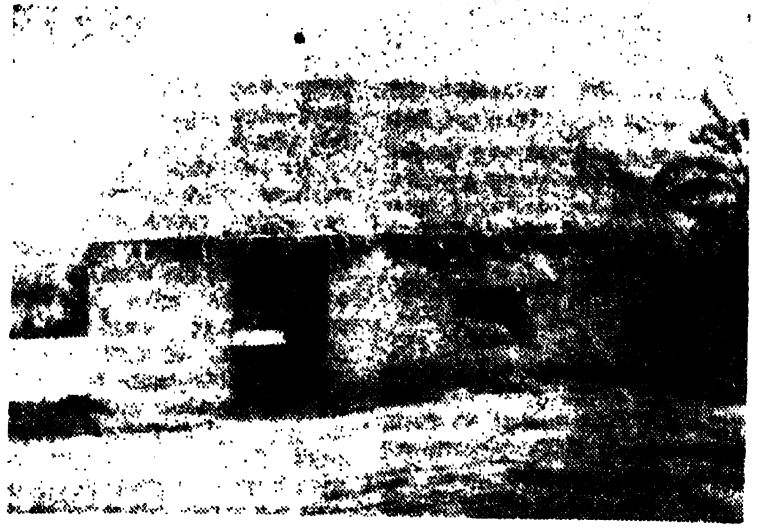
নিরক্ষরতা আমাদের দেশের বোধ করি সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, এখনও আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। দেশের অধিকাংশ মানুষকে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে, দেশকে কখনই উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণ সবচেয়ে প্রথমে প্রয়োজন। দেশের প্রতিটি মানুষের চোখের সামনে থেকে যখন অক্ষরের বাধা দূর হয়ে যাবে, যখন সে পাবে লিখিত জ্ঞান ও তথ্যের জগতে প্রবেশাধিকার তখনই যথার্থ মুক্তির পথ নির্দেশিত হবে।

ভারতে এই নিরক্ষরতা সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা হয়ত চলে আসছে প্রায় ছয় দশক ধরে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জনসংখ্যার ক্রমানুপাতিক বৃদ্ধির সঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের হার ক্রমশ কমে এসেছে। অর্থাৎ নিরক্ষরতা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। দেশে নিরক্ষর নাগরিকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আদমসুমারী অনুযায়ী এই নিরক্ষরতা দূরীকরণের একটি পরিসংখ্যান এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। ১৯০১ সালে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৬·২ শতাংশ; ১৯৪১ সালে দাঁড়ায় ১৪·৬ শতাংশ; ১৯৪৭ সালে হয় ১২ শতাংশ; ১৯৫১ সালে দাঁড়ায় ১৬·৬ শতাংশ; ১৯৬১ সালে ২৪ শতাংশ; ১৯৬৬ সালে ২৮·৬ শতাংশ এবং ১৯৬৯ সালে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ। এর মধ্যে আবার ১৯৩১—৪১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বেশ একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা যায়। এই সময় নিরক্ষরতা দূরীকরণ শতকরা ৫·৫ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১—৬১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই বৃদ্ধির পরিমাণের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করলে বিষয়টা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে। ১৯৫১—৬১'র মধ্যে বাংলাদেশে বৃদ্ধি হয়েছে ৫·৩ শতাংশ এবং ভারতে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭·৪ শতাংশ। ১৯৩১—৪১ সালে নিরক্ষরতা কমে আসার কয়েকটি কারণ ছিল। তখন সমস্ত ভারতে চলছিল নানা প্রকার শিক্ষা-আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের আদমসুমারীতে লক্ষ্য করা যায়, নিরক্ষরতা আবার বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন, যুদ্ধ, মন্বন্তর ইত্যাদি কারণে শিক্ষা প্রসার সম্ভব হয় নি। সাধারণ মানুষ শিক্ষা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসবার সুযোগ পায় নি। স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালেও নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য তেমন কোন ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি, যার ফলে গ্রাম-গ্রামান্তরে শিক্ষা প্রসার সম্ভব হতে পারত। নিরক্ষরতা দূরীকরণের গতি যেভাবে চলছে, যদি সেভাবেই চলতে থাকে, তাহলে ২০০০ খৃষ্টাব্দের আগে ভারতবর্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কখনই সম্ভব নয়।

নিরক্ষরতার এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবেকবান নাগরিক মাত্রেই ভাবিত হবেন। যদি এভাবেই নিরক্ষরতা এগিয়ে চলতে থাকে, তাহলে আমাদের দেশের অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎও হবে অনিশ্চিত। সরকার যে এ-ব্যাপারে চিন্তিত নন, এমন নয়। কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টা খণ্ডিত। যে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তুললে এই সমস্যার সমাধান হতে পারত, সরকার তা গঠন করতে অসমর্থ হয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র কিছু সুযোগ-সুবিধা দিলেই নিরক্ষরতা দূর করা যাবে না। দেখা গেছে, কোন গ্রামে হয়ত ৫০ জন নিরক্ষর শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী। গ্রামে হয়ত অবৈতনিক শিক্ষায়তনও আছে। তবু মাত্র ৫ জন ছাত্র সেই সুযোগ গ্রহণ করে। এর কারণ, এই ৫০ জনের মধ্যে ৪৫ জনকেই কোন না কোনভাবে পরিবারে সাহায্য করতে হয়। এ'দের মধ্যে শিক্ষা প্রসার করতে হলে এ'দের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করেই অগ্রসর হতে হবে। ডঃ ডি এস কোঠারির নেতৃত্বে গঠিত 'শিক্ষা কমিশন' এই সমস্যা উপলব্ধি করেই মন্তব্য করেন।

> "Conventional methods of hasening literacy are of poor avail. If the trend is to be reversed, a massive unarthodox national effort is necessary.

শিক্ষা কমিশন এ ব্যাপারে তিনটি সুপারিশ করেছিলেন। সেগুলি হল—

(১) সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার।

(২) ১১-১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলেদের আংশিক সময়ের শিক্ষা লাভের সুযোগ দান এবং

(৩) ১৫-৩০ বৎসর বয়স্কদের আংশিক বৃত্তিমূলক সাধারণ শিক্ষালাভের সুযোগ দান।

কোঠারি কমিশনের এই সুপারিশগুলি খুবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একে সাফল্য-মণ্ডিত করতে হলে সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করতে হবে। সুখের বিষয়, বাংলাদেশের একদল তরুণ, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছেন। আগামী ৬—৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৬ সেপ্টেম্বর বিদ্যাসাগর ও ডেভিড হেয়ারের গলায় মাল্যদান করে এই সম্মেলনের উদ্বোধন হবে। তারপর উপস্থিত প্রতিনিধিরা মিছিল করে দ্বারভাঙ্গা হলে যাবেন। সেখানে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে ভাষণ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীভি কে কৃষ্ণমেনন, শ্রীমতী অরুণা অসাফআলী প্রমুখ। এ ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস অব ফাংশন্যাল লিটারেসির প্রতিনিধি হিসেবে রুমানিয়ার শ্রীমতী স্তানাদ্রাগোরী এবং আরো অনেকে।

পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণের এই আন্দোলনের আরম্ভ ঘটেছে মোটামুটি ১৯৬৫ সাল থেকে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে 'পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন শ্রীসুধীর চ্যাটার্জী। ছাত্ররা নিজেদের রক্ত বিক্রী করে সেই টাকায় এই পরিকল্পনা শুরু করেন। প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী বয়স্ক শিক্ষার ট্রেনিং নেন। এর মধ্যে প্রায় ১৫০ জন বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে লিটারেসি সেন্টার খোলেন। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শ্রীচিন্ময়মোহন সেহানবীশ ও শ্রীপার্থ সেনগুপ্ত আমাকে বলেন—'আমাদের এই প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। তাঁরা নিজেরাই এগিয়ে আসেন। সরকারের বিভিন্ন ব্লক অফিসের দ্বারা যা হয়নি, এই সীমিত চেষ্টায় তার অনেক বেশি হয়েছে। অনেক জায়গায় গ্রামবাসীরাই নিজেদের পয়সা ও শ্রম দিয়ে ঘর তৈরী করে দেন।' খড়্গপুরের কাছে একটি গ্রামে এমনি করেই গ্রামবাসীরা একটি মাটির ঘর তৈরী করে দিয়েছিলেন। এখন সেখানে পাকাবাড়ি উঠেছে। বর্তমান সম্মেলন এই আন্দোলনে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করবে বলে আশা করি।'

উদ্যোক্তারা এ ব্যাপারে কয়েকটি প্রোগ্রাম ঘোষণা করেছেন। এর থেকে জানা যায়, অবিলম্বে তাঁরা হাওড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলায় ১০০টি কেন্দ্র খুলবেন। প্রতিটি কেন্দ্রে ৩০ জন করে ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ও হিন্দি। এর জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তার অধিকাংশই নাকি ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের রক্ত বিক্রী করে সংগ্রহ করবেন। যাঁরা সমস্যাটিকে এত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে আমাদের আশা অনেক। আশা করি এ'দের প্রচেষ্টায় নিরক্ষরতার সমস্যা অনেক কমে আসবে এবং আমাদের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করবে।

—বিশেষ প্রতিনিধি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দীনা সাজতে ভালোবাসে। ডাক্তার বলে যে, দিনরাত মেডিকেল জার্ণাল বা বই নিয়ে বসে থাকে তা নয়। সে জন্য তার আলাদা সময় আছে। পরিপূর্ণভাবে সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। তার সৌন্দর্য তার গর্বের সামগ্রী। তার জন্য সে যথেষ্ট সময় দিতে প্রস্তুত। কাবার্ডের অপর দিকে পর-পর দুটো বেসিন লাগানো আছে। টাওয়েলস স্ট্যান্ড থেকে একটা বড় তোয়ালে কাঁধে ফেলে দীনা দাঁত মাজল। সনতের মত তার দাঁতের সম্বন্ধে কোন ম্যানিয়া নেই। দীনার দাঁত স্বভাবতই উজ্জ্বল ছোট ছোট মুক্তোর মত। এবার দীনা নাইটিটা খুলে সাওয়ারের তলায় দাঁড়াল। তারপর সাবান মেখে নিল সর্বাঙ্গে। ঝর্ণার জল তার শুভ্র দেহের ওপর দিয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে চলল অবিরল-ধারায়। বিচিত্র বর্ণের তোয়ালেটা জড়িয়ে পাখাটা খুলে দিল। স্নানের পরে পাখার হাওয়াতে দীনার মন আর স্নায়ু স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। কাবার্ডের সামনে চেয়ারে বসল দীনা। দেয়ালে টাঙানো ঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে প্রসাধন শুরু করল সে। শাড়ী পরে বাইরে বেরিয়ে এসে দীনা দেখল তার অলক্ষে ড্রইংরুমের টেবিলে কে যেন এক গুচ্ছ ফুটন্ত তাজা গোলাপ রেখে দিয়েছে। খুশী মনে এগিয়ে গেল সে। গোলাপগুচ্ছের গায়ে একটা কার্ড দেখতে পেল দীনা। তুলে নিয়ে দেখল তাতে লেখা আছে 'উইথ কমপ্লিমেন্টস্—রাকেশ অ্যাডভানী'। দীনা রাকেশের স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হল। লোকটা প্রেসার ট্যাকটিস অবলম্বন করেছে বলে বুঝতে পারল সে। এই যে বারবার সামনে এসে দাঁড়ানো, টেলিফোন করা, ফুল পাঠানো—এসবই তাকে চিঠিগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে। তাকে চাপ দেবার উপায় এটা। একটু হাসল দীনা। এতে তার কিছুই হবে না। রাকেশের মত বহু লোকই সে দেখেছে। চাপ দিয়ে কিছুই

করতে পারবে না রাকেশ। ফুলটার দিকে তাকিয়ে কি ভাবল দীনা। তারপর বেয়ারাকে ডেকে গুচ্ছটা মিসেস পোকনওয়ালার কেবিনে দিয়ে আসতে বলল। দীনা টেবিল থেকে এক কাপ চা ঢেলে নিল, তার সংগে দুটো টোস্ট। টিপটের কভারটা ভালভাবে ঢাকা দিয়ে রাখল সে। আশা করেছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত সরিৎ এসে পড়বে। দীনার মনে পড়ল আজ একটা অপারেশন আছে। মিসেস দাস মা হতে চলেছেন। এই তার প্রথম সন্তান। কিন্তু বিপদ হয়েছে তার ক্ষীণ কটিঅস্থির জন্য। পেটের মধ্যে বাচ্চাটা মারা গিয়েছে, সে কথা মিসেস দাস জানেন না। কোমরের অস্থি-বেষ্টনী যদি স্বাভাবিক মাপের থাকত তাহলে কোন অসুবিধা হত না প্রসবের। কিন্তু নির্গমপথ পার হতে না পারার জন্য শিশুটা মারা গিয়েছে সকালে' এটাকে খন্ড খন্ড করে কেটে বার করতে হবে। তবে মিসেস দাসকে বাঁচানো সম্ভব হবে। এ অপারে-শনের নাম ক্রেনিওটমি।

সরিতের জন্য আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে দীনা। একলা বসে থাকতে ভাল লাগল না তার। সে জন্য দীনা নীচে নেমে এল। সনতের ঘরের পর্দাটা নাড়া দিল দীনা। কোন আওয়াজ না পেয়ে মৃদুস্বরে ডাকল সে।

—ছোড়দা আসব ভেতরে।

—এস বৌদি। সনতের গলার স্বরটা অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর।

—সকালবেলা চুপ করে বসে আছ? দীনা ডিভানে বসল।

—এমনি। অন্যদিকে তাকিয়ে রইল সনৎ।

—কি হয়েছে ছোড়দা। ভয় পেল দীনা সনতের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে।

—তোমাকে এসব বলা উচিত কিনা ভাবছি।

—নিশ্চয়ই বলবে কোন কথা লুকিয়ে রাখা উচিত হবে না।

—সহ্য করতে পারবে? সনৎ তাকাল দীনার দিকে।

মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল দীনার। সে ভেবেছিল সনৎ তার নিজের কোন সম-স্যার কথা উল্লেখ করছে। কিন্তু বিষয়টা তার নিজের সম্পর্কে শুনে তার রাকেশ অ্যাড-ভনীর কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। তবুও সাহসে বুক বেঁধে বলল—

—পারব ছোড়দা। সব জিনিসকেই ফেস করতে হবে। কতদিন এড়িয়ে যাওয়া যায়?

—কেতকী মেয়েটা কেমন?

—স্টাফ নার্স হিসাবে এফিসিয়েন্ট বলতে পার কিন্তু মানুষ হিসাবে বলা শক্ত। পর-বর্তী প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হল দীনা।

—বিয়ের আগে দাদার সংগে কেতকীর কি কোন সম্পর্ক ছিল বলে জান? সনৎ তাকাল দীনার দিকে। দীনাকে আঘাত দেওয়ার ইচ্ছা তার ছিল না কিন্তু দুর্জয় রাগ আর হিংসার বশবর্তী হয়ে সনৎ সব কথাই বলবে বলে প্রস্তুত হল। দীনাকে সরিৎ সমীহ করে কিছুটা। তার ব্যক্তিত্বের কাছে সরিৎকে নীচু হতে দেখেছে সনৎ। কিন্তু কেতকীর স্পর্ধার তুলনা মেলে না। কোন্ সাহসে সে একজন বিবাহিত লোকের সংগে অবৈধ সম্পর্ক রাখে? একটা নিম্ন-শ্রেণীর মেয়েছেলে ছাড়া কিছু নয় কেতকী। 'হতে পারে কিন্তু বিয়ের পরও!' চুপ করে গেল দীনা। তার জিনিসটা ভাবতেও ভয় হচ্ছে।

—হ্যাঁ তাই আছে। আলতোভাবে কথাটা উচ্চারণ করল সনৎ।

—না, না, মিথ্যে কথা। চেঁচিয়ে উঠল দীনা। উত্তেজিত হয়ে পড়ল সে এক নিমেষে। মুখটা রক্তবর্ণ হয়ে উঠল সংগে সংগে।

—মিথ্যে হলেই খুশী হত সকলেই, অন্ততঃ আমি নিষ্কৃতি পেতাম।

—তুমি? দীনা তাকাল সনতের দিকে।

—হ্যাঁ বৌদি, আমিও জড়িত এ-ব্যাপারে। কেতকীর আকর্ষণ আমিও অব-হেলা করতে পারি নি।

—ছোড়দা—। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল দীনা।

—ভয় পেও না বৌদি। আমাদের সকলকেই এর মোকাবিলা করতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দীনা। অকস্মাৎ সে অস্বাভাবিকভাবে শান্ত আর স্থির হয়ে গেল। মনে মনে সে নিজের উত্তেজনাকে দমন করতে চেষ্টা করল। উপহাস করল নিজেকে। অপরের সামনে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলাটা একজন সার্জনের পক্ষে শুধু অশোভন নয়, অমার্জ-নীয় অপরাধ। মানসিক চাঞ্চল্য যে কারণেই হোক না কেন তার প্রফেশনে সেটার স্থান নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল দীনার। তারপর সনৎকে শান্তগলায় বলল এবার

—তুমি আমায় সব বলতে পার ছোড়দা।

—অন্য দিনের চেয়ে আজ সকালে উঠে আমি নার্সিং হোমে কেতকীর সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে খুব আস্তে আস্তে উঠে ভেবেছিলাম ওকে চমকে দেব। কিন্তু নিজেই হতভম্ব হয়ে গেলাম। ছোট ঘরটায় ঢুকে অপারেশন থিয়েটারের বন্ধ কাঁচের দরজা দিয়ে দেখলাম ওরা দুজনে প্রেমালাপে রত... করছে।

—ওঃ এই। হেসে উঠল দীনা। এর জন্য তুমি এত উতলা হচ্ছ ছোড়দা।

—বল কি বৌদি, তুমি এটা হেসে উড়িয়ে দেবে? অবাক হয়ে তার দিকে থাকে সনৎ।

—নিশ্চয় এটাত হাসবারই জিনিস, খুব সামান্য ব্যাপার। তাহলে দিল্লীর সোসাই-টীর কান্ড দেখে তুমি মূর্ছা যাবে ছোড়দা—আবার হাসল দীনা।

—আমি কিন্তু তোমার সংগে একমত নয়। সনতের গলার স্বরটা এখনও স্বাভাবিক নয়।

—মেমসাব—বেয়ারা ডাকছে পর্দার ওপাশ থেকে।

—কি হয়েছে?

—সাহেব টেলিফোনে বলেছেন বাড়ীতে চা খাবেন না আর, আপনাকে যেতে হবে নার্সিংহোমে—অপারেশন আছে।

—ঠিক আছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে তার অজান্তে।

দীনা বাইরে গেলে সনৎ তার বাক্স থেকে একটা লজেন্স তুলে মুখে দিল। গলাটা শুকিয়ে গিয়েছে তার। জিভটা তালুতে আটকে গিয়েছে যেন। এতক্ষণ সেদিকে তার নজরই ছিল না। কিন্তু দীনার সংগে আলোচনার পর তার খেয়াল হল।

দীনা হাসিমুখে বাইরে বেরিয়ে এল বটে কিন্তু সেটা তার অভিনয়। সনতের ঘরের বাইরে এসে মুখটা তার গম্ভীর হয়ে গেল। একটা হেস্তনেস্ত তাকে করতেই হবে। বাঙ্গালী মেয়েদের মত কাঁদতে পারবে না সে। এসব তার ধাতে সয় না। যে কোন উপায়েই হোক না কেন এই নোংরা ব্যাপার সে নির্মূল করবে। বাইরের পোশাক পরে নিল দীনা। মিসেস দাসের অপারেশনের কথা মনে পড়ল তার।

কেতকী দীনার অ্যাপ্রনের দড়িটা বাঁধতে যেতে ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা সরিয়ে নিল সে। সরিৎ একবার তাকাল দীনার দিকে। তার ভাবান্তর লক্ষ্য করে আশ্চর্য হল সে। সাধারণতঃ দীনা এ ধরনের অশোভন ব্যবহার করে না। কিন্তু মেয়েদের মনের ব্যাপার খুবই জটিল বলে সরিতের ধারণা। সুতরাং সে রুগীর দিকে নজর দিল। তার মুখে রবারের মাস্কটা লাগিয়ে অ্যানেসথেশিয়া দিতে আরম্ভ করল সে একমনে। কেতকী দীনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে আর অপর দিকে আরও একজন নার্স।

—আই অ্যাম রেডি। বলল সরিৎ। রুগী তৈরী।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল দীনা একবার। তারপর শুরু করল তার কাজ।

—স্পেকুলাম—হাতটা নাড়াল দীনা।

কেতকী যন্ত্রটা এগিয়ে দিল তাকে। স্পেকুলাম দিয়ে মাতৃদেহের অংশ প্রসারিত করল দীনা। ভালভাবে তারপর ভিতরে স্পর্শ করে দেখল। শিশুর মাথা নীচে নেমে এসেছে। কিন্তু মায়ের কোমরের অস্থি-বেষ্টনী ছোট বলে বাইরে আসতে পারে নি বেচারা অস্বাভাবিক বাধায় আটকে গিয়েছে। মৃত শিশুর মাথাটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল। মধ্যভাগ নরম তুলতুলে। এই জায়গায় পারফোরেটরের সাহায্যে গর্ত করে ক্রেনিওক্লাস্টফরসেপের সাহায্যে মৃত শিশু-টাকে সম্পূর্ণভাবে বাইরে নিয়ে আসবে সে খন্ড খন্ড করে।

—ভলসেলাম—হাতটা আবার বাড়াল দীনা।

কেতকীর পেটের যন্ত্রণাটা বেড়েছে। কিছুক্ষণ আগেই সে অনুভব করেছে সেটা। কিন্তু অপারেশন ছেড়ে যাবে কি করে। কেতকী ভালভাবে শুনতে পায় নি দীনা কি চেয়েছে। আর্টারি ফরসেপ একটা এগিয়ে দিয়েছে সে।

—হোয়াটস দ্যাট? দীনা একবার সেটার দিকে তাকাল তারপর সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল অদূরে। পাশে রাখা আলমারীতে সজোরে সেটা লেগে কাঁচগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে গেল ঝন-ঝন করে। সকলেই চমকে উঠেছে। অবাক হয়ে গিয়েছে তার ব্যবহারে। এ ধরনের ভুল হলে রহস্য করতে পারে বড়জোর, কিছু বলতে পারে ভদ্রভাবে কিন্তু একি!

—স্টেডি—। সরিৎ শান্তগলায় বলল দীনাকে। বেশী কিছু বলতে পারল না কারণ হতভম্ব হয়ে গিয়েছে সে। দীনার এ ধরনের রাগ, এ রকমের উগ্র আর অশোভন ব্যবহার সে কোন দিনই দেখেনি। কিন্তু কারণটা কি তা ভেবে উঠতে পারল না কোন মতে। বিমূঢ় হয়ে গিয়েছে ডাঃ সরিৎ মুখার্জি।

—ক্লেনিওক্লাস্ট—দীনার হাতে কেতকী তুলে দিল যন্ত্রটা। এবার আর ভুল হল না। কিন্তু কেতকীর যন্ত্রণা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। না, সে হারবে না। অন্তত দীনার সামনে নয়।

সোয়াব্—রক্তাক্ত মৃতঅঙ্গ ভালভাবে মুছিয়ে দিচ্ছে দীনা। মৃতশিশুর দেহের অংশগুলো নিয়ে একজন নার্স দূরে একটা বালতিতে রেখে দিচ্ছে। দীনার কাজ শেষ হল এতক্ষণে। যে শিশুর জন্মে আনন্দ সেই মায়েরও মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

অপারেশন শেষ হল। মিসেস দাস বেঁচে গেলেন। দীনার কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে হাতের গ্লাবস্ খুলে হাত ধুয়ে নিল। তার অ্যাপ্রন খুলে দিল অপর নার্সটি। এবার সে আর আপত্তি করল না।

দীনা অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাবার পর সরিৎ তার যন্ত্রপাতি গুছিয়ে মাস্কটা খুলে দ্রুত এগিয়ে গেল দীনার সন্ধানে। খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছে সরিৎ। দীনার স্বাস্থ্যের জন্য তাকে কোন দিনই দুশ্চিন্তা করতে হয় নি বরঞ্চ সেদিক দিয়ে দীনাকেই তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় অনেক সময়। দীনার মানসিক বিপর্যয়ের হেতুটা কি, তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। বাইরে এসে সরিৎ খবর পেল মেমসাব বাড়ী চলে গিয়েছেন। সরিৎ আর দেরী করল না, একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে সেও সোজা রওনা হল।

দীনা বাড়ীতে এসে সোজা উপরে চলে গেল। তার দেহ তখনও কাঁপছিল উত্তেজনায়। একটা চেয়ারে বসে সব জিনিসটা ভাবতে লাগল সে। কপালের শিরাদুটো ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়। ঘাড়ের কাছে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করছে সে। উজ্জ্বল তারকা আর কালো বিন্দুগুলো অজস্রধারায় তার চোখে সাঁতরে বেড়াচ্ছে যেন। দুহাতে মাথাটা চেপে বসে রইল দীনা। তার অজান্তে সরিৎ কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে বুঝতেই পারে নি।

—কি হয়েছে দীনা। তার পিঠের উপর হাতটা রাখল সরিৎ। সেই ঘনিষ্ঠ পরিচিত স্পর্শ পাওয়ার জন্য দীনা অনেক সময় লালায়িত হয়েছে, উন্মুখ হয়েছে তার আশায়। সরিতের হাতটা ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দীনা বলল—

—ডোন্ট টাচ মি— চোখদুটো তার জ্বালা করে উঠল।

—বাট হোয়াই? কি হয়েছে সেটা বলবে ত। সরিতের স্বরটা আশঙ্কায় কাঁপছে। চুপ করে রইল দীনা। কথা বলতে ঘৃণা বোধ করছে সে।

—প্লিজ দীনা, আমায় জানতে দাও সব কথা। ভাগ নিতে দাও তোমার দুঃখের।

—নির্লজ্জতার শেষ নেই তোমার। এবার ঠোঁট দুটো কাঁপছে দীনার।

—আমার! অবাক হল সরিৎ। আমি কি করেছি?

—যে কোন ভদ্রলোক যা করতে লজ্জা পায় তুমি তাই করেছ। তুমি যে এত নীচ তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

—তার মানে? কৌতূহলের বদলে বিরক্তি আসছে সরিতের, সহানুভূতির পরিবর্তে বিরুদ্ধতা।

—এখনও না জানার ভান করছ? এখনও শঠতা? চিপ অ্যাকটিং?

—দীনা, কি বলছ তুমি?

—ঠিক বলছি আমি; ভদ্রবেশী লম্পট।

—দীনা! চাপা শব্দে গর্জন করে উঠল সরিৎ তারপর ধীরে ধীরে বলল—আমার বিরুদ্ধে তোমার কি বলার আছে স্পষ্টভাবে বল দীনা।

—একজন নার্সের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছ, সেকথা তোমায় বলে দিতে হবে। নিজেরই নার্সিংহোমে তুমি একজন বিবাহিত ডাক্তার হয়ে নার্সের সঙ্গে নোংরামি করছ, সেটা কি তোমায় মনে করিয়ে দিতে হবে?

উঠে দাঁড়াল দীনা,

—মিথ্যে কথা। রীতিমত চীৎকার করে উঠল সরিৎ এবার।

—তাই নাকি। তোমার চীৎকারেই কি নোংরামি ঢাকা পড়বে, না, আমি ভয় পেয়ে চুপ করে থাকব—কোনটা ভাবছ? একদিকের ভ্রূটা উপরে উঠে গেল দীনার।

—না, কোনটাই না। কিন্তু সব জিনিসটাই মিথ্যে, তুমি মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছ।

—বিয়ের আগে কেতকীর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক ছিল? কি চুপ করে রইলে কেন, বল। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দীনা।

—কিন্তু সেকথা এখন উঠছে কেন? সরিৎ চেয়ারে বসল এতক্ষণে।

—কারণ, তুমি এখনও ঐ নোংরা মেয়েছেলেটার সঙ্গে সমানে প্রেম করছ বলে। ডাক্তার মুখার্জি, প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করো না। ভালো মানুষ সাজবার ভান করো না।

—না, তা করার কোন প্রয়োজন নেই আমার। তুমি আমায় মিথ্যে দোষী করছ। যে অপরাধ করে নি তাকে তুমি শাস্তি দিচ্ছ, অপমান করছ বিনা কারণে।

—এখনও নির্লজ্জের মত অস্বীকার করবে? এখনও সাধু সাজবার চেষ্টা! কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না, আজ তুমি ধরা পড়ে গেছ।

—ধরা পড়ে গেছি? কি বলছ দীনা?

—ঠিকই বলছি। ছিঃ-ছিঃ —এই তোমার রুচিবোধ? এর গর্ব কর তুমি। এই তোমার শিক্ষা! এই তোমার পৌরুষ! সাপের মত হিস্-হিস্ করে উঠল দীনা।

—দীনা প্লিজ, আমায় স্পষ্টভাবে বল কেতকীর সঙ্গে আমি কি দুর্ব্যবহার করেছি, কি অপরাধে ধরা পড়লাম আমি।

—আজ অত সকালে কোথায় গিয়েছিলে? জেরা শুরু করল দীনা।

—নার্সিংহোমে।

—কেন?

—পেশেন্টটা ভাল আছে কিনা দেখতে। শান্তভাবে উত্তর দিল সরিৎ।

—টেলিফোনে খবরটা পাওয়া যেত না? বক্রদৃষ্টিতে তাকাল দীনা।

—যেত, কিন্তু নিজেই হেঁটে গেলাম বেড়ানোর জন্য।

—এবং নিভৃতে প্রেমালাপের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল দীনা। সে সময় ছোড়দাও গিয়েছিল। সে খবরটা জানলে সাবধান হতে নিশ্চয়! কি, চুপ করে রইলে কেন?

—সনৎ—চীৎকার করে উঠল সরিৎ।

—হ্যাঁ, তোমার ভাই সনৎ। তোমরা দুজনেই যে একই নার্সের সঙ্গে প্রেম করছ একথা তুমি বোধ হয় জান না?

চুপ করে কি ভাবল সরিৎ। মুখটা তার কঠিন হয়ে উঠল। চিবুকের মাংসপেশী টান হয়ে গেল এক মুহূর্তে। জানলার দিকে এগিয়ে গেল সে। তারপর পাশে রাখা টেবিলের উপর বদ্ধমুষ্টি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে একটা আঘাত করে চীৎকার করে উঠল, —আই উইল টিচ হার এ লেসন্। উচিৎ মত শিক্ষা দিয়ে দেব আমি।

জোরে হেসে উঠল দীনা; অস্বাভাবিক হিস্টিরিয়ার হাসি। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।—বাঃ, তাহলে ত' অনেক দূর গড়িয়েছে।

—তার মানে?—সরিৎ ঘুরে দাঁড়াল দীনার দিকে।

—মানেটা খুবই সহজ, হামেশাই বস্তি থেকে শুরু করে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত তার বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে। হিংসার জন্য প্রেমিককে শাস্তি দেওয়ার রেওয়াজ এখনও যথেষ্ট চালু আছে।

—আই সী, এতক্ষণে বুঝেছি—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সরিৎ।

—বুঝেছ তাহলে? একটু দেরী হয়ে গেল বুঝতে, তাই না।

কিন্তু—সরিৎ থেমে যায় কি বলতে গিয়ে।

আবার কিন্তু কিসের; লজ্জা পাচ্ছ বুঝি। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা স্পর্শ করল সরিৎকে।

অগ্নিদৃষ্টিতে সরিৎ তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ তারপর বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

দীনা সাইড টেবিলে সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল। আশ্চর্য লাগছে তার। সরিতের সঙ্গে এ ধরনের জিনিস নিয়ে মনোমালিন্য হবে একথা সে কোন দিনই ভাবতে পারে নি। সরিৎ তাকে এভাবে ঠকাবে কেন; সব পুরুষ মানুষই কি এই রকম? কিন্তু এটা সে বিশ্বাস করতে পারছে না, গ্রহণ করতে পারছে না সত্য বলে। এত নীচ সরিৎ কি করে হল! কিন্তু তাকে ছেড়ে সরিৎ আর কোথাও যায় না বলে মনে পড়ল দীনার। নার্সিংহোমে সব সময় তার কাছাকাছি থাকে সে আর বাড়ীতে ত কথাই নেই। তাহলে কি ছোড়দা ভুল দেখেছে? না, তাও নয়। সরিৎ অন্য কোনদিনই এভাবে সকালে বের হয় না, এমন কি বিকেলেও নয়। তার সঙ্গ ছাড়া সে একপাও চলে না। সরিতের ক্লাবের হাঙ্গামা নেই অন্য কোন শখ নেই এক গাছের শখ ছাড়া। মেয়েদের সম্বন্ধে তার দুর্বলতার কথা দীনা কোনদিনই সন্দেহ করতে পারে নি। কিন্তু ওর ভাইয়ের সঙ্গে কেতকীর প্রেমের কথার উল্লেখে তাহলে এত অসম্ভব রাগ হল কেন? মনটা সঙ্গে সঙ্গে বিষিয়ে উঠল দীনার। এতক্ষণ সরিতের পক্ষে যেসব যুক্তি তার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছিল, সেগুলো মিলিয়ে গেল ছায়ার মত। চোখদুটো বাঘিনীর মত জ্বলে উঠল তার। সরিতের সঙ্গে এরপরে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক আর থাকবে না বলেই মনে হল দীনার। একবার তার মনে হল রাকেশের সঙ্গেই সে চলে যাবে। রাকেশ লম্পট, নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু সরিতের সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়? আবার দীনার মনে হল, একটা নার্সের কাছে হেরে দেশ ছেড়ে চলে যাবে? সেটা ত তারই পরাজয়, তার সারাজীবনের লজ্জা। তাহলে সে ডাক্তার হয়েছে কেন?

কথাটা ভাবতেই মনে মনে কি যেন সংকল্প করল দীনা। ঠোঁট দুটো শক্ত হয়ে উঠল পরস্পরের চাপে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে খোলা জানালার দিকে।

হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টাটা বেজে উঠল তীক্ষ্ণ ঝনৎকারে। চমকে উঠেছে দীনা; প্রকৃতিস্থ হতে সময় লাগল একটু, তারপর ফোনটা কানে দিয়ে বলল—হ্যালো, কে?

মিসেস মুখার্জি?

কথা বলছি।

আমি রাকেশ অ্যাডভানী।

কি খবর?

খবর সেই একটাই,—মানে চিঠিগুলোর কথা বলছি। আমার ভীষণ টাকার দরকার। চিঠিগুলোর বদলে আমাকে টাকা দাও কিছু। আমি খুব বিপদে পড়েছি দীনা। ব্যাকুল হল রাকেশ।

কত টাকা? প্রচন্ড আঘাতে আর মানসিক বিপর্যয়ে দীনার মনটা দুর্বল হয়ে গিয়েছে অকস্মাৎ।

বেশী নয় দীনা, মাত্র দশ হাজার। কাকুতি করল রাকেশ অ্যাডভানী।

যদি না দিই।

তাহলে চিঠিগুলো তোমার স্বামীকে উপহার দেব।

তাই নাকি—। হেসে উঠল দীনা উঁচু-গলায়।

হাসছ যে; তুমি ভেবেছ আমি তোমায় ভয় দেখাচ্ছি।

না, তা নয়। আমি জানি টাকার জন্য তুমি সবই করতে পার। তোমায় আমি চিনি রাকেশ অ্যাডভানী। আমি হাসছি অন্য কারণে। আমি হাসছি এই ভেবে যে, তোমার অস্ত্র আর কোন কাজে লাগবে না।

তার মানে? রাকেশের বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।

তার মানে, আমি যদি স্বামীকে ত্যাগ করি তাহলে আর তোমার চিঠির মূল্যই বা কে দেবে?

তুমি স্বামীকে ত্যাগ করবে? কিন্তু কেন?

সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তার মধ্যে তুমি নাক গলিও না।

দীনা, তুমি যদি ডাক্তারকে ডাইভোর্স কর তাহলে সবদিক দিয়েই ভাল হয়। উৎফুল্ল হল রাকেশ।

কি রকম?

দীনা, তুমি কি জান না, আমি তোমায় ভালবাসি।

জানি বৈকি, খু-ব ভালবাসো। তাহলে ডাক্তারকে ডাইভোর্সের পর তোমাকেই বিয়ে করতে বল নাকি?

অনুরোধ করছি। তাছাড়া নার্সিংহোম শুধু ডাক্তারই করতে পারে না, আমিও পারি।

নিশ্চয় পার। দীনার স্বরে কৌতুক।

তাহলে দুজনে মিলে একটা নার্সিংহোম খুলে ফেলি।

উত্তম প্রস্তাব; কিন্তু তোমার দশ হাজারে কুলোবে না বন্ধু।

দশ হাজার টাকা?

হ্যাঁ, যেটা আমার কাছ থেকে চাইছ।

আই সি, আমার সঙ্গে রহস্য করছ—। রাকেশের গলার স্বরটা গম্ভীর হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

না, রহস্য নয়; এছাড়া তোমার টাকা কোথায় বল।

তুমি ভুলে গেছ দীনা, আমি নারায়ণদাস অ্যাডভানীর একমাত্র উত্তরাধিকারী।

তাছাড়াও তোমার অনেক গুণ আছে। জানি তুমি জুয়া খেলতে পার, চুরি করতে আর লোক ঠকাতে সিদ্ধহস্ত, জালা-জালা মদ গিলতে পার; তোমার গুণের সীমা নেই রাকেশ।

দীনা, যখন একটা নিরীহ লোককে কর্ণার করা হয়, তখন সে কি করে জান?

জানি, মরীয়া হয়ে ওঠে।

ঠিক; আমিও মরীয়া হয়ে উঠেছি, কথাটা স্মরণ রেখ।

রাখব; কিন্তু রাকেশ যে মরীয়া হয়, মারতেও পারে—তাই না।

স্বচ্ছন্দে; এখন আমি সব করতে পারি।

কথাটা মনে থাকবে? জিজ্ঞাসা করল দীনা।

নিশ্চয়, তুমি যা বলবে আমি হাসিমুখে তাই করব; কিছুতেই আটকাবে না।

বেশ; তাহলে রবিবার আমাদের নার্সিং-হোমে ফাংসন আছে সেখানে দেখা কর আমার সঙ্গে।

লাইনটা কেটে দিল দীনা। দীনা টেলিফোনটা কেটে দেবার পর কিছুক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল রাকেশ আডভানী। দুর্জয় রাগে তার সর্বশরীর কাঁপছে তখনও। চিঠির ভয়ে দীনা টাকা দেবে না জেনে সে নিষ্ফল আক্রোশে জ্বলেছিল হাতের কাছে দীনাকে পেলে গলা-টিপে হত্যা করতেও তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হত না। দীনা ইচ্ছা করেই তাকে অবজ্ঞা করছে, তাচ্ছিল্য করছে তার পৌরুষকে। স্বামীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদের কথাও সত্য বলে মনে হল না রাকেশের। তাছাড়া কাউকে মারার কথাটাও বিশ্বাস করল না সে। কাকে মারার কথা বলেছে। স্বামীর সঙ্গে যতই মনোমালিন্য হোক না কেন তাকে জব্দ করার জন্য রাকেশের সাহায্য দীনার মত মেয়ে নিশ্চয়ই নেবে না। রাকেশের মনে পড়ল, তাকে বিয়ে করবে কথা দিয়ে দীনা লুকিয়ে বাঙালী ডাক্তারটাকে বিয়ে করেছিল। এ কথা সে এখনও ভোলেনি। ওর মত নিষ্ঠুর আর ধড়িবাজ মেয়ে তার নজরে পড়েনি। দীনাকে সে যথেষ্ট চেনে। মায়ের সেবা করার ছল করে তার বাবাকে কিভাবে নিজের মুঠোর মধ্যে করে নিল তা সে ভোলে নি।

আর দেরী করল না রাকেশ। গড়িয়াতে বাবলু মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করে যা কিছু করার তাকে করে ফেলতে হবে। আর দেরী করা চলবে না। বাবলু মণ্ডল আর রাকেশ অ্যাডভানীর মধ্যে অনেক মিল আছে। দুজনেরই মনোভাব এক, কোন তফাৎ নেই। চেহারা বা সাজপোশাকে ব্যতিক্রম থাকলেও উদ্দেশ্য তাদের এক। এমন কি জীবনযাপন পদ্ধতিও একই ধরনের, কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু উপায়ের তারতম্যে।

বাবলু মণ্ডল কলোনীর পাশে পানের দোকানের সামনে লুঙ্গি পরে বসেছিল। রাকেশকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, কি দোস্ত হঠাৎ অসময়ে যে।

তোমার সঙ্গে কথা আছে, না এসে উপায় কি; টেলিফোন থাকলে না হয় আলাদা কথা।

কলোনিতে টেলিফোন—হেসে উঠল বাবলু—বলল—হবে দোস্ত, সব হবে। এস, এখানে বস।

নোংরা বেঞ্চের একধারে বসল রাকেশ। এবার বল কি ব্যাপার—বাবলু তাকাল তার দিকে।

দীনাকে আজ ফোন করে টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু সুবিধে হল না।

কেন?

ও হয়ত ডাক্তারকে ডাইভোর্স করছে। তাই চিঠিগুলো দিয়ে কোন কাজ হবে না।

তাহ'লে, অল গন ফট। নিজস্ব ভঙ্গীতে বলল বাবলু।

তাইত দেখছি, তুমি কোন মতলব বাতলাতে পার।

আরে খালি পেটে কি মাথায় মতলব আসে, পেটে কিছু দিতে হয়।

বেশ চল; এখানে দোকান আছে ত।

আলবৎ, কালীমার্কা থেকে বিলিতী পর্যন্ত।

বাবলু বাড়ী থেকে পোশাকটা পরিবর্তন করে নিল।

কেতকী আগেই ডাঃ সেনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিল। সুতরাং বেশীক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে হল না। অন্য রুগী প্রায় সকলেই চলে গিয়েছিল। ডাঃ সেন তাঁর কাজ শেষ করে কেতকীর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। কেতকীকে তিনি স্নেহ করেন। অনেক নার্সই তিনি দেখেছেন কিন্তু কেতকীর মত মেয়ে তাঁর চোখে পড়ে নি। শুধু কাজের দিক দিয়ে নয়, এত শান্ত আর ভদ্রস্বভাব মেলা শক্ত। ডাঃ সেন নিজেই কেতকীকে ডাকলেন—এসো ভেতরে, কি হয়েছে বল ত। স্নেহভরে হাতটা রাখলেন কেতকীর পিঠের ওপর।

কেতকী সামনের চেয়ারে বসে বলল—পেটে যন্ত্রণা হয়।

কতদিন ধরে?

তা প্রায় বছর দুই হবে। একটু ভেবে উত্তর দিল কেতকী।

সে কি, দু বছর। অবাক হলেন ডাঃ সেন, বললেন—কাউকে এর মধ্যে দেখিয়েছ?

না—। ঘাড় নাড়ল কেতকী।

তাহ'লে এতদিন কি করছিলে?

চুপ করে রইল কেতকী। ডাক্তার সেন আবার বললেন—তুমি ত সরিতের নার্সিং-হোমে আছ। তাঁকে কিংবা তাঁর স্ত্রীকে দেখালেও তো পারতে।

হয়ে ওঠেনি—মৃদুস্বরে উত্তর দিল কেতকী।

ময়রা নিজে সন্দেশ খায় না, তাই না? ডাক্তার বা নার্স আর সবায়ের চিকিৎসা করবে নিজেরটি ছাড়া। হেসে উঠলেন ডাঃ সেন। তারপর তাঁর সহকারিণী নার্সকে ডাক দিলেন।

সিস্টার, এঁকে রেডি করুন, আমি গ্লাভসটা পরে আসছি।

লম্বা বেডের উপর শুয়ে পড়ল কেতকী। নার্স তাকে সাহায্য করল যত্ন করে। ডাঃ সেন অনেকক্ষণ ধরে ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন নানাভাবে। নানাদিক দিয়ে প্রশ্ন করলেন এক-একটা করে। তারপর বললেন—কেতকী, আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে যাও, আর দেরী করা চলবে না।

কিন্তু—চেয়ারে এসে বসল কেতকী।

না, আর কিন্তু নয়; আমি অন্য কথা শুনতে চাই না। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখছি, কবে খবর দেবে।

সোমবারে খবর পাবেন। রবিবার নার্সিংহোমে একটা ফাংসন আছে, তার পরের দিন।

আমি একটা কার্ড পেয়েছি, অবশ্য যেতে পারব কি না ঠিক নেই। বেশ তাহ'লে সোমবারেই, কেমন। ইতিমধ্যে তুমি এই প্রেসক্রুপসন অনুযায়ী চল, তাহ'লেই হবে।

আমার একটা কথা শুনতে হবে স্যার—দ্বিধাভরে বলল কেতকী।

কি বল?

(ক্রমশঃ)

রেডারের পর্দায় প্রতিফলিত ঝড়ের সংকেত

কি এবং কেন (৮) রেডার

আজকাল সংবাদপত্রের পাতায় 'রেডার' কথাটি প্রায়ই উল্লেখিত হতে দেখা যায়। সেকারণে রেডার কথাটির সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত। কিন্তু 'রেডার' বলতে কি বোঝায় এবং তার কার্যকারিতা কি সে সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা সুস্পষ্ট নয়।

রেডার কথাটি এসেছে ইংরেজি 'রেডিও ডিটেকশন অ্যান্ড রেঞ্জিং' কথাগুলি থেকে। অর্থাৎ বেতার তরঙ্গের সাহায্যে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ও দূরত্ব নির্ণয়ের জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তা 'রেডার' নামে অভিহিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই রেডারকে কার্যক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়। এবং ঠিকভাবে বলতে গেলে রেডারের আবিষ্কার ওই সময়েই হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী প্রচন্ড বোমা বর্ষণ করে ইংল্যান্ডকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু রেডারের সাহায্যে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর চালকেরা জার্মান বিমানের আগমন সংকেত আগে থেকেই জানতে পারতেন এবং সময় থাকতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন।

১৯২০ সাল নাগাদ মার্কিন নৌ-গবেষণাকেন্দ্রে এ এইচ টেলর এবং এল সি ইয়ং রেডার নিয়ে প্রাথমিক গবেষণা করেন। এই দুজন বিজ্ঞানী উচ্চ কম্পনাঙ্কের বেতারতরঙ্গ পাঠিয়ে এবং তার প্রতিধ্বনি বিশ্লেষণ করে পোটোম্যাক নদীর বুকে জাহাজের উপস্থিতি সনাক্ত করেছিলেন। তাঁদের সেই প্রাথমিক গবেষণার সূত্র অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে উন্নত ধরনের রেডার উদ্ভাবিত হয়। উন্নত ধরনের রেডার-যন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে যাঁদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী এম এল ই ওলিফ্যান্ট এবং ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী ডঃ লী এ দু ব্রিজ।

রেডার-যন্ত্রের আর এক নাম দেওয়া যেতে পারে 'ইকোমিটার'। আমরা জানি 'ইকো' শব্দের অর্থ প্রতিধ্বনি। তাহলে ইকোমিটার বলতে বোঝায় প্রতিধ্বনি-পরিমাপক যন্ত্র। এখন প্রতিধ্বনি বলতে আমরা সাধারণত শব্দতরঙ্গের প্রতিফলনকে বুঝি। যদি আমরা একটা শূন্য প্রকোষ্ঠে শব্দ করি তাহলে সেই শব্দ প্রকোষ্ঠের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হবে এবং সেই প্রতিধ্বনি আমাদের কানে এসে বাজবে। রেডারযন্ত্রে অবশ্য শব্দতরঙ্গের পরিবর্তে বেতারতরঙ্গ ব্যবহার করা হয়।

আমরা জানি, প্রকোষ্ঠটি (যেখানে আমরা শব্দ করেছিলুম) যদি খুব বড় হয় তাহলে আমরা যে শব্দ করলুম তার প্রতিধ্বনি আমাদের কাছে পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হবে। কারণ শব্দকে এখন বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শব্দের প্রতিধ্বনি শুনে কোনো বস্তুর (যা থেকে শব্দ প্রতিহত বা প্রতিফলিত হয়ে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়েছে) দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। কিভাবে তা করা যায় দেখা যাক। মনে করুন, আমরা একটা ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তার বেশ কিছু দূরে খুব উঁচু একটা স্তূপ আছে। এখন আমরা নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে বন্দুকের আওয়াজ করলুম। বন্দুকের শব্দ ঐ স্তূপে আঘাত পেয়ে প্রতিফলিত হবে এবং আমরা ঐ প্রতিফলিত শব্দ প্রতিধ্বনিরূপে শুনতে পাব। যে সময়ে আমরা শব্দ করেছি এবং যেসময়ে আমরা তার প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছি, ঘড়ির সাহায্যে সেই দুই সময়ের ব্যবধান পরিমাপ করা যায়। ধরা যাক, এই সময়ের ব্যবধান ১ সেকেন্ড, অর্থাৎ শব্দ করবার ১ সেকেন্ড পরে আমরা তার প্রতিধ্বনি শুনেছি। আমরা জানি, শব্দের গতি সেকেন্ডে ৩৩১০০ সেন্টিমিটার। যেহেতু আমরা ১ সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনি শুনেছি, তাহলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ঐ সময়ে শব্দতরঙ্গ ৩৩১০০ সেন্টিমিটার পথ অতিক্রম করেছে। অতএব আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে শব্দ করেছিলুম সেখান থেকে স্তূপটির দূরত্ব হবে ১৬৫৫০ সেন্টিমিটার।

এইভাবে প্রতিধ্বনি শুনে আমরা বস্তুটির দূরত্ব পরিমাপ করতে পারি। আমরা যদি কোনো বস্তুর দূরত্ব নিখুঁতভাবে নির্ণয় করতে চাই, তাহলে আমাদের খুব জোরে ও বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছোট শব্দ (যেমন ধরুন ক শব্দটি) করতে হবে। শব্দটি ছোট না হলে অভীষ্ট বস্তুর বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিফলিত শব্দ প্রতিধ্বনিকে পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করতে দেবে না।

এই তথ্যের ওপরই রেডার যন্ত্রের কর্মপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। আগেই বলা হয়েছে, রেডারযন্ত্রে শব্দতরঙ্গের পরিবর্তে বেতারতরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, রেডারের সাহায্যে কোনো বস্তুর স্থান নির্ণয় করবার জন্যে উচ্চশক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-চৌম্বক স্পন্দনের প্রয়োজন। এই স্পন্দন এক সেকেন্ডের প্রায় এক-সহস্রাংশ সময় অন্তর বেশ কিছুক্ষণ পাঠাতে হবে। এই বিশেষ ধরনের বিদ্যুৎ-চৌম্বক স্পন্দন ভালভ-এর সাহায্যে করা হয়। বেতারযন্ত্রে যে ভালভ ব্যবহৃত হয়, সেই ভালভগুলি ঠিক সেই জিনিস না হলেও অনেকটা সেই ধরনের। স্পন্দনগুলিকে অবশ্য ঠিক একই সময়ের ব্যবধানে পাঠাতে হবে। প্রতিফলিত তরঙ্গের স্পন্দনগুলিকে মাপবারও বিশেষ প্রয়োজন। এই স্পন্দনগুলিকে পরিমাপ করা হয় ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ নামে যন্ত্রের সাহায্যে। স্পন্দন প্রেরণ এবং প্রতিফলিত স্পন্দন গ্রহণ—এই দুই সময়ের মধ্যে যে ব্যবধান তা নির্ণয় করবার জন্যেই এত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা এবং এই সমস্ত যন্ত্রপাতির একত্র সমাবেশই রেডারযন্ত্র নামে পরিচিত।

যে বেতারতরঙ্গ কোনো বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্যে বেতারযন্ত্রে ব্যবহার করা হয়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যদি ১০ সেন্টিমিটার হয় তাহলে রেডার যন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। এই ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতারতরঙ্গ উৎপন্ন করা হয় ম্যাগনেট্রন নামে একরকম যন্ত্রের সাহায্যে। বর্তমানে আরও উন্নত ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে ১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতারতরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়।

আধুনিক বিজ্ঞান জগতে রেডার একটি অপরিহার্য যন্ত্র। বিমানচালক এবং জাহাজের নাবিকদের কাছে রেডার আজ অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। রেডারের সাহায্যে জাহাজের চালক দেখতে পান—কোথায় আলোঘর, কোথায় জলের ওপর ভাসমান পাহাড় এবং সেই সমস্ত বস্তুর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সহস্র সহস্র জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারেন। নিরাপদে বিমানঘাঁটিতে অবতরণের জন্যেও রেডার ব্যবহার করা হয়। আমাদের দমদম বিমানঘাঁটিতে এই উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী রেডার বসানো হয়েছে।

আবহাওয়াবিদদের কাছেও রেডার একটি অতিপ্রয়োজনীয় যন্ত্র। বৃষ্টিকণা রেডার থেকে প্রেরিত বেতারতরঙ্গকে প্রতিফলিত করতে পারে। ধাতু, মিশ্রিত ধাতু বা তেলের খনিগুলি কোন স্থানে অবস্থিত তা-ও রেডারের সাহায্যে নিশ্চিতরূপে বলা যায়। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের বিমানের উপস্থিতি নির্ধারণে রেডারের বিশেষ কার্যকারিতা আগেই বলা হয়েছে। আর আজ মহাকাশ গবেষণায় রেডারের ভূমিকা যে কতখানি তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধি নির্ধারণে রেডার বিশেষ সহায়তা করে।

ক্যান্সার-এর একটি মূল্যবান প্রতিষেধক

আমাদের হিমালয় অঞ্চলে নানা বনৌষধি পাওয়া যায়, যার কার্যকারিতা সম্পর্কে এদেশে বিশেষ গবেষণা হয়নি। সম্প্রতি হিমালয় অঞ্চলে উৎপন্ন 'কুড়' নামে একটি বনৌষধির ক্যান্সার প্রতিষেধক ভেষজরূপে কার্যকারিতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে এই বনৌষধিটি বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকায় যথেষ্ট পরিমাণে চালান যাচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বলছেন, কুড়-এর শিকড়ে ক্যান্সারের প্রতিষেধক বিশেষভাবে দেখা যায়। তাঁরা বর্তমানে কুড় নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এক-একটি কুড় গাছে প্রায় দেড়-দুই কিলোগ্রাম পরিমাণ শিকড় জন্মায়। যে জমিতে বছরে কমপক্ষে তিন ফুট তুষার জমে, সেইসব জমিতেই কেবল কুড় জন্মে থাকে। এই বনৌষধির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তুষারের নিচে থাকার সময় কুড়-এর পাতা মরে গেলেও আসলে গাছের কোনো ক্ষতি হয় না। তিন বছর জমির নিচে থাকার পর গর্ত খুঁড়ে কুড়-এর শিকড় বার করে নেওয়া যায়।

আমাদের দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র আছে। সেখানে কুড় নিয়ে কোনো গবেষণা হয়েছে কিনা আমরা জানি না। তবে যে বনৌষধিটি বিদেশের গবেষণাগারে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে তার সম্পর্কে যথোচিত গবেষণা আমাদের দেশেও হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। —রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পাঁচ)

খবরের কাগজ বা চলতি রাজনৈতিক ডিক্সনারীর ভাষায় 'বিগ পাওয়ারে'র এম্বাসীগুলোর ব্যাপারই আলাদা। ওখানে যে কি হয়, আর কি হয় না, তা স্বয়ং অল মাইটি গডও জানেন না। অনেকটা মধ্যযুগীয় হারেমের মত আর কি। কিছু বোঝা যায়, কিছু দেখা যায়, কিছু শোনা যায়, কিছু অনুমান করা যায়। তবুও সব কিছু জানা অসম্ভব। ওদের ওখানে কে সত্যিকার ডিপ্লোম্যাট বা প্রেস অফিসার বা গোয়েন্দা বিভাগের লোক, তা স্বয়ং অ্যাম্বাসেডরের অন্তর্যামীও জানেন না।

বিগ পাওয়ারের অ্যাম্বাসেডরদের অবস্থা অনেকটা বড় বড় কোম্পানীর পাবলিক রিলেসান্স ম্যানেজারের মত। কোম্পানীর পরিচালনা বা অর্থকরী ব্যাপারে বা গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের ক্ষেত্রে পাবলিক রিলেসান্স ম্যানেজারের কোন ভূমিকা নেই কিন্তু প্রচার বেশী। অ্যাম্বাসেডর বক্তৃতা দেবেন, ছবি ছাপা হবে, এম্বাসীর সবাই তাঁকে মান্যগণ্য করবে, কিন্তু রাজনৈতিক চাবিকাঠি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যের কাছে থাকে।

ভাগ্যবান ডিপ্লোম্যাটেরও অভিভাবক থাকবেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু বিগ পাওয়ারের ডিপ্লোম্যাটদের প্রায় ছায়ার মত অনুসরণ করে ওদেরই সহকর্মী—গোয়েন্দা। আবার এই গোয়েন্দাদের নজর রাখার জন্যও আছে ব্যাপক ব্যবস্থা—কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।

বিগ পাওয়ারের চান্সেরীগুলো যেন এক-একটি সতীনের সংসার! কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, কেউ কাউকে ছাড়তেও পারে না! তাইতো সবার মনেই সন্দেহ আর অশান্তি।

ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে ওসব বালাই নেই। বিগ পাওয়ারের লুকোচুরি খেলার প্রয়োজন আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের দেশে কত কি হচ্ছে। বিপরীত পক্ষের সেসব গোপন খবর জানার জন্য ওরা হরির লুঠের বাতাসার মত শত-শত সহস্র-সহস্র কোটি-কোটি টাকা ব্যয় করতে দ্বিধা করে না। আমাদের দেশের মানুষকে খেতে-পরতে দেওয়ারই পয়সা নেই; সুতরাং লুকিয়ে লুকিয়ে *অপরের সর্বনাশ করার* জন্য অর্থ ব্যয় অসম্ভব। আমাদের চান্সেরীগুলো সতীনের সংসার নয়। কিছু কিছু অহংকারী বা দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক থাকলেও অবিশ্বাসের অন্ধকার নেই কোথাও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইণ্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক মিশনের সবাই এক বৃহত্তর পরিবারের মত বসবাস করেন। ভাগাভাগি করে নেন নিজেদের সুখ-দুঃখ।

ফরেন সার্ভিসে ঢুকে প্রথম ফরেন পোস্টিং পাবার পরই দয়ালের বিয়ে হলো। বিয়ের পর মৃণালিনীকে নিয়ে বন-এ ফিরল, তখন কি কাণ্ডটাই না হলো।...

...কর্মচঞ্চল ফ্রাঙ্কফার্ট এয়ার পোর্টের চির কর্মব্যস্ত কর্মচারীরাও থমকে দাঁড়ালেন। শাড়ী পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মেয়ের দল সারি বেঁধে লাইন করে দাঁড়ালেন। কারুর হাতে শাঁখ, কারুর হাতে বরণডালা। মাস্টার অফ সেরিমনিজ শ্রীবাস্তব কোন ত্রুটি করেননি। এয়ার পোর্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েছিল টার্মিনাল বিল্ডিং-এর বাইরে, ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডের কাছে এই অনন্য অভ্যর্থনা জানাবার। টেলিভিশন কোম্পানীতে খবর দিয়েছিল, ট্রাডিশন্যাল ইণ্ডিয়ান ওয়েলকাম সেরিমনি 'টেক' করে টেলিকাস্ট করার জন্য।

এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনটা ট্যাক্সি করে এসে থামতেই মাস্টার অফ সেরিমনিজ ইঙ্গিত করল। জন-পঞ্চাশেক ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে হাতে তালি দিতে দিতে গাইতে শুরু করল রাজস্থানী ফোক সঙ। এসো রাজপুত্র, এসো রাজকন্যা, নতুন জীবনের পরিপূর্ণ সুরাপাত্র পান কর। প্লেনের দরজা খুলতেই শুরু হলো শঙ্খধ্বনি। দয়াল আর মৃণালিনী মুগ্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল দরজার মুখে। নীচে নেমে আসতেই মেয়েরা করল বরণ নববধূকে। ধুতি-পাঞ্জাবি শেরওয়ানী-চাপকান পরে পুরুষের দল মালা পরালেন দয়ালকে, মৃণালিনীর হাতে তুলে দিলেন ফুলের তোড়া।

অ্যাম্বাসেডর আসেননি ইচ্ছা করেই। তবে স্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন, যাও, যাও, তুমি যাও। আমার সামনে হয়ত ওরা ঠিক সহজ হয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে পারবে না।

মাস্টার অফ সেরিমনিজ সব অনুষ্ঠান শেষে এগিয়ে নিয়ে গেলেন অ্যাম্বাসেডর-পত্নীকে। সন্তানতুল্য দয়ালকে আশীর্বাদ করলেন, নববধূর সিঁথিতে পরিয়ে দিলেন সিঁদুর।

সন্ধ্যায় জার্মান টেলিভিশনে এয়ার পোর্টের এই অনুষ্ঠান টেলিকাস্ট করা হলো। রাতারাতি দয়াল ও মৃণালিনী বিখ্যাত হয়ে গেল। বন-এ দয়াল মৃণালিনীকে নিয়ে কতদিন ধরে চলল আনন্দোৎসব।

সেদিন বন ইণ্ডিয়ান অ্যাম্বাসীর যাঁরা দয়াল-মৃণালিনীকে নিয়ে এই আনন্দোৎসব *করেছিলেন, তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছেন সারা* দুনিয়ায়। কেউ অস্ট্রেলিয়া, কেউ ভিয়েতনাম, কেউ ওয়াশিংটন, কেউ মস্কো। কত কি হয়ে গেছে এর মধ্যে। কত উত্থান, কত পতন। তবুও কেউ ভুলতে পারেননি দয়াল আর মৃণালিনীর কথা। যে মৃণালিনীকে নিয়ে ওঁরা এত আনন্দ করেছিলেন, সে মা হতে পারল না জেনে সবাই দুঃখিত, মর্মাহত। পর পর তিন তিনটি সন্তান নষ্ট হলো মৃণালিনীর। একটা ফুটফুটে সুন্দর শিশু দেখলে কাঙালিনীর মত ছুটে যায় মৃণালিনী। চান্সেরীর বন্ধু-বান্ধবদের বাচ্চাদের নিয়েই আজ সে দিন কাটায়।

তরুণ দুঃখ পায় মৃণালিনীকে দেখে, সান্ত্বনা পায় তার দুঃখের এতগুলো অংশীদার দেখে।

মৃণালিনী তরুণকে বলত, জানেন ভাই, প্রথম প্রথম নিজেকে সামলাতে পারতাম না। একলা থাকলেই চুপচাপ বসে বসে চোখের জল ফেলতাম। পার্টিতে রিসেপশনে-ককটেল-এ গিয়েছি কিন্তু মুহূর্তের জন্য মনে শান্তি পাইনি। কিন্তু আজ?

বন্ধুপত্নীকে আর বলতে হয় না। বাকিটুকু তরুণ জানে। জানে নায়েক, রঙ্গস্বামী, চ্যাটার্জী, শ্রীবাস্তবের ছেলে-মেয়েরাই ওর সারা জীবন জুড়ে রয়েছে। অস্ট্রিয়ায় থাকবার সময় মিসেস শ্রীবাস্তব অসুস্থা হলে দুটি বাচ্চাই তো মৃণালিনীর কাছে থেকেছে। ছোট বাচ্চাটা তো নিজের বাপ-মার কাছে যেতেই চায় না! দয়াল যেখানেই বদলী হোক না কেন, মৃণালিনীর একটা সংসার সেখানে আছেই।

'আচ্ছা দাদা, তোমার বাচ্চা হলে আমার কাছে রাখবে তো?' মৃণালিনী সত্যি সত্যিই জানতে চায় তরুণের কাছে।

তরুণ মুচকি হাসে।

'হাসছ কেন দাদা?'

'হাসব না?' একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। একটু পরে, একটু যেন তলিয়ে যায়।

বলে, ওসব কথা আজ আর ভাবি না, ভাবতে পারি না, ভাবতে চাই না।

সত্যিই কি সেসব ভাবে না তরুণ? লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করে নিঃসঙ্গ তরুণ নিশ্চয়ই সে স্বপ্ন দেখে। কত কি ইচ্ছে করে, কত কি মনে পড়ে তার!

'জান মা, কলেজের একজন লেকচারার আমার হাত দেখে কি বল্লেন?'

'কি বল্লেন?'

'বল্লেন আমার নাকি অনেক দেরীতে বিয়ে।' তরুণ মুচকি মুচকি হাসে।

'বাপ-বেটায় বেরিয়ে যাবে আর আমি একলা একলা এই ভূতের বাড়ী পাহারা দেব, তাই না?' মা বেশ রাগ করেই বলেন।

রাগ করবেন না? উনি যে বরাবর স্বপ্ন দেখেছেন বি-এ পাশ করার পরই ছেলের বিয়ে দেবেন, ইন্দ্রাণীর মত একটা বৌ আনবেন ঘরে। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে কতদিন ইন্দ্রাণীকে বলেছেন, দশটা নয়, পাঁচটা নয়, একটা মাত্র ছেলে আমার। খুব ইচ্ছা করে ছেলে-বৌ-এর সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াই। ঢাকায় যেন আর মন টেঁকে না।

'কেন মাসিমা আমরা তো আছি', হাসি হাসি মুখে ইন্দ্রাণী বলে।

'তোকে কি আর আমার কাছে চিরকাল ধরে রাখতে পারব মা? কত বড় ঘরে তোর বিয়ে হবে, কোথায় চলে যাবি তার কি কোন ঠিক-ঠিকানা আছে?' কথাগুলো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ছোট্ট দীর্ঘ-নিঃশ্বাসও পড়ে।

পরে ইন্দ্রাণী তরুণকে বলেছিল, 'জান মাসিমা কি বলছিলেন?'

'কি?'

'বলছিলেন আমার কত বড় ঘরে বিয়ে হবে, আমি নাকি কোথায় চলে যাব।'

বইটা উল্টে রেখে তাচ্ছিল্য ভরে তরুণ জবাব দেয়, 'ডাকাতদের মত কোঁকড়া চুল-ওয়ালা মেয়েকে রমনার কোচোয়ানরা ছাড়া আর কেউ বিয়ে করলে তো?'

চোখ দুটো ঘুরিয়ে ইন্দ্রাণী জবাব দেয়, 'তুমি বুঝি এবার পরীক্ষার পর কোচোয়ান-গিরি শুরু করবে?'

তরুণ হাসতে হাসতে নিজের হার স্বীকার করে।

'এই বুদ্ধি নিয়ে তোমার কোন চুলোয় জায়গা হবে, তাই ভাবি। আমি না থাকলে যে তোমার কি দুর্গতিই হবে?'

শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে এখন যৌবনের প্রতিটি দিন পাশে পেয়েছে ইন্দ্রাণীকে, সাহায্য নিয়েছে প্রতি পদক্ষেপে।

সেদিনের ঢাকা হারিয়ে গেছে তরুণের জীবন থেকে, কিন্তু দূরে সরে যায়নি ইন্দ্রাণীর স্মৃতি। ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্র কত মেয়ের সান্নিধ্য পেয়েছে কিন্তু ইন্দ্রাণীর স্মৃতি চাপা দিতে পারেনি কেউ। বিধাতা-পুরুষের নির্দেশে সে যেন আজও তারই পথ চেয়ে বসে আছে। বন্ধু-বান্ধব সহকর্মী-দের হাসি-খুশিভরা সংসার দেখে, তাঁদের ছেলেমেয়েকে আদর করে, ভালবাসে। কত আনন্দ পায়। দিনের শেষে যখন নিজের শূন্য ফ্ল্যাটে ফিরে আসে, তখন পিকাডেলী সার্কাস—টাইমস স্কোয়ার—গিঞ্জার সব নিওন লাইটগুলো একসঙ্গে জ্বলে উঠলেও তরুণের অন্ধকার মনে একটুও আলোর ইসারা দিতে পারে না। ইন্দ্র-পত্নী ইন্দ্রাণীর মত হয়ত তাঁর ইন্দ্রাণী সুন্দরী ছিল না সত্য, কিন্তু সে ছিল অপরূপা, অনন্যা। কিশোরী ইন্দ্রাণী যখন ম্যাট্রিক পাশ করে ইডেন কলেজে ভর্তি হলো, শাড়ী পরতে শুরু করল, তখন যেন রাতারাতি ওর দেহে বন্যা এলো। চোখের নিমেষে যেমন পদ্মার ভাবান্তর হয়, ইন্দ্রাণীর সর্বাঙ্গে তেমন ভাবান্তর দেখা দিল। মেঘ দেখলেই মেঘনার জল নাচতে থাকে আর অতদিনের অত পরিচিতা মেয়েটাকে দেখেও তরুণের মনে দোলা দিতে শুরু করল।

শীতের সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া এম-ব্যাঙ্কমেন্ট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তরুণ একটু দাঁড়ায়। ফেন্সিং-এ ভর দিয়ে টেমস-এর দিকে তাকায়। চারদিকের কুয়াশা যেন তরুণকেও গ্রাস করে।... এই ক'বছরে ইন্দ্রাণী নিশ্চয়ই আরো পূর্ণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, ওর ঐ স্বচ্ছ কালো চোখের বিদ্যুৎ আরো উজ্জ্বল আরো স্পষ্ট হয়েছে। ওর ঐ ঘন কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো কোনদিনই শাসন মানত না। যে এক গোছা চুল সব সময় কপালের পর উড়ে বেড়াত, সেগুলো তো এতদিনে আরো দুরন্ত, আরো অবাধ্য হয়ে ওকে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

ঘন কুয়াশা পাতলা হলো। ও পারের রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলের আলোগুলো বেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তরুণের মনের স্বপ্নময় কুয়াশাও কেটে যায়, ফিরে আসে রূঢ় বাস্তবে, নির্মম ইন্দ্রাণী-বিহীন নিঃসঙ্গ জীবনে।

মনটা কদিন ধরেই ভাল না। ডেপুটি হাই-কমিশনারের সঙ্গে কাজ করতে একটুও ইচ্ছা করে না। বুড়ো-হাবড়া হাই-কমিশনার দেশসেবার বিনিময়ে কেনসিংটনের ঐ বিরাট প্রাসাদ ও রোলস রয়েস ভোগ করছেন। কিছু কাগজপত্র সই করতে হয় বটে, তবে নিন্দুমাত্র দায়িত্ব-কর্তব্যের বালাই নেই। ডেপুটি হাই-কমিশনারই সর্বময় কর্তা!

ডেপুটি হাই-কমিশনার মিঃ ব্যাস নিঃসন্দেহে একজন উঁচুদরের কূটনীতি-বিদ। বেনিয়া ইংরেজ পর্যন্ত দর কষাকষিতে মাঝে মাঝে হার মানতে বাধ্য হয়। এর আগে উনি যখন অস্ট্রেলিয়ায় ছিলেন তখন ভারতীয় ইমিগ্রান্টদের নিয়ে এক মহা হৈ-চৈ পড়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার কিছু সংবাদপত্র ও রাজনীতিবিদ এমন হাহাকার করে উঠলেন যেন কয়েক ডজন ব্ল্যাক ইণ্ডিয়ানকে অস্ট্রেলিয়ায় পাকাপাকিভাবে থাকার অনুমতি দিলে আকাশ ভেঙে পড়বে। মিঃ ব্যাস তখন কানে কানে ফিস-ফিস করে ও'দের বলে-ছিলেন, কিছু মধ্যযুগীয় আদিবাসী ছাড়া অস্ট্রেলিয়ান বলে কোন জাত নেই। তোমরা সবাই একদিন ইমিগ্রান্ট হয়েই এ দেশে এসেছিলে। সুতরাং ইণ্ডিয়ানদের এত ঘেন্না করছ কেন?

এই ছোট্ট একটা চিমটি কাটাতেই অস্টেলিয়ার ঐ সংবাদপত্র ও রাজনীতি-বিদরা হুঁস ফিরে পেয়েছিলেন এবং কাজ হয়েছিল।

কূটনীতিবিদ ব্যাস সাহেবের নিন্দা তাঁর চরম শত্রুরাও করবে না। তবে সন্ধ্যার পর বা কাজ-কর্মের অবসরে সুন্দরী-সান্নিধ্য পেলে ভুলে যান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়। হাজার হোক সাবেকী মানুষ! শিকার করেন শুধু ভারতীয়।...

এডিনবরা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য ভারতবর্ষ থেকে একদল শিল্পী এলেন লণ্ডনে। কলকাতার মিস বলাকা রায় ও বোম্বের সুজাতাও এলেন। ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ ও'দের থাকার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মিঃ ব্যাস গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলেন, ডোন্ট বদার অ্যাবাউট আওয়ার আর্টিস্টস। আমাদের আর্টিস্টদের থাকার ব্যবস্থা আমরাই করব।

ব্যাস সাহেব আর্টিস্টদের জানিয়ে দিলেন, ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা করলেই বড় বড় হোটেলে থাকতে হবে ও তার ফলে আপনাদের সীমিত ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে বিপদে পড়তেন। তাই আমরাই ব্যবস্থা করছি।

কলকাতা থেকে মিস রায় লিখলেন, মেনী মেনী থ্যাংকস। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব, তা ভেবে পাচ্ছি না। ফেস্টিভ্যাল কর্তৃপক্ষ ইনভিটেশন পাঠিয়েছেন বলে রিজার্ভ ব্যাংক মাত্র ২৭ পাউন্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ মঞ্জুর করেছে। দশ দিনের জন্য সাতাশ পাউন্ড! ভাবলেও মাথা ঘুরে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম এসকর্ট হিসেবে ছোট ভাইকে সঙ্গে নেব, কিন্তু এই ফরেন এক্সচেঞ্জ...।

শেষে লিখলেন, আপনার ভরসাতেই আসছি। দয়া করে দেখবেন। এয়ার পোর্টে যদি কাউকে পাঠান তবে বিশেষ কৃতজ্ঞ হবো।

ব্যাস সাহেব মনে মনে হাসলেন। উত্তর দিলেন পরদিনই, কিছু ঘাবড়াবেন না মিস রায়। আপনাদের সাহায্য করা আমার কর্তব্য। সব ব্যবস্থা ঠিক থাকবে। যদি কাইন্ডলী একুশে বি-ও-এ-সি ফ্লাইট থ্রি-সিক্স-ওয়ানে আসেন, তবে বড় ভাল হয়।

ডেপুটি হাই-কমিশনার সাহেব এমনভাবে প্রোগ্রাম ঠিক করলেন যে দুজন আর্টিস্ট একসঙ্গে এলেন না। তাছাড়া এক একজনকে এক-একটা হোটেলে ব্যবস্থা করলেন। কার্লটন টাওয়ারে সুজাতা, স্ট্র্যান্ড প্যালেসে মিস রায়। বোম্বের উঠতি নায়ক প্রেমকুমার? কেনসিংটন প্যালেসে।

সবাইকেই এক কৈফিয়ত, লণ্ডনে এখন ভীষণ পুরোপুরি টুরিস্ট সীজন। ট্রান্স-আটলান্টিক চার্টার্ড ফ্লাইটে রোজ কয়েক হাজার আমেরিকান আর কানাডিয়ান আসছে। কিভাবে যে আমরা হোটেলে রিজার্ভেশন পেয়েছি, তা ভাবলেও অবাক লাগে।

সুজাতা দেবী বছর তিনেক আগে বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল দেখে দেশে ফেরার পথে মাত্র দু'দিনের জন্য লণ্ডনে এসেছিলেন শুধু বোম্বের বাজারে নিজের দাম বাড়াবার জন্য। সুতরাং ধরতে গেলে তিনজনেই একেবারে আনকোরা। নিউকামারদের হাত করা খুব সহজ। টালিগঞ্জের ফিল্ম পাড়ায় বা পার্ক স্ট্রীটের ঐ দু-চারটে রেস্তোরাঁয় চালিয়াতি করা সহজ, কিন্তু লণ্ডনের মত মহা মহানগরে এসে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে রীতিমত কেরামতি দরকার। অজস্র অর্থ থাকলে তবু সম্ভব, কিন্তু সাতাশ পাউণ্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে?

হিথরো এয়ার পোর্টে মিঃ ব্যাস ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বল্লেন, মিস রয়! দিস ইজ ব্যাস।'

'গুড আফটারনুন! গুড আফটারনুন! আপনি নিজে কষ্ট করে এয়ার পোর্টে এসেছেন?'

কেবিন ব্যাগ—হ্যাণ্ড ব্যাগ ঠিক করে ধরতে ধরতে বল্লেন, 'ছি-ছি, আমার জন্য আপনাকে কি দুর্ভোগই না সহ্য করতে হলো।'

ব্যাস সাহেব মনে মনে ভাবলেন, 'আসব না সুন্দরী! তোমার মত সুন্দরী অথচ ইগনোরেণ্ট গেস্টদের শিকার করবার জন্য রোজ এয়ার পোর্টে আসতে রাজী আছি।'

নিজের অজ্ঞাতেই ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠল। —'হাজার হোক আপনি একজন সেলিব্রেটেড আর্টিস্ট। আপনাদের সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য।'

নিজের গাড়ীতে নিজে ড্রাইভ করে মিস রায়কে নিয়ে গেলেন স্ট্র্যাণ্ড প্যালেসে। গাড়ী থেকে নমার আগে মিস রায়ের কোটের দুটো বোতাম আটকে দিয়ে উপদেশ দিলেন, বোতামগুলো ভাল করে আটকে নিন। হঠাৎ কখন ঠাণ্ডা লেগে যাবে, তা টেরও পাবেন না।

ফিল্ম স্টার হলেও বাঙালী মেয়ে তো! ব্যাস সাহেব অত আপন জ্ঞানে কোটের বোতাম লাগাবার সময় বলাকা রায় একটু অস্বস্তি বোধ করেছিল। কিন্তু একে লণ্ডন, তারপর এমন পরম হিতাকাংক্ষী; তাই আপত্তি করা তো দূরের কথা, হাসিমুখেই ধন্যবাদ জানিয়েছিল। তাছাড়া সিনেমা-অ্যাকট্রেস হয়েও কলকাতা শহরে ঠিক সামাজিক স্বীকৃতি বা মর্যাদা পান না মিস রায়। একটু হাসি, একটু কথা, একটু মেলামেশা অনেকেই পছন্দ করেন, কিন্তু স্বীকৃতি-মর্যাদা দিতে ও'দের বড় কুণ্ঠা। লণ্ডনে ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনারের এমন সহজ সরল মেলামেশা ও সাহায্যে মিস রায় বরং কৃতজ্ঞ হলেন।

একটু জল, একটু সার ছড়ালে ফসল হবেই। জমিটা উর্বর হলে সে ফসল আরো ভাল হয়।

এই সামান্য সৌজন্যের সার ছড়িয়েই ব্যাস সাহেব শান্তি পেলেন না। ওয়েস্ট মিনিস্টার, সেন্ট জেমস পার্ক, বাকিংহাম প্যালেস, রিজেন্ট পার্ক, হাইড পার্ক মার্বেল আর্চ, জুলজিক্যাল গার্ডেন, কেনসিংটন গার্ডেন দেখালেন, বেড়ালেন। তারপর মিস রায় এডিনবরা থেকে ফিরে এলে উদার ডেপুটি হাই-কমিশনার সাহেব তাঁকে নাইট ক্লাব দেখালেন, উইক-এণ্ডে ব্রাইটনের সমুদ্র পাড়েও নিয়ে গেলেন।

মৌমাছি শুধু মধুর জন্যই ফুলের কাছে যায় ফুলের সৌন্দর্য বা সান্নিধ্য উপভোগের জন্য নয়। ব্যাস সাহেবও ঠিক তাই। নিজের কাজ-কর্ম কাউন্সিলার ও তরুণের পর চাপিয়ে দিয়ে মিছিমিছি বলাকা রায়ের পিছনে ঘুরে বেড়াননি, একথা হাই-কমিশনের সবাই জানত।

মিসেস ব্যাস তখন ইণ্ডিয়ায় থাকায় ব্যাস সাহেবের লীলা খেলা আরো জমেছিল। বলাকাকে বিদায় দেবার পর সুজাতাকে তো নিজের আস্তানাতেই নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অনারে ডিনার-ককটেল হলো। ডেইলি মীরর-এর ফটোগ্রাফারকে এনে ফিচার ছাপাবার ব্যবস্থাও হলো।

বিদেশ-বিভুঁইতে বলাকা রায় বা সুজাতার মত কত কে আসেন। ভারতবর্ষের পরিচিত সমাজ-সংসার থেকে দূরে এসে এ'রা যেন কেমন মুক্ত হন বহুদিনের বহু রীতিনীতি সংস্কার থেকে। কেমন যেন শিথিল হয় সব বন্ধন। নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ দেখার আনন্দে মেতে ওঠে বলাকা রায়-সুজাতা ও আরো অনেকে। আর সেই বন্ধনহীন আনন্দের ফাটলের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ঢুকে পড়েন ব্যাস সাহেব।

যে তরুণ সারা জীবন ধরে ভালবেসেছে, স্বপ্ন দেখেছে শুধু ইন্দ্রাণীকে, সে সহ্য করতে পারে না ব্যাভিচারী ব্যাসকে। অথচ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অল্ডউইচের বিরাট হাই-কমিশনে শুধু ঐ একটি মানুষকে নিয়েই তাঁর সংসার। কূটনৈতিক দুনিয়ার বিরাট চাকচিকা-রোশনাইয়ের মধ্যেও তরুণ যেন আলোর নিশানা খুঁজে পায় না। কর্তাদিনের কত স্বপ্নের লণ্ডনও যেন ভাল লাগে না তাঁর। এত বড় শহরের এত পরিচিতের মধ্যেও নিঃসঙ্গতা দাহ যেন তাকে আরো পীড়া দেয়।

।

একটু আগে বৃষ্টি ধরেছে। না, আর দেরী করা ঠিক না—এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর। একটি বিশুদ্ধ ধ্রুপদী বর্ষণ শুরু হলে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে। তাই সময় থাকতে ওঠা দরকার। ওঠা তো দরকার, কিন্তু উঠব কি করে। বৃষ্টি থেমেছে বাইরে, কিন্তু ভেতরে তখনো অঝোর ধারায় কবিতায়, গানে রবীন্দ্র-বরিষণ। পঁয়তাল্লিশে পূর্ণ-যুবক ব্রজসুন্দরবাবু সবে মেঘদূত আবৃত্তি শেষ করে বর্ষণশেষের রেশটুকু মেলে ধরেছেন গানে—ঘর জুড়ে ঝম-ঝম করে বৃষ্টিধারার মত নূপুর বাজিয়ে চলেছে রবীন্দ্র-সংগীতের সুর। এ ভরা আসর ছেড়ে মন উঠতে চায় না।

একদিন, মাত্র কয়েকটি সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টার পরিচয়, তাতেই বাঁধা পড়েছি এদের কাছে। আর যারা মধুর শৈশবের স্বর্ণ-সুন্দর বছরগুলি এখানে কাটিয়ে গেছেন তারা কি কোনদিনই এই মায়ার বাঁধন কাটাতে পারেন? পারেন না। তাই আজও সময় পেলে শান্তিবাবু, পতিতবাবু, বিশ্বনাথবাবুরা ছুটে ছুটে আসেন তাঁদের অতিপ্রিয় হারানোর কৈশোরের খেলাঘরে, বড়িশা হাইস্কুলে।

এই স্কুলেরই শিক্ষকের সেই কবিতাটি বোধ হয় কোনদিনই এ যুগের ছাত্ররা ভুলতে পারবেন না—'বর্ষে বর্ষে দলে, আসে বিদ্যা মঠতলে......।' সেই সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অনেকদিন হল কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর ছাত্ররাই আজ রিটায়ার করছেন বা করার মুখে। একদিন যাঁদের 'কলরবে' ঘরগুলো ভরে ছিল, তাঁরা আজ নেই। তাঁদের ঠাঁই জুড়ে রয়েছে নতুনেরা। এক চিরতারুণ্যের বসন্তোৎসব চলেছে এইখানে। এই অরণ্যে পাতা ঝরে অগোচরে. অজস্র কিশলয়ের ভিড়ে জীর্ণদলের বিদায় ঘোষণা এখানে অশ্রুত। ইতিহাস শুধু নীরবে নিভৃতে রসসিঞ্চন করে চলে শিশু-তরুর মূলে। ভাদ্রশুরুর এক বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় সেই অরণ্যের বুকে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের তরে মনে হয়েছিল বুকের দু ইঞ্চি গভীরে যেখানে এক আশ্চর্য কম্পিউটার যন্ত্র অবিরত কাজ করে চলে বুঝিবা সেখানে ধরা পড়েছে নীরব রস-সিঞ্চনের গোপন রহস্যটুকু। সেই রহস্যের দুয়ার এবার উন্মুক্ত হোক।

১৮৫৬ সাল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন ভীষণ ব্যস্ত। কলেজ চালানোর সংগে সংগে তাঁকে তখন আরো অনেক কাজ করতে হচ্ছে। হুগলী, নদীয়া, বর্ধমান ও মেদিনী-পুরের গাঁয়ে গাঁয়ে মডেল স্কুল খুলছেন। আট মাস আগে ১ মে, ১৮৫৫ ডি, পি, আই, তাঁকে তৎকালীন বাংলা দেশের ছোটলাট হ্যালিডের নির্দেশে 'দক্ষিণ বাংলার বিদ্যালয়গুলির সহকারী ইন্সপেকটরের পদে' নিযুক্ত করেছেন। আট মাসে চারটি জেলায় কুড়িটি স্কুল খুলেছেন। আরো স্কুল খুলতে হবে। নিত্য-নতুন পরিকল্পনা মাথায় আসছে। নিশ্চয়ই কলেজের সহকর্মীদের কাছে এসব পরিকল্পনার কথা গোপন ছিল না। শুনে তাঁরাও উৎসাহী হয়ে ওঠেন যেমন হয়েছিলেন মুরাদপুরের জগন্মোহন তর্কালংকার।

জগন্মোহন পড়ান সংস্কৃত কলেজে, থাকেন মুরাদপুরে। কোথায় মুরাদপুর? কেন বড়শেতে। আজ যেটা বড়শে-বেহালার চৌরাস্তা বলে পরিচিত, সেখানে বীরেন রায় রোড ধরে পূর্বদিকে মাইলটাক হাঁটলে পৌঁছে যাবেন মুরাদপুরে। সে যুগে এই ছোট্ট পাড়াটি ছিল বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের আস্তানা। জগন্মোহন, জগন্মোহনের জ্ঞাতি, বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত সহকর্মী মদনমোহন থাকতেন এই মুরাদ-পুরে। বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে মদনমোহনের বাসায় বেড়াতে আসতেন। হাজার কাজের মাঝে মুহূর্তকয়েক বিশ্রাম নিতে এসেও তাঁর মন বিদ্রোহ করে উঠত বড়শে-বেহালার দৈন্যদশায়। হয়তো আলাপ-আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠত সেই ক্ষোভ—যে বড়শে-বেহালা শহর কলকাতার জন্মদাতৃ তার ঘরে ঘরে কেন অন্ধকার? কেন পাড়ায় পাড়ায় স্কুল নেই? সংস্কৃত কলেজের দুই

বড়িশা হাইস্কুল

এ

অধ্যাপক যে পল্লীতে বাস করেন সেখানে কেন আধুনিক শিক্ষার এত অভাব?

মুখের কথায় এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কাজে দেখাতে চেয়েছিলেন জগন্মোহন। স্কুল বসাতে হবে। মডেল স্কুল। স্বয়ং অধ্যক্ষমশাই নিজে যে সব স্কুল খুলেছেন দক্ষিণ বঙ্গের গাঁয়ে গাঁয়ে তারই অনুসরণে গড়ে উঠবে এই স্কুল। স্কুল তো খুলবেন, কিন্তু টাকা পাবেন কোথায় দরিদ্র অধ্যাপক? তাই ছুটে গেলেন বড়শের বিখ্যাত সাবর্ণ পরিবারের অন্যতম কর্তা সূর্যকুমার রায়-চৌধুরীর কাছে। অধ্যাপকের মনের কথা জানতে পেরে চৌধুরীমশাই বেজায় খুশী। শুধু চৌধুরীমশাই কেন সেই সঙ্গে 'বড়িশা দেশ-হিতৈষণী সভার' আরো তিনজন সদস্য তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধানাথ রায় ও ভুবনমোহন রায় মশাইও এগিয়ে এলেন। এঁরা এগিয়ে এলেন, সেই সঙ্গে পেছনের টান প্রবল হয়ে উঠল। প্রাচীন জমিদারী রক্ষণশীলতার তীব্র আকর্ষণ এ যুগে আমাদের পক্ষে অনুমান করাও অসম্ভব; সে যুগে কত ভাল কাজের ইচ্ছা যে এই বাধার সামনে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। জগন্মোহনের কপাল ভাল যে রক্ষণশীল দুর্গের অন্যতম প্রহরী সেদিন তাঁর ব্রতেই দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাই সব বাধা অতিক্রম করে সেদিন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল, ২৫ জানুয়ারী, ১৮৫৬ সাল।

আজ থেকে একশো চোদ্দ বছর আগে জমিদার বাড়ির 'সাজের আটচালায়' এই স্কুল প্রথম শুরু হয়। কে, কে, রায়চৌধুরী রোডে, বড়িশা গার্লস স্কুলের পেছনে সেই আটচালার সামান্য ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। আর সব ভেঙেচুরে গেছে, আছে শুধু কয়েকটা থাম। এই বাড়িতেই সূর্য-কুমারকে সেক্রেটারী করে, হেডমাষ্টার জানকীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় স্কুল প্রথম পা ফেলতে শুরু করে।

বছর চারেক বাদে স্কুলের ঠিকানা গেল বদলে। বড়িশার 'বেনাকীবাটির' জমিদাররা স্কুলের নিজস্ব আস্তানার জন্য জমি দিলেন। সেই জমিতে বাড়ি উঠতে আটচালা ছেড়ে স্কুল উঠে এল, ১৮৬০ সাল। পরের বছর সরকারী অনুমোদন পেয়ে মিডল ইংলিশ স্কুল হাই ইংলিশ স্কুলে পরিণত হল। চার বছর বাদে ইউনিভার্সিটির অনুমোদন ও সরকারী সাহায্য দুইই জুটল স্কুলের।

অনুমোদন পেয়ে ১৮৬৬ সালে স্কুল প্রথম ছেলে পাঠাল এনট্রান্স এগজামিনেশনে। ঠিক এর দু বছর আগে এক প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় স্কুল। সে বছর আশ্বিনের ঝড় মত্ত দৈত্যের মত গোটা দক্ষিণবঙ্গ তছনছ করে দিয়েছিল। স্কুলও রেহাই পায় নি। প্রচণ্ড ঝড়ে স্কুলের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। বড়শে-বেহালার এক-মাত্র হাই স্কুলের এই নিদারুণ বিপর্যয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা এগিয়ে এলেন সাহায্যে করতে। যে ঘর মাটিতে মিশে গিয়েছিল তাই আবার বছর ঘুরবার আগেই সবার সহৃদয় সাহায্যে গড়ে উঠল। জনসাধারণের সাহায্য যে নিছক অপব্যয় হয় নি, তারই প্রমাণ স্কুল দিল কয়েক বছর বাদে। এই স্কুলেরই ছাত্র ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯ সালে এনট্রান্সে বৃত্তি পেয়ে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেন।

কিন্তু বিপর্যয় যেন স্কুলের নিত্যসঙ্গী। ঝড়ে বাড়ি উড়ে গিয়েছিল, আগুন নতুন ভিটে পুড়িয়ে ছাই করে দিল। গত শতাব্দীর আশীর যুগের ঘটনা এটি। সাধের স্কুলের করুণ পরিণতিতে বিচলিত হয়ে সাবর্ণ চৌধুরীরা সাহায্যে এগিয়ে এলেন। বড়শের 'বড়বাড়িতে' ঠাঁই পেল স্কুল। জমিদার তারাকুমার রায়চৌধুরী স্কুলের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমান ডায়মণ্ড-হারবার রোড ও বীরেন রায় রোডের মোড়ে এগার কাঠা জমি দান করলেন। এই জমিতেই ১৮৯৬ সালে স্কুলের বর্তমান মেন বিল্ডিংয়ের একতলাটি ওঠে।

সে যুগে এই একতলাটি তুলতে প্রায় দশ হাজার টাকার মত ব্যয় হয়েছিল। এই ব্যয়ের মধ্যে চার হাজার চারশো টাকা এসেছিল রাজকোষ থেকে। কিছুটা এল লোকাল ডোনেশন থেকে আর প্রায় তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন বরিশালের লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী। বরিশালের জমিদার কেন বড়শের স্কুলের জন্য দান করলেন? সে আর এক কাহিনী। কতটা সত্য, কতটা বানানো বলা কঠিন তবু সুযোগ যখন পেয়েছি তখন গল্পটা বলেই ফেলি। জনশ্রুতি রাখালবাবুর ফ্যামিলীর কেউ বিলেত যান বা খৃশ্চান হন। ফলে গোঁড়া রক্ষণশীলদের চোখে তিনি প্রায় পতিত হয়ে উঠেছিলেন। জামাই আদরের জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত, কিন্তু সাবর্ণরা জামাইকে স্বীকার করতে চাইতেন না। রাখালবাবুর তখন রীতিমত করুণ অবস্থা। ঠিক এই সময়েই স্কুলবাড়ি আগুনে পুড়ে গেল। নতুন বাড়ির জন্য তারাকুমার জমি দিলেন। সরকারী সাহায্য পাওয়া গেল। স্থানীয় বাসিন্দারাও কিছু অর্থ সাহায্য করলেন। তবু আরো কিছু টাকার দরকার। কোথায় টাকা পাওয়া যাবে? তখন সাবর্ণরাই হদিশ দিলেন—যদি রাখালচন্দ্র স্কুলের এই প্রয়োজন মেটান তাহলে জামাই আবার শ্বশুরবাড়ির স্বীকৃতি ফিরে পাবেন। সেযুগে সাবর্ণদের স্বীকৃতির সামাজিক মূল্য ছিল অপরিসীম। তাই এককথায় রাখালচন্দ্র স্কুল বিল্ডিংয়ের প্রয়োজনের গ্যাপটুকু ফিল আপ করে দিলেন।

নতুন বাড়িতে যখন স্কুল উঠে এল তখন হেডমাষ্টার হয়ে এলেন মাখনলাল রায়চৌধুরী। বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট মাখনলাল পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর। তাঁর সুনিপুণ পরিচালনায় দিন দিন স্কুলের উন্নতি হতে লাগল। স্কুলের উন্নতির স্তর-বিবর্তনের মধ্যেই বিদায় নেন এই সর্বজন-শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। তাঁর জায়গায় এলেন অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেখতে দেখতে স্কুলের জীবনের প্রথম পঞ্চাশটি বছর কেটে গেল। এই পঞ্চাশ বছরে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বড়শে-বেহালার পুরোনো চেহারা আমূল পাল্টে গেছে। বহু প্রাচীন গ্রাম দুটিকে হৃদপিণ্ডের মত বুকের মাঝে নিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর আগে যে মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে উঠেছিল, তার পাড়ায় পাড়ায় তখন নতুন নতুন স্কুল গড়ে উঠছে। পঞ্চাশ বছর আগে যেখানে ছিল মোটে দুটি স্কুল, বড়িশা মডেল স্কুল (বড়িশা হাইস্কুল ও বেহালা বাংলা স্কুল (বেহালা শিক্ষায়তন), ততদিনে সেখানে আরো অনেক স্কুল হয়েছে। জগন্মোহন, সূর্যকুমারের স্বপ্ন সার্থক হয়ে উঠেছে। বড়শে-বেহালার ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আধুনিক শিক্ষার দীপশিখা।

এই অসংখ্য দীপশিখা যে আগুনে প্রাণ পেয়েছে তার আলোর আভায় দশদিক তখন উজ্জ্বল। সেই ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে নীরবে যে প্রাণগুলি তিল তিল করে আত্মবিসর্জনের মধ্য দিয়ে দেবারতির পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিল তাঁদের কথা যে ভোলে ভুলুক বড়িশা হাইস্কুল কোন-দিনই ভুলতে পারবে না। মাখনলালের পর অতুলচন্দ্র। অতুলচন্দ্রের পর ক্ষীরোদচন্দ্র সান্যাল ও ব্রজলাল মিত্র পর পর এই স্কুলে হেডমাস্টারী করেন। ব্রজবাবুর জায়গায় ১৯০৯ সালে এই স্কুলের হেডমাষ্টার হলেন মাখনলালের ভাই ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ক্ষীরোদচন্দ্র নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ পঁচিশ বছর (১৯৩৪ পর্যন্ত) এই স্কুলে তিনি হেডমাষ্টারী করেছেন। তাঁকে ঘিরে কত কাহিনী ছড়িয়ে আছে। তাঁর সময়েই ১৯১৯ সালে স্কুলের দোতলা ওঠে। অজস্র কৃতী ছাত্র এ সময়ে এই স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। ক্ষীরোদবাবুর সময়ে স্কুলের অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাষ্টার ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়। কালিদাসবাবু ১৯৩০ সালে এই স্কুল ছেড়ে ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে যোগ দেন। তাঁর স্কুল ছেড়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে সে সময়ে বড়িশা স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। স্কুল-ছাড়ার কারণ হিসেবে যা শোনা যায় তাহল এই যে, সে সময় বড়শে-বেহালার বাস সার্ভিস চালু হয়নি। কালিদাসবাবু বেহালা ট্রাম ডিপো থেকে চৌরাস্তার মোড় পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া বাবদ মাসে মাত্র পাঁচটা টাকা অ্যালাওয়েন্স চেয়েছিলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। তখন স্কুলের সেক্রেটারী রায়বাহাদুর কালীকুমার রায়চৌধুরী। চৌধুরীমশাই অনুরোধ না রাখায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যান কালিদাসবাবু। এই ঘটনায় ছেলেরা ক্ষেপে ওঠে। সেদিন ছেলেদের আন্দোলনের যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি এ যুগের স্বনাম-ধন্য অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়।

অমিয়রতনের আগে ও পরে ক্ষীরোদচন্দ্রের সময়ে যে সব কৃতী ছাত্র এই স্কুল থেকে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এ কটি নাম উল্লেখযোগ্য—ডাঃ শচীমোহন মুখোপাধ্যায় (চিকিৎসক-গবেষক), পরেশ দাসগুপ্ত (সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা) ও অমিয়ভূষণ দাসগুপ্ত (ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডাইরেকটর)।

ক্ষীরোদবাবুর পর বঙ্কিমচন্দ্র রায় দু বছর এ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বহন করেন। ছত্রিশ সালে বঙ্কিমবাবুর জায়গায় এলেন উমাপদ দত্ত। উমাপদবাবু চল্লিশ সাল পর্যন্ত এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর সময়েই এ স্কুলের ছাত্র শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হন, ১৯৩৯ সাল। পরের বছর উমাপদবাবুর বিদায় গ্রহণে স্কুলের হেডমাস্টার হলেন বেচারাম মুখোপাধ্যায়।

এই বিশাল চেহারার মানুষটির স্বভাব ব্যক্তিত্বের একটি প্রচণ্ড আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল। ছাত্ররা ভয় পেত, সহকর্মীরা করত শ্রদ্ধা। সতেরো বছর এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন তিনি। শুধু হেডমাস্টার তিনি ছিলেন না। তিনি ছিলেন আধুনিক বড়িশা হাইস্কুলের প্রাণপুরুষ। সেই প্রাণপুরুষের প্রাণময়তার কাহিনী শুনেছি তাঁরই প্রাক্তন ছাত্র ও সহকর্মীদের মুখে।

আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হয়েছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। স্কুলে যখন ভর্তি হলেন তখন সারাদেশে দুর্ভিক্ষ। বেচারামবাবুর অনুমতি নিয়ে সে সময় ক্লাস নাইন-টেনের ছেলেরা স্কুলে লঙরখানা খুলেছিল, একথা স্পষ্ট মনে আছে বিশ্বনাথবাবুর। আর একটি ঘটনার কথাও বোধহয় কোনদিনই বিশ্বনাথ ভুলতে পারবেন না। স্কুল জীবনেই রাজনীতির পাটে হাতখড়ি। ক্লাস টেনে উঠতে না উঠতেই বনে গেছেন ছাত্রনেতা। ক্ষুদে বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশ এসেছিল স্কুলে। রুখে দাঁড়ালেন হেডমাস্টারমশাই—না, আমার স্কুলে পুলিশ ঢুকতে পারবে না। সেদিন পুলিশ ফিরে গিয়েছিল খালি-হাতে। ছাত্র কিন্তু গুরুর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। পরের বছর ম্যাট্রিকে সেভেন্থ স্ট্যাণ্ড করেন বিশ্বনাথ, ১৯৪৯ সাল।

তারপর কুড়িটি বছর পার হয়ে গেছে। আজ কলেজের অধ্যাপনায় সেদিনের সেই ছাত্র রীতিমত ব্যস্ত। তবু যেন স্কুলের কথা কিছুতেই ভুলতে পারেন না বিশ্বনাথ। সময় পেলেই ছুটে আসেন, যেমন সেদিন এসেছিলেন। হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। চুপ করে শুনছিলেন আমার প্রশ্নের উত্তরে মাস্টারমশাইদের জবাব। বেচারামবাবুর প্রসঙ্গ আসতেই মাস্টারমশাইরা হেসে বললেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন। ওঁতো ছাত্র ছিল বেচারামবাবুর। শুধু ছাত্র নয় বছর কয়েক এই স্কুলে পড়িয়েছেনও বিশ্বনাথ। সেদিনের কিশোর আজ প্রায় যৌবনের প্রান্তসীমায়। চুলে সামান্য পাক ধরেছে। বিশাল দুটি চোখ, ভরাট গলার স্বর। দ্রুত অথচ চমৎকার উচ্চারণ। মাস্টারমশায়ের সম্পর্কে বললেন,—বেচারামবাবুর মত ইংরেজীর শিক্ষক কলেজেও আমি পাই নি। লিটারেচারের থেকেও ল্যাঙ্গুয়েজের উপর স্যারের দখল ছিল বেশী। পড়াতেন অপূর্ব। মনে আছে স্যার পছন্দ করতেন ছোট ছোট ইডিয়মেটিক একসপ্রেশন। 'কোয়ারেল' লেখা চলবে না, লিখতে হবে 'ফল আউট।'

বেচারামবাবুর যেমন ল্যাঙ্গুয়েজে দখল ছিল, তেমনি মাখনবাবুর (তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার মাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়) ছিল লিটারেচারে। ওরকম পাণ্ডিত্য এ যুগে বড় একটা দেখা যায় না। আর একজনের কথা আপনাকে বলি। কবি মোহিতলালের প্রিয় শিষ্য তারাচরণ বসু আমাদের পড়াতেন বাংলা। অথচ নিজে ছিলেন সংস্কৃতে ফার্স্টক্লাস এম-এ, পঞ্চতীর্থ। বহু ভাষা জানতেন তারাচরণবাবু। নিরভিমান শব্দটির মানে অভিধানে কখনো আমাদের খুঁজতে হয় নি—তারাবাবুকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন।

বিশ্বনাথ পাস করেছেন উনপঞ্চাশে। তার দু বছর আগে থেকেই স্কুলের জীবনে এসেছে প্রচণ্ড পরিবর্তন। দেশ বিভাগের ফলে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এসেছেন এই মহানগরীতে। খোদ শহরে তাদের জায়গা হয়নি। ঠাঁই মিলেছে শহরতলীতে। দমদম, কসবা, টালিগঞ্জ, যাদবপুর, বেহালায়। বেহালার এই আকস্মিক স্ফীত জনসংখ্যার শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্যই বড়িশা হাইস্কুল সেদিন তার দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সর্বসাধারণের সুবিধা করতে গিয়েই স্কুলের অসুবিধা দেখা দিল। ১৮৬৫ থেকে একটানা তিরাশী বছর সরকারী অনুদান পাওয়ার পর হঠাৎ সেই সাহায্যের স্রোতে ভাঁটা পড়ল। কারণ হিসেবে দেখানো হল সরকারী অনুদান পেতে হলে যত ছাত্র থাকা উচিত (তখন লিমিট ছিল ৭৫০) তার চেয়েও বেশী ছাত্র এই স্কুলে পড়ে। প্রাণহীন নিয়মের হাঁড়িকাঠে জবাই হল একটি সৎচেষ্টার আদর্শ—কি বিচিত্র নিয়ম!

নিয়ম যতই কঠোর হোক, সরকারী সাহায্যের সুযোগ বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও স্কুল পল্লীর সামগ্রিক স্বার্থের মুখ চেয়েই সেই ক্ষতি সেদিন স্বীকার করে নিয়েছে। শুধু তাই নয় বৃহত্তর দায়িত্ব পালনেও অগ্রণী হয়েছে বড়িশা হাইস্কুল। সে সময় দক্ষিণ শহরতলীর এই মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় কোন কলেজ ছিল না। স্কুল দায়িত্ব নিল সেই প্রয়োজন মেটানোর। স্কুলের মেন বিল্ডিংয়ের সামনে একতলা গ্যালারীতে পঞ্চাশ সালে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ খোলা হল। পরবর্তীকালে এই কলেজটিই পরিচিত হয়েছে বিবেকানন্দ কলেজ নামে। এখনো বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন স্কুলের জমিতেই প্রতিষ্ঠিত। এরই অপর একটি অংশ আজ ঠাকুরপুকুরে শুধু বিবেকানন্দ কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্থানীয় চাহিদার ফলেই স্কুল থেকে কলেজের উৎপত্তি। ঐ চাহিদা মেটাতেই তিপ্পান্ন সালে স্কুল বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বড়িশা উচ্চ বালিকা বিদ্যামন্দির। এর চার বছর পরে রিটায়ার করলেন বেচারামবাবু। তাঁর জায়গায় মাখনবাবু হলেন হেডমাস্টার। ততদিনে স্কুলের ভেতরে এক নতুন ঝগড়ার সূত্রপাত হয়েছে। ঝগড়ার প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে একটু পিছিয়ে যাওয়া দরকার।

শুরু থেকেই এই স্কুলের পরিচালন দায়িত্ব বহন করে এসেছেন বড়িশার বিখ্যাত জমিদার পরিবার, যাদের কথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে এ প্রবন্ধে। বর্তমান শতাব্দীর সূচনাবধি থেকে ছত্রিশ সাল পর্যন্ত স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন রায়-বাহাদুর কালীকুমার রায়চৌধুরী। কালী-বাবুর পরবর্তী কুড়ি বছরও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই পরিবারেরই কেউ না কেউ স্কুলের সেক্রেটারী হয়েছেন। কটু শোনালেও স্পষ্ট বলা দরকার, এই স্কুলের উন্নতির মূলে যেমন ছিলেন এই পরিবার তেমনি তাঁরা স্কুলটিকে তাঁদের বহুধাবিস্তৃত জমিদারীরই একটি অংশবিশেষ মনে করতেন। পরিচালন ব্যাপারে এই বিশেষ মেজাজটি বার বার প্রকাশ পেয়েছে। ইলেকসন টিলেকশনের ধারও তাঁরা ধারতেন না। স্বাধীনতার পর উনপঞ্চাশ সালে একবার ইলেকশন হয়েছিল—তারপর দীর্ঘ আট বছরে ম্যানেজিং কমিটির আর কোন ইলেকশন হয়নি। ইলেকশন হয়নি অথচ কমিটি নিজেই নিজের নেতা পাল্টেছে বারকয়েক। কালীবাবুর পর ন' বছর সেক্রেটারী ছিলেন চণ্ডীচরণ গাঙ্গুলী। চণ্ডীবাবুর পর সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দশ বছর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছেন। সুবোধবাবুর আমলেই ঐ ইলেকশন হয়েছিল। পঞ্চান্ন সালের মে মাসে সুবোধবাবু মারা গেলে সেক্রেটারী হন চিন্তামণি বন্দ্যোপাধ্যায়। সে সময় থেকেই ধীরে ধীরে বিক্ষোভের গুঞ্জন আওয়াজে পরিণত হয়। শোনা যায়, এ সময় মাস্টারমশাইরা নিয়মিত মাইনে পর্যন্ত পেতেন না। তেরোশ ছাত্র যে স্কুলে পড়ত সেখানকার পঁচিশজন শিক্ষক সারা মাস ধরে চেয়েচিন্তে তাঁদের বেতন আদায় করতেন। ব্যাপারটা যতই দুঃখের ও লজ্জার হোক, স্কুল কমিটি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। কমিটি উদাসীন হলেও পাবলিক এ অন্যায় বেশীদিন বরদাস্ত করেন নি। তারা দাবী তুললেন, পরিচ্ছন্ন পরিচালনার জন্য দরকার নতুন ম্যানেজিং কমিটি—নির্বাচন হোক। শেষপর্যন্ত বোর্ড থেকে ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করে সাতান্ন সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম এল দাসকে সেক্রেটারী করে একটি অ্যাড হক কমিটি বসানো হল।

এই অ্যাড হক কমিটির কাজের অন্যতম শর্ত ছিল দ্রুত ইলেকশনের আয়োজন করা। কিন্তু কে কার কথা শোনে। নতুন কমিটি তখন এক নতুন পরিকল্পনায় মশগুল তারা তখন ভাবছেন স্কুল, গার্লস স্কুল ও কলেজ

তিনটি প্রতিষ্ঠান একটি এডুকেশন সোসাইটির মাধ্যমে পরিচালনা করবেন। প্ল্যানমত বন্দোবস্ত হয়ে গেল। তাই তারা আর ইলেকশন নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলেন না। কিন্তু তুঘলকী পরিকল্পনা সফল হয়ে ওঠবার আগেই মামলা উঠল হাইকোর্টে। অভিযোগ, কমিটি ইলেকশন করছে না। হাইকোর্টের নির্দেশে শেষপর্যন্ত কমিটি বাধ্য হল ইলেকশন করতে। উনষাট সালে ইলেকশনের ফলে স্কুল আবার ফিরে পেল ম্যানেজিং কমিটি। এই ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সেক্রেটারী হলেন স্কুলেরই প্রাক্তন কৃতী ছাত্র অধ্যাপক শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়। শান্তিবাবু একবছর সেক্রেটারী ছিলেন। ষাটসালে তাঁর জায়গায় সেক্রেটারী হলেন অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ দে।

ইতিমধ্যে স্কুলের চেহারা গেছে অনেক পাল্টে। আটান্ন সালে হাই স্কুল আপগ্রেডেড হয়েছে। শুরুতে দুটি স্ট্রীম নিয়ে চালু হয়েছিল হায়ার সেকেন্ডারী ব্যবস্থা— বিজ্ঞান ও কলা। বিজ্ঞান বিভাগের প্রয়োজনেই একষট্টি সালে স্কুলের মেন বিল্ডিংয়ের উত্তর পশ্চিমে উঠল তিনতলা সায়েন্স ব্লক। সায়েন্স ব্লকের দোতলায় ফিজিক্স ল্যাবরেটরী; তেতলায় কেমিষ্ট্রি, বায়োলজি ও জিওগ্রাফির প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বসে।

স্কুল যখন দিন দিন বেড়ে চলেছে তখন ভেতরে নতুন এক অশান্তি দেখা দিল। এই ঝগড়া জনৈক শিক্ষককে কেন্দ্র করে। চার বছর ধরে এই ঝগড়াকে কেন্দ্র করে স্কুল বারংবার আন্দোলিত হয়েছে। শেষপর্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে ম্যানেজিং কমিটি হাল ছেড়ে দেয় চৌষট্টি সালে। ঠিক সেই বছরই মেন বিল্ডিংয়ের পেছনে দোতলা হিউম্যানিটিজ ব্লক তৈরী শেষ হল। ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করে বোর্ড এবার স্কুলের তদারকির দায়িত্ব তুলে দিলেন এডমিনিস্ট্রেটরের হাতে। সেই থেকে স্কুল এডমিনিস্ট্রেটরের পরিচালনাধীন।

গত পাঁচ বছরে দু দুজন এডমিনিস্ট্রেটর এই স্কুল পরিচালনায় দয়িত্ব বহন করেছেন। এই সময়েই ছেষট্টি সালে স্কুলে বাণিজ্যিক শাখা খোলা হয়েছে। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য—তিনটি শাখা মিলিয়ে ক্লাস ফাইভ থেকে ইলেভেন সাতটি ক্লাশে বর্তমানে মোট দেড় হাজারের উপর ছাত্র পড়ে স্কুলে, বললেন বর্তমান প্রধান শিক্ষক বিনয়ভূষণ আইচ। ষাট সাল থেকে এই স্কুলে পড়াচ্ছেন বিনয়বাবু। মাখনবাবুর পর উনিই হেড-মাস্টার হয়েছেন সাতষট্টিতে। গত দশ বছরের ইতিহাসের প্রত্যক্ষ সাক্ষী বিনয়বাবু নিজেই। অতীতের ইতিহাস জেনেছেন সহকর্মী বিষ্ণুবাবু নৃপেনবাবুদের কাছ থেকে। অতীত ও বর্তমানের হিসাব নিকাশ পেশ করে বললেন, এবার আমাদের ফিউচার প্ল্যানিংয়ের কথা বলি আপনাকে। গোড়াতেই বলি লাইব্রেরীর কথা।

বর্তমানে লাইব্রেরী আছে মেন বিল্ডিংয়ে। আড়াই হাজারের উপর বই। প্রতি বছরই নতুন নতুন বই কেনা হয়। ছেলেদের চাহিদা বিপুল। ওরা গড়ে সপ্তাহে সাড়ে সাতশো বই নেয়। কিন্তু লাইব্রেরী রুমে জায়গা বড় কম। এবার হিউম্যানিটিজ ব্লকের দোতলায় একটা বড় ঘর আমরা তুলেছি। সেখানেই লাইব্রেরী নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের। ওখানে বসে পড়বার মত জায়গাও আমরা ছেলেদের দিতে পারব।

লাইব্রেরীর ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়ে গেলে, ইচ্ছা আছে ছাত্রদের জন্য একটা টেক্সট বুক লাইব্রেরী গড়ে তোলা। অধিকাংশ ছাত্রেরই ক্ষমতা নেই বই কেনার। তাই আপনার মাধ্যমে আমরা আমাদের আবেদন পাঠাচ্ছি এদেশের সব টেক্সট বুক পাব্লিশারদের কাছে—আপনারা আমাদের সাহায্য করুন যাতে দেড় হাজার ছেলে অন্তত বইয়ের অভাব থেকে মুক্তি পায়।

অভাব কি শুধু বইয়ের? পুষ্টির অভাব আরো সাংঘাতিক। যে স্কুলের শতকরা পঁচাশী ভাগ ছেলে আসছে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ঘর থেকে তাদের কপালে কতটুকুই বা পুষ্টিকর খাদ্য জোটে? জোটে না বলেই বিনয়বাবু বললেন, যে ওরা ঠিক করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে একলার ক্ষমতায় টিফিন দেওয়ার কোন উপায় নেই স্কুলের। টিফিন দূরের কথা। দু বছর পরে মাষ্টার মশাইদের মাইনে কি করে স্কুল দেবে সে চিন্তাতেই পাগল হয়ে উঠেছেন স্কুল কর্তৃপক্ষ। বর্তমান সরকারী নিয়মে হাজারের বেশী ছাত্রের স্কুলে অনুদান দেওয়া হয় না। ইচ্ছা করলেও আজ আর স্কুল ছাত্র কমাতে পারে না। কারণ পাঁচশো ছাত্র রাতারাতি কমিয়ে ফেলা শুধু অসম্ভব নয় অমানবিক। অথচ পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষকের বেতন এইডেড স্কুলের স্কেল অনুযায়ী দিতে গিয়ে স্কুলের কালঘাম ছুটে যাচ্ছে। গড়ে মাসিক পাঁচটাকা ছাত্র-বেতনের স্কুলে কর্তৃপক্ষকে মাস গেলে বারো হাজার টাকা যে করেই যোগাড় করতে হবে স্টাফ পেমেন্টের জন্য। তাই স্কুল আজ সরকারী সাহায্যের প্রত্যাশী। স্কুলের প্রশ্ন—শুধু সংখ্যা অনুপাতে কেন সরকারী সাহায্য দেওয়া হবে? মেরিটের বিচার কেন হবে না? বিনয়বাবু বললেন গত তিন বছরে এ স্কুলের গড় পাশের হার শতকরা আশী-ভাগ। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত বড়িশে-বেহালার অভিভাবকদের উপর বাড়তি টিউশন ফীর বোঝা স্কুল চাপাতে চান না। তাঁরা চান সরকারী সাহায্য। যে সাহায্যে স্কুলের আর্থিক বনিয়াদ সুদৃঢ় করে তুলবে, নিরাপদ ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি বহন করে আনবে। সেই সঙ্গে যদি সরকার এই দেড়-হাজার ছাত্রের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য দেন তাহলে স্কুল ছাত্রদের জন্য সস্তায় টিফিন দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারে।

আমি তো পাতাজুড়ে শিক্ষকদের পরিকল্পনার কথা আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনা করলাম। এর কি কোন ফল হবে? জানি না এ প্রশ্নের জবাব কোনদিনও মিলবে কিনা। শুধু জানি সেদিন মাষ্টারমশাই ও প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক স্বপ্নের জগতে আমি চলে গিয়েছিলাম। যে স্বপ্নের জগৎ আমার সামনে তুলে ধরেছিলেন বিনয়বাবু, নৃপেনবাবু, বিষ্ণুবাবু, দানীশবাবু, নীহারবাবু, ব্রজবাবু, বিশ্বনাথবাবু। যে দেশের দিক দিগন্ত জুড়ে আজ শুধু ভাঙনের কথা সেখানে আজো এরা গড়বার কথা বলেন! বাস্তব ও স্বপ্ন নিশ্চয়ই এক নয় তবু বিশ্বাস করি, ইমাজিনেশন না থাকলে সত্যিকারের শিক্ষক হওয়া যায় না। ছাত্র গড়াও সম্ভব নয়। জগন্মোহন, ক্ষীরোদচন্দ্র, বেচারামবাবুর উত্তরসূরীদের মনে আজো ইমাজিনেশন আছে। আর আছে বলেই তাঁরা এ যুগেও স্কুল ছুটির পর ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেন স্কুলের আলোচনায়—নতুন নতুন পরিকল্পনার জাল তাঁরা বুনে চলেন। খুব ক্লান্ত হলে ব্রজবাবুকে অনুরোধ করেন তাঁরা—একটি গান শোনান। প্রাক্তন ছাত্র ও সহকর্মীকে বলেন—একটা কবিতা শোনাও হে বিশ্বনাথ।

—অনিরহসু

পরের সংখ্যায় : হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল

সকালে বিকেলে ॥

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ট্রেনযাত্রী। রাত্রি ভোর গাঁয়ের স্টেশনে,
মাটির ভাঁড়ের চায়ে অদ্ভুত আস্বাদ।
অনেক দেরিতে তবু নতুন বর্ষার জলে
মাঠে মাঠে দেখা দেয় নতুন ফসল।
আশ্বাসে চাষীর মন ভরে ওঠে
বেঁচে যাবে এবারের মতো,
পারবে বাঁচাতে আপামর দেশের মানুষে।
বীরভূমে রাঙা মাটি হাসে;
রোদ-বৃষ্টি ঝলকে ঝলকে,
দিনটি ভালোই কাটে আলো আর
ছায়ার খেলায়। সহসা খবর—
অজয়ের বাধ ভেঙে ভেসেছে প্রান্তর;
সাত হাজার একরের কৃষিভূমি
জলের তলায়. ডুবে আছে বহু লোকালয়।
চাষীদের মুখগুলি সে সংবাদে
মুহূর্তে মলিন। আবার মাটির ভাঁড়ে
চায়েতে চুমুক. এবার বিস্বাদ।
সকালে সুখের ছবি, বিকেলে বিষাদ।

গাড়ি ছাড়ার সময় হলে একটুখানি স্বেচ্ছাচারী ॥

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তুফান মেলের যাত্রা সময় গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা হলে
মেঘ উড়ে যায়. মেঘের পাহাড়, শাদা কালো
স্বর্ণলতা, কেন দেখাও ঃ আলতা. সিঁদুর, চিকন শাড়ি,
লাল রঙা পাড়
পায়ের নিচে রেলের চাকা নিস্পৃহ কাল, আপনি চলে
এই শরতে নদীর ডাকে, যখন আমি স্বেচ্ছাচারী

অনেক কাল তো ঘুমিয়েছিলাম, স্বপ্নবিহীন. ছায়ার মধ্যে
হাজার দুয়ার ঘর দেখিনি. একটি ঘরেই রাহাজানি
আমি যখন বাইরে যাবো
তখন আমার পদধ্বনি
কেমন করে স্বর্ণলতা. সেই মুহূর্তে শুনতে পেলে?
ভাবছ বুঝি এই অবরোধ চিরটাকাল রাখা যাবে?

তুমি আমার কেবল দেখাও ট্যুরিস্টব্যুরোর দেয়ালে ছবি
টেলিগ্রাফের তারের ফাঁকে সিমলা পাহাড়, খাজুরাহো
চোখের সামনে পুরীর সাগর

দোরের নিচে গুপ্ত সিঁড়ি
আঁচল ছুঁলেই অমনি তুমি দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো

কোথায় যাবো? কোন্ দিগন্তে? হাওড়া স্টেশন অন্ধকারে
ফিরে এলাম ব্রীজ পেরিয়ে

নদীর শব্দ শুনতে শুনতে
তোমার হাতে হাত মেলালাম, আবার পতন, নিয়ম মতো
ট্রেন ছেড়ে যায়, চোখের সামনে
আলতা, সিঁদুর. রাঙা শাড়ি
কেমন যেন জড়িয়ে থাকা না-জানা এক মোহের মতো

তুমি আবার চাঁদ দেখালে গরাদ দেওয়া জানলা দিয়ে
ইলেকট্রিকের তারের ফাঁকে. আটকে-পড়া, দ্বিখন্ড চাঁদ
কোজাগরীর মধ্যরাতে
তুমি আমায় লোভ দেখালে
কখনো কি তোমার মনে নদী হবার সাধ জাগে না? একটুখানি
স্বেচ্ছাচারী?

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। ঝুমোর ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমো প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ও'রা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের খবর, চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিনিসপত্রের দামও আকাশছোঁয়া।

এমন সময় এল সেই মারাত্মক সংবাদ। জাপানীরা বোমা ফেলেছে বর্মায়। সেখান থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে ভারতে। রাজদিয়াতেও জান নিয়ে ফিরে এসেছে একটি পরিবার। পরদিন। সকলেই ছুটল ত্রৈলোক্য সেনের কাছে। শুনল রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে আসার মর্মান্তিক কাহিনী। সময় এগোল যথানিয়মেই। দেখতে দেখতে যুদ্ধের হাওয়া এসে লাগল রাজদিয়াতে। সৈন্য আসতে শুরু করেছে। কলকাতা থেকেও লোক পালাচ্ছে। বিনুর নতুন বন্ধু অশোক। মিলিটারি ব্যারাকে গেল তারা একদিন। ইতিমধ্যে বিনু সিগারেট ধরেছে। ধরাও পড়ল মজিদ মিঞার চোখে। কান ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল বাড়িতে।]

॥ একান্ন ॥

চোখাচোখি হতেই ঝুমা হাতছানি দিল।

প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারল না বিনু। এই বিকেলবেলায় নদীর দিক থেকে এমন এলোমেলো হাওয়া দিয়েছে, সূর্যটা ডুবু-ডুবু, রোদের রঙ বাসি হলুদের মতন, যখন পশ্চিমের ভাসমান মেঘ ফুলে ফুলে পাহাড়ের মতন হয়ে আছে সেই সময় স্টিমারঘাটায় কাছে ঝুমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল। অবাক বিনু দাঁড়িয়েই থাকল।

ঝুমা আবার ডাকল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো—'

দু চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল বিনু।

স্তূপাকার মালপত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ঝুমা। ট্রাঙ্ক, স্যুটকেশ, বেতের বাস্কেট, কুঁজো, চার-পাঁচটা হোল্ডঅল, টিফিন-কেরিয়ার—কত যে জিনিস, লেখা-জোখা নেই। ঝুমা ছাড়া আর কারোকেই দেখা যাচ্ছে না।

পলকহীন তাকিয়েই ছিল বিনু। চোখ কুঁচকে ঝুমা বলল, 'একেবারে বোবা-হয়ে গেলে যে। আমাকে যেন চিনতেই পারছ না—'

হঠাৎ দেখলে সত্যিই চেনা যায় না। মাথায় অনেকখানি লম্বা হয়ে গেছে ঝুমা। দু বছর আগে যে ছিল বালিকা, বড় বড় পা ফেলে কখন সে কৈশোরকে ধরে ফেলেছে, কে বলবে। গায়ের চামড়া এখন টান-টান, মসৃণ; তাতে চকচকে আভা ফুটেছে। প্রচুর স্বাস্থ্য মেয়েটার, গায়ের আঁটো-সাঁটো জামাটায় ধরতে চায় না।

চোখ এমনিতেই বড়; তার মাঝখানে কালো কুচকুচে মণিদুটো নিরত-অস্থির, নিয়ত-ছটফটে।

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না বিনু। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বিব্রত-ভাবে বলল, 'না, মানে—'

'মানে আবার কী?'

'অনেকদিন পর তোমাকে দেখলাম কিনা।' একটু সামলে নিয়ে বিনু আবার বলল, 'তুমি একলা এখানে—এই স্টিমার-ঘাটায়!'

ঝুমা বলল, 'আজই আমরা কলকাতা থেকে এলাম যে—'

'কখন এসেছ?'

'এই তো এলাম। ঐ দেখছ না স্টিমারটা—'

বিনু তাকিয়ে দেখল, জেটিঘাটের ওপাশে রাজহাঁসের মতন সেই স্টিমারটা দাঁড়িয়ে আছে। তার মাস্তুলে খয়েরি রঙের শঙ্খচিল। হঠাৎ বিনুর মনে পড়ল, ওবেলা স্কুলে আসার সময় স্টিমারটা চোখে পড়ে নি। সে বলল, 'স্টিমার তো সকালবেলা আসবার কথা—'

ঝুমা বলল, 'হ্যাঁ, বড্ড দেরি করে এসেছে। পাক্কা দশ ঘন্টা লেট—'

এবার বিনু ভাল করে লক্ষ করল, ঝুমার চুল রুক্ষ, উস্কোখুস্কো। প্রায় দু'দিন স্টিমার এবং ট্রেনে কাটিয়ে আসার ফলে মুখ-চোখ মলিন। তারপর একটা কথা খেয়াল হতে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমাকেই তো শুধু দেখছি; আর সবাই কোথায়?'

'জেটিঘাটের ভেতর। কুলীদের দিয়ে মালপত্তর এনে এনে রাখছে। আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। দাদু আর বাবা গেছেন একটা ঘোড়ার গাড়ি যোগাড় করতে। ও'রা এলেই আমরা বাড়ি যাব।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল ঝুমার, 'আচ্ছা বিনুদা—'

'কী বলছ?'

'তোমরা তো সেই থেকেই দেশে আছ, আর কলকাতায় যাও নি—তা না?'

'হ্যাঁ। তোমায় কে বললে?'

'বা রে, কলকাতায় গেলে তুমি বুঝি আমাদের বাড়ি যেতে না? তা ছাড়া—'

'কী?'

চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুমা এবার বলল 'তোমরা যে দেশে আছ, সে খবর আমরা পেয়েছি।'

বিনু শুধলো, 'কেমন করে?'

'হাঁদা-গঙ্গারাম, কিছুই জানো না! সুনীতিদি প্রত্যেক সপ্তাহে আমার মামাকে দুখানা করে চিঠি লেখে। তাইতেই জানতে পেরেছি।'

বিনু মনে মনে ভাবল, সত্যিই সে হাঁদা। সুনীতির সব চিঠিই তো সে নিজের হাতে ডাকবাক্সে দিয়ে আসত অথচ এই সোজা জিনিসটা তার মাথায় ঢুকল না?

ঝুমা এবার গলা নামিয়ে ফিস ফিস করল, 'তোমার দিদি আর আমার মামার ভেতর ব্যাপার আছে, না বিনুদা—' বলে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে কেমন করে যেন হাসতে লাগল।

ঝুমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে বিনু। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। দু বছর

আগে মেয়েটা ছিল দুর্দান্ত, ডানপিটে। ভয়-টয় বলে তার কিছুই ছিল না। টের পাওয়া যাচ্ছে, সেই ঝুমা এবার অন্য দিক থেকে পেকে টুকটুকে হয়ে এসেছে।

একটু নীরবতা।

তারপর ঝুমাই আবার ডাকল, 'বিনুদা—'

'কী বলছ?'

'সেই হিংসুটি মেয়েটা এখন কোথায় গো?'

'কার কথা বলছ?'

'ঝিনুক—ঝিনুক—'

বিনু বলল, 'ঝিনুক আমাদের বাড়িতেই আছে।'

ঝুমা ঘাড় বাঁকিয়ে শুধলো, 'সেই তখন থেকে?'

'হ্যাঁ।' গভীর সহানুভূতির গলায় বিনু বলতে লাগল, 'কোথায় আর যাবে বল। ওর মা তো এখানে নেই—'

'ঝিনুকের মা এখনও আসে নি?'

'না।'

'আর আসবে না মনে হয়।'

'তা-ই শুনেছি।'

একটু কি ভেবে ঝুমা এবার জিজ্ঞেস করল, 'ঝিনুক এখন কত বড় হয়েছে বিনুদা?'

ঝুমার কথায় চকিত হল বিনু। সত্যিই বড় হয়ে উঠেছে ঝিনুক; প্রায় ঝুমার মতনই কিশোরী।

দু বছর হতে চলল—একই বাড়িতে সাতাশের বন্দের ছ'খানা ঘর, ঢালা উঠোন, স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন বাগান, টলটলে পুকুর, পাখিদের অশ্রান্ত কিচির-মিচির আর গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত দিয়ে ঘেরা ছোট্ট মনোরম একটি ভুবনের মাঝখানে তারা পাশাপাশি আছে। অথচ তিল তিল করে কখন যে ঝিনুক বড় হয়ে উঠেছে লক্ষই করে নি বিনু। আজ ঝুমার কথায় আচমকা তা মনে পড়ে গেল।

ঝুমা যেন নিশ্বাস-বায়ুর মতন। সে কাছেই আছে কিন্তু তার কথা মনেই থাকে না।

বিনু বলল, 'তোমার মতনই বড় হয়েছে।'

'তা হলে তো—' বলে চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে লাগল ঝুমা।

'তা হলে কী?'

ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে ঝুমা বলল, 'দুজনে বেশ চালাচ্ছ—' কথায় কথায় ভুরু নাচানো মেয়েটার স্বভাব।

কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল বিনুর। আবছা গলায় সে বলল, 'কি যা-তা বলছ!'

ঝুমা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় জেটিঘাটের ভেতর থেকে চার-পাঁচটা কুলীর মাথায় বড় বড় লোহার ট্রাঙ্ক চাপিয়ে স্মৃতিরেখা বেরিয়ে এলেন। তাঁর পেছনে রুমা আর আনন্দ।

আনন্দও তবে এসেছে!

কাছাকাছি এসে কুলীরা ট্রাঙ্কগুলো নামাল। স্মৃতিরেখা বিনুকে দেখতে পেয়েছিলেন। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বিনু না?'

বিনু বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চিনতেই পারা যায় না। কত বড় হয়ে গেছ!'

লজ্জায় চোখ নামাল বিনু।

স্মৃতিরেখা বললেন, 'তুমি এখানে কোত্থেকে এলে?'

বিনু বলল, 'স্কুল থেকে? বাড়ি ফিরছিলাম ঝুমা ডাকল।'

একটু চুপ করে থেকে স্মৃতিরেখা এবার বললেন, 'বোমার ভয়ে পালিয়ে এলাম। কলকাতায় যে কোনদিন এখন বোমা পড়তে পারে।'

চোখ মাটির দিকে রেখেই বিনু বলল, 'কলকাতা থেকে অনেক লোক রাজদিয়ায় চলে এসেছে।'

'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'কলকাতা একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। যে যেদিকে পারছে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সে যাক গে। হ্যাঁ বিনু—'

মুখ তুলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল বিনু।

স্মৃতিরেখা বললেন, 'শুনেছি, তোমরা নাকি সেই থেকেই রাজদিয়ায় আছ—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'জমিজমাও কিনেছ—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কতটা?'

'পঞ্চাশ কানির মতন।'

'তোমার বাবা বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন।'

একটু চুপ।

তারপর স্মৃতিরেখা আবার বললেন, 'বাড়ির সবাই ভাল তো?'

বিনু মাথা নাড়ল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

এর পর এলোমেলো অসংলগ্ন নানা রকম কথা হতে লাগল। যুদ্ধের কথা, জাপানী বোমার কথা, রাজদিয়ার কথা, কলকাতা থেকে আসার সময় ট্রেনে-স্টিমারে অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে অত্যধিক কষ্টের কথা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক সময় শিশির আর রামকেশব ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ফিরে এলেন। দেখেই বিনু চিনতে পারল, গাড়িটা ঝিনুকদের। শিশিররা তা হলে ঝিনুকদের ফীটন চেয়ে আনতে গিয়েছিলেন?

কুলীগুলো একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। রামকেশব তাড়া লাগালেন, 'মাল তুলে ফেল—'

বাক্সপ্যাটরা তোলা হলে কুলীরা ভাড়া নিয়ে চলে গেল। রামকেশব বললেন, 'সবাই গাড়িতে ওঠ।'

স্মৃতিরেখা বিনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদের বাড়ি যাবে নাকি, চল—'

ঝুমাও তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'চল না, চল—' আগ্রহে তার চোখ চকচক করতে লাগল।

যাবার খুব যে একটা অনিচ্ছা ছিল তা নয়। হয়তো যেতও বিনু। কিন্তু পরক্ষণে সে-ই নিষেধাজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেল। আজকাল স্কুল ছুটির পর আর এক মুহূর্তও বাইরে থাকার উপায় নেই। মজিদ মিঞা তার কি সর্বনাশটাই না করেছে।

একটু ভেবে বিনু বলল, 'এইমাত্র আপনারা এলেন। আজ বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন গিয়ে। আমি পরে যাব।'

স্মৃতিরেখা বললেন, 'সেই ভাল। ট্রেনে-স্টিমারে দু দিন যা ধকল গেছে! এখন চান করে একটু শুতে পেলে বাঁচি। তোমাকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে কথাই বলতে পারব না। পরে আসবে কিন্তু—'

'আসব।'

ঝুমা বলল, 'কালই এসো—'

বিনু হাসল।

স্মৃতিরেখা আর কিছু না বলে ফীটনে উঠলেন। তাঁর পিছু পিছু শিশির, রুমা আর রামকেশবও উঠলেন।

উঠতে উঠতে রামকেশব বিনুকে বললেন, 'হেমদাদা আর বৌ-ঠাকরুণকে বলিস, কলকাতা থেকে শিশিররা আজ এসেছে।'

বিনু ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'বলব।'

আনন্দ আর ঝুমা এখনও নীচে দাঁড়িয়ে। সবার কান বাঁচিয়ে নীচু চাপা গলায় আনন্দ বলল, 'বাড়িতে আমার কথাও বোলো।'

ঝুমাটা কাছেই আছে; তাকে ফাঁকি দেওয়া যায় নি। চোখ কুঁচকে ঠোঁট ছুঁচলো করে সে বলল, 'কার কাছে বলবে মামা? সুনীতিদির কাছে?'

'তুই ভীষণ ফাজিল হয়েছিস—' আলতো করে ঝুমার মাথায় চাঁটি কষিয়ে দিল আনন্দ।

নাকের ভেতর থেকে কপট কান্নার মতন শব্দ করতে লাগল ঝুমা, 'উ'-উ'-উ—'

'আর বাঁদরামো করতে হবে না। গাড়িতে ওঠ—' দুজনে ফীটনে উঠে দরজা বন্ধ করল।

সঙ্গে সঙ্গে রামকেশব চেঁচিয়ে বললেন, 'গাড়ি চালা রে রসুল—' ঝিনুকদের কোচোয়ানটার নাম রসুল।

ফীটন চলতে শুরু করল। জানলার বাইরে মুখ বার করে হাত নাড়তে লাগল ঝুমা। যতক্ষণ দেখা যায়, নদীর পাড়ে স্টিমারঘাটায় দাঁড়িয়ে থাকল বিনু।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে আজ সন্ধ্যে হয়ে এল। পুকুরের ওপারে ধানের খেত এর মধ্যেই ঝাপসা হয়ে গেছে। আকাশ যেখানে ধনুরেখার দিগন্তে নেমেছে, সেই জায়গাটা নিরাকার, অস্পষ্ট। বাগানের একোণে-ওকোণে থোকা থোকা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। সোনাল আর পিঠকীরা ঝোপের ভেতর জোনাকিদের নাচানাচি শুরু হয়ে গেছে।

স্টিমারঘাটায় যে সূর্যটা ছিল ডুবু-ডুবু, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশ জুড়ে ধুঁই ফুলের মতন অগণিত তারা ফুটতে শুরু করেছে।

উঠোনে পা দিতেই সুরমা ছুটে এলেন, 'তোর তো একেবারেই লজ্জা নেই বিনু! সেদিন যে মজিদ মিঞা অত করে মারল, এর মধ্যেই ভুলে গেলি!'

স্নেহলতা, সুধা-সুনীতি, শিবানী, ঝিনুক—সবাই একধারে দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব তার ফেরার জন্য ওরা উঠোনে

অপেক্ষা করছিল। অবনীমোহন আর হেমনাথকে অবশ্য এদের ভেতর দেখা গেল না।

স্নেহলতা বললেন, 'গায়ের ব্যথাও মরল, আবার যে কে সে-ই হয়ে দাঁড়ালি।'

বিনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোমরা যা ভাবছ তা নয় দিদা—'

সুধা এই সময় গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে ভেংচি কাটার মতন মুখ করে বলল, 'তোমরা যা ভাবছ তা নয় দিদা! নিশ্চয়ই তা-ই। আবার ঐ বাঁদরগুলোর সঙ্গে মিলিটারী ব্যারাকে গিয়ে ভিখিরিদের মতন চাইছিলি; সিগারেট খাচ্ছিলি। দাঁড়া, আজই মজিদ মামাকে খবর পাঠাচ্ছি। চ্যালা কাঠ দিয়ে যাতে—'

সুধার কথা শেষ হল না, তার আগেই বিনু ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিমেষে দেখা গেল, সুধার চুলের গোছা বিনুর মুঠোয়। সুধাও ছাড়ে নি, দু হাতের দশটা নখ বিনুর গালে বসিয়ে দিয়ে ধরে আছে।

চেঁচামেচি এবং টানাটানি করে স্নেহলতারা দুজনকে ছাড়িয়ে দিলেন।

যে সুনীতি চিরদিনই ধীর স্থির শান্ত, হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল তার। ছুটে এসে বিনুর গালে এক চড় কষিয়ে দিল। চোখ পাকিয়ে বলল, 'অন্যায়ও করবে আবার লোকের গায়ে হাতও তুলবে। দিন দিন তোমার আস্পর্ধা বেড়েই চলেছে। খুনী কোথাকার—'

দুর্বিনীত ঘাড় বাঁকিয়ে বিনু বলল, 'আমি অন্যায় করিনি।' চড় খেয়ে তার চোখ টলটল করছে। মনে হচ্ছে সে দুটো বুঝি ফেটেই যাবে।

সুরমা বললেন, 'অন্যায় করিস নি তো এতক্ষণ ছিলি কোথায়? তোকে না বলে দেওয়া হয়েছে স্কুল ছুটির পর এক মিনিট বাইরে থাকবি না। আবার সন্ধ্যে করে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছ!'

বিনু বলল, 'স্কুল ছুটির পর আমি তো আসছিলামই। স্টিমারঘাটার কাছে ঝুমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

'কোন্ ঝুমা?'

'ঐ যে রামকেশবদাদুর নাতনী—'

স্নেহলতা বললেন, 'ওরা এসেছে নাকি?'

বিনু বলতে লাগল, 'হ্যাঁ আজই বিকেলবেলা এসেছে। স্টিমারঘাটায় নেমেই আমাকে দেখতে পেয়ে ওরা আটকাল। কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে গেল।'

সুধাটা চিরকালের ঘরশত্রু। সে হঠাৎ বলে উঠল, 'গোয়ালন্দের স্টিমার তো আসে সকালে। বিকেলবেলা এসেছে কি রকম!'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলল বিনু, 'বিশ্বাস না হয় ঝুমাদের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় না বাঁদরী।'

আবার একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যাবার উপক্রম হচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দুজনকে থামিয়ে স্নেহলতা বললেন, 'ঝুমাদের জন্যে দেরি হয়েছে, সে কথা বলবি তো? কী বোকা ছেলে তুই! শুধু-শুধু মার খেলি!'

অভিমানের গলায় বিনু বলল, 'তোমরা আমাকে বলতে দিলে কোথায়?'

বিনুর একখানা হাত ধরে স্নেহের সুরে স্নেহলতা বললেন, 'চল্, হাত-মুখ ধুয়ে খাবি। সেই কখন চাট্টি খেয়ে স্কুলে গিয়েছিলি।'

●

খেয়েটেয়ে বিনু যখন পড়তে বসল, বেশ রাত হয়ে গেছে। ধানখেতে, পুকুর, সুদূরে বনানী, গাছপালা—সব কিছুই এখন গাঢ় অন্ধকারে অবলুপ্ত।

সুধা-সুনীতি আর ঝিনুক আগেই পড়তে বসেছিল।

এ বাড়িতে আজকাল আর কেরাসিন ঢোকে না; হেমনাথের বারণ। সারাদেশ যখন অন্ধকারে ডুবে আছে তখন নিজের ঘরে তিনি দেয়ালী জ্বালাতে চান না। তা ছাড়া নিত্য দাসের ওপর তিনি এত অসন্তুষ্ট যে তার দোকানের একটা কুটো বাড়িতে আসতে দেবেন না।

কেরাসিন আসে না। এ বাড়িতে আজকাল রেড়ির তেল জ্বলে।

এই মুহূর্তে পুবের ঘরের এক কোণে দুটো আড়াইতলা কাঠের পিলসুজে প্রদীপ জ্বলছে। রেড়ির তেলের নিরুত্তেজ আলোয় চারধার স্নিগ্ধ। বিনুরা তিন ভাই-বোন আর ঝিনুক সুর করে পড়ে যাচ্ছিল।

বিনুর ডান পাশে বসেছে সুনীতি। তারপর সুধা এবং ঝিনুক।

পড়তে পড়তে মুখ তুলে সুনীতি একবার বিনুকে দেখে নিল। তারপর আবার বইয়ের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ পর আবার বিনুকে দেখল, তারপর কি ভেবে আবার বই নাড়াচাড়া করতে লাগল।

অনেকক্ষণ ইতস্তত করার পর খুব আস্তে করে গলার ভেতর থেকে সুনীতি ডাকল, 'বিনু—'

বিনু শুনেও শুনল না। গলা চড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিরক্ত অপ্রসন্ন চোখে তাকাল বিনু।

সুনীতি বলল, 'খুব পড়া দেখাচ্ছিস, না?' বলে হাসল।

বিনু কিছু বলল না; চোখ কুঁচকেই থাকল।

সুনীতি এবার কোমল গলায় বলল, 'গালে খুব লেগেছিল, না রে?'

বিকৃত মুখে বিনু বলল, 'না, লাগবে না!'

'সত্যি, আর মারব না। হঠাৎ এমন রাগ হয়ে গিয়েছিল।' বিনুর মাথায় হাত বুলোতে লাগল সুনীতি।

এক ঝটকায় সুনীতির হাতটা সরিয়ে দিল বিনু, 'মারবার সময় মনে ছিল না, এখন আদর ফলানো হচ্ছে!'

সুনীতি আবার বিনুর মাথায় হাত রাখল। খোশামোদের গলায় বলল, 'জীবনে আর কক্ষনো তোর গায়ে হাত তুলব না। মাকালীর দিব্যি। আর— '

'আর কী?'

'তোকে একটা জিনিস দেব।'

'কী জিনিস?'

'দুটো টাকা।'

বিনু এবার নরম হল, একটু ভেবে বলল, 'কখন দেবে?'

'আজকেই।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর সুনীতি গলার স্বর আরো নামিয়ে দিল, 'এ্যাই—'

'কী বলছ?'

'ঝুমারা কে কে এসেছে রে?'

'ঝুমা, রুমাদি, শিশিরমামা, মামী আর—'

নিশ্বাস বন্ধ করে পলকহীন তাকিয়ে ছিল সুনীতি। চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'আর কে?'

বিনুর চোখ ঝিকঝিক করতে লাগল। সে বলল, 'যার কথা শুনবার জন্যে দম বন্ধ করে আছ, সে। আনন্দদাও এসেছে।'

'আহা, দম বন্ধ করে থাকবার আর লোক পেলাম না!' বলেই ঝুঁকে পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগল সুনীতি।

বিনু বলল, 'আমার টাকা দাও—'

'দেব'খন।'

'ও, কাজের বেলায় আঁটিসুঁটি, কাজ ফুরোলে দাঁত কপাটি।' টাকা না দিলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে।'

কিছুক্ষণ পড়াশোনার পর বিনু হঠাৎ শুনতে পেল, নীচু গলায় সুধা সুনীতিকে বলছে, 'তোর মনস্কামনা পূর্ণ হল তো দিদিভাই—'

সুনীতি বলল, 'কিসের আবার মনস্কামনা?'

উত্তর না দিয়ে সুধা রগড়ের গলায় বলল, 'আনন্দদা'র খবর জানবার জন্যে নগদ দুটো টাকা খরচ করতে হল দিদিভাই।'

সুনীতি ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'আহা—হা—'

এক সময় খাবার ডাক পড়ল।

বইটই গুছিয়ে প্রথমে সুধা-সুনীতি রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

পুবের ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে উঠোন। সুধা-সুনীতির পর বিনু আর ঝিনুক খেতে গেল।

অন্ধকারে খেতে খেতে হঠাৎ ঝিনুক বলল, 'তোমার তো এখন ভারি মজা, না বিনুদা?'

বিনু বলল, 'কেন?'

'ঝুমা এসেছে।'

বিনু কিছু বলল না; রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে ঝুমার কথাগুলো বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল শুধু।

●

পরের দিন ছিল রবিবার। দুপুরবেলা বিনুরা সবে খেয়েদেয়ে উঠেছে, সেই সময় ঝুমা আর আনন্দ এসে হাজির।

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িময় সাড়া পড়ে গেল। সুরমা-শিবানী-হেমনাথ-অবনীমোহন, সবাই ছুটে এলেন।

আনন্দ বলল, 'কলকাতা থেকে আমরা কাল এসেছি।' বলে হাসল, তার হাসিটা কেমন যেন লজ্জার রঙে ছোপানো।

সুরমা বললেন, 'বিনুর কাছে কালই আমরা সে খবর পেয়ে গেছি।'

'ওর সঙ্গে স্টিমারঘাটে আমাদের দেখা হয়েছিল।'

স্নেহলতা বললেন, 'উঠোনে দাঁড়িয়ে কথা নয়। চল, ঘরে চল—' ঝুমাদের হাত ধরে তিনি নিজের ঘরে এই এনে বসালেন। অন্য সবাই তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

ঘরে এসে আনন্দ বলল, 'জাপানী বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে লোক পালাবার হিড়িক পড়ে গেছে। আমার বাবা-মা, ভাই-বোনেরা মধুপুরে চলে গেছে—'

সুরমা শুধোলেন, 'মধুপুরে কে আছে?'

'কেউ নেই। আমাদের একটা বাড়ি আছে, একজন মালী দেখাশোনা করে।'

'কলকাতায় একখানা বাড়ি আছে না তোমাদের?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

আগের বার সুযোগ হয়নি। এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জেনে নিলেন সুরমা। আনন্দর বাবা অ্যাডভোকেট, দুই দাদা বড় সরকারী চাকুরে। ছোট ভাইটা বি-এ পড়ছে। বড় বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট যে বোন দুটো রয়েছে তারা এখনও ছাত্রী। বাকি রইল আনন্দ নিজে। আগেই এম-এ আর ল'টা পাশ করেছিল। কিছুদিন হল, বাবার সঙ্গে কোর্টে যেতে শুরু করেছে। আশা, বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই সে দাঁড়িয়ে যাবে। অ্যাডভোকেট হিসেবে বাবার বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং খ্যাতি আনন্দকে অনেকখানি এগিয়ে দেবেই। দু-চার বছর বাবার সঙ্গে বেরুতে পারলে সাফল্যের চাবিকাঠিটার সন্ধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

সুরমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল। 'জাপানী বোমার ভয়ে আমাদের বাড়ির সবাই গেল মধুপুরে। দিদি-জামাইবাবু আমাকে কিছুতেই ছাড়লেন না, টানতে টানতে রাজদিয়ায় নিয়ে এলেন।'

কৌতুকের গলায় হেমনাথ হঠাৎ বলে উঠলেন, 'রাজদিয়ায় আসতে তোমার বুঝি একটুও ইচ্ছা ছিল না!' বলে চোখের মণি দুটো কোণে এনে আড়ে আড়ে সুনীতির দিকে তাকালেন।

বিনু লক্ষ্য করেছে, এতক্ষণ একদৃষ্টে আনন্দর দিকে তাকিয়ে ছিল সুনীতি। তার চোখে-মুখে ঢেউয়ের মতন কী খেলে যাচ্ছিল। হেমনাথ তাকাতেই দ্রুত মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

এদিকে আনন্দ থতমত খেয়ে গিয়েছিল, 'না—মানে, দু বছর আগে যখন এসেছিলাম রাজদিয়া আমার খুব ভাল লেগেছিল তাই—'

বাধা দিয়ে হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'তুমি ভাই আর যাই হও, উৎকৃষ্ট উকিল হতে পারবে না—' বলে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, নিজের কেসটা পর্যন্ত ভাল করে সাজাতে পার না!'

অপলক তাকিয়ে থেকে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করল আনন্দ, তারপর হেমনাথের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হেসে উঠল।

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'এবার বন্দুক-টন্দুক এনেছ তো? তোমার যা শিকারের নেশা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ এনেছি। টোটা আর ছররা মিলিয়ে এনেছি পুরো এক বাক্স।'

স্নেহলতা বললেন, 'রাজদিয়ার জন্তু-জানোয়ার আর পাখিদের দেখছি বড়ই দুর্দিন।'

প্রগল্‌ভতার ঈশ্বর আজ বুঝি হেমনাথের কাঁধে ভর করে বসেছে। চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রগড়ের সুরে আনন্দকে বললেন, 'তুমি যা শিকারী তা আমার জানা আছে। নিশানার এক শ হাত দূর দিয়ে গুলি চলে যায়। অবশ্য—'

আনন্দ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'এক জায়গায় তীর ঠিক বিঁধিয়েছ। সেখানে নিশানা ভুল হয় নি—' বলে চোরা চোখে সুনীতিকে বিদ্ধ করলেন।

সুনীতি সেই যে মুখ নামিয়েছিল, আর তোলে নি। সমানে নখ খুঁটেই চলেছে।

হকচকিয়ে আনন্দ কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বিনুর মনে হল কাঁধের কাছে কেউ মৃদু টোকা দিচ্ছে। মুখ ফেরাতেই সে দেখতে পেল, ঝুমা।

চোখে চোখ পড়তেই ঝুমা বলল, 'চল—'

'কোথায়?'

'তোমাদের বাগানে বেড়াই গে। এখানে বসে বসে বড়দের কথা শুনে কী হবে? তার চাইতে আমরা গল্প করব।'

একটু চুপ করে থেকে বিনু বলল, 'চল—'

দু জনে ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানে চলে এল।

হেমনাথের বাড়ির নক্সাকরা টিনের চালগুলোতে রোদ ঝলকে যাচ্ছে। পুকুরে, দূর ধানখেতে, গাছপালার মাথায় কিংবা আকাশ জুড়ে—যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, রোদের ছড়াছড়ি। কিন্তু বাগানের ভেতরটা বড় ছায়াচ্ছন্ন, নিঝুম মায়ের কোলের মতন ঠান্ডা। এখানে এসেই যেন ঘুমে চোখ জুড়ে যায়।

মৌটুসকি আর হলদিবনা পাখিগুলো ঘন জামরুল পাতার ভেতর বসে বসে খুনসুটি করছিল। বড় বড় ঘাসের সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িং ঢ্যাঙা পায়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। কতকগুলো বহুরূপী অকারণেই ছোটাছুটি করছিল। আর শোনা যাচ্ছিল ঝিঁঝির ডাক। কোন পাতাল থেকে তাদের বিলাপ উঠে আসছিল, কে বলবে।

মুত্রাঝোপের পাশে, কাঁটাবেতের বনের ধারে, কিংবা আখ-জাম-বাতাবী লেবু গাছের তলায় তলায় বিনুরা কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। কিন্তু একটা জায়গাও মনঃপূত হল না।

শেষ পর্যন্ত ঝুমা বলল, 'চল, পুকুরঘাটে গিয়ে বসি—'

বিনু তক্ষুনি সায় দিল, 'চল—'

পুকুরঘাটটা নারকেল গুঁড়ি দিয়ে বাঁধানো। বসতে গিয়েই ঝুমার চোখে পড়ল, ডান ধারে সরু পিঠক্ষীরা গাছটার গায়ে একটা ছোট একমাল্লাই নৌকো বাঁধা রয়েছে।

ঝুমা তাড়াতাড়ি মত বদলে ফেলল, 'এখানে বসব না।'

'তা হলে কোথায় বসবে?'

'নৌকোয় চড়ব।'

নৌকোর নামে বিনুও উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'সেই ভালো। এসো—'

দুজনে পিঠক্ষীরা গাছটার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রথমে ঝুমাকে নৌকোয় তুলল বিনু, তারপর নিজে উঠে বাঁধন খুলে বৈঠা নিয়ে গলুইর কাছে বসল।

ঝুমা বলল, 'সেবার তুমি আর আমি নৌকোয় করে অথৈ জলে চলে গিয়েছিলাম, মনে আছে বিনুদা—'

'হুঁ—' বলেই বৈঠার খোঁচায় নৌকোটাকে মাঝ-পুকুরে নিয়ে এল বিনু।

'সেবার কিন্তু আমরা নৌকো বাইতে জানতাম না। কি কষ্টে যে পুকুর পার হয়ে ঐ ধানখেতের দিকে গিয়েছিলাম!'

'এবার আর কষ্ট হবে না। আমি নৌকো বাওয়া শিখে গেছি।'

এখন চারদিকে শুধু জল। পুকুরের ওপারে ধানখেতে, মাঠ—সব একাকার। মাঠের মাঝখানে হিজল, আর বন্যা গাছগুলোর বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে। হিজলের যে ডালপালা জলের ওপরে, ফুলে ফুলে সেগুলো ছাওয়া। আর বন্যা গাছের ডাল থেকে শক্ত শক্ত অসংখ্য গোলাকার ফল ঝুলছে। ধানখেতে বাদ দিলে যে মাঠ, সেখানে শুধু শাপলা শালুক আর পদ্ম বন।

পুকুর, ধানখেত পার হয়ে একসময় শাপলাবনে এসে পড়ল বিনুরা।

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়তে ঝুমা বলে উঠল, 'তোমাকে তো নিয়ে এলাম। সেবারের মতন আবার কান্ড করে বসবে না?'

'কিসের কান্ড?'

'কাউফল পাড়তে জলে ডুবে গিয়েছিলে, মনে পড়ে?'

বিনু বলল, 'এখন আর ডুবব না, সাঁতার শিখে গেছি।'

চোখের তারা স্থির করে ঝুমা বলল, 'বাবা, তুমি দেখছি অনেক কিছু শিখে গেছ। নৌকো বাইতে শিখেছ, সাঁতার দিতে শিখেছ—'

'বা রে, আমি বড় হয়েছি না?'

'বড় হয়েছ!' বলে নৌকোর মাঝখান থেকে অনেক কাছে চলে এল ঝুমা। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক-থেকে ওদিক থেকে মিটমিটে দুষ্টুমির চোখে বিনুকে দেখতে লাগল।

বিব্রত মুখে বিনু বলল, 'কী দেখছ?'

'সত্যিই তো বড় হয়েছ। ঠোঁটের ওপর গোঁফ উঠছে—'

বিনু লজ্জা পেয়ে চোখ নামাল।

ঝুমো আবার বলল, 'বড় তো হয়েছ, সিগারেট খাও?'

সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে যে স্মৃতিটা জড়ানো তা খুব মনোরম নয়। বিনু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানাল, সে সিগারেট খায় না।

ঈষৎ ধিক্কারের গলায় ঝুমো বলল, 'সিগারেট খাও না, কি বড় হয়েছ!'

বিনু চুপ।

কিছুক্ষণ পর ঝুমো শুধলো 'সেই কাউগাছটা এখনও আছে বিনুদা?'

বিনু বলল, 'আছে।'

'চল, কাউ পাড়ি গে—'

'কাউ এখনও পাকে নি। কাঁচা কাউ পেড়ে কী হবে?'

'তা হলে থাক। শাপলাই তুলি।'

নৌকোর ধারে গিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে কাচের মতন টলটলে জল থেকে শাপলা তুলতে তুলতে ঝুমো বলল, 'আচ্ছা বিনুদা—'

বিনু তক্ষুনি সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'মনে পড়ে, সেবার রাত্রিবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে যাত্রা শুনতে গিয়েছিলাম—'

'হুঁ।'

'ঝিনুকটার কি হিংসে; আগে থেকে নৌকোয় উঠে বসে ছিল—'

'হুঁ।'

'আমরা কলকাতায় চলে যাবার পর তুমি আর যাত্রা দেখেছ?'

'না।'

'কেন?'

'কে দেখাবে বল?'

'কেন, যুগল।'

'যুগল তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'বিয়ের পর ভাটির দেশে চলে গেছে।'

'ও মা, তাই নাকি! আর ফিরবে না?'

'না।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর ঝুমোই আবার শুরু করল, 'জানো বিনুদা—'

'কী?'

'কলকাতায় যাবার পর তোমার কথা খালি মনে পড়ত।'

'আমারও।'

'ছাই।' ঠোঁট উল্টে দিল ঝুমো।

বিনু বলল, 'বিশ্বাস কর, সত্যি মনে পড়ত।'

'রোজ ভাবতাম, আমাদের বাড়ি আসবে।'

'কি করে যাব বল? আমরা তো রাজদিয়ায় থেকে গেলাম। কলকাতায় যাওয়া হল না।'

ঝুমো বলল, 'যাওয়া না হয় নাই হয়েছিল, চিঠি লিখলেও তো পারতে।'

বিমূঢ়ের মতন বিনু বলল, 'চিঠি লিখব!'

'হ্যাঁ জানো না 'লাভার'রা চিঠি লেখে। তোমার দিদি আর আমার মামা ঝুড়ি ঝুড়ি চিঠি লিখত।'

'লাভার' শব্দটার মানে বিনুর অজানা নয়। তবু সে জিজ্ঞেস করল, 'লাভার কী?'

'আহা-হা! তুমি একটি গর্দভচন্দ্র শিকদার—' লাজুক হেসে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ঝুমো বলল, 'যাদের মধ্যে ভাব থাকে তাদের লাভার বলে।'

ফস করে বিনু বলে ফেলল, 'আমি কি তোমার—' শেষ শব্দটা গলার ভেতর থেকে কিছুতেই বার করে আনতে পারল না সে।

ঘাড় বাঁকিয়ে কেমন করে যেন হাসল ঝুমো, 'তুমি আমার কী?'

বিনু কিছু বলতে পারল না, ঝুমোর দিকে তাকিয়েও থাকতে পারল না। মুখ নামিয়ে এলোমেলো নৌকো বাইতে লাগল।

এরপর অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ। শাপলা আর বড় বড় পদ্মপাতা তুলে তুলে নৌকো বোঝাই করে ফেলতে লাগল ঝুমো, আর বিনু লক্ষ্যহীনের মতন কখনও উত্তরে কখনও দক্ষিণে নৌকোটা ছুটিয়ে বেড়াতে লাগল।

একসময় ঝুমো ডাকল, 'বিনুদা—'

'কি বলছ?' এক পলক তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল বিনু।

'কলকাতা থেকে আসবার আগের দিন একটা ইংরেজি সিনেমা দেখেছিলাম—'

'কী সিনেমা?'

'ফাইটের। খুব লড়াই ছিল। আর—'

'আর কী?'

ঠোঁট টিপে-টিপে চোখের তারায় হাসতে লাগল ঝুমো, 'এখন বলব না।'

বিনু শুধলো, 'কখন বলবে?'

একদিনে সব শুনতে চাও নাকি? 'কাল স্কুল ছুটির পর আমাদের বাড়ি যেও, তখন বলব।'

সেবার ঝুমো ছিল দুরন্ত, দুর্দান্ত, দুঃসাহসী। দু বছর পর কলকাতা থেকে অসীম রহস্যময়ী হয়ে ফিরে এসেছে মেয়েটা।

একটু ভেবে বিনু বলল, 'স্কুল ছুটির পর দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা বকে—'

ঝুমো বলল, 'আমি মাসিমাকে বলব'খন।'

'আচ্ছা।'

নৌকোয় ওঠার পর থেকে কত কথা যে বলেছে ঝুমো! অনেক সময় এক কথার সঙ্গে আরেক কথার মিল ছিল না। তবু এই অসংখ্য অসংলগ্ন কথা, ঝুমোর হাসি, চোখের তারায় অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত—সব যেন বিনুকে হাতছানি দিয়ে দিয়ে এক অচেনা রহস্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

আদিগন্ত এই মাঠের ভেতর শুধু জল, আর জল। মাঝে মাঝে ধানখেত, নলখাগড়ার ঝোপ, মুত্রার জঙ্গল, শাপলাবন, শালুকবন, পদ্মবন, কদাচিৎ এক-আধটা বন্যা কি হিজল গাছ ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। এই নির্জন জলপূর্ণ চরাচরে নিঝুম দুপুরবেলায় ঝুমোকে বড় ভাল লাগছে। আবার কেমন যেন ভয়ও করছে বিনুর। বুকের ভেতর ছোট ছোট ঢেউয়ের মতন কি যেন বয়ে যাচ্ছে তার।

রোদের রঙ যখন গাঁদাফুলের মতন হলুদ হয়ে এল সেই সময় ঝুমো বলল, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার ফিরবে না?'

বিনু বলল, 'হ্যাঁ।'

পুকুরঘাটে ফিরে এসে বিনু অবাক। জলে পা ডুবিয়ে নারকোল গুঁড়ির সিঁড়িতে একা একা বসে আছে ঝিনুক।

সেই পিঠক্ষীরা গাছটার সঙ্গে নৌকো বাঁধতেই প্রথমে লাফ দিয়ে পাড়ে নামল ঝুমো, তারপর বিনু। নেমেই বিনু ঝিনুককে শুধলো, 'এখানে বসে আছ যে?'

আধফোটা গলায় ঝিনুক বলল, 'এমনি।'

'কখন থেকে বসে আছ?'

'অনেকক্ষণ। তোমরা যখন নৌকোয় করে ধানখেতের ভেতর ঢুকলে সেই তখন থেকে—'

বিনুর একবার ইচ্ছে হল, জিজ্ঞেস করে, তাদের পিছু পিছু কি ঘর থেকে পুকুরঘাট পর্যন্ত চলে এসেছিল ঝিনুক? কি ভেবে আর জিজ্ঞেস করল না। বিনুর মন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে রইল।

বাড়িতে এসে বেশিক্ষণ থাকতে পারল না ঝুমো। একটু পর তাকে নিয়ে আনন্দ চলে গেল।

যাবার আগে অবশ্য ঝুমো সুরমাকে বলে গেছে, 'স্কুল ছুটির পর বিনুদা কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি যাবে মাসিমা—আপনি বকতে পারবেন না।'

সরল মনে সুরমা বলেছেন, 'তোমাদের বাড়ি গেলে বকব কেন? নিশ্চয়ই যাবে।'

বিনু লক্ষ করেছে, সেইসময় একবার তার দিকে আরেকবার ঝুমোর দিকে তাকাচ্ছিল ঝিনুক। কি যেন খুঁজবার চেষ্টা করছিল সে।

●

পরের দিন স্কুল ছুটির পর ঝুমোদের বাড়ি গেল বিনু।

তাকে দেখেই চোখের কোণে হাসল ঝুমো, 'একেবারে গুড বয়। আজ আসতে বলেছি, আজই এসেছ—'

খানিকক্ষণ এ-গল্প সে-গল্পের পর ঝুমোকে একলা পেয়ে বিনু বলল, 'এবার সেই সিনেমার কথাটা বল।'

'ও বাবা, ছেলের আর তর সয় না।'

কিছুতেই সিনেমার কথাটা সেদিন বলল না ঝুমো।

সেদিন কেন, আরো দিন কয়েক বিনুকে ঘোরাল ঝুমো। তারপর একদিন বিকেলবেলা বিনু ওদের বাড়ি যেতেই তাকে ছাদে নিয়ে গেল। কার্ণিশের ধারে নিরালা একটু কোণ দেখে তারা দাঁড়াল।

দূরে স্টিমারঘাটা আর বরফ কলের চুড়োটা চোখে পড়ছে। ডানধারে ঝাউবনের ওপারে সারি সারি মিলিটারি ব্যারাক। ব্যারাকের ওধারে বিকেলের রোদ গায়ে মেখে নদীর ঢেউগুলো টলমল করছে মোচার খোলার মতন কেরায়া আর ভাউলে নৌকোগুলো দুলছে। ছেঁড়া রঙীন

পাঁপড়ির মতন আকাশময় ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছে।

বিন্দু বলল, 'এবার বল—'

ভুরু দুটো বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বলল, 'শুনবার জন্যে ঘুম হচ্ছিল না বুঝি?'

প্রথম দু-একদিন মুখচোরার মতন ছিল বিন্দু, এখন সাহস বেড়ে গেছে। সে বলল, 'হচ্ছিলই না তো—'

একটু চুপ করে থেকে ঝুমা বলল, 'সিনেমাটায় কী ছিল জানো—' বলেই দু হাতে মুখ ঢেকে খিল-খিল করে হেসে উঠল।

'হাসছ কেন, বল—'

অনেকক্ষণ হাসবার পর স্থির হল ঝুমা। তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিসফিস গলায় বলতে লাগল, 'সিনেমায় একটা সাহেব একটা মেমসাহেবকে খুব 'কিস' খাচ্ছিল—'

নাক-মুখ ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল বিন্দুর। অবিশ্বাসের গলায় সে বলল, 'যাঃ—'

'সত্যি বিন্দুদা, মা কালীর দিব্যি।'

খানিক চিন্তা করে বিন্দু বলল, 'সাহেবটার কত বয়েস?'

'সাতাশ আটাশ—'

'আর মেমটার?'

'বাইশ তেইশ।'

'এত বড় ছেলেমেয়ে কখনো 'কিস' খায়!'

মুখ ফিরিয়ে ঝুমা বলল, 'তুমি একটা হাঁদারাম, কিছু জানো না। 'লাভার' হলেই 'কিস' খায়। এই যে আমার দিদি—'

বিন্দু শুধলো, 'তোমার দিদি কী?'

কলকাতায় 'দিদির এক 'লাভার' আছে—অনিমেষদা। অনিমেষদা আমাদের বাড়ি এলেই দুজনে ছাদে চলে যেত। তারপর খুব 'কিস' খেত।'

সমস্ত শরীর কেমন যেন জ্বরের মতন লাগছিল। ঝাপসা কাঁপা গলায় বিন্দু বলল, 'সত্যি?'

'সত্যি।'

তারপর কী হয়ে গেল, কে বলবে। কিছুক্ষণের জন্য সময় যেন তার গতি হারিয়ে এই নির্জন ছাদে স্তব্ধ হয়ে রইল।

বিন্দুর যখন জ্ঞান ফিরল, দেখতে পেল, বুকের ভেতর ঝুমা চোখ বুজে আছে। চকিত বিন্দু এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়িঘরের দিকে ছুটল। তর-তর করে নীচে নেমে রাজদিয়ার রাস্তা দিয়ে আচ্ছন্নের মতন সে ছুটতে লাগল, ছুটতেই লাগল। তার চারধারে চরাচর যেন দুলতে শুরু করেছে।

বিন্দু জানে না, একটু আগে ঝুমা তার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনের সিংহদরজায় পৌঁছে দিয়েছে।

স্কুলের ছুটি হলে আজকাল আর কোনদিকে তাকায় না বিন্দু, সম্মোহিতের মতন নেশাগ্রস্তের মতন ঝুমাদের বাড়ি চলে যায়। এই সময়টার জন্য সারাদিন অস্থির উন্মুখ হয়ে থাকে সে।

অশোকের কাছে জীবনের রহস্যময় একটা দিকের কথা কিছু কিছু শুনেছিল বিন্দু। কিন্তু সে সব ভাসা-ভাসা, মৌখিক। ঝুমা যেন একটানে চারদিকের সব পর্দা ছিঁড়ে সেই রহস্যটাকে তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ একদিন স্কুল ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি এসে বিন্দু অবাক, ঝিনুক বসে আছে।

বিন্দু শুধলো, 'তুমি!'

ঝিনুক বলল, সুধাদিদি, সুনীতিদিদির ছুটি হতে আজ অনেক দেরি হবে। কতক্ষণ আর স্কুলে বসে থাকব! তুমি আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।'

স্কুল ছুটির পর ঝিনুক তার ক্লাসে বসে থাকে। কলেজ থেকে ফেরার পথে সুধা-সুনীতি বাড়ি নিয়ে যায়। দু বছর এই নিয়মেই কেটেছে। আগেও তো সুধা-সুনীতি কত দেরি করে তাকে বাড়ি নিয়ে গেছে! এতকাল পর হঠাৎ বিন্দুর সঙ্গে বাড়ি ফেরার কেন যে দরকার হল ঝিনুকের, কে বলবে!

যাই হোক, আজ আর ঝুমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলতে পারল না বিন্দু। একটু পর ঝিনুককে নিয়ে বাড়ি চলে গেল।

আশ্চর্য! পরের দিনও ছুটির পর দেখা গেল, ঝুমাদের বাড়ি এসে বসে আছে ঝিনুক। তারপরের দিনও সেই এক ব্যাপার।

দু-চারদিন দেখে ঝিনুকের চাতুরি ধরে ফেলল বিন্দু। এখন আর ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি যায় না সে, স্কুল কামাই করে দুপুরবেলা ঝুমাদের বাড়ি যেতে লাগল।

ঝিনুকের সাধ্য কি ঝুমার কাছ থেকে বিন্দুকে ফেরায়!

●

কিছুদিন ধরেই খবর কাগজে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল, ঝড় আসছে।

পরাধীন দেশের আত্মা অপমানে অত্যাচারে টগবগ করে ফুটছিল। টের পাওয়া যাচ্ছিল, যে কোনদিন বিস্ফোরণ ঘটে যাবে।

কিছুদিন আগে ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে। তারপর কয়েকটা মাস সমস্ত ভারতবর্ষ যেন রুদ্ধশ্বাসে অনিবার্য কোন পরিণামের প্রতীক্ষা করছিল।

শেষ পর্যন্ত সেই দিনটি এসে গেল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে গান্ধীজী আগেই 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের কথা বলেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটি তাকে একটা প্রস্তাবে রূপ দেয়।

আটই আগস্ট বোম্বাইতে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল।

এই সময় বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেছেন, 'এই আন্দোলনে আমি আপনাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছি। আপনাদের অধিনায়ক হিসেবে নয়, আপনাদের সকলের ভৃত্য হিসেবে।' তারপরেই সমস্ত জাতির উদ্দেশে ডাক দিলেন, 'ব্রিটিশ ভারত ছাড়—কুইট ইণ্ডিয়া—'

সারা দেশে যেখানে যত বিক্ষোভ, যত বেদনা, যত অসম্মান পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল সব এক নিমেষে দৃপ্ত অগ্নিশিখা হয়ে উঠল যেন। আর সেই ঊর্ধ্বমুখ শিখার শীর্ষে দুটি অক্ষর জ্বলতে লাগল, 'কুইট ইণ্ডিয়া—'

'কুইট ইণ্ডিয়া—' শৃঙ্খলিত দেশ এই মন্ত্রটির জন্য যুগ যুগ তপস্যা করেছে। কোটি কোটি মানুষ নিদ্রোত্থিতের মতন চকিত হয়ে উঠল।

কিন্তু তারপরেই নিদারুণ খবর এল। 'রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনের পর গান্ধীজী, রাষ্ট্রপতি আজাদ, প্যাটেল, জওহরলাল, সরোজিনী নাইডু, ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ, আসফ আলী, কৃপালনী, সীতারামাইয়া এবং সৈয়দ মামুদ সহ ওয়ার্কিং কমিটির সব সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

'বিড়লাভবনে কস্তুরবা, গান্ধীজীর একান্ত সচিব প্যারেলাল, ডাক্তার সুশীলা নায়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ। এলাহাবাদে ট্যাণ্ডন এবং কাটজু।'

সারা দেশ জুড়ে শুধু ধরপাকড়ের খবর। নেতাদের কেউ বাইরে নেই, সবাই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

নেতৃহীন অনাথ দেশ এ অসম্মান নীরবে মেনে নিল না। যুগ-যুগান্ত ধরে বুকের ভেতর যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ বারুদ হয়ে ছিল দিকে দিকে তার বিস্ফোরণ শুরু হল। কোথায় মহারাষ্ট্র, কোথায় বিহার, কোথায় পাঞ্জাব—দিগ-দিগন্ত থেকে কত খবর যে আসতে লাগল! এখানে টেলিগ্রাফের তার কেটে দিয়েছে, এখানে মাইলের পর মাইল রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে, সেখানে থানা আক্রমণ, ডাকঘরে আগুন ওদিকে বিদেশী শাসকও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকল না। রক্তচক্ষু মেলে তারা দিগ্বিদিকে ছুটতে লাগল। পরাধীন দেশের জাগ্রত বিবেককে স্তব্ধ করে না দেওয়া পর্যন্ত তার ঘুম নেই।

শুরু হয়ে গেল সন্ত্রাসের রাজত্ব। গুলি, ধরপাকড়, গ্রেপ্তার। বেয়নেটের ধারাল ফলার কত মানুষের বুক ফালাফালা হয়ে গেল, রাইফেলের নল থেকে বুলেট ছুটে গিয়ে কত মানুষের পাঁজর বিদীর্ণ করে দিল। জেলখানাগুলো ভরে উঠতে লাগল।

সৌরাষ্ট্র থেকে আসাম, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—সমস্ত দেশ উত্তাল, ছোট-বড় অসংখ্য ঢেউয়ে তরঙ্গিত। কোটি কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের মতন একটি মাত্র শব্দ শোনা যায় 'কুইট ইণ্ডিয়া—'

সারা দেশ যখন দুলছে, রাজদিয়া কি স্থির থাকতে পারে? দূরের ঢেউ এই ছোট রাজদিয়াতে এসেও ভেঙে পড়ল।

বিনুদের স্কুলের হেডমাস্টার মোতাহার হোসেন সাহেব সেদিন একটা মিছিল বার করলেন। পতিত-পাবন খলিল থেকে শুরু করে কে নেই তাতে? কলেজের ছেলেরা এসেও যোগ দিল। শুধু কি স্কুল কলেজের ছেলেরা? রাজদিয়াবাসীদের অনেকেই মিছিলে এসেছে। সারা শহর বেরিয়ে পড়েছে। বিনু কি চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারে? সেও ছুটে এসেছে। প্রায় সবার হাতেই একটা করে ত্রিবর্ণ পতাকা।

সমস্ত দেশ জুড়ে যে বর্বরতা চলছে তার প্রতিবাদ করতে হবেই। শোভাযাত্রা শহরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই সঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠে শোনা যেতে লাগল :

'গান্ধীজী কি—'

'জয়—'

'ভারত মাতা কি—'

'জয়—'

'ব্রিটিশ—'

'ভারত ছাড়—'

ঘুরতে ঘুরতে থানার কাছে আসতেই হঠাৎ পুলিশরা লাঠি চার্জ শুরু করে দিল। একটা লাঠি পড়ল বিনুর হাঁটুতে। লুটিয়ে পড়তে পড়তে বিনু দেখতে পেল মোতাহার হোসেন সাহেবের মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। শুধু কি মোতাহার সাহেবই, কত ছেলের যে হাত-পা ভেঙেছে হিসেব নেই। শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। অনেকে পালাচ্ছে। থেকে থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে।

দেখতে দেখতে একসময় বেহুঁশ হয়ে পড়ল বিনু। জ্ঞান ফিরলে দেখল, সদর হাসপাতালে শুয়ে আছে পায়ে মস্ত ব্যাণ্ডেজ। তার পাশের বেডে মোতাহার সাহেব। তাঁর পর সারি সারি বেডগুলোতে আরো অনেক ছেলে। বেড বেশি নেই বলে অনেককে মেঝেতে ফেলে রাখা হয়েছে।

হাসপাতালে সাতদিন থাকতে হল। এর ভেতর হেমনাথ আর ঝিনুক রোজই আসে।

ঝিনুক ছলছল করুণ চোখে তাকিয়ে বলে, 'তোমার খুব লেগেছে, না বিনুদা?'

বিনু হাসে, 'না, তেমন কিছু নয়।'

সুরমা, অবনীমোহন, সুধা-সুনীতি একদিন পর পর এসে দেখে যায়। ঝুমাও এল একদিন। ঠোঁট টিপে বলল, 'আচ্ছা বীরপুরুষ!'

হাসপাতালে থাকার সময় বিনু লক্ষ করেছে, দিন-রাত পুলিশ সারা হাসপাতালটা ঘিরে রেখেছে। সাতদিন পর পুলিশ পাহারাতেই কোর্টে যেতে হল। তাদের বিরুদ্ধে থানা আক্রমণের অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিচারে পনের দিনের জেল হয়ে গেল বিনুর মোতাহার হোসেন সাহেবের হল দু মাস। অন্য ছেলেদেরও দশ থেকে পনের দিনের সাজা হল।

মুক্তির দিন জেল গেটে সে কি দৃশ্য। সারা রাজদিয়া যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে। বিনুরা বেরিয়ে আসতেই কারা যেন গলায় ফুলের মালা দিয়ে কাঁধে তুলে ফেলল। কাঁধে চড়েই বাড়ি ফিরল সে।

জেল খাটা, পা ভাঙার জন্য অবনীমোহন বা সুরমা সুখী নন। তাঁরা বলতে লাগলেন, 'হৈ-হৈ করে কতগুলো দিন নষ্ট করল। এ বছর কিছুতেই ও পাশ করতে পারবে না। একটা বছর মাটি হবে।'

হেমনাথ বিনুর পক্ষ নিয়ে বললেন, 'হোক নষ্ট, পড়াশোনার জন্য সারা জীবন পড়ে আছে। কিন্তু এমন দিন আর কখনও আসবে না। সেদিন প্রসেশানে না গেলে আমিই ওকে দিয়ে আসতাম।'

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের উত্তেজনা কেটে যেতে বেশ সময় লাগল। তারপর স্কুল, পড়াশোনা, ছুটির পর ঝুমাদের বাড়ি যাওয়া, ঝিনুকের সঙ্গে লুকোচুরি দিয়ে ঘেরা সেই জড়ানো অভ্যস্ত জীবনের ভেতর আবার ফিরে গেল বিনু।

দেখতে দেখতে আবার পুজো এসে গেল।

পুজোর পর মাঠের জলে যখন টান ধরল, ধানের সবুজ শিষগুলোতে হলুদ আভা লাগল সেই সময় একদিন হরিন্দ এবং তার দুই মোষের মতন ঢাকী কাগা-বগা রাজদিয়ার রাস্তায় রাস্তায় ঢেঁড়া দিয়ে গেল, 'যার যত নাও আছে তিন দিনের ভিতর সগল থানায় জমা দিবা, নাইলে বিপদ আছে।'

বিনু স্কুলে যেতে যেতে ঢেঁড়া শুনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নৌকা জমা দিতে হবে কেন?'

হরিন্দ যা বলল তা এই রকম। জাপানীরা যে কোনদিন পূর্ববাংলায় এসে পড়তে পারে। এসেই যদি নৌকো পেয়ে যায় মিত্রশক্তির পক্ষে বিপদ ঘটে যাবে। তাই সতর্কতা হিসেবে নৌকো আটক করা হচ্ছে। বিপদ কেটে গেলেই ফেরত দেওয়া হবে।

বিনু একাই না, রাজদিয়ায় আরো অনেকে হরিন্দর চারপাশে ভিড় জমিয়েছিল। তাদের ভেতর ভীত সন্ত্রস্ত গুঞ্জন উঠল, 'হে ভগবান, নাও হইল আমাগো হাত-পাও। নাও যদি আটকায় আমরা কী করুম? খামু কী?'

'এইবার মরণ, মরণ—'

তিন দিনের মধ্যেই দেখা গেল, খাল-বিল-নদী শূন্য করে থানার পাশের মস্ত মাঠটায় অসংখ্য নৌকো উঠে এসেছে। গাছি, ভাউলে, মহাজনী কোষ, একমাল্লাই, দু-মাল্লাই, চারমাল্লাই—কত রকমের যে নৌকো তার লেখাজোখা নেই।

শুধু রাজদিয়ায়ই না, চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ-চর-জনপদ, সব জায়গার নৌকোই আটক করা হয়েছে।

নৌকো আটকের পর একটা সপ্তাহও কাটে নি।

আরেক দিন স্কুলে যাবার সময় বিনু দেখতে পেল, নদীর পারে বিরাট ভিড় জমেছে। পায়ে পায়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই একটা দৃশ্য দেখে সে অবাক।

শত শত লোক নদী সাঁতরে রাজদিয়ার দিকে আসছে। তারা পাড়ে উঠতেই কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কোনখানের মানুষ?'

আগন্তুকদের একজন বলল, 'চর-বেউলার।'

'নদী সাঁতইরা আইলা যে?'

'কি করুম, গরমেন্ট নাও লইয়া গেছে। হেয়া ছাড়া আমাগো চরে এক দানা চাউল নাই। পোলামাইয়া লইয়া না খাইয়া আর পারি না।'

আরেকজন বলল, হুদা (শুধু) আমাগো চর নিকি, কুনো চরেই চাউল নাই। দ্যাখেন না দু-এক দিনের ভিতর আরো কত মানুষ রাইজদার শহরে আসে।'

সত্যিই দেখা গেল, কয়েক দিনের মধ্যে আরো অসংখ্য মানুষ খাদ্যের আশায় রাজদিয়াতে হানা দিল।

লোকগুলো সারাদিন দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় আর গোঙানির মতন শব্দ করে বলে, 'দুগা ভাত দিবেন মা, এট্টু ফেন দিবেন—'

বিমর্ষ হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে গেছে।'

(ক্রমশঃ)

আসামের কারুশিল্প

আশীষ বসু

বাঁশের ফুলদানি, মগ, ছাইদানি

এতগুলি সংস্কৃতির মিলন বোধহয় আর এমনটি কোথাও হয়নি। একদিকে থেকে মঙ্গোল সংস্কৃতি, অন্যদিকে থেকে হিন্দু সংস্কৃতি, উপজাতি শিল্পচেতনা ইত্যাদির সংমিশ্রণে আসামের কারুশিল্পের সামগ্রিক পরিচয়।

অতি উত্কৃষ্ট ভাস্কর্য ছড়িয়ে আছে আসামের নানাস্থানে। পাটলিপুত্র এবং গুপ্তস্কুলের ভাস্কর্যের প্রভাব যেমন রয়েছে সেখানে তেমনি আবার তা স্থানীয় শৈলীর বিকাশে সমুজ্জ্বল। গৃহনির্মাণ কাজে আসামের শিবসাগরের জয়সাগর দেউলের রঙঘর, কারেঙ ঘর ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৌহাটির যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে নাচের ভঙ্গীতে গড়া গণপতির মূর্তি, বিষ্ণু মূর্তি, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্রের মূর্তি, পিতলের দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি ইত্যাদি। এগুলি আসামের কারুশিল্পের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ। অহম রাজাদের তৈরী একাধিক রঙঘর, অর্থাৎ যেখানে বসে রাজারা হাতীর লড়াই ও অন্যান্য খেলাধুলো দেখতেন, আসামের নানাস্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া যুদ্ধের কাজে সৈন্য রাখার জন্য মাটির নীচে তৈরী তলাতল ঘরও দেখার মতো কাজ।

হাজো, দেবেকা, কামাখ্যা, সদিয়া, বামুনি, নুমালিগড় প্রভৃতি আসামের বিভিন্ন স্থানে অসমীয়া স্থাপত্যশিল্পের নানা নিদর্শন আজও দেখা যায়।

এখনও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব কারুশিল্পের কাজ হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হোল কামরূপ জেলা, গৌহাটি যার সদর। একমাত্র কামরূপ জেলাতেই রেশমবস্ত্র, পিতলের কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ, মোষের শিংয়ের তৈরি জিনিসের কাজ, এম্ব্রয়ডারী কাজ, বাঁশের ঝাঁপি তৈরি এমনি একাধিক কারুশিল্পের কাজ হয়ে থাকে।

কয়েক বছর আগে একবার কামরূপ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেসময় দেখেছিলাম কামরূপ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে কতো-রকমের কাজ হচ্ছে। সোয়ালকুচি গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় শুধু আওয়াজ শুনেছিলাম 'ঠক, ঠক'। তাঁতের আওয়াজ হচ্ছে। আসামের রেশমবস্ত্র অধিকাংশই এই সোয়ালকুচি গ্রামে বোনা হয়ে থাকে। শুনেছিলাম যে এক হাজারের ওপর কারিগর আছেন এই গ্রামে। বড়পেটায় দেখেছিলাম হাতীর দাঁতের আর মোষের শিংয়ের কাজ। খুব সৌখীন কাজ নয় তবু কাজের স্বকীয়তা আছে বৈকি। নলবাড়ী অঞ্চলে দেখেছিলাম অতি উৎকৃষ্ট বাঁশের ঝাঁপি তৈরি হচ্ছে। রঙদার ঝাঁপি, কলকাতায় যা আসামের ঝাঁপি বলে বিক্রি হয় তা এই নলবাড়ীতে এবং আরও দু' একটি জায়গায় তৈরি হয়ে থাকে। সারুথেবাড়ী এবং গৌহাটি সদরে তৈরি হয় কাঁসা-পিতলের জিনিস, সারুথেবাড়ীতেও কয়েক শ' কাঁসা-পিতলের কারিগর রয়েছেন।
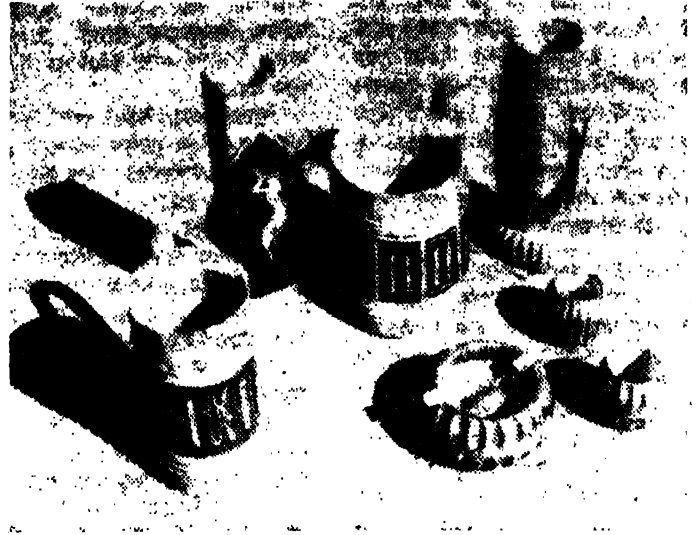
সুপুরী দিয়ে পান খাওয়া 'মঙ্গোলয়েড' সংস্কৃতির একটি নিদর্শন, তাই আসামের গ্রামে গ্রামে পানের সরঞ্জাম প্রায় ঘরে ঘরেই দেখা যায়। 'পানবাটা' আসামের কারুশিল্পের প্রতীক বলা চলে। হাজো এবং সারথেবাড়ীই কাঁসা এবং পিতলের কাজের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র।

আসামের ধুবড়ী-গোয়ালপাড়া শোলার কাজের জন্য বিখ্যাত। এখানকার তৈরি শোলার মুখোস আমি দেখেছি। বিশেষ করে শোলার তৈরি কালীর মুখোস খুব ভালো কাজ। এরকম কাজ ভারতের অন্য কোথাও হয় না বলেই মনে হয়। এছাড়াও শোলার তৈরি নানারূপ পুতুলও এখানে তৈরি হয়। অনেকটা বাঙলাদেশের কৃষ্ণনগরের মাটির কাজের মতো এখানকার শোলার শিল্পীরা কলার কাঁদি, বেগুন, আম ইত্যাদির নকল তৈরি করে থাকেন।

নক্সীকাজ বিশেষ করে সুতীবস্ত্র-চাদর, মেখলা-রিহা ইত্যাদি পরিধেয় বস্ত্রের নক্সার জন্য আসাম এবং মণিপুর অঞ্চল খুবই বিখ্যাত। আসামের পার্বত্য এলাকায় নানা উপজাতির বাস এবং তাদের অনেকেরই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সেই সেই অঞ্চলের বস্ত্রসমূহে দেখা যায়, বিশেষ করে তার এম্ব্রয়ডারী কাজের নক্সায়। আসামের নক্সাকাজে ব্যবহৃত প্রতীকচিহ্নগুলিতে লতাপাতা, কদমফুল, ময়ূর, পাখী ইত্যাদির বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে।

এছাড়াও অন্যান্য কারুশিল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাছাড় অঞ্চলের শীতলপাটির কাজ। পূর্ববাঙলা থেকে আগত বহু শরণার্থীসহ কয়েক সহস্র শিল্পী এই শীতলপাটি তৈরির কাজে নিযুক্ত। শীতলপাটি তৈরির জন্য কাঁচামাল একশ্রেণীর ঘাস যার নাম 'মোথরা' তা ভারতবর্ষে একমাত্র আসামেই পাওয়া যায় বলা চলে। বাঙলাদেশে অতিসামান্য মোথরার চাষ হয়ে থাকে। অবশ্য অনেক কারিগর বাঙলাদেশেও রয়েছেন। জোয়াই ও বদরপুর অঞ্চলে খুব ভালো বেত ও বাঁশের কাজ হয়ে থাকে। গোয়ালপাড়ায় তৈরি পোড়ামাটির পুতুল দেখলে অবাক হতে হয়। এগুলিকে লোকসংস্কৃতির এক আশ্চর্য নিদর্শন বলে মনে হবে। পাঠশালা অঞ্চলে সুতীবস্ত্র ছাড়াও বাঁশের কুলো, চালনি, ছিপ, ডালা ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে।

আসামের কাঠের কাজ এবং নানারকমের কাঠের তৈরি অলঙ্কার দেখার সুযোগ একবার হয়েছিল নংক্রেম উৎসবের সময়। শিলং থেকে আট মাইল দূরের একটি গ্রামের রাজবাড়ীতে সেই উৎসবে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। যে অপূর্ব কারুশিল্পের নিদর্শন সেদিন দেখেছি তা কোনওদিনই ভুলতে পারবো না।

এতক্ষণে কেঁদুলির মেলায় কি হচ্ছে কে জানে? দীপেনের তা জানবার দরকারও নেই। কোনমতে মেলা দেখা সেরে চলে এসেছে সে। চলে এসেছে বললে ভুল হবে। একপ্রকার পালিয়েই এসেছে। যেভাবে ফিরে আসতে হয়েছে সেটাকে পালিয়ে আসাই বলে। নিশ্চিন্তভাবে শেষ দিনটি পর্যন্ত মেলা দেখার সখ আর ছিল না। শেষদিনটি পর্যন্ত তার থাকার ইচ্ছে ছিল, থাকার ব্যবস্থাও সে করে ফেলেছিল। ব্যবস্থা হয়েছিল সুখীয়াদের বাড়িতে। সাঁওতালী মেয়ে সুখীয়া। সুখীয়ার বাপ নেই। সুখীয়ার কাকা কেঁদুলি গ্রামের একটা তল্লাটের মাঝি অর্থাৎ দলের সর্দার। তার খাতির অনেক। কেঁদুলির মেলাতে আসছিল সুখীয়ার কাকা গরুর গাড়িতে করে সুখীয়া আর তাদের পাড়ার কয়েকজনকে নিয়ে। মেলাতে আসবার মুখে গরুর গাড়ির তলা থেকে ঝুলন্ত হ্যারিকেনটা খুলে ছিটকে পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। একেবারে দীপেনের পায়ের কাছে এসে গড়িয়ে পড়েছিল। দীপেন তাড়াতাড়ি করে কুড়িয়ে সুখীয়ার কাকার হাতে তুলে দিয়েছিল। তারপরেই পরিচয়। মেলায় ঘুরতে ঘুরতে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। তারপর রাত কাটাবার সমস্যা জানাতেই সুখীয়ার কাকা জোর করে তাকে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা রাতই কাটিয়েছিল দীপেন। এবং পরের দিন সকালের দিকে ঘন্টা কয়েক। আর দুটো রাত থাকলে পুরো তিন দিন তিন রাত থাকা হয়ে যেত, মেলার কটা দিন। সুখীয়ার কাকার কোন আপত্তিই ছিল না। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমনই একটা কাণ্ড ঘটে গেল যার জন্যে দীপেনের পক্ষে আর একটা দণ্ডও থাকা সম্ভব হয়ে উঠল না।

অবশ্য কেঁদুলির মেলা এখন দীপেনের দৃষ্টির অনেক ওপারে। তবুও বাসের গতিটা যদি ড্রাইভার এই মুহূর্তে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিতে পারত তাহলে তার শিহরিত পলায়নপর মনের যন্ত্রণায় কিছুটা উপশম হয়তো ঘটতো। বাস ছুটে চলেছে। কেঁদুলি থেকে দুবরাজপুরে। অনেকটা পথ। দুপাশে ক্ষেত আর গাছপালা, মাঝখান দিয়ে বাঁকা পিচের রাস্তা। বাস ছুটছে না তো যেন সেই ছুটছে, বাসের থেকেও জোরে ছুটছে সে। দেহের কলকব্জার সংগে ফিট করে বুকের ওপরে একটা স্পীডোমিটার বসিয়ে দিলে দেখতে পারত সে মনের গতি কতখানি। যে ঘটনা ঘটে গেল মেলার মুক্তাঙ্গনে তার জন্যে দায়ী কি শুধু সে একলাই? ওই যে কি নাম যেন একজন ঘাটোয়ালের? হ্যাঁ, বংশী রায়। বংশী রায়ের কি কোন দোষই নেই? তার নিজের অপরাধ সে মেলায় এসেছিল। কিন্তু এমন বহু মেলাতেই তো সে গিয়েছে, শান্তিনিকেতনের পৌষের মেলা, ঘোষপাড়ার সতীমায়ের মেলা, মালদার রামকেলির মেলা—ছোট বড় বহু মেলাতেই গিয়েছে সে। হাতের চেটোতে থুতনি রেখে ভাবল দীপেন হয়তো তার নিজের অপরাধ সুখীয়াদের সংগে সে

আন্তরিকভাবে মিশে গিয়েছিল বলে। কিন্তু কেউ যদি তাকে আন্তরিকভাবে কাছে টেনে নেয়, আপন করে নেয়, শ্রদ্ধা ভালবাসা দেয়—সেটা কি সে অগ্রাহ্য করতে পারে, না অশোভন ঘৃণায় তাকে ছোট করতে পারে? স্নেহ ভালবাসা বন্য পশুকেও বশে আনতে পারে। তাছাড়া সুখীয়াদের সংগে মেশবার দুর্নীতিসন্ধি তো তার কিছু ছিল না। প্রয়োজনবোধেই মিশতে হয়েছিল। তাও তো পুরোপুরি দুটো দিনও না। লোকসাহিত্যের ওপর গবেষণার কাজে এই রকমভাবে তাকে নানান জায়গায় ঘুরতে হচ্ছে। ঘুরতে হবেও। এ-মেলা সে-মেলা তো আছেই। কার কাছে প্রাচীন লোকগীতির পুরোনো পুঁথি পাওয়া গেল ছোটো তার কাছে। কার কাছে লোকসাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া গেল ছোটো তার কাছে। কোথায় ঘাটোয়ালদের জীবনযাত্রা, কোথায় সাহেব-ধনী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার হদিস মিলল ওমনি খাতা-কলম ক্যামেরা নিয়ে ছোট তাদের কাছে। গবেষণার ব্যাপারে এতো লেগেই রয়েছে।

—কি কোথায় গিয়েছিলেন?

চমকে উঠল দীপেন। নিজের স্থূলে অস্তিত্বটা বুঝতে পারল এতক্ষণে। বুঝল সে বাসের ভেতরে বসে রয়েছে। বসে রয়েছে একবাস লোকের মধ্যে। দাঁড়িয়ে বসে ঠাসা-ঠাসি গাদাগাদি করে চলেছে লোক। সবই তো অচেনা মুখ, অথচ কে যেন তাকেই সম্বোধন করে বলল কথাগুলো।

—এই যে এদিকে—কোথায় গিয়ে-ছিলেন?

ভাল করে লক্ষ্য করল দীপেন। ভিড় কাটিয়ে চোখের দৃষ্টি ঠিকরে গিয়ে পড়ল বাসের ডান ধারের একটা কোনার দিকের সিটে। ঠিকই তো? চিনতে ভুল হচ্ছে নাতো? কোথায়, কোথায় যেন—মনে পড়েছে—চিরিমিরির লাহিড়ী মাল্টিপারপাস স্কুলে একসংগে কয়েক মাস ধরে মাস্টারী করেছে। নামটা যেন কি? জীবনবাবু। জীবন কি যেন? উপাধিটা, উপাধিটা? আশ্চর্য ভুলে গেছে একেবারে। দীপেনের মনে হোল বাসের স্পীডোমিটারের কাটাটা আরও অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। একদমে ছুটে চলেছে। এ যেন ছোটবেলায় কপাটি খেলার মত—একদমে চু-উ-উ করে কাউকে মোড় করে আসা। বাসটা বোধহয় আর থামবে না। একেবারেই দুবরাজপুরে যাবে। তাই যেন হয়। বাস ছুটে চলেছে—সংগে সংগে তার গোটা শরীরটাও ছুটে চলেছে—একই গতিতে। কেঁদুলি থেকে দুবরাজপুর—অনেকটা দূর।

অবাক হেসে ফের জিগেস করলেন জীবনবাবু—কোথায় গিয়েছিলেন? দীপেন এবারে উত্তর না দিয়ে পারল না, অল্প একটু হেসে বলল সে—কেঁদুলির মেলাতে। তারপর আপনি কোথা থেকে?

—আমিও তো মেলা থেকেই ফিরছি—আপনাকে তো দেখলাম না মেলায়? গিয়ে-ছিলেন কবে?

হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না দীপেন। মনে মনে ভাবল সে কালকেই তো এসেছিল মেলায়! না পরশু? না তারও আগের দিন? মনে হচ্ছে যেন বহুদিন হয়ে গেল। ঠিক, কাল.কই তো এসে পেঁৗছেছিল মেলায়। সকালে দুবরাজপুর স্টেশনে নেমে বাসে চড়েছিল। কেঁদুলিতে পেঁৗছতে প্রায় মাইল-খানেক বাকি থাকতেই বাসটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। বাসের গিয়ার খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাস আর চলল না। যাত্রীরা একে-একে নেমে পড়ল। মেয়ে মরদ শিশু বুড়ো-বুড়ি, বহু লোক। বহু লটবহর।

প্রত্যেককেই অর্ধেক করে ভাড়া ফেরত দিল কনডাকটার। তারপরেই পাকা পিচের রাস্তা ধরে হাঁটতে আরম্ভ করল সকলে। দীপেনও হাঁটতে লাগল। শীতের সকাল। কনকনে ঠান্ডা। ঠান্ডা যেন হাড়ে বিঁধতে লাগল। হিমালয়ের ঠান্ডা নেমে এসেছে। গায়ে জড়ানো গরমের শালটায় শীত মানছে না। তবুও তো সার্জের একটা পাঞ্জাবি রয়েছে গায়ে। পাঞ্জাবির তলায় একটা উলের সোয়েটার। গলায় জড়ানো মাফলার। পায়ে অ্যালবার্ট সু। বাঁ কাঁধে সুতীর ব্যাগ ঝুলছে। ইচ্ছে করল ব্যাগের ভেতর থেকে কম্বলটাও বার করে আপাদমস্তক জড়িয়ে নেয়। ব্যাগের মধ্যে আরও টুকিটাকি জিনিস রয়েছে। টুথপেস্ট ব্রাশ আয়না চিরুনি, মোটা দেখে বাঁধানো একটা লেখার খাতা, ফাউন্টেন পেন, সুলেখা কালি, এক প্যাকেট বিস্কুট, এক ঠোঙা কাজু বাদাম, গোটা কয়েক কমলালেবু, একটা পায়জামা। ডান কাঁধ দিয়ে আড়াআড়িভাবে ব্যাগের সংগেই বাঁপাশে ঝুলছে একটা দামী ক্যামেরা।

চলতে বেশ ভালই লাগছে দীপেনের। দুপাশে তাকাতে তাকাতে অনেকটা এগিয়ে এসেছে। একটা লোককে জিগ্যেস করে জানতে পারল কেঁদুলির এলাকায় এসে পড়েছে সে। মুঠো মুঠো রোদ্দুর পড়েছে ছড়িয়ে কেঁদুলির লাল মাটিতে। ট্রেনের দুলুনিটা এখনও কাটেনি। তার ওপর রাত-জাগা। ট্রেনেতে আসার সময় বেশ ঠান্ডা লেগেছে। কনকনে ঠান্ডা গেছে। কম্পার্ট-মেন্টের বন্ধ জানলা দরজা ফুঁড়ে ঠান্ডা ঢুকেছে ভেতরে। অসম্ভব ভিড় ছিল গাড়িতে। হাওড়া থেকে অনেকটা রাস্তা দাঁড়িয়ে আসবার পর কোনমতে এক চিলতে জায়গা পেয়েছিল বসবার। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে বসে আসতে হয়েছে সারাটা রাত। রোদটা এখন বেশ মিষ্টিই লাগছে। পিচ দিয়ে বাঁধানো সড়ক। দুপাশে ধানক্ষেত। শূন্যনীল উপুড় করা সবুজ ধানক্ষেতের পর। চাষীরা ফসল কাটছে। কোন কোন ক্ষেতের ফসল তোলা হয়ে গেছে। কাটা ধানগাছের মুথোগুলো ফাঁকা আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রয়েছে। পিচের রাস্তার দুপাশে সার দিয়ে অশোক শিরীষ বাবলা ছাতিম আর কৃষ্ণচূড়া গাছ। থেকে থেকে দু-একখানা করে লরী আর প্রাইভেট বাস চলে যাচ্ছে। বেশ কয়েকটা গরুর গাড়ি সার বেঁধে রাস্তা জুড়ে চলেছে। সোনালী খড়ের বোঝা বয়ে চলেছে অলস মন্থর গতিতে। যতই এগোচ্ছে দীপেন রাস্তার দুপাশ জুড়ে মনে হচ্ছে প্রসারিত শান্তি। এই রাস্তাই সোজা কেঁদুলির মেলার দিকে চলে গেছে। যেতে যেতে লক্ষ্য করল দীপেন, ক্ষেতের ফসলের ফাঁকে ফাঁকে নীল হলদে পাখিরা কেমন এসে এসে জড় হচ্ছে—আবার উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আরো খানিকটা এগোবার পর অজয় নদী চোখে পড়ল। ধু-ধু করছে বালির চর। এপাশের তীরে জায়গায় জায়গায় খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর। সাঁওতালদের ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, বুড়োবুড়িরা রোদ পোয়াচ্ছে। কাছাকাছি হাঁস আর মুরগীর দল ডানা নেড়ে নেড়ে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা ছাগল চরছে। দুপাশের মাঠে গরুগুলো ছাড়া রয়েছে ইতস্ততঃ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্য এসে লুটো-পুটি খাচ্ছে রাস্তায়। চলতে চলতে ব্যাগ আর ক্যামেরাটা একবার ডান কাঁধে নিয়ে এলো দীপেন।

বাঁ-কাঁধটা ধরে গেছে। কাঁধ পালটাতে একটু আরামবোধ করল সে। এরই মধ্যে কিছু কিছু লাল মাটির ধুলো জমে উঠেছে অ্যালবার্ট সুয়ের ওপর। লাল মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে ভাল লাগে তার। মাঝে মাঝে রাস্তার ধার ঘেঁষে হাঁটতে লাগল সে যেখানে ধুলো আর বিষন্ন সবুজ ঘাসের আস্তরণ রয়েছে ছড়িয়ে। শীতের রাতের শিশির ভেজা ঠান্ডা ঘাসের বুকে পা ফেলে ফেলে হাঁটতে লাগল। সকালের সূর্যের ভাপ এসে লাগছে গাছে গাছে ঘাসে ঘাসে লাল মাটির বুকে বুকে।

রাস্তা দিয়ে সাঁওতালদের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি দল বেঁধে চলেছে। কেউ বাঁকে করে জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, কেউ মাথায় করে। বাউলও চোখে পড়ল। নানান সম্প্রদায়ের লোক এগিয়ে চলেছে মেলার দিকে। কয়েকটা গরুর গাড়ির মধ্যে সাঁওতালদের ছেলেমেয়ে বউ বুড়ো-বুড়ি চোখে পড়ল। সকলেই সেজেগুজে চলেছে। লক্ষ্য করল দীপেন প্রত্যেক গরুর গাড়ির তলায় কেরোসিনের বাতি ঝুলছে। গরুর গাড়ি চলার তালে তালে বাতিগুলোও দুলছে। এরকম বাতি দুলতে দেখেছে স্টীমারে জাহাজে। কয়েকটা গরুর গাড়ি থেকে বিশ্রী রকমের ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ উঠছে। চাকায় তেল পড়েনি অনেকদিন। অনেক বেশি বয়সের বুড়োবুড়ি ডুলিতে চেপে চলেছে। পিটপিট করে তাকাচ্ছে তারা এদিক-ওদিক। দীপেন চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল। তার সামনের গরুর গাড়িটা থেকে তলাকার ঝুলন্ত কেরোসিনের বাতিটা হঠাৎ খুলে গিয়ে ছিটকে পড়ল এসে তার পায়ের কাছে। দীপেন তৎক্ষণাৎ সেটা পা দিয়ে আটকে নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিল হাতে করে। কেরোসিনের গন্ধ ছাড়ছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল বাতিটা। গাড়িটা কিন্তু থামল না। এগিয়ে চলল। সে বুঝতে পারল গাড়ির গাড়োয়ান বা ছইয়ের ভেতরে যারা বসে রয়েছে তারা কেউই টের পায়নি বাতিটা এমনিভাবে খুলে পড়েছে রাস্তায়। দীপেন কয়েক মুহূর্ত বাতিটা হাতে করে ইতস্ততঃ করল। তারপর সোজা গাড়োয়ানের কাছে গিয়ে বাতিটা এগিয়ে দিয়ে বলল—তোমাদের বাতিটা রাস্তায় খুলে পড়ে গেছে।

গাড়োয়ান সাঁওতাল। সে খুশি হয়ে একগাল হেসে বলে উঠল—তুই খুব উপকার করেছিস বাবু—আমার তো হুঁস ছিল নাই।

রাতের বেলায় ডেরায় ফিরে যেতে কষ্ট হোত।

দীপেনের হাত থেকে বাতিটা নিল সে। ছইয়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফের বলল—এই সুখীয়া, তোরাও খেয়াল করিস নাই বাতিটা খুলে পড়ে গেছে রাস্তায়? নে রেখে দে বটে।

দীপেন লক্ষ্য করল কমবয়সী একটি সাঁওতাল তরুণীর মুখ উঁকি মারছে ছইয়ের ভেতর থেকে। দীপেনের দিকে তাকাল সে বার কয়েক বড় বড় চোখ মেলে। মুখখানা হাসিখুসি। চোখ দুটো ভীষণ রকমের চঞ্চল। মাথাভর্তি চুল। চুলে পলাশ ফুল গোঁজা। গায়ে একটা সুতীর কম্বল কোনমতে জড়ানো। নিটোল হাতখানা বাড়িয়ে বাতিটা নিয়ে ছইয়ের ভেতরে একপাশে রেখে দিল সে। ভেতরে আরও কয়েকজন সাঁওতালী মেয়ে-পুরুষ রয়েছে। ছোট ছোট দুটো ছেলেমেয়েও চোখে পড়ল। গাড়ি চালাতে চালাতে গাড়োয়ানটি বলল—তু কুথাকে যাবি বাবু?

দীপেন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বলল—কেন্দুলির মেলায়, আর কত দূর রে?

গরু তাড়াবার পাচনবাড়িটা তুলে দূরের দিকে দেখিয়ে বলল সে—এসে গেছি বাবু—আর দেরী নাই—হুই যে ডানহাতি একটা রাস্তা বেঁকে গেছে দেখছিস ওটাই তো মেলায় ঢোকবার রাস্তা—একটুকুন গেলেই মেলা। তোর যদি শরম না লাগে গাড়িতে উঠে আয় না বাবু!

অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলে উঠল দীপেন—না-না শরম কেন লাগবে? আমরাও গরুর গাড়িতে চড়ি, তবে এসে যখন গেছি এটুকুর জন্যে আর গাড়িতে ওঠবার দরকার নেই।

দীপেন হাঁটতে লাগল গরুর গাড়ির সংগে সংগে। পিলপিল করে মিছিলের মত লোক চলেছে। রাস্তা জুড়ে মানুষ। এসে পড়েছে মেলাতে। কেঁদুলির মেলার ভিড়ে মিশে গেল সে।

শুধু মেলা দেখতেই আসেনি লোক, বহু তীর্থযাত্রীও এসেছে। কেঁদুলি কবি জয়দেবের জন্মস্থান। দীপেন জানে প্রতি বছর মকর সংক্রান্তিতে দলে দলে তীর্থযাত্রীরা আসে এই কেঁদুলির মেলায়। প্রায় সারা গ্রামখানা জুড়ে বসে মেলা। দূর দূর জায়গা থেকে লোক আসে, এমন কি জয়পুর যোধপুর থেকেও। ভিড় ঠেলে আরও ভেতরে ঢুকে গেল দীপেন। চোখের চশমাটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল একজনের মাথার গুঁতোয়। কোনমতে সামলে নিল সে হাত দিয়ে। ব্যাগ আর ক্যামেরাটা বাঁ-কাঁধে এনে ক্যামেরার ওপর বাঁহাতটা চেপে ধরে এগোতে লাগল। চারিদিকে দোকানপাট। কাঁচা বাঁশের খুঁটি—তার ওপর কোথাও টিন, কোথাও ত্রিপল, কোথাও চটের ছাউনি বিছিয়ে সারি সারি দোকান বসেছে। খেলনার দোকান, মনোহারী দোকান, মিষ্টির দোকান। ছোট ছোট হোটেল রেস্তোরাঁ। আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সে, দেখল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছে সার্কাস। ম্যাজিকওয়ালাদের তাঁবুও রয়েছে। নাগরদোলা বসেছে। নাগরদোলাতে ছেলে-মেয়ের দল চেপেছে—ওখানেও আর সাঁওতালী যুবক-যুবতী রয়েছে। নাগরদোলাতে চেপেছে দীপেন। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে একবার খুব বড় রকমের শিল্পমেলা হয়েছিল সেখানে চেপেছিল নাগরদোলাতে। তখন সে স্কুলে নীচু ক্লাশে পড়ে। আর একবার, আর একবার কোথায় যেন? কলকাতাতেই, খুব সম্ভব এক কৃষিমেলাতে, জায়গাটার নাম ঠিক এখন মনে করতে পারছে না। নীচে থেকে ওপরে ওঠবার সময় বেশ ভালই লাগে, কিন্তু ওপর থেকে নীচে নামবার সময় বুকের মধ্যে কেমন যেন শির-শির করে ওঠে।

—কোথায় রাত কাটিয়েছিলেন? আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল নাকি কেন্দুলিতে? বেশ আগ্রহের সংগে চোখ তুলে জিগ্যেস করলেন জীবনবাবু।

দীপেনের মনে হোল বাসটা বেশ জোরেই ছুটছে। নাগরদোলায় চাপার মত সব কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে, এক-একটা ছবির দৃশ্য যেন নিমেষের মধ্যে সরে সরে যাচ্ছে। জীবনবাবুর একথার কি উত্তর দেবে সে বুঝে উঠতে পারল না। কেমন যেন সংকুচিত হোল, বিব্রতবোধ করল। তবুও গম্ভীর অথচ মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল সে—হ্যাঁ, আত্মীয়ই বলতে পারেন।

পরক্ষণেই মনে মনে ভাবল সে, পরমাত্মীয় বলতেই বা বাধা কোথায়? তাই পালিয়ে আসলেও পালিয়ে আসতে হয়তো চায়নি সে। নিছক আত্মরক্ষার জন্যেই কি তার মন বিচলিত হয়েছিল? জীবনবাবুর প্রশ্নের ভাল রকম উত্তর দিতে পারল না দীপেন। মেলার পরিবেশেই ঘুরপাক খেতে লাগল তার মনটা।

হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বেলাটা অনুভব করল দীপেন। কোন ফাঁকে গড়িয়ে গেছে বেলা। চান হয়নি, খাওয়া হয়নি। অজয়ের তীরের কাছে দাঁড়িয়ে যখন চিন্তা করছে দীপেন এই সমস্ত জিনিসপত্তর কার হেপাজতে রেখে চান করে আসবে সেই সময়েই চোখে পড়ল সেই গরুর গাড়ির সাঁওতাল পরিবারটিকে। গরুর গাড়ির মধ্যেই বসেছিল তারা। দীপেনকে দেখতে পেয়ে গাড়োয়ানটি গরুর গাড়ি থেকেই হাঁক দিয়ে ডেকে উঠল—শোন কেনে বাবু—ইধারকে আয় কেনে!

দীপেন একটু ইতস্ততঃ করে এগিয়ে গেল। কাছে যেতেই খুব খুশি হোল লোকটি। দু পা ঝুলিয়ে বসেছিল সে গরুর গাড়ির সামনের দিকটায়। টিন দিয়ে বাঁধানো একটা ছোট্ট আরশি এক হাতে ধরে সামনে রেখে আর এক হাতে চিরুনি চালিয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল সে—তুই এখনও চান করিস নাই বাবু?

দীপেন দেখল, লোকটি ছাড়া আরও কয়েকজন ছইয়ের ভেতরে রয়েছে বসে। তাদের মধ্যে বয়স্ক যারা তাদের চান হয়ে গেছে। তারা জুল জুল করে দেখছে দীপেনকে। গাড়োয়ানটিকেও দেখে মনে হোল সদ্য চান সেরে উঠে মাথা আঁচড়াচ্ছে সে। দীপেন তাকে লক্ষ্য করে তার কথার জবাব দিল—নারে, সেই চিন্তাই করছি। তোকে দেখে মনে হচ্ছে তোর চান হয়ে গেছে?

——হ্যাঁ বাবু, আমাদের গাড়ির সকলেরই চান হয়ে গেছে; কেবল সুখীয়া বাদে, সুখীয়া চান করছে বটে।

—তোর নাম কি বলতো?

—আমার নাম কদমলাল কিসকু। আমি আমাদের এলাকার একজন মাঝি আছি—তোরা যাকে সর্দার বলিস।

বিনীত গর্বে চিকচিক করে উঠল, কদমলালের চোখ দুটো।

বলল সে—আমাকে সবাই কদম মাঝি বলেই ডাকে। তুইও কদম মাঝি বলে ডাকিস।

দীপেন কতকটা নিশ্চিন্ত সুরে বলে উঠল—ঠিক আছে। তুই আমার জামা-কাপড় ঘড়ি বোতাম ক্যামেরা এগুলো দেখিস, চানটা সেরে আসি, পরে তোদের ফটো তুলব।

কদম মাঝির চোখ দুটো নেচে উঠল। মাথা আঁচড়ানো থামিয়ে কালো পুরু ঠোঁটের কোঁকে হেসে বলে উঠল—ফটো তুলবি তুই আমাদের বাবু? সব থেকে বেশি খুশি হবে সুখীয়া। সুখীয়া ফটো তুলতে খুব ভালবাসে।

দীপেন কদম মাঝির কাছে তার জামা-কাপড় ব্যাগ ঘড়ি বোতাম ক্যামেরা রেখে আণ্ডার অয়ার পরে একটা তোয়ালে গায়ে ফেলে চান করতে চলে গেল।

এই মকর সংক্রান্তির দিনটিতে অজয় নদের জলে চান করতে পারাটাই নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। এ স্নান এই তিথিতে পুণ্যস্নান। বালির ওপর দিয়ে বেশ খানিকটা হেঁটে গেল দীপেন। এক জায়গায় অনেকটা জল রয়েছে। সেখানে মেয়ে-পুরুষ সাধু-সন্ন্যাসী বাউল-সাঁওতাল অনেকেই চান করছে। দীপেন আর দেরী করল না। চান করতে নেমে গেল। চান করতে নেমে দেখল একটি কালো তন্বী সাঁওতালী মেয়ে কতকটা অসম্বৃত অবস্থায় চান করছে। বুকে আর কোমরে কোনমতে দুচিলতে কাপড় জলে ভেজা অবস্থায় যেটুকু দেহের সংগে লেপটে রয়েছে তাতে মেয়েটির নিটোল নিভাঁজ অবয়বের সমস্ত অংশটা কল্পনা করে নিতে কষ্ট হল না দীপেনের। মুখখানা দেখে মেয়েটিকে চেনা-চেনাই মনে হল। কদম মাঝির গরুর গাড়িতেই দেখেছে তাকে। নামটা যেন কি? সুখীয়া। অনেকেরই দৃষ্টি সেদিকে স্থির হয়ে রয়েছে। দীপেন অবশ্য লজ্জায় বেশিক্ষণ তাকাতে পারল না। কোনমতে চান সেরে কদম মাঝির কাছে চলে এলো। দীপেন আসতেই তার দিকে জামা-

কাপড়গুলো এগিয়ে দিল কদম মাঝি। কদম মাঝি একটু উদ্বিগ্ন চিত্তে গরুর গাড়ী থেকে তক্ষুনি নেমে অজয়ের তীরের দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হাঁক পাড়ল—ই সুখীয়া তু উঠিং আয় কেনে—কত চান করবি তু?

কদমমাঝি দীপেনের কাছে ফিরে এসে বলল—জানিস বাবু, সুখীয়া মেলাতে এলেই তার নদীতে চান করা চাই চাই।

সুখীয়া একটু পরেই কাঁপতে কাঁপতে ভিজে কাপড়ে উঠে এলো। কাঁপা কাঁপা ঠোঁটেই ঝিলিক দিয়ে হেসে বলল সে—পুণ্যি হবে যে—পুণ্যি করব নাই—কি বল বাবু? এই তো বাবুও এসেছে কলকেত্তা থেকে পুণ্যি করতে।

দীপেনের জামা-কাপড় পরা হয়ে গিয়েছিল। সে সুখীয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল তক্ষুনি—না সুখীয়া, আমি পুণ্যি করতে আসি নি—আমি মেলা দেখতে এসেছি—তোদের কথা জানতে এসেছি—

উৎসুক হয়ে জিগেস করল সুখীয়া—আমাদের কথা জেনে তোর কি লাভ হবে বাবু?

দীপেন আয়না চিরুনি বার করে মাথা আঁচড়াচ্ছিল, বলল কি করে তোকে বোঝাই বল তো? গবেষণা কাকে বলে জানিস?

—লিখা-পড়ার কাজ হবে বোধহয়!

—ঠিক ধরেছিস, লেখা-পড়ার কাজে লাগবে।

সুখীয়া ভিজে কাপড় ছেড়ে একটা গেরুয়া রঙের ব্লাউস আর লাল নক্সা-পেড়ে একখানা ডুরে শাড়ি পেঁচিয়ে পরল। ভিজে কাপড়খানা নিংড়ে গরুর গাড়ির ছইয়ের ওপর মেলে দিল। ছইয়ের ওপর আরও জামা-কাপড় শুকোচ্ছে। দীপেন কদম মাঝির দিকে তাকিয়ে বলল—কদম মাঝি, তোদের গরুর গাড়ির ছইয়ের ওপর আমার ভিজে তোয়ালে আর আন্ডার ওয়ারটা শুকোতে দিলাম—

কদম মাঝির গলায় সহজ সমর্থনের সুর ফুটে উঠল—দে না বাবু—এ আর শুধাচ্ছিস কেনে? সুখীয়া তাড়াতাড়ি খেয়ে নে কেনে—বাবু তোদের ফটো লিবে যে! বাবু তুই খেয়ে এসে ফটো তুলবি তো?

দীপেন গায়ে শালখানা জড়িয়ে নিয়ে ক্যামেরা আর ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বললে—হ্যাঁরে, খেয়ে এসেই ফটো নেবো তোদের—আরো যারা যারা তোদের জানা-শোনা আছে তাদের জানিয়ে দিস—কিন্তু কোথায় খাই বল তো?

—হোটেলের কথা শুধাচ্ছিস?

—হ্যাঁরে হ্যাঁ, হোটেল ছাড়া কে আর আমার জন্যে এখানে তাঁরবত করে রেঁধে রেখেছে?

একটুখানি চিন্তা করে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল কদম মাঝি—বোলপুরের ওই মহামায়া হোটেল বসেছে পুব দিক পানে, ওই হোটেলে খেঁলিগে যা! হোটেলটা ভাল বটে—উয়ার নাম-ডাক আছে।

—তোরা কোথায় খাবি?

—আমরা ডেরা থেকে খাবার এনেছি—পান্তা ভাত আছে পিঁয়াজ আছে—দোকান হতে ফুলুরি কিনে লিব—গরুর গাড়িতে বসেই সকলে খেয়ে লিব। তুই তাড়াতাড়ি খেয়ে আয় বাবু!

দীপেন মেলার পুব দিকে গিয়ে মহামায়া হোটেল খুঁজে নিল। হোটেলটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হোল। তাদের আপ্যায়নেরও অভাব হোল না। খাওয়া সারা হলে বেরিয়ে এলো সে হোটেল থেকে।

দীপেন আসতে আসতে মেলার এই মোহন পরিবেশে লক্ষ্য করল অল্প দূরেই পাঁচজন সাঁওতালী যুবতী একটি তমাল গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে গল্প করছে। দেহ তাদের সুদীর্ঘ কালো, স্বাস্থ্য নিটোল, কমনীয়তা ফুটে বেরোচ্ছে। আরও জন-তিনেক সাঁওতাল যুবক তাদেরই পাশে বসে কেউ বাজাচ্ছে বাঁশি, কেউ বাজাচ্ছে ঢোল। থেকে থেকে ফস্টিনস্টি করছে তারা মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েগুলো ফিক ফিক করে হাসছে, এ ওর গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। দীপেন ঘুরতে ঘুরতে কদম মাঝির কাছে চলে এলো।

সুখীয়া বেশ সুন্দর করে সেজেছে এরই মধ্যে। মাথায় খোঁপার সঙ্গে পলাশ ফুল গুঁজেছে নতুন করে। ডুরে শাড়িখানা আরও সুন্দর করে পেঁচিয়ে পরেছে। দীপেন আসতেই সুখীয়া হেসে জিগ্যেস করল—বাবু তুই ফটো তুলবি তো?

দীপেন ক্যামেরাটা চামড়ার খাপ থেকে বার করতে করতে বললো—তোদের সকলের ফটো নেবো—আরো যে যেখানে আছে ডেকে নিয়ে আয়—

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে চলে গেল সুখীয়া। দীপেন মেলার চার ধারে ঘুরতে লাগল। ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করতে লাগল নানান দৃশ্য। সারি সারি মিষ্টির দোকান। থরে থরে মিষ্টি সাজানো রয়েছে। নানা রকমের প্লাস্টিক আর কাঠের খেলনা। কাঠের বারকোষ বেলুন চাকি পিঁড়ি। আয়না চিরুনি শাঁখা চুড়ি। সারি সারি শাঁখের দোকান। লোহার হাতা-খুন্তি সাঁড়াশী বঁটি। মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল। লাঠি ছড়ি, বাঁধানো ছবি, পুঁতির মালা। হরেক রকমের জিনিস। দীপেন লক্ষ্য করল, লম্বা একটা কাঠির সঙ্গে সুতো লাগিয়ে কাঠির ডগায় প্লাস্টিকের বাঁদর নাচাচ্ছে একটা বাচ্চা ছেলে। নীচের থেকে সুতো ধরে টানছে আর ওপরে বাঁদরটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। বেশ মজা লাগছে দেখতে দীপেনের। ক্যামেরা বার করে কয়েকটা ছবি তুলে নিল। উত্তর দিকে এগিয়ে গেল সে। ছোটখাটো সার্কাস বসেছে তাঁবু খাটিয়ে। বাইরে নানান ছবি আঁকা রয়েছে অপটু হাতের। কস্টিউম পরে মেয়ে-মানুষ। ট্র্যাপিজে ঝুলছে। আরও একটু দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণ করে ম্যাজিক পার্টি বসেছে তাঁবু খাটিয়ে। এ-কে মুখার্জির ইন্দ্রজাল—মুণ্ডহীন ধড়, ধড়হীন মুণ্ড। ইলেকট্রিক গার্ল। মৎস্য নারী। স্পাইডার গার্ল। বাইরে ক্যানভাসের ওপর ছবি আঁকা। মুখে মাইক লাগিয়ে চিৎকার করছে—চলে আসুন চলে আসুন, মাত্র পঁচিশ পয়সার টিকিট। এমন সস্তায় পৃথিবীর আশ্চর্যতম জিনিস দেখবেন—জ্যান্ত মানুষের মুণ্ডহীন ধড়, ধড়হীন মুণ্ড। একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ের দেহ দিয়ে ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করতে থাকবে অথচ সে কথা বলবে আপনাদের সামনে। সত্যিকার মৎস্য নারী কি কখনও দেখেছেন? রূপকথার গল্পেই পড়েছেন—চাক্ষুষ দেখবেন আসুন, পরখ করুন নিজের চোখে—এ ছাড়াও আছে স্পাইডার গার্ল—আসুন আসুন সুবর্ণ সুযোগ হারাবেন না।

ভিড়ের ধাক্কা খেল দীপেন। বেশিক্ষণ আর দাঁড়াতে পারল না। এগিয়ে গেল সে। এক পাশে কাঠের তৈরী মরণ কূপ। আরও খানিকটা এগিয়ে গেল সে। একটা তিন-চার বছরের ছেলে মায়ের কোলে চড়ে প্লাস্টিকের বাঁশিতে ফুঁ দিচ্ছে প্রাণপণ শক্তিতে। কচি কচি গাল দুটো বেলুনের মত ফুলে ফুলে উঠছে। দীপেন এবারে পশ্চিমের দিকে গেল। সারি সারি জিলিপি আর তেলে-ভাজার দোকান বসেছে হোগলার ছাউনীর তলায়। বড় কড়াইতে তেল ফুটছে আর ফুটো-করা নারকোলের মালায় করে জিলিপি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ছাড়ছে। সুখীয়া কোথা থেকে কতকগুলো ছেলেমেয়ে জোগাড় করে এসে হাজির। দীপেন এদের মধ্যে অনেককেই চিনতে পারল। তমাল গাছের তলায় এরা গল্প করছিল। সকলেই মাথায় পলাশ ফুল গুঁজেছে। প্রত্যেকটি মেয়েই শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়েছে। দীপেন তাদের জিলিপি কেনবার পয়সা দিল প্রত্যেককে। সকলকে জিলিপি কিনতে বলল সে। সকলেই জিলিপি কিনতে লাগল। সেই ফাঁকে সে কয়েকটা ফটো তুলে নিল কায়দা করে। সকলেই খুশি। এর পর এক সঙ্গে এগিয়ে চলল তারা। কদম মাঝিও এসেছে সঙ্গে। ধীরে ধীরে সিদ্ধাসনের সামনে প্রায় পড়ন্ত বেলায় এসে দাঁড়াল সকলে। ফাঁকা জায়গা কোথাও নেই এই মেলার চত্বরটুকুতে। লোকে গিসগিস করছে। যাত্রীরা ঘাসের ওপরেই বসেছে, অনেকে চট পেতে নিয়েছে। যে যেখানে যেমনভাবে পেরেছে আস্তানা করে নিয়েছে। সিদ্ধাসনের দিকে তাকাল দীপেন। এইখানে জয়দেবের বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকটি লেখা রয়েছে বাংলা হরফে — স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম দেহিপদপল্লব মুদারম। কাছেই কুশেশ্বর শিবমন্দির। কদম মাঝি বলল এটা নাকি জয়দেবের সাধনার স্থল। পাশেই পোড়া মাটির মন্দির। এটাকে আবার জয়দেব-পদ্মাবতীর মন্দিরও বলা হয়। আসলে নাকি এটা রাধাকৃষ্ণেরই মন্দির। দীপেন দেখল রাধাকৃষ্ণেরই মূর্তি রয়েছে। সকলে ঘুরতে ঘুরতে নাগর দোলার কাছে এসে থামল। নাগর দোলা ঘুরছে। ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়ি যুবক-যুবতী ঘুরছে। ঘুরছে আর ঘুরছে। সুখীয়ারা অবাক হয়ে দেখছে। সুখীয়া দীপেনের দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে। সুখীয়াকে সুন্দর লাগছে দেখতে। দীপেন লক্ষ্য করল অস্তমিত সূর্যের আবীরের স্পর্শ লেগেছে পশ্চিম প্রান্তে। সুখীয়ার মাথায় সেই অস্তমিত সূর্যের রশ্মি এসে পড়েছে। তার মাথার পলাশ আরও বেশি রাঙা হয়ে উঠেছে। সুখীয়ার মুখখানি

হাসি-হাসি। চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল। হাততালি দিচ্ছে থেকে থেকে তার যৌবনপুষ্ট নধর দেহখানা দুলিয়ে দুলিয়ে। দীপেন এদের ছবি নিল সুযোগ বুঝে—একখানা নয় কয়েকখানা। ছবি তুলে ফিল্ম গোটাতে লাগল ধীরে ধীরে। এই সময় কোথা থেকে বেশ কর্কশ পেশীবহুল চেহারার মধ্যবয়স্ক একজন লোক সুখীয়ার কাছে এসে দাঁড়াল এবং গলার স্বরটা নামিয়ে বলে উঠল—কে রে সুখীয়া?

দীপেন একটু দূরে দাঁড়িয়ে ফিল্ম গোটাচ্ছিল। লোকটার কথাগুলো কিন্তু স্পষ্ট তার কানে গেল। ফিল্ম গোটাতে গোটাতে একবার আড়চোখে দেখে নিল সে লোকটাকে। লোকটার মুখখানা চোয়াড়ে। দেহের পেশীগুলো খুবই স্পষ্ট। মাথার চুলগুলো উলটিয়ে আঁচড়ানো। পরণে সরু ফুলপ্যান্ট। সরু করে হাত গুটিয়ে চাইনিজ সার্টটা গুঁজে পরেছে। পায়ে চটি। ডান হাতের কব্জিতে লোহার বালা। মোটা করে গোঁফ ছাঁটা। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো। কোমরে দু হাত রেখে চোখ পাকিয়ে তাকাচ্ছে সে থেকে থেকে দীপেনের দিকে। সুখীয়া একটু বিরক্ত ভাব প্রকাশ করল। তবুও সংযত হয়ে লোকটার কথার জবাব দিল সে—বাবু কলকেত্তা থেকে এসেছে বটে—মেলা দেখতে—খুব ভাল আছে বাবু—মেলার ফটো লিলে—আমাদের ফটো লিলে।

লোকটা ঈর্ষান্বিত কণ্ঠে বলে উঠল—খুব যে খুশি ভাব—মাথায় ফুল গুঁজেছিস—গা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছিস—

সুখীয়া মাথা ঘুরিয়ে কোমরে হাত রেখে বলল—মেলা দেখতে এসেছি—হাসব না তো কি কাঁদব?

—না না কাঁদবি কেনে? কাঁদবি কোন দুঃখে পিরিত হলছে যে।

সাপিনীর মত ফোঁস করে উঠল সুখীয়া—মুখ সামলে কথা বলবি বংশী! তু ভাগ এখান থেকে!

সুখীয়া দীপেনের দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল—বাবু আর ফটো তুলবি নাই?

দীপেন বলল—আজকে আর হবে না রে সুখীয়া, রোদ চলে গেছে।

দীপেন লক্ষ্য করল কদম মাঝি তার কাছে নেই। অজয়ের তীরে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ফিল্ম গুটিয়ে ক্যামেরাটা খাপে পুরে কাঁধে ঝুলিয়ে একলাই এগিয়ে আসছিল সে অজয়ের তীরের দিকে। দীপেন একটু এগিয়ে এসেই থমকে থেমে পড়ল। শুনতে পেল লোকটা শাসিয়ে বলছে সুখীয়াকে—সুখীয়া তোকে সাবধান করে দিচ্ছি—কলকেতার বাবুরা খুব ধুরন্ধর হয়—তোর সর্বনাশ করে চলে যাবে—তুই বুঝতেও পারবি না—চলে যাবার পর মালুম হবে—তখন আফশোস করতে হবে—তখন এই ঘাটোয়াল বংশীর কথাই মনে পড়বে।

সুখীয়া ঝাঁঝালো সুরে জবাব দিল—তুই যা কেনে—খুব লম্বা লম্বা বাত বুলছিস—আমি দিখুদের সঙ্গে মিশি নাই ভাবছিস? বাবুটো ভাল আছে।

—ঠিক আছে। বাবুটা ভাল কি মন্দ পরে বুঝবি। বলে চাপা আক্রোশে ফুলতে ফুলতে মেলার ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

দীপেন আর দাঁড়াল না। কদমখণ্ডীর ঘাটের কাছে চলে এলো সে। কাঙালখেপা আর কুঠুরেবাবার আশ্রমের আশেপাশে আউল বাউল বৈষ্ণবেরা আখড়া গেড়েছে, ধুনি জ্বালিয়েছে। বাউলানী আর বৈষ্ণবীও রয়েছে আখড়াতে। ঘাটের ওপরেই কুঠুরেবাবার আশ্রম। এখানে একটা অতিথিশালাও চোখে পড়ল দীপেনের। কদম মাঝি কোন ফাঁকে দীপেনের কাছে এসে হাজির হয়েছে। দীপেন কদমকে দেখে বলল—আচ্ছা কদম, এই অতিথিশালায় আমাদের মত লোকেদের থাকতে দেয় না?

কদম মাঝি বলল—এসব আশ্রমের অতিথিদের জন্যে বাবু—তুই আশ্রমের অতিথি হয়ে এলে থাকতে পেতিস।

—এখানে কোন ধর্মশালা নেই?

—তা ঠিক বুলতে পারব নাই—তোবে অত চিন্তা কিসের? আমাদের ডেরাতে থাকবি—তোর কোন কষ্ট হবে নাই—তুই না থাকলে ভীষণ গোঁসা হবে—সুখীয়াও গোঁসা করবে।

—কিন্তু তোর ডেরা তো অনেক দূরে?

—আমাদের সঙ্গে গরুর গাড়ি করে যাবি। গরুর গাড়ি চাপতে তো কষ্ট হবে না তো?

—না না, তা হবে না, সে অভ্যেস আছে রে—আমরা গাঁয়ের লোক — তবে কি না—

—তবে আবার কি বুলছিস?

—আমার এরকম যেখানে-সেখানে কষ্ট করেও রাত কাটানো অভ্যেস রয়েছে—কিন্তু কষ্ট হবে তোদের।

—কি বুলছিস বাবু—তুই একটামাত্র মুনিশ আছিস—একটা কি দুটো রাত থাকলে আমাদের কষ্ট হবে? তোরা ভাবতে পারিস বাবু—আমরা ভাবি না।

অতিথিশালার পাশেই মনোহরবাবার আশ্রম। জায়গায় জায়গায় অন্নসত্রও খোলা হয়েছে। দীপেন আর কদম মাঝি এগিয়ে এলো আরও খানিকটা। অজয়ের তীরে দাঁড়িয়ে ওপারে তাকাল দীপেন। কদম মাঝি হাত তুলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—উই যে দেখতে পেছিস—মন্দিরের চুড়োর মত—উটো ইছাই ঘোষের দেউল আছে বটে—আর একটুকুন ওপাশে বিল্ব-ঠাকুর-চিন্তার আশ্রম।

দীপেন সোজা চোখ মেলল। সাহিত্যের ইতিহাসে পড়া বীর লাউসেনের কাহিনী মনে পড়ে গেল। বিল্বমংগল ঠাকুর আর চিন্তামণির গল্প স্মরণ করল। কেমন যেন সব ধূসর হয়ে এসেছে। সূর্যাস্তের আলোয় রাঙা আকাশের নীচে অজয়ের এক চিলতে জলে তখন বৈরাগ্যের রঙ লেগেছে। বটগাছ আর তমালগাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত দিন শীতের সন্ধ্যেতে ডুব দিয়েছে কোন অজান্তে। বাউল আর সাঁওতালদের গান ভেসে আসছে। একতারার সুর, সারেঙ্গি, খঞ্জনী, হারমোনিয়াম। আলাদা সুরগুলো একসঙ্গে এসে মিশে যাচ্ছে। থেকে থেকে ঘণ্টার আওয়াজ আসছে। দোকানে দোকানে সুগন্ধি ধূপ পুড়ছে। গন্ধ ভেসে আসছে। দোকানে দোকানে জ্বলে উঠেছে হ্যারিকেন মোমবাতি গ্যাস আর পেট্রোম্যাকসের আলো। চেয়ে দেখল দীপেন বাউলের দল একতারা হাতে করে গানের তালে তালে ঘুঙুর পায়ে নাচতে শুরু করেছে।

মেলার হট্টগোলে রাত বেশ গড়িয়ে গেল। কদম মাঝি তোড়জোড় করতে লাগল বাড়ি ফেরবার জন্যে। সে নাছোড়বান্দা। দীপেনকে যেতেই হবে তাদের সঙ্গে। মেলাতে একটুখানি রাত কাটাবার মত জায়গা হয়তো জুটেই যেত দীপেনের। তাতে ঘুম না হবার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। আগের রাতেও তার ঘুম হয়নি ট্রেনে। হয়তো কদম মাঝির বাড়িতে গেলে হাত-পা ছড়িয়ে একটু ঘুমোতে পারবে। দীপেন আর আপত্তি করল না। সকলে যখন গরুর গাড়ি করে কদম মাঝির বাড়িতে এসে পৌঁছাল তখন মাঝ রাতের নিশুতি।

খড়ের ছাউনী দেওয়া মাটির ঘর। ঘর একখানা নয়, অনেকগুলো। মাটির উঠোন দাওয়া ঘর সুন্দর করে নিকোনো। সাজানো-গোছানো ঝকঝকে-তকতকে। ঘরের দেওয়ালে নানা রঙের ছবি আঁকা। ঘরের মধ্যে লাঠি বর্শা বল্লম তীর-ধনুক। দীপেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। গায়ে হাতে পায়ে ব্যথা অনুভব করছিল। ক্ষিদেতে শরীর পেট জ্বলছিল। ঘরের সঙ্গে লাগানো মাটির উঁচু দাওয়া। তারই এক-

পাশ ঘেরা। ঘেরা জায়গাটুকুতে খাটিয়া পেতে দীপেনের শোবার ব্যবস্থা করে দিল কদম মাঝি। দীপেন খাটিয়ার পর বসল। একটু পরেই মাটির একটি পাত্রে হাড়িয়া এনে রাখল কদম মাঝি দীপেনের সামনে। একটা উৎকট পচা গন্ধ বলেই মনে হোল। হাঁড়িটা মুখের কাছে তুলে ধরতেও গা ঘিনঘিন করে উঠল। দীপেন নাক মুখ কুঁচকে কদম মাঝিকে বলল—কদম কিছু মনে করিস না, আমার তো হাড়িয়া খাওয়া অভ্যেস নেই—অন্য কিছু খাবার থাকে তো দিতে পারিস।

কদমমাঝির গালের কপালের চামড়া কুঁচকে উঠল, কালো পুরু ঠোঁট ফাঁক করে হেসে বলল—আজ আমাদের বাঁধনা পরব বাবু—সমরাত্তির হাড়িয়া খেয়ে আমরা নাচবো আর গাইবো—তাই তোকেও হাড়িয়া খেতে দিয়েছি—খা না বাবু—ভাল লাগবে—ডর করিস নাই।

—আরে কদম, হাড়িয়া আমি সহ্য করতে পারব না, একেবারেই অভ্যেস নেই—তুই বরং চিঁড়ে মুড়ি যা থাকে নিয়ে আয়।

—চিঁড়ে আর গুড়ের পাটালি খাবি বাবু?

—সে তো অতি উপাদেয় রে—নিয়ে আয় নিয়ে আয়!

সুখীয়া এসে হাড়িয়ার পাত্রটা উঠিয়ে নিয়ে গেল। একটু পরে বড় একখানা কাঁসার থালাতে প্রচুর পরিমাণে মোটা মোটা লাল চিঁড়ে, খেজুরের গুড়ের অনেকটা পাটালি এনে হাজির করল সুখীয়া। দীপেন খাটিয়ার ওপর বসে খেতে লাগল। এমন সময় মেলায় দেখা সেই লোকটা এসে হাজির। পাড়ার আশপাশ থেকে বহু সাঁওতাল মেয়ে-মরদ দলদল করে এসে জড় হয়েছে খোলা উঠোনটায়। উঠোনের এক জায়গায় শুকনো ডালপালা কাঠ জড় করে আগুন ধরিয়েছে। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসেছে সকলে। দাওয়ার পর বসে সব দেখতে পাচ্ছে দীপেন। গোটা উঠোনটাই চোখে পড়ছে। অনেকগুলো মাটির হাঁড়ি রয়েছে। হাঁড়ি থেকে হাড়িয়া ঢেলে কাচের গেলাসে করে খাচ্ছে সকলে। দীপেন লক্ষ্য করল কদমমাঝি একটা গোটা হাঁড়ি নিয়েই বসেছে। লোকটাকে চোখ ঘুরিয়ে দেখে কদমমাঝি বলে উঠল—এই যে বংশী—তুই শালা জমি-জিরেত বাড়িয়ে এখন গেরামের উঠতি মোড়ল—গরীব চাষীর দুঃখু দেখ না—শালা গোপনে গোপনে রেতের বেলায় ধান পাচার করলে লেভী দেবার ভয়—চড়া দাম হেঁকে মুনাফা লুটলে—আমরা শালা ভুখা রইলাম—শালা এর শোধ নিব এক-দিন—জানিস তো আজ আমাদের পরব—শালা আসছিল কদম হাড়িয়া খা—কিন্তু নাচতে দিব নাই।

দীপেনের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। শালখানা গায়ে বেশ করে জড়িয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল সে। হাড়ের মধ্যে শীত ঢুকছে। দীপেন লক্ষ্য করল—বংশী তার লম্বা লম্বা চুলগুলো চোখের ওপর থেকে দুহাত দিয়ে পেছনের দিকে ঠেলে তুলে দিয়ে কঠিন গম্ভীরপানা মুখ করে তাকাল কদমমাঝির দিকে। অপরাধকে চাপা দেবার চেষ্টায় একটা কৃত্রিম সহজভাবকে আনবার চেস্টা করল সে। তারপরেই বিকট একটা পৈশাচিক হাসি হেসে কদমমাঝির কাছ থেকে হাঁড়িটা তুলে নিল দুহাত বাড়িয়ে। হাঁড়িতে মুখ লাগিয়ে ঢকঢক করে সমস্ত হাড়িয়াটুকু খেয়ে নিঃশেষ করে হাঁড়িটা ফের নামিয়ে রাখল সে কদম মাঝিরই সামনে। দম নিতে লাগল বংশী। কদমমাঝি কটমট করে তাকাল বংশীর দিকে। দীপেন দেখল কদমমাঝির কর্মঠ হাতদুটি শিথিল হয়ে এসেছে। ওই দুটো হাত দিয়েই সে থরে থরে ফসল তোলে মাঠ থেকে। বয়স হলেও পেশীবহুল গড়ন আর প্রশস্ত কাঁধ দেখে মনে হয় এখনও সে শক্তি ধরে। ঝাঁকানি দিয়ে দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠছে সে। আরো যারা বসেছিল আগুনের চারপাশে তারাও দুলছে। বাঁধনা পরবের প্রচন্ড আনন্দ শিহরণে উদ্দাম হয়ে উঠেছে সকলে। মেয়েরা উঠোনে গোল হয়ে নাচতে শুরু করেছে। গায়ে তাদের গরম জামাকাপড় কিছু নেই। কেবল লজ্জা নিবারণের আচ্ছাদনটুকু মেয়েদের দেহের সংগে কোনমতে সাপের মত লেপটে রয়েছে। বংশী এবারে তার ছিলছিলে চাবুকের মত লম্বা দেহখানা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে নিয়ে গেল সুখীয়ার কাছে। মাদল বাজতে শুরু করেছে বাঁধনা পরবের। সাঁওতালী মেয়ে মরদের মিষ্টি সরল চাহনী অথচ নিলাজ মেলামেশা কতকটা সম্মোহিত করল দীপেনকে। একে অপরের কোমরে হাত দিয়ে জড়িয়ে কখনো গোল হয় কখনো একসারে লম্বা হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে তালে তালে সামনে পেছনে পা ফেলে ঘুরে ঘুরে নাচছে। নাচছে আর নাচছে। দীপেনের মনে হল কেঁদুলির আকাশ বাতাসও নাচছে। মধ্যরাতের শীতটা অনেকটা হাল্কা বলেই মনে হোল। সংগে সংগে গানও গাইছে এক-সুরে মাদলের তালে তালে। সুখীয়া একলাই নাচছিল দলের মাঝখানে। বংশী সোজা গিয়ে সুখীয়ার হাত ধরে টেনে নিল বুকের কাছে। ডাগর মেয়ে সুখীয়ার নরম হাতখানা ধরে কাছে টানতেই দেহের রক্ত চনমনিয়ে উঠল বংশীর। চোখেমুখে আগুনের রঙ। বুকে রক্তের ঢেউ ভাঙছিল তখন। সুখীয়ার আধখোলা নিটোল শঙ্কাজোড়ার দিকে তাকিয়ে বংশীর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। বেতাল হয়ে ঈষৎ জড়িত গলায় বলল সে—চল, তুই কিন্তু আজ আমার জুটি—কত নাচতে পারিস দেখব—

সুখীয়া এক ঝটকায় হাতখানা ছিনিয়ে নিল। মুখখানা কঠিন করে তীব্র গলায় বলে উঠল তক্ষুণি—যা কেনে—তোর সংগে নাচব নাই—তুই মরো আছিস।

বংশী সেই মুহূর্তে পকেট থেকে দশ টাকার একখানা নোট বার করে সুখীয়ার হাতের মুঠোয় গুঁজে দিল। সুখীয়া নোটখানা আগুনের কাছে এনে মেলে ধরল। এক মুহূর্তের জন্য ঘেন্নায় শিউরে উঠল সে। পরে নোটখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে দলা পাকিয়ে বংশীর দিকেই ছুঁড়ে মারল। বংশী একটু থতমত খেয়ে গেল। বিষধর সাপের নিঃশ্বাস ছাড়ছিল সুখীয়া। বংশী কটাক্ষ করে ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা হাসির ঢেউ তুলে সুখীয়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলে উঠল—দশ টাকাতেও মন ভরল না? কলকাতার বাবু তোকে তোর পিরিতের দাম এর থেকেও বেশী দিয়েছে নাকি?

সুখীয়া এবার গর্জে উঠল—মুখ সামলে বংশী—মুনাফা লুটে তুই খুব টাকার গরম দেখাচ্ছিস—বেরিং যা এখান থেকে—তোর সংগে কিছুতেই নাচব নাই—তুই আমাদের ডেরাতে আসতে পারবি না। কদম মাঝি নিজের ঝিমিয়ে পড়া শরীরখানা কোনমতে তুলে নিয়ে বংশীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। বংশী তার বাঁ হাতের কব্জি এগিয়ে দিয়ে সমস্ত শরীরটা দিয়েই ঠেলা মারল কদম মাঝিকে। কদমমাঝি টাল সামলাতে পারল না। পেছনেই আগুন। আগুনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল সে। দীপেন তক্ষুণি ছুটে এসে কদমমাঝিকে জড়িয়ে ধরল। সুখীয়াও সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এলো তার কাকাকে ধরতে। নাচ গান থামিয়ে হৈ-হৈ করে তেড়ে গেল সকলে বংশীর দিকে। বংশী বেগতিক দেখে কোনমতে দলা পাকানো দশ টাকার নোটখানা কুড়িয়ে নিয়ে উঠোনের খড়ের গাদার পেছনে দৌড় মারল। কদমমাঝির নেশাতুর চোখে পোড়া-কাঠের আগুন জ্বলতে লাগল ধকধক করে।

আবার শীতের হাওয়াটা যেন ভারী হয়ে উঠেছে। চাঁদের রোশনাই চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে নিবিড় ছায়াঘন গাছে গাছে, ঝাড়ের উঠোনে, দাওয়ায় খড়ের চালে। আকস্মিক বিপদের আশংকা থেকে কদমমাঝিকে রক্ষার জন্যে সকলে সসব্যস্তে ছুটে এল দেখে কদমমাঝি মনে মনে খুশি না হয়ে পারল না। এ এলাকার মাঝি সে। পুরোনো প্রতাপটা রোমন্থন করে উঠল দেহের শিরায় উপশিরায়। ক্ষণিক আনন্দে নিষ্প্রভ চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল কদমমাঝির। হেঁকে বলে উঠল সে—তোরা নাচ—নাচ বন্ধ করলি কেনে? বাবু আজ আমাদের অতিথি হলছে—বাবু খুব ভাল—বাবুকে নাচ দেখা তোরা, গান শোনা!

বিপুল উদ্দমে আবার নাচতে শুরু করল সকলে। গানের তালে তালে মাদল শিঙ্গা বাজতে আরম্ভ করল আবার। পচা মাংসের ভেপসা গন্ধে গুমোট হয়ে উঠেছে হাওয়া। মত্ততায় উদ্দাম হয়ে উঠল সকলে। কিছুক্ষণ পরে মেয়ে মরদে নিলাজ ভঙ্গিতে জড়িত উল্লাসে বেরিয়ে পড়ল বনের মধ্যে, ঝোপে ঝাড়ে।

দীপেনের ভীষণ শীত করছিল। কম্বল শাল জড়িয়েও শীত মানছিল না।

কদমমাঝি বসে গেল না। দাওয়ার পরে অন্য একখানা খাটিয়ায় বসে ঝিমোতে লাগল। দীপেন যে শীতেতে অস্বোয়াস্তি-বোধ করছিল ভাল করে ঘুম আসছিল না সেটা কিন্তু বুঝতে পেরেছিল কদম-মাঝি। কদমমাঝি দীপেনের দিকে তাকিয়ে বলল—তোর জাড় কাটছে না বাবু? দাঁড়া খড় বিছিয়ে দিই খাটিয়ার ওপরে—দেখবি ভীষণ গরম হবে।

কদমমাঝি তাড়াতাড়ি করে উঠে গিয়ে খড়ের গাদা থেকে খড় এনে বিছিয়ে দিল খাটিয়ার ওপরে। খড়ের ওপরে সতরঞ্চি কম্বল চাদর পেতে দিল। দীপেন এবারে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে পড়ল এবং বেশ আরামবোধ করল। একটু পরেই ভীষণ গরম বোধ হোল. মনে হোল তুলোর গরমও বোধকরি এত আরামদায়ক নয়। অল্প-ক্ষণের মধ্যেই ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল দীপেন। আচ্ছন্ন অবস্থাতেই মৃদু মৃদু কানে ভেসে এল বাঁধনা পরবের মিলিত কন্ঠের গান আর মাদলের বাজনা—ডিম-ডিম-ডিম ডিম ডিম-ডিম।

দীপেনের পাশের সীটটা খালি হতেই তাড়াতাড়ি করে জীবনবাবু উঠে এসে তারই পাশটাতে বসে পড়লেন। জীবনবাবু মৃদু হেসে বসে পড়তেই দীপেনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন জীবনবাবু—আচ্ছা দীপেন-বাবু মেলায় কি একটা গন্ডগোল দেখলাম—ঠিক বুঝতে পারলাম না—সাঁও-তালরা একটা জায়গায় জড় হয়ে জটলা করছে—তারা সবাই উত্তেজিত বলে মনে হোল—প্রত্যেকের হাতে তীরধনুক লাঠিসোঁটা বর্শাবল্লম—সে এক তুলকালামকান্ড মশাই। সকলেই কাকে ঘিরে যেন মারমুখী হয়েছে।

বংশীর ভয়ংকর মুখখানা ভেসে উঠল সেই মুহূর্তে দীপেনের মনে। স্পষ্ট দেখতে পেল তার উঁচু কঠিন চোয়াল দুটো।

জীবনবাবু ফের বললেন—আমি তো ওই রকম গন্ডগোল দেখে আর দাঁড়ালাম না—জানেন নাকি কি ব্যাপার?

বেশ চিন্তিত মুখে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল দীপেন—এ্যাঁ—হ্যাঁ—না—মানে—

দীপেন তার জবাবটা শেষ করতে পারল না। সে নিজে যে ঘটনার উপলক্ষ্য তার শেষটুকু আর একবার থিতিয়ে ভাববার চেষ্টা করল।

তারপর, হ্যাঁ তারপর সুন্দর নিটোল একটা রাত পুইয়েছিলু। সে রাত সাঁওতাল-দের বসন্ত উৎসবের রাত, বাঁধনা পরবের রাত।

শীতের সকালের নরম রোদ এসে পড়-তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল দীপেন। বিগত রাত্রির ঘটনাকে এই মুহূর্তে কেমন একটা স্বপ্নের মতো মনে হোল। নড়েচড়ে বসতে কষ্ট হচ্ছিল তার। সমস্ত শরীরটা জড়িয়ে উঠেছে ব্যথায়। কম্বল মুড়ি দিয়ে আরও খানিকটা পড়ে থাকতে পারলে ভাল হোত।

কিন্তু সকালের দিকেই গরুরগাড়ি করে সকলে চলে এলো মেলায়। মেলায় পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা হয়ে গেল। অজয় নদে চান করা আর হোল না দীপেনের। কোনমতে মহামায়া হোটেলে দুটো খেয়ে নিয়ে সুখীয়াদের কয়েকটা নাচের ফটো তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো সে। মুভি ক্যামেরা না হলে ঠিক নাচের ফটো ওঠে না জানে দীপেন। তবুও নাচের ভঙ্গীতে ছেলে-মেয়েদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে ক্যামে-রার ডিসটানটা ঠিক করতে লাগল। ছেলে-দের মধ্যে কারো হাতে মাদল. কারো হাতে বাঁশি। মেয়েদের মাথায় পলাশ ফুল গোঁজা। হঠাৎ ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার দিয়ে বংশীর চেহারাটা নজরে এলো। বিশ্বাস করতে পারল না দীপেন নিজেকে। কালকে অত কান্ড হবার পরও বেহায়ার মত বংশী এসে দাঁড়িয়েছে দলের মধ্যে। চোখ তুলে তাকাল দীপেন। সুখীয়ার সংগে কথা বলছে সে হেসে হেসে। সুখীয়া দলছাড়া হয়ে পড়েছে। দীপেনের এবার যেন একটু রাগই হোল। কতকটা উত্তেজিত গলায় বলে উঠল সে—কি অন্যক্ষ সুখীয়া—ঠিক জায়গায় এসে দাঁড়া না—এখন কোন কথা বলিস না।

কথা কটা তীরের মত বিঁধল গিয়ে বংশীর বুকে। বংশী তক্ষুনি চোয়াল শক্ত করে পেশী ফুলিয়ে এগিয়ে এলো দীপেনের কাছে। খপ করে দীপেনের একখানা হাত ধরে বলে উঠল বংশী—খুব মজা লুঠছিস না? তোর মতলব কি বলতো? এখুনি এখান থেকে চলে যা—তা না হলে সাঁওতালদের লেলিয়ে দেব—ওরা তোকে কাঁড় মারবে! প্রাণের ভয় থাকে তো—

সুখীয়া ছুটে এসে এক ঝটকায় বংশীর হাতখানা সরিয়ে দিয়ে শাসিয়ে উঠল—তু হট যা বংশী—বাবুর গায়ে হাত দিবি নাই—বাবু ভাল আদমি আছে—কাঁড় তোকে মারব—হট যা তুই বলছি—

দলে দলে সাঁওতালী ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ি জোয়ান মর্দ ছুটে এলো। হৈ হৈ করে আক্রোশে ঘিরে ধরলো বংশীকে। অভিমন্যুর ব্যূহ তৈরী হয়ে গেল মুহূর্তমধ্যে। চারপাশ থেকে লোক জড় হচ্ছে। হৈ হৈ আওয়াজ চারিদিক থেকে আসছে। বর্শাবল্লম লাঠি তীর ধনুক কোঁচ হাতে এসে পড়ল সাঁওতালেরা। কালো কালো মাথা গিসগিস করতে লাগল। বংশীকে লক্ষ্য করে সকলে বলছে—এ বংশী—এ খাটোয়াল—কাঁড় তোকে মারব—খবর-দার বাবুর গায়ে হাত দিবি নাই।

দীপেন নিজেকে বেশ অপ্রস্তুত বোধ করল। এমন একটা ভীতিজনক কান্ড ঘটে যাবে সে ধারণায় আনতে পারে নি। সে একটুক্ষণ কি চিন্তা করে ওই ভিড় আর হট্টোগোলের মধ্যে থেকে কোনমতে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কদমমাঝি আর সুখীয়াকে ডাকল ইসারায়। বংশীকে ঘিরে ততক্ষণ তুমুলকান্ড চলছে সাঁওতালদের মধ্যে। তাকে বোধহয় তীর মারবার মতলব আঁটছে সকলে। কদমমাঝি আর সুখীয়া দীপেনের সামনে দাঁড়াল উত্তেজিত শরীর নিয়ে। তাদের শরীরের উত্তাল রক্তে তখন আগুন ছুটছে। বংশীকে যেন তারা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে এই মুহূর্তে। ঘনঘন নিশ্বাসে সুখীয়ার বুক. ওঠানামা করতে লাগল. জিজ্ঞেস করল সে—কিছু বলবি বাবু তুই?

দীপেন অনুনয়ের সুরে বলল—দেখ তোরা কাঁড় মারিস আর যাই মারিস—আমি মেলায় থাকতে আর এসব কান্ড করিস না—অন্য লোকেরা ভাববে আমিই এসব কান্ড করিয়েছি— আমি চাই না আমার জন্যে কারো কিছু ক্ষতি হোক—আর সত্যিই তো আমি এই মেলায় এসে তোদের সংগে মিশেছিলাম বলেই তো আজ এমন কান্ডটা ঘটে গেল।

কদমমাঝি রাগে কাঁপছিল, দীপেনের একখানা হাত ধরে নরম সুরে বলল সে—না বাবু তুই কিছু মনে করিস না—ওই বংশী বেটাই বদমাইশ আছে—তোর কোন দোষ নাই—ওর স্বভাবটোই ওইরকম আছে—আজ ভীষণ গোসা হয়ে গেল বাবু।

—ঠিক আছে তোরা এখন গোলমালটা থামিয়ে দে তো কায়দা করে—মেলার মধ্যে কেমন একটা বিশ্রী কান্ড ঘটে গেল বলতো।

কদমমাঝি আর সুখীয়া দীপেনকে কিছুটা আশ্বস্থ করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দীপেন আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। পা জড়িয়ে আসছে, শরীর অসাড় হয়ে আসছে। কেমন ঝিম মেরে আসছে ক্লান্তিতে। কোন মতে দম আটকানো অস্থির ভিড়ের চাপ থেকে সন্তর্পণে নিজেকে মুক্ত করে এনে জোর কদমে পা চালাল সে দুবরাজপুরের বাস ধরবার জন্যে।

রাস্তায় এসে মাঠের দিকে চেয়ে দেখল দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে কখন। মাঠের ওপর থেকে রোদ সরে গিয়ে তাল গাছের মাথায় ঠেকেছে সে রোদ। তারপর সেখান থেকে আরো ওপরে উঠে সেই ম্লান রোদ চোখের আড়াল হলো দুবরাজপুরের একখানা বাস আসতেই।

—কী অত ভাবছেন বলুন তো দীপেনবাবু?

এবারে জীবনবাবু একটু বিস্মিত কন্ঠেই বলে উঠলেন।

দীপেনের চোখের সামনে থেকে একটা ঘোলাটে পর্দা সরে গেল। সপ্রতিভ চোখে জীবনবাবুর দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত কন্ঠে বলে উঠল সে—না প্রাজ্ঞে, কি আশ্চর্য দেখুন মেলায় একটি বারও আপনার সংগে দেখা হলো. না—দেখা হোল কি না এই চলন্ত বাসে। বাসের তীব্র গতিটা নিরেট-ভাবে উপলব্ধি করল দীপেন। মনের মধ্যে একই প্রশ্ন ঘুরেপাক খেতে লাগল—দুব-রাজপুর আর কতদূরে?

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

২৫

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণ-চিত্রসেন

আপনি কতখানি গণ্যমান্য লোক ?

আমাদের মধ্যে অনেকেই গর্ব করে বলেন, মান সম্মানের জ্ঞান তাঁদের যথেষ্টই আছে। কিন্তু যখন খুব মন দিয়ে নিজেদের যাচাই করি, তখন কি ঠিক ততখানি গর্ব করার মতো কিছু পাই ?

এ বিষয়ে যাতে আমরা নিজেদের যাচাই করে দেখতে পারি, তাই নীচে দেওয়া হলো একটি টেস্ট-লিস্ট। এতে বিভিন্ন পরিস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে—যে পরিস্থিতিতে আপনি যেমনভাবে ভাবেন বা কাজ করেন ঠিক তেমনভাবে টিক দিয়ে যান। সবশেষে আপনার মানসম্মান বোধের মাপকাঠি পাবেন।

১। দোকানী আপনাকে বেশি পয়সা ফেরৎ দিয়ে ফেলেছে, কিংবা দামে কিছু ভুল করে ফেলেছে।

(ক) তাকে বলবেন ? বোধহয় না! আজ বরাত ভাল।

(খ) দোকানী-বেচারীকে হয়তো খেসারত দিতে হবে। হয়তো কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ভুল করেছে, হয়তো কাজে নতুন লেগেছে, কিংবা মনে মনে হিসাব করতে পাকা নয়। আপনি নিশ্চয়ই ভুলটা ধরিয়ে দেবেন।

২। বিলের টাকা শোধ করতে হবে।

(ক) টাকার জন্যে ক'দিন সবুর সইতে পারে না? আপনি যতদিন সম্ভব টাকার জন্যে সময় নিতে থাকেন।

(খ) আপনি জিনিষ পেয়ে গেছেন কিংবা যে কাজের জন্য বিল হয়েছে, সে কাজও সম্পূর্ণ হয়েছে, সুতরাং তাদের বিলের টাকা মিটিয়ে দেওয়াই উচিত। সত্যি সত্যি তাদেরও তো অন্য পাওনাদারদের বিল মেটাতে হবে।

৩। আপনাকে কেউ সুন্দর একখানি বই পড়তে দিয়েছিল।

(ক) যদি বইখানি বেশ কিছুদিন আটকে রাখতে পারেন, তাহলে হয়তো বই-এর মালিক বইটার ঠিক-ঠিকানাই পাবেন না—ভুলে যাবে, আর তাহলে তো বইখানি দখলেই এসে যাবে।

(খ) বইখানা পড়া হয়ে গেলেই বই-এর মালিককে ধন্যবাদ দিয়ে ফিরিয়ে দেবেন, আর চাইবেন, আপনার বই নিয়েও সে যেন অমনি করে।

৪। হয়তো ক্লাবের আপনি সেক্রেটারী হয়েছেন।

(ক) কেউ যদি ভাবে, আপনি এবার খুব খাটবেন, তাহলে ভুল করবে। যা চলছিল, তাই-ই চলবে, ব্যস্।

(খ) আপনি একটা দায়িত্ব নিয়েছেন। যতদূর সম্ভব দক্ষতার সঙ্গে আপনাকে কাজ করতে হবে।

৫। আপনি এমন একটা জিনিস বা কাজ করেছেন, যেটি সফল হয়েছে, কিন্তু আপনি বেশ ভালোভাবেই জানেন, সহায়তা না পেলে সেটি আপনি কোনমতেই করতে পারতেন না।

(ক) সবাই আপনার প্রশংসা করছে আর তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে আছেন। 'আমি তো করেছি'—এই মনোভাবে বুক ফুলিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলছেন। প্রশংসার সব ভাগটুকুই নিজে নিচ্ছেন।

(খ) আপনার প্রশংসার কথা উঠলেই আপনি চটপট সেইসব লোকেদের দেখিয়ে দিচ্ছেন, যাঁরা খুব খেটেছেন সফলতার পথে আর তাঁদের সামনে টেনে এনে প্রশংসার ভাগ দিচ্ছেন।

৬। আপনি একটা ভুল করেছেন।

(ক) চুপচুপ! কেউ যেন জানতে না পারে। একটা গল্প খাড়া করে ফেললেন যেন সব ঠিকই আছে। যতক্ষণ কেউ ধরতে না পারলো, ততক্ষণ মনে কোন দ্বিধাই বোধ করলেন না।

(খ) ভুলটা ভালো হয়নি, তবুও ভুল স্বীকার করে মাফ চাইলেন।

৭। কারো সঙ্গে দেখা করার কথা দিলেন।

(ক) ভুলে গেছি, সময় করে উঠতে পারিনি, এমন একটা কাজ এসে পড়লো—এইসব পুরনো মামুলী ওজর। ওদিকে, যিনি অপেক্ষা করেছিলেন, তিনি হতাশ হলেন, তাঁর কাজের ক্ষতি হলো।

(খ) কথা রাখেন। যদি ঘটনাচক্রে কোথাও আটকে পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোককে জানাবার চেষ্টা করেন। না পরলে কাজের ফাঁকে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বুঝিয়ে বলেন, মাফ চেয়ে নেন, কিংবা একটা খবরও পাঠিয়ে দেন।

৮। আপনার ঘরের লোক, আপনার বন্ধুবান্ধব, আপনার চাকরীর মালিক, কিংবা বড়কর্তা,

(ক) যার কাছে পারেন, ওদের নিয়ে পঞ্চাশ কথা শুনিয়ে দেন, ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ওরা যদি কেবল জ্বালাতন করে, তাহলে ওদের ভাল করতে ইচ্ছে হয় ? ওদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে, ওদের দোষ খুঁজে ওদের নীচু করে নিজেকে বড়, খাঁটি মনে করেন।

(খ) আপনি সকলকে মানিয়ে চলেন। যদি অসহ্য কিছু ঘটে যায়, তাহলে সেকথা নিয়ে একমাত্র ঘনিষ্ঠতম বিচক্ষণ বন্ধুটির সঙ্গেই পরামর্শ করেন। আরো ভালো হয়, যার সঙ্গে অসহ্য কিছু ঘটেছে, তার সঙ্গেই সামনাসামনি আলাপ-আলোচনা করে পরস্পরকে বোঝবার চেষ্টা করেন।

৯। আপনি কারো আস্থাভাজন হয়ে গোপন কথাটি জেনেছেন।

(ক) নিশ্চয়ই কাউকে বলবেন না তবে নিজের বউকে, মাকে, অন্তরঙ্গ বন্ধুকে, আর অফিসের দু'একজনকে বলতে ক্ষতি কী!

(খ) কেবলমাত্র আপনার ওপর আস্থা রেখেই গোপন কথাটি জানানো হয়েছে। আপনি আর সকলের কাছে সব সময়ে সে বিষয়ে মুখে চাবি দিয়ে থাকবেন।

১০। আপনি বিয়ে করেছেন কিংবা বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছে। অথবা, অন্য কেউ বিয়ে করেছে কিংবা তার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছে।

(ক) নিজের ব্যাপার? তাতে কি হয়েছে? তাই নিয়েও সবসময়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে আপনি প্রস্তুত।

(খ) যদি একবার ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেন, তাহলে আবার—আবার করা মারাত্মকরকম সহজ। কিন্তু এতে মজা ছাড়াও আরো অনেক কিছু ঘটতে থাকে, অতএব 'না'।

যখনি (খ)-তে টিক দেবেন, তখনি আপনি ৫ পাবেন। আমাদের সকলেরই পুরো-নম্বর পাওয়া উচিত, কিন্তু মানুষের স্বভাব এমন যে, গড়পড়তা ৩০ পেয়ে থাকেন; ৪০ পেলে খুব ভালো, ৩০ থেকে ৪০ বেশ ভালই। ৩০-এর নীচে মোটেই সন্তোষজনক নয়।

অঙ্গনা

শিল্পীর তুলি

আকাঙ্ক্ষা আশৈশব। বড় হয়ে শিল্পী হবো। প্রেরণা ছিলেন বাবা। বন্দনা বাবার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন। দিন-রাত্ত রঙ আর তুলি নিয়ে ইজেলের সামনে বসে থাকা সেই ধ্যানস্তব্ধ মানুষটির দিকে তাকিয়ে তিনি কখন নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। তাঁর চোখে তখন সাত রঙের বর্ণসুষমা। আর কিছু মনে থাকতো না। হুঁশ হতো বাড়ির আর কারো ডাকে। তাঁরা জানতেন, বন্দনার এই অভ্যাস। আর আশা করতেন, বন্দনার এই তন্ময়তা একদিন বাস্তবে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

বাবা শিল্পী। মেয়ের পক্ষেও এই পরিচয়ই সবচেয়ে গৌরবের। সেদিনের স্বপ্ন দেখা বন্দনার জীবনে আজ অনেকখানি সার্থক। এখনো অবশ্য তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠায় অবিচল সংগ্রামী। কিন্তু কাজে নিষ্ঠায় এবং রাম

থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, প্রত্যাশিত ধাপে পৌঁছবেন তিনি অচিরেই।

বাবার কাছেই তুলি ধরতে শিখেছেন। বাবা ইজেলের সামনে আর পেছনে বসে আছেন চন্দনা। অনেকদিনই তিনি বন্দনার এই আগ্রহের কথা জানতে পারেন নি। হঠাৎ কাজের ফাঁকে পেছন ফিরে মেয়েকে যেদিন আগ্রহভরা চোখে ইজেলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন সেদিন থেকেই বন্দনার স্থান হলো বাবার পাশে। তিনি বুঝেছিলেন দৃষ্টিভরা চোখ এ নয়। শিল্পের আগ্রহে মেয়ে বিভোর। আর দেরী করলেন না তিনি। অচিরেই বন্দনার হাতে তুলি তুলে দিলেন। ব্যস, বন্দনার জয়যাত্রাও শুরু হলো প্রায় সেদিন থেকেই।

কতই বা তখন তার বয়স। ছোট্ট বন্দনা গুটিগুটি স্কুলে যায়। ছবি আঁকায় তাঁর ভারি বাহাদুরি। স্কুলের শিক্ষকরা ভাবতেন, বড় হয়ে বাবার নাম রাখবে। ছোট্ট হাতে তুলি বুলিয়ে তখন থেকেই বন্দনা সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। শুধু কি তাই, ছবি আঁকায় স্কুলের কোন পুরস্কারই আর কারো পাবার জো নেই। সবই বন্দনার ভাগ্যে। স্কুলেরও এ জন্য গর্বের অন্ত নেই।

স্কুলে তো এমনি নাম-ডাক। বন্দনা এবার যোগ দিল শংকরস্ উইকলি পরিচালিত ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায়। সেখানেও তাঁর জয়জয়কার। সকলের সেরা বন্দনা। হাসি হাসি মুখে বন্দনা পুরস্কার নিয়ে এলেন। এ জয় সত্যি আনন্দ এবং গর্বের। স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে সেই প্রথম তাঁর খ্যাতি। মনে হলো, আকাঙ্ক্ষা সত্যি হলেও হতে পারে। সবচেয়ে বেশি খুশি বাবা। তুলির টানে টানে রঙবাহার তো তিনিই

মেয়েকে শিখিয়েছেন। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আশাও ডানা মেলে।

এমনি করেই স্কুলে রঙে রঙ করা দিনগুলি শেষ হয়। শিল্পচর্চায় বন্দনা অক্লান্ত। স্কুল পেরিয়ে কলেজ। সেখানেও বন্দনার খ্যাতির কমতি নেই। তবু তাঁকে কেমন অখুশি মনে হয়। ঠিক আশা মিটছে না। মন ভরে শিল্পচর্চায় নিজেকে ঢেলে দিতে পারছেন না। প্রতীক্ষা করেন, কবে সে দিন আসবে। আবার মাঝে মাঝে নিজেই হতাশ হতেন। রঙ আর তুলি নিয়ে বেশি দূরে হয়তো এগুনো গেলো না। এমনি কত-শত চিন্তার তুফান। হতাশার মধ্যেও বন্দনা আশা জাগিয়ে রেখেছেন। কলেজের গণ্ডীটা পেরোতে পারলে হয়। তারপর দেখা যাবে, আকাঙ্ক্ষা সজীব না নির্জীব।

সাত-পাঁচ এসব ভাবনার মধ্যেই বন্দনা পরীক্ষার সিঁড়ি ভাঙছেন। হঠাৎ নিজের অজান্তেই তিনি একদিন গান গেয়ে উঠলেন। বি-এ পাশের খবরটা শোনার পরই উৎসাহে এক রকম ফেটে পড়লেন। কলেজের শেষ ধাপ তাঁর কোন অসুবিধেই হয় নি। আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দুলছিলেন। তাই মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যেতেন। আর সুযোগ বুঝে দুর্বলতা এসে কাঁধে ভর করতো। এবার আর কোন দুর্বলতা-দুশ্চিন্তার সুযোগ নেই। পুরোপুরি নির্ভয়। শিল্পশিক্ষায় এবার বন্দনা নিজেকে পুরোপুরি ঢেলে দিতে পারবেন।

কলকাতা ছেড়ে শান্তিনিকেতন। ভর্তি হলেন ফাইন আর্টসে। শিক্ষার আগ্রহে বন্দনা অধীর। এখানে এসে তাঁর শেখার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। এতকিছু যে শিল্পের ভাণ্ডারে জমা হয়ে রয়েছে এতকাল তা তাঁর জানা ছিল না। পড়াশোনার ক্ষতি হবে ভেবে বাবাও তাঁকে সবকিছু শেখান নি। বর্ণ পরিচয় করেই তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন। তারপরের টুকু তো বন্দনার নিজের দায়। আগ্রহ থাকলে হবে।

সেই আগ্রহ বুকে নিয়ে বন্দনা এতদিন অস্থির হয়েছিল। এবার তাঁর সব আগ্রহ মুক্তি পেল। যত পারেন তত শেখেন। কোন ক্লান্তি নেই। এখানে এসে যেন নতুন প্রাণ পেলেন। সব সময় একই ভাবনা আর শিল্পের সাধনা।

চার বৎসরের কোর্স বন্দনা শিখতে শুরু করলেন। মাটির কাজ দিয়েই সূচনা। ক্রমে কাঠ, চামড়ার কাজেও হাত পাকালেন। এক-একটা জিনিস শেখেন আর পরেরটার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। বন্দনা ভাবতেই পারেন না, এখানেই শেখার শেষ। আর পরের কোর্সটা এসেও যায়। এমনি করে পালাক্রমে বাটিক পেন্টিং, এম্ব্রয়ডারী এবং আরো কত কি। বন্দনা প্রাণপণ আগ্রহে সবকিছু শেখেন। এতোদিনে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ছক কাটা হয়ে গেছে। তাই শেখার মধ্যেই ভাবতে বসেন।

দেখতে দেখতে শান্তিনিকেতনের দিন ফুরিয়ে আসে। চার বছর ফুরিয়ে যায়। বন্দনার কোর্স কমপ্লিট। শেখা বিদ্যার এবার প্রয়োগ। আর এক শিক্ষা। শান্তিনিকেতনের জীবনে বন্দনার ভাগ্যে জুটেছে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর আশীর্বাদ। তিনি বন্দনাকে একপলক দেখেই বুঝেছিলেন, এ মেয়ে হয়তো কিছু করলেও করতে পারে। বন্দনাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। বন্দনাও সেদিন শিল্পাচার্যের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, আপনার আশীর্বাদের মান যেন রাখতে পারি।

প্রথম জীবনে বাবার আশীর্বাদ। আর আনুষ্ঠানিক ছাত্রজীবনের সমাপ্তিতে শিল্পাচার্যের আশীর্বাদ। বন্দনার শিক্ষা-জীবন পরিপূর্ণ। কলকাতায় ফিরে এলেন। আর এসেই এক চিন্তা, কিভাবে কি করা যায়। নিজের পা রাখার জায়গা করে নেওয়া যে কি কঠিন বন্দনা তা ভালভাবেই জানেন। তাই ভাবতে থাকেন।

কিন্তু একনাগাড়ে বসে ভাবার চেয়ে কাজ করতে করতে ভাবনাই ভাল। তাতে কাজও এগুবে আবার চিন্তার সুযোগও বাড়বে। ১৯৬৭ সাল নাগাদ তিনি জনৈক আত্মীয়ের বাড়িতে খুললেন একটি স্টুডিও। অচিরেই আরো একজন তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন।

কাজ তো শুরু করলেন। এবার ভাবনা অর্ডার ধরা যায় কিভাবে। যেই ভাবনা সেই কাজ। বন্দনা নিজেই বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে থাকলেন দোকান থেকে দোকানে। প্রথমে বড় বড় সেলস এম্পোরিয়মে নক করলেন। খাদি-ভবন থেকে গভর্ণমেন্ট সেলস্ এম্পোরিয়ম। খুব একটা কাজ হলো না। বন্দনা এতটুকু দমলেন না। তেমনি সোজা হয়ে নিউমার্কেটের দোকানে দোকানে ঘুরলেন।

অনেকের যেমন হয় বন্দনারও তেমনি। সেদিনে তাঁর অভিজ্ঞতা খুব একটা আনন্দের নয়। বরং উল্টোটাই। কেউ খুব একটা পাত্তা দিতে চায় নি। কিন্তু চাকা ঘুরলো। পুজোর আগে একটা বাটিক অর্ডার পাওয়া গেল। বন্দনা চাইলেন, একটা সুযোগেই বাজারে চাঞ্চল্য আনতে। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। কাজ করলেন প্রাণ ঢেলে। কম্পিটিশন মার্কেটের প্রথম ধাপ এমনিভাবে পেরিয়ে এলেন বন্দনা। তারপর থেকে অর্ডারের জন্য তাঁর আর আটকায় নি। এখন অনেকেই বন্দনার কাজ পাওয়ার আশায় থাকে।

বাটিক, এম্ব্রয়ডারী, হ্যাণ্ড পেইন্ট সব কাজই হয় বন্দনার নিজস্ব স্টুডিও ইন্দো-ইণ্ডাস্ট্রীজ-এ। এরই মধ্যে তিনি গতানুগতিক পথ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন যথাসম্ভব। সব কাজের মধ্যেও এমন একটি দিককে তিনি বেছে নিয়েছেন আর সবাই যার চিন্তা থেকে নিজেদের গুটিয়ে রাখতে চান। ফেব্রিক পেইন্টিং-এ বন্দনার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোন শিল্পী এ নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নন। বন্দনা এদিক থেকেও ব্যতিক্রম। ইজেলের সামনে বসে বাবার ছবি আঁকার সেই স্মৃতিই তিনি ধরে রাখতে চান অন্যভাবে। ক্যানভাস এবং কাগজে রঙের বাহারে যে চিন্তা-বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা যায় তা শাড়ী এবং কাপড়েও সম্ভব। এ হলো বন্দনার আন্তরিক বিশ্বাস।

এই বিশ্বাসে ভর করেই তিনি ফেব্রিক পেইন্টিং নিয়ে কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি কাজ শুরু করেন। আর এক বছরের ব্যবধানে আকাদেমী অব ফাইন আর্টসে তাঁর সর্বপ্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিষয়বস্তু ছিল সেই হাতে আঁকা শাড়ী। প্রদর্শনী করার পর তাঁর আগ্রহ এবং উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে। তাই তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতিতে এখনো নবীন।

ফেব্রিক পেইন্টিং সম্বন্ধে আমাদের অনেকের অনাগ্রহ থাকলেও বন্দনার এই কাজ অনেকের প্রশংসা পেয়েছে। আর প্রশংসা শুধু দেশের সীমায় আবদ্ধ না থেকে বিদেশেও প্রসার লাভ করেছে। শাড়ী এবং কাপড়ে বন্দনার তুলির টান যেন ম্যাজিকের মত কাজ করে। কাজ শেষ হয়ে যাবার পর কাপড়টি মেলে ধরলে মনে হয় যেন ভোজবাজি। সৌন্দর্য এবং মনোহারিত্বের এমন যুগলমিলনে মুখ দিয়ে একটি কথাই বেরিয়ে আসে, অপূর্ব।

কিন্তু এতেও বন্দনা খুশি নয়। তাই এখনো তাঁর সমান পরীক্ষা চলছে। তাঁর স্টুডিওতে কর্মীসংখ্যা এখন ষোলজনের মতো। সবাইকে মাইনে দেওয়া হয়। সবরকম কাজই হয়। তবে হাতে আঁকা শাড়ী বন্দনার বিশেষত্ব। স্টুডিওর সঙ্গে সঙ্গে বন্দনা একটি স্কুলও চালায়। ছাত্রসংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। মোটে পাঁচ-ছজন। তবু যারা শেখে বন্দনার আন্তরিকতায় তারা যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে। স্কুলটি পাড়ায় বেশ উৎসাহ সঞ্চারও করেছে।

বাজারে বন্দনার কাজের এখন বেশ চাহিদা। সেলস এম্পোরিয়ম ছাড়াও নানা দোকান তাঁর কাজ নেয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নিউমার্কেট অঞ্চল। এখানকার অনেক দোকানেই তাঁর হাতের কাজ বিক্রি হয়। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন একজন সেলসম্যান। তিনিই ঘুরে-ঘুরে অর্ডারপত্র জোগাড় করেন এবং মাল ডেলিভারী দেন।

কথায় কথায় শ্রীমতী বন্দনা দাশগুপ্ত তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কিছুটা আঁচ দিলেন। পুজোর আগে একেবারে নতুন ধরনের হাতেআঁকা শাড়ী বাজারে ছাড়ার ইচ্ছে আছে। কাজকর্ম এখন সে রকমভাবেই এগুচ্ছে। খবরটা রীতিমত উৎসাহের। অন্তত ফ্যাশনপ্রিয়াদের কাছে। পুজোয় যাঁরা নতুন কিছু আশা করেন তাঁরা বন্দনার কাছ থেকে এবার কিছু পাবেন। আর এবার কেন, হয়তো ফি-বারই।

—প্রমীলা

'৪২ সালের আন্দোলনে অনেকেই জড়িয়ে পড়েছিল—কেউ কম কেউ বেশী।

স্বাস্থ্যহানির দরুন সঙ্গীদের বেশ কিছু আগে জেল থেকে বার হয়েছি। জীবিকা অর্জনের ইচ্ছা ও প্রয়োজন থাকলেও দেহ ঠিক উপযোগী নয়। সম-ব্যবসায়ী বন্ধুদের সহৃদয় সহযোগিতায় মোকর্দমা কিছু কিঞ্চিৎ হাতে আসছে। তবে কোর্টে যাওয়া নামমাত্র, বেশী ক্ষেত্রে সূত্রেতেই তারিখ পরিবর্তন।

(২)

'৪৪ সালের গ্রীষ্ম এসে পড়ল। সেই সঙ্গে প্রায় বর্ষণও আছে যদিও মৌসুমী-ধারা আসতে এখনও বিলম্ব। রোদ্র ও বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য সারা বাড়ী তল্লাসে একটি ছাতার হদিস হল। বোধ হয় অতীতে কোন মক্কেল ফেলে গিয়ে আর উদ্ধার করতে পারে নি। একজনের ছিল, এখন দশের। "অতি পুরাতন ভৃত্য" দিনে রোদ-বৃষ্টি থেকে এবং শীতের রাতে হিম বর্ষণ থেকে মাথা বাঁচিয়ে অবাধ কর্তৃত্ব পরিচালনা করেছে। পুকুর পাড়ে আড়াল বিছিয়ে তাঁবু হিসাবেও কাজ দেয়। সাবেক বুনিয়াদ কাল কাপড়ের উপর পুরু শাদা মলাটে ছত্র-বাহাদুরের বপু একাধারে যাবতীয় ঋতুসংহারে সক্ষম। আমার কলেজে-পড়া কন্যাকেও নিঃসঙ্কোচে এর আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

(৩)

ফুটবল মরশুমে আমি ও আমার অধ্যাপক বন্ধু প্রতিদিনের দর্শক। ছত্র-মহারাজ আমাদের নিত্য-সহচর। অধ্যাপকের হাতেই থাকে—বৃষ্টি পড়লে আমার দখলে। উকীল ও মাষ্টারের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন। এ অবস্থা বেশী দিন চলল না। "নিমিত্তং ক্লিশ্যদাসাদ্য দেহী প্রাণৈর্বিমুচ্যতে"। দুই দলের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পৃষ্ঠপোষক দর্শক-মনে তিক্ত প্রতিহিংসা ফুটিয়েছে। যথারীতি উত্তেজনা, উন্মাদনা ও শেষে রণবিহার। ছাতাটা বাঁচিয়ে গুছিয়ে বন্ধ করে রক্ষা করব এমন সময় কখন হস্তান্তরিত হয়ে রণসম্ভারে পরিণত হল বোঝবার আগেই সে মৃত সৈনিকের মত শয্যাশায়ী—রক্তাক্ত না হলেও ছিন্ন-কলেবর। প্রয়োজনে আচ্ছাদন ও বিপদে সহায়—পরমবন্ধুর অকস্মাৎ তিরোধান বেদনাদায়ক। তাই তার ভগ্নদেহ স্নেহমর্যাদায় বাড়ী আনা হল। সমস্ত পরিবার কিছুকাল শোকসন্তপ্ত। আমি ও অধ্যাপক ছত্রছায়া থেকে নির্বাসিত। যুদ্ধের বাজার—নতুন ছাতা সামর্থ্যের বাইরে। নিজের জন্য তত ভাবি না, কারণ 'উকীল ত'—নামে গাছতলার হলেও নিয়মিত অভ্যাস মাঠ চলা, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে। রোদ গা-সওয়া। বৃষ্টি এলে হয় মক্কেলের ছাতা, নয় ছাতার কাপড়ের গাউন অবগুণ্ঠনে ২৫।৩০ গজ দৌড় নিত্য ডায়েরিভুক্ত। বেচারা অধ্যাপকের আকাশ-ফাটা রৌদ্রে কলেজ যাতায়াত। নতুন করে বেদনা ঘোষণা জানি না নিজের কষ্টটাই অনেকখানি তার মধ্যে দেখলাম কি না।

(৪)

রামপুরহাটে ডাক পেয়েছি—যেতে হবে। চলাফেরা তখনও জোরদার নজরাধীন। মাঠে ঘাটে কোর্টে হাওয়ার মত কেউ না কেউ ঘিরে আছে। গোপনে থাকার কথা কিন্তু পরস্পর জানাজানি হয়। বাহিরে একজন সঙ্গী অসুস্থ অবস্থায় কম নির্ভর নয়। টিকিট কাটা, কুলি ডাকা, মাল পাহারা ইত্যাদির জন্য কোন উদ্বেগ পরিশ্রম নাই। সবই রক্ষী-তত্ত্বাবধানে—যেন লাটসাহেব সফরে বেরিয়েছি।

(৫)

দুদিনের জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছি, কিন্তু প্রথম দিনেই মোকর্দমা আরম্ভ হয়ে বন্ধ হল। গভীর রাতে ট্রেন—সেইটাই ধরব। আমার টিকটিকি বন্ধু পূর্ব হিসাব মত কাছেই কোন গ্রামে শ্বশুরবাড়ী জামাইষষ্ঠী নিমন্ত্রণে গিয়েছেন, কি করে তাঁকে সংবাদ দিই। তাঁর পাহারামুক্ত হয়ে যদি ফিরে আসি তাঁকে জবরদস্ত জবাবদিহি করতে হবে। রাজদ্বারের এবং রাজ-পথের অযাচিত বন্ধুর এই আশু অমঙ্গল আশঙ্কা করে হতাশ নিশ্চিন্ত হলাম। সে কি আমাকে একেবারে অনাথ করে রেখে গিয়েছে—মনে হয় না। স্থানীয় কোন অদৃশ্য অভিভাবক নিশ্চয়ই সাময়িক ভার নিয়েছে। ঠিক তাই। ট্রেন এসে পড়ল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে মালপত্র সামলে দরজা বন্ধ করব, এমন সময় প্রতি-সম্ভাষণ, "এই যে স্যার, আমি পাশের গাড়ীতেই আছি, আপনি নিশ্চন্তে ঘুমোন—রাত তিনটায় বারাহারোয়া স্টেশনে নামিয়ে নিব।" গভীর রাতে ২।৩ ঘণ্টা ঘুমে গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে যাওয়ার আশঙ্কা বাস্তব। কুণ্ঠিত নিদ্রাও গভীরতা স্পর্শ করে না। এই দুশ্চিন্তার বোঝা অন্যের ঘাড়ে দিয়ে পা মেলবার চেষ্টায় আছি। তিন বেঞ্চের প্রকোষ্ঠে। মাত্র একটা দখল করে অতিকায় এক বপু সমস্ত দৈর্ঘ্য জুড়ে। প্রস্থে সঙ্কোচ সমাধান জন্য শায়িতদেহ দেওয়ালমুখী। নাসিকার আওয়াজ গর্জন কি আর্তনাদ বলা কঠিন—কখনও খাদে নেমে আবার সপ্তমে, কখনও বিকৃত ধ্বনির

অসংলগ্ন অশ্রাব্য বিন্যাস। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই ব্যবসায়ী। কারণ উপরের তাক বোঝাই নানারকমের নতুন ছাতা। সম্ভবতঃ গুজরাটী। অন্য কোন আরোহী নেই।

ঘুম এল না। ছাতার একান্ত প্রয়োজন, সেই সঙ্গে নানা ছাঁদের ছাতার সম্ভার আমার মনকে আক্রমণ করল। —দুই-একটা ছাতা থাকা না থাকা এদের কিছুই এসে যায় না। লাভের সামান্য হেরফের মাত্র। আমাদের ত ব্যবসা বা বিলাসিতা নয় নিছক প্রয়োজন। এই রকম কত যুক্তি মনের মধ্যে আমার প্রায় অগোচরে তোলপাড় করে শেষ হয়ে গেছে। নীতিবোধ প্রায় পরাস্ত। অবিদ্যা পরাভূত মন দেহকে টেনে তুলেছে। চঞ্চল হয়ে পায়চারি করছি। বেশ দেখছি, সহযাত্রীর ঘুম সহজে ভাঙবার নয়— অন্তত তার নাসিকা অনুপ্রাণিত দেহ সেইরূপই নির্দেশ দেয়। আমি এক—এবং একটাই ছাতা নেব—তাও নিজের জন্য নয়, পরের জন্য, বন্ধুর জন্যও নয়, নির্দোষ অভাবক্লিষ্ট অধ্যাপকের জন্য। পবিত্র প্রয়োজনের তাগিদে আইন ভঙ্গের সামান্যতম ব্যাকরণ-প্রমাদ মাত্র। মন আমার দখল ছেড়েছে। মন্ত্রবিহীন যন্ত্রবৎ হাত তাকে উঠেছে এমন সময় কানে এল 'বাহবা, বাহবা'। বার-হারোয়া স্টেশনের চলতি নাম বাহবা। গাড়ী প্লাটফর্মে সম্পূর্ণ থামবার আগেই মৃত্যুর বেষ্টনী থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে চলতি গাড়ীর দরজা খুলে লাফিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে পাশের গাড়ী থেকে আমার পথের সাথীও নামলেন। তাঁকে বল্লাম, "শীগ্গির আমার মালপত্র বার করুন আর ঐ ঘুমন্ত ভদ্রলোককে ডেকে বলুন ক্যাচার লাগিয়ে দিতে।"

(৬)

কিছুদিন পর সেই কোর্টেই গিয়েছি—মার দাঙ্গামার এক মোকর্দমায় আসামী পক্ষ নিয়ে। এজলাসে যেতেই হাকিম বললেন, একটা ছোট মোকর্দমা সেরে আমারটা ধরবেন।

আমি আসামীর কাঠগড়ার সামনেই বেঞ্চে বসে আছি। মোকর্দমার ডাক হল, বাদী একজন সওদাগর। রাতের ট্রেনে তাঁর দোকানের বিক্রীর জন্য ছাতার বাণ্ডিল সঙ্গে ফিরছিলেন। ভাল পোশাক পরা এই সুচেহারার যুবক একমাত্র সহযাত্রী। তাঁর ঘুমন্ত অবস্থায় আসামী একটা ছাতা টানাটানি করছিল। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভাঙে এবং তিনি হাতে হাতে ধরে ফেলেন এবং পুলিশে হাওলা করেন।

ছাতা অবশ্য সম্পূর্ণ বাণ্ডিলচ্যুত হয় নি এবং সেটা সবচেয়ে কম দামের।

চুরির চেষ্টার অপরাধ এই মর্মে অভি-যোগ গঠন করে হাকিম শুধোলেন "দোষী, না নির্দোষ।" আসামী সহজ সরল উত্তর দিল "আমি দোষী।" ততক্ষণে আমি প্রায় আসামীর গা-ঘেঁষা হয়ে গেছি। তারই মুখ দিয়ে যেন আমারই স্বীকৃতি প্রকাশ পেল "আমি দোষী।"

কিশলয়

কোন নাট্যগোষ্ঠী ক'বছর টি'কে রইলো সময়ের বিচারে সে আলোচনার গুরুত্বকে কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু, স্থায়িত্বের যথার্থ ইতিহাস রাখতে গেলে শুধু বছরের হিসেব করলে চলবে না; দেখতে হবে দেশের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সেই গোষ্ঠীর শিল্পীরা কতোটা স্বকীয় শিল্পচিন্তার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। এই সত্যকে স্মরণে রেখে বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশে এমন কিছু অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী আছে যাদের প্রতিষ্ঠা সুদীর্ঘ দিনের কোন অভিজ্ঞতা বহন করে না, কিন্তু সভ্যদের নাট্যচেতনার স্বচ্ছতা ও উজ্জ্বলতায় গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছে নাট্যানুরাগীদের মনে। বলতে দ্বিধা নেই উত্তর ক'লকাতার 'কিশলয়' এমনি একটি নাট্যসংস্থা।

সময়টা ছিল ১৯৬১। বাংলাদেশে নাটক তখন বহু চিন্তায় আলো জ্বেলেছে। সেই আলোকিত আবেশে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ তখন গভীর অনুভূতি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে নাটকে এসেছে নতুন আন্দোলন। নাট্য-চিন্তার এই ব্যাপ্ত পটভূমিকায় কুমারটুলী শোভাবাজার এলাকার কয়েকজন উৎসাহী যুবকের উদ্যম সেদিকে সঞ্চারিত হোল। সবার মনে উদ্দীপনার সুরে নাট্যচর্চার কথা তুললেন সত্য গোস্বামী। তাঁর আহ্বানেই আর সবাই প্রতিশ্রুতি নিলেন যেভাবেই হোক এই এলাকায় একটি নাট্য-সংস্থা গড়ে তুলতে হবে। কি ধরনের গোষ্ঠী তৈরী করার কথা এ'রা ভেবে-ছিলেন সে বিষয়ে প্রশ্ন করতে এ'রা বলেছেন—শুধু নাট্যাভিনয় নয়, যুগধর্মের সঙ্গে তাল রেখে নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে হবে এমন একটি নাট্য-সংস্থা যা অন্য পাঁচটা অপেশাদার নাট্য-সংস্থা থেকে হবে সম্পূর্ণ পৃথক। বেশ কিছুদিন নিস্তাজড়ানো চেষ্টার পর এমন একটি সংস্থার সূচনা হোল। নাম হোল 'কিশলয়'। প্রাণবন্ত জীবনবোধের দিক থেকে নামটি সত্যি আশ্চর্য গভীর এক অর্থে দ্যুতিময়।

কিন্তু শুরুতেই 'কিশলয়ে'র দুরন্ত আবেগকে হঠাৎ—থমকে দাঁড়াতে হোল। কারণটা একটা নিষ্ঠুর বাস্তব সত্য। আকস্মিকভাবে জীবিকা অর্জনের তাগিদে গোষ্ঠীর বেশ কয়েকজনকে নাট্যশিল্পের স্বপ্নসাধ থেকে দূরে সরে যেতে হোল। যে তিন চারজন রইলেন তাঁদের মনে এলো এক মন্থর বিষণ্ণতা। এমনি করে বেশ ক'টা দিন কেটে গেলো। দিন, মাস ও বছর জড়িয়ে হোল তিন বছর। অবশিষ্ট যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই বেদনাভারে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও ভেঙে পড়লেন না। মনে মনে আশা পোষণ করতে থাকলেন, আবার 'কিশলয়' একদিন মুক্ত হওয়ায় হেসে উঠবে। তাই হোল। কিছু নতুন শিল্পী এলেন। সবার চেষ্টায় আবার আসর জমে উঠলো। বেদনা গেলো সরে। প্রাণোচ্ছলতার বন্যা কাঁপলো সবার মনে। ১৯৬৪র ১৯ এপ্রিল মিন্টু চক্রবর্তীর 'নতুন ঠিকানা' অভিনয় করে 'কিশলয়ে'র শিল্পীরা নাট্যচর্চার নতুন ঠিকানা খুঁজে পেতে চেষ্টা শুরু করলেন।

এরপর থেকে 'কিশলয়ে'র শিল্পীরা ক'লকাতা এবং তার আশে-পাশে বিভিন্ন ধরনের নাটক পরিবেশন করে বাংলাদেশের নামী নাট্যসংস্থার তালিকায় তাঁদের গোষ্ঠীর নাম জুড়ে দিতে সক্ষম হোলেন। নাটকগুলোর নাম হোল; 'ভীমপলশ্রী', 'রিহার্সাল', 'একি হোল', 'শুরুতেই শেষ', 'দেবদাস', 'গভীর জলের মাছ', 'পণরক্ষা', 'মধ্যাহ্নের গান', 'মঞ্জরী অপেরা', 'সাজাহান'। এর মধ্যে 'রিহার্সাল' নাটকটি নিয়ে 'কিশলয়ে'র শিল্পীরা হালিসহর, নৈহাটী, চুঁচুড়া, কোন্নগর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত নাট্য-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬৪-৬৫তে সুভাষবাগে আয়োজিত নাট্যসম্মেলনে এই নাটকের অসাধারণ অভিনয় নাট্যানুরাগীদের বিস্ময়ে মুগ্ধ করে। এরপর সংস্থা রেজিস্ট্রিকৃত হয় এবং রবীন্দ্রভারতীর অনুমোদন লাভ করে। 'রিহার্সালে'র মতো 'পণরক্ষা' নাটকটিও 'কিশলয়ের'র একটি সার্থক প্রযোজনা। 'রিহার্সালে' যেমন হাসির হিল্লোল উঠেছে প্রতিটি মুহূর্তে, 'পণরক্ষা'র দর্শকের চোখে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু অশ্রু।

'কিশলয়ে'র আর একটি অসাধারণ প্রযোজনা হোল জীবনপ্রেমিক তারা-শঙ্করের 'মঞ্জরী অপেরা'। এ নাটক 'কিশলয়' বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিল কারণ শিল্পীরা যাঁরা সমস্যাসঙ্কুল জগতের মধ্যে পরিশ্রান্ত মানুষকে আনন্দ দেবার ব্রত নিয়ে বেঁচে থাকে, কিন্তু নিজেদের পরিচয় থাকে সাধারণ মানুষের কাছে অজ্ঞাত। তাঁদেরই জীবনের করুণ কাহিনী জানবার ও জানাবার প্রয়াসে। আর তাছাড়া সংস্থার সভ্যদের ধারণা, 'যে পথের পথিক আমরা তার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে 'মঞ্জরী অপেরায়।' 'মঞ্জরী অপেরা' নাটকের প্রযোজনায় শিল্পীদের আন্তরিক নাট্য-নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক অনুশীলন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সেই সূত্রে 'কিশলয়' বাংলাদেশের প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠীদের মধ্যে আসন করে নিতে পেরেছে।

'কিশলয়ে'র সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'ফাঁস' আঙ্গিক পরিকল্পনার দিক থেকে নিঃসন্দেহে স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান দিতে পেরেছে। বায়োমেকানিকাল প্রথায় পরিবেশিত এই নাটকটি সম্পর্কে 'কিশলয়ে'র শিল্পীদের দাবী হোল—'আমাদের এই প্রথায় অভিনয়, আগামীদিনের নাট্যকারদের নাটক রচনার সহায়ক হবে।'

'কিশলয়ে'র আগামী নাটকের তালিকায় আছে শৈলেন গুহ নিয়োগীর 'অনশন' ও ইন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ের 'সীমানা ছাড়িয়ে'।

এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা অভিনয় করাকে শুধু নিছক আনন্দের সূত্রেই গ্রহণ করেন নি, করেছেন জনসেবার জন্যও। জানা গেছে গত ১৭ মে ১৯৬৮'তে 'সাজাহান' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল, তার সবটাই এ'রা তুলে দিয়েছেন সংস্থার শুভানুধ্যায়ী শ্রীনিখিল রায়ের মারফৎ এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার হাতে। এসম্পর্কে এ'রা বিনীত-ভাবে নিবেদন করেছেন—'গোধূলি লগ্নে সমর্পিতা কন্যার অশ্রুউদ্গত আনন্দের অন্তরালে সংগোপনে হৃদসঞ্চিত বেদনার সরিক হয়ে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছি।'

'কিশলয়ে'র শিল্পীরা তাই থেমে নেই। ক্রমাগত নাট্যপ্রযোজনার মধ্য দিয়েই নিজেদের সজীবতা প্রকাশ করছেন, প্রদীপ্ত করে তুলছেন জীবনবোধের সব আলো-গুলোকে। এ'রা বলেন—বিভিন্ন নাটকের মাধ্যমে আমরা চালিয়ে যাচ্ছি পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সাধারণের কাছে আমাদের বক্তব্য, 'আমাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আর আদর্শ নাটকে যদি উপস্থিত না থাকে, যদি পাত্র-পাত্রীর সুখ-দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে 'কিশলয়ে'র অভিনেতা, অভিনেত্রীরা নিজে-দের না মেশাতে পারেন তবে যে কোন সমালোচনা আমরা নতশিরে গ্রহণ করবো আগামীকালের জন্য।'

—দিলীপ মৌলিক

এবারকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সারা দেশে যে গভীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছিল ইতিপূর্বে তা কখনো ঘটে নি।

ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সংবিধানের দিক দিয়ে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু প্রয়োগের দিক দিয়ে নয়। ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। প্রধানমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে সাধারণভাবে তাঁর কিছু করার নেই। তাই তিনি শুধুই রাষ্ট্রপ্রধান, সাংবিধানিক প্রধান।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাই ভারতে কখনও গভীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয় নি, সাধারণ মানুষের মনে সাড়া জাগে নি।

কিন্তু এবারকার ব্যাপার ছিল ভিন্ন। এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মর্যাদার প্রশ্ন ছিল, দু পক্ষের মর্যাদার লড়াই। লড়াই-এর আগে মহড়া দেখে সাধারণ মানুষে নড়ে উঠেছিল। ফলাফল জানার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করে ছিল।

ভারতের রাষ্ট্রপতির পদটি যে কেবল অর্থবান আর খ্যাতিমানদের জন্য নয়, এই পদের জন্য অখ্যাত অজ্ঞাত স্বল্পবিত্তরাও যে আকাঙ্ক্ষী হতে পারেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন তার প্রমাণ এবারও পাওয়া গেছে। এই প্রমাণ যাঁরা দিয়েছেন, রবার্ট ব্রুসের মতো যাঁরা বারবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের প্রতি কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় নি। জনসাধারণের দৃষ্টি ছিল তিনজন খ্যাতিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর। এই তিনজনকে নিয়েই ছিল তাঁদের চিন্তা। ঠিক তিনজনও নয়—দুজন। দু জন দু বিপক্ষ শিবিরের মর্যাদার প্রতীক।

এই লড়াইয়ের ফলাফল জানার জন্য জনসাধারণ গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে, আগ্রহ নিয়ে অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করেছিল। ভোট গ্রহণের পর সেই উৎকণ্ঠা আর আগ্রহ প্রচন্ড হয়েছিল। ফলাফল ঘোষণার দিন তা উঠেছিল চরমে। সমস্ত দেশ যেন কান পেতে ছিল।

রেডিও কর্তৃপক্ষ আগেই এটা অনুমান করেছিলেন—এবং শ্রোতাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাও করেছিলেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার জন্য ২০শে আগস্ট দিল্লী থেকে কয়েকটি অতিরিক্ত নিউজ বুলেটিন প্রচারিত হয়েছিল—ইংরেজীতে আর হিন্দীতে (এবং সেগুলি কলকাতা থেকে পুনঃ-প্রচারিতও হয়েছিল)। এই ব্যবস্থার জন্য দিল্লীর কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদার্হ।

কলকাতার কর্তৃপক্ষও কম ধন্যবাদের পাত্র নন। তাড়াতাড়ি নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণায় তাঁরাও কম সচেষ্ট হন নি। দিল্লীর ইংরেজী আর হিন্দী বুলেটিনগুলো রিলে করা ছাড়াও তাঁরা স্থানীয়ভাবে বাংলা বুলেটিন প্রচার করেছেন। কখনও কখনও প্রতিযোগিতায় দিল্লীকে তাঁরা হারিয়ে দিয়েছেন, দিল্লীর আগেই খবর দিয়েছেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে এই খবর দেওয়া হয়েছে, আবার চলতি অনুষ্ঠান থামিয়েও দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল যখন টেলিপ্রিন্টারে এল তখন কলকাতা-ক'য়ে একজন খ্যাতনামা শিল্পীর গান হচ্ছিল। গান থামিয়ে ফল ঘোষণা করা হল। এই রকমটা ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ অকল্পনীয় ছিল, সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

স্পষ্ট বোঝা গেল, লাল ফিতার বাঁধন শিথিল হচ্ছে,কর্তৃপক্ষ শ্রোতাদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছেন।

লাল ফিতার বাঁধন খুলতে না পারায় পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেনের মৃত্যুসংবাদ প্রচারে বিলম্ব হওয়ায় রেডিও কর্তৃপক্ষের প্রভূত সমালোচনা হয়েছিল সংসদে, খবরের কাগজে জনসাধারণে। অনেক দোষ পড়েছিল। সেই দোষ এবার কিছুটা কাটল।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৬ই আগস্টের বেলা তিনটের নাটক 'নিত্যশবরী'। রচনা—অগ্নি মিত্র।

সবিতা আর নীপা দুই বোন। নীপার তখন বিয়ে হয় নি, বাবা মারা গেলেন। ভাই-বোনদের দায়িত্ব নিল শশাঙ্ক—সবিতার স্বামী। শশাঙ্কর উদারতার আড়ালে ইতরতা লুকিয়ে ছিল। সুন্দরী শ্যালিকাকে বিত্তবান ব্যবসায়ী অরুণ দত্তের দিকে ঠেলে দিয়ে সে নিজের কাজ হাসিল করবার মতলব করল।

অরুণ দত্তর হাত থেকে বাঁচবার জন্য নীপা ঝড়ের মতো সমরেশের কাছে গিয়ে হাজির হল। সমরেশ তিনদিনের মধ্যে তাকে বিয়ে করে তার ভালোবাসার মর্যাদা দিল। তারজন্য তাকে টাকা ধার করতে হল আর এক ইতরের কাছ থেকে। তার নাম বীরেশ্বর।

নীপা আর সমরেশের সুখের সংসারে

একদিন খড় তুলল বীরেশ্বর। লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে অশালীন মন্তব্য করে পাওনা টাকা দাবি করল। শেষে সমরেশের কঠোরতার কাছে হার মেনে শাসিয়ে গেল। সমরেশ কথা দিল, তিনদিনের মধ্যে সমস্ত টাকা শোধ করে দেবে।

কিন্তু কোথা থেকে দেবে? মান বাঁচানোর জন্যে আগেই তো সে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। এখন সম্বল শুধু বইগুলো। সেগুলো তার প্রাণ। বইগুলোর প্রতি নীপার মমতা অপরিসীম। সমরেশ ঋণমুক্ত হবার জন্য নীপাকে লুকিয়ে লুকিয়ে দামী কয়েকখানা বই বিক্রি করে দিল। কিন্তু লুকোনো থাকল না শেষ পর্যন্ত, সমরেশ ধরা পড়ে গেল নীপার কাছে।

নীপা আবার সমরেশকে লুকিয়ে গয়না বিক্রি করে বইগুলো উদ্ধার করল। দোকান থেকে বইগুলো নিয়ে যখন সে রিকশায় উঠছে তখন শশাঙ্কর সঙ্গে দেখা। শশাঙ্ক শুধু ভাবল না, স্পষ্ট বলল : সমরেশ নীপাকে দিয়ে বই বিক্রি করাচ্ছে, তারি গয়না বিক্রি করে খাচ্ছে, এটা ভালো নয়।

নীপা কিছু বলার সুযোগ পেল না। বইগুলো নিয়ে সে লুকিয়ে রাখল তার ভাই শংকরের কাছে।

এদিকে নীপা যখন চাকরির ব্যাপারে অন্যত্র তখন একদিন শশাঙ্ক এসে সমরেশকে কথা শুনিয়ে গেল—স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে খাচ্ছে, স্ত্রীকে দিয়ে বই বিক্রি করাচ্ছে, নীপা যদি কিছুদিন তাদের কাছে গিয়ে থাকে তাহলে সমরেশের ভার কিছুটা লাঘব হয়, নীপা এতে অরাজী নয়।

কথাগুলো শুনে সমরেশ ক্ষেপে গেল। নীপা ফিরলে তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করলে। কিন্তু উত্তর পেল না কিছু। ভাঙ্গন ধরল তাদের সুখের দাম্পত্য জীবনে। প্রতিশোধ নিতে সমরেশ চাকরি নিল তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী অরুণ দত্তর প্রতিষ্ঠানে। একদিন ঘোষণা করল, অরুণ দত্তর ব্যবসা দেখতে তাকে নাগপুরে যেতে হবে—এবং যাবে সে একা। কবে ফিরবে স্থিরতা নেই, ফিরবে কিনা তা-ও না।

নীপা সব বুঝল, দুঃখে বেদনায় অভিমানে তার বুক ফেটে যেতে লাগল। নীপাকে দেখাশোনা করার কথা বলতে সমরেশ শংকরের কাছে যেতে আসল ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ল। সমরেশ তার ভুল বুঝল, অনুতপ্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে নীপার কাছে হৃদয় খুলে দিল।...জানাল, আর সে নাগপুরে যাবে না।

কাহিনী খুব মর্মস্পর্শী না হলেও নাটকটি সুবিন্যস্ত। কাহিনী মনে গভীর রেখাপাত না করলেও অভিনয় সুন্দর। সংলাপ ভালো, স্পষ্ট। নাটকটি অভিনয়গুণ-সমৃদ্ধ।

নীপার ভূমিকায় শ্রীমতী মলয়া সরকার, সবিতার ভূমিকায় শ্রীমতী লীলাকমল চক্রবর্তী, সমরেশের ভূমিকায় শ্রীসত্যেন মুখোপাধ্যায়, শশাঙ্কর ভূমিকায় শ্রীশুভেন্দু-লাল সেনগুপ্ত, বীরেশ্বরের ভূমিকায় শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য ও অরুণ দত্তর ভূমিকায় শ্রীবিজু ভাওয়াল ভালো অভিনয় করেছেন।

১৮ই আগস্ট রাত ৯টা ৪৫ মিনিটে কাজরী শোনালেন শ্রীমতী শেফালী মুখোপাধ্যায়। ভালো লাগল। বেশ একটা বৈচিত্র্য পাওয়া গেল। কন্ঠটিও সুন্দর।

১৯শে আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় প্রচারিত 'বিচিত্রা'র বিষয় ছিল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে নানা শ্রেণীর লোকের প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ায় একজন সাংবাদিক-সাহিত্যিক, একজন অধ্যাপক, একটি ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার, একজন সাধারণ গৃহস্থ বধূ ও একজন ছাত্রের বক্তব্য আর দুজন ছাত্রের আলোচনা শোনা গেল। অনুষ্ঠানটির আসল উদ্দেশ্য কী ছিল? এ বিষয়ে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের বক্তব্য প্রচার, না সাধারণভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে যা ভেবেছেন তা শোনানো? এই রকম সব গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিষয়ে বিশেষ লোকদের কথাই তো শ্রোতারা শুনতে চান! যাঁরা এই পথের লোক তাঁদের কথা! মানে, যাঁরা এ নিয়ে চিন্তা করেন, কাজ করেন তাঁদের! কিন্তু অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা তেমন ছিল না।

সাংবাদিকের কথা আলাদা, কারণ সাংবাদিকদের সব কিছু নিয়েই ভাবতে হয়, চিন্তা করতে হয়, লিখতে হয়। 'এ জার্ণালিস্ট মাস্ট নো সামথিং অভ এভরি থিং।' সাহিত্যিকের প্রশ্ন বাদ দেওয়া যেতে পারে, কারণ এখানে যিনি সাংবাদিক তিনিই সাহিত্যিক—সাংবাদিক-সাহিত্যিক।

অধ্যাপক হিসাবে যাঁর নাম বলা হয়েছে তিনি অর্থনীতি অথবা বাণিজ্য বিভাগের অন্য কোনো শাখার অধ্যাপক নন, তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি বিষয়ের অধ্যাপক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি যে এই বিষয়ে পারদর্শী নন, এমন কথা বলা হচ্ছে না। রাজনীতিক হলে সংগীত বুঝবেন না, এমন কথা নেই—তবু লোকে সংগীত সম্বন্ধে অভিমত নিতে হলে সংগীতজ্ঞের কাছেই যায়, রাজনীতিকের মন্তব্যের চেয়ে সংগীতজ্ঞের মন্তব্যকেই গুরুত্ব দেয়।

ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজারের বক্তব্য অবশ্যই শ্রবণীয়, সুতরাং তাঁর নির্বাচন নির্ভুল।

কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ বধূ আর ছাত্র তিনজন? তাঁদের বক্তব্যকে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যের সংগে একাধারে রাখা যায় কেমন করে? বিশেষ করে, ঐ ছাত্ররা বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র এমন কথা যখন বলা হয় নি, তাঁদের বক্তব্য থেকেও যখন তা বোঝা যায় নি!

এই সব টেকনিক্যাল বিষয়ে নন-টেকনিক্যাল লোকদের বক্তব্য শোনার আগ্রহ শ্রোতাদের বড়ো থাকে না। তাঁরা ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝতে চান, এবং সেজন্য সঠিক ব্যক্তির কথাই শুনতে চান। বেতার কর্তৃপক্ষের এটা বোঝা দরকার। রবীন্দ্রনাথের ভাষা একটু বদলে বলা যায়, ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজতে যাওয়াটা ঠিক নয়।

এইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় ছোটদের আসরে আলোর কথা বললেন, শ্রীকৃষ্ণপদ সরকার। সুন্দর বললেন, বেশ বিশদভাবে বললেন—অনেক তথ্য ছিল। কিন্তু এই আসরটি পল্লী অঞ্চলের ছোটোদের আসর, সেই দিক দিয়ে বিচার করলে আলোচনাটা একটু ভারী হয়ে গেছে।

২০শে আগস্ট সকাল ৮টায় লোক-গীতির অনুষ্ঠান ছিল। গান শেষ হয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তারপর বাজনা বেজে উঠল (এ বাজনা বাজাবার কথা ছিল না), খানিকক্ষণ বাজনা বাজার পর হঠাৎ সেটা থামিয়ে দিয়ে ঘোষণা করা হল, 'এতক্ষণ লোকগীতি শুনছিলেন...।' কিন্তু এতক্ষণ কি আমরা লোকগীতি শুনছিলাম? বাজনা আর লোক-গীতি কি এক জিনিস? লোকগীতি শেষ হয়ে যাবার পরে তো কোনো ঘোষণা করা হয় নি! অনেকক্ষণ ফাঁক গেছে, তারপর বাজনা বেজেছে। ঘোষিকা কি অন্যমনস্ক ছিলেন? অথবা ঘরেই ছিলেন না? ভাগ্যিস রেডিও সরকারী প্রতিষ্ঠান!

—শ্রবণক

জলসা

শিশুশিল্পী পরিবেশিত বাল্মীকি প্রতিভা

সম্প্রতি 'দক্ষিণী'র শিশু শিল্পীরা অভিনয় করলেন বাল্মীকি প্রতিভা নৃত্যনাট্য। কলামন্দিরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি সব দিক দিয়েই আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

অভিনয়ের দিক দিয়ে প্রথমেই রাজর্ষি চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ নৈপুণ্যের কথা বলতে হয়। এই শিশু-শিল্পী বাল্মীকির বিভিন্ন সময়ের নানান ভাবান্তরকে যেভাবে মূর্ত করে তোলেন তাতে সমস্ত দর্শকই অভিভূত হয়ে যান।

এ ছাড়া বালিকাবেশী রূপা চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর ভূমিকায় বকুল বসু ও রূমা চক্রবর্তী, দস্যুদলের ভূমিকায় কুনাল ঘোষ, অনিন্দ্য সেন, প্রবাল দাশগুপ্ত, অশোক চৌধুরী এবং দেবাশীষ রায়চৌধুরী সংবদ্ধ নৈপুণ্য অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য করেছিল তথাকথিত 'মিহি-কোমরের' অধিকারী প্রধান দস্যুর স্থূল-উদর কৌতুকাভিনয় ত হাসিতে আসর মাত করে দিয়েছে। পরীদের নৃত্যরচনার সাম্য ও সুষমার জন্য ধন্যবাদার্হ নৃত্য-পরিচালিকা আলো রায়। অমল নাগের পরিচালনায় গানগুলি সুন্দর গেয়েছেন দিয়া ঘোষচৌধুরী, অঞ্জনা বসু, মহুয়া চৌধুরী, স্বাতী দে। বিভিন্ন রাগে আবহসংগীত রচনা করেছেন দীনেশ চন্দ্র, সলিল মিত্র, রমেশ চন্দ্র, কার্তিক বসাক, সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর দাস।

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে 'নৃত্যভারতী' সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থে সংস্থার পক্ষ হতে এক মনোজ্ঞ নৃত্যগীত ও নাটানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীমতী নীলিমা দাসের সংগীত ও নৃত্য পরিচালনায় 'সাতভাই চম্পা'র নৃত্য-নাট্যরূপ দিচ্ছেন শিশু-শিল্পীরা। আর এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানে কামন দেবীর তত্ত্বাবধানে মহিলাশিল্পী মহলের জনপ্রিয় নাটক তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের 'কবি।'

রবিরশ্মির শ্রাবণ সন্ধ্যা

তিমির অবগুণ্ঠনে জগতের কোলাহল-মুখরতা ঢাকা। আকাশ পৃথিবীর সঙ্গে অবিরল বর্ষণধারার ভাষায় কথা বলে চলেছে এমনই এক কাব্যময় সন্ধ্যায় রবিরশ্মির সভ্যেরা কবিগুরুর ধ্যানলোকে উদ্ভাসিত শ্রাবণের রূপটি রবীন্দ্র-সদন মঞ্চে তুলে ধরে "শ্রাবণ-সন্ধ্যা"র সার্থক উদ্‌যাপন করেন। রবীন্দ্র-কাব্য ও সংগীতে বর্ষার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বর্ষার দিগদিগন্ত প্লাবিত লীলায়িত রূপ কবিকে মুগ্ধ করেছে, আর

রবিতীর্থ প্রযোজিত তাসের দেশ-এর দৃশ্য

আবিষ্ট কবি অজস্র গানের মালা গেঁথে 'বর্ষাবরণ' করেছেন। রস ও ছন্দের বৈচিত্র্যে দোলায়। শ্রাবণের বিভিন্ন গানগুলির সুসংবদ্ধ সংকলন ও পরিচালনা সাগর সেনের গভীর বোধের উজ্জ্বল নিদর্শন। নৃত্যসংগীত গানগুলি অধিকতর উপভোগ্য হয়ে ওঠবারই কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে গানের ভাব-সৌন্দর্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের উজ্জ্বল তারকাদের কণ্ঠে অসামান্য মর্যাদা-গম্ভীর রূপ পরিগ্রহ করেছে—তার সঙ্গে ছন্দ মেলানো নৃত্যশিল্পীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রথমেই "তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত" দিয়ে সমবেত কণ্ঠে নটরাজ বন্দনা শুরু—তারপরই দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে "এসো গো জেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি" এক আবেগঘন মুহূর্ত সৃষ্টি করে। শ্রাবণ-সন্ধ্যার এই প্রদীপ জ্বালার পর একে একে সুমিত্রা সেন, সাগর সেন, কমলা বসু, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় একক এবং সমবেত সঙ্গীতে শ্রাবণের অর্ঘ্য সাজালেন। আপনাপন বৈশিষ্ট্যে সকলেই কবির গানের ভাবৈশ্বর্যকে মেলে ধরেছেন তবে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠের "অশ্রুভরা বেদনা" এবং "ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়া" শিল্পীর প্রেরণাদীপ্ত মুহূর্তের যেন এক বিশেষ সম্পদ হয়ে উঠেছিল। এ গান বহুদিন মনে থাকবে। কবির বিভিন্ন রচনা সংগৃহীত ভাষ্যরচনা করেন ভাস্কর বসু এবং আবেগভরা কণ্ঠের অনুরণনে তাকে সার্থক করেন প্রদীপ ঘোষ। এমন এক সুন্দর সন্ধ্যা উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ পাবেন সাগর সেন।

সংগীতজ্ঞের সম্বর্ধনা

পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত অধ্যাপনার দায়িত্ব নিয়ে প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও শিল্পী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সম্প্রতি আমেরিকা গেছেন। সেই উপলক্ষে তাঁর বিড়লা একাডেমীতে বিদায়-অভিনন্দন জানান তাঁর ছাত্র-ছাত্রী এবং গুণমুগ্ধ শিল্পীরা। আড়ম্বরহীন অথচ আকর্ষণীয় এই অনুষ্ঠানটির জন্য উদ্যোক্তারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীঘোষ বলেন, এই আয়োজন কেন এবং এর প্রয়োজন আছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কর্মসমাপনান্তে আমি এই অধ্যাপনা ভার গ্রহণ করেছি নেহাতই বেঁচে থাকার তাগিদে। বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার কতটা করতে পারব অথবা পারব কিনা তাও জানি না। যাইহোক, যদি কিছু করতে পারি তবে এ্যাডভান্স পেমেন্টের মতই এই সম্বর্ধনা জমা রইল। আর যদি না পারি তবে সবই বৃথা।

এরপর তাঁর ছাত্র-ছাত্রী এবং গুণমুগ্ধ শিল্পীরা তাঁরই রচিত গান গেয়ে শ্রীঘোষকে শ্রদ্ধা জানান।

এই সংগীতানুষ্ঠানটি শুরু হোলো মানস মুখোপাধ্যায়ের 'কোন যুগে পরবাসী' দিয়ে। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় 'অন্তরদ্বার খোলগো' এবং আরও একটি রাগপ্রধান গান গেয়ে আসর জমিয়ে তুললেন। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গাইলেন 'পাল তুলে দিনু পাড়ি'। পরিশীলিত মধুর কন্ঠের গানটি সবার অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছে।

এরপর উৎপলা সেন 'কূল ছেড়ে এসে মাঝ দরিয়া'য় গেয়ে সকলকে অবাক করে দিলেন। শ্রীমতী সেনের কাছে আমরা আধুনিক গান শুনতেই অভ্যস্ত। কিন্তু আহির ভৈরবে ছোঁয়ায় রাগপ্রধান গান এমন অনায়াস দক্ষতায় পরিবেশন করতে দেখে বোঝা গেল ইনি এখন উচ্চাংগ সংগীত চর্চায় মনোযোগী।

প্রভাতী মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসুর গান দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অধিকাংশ শিল্পীর সঙ্গেই জ্ঞানবাবুর সুবিখ্যাত শিষ্য শ্যামল বসু তবলা সংগত করেন।

—চিত্রাঙ্গদা

বিতর্কিত আলোচনা

দিনে দিনে পৃথিবীর পরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসছে। এক দেশের সঙ্গে অন্যদেশের আজ সহজ পরিচয়ের সুযোগ। নিজের দেশের দিকে তাকালে এই সত্য স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। দমদম, পালাম এবং শান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে বিদেশী ভাষা ও বর্ণের সমাবেশ দেখে মনেই হয় না আমরা দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। বিদেশীরা যেমন আমাদের দেশে আসছেন তেমনি আমাদের অনেকেও নানা দেশে পাড়ি জমান। শুধু মানুষের আনাগোনাই নয় শিল্প সংস্কৃতির আদানপ্রদানও চলছে। তাই সকলেই আমরা খুব কাছাকাছি দাঁড়াতে পারছি। যার মূল্য অপরিসীম।

আজকের দিনে শিল্প সংস্কৃতির অন্যতম বাহন সিনেমা। বিভিন্ন দেশের দূত হয়ে নানা বিদেশী সিনেমা আমাদের দেশে আসছে। সেসব ছবি আমাদের চিন্তাভাবনার নতুন দিগন্ত সংযোজন করে। বিদেশী চলচ্চিত্রে সবচেয়ে যা লক্ষণীয় নগ্নতা সম্পর্কে তাদের কোন সংস্কার নেই। আর চুম্বন তো স্বাভাবিক অভিনয়ের অংগ। তাই এসম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাববার অবকাশ আছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন প্রসঙ্গ উঠলেই একদল লোক হা-হা করে ওঠেন। তাঁদের মতে, ভারত সংস্কৃতি এবার উচ্ছন্নে যাবে। তবে সংস্কারমুক্ত মনে এসম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মেরে যায়। সম্প্রতি খোসলা কমিটির রিপোর্ট এসম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন, ফিল্মে চুম্বন ও নগ্নতা প্রদর্শন আপত্তিকর নয়। এবার হয়তো ভারতীয় ফিল্ম আত্মমুক্তির পথ পাবে।

অনেকে প্রশ্ন তুলবেন (যেমন আপনারাও তুলেছেন) ফিল্ম সেন্সর শিপ তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীখোসলা ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির পরিপন্থী এমন রায় দিলেন কোন বিবেচনায়? তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাই শ্রীখোসলা এই রিপোর্ট যথার্থ সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। এবং তিনি প্রকৃতই ভারতীয় চলচ্চিত্রের উন্নতি চান।

সংস্কার এবং সংস্কৃতি যে এক নয় সেকথা আমরা ভুলতেই বসেছি। তাই ডাইনামিক পৃথিবীতে বাস করেও আমরা সংস্কারের নামে সংস্কৃতির শ্বাসরোধ করছি। এদিক থেকে খোসলা রিপোর্ট অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। ভারতীয় চলচ্চিত্রে যদি চুম্বন ও স্বাভাবিক নগ্নতা প্রদর্শিত হয় তবে আমাদের অন্ধ গলিতে মাথা না খুঁড়ে সরাসরি রাজপথে পৌঁছে যাবার সুযোগ মিলবে।

সবশেষে সংস্কারপন্থীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন, ফিল্মের দৌলতে তরুণ-তরুণী উচ্ছন্নে যাচ্ছে এরকম একপেশে চিন্তা ছেড়ে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করলেই আসল রোগের ডায়াগনোসিস হবে। এবং তাঁরা বুঝতে পারবেন প্রতিকারের পথ সংস্কার নয়, সংস্কারমুক্ত মন।

পারুল দাশগুপ্ত,
জলপাইগুড়ি।

(২)

ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁর আত্মিক যোগ আছে তিনি নিশ্চয়ই জানেন চুম্বন ব্যাপারটা ভারতীয় সমাজে কতটা প্রকাশিতব্য। সিনেমার ক্ষেত্রে এটা অবশ্য প্রয়োজনীয় একথা কখনই মেনে নেওয়া যায় না। জানি, শিল্পের প্রধানতম লক্ষ্য বাস্তব হয়ে ওঠা। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের ঘনিষ্ট সম্পর্কের বাস্তব চিত্র তুলতে গেলে গোটাকয় চুম্বন আর নগ্ন দৃশ্য না দেখালে কি চলে না? বাস্তব হতে গেলে কি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রুচিকে বিসর্জন দিতে হয়? নিজস্বতা বলে কি আমাদের কিছু আর থাকবে না? পাশ্চাত্য সমাজে চুম্বন যত সহজে ও যতখানি প্রকাশ্যে দেখানো হয় ভারতীয় সমাজে এখনও সে ভাবে তা আসেনি। ওরা যুগের সঙ্গে তাল রেখে যেভাবে এগিয়েছে আমরাও আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে এগিয়ে যাব নিশ্চয়ই, এবং বলতে দ্বিধা নেই এগিয়েছিও নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন চুম্বন ও নগ্ন দৃশ্যকে ছবিতে দেখানোর মত অবস্থায় আসিনি।

প্রথমতঃ দর্শক সাধারণ এখনও সত্যিকারের দর্শক হয়ে ওঠেনি আর অশিক্ষিতের হার এখনও সত্তর শতাংশেরও বেশী। আর্ট কি তাই বোঝেনা অনেকে। সিনেমা যে আর্ট তা বোঝা তো দূরের কথা।

দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় ভাষায় ছবি করতে গেলে চুম্বন ও নগ্নদৃশ্যের অভাবে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয় একথা মেনে নেওয়া যায় না। প্রমাণ আছে অনেক। সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসার-এ চরিত্র অপু আর অপর্ণার সম্পর্কের গভীরতা কাপড়ের গাঁটছড়া বাঁধার মধ্য দিয়ে যত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে, অন্য কোন উপায়ে ঐরকম দৃশ্যে পরিকল্পনা করা সম্ভব ছিল কি?

তৃতীয়তঃ ভারতীয় শিল্পকলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বিদেশে একটি নির্দিষ্ট ধারণা আছে। বাস্তবের দোহাই দিয়ে গড্ডালিকা স্রোতে পা বাড়ালে নতুন সৃষ্টির আনন্দে উৎফুল্ল হওয়ার চাইতে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ভারতীয় ছবির স্বাতন্ত্র্যও ক্ষুন্ন হবে বই কি।

চতুর্থতঃ সেন্সর প্রথার শৈথিল্য চিত্র ব্যবসায়ে যে নোংরামির জোয়ার আনবে তার সম্ভাব্য ফল স্বাস্থ্যকর হবে না। সমাজের ওপর এখনও সাহিত্যের প্রভাব বেশী নয় বটে কিন্তু সিনেমার প্রভাব অবশ্যই আছে। সুতরাং চুম্বন বা নগ্নদৃশ্য ছবিতে দেখালে তার অদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তার প্রয়োজন আছে।

পঞ্চমতঃ খোসলা কমিটির সিদ্ধান্তকে কার্যকর করে পরিচালকরা যদি চুম্বন ও নগ্নদৃশ্য দেখান, সে দৃশ্য শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় তোলা হয়েছে তার বিচার করবেন কে? মাইনে করা কজন সরকারী কর্মচারী? সুতরাং সেখানেও সাম্প্রতিক শ্লীল অশ্লীলের মত বিতর্কের ঝড় বইবার সম্ভাবনাই বেশী।

কাজেই চুম্বন নিয়ে চরম-আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। কলকাতা-বোম্বাইয়ের চিত্রমহল যতই গুঞ্জন করুন তা গুঞ্জনেই পরিণত হবে। এ ব্যাপারে একটা জিনিস লক্ষ্য করার মত যে জাতিধর্ম নির্বিচারে নায়ককুল স্বাগত জানাচ্ছেন চুম্বন ও নগ্নদৃশ্যকে, কিন্তু নায়িকাকুলে বিপরীত পাওয়া। কারো কারো কথায় এটা বেশ স্পষ্ট যে অনেকেই এখনো সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু তাঁদের এ সংস্কারকে কুসংস্কার বলা যায় কি?

আরো একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যে, সেন্সর প্রথার শোষণ শুধুমাত্র যৌনতা চুম্বনের ওপরই। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কিছু বাধানিষেধও আছে। কই, সে সম্পর্কে তো উচ্চবাচ্য শোনা যাচ্ছে না? বরং শিল্পসৃষ্টির জন্যই সেদিকে নজর দেওয়া অধিকতর প্রয়োজন। শিল্পীর হাত যদি রাজনীতি বা সামাজিক নীতির শেকলে বাঁধা থাকে তাহলে গুটিকয় অশ্লীল দৃশ্য এনে তাকে শিল্প বলে চালান যাবে না। শিল্পীও তাতে রাজী হবেন কি?

দেশের সঙ্গে মাটির, মাটির সঙ্গে ঐতিহ্যের, ঐতিহ্যের সঙ্গে সংস্কৃতির, সংস্কৃতির সঙ্গে আবার নৈতিকতার যোগ বড় ঘনিষ্ঠ। সুতরাং নৈতিকতা সতীত্ব হারালে ঐতিহ্যের কুল যাবে এবং সংস্কৃতিরও অপমান হবে বলেই ধারণা। আমাদের দেশের সামাজিকতা এখনও এমন পর্যায়ে আসেনি যেখানে চুম্বন বা নগ্নদৃশ্যের প্রকাশ্য প্রদর্শনীর প্রয়োজন 'শিল্পসৃষ্টির' সুড়সুড়িতেও ক্ষমা [illegible] চলে।—

রতীনকুমার চন্দ্র,
জামালপুর।
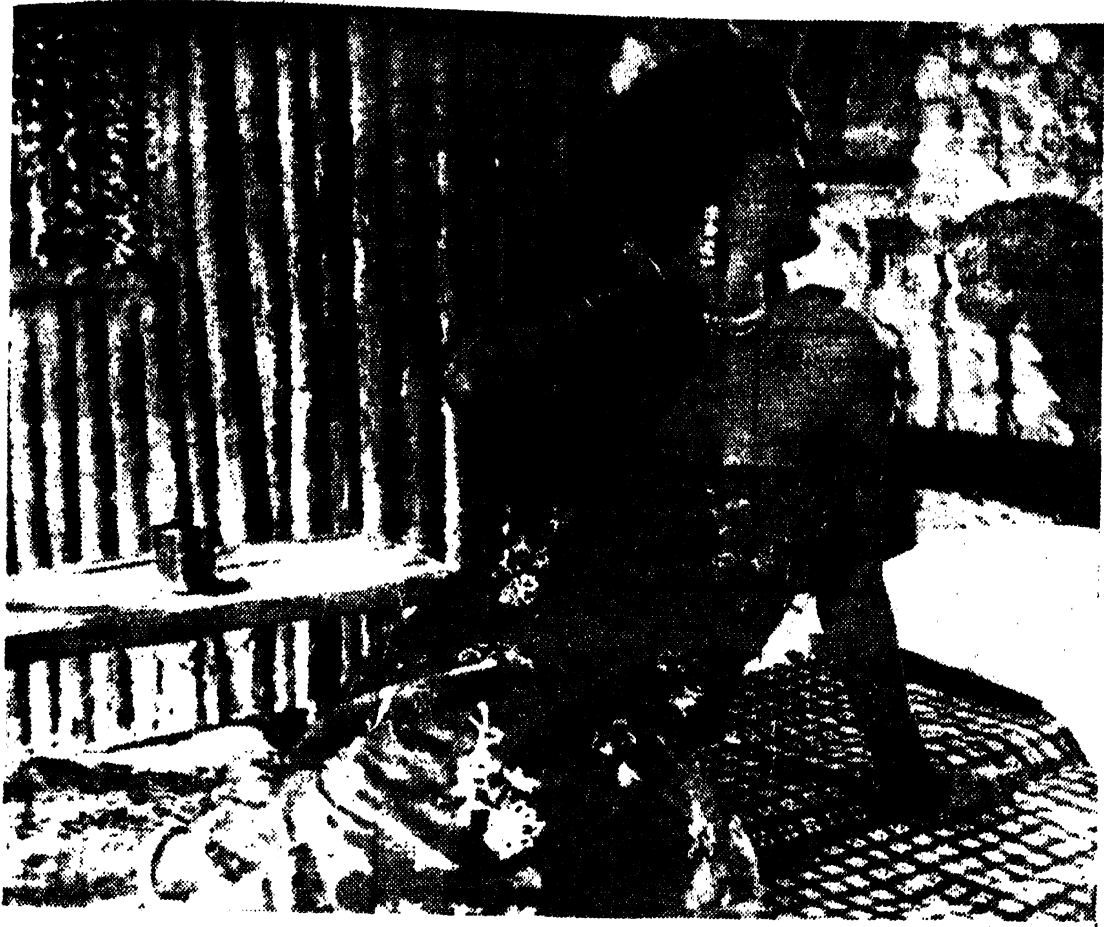
অনমোল মোতি/ববিতা

প্রেক্ষাগৃহ

চিত্র সমালোচনা

শত্রুভাবাপন্ন দেশের নকলের সঙ্গে ভারতের আসলের দ্বন্দ্ব

পিঠে একটি জড়ুলের অভাব এবং বাঁ চোখের তারাটি একটু বেশী নীলাভ— চেহারার মধ্যে এইটুকু তফাৎ দুই শত্রুভাবাপন্ন দেশের দুই যুবকের মধ্যে। কিন্তু এই তফাৎটুকু সেরে নিতে দেরী হয়নি— চোখে একটি কাঁচের পরকলা এঁটে এবং পিঠে কৃত্রিম জড়ুল তৈরী করে নিয়ে। কণ্ঠস্বরে ধরা পড়বার সম্ভাবনাকে লোপ করে দেওয়া হল বোবা সাজিয়ে: যেন একটা দুর্ঘটনার ফলেই এটা ঘটেছে। দুর্ঘটনার চিহ্নস্বরূপ গলদেশে একটি ক্ষত করে দেওয়া হল। — ব্যস, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক রাজেশকে বন্দী করে রেখে তার পরিবর্তে অভারতী গারেকনকে নকল-রাজেশ সাজিয়ে শত্রুপক্ষীয় লোকেদের দ্বারা সদ্যনিহত ডঃ শমার পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কীয় আবিষ্কারকে ধ্বংস করবার কাজে পাঠানো হল। কিন্তু নকল-রাজেশের পথে অনেক বাধা। প্রথমেই পালিত কুকুর; তারপরে গৃহভৃত্য ভোলা এবং তারও পরে আসল রাজেশের প্রণয়িনী রীতা। প্রথম দুই বাধাকে পৃথিবী থেকে অপসারিত করতে সময় লাগল না, কিন্তু গোল বাধল তৃতীয়ের বেলায়। সুন্দরী রীতা মা হতে চলেছে— তাকে হত্যা করতে পারল না গারেকন। এবং এই না-পারাই কাল হল। রাজেশ কৌশলে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে গারেকনের ধ্বংস প্রচেষ্টা ব্যর্থ করল এবং প্রণয়িনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটাল।

—এই হচ্ছে নবরত্ন ফিল্মস নিবেদিত ও দেবেন বর্মা প্রযোজিত রঙীন ছবি **'ইমাকীন'এর** কাহিনীর সারাংশ। কিছু দিন আগে একটি ছবি দেখেছিলুম, তাতে চীনা ও ভারতীয় যুবকের মধ্যে এমনই সৌসাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যে, একই 'তারকাকে

দিয়ে ঐ দুই ভূমিকায় অভিনয় করাতে প্রযোজকের মনে কোনো দ্বিধা জাগে নি; তা ছাড়া ঐ দুটি চরিত্র অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে একইভাবে হিন্দীতে সংলাপ বলেছিল। বর্তমান ছবি 'ইয়াকীন'-এর প্রযোজকরা একই ধর্মেন্দ্রকে দিয়ে ভারতীয় রাজেশ এবং অ-ভারতীয় গারেকনের ভূমিকা দুটি করালেও তাদের মনে হয়ত একটু কিন্তু জেগেছিল দুটি চরিত্রকে প্রথম থেকেই হুবহু এক হিসেবে দেখাতে এবং সমান কারণেই ও'রা অ-ভারতীয় চরিত্রটিকে প্রকাশ্যে বোবা সাজিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু শেষোক্ত চরিত্রটি যখন সংগোপনে নিজের দলের লোকের সঙ্গে কথা বলছে, তখন সে রাজেশেরই (কারণ ধর্মেন্দ্রই ত রাজেশ।) গলাতে কথা বলছে, এবং ধ্বংসে কার্যের প্রস্তুতির সময়ে যখন সে রাজেশের সম্মুখীন হল, তখন দুজনের গলার আওয়াজ ও কথা বলায় ভঙ্গীতে পর্যন্ত কোনো পার্থক্য নেই।

কিন্তু এ সত্ত্বেও চিত্রনাট্যকার-প্রযোজক দেবেন বর্মার বাহাদুরী হল ছবিটি কোথাও শ্লথগতি নয়; ঘটনা, দৃশ্য, এমন কি শট্ পর্যন্ত অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল। রসের বিন্যাসেও এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়; এই প্রেমের দৃশ্য, পরক্ষণেই কুটিল চক্রান্ত, আবার পর মুহূর্তেই হাস্যমুখর লঘু দৃশ্য। মাত্র চমক সৃষ্টির আতিশয্যে তাঁরা যেন ভোজবাজীর আশ্রয় নিয়েছেন বলে মনে হয়; মৃত শর্মার দেহ এবং ডিটেক্টিভ ডেভিডের উধাও হওয়াতে এইটে বড্ড বেশী প্রকট।

অভিনয়াংশে রীতার ভূমিকায় শর্মিলা ঠাকুর অত্যন্ত সংযতভাবে চমৎকার সু-অভিনয় করেছেন। যুগ্ম-ভূমিকায় ধর্মেন্দ্র বলিষ্ঠ অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন। ডিটেক্টিভরূপে ডেভিড, ডঃ শর্মাবেশে

শুভা কাহী শাম কাহী : লিলি চক্রবর্তী। পরিচালক : দিলীপ বসু

ভৃত্য ভোলার ভূমিকায় অসিত সেন, ডিটেক্টিভ বেশী গুপ্ত শত্রু হিসেবে গৌতম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিশেষ করে দৃশ্যপট রচনা এবং চিত্রগ্রহণে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সম্পাদনা সম্পর্কেও সমান কথা বলা চলে। তিনটি কুকুর দ্বারা আক্রমণের দৃশ্যটি আশ্চর্যভাবে বাস্তব হয়েছে চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার যৌথ দক্ষতার গুণে। ছবির প্রতিটি গানই সুর ও গাওয়ার দিক দিয়ে মনোহর। বিশেষ করে 'বচ বচ বচকে', 'গর্ তুম ভুলা ন দোগে সপ্‌নে', 'বহারো কী বরাত আগই'—গান তিনখানি বারংবার শোনবার মতো।

নবরত্ন ফিল্মস-এর 'ইয়াকীন' হিন্দী ছবি সাধারণ দর্শককে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

মঞ্চাভিনয়

লাঙল যার, ফসল তার

'লাঙল যার, ফসল তার'—এই কথাই কি বলতে চেয়েছেন কাহিনীকার সমরেশ বসু ও নাট্যরূপদাতা বরুণ দাশগুপ্ত চতুরঙ্গ প্রযোজিত 'আবর্ত' নাটকটির মাধ্যমে? চাকরী থেকে ছাটাই হয়ে-যাওয়া সনাতন যখন দেশের ভিটেতে ফিরে এসে বলে—আমরা দেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই সবাই মিলে একসঙ্গে লড়াই করব মাটি থেকে উৎখাত হওয়ার বিরুদ্ধে, তখন দর্শকমাত্রেরই কি মনে পড়ে না এই স্লোগান : লাঙল যার, ফসল তার?

অবশ্য এরও আগে কথা আছে। জমিদারী প্রথা সৃষ্টির দিন থেকে এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পরেও কৃষকেরা যে ক্রমেই ভূমিহীন হয়ে পড়ছে, তার অন্যতম

কারণ হচ্ছে, কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার অভাব। প্রকৃত শিক্ষা থাকলে ধনী জমিদারই বলুন, আর জোতদারই বলুন, ঋণ বা দাদন প্রভৃতি সম্পর্কিত ব্যাপারে জাল তৈরী করবার সময়ে কৃষকদের ঠকাতে চেষ্টা করত কম। তাছাড়া শিক্ষার গুণে তাদের আত্ম-প্রত্যয় জন্মাত, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতেও শিখত। সনাতন ও রাজা যে তাদের জমি থেকে বঞ্চিত হল, রাজা যে মিথ্যা দেনার দায়ে মিথ্যা অঙ্গীকারপত্রের সহায়তায় তার প্রাপ্য ফসল থেকে বঞ্চিত হল, বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হল, তার জন্যে তাদের অশিক্ষা কি অল্প দায়ী?

রাজা-পদ্ম, সনাতন-বাসিনীর কৃষক-গৃহস্থ জীবনের বঞ্চনার নাটকীয় আলেখ্যটি তিনটি পৃথক এবং কতকটা বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের মারফৎ কথিত হয়েছে। এদের গোড়ায়, মাঝে ও শেষে যোগসূত্র হিসেবে ব্রজের ভাষ্য-দৃশ্যগুলি চমৎকার কাজ করেছে।

'আবর্ত' নাটকটির সামগ্রিক উপস্থাপনা অভিনব। দর্শক ও নাটকস্থ পাত্রপাত্রীদের মধ্যে ব্যবধান লুপ্তপ্রায়। যখন ওরা আমাদের মাঝে এসে বলে—বাবুরা, বলে দিন এর উপায় কি, তখন নিজেদের যেন কেমন অসহায় মনে হয়। অবশ্য এর একটা কারণ, উপায় জানা থাকলেও নাটক দেখছি, এ-কথাটা মনে থাকায় উপায় বাৎলাবার উপায় থাকে না। মঞ্চে দৃশ্যপট সংগঠনেও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সামগ্রিক অভিনয় খুব উঁচু পর্দায় বাঁধা এবং প্রচন্ড বাস্তবধর্মী। বিশেষ করে রাজা ও তার বৌ পদ্মরূপে মিহির চট্টোপাধ্যায় ও সবিতা সমাজদারের অভিনয় নৈপুণ্য অতুলনীয়। মহীন ঠাকুরের শঠ চরিত্র আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করেছেন সুজন সেনগুপ্ত। বাসিনী, সনাতন, দারোগা ও ব্রজ বেশে যথাক্রমে শাশ্বতী রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিমেষ চক্রবর্তী ও বরুণ দাশগুপ্ত সু-অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রাম্য চাষীর দল, বিশেষ করে সেই যাত্রা দলে সীতা-সাজা ছেলেটি—সকলেই প্রশংসনীয়।

প্রথিত নাট্য সংস্থা থিয়েটার গিল্ড আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় একাডেমি অফ ফাইন আর্টস হলে শ্রীবিমল করের 'যদুবংশ' মঞ্চস্থ করবে। উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়েছেন সমীর লাহিড়ী।

রঙমহল হাসির হাল্কা নাটকের জন্য দর্শক মনে এক নতুন আসন করে নিয়েছে। ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার শুভ-জন্মাষ্টমী-দিবসে সন্ধ্যা ৬॥টায় রঙমহলে যে নাটকখানির উদ্বোধন হয়েছে সেই নতুন নাটকখানির নাম 'আমি মন্ত্রী হব'। লিখেছেন 'টাকার রং কালো'র যশস্বী নাট্যকার সুনীল চক্রবর্তী। এটা শুধু হাসির নয়—তার সঙ্গে আছে ব্যঙ্গও। আজকের সমাজব্যবস্থার ওপর কষাঘাত। এতে আছেন—জহর রায়, সত্য বন্দ্যো, হরিধন, অজিত চট্টো, তুষার বন্দ্যো, মৃণাল মুখো, সমরনাথ বন্দ্যো, ইন্দ্রজিৎ, সুজিত, মানস, কার্তিক, মিন্টু, বাসবী নন্দী, মমতা বন্দ্যো, নন্দিতা দে, রত্না ঘোষাল ও সরযূ দেবী প্রভৃতি। এখন থেকে 'আমি মন্ত্রী হব' নাটকখানি প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিন নিয়মিতভাবে দর্শকদের অভিবাদন জানাবে।

নাট্য আন্দোলনের অন্যতম শরিক 'পথিক' গোষ্ঠী ম্যাক্সিম গোর্কির অমর সৃষ্টি 'মা' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ ক'রে শহর কলকাতার চতুর্দিকে বিরাট আলোড়ন এনেছেন। যেহেতু 'মা'-র বক্তব্য বর্তমান বাংলা তথা সারা ভারতের সমাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই সর্বস্তরের মানুষের কাছে 'মা' নাটকের মূল বক্তব্যকে পেঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'পথিক' সংস্থা শহরতলী ও গ্রামে নিয়মিত অভিনয়ের একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। বর্তমান পর্যায়ের প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে কালচারাল এণ্টারপ্রাইজের পরিবেশনায় রাজপুর ছায়াবাণী সিনেমা হলে ১৩ সেপ্টেম্বর রাত ৮টায়।

সম্প্রতি উত্তর কলকাতার প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠী পঞ্চমিত্রম দু'খানি নাটক মঞ্চস্থ করল। নাটক দুটির নাম—'হারানো চিঠি' ও 'ছুটির খেলা'। 'হারানো চিঠি' অভিনীত হয়েছে গত ১৮ আগষ্ট মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে, 'ছুটির খেলা'র অভিনয় হয়েছে গত ২৭ আগষ্ট রবীন্দ্র সদন রঙ্গালয়ে। দু' খানা মূল নাটকের নাট্যকারই হচ্ছেন বিদেশী—রুমানিয়ান।

নির্দেশনায় সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় সফল। রবীন্দ্র সদন মঞ্চে 'ছুটির খেলা'র প্রযোজনাও কম আকর্ষণীয় নয়। উভয় নাটকে দলগত অভিনয়ের সাফল্যে অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী করতে পারেন—দীপক সেনগুপ্ত, তপন ভৌমিক, শ্যামল সেন, এন সাচারকে, সরিৎ ঘোষ, অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মমতা চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

অহীন্দ্র চৌধুরী সম্বর্ধনা ও রাজা রামমোহন যাত্রাভিনয়

আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় মহাজাতি সদনে তরুণ অপেরা সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রাজা রামমোহন' পালা অভিনয় করবেন। নির্দেশনা অমর ঘোষের।

ঐদিন অভিনয়ের পূর্বে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে ডি-লিট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে তরুণ অপেরার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

স্টুডেন্টস হেলথ হোমের উদ্যোগে আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সঙ্গীত কলামন্দিরে সপ্তাহব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। হেলথ হোমের সাহায্যার্থে অনুষ্ঠিত এই নাট্যোৎসব বহুরূপী, নান্দীকার, রূপকর, চলাচল, অনামিকা, শান্তি-নিকেতন আশ্রমিক সংঘ বিভিন্ন দিনে অংশ নেবেন।

বারুইপুরের 'নাট্যজিজ্ঞাসা' নাটকর্মী ও দর্শকদের প্রয়োজন এবং আগ্রহের কথা মনে রেখে 'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বক্তৃতামালা' পর্যায়ে নাটক, প্রযোজনা, পরিচালনা, অভিনয়, আলো, মঞ্চ, রূপসজ্জা, ধ্বনি, সঙ্গীত, বাংলা থিয়েটার: গিরিশ ও শিশির-যুগ, নবনাট্য আন্দোলন ও জাতীয় নাট্যশালা এই বারোটি বিষয়ে বারোটি বক্তৃতার আয়োজন করেছেন। বে-সরকারী প্রচেষ্টায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিনয়-কলা বিষয়ক বক্তৃতামালার অনুষ্ঠান বাংলা দেশে সম্ভবতঃ এই প্রথম। প্রতিটি বিষয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় গুণীজন ভাষণ দেবেন স্থির হয়েছে এবং ইতিমধ্যে 'আলো' এবং 'অভিনয়' সম্পর্কে প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতা দিয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়দ্বয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা যথাক্রমে শ্রীঅমর ঘোষ এবং শ্রীমতী নিবেদিতা দাস। বিশদ বিবরণের জন্য আগ্রহী শ্রোতারা শিশির বসু, স্টেশন রোড, বারুই-পুর, ২৪ পরগণা অথবা বিজন দাস, পদ্ম-পুকুর, বারুইপুর এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

গত ২১ আগস্ট সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে 'পানিতুয়া'র দ্বাদশতম বার্ষিক উৎসব অনু-ষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগী এবং পুরস্কার বিতরণ করেন আন্দামান অভিযাত্রী শ্রীপিনাকীরঞ্জন চট্টো-পাধ্যায়। ঐ দিনকার অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল অশীষ সরকারের পরিচালনায় 'বীরপুরুষ' আলেখ্য প্রদর্শনী। অংশ নিয়ে-ছিলেন—ইন্দ্রজিৎ বসাক, পিঙ্কু সরকার, সুস্মিতা সিংহ, মালতী দাস, শেলী দাস, সুজিত মিত্র, ভোলা বসাক, দীপক রায়, শ্রীবাস দত্ত, প্রমুখ। এ ছাড়া ঐ দিন পান-তুয়া'র সদস্যরা অভিনয় করলেন শ্রীআশীষ সরকারের 'ঘুণধরা বাঁশী'। এই নাটকটিতে অভিনয় করেন সমীনাথ রায়চৌধুরী, জীতেন সেন, শ্যামল ব্যানার্জি, প্রদীপ দাস ইত্যাদি। নাটকটির পরিচলনায় ছিলেন অসীম সর-কার।

আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে রাগরঙ্গের প্রযোজনায় কবি গুরুর 'চিত্রাঙ্গদা' মঞ্চস্থ হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লেডি রাণু মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন। শ্রীঅশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন বসু, শ্রীসাধন গুহ, শ্রীমতী বনানী ঘোষ, শ্রীমতী পলি গুহ, শ্রীমতী গীতা সরকার ও শ্রীমতী হিমানী সরকার চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে অংশ গ্রহণ করবেন।

প্যার কা স্বপন/মালা সিন্‌হা ও বিশ্বজিৎ

যেন ভুলে না যাই

ক্লার্ক গেবল্

ক্লার্ক গেবল্

উনিশশো এক সালের সেই দিনটিও ছিল ফেব্রুয়ারী মাসের এক তারিখ। এই বিশেষ দিনটিতে কাজিজ শহরের ওহাইও-তে ক্লার্ক গেবল্ জন্মেছিলেন। সেদিন কেই বা জানতেন, এই শিশুটিই একদিন চলচ্চিত্রের নায়কের নায়ক হয়ে রাজার রাজা হবেন! নামকরা অতি জনপ্রিয় অভিনেতা হবেন। ক্লার্কের বাবা উইলিয়ম এইচ গেবল কি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর একমাত্র ছেলে পৃথিবী বিখ্যাত নায়ক হবে? যদি তিনি আঁচ করতে পারতেন তাহলে নিজের কারবারের মধ্যে ঢুকিয়ে ক্লার্কের অভিনয়-জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করতেন না। জানিনা তাঁর মা বেঁচে থাকলে কি করতেন, কারণ তিনি ক্লার্কের জন্মের পরই মারা যান।

ছোটবেলা থেকেই ক্লার্ক গেবল্ বিমাতার কাছে মানুষ। ফলে অবাধ স্বাধীনতা না পাওয়ার জন্য তিনি কোনদিন মুখ ফুটে মনের কথা কাউকে জানাতে পারেননি। এবং সেই কারণে বলি-বলি করেও অভিনয় শেখার ব্যাপারটা বলা হয়নি। ক্লার্কের যখন ষোল বছর বয়স তখন তাঁর বাবা তাঁকে চাষাবাদের কাজে লাগিয়ে দেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ দায়িত্বের বোঝা ক্লার্ককে কিছুদিন বহন করতে হয়। তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের জন্য ক্লার্ক গ্রাম ছেড়ে এ্যাকরণ শহরের এক তৈল শোধন কোম্পানীতে চাকরী নিয়ে চলে আসেন। কাজের সঙ্গে সঙ্গে ক্লার্ক আবার লেখাপড়ায় মেতে উঠলেন। তাঁর ইচ্ছে হল ভবিষ্যতে ডাক্তারী পড়বেন। কিন্তু এ পরিকল্পনায় হঠাৎ বাধা পড়ল। ক্লার্কের বাবা চিঠি লিখে জানালেন যে, চাষাবাদের কাজ বন্ধ করে তিনি ওকলাহোমায় একটা থিয়েটার দল খুলতে চান। ক্লার্ক ইচ্ছে করলে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে পারে।

এ যেন শাপে বর হল। এতদিন যেটা শুধু ক্লার্কের মনে সুপ্ত ছিল তা অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে খোদ কর্তার কাছ থেকে সাড়া এল। আর এতটুকু সময় নষ্ট না করে ক্লার্ক চাকরী, লেখাপড়া সব ছেড়েছুড়ে বাবার কাছে ছুটলেন থিয়েটার দলে যোগ দিতে।

শেষ পর্যন্ত ক্লার্কের বাবা থিয়েটার চালাতে পারলেন না। ক্লার্ক কিন্তু আগের জায়গায় আর ফিরে না গিয়ে ওকলাহোমায় যোশেফ ডিলন-এর থিয়েটার স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলেন। অভিনয় শেখার প্রতি ক্লার্কের বিশেষ নিষ্ঠা দেখে যোশেফ ডিলন খুশি হয়ে স্থানীয় একটা থিয়েটারে ছোটখাটো চাকরী গেবল্‌কে জুটিয়ে দিলেন।

যোশেফ ডিলনের আন্তরিক চেষ্টায় ক্লার্ক গেবল খুব অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয়-বিদ্যায় রপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। অভিনয় পাঠের সঙ্গে সঙ্গে গুরু-শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। সব ছাত্রদের মধ্যে থেকে গেবল্‌কেই যোশেফ একটু আলাদা চোখে দেখতে শুরু করলেন। কারণ তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, একদিন না একদিন ক্লার্ক গেবল্ অভিনয় জগতে খ্যাতিলাভ করবে। তাই প্রথম থেকেই তিনি গেবল্‌কে উৎসাহিত করে বারবার প্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি ক্লার্ককে বললেন, 'আমি হলিউডে একটা নাটকের স্কুল খুলব বলে ঠিক করেছি। তুমি কি আমার সঙ্গে সেখানে যাবে?' কেন জানিনা ক্লার্ক গেবল্ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে উত্তর দিলেন, 'আপনি যেখানেই যাবেন আমি চিরদিন আপনার সঙ্গে থাকব।'

কি জানি কি হয়ে গেল। সেদিন থেকেই দুটি মন এক হল। ভালবাসার বন্ধনে একাত্ম হতে চাইল। ও'রা দুজনেই বিয়ের প্রস্তাবে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেললেন। ১৯২৪ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ক্লার্ক গেবল্-এর সঙ্গে যোশেফ ডিলনের বিয়ে হল। গেবল্-এর বয়স তখন তেইশ আর যোশেফের সাঁইত্রিশ। বয়সের এই ব্যবধানে মনে হয়, ক্লার্ক গেবল্ জ্ঞান হবার আগেই মাকে হারিয়েছেন বলে মাতৃস্নেহের অভাব কিছুটা পূরণ হবার জন্য যোশেফের মত একজন বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করলেন। কারণ আমরা এর পরেও দেখেছি, গেবল্ ১৯৩১ সালে একচল্লিশ বৎসর বয়সের মেয়ে রিহা ল্যাঙহামকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন।

যোশেফ ডিলনের চেষ্টায় ১৯২৫ সালের শুরুতে ক্লার্ক গেবল্ হলিউডের আর্নস্ট লুবিচের ছবিতে প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পেলেন। সামান্য এক সৈনিকের চরিত্রে ক্লার্ক চলচ্চিত্রে সর্বপ্রথম অভিনয় করলেও তাঁর এই প্রথম সূচনাকে খুব বড় করে দেখেছিলেন যোশেফ ডিলন। এরপর ক্লার্ক হলিউডের স্টুডিওগুলোতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করলেন। পেছন থেকে যোগাযোগ এবং সব সময় উৎসাহ জুগিয়ে চললেন যোশেফ।

১৯২৭ সালে হলিউডে সবাক ছবির যুগ এল। ছবিতে প্রথম কথা ফুটল। নায়ক-নায়িকার সংলাপ শোনা গেল। সবাক ছবির জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে ক্লার্ক গেবল্ও জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগলেন। ১৯৩০ থেকেই ক্লার্কের অভিনয়-জীবন দানা বাঁধতে থাকে। এই সময় মেট্রো-গোল্ডেন-মায়ার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্লার্ক গেবল্ দু' বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন। এই সংস্থার হয়ে তিনি 'দি ইজিয়েস্ট ওয়ে', 'পেইণ্টেড ডেজার্ট' এবং 'এ ফ্রি সোল' ছবিতে অভিনয় করলেন। 'এ ফ্রি সোল' ছবিতে ক্লার্ক গেবল্ নায়িকা নর্মা শেয়ারার বিপরীতে অভিনয় করে অভূতপূর্ব সাফল্যে উন্নীত হন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, পৌরুষ এবং বলিষ্ঠ চেহারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দর্শকরা মুগ্ধ হন। সেই সঙ্গে ক্লার্ক গেবল-এর আবির্ভাবে হলিউড এক নতুন নায়ককে আবিষ্কার করল। দেখতে দেখতে গেবল্-এর জনপ্রিয়তা হলিউড থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে তাঁর গুণমুগ্ধ মেয়ে-দর্শকরা তাঁকে

অভিনন্দিত করে কাতারে কাতারে চিঠি পাঠাতে থাকল।

প্রতিষ্ঠার এই প্রাক লগ্নে ক্লার্ক গেব্ল্-এর পাশে আমরা যাঁকে বেশি করে আশা করেছিলাম সেই প্রথম প্রিয়তমা এবং অভিনয় শিক্ষাগুরু যোশেফ ডিলনকে চিরদিনের জন্য হারালাম। জনপ্রিয়তা এমন জিনিস যে মানুষকে আপনজনের কাছ থেকে পর করে দেয়। বহু মেয়ের আকর্ষণে ক্লার্ক গেব্ল্ ক্রমশ যোশেফকে দূরে সরিয়ে দিলেন। যোশেফের কথা তিনি প্রায় ভুলেই গেলেন। ক্লার্কের এই হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করে যোশেফ বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব এনে নিজে থেকেই সরে দাঁড়ালেন। ক্লার্ক গেব্ল্ও রাজি হয়ে গেলেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর এক সংগে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকার পর ১৯৩০ সালের পয়লা এপ্রিল যোশেফ ডিলনের সংগে ক্লার্ক গেব্ল্-এর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে। জানিনা তাঁদের এই মধুর সম্পর্কে কি করে ঘুণ ধরল, তবে এটা খুবই দুঃখের কথা যে একদিন যাঁর প্রেরণায় এবং সাহায্যে ক্লার্ক গেব্ল্ অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন; আজ সাফল্যের স্বারপ্রান্তে এসে তাঁকেই ভুলে গেলেন!

সুন্দরী মেয়েদের আকর্ষণ দুর্নিবার। তার ওপর ভালবাসা এবং স্নেহ মিলিয়ে যে জোয়ারের টান তাকে সহজে কি ধরে রাখা যায়। ক্লার্ক গেব্ল্ও প্রেমের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে এক এক করে পাঁচজন মহিলাকে বিয়ে করলেন। যোশেফ ডিলনের পর তাঁরা হলেন রেহা ল্যাঙহাম, ক্যারল লম্বার্ড, লেডি সিলভিয়া অ্যাশলে এবং কে স্প্রেকলেস। পঞ্চম স্ত্রী স্প্রেকলেসই ক্লার্ক গেব্ল্-এর জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলেন। এবং এ'রই সাহচর্যে ক্লার্ক পরবর্তী জীবনে সুখি হতে পেরেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ক্লার্ক গেব্ল্-এর দুটি সন্তান এ'রই সৌভাগ্য ঘটেছিল।

ক্লার্ক গেব্ল্ তাঁর জীবনে মোট ৯০টি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। বিখ্যাত কয়েকটি ছবির নাম : স্ট্রেঞ্জ ইণ্টারলিউড, দি হোয়াইট সিস্টার, হেল ডাইভার্স, পলি অফ দি সারকাস, চাইনা সিজ, ইট হ্যাপেন্ড ওয়ান নাইট, গন উইদ দি উইণ্ড, ফরসেকিং অল আদার্স, মিউটিনি অন দি বাউণ্টি, কল অফ দি ওয়াইল্ড, ইডিয়টস ডিলাইট, স্ট্রেঞ্জ কারগো, সামহোয়ার আই উইল ফাইণ্ড ইউ, অ্যাডভেঞ্চার, কমাণ্ড ডিসিশন, হোমকামিং, সানফ্রানসিসকো, এনি নাম্বার ক্যান প্লে, কি টু দি সিটি, টু প্লিজ এ লেডি, লোন স্টার, নেভার লেট মি গো, মোগাম্বো, বিট্রেড, সোলজার অফ ফরচুন, টল মেন, কিং অ্যাণ্ড ফোর কুইনস, বেণ্ড অফ এঞ্জেলস, টিচারস পেট, বাট নট ফর মি এবং মিসফিট।

চলচ্চিত্র ছাড়াও ক্লার্ক গেব্ল্ থিয়েটারে যে যে নাটকে অভিনয় করেছিলেন তা হল : কিলার মিয়র্স, লেডি ফ্রেডরিক, ম্যাডাম এক্স, গ্রেট ডায়মণ্ড রবারি, হোয়াট প্রাইস গ্লোরি, কপারহেড, রমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট এবং দি লাস্ট মাইল।

১৯৬০ সালের ১৬ই নভেম্বর ক্লার্ক গেব্ল্ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু আমেরিকা নয়, সারা বিশ্ব একজন প্রকৃত নায়ককে হারাল। এর আগে হলিউডের কোন চিত্র-তারকার পরলোকগমনে সারা পৃথিবী এতখানি শোকগ্রস্ত হয় নি, যেমন হয়েছিল ক্লার্ক গেব্ল্কে নিয়ে। তাঁর মৃত্যুর অবসানে চলচ্চিত্রের একটা যুগ শেষ হল। এখন আর সেই প্রাচীনকালের ছবি আমরা দেখি না কিন্তু ক্লার্ক গেব্ল্কে কি ভুলতে পেরেছি। তিনি আজও নায়কের রাজা। মৃত্যু তাঁকে কেড়ে নিলেও তিনি চিরদিন দর্শকদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন। যতদিন ছবি চলবে ততদিন ক্লার্ক গেব্ল্কে লোকে মনে রাখবে। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৬১ সালের ২০ মার্চ তাঁর ছেলে কে গেব্ল্ জন্মগ্রহণ করে। ক্লার্ক গেব্ল্ শুধু স্মৃতির মধ্যে নয়, তাঁর ছেলে কে গেব্ল্-এর মধ্যেও বেঁচে থাকবেন।

—চিত্রলেখ

কমল ভট্টাচার্য

টম গ্রেভনী কি করবেন!

চিরকাল যে খেলা থাকে না, খেলার জলুস যে ধীরে ধীরে কমে যায় একথা খেলোয়াড়মাত্রই জানেন। আজ থেকে সাত বছর আগে ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা ক্রিকেটসমালোচক ডেরিক হুগার পঁয়ত্রিশ বছরের ইংল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেটার টম গ্রেভনীকে সেই কথাই বলেছিলেন—রসিকতার ছলেই তিনি বলেছিলেন—'দ্যাখ হে টম, আটতিরিশ বছর বয়সে তুমি বোধহয় বড় খেলায় ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম সারির পর্যায়ে পড়বে না। তখন তো তোমার চোখ যাবে। খেলার ভুলচুক ত হবেই।' টম গ্রেভনী বড় ব্যাটসম্যান, তাঁর মারের ছটায় দর্শকদের চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু মুস্কিলও আছে তাতে। চরম মুহূর্তে হাত জমিয়ে চৌকস মার মারতে গিয়ে তিনি যখন আউট হয়ে যান—তখন কেউ কেউ আফশোষ করেন। ইদানীং বেধড়কি মারের বহরটা তাঁর বেড়েই গিয়েছিল, আর সেই শক্ত হাতের মারে এক একটা মারাত্মক ভুলও করছিলেন গ্রেভনী। কিন্তু টম গ্রেভনী তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেননি। বরং জোর গলায় বলছিলেন—'এর মধ্যে ভুল আবার কোথায় দেখলেন? খেলতে হয় খেলছি। আগেও যা খেলেছি—আজও তাই খেলছি।' আরও একটু আপত্তি জানিয়ে কথাটা সহজ করে তুললেন তিনি—'আজকের খেলায় বাঁধা ব্যবস্থা মতে যদি ক্রিকেট খেলতে হয় তাহলে আমি একহাত বাজী লড়তে রাজি আছি যে, জ্যাক হবস চল্লিশ বছর পেরিয়েও সেঞ্চুরী করতে পারতেন কিনা সন্দেহ!' আসল কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, ক্রিকেটের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে গেলে খেলার মাদকতা থাকে না। আঁটসাট খেলা শিক্ষার ধার বড় একটা ধারতেন না তিনি। সেই ১৯৪৮ সালে ভাই কেন-এর সঙ্গে গ্লস্টারশায়ার কাউন্টি দলে ঢুকেছিলেন। তখন তাঁর বয়স কত হবে—বছর বাইশ। তিন বছরের মধ্যেই সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেন। এবং পরের বছর 'উইসডেনে' পাঁচজনের মধ্যে গ্রেভনীর জায়গা হোল। গ্রেভনীর ব্যাটিংয়ে মুন্সিয়ানার ছাপ আছে দেখে ক্রিকেট-রসিক-মহল উদ্ভাসিত হলেন। প্রবীণরা স্বীকার করেন টমের এবং হ্যামন্ডের খেলায় অনেক মিল আছে।

এই সব গরম গরম মন্তব্যে টম বড় একটা বিচলিত হতেন না। মুখবোজা মানুষ—মুচকি হাসিতেই কাজ সারেন তিনি। কাজেই ক্রীড়া-সাংবাদিকরা এমন একটা মানুষকে নিয়ে রবিবারের খেলার পাতাটাকেও ভরাট করে তুলতে পারেননি।

গ্রেভনীর জন্ম রাইডিং মিল, নর্দামবারল্যান্ডে। খেলার জন্যে ল্যাঙ্কাশায়ারে কিছুদিন থাকার পর গ্লস্টারশায়ার কাউন্টিতে যোগ দেন। ব্রিটিশ স্কুলের হয়ে রাগবী খেলতেন। আর হেনবারী গল্‌ফ ক্লাবের চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়। টম গ্রেভনী প্রমাণ করেন খেলা ভালবাসেন তাই খেলা, সে যে খেলাই হোক না কেন কোনটাতেই তাঁর অরুচি নেই। কিন্তু ক্রিকেট খেলে টম গ্রেভনী সুখী হতে পেরেছেন কি? বোধহয় না। 'খেলতে হয় তাই খেলা'—এই বলার মধ্যে তাঁর যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল বৈকি। তাই ক্রিকেটসমালোচক ডেরিক হুগার গ্রেভনীকে যখন তাঁর খেলার বিষয়ে

টম গ্রেভনী

মন্তব্য করছিলেন তখনও তিনি মনের জ্বালা প্রকাশ করেননি। যথেষ্ট বলার মত কথা থাকা সত্ত্বেও।

সেই ১৯৬০ সালের কথাই বলি, নভেম্বর মাস। তখন গ্রেভনী ক্রিকেটের মহাপুরুষ। এত সত্ত্বেও গ্লস্টারশায়ার কাউন্টি দল ইংল্যান্ডের সেরা টেস্ট ক্রিকেটার গ্রেভনীকে বাদ দিয়ে একজন ২৩ বছরের অপেশাদার খেলোয়াড়কে দলের নেতৃত্বের ভার দিলেন—যাঁর নাম পাগ্‌। কানাকানি হোল এই নিয়ে, কেউ কেউ প্রতিবাদও করল এই অন্যায় কাজ দেখে। কিন্তু কম কথার মানুষ গ্রেভনী মানে মানে দলের কাছ থেকে ছাড়পত্র চাইলেন। উস্টারশায়ার কাউন্টি দল তখন হাত পেতে বসে আছে গ্রেভনীকে পাবার জন্যে। কিন্তু অত তাড়া কিসের? দিচ্ছি দিচ্ছি করে গ্লস্টারশায়ার কাউন্টি দল মাস তিনেক কাটিয়ে দিল। তারপর চাপে পড়ে কমিটি সোয়া এক ঘন্টা বাক-বিতন্ডার পর গ্রেভনীকে ছাড়পত্র দিল। গ্রেভনী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কেননা এম সি সি-র বা আইন তাতে কোন দল বেঁকে বসলে কারও করার কিছু নেই। কিন্তু সুখ তখনও গ্রেভনীর কপালে লেখা হয়নি। কাউন্টি দল তাঁকে ছাড়লেও আইনের আর এক কড়া প্যাঁচে পড়লেন ইংল্যান্ডের সেরা ব্যাটসম্যান টম গ্রেভনী। ব্যাপারটা হোল এই যে, কোন চ্যাম্পিয়ন দল থেকে আর এক চ্যাম্পিয়ন দলের পক্ষে খেলোয়াড় সই করলেই যে তিনি আগামী মরশুমেই খেলতে পারবেন এমন কথা কেউ বলে নি। এইসব ব্যাপারেও একটা নির্দিষ্ট সময়কাল আছে। কাজেই এম সি সি ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড একেবারে না করে দিলেন। নতুন কাউন্টি দলে খেলতে হলে গ্রেভনীকে একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে। গ্রেভনী বড় ফাঁপরে পড়লেন। কি করবেন আর তবে শেষ চেষ্টা করলেন একবার। মীমাংসার জন্যে কোর্ট-কাছারী পর্যন্ত গিয়েও গ্রেভনী কোন সুফল পেলেন না। এত বড় একজন ক্রিকেটারের সর্বনাশ দেখে সবাই হায় হায় করে উঠলেন। সেকি কথা! একে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স, তাতে এক বছর খেলা বাদ গেলে খেলোয়াড়-জীবনের কি অস্তিত্ব থাকবে? ধন্য আইন বাবা। সবাই স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, একে ত গত বছরের পর আর ইংলন্ডের টেস্ট ম্যাচ খেলবে সেই বাবাটিতে। এতদিন বাদে গ্রেভনীর শুকিয়ে যাবার কথা দেখা যাক কি হয়?

পঁয়ত্রিশ বছরের টম গ্রেভনী সেদিন ঘাবড়ে যান নি। ইংল্যান্ডের হয়ে ৪৮ বার টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়ে গেল। রানও তো বড় কম নয় ২,৫৯০—টেস্ট ম্যাচ এ্যাভারেজ হোল ৩৯-২৪। কিন্তু খেলবেন কোথায়! একটা বছর তো বসে কাটাতে হবে। কোন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নেই টম গ্রেভনীর। কাউন্টির সেকেন্ড ইলেভেন—এর খেলা, কখনও-সখনও ইউনিভারসিটির বিরুদ্ধে খেলা, আর একটি ম্যাচ সফররত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে—তা মন্দ কি! মনের সুখে গ্রেভনী খেলতে লাগলেন।

গ্রেভনী যে খেলা ভোলেন নি তা প্রমাণ করলেন একটি বছর বাদ দিয়ে। অর্থাৎ ১৯৬২ সালের ক্রিকেট মরসুমের শুরুতেই। তখন জুন মাসের সবে ১৫ তারিখ; গ্রেভনীর হাজার রান পূর্ণ করতে

মাত্র একটি রান দরকার। এবং পাকিস্তানের সঙ্গে এজবাসটন মাঠে প্রথম টেস্ট ম্যাচেই ৯৭ রান করেন। তাঁর চমকপ্রদ খেলা দেখে সবাই সাধুবাদ না দিয়ে পারেন নি। অসীম ক্ষমতা না থাকলে এই অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হওয়া যায় না। টম আবার নতুন করে খেলা শুরু করলেন—আটতিরিশ বছর বয়সেও তিনি নবীন; কিন্তু এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও গ্রেভনী ইংল্যান্ড দলে তাঁর আসন পাকা করলেন কি করে? কি তার রহস্য?

কথাটা গ্রেভনী খুলে বলেছিলেন সেই ক্রিকেটসমালোচক হুপারকে। 'হ্যাঁ, একটা বছর চ্যাম্পিয়ন দলে খেলতে পারব না এটা আমায় বেশ ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে দেখলাম, এটা আমার অভিশাপ নয় আশীর্বাদই। তা নয়ত কি, সেকেন্ড ডিভি-সনের খেলায় ফুরসং ছিল নাকি! শুধু খেলে গেছি। আলগা বলে ফ্রন্টফুটের সট আমায় কম আরাম দেয় নি। রোজ রান করেছি। মনে হয় এই ধরনের স্বচ্ছল ব্যাটিং করার জন্যেই আমার হাতের মুঠি আরও শক্ত হয়ে উঠেছিল। নইলে ইংল্যান্ড টিমে আবার জায়গা পাওয়া সাধ্য কি!'

তবে এর মধ্যেও কথা আছে। খেলতে কে না চায়। বিশেষ করে টেস্ট ম্যাচ। আর গ্রেভনীর মত বর্ষীয়ান ক্রিকেটারের আবার নতুন করে জায়গা দখল করার পেছনে যত কিছুই কারসাজি থাকুক না কেন তাতে গ্রেভনীর কিন্তু আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় নি। জীবনে ৪৮ বার টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন, না হয় আরও খেলবেন তাতে হয়েছে কি। 'খেলবো যতদিন পারি' এই ছিল তাঁর মনোভাব।

১৯৬৩ সালে গ্রেভনী ইংল্যান্ড দলে স্থান পাবেনই। এম সি সি'র অস্ট্রেলিয়া সফর ত আর উপেক্ষা করা চলবে না। গ্রেভনী এই ধরনের কথা ঠাট্টার ছলেই বলে-ছিলেন 'জানেন ত, জগতে আজকাল মেয়েরা তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট সজাগ। কাজেই যে সব খেলোয়াড়দের পারিবারিক দায়িত্ব আছে, তা থেকে তাঁদের অব্যাহতি পাওয়া দুষ্কর। এম সি সি যদি দরজা খুলে দেয়, বহু স্ত্রীই তাঁর স্বামীর সঙ্গ নেবেন। তবে যাঁদের ছেলে-পিলে আছে—যেমন আমার — আমাদেরই পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।' টম কথা কম বলেন—কিন্তু যেটা বলেন সেটা কত গুছিয়ে বলেন তা তাঁর জবানীটা পড়লেই বোঝা যায়। খেলাটাই তাঁর কাছে সব নয়। পারিবারিক জীবনকে তিনি খেলার জন্যে তুচ্ছ জ্ঞান করেন নি। খেলাটা শুধু খেলার জন্যেই—অন্য কিছু নয়। এ ধরণাটা আজও তিনি মুছে ফেলতে পারেন নি। সেদিনের ১৯৬০ সাল ছিল এক দুর্বিসহ যাতনা—শুধু খেলতে না পারার জন্যে। ঘোরতর প্রতিবাদ তুলে খেলার মাধ্যমেই তিনি ক্রিকেটের কর্তাব্যক্তিদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছিলেন। আইন কখনও খেলোয়াড়ের হাত-পা দীর্ঘদিন বেঁধে রাখতে পারে না। সোজা কথায় এত আইন থাকবে কেন? একটা দল থেকে অপর দলে যেতে ছাড়পত্রটাই যথেষ্ট ছিল না কি?

কিন্তু সেক্ষেত্রে গ্রেভনীকে একটি বছর বড় খেলা থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। আজ গ্রেভনীর ৭৯টি টেস্ট খেলা হয়ে গেছে। এবং গত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচে তাঁর ৭৫ রানের খেলাটি মনে রাখার মত। কিন্তু গোল বাধল টেস্ট ম্যাচের বিরতির দিনে গ্রেভনীর বেনিফিট ম্যাচে অংশ গ্রহণ নিয়ে। এটা ছিল আইন বিরুদ্ধ। কাজেই গ্রেভনীকে পর পর তিনটি টেস্ট ম্যাচে বাদ দেওয়া হল।

চুয়াল্লিশ বছরের গ্রেভনী আজও যে ইংলন্ড দলে খেলছেন এটাই তো মস্ত কথা। দর্পের মুখ রাখতে আজও যে দেশে গ্রেভনীর মত প্রবীণ খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হয় তাদের আবার এত শাসন শোভা পায় কি? কেউ হয়ত বলবেন, আইন ভেঙেছেন যখন তখন তাঁকে অপরাধী না করে উপায় কি। কিন্তু কেন যে তিনি আইন ভেঙেছেন সে খোঁজ রেখেছেন কি কেউ? সারা জীবনের একটা কিছু সঙ্গতি জমা থাকলে শেষ বয়সে আর দুঃখ-কষ্টে পড়তে হয় না। ৭৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলেও যাঁর অর্থের জন্যে বেনিফিট ম্যাচ খেলতে যাওয়া তাঁর বিরুদ্ধে এমন কঠোর শাস্তি এম সি সি নিলেন কি করে! কর্তৃপক্ষরা গ্রেভনীকে আজও স্বস্তি দিলেন না। ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেনশিপের ভার আজ গ্রেভনীর হাতেই আসা উচিত ছিল। কিন্তু সে ভার পেলেন ইলিংওয়ার্থ। এর চেয়ে দুঃখের কি থাকতে পারে? এম সি সি কর্তৃপক্ষরা এর যথার্থ কারণ কি আজও দিতে পেরেছেন?

দর্শক

ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ড

তৃতীয় টেস্ট ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড: ১৫০ রান (গ্লেন টার্নার ৫৩ রান। আণ্ডারউড ৪১ রানে ৬ এবং ইলিংওয়ার্থ ৫৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ২২৯ রান (হেস্টিংস ৬১ রান। আণ্ডার-উড ৬০ রানে ৬ উইকেট)

ইংল্যান্ড: ২৪২ রান (এডরিচ ৬৮, শার্প ৪৮ এবং বয়কট ৪৬ রান। টেলর ৪৭ রানে ৪ এবং কুনিস ৪৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৩৮ রান (২ উইকেটে। ডেনেশ ৫৫ নটআউট এবং শার্প ৪৫ নটআউট)

ওভালে আয়োজিত ইংল্যান্ড বনাম নিউ-জিল্যান্ডের ৩য় অর্থাৎ সিরিজের শেষ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে নিউ-জিল্যান্ডকে পরাজিত করে ২—০ খেলায় (ড্র ১) 'রাবার' জয়ী হয়েছে।

১৯৬৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম নিউজিল্যান্ডের টেস্ট সিরিজ ড্র যাওয়ার ফলে অনেকেই নিউজিল্যান্ডের শক্তি সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে নিউজিল্যান্ড খুব জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং অন্তত একটা টেস্ট ম্যাচ জিতবে যা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট জয় হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ডের জয়ের ঘর তেমনি শূন্য রয়ে গেল। আর জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন পরিচয়ই পাওয়া গেল না। ট্রেন্ট ব্রিজের ২য় টেস্ট খেলা ড্র গেছে স্রেফ বৃষ্টির কৃপায়; এর মধ্যে নিউজিল্যান্ডের কোন কৃতিত্ব ছিল না। ইংল্যান্ড লর্ডস মাঠের প্রথম টেস্ট খেলায় ২৩০ রানে এবং ওভালের ৩য় টেস্টে ৮ উইকেটে নিউজিল্যান্ডকে পরাজিত করে 'রাবার' জয়ের সম্মান লাভ করেছে। ১৯৬৯ সাল ইংল্যান্ডের পক্ষে খুবই পয়মন্ত—উপর্যুপরি দুটি টেস্ট সিরিজে রাবার জয় হল—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ২—০ খেলায় (ড্র ১) এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ খেলায় (ড্র ১)।

নিউজিল্যান্ড টসে জিতে প্রথমেই ব্যাট করার দান নেয়। লাঞ্চের সময় রান ছিল ৩৯ (১ উইকেটে)। চা-পানের সময় রান দাঁড়ায় ৯০ (২ উইকেটে)। বৃষ্টির দরুন খেলা ভাঙার নির্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট আগে নিউজিল্যান্ডের ১ম ইনিংসের ১২৩ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় খেলা বন্ধ হয়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান (৫৩) করেন গ্লেন টার্নার। আণ্ডারউড ৪টে উইকেট পান।

দ্বিতীয় দিনে ১৫০ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এই-দিন তাদের প্রথম ইনিংস আধ ঘণ্টার কিছু কম সময় টিঁকেছিল। শেষ তিনটে উইকেটে ২৭ রান যোগ হয়। দলের ১৫০ রানের মাথায় তিনটে উইকেট পড়ে যায়। আণ্ডার-উড ৪১ রানে ৬টা উইকেট পান। খেলার শেষদিকে তিনি পর পর দুটো উইকেট নিয়ে 'হ্যাটট্রিক' করার পথে অগ্রসর হন। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের শেষ খেলোয়াড় হেডলে হাওয়ার্থ খেলতে নেমে মরণপণ করে আণ্ডারউডের 'হ্যাটট্রিক' ঠেকিয়ে দেন।

ইংল্যান্ড এইদিন প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ১৭৪ রান সংগ্রহ করেছিল।

ওভালে ইংল্যান্ড বনাম নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলার প্রথম দিনে ইংল্যান্ডের উইকেট-কিপার অ্যালান নট নিউ-জিল্যান্ডের ভিক পোলার্ডকে স্টাম্প-আউট করেছেন।
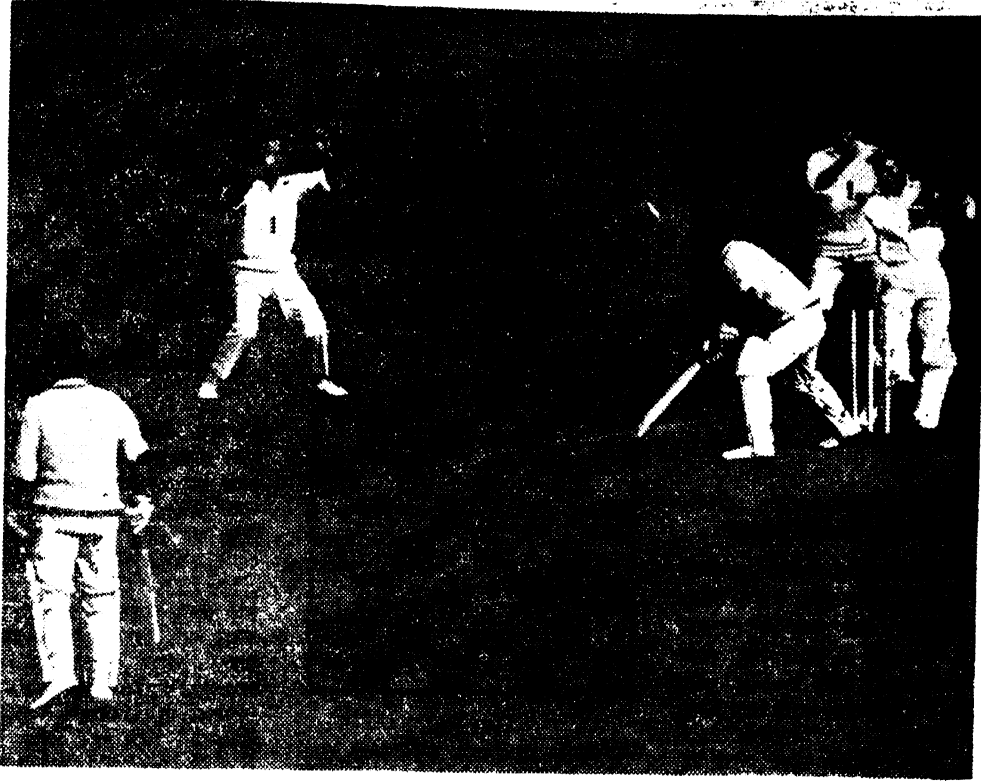
ইংল্যান্ডের ৮৮ রানের মাথায় ১ম উইকেট (বয়কট) পড়ে। এবার বয়কট আর তাঁর অনুরাগীদের হতাশ করেন নি। টেস্টের উপর্যুপরি চারটি ইনিংসের খেলায় তিনবার 'শূন্য' রান করার পর তিনি এবার ৪৬ রান করলেন। চা-পানের সময় ইংল্যান্ডের রান দাঁড়ায় ১৩১ (৪ উইকেটে)। ঝড়-বৃষ্টির দরুন খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ৭০ মিনিট আগে খেলাটি বন্ধ করতে হয়। খেলার এই অবস্থায় ইংল্যান্ড ২৪ রানে এগিয়েছিল এবং হাতে জমা ছিল প্রথম ইনিংসের পাঁচটা উইকেট।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের সময় ২৪২ রানের মাথায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ইংল্যান্ড ৯২ রানে অগ্রগামী হয়। লাঞ্চের সময় তাদের রান ছিল ১৯৫ (৮ উইকেটে)। নিউজিল্যান্ডের ডিক মজ ইংল্যান্ডের শার্পকে আউট করে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে ১০০টি উইকেট পাওয়ার গৌরব লাভ করেন। তাঁর আগে নিউ-জিল্যান্ডের কোন খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ১০০ উইকেট পূর্ণ করতে পারেন নি।

তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় নিউজিল্যান্ড ২য় ইনিংসের দুটো উইকেট খুইয়ে ৭১ রান সংগ্রহ করেছিল।

চতুর্থ দিনে চাপানের পর ২২৯ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের ২য় ইনিংসের খেলা শেষ হলে ইংল্যান্ড জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৩৮ রান তুলতে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। এবং ২য় ইনিংসের এক উইকেটের বিনিময়ে ৩২ রান সংগ্রহ করে। খেলার এই অবস্থায় জয়লাভের জন্যে ইংল্যান্ডের ১০৬ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে জমা ছিল ২য় ইনিংসের ৯টা উইকেট এবং পঞ্চম দিনের খেলা।

পঞ্চম দিনে লাঞ্চের পরেই ইংল্যান্ড ২ উইকেটের বিনিময়ে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৩৮ রান পূর্ণ করে ৮ উইকেটে জয়ী হয়। ইংল্যান্ডের নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় মাইক ডেনেশ ৫৫ রান এবং ফিল শার্প ৪৫ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। শেষ দিনের খেলাতেও বৃষ্টি কম বাগড়া দেয়নি। লাঞ্চের আগে ইংল্যান্ডের রান যখন ১২৮ (২ উইকেটে) এবং খেলায় জয়লাভের জন্যে ইংল্যান্ডের আর মাত্র ১০ রান দরকার তখন তেড়ে বৃষ্টি নেমে খেলোয়াড়দের প্যাভিলিয়নে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এই বৃষ্টির দরুন লাঞ্চের আগে আর খেলা হয়নি। বেলা ২-২০ মিনিটে পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়। ডেনেশ এবং শার্প ১৫টি বল খেলে জয়লাভের প্রয়োজনীয় বাকি ১০ রান তুলে দেন।

আলোচ্য ৩য় টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের ডেরেক আণ্ডারউড ১০১ রানে ১২টি উইকেট পেয়ে ১০০ স্টার্লিং পাউন্ড পুরস্কার পেয়েছেন। ইংল্যান্ড-নিউ-জিল্যান্ডের ১৯৬৯ সালের টেস্ট সিরিজে তিনি বিভিন্ন খাতে যে নগদ পুরস্কার পেয়েছেন তার মোট পরিমাণ ৫০০ স্টার্লিং পাউন্ড।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ১৯৭০ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার (জুল রিমে কাপ) প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলাগুলি পুরো দমে চলছে। প্রতিযোগিতায় যোগদান-কারী দেশগুলিকে (মেক্সিকো এবং ইংল্যান্ড বাদে) ১৪টি গ্রুপে ভাগ করে লীগ প্রথায় খেলানো হচ্ছে। মোট ১৬টি দেশ—ইংল্যান্ড, মেক্সিকো এবং ১৪টি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান দেশই মেক্সিকোর চূড়ান্ত পর্যায়ের লীগ খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলায় গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান আখ্যা নিয়ে মেক্সিকোর চূড়ান্ত লীগ খেলায় যোগদানের যোগ্যতা লাভ করেছে এ পর্যন্ত এই দুটি দেশ— উরুগুয়ে এবং ব্রেজিল। এই দুটি দেশই দুবার করে জুল রিমে কাপ জয়ী হয়েছে উরুগুয়ে ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালে এবং ব্রেজিল ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে। এবার প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ খেলায় উরুগুয়ে ১২শ এবং ব্রেজিল ৯১শ গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

দাবার আসর

এ সপ্তাহে আমরা দাবার অন্যান্য ঘুঁটির গতি নিয়ে আলোচনা করব।

মন্ত্রী : মন্ত্রী র‍্যাঙ্ক, ফাইল ও ডায়াগোনাল দিয়ে চলাফেরা করে। অর্থাৎ পাশাপাশি, ওপর-নীচে এবং কোণাকুণি যে কটা ঘর খালি পায়, তার যে কোন ঘরে যেতে পারে। চলার পথে মন্ত্রী বিপক্ষের প্রথম যে ঘুঁটির সম্মুখীন হয়, তাকে মেরে নিতে পারে। স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোন ঘুঁটিকেই মন্ত্রী ডিঙিয়ে যেতে পারে না, সুতরাং এই সব ঘুঁটি ডিঙিয়ে পরবর্তী কোন ঘরে মন্ত্রীর রোধ থাকে না। স্বপক্ষের কোন ঘুঁটির ঘরে মন্ত্রী বসতে পারে না।

মন্ত্রীই হচ্ছে ছকের সবচেয়ে শক্তিমান ঘুঁটি। কারণ ছকের মাঝখানে বসে মন্ত্রী একসংগে ২৭টি ঘরের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারে। মন্ত্রী কিভাবে চলাফেরা করতে পারে তা ১ নং চিত্রে দেখানো হোল। চিত্রে মন্ত্রী ডি-৫ ঘরে বসেছে। এখান থেকে নিম্নলিখিত ঘরগুলিতে মন্ত্রী যেতে পারে :— সি-৬, বি-৭, এ-৮, ই-৪, এফ-৩, জি-২, এইচ-১, সি-৪, বি-৩, এ-২, ই-৬, এফ-৭, জি-৮, ডি-৪, ডি-৩, ডি-২, ডি-১, ডি-৬, ডি-৭ ডি-৮, ই-৫, এফ-৫, জি-৫, এইচ-৫, সি-৫, বি-৫, এবং এ-৫।

নৌকা : নৌকার গতি মন্ত্রীর মতই, কেবল মন্ত্রীর কোণাকুণি গতি নৌকায় অনুপস্থিত। নৌকা যায় শুধু র‍্যাঙ্ক এবং ফাইল দিয়ে, সামনে-পিছনে এবং পাশাপাশি যতদূর খালি পাওয়া যায়। নৌকা চলতে চলতে বিপক্ষের প্রথম যে ঘুঁটির সম্মুখীন হয়, তাকে মেরে নিতে পারে, কিন্তু ডিঙোতে পারে না। স্বপক্ষের কোন ঘুঁটিকেও ডিঙোতে পারে না বা তার ঘরে গিয়ে বসতে পারে না। ছকের যে কোন ঘরে বসে নৌকা একসংগে ১৪টি ঘরের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারে। সুতরাং দুটো নৌকা একত্রে ২৮টি ঘরকে আক্রমণ করতে পারে কিন্তু মন্ত্রী করে ২৭টি। দুটো নৌকা মিলিতভাবে বিপক্ষের রাজাকে মাত করতে পারে, কিন্তু একক মন্ত্রী তা পারে না। এই সব কারণে দুটো নৌকার মিলিত শক্তি অনেক ক্ষেত্রেই একক মন্ত্রীর শক্তির চেয়ে বেশী।

২নং চিত্রে নৌকাকে ই-৫ ঘরে দেখানো হয়েছে। এখান থেকে নৌকা যেতে পারে ই-৪, ই-৩, ই-২, ই-১, ই-৬, ই-৭, ই-৮,

১নং চিত্র

তীরচিহ্নযুক্ত ঘরগুলিতে মন্ত্রী যেতে পারে। মন্ত্রীর গতি সামনে, পিছনে, পাশাপাশি এবং কোণাকুণি ঘরে।

এ-৫, বি-৫, সি-৫, ডি-৫, এফ-৫, জি-৫ এবং এইচ-৫ ঘরে।

গজ : গজ শুধুমাত্র ডায়াগোনাল দিয়ে, অর্থাৎ কোণাকুণি যায়। প্রতি খেলোয়াড়ের দুটি করে গজ আছে। এর একটি সাদা ঘরে এবং অপরটি কালো ঘরে বসে। কোণাকুণি চলার ফলে সাদা ঘরের গজ কখনোই কালো ঘরে এবং কালো ঘরের গজ সাদা ঘরে যেতে পারে না। গজও স্বপক্ষের ঘুঁটির ঘরে বসতে পারে না, স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোন ঘুঁটিকে ডিঙোতে পারে না, এবং চলার পথে বিপক্ষের প্রথম ঘুঁটিকে মেরে নিতে পারে। একক গজ ছকের মাঝখানে বসে ১৩টি ঘরের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারে। দুটো গজ একত্রে আক্রমণ করে ২৬টি ঘর। সুতরাং দুটো গজের মিলিত শক্তি মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। গজের গতিবিধি ৩নং চিত্রে দেখানো হোল।
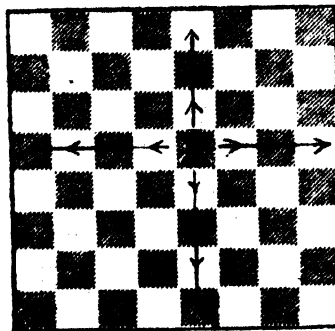
২নং চিত্র

তীরচিহ্নযুক্ত ঘরগুলিতে নৌকা যেতে পারবে। নৌকার গতি শুধু সামনে, পিছনে এবং পাশাপাশি ঘরে।

৩নং চিত্র

গজ সব সময়ই শুধু কোণাকুণি ঘর দিয়ে যায়। সাদা গজ সব সময় সাদা ঘরের ওপর দিয়ে যায়, তেমনি কালো গজ যাবে কালো ঘরের ওপর দিয়ে। যে সমস্ত ঘরের ওপর দিয়ে গজ যেতে পারে, তা লম্বা তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

ঘোড়া : দাবার সমস্ত ঘুঁটির মধ্যে একমাত্র ঘোড়াই স্বপক্ষের বা বিপক্ষের ঘুঁটিকে ডিঙিয়ে যেতে পারে। এই বিশেষ ক্ষমতা ঘোড়াকে দেয়া হয়েছে কারণ এর গতিবিধি একটু বিচিত্র রকমের। যে ঘরে ঘোড়া রয়েছে, সেখান থেকে ওপর-নীচে বা পাশাপাশি দু ঘর গিয়ে নতুন জায়গা থেকে আবার এক ঘর ওপর নীচে বা পাশাপাশি যায়। অথবা বলতে পারি, সামনে-পিছনে বা পাশাপাশি এক ঘর গিয়ে আবার কোণাকুণি এক ঘর যাবে (দূরের দিকে)। ঘোড়া যে ঘরে গিয়ে বসতে পারে, সেই ঘরে বিপক্ষের কোন ঘুঁটি থাকলে তাকে মেরে নিতে পারে। যে সব ঘুঁটিকে ঘোড়া ডিঙিয়ে যাচ্ছে, সে সব ঘুঁটিকে মারতে পারে না। ছকের মাঝখানে বসে ঘোড়া একসংগে ৮টি ঘরের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারে।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

জানো, রাস্তাঘাটে
আমার দিকে
তাকিয়ে কারো
পলক পড়েনা...

কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

KPN 4622

৯ম বর্ষ
২য় খণ্ড

১৯শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 12th September, 1969 শুক্রবার ২৬শে ভাদ্র, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমানব বড়ুয়া

পুরনো গান

১২।৫।৭৬ (ইং ২৯।৮।৬৯) তারিখে প্রকাশিত 'অমৃতে'র চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীঅর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুসন্ধানী সূত্রে জানাই যে তাঁর প্রয়োজনীয় তিনটি গানের মধ্যে দু'টি গানের পূর্ণপদ আমার জানা আছে। বহু পুরাতন রেকর্ড কাকলীর জীর্ণ পাতা থেকে নিম্নলিখিত গানগুলি সংগ্রহ করেছিলাম। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রয়োজনে গান দু'টি আপনার নিকট পাঠালাম।

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল॥
কহিতে শিহরি কি করি অচল,
নাহি চলাচল হ'ল।
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল অঞ্চলের নিধি
পেয়ে হারাল॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার।
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার॥
আরও ভাবি গিরি দোষ কি অভয়ার।
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো।।
(২) এবার আমার উমা এলে আর
উমাকে পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা
শুনবো না॥
আসে যদি মৃত্যুঞ্জয় উমা নিবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া

জামাই বলে মানবো না॥

দীনেশচন্দ্র অধিকারী,
কলিকাতা—৯।

(২)

শুক্রবার ১২ই ভাদ্র প্রকাশিত অমৃত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা-২০) তিনটি আগমনী সংগীতের সম্পূর্ণ পদ জানতে চেয়েছেন। এর মধ্যে আমার দু'টি গান সম্পূর্ণ জানা থাকাতে লিখে পাঠালাম—

গুণকেলী—একতালা।

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা নাকি বড় কেঁদেছে।
দেখেছি স্বপন, নারদ বচন, উমা
মা মা বলে কেঁদেছে॥
সোনার বরণী গৌরী আমার,
ভাংগর ভিখারী জামাই তোমার,
মায়ের বসন ভূষণ সব আভরণ,
তাও বেচে নাকি ভাংগ খেয়েছে॥
(—অজ্ঞাত)

পিলু—বাহার যৎ।

(গিরি) এবার আমার উমা এলে আর
উমায় পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো
কথা শুনব না॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
(তারে) জামাই বলে মানব না॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ-দুঃখ কি প্রাণে সয়,
(জামাই) শ্মশানে মশানে ফিরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না॥
(—রামপ্রসাদ)

গান দুইখানি আমার জানা ছিল, পাঠালাম, অর্ধেন্দুবাবুকে জানালে বাধিত হ'ব।

নমিতা সিংহ,
সোনারপুর, ২৪-পরগণা।

জাতীয় সংগীতের অমর্যাদা

১৫ই আগস্ট সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীসঞ্জিত দেব জাতীয় সংগীতের অমর্যাদা শীর্ষকে শ্রীএস কে পাতিলের একটি তথাকথিত বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মাঝে শ্রীপাতিল 'জনগণমন' সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন এমন গুজব রটেছিল এবং কয়েকটি বাংলা সাময়িক পত্রিকায় এবং বোম্বাইর একটি পত্রিকাতেও এই প্রসঙ্গে শ্রীপাতিলের সমালোচনা করেছিলেন। উত্তরে একটি পত্র লিখে শ্রীপাতিল এই গুজবকে স্পষ্ট ভাষায় খণ্ডন করেছেন। তিনি লিখেছেন যে জাতীয় সংগীতের বিরুদ্ধে তিনি কোনোদিন কোনোপ্রকার বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেননি এবং যদি অপর কেউ করে, তাহলে তিনি স্বয়ং তার বিরোধিতা করবেন।

ঐ সংখ্যায় বেতার-শ্রুতিতে শ্রীশ্রবণক লোকমান্য তিলক বা টিলক প্রশ্ন তুলেছেন। প্রকৃত মারাঠী উচ্চারণ হচ্ছে 'টিড়ক'। ইংরাজীতে **Tilak** লেখা হয়, যেমন 'ঠাকুর' ইংরাজীতে **Tagore** হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করি শরৎবাবুর 'পথের দাবী'র একটি চরিত্র 'তলোয়ারকরের প্রতি। 'টলওয়াড়কর' বা **Talwalkar** বলে একটি প্রখ্যাত মারাঠী পদবী আছে। 'কর' কোন স্থানের অধিবাসী বোঝায়। যেমন মালাডকর মানে মালাডবাসী, গজেন্দ্রগড়কার মানে গজেন্দ্রগড়ের অধিবাসী ইত্যাদি। প্রকৃত উচ্চারণ না জানার ফলে 'তড়ওয়াড়কর' তলোয়ারকর হয়েছেন ফলে তলোয়ারের মত একটি ধারাল চরিত্রের সৃষ্টি হলেও আসলে মহারাষ্ট্রে ঐ প্রকার কোনো পদবী নেই। এইভাবে গুজরাতের 'বাড়োলী', বারদোলী **Bardoli** 'মাঁকড়' মানকাদ **Mankad** 'মেহতা' মেটা; 'রজনীশ' রাজনীশ, ইত্যাদি বা পাঞ্জাবের 'নন্দা' নন্দ হয়েছেন। 'বনাসকাঁঠা'কে বনসকণ্ঠ 'ভাবনগর'কে ভবনগরও ছাপা হয়। 'তেলুগু'কে তেলেগু বলা হয়।

বহির্বঙ্গে এইভাবে বাংলা নামেরই দুর্গতি হয়। 'ভাদুড়ী'কে বাহাদুরী বানাতে দেরী হয় না। আমার মতে সরকারীভাবে একটি অভিধান প্রকাশ করা উচিত, যাতে প্রতি প্রদেশের প্রতিটি শহর, স্থান, নাম ইত্যাদির সঠিক উচ্চারণ থাকে তাহলে সংবাদপত্রে বা বেতারে এরকম মারাত্মক ভুল হবে না।

কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায়
আমেদাবাদ—১।

বার্মিজ সাহিত্য

সম্প্রতি 'অমৃতে' (১-৮-৬৯) মানসী মুখোপাধ্যায় 'যুদ্ধোত্তর বার্মিজ কথা-সাহিত্য' আলোচনা পড়ে খুশী হয়েছি। বার্মার পটভূমিকায় শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের কিছু সরস গল্পকাহিনী আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। তিনি যে বর্মী-সাহিত্য গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন, বর্তমান প্রবন্ধের রূপরেখায় তা' সুন্দর ধরা পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নিঃসন্দেহে বার্মার জনজীবনের মহাক্রান্তিকাল। সভ্যতার এই সংক্রান্তি ও সংঘাত স্বভাবতই ও'দেশের সমকালীন সাহিত্যে বিধৃত। এই জন্যেই শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের মনোরম আলোচনা অনুসন্ধিৎসু পাঠককে তৃপ্তি দেবে। তিনি শুধু 'কথা-সাহিত্য' নিয়েই লিখেছেন। কাব্য ও নাট্য-সাহিত্য নিয়ে ভবিষ্যতে এ-রকম আলোচনা হলে, আমাদের নিকটতম বন্ধুরাষ্ট্রের সাহিত্যকর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাওয়া যাবে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমসাময়িক রাজনীতিতে বার্মার স্থান ও ভূমিকা একটু আশ্চর্যই বটে। গত ক' বছর ধরে ও'রা খুব কম কথা বলছেন। আভ্যন্তরীণ উৎপাতও বেশ খানিকটা মিটিয়ে এনেছেন। অথচ সমাজচিন্তা ও'রা ছাড়েননি। এই অন্তর্মুখিতা বোধহয় একদিকে ও'দের ভালো করেছে। কাজেই আশা করছি, কাব্য ও নাট্য-সাহিত্যের আলোচনাও সময়োপযোগী হবে এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা হয়তো ইরাবতী-চিন্দুইনবিধৌত শ্যামলী দেশ-কন্যার মানস-চিন্তার রূপান্তরটি প্রত্যক্ষ করতে পারব।

পত্রিকা-ভবনে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীঅমূল্যকুমার গোস্বামী (সভাপতি), প্রভুপাদ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থকে (উদ্বোধক) দেখা যাচ্ছে।

উপস্থিত ছিলেন না। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী উঠে দাঁড়িয়ে স্পীকারকে অনুরোধ করলেন যে, ভোটটা তখন না নিয়ে যেন পরে নেওয়া হয়। তাঁর যুক্তি এই যে, বিরোধী দলের সঙ্গে যে বোঝাপড়া আছে তদনুযায়ী বিকালের আগে ডিভিসন চাওয়ার কথা নয়। সেই বোঝাপড়া মেনে চলার জন্য শ্রীত্রিপাঠী বিরোধীদের অনুরোধ করেন। শ্রীত্রিপাঠীর এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বিধানসভায় হৈ-হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। তারপর স্পীকার শ্রীএ জি খের যখন শ্রীত্রিপাঠীর আপত্তি মেনে নিয়ে ভোট নেওয়া বন্ধ করে দিলেন তখন হৈ-হট্টগোল চরমে উঠল। সভার কাজ চালান অসম্ভব দেখে স্পীকার সাময়িকভাবে অধিবেশন মুলতুবী রেখে চেয়ার ছেড়ে গেলেন। কংগ্রেস সদস্যরাও অনেকে সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেই সময়েই আর একটি আশ্চর্য কান্ড ঘটল যার সঙ্গে তুলনীয় আর কোন ঘটনা ইতিপূর্বে আর কোথাও কখনও দেখা যায় নি। স্পীকার শ্রীখের যে আসন ছেড়ে গেলেন সেই আসনে গিয়ে বসলেন ডেপুটি স্পীকার শ্রীবাসুদেব সিং। স্পীকারের নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে শ্রীসিং বললেন, ডিভিসনের ঘন্টা বাজাবার পর ভোট গ্রহণ বন্ধ করা যায় না। এই কথা বলে ডেপুটি স্পীকার ভোট নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার আগেই স্পীকার শ্রীখের সভাকক্ষে ফিরে আসেন। ডেপুটি স্পীকার আসন ছেড়ে গেলে স্পীকার সেই আসনে গিয়ে বসলেন এবং নীরবে বসে সভায় হৈ-হট্টগোল শুনতে থাকলেন। বিরোধী পক্ষ ক্রমাগত ভোট নেওয়ার জন্য দাবী জানাতে থাকলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি বিধানসভার অধিবেশন বন্ধ করে দিলেন।

পরের দিন বিধানসভার বৈঠক বসামাত্র সভাকক্ষ শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দাবীতে মুখর হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের ভিতরেই কমুনিস্ট, এস-এস-পি প্রভৃতি দলের কয়েকজন সদস্য ডেস্কের উপর উঠে স্পীকারের আসন লক্ষ্য করে কুশান, চপ্পল ও বই ছুঁড়তে থাকলেন। ৮০ মিনিট ধরে সভায় এমন প্রচন্ড চীৎকার, বাধা দান ইত্যাদি চলল যে, সভার কাজ চালান অসম্ভব হয়ে পড়ল। এস-এস-পি দলের একজন সদস্যকে স্পীকার সভাকক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। ঐ সদস্য সেই আদেশ মানতে অস্বীকার করলেন। ইতিমধ্যে সম্ভবত স্পীকারের নির্দেশে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ও প্রাদেশিক সশস্ত্র কনস্টেবল বাহিনীর ৫০ জন কনস্টেবল সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন এবং একে একে প্রায় এক ডজন বিরোধী সদস্যকে জোর করে সভাকক্ষ থেকে বের করে দিলেন। পাঁচজন প্রাক্তন উপমন্ত্রী সহ ২৫ জন বিরোধী সদস্যকে পাঁচদিনের জন্য 'সাসপেন্ড' করা হল।

এই সাসপেনসনের আদেশ অবশ্য তিন দিনের মধ্যেই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিধানসভা আর চালান যায় নি। কয়েকজন বিরোধী নেতা বলেছেন, শ্রীএ জি খের যতদিন স্পীকারের আসনে বসে থাকবেন ততদিন তাঁরা সভা চলতে দেবেন না। স্পীকার শ্রীখের ও ডেপুটি স্পীকার শ্রীবাসুদেব সিং উভয়ের বিরুদ্ধেই পৃথক পৃথক অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে-সব নোটিশ শিকায় তুলে রেখে বিধানসভার ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এই ঘটনার জের কি সহজে মিটবে? অনুমান করা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার কংগ্রেস দলের ভিতরে যে ফাটলের আভাষ দেখা গিয়েছিল বিধানসভার ঘটনায় সেই
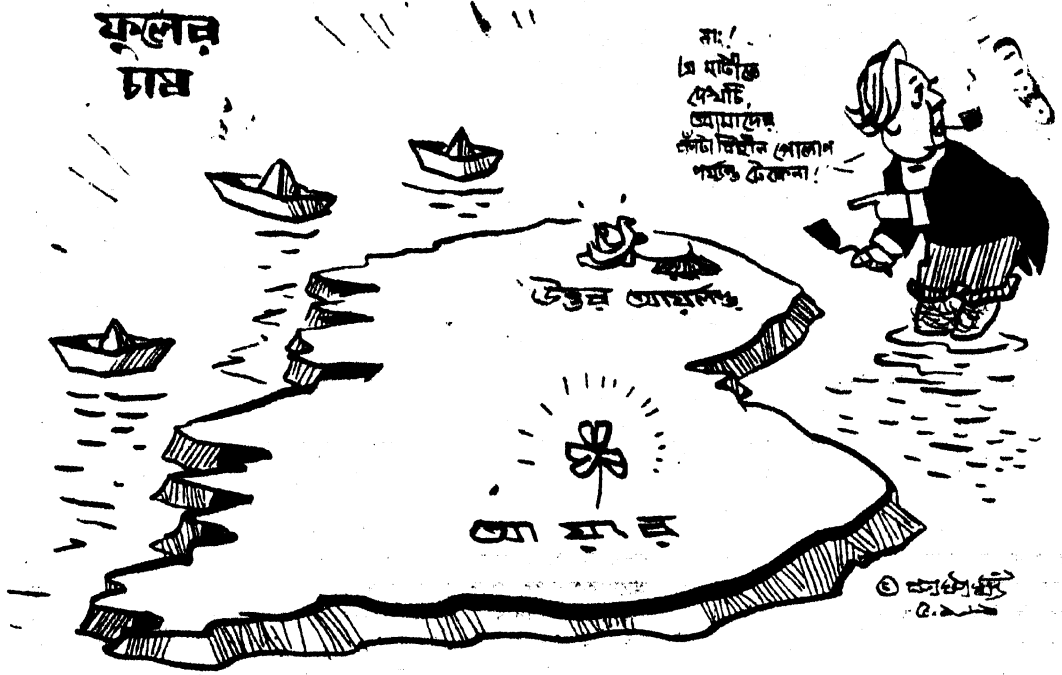
ফাটল আরও বাড়তে পারে এবং আজই হোক বা আগামীকালই হোক, ঐ রাজ্যের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব বিপন্ন হতে পারে।

আরও বেশী জাপানী চাই!

পৃথিবীর ছোট-বড় অনেক দেশই যখন জনসংখ্যার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তখন জাপানও ঘামাবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আজকের পৃথিবীতে যেসব দেশ জনসংখ্যার ভারে পীড়িত তাদের মধ্যে জাপানের স্থান সপ্তম। আর প্রতি বর্গ-মাইল জনসংখ্যার ঘনত্ব দিয়ে যদি বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে, জাপানের চেয়ে বেশী ঘন জনবসতি রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা মাত্র চার।

কিন্তু, না, অতিশয় সম্প্রতি যে খবর বেরিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, জনসংখ্যা সম্পর্কে জাপানের চিন্তাটা একটু ভিন্ন ধরনের।

সেদেশে জনসংখ্যার সমস্যা সম্পর্কিত যে মন্ত্রণা পরিষদ আছে তাদের একটি রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জাপানে জন্ম-হার যেভাবে কমছে সেভাবে কমতে থাকলে ২০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে সেদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া দূরস্থান বরং কমতে থাকবে।

রিপোর্টে দেখান হয়েছে যে, গত এক দশকে জাপানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সালের মধ্যে জন্মহার হাজারকরা ১৩·৭ থেকে ১৯·৪-এর মধ্যে ওঠানামা করছে। যুদ্ধের আগে জাপানের জন্মহার ছিল হাজারকরা ৩০।

জন্মহার কমার কারণ হল, জাপানীরা আরও বেশী সন্তান চাওয়ার বদলে আরও বেশী সচ্ছলতা ভোগ করতেই অধিকতর উৎসুক। জাপান সরকারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ দপ্তরের একটি সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, গত দশ বছরে সন্তান-ধারণ-ক্ষম নারীদের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জন হয় ভ্রূণনাশের দ্বারা অথবা জন্মনিয়ন্ত্রণের দ্বারা সন্তানের জন্ম নিরোধ করেছেন।

ভবিষ্যৎ জন্মহার নির্ণয়ে আর একটি সূচক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেটিকে বলা হয় 'বিশেষ জন্মহার'। 'বিশেষ জন্ম-হার' বলতে বোঝায় প্রত্যেক নারী পিছু সন্তানের গড় সংখ্যা। জাপানের জনসংখ্যা মন্ত্রণা পরিষদ হিসাব করেছেন যে, সে দেশের বর্তমান জনসংখ্যা বজায় রাখতে হলে 'বিশেষ জন্মহার' ২·১৩ দরকার। সে-জায়গায় এখন জাপানের 'বিশেষ জন্ম-হার' হচ্ছে মাত্র ২।

প্রতিটি নারী যদি গড়ে একটি করে মেয়ের জন্ম দেয় এবং সেই মেয়ে যদি আবার একটি করে মেয়ের জন্ম দেয় তাহলে জনসংখ্যা একটা স্তরে স্থির হয়ে থাকতে পারে। এই গড় যদি একের বেশী হয় তাহলে জনসংখ্যা বাড়বে আর যদি এই গড় একের কম হয় তাহলে জনসংখ্যা কমবে। জাপানে প্রতিটি নারীর মেয়ে-সন্তানের গড় সংখ্যা ০·৯। অর্থাৎ সেদেশে অস্বাভাবিক কম। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৮ জনসংখ্যা যে কমবে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। পৃথিবীর যেসব দেশ সম্পর্কে জনসংখ্যা সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে আর কোথাও প্রতি নারীপিছু মেয়ে-সন্তান জন্মের হার এত কম নয়।

পরিষদের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে জাপানে শ্রমিকের অভাব সংক্রান্ত সমস্যা তীব্রতর হবে। দেখান হয়েছে যে, ১৯৮৫ সালে অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র ১৬ বছর পরে প্রতি ১০ জন জাপানীর মধ্যে এক জনের বয়স হবে ৬৫ বছর বা তার বেশী এবং ৫০ বছর বাদে প্রতি ১০ জন জাপানীর মধ্যে পাঁচজনই হবে ৬৫ বছর বয়সের বা তার চেয়ে বেশী বৃদ্ধ।

'জনসংখ্যার উৎকর্ষ' নিয়েও মন্ত্রণা দাতা পরিষদ মাথা ঘামিয়েছেন। কেননা, জাপানের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ দপ্তরের একটি সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে যে, মধ্য-বিত্তদের জন্মহারই কমতির দিকে, উচ্চ-বিত্ত ও নিম্নবিত্তদের ভিতর জন্মহার অপরিবর্তিত আছে। এইসব তথ্যের পরি-প্রেক্ষিতে পরিষদ সুপারিশ করেছেন যে, 'বিশেষ জন্মহার' বেড়ে যাতে ২·১ হয় তার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রতিটি জাপানী পরিবারের আয় বাড়াতে হবে। সন্তান পালনের ব্যয়-নির্বাহের জন্য সরকারী সাহায্য দিতে হবে এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মহান সংগ্রামী হো চি মিন

উত্তর ভিয়েতনামের প্রেসিডেণ্ট হো চি মিনের মৃত্যুতে এ যুগের একজন অবিস্মরণীয় নেতা এবং মহান সংগ্রামীর অন্তর্ধান ঘটল। হো চি মিনের নাম আজ সকলের মুখে মুখে। তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ আমেরিকাতেও তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যা কম নয়। মার্কিন দেশেই এই খর্বকায় কৃশ এবং সাধারণ চেহারার মানুষটি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ভিয়েতনামের যুদ্ধের প্রচণ্ড সংকটময় মুহূর্তেও মার্কিন সাংবাদিক প্রতিনিধির কাছে হো চি মিন বলেছেন মার্কিন জনগণের জন্য ভিয়েতনামীদের আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা ছাড়া অন্য কোনো মনোভাব নেই। আমেরিকানরা যেদিন ভিয়েতনাম থেকে চলে যাবে সেদিনই ভিয়েতনামীরা আমেরিকানদের প্রতি ভালবাসার হাত প্রসারিত করে দেবে করমর্দনের জন্য। হো চি মিন এক আশ্চর্য পুরুষ। সারা ভিয়েতনামে তিনি পরিচিত ছিলেন আঙ্কল হো বা চাচা হো নামে। শিশুদের মধ্যেই তাঁকে দেখা যেত সবচেয়ে হাসিখুশি। বাংলায় তাঁর নামের অর্থ জ্ঞানী হো। হো শুধু জ্ঞানী নন তিনি জ্ঞানভিক্ষু। আজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন ভিয়েতনামের মানুষকে স্বাধীন জাতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। যুবা বয়স থেকেই তাঁর এই সংগ্রাম। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, জাপানী ফ্যাসিস্ত এবং শেষ জীবনে মার্কিন সামরিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তিনি আপসহীন সংগ্রাম করে গেছেন। ভিয়েতনামের মানুষের এক স্বপ্ন স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম। এই মন্ত্রে তিনি সারা ভিয়েতনামকে উদ্দীপিত করে গেছেন। ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম তিনি চোখে দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু অপরাজেয় ভিয়েতনামের হৃৎস্পন্দন তিনি শুনেছেন। এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি গেছেন যে, তাঁর দেশবাসীকে যে-সংগ্রামের প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ করে গেছেন লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত সে সংগ্রামের শেষ নেই। ভিয়েতনাম আজ দুনিয়ার গণতান্ত্রিক, স্বাধীনতাকামী মানুষের কাছে একটি পবিত্র নাম। হো চি মিন একটি প্রজ্জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞার প্রতীক।

হো চি মিনকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই তাঁর সারল্যে ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছেন। একজন সাধারণ ভিয়েতনামী যেভাবে জীবন যাপন করে হো চি মিন রাষ্ট্রপতি হওয়া সত্ত্বেও সেই সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর প্রতিজ্ঞার কঠোরতা ছিল অবিচল। তাঁর দেশপ্রেম সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরাও প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ। অথচ হো চি মিন সব সময়েই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভিয়েতনামে সংঘর্ষের অবসান করতে চেয়েছেন। ফরাসীদের প্রতি তিনি আস্থা রেখেছিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে তারা ভিয়েতনামকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠার দাবী মেনে নেবে। ১৯৪৫ সালে তিনি ও তাঁর মুক্তি সংগ্রামী বাহিনী জাপানীদের হাত থেকে দেশ উদ্ধার করে ভিয়েতনামে স্বাধীন সরকার ঘোষণা করেছিলেন। ফরাসীরা যদি তখন বিশ্বাসঘাতকতা না করত এবং ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিত তাহলে আজ এত রক্তক্ষরণের কোনো প্রয়োজন হত না। ফরাসীরা আবার ভিয়েতনামকে উপনিবেশে পরিণত করতে চাইলে হো চি মিন তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। ইতিহাসের অমোঘ বিধানে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ভিয়েতনাম থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেও ১৯৫৪ সালের জেনিভা চুক্তি অনুযায়ী ভিয়েতনাম দ্বিখণ্ডিত হয়। সেই খণ্ডিত ভিয়েতনামের দক্ষিণ অংশে ফরাসীদের জায়গায় আমেরিকানরা একটি সরকার খাড়া করে ভিয়েতনামে এ যুগের নৃশংসতম যুদ্ধের মহড়া করে যাচ্ছে।

ভিয়েতনামের এই জ্বলন্ত প্রতিরোধের সঙ্গে হো চি মিনের নাম জড়িত। বিগত দশ বৎসরে এই নাম দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে মুক্তির প্রতীক হিসাবে। হো চি মিন ভিয়েতনামের জন্য স্বাধীন জাতির মর্যাদা চেয়েছিলেন। তাঁকে বাধা দিয়ে, বঞ্চিত করে এই আকাঙ্ক্ষা দমন করতে পারেনি পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি। বরং হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামীরা যে-প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে দুনিয়ার মানুষের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি পড়েছে এই জাতির উপর। হো চি মিন এই প্রতিরোধ সংগ্রামে কমিউনিজমের কথা বলেন নি, বিপ্লব রপ্তানীর কথা বলেন নি, তিনি ছোট ছোট কবিতায় ভিয়েতনামীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাঁদের ঐতিহ্যের কথা, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন স্বাধীন মাতৃভূমির কথা। এই প্রাজ্ঞ দেশপ্রেমিক নেতা কমিউনিস্ট শিবিরে আদর্শের সংঘাতের সময়ে কোনো পক্ষে জড়িয়ে পড়েন নি। উভয় পক্ষের চাপ তিনি তাঁর অপরিসীম প্রজ্ঞায় ও বিচক্ষণতায় এড়িয়ে গিয়ে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মানবমুক্তির বৃহৎ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনিই প্রেরণা দিয়েছেন আরও অনেক জাতিকে যারা ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত।

হো চি মিন সংগ্রামী, হো চি মিন দেশপ্রেমিক, হো চি মিন নিপীড়িত মানবতার সামনে উজ্জ্বল দীপশিখা। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা আর অভিনন্দন। যুগ যুগ তিনি অমর হয়ে থাকবেন। মানবপ্রেমিক সংগ্রামীর মৃত্যু নেই।

সাদা চোখে

কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের এখন শনির দশা চলছে। গ্রহের ফেরে তিনি শুধু দলীয় নেতৃত্ব হারাতে বসেছেন এমন নয়, বাঁকুড়ার দেওলাগড়ে যে ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের উপর একটু আস্তানা গড়ে তুলেছিলেন তাও যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কোপানলে পড়ে যেতে বসেছে। পশ্চিম বাংলার রাজনীতি থেকে প্রত্যক্ষভাবে সরে গিয়ে নয়াদিল্লীতে একটু-খানি যৌথ নেতৃত্ব দিয়ে শ্রীঘোষ ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেখানেও আসর জমাতে দেন নি। অধিকন্তু এমন এক ধাক্কা এল যে শ্রীঘোষ ও তাঁর সহকর্মীরা সকলেই প্রায় এখন অথৈ জলে। অবস্থার ভয়াবহতা পরিমাপ করে শ্রীঘোষের অন্যতম দোসর শ্রীসদোবা পাতিল আক্ষেপ করে বলেছেন যে ওয়ার্কিং কমিটির সভায় শ্রীমতী গান্ধীসহ অনেক কর্মী ও নেতাকে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করে তিনিই একমাত্র গর্জন করেছিলেন। অন্য কেউ টুঁ-শব্দটি পর্যন্ত করেন নি। অন্য কেউ বলতে গিয়ে শ্রীপাতিল নিশ্চয় শ্রীঘোষের কথাও বলেছেন। কিন্তু শ্রীপাতিলের এটা জানা উচিত শ্রীঘোষ কদাচিৎ গর্জন করেন। তিনি নীরব কর্মী। নিতান্ত প্রয়োজন বোধ না করলে কিম্বা অপরিহার্য হয়ে না দাঁড়ালে শ্রীঘোষ কখনও পুরনো দিনের যুদ্ধের রীতিমাফিক বুকটান করে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন না। সেটা নেহাতই সেকেলে সেনাপতিদের পদ্ধতি। তিনি তাই আধুনিক সেনাপতিদের মত বহুদূর থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তবু এর একটুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেছে শ্রীঅজয় মুখার্জির বিদ্রোহ দমনের সময়। নয়তো ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কিম্বা ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে যখন কংগ্রেস ছেড়ে দিতে হয়েছিল তখনও কিন্তু শ্রীঘোষ নেপথ্য নায়ক হিসাবেই কাজ করেছিলেন। অবশ্য শ্রীঘোষ তখন এতবড় বিরাট আকারও ধারণ করতে পারেন নি।

যা হোক, শ্রীঘোষ কংগ্রেসকে ক্রমঃপরি-শুদ্ধির মাধ্যমে যেভাবে একাত্মভাবে নিজের আয়ত্তাধীন করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন, যাতে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের আগে তিনি সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করে-ছিলেন। কিন্তু তারপর থেকেই শ্রীঘোষের বস্তুতপক্ষে শনির দশা শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে এক-আধটুকু শুভ ফল পেলেও আজ মহারাজের কোপানলে পড়ে শ্রীঘোষ প্রায় সর্বস্বান্ত। না দিল্লী না বাংলা—কোথাও শ্রীঘোষের যেন এতটুকু ঠাঁই নেই।

পরাজিত হলেই বিজ্ঞের মত উপদেশ দেওয়া হচ্ছে অস্তিত্ব বজায় রাখার সনাতন পন্থা। শ্রীঘোষও এখন সেই মহাজনস্য পন্থা অবলম্বন করে রাজনীতিতে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এদিকে যে তলার মাটি ফাঁক হয়ে গেছে সেদিকে শ্রীঘোষের লক্ষ্য আছে কিনা জানি না। একশ্রেণীর কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে দলীয় অনুশাসন কেন কার্যকর করা হয়নি এই প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে শ্রীঘোষ বলেছেন কার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হবে? অ্যাকশান নিলেই ত কংগ্রেস ভেঙে যাবে! আর কংগ্রেস সঙ্গে সঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের সরকার হারাতো। তারপর শ্রীঘোষ সখেদে বলেছেন, সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস আর বেঁচে নেই।

শ্রীঅতুল্য ঘোষের উক্তি একদিক দিয়ে সত্যি। কারণ যে কংগ্রেসের উপর সিণ্ডিকেটের প্রভাব ছিল সেই কংগ্রেস সত্যিই বেঁচে নেই। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে এখন কংগ্রেস পুরনো খোলস বদলে ফেলে নব-জন্মলাভ করছে।

শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার জন্য অনুশাসন কার্যকর করা হলে পশ্চিম বাংলায় ঘোষপন্থী কংগ্রেসের অস্তিত্বই আর থাকতো কিনা সন্দেহ। কারণ, শুধুমাত্র পরিষদীয় দলেই শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থকদের সংখ্যাধিক্য ছিল এমন নয়, প্রদেশ কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতেও তাঁরা তখন সংখ্যা-গরিষ্ঠ। কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে সেই কমিটিতে ক্রমে ক্রমে তরুণ তুর্কীদেরই প্রভাব বেড়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যাঁরা একটি নয়া মার্গে চলাচলের কথা ভাবছিলেন তাঁদের মধ্যে সহযোগিতা অনেক বেড়ে গেছে। একমাত্র রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্রই নীতি বক্তব্যের উপর জোর দিয়ে ঘোষচক্রকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন। আরও কয়েকজন আছেন অবশ্য তবে তাঁরা ও গলিতনখদন্ত জরদ্গব মাত্র।

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতিতে, শ্রীঘোষ ও তাঁর চক্রের সদস্যরা বর্তমানে কি ভাবে নাজেহাল হচ্ছেন তা লক্ষ্য করার বিষয়। ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে তাঁর 'অশালীন' উক্তির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার জন্য দাবী উঠেছে। আর অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় শ্রীঘোষকে 'ঢুকতে পর্যন্ত' দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও শ্রীঘোষ এখনো কোন গর্জন করেন নি। কিম্বা করবেন বলেও মনে হয় না। যতক্ষণ অবস্থার আনুকূল্য তিনি উপলব্ধি করবেন না ততক্ষণ তিনি গর্জন করবেন না। তিনি শুধু তখনই গর্জন করতে শুরু করবেন যখন সিণ্ডিকেটের নৌকো থেকে নেমে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পাল তুলে পাড়ি জমাতে পারবেন। এবং তখনই তাঁর গর্জন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে যখনই তিনি বুঝবেন ইন্দিরাজী তাঁকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। সমদর্শী বিশ্বাস করে শ্রীঘোষ অচিরেই ইন্দিরাজীর নৌকায় উঠে পড়বার চেষ্টা করবেন। আর ইন্দিরাজীও শ্রীঘোষকে ঠেলে জলে ফেলে না দিতেও পারেন। কারণ, তিনিও ত সিণ্ডিকেট ভাঙতে চান!

শ্রীঘোষ কেন ইন্দিরাজীর নীতি সমর্থনের দিকে ঝোঁক দেখাবেন একথা অনেক গুণীজনই জিজ্ঞাসা করতে পারেন। উত্তর হচ্ছে, রাজনীতিতে অনেক সময়ই অঘটন ঘটে। কিন্তু এই মামুলী ব্যাখ্যা না দিয়ে যদি রাজনীতিক সমীক্ষাও করা যায় তাহলেও এরকম সিদ্ধান্তে আসা মুস্কিল হবে না।

১৯৬৭ সালে নন্দজীকে সামনে রেখে পশ্চিম বাংলায় এড হক কমিটি করে শ্রীঅজয় মুখার্জিকে কংগ্রেসে ফিরিয়ে এনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমাধি রচনার নেপথ্য চেষ্টা চলছিল—তখন শ্রীঅতুল্য ঘোষ একবার গর্জন করেছিলেন। তিনি এ সমস্ত নীতি-বিগর্হিত কাজে বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রধারণ করেছিলেন। কিন্তু পরে শ্রীঘোষই তাঁর সাঙ্গপাঙ্গসহ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমাধি রচনা করেছিলেন। প্রথমে তিনি বিরোধিতা করে-ছিলেন পরে তিনিই নায়ক হয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কেন শ্রীঘোষ হঠাৎ এই ভূমিকা নিলেন একটু অনুধাবন করলেই সমস্তকিছু দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে

উঠবে। প্রথমে আদর্শ ও তত্ত্বগত বক্তব্যের ধূম্রজাল সৃষ্টি করে শ্রীঘোষ এড হক কংগ্রেস গঠন, শ্রীঅজয় মুখার্জির উল্টোরথ যাত্রা আর ফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটানোর বিরোধিতা করেছিলেন। এর একমাত্র কারণ, যা ঘটতে যাচ্ছিল তার উপর শ্রীঘোষ ও তাঁর চক্রের কোন হাত থাকত না, বা তাঁর কোন নেতৃত্ব থাকত না। অতএব, যে পুজোর পুজারী তিনি হবেন না সেখানে বীজমন্ত্র বিচারণে ভুল হতে বাধ্য। কাজেই সে পুজো শুদ্ধ হতে পারে না। পরে যখন সমস্ত কিছু বানচাল হয়ে গিয়ে তাঁর হাতেই নেতৃত্ব এসেছিল, তখনই তিনি স্বহস্তে যুক্তফ্রন্টের বলি সমাধা করেছিলেন। আদর্শ ও তত্ত্বকথা তখন তাঁর কাজের মধ্যেই নিশ্চয় মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

কাজেই বর্তমানেও বেকায়দায় পড়ে শ্রীঘোষ কিছু কিছু নীতিগত বক্তব্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। যে কঠোরতম ভাব তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধারা প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের আগে পর্যন্ত দেখিয়েছিলেন পরে তাকে অনেক সরলীকরণ করে শ্রীঘোষ যেন মধ্যস্থতা করে কংগ্রেসকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন এমন একটা মেক-আপ নিয়েছিলেন, শক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমে আত্মরক্ষা করে, ও আকাশ দেখার ভাব করে, রাজনীতিতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী। কাজেই তিনি এখন ইন্দিরাজীর রাজনৈতিক শক্তির নব-মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছেন। যে মুহূর্তে তিনি নিশ্চিত হবেন যে ইন্দিরাজীকে আর সরানো যাবে না, কিম্বা বিপদগ্রস্ত করা যাবে না—তখনই তিনি আবার বিবৃতি দিতে শুরু করবেন।

পশ্চিম বাংলায় প্রধানমন্ত্রীর দুদিবস-ব্যাপী সফর হচ্ছে—অথচ শ্রীঘোষের মুখে একটিও কথা নেই। অনেকেই বলবেন শ্রীঘোষ ত পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের একজন মামুলী সদস্য ছাড়া কিছুই নন। আসলে অবশ্য তা ঠিক নয়। এখনও কংগ্রেস ভবনে গেলেই অতুল্যবাবু আসবেন কিনা প্রশ্ন করলে জবাব মিলবে 'বড়বাবু আসবেন না।' দীর্ঘদিন ধরেই অতুল্যবাবু কংগ্রেসে 'বড়বাবু' ছিলেন। এখনও আছেন। তবে কিছু লোকের মনে—সংগঠনে নয়। আগে মনে ও সংগঠনে দু জায়গাতেই বিরাজমান ছিলেন।

ইন্দিরাজী কী রাজনৈতিক লাইন নিয়েছেন অতুল্যবাবুরা তা এখনো পুরো-পুরিভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। আর দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গে কি আন্দাজ কংগ্রেসী ইন্দিরাজীকে সমর্থন করছেন তারও পুরো হিসাব ঘোষ মহাশয় এখনো করে উঠতে পারেন নি। এবারে একটি অসহনীয় সংখ্যাধিক্যতা অর্জন করে যুক্তফ্রণ্ট গদীতে কায়েম হবার পর থেকেই শ্রীঘোষ তাঁর অনুগতদের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করে হিল্লি-দিল্লী করে কালক্ষেপণ করেছেন। রাজ্য কংগ্রেস সংগঠনে বিবর্তন পরিবর্তনের খবর তিনি রেখেছেন, এবং প্রয়োজনমত সৈন্য ও পরিচালনা করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মাধ্যমে চূড়ান্ত আঘাত খাওয়ার পর পশ্চিমবাংলায় সত্যিই কি হাল হয়েছে দীর্ঘদিন পরই শ্রীঘোষ তার সমীক্ষা করছেন, এবং অকুস্থল পরিদর্শনেও ব্রতী হয়েছেন।

কাজেই ইন্দিরাজীর সম্বর্ধনা-সভার চৌহদ্দির মধ্যেও থাকতে পারছেন না, এতেও শ্রীঘোষ কোন কথা বলছেন না। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছেন পায়ের তলায় মাটি সরে গেছে। তিনি এখন কংগ্রেস সংগঠনের আর তেমন কেউ নন।

শ্রীঘোষ ও তাঁর অনুগামীরা এবার মূল্যায়ন করবেন ইন্দিরাজীর রাজনৈতিক প্রভাব পশ্চিমবাংলায় কতটুকু বিস্তার লাভ করল। বস্তুতপক্ষে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আসীন হওয়ার পর থেকে ইন্দিরাজী এই রাজ্যে আসেন নি। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে একটানা প্রতিবাদ ও অনুযোগের সুরই এতদিন ধ্বনিত হচ্ছিল। কিন্তু ব্যাংক জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এই দুটি প্রধান বিষয়ে শ্রীমতী গান্ধী যে নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি করেছেন তার ফলে বামপন্থীরাও তাঁর বিরুদ্ধে এখন মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করছেন না। বরঞ্চ তাঁর সরকারকে রক্ষা করার জন্য তাঁদের সরব প্রতিশ্রুতি দিতে হচ্ছে। এই রাজনৈতিক অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যেই শ্রীমতী গান্ধী ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বক্তৃতা করছেন। কে কংগ্রেসের থেকে সভাপতি হল সেটা বড় কথা নয়—প্রায় হৃতসর্বস্ব কংগ্রেস ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে জনমনে কতটুকু বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারল তারই মূল্যায়ন বড় কথা। রাজনীতিতে প্রধানতম মূলধন হচ্ছে গণ-আস্থা। কাজেই ইন্দিরাজী কংগ্রেস সংগঠনকে একটি জোর ধাক্কা দিয়ে অনড় অবস্থা থেকে প্রায় গতিশীল করে তুলেছেন। এবং এই রাজ্যের বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মী ও নেতা ইন্দিরাজীর এই নবপ্রচেষ্টার তাৎপর্য যে উপলব্ধি করেছেন তা বুঝতে এখন আর কারও কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কাজেই ইন্দিরাজীকে পশ্চিমবঙ্গে এনে তাঁর অধুনাপ্রাপ্ত জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবনের জন্য এই নেতা ও কর্মীবৃন্দ নিশ্চয়ই প্রশংসা পাবেন।

অতুল্যবাবুরা ইন্দিরাজী কংগ্রেস কর্মী বৈঠকে কি বক্তব্য রাখেন তা খুঁটিয়ে দেখবেন। বিচার বিবেচনা করবেন। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য কংগ্রেসের একটি অংশ তাঁর বিরুদ্ধে গোষ্ঠীচক্র সৃষ্টির অভিযোগ এনে আন্দোলন করছিলেন। কিন্তু তাঁকে বিপাকে ফেলতে পারেন নি। প্রথম কারণ, রাজ্যের সংগঠনে অতুল্যবাবুর শক্তি; আর দ্বিতীয়ত বলশালী সিণ্ডিকেটের বজ্রমুষ্টি। দ্বিতীয়টির ভগ্নদশা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমটিও ভেঙে যেতে শুরু করেছে। এবং পশ্চিমবঙ্গে তা অতি দ্রুত ঘটে গেছে। কাজেই অতুল্যবাবুদের এখন দাঁড়াবার মত জায়গাও নেই।

সব ব্যাপারেই বিশ্রাম আছে। রাজনীতিতে কিন্তু নেই। কোনো ফাঁকে কোনোক্রমে কারও মাথায় একবার রাজনীতির নেশা ঢুকলেই হল, আমৃত্যু তা জেঁকে বসবে। কদাচিৎ কেউ রাজনীতির আখড়া ছাড়তে পেরেছেন। আবার ক্ষমতার স্বাদ পেলেই রাজনীতির অভিনয়ে আবার ফিরে এসেছেন। তাই ভারতবর্ষে বিশেষ করে রাজনীতিবিদরা আমরণ দেশসেবা করে যান। তাঁরা অবসর বলে কি বস্তু তা ভেবে দেখবারও অবকাশ পান না। সেই দিক থেকে চিন্তা করলে অতুল্যবাবুরও অবসর নেওয়ার প্রশ্নই আসে না। কাজেই রাজনীতিতে বেঁচে থাকতে হলে তাঁকে একটা রাস্তা বের করতে হবে। শুধু সিণ্ডিকেট নতুন ভাবধারার ধাক্কা খেয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। রক্ষণশীলতার প্রবণতা সিণ্ডিকেটকে আরও পঙ্গু করে দেবে। কিন্তু শ্রীঅতুল্য ঘোষ রাজনীতিতে গণ্ডারবৃত্তি কোনদিনই অবলম্বন করেন নি। সুযোগ মতই তিনি শত্রুর সঙ্গেও হাত মিলিয়েছেন, আবার ধারণাও পালটিয়েছেন। যেমন শ্রীনন্দকে বধ করবার জন্য তিনি শ্রীমতী গান্ধীকেই প্রধানমন্ত্রীরূপে বৃত করাতে এগিয়ে এসেছিলেন। সেই সুবাদে ইন্দিরাজীর কাছে যাতায়াতের একটি বিশেষ পাশপোর্টও ছিল মনে হয়। কাজেই ইন্দিরাজীর পালে যখন নতুনভাবে হাওয়া লেগে নৌকো তীরবেগে ধাবিত হচ্ছে, তখন সমাজবাদের আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য অতুল্যবাবুরা দল পাল্টাবেন। কে জানে, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসেও হয়তো তখন আবার সবাই কেঁচে গণ্ডূষ হতে শুরু করবে।

—সমদর্শী

ফেরা

সমীর দত্ত

পোর্ট অফিসার মিঃ ডি'সুজার সঙ্গে হঠাৎ বীচে দেখা হয়ে গেল রঞ্জনের। এটাই সে ভয় পাচ্ছিল। যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। মিঃ ডি'সুজা যেন তার গন্ধ পেয়েছিলেন।

বেশ ত নিরিবিলি ঘুরছিল সে। ক্যাসুরিনার একটানা সোঁ সোঁ দীর্ঘশ্বাস, লাল টাইলে ঢাকা সিমেনস ক্লাব ও আপিস, গোয়ার দিকের সুরকি-লাল 'শিবাজীগড়' পাহাড় সবই তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল। গোটানো ট্রাউজার, জুতো হাতে খালি পায়ে সমুদ্রে দাঁড়িয়ে ছিল সে। অবিরাম ঢেউগুলো ফোঁসতে ফোঁসতে তার হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসছিল, যেন দারুণ বিপদে পড়ে ভয়ে একেবারে সাদা হয়ে তার কোলে আশ্রয় পাবার জন্যে দোওাচ্ছিল। ধুলোয় চাপা লাইব্রেরীর একগাদা বই আর কলেজের নোট নিয়ে বিকেলবেলায় সমুদ্রের লোনা হাওয়া ফুসফুসে ঝলকে ঝলকে টেনে নিতে একটা নেশায় পেয়ে বসেছিল তাকে।

এলোয়ে একটাই অসুবিধা—সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখা যায় না। তার মনে আছে—স্পষ্ট তার চোখের উপর জেগে উঠছে সূর্য মহাবলিপুরম, পুরী কিম্বা কোনারক। এখানে সে প্রতিদিন আগুনের গোলাটাকে আরব সাগরের পেটের ভিতর ঢুকে পড়তে দেখেছে—আর সে অনুভব করেছে কেমনভাবে ঋতুগুলো পাল্টে যাচ্ছে, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা সব ধীরে ধীরে বইয়ের পাতার মতো খুলে গেছে তার চোখের সামনে।

আজকে কেমন হেলে পড়েছে সূর্যটা, 'দেওগড়' পাহাড়ের ঠিক বাঁ কাঁধে — যেন ক্লান্ত করেদীকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে

ফাঁসকাঠে। ধীরে ধীরে ঘুর্ণি খুলে নেমে আসছে সে, এখনই ঝাঁপ দেবে জলে। লাল খুনে জ্বলতে থাকবে সাগরের বুক; তারপর ধুয়েরী, বেগুনী, ধুসর ছোপে ঢেকে যাবে তার সমস্ত শরীর। সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকার সব কিছুর উপর বিছিয়ে দেবে তার চাদর। ঝিকমিক তারায় ভরে যাবে আকাশ। পাহাড়ের মাথায় ডি এমের বাড়ীর ফ্লাড লাইট সবচেয়ে আগে জ্বলে উঠবে তারপর হাজার আলোর মালা গলায় চাড়িয়ে সমুদ্র আর পশ্চিমঘাটের পাহাড় ঘেরা এলোর রাত্রের জন্যে প্রস্তুত হবে।

"হ্যালো', 'জন। দিন দিন কবি বনে যাচ্ছ দেখছি। বেঙ্গলীদের ক্যারাকটার-ই এ-ই। মাছ আর কবিতা ছাড়া তোমরা এক পা-ও এগুবে না।"

মিঃ ডি'সুজার কথায় রঞ্জনের সংবিৎ ফিরে আসে। ধরা পড়ে গিয়ে সে মুখ খোলে, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন? আজ ক্লাবে যান নি? আপনার ফ্যামিলি পাঞ্জিম থেকে ফিরেছে?"

"তোমাকে খুঁজতেই বেরিয়েছিলাম। কলেজেও ফোন করেছিলাম। প্রফেসর প্রভু আন্দাজেই বলে দিলেন, হি মাস্ট হ্যাভ গন টু দা বীচ। কাছাকাছি তোমাকে স্পট না করে একটু মুস্কিলেই পড়েছিলাম। ঘুঘু-পাখীর মতো তোমার যা স্বভাব ভায়া। হ্যারি আপ, বয়; রীটা, জুয়ান এবং মিসেস এখনই এসে পৌঁছবেন। ফেরি ঠিক সাতটায় ঘাটে লাগে।"

বীচ রোডের পাশে পার্ক করা মিঃ ডি'সুজার রোভারে তারা দুজনে উঠে পড়ে। ঘন ঘন অ্যাকসেলেটারের চাপে গাড়ী ঝড়ের বেগে কালী নদীর ফেরিঘাটের দিকে ছুটে চলে।

রঞ্জনের মনে পড়ে তিন বছর আগে সেই রাত্রির কথা যেদিন সে 'সি ভিউ' হোটেলে এসে জুটেছিল। একটানা দেড়শ' মাইল পাহাড় ডিঙিয়ে বাঙ্গালোর থেকে এলোরে এসে যখন সে মাটিতে পা ফেলল তখন তার শরীরটা সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পাচ্ছিল না। ঘন ঘন নিঃশ্বাসের সঙ্গে একটা একটানা বমির ভাব তাকে কাবু করে এনেছিল।

প্রফেসর কৌসিক মিঃ ডি'সুজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন, "মিট মিঃ রঞ্জন সেন আওয়ার নিউ লেকচারার ইন ইংলিস। অ্যান্ড হি ইজ আওয়ার পোর্ট অফিসার মিঃ রোজারিও ডি'সুজা।"

করমর্দনের পরেই উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন মিঃ ডি'সুজা। বার বার বলতে থাকেন, "হাউ ওয়ান্ডারফুল টু মিট এ ইয়াং প্রফেসর।" তারপরই জিজ্ঞাসা, "কি খাবেন? স্কচ না ব্র্যান্ডি? আপনি ত জার্নি করে এলেন; ব্র্যান্ডিই ভাল হবে।"

ওয়েটার টেবিলে দুটো পেগ নামিয়ে যায়। হুইস্কি-চকচকে চোখে মিঃ ডি'সুজা বলেন, "আমার একটা প্রোপোজাল আছে মিঃ সেন। আপনি আজ হোটেলে থাকতে পারবেন না। আপনি আমার বাড়ীতে গিয়ে থাকবেন। একটা বাড়ীটাড়ি দেখে নিয়ে তারপর সেখানে চলে যাবেন। আপনার কি অপিনিয়ন?"

মিঃ ডি'সুজার চরম হৃদ্যতায় রঞ্জনের কেমন যেন এক্সট্রা অস্বস্তি — একটা ভয় মনের ভিতর নাড়া দেয়। তার ছাব্বিশ বছরের জীবনে এত উজ্জ্বল কোন লোককে ত সে এর আগে কখনও দেখে নি।

তার ওপরে দ্বিতীয় ব্যক্তির বিন্দুমাত্র দাবী থাকতে পারে একথা সে কোনদিনই গ্রাহ্য করে নি।

প্রফেসর কৌসিক তাদের টেবিলে এসে দাঁড়াল। "মিঃ সেন, প্লিজ ডোন্ট হেজিটেট টু গো উইথ আওয়ার পোর্ট অফিসার। হি ইজ দা ডিক্টেটার অব এলোর। ও'কে চটান মানে একেবারে ফেটাল; ও'র রিকোয়েস্ট ত আপনার তরফে গ্রেট অনার।"

বাড়ীতে ঢুকেই মিঃ ডি'সুজা দারুণ হট্টগোল তোলেন, "এ গেস্ট ফর ইউ অল। রীটা, জুয়ান, মিরান্ডা!"

বাংলোর বারান্দায় এসে যারা দাঁড়ায় তাদের দেখে রঞ্জনের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সিঁড়ি বেয়ে চটপট নেমে আসে দশ বার বছরের উজ্জ্বল একটি ছেলে—পেছনে মধ্যবয়স্কা একটি মহিলা এবং শেষে বাইশ-তেইশ বছরের অপরূপ একটি যুবতী।

প্রায় একসঙ্গেই মিঃ ডি'সুজা জড়িয়ে নেন তিনজনকে, "ও মাই এঞ্জেলস!" পর-মুহূর্তে কড়া হুকুম, "তোমাদের গেস্ট এসেছেন। তাঁর হসপিটালিটির যেন কোন রকম কমতি না হয়। নতুন এসেছেন এলোরে। বাড়ী না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবেন। ইনি এখানকার কলেজে ইংলিসের নতুন লেকচারার।"

রঞ্জন জড়তা বোধ করে। কোনরকমে "হাউ ডু ইউ ডু"—বলেই চুপ করে যায়। একজোড়া অবিশ্বাস্য উজ্জ্বল চোখের প্রখরতা সে তার শরীরে অনুভব করে। এক অপ্রতিরোধ্য জটিল বোধ তার বুকে জট পাকাতে থাকে। হাইচার্চ রোডে পাহাড়ের ওপর মিঃ ডি'সুজার বাংলা থেকে দেখা এলোর শহরের হাজার বাতির মালা হঠাৎ ঝলসে ওঠে, শাল-সেগুনের মাথায় মাথায় সমুদ্রের গর্জন মনে হয় দুরন্ত তুফান তুলেছে আর জাহাজের ধোঁয়া আকাশের গায়ে হিজিবিজি লিখে দেয় অনির্বচনীয় কোন এক বার্তা।

গেলাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে মিঃ ডি'সুজা বলে চলেন, 'জানেন মিঃ সেন—না, না কি যেন বললে তোমার নাম—রঞ্জন. 'জন বলেই ডাকব তোমাকে কি বল ইয়াং ম্যান। রীটা এবং জুয়ান দুজনেই দেখছি ভীষণ খুশী হয়েছে তোমাকে পেয়ে। তুমিও মেতে ওঠ এদের সঙ্গে। কোনরকম হেজিটেশন যাতে না দেখি তোমার এ বাড়ীতে। রিমেম্বার ইউ আর এ মেম্বার অব দা ফ্যামিলি ফ্রম নাও অন।'

রীটা জিজ্ঞাসা করে, "আপনি কোন স্টেইট-এর লোক? মাইশোরেই থাকেন?'

বিয়ারে চুমুক দিয়ে মিঃ ডিসুজা হাসেন, সেন কান্ট্ বি এ মাইশোরীয়ান। হি মাস্ট বি এ বেঙ্গলী। ক্যালকাটায় খিদিরপুরে যখন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তাম, তখন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল রনি সেন। জান জন, দুটো কারণে তোমার প্রতি আমি অ্যাট্রাকটেড। নাম্বার ওয়ান, ইউ আর এ ইয়াং প্রফেসার; নাম্বার টু ইউ বিলং টু ক্যালকাটা।"

রীটার প্রশ্নে রঞ্জন অপ্রস্তুত বোধ করে, "ওয়েল, ইউ আর এ হিন্দু সেন!"

মিঃ ডি'সুজা মেয়ের দিকে ভ্রূ কুঁচকান, "জন হয়ত হিন্দু, তবে বেঙ্গলীরা ক্রিশ্চানও হয়। জান জন, আমি দারুণ খুশী যে তোমার কাছ থেকে ক্যালকাটার গল্প শুনব। সেই কবে ক্যালকাটা ছেড়ে পরিবারসুদ্ধ সব চলে এসেছিলাম—ওয়ারের ঠিক পরে পরেই। হোয়াটে লাইভলি সিটি! সব জায়গায় শুধু শহরটার নিন্দে শুনি। জানি না কতদিন এই হেইট ক্যাম্পেইন চলবে!"

●

দরজায় টোকা পড়তে রঞ্জন দরজা খুলে দিয়ে চমকে ওঠে। ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে রীটা, হাতে একটা ফ্লীট গান।

সে মুখ খোলে, "হোয়াটে এ অন্ডার-ফুল ম্যান ইউ আর! মশার কামড়ে আপনার নিশ্চয়ই দফারফা শেষ। এ ঘরের পাখাটাও আউট অব অর্ডার। আমাদের বাংলোটা হিল-টপে থাকায় দরুন যত রাজ্যের ঝোপ-ঝাড় থেকে মশার ঝাঁক ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে। বাবা এই ফ্লিট গানটা দিয়ে আপনার ঘরটা ভাল ক'রে স্প্রে করে দিতে বললেন। এখন আমার অর্ডার আপনাকে কিছুক্ষণ রেফ্যুজি হয়ে থাকতে হবে।"

এই বলেই দরজা বন্ধ করে রীটা ঘর স্প্রে করতে থাকে। রঞ্জন অবাক মানে। বাবা ও মেয়ের মধ্যে কি আশ্চর্য মিল! দুজনের কাজকর্মেই যেন প্রাণ উপচে পড়ছে।

ফ্লিটের কড়া ঝাঁজে রঞ্জনের নাক জ্বালা করে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দার থামে হেলান দিয়ে রঞ্জন চেয়ে থাকে বাইরের অন্ধকারে। বাগানে সার বেঁধে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শাল আর সেগুনের গাছ।

গোলাপ আর রজনীগন্ধার মিষ্টি ঘ্রাণ ভেসে আসে হাওয়ার ঢেউয়ে ঢেউয়ে। বনেঢাকা সামনের পাহাড়গুলো যেন দলবেঁধে গা ধুতে নেমে গেছে আরব সাগরে। আকাশে জ্বলতে থাকে লক্ষ তারা ও গ্রহপুঞ্জ আর তার ঠিক মাথার উপরেই নীলাভ আলোর দীর্ঘশ্বাস তোলে কালপুরুষ। একজোড়া প্যাঁচা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শালগাছ থেকে উড়ে যায়।

"কি অর্থ এর? কি? কি?" নিজের প্রশ্নেই রঞ্জন কেঁপে ওঠে। সমুদ্রের অবিরাম গর্জন ছাড়িয়েও হাওয়ায় হাওয়ায় ঝুলে থাকে সে গোঙানো ডাক। আর রাত্রির বিরাট শান্তি ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে মেঝেতে ছুঁড়ে দেওয়া কাঁচের বাসনের মতো।

রীটা মশাদের বংশ উচ্ছেদ করে চলে। কেমন অসহায় মনে হয় নিজেকে রঞ্জনের। সব কিছু বমি পাওয়ার চাইতেও তিক্ত হয়ে ওঠে মুহূর্তে। নেশার মতো এক অপ্রতিরোধ্য অবসাদ তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে দেয়। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে সে।

শেষ কয়েক বছর ধরেই রুটিনমাফিক এই অবসাদ তাকে আক্রমণ করে আসছে। তাকে ঘেরাও করে রেখেছে, চাকু দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিটিয়ে দিয়েছে তার নাড়ীভুঁড়ি চারিদিকে। দুরন্ত যাযাবর জীবনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষময় ঠেকেছে তার।

স্পষ্ট মনে পড়ছে ভুটানে চাকরী-জীবনের সেই চরম ঘটনার কথা। ছবির মতো 'হা'-উপত্যকা দেখতে চলেছে সে। পিঠে বাঁধা খাবার-দাবার। একটানা চড়াই পার হয়ে হাজার দশেক ফুটে উঠে এসে ভারী ভাল লাগছে তার। জুন মাসেও কি আরাম হিমালয়ের এই পাহাড়গুলোতে। পথের ওপর আকাশছোঁয়া স্প্রুস গাছের তলায় স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল বসিয়েছে। সামনেই বার্লির খেতের ভিতর একপাল ইয়াক চরছে। কেমন মজার হয় জন্তুগুলোকে দেখতে। স্কুলে পড়া ভূগোলের চাইতেও মজার। কম্বলের মতো কালো লোমে আপাদমস্তক ঢাকা প্রকাণ্ড ভালুক যেন। চোখের সামনে অন্তহীন হিমালয়ের সারি পশ্চিমে সিকিমের দিকে চলে গেছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে রডোডেনড্রনের আগুন জ্বলছে। নীচে—বহুনীচে পাহাড়ের পেটের ভিতর উঁকি মারছে কয়েকটা বৌদ্ধ গুম্ফা। তাদেরই দিকে পিঁপড়ের সারি তীর্থযাত্রিরা সরু পথ দিয়ে উঠে আসছে। এক অব্যক্ত আনন্দে ধীরে ধীরে ভরে উঠছে তার সমস্ত বুক। নিছক বেঁচে থাকার আনন্দই যে এতখানি, রঞ্জন কি ভেবেছিল কোনদিন? আনন্দ তীব্রতর হয়ে উঠছে, আরও আরও, সব রোমকূপগুলো তার খাড়া হয়ে উঠল, প্রচণ্ড রোমাঞ্চে তোলপাড় হচ্ছে তার বুকের রক্ত—আর সে পারছে না, কিছুতেই না, আনন্দে দমবন্ধ হয়ে আসছে......।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা অট্টহাসি ধ্বনিত হল পাহাড়ের গুহায় গুহায়। পাথরে প্রতিধ্বনিত হতে হতে সে হাসি ছুটে চলল নীচে উপত্যকার দিকে.........

"হো-হো-হো-হো-হো-হো......... কি অর্থ এসবের? হো-হো-হো.........।"

"খবরদার না!" চীৎকার করে বলতে চাইল রঞ্জন। কিন্তু একেবারে ভয়ে সেঁদিয়ে গেল সে। শুকানো জিভ ঝুলে পড়ল; কেউ যেন একটা মস্ত কাঠের গোঁজাল মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে তার—এমন হাঁ করে রইল তার মুখ। চা খাওয়া হল না।

"কি, বাগানে পাইচারী করছেন যে? ভেরি সরী, মাঝরাতে বিছানা থেকে উঠিয়ে রেফ্যুজি করে দিয়েছি। একি, আপনার শরীর খারাপ লাগছে নাকি? আপনাকে কেমন যেন দেখতে লাগছে। বাবাকে ডাকব?"

রঞ্জন যেন গর্জে ওঠে, "আই অ্যাম ফাইন। তুমি শুতে যাও।" আরও নিষ্ঠুর হয়ে বলতে থাকে, "মাঝরাতে অপরিচিত লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে তোমার ভয় করে না। আমি স্কাউন্ড্রেলও ত হতে পারি।"

একথায় রীটা হাসতে থাকে, "ইউ—এ স্কাউন্ড্রেল! দ্যাট ইজ রিয়েলি ফানি। জানেন, আমরা গোয়া-এলোরের লোক। এক নজরেই ধরতে পারি কে স্কাউন্ড্রেল আর কে ক্লিন।" দুষ্টুভাবে রঞ্জনের দিকে সে ভ্রূ কুঁচকায়।

রঞ্জন চুপ করে আছে দেখে মুচকি হেসে বলে, "কি করে এখনই ঘরে ঢুকবেন। একেবারে ফ্লিটের গ্যাসে বোঝাই।"

দাম্ভিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকে রীটা—মিশরের কোন সম্রাজ্ঞী যেন। হাওয়ায় উড়তে থাকে কাঁধ পর্যন্ত নুয়ে পড়া তার চুলের কুচকুচে গোছাসব। কখনও ফুলে ওঠে তার গাউনের তলদেশ প্রকাণ্ড বেলুনের মতো, আক্রোশে চেপে ধরে তার শরীরটাকে। স্পষ্ট হতে থাকে তার দেহের নতুন নতুন রেখা-উপরেখা। নিটোল বুক চকিতে ফুটে ওঠে ফুলের মঞ্জরীর মতো। কেউ যেন অপরূপ প্রাসাদের গুপ্ত দরজা একটার পর একটা খুলে দেয় হতবাক দর্শকের চোখের সামনে।

রঞ্জনের কানে বাজতে থাকে ভুটানের সেই অট্টহাসি "হো-হো-হো-হো-হো"। ঘামে ভিজে ওঠে তার সমস্ত শরীর। এখনই মাটিতে বসে পড়বে সে। পায়ের তলায় মাটি নেই তার, শুধু সীমাহীন শূন্যে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলতে থাকে সে।

"আই অ্যাম ভেরি টায়ার্ড, রীটা!" এই বলে সে ফ্লীটবোঝাই ঘরেই শুয়ে পড়ে।

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় রীটা, "হোয়াটে অণ্ডারফুল ম্যান ইউ আর!"

●

গাড়ীর সামনে বসেন মিঃ ডি'সুজা, মিরাণ্ডা আর জুয়ান। পেছনে শুধু রঞ্জন ও রীটা।

রীটা, "ঠিক করেছিলাম পশ্চিম থেকে আর ফিরব না। গ্র্যানির কাছেই থেকে যাব। ওখানে কিসের অভাব আমার। বাংলো ক্যাসুরিনা, অ্যাক্রাবিয়ান সী সবই ত ছিল। পাঞ্জিমের মতো গে লাইফই বা আর কোথায় পাওয়া যাবে? পাঞ্জিম ইজ দা প্যারিস অব ইণ্ডিয়া!"

রঞ্জন বিরক্ত হয়, "তবে এলে কেন? তোমার ফিরে আসা একেবারেই উচিত হয়নি।"

রঞ্জনের উরুর ওপর রাখা হাত রীটা নিমেষে টেনে নেয়। জানালার দিকে চেপে বসে সে। চাপা অভিমানে টকটকে রাঙা হয়ে ওঠে তার মুখ। কালো ব্লাউজ আর স্ল্যাক্সে তাকে দেখায় এক দাম্ভিক নাবিকের মতো যে এখনই খোলা ডিঙিতে করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে মাটিতে পা ফেলেছে।

রঞ্জন বলে, "মিঃ ডি'সুজা, আমাকে বাড়ীতে ড্রপ করে দেবেন; আজকে আর আপনার ওখানে যাব না। কাল কলেজে জরুরী ক্লাস আছে; মেটাফিজিকালদের ওপর নোট তৈরী করতে হবে।"

পরদিন কলেজ থেকে সোজা রীটাদের বাড়ী চলে আসে রঞ্জন। মিঃ ডি'সুজা বাড়ী ছিলেন না। পোর্টে 'ওর লোডিং' চলছে জাপানী ও রুশ জাহাজে। রীটার মা মন দিয়ে বাইবেল বিড়বিড় করে চলেছেন ইজি-চেয়ারে বারান্দায়। জুয়ান টার্জানের ছবি দেখতে সিনেমায়। ড্রইংরুমে চোখবুজে পিয়োনোর নেশায় বিভোর রীটা, পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে কিটি।

মিরাণ্ডা বলেন, "হিয়ার ইজ ইয়র প্রফেসর, রী—।"

রীটা চোখ খোলে, ফের পিয়ানোয় মন দিতে চায়।

রঞ্জন : "জরুরী কথা আছে তোমার সঙ্গে, রীটা।"

—"কি কথা আবার আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে কোন কথা নেই।" কিটিকে কোলে তুলে নিয়ে তার নরম লোমে বিলি কাটতে থাকে রীটা।

রঞ্জন : "আমি যেখানে খুশী ঘুরতে চলে যাচ্ছি এখনই। কবে ফিরব বা আদৌ ফিরব কিনা কিছুই জানি না। একথা আর কেউই জানে না। তোমাকেই প্রথম বলছি। তোমার সঙ্গে এই দুই বছর সমানেই জড়িয়ে পড়ছি। সবচেয়ে সারপ্রাইজিং কি লাগে জান, রী—' যখনই আমাদের কথা ভাবি তখনই সমস্ত জিনিসটাকে কেমন হাস্যকর, অর্থহীন মনে হয় আমার কেমন একটা বিতৃষ্ণা বোধ করি তখন। এভরিথিং ইজ মিনিংলেস, রী—, এভরিথিং ইজ মিনিংলেস! আমাকে তুমি আর দিনের পর দিন বেঁধ না। ছেড়ে দেও আমাকে, ছেড়ে দাও।" রঞ্জন যেন কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। আবার শুরু করে, "ফরগীভ মি, রী—। জিসাস ক্রাইস্টের বাণীই ত ক্ষমা। আমি ফ্রিডম চাই, সব কিছুর থেকে, প্রেমের থেকেও ফ্রিডম চাই। জান, রী—, সবরকম রেসপনসিবিলিটিই আমার ঘৃণার বস্তু। এণ্ডলেস ভ্যাকুয়ামে থাকতেও দারুণ ফ্রিডাম আছে—যত টর্চারই হোক, আবসলুট ফ্রিডামের প্রাইজ রয়েছে তাতে। আমি কনফেস্ করছি আমার গীল্ট। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। টেক পিটি অন মাই সোল! কি সিকিউরিটি আছে আমার জীবনের, রী—. লাইফের কোন মিনিং খুঁজে পাইনি

আজও। মাঝে মাঝেই সুইসাইডকেই একমাত্র পথ বলে দেখতে পাই।"

পাথরের মতো নিশ্চুপ হয়ে রীটা পিয়ানোর উপর মাথা গোঁজে। সাদা লেসের কারুকার্যকরা গাউনে অপরূপ মনে হয় তাকে। ক্লান্ত, অবসন্ন দেখায় ঐ সদাহাস্যো-উজ্জ্বল তরুণীকে।

রীটার চিবুক হাতে তুলে তার নরম ঠোঁটে আলতো চুমু খেয়ে রঞ্জন বেড়িয়ে আসে, "গুড বাই, রী—!"

বাঙ্গালোরে দু-চারদিন থাকে রঞ্জন। পথে-ঘাটে নিরুদ্দেশ ঘুরে বেড়ায় সে। সেখান থেকে মাদ্রাজ চলে যায়। 'অশোক' লজ থেকে বেরিয়ে সারাদিন সমুদ্রের ধারেই সময় কাটায়। গরমে ঘেঁজে ওঠে তার শরীর, গাল বেয়ে টস টস ঘাম ঝরে। সীমাহীন শূন্যে স্থির এক বিন্দুর মতো ভেসে থাকে সে। বিকেলের পড়ন্ত রোদ চেয়ে দেখে উলঙ্গ মেছো শিশুরা জল ছিটিয়ে সাগরে খেলা করে। ধীরে ধীরে বীচ মেয়েপুরুষের ভীড় হয়, তারা বালির উপর মেলা বসায়।

ছুটি শেষ হবার আগেই রঞ্জন এলোরের দিকে পা বাড়ায়। বাসে দুলতে দুলতে সে স্পষ্ট আবিষ্কার করে রীটাকে ছাড়া এক মুহূর্তও সে বাঁচতে পারবে না। জানালার বাইরে পশ্চিমঘাটের প্রসেসান, জঙ্গলে চন্দনকাঠ, দারুচিনির মাথাউঁচনো ভিড়, হঠাৎ তেড়ে আসা আরব সাগরের ঝলসানো রূপ অনির্বচনীয় অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে
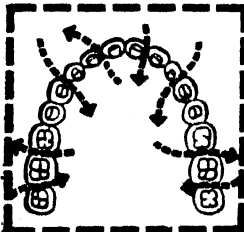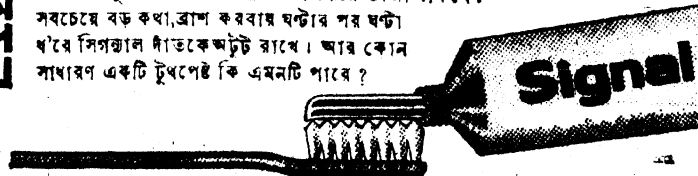
রঞ্জনের কাছে। শ্বাসরোধী আনন্দ ঢেউ তোলে তার রক্তে, যেমন তুলেছিল হারের পথে হিমালয়ের দশ হাজার ফুট পাহাড়ের মাথায়।

"কি বোকা, বুদ্ধু আমি। এতকাল মিছে শূন্যে ভেসে বেড়িয়েছি।" মনে মনে বলে রঞ্জন। তার প্রবল ইচ্ছা জাগে বাসশুদ্ধ লোকের পা জড়িয়ে চুমু খেতে খেতে সে বলে, "আপনাদের গোলাম আমি। একটু সেবা করতে দেবেন আমাকে? আপনারা দেখুন, স্বাধীন আমি, একেবারে স্বাধীন। সব কিছুকেই আমি এখন ভালবাসতে পারি।"

বাস থেকে নেমেই স্কুটার নিয়ে হাই-চার্চ রোডে চলে আসে রঞ্জন।

"কি ব্যাপার 'জন! কোথায় উধাও হয়েছিলে? রীটা বলছিল এলোরের মতো জায়গাও তোমার ধাতে সইছে না। কিন্তু মাই ডিয়ার ইয়াং ম্যান, বলে রাখছি এ-রকম চার্মিং স্পট হোল ওয়েস্ট কোস্টে আর কেথাও পাবে না।"

রীটা এবং তার মাও ড্রইং-রুমে ঢোকে। কেমন করুণ লাগছে রীটাকে। ডাগর ডাগর চোখের তলায় কেমন কালি পড়েছে। হয়ত বা গোপন কান্নারও চিহ্ন রঞ্জন দেখতে পায়। এই প্রথম রীটাকে শাড়ি পরতে দেখে চমকে ওঠে সে। নীল শাড়িতে জ্বলজ্বল করছে তার রাঙা শরীর ভোরের গোলাপের মতো। একগোছ কাল চুল কপাল ছাড়িয়ে নেমে এসে বাঁ চোখর খানিকটা ঢেকে দিয়েছে। লম্বা, নিটোল হাতদুটো ঝুলে আছে সরু কোমরের পাশে। রঞ্জন চেয়ে থাকে সেই ভেনাসের দিকে। বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

পাশাপাশি সোফায় বসে থাকে রঞ্জন ও রীটা। মিরাণ্ডার গুনগুনে গান ভেসে আসে কানে। মিঃ ডিস্যুজা কি যেন বলে চলেছেন তাকে।

রঞ্জন মৃদুস্বরে বলে, "আই অ্যাম রিয়েলি ভেরি সরী, রী—। সেদিন আমি অত্যন্ত রুড হয়েই কথা বলেছিলাম তোমার সঙ্গে। প্লীজ ফরগিভ মি।" রীটার দুটো হাত হাতে নিয়ে আলতো চুমু খায় সে। হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে আরও তাকে টেনে আনে কাছে। তারপর মন্ত্রর মতো উচ্চারণ করে চলে, "জান রী—, আজকেই ফিরে এসে আমার প্রথম মনে হ'ল যেন আমি সবকিছুর সঙ্গে হারমনি খুঁজে পেয়েছি। রাস্তার লোকজন, সাইকেল, দোকানপাট, বাজার সব কিছুই দারুণ মিনিংফুল মনে হচ্ছে। আগের ঝিমধরা রোগ আমার সেরে উঠেছে। তুমিই সে ডাক্তার যে আমাকে সারিয়ে তুলেছে, রী—।"

"ইজ নট এভরিথিং মিনিংলেস?" বিদ্রুপের মতো শোনায় রীটার প্রশ্ন।

●

ঘুম থেকে উঠেই রঞ্জনের মনে পড়ে আজ রবিবার। হাতঘড়িতে তাকাতেই লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ে। রীটা এখুনিই তাকে চার্চে নিয়ে যেতে আসবে। চটপট মুখহাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নেয় সে। নিমেষেই রীটা গাড়ী নিয়ে হাজির হয়। সঙ্গে মিরাণ্ডা ও জুয়ান।

প্রথম সারিতেই তারা জায়গা করে নেয়। সামনেই পালপিটের দেওয়ালে ক্রুশবিদ্ধ মস্ত খৃষ্ট, সৌমকান্তি সে পুরুষ উঁচিয়ে রেখেছেন হাত ক্ষমার ভঙ্গিতে। বিরাট বিরাট রোজ উইনডো রঙিন কাচে তৈরি যেন খোলা পাপড়ি গোলাপ একটার পর একটা। বাইবেলের নানা উপাখ্যান শিল্পির তুলির আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে স্টেইনগ্লাসের কয়েকটা জানালায়। ভেতরে এত জায়গা যেন এলোরের সব লোক অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারে।

রঞ্জন চেয়ে দেখে বাঁদিকের সারিতে তার কলেজের কয়েকজন ছাত্রী তাদের দিকে তাকিয়ে গা টেপাটিপি করছে। দারুণ অস্বস্তি বোধ করে সে।

রীটার কানে কানে সে বলে চলে, "তোমায়-আমায় ঘিরে সর্বত্রই কৌতুক জমে উঠছে, কলেজে বিশেষ করে। নোটিস করনি ইভ্‌নিং ওয়াকের সময় বীচে কলেজের মেয়েগুলো আমাদের দেখে কেমন নিজেদের গায়ে ঢলে পড়ে। সেদিন কথা নেই বার্তা নেই প্রফেসার কৌসিক দুম করে বসে ফেললেন, 'হেলো, মিঃ সেন! হোয়েন আর উই হ্যাভিং দি গ্র্যান্ড ফিস্ট?"

অর্গানের গম্ভীর সঙ্গীতে গমগম করে গির্জার বাতাস। বিশ্বাসীদের দল ভক্তিতে চোখ বোজে। খৃষ্টের বন্দনা ছড়ায় 'হ্যালেলুজা'। ঘোলা চোখে রঞ্জন তাকিয়ে থাকে রঙিন জানালাগুলোর দিকে যার ভিতর দিয়ে সূর্যের দীর্ঘ সব বর্শা গেঁথে দিয়েছে স্বর্গ ও মর্তকে। রীটার বিশ্বাস রঞ্জনের মতো 'গডলেস' মানুষও রবিবারে চার্চে প্রেয়ার গাইলে ফেইথ অনায়াসে তার বুকে জোয়ার আনবে। গির্জার বাজনা রঞ্জনের ভাল লাগে কিন্তু কোন ধর্মীয় অনুভূতি তার জাগে না।

●

এলোরে মনসুন নেমেছে। আকাশ এফোঁড়-ওফোঁড় করে বৃষ্টির অজস্র ধারা সারবাঁধা নারকেল গাছকে চাবুক মারছে। ধুয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের পাথর আর রাস্তার তেতে ওঠা পিচ। হাওয়ায় হাওয়ায় তোলপাড় হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। গোঙাতে গোঙাতে আছড়ে পড়ছে রশিবাঁধা জেলেদের নৌকোর ওপর।

জল চুইয়ে পড়া রেইনকোট বারান্দায় খুলে রাখে রঞ্জন। মাথার টুপি এবং রবারের গামবুটও ছুড়ে ফেলে সে হাল্কা হয়। সোজা রীটার ঘরে সে চলে আসে। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব সারা বাড়ীতে সে বুঝতে পারে। রীটার ঘরে মিরাণ্ডা এবং মিঃ ডিস্যুজার সঙ্গে দেখা হয়। অপরাধীর মতো তারা ফ্যালফ্যাল করে রঞ্জনের দিকে তাকান। মিঃ ডিস্যুজার পাতলা ঠোঁট দুটো মৃদু কাঁপতে থাকে। বিধ্বস্ত চুল আর রাত্রের ড্রেসিং গাউনে রীটা বসে আছে মোজাইক করা ফ্লোরের উপর। দুমড়ান কাঠের ক্রুশ হাতে ধরে নির্বাক চেয়ে আছে সে মাটির দিকে। রঞ্জন ক্রুশটা চিনতে পারে। ওটা পাঞ্জিম থেকে এনেছিল সে রীটার জন্মদিনের প্রেজেন্ট।

বিস্ময়ের অবধি থাকে না রঞ্জনের, "হোয়াট ইজ গোয়িং অন?" হিংস্র হায়নার মতো শোনায় তার স্বর।

মিরাণ্ডা ব্যাকুলভাবে বলেন, "ইউ নো ইট অল, মিঃ সেন......। লিভ রী—অ্যালোন!"

রঞ্জন—"কি হয়েছে রীটা, বল, বল।"

রীটা—"আমি পারব না, পারব না। ফরগিভ মি প্লিজ।"

রঞ্জনের বুকে যেন একটা ধারাল ছুরি ঢুকিয়ে দেয়, "কি ভয়ংকর! বাঙ্গালোর থেকে এইমাত্র কলকাতায় টেলিগ্রাম করে ফিরছি। বাড়ীতে বলে দিয়েছি তোমাকে নিয়ে এগারো তারিখেই পৌঁছে যাব, রীটা। ওদের সঙ্গে পাক্কা ছয় বছর বাদে দেখা হবে। সেভ মি রী—।"

রীটা দেওয়ালে টাঙানো খৃষ্টের বিরাট ছবিটার দিকে আঙুলে দেখায়, "কিছুতেই ভরসা পেলাম না 'জন। তোমাকে কথা দেবার পর রাতের পর রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। বীভৎস সব নাইটমেয়ার ঘিরে ধরেছে আমাকে। কত কেঁদেছি জিসাসের কাছে। তবু তোমার স্ত্রী হবার অনুমতি দেননি তিনি আমাকে। প্লিজ ফরগিভ মি, 'জন!"

রঞ্জন যন্ত্রণায় ছটফট করে, "তাই যদি হয় তবে এখুনিই চল ফাদারের কাছে আমাকে ক্রিশ্চান করিয়ে নেবে। তাতেই যদি তোমার আমাকে বিয়ে করতে ভরসা হয়, চল, এখুনিই চল।"

"যাবো? সত্যি যাবো?" মুহূর্তের জন্য রীটার জলে ভেজা ডাগর ডাগর চোখগুলো চিকচিক করে ওঠে আলোয়। পরমুহূর্তেই "নো, নো"—বলে ভয়ে চোখ বোজে। "জিসাস ক্রাইস্ট ইন হেভেন,হেল্প দিস্ উইমেন, প্লিজ!"

মিঃ ডিস্যুজা মন্ত্রপাঠের মতো উচ্চারণ করে চলেন, "ইট ইজ অল সো এমব্যারাসিং!" তিনি বুকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকেন।

রঞ্জন থামে না, "রীটা তুমি মনে করতে চেষ্টা কর ঘনিষ্ঠভাবে মেশার আমাদের অজস্র দিনগুলো। ভুলে যেও না আমাদের লঞ্চ আর গাড়ী করে গোয়া চষে বেড়ানর কথা। ডোন্ট ফরগেট আওয়ার স্টোলেন কিসেস। আমাকে অন্ধকারে পিষে মের না, রীটা। হ্যাভ মার্সি, আই বেগ ইউ, রীটা।"

তারপরই হেসে যেন গাড়িয়ে পড়ে রঞ্জন, হাসতে হাসতে দমবন্ধ হয়ে আসে তার, তলপেটে খিল ধরে যায়, "হো-হো-হো-হো--হো...। ইউ ওয়ের রাইট রীটা, এভরিথিং ইজ মিনিংলেস। অ্যাবসলিউটলি মিনিংলেস, রীটা।"

।। উনিশ ।।

আগস্ট অভ্যুত্থান গণসত্যাগ্রহ নয়। গণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ করার পূর্বেই গান্ধীজীকে বন্দী করা হয়। সুতরাং ওটা অনারব্ধ থেকে গেল। ইতিহাসের গর্ভে অজাত সন্তানের মতো।

তার বদলে যেটা ঘটে গেল সেটা একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রাকৃতিক উচ্ছ্বাস। বন্যা বা ভূমিকম্প। কিন্তু তার পেছনেও কংগ্রেস কর্মীদের হাত ছিল। বেশীর ভাগই বাম-পন্থী, কিছু কিছু আবার গোঁড়া গান্ধী-পন্থী। সচরাচর যাঁরা খাদির কাজ নিয়ে ব্যস্ত। রাজনীতির ঘোলাজলের বাইরে পবিত্র জীবন যাপন করেন।

কলকাতায় তখন নিষ্প্রদীপ। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ালে কেই বা টের পাচ্ছে? একদিন আঁধার রাতে কলকাতার এক নির্জন পথে আমরা তিনজন পায়চারি করছিলুম। আমার স্ত্রী, আমি ও আমাদের গান্ধীবাদী বন্ধু। অবাক কান্ড! তিনি তখন আন্ডার-গ্রাউন্ডে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরছেন। আসাম থেকে তাঁর কাছে কর্মীরা আসেন নির্দেশ নিতে। ফিরে গিয়ে সেই নির্দেশ পালন করেন। কী রকম নির্দেশ? টেলিগ্রাফের তার কাটা, রেললাইন ভেঙে ফেলা এসব শুনলে আমি স্তম্ভিত হতুম না, কারণ বিহারেও এসব হয়েছিল, আর আমি তখন বাঁকুড়ায়। স্তম্ভিত হলুম যখন বন্ধুর মুখে শুনলুম যে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন রেলের পুল ধ্বংস করতে। কী সর্বনেশে কথা!

তিনি আমাকে বোঝান যে রেলের পুল ধ্বংস করলে মিলিটারি যাতায়াত বন্ধ হবে। জাপানীরা এগিয়ে আসতে পারবে না, ইংরেজরাও এগিয়ে যেতে পারবে না। মাঝ-খানে একটা এলাকা থাকবে, সেটা নো ম্যান্স ল্যান্ড। সেখানে আমরাই রাজা। তাছাড়া সেটা হবে যুদ্ধমুক্ত অঞ্চল। সেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলবে না। দেশ যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় তার জন্যেই যাতায়াতের ব্যবস্থা অচল করে দিতে হবে।

দেশ যাতে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হয় তার জন্যে দুই পাগলা ষাঁড়কে পরস্পরের কাছ থেকে ঠেকিয়ে রাখা যে শান্তিবাদীর কর্তব্য সেবিষয়ে আমার সংশয় ছিল না। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য ছিল, 'উপায়টা কি অহিংস? রেলের পুল ধ্বংস করা—।'

'আমাদের সম্পত্তি, ইংরেজদের সম্পত্তি তো নয়। আমাদের সম্পত্তি আমরা যদি ধ্বংস করি তবে হিংসা হবে কেন? মানুষকে তো মারছিনে। বরং মানুষকে যুদ্ধের মুখ থেকে বাঁচাতে চাইছি। নির্দেশ দেওয়া আছে যেন একটিও প্রাণ নষ্ট না হয়।' বন্ধুর উক্তি।

অর্থাৎ এটাও একপ্রকার পোড়ামাটি। তফাৎ এই যে এটা দুই যুধ্যমান পক্ষের বিরুদ্ধে। ইংরেজরা বলবে সাবোটাশ। কিন্তু ইতিহাস বলবে আত্মরক্ষা।

ওই পুল হয় ইংরেজরা ওড়াত, নয় জাপানীরা ওড়াত। ওসব রেললাইন হয় ইংরেজরা ওপড়াত, নয় জাপানীরা ওপড়াত। ওসব টেলিগ্রাফের তার হয় ইংরেজরা কাটত, নয় জাপানীরা কাটত। জাপানীরা যদি আক্রমণ করত তা হলে ওর নাম হতো মিলিটারি নেসেসিটি। তখন সকলের মুখ বন্ধ। কিন্তু শান্তিবাদীরা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়। ও যে অহিংসা নয়।

গান্ধীজীকে আগা খান প্রাসাদে বন্দী করে বড়লাট তাঁকেই দায়ী করেন আগস্ট অভ্যুত্থানের যাবতীয় যুদ্ধবিরোধী সমাজ-বিরোধী আইনবিরোধী ঘটনার জন্যে। তিনি সে দায়িত্ব অস্বীকার করেন ও বড়লাটকে পরামর্শ দেন আদালতে বিচারের জন্যে পাঠাতে। এই নিয়ে পত্রব্যবহার অনেকদিন ধরে গড়ায়। তারপরে বেরোয় সরকারী প্রচার-পুস্তিকা, তাতে অভ্যুত্থানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে কংগ্রেসকে ও গান্ধীকে বিনা বিচারে অপরাধী করা হয়।

দুনিয়ার চারদিকে রটে গান্ধী ও কংগ্রেস যে কেবল ব্রিটেনের শত্রু তাই নয়, জাপানের মিত্র ও তাঁদের কার্যকলাপ যুদ্ধজয়ের পরিপন্থী। গান্ধীর বিরুদ্ধে বিশেষ অভি-যোগ তিনি অহিংসার বদলে হিংসার বিধান দিয়েছেন।

এর কোনো প্রতিকার খুঁজে না পেয়ে গান্ধীজী অনশনের সংকল্প নেন। তখন তাঁকে জানানো হয় তাঁকে অনশনকালের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি তার উত্তরে বলেন, ছেড়ে দিলে তিনি অনশন নাও করতে পারেন। তখন প্রতিকারের অন্য উপায় পাবেন। তা শুনে বড়লাট সিদ্ধান্ত করেন যে অনশনটা বিনা শর্তে মুক্তি পাবার জন্যে একটা চাল। কাজেই অনশনের একুশ দিন ছেড়ে দেওয়া হবে এরূপ প্রস্তাব রদ করেন।

এমনি করে শুরু হয় সেই হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতা। গান্ধীজীর না হোক আমাদের। কিছুই করতে পারিনে আমরা। এত অসহায়! ওই অনশন পর্যন্তই আমাদের দৌড়। সেটা আর কতটুকু সময়ের জন্যে! একুশ দিন ধরে চলে তাঁর অনশনের ম্যারাথন। কী করে যে বাঁচলেন!

লোকে একটি আঙুলও নাড়ল না। দার্শনিকের মতো মৌন হয়ে দেখল। ছ'মাস আগে যারা অত বড়ো একটা বিদ্রোহ করতে পারল ছ'মাস পরে তারা একেবারে ঠান্ডা। এই হচ্ছে হিংসার পরিণাম। হিংসাকে প্রতি-হিংসা দিয়ে দমিয়ে দিলে সে আর মাথা তুলতে পারে না। সিপাহী বিদ্রোহের বেলাও তাই হয়েছিল।

গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টির জন্যে গভর্নমেন্ট উদার ব্যবস্থা করেছিলেন। চন্দনকাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেটদেরও সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যাতে শান্তিভঙ্গ না হয়। আমার ম্যাজিস্ট্রেট বন্ধু খবরটা আমাকে দেন। না, শান্তিভঙ্গের লেশমাত্র লক্ষণ ছিল না। গান্ধীজীর প্রয়াণ লোকে শান্তভাবেই নিত। কিন্তু ক্ষমা করত না ইংরেজদের।

ইতিহাসের রায় কী হবে বলতে পারিনে, কিন্তু আমার নিজের রায়, ওই আগস্ট মাসটাই তাঁর জীবনের ফাইনেস্ট আওয়ার, সুন্দরতম ঘটিকা। যুদ্ধকালে আর কখনো কেউ যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী জন-আন্দোলনের ডাক দিয়ে যাননি। রেজিস্টান্স বা প্রতিরোধ হয়েছে হিটলার অধিকৃত ফ্রান্সে। যুগোশ্লাভিয়ায় হয়েছে নাৎসী আক্রমণের পর সশস্ত্র বিদ্রোহ। কিন্তু ওসব সংগ্রাম যুদ্ধকালীন হলেও শান্তির জন্যে নয়, দুই আগুনের মধ্যবর্তী নয়। তা ছাড়া ওসব দেশের সামরিক শাসকগণ অনবচ্ছিন্ন দুই শতাব্দীর বদ্ধমূল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ঊর্ধ্বতম অঙ্গ নন। গান্ধীর ওই কীর্তি

যদিও গণসত্যাগ্রহ নয় তা হলেও ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বাইরে যদিও থাকতে দেওয়া হলো না তাঁকে, তবু নিছক আত্মিক বল দিয়ে তিনিই নেপথ্য থেকে প্রেরণা দিচ্ছিলেন।

এই প্রসংগে তিনি বলেছিলেন মনে আছে যে শরীর না থাকাটাই সবচেয়ে ভালো, শরীরটা কেবল বাধা দেয়। অবারিত আত্মা তা হলে আরো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তিনি যদি শুধু চিন্তাই করেন, আর কিছু না করেন, তা হলেও কাজ তাঁর চিন্তামতো হবে। অর্থাৎ তাঁকে জেলেই পোরা হোক আর গুলিই করা হোক, যে চিন্তা সেই কাজ। এখন চিন্তাটাই আসল। চিন্তার সাহস ক'জনের আছে? আর সে চিন্তা এমন চিন্তা হওয়া চাই যা ইতিহাসের গতিপথের নির্দেশক। ব্যক্তিবিশেষের দিবা-স্বপ্ন নয়।

গান্ধীজী সেদিন ইতিহাসের গতিপথ নির্দেশ করে দেন। সংগে সংগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গুলি করা হতো যদি জাপান সেই মুহূর্তে জয়যাত্রা করে ইংরেজকে কোণঠাসা করত। গান্ধীজী সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন বলেই এমন লগ্নে বিদ্রোহ করেন যে লগ্ন জাপানী আক্রমণের প্রতিকূল। যখন বাংলায় আসামে চতুর্মাস্যা। তা ছাড়া একথাও তিনি বলে রাখেন যে জাপানীরা তাঁর আন্দোলনের সুযোগ নিলে তিনি তা বন্ধ করে দেবেন।

কিন্তু এহো বাহ্য। এর চেয়ে গূঢ় সত্য হলো তাঁর হৃদয় ছিল ইংরেজদের প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ। তিনি ও'দের আন্তরিক ভালোবাসতেন। আর ও'রাও সেটা অনুভব করতেন। আগস্টের আগে বড়লাট বলেছিলেন প্রখ্যাত মার্কিন লেখক লুইস ফিশারকে—

'Make no mistake about it.... The old man is the biggest thing in India .. He has been good to me .... If he had come from South Africa and been only a saint he might have taken India very far. *But he was tempted by politics.. I have been here six years and I have learned restraint.... But* if I felt that Gandhi was obstructing the war effort I would have to bring him under control.'

তা ছাড়া ইংরেজ প্রধানরাও দেয়ালের লিখন পড়তে জানতেন। সিংগাপুর, মালয়, বর্মার পতন তাদের প্রেস্টিজে নাড়া দিয়েছিল। শুধুমাত্র গায়ের জোরে তো এত বড়ো সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায় না। প্রভাব প্রতিপত্তিও চাই। বড়লাটই লুইস ফিশারকে বলেছিলেন,

'আমরা ভারতবর্ষে থাকতে যাচ্ছিনে। অবশ্য, কংগ্রেস একথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমরা এদেশে থাকব না। আমরা প্রস্থানের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।'

স্বরাষ্ট্রসচিব ম্যাকসওয়েল তো আরো খোলসা করে বলেছিলেন ফিশারকে, 'যুদ্ধ শেষ হবার দু'বছর বাদেই আমরা এদেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি।'

এসব কথা আগস্ট ঘটনাবলীর পূর্বের। পূর্বের থেকেই প্রস্থানের ভাব মনে উদয় হয়েছিল। গান্ধীর সংগে বড়লাটের খুব বেশী মতভেদ ছিল না। মাত্র পাঁচ বছর এদিক ওদিকের। একটা জাতির ইতিহাসে পাঁচটা বছর এমন কী বেশী সময়! তবু গান্ধীর কাছে ব্যবধানটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটিকায় তিনি ভারতকে এমন এক মহত্ত্ব দিতে চেয়েছিলেন যে আর সব দেশের লোক তার দিকে শ্রদ্ধার সংগে তাকাত। তার কথা শ্রদ্ধার সংগে শুনত। কে জানে সে হয়তো বিশ্বশান্তির দূত হতো।

অনেকেই ধরতে পেরেছিলেন যে গান্ধীজীর প্রকৃত উদ্দেশ্য জাপানের সংগে সম্মানজনক সন্ধি করা। সেটা ইংরেজ থাকতে হবার নয়। ইংরেজ আমেরিকানরা জাপানের আত্মসমর্পণ চায়। জাপানও বিনা-শর্তে আত্মসমর্পণ করবে না। এরাও শর্তাধীন আত্মসমর্পণ গ্রাহ্য করবে না। তা হলে ভারত কেনই বা এই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়বে। জাপান এমন কী ক্ষতি করেছে ভারতের!

তা হলে দেখা যাচ্ছে ওর পেছনে ছিল পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্ন। সে প্রশ্নে গান্ধী বড়লাট কখনো একমত হতে পারতেন না। গান্ধী-চার্চিল তো উত্তরমেরু দক্ষিণমেরু। রুজভেল্ট ভারতের বন্ধু হলেও জাপানের শত্রু। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি যদি ভারতেরও পররাষ্ট্রনীতি হয় তবে রুজভেল্টের সৌজন্যে শাসনক্ষমতা হাতে পেয়ে কংগ্রেস রুজভেল্টেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ও জাপানের শত্রু হবে। অমন করলে জাপানকে খোঁচানো হয়। সে কি সন্ধি করবে ভারতের সংগে? দেশ কি যুদ্ধক্ষেত্র হবে না? গান্ধী যুদ্ধ ডেকে আনতে চান না। কিন্তু জাপান যদি আসে প্রতিরোধ করবেন।

গান্ধীজীর পররাষ্ট্রনীতি ছিল স্বতন্ত্র ও স্বাধীন দেশের মতো। তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেটাও স্বাধীন মানুষের মতো।

চার্চিল রুজভেল্টের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলার নাম ভারতীয় স্বাধীনতা নয়। জাপানকে রুখতে হবে একশো বার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তাও চালাতে হবে। তাতে যদি যুদ্ধ একটু আগে শেষ হয় তা হলে তো বিশ্বের আরাম, আর যদি কোনোপক্ষকে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ না করতে হয় তবে তো শান্তি সুগম।

যেখানে সামরিক কর্তৃত্ব নিয়ে গভীর মতবিরোধ, যেখানে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে মূলগত মতভেদ সেখানে যুদ্ধকালীন গভর্নমেন্ট গঠন করা যায় না। যুদ্ধকালীন অসহযোগই সেখানে একমাত্র নির্ভরযোগ্য নীতি। আগস্ট অভ্যুত্থান গভর্নমেন্ট পরিবর্তনের জন্যে পরিকল্পিত হয়নি, যদিও কংগ্রেসের আগস্ট প্রস্তাবটা পড়লে সেইরকম মনে হবে। পরিকল্পনাটা জনগণকে জাগানো ও তাদের ভাগ্য তাদের হাতে নিতে শেখানো। যুদ্ধে নয়, যুদ্ধবিরোধিতাতেই তাদের আত্মশক্তির উপলব্ধি।

অগাস্ট অভ্যুত্থান অল্পদিন স্থায়ী হলেও আত্মউপলব্ধির একটা মধুর স্বাদ রেখে যায়। তার সঙ্গে অহিংসার স্বাদ থাকলে সে মাধুরী তিক্ততাহীন হতো। সেটা হবার নয়। স্বাধীনতা যেমন অনেক দূর এগিয়ে গেল, তেমনি অহিংসা অনেক-দূর পেছিয়ে রইল। আগস্ট অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি স্বাধীনতার দিক থেকে প্রগতি, অহিংসার দিক থেকে অগতি। গান্ধীজী একই সঙ্গে জিতলেন ও হারলেন। দেশ দিনকের দিন সহিংস ও অরাজক হলো। তবে তার আগে কিছুকাল বলহীন ও অবসন্ন।

সেই অবসাদের সময়টাতেই বাংলায় মন্বন্তর ঘটে যায়। বাংলা সরকার চরম অপদার্থতার পরিচয় দেন। আশ্চর্যের কথা বড়লাট লিনলিথগাউ ছিলেন কৃষিবিশারদ। প্রথমবার ভারতে এসেছিলেন কৃষি কমিশনের সভাপতি হয়ে। ভারত সরকারের সর্বময় কর্তা হিসাবে তিনিও দায়িত্ব এড়াতে পারতেন না। মন্বন্তর বিহারে ও যুক্ত-প্রদেশেও ছড়াতে যাচ্ছিল। সেসব প্রদেশের গভর্নররা কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করেন। ছুটি নিয়ে আলমোড়ায় বসে আমি গভর্নর হ্যালেটের সুব্যবস্থার সাক্ষী হই।

বাংলা আর যুক্তপ্রদেশ এই দুই জায়গার অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই শিক্ষা হয় যে ভারতীয় ধনিকদের বিশ্বাস করা যায় না, তাদের উপরে অঙ্কুশ প্রয়োগ করা চাই। আর সেকাজ ইংরেজরাই ইচ্ছা করলে পারতেন। সেখানে নির্বোধ নন।

কথাগুলো আমি গান্ধীজীকে শোনাতে চেয়েছিলুম। কিন্তু শোনাতে পারিনি। শোনালে লাভ কী হতো? ভারতীয় ধনিক-দের সুমতি উদ্রেক করা তাঁরও সাধ্যের বাইরে। অহিংসার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল কী করে গরিবকে বড়লোকের শোষণ থেকে বাঁচাতে হয়। সে সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার আগেই আরেক সমস্যা তাঁর কাল হয়। সাম্প্রদায়িক সমস্যা।

গান্ধীজী যখন জেলে তখন তাঁর পক্ষে অবহিত হওয়া সম্ভব ছিল না সাম্প্রদায়িক দলগুলি কীভাবে পরস্পরবিরোধী কার্যক্রমের দ্বারা পরস্পরের বলবৃদ্ধি করে চলেছে। দৃশ্যত শত্রু, বস্তুত মিত্র। সাম্প্রদায়িকতা উভয়ক্ষেত্রেই জাতীয়তার নামাবলী ধারণ করেছিল। মুশ্লিমরা নাকি এখন একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নেশন। তেমনি হিন্দুরাও এখন একটা সম্প্রদায় নয়, একটা নেশন। এ যেমন মুশ্লিম লীগের নয়া থীসিস তেমনি হিন্দু মহাসভার নতুন তত্ত্ব হলো হিন্দুরাই একমাত্র নেশন, মুসলমান খৃষ্টানরা নেশন নয়, এলিয়েন। কতকটা জার্মান ইহুদীর মতো। সেদিন জনমত এমন বিভ্রান্ত ছিল যে জাতীয়তার মুখোশপরা এই সাম্প্রদায়িতাকে জাতীয়তা বলে অনেকে ভুল বুঝেছিল ও প্রশ্রয় দিয়েছিল।

যে প্রদেশে ত্রিশ লক্ষ হিন্দু মুসলমান একটু ফ্যান না পেয়ে একমুঠো ভাত না পেয়ে পথে-ঘাটে মারা যায় সেই প্রদেশেই শোনা গেল উপনির্বাচনে মুশ্লিম লীগ জিতেছে। আমার ধারণা ছিল লীগ হেরে যাবে, কারণ যুদ্ধের সময় যখন চট্টগ্রাম নোয়াখালী, বরিশাল বিপন্ন তখন লীগ অগাস্ট অভ্যুত্থানের মতো কোনো আন্দোলন করেনি, যা করবার তা করেছে কংগ্রেস। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন। অগাস্ট অভ্যুত্থানে মুসলমানরা প্রায় জায়গায় সরে দাঁড়িয়েছে। আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তার সময় তিনি বলেন, 'আমার প্রদেশের মুসলমানরা কংগ্রেসকে অভিশাপ দিচ্ছে।'

তিনি যুক্তপ্রদেশের মুসলমান। সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা তাঁর স্মরণে জ্বলজ্বল করছে। 'হিন্দু মুসলমান একযোগে বিদ্রোহ করে ফায়দা কী হলো? মুসলমানদের ধরে ধরে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ওদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। আর হিন্দুরা সেসব কিনে বড়লোক হয়ে গেল। এই অগাস্ট অভ্যুত্থানও তো সেইরকম একটা বিদ্রোহ। এতে যোগ দিলে মুসলমানরাই পস্তাবে।

আমার অপর এক মুসলমান বন্ধু খাকসার। এমন ত্যাগবীর আমি দেখিনি। মন্বন্তরের সময় তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা করলে বহুলোক প্রাণে বাঁচত। স্বার্থপর মুসলমান মন্ত্রী তাঁকে তা করতে দেননি বলে তিনি পদত্যাগ করেন। আমাকে বলেন, 'আমরা সবাই এই দুর্ভিক্ষের দায়ে দায়ী। কারো বিবেক নির্মল নয়। আপনারও না।' আমি বলি, 'আমি তো জজ। আমার কী দায়!' তিনি বলেন, 'আপনি এই সরকারের কর্মচারী।'

আমার সেই গান্ধীভক্ত খদ্দরভক্ত অথচ খাকসার বন্ধুও এর আগেই বলেছিলেন যে, 'আপনি আশা করছেন আমরা ও আপনারা এক নেশন গঠন করব। তা হবে না।' পরে তিনি এক খাকসার পত্রিকা পাঠিয়ে দেন। দেখি তিনি পাকিস্তান চান।

অগাস্ট অভ্যুত্থান একটা প্যারাডক্স। পাকিস্তানকেও সে কয়েক কদম এগিয়ে আনে। গান্ধী কী করে জানবেন যে, স্বাতন্ত্র্যকামী মুসলমানরা কংগ্রেসের ভয়েই পাকিস্তানী হবে।

কবি শ্রীবিষ্ণু দের ষাট বছর

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান নায়ক কবি বিষ্ণু দে-র সম্প্রতি ষাট বছর পূর্ণ হলো। সেই উপলক্ষে মাত্র কয়েকদিন আগে গ্রুপ থিয়েটার গোষ্ঠী তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন বিড়লা আকাদমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার রঙ্গালয়ে।

শ্রীবিষ্ণু দে প্রায় চল্লিশ বছর ধরে কাব্যসাধনা করে আসছেন। তাঁর কাব্য-গ্রন্থের সংখ্যা ১৭টি। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন সংকলন, অনুবাদ, প্রবন্ধ ও সমালোচনার গ্রন্থ। মাত্র কয়েক বছর আগেই তিনি সাহিত্য আকাদমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

বিষ্ণুবাবু অমৃতের প্রথম থেকেই একজন নিয়মিত লেখক ও শুভানুধ্যায়ী। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি। এই সংখ্যায় অন্যত্র তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হল।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

কাঠগড়ায় লেখক

এই কালটিতে লেখকরাই সবচেয়ে অবহেলিত এবং উৎপীড়িত, কিন্তু তাঁদের দাবী-দাওয়া নিয়ে জনমত গড়ে তোলার মত কোনো শক্তিশালী দল নেই। যাঁরা সংবাদপত্র পাঠ করেন তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে সম্প্রতি আনাতোলি কুজনেৎসভ কিভাবে ব্রিটেনে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। এর আগে আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন ও ইউলি গ্যালানস্কির কণ্ঠ নীরব হয়েছে, কবি ইয়েভগেনী ইভতুসেংকো এবং আঁদ্রে ভজনেসেনস্কীকে নাকি ধীরে ধীরে 'নিষ্পিষ্ট' করা হচ্ছে। এডওয়ার্ড ক্র্যাংকস এই কথা লন্ডন অবজারভারে লিখেছেন।

সোলঝেনিৎসিনের 'ওয়ান ডে ইন দি লাইফ অব আইভান ডেনিসোভিচ' বাংলায় অনুবাদ করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর ইভতুসেংকোর অজস্র কবিতা বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সুতরাং এই দুজন লেখক এদেশে যথেষ্ট পরিচিত। আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের নতুন উপন্যাস 'দি ফার্স্ট সার্কল' সম্প্রতি লন্ডনে প্রকাশিত হয়েছে, এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে এবং কুজনেৎসভের দুর্দশার কথা আরেকটি পৃথক প্রবন্ধে আলোচিত হবে। সোলঝেনিৎসিনের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'আইভান ডেনিসোভিচ' যিনি পাঠ করেছেন এই বিষয়ে অধিকতর সংবাদের জন্য তাঁর আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

১৯৬৬ খৃস্টাব্দে আঁদ্রে সিনিয়াভস্কী এবং ইউলি ড্যানিয়েলের যে বিচার অনুষ্ঠিত হয় এক হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে তা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অভিযোগ, আত্মপক্ষ-সমর্থন, এবং সিনিয়াভস্কী (আব্রাম টার্টজ) এবং ড্যানিয়েলের (নিকোলাই আরঝাক) প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাদেশে সারা বিশ্বে তুমুল প্রতিবাদ উঠেছিল, স্তালিনের আমলের পর রাশিয়ার কোনো কান্ড নিয়ে আর এত হৈ-চৈ হয় নি।

আদালতের প্রতিদিনের বিবরণের সারাংশ অকসফোর্ডের সেন্ট অ্যান্টনী কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপক ম্যাকস হেওয়ার্ড সংকলন ও সম্পাদনা করে প্রকাশিত করেছেন। ম্যাকস হেওয়ার্ড রুশ সাহিত্যের কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। ম্যানিয়া হ্যারীর সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি প্যাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো' অনুবাদ করেছেন। মায়কোভস্কীর 'বেড বাগে'র অনুবাদ ম্যাকসের করা। দুদিনেৎসভের 'নিউ ইয়ার্স টেল' এবং সোলঝেনিৎসিনের 'আইভান ডেনিশোভেচে'র অনুবাদও ম্যাকসের। এ ছাড়া তিনি লিটারেচার অ্যান্ড রেভোলিউসান ইন সোভিয়েট রাশিয়া ১৯১৭-৬২ গ্রন্থটির অন্যতম সম্পাদক। সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে ম্যাকস একজন অধিকারী ব্যক্তি। এই বিষয়ে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। তিনি লীডসের রুশ ভাষা বিভাগের প্রধান ছিলেন ১৯৫৫-এ, বর্তমানে সেন্ট অ্যান্টনি কলেজের একজন ফেলো।

কোনো কিছু লেখার অপরাধে লেখকদের এই সর্বপ্রথম কাঠগড়ায় হাজির হতে হল সোভিয়েত রাশিয়ায়। এর আগে অনেকের নির্বাসন হয়েছে, কারারুদ্ধ করা হয়েছে বা নিশ্চিহ্ন করাও হয়েছে। কিন্তু এর আগে আর বিচার হয় নি, বিচারে মুখ্যতম সাক্ষী হিসাবে হাজির করা হয়েছে তাঁদেরই রচনাকে।

১৯৬৬-র ১০ই ফেব্রুয়ারী বিচার শুরু হল, চার দিনব্যাপী বিচার। বিচারান্তে দুজন লেখকের যথাক্রমে সাত আর পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। এর আগে প্রতি-বিপ্লবী ক্রিয়াকান্ডের জন্য গুলি করে মারা হয়, কবি গুমিলেভকে। বিশের দশকে বোরিস পিলনিয়াককে অস্বীকার করা হয়, তিনি বিদেশে পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বিচার হয় নি, ১৯৩৭-এর পর তিনি নিরুদ্দেশ হন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করেন নি কর্তৃপক্ষ। আইজাক ব্যাবেলকে ১৯৩৯-এ গ্রেপ্তার করা হয়, কারণটা কি প্রকাশ করা হয় নি, তবে সম্ভবত অ-সাহিত্যিক কোনো কর্মের জন্যই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়, তিনি ধরা পড়ার অনেক আগেই লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। আখমাটোভা এবং হাস্যরসিক মিখাইল জোসঝংকো ১৯৪৬-এ অস্বীকার করা হয়, তাঁদের রচনায় সোভিয়েটবিরোধী মনোভাব ছিল। তাঁদেরও বিচার হয় নি, শুধু সোভিয়েট ইউনিয়ন অব রাইটার্স নামক প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। বোরিস পাস্তেরনাকের ঘটনা ত অতিসাম্প্রতিক এবং অতিআলোচিত।

এই সব কারণে এই বিচারটি কুখ্যাত সাক্কো-ভ্যানজেটির মামলার সঙ্গে তুলনা করেছেন 'দি স্যাটারডে রিভিয়্যু' নামক বিখ্যাত সাহিত্য সাপ্তাহিক। তবে এই বিচারটির সাহিত্যিক মূল্য আছে এবং সেই কারণে সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ব্যাপার। ম্যাকস হেওয়ার্ড বিচারবিবরণী অনুবাদ করেছেন, সম্পাদনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে একটি ৩৮শ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাও লিখেছেন। বিচারবিবরণীটা

পশ্চিম জগতে পৌঁছেছিল কোনো অপ্রকাশ্য সূত্রে, মনে হয় কিছু লেখক এই ঘটনার পিছনে হয়ত আছেন।

ম্যাকস হেওয়ার্ড লিখেছেন যে এই সব বিবরণ যে যথাযথ এবং খাঁটি তা তিনি সোভিয়েত পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত সংবাদ ও অন্যান্য পশ্চিমা সংবাদদাতাদের বে-সরকারী রিপোর্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন।

হেওয়ার্ড লিখছেন যে আদালতগৃহে মুষ্টিমেয় যে সব নির্বাচিত শ্রোতা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ হয়ত নোট নিয়ে থাকবেন। হয়ত অংশত এর অনেকখানি পরে আবার নতুন করে লেখা হয়েছে। মোটামুটি বিবরণ প্রায় ঠিকই আছে তবে যেখানে এই অজানা সংবাদসংগ্রাহক ব্যক্তিবিশেষের নাম ভালো বুঝতে পারেন নি সেখানে ত্রুটি ঘটেছে।

দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে দুই আসামীর স্ত্রীরা যে বিবৃতি দিয়েছিলেন সেই বিবৃতি মস্কোর বুদ্ধিজীবীর সমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছিল, আসামীদের সমর্থনে প্রদত্ত সাক্ষীদের সওয়াল প্রভৃতি। ম্যাকস হেওয়ার্ড চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব ধারাবাহিকত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে সিনিয়াভসকী এবং ড্যানিয়েলের এই মামলায় একটা নির্ভরযোগ্য কাঠামো খাড়া করতে।

এই দুজন লেখকই জন্মেছেন ১৯২৫-এ। সিনিয়াভসকী জাতে রুশ আর ড্যানিয়েল হলেন রাশিয়ান ইহুদী। ড্যানিয়েল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একজন প্রাক্তন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি আহত হয়েছিলেন ফলে পেন্সন পান। যুদ্ধের পর ড্যানিয়েল ফাইলোলজিক্যাল ফ্যাকালটি অফ মস্কো য়ুনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন এবং এইখানেই তাঁর সঙ্গে মাদাম জাময়স্কার সঙ্গে পরিচিত হন, এই মাদামকে আরো দু-একজন বিদেশীর সঙ্গে রাশিয়ায় থেকে পড়াশোনার অনুমতি দেওয়া হয়, তাঁর বাবা ছিলেন ফরাসী নেভ্যাল অ্যাটাসে। মাদাম পরবর্তীকালে 'ল ম'দে' পত্রিকায় স্বীকার করেছেন যে ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে রাশিয়া ভ্রমণে এসে তিনি 'এ ব্রাম টার্জ' লিখিত প্রথম গ্রন্থ পাচার করেন। 'এস্পিরিট' বামপন্থী ক্যাথলিক পত্র, সেইখানেই প্রথম 'এ ব্রাম টার্জে'র রচনা প্রকাশিত হয় পরে পোলিস পত্রিকা 'কুলটুরা'য় কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। ধরা পড়ার কিছু আগেও তিনি গোর্কী ইনস্টিটুট অব ওয়ার্লড লিটারেচারের একজন প্রবীণ কর্মী ছিলেন। ছাত্র, পণ্ডিত এবং শিক্ষক হিসাবে তাঁর মস্কো শহরে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

সিনিয়াভসকী মার্কসহীন কম্যুনিজম বা অ-মার্কসীয় কম্যুনিজমে বিশ্বাসী। মামলার সময় তিনি স্বীকার করেছেন আদর্শবাদীর ভূমিকা নিয়েই তিনি যেটুকু করার তা করেছেন। অনেক রুশী বুদ্ধিজীবীর মত ১৯৫৬ খৃঃ বিংশতিতম পার্টি কনগ্রেসে ক্রুশ্চেভ যখন স্তালিন পর্বের কাহিনী প্রকাশ করলেন তখন তিনিও বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁর তিনখানি বই বিচারের বিষয়বস্তু 'দি ট্রায়াল বিগিনস' অন সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম এবং লিউবিমোভ। এই শেষোক্ত গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি। 'মায়ানগরী' এই নামে অনুবাদ করেছেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

এই উপন্যাসটি সিনিয়াভসকীর তৃতীয় উপন্যাস—সম্ভবত এই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ। লিউবিমোভ—এক স্বপ্নের জগৎ, অতিপ্রাকৃত কাহিনী। হয়ত লেখকের পরিচিত কোনো শহর। সলটিখোভ-স্খেরড্রিন 'হিস্ট্রি অব দি টাউন অব গ্লুপোভ' (১৮৬৯-৭০) গ্রন্থে জারতন্ত্রের রাশিয়া নিয়ে এক শ্লেষাত্মক বর্ণনা দিয়েছেন, তবে তার সুর আলাদা। সিনিয়াভস্কি আদালত বলেছেন—'গ্লুপোভ' কথাটিতেই দুটি গ্রন্থের পার্থক্য বোঝা যায়, গ্লুপোভ কথাটির অর্থ নির্বোধ। সলটিখোভ নিকোলাস প্রথমের কাল পর্যন্ত রাশিয়ায় এক নির্মম ইতিহাস বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সিনিয়াভস্কি বিচারকালে প্রবলভাবে অস্বীকার করেছেন যে তিনি সোভিয়েত রাশিয়াকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই কাহিনী ঈশপীয় আঙ্গিকের এবং পাস্তেরনাকের জিভাগো এবং কবিতায় একটি কেন্দ্রীয় সুরভিত্তিক। এই কাহিনীর মতে মানুষ যুগের হাতে বন্দী, কিন্তু সেই মানুষ এবং তার ইতিহাস কিন্তু চিরন্তন ধারাশ্রয়ী। সেখানে সে বাধা-বন্ধনহীন নিত্যকালের স্রোতে ভাসমান। এই গ্রন্থের একটি চরিত্র হঠাৎ অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ হবে, এই কৌশলটি লেখকের একটা প্রিয় শিল্পরীতি। অন্য কাহিনীতেও অনুরূপ ঘটনা আছে। লেনিয়া ছিল এক সাইকেল কারখানার শ্রমিক, কিন্তু এক ঐশী বা অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সে নিজের ইচ্ছা অপরের ওপর আরোপ করে প্রভাবিত করতে পারে এবং সেইভাবেই সে এক মে-ডে উৎসবে সোভিয়েত সরকারের কাছ থেকে কর্তৃত্বভার নিয়ে আপনাকে লিউবিমোভের শাসনকর্তা হিসাবে ঘোষণা করল, লিউবিমোভ শহরকে মহাকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল আর তার চারপাশে একটা অতিপ্রাকৃত যবনিকা সৃষ্টি করল। এই গ্রন্থের মাধ্যমে দেখা যায় লেখকের মনে খৃস্টীয় ধর্মবিশ্বাস এবং নিষ্ঠার অভাব নেই। ড্যানিয়েল আরঝাকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ যে প্রমাণ উপস্থাপিত করেন সেটি তাঁর একমাত্র উপন্যাস—'দিস ইজ মস্কো স্পিকিং'—এই উপন্যাসটিও ফেবলধর্মী এবং ইতালীর ছায়াছবি 'দি টেনথ ভিকটিমে'র সমতুল। অতিশয় আতঙ্ককর কাহিনী। উপন্যাসটির আঙ্গিক, বক্তব্য ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত সরকারবিরোধী এই কথা বললেন সরকার। সিনিয়াভসকীর তবু সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল কিন্তু ড্যানিয়েলের তেমন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা ছিল না বিচারপর্বের পূর্বে। কবিতার অনুবাদক হিসাবেই তাঁর খ্যাতি। এই মামলার কথা পশ্চিম জগতে পৌঁছলে জিয়ানকারলো ভিগোরেল্লি ১৯৬৫-র অকটোবরে প্রকাশ্যে এই সংবাদটি আলোচনা করেন। তিনি হলেন 'য়ুরোপীয়ান কম্যুনিটি অব রাইটার্সে'র সেক্রেটারি-জেনারেল। তাঁদের চেষ্টায় কোসিগিন, সুরকোভ প্রভৃতির কাছে

আবেদন জানানো হয়। কিন্তু তাঁরা লেখকদের গ্রেপ্তার সংবাদটুকু শুধু সমর্থন করে জানান যে যেটুকু আইনসঙ্গত তাই করা হবে। একটা প্রগতিবাদী শক্তি ও রক্ষণশীল মতামতের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছে ২৩শতম পার্টি কনগ্রেসে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। রুশ সাহিত্যের এই বিচার নানা দিক থেকে ঐতিহাসিক ও রোমাঞ্চকর—ম্যাকস হেওয়ার্ড তাঁর ভূমিকায় সেই বিশ্লেষণ সুন্দরভাবে করেছেন। এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছেন মণি গঙ্গোপাধ্যায় এবং 'বিচার' নামে তা প্রকাশিত হয়েছে।

—অভয়ঙ্কর

ON TRIAL — Translated, Edited and with an introduction by MAX HAYWARD: Published — Harper & Row, Publishers New York—London.
Price 4 Dollors and 95 Cents:

সাহিত্যের খবর

কবি সম্মেলন বা কবিতা পাঠের আসর কাব্য আন্দোলনে কতখানি সাহায্য করে, এ নিয়ে বিতর্ক থাকলেও কিন্তু পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই কবি সম্মেলন বা কবিতা পাঠের আসর দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। আমেরিকার 'আকাদমি অব আমেরিকান পোয়েটস' এমনই একটি সংগঠন, যার প্রভাব আমেরিকার কাব্য আন্দোলনে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। গত মে মাসে এই আকাদমির ৩৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে আমেরিকার একালের ছ'জন বিশিষ্ট কবি কবিতা পাঠ করেন। এঁ'রা হলেন—লুই বোগান, এলিজাবেথ বিশপ, রবার্ট লোয়েল, এলান টেট, রবার্ট ফিজারাল্ড এবং জন হুইলক। প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ রচনা থেকে চারটি-পাঁচটি করে কবিতা পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। এই সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৪ সালে। প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমতী হুই বুলক। সাধারণের মধ্যে কবিতা চর্চার প্রসারণ ঘটানোই ছিল এর উদ্দেশ্য।

শুনে আশ্চর্য হতে হয়, পূর্ব জার্মানীতে জুন মাসের সেরা বই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে একটি কবিতার বই। বইটির নাম 'সেনসিবল উয়েজ' কবি রাইনর কুনজে। বয়স ছত্রিশ। কবি কোন আলংকারিক চিত্রকল্প ব্যবহার করেন নি। তাঁর বাক প্রতিমা অনেকটা ব্রেখটের মত। কিন্তু কবি বর্তমানের জীবন থেকে দূরে সরে দাঁড়ান নি। বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে উত্তরণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন এই বই-এর মধ্যে।

ভাগবদ্গীতার রচয়িতা কে? পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জি এস খেইর এ সম্বন্ধে সম্প্রতি খুব একটা চাঞ্চল্যকর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'গীতা'র রচয়িতা তিনজন। 'কোয়েস্ট ফর দি গীতা' বলে বোম্বাই থেকে তাঁর একটি বই বেরিয়েছে। বইটিতে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। গীতা যে তিনজন লেখকের রচনা তার প্রমাণ, এতে তিন ধরনের কালি ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া তিন রকম কালিতে লেখা অংশের বাক রীতিও ভিন্ন ভিন্ন। ডঃ খেইর-এর বইটি প্রকাশের দিনে একটি ছোটখাট অনুষ্ঠান হয়। এতে পৌরোহিত্য করেন ডঃ গজেন্দ্র গাদকর। তিনি বলেন, 'গীতা সম্বন্ধে এই গবেষণা সত্যই বিস্ময়কর।'

'রামায়ণ' নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন আলোচনা হয়েছে। অনেক বিদেশী ভারতীয় ভাষায় শিক্ষালাভ করে রামায়ণের উপর গবেষণা করছেন। বেলজিয়ামের ডঃ কামিল কুলকে দীর্ঘদিন অনুশীলনের পর হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। বর্তমানে তিনি রাঁচির সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক। 'রামায়ণে'র উপর তিনি গবেষণা করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি বিভিন্ন পণ্ডিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পরেশমল্ল বড়ুয়া অসমীয়া তরুণ কবিদের মধ্যে অন্যতম। এর আগে 'অমৃতে' তাঁর 'আরণ্যক' গ্রন্থটির উপর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি তিনি অসমীয়া ভাষায় বিশ শতকের সোভিয়েত কবিতার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন। অসমীয়া ভাষায় সোভিয়েত কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, বলে আমাদের জানা নেই। এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে কলাগুরু বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার স্মরণে। কবি বই-এর ভূমিকায় স্বীকার করেছেন, ইংরেজি ভাষায় অনূদিত কবিতা থেকেই অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ। সাহায্য গ্রহণ করেছেন মণীন্দ্র রায় অনূদিত সোভিয়েত কবিতার বাংলা অনুবাদ থেকে। এই অনুবাদ সম্পর্কে লেখক বলেছেন—'ইংরেজির পরা অনুবাদ করোঁতে কবিতাসমূহর আকৃতি ছন্দ-ধ্বনি-শব্দ-নির্বাচন যি রূপত পোওয়া হইছে, সেই রূপতেই রাখিবলৈ পার্যমানে চেষ্টা করিছোঁ যদিও, বেচি ভাগ সময়তেই অসমর্থতায়ে প্রকাশ পাইছে এই কথা অস্বীকার করার মোর কোনো হল নেই।' প্রথম অনূদিত কবি ম্যাকসিম গোর্কী এবং সর্বশেষ কবি বেলা আখমাদুলিনো সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে ইভতুশেঙ্কোর কবিতা। কারণ কি, বলা মুস্কিল। অনুবাদও যেন এখানে বেশি স্বচ্ছ।

কেউ কি কখনো ভাবতে পেরেছিল, সে লেখক হবে। সামান্য একজন ওয়েটার একদিন গল্পলেখক হিসেবে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করবে এ ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু রবার্ট ডীন ফারের ক্ষেত্রে তাই ঘটল। নিউ-ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ক্লাবে তিনি ছিলেন একজন ওয়েটার। চার বছর আগে একদিন তিনি সেই ক্লাবের চেয়ারম্যান লুই লেরীকে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি জানান যে, তিনি একটি গল্প লিখেছেন এবং যদি চেয়ারম্যান গল্পটি পড়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তাহলে খুবই উপকৃত হবেন। লুই লেরী পাণ্ডুলিপি পাঠ করে এত মুগ্ধ হন যে, এটি প্রকাশের জন্য জনৈক প্রকাশককে অনুরোধ জানান। প্রকাশের পর বইটি খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিগ্রো জীবন নিয়ে এই গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে। সমালোচকদের মতে নিগ্রো জীবনের এমন নিখুঁত চিত্র খুব কম উপন্যাসেই দেখা যায়। গত মাসে ফ্যাকাল্টি ক্লাব ডীন ফারকে এক সভায় অভিনন্দন জানান।

মেঘদূত অনুবাদক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রকাশক, জয়দুর্গা লাইব্রেরী। ৮।এ, কলেজ রো। কলিকাতা—৯। মূল্য ৭ সাত টাকা।

মহাকবি কালিদাসের অভিনব সৃষ্টি মেঘদূত। সুদীর্ঘকাল ধরে এই গীতিকাব্যখানি ভারতের রসিক চিত্ত অধিকার করে আছে। বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সকল দেশে মেঘদূত সমাদৃত হচ্ছে।

মহামহোপাধ্যায় আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরে আজ পর্যন্ত বাঙলায় গদ্য ও পদ্যে মেঘদূতের অনেক অনুবাদ হ'য়েছে। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের মতো কেউই মন্দাক্রান্তা ছন্দে সমগ্র মেঘদূত অনুবাদ করতে সাহসী হননি। কবি শ্রীমান যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার মেঘদূতের ছন্দ বজায় রেখে বাংলা কবিতায় অনুবাদ করে অসীম দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মূল শ্লোকের চারি পংক্তির সীমিত আয়তনের মধ্যেই তিনি মেঘদূতের সৌন্দর্য ও মাধুর্য রক্ষা করতে পেরেছেন। অক্ষর অনুবাদ সম্পূর্ণ মূলানুগ হয়েছে।

শ্রীগীত-গোবিন্দের মত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ খুবই কঠিন কাজ। স্বাধীন ছন্দ যদিই বা সম্ভব, কিন্তু মূল ছন্দে মৈব নৈবচ। যোগীন্দ্রনাথের অনুবাদ পড়িয়া

আমার সুনিশ্চিত অভিমত, অনুবাদ বিভাগে তিনি নতুন উদাহরণের সৃষ্টি করলেন। এ কাজে তিনিই প্রথম পথ প্রদর্শক। অনুবাদে ত্রুটি-বিচ্যুতি যে নেই তা নয়। তবে সেটা স্বাভাবিক বলেই মার্জনীয়।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন প্রবীণ ছান্দসিক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন। ভূমিকায় সেন মহাশয় কবি কালিদাস, মেঘদূত, ও তার ছন্দ আদি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ভূমিকাটি যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি সরস ও শিক্ষণীয়। বর্তমান গ্রন্থে এটি একটি মূল্যবান সংযোজন।

ভূমিকা লেখক ও প্রকাশককে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

●

পার্থিব পদার্থের রূপ ও স্বরূপ
—ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতে ; যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান — তপতী পাব্লিশার্স : ৫।১এ, কলেজ রো : কলকাতা—৯। দাম—পনেরো টাকা।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-ভিত্তিক দর্শনের সমন্বয়মূলক আলোচনার অভাব সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে চোখে পড়ে। এবং সম্প্রতি অনেককেই বলতে শোনা যায়, প্রাবন্ধিকের জীবনে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিবেণীসঙ্গম যদি না ঘটে তো এ-অভাব পূরণ হবার নয়।

অনেকের এই অনুমান ভ্রান্ত, তা বলবো না ; বরং বলবো, বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের দেড়শো বছরের ইতিহাস-পর্যালোচনা এ-অনুমানকেই জোরদার করে। কেননা, অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে সুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-প্রবন্ধকারদের প্রায় সকলেই একদিকে যেমন সাহিত্যগুণান্বিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন, অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞান ও দর্শনের মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটিয়ে আপন আপন রচনার মধ্যে এনেছেন অনির্বচনীয়ত্ব।

খুবই স্বাভাবিক যে এ-অনির্বচনীয়ত্ব সৃষ্টির ক্ষমতা এ-যুগের প্রবন্ধকারদের অধিকাংশেরই নেই। কারণ, এ হল পল্লব-গ্রাহীতার যুগ। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যুগের মতো বহু বিদ্যা আত্মসাৎ করার যুগ নয়। কিন্তু এ-যুগেও যদি কাউকে পূর্বসূরীদের পথ ধরে চলতে দেখা যায় তো বুঝতে হবে তিনি দুঃসাহসী।

'পার্থিব পদার্থের রূপ ও স্বরূপ' পড়ে মনে হল, দুঃসাহসী এখনও কেউ কেউ আছেন ; প্রথা-বিরুদ্ধ পথে চলবার সাহস এখনও কেউ কেউ রাখেন।

কিন্তু তবু বলবো, সাহসইতো সব নয় ; তার সঙ্গে শক্তিও চাই। আর চাই সাহিত্যিকের মেজাজ। এই শেষোক্ত দু'টি গুণের দিক থেকে আলোচ্য গ্রন্থের লেখক পূর্বসূরীদের ঠিক সমগোত্রীয় না হলেও তিনি যে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধকারদের মধ্যে অন্য গোত্রীয়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কেননা, পরমাণুর স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে এ-গ্রন্থের অনেক জায়গাতেই তিনি নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন। এইসব ভাবনার সঙ্গে একমত না হতে পারেন অনেকেই ; অনেকেই হয়তো "ভর ও তেজের দ্বন্দ্বাত্মক মিলনের ফলেই যে আলোকরশ্মির স্বয়ংক্রিয়মানতাজনিত ত্বরিত গতি" (পৃঃ ৪৩৫—৩৬)—লেখকের এই সিদ্ধান্তটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন ; অথবা বলতে পারেন, "মস্তিষ্ক সমেত মানুষের এই দেহ আর জীবন যে ভর-তেজেরই যন্ত্র-যন্ত্রী প্রক্রিয়া প্রসূত এক মহাসঙ্গীত" (পৃঃ ৪৩১—৩৫), এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার আগে আলোচনা আরও তথ্য ও যুক্তিনির্ভর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তবু সবদিক মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, তিনি শুধু পুরনো তত্ত্বকে হুবহু গ্রহণই করেননি ; নতুন ভাবনার রসে তাদের জারিতও করেছেন। এবং ফলে, নতুন কিছু জিনিস উপহার দিতে পেরেছেন।

সামগ্রিক ভাবে আলোচনা করলে মনে হয়, পরমাণু সম্পর্কে দর্শন-নির্ভর এমন তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা বাংলা-সাহিত্যে খুব অল্পই হয়েছে ; এবং এই সুচিন্তিত আলোচনার জন্যে লেখক বিদগ্ধ পাঠকদের সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন লাভ করবেন।

●

মই ময়ূর মন [কাব্যগ্রন্থ]—লোকনাথ ভট্টাচার্য।। অবায়, ৪২ গড়পার রোড, কলকাতা। দাম তিন টাকা।

বাঙালি মন ও ফরাসী মননশীলতায় লোকনাথ ভট্টাচার্যের কবি-প্রসিদ্ধি এককালে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। বিশেষ করে মূল ফরাসী থেকে র‍্যাঁবোর 'নরকে এক ঋতু' অনুবাদ করে তিনি অনেকের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

'মই ময়ূর মন' কাব্যগ্রন্থেও তাঁর সেই মননশীলতার স্বাক্ষর বিধৃত। লোক-প্রচলিত আটপৌরে শব্দকে তিনি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেন প্রতি মুহূর্তে। শব্দের চেয়ে বিষয়ের বন্ধনে ধরা দিতেই তাঁর উৎসাহ সর্বাধিক। আত্ম-তন্ময়তার মুহূর্তেও লক্ষ্য করেন জনতার কোলাহল। যদিও ভাবনার দিক থেকে লোকনাথ ভট্টাচার্য রোম্যান্টিক-তায় আশাবাদী। উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যায় প্রথম কবিতার সমাপ্তি-প্রান্তিক কয়েকটি পংক্তি : "শুনলাম, কলকাতায় নাকি চারশো মেয়ের দল শোভাযাত্রা করে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছে...। ভিড়ের মধ্যে আমি সেই নেত্রীর মুখটি খুঁজি, হাতে এক গুচ্ছ ফুল, তার খোঁপায় পরাবার।"

এই কাব্যগ্রন্থের সব ক'টি কবিতাই গদ্যে লেখা। এবং মৌল-প্রবণতায় প্রতিটি কবিতাই বিশ্লেষণধর্মী। মাঝে মাঝে কাহিনীর আভাস, সংলাপ বিনিময় ও নাটকীয়তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সকাল সন্ধ্যার বর্ণনায়, আকস্মিকতার উপলব্ধিতে ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনে তিনি জাগ্রত দর্শক। একটা পরিণত বয়সের চেতনা কবিমানসিকতায় স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করেছে।

অনেকদিন পর বাংলা কবিতার পাঠক লোকনাথবাবুর কবিতা হাতে পেয়ে খুশি হবেন। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কবিকন্যা ঈশা ভট্টাচার্য।

●

হো-চি-মিন (জীবনী)—বাদল চট্টোপাধ্যায়। কিশোর সাহিত্য সঙ্ঘ। ৭৩ স্বামীজী সরণী। কলকাতা—৪৮। দাম পাঁচ টাকা।

ভিয়েৎনামের অবিস্মরণীয় পুরুষ হো-চি-মিনের জীবনকথা বাঙলা ভাষায় বিশেষ রচিত হয় নি। সম্প্রতি বাদল চট্টোপাধ্যায়ের 'হো-চি-মিন' বইখানি থেকে এই অসামান্য কৃতী পুরুষ সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যাবে। মূলত অল্পবয়সীদের জন্যে বইখানি লেখা। এই ধরনের মানুষের জীবনকথা লেখবার সময় আরও যত্নবান হওয়া উচিত। ভাষায় লেখকের দুর্বলতা, শব্দব্যবহারে অসার্থকতা বইখানিকে সুখ-পাঠ্য বা উঁচুদরের মর্যাদা দেয় নি।

●

ফারাক্কা ও আগের কিছু (কবিতা)—মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। দাস পাবলিশিং কনসার্ণ। ২৫।২ বিধান সরণী। কলকাতা—৬।

আঠারোটি কবিতা ও মোটামুটি বড় আকারের একটি কাব্যনাট্য নিয়ে মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'ফারাক্কা ও আগের কিছু' নামেয় এই সংকলনটি কবির নিজের ভাষায় 'পাঁচমিশেলি পাঁচালি'।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

কবিতা — (১৮ সংকলন) সম্পাদক—সুপ্রিয় বাগচী, কলকাতা-৪৭, দাম : চল্লিশ পয়সা।

কবিতার কাগজের সংখ্যা বাংলাদেশে নেহাত কম নয়। তবে হাল্কা-চালের প্রচ্ছদের আড়ালে সিরিয়স কবিতার পত্রিকা বিশেষ দেখা যায় না। সেদিক থেকে সুপ্রিয় বাগচী সম্পাদিত 'কবিতা' সত্যিই উল্লেখ্য। বর্তমান সংখ্যাটি আরেক দিক দিয়েও বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এ সংকলনে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই মহিলা। পূর্ব বাংলার ৫ জন, বাকি ১০ জন পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে কলকাতার। সম্পাদকের সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্যে ধন্যবাদ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মন্দিরের পরে খানিকটে পোড়ো জমি. হতভম্ব হয়ে দাঁইড়েই রয়েছি ত্যাখনও হাবা-বোধের মতনই হয়ে যাবে তো, উইং হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আমার পিঠে হাত দিয়ে বললে—'দেখো কান্ড! হাঁ করে চেয়ে আচিস যে? আয় ভেতরে।'

ঠাকুরমশাই উঠোনে কাপড় মেলে দিয়ে এইবার দাওয়ায় উঠতে যাবে, ওনাকে আমার পিঠে হাত দিয়ে ঢুকতে দেখে তো আমার চেয়েও হতভম্ব হয়ে দাঁইড়্যে পড়েচে। যেন চিনতে পারলে না, এইভাবেই খানিকটা চেয়ে থেকে বললে—'নেত্য নাকি রে? তা তুই হঠাৎ?'

'না চেনবারই কথা তো—পর করে দিয়ে আর খোঁজ-খবর...?'—বলতে বলতে এগিয়ে পেন্নাম করতে করতে কথাগুলো আটকে গেল গলায়। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে পড়েই রইল একটু। 'ওঠ হয়েছে'—বলে ঠাকুরমশাই তুলে নেওয়ার পরও একটু মুখ ঘুরিয়ে দাঁইড়োই রইল। তারপর চোখ দুটো আঁচলে মুচে নিয়ে বললে—'আসতে হলো বৈকি হঠাৎ, তুমি তো আর...'

একটা ঢোক গিলে এবারও সামলে নিলে দিদিমণি। ত্যাতক্ষণে আশ্চয্যির ভাবটা গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঠাকুরমশায়, বললে—'আমি? আমি?—তা আমি— কি যে বলে—'

আমতা আমতা করছে আর চারিদিকে চাইচে ঘুরে ঘুরে; কি যেন কি করবে, কোথায় বসাবে মেয়েকে ঠাওর করে উঠতে পারচে না। বলেও ফেললে—'তা খানিকটে বসবি তো মা?...ওরে স্বরূপে!'

দিদিমণি বললে — 'খানিকটে মানে?। এখন নড়চে কে?...স্বরূপে, মাদুরটা পেতে দে দাওয়ায়...তুমি আহ্নিকটা সেরে নাও বাবা, আমি ততক্ষণ স্বরূপের সঙ্গে গল্প করচি। রান্নাঘরের দাওয়াতেই পেতে দে স্বরূপ, কানের কাছে গজগজ করতে যাই কেন? অনেক কথা, পেট ফুলচে। তুমি হয়ে এসো বাবা।'

'আমি এই এলুম বলে। দ্যাখোনা! একটু বলেও পাঠাতে হয়, তোয়ের থাকে লোকে...' হন্তদন্ত হয়ে উঠে গেল দাওয়ায়।

দিদিমণি বলল—'ভাবলে মেয়ের মতন ঠাকুরকেও ফাঁকি দিতে হবে না তোমায়, পালাবে না মেয়ে।'

উনি চলে গেলে আমার দিকে সেই নকুলে হাসি হেসে চাইলে, চাপা গলায় বললে—'পালাবে কি, দ্যাখ না, এমন এক মতলব বের করেছি নিজেই তাড়াতে পথ পাবে না, তারপর যা ভেবেচি সে তো আচেই।'

নাতনী কলকে সেজে আনতে বলল—'আমাকেই দে আগে, মোহাড়াটা সামলে দিই।' নিজের হুঁকোয় বসিয়ে কলকেটা লম্বা টানে ভাল করে ধরিয়ে দিয়ে আমার হুঁকার মাথায় বসিয়ে দিল, আবার বাঁশের বাতাটা তুলে নিয়ে বলল—'তা মতলব বের করতে ওনার তো জুড়ি ছেল না। তাড়াতাড়ি সারবে কি, মনটা তো খুবই চঞ্চল হয়ে রয়েছে, নিদেন পক্ষে মন্তরগুলো একবার করে আওড়াতে হবে তো, নিশ্চয় তাতেই ওলট-পালট হয়ে গিয়ে সিদিন বরং খানিকটে দেরী হয়ে গেল ঠাকুরমশাইয়ের। অবিশ্যি, যাখন বেইরে এল ত্যাখন আবার পূর্বের মতন হন্তদন্ত হয়েই বেইরে এলো। আমি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে, দিদিমণিকে দেখতে না পেয়ে, মুখ শুকনো করে আমায় সুদোলে—'নেত্য কৈ রে স্বরূপে? চলে গেল নাকি?'

আজ্ঞে, স্বরূপকে তো দিতেও হোল না উত্তুর। দিদিমণি ত্যাতক্ষণে ইদিকে ভাতের হাঁড়ি নাব্যে, কড়ায় তেল ছেড়ে দিয়েচে। আমি ইরই মধ্যে জেলে পাড়ায় ছুটে গিয়ে মাছ নিয়ে এসে কেটে-কুটে ঠিক করে রেখেচি, উদিকে ঠাকুরমশাইরেও জিগোনো, ইদিকে গরম তেলে মাছ ছেড়ে দিতে ছ্যাঁক করে শব্দ।

একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বাবাঠাকুর, তারপর খড়ম পায়ে এইগ্যে এসে একটু অবাক হয়ে গিয়ে—'নেত্য, তুই হেঁসেলে!'

যেন কিছুই হয়নি, খন্তিটে তুলে নিয়ে পিঁড়ির ওপর ঘুরে বসল দিদিমণি, আজ্ঞে, ঠিক সেই সাবেকের মতন, যেন এর মধ্যে কোথাও কিছু হয়নি তো। আমায় সাক্ষী রেখে বললে—'ঐ শোন স্বরূপ, বলছিলুম না তোকে?—বেরিয়ে ঠিক এই কথা বলবেন? জিজ্ঞেস কর, মেয়ের না হয় রাজভোগের ব্যবস্থা করে আলাদা করে দিয়েছেন, কিন্তু মেয়ে তো মেয়েই, তার কখনও রোচে? বাপ ইদিকে কোনকরকম করে নিজের দুটো ভাতে-ভাত ফুটিয়ে দিন গুজরান করে যাচ্ছেন।'

আমায় শিকিয়ে পড়িয়ে রেখেচে, বললুন—'দুদিন হাত পুড়েও গেল তো।'

একটু কটমটিয়ে চাইল বাবাঠাকুর আমার পানে, বলল—'তুই ফোড়ন দিস আবার বাড়িয়ে বলছে লোকজন এইসব?'

তারপরই আবার ওনার দিকে চেয়ে সেই রকম আমতা-আমতা করে কি বলতে যাবে, কথা খুঁজে পাচ্চে না, দিদিমণি খুন্তিতে মাছগুলো উল্টে, আবার ঘুরে বললে—'তুমি এসে বোস বাবা দাওয়ায়। দুটো কাজের কথা আচে।'

আমি মাদুর ছেড়ে নেবেই এসেছিনু, বাবাঠাকুর ভেতরে গিয়ে খড়ম ছেড়ে গিয়ে বসল, এবার যেন অনেকটা গুচিয়ে নিয়ে বলল—তা না হয় বসচি—আর বসবই তো, এ্যাদ্দিন পরে এলি তুই—কিন্তু এ কী কান্ডটা করে বসলি? জামাই জানেন?'

দিদিমণি মুখটা ঘুইর্যে কড়ায় খুন্তির আওয়াজ তুলে বললে—'সবারই আক্কেল আচে।'

ত্যাখনকার মতন ঐটুকুই। যাতক্ষণ রান্না নিয়ে রইল ও নিয়ে কোন কথা আর একেবারেই তুললে না দিদিমণি; তা রাঁধলেও তো বসে বসে অনেকগুলো—মাছের ঝোল, ডাল, ভাজা, দুটো ব্যানুন, অম্বল—কিন্তু ও নিয়ে আর কোনও কথা নয়। ঠাকুরমশাই বাইরে বসে, উনি ভেতরে, আর সব পাঁচটা কথা নিয়ে নানারকম গপ্প হোল বাপে-মেয়েয়, সেই সাবেকের মতন, তবে এ নিয়ে না রাম না গঙ্গা, কিছু নয়। ইনি তুলতে গেলেও দিদিমণি চাপা দিয়ে যায়। তুললে একেবারে সেই খাওয়ার সময়।

দ্রুপদীর মতন রান্নার হাত ছেল তো, ঝোল মেখে দু' গেরাস খেয়ে বাবাঠাকুর একটু সুখ্যোৎ করেচে, দিদিমণি সামনে পাখা হাতে বসে খাওয়াচ্ছেল, বললে—'মেয়ে যা সামনে ধরে দেবে তাই মিষ্টি তোমার, রান্না তো ভারি!'

তারপরেই মুখটা একটু ভার করে বললে—'তা সে মিষ্টি হোক, তেতো হোক, এই ব্যবস্থাই চলবে এবার থেকে বাবা।'

'তুই রাঁধবি আর আমি গিয়ে খেয়ে আসবো?'—একটু যেন হাসিচ্ছলেই বললে কথাটা বাবাঠাকুর।

'না, সে ভাগ্যি মেয়ে করেছে কিনা।'

'তবে?'—আর একটু ঝোল ঢেলে নিয়ে মাখতে মাখতেই সুদোলে বাবাঠাকুর মাথা নীচু করে। দিদিমণি ত্যাখন-ত্যাখন ঐ পক্কনতই এনে ছেড়ে দিলে, একটু একটু করে এগুতে হবে তো? সেই সবে থেকে বলেচে বাপ। কথাটা না থেকে ছেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—'সে যা হয় হবে, তুমি এখন

খেয়ে নাও তো। আর একটু ঝোল দিই ভালো হয়েছে তো। যেন মনে হচ্ছে কদ্দিন তোমায় বসে খাওয়াইনি বাবা।' বেশ পরিতোষের সঙ্গে খাওয়ালে চে'চে-পু'চে, একথা সেকথা তুলে। তারপর, এমন মন্তর ঝেড়ে দিয়েচে, বাবাঠাকুরই কি আর থির থাকতে পারে? দিদিমণি হে'সেলে শেকল তুলে দিয়ে বড় ঘরে পান সাজতে চলে গেছে—আমাকে একটু চোখ টিপে দিয়েই বৈকি, মানে, দেখ রগড়টা,—বাবাঠাকুর আঁচো উঠে মুখ-হাত মুচতে মুচতে নিজেই তুললে কথাটা। 'তা হ্যাঁরে নেত্য, কৈ উত্তর দিলিনে তো আমার কথাটার। তুই এই করে রোজ রাঁধবি, আর আমি গিয়ে খেয়ে খেয়ে আসব?'

দিদিমণি পান সাজতে শুরু করেছে, পান হাতে করেই বেইরো এলো দাওয়ায়, বললে, কেন বাবা, উত্তর তো দিলুম,—'মেয়ে তোমার সে ভাগ্যি করেছে?'

বাবাঠাকুর ভক্তের মতো করেই বললে—'না হয় করেনি। তা হলে?' না,—'তুমি উঠে এসো বাবা, রোদের তাত।'

বুঝলেন না? খাওয়া হয়ে গেছে, এবার তো যা করতে আসা, করতে হবে। বাবাঠাকুর হাতমুখ মুচে চৌকিতে বসেচে, দিদিমণি নীচেয় বসে পান সাজতে সাজতে বললে—'কেন বাবা? এসে রে'দে দিয়ে যাবো দুবেলা, এই যেমন আজ দিয়ে যাচ্ছি।'

'তুই—রে'ধে দিয়ে যাবি। দুবেলা।'—একেবারে সোজা হয়ে বসল বাবাঠাকুর, আশ্চয্যির যেন আর কুল-কিনারা পাচ্চে না।

দিদিমণি খুব সহজভাবেই বললে—'কেন, এতে আশ্চয্যি হওয়ার কি দেখলে বাবা? তুমি না হয় দিব্যি করেচো, মেয়ের বাড়ি মাড়াবে না, মেয়ে তো সেরকম দিব্যি করতে পারে না। এক যদি ঢুকতে না দাও।'

'তোকে ঢুকতে দেবো না? হাঁরে, বললি কি করে?'—যেন বলবার জোর পেয়ে সুদোলে ঠাকুরমশাই। কিন্তু এ'টে উঠতে পারে? দিদিমণি বললে—তক্ক হলে কখনও হারতে দেখিনি তো—বললে 'তা হলে? ঐ তো বললুম ত্যাখন, মেয়ে 'নিজে রাজভোগ খেয়ে যাবে আর উদিকে বাপ হাত পুরিয়ে যা হোক দুটো নাব্যে নিতে থাকবে দুবেলা? তুইও শুনিচস তো স্বরূপে?'

আমার তো আহ্লাদে নাপাতে ইচ্ছে করচে দাঠাকুর—কি যে বলে, যা ন্যায়-শাস্তোরটা ঝাড়লে, আর তো কাটান নেই। আমায় জিগোতে উত্তুর করলুম—'তা হলে ওবেলা এমনি করে সব ব্যবস্থা করে রাখব তো?'

ওনারা ঘরের ভেতর, আমি দরজার সামনে দাওয়ায় দাঁইড়্যে। বাবাঠাকুর আবার সেই রকম করে আমার পানে চেয়ে বললে—'তুই ছোঁড়াও বুঝি ফোড়ন দেওয়ার জন্যে মোতায়েন রয়েছিস?'

উনি এদিকে মুখ ফেরাতে দিদিমণিও ওদিক থেকে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে একটু হাসলে। তারপর আবার সেইরকম ভারিক্কে হয়ে গিয়ে বললে—'তা হলে উপায়টা আমায় বলে দাও বাবা। আর, যদি এমন হয় যে অন্যায় বলে থাকি...'

'অন্যায়?—অন্যায়?...' আমতা আমতা করতে লাগল বাবাঠাকুর। খুবই ঘেবড়ে গেচে ভেতরে ভেতরে। তারপর মেয়েকেও তো চেনে, যা বললে তাই যদি করে বসে। বললে—'কথাটা কি জানিস মা, মেয়েকে দান করলুম, আর সে আমার রাঁধুনি হয়ে থাকবে? ইদিকে, বেয়াই বলেন, জামাই বলেন—ব্যবস্থা করে দিচ্চি। তা জামাইয়ের ব্যবস্থা 'তুই একটু ভেবে দেখ না মা। হওয়া যায় রাজি?'

না,—'বেশ তো বাবা, তা হলে মেয়েকেই ব্যবস্থা করতে দাও। ভাই নেই একটি, আমারই তো হক।'

উঠে পান বাড়িয়ে বললে—'এই নাও, ধরো আমি পানও সেজে রেখে যাচ্চি বাবা।'

বাবাঠাকুর একটু যেন ভয়ে ভয়েই বলে উঠল—'সে ও ছোঁড়া তো পারে। বেশ ভালেই পারে।......

বুঝলেন না?—এও তো একটা না—যাবার ছুতোই। তারপর আবার কথা ফিরিয়ে নিয়ে বললে—'একটু ভেবে দেখতে দে মা ভালো করে, রীতিমতো একটা সমিস্যে দাঁড় করালি তো অবুঝ হয়ে। দেখি ভেবে।'

তারপর একটু যেন চমকে উঠে বললে—'আর একটা কথা মা, রাখবি বাপের কথা। মানা তো করতে পারি না, আসবি য্যাখন খুশী, তবে এই করতে দুদিন আসিসনে এখন। এর মধ্যে আমি ভেবে দেখচি কী একটা সমাধান হতে পারে।'

—এটা ওনাদের ন্যায়শাস্তোরের কথা দাঠাকুর, 'সমিস্যে' আর তার 'সমাধান'—কানে যেত তো। তা সমিস্যে যে মেয়ে আরও [illegible] যে বলে, বাড়িয়ে রেখেছে সেটা তো টের পেলে পরে, য্যাখন দিদিমণি আমায় বললে—'আয় স্বরূপে, একটু বসবি। আমি ততক্ষণ দুটি খেয়ে নিই।'

বাবাঠাকুর আবার দু হাতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসল, ডাগর ডাগর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে, সুদোলে—'তুই খেয়ে যাবি!—এখানে। তাহলে সেখেনে গিয়ে?'

দিদিমণি বলে—'সেখেনে তোমার পেসাদটুকু তো পাব না বাবা, অ্যাদ্দিন পরে যখন কপাল-গুণে পেলুম।'

আমায় ডেকে নেবে গেল। আমি যাওয়ার সময় আড়চোখে দেখি বাবা ঠাকুর আস্তে আস্তে গা এলিয়ে দিলে চৌকির ওপর, একটা নিঃশ্বেসও পড়ল ফোঁস করে।

সমিস্যের ওপর সমিস্যে তো!

এর পর রান্নাঘরে গিয়ে ওনার পাতেই ভাত তরকারি বেড়ে নিয়ে সেই সাবেকের হাসি দাঠাকুর। খাবে কি, গেরাস তুলচে আর চাপা হাসিতে দুলে দুলে উঠচে। অনেকটা হাসি বেরিয়ে গিয়ে একটু থির হয়ে বললে—'আমিও ঐ বাপেরই বেটি—এখনও সমিস্যের হয়েচে কি তোমার?'

আমার যা চিন্তে, সুদোলুম—'তাহলে ওবেলা আর সত্যিই তুমি আসবে না দিদিমণি!' বললে—'থাম ছোঁড়া, আসবার আর দরকারই হয় কিনা দেখ—বসে বসে। আমার সব মতলব পুরো হয়ে গেল নাকি ইরই মধ্যে? ঢের তো এখনও বাকি, ঐ যে ঠাকার করে ভেয়ের বাড়ি গিয়ে উঠে-চেন।'

—ভারিক্কে হয়ে বলতে যায় আবার হেসে হেসে ওঠে।

মেয়েদের আঁচিয়ে এসে রান্নাঘরের শেকলটা তুলে দিয়ে বললে—'ওখানে ভাত—তরকারি [illegible] করে রেখে দিয়েছি, আমি চলে গেলে [illegible] তুই বাসন-কোসন-গুলো মেজে রাখিস [illegible]। এখন আয়। বাবা কি [illegible]।'

বললে—[illegible] সমিস্যের কথা ভাবছে, [illegible]।'

[illegible] দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কথা

হচ্ছে, একটু হেসে উঠল, বললে—'আয় দেখবি। সনিস্যের এখন হয়েছে কি? আগে দুজনকে একস্তর করি।'

সুদোলুম—'আসবে মাসিমা?'

বলে—'দেখিখন আসে কিনা।'

'নে'সবে কে গিয়ে?'—সুদোলুম আমি।

বললে—'তাও দেখবিখন; আয় তো। এত বকাতে পারে ছোঁড়া!'

ঘরে গিয়ে পান মুখে দিয়ে চৌকিতে উঠে বসে বাবাঠাকুরের একটা পা কোলে তুলে নিলে।

বাবাঠাকুর বললে— 'যাবি'ন এবার?'

দিদিমণি বললে— 'যাচ্ছি কিনা। বাবা যেন তাড়াতে পারলে বাঁচেন!'

বাবাঠাকুর একটু কাঁচুমাচু হ'য়ে বললে—'নারে, তা নয়। দেরী হ'য়ে গেল তো খানিকটা।' না, 'হোকগে, পা দুটো একটু টিপে দিই।'

আমি দরজার বাইরে দাওয়ায় ওনার মুখের পানে চেয়ে ব'সে আছি, পা টিপতে টিপতে একটু পরে বললে—'একটা কথা বাবা, অবিশ্যি তোমার বেয়াইয়েরও নয়, জামাইয়েরও নয় ও'রা এসবের জানেনই বা কি? বলেছিলেন, খুড়শ্বাশুড়ি, মানে তোমার বেয়ান।'

'কি কথা মা? একটু ধড়মড়িয়ে বাবাঠাকুর যেন মাথাটা তুললেন খানিকটা।

'তেমন কিছু নয়, শুয়ে থাকো তুমি।'—মাদুরের ওপর একটা বালিশ। দিদিমণি আবার ঠিক ক'রে দিয়ে বললে—'উনি বলছিলেন অষ্টমঙ্গলার কথা। নাকি বিয়ের পর একবার আসতে হয়।'

'তা তো হয়ই মা।'—এবার পা দুটো টেনে নিয়ে সোজা হ'য়ে উঠে বসলেন বাবাঠাকুর। বেশ খানিকটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, বললেন—'দেখ দিকিন্ তোর গন্ডধারিনীর কান্ড, দিব্যি ছেড়ে-ছুড়ে গিয়ে বসে রইল, আমার এ কি কাজ, না, মনে থাকে এসব? ঘোঁট হচ্ছে নিশ্চয় এ নিয়ে তোর শ্বশুরবাড়িতে।'

বেশ ছটফটিয়ে গেছেন। দিদিমণি বললে—'ঘোঁট কেন হ'তে যাবে? বোঝেন

নাকি তাঁরা? শুধু শ্বাশুড়ি একবার বলছিলেন।'

'তা মেয়েলি আচার তো একটা, আমি কি ক'রে করি বল? কি বেয়াক্কেলের মতন কাজটা দেখতো করলে তোর গন্ডধারিণী।'

কোন উপায় না দেখে সব ঝালটা যেন মাঠাকরুণের ওপর গিয়ে ঝাড়ল। তানার সঙ্গে গেয়েও রেহাই নেই।

দিদিমণি বললে—'সে কথা কি শ্বাশুড়ি বোঝেন না? উনি বলছিলেন, একটা নিয়ম আছে, সেরে নিতে হয়, তা বেহাই চানতো পাড়ার এয়োস্ত্রী ক'জনকে ডেকে সেরে নিতে পারেন। শুধু একবার নিয়ম পালন ক'রে ধুলো পায়েই চলে আসা, একা বেটাছেলে, দোষই বা এমন কি হচ্ছে।'

'হয় তাতে?' —যেন হাতে সগ্গ পেলে। বাবাঠাকুর বললে—'আমি তা'হলে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সবার হাতে ধ'রে বলে আসি। দ্যাখ্ তো কি আতান্তরে ফেলে গেলো আমায়! কার বোঝা কার ঘাড়ে এসে পড়ল!'

বুঝেলেন না দা'ঠাকুর? এমন রাজসিক বিয়েটা হোল, অথচ কোনরকমে মেয়ের একটা বিয়ে দিয়ে তাকে বিদেয় করবার জন্যে যে মানুষটা পাগলের পারা হ'য়ে গেছেল সেই পেল না দেখতে—ভেতরে ভেতরে গোমরাবেই তো বাবাঠাকুর, সেই কথাই আর এক রকম হ'য়ে বেরুতে লাগল মুখ দিয়ে।

দিদিমণি বললে —'আমি একটা কথা বলি বাবা যা ভেবে রেখেছি। মা রইলেন না, আয়ুর কথা কে বলতে পারে? কিন্তু মসীমা যা করলেন, তা মায়ের চেয়ে কি কম?'

ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল বাবাঠাকুর। আপনভোলা মানুষ, অত ভাবেনি তো এদিকটা। পরপর নিজেই বললে—'তা যদি বলবি মা তো ব্রেজো যা করলে তা তোর গন্ডধারিণী দ্বারা তো হোতও না, শান্ত-শিষ্ট মানুষ ছেল সে।'

দিদিমণি বললে—'আমি তাই বলছিলুম। অবিশ্যি, পাড়ার মেয়েদের ডেকে দায়সারা করে হয়ে যায় কাজটা সারা, তবে তিনি যদি এসে দাঁড়ান একবার।'

'ব্রেজো!'

অকস্মাৎ ভয়েই যেন খানিকটা শিউরে উঠল বাবাঠাকুর। বুঝলেন না, সেই মানুষ, আবার? এখন তো আবার একা—একাই, মাঝখানে দিদিমণিও নেই। সেই কথাই বললেও, যদিও একটু ঘুরিয়েই। বললে—'এলে তো ভালোই হয়, কিন্তু, তুই নেই, চাইবে কি আসতে? যা জেদি মানুষ'।

দিদিমণি বলে—'তবু আমাদের তো একবার বলা দরকার বাবা। তুমিই বলচ—এতটা করলেন, উনি না হ'লে হোতই না। না বললে, অভিমান বলেও তো একটা জিনিস আছে'।

হেঁট হ'য়ে রগ দুটো একটু টিপে শুনছে বাবাঠাকুর। বললে—'তা তো আছে, অভিমান বলে জিনিস নেই? যে নাকি অতটা করলে? অভিমান হয় বৈকি—অভিমান হবে না?'

যেন নিজের মনেই আওড়ালে কথাগুলো—দিদিমণি এদিকে চোখ টিপছে আমায়— তারপর হাতটা মাথে ওনার দিকে চেয়ে বললে—'কি করা যায় বলতো মা? একটা চিঠি লিখে স্বরূপের বাবা শিবদাসকে না হয় পাঠো দিবি?'

দিদিমণি চাপা হাসিতে হঠাৎ একটু দুলে উঠল। কাজের কথাই হচ্ছে, যেমন হ'তে হয়, তবে বাপের অবস্থাটা কি হয়ে এসেছে তাও তো দেখছে, আর যেন চাপতে পারলে না হাসি। বাবাঠাকুর জিগোলে—'কি হোল, হাসিলে যে?

না, 'তুমি যেন ভেবে কথা বলতে জান না। বাবা; যার অষ্টমঙ্গলা তাকেই চিঠি লিকতে হবে?' —হাসিতে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে দিদিমণি।

বেশ, একটু অপরুদ্ধ হয়ে পড়েছে তো বাবাঠাকুর, বেফাঁস কথা, তাও মেয়েকেই দেখিয়ে দিতে হোল, আমতা আমতা ক'রে বললে—'হ্যাঁ—তা—তা'লে আমিই না হয় লিকে দেবো'খন'।

এবার বেশ ভারিক্কে হয়েই ঘুরে বসল দিদিমণি, কথাগুলো সব গুরুচরণই তো, বাপ এড়িয়ে যেতে চায়, তাইতেই না ওনাকে তক্কগুলো ক'রতে হচ্ছে। এবার যতটা পারল সামলে—সুমলে নিয়েই বললে—'যদি সত্যিই আমাদের ইচ্ছে থাকে বাবা যে তিনি আসুন, এসে সামলে দিন, তাহ'লে শুধু চিঠি লিখেই কাজ হবে না অবিশ্যি আমার যা মন বলছে'।

'তা হলে।—একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে দিদিমণির মুখের দিকে চেয়ে রইল দাঠাকুর। বুঝলেন না? তক্ক করে করে দিদিমণি এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, খোদ ওনার নিজের যাওয়া ছাড়া আর তো উপায় নেই।

দিদিমণি যেন সহসা কথার মাঝখানেই উঠে পড়ল। পায়ে হাত বুলিয়ে পেন্নাম ক'রে বললে—'এবার আমি যাই বাবা, দেরি হ'য়ে গেল খানিকটা। ভেবেচিন্তে যা হয় একটা ঠিক করে জানিও আমায়।'

নেবে আসতে আসতেই বললে। ঠাকুরমশাই চুপ করেই সঙ্গে এসে পাল্কিতে তুলে দিলে। আমিও সঙ্গে রয়েচি, বেয়ারারা পাল্কি তুললে আমায় বললে—'পাট সেরে সন্ধ্যের পর একবার পারিস তো আসিস স্বরূপে।'

চোখ টিপেও দিলে।......দেখি দা'ঠাকুর একবার কলকেটা, এমনি খাচ্ছি না তো খাচ্চি না, সামনে থাকলে কেমন যেন আবার স্থির থাকে না মন'।

হুঁকা বেঁকিয়ে ধরতে তুলে নিয়ে কয়েকটা টান দিয়ে আবার রেখে দিল, বলল—'তার পর সেই হাসি আবার দেখেলে'।

প্রশ্ন করলাম—'গেলে বুঝি তুমি সন্ধ্যেয়?'

'সন্ধ্যেয় কি বল আপনি!'—বাতা একটা তুলে নিয়ে আরম্ভ করেছিল স্বরূপ, হাত থামিয়ে বলল—'সন্ধ্যে পর্যন্ত আর থাকে ধৈর্য? খানিকটা বল-বেস করে আমার পাঠো বাবাকে একেবারে তোরের

হোয়েই এসচে বলেছে ঠাকুরমশাই। আমি তানাদের পৌঁছে দিয়ে মাঠনে মাঠনে একেবারে হ' আনী দেউড়ি। আজ্ঞে হ্যাঁ তা ছুটেই একরকম বৌক। ষ্যাখন পৌঁছুলুম, হাঁপাচ্ছি। স্বরূপের জন্যে তো ঢালা হুকুম, সোজা অন্দর মহলে গিয়ে উঁগার ঝির সঙ্গে দেখা। জিগোলাম—'দিদিমণি কোথায় গা উঁগার মাসী?'

না, 'কেন'?

না, 'একটা কথা আচে। তানাকেই বলতে হবে'। বুঝলেন না? উঁগার ঝি হচ্চে দেউড়ির সব ওপরের ঝি। ঝিয়েদের কম্যাণ্ডার-ইন্‌চিফ আর কি। তা স্বরূপই বা কার নীচে তা কন? দম কমাই কেন নিজের? বলনু, খাসজাণীর কানে দেওয়ার মতন কথা। উঁগার ঠোঁট কুঁচকে ছাতের দিকে মুখটা একটু তুলে দিলে, মানে ওপরের ঘরে আচে। আমি তিন লাপে একেবারে তেতলায় ওনার ঘরের দরজায়। সঙ্গে সঙ্গেই অপরূপ হয়ে কাঠ মেরে যাওয়া বৌক. জামাইবাবু থাকতে পারে অতটা তো হুঁস নেই। তা' হোক দা'-ঠাকুর। সেই তো আমার প্রথম কাশী-যাত্রার পুণ্যি অজ্জন, একসঙ্গে হর-পাব্বতী দর্শন যে কি তা সেই প্রেথমেই তো পারনু জানতে, সে যে কী......'

মনে ছাপটা নিশ্চয় বেশী করেই প'ড়েছিল? স্মৃতির উদ্দেশে চোখদুটোও উদ্বেল হ'য়ে উঠল। তবে, এবার আনন্দের আবেগ, চোখ দুটো মুছে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার সহজ হ'য়ে উঠে বলল—"কলকাতা থেকে আমদানী করা সায়েব বাড়ির একটা গদি-আঁটা কৌচে জানলার ধারে বসেছেন দুজনে, দিদিমণি একটু জড়সর হ'য়ে গেছে। জামাইবাবু বললে—'কিরে রূপচাঁদ? আয় ভেতরে।'

আজ্ঞে বিয়ের পর আমার ঐ নাম পড়েছেল, দা' ঠাকুর আদরের, না হয় ঠাট্টার বলতে হয় তো তাও বলতে পারেন।"

সূক্ষ্ম একটু গর্বের রেস স্বরূপের কণ্ঠে। বলে চলল—'এরপর দিদিমণি সুদোলে—'তুই এখুনি চলে এলি যে!'

ভেতরে গিয়ে দাঁইড়্যোচি, বলনু—'কাজ তো হ'য়ে গেল।'

'তার মানে!'—আশ্চর্য্য হ'য়ে সিধে হয়ে ঘুরে বসল আমার দিকে দিদিমণি। আমি বলনু—'তুমি চলে এলে, উনিও ত্যাখনি আমায় বললে—তুই তাড়াতাড়ি গিয়ে তোর বাবাকে লোচনের ছইওলা গাড়িটে জুতিয়ে নিয়ে আসতে বল্‌গে। যাই, একটা ফ্যাসাদ বাড়িয়ে গেল নেত্য, বোঝে না তো, সে পাগল-ছাগল মানুষ, নেত্যও থাকবে না, কী মাথায় ঢোকে, কী কাণ্ড আবার ক'রে বসে...'

শুনতে শুনতে দিদিমণির চোখদুটো চক্‌চক্‌ ক'রে উঠেছে, আঁজলায় মুখটা ঢেকে একেবারে খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল। জামাইবাবু তো হয়েই যাবে আশ্চর্য্য, সুদোলে—'কি হোল! হঠাৎ এত হাসি? রোগ যেন তোমার একটা!'

কী ভাগ্য করেছিনু, সিদিন হর-পার্বতীর ঝগড়াও দেখনু। আজ্ঞে তখন, না কেন? যাত্রাতেও দেখেচি, তবে এ তো একেবারে খাঁটি জিনিস, লাগতে পারে কখনও এর কাচে? দিদিমণি কেন সব দোষটা ওনার ঘাড়েই তুলে দিয়ে একটু মুখ নাড়া দিয়েই বললে—'তোমারই সেই আজগুবি রোগ—বিধবাদের বিয়ে দেওয়া, ভুলে গেলে ইরিই মধ্যে? বাবার সেই থেকে ভয়, মাসীমা কোনদিন একটু বেকায়দায় পেলেই গলায় একছড়া মালা...'

আর শেষ করতে পারে দা'-ঠাকুর? মুখ ঢেকে হাসতে গিয়ে আরও উলুটে-পালুটে প'ড়তে লাগল।

জামাইবাবু একটু অবাক হয়েই চেয়ে রইল খানিকটে, তারপর আমায় সুদোলে—তা কি হোল তারপর? নিয়ে এলি লোচনের ছইওলা গাড়ি?

বলনু—'আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনজনে এসে দেখি, বাবাঠাকুর একেবারে রেডি উড়ুনি গায়ে দিয়ে, চটি পড়ে, লাঠি নিয়ে। আপনি যেমন রেডি হয়ে থাক, ঘোড়ায় জিন কষে নিয়ে আসলে, নাপ্যে, চ'ড়ে বোস'। আজ্ঞে হাসবার জন্যে বলব শ্বশুরকে টেনে নিয়ে, ঘাড়ে দুটো মাথা নেই তো আমার। আমি বল্লনু জামাইবাবুরই একটু বড়াই করে. ক'বারই চোখে পড়েছে তো জামাইবাবু ঘোড়সওয়ারি হয়ে সাজগোজ পরে, সে একটা দেখবার মতো দিশ্য। বড়াই করেই বলা, তা এবার চাপতে গিয়েও ওনার হাঁসিও খানিকটা বেইরেই গেল। ত্যাখনই সামলে নিয়ে যেন আমায় একটু দাবড়ানি দিয়েই বললে—"ঐ ক'রে বলে? গুরুজন না তিনি?"

তারপর দিদিমণিকেও যেন একটু রাগ ক'রে বললে—'তা তুমি ও'কে হঠাৎ পাঠাতে বা গেলে কেন মাসীমাদের কাছে?'

না, 'অষ্টমঙ্গলা আছে, সুবুচনী আচে—খুড়িমা বলছিলেন।'

উনি বললে—"বিয়ের ব্যাপারে ওসব মেয়েলি আচার বৈতো নয়; না করলেই বা ক্ষাতিটে কি হচ্চে?'

—সায়েবের কালেজে ইঞ্জিরি পড়া ছেলে তো। এবার দিদিমণিও মুখভার ক'রে বললে—'মেয়ে একেবারে না থাকলেই বা ক্ষেতিটা কি বিয়ের ব্যাপারে?'

লেহ্য কথাই তো দা'ঠাকুর। অনাদি ন্যায়রত্ন মশাইয়ের মেয়ের মতনই। মেয়ে নিয়ে য্যাখন বিয়ে, ত্যাখন মেয়েলি আচার-গুলোই যদি বাদ দেবে তো গোড়া হাবেড়ে একেবারে কনেকেই বাদ দেও না কেন? একটু চুপ করেই রইল জামাইবাবু, দেখনু শুধু আড়চোখে যেন একটু ওনার দিকে চাইল।

এরপর বললে—'বেশ না হয় পাঠালে—অবিশ্যি না পাঠালেই হোত, বুড়োমানুষ, এতটা পথ—তবে যখন সেই মতলবই ক'রেছিলে, আমায় বললে পাল্কি বেয়ারারই ব্যবস্থা করি। দুটো পাল্কি যেত, একটা মাসিমার জন্যেও!'

দিদিমণি বললে—'জামাইয়ের কোনরকম সাহায্যি নেবার মানুষ দুজনার মধ্যে এক-জনও? আমাকেই যে দুষচ?"

এবার বেশ খানিকক্ষণ চুপ। এবার রাগটা তো তিনজনেরই ওপর। ইনি দোষ চাপাচ্চেন, উঁদিকে ওনারা নেবেন না কোন-রকম সাহায্যি। বেশ খানিকক্ষণ চুপ রইল দিদিমণি। জামাইবাবু বার দুই-তিন আড়ে চেয়ে চেয়ে দেখলে। তারপর একবার চোখা-চোখি হয়ে যেতেই ফিক করে হেসে ফেলে ও ভাবটাই গেল কেটে দিদিমণির। আমি জানি তো, বেশিক্ষণ মুখ ভার ক'রে থাকার সে ক্ষ্যামতাই ছেল না ওনার। আজ্ঞে, হোলও তাই। একবার হাসি বেইরে, হাসির সঙ্গে ও-ভাবটাও গেল কেটে। জামাইবাবুর দিকে চেয়ে বললে—

'শোন তাহ'লে সব কথা। অষ্টমঙ্গলা, সুবচুনী—ওসব আমিই সাঁদ করিয়ে দিয়েছি মাথায়, খুড়িমা কেন বলতে যাবেন, দেখচেন না কি একলা বেটাছেলে?"

জামাইবাবু আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়ে জিগোলে—'তুমি মাথায় সাঁদ করিয়ে দিয়েচ?'

'হ্যাঁ, কি করতে পারতুম বলো।'—এবার সোয়ামী-ইস্তিরিতে পরামর্শের মতন ওনাকেই সাক্ষী মানল দিদিমণি। বললে—'দু'জনকে একত্তর করে একটা ব্যবস্তা করতে হবে তো? না, উনি চিরকাল হাত-পুড়িয়ে খাবেন, আর উনি ভাইয়ের আশ্র-দাসী হয়ে ভাই-ভেজের গঞ্জনা খা'বেন। তখন কাজের ভিড়, নতুন বৌ হয়ে বাড়ীতে এয়েচি ......'

জামাইবাবুর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানেও সেই মেঘটা বেশ পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে। বললে—'তাই এই ক'রে দু'জনকে একত্তর করা? খুব মতলব এ'টেছো তো!'

আমায় বললে—'তোর দিদিমণির দু'-দিনেই কনে-বৌ থেকে একেবারে পাকা গিন্নি রে রূপচাঁদ, আর ভাবনা কিসের?'

দিদিমণি বললে—'এখন গিন্নীপনার হয়েচে কি? হোক তো দুজনে একত্তর আগে। আমি কিরকম ফিকিরে মাসীর বোন-ঝি তা তোর জামাইবাবু ভুলে গেচেন দুদিনেই। মনে করিয়ে দে-রে স্বরূপ।'

আজ্ঞে, আবার তো সেই হাসি। গলে উঠেই পড়ল। বললে—'যাই নীচে, তোমার বেড়াতে যাওয়ার ব্যবস্তা করি গে। তুমিও রেডি হও।

ইঞ্জিরি কথাটা ব'লে ওনার দিকে আড়ে চেয়ে একটু হেসে নিয়ে আমায় বললে—'আয় রে স্বরূপ।'

আজ্ঞে, আমার তো ত্যাখন—"প্রেমানন্দে হরি হরি"—ব'লে দু'হাত তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে। কলহ-মিলন দুটোই তো দেখা হ'য়ে গেল।' (ক্রমশঃ)
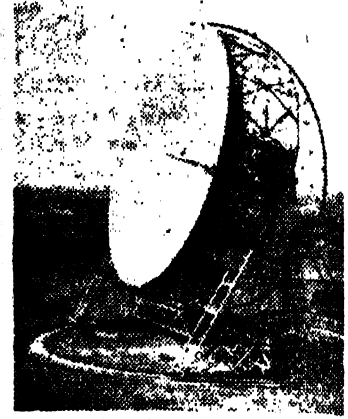
কি এবং কেন (৯) : রেডিও-টেলিস্কোপ

আমরা জানি, দূর-দূরান্তর গ্রহ-নক্ষত্রাদি থেকে যে বিভিন্ন তরঙ্গমালা অসীম নিস্তব্ধ মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে আসছে, তার অতি ক্ষুদ্র এক অংশ আলোক-তরঙ্গ আমাদের বায়ুমণ্ডলের সকল বাধা পেরিয়ে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছুতে পারে। এই আলোকের সাহায্যেই টেলিস্কোপ বা দূরবীণ সুদূর মহাকাশের সংবাদ সংগ্রহ করে আনে। কিন্তু বিভিন্ন জ্যোতিষ্ক থেকে আলোক ছাড়া অন্যান্য যেসব তরঙ্গ পৃথিবীর বুকে হয়তো এসে পড়ছে, তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ দূরবীণ অচল। তা হলে তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে?

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হার্ভজ বেতারতরঙ্গ আবিষ্কার করার ৬ বছর পরে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সার অলিভার লজ এবং পরে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন, সূর্য ও বহির্বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেতার-তরঙ্গ বিকিরিত হচ্ছে ও পৃথিবীতে এসে পড়ছে। আলোকের পরিবর্তে তা হলে বহির্বিশ্ব পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা যেতে পারে।

বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে আমরা সকলেই আজ অল্পবিস্তর পরিচিত। আমাদের রেডিও যন্ত্রে বা ট্রানজিস্টরে এই বেতার-তরঙ্গ আমরা নিয়মিত ব্যবহার করে থাকি। বহির্বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বেতার-তরঙ্গও এই একজাতীয়। আলোক-তরঙ্গ ও বেতার-তরঙ্গ মূলত একশ্রেণীর তরঙ্গমালারই অন্তর্গত—যার নাম বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ, তফাৎ শুধু এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে।

বেতারের সাহায্যে জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ যে বিজ্ঞান শাখার অন্তর্গত সেই শাখাকে বলা হয় বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সার অলিভার লজ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা সূর্য থেকে আগত বেতার-তরঙ্গকে পৃথিবীতে বসে ধরবার জন্যে নানা জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন, তথাপি উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে তাঁদের চেষ্টা সফল হয় নি। প্রকৃতপক্ষে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে মাত্র ৩৭ বছর আগে। এর আগে পর্যন্ত মহাকাশের কোনো অঞ্চল থেকে আদৌ বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে এসে পড়ছে কিনা, তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের ছিল না। বহির্বিশ্ব থেকে আগত বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচয় লাভের সুযোগ ও গৌরবের অধিকারী হচ্ছেন কার্ল ইয়ানস্কি। সেটা ১৯৩২ সালের কথা। যুবক ইয়ানস্কি তখন আমেরিকায় বেল টেলিফোন গবেষণাগারের ইঞ্জিনীয়ার। দূর-পাল্লার বেতার টেলিফোন ব্যবস্থার নানা খুঁটিনাটি নিয়ে তিনি যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁর বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে খুব স্পষ্টভাবে একরকম হিস-হিস শব্দ শুনতে পেলেন। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন, পার্থিব কোনো কারণে এরকম শব্দ হচ্ছে। কিন্তু এরিয়েলের অবস্থান ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণ থেকে শীঘ্রই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, ঐ অদ্ভুত শব্দের উৎস পৃথিবীর বাইরে আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রস্থলে। অর্থাৎ ছায়াপথের কেন্দ্রস্থল থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে ঐ হিস-হিস শব্দ সৃষ্টি করেছে। ইয়ানস্কির এই চমকপ্রদ আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক যুগান্তকর ঘটনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেসময় ইয়ানস্কি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় এই অভূতপূর্ব আবিষ্কারকে বেশিদূর অনুধাবন করতে পারেন নি।

এরপর ১০ বছর আর এই আবিষ্কার সম্পর্কে কেউ তেমন আগ্রহ দেখান নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক দৈব ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ব্যাপারের প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আবার আকৃষ্ট হয়। বৃটিশ সেনাবাহিনীর রেডার যন্ত্রগুলি তখন জার্মানীর প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্যে ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলভাগে স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন বিকেলের দিকে এই সব রেডারযন্ত্রে এক অভিনব বেতার-সংকেত ধরা পড়লো। প্রথমে বিশেষজ্ঞরা ভেবেছিলেন—রেডার-যন্ত্রগুলিকে অকেজো করে দেবার জন্যে এটা হচ্ছে জার্মানদের এক নতুন রকমের ধাপ্পা। কিন্তু পর পর কয়েকদিন বিকেলের দিকে এই বেতার সংকেত রেডার যন্ত্রগুলিতে পরিলক্ষিত হতে লাগলো। সার জে এস হে ছিলেন তখন বৃটিশ সেনাবিভাগে বেতার গবেষণা শাখার অধিকর্তা। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, এই বেতার সংকেত আসছে সূর্য থেকে। সূর্যের ওপর তখন প্রকাণ্ড একটা সৌর কলঙ্ক দেখা গিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ হবার পর এই অদ্ভুত ঘটনা

চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, সুদূর নীহারিকা-লোক, ছায়াপথ, গ্রহ-নক্ষত্রাদি থেকে বেতার-সংকেত পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়।

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে থাকেন, আলোক দূরবীক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রাখা হলো বেতার-দূরবীক্ষণ (রেডিও টেলিস্কোপ)। বেতার-দূরবীক্ষণের যন্ত্রপাতি মূলত তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথমটি এরিয়েল। এর কাজ হচ্ছে মহাশূন্য থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়টি হলো গ্রাহকযন্ত্র। এটি সংগৃহীত বেতার-তরঙ্গমালাকে পরিবর্তিত ও সুসংবদ্ধ করে। তৃতীয় অংশটি হচ্ছে পরিমাপক বা লেখনী যন্ত্র। দূরাগত বেতার-সংকেতকে লিপিবদ্ধ ও পরিমাপ করাই হচ্ছে এর কাজ।

বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রাদি থেকে বেতার-তরঙ্গ যখন পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, তারা মোটেই শক্তিশালী নয়। বাড়ির ছাদের ওপর একটি মাত্র তার দিয়ে তৈরী যে এরিয়েলের সঙ্গে আমরা পরিচিত, এক্ষেত্রে তা অচল। তাই বেতার-দূরবীক্ষণে মূল এরিয়েলের সঙ্গে একটি প্রতিফলক যুক্ত করে দেওয়া হয়। প্রতিফলক সমন্বিত এরিয়েলটি ইচ্ছামত সব দিকেই ঘোরানো যায়। ফলে এর সাহায্যে মহাকাশের যে কোনো দিকে পর্যবেক্ষণ চালানো যায়। প্রতিফলকের আকৃতি সাধারণত অধিবৃত্তাকার হয়ে থাকে।

গ্রাহকযন্ত্রটি আমাদের বাড়ির রেডিও গ্রাহকযন্ত্রের একটা উন্নত সংস্করণ। লেখনী যন্ত্রটি কিন্তু অদ্ভুত ধরনের। একটি ছোট কলম এখানে আপন মনে ছক কাটা কাগজের ওপর নাচতে থাকে। কাগজটি আস্তে আস্তে একদিকে সরে যায়, আর কলমটিও নাচতে নাচতে তার ওপর দাগ কেটে যায়। কোনো বিশেষ মুহূর্তে ছক-কাগজের ওপর লেখনীর অবস্থান বহিরাগত বেতার তরঙ্গের তীব্রতা সূচিত করে। মজার কথা এই যে, লাউড স্পীকারের সাহায্যে মহাশূন্যের এই সব বেতার সংকেত ইচ্ছা করলে কানে শোনবারও ব্যবস্থা করা যায়। সূর্য ও আমাদের ছায়া-পথের বেতার-সংকেত অনেকটা মৃদু শিসের

মতো। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহ থেকে আগত সংকেত প্রচণ্ড গর্জনের মতো শোনায়। মহাকাশ অভিযানে বেতার দূরবীক্ষণ আজ বিজ্ঞানীদের এক অন্ত বড় হাতিয়ার। এই হাতিয়ারের সাহায্যেই আজ ব্রহ্মাণ্ডলোকের কোয়াসার, পালসার, এক্স-রে নক্ষত্র ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

সাইবেরিয়ার বিজ্ঞান-নগরী

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে একটি নগরী গড়ে উঠেছে—একথা শুনলে অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হবে। কিন্তু সত্যসত্যই এমন একটি অভিনব নগরী গড়ে উঠেছে সোভিয়েত রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে। এই নগরীটির নাম আকাদেম-গোরোডক। এই শহরের মোট জনসংখ্যা ৪০ হাজার। তাদের মধ্যে সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি হচ্ছেন বিজ্ঞানী। এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে ৫০ জন হচ্ছেন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আকাডেমিনিয়ান এবং বিজ্ঞান আকাদেমির সদস্য। বাকি ৩৭ হাজার লোকের মধ্যে শিশুরা ছাড়া প্রায় সকলেই হচ্ছেন সহ-গবেষক, গবেষণাগারের কর্মী বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। কাজেই বলা চলে এখানকার সব বাসিন্দাই হচ্ছেন বিজ্ঞানী।

আজ এই নগরীতে বিজ্ঞানীদের জন্যে ঘর-বাড়ি, দোকান, হোটেল-রেস্টুরেন্ট, ক্লাব, প্রেক্ষাগৃহ, প্রমোদ-উদ্যান সব কিছুই আছে। কিন্তু ১০ বছরে আগে এখানে এসবের কিছুই ছিল না। তাই ১০ বছর আগে খ্যাতনামা গণিতবিদ আকাডেমিশিয়ান মাই-কেল লাভরেনটিয়েভ যখন এই মরুভূমি সদৃশ অঞ্চলে একটি বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করেন তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। সেসময় অধ্যাপক লাভরেনটিয়েভের বয়স প্রায় ৬০ বছর। এই বৃদ্ধ বয়সে মস্কোর মতো শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে সাইবেরিয়ায় যাওয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার। সাইবেরিয়া সম্পর্কে লোকে ঠাট্টা করে বলত 'সেখান ১২ মাস শীতকাল ও বাকি সময় গ্রীষ্মকাল।' কিন্তু লাভ-রেনটিয়েভ সাইবেরিয়া সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন এবং তার প্রাকৃতিক সম্পদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উচ্চ আশা পোষণ করতেন। আজ যেখানে বিজ্ঞান-নগরী গড়ে উঠেছে সেই নভোসিবারস্ক শহর থেকে ৫০০ কিলো-মিটার দূরে ৩ কোটি লক্ষ টন পরিমাণ একটি আকরিক সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া সাইবেরিয়া অঞ্চলে ২ কোটি লক্ষ টন কয়লা সঞ্চিত আছে। সারা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বনসম্পদের চার-পঞ্চমাংশ এবং জলবিদ্যুৎ সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ এখানে আছে। এই অঞ্চলে সোনা, খনিজ লবণ, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসও প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত আছে।

এই বিজ্ঞান-নগরীতে ২২টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই গবেষণাগারগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত. এখানে একটি কম্প্যুটিং কেন্দ্র আছে, বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং একটি কারখানাও আছে যেখানে বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করা হয়। এখানে একটি পদার্থ-বৈজ্ঞানিক গণিত শিক্ষাকেন্দ্রও আছে। অর্থ-নীতি ও শিল্পোৎপাদন সম্পর্কিত একটি প্রতিষ্ঠানও এখানে স্থাপিত হয়েছে। আজ শুধু নভোসিবারস্ক গবেষণাকেন্দ্র নয়, তার আশে-পাশে আরও কয়েকটি বিজ্ঞানকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সাইবেরিয়ার এই সমস্ত বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রের সভাপতি হচ্ছেন আকাডেমিশিয়ান মাইকেল লাভরেনটিয়েভ।

সাইবেরিয়ার এই বিজ্ঞান-নগরী বয়সে তরুণ হলেও ইতিমধ্যে এখানকার কাজের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সে কারণে সোভিয়েত রাশিয়ার মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ এবং অন্যান্য প্রধান শহরের বিজ্ঞানীরা এখানে আলাপ-আলোচনার জন্যে মাঝে মাঝে আসেন। এখানে ইতিমধ্যেই একাধিক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান আলোচনাচক্র ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বছর বসন্তকালে এখানে পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কিত আন্ত-র্জাতিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। গত বছর এক হাজারেরও বেশি বিদেশী বিজ্ঞানী এই বিজ্ঞান-নগরী পরিদর্শন করেন।

চান্দ্রশিলা পরীক্ষার ভিত্তিতে চন্দ্রের বয়স

চন্দ্রের বয়স কত?—এই প্রশ্ন বিজ্ঞানী-দের কাছে দীর্ঘকাল ধরে একটি সমস্যা হয়ে আছে। চন্দ্র কি সৌরজগৎ সৃষ্টির আদি-কালেই সৃষ্ট হয়েছিল, না তার পরবর্তী-কালে? দীর্ঘদিনের এই জটিল প্রশ্নের একটি সদুত্তর অ্যাপোলো-১১-র মহাকাশচারীদের আনীত চন্দ্র পৃষ্ঠের উপলখণ্ডের রাসায়নিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পাওয়া গেছে। এই পরীক্ষার ভিত্তিতে বলা যায়, সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি যতদিন আগে চন্দ্রের বয়সও ততদিন। অর্থাৎ ৪৫০ কোটি বছর আগে চন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়।

কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যদি সঠিক হয় তা হলে একথাই প্রমাণিত হবে, চন্দ্র যখন প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তখন থেকে আজ পর্যন্ত চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ সম্ভবত প্রায় অবিকৃতই রয়েছে।

কোনো বস্তুর সঠিক বয়স নির্ণয়ের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে। এই পদ্ধতিতে এই অনুমান সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হলে বলা যাবে, পৃথিবী তার শৈশবে যে অবস্থায় ছিল চন্দ্র এখন সেই অবস্থায় রয়েছে। পৃথিবী এবং সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের জন্ম, বয়স ও বিবর্তন সম্পর্কে গবেষণার পক্ষে চন্দ্র হবে একটি প্রাকৃতিক গবেষণাগার। এ ছাড়া সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জীবনচক্র সম্পর্কে অনেক কিছু এ থেকে জানা যাবে।

চন্দ্রের বয়স সম্পর্কে এই আবিষ্কার চান্দ্র-তত্ত্বের জনক নোবল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ হ্যারল্ড উরে-র সিদ্ধান্তের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। ডঃ উরে বিগত কয়েক দশক ধরেই বলে আসছেন, সৃষ্টিকালে চন্দ্রের পৃষ্ঠদেশ যেমন ছিল এখনও অনেকটা সেই রকমই আছে।

সাইবেরিয়ার বিজ্ঞান-নগরী [illegible]

চন্দ্র থেকে আনীত নমুনা পরীক্ষা করে এই যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করা হয়েছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে চান্দ্রশিলার নমুনাগুলি পরীক্ষা করেছেন। প্রিজম্‌ যেমন আলোকরশ্মিকে সপ্ত রঙে বিচ্ছিন্ন করে প্রকাশ করে, তেমনি স্পেকট্রোমিটারও প্রস্তর খণ্ডের নমুনাকে বিশ্লেষণ করে যেসব রাসায়নিক মৌল পদার্থ দিয়ে ঐ প্রস্তরখণ্ড গঠিত সেগুলিকে পৃথক করে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, চান্দ্র-শিলায় আর্গন জাতীয় যেসব বিরল গ্যাস প্রভূত পরিমাণে পাওয়া গেছে তা এই কথাই প্রমাণ করে যে ভূ-ত্বকে প্রাচীনতম শিলা যত প্রাচীন, চান্দ্রশিলাও তত প্রাচীন এবং শেষোক্তগুলি ৪৫০ কোটি বছরের মতো প্রাচীন হতে পারে।

আর্গন-৪০ গ্যাসের সঙ্গে পটাসিয়ামের অনুপাত হিসাব করে বয়স নির্ণয় করা হয়। পটাসিয়াম-৪০ নামক তেজস্ক্রিয় পটাসিয়াম ভেঙে আর্গন-৪০ সৃষ্টি হয়। কোনো পদার্থের মধ্যে আর্গন-৪০ যদি সামান্য পরিমাণে বর্তমান থাকে, তাহলে পদার্থটি হবে নূতন আর প্রচুর পরিমাণে থাকলে হবে বহু প্রাচীন। চান্দ্রশিলার নমুনাগুলি পরীক্ষা করে তাতে প্রচুর পরিমাণ আর্গনের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এ-থেকে ঐ নমুনাগুলির প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাসপাতালে ভর্তি হবার আগে আমি আপনাকে একটা প্যাকেট দিয়ে যাব সেটা রেখে দিতে হবে।

কেন, তোমার অন্য কেন আত্মীয় নেই।

না, কেউ নেই—ম্লান হয়ে গেল কেতকীর মুখ।

বেশ, তোমার জন্য তাও করব। হাসলেন ডাঃ সেন।

কেতকী হেঁট হয়ে ডাঃ সেনের পদধূলি নিল।

চেম্বারের বাইরে এসে ডাঃ সেনের প্রেসক্রিপসনটা একবার পড়ে নিল কেতকী। তারপর কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে ভেবে নিল মনে মনে। একটা ট্যাক্সি নিয়ে মার্কেটের দিকে যেতে বলে সে পিছনে হেলান দিয়ে বসে রইল চোখ-দুটো বন্ধ করে। একের পর এক ছবি ফুটে উঠতে লাগল তার মনের পর্দায়। একটা শোভাযাত্রা, কত লোকের ভিড় সেখানে—পরিচিত অপরিচিত, ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ—কেতকীর মনে পড়ছে না ভালভাবে।

মার্কেটে নেমে কেতকী এদিক-ওদিক ঘুরল কিছুক্ষণ। তারপর শাড়ীর দোকানে গিয়ে ঢুকল। দীপার শাড়ীর মত রঙের একটা শাড়ী তার অনেকদিন ধরে কেনার ইচ্ছা ছিল। শাড়ী ছাড়া কয়েকটা প্রসাধন-দ্রব্যও কিনল সে। সামনেই উৎসব। কেতকী তাতে ভালভাবে সাজবে। দীপা দেখবে নার্স কেতকী তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ওদের অবজ্ঞার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবে সে।

এ'কদিন দীপার কিভাবে কেটেছে তা সে নিজেই জানে না। তার বিবাহিত জীবনে সরিতের পাশে থেকেও সে যেন নিঃসঙ্গ। পরস্পর ওদের বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেদিন থেকেই। সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। প্রাণহীন। কলহাস্যের গুঞ্জন আজ স্তব্ধ। দীপা এতে অভ্যস্ত নয়। তার প্রাণ-চাঞ্চল্যের আবেগ ব্যাহত হয়ে গিয়েছে রূঢ় আঘাতের পর। সরিতের কথাই মনে পড়ে তার বারবার। ব্যাপারটা মনে মনে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করেছে দীপা কিন্তু ঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে নি সে। মানুষের ভুল হয় তা সে জানে। তার নিজের জীবনেও র‍্যাকেশ অ্যান্ডভানী আছে। কিন্তু কেতকীর সঙ্গে সরিতের আগে যাই থাক বিয়ের পরও এধরনের বিসদৃশ ব্যবহারের কথা ভাবতেই পারা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা হল সরিৎ কেতকীর সঙ্গে ধস্তাধস্তির কারণটা বলতে রাজী নয়। কেন যে সেটা গোপন রাখতে চায় তাও দীপা ভেবেছে বহুবার। সরিতের ব্যবহার তার কাছে খুব রহস্যময় বলে মনে হয়েছে। কয়েকদিন সে ভেবেছে সরিতের সঙ্গে সব জিনিসটা পুনরালোচনা করবে কিনা। উসখুস করেছে দীপা সরিতের সঙ্গে কথা বলার জন্য। অভিমান

হয়েছে তার, সরিৎ তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে, নিজে থেকে কথা বলছে না বলে। সরিৎ তার সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করতে নারাজ। এ অবস্থায় যে কোন আলোচনাই আরও তিক্ততার সৃষ্টি করবে তা সে জানে। কিন্তু নারীসংহোমের উৎসবের দিন এগিয়ে আসছে। এখন আর চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, তাই সে দীপাকে বলল সেদিন—

বাকী কার্ডগুলো আজই পাঠাতে হবে, আর সময় নেই।

পাঠিয়ে দাও। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল দীপা।

রিফ্রেসমেন্টের ব্যবস্থা কি হবে, কেটারারকে দেওয়া হবে?

একটু চুপ করে রইল দীপা—তারপর বলল—না সে ব্যবস্থা পরে হবে।

সরিৎ এইটাই চাইছিল। একটু ধরিয়ে দিতে পারলেই হল। তারপর দীপার উৎসাহে আপনা থেকেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। তাই হল, সরিৎ চলে যাবার পরই দীপা অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ঘুমটা যেন হঠাৎ ভেঙ্গে গেল তার। মুহ্যমান মন আর দেহ সক্রিয় হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। এতদিন সে স্বভাবের বিরুদ্ধে চলছিল। মনটা কিন্তু উন্মুখ হয়েছিল ফিরে যেতে তার আনন্দময় কর্মবেষ্টনীর মধ্যে। উঠে পড়ল দীপা। তারপর নিমন্ত্রিতদের লিস্ট মিলিয়ে খামের উপর সযত্নে একটা একটা করে নামগুলো লিখতে লাগল। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল তার মন। সাচ্ছন্দ্য ফিরে এল তার চলনে।

গ্রীনল্যাণ্ড নারীসংহোম আজ উৎসবের সজ্জায় সেজেছে। ফুল আর আলোর অপূর্ব সমাবেশ। গেটের উপর আলো জ্বলছে ঝলমল করে। চতুর্দিক ছিমছাম, পরিষ্কার। দেওয়ালের মাঝে সুসজ্জিত ফুলের গুচ্ছ দুলছে। টবে রাখা ছোট গাছগুলো সিঁড়ির পাশে পাশে সাজানো হয়েছে আজ। হলঘরের একদিকে উঁচু একটা ডায়াস তৈরী করা হয়েছে। তার সামনে সারবন্দী চেয়ার—মাঝে একটা প্যাসেজ।

দীপা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল তাড়াতাড়ি। আর সময় নেই, তাকে সেজে নিতে হবে এখুনি। ঘরে ঢুকে প্রথমেই ড্রেসিংটেবিলের সামনে তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে বসল সে। মুখটা ভালভাবে মুছে নিয়ে প্রসাধন শুরু করল শান্তমনে।

দীপা দীর্ঘকেশী নয়। দিল্লী থেকেই তার চুলটা কাটা [illegible]। কাঁধের একটু নীচে চুলটা এসে থেমে গিয়েছে। কোঁকড়ানো চুল। দীপার চুলের রং কিন্তু কালো নয়, একটু কটা, সামান্য সোনালী আভা লেগে আছে তার গায়ে। চুলটা ভালভাবে আঁচড়ে নিল সে ড্রায়ার আর ব্রাশের সাহায্যে। তারপর তার ছোট কপালের ওপর সাজিয়ে নিল কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছটা। ফাউণ্ডেশন ক্রীমের পট থেকে পরিমাণমত ক্রীম নিয়ে মুখ, গলা আর ঘাড়ে মেখে নিল সে। আঙুলের চাপ সব জায়গায় সমান থাকে না। ম্যাসেজ করার স্বতন্ত্র নিয়মটা সে দিল্লীর বিউটি সেলুন থেকে আয়ত্ত করে নিয়েছে।

ক্রীমমাখা শেষ হলে কমপ্যাক্টের পাফটা সে হাল্কা করে বুলিয়ে নিল সমানভাবে। তারপর দেখে নিল রঙের কোন তারতম্য হয়েছে কিনা। খুশী হল দীপা, সব জায়গায়ই সমান হয়েছে। এবার ক্ষুদ্রাকৃতি একটা ব্রাশ দিয়ে ভ্রূ-দুটোর ওপর বুলিয়ে নিল এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত। পেন্সিল দিয়ে সে সূক্ষ্মভাবে ভ্রূটা দীর্ঘায়িত করতে লাগল নিখুঁত শিল্পীর ভঙ্গীতে। চোখে কাজল দিতেই ভালবাসে দীপা, সুরমা নয়। দিল্লীতে থাকতে সে বরাবরই সুরমা ব্যবহার করেছে, কিন্তু বাঙালী মেয়েদের চোখে কাজল দেওয়াটাই তার পছন্দ বেশী। একবার সে ভাবল চোখের পাতার ওপর সামান্য ম্যাসকারার প্রলেপ দেবে কিনা। কিন্তু কি ভেবে সেটা আর লাগাল না শেষ পর্যন্ত। নকল চোখের পাতাও তার সংগ্রহে আছে। সেটাও বাদ দিল সে তার সজ্জা থেকে। শুধু কাজল নিয়ে সে চোখের ধারে লাগিয়ে নিল নিপুণভাবে তারপর শেষ প্রান্তে একটু টেনে উঁচু করে দিল রেখাটা। এবার লিপ-স্টিকের বাক্সটা বার করল দীপা। বিভিন্ন রঙের লিপস্টিক সাজান রয়েছে এতে। তার কাছে এটা একটা মূল্যবান সম্পত্তি। বিলেত থেকে তার এক সহপাঠিনী ফরমাস মত এটি সংগ্রহ করেছে—এর জন্য দীপাকে কাস্টমস্ ডিউটি হিসাবে বেশ কিছু খরচ করতে হয়েছে। পিংক থেকে শুরু করে গাঢ় লাল, ন্যাচারাল থেকে আরম্ভ করে ক্রীমসন পর্যন্ত। বিভিন্ন সময়ে, দিনে বা রাতে, ভিন্ন ভিন্ন রঙের সাজের সঙ্গে প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী মিল বা অমিল করে এগুলো ব্যবহার করে থাকে দীপা। সে আজ পিংক রংটাই পছন্দ করল। ওপর এবং নীচের ঠোঁট দুটোতে সে হাল্কাভাবে লিপস্টিক লাগিয়ে নিল সচ্ছন্দভঙ্গীতে। ঠোঁটদুটো জড়ো করে মুখটা দেখল একবার। তারপর একটু হাঁ করে স্টিকটা বুলিয়ে নিল কয়েক জায়গায়।

কাবার্ড খুলে তার জামাকাপড়ের স্তূপটা লক্ষ্য করে খুশী হল সে। কিন্তু কোন্ কাপড়টা পরবে সেটা ঠিক করতে সময় লাগছে দীপার। মাঝে মাঝে অবশ্য সরিতের পরামর্শ সে নেয়, তাতে আর কিছু না হোক পছন্দ করতে সময়টা লাগে কম। সরিৎ এখন বাথরুমে, তাছাড়া তার সঙ্গে সম্পর্কটা এখনও স্বাভাবিক হয়ে আসে নি। কয়েকটা শাড়ী বার করে পরপর খাটের ওপর সাজিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। [illegible] পার্ল, পিংক, [illegible] শেষ পর্যন্ত [illegible] পছন্দ হল তার।

[illegible] থেকে দীপা ব্যাকলেস পরার অভ্যাস। শাড়ী পরলেও তার সঙ্গে ব্যাকলেস পরে থাকে সে। তা না হলে [illegible] যেন খালি খালি লাগে তার, মনে হয় কিছু পরাই হয় নি। [illegible] রঙের পেটিকোট আর [illegible] নিল দীপা। [illegible] চোলিটা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এবার শাড়ীটা পরতে শুরু করল বিচিত্র ভঙ্গীতে। শাড়ীটা তার অঙ্গে একেবারে লেপটে রইল। [illegible] পিন আপ [illegible] দাঁড়াল। নিজেকে আয়নাতে নিরীক্ষণ করে খুশী হল [illegible] দীপা [illegible]। কিন্তু [illegible] দিকে [illegible] [illegible] [illegible] উপায় নেই [illegible] হিসাবে [illegible] [illegible] লাগছে। [illegible] [illegible] [illegible] কোন ত্রুটি হয় নি। [illegible] [illegible] একটা [illegible] আর লম্বা [illegible] একটা [illegible] নিল সে। [illegible] [illegible] [illegible] না বলে ঠিক করেছিল। তারপর কি ভেবে ডানহাতের কব্জিতে একটা চৌকা ঘড়ি আর অপর হাতে দুগাছা হীরের চুড়ি পরে তার সাজ শেষ করল। ঘর থেকে বার হবার আগে একবার সেন্টেডস্প্রেটা নিয়ে হাল্কাভাবে স্প্রে করে নিল কয়েক জায়গায়। এইটেই তার সজ্জার ফিনিশিং টাচ।

মুখ তুলতেই আরশিতে সরিতের ছায়া তার নজরে পড়ল। অবাক হয়ে সরিৎ মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখছে তাকে। ভাল লাগল দীপার। অন্য সময় হলে হেসে ফেলত কিংবা কোন মন্তব্য করত হয়ত। কিন্তু এখনও তার মনের সহজ-সাচ্ছন্দ্যটা ফিরে আসে নি, এখনও কোথায় বাধছে যেন। দীপা লক্ষ্য করল সরিৎ তার দেওয়া জন্ম-দিনের উপহার লক্ষ্ণৌর কাজকরা আদ্দির কুর্তা আর কোঁচানো ধুতিটা পরেছে। দীপা এই সাজটাই পছন্দ করে। গিলেকরা কুর্তা আর কোঁচানো কাপড় তার খুব ভাল লাগে। প্যান্টের সঙ্গে টি জি বা বুস শার্ট দেখে তার চোখ পচে গিয়েছে—বাবুর্চি-বেয়ারা থেকে বাবলু মণ্ডল পর্যন্ত সবারই এক সাজ।

কিছুক্ষণ আগে দীপা সমৎকে অনেক বুঝিয়ে গাড়ী দিয়ে সুপর্ণাকে আনতে পাঠিয়েছে। সমৎ প্রথমে রাজী হয় নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৌদির কথা এড়াতেও পারে নি। গাড়ীটা সুপর্ণাকে আনতে গিয়েছে সুতরাং তাদের ট্যাক্সি করেই রওনা হতে হবে। খুশি মনে সরিৎ ট্যাক্সিটা আনিয়ে রাখলো হয়। একটু পরেই ট্যাক্সির আওয়াজ পেতে নীচে নেমে গেল দীপা।

নারীসংহোমে পৌঁছে দীপা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কারণ কোন অতিথিই তখন পর্যন্ত আসে নি। আয়োজনের শেষ ব্যবস্থা আর খুঁটিনাটিগুলোর তদারক করতে লাগল দীপা নিখুঁতভাবে। এক একজন করে অভ্যাগতদের আগমন শুরু হল কিছুক্ষণের মধ্যেই। তাঁদের মধ্যে [illegible] বেশী। তাছাড়া শহরের কিছু বিশিষ্ট লোককেও আহ্বান করা হয়েছে। মিসেস পোদ্দারওয়ালার মাধ্যমে কয়েকজন নামজাদা পার্শীকে নিমন্ত্রণ করেছে দীপা। ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে আগরওয়ালা, চোপরা, কাপুর, আলিভাই করিমভাই, সচদেব, খান্না, এমনকি মিলওয়ালা সাধুখাঁ পর্যন্ত

আমন্ত্রিত হয়েছে। হলের টেবিলে একটা সুদৃশ্য গোলাপের গুচ্ছ রাখা আছে। এটি পাঠিয়েছেন নারায়ণদাস এ্যাডভানী. তার সংগে দীপাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একছত্র চিঠি। নারায়ণদাস অ্যাডভানী এখনও উত্থানশক্তিরহিত না হলে দীপার আহ্বান তিনি অবহেলা করতে পারতেন না কোনমতেই।

অর্কেস্ট্রা দল এসে পড়েছে। প্রথমে তারাই সংগীত পরিবেশন করবে। যন্ত্রগুলো বাঁধছে তারা; শব্দ হচ্ছে নানা ধরনের। অনেকগুলো যন্ত্র এনেছে তারা—অ্যাকর্ডিয়ান, গীটার, চেলোক, ম্যারাকাস, মোলাডিচা, ভায়োলিন, বঙ্গো, পিকসু, তাম্বুরীন, ড্রাম, সিম্বল এমনকি সেতার পর্যন্ত।

সনৎ সুপর্ণাকে নিয়ে ঢুকল। হাল্কা রঙের একটা শাড়ী পড়েছে সুপর্ণা. তার সংগে ম্যাচ করা ব্লাউজ। গলায় একটা সরু চেন আর হাতে একটা ঘড়ি—এই মাত্র অলংকার। কিন্তু বেশ মানিয়েছে তাকে। লাজুকমুখে যখন সে দীপাকে প্রতিনমস্কার জানাল তখন দীপার মনে হল সে যেন অনেক দিনের চেনা। তার হাত ধরে সামনের সারিতে বসিয়ে দিয়ে দীপা সনতের কাছে ফিরে এল। তারপর হাসিমুখে সনতের কানে আস্তে আস্তে বলল—এত দেরী হল কেন বুঝেছি। সনতের মুখটা লাল হয়ে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে সে কাছেই একটা চেয়ারে বসে পড়ল কোনরকমে। বেশী ভিড় সে পছন্দ করে না। অত লোকের দৃষ্টির সামনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিরাট একজোড়া বুট পরে সশব্দে আসতে শুধু তার লজ্জা করে না, বিরক্তিও আসে রীতিমত। আজ সে নারসিংহোমের ফাংসানে যোগদান না করারই সিদ্ধান্ত করেছিল। কেতকীর সামনে আসতে সে প্রস্তুত নয়। তাকে দেখলেই তার মনের অবস্থা যে সংকটজনক হয়ে উঠবে তা সে ভালভাবেই জানত। সাধারণত সে শান্তপ্রকৃতির। কিন্তু যে কোন কারণে রেগে উঠলে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না সে কথা সে নিজেই অনুভব করেছে কয়েকবার। কিন্তু একদিকে সুপর্ণাকে কথা দেওয়া আর অপরদিকে বৌদির পীড়াপীড়িতে তাকে শেষ পর্যন্ত এখানে আসতে সম্মত হতে হয়েছিল। এতক্ষণ সে কোনদিকেই তাকায় নি—তাকাতে ভয় করছিল সনতের। কেতকীর কথা মনে হতেই সেদিনের অপারেশন থিয়েটারের ঘটনাটাও মনে পড়ে গেল সংগে সংগে। সনৎ অনুভব করল তার গলাটা যেন শুকিয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। অনুভূতিটাকে সে দমন করতে চেষ্টা করল নানাভাবে। কিন্তু বিশেষ ফল হল না। মনে হল তার জিবটা যেন তালুতে আটকে গিয়েছে। পকেট হাতড়ে লজেন্সের কৌটা থেকে একটা লজেন্স সকলের অলক্ষে বার করে মুখে দিল সে। এতক্ষণে আরাম পেল যেন একটু। সে ভাবটা কেটে গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল সনৎ মুখার্জীর।

সরিৎ আর দীপা অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। হলটা ধীরে ধীরে ভরে উঠেছে তাদের সমাগমে। এক ফাঁকে দীপা কিচেনে জলযোগের আয়োজনটা তদারক করে এল, সব ব্যবস্থা দীপাই করিয়েছে। চিজ পকোড়া, চিকেন প্যাটিস, ফিসবল, ভেজিটেবলকাটলেট, লেমন পেস্ট্রি ও এক পিস করে প্লেন কেক। এছাড়া কোল্ড ড্রিংকস, চা, কফি এবং আইসক্রীমেরও ব্যবস্থা রয়েছে। হলের এক ধারে লম্বা টেবিলের উপর এগুলো সাজান হবে। তার সংগে থাকবে, প্লেট, ছুরি, কাঁটা আর কাগজের ন্যাপকিন। ভোক্তারা ইচ্ছামত খাবার তুলে নেবে নিজেদের প্লেটে। খাওয়ার ব্যাপারে দীপা বুফের ব্যবস্থাই পছন্দ করে। ওপরে ফিরে দীপা প্রায় সকলকেই দেখতে পেল, শুধু কেতকী ছাড়া। আশ্চর্য হল সে এ'কদিন তারা একসংগেই কাজ করেছে। অবশ্য আগের মত কথার আদান-প্রদান হয় নি। কিন্তু তার না আসার কারণ খুঁজে পেল না দীপা।

অকস্মাৎ অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল ডায়াসের উপর। সচকিত হয়ে উঠল সকলে। হিন্দি ফিল্মের একটা হিট সং বাজছে অর্কেস্ট্রাতে। সুরটা হুবহু নকল করেছে ওরা, এতটুকুও খুঁত নেই। সুরটা সর্বজন পরিচিত. কিন্তু অর্কেস্ট্রার মাধ্যমে সেটা যেন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সকলের মনেই সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল ডাঃ দীপা মুখার্জী। এ সুরটা তার খুব প্রিয়। একবার সরিতের দিকে তাকাল সে, দেখল সরিৎ তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

বাজনাটা থামল এবার। সমবেত করতালি ধ্বনিতেই বোঝা গেল সকলেই মুগ্ধ হয়েছে বাজনা শুনে।

হঠাৎ দীপা দেখল, সকলেরই দরজার দিকে লক্ষ্য। সেও সেদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। নার্স কেতকীকে চিনতে দেরী হল দীপার। সরিৎ আর সনৎও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে তার পরিবর্তন লক্ষ্য করে।

অপরূপ সাজে সেজেছে কেতকী। তার সত্তাটাই যেন পাল্টে গিয়েছে। সে-ও দীপার মত হাল্কা সবুজ রঙের শাড়ী পরেছে। তার শাড়ী পরার ভঙ্গী কিছুটা সাধারণ কিন্তু তাতে কেতকীকে মানিয়েছে চমৎকার। তার অন্যান্য সাজসজ্জাও দীপার চেয়ে নিরেস। কিন্তু সকলের দৃষ্টি যে কেতকী আকর্ষণ করেছে তা সে নিজেই অনুভব করল। এটাই সে চেয়েছিল। দীপার চেয়ে সে কম সুন্দরী নয় তাই সে আজ সকলের কাছে প্রমাণ করে দিয়েছে। সকলেই তার সংগে আলাপ করতে ব্যগ্র হল। ডাঃ দীপা মুখার্জী, কেতকীর রূপান্তরে খুশী হয় নি। একবার তাকিয়ে সে দেখল সরিতের দিকে। লক্ষ্য করল সেও কেতকীর দিকে দেখছে। চোখের ভাষাটা সরিতের ভিন্নধরনের। নিষ্ঠুর ব্যাধ যেন শিকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একটা অস্পষ্ট যন্ত্রণা হচ্ছে দীপার বুকের মধ্যে। এত আলো আর আনন্দ তার কিছুই করতে পারল না। চোখদুটো জ্বালা করতে লাগল নিষ্ফল আক্রোশে।

অকস্মাৎ অর্কেস্ট্রার বাজনায় চমকে উঠল দীপা। এবার তারা বিদেশী গানের সুরটা ধরেছে। এখন আগের যন্ত্রগুলোর সংগে ট্রামপেট বাজছে একটা। বিদেশী সুর কিন্তু সকলের মনকে নাচের ছন্দে দুলিয়ে দিল। আরও কয়েকজন অতিথি এসে পড়ল এবার। দরজার কাছেই কেতকী বসে আছে। মনে যা ইচ্ছা ছিল তার কিছুটা সফল হয়েছে। এখনও কিন্তু আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে মেটে নি। আরও কিছু আশা আছে তার। তাকিয়ে সে হলঘরের চারিদিকটা একবার দেখল। অনেক পরিচিত মুখের সন্ধান মিলল সেখানে। দীপার কাছে সুপর্ণাকে দেখে আশ্চর্য হল সে। কারণ এত জাঁকজমকের মধ্যে তার সাজটা চোখে পড়ে। বেনারসী, ক্রেপ নাইলন, পিওর সিল্ক-এর মধ্যে তার শাড়ীর রং নিষ্প্রভ বটে তবে তার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। নিজের বৈশিষ্ট্যের অহংকার নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেন সে। সুপর্ণার সংগে কেতকীর পরিচয় নেই। তবুও ভাল লাগল তাকে।

কেতকী যে নার্স সে কথা সে এখন ভুলে গিয়েছে। তার মনে শুধু জেগে আছে একটি কথা—দীপার চেয়ে সে কোন অংশে কম নয়।

বাজনাটা যেমন অতর্কিতে শুরু হয়েছিল তেমনি থেমে গেল সহসা। ডাঃ সেন দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখে সরিৎ এগিয়ে গেল অভ্যর্থনা করতে, বলল—আপনি এসেছেন স্যার। আমি আশাই করিনি যে আপনি আসবেন।

তুমি ডেকেছ, আসব না; তোমার স্ত্রী কোথায়?

আগে আছে, চলুন এগিয়ে বসবেন।

কয়েক পা এগিয়েই ডাঃ সেন কেতকীকে দেখতে পেলেন। দাঁড়িয়ে উঠল কেতকী, কিছু বলার আগেই ডাঃ সেন তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বললেন—তুমি এত পিছিয়ে বসে কেন, এস আমার সংগে।

কেতকী তাঁর সংগে এগিয়ে চলল। পাশেই সরিৎ রয়েছে। ডাঃ সেন তার রোগের সম্বন্ধে কিছু বলে না বসেন। ডাঃ সেন কিন্তু কিছুই বললেন না। রোগীর সম্মতি না নিয়ে অপরের সংগে রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করা রীতিবিরুদ্ধ। কেতকীর কাঁধে ডাঃ সেনের হাতটা তখনও রয়েছে। শুধু কলকাতা নয় সারা ভারতবর্ষের নামজাদা সার্জন ডাঃ সেন। তাঁর পান্ডিত্য, খ্যাতি আর সৎ ব্যবহার সর্বজনবিদিত। তাঁর সংগে কেতকীর হৃদ্যতা লক্ষ্য করে দীপা আরও জ্বলে উঠল ঈর্ষায়।

ডাঃ সেনের সংগে শিষ্টাচারের পর ডায়াসে উঠে দীপা সুপর্ণার নাম ঘোষণা করল। দীপাই অ্যানাউন্সারের কাজ করছে। সুপর্ণা গাইতে বসল মাইকের সামনে। অর্কেস্ট্রার পর রবীন্দ্রসংগীত গাইল না সে। একটা হাল্কা ধরনের আধুনিক গান দিয়ে শুরু করল প্রথমে। ভাল লাগল শ্রোতাদের। এরপর একটা রবীন্দ্রসংগীত

গাইল সুপর্ণা তার নিজস্ব ভঙ্গীতে। সুপর্ণার গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত খোলে ভাল। এর ফাঁকে কেতকী উঠে গিয়ে দীপাকে কি যেন বলল। তার মুখের দিকে দীপা অবাক হয়ে তাকাল কয়েক মুহূর্ত সুপর্ণার গান শেষ হওয়ার পর দীপা মাইকে ঘোষণা করল যে তাদের নার্সিং-হোমের পক্ষ থেকে একজন গান গাইছেন এবার।—নার্স কেতকী। দীপা ইচ্ছা করেই কেতকীর নামের আগে নার্স কথাটা জুড়ে দিয়েছে। তাতে কিছু এসে যায় না কেতকীর। হাসিমুখে সপ্রতিভভাবে সে উঠে গেল ডায়াসে। অপূর্ব কণ্ঠস্বর কেতকীর। অনভ্যাসের জন্য সামান্য খুঁত হয়ত রইল কিন্তু সেটা খুব বড় কথা নয়। কেতকী প্রথমেই শুরু করল রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে—

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

এত দরদ দিয়ে গানটা গাইল যে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে গেল। এরপর কবীরের একটা ভজন গাইল কেতকী। এত মধুর আর এত প্রাণমাতানো যে মুহূর্তের মধ্যে সকলেই অভিভূত হয়ে পড়ল যেন। ভজন গানে যে এত মাধুর্য আছে, এত আবেগের সৃষ্টি করতে পারে—তা অনেকেই আগে অনুভব করেন নি। অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল প্রত্যেকে। গানের প্রত্যেক কলিটি কেতকী বারবার গাইল— গানের বাণী সুস্পষ্ট, হিন্দী উচ্চারণ নিখুঁত, সুর আর তালের অপূর্ব সমন্বয়—। গান শেষ করে উঠে দাঁড়াল কেতকী। প্রথমে করতালি দিতে ভুলে গেল শ্রোতারা। শুধু গুঞ্জনধ্বনি উঠল একটা তারপর কেতকী তাদের নমস্কার জানাতে সমবেত করতালিধ্বনি উঠল স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে। ডাঃ সেনের চোখ বাষ্পাকুল হয়ে গিয়েছে। তাঁর কথা বলবার শক্তি নেই যেন।

সনতের গান ভাল লেগেছে। কিন্তু তার মন অন্যদিকে রয়েছে। একজন মেয়ে কি করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারে তাই ভাবছিল সে। তার অবচেতন মনের মধ্যে কেতকীর চরিত্রের শিথিলতার কথাই মনে পড়েছে বারবার। তাকে নিয়ে খেলা করেছে কেতকী একথা বুঝেছে সে।

নার্স কেতকী সপ্রতিভভাবে এসে দাঁড়াল দীপার পাশে। সুপর্ণাও দাঁড়িয়েছে তাকে অভিনন্দন জানাতে। সনৎ তাকিয়ে পাশাপাশি তিনজনকে দেখল। দীপার রূপের মধ্যে অহঙ্কার লুকিয়ে রয়েছে যেন। সবদিক দিয়েই সে সুন্দরী। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোথায় যেন উগ্রভাব মিশে রয়েছে তার সৌন্দর্যের মধ্যে। উদ্ধত রূপের সর্বাঙ্গীন প্রকাশ হয়েছে সেখানে। তার পাশে সুপর্ণাকে বেমানান লাগছে সাজসজ্জায়। সুপর্ণার স্নিগ্ধলালিত্য কিন্তু দীপার প্রখর রূপের পাশে অর্থহীন হয়ে পড়ে নি। বরঞ্চ তার মহিমা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। কেতকী কিন্তু অনারূপকে তাচ্ছিল্য করেছে তার অনায়াসলব্ধ সাচ্ছন্দ্যের মহিমায়। তার কাছে ডাঃ দীনা মুখার্জী, সরিৎ, গ্রীণল্যাণ্ড নার্সিং হোম যেন সম্পূর্ণ অর্থহীন।

গেটের দারোয়ান রাকেশ অ্যাডভানীকে ভিতরে আসতে দিল না। কারণ এর আগে দীপা তাকে সেই আদেশই দিয়েছিল। রাকেশ কিন্তু ক্ষান্ত হল না তাতে। সে বাবলু মণ্ডলকে ডেকে দিতে অনুরোধ করল। একটু পরেই বাবলু এসে তাকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল।

আরে দোস্ত, তুমি এসে গেছ, চল ওপরে।

এরা যেতে দেবে না, তার চেয়ে বাইরে চল।

আর একটু পরে দোস্ত, কেতকী যা গাইল না, চোখ ট্যারা হয়ে গেল মাইরী।

আর দীপা কোথায়?

আছে ঐখানে।

আমি দেখা করতে পারলাম না, আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। কি রংয়ের শাড়ী পরেছে দীপা?

সবুজ, কেন বলত?

কাপড়ের ব্যবসা করি কিনা তাই কৌতূহল হল।

এসো, একটা সিগারেট তো খাও।

বাইরে বেরিয়ে গেল বাবলু। দারোয়ান জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ডাঃ সেন উঠলেন এবার। কেতকী তার সঙ্গে বাইরে এল। প্যাকেটটা তৈরীই ছিল। ডাঃ সেন গাড়ীতে ওঠার আগে কেতকী সেটা কোয়ার্টার্স থেকে এনে তাঁর হাতে দিয়ে দিল। ডাঃ সেন প্যাকেটা নিলেন। সেটা বেশ ভারী বলে মনে হল তার।

কেতকী ফিরে এল হলে। কে যেন গান গাইছে তখনও।

এবার খাবার পালা। ধীরে ধীরে ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল। উৎসব শেষ হল।

গত কয়েক দিনের একটানা পরিশ্রমের পর সরিৎ আর দীপা দুজনেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সোমবার তারা ইচ্ছা করেই কোন কেস নেয়নি। সুতরাং অবচেতন মনের মধ্যে কোন উদ্বেগ স্থান পায়নি। পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা উপভোগ করছে তারা। মাথার কাছে রাখা টেলিফোনটা কিন্তু বাদ সাধল। ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল সেটা। জড়িত কণ্ঠে সে বলল, হ্যালো, কে? নার্সিং হোম থেকে—কি হয়েছে? নার্স কেতকীর ঘুম ভাঙছে না? দরজায় ধাক্কা দাও।...আমি কি নার্সকে গিয়ে ঘুম থেকে তুলব? আশ্চর্য বুদ্ধি তোমাদের! ...আধ ঘণ্টা ধরে ধাক্কা দিয়েছ, চীৎকার করেছ?—আই সি—ঠিক আছে আমি যাচ্ছি।

ঘড়িটা দেখল সরিৎ—সকাল সাড়ে সাতটা। দীপাও উঠে পড়েছে তখন।

কেতকীর কোয়ার্টার্সের সামনে ছোট-খাটো একটা ভিড় হয়ে গিয়েছে। আরও কয়েকবার দরজায় করাঘাত করা হল। চীৎকার করে ডাকা হল কেতকীকে। কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া না যেতে দরজা ভাঙ্গা হল শেষ পর্যন্ত। সশব্দে দরজাটা ভেঙে পড়ল ঘরের ভিতরে। কেতকী সেদিকে তাকাল না, কারণ তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গিয়েছে। নিষ্পলক বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে আছে টিউব-ল্যাম্পটার দিকে। কেতকী তার ছোট বিছানাটার ওপর শুয়ে রয়েছে আলস্য ভঙ্গীতে।

গত রাতের উৎসবের সাজেই রয়েছে কেতকী। কোন পরিবর্তন করেনি সে। সবুজ শাড়ী আর প্রসাধনের সব চিহ্ন নিয়ে শুয়ে রয়েছে নার্স কেতকী। মাঝে মাত্র একটা রাত।

কেতকী মারা যাবার দুদিন পরের ঘটনা। পুলিশকে সংবাদ দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কেননা কেতকীর মৃত্যুর কারণ অজ্ঞাত। সাধারণভাবে তার দেহের সৎকার সম্ভব ছিল না। এ দুদিন যেন দুঃস্বপ্নের মত কেটে গিয়েছে সকলের। সনৎও অফিস যায় নি। ছুটি নিয়েছে সে কয়েক দিনের জন্য। সনতের কাছে এটা একটা অস্বাভাবিক মানসিক বিপর্যয়।

কে? চমকে উঠেছে সনৎ।

দুজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। বেয়ারার গলা। পাঠিয়ে দাও। হয়ত অফিসের কেউ ভাবল সনৎ।

আসতে পারি—।

আসুন—। ওঠবার চেষ্টা করল সনৎ। পাটা দুর্বল হয়েছে আরও।

ঘরের মধ্যে দুজন অচেনা ভদ্রলোক এসেছেন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সনৎ তাকাল তাদের দিকে।

আমরা ডি ডি থেকে আসছি। সনতের হৃৎপিণ্ডটা যেন থেমে গেল অকস্মাৎ। পুলিশ, তার কাছে কেন?

আপনারা বোধ হয় দাদাকে খুঁজছেন—মানে ডাঃ সরিৎ মুখার্জীকে।

না আপনাকে, আপনিই ত সনৎ মুখার্জী।

হ্যাঁ, বসুন।

এ সিরিঞ্জটা আপনার? একটা সিরিঞ্জ বার করল সুব্রত চৌধুরী।

হ্যাঁ আমারই—। সনৎ তাকাল সুব্রতর দিকে। সুশ্রী সুন্দর চেহারা। এ ধরনের চেহারা পুলিশের মধ্যে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না।

আপনিও চাকরী করেন?

করি।

তাহলে সিরিঞ্জ?

আমি নিজেই ইনসুলিন ইনজেকশন নেই। আমার ডাইবেটিস আছে।

সিরিঞ্জটা খাটের কাছেই ছিল। বলল সুব্রত।

কেতকী এখন খাটে, লাশ।—ভাবল সনৎ তারপর বলল, আমি দিয়েছিলাম। সনতের গলার স্বরটা কেঁপে উঠল।

কেন? নার্সিং হোমে সিরিঞ্জের অভাব হয়েছিল? এবার প্রশ্ন করলেন অপর ভদ্রলোক।

সনৎ তাকাল তার দিকে। কালো মোটা চেহারা, গলার স্বরটা কিন্তু বিসদৃশভাবে ক্ষীণ, শরীরের অনুপাতে একেবারে বেমানান। মিঃ ঘোষের চেহারা সুব্রত চৌধুরীর ঠিক বিপরীত। দুজনেই তাকিয়ে আছে সনতের দিকে। অপেক্ষা করছে তার উত্তরটা শোনার জন্য।

অভাব কিনা জানি না, তবে শুনেছি কিছুদিন ধরে ওখান থেকে ওষুধ আর যন্ত্রপাতি নিখোঁজ হচ্ছিল। তাই কেতকী ওটা চাইতে আমি দিয়েছিলাম সেই দিনেই।

কোন দিন?

রবিবার সকালে।

আপনি নারসিং হোমে প্রায়ই যান?

হ্যাঁ, ওখানকার অ্যাকাউন্টস চেক করছি আমি। সনতের গলাটা শুকিয়ে আসছে আবার।

নার্স কেতকীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

বেশীদিনের নয়, প্রায় মাসখানেক। একটা লজেন্স মুখে দিল সনৎ।

আপনি দুদিন অফিসে যান নি না?

না, শরীরটা ভাল নয়।

এখনও ইনসুলিন ইনজেকসন নেন?

হ্যাঁ, আরেকটা সিরিঞ্জ আছে আমার।

আপনার সঙ্গে সুপর্ণা দেবীর আলাপ আছে?

আছে; এক সঙ্গেই কাজ করি আমরা।

রবিবার রাত্তে উৎসবের পর আপনি নার্স কেতকীর কোয়ার্টাসে গিয়েছিলেন!

হ্যাঁ—সনৎ মাথাটা নীচু করল।

তখন রাত কটা? সুব্রত চৌধুরী নিজের ঘড়িটার দিকে তাকাল।

প্রায় সাড়ে এগারোটা।

সুপর্ণা দেবীর সঙ্গে কতদিনের আলাপ?

যতদিন অফিসে ঢুকেছি—চার বছরের মত।

নার্সিং হোমের উৎসবে গান গেয়েছিলেন তিনি?

হ্যাঁ, আমিই ব্যবস্থা করেছিলাম।

উঠে পড়ল সুব্রত চৌধুরী আর মিঃ ঘোষ। সনৎ বসে রইল চুপ করে। এখনও সে ওদের প্রশ্নগুলোর অর্থ বুঝে উঠতে পারছে না ঠিক করে। প্রশ্নগুলো জট পাকিয়ে যাচ্ছে চিন্তা করতে গেলেই। সব জিনিসটা তার কাছে অস্বাভাবিক আর অবাস্তব ঠেকছে।

সনতের দৃষ্টি পড়ল সেলফে রাখা তিব্বতী মুখোশগুলোর ওপর। বীভৎস মুখোশগুলো তাকে যেন আহ্বান করছে বারবার। উঠে গিয়ে সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে মুছে রেখে দিল আবার। মুখোশগুলিই তার বন্ধু, আর কেউ নয়।

চেয়ারে এসে আবার বসল সনৎ। কেতকীর কথা মনে পড়তে লাগল। তার মৃতদেহটা সনৎ দেখেছে। বিছানায় শুয়ে সে জ্বলন্ত আলোটা দেখছিল অপলক দৃষ্টিতে। হঠাৎ সনতের সিরিঞ্জের কথাটা মনে পড়ল। মূর্খ সে, প্রচণ্ড মূর্খ—তা না হলে ওটা কেতকীর কাছে ফেলে এল কেন। দু হাতে মাথাটা ধরে বসে রইল সনৎ। তবে কেতকী আর প্রলুব্ধ করতে পারবে না তাকে। ...দুর্নিবার আকর্ষণে বারবার ছুটে যেতে হবে না তার কাছে। সরিতের সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ও তাকে আর দেখতে হবে না। তার পঙ্গুতা নিয়ে কেতকী মুখে কিছু বলত না, কিন্তু সে তার চলনের দিকে তাকিয়ে থাকত বলে মনে পড়ল সনতের। সরিতের সঙ্গে নিশ্চয়ই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। কিন্তু এখন জুটি ভেঙে গিয়েছে।

সনৎ আবার তিব্বতী মুখোশগুলোর দিকে তাকাল সস্নেহে।

ড্রীমল্যান্ড নারসিং হোমের কাজ বন্ধ হয়নি। সেদিন অপারেশন শেষ হবার পর সরিৎ খবর পেল নীচে অফিসঘরে তার জন্য পুলিশের লোক অপেক্ষা করছে।

কেতকীর মৃত্যু স্বাভাবিক নয় তা সকলেই অনুমান করে নিয়েছে। সুতরাং পুলিশের আগমন তার কাছে প্রত্যাশিত নয়। অফিসঘরে ঢুকে সরিৎ দেখল ঘরটা খালি। অন্য লোকদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র পুলিশের দুজন লোক রয়েছে। সরিৎ গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। সুব্রত চৌধুরী প্রথমে শুরু করল—

আপনিই ডাঃ সরিৎ মুখার্জি—।

হ্যাঁ। আপনারা নার্সের মৃত্যুর সম্বন্ধে খোঁজ করছেন?

তাই; ডাঃ মুখার্জি এই নার্সটি আপনার কতদিনের চেনা। সুব্রত তাকাল তার দিকে।

প্রায় ন' দশ বছর হল। মেডিকেল কলেজে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি।

আপনি ডকটর অব অ্যানেসথেশিয়া বিলেত থেকে পাশ করেছেন?

হ্যাঁ, তার পরে এখানে নারসিং হোম খুলেছি আমরা।

নার্স কেতকীকে কি আপনি ডেকে এনেছেন আপনাদের নারসিং হোমে।?

না, সে নিজেই এসেছিল চাকরীর জন্য।

মেডিকেল কলেজে থাকতে আপনারা প্রায়ই মেলামেশা করতেন?

আমাদের মধ্যে আলাপ ছিল। ছোট্ট করে উত্তর দিল সরিৎ।

শুধু আলাপ! এবার জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ ঘোষ। মোটা কালো অস্বাভাবিক লোকটার দিকে বক্র দৃষ্টিতে তাকাল সরিৎ।

তাছাড়া কি? ভ্রূ কুঞ্চিত হল সরিতের।

তার চেয়ে একটু বেশী ডাঃ মুখার্জি। আমরা খবর নিয়ে জেনেছি, নার্স কেতকীর সঙ্গে আপনার গভীর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

হোয়াট ডু ইউ মীন? সরিতের গলার স্বরটা একটু চড়া।

আপনাদের বিয়ের কথা পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল বলে খবর পেয়েছি আমরা।

অনেকের সঙ্গেই আমার বিয়ের কথা হয়েছে। তাতে কি হল?

না, কিছু হয়নি, কিন্তু তবুও উত্তেজিত হচ্ছেন কেন আপনি? বাই দি ওয়ে ডাঃ মুখার্জি, বিলেত যাওয়ার আগে আপনি নার্স কেতকীকে একটা রিস্টওয়াচ দিয়েছিলেন? মোটা লোকটার মুখে বাঁকা হাসি।

হ্যাঁ দিয়েছিলাম। ও বয়সে অনেকেই অনেককে উপহার দিয়ে থাকে, তাতে ক্ষতি হয় না।

নার্স কেতকীর কিন্তু ক্ষতি হয়েছিল। আস্তে করে বলল সুব্রত চৌধুরী—প্রাণটা দিতে হয়েছে অকালে।

তার জন্য আমি দায়ী নই। শক্তভাবে বলল ডাঃ সরিৎ মুখার্জি। কেউ যদি নিজে আত্মহত্যা করে কোন আত্মসম্মানের জন্য তাহলে কার কি করার আছে?

আত্মহত্যা বলছেন কেন?

দরজাটা বন্ধ ছিল বলে। সামান্য সাধারণ বুদ্ধিও লোকগুলোর নেই দেখে আশ্চর্য হল সরিৎ।

কিন্তু কিচেনের জানালা খোলা থাকে আর সেদিক দিয়ে কেতকীর ঘরে যাওয়া যায় বলেও আমরা জানি।

তাহলে ঘরের দরজাটা ভাঙ্গা হল কেন? কিচেনের জানালা দিয়ে ঢুকলেই ত হোত?—সরিৎ এবার প্রশ্ন করল।

দরজাটা, আপনিই ভাঙতে হুকুম দিয়েছিলেন। আর সে কথাটা আপনারই মনে থাকা উচিত ছিল।

তাড়াতাড়িতে আমার মনে ছিল না। হঠাৎ স্বরটা নেমে গেল সরিতের।

তাও নয়, বাবলু মণ্ডল ও রাস্তার কথা উল্লেখ করায় আপনি ধমক দিয়েছিলেন তাকে।

ডার্টি লোফার—চাবুক মারা উচিত ওকে। রাগে সরিতের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

বাবলু মণ্ডল আরও কয়েকটা কথা আমাদের জানিয়েছে ডাঃ মুখার্জি।

কি? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সরিৎ।

উৎসবের কয়েক দিন আগে সে আপনাদের কথাবার্তা কিছুটা শুনেছিল।

তা শুনুক না, ক্ষতি কি?

আপনার পক্ষে ক্ষতিকর বৈকি। কারণ আপনি কেতকীকে শাসিয়েছিলেন, এমন কি প্রাণের ভয়ও দেখিয়েছিলেন।

রাগ হলে লোকে অনেক কিছুই বলে থাকে।

হঠাৎ এত রাগের কি ছিল ডাঃ মুখার্জি যে একজন নার্সকে ও ধরনের শাসানির প্রয়োজন হয়েছিল।

সে কথা বলতে আমি বাধ্য নই। ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তাহলেও কি আমরা ধরে নেব—নার্স কেতকীর সঙ্গে আপনার ডাক্তার নার্সেরই সম্বন্ধ ছিল আর কিছু নয়।

না, অন্য কিছু নয়। দৃঢ়ভাবে সরিৎ উচ্চারণ করল কথাটা।

তাহলে নার্সের কোয়াটার্সে সকলের অগোচরে কিচেনের জানালা দিয়ে গিয়েছিলেন কেন? সাধারণত ডাক্তাররা এ ধরনের ব্যবহার করে না বলেই ত জানি আমরা। সুব্রত চৌধুরীর কথায় ব্যঙ্গের ছোঁয়াচ সুস্পষ্ট।

তাকে সাবধান করার জন্য, সরিতের গলা একটু গম্ভীর।

কোন্ বিষয়ে?

ওকে নিয়ে আমাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি চলছিল।

কেন, আপনার সঙ্গে ত নার্স কেতকীর সাধারণ সম্পর্ক ছিল। তাহলে ভুল বোঝার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে।

একটু বিচলিত হয়ে পড়ল ডঃ সরিৎ মুখার্জি। একটা থেকে অন্য আরেকটা প্রশ্নে চলে আসবে ওরা একথা ভাবতেও পারে নি। তবু বলল—দীপা, মানে আমার স্ত্রীর খুব জেলাস। যে কোন মেয়ের সংগে মিশতে দেখলেই ও সন্দেহ করবে বিনা কারণে।

ভাল; তাহলে নার্স কেতকীকে কি বিষয়ে সাবধান করেছিলেন?

চুপ করে রইল সরিৎ, কোন উত্তর দিল না। প্রশ্নটা অন্যভাবে করলেন মিঃ ঘোষ।

নার্স কেতকী কি আপনার ভাই সনতের সংগে ইদানীং মেলামেশা করছিলেন?

হ্যাঁ। সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল সরিৎ।

সে বিষয়ে আপনার আপত্তি ছিল?

ছিল বৈকি, আমার ভাই পঙ্গু, তাকে নিয়ে একটা নার্স খেলা করবে, এটা আমি চাই না।

বেশ, তাহলে আপনার ভাইকে এ বিষয়ে কিছু বলেছেন নিশ্চয়ই।

না তার সংগে এ বিষয়ে কোন কথা হয়নি আমার।

তাহলে আমরা একথা ভাবতে পারি যে, আপনি এই কারণেই নার্সকে শাসিয়েছিলেন।

শাসাইনি, ধমকে ছিলাম মাত্র।

কিন্তু আপনার ধমকের মধ্যে প্রাণ নিয়ে টানাটানির কথাও ছিল।

চুপ করে ছিল সরিৎ, কোন উত্তর দিল না সে।

ডাঃ মুখার্জি, আপনি কি পেন্টোশ্যাল ব্যবহার করেন অ্যানেস্থেশিয়ার জন্য?

করি; তাছাড়া ফ্লাক্সিডিল, পেথিডিনও ব্যবহার হয়।

একটা লোককে যদি বেশী পরিমাণে এই ওষুধ ইনজেকশন করা হয়, তাহলে তার মৃত্যু হতে পারে?

নিশ্চয়! দ্বিধা করল না সরিৎ উত্তর দিতে।

ধন্যবাদ। এখন আর আপনার সময় নষ্ট করব না, আপনার সংগে পরে আবার দেখা হবে।

সরিৎ চুপ করে বসে রইল চেয়ারে।

দীপার সরিতের বিশেষ কোন আলাপ হয়নি। আজকাল দুজনেই দূরে দূরে থাকে। একজন আর একজনকে সহ্য করতে পারছে না যেন। সরিৎ একদিন সনতের সংগে দেখা করার কথা ভাবছে। বিশেষ জরুরি কথা আছে তার। কিন্তু তার নাগাল পাচ্ছে না সে। তার আক্রোশ জমছে ক্রমাগত, পুলিশের বিরুদ্ধে, দীপার বিরুদ্ধে, সনতের বিরুদ্ধেও।

আজ তাকে পাওয়া গিয়েছে। সরিৎ আর দেরী করল না, তার ঘরে গিয়ে দেখা করল। সনৎ প্রস্তুতই ছিল। সরিতের সংগে বোঝাপড়া তারও প্রয়োজন হয়েছে।

তুমি কেতকীর সংগে কতদিন মিশছিলে? সরাসরি জিজ্ঞাসা করল সরিৎ।

আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না—সনৎ তাকাল সরিতের দিকে।

তোমাদের মধ্যে কি একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

সে কথা এখন ওঠে না—ধীরে ধীরে বলল সনৎ।

সে কথা আমি বুঝব; তোমাকে আমি নারসিং হোমে পাঠিয়েছিলাম অ্যাকাউন্টস দেখার জন্য। নার্সের সংগে প্রেম করার জন্য নয়।

জানি, নার্সের সংগে প্রেম করার একমাত্র অধিকার একমাত্র ডাক্তারদের—

বাঁকা হাসি সনতের ঠোঁটে।

তার মানে? গর্জন করে উঠল সরিৎ। তুমি কি বলতে চাও?

আমি কিছুই বলতে চাই না, যা বলার তুমিই বলছ। তবে কারুর সংগে মেলামেশার প্রয়োজন হলে তোমার অনুমতি চাইব না নিশ্চয়।

না, তা চাইবে না জানি, কিন্তু যেখানে আমার সুনাম বা সম্মানের প্রশ্ন জড়িত আছে, সেখানে ও ধরনের ব্যবহারে আমার আপত্তি আছে।

কি হিসাবে? নারসিং হোমের মালিক হিসাবে? আমি যদি কেতকীর সংগে প্রেমই করে থাকি, তাহলে অন্য কারুর তাতে মাথা ব্যথার প্রয়োজন নেই। তবে আসল কথা তা নয়।

আসল কথাটা কি? সরিৎ তাকাল সনতের দিকে।

ইউ আর জেলাস—সনৎ আস্তে উচ্চারণ করল কথাটা।

সনৎ—চীৎকার করে উঠল সরিৎ।

তোমার চীৎকারে ভয় পাই না আমি।

তা পাবে না—হঠাৎ শান্ত হয়ে বলল সরিৎ, কিন্তু যখন ছোটবেলায় পোলিওর জন্য পঙ্গু আর অসহায় হয়েছিলে, তখন ভয় পেতে,—এখন তুমি স্বাধীন। আমি তোমার ব্যবহারে বা কথায় আঘাত পাইনি বরং এইটেই আশা করেছিলাম অনেকদিন আগে।

মহামানবের মত ব্যবহার করেছ, জানি। তাই এখনও বাবার টাকা বা মায়ের গয়নার কোন হদিশ নেই।

তোমার লেখাপড়া শেখাতে বা তোমার অন্য খরচের কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ।

না, ভুলিনি; আর তাই যদি হয় তাহলে তোমার মহানুভবতা প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমার [illegible] থেকেই আমার খরচ চলেছে, তাতে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই।

না, কৃতিত্ব তোমার। একটা চীপ নার্সের সংগে ঘনিষ্ঠতা করে তুমি খুব বাহাদুরী করেছ।

সেই চীপ নার্সটার সংগে অপারেশন থিয়েটারে ধস্তাধস্তি করে তুমিই বাহাদুরী করেছ, আমি নই।

হাউ ডেয়ার ইউ। সরিৎ এগিয়ে এল সনতের দিকে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে।

সনৎ দাঁড়িয়ে রইল শক্ত হয়ে। যে কোন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত সে।

তুমি স্বাভাবিক নও—দেহে-মনে তুমি রোগগ্রস্ত। তোমার ডাইবেটিস আছে সেটাও লুকিয়ে রেখে তোমার কুটিল মনেরই পরিচয় দিয়েছ। শুধু তাই নয়, তোমার সিরিঞ্জটা কেতকীর ডেডবডির কাছেই পাওয়া গিয়েছে বলে, পুলিশ তোমায় সন্দেহ করেছে—এ খবর রাখ?

সন্দেহ করলে কোন ক্ষতি নেই। সিরিঞ্জটা যারই হোক না কেন, নার্সিং হোমের ওষুধগুলো আমার সম্পূর্ণ অজানা। মারাত্মক ওষুধ নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে এ তাদেরই কাজ—একথাও পুলিশ সন্দেহ করে বলে আমি শুনেছি।

তাই নাকি? আমাদের মারাত্মক ওষুধের দরকার নেই, তোমার ঐ ইনসুলিন ইনজেকসন করে যে কোন লোককেই মারা যায় জান—অব্যর্থ আর চরম ব্যবস্থা। কোন সন্ধান পাওয়া যাবে না, প্রমাণ পর্যন্ত নয়! একথা পুলিশও জানে আর তুমিও জান।

শুধু ডাক্তার নয়, কেমন। হেসে উঠল সনৎ জোর-গলায়। আমার সিরিঞ্জ নিয়ে ইনসুলিন ইনজেকসন দিতে তোমার বাধা কোথায়? সাপও মরবে তাতে লাঠিও ভাঙবে না। স্ত্রীকেও সন্তুষ্ট করা যাবে আর বিশ্বাস-ঘাতিনী প্রেমিকা এবং অকৃতজ্ঞ আত্মীয়কে একসংগে শাস্তি দেওয়া যাবে। পুলিশের সাধ্যি নেই অপরাধীকে স্পর্শ করে।

সরিৎ কথার কোন জবাব দিল না। সনতের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। দ্রুত শ্বাস পড়তে লাগল তার। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সনৎ সেদিকে তাকিয়ে রইল দারুণ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হয়ে এল তার মন। আজ সে অফিসে যাবে বলে স্থির করল। একটু দেরী হয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু বাড়ীতে বসে থাকলে আরও দুর্বল হয়ে যাবে সে, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে তার নিজের ওপর।

অফিসে গিয়ে যখন সে পৌঁছুল তখন বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে। সুপর্ণার সংগে একবার চোখাচোখি হতে মুখটা নামিয়ে নিল সনৎ। কাজের মধ্যে একফাঁকে সুপর্ণা এসে দাঁড়াল তার টেবিলের সামনে। তারপর মৃদুস্বরে তাকে ছুটির পর তার জন্য অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

মানুষগড়ার ইতিকথা

হুগলী, ব্যাণ্ডেল, চুঁচুড়া—যাওয়া যায় সব দিক থেকেই। তবে ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকেই কাছে হয়। মাইলটাক মোটে। বাসে সাত-আট মিনিট। রিকশায় বড়জোর দশ মিনিট। হুগলী-ধানিয়া রোড আর ব্যাণ্ডেল স্টেশন রোড ছাড়িয়ে দক্ষিণে সামান্য পথ এগুলেই কালীতলা। কালীতলা ছাড়িয়ে বাঁয়ে ঘুরুন। ঘুরতেই সামনে গঙ্গা। গঙ্গার পাড়ে হুগলী গভর্নমেণ্ট ট্রেনিং কলেজ। প্যারালাল টু গঙ্গা রাস্তা এবার সোজা গিয়েছে দক্ষিণে। আর বেশী বাকি নেই। সামান্য এগুলেই ইমামবারা পৌঁছে যাবেন। তার আগেই রায়বাহাদুর সতীশ মুখার্জি রোড আর চকবাজার রোডের মোড়ে নেমে পড়ুন। এটা একটা বড় মোড়। রিকশা স্ট্যাণ্ড, দু নম্বর চার নম্বর বাসের স্টপ। মোড়ের উল্টোদিকে চকবাজার রোডের উপর বাঁ হাতে পাঁচিলঘেরা সেই পুরোনো মন্দির—আজ থেকে একশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে স্মিথ সাহেব স্থানীয় জমিদারদের সাহায্যে বানিয়েছিলেন।

কে স্মিথ সাহেব? বারে হুগলীর প্রথম জেলাজজ ডি সি স্মিথ। ১৮২৬ সালে সাহেব হুগলীর জজ হলেন। তখন অর্থের অভাবে শ্রীরামপুর চুঁচুড়োর মিশনারীদের বহু বছরের চেষ্টায় গড়ে-ওঠা স্কুলগুলো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। জাত ব্যবসায়ী ইংরেজরা সে যুগে কলকাতায় স্বদেশী সন্ন্যাসীদেরও পাত্তা দিত না। পাছে তাদের ধর্মপ্রচারের ঠেলায় দিশি লোকগুলো খেপে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য লাটে ওঠে। তাই কলকাতায় ঢুকতে না পেয়ে ইংরেজ-শাসিত এলাকার বাইরে চন্দননগর, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়ো হুগলীতেই আস্তানা গেড়েছিলেন খৃষ্টান ধর্মের সব সম্প্রদায়ই। সেখান থেকেই খৃষ্টের মহামহিমা প্রচারে তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন। ধর্মপ্রচারের প্রধান উপায় হিসাবে দিশি লোকদের জন্য বিলিতি শিক্ষা বিস্তারের উপযোগী গণ্ডায় গণ্ডায় স্কুল তাঁরা বানিয়েছিলেন। স্মিথ সাহেব যখন হুগলীর জজ হয়ে এলেন তখন শুধু চুঁচুড়া ও তার আশ-পাশেই এরকম চোদ্দটা স্কুল ছিল। এই স্কুলগুলো ছিল নৈহাটি, ভাটপাড়া, গৌরীপুর, বিবিহাট, মালকুণ্ডু, হালদারপাড়া, হাজিনগর, খাস-বাটি, বাঁশবেড়িয়া, কাচড়াপাড়া, কুলু-পুখেরিয়া, কানখালি ও হুগলীতে। মাস মাস আটশো সাড়ে আটশো টাকা ইংরেজ সরকার স্কুলগুলোর জন্য সাহায্য দিতেন। হঠাৎ ১৮৩২ সালের ১ সেপ্টেম্বর এক সরকারী আদেশে এই সাহায্য কাটা গেল। আদেশে বলা হল যে, যদি কেউ এই স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকে তবে তার হাতেই আসবাবসমেত স্কুল বাড়ি তুলে দেওয়া হবে—বাড়ি মেরামতির খরচ সরকারই বহন করবে। তবে নিছক নিঃশর্ত দান নয়—সরকারী কর্মচারীরা সময় সময় পরিদর্শন করবেন একথাও আদেশে লেখা ছিল।

দেখতে দেখতে চোদ্দটার মধ্যে এগারটা স্কুল উঠে গেল। কে নিতে যাবে দায়িত্ব? কার এত মাথা ব্যথা পড়েছে? ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেটস সাহেব উঠে-পড়ে লাগলেন। লিউইস বেটস ছিলেন স্কুলগুলোর সুপারিন-টেনডেণ্ট। আটশো ছেলে পড়ত স্কুল-গুলোতে। সরকারী সাহায্য বন্ধ, স্থানীয় অধিবাসীরা কেউ দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন না। এগারোটা উঠে গেছে, কোনমতে তিনটে তখনো টিকে রয়েছে। সাহেব ছুটে গেলেন চার্চ মিশনারী সোসাইটির কাছে, বললেন—তোমরা এই ভার নাও। কুড়ি বছর ধরে হুগলী নদীর দুপাড়ের লোকেরা কিমি-পয়সায় পড়াশোনার সুযোগ পেয়ে এসেছে, তারা ইংরেজী শিখতে চায়। আমাদের দেখা উচিত স্কুলগুলো যাতে বন্ধ না হয়। আরো বললেন, একটু চেষ্টা করলেই খরচ অনেক কমানো যেতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি স্থানীয় জমিদারদের উপর তাঁর প্রভাব খাটান তাহলে কিছু সাহায্যও মিলবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে। নিরুপায় বেটস সাহেব শেষ পর্যন্ত একটি প্রস্তাব দিলেন যে তিনি নিজেই একটি ইংরেজি স্কুল খুলবেন, যদি গভর্নমেণ্ট ফি মাসে আড়াই শো টাকা সাহায্য দেন। প্রস্তাবটি সেদিন গৃহীত হয় নি।

বেটস সাহেবের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিন যে কাজ হয় নি, তাই সহজ হয়ে উঠল স্মিথ সাহেবের এগিয়ে আসায়। জজ-সাহেব নিশ্চয়ই সেদিন অনুভব করেছিলেন যে, সারা দেশে যখন ইংরেজী শিক্ষার প্রবাহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যখন খোদ বড়লাটের ইচ্ছা ইংরেজী এদেশের শিক্ষার মাধ্যম হয় তখন রাজধানীর এত কাছে থেকেও প্রদীপের আলো থেকে হুগলীকে বঞ্চিত রাখা অন্যায়। হুগলীর 'সেটিত' স্কুল উঠে যাওয়ার দু বছর পরে স্থানীয় জমিদারদের বদান্যতায় ও সরকারী সাহায্যে স্মিথ একটি নতুন স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। আজো প্রতিষ্ঠার সেই ব্যাকগ্রাউণ্ড স্টোরী হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের মেন বিল্ডিংয়ের হলঘরের দেওয়ালে একটি ট্যাবলেটে কয়েকটি ইংরেজী লাইনে খোদাই করা আছে :

"এই স্কুল ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে ডি সি স্মিথ, এসকোয়ার, হুগলীর জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিম্নলিখিত জমিদারদের অর্থসাহায্যে স্থাপিত হইয়াছে :

১। ডি সি স্মিথ, এসকোয়ার,
২। মহারাজাধিরাজ মহতাব চাঁদ বাহাদুর,

হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল

৩। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর,

৪। কালীনাথ মুন্সী,

৫। প্রাণচন্দ্র রায়,

৬। শিবনারায়ণ চৌধুরী,

৭। রামনারায়ণ মুখার্জি,

এবং ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৩৭ খৃস্টাব্দে মহম্মদ মহসীনে কলেজের শাখা বিদ্যালয় স্বরূপ উন্মুক্ত হইল।"

—টি এ ওয়াইজ, অধ্যক্ষ।

নতুন স্কুলের জন্য সরকার সেদিন গঙ্গার পাড়ে হুগলীর পুরোনো ফোর্টের লাগোয়া দু বিঘা সাত কাঠা জমি মিনি-মাগনা দিয়েছিলেন। সেই জমিতেই জমিদারদের অর্থসাহায্যে স্কুলের জন্য একটা এক-তলা বাড়ি উঠল। 'দি সাবসক্রিপসন স্কুল হাউস, বা সাধারণের দানে গঠিত বিদ্যালয় গৃহ।' ১৮৩৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুলের উদ্বোধন হয়। স্কুলের প্রথম হেড-মাস্টার নিযুক্ত হলেন পার্বতীচরণ সরকার। বছর ঘুরবার আগেই হেডমাস্টার পাল্টে গেলো। পার্বতীচরণের জায়গায় নতুন হেড-মাস্টার হয়ে এলেন স্বয়ং প্যারীচরণ সরকার। পরবর্তী জীবনে বারাসত ও হেয়ার স্কুলের স্বনামধন্য হেডমাস্টার, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর, এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্রের সুহৃদ প্যারীচরণের কর্মবহুল জীবনের সূচনা এই হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে। তখন অবিশ্যি স্কুলের নামের মধ্যপদটি ছিল না। থাকার কথাও না। কারণ যার ব্রাঞ্চ বলে গত শতাব্দীতে এটি পরিচিত ছিল, তখনো তার জন্ম হয় নি। সবে তোড়জোড় চলছে। মহম্মদ মহসীনের ট্রাস্ট ফান্ডের দায়িত্ব তখন সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। ১৮৩৫ সালে সরকারীভাবে ইংরেজী এদেশের শিক্ষার বাহন হিসাবে স্বীকৃতি পেলে প্রাতঃ-স্মরণীয় মহামানবের আত্মিক ইচ্ছাটুকু সফল করে তোলার জন্য সরকারী উদ্যোগে পরের বছর চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে পেরন সাহেবের বাংলোয় প্রতিষ্ঠিত হল একটি কলেজ। এই কলেজটিরই নাম মহম্মদ মহসীন কলেজ।

নামেই কলেজ। আসলে স্কুল ও কলেজ দুটোরই কাজ চালাতে হত। স্কুলই নেই দেশে, কলেজ চলবে কিসে। বিশেষ করে হুগলীতে। স্কুল বলতে তখন গোটা হুগলীতে মোটে দুটি—সাবসক্রিপসন স্কুল আর ইমামবারা স্কুল। একই ট্রাস্ট ফান্ডের টাকায় ইমামবারা স্কুল ও মহসীন কলেজের ব্যয় নির্বাহ হত বলে কর্তৃপক্ষ ইমামবারা থেকে স্কুলটিকে সরিয়ে এনে কলেজ বাড়িতে বসালেন। এই স্কুলটিই চুঁচুড়ার বিখ্যাত হুগলী কলেজিয়েট স্কুল। সাবসক্রিপসন স্কুলটির পরিচালনায় যাতে কোন অসুবিধা না হয় তাই সরকারী নির্দেশে কলেজের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। কলেজের প্রিন্সিপ্যালই স্কুলের সর্বময় কর্তা হলেন। কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল টি এ ওয়াইজ কলেজের ব্রাঞ্চ হিসাবে স্কুলের দরজা সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দিলেন ১৮৩৭ সালের ৫ ডিসেম্বর। বহু লোকের আজো একটা ভুল ধারণা আছে যে এই স্কুলটি বুঝি হুগলী কলেজিয়েট স্কুলেরই ব্রাঞ্চ। আসলে এটি ছিল হুগলী মহম্মদ মহসীন কলেজের ব্রাঞ্চ।

নামে কি এসে যায়, ফুলের পরিচয় তার বর্ণে ও সুগন্ধে। যে স্কুল যুগে যুগে শত শত কৃতী ছাত্র উপহার দিয়েছে তার পরিচয় কোন পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। প্যারীচরণের পর ক্ষেত্রমোহন চ্যাটার্জি ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্কুলের হেডমাস্টার হন। তখন স্কুল মোট সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। পুরোনো নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোট একশো উনাশীটি ছেলে এই স্কুলে পড়ত। ফার্স্ট ক্লাসে — ৩০, সেকেণ্ড ক্লাসে—২৭ থার্ড ক্লাসে—৩৯, ফোর্থ ক্লাসে—৩৫, ফিফথ ক্লাসে—২৭, সিক্সথ ক্লাসে—৮ ও সেভেন ক্লাসে—১৩ জন। এই একশো উনাশীটি ছেলেকে পড়ানোর জন্য হেডমাস্টার সমেত ছজন শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের মাসিক আয় তখন টিউশন ও অ্যাডমিশন ফি এবং রি-অ্যাডমিশন ফাইন ও বকেয়া মাইনে ধরে প্রায় চারশো টাকা। শুরু থেকেই সরকারী স্কুল বলে ছাত্রসংখ্যা বা টিউশন ফি'র আদায় অবস্থা যাই হোক না কেন স্কুল পরিচালনায় ব্যয়ভার সরকারই বহন করতেন।

ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা এবং ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে এনট্রান্স এগজামিনেশন নেওয়া শুরু হলে, ব্রাঞ্চ স্কুলের ছেলেরা গোড়া থেকেই এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। গিরিশচন্দ্র তখন স্কুলের হেডমাস্টার। গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ও ষষ্ঠ দশকের শুরুতে যে সব ছাত্র এই স্কুলে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে ক্যালকাটা হাইকোর্টের জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও সাব-জজ কার্তিক-চন্দ্র পালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৬০ সালে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় দুশো কুড়ি। শিক্ষকসংখ্যাও সেই সঙ্গে বেড়ে হল নয়।

গিরিশচন্দ্রের পর ১৮৬৩ সালে যজ্ঞেশ্বর ঘোষ এই স্কুলের হেডমাস্টার হন। ঘোষমশাই একটানা বারো বছর এই স্কুলের পরিচালন দায়িত্ব বহন করেছেন। তিনি যখন হেডমাস্টার হয়ে এলেন ঠিক সেই সময়ে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট কমে গিয়ে-ছিল। ১৮৬৫ সালে মোটে একশো ছিয়াত্তরটি ছেলে এই স্কুলে পড়ত। দশ বছর পরে তাঁর বিদায়ের কালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয় দুশো পঞ্চান্ন। এই দশ বছরে ছাত্রসংখ্যা যেমন বেড়েছে, স্কুলের সুনামও বেড়েছে প্রচুর। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বোস, প্রখ্যাত অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছেলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার প্রসাদদাস মল্লিকের মত কৃতী ছাত্ররাই স্কুলের সুনাম সে যুগে বাড়িয়েছেন। ঘোষমশায়ের আমলে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ও সুনামই শুধু নয় আয়ও বেড়েছে যথেষ্ট। ছাপান্ন সালে স্কুলের টিউশন ফি ইত্যাদি বাবদ মাসিক আয় ছিল চারশো টাকা, কুড়ি বছর পরে এই আয় বেড়ে হয় পাঁচশো। আটষট্টি সালের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তখন স্কুলের সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়ে প্রায় আঠারোশো টাকা জমা আছে। এ সময় একবার কথা উঠেছিল টিউশন ফি'র হার বাড়ানো হোক। তখন ক্লাস ফোর (তৎকালিন সেভেন্থ ক্লাস) থেকে ক্লাস টেন (তৎকালীন ফার্স্ট ক্লাস) পর্যন্ত ফ্ল্যাট রেটে দু টাকা ছিল টিউশন ফি। কিন্তু অ্যানুয়েল রিপোর্টে উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ দেখে ফি বাড়ানোর কথা চাপা পড়ে যায়।

প'চাত্তর সালে যজ্ঞেশ্বরবাবুর বিদায়ের পর এক বছরের জন্য হেডমাস্টার ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত দাস। সাতাত্তর সালে তাঁর জায়গায় এলেন কালিদাস মুখার্জি। এগারো বছর কালিদাসবাবু এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সময়ে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮৯ সালে দাঁড়ায় তিনশো সাতান্ন। এ সময়ে যে সব কৃতী ছাত্র এ স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে পরবর্তী জীবনে স্মল কজেজ কোর্টের চীফ জজ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হুগলী-চুঁচুড়ো মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান প্রসাদদাস মল্লিক, কলকাতা হাইকোর্টের জজ রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ গুহ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হরচন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কালিদাসবাবুর পর তিন বছরে পর পর দু-দুজন প্রধান শিক্ষক বদল হন এ স্কুলে—প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ চ্যাটার্জি দু বছরের জন্য ও শেষে মাস-সাতেকের জন্য ছিলেন অক্ষয়কুমার মুখার্জি। অক্ষয়বাবুর পর হেড-মাস্টার হলেন রামদাস চক্রবর্তী। ঠিক এ সময় থেকেই ধীরে ধীরে ছাত্রসংখ্যা কমতে থাকে। কমে যাওয়ার অন্যতম কারণই হল হুগলী-চুঁচুড়ায় এ সময় আরো অনেকগুলি হাইস্কুলের পত্তন। এ ছাড়া আর একটি কারণে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। ১৮৯৬ সালে বাংলার ছোটলাট স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকেন্জির নির্দেশে সমস্ত সরকারী অফিস ও কোর্ট হুগলী থেকে চুঁচুড়ায় উঠে আসে। মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী ও ব্যবহারজীবী বাঙালীদের অনেকেই এ সময় হুগলী থেকে চুঁচুড়ায় বাসা বদল করেন। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই ছাত্রসংখ্যা যায় কমে। কমতে কমতে ১৯০২ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় একশো একষট্টিতে।

তখন হেডমাস্টার রাজেনবাবু। রাজেন্দ্র-লাল গুপ্ত। হুগলী থেকে চুঁচুড়ায় যখন কোর্ট-টোর্ট উঠে এল তখন সরকারী অফিসের জায়গা করে দেওয়ার জন্য চুঁচুড়ার পুরোনো ব্যারাকবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত নর্মাল স্কুল এবং নর্মাল স্কুলের প্র্যাকটিশ টিচিংয়ের জন্য সংলগ্ন মডেল স্কুল বহুদিনের বসত ভিটে ছেড়ে হুগলীর পরিত্যক্ত কাছারি-বাড়িতে উঠে আসে। এসব গত শতাব্দীর ছিয়ানব্বই সালের ঘটনা।

এই ঘটনার ঠিক ছ বছর পরেই সরকারী নির্দেশে ব্রাঞ্চ স্কুলের সঙ্গে হুগলী মহসীন কলেজের যোগসূত্র ছিন্ন

হয়। কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক চুকল। ওদিকে মডেল স্কুল এসে জুড়ল ব্রাঞ্চ স্কুলের সঙ্গে, ২৪ জানুয়ারী, ১৯০২। ঐ বছরই দোসরা জুনের চিঠিতে ডি পি আই হুগলী কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে নির্দেশ দিলেন স্থায়ী অগ্রিম বাবদ দশটি টাকা সংযুক্ত ব্রাঞ্চ ও মডেল স্কুলের হেডমাস্টারের হাতে তুলে দিতে। এই মডেল স্কুলই ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রাইমারী সেকশন হল। একদিন আগেও ২৩ জানুয়ারী যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল একশো একষট্টি, একদিন পরে এই সংযুক্তির ফলে ছাত্রসংখ্যা এক লাফে বেড়ে হল দুশো চুয়ান্ন। হেডমাস্টার সমেত চোদ্দজন শিক্ষক পড়াচ্ছেন। দু-দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার (তখন অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টার কথাটি প্রচলিত ছিল না); একজন পেতেন চল্লিশ টাকা, অন্যজন ছত্রিশ টাকা। হেডপণ্ডিতের মাইনে ছিল তেত্রিশ টাকা। চারজন পণ্ডিতের প্রত্যেকে পেতেন ত্রিশ টাকা করে মাইনে; ড্রয়িং টিচারের বেতন ছিল পঁচিশ টাকা। ক্লাস ফোর স্টাফের মাইনে সমেত স্কুলের মাসিক ব্যয় তখন সাকুল্যে চারশো টাকা। ছাত্র-বেতন থেকেই মাসিক আদায় হত প্রায় সোয়া চারশ টাকা।

সেকালে সরকার লাইব্রেরী বাবদ বার্ষিক চুয়াত্তর ও প্রাইজের জন্য বার্ষিক ষাট টাকা মঞ্জুর করেছিলেন। যদি জিজ্ঞাসা করি সাতষট্টি বছর পরে অন্তত এই দুটি খাতে সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ আজ কত? যদি কেন, আমি জানতে চেয়েছিলাম শক্তিবাবুর কাছে। শক্তিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। গত এক বছর ন মাস যাবৎ শক্তিবাবু এ স্কুলের হেড-মাস্টারের দায়িত্ব বহন করছেন যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টার। চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। ফর্সা টকটকে মুখে টিকোল নাকের পরে কালো লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমার ব্রীজটা আঙুলে দিয়ে চেপে ধরে আস্তে আস্তে বললেন—আগে প্রাইজ বাবদ যা বরাদ্দ ছিল তা ত দেখলেন। মাঝে সামান্য বেড়ে হয়েছিল একশো টাকা; গত বছর পেয়েছি দেড়শো, এ বছর আড়াইশ শো টাকা। কিন্তু এ টাকার প্রতিটি পাই-পয়সা ব্যয় করতে হবে প্রাইজ কেনায়। তাহলে অনুষ্ঠান আয়োজন কি করে হবে? তাই প্রাইজ ডিসট্রিবিউশন সেরিমনি থেকে সেরিমনি শব্দটাই বাদ গেছে।

আর লাইব্রেরীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন? তাহলে বলি বাংলাদেশের খুব কম স্কুল-লাইব্রেরীতে এত বই আছে যা কিনা আমাদের আছে। দশ হাজারের ওপর বই। বহু দুষ্প্রাপ্য বইও আছে। নেই শুধু লাইব্রেরীয়ান। ছেষট্টি সালে ক্যালকাটা মাদ্রাসা থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছি। গত তিন বছরের খবর রাখি, লাইব্রেরীয়ানের অভাবে ছেলেরা কোন বই পায় নি। অথচ ফি মাসে সরকারের কাছে আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি। বলতে বলতে শক্তিবাবু টেবিল থেকে একটা চিঠি তুলে দেখিয়ে বললেন—আজও একটা পাঠাচ্ছি। জানি এ চিঠিতেও কোন ফল হবে না। স্কুলটা সরকারী বলেই শক্তিবাবুর আক্ষেপের কারণ বুঝি। [illegible] কোন মিশনারী বা কলকাতার [illegible] বেসরকারী স্কুল...। স্কুলবাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে টিচার্স রুমে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। লম্বা একফালি একটা ঘর। মাঝে খান-কয়েক টেবিল জুড়ে চেহারাটা হয়েছে অনেকটা ব্যাঙ্কোয়েট টেবিলের মত। দু পাশে খান-পঁয়ত্রিশ চেয়ার। প্রায় চল্লিশটা আলমারী বোঝাই বই দু পাশের দেয়ালে সারবন্দী সাজানো রয়েছে। আলমারীর তালা-গুলোয় মরচে ধরে গেছে। আর ওদিকে সরকারী অফিসে লাল ফিতেয় বাঁধা ফাইলে এতদিনে বোধহয় বিঘৎ পুরু ময়লা জমেছে।

থাক সে কথা। পুরোনো দিনের কথা বলতে বলতে একেবারে ১৯৬৯-এ এসে গেছি। অথচ গোটা কয়েক জরুরী কথা তার আগে সেরে নেওয়া দরকার। বিশ শতকের দ্বিতীয় বর্ষে মডেল স্কুল আর ব্রাঞ্চ স্কুল জোড়া লাগল। তখনো মডেল স্কুল বসত কাছারি বাড়িতে। সাত বছর পরে ইনস-পেকটর অব স্কুলস এর অফিস হুগলী থেকে চুঁচুড়ায় বদলী হয়ে গেলে পরিত্যক্ত অফিসবাড়িতে মডেল স্কুল অর্থাৎ ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রাইমারী সেকশন উঠে এল। তখন হেডমাস্টার ছিলেন তারকনাথ সরকার।

আগেই বলেছি জোড়া স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা ছিল দুশো চুয়ান্ন। পরবর্তী কুড়ি বছরে এই সংখ্যা আড়াইশো থেকে তিনশোর মধ্যে ওঠানামা করেছে। সাধারণত সরকারী স্কুলে সন্তানকে পড়াবার আগ্রহ থাকে অভি-ভাবকদের। তবু কেন ব্রাঞ্চ স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশের যুগের সূচনাতেও তিনশোর কোঠা ছাড়াতে পারে নি? কারণ—(১) সরকারী স্কুলের রেজাল্টের মান বজায় রাখার জন্য ভর্তির ব্যাপারে কড়াকড়ি; (২) একশো বছরে হুগলী-চুঁচুড়ার শিক্ষা মানচিত্রের অসামান্য পরিবর্তন। অর্থাৎ একশ বছর আগে যে শহর দুটির দুই প্রান্তে ছিল মোটে দুটি স্কুল, শতবর্ষ পরে পাড়ায় পাড়ায় নতুন নতুন হাইস্কুল গড়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের মূলেও কিন্তু এই দুটি স্কুল। সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতকে যে হুগলী ছিল সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, বিংশ শতাব্দীতে তাই হয়ে উঠেছে আধুনিক শিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান। এই পীঠের পূজারী তালিকা খুঁজলে আধুনিক বাংলাদেশের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহান শিক্ষকদের অনেকেরই নাম পাওয়া যাবে। তারকনাথ সরকারের পর একে একে সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী, যোগেন্দ্র-নাথ ভট্টাচার্য, রাবণেশ্বর ব্যানার্জি, হরিপদ মুখার্জি, কালিদাস ব্যানার্জি, ললিতকুমার চক্রবর্তী ও শ্রীমন্ত সরকার ব্রাঞ্চ স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত কাজ করে গেছেন।

শুধু পড়াশোনায় ভাল ফল দেখানোয় ব্রাঞ্চ স্কুলের ছাত্রদের কৃতিত্ব কোনদিনই সীমাবদ্ধ ছিল না। শ্রীমন্তবাবু আটাশ সালে এ স্কুলের হেডমাস্টার হন। সে সময় তাঁর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯১৬ সাল থেকে কায়িক শ্রমের ব্যাপারে ছাত্রদের উৎসাহ দানের জন্য স্কুলে একটি ম্যানুয়াল ট্রেনিং ক্লাস নেওয়া শুরু হয়। স্কাউট তখন এ স্কুলে শুধু নয়, গোটা তল্লাটেই খুব জনপ্রিয় ছিল। যেমন পপুলার ছিল সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স আসোসিয়েশন। স্বয়ং শ্রীমন্তবাবু নিজেই অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য ছিলেন। খেলাধুলার ব্যাপারে শ্রীমন্তবাবুর মন্তব্যটুকু তুলে ধরলাম: গেমস এখানে খুব পপুলার। ফুটবলে ছাত্র-দের উৎসাহের কোন সীমা নেই। ক্রিকেটেও হয়। তবে হকি কোনদিনই এই স্কুলে চালু হয় নি। ভলি ও বাস্কেটবল চর্চার অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। যেমন ব্যায়াম শিক্ষাও আজ আর প্রচলিত নয়।

শ্রীমন্তবাবুর পর একে একে প্রবোধ গাঙ্গুলী, জে এম ব্যানার্জি ও গৌরগোপাল

রায় চল্লিশ বছর এই স্কুলে হেডমাস্টারী করেছেন। পঞ্চাশ সালে গোরবাবুর জায়গায় এলেন অর্ধেন্দুশেখর ভট্টাচার্য। অর্ধেন্দুবাবু একটানা তেরো বছর এ স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। স্কুলের ইতিহাসে এই তেরোটি বছরের মূল্য অপরিসীম। দেশজোড়া শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কারের ঢেউ বিগত দশকের শেষভাগে এই স্কুলেও বয়ে এনেছে অনেক পরিবর্তন। উনষাট্টি সালে সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ এই দুটি স্ট্রীম নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারী ব্যবস্থা এ স্কুলে চালু হয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারী সেকশন খুলতে গিয়ে দেখা গেল স্কুলে জায়গা হয় না। বাড়ি তো মোটে দুটি। এক সেই ১৮৩৪ সালের 'সাবস্ক্রিপসন হাউস' আর প্রাইমারী সেকশনের লোয়ার ব্লক। দুটিই একতলা। আজকের অধিকাংশ পায়রার খুপরীর তুলনায় বাড়ী দুটিকে রাজপ্রাসাদ বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হবে না, তবে বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। তাই একষাট্টি সালে সায়েন্সের প্রয়োজনে মেন বিল্ডিংয়ের উত্তরে চকবাজার রোডের গা ঘেঁষে উঠেছে দোতলা সায়েন্স ব্লক। ব্লকের দোতলায় রয়েছে ফিজিক্স ও বায়োলজির ল্যাবরেটরী। কেমিস্ট্রির জায়গা হয় নি নতুন বাড়িতে। পুরোনো মেন বিল্ডিংয়ের একটা ঘর তাই ছেড়ে দিতে হয়েছে কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটরীর জন্য।

এ তো গেল ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির কথা। কিন্তু জিওগ্রাফীর হাল কি? হঠাৎ জিওগ্রাফীর প্রসংগটা বা তুললাম কেন? তার কারণ, শ্রীমন্তবাবু সেই আটান সালে তাঁর রিপোর্টে এক জায়গায় বলেছিলেন—'একেবারে গোড়া থেকেই এই স্কুল জিওগ্রাফী পঠন বিষয়ে ইউনিভার্সিটির অনুমোদন লাভ করেছিল।' যে সৌভাগ্য সে যুগে এদেশের সব স্কুলের কপালে জোটে নি, অনাদরে অবহেলায় সেটুকু আজ মুছে যেতে বসেছে। স্কুলের তিন-তিনটে বাড়ি, খেলার ফুল সাইজ মাঠ আছে ঠিকই তবু জায়গার অর্থাৎ ঘরের বড় অভাব। তাই পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও ঘরের অভাবে ভূগোল চর্চা বড় গোলে পড়ে গেছে। শান্তিবাবু বললেন তাঁদের কমপক্ষে আরো পাঁচখানা ঘর দরকার। জিওগ্রাফীর জন্য একটা; একটা ক্যারিয়ার টিচারের জন্য। দুখানা দরকার ইলেকটিভ বিষয়ের ক্লাসরুম হিসাবে, ও ছাত্রদের কমনরুমের জন্য একখানা।

"আজ থেকে সাতষট্টি বছর আগে রাজেনবাবুর সময় দুশো ছয়াশিটি ছেলে পড়ত এই স্কুলে। আজ সেখানে প্রাইমারী সেকেণ্ডারী মিলিয়ে ছাত্রসংখ্যা ছশোরও বেশী। এই ছশো ছেলেকে পড়ানোর জন্য সবশুদ্ধ আছেন চল্লিশজন শিক্ষক— প্রাইমারীতে তেরোজন এবং সাতাশজন সেকেণ্ডারীতে। সে আমলে অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টারের মাইনে ছিল চল্লিশ আর আজ এই পোস্টের স্কেলই হল সাড়ে তিনশো থেকে পাঁচশো পঁচিশ (রাণ স্কুলে দু বছরের ওপর কোন হেডমাস্টার নেই)। পাসকোর্সে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের বেতনক্রম একশো পঁচাত্তর থেকে তিনশো পঁচিশ। অনার্স বা এম-এ হলে দুশো পঁচিশ থেকে চারশো পঁচাত্তর। ষাট-সত্তর বছর আগেও হাজার পাঁচেক টাকায় স্কুলের সারা বছরের খরচ-খরচা মিটত। আজ সেখানে বছরে লাগে দু লাখ সোয়া দু লাখ। অথচ টিউশন ফি থেকে স্কুলের আয় বড়জোর হাজার কুড়ি টাকা বছরে। তাও আবার মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা পনেরো ভাগ ফ্রীশীপ পায়।

বাষট্টি থেকে উনসত্তর, এই আট বছরে সায়েন্স হিউম্যানিটিজ মিলিয়ে মোট দুশো উনসত্তরটি ছেলে এই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে। পাশ করেছে দুশো উনষাটজন। ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে উনষাটটি ছেলে। স্কলারশিপ পেয়েছে মোট এগারোটি ছেলে। এ বছর সায়েন্সে যে ছেলেটি সাইথ স্ট্যাণ্ড করেছে সে এই স্কুলেরই ছাত্র শংকর ঘোষ। তবে একটি কথা, এ পর্যন্ত হিউম্যানিটিজে একটি ছেলেও ফার্স্ট ডিভিশন পায় নি। কারণ সকলেরই জানা। ভাল ছেলেরা আজকাল প্রায় সবাই চায় সায়েন্স পড়তে। তবু মাস্টারমশাইরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন যে আট বছরে তাঁদের একশোটি ছেলের মধ্যে ছিয়াশীটি ছেলেই পাস করেছে। কম্পার্টমেন্টাল ধরলে সংখ্যাটি হবে পঁচানব্বুই।

শুধু পড়াশোনা নয়, খেলাধুলাতেও সমানে এগিয়ে চলেছে রাণ স্কুলের ছেলেরা; চৌষট্টি, পঁয়ষট্টি ও ছেষট্টি পর পর তিন বছর জেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ঘরে নিয়ে এসেছে বিধানচন্দ্র শীল্ড। কিন্তু একটি ব্যাপারে দেখলাম চল্লিশ বছরেও কোন পরিবর্তন হয় নি। আজ থেকে একচল্লিশ বছর আগে শ্রীমন্তবাবু তাঁর রিপোর্টে ফুটবলের জনপ্রিয়তার কথা বলেছিলেন। সেই জনপ্রিয়তা যে আজো সমান প্রবল তার প্রমাণ তো উপরেই দিয়েছি। কিন্তু হকি, ক্রিকেট, ভলি বা ব্যায়াম চর্চার কি হোল? প্রশ্নটা করাই বোধহয় অন্যায় হয়ে গেল। কারণ এ প্রশ্নের জবাবে শান্তিবাবু কি আর বলতে পারেন, কি বা তাঁদের করার আছে। ছশো ছেলের স্কুলে খেলার জন্য বার্ষিক বরাদ্দ মোট বারোশ টাকা। মাথাপিছু দু টাকা। এই সামান্য টাকার মধ্যে শ' আড়াই টাকা গভর্ণমেন্ট দেন, বাকিটা আসে ছাত্রদের গেমস ফি থেকে। এর মধ্যে অ্যামুয়াল স্পোর্টস করতে হবে। তবু যে ছেলেরা ফুটবল খেলে, খেলে শুধু নয় বছর বছর চ্যাম্পিয়ান সেটাই তো এদেশে এক আশ্চর্য ঘটনা।

মাস্টারমশাইদের নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে অ্যাকটিং হেডমাস্টারমশায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে স্কুল কম্পাউণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই চকবাজার রোডের গা ঘেঁষে পাঁচিল। দক্ষিণে রায়বাহাদুর সতীশ মুখার্জি রোড। পূবে স্ট্র্যাণ্ড রোড। উত্তরে বি টি কলেজ। বি টি কলেজের গা ঘেঁষে পূবে সামান্য বাঁক নিয়ে উত্তর-দক্ষিণে গঙ্গা ছুটে চলেছে। দুর্দান্ত ঘোলা জলের উপর দিয়ে পচা ভাদ্দুরের গুমোট কাটিয়ে হু-হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখি মেন বিল্ডিংয়ের দক্ষিণ প্রান্তে বিশাল বকুল গাছ দুটি ঝাঁকড়া মাথা দুলিয়ে নাচছে। হঠাৎ মনে পড়ল আর একটি গাছ তো এখানে থাকার কথা, এই হুগলীতে। কোথায় সেই বট, যে গাছের তলায় বসে শ্রীকান্ত স্কুল পালিয়ে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে গল্পে গল্পে সারাটা দুপুর কাটিয়ে দিত। সেই সংখ্যার বটগাছটিকে আমি খুঁজে পাই নি কিন্তু ছেলেটির নাম দেখলাম স্কুলের একটা পুরোনো রিপোর্টে প্রাক্তন কৃতী ছাত্র তালিকায় দেওয়া আছে: শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি, নভেলিস্ট।

—অভিরঞ্জন

ভ্রম-সংশোধন

অমৃতের ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড ১৭ সংখ্যায় 'আনুব গতার ইতিকথায়' হাওড়া জিলা স্কুল প্রসঙ্গে ৩৬২ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে এক জায়গায় ছাপা হয়েছে 'গড়ে প্রতি বর্গমাইল পিছু একটি করে মাধ্যমিক স্কুল খুব কম জেলাতেই আছে।' আসলে হবে 'প্রতি আট বর্গমাইল পিছু।'

নিমাই ভট্টাচার্য

।। ছয় ।।

কেনসিংটন গার্ডেনস্, হাইড পার্কের বাঁদিক দিয়ে যে রাস্তাটি চলে গেছে, তার নাম বেজওয়াটার রোড। এজওয়ার রোড ও পার্ক লেনের মোড়ে মার্বেল আর্চকে স্পর্শ করতেই বেজওয়াটার রোডের নাম হারিয়ে গেল, শুরু হলো অক্সফোর্ড স্ট্রীট।

সবুজের মেলার পাশের শান্ত বেজওয়াটার রোড নাম পাল্টাতেই চরিত্র হারিয়ে ফেলল। প্রাণ-চঞ্চল অক্সফোর্ড স্ট্রীট যেন মানুষের উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার তীর্থক্ষেত্র। দুনিয়ার সবকিছু সম্পদ-সম্ভোগের প্রদর্শনী হচ্ছে এই অক্সফোর্ড স্ট্রীট পাড়া। অক্সফোর্ড স্ট্রীট, বেকার স্ট্রীট, নিউ বণ্ড স্ট্রীট, রিজেন্ট স্ট্রীট, উইগমোর স্ট্রীট, টটেনহাম কোর্ট রোড, চারিং ক্রশ ও আশে-পাশে মানুষ গিজগিজ করছে। সীমাহীন লালসা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই।

অক্সফোর্ড স্ট্রীট সোজা আরো এগিয়ে গেল। মানুষের ভীড় একটু পাতলা হলো। রাস্তার নামও পাল্টে গেল। এবার নিউ অক্সফোর্ড স্ট্রীট। এরপর আবার পরিচয় ও চরিত্র পাল্টে গেল ঐ একই রাস্তার। হলো হাই হোবর্ণ। আবার বদলে গেল। এবার শুধু হোবর্ণ।

রাস্তাটা ধনুকের মত একটু ডান দিকে বেঁকে যেতেই আরো কতবার ঐ একই রাস্তার পরিচয় ও চরিত্র পাল্টে গেল।

বেশ মজা লাগে তরুণের। কোনদিন কাজকর্মের মাঝে সুযোগ পেলে অফিস থেকে বেরিয়ে স্ট্রাণ্ড ধরে এগিয়ে যায় চারিং ক্রশ। তারপর যেদিকে খুশী চলে যায়। হারিয়ে যায় সর্বজনীন মহামেলায়। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে হাজির হয় টি সেন্টারে।

শুধু ক্লান্ত হয়ে নয়, মাঝে মাঝে ভুল করে, অন্যমনস্ক হয়েও তরুণ হাজির হয় টি সেন্টারে।

কাউন্টারের কাছে যাবার আগেই মিস বোস এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানান, আসুন, আসুন। এতদিন কোথায় ছিলেন।

তরুণ একটু হাসে, এক ঝলক দেখে নেয় মিস বোসের অশান্ত, অবাধ্য কোঁকড়া চুলগুলো আর ঐ দুটো মিষ্টি চোখ। তারপর বলে, কোথায় আর যাব?

চন্দনা বোস বলে, আজও কি মানুষের শোভাযাত্রা দেখতে এদিকে এসেছেন?

'যদি বলি আপনার কাছেই এসেছি।'

রাশ-আওয়ার না হলেও তখনও বেশ কিছু কাস্টমার ছিলেন। তবুও চন্দনা হেসে উঠল। ভ্রু দুটো টেনে উপরে উঠিয়ে বলল, ফর গডস সেক এমন মিথ্যা কথা বলবেন না।

'যাকগে ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। চলুন আপনার বাড়ী যাই।'

'এক্ষুনি?'

'তবে কি? মিসেস অরোরাকে বলুন আমাকে মাছ রান্না করে খাওয়াবেন বলে...!'

চন্দনা আবার একটু হেসেই চলে গেল মিসেস অরোরার কাছে।

দু-এক মিনিটের মধ্যেই ঘুরে এসে বললেন, 'আপনার বহিনজী আপনাকে ডাকছেন।'

হাইকমিশনের সবাইকেই মিসেস অরোরা একটু খাতির করেন। তবে তরুণকে উনি ভালবাসেন। হাইকমিশনের আর কেউ ওকে বহিনজী বলেন না, উনিও আর কাউকে ভাইসাব বলেন না। লণ্ডন শহরে এসব সম্পর্ক দুর্লভ হলেও মনটা তো ভারতীয়।

কদাচিৎ কখনও কখনও তরুণ এদিকে এলে চন্দনার সঙ্গে দেখা করবেই। সেই সেবার চার্চ হলে নববর্ষ উৎসবে আলাপ হবার পর থেকেই দুজনের মধ্যে একটা বেশ মৈত্রীর ভাব জমে উঠেছে। চন্দনার ঐ কোঁকড়া চুল আর ঐ চোখ দুটো দেখে তরুণের যে অনেক কথা মনে পড়ে, অনেক স্মৃতি ফিরে আসে। কিন্তু সেকথা একটি বারের জন্যও প্রকাশ করে না। তবে চন্দনা জানে, বোঝে তরুণ তাকে পছন্দ করে, হয়ত একটু ভালবাসে। সে পছন্দ বা ভালবাসায় অবশ্য মালিন্যের স্পর্শ নেই। টি এক্সপোর্ট ব্যুরোর চেয়ারম্যানের মত নোংরা চরিত্রের লোক তরুণ নয়, সেকথা চন্দনা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।

বৃদ্ধ চেয়ারম্যানের কথা মনে হলে ঘেন্নায় চন্দনার সারা মন ঘিন ঘিন করে ওঠে।

...বিশ্বের বাজারে ইণ্ডিয়ান টি'র চাহিদা কমে যাচ্ছে। এককালে যেসব দেশে শুধু দার্জিলিং বা আসামের চা বিক্রী হতো, সেসব দেশের বাজারে সিংহল ও সাউথ আফ্রিকার চা'র বেশ চাহিদা হচ্ছে। লণ্ডন চা নিলামের বাজারে ক' বছর আগেও ইউরোপ আমেরিকার কাস্টমাররা দার্জিলিং টি কেনার জন্য হুড়োহুড়ি করত। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন, জেনেভা, ব্রাসেলস, টারান্টো উরুগুয়ে, জনারিও'র বড় বড় রেস্তোরাঁয় কবছর আগেও ইন্ডিয়ান চা সার্ভ করে নিজেদের কৌলীন্য প্রচার করত। বড় বড় নিওন-সাইজের বিজ্ঞাপন দিত, ফর বেস্ট ইণ্ডিয়ান টি, ভিজিট...। ক' বছরের মধ্যে সব নিওন-সাইনের আলো নিভে গেল।

কর্মবীর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও তাঁদের প্রতিভাবান কমার্শিয়্যাল অ্যাটাচির দল এসব ব্যাপারে নজর দেবার তাগিদবোধ করলেন না। কলকাতা থেকে বেস্ট ইণ্ডিয়ান টি'র স্যাম্পল প্যাকেট পেয়েই ওরা মহা-খুশী রইলেন।

দু-চারটে খবরের কাগজের রিপোর্ট ও পার্লামেন্টে কিছু কোশ্চেন হবার পর কুম্ভকর্ণ ভারত সরকারের যখন নিদ্রাভঙ্গ হয়ে উদ্যোগ ভবনে নতুন ফাইলের জন্ম হলো, ততদিনে ওসব দেশের কয়েক কোটি মানুষের অভ্যাস পাল্টে গেছে। সাউথ আফ্রিকা ও সিংহল গ্যাঁট হয়ে বসেছে লণ্ডন টি অকসানে।

রোগটা যখন ক্যান্সারের পর্যায়ে পৌঁছেছে, তখন সর্বরোগবিনাশিনী বটিকা আবিষ্কারের প্রয়াসে এক ডেপুটি মন্ত্রী তিন সপ্তাহে ন'টি দেশ ভ্রমণ করে দিল্লী ফিরে গেলেন। এই ভ্রমণে রোগের কোন সুরাহা হলো না বটে, তবে ডেপুটি মন্ত্রীর গাল দুটি কাশ্মীরী আপেলের মত লাল হলো।

প্রথমে প্রিলিমিনারী রিপোর্ট ও প্রেস কনফারেন্স হতে দেরী হলো না। মাস তিনেকের মধ্যেই মিনিস্টার-ডেপুটি মিনিস্টার-সেক্রেটারীর মিটিং হলো। পরের চার মাসে সেক্রেটারী জয়েন্ট সেক্রেটারী-ডেপুটি সেক্রেটারীদের নিয়ে দু-তিনবার মিটিং করলেন। এরপর দুজন ডেপুটি সেক্রেটারী ও একজন জয়েন্ট সেক্রেটারী টি এক্সপোর্টার্সদের সমস্যা ও মতামত জানার জন্য বার-কয়েক কলকাতা-দার্জিলিং-গৌহাটি-শিলং ঘুরে এলেন পরের ছ'-সাত মাসের মধ্যেই। জয়েন্ট সেক্রেটারী দার্জিলিং গিয়ে একটু গ্যাংটক ঘুরে আসায় তাঁর মনে হলো পাঞ্জাবের বেড কভারের ডিমাণ্ড ওখানে বেশ ভালই। দিল্লী ফিরে একটা রিপোর্টও দিলেন, বেড কভার বিক্রী হলে সিকিমের কমন ম্যান ভীষণ খুশী হবে ও ইণ্ডিয়া-সিকিমের কালচারাল-সোশ্যাল-ইকনমিক্যাল সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে।

কেরালার কোট্টায়াম জেলার অ্যাডিসনাল সেক্রেটারী এই রিপোর্ট পড়েই বললেন, ডিড আই টেল ইউ যে কেরালার কয়ার ম্যাটের ভীষণ ডিমাণ্ড আছে।

তাই নাকি?

তবে কি! সেবার শিলিগুড়ি এয়ার পোর্টে সিকিম প্যালেসের একজন হাই-অফিসারের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় উনিই জানালেন কয়ার ম্যাট-কার্পেটের ভাল ডিমাণ্ড হতে পারে সিকিমে।

কোয়াইট ন্যাচরাল।

তাইতো বলছিলাম, আপনি একবার কেরালা ঘুরে আসুন। তারপর একটা কম্প্রিহেনসিভ রিপোর্ট দিন।

চায়ের সমস্যা চাপা পড়ল। জয়েন্ট সেক্রেটারী ছুটলেন কেরালা।

যাই হোক, এমনি করে আবার মন্ত্রী-পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছুতে পৌঁছুতে চা রপ্তানী শিল্পের প্রায় নাভিশ্বাস উঠার উপক্রম হলো। সার্জিক্যাল অপারেশন করে অনতিবিলম্বে রোগ সারাবার জন্য মিঃ বহুগুণার নেতৃত্বে সাতজনের এক কমিটি নিয়োগ করে বলা হলো, সরকারী পয়সায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে এসে চটপট রিপোর্ট দিন।

এই কমিটির শিরোমণি হয়েই বহুগুণা সাহেব লণ্ডন এসেছিলেন। টি সেন্টারের ম্যানেজারের ঘরে হলো অফিস। অস্থায়ী আবাস-স্থান হলো কাছেরই মাউন্ট রয়্যাল হোটেলে।

দু-চার দিন টি সেন্টারে আসার পরই বহুগুণা সাহেব বললেন, ইফ ইউ ডোন্ট মাইণ্ড মিসেস অরোরা, মিস বোস আমার কাজে একটু হেলপ করুক।

কথাটা বলতে না বলতেই আবার বললেন, অবশ্য যদি আপনার এখানকার কাজের কোন ক্ষতি না হয়।

মিসেস অরোরা একজন সামান্য ম্যানেজার। চেয়ারম্যান বহুগুণা সাহেবের অনুরোধ অপেক্ষা করার কথা উনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। উনি দিল্লীতে না থাকলেও ভূতপূর্ব সেন্ট্রাল মিনিস্টার বহুগুণা সাহেবের ইনফ্লুয়েন্সের কথা ভালভাবেই জানেন। চায়ের রপ্তানীর বাজার স্ট্যাডি করতে এলেও এয়ার ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার থেকে হাইকমিশনার পর্যন্ত ওঁকে নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং মিসেস অরোরা কৃতার্থ হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই। যদি আমাকে দরকার হয়, বলতে দ্বিধা করবেন না।

তোমাকে বহুগুণা সাহেবের দরকার নেই। তোমার বসন্ত বিদায় নিয়েছে। চৈত্র দিনের ঝরা পাতার বাজারে তোমাকে নিয়ে কি হবে?

'না, না, আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। মিস বোস হলেই সাফিসিয়েন্ট।'

'অ্যাজ ইউ প্লিজ স্যার। উই আর অ্যাট ইওর ডিসপোজ্যাল।'

'মেনী থ্যাঙ্কস মিসেস অরোরা।'

কয়েক দিন পর কমিটির অন্য সদস্যরা কন্টিনেন্টে চলে গেলেন। বহুগুণা সাহেব একাই থেকে গেলেন লণ্ডনে।

'আমি তো এখন একাই কাজ করব। আমি আর কেন একলা একলা টি সেন্টারে যাই? তুমিই না হয় হোটেলে চলে এসো।'

চেয়ারম্যানের আদেশ শিরোধার্য করে নিল চন্দনা।

একদিন বেশ কেটে গেল।

পরদিন।

'এখন থেকে রোজ সকালেই আমি কেনসিংটনে হাইকমিশনারের বাড়ী যাব। তুমি বিকেলের দিকেই এসো।'

'অ্যাজ ইউ প্লিজ স্যার।'

চন্দনা দরজা নক্ করার আগে একবার ঘড়িটা দেখে নিল। হ্যাঁ, চারটেই বাজে।

'কাম ইন।'

আমন্ত্রণ শুনে ঘরে যেতেই হাসি মুখে বহুগুণা সাহেব অভ্যর্থনা করলেন, 'এসো, এসো। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

চন্দনা পাশের সোফাটায় বসে একটু মুচকি হেসে বললে, 'সো কাইণ্ড অফ ইউ স্যার!'

'দেখ চন্দনা, অত ফরম্যাল হবে না।'

বহুগুণা সাহেব চন্দনার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে তুলে ধরে বললেন, 'আমার কাছে এত ফরম্যাল হবার দরকার নেই। বী ইনফরম্যাল, বী কমফরটেবল।'

এই বলে চন্দনাকে নিয়ে বড় সোফাটায় পাশে বসালেন। 'বলো, কফির সঙ্গে কি খাবে?'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ। আমি এখন কিছু খাব না।'

'আবার ফর্মালিটি?' ডান হাত দিয়ে চন্দনাকে একটু জড়িয়ে ধরে বললেন, 'বিলেতে থেকে একেবারে বিলেতী হয়ে গেছ? বলো কি খাবে?'

'ওনলি কফি স্যার।'

'তাই কি হয়?'

টেলিফোন তুলেই ডায়াল করলেন, রুম সার্ভিস! প্লিজ সেণ্ড টু প্লেটস অফ চিকেন স্যাণ্ডউইচ, সাম পেস্ট্রি অ্যাণ্ড কফি ফর টু।

চন্দনা ঈষাণ কোণে একটা ছোট্ট কালো মেঘ দেখতে পেল। মনের মধ্যে অনিশ্চিতের আশংকা দোলা দিল। অনুমান করতে কষ্ট হলো না বহুগুণা সাহেবের অন্তরের ক্ষীণ আশা।

আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই চন্দনার। তাই যেন একটু মুচকি হাসল। লণ্ডনে আসার প্রথম কয়েক মাসে এমনি কত বিপদের ইঙ্গিত দেখা দিয়েছিল! শেষ পর্যন্ত নিজেকে বাঁচাতে পেরেছে চন্দনা। তাইতো কেমন যেন একটু বিদ্রুপের হাসি উঁকি দিল তার ঐ দুটো ঠোঁটের কোণে।

'জান চন্দনা, এতবার তোমাদের এই বিলেতে এসেছি কিন্তু সব সময়ই কাজকর্ম নিয়ে এমন বিশ্রী ব্যস্ত থেকেছি যে কিছুই দেখা হয় নি।'

'তাই নাকি স্যার?'

'তবে কি! ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা উইণ্ডসর ক্যাসেল-এর পাশ দিয়ে গেছি হাজার বার কিন্তু ভিতরে যাবার সময়সুযোগ হয় নি।'

চন্দনা মনে মনে ভাবে, হোটেলের এই ঘরে মাঝে মাঝে তোমার আলিঙ্গন ও আদর উপভোগ করার চাইতে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান অনেক ভাল।

'আমিও যে সব কিছু দেখেছি তা নয়। তবুও চলুন না, সব কিছু দেখিয়ে দেব।'

'দ্যাটস লাইক এ ওয়াণ্ডারফুল গার্ল', বলেই বহুগুণা ডান হাত দিয়ে চন্দনাকে একটু কাছে টেনে আদর করলেন।

চন্দনা লোহার মত শক্ত হয়ে থাকে, নিজের বুকের পর দুটি হাত রেখে ছোটখাট আক্রমণের প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা করে।

'আঃ! তুমি বড় রিজিড, বড় কনজার-ভেটিভ। এতদিন বিলেতে থাকার পরও একটু ফ্রিলি মিশতে পার না? তাছাড়া আমার মত ওল্ডম্যানের কাছে লজ্জা কি?'

'না, না, লজ্জা কি!'

সকাল সাড়ে এগারটায় বাকিংহাম প্যালেসের সামনে একদল বাচ্চা ও টুরিস্ট-দের সঙ্গে বহুগুণা সাহেবকে 'চেঞ্জিং অফ দি গার্ড' দেখাল। তারপর ন্যাশনাল গ্যালারী, ব্রিটিশ মিউজিয়াম।

'বুঝলে চন্দনা, এতো মিউজিয়াম নয়, একটা দুনিয়া। ভালভাবে দেখতে হবে। আর একদিন আসব। চলো আজকে একটু রিজেন্ট পার্ক বা কেনসিংটন গার্ডেনে যাই।'

সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই বহুগুণার আরো গুণ প্রকাশ পেল।

'শুনেছি তোমাদের এই লণ্ডনে ওয়ার্ল্ড ফেমাস নাইট ক্লাব আছে। কে যেন বলেছিল 'ফোর হানড্রেড ক্লাব' 'রিভার ক্লাব' ও আরো কি কি সব নাইট ক্লাব আছে। কত বারই তো এলাম অথচ কিছুই দেখলাম না। তুমি আমাকে একটু নাইট ক্লাব ঘুরিয়ে দাও তো।'

লণ্ডনের নাইট ক্লাব গুলি যে পৃথিবী-বিখ্যাত, তা চন্দনা শুনেছে। কখনও দূরে থেকে, কখনও পাশ দিয়ে যাবার সময় নাইট ক্লাবগুলোর নিওন সাইন দেখেছে। সেরকম বন্ধু ও অপব্যয় করার মত টাকাকড়ি থাকলে হয়ত একদিন ভিতরে ঢুকে দেখত। সে সুযোগ ওর আসে নি। তবে শুনেছে সবকিছু। ও জানে যৌবন-পসারিণীরা নাচে, দর্শকদের নাচায়। রাত যত গভীর হয় সবাই তত বেশী আদিম হয়। যৌবন-পসারিণীদের দেহ থেকে ধীরে ধীরে পোশাকের ভার কমে আসে আর দর্শকরা তত বেশী মদির হয়, উন্মত্ত হয়। হয় আরো কত কি!

বহুগুণার মত বৃদ্ধকে নিয়ে বিশ্ব-বিখ্যাত 'ফোরহানড্রেড ক্লাবে' যাবার কথা ভাবতেও চন্দনার বিশ্রী লাগল। একবার ভাবল, মিসেস অরোরাকে বলে। তারপর মনে হলো, বহুগুণা সাহেবের এই সব গুণের কথা জানাজানি হলে ওকে নিয়েও নিশ্চয়ই সরস আলোচনা শুরু হবে। নিশ্চয়ই অনেকে অনেক কিছু ভাববে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এদিক-ওদিক-সেদিক চিন্তা করে চন্দনা বলল, 'ঠিক আছে আমি আপনার একটা রিজার্ভেশন করে দেব।'

'ইউ নটি গার্ল। আমাকে একলা একলা নেকড়ে বাঘের মুখে ঠেলে দিতে চাও?'

চন্দনার হাসি পেল।

নাইট ক্লাবে গেলেন বহুগুণা সাহেব। মিস চন্দনা বোসকে পাশে নিয়ে উপভোগ করলেন যৌবন-পসারিণীদের নাচ। লাস্ট ফাইন্যাল সিনে লাইট অফ হয়ে গেলে মুহূর্তের জন্য আতিশয্যের আধিক্যে চন্দনার হাতটা চেপে ধরেছেন। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

বারোটা বাজার আগেই নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ফেরার পথে ট্যাক্সিতে বেশ একটু নিবিড় হয়ে বসলেন।

'জান চন্দনা, তোমাকে বলতে একেবারেই ভুলে গেছি। কাল সকালেই চারজন ব্রিটিশ অকসানার্স আসছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। হাইকমিশনের অফিস থেকে যে

ব্রীফ দিয়েছে, সেই তার বোসিসে তোমাকে আজ রাত্রেই একটা ছোট্ট নোট ঠিক করে দিতে হবে।'

'আজ রাত্রেই?' চন্দনা চমকে ওঠে। নাইট ক্লাব থেকে ফেরার পর বহুগুণা সাহেবের সঙ্গে হোটেলের ঐ ঘরে কাজ করতে হবে? 'আমি বরং স্যার কাল ভোরে এসেই...।'

কথা শেষ হবার আগেই বহুগুণা বাধা দিলেন, 'নট অ্যাট অল। আজ রাত্রেই ওটাকে রেডি করতে হবে।'

হোটেলের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বহুগুণা সাহেব নিজে চন্দনার কোট খুলে দিলেন। মুহূর্তের জন্য একবার যেন কী ভীষণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আগুনের হল্কার মত নিঃশ্বাস পড়ছে তাঁর। চিড়িয়াখানার নেকড়ে বাঘ তখন ওঁকে দেখলেও হয়ত ভয় পেত।

বহুগুণা সাহেব আরো এগিয়ে এলেন। চন্দনা একটু পিছিয়ে যেতেই বহুগুণা সাহেব দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'প্লিজ ডোণ্ট ডিসিভ মী টু নাইট।'

চন্দনার মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুল না। বহুগুণা সাহেব হঠাৎ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে দানবের বেগে জড়িয়ে ধরলেন চন্দনাকে।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন দরজায় ঠক্ ঠক্ করে নক্ করল।

ঘরে আলো জ্বলে উঠল। চন্দনা প্রায় কাঁপতে কাঁপতে পাশে সরে দাঁড়াল। বহুগুণা সাহেব একটু থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কাম ইন।'

দরজা খুলে অপ্রত্যাশিতভাবে তরুণ মিত্র একটা গোলাপী কভার নিয়ে ঘরে ঢুকল, 'এক্সকিউজ মী স্যার! দিল্লী থেকে একটা আর্জেণ্ট মেসেজ আছে। আজ রাত্রেই রিপ্লাই দিতে হবে।'

'আজ রাত্রেই?'

'ইয়েস স্যার।'

একটা ব্রিটিশ নিউজ পেপারের রিপোর্টের ভিত্তিতে বহুগুণা সাহেবের কার্মটি নিয়ে পার্লামেণ্টে সর্ট নোটিশ কোশ্চেন টেবিল করেছেন আট-দশজন অপোজিশন এম-পি।

'স্যার আমাদের হাইকমিশনের একজন স্টাফকে সঙ্গে এনেছি। আপনি কাইণ্ডলি ওকে আপনার রিপ্লাইটা ডিকটেট করে নীচে একটা সই করে দেবেন। উই উইল সেণ্ড এ কেবল টু ডেলহি।'

এবার তরুণ চন্দনার দিকে তাকায়। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য হয়ত স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর বলে, 'এক্সকিউজ মী মিস বোস, চলুন আমাদের অফিস কারে আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দেবে।'

চন্দনা সেদিন মনে মনে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়েছিল ভগবানকে। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল তরুণকে।

সেই থেকে তরুণের প্রতি চন্দনার একটা অদ্ভুত বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। হয়ত ভালওবাসে। চন্দনা বুঝতে পারে তরুণ যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে সারা দুনিয়া। ওর মত এক সাধারণ মেয়ের দুটি চোখের ছোট্ট দুটি তারার মধ্য দিয়ে বিরাট এক দুনিয়া দেখছে। যেন ক্যামেরার ছোট্ট লেন্সের মধ্য দিয়ে সুন্দর অরণ্য-পর্বতের ছবি তোলা। ক্যামেরাম্যান প্রকৃতির ঐ অনন্য সৌন্দর্যকে বন্দী করতে চায়, উপভোগ করতে চায় সর্বক্ষণ। তাইতো সে ক্যামেরার লেন্সকে যত্ন করে, ভালবাসে। চন্দনা জানে সে শুধু ক্যামেরার লেন্স মাত্র, অপরূপ প্রকৃতি নয়।

তবু তার ভাল লাগে, তবু সে খুশী। তরুণ মাছ খেতে চাইলে সে এক পাউণ্ড-দেড় পাউণ্ড খরচা করে মাছ কেনে, মাংস কিনে কত যত্ন করে রান্না করে।

গ্যাসে মাছটা চাপিয়ে দিয়ে কোথায় সোফাটায় বসে চন্দনা প্রশ্ন করে, একটা কথা বলবেন?

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

'কাকে আবার?'

'আপনি জানেন আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি বিশ্বাস করি আপনি মিথ্যা কথা বলেন না।'

'না, না, মিথ্যা বলব কেন? খুঁজি না কাউকে। তবে মনে পড়ে যায় অনেক দিন আগেকার কথা, ছোটবেলার কথা, ছাত্র-জীবনের কথা।'

একটু নিবিড় হয়ে মিশলেই বেশ বোঝা যায় তরুণ যেন কারুর ভালবাসার কাঙাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পৃথিবীতে থেকেও সে যেন এক মহাশূন্যে বিচরণ করছে। পুরুষের চোখে ধুলো দেওয়া যায় কিন্তু মেয়েদের? অসম্ভব।

তরুণের জীবনের, মনের এই দুঃখের ইঙ্গিত পাবার জন্য চন্দনা যেন ওকে আরো ভালবাসে।

তরুণও ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে চন্দনাকে। কি নিদারুণ সংগ্রাম করে মেয়েটা কটা বছরে সারা পরিবারকে রক্ষা করল।

দুটি বছরে দুজনে কত কাছে এলো।

'চন্দনা, এবার তো আমার যাবার পালা।'

'তোমার ট্রান্সফার অর্ডার এসে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

চন্দনা যেন বাক্ শক্তিটাও হারিয়ে ফেলল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

তরুণ একটু কাছে টেনে নেয় চন্দনাকে। মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'আমার একটা কথা শুনবে চন্দনা?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি একটা বিয়ে কর।' তরুণের দৃষ্টিটা ঘুরে আসে লণ্ডনের মেঘলা আকাশের কোল থেকে। আমার খুব ইচ্ছা করে তোমার বিয়েতে আমি খুব হৈ-চৈ করি, খুব মজা করি, খুব মাতব্বরী করি।'

'আর একটা বছর। ছোট ভাইটা যাদবপুর থেকে বেরিয়ে যাক। তারপর তুমি একটা ছেলে ঠিক করে দিও, নিশ্চয়ই বিয়ে করব।'

চন্দনার এমন সুন্দর আত্মসমর্পণে মুগ্ধ হয় তরুণ। এমন অধিকার কজন আধুনিকা দিতে পারে অপরিচিত ডিপ্লোম্যাটকে?

'নিশ্চয়ই আমি ছেলে খুঁজে দেব। তবে বিলেতী বাঁদরদের সঙ্গে কিন্তু আমি বিয়ে দেব না।'

চন্দনা শুধু মাথা নীচু করে হাসে।

দুদিন পর হিথরো এয়ারপোর্ট থেকে তরুণ বিদায় নিল। চন্দনা ঐ এয়ারপোর্টের ভীড়ের মধ্যেই প্রণাম করে বলল, 'আমাকে কিন্তু ভুলে যেও না।

'পাগলী মেয়ে কোথাকার।'

একটি দেয়াল ॥

বিষ্ণু দে

তারপরে দেওদার-বীথি শেষ, তারপরে কিছু
একদা-লালিত আম্রকুঞ্জ, কিছু জাম, কিছু নীরক্ত পেয়ারা,
ওইদিকে সিসু আর গমহার, পুষ্পময় সেগুন ও শাল।
তারপরে স্মৃতি দেখি মৃত শত ফুলের হরেক দ্বীপে
যা ছিল কেয়ারি, শখ, সাধ, তাই দেখি বামন জঙ্গল।

চলি কয়জনা, বেশ সাবধানেই, মাথা হেঁট, চোখ নিচু,
বাড়ি কোথা? সে শৌখীন ছুটির প্রাসাদ বুঝি ওই একটি দেয়াল?
কোথায় সে ভোজ্য পেয়? জনা দশ বাবুর্চি বেয়ারা?

ওদিকে ও কার ঘর? মাটিতে নিকানো দাওয়া, জর্মান প্রদীপে
জ্বলে নি তখনও আলো। একটিই নিঃসঙ্গ ঘর। দলবল
ছেড়ে, জুতো টিপে টিপে চলি, একা, সাবধানেই, মাথা নিচু,
সূর্যাস্ত-আভায় লাল নিজেরই ছায়ার যেন পিছু পিছু।
মোটা কাঁঠাল গুঁড়িতে আঁটা দ্বার খোলা, খাটিয়ায় বিছানো কম্বল।

ভদ্রলোক, বোধহয় তো ভদ্রলোকই, ভোজপুরী দারোয়ান নয়,
শাদা চুল
ভ্রুতে ঢাকা দুই চোখ, হঠাৎ বলেন, যেন অন্ধ চোখে
কিংবা পাতা-বন্ধ চোখে, বলেন ঃ ও সব শখ সাধ সবই ভুল,
সঙ্গীতের ধ্রুবপদ মাত্র সত্য জেনো, বীরবলের মতো, বলো, কে
চায় খেয়াল?
দেখেছ তো দশা তার, পশ্চিমে কি পুবে? মাত্র একটি দেয়াল?

আমেরিকার সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলন

সারা আমেরিকায় তোলপাড় হচ্ছে। ছাত্র আন্দোলন মুখ্য আলোচ্য বিষয়। গত কয়েক মাসে আমেরিকার প্রধান প্রধান বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজে আন্দোলন চরম সীমায় পৌঁছায়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ী দখল, ঘেরাও, সত্যাগ্রহ, শোভাযাত্রা ইত্যাদি শিক্ষায়তনগুলির সুশৃংখল ও শান্ত আব-হাওয়াকে হঠাৎ সম্পূর্ণভাবে ওলট-পালট করে দিয়েছে। একটা বিচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে ছাত্র-ছাত্রীরা। আমেরিকার মত সব পেয়েছির দেশে হঠাৎ এ বিদ্রোহ কেন—প্রশ্ন হতে পারে। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা সব দেশেই সম্ভবত আদর্শবাদী ; সমাজের নানা পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী। আমাদের দেশে যেমন ছাত্রআন্দোলন. স্বাধীনতাসংগ্রামকে সমৃদ্ধ করেছে এবং স্বাধীনোত্তর সমাজে নানা অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে এখনও মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে, এদেশেও তাই হচ্ছে।

ইতিপূর্বে ছাত্র আন্দোলনের রূপ ছিল ভিন্নতর। আলোচনা সভা, প্রতিবাদ সভা, দাবী-দাওয়া পেশ করা, শিক্ষায়তনের অন্যান্য কাজ-কর্মের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা আনুষ্ঠানিক হয়ে ছিল। গত বছর নিউ-ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের 'স্ট্রাইক' ছাত্র আন্দোলনে এক নতুন পর্যায় আনে। এ আন্দোলনের ফলে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু কিছু সংস্কারের প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় সংস্কার চলে টিমে গতিতে। বিশ্ব-বিদ্যালয় অধিকসংখ্যায় নিগ্রো এবং পোর্টে-রিকান ছাত্র ভর্তির যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলো, এক বছরে তার প্রগতি সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ জাগে। তাদের জন্য দাবীগুলো বিশেষ কোন সমর্থন পাচ্ছিল না। অতএব এবছর ছাত্রদের আন্দোলন নূতন মোড় নিতে শুরু করে।

ছাত্রদের দাবীগুলোকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা চলে ঃ প্রথমতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত মহল্লা সম্পর্কিত দাবী, দ্বিতীয়ত দেশের সংখ্যালঘু সম্পর্কিত দাবী এবং তৃতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামরিক সংস্থা ও গুপ্তচরসংস্থার যোগাযোগ সম্পর্কিত দাবী। এছাড়া আছে শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কিত, গ্রেড ইত্যাদি সম্পর্কিত দাবী। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব দাবী-দাওয়া ধীরে ধীরে ছাত্র আন্দো-লনের সার্বজনীন দাবী বলে স্বীকৃত হচ্ছে। শিক্ষা এবং গবেষণা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি হচ্ছে। ফলে তার আশেপাশের ছোট বড় সব বাড়ী এবং জমি-জমা চলে আসছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে। ছাত্রদের মতে এর ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি এ সমস্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। এ সমস্ত পরিবার অর্থাভাবে এবং নানা ভেদ-নীতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলে-মেয়েদের পাঠাতে পারে না। ছাত্রেরা চায় বিশ্ববিদ্যালয় তার সংযুক্ত এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি ব্যাপারে নীতি পরিবর্তন

সেপুকা বিপ্লব

করুক। স্থানীয় সব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার খোলা রাখুক। ভেদ-নীতি বর্জন করুক। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার ব্যবস্থা সুচিন্তিত ভাবে করা হোক। দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যা-লয়গুলিতে নিগ্রো এবং পোর্টোরিকান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার অত্যন্ত কম। ছাত্রেরা বলে ছাত্রভর্তি ব্যাপারে ভেদ-নীতিই এর অন্যতম মুখ্য কারণ। নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হোক, তাদের থাকার জন্য আলাদা ব্যবস্থা হোক, অধিকসংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিয়োগ করা হোক—ইত্যাদি দাবী শুধু নিগ্রোদের নয়, সব ছাত্র-ছাত্রীর। আফ্রো-আমেরিকান ইতিহাস পড়ানোর যৌক্তিকতা সকলেই স্বীকার করছে এবং দাবী করছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের আরো অভিযোগ যে—শিক্ষকেরা বই লেখার কাজে এবং স্বদেশে ও বিদেশে নানা গবেষণার কাজে ব্যস্ত এবং সে কারণে ছাত্রদের পড়ানোর কাজে বেশী সময় তাঁরা দিতে পারেন না। তারা আরো আবিষ্কার করেছে যে শিক্ষকেরা সামরিক বিভাগ ও গুপ্তচর বিভাগের

আর্থিক সাহায্য নিয়ে নানা ধ্বংসাত্মক গবেষণায় নিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় এ সমস্ত গবেষণার জন্য বিরাট আর্থিক সাহায্য লাভ করছে। ছাত্রেরা প্রশ্ন তুলেছে শিক্ষা এবং মানবসমাজের উন্নতিমূলক গবেষণার পরিবর্তে মারণাস্ত্রের গবেষণা করা শিক্ষায়তনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত কিনা। তাদের মতে *জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য গবেষণা বা তথ্য সংগ্রহ করা এক কথা ; কিন্তু মারণাস্ত্রের গবেষণার বা অন্য দেশের স্বার্থ-বিরোধী গবেষণা বা* তথ্যাহরণের উদ্দেশ্যে অন্য. ছাত্রেরা এর বিরুদ্ধবাদী। গণতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার অধিকার তাদের আছে এবং এজন্যে তারা যা কিছু অন্যায় অবিচার ভেবেছে তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে প্রগতি-বাদী স্টুডেন্টস ফর ডেমোক্র্যাটিক সোসাইটি (এস ডি এস)। এদেশে এদের চরম মতবাদী আখ্যা দেওয়া হয়। এদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। অন্যদিকে কিছু ছাত্র-ছাত্রী প্রতিক্রিয়াশীল বা প্রাচীন-পন্থী। মধ্যপন্থী, ছাত্র-ছাত্রীরা সংখ্যাগুরু। দেখা গেছে নেতৃত্ব না করলেও ছাত্র আন্দোলনে এরা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এরা কিন্তু চরমপন্থী এস ডি এস-এর সব কর্মপন্থা স্বীকার করে না, কিন্তু তাদের দাবী-দাওয়ার ন্যায্যতা স্বীকার ও সমর্থন করে। সব রকমের হিংসাত্মক ক্রিয়া-কলাপের এরা বিরুদ্ধে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসকবর্গ আন্দোলনকে বিনষ্ট করার জন্য যখন পুলিশের আশ্রয় নেয়, তখন সব ছাত্রেরা সঙ্ঘবদ্ধ না হয়ে পারে না। ফলে এস-ডি-এস-এর সঙ্গে এরা মিলিত হয়। দেখা গেছে পুলিশের আগমন সব সময়ই নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপের সূত্রপাত করে। ছাত্ররা সাধারণত নিরস্ত্র এবং অহিংস আন্দোলনে নিযুক্ত। তাদের মারধোর, গ্রেপ্তার আন্দোলনকে দমন তো করেই না বরং পুষ্ট করে। মধ্যপন্থী ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণের প্রায় কেউই নিরস্ত্র ছাত্রদের উপর পুলিশের হামলা বরদাস্ত করে না : ফলে ছাত্র আন্দোলন সমর্থন লাভ করে।

নিগ্রো যুব-সংগঠনগুলি কখনও স্বাধীন ভাবে এবং কখনও এস ডি এস-এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এবছরের শুরুতেও ছাত্র আন্দোলন কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির সমস্যা ভেবে চুপ করে ছিল। অনুশাসন-হীনতা এ সমস্ত কলেজেই সম্ভব—এমন মন্তব্যও শোনা গেছে। কিন্তু এবছর একে একে সব কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন শুরু হল এবং ভাল ভাল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা তার কর্ণধার হ'ল। তখনও আন্দো-লনের গভীরতা এরা উপলব্ধি করেনি। কোন কথা শুনবো না, পুলিশের সাহায্যে আন্দোলন বন্ধ করব, ক্লাস বন্ধ করে দেব—ইত্যাদি হুমকিতে কিছু হল না। ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে একের পর এক সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে তুলল। নিউইয়র্কের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় এই আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছে। কিছু জিনিসপত্র, ফাইল, লাইব্রেরীর কিছু অংশ ধ্বংস হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ক্লাস বন্ধ রাখতে হয়েছে, হারভার্ড, কর্নেল, প্রিন্সটন, ওয়েস্টার্ণ রিজার্ভ, উইসকনসিন রাটগার্স স্ট্যানফোর্ড ইত্যাদি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটাই বাদ যায়নি।

ছাত্র আন্দোলনে বরাবর অনেক শিক্ষা-বিদ, শিক্ষক এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সমর্থন করেছেন। কারণ, ছাত্রদের অধিকাংশ দাবী-দাওয়া যুক্তিসম্মত বলে তাঁরা মনে করেছেন এবং তাতে সক্রিয় অংশও গ্রহণ করেছেন। শিক্ষায়তনের নানা সংস্কার আনার এঁরা পক্ষপাতী।

পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশান এবং রেডিও ছাত্র আন্দোলনের বিস্তারিত খবর প্রকাশ করে। ফলে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন কোন মিটিং-এ মন্তব্য করেছেন—যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধি-কর্তারা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ান, ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনুশাসনহীনতা দমন করুন। কিন্তু সম্প্রতি কোন কোন কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের সশস্ত্র অবস্থায় বাড়ী দখল, বোমা ফাটানো ইত্যাদির ফলে এটর্নী জেনারেল মিচেল কড়া বন্দোবস্তের জন্য আদেশ জারী করেছেন। ছাত্র আন্দোলনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য নিউইয়র্ক আইন পাশ করছে। অনেকে নানা ধরণের প্রশ্ন তুলছে, পুলিশকে শিক্ষায়-তনের আওতার আসতে দেওয়া আদৌ উচিত কিনা, নিরস্ত্র ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পুলিশের হামলা করা উচিত কিনা ইত্যাদি। কারও কারও মতে ছাত্রেরা আদর্শবাদী, তাদের দাবী-দাওয়া শোনা উচিত। তাঁদের মতে বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়গুলি ছাত্রদের সমাজে সুস্থ এবং মানসিক বোধ ও অধিকার নিয়ে বাঁচবার যোগ্য করছেন, সুতরাং সেগুলো পালটানো দরকার। সামরিক সংস্থা বা গুপ্তচর সংস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রিক্রুট করার ব্যবস্থা ছাত্রেরা সমর্থন করে না। এ ব্যবস্থা বন্ধ করার পক্ষপাতী অনেকে। ছাত্রেরা ভিয়েৎ-নাম যুদ্ধ বন্ধ করার দাবী করছে সম্পূর্ণ ভাবে। গত কয়েক বছরে ভিয়েৎনামে ৩৫ হাজারেরও বেশী আমেরিকান সৈন্য নিহত এবং ২ লাখেরও বেশী আমেরিকান সৈন্য আহত হয়েছে। এদের অধিকাংশ অল্প-বয়স্ক আমেরিকান যুবক। ফলে সকলের মধ্যে একটা নিদারুণ অনিশ্চয়তার ভাব দেখা গেছে। অন্য একদল বলেন ছাত্রদের শিক্ষাতেই নিযুক্ত থাকা দরকার, আন্দোলনে নয়, কারণ তারা এখনও ছেলেমানুষ—'কিডস্'। কারও মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে তার ইচ্ছামত গবেষণার কাজে নিযুক্ত থাকা। এতে বাধা দেবার কোন অধিকার ছাত্রদের নেই। তারা শিখতে আসে শেখাতে নয়। অতএব এদের অনুশাসনহীনতা ক্ষমার্হ নয়।

একটা কথা এখানে বলা সমীচীন মনে করি। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশ কৈশোরোত্তীর্ণ। অনেকেই বিবাহিত, সংসারধর্ম পালন করছে, অনেকে বেশ কিছুদিন অর্থোপার্জন করার পর প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে উচ্চশিক্ষা নিতে আসে। এদের ছেলেমানুষ বা কিডস্ বলার সমীচীনতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যায়। আসলে এরা পূর্ণবয়স্ক এবং সমাজের পরিবর্তনআকাঙ্ক্ষী। এরা প্রশ্ন তুলছে বর্তমান শিক্ষার উদ্দেশ্য, যৌক্তিকতা ইত্যাদি সম্বন্ধে। প্রশ্নগুলি উড়িয়ে দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এবিষয়ে সম্প্রতি চিন্তাবিদরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

ফলে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে সেখানেই যে নানা বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে তা নয়। অন্যান্য শিক্ষায়তনেও নানা সংস্কার প্রবর্তন হচ্ছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হচ্ছে, যেমন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রায় সর্বত্র আফ্রো-আমেরিকান ইতিহাস বা ব্ল্যাক স্টাডির প্রবর্তন হচ্ছে। সংখ্যালঘু ছাত্রদের অধিকসংখ্যায় ভর্তি করা হচ্ছে, নিগ্রো এবং পোর্টোরিকান শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্রেড' ব্যবস্থা রদ করা হয়েছে। এখন শিক্ষার প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতা মুখ্য গণতান্ত্রিক পন্থায় শিক্ষাকেও জীবনে অধিকতর মহত্বপূর্ণ করার প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে।

সর্বশেষে মার্কিন রাষ্ট্রের শিক্ষাদপ্তর স্থির করেছে যে ছাত্রদের মতামতকে শিক্ষা নীতি নির্ধারণে বিশেষভাবে গ্রাহ্য করা হবে। এবিষয়ে বাদ-বিবাদ শুরু হয়ে গেছে। আগামী শিক্ষানীতি স্থির হবে ছাত্রদের ন্যায্য দাবী-দাওয়াকে স্বীকৃতি দিয়ে। সারা দেশ উন্মুখ হয়ে প্রতীক্ষা করছে পরবর্তী অধ্যায় দেখবার জন্য।

আগের ঘটনা

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী এবার। আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ওঁরা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের খবর, চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিনিসপত্রের দামও আকাশছোঁয়া।

এমন সময় এল সেই মারাত্মক সংবাদ জাপানীরা বোমা ফেলেছে বর্মায়। সেখান থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে ভারতে। রাজদিয়াতেও জান্ নিয়ে ফিরে এসেছে একটি পরিবার। পরদিন। সকলেই ছুটল ত্রৈলোক্য সেনের কাছে। শুনল রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে আসার মর্মান্তিক কাহিনী। সময় এগোল যথানিয়মেই। দেখতে দেখতে যুদ্ধের হাওয়া এসে লাগল রাজদিয়াতে। সৈন্য আসতে শুরু করেছে। কলকাতা থেকেও লোক পালাচ্ছে। বিনুর নতুন বন্ধু অশোক। মিলিটারি ব্যারাকে গেল তারা একদিন অশোক বিনুকে দেখাল জীবনের পথ কত বিচিত্র। আর কলকাতা থেকে ফিরে এসে ঝুমা সেই বিচিত্র পথকে করল প্রশস্ত। তরুণ বিনুকে পৌঁছে দিল যৌবনের দ্বারে।

।। বাহান্ন ।।

শুধু নদীর চরগুলো থেকেই না, চারদিকের গ্রাম-গঞ্জ থেকেও খাদ্যের সন্ধানে কত মানুষ যে রাজদিয়ায় ছুটে এল। এমন কি আজুমান বেবাজিয়ানীরা পর্যন্ত এসেছে। থানা থেকে তাদের নৌকোও 'সীজ' করে নিয়েছে। যুদ্ধ ভাসমান বেদেবহরকেও রেহাই দ্যায় নি।

আজকাল সমস্ত রাজদিয়া জুড়ে দিন-রাত শুধু শোনা যায়, 'মা জননী, দুগা ভাত দ্যান, এট্টু ফ্যান দ্যান—'

'না খাইয়া খাইয়া শরীলে আর দ্যায় না।'

রাস্তায় বেরুলেই চোখে পড়ে কঙ্কাল-সার প্রেতের মতন দলে দলে মানুষ দুর্বল অশক্ত পায়ে টলমল করে হাঁটছে, এক দুয়ার থেকে তাড়া খেয়ে যাচ্ছে আরেক দুয়ারে।

অবশ্য রাজদিয়াবাসীরা একেবারে নির্দয় না. সব বাড়ি থেকে চাল-ডাল যোগাড় করে শহরের দু মাথায় দুটো লঙ্গরখানা খুলে ফেলল। সারাদিন পর বেলা হেলে গেলে মাথাপিছু দু হাতা করে তরল ট্যালটেলে খিচুড়ি দেওয়া হতে লাগল।

কিন্তু দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের দুটো মোটে লঙ্গরখানা খাড়া করে কতক্ষণই বা যুদ্ধ চালানো যায়! ক'টা লোককেই বা খাওয়ানো চলে!

কাজেই চারদিকে চুরির হিড়িক পড়ে গেল।

বাজার থেকে ধান-চাল উধাও হবার পর থেকেই চুরি শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন যা চলছে তার সঙ্গে কোনকিছুর তুলনাই হয় না।

থালা-ঘটি-বাটি-গাড়ু-বদনা, কাঁসা বা পেতলের একটুকরো বাসনও বাইরে ফেলে রাখবার উপায় নেই। রান্নাকরা ভাত-তরকারি পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। তবে সব-চাইতে বেশি যা চুরি হচ্ছে তা ধান।

কার্তিকের মাঝামাঝি মাঠের জল নেমে গিয়েছিল। রাজদিয়ার দক্ষিণে এসে দাঁড়ালে, যতদূর চোখ যায়, এখন শুধু ধান-ধান আর ধান।

সবে অঘ্রাণ পড়েছে। এই মাসের শেষ থেকে আমনের মরশুম। ধানের শিষগুলো এখনও কাঁচা রয়েছে তাতে সোনালী আভা লাগেনি। সবুজ তুঁষের ভেতরকার শস্য এখনও যথেষ্ট পুষ্ট নয়। তা হলে কি হবে, রাতের অন্ধকারে মাঠকে মাঠ কাঁচা ধানই কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

ধানই যদি চলে যায়, সারা বছর লোকে খাবে কী? চুরি ঠেকাবার জন্য রাজদিয়ার সব বাড়ি থেকে ছেলে নিয়ে নিয়ে ডিফেন্স পার্টি তৈরি হল।

ডিফেন্স পার্টির দুটো কাজ। প্রথমত, রাত জেগে জেগে জমির ধান পাহারা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, নদীর ধারে ধারে ঘুরে মহাজনী নৌকোগুলোর ওপর নজর রাখা।

এ অঞ্চলের প্রায় সব নৌকোই যুদ্ধের কল্যাণে 'শীল' করা হয়েছে। তবে 'স্পেশ্যাল পারমিট' নিয়ে কেউ কেউ দু-একখানা রাখতে পেরেছে. যেমন ব্যবসাদারেরা।

যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ শুরু হবার পর ধান-চাল জামা-কাপড়ের কারবারীরা বুঝি আর মানুষ নেই। দুঃশাসনের মতন সারা দেশকে বিবস্ত্র এবং নিরন্ন করে তারা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

রাতের অন্ধকারে বেশি লাভের আশায় ব্যবসায়ীরা নৌকো বোঝাই করে রাজদিয়ার ধান-চাল এবং অন্য সব শস্য দূর-দূরান্তে পাচার করে দিতে চাইছে। ডিফেন্স পার্টি তা হতে দেবে না। ঘুরে ঘুরে তারা মহাজনী নৌকো ধরছে।

সব বাড়ি থেকেই দুটি একটি করে যুবক নেওয়া হয়েছে ডিফেন্স পার্টিতে। ঠিক ঐ বয়েসের ছেলে হেমনাথদের বাড়িতে নেই। কাজেই বিনুকেই দলে নিতে হল।

যুদ্ধের দৌলতে রাজদিয়ায় তো কম ছেলে নেই। সবাইকে একসঙ্গে রাত জাগতে হয় না। ছোট ছোট গ্রুপে ভাল করে পালা করে তারা জাগে। আজ এর পালা পড়লে, কাল ওর। সপ্তাহে দুদিন জাগতে হয় বিনুকে।

ছেলেরা রাত জাগবে। তাই বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে পাঁচ ব্যাটারীর বড় বড় অনেক-গুলো টর্চ কেনা হয়েছে, চা আর মুড়মুড়ে 'এস' বিস্কুটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথম দিন রাত জাগতে এসে বিনু দেখল, তার দলে শ্যামল আর অশোকও রয়েছে।

মজিদ মিঞার হাতে মার খাবার পর অশোক-শ্যামলের সঙ্গে আর মিশত না বিনু। অশোকরাও খুব সম্ভব আর মার খায় নি। মজিদ মিঞা ওদের বাড়ি গিয়েও সিগারেট খাবার কথা বলে এসেছিল। মায়েটার

খাবার পর দু পক্ষই পরস্পরকে এড়িয়ে যাচ্ছিল।

যাই হোক ডিফেন্স পার্টিতে তার দলে অশোকরা না থাকলেই ভাল হত। বিনুর খুবই অস্বস্তি হতে লাগল।

বিনুদের দলে সবসুদ্ধ বারোটি ছেলে। তাদের কাজ হল, নদীর পারে ঘুরে ঘুরে ধান-চাল বোঝাই মহাজনী নৌকো খোঁজা। টর্চ নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ল।

প্রথম দিকে বিনু অশোকদের সঙ্গে কথা বলছিল না। অশোকরাও মুখ বুজেই ছিল। আড়চোখে তিনজন তিনজনকে দেখে যাচ্ছিল শুধু।

নদীর পাড়ে এসে অশোক আর পারল না। বিনুর কাছে নিবিড় হয়ে এসে বলল, সেই লোকটা সেদিন তোমাকে কান ধরে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল?

বিনু বুঝল, মজিদ মিঞার কথা বলছে অশোক। বিব্রতভাবে বলল, 'হ্যাঁ।'

'লোকটা এক নম্বরের ডাকাত।'

বিনু উত্তর দিল না।

অশোক আবার বলল, 'বাড়ি নিয়ে গিয়ে তোমাকে মেরেছিল?'

মুখ নীচু করে বিনু মাথা নাড়ল।

অশোক আবার বলল, 'খুব?'

'হ্যাঁ। মারের চোটে জ্বর এসে গিয়েছিল।'

'গভীর সহানুভূতির গলায় অশোক বলল, 'ইস, এমন করে কেউ মারে!' খানিক নীরব থেকে আবার বলল, 'আমাকেও বাবা খুব মার দিয়েছিল।'

'তাই নাকি?'

'মারতে মারতে বাড়ির বার করে দিয়েছিল। ঠাকুমা গিয়ে আমাকে ফিরিয়ে এনেছে।'

এতক্ষণ শ্যামল চুপ করে ছিল। এবার মুখ খুলল, 'তোমাদের শুধু মেরেছিলই আমার অবস্থা কী হয়েছিল জানো?'

ধীরে ধীরে বিব্রত ভাবটা কেটে যাচ্ছিল বিনুর। উৎসুক সুরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল?'

শ্যামল বলতে লাগল, 'মার তো খেয়েছিলামই তার ওপর দু'দিন কিছু খেতে দেয় নি।'

'আহা রে—'

দেখা গেল তিনজনেই তিনজনের দুঃখে দুঃখী, সমব্যথী। একটি রাত একসঙ্গে জাগবার আগেই তাদের বন্ধুত্ব আবার আগের মতন গাঢ় হয়ে গেল।

ওধারে নারায়ণের গীর্জা আর এধারে সারি সারি মিষ্টির দোকানগুলোর সামনে ঘন হিজলবন—নদীর দীর্ঘ পাড় ধরে ডিফেন্স পার্টির ছেলেরা কতবার যে টহল দ্যায়! নদীর জলে সন্দেহজনক কিছু নড়তে দেখলেই তারা থমকে দাঁড়ায়, একসঙ্গে পাঁচটা টর্চ জ্বলে ওঠে।

সময়টা অঘ্রাণের মাঝামাঝি। কিন্তু এরই ভেতর জল-বাংলার এই ছোট্ট নগণ্য শহরটিতে শীত নেমে গেছে।

নদীর দিক থেকে উল্টো-পাল্টা জোলো হাওয়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় তা বরফের মতন ঠান্ডা। গুঁড়ো গুঁড়ো হিমে নদী, আকাশ, দূরের ঝাউবন, সারি সারি হিজলগাছ কিংবা রাজদিয়া শহরের বাড়ি-ঘর, মিলিটারি ব্যারাক—সব কেমন যেন ঝাপসা মতন।

সারা গা আলোয়ানে মুড়ে, কানে-মাথায় কম্ফোর্টার জড়িয়েও শীতে কাটে না।

একদিন ডিফেন্স পার্টির সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে মানিক বলল, 'আজ বড্ড ঠান্ডা, না?' মানিক, নাহা বাড়ির ছেলে, মাসখানেক হল কলকাতা থেকে এসে এখানকার কলেজে বি-এতে ভর্তি হয়েছে। বিনুদের গ্রুপটার সে নেতা।

অন্য ছেলেরা হি-হি কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'হ্যাঁ মানিকদা—'

'একটা জিনিস খেলে শীতটা কিন্তু কেটে যেত।'

'কী?'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে দেখাল মানিক।

আবার সিগারেট! বিনু চমকে উঠল। লক্ষ্য করল, অশোক শ্যামলও খুব একটা আরাম বোধ করছে না।

বিনু বলল, 'আমি তো সিগারেট খাই না।' মজিদ মিঞার মারের কথা ভেবে আর সুখ নেই তার। অশোক শ্যামলও তাই বলল।

মানিক বলল, 'যা শীত! এক-আধটা খেলে গা গরম হয়ে যাবে। হি-হি করে কাঁপছ, কাঁপুনি বন্ধ হবে।' নাও-নাও, সবাই একটা করে নিয়ে নাও।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'কেউ যদি দেখে ফেলে—'

'এই শীতের রাত্তিরে তোমাদের সিগারেট খাওয়া দেখবার জন্যে লোকের বাইরে বেরুতে বয়ে গেছে। সবাই লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে, দ্যাখো গে—সিগারেট টেনে ভাল করে পেয়ারাপাতা চিবিয়ে বাড়ি যাবে, কেউ টেরও পাবে না।'

'কিন্তু?'

'আবার কী?'

'আপনি রয়েছেন।'

'আমার কাছে লজ্জা কি। আমরা সবাই বন্ধু—ফ্রেন্ডস—'

কোন অজুহাতই খাটল না, একটা করে সিগারেট নিতেই হল সবাইকে।

আবার সিগারেট খাওয়া শুরু হয়েছে। ডিফেন্স পার্টিতে রাত জাগতে এসে শুধু কি সিগারেট, আরো চমকপ্রদ সব ব্যাপার ঘটতে লাগল।

একদিন রাত্রিবেলা বিনু আর শ্যামলকে সবার কাছ থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে অশোক বলল, 'আজ আর আমরা ওদের সঙ্গে সঙ্গে নদীর পাড়ে ঘুরব না।'

বিনু শুধলো, 'তা হলে কী করবে?'

'এক জায়গায় যাব।'

'কোথায়?'

চোখ টিপে রহস্যময় হেসে অশোক বলল, 'চল না, গেলেই বুঝতে পারবে। দারুণ মজা হবে।'

অশোক শ্যামল আর বিনুকে নিয়ে মল্লিকদের কুপাসি বাগান পেরিয়ে একটা ঘরের বন্ধ জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

বিনু বলল, 'এখানে কী?'

চাপা গলায় অশোক বলল, 'একদম চুপ। কথা না বলে জানলায় কান দিয়ে দাঁড়াও।'

দিন কয়েক আগে মল্লিকদের ছোট ছেলে সুখরঞ্জনের বিয়ে হয়েছে। এটা তাদেরই ঘর। বিনু তা জানে, খুব নীচু গলায় সেকথা অশোককে বললও।

বিরক্ত সুরে অশোক বলল, 'ছেলেটা তো খালি বক-বক করে! মুখ বুজে জানলায় একটু কান পাতো না ভাই—'

জানলায় কান রাখতেই সমস্ত শরীর ঝিম-ঝিম করতে লাগল। সুখরঞ্জন যা-যা বলে তার বউকে আদর করছে, এমন সব সোহাগের ভাষা আগে আর কখনও শোনেনি বিনু।

অনেকক্ষণ পর সুখরঞ্জনের গলা ধরে জড়িয়ে এল। তখন অশোক বলল, 'চল—'

বাগানের বাইরে বড় রাস্তায় এসে অশোক আবার বলল, 'কিরকম লাগল?'

শ্যামল শিষ টানার মতন শব্দ করে বলল, 'সত্যি মজাদার।'

'কী বলেছিলাম—'

বিনু বলল, 'এখানকার খবর তুমি কি করে জানলে ভাই?'

মুরুব্বিআনা চালে হেসে অশোক বলল, 'অনেক কষ্ট করতে হয়েছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আরো অনেক জায়গার খবর আমি জানি।'

'একদিনে সব শুনে ফেললে তারপর কী করবে?' একটু ধৈর্য ধর।'

এরপর থেকে ডিফেন্স পার্টির সঙ্গে রাত জাগতে এসে তিনজনে এক ফাঁকে সরে পড়ত। যুবতী স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে যুবকেরা যেখানে শুয়ে থাকে, বিনুরা গিয়ে তাদের ঘরের জানলায় কান পাতে।

তা ছাড়া রাজদিয়ার রাস্তায় আরো কত দৃশ্য চোখে পড়ে। হুস-হুস করে যে জীপগুলো ছুটে যায় তার ভেতর দেখা যায়, আমেরিকান টমির গলা জড়িয়ে নারীদেহ ঝুলেছে। ঝাউবনের মধ্যে নিগ্রো সৈন্যগুলো কোত্থেকে মেয়েমানুষ জুটিয়ে এনে এই শীতের রাতে নরকের খেলা শুরু করে দ্যায়।

একদিন এক বাড়িতে কান পাততে গিয়ে বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল।

বিনুরা দেখল, শীতের রাত্তিতে এরা জানলা খুলে শুয়েছে।

খুব চাপা গলায় অশোক বলল, 'ভালই হয়েছে। এতদিন খালি শুনেছ, এবার ভেতরকার মজা দেখতে পাবে।'

পা টিপে-টিপে তিনজনে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অন্য সব বাড়ির জানলায় কান রেখে বিনুরা যা শুনেছে, এখানেও প্রায় তাই শুনতে পেল। গাঢ় গলায় পুরুষটি তার সঙ্গিনীকে আদরের কথা বলছে। মাঝে মাঝে চুমু খাবার শব্দ।

উত্তেজনায় তিনজন জানালায় মুখ বাড়াতে লাগল। কিন্তু ঘরের ভেতর আলো নেই, তা ছাড়া ওরা মশারি টাঙিয়ে শুয়েছে। চোখে শান দিয়েও কিছুই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাইরে হিমের ভেতর অস্থির হয়ে উঠল বিনুরা। হঠাৎ শ্যামল এক কাণ্ড করে বসল, বোতাম টিপে হাতের টর্চটা জেলে ফেলল। মশারির গায়ে আলো পড়তেই দুটি ঘনবদ্ধ যুবক-যুবতী ছিটকে দুধারে সরে গেল। তারপরেই যুবকটি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে-কে রে, চোর—'

মেয়েটিও চেঁচাতে লাগল, 'চোর-চো—'

ততক্ষণ আলো নিভিয়ে ফেলেছে শ্যামল। একমুহূর্ত বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর সারা বাড়ির দরজা-জানলা খোলার আওয়াজ কানে আসতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে লাগল এবং চোখের পলকে এর ঢেঁকিঘরের পাশ দিয়ে, ওর বাগানের ভেতর দিয়ে, তার উঠোন ডিঙিয়ে নদীর পারে এসে পড়ল।

নদীর পারে স্টিমারঘাটার কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে অশোক শ্যামলকে বলতে লাগল, 'তুমি কি ছেলে বল তো। ফস করে টর্চ জেলে দিলে!'

কাজটা যে ভাল হয় নি, শ্যামল আগেই বুঝতে পেরেছিল। সে চুপ করে থাকল।

অশোক আবার বলল, 'টর্চটা জেলেছিলে, একটু পরেই যদি জ্বালতে—'

শ্যামল বলল, 'পরে জ্বাললে কী হত?'

চোখের তারা নাচিয়ে নাচিয়ে অশোক বলল, 'আরো মজা দেখতে পেতে।'

একধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল বিনু। ভয়ে উত্তেজনায় তার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছিল। আর সেই কাঁপুনির মধ্যে, কেন কে জানে, হঠাৎ ঝুমার কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছিল তার।

●

রাজদিয়ায় আসবার পর কিছুদিন বেশ ভালই ছিলেন সুরমা। কাগজের মতন সাদা ফ্যাকাসে শরীরে লালচে আভা দেখা দিয়েছিল। নিষ্প্রভ চোখে আলোর খেলা শুরু হয়েছিল, রুগ্ন মুখে লাবণ্য ফুটি-ফুটি করছিল। চোখের কোণে, শীর্ণ আঙুলের মাথায় রক্তের সঞ্চার চোখে পড়ছিল।

কিন্তু ক'দিন আর। তারপরেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন সুরমা। টিপটিপে বৃষ্টির মতন একটানা অসুখ চলছিলই তার মধ্যেই ভাত খেতেন, স্নান করতেন, হেঁটে চলে বেড়াতেন।

কিন্তু এ বছর শীত পড়তেই একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন সুরমা। লারমোর রোজ সকালবেলা একবার করে তাঁকে দেখে যান। সুরমার অসুখটা হার্টের, হৃৎপিণ্ডটি খুবই দুর্বল। তার ওপর নানারকম স্নায়বিক উপসর্গ রয়েছে।

এবার শুয়ে পড়বার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে গেছেন সুরমা। যতদিন যাচ্ছে, মৃত্যুভয় চারদিক থেকে তাঁকে যেন ঘিরে ধরতে শুরু করেছে। প্রায় সারাদিনই ক্ষীণ সুরে তিনি বলে যান, 'ওগো, সুধা-সুনীতির বিয়ের ব্যবস্থা কর।'

অবনীমোহন বলেন, 'হবে হবে, আগে তুমি সেরে ওঠ।'

'এবার আমি আর উঠব না। মন বলছে, এই শোওয়াই আমার শেষ শোওয়া।'

'কি আজে-বাজে বলছ! ঠিক সেরে উঠবে তুমি, আবার আগের মতন সুস্থ হবে।'

বিচিত্র হাসেন সুরমা, 'যতই ভোলাতে চাও না, এবার আর আমার রেহাই নেই। বেঁচে থাকতে থাকতে সুধা-সুনীতির বিয়ে দাও। দেখে শান্তিতে চোখ বুজি।'

সুরমা কোন কথাই যখন শুনবেন না তখন কি আর করা। সুধার জন্য হিরণকে এক রকম ঠিক করাই আছে। সুনীতির সঙ্গে আনন্দর বিয়ের ব্যাপারে অবনীমোহন আর হেমনাথ রামকেশবের বাড়ি ছুটলেন। তারপর রামকেশব এবং স্মৃতিরেখার সঙ্গে পরামর্শ করে মধুপুরে আনন্দর বাবাকে চিঠি লেখা হল। ইভাকুয়েশনের সময় থেকে ও'রা ওখানে গিয়ে আছেন। স্মৃতিরেখা এবং রামকেশবও আনন্দর বাবাকে চিঠি লিখলেন।

দিনকয়েকের ভেতর উত্তর এসে গেল। ছেলে আনন্দ বড় হয়েছে, তাকে সংসারী করবার জন্য আনন্দর বাবা পাত্রীর খোঁজ করছিলেন সুনীতিকে যদি ছেলের পছন্দ হয়ে থাকে, এ বিয়েতে তাঁর আপত্তি নেই। শিগগিরই তিনি রাজদিয়া আসছেন। সাক্ষাতে অন্য কথা হবে।

দিন পনেরোর ভেতর মধুপুর থেকে আনন্দর বাবা এসে পড়লেন। হেমনাথ এবং অবনীমোহনের সঙ্গে কথা বলে, সুনীতিকে দেখে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। এক কথায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। স্থির যে, মাঘ মাসে ধানকাটার পর বিয়েটা হবে।

বিয়ের ক'দিন আগে এক দুপুরবেলায় মাঠের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে কুমোরপাড়ার হাচাই পাল এসে হাজির। ভয়ে চোখের তারা ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার।

স্নেহলতা উঠোনের একধারে তুলসীমঞ্চের পরিচর্যা করছিলেন। সুধা-সুনীতি, বিনু-ঝিনুক, বাড়ির সবাই দাঁড়িয়ে ছিল।

হাচাই পালের ঐ রকম সন্ত্রস্ত উদভ্রান্ত চেহারা দেখে স্নেহলতা চমকে উঠলেন, 'কি হয়েছে রে হাচাই—'

হাঁপাতে হাঁপাতে হাচাই পাল বলল, 'সুন্দি কাউঠার খোজে মাঠে গেছিলাম। গিয়া দেখি বাঘ। 'দেইখাই দৌড় (দৌড়) দিলাম—'

'বাঘ!'

'হ বৌ-ঠাইরেন—'

এই বাঘ নিয়ে দিন সাতেকের মধ্যে এক মজার ব্যাপার ঘটে গেল।

(ক্রমশঃ)

প্রদর্শনী গৃহে শ্রীমতী অসীমা মুখোপাধ্যায়

বাগবাজার মাল্টি পার্পাস স্কুলে ২৩ আগস্ট একটি সুন্দর কারুশিল্পের প্রদর্শনী হয়ে গেল। মেয়েদের জীবিকা হিসেবে পুতুল তৈরী কতটা লাভজনক বৃত্তি হতে পারে তার নিদর্শন তুলে ধরাই এই প্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য।

শ্রীমতী অসীমা মুখার্জি কোথাও কোন প্রথাগত শিল্পশিক্ষা করেন নি। তবে অনেকদিন থেকেই পুতুল তৈরী শখ হিসেবে স্বগৃহে বসে চর্চা করতেন। নিজের চেষ্টায় তাঁর কাজের এতটা উন্নতি হয়েছে যে, বর্তমানে বিদেশেও তিনি পুতুল রপ্তানির অর্ডার লাভ করেছেন। বার্লিন ও মস্কোতে তাঁর পুতুলের বেশ কিছু চাহিদা হয়েছে। প্রদর্শনীতে রঙীন কাপড় ও তুলোর তৈরী খান কুড়ি পুতুলের নমুনা তিনি উপস্থিত করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রমণীমূর্তি এই প্রদর্শনীর একটা বৃহৎ অংশ অধিকার করেছে। দার্জিলিং, কাশ্মীর, সাঁওতাল পরগণা, বাংলা দেশ ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্যের রমণীমূর্তির মধ্যে পূজার ডালি হাতে বাঙালী মেয়েটি নাকি বিদেশে সবচেয়ে প্রশংসা লাভ করেছে। পুতুলগুলি মাপে ছোট কিন্তু অনেকখানি যত্ন নিয়ে করা এবং গঠন ও সজ্জার কোন খুঁটিনাটিই শিল্পী উপেক্ষা করেন নি। এছাড়া দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি যুগল মূর্তিগুলিও মন্দ হয়নি।

পাপুর ছবি

'পাপুর বই'য়ের শিশু-লেখক এবং শিল্পী পাপু আজ বাংলাদেশের পাঠক সাধারণের কাছে সুপরিচিত। ভাল নাম ছিল তার পুরঞ্জয় সরকার। মাত্র সাড়ে আট বছর বেঁচেছিল সে এই পৃথিবীতে। তার আঁকা প্রায় পাঁচশ ছবি থেকে ৮০ খানা নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন [illegible] গ্যালারিতে। প্রদর্শনী শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর, চলবে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

●

২২ আগস্ট থেকে ৫ সেপ্টেম্বর অবধি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে মধ্য গ্রীষ্ম-কালীন শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হল। এটি অ্যাকাডেমির পঞ্চম বার্ষিক অনুষ্ঠান। চুয়াত্তরজন শিল্পী একশ বারোটি চিত্র, ভাস্কর্য ও গ্রাফিকস নিয়ে এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। যদিও প্রদর্শনীর নাম পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের গ্রীষ্মের মধ্য-কালীন প্রদর্শনী তবু বলা বাহুল্য, কলকাতার অনেক খ্যাতনামা তরুণ ও প্রবীণ শিল্পীর কাজ এখানে অনুপস্থিত। যাই হোক উপস্থিত শিল্পীদের কাজের মধ্যে এবারে যে সব রীতির চর্চা দেখা গেল তার মধ্যে ফিগারেটিভ ও আধা ফিগারেটিভ রীতি প্রদর্শনীর অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে। দুঃখের বিষয় নন-ফিগারেটিভ রীতির নমুনা প্রচুর থাকলেও খুব একটা উল্লেখযোগ্য শিল্প-প্রচেষ্টা এবারে বিশেষ অনুভূত হল না। এক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্র একটা পুনরাবৃত্তির ঝোঁকই যেন কিছুটা প্রবল। এরই মধ্যে ত্রিলোক কাউল ও সুনীল পালের দুখানি নীল, লাল, ধূসর প্রভৃতি বর্ণের প্যালেট নাইফের কাজে কতকটা দক্ষতার পরিচয় দেয়। ধীরাজ চৌধুরীর 'নেচার অ্যাজ আই ফেল্ট ইন গ্রীন' ও 'নেচার অ্যাজ আই ফেল্ট ইন রেড' একটি গাছের ফর্মের বিভিন্ন রঙের হেরফের। কাজ হিসেবে দক্ষ তবে কিছুটা এক্সারসাইজ-এর ভাবই প্রধান লাগলো। এই ধরনের আধা ফিগারেটিভ কাজের মধ্যে অমরেন্দ্রলাল চৌধুরীর 'কার্ণিভাল' এবং 'ইডেনস ইভ অ্যান্ড আই' দুটিকেও ফেলা যায়। অরুণ পাল, শচীব্রত দেব, অমিত রায়, ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা সদ্য প্রদর্শিত ছবিগুলির পুনঃ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং এঁদের চিত্রের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পরিণত শিল্পীদের মধ্যে বিনোদ কর্মকারের 'অমন্দন' [illegible]

সামান্য একটু হেরফেরে নদী-মাতৃক বাংলার একান্ত চির পরিচিত দৃশ্যটি বেশ একটা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। গোপাল ঘোষের দুখানি ছোট্ট নিসর্গদৃশ্য বড় বেশী পিকচার পোস্টকার্ড ঘেঁষা। বরং মনীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'এ বোট ইন দি ক্যানাল' ও 'প্যাডি ফিল্ডে'র চিত্রধর্মিতা বেশী পরিস্ফুট মনে হল। মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্তিনিকেতনের রীতি অনুযায়ী নিসর্গ দৃশ্যটি আজকাল বেশী দেখা যায় না বলেই বোধহয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমর ভৌমিকের দুটি বড় কম্পোজিশনের মধ্যে ১ নম্বর ছবিটি এবারের প্রদর্শনীর অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ বলে মনে হয়। ছবিতে গগনেন্দ্রনাথের কাছ থেকে শিল্পী হয়ত অনেক ইঙ্গিত নিয়ে থাকবেন। প্রদর্শনীতে আরেক ধরনের ছবি দেখা যাচ্ছে। সেগুলিকে ভদ্র ইংরিজীতে ভেরিয়েশন বলা চলে। যেমন কার্তিক পাইনের 'বার্থডে' যেখানে মানুষ আর গরুতে কতকটা শেয়ালের মত রঙ মেখে মাথা ঠোকাঠুকি করছে এবং শূন্যে দেখা যাচ্ছে শায়িতা দিগম্বরী। মহিম রুদ্রের সূর্যকরোজ্জ্বল বাগানে উপবিষ্টা রমণী কোরোর একটি অনুরূপ চিত্রের বিবসনা ভেরিয়েশন। তাঁর উজ্জ্বল লাল সবুজ নীল রঙের গাছের ওপর শাদা পাখিটাও একেবারে অপরিচিত মনে হলো না। তেমনি কাতায়ুন শকলাতের সুঅঙ্কিত 'ইন দি উম্ব অব মাই ভিলেজ'-এর মধ্যে স্বপ্নদৃষ্ট মুখের ও গাছপালার আমেজে রৌদ্র স্বপ্নময় কয়েকটি চিত্রের ভেরিয়েশন দেখা যায়। 'পার্ট অব মাই হাউস'এর প্যাটার্ন আবার অন্য রকম।

ভাস্কর্যের মধ্যে নতুন কিছুই চোখে পড়ল না। সময়েশ চৌধুরী বা সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাজ দুটি সাধারণ এবং বিপুল সাহার প্রতিকৃতিগুলির আলোচনা গত প্রদর্শনী পরিক্রমায় করা হয়ে গিয়েছে। গ্রাফিকস ও জল রঙের অন্যান্য নিদর্শন যা দেখা গেল তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ [illegible]

—[illegible]

খট-খট-খট, দরজার কড়াটা আজও ঠিক সময়েই বেজে উঠল। কান চেপে শুয়ে রইল চিত্রা। যার জন্য কড়া নড়ছে সে কান খাড়া করেই ছিল, চট করে উঠোনে নেমে দরজাটা খুলে দিল। তারপর ওরা গিয়ে বসল বসার ঘরে। এ ঘর থেকে চিত্রা ওদের নড়াচড়া চলা-ফেরা যেন চোখের সামনে দেখছে। শুধু কথাবার্তা কেন নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও যেন শুনতে পারলে বেঁচে যায়। এইভাবে উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। আর সুবিমল! সে নিশ্চয়ই ভাবছে যে ও ঘুমোচ্ছে। তার এনে দেওয়া সেই পুরিয়া খেয়ে, ও খুব ঘুমোচ্ছে! হজমের গোলমাল থেকেছে বলায় ডাক্তার সেন-এর কাছ থেকে ওষুধ এনেছে বলল। ভাত খাবার পর ওষুধটা খেলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করে আর ভীষণ ঘুম পায় বলাতে বলেছিল, তিনি হয়তো তোমাকে ঘুম পাড়াতেই চান। 'সর্বরোগ হরে নিদ্রা' জানো না!

জানে না আবার! সব জানে চিত্রা। ঘুম যে তাকে কে পাড়াতে চায়, বিশেষ করে এই সময়টায় তাও কি আর বোঝে না চিত্রা! তাই তো অত করে বার বার তার ওষুধ খাওয়ার খোঁজ! না খেয়ে থাকলে নিজেই জল এনে তরিবত করে খাওয়ান। মিষ্টি মিষ্টি কথা, পুরু চশমার আড়ালের ঐ উদাস চাউনি, ঘন পুরু ওল্টান চুল, গজদন্ত বোয়োন শাদা দাঁতের ঝিলিকে মেশা নিটোল চিবুকের ঐ মাধুরীমাখান হাসি আর তার সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া, তাকেও আচ্ছন্ন করেছিল। ওর উচ্চারণের গভীরতায় শেলী, বায়রণ, মিল্টন, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যেন মূর্ত হয়ে উঠতেন। তার সমস্ত সত্তায় যেন ছেয়ে গিয়েছিল সুবিমল। না হলে সে সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, মা বাপের ঘর একেবারে ছেড়ে এসে তাকে বিয়ে করে। তার ব্যারিস্টার বাবার মুখে চুন-কালি দেয়নি সে। শুধু ওর ঐ উদার আবৃত্তি আর চাল-চলনই নয়, ওর ঐ উঁচু লম্বা চেহারা, সরু কোমর, পাতলা ধুতির আড়ালের পেশী-বহুল শক্ত ঊরু, রোমভরা হাতের চওড়া কব্জি আর বুকখোলা পাঞ্জাবীর মধ্যেকার চওড়া বুক একটা নতুন কামনা জাগিয়েছিল তার মনে। অমনি করে সে তো তাকেও পড়াতে যেত আর পড়ার মাঝখানে কোন একটা গভীর তত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে যখন সিগারেট হাতে অমনভাবে জানলার বাইরে তাকাত তখন ওকে কি অদ্ভুত [illegible]

মনে হত। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে তার ঐ দেখা ও দেখে ফেলত, লজ্জায় মরে যেত চিত্রা! আর ঐ নতুন উচ্ছাস বেশ তারিয়ে তারিয়ে চাখত সুবিমল, ওর মুখে তখন একটা প্রশ্রয়ের হাসি ফুটত আর তাতে চিত্রার মধ্যে যেন একটা বন্য আবেদনের সাড়া জাগত। চুম্বকের মত একটা অলক্ষ্য আকর্ষণে সুবিমল পাকে পাকে বাঁধছিল তাকে। তখন যে বাঁধনে সে নিজেই যেচে বাঁধা পড়েছে। সেই বাঁধনের চাপে, আর ঐ দুষিত হাসির সম্মোহনে আজ সে এখন দিশাহারা। আকুল হয়ে ভাবছে চিত্রা, যে কি করবে সে! কেননা এখন ঐ একই খেলায় মেতেছে সুবিমল, ওঘরে!

বিয়ের পর ওর এই স্বভাব বুঝতে চিত্রার বিশেষ দেরী হয়নি! তবে দুর্বলতা ওর একার না, ওর ঐ লেডিলাভ চেহারা মেয়েদেরও পাগল করে, তাতে আবার ওর ব্যক্তিত্ব নেই, স্বাতন্ত্র্যতা বা সম্মানবোধও নেই না হলে ও মেতে যায়?

নীচু থেকে উঁচুতে উঠল সুবিমল। বলতে গেলে তারই চেষ্টায়! তারই কথায় অনুপমবাবু ওকে মর্ণিং সেকসনে মেয়েদের ক্লাশ নিতে অ্যালাউ করলেন। আজ ও এক-জন পদস্থ প্রফেসার! অমনি ধারা করার বয়সও পেরিয়ে গেছে, ভেবেছিল সংসারের চাপে ছেলের মায়ায় ও শুধরে যাবে, কিন্তু আজও তার স্বভাব বদলাল না। বরং আরও সাহস বেড়েছে। বাইরের রঙিন ঘুড়ি এখন ঘরে এসেছে। আবার সে আর কেউ নয় তারই প্রাণের বন্ধু রমলা। তার চেয়ে বয়সে কিছু ছোট! নতুন করে ফের এম-এ দেবার জন্য তৈরী হচ্ছে, সেই একটু সাহায্য করতে বলেছিল সুবিমলকে! তাই আসা-যাওয়া, মেলামেশা। পড়াশুনোর পর সবাই মিলে একটু চা খাওয়া হৈ-চৈ গল্প! রমলা প্রাণবন্ত মেয়ে, খুব জমাতে পারে, তার ওপর খুব সুন্দর গাইতে পারে। সুবিমলও গান পাগল, নিজেও ভালই গায়! চিত্রাও কি আর গান শুনতে ভালবাসে না, না গান বোঝে না। তবে বাড়াবাড়ি দেখলে কার না রাগ হয়। কতদিন সে উঠে গেছে খোকনকে খাওয়াতে বা পড়াতে আর ওরা দুজনে তখন ছাতে বসে গানের নৌকোয় ভেসে চলেছে! গানের মধ্যে দিয়ে দুজনের মনের ভাব আদান-প্রদান হচ্ছে। আগের উন্মনা সুবিমল এখন একেবারে আনমনা! বাজার, রেশন, চাকরের অসুখ, খোকনের জ্বর সবেতেই তার প্রচন্ড বিরক্তি আর রাগ! একমাত্র অনুরাগ রমলা! সে এলে কোনরকমে একটু পড়াশুনোর পর রাগ-রাগিণীর রঙ্গ শুরু হয়ে যায়! সারাদিনে প্রচন্ড বিরক্ত সুবিমল তখন সুন্দর করে হাসে, সাজিয়ে সাজিয়ে কথার জাল বোনে। ডাকতে হয় তাই তাদের আসরে চিত্রাকে ডাকে। একদিন তো রমলা বলেই বসল যে, 'সুবিমলের মত বর পেলে আমি বর্তে যেতাম। তুই বোধহয় আর জন্মে অনেক তপস্যা করেছিলি।' সে দেখত, ওর চোখে সেই একই মায়াকাজল যা এক-দিন তার কৌটোয় ছিল! বারে বারে রমলাও তখন ভাবত, বলত, কি যে তুই সংসারী হয়েছিস। খালি রাঁধতে শিখছিস, ঘর গুছোচ্ছিস আর ছেলে মানুষ করছিস! এই মানুষটার দিকেও তো একটু তাকা।

সেও ঠাট্টা করে বলত, তুই-ই তো আছিস তার জন্য! সেটি যে কতবড় সত্যি হয়ে উঠেছে সেটা তার বুঝতে দেরী হয়নি। ওদের কান্ড-কারখানা দেখতে দেখতে সে সমানে নিজেকে গুটাতে শুরু করেছে, তার-পর একটু একটু করে একটা খাঁচায় বন্ধ দেখা পাখী হয়ে গেছে।

শেষ অবধি খোকনের চোখেও পড়েছে।

ছেলেমানুষ যেমন আদর বোঝে, তেমনি অবহেলাও বোঝে। অভিমান হয়েছে বাপের ওপরে! আগে কলেজ ফেরত সুবিমলই ওকে স্কুল থেকে নিয়ে আসত। তারপর ওকে চান করিয়ে নিজে চান করত। খেতে বসে খোকন ভাল করে খেলে চারটে চুমু, আর কম খেলে দুটো, ভাত ফেললে একটাও না এই কণ্ডিশনে খাওয়া শুরু হত। চিত্রা হত জাজ। তার বিচারে চুমুর পরিমাণ বাড়ত, কমত! আর এখন চাকর বা চিত্রা খোকনকে নিয়ে আসে। চান করায় চিত্রা। খাওয়ায়ও চিত্রা! সুবিমল জোরে উঠে এক কাপ চা খেয়েই কলেজে ছোটে। ফিরে এসে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। খেতে ডাকলে কোন রকমে স্নান করে খেয়েই আবার বেরিয়ে যায়। এক দেড় ঘন্টা পরে পড়াতে পড়াতে ফিরে আসে, যেদিন আসে না সেদিন রমলাও আর আসে না। ঐ সময়ে কোন টিউশানিতে যায়, কিন্তু সে টাকা চিত্রা হাতে পায় না। বললে বলে, কেন! আমার নিজের হাতখরচ নেই। সব সময় তোমার কাছে হাত পাততে হবে বুঝি। ওঃ কি আমার মহারাণী রে!

চিত্রা কি আর বোঝে না—রমলার মায়ের অসুখ, ওর দাদার একার আয়ে সংসারই চলে না তায় ওষুধ পথ্যি! তাছাড়া এই যে বেড়াতে যায় তার ট্যাক্সি খরচ রেস্টুরেন্টের বিল কি নেই।

কিন্তু সেদিন আর সহ্য করতে পারেনি চিত্রা। রাত্রে বিছানায় শুতে এলেও আজকাল কথা বলে না সুবিমল, জানলার ধারে মুখ করে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খায়, নয়তো ওঘরে বসে পড়ে, চিত্রা ঘুমোলে তবে শুতে আসে। ওর হাবভাব দেখেই বুঝতে পারে চিত্রা যে ওর সারা সত্তায় এখন রমলা। ফেরেও অনেক রাত করে। কত দিন আগে সে খোকন আর সুবিমল তখন একসঙ্গে বেড়াতে যেত সন্ধ্যেবেলা। বিয়ের আগেকার তার উঁচুমহলের বন্ধুদের বা নাকউঁচু আত্মীয়-স্বজনদের কারুর সঙ্গেই কোন যোগাযোগ রাখেনি চিত্রা। কেননা তার অবস্থা স্বচ্ছল নয়, অন্যের দয়া কুড়োবার চাইতে ও নিজেকে সবার কাছ থেকে সরিয়ে এনেছে। শেষে নিজেকে সুবিমলের জগতে বিকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আজ সে কত একা। কেউ নেই তার পাশে। সুবিমল এরপর যত সরে গেছে তত বেশী করে সে তার খোকনকে আঁকড়ে ধরেছে। তাদের দুজনেরই মনের ব্যথা যে এক!

সেদিন সুবিমল শুতে আসতেই চিত্রা গম্ভীরভাবে বলল, জানলার ধারে খোকন ঘুমিয়েছে তুমি এদিকে এসে শোও, কথা আছে।

জ্বলন্ত গলায় সুবিমল বলল—এটুকু বিলাসিতা আছে তাও সহ্য হোল না। রাজপুত্তুরকে ওখানে শোয়ান হয়েছে। ব্যঙ্গের মত করে বলল—কথাটা কি? এই দুপুর রাতে হয় হিসেব শোনাবে নয়তো অসুখ, এই তো। আমার ভাল লাগে না। ওপাশ ফিরে শুলে সুবিমল।

চিত্রাও আজ বদ্ধপরিকর—তবুও ঠান্ডা গলায় বলল—ভাল না লাগলে তো চলবে না। এড়িয়ে যেতে চাইলেই কি সব এড়ান যায়। সংসার তো আর আমার একার নয়। তোমারও তো কিছু দায়িত্ব আছে।

বিরক্তির সঙ্গে সুবিমল বলে, না নেই। আমি ভাত রাঁধব না ছেলে পড়াব। রোজ-গারের দায়িত্ব আমার তার তো সবটাই এনে পায়ে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে, তাতেও কি কুলোচ্ছে না, তেমনি করেই শক্ত হয়ে শুয়ে থেকে বলে,—এবার দয়া করে একটু রেহাই দাও।

উত্তেজিত চিত্রা বলে ওঠে, না কুলোচ্ছে না, খোকা বড় হচ্ছে না। খরচ নেই তার!

সুবিমলও সমান তেজে ব্যঙ্গের মত করে বলে— যাও না, এম-এ তো পাশ করেছ, ঘরে বসে মাটি না কাঁপিয়ে একটু রোজগারের ধান্দা দেখ না। মনটাও বড় হবে, আর রাজপুত্রেরও রাজভোগ খাবে।

এবার আর নিজেকে সামলাতে পারেনি চিত্রা—উঠে বসেছে। তারপর তার শিক্ষা সংযম সব হারিয়ে চিৎকার করে বলেছে— ওঃ আমার মন ছোট, তাই না! আমি বাইরে গেলে তোমাদের রাসলীলার আরও একটু সুবিধে হবে বুঝি। তাই চাকরী করাতে চাও। বাবা শুনেলে আমার মাথাটা কাটা যাবে না তোমার? আর যত রাগ ছেলেটার ওপর। ও তোমার কি ক্ষতি করেছে শুনি।

এবার সুবিমলও ক্ষেপে ওঠে, বলে তুমিই তো ওর বারটা বাজিয়েছ। রমলা ঠিকই বলে, তুমিই তো ওকে দিয়ে স্পাইং করাও, তার ওপর সম্মানে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলছ।

চিত্রাও সমান তেজে উত্তর দিয়েছে— যেমন তুমি ছোট হয়ে গেছ, তেমনি ঐ রমলা একটি শনি। আমি শেখাই! ছিঃ ছিঃ নিজে তুমি ছাতে বসে রমলার সঙ্গে নানা কান্ড করবে। আর তাই যদি ছেলে হঠাৎ দেখে ফেলল তো হল তার দোষ। বাপের এই সব কান্ড দেখে কি শিক্ষা পাচ্ছে ও। তোমার কাছে থাকলে নির্ঘাৎ বয়ে যাবে ছেলেটা। নিজের মনেই ক্ষোভের সঙ্গে বলে, ছিঃ ছিঃ আমি শেখাই। তুমি ওর মনটা বুঝলে না। না, না, করবে না! কতখানি অভিমান ওর ছোট্ট বুকে! তুমি তো দেখবেই না। আমিও দেখব না ওকে, তাই না! রাক্ষুসী কি বলেছে……, এপাশ ফিরে এক ধমক দেয় সুবিমল—চুপ করো! ও যাতে শিক্ষা পায় সেই ব্যবস্থাই করা হবে এবারে! আর কোন কথাই সে বলতে দেয়নি।

ছেলের শিক্ষার সুব্যবস্থাই করল সুবিমল। ধানবাদের কাছে একটা বোর্ডিং স্কুলে রেখে এল খোকনকে! যাবার সময় সে একটুও কাঁদেনি। চিত্রা যে ভাবে বুঝিয়েছিল, ওকে বড় হতে হবে, দাদুর মত জজ হতে হবে, আর যে যা অন্যায় করবে তার সাজা দিতে হবে। ও জিজ্ঞেস করেছিল রমলামাসীকেও? বাবাকেও? চিত্রাও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে জোর দিয়ে বলেছিল— হ্যাঁ নিশ্চয়ই! তারপর আর কোন কথা না বলে সে তার সবচেয়ে পছন্দের হালকা সবুজ চেক চেক বুশ সার্ট আর সবুজ রংয়ের হাফপ্যান্টটা পরে তার জামা কাপড় বই এর স্যুটকেশ সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল বাপের সঙ্গে। চিত্রা তাকে পই পই করে বলে দিয়েছিল গিয়েই যেন সে চিঠি দেয়। চিঠি খোকন লিখতে পারে। সেবার পুজোর সময় চিত্রার মাসীমা জোর করে খোকনকে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের দেশের বাড়ীতে। চেয়েছিলেন চিত্রাও যাক। কিন্তু সে যায়নি, খোকনকেই শুধু পাঠিয়েছিলেন। তখন বড় বড় কাঁচা অক্ষরে খোকন তাকে লিখেছিল, 'মামণি, তোমার জন্য মোন কেমন কোরছেছ……' এমনি সব। স্নেহের হাসি হাসে চিত্রা। এবারও তাই বাড়ীর ঠিকানা লিখে চারখানা খাম দিয়েছিল ওর সংগে। ওঘরে রমলার খিলখিল হাসিটা হঠাৎ কানে বাজে, বলছে আঃ ছাড়ো! ছাড়ো না! খোকা নেই বলে খুব সাহস বেড়েছে তাই না। তারপরই যেন ভীতু গলায় বলে—এই জানো! একটু আগেই যেন দেখলাম খোকার মুখটা ঐ জানলার ধারে একটু উঁকি দিয়েই সট করে সরে গেল। সুবিমলের গলাতেও কি আশঙ্কা? ঐ তো বলছে—কই! কই! কোথায়! তারপর বলছে—হ্যাঁ ঠিক। বারে বারে আমারও তাই মনে হচ্ছিল। এবার রাগের মত করে বলে— অত্যন্ত অন্যায়। এটুকু ছেলের এতখানি পাকামি অসহ্য। ঠিকই বলেছ, ঐ চিত্রা! ঐ ওরই কুশিক্ষা এসব।

এবার অধৈর্য রমলা বলছে—আঃ থেতে দাও। ছেলেটাকে বিদেয় করেছ না বাঁচা গেছে একটু কি ধরবার ছোবার ছিল তোমার। কি রকম চোখ বার করে তাকাত? আর আড়াল থেকে আগপাত। ছেলে তো নয়, যেন ক্ষুদে শয়তান! কম জ্বালিয়েছে!

ধমকের মত করে সুবিমল বলল— আঃ রমলা থাকতে দাও। লিভ ইট! নির্জন দুপুর, আবার হয়তো আদরে মেতে উঠেছে ওরা। শুধু ফিস-ফিস কথা। পরের দিন, তারপরের দিন, রোজই এমনি।

সেদিন বিরক্ত রমলা বলছে, বাবাঃ, তোমার যেন এক বাতিক হয়েছে। ছেলেকে রেখে এসেও শান্তি নেই। আনাচে-কানাচে অনবরত শুধু তাকেই দেখছ। গলায় আদর ঢেলে বলে, কে…ম…ন—যেন হয়ে যাচ্ছ আর আমি আসব না তোমার বাড়ীতে। পরক্ষণেই সুবিমলের আকুতি ঢালা ভারী গলা বলছে, আর না, আর কখনো বার বার জানলার ধারে যাব না। দেখো। তারপরই যাচাই-এর মত করে জিজ্ঞেস করছে বল। তুমি আমায় কখনই ঘেন্না করবে না, করতেই পারবে না তাই কিনা, বল। বল রমলা।

রমলা বলেছে কক্ষণ না। বরং ঐ বিচ্ছুটাকে বিদেয় করেছ বলে আরও বেশী করে তোমায় ভালবাসব, দেখ! আর না……

আর শুনতে চায়নি। বিতৃষ্ণা ধরে গেছে তার। পাশ ফিরে শোয় চিত্রা। ভাল লাগছে না। খোকন নেই। কোন কাজও যেন নেই। কোন অবলম্বনও নেই যেন তার জীবনে। এমনি মাথার যন্ত্রণা হলে ঐ খোকনই তার ছোট ছোট হাতে কেমন সুন্দর করে মাথা টিপে দিত, কত আদর করত তাকে। আর ওদের যত রাগ কিনা তার ঐ খোকনের ওপর। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে তার এই নিঃসঙ্গ অবস্থার কথা। এমনি একা আর ফাঁকা হয়ে যাওয়ার ব্যথা সে আর কাকে জানাবে। বাবা তো আজও মুখ ফিরিয়ে আছেন। মা নেই। থাকলে সে যেমন করে খোকনের মনের কথা বোঝে, তিনিও হয়তো তেমন করে তার কথা বুঝতেন। খোকনের স্কুল কেমন। সেখানে সে কি খাচ্ছে, তাদের কি নিয়ম কানুন। কবে তার আবার ছুটি। দরকার মত-তাকে আনা যাবে কিনা। কত-

আপনার...
আমেজভরা আনন্দে
আপনার!

...লি ছেলে আছে সেখানে। মাস্টাররা মানুষ ...ন! কত প্রশ্নই যে চিত্রার মনে ঘুরছে ...তু এর একটারও কোন উত্তর সে ...বিমলের কাছে পায়নি। খোকনের নাম ...লেই সে জ্বলে ওঠে। অতি কষ্টে সে ...লের নামটা শুধু জোগাড় করেছে। বেশী ...ছু বললেই প্রচণ্ড বিরক্তির সঙ্গে বলে, ...! ফের শুরু করলে, বলেছিলে ছেলে ...মার কাছে থাকলে বয়ে যাবে। তাই তাকে ...র শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাই করা হয়েছে। ...স! বার বার এক কথা ঘ্যান ঘ্যান করবে ...।

আজকাল চিত্রার প্রায়ই এ কথাটা মনে ..., যে সুবিমল তার ওপরে এত বেশী ...ক্ত কেন। একদিন তো সেও তাকে কাছে ...তই চেয়েছিল। তার জন্য তো চেষ্টারও ... করেনি সে। তবে। তবে কি সে ...য়ে গেছে। নতুন করে কি তার আর ... দেবার নেই বলেই সুবিমলের তার ... আর কোন আকর্ষণ নেই। তাতো ... মনের কষ্ট অভাবে, আগের মত তার ...ভরা স্বাস্থ্য হয়তো নেই। কিন্তু এখনো ... পথে-ঘাটে লোকে তার দিকে সম্ভ্রমের ...খ ফিরে ফিরে তাকায়। সবচেয়ে বড় কথা ... খোকন তাকে বলে, মা তুমি কি ...দর। রমলা আফশোষ করে বলে, আমি ... তোর মত ফর্সা হতাম। অনেক ভেবে ...র একটা কনক্লিউশনে আসে চিত্রা, ভাবে ...র কিছু নয়, সুবিমলের যা নেই তার ...টা আছে, আভিজাত্যের স্বাতন্ত্র্য আর ...ত্তি। হয়তো এর জন্য তার কাছে ছোট ...য় যায় সুবিমল, আর সেই ইনফিরিয়রিটি ...মপ্লেকস ঢাকতে গিয়ে সে তার কাছে ঐ ...জ্জের মুখোস পরে। ঐ সাধারণ রমলার ...ছে এসব কোন দায় নেই। তাই সেখানে স্বচ্ছন্দ।

শুধু ঘুম নয়, কেমন যেন একটা এখন ...শ ভাব চিত্রার, সে শুনতে পায় সব, ...তেও পারে সব কিন্তু হাত-পা নেড়ে কিছু করবে সে ক্ষমতা নেই। গা-হাত-... যেন সব সময় ঝিমঝিম করছে চিত্রার।

চিত্রা বুঝতে পারছে, সুবিমল এঘরে ...ছে পায়চারী করছে তার পরিচিত ...গতে মাঝে মাঝে নিজের মাথার চুলের ... অস্থিরভাবে আঙুল চালাচ্ছে। তার ...ছ এসে দাঁড়াল, তার মাথায় হাত রাখল। ...র ভেতরে একটু আনন্দে কেঁপে উঠল ...। কিন্তু পরক্ষণেই তার স্নেহের হাতটা ...ম এসেছে গলার কাছে। ওর গলার নরম ...ড়ায় সুবিমলের শক্ত নখ ফুটে যাচ্ছে, ...ী হাতের চাপে নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে ...র, তবু সে চিৎকার করেনি ঘুমের ...রেই যেন পাশ ফিরেছে। ছিটকে সরে ...ছ সুবিমল।

হঠাৎ হঠাৎ আবার ভাল ব্যবহারও করে ...বিমল। সেদিন অমনি আচ্ছন্নতার মধ্যেই ...র চাপ পড়তে উঠে বসেছিল চিত্রা দেখে ...র দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে উপুড় ...র শুয়ে আছে ও। অনেক অনেক দিন ...গে। সে রাগ করলে অমনি করে তার রাগ ভাঙতো। চিত্রার হাঁটুতে ভীষণ সুড়-সুড়ি লাগে, তাই ওর হাঁটুতে মুখ ঘষত, আর বলত হাসো। শিল্পীর হাসো তবে ছাড়ব। সেদিনও তাই চিত্রা সব ভুলে আগের মতই আদর করে বলেছিল এই পাগলা। তোমারও খোকনের জন্য মন কেমন করছে তাই না। তক্ষুনি উঠে বসেছে সুবিমল, খাটের বাজুতে রাখা তোয়ালেটা টেনে এনে তার গলার কাছে টান করে ধরে কেমন করে যেন দাঁতে-দাঁত চেপে বলেছে ফের খোকন খোকন। একেবারে থামিয়ে দেব কথা বলা।

তখনই আবার দরজার কড়াটা নড়ে উঠেছে—সঙ্গে সঙ্গে ঐ তোয়ালেটাই কাঁধে ফেলে কলঘরে গিয়ে ঢুকেছে। রাগের গলায় তাকে বলেছে যাও। দেখ কে।

সুবিমলের স্কুলের বন্ধু সঞ্জয় আর অরুণ। তাদের বিয়ের সাক্ষীও হয়েছিল ওরা। শ্রীমন্তও স্কুলের কাজ থেকে ফিরেছে। তাকে চা করতে বলেছে চিত্রা, গা ধুয়ে সুবিমল আসতে তারাও চিত্রার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেছে, সত্যিই ছেলেটা নেই, বাড়ীটা যেন ঝিমিয়ে আছে রে। থাকলে এতক্ষণ কাকু কাকু করে কত কথা বলত। কোন স্কুলে দিলি? কাঁদেনি মাকে ছেড়ে যেতে?

না চিত্রাও কাঁদেনি, সে বুঝেছিল, এ তার কাঁদার সময় নয়। মান, সম্ভ্রম নিজের প্রাণের মায়া সব ছাপিয়ে জেগে উঠেছিল তার মাতৃত্ব। প্রথমে সে এই ওষুধ খাওয়ানর আদরটুকুকেও সন্দেহ করেনি। ডাঃ সেনকে পাশের বাড়ীতে আসতে দেখে তাঁকে ডেকে এনে শুধু বলেছিল, তাঁর দেওয়া ঐ ওষুধে কেনবা শুধু ওর ঘুম পায়, হজমও তো কই ভাল হচ্ছে না। শুনল তাঁর কাছে সুবিমল যায়নি। আর এও জানল যে, ওষুধটা ইকোয়ানীল গুঁড়ো। বললেন বেশী খেও না, ভয়ানক ক্ষতি করবে।

ক্ষতি! আরও কি ক্ষতি হতে তার বাকি আছে। ট্যাবলেট গুঁড়িয়ে ঐসব পুরিয়ার ভরেছে, সুবিমলের সামনে হাসতে হাসতে রোজ খেয়েওছে। অঘোর ঘুমের ভান করে সারা দুপুর চোখ টিপে পড়েও থেকেছে। আর সুবিমলকে তার বুদ্ধির ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে একটু একটু করে খুব নিরীক্ষণ করে পড়তে চেয়েছে।

সেদিন রাত্রে তাই ওকে বলেছিল, খোকনের ঐ ছবিটা একটু বড় করতে দিলাম। দরজার সামনে ঐ দেরাজটার ওপরে রাখব, অন্তত ঘর ভরে হাসবে। যে পোশাক পরে গিয়েছিল, সেই তার গত পুজোর সবুজ চেক চেক বুশ সার্ট আর কর্ডের হাফপ্যান্ট পরে মুখ ভরে হাসছে খোকন।

সুবিমল সঙ্গে সঙ্গে তেতো গলায় বলল—এদিকে তো নড়তে পার না তবু বেরিয়ে দোকানে যাওয়া হয়েছে। যতসব ন্যাকামী। একটা ছবি তো রয়েছে আবার ছবি কি হবে।

খবরদার আর আমায় না জিজ্ঞেস করে কোন কিছু করবে না, যেমন দিয়েছ, তেমনি কালই নেগেটিভ সমেত সমস্ত ছবি ফেরত আনা চাই-ই বুঝেছ। ওঃ পাগল করে দেবে দেখছি আমায়।

সে রাতে সুবিমল ঘুমোয় নি, খালি সিগারেট খেয়েছে।

সুবিমল বেরিয়ে গেলে কোনরকমে পোস্ট অফিস অবধি গিয়ে চিত্রা তার মামাতো ভাইকে মান খুইয়ে ফোন করেছে। ধানবাদে তার শ্বশুরবাড়ী, প্রায়ই যায়। সে আসতে তাকে খোকনের ছবি দিয়ে স্কুলের নাম বলে, তার খোকনের একটা খবর এনে দেবার জন্য আকুতি করেছে।

সে খবর দিয়েছে। ঐ স্কুলে, ঐ নামে, ঐ চেহারার কোন ছেলে নেই। কখনই ভর্তি হয়নি। তবে কি ও চিত্রার ওপর রাগ করে এক স্কুলে দিয়ে অন্য স্কুলের নাম বলেছে? নাকি দূরে কোন আত্মীয়ের বাড়ী রেখে এসেছে? বেশী দূরে তো হবে না। কেন না পরের দিনই তো ফিরে এসেছে, তবে! ভয়ে আশঙ্কায় ঠান্ডা হয়ে গেছে তার ভেতরটা। কিন্তু না, তাকে জানতে হবে তার খোকনের খবর তাকে যে করে হোক পেতে হবে। ঘুমের ওষুধের বিষ কাটাতে তাই সে জোর করে দুধ খেয়েছে। নিজেকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এও ভেবেছে, হাজার হোক ও তো বাপ। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে সেদিন দুপুরের সেই ভয়ঙ্কর চাউনি।

বেশী করে কিসমিস দিয়ে হালুয়া করে সুবিমলকে দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলেছে, সুজিগুলোয় পোকা পড়ছিল। কে আর খাবে, খোকন তো আর নেই! কি ভালই বাসতো ও এমনি হালুয়া!

মনোযোগ দিয়ে ওর মুখের লেখা পড়তে চেয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারেনি। কেননা সুবিমল ক্ষেপে ওঠেনি। শুধু বলেছে, এখন হালুয়া খাবো না, ক্ষিদে নেই।

এ দুদিন দুপুরে ঠিক সময়েই কড়া নড়েছিল কিন্তু আশ্চর্য সুবিমল বাড়ী ছিল না। চিত্রা তো ঘুমোচ্ছে। শ্রীমন্ত তো এ-সময় স্কুলের কাজেই যায়, তাই কে আর দরজা খুলে দেবে। ফিরে গেছে তাই রমলা। সেদিন সে তাই সন্ধ্যের সময় এসেছিল। ছাতে মাদুর পেতে শুয়েছিল সুবিমল। চিত্রাকে কিছু না বলে রানীর মত সে গটগট করে ছাতে উঠে গেল। কিন্তু একটু পরেই যেন ভিখিরীর মতই নেমে এলো। চিত্রাকে সামনে দেখে কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল—সুবিমলের কি হয়েছে রে! চিত্রা কথা বলেনি—তার রুচি হয়নি। 'কেন?'—কথাটা চোখে ফুটিয়ে, শুধু তাকিয়েছে ওর দিকে। স্বগতোক্তির মত করেই হাঁপাতে হাঁপাতে রমলা বলেছে—ওঃ যেন একটা ক্ষ্যাপা কুকুর। চিত্রা তখন তার গালে গলায় হাতে স্পষ্ট চাকা চাকা কামড়ের দাগ দেখেছে। উর্ধ্বশ্বাসে, যেন ছুটে বেরিয়ে গেল ও।

সেদিনই রাতে সুবিমল চিত্রাকে কাছে টেনেছে। ভয়ে হিম হয়ে যাওয়া চিত্রা তবু হেসে কথা বলেছে—আর সুবিমল তাকে বলেছে,—চিত্রা! আমায় তুমি ক্ষমা করতে পারবে না চিত্রা! বল! পারবে না! আবার আমরা তেমনি করে সুখী হব। তোমাকে আমি ফের খোকন এনে দেব চিত্রা! তাকে নিয়ে আবার আমরা তেমনি করে আনন্দ করব। অন্ধকারে তলিয়ে থাকা সুবিমল, স্বগতোক্তির মত করে বলে, রমলা পারবে না, ও কক্ষনো মা হতে পারবে না। খোকন রাগ করেছিল না। তাই তো আজ ওকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছি। নিষ্ঠুরের মত ওর সাধ মিটিয়ে দিয়েছি। ওর মধ্যে আছে শুধু প্যাসন। নাথিং এলস্।

চিত্রা দেখছে ক'দিন ধরেই সুবিমল বিশেষ কোথাও বেরুচ্ছে না। যদিও কোথাও যায়, তক্ষুনি ফিরে আসে। শুধু দুপুরে নয়, অন্য সময়েও কেউ কড়া নাড়লেই সে সচকিত হয়ে ওঠে। পারতপক্ষে কখনই নিজে দরজা খুলতে যায় না। অপরিচিত কারুর গলা পেলেই ভীষণ চমকে ওঠে। এখন সে সব সময়ই ভেতরের ঘরে। আর একদণ্ড তার চিত্রা ছাড়া চলে না। সারারাত তো বলতে গেলে ঘুমোয়ই না। হয় পড়ে, নয় পায়চারী করে; নয় সিগারেট খায় শুয়ে শুয়ে। সেদিন দুপুরে ও একটু ঘুমোতে ছাতে গিয়েছিল তাইতেই ঘুম ভেঙে উঠে চিৎকার করে ডেকেছে তাকে। সে আসতে ভয়ের গলায় অসহায়ের মত করে বলেছে, কোথায় গিয়েছিলে তুমি আমায় একা ফেলে! মায়া হয় ওর জন্য চিত্রার। কিন্তু খোকন! তবু খোকনের জন্য আর কোনরকম কোন ঔৎসুক্যই আর ইদানীং প্রকাশ করে না চিত্রা। শুধু তাদের আগেকার সুখী দিনের এক-আধ টুকরো ছবি মাঝে মাঝেই এক... করে তুলে ধরেছে। সেদিন যেমন খে... বসে বলল, আজ শ্রীমন্ত ইলিশ মাছের ... এনেছে। তুমিও একদিন এনেছিলে, ম... আছে? খোকন সেদিন কি খুশী! কত ... খেয়েছিল ডিম ভাজা আর মাখন দি... তুমিও তাকে কত আদর করেছিলে! ... স্পষ্ট দেখল, সুবিমল মুখ নীচু করে চো... জল লুকোচ্ছে।

তার ব্যবস্থা মতই মামাতো ... ছেলেকে স্কুল ফেরৎ নিয়ে এসেছে ড্রাইভা... সে খোকনেরই বয়সী। বাইরের ঘরে তা... নিয়ে আদর করছে চিত্রা। ইচ্ছে ক... খোকনের মুখের ছড়াগুলো ওকে ... বলাচ্ছে। যা ভেবেছিল তাই, সঙ্গে স... পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে সুবি... পাগলের মত বলে উঠেছে—কে? ও কে...

তারপর বাচ্চাটাকে ছোঁ মেরে তুলে... প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরে চেঁচিয়ে বলে... খবরদার, ঐ ছড়া বলবি না, তোকেও তা... শেষ করে দেব। ভয় পেয়ে কেঁদে উ... বাচ্চাটা। তখন আবার তাকে আদরে ভ... দিয়েছে, জলভরা চোখে চুমুর পর... খেয়েছে ওকে। আর একেবারে এক... পাথরের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দে... চিত্রা।

খট্ খট্ খট্। জোরে কড়াটা ... উঠেছে। আশ্চর্য! আর ভয় পা... সুবিমল। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে নি... উঠোনে নেমে হাট করে খুলে দি... দরজাটা।

পুলিশ। হাতে খোকনকে ঠিকানা দি... দেওয়া সেই খাম আর তার স্যুটকেশ।

ধানবাদের কাছাকাছি একটা গ্রামে এ... শুকনো কুয়োর মধ্যে পচা গন্ধ পেয়ে গ্রা... বাসীরা পুলিশে খবর দেয়। ওরা গিয়ে... কুয়ো থেকে একটা বাচ্চা ছেলের ল... তোলে। তাকে কেউ গলা টিপে মেরে কুয়ো... ফেলে দিয়েছে। তার পরনে ছিল এ... সবুজ চেক চেক বুশ সার্ট আর ক... হাফপ্যান্ট। সেই সঙ্গেই ছিল এই স্যুটকে... আর তার মধ্যে এই ঠিকানা।

অঙ্গনা

ালটে সমানাধিকার

সমসাময়িক কার্টুন

জার্মান পার্লামেণ্টে মহিলা সদস্যারা আলোচনা করছেন।

পশ্চিমী দেশে মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতা একসময়ে আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক করতো। াই তাজ্জব বনে যেতাম ও দেশের মেয়ে- ের দেখে। বিজ্ঞানাগার থেকে বাজার সর্বত্র ের অবাধ যাতায়াত। অধিকারের এতটা স্বীকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই আমরা মরমে ে যেতাম। আমাদের নারীসমাজের কথা ভবে কপাল চাপড়াতাম। কি দুর্বিসহ অবস্থা। স্বাধীনতা বলতে তাদের তখন কছুই ছিল না। তবে সুখের কথা, ইতি- ধ্যে নারীমুক্তি আন্দোলন দেশে জোরদার য়েছে। কিঞ্চিৎ সুলক্ষণও শুরু হয়েছে। লা চলে, সবেমাত্র অংকুরোদ্গম হচ্ছে। সে বে বেশি দিনের কথা নয়। তারপর থেকে া সময়টুকু পেরিয়ে এসেছি ব্যক্তিজীবনে ার দৈর্ঘ্য বিস্তৃত হলেও জাতিগতভাবে তা ামানাই। কিন্তু এ সময়ে আমরা পথ ঢেঙিছি অনেকখানি। এটা আবার অনেকের র্ষার উদ্রেক করতে পারে।

দেশ স্বাধীন হবার পর ঘোষিত হলো, কলের সমানাধিকার। নারী-পুরুষ কোন ফাৎ নেই। এই সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিত হলো আমাদের সংবিধান। ইতিমধ্যে থিবীর অগ্রগামী দেশগুলি আরো গিয়েছে। কিন্তু তাদের অগ্রগতি আর ামাদের অগ্রগতিতে অনেক তফাৎ। এগিয়ে কা একটা জাত পিছিয়ে পড়েছিল। যে ান ঘটনাচক্রেই হোক। আবার গতিবেগ পয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। আর আমরা অগ্রগামী বলেই মেয়েদের সমানাধিকার মেনে নিতে আমাদের কোথাও আটকায়নি।

পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলি কিন্তু ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়। সেদেশের মেয়েরা সব সুযোগ পেয়েছেন। শিক্ষা থেকে জীবিকা পর্যন্ত কোথাও তাঁদের আটকায়নি। কিন্তু একটা গাঁট পেরোতে তাঁদের অনেক সময় লেগেছে। রাজপথে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। আন্দোলন করতে হয়েছে। একদিন, একমাস বা এক বছর নয়। দীর্ঘদিন। এমন কি, এই আন্দোলনের পেছনেই হয়তো এক পুরুষ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তারপরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা মাঠে মাঠে সোনালি ফসল তুলে বেড়াচ্ছেন।

পৃথিবীর অগ্রগামী পশ্চিমী দেশ- গুলিতে নারীসমাজের এই দাবী ছিল সমানাধিকারের। সহসা তাঁরা তা পাননি। এমন কি জন্মসূত্রেও নয়। লড়াইয়ের পথে রক্তরাঙা অধ্যায় পার হয়ে নিজেদের অধিকার তাঁরা আদায় করে নিয়েছেন। অথচ অগ্রগতিতে সম্মুখ দেশগুলির এহেন অনুদারতার কোন সুদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। কেন এ ব্যাপারে এত দেরী হলো? উত্তরে শুধু বলা যায়, এজন্য ওদের চরিত্র- বৈশিষ্ট্যই দায়ী। বরাবরের রক্ষণশীলরা এ ব্যাপারেও কোন উদারতার প্রদর্শন করেননি। অথচ চিরকালের বদনাম ঘোচানোর একটা বড় সুযোগ ছিল সেটাও ফস্কে গেল আবার . লড়াই পথে দাবীও আদায় হলো। এই ইতিহাস হলো ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং জার্মাণীর। সর্বত্র একইভাবে নারীসমাজ সমানাধিকারের দাবী আদায় করে নিয়েছেন।

যতটা কম কথায় এবং সহজে এই অধিকার আদায়ের কথা বলা হলো, পথ কিন্তু ততটা প্রশস্ত ছিল না। অনেক ঝট্টা, অনেক বিপ্লবের ঝড় এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে। যিনি প্রথম এই দাবীর কথা উচ্চারণ করেন তাঁকে অনেক হেনস্তা হতে হয়েছে। তিনি কল্কেও পাননি। তবে যে বীজ তিনি বপন করে গেছেন সে পথ ধরে এগিয়ে এসেছেন উত্তরসুরীর দল। পর্যায়ক্রমে

আন্দোলনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমেই তাঁদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এব্যাপারেও অনেক শ্রেণীবৈষম্য করা হয়েছে। অভিজাত-অনভিজাতের তফাৎ করতে ছাড়েননি সেসব দেশের কর্তাব্যক্তিরা।

খবরের কাগজওয়ালারাও যেন এমনি একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। মওকা পাওয়ার সংগে সংগে তাঁরাও উৎসাহে অস্থির। নারীসমাজের ভোটাধিকার নিয়ে কত ঠাট্টা, কত বিদ্রূপ। কার্টুনিস্টদেরও এই সুযোগ। নানারকম ব্যংগচিত্র তাঁরা প্রকাশ করতে লাগলেন। রসিকতা যে কত সাংঘাতিক হতে পারে একটি চিত্রে তার কিছুটা প্রমাণও পাওয়া যাবে।

এত ঝড়ঝঞ্ঝা মাথার উপর দিয়ে গেছে। তবু অধিকার আদায়ের দাবী থেকে মেয়েরা সরে আসেনি। বরং প্রতিটি আঘাতই তাঁদের নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে। প্রচন্ড উৎসাহে তাঁরা আবার সংগ্রামের পথে এগিয়ে গেছেন।

সত্যি ভাববার কথা, মেয়েদের সব অধিকার আছে অথচ দেশের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার নেই। এরকম একটা বে-আইন বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। পশ্চিমের এই তিন দেশের মহিলারা সব বিষয়ে অগ্রণী হয়েও এব্যাপারে চুপচাপ ছিলেন। এদিকে তাঁরা ততটা গুরুত্ব দেননি। অথবা প্রকাশ্যে পুরুষসমাজের বিরুদ্ধাচারণ করার সাহস তাঁদের ছিল না। তাই অনেক কিছুর মতই দেখা যায়, পশ্চিমী দেশ-গুলিতেও নারীর সমান অধিকারের দাবী নিয়ে এগিয়ে এসেছেন পুরুষ।

পশ্চিম জার্মানীও এর ব্যতিক্রম নয়। নারীদের সমানাধিকারের প্রশ্নে এ দেশও অনেক পিছিয়ে ছিল। সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলির কথা বাদ দিলে পাশ্চাত্য দুনিয়ায় প্রথম ভোটাধিকার লাভ করে আমেরিকার একটি রাজ্য। এবছর সে অধিকারের শত-বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। আমেরিকার পক্ষে সেদিন এই সিদ্ধান্ত ছিল ঐতিহাসিক। যে অধিকার একটি রাজ্যে তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তা আরো সবাইকে প্রেরণা জোগায়। এই পথ ধরে এগিয়ে আসেন নারীসমাজ। দাবীর সংগে তাঁরা সোচ্চার হন। তারপরের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। ফলশ্রুতি দাবী আদায় হলো।

আমেরিকার এই বিশেষ রাজ্যটিতে মহিলাদের ভোটাধিকার আগে স্বীকৃত হলো বটে কিন্তু তারও অনেক আগে থেকেই জার্মানীতে মহিলাদের ভোটাধিকারের কথা বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকে। সর্বপ্রথম এর স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন একজন প্রাশিয়ান উদারনৈতিক। নাম তাঁর থিয়োডোর ভন হিপ্পেল। ১৭৯২ সাল নাগাদ তিনি দাবী করেন, পুরুষদের মতই মেয়েদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থাকা প্রয়োজন। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত। জার্মান পুরুষসমাজ বেশ কান খাড়া করে কথাগুলো শুনলেন। প্রতি-ক্রিয়া বিলম্বিত হলো না। এই উদার-নৈতিককে নিয়ে সবাই রসিকতা শুরু করলেন। কটুকাটব্য তাঁকে অনেক সহ্য করতে হলো। তিনি কিন্তু নিজের দাবীতে অবিচল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর যে তিনি জনমত সংগঠিত করতে পারলেন না। মোটা-মুটি জোরালো বক্তব্য রাখার মত তাঁর পাশে আর কাউকে পাওয়া গেল না। অবশ্য এ দোষ তাঁর নয়। এ হচ্ছে যুগাশ্রিত সংস্কারের ফল। তাই তিনি একাই কেঁদে গেলেন। ভগ্নহৃদয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। কিন্তু অধিকারের স্বরটি হারিয়ে গেল না।

সংস্কারাচ্ছন্নরা প্রমাদ গুণলেন। তাঁরা বুঝলেন, মেয়েদের অধিকার যদি পুরুষের সমান হয় তবে দেশটা উচ্ছন্নে যাবে। আসলে নিজেদের একচেটিয়া প্রভুত্ব বজায় রাখা চলবে না। তাঁরা রীতিমত শংকিত। কি করা যায় কিছুই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। কিন্তু ভেবে-চিন্তে পথ একটা বাৎলাতেই হবে। না হলে এই বৃদ্ধ উদার-নৈতিকের পথে দেশের মেয়েরা এগিয়ে এসে তাঁদের গলা টিপে ধরবেন।

তাঁরা ভবতে লাগলেন কিভাবে এই আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়া যায়। সহসা কোন পথও তাঁরা পেলেন না। ভাবনা কিন্তু শেষ হলো না। ফলাফল প্রকাশিত হলো বাট বছর পরে এ ফতোয়ায়। সরকারী নির্দেশ এলো, মহিলারা কোন সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না। সংগে সংগে মহিলাদের ভোটাধিকার দানের আশারও অকালমৃত্যু ঘটলো।

তারপর অনেক বছর কেটে গেল। জার্মানীতে ইতিমধ্যে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে। কায়েম হয়েছে প্রজাতন্ত্র। এই অবস্থায় মহিলাদের দাবীও ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। আর কোন উপায় নেই দেখে ১৯১৮ সালে কাউন্সিল অফ পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ মহিলাদের ভোটা-ধিকার মেনে নিলেন।

মেয়েরা প্রায় প্রস্তুত হয়েই ছিল। কাউন্সিলের ঘোষণার সংগে সংগে তাঁরা তৎপর হয়ে উঠলেন। কয়েক সপ্তাহের উইমারের আইনসভায় ৩৭ জন নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন। ১৯২৩ সালের নির্বাচনে নারী সদস্য সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস পেল। ৩৬ জন কমে হলো ২৭ জন। কিন্তু এরই মধ্যে মজার ব্যাপার হলো, যাঁরা মহিলাদের ভোটাধিকারের জন্য আপ্রাণ লড়াই করে এই সংগ্রামে জয়যুক্ত হলেন দেশের মহিলারা তাঁদের প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করেননি। নির্বাচনে দেখা গেল কোন কোন রাজনৈতিক সংস্থা পুরুষের তুলনায় ঢের বেশি মহিলা ভোট পেয়েছে। অথচ সে দলে কোন মহিলা প্রার্থী পর্যন্ত নেই। এই মনোভাব দেখা গেছে হিটলারের সময়েও। ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট উওমেনস মুভমেন্ট এসময় যে কার্যসূচী প্রকাশিত হয় তাতে একটি কথাই ছিল, নারীর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সন্তান। যোগ্য সন্তান দেশের মর্যাদা রাখবে। আর কোন কথা তাতে প্রাধান্য পায়নি।

১৯৪৯ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে যে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে দেখা যায় নারী ভোটার সংখ্যা পুরুষদের ছাপিয়ে গেছে। শতকরা হিসেবে নারী ভোটার যেখানে ৫৫ পুরুষ সেখানে ৪৫। তাসত্ত্বেও নির্বাচনে পুরুষ প্রতিনিধির বিরাট সংখ্যাধিক্য। বর্তমান জার্মান পার্লামেন্টই এর অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ৫১৮ জন পার্লামেন্ট সদস্যের মধ্যে মহিলার সংখ্যা মাত্র ৩৭ জন। ভোটদানে মেয়েদের মতিগতি বোঝা সত্যি ভার।

জার্মানীতে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের একটির দিকে মহিলাদের সমর্থন বেশ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। কনরাড আদেনয়ের একবার রসিকতা করে বলেছিলেন, মেয়েদের যদি দুটো করে ভোট হতো।

মহিলাদের ভোটাধিকারের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, নির্বাচনী রায়ে মহিলা ভোটারদের গুরুত্ব সর্বাধিক। এতৎসত্ত্বেও তাঁরা আইনসভায় খুবই সংখ্যালঘু।

—প্রমীলা

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

২৬

চিত্রকল্পনা-**প্রেমেন্দ্র মিত্র**
রূপায়ণে-**চিত্রসেন**
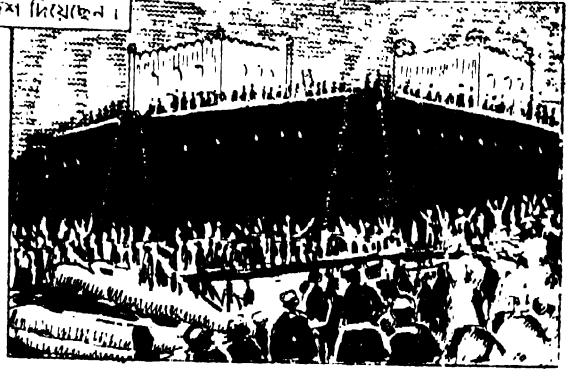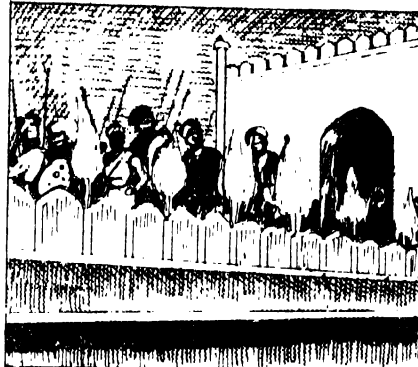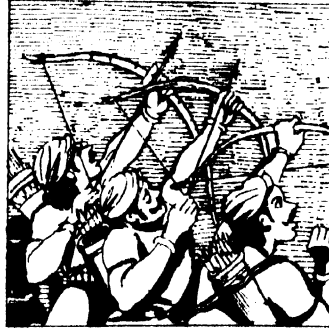
রেডিওর এক মিনিটি আর বাইরের এক মিনিট এক নয়। বাইরের এক মিনিট কোথা দিয়ে কেটে যায়, টের পাওয়া যায় না; কিন্তু রেডিওর এক মিনিটের নৈঃশব্দ্য অসীম মনে হয়।

বাইরের দু মিনিটে দু শ' পা-ও যাওয়া যায় না, কিন্তু রেডিওর দু মিনিটে পৃথিবী জয় করে ফেলা যায়। রেডিওর প্রথম দু-তিন মিনিট অত্যন্ত কুশলু। এই দু-তিন মিনিটের মধ্যে যদি শ্রোতাদের আকর্ষণ করা না যায় তাহলে আর তাঁদের আকর্ষণ করা বড়ো কষ্ট — সে নাটকের ক্ষেত্রেই হোক আর নকশার ক্ষেত্রেই হোক, অথবা কথিকার কিংবা আলোচনার বা অন্য কিছুর। প্রথম দু-তিন মিনিটের মধ্যে শ্রোতারা যদি আগ্রহান্বিত হতে না পারেন তাহলে তাঁরা আর বড়ো অপেক্ষা করেন না, যে যার কাজে মেতে যান—গল্প জুড়ে দেন, কাগজ পড়তে শুরু করেন অথবা হাতের কাজ শেষ করতে লাগেন। রেডিও চলতে থাকে অথবা বন্ধ হয়ে যায়।...অনুষ্ঠানটা অশ্রুত থাকে, তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

তাই রেডিও বিশেষজ্ঞরা বলেন, ঐ গোড়ার দু-তিন মিনিটকে যেমন করে হোক, আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে—তা সে বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে হতে পারে, বলার ভঙ্গিতে হতে পারে, চমকে হতে পারে, সাসপেন্সে হতে পারে, আরও অনেক কিছুতে হতে পারে। কোথায় কোনটা খাটবে সেটা চিন্তা করে বার করতে হবে।

এই চিন্তাটা অনেকে করতে চান না, অথবা কৌশলটা তাঁদের জানা নেই। তাই অনেক সারগর্ভ, জ্ঞানগর্ভ, প্রয়োজনীয় আলোচনা, কথিকা ইত্যাদি মার খায়। অবহেলিত হয়ে অশ্রুত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যটাই মাটি হয়ে যায়; রেডিওর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময় অনর্থক নষ্ট হয়, অর্থের অপচয় ঘটে।

রেডিওর অনেক আলোচনা, কথিকা ইত্যাদির বড়ো একটা অংশ কাটে একঘেয়ে; নীরস ভূমিকাতে, আসল কথাটা যখন আসে তখন সময় থাকে কম। তখন সেই কম সময়ে কম করে আসল কথাটা বলায় অনুষ্ঠানটা বিফল হয়ে যায়।

রেডিওর অনেক আলোচনা, কথিকা ইত্যাদিতে আর-একটা জিনিস দেখা যায়, যাতে শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট হয়, শোনার ইচ্ছা কমে যায়। তা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট পড়ার ভাব। আলোচনা যত ঘরোয়া হয় তত তার আকর্ষণ বাড়ে। এই ঘরোয়া-ভাবটা আনার জন্য স্ক্রিপ্ট পড়ার ভঙ্গিটা দূর করা দরকার। স্ক্রিপ্টটা থাকে সহায়ক হিসাবে। স্ক্রিপ্টটা পড়তে হয় পড়ার মতো করে নয়, বলার মতো করে—রেডিও নাটকে শিল্পীরা যেমন স্ক্রিপ্ট দেখে অভিনয় করেন। বক্তার সঙ্গে শ্রোতার সম্পর্ক তো পড়ার আর শোনার নয়, বলার ত শোনার। পড়ার আর শোনার সম্পর্ক তো পাঠক আর শ্রো মধ্যে। রেডিওর অনুষ্ঠানে এই সম্পর্কের সুযোগ নেই, যা অত্যন্ত কম। আঙুলে গুনে বলা যায়। তা ধর্তব্য নয়। রেডি সম্পর্ক সরাসরি সম্পর্ক— বলার আর শোনার।

রেডিওর আলোচনা, কথিকা প্রভৃতিতে অংশগ্রহণকারী প্র ব্যক্তির এই কথাটা স্মরণ রাখা দরকার, রেডিও কর্তৃপক্ষেরও স করিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলে রেডিওর অনুষ্ঠান প্রাণ প আকর্ষণীয় হবে, শ্রবণীয় হবে।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

১৮ই আগস্ট সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে রবীন্দ্রসংগীত শোনালেন শ্রীরণজিৎ সেন।... চলনসই গেছের।

১৯শে আগস্ট রাত ৮টায় ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে একটি সুন্দর আলোচনা শোনা গেল। আলোচনা করলেন শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ নিয়ে দেশে প্রচন্ড হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। অনেকে অনেক কথা বলেছিলেন। কিন্তু খুব সহজ করে, সাধারণ মানুষের বোঝার মতো করে, তথ্য দিয়ে, সবিস্তারে খুব বেশি বলা হয়নি। জনসাধারণ স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের দু-রকম কথা শুনে দোটানায় পড়েছিলেন। এই রকম সময়ে বেতার কর্তৃপক্ষ অনেক আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার মধ্যে এই আলোচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শুধু তথ্য আর ভাষার প্রাঞ্জলতার দিক দিয়েই নয়, বলার ধরণের দিক দিয়েও।

২১শে আগস্ট সকাল সাড়ে ৯টায় প্রচারিত সংবাদ বিচিত্রার বিষয় ছিল তিনটি : অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ, কবি রামপ্রসাদ স্মরণ ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী তীরে জঙ্গীপুরের সদর ঘাটে সন্তরণ প্রতিযোগিতা।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের মৃত্যুতে ক প্রকাশ করেছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও নোজ বসু। একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে য়ে তাঁরা যে বিয়োগ-ব্যথা অনুভব ছেন, স্বল্প ভাষণে তা-ই তাঁরা প্রকাশ ছেন।

সাধক কবি রামপ্রসাদ বাংলা সাহিত্যের হাসে একটা যুগ সৃষ্টি করেছেন, রণ শ্রোতাদের অনেকেরই হয়তো এ টা জানা নেই। রামপ্রসাদ তাঁদের কাছে বি। ভক্তকবি হিসাবেই তিনি অমর আছেন তাঁদের অন্তরে। তাই রাম-দের সমকালের আর কারও স্মরণানুষ্ঠান হ বা না হোক, তাঁর হয়। প্রতি বছর । এবারও হয়েছিল। এবারের একটি ষ্ঠানে পশ্চিম বঙ্গের অস্থায়ী রাজ্য- শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ ও কলকাতার শ্রীপ্রশান্ত শূর যে ভাষণ দিয়েছিলেন, দ বিচিত্রায় তার অংশবিশেষ শোনানো ছে।

সদরঘাটের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যে চ উৎসাহ আর উদ্দীপনা সৃষ্ট ছিল, সংবাদ বিচিত্রার টেপ-রেকর্ডার খানিকটা অংশ ধরে এনে শ্রোতাদের য়েছে। সদরঘাটে যাঁরা দর্শক হিসাবে স্থিত ছিলেন, তাঁরা প্রতিযোগিতার ক আনন্দের ভাগী হতে পেরেছিলেন, যাঁরা রেডিওয় এই সংবাদ বিচিত্রাটি হিলেন, তাঁরাও খানিকটা উত্তেজনা ভব করতে পেরেছিলেন। সংবাদ- ার এই অংশটি সপ্রাণ, উত্তেজনাময়।।

মগ্র অনুষ্ঠানটি সুসম্পাদিত সুগ্রথিত।

২৩শে অগস্ট সকাল ৮টায় লোকগীতি লেন শ্রীবৃন্দাবনদাস বৈষ্ণব। কোনো- ছলাকলা ছিল না, সহজ সরল ভঙ্গর। পল্লীর মানুষের প্রাণখোলা প্রাণস্পর্শী।

২৪শে অগস্ট বেলা ১টায় নাটক ছিল লাইন"। রচনা শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ পাধ্যায়।

নাটক বলতে সাধারণত যা বোঝায়, লাইন" সে রকম কিছু নয়। এতে সংখ্যাও বেশি ছিল না। একেবারে দিকে ছাড়া অ্যাকশনও ছিল না এতে। নাটকীয় সংঘাত ছিল প্রায় গোড়া —মানসিক সংঘাত। আর তাতেই টা প্রাণ পেয়েছিল, সারাক্ষণ শ্রবণ র্ষণ করে ছিল।

নাটকটিতে চরিত্র ছিল মাত্র দুটি— আর শুভ্রা। তারা দুজনে তাদের কথা গেছে শুধু। সেই বলাটাই নাটক ছে।

অজয় আর শুভ্রা একসময় পরস্পরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিল। অনেক দিন পরে শিমুলতলায় তাদের দেখা হ'ল। অজয় তার রুগ্না স্ত্রীর শরীর সারাতে এসেছে, শুভ্রা তার নিজের। হঠাৎ স্টেশনে দেখা হয়ে গিয়েছিল, শুভ্রা ঠিকানা দিয়ে অজয়কে আসতে বলেছিল। অজয় এসেছে, তারপর দুজনে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। বাইরেই তাদের সমস্ত কথা হয়েছে।

অজয়ের তিনটি (?) সন্তান, ছোটোটির বয়েস এক বছরও নয়। সে মস্ত মাইনের মস্ত চাকরি করে, তার স্ত্রী বাংলা দেশের নামকরা সুন্দরী একজন। তবু সে সুখী নয়, এতগুলো বছর সব সময় তার শুভ্রার কথা মনে হয়েছে, শুভ্রাকে ছাড়া আর কাউকে সে ভালোবাসতে পারে নি—এই কথা শুনে শুভ্রা হেসে উঠল, বিদ্রূপ করল। এমন কথা অজয়ের মুখে মানায় না।

ভালোবাসা কাকে বলে তার একটা নমুনা দিল শুভ্রা। অজয় যখন তাকে ছেড়ে বিলেত চলে গিয়েছিল, শুভ্রা তখন বস্তিতে বস্তিতে শ্রমিক-মজুরদের মধ্যে কাজে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিল। তখন

তার এক সহকর্মী—কালো রং, রোগা চেহারা, মুখে বসন্তের দাগ, বয়েসেও তার চেয়ে ছোটো—তার অগোচরে তাকে ভালো-বেসেছিল। সেই ভালোবাসাটা তার কাছে ধরা পড়ল এক দুর্যোগের রাত্রে। মালিকের ভাড়াটে গুন্ডার আঘাতে তারা দুজন একটা মাঠের মধ্যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে ছিল। অনেক রাত্রে আকাশের পূর্ণিমার চাঁদ যখন মাঠে আলোয় ভরে দিয়েছিল, শুভ্রা সংজ্ঞা পেয়ে তখন দেখল ছেলেটি তার মুখের ওপর ঝুঁকে আছে, তার ঠোঁট শুভ্রার কপাল ছুঁই-ছুঁই করছে।...শুভ্রা উঠে বসে তাকে মৃদু ভৎসনা করল। তারপর ছেলেটা বদলে গেল। তারপর তার ছিন্নভিন্ন দেহটা পাওয়া গেল রেল লাইনের ধারে।

শুভ্রা অজয়কে জিজ্ঞাসা করল, এমন ভালোবাসা কি সে দেখাতে পারে? পারে এমন করে শুভ্রার জন্য প্রাণ দিতে?

এমন সময় প্রচণ্ড শব্দ করে প্রচণ্ড বেগে একটা ট্রেন ছুটে এল। সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।...ট্রেনটা চলে গেলে শুভ্রা আপন মনে বলে উঠল : ভাগ্যিস চট করে এমন চমৎকার গল্পটা তার মাথায় এসেছিল।

মাত্র দুটি চরিত্র। শুধু কথা। শেষে একটুখানি অ্যাকশন। তাতেই নাটকটা জমে উঠেছিল। নাটকটায় প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন অজয়রূপী শ্রীনির্মলকুমার আর শুভ্রারূপী শ্রীমতী কণিকা মজুমদার। তাঁদের অভিনয় বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। অভিনয়ের জন্যই এমন অ্যাকশনহীন একটা নাটক প্রাণ পেয়েছিল।

২৪শে অগস্ট বেলা ২টায় 'মালঞ্চ' অনুষ্ঠানটি ছিল নজরুল বিষয়ে। এই অনু-ষ্ঠানে নজরুলের কথা বললেন শ্রীকমল দাশগুপ্ত—নজরুলের জীবনের অনেক কথা। আর নজরুলের গান শোনালেন শ্রীমতী ফিরোজা বেগম—অনেক গান : বাউল, কীর্তন গজল, ইসলামী গান, ছোটোদের গান, চল-চ্চিত্রের গান, ভারতের মহামিলনের গান। গানগুলির জন্য অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। নজরুলের নানা ধরনের এত-গুলি গান একসঙ্গে তো বড়ো শোনা যায় না! —শ্রবণক

বিতর্কিত আলোচনা

চুম্বন ও নগ্নতা

গত ১৭শ সংখ্যা 'অমৃতে' জনৈক বিশেষ প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত 'চুম্বন ও নগ্নতা' নামাঙ্কিত একটি নিবন্ধ চোখে পড়লো। ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্ন দেহের দৃশ্যের অবতারণা অচিরেই আইনের অনুমোদন পেতে পারে—এই আশঙ্কায় লেখক অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলেছেন,—'আজকের সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। চলচ্চিত্রের সঙ্গে জন-রুচির যে একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা একটু চোখ ফেরালেই দেখা যায়। আজকের মেয়েরা কি ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরে দিব্যি দিবালোকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেটা লক্ষ্য করেছেন কি? গায়ের জামা কাপড় কতো সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। এইসব অশালীনতা চলচ্চিত্রেরই প্রভাব।

ভারতীয় সমাজের সংস্কৃতিতে কি এতই দৈন্য যে, পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করে আমাদের বাঁচতে হবে। আমাদের কি নিজস্ব ঐতিহ্য নেই। রামায়ণ-মহাভারতের ভারতবর্ষে কি আজ ন্যুব্জ-কুব্জ অবস্থা। আমাদের অতি প্রাচীন সংস্কৃতি সেই শিক্ষাই কি দেবে?'

লেখকের কি ধারণা যে, রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ভারতীয় মেয়েরা বোরখা পরে বেড়াতো? রামায়ণ-মহাভারতের যুগে তো বটেই এমন কি পরবর্তী হিন্দুরাজাদের যুগেও মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ আজকের চাইতে অনেক বেশি সংক্ষিপ্ত ছিলো। লেখকের নিশ্চয় জানা আছে যে, সে-যুগে সুন্দরী নারীকে 'সুস্তনী' বলে সম্বোধন করার রীতিও প্রচলিত ছিল। সেকালে নারী-পুরুষের পারস্পরিক মিলনের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিলো। অতীতে আমাদের দেশে নারী-পুরুষ যত্র-তত্র যৌনকামনা চরিতার্থ করতো; মুনিদেরও সময়বিশেষে মতিভ্রম হতো। কিন্তু জীবনের মূল্যবোধগুলোর প্রকৃতি অন্য ধরনের ছিলো বলেই এসব নিয়ে 'বিশেষ প্রতিনিধি'র মতো কেউ মাথা ঘামাতো না। কিংবা অঙ্গ জ্বলতো না কারো। 'বিশেষ প্রতিনিধি' অতীতে ফিরে যেতে চান, খুবই ভালো। তবে রামায়ণ-মহাভারতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলে বক্তব্যটাকে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কারণ, সেই সময় মেয়েদের স্বাধীনতা সীমিত হয়েছিলো; পর্দারও প্রচলন হয়েছিলো সমাজে।

বিশেষ প্রতিনিধি রবীন্দ্রসরোবরের দুর্ঘটনাকে চলচ্চিত্রের প্রভাব বলে অভিহিত করেছেন। চলচ্চিত্রের অধিকাংশ কাহিনীতেই নায়ক-নায়িকাকে প্রেমের পালা শেষ করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা যায়। তার মানে নিশ্চয় এই নয় যে, যাঁরা প্রেম করে বিয়ে করেছেন এবং সুখী হয়েছেন তাঁরা চলচ্চিত্রের দ্বারা প্রভাবিত? অর্থাৎ খারাপ যদি মানেন ভালোটাই বা মানবেন না কেন?

ডকটর রমেশ মজুমদার বলেছেন (গত সংখ্যার অমৃতে দ্রষ্টব্য) যে, আগে যে মেয়েদের নৈতিক চরিত্র খুব ভালো ছিলো, তা তো মনে হয় না। একটি ঘটনায় জানা যায়, যজ্ঞাসনে উপবিষ্ট পুরোহিত নারীকে জিজ্ঞেস করেন, স্বামী ছাড়া আর কজন পুরুষের সঙ্গে তিনি সহবাস করেছেন। নারী উত্তর দেন, পাঁচজন। এই স্বীকৃতির ফলে নারী কিন্তু সমাজচ্যুত হন নি।

বিশেষ প্রতিনিধি সগর্বে মন্তব্য করেছেন যে, একজন ভারতীয় হয়ে তিনি ভাবতে কোন মতেই পারেন না কি করে ফিল্ম-সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটির কর্তাব্যক্তিরা এই সুপারিশকে সমর্থন করলেন। বিশেষ করে সভাপতি শ্রীজি ডি খোসলা অভাবনীয় এই পরিকল্পনায় কি করে রায় দিলেন তা ভেবে তিনি আরো আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। কারণ, শ্রীখোসলা একদা পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন।

আমি কিন্তু উপরোক্ত বিদগ্ধ সভাপতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রগতিশীল এবং সঙ্গত কারণেই প্রশংসনীয়। পরিশেষে শুধু এইটুকুই বলবো—ঐতিহ্য নামক বস্তুটি কোন বিশেষকালে সীমাবদ্ধ নয়। ঐতিহ্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে চাই ইতিহাস-সচেতনতা এবং নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা। ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার শুধু তাঁদেরই প্রাপ্য যাঁরা সংস্কারমুক্ত হয়ে যাবতীয় d0gma পরিত্যাগ করেছেন।

প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী
করিমগঞ্জ আসাম

●

সেপ্টেম্বর '৬৯ ইং-র প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত অমৃতে 'চুম্বন ও নগ্নতা' সম্পর্কে শ্রীমতী পারুল দাশগুপ্তের খোসলা কমিটির রিপোর্টের বিষয়ে প্রকাশিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু মতামত সর্বসাধারণের অবগতার্থে উপস্থাপিত করছি।

পৃথিবীর সব দেশেই যখনই সমাজের রীতি-নীতির কোন পরিবর্তন সূচিত হয়, তখনই চারিদিকে 'গেল-গেল' রব ধ্বনিত হয় এবং ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নহে। আবার সেই রীতি-নীতি যখনই প্রয়োজনের তাগিদে বা অন্য কোন কারণে সমাজের [illegible] হয়ে যায়, তখন সকলেই সেটাকে [illegible] নেন। এককালে আমাদের দেশে [illegible] দেখা দূরের কথা, কেউ সাধারণ গান-[illegible] চর্চা করলেই তাকে 'বখাটে' আখ্যা [illegible] হত, এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট [illegible] প্রকাশ করা হত। কিন্তু সাম্প্রতিক [illegible] সিনেমার পর্দায় অভিনয় করে 'অমুক [illegible] তমুক কুমার' হবার সাড়া পড়ে [illegible] গান-বাজনা শিখে অনেকে অনেক শ্রী[illegible] কর' উপাধিতে ভূষিত হচ্ছেন। [illegible] এইসব বৃত্তিতে উপার্জিত আয়ের প[illegible] অনেকের উচ্চাশাকেও অতিক্রম করে [illegible] এবং সর্বোপরি সর্বজনস্বীকৃতভাবে গান, অভিনয় শিক্ষালাভ করবার [illegible] ষ্ঠানও সর্বত্র চালু হয়েছে। এককালে [illegible] দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নারীকুল, প্রয়ো[illegible] তাগিদে বা যুগের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে [illegible] বিষয়ে পুরুষ জাতিকেও হার মানিয়ে[illegible] ছেন। যেকালের পর্দাশ্রয়ী নার[illegible] সেকালে প্রশংসাধন্য হলেও, বর্তমা[illegible] যদি কেউ সেই চাল-চলন রীতি [illegible] রাখেন তিনি নিতান্তই এ-যুগে [illegible] বলে আখ্যা লাভ করবেন। সুতরাং [illegible] ও নগ্নতা' সম্পর্কে যে 'গেল-গেল[illegible] উঠেছে, সহনীয় হয়ে দাঁড়াবে এবং প[illegible] কালে কোন চলচ্চিত্রে 'চুম্বন ও নগ্ন[illegible] থাকাটাই ব্যতিক্রম বলে মনে হবে।

অনেকে ভারতীয় সংস্কৃতির [illegible] দিয়ে চলচ্চিত্রে 'চুম্বন ও নগ্নতার [illegible] বিরুদ্ধ-মতবাদ পোষণ করছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে প্রকৃত কি [illegible] ঠিক বুঝতে পারি না।

অজন্তা-ইলোরার গুহা-চিত্রাবলী ভারতীয় সংস্কৃতিতে সত্য তেমনি [illegible]রকের সূর্য-মন্দিরের ভাস্কর্যের নি[illegible] ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। [illegible] যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির নামে 'চুম্বন ও নগ্নতা'র চলচ্চিত্রে [illegible] সম্পর্কে প্রতিবাদ করছেন, তাঁরা অ[illegible] চিত্রাবলীকে মানলেও মনে হয় কোণ[illegible] ভাস্কর্যাবলীকে বোধহয় ভারতীয় সং[illegible] অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দিতে রাজী না।

সুতরাং আমার মতে যদি এ[illegible] ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ভাবিরোধ ব[illegible] চ্চিত্রে 'চুম্বন ও নগ্নতা'কে বাদ দি[illegible] তবে প্রথমে 'ভারতীয়-সংস্কৃতি যথার্থ কি বোঝায়?' তার মাপকাঠি [illegible] করতে হবে এবং তার পরিপন্থী 'চুম্বন ও নগ্নতা'কে নয়—বর্তমান আরও যা উল্লেখিত ভারতীয় সং[illegible] মাপকাঠি বিরোধী সেই সমস্ত [illegible] নীতিও বাদ দিতে হবে। যেসব রীতি [illegible] সেই মাপকাঠির অনুকূলে হবে, তা[illegible] গ্রহণ করা উচিত। ব্যক্তিগত সু[illegible] ভাসা-ভাসা, ভারতীয় সংস্কৃতির [illegible] দিয়ে 'কোন নীতি গ্রহণ' বা 'কোন বর্জন' করা চলবে না।

মাধুরী [illegible]
কলিকাতা

অভিনেত্রী শকুন্তলা সেন ফটোঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

ভালবাসার স্বপন

সুন্দরী সুধার অপরাধ—সে 'ইয়েস' এবং 'নো'র বেশী ইংরিজী জানে না, স্বামীর সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে 'বল'-নাচতে জানে না, আচারে-আচরণে বেশ-ভূষায় সে আদৌ আধুনিকা নয়। তার ওপর আধুনিক যুগের নায়ক রমেশের মতে আগে প্রেম, পরে বিবাহ। অতএব সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী পিতা শেঠ জাওলাপ্রসাদের চাপে প'ড়ে সুন্দরী সুধাকে সে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রেই সে সুধাকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তাকে ভালোবাসা তার পক্ষে অসম্ভব এবং সেই কারণে সে তার ওপর স্বামীর অধিকারও স্থাপন করতে চায় না। বিলেত যাবার পূর্ব মুহূর্তে সে স্ত্রীকে ছাড়পত্রও লিখে দেয়, যার বলে সুধা অন্য কাউকে বিবাহ ক'রে সুখী হ'তে পারে। পুত্রের ব্যবহারে জাওলাপ্রসাদ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন এবং আদরের পুত্রবধূ সুধাকে বধূর পরিবর্তে কন্যারূপে গ্রহণ ক'রে তাকে কোনো যোগ্য পাত্রে অর্পণ করবার সংকল্প প্রকাশ করলেন। কিন্তু সুধার কাছে এ প্রস্তাব কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়; বিবাহিতা হিন্দু ললনার আবার বিবাহ সে চিন্তাতেও আনতে পারে না। কাজেই আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে সে শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করল। কিন্তু চলন্ত মোটরগাড়ীর সামনে থেকে তাকে তুলে নিলেন নিঃসঙ্গ শংকরনাথ। তার মনের দুঃখের কথা জেনে শংকরনাথ সুধাকে নতুন ক'রে গড়তে চাইলেন—তাকে সাজে-বেশে, শিক্ষায়-দীক্ষায় ক'রে তুললেন একেবারে মডার্ণ। তারপর তাকে পাঠিয়ে দিলেন বিলেতে নবরূপে স্বামীর মন জয় করবার নব অভিযানে। সুধা এখন আর সুধা নয়, সে এখন সুষমা। রমেশের চিত্ত জয় সহজেই সুসম্পন্ন হ'ল। কিন্তু শংকরনাথ ওদের সহজে মিলতে দিলেন না। তিনি প্রথমে রমেশের একাগ্রতাকে পরীক্ষা করলেন, এবং পরে সুধাকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে পাঠিয়ে দিলেন তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার শ্বশুরবাড়ীতে। রমেশও ফিরে এল পিতৃগৃহে এবং সেইখানেই সে নতুন করে পেল—না, সুষমাকে নয়—সুধাকে।

—মডার্ণ পিকচার্স-এর নিবেদন টি, সি, দেওয়ান প্রযোজিত ও হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রঙীন চিত্র "প্যার কা স্বপন"-এর যে-কাহিনীটি ওপরে বিবৃত হ'ল, সেটি এমন কিছু অভিনব নয়। বার্ণার্ডশ'-র পিগম্যালিয়ান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এ-ধরনের কাহিনীকে চিত্রায়িত হ'তে এর আগেও কয়েকবার দেখা গেছে। তবে কাহিনীর ডিটেলে—তার ঘটনাবিন্যাসে নিশ্চয়ই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নায়িকা সুধাকে আধুনিকা করবার জন্যে অশোককুমার অভিনীত শংকরনাথ চরিত্রটির সংযোজন কাহিনীটির গতিপথকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করতে প্রচুর সহায়তা করেছে।

নায়িকা সুধার ভূমিকায় মালা সিংহের সংবেদনশীল অভিনয় ছবিটির একটি বিশেষ আকর্ষণ। নায়ক রমেশ যখন সুষমা-রূপিনী সুধার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, তখন একদিকে রমেশের প্রতি তার অদম্য প্রেম, অন্যদিকে রমেশ তাকে অন্য নারী জ্ঞানে ভালো বাসছে, এর জন্যে একটা চাপা অভিমান—এই উভয় মনোভাবকে তিনি সুন্দরভাবে সুপরিস্ফুট করেছেন। নায়ক রমেশ বেশে বিশ্বজিৎ স্বচ্ছন্দ সাবলীল অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের তুষ্ট করেছেন। শংকরনাথরূপে অশোককুমারের স্বাভাবিক বাস্তবানুগ অভিনয় দর্শক সহানুভূতির আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। শংকরনাথের একমাত্র পুত্র মনোহরের ইংরাজপত্নীজাত কন্যা জেনীর ভূমিকায় হেলেন চরিত্রোচিত সু-অভিনয় করেছেন। ইংলণ্ডে সুধার

অভিভাবক প্রকাশ মালহোত্রার ভূমিকায় রাজেন্দ্র হাকসারের অভিনয় বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। অপরাপর ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত (জাওলাপ্রসাদ), দুর্গা খোটে (সুধার মা), জনি ওয়াকার (বিলাতের ভারতীয় সমাজের যোগাযোগকারী ভাঁড়), কুন্দন (রমেশের বন্ধু) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ প্রশংসনীয়। বিশেষ ক'রে রঙীন চিত্রগ্রহণে জয়ন্ত পাথারে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির দৃশ্যসজ্জা ও বহির্দৃশ্যগুলি আকর্ষণীয়। কিন্তু ছবির গানগুলির সুর যোজনায় সংগীত পরিচালক চিত্রগুপ্ত কোনো অভিনবত্বের আমদানী করতে পারেন নি।

অশোককুমার ও মালা সিংহের অভিনয়দীপ্ত "প্যার-কা স্বপ্ন" হিন্দী ছবির দর্শক সাধারণকে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

এস এস প্রোডাকসন্সের দুটি মানচিত্রের সেটে পরিচালক পীযুষ বসু, সুপর্ণা সেন ও উত্তমকুমার ফটো—অমৃত।

নৃত্যনাট্য

সতীর দেহত্যাগের পরে মহাদেব বসেছিলেন ধ্যানে। তাঁর সেই ধ্যান ভংগ করতে গিয়ে মদনকে শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে নির্গত অগ্নিতে পুড়ে মরতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্রনন্দিনী পার্বতীর পুজো-আরাধনা দেবাদিদেবের ধ্যান ভংগ করে তাঁর মনে পুনর্বিবাহ ইচ্ছা জাগাতে সমর্থ হয় এবং হরপার্বতীর মিলনের ফলে কার্তিকেয়ের জন্ম সম্ভব হয় তথা স-স্বর্গরাজ্য পৃথিবী রক্ষা পায়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত এই ঘটনাকে অবলম্বন করে মহাকবি কালিদাস রচনা করেন তাঁর অমর কাব্য 'কুমারসম্ভবম্'। এই

কুমারসম্ভব-এরই একটি নৃত্যনাট্য রূপ সেদিন শেক্সপীয়ার সরণিস্থ কলামন্দিরে পরিবেশন করলেন নবগঠিত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'পাঞ্চজন্য'। নৃত্যনাট্যে রূপান্তর কার্যে মূল কাব্য সম্পর্কে প্রচুর স্বাধীনতা অবলম্বন করলেও নৃত্যকলা প্রদর্শন ও তার সংগে সহযোগী যন্ত্রসংগীত রচনার অনুকূল বাহন হিসেবে নৃত্যনাট্যটি প্রচুর সার্থকতা লাভ করেছে। ভরতনাট্যম ও কথাকলি—এই দুই বিশিষ্ট ধারার নৃত্যকেই এতে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং সহ-সংগীত রচনায় দক্ষিণ ভারতীয় কণ্ঠসংগীতের সংগে মর্দলম ও মন্দিরার ব্যবহারকে সম্পূর্ণ বর্জন করে উত্তর ভারতীয় রাগাশ্রয়ী সংস্কৃত গানের সংগে তবলা, পাখোয়াজ, জলতরংগ, সেতার প্রভৃতির পরীক্ষামূলক ব্যবহার নিশ্চয়ই এক অভিনব দিগন্তের সূচনা করল।

সতী শিবের কাছ থেকে পিতা দক্ষের যজ্ঞে যোগদান করবার জন্যে অনুমতি চাইছেন—এই দৃশ্যে নৃত্যনাট্যটির শুরু। পরে সতীর মৃতদেহ নিয়ে শিবের রৌদ্রতাণ্ডব। পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল, হিমালয়-দুহিতা পার্বতী তিন সখী পরিবেষ্টিত হয়ে ধ্যানরত শিবকে পুজো করছেন। এর পর ইন্দ্র-প্রেরিত অপ্সরা শিবের ধ্যানভংগ করতে অকৃতকার্য হলেন। পরের দৃশ্যে নৃত্যরত রতির কাছে এলেন মদন এবং দৈবতনৃত্যের পরে মদন স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করলেন, হরের ধ্যানভংগ করবার জন্যে আদিষ্ট হয়ে তাঁকে যেতে হচ্ছে। রতি ভয় পেলেন ও মদনকে এই অসমসাহসিক কাজ করতে বারণ করলেন; কিন্তু মদন নিরুপায়। শিবের ধ্যানভঙ্গ করতে এসে মদন যখন ভস্মীভূত হলেন তখন বিরহবিধুরা রতি শিবের পায়ের কাছে পড়ে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলেন। এর পরে পার্বতী এলেন নিজের নৃত্যকলা দ্বারা শিবের ধ্যানভংগ করে তাঁর মনোরঞ্জন করতে এবং সফলকাম হবার পরে উভয়ে লাস্যনৃত্যে মাতোয়ারা হলেন।

শিব (নরেশকুমার) এবং মদনের (কেশ নায়ার) একক নৃত্যগুলিতে কথাকলি ধারা এবং সতী, পার্বতী (ইন্দ্রাণী রায়চৌধুরী) অপ্সরা (শ্রীলেখা সেন), রতি (মঞ্জু গুহ) ও সখিবৃন্দের নৃত্যে ভরতনাট্যম অনুসৃত হয়েছিল। ভরতনাট্যমের আলারিপু, বর্ণম ও তিল্লনম্ পর্যায়ক্রমে স্থান পেয়েছে এই অভিনব নৃত্যনাট্যে। নাট্যাচার্য আর এস আনন্দম এই 'কুমারসম্ভবম্' নৃত্যনাট্য রচনায় পারম্পর্য রক্ষা করে যেভাবে প্রাচীন নৃত্যকে সংস্কৃত কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রীসংগীত সহযোগে রূপায়িত করেছেন, তাতে শুধু যে ভারতীয় নৃত্য ও রাগরাগিণী সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ দক্ষতারই পরিচয় পাওয়া গেছে, তাই নয়, তিনি যে একজন দুঃসাহসিক সৃষ্টিধর্মী শিল্পী, তারও প্রমাণ রেখেছেন তিনি। শিবের হৃদয় জয় করবার জন্যে পার্বতী যে 'তিল্লনম্' নৃত্যটি অনুষ্ঠিত করে, তার সংগে একটি পাখোয়াজ ও চার জোড়া তবলা সহযোগে তিনি যে 'পঞ্চমুখী' ছন্দের সৃষ্টি করেছেন, দর্শক-মনে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে অভূতপূর্ব। এরই সূচনা স্বরূপ 'নমঃ শিবায়'—এই পাঁচটি বর্ণের প্রতিটিকে আদিতে রেখে 'নগেন্দ্র হরায়' ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গে পার্বতী পুজো-নৃত্যও যথেষ্ট অভিনবত্বপূর্ণ।

সতী ও পার্বতী বেশে কুমারী ইন্দ্রাণী রায়চৌধুরী অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল
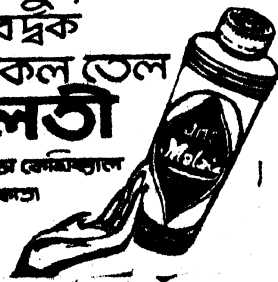
সংগীতে ভরতনাট্যম নৃত্যকে রূপায়িত করেছেন। অপ্সরা ও রতিরূপে শ্রীলেখা সেন ও মঞ্জু গুহও নৃত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। মদনের ভূমিকায় সহযোগী পরিচালক গুরু কেলু নায়ার কথাকলি নৃত্যের বলিষ্ঠ প্রয়োগে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। মহাদেববেশী নরেশকুমারের আকৃতি যথেষ্ট সৌষ্ঠবপূর্ণ, তাঁর ভংগীতেও একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকটিত, কিন্তু সমগ্র নৃত্যের মধ্যে আশানুরূপ দক্ষতার পরিচয় নেই। অন্যান্যদের নৃত্য সাধারণ-ভাবে সুন্দর। পোশাক-পরিচ্ছদ রচনায় অধিকতর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন ছিল।

'পাঞ্চজন্য' নিবেদিত 'কুমারসম্ভবম' নৃত্যনাট্যটির একাধিক পুনঃপ্রদর্শন কামনা করি।

বোম্বাই থেকে

বম্বের চিত্র-জগতের কথা বলতে গেলে প্রথমেই নজরে পড়ে এখানকার কর্মপদ্ধতির কথা। সেটা বাইরে থেকে যতটা না জানা যায় ভিতরে ঢুকলে কলকাতার কাজের ধারার সংগে পার্থক্যটা সহজেই নজরে পড়ে। এ সংখ্যায় সেই সম্বন্ধেই একটু আলোচনা করা যাক।

কলকাতায় যেমন প্রোগ্রাম চালু হয় (এখানে বলে শিফ্‌ট্‌) সাধারণতঃ বেলা ১১টায়—এখানে কিন্তু তা নয়। ১ নং শিফ্‌ট হল সকাল ৭টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত, ২ নং শিফ্‌ট্‌ হল বেলা ৯-৩০ থেকে সন্ধ্যা ৬-৩০ পর্যন্ত (মাঝে এক ঘন্টা লাঞ্চ ব্রেক), আর ৩নং শিফ্‌ট হল ২টা থেকে ১০টা পর্যন্ত। প্রত্যেক স্টুডিও-তেই ক্যানটিন আছে—সেখানে ভাত, ডাল, তরকারী, মাংস, দই, রুটি, সব পাওয়া যায়। এছাড়া টিফিনের সময় পাঁউরুটি, ডিম চা, বিস্কুট পর্যাপ্ত পরিমাণে মেলে। অবশ্য এ ক্যান্টিনশুধু স্টুডিও কর্মীদের জন্য স্টাররা বা পরিচালকরা কেউ এখানে খান না—তাঁদের খাবার আসে কখনও প্রযোজকের বাড়ী থেকে কিংবা কোন নাম করা হোটেল থেকে।

প্রযোজকের প্রোডাকশান ম্যানেজার এই সব কর্মী বা সহকারীদের খোরাকীর টাকা দিয়ে খালাস, খাওয়ানোর ঝক্কি তাঁরা নেন না। তবে ৪।৫ বার চা সরবরাহ করে থাকেন বিনা মূল্যে। শুধু তাই নয় এইসব কর্মী-দের গাড়ী ভাড়া বাবদও দু টাকা করে দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া মাসের মধ্যে একটা দিন ধার্য থাকে যেদিন তাঁরা সবাইকে একসংগে পুরো মাহিনা দেন। এ সব কারণে কর্মীরা সকলেই খুশী মনে কাজ করে। স্টুডিওর ইলেকট্রিসিয়ানরা 'বেশীক্ষণ' কাজ করলে 'ওভার টাইম' পায়, সুতরাং তাঁরাও কোনো সময় প্রতিবাদ করবার সুযোগ পান না।

প্রযোজকদের যে সব সময় একটা স্টুডিওতে [illegible] এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। যে, যেখানে যখন ফাঁক পায় সেইখানে তাদের 'সেট' ফেলে শুটিং চালিয়ে যায়।

সাগিনা মাহাতো/রোমী চৌধুরী ফটোঃ অমৃত

প্রত্যেক বড় বড় স্টারের নিজস্ব 'মেক-আপ ম্যান' আছে—তারা শুধু সেই বিশেষ শিল্পীদেরই 'মেক-আপ' করে। অন্য কোন শিল্পীদের মেক-আপ করে না। এই বিশেষ শিল্পীরা যখন যে ছবিতে কাজ করে এই মেক-আপ ম্যানরাও শিল্পীদের সংগে যায়। এর জন্য আলাদা খরচ হয় এবং সেটা প্রযোজককেই বহন করতে হয়। এই মেক-আপ ম্যানরা বেশ ভাল পয়সা উপায় করে। আমাদের বাংলা দেশেরই একটি ছেলে রণজিৎ দত্ত, তার সংগে আলাপ করে জানলাম যে সে উঠতি নায়ক সঞ্জয়ের মেক-আপ ম্যান। সে পায় দৈনিক ৭৫্ টাকা। আউট-ডোরে গেলে তার পারিশ্রমিক হয় দ্বিগুণ।

এখানে যাবতীয় খরচই প্রযোজকের, স্টুডিও কর্তৃপক্ষ শুধু দেন স্টুডিও ফ্লোর ছুতার মিস্ত্রি রেকর্ডিং মেসিন এবং ক্যামেরা। অনেক প্রডিউসারের শব্দযন্ত্রীও নিজস্ব মাহিনাভুক্ত।

কলার ফিল্ম বা রঙীন ছবির উপরই সব প্রযোজকের নজর এখন, ব্ল্যাক আন্ড হোয়াইট ক্রমশ উঠেই যাচ্ছে। এখন আর কথাই বলতে চান না।

হরবোলা : নিভাননী দেবী।পরিচালক : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—এখানে প্রায় সব বড় বড় শিল্পীদেরই নিজস্ব সেক্রেটারী আছে—শিল্পীদের কাছ থেকে 'ডেট' নিতে গেলে প্রোডিউসারদের প্রথমে এই সেক্রেটারীদের শরণাপন্ন হতে হয়। কোন কোন সময় দু জন প্রোডিউসারের কাজ একই সঙ্গে পড়লে শিল্পীরা ডবল শিফ্‌টেও কাজ করেন অর্থাৎ কোনো ছবিতে ৭টা—২টা শ্যুটিং করে সোজা চলে যান অন্য ছবির শ্যুটিং-এ ২টা থেকে ১০টা। এত পরিশ্রম সত্বেও কিন্তু তাঁরা সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে খুব সচেতন। শুধু তাঁরাই নন, স্টুডিওর প্রত্যেক কর্মীই তাই।

এখানে একটা হিন্দি ছবিতে সাধারণত সময় লাগে ৭৩ থেকে ৮০ দিন—কোনো কোনো ছবিতে তারও বেশী। তবে এখানকার নামকরা প্রযোজক পরিচালক বি আর চোপরা এখন যে ছবিখানি করছেন সেটি ৩০ দিনের মধ্যে শেষ করবেন বলে রাজকমল স্টুডিওতে একটানা ৩০ দিন শ্যুটিং ফেলেছেন। খুব কম সময়ে ছবি করার এইটাই হবে রেকর্ড এখানে।

●

প্রত্যেক ছবিতেই কিছু না কিছু আউটডোর শ্যুটিং থাকবেই—আর সেই আউটডোর শ্যুটিং-এর জন্য প্রোডিউসাররা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটোছুটি করেন। কিন্তু অনেকে আবার ভারতের বাইরেও পাড়ি দিচ্ছেন। সেদিন মনোজকুমার তাঁর দলবল নিয়ে লন্ডন চলে গেলেন। 'পূরব পশ্চিম' ছবির জন্যে। তাঁর সঙ্গে প্রাণও গেলেন। নায়িকা সায়রা বানু তো লন্ডনে আছেন এখন।

কে আসিফ (মুঘল-এ-আজম-খ্যাত) তাঁর ছবি 'লায়লা মজনু'র (লভ অ্যাণ্ড গড্) জন্যে শোনা যাচ্ছে শিগগীর বাগদাদ কাইরো প্রভৃতি জায়গায় যাবেন। এই ছবিতে অভিনয় করা কালীনই গুরু দত্ত মারা যান, তাঁর জায়গায় এখন সঞ্জীবকুমার অভিনয় করছেন। এ দুজনের মেক-আপের পর আশ্চর্যরকম সাদৃশ্য দেখা গেছে। আরও সব থেকে আশ্চর্যের কথা—দুজনেরই জন্মদিন নাকি একই তারিখে। ৯ই জুলাই।

শিল্পী পরিবার বটে রাজ কাপুরদের। তাঁদের পরিবারের সকলেই শিল্পী। তিনপুরুষ ধরে শিল্পী হওয়া কম কথা নয়। পৃথ্বীরাজ সেই নির্বাক যুগ থেকে আজও অভিনয় জগতে সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর ছেলেরা তো সবাই স্বনামধন্য রাজকাপুর, শম্মী কাপুর, ও শশী কাপুর। এখন রাজ কাপুরের ছেলে ডাব্বু (ভাল নাম রণধীর) এতদিন বাবার সঙ্গে এবং পরিচালক লেখ-ট্যাণ্ডনের সঙ্গে কাজ শিখে এখন পরিচালক-রূপে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছে। সম্প্রতি তার ছবি 'কাল আউর কাল'-এর শুভ মুহূর্ত হয়ে গেল। এ ছবির নায়িকা ববিতা। আর নায়ক ডাব্বু নিজেই। উঠতি নায়িকাদের মধ্যে ববিতার চাহিদা খুব। এ ছাড়া পৃথ্বীরাজ এবং রাজকেও দেখা যাবে এ ছবিতে।

●

সম্প্রতি (২৩ আগস্ট) ফিল্ম জার্নালিস্টস সোসাইটির উদ্যোগে পুরানো দিনের কয়েকজন শিল্পী ও চিত্রনির্মাতাকে সম্বর্ধনা জানানো হল—শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মুবারক, পি জয়রাজ, ললিতা পাওয়ার ও চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে জে, বি, এচ ওয়াদিয়া। এই উপলক্ষে কয়েকটি নির্বাক ছবিও দেখানো হয়। ভারতের প্রথম নির্বাক ছবি দাদা ফালকেকৃত 'রাজা হরিশচন্দ্রে'র একটি রীল, ললিতা পাওয়ার অভিনীত "গ্যালান্ট হার্টস" (১৯৩০ সালে নির্মিত) এবং 'whirl wind' (১৯৩০ সালে জে, বি, এচ ওয়াদিয়া কৃত একটি শর্ট ফিল্ম) দেখানো হয়।

এদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বিগত দিনের বিখ্যাত অভিনেতা মুবারক বলেন : পুরানো দিনের বহু শিল্পী ও কলাকুশলীদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সেবায় ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প আজ এই শীর্ষস্থানে আসতে পেরেছে। কিন্তু চলচ্চিত্রশিল্প আজ পর্যন্ত এইসব শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য কি করেছে! যদি কিছু করত তাহলে আনোয়ারী বেগমকে ('পুরাণ ভগত' চিত্রে যিনি পুরাণের মা করেছিলেন) বম্বের মহালক্ষ্মীর এক মসজিদের কাছে বসে ভিক্ষে করতে হত না। ...মনে পড়ে সেইদিনের কথা—যেদিন বোম্বাইয়ের কাছে একটা পাহাড়ের ওপর একটা ছবির শ্যুটিং করছি। প্রখর রোদ্রে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কর্মীদের কাছে একটু জল চাইলাম—তারা হেসে উঠল সব। বলল : এখানে জল কোথায়? পাহাড়ের ওপরে কি জল পাওয়া যায়!...শ্যুটিং শেষে নীচে এসে জল খেতে হল। আর এখন ...কোনো নায়িকার হঠাৎ খিদে লাগল—মুখ থেকে কথা বের করতে না করতে তিনখানা গাড়ী ছুটল শ্রেষ্ঠ হোটেল থেকে স্যাণ্ডউইচ বা অন্য কিছু খাবার অনতে। সেদিনের সঙ্গে এদিনের কত তফাৎ!

কথাটা নির্মম সত্য। যাঁরা কর্মীদের দুঃখে কথায় কথায় বিগলিত হয়ে পড়েন তাঁদেরও ভেবে দেখতে বলি—পুরনো দিনের শিল্পী বা কলাকুশলী যাঁরা আজ এই চিত্রজগত থেকে অবসর নিয়েছেন, যাঁরা দুঃস্থ সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তাঁদের জন্যে কিছু করা যায় কিনা!

—প্রবাসী

বিবিধ সংবাদ

রবীন্দ্র সদনের পরিচালক সমিতির উদ্যোগে আসছে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত ষোলদিন ধ'রে প্রতি সন্ধ্যায় পেশাদারী যাত্রার আসর বসছে রবীন্দ্রসদনে। বাঙলার নিজস্ব জিনিস, একেবারে মাটির সঙ্গে যোগাযোগবিশিষ্ট, লোকসংস্কৃতির বলিষ্ঠ বাহন যাত্রা আজও যুগরুচির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে বর্তমান সমাজের দর্পণ হিসেবে নিজের কাজ ক'রে চলেছে, অগণিত মানুষকে আনন্দ দেওয়ার সঙ্গে ন্যায়-নীতি-ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা বিতরণ ক'রে। যাত্রাশিল্পকে উৎসাহ দিয়ে তার মানোন্নয়নে সাহায্য

সংকলন ঃ ললিতা চট্টোপাধ্যায় ঃ পরিচালনা ঃ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

করবার জন্যে রবীন্দ্র সদন পরিচালক সমিতির এই প্রয়াসকে আমরা অভিনন্দন জানাই। শুনেছি, কর্তৃপক্ষ এই উৎসব সম্পর্কিত প্রচার, বিজ্ঞাপন, প্রবেশপত্র মুদ্রণাদির ব্যয় বাবদ বিক্রীত অর্থের শতকরা তিরিশ ভাগ রেখে বাকী সত্তর ভাগই অংশ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে অর্পণ করে যাত্রা মরশুমের শুরুতে আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা উৎসাহিত করবার ব্যবস্থা করেছেন। শহরের প্রায় সবকটি নামকরা যাত্রা প্রতিষ্ঠানই এই যাত্রা উৎসবে অংশ গ্রহণ করছেন।

১৯১৯-এর ২৭ আগস্ট তারিখে মহামতি লেনিন রুশ সিনেমা শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার নির্দেশ জারী করেন। সেইদিন থেকে সোভিয়েত চলচ্চিত্র সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতার পথে অগ্রসর হয়ে দেশ ও সমাজের উন্নয়নকে লক্ষ্য হিসেবে রেখে শৈল্পিক সার্থকতা লাভের প্রয়াস করেছে। এই স্মরণীয় যাত্রার পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি হওয়ায় ক্যালকাটা সিনে সেন্ট্রাল ১ সেপ্টেম্বরে আকাদামী অব ফাইন আর্টস হলে একটি স্মারকসভার আয়োজন করে-ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে-ছিলেন যথাক্রমে নাট্যকার মন্মথ রায় পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগমন্ত্রী জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য এবং সোভিয়েত ভাইস-কন্সাল এ, এস, প্যারাস্টভ। প্রত্যেকেই দেশোন্নয়নে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন এবং শ্রীভট্টাচার্য আমাদের দেশের চলচ্চিত্র-শিল্পেরও রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়া আশু প্রয়োজন ব'লে মন্তব্য করেন।

বাণী সমাজের অন্যতম পালা নাটক দাস-রঘুনাথের হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ১২, ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর '৬৯ তিনদিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন উৎসবে মাননীয় বিচারপতি শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সভাপতি ও মাননীয় কৃষি-মন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন।

ভারত বিখ্যাত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তের শিষ্য তপন দত্ত মূকাভিনয়ে ইতি-মধ্যেই কলিকাতা ও বাঙলার বাইরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একক অভিনয় পরিবেশনের মাধ্যমে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর অভিনীত ফীচারের মধ্যে যেগুলি বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, সেগুলি হচ্ছে ঃ অতীত বর্তমান ভবিষ্যত, বেকার যুবক, চোর, ঠেলারিক্সা-আলা, প্রসাধন, বাসযাত্রী, ডাক পিয়ন, আত্মহত্যার পূর্ব মুহূর্ত, পুরাতন ভৃত্য প্রভৃতি।

যাত্রা জগতে তরুণ অপেরা আর এক নতুন দিকের উন্মেষ ঘটালেন। হিটলার পালা সূচনা থেকে তরুণ অপেরার শিল্পীরা যাত্রাকে নতুন সাজে সাজানর প্রয়াস করে এসেছেন। শুধু কাহিনী বক্তব্য আর আঙ্গিকের উপস্থাপনাই নয়, শিল্পীর মর্যাদা আর সম্মান তরুণ অপেরাই প্রথম দিলেন যাত্রা জগতে। হিটলার নাটকের দেড়শত রজনী অভিনয়ে এঁরাই প্রথম শিল্পীর হাতে তুলে দিলেন পুরস্কার। যাত্রা করে শিল্পী প্রথম সম্মান পেলেন এ দলেই। শুধু নিজের দলের শিল্পীরাই নন, গতদিনের দুঃস্থ এবং পঙ্গু শিল্পীদেরও এঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। এই সঙ্গে এঁরা সাহায্য করলেন পরলোকগত শিল্পী প্রভাত মিত্র ও বিভোর বসুর পরিবারবর্গকে। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত পঙ্গুশিল্পী গৌরীশঙ্কর বর্মণ এবং জয়নারায়ণ মুখার্জীকে আর্থিক সাহায্য করলেন। তরুণ অপেরা এ সবই দিলেন ওরা জুনের হিটলার পালার বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে। মোট সাহায্যের অঙ্ক বারশ চার টাকা। এদিন মহাজাতি সদন হলে তরুণ অপেরার আসরে সভাপতিত্ব করেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে আধুনিক যাত্রায় থিয়েটার প্রকরণের কথা উল্লেখ করে তাঁকে স্বাগত জানান।

যথারীতি এবছরও ইউথ পাপেট থিয়েটার আয়োজিত ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের প্রতিযোগিতার আসর বসছে—আসছে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলে। বিষয়—অঙ্কন, প্রবন্ধ ও কন্ঠ-সঙ্গীত। গান্ধী শতবার্ষিকী উদযাপনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধের বিষয়—'মহাত্মা গান্ধীর জীবনী' ১৮ বছর অবধি ছেলে-মেয়েদের তিন ভাগে বিভক্ত করে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নজরুলগীতি, লোকসংগীত, প্রবন্ধ এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ইউথ পাপেট থিয়েটার ছোট ছেলে মেয়েদেরই

নবদম্পতি : স্বপ্না ঘোষ ও সুখেন দাশ। পরিচালনা : তারু মুখোপাধ্যায়

মঞ্চাভিনয়

গত শনিবার ১৬ আগস্ট, মহাজাতি সদনে ছাত্র সমিতির ৪৭তম বার্ষিক পুনর্মিলনোৎসব ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা মহানগরীর মেয়র শ্রীপ্রশান্তকুমার সুর এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য ও পুরস্কার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে সমিতির সভাবৃন্দ শ্রীরমেন লাহিড়ীর 'পান্থশালা' নাটকটি অভিনয় করেন। বিভিন্ন চরিত্রে সু-অভিনয় করেন সর্বশ্রী অশোক ঘোষ, মানিক বড়াল, অসিত ঘোষ, জিতেন দে, সন্তোষ শাঁই, অসীম দত্ত, নিমাই পাল, বিমল দাস, সমীর ঘোষ, শান্তি দত্ত, সৌমেন দাস, জয়দেব দাস, দীপালী ঘোষ, ঋত্বিকা ভট্টাচার্য ও মীনা হালদার। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীবিভূতি দাস।

গত ১৭ আগস্ট হাইন্ডমার্ন মঞ্চে শ্রীরবীন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত "কালের মৈনাক" নাটকটি কাঁচরাপাড়া আর্ট থিয়েটার মঞ্চস্থ করে। নাটকের বক্তব্য অতি সাধারণ এবং নাটকীয় গতি অতি শ্লথ। যেটুকু দর্শকচিত্ত জয় করেছেন সেটুকু শুধু অভিনেতাদের অভিনয় কৌশলে। এই অভিনয়ের জন্য নাম করতে হয় ননী দে, দিলীপ রায় এবং তাপস ভৌমিক, বাসন্তী মুখোপাধ্যায় ও শ্যামলী মজুমদার। নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

নট ও নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর বহু বিতর্কিত নাটক "ভিত্তি" কাঁচরাপাড়া আর্ট থিয়েটারের সভ্যবৃন্দ মঞ্চস্থ করছেন আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। আর্ট থিয়েটারই প্রথম

মধ্যে থেকে প্রতিভা খুঁজে বার করায় প্রয়াসী হয়েছেন, এটা সত্যিই প্রশংসনীয়।

গত ১৬ আগস্ট, রাজা রামমোহন লাইব্রেরী মঞ্চে মডার্ন ম্যাজিক সেন্টার-এর উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে যাদুকর ইউ সি আচারিয়া, যাদুকর সমীরন এবং গীতাকুমারকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। পরে যাদুবিদ্যার প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন যাদুকর সত্যরঞ্জন, টগরকুমার, পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ শাহ, সমীর কুমার, ইউ এন মালী, সমীরন, বিষ্ণুচরণ ঘোষ এবং যাদুকর দি গ্রেট সুশীল।

গত ১০ আগস্ট রবিবার সকালে রবীন্দ্র রঙ্গমঞ্চে 'মেঘের পরে মেঘ' রবীন্দ্র নৃত্যবিচিত্রা সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করে 'কিন্নর দল'। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডঃ সুপ্তি সেন। সংগীতাংশে ছিলেন পরিচালিকা নিজে ও তপন সিংহ, মিতা চট্টোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাশগুপ্ত ইত্যাদি। নৃত্যাংশে ছিলেন রুবী সিংহ, উৎসা ভার্মা, কুঙ্কুম গুহ। আবৃত্তিতে অংশ নিয়েছিলেন প্রবীর চক্রবর্তী ও তপন ভট্টাচার্য।

কৃষ্টি আয়োজিত হাওড়া জেলা সাহিত্য ও নাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্প্রতি হাওড়া টাউন হলে। অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ, সভাপতি ডঃ নিমাইসাধন বসু। এদিন দুখানি নাটক কিরণ মৈত্রের "বুদ্বুদ" ও 'অভিসার' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন যথাক্রমে কৃষ্টির শিল্পিবৃন্দ এবং হরিদাস সঙ্গীত চক্রের শিল্পিবৃন্দ। 'বুদ্বুদ' নাটকটি পরিচালনা করেন শ্রীবিশ্বনাথ সামন্ত নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন কুমার অজয়। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শ্রীমনমোহন সিংহ এবং সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীঅজিতহরি দত্ত। এদিনও দুখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। অগ্নিদূত রচিত 'ঝি-ঝি পোকার কান্না' এবং চক্রগোষ্ঠীর 'আমি এ চাই নি'।

ছায়া : সুস্মিতা সান্যাল ও শিখা ভট্টাচার্য। পরিচালনা : অরিন্দম

[ভাবে] বর্জিতভাবে বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাঙালার যাত্রা উৎসবে প্রথম তুলসী [লাহি]ড়ীর "ছেঁড়া তার"-এর যাত্রাভিনয় [হল]। "ভিত্তি" নাটকটি দার্জিলিং ও [সংল]গ্ন শহরের পটভূমিকায় রচিত। আর্ট [থিয়ে]টারের এই প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ।

[প্রা]য় উনিশ বছর পর শচীন সেনগুপ্তের [স্ম]রণীয় নাটক 'ধাত্রীপান্না' সম্প্রতি [...]ার সঙ্গে অভিনীত হোল 'রঙমহলে'র [...]। অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন [...]ী নাট্যসংস্থা। বহুকাল পরে খাত-[না]তসম্পন্ন নাটকটির প্রযোজনার ব্যবস্থা [...]মঞ্জরী'র সভ্যরা নাট্যানুরাগীদের কাছ [থে]কে অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন। [নাট]কটির অভিনয় দেখে দর্শকরা যে আনন্দ [পেয়ে]ছেন, একথা বিনা দ্বিধায় বলা যেতে [পারে]। প্রতিটি চরিত্র সুঅভিনীত। নাট্য-[সম্রা]জ্ঞী সরযূ দেবীর অসাধারণ অভিনয়-[গু]ণে সেদিন আবার নতুন করে পরিস্ফুট [হয়ে] উঠলো 'পান্না'র চরিত্রচিত্রণে। 'বনবীরে'র [ভূমি]কায় মহেন্দ্র গুপ্তের অভিনয় ভোলা [যায়] না; চরিত্রটিকে প্রতিটি মুহূর্তে [জীবন্ত] করে তুলতে শিল্পী যে অভিনয়-[রীতি]কে গ্রহণ করেছেন তা সচরাচর চোখে [পড়ে] না। তাঁর অপূর্ব বাচনভঙ্গী নাটকটির [এক]টি অমূল্য সম্পদ। আর পঞ্চু সেনের [অভিনয়] দেখে মনে হয়েছে যে তিনি সত্যি [অভিন]য় যাদুকর। জ্যোৎস্না দত্তের 'চম্পা'ও [এক]টি বৈশিষ্ট্যচিহ্নিত চরিত্রচিত্রণ; থিয়েটারে [এই] হয় তাঁর এই প্রথম অভিনয়। সাধনা [রায়]চৌধুরী 'শীতলসেনী' চরিত্রের সঙ্গে [সুন্দ]রভাবে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছেন। [অন্যা]ন্য ভূমিকায় ছিলেন : রাধারমণ পাল, [...] ভট্টাচার্য, প্রদীপ ঘোষ, অবনী মুখো-[পাধ্যা]য়, সুনীত মুখোপাধ্যায়, শংকর [বন্দ্যো]পাধ্যায় ও ইন্দ্রজিৎ।

[মা]ণিকতলা-চিৎপুর রেশনিং অফিস [রিক্রি]য়েশন ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রীতি [সম্মে]লন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হোল 'স্টার' [রঙ্গ]মঞ্চে। এই উপলক্ষ্যে শরৎচন্দ্রের ['বিরাজ]হীন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। শ্রীবাসব [সেনে]র নির্দেশনায় নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে [ওঠে]। বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা সুঅভিনয় করেন [তাঁরা] হোলেন : বাসব সেন (সতীশ), [...]তি সেন (উপেন), কার্তিক দাস [(বিহা]রী), সত্যেন দাশগুপ্ত (অনঙ্গ [...]র), সুনীল ব্যানার্জি (শশাঙ্ক), তারক [দা]স (রাখাল), রাণু রায় (সাবিত্রী), [...]ত সরকার (কিরণময়ী)।

[...]কিছুদিন আগে 'অগ্রগামী'র শিশু-[শিল্পী]রা 'বিশ্বরূপা' মঞ্চে ডি-এল-রায়ের ['সাজা]হান' নাটক পরিবেশন করে। সাত [থেকে] সতেরো বছরের শিল্পীরা যেভাবে এই [নাট]কের বিভিন্ন চরিত্র নিখুঁতভাবে অভিনয় [করে]ছে তাতে সত্যি বিস্মিত হোতে হয়। [নাট]কটির নির্দেশনায় শ্রীমতী জ্যোৎস্না [...]দার আন্তরিকতার পরিচয় রাখতে [পেরে]ছেন।

[কৃষ্ণ]নগর মহিলা কলেজের দ্বাদশতম [...]তা বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ পরিবেশিত হোল স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে। অঞ্জলি লাহিড়ীর নির্দেশনায় উক্ত কলেজের ছাত্রীরা নাটকটিকে সুন্দরভাবে মঞ্চে উপস্থিত করতে পারেন। এই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন আলপনা ব্যানার্জি (তিলোত্তমা), মালবিকা দত্ত (বিমলা), খুশী পাল (জগৎ সিংহ), সুস্মিতা সরকার (গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ), রত্না রায় (ওসমান), করবী বসু (আশমানি), তপতী মৈত্র (আয়েষা), দীপালি মজুমদার (কতলু খাঁ), দেবযানী মুখার্জি (অভিরাম স্বামী), ইরা সরকার (বীরেন্দ্র সিংহ), করুণা ব্যানার্জি (ইব্রাহিম)। নৃত্যপরিকল্পনা ও দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন কার্তিক সাহা ও রতন মোদক।

শান্তি / সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, ক্যামেরাম্যান মণীষ দাশগুপ্ত এবং সহকারী কাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। ফটো : অমৃত

উত্তর কলকাতায় সম্প্রতি 'রৈবতক' নামে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। প্রথম নাট্যোপহার হিসেবে সংস্থার শিল্পীরা আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নরনারায়ণ' নাটকটি পরিবেশন করবেন।

মতিঝিল ইনস্টিটিউট পরিচালিত তৃতীয় বার্ষিক একাংক নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে আগামী অকটোবর মাসে। প্রতিযোগিতায় নাম দেবার শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর। যোগাযোগের ঠিকানা : সম্পাদক, ১৯নং মতিঝিল এভিনিউ, কলিঃ-২৮।

গত ২০ আগস্ট, থিয়েটার সেন্টারে দক্ষিণ কলকাতার সুপরিচিত নাট্যগোষ্ঠী রংরুটের দুটি একাঙ্ক 'জীবনের গান' ও 'সোনার ঘড়া' মঞ্চস্থ হয়। রূপকাশ্রয়ী একাংক 'সোনার ঘড়া'য় ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের কথা বলা হয়েছে। 'জীবনের গানে' দেখানো হয়েছে কিভাবে নাট্য-রচয়িতার সত্তা বিত্তের বিনিময়ে কেনা হয়। ব্যতিক্রম অনির্বাণ। নাটকের মুখ্য এই চরিত্রটি প্রলোভনের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে জীবনের গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলে অনেক বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে। তরুণ নাট্যকার শ্রীসরোজ রায় দুটি একাঙ্কের রচয়িতা। সফল পরিচালনার কৃতিত্বও তাঁর। দলগত অভিনয় প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অনবদ্য। "সোনার ঘড়ায়" সর্বশ্রী সীমা গুপ্তা, অরূপ গাঙ্গুলী, জ্ঞানরঞ্জন মুখার্জী এবং জীবনের গানে সর্বশ্রী অরূপ গাঙ্গুলী, রণজিত ভৌমিক, বাপুজি নন্দী ও সুষমা দাসের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। আবহ ও কণ্ঠ সংগীতে শ্রীমিণ্টু মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। আলোক সম্পাতে শ্রীবিমল দাস গতানুগতিক।

গত ১০ আগস্ট মিনার্ভা মঞ্চে 'প্রতি-বিম্ব' নাট্য-গোষ্ঠী অগ্নিদূত বিরচিত 'ঝি ঝি পোকার কান্না' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। একটি সার্থক নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য যে শিল্পবোধ, দলগত গঠনশক্তির প্রয়োজন হয়, এ অভিনয়ে তার অধিকাংশ গুণই বর্তমান ছিল। চরিত্র-চিত্রণের উল্লেখযোগ্য হলেন প্রমোদ কুণ্ডু, অসিত সেনগুপ্ত, পিলু মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য যাঁরা অংশ নিয়ে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন পণ্ডিত, বেণু মল্লিক, সজল দাসের নাম উল্লেখ-যোগ্য। স্ত্রী চরিত্রে চন্দ্রকলা ও তাপসী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় ছিল সাধারণ। নাট-কের সঙ্গীত ক্ষেপন ও পরিচালনায় ছিলেন যথাক্রমে দিলীপ ঘটক ও প্রকাশ নন্দী।

উত্তর কলিকাতার প্রদর্শক গোষ্ঠীর পরবর্তী বলিষ্ঠ প্রযোজনা মনস্তত্ত্বমূলক নাটক অমানুষ অন্ধকার থাক। নাটকীয়তা, বক্তব্য ও আঙ্গিকে এক নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যাবে এ নাটকে। নাটকটি লিখেছেন সমীর মজুমদার। উপদেষ্টা হিসাবে থাকছেন নাট্যকার স্বয়ং ও অনিল গঙ্গোপাধ্যায়। নির্দেশনায় তিন তরুণ নাট্য-রসিক দুলাল ভট্টাচার্য, অজয় মুখার্জি ও পবিত্র রায়চৌধুরী। উত্তর কলকাতার বিশ্বরূপা মঞ্চে ১ নভেম্বর (শনিবার) বেলা আড়াইটায় এ নাটকটির প্রথম অভিনয় হবে।

ভারতীয় শিল্পী পরিষদের অনবদ্য মঞ্চ সৃষ্টি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুরস্কৃত অতীনলাল পরিকল্পিত 'শ্রীচৈতন্য' নৃত্য-নাট্যের আগামী অভিনয় ১৪ সেপ্টেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে।

গত ১৫ আগস্ট রামমোহন লাইব্রেরী হলে মুরারীপুকুর ও সি'র পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রীহরিপদ দে ও শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সংঘের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক অগ্নিদূত রচিত 'ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না' নাটকটি সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়। চরিত্র চিত্রনে রমেশ দাস, মুকুল অধিকারী, বৈদ্যনাথ দাস, বাসুদেব সাহা, কমল অধিকারী প্রমুখ সু-অভিনয়ের স্বাক্ষর রাখেন। নাটকটি পরিচালনা করেন রমেশ দাস।

স্টুডিও থেকে

১৪ আগস্ট সন্ধ্যায় ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে কণক প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ-এর প্রথম ছবি "মহামায়ার দান" ছবির জন্যে কয়েকটা গান রেকর্ড করা হয়েছে সংগীত পরিচালক অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরে। মিন্টু ঘোষ রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত কণক মুখোপাধ্যায় ছবিটির কাহিনীকার ও পরিচালক। "মহামায়ার দান"-এর চিত্র গ্রহণ শীঘ্রই সুরু হচ্ছে।

তরুণ চিত্রপরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরীর পরবর্তী ছবির নাম "যদুবংশ"। বিমল করের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। আশীষ রায়ের প্রযোজনায় এলিট মুভীজের পতাকাতলে ছবিটির চিত্র গ্রহণ সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

ছবিটির প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করছেন শমিত ভঞ্জ ও অপর্ণা সেন। ছবিটির কয়েকটা গানও ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে।

গেল ২৭ আগস্ট ঝুলন পূর্ণিমার শুভদিনে এস, এস, ফিল্মস-এর প্রথম প্রয়াস "দুটি মন" ছবির চিত্রগ্রহণ ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন—পীযূষ বসু। সুর দায়িত্ব নিয়েছেন—হেমন্তকুমার ... পাধ্যায়। চিত্র গ্রহণ, সম্পাদনা ও নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে দিলী... মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রসাদ মিত্র। শ্রীমতী সুপর্ণা সেন প্রযো... ছবিটির নায়ক-নায়িকা হলেন—বৈত... কার উত্তমকুমার ও সুপর্ণা সেন। ... বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—ছায়া দেবী, ... বরুণ, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। অপ্সরা ... ছবিটির পরিবেশক।

শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী বিদেশ ফিরেই বনফুলের 'মৃগয়া'কে ... করতে শুরু করেছেন। সম্প্রতি অরুন্ধতী দেবীর পরিচালনায় সংগীত গ্রহণ হোল। অংশ নিয়ে... প্রবীর গুহঠাকুরতা ও অনুপ ... তারকা বহুল এ ছবির বিভিন্ন ... আছেন উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, ... দত্ত, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু ... পাধ্যায় এবং এক বিশিষ্ট চরিত্রে অরুন্ধতী দেবী নিজে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ নাগা... বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হবে।

অলিম্পিক পিকচার্সের 'দেবী' ... প্রায়। মধুসূদন রাও পরিচালিত এ... ছবিখানির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন সঞ্জীবকুমার, মেহমুদ, রেহমান ... ভেনাস পিকচার্সের সহ প্রতিষ্ঠ... অলিম্পিক পিকচার্স বয়সে নবীন। ... তোলা এ ছবির সংগীত পরচালক ... কান্ত প্যারেলাল। আশা করা যায় ... 'সুরা', 'সাথী' ছবির মত 'দেবী'ও ... হবে।

মঙ্গল চক্রবর্তী রচিত — পরি... ইউনিট প্রোডাকসন্স অব ইন্ডিয়ার ছবি "আলেয়ার আলো"-র চিত্রগ্রহণ ... প্রায়। গোপেন মল্লিক ছবিটির সু... নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা ... পাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ... চিত্রণে আছেন—সৌমিত্র চট্টো... অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী, কালী ... পাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জ... শেখর চট্টোপাধ্যায়, বনানী ... জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অজিতেশ বন্দ্যো... মৃণাল মুখোপাধ্যায়, সাধনা রায় ... ও রাধামোহন ভট্টাচার্য। ধানবাদ, ... মুরুন্ডী, ব্রজরাজনগর, কোডারমা ... রাজাউলি ফরেস্ট-এ ছবিটির বহি... গৃহীত হয়েছে। বিহারের রাজ্যপা... নিত্যানন্দ কানুনগো ছবিটির বহি... গ্রহণে যাতে কোন অসুবিধা না হ... যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং শিল্... কলাকুশলীদের উৎসাহ দেন। চিত্রগ্র... সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে রামানন্দ গুপ্ত ও বিশ্বনাথ নায়ক।

বি, পি, পিকচার্স ছবিটির পরি...

আসন্ন সংগীত সম্মেলন

...রাজাতি সদনে সদারং সংগীত ...ন—সর্বভারতীয় সদারং সংগীত ...নে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন ...ন্ডত ভীমসেন যোশী, মণাব্বর আলি ...সংগীতঅলংকার সনন্দা পট্টনায়ক, ...চনা যজুর্বেদী (কণ্ঠসংগীত), ... নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমজাদ ... খাঁ, ইমরাৎ খাঁ (যন্ত্রসংগীত)— ...বিরজু মহারাজ— তবলাসংগতে ...মহারাজ। স্থানীয় শিল্পী—সত্যেন ...দ, এ কানন, দীপালী নাগ। ...রিতভাবে পরে জানা যাবে।

...ন্দিরা সিনেমায় ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ...সেপ্টেম্বর অবধি সুরদাস সংগীত ...নে যন্ত্রসংগীতে থাকবেন ওস্তাদ ...রৎ খাঁ, পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, ... হালিম জাফর খাঁ, পণ্ডিত ভি জি ... সুরশ্রী কল্যাণী রায় এবং বিলায়েত ...শিষ্যশিল্পী সুজাত খাঁ। মালঞ্চ সেন ...দ)।

...চলায় কেরামৎ খাঁর পুত্র মাস্টার ...ম সবার। কণ্ঠসংগীতে— ওস্তাদ ...দ হোসেন খাঁ (কাবুল), ডাঃ এম ...গৌতম (বেনারস), প্রোঃ দীনকার ...নী (দিল্লী), কুমার মুখোপাধ্যায়, সোম ...নারী, শিপ্রা বসু, আরতি বাগচী। ...বন্দনা সেন, শর্মিষ্ঠা ও দেবলা

...সংগতে মহম্মদ সগীরুদ্দিন, কেরামৎ ...শান্তাপ্রসাদ, কানাই দত্ত, শ্যামল বসু, ...চ্যাটার্জি, মানিক দাস, বার্টোলিলি ও ...রাঘব মিত্র।

...২ শ্রাবণের রেকর্ড সংগীত

...দ্র বৈশাখের তপস্যালগ্নে যে মহা-...ার শুরু বাইশে শ্রাবণের ঘনঘোর ...ণ তার পূর্ণ প্রশান্তি। কবির নিজের ... এ যেন এক জীবন থেকে আর এক ...র তোরণদ্বারে পৌঁছানো। প্রথমটিতে ...ফোন কোম্পানী আনন্দের ডালি ...য়েছেন অনাগতকে বরণ করবার ...নায়—দ্বিতীয়টির প্রতিও যথোচিত ...নিবেদন করেছেন তরুণেতর শিল্পী-...ণ্ঠে—শ্রাবণ-দিনের কিছু গান পরি-...করে। এতে করে কবির তিরোধান-...র প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং সম্ভাবনা-... নবীন প্রতিভাদের রসিকজনের ... আনা, উভয় কাজই সুসম্পন্ন হতে ...ছ।

চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের "মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' এবং বাদল-শারা হোলো সারা' গান দুটিতে শিল্পীর অনুভব এবং গাইবার আন্তরিকতা চিত্তকে এক নিমেষে আকৃষ্ট করে। তাঁর অন্যান্য গানের মত এ গানও সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

গোরা সর্বাধিকারীর গান বহু অনু-ষ্ঠানে এবং নৃত্যনাট্যে তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছে। ২২ শ্রাবণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রেকর্ড 'পরবাসী চলে এসো ঘরে'—সেই ধারণা আরো দৃঢ় করেছে। ইনি শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক অতএব 'শান্তিনিকেতনী ঐতিহ্য' এবং আঙ্গিকসমৃদ্ধ তাঁর গান এই সংগীতধারায় অবশ্যই এক প্রশংসনীয় সংযোজন। বীথীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "আমার সকল রসের ধারা" এবং "কেন তোমরা আমায় ডাক" শোনবার মত দুটি গান শুধু গানের কাব্যসৌন্দর্যের জন্যই নয় সুকণ্ঠ শিল্পীর পরিবেশনসৌকর্যও লক্ষণীয়। শৈলেন দাস সুপরিচিত শিল্পী। তাঁর এবারের গান 'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো" এবং "চিত্ত আমার হারালো আজ"—স্ব-মানে প্রতিষ্ঠিত।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর কণ্ঠমাধুর্য ও গায়নশিল্পী সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করে তিনি হলেন বনানী ঘোষ। "আমি তোমায় আবার চাই শুনাবারে" একটি উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত এবং "সুখে আছি সুখে আছি" মায়ার খেলার গানটি অত্যন্ত উপভোগ্য। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়নশৈলীর প্রভাব গান দুটিকে বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত করেছে। আর একটি শ্রবণ-যোগ্য রেকর্ড হোল স্বপ্না ঘোষালের "যেতে যেতে চায় না যেতে' এবং 'পথ চেয়ে যে কেটে গেল—"।

প্রভাতী মুখোপাধ্যায়

অনুপকুমার ঘোষাল

বাকী দুজন শিল্পী হলেন অদিতি সেনগুপ্ত ও মেখলা পাল। এঁদের গাওয়া গানগুলি হোলো যথাক্রমে—"ছায় অতিথি এখনই কি হোলো", "রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি", "এবার ভাসিয়ে দিতে হবে" এবং "যারে তুমি ভাসিয়েছিলে"। ই পি রেকর্ড— ২২ শ্রাবণ উপলক্ষে একখানি মাত্র ই পি রেকর্ড বার হয়েছে। শিল্পী সুপ্রীতি ঘোষের গাওয়া চারখানি গান হোল "ডাকব না, ডাকব না", "ওরে আমার, হৃদয় আমার" "তোমায় নূতন করে পাব বলে" "পুব সাগরের পার হতে"। সুপ্রীতি ঘোষ স্বনামধন্যাশিল্পী। কবির গান ও সুর তাঁর কণ্ঠে রসরূপ লাভ করেছে একথা বলাই বাহুল্য।

আধুনিক গানের দুই তরুণ শিল্পী— সম্পূর্ণ অপরিচিত দুই তরুণ শিল্পীর শুধু নাম নয়, দুটি আধুনিক গানের রেকর্ডও শোনা গেল প্রাক্-পূজা সংগীত সিরিজে। লক্ষ্মীকান্ত রায় ও প্রবীর মজুমদারের সুরে গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন "বিনা দোষে দোষী হয়ে" এবং "একটু আগে তোমায় ভাবছিলাম" (কথা—সুনীলবরণ)। শিল্পীর নিজস্ব গায়নভঙ্গী ও জড়তামুক্ততা প্রশংসা আদায় করে নেবে নিশ্চয়। তবে সুর ও কথা সুন্দরতর হলে শিল্পীর কৃতিত্ব অধিকতর পরিস্ফুট হোত বলেই আমাদের বিশ্বাস। চন্দনা মুখো-পাধ্যায়ের "ঐ নীল দূর নীলে" এবং "এই ভালো লাগা রাত যেন" শুনতে ভাল লাগে মধুর কণ্ঠের জন্য। রেওয়াজ করলে শিল্পীর উপযুক্ত মানে পৌঁছতে দেরী হবে না।

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর স্মৃতি সভায়

স্বর্গত ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর তিরোধান দিবস উপলক্ষে তাঁর পুত্র, শিষ্য ও অগণিত অনুরাগী আয়োজিত রবীন্দ্র-সদনের শিব-সান্নিধ্যক, সঙ্গীতসভার জন-সমাগম দেখে আবার নতুন করে অনুভব করলাম খাঁ সাহেব শুধু যাদুকর শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সঙ্গীতরসিকদের একেবারে হৃদয়ের অতি কাছের মানুষ। তাঁর গানে পাণ্ডিত্য ছিল, উপযুক্ত তালিম ছিল, ছিল একনিষ্ঠ রেওয়াজজাত এবং অনায়াস-দক্ষতাপ্রসূত সুকঠিন তানের বিস্ময়কর মাধুর্য, ঘরানার আভিজাত্য। কিন্তু এ সকলের চেয়ে বড় ছিল তাঁর অসাধারণ রসবোধ আর সঙ্গীতানুরাগীদের প্রতি 'মহব্বৎ'। এইজন্যই তাঁর গানে পাণ্ডিত্যের সরস প্রকাশ ও সংবেদনশীলতা সকল শ্রেণীর শ্রোতাকে এমন অভিভূত করেছিল। তাঁর পরিবেশনায় রাগের অন্তর-প্রবাহী আকুলতার প্রবলবেগ শ্রোতাদের হৃদয়তটে আছাড় খেয়ে পড়ে তাদের অন্তরেও এক অনির্দ্দেশ্য আবেগে নাড়া দিত। তখন আমরা ভুলে যেতাম তিনি 'পাতিয়ালা' না 'গোয়ালিয়র' ঘরানার গায়ক। তিনি সত্যিকারের 'খেয়ালী' ছিলেন না ঠুংরী-ঘেঁষা' খেয়াল গাইতেন। শুধু মনে হোত "হারিয়ে গেছি" সেই জগতে যে জগতে 'হারানো'র মত দুর্লভ লগ্ন জীবনে কমই আসে।

গান শোনা ছাড়াও স্মৃতির এই অবগাহনে 'চিত্তশুদ্ধি' করে নেওয়াটা ছিল এ আসরের উপরি পাওনা। তাই উদ্যোক্তা-দের ধন্যবাদ জানাই।

কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন মুনাব্বর খাঁ, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস সান্যাল, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, তরুণ শিল্পী প্রভাতী মুখোপাধ্যায়। এ ছাড়া ওস্তাদ আমিনুদ্দিন দাগারের ধ্রুপদের অবতারণা স্বর্গত ওস্তাদের ধ্রুপদের প্রতি অনুরাগকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। মুনাব্বর খাঁর "হংসধ্বনি" তানের বাহারে উপভোগ্য হয়েছে। তবু শুনতে শুনতে মনে হয়েছে সর্বভারতীয় এই রাজ্যের কাছাকাছি 'ভূপালী' গাইলে কি ক্ষতি হোত? বিশেষ "ভূপালী" যখন তাঁর স্বর্গত পিতা ও গুরুর প্রিয় রাগ ছিল? এই দিনটির পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে সেইটিই সুন্দর হোত। ঠুংরী ত পিতারই 'খাস তালিম' তার আঙ্গিক বিচার বাহুল্য। পিতার 'দেবদুর্লভ' কণ্ঠমাধুর্যের অধিকারী না হলেও 'মেজাজ' অনেকটাই পেয়েছেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের "গাওতি" তাঁর পরিণততর শিল্পবোধের উজ্জ্বল নিদর্শন। মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কানাড়া" ও ঠুংরীতে আবেগ ও আন্তরিকতা অত্যন্ত চিত্তস্পর্শী। কালিদাস সান্যাল গেয়েছিলেন একটি অপ্রচলিত রাগ "সাঁঝ গিরি"। নামের মত রাগটিও মিষ্টি। আর মারবা ঠাটের অন্যান্য রাগের সঙ্গে এ রাগের পার্থক্য ও সাদৃশ্য স্বল্পপরিসরে সুপ্রদর্শিত হওয়ায় রাগের আন্দাজটিও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুমার মুখোপাধ্যায় গাইলেন "নন্দ"—যে রাগ আমীর খাঁ সাহেব বারবার গেয়ে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। আগ্রা ঘরানার ঢঙে রাগটির পরিবেশন প্রয়াসে ত্রুটি ছিল না। ওস্তাদ আমিনুদ্দিন দাগার গীত "দরবারী কানাড়া"র আলাপ ও ধামার গমক তান ও চাঞ্চল্যকারী অলংকারবর্জিত হয়ে এক শান্ত সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে, অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছে।

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুযোগ্য ভ্রাতা প্রদ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইমন-কল্যাণ'—সকলের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে ইনি ছাড়াও উদীয়মান তরুণ প্রতিভা হিসেবে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে প্রভাতী মুখোপাধ্যায় 'বড়ে গোলাম আলি খাঁর ক্ষুদে সাকরেদ। বড়ে গোলাম আলির কাছে শিক্ষার পূর্বে ইনি ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ, মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সহজাত স্বাভাবিক প্রতিভা উপযুক্ত শিক্ষায় মার্জিত হওয়ার দরুনই বোধহয় গ্রহণশীলতায় ব্যাপ্তি এমন উজ্জ্বল। 'মালকোষ' খাঁ সাহেবের প্রিয় রাগ এবং সীমিত সময়ে ওস্তাদের গায়ন-শিলীর এক চিত্তগ্রাহী রূপ মেলে ধরে সবাইকে ইনি চমকে দিয়েছেন, সুন্দর কণ্ঠও অনাড়ম্বর আকর্ষণ। ভবিষ্যতে স-বিস্তারে এঁর গান শোনার ইচ্ছে রইল।

যন্ত্র-সঙ্গীতে 'ইমন-কল্যাণ' রাগে মহম্মদ দবীর খাঁর বীন এক মর্যাদামণ্ডিত ধ্রুপদী পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

সেতারে ইমরাৎ খাঁ ও কল্যাণী রায় 'এমায়েত খাঁ ঘরানার গায়ন-শৈলীর এক সমৃদ্ধ সুন্দর অবয়ব পরিস্ফুট করেন। কল্যাণীর 'শ্রী' বাহুল্যবর্জিত কিন্তু শ্রী-মণ্ডিত। ইমারৎ খাঁর 'মালকোষ' তার সপাট তান—লাগডাট ও মীড়ের বাহারে দীপ্ত।

পণ্ডিত ভি জি যোগের 'হাম্বীর' দ্রুত-গতি-তানের ঝলমলানী ও ছন্দে-চাতুর্য দর্শকদের প্রচুর হাততালি পেয়েছে। তবে অভিজ্ঞ এবং প্রবীন এই শিল্পীর কাছে আমরা আরো পরিমিত বোধসম্পন্ন ও পরি-শিল্পকৃতির আশা করেছিলাম।

যন্ত্র-সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর সরোদ।—'দরবারী-কানাড়া'র আলাপ ও 'কিরবাণী'র শিল্পীর ধ্যান, রসবোধ ও রঙিন মণেটীর যে ছবি ফুটে উঠল ওস্তাদ আলি আকবর খাঁকে বাদ দিলে তার ধারেকাছেও অধুনাকালের কোন সরোদী পৌঁছতে পারেন কিনা সন্দেহ। আলাপের 'জোড়' অঙ্গ—সুরবাহারের 'তার-পরণ'-এর ঢঙে তবলাসঙ্গত বাজিয়ে আলাউদ্দিন ঘরাণার ধ্রুপদী ঐতিহ্য-র প্রতি শিল্পী আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন। এরপর এ রীতি হয়ত চালু হবে এবং হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়—কিন্তু ইদানীংকালে প্রথম অবতারণার কৃতিত্ব হবে কলকাতার সম্মেলন-কর্তাদের অব-হেলিত শিল্পী বাহাদুর খাঁর। সঙ্গতে আফাক হোসেন, শ্যামল বসু, সগীরুদ্দিন, কেরামৎ খাঁ, চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতার নামী সঙ্গীতিয়ারা প্রায় সবাই ছিলেন। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হলাম শিশির-কণা ধরচৌধুরীর মত এক অসাধারণ প্রতিভা-ময়ী প্রথম শ্রেণীর শিল্পীকে উদ্যোক্তারা বিস্মৃত হলেন কি করে তিনি কলকাতায়ই আছেন এবং এ-আসরে দক্ষিণার কোনো প্রশ্নও ওঠে না। তবু তাঁর বাজনা আমরা শুনতে পেলাম না কেন?

●

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির মাধ্যমে তরুণ কণ্ঠশিল্পী অনুপকুমার ঘোষাল আত্মপ্রকাশ করেন। এই ছবির সবকটি গানই তাঁর গাওয়া এবং নিজস্বভঙ্গীতে। শ্রোতারা তাঁর এই বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ। এখন তার গুণমুগ্ধের সংখ্যা অনেক। অথচ আত্মপ্রকাশেই যিনি বাজিমাৎ করেছেন পত্র-পত্রিকাগুলি কিন্তু তাঁর কোন উল্লেখও করে নি। গুপী গাইন বাঘা বাইন ছবি সম্পর্কে অসংখ্য কথা বলা হয়েছে। সঙ্গীতাংশ এই ছবির সাফল্যের মূলে অনেকখানি। এ প্রসঙ্গে একদিন তিনি দুঃখপ্রকাশও করেছেন আমাদের প্রতি-নিধির কাছে। 'সাগিনা মাহাতো' এবং 'মৃগয়া' ছবিতে আবার শ্রোতারা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাবেন এবং সমান মুগ্ধ হবেন আশা করা যায়।

—চিত্রাঙ্গদা

গন্ধর্ব

বাংলাদেশের নাট্যজগতে 'গন্ধর্ব' একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নাট্যআঙ্গিক ও নাট্য-সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সফলোর সঙ্গে যে ক'টি গোষ্ঠী চালিয়ে যেতে পেরেছেন, তাদের মধ্যে 'গন্ধর্ব'র প্রয়াস নিঃসন্দেহে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে অস্ফুট নাট্যোপলব্ধি। মঞ্চের উপর প্রতীকী বিন্যাসে নাটকের প্রযোজনা, সাগরপারের নাট্যলোক থেকে নতুন চিন্তা অভিনয়ের ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলা, শুধু এই নিয়েই গোষ্ঠীর শিল্পীরা নিজেদের নাট্য-চেতনা ও নাট্যানুশীলনের স্বাতন্ত্র্যকে জাহির করতে চাননি। তাঁরা ভেবেছেন তাঁদের এই নাট্যানুশীলন নতুন এক হিল্লোলে তাঁদের আনন্দ দেবে তখনই, যখন তাঁরা দেখবেন বাংলাদেশের নাট্যানুরাগী প্রতিটি দর্শক তাঁদের বিশিষ্ট চিন্তার মৌলধর্মের সঙ্গে সেতুবন্ধন করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। শুরু থেকে তাই তাঁদের চেষ্টা কিভাবে প্রতিটি মানুষের মনে পরিবর্তিত চিন্তায় নাট্যলোক সম্পর্কে নতুনভাবে আলোক-সম্পাত করা যায়। তাই শুধু অভিনয় নয়, পত্রিকা প্রকাশ, নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা চেষ্টা করেছেন কিভাবে বাংলার নাট্য-আন্দোলনের সজীবতাকে চিরন্তন করে তোলা যায়। এই প্রচেষ্টায় নিষ্ঠার যে কোন শৈথিল্য নেই, তার প্রমাণ আজো 'গন্ধর্বে'র নাট্যপ্রযোজনা আমাদের শিল্প-চিন্তাকে দোলা দেয়, আমাদের জীবন-বোধকে আন্দোলিত করে।

এগারো বছর আগে 'গন্ধর্ব' যাত্রা শুরু করেছিল নাট্যানুশীলনের পথে। সময়টা ছিল ১৯৫৮-র মে মাস। আন্দোলন সৃষ্টি-কারী আই-পি-টি-এ তখন ভেঙে গিয়েছে, সামগ্রিক চিন্তার যে ঐক্য ছিল তা বেশ কিছু পরিমাণে প্রতিহত ও বিপর্যস্ত। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজের কিছু ছাত্র-ছাত্রী তখন আই-পি-টি এর সঙ্গে মোটামুটি আত্মিকভাবে জড়িত। সবাই তখন এঁরা চিন্তা করছেন নতুন একটা কিছু করার। এই চিন্তাকে আরো জোরদার করে তুললো আরো কয়েকটি নাটকপাগল এসে। সবাই চাইলো একটা নাটক অভিনীত হোক। সুযোগও একটা মিলে গেলো। মন-মোহন পাঁড়ের বাড়ীতে অভিনয় করার একটা আমন্ত্রণ পাওয়া গেলো। শুরু হোল নাটকের মহলা। Rising of the Moon অবলম্বন করে লেখা হোল 'সূর্যলগ্ন' নাটক। একটা ঘর ভাড়া করা হোল। এই সব ছেলেরা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে মহলার খরচ চালাতে লাগলেন। উদ্যমে, উৎসাহে এতটুকু মন্থরতা এলো না। নির্দিষ্ট দিনে অভিনীত হোল নাটক। প্রথম প্রচেষ্টা প্রত্যাশিত সাফল্য আনলো। দর্শকরা জানালেন অভিনন্দন, শিল্পীদের মনে জাগলো অনুরণন। দুয়ের মেলবন্ধনে গড়ে উঠলো 'গন্ধর্ব'—একটি প্রতিশ্রুতিময় নাট্যগোষ্ঠী। এরপর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গন্ধর্ব' ১৩৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে তার স্থায়ী আসর বসালো।

'সূর্যলগ্ন' সুপ্রযোজিত হবার পর প্রশ্ন এলো—অতঃকিম। তখনকার চারদিকে নাট্যআবহাওয়া সম্পর্কে গোষ্ঠীর পরি-চালক দেবকুমার ভট্টাচার্য বলছিলেন—'চারদিকে নাটকের জোয়ার আজকের মতো লাগেনি। তবু নেই নেই করেও যা ছিল তাদের মধ্যে একটা কথা চালু ছিল যে 'ভালো কিছু করতে হবে।' আমাদের প্রথম সমস্যা হোল এই 'ভালো কিছু'র বিচার নিয়ে। আমরা বললাম যে 'ভালো কিছু' 'মহৎ কিছু' বা 'সৎ কিছু' বলে কিছু নেই, আসলে যা আছে তা হোল 'ঠিক কিছু'। বিচার হবে না ভালো বা মন্দের বিচার হোক ঠিক বা ভুলের। চিন্তা করব না কম্পিটিশান নিয়ে— কাজ করবো কনট্রিবুশান-এর মনোভাব নিয়ে।'

সেই 'ঠিক কিছু' করার তাগিদেই 'গন্ধর্বে'র শিল্পীরা প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে ঋত্বিককুমার ঘটকের 'দলিল' মঞ্চস্থ করলেন। এই নাটক নির্বাচন নিয়ে যে সব প্রশ্ন উঠেছিল তার উত্তরে 'গন্ধর্বে'র বক্তব্য হোল, 'দলিল' নাটকে রক্তমাংসের কিছু মানুষের জীবনের তাপ অনুভব করা যায়, তাই দেশবিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও যখন পুরোনো মনে হয়, তখনও সেই মানুষগুলির আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনা আমাদের স্পর্শ করে, আমরা আন্দোলিত হই। এখানেই দলিলের সার্থকতা। দ্বিতীয়ত 'দলিল' নাটকের নর-নারীর সঙ্গে বাঙালীর নাড়ীর যোগাযোগ। আর তাদেরই নিয়ে যে নাটক গড়ে উঠতে পারে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের।

সাধারণ ঘটনার মধ্যেও যে নাটকের উপাদান পাওয়া যায়, সেই দিকটিকেও আমরা স্পষ্ট করতে চেয়েছি।' 'গন্ধর্বে'র দ্বিতীয় নাটক হোল 'অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি'। এই নাটকের সমস্যাও আমাদের আজকের জীবনের অত্যন্ত বাস্তব সমস্যা। আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সংকটের মধ্য দিয়ে ক্রমে গড়ে উঠছে নাটক সৃষ্টির উপযুক্ত পটভূমি, 'গন্ধর্বে'র লক্ষ্য তাকে স্পষ্টতর করে তোলা।

এরপর দশ-এগারো বছর ধরে 'গন্ধর্ব' বহু নতুন চিন্তাসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটকের প্রযোজনা করে বাংলার নাট্যআন্দোলনকে বেগবান করেছে। নাটকের তালিকায় রয়েছে মন্মথ রায়ের 'অমৃত অতীত', মনোজ মিত্রের 'মোরগের ডাক', 'পাখীর চোখ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'শেষরক্ষা' অতনু সর্বাধিকারীর 'যক্ষ' ও 'অন্য স্বর' অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নায়িকার নাম নিয়তি' ও 'সন্ধ্যার রং', অরুণ মুখোপাধ্যায়ের 'একা নয়' (ম্যাক্সিম গোর্কির কাহিনী অবলম্বনে), উৎপল দত্তের 'মধুচক্র' (বার্ণাড শ'র মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেসন অবলম্বনে), বলবন্ত গার্গীর 'অংকুর' কৃষ্ণ ধরের 'এক রাত্রির জন্য' (আধুনিক কাব্যনাট্য), 'ফুলওয়ালী' গিরিশংকরের 'রক্তকরবীর পরে', সুরঞ্জন মিত্রের 'নেপথ্য দর্শন', চিত্তরঞ্জন ঘোষের 'দেবরাজের মৃত্যু', রাম বসুর 'নীলকণ্ঠ' (আধুনিক কাব্যনাট্য), তৃপ্তি চৌধুরীর 'মাটির রং সবুজ', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সূর্যের মতো সমুদ্র', ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'একচক্ষু', মমতা চট্টোপাধ্যায়ের 'উড়োপাখির ছায়া', মন্মথ রায়ের 'ভূ-ভার-হরণ কর্পোরেশন', 'অনিরুদ্ধ' প্রভৃতি।

প্রতিটি নাটকেই 'গন্ধর্বে'র শিল্পীরা তাঁদের স্বকীয় নাট্যচিন্তার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। নাটকগুলোর বিষয়বস্তুতে যেমন জীবনবোধের গভীরতর দীপ্তি আছে, তেমনই মঞ্চপরিকল্পনায় তাঁদের সুগভীর শৈল্পিক প্রবণতা নাট্যানুরাগীদের করেছে বিমুগ্ধ। নাটকের মৌল ধর্মের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মঞ্চসজ্জায় সাজেসটিভনেস আনার

ব্যাপারে 'গন্ধর্বে'র কৃতিত্ব কোন অংশে কম নয়। কাব্যনাট্য পরিবেশনও 'গন্ধর্ব' স্বতন্ত্রের দাবী নিঃসন্দেহে করতে পারেন।

'গন্ধর্বে'র সাম্প্রতিক দুটি প্রযোজনা 'এক নয়' ও 'মধুচক্র' বাংলা নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'একা নয়' নাটক কেন 'গন্ধর্ব' পরিবেশন করছে তার কৈফিয়ৎ তাঁরা দিয়েছেন দর্শক সমাজের কাছে—'বর্তমান যুগের আধুনিক সমস্যা কি? অর্থনৈতিক সমস্যা বাদ দিলে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব, সংকীর্ণতা, হতাশা, নৈরাশ্য প্রভৃতির কাছে মাথা নত করা। আমরা মনে করি বর্তমান সমাজে বাঁচতে গেলে এ সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং এই সমস্ত সমস্যা যা আমাদের কাজে বাধা দেবার পক্ষে যথেষ্ট তাকে যে কোন ভাবে হটাতে হবে। 'একা নয়' নাটকের প্রথমাংশে একক স্বাধীনতার দায়িত্বহীনতা ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের পরিণামের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী অংশে যৌথজীবনের বিজয়যাত্রার মধ্যে অনেকের শুভকামনায় একজনের আত্মত্যাগের আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে। *যৌথচেতনারবাণীমুখর এই নাটকের মূল কথাই হোল—একা নয়, বাঁচার পথ মানেই যূথবদ্ধতার পথ, নাটকের একটি চরিত্র যে উপযুক্ত সমস্যায় অসুস্থতার অনুপ্রেরণার মাঝে নাটকের সমাপ্তি।'*

'গন্ধর্বে'র শিল্পীরা নাট্যানুশীলনে কতোটা আগ্রহী তার প্রমাণ ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ, ও নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন। দীর্ঘ আট-ন বছর 'গন্ধর্ব' পত্রিকা বাংলার নাট্যানিরীক্ষার প্রতিটি পর্যায়কে বাংলাদেশের মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। বিশ্বের নাট্য-আন্দোলনের ধারা আজ কোন পথে প্রবাহিত, তার ওপরেও করেছে ব্যাপ্ত আলোকসম্পাত। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটক প্রকাশ করে বাংলার নাট্যরচনার ক্ষেত্রে উদ্দীপনা এনেছে। সাহিত্যিক বিমল কর—এই পত্রিকায়ই প্রথম নাটক লেখেন, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অ্যাবসার্ড নাটকগুলো এতেই প্রথম প্রকাশের ভাষা পায়। যাঁরা নাটক সম্পর্কে সাধারণভাবে কৌতূহলী, যাঁরা নাটক নিয়ে দুরূহ গবেষণায় রত, সবার কাছেই গন্ধর্ব পত্রিকা বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য মেলে ধরতে পেরেছে। অর্থাভাবে কিছুদিন হোল এই অসাধারণ নাট্য ত্রৈ-মাসিকটির প্রকাশের আলো স্তিমিত হয়ে গেছে। ব্যাপারটা অতি দুঃখের এবং বেদনার। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রতিটি নাট্যানুরাগীরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত, কেননা 'গন্ধর্ব' পুনঃপ্রকাশিত হোলে সামগ্রিকভাবে বাংলা নাট্যসংস্কৃতিরই গৌরব সমুন্নত হবে।

নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন 'গন্ধর্বে'র আর একটি স্মরণীয় প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রশত-বার্ষিকী বছরে পার্ক সার্কাস ময়দানে আয়োজিত পিস কনফারেন্সের মেলায় ও মার্কাস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে মেলা প্রাঙ্গণে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা নাট্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করে-ছিলেন। এই প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পর্কে এ'রা বলেছেন—'নাট্যসমাজ সম্বন্ধে জন-সাধারণের এখনো যে বিপরীত ধারণা রয়েছে সেটা দূর করতে গেলে জন-সাধারণকে মঞ্চের সঙ্গে জড়িয়ে রাখা দরকার। এই জন্য আমাদের বিশ্বাস যে এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে নাট্যপ্রদর্শনীর প্রয়োজন আছে।' এই নাট্যপ্রদর্শনীতে ছিল—বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম নাট্য-পত্রিকা; জাতীয় নাট্যশালার উপর প্রথম প্রবন্ধ (হিন্দু দর্শন), বৃটিশ শাসিত বাংলাদেশে নাট্যনিয়ন্ত্রণ 'একে কি বলে সভ্যতার' প্রথম অভিনয়ের শিল্পী তালিকা (গিরিশবাবুর হাতের লেখা); গিরিশবাবু ও দানীবাবুর স্ব-স্ব অভিনয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ (স্বহস্ত লিখিত); উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, বিনোদিনী দাসী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষীরোদপ্রসাদ, ভুনীবাবু প্রভৃতির হাতের লেখা ও চিঠি; ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনের শেষ কবিতা, 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (তৎকালীন সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ)-র পাণ্ডুলিপি, প্রথম প্রকাশিত লিফলেট ও বুকলেট নাটক; খেউড় নাটকের অদ্ভুত ধরনের বিজ্ঞাপন, নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও দানীবাবু ব্যবহৃত তরবারী, ক্ষীরোদ-প্রসাদের চশমা, দানীবাবুর পাম্পশু জুতো ও লাঠি, শিশিরকুমার ব্যবহৃত গদি, চাদর ও 'মাইকেল' নাটকে ব্যবহৃত তোয়ালে।

এ ছাড়া ছিল বহু সমসাময়িক নাট্য-সংস্থা যথা 'বহুরূপী', 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ', 'লোকনিক' ও 'গন্ধর্ব' প্রভৃতির বিভিন্ন নাটকের ছবি, শো-বোর্ড, পোস্টার ইত্যাদি। এর সঙ্গে ছিল প্রচুর ঐতিহাসিক ও আধুনিক পোস্টারের প্রতিলিপি। প্রদর্শনীতে বিক্রয়ের জন্য ছিল অজস্র বই, নানা পত্র-পত্রিকা, দেশী ও বিদেশী প্রায় সমস্ত বিখ্যাত নাট্যকারের নাটক এবং নাটক ও নাটকের আঙ্গিকের ওপর লেখা বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

গন্ধর্ব নাট্যপ্রযোজনা করে নিজস্ব কিছু জিনিস করেছে। যেমন আলোক-সম্পাতের কিছু উপকরণ, একটি টেপ-রেকর্ডার, কিছু সেট, সীন ইত্যাদি। শুধু কলকাতায় নয় কলকাতার বাইরেও অনেক জায়গায় 'গন্ধর্ব' তাদের বহু নাটক পরিবেশন করে এসেছে। 'গন্ধর্বে'র আগামী নাটকের (নাম এখনো হয়নি) বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিচালক দেবকুমার ভট্টাচার্যের কাছে যা শুনেছি তা হোল এই—একটি আবেগপ্রবণ লোক স্বপ্নের জগতে বিলীন হয়ে নাটকের চরিত্র খুঁজে চলে, খোঁজার পর হয়তো পায়ও কিছু। কিন্তু এই স্বাপ্নিক মানুষটি যখন বাস্তবের আলোয় সেই সব চরিত্রের অর্থহীন অস্তিত্বের শূন্যতার ছবি দেখে তখন তার কাছে স্বপ্নের আমেজ স্তিমিত হয়ে যায়। বাস্তব তার কাছ থেকে সত্য হয়ে ওঠে। তখন সে পরিকল্পনা নেয় এই বাস্তবের আলো-আঁধার থেকেই গড়ে নিতে হবে চরিত্র লিখতে হবে বাস্তব জীবনসম্বন্ধ নাটক।

অ্যাবসার্ড নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে 'গন্ধর্বে'র বক্তব্য হোল—অ্যাবসার্ড নাটকের মধ্যে যে দর্শন আছে তাকে উপলব্ধির খাতিরে স্বীকার করা যায়, কিন্তু তাকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মঞ্চে তুলে ধরার কোন যুক্তি নেই। এই সব নাটকে প্রতিভাত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত জীবনের বিষণ্ণতাকে, একাকীত্বের নির্জনতাকে নতুন করে মঞ্চে আমার মধ্যে কোন গভীর উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। প্রত্যেকের মাঝে একটা ব্যবধান থাকলেও, সেই দূরত্ব সরিয়ে দিতে হবে কম্যুনিকেট করতে হবে সবার সঙ্গে। ভাবতে হবে একটি আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে আমরা সবাই একটি লক্ষ্যের দিকেই ছুটে চলেছি। 'গন্ধর্বে'র ধারণা এই সংহতিবোধ বাংলার সাম্প্রতিক নাট্যআন্দোলনকে ব্যাপ্তি দিতে দ্রুত সাহায্য করবে।

—দিলীপ মৌলিক

অজয় বসু

স্টেডিয়ামের কি হলো?

কলকাতায় স্টেডিয়ামের কি হলো?

প্রশ্নটি আনকোরা নয়। দীর্ঘদিনের পুরানো। এই শতকের তিন দশকে প্রথম উচ্চারিত এই প্রশ্ন গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নানা কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শব্দ ব্রহ্ম, তার বিনাশ নেই। কিন্তু স্টেডিয়ামের দাবী ঘিরে যে কোলাহল তার অস্তিত্ব যে কতোটুকু বিগত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের খতিয়ানে তা বুঝে বোধহয় আমরা এতোদিনে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি! এই দাবীর গলা যতোই চড়ুক না কেন, স্টেডিয়াম গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা যাঁদের হাতে রয়েছে তাঁদের পাষাণচিত্তে চড়া গলাও মিনমিনে ধাক্কা দিতে পারছে কিনা সন্দেহ।

অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বোধহয় মহানগরীর মেয়র। তাই অবিলম্বে কলকাতায় স্টেডিয়াম করার দাবীতে তিনি এক আন্দোলন গড়ার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। যতো তাড়াতাড়ি তিনি এই কাজে নেতৃত্ব দেন, কলকাতার যুবকদের বজ্রমুষ্ঠি শূন্যে তুলে স্টেডিয়ামের দাবীতে আওয়াজ তোলার জন্যে পথে নামতে পারেন ততোই মঙ্গল! কারণ, মেয়র নিজে এক রাজনীতিক দলের নেতা। দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে এক সুসংহত আন্দোলন করায় রাজনীতিক দলের মুন্সীয়ানা আছে। তাই আশা করতে পারা যায় যে স্টেডিয়াম গড়ার দাবী হাতে নিয়ে রাজনীতিকেরা যদি কলকাতার ক্রীড়ামহলের বহু যুগের জমা চোখের জল মুছিয়ে দিতে কোমর কষে এগোন তাহলেই কাজের কাজ করে তোলা যাবে।

কলকাতায় স্টেডিয়াম নির্মাণের দাবী হাতে করে রাজনীতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে আজ আন্দোলনের পথে নামতে যে হচ্ছে, সেটা দুঃখের কথা। ইংরেজ নয়, কংগ্রেসও নয়, পশ্চিম বাংলার শাসন ভার এখন লোকপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের হাতে। সাধারণ মানুষের মনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের যে ভাবমূর্তি আঁকা রয়েছে, ফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত রাজনীতিক কর্মী এবং সাধারণ মানুষ যদি আজ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হন তাহলে কি সেই ভাবমূর্তি অটুট থেকে যাবে?

শাসনভার হাতে নিয়ে ফ্রন্ট সরকার একটি স্বতন্ত্র ক্রীড়া দপ্তর প্রতিষ্ঠিত করে পশ্চিম বাংলার ক্রীড়ামহলকে নতুন আশায় উজ্জীবিত করেছিলেন। তখন মনে হয়েছিল যে বাংলাদেশের ক্রীড়াজীবন সম্পর্কে সরকারী নীতিতে বিপ্লবের অংকুরোদ্গম ঘটেছে এবং কালে সেই বীজ মহীরুহে রূপান্তরিত ও ফলে ফুলে মুকুলিত হয়ে উঠবে। তারপর কয়েক মাস কেটেছে। হয়তো তেমন বেশি সময় নয়। তাই সেদিনের ধারণা এখনও সাধারণের মন থেকে পুরোপুরি সরে না গেলেও, খেলাধুলো সম্পর্কে যে সব সাধু সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছিল সেগুলির দিকে কাজের হাত যদি এখনই না বাড়ানো হয় তাহলে প্রাথমিক প্রত্যাশা যে প্রচণ্ড মার খাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ফ্রন্ট সরকার শাসনভার নিয়েই ঘোষণা করেছিলেন যে কলকাতায় অবিলম্বে একটি উপযুক্ত স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী সেদিন প্রকাশ্যেই বাংলাদেশের ক্রীড়ামোদী জনসাধারণকে মাত্র কুড়িটি মাস অপেক্ষা করতে বলে জানিয়েছিলেন যে হয়তো মে মাসেই ইডেনে সর্বার্থক স্টেডিয়াম গড়ার কাজে হাত দেওয়া হবে।

গত মে মাসের প্রথম দিনটিকে সরকারের দখলীকৃত ইডেন উদ্যানে ভজনখানেক মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলা হয় যে ইডেনে সর্বার্থক স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে, তবে ইডেনে পাশ্চিমশালী ক্রীড়াকেন্দ্র তৈরীর বিপক্ষে যে অভিমত রয়েছে সেটিও বিবেচনা করা হবে। তারপর আরও কয়েক মাস কেটেছে, কলকাতার ফুটবল ঘিরে গড়ের মাঠে আরও বেশ কদিন ইঁট ছোঁড়াছুঁড়ি করা হয়েছে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা পাকিয়ে তোলার জন্যে স্বভাব-দুর্বৃত্তরা হাতের আস্তিন গুটিয়েছে, তবু প্যাকা স্টেডিয়াম গড়ার পথে গড়ের মাঠে কোথায়ও, মায় ক্রিকেট উদ্যান ইডেনেও একখানি ইঁটও জড়ো করা হয়নি।

শুধু সেই উচ্চারিত আশ্বাস বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, স্টেডিয়াম হবে, হবে। এ আশ্বাস কিন্তু 'ভুতের রাজার' কণ্ঠনিঃসৃত 'জবর জবর বর' নয় যে হবে বলামাত্রই আমাদের চোখের সামনে আধুনিক কায়দার পাকা একটি স্টেডিয়াম ভেসে উঠবে। তাই আশ্বাসের ছায়া ছাড়া স্টেডিয়ামের কোনো কায়ার সন্ধান না পেয়ে সাধারণ ক্রীড়ামোদী এখনও যথারীতি কপাল চাপড়ে শুধাচ্ছেন, স্টেডিয়াম কবে হবে!

কবে হবে এবং কোথায় হবে? দুটি প্রশ্নই অঙ্গাঙ্গী জড়িত।

ইডেনে সর্বার্থক স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনাই বা কেন? ইডেন ছাড়া ওই ময়দান অঞ্চলে কি আর ফাঁকা জমি নেই?

ইডেনে প্রস্তাবিত সর্বার্থক বা কম্পোজিট স্টেডিয়াম নামক বস্তুটি আসলে কি? ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় খেলা যাতে এই একই ক্রীড়াকেন্দ্রে হতে পারে তারই জন্যেই বোধহয় এই সর্বার্থক পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনার কাঠামো সম্পর্কে মনে মনে একটি ধারণা গড়ে তোলার সময় কি চিন্তা করা হয়েছে যে ইডেনে প্রস্তাবিত সর্বার্থক স্টেডিয়ামে আধুনিক মাপের একটি সিন্ডার ট্র্যাক নির্মাণ করা যাবে? যেখানে একালের উপযোগী বড়সড় অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার আসর বসানো যাবে?

বাংলাদেশে তেমন জনপ্রিয়তা না থাকলেও অ্যাথলেটিকসই জাতির পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান। বিশ্ব ক্রীড়া ওলিম্পিকেও অ্যাথলেটিকদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। তাই কোনো স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা ঘিরে চিন্তা করার সময় একটি অ্যাথলেটিক ট্র্যাক নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার ওপরই সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ইতালীয় স্থপতি মিঃ ভিটেলজির এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান ছিল বলেই তিনিও ইডেনে তথাকথিত সর্বার্থক স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রস্তাবকে আমল দেন নি। তাঁর পরিকল্পনার খসড়া ছিল ক্রিকেট বাদ দিয়ে অন্য নানান খেলার আসর বসাবার উপযোগী এক স্টেডিয়াম বানানো। নানান খেলার ব্যবস্থা সেখানে করা গেলে সেটিকেও কম্পোজিট বা সর্বার্থক স্টেডিয়াম বলা চলতো।

কিন্তু ইডেনে যে সর্বার্থক স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বা যে পরিকল্পনার কথা লোকমুখে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে পরিকল্পনায় কি অ্যাথলেটিক ট্র্যাক নির্মাণের প্রস্তাব সংরক্ষিত রয়েছে? ক্রিকেট মাঠের আধুনিক মাপের চাহিদা মিটিয়ে কি সেই পরিধির চারপাশে বৃত্তাকারে চারশো মিটার মাপের একটি ট্র্যাক গড়া যেতে পারে? যদি না যায় তাহলে ওই তথাকথিত সর্বার্থক স্টেডিয়ামে একাধারে বড়সড়

অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতা এবং টেস্ট ক্রিকেটের আসর কি করে সাজানো যাবে?

আর যদি ইডেনে তথাকথিত সর্বার্থক স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক ট্র্যাক নির্মাণের কোনো পরিকল্পনা না থাকে তাহলে অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে তাও ভেবে দেখা দরকার। স্টেডিয়াম থাকবে, কিন্তু তা হবে অসম্পূর্ণ। স্টেডিয়াম না থাকাটা আজ মহানগরীর পক্ষে লজ্জাকর, তেমনি স্টেডিয়াম থেকেও সেই স্টেডিয়ামে ট্র্যাক না থাকাটা সমানই লজ্জাজনক হয়ে দাঁড়াবে না কি?

স্টেডিয়াম গড়ার কথা উঠলেই অধুনা ইডেনের কথা তোলা কেন হয় তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। কলকাতার প্রয়োজন একটি বড়সড় ফুটবল স্টেডিয়াম, যেখানে অ্যাথলেটিকস, হকি এবং ক্রিকেট বাদ দিয়ে আরও পাঁচরকম খেলার ব্যবস্থা করা যায়। এই প্রয়োজন তো গড়ের মাঠের অন্য অঞ্চল মিটোতে পারে। অ্যালেনবরায় ঠাঁই না পেলে আরও অনেক ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে। সেগুলিকে ছেড়ে রেখে সমস্ত দৃষ্টিটিকে কেবলই ইডেনের দিকে প্রসারিত করা হচ্ছে কেন? এই দৃষ্টি অস্বচ্ছ। এবং এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ইডেনের ক্রিকেটী ঐতিহ্য অস্বীকার করা হচ্ছে। নির্দ্বিধায় বলবো যে ইডেনে বর্ষায় নিয়মিত ফুটবলের লাঙল চষা হলে ক্রিকেট উদ্যানের অস্তিত্ব বিপন্ন হবেই। কাগজে-কলমে হিসেব মিলিয়ে যতোই বোঝাবার করা হোক যে ফুটবল-ক্রিকেট এক মাঠে খেলা চলতে পারে, আসলে এই ব্যবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে ইডেন ক্রিকেট উদ্যান থেকে কার্যত একটি ফুটবল মাঠেই পর্যবসিত হতে বাধ্য হবে। যদি লক্ষ্য তাই হয় তাহলে খোলাখুলি সেই কথা বলেই ইডেনে তথাকথিত সর্বার্থক স্টেডিয়াম বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক। ফুটবল-ক্রিকেটে সন্ধি স্থাপনের ঠুনকো অজুহাত না তোলাই ভাল। এই অজুহাত তুললে তা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর হয়ে দাঁড়াবে।

ময়দানের অন্য অঞ্চলে নাকি জমি পাওয়ার অসুবিধা আছে। ওই অঞ্চলের অনেকটা কেন্দ্রীয় সরকারে এক্তিয়ার। কিন্তু রাজ্যের প্রয়োজনে পাওনা-গণ্ডা উপুড়হস্ত করার জন্যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাবর সাধু সংকল্প কি পশ্চিম বাংলা সরকার গ্রহণ ও ঘোষণা করেননি? জীবনের অন্য ক্ষেত্রে যদি সেই আন্দোলন চালানো যেতে পারে তাহলে এক্ষেত্রেই বা সঙ্কোচ কিসের? আইনত এক্তিয়ার যে পক্ষেরই হাতে থাকুক, জমি বাংলাদেশেরই। এবং বাংলার জনসাধারণের কল্যাণে সেই জমি ব্যবহারের দাবী নস্যাৎ করার নৈতিক অধিকার কেন্দ্রের নেই। এ সম্পর্কে কেন্দ্রের সুস্পষ্ট বক্তব্য যে কি তা জানতে চাওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। যদি হয় তাহলে তা জানতে চাওয়ার এই অনুকূল মুহূর্ত। রাজ্য সরকার অন্য অনেক বিষয়েব মতো গড়ের মাঠের অংশ বিশেষ জনকল্যাণে হাতে পাওয়ার জন্যে নতুন আওয়াজ তুলতে পারেন না?

কিন্তু স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে কথা অনেক হয়েছে। কথায় কথায় দিস্তে দিস্তে কাগজের আদ্যোপান্ত ভরে উঠলেও কাজের কাজ বিশেষ হয়েছে বলে মনে করা যায় না। পারস্পরিক স্বার্থের গাঁটছাড়ায় যাঁরা জড়িয়ে রয়েছেন তাঁরা স্টেডিয়াম গড়ার প্রধান অন্তরায়, একথা এতোদিন আমরা শুনে আসছিলাম। বিশ বছরের শাসনকালে কংগ্রেসও কলকাতায় স্টেডিয়াম নির্মাণে সনিষ্ঠ কার্যক্রম হাতে নেয় নি—এ অভিযোগও অশ্রুত নয়।

কিন্তু আজ অবস্থা বদলে গিয়েছে। তাই প্রশ্ন, এখনই কেন স্টেডিয়াম নির্মাণে আশানুরূপ তৎপরতা দেখা যাচ্ছে না? কলকাতার স্টেডিয়াম হলে টিকিট পাওয়ার পথে ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের হাহাকার ঘুচতে পারে, প্রতিদিনের দুর্ভোগ ভোগের অভিশাপ থেকে তাঁরা মুক্তি পেতে পারেন, যে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গড়ের মাঠে বড় ফুটবলের আসর বসে তার শাপমোচনও হতে পারে। মেঠো হাঙ্গামা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মূলেও আছে এই অস্বাস্থ্যকর পরিপার্শ্ব। সুতরাং স্টেডিয়াম গড়ায় আর দেরী করা চলে না।

কলকাতার ক্রীড়ানুরাগী জনসাধারণের স্টেডিয়াম সম্পর্কে হতাশা দীর্ঘদিনের। অভিজ্ঞতাও নিতান্তই তিক্ত। সেই নৈরাশ্যের বোঝা আরও দুর্বহ না করে এবং মেয়রকে আন্দোলনের পথে পা বাড়াবার আর সুযোগ না দিয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকার কি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজে হাত দেওয়ার যৌক্তিকতা অবিলম্বে উপলব্ধি করতে পারেন না? রাজ্যে ক্রীড়াদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সভা-সমিতিতে ভাষণ দিতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী অগুণিত আশ্বাসবাণীও উচ্চারণ করছেন—খেলা-ধূলার প্রসার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, ক্রীড়ামহল থেকে বাস্তুঘুঘুদের উৎখাত করা হবে, কলকাতার স্টেডিয়াম গড়া হবে। কিন্তু মুখের কথাই কি অমৃত সমান যে চিরদিন তা শুনে শুনেই আমাদের পরিতৃপ্ত থাকতে হবে! কথা ঢের হয়েছে, এখন কাজ চাই। খেলা দেখার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে কলকাতার ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের দাবী তাই, এখনই স্টেডিয়াম চাই। যে দাবী সোচ্চার হয়েছে মেয়রের ঘোষণায়।

জনকল্যাণ চিন্তায় এই সঙ্গত দাবী কি এখনই সুবিবেচনা ও সুবিচারের প্রত্যাশা রাখে না?

খেলাধুলা

দর্শক

ইরাণী ট্রফি

বোম্বাই : ২৩৬ রাণ (সারদেশাই (৫৩ এবং ওয়াদেকার ৫২ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৪৩ রাণে ৭ এবং গোবিন্দরাজ ৩৪ রাণে ২ উইকেট)

ও ১৩৭ রাণ (ওয়াদেকার ৬৯ রাণ। সুব্রত গুহ ৪৫ রাণে ৪ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৩২ রাণে ৪ উইকেট)

ভারতীয় অবশিষ্ট দল : ৯৬ রাণ (ভেংকট-রাঘবন ২৭ এবং হনুমন্ত সিং ২৪ রাণ। পাই ৩৩ রাণে ৩, ইসমাইল ৩৩ রাণে ৩, শিভালকার ৭ রাণে ২ এবং সোলকার ১৫ রাণে ২ উইকেট)

ও ৭৭ রাণ (২ উইকেটে। চৌহান ২৮ এবং এস অমরনাথ নট আউট ৩৭ রাণ)

বোম্বাই বনাম ভারতীয় অবশিষ্ট দলের ইরাণী ট্রফির চারদিনব্যাপী ক্রিকেট খেলাটি সরকারীভাবে অমীমাংসিত এবং সেই সঙ্গে বোম্বাইকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ প্রথম ইনিংসের খেলায় বোম্বাই ১৪০ রাণে অগ্রগামী ছিল। এই নিয়ে আটবারের খেলায় বোম্বাই ইরাণী ট্রফি পেল পাঁচবার এবং তাছাড়া একবার যুগ্ম-বিজয়ী হয়েছে।

দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যাটিংয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন মাত্র দুজন খেলোয়াড়—বোম্বাই দলের ওয়াদেকার (৫২ ও ৬৯ রাণ) এবং সারদেশাই (৫৩ রাণ)। অপরদিকে বোলিংয়ে সাফল্য লাভ করেছেন ভারতীয় অবশিষ্ট দলের ভেঙ্কটরাঘবন—৭৫ রাণে ১১ উইকেট (৪৩ রাণে ৭ ও ৩২ রাণে ৪)।

প্রথম দিনেই বোম্বাই দলের প্রথম ইনিং-সের খেলা ২৩৬ রাণের মাথায় শেষ হয়। ভারতীয় অবশিষ্ট দল এই দিন আর ব্যাট করতে নামেনি, হাতে সামান্য সময় ছিল। রঞ্জি ট্রফি বিজয়ী বোম্বাই দলের শক্তিকে খর্ব করেছিলেন অবশিষ্ট দলের ভেংকট-রাঘবন। লাঞ্চের আগের খেলায় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল— ১৩ ওভার, ৫ মেডেন, ১৬ রাণ এবং ১ উইকেট। চা-পানের পরবর্তী এক ঘন্টার খেলায় তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ২৫ ওভার, ১৩ মেডেন, ২৭ রাণ এবং ৬ উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ১৩৬ রাণে ১৩টা উইকেট পড়ে যায়—ভারতীয় অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংসের ৯৬ রাণে ১০টা এবং বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংসে ৪০ রাণে ৩টে। অবশিষ্ট দলের প্রথম ইনিংসে বোলার ভেঙ্কটরাঘবন দলের সর্বোচ্চ ২৭ রাণ করেন। তাঁর পরেই হনুমন্ত সিংয়ের ২৪ রাণ। খ্যাতনামা ব্যাটসম্যানদের পক্ষে দলের এই শোচনীয় অবস্থা খুবই লজ্জার কথা।

বোম্বাই প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৪০ রাণে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং বাকি এক ঘন্টার খেলায় ৩টে উইকেট খুইয়ে ৪০ রাণ সংগ্রহ করে। ফলে

কুমারী কারিন বালজার (পূর্ব জার্মানী) : গত ৫ই সেপ্টেম্বর ১০০ মিটার হার্ডলস রেস ১২·৯ সেকেন্ডে শেষ করে অপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বরেকর্ড (১৩ সেকেন্ড) ভেঙেছেন।
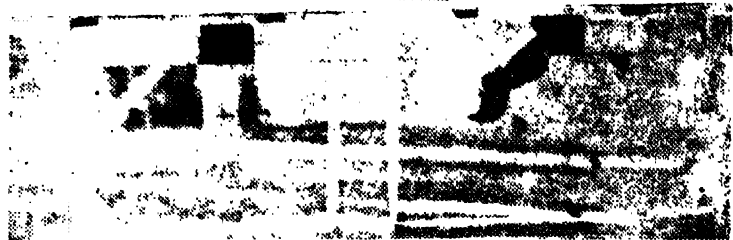
তারা ১৮০ রাণে এগিয়ে যায় এবং তাদের হাতে জমা থাকে দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট।

তৃতীয় দিনে ১৩৭ রাণের মাথায় বোম্বাই দলের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এই দিন তারা তাদের বাকি ৭টা উই-কেট খুইয়ে মাত্র ৯৭ রাণ সংগ্রহ করেছিল।

খেলার এই অবস্থায় ভারতীয় অবশিষ্ট দলের জয়লাভ করতে ২৭৮ রাণের প্রয়োজন হয়। তারা তৃতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় একটা উইকেট খুইয়ে ৪৪ রাণ সংগ্রহ করেছিল। হাতে জমা ছিল এক দিনের খেলা এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ৯টা উইকেট।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে পুরো সময় খেলা হয়নি—মাত্র ৯০ মিনিট খেলা হয়েছিল। বৃষ্টির দরুন চা-পানের বিরতির পাঁচ মিনিট আগে খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে প্যাভিলিয়নে আশ্রয় নেন। এই সময় ভারতীয় অবশিষ্ট দলের রাণ ছিল ৭৭ (২ উইকেটে)। চা-পানের পর আর খেলা হয়নি।

হার্ডলসে বিশ্ব রেকর্ড

পূর্ব জার্মানীর কুমারী কারিন বাল-জার মেয়েদের ১০ মিটার হার্ডলস রেস ১২·৯ সেকেন্ডে শেষ করে গত জুলাই মাসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব রেকর্ড সময় (১৩ সেকেন্ড) ভেঙে দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, তিনিই সর্বপ্রথম মেয়েদের ১০০ মিটার হার্ডলস রেস ১৩ সেকেন্ডের কম সময়ে অতিক্রম করার গৌরব লাভ করলেন।

কুমারী বালজার ১৯৬৪ সালের অলি-ম্পিক গেমসে মেয়েদের ৮০ মিটার হার্ডলসে স্বর্ণপদক জয় করেছিলেন।

ভারত সফরে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল তাদের ১৯৬৯ সালের ইংল্যান্ড সফর শেষ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে ভারতবর্ষ এবং পাকি-স্তান সফর করে যাবে। ভারতবর্ষের মাটিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের এই নিয়ে তৃতীয় সফর হবে। ১৯৬৯ সালের ভারত সফরে পাঁচদিনব্যাপী তিনটি টেস্ট খেলা নিয়ে তারা মোট পাঁচটি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। ভারতবর্ষের মাটিতে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের প্রথম খেলা সুরু হওয়ার তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর এবং শেষ খেলা ১৫ই অক্টোবর।

টেস্ট খেলার স্থান ও তারিখ

১ম টেস্ট (আমেদাবাদ) : সেপ্টেম্বর ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ ও ২৯শে

২য় টেস্ট (নাগপুর) : অক্টোবর ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮ই

৩য় টেস্ট (হায়দরাবাদ) : অক্টোবর ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০শে

এখানে উল্লেখ্য, ভারত সফরে আগত নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলটি ১৯৬৯ সালের

ইংল্যান্ড সফরে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। টেস্ট সিরিজে তারা ০—২ খেলায় (ড্র ১) পরাজিত হয়েছে এবং কাউন্টি ক্রিকেট দলগুলির বিপক্ষে তাদের একমাত্র জয়— ওয়ারউইকশায়ার দলের বিপক্ষে ৫০ রাণে।

বড়দলৈ ট্রফি

নেহরু স্টেডিয়ামে আয়োজিত আসামের লোকপ্রিয় বড়দলৈ ফুটবল ট্রফি প্রতিযোগিতার ফাইনালে মহমেডান স্পোর্টিং ২—০ গোলে গত বছরের বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করেছে। মাঠের মধ্যে এক শ্রেণীর দর্শকদের অনুপ্রবেশের ফলে খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের ১৬ মিনিট আগে খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়। দু' পক্ষের সমর্থকদের বিক্ষোভ এবং ইস্টক বর্ষণের কারণে পুনরায় খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

ফিল শার্প (ইংল্যান্ড)
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯৬৯ সালের ২য় টেস্টে তাঁর টেস্ট খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সেঞ্চুরী (১১১ রান) করেন।

পরলোকে রকি মার্সিয়ানো

মুষ্টিযুদ্ধে প্রাক্তন বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান রকি মার্সিয়ানো এক বিমান দুর্ঘটনায় দেহত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল একদিন কম ৪৬ বছর। চিকাগো থেকে ডেসমনেসে যাওয়ার পথে এই বিমান দুর্ঘটনা ঘটে।

১৯৫২ সালে (সেপ্টেম্বর ২৩) বিশ্ব খেতাব লড়াইয়ের ত্রয়োদশ রাউন্ডে মার্সিয়ানো তৎকালীন বিশ্ব হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ান জার্সি জো ওয়ালকটকে নক-আউটে পরাজিত করে হেভীওয়েট বিভাগে বিশ্ব খেতাব জয় করেছিলেন। সেই সময় থেকে তিনি অপরাজিত অবস্থায় ১৯৫৬ সালের ২৭শে এপ্রিল বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের আসর থেকে চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। হেভীওয়েট বিভাগের বিশ্ব খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখতে মার্সিয়ানোকে ৬ বার খেতাবের লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল। তিনি শেষ লড়েছিলেন ১৯৫৫ সালে আর্চি মুরের সঙ্গে। মার্সিয়ানোর পেশাদার খেলোয়াড়-জীবন এক বিপুল সাফল্যের প্রতীক—৪৯টি লড়াইয়ের প্রতিটিতে জয় এবং নক-আউটে জয়লাভ ৪৩ বার।

১৯২৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর আমেরিকার ব্রকটনে এক দুঃস্থ মুচি পরিবারে মার্সিয়ানোর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন ইতালীর অধিবাসী। পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান মার্সিয়ানো তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন পিতার দোকানে। তারপর অর্থের জন্যে তিনি মাটি কাটার কাজ হাত পেতে নিয়েছিলেন, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। শেষ-পর্যন্ত এই হাতই একদিন তাঁকে বিশ্বখ্যাত এবং বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছে। তাহলে বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধের আসর থেকে সুস্থ-সবল এবং অপরাজিত মার্সিয়ানোর অকাল অবসর গ্রহণের কারণ কি? এর প্রধান কারণ সংসারের আকর্ষণ—তাঁর স্ত্রী বারবারা এবং কন্যা মেরী।

সামরিক ফুটবল প্রতিযোগিতা

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম মাঠে আয়োজিত সার্ভিসেস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে সেন্ট্রাল কম্যান্ড ২—১ গোলে ইণ্ডিয়ান নেভী দলকে পরাজিত করে।

এই প্রতিযোগিতায় সেন্ট্রাল কম্যান্ড দলের এই প্রথম চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ। প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান পেয়েছে ইস্টার্ণ কম্যান্ড।

পোলভল্টের ১৮ ফিটের বেড়া

আমেরিকার এ্যাথলীটরা প্রতিটি অলিম্পিক গেমসের পোলভল্টে স্বর্ণপদক জয়ের সূত্রে অসাধারণ সাফল্যের পরিচয়

রকি মার্সিয়ানো

দিয়েছেন। পোলভল্টের ইতিহাসে ১৭ ফিট উচ্চতা অতিক্রম করার প্রথম গৌরব লাভ করেন আমেরিকার জন পেনেল, ১৯৬৩ সালে। বর্তমানে পোলভল্টারদের লক্ষ্য ১৮ ফিটের উচ্চতা অতিক্রম করা। বিশেষজ্ঞ মহলের দৃঢ় ধারণা, আমেরিকার জন পেনেল, বব সিগ্রীন এবং ডিক রেলসব্যাক—এই তিনজনের পক্ষে পোলভল্টে ১৮ ফিট উচ্চতা অতিক্রম করা অসম্ভব হবে না।

গত ২২শে জুন এক আন্তর্জাতিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে জন পেনেল ১৭ ফিট ১০½ ইঞ্চি উচ্চতা অতিক্রম করে পোলভল্টে নতুন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক পোলভল্টে পঞ্চম স্থান লাভের পর তাঁর এই সাফল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে জন পেনেল একবার ১৮ ফিট উচ্চতা অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই লাফটা তৎকালীন আইন অনুসারে 'ফাউল' ঘোষণা করা হয় এই কারণে যে বার অতিক্রম করার পর পোলের অবস্থান নিয়মমাফিক ছিল না। অদৃষ্টের কি পরিহাস পোলের অবস্থান সম্পর্কে পূর্বের নিয়ম বর্তমানে আর নেই। পেনেলের বর্তমান বয়স ২৮ বছর। পেনেল দুটি অলিম্পিক আসরে (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) যোগদান করে কোন পদকই পাননি।

১৯৬৮ সালের অলিম্পিক পোলভল্টের স্বর্ণপদক বিজয়ী বব সিগ্রীনের উচ্চতা অতিক্রম করার রেকর্ড ১৭ ফিট ৯ ইঞ্চি। তাঁর বর্তমান বয়স ২২ বছর।

ডিক রেলসব্যাক কলেজের ছাত্র, বয়স ২০ বছর। তিনি বেশীর ভাগ অনুষ্ঠানে ১৭ ফিট ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত উচ্চতা অতিক্রম করে যাচ্ছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

সত্যিই কী চমৎকার সিগারেট।
কী অপূর্ব স্বাদ আর সোনালীবর্ণের
ভার্জিনিয়া তামাকের কী অপূর্ব গন্ধ!
তাই ত' পানামা সারা ভারতের
এত প্রিয়। আপনিও ওকে আপনার
একান্ত প্রিয় করে তুলুন।

… প্রাইভেট লিঃ
বোম্বাই–…

আজীবনের উপার্জন উইয়ের উদরে

জাবালপুর জুলাই ২—পুরো সম্পত্তি ছিল কারেন্সী নোটের আকারে। একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে সমস্ত নোট পুরে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল একটি ছোট স্যাঁতসেঁতে ঘরে।

সব মিলেমিশে ফল হ'ল এই যে দামো জেলার জাবেরার এক গ্রামবাসীর সম্পত্তির বেশির ভাগই জলে গেলো, যা সে গত দেওয়ালীর দিন "নিরাপদে" জমিয়ে রেখেছিল।

এটা ছিল তার আজীবনের উপার্জন, নোটের আকারে মোট ৫০০০ টাকা। সে ভেবেছিল যে ঐ লম্বা ধুলো-পড়া বাক্সটা সবচেয়ে সেয়ানা চোরকেও ঠকাতে পারবে।

কিন্তু উই পোকাদের ঠকাতে পারেনি। নোটের কাগজ, কিবা স্যাঁতসেঁতে হয়ে, তাদের কাছে মনুষ্যের উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হয়েছিল।

গত সপ্তাহে একদিন একটা দলিল খুঁজতে গিয়ে গ্রাম্য পুঁজিবাদী দেখে কি তার সব নোট উই পোকাদের উদরস্থ হয়েছে। সব একশো টাকার নোট একেবারে উধাও।

বাকি যা পড়ে ছিল তা মোট ৮০০ টাকা মূল্যের অংশত ভাঙ্গা দশটাকা ও পাঁচ টাকার নোট

—ইউ এন. আই

সঞ্চয় করুন
পি.এন.বি.তে
আপনার টাকা
মজুত রাখবার
উপযুক্ত স্থান

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত

তত্ত্বাবধায়ক: এস. সি. ত্রিখা

সারা ভারতে ৫৮০টির বেশী শাখা

NF/PNB-180 B

৯ম বর্ষ
২য় খণ্ড

২০শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday 19th September, 1969 শুক্রবার, ২রা আশ্বিন, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপুলক মণ্ডল

রিক্সাচালক ও আমরা

প্রথমেই বলে রাখছি যে, আমি কোন 'ইজমে'র বশবর্তী হয়ে চিঠিটি লিখছি না, লিখছি নিজের বিবেকের তাগিদে। এ জন্য পাঠকবন্ধুদের অনুরোধ জানাচ্ছি যে তাঁরা যেন নিজেদের বিবেক অনুযায়ী চিঠিটি বিচার করেন। আর একথা বলাই বাহুল্য যে, নিম্নলিখিত মতামতগুলি আমার নিজস্ব।

মনে হয় আজকের এই সভ্যতার যুগে (২) রিকসা আমাদের সমাজে একেবারেই বেমানান। মানুষের ওপর বসে মানুষে ঝড়ে-জলে, রোদে-কাদায় ঘেড়িয়ে বেড়ায়, অনেক সময় তাদের ওপর অবিচারও করে (ব্যতিক্রম নিশ্চয় আছে) ভালো-মন্দ সব দলেই থাকে, রিকসাচালকেরাও ব্যতিক্রম নয়। একথা অনেকে মনে করতে চান না যে রিকসা রিকসা-চালকের নিজের শক্তির ওপর চলে—কোন বৈদ্যুতিক কলকব্জা মারফৎ চলে না—এজন্য অন্যান্য বৈদ্যুতিক যান-বাহনের সঙ্গে রিকসার তুলনা চলে না। তাছাড়া একথা নিশ্চয় অস্বীকার করা চলে না যে, রিকসা-চালকেরাও মানুষ। আমাদের মত তাদেরও ইচ্ছা-অনিচ্ছা রয়েছে, দুঃখ-সুখও রয়েছে।

আর তাদের ওপর ট্র্যাফিক পুলিশদের জোর-জুলুমের কথা নিশ্চয় নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আশীষকুমার সিংহ
পাটনা—৬

মানুষগড়ার ইতিকথা

বিগত ১৯শে ভাদ্রের 'অমৃত'এ শ্রীমতী ভট্টাচার্য লিখিত একটি প্রতিবাদপত্র পড়লাম। প্রতিবাদটি ৩০শে শ্রাবণ তারিখে প্রকাশিত 'অমৃত'এ সন্ধিৎসু লিখিত 'মানুষগড়ার ইতিকথা' পর্যায়ে বেহালা শিক্ষায়তন শীর্ষক রচনা প্রসঙ্গে। প্রতিবাদপত্রে ত্রুটিপূর্ণ তথ্য জ্ঞাপনের জন্য আমাকে তিনি দায়ী করেছেন এবং আমার আচরণে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছে। তাঁর প্রশ্ন সম্পর্কে আমার বক্তব্য 'অমৃত'-এ প্রকাশিত হলে বাধিত হব।

সন্ধিৎসু বিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহের জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে এসেছিলেন এবং আমার সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। আমি তাঁকে আমার জ্ঞাত সর্বপ্রকার তথ্যই পরিবেশন করেছি। পরিবেশন করেছি প্রাক্তন সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষক মহাশয়দের তালিকা, প্রাক্তন ও বর্তমান পরিচালকদের তালিকা, কৃতিদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য ছাত্রদের তালিকা, আরও তথ্য যা বিদ্যালয়ের গৌরবের সহায়ক। প্রকাশিত [illegible] নাম ও তথ্য নেই। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক স্বর্গত নলিনীরঞ্জন মিত্রের নামও প্রকাশিত রচনায় ছিল না। আমি তথ্য সরবরাহ করেছি। লেখক ইতিহাস রচনা করেছেন। বিষয়টি লেখকের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তিনি কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টিকে দেখবেন, সংগৃহীত তথ্যের কতটুকু তিনি গ্রহণ করবেন, কোন্ তথ্য তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় মনে হবে; সেটা লেখকের বিশেষ অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। রচনা বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধতর হবার অবকাশ সব সময়েই থাকবে এবং তা নিয়ে বিতর্কের সম্ভাবনাও থাকবে। রচনার অসম্পূর্ণতা ও তথ্যগত ভ্রান্তি এক নয়। রচনাটি পড়ে শ্রীমতী ভট্টাচার্যের মনে হয়েছে স্বর্গত গোপালবাবুর পর আমি প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করছি। প্রকাশিত রচনার কোথাও গোপালবাবুর মৃত্যুর পর আমার কার্যভার গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয় নি। তথ্যভিত্তিক রচনা অসম্পূর্ণ হতে পারে, কিন্তু অনুল্লেখিত কোনও উপাদানের উপর ভিত্তি করে কোনও অনুমানগত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা কি যুক্তির দ্বারা সমর্থিত?

স্বর্গত মিত্রের নামের অনুল্লেখ শ্রীমতী ভট্টাচার্যের মত আমাদের মনেও প্রশ্ন তুলেছিল, কিন্তু সন্ধিৎসু লিখিত প্রায় সবগুলি রচনা পড়ার পর পাঠক হিসাবে আমার ধারণা হয়েছে যে বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বাংলা দেশের শিক্ষা জগতে যে নিঃশব্দ অগ্রগতির সূচনা হয়েছিল সন্ধিৎসু তারই একটি ইতিহাস রচনা করে চলেছেন। এক-একটি বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তিনি তার দীর্ঘ জীবনের কাহিনী লিখেছেন। তাই মনে হয় বিদ্যায়তগুলির পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তার প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি, সমকালীন সমাজে ও জীবনে তার প্রভাব, দান ও স্থান প্রভৃতি বিষয়গুলি মুখ্যতঃ তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করেছেন বিদ্যালয়গুলির বর্তমান সমস্যার কথা। কোনও নামের উল্লেখ বা অনুল্লেখ এই বিশেষ চিন্তাধারার দ্বারা হয়তো নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকবে। আবার বলছি, পাঠক হিসাবে এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের অবগতির জন্য জানাই যে, ৯ই শ্রাবণ তারিখে প্রকাশিত 'অমৃত' সংখ্যায় গার্ডেনরীচ মুদিয়ালী হাইস্কুলের ইতিহাসেও স্বর্গত নলিনীরঞ্জন মিত্রের নামোল্লেখ ছিল না। বেহালা শিক্ষায়তনে যোগদানের পূর্বে তিনি পূর্বোক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সন্ধিৎসু সেখানেও অতীতের আরো কয়েক জন ও বর্তমান প্রধান-শিক্ষক [illegible]

পরিশেষে বিনীতভাবে নিবেদন করি যে, প্রধান শিক্ষক হিসাবে আমার কার্যভার গ্রহণের যে সময় শ্রীমতী ভট্টাচার্য নির্দেশ করেছেন তা ভ্রান্ত।

স্বর্গত মিত্রের নামের সংযোজনায় রচনাটি সমৃদ্ধতর হলে আমিও প্রশ্নকর্ত্রী শ্রীমতী ভট্টাচার্যের মতই সুখী হতাম এবং আমার তথ্যপ্রদান প্রসঙ্গে তাঁর ধারণা ও অনুসন্ধান সত্যভিত্তিক হলে আমার মনোভাব ও আচরণের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই আমি তার সঙ্গে একমত হতে পারতাম।

প্রশান্তকুমার মুখোপাধ্যায়
প্রধান শিক্ষক
বেহালা শিক্ষায়তন

ডিপ্লোম্যাট

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃত'র নিয়মিত পাঠক হিসাবে উক্ত পত্রিকার অন্যতম প্রিয় লেখক শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের মিষ্টি লেখার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। বর্তমানে শ্রীভট্টাচার্যের লেখা 'ডিপ্লোম্যাট' আমার খুব ভাল লাগছে। শিল্পীর দরদী লেখনীর সুঠাম আঁচড়ে প্রতিটি চরিত্র সজীব। প্রতিটি সংখ্যা পড়া শেষেও ভাল-লাগার মিষ্টি রেশ থেকে যায়। লেখককে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। তবে প্রতি সংখ্যায় যদি আরো একটু লেখার দৈর্ঘ্যতা বাড়ে তবে আমার মত অনেকেই খুশী হবেন। সেই আশাতেই আমি সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিতাই অধিকারী
শান্তিপুর,
নদীয়া

বিশ্বকোষ প্রসঙ্গে

গত ১৯শে ভাদ্রের অমৃতে আমার লেখা পত্র (৫ই ভাদ্রের সংখ্যায়) উপলক্ষ করে শ্রদ্ধাস্পদ অভয়ঙ্কর বিশ্বকোষ, নগেন্দ্রনাথ, রঙ্গলাল ও ত্রৈলক্যনাথ সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে আমি ত' অশেষ উপকৃত হয়েছি-ই, অমৃতের তথ্যান্বেষী অনেক পাঠকই উপকৃত হয়েছেন বলে মনে করি। আমি যদি রঙ্গলাল সম্বন্ধে পত্রটি না লিখতাম তাহলে এই মূল্যবান তথ্য কোন দিন প্রকাশিত হত কিনা সন্দেহ।

যাই হোক, অভয়ঙ্করের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, তিনি যেন এরকম পুনরায় [illegible] লেখেন।

[illegible]

চৈতন্য লাইব্রেরী প্রসঙ্গে

গত ২৩শে শ্রাবণ (১৩৭৬ (৮ আগস্ট, ১৯৬৯) তারিখের 'অমৃত'-এর চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত 'চৈতন্য লাইব্রেরীর আবেদন' শীর্ষক পত্রে দীর্ঘকালের ঐতিহ্যবাহী ও 'বহু দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সুবর্ণ ভাণ্ডার' এই গ্রন্থাগারের প্রতি 'বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে উৎসাহী জনসাধারণের' দৃষ্টি আকর্ষণের আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করে অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলাম। সত্যিই, এরূপ একটি অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের উপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ প্রচেষ্টায় হওয়া অবিলম্বে প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে উক্ত পত্রে একটি নামের উল্লেখ দেখে বিস্মিত হলাম। শুধু বিস্মিতই নয়, বিভ্রান্তও। পত্রলেখক লিখেছেন : "স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আশুতোষ চৌধুরী, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি যুগস্রষ্টাগণ এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন।" আমরা যতদূর জানি, চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। অথচ কালীপ্রসন্ন সিংহের (জন্ম ১৮৪০) স্বল্পায়ু জীবনের অবসান ঘটে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। এই তথ্য যদি সঠিক হয়, তবে কালীপ্রসন্ন চৈতন্য লাইব্রেরীর সঙ্গে কিভাবে 'প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন', পত্রলেখক অধ্যাপক সুজিতকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকট থেকে সে বিষয়ে আমরা জানবার অপেক্ষায় রইলাম।

বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-৯

বেতারশ্রুতি

আপনার পত্রিকার গত ৮ই আগস্টের সংখ্যায় 'কলাশ্রুতি' সম্পর্কে আমার একটি চিঠি আপনি প্রকাশ করেছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। ২৯ তারিখে প্রকাশিত শ্রীলতীন্দ্রকুমার মিত্র'র চিঠির জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

আমার চিঠির উত্তর দিয়েছেন 'শ্রবণক' ৮ তারিখের সংখ্যাতেই। তাঁর উত্তরে আমার কিছু বলা দরকার।

'শ্রবণক'-কে এই কারণে ধন্যবাদ যে, তিনি আমার একটা ভুল ভেঙে দিয়েছেন। না, তিনি বৈয়াকরণ নন, রাম-শ্যাম-যদুর মতোই একজন। যথেষ্ট উৎসাহ নিয়েই তাঁর সঙ্গে ব্যাকরণের আলোচনায় মেতেছিলাম। [illegible]

পালটে দিতে সাহায্য করেছে। তাই, তাঁর সব উত্তরের উত্তর দেবার কোনো মানে হয় না। চলতি কথায় যাকে 'ছাত্র' বলে, আমার হয়তো সে বয়েস নেই; স্কুল-কলেজ সেই কবে এক যুগ আগে শেষ করে বসে আছি। তাই, আমাকে একেবারে 'পুঁচকে ছাত্র' ভেবে 'শ্রবণক' উত্তর দিতে গিয়ে নিজেকে 'মাস্টার' বানিয়ে ফেলেছেন।

'প্রতিশ্রুতি'-কে তিনি প্রাদি তৎপুরুষ সমাস বলেছেন। আমি বলবো : মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি। শাস্ত্রে 'প্রতি'-র অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

সাদৃশ্যাদানহিংসাস্বীকৃতৌ
প্রতিনিধৌ রুচিৎ।
বাধ্যাভিমুখ্যয়োর্ব্যাপ্তৌ
বারণে প্রতিরুচ্যতে।

অতএব বহুব্রীহিরন্যার্থে—এই সূত্রানুসারে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি।

'সন্দেশ', 'গবাক্ষ' বা 'শ্বশুর'-এর উল্লেখ যে জন্যে করেছিলুম তা' তিনি আদৌ বুঝতেই পারবেন না—তাই কি আমি জানতুম ছাই! নইলে কি তাঁর কাছে ওয়ার্ড-বুক-এর পাঠ নিতে যাই! 'সন্দেশ' ও 'গবাক্ষ'—উভয় ক্ষেত্রেই শব্দের অর্থ সম্প্রসারণের কথা তিনি মেনে নিয়েছেন : 'জানালা আর গবাক্ষ সমার্থক শব্দ'; 'মিষ্টান্ন অর্থই বহুল প্রচলিত'। এতোই যদি জানলেন, তবে 'শ্বশুর'এর বেলায় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতে শুরু করলেন কেন? এখানে এসে 'কলাশ্রুতি'-র ফলশ্রুতি নিয়ে কি তিনি ভাবনায় পড়লেন? ভাবতে কষ্ট হচ্ছে তিনি 'শ্বশুর' শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় জানেন না। আশু+অশ্+উর=শ্বশুর=যিনি শীঘ্র খান। কিন্তু লোক-প্রচলিত অর্থ অন্য।

আমি বলেছিলুম, 'কলাশ্রুতি'র অর্থ—'কোন বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যপাঠে মনের উপরে মোটামুটি যে ফল হয়'। উত্তরে তিনি বলেছেন : 'না, ও অর্থ হয় না।' সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত অভিধানে আমার অর্থটি আছে: তাহলে 'শ্রবণক' লিখিতভাবে দয়া করে বলুন যে, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত ভুল।

সমীকরণ কাকে বলে আমি তাঁর কাছে শিখতে চাই নি, কারণ, আজ প্রায় বারো [illegible]

তা জানাতে হচ্ছে। এবং 'পাস্তীরিজ্য' দিয়ে পুরো মার্ক দেবো না। আর, 'মার্ক' বলবো, না 'নম্বর' বলবো, না 'অঙ্ক' বলবো, তা' খোড়াই কেয়ার করি। আমার এই চিঠিতেই হয়তো হাজার গণ্ডা ব্যাকরণ-ভুল আছে।

সামসুল হক
কলকাতা—২০

(২)

প্রতি সপ্তাহে অমৃত পত্রিকায় শ্রবণক মহাশয়ের বেতারশ্রুতি প্রসঙ্গে আলোচনা আমি নিয়মিতভাবে পাঠ করে থাকি। তবে যাঁদের জন্য বিশেষ করে তিনি এই আলোচনার অবতারণা করে থাকেন; মনে হয়, তাঁরা কেউ এসব পড়েন না। কিম্বা পড়েও মনে মনে বলেন, খুব জ্ঞান দিয়েছেন দেখছি! বেতারে লোকগীতির ঘোষণা কিম্বা অনুরোধের আসরে গৌহাটির প্রাধান্য কি এতটুকু কমেছে?

এবার গ্রামোফোন রেকর্ড বাজতে বাজতে কাটা জায়গায় এসে বার বার পাক খাওয়ার প্রসঙ্গে (অমৃত ২৩শে শ্রাবণ, ১৪শ সংখ্যা) আসা যাক। ঘোষক-ঘোষিকারা সমালোচনার ইমিউনিটি লাভ করেছেন দেখে শ্রবণক মহাশয় স্টেশন ডিরেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ ব্যাপারেও কতদূর কি হবে জানি না। তবে কাটা রেকর্ড ঐ রকম বলে একটা জায়গায় এসে ঘুরপাক খেতে থাকে সেই সময় ঘোষক-ঘোষিকাদের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দায়সারা গোছের একটু দুঃখ জানাতে হয়। এই কষ্টের একটা সহজ সুরাহা হয়ত-বা স্টেশন ডিরেক্টর মশাই করতে পারেন। অনুষ্ঠান প্রচার বিঘ্ন ঘটার আমরা বিশেষ দুঃখিত কথাগুলির একটা রেকর্ড করিয়ে নিলে কেমন হয়? প্রয়োজন মাফিক রেকর্ডটি বাজিয়ে দিলেই ব্যাস, আর কিছু করতে হবে না। তবে নিশ্চয় করে কিছুই বলা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রেও হয়ত শুনবো, ঐ রেকর্ডখানাই বাজছে—অনুষ্ঠান প্রচার বিঘ্ন...বিঘ্ন...বিঘ্ন ঘটার আমরা বিশেষ দুঃখিত...দুঃখিত... দুঃখিত।

গীতা সরকার
কলকাতা—৩২

সাদা চোখে

বর্তমানে একটি সংকটের যুগ চলেছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি, আদর্শ, আস্থা, তত্ত্ব, তথ্য এমন কি গণতন্ত্রেও সংকট দেখা দিয়েছে। যাঁরা মননশীলতার কারবারি তাঁরা এই সংকটের জন্য গভীর উদ্বেগ বোধ করছেন। আর যাঁরা সাধারণ মানুষ, পরিশ্রম করে দিন গুজরান করেন, তাঁদেরও নাভিশ্বাস উঠেছে। কারণ খাদ্যের সংকট, মৎস্যের সংকট, আর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিজনিত সংকট। ছাত্র সম্প্রদায় দিবারাত্র মিছিলে, ধর্মঘটে ব্যাপৃত। ফলশ্রুতি শিক্ষাসংকট। অতএব, দেখা যাচ্ছে সংকট যেভাবে জীবনের প্রতি স্তরকে ক্রমেই ঘিরে ফেলছে তা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হবে।

সংকট যখন এমনিভাবে ঘনিয়ে আসে তখন সংকট-ত্রাণ কমিটিগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে মুক্তিপথের ইসারা দিয়ে থাকে। সংকটত্রাণ কমিটি বলতে সমদর্শী রাজনৈতিক দলগুলিকেই বোঝাতে চাইছে। সংকট আসে—আর রাজনৈতিক দলগুলি তার মোকাবিলা করে তাদের নিজস্ব কর্মপন্থা ও সংগ্রামের মাধ্যমে। জনতার এবং জাতির মুক্তিমার্গ নির্দেশ করাই রাজনৈতিক দলের প্রধান ভূমিকা।

কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে সেই রাজনৈতিক দলগুলি ও তত্ত্বগত আদর্শগত সংকটে পড়েছেন। আবার যেখানে তাঁরা জোট বেঁধে নবদিগন্তের অভিযানে ব্যাপৃত সেখানে দেখা দিয়েছে আস্থার সংকট। অতএব, এই সংকটের আবর্ত থেকে মুক্তি দেবে কে? আজকের দিনে এই প্রশ্ন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে মানুষের মনে—যাঁরা বাস্তবের কঠিন আঘাতে ক্রমেই জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছেন। নবমূল্যায়ন করে, সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ে যাঁরা নয়া সমাজ গঠনের মহাযজ্ঞে আহুতি দিতে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ছেন সেই মানুষ জিজ্ঞাসা করছে কে সংকট থেকে পরিত্রাণ করবে?

জাতীয় জীবনে সংকট এলে তার থেকে পরিত্রাণ করে জাতিকে নবজীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অবশ্যই রাজনৈতিক দলের। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একক দায়িত্ব ছিল কংগ্রেসেরই এই শোষিত, দলিত জাতির মধ্যে জীবনের নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করে নয়াদিগন্ত এনে দেবার। কিন্তু কংগ্রেস তা পারে নি। এবং সেইজন্য কংগ্রেসের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে আদর্শগত সংকট। জনজীবনের সঙ্গে ক্রমশই সংযোগ হারিয়ে কংগ্রেস রাজধানীমুখী দল হয়ে পড়েছে। জলের গতি না থাকলে যেমন জল দূষিত হয়ে যায়, আজ কংগ্রেসের মধ্যে তেমনি আন্দোলন না থাকার ফলে কর্মীদের মন "শয়তানের কারখানায়" রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে গতিহীন দলের মধ্যে আদর্শের নবজিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু উত্তর কোথায়? আদর্শের যতই অভাব ঘটবে ততই নেতৃত্বের মধ্যে আসবে সংকট। কংগ্রেসের মধ্যে আজ তাই ঘটছে। এবং স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমবঙ্গেও তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। আদর্শের চিহ্ন যদি হারাধনের মত নেতা ও কর্মীরা দেখতে পেতেন তবে মনে হয় এত নাটক অভিনীত হত না।

কংগ্রেসের সংকট আছে বলেই দিকে দিকে যুক্তফ্রন্ট গঠনের হিড়িক পড়েছিল। উদ্দেশ্য, সংকটগ্রস্ত কংগ্রেস জাতীয় সংকটকে গভীরতর করে তোলার আগেই নবজীবনের সূত্রপাত করা। পশ্চিমবঙ্গে সেই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। কিন্তু সেই যুক্তফ্রন্টের প্রায় সকল দলই আবার আদর্শগত সংকটের মধ্যে পড়েছে। শুধু তারা অন্তর্দলীয় সংকটের শিকার হয়েছে তা নয়, সেই সঙ্গে আস্থার সংকট দেখা দেওয়ার ফলে গোটা ফ্রন্টই সংকটের আবর্তে পড়েছে। ৩২ দফা কর্মসূচীর দফা রফা হবার উপক্রম। নিজেরা লড়াই করেই তাঁরা আত্মবিমোচনের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। অবশ্য, এর গুরুতর পরিণামের কথা ভেবে সংযত হওয়ার প্রচেষ্টা চলে, বৈঠক হয়। কিন্তু সমস্যার সূত্র সন্ধানের বদলে নয়া-সংকটের সৃষ্টি হয়। "আস্থার সংকট" যা হালফিল যুক্তফ্রন্টকে ঘিরে ফেলছে, তা কারও বিলাস কল্পনা নয়। ফ্রন্টের নেতৃবৃন্দেরই স্বীকৃতি। এমন কি ফ্রন্টের মুখ্য শরিকের প্রতিনিধি শ্রীজ্যোতি বসুই স্বীকার করেছেন, বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি ধ্বসে গেছে। অর্থাৎ সোজা কথায়, আস্থার সংকট দেখা দিয়েছে। কেন এই আস্থার সংকট? কারণ, চৌদ্দ শরিকের মন্ত্রীরা দলীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যতটুকু কাজ করছেন, ঐক্যবদ্ধভাবে ফ্রন্টের কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য কিংবা গণমনে ফ্রন্টের একটি সার্বিক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলনের জন্য তত কাজ করছেন না। এক কথায় বলতে গেলে ফ্রন্টের মহান উদ্দেশ্যকেই বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শরিকরা নিজের নিজের পথে বিচরণ করছেন। এ সমস্ত অভিযোগ সমদর্শীর নয়। এক শরিক আর এক শরিকের বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা বক্তব্য হিসাবে রেখেছেন তারই পুনরুল্লেখ করা হল মাত্র।

[illegible] অন্তর্দলীয় কোন্দলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ [illegible] নিচ্ছে বলে কেন্দ্রীয় [illegible] শরিকই অনুযোগ করছেন। [illegible] ঘটনা নিয়ে যখন প্রায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেল তখনই এই অভিযোগ আরও স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। কম্যুনিস্টরা প্রশ্ন করেছিলেন, আহত কম্যুনিস্ট নেতা যে সমস্ত "দুষ্কৃতকারীর" নাম করেছিলেন তাদের গ্রেপ্তার করা হলো না কেন। শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় তদন্ত করিয়ে যে রিপোর্ট পেয়েছেন তাতে উল্লিখিত "অপরাধীদের" গ্রেপ্তার করা যায় না। এখন যদি শুধু কম্যুনিস্টদের বক্তব্যের উপর শ্রীবসুকে তাঁর দলের নেতাদের কারারুদ্ধ করতে হয় তবে শ্রীবসুর অবস্থা কি দাঁড়ায়? অবশ্য, শ্রীবসু বলেছেন তিনি যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন এবং করবেন। এই বক্তব্যের পরও যখন অনেক সদস্য সন্তুষ্ট হতে পারে নি তখনই আস্থার সংকটের প্রশ্ন উঠেছে।

তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আস্থার সংকট যুক্তফ্রন্টে নতুন নয়। আচারে, বিচারে এমন কি বিহারেও শরিক যা ফ্রন্টগঠনের পরদিন থেকেই আস্থার অভাব দেখিয়ে আসছেন একে অপরের প্রতি। যে কোন প্রশ্নে ফ্রন্টের শরিকদের পরস্পর-বিরোধী বিবৃতিই এই আস্থার অভাবের সাক্ষ্য। কিন্তু আজ তা সংকটের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কারণ হচ্ছে, যে কর্মসূচীর উপর ভিত্তি করে ঐক্য ও আস্থা পরস্পরের প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছিল, সেই যোগসূত্রই আজ ছিন্ন হতে বসেছে। পরস্পর দলীয় স্বার্থে দিকবিদিকে ছুটছেন, তাই আস্থার অভাব ঘটেছে। আর দলের ক্ষুদ্র স্বার্থে একে অপরকে আঘাত করছেন বলে এবং সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের ভূমিকা সেই অবস্থায় ঠিকমত কাজ করছে না বলেই আস্থার অভাব গভীরতর হয়ে সংকটের রূপ ধারণ করেছে। ফলে, কংগ্রেসের বিকল্প রূপে যে ফ্রন্ট গড়ে উঠেছিল মানুষের মুক্তির শপথ নিয়ে, ক্রমেই তা লোকচক্ষুর কাছে হেয় প্রতিপন্ন হতে শুরু করেছে। কোন ধনবাদীর চক্রান্তের ফলে এ ঘটনা ঘটছে বলে মনে হয় না। নিছক, শরিকী কোন্দলের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই আস্থার মৃত্যু ঘটছে। আর আস্থার মৃত্যুর অর্থই হল ফ্রন্টের আত্মিক মৃত্যু। শুধু নিষ্প্রাণ ধড় নিয়ে সংকটজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আলোয় নিয়ে আসা যাবে না।

ফ্রন্টের আস্থার সংকট আর তার শরিকদের নিজেদের দলের সংকট সব মিলিয়ে পরিস্থিতি রীতিমত জটিল। চৌদ্দ শরিকের মধ্যে দু-তিনটি দলের হয়ত সংকট নেই। কারণ তাদের রাজনৈতিক [illegible] সীটে আর বস শূন্য-স্থিতি। কিন্তু আবার এমন কয়েকটি দল আছে যাদের অস্তিত্ব নিতান্তই মামুলী অথচ তারাও সংকটে পড়ে যেটুকু অস্তিত্ব আছে তাও হারাতে বসেছে। এমন দুটি দল হচ্ছে [illegible] পি আই ও [illegible] পার্টি। [illegible]

ধরা পড়ে। আসলে বিদ্রোহী পি এস পি এই আদর্শগত সঙ্কটেরই সন্তান মাত্র। এস এস পিতে আদর্শগত সঙ্কট না থাকলেও সেখানে অন্য সঙ্কট প্রকট হয়ে উঠেছে। সেটা হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সঙ্কট ও মানসিকতার সঙ্কট। বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সি ইত্যাদি দলের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে সঙ্কট নেই। কিন্তু সেখানেও তা আছে। বাংলা কংগ্রেসের যে সঙ্কট তা আদর্শের নয়। প্রশ্নের শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে বাদ দিয়ে অন্য যাঁরা আছেন তাঁরা দলকে কোন দিকে নিয়ে যাবেন সেই ভাবনার সঙ্কট। শ্রীসুকুমার রায় যদি বাম-ঘেষা হয়ে পড়েন তবে শ্রীসুশীল ধাড়া ডানঘেষা ভাব দেখান। এই দোটানার সঙ্কট মাঝে মাঝে বাংলা কংগ্রেসকে আচ্ছন্ন করছে। এস ইউ সি ভুগছে দল বিস্তারের জন্য অত্যধিক আগ্রহের সঙ্কট থেকে। যে হারে দলের কলেবর বৃদ্ধি ও জনসমক্ষে পরিচিতি লাভ করা উচিত সেই হারে সব হচ্ছে না বলেই ধৈর্যের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ফলে, শরিকী লড়াইয়ে কম শক্তি নিয়েও বেশী ভাবে তারা জড়িয়ে পড়েছে। আর ফরওয়ার্ড ব্লকে দেখা দিয়েছে পথের সঙ্কট। শরিকদের মধ্যে কাদের নিয়ে জোট বাধলে প্রগতিশীল নামের উপর কালিমা লিপ্ত হবে না অথচ হনহনিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে, এই পথের সঙ্কটের জন্যই মাঝে মাঝে তাঁরা লাইনচ্যুত হয়ে পড়েন।

দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা বড় দল। আজ পর্যন্ত অবশ্য সাম্যবাদী আন্দোলন বিভক্ত হওয়ার পর থেকে তাদের মধ্যেই শুধু ভারতীয় পারিপার্শ্বিকতাকে কেন্দ্র করে দলের ভিতর আদর্শগত সংকট সৃষ্টি হয়নি। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের প্রভাবের ফলে কিন্তু (বিশেষ করে চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি সোভিয়েটের ব্যবহারে) ভারতের দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। নয়তো সেই কে ডি মালব্য, ভি কে কৃষ্ণমেনন থেকে শুরু করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত সকলের বিষয়েই তাঁদের এসেসমেণ্ট একই ধারায় চলছে। আদর্শগত প্রশ্ন এসে এই ব্যাপারে দলে সংকটের সৃষ্টি করতে পারে নি। দক্ষিণপন্থীদের কেন্দ্র করে যুক্তফ্রণ্টে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হচ্ছে সেটা ঈর্ষা-সঞ্জাত।

কিন্তু বামপন্থী কম্যুনিস্ট দল ও আর এস পি আদর্শগত সংকটে ভুগছেন। আর এস পি একদল কর্মী সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য নয়া দল গঠন করে ফেলেছেন। আবার মার্কসবাদীদের এক অংশ সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে দল ছেড়ে গিয়ে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে শস্ত্রবলের মাধ্যমে বিপ্লব আনার ব্যাপারে মতের মিল থাকলেও বর্তমান পারিপার্শ্বিকতায় তা সম্ভব কিনা—এই প্রশ্ন তাঁদের সঙ্কটের মধ্যে ফেলেছে। এবং এই সঙ্কট এত গভীর হয়ে পড়েছে যে ভিন্ন গ্রুপ ভিন্ন ভিন্ন [illegible] [illegible]।

আসলে অস্ত্র কিন্তু বিপ্লব করে না। বিপ্লব করে জনতা। আর সেই জনতা সংগঠিত না হলে বিপ্লব করবে কে? বিভিন্ন বামপন্থী দল থেকে ছুটে যাওয়া কমরেডরা তাই চিন্তার সঙ্কটে পড়েছেন। মুষ্টিমেয় অসমসাহসী মানুষ যখন এমনিতর কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন তখনই বলা হয় এডভ্যানস্যারিজম্। অর্থাৎ এই দুঃসাহসী অভিযান আদর্শগত সঙ্কটেরই প্রতিফলন মাত্র।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা একথা বোঝেন যে জনতাই করে বিপ্লব। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সঙ্কটে পড়েছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কতখানি সমাজবাদী কিম্বা আদৌ সমাজবাদী কিনা বা তাঁর কর্মকাণ্ড ভারতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কাজে কতদূর সহায়ক হবে ইত্যাদি প্রশ্নে সংকটে পড়েছেন মার্কসবাদীরা। তাঁদের নেতারা বিভিন্ন রকমের ভাষ্য দিচ্ছেন। কখনও বলছেন ইন্দিরাজীকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার, আবার কখনও বলছেন তাঁর প্রতি মোহ নেই। এই স্ববিরোধক বক্তব্য রেখে হয়ত মার্কসিস্টরা দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টদের সঙ্গে নিজেদের আদর্শগত পার্থক্য বোঝাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আসলে এটা নিজেদের মধ্যেই চিন্তার দৈন্যের সঙ্কট সূচিত করে মাত্র। মনে হয়, চীন থেকে যে সঙ্কটের সড়ক শুরু হয়েছে সেই পথ ধরে মার্কসবাদীরা বর্তমানে ইন্দিরাজীকে নিয়েই সঙ্কটে পড়েছেন।

যাঁরা হাত ধরে নতুন যুগে নিয়ে যাবেন বলে প্রথমে দায়িত্ব নিয়েছিল তাঁরা সঙ্কটের শিকার হলেন। নতুন করে পরিত্রাণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাঁরা এলেন তাঁরাও আবার সঙ্কটের আবর্তে ঘুরতে শুরু করলেন। কাজেই এই সঙ্কটের থেকে মুক্তি পেতে হলে জনতাকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাঁদের মধ্য থেকেই নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে, যাঁরা সঙ্কটে না পড়ে সঙ্কটের মোকাবিলা করতে পারেন। নয়তো মুক্তির পথ নেই।

—[illegible]

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি কলকাতায় আসেন তিনদিনের সফরে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস আয়োজিত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে একটি বিরাট জনসভায় তিনি ভাষণ দেন। এই তিনদিন বহু সভা-সমাবেশে শ্রীমতী গান্ধী বক্তৃতা করেন। ১৩ তারিখ দমদম বিমানবন্দরে অবতরণকালে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, রাজ্যপাল শ্রী ডি এন সিংহ, রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ এবং আরো কয়েকজন।

দেশেবিদেশে

চণ্ডীগড়ের জন্য প্রাণপণ

শিখদের পবিত্র তীর্থ অমৃতসরে ভিক্‌টোরিয়া জুবিলি হাসপাতাল। সেই হাসপাতালের একটি কক্ষের দিকে এখন পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজনীতিকদের নজর, [illegible] উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিও সেই দিকে।

হাসপাতালের সেই কক্ষটিতে এক পা এক পা করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ৮৫ বছর বয়সের বৃদ্ধ শিখ নেতা শ্রীদর্শন সিং ফেরুমান। গত ১৫ আগস্ট থেকে তিনি অনশন-[illegible]

২৬ দিন পার হওয়ার পর গত ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদ হচ্ছে : তিনি উঠে দাঁড়াতে পারছেন না, তাঁর হাত অবশ হয়ে গেছে, তাঁর মাথা ঘুরছে, তাঁর প্রস্রাবে অ্যালবুমিন ও অ্যাসেটোন পাওয়া যাচ্ছে। আরও খবর, শ্রীফেরুমানের রক্তের চাপ কমে ১০০।৬০-এ দাঁড়িয়েছে এবং তাঁর শরীরের ওজন হয়েছে মাত্র ৫৭ কিলোগ্রাম।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি [illegible]

প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁদের সকলেরই অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর মৃত্যু প্রায় অবধারিত জেনেই যেন সকল পক্ষ এখন প্রস্তুত হচ্ছেন। পাঞ্জাব সরকার অমৃতসরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি "আপাতত" বন্ধ করে দিয়েছেন, তাঁরা ধরপাকড় আরম্ভ করেছেন। পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতারা সবাই এসে অমৃতসরে জড় হয়েছেন। তাঁরা "ফেরুমান ইচ্ছা পালন সমিতি" নামে একটি সংস্থা গঠন করেছেন। শ্রীফেরুমান মারা গেলে এই সমিতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

শ্রীদর্শন সিং ফেরুমানের পণ, "হয় চন্ডীগড়, না হয় আমার প্রাণ।" প্রায় তিন বছর হতে চলল "পাঞ্জাবী সুবা"র দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে। হিন্দীভাষী হরিয়ানা রাজ্য পাঞ্জাব থেকে আলাদা হয়ে গেছে। রাজধানী চন্ডীগড় এখনও দুই রাজ্যের এজমালি সম্পত্তি, ভাররুরিত্ত তাই। চন্ডীগড়ের সরকারী মহাকরণ ভবনের একাংশে পাঞ্জাব সরকারের মন্ত্রী ও অফিসাররা বসেন অন্য অংশে বসেন হরিয়ানা সরকারের মন্ত্রী ও অফিসাররা।

চন্ডীগড় কার ভাগে পড়বে—পাঞ্জাবের, না হরিয়ানার—তা নিয়ে বিরোধ রয়েছে প্রথম থেকে। পাঞ্জাব রাজ্য পুনর্গঠনের জন্য ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার যে সীমানা কমিশন গঠন করেন তার রিপোর্ট পাওয়া যায় মে মাসে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, চন্ডীগড় সম্পর্কে কমিশনের সদস্যরা একমত হতে পারেন নি। কমিশনের সদস্য ছিলেন তিনজন। তাঁদের মধ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্রীজে সি শাহ্ ও শ্রীএম এম ফিলিপ চন্ডীগড়কে হিন্দীভাষী হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছিলেন এবং কমিশনের তৃতীয় সদস্য শ্রীসুবিমল দত্ত ঐ শহর পাঞ্জাবকে দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কমিশন এ বিষয়ে একমত হতে পারেন নি বলে ভারত সরকার ঘোষণা করেন, চন্ডীগড় দুই রাজ্যেরই যৌথ রাজধানী শহর হয়ে থাকবে।

চন্ডীগড় ভারতবর্ষের নবীনতম রাজধানী শহর। ভারতবিভাগের আগে এই শহরের কোন গুরুত্বই ছিল না। অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী যখন পাকিস্থানের অংশে পড়ল তখন নূতন রাজধানী শহরের খোঁজে চন্ডীগড়ের দিকে নজর পড়ল। বিখ্যাত স্থপতি লে করবুজিয়রের এই সুপরিকল্পিত শহরকে এমন একটা আধুনিক রূপসৌকর্য দিলেন যার তুলনা ভারতবর্ষের অন্য কোন শহরে পাওয়া যাবে না।

এহেন চন্ডীগড় শহরের উপর একক অধিকার পাকা না হওয়া পর্যন্ত পাঞ্জাবের মন ভরবে না, হরিয়ানারও না। শ্রীদর্শন সিং ফেরুমানের অনশন একটা জনপ্রিয় সমস্যা নিয়ে লড়াই করার হাতিয়ার তুলে দিয়েছে পাঞ্জাবের কংগ্রেসের হাতে। শ্রীফেরুমান নিজে একজন পুরোনো কংগ্রেসী, যদিও অনশন আরম্ভ করার আগে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র দলে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন স্বাধীনতার আন্দোলনে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ঐসব আন্দোলন সম্পর্কে এবং পরবর্তীকালে মোট দশ দফায় প্রায় কুড়ি বছরকাল তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন। ১৯৫৯ সালে স্বতন্ত্র দল গঠনের সময় থেকে ঐ দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনশন আরম্ভ করার প্রাক্কালে তিনি ঐ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন।

"মহৎ কাজের জন্য যদি কোন শিখ আত্মোৎসর্গের সঙ্কল্প নেয় তাহলে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবে না"—শ্রীফেরুমানের এই ঘোষণার মধ্যে একটি বক্র ইঙ্গিত রয়েছে অকালী নেতা সন্ত ফতে সিং-এর প্রতি। চন্ডীগড় পাঞ্জাবকে দেওয়ার দাবীতে

...তজীও আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ ...রেছিলেন। তাঁর আত্মাহুতি দেওয়ার জন্য ...মৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে অগ্নিকুণ্ড ...স্তুতও হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে প্রাণ-...সর্জন দিতে হয় নি। চণ্ডীগড় ...জাবের সঙ্গে যুক্ত না হওয়া সত্ত্বে সন্ত ...ন্ত সিং নিজের প্রাণরক্ষা করে সঙ্কল্প-...ত হয়েছেন, এই সমালোচনা আজ ...তজী ও তাঁর অকালী দলকে শুনতে ...চ্ছে। আর এই সমালোচনার মধ্যে ...জাবের কংগ্রেস দল দেখতে পাচ্ছে তাদের ...। রাখার জায়গা। পাঞ্জাবের অকালী ...নতুন মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং অভিযোগ ...রেছেন যে, পাঞ্জাবে কংগ্রেস দল শ্রীদর্শন ...ং ফেরুমানের অনশনে উস্কানি দিয়েছে। ...জাবী কংগ্রেস নেতারা এই অভিযোগ ...স্বীকার করে বলেছেন যে, রাজ্য ...নর্বিন্যাসের জন্য অনশনের অস্ত্র প্রয়োগে ...রা বিশ্বাসী নন: কিন্তু শ্রীফেরুমান ...র জন্য লড়াই করছেন তাতে তাঁদের ...র্ণ সহানুভূতি আছে। পাঞ্জাবী ...গ্রেস নেতারা যাই বলুন না কেন, ...। [illegible] যে, শ্রীফেরুমানের অনশনের ঘটনাটিকে তাঁরা ঐ রাজ্যে কংগ্রেসের পুনর্বাসনের একটি সুযোগ হিসাবে দেখছেন। অকালী দলও অবশ্য চুপ করে বসে নেই। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে এখন "অমাবস্যা মেলা" হচ্ছে। দলের নেতারা ঐসব মেলায় চলে গেছেন নিজে-দের বক্তব্য জনসাধারণের সামনে রাখার জন্য। অকালী দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, চণ্ডীগড় আদায় করার জন্য তাঁরাও প্রস্তুত হচ্ছেন। দলের ওয়ার্কিং কমিটি সন্ত ফতে সিংকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি যেন এই বিষয়ে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর "চূড়ান্ত রায়" জেনে নেন। তারপর যদি দরকার হয় তাহলে অকালী দলও চণ্ডীগড় আদায়ের আন্দোলনে নামবে।

কংগ্রেসের মতো একটা সর্বভারতীয় দলের পক্ষে এই ধরনের একটা নিতান্ত আঞ্চলিক প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত হয়ে যাওয়ার যে বিপদ রয়েছে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে হরিয়ানা কংগ্রেসের আচরণে। "শাহ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী" চণ্ডীগড় ও অন্যান্য হিন্দীভাষী অঞ্চলকে হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত করা হোক, এই দাবীতে পাল্টা অনশন করছেন শ্রীউদয় সিং মান আর তাঁকে সমর্থন করছে সেখানকার কংগ্রেস সংগঠন। হরিয়ানার কয়েকজন কংগ্রেস এম-পি নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে চণ্ডীগড়ের উপর হরিয়ানার দাবী জানিয়ে এসেছেন।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ অনশন চলতে থাকবে ততক্ষণ চণ্ডীগড়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নূতন করে আলোচনা আরম্ভ হবে না। আলোচনার আবহাওয়া তৈরী করার জন্যই অনশন তুলে নেওয়া দরকার, এই হচ্ছে নয়াদিল্লীর অভিমত।

একদিকে নয়াদিল্লীর এই অনড় দৃঢ়তা অন্যদিকে একজন মৃত্যুপথযাত্রীর বৃদ্ধের অবিচল সঙ্কল্প এবং এই দুয়ের মধ্যে রাজনীতির ফসল কুড়োবার বাসনা পাঞ্জাব ও হরিয়ানাকে একটা [illegible] অস্থিরতার দিকে অনিবার্যভাবেই টেনে নিয়ে [illegible]

অপ্রীতিকর যুব উৎসব

দিল্লীতে কবিগুরুর নামাঙ্কিত রবীন্দ্র রঙ্গশালায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক একটি যুব উৎসবের যে-সমস্ত খবর পাওয়া গেছে তাতে আমরা দুঃখবোধ না করে পারছি না। ঘটনাগুলো শুধু অপ্রীতিকরই নয়, গভীর লজ্জা ও ক্ষোভেরও। এই উৎসবের শেষ থেকে শুরু গোটাটাই চরম দায়িত্বহীনতায় চিহ্নিত এবং শৃংখলা ও শালীনতাবর্জিত। যুব উৎসবের আয়োজন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের দূরদৃষ্টিহীনতাই এর জন্য দায়ী। শেষের দিনে জনতার উচ্ছৃংখল ও উন্মত্ত আচরণে উৎসব পণ্ড হয়ে যায় এবং উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত মেয়েদের নিয়ে গুণ্ডারা টানাটানি করে। এই ঘটনার পর এ ধরনের কোনো উৎসব আয়োজনের সার্থকতা আছে কিনা তা ভাববার বিষয়। যে উৎসবে মেয়েরা তাঁদের সম্ভ্রম ও মর্যাদা নিয়ে নিরাপদে যোগ দিতে পারেন না তাকে যুব উৎসব নাম দেওয়া সংস্কৃতির প্রতি পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জনপ্রতিনিধিরা এই লজ্জাজনক ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন। কালবিলম্ব না করে এই তদন্তের ব্যবস্থা তিনি করুন। এতে সত্য উদ্ঘাটন ও অপরাধীর শাস্তিদানে সহায়তা হবে। নয়তো খাস রাজধানীর বুকে গুণ্ডা বদমায়েস ও লম্পটদের দৌরাত্ম্যই আরও বেড়ে যাবে।

কলকাতার নামে তো বদনামের অন্ত নেই। দিল্লীওয়ালারা কলকাতার কোনো খুঁত পেলেই শতমুখে তা প্রচার আরম্ভ করে। রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা নিয়ে এখনও সারাভারতে কম প্রচার চলছে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন। সেই প্রকাশ্য তদন্তের বিবরণ কিন্তু বাংলার বাইরে প্রচার হয় না। পশ্চিমবাংলাকে অপদস্থ করার জন্য যাঁরা এত ব্যগ্র তাঁরা এবার রাজধানী দিল্লীর দিকে একটু নজর দিন। রাজধানীতে মেয়েরা কতটা নিরাপদ এবং কলকাতার রাস্তায় মেয়েরা যত নিরাপদে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যের পর রাজধানীর রাজপথে মেয়েরা তা পারেন কিনা তা যাচাই করে দেখুন।

দিল্লীর এই উৎসবে আরও অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। কমেক্স-৩ নামে ইয়োরোপের একটি যুব দল আসে দিল্লীতে। এই দলে শ' পাঁচেক ছাত্রছাত্রী ছিল। ছাত্রছাত্রীদের আন্তর্জাতিক মিলন ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানই এই উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেও শ' তিনেক ছেলেমেয়ে গিয়েছিল এই উৎসবে যোগ দিতে। এই উৎসব পরিচালনার ভার কিন্তু সরকারের শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক দপ্তর না নিয়ে কিছু বেসরকারী কালচারওয়ালাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরা কালচারের নামে নিজেদের আখের গুছাবার তালে ছিলেন। আটশো ছাত্রছাত্রীদের থাকা-খাওয়ার নিদারুণ অব্যবস্থা প্রথম থেকেই উৎসবের পরিবেশ নষ্ট করে দেয়। চড়া দামে ওদের কাছে অখাদ্য পরিবেশন করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। দিল্লীর গ্রীষ্মে এদের স্নান করবারও যথেষ্ট ব্যবস্থা উদ্যোক্তারা করেননি। কমেক্সের সঙ্গে যাঁরা এসেছিল তাদের গায়ের রঙ শাদা। ভারতবর্ষ এককালে একটি শ্বেতাঙ্গ জাতির উপনিবেশ ছিল। সে কারণেই কিনা জানি না, শ্বেতাঙ্গ প্রতিনিধিদের অনেকে ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে এক শিবিরে থাকতে গররাজী হয়। চমৎকার আন্তর্জাতিক মিলনের ব্যবস্থা। প্রাচ্যদেশ এবং অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি যদি এতই ঘৃণা থাকে তাহলে এদের জামাই আদরে এনে কালচার-সার্কাস দেখাবার কী প্রয়োজন ছিল? উদ্যোক্তাদের যদি আত্মমর্যাদাবোধ থাকত, তাহলে এই অশালীনতার প্রতিবাদ তাঁরা করতেন। তা না করে উদ্যোক্তারা ভুল বোঝাবুঝি বলে একটা সাফাই গাইবার চেষ্টা করলেন।

উৎসবের কর্মসূচী প্রণয়নেও উদ্যোক্তারা চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্বভারতী, গৌহাটি ও কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা তো তাঁদের প্রতি অপমানকর ব্যবহারের প্রতিবাদে উৎসব থেকে চলে আসবেন বলেই ভেবেছিলেন। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে তাঁরা থেকে যান। বিশ্বভারতীর দলকে প্রথম দিনে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের জন্য ডেকেও উদ্যোক্তারা নাকি সেদিন তাঁদের অভিনয় করতে দেননি। রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত রঙ্গশালায় কবিগুরুর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের প্রতি এমন অভদ্র আচরণ আমাদের সাংস্কৃতিক অধঃপতনের চরম নিদর্শন। এ সমস্তই দিল্লীর যুব উৎসবের ব্যর্থতার দিক। একটি উৎসবকে সত্যিকারের আন্তর্জাতিক রূপ দিতে গেলে যে উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সাংস্কৃতিক চেতনা ও শিক্ষা প্রয়োজন উদ্যোক্তাদের তা ছিল না। উৎসবের নামে রঙ্গ-তামাসা করতে গেলে তার পরিণতি ভাল হতে পারে না। সংস্কৃতি ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, অতি সহজেই তা আয়ত্ত করা যায়। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির নামে পপ-সঙ্গীত বা স্থূলরসের প্রহসন পরিবেশন করা উৎসবের উদ্দেশ্যেরই বিরোধিতার নামান্তর। অথচ দিল্লীর কালচারওয়ালারা কতকগুলো অপরিণতবুদ্ধি বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে তাই করালেন। এতে আমাদের তরুণতরুণীরা কী লাভ করল? আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠানের আগে তার প্রকৃত সার্থকতা নিয়ে চিন্তা না করলে পরিণতি এমন অপ্রীতিকর হতে বাধ্য। আমাদের দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিয়ামকদের কী এ বিষয়ে কিছুই করণীয় নেই?

হে মৃত্যু ॥

শ্রী গিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়

হে মৃত্যু,
তুমি আমাকে উদ্দীপ্ত-চক্ষু বাঁকানো-ঠোঁট চিলের মত
ছোঁ মেরে নিয়ে যেও না।
আমার রক্ত যেন গড়িয়ে না পড়ে ধুলোয়;
তীব্র ব্যথায় যেন আমি চীৎকার করে না উঠি,
আমার অঙ্গ যেন বিবশ না হয় ব্যথার দহন-জ্বরে।
হে বলবান মৃত্যু
হে মহান মৃত্যু
দয়া করে তুমি এসো না কাউবয়রূপে
হাতে ফাঁস নিয়ে।
হ্যাঁচকা দিয়ে আমায় টেনে নিয়ে যেও না—
বন্য পশুর মত।
অপমানের চূড়ান্ত কোরো না
হে মৃত্যু।
তার চেয়ে এসো তুমি শোভন মোহন রূপে
এসো মায়ের গলায় ঘুমপাড়ানি গানের গুন-গুনানির মত
এসো ঠাকুমার মুখের রূপকথার মত
এসো সুয়োরাণী-দুয়োরাণী ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প হয়ে
এসো সাগর জলের নীচে রাক্ষসের প্রাণ-ভ্রমরের কাহিনী হয়ে।
তারপরে নিয়ে যেও আমায় আধো ঘুম আধো জাগরণের
দোলায় দুলিয়ে দুলিয়ে
নিদ্রিতা নক্ষত্রমালার দেশে
হে মৃত্যু।

বাড়ে মানে কমতে থাকে কিছু

রত্নেশ্বর হাজরা

বয়স বাড়ে মানে বয়স কমে যায়
বয়স মানে আয়ু মানে কিছুটা সময় একটা পরিধিতে
হেঁটে পার হওয়া চলে দৌড় কিংবা—
মানে গতি বেড়ে যায়
বাড়ে মানে কমতে থাকে কিছু
দূরত্ব অথবা দুঃখ—
চাই না
অথচ যারা চলে গেলে বস্তুবিশ্ব দোষে—
এ যেন আনন্দ গেলো রিক্ত করি ভাল
লোকপালনের জন্য
মাঠে যাই না
কফিহাউস ছেড়ে দিই
সঙ্গত ছাড়াই সারাদিন
দিলরুবায় কাঁপাই সুলতান
সারাদিন
বয়স বাড়ে সারাদিন কমতে থাকে কিছু—

অদ্য শেষ রজনী

অজিত চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে মোটর-গাড়িটা প্রায় ষাট কিলোমিটার বেগে ছুটছিল। ইচ্ছে করলে স্পিডোমিটারের কাঁটাটাকে আরো একটু তোলা যায়। সত্তর......আশী,......নব্বই... ...একশ পার হলেই ক্ষতি কি? হামেশাই এসব রাস্তায় ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটে।

পথ ঘাট ভারী সুন্দর। চওড়া পীচের রাস্তা, দূরে দূরে ছোট ছোট গ্রাম। দিনমানেই পথ প্রায় জনহীন, রাতে তো কথাই নেই। দুপাশে উঁচুনীচু অসমান জমি, কখনও ধানের ক্ষেত কখনও অনুর্বর প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট বড় পাহাড়ের দেখা, কোথাও পথের খানিকটা দূরে নানা আকারের প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলা।

সবেমাত্র নভেম্বরের প্রথম। শীত পড়তে এখনও কিছু দেরি। কিন্তু প্রকৃতিতে তার আগমনের সূচনা টের পাওয়া যায়। বিকেল ফুরোতেই কেমন একটা শীত শীত ভাব। একটু আগেই স্লাইড-গ্লাসগুলো তুলে দিয়েছে মালা। গাড়ি জোরে ছুটলেই হাওয়া এসে তীরের মত নাকে মুখে বিঁধতে থাকে। এই সব পাহাড়-ঘেঁষা অঞ্চলে শীত না পড়তেই শীতের বাতাস বয়। ঠোঁটে, গালে একবার আলতোভাবে আঙুল বুলিয়ে নিল মালা। কে জানে হয়ত কাল সকালে উঠেই দেখবে ঠোঁট দুটো ফেটে বিশ্রী দেখাচ্ছে।

বাঁকুড়ায় ঢুকবার একটু আগেই সূর্য ডুবল। খানিক পরেই অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত্রির। কি তিথি কে জানে। নিশ্চয় অমাবস্যা কিংবা চতুর্দশী। নইলে এমন আলকাতরার মত জমাট অন্ধকার হয়। বিরক্তমুখে মালা বলল,—মুকুটমণিপুর আরও কত পথ বলো দিকি? কলকাতা থেকে বেরিয়ে বললে ঘণ্টা চার পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে যাব। কিন্তু পথ যে আর ফুরোয় না বাপু।'

হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল নিশাকর। সাড়ে ছটার মত। অর্থাৎ ইতিমধ্যে ছ' ঘণ্টা কাবার। মুকুটমণিপুর পৌঁছতে আরো এক ঘণ্টার মত লাগবে।

পথঘাট অজানা। এ দিকটায় আগে কখনও আসেনি নিশাকর। অবশ্য এতদিন বেড়াতে আসার মত কি আকর্ষণ ছিল এ অঞ্চলের? ইদানীং কংসাবতী ড্যাম হওয়ার দরুণ মুকুটমণিপুরে ট্যুরিস্ট বাংলো হয়েছে। ঝিলিমিলি অঞ্চলের ঘন পাহাড় এবং প্রকৃতির আরণ্যরূপ এখন ট্যুরিস্টদের কাছে ফলাও করে গল্প করা হয়।

ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ক্রীমজাতীয় তেল তেলে একটা বস্তু বের করে গালে, ঠোঁটে এবং গলায় ঘষল মালা। হাওয়ায় মুখ-টুখ কেমন খসখসে লাগল। একটু ক্রীম-ট্রিম না মাখলে গাড়ি থেকে নামার সময় তাকে বেশ শুকনো দেখাবে।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল নিশাকর। নিজের রূপ আর সৌন্দর্য সম্বন্ধে আশ্চর্য সচেতন মালা। এতখানি বয়স হল তার। কিন্তু দেহে এখনও ভরা যৌবন। টানা টানা কালো চোখ, প্রায় জোড়া ভ্রূ উড়ন্ত পাখির ডানার মত কপালের নীচে আঁকা। গায়ের রং রীতিমত ফর্সা, মুখের ডৌল আশ্চর্য সুন্দর, দেখে কেউ বলতে পারবে না যে, এই আশ্বিনে চল্লিশ পার হয়ে এসেছে মালা।

হঠাৎ বে-আক্কেলে একটা শব্দ করে বিকল হয়ে পড়ল গাড়ি।

মালা সভয়ে বলল,—গাড়ি খারাপ হল নাকি?'

[illegible] ঘুরিয়ে, [illegible] টেনে চেষ্টা করল নিশাকর। [illegible] দিল। কিন্তু গাড়ি নড়ল না। সুতরাং দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল।

[illegible] বলল,—'আপনার কি [illegible]? গাড়ি [illegible] এখানেই সমস্ত রাত পড়ে থাকতে হবে আমাদের?' কুয়াশার মত [illegible] বন [illegible] দিকে তাকিয়ে মালা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। [illegible] বাবা! কি বিদঘুটে জায়গা! এখানে থাকলে আমি কিন্তু ভয়েই হার্টফেল করব।'

অল্প একটু বিরক্তি প্রকাশ করে নিশাকর বলল,—'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এঞ্জিনটা আগে দেখি একবার।'

ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ছোট একটা টর্চ সঙ্গে এনেছিল। এঞ্জিনের ঢাকনাটা খুলে আলো ফেলল নিশাকর। একটা তার টেনে দেখল। এটা ওটা নেড়ে সম্ভবত এঞ্জিনের সামর্থ্য পরীক্ষা করল। কিছুক্ষণ কসরৎ করার পর অবশ্য স্টার্ট নিল গাড়িটা। উল্লসিত হয়ে মালা বলল—'বাক বাবা, বাঁচা গেল এতক্ষণে। যা দুর্ভাবনায় ফেলেছিলে আমাকে।'

গম্ভীর মুখ করে নিশাকর বলল,—'আজ রাতে কিন্তু মুকুটমণিপুর পর্যন্ত যাবে না গাড়ি।'

—'তার মানে?' মালা প্রায় আর্তনাদ করল।

নিশাকর একটা হতাশভঙ্গি করে বলল, 'এঞ্জিনটা কেমন বিশ্রী ঘর্ঘর শব্দ করছে। কোনো মেকানিককে দিয়ে গাড়িটা একবার না দেখিয়ে আর এগোনো উচিৎ নয়। মুকুটমণিপুর পৌঁছবার আগে মাইল তিনেক আবার কাঁচা রাস্তা।'

মালা বলল,—'আজ রাতটা তাহলে কাটাবে কোথায়?'

—'সামনেই একটা ছোট শহর পড়বে। খাতড়া না কি যেন নাম। ওখানেই একটা হোটেলে জায়গা পেলে ভালো, নইলে ডাকবাংলোর খোঁজে বেরোতে হবে।'

প্রস্তাবটা কিছুমাত্র মনঃপূত হয়নি মালার। কিন্তু বিকল্পও কিছু ভাবতে পারছে না সে। সুতরাং নিশাকর যা বলছে তাই করা ছাড়া উপায় নেই তার। খানিকটা গজগজ করার ভঙ্গিতে মালা বলল,—'যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড তোমার। বিদেশ বিভুঁই জায়গা। গাড়িটা ভালো করে না দেখিয়ে কি এতখানি পথ পাড়ি দিতে হয়?'

কপাল ভালো। খাতড়াতে ঢুকেই বেশ ছিমছাম একটা হোটেলের সন্ধান মিলল। [illegible] গোছের একটা নাম। নতুন রং-করা বাড়ি। দোতলার উপর একখানা ঘরও আছে। হোটেলের চারপাশ বেশ খোলামেলা। একটু নিরিবিলিও বলা চলে।

মালাকে গাড়িতে রেখে নিশাকর ভিতরে ঢুকল। [illegible]-টাকিস কোথায় কে জানে। বাড়ির ভিতরটা কেমন প্রাণহীন আর চুপচাপ। [illegible] জনহীন পুরী। লোকজন কি [illegible] এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

[illegible] দিকে একটা ঘরে যেন আলোর [illegible] [illegible] চেয়ারে বসে [illegible] ঝিমোচ্ছে। নিশাকর পা [illegible] সেদিকে এগিয়ে গেল।

তার জুতোর শব্দ শুনে লোকটা মুখ তুলে তাকাল। ঘরের ভিতর একটা টেবিল আর চেয়ার সাজানো। একপাশে একটা খাটও রয়েছে। [illegible] সাধারণ বিছানা পাতা ওতে। [illegible] দামের একটা মশারির উপরে টাঙানো। দেওয়ালে কোনো ঠাকুর-দেবতার পট। দূরে থেকে সেটি চিহ্নিত করা অসম্ভব।

বাইরে দাঁড়িয়ে নিশাকর বলল,—'এই হোটেলের ম্যানেজারকে খুঁজছিলাম।'

লোকটা চেয়ারে বসেই উত্তর দিল—'কেন বলুন তো?'

—'আজ রাতটা থাকার মত ব্যবস্থা হতে পারে এখানে?'

—'ভেতরে আসুন,' লোকটি অনুরোধ করল। বলল,—'কোথা থেকে আসছেন আপনি? রাতে এখানে একাই থাকবেন?'

—'আসছি কলকাতা থেকে।' নিশাকর একটু হাসল। বলল—'আমি একা নই, সঙ্গে আমার স্ত্রীও আছেন।'

হ্যারিকেনের শিখাটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আলোটা তার মুখের উপর লোকটি তুলে ধরল। একদৃষ্টে কয়েক মুহূর্ত সে চেয়ে রইল। এক মাথা চুল ওর,—কালো আর সাদায় মেশামিশি। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কেমন অদ্ভুত চাউনি লোকটার। পরিস্থিতিটা নিশাকরের খুব অস্বস্তিকর লাগল।

আলোটা নামিয়ে লোকটি বলল,—'কি জানেন? রাতে ভিতে অনেক সময় বাজে লোক এসে হোটেলে আশ্রয় খোঁজে। পরে পুলিশ এসে আবার হামলা করবে।' একটু থেমে সে ফের বলল,—'মুখে অবশ্য মনের কথা লেখা থাকে না। তবু একবার চেষ্টা করতে হয়। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

অভ্যর্থনার রকমটা ভালো নয়। উপায় থাকলে আর এক দণ্ডও এই হোটেলে থাকত না নিশাকর। কিন্তু বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। মাথার উপর নক্ষত্রখচিত শ্লেট রঙের আকাশ। চারপাশের নিস্তব্ধতা মনের ভিতরে একটা ভয়ের অনুভূতি সঞ্চার করে। আবার অন্য কোথাও যে আশ্রয় মিলবে তার নিশ্চয়তা কি?

লোকটি বলল,—'এই হোটেলের আমি মালিক। অবশ্য,—'একটু থেমে সে যোগ করল,—'আদ্য শেষ রজনী।'

নিশাকরের কৌতূহল হল। লোকটার কথাবার্তা কেমন এলোমেলো। মনের ভিতর নিশ্চয় কোন দুঃখবোধ আছে ওর। আচ্ছা, লোকটা ছিটগ্রস্ত নয় তো? নিশাকর মনে মনে ভাবল।

লোকটি নিজে থেকেই মুখ খুলল। 'আপনি নিশ্চয় খুব অবাক হয়েছেন। ভাবছেন কোন রহস্য আছে এর মধ্যে।' মাথা নেড়ে সে ফের বলল,—'ব্যাপারটা সাদা মাটা। হোটেল বাড়িটা আমি বেচে দিয়েছি। কাল থেকে এটা অন্যের সম্পত্তি। তারা হোটেল ব্যবসা করবে না। আমিও চলে যাব অন্য কোথাও। [illegible] এক জায়গায় [illegible] [illegible]?'

নিশাকর [illegible] [illegible]—'তা [illegible] [illegible] দিলেন কেন? তেমন [illegible] চলছিল না বুঝি?'

লোকটি ঈষৎ হাসল। বলল,—'সে অনেক কথা। এক ইতিহাস। যদি সময় পান [illegible] খাওয়াদাওয়া [illegible] আসবেন না একবার। কাহিনীটা আপনাকে শোনাব।'

[illegible] করে ওকে দেখল নিশাকর। একটু কোলকুঁজো দেহ, মিশমিশে কালো রং। চোখ দুটি কোটরগত, ঠোঁট বেশ পুরু। সুশ্রী তো নয়ই, বরং কুৎসিৎ বলা যায়।

ভদ্রতা করে নিশাকর বলল,—'সময় করতে পারলে নিশ্চয় আসব।'

মালিকের ডাকহাঁকে একটা [illegible] গোছের ছেলে এসে উঁকি দিল। লোকটি বলল,—'মানুষজন প্রায় সব বিদেয় করে [illegible]। এখন শুধু এই ছেলেটা আর একজন [illegible] বামুন সম্বল। কাল সকালে [illegible] পড়বে। ব্যস, হোটেলের পরমায়ু শেষ।'

ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে মালিক বলল, —'এই হাঁদা, দোতলার ঘরটা বাবুদের খুলে দিয়ে আয়। ঘরে বাতি দিয়ে আলো জেলে দিবি। বাথরুমে জল আছে কিনা দেখে নিস।'

চকচকে চোখ করে ছেলেটা বলল,—'দোতলার ঘর খুলব?'

দাঁত খিঁচিয়ে প্রায় ভেড়ে গেল লোকটা। 'দোতলার ঘর খুলতে বলেছি তো। অবাক হবার কি আছে? জলদি যা, সুমুখে বাবুর গাড়ি দাঁড়িয়ে। মালপত্র যত আছে সব উপরে রেখে আয়।'

নিশাকরের দিকে তাকিয়ে অনেকটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল লোকটা, বলল,—'আপনারা এই হোটেলের শেষ রজনীর অতিথি। ভাগ্যাহাটে এসেছেন। কোন ত্রুটি হলে ক্ষমা করে নেবেন।'

লোকটার আগ্রহ এবং কথা বলার ভঙ্গি নিশাকরকে মুগ্ধ করল। এই সব ছোটখাটো হোটেলে তার মত খরিদ্দার নিশ্চয় কালেভদ্রে আসে। সম্ভবত সে কারণেই লোকটা তাকে এত আপ্যায়ন করছে।

ঘর দেখে ধাঁধা লাগার অবস্থা। আশ্চর্য এই আধাশহরের হোটেলে এমন সুন্দর ঘর পাওয়া যেতে পারে, তা যেন কল্পনারও অতীত। বেশ বড় সাইজের ঘরখানা। দেওয়ালে ডিসটেম্পার করা হাল্কা সবুজ রং। মোজাইক করা মেঝে। এক কোণে সুন্দর ড্রেসিং টেবিল। ঘরের মাঝখানে প্রমাণ সাইজের পালংক, একপাশে দুটো চেয়ার টেবিলও রয়েছে, দেওয়ালে টাঙানো গোটা দুই নিসর্গ চিত্র।

মালা বলল, 'তুমি একটু ছাদে গিয়ে বেড়াও। আমি ছেলেটাকে দিয়ে ঘরটা একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিই।'

ফাইফরমাশ খাটবার জন্য তৈরি ছেলেটা, সে বলল, 'আজ্ঞে আপনাদের সঙ্গে [illegible] আছে তো? এখানে আবার [illegible] [illegible]। রাত দুপুরে মশারাই জনতোলি খুলে [illegible] হবে দুদিন উড়িয়ে নিয়ে যাবেক।'

ছেলেটার কথায় মালা হেসে [illegible]। বলল,—'সে অবস্থা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]'

আমাদের সঙ্গে ভালো নেটের মশারি আছে, মশার সাধ্য নেই ঢোকে।'

হাসে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল নিশাকর। বেশ হিম পড়তে শুরু করেছে। লেগ বাতাস স্তব্ধ, শীতল। মাথার উপর অগণিত তারার মিটমিটে হাতছানি। দূরে, বহু দূরে ধাবমান লাল আলোগুলি চলমান মোটরযানের অস্তিত্বের ইঙ্গিত।

অনেক কিছু ভাবছিল নিশাকর। কলকাতার দুটো ব্যবসার জালে বন্দী সে। কার্ডবোর্ড বক্স তৈরির প্রতিষ্ঠানের সে পুরো মালিক আর লোহালক্করের কারবারে সে অন্যতম অংশীদার, সমস্ত দিনটা চরকির মত ঘুরপাক খায় নিশাকর। কোনো দিকে ফিরে তাকানোর ফুরসৎ নেই। বাড়ি ফিরতেই রাত আটটা, নটা। মালা অনুযোগ জানায়, অভিমান করে। কিন্তু নিশাকর গ্রহ-বন্দী উপগ্রহের মত তার ব্যবসার কক্ষ-পথে ঠিক ঘুরে চলেছে। সরে আসতে পারে এমন শক্তি কোথায়?

তবু মাঝে মধ্যে ডুব দেয় নিশাকর। এক ডুবে বহুদূরে চলে যায়। পানকৌড়ির মত ভুস করে ভেসে ওঠে কোন গ্রামীণ পরিবেশে। চার পাঁচ দিন শুধু মালাকে নিয়েই থাকে। ঘর সংসারে মালার নির্ঝঞ্ঝাট বিলি ব্যবস্থা। একমাত্র ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছে মুসৌরীর স্কুলে। পাঁচ মাস টার্মের পর এক মাসের জন্য সে মায়ের কাছে এসে থাকে। বৎসরে মাস দেড় দুই ছেলেকে কাছে পায় মালা।

হোটেলের সেই বয়টা সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতেই নিশাকর ঘরে ফিরে এল। এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরের ছিরি ছাঁদ প্রায় বদলে দিয়েছে মালা। পালংকের গদীর উপর নিজেদের একটা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। টেবিলের উপর এক টুকরো কাগজ বিছিয়ে টুকিটাকি প্রয়োজনীয় জিনিস সাজিয়ে রেখেছে। জানালায় নকশা কাটা সুদৃশ্য পর্দা। নিশ্চয়ই হোটেলের চাকরটা টাঙিয়ে দিয়ে গেছে।

আয়নার সামনে মালা দাঁড়িয়ে।

দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখছিল সে। ঘাড়ের কাছে খোঁপাটা প্রায় নেমে এসেছে। হাতের কায়দায় মালা সেটাকে স্বস্থানে আনল।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে মালা বলল,—'ওগো, একটা কথা শুনেছ?'

'কি কথা?' নিশাকর হেসে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

চাকরটা কি বলছিল জানো? আজ এক বছরের উপর হল দোতলার এই ঘরটা তৈরি হয়েছে, সাজানো হয়েছে। কিন্তু কাউকে ভাড়া দেওয়া হয়নি। বলতে গেলে আমরাই প্রথম বাস করলাম এখানে।

—'কারণটা কি?'

ঘাড়ে গলায় পাউডার ঘষতে ঘষতে মালা বলল,—'কি জানি বাপু। চাকরটা বলছিল, মালিকের যত উদ্ভট খেয়াল। ওরা নাকি আমাদের বলে, ঘরটা ওর বউয়ের জন্য রিজার্ভ করা।'

—'তাই নাকি?' নিশাকর পরিহাস করে বলল, 'তাহলে নিশ্চয় আগের জন্মে তুমি ওর বউ ছিলে।'

—'দূর!' মালা আরক্ত হয়ে বলল, 'তা কেন হতে যাবে? হোটেল কাল থেকে উঠে যাচ্ছে বলে আজ শেষ রজনীতে আমাদের থাকতে দিয়েছে।'

দরকারী একটা কথা হঠাৎ মনে হল নিশাকরের। গাড়িটা একবার দেখানো দরকার। হোটেলের মালিক হয়ত একজন মেকানিকের খোঁজ দিতে পারবে। আজ রাতে গাড়ির গলদ শুধরে রাখলে কাল ভোর ভোর বেরিয়ে পড়া যায়।

বিরক্ত মুখে মালা বলল, 'একটুও দেরি কোরো না কিন্তু। বেশীক্ষণ একলা থাকতে আমার খুব ভয় করবে।'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল নিশাকর। বলল—'ভয় কিসের? দরজাটা বন্ধ করে থেক। আমার আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না।'

বনেট খুলে এঞ্জিনের দোষত্রুটি শোধরাতে আধঘণ্টাও লাগল না। মেকানিকটি কাজের লোক। নিজের লাইনে বেশ অভিজ্ঞ। গণ্ডগোলের কারণ আন্দাজ করতে ওর দেরি হল না।

মেকানিক চলে গেলে নিশাকরের মনটা লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত হাল্কা হয়ে এল। গাড়ির এঞ্জিন বিগড়ে যাবার পরই দুশ্চিন্তার শুরু। গুরুভার শ্রাবণ দিনের মেঘের মত এতক্ষণ মাথার উপর কি যেন একটা ঝুলেছিল। গাড়ির সমস্যার সমাধান হতেই চিন্তাটাও মুহূর্তমধ্যে উধাও।

কখন অন্যমনস্কের মত নিশাকর আবার সেই ছোট ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর ছায়া ছায়া অন্ধকার। হ্যারিকেনের শিখাটা কমানো। চেয়ারের উপর বসে ঠিক আগের মতই ঝিমোচ্ছিল লোকটা।

ঘরে পা দিয়ে নিশাকর বলল,—'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। পেট্রোল পাম্পে গিয়ে খোঁজ করতেই মেকানিককে পেয়ে গেলাম।'

'গাড়ি ঠিক হয়েছে আপনার?'

লোকটি চোখ তুলে তাকাল।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল সকালেই যেতে পারব মনে হচ্ছে।'

চেয়ারে বসে মানুষটাকে দেখছিল নিশাকর। ধান কেটে নেওয়া জমির অগ্রভাগের মত খোঁচা খোঁচা দাড়ি। থুতনীর বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ। কেমন অদ্ভুত চাউনি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার মুখের উপর কি দেখছে লোকটা? ওর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে রীতিমত সন্দিহান হয়ে পড়েছে নিশাকর।

হ্যারিকেনের কলটা সামান্য একটু ঘুরিয়ে দিতেই ঘরটা আর একটু আলোকিত হল।

লোকটি বলল,—দোতলার ঘরখানা আপনার স্ত্রীর পছন্দ হয়েছে তো?'

—'নিশ্চয়ই।' নিশাকর সন্তোষ প্রকাশ করল। 'অমন ঘর আবার অপছন্দ হয়।'

'আপনারা দুজনে এই হোটেলের শেষ রজনীর অতিথি। তা ছাড়া,—' লোকটি একটু থেমে বলল,—'আজকের এই তারিখটি আমার বিয়ের দিন। জানেন, আজ আমার বিয়ের কুড়ি বৎসর পূর্ণ হল।'

—'তাই নাকি? কিন্তু এমন দিনে আপনি হোটেলে চুপচাপ বসে কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। আপনার স্ত্রী নিশ্চয় অপেক্ষা করছেন।'

লোকটি জোরে হেসে উঠল। বলল,—'মাথাই নেই তো মাথাব্যথা কিসের? আমার মশায় স্ত্রীও নেই, বাড়িও নেই। তাই ঘরে ফেরার ভাবনাও নেই।'

—'নেই মানে? উনি মারা গিয়েছেন?' নিশাকর দ্বিধাগ্রস্তভাবে শব্দ কটি উচ্চারণ করল।

লোকটি মাথা নাড়ল। কয়েক সেকেন্ড পরে বলল,—'আমার স্ত্রী একটা লোকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। আমাদের বিয়ের ঠিক ছ মাস পরের ঘটনা এটা।'

বউ পালানোর এই দুঃসংবাদটা নিশাকরকে একটু লজ্জিত এবং সহানুভূতিশীল করল। লোকটিকে কি বলা যায় তাই ভাবছিল সে। সম্ভবত এ জন্যই ওকে একটু উদ্‌ভ্রান্ত এবং অসংলগ্ন মনে হচ্ছে।

লোকটি আপন মনে বলতে শুরু করল,—'কাউকে বিশ্বাস করতে নেই মশায়। কাউকে না। বন্ধুবান্ধব, নিজের স্ত্রী, কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। আর বিশ্বাস করেছেন কি ঠকেছেন......'

সম্ভবত এবার সে তার অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর গল্প করবে। নিশাকর অলসভঙ্গিতে চেয়ারে গা এলিয়ে রইল। এই ধরনের লোক তার চেনা। নিজের কোন কথা গোপন করতে জানে না এরা। সামান্যতম সহানুভূতি এবং মনোযোগী শ্রোতা পেলে উথলে ওঠা দুধের মত এরা নিজেকে উজাড় করে দেয়।

লোকটি আবার মুখ খুলল—'তিরিশ বৎসর বয়সে আমার বিয়ে হল মশায়। আমার বউ মুক্তোর বয়স তখন কুড়ি একুশ। বউকে যখন দুধে আলতায় পা দিয়ে দাঁড় করাল, তখন এক ঠাকমা আমার কানে কানে বললেন,—ওরে ছোঁড়া, এযে এক রাজার [illegible]। ওর রূপে যে তুই পিঁপড়ের মত পুড়ে মরবি। কথাটা কিন্তু সত্যি মশাই। বিয়ের আগে আরো কয়েকটা সম্বন্ধ হয়েছিল আমার। কিন্তু মেয়ে সুবিধের নয় বলে আমি রাজী হইনি। তা মশায়, আমার ভাগ্যে সবুরে মেওয়া ফলল। সেই বয়সে মুক্তো প্রায় ডানাকাটা পরী। এমন রূপসী আমাদের ও-তল্লাটে কেউ দেখেনি। পাড়ার লোকে আড়ালে বলল,—বাঁদরের গলায় মুক্তোমালা ঝুলেছে গো।

মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল নিশাকরের,—'কি নাম বললেন আপনার স্ত্রীর, মুক্তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' লোকটি মাথা নামিয়ে টেবিলের উপর কি যেন খুঁজল। বলল,—'তারপর বুঝলেন মশায়, আমাদের ওই ছোট্ট গাঁয়ে মুক্তোর মন টেকেনি। আমাকে সে বলত, শহরে চল। এই এঁদো পাড়াগাঁয়ে মানুষ থাকে? তা ওর দোষ নেই খুব। শহরের স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে মুক্তো। সিনেমা থিয়েটার দেখেছে। ওর কি পাড়াগাঁ পছন্দ হতে পারে?'

বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। ঘরের মধ্যে বসেও নিশাকরের একটু শীত-শীত লাগল। দরজাটা ভেজিয়ে দিলে ভাল হত। কিন্তু লোকটির হয়ত তা পছন্দ নয়। এই ভেবে সে নিরস্ত হল।

লোকটি বলে চলল,—'সে বছর আমাদের গাঁয়ের স্কুলে একজন নতুন মাস্টার এল। একেবারে ছোকরা মাস্টার, তেইশ-চব্বিশের মত, বয়স, ফর্সা রং, ছিপছিপে গড়ন। একমাথা কোঁকড়া চুল মাস্টারের, চোখে সোনালী ফ্রেমের খুব সুন্দর একটা চশমা পড়ত। আমাদের গ্রামের জমিদার হাইস্কুলে সে বছরই ক্লাশ নাইন খোলা হল।

সবাই ধরে বসল মাস্টারকে আমার ঘরে থাকতে দিতে হবে। বৈঠকখানা ঘরটা বাইরের দিকে। ও ঘরটায় মাস্টার বেশ স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারে। সকলের কথা এড়াতে না পেরে আমি রাজী হলাম মশায়, নতুন মাস্টার আমার ঘরে এসে উঠল।'

একটু থেমে সে ফের শুরু করল,—'নতুন মাস্টারের সামনে প্রথম দিকে মুক্তো বেরোত না, কিন্তু ঘরে একটা লোক থাকলে কতক্ষণ তাকে এড়িয়ে চলা যায়? নতুন মাস্টার মুক্তোকে হঠাৎ বৌদি বলে ডাকতে শুরু করল। আমি দেখলাম কখন ওরা সহজ হয়ে গেছে। নতুন মাস্টার ঠাট্টাতামাশা করছে মুক্তোর সঙ্গে। মুক্তোও পরিহাস করতে ছাড়ছে না। আমাদের দেশে দেওর-ভাজের সম্পর্ক তো বোঝেন মশায়। ওদের রঙ্গ পরিহাস স্বাভাবিক এবং নির্দোষ বলেই আমাকে মেনে নিতে হল।'

এমনি শীতের রাতে পরস্ত্রীর একটা রসালো কেচ্ছাকাহিনী শুনতে পাবার লোভে রীতিমত উৎক এবং রোমাঞ্চিত হওয়ার কথা। কিন্তু নিশাকর কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠছে। বাইরের ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া কখন সন্তর্পণে তার অন্তরে অনুপ্রবেশ করে বসেছে।

লোকটি বলল,—'ওই মাস্টারকে ঘরে ঠাঁই দেওয়াই আমার দুর্ভাগ্যের মূল হল মশাই। বললে বিশ্বাস করবেন না, তারপর কি ঘটল। নিজের বউকে ওই অবস্থায় দেখলে আপনিও ক্ষেপে উঠতেন। আমিও কি মাথার ঠিক রাখতে পেরেছিলাম? একদিন জ্যোছনা রাত্তির, কতক্ষণ ঘুমিয়েছি আমার হুঁস ছিল না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি পাশে মুক্তো শুয়ে নেই। আমার মাথায় কিছুদিন হল একটা সন্দেহ চেপে বসেছিল। বিছানায় ওকে না দেখে সন্দেহের আগুনটা দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। প্রায় এক লাফে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ঘরের ভেজানো দরজাটা নিঃশব্দে খুলে উঠোনে পা দিলাম। ফুটফুটে জ্যোছনায় সমস্ত উঠোনটা হাসছে। কিন্তু মুক্তো কোথায়? তাকে কোনোখানে পেলাম না। পা টিপে টিপে নতুন মাস্টারের শোবার ঘরের কাছে গেলাম আমি। দরজাটা বন্ধ কিন্তু উঠোনের দিকে একটা ছোট জানালা আছে। খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। জ্যোছনার আলোয় সমস্ত ঘরটা সাদা কাগজের মত পরিষ্কার। তাকিয়ে দেখি মুক্তোকে ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে নতুন মাস্টার শুয়ে। বেশ নীচু গলায় ফিস ফিস করে কথা বলছে দুজনে। মুক্তো ওর ফর্সা, দীঘল দুটি বাহুলতার সাহায্যে মাস্টারের কণ্ঠ বেষ্টন করেছে। আর নতুন মাস্টার ওর গালে, গলায়, কপালে অজস্র চুমো খাচ্ছে। আচ্ছা মশাই, নিজের স্ত্রীকে এমনি অবস্থায় দেখলে আপনি কি করতেন বলতে পারেন?'

চমকে উঠে নিশাকর শুধু বলল, 'আমি? মানে—'

লোকটা ভ্রূ কুঁচকে হাসল। বলল, 'অবশ্য এরকম একটা প্রশ্নের চট করে জবাব হয় না। কিন্তু সে রাত্তিরে আমি কি করলাম জানেন? মাথায় আমার খুন চেপেছিল। একটা কাটারি হাতে করে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম—'দরজা খোলো শিগগির।' অনেকক্ষণ কেউ বেরোল না। ঘরের মধ্যে কোন সাড়া নেই। আমি হুংকার দিয়ে আবার বললাম, 'দরজা খোলো শিগগির।'

লোকটার চোখ দুটো শ্বাপদের মত জ্বলছিল। প্রতিহিংসায় মানুষ বুঝি এমনি ভয়ংকর হয়ে উঠে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল ওর। শব্দটা ঠিক সাপের হিসহিসানির মত নিশাকরের ভয় হল।

—'বুঝলেন মশায়, মিনিট কয়েক পরে দরজা খুলে নতুন মাস্টার বেরিয়ে এল। ওর হাতে ফুট চারেক লম্বা একটা মজবুত লাঠি। মুক্তো ভয়ে ঘরের মধ্যেই কুঁকড়ে রইল। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি মাস্টারের মাথায় কাটারির কোপ হানলাম। ইচ্ছে, ওর মাথাটা দু ফাঁক করে দিই। কিন্তু নতুন মাস্টার ভারী সেয়ানা। সাঁৎ করে নিজেকে বাঁচাল। কিন্তু পুরোপুরি নয়। কাটারির একটা কোণা লেগে, ওর কপাল দিয়ে দরদর করে রক্ত বেরোতে লাগল।'

নিশাকর আড়চোখে তাকিয়ে দেখল বউয়ের কেচ্ছা-কাহিনী কেমন অবলীলাক্রমে বলে চলেছে লোকটা। হাজার হলেও নিশাকর সম্পূর্ণ অপরিচিত। এর জন্যে বুঝি

চয়ের মধ্যে কি সব কথা ফাঁস করতে আছে? খুব অস্বস্তি বোধ করল নিশাকর। এবং একটু ভয়ও হল ওর। মনের মধ্যে একটা জড়-সড় হতবুদ্ধি ভাব। নিশাকর একটু কুঁকড়ে বসল। লোকটি বলল,—'কিন্তু নতুন মাস্টার ঘায়েল হল না মশায়। রক্ত দেখে আমি লাফিয়ে ওঠার আগেই ওর সেই লাঠি দিয়ে সজোরে আমার মাথায় আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়লাম আমি। যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমার চারপাশে অনেক লোক। গ্রামের সবাই আমার ঘরে জুটেছে। শুধু নতুন মাস্টার আর মন্তোকে দেখতে পেলাম না। পাড়ার সেই ঠাকমা সখেদে বলে উঠল,—'পোড়ার-মুখি কুলে কালি দিয়ে পালিয়েছে। এ হবে, আমি জানতাম। আগে থেকে জানতাম।'

হঠাৎ ওর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটি বলল,—'মনে হচ্ছে, আপনি বেশ ভয় পেয়েছেন মশায়, অবশ্য কেলেং-কারীটা সাংঘাতিক। ভয় পাওয়ারই কথা।'

নিশাকর ম্লান হাসবার চেষ্টা করল,—'ভয় পাব কেন? বারে, ভয় কিসের?'

লোকটার ঠোঁটে কেমন জ্বালা ধরানো হাসি। সে বলল, —'মন্তো পালিয়ে যাওয়ার পর ঘর-সংসার কেমন বিস্বাদ হয়ে উঠল আমার। পড়শীরা আড়ালে হাসত। মুখে প্রবোধ দিত। বিয়ে না হলে এক জ্বালা, আবার বউ পালিয়ে গেলে অন্য জ্বালা মশায়। জীবনটা প্রায় দুর্বিসহ হল। অবশ্য এ দুঃখ আপনি বুঝবেন না। কিন্তু ধরুন, যদি আপনার স্ত্রী কোনো পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যান, তাহলে সমাজে আপনার টেঁকা দায় হয়ে উঠবে।'

ইংগিতটা অসম্মানকর। কিন্তু নিশাকর জবাব দিল না। লোকটি আপন মনে বলে গেল,—'জানেন মশায়, ক্ষোভে দুঃখে আমি গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। মনে বাসনা, যে করে হোক ওদের খুঁজে বার করব। পাঁচ দশ ...... পনেরো, কুড়ি বৎসরের মধ্যেও কি ওদের খুঁজে পাব না? একবার দেখা পেলে ওদের পিরীত আমি চটকে দেব। গাঁ ছেড়ে কলকাতায় গেলাম মশায়। হাতে টাকা-পয়সা নেই। শোভাবাজারে একটা ওষুধের দোকানে চাকরি নিলাম। নিজের পেটটা তো চালাতে হবে। স্কুলের খাতায় নতুন মাস্টারের একটা ঠিকানা ছিল। কলকাতায় একটা গলির মেসের ঠিকানা। আমি এসে শুনলাম মেসটা উঠে গেছে। বাড়িটায় মেয়ে-পুরুষের বাস। নতুন মাস্টারকে তারা কেউ চেনে না। দোকানে খদ্দের এলেই আমি হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকাতাম। আমি মনে মনে ভাবতাম ওষুধ কিনতে নতুন মাস্টার একদিন ঠিক এই দোকানে এসে উঠবে।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন লক্ষ্য করল লোকটা। বলল,—'আমার কাছে তখন একটা ছোরা রাখতাম। পথেঘাটে যখন বেরো-তাম, তখন ছোরাটা আমার কোমরে গোঁজা থাকত। হঠাৎ নতুন মাস্টারকে পেলে আমি ওর পিঠে আমূল বসিয়ে দেব সেটা। ছোরাটা আপনি দেখবেন?'

নিশাকর কিছু বলার আগেই লোকটা তার বালিশের নীচে থেকে খাপে ঢাকা ছোরাটা বের করে আনল। ইঞ্চি ছয়েক লম্বা, ক্ষুরধার ফলা ছোরাটার। খাপ থেকে খুলে অদৃশ্য শত্রুর পিঠে আমূল বসিয়ে দেখার মত একটা মহড়া দিল লোকটা। ওর কাণ্ড-

কারখানা দেখে নিশাকর প্রায় কাঁপছিল। মানুষটা নিশ্চয় ছিটগ্রস্ত। বলা যায় না, কখন বদখেয়ালে ওটা নিয়ে হয়ত নিশাকরের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু না। ছোরাটা খাপে ভরে লোকটা আবার সেটা বালিশের নীচে রেখে এল। বলল,—'প্রায় পনের বৎসর কলকাতায় রইলাম মশায়। কিন্তু নতুন মাস্টারের দেখা পেলাম না। তর্তদিনে নানারকম ওষুধ আর বিষের রহস্য আমার জানা হয়েছে। আচ্ছা, আপনি হায়োসিন বিষের কথা শুনেছেন?'

—'হায়োসিন?' নিশাকর মাথা নাড়ল।

—'সাদা সাদা গুঁড়ো পাউডারের মত এটা। কিন্তু এর হদিস বের করা খুব কঠিন। চায়ের কাপে অল্প একটু হায়োসিন মিশিয়ে দিলে আর রক্ষা নেই। সাধারণত ডাক্তাররা এসব কেসে, হার্টফেল করে মৃত্যু হয়েছে বলে বসেন।'

লোকটা হি-হি করে হাসল। বলল,—'ওষুধের দোকানের চাকরি ছেড়ে আমি মশায় হোটেল ফেঁদে বসলাম। ভেবে দেখলাম ওসব ছোরাছুরি চালানোর কম্মো নয়। আনাড়ি হাতে ছোরা মারতে গিয়ে শেষে ধরা পড়ি। তাহলেই শ্রীঘর বাস। ও শালা আমার বউকে নিয়ে ফুর্তি করবে আর আমি জেলের ঘানি টানি।'

নিশাকর ভাবল, কিছু বলবে। দোতলায় মালা অনেকক্ষণ একা রয়েছে। এবার তার যাওয়া উচিত। কিন্তু লোকটা যেভাবে গল্প ফেঁদে বসেছে, এখনই তার নিস্তার আছে বলে মনে হল না।

—'আচ্ছা মশায়, আপনি বিষ দিয়ে কখনও ইঁদুর মেরেছেন? বিষ মেশানো খাবার খেয়ে ইঁদুরগুলো কেমন ছটফটিয়ে মরে।' লোকটার চোখ দুটো উত্তেজনায় চকচকে দেখাল। সে বলল,—'আমার হোটেল ফাঁদবার উদ্দেশ্য কিন্তু এই ছিল। নতুন মাস্টার এলে আমি ওকে এমন সমাদর করব, যে ও বুঝতেই পারবে না, আমি ওকে চিনতে পেরেছি। কপালের সেই কাটা দাগটা তো মিলোতে পারে না। তারপর চায়ের সঙ্গে হায়োসিন মিশিয়ে ওকে আমি যমালয়ে পাঠাব। ডাক্তার এসে কি বলবে? হৃদযন্ত্র দুর্বল ছিল, তাই মৃত্যু ঘটেছে।'

হঠাৎ চুপসে যাওয়া একটা বেলুনের মত হতাশ ভঙ্গি করল লোকটা। বলল—'কিন্তু কিছুই হল না মশায়। নতুন মাস্টারের দেখা আমি আর পেলাম না। আমার বউকে নিয়ে কোথায় যে পালাল সে। এদেশে আছে কিনা তাই বা কে জানে? আজ বিশ বৎসর আমি ওকে খুঁজছি। কিন্তু আর নয়। এবার আমি দেশে ফিরব ভেবেছি। কিংবা কোনো তীর্থে গিয়ে বাকী জীবনটা কাটাব।'

নিশাকর বলল,—'আমি এখন উঠি তাহলে। আমার স্ত্রী আবার অনেকক্ষণ একা রয়েছেন।'

—'বিলক্ষণ, গায়ে পড়ে একটা বাজে গল্প শোনালাম এতক্ষণ ধরে। আপনার নিশ্চয় গা ঘিন ঘিন করছে?'

নিশাকর কোনো জবাব দিল না। কথায় কথা বাড়ে। চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

দোতলায় এসে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল নিশাকর। একটা পাগলের বকবকানি শুনতে গিয়ে মাথা খারাপ হবার জোগাড়। বুকের ভিতরটা এখনও কেমন ঢিপ ঢিপ করছে তার। ঠান্ডা শিরশিরে একটা ভয়ের স্রোত পা থেকে মাথা পর্যন্ত উঠছে, নামছে।

ঘড়িতে রাত দশটা। বিছানার এক পাশে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে মালা। একটা পাশ বালিশকে শিথিল ভঙ্গিতে জড়িয়ে আছে। সজোরে নাড়া না দিলে ওর ঘুম ভাঙবে বলে মনে হয় না।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ হতেই নিশাকর তাকাল। হোটেলের সেই চাকরটা মুখ বাড়িয়ে আছে।

—'খাবার আনব বাবু?' ছেলেটা এক মুখ হাসল।

—'খাবার?' চট করে হায়োসিনের সাদা গুঁড়োর কথা মনে পড়ে গেল নিশাকরের। তার কপালে অবশ্য কাটারির আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। তবু লোকটাকে বিশ্বাস কি? হয়ত শেষ রজনীতে বিষটা তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে।

গম্ভীরমুখে নিশাকর বলল,—'আমাদের দুজনেরই শরীর খুব খারাপ। আজ রাতে আর কিছু খাব না।'

জিনিসপত্র সব গোছানই ছিল। তবু বাকী কাজটুকু আজ রাতেই সেরে রাখল নিশাকর। কাল খুব ভোরেই রওনা হবে তারা। এই পান্থশালায় আর নয়। রাতের অন্ধকার নিশ্চিহ্ন হবার পর আর একটি মুহূর্তও ব্যয় করবে না।

ঘরের দরজায় চাবি লাগানোর ব্যবস্থা। টেবিলের ওপর চাবিটা রয়েছে। খুব সন্তর্পণে চাবিটা ঘোরাল নিশাকর। দরজা টেনে দেখল। না, কোনো ভুল হয়নি তার। এবার নিশ্চিন্তে ঘুমোনো চলে।

শেষ রাতের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নিশাকরের। মালা তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরেছে। আবেগে নয়,—আশংকায়, ভয়ে।

ফিসফিস করে মালা বলল,—'ঘর থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।'

—'কেমন করে বুঝলে?'

'খুট করে একটা শব্দ হতেই আমার ঘুম ভাঙল। মনে হল কে যেন দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল।'

খুব দ্রুত বিছানা থেকে নামল নিশাকর। টর্চের আলো ফেলে ঘরটা ভালো করে দেখল। দরজাটা টেনে পরীক্ষা করল। না, চাবি লাগানো আছে।

ভোর হতে আর এক মিনিটও দেরি করল না সে। নীচে গিয়ে চাকরটাকে ডেকে আনল। গাড়িতে মালপত্র তোলা হলে বলল,—'তোর মালিক উঠেছে কি না দ্যাখ। চল্, একবার ঘরে গিয়ে দেখা করে আসি।'

গাড়ির আয়নায় নিজের মুখখানা দেখছিল নিশাকর। কপালের সেই ক্ষতের চিহ্নটার কোন অস্তিত্ব নেই। সার্জনের কেরামতীর প্রশংসা করতে হয়। প্ল্যাস্টিক সার্জারির অসামান্য অবদান। নিশাকর নিশ্চিন্ত হতে চাইল।

ভেজানো দরজাটা খুলেই চীৎকার করে উঠল ছেলেটা। —'বাবু, দেখবেন আসুন। মালিক যে মরে পড়ে আছেন।'

মেঝের উপর মৃতদেহটা পড়ে। টেবিলের উপর একটি পাত্রে আহারের অবশিষ্ট। গ্লাসও রয়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করল নিশাকর। টেবিলের এক কোণে গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা রঙের কি যেন বস্তু। দেখা মাত্র মস্তিষ্কের রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে পুলিশ আর ডাক্তার এসে উঠল ঘরে।

দারোগা বলল,—'আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। সাদা রঙের এই গুঁড়োটাই সম্ভবত বিষ। একটা জবানবন্দী পেলেই ল্যাটা চুকে যেত।'

বেলা আটটা নাগাদ অব্যাহতি পেল নিশাকর। তার পরিচয়, আগমনের উদ্দেশ্য, রাত্রিবাসের কারণ, সব কিছু শুনে দারোগা তাকে যেতে অনুমতি দিল। প্রয়োজন হলে পুলিশ তার ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করবে। তবে তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই বলে মনে হয়।

দারোগা হেসে বলল,—'অন্য কেউ হলে জিনিষপত্র একবার সার্চ করে দেখতাম। কিন্তু আপনি সস্ত্রীক এসেছেন। এই কেসের সঙ্গে আপনাকে জড়ানোর কোন মানে হয় না।'

মুকুটমণিপুর নয়। সোজা কলকাতায়—এ যাত্রায় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে এই ঢের। মনে মনে তাই ভাবছিল নিশাকর। হায়োসিনের সাদা সাদা গুঁড়ো, চকচকে ছ' ইঞ্চি ছোরাটা তার চোখের সামনে ভাসছিল।

বাক্স খুলে প্রায় সাপ দেখার মত পিছিয়ে এল নিশাকর। জামা কাপড়ের উপর সাদা সাদা গুঁড়ো ভর্তি একটা শিশিতে বিষ কথাটি পরিষ্কার লেখা। এক পাশে ছোট্ট একটা চিঠি—

মুক্তামালা,

আজ আমাদের বিবাহের রজনী। নিশাকরবাবুকে লইয়া একবার আসিও। আমি প্রতীক্ষায় থাকিব। ইতি—

অন্নদাশঙ্কর রায়

।। বিশ ।।

অগাস্ট অভ্যুত্থানের মূলে এই ভয়টাও একটা প্রেরণা ছিল যে ইংরেজরা আমাদের জাপানীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালাবে, আমাদের প্রভুবদল ঘটবে। প্রভুবদলের ভয়েই আমরা সেদিন অমন মরীয়া হয়ে উঠেছিলুম। অহিংসার নিয়ম মানতে পারি নি। প্রভু-বদলের আশঙ্কা না থাকলে সেই আমরাই অহিংসার দৃষ্টান্ত দেখাতুম।

তেমনি ঝীণা সাহেবের ও তাঁর অনুবর্তীদের প্রাণেও ছিল আরেক রকম প্রভুবদলের ভয়। ইংরেজ তাঁদের কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে আর কংগ্রেস তখন অহিংসার কথা ভুলে গিয়ে পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে ব্রুট মেজরিটির শাসন চালাবে। হিন্দুদের বুটের তলায় পড়ে থাকবে আর সব সম্প্রদায়। মাইনরিটি কোনোদিন গণতন্ত্রের পথ ধরে মেজরিটি হবে না। সুতরাং কংগ্রেস মেজরিটিই চিরন্তন হবে। সেটা হবে ব্রিটিশ রাজত্বের চেয়েও চিরস্থায়ী। ইংরেজরা বিদেশী লোক। তারা একদিন বিদায় নিতে পারে। কিন্তু হিন্দুরা তো যাবার মানুষ নয়, তাদের যাবার জায়গাও নেই। কাজেই তারা মুসলমানদের মাথায় চড়ে বসে থাকবে। সিন্দবাদ নাবিকের ঘাড়ে যেমন সেই বুড়ো।

এই ভয়টাকে জাগিয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারাই, মায় গান্ধী। তাঁরা খোলাখুলি বলে বেড়িয়েছিলেন যে ইংরেজের পরে কংগ্রেস। কংগ্রেসের হাতেই ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর করে যাবে। মুসলমানরা যদি ক্ষমতার অংশ চায় তো কংগ্রেসে যোগ দিক ও স্বাধীনতার জন্যে লড়ুক। মুসলমানদের জন্যে আবার আলাদা নির্বাচকমন্ডলী কেন? তেমন মন্ডলী যতদিন না রহিত হয়েছে ততদিন ওতে কংগ্রেসও প্রার্থী দেবে। মুসলিম প্রার্থী অবশ্য। কংগ্রেস মুসলিম প্রার্থীরা জয়ী হলে কংগ্রেস মন্ত্রীমন্ডলীতে তাঁদের থেকেই মুসলিম মন্ত্রী নেওয়া হবে। বাইরে থেকে যদি কাউকে নেওয়া হয় তো তিনি কংগ্রেস অঙ্গীকারনামায় সই করবেন। ইতিমধ্যে আটটা প্রদেশ কংগ্রেসের ছত্রতলে এসেছিল। এর পরের ধাপটা কেন্দ্রে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব। অনন্যানিরপেক্ষ মেজরিটি যদি সে পায় তবে তাকে হটাবে কে ও কবে?

পুরাতন শাসনসংস্কার আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার জন্যে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে কংগ্রেস অনন্যানিরপেক্ষ মেজরিটি পায়নি, কারণ মনোনীত সদস্য ও সরকারী সদস্যদের একটা ব্লক ছিল, সেটা কংগ্রেসের পথরোধ করেছিল। কোনো মতে সেটাকে সরাতে পারলে কংগ্রেসকে রোখে কে? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হলে সে ব্লক আর কংগ্রেস বিরোধী হবে না। তখন কংগ্রেস নিজের খুশি মতো স্টীমরোলার চালাবে।

সেকথা ভাবতেই ঝীণা সাহেব চোখে সরষে ফুল দেখেন। ছিলেন তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির নেতা। তাঁর পার্টিতে ছিলেন কোয়াসজী জাহাঙ্গীর প্রমুখ পার্শী, হিন্দু, মুসলমান সভ্য। ওটা একটা নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী। কখনো সরকারের পক্ষে ভোট দেয়, কখনো কংগ্রেসের পক্ষে। কারো কাছে কোনো অনুগ্রহ চায় না। ঝীণা সাহেব তেমন মানুষই নন। তাঁর নিজের যথেষ্ট আয় ছিল। তাঁর সঙ্গীরাও ধনিক। তা-ছাড়া ঝীণা সাহেবের জীবনের রেকর্ড এমন যে সরকারী পদমর্যাদা বা উপাধির জন্যে কোনোদিন তিনি তাঁর স্বাধীনতা বিকিয়ে দেননি।

তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেননি তা ঠিক। তা বলে তিনি সহযোগীও ছিলেন না। উইলিংডন যখন বম্বের গভর্নর ছিলেন তখন ঝীণা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিলেন। বম্বের কংগ্রেসকর্মীরা চাঁদা করে তাঁর নামে একটা হল প্রতিষ্ঠা করেন। যাঁর স্ত্রী পার্শী ও বন্ধুরা অধিকাংশ হিন্দু বা পার্শী, যিনি আহারে বিহারে আহেল বিলিতী, তাঁকে মুসলমান বলতেই অনেকের আপত্তি ছিল। তাঁর স্ত্রীর নাম রতনপ্রিয়া, তাঁর নিজের নামের পদবী ঝীণা, যে নাম হিন্দুদেরই নাম হয়। গান্ধী নাকি প্রথম পরিচয়ে জানতেনই না যে ঝীণা একজন হিন্দু নন। পাকিস্তানের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন ইসমাইলিয়া খোজা। আইনে বলে "The term 'Hindu' includes an Ismailia Khoja".

আইনসভায় যিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির নায়ক হিসাবে ভারতীয় স্বার্থ দেখতেন তিনিই আবার মুসলিম সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দেখতেন মুসলিম লীগ নেতা হিসাবে। এই দ্বৈত সত্তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিশেষত্ব ছিল প্রথমাবধি। গান্ধীযুগের পূর্বে তিনি ছিলেন একাধারে কংগ্রেস নেতা ও মুসলিম লীগ দলপতি। সেই জন্যে দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতুবন্ধন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়। লখনউ চুক্তি তাঁর সেতুবন্ধনের নিদর্শন। সরোজিনী নাইডু তাঁকে হিন্দু মুসলিম একতার রাজদূত বলে অভিহিত করেছিলেন।

ঝীণা সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের আদিতে তিনি কংগ্রেসম্যান, শুনেছি দাদাভাই নওরোজীর প্রভাবে। আইনসভায় নির্বাচনের সূত্রপাত হলে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রবেশ করেন ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত থাকেন। দাঁড়াতে হতো তাঁকে স্বতন্ত্র নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জিততে হতো কেবলমাত্র মুসলমানদের ভোটে। সাম্প্রদায়িক জনপ্রিয়তা ভিন্ন সেটা সম্ভব নয়। তা হলেও তিনি যেমন তাঁর সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করতেন তেমন আর কেউ নয়। না পড়তেন নামাজ, না রাখতেন রোজা, না পরতেন মুসলমানী পোশাক, না জানতেন উর্দু, না ছাড়তেন মদ। চল্লিশ বছর বয়সে
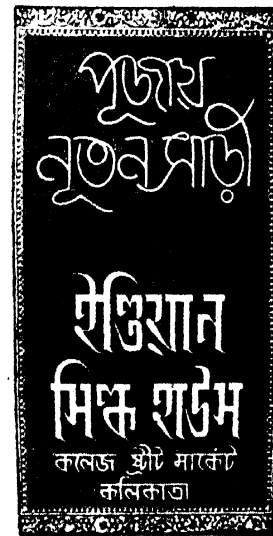
য়ে করে বসলেন রতনপ্রিয়া পেতিককে। র কন্যার বয়সী। বিয়েটা ইসলামী মতে য়েছিল, তাছাড়া ইসলামের সঙ্গে আর কো সম্বন্ধ ছিল না। ভদ্রমহিলা কালের পক্ষে স্বাধীনা ছিলেন।

মুসলমান সমাজ তো চটলই, ওদিকে রকারী মহলও যে খুব খুশি হলো তা য়। একবার লর্ড চেমসফোর্ডের সকাশে সেই তজস্বিনী মহিলাকে প্রেজেন্ট করা হলে তিনি রাজপ্রতিনিধিকে হাতযোড় করে নমস্কার করেন। তখনকার দিনে ওটা ছিল অকল্পনীয় এক স্পর্ধা। প্রায় বমশেল বললেও চলে। বড়লাট ছিলেন বাপের বয়সী, তাই ক্ষমা করলেন।

"মিসেস জিনা, যখন আপনি রোমে তখন রোমানদের মতো ব্যবহার করবেন।" চেমসফোর্ডের হিতোপদেশ।

"ইওর এক্সেলেন্সী, ওছাড়া আমি আর কী করেছি? যখন আমি ভারতে তখন আমি ভারতীয়দের মতোই নমস্কার করেছি।" রতনপ্রিয়ার প্রত্যুক্তি।

ঝীণা বা তাঁর পত্নী শাসককুলের কাছে মাথা নত করবার পাত্র বা পাত্রী ছিলেন না। তেমনি সমাজের কাছে সুলভ বাহবা কুড়োবার জন্যে খাটো হতেন না। ঝীণার উচ্চাভিলাষ বলতে ওই দুটোই ছিল : আইনসভায় গিয়ে ডিবেটে যোগ দেওয়া। আর কংগ্রেস লীগের মাঝখানে সেতুবন্ধন করা। ইংরেজরা তখন তাঁকে তাঁদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতিতে আকৃষ্ট করতে পারেনি। সে খেলায় তাঁর কোনো হাত ছিল না। বরং বলা যেতে পারে যে তাঁর কার্যকলাপ ছিল সে নীতির বিপরীত।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে ঝীণাকে আর কংগ্রেসে দেখা গেল না। লীগেও যে দেখা গেল তা নয়। কিছুদিনের জন্যে তিনি অজ্ঞাতবাস করেন। নানা কারণে তাঁর পারিবারিক জীবনে কন্যাসন্তান রেখে অকালে দেহত্যাগ করেন· অশান্তির ঝড় বয়ে যায়। রতনপ্রিয়া একটি কন্যা সন্তান রেখে অকালে দেহত্যাগ করেন। ঝীণার সংসারজীবন তখন থেকেই চিরদুঃখের। ওই মেয়েটিকেও কি তিনি রাখতে পারলেন? ওর যখন বিয়ের বয়স হলো তখন ও চলল সাগরপারে এক পার্শী খৃস্টান কুবেরনন্দনের বধূ হয়ে। পিতার অমতে।

সে ঘটনার কিছু আগেই কলকাতায় ঝীণা ও তাঁর দুহিতাকে আমি চাক্ষুষ করি। ফিরপোর থেকে বেরিয়ে মোটরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন ওঁরা। ওঁদের পেছনে একসার বোরা বা খোজা বণিক। বোধহয় লাঞ্চনের নিমন্ত্রণ ছিল। আমি তখন দর্জির দোকানে ঢুকছি। সালটা ১৯৩৭। বাংলায় প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডল গঠিত হয়েছে, কিন্তু যেসব প্রদেশে কংগ্রেস মেজরিটি সে-সব প্রদেশে হয়নি।

ঝীণা প্রত্যাশা করেছিলেন যে নতুন ভারত শাসন আইন অনুসারে যে-সব প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডল গঠিত হবে তাতে পুরাতন রীতি রক্ষিত হবে, গভর্নরই উদ্যোগী হয়ে আপনার দায়িত্বে মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও মেজরিটি মাইনরিটি দুই সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন দু'সেট লোক নেবেন। যেমন হতো মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার অনুসারে। প্রধানমন্ত্রী বলে একজন অন্যান্য মন্ত্রী নির্বাচন করবেন ও মেজরিটির নেতা মাইনরিটির অনাস্থাভাজন ব্যক্তিকেও নেবেন ঝীণা এতটা ভাবতে পারেননি। কিন্তু গান্ধী ভেবেছিলেন। গভর্নরকে প্রধানমন্ত্রীর উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে, নইলে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডল গঠন করতে কংগ্রেসকে অনুমতি দিতেন না। ভেবে দেখার জন্যে ছ' মাস দেরিও করিয়ে দেন তিনি।

ফলে দাঁড়ায় এই যে মন্ত্রীপদগুলো হয় কংগ্রেসের দান। কংগ্রেস দান করলেই লীগ পাবে। তার জন্যে কংগ্রেসের কাছেই হাত পাততে হবে, গভর্নরদের কাছে গিয়ে চাইলে মিলবে না। ঝীণার মতো মানী মুসলমান হিন্দুর কাছ থেকে দাক্ষিণ্য গ্রহণ করবেন? ইংরেজ তাঁকে এমন করে পথে বসাবে এটা কি হলো ইংরেজের মতো কাজ! কেন্দ্রীয় সরকারেও এই নতুন রীতি প্রসারিত হবে নাকি! সেখানেও কি কংগ্রেস দেবে, লীগ নেবে? সম্বন্ধটা হবে দাতা ও গ্রহীতার? যেটা এতদিন ছিল ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের।

ঝীণা ইতিমধ্যে তাঁর ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি ভেঙে দিয়ে তার বদলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম লীগ পার্টি গড়েছিলেন ও তার চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। মূল মুসলিম লীগের সভাপতিত্বও তাঁর করতলগত হয়। তিনিই হয়ে দাঁড়ান স্থায়ী সভাপতি। তাঁর যৌবনের মুসলিম লীগের সঙ্গে বার্ধক্যের মুসলিম লীগের পার্থক্য ছিল। সে মুসলিম লীগ কল্পনা করতে পারেনি যে ক্ষমতা একদিন ভারতীয়দের হাতে আসবে ও কংগ্রেসের হাতে পড়বে। যদি করত তবে লখনউ চুক্তিতে তার জন্যে ব্যবস্থা থাকত। লখনউ চুক্তির মতো আর একটা চুক্তি ছিল ঝীণার ধ্যান। কিন্তু এ কংগ্রেস সে কংগ্রেস নয়। এ কংগ্রেস সংগ্রামী কংগ্রেস, যে সংগ্রাম করবে না তার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না।

তা ছাড়া কংগ্রেস তো জানিয়েই দিয়েছে যে দেশে দুটি মাত্র পক্ষ আছে, ইংরেজ আর কংগ্রেস। মুসলমানদের কংগ্রেসেই যোগ দিতে হবে। ওদের যা পাবার ওরা পাবে কংগ্রেসের ভিতর থেকে ও তার সভ্য হিসাবে। আর নয়তো ইংরেজের কাছ থেকে, ওদের বাহনহিসাবে। শুধুমাত্র মুসলমানদের নিয়ে একটা তৃতীয় পক্ষ কংগ্রেস স্বীকার করে না, করে ইংরেজ। ঝীণা সাহেবের মনের জ্বালা এইখানে।

তারপর তিনি ভুলে যান যে তিনি যখন লখনউ চুক্তির ঘটকালী করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন কংগ্রেস ও লীগ উভয় দলের আস্থাভাজন নেতা, শুধু মুসলিম লীগের নন। সে সময় তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি মুসলমান হয়ে কংগ্রেসে আছেন কী করে, ওরা না হিন্দু? তিনি উত্তর দেন, কংগ্রেসে আছি ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের খাতিরে আর লীগে রয়েছি মুসলমাদের বিশেষ স্বার্থের খাতিরে। তখনকার দিনে ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থ ও মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থ পরস্পর বিরোধী বলে বিবেচিত হতো না। তাই ঝীণা, ফজলুল হক, মজহরুল হক, এমন কি আবুল কালাম আজাদ পর্যন্ত দুই প্রতিষ্ঠানে ছিলেন। যতদূর জানি। তখনো কংগ্রেস একটা পার্টিতে পরিণত হয়নি। লীগও না। পার্টির ধারণা আসে স্বরাজ পার্টি সংগঠনের সময়। ঝীণা সে সময় ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি গড়েন। ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের খাতিরেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টিতে থাকেন। তাঁর কাছে ওই হয় কংগ্রেসের বিকল্প।

তখনো ক্ষমতার রাজনীতি ভূমিষ্ঠ হয়নি। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা স্বরাজ পার্টিরও অভিষ্ঠ ছিল না। ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির তো নয়ই। ত্রিশের দশকে যখন ক্ষমতার রাজনীতি এসে কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দেয় তখন অনেকগুলি পার্টি গজিয়ে ওঠে। কৃষক প্রজা পার্টি, ইউনিয়নিস্ট পার্টি প্রভৃতি নির্বাচনে নামে। যেখানে যেখানে পারে মন্ত্রিত্ব করে। তখন এমন কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না যে কগ্রেস মুসলমানরা কংগ্রেস টিকিটে মুসলিম নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়াতে পারবে না। তাই উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদিও বলতে গেলে হিন্দুশূন্য তবু সেখানেও কংগ্রেস মুসলমানরা আধিপত্য করেন। কংগ্রেস আর হিন্দু যে সমার্থক নয় সেটার দৃষ্টান্ত উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।

ইংরেজদের তো একটা শ্রুতিই আছে, তাঁরা যা দেখতে চান না তা দেখেন না। নেলসন তাঁর কানা চোখে দূরবীণ দিয়ে কোপেনহাগেন বন্দরের দিকে তাকিয়ে ডেনমার্কের শ্বেত পতাকা দেখতে পান না, সমানে গোলা চালিয়ে যান। তেমনি এদেশের ইংরেজরাও মেনে নিতে পারেন না যে

কংগ্রেস বলতে মুসলমানও বোঝায়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দেন ঝীণা সাহেব যখন তাঁর থীসিস হয় মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। তার মানে দাঁড়ায় কংগ্রেস কেবল হিন্দুদেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাই যদি হতো তবে খোদ ঝীণা সাহেব ওর মেম্বর ছিলেন কী করে, দুই প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে সেতুবন্ধন করেছিলেন কী সূত্রে? ইতিহাসকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কংগ্রেসের নতুন নীতি বা নতুন নেতৃত্ব তাঁর মনঃপূত হয়নি বলেই কি উক্ত প্রতিষ্ঠান ষোল আনা হিন্দু বনে গেল? আর লীগই বা মুসলমানদের ষোল আনার হয় কী করে? যখন ইউনিয়নিস্টরা পাঞ্জাব চালাচ্ছে আর কৃষক-প্রজারা বাংলায় মুসলিম লীগকে প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে বঞ্চিত করেছে।

নেলসনের মতো ঝীণা সাহেবেরও ছিল দূরবীণ নয়, মনোক্ল চশমা। সেটা এক-চোখে পরতেন। তাই তিনি সেই এক চোখেই দেখলেন যে মুসলিম লীগ ষোল আনা মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। আসলে এর পেছনে কূটনীতি ছিল। একবার যদি কংগ্রেসকে দিয়ে এটা মানিয়ে নেওয়া যায় তবে একধার থেকে যেখানে যত কংগ্রেস মুসলমান মন্ত্রী আছেন সবাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তেমনি একবার যদি ব্রিটিশ কর্তাদের দিয়ে মানিয়ে নেওয়া যায় তবে যেখানে যত কংগ্রেস মুসলিম মন্ত্রী আছেন সবাই পদচ্যুত হন। তখন তাঁদের পরিবর্তে মন্ত্রিত্ব করেন লীগ মনোনীত ব্যক্তিরা।

লীগ মন্ত্রীরা কংগ্রেস মন্ত্রীমন্ডলে যোগ দিলে ওর নাম আর কংগ্রেস মন্ত্রীমন্ডল থাকে না। প্রধানমন্ত্রী বেচারারও ক্ষমতা যায়, তিনি হন শুধু কংগ্রেসের বা হিন্দুদের মন্ত্রীপ্রধান। অন্য যে কোনো মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে সমান। ইংলন্ডের প্রাইম মিনিস্টার সীস্টেম সবে ভারতে প্রবর্তিত হয়েছে। সেটা এক কথায় খারিজ হয়। তেমনি মন্ত্রী-মন্ডলের যৌথ দায়িত্ব নামক তত্ত্বটিকেও অঙ্কুরেই বিনাশ করা হয়। ক্যাবিনেট সীস্টেম বলে কিছু গড়ে ওঠে না। ঝীণা সাহেবের সাহচর্য এতই মূল্যবান যে তার জন্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী ডেমক্রাসীর দুটি কীর্তিস্তম্ভ—প্রধানমন্ত্রী ও যৌথ দায়িত্ব—বিসর্জন দিতে হয়।

ঝীনা সাহেব বলতে আরম্ভ করেন, পার্লামেন্টারী ডেমক্রাসী ভারতের জন্যে নয়। অবিকল ইংরেজদের মতো কথা। তা যদি সত্য হয় তবে তাঁর নিজের জীবনটাই বৃথা গেছে। কারণ তিনিই আমাদের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পার্লামেণ্টারিয়ান! নির্বাচিত আইনসভার গোড়া থেকেই তিনি রয়েছেন ও শেষপর্যন্ত আছেন, মালবীয়জীর বেলাও যা খাটে না। ওটা সত্য হলে বাংলাদেশে নাজিমউদ্দীন সাহেবেরও স্থান হয় না। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্র্যাসী না থাকলে তিনিও থাকেন না। তেমনি তিনি মেজরিটির উপর ভীটো দাবী করে বসেন। সেটা কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের দেওয়া হলে বাংলায় পাঞ্জাবে হিন্দু শিখদেরও দিতে হয়। এর পরে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্যে এক-তৃতীয়াংশ ওয়েটেজের প্রস্তাবও তোলেন। কেই বা তাতে রাজী হচ্ছে? ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ঠেলাতেই মানুষ অস্থির।

প্রাদেশিক মন্ত্রীমন্ডলগুলোতে কোয়ালিশনের বাসনা তাঁর ছিল, সেই জন্যে তিনি কোনো চরম পদক্ষেপ নেন নি। কিন্তু যেই সেগুলি যুদ্ধের ইস্যুতে পদত্যাগ করে চলে গেল অমনি তিনি বুঝতে পারলেন যে ওদের পদত্যাগের উদ্দেশ্য ইংরেজের উপর চাপ দিয়ে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট গঠন করা। সেটাও হতো একটা কংগ্রেস গভর্নমেন্ট। অন্তত কংগ্রেস প্রভাবিত গভর্নমেন্ট। সেখানেও সেই মেজরিটি রুল। মাইনরিটির প্রতিনিধিরা যাবেন না, যাবেন মেজরিটির দ্বারা বাছাই করা তথাকথিত মুসলমান। ঝীণা কংগ্রেসের ভয়ে ঝাঁপ দিয়ে বলেন, মা ধরণী, দ্বিধা হও।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাত থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল স্বরূপ, বলল—'এবার ফিকরের কথায় এসে পড়া যাক দা'ঠাকুর।

আজ্ঞে হ্যাঁ, ব্রেজঠাকুরুণ এলেন বৈকি. না এসে পারেন? আর এ যা এক ব্রেজঠাকরুণ এলেন যেন সম্পূন্ন? আলাদা মনিষ্যি। কথাটা বুঝলেন না? এর আগে সেবার য্যাখন এলেন ত্যাখন সবই তো সমিস্যে। প্রেথমে তো নেমেই বাড়ীর উঠোনে বিধবা আর সধবা পার্টিদের লাঠালাঠির উদ্দুগ, একদল বলে ঠাকুর-মশাই গেরামে বিধবা-বিবাহ দিয়েচেন. আমার ঘর জ্বালিয়ে দেবে, একদল লাঠি নিয়ে তোয়ের. মরদকা বাচ্চা হোস তো জ্বালা দেখি ঘর। সেই থেকেই তো ওনাকে রণচন্ডী মূর্ত্তি ধরতে হোল। তারপর ওদিক সামলান তো বাড়ীতে ঐ রকম আইবুড়ো মেয়ে অথচ বাপের ঐ অবস্থা। আয়ের দিকে খেয়াল নেই, তারপর আবার কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ল—ভদ্রাসনটুকুও সুদখোর রাজ. ঘাবালের কাছে কর্জের দায়ে বাঁধা. আর সে আস্তিস্যি দেখিয়ে তার অপদার্থ গোঁজেল ছেলের সঙ্গে বিয়ে একরকম পাকা করেই এনেচে। মাথা কখনও ঠিক থাকে মানুষের? সব্বদাই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলত।

তা সে সব সমিস্যে তো মিটে গেচে এখন আর সে ব্রেজঠাকরুণই নয়। য্যাখন এসে পেঁছুল—তারপর দিন ঐ সময়েই বাড়ির দরজায় নামল তো শালী আর ভগ্নী পোত—ভেতরে এসে উঠোনের মধ্যিখানে দাঁইড়ো একবার চারদিকটা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—'মেয়েটা নেই, বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করচে গো।'

বাবাঠাকুরেরও দেখুনে আর যেন সে আতঙ্কের ভাবটা নেই। এগুনে তো এড়িয়ে এড়িয়েই যেত, খেয়ালী মেয়ে-মানুষ। উনিও বিধবা-বিয়ের পুরুত. কখন হঠাং একটা মালা দেয় বুঝি গলায় ঝুলিয়ে। এখন আর সে ভয়টা যেন নেই, বললে—'আশীব্বাদ কর্‌রো দিদি এখন যে বাড়ি গেচে সে বাড়িটা যেন আলো করে রাখতে পারে।'

উনি বললে—'ও মা, তা আবার নয় ভাই আর ও আমার যা মেয়ে, রাখবেই আলো ক'রে. দেখে নিও।'

এরপর বাবাকে বললে—আজ্ঞে, বাবাকেই তো বাড়ী আগলাতে রেখে গেছল ঠাকুরমশাই. সামনে দাঁইড়োই ছেল—বাবাকে বললে শিবদাস, তুমি লোচনকে বলে দাও বলদের গাড়ি নিয়ে যেন চলে না যায়। আমি একবার কুটুমবাড়ি যাব। মেয়েটাকে দেখে আসি একবার।'

আমি তো আর নিজেকে ধরে রাখতে পারচি না দা'ঠাকুর; এ কী কান্ড! পিরিথিমিটে উল্টে গেল নাকি! কি করব, কি বলব ভাবতে গিয়ে আপনিই যেন মুখ দিয়ে বেইরে গেল—'দিদিমণিকে গিয়ে খবর দিইগে মাসিমা?'

ঠিক ধমক না হলেও, একটু দাবড়ানি গোছেরই দিলে উনি বললে—'চুপ কর ছোঁড়া, কী পেল্লায় মানুষটা আসবে ফটকে-ফটকে ম্যারাপ বেঁধে রোশনচৌকি বসাতে হবে, ও চলল আগে ভাগে খবর দিয়ে রাখতে।'

তারপর একটু যেন ভেবে নিয়ে নিজেই বললে—'তা নয়,' যাবি একবার? কুটুমবাড়িই তো। তা' ছাড়া নেত্যও যদি না থাকে বাড়িতে। হ'তে পারে তো—দশ আনী তরফ রয়েছে, আরও সব ফিকড়ি রয়েছে রায়চৌধুরীদের—নতুন বউ. টানাটানি হচ্চে নিশ্চয়। যাবি তো যা না হয়।'

বাবাকে বললে—'তুমি লোচনকে বলে দেওগে, খাবার দিচ্চি, খেয়ে যাক। আমি মুখ হাত ধুয়ে অনাদিকে কিছু খাইয়েই বেরিয়ে পড়ব।'

আমায় বললে—'তুইও একটু দাঁড়া।' সেখান থেকেই একটা তিজেলে করে মাথা সন্দেশ নিয়ে এসেছিল, আমার হাতে একদলা দিয়ে বললে—'তা যাবি তো না হয় যা-ই চলে।'

সেদিন গিয়ে নীচেই দিদিমণির সঙ্গে দেখা। আগের দিনের মতন গেচিও য্যাখন এইবার জামাইবাবু বেড়াতে যাবে। ঘোড়ায় চড়েই যায়, সাজগোজের সময় দিদিমণি সামনে থাকে। উঠোন পেইর্য়ে ওনার ঘরের পানে যাচ্ছেল, আমায় দেখে থমকে দাঁইড়্যে সুদোলে—'কি রে স্বরূপ, হাঁপাচ্ছিস যে। আর তোর মুখময় কি লেগে রয়েচে ওসব?'

হাত বুলিয়ে দেখি মাসীমা যে সন্দেশ দেছল। আজ্ঞে, খেতে খেতেই মাঠ ভেঙে ছুটেচি, তা কতটা পেটে গেল, কতটা বাইরে রয়ে গেল হুঁস নেই তো। কাপড়ের খুঁটে মুখ মুচতে মুচতে বলনু—'সন্দেশ, মাসীমা দিয়েচে।'

'এয়েছে মাসীমা!' আমার অবস্থাটা দেখে বোধহয় ভয় পেয়েই গেছল. কিছু দুঃসংবাদ ভেবে. ওনার নামে উলসে উঠল। আমি বলনু—'এসেই তোমায় দেখবার জন্যে ছুটে আসচে।'

'সত্যি নাকি রে! আসচে মাসীমা!' —আরও উলসে উঠেচে দিদিমণি, আমি খবরটা আরও জমকাল করে তোলবার জন্যে বলনু—'পাগলের মত ছুটে আসচে, তুমি সব গয়নাগাটি পরে সেজেগুজে কোচে বোসগে দিদিমণি।'

অবাক হয়ে চেয়ে আছে দিদিমণি আমার মুখের পানে, তাল রাখতে না পেরে একটু বেশী জমকাল করে ফেলেচি তো খবরটা। একটু যেন সম্বিত হয়ে সুদোলে—'ছুটে আসচে কিরে! কোন্ দিক দিয়ে ছুটে আসচে? তুই কোন্ দিক দে এলি? হ্যাঁরে, মাথা ঠিক আচে তো তার?'

ছুটে আসা মানে ছুটেই আসা বুঝতে হবে—আমার তো আর সে রুদ্দেশ্য ছেল না, নরম করে দিয়ে বললুম—'সে ছুটে আসা নয়। সে রকম মাথার গোলমালও নেই আর। আমায় বললে তুই যা গিয়ে বলগে আমি হাত-মুখ ধুয়ে. পথের কাপড়-চোপর ছেড়ে, অন্যাদিকে জলটল খাইয়ে, লোচনকেও খেতে দিয়ে তার গাড়িতে করে আসচি।'

মিলিয়ে মিলিয়ে শুনছেন দিদিমণি, বললে—'দেখেচ, খামোখা কি ভয়ই পাইয়ে দেছল ছোঁড়া! বুক এখনও ধড়ফড় করছে। —ভাবচি, একে পাগল-ছাগল মানুষই—কি বলে ভেয়ের বাড়ি থেকে ডেকে আনচে আবার বাবা, কে জানে, কি হতে কি হয়েচে বোধহয়।'

আমি মনের সব খুঁৎটুকু সরিয়ে দেওয়ার জন্যে বলনু—'না, এখন তো দুজনে গলায় গলায় ভাবও। উনি ওনাকে কথায় কথায় 'দিদি' বলচে, উনিও ওনাকে 'ভাই' বলচে।

দিদিমণি চড় উঁচিয়ে এগিয়ে এলো আমার পানে, বললে, 'দিই বসিয়ে দু ঘা? ছোঁড়ার সে রোগ গেল না এখনও—বাহাদুরি করে বানিয়ে বলা। আবার বলে—গলায় গলায় ভাব।'

এর পরেই ওনার রকমখানা গেল পালটে। টগর-ঝি কোথায় যাচ্ছেল, তাকে ডেকে বললে, 'টগর, নায়েবমশাইকে বলে আয় শীগ্গির পাল্কিটা একবার আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বড় দেউড়িতে লোক পাঠিয়ে খুড়িমাকে খবর দেবেন যে, মাসীমা আসচেন, উনি দুজনের মধ্যে কেউ এলেই আমায় জানাতে বলে দিয়েছেন।'

একেবারে ব্যস্ত হয়ে উঠেচে। আজ্ঞে, এসেই মাথাটা গুলিয়ে দিয়েচি, তাই, নৈলে হওয়ার কথাই তো।

আর দাঁড়াবার ফুরসৎ আচে? আমায় বারান্দায় বসতে বলে গরগর করতে করতে হনহনিয়ে ওপরে চলে গেল—'এক পাগল ছুটতে ছুটতে উপস্থিত, এক পাগল তার জন্যে গয়নাগাটি পরে বসে থাকুক—দুই

পাগলকে একঠাঁই করে ও হতভাগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখুক!'

একটা সাড়া পড়ে গেল দেউড়িতে, ভেতর-বার নিয়ে। দিদিমণি জামাইবাবুকে খবরটা দেওয়ার জন্যেই অমন করে ওপর-তলায় চলে গেছল, তিনি ঘোড়ায় চড়বার সায়েবী সাজগোজ পরেই খসখসিয়ে নেমে এয়েচে, আমি নজরে পড়ে যেতে দাঁইড়ো পড়ে বললে—'এই যে তুইও রয়েচিস। তা হ্যাঁরে, ভাঁওতা দিচ্চিস না তো? তোর আবার সে রোগ আচে, দেখেচি তো।'

বলনু—'আজ্ঞে, কাজের কথায় দিই না তো ভাঁওতা।'

হেসে উঠল একটু, দিদিমণিও নেমে এসেচে, তানার দিকে চেয়ে বললে—'শুনচ? তার মানে, দেয় ভাঁওতা সুবিধে পেলে।'

এর পর আবার আমার পানে চেয়ে বললে—'তা হলে তুই-ই ছুটে যা তো, কাছারি বাড়ি থেকে জেনে আয়, পাল্কিটা নিয়ে গেছে কিনা। পারবি তো?'

মাথা নেড়ে আমি চার লাফে ছুটে বেইরে গেলুম।

পাল্কি চলে গেছে। খবর নিয়ে আমি আর এক ছুটে সদর ফটকে চলে গেলুম। এদিকে জামাইবাবুকে তাড়াতাড়ি খবরটা পেঁছে দিতে হবে, উ-দিকে ভেতরে ধুক-ধুকুনি, লোচন দাস গাড়ি এনে ফেললে না তো বলদের ন্যাজ-মলা দিতে দিতে। খানিকটা এগিয়ে যদ্দুর নজর যায় দেখে নিয়ে ফিরেচি, দেখি দারোয়ান দুবেজী তার ঘর থেকে বেইরে এসে, কেতামাফিক সিদে হয়ে ফটকে মোতায়েন হয়ে দাঁইড়োচে। ঝক ঝকে উর্দি-চাপরাশ-আঁটা, মাথায় পগ্‌গ, পায়ে নাগরা, হাতে সেই পেতল বাঁধানো লাঠি। আমার ওপর নজর পড়তে—'আরে, স্বরূপ ভাইয়া যে! কেমোন আচে?'

আজ্ঞে, খাতির। স্বরূপ আর কেউকেটা নয় তো। কিন্তুক তাখন আলাপ জমাবার তো ফুরসৎ নেই স্বরূপ-ভাইয়ার। 'খুব ভালো।'—বলে ছুটতে ছুটতেই অন্দর মহলে গিয়ে খবরটা দিতে, জামাইবাবু দিদি-মণিকে নীচেই থাকতে বলে এগিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়েচে, আমি দিদিমণিকে সুদোলুম—উনিও ঐ পোষাকেই থাকবে, না গা?'

দিদিমণি খিলখিল করে হেসে উঠে বললে—'ওগো, শোনো কি বলে স্বরূপ।'

উনি ঘুরে চাইতে বললে—'তোমাকেও ঐ উদ্ভুটে সাজে থাকতে হবে।'

'তাই নাকি?'—বলে একবার নিজেকে আগাপাসতলা দেখে নিয়ে হাসতে হাসতে উঠে গেল জামাইবাবু।

অভ্যত্থনাটা যা হোল তা দেখবার মতন বৈকি। হৈ চৈ নেই, অথচ তারই মধ্যে সব-কিছু আচে। অন্দর মহলের নীচের তলায় একটা বড় ঘর সব্বদাই সাজানো-গোছানো থাকে, আত্মীয়-কুটুম মেয়েছেলে কেউ এল-গেল, তার জন্যে আধখানা ঘর জুড়ে নীচু চৌকিতে ফরাশ বেছানো, বেশ একটি মাঝারি গোছের মজলিশ বসেছে তার ওপর। দশ-আনী তরফের গিন্নি, বড় বৌ, আর মেজো মেয়ে, আরও কাছাকাছি আত্মীয়দের বাড়ি থেকে বড়দের জনাপাঁচেক, গুটি তিনেক বউ আর ঝিউড়ি মেয়েও,—গল্পস্বল্প হতে লাগল। অবিশ্যি বড়দের মধ্যেই। আমি কপাটের বাইরে বসে দেখচি। তা দেখলুম মাসীমা কি একটুও বেমানান? চেহারাটা তো সুপুরুষই, যেমন মা-ঠাকরুণ ছেল, তেমনি বড় বোনেরাও অষ্টপহর মাথায় চুড়ো বেঁধে রণমূর্ত্তি ধরে বেড়ালে কোথা থেকে খোলতাই হবে চেহারার তা আমায় ক'ন। এ যেন সবার মাঝখানে এতখানি জায়গা নিয়ে সত্যিই খড়দার-মা-গোঁসাই বসে আচেন। এক-খানি ভাল গরদের শাড়ী-পরা, সেই বিয়ের রেতে একবার দেখেছিনু। এই ঘোরালো মুখ, ঠোঁট দুটি পান-দোক্তায় রাঙা হয়ে রয়েচে, কপালের মাঝখানে একটি বড় শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। আর সেই ভাঙা কাঁসির মতো খনখনে গলাও তো নেই। অবিশ্যি, খাস্তার শিরোমণিকের মতন একেবারে বীণা-নিন্দিতো হয় কি করে, সে বয়েসও তো নয়, তবে এই মানুষই যে ঘোষপাড়ার পুকুরে দাঁইড়ো ডাকসাইটে পাড়াকুঁদুলিদের মোয়াড়া নিত, তা তো বোঝবার জো নেই। ওনাদের গপ্প হচ্চে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও দেখলুম বৈকি, মজলিসী গপ্পগুজব করবার তরিবৎও কি রকম রপ্তো! অতগুলো জমিদার ঘরের গিন্নী সব, পেরায় সমবয়সী, একজনা তো বড়ই, তা সমানে তাল রেখে যাচ্চে মাসীমা।—ওনাদের গপ্প হচ্চে, আমি দরজার পাশে থেকে হাঁ করে চেয়ে আচি, সেই রেজঠাকরুণ, না, অন্য কেউ। এমন সময় জামাইবাবু ওপর থেকে নেমে এসে ঘরে ঢুকল। আজ্ঞে না, (জিভ কাটল স্বরূপ), আমি অবিশ্যি চাইবুই যেমন জমকাল পোষাকে দেউড়ির ফটকে দারোয়ান দেখে আসচে মাসীমা, ভেতরে এসে তার মনিবকেও তেমনি জমকাল পোষাক দ্যাখে, কিন্তুক সে তো হয় না। জামাইবাবু নেমে এলো, পরনে ফিনফিনে ফরেশডাঙার কালাপেড়ে ধুতি, গায়ে সেকেলে বড়মানুষ-দের ঘুন্টি-দেওয়া মেরজাই, পায়ে একজোড়া ফুলকাটা সাদা চামড়ার কটকি চটি। আমি উঠে দাঁইড়োচি, 'এই যে রূপচাঁদও রয়েচিস'—বলে আমার মাথায় হাতটা বুলিয়ে চৌকাঠের বাইরে চটি যোড়াটা খুলে চৌকির দিকে এগিয়ে যেতে, সামনের ওনারা সরে সরে রাস্তা করে দিয়েচে, উনি উঠে গিয়ে মাসীমাকে গড় করে উঠে বললে—'আজ মাসীমার পায়ের ধুলো পড়ল বাড়ীতে, কত যে সৌভাগ্য আমাদের!'

উনি আসতেই মাসীমা মাথার কাপড়টা কপাল পজ্জন্ত নাব্যে দিয়েচে—আজ্ঞে, আজ-কালকার মতন তো নয়—শাশুড়ী, জামাই, ভাসুর, ভাদ্দর বউ—সবাই মাইডিয়ার আর গুডমর্ণিং। সেকালে তো সে রকম ছেল না—উনিও মাথার কাপড়টা নাব্যে দেছে, জামাই-বাবুও বিঘৎখানেক তফাৎ থেকে গড় করে উঠে ঐ কথা বলেছে, রেজঠাকরুণ পাশের একজনের দিকে চেয়ে একটু গলা খাটো করে বললে—'বলুন, আশীর্বাদ করচি, রাজ-রাজেশ্বর হোন, আর সৈভাগ্যির কথা যে বললেন—আমার চেয়ে তো ও'র সৈভাগ্যি বেশী নয়, ও'র মুখে মা ডাক শোনা, এ সৈভাগ্যির কথা ভাবতে পেরেছিলুম কবে?'

আজ্ঞে, আসরটা যেন থমথম করচে, লাখ টাকার কথা তো একটা। তা জামাইবাবুও কম যওয়ার পাত্তোর নয়।

পিছু হটে নেমে এসে হাতজোড় করে একটু মিষ্টি করে হেসেই বললে—'ছেলে-বেলায় মা হারিয়েচি। মা পেলুম, এর চেয়ে আর বড় সৈভাগ্যি কি হবে বলুন?'

বলে বেইরে আসছিল, মাসীমা পাশের মানুষটিকে বললে—'একটু থেমে যেতে বলুন।'

—আজ্ঞে, শুধু একটা পর্দা রেখে যাওয়া, সেকালের পদ্ধতি, নৈলে শুনচে তো ঘর সুদ্দ সবাই। জামাইবাবু দাঁইড়ো পড়তে বললে— 'আমি এসেছিলুম বাবা—এমনি তোমাদের সবাইকে দেখবার জন্যে মনটা আনচান করচেই—তা ছাড়া আমি একটা কথা বলতে এয়েচি—বেয়ানদেরও তাই বলছিলুম—আমায় দায় থেকে তো উদ্ধার করলে সবাই

ব্রিটানিয়া
থিন
এরারুট
BRITANNIA
THIN ARROWROOT
ARROWROOT
BISCUIT
খেতে ভালো,
পুষ্টিকর—
সবাইকার
মনের মতো
ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

মিলে; এখন কাজটুকু সম্পন্ন করে দেও। অষ্টমঙ্গলাটা রয়েচে, তার সঙ্গে সত্যনারায়ণ আর সুবচুনী। না বাবা, পদ্ধতি যাই হোক, জোড়ে গিয়ে দু'দিন থাকা—কিন্তু আমি রাজপুত্তুরকে আমার কুঁড়েতে কোথায় জায়গা দোব? দু'দিন এখান থেকেই গিয়ে কাজ শেষ করে ধুলো পায়েই আসবে ফিরে।'

এবার একবার পেসাদটা পেতে হবে দাঠাকুর। সাধ তো হয় একটি একটি করে বলেই যাই, বলেই যাই, তা আর দম থাকে কৈ?'

কলকেটা তুলে নিয়ে দুটো টান দিয়ে নামিয়ে দেখল। হেসে বলল—'তাহলে টেনে যাচ্ছিলেন কি? আগুনটুকুও যে নেই আর।' ডাক দিতে একটি নাতনী এসে কলকেটা নিয়ে গেল।

বললাম—'যা কাহিনী ফেঁদেচ —সেই ব্রেজঠাকরুণ যে কদিনেই এতটা বদলে গেলেন!...'

'আজ্ঞে, বদলানো তো নয় দাঠাকুর। বলিনি? মানুষটাই আসলে ঐ। ভেতরে তাল-শাঁস। ওপরটা যে ওরকম দেখেছিলেন।—চিমড়ে খোসা আর আঁশ, সে তো সমিস্যেয়—সমিস্যেয় জর্জরিত হয়ে ওরকমটা হয়ে গেছল। সমিস্যেও সব কেটে গেল, খাঁটি জিনিসটেও এল বেইরে।

অষ্টমঙ্গলা আর পুজো দুটো যা হোল, তাও তো মসনের আধখানা নিয়ে দু'দিন সাড়া জাগিয়েই হোল বাইরের খোলা জায়গাটায় শামিয়ানা খাটিয়ে। বাজনা-বাদ্যি, খাওয়া-দাওয়া। অষ্টমঙ্গলা মেয়েদের ব্যাপার, এয়োস্ত্রীদের নিয়ে বরণ, সেদিন ছোট বড় সধবা বিধবা সব মেয়েদের ঢালোয়া নেমন্তন্ন। পরের দিন এ-বেলা ও-বেলা দুটো পুজো, তার সঙ্গে তাবৎ বেটাছেলের ভোজ। ওদিক থেকে লোকলস্কর এসে সামাল দিতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর, তাও বলি, সময় পাওয়া গেচে, এক হিসেবে বিয়ের চেয়েও যাঁহাতক ঘটা করেই অষ্টমঙ্গলা আর পুজো হল দু'দিন ধরে, তা কৈ একটুও বেমানান হোল না তো দাঠাকুর। বাড়ির কথা বলচি। বাইরের সমস্ত চত্তরটা ধরে সামিয়ানা, ইদিকে ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্যে সেই জাট-কেম্পন রাজু ঘোষাল দরাজ হাতে ট্যাকা দিয়ে বাড়িটা ঢেলে সাজোচ্ছেল তো—ফলাও করে দেয়াল দিয়ে ঘেরে উঠোন, দুখানা বড় ঘর—অবিশ্যি রাজবাড়ির মতন করে রাজসুয় যজ্ঞি কি করে মানবে? তবে ভেতর-বাইরে মিলে দিব্যি কুলিয়েও তো গেল। আজ্ঞে, শাপে বর আর কাকে বলবেন? সে কুচুক্কুরে ভাবলে, একদিন না একদিন বাড়ীটা তো আপসে তারই হাতে এসে যাবে, ছেলে হবে জামাই—না চাইতেই বাকস খুলে টাকা বের করে দিয়ে গেছে, বাবাঠাকুরও সাইরেসুইয়ে, নতুন ঘর তুলে মনের মতন করে নেচে বাড়ি —তা সে কুচুক্কুরে যাই না কেন ভাবুক, বাড়িটা তো যাঁর বাড়ি তানারই কাজে এল। নৈলে সে যে ছেল, নেতান্ত দুখানি গোল-পাতার ছাউনি-দেওয়া ঘর আর একটা গোয়াল, তাতে জো এ মোচ্ছব হোত না।

আমি বললাম—'কথা রেখে কথা বলি স্বরূপ, আমি বাড়িটার বিষয়েই জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম। শেষ পর্যন্ত সেটার হোল কি? বিয়ে নিয়ে কাজগুলো তো দুদশ দিনের মধ্যে মিটে গেল, তারপর? ওটা তো বাঁধাই ছিল ঘোষালের কাছে?'

'সেই কথাতেই আস্মো এবার এসতেছি দাঠাকুর।' —ছিপ কাতা দুটোই রেখে দুই হাটুতে দুটো হাত রেখে সোজা হয়ে বসল স্বরূপ, বলল—'দিদিমণি যে বলা নেই কওয়া নেই হেঁসেলে এসে ঢুকল, ওনার আসল মতলব তো ছিল বাড়ি, বাবা-ঠাকুর। আর মাসিমার ব্যবস্থা করা তারজন্যে ওনাদের একত্তর করতে হয় আগে, অষ্টমঙ্গলা আর সত্যনারায়ণ পুজো—ও দুটো তো ফাউ, মাঝখান থেকে হয়ে গেল তো হয়ে গেল। একটা ঢো না তুললে তো পারা যেত না দুজনকে একত্তর করতে। ওদুটো যেদিন চুকে বুকে গেল, তার পরদিনই ওনারা দুজনে এসে হাজির। আজ্ঞে হ্যাঁ, দিদিমণি আর জামাইবাবু। কথাটা বুঝলেন না? খায়-খেয়ালি মানুষ, মাসীমাকে পাকে-চক্রে টেনে তো নেসল দিদিমণি, কিন্তুক আবার ফিরে যেতে কতক্ষণ? মাসিমা রয়েছে ঘরটর গোছগাছ করে দিত সমস্ত দিন লেগে গেছে, মাসিমা রয়েচে বলে আমিও আর দেউরিতে যাইনি, রাত ত্যাখন খানিকটা নিষুতি হয়ে এসেছে, একটা পাল্কি দরজায় এসে নামল। আমিই বাইরে ছেনু, মাসিমা হেঁসেলে। বাবাঠাকুর বড়ঘরে পিদিমের সামনে বসে নেকাপড়া করচে। খবরটা দিতে দুজনেই বেইরে এসে নিয়ে গিয়ে নতুন ঘরটায় বসালে। আজ্ঞে সেখানেও দিদিমণির কারসাজি। কাজের জন্যে যা সব এসেছিল দেউড়ি থেকে, তৈজস-পত্তর, গালচে, আসবাব, তার সব কিছুই গেচে চলে, শুধু এই ঘরটি রয়েচে সাজানো। দেউড়ির লোকেরা এসেই সব খুলচে-খালচে, নে যাচ্ছে, এনারা আর ওদিকে কোন খেয়াল করেন নি। জামাই এয়েচে, ঐ ঘরে গিয়ে বসালে মাঝখানে। কে কোথায় বসল, কি হোল জানিনে দাঠাকুর ওনারা এসতেই ব্রেজঠাকরুণ আমার গা টিপে ডেকে নিয়ে, বিধুময়রার দোকান থেকে খাবার নেসতে পাটোচ্ছেল এসে দেখি ব্যাপার একেবারে গুরুচরণ। চার-চারটে মানুষ বাড়িতে অথচ একেবারে সাড়া-শব্দ নেই। এ-ঘর ও-ঘর দেখে পা টিপে টিপে নতুন ঘরটার কাছে আড়াল থেকে গিয়ে দেখি চারজনেই মাথা হেঁট করে গালচের ওপর চুপচাপ বসে রয়েচে, কারুর বাড়িতে সাধন কবরেজ রুগী দেখতে এলে দেখতুম বসে থাকতে। উদিকটা বাবাঠাকুর আর জামাইবাবু ইদিকটা এরা দুজনে ঘেঁসাঘেঁষি করে। বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠল দাঠাকুর, প্রেথমেই যা ভয়টা হোল তা হচ্চে —দিদিমণিকে ফিরিয়ে দিতে এল না তো জামাইবাবু?'

'ফিরিয়ে দিতে?'—আমি বেশ একটু চকিত হয়েই প্রশ্ন করলাম। হঠাৎ হো হো করে হেসে ঘাড়টা একটু উলটে দিল স্বরূপ, বলল—তা বুঝলেন না? হুড়কো মেয়ে নিয়ে ঝামেলা। সেকালে আমাদের জেলে-পাড়া, মন্ডলপাড়া—উদিকের সব পাড়াতেই পেরায় লেগে থাকত তো। মেয়ে স্বামীঘর করতে চায় না, পাইলে পাইলে এসে বাপের বাড়ি, তার ফয়সালা হয় বেয়াই বেয়াইয়ে..'

—বলতে বলতে আর একচোট হেসে উঠে বলল—'বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিদিমণি যাওয়া-আসা নাগোচে—সিদিন হঠাৎ এল আজ আবার কি ভেবে এয়েচে—সঙ্গে জামাইবাবু—লাগছেল ভালোই একদিক দিয়ে—তেমনি আবার ও-ভয়টাও একটু একটু যেন লেগেছেল বৈকি। দোকান থেকে ফিরে এসে ঐভাবে চারজনকে বসে থাকতে দেখে প্রেথমটা ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। ঘরেরও তো মিল নেই—কোথায় রাজা আর কোথায় কুঁড়েঘরের একটা মেয়ে। আমি পা টিপে টিপে গিয়ে জানালার ধারটায় কান পেতে বসনু। খানিকক্ষণ কোন কথাই নেই, তারপর ব্রেজঠাকরুণের গলা। বলচে—আমায় নেত্য যেমন বলাচ্চে তেমনি বলচি ভাই, দোষগুণ কিছু ধোর না। ও বলচে—বাবাকে বলো মাসিমা, উনি যদি বাড়িখানা রাজু ঘোষালকে ঋণের দায়ে দিয়ে দেন, তারপর কিছু তো হাতে থাকবেই, তাই দিয়ে কাশীবাসী হনতো আমার জোর কি আছে? তবে একটা বিষয়ে জোর না থাক, আশা তো থাকে সন্তানের।'

দীর্ঘশ্বাসটা আস্তে আস্তে বেইরে গিয়ে এতক্ষণে বুকটা হালকা হোল দা'-ঠাকুর, তাহলে হুড়কো মেয়ে বাপকে ফিরিয়ে দিতে আসেনি জামাইবাবু। দিদিমণি আবার বুদ্ধি করে একটা কিছু বের করেচে, নিজে তো কথা কইবে না জামাইবাবুর সামনে, মাসিমাকে দিয়ে বলাচ্চে। খানিকটে

আবার চুপচাপই গেল। আমার বুঝতে বাকী রইল না সেয়ানা-মেয়ে, আগে যা কথাবার্তা হয়েচে তাতে খানিকটে কাহিল করে এনেচে বাপকে, ঠাকুরমশাই যেন বেশ সমঝে বুঝে উত্তরগুলো দিচ্চে। মানুষটা তো তর্কের-পণ্ডিতই, তাড়াহুড়ো করবে না। আমি জানলার ফাঁকে কান চেপে রইলুম।

একটু পরে বাবাঠাকুর সুদোলে—'তা আশাটা করে কি বললে? গরীব বাপের তো।'

'মাসিমা বললে—বলচে, একটা যৌতুক আশা করেই। উনি যখন বাড়িটা ছেড়েই দিচ্চেন ধুলোর-দামে, মেয়েকেই দিয়ে দিন না।'

'ঋণ সুদ্ধু যৌতুক?'—এবার উত্তরটা সঙ্গে সঙ্গে দিলে বাবাঠাকুর। ইদিকে ব্রেজ-ঠাকরুণেরও বিলম্ব হোল না, বললে—'সে যাকে দেওয়া সে আপনি বুঝে নেবে। এই তো সেদিন মহেশ কাকা মেয়ের বিয়েতে জামাইকে সুদ্ধু কন্যাদান করলে; যাকে দান করা তারা নিজের ঠিক করে নেবে সেই ভরসাতেই তো।'

আর তর্ক যোগায় মুখে এর ওপরই যতই না কেন ন্যায়ের পণ্ডিত হন। বাবা-ঠাকুর গুম হয়ে বসে রইল। আজ্ঞে, তা বেশ খানিকক্ষণ বৈকি। তারপর একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে বললে—'না হয় দিলুম, তারপর দাঁড়াব কোথায়? বাপের সম্পত্তি তো জলে গেল!'

একাক তো শালী-ঝলীপোলা দাঁড়িয়ে গেছে, ব্রেজঠাকরুণ আর দিদিমণির পানে না চেয়েই বললে—'মেয়ে বলচে পাওনাদার যদি ক্রোক করে নেয় বাড়ি—আর নেবেই তো একদিন—তখন দাঁড়াবে কোথায়?'

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল বাবা-ঠাকুর, যেন জেলা-কাছারির বিশম্ভর মোক্তার জেরায় জেরায় কোণঠাসা করে ফেলেচে কাঠগড়ার আসামীকে। আমার লাগচে তো ভালই একদিক দে, তেমনি আবার মুখে সেই অপরূপ হাসি, নিজেরই মনিব তো, মনটায় এক একবার মোচড় দিয়ে উঠচে—এই রকম যখন অবস্থা, সে আর এক দিশা, যার জুড়ি জন্মে কখনও দেখলাম না, আর দেখতেও হবে না এই মাইডিয়ার আর গুডমর্ণিং-এর যুগে। সামনাসামনি হাত দুয়েকের তফাতে বসে ছেল জামাইবাবু—আজ্ঞে রাজাই তো, সেকালের জমিদার—কি দাপট! —উঠে গিয়ে দু হাতে দুটি পা চেপে ধরল বাবাঠাকুরের—'আপনি সবার কথা ভাবচেন ছেলের কথা কে ভাবচেন? আপনি এভাবে থাকলে, তারপর পাওনা দারের অত্যাচারে নিরাশ্রয় হলে, আমি গাঁয়ে মুখ দেখাই কি করে তা বলুন? আপনার মেয়ের কথা না হয় বাদই দিলুম।'

ঘরটায় একটা ছুঁচ পড়লে তার শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় দাঠাকুর, এমনি আচমকা। সবার নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেচে। আচমকা আর একেবারে নতুন ধরণের তো, পরে যেমন শুনলুম দিদিমণির কাছে, তিনিও তো কিছু জানতো না, এরকম কাণ্ডটা করবে জামাইবাবু, নিজের পেটে পেটেই রেখেছিল।

আর উপায় আছে? মানতেই হোল এবার বাবাঠাকুরকে।

'তবে এত দেখলুম দাঠাকুর, গাঁয়ের রাজা, পা চেপে ধরেচে, 'হাঁ-হাঁ করচ কি!'—বলে শশব্যস্ত হয়ে ওঠা—সেসব একেবারেই নয়। একটুখানি ভেবে নিলে বাবাঠাকুর, আজ্ঞে, একেবারে অকস্মাৎ, তৈয়ের তো ছিল না—তারপর আস্তে আস্তেই ডানহাতটা মাথায় চেপে বললে—'বোস, বাবাজী হয়েচে, হয়েচে। হাঁ, মানতে হবে বৈকি, তার ঋণ আর ছেলের ঋণ....'

'কিন্তু ছেলের তো ঋণ হয় না বাবা।' মুখের কথা কেড়ে নিয়েই মুখের পানে চেয়ে একটু হেসে বললে জামাইবাবু। পৌঁছিয়ে গিয়ে বসেচেও। ব্রেজঠাকরুণ মুখিয়েই ছেল হেসে বললে—'নাও, এবার দাও উত্তর কত বড় পণ্ডিত দেখি।' আজ্ঞে আমার মনটা তো খুশিতে ভরে উঠবেই কিনা! ঠাকুরমশাইও হাসল। একটু অপরূপ ভাব যেন আচেই, তবু দেখলুম অনেকটা পস্কের হয়ে এয়েচে, বললে—'প্রয়োজন কি উত্তরে দেওয়ার দিদি? শাস্তোরে বলে—বলে একটা সংস্কৃত শোলোক আওড়ালে, যার মানে দিদিমণিকে সুধিয়ে পরে জানলুম—আর সবার কাছেই জিৎ, তবে ছেলে আর শিষ্যির কাছে হারটাই কামনা করবার মতন। বুঝলেন না, হেরে শাস্তোরের জোরে জেতা আর কি। এরপর জামাইবাবুর দিকে চেয়ে কইলে, —'বেশ, তাহলে এবার যা ব্যবস্থা করবে করো।'

আমি জানলার পাশে দাঁইড়্যে উৎকর্ণ হয়ে শুনচি।

তা ব্যবস্তা যা করলে জামাইবাবু তা ওনার মতনই। শ্বশুরকে তিন ধার থেকে চেপে রাজি করে এনেচি বলে যে যেমনভাবে চাইব, তেমনিভাবে চালাব তা নয়। তিন রকম ব্যবস্থা, এখন উনি যেটা পছন্দ করে। পয়লা, ভদ্রাসনটা ঋণ থেকে খালাস করা রইল, ওনারা দুজনে দেউড়ি গিয়ে থাকবে। আলাদা চায়, চাকর-দাসী, রসুইয়ে সব আলাদা-আলাদা দুজনারই, দেউড়ির সংলগ্ন আলাদা বাড়ি করে দিয়ে। দেউড়ির সামিল থাকতে চান, আরও ভালো। এ-ব্যবস্থা না পছন্দ হয়, এখানেই রইলেন। চাকর-বাকরের ব্যবস্থা,—রসুইয়ের পর্যন্ত......'

স্বরূপ মণ্ডল হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে আবার একেবারে ফুকরে হেসে উঠল, বাতা—চাটা থামিয়ে। বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—'মোড়লের পোর হোল কি?'

স্বরূপ হাসির দমকের মধ্যেই বলে চলল—'আজ্ঞে, হোল যা তা আর কয়ে কাজ নেই। আমার বাড়িটার ওপরই মায়া লেগে আছে দাঠাকুর। আর ব্যবস্তাও হোল যার চেয়ে বাড়া আর হতে নেই। ইদিকে দেখুন, ব্রেজ-ঠাকরুণও আর সে-ব্রেজঠাকরুণ নেই, বাবা-ঠাকুরেরও আর সেই পালাই-পালাই ভাবও নেই। মনটা আমার উল্লসে-উল্লসে উঠচে, দেখলাম, তাহলে ওটুকু আর কেন, মিটিয়ে ফেললেই তো চুকে যায়, হয়ত একেবারে, যাকে বলে সর্বাঙ্গসুন্দর। এমন জমাট আসরে একটু দখল দেওয়ার লোভটাও সামলাতে পারলুম না; জানলা দিয়ে দেখছিলুম একটু আড়াল হয়ে খপ করে সরে একেবারে কপাটের সামনে এসে বললুন,—'তাহলে, ওনাদের দুজনের বিধবা-বিয়ে হয়ে গেলেই তো আরও খাসা হয়।'

আচমকা একেবারে, এক রকম বিনি মেঘে বজ্রপাতই তো, চারজনই অবাক হয়ে চাইলে একটু—আজ্ঞে, এরপরই যে যার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চাপা হাসি! শ্বশুর, জামাই, মেয়ে, শাশুড়ি—কেউ কারুর মুখের পানে তো চাইতে পারচে না। মাসিমা আর দিদি-মণি ঘোমটা মুখে চেপে তো হাসির চোটে যায় আর কি! আমি তখনও তো ঠিকমত বুঝতে পারি নি কাণ্ডটা কি করে বসে আচি, একটু অপ্রস্তুত হয়ে, দাঁইড়েই আচি, দিদিমণি কোন রকমে উঠে পড়ে বাইরে এসেই আমার কানটা নেড়ে একটা থাপ্পড় ঝেড়ে রান্নাঘরের দিকে পাইল্যে বাঁচল। উনি উঠে যেতে ব্রেজঠাকরুণও গালে ঘোমটার কাপড় টেনে পাশ কাটো বেইরে এসে 'মুখপোড়া!' বলে খিড়কি দিয়ে পালালো। থাপ্পড়ে কানটা ঝন-ঝন করচে, তার মধ্যে থেকেই শুনেনু, জামাইবাবু ঠাকুরমশাইকে বলচে—'আজ্ঞে, আজ তাহলে উঠি। চিন্তা করে দেখে ডেকে পাঠাবেন।'

—কোন রকমে কিছু বলে পালানো আর কি!

ঠাকুরমশাইও কোন রকমে মুখ দে বের করলে—'হ্যাঁ, এসো। দেখি ভেবে একটু।'

আসর ভেঙে গিয়ে সেদিনকার মতন ঐ পর্যন্তই হয়ে রইল।......ওরে শান্ত, তোরা যে ভুলে বসে রইলি আমাদের! লোকটা কে এয়েচে, একটু হুঁশ করবি তো।'

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

৩১শে ভাদ্র, শরৎচন্দ্রের জন্মদিন। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—৩১শে ভাদ্র আসবে প্রতি বৎসর সেদিন কিন্তু আমি আর আসবো না। শরৎচন্দ্র নেই—কিন্তু তিনি আজো অবিস্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্যাহ্ন গগনে তখন শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবটা শুধু যে আকস্মিক তা নয় একরকম অভাবিত। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পগুলি বাঙালী পাঠক-সমাজকে পরিচিত জগতের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার একটা সুযোগ দিয়েছে, এই পরিচিত জগত নিছক বাস্তব জগৎ নয়, কিছুটা রঙেরসেবোনা রোমান্সের যাদু। রবীন্দ্র-নাথের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছিলেন প্রভাতকুমার। রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই অনু-প্রাণিত হয়ে তিনি গদ্যরচনায় হাত দেন, তার আগে লিখেছেন 'পদ্য' আর তাঁর গদ্য-রচনার প্রধান জিনিস ছিল রস। রবীন্দ্র-পরিবেশের লেখক হয়েও প্রভাতকুমারের কাহিনীর পরিবেশন ও বিন্যাসে স্বকীয়তা ছিল তাই প্রভাতকুমার বাঙালী পাঠকের প্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) আর 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০)—রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যে এই যে একটা বিশেষ কাল যে কালে এতগুলি আশ্চর্য উপন্যাসের ও গল্পের ফসল ফলেছে সেই কালটি প্রায় ষোলো বছর স্থায়ী অর্থাৎ ১৯০১-১৯১৬। ১৯১৬-র রবীন্দ্রনাথ এক অতিকায় পুরুষ, শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে তখন তিনি প্রতিষ্ঠিত।

এই রবীন্দ্রনাথ চোখের সামনে ছিল শরৎচন্দ্রের। শরৎচন্দ্র অমল বোস মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখেছিলেন—

"—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানেনি গুরু বলে—আমার চাইতে কেউ বেশী মকশো করেনি তাঁর লেখা। তাঁর কবিতার কথা বলতে পারব না, কিন্তু আমার চাইতে কেউ বেশী পড়েনি তাঁর উপন্যাস—তাঁর চোখের বালি, তাঁর গোরা, তাঁর গল্পগুচ্ছ। আজকের দিনে যে এত লোকে আমার লেখা পড়ে ভাল বলে, সে তাঁরি জন্যে। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি।"

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের দুটি বিখ্যাত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, একটি—অল্পবয়সের রচনা দেবদাস আর অপরটি চরিত্রহীন। এই সঙ্গে পাওয়া গেছে 'শ্রীকান্ত' (প্রথম পর্ব) আর তারপর দত্তা। শরৎচন্দ্র জয় করলেন বাংলার সাহিত্য-সমাজ—

তাঁর জীবনের সঙ্গে সাহিত্য জড়িয়ে আছে। প্রথম জীবনের বিভ্রান্তি, উদ্দামতা, কল্পনাবিলাসী কিশোরের ভাবালুতা প্রভৃতির সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমিক, ভগ্নহৃদয়, স মা জ উ পে ক্ষি ত, আত্মীয়স্নেহ-বঞ্চিত মানুষটির কথাও স্মরণ রাখতে হবে। সংসার তাঁকে অকৃপণ করে এতটুকু দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেনি।

আজকের ভাষায় যাকে 'ফ্রাসটেসন' বলে, সেই 'ফ্রাসটেশন' শরৎচন্দ্রকে স্পর্শ করেছে নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁর অপরাজেয় প্রাণশক্তিকে অবদমিত করতে পারেনি। তাঁর মানসিকতার ক্রমবিকাশে এই বিষয়টি স্মরণ রাখা প্রয়োজন। প্রথমে তিনি কল্পনাবিলাসী, তারপর তাঁর মনে জেগেছে সামাজিক বৈষম্য ও বিচারের কথা—তাঁর মনে জেগেছে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি আরও পরিণত বয়সে তাঁর উপন্যাস যে সমস্যা প্রধান হয়েছে তার কারণ তাঁর নিজের মানসিকতা চিন্তার সাগরে গিয়ে হাঁফিয়ে উঠেছে। আরো পরিণতি লাভ করে তিনি যে আর লেখেন নি বোধকরি তার অন্যতম কারণ এই চিন্তার সর্বগ্রাসী প্রভাব। শেষজীবনের শরৎচন্দ্রকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে জানতাম, লক্ষ্য করেছি সেই সময় নানাবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার চিন্তায় তিনি কত আচ্ছন্ন। সর্বদাই এইজাতীয় চিন্তায় তিনি ডুবে থাকতেন।

শরৎচন্দ্র 'শুভদা' লিখেছেন অল্পবয়সে, এই উপন্যাসটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়, যে কোনো কারণেই হোক এই উপন্যাস প্রকাশে তাঁর কুণ্ঠা ছিলই তিনি এক জায়গায় লিখেছেন—"শুভদা প্রথম যুগের লেখা—অর্থাৎ বড়দিদি, চন্দ্রনাথ ও দেবদাস প্রভৃতির পরে—"। 'শুভদা'র মধ্যে আছে এক বেদনাভরা ইতিহাস। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'তে সুরেন আর মাধবী চরিত্র দুটির মধ্যে আছে সে যুগের বাঙালী পুরুষ ও রমণীর মানসিকতার ছাপ। স্নেহ এবং প্রেম দুয়ে মিলে এখানে এক। 'দেবদাস'ও শোনা যায় অল্পবয়সের রচনা, এই উপন্যাসে অল্প বয়সের উচ্ছ্বাসটি তাই স্পষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ আছে বঙ্কিম-চন্দ্রের এই উক্তি রূপায়িত পার্বতী আর দেবদাসের কাহিনীতে। এ যেন লয়লা-মজনুর প্রেমকথা। আমি নিজে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সর্বত্র এই দেবদাস কাহিনীর জয়ধ্বনি শুনেছি। কেউ দেখেছেন ছায়াছবি, কেউ পড়েছেন অনুবাদ। 'দেবদাস' উপন্যাসে হতভাগ্য দেবদাস যেন আর এক শ্রেণীর বাঙালী তরুণের প্রতীক।

'দত্তা' উপন্যাসটির বিষয়বস্তু বিচিত্র। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই কোনো এক সময় সেই-কালের ব্রাহ্মসমাজটি দেখেছেন। রাসবিহারী চরিত্র রক্ত মাংসের তেমনই রক্ত মাংসের চরিত্র দয়াল একথা সে যুগের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই স্বীকার করবেন। একদিন রসিকতা করে আবার দাড়ি রাখার কথা ওঠায় শরৎচন্দ্র হেসে বলেছিলেন—

'সে ভালো দেখাবে না,—যে দাড়ি ছিল সেটা থাকলেও না হয় অনেকটা ব্রাহ্ম-

সমাজের গরীব আচার্যের মত দেখাত।'

এই সব কথায় মনে হয় শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজকে জানতেন, তাঁর রচনায় একাধিকবার ব্রাহ্মসমাজের কথা এসেছে।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এক আশ্চর্য সৃষ্টি। শিল্পকর্ম হিসাবে হয়ত তেমন উন্নত নয়, কিন্তু উপন্যাসের যে উদ্দেশ্য তার সার্থক হয়েছে। লেখক প্রাণ-মন ঢেলে এই উপন্যাস রচনা করেছেন। 'পথের দাবী' সম্পর্কে শরৎচন্দ্র নিজেই অনেক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এক জায়গায় বলেছেন—'পথের দাবীতে বুঝিয়েছি—সংস্কার জিনিসটার মানে কি। ওটা ভালো কিছু নয়। যেটা খারাপ জিনিস অনেকদিন চলে ধড়ধড়ে নড়নড়ে হয়ে পড়েছে—সেটা মেরামত করে আবার দাঁড় করান।' এই সূত্রে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন রিফর্ম'স আর রেভোলিউসন এক নয়।

'পথের দাবী'র কিছু অভিজ্ঞতা তাঁর প্রত্যক্ষ। তিনি বার্মা, জাভা, বোর্নিয়ো এইসব জায়গা ঘুরেছেন। অনেক স্মাগলার দেখেছেন। বলেছেন—"এইসব অভিজ্ঞতার ফল 'পথের দাবী'। বাড়িতে বসে, আর্ম-চেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না; অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না।"

এই দিনই শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "আমার চরিত্রগুলির ৭০ শতাংশ সত্য। তবে এটাও মনে রাখতে হবে সত্য মাত্রেই সাহিত্য নয়।"

'পথের দাবী'র প্রতি শরৎচন্দ্রের মমতা ছিল অসীম। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ হয়। এক জায়গায় বলেছেন ক্ষোভসহকারে (১৩৩৭)—

"একটা বই লিখলুম 'পথের দাবী'—সরকার বাজেয়াপ্ত করে দিলে। তার সাহিত্যিক মূল্য আছে না-আছে দেখলে না। কোথায় গোটা দুই সত্য লিখেছিলুম, সেইটাই দেখলে।"

একথা অস্বীকার করা যায় না যে বাংলা-সাহিত্যে আনন্দ মঠ, গোরা ও পথের দাবী একটি বিশিষ্ট ধারা অনুসরণ করেছে এবং সেই কারণেই এই উপন্যাস বাঙালীর চিত্তে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। যিনি সব্যসাচী তিনি কি উত্তরকালের সুভাষচন্দ্র বা সূর্য সেনকেই আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন না? বাঙালীর কাছে শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসটির অনেক লাইন অতি পরিচিত।

শরৎচন্দ্র লিখেছেন আর একটি অদ্ভুত উপন্যাস তার নাম 'দেনা পাওনা'—এই উপন্যাসের কাহিনী কিঞ্চিৎ অসাধারণ। কে একজন পণ্ডিত কোনো একটি বিদেশী কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিন্তু ভৈরবী আর জীবানন্দ একেবারে রক্তে মাংসে বাঙালী চরিত্র। তাই ভৈরবী চায় তার জীবনের শূন্যতাকে পূর্ণ করতে, সে চায় ঘর বাঁধতে আর উচ্ছৃঙ্খল জমিদার

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা সাহিত্যের চার দীপ্তিমান পুরুষ কাজি নজরুল ইসলাম, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি জসিমুদ্দিন এবং অমিয় চক্রবর্তীকে এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে সম্মানসূচক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করেন গত ১১ সেপ্টেম্বর। ছবিতে তাঁদের মধ্যে উপস্থিত দু'জন—ডঃ তারা-বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে দেখা যাচ্ছে।

জীবানন্দও চেয়েছিল দু' দণ্ডের শান্তি, স্ত্রী চাই পুত্র চাই এই আর্তনাদ সাধারণ মানুষের প্রাণের আর্তনাদ।

শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' নারী চরিত্রের একটি বিশেষ দিক তিনি এঁকেছেন আর নীলাম্বর যেন সংসার বিরাগী-মহাদেব, গাঁজা ভাঙ পান করে সব বিষয়ে তিনি চোখ বুজিয়ে আছেন। 'পল্লীসমাজ' আজ আর নেই কিন্তু রমা ও রমেশকে আজ যারা পঞ্চাশোর্ধে তাঁরা অনেকেই দেখেছেন। 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে কুসুম আর বৃন্দাবনের মধ্যে যে এক সংঘাত বেঁধেছে সেই সংঘাত দৈনন্দিন জীবনের এক পরিচিত চিত্র।

শরৎচন্দ্র ক্ষেপে গিয়েছেন 'বামুনের মেয়ে'তে, তিনি কৌলীন্য প্রথাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। একবার তিনি এই উপন্যাস প্রসঙ্গে বলেছেন—

'বামুনের মেয়ে' বলে আমার একখানা বই আছে। অনেকে হয়ত পড়েন নি। লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা হয়; তাঁকে বলি এই রকম একখানা বই লিখতে ইচ্ছা হয়; এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। তিনি বললেন : এখন ত' আর কৌলীন্য নেই, একজনের ১০০টা বিয়ে নেই, প্লটএর ত' ভাবনা নেই—তবে এটাকে ঘেঁটে কি হবে? তবে যদি সাহস থাকে, লেখো, কিন্তু মিছে কল্পনা কোরো না।' শরৎচন্দ্র বলেছেন—'ইতিহাসের কথা নয় নিজে যা দেখেছি তাই লিখেছি।'

এই উপন্যাসের পর শরৎচন্দ্রকে অনেক আঘাত সইতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র নিজে ব্রাহ্মণ তাই এই উপন্যাস লিখতে পেরে-ছিলেন অন্য কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত লেখককে এ ধরণের আত্মসমালোচনা করতে আর দেখিনি।

শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের দুটি উপন্যাস 'বিপ্রদাস' আর 'শেষ প্রশ্ন'—'বিপ্রদাসে'র ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটেছিল বিপ্লবীদের মাসিকপত্র 'বেণু'তে। 'বিপ্রদাস মুখ্যত এক জটিল মনোবিশ্লেষণের উপন্যাস

—বন্দনা চরিত্রটি এক আশ্চর্য সৃষ্টি। দ্বিজদাস আর বিপ্রদাস দুটি চরিত্রের মধ্যে আছে অসামান্য দৃঢ়তা। এর আগে 'শেষ প্রশ্ন' প্রকাশিত হয়েছে। সেই উপন্যাসের 'কমল' চরিত্রটি নিয়ে সেদিন বাংলাদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। শরৎচন্দ্র কোনো কৈফিয়ৎ দেন নি। কমলের মত নারী চরিত্র কি সত্যই বিরল? উপন্যাসটির মধ্যে শরৎচন্দ্রের যে বৈশিষ্ট্য তা ধরা পড়েছে আশুবাবুর চরিত্রসৃষ্টিতে। শেষ প্রশ্নে শরৎচন্দ্র সেদিন যে প্রশ্ন তুলেছিলেন সেই প্রশ্নের জবাব কি আজো আমরা পেয়েছি? 'শেষের পরিচয়' তিনি নিজে সম্পূর্ণ করতে পারেন নি, কিন্তু এই অসম্পূর্ণ উপন্যাসেও শরৎচন্দ্রের স্বকীয়তার ছাপ আছে। সবিতা চরিত্রটি কি বৈপ্লবিক নয়? দেনাপাওনায় ষোড়শী, চরিত্রহীনের কিরণময়ী, অন্নদা দিদি আর তার সাপুড়ে স্বামী। যিনি মুসলমান হলেও স্বামী দেবতা, এই মনোহর অথচ বিচিত্র সৃষ্টি শরৎচন্দ্রেই সম্ভব।

শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা যে কী অসাধারণ এবং দিনে দিনে তা কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এম-সি-সরকারের দোকানে গিয়ে শরৎ সম্ভারের বিক্রি দেখলে। বাঙলার মানুষকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিলেন বলেই বাঙলার মানুষও তাঁকে দিয়েছে প্রাণের ভালোবাসা।

তিনি যুগান্তরের লেখক, তাই "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে।"

মানুষের যিনি মূল্য জেনেছিলেন সেই মানবদরদী অপরাজেয় কথাশিল্পীর স্মরণে প্রণতি জানাই।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

বাংলা সাহিত্যের বিকাশে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র অবদান অপরিসীম। সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসর ধরে বিভিন্নভাবে এই সংগঠন বাংলা সাহিত্যের সেবা করে আসছে। অবশ্য ইদানিং এই সংগঠনের কাজ কিছুটা স্তিমিত। তরুণ সাহিত্যসেবীদের আর সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারছে না। গত ৬ ভাদ্র পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত হল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র ৭৫তম অধিবেশন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। এই সভায় ১৩৭৬ সালের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; সহ-সভাপতি সর্বশ্রী ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, যোগেশচন্দ্র বাগল, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। সম্পাদক—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সহকারী সম্পাদক : শ্রীদেবজ্যোতি দাস ও শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, কোষাধ্যক্ষ : শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ, পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য, চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যাল, পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় এবং গ্রন্থশালাধ্যক্ষ : শ্রীমতী উষা সেন।

প্রখ্যাত উর্দু কবি মাখদুম মহীউদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সম্প্রতি দুটি শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভাটির উদ্যোক্তা ছিলেন 'ইয়ং রাইটার্স ফোরাম' ও দ্বিতীয় সভাটির উদ্যোক্তা ছিলেন 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন।' প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় গত ২ সেপ্টেম্বর ইন্ডো জি ডি আর মৈত্রী সমিতি ভবনে। সভাপতিত্ব করেন শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ। রুমা গুহ-ঠাকুরতার পরিচালনায় 'ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার' মাখদুমের 'জানে-আলে সিপাহী কো পুছো ও জায়ে কাঁহা' গানটি পরিবেশিত হয়। মাখদুমের কবিতা পাঠে এবং মাখদুমের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সামসুজ্জেমান, মহম্মদ আজম, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, চিন্মোহন সেহানবীশ, তরুণ সান্যাল, সত্য গুহ, তরুণ সেন, মহম্মদ ইলিয়াস এবং আরো অনেকে। দ্বিতীয় সভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীসতীকান্ত গুহ। এই শোকসভাতেও মাখদুমের কয়েকটি মূল কবিতা ও অনুবাদ পাঠ করা হয় এবং মাখদুমের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী শ্যাম নিগম, কামিল প্রেমী, বালকৃষ্ণ, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমল ভৌমিক, আশিস সান্যাল, গণেশ বসু এবং আর কয়েকজন।

কানাডার ফরাসী ভাষী কবিদের রচনার সঙ্গে পরিচয় আমাদের খুবই সীমিত। অথচ ইদানিং কানাডার সাহিত্যআন্দোলনে ফরাসী কবিরা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। মার্গারেট ডিসেনডর্ফ সম্প্রতি একটি পত্রিকায় কানাডার ফরাসী কবিদের উপর একটি সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকে জানা যায়, কানাডার ফরাসী কাব্যধারায় 'শুদ্ধ কবিতা'র প্রভাব খুবই স্তিমিত। কুইবেকে যে কাব্যআন্দোলন চলছে, তার মধ্যে একটা জাতীয় চরিত্র পরিস্ফুট। তাঁদের কবিতার পটভূমিতে আছে মানুষ। এ-ছাড়াও কুইবেকের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে কাব্যে প্রকাশের প্রবণতাও লক্ষণীয়। জিরাল্ড গোডিনের কবিতায় এই প্রবণতাগুলি সবচেয়ে বেশি ধরা পড়েছে। এর ব্যতিক্রমও যে নেই, তা নয়। অ্যালেন গ্রান্ডবই কবিতার ভাষাকে মানুষের দৈনন্দিন মুখের ভাষার কাছে নিয়ে আসার পক্ষপাতী নন। এই ধারার কবিদের মধ্যে আছেন ফ্রাঁসোই হারটেল, আনে হেবই, রীনা লেসনার প্রমুখ। রীনা লেসনারের কবিতায় যে প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে মেটারলিঙ্ক ও জর্জ ট্র্যাকেলের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। কানাডার কুইবেক থেকে কয়েকটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়, যাতে কানাডার ফরাসী কবিদের কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।

ম্যাকবেথ নাটকটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় দীর্ঘদিনের। আমরা নাটকটির যথাযথ পরিবেশন দেখতেই অভ্যস্ত। কিন্তু শেকস্‌পীয়র যেভাবে লিখেছেন, ঠিক সেভাবে তাকে পরিবেশন না করে যদি কিছুটা অন্যভাবে পরিবেশন করা হয়, তাহলে কেমন হয়? হ্যাঁ, ম্যাকবেথকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে পরিবেশন করা হয়েছে। অবশ্য আমাদের দেশে নয়। পশ্চিম জার্মানীতে। চার্লস ম্যারউইজ নাটকটিকে নবরূপে পরিবেশন করেন। শেকস্‌পীয়রের লেখা কথোপকথনের কোন পরিবর্তন তিনি করেন নি। কিন্তু দৃশ্যগুলি যেভাবে পর পর সাজান ছিল, তার পরিবর্তন করেছেন। প্রথমেই একসঙ্গে তিন ম্যাকবেথের আবির্ভাব—ম্যাকবেথের স্বগত ভাষণে এই তিন ম্যাকবেথেই অংশগ্রহণ করেছেন। লেডি ম্যাকবেথের সঙ্গে দুইজন উইচকে সর্বদাই দেখা গেছে। এ-রকম অভিনব পরিবেশন পশ্চিম জার্মানীতে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংকলয়িতা শ্রীপুলিনবিহারী সেন। প্রকাশক : বিশ্বভারতী গ্রন্থনা বিভাগ, কলকাতা। মূল্য ৬-৫০

প্রখ্যাত সুরকার রোহান সেবাস্তিয়ান বাখ্-এর বংশলতিকা উদ্ধৃত করে সমাজ-তত্ত্ববিদ্ষী মার্গারেট মীড তাঁর 'কন্টিনিইটিজ ইন কালচারাল এভল্যুশন' গ্রন্থে দেখিয়েছেন : কিভাবে পারস্পরিক প্রভাবে-প্রচ্ছায়ায় একটি প্রতিভা-সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে ওঠে, এবং ইতিহাসের পাতায় আপন বহু বিচিত্র স্বাক্ষর রেখে যায়। উনিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণে এদেশে আবির্ভূত এমনই একটি বিদগ্ধ, ঐতিহাসিক পরিবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী। স্বদেশীয় সংস্কৃতিতে এই পরিবারের অবদান বহুমুখী ও অমেয়। এই ঠাকুর পরিবারের কেন্দ্রীয় প্রাণ-পুরুষ : 'প্রিন্স' দ্বারকানাথের পুত্র 'মহর্ষি' দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর মাধ্যমে তিনি নিজেকে ব্যক্ত করেছেন স্বদেশবাসীর কাছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তিনি কেমন ছিলেন? তার পরিচয় আছে 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর লেখা 'পিতৃস্মৃতি'তে, যার পুনর্লিখন কবি স্বহস্তে করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও : কিছু চিঠিপত্রে। মহর্ষির জন্মদিনে ও মৃত্যুদিনে প্রদত্ত কবির ভাষণ : প্রবন্ধ ও বক্তৃতা মাধ্যমে মহর্ষিচরিত্র আলোকিত হয়ে ওঠে। সমস্ত রচনা একত্রিত করে, মহর্ষির সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ বিগত পৌষে প্রকাশ করেছেন 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।'

'জীবনস্মৃতি' ও 'পিতৃস্মৃতি' স্বরূপত পারিবারিক তথ্যচিত্র। পিতৃদেবের যে বিরাট ও মহৎ ভাবরূপ রবীন্দ্রনাথের মনে চির-মুদ্রিত ছিল, তার অকপট প্রকাশ ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধে বক্তৃতায়। পিতার স্বভাবে ও আচরণে তিনি কেবলমাত্র এক প্রবল ব্যক্তিত্বকেই দেখেন নি, তাঁর মধ্যে দিয়ে উপনিষদের তথা ভারত-আত্মার মৌল সত্যের অভিব্যক্তিকে গভীরভাবে অনুভব করেছেন। এই অনুভব যে তাঁর অধ্যাত্ম-ভাবনার মৌল বেদী, সে-কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। স্বভাবতই মহর্ষি-প্রসঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে মিশে গেছে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গও

বস্তুত, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ' একটি জীবনীগ্রন্থ মাত্র নয়, একটি জীবনচর্যার অন্তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ। যে-জীবনচর্যা ঠাকুর-বাড়ীতে একটি বিশেষ পরিবেশ গড়ে তুলেছে, যে-পরিবেশে লালিত হয়েছেন একের পর এক উজ্জ্বল প্রতিভা এবং উজ্জ্বলতম রবীন্দ্রনাথ; যার ভাব-প্রভাব জোড়াসাঁকো থেকে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। পিতৃ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পর্যালোচনা করেছেন ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি-জীবনদর্শন এবং স্বগত বক্তব্য রেখেছেন—যার সঙ্গে তুলনীয় 'ধর্ম', মানুষের ধর্ম', শান্তিনিকেতন, সাধন.' ইত্যাদি রচনাবলী। এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে সংকলয়িতা এবং প্রকাশকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

●

আমাদের নাটক— (নাটক সংকলন) হাসি দাশগুপ্ত। ধূপছায়া প্রকাশনী—১৫৭, কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা—১৯, দাম—তিন টাকা।

শ্রীমতী দাশগুপ্ত গোখেল মেমোরিয়াল শিক্ষিকা শিক্ষণ বিভাগে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা। তাই তাঁর এই রচনাগুলির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যথেষ্ট মুন্সীয়ানা লক্ষ্যণীয়। শিশুদের আবেগ অনুভূতিগুলি 'অভিনয় পদ্ধতি'র প্রয়োগে যে বিশেষভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, লেখিকা সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই যে এই নাটকগুলি রচনা করেছেন তা সার্থক হয়ে উঠেছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রথম নাটক 'পিঠে খাবার মজা' পাঁচ থেকে সাত বছরের শিশুদের জন্যে রচিত। দুটি গৃহস্থের ছেলে, কয়েকটি মুরগী, হাঁস, কুকুর ও বেড়াল—এই নাটকের পাত্রপাত্রী, গৃহস্থের বাড়ি থেকে দুধ ময়দা চিনি যোগাড় করে পিঠে তৈরী করে খাওয়া নিয়ে এই মজার নাটক রচিত। শিশুদের সত্যিই উপভোগ্য এর বিন্যাস। কিন্তু চরিত্র-গুলির সাজ-পোশাক সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত থাকলে আরো ভালো হোত।

দ্বিতীয় নাটক 'বুদ্ধির জয়' ছয় থেকে আট বছরের শিশুদের জন্যে রচিত। বনের রাজা সিংহ থেকে শুরু করে বাঁদর, হরিণ খরগোস ইত্যাদি চরিত্র নিয়ে এর কাহিনীর বিস্তার। বনের রাজা সিংহ ও সিংহিনী চক্রান্ত করলো অন্যান্য ইতর প্রাণীদের খেয়ে ফেলার। শেষ পর্যন্ত খরগোসের বুদ্ধির জোরে সবাই তারা কেমন করে প্রাণে বাঁচলো তাই দেখানো হয়েছে এই নাটকে। নাটকটি যেমনই উপভোগ্য তেমনিই শিক্ষাপ্রদ। এ নাটকেও সাজ-পোশাকের ইঙ্গিত বিশেষ-ভাবে প্রয়োজনীয়।

তৃতীয় নাটক 'নদী' আট থেকে দশ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য রচিত। নদীর উৎস মুখ থেকে সাগরে গিয়ে মিলিত হওয়ার যাত্রাপথে সূর্য, পাহাড়, ঝরনা, চাষাচাষী, জেলে, মাঝি, সওদাগর, গ্রামবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে পরস্পরের আদানপ্রদান নিয়ে এই কাহিনী বিন্যাসিত। নাটকটি সঙ্গীতবহুল এবং শিক্ষাপ্রদ।

চতুর্থ নাটক 'ধন্যবীর' গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের মরু পরিক্রমার পথে মরু-বাসীদের আতিথেয়তার কাহিনী নিয়ে রচিত। এ নাটকেও যথেষ্ট শিক্ষণীয় বিষয় আছে। 'আমাদের নাটক' শিশুদের অভি-নয়ের জন্য যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলেই বিশ্বাস।

●

ক্যাকটাস (কাব্যগ্রন্থ)।। ফণী বসু। গ্রন্থ জগৎ। ১৯, পন্ডিতিয়া টেরেস, কলিকাতা-২৯। তিন টাকা।।

আলোচ্য বইখানি সম্ভবত কবির প্রথম প্রকাশিত বই। প্রায় একান্নটি বিভিন্ন ধরনের কবিতার এই সংকলনটি পড়ে যে কথাটা প্রথমেই মনে হয়েছে তা হোল ফণীবাবু কবিতাই লিখেছেন, কেবলমাত্র আঙ্গিক বা বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে তিনি কবিতার প্রাণ সন্ধান করতে প্রয়াস পেয়েছেন। একই সঙ্গে কবি তাঁর দরদী দৃষ্টি দিয়ে মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক জগতটাকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। খুঁটিয়ে সবকিছু দেখবার দৃষ্টিভঙ্গীই কবিকে বাস্তবধর্মী করে তুলেছে। কবি তাঁর নিজস্ব বক্তব্যকে সহজভঙ্গীতে অমিলছন্দে উপস্থাপিত করেছেন। বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা পাঠকের ভাল লাগবে। মণীন্দ্র মিত্রের আঁকা প্রচ্ছদটি সুন্দর।

●

পল্বল (উপন্যাস) বিনয় চৌধুরী। প্রকাশক—নবভারতী, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম—তিন টাকা।

বিনয় চৌধুরী ইতিপূর্বে উপন্যাস রচনা করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পল্বল তাঁর নবতম উপন্যাস। শর্বানী একটি উৎপীড়িতা মেয়ে, তার ওপর অবহেলা আর বঞ্চনার সীমা নেই, উপন্যাসটিতে শর্বানীর দুঃখজ্বালার কথা অসামান্য সহানুভূতির সঙ্গে লেখক বিধৃত করেছেন। শ্রীচন্দকে নিয়ে এই উপন্যাস সামাজিক ক্ষুদ্রতা আর সঙ্কীর্ণতার শীকার কয়েকটি অসহায় মানুষের কথা এই উপন্যাসে অতি সুন্দর ফুটেছে। লেখক যেভাবে মতি দিদিমা, রামেন্দর, নৃসিংহ মাস্টার প্রভৃতি চরিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে তাঁর লিপি-

কুশলতার পরিচয় পাওয়া গেছে। শর্বানী যেভাবে অবস্থা বিপর্যয়ের চাপে তার জীবনের ব্যর্থ অভিশাপে জর্জর হয়েছে তা অতি বেদনাদায়ক। যেভাবে স্বামী-পরিত্যক্ত শর্বানী সংগ্রাম করেছে তা বাংলা সমাজে অপরিচিত নয়। বাংলাদেশে আজও নববধূকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয় এবং সেই সব অত্যাচার পশুর মত নীরবে সহ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই নিস্কৃতির। এই অসহায় অবস্থা থেকে নিরাপরাধ মানুষকে মুক্তিদানের কোনো ব্যবস্থা নেই। এরা সমাজের শিকার। সমাজের পঙ্কিল পরিবেশে শুদ্ধ শুচি প্রাণ নিষ্পেষিত হয়ে পড়ে। উপন্যাসটির ঘটনা সংস্থাপনে লেখক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচনায় পরিমিতিবোধ আছে।

আকাশ অরণ্য মাটি (কবিতা সংকলন)—ব্রজগোপাল রায়। জনসংযোগ প্রকাশনী ৩৩এ, বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-৫। দাম : দু টাকা।

প্রথম মুখ (কাব্যগ্রন্থ)—রূপাই সামন্ত। সিগনেট বুকশপ, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম : দু টাকা।

বর্তমান জীবন-যন্ত্রণা ও নাগরিক বৈদগ্ধ্যের মধ্যেই কবি চিরকালীনত্বের আস্বাদ পেতে চেয়েছেন বিভিন্ন কবিতায়। শব্দচয়ন, ইমেজ ব্যবহার ও ভাব-সংহতিতে আত্মশালীন হতে পারলে ব্রজগোপাল রায় ভবিষ্যতে ভালো কবিতা হয়তো লিখতে পারবেন। এ সংকলনের অধিকাংশ কবিতাই অপরিণত।

বেশ মিষ্টি, সহজ ও আবেগময় ভাষায় কবিতা লেখেন রূপাই সামন্ত। প্রেমের এক রকম প্রচ্ছন্ন বিষাদ ও আর্তি বুকে রেখে তিনি সৌন্দর্য দর্শন করেন প্রকৃতি ও মানবীয় সম্পর্কের। সম্পূর্ণ এক কবিতার নির্দেশকে মানা করে কোথাও কোথাও পংক্তি গঠনে চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন তিনি। তবে লক্ষণীয় তাঁর কবিতায় নাগরিকতার অনুপস্থিতি। মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির অন্তরঙ্গ উচ্চারণেই তিনি সাবলীল।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

সাহিত্য চর্চা (২) — সম্পাদক—গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ৪এ, গোলক দত্ত লেন, কলিকাতা ৫ থেকে প্রকাশিত। দাম—একটাকা মাত্র।

সাহিত্য-চর্চা আধুনিক সাহিত্য ভাবনার প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক। আলোচ্য সংখ্যাটি ১৯৬৯-র দ্বিতীয় সংকলন। এই সংকলনের শুরু হয়েছে তিনখানি চিঠি দিয়ে। পাঠকরা এই চিঠিতে পত্রিকা সমালোচনা করেছেন। কবি কৃষ্ণ ধর আধুনিক কাব্য-নাটকের উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধটিতে কাব্য-নাটকের রীতি ও প্রকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইয়েভগেনী দাগর নিকোফের একটি প্রবন্ধ এবং ডিলান টমাসের একটি গল্পের অনুবাদ এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ। তরুণ সেনের 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' প্রবন্ধটি ভালো, তবে বিস্তৃততর হলে ভালো হত। সুবিমল মিশ্রের গল্পটি প্রশংসনীয়। সাহিত্যচর্চার কবিতাংশ বিশেষ সমৃদ্ধ। মণীন্দ্র রায় রাম বসু, তুলসী মুখোপাধ্যায়, সত্য গুহ, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতির কবিতা উপভোগ্য। এই সংখ্যায় ডক্টর মহম্মদ শহীদুল্লাহের একটি স্কেচ এঁকেছেন মুর্তাজা বশীর। পত্রিকাটির মধ্যে নিষ্ঠা ও পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়।

●

সপ্তপর্ণীপা সম্পাদক : রবীন দত্ত ও জীবনময় দত্ত। (জুলাই, ১৯৬৯)। **এ।১২ কঙ্করবাগ কলোনী, পাটনা—১ থেকে প্রকাশিত। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।**

বাংলার বাইরে আজকাল কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। বিহার থেকে প্রকাশিত প্রগতিশীল সাহিত্য ও সংস্কৃতি ত্রৈমাসিক সপ্তপর্ণীপা আমরা পূর্বেও পেয়েছি। সম্প্রতি বিশেষ কবিতা সংখ্যাটি সমালোচনার জন্য পেয়েছি বলা বাহুল্য পত্রিকাটি অনেক দিক থেকে বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। এই সংখ্যায় পঁচিশটি কবিতা আছে। অনিরুদ্ধ, কামাখ্যা সরকার, অজীন চক্রবর্তী, অসীম ভৌমিক, রবীন দত্ত, জীবনময় দত্ত ও কালীপদ কোঙারের কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঘোষের নাটিকা প্রশংসনীয়, তবে এই সংখ্যায় না থাকলেই ভালো হত। আরেকটি কথা সম্পাদকীয়ের শিরোনাম 'ক্রোকজ্যাপস' কেন? একটি বাংলা নাম দিলেই ভালো হয়।

●

নির্বেদ ।৩, ৪ ও ৫। (কবিতা সংকলন)। মানিক চক্রবর্তী সম্পাদিত। ৩।১।২ কেদার বসু, লেন, কলকাতা-২৫

সংকলনগুলিতে লিখেছেন, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মানস রায়-চৌধুরী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, রত্নেশ্বর হাজরা, গৌর গোস্বামী, মানিক চক্রবর্তী এবং অনেকে। মানিক চক্রবর্তীর কবিতা-বিষয়ক প্রস্তাবটি বিসদৃশ হলেও উৎসাহব্যঞ্জক।

●

জ্ঞান ও বিজ্ঞান (আগস্ট ১৯৬৯)—সম্পাদক : গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। পি-২৩ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট। কলকাতা—৬। দাম একটাকা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান সংখ্যাটি চন্দ্রাভিযান সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। চাঁদ সৃষ্টি হোল কিভাবে, চাঁদ মানুষের কি কাজে লাগতে পারে মহাকাশ অভিযানের নানা পর্যায়, চাঁদে মানুষ, রকেটের কথা প্রভৃতির সম্পর্কে আলোচনা আছে।

বইকুণ্ঠের খাতা

বটতলার বই

টোলা-টুলি-বাগান- বাজার-পাড়া -তলা ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছিল পুরনো কলকাতা। এখন অবশ্য তার জায়গা দখল করে নিচ্ছে লেন-এভেন্যু-স্ট্রীট-রোড প্রভৃতি ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কল্যাণে গড়ে-ওঠা পথ-ঘাট। হাতিবাগান, কলাবাগান, কুমারটুলি, কালিঘাট, শাঁখারিটোলা, পাইকপাড়া, বড়বাজার অঞ্চল এখনো তার আদি সাক্ষ্য বহন করছে। তেমনি হয়তো ছিল বটতলা। সঠিকভাবে বলা কঠিন, কোথায় ছিল সেই প্রাচীন বটগাছ, যার নিচে কিংবা আশেপাশে দোকান সাজিয়ে বসেছিলেন কলকাতার প্রাচীনতম প্রকাশকের দল। আজ তা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। আমাদের জন্যে রয়ে গেছে বটতলার বই।

"কি বই ছাপেন তাঁরা? কি তাঁদের বৈশিষ্ট্য?"—একদিন প্রশ্ন করেছিলেন জনৈক তরুণ সাহিত্যিক। ভারি মুস্কিলে পড়েছিলাম প্রশ্নের ধরণ-ধারণে। বটতলার বই পড়েননি, বাংলাদেশে এমন দুচারজন শিক্ষিত মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এখনকার গ্রামজীবনকে ছেয়ে আছে বটতলার বই, শহুরে কিশোরদের জন্যে রহস্যরোমাঞ্চ।

পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি : কি বই চান? ইহলোকের না পরলোকের? ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সম্পর্কিত সব রকমের বই পাবেন আপনি। বলুন, কি বই চাই?

মানে?

—রামায়ণ-মহাভারত ছাপেন ও'রা। ছাপেন ধর্মবিষয়ক যাবতীয় সুলভ ও রাজ সংস্করণের বই (?)। যথা—চণ্ডীমঙ্গল, মনসা মঙ্গল (বা পদ্মাপুরাণ), মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, গীতা (ছোট ও বড় সাইজ), গীতগোবিন্দ, চৈতন্যচরিতামৃত, অন্নদামঙ্গল, লক্ষ্মীর পাঁচালি, শনির পাঁচালি, নিত্যকর্মপদ্ধতি, কালিদাসের হেঁয়ালি, গোপাল ভাঁড়ের রহস্য, ধাঁধা, ছড়া, খনার বচন, লতাপাতার গুণ, মেসমেরিজম, হিপ্নোটিজম, কামশাস্ত্র, কোকশাস্ত্র, প্রেমপত্র, পুরোহিত দর্পণ, নাটক-নভেল, যাত্রা-থিয়েটার, রহস্যরোমাঞ্চের বই। অর্থাৎ আপনি সুখেসম্পদে থাকতে হলে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক-জীবনে আস্থাবান হলে কিংবা ঐহিক সুখভোগে ইচ্ছুক হলে, বটতলা আপনাকে মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশ দিতে সক্ষম। নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে হলেও 'হস্তরেখা বিচার' কিংবা 'সরল জ্যোতিষ শাস্ত্র' আপনি পাবেন ও'দের কাছ থেকেই। দাম সস্তা, ছাপা নিভুল, কেবল তথ্যের গ্যারান্টি নেই।

আমি বিষয়টাকে হালকা করতে চেয়েছিলাম। ততোধিক হালকা হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। বললে, এসব জানি। পড়েওছি। সিরিয়াসলি ভাবিনি কখনো। অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা বলছি, শুনুন। সবে নাইন থেকে প্রমোশন পেয়ে টেন-এ উঠেছি। রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াই। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারি। বেশ একটু ফ্রি আছি। বুঝতেই পারছেন, কিশোর বয়স। মেয়েদের দেখলে ভালো লাগে। একদিন বৌদির আদেশ হলো, 'বারো মাসের ব্রতকথা' কিনে আনতে হবে। সন্ধ্যায় কিনে আনলাম, আরেকটা বই। বৌদিকে বললাম আজ পেলাম না, কাল এনে দেব। বেশ একটু রাত জেগে পড়েছিলাম বইটি। নাম : প্রেমপত্র। প্রচ্ছদে ভুবনমোহিনী সদ্যবিবাহিত তরুণীর বিরহকাতর ছবি। ভেতরে স্বামী-স্ত্রীর সম্ভাব্য পত্রের খসড়া। কতবার যে বইটি পড়েছিলাম মনে নেই।

তার পরের দিনই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে দেখা। দুজনেই সাহিত্য সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলাম, বিশেষ করে বর্তমান বাংলা সাহিত্য। সিরাজ নিজের জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাল্য-কৈশোরের স্মৃতি-চারণা করছিলেন।

বললেন, নয় দশ বছরের সময় আমি প্রথম কবিতা লিখি। তারও আগে পড়েছি বটতলার বই, হরিদাসের গুপ্তকথা, অনন্তপুরের গুপ্তকথা ইত্যাদি। তখন আমার মনে সেসব গল্প বেশ আলোড়ন তুলেছিল। লিখেও ফেলেছিলাম, ওরই অনুকরণে আরেকটা বই। সে পাণ্ডুলিপি এখন কোথায় হারিয়ে গেছে, কে জানে।

এই শক্তি নিয়েই টি'কে আছে বটতলা। তারাচাঁদ দাস অ্যাণ্ড সন্সের 'বর্ণ-পরিচয়' স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পথাবলম্বনে রচিত। এখনো বছরে বিক্রী হয় প্রায় এক লক্ষ। শিশুপাঠ্য অন্যান্য বইও প্রকাশ করেন তাঁরা। বাল্যশিক্ষা, ধারাপাত প্রভৃতি। তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা-পদ্ধতি সরবরাহ করেন তাঁরাই।

এলাকা হিসেবে বলা যায়, উত্তর-পশ্চিম কলকাতার চিৎপুর রোড, নিমু গোস্বামী লেন, গরানহাটা রোড, তারক চ্যাটার্জি লেন কিংবা তার কাছাকাছি অঞ্চলের প্রকাশকরাই মূলত বটতলার দোকানী হিসেবে প্রসিদ্ধ। রুচিবোধ ও মানসিকতার দিক থেকে এ'রা চির-কিশোর। সাহিত্যের ব্যবসা করতে চান না ওরা। চিরটাকাল করে এসেছেন বইয়ের ব্যবসা। কিন্তু বিরোধ ছিল না কখনো কলেজ স্ট্রীটের সঙ্গে। সত্যি বলতে কি, কলেজ স্ট্রীট তখনো অঙ্কুরেই। বইপাড়া হয়ে ওঠেনি। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে দোকান খুলে বসেছিলেন বিদ্যাসাগর। শোনা যায়, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কের বই বের করতো বিদ্যাসাগরের প্রকাশনী। ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হলো গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, টি সি আড্ডি অ্যাণ্ড কোম্পানি। বটতলাকে এড়িয়ে গ্রে স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে বইয়ের ব্যবসা শুরু হলো নতুন ধরনের। আজকের কলেজ স্ট্রীটের পূর্বসূরী ও পথ প্রদর্শক হিসেবেই কাজ করেছেন এ'রা। রবীন্দ্রনাথের বই করতেন এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেস। পরে ও'রা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস করেছেন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। অবশ্য, এটা বেশী দিনের কথা নয়। এই তো সেদিন!

'বইকুণ্ঠের খাতা' লিখতে বসে প্রায়ই মনে হতো এ'দের কথা। জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল বটতলার বইয়ের অতীত-ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। ভদ্রলোক বললেন, পুরনো পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখুন। অনেক নতুন খবর পাবেন। চমকপ্রদ সব বিজ্ঞাপন বেরোয় ও'দের। আগে গুপ্তপ্রেস আর পি এম বাগচীর পঞ্জিকাতেই ও'রা বিজ্ঞাপন দিতেন। এখন অনেক ফুল-পঞ্জিকা, হাফ পঞ্জিকা, পকেট পঞ্জিকা বেরোয়। লক্ষ্য করবেন, বাঁধা কপি, মুলো কিংবা ফুলকপির সচিত্র বিজ্ঞাপনের নিচে কিংবা আশেপাশে বটতলার বইয়ের বিজ্ঞাপন।

ঘটনাক্রমে সেদিন দেখা হলো, 'সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরীর' একজন কর্মচারী শ্রীষষ্ঠীচরণ হাজরার সঙ্গে। ভদ্রলোক স্বভাবসুলভ সঙ্কোচের সঙ্গে কথা বলছিলেন। শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের গলির ভেতর কয়েকটা নতুন বইয়ের দোকান করেছেন চিৎপুরের প্রকাশকরা। আগে ঐ অঞ্চলে বটতলার বই বিক্রী হতো না বেশী। এখন হয়। ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা বটতলা ছেড়ে কলেজ স্ট্রীটের দিকে ঝুঁকলেন কেন?

—আমরা ঝুঁকিনি। ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছি। চিৎপুরের বই আজকাল বিক্রী করেন কলেজ স্ট্রীটের দোকানদাররাও। সে রকম কয়েকজন এজেন্ট ছিল আমাদের, সাহা বুক স্টল, বসাক লাইব্রেরী প্রভৃতি। ওরা বেশী কমিশনে বই এনে খদ্দেরদের কাছে পাইকারী-খুচরো দুরকমেই বিক্রী করতেন। তাতে আমাদের যে খুব লাভ হয়েছে, তা নয়। মফঃস্বলের খদ্দেররা এখন ও'দের কাছ থেকেই বেশী কেনে। ফলে, আমাদের লাভ হয় কম। বোধহয়, এজন্যেই অনেকে কলেজ স্ট্রীটে দোকান খুলে বসেছেন সরাসরি বই বিক্রীর কথা ভেবে।

কলেজ স্ট্রীটের দোকানদাররা কি এখন আপনাদের ধরণে বই প্রকাশ করতে আগ্রহী হয়েছে বলে মনে করেন? সাধারণ মানুষের তো ধারণা, কলেজ স্ট্রীটের খদ্দেররা চিৎপুরের ছায়া মাড়ায় না, আর চিৎপুরের খদ্দেররা এড়িয়ে চলে কলেজ স্ট্রীটকে।—এ ধারণা কি ঠিক নয়?

—আগে খানিকটা ঠিকই ছিল। এখন নয়। মফঃস্বলের দোকানদাররা মোটামুটি সব রকমের বই-ই বিক্রী করেন। গল্প-উপন্যাস যেমন ও'দের দোকানে পাওয়া যায়—তেমনি ধর্মগ্রন্থের চাহিদাও গাঁয়ের খদ্দেরদের মধ্যে প্রচুর। তা ছাড়া আমাদের বই বিক্রী করে ওদের লাভ হয় বেশী।

—কি রকম? খুলে বলুন।

—আমরা বই বিক্রী করি নেট দামে। ধরুন, রামায়ণ-মহাভারতের দাম ১৫।১৬ টাকা। আমরা কমিশনের হিসেব না করে বিক্রী মূল্য ঠিক করি ৭।৮ টাকায়। দোকানদাররা সেসব বই পুরো দামে বিক্রী করতে পারলে একেকটা বইতে সাত আট টাকা প্রফিট করে। অন্য বইতে এত লাভ কোথায়?

ভদ্রলোক অবশেষে দুঃখ করে বললেন, আজকাল কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকরা অনেকেই যৌনবিজ্ঞান, কামশাস্ত্র প্রভৃতি বের করছেন। কোনো কোনো বই ভালো। অধিকাংশ বই আমাদের চেয়েও খারাপ। ও'রা আমাদের ব্যবসার ফন্দিফিকির কিছুটা বুঝে ফেলেছন।

আপনারা তো পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন না। তা হলে আপনাদের বই প্রচারিত হয় কি করে?

—আমাদের বইয়ের লেখক বড় কথা নয়। আমরা বই বের করি নানারকমের। ভি পি তে বই যায়। ক্যাটালগ পাঠাই। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন দেখে অনেকে চিঠি দেন। তা ছাড়া প্রত্যেক বইয়ের পেছনে অন্যান্য বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপি। তাতেও কাজ হয়। একটা পঞ্জিকা তো পত্রপত্রিকার মতো দুএক সপ্তাহের পাঠ্য বই নয়। সারা বছর দরকার পড়ে তার। তিথি-নক্ষত্র দেখার জন্যও পঞ্জিকা দরকার। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ হিন্দুর বাড়িতেই পঞ্জিকা থাকে।

আপনারা একই বইয়ের দাম কম বেশী করেন কি করে? রাজসংস্করণ, আর সুলভ সংস্করণ বলতে কি বোঝেন?

—ওটা ছাপা বাঁধাইয়ের ব্যাপার। রাজ সংস্করণে বইটা পুরো থাকে। পৃষ্ঠা ও ছবির সংখ্যা বেশী। সুলভ সংস্করণে আমরা কোনো কোনো অধ্যায় বা ঘটনা বাদ দিই। মূল বিষয় অবশ্য সব গ্রন্থেই ঠিক থাকে।

বইয়ের দাম এত সস্তা করেন কি করে?

—অনেক সময় রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-চণ্ডী কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো বড় বই ছাপা হলে পাশাপাশি অন্য প্রকাশকদের জানিয়ে দেওয়া হয়। কেউ পাঁচ হাজার, কেউ দশ হাজার ফর্মা ছাপার অর্ডার দেন। তাতে ছাপার খরচ অনেক কমে যায়। টাইটেল ও কভার আলাদা আলাদাভাবে সকলে ছেপে নিয়ে নিজেদের নামে প্রকাশ করে। তা না হলে কি পোষানো যায়?

বটতলার প্রকাশক বলতে আপনি কাদের বোঝেন?

—তারাচাঁদ দাস অ্যান্ড সন্স, জেনারেল লাইব্রেরী, সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, তারা লাইব্রেরী, জগন্নাথ লাইব্রেরী (এখন উঠে গেছে। এককালে ওরা মুসলমানী বই ছাপতো।) অক্ষয় লাইব্রেরী, শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী ডায়মন্ড লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী, ওরিয়েন্ট লাইব্রেরী, নিউ মাণিক লাইব্রেরী, স্বর্ণলতা লাইব্রেরী প্রভৃতি। আমরা সকলেই একই ধাঁচের বই বের করি।

এখন কি আপনাদের বইয়ের চাহিদা আগের চেয়ে কমেছে?

—না, কমেনি। আরো বাড়তো, যদি কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকরা আমাদের দিকে হাত না বাড়াতো।

আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী আর কারা?

—দেব সাহিত্য কুটীর। ওরাও আমাদের মতো ধর্মপুস্তক প্রকাশ করে। নাটক-নভেলের বই, রহস্য রোমাঞ্চের বই বের করে ও'রা বেশী। এককালে বসুমতী সাহিত্য-মন্দির আমাদের মতো ধর্মগ্রন্থ বের করতো।

ভাবতে-আমি অবাক হচ্ছিলাম। গত চার পাঁচ বছরের সাহিত্যের বাজার লক্ষ্য করলে হয়তো এতটা অবাক হওয়ার কারণ ছিল না। অন্তত আমার কাছে এখন এটা অনুচিত বিস্ময় বলেই মনে হচ্ছে। যৌনপত্রিকা ও যৌনগ্রন্থের প্রকাশ এ সময়েই বোধহয় সবচাইতে বেশী হয়েছে। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, এতদিন পরে কেন? দীর্ঘ ষাট সত্তর বছর কিংবা তারও বেশী সময়ে যখন কলেজ স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মধ্যে কোনো বিরোধ বা মানসিক সমঝোতা স্থাপিত হয়নি—তখন বিশ শতকের শেষার্ধে এসে কোন্ অলৌকিক ক্ষমতা বলে তা সম্ভব হলো?

ষষ্ঠীবাবু চুপচাপ ছিলেন। বললাম, আপনাদের পাইকারী ব্যবসাকেন্দ্র কোনটা?

—চিৎপুর আর ক্যানিং স্ট্রীট। ক্যানিং স্ট্রীটের মহামায়া লাইব্রেরী আর সুর অ্যান্ড কোম্পানী আমাদের বই পাইকারী বিক্রী করে আসছে দীর্ঘকাল। ওখানে অন্যান্য জিনিষও পাইকারী কিনতে পাওয়া যায় কিনা? তাতে খদ্দেররা যাতায়াতের অসুবিধা কাটিয়ে মহামায়া কিংবা সুর কোম্পানী থেকেই ন্যায্য দামে বই পায়।

শুনেছি, আপনারা শতকরা হিসেবে বই বিক্রী করে থাকেন?

—হ্যাঁ, করি। ঠিকই শুনেছেন। বর্ণ-পরিচয়, ধারাপাত প্রভৃতি বই বান্ডিল করা থাকে পঞ্চাশ কিংবা একশটার। ছ টাকা সাত টাকা শ' দরে ওগুলি বিক্রী হয়। অন্যান্য বইও হয়। বেশী দামী বই অবশ্য সকলে ওভাবে কেউ কিনতে পারে না।

বছরখানেক আগে বীরভূমে গিয়ে দেখেছিলাম বাজারে বাজারে বটতলার বই বিক্রী করছে ছোটখাট দোকানীরা। রেলের হকাররা বিক্রী করে ব্রত-পাঁচালি-ধারাপাত বর্ণ পরিচয়ের বই। কলকাতার ফুটপাথে, শহর গঞ্জের স্টেশনারী দোকানে বটতলার বইয়ের চাহিদা সর্বাধিক। খালি পায়ে বটতলায় ছুটে আসে গ্রাম-গ্রামান্তরের মানুষ। তারা পাইকারী দরে বই কিনে নিয়ে যায়। আর ফেরি করে বিভিন্ন অঞ্চলে, নানা রকম সুর করে।

উঠতি যুবক কিংবা সদ্য গোঁফ ওঠা ভীরু চোখের কিশোর জিজ্ঞেস করে, 'বাজ-পাখির আকাশ বিজয়" আছে, ফেরিওয়ালা?

—দু এক আনা কমিশনে বিক্রী হয়ে যায়।

খিড়কি দুয়ার খুলে জিজ্ঞেস করেন মা-ঠাকুমা, লক্ষ্মীর পাঁচালি আছে? কিংবা চন্ডীমন্ডপের ধারে উপবিষ্ট সেই বৃদ্ধ তাকে ডেকে কাছে বসান। দর দাম করেন। কাশীদাসী মহাভারত কিংবা কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিনে ফেলেন একটা। শহর-জীবনের বিস্তৃতি ঘটেছে ঠিকই। নাগরিক বৈদগ্ধ্যও বাড়ছে।

কিন্তু বটতলার বই? তার চাহিদা কমছে না। গরুর গাড়ির ছাউনির ভেতর, ফেরিওয়ালার কাপড়ের গাঁটরিতে কিংবা ছোটখাট দোকানদারদের মারফৎ তাদের বই চলে যাচ্ছে প্রতিদিন, শহর ছাড়িয়ে, সুদূর গ্রামাঞ্চলে।

—বিশেষ প্রতিনিধি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অফিসের ছুটির পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই সুপর্ণা এসে পড়ল। বলল, চলুন, কোথাও যাই। অনেক কথা আছে। পরিচিত রেস্টুরেন্টে গিয়ে উঠল দুজনে। সুপর্ণার ব্যবহারের মধ্যে কোন জড়তা লক্ষ্য করল না সনৎ। কোন তারতম্য হল না তার কথাবার্তায়।

কাগজে ড্রীমল্যাণ্ড নার্সিংহোমের কথা পড়েছি— বলছে সুপর্ণা। কিন্তু তার জন্য আপনার অফিসে না আসার কারণ কি।

কিছুক্ষণ অনামনস্ক হয়ে রইল সনৎ তারপর বলল—আমিও জড়িয়ে পড়েছি।

সে কি? অবাক হয়ে সুপর্ণা তাকিয়ে রইল তার দিকে।

হ্যাঁ, পুলিশ আমাকে সন্দেহ করছে।

আপনাকে সন্দেহ করবে কেন, বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় ওঁর কোন অসুখ ছিল বোধ হয়। তাতেই মারা গিয়েছেন।

পুলিশ কিন্তু তা ভাবছে না। আমার একটা সিরিঞ্জ ওখানে পাওয়া গিয়েছে বলে তারা আমাকেই সন্দেহ করছে। একটু চুপ করে সনৎ আবার বলল, আজ আপনার বাবার একটা কথা মনে পড়ছে। উনি আগেই বলেছিলেন, আমি পুলিশের দ্বারে লাঞ্ছিত হব এই ব্যাপারে। একদিন আমি ওঁর ভবিষ্যদ্বাণীর কথাই ভাবছিলাম। এত আশ্চর্য মিল আমি কোনদিনই চিন্তা করতে পারি নি। আপনার বাবার সঙ্গে আজ দেখা হতে পারে? সনৎ তাকাল সুপর্ণার দিকে?

বলা মুশকিল; কোথায় আছেন কি করছেন তা কেউ জানে না। চলুন না থাকতেও পারেন হয়তো।

ভবতোষবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। সনৎকে দেখে বহুদিনের পরিচিতের মত ব্যবহার করলেন তিনি। আহ্বান করলেন পরম আত্মীয়ের মত। আসুন আসুন— বললেন তিনি, সেদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখাই হল না। সুপর্ণা, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চট করে দু কাপ চা নিয়ে এসো। দেখো, তোমার মা যেন আবার জানতে না পারে আমি চা চেয়েছি, তাহলেই গণ্ডগোল।

হাসিমুখে সুপর্ণা চলে গেল। বাবার ছেলেমানুষী তার ভাল লাগে।

সেদিন মাছ ধরতে গিয়েছিলাম—বললেন তিনি। ধরেছি, তবে ছোট মাছ। চাঙ্গা, মাগুর আর একটা প্রকাণ্ড শোলমাছও পেয়েছি। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। বললেন—এরকম আনন্দ আর কিছুতেই নেই।

কিন্তু ক্লান্তি আসে। মন্তব্য করল সনৎ।

ক্লান্তি, না না ক্লান্তি কোথায়। শুয়ে-বসে থাকলে বেশী ক্লান্তি আসে। বিশ্রাম দরকার রুগীদের; স্বাভাবিক লোকের জন্য আনন্দ। বসে থাকলেই চিন্তা, চিন্তা এলেই রোগ আর ক্লান্তি—কি ঠিক না। হেসে উঠলেন ভবতোষবাবু।

আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় আউটিং-এ যাবার, কিন্তু—থেমে গেল সনৎ। কথাটা আর শেষ করল না।

যত লুকিয়ে থাকতে চেষ্টা করবেন, তত হৃৎপিণ্ড ছোট হয়ে আসবে। সাপের মত খোলস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ুন। গুটিপোকার মত নিজের চারদিকে দেওয়াল তৈরী করে বাঁচা যায় না।

কিন্তু, কি করব।

যেকোন একটা শখ বেছে নিন।

কিছু কিছু লিখে থাকি আমি।

ভাল কথা। কিন্তু বাড়ীতে বসে সাহিত্য করার চেয়ে মাছধরার নেশা অনেক ভাল। পিকনিকও করতে পারেন। আসল কথা

হল বাইরে বেরিয়ে পড়তে হবে পরিচিত জায়গা ছেড়ে। চলনুন না আমার সঙ্গে মাছ ধরতে দেখবেন কত মজা।

যাব একদিন। এখন ত জড়িয়ে পড়েছি পুলিশের ব্যাপারে।

কেন? বিস্মিত হলেন ভবতোষবাবু।

আপনিই এর আগে বলেছিলেন যে, আমি পুলিশের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ব।

বলেছিলাম নাকি? মনে পড়ছে না ত কিছু। ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন ভবতোষবাবু।

চা নিয়ে সুপর্ণা ঘরে ঢুকল। তার হাতে কাপের দিকে তাকিয়ে ভবতোষবাবু বললেন, চায়ের পাতা বেশী দিয়েছ ত? তুমি চা কর বেশ। আর কেউ পারে না।

কেউ বলতে অবশ্য তিনি স্ত্রীর কথাই উল্লেখ করলেন।

চা করা একটা আর্ট। বলতে লাগলেন ভবতোষবাবু। এ জিনিসটা জানে শুধু জাপানীরা। এটা তাদের একটা শিক্ষণীয় অনুষ্ঠান। চিনি বেশী দিলে চায়ের ফ্লেবার পাবে না। দুধ বেশী বা কম দিলে চায়ের আস্বাদ যাবে পাল্টে। আবার কাপ-ডিশেরও অংশ আছে। ফাটা, হ্যাণ্ডেল ভাঙা কাপ-ডিশে চা খাও—একরকম; আর গরমজলে ধুয়ে ডিসের উপর চা না ফেলে পরিষ্কার কাপে চা খাও—অন্যরকম লাগবে। দাও চা-টা দাও।

নিজেই চায়ের কাপটা চেয়ে নিলেন ভবতোষবাবু।

বাইরে বেরিয়ে সনতের ভাল লাগল। তার কারণ এতক্ষণ সে নিজের কথা ভুলে ছিল। যন্ত্রণাদায়ক চিন্তাগুলো তাকে পীড়ন করতে পারে নি অনেকটা সময়। দুর্বল পাটা নিয়ে ধীরে ধীরে ট্রামরাস্তার দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। অনেকগুলো ভাল কথা আজ সে ভবতোষবাবুর কাছ থেকে শুনল। সত্যিই সে গুটিপোকার মত দেওয়াল তৈরী করে বাঁচতে চেয়েছে চিরকাল। হীনমন্যতা তাকে ছোট করে রেখেছে তার নিজের কাছেই। পৌঁছে সে শুনল বাড়ীতে আবার পুলিশের লোক এসেছে। এবার তার বৌদি দীনার পালা।

দীনা স্বীকার করল, যে সে কেতকীকে ভাল চোখে দেখতে পারত না।

কিন্তু তার কারণ কি? জিজ্ঞাসা করল সুব্রত চৌধুরী।

কাজের দিক দিয়ে তার বিরুদ্ধে বলার কিছু ছিল না কিন্তু অন্য দিক দিয়ে তার দোষ ছিল অনেক।

স্বভাবচরিত্রের কথা বলছেন?

কেতকী একটা চীপ ফ্লার্ট ছিল—বলতে বাধল না দীনার।

তার প্রমাণ পেয়েছেন কিছু? সুব্রত প্রমাণের কথা আগেই জানে। তবে এ'র মুখ থেকে কথাগুলো বার হলে ফল হতে পারে। সে জানে যে কোন কারণে মন বিচলিত হলে অনেক সত্য বেরিয়ে আসে, অনেক রহস্যের উদ্ঘাটন হয়।

হ্যাঁ, আমার স্বামীর সঙ্গে করত। চোখদুটো জ্বলে উঠল দীনার।

তাহলে ওকে রেখেছিলেন কেন?

আমি রাখিনি, আমার স্বামী রেখেছিলেন।

এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয়েছিলো আপনাদের মধ্যে?

সম্প্রতি তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছে, ওকে নিয়ে, স্বীকার করল দীনা।

কেতকীর মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি?

ওসব মেয়েছেলে এভাবেই মরে।

তার মানে, আত্মহত্যা করেছে বলছেন?

নিশ্চয়। তাছাড়া আর কি? ওকে মার্ডার করবে কে? কোন কারণ নেই তার।

আছে মিসেস মুখার্জি, অনেকগুলো মোটিভ রয়েছে।

মোটিভ আবার পেলেন কোথায়?

কেন, জেলাসি।

তার মানে কি, আপনারা আমাকেই সন্দেহ করেছেন, হেসে উঠল দীনা জোরগলায়।

সন্দেহ করাই আমাদের কাজ, আস্তে করে উত্তর দিল সুব্রত চৌধুরী। তারপর বলল, জোরাল উদ্দেশ্য রয়েছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। বাই দি ওয়ে, মিসেস মুখার্জি, আপনি মিসেস দাশের অপারেশনের সময় কেতকীর সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেছিলেন?

একটু ভেবে নিল দীনা, তারপর বলল, ভুল যন্ত্র দেওয়ার জন্য সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। তাকে দুর্ব্যবহার বলে না, ওতে এ্যাসিস্টেন্টরা হুঁশিয়ার থাকে, ভুল করে না আর।

খুব ভাল কথা, কিন্তু অপারেশনের শেষে হাত ধোবার সময় আপনি কি বলেছিলেন মনে আছে।

না, মনে নেই। বলতে দেরী হল না দীনার।

আপনি বলেছিলেন, 'দ্যাট বীচ শুড বি কিল্ড।'

হতে পারে। আমার বেয়ারাকেও সেদিন ফুলদানি ভাঙার জন্য বলেছিলাম, তাকে মেরে ফেলা উচিত, কই মারিনি ত তাকে। হেসে উঠল দীনা ব্যঙ্গভরে।

মিঃ ঘোষ তার স্থূলদেহটা নাড়াচাড়া করে ভালভাবে বসে বললেন, মিসেস মুখার্জি, আপনি রাকেশ অ্যাডভানীকে চেনেন?

চিনি, ভালভাবেই চিনি। দিল্লী থেকে আমাদের অনেকদিনের আলাপ। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল দীনা।

ওর সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা ছিল।

ছিল, তবে লম্পট জুয়াচোরটাকে আমি বিয়ে করতে রাজী হইনি শেষ পর্যন্ত।

আপনার লেখা কতগুলো চিঠি ওর কাছে আছে?

হ্যাঁ, তাই নিয়ে আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি।

কলকাতায় আপনার সঙ্গে ওর কত দিনের যোগাযোগ?

অল্পদিনের। ওর বাবা নারাণদাস অ্যাডভানীর অ্যাকসিডেন্টে আমার স্বামী অ্যানেসথেশিয়া দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই সন্ধান পেয়ে আমার পিছু নিয়েছিল লোকটা।

আপনার স্বামীর সঙ্গে ইদানীং আপনার মনোমালিন্য চলছিল?

হ্যাঁ, ঐ নচ্ছার মেয়েছেলেটার জন্য। মুখটা লাল হয়ে উঠল দীনার।

আপনাকে রাকেশ যে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছে সে কথা কি আপনার স্বামীকে জানিয়েছিলেন?

না, গোপন করেছিলাম। কোন স্ত্রীই তার স্বামীকে বিয়ের আগের দুর্বলতার কথা জানতে দিতে চায় না।

ডাঃ মুখার্জির সঙ্গে কেতকীর ফ্লার্টিং-এর কথা আপনি কি করে জানলেন। নিজে কিছু দেখেছেন?

আমার দেবর সনৎ দেখে আমায় জানিয়েছিল ব্যাপারটা।

তারপরেই মিসেস. দাশের অপারেশন হয়েছিল?

হ্যাঁ, সেখানেই কেতকীর ভুলের জন্য আমি রাগ করে যন্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

রাকেশ অ্যাডভানীর সঙ্গে আপনি কোন যোগাযোগ রাখতেন?

আমি নই, ওই রাখত—টেলিফোন করত, নার্সিংহোমের সামনে দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকত।

দেখা করতেন?

না, রাকেশই দেখা দিত রোজ, সাইকোলজিক্যাল প্রেসার দেবার জন্য; আমার মনকে দুর্বল করার জন্য।

রাকেশের সঙ্গে টেলিফোনে আপনার কি কথা হোত?

ও টাকা চাইত, আমি দিতে নারাজ হতাম।

এছাড়া অন্য কিছু?

না, প্রেমালাপ করার মত লোক নয় রাকেশ অ্যাডভানী।

আপনার স্বামীর সম্বন্ধে কোন আলোচনা—

না। ছোট্ট করে উত্তর দিল দীনা।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিসেস মুখার্জি, আপনি রাকেশকে জানিয়েছিলেন যে, স্বামীকে ত্যাগ করে আপনি চলে যাচ্ছেন।

মিথ্যে কথা—উত্তেজিত হয়ে উঠল দীনা।

আপনি রাকেশের সংগে চলে যেতে চেয়েছিলেন?

জোরে হেসে উঠল দীনা—হিস্টিরিক্যাল হাসি। হাসিটা থামলে সে বলল, এত লোক থাকতে রাকেশ অ্যাডভানী!

নার্সিংহোমের উৎসবে রাকেশকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন?

না। টেবিলের ওপর নামের লিস্ট ছিল। সেটা এগিয়ে দিল দীনা।

তাতে রাকেশের নাম নেই।

টেলিফোনে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?

মনে পড়ছে না। মিথ্যা বলল দীনা।

তাহ'লে আমি মনে করিয়ে দিই। আপনি তাকে শুধু নিমন্ত্রণ জানান নি, জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনার জন্য কাউকে সে খুন করতে প্রস্তুত আছে কিনা।

মিথ্যা কথা। আমি এত বোকা নই যে রাকেশকে আমার জন্য খুন করতে অনুরোধ করব। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন যে একটা ডাক্তারের হাতে অনেক রকম ক্ষমতা থাকে। একটা লোক মারতে ডাক্তারকে গুণ্ডা ডাকতে হয় না।

তাহ'লে ডাক্তার ইচ্ছা করলেই মারতে পারে বলছেন।

পারে, যদি সে ক্রিমিন্যাল মাইণ্ডেড হয়, অপরাধপ্রবণ হয়।

শুনেছি আপনি খুব রাগী।

ঠিক শুনেছেন, তবে যে রাগী হয় সেই খুনী হয় না। বাঁকা হাসল দীনা।

বিদায় নিয়ে চলে গেল সুব্রত চৌধুরী আর মিস্টার ঘোষ। দীনা চুপ করে বসে ভাবতে লাগল সব জিনিসটা। তাকে পুলিশ জালে জড়াতে চাইছে। মোটিভ খুঁজে পেয়েছে ওরা তার বিরুদ্ধে—বেশ জোরালো মোটিভ।

বাবলু মণ্ডলকে নিয়ে আসা হ'ল থানাতে। থানার সংগে তার পরিচয় আছে। কয়েকবারই তাকে থানায় যেতে হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন কারণে। অভিজ্ঞতাটা তার কাছে খুব প্রীতিপ্রদ নয়।

আরে, এ-যে চেনা লোক দেখছি। সুব্রত তাকে দেখেই চিনেছে।

আজ্ঞে, হ্যাঁ স্যার। নমস্কার করল বাবলু। তারপর বলল—কিন্তু আমি স্যার, ছিনতাই করি না আর।

আরও বড় জিনিস করছ তাহ'লে। সুব্রত তাকাল তার দিকে।

আবার বড় কি স্যার। বাবলুর চোখ-দুটো বড় হয়ে গেল।

এই ধর খুন। কথাটা আস্তে উচ্চারণ করল সুব্রত।

খুন?

হ্যাঁ, খুন; তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে। খুন কাকে বলে জান না?

হ্যাঁ স্যার, তা জানি।

তুমি এখন কি করছ?

ড্রীমল্যান্ডনার্সিং হোমে কাজ করি।

সে জানি, কিন্তু কি কাজ?

পেশেণ্টদের চার্ট করি, বাজারের হিসেব লিখি।

বল কি, তাহলে দস্তুরমত ভদ্রলোক। তুমি নার্স কেতকীকে চিনতে?

খুব চিনতাম। জিভ কাটল বাবলু।

কি হল, জিভ কাটলে কেন?

না, মানে চিনতাম।

তাহলে, খুব চিনতে না, কি বল।

না স্যার, মানে এমনি দেখেছি।

আচ্ছা, তুমি বলেছিলে, কিচেনের জানলা দিয়ে নার্সের ঘরে যাওয়া যায়—এটা তুমি জানলে কি করে?

জানলা তো স্যার সকলেই দেখতে পায়।

হ্যাঁ তা জানি, কিন্তু ওদিক দিয়ে যে যাতায়াত করা যায় সেটা জানলে কি করে?

ডাক্তার সাহেব একদিন গিয়েছিলেন দেখেছি।

তুমি নিজে যাওনি।

না স্যার, মাইরী না।

ঠিক করে বল। অনেকের ধারণা, তুমিই নার্সকে মেরেছ।

কি বলছেন স্যার; আমি মারব কেন?

তুমি রাকেশকে বলনি, যদি দরকার হয় মেয়েটাকে সাবড়ে দিতে পার।

ও, রাকেশ আমার নামে লাগিয়েছে। তাহলে শুনুন স্যার—যেদিন ফাংসান হয়েছিল সেদিন রাকেশ প্রায় রাত আটটায় নারসিংহোমে এল। তখন দস্তুরমত ওর পা টলছে। দারুণ মাল টেনেছে। আমায় দেখে বলল—'সে ছুঁড়ি কোথায়?' আমি জানি, মেমসাহেবের ওপর ওর নজর। তাই বললাম যে মেমসাহেব হলঘরে আছে। তাতে ও জিজ্ঞেস করল, কি রঙের শাড়ী পরেছে। আমি তাকে সবুজ রঙ বলে দিলাম। তাতে রাকেশ বললে—'আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার।' আমার মনে হয় স্যার ওই সাবড়েছে কেতকী নার্সকে।

রাকেশ কেন নার্সকে মারবে?

মেমসাহেব আর নার্স, দুজনেই এক রঙের শাড়ী পরেছিল। ও হয়ত ভুল করে—

বাঃ, তোমার মাথা ত বেশ পরিষ্কার। সে যাক, সম্প্রতি ওখান থেকে যে ওষুধ আর যন্ত্রপাতি চুরি যাচ্ছে, সেগুলো কে করছে জান।

তা কি করে জানব স্যার।

তা বটে, এসব তুমি জানবে কি করে। কিন্তু এ যে তোমার লাইনেরই ব্যাপার, অন্য কে জানবে? প্রশ্ন করল সুব্রত চৌধুরী।

মিথ্যে বলব না স্যার, দু একটা নিয়েছি।

কি নিয়েছ বল, তা না হলে—কথাটা শেষ করল না সুব্রত চৌধুরী।

যন্ত্রপাতি, সিরিঞ্জ, ওষুধ—। এবার আমায় ছেড়ে দিন স্যার।

তার মধ্যে পেথিডিন কি মরফিন ছিল?

বলতে পারব না স্যার, আমি ওষুধের অত নাম জানি না।

বেশ; এবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, ঠিক ঠিক উত্তর দাও।

নিশ্চয় দেব স্যার—ব্যগ্র হয়ে উঠল বাবলু মণ্ডল সংবাদ দিতে।

তোমাদের মেমসাহেব নার্স কেতকীর ঘরে গিয়েছিলেন?

আমি দেখিনি স্যার, তবে—চুপ করে গেল বাবলু।

তবে কি? চুপ করলে কেন?

মেমসাহেব একদিন ডাক্তারসাহেবকে ছোট ঘরটায় বসে খুব চীৎকার করে বলেছিলেন যে, 'হয় কেতকী থাকবে না হয় তিনি থাকবেন'—।

এটা কবেকার ঘটনা?

ফাংসানের দু' একদিন আগের।

আর একটা কথা। তুমি বলেছিলে ডাক্তারসাহেবের ভাই সনৎ উৎসবের রাত্রে নার্সের ঘরে গিয়েছিলেন। তিনি দরজা দিয়ে গিয়েছিলেন না কিচেনের জানালা দিয়ে।

তা বলতে পারব না স্যার। আমি ল্যাংড়াকে বেরুতে দেখেছি ঢুকতে নয়।

তখন তুমি কোথায় ছিলে?

দরোয়ানের ঘরের পাশে লুকিয়ে ছিলাম।

লুকিয়ে ছিলে কেন?

মানে স্যার—

কিছু সরাবার তালে ছিলে?

কোন জবাব না দিয়ে বাবলু মাথাটা চুলকাতে লাগল শুধু।

তুমি যখন সনৎকে দেখলে তখন তার মুখের অবস্থা কেমন ছিল।

খুব উত্তেজিত ছিল স্যার। লোকে ভয় পেলে যেমন হয় তেমনি।

তুমি এখন যেতে পার, পরে আবার ডাকব।

আবার কেন স্যার। আপনারা ডাকলে আমি ভীষণ ঘোমকে যাই।

(ক্রমশঃ)

কি এবং কেন (১০) : প্লাস্টিক্‌স

আজকাল বাজারে ছোটদের নানারকম খেলনা থেকে শুরু করে গৃহস্থালী জিনিস—সর্বত্র প্লাস্টিকসের আধিপত্য দেখা যায়। মনোহারী ছাতার বাঁট, বর্ষাতি, ব্রাশ, গ্লাস, কাপ-প্লেট, বালতি, মগ, দড়ি, টেবিল ক্লথ সব কিছুই প্লাস্টিকে তৈরী হচ্ছে। কাজেই 'প্লাস্টিকস' কথাটির সঙ্গে আজ আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু প্লাস্টিকস জিনিসটা আসলে যে কী তা সঠিকভাবে অনেকের জানা নেই। আর সত্যি কথা বলতে কি, প্লাস্টিক হচ্ছে গবেষণাগারে তৈরী করা এক রকম রাসায়নিক পদার্থ, যার আসল উপকরণ হলো রজন জাতীয় পদার্থ। প্লাস্টিক পদার্থটি তরল অবস্থায়, বা ময়দার তালের মতন তৈরী করা হয়। যাতে সহজে ছাঁচে ঢালা যায় তারপর ঠাণ্ডা করলে শক্ত হয়ে গেলে ছাঁচ থেকে তোলা হয়।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়—প্লাস্টিকস কত রকমের, তাহলে এক দীর্ঘ তালিকা পেশ করতে হয়। প্লাস্টিক সাধারণ তিন রকমের—(১) রজন জাতীয় সংশ্লেষিত প্লাস্টিকস। এর আবার কয়েকটি গোত্র আছে—যেমন ফিনোলীয়, ইউরিয়া-ফরম্যাল-ডিহাইডীয়, এক্রাইলিকীয়, নাইলনীয়, ভিনাইলীয়, পলিস্টাইরিনীয়, এলাকিড়ীয়, হাভেগীয়, কুমারোন ইণ্ডিনীয় এবং ফরফ্যুরাল-ফিনোলীয়। (২) সেলুলোজ প্লাস্টিকস-এর কয়েকটি গোত্র হচ্ছে সেলুলোজ অ্যাসিটেট, সেলুলোজ নাইট্রেট, সেলুলোজ অ্যাসিটেট বিউটিরেট এবং ইথাইল সেলুলোজ। (৩) প্রোটিন প্লাস্টিকস-এর তিনটি গোত্র হচ্ছে ক্যাসিন বা ছানা জাতীয়, সয়াবীন এবং জীরিন বা ভুট্টাজাতীয়। আরও কতকগুলি আছে। তবে সেগুলি হচ্ছে অপাংক্তেয় হরিজন, যথা বানাস, লিগনিন, মাইসালেকস ও বিটুমিন।

প্লাস্টিকস-এর ইতিবৃত্তের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, প্রায় একশো বছর আগে ১৮৭১ সালে বিজ্ঞানী বেয়ার দেখেছিলেন, ফিনোল বা কারবলিক অ্যাসিড ফরমালডিহাইডের সঙ্গে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে একেবারে অপরিচিত এক পদার্থে পরিণত হয়। এর অনেক বছর পরে ১৯০৯ সালে বেকল্যান্ড এই বিষয়ে পরীক্ষা চালান এবং রজন জাতীয় এক পদার্থ আবিষ্কার করেন, যা জনসমাজে 'বেকলাইট' নামে পরিচিত হয়। ১৯২৭ সালে বেকলাইট বা ফিনোলীয় রজন সস্তায় প্রস্তুত করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে।

১৯২৮ সালে নিত্তির ঢাকনার সুদৃশ্য বাকসের জন্যে বড় বড় চাদর তৈরী করার কথা ওঠে। দেখা যায়, ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইডীয় প্লাস্টিকসের ডেলায় চাপ দিয়ে বড় বড় চাদর তৈরী করা যায়। ইউরিয়া ঘটিত রজন কাচের মতো স্বচ্ছ ও বর্ণহীন। তাই যে কোনো রঙ মিশিয়ে এই রজনকে মনোহারী করে তোলা যায়। ইউরিয়া প্লাস্টিকসের সুবিধা হচ্ছে, এটি কাচের চেয়ে হালকা অথচ কাচের মতো ঠুনকো নয়। এ কারণে বিমানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ঘরবাড়ির দরজা-জানলা, কাপ-প্লেট, রেকাবি ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় জিনিস এই প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী হয়।

সব প্লাস্টিকসের আদি জন্ম বলতে গেলে জার্মানীতে এবং প্রচার ও প্রসার হয়েছে আমেরিকাতে। ১৯০১ সালে রসায়ন বিজ্ঞানী রোয়েম তৈরী করেন এক্রাইলিক প্লাস্টিকস। ১৯৩১ সালে পুটিং জাতীয় কাজে কাচের বন্ধনী হিসাবে এর ব্যবহার শুরু হয় আমেরিকায়। একে বলা হয় কেলাসিত স্বচ্ছ প্লাস্টিকস। কাচ জোড়বার কাজে এটি অদ্বিতীয়। কাচের পরিবর্তে এর ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। চশমার ফ্রেম, জানলার কাচ, সার্সি—সব কিছুই করা চলছে। নাইলন বা কৃত্রিম রেশম জাতীয় তন্তুও একরকম প্লাস্টিকস। মোজা থেকে শুরু করে কত রকম জিনিসই আজকাল নাইলনে তৈরী হচ্ছে।

নিত্য নতুন জিনিস থেকে নতুন নতুন রকমের প্লাস্টিকস উদ্ভাবিত হচ্ছে। সম্প্রতি আমেরিকায় আখের ছিবড়াকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্লাস্টিক শিল্পের কাজে লাগানো হয়েছে। আখের ছিবড়ার প্লাস্টিকস থেকে তৈরী হচ্ছে বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, বোতলের ছিপি, বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেড এবং আর কত কি। কাঠের গুঁড়োকেও প্লাস্টিক শিল্পের কাজে লাগানো হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর আগে মার্কিণ প্লাস্টিক বিশেষজ্ঞ মিঃ রুকোমিড কাঠের গুঁড়োকে প্লাস্টিকে রূপান্তরিত করার গবেষণায় সাফল্য অর্জন করেছেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আরও দু একটি জিনিসের সঙ্গে কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে তিনি এই প্লাস্টিকস উদ্ভাবন করেছেন। বিজ্ঞানের যাদুস্পর্শে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত জিনিস আজকাল মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হচ্ছে তার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে প্লাস্টিকস—যা আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় [illegible] হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অভিকর্ষ তরঙ্গ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রবর্তন করে বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। এই তত্ত্বে তিনি যে সব ধ্যানধারণার কথা ব্যক্ত করেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

বিশ্বজগতে অভিকর্ষের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আইনস্টাইন শক্তিবাহী অভিকর্ষ-তরঙ্গের অস্তিত্ব স্বীকার করেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন—এই অভিকর্ষজনিত বিকিরণ ঘূর্ণমান বস্তু থেকে নিঃসৃত হয়ে থাকে এবং সেটি আলো, বেতার, রঞ্জনরশ্মি ও অনুরূপ ধরণের শক্তির মতো বিদ্যুৎ চৌম্বক বিকিরণের সমগোত্রীয়।

১৯১৬ সালে প্রবর্তিত আইনস্টাইনের এই তত্ত্ব অধিকাংশ পদার্থ-বিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা বলেছিলেন, এই তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করে দেখবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ হিসাবে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছিলেন, অভিকর্ষ-তরঙ্গ অতিমাত্রায় নিস্তেজ।

এতদিন পর্যন্ত অভিকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয় নি। কিন্তু সম্প্রতি মার্কিণ যুক্ত-

রাখে মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জোসেফ ওয়েবার তাঁর উদ্ভাবিত 'বেসিক ডিটেক্টর' যন্ত্রের সাহায্যে এই অভিকর্ষ তরঙ্গ সম্পর্কিত পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, মহাকাশে অবস্থিত নক্ষত্রমন্ডলী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ অভিকর্ষজনিত শক্তি এত জোর বিকিরণ করে যে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তার অস্তিত্ব ধরা যেতে পারে।

এক দশক আগে ডঃ ওয়েবার উপযুক্ত সরঞ্জাম উদ্ভাবনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। আইনস্টাইনের তত্ত্বে বর্ণিত বক্রাকার সময় ও কালের ধারণার ওপর ডঃ ওয়েবার গবেষণা চালান। যেহেতু অভিকর্ষ তরঙ্গ আঁকাবাঁকা, সে কারণে তার চলার পথের যে কোনো পদার্থের উপরিভাগে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হ্রাসবৃদ্ধি এতে ঘটবে। অবশ্য এই হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষুদ্র—একটি পরমাণু কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধের মাত্র কয়েক শতাংশেরও ভগ্নাংশ।

ডঃ ওয়েবার যে 'বেসিক ডিটেকটর' যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন তাতে আছে দেড় টন ওজনের একটি নিরেট বড় অ্যালুমিনিয়াম সিলিন্ডার বা নলাকার পাত্র আর আছে শ্রেণীবদ্ধ ইলেকট্রনিক সাজ-সরঞ্জাম। এটি এমনভাবে তৈরী যাতে যাবতীয় অভিকর্ষ-বহির্ভূত প্রভাব ঠেকিয়ে রাখা যায়।

নিম্নতাপ ইলেকট্রনিক সাজ-সরঞ্জামে ক্ষুদ্রাকার ইলেকট্রনিক কেলাসখন্ড অভিকর্ষ তরঙ্গের যে কোনো হ্রাসবৃদ্ধি নির্ণয় করতে পারে এবং সেই সঙ্গে যন্ত্র সৃষ্ট শক্তির পরিণামগত স্পন্দনকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করে। জটিল ইলেকট্রনিক বর্তনী অতিক্রম করার পর তরল হিলিয়ামে শূন্যাঙ্কের কয়েক ডিগ্রির মধ্যে শীতল হয়ে ঐ সব স্পন্দন গ্রাফ কাগজে লাল রেখায় চূড়ান্ত রূপ নেয়।

নিম্নতাপ ইলেকট্রিক সাজ-সরঞ্জাম পরমাণু ও ইলেকট্রন কণিকাসমূহের গতি কমিয়ে দেয়। গবেষণাগারে যে তাপমাত্রা থাকে, তা এই শ্লথগতি অভিকর্ষ তরঙ্গ থেকে যেরকম তীব্র সাড়া পাবার আশা করা যায়, প্রায় ততটাই সাড়া জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট। ভূকম্প, বিদ্যুৎ-চৌম্বক বা অন্য কোনোরকম ক্রিয়ায় যাতে শক্তির স্পন্দন না জন্মায়, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হবার জন্যে সাজ-সরঞ্জাম আলাদা রাখতে আর অভিকর্ষ-বহির্ভূত গোলযোগ পরিমাপ করতে বিশদ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। শ্রুতি-সহায়ক গদীর ওপর অবস্থিত একটি দন্ডে ভর করা তার থেকে সিলিন্ডারটি ঝোলানো হয়। লোহার সিন্দুকে এটিকে পুরে রাখা হয়। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার একমাত্র ব্যবস্থা হলো ইলেকট্রনিক কেলাসখন্ডের সঙ্গে যুক্ত তার।

ডঃ ওয়েবার তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ৬টি আলাদা আলাদা সিলিন্ডার ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে ৫টি রাখা হয় ওয়াশিংটন ডি-সি'র কাছাকাছি মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এবং আর একটি রাখা হয় ৬০০ মাইল দূরবর্তী আরগোনে। এক নাগাড়ে কয়েক মাস ধরে দুই বা ততোধিক ডিটেকটরে যুগপৎ রেকর্ডিং করা হয়। এই রেকর্ডিং-এর সঙ্গে সমকালে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিসংখ্যানগত অনুশীলন করে ডঃ ওয়েবারের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে, তিনি অভিকর্ষ তরঙ্গ ধরতে পেরেছেন।

ডঃ ওয়েবারের এই অভিমত নির্ভুল বলে প্রমাণিত হলে বিজ্ঞান-জগতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্ব ও জ্যোতিঃ-পদার্থবিজ্ঞানে তার গভীর তাৎপর্য দেখা যাবে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণরূপে তার ওপর নির্ভরশীল। সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্ত্য সম্পর্কে অনুশীলনের ব্যাপারে অভিকর্ষজাত বিকিরণ এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। এমন কি, মানুষ হয়তো কোনোদিন অভিকর্ষজাত শক্তিকে কাজে লাগাবে এমন আশা করাও দুরাশা নয়।

একটি মূল্যবান বিজ্ঞান-গ্রন্থ : সায়েন্স ইন ইন্ডিয়াস ফিউচার

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানকে পরিহার করে কোনো উন্নতিকামী দেশ বা জাতি প্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সুখ-সমৃদ্ধিময় করে তুলতে বিজ্ঞান আজ অপরিহার্য। এ কারণে আমাদের ভারতের ভবিষ্যৎ রচনায় বিজ্ঞান আজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দেশের নানা প্রান্তে অনেকগুলি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে এবং গবেষণা কাজে সরকার প্রভূত অর্থ ব্যয় করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে বহু লোক আজও বিজ্ঞানের অপরিসীম ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন নন বা এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ প্রকাশ করেন না। দেশের সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরার জন্যে দেশের বহু বিজ্ঞান-লেখক আজ চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁদের নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ ছাড়া, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের প্রগতি এবং শিল্পোন্নয়নের পথে নানা সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্ত প্রশ্ন ও সমস্যা সামনে রেখে ভারতের প্রেস ইনস্টিট্যুট, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা এবং বিজ্ঞান-লেখক সমিতি একটি মূল্যবান আলোচনাচক্রের আয়োজন করেন। এই আলোচনায় দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, কারুবিদ ও বিজ্ঞান-লেখকেরা অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা যে সব নিবন্ধ এই আলোচনাচক্রে পাঠ করেন সেগুলি সংকলন করে প্রেস ইনস্টিট্যুট এই মূল্যবান বিজ্ঞান-গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। এতে গবেষণার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন ডঃ আত্মারাম', গবেষণা-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে শ্রী এম এল ধর, শিল্প-নীতি সম্পর্কে শ্রী জি পি কানে, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার সম্পর্কে শ্রীহরিনারায়ণ সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, খাদ্যের অপচয় রোধ এবং কৃষি ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ভূমিকা প্রসঙ্গে যথাক্রমে সর্বশ্রী এন কে পাণিককর, এস ভি পিঙ্গেল, এইচ এ পারপিয়া এবং এম এস স্বামীনাথন। এ-ছাড়া, সর্বশ্রী কে ভি রাঘব রাও, বি এল টেনেজা, সি গোপালন, জে বি শ্রীবাস্তব, এস কে মজুমদার, বি এল রাইনা, ষি কে রাও, বি কে নায়ার, কমলেশ রায় এবং এস ভগবন্তম আলোচনা করেছেন ভূগর্ভস্থ সঞ্চয়াগার, ভারতে চিকিৎসা গবেষণার উল্লেখযোগ্য দিক, পুষ্টির অভাব, মহামারী ও তার নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসায় পরমাণু বিজ্ঞান, পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী, পরিবার পরিকল্পনার দিকদর্শন, ভারতীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞানের স্থান, বিজ্ঞান রচনা এবং পারমাণবিক কারুবিদ্যা ও সরবরাহ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে। এই নিবন্ধগুলির সব কটিই তথ্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের কাছে এই আলোচনাগুলি নিঃসন্দেহে অনেক খোরাক জোগাবে। প্রেস ইনস্টিট্যুট এই মূল্যবান বিজ্ঞান-গ্রন্থটি সংকলন করে সত্যিই ধন্যবাদার্হ। গ্রন্থটির প্রকাশক দিল্লীর বিকাশ পাবলিকেশন এবং দাম পনের টাকা।

ডঃ ওয়েবার অভিকর্ষ তরঙ্গ সন্ধানী যন্ত্রের মডেল ব্যাখ্যা করছেন।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিমাই ভট্টাচার্য

— সাত —

উনিশ শ' ষাট সালের তেসরা মে তুরস্কস্থিত মার্কিণ বিমান বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে একটা ছোট্ট খবর প্রচার করা হলো : আদানা এয়ার বেস্ থেকে ন্যাশনাল এরোনটিকস্ অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একটা বিমান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের জন্য ওড়বার পর নিখোঁজ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ওয়ার সার্ভিসের অসংখ্য চ্যানেলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ছোট্ট খবরটি ছড়িয়ে পড়ল সারা দুনিয়া। কিন্তু কেউই বিশেষ গ্রাহ্য করল না। কোন কাগজে খবরটা বেরুল, কোন কাগজে বেরুল না। ডিপ্লোম্যাটরাও বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না।

দুদিন পর পাঁচই মে সুপ্রীম সোভিয়েটের এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চভ ঘোষণা করলেন, একটা পরিচয় বিহীন মার্কিন বিমান সোভিয়েট ইউনিয়নের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করায় গুলী করে নামান হয়েছে।

চমকে উঠল দুনিয়া।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়াশিংটন থেকে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হলো, ১৯৫৬ সাল থেকে যে ইউ—টু বিমান পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুর আবহাওয়া সম্পর্কিত গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, এমনি ঐ বিমানের পাইলট তুরস্কের লেক ভ্যান-'এর উপর দিয়ে ওড়ার সময় জানায় তার অক্সিজেন সাপ্লাইতে গন্ডগোল হচ্ছে। হয়ত এমনি পরিস্থিতিতে বিমানটি রাশিয়ায় ঢুকে পড়ে।

শুধু এইটুকু বলেই ওয়াশিংটন থামল না। ঐ একই ঘোষণায় জানাল, নিরস্ত্র ঐ পাইলটের নাম।

ওয়াশিংটন থেকে মস্কোতে একটা নোট পাঠিয়ে আবহাওয়ার তথ্যসন্ধানী ঐ বিমানের বিশদ খবরও জানতে চাইল।

মার্কিন সরকার স্থির ধরে নিয়েছিলেন যে পাইলট ফ্রান্সিস গ্রে পাওয়ার্স বেঁচে নেই। বিমানটিকে গুলী করে নামাবার পর সে বেঁচে থাকতে পারে না।

সেই আশায় ও ভরসায় ৬ই মে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে জোর গলায় প্রচার করা হলো, সোভিয়েট আকাশ সীমা লঙ্ঘনের কোন কথাই উঠতে পারে না।

সেই তেসরা মে'র ঘোষণার পর ক্রুশ্চভ কদিন ধরে শুধু মুচকি মুচকি হাসলেন। সাতই মে আর সে হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। সুপ্রীম সোভিয়েটে বক্তৃতা দেবার সময় ইউ—টু বিমানের নাড়ি-নক্ষত্র জানিয়ে ঘোষণা করলেন, ফ্রান্সিস গ্রে জীবিত ও সোভিয়েট কারাগারে। ফ্রান্সিস গ্রে স্বীকারোক্তি করেছে ও তার সঙ্গে প্রচুর টাকা, আত্মহত্যার সরঞ্জাম, সোনা, অস্ত্রশস্ত্র ও এক থলি ভর্তি ঘড়ি ও আংটি ছিল।

এই বক্তৃতার শেষে ক্রুশ্চভ নরওয়ে তুরস্ক ও পাকিস্থানকে সতর্ক করে বললেন যে সব দেশ থেকে এইসব গোয়েন্দা বিমান উড়বে, তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।

মার্কিন সরকারকে কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করলেও ক্রুশ্চভ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সম্পর্কে একটুও কটু কথা বললেন না।

সারা দুনিয়ার ডিপ্লোম্যাটরা ক্রুশ্চভের এই রসিকতা ঠিক ধরতে পারলেন না। সবাই ভাবলেন, হয়ত তেমন কিছু হবে না।

সাতই মে ওয়াশিংটন থেকে আবার বিবৃতি। প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই তাঁরা স্বীকার করলেন গোয়েন্দা বিমানের অভিযান কাহিনী—তবে ঠিক অনুমতি দেওয়া হয়নি।

এবার শুধু ক্রেমলিনের নেতৃবৃন্দ নয়, সারা দুনিয়ার ডিপ্লোম্যাটরাও মুখ টিপে হাসতে শুরু করলেন। আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী তাহলে সরকারের বিনা অনুমতিতেই এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আর কোন গত্যন্তর না থাকায় শেষ পর্যন্ত ইউ—টু ফ্লাইট সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ঘোষণা করলেন এগারই মে।

ঐদিন প্রায় একই সময়ে মস্কোর ফরেন করসপনডেন্টদের ক্রুশ্চভ নেমন্তন্ন করে ইউ—টু ফ্লাইটের যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম দেখালেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সাইক্লোন উঠল। আমেরিকার দুই দোস্ত—ফরাসী ও ব্রিটিশ সরকার ভাবল যে ওদের দেশের পর দিয়েও নিশ্চয়ই অমনি গোয়েন্দা বিমান ঘুরে বেড়ায়। জ্ঞাতি শত্রু।

পৃথিবীর নানা প্রান্তে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ক্রুশ্চেভের ধমক খেয়ে নরওয়ে প্রতিবাদপত্র পাঠাল ওয়াশিংটনে। ব্ল্যাক সীর এ পারের তুরস্ক প্রভু-সেবা করতে গিয়ে এমন বিপদের মুখোমুখি হবে ভাবতে পারেনি। মার্কিণ সাহায্যে তুরস্ক বেঁচে আছে বলে নরওয়ের মত প্রতিবাদপত্র পাঠাতে পারল না ওয়াশিংটনে। খপ্পরে পড়ল পাকিস্থান। আয়ুব খাঁ একই সঙ্গে ক'বছর দুধ আর তামাক খাচ্ছিলেন 'কল্কে' এবার ক্রুশ্চভের ধমক খেয়ে তাঁর পাতলুন ঢিলা হয়ে গেল।

কদিন পরই প্যারিস সামিট! দীর্ঘ-দিনের পৃথিবীব্যাপী প্রচেষ্টার পর বিশ্বের চার মহাশক্তি বিশ্ব সমস্যার সমাধানের আশায় কদিন পরই প্যারিসে বসবে। তারপর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ক্রুশ্চভের আমন্ত্রণে যাবেন সোভিয়েট ইউনিয়ন। এমনি এক বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্তের ঠিক আগে অ্যালান ডালেস পাঠালেন ইউ- টু?

অভাবিত আশংকায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন চিন্তাশীল রাষ্ট্রনায়করা। সবার মুখে এক কথা, প্যারিস সামিট হবে তো? ক্রুশ্চভ আসবেন তো?

শেষ পর্যন্ত ওরলি এয়ারপোর্টে এরোফ্লোটের স্পেশ্যাল প্লেন ল্যান্ড করল। হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন ক্রুশ্চভ।

আঠারই মে প্যারিসে সারা দুনিয়ার সাংবাদিকদের একটা গল্প শোনালেন ক্রুশ্চভ।......ছোটবেলায় বড় গরীব ছিলাম আমরা। আমার দুঃখী মা একটু দুধ, একটু ক্ষীর অতি যত্নে লুকিয়ে রাখতেন আমাদের দেবার জন্য। কোথা থেকে একটা বিড়াল এসে ঐ দুধ, ঐ ক্ষীর একটু খেয়ে গেলে মা রাগে, দুঃখে জ্বলে উঠতেন। শেষকালে বিড়ালটার মুন্ডু ধরে ঐ ক্ষীরের মধ্যে ঘষে দিতেন। কেন জানেন? বিড়ালটাকে শিক্ষা দেবার জন্য।

গল্পটা বলে ক্রুশ্চভ সাংবাদিকদের বললেন, আমাদের দেশের মানুষের একটু দুধ, একটু ক্ষীর যে সব হ্যাবড়া বিড়াল চুরি করে খেতে চায়, তাদের শিক্ষা দেবার জন্য একটু নাক ঘষে দেব। আর কিছু নয়।

শীর্ষ সম্মেলন শুধু বর্জন করেই শান্ত হলেন না ক্রুশ্চভ, প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ভ্রমণ করতে নিষেধ করলেন।

যত সহজে এসব ঘটনাগুলো খবরের কাগজের রিপোর্টাররা লিখতে পারেন, ডিপ্লোম্যাটদের পক্ষে ঠিক তত সহজে এর তালে তালে চলা সহজ নয়। যুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনীতির সেই স্মরণীয় দিনগুলিতে মস্কো, লন্ডন, প্যারিস, ওয়াশিংটন

ও ইউনাইটেড নেশনসস্থিত ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের দিবারাত্র শুধু ওয়ারলেস ট্রান্সক্রিপ্টের ফাইল নিয়ে কাটাতে হয়েছে।

অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন এমন মহিলার সন্তান ছেলে না মেয়ে, তা অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিক জানাতে পারেন বলে দাবী করেন। কিন্তু রাশিয়া বা ক্রুশ্চভের মনে কি আছে তা কেউ বলতে পারেন না। তবুও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য সোভিয়েট ইউনয়ন ও ভারতবর্ষ প্রায় একই পথের পথিক। তাই তো দুনিয়ার নানা কোণা থেকে সম্ভাবিত সোভিয়েট পদক্ষেপ সম্পর্কে ভারতীয় দূতাবাসে ঘন ঘন তাগিদ।

বাইরের দুনিয়াকে না জানালেও মস্কো ও ইউনাইটেড নেশনস-এর ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরা অনুমান করলেন, ক্রুশ্চভ ঐখানেই যবনিকা টানবেন না। নতুন রংগমঞ্চে এবার নাটক শুরু হবে।

মস্কো ও ইউনাইটেড নেশনস্ থেকে ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটিক মিশন টপ সিক্রেট কোডেড্ মেসেজ পাঠালেন দিল্লীতে। সতর্ক করে দেওয়া হলো সম্ভাবিত সোভিয়েট পদক্ষেপ সম্পর্কে। দিল্লীতে ক্যাবিনেট ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে একবার ঐ নোট নিয়ে আলোচনাও হলো। মোটামুটি-ভাবে ঠিক করা হলো বিশ্বশান্তির জন্য ক্রুশ্চভের আবেদন অগ্রাহ্য করার প্রশ্নই ওঠে না।

তারপর সত্যি একদিন এরোফ্লোটের ইলুসিন চড়ে ক্রুশ্চভ এলেন নিউইয়র্ক, এলেন এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাতিন আমেরিকা থেকে আরো অনেকে। মার্কিন ডিপ্লোম্যাসীর রাহুর দশা যেন শেষ হয় না।

ডিপ্লোম্যাট ও সাংবাদিকদের অনেক বিনিদ্র রজনী যাপনের পর এরোফ্লোটের ইল্যুসিন আবার ক্রুশ্চভকে নিয়ে নিউ-ইয়র্ক ইন্টার ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ল। উড়ল আরো অনেক বিমান। বিদায় নিলেন এশিয়া-আফ্রিকা ল্যাতিন আমেরিকার নেতৃবৃন্দ।

অনেক দিন পর ডিপ্লোম্যাটরা একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

'মিশ্র, আর খেও না।'

'প্লিজ ডোন্ট স্টপ মী টু-নাইট'। আই মাস্ট ড্রিঙ্ক লাইক ফিস।'

ইন্ডিয়ান মিশনের তিন তলার রিসেপশন হলের জানলা দিয়ে মিশ্র একবার বাইরের আকাশটা দেখে নিয়ে তরুণকে বলল, 'ইজিপশিয়ান গার্ডেনে নাচ দেখতে যাবে?'

'এত ড্রিঙ্ক করার পর কি ইজিপ-শিয়ান গার্ডেনের বেলী ডান্সারদের বেলী দেখার অবস্থা থাকবে?

'আই অ্যাম নট এ পিউরিটান লাইক ইউ।'

'তবুও.........।'

'ঐ তবুও টবুও ছেড়ে দাও। আমি তো তুমি নই যে কবে কোনকালে এক মেয়ের প্রেমে পড়েছি বলে আর কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাব না?'

অ্যাম্বাসেডর এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে মিশ্রের পাশে এসে হাজির হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'মিশ্র আর ইউ হ্যাপি?'

গেলাসের বাকি স্কচটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে মিশ্র জবাব দিল, 'সো কাইণ্ড অফ ইউ স্যার? লাইফে আপনার মত বস আর স্কচ হুইস্কী পেলে আমি আর কিছু চাই না।'

ইন্ডিয়া শো রুমের মিস মার্জিথিয়াকে একটু পাশে আবিষ্কার করতেই অ্যাম্বাসেডর দূরে সরে গেলেন।

মিশ্র এগিয়ে এলো, 'হাউ আর ইউ ডিয়ার ডার্লিং সুইট হার্ট?'

বাঁ চোখটা একটু ছোট করে, ডান চোখে একটু ঈষৎ দুষ্টু ইঙ্গিত ফুটিয়ে মিস মার্জিথিয়া বললেন, 'ডোন্ট বি সিলি ইউ নটি বয়?'

'সুইট ডার্লিং, স্কচ পেলে দুনিয়া ভুলে যাই, আর তোমাকে পেলে স্কচও ভুলে যাই।'

মিস মার্জিথিয়া তরুণকে বললেন, 'ডু ইউ বিলিভ হিম, মিস্টার মিত্র?'

'সার্টেনলি আই বিলিভ মাই কলিগ।' তরুণ হাসতে হাসতে উত্তর দেয়।

'এত বিশ্বাস করবেন না, বিপদে পড়বেন।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয় তরুণ, 'যেমন আপনি বিপদে পড়েছেন, তাই না?'

হাসতে হাসতে বললেও বিদ্রূপটা কাজে লাগে। মিস মার্জিথিয়া স্কচ হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ভীড়ের মধ্যে মিশে যান।

মিস মার্জিথিয়াকে অমনভাবে পালিয়ে যেতে দেখে তরুণ না হেসে পারে না। মিশ্রকে নিয়ে নেপথ্যে অনেক আলোচনা, সমালোচনা হয়। কোন আড্ডাখানায় নিউ-ইয়র্কবাসী দু'পাঁচজন ভারতীয় এক হলেই মিশ্রের নিন্দা হবেই। কিছু হাফ্ বেকার-হাফ এমপ্লয়েড ছোকরা তো রেগে বলেই ফেলে, 'স্কাউন্ড্রেল, ডিবচ, ড্রাংকার্ড'!'

বলবে না? মিশ্র যে মেয়েদের সাবধান করে, সতর্ক করে দেয় ঐসব নোংরা ছেলে-গুলো সম্পর্কে। 'মিস জোশী, ইউ আর এ গ্রোন-আপ গার্ল। লেখাপড়াও শিখেছ, কিন্তু জীবন সম্পর্কে তোমার চাইতে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। একটু সাবধানে থেকো।'

মিস জোশী শুধু বলেছিল, 'থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ।'

তখন বয়সটাই এমন যে কারুর উপদেশ শুনতে মন চায় না। আগ্নেয়-গিরির মত দেহের মধ্যে যৌবনের আগুন লুকিয়ে লুকিয়ে টগবগ করে ফুটছে। ফিফথ্ এভিনিউ আর টাইমস্ স্কোয়ারে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আগ্নেয়গিরি যেন আর শাসন মানতে চায় না, অধিকাংশ মেয়েরা সে শাসন মানেও না। সে শাসন মানবে কেন? ফিফথ্ এভিনিউ-টাইমস্ স্কোয়ার দিয়ে সন্ধ্যার আমেজী পরিবেশে একটু ধীর পদক্ষেপে মিস যশোদা জোশীর মত মেয়েরা যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন কে যেন বার বার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, বিশ্ব সংসারে এসেছ দু'দিনের জন্য। আনন্দ কর, উপভোগ কর। চারদিকে তাকিয়ে দেখ তোমার মত মেয়েরা কিভাবে রসের মেলায় পসারিণী হয়ে......!

মিশ্রের উপদেশ বেসুরো ঠেকে যশোদার কানে। তবুও যে সে শুনেছে, তার জন্যই মিশ্র কৃতজ্ঞ। যশোদা তো অপমান করেও বলতে পারত, আমি কি করি বা না করি তা নান্ অফ্ ইওর বিজিনেস!

ঘরপোড়া গরু যে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়! মিশ্রও তাইতো এসব মেয়েরা বিদেশে এসে এমন স্বচ্ছন্দ হয়ে ছেলেদের সংগে ঘনিষ্ঠতা করলে ভয় পায়।

'জান তরুণ, কালরাত্রে চৌবের বাড়ীর থেকে আমার ফিরতে ফিরতে রাত দেড়টা-দুটো হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হলো [illegible] টাইমস্ [illegible] কাছে

ফয়েল দিয়ে মোড়ানো
যাতে আরও বেশী তাজা থাকে !
৩০ প.
১০ টি
TAJ MAHAL
MADE IN INDIA
CIGARETTES
ভেতরে
অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল
দিয়ে মোড়ানো থাকে
ব'লে তাজ মহল সিগারেট
আরও তাজা পাবেন—কিন্তু
তার জন্যে কোন বাড়তি
দাম দিতে হবে না।
তাজ মহল
সিগারেট
শতকরা ১০০ ভাগ দেশী সিগারেট
টোব্যাকো কোং প্রাইভেট লিমিটেড, বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের

গাড়ী পার্ক করে সিগারেট কেনার জন্য দু'পা এগিয়েই দেখি দ্যাট স্কাউন্ড্রেল মালহোত্রার সঙ্গে যশোদা......।'

তরুণ বলল, 'ওদের নিয়ে তুমি অত ভাববে না।'

বোতলখানেক হুইস্কী খেয়েও মিশ্র বেহুঁস হয় না। একবার মাথা নীচু করে কি যেন ভাবে।......'না চেয়ে যে থাকতে পারি না ভাই। ওদের দেখলেই যে আমার অমলার কথা মনে হয়।'

হাতের গেলাসটা নামিয়ে রেখে মিশ্র পাথরের মত নিশ্চুপ নিশ্চল হয়ে বসে পড়ে। চোখের জলও গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

তরুণের মনে পড়ল সেই পুরনো দিনের কথা।.........

সেকশন অফিসার প্রকাশচন্দ্র প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে তরুণকে খবর দিল, 'জানেন স্যার, জেনেভা থেকে এক্ষুণি একটা মেসেজ এসেছে মিশ্র সাহেবের মেয়ে সুইসাইড করেছে।'

তরুণ চমকে উঠে, 'হোয়াট আর ইউ সেইং? অমলা সুইসাইড করেছে?'

পাঁচ হাজার মাইল দূরে ছিলেন মিশ্র। কিন্তু খবরটা ওয়েস্ট ইউরোপিয়ান ডেস্কে আসার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ল দিল্লীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঘরে ঘরে। বাইরের দুনিয়ার লোক মিঃ মিশ্রকে নিয়ে অনেক কিছু ভাবলেও ফরেন মিনিস্ট্রীর সবাই তাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, আপনজ্ঞান করে।

যে সমস্যার কথা কাউকে বলা যায় না, মিশ্র সাহেবকে হাসিমুখে সে কথা বলা যায়; যে সমস্যার সমাধান আর কেউ পারবেন না, তাও মিশ্র সাহেব হাসতে হাসতে ঠিক করে দেবেন। সন্ধ্যার পর হুইস্কী না খেয়ে যেমন তিনি থাকতে পারেন না, তেমনি সহকর্মী ও বন্ধুদের উপকার না করেও স্থির থাকতে পারেননা।

লাঞ্চের পর অফিসে এসেই মিশ্র টেলিফোনের 'বাজার' বাজিয়ে হীরালালকে তলব করলেন, চলে আসুন।

মিশ্র তখনও সিগারেট খাচ্ছেন। তিন-চারটে ফাইল নিয়ে হীরালাল ঘরে ঢুকতেই কেমন যেন খটকা লাগল। ভ্রূ-কুঁচকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতেই বুঝলেন হীরালাল বেশ চিন্তিত।

হীরালাল মিশ্র সাহেবের সামনে ফাইলগুলো নামিয়ে রাখলেন।

মিঃ মিশ্র সিগারেটের শেষ টানটা দিতে দিতে বাঁকা চোখে আরেকবার হীরালালকে দেখে নিয়ে বললেন, কি হয়েছে আপনার?

'না স্যার, তেমন কিছু না।'

'দেখ হীরালাল, আমার কাছে বলতেও তোমার দ্বিধা হয়?'

সকৃতজ্ঞ হীরালাল বলে, 'আপনার কাছে আর কি দ্বিধা করব। তবে......।'

'তবে আবার কি? টেল মী ফ্র্যাঙ্কলি হোয়াইট্‌ রং উইথ ইউ?'

হীরালাল আর চেপে রাখতে সাহস করে না। জানে এবার না বললে বকুনি খাবে।

'কালকেই চিঠি পেয়েছি আমার মেয়েটার শরীর খারাপ হয়েছে অথচ......।'

'আপনি তো জানেন আমার ডিক্‌-নারীতে 'ইফস্‌' অ্যান্ড 'বাট' লেখা নেই।'

ড্রয়ার থেকে বার্কলে ব্যাঙ্কের চেক বই বের করে একশ' পাউন্ডের একটা চেক দিলেন হীরালালকে। 'পাতিয়ালার ঐ অপদার্থ শ্বশুরবাড়ীতে মেয়েটাকে আর ফেলে না রেখে এখানেই নিয়ে আসুন।'

'আপনি আবার......।'

'ফরেন সার্ভিসে কাজ করে করে বড় বেশী ফরম্যালিটি করতে শুরু করেছেন। আচ্ছা আজ যদি আমারই দু'তিনটে মেয়ে থাকত?'

এরপর কি আর কিছু বলা যায়? না। হীরালাল টেবিলের পর ফাইলগুলো রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।......

'কি বল্লে? ম্যাভেরিয়াম বিয়ার খেতে ইচ্ছা করছে?'

'তারপর ঐ তাজ-এ একটু সিম্পল চিকেন রাইস'এর লাঞ্চ', ছোকরা ডিপ্লো-ম্যাট বড়ুয়া আর্জি পেশ করে।

'দ্যাখ ছোকরা, তুমি তো জান আমি ডিস আর্মামেন্ট—সামিট—বিগ পাওয়ার রিলেসান্স ডিল করি। সুতরাং এত ছোট-খাট সামান্য বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে আমার কাছে এসো না।'

প্রাইম মিনিস্টার, ফরেন মিনিস্টার, ফরেন সেক্রেটারী থেকে শুরু করে ক্লার্ক—বেয়ারারা পর্যন্ত মিশ্রকে ভালবাসে। ভাল না বেসে যে উপায় নেই।

সেই মিশ্র সাহেবের আদুরে দুলালী অমলা আত্মহত্যা করেছে শুনে সবাই মর্মাহত হলেন।......

বছর খানেক পরে তরুণ মিঃ মিশ্রকে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না। সন্ধ্যার পর বোতল বোতল মদ গেলেন আর ইয়ং ইন্ডিয়ান মেয়ে দেখলেই বলেন, 'মনে হয় অমলাও ওদের মত কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক্ষুণি দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরবে।'

অমলা তখন আট-ন' বছরের হবে আর কি। মিসেস মিশ্র মারা গেলেন ক্যান্সারে। বহুদিন ধরেই ভুগছিলেন। বিশেষ করে শেষের বছর দুয়েক অমলার

সব কিছুই মিশ্রসাহেব করতেন। স্ত্রী মারা যাবার পর মুষড়ে পড়লেও অমলাকে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে অমলা বড় হলো। সেই ছোট্ট কিশোরী অবলা অমলা প্রাণ-চঞ্চলা হয়ে উঠল। দিগন্ত বিস্তৃত অতল সমুদ্রের এই ছোট্ট দ্বীপে স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ে তুললেন মিশ্র সাহেব।

ঘরে কোন ভাইবোন—মাকে না পেয়ে সাহচর্যের জন্য অমলা বাইরের দুনিয়ায় তাকিয়েছিল। কত ছেলে, কত মেয়ে ছিল তার বন্ধু। মিঃ মিশ্র বাধা দেন নি, বরং উৎসাহ দিতেন। কিন্তু সাহচর্য, বন্ধুত্বের সুযোগে এমন সর্বনাশ!

'হ্যাঁ হ্যাঁ তরুণ, ঐ ছোকরাগুলো দেহের আগুন, যৌবনের জ্বালা, চোখের নেশা চরিতার্থ করার জন্য যদি অমলার মত ঐ যশোদারও চরম সর্বনাশ করে? যদি নিজের লজ্জা লুকোবার জন্য অমলার মত যশোদাও যদি—।'

আর বলতে পারেন না। হাত দুটো কাঁপতে কাঁপতে জড়িয়ে ধরেন তরুণকে। ছল ছল চোখ দুটো জলে ভরে যায়।

একটা বিরাট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, এই বিশ-বাইশ বছরের মেয়ে-গুলোকে সুন্দর শাড়ী পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ঘুরতে দেখলেই কেবল অমলার কথা মনে হয়।

তরুণ কি জবাব দেবে? কিছু বলতে পারে না। একটু সন্তানস্নেহ দেবার জন্য এমন কাঙালকে কি বলবে সে? মায়ের কোল খালি করে শিশু সন্তান চলে গেলে সে মা উন্মাদিনী হয়ে উঠে। মিশ্র সাহেবের মনের মধ্যে অমনি জ্বালা করে দিন-রাত্তির চব্বিশ ঘণ্টা।

'আচ্ছা তরুণ, অনেকে তো অন্যের মাকে মা বলে ডাকে, অন্যের বাবাকে বাবা বলে ডাকা যায় না?'

এবার তরুণের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। আর যেন সে সহ্য করতে পারছে না। শুধু বলে, 'নিশ্চয়ই ডাকা যায়।'

হাসিতে লুটিয়ে পড়েন মিশ্র। 'ডোন্ট টক ননসেন্স তরুণ। তুমি কি ভেবেছ আমি মাতাল হয়েছি? যা বোঝাবে তাই বুঝব?'

ইউ-টু ফ্লাইট, প্যারিস সামিট ও তারপর ইউনাইটেড নেশনস নিয়ে এতদিন ব্যস্ত থাকায় বেশ ভাল ছিলেন মিঃ মিশ্র। একটু অবসর পেয়ে আবার সব অতীত ভীড় করছে ওর কাছে।

পার্টি শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। প্রায় সবাই চলে গেছেন। এক কোণায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিশ্র তরুণের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন।

ধীরে ধীরে অ্যাম্বাসেডর এসে পাশে দাঁড়ালেন। মিশ্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, কাল কত তারিখ মনে আছে?

'টুমরো ইজ ফোর্টিন্থ সেকেন্ড।'

'কাল আমার মেয়ে আসছে, তা জান?'

'সিওর স্যার। বি-ও-এ-সি ফ্লাইট সিক্স-জিরো-ওয়ান।'

অ্যাম্বাসেডর খুশীতে হেসে ফেললেন। 'দ্যাটস্ রাইট'। আমি তো আবার পরশু দিনই জেনেভা যাচ্ছি। সুতরাং ভুলে যেও না টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট গার্ল।'

'নো স্যার, নট অ্যাট অল।' মিশ্র এবার একটু মুচকি হাসতে হাসতে বলে, ইফ আই মে সে ফ্রাঙ্কলি স্যার, রীণা আপনার চাইতে আমাকেই বেশী পছন্দ করে।......

অ্যাম্বাসেডর তরুণের কানে কানে বললেন, 'প্লিজ টেল মিশ্র যে আমি তার জন্য আনন্দিত।'

আর কোন কথা না বলে অ্যাম্বাসেডর বিদায় নিলেন। 'গুড্ নাইট। সী ইউ টুমরো।'

'গুড নাইট স্যার।'
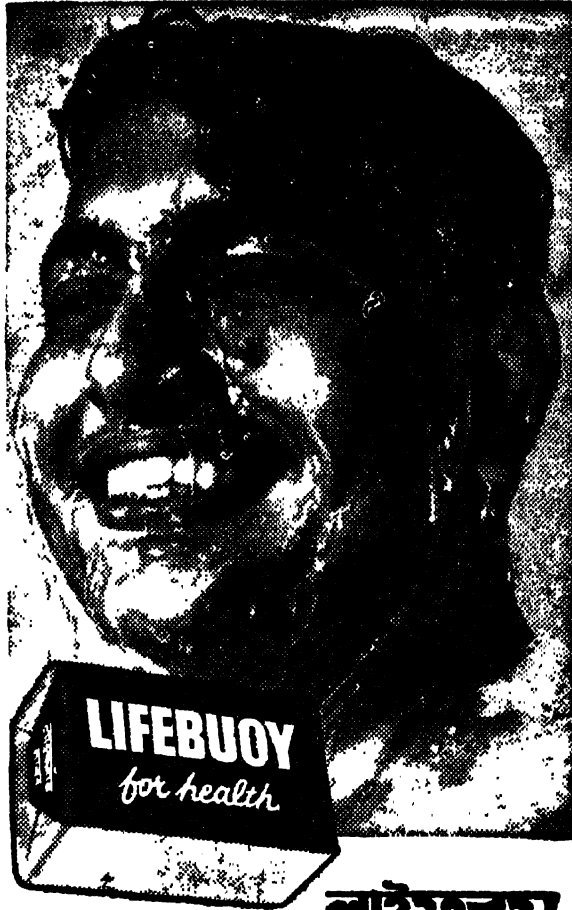
মানুষগড়ার ইতিকথা

উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুল
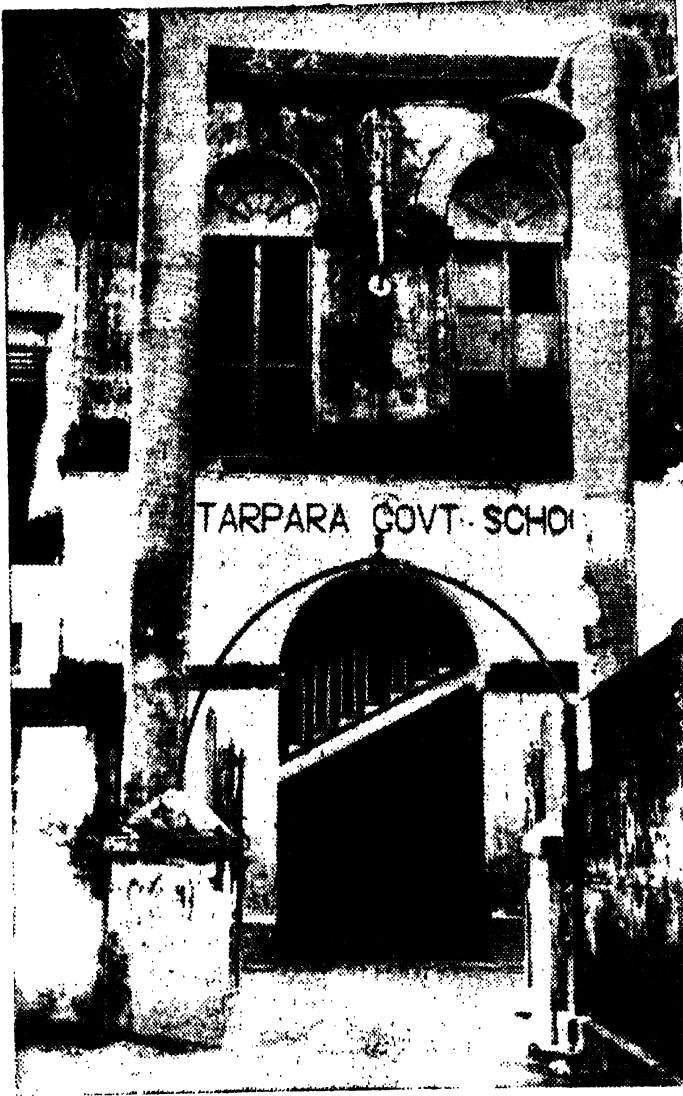
বালীখাল ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে পূবে তাকাতেই চোখে পড়ল গঙ্গা। না জলের কোন শব্দ আমি পাই নি, বরং ছুটন্ত রিকসার ঠুং ঠুং, ভ্যাকো ভ্যাকো অনেক স্পষ্ট। বাসের গর্জন ঘোরতর। বাস চলেছে, রিকসা চলেছে। ব্রীজের তলা দিয়ে নৌকো চলেছে। যে নাড়িতে হাত রাখলে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয় সেই ধমনীরই স্রোতধারা, আকারে ক্ষীণ হ'লেও, বয়ে চলেছে এই খাল দিয়ে। এই খালটার বয়সই কি নেহাৎ কম হল! আর ঐ যে দেখা যায় স্কুলবাড়ি, খাল আর গঙ্গার সমকোণে পুরোনো জি, টি, রোডের ডানহাতে শতাব্দী প্রাচীন জীর্ণতার আবরণ সর্বাঙ্গে ধারণ করে আজো স্পন্দমান, তার ইতিহাস? সেই ইতিহাস জানতে হলে এই খাল পেরিয়ে, ওল্ড জি, টি, রোডের অংশবিশেষ মিনিট খানেক পায়ে পায়ে ঘুরিয়ে, আচার্য ধ্রুব পাল রোডে ঢুকুন। বাঁ হাতে পড়বে প্যারী-মোহন কলেজ। আর সামনে? পাতলা লোহার গেটের আড়ালে যেন এই তীর্থ-ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছ ছটি পাম গাছ। মোটা মোটা পাম-থামের আড়ালে একশো তেইশ বছরের পুরোনো সেই বিখ্যাত দোতলা বাড়িটি যার একতলার মাথায় বড় বড় হরফে লেখা আছে উত্তরপাড়া গভর্নমেণ্ট স্কুল।

এইখানে দাঁড়িয়ে একবার মুখ ফেরান সেই সুদূর অতীতে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছিল এদেশের ভাগ্যবিধাতা। গভর্নর জেনারেল সার হেনরী হার্ডিঞ্জ। ১৮৪৪ সালে এক সরকারী ঘোষণায় এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে বড়লাটের মনোভাব ব্যক্ত হোল : "বাংলা দেশের বর্তমান শিক্ষার অবস্থার কথা মনে করে এবং সেই শিক্ষাকে উৎসাহ দেবার জন্য, সরকার কৃতী ব্যক্তিদের উপযুক্ত রাজ-কার্যে নিয়োগ করতে সম্মত আছেন।"

ইংরেজী শিখলে চাকরী মিলবে। কিন্তু শহর কলকাতার বাইরে গোটা দেশে তখন কোথায় ইংরেজী শিক্ষার এত সুযোগ। স্কুল কোথায়? কেই বা স্কুল খুলবে? কোম্পানীর ভারী বয়ে গেছে এদেশের কটা লোক পড়াশোনার সুযোগ পেল কি পেল না দেখতে। আর কজনেরই বা সামর্থ্য ছিল কলকাতায় রেখে ছেলে-পিলেকে স্কুলে পড়ানোর। অন্তত উত্তর-পাড়ার সাধারণ মানুষের যে সেদিন সে সামর্থ্য ছিল না সে কথা সবচেয়ে ভাল করেই জানতেন মুখুজ্যেরা। তখন উত্তর-পাড়ার মুখুজ্যে বাড়ির কর্তা জয়কৃষ্ণ। ১৮৪০-এ জগমোহন মুখুজ্যের মৃত্যুর পর ছোট ছোট ভাইদের দেখাশোনা ও সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব বর্তেছিল জয়কৃষ্ণের ওপর। কতই বা তাঁর বয়স তখন—মাত্র বত্রিশ। হুগলীর ল্যান্ড রেভিনিউ কালেক্-টরের অফিসে রেকর্ড-কীপারের কাজ করতেন। ষোল বছর বয়স থেকে চাকরী করছেন। ছ-বছর মীরাটে ফৌজী দপ্তরে কেরানীর কাজ করেছেন। বাইশ বছর বয়সে সে কাজ ছেড়ে দেশে ফিরে এসে এই নতুন কাজ শুরু করেন। তখন ছোট রাজকৃষ্ণের বয়স মোটে সতেরো। বড় জয়-কৃষ্ণের মত ছোট রাজকৃষ্ণও খুব অল্প বয়সেই চাকরীতে ঢোকেন। বাপ দাদা দেশে ফিরলেও রাজকৃষ্ণ ফেরেন নি। হাজারীবাগে মিলিটারী ক্যাম্পে মেস-ক্লার্কের চাকরী নিলেন। কিন্তু অপরিসীম পরিশ্রমে অল্পবয়সে স্বাস্থ্য হারিয়ে বাধ্য হলেন ঘরে ফিরতে। ততদিনে রেকর্ড-কীপার বাবুর নখদর্পণে হুগলী জেলার তাবৎ জমিদারকুলের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর। যখনি কোন পুরোনো জমিদারী খাজনা বাকী [illegible] নীলামে ওঠে, তখুনি

দুভাই মিলে সেই জমিদারী ডেকে নিতে লাগলেন। এ ভাবে সিঙ্গুরের বিখ্যাত নবাব বাবুদের সম্পত্তির একটা বড় অংশের মালিক হয়ে উঠলেন জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ। পত্তন হোল উত্তরপাড়ার মুখুজ্যেদের জমিদারীর।

কিন্তু এ কেমন জমিদার? বাইনাচ, পায়রা ওড়ানো, বেড়ালের বিয়েতে নেই কোন উৎসাহ। এঁরা স্কুল খোলেন, লাইব্রেরী গড়েন, প্রজারা যাতে পয়সার অভাবে বিনে ওষুধে না মরে তাই ডিসপেনসারী বসান। মেয়েদের জন্যও স্কুল খুলতে চান। এঁদের যৌথ জমিদারীতে প্রায় ত্রিশটা হাই মিডল ইংলিশ স্কুল খোলা হয়েছিল। তাই হার্ডিঞ্জ সাহেবের ঘোষণা কানে আসতেই দুভাই নড়ে চড়ে বসলেন—এবার একটা কিছু করা দরকার। উত্তরপাড়ায় কোন ইংরেজী স্কুল ছিল না। দুজনে মিলে ঠিক করলেন একটা স্কুল খুলবেন যেখানে জুনিয়র স্কলারশিপ মান পর্যন্ত পড়ানো হবে। তখন হাওড়া ছিল হুগলী জেলার ভেতর। তবে হাওড়ার জন্য ছিলেন স্বতন্ত্র ম্যাজিস্ট্রেট। উত্তরপাড়া ছিল হাওড়া ম্যাজিসট্রেসির আওতায়। মুখুজ্যেরা ম্যাজিসট্রেটের মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন—সরকার যদি স্কুলের দায়িত্ব নেন তাহলে আমরা স্কুলের খরচ খরচা মেটানোর বার্ষিক বারোশ টাকা আয়ের সম্পত্তি সরকারের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। এ ছাড়া স্কুলের বাড়ি নির্মাণের জন্য আরো পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। হিসেব করে দেখা হয়েছিল সে আমলে স্কুলের নিয়মিত পরিচালনার জন্য মাসিক তিনশো টাকার প্রয়োজন। এর মধ্যে একশ টাকা আসবে জয়কৃষ্ণ-রাজকৃষ্ণের সম্পত্তি থেকে, একশ পাওয়া যাবে ছাত্র-বেতন থেকে, বাকিটা দিতে হবে গভর্নমেণ্টকে।

৫ ডিসেম্বর, ১৮৪৫ হাওড়ার ম্যাজিসট্রেট জয়কৃষ্ণ-রাজকৃষ্ণের প্রস্তাবে সায় জানিয়ে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি সরকারের ঘরে পাঠালেন। শিক্ষানুরাগী হার্ডিঞ্জের সরকার সানন্দে রাজী হলেন এই প্রস্তাবে। সরকারী অনুমোদন মিলতেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুল খোলা হল, ১৬ মার্চ, ১৮৪৬। তখনো স্কুলের নিজস্ব বাড়ি তৈরী হয় নি, তাই সম্ভবত জমিদারদেরই কোন বাড়ির একটা ঘরে এই স্কুল শুরু হয়। তবে বালীখালের উত্তরে বর্তমান জায়গায় স্কুলের একতলা বাড়িটি প্রতিষ্ঠা-বর্ষেই তৈরী হয়েছিল।

সদ্য প্রতিষ্ঠিত স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে এলেন রবার্ট হ্যান্ড। সি, গ্র্যান্ট নিযুক্ত হলেন অ্যাসিসট্যান্ট মাস্টার। যাতে ছাত্ররা স্কুলে পড়তে উৎসাহ বোধ করে তাই সরকার চারটি স্কলারশিপ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন—বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের কৃষ্ণনগর কলেজে পড়বার সুযোগ দেওয়া হবে। স্কুল পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোল। কমিটির ছজন সদস্যের মধ্যে ছিলেন, লবণ গোলার সুপারিনটেন-ডেনট এইচ, আলেকজান্ডার, হাওড়ার ম্যাজিসট্রেট ই, জেনকিনস, সিভিল সার্জেন ডবলিউ গ্রীন, লবণ গোলার সিনিয়র ইনডেনট্যানট ই, রোয়ার, জমিদারবাবু জয়কৃষ্ণ মুখার্জী ও জমিদারবাবু রাজকৃষ্ণ মুখার্জী।

এক বছরেই স্কুল যে রীতিমত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মিলবে ছাত্র সংখ্যায়। প্রথম বছরের শেষে ছাত্র-সংখ্যা দাঁড়াল একশো পঁয়ষট্টি। ইতিমধ্যে শিক্ষক সংখ্যাও বেড়েছে। গ্র্যান্ট সাহেব বদলি হয়ে গেছেন আলিপুর স্কুলে। তাঁর বদলে এসেছেন নবীনচন্দ্র বোস সেকেন্ড অ্যাসিসট্যান্ট মাস্টার হয়ে। কৈলাসচন্দ্র মুখার্জী নিযুক্ত হলেন থার্ড মাস্টার। ঐ বছরই "যাতে হেড মাস্টার মশাই আরো বেশী সময় স্কুলের জন্য ব্যয় করতে এবং বেশী পরিমাণে ঔদারিক করতে পারেন" সেজন্য তাঁর কোয়ার্টারের প্রয়োজনে স্কুলের দোতলা উঠল। হ্যান্ড সাহেব ভাড়া বাড়ি ছেড়ে তাঁর সদ্যনির্মিত কোয়ার্টারে এসে উঠলেন।

পরের বছর ছাত্রসংখ্যা আরো বাড়ল। একশো পঁয়ষট্টি বেড়ে হোল একশো তিরাশী। গড়ে মাসে ছাত্র-বেতন বাবদ দুশো তেরো টাকা আদায় হত। এ বছরের শেষের দিকে ডিসেম্বর মাসে লজ সাহেব এলেন ইন্সপেকশনে। পাঁচদিন ধরে ইন্সপেকশনের পর যে রিপোর্ট সাহেব পেশ করেছিলেন, তাতে স্কুলের ভালো ও খারাপ, দুটি দিকই সমভাবে ধরা পড়েছিল। ছাত্রদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রশংসা করলেও, পড়াশোনার মান সম্পর্কে আদৌ উঁচু গলায় প্রশংসা করেন নি সাহেব। উঁচু ক্লাসে নীচু মানের ছাত্রদের ভর্তি করার বিষয়ে বেশ কড়া করেই ধমকে ছিলেন সাহেব "ছাত্রদের ও নিজেদের তৃপ্তির জন্য এবং সরকারের কাছে বাহবা পাওয়ার আশায় এমনসব ছাত্রকে ইতিহাস, কাব্য ও অংকশাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যারা সঠিকভাবে বানান পর্যন্ত করতে পারে না এবং এর ফল যে কি হয়েছে, তা যে কোন ক্লাসের দিকে তাকালেই বেশ বুঝতে পারা যাবে।" সে বছর পরীক্ষার্থী পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে চারজন কালিপদ চ্যাটার্জি, উমেশচন্দ্র ঘোষ, নবকৃষ্ণ মুখার্জি ও গোপীনাথ মুখার্জি স্কলারশিপ পেয়ে হিন্দু কলেজে পড়বার সুযোগ পান। পরের বছর যাঁরা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন তাঁরা হলেন দীননাথ মিত্র, পরবর্তী কালে 'ফাইটিং মুন্সেফ' নামে খ্যাত প্যারীমোহন ব্যানার্জি, প্যারীলাল ব্যানার্জি, প্রসন্নকুমার ব্যানার্জি, উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি ও ভুবনমোহন মিত্র। তখন হেড-মাস্টার সমেত ছজন শিক্ষক স্কুলে পড়াতেন। হ্যান্ড সাহেব মাইনে পেতেন দুশো টাকা। অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার নবীন-চন্দ্র বোস পেতেন পঞ্চাশ টাকা। থার্ড মাস্টার কৈলাসচন্দ্র মুখার্জি পেতেন ত্রিশ টাকা। অভয়চন্দ্র ব্যানার্জি ও কুঞ্জবিহারী চক্রবর্তীর মাইনে ছিল কুড়ি টাকা আর পণ্ডিত যদুনাথ শর্মা পেতেন কুড়ি টাকা।

সাত বছর হ্যান্ড সাহেব উত্তরপাড়া গভর্নমেণ্ট স্কুলে হেডমাস্টারী করেছেন। এই সাত বছরে ছাত্রসংখ্যা যেমন বেড়েছে স্কুলের তেমনি বেড়েছে সুনাম। এ সময়ে যেসব ছাত্র স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য সাবজজ প্যারীমোহন ব্যানার্জি (পূর্বোক্ত ফাইটিং মুনসেফ), এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার রায়বাহাদুর প্রসন্নকুমার ব্যানার্জি ও হেডমাস্টার বনমালী মিত্রের নাম। বাহান্ন সালের নভেম্বরে হ্যান্ড সাহেব হিন্দু কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক পদে প্রমোশন পেয়ে বদলী হয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় বর্ধমান থেকে বদলী হয়ে এলেন স্বয়ং রামতনু লাহিড়ী।

"লাহিড়ী মহাশয় ১৮৫২ সাল হইতে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন।...... সে সময়ে যাঁহারা তাঁহার ছাত্র ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার পাঠনার রীতি বড় চমৎকার ছিল। তিনি বৎসরের মধ্যে পাঠগ্রন্থের সমগ্র পড়াইয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু যেটুকু পড়াইতেন, সেটুকুতে ছাত্রগণকে এরূপ ব্যুৎপন্ন করিয়া দিতেন যে, তাহার গুণে পরীক্ষাকালে ছাত্রগণ সন্তোষজনক ফল লাভ করিত। ফলতঃ জ্ঞাতব্য বিষয় যোগান অপেক্ষা জ্ঞান-স্পৃহা উদ্দীপ্ত করার দিকে তাঁহার অধিক যত্ন ছিল। বিশেষতঃ যখন ধর্ম বা নীতি বিষয়ে কিছু উপদেশ দিবার অবসর আসিত, তখন তিনি উৎসাহে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। নীতির উপ-দেশটি, ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত করিবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতেন। তিনি যাহা
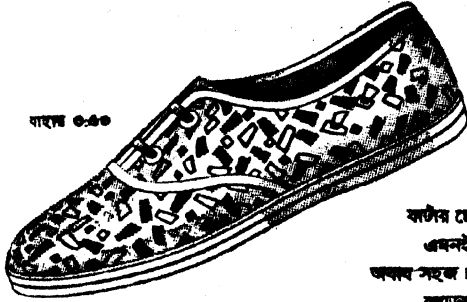
ছোটদের জুতো চাই
আজীবন
খুশি পায়ে চলতে
বাটার ছোটদের জুতো বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি।
এমনই এদের নকশা ও নির্মাণ-বৈশিষ্ট্য যে হাঁটতে চলতে
অবাধ সহজ। সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা, খাপখাওয়ানো
গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর তলি যা অনায়াসে পা
সঞ্চালনের সহায়ক। টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর
আরামে পয়লা নম্বর—এমন জুতোই এখন মজুত
বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের,
এদের খুশি পায়ে শুরু হোক শরতের
Bata
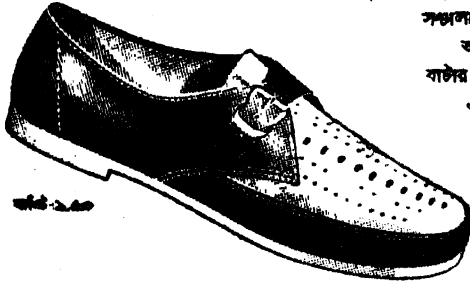
বলিতেন, তাহার পশ্চাতে তাঁহার প্রেম ও উৎসাহ-পূর্ণ হৃদয় এবং সর্বোপরি তাঁহার জ্বলন্ত সত্যানিষ্ঠাপূর্ণ জীবন থাকিত সুতরাং তাঁহার উপদেশ আগুনের গোলার ন্যায়, ছাত্রগণের হৃদয়ে পড়িয়া সুমহৎ আকাঙ্ক্ষার উদয় করিত। এই সময়ে যাঁহারা তাঁহার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেদিনের কথা কখনই ভুলিতে পারেন নাই।"

(রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী)

ছাত্ররা যে কোনদিনই লাহিড়ীমশাইকে ভুলতে পারেন নি, তার প্রমাণ আজো স্কুলের মেন বিল্ডিংয়ের একতলার হল-ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালে আঁটা প্রস্তর ফলকটিকে দেখলে বোঝা যায়। লাহিড়ী মশাই চলে যাওয়ার বহু বহু বছর পরে তাঁরই অনুরক্ত ছাত্ররা গুরুর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় এই ফলকটি বসিয়েছিলেন :

"বাবু রামতনু লাহিড়ীর পুণ্য স্মৃতির স্মরণে, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার স্মারক হিসাবে তাঁহার উত্তরপাড়া স্কুলের জীবিত ছাত্রগণ কর্তৃক এই ফলকটি স্থাপিত হইল। উত্তরপাড়া স্কুলের হেডমাস্টাররূপে ১৮৫২ হইতে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত কাজ করিবার সময়ে, তাঁহার সপ্রেম যত্ন, পরিবর্তিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে নির্ভর তাঁহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। দৈনিক জ্ঞানদানে অপেক্ষা ছাত্রদের মানসিক চিত্তবৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত করিয়া সকল জ্ঞানের আধার সেই পরম জ্ঞানের প্রতি তাঁহাদের আকৃষ্ট করাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। সর্বোপরি নিজ পবিত্র জীবন যাপন প্রণালী তিনি তাঁহাদের নিকট উদাহরণস্বরূপে রাখিয়া গিয়াছেন। জন্ম ডিসেম্বর ১৮১০; মৃত্যু আগষ্ট ১৮৯৮"

চার বছর এই স্কুলে হেডমাস্টারী করার পর সাতান্ন সালে লাহিড়ী মশাই বারাসাত গভর্নমেন্ট স্কুলে বদলী হয়ে যান। তাঁর জায়গায় যিনি হেডমাস্টার হয়ে এলেন তিনি এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র বনমালী মিত্র। মিত্রমশাই একটানা কুড়ি বছর এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আমলের শুরুতেই স্কুল সদ্য প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির অনুমোদনক্রমে এনট্রান্স এগজামিনেশনে ছাত্র পাঠাতে শুরু করে। এ সময় সুজন পণ্ডিতমশাই সমেত দশজন শিক্ষক স্কুলে পড়াতেন। ১৮৬৬ সালে হাওড়া জিলা স্কুলের হেডমাস্টারমশাই স্বয়ং এই স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন যে, সেকেন্ড, থার্ড ও ফোর্থ ক্লাসের ছেলেরা সমস্ত বিষয়েই পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পেরেছে। নীচু ক্লাসের ছাত্রদের পাঠে মনোযোগিতা দেখে তিনি পণ্ডিতমশাইদের প্রাণখুলে প্রশংসা করেন। বিশেষ করে স্কুলের শৃঙ্খলার মান সম্পর্কে তিনি বেশ বড়রকমের সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। ঠিক এই বছরই স্কুল পরিচালন বিষয়ে সরকারী স্কুলগুলির লোকাল কমিটিগুলিকে ডি-পি-আই নয়া নির্দেশ জারী করলেন—(১) এবার থেকে নিয়মিতভাবে স্কুলের সমস্ত আয় জমা দিতে হবে জিলা কালেকটরের অফিসে; (২) স্কুল পরিচালনার সর্বময় কর্তা হলেন লোকাল কমিটির সেক্রেটারী; (৩) লোকাল কমিটির লিখিত নির্দেশ ছাড়া কোন ছাত্রকে স্কুল থেকে তাড়ানো বা বেত মারা চলবে না।

ছাত্রকে ইচ্ছামত স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া বা বেতমারা যাবে না ঠিকই তবে তাই বলে স্কুলের ডিসিপ্লিন বজায় রাখার জন্য কোন স্টেপই কি হেডমাস্টার নিতে পারবেন না? হয়তো সরকারী নতুন আইন কোন কোন অভিভাবকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। সেই বিভ্রান্তির একটি নমুনা এখানে পেশ করছি। ১৮৬৮ সালে বনমালীবাবু অনিয়মিতভাবে মাইনে দেওয়ার অপরাধে একটি ছেলেকে একটাকা ফাইন করেছিলেন। হয়তো খুবই সামান্য ঘটনা, কিন্তু সেদিন ঘটনাটির জের অনেক-দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। ছাত্রের অভিভাবক এ ব্যাপারে স্কুলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বসলেন। স্মল কজেস কোর্ট ঘুরে মামলা উঠল হাইকোর্টে। শেষ পর্যন্ত বিচারপতি হেডমাস্টারের অনুকূলে রায় দেওয়ায় ঘটনার নিষ্পত্তি হোল। ছাত্রের আনুগত্য যে সে যুগেও শিক্ষকের সহজ-প্রাপ্য ছিল না এই ঘটনাই তার জ্বলন্ত উদাহরণ। উদাহরণ আরো আছে। এই ঘটনারই চার বছর আগে পণ্ডিত বাণী-কুমার ভট্টাচার্যকে ইন্সপেকটর অব স্কুলস এইচ উড্রোর রিপোর্ট অনুযায়ী ক্লাস পরিচালনে অসামর্থ্য, পরীক্ষার উত্তরপত্রে নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে অমনোযোগিতা ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনার দায়ে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। থাক এসব কথা, বরং নেওয়া যাক স্কুলের ফসলের খতিয়ান।

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রখ্যাত আইনজীবী ডঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ ও এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রমদাচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়, রায়বাহাদুর বংশীধর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মত কতী ছাত্ররা এ আমলে স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছিলেন।

সাতাত্তর সালে বনমালীবাবুর বিদায়ের পর স্কুলের আর এক প্রাক্তন কৃতী ছাত্র শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী স্কুলের হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে এই স্কুল থেকেই শ্যামা-চরণ জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে আট টাকা মাসিক বৃত্তি পেয়েছিলেন। তখন লাহিড়ী মশাই ছিলেন হেডমাস্টার। বাইশ বছর পরে বনমালীবাবুর জায়গায় তিনিই হোলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, অক্টোবর, ১৮৭৬। পূর্বসূরীর মত তিনিও কুড়ি বছর প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব বহন করেছেন। এই কুড়ি বছরে স্কুলের জীবনে এসেছে বিপুল পরিবর্তন।

১৮৮৭ সাল। উনআশী বছরের বৃদ্ধ জয়কৃষ্ণ গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন পাঠালেন স্কুলের সঙ্গে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রার্থনা করে। প্রার্থনা মঞ্জুর হল, তবে একটি শর্তে—সরকার আর স্কুলের দায়িত্ব বহন করবেন না। শর্ত অনুযায়ী স্কুল ও কলেজের যৌথ পরি-চালন দায়িত্ব বহনের জন্য হুগলীর কালেকটরকে প্রেসিডেন্ট করে একটি বোর্ড গঠন করা হোল। প্রতিষ্ঠার তেত্রিশ বছর পরে ১৮৮৯ সালে সরকার স্কুলের দায়িত্ব এই বোর্ডের হাতে তুলে দিলেন। আট বছর বোর্ড এই স্কুল চালিয়ে-ছেন। এ সময়ে শ্যামাচরণ ছিলেন একই সঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও কলেজের অধ্যক্ষ। সাতাশী সাল থেকে ছিয়ানব্বই সাল, অবসরগ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শ্যামাচরণ এই যৌথ দায়িত্ব নিষ্ঠাভরে পালন করেছেন। সেদিন যদি ঐ কলেজটি শ্যামাচরণের সুযোগ্য পরিচালনার সুযোগ না পেত তাহলে আজকের উত্তরপাড়ার বিখ্যাত প্যারীমোহন কলেজটি আমরা পেতাম কিনা সন্দেহ।

সন্দেহ কিন্তু গোড়া থেকেই আইনজ্ঞ-দের মনে ছিল—এভাবে সরকারী স্কুল বেসরকারী লোকাল বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া যায় কিনা? সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যখন বোর্ডের কোন কোন সদস্য সরাসরি গভর্নমেন্টকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন যে এভাবে স্কুলের দায়িত্ব ট্রান্সফার করা যায় না, অতএব সরকারের উচিত আগের মতই স্কুলকে মাস মাস সাহায্য

দেওয়া। শেষমেষ অ্যাডভোকেট জেনারেলের পরামর্শে সরকার আবার স্কুলের দায়িত্ব নিজের হাতেই ফিরিয়ে নিলেন, ১৮৯৭ সালে। ঠিক তার এক বছর আগেই শ্যামাচরণ রিটায়ার করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে কৃতী ছাত্র শ্যামাচরণ জানতেন কিভাবে ছাত্রদের কৃতিত্ব ফুটিয়ে তোলা যায়। তাঁর সময়ে ১৮৮০ সালে গিরিশচন্দ্র ব্যানার্জি, ১৮৮৪ সালে পরবর্তী জীবনে অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, হরিপদ ভট্টাচার্য ও যোগীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এনট্রান্সে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেয়েছিলেন। ঐ চুরাশী সালের একটি ঘটনা মনে রাখবার মত। গেজেটে মল্লিক, ভট্টাচার্য ও মুখার্জি উত্তরপাড়া স্কুলের তিন কৃতী ছাত্রের নামই ছিল না। শ্যামাচরণবাবু তীব্র প্রতিবাদ করে ইউনিভার্সিটিতে চিঠি লিখলেন। হাতে হাতেই ফল পাওয়া গেল। পরবর্তী গেজেটে এই তিন কৃতী ছাত্রের নাম উল্লিখিত হোল। শুধু নাম বেরুল তাই নয়, এঁরা যে তিনজনই ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশিপ পেয়েছেন সেটাও জানা গেল। আশা করি ঘটনাটি বর্তমান সেকেন্ডারী বোর্ডকে কিছুটা সান্ত্বনা দেবে —ভুলেরও যে সুমহান ঐতিহ্য আছে, জেনে তাঁরা নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হবেন।

শুধু আশী বা চুরাশী সালেই নয়, গত শতাব্দীর আশী ও নব্বইয়ের যুগে কি বছরই উত্তরপাড়া স্কুলের ছেলেরা এনট্রান্সে কান না কোন স্কলারশিপ যে পেয়েছেন ...রনো রেকর্ডে তার স্পষ্ট প্রমাণ আজো ...লবে। এ সময় স্কুলের সুনাম এত ...ড়িয়ে পড়েছিল যে, ছাত্ররা আড়িয়াদহ, ...ক্ষণেশ্বর, বেলঘরিয়া, বরাহনগর, আলম-...জার থেকেও আসত এখানে পড়তে। ...শ বৎসর স্কুল পরিচালনার পর ছিয়া...ব্বই সালে এই স্কুলেরই প্রাক্তন কৃতী ছাত্র ...দুনাথ পালের হাতে প্রধান শিক্ষকের ...য়িত্ব তুলে দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন ...্যামাচরণ।

গত শতাব্দীর সাতানব্বই সাল থেকে বর্তমান শতাব্দীর দশ সাল পর্যন্ত একটানা চোদ্দ বছর, যদুনাথ পাল ছিলেন এ স্কুলের হেডমাস্টার। শুধু হেডমাস্টার বললে তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় না। তিনি ছিলেন এক আদর্শ শিক্ষক। সেই আদর্শ শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন তাঁরই অনুরক্ত ছাত্ররা স্কুলকে এই মহান শিক্ষাগুরুর একটি আবক্ষ মর্মর মূর্তি উপহার দিয়ে। মূর্তিটি মেন বিল্ডিংয়ের দোতলায় হলঘরের প্রবেশপথে স্থাপিত রয়েছে। কিন্তু মূর্তির ঠিক নীচেই পরিচিতি-ফলকে যে ক'টি লাইন লেখা আছে তাতে বলা হয়েছে যদুনাথ পাল কুড়ি বছর উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। আসলে হবে চোদ্দ বছর। এই ভুল কেমন করে সম্ভব হোল? খুব বেশীদিন আগের কথাও নয়। আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগেও আচার্য যদুনাথ জীবিত ছিলেন। ভুলটি কি স্কুলের বর্তমান কর্তৃপক্ষ শোধরাতে পারেন না?

যদুনাথের আমল স্কুলের ইতিহাসে অনায়াসেই সুবর্ণযুগ বলে আখ্যাত হতে পারে। ১৯০৭, ১৯০৮ সালে এনট্রান্সে ও ১৯১০ সালে ম্যাট্রিকুলেশনে এ স্কুলের ছেলেরাই প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। *এই ত্রয়ী কৃতীর অন্যতম সত্যেন্দ্রনাথ মোদক পরবর্তী জীবনে আই, সি, এস, হয়েছিলেন; অপর কৃতী ছাত্র গোবিন্দচরণ দাস হয়েছিলেন ডেপুটি আকাউনটেন্ট জেনারেল।*

যদুনাথের অবসর গ্রহণের পর হরকান্ত বসু স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন। ছ' বছর হরকান্তবাবু এ স্কুলে ছিলেন। তাঁর সময়ে স্কুলের পূর্ব সুনাম পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে এ স্কুলের ছাত্র পর পর দুবার ম্যাট্রিকে ফোর্থ প্লেস পেয়েছে এবং পরের বছর থার্ড হয়েছিল উত্তরপাড়া স্কুলেরই ছেলে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায় সে আমলে যে এ স্কুল আদৌ পিছিয়ে ছিল না তারই সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ ১৯১১ সালে শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের অন্যতম খেলোয়াড় মনোমোহন মুখার্জী। সে আমলে বাংলা দেশের সেরা স্কুলগুলির তালিকায় নিঃসন্দেহে এ স্কুল উপরের দিকেই স্থান পেত। ১৯১৫ সালে হরকান্তবাবু বদলি হয়ে গেলেন।

এর পরের অবস্থা উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুল ম্যাগাজিনের ফাউনডেশন সংখ্যার (মে, ১৯২৯) সম্পাদকীয় থেকে তুলে দিচ্ছি : "আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে ১৯১৫ সালে বাবু হরকান্ত বসু হেয়ার স্কুলে বদলি হইয়া যাইবার পর হইতে আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে ঘন ঘন পরিবর্তন হইতেছে; যেমন বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী — ১৯১৬-১৮, বাবু হরিপদ মুখার্জী —১৯১৮-১৯, বাবু বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী—১৯১৯-২৫, বাবু কালীপ্রসন্ন বসু ১৯২৬-২৭, বাবু কিরণশশী দত্ত (অফিসিয়েটিং)—১৯২৭ ও বাবু বীরেন্দ্রনাথ সেন—জানুয়ারী ১৯২৭ হইতে ডিসেম্বর, ১৯২৮।" প্রতিষ্ঠা ইস্তক উনসত্তর বছর যে স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন মাত্র ছজন প্রধান শিক্ষক, হরকান্তবাবুর পর সেই স্কুলেরই দায়িত্ব বহন করেছেন সমসংখ্যক হেড মাস্টার মাত্র তেরো বছরে। এর ফল যে আদৌ ভাল হয় নি তা স্কুল ম্যাগাজিনের উক্ত সংখ্যার *সম্পাদকীয় কলমেরই বিভিন্ন অংশে স্পষ্ট ভাষায় ধরা পড়েছে—তিরাশী বছরের পুরোনো বিল্ডিংয়ের তখন পড় পড় অবস্থা। নিয়মিত মেরামতির অভাবে ছাদ* ভেঙে পড়ছে, দেয়াল থেকে চুণবালি খসে পড়ছে। কোন কোন ক্লাসরুমের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। পাব্লিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের ইনসপেক্টর এসে বলে গেছেন যে ঐ সব ঘরে ক্লাস নেওয়া আদৌ উচিত না; ছাত্রদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। নীচু ক্লাসগুলিতে জায়গার অভাবে স্থানীয় ছাত্ররা এমন কি প্রতিষ্ঠাতাদের বংশধররাও ভর্তি হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। তবু এরই মধ্যে স্কুলের রেজাল্ট পূর্ব ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। ১৯২৮ সালে ম্যাট্রিকে উত্তীর্ণ তেত্রিশটি ছাত্রের মধ্যে সাতজন ছাড়া বাদ বাকি সবাই ফার্স্ট ডিভিশনেই পাস করেছেন। ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে বীরেনবাবু বদলি হয়ে গেলেন, বারাসাত গভর্ণমেন্ট স্কুলে। তাঁর জায়গায় এলেন উপেন্দ্রনাথ গুহ।

মাত্র তিন বছর উপেনবাবু এ স্কুলে ছিলেন। কিন্তু এই তিন বছরেই অনেক নতুন জিনিষ চালু করেছেন স্কুলে। স্কুলের কোন ম্যাগাজিন ছিল না। তাঁরই উৎসাহে ছেলেরা ম্যাগাজিন বার করল। শুরুতে ঠিক হয়েছিল যে বছরে তিনটি করে সংখ্যা প্রকাশিত হবে। স্কুলের স্কাউট দলটিকেও ভালভাবে গড়ে তোলেন তিনি। ড্রিল কমপালসারী হোল। রোজ ছুটির পর সব ক্লাশ একসঙ্গে নিয়ে আট মিনিট করে ড্রিল হত। কিন্তু ছেলেদের দুটি বড় অভাব তিনিও দূর

করে যেতে পারেন নি। আজ থেকে ঠিক চল্লিশ ব'ছর আগে ছাত্ররা তাঁদের ম্যাগাজিনের পাতায় দুঃখ করে বলেছিলেন : "আমরা স্কুল লাইব্রেরী হইতে যে পরিমাণ সাহায্য আশা করি তাহা পাই না। স্কুলে লাইব্রেরীয়ান পদ নাই। ফলে পুস্তক পাওয়া সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অধিকাংশ পুস্তকই পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের (প্রথম মহাযুদ্ধ) পর ভূগোল, ইতিহাস ও মেকানিকসের সর্বাধুনিক পুস্তকগুলি আজিও কেনা হয় নাই। ফলে আমাদের চাহিদা মিটাইবার কোনরূপ সুযোগ নাই।"

শুধু কি লাইব্রেরীর বিষয়েই ছাত্রদের অভিযোগ সেদিন সীমাবদ্ধ ছিল? না, খেলার মাঠের বিষয়েও তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন—"আমাদের মাঠ ছোট ও অনিয়মিত আকারের বলিয়া খেলোয়াড়-ছাত্ররা খেলিবার সামান্য সুযোগই পায়।"

চল্লিশ বছর পরেও কি অভাব দূর হয়েছে? কিছুই মিটেছে? উত্তরে বলব—না। বিন্দুমাত্র না। লাইব্রেরীর অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। একশো তেইশ বছরের পুরোনো মেন-বিল্ডিংয়ের দোতলায় হলঘরের লাগোয়া একটা ঘরে তালাবন্দী হয়ে অপেক্ষা করছে প্রায় হাজার আষ্টেক বই, যদি কোনদিন কোন লাইব্রেরীয়ান এসে বন্ধ দুয়ার খোলেন তারই জন্যে। ততদিনে বইগুলো আদৌ থাকবে না, উইয়ের খাদ্যে পরিণত হবে কে জানে। আর মাঠ? আরো ছোট হয়ে গেছে। চাল্লশ বছর আগে স্কুলের প্রবেশ পথের ডান হাতে ছিল এই মাঠ। সেই মাঠের উপর আজ টেকনিক্যাল সেকশনের দু-দুটি টিনসেড ও একতলা টেকনিক্যাল বিল্ডিং এবং দোতলা মালটি-পারপাস ব্লক দাঁড়িয়ে আছে। মাঠ সরে গেছে পশ্চিমে পুরোনো জি, টি, রোডের ধারে।

অভাব-অভিযোগের ফিরিস্তি পেশ করতে গিয়ে বড় দ্রুত এগিয়ে এসেছি বর্তমানকালে। একটু পিছিয়ে যাওয়া দরকার। উপেনবাবু বদলি হলেন ত্রিশ সালে। পরবর্তী বিশ বছরে পাঁচজন হেড মাস্টারমশাই এ স্কুল চালিয়েছেন। উপেনবাবুর পর ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়ের মধ্যে যারা এ স্কুলের হেড মাস্টার হয়েছেন তাঁরা হলেন মোহিনীমোহন দাস, তুলসীদাস ব্যানার্জী, ক্ষীরোদচন্দ্র সেন ও দ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। খ্যাতনামা ফুটবলার মনোমোহনের ছেলে ত্রিশের যুগে মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন বিমল মুখার্জী এ সময়েই উত্তরপাড়া স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৯ সালে স্কুলের হেড মাস্টার হয়ে এলেন কালীচরণ আঢ্য।

আঢ্যমশাই দশ বছর এ স্কুলে ছিলেন। এ দশ বছরে স্কুলের ছটি ছেলে ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছে। চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ সাল, আট বছরে গড়ে শতকরা নব্বইজন পরীক্ষার্থী পাশ করেছে যখন ইউনিভার্সিটির গড় পাশের হার পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। এই সময়ে স্কুলের শতবার্ষিকী উদযাপিত হোল আটচল্লিশ সালে। ছেচল্লিশে হওয়ার কথা, কিন্তু সারাদেশে তখন তুমুল উত্তেজনা, গন্ডগোল। তাই দু'বছর পরে স্বাধীনতার দ্বিতীয় বর্ষে উত্তরপাড়া স্কুলের প্রথম শতবার্ষিকী উদযাপিত হোল। উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।

পরের বছর আঢ্যমশায়ের জায়গায় হেড মাস্টার হয়ে এলেন মনোজমোহন ব্যানার্জী। মনোজবাবু দু'বছর ছিলেন। বাহান্ন সালে তাঁর জায়গায় এলেন সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের তামসরঞ্জন রায়। তামসবাবুর সময় স্কুলের পুরোনো খেলার মাঠে টেকনিক্যাল সেকশনের বিল্ডিং ও টিন সেড দুটি তৈরী হয়। গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে দুটি সরকারী স্কুলে প্রথম টেকনিক্যাল সেকশন খোলা হয় তার মধ্যে অন্যতম এই উত্তরপাড়া স্কুল।

পাঁচ বছর পরে হাই স্কুল হোল হায়ার সেকেন্ডারী। শুরু থেকেই কলা, বাণিজ্য ও কারিগরী তিনটি স্ট্রীম চালু হোল। কারিগরী বিভাগের জন্য কোন অসুবিধে হয় নি। কারণ আগেই বলেছি। সায়েন্সের প্রয়োজনে টেকনিক্যাল বিল্ডিংয়ের পাশে স্কুলের মেন বিল্ডিংয়ের উত্তর-পশ্চিমে একটা দোতলা বাড়ি তোলা হোল। এই বাড়িটিই আজ মালটি পারপাস ব্লক নামে পরিচিত।। বাষট্টি সাল থেকে এই বাড়িতে ক্লাস নেওয়া শুরু হয়েছে। এই বিল্ডিংয়ের দোতলায় রয়েছে ফিজিকস, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির ল্যাবরেটরী।

তামসবাবু টেকনিক্যাল সেকশন চালু করে গিয়েছিলেন, উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থা চালু করে যান যতীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী। ইনিও সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিসের লোক। তামসবাবু ও যতীন্দ্রবাবুর মাঝে একবছর হেড মাস্টার ছিলেন কালিপ্রসাদ রায়। সাতান্ন সালে যতীন্দ্রবাবুর জায়গায় এলেন অরুণপ্রকাশ চক্রবর্তী। সাত বছর চক্রবর্তী-মশাই এ স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। গত প'য়ষট্টি সালে তাঁর জায়গায় জলপাই-গুড়ি জেলা স্কুল থেকে বদলি হয়ে এলেন জয়গোপাল মুখার্জী। সময় যেন উদ্দাম সরকারী বাস, থামতে জানে না। এই তো সেদিন এলেন জয়গোপালবাবু, এরই মধ্যে বিদায়ের ঘণ্টানাড়া শুরু হয়ে গেছে। আগামী নভেম্বরে রিটায়ার করবেন। হাসতে হাসতে বললেন—সাড়ে প'য়ত্রিশ বছরের শিক্ষকতার জীবন এবার শেষ হয়ে এল। আর তো মোটে দুটি মাস। চৌত্রিশ সালে পয়ত্রিশ টাকা মাইনের ডঃ রাধা-কৃষ্ণানের যে ছাত্রটি বৌবাজার মেট্রো-পলিটান স্কুলের শিক্ষক হিসাবে কর্ম-জীবনে প্রবেশ করেছিলেন, ঊনসত্তর সালে বিদায় নেওয়ার আগে মুখে মুখে, পুরোনো দলিল ও সহকর্মীদের সাহায্যে স্কুলের ইতিহাস বর্ণনা করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। গোড়ায় বুঝতে পারি নি কেন? পরে বুঝেছি এই নিরভিমান জ্ঞানতপস্বী চান নি সমকালীন ইতিহাস নিজমুখে বর্ণনা করতে। তাই সহকর্মীদের ওপরেই সে ভার ছেড়ে দিলেন।

আমি জানতে চেয়েছিলাম সাম্প্রতিক অতীতে স্কুলের ফলাফল কেমন? উত্তর পেলাম অ্যাসিসট্যানট হেড মাস্টার যতীনবাবুর কাছ থেকে। রেজাল্ট রেকর্ড খুলে আমায় দেখালেন। লোভ হচ্ছিল পুরো রেকর্ডটাই তুলে ধরি। কিন্তু জায়গার স্বল্পতার কথা ভেবে সংক্ষেপে সারছি। গত ন' বছরে ছটি ছেলে স্কলারশিপ পেয়েছে। তার মধ্যে একষট্টি সালে সায়েন্সে থার্ড হয়েছিল এই স্কুলেরই ছাত্র সুকুমার ঘোষ। তিনটি স্ট্রীমে গড় পাশের হার শতকরা সাতানব্বই ভাগেরও ওপর। এ বছর সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজে শতকরা একশজনই পাস করেছে। শুধু টেকনিক্যালের একটি ছেলে ফেল না করলে সব কটি স্ট্রীমেই সেন্ট পার্সেন্ট ছেলে পাশ করত।

আজ থেকে একশো তেইশ বছর আগে যে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল একশো প'য়ষট্টি, আজ সেখানে পড়ছে সাতশো ঊনিশটি ছেলে। শিক্ষক সংখ্যা প্রাইমারী সেকেন্ডারী মিলিয়ে একচল্লিশ। সেকেন্ডারী সেকশনেই আছেন ত্রিশজন শিক্ষক। সোয়াশ বছর আগে জয়কৃষ্ণ-রাজকৃষ্ণ বারো মাসে মাত্র বারোশ টাকা সাহায্য চেয়েছিলেন সরকারের কাছে, আর আজ বছরে সোয়া দু'লাখ থেকে আড়াই লাখ টাকা পর্যন্ত সরকার ব্যয় করেন এই স্কুলের জন্য। টিউশন ফি থেকে সারা বছরে বড় জোর ত্রিশ হাজার টাকা আয় হয় স্কুলের। বাকি সবটাই আসে রাজকোষ থেকে। এতটাই যখন সরকার দেন তখন আর সামান্য কিছু ব্যয় করে যদি খান দুই টিউবওয়েল বসিয়ে দেন তাহলে সাড়ে সাতশো ছাত্র ও শিক্ষকের জলকষ্টের অবসান হয়। সারাটা গরমকাল জলের অভাবে এ'রা বড় কষ্ট পান। ছেলেরা এ বাড়ি ও বাড়ি গিয়ে জল খেয়ে আসে।

অথচ স্কুলের পুবে-দক্ষিণে অফুরন্ত জলপ্রবাহ। পুবে গঙ্গা, দক্ষিণে বালী খাল। আমি বালী খাল ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে আর, একবার তাকালাম স্কুলের দিকে। ছোট মাঠে ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলছে। দিন শেষের গোলাপী রোদ্দুর আকাশ জোড়া মেঘের পর্দা ছিঁড়ে সারাটা স্কুলে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে অদূরের গঙ্গায়, পায়ের তলার খালের জলে। সেই আলোয় আলোময় সন্ধ্যায়, দূরে বহুদূরে সিপ্রাপারে কোন উজ্জয়িনীতে নয়, দুয়ার হতে অদূরে কলকাতার পাশেই গঙ্গাতীরে শত সহস্র প্রাণ ও জীবনের স্মৃতিময় ঐ বাড়ি মনে হোল যেন স্বপ্নপুরী। স্বপ্ন কখনো পুরোনো হয় না, ঋতু বসন্তই তার জীবন। জয়কৃষ্ণ-রাজকৃষ্ণের স্বপ্নমন্দির উত্তরপাড়া গভর্নমেন্ট স্কুলের খোলসটা যত প্রাচীনই হোক, ভেতরে ফালগুন চির বিরাজমান।

—সম্ধিৎসু

পরের সংখ্যায় : ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন।

আগের ঘটনা

চাঁদশের পুব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি, সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয় বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ায় বিদায়ের করুণ রাগিণী। এবার আনন্দ-শিশির-ঝুমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ওঁরা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। সকলের মুখেই তখন যুদ্ধের খবর, চোখে আতঙ্কের ছায়া। জিনিসপত্রের দামও আকাশছোঁয়া।

এমন সময় এল সেই মারাত্মক সংবাদ। জাপানীরা বোমা ফেলেছে বর্মায়। সেখান থেকে দলে দলে লোক পালিয়ে আসছে ভারতে। রাজদিয়াতেও জান নিয়ে ফিরে এসেছে একটি পরিবার। পরদিন। সকলেই ছুটল ত্রৈলোক্য সেনের কাছে। শুনল রেঙ্গুন থেকে পালিয়ে আসার মর্মান্তিক কাহিনী। সময় এগোল যথানিয়মেই। দেখতে দেখতে যুদ্ধের হাওয়া এসে লাগল রাজদিয়াতে। সৈন্য আসতে শুরু করেছে। কলকাতা থেকেও লোক পালাচ্ছে। বিনুর নতুন বন্ধু অশোক। মিলিটারি ব্যারাকে গেল তারা একদিন অশোক বিনুকে দেখাল জীবনের পথ কত বিচিত্র। আর কলকাতা থেকে ফিরে এসে ঝুমা সেই বিচিত্র পথকে করল প্রশস্ত। তরুণ বিনুকে পৌঁছে দিল যৌবনের দ্বারে।

।। তিপ্পান্ন ।।

কুমোরপাড়ার হাচাই পালই শুধু নয়, ক'দিনের মধ্যে বাঘটাকে আরো অনেকে দেখল। যেমন মুধাবাড়ির ছমিমুদ্দিন, গোসাই-বাড়ির সহদেব, নিকুঞ্জ কবিরাজ, অধর সাহা, মনা ঘোষ—এমনি আরো অনেকে।

কেউ বলল, বাঘটা ছ'হাত লম্বা, কেউ বলল আট হাত, কেউ বলল দশ হাত। যত দিন যেতে লাগল লোকের মুখে মুখে বাঘটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ উচ্চতা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে লাগল।

নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বাঘটাই যেন উঠে পড়ে লেগে গেল। আজ এ বাড়ির ছাগল পাওয়া যাচ্ছে না, কাল ও বাড়ির গরুর খোঁজ নেই, পরশু সে বাড়ির হাঁসের ঝাঁক নিরুদ্দেশ। একদিন তো যুগীপাড়ার একটা ছেলেই নিখোঁজ হয়ে গেল। মাঠের মাঝখানে নলখাগড়ার ঝোপে খান-কয়েক হাড় ছাড়া ছেলেটার আর কোন কিছুই পাওয়া গেল না।

রাজদিয়াকে ঘিরে দশ বারোখানা গ্রামে সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হয়ে গেল। কনট্রোলের দোকান থেকে কেরোসিন উধাও হবার পর সন্ধ্যে নামতে না নামতেই চারদিক নিশুতি-পুরে হয়ে যাচ্ছিল। আজকাল বিকেল থাকতে থাকতেই বাঘের ভয়ে ঘরে ঘরে খিল পড়ে যায়।

সবচাইতে অসুবিধে হয়েছে বিনু আর ঝিনুকের। তারা যে বড় হয়েছে এ কথাটা স্নেহলতা বা বাড়ির আর কেউ মানতেই চায় না। এখন কিছুদিন স্কুল ছুটি চলছে। বেলা পড়ে রোদ বেশ চনচনে হয়ে উঠলে তবে তারা ঘরের বার হতে পারে; আবার বিকেল-বেলা রাজদিয়ার সব লোক বাইরে থাকতে থাকতেই তাদের ঘরে ঢুকিয়ে ফেলা হয়। বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যাবার উপায় নেই তাদের। স্নেহলতার ভয়, বাঘটা তাকে তাকে আছে। রাজদিয়ার কয়েক হাজার লোকের ভেতর থেকে বেছে বেছে তাঁর নাতি-নাতনী দুটোকে টপ করে মুখে তুলে নিয়ে যাবে।

স্নেহলতা লক্ষ্মণের গণ্ডী কেটে দিয়েছেন। পেছনে বড়ঘরের সামনে উঠোন, দক্ষিণে মধুটকুরি আমের গাছ, উত্তরে ঢেঁকি-ঘর—এই চতুঃসীমার মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে কার আর ভাল লাগে! এমন কি বাগান এবং পুকুরেও একা একা যাওয়া বারণ।

অন্য কিছুর জন্য না, ঝুমার জন্যই খুব খারাপ লাগে বিনুর। সারাদিন ছটফট করে এঘর ওঘর করে বেড়ায় সে; উঠোন জুড়ে অস্থির চঞ্চল হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে।

ঝিনুক কিন্তু ভারি খুশী। পুবের ঘরের উঁচু পৈঠের ওপর বসে পা নাচাতে নাচাতে কৌতুকের চোখে সে বিনুর অস্থিরতা দেখতে থাকে। এক সময় খুব আস্তে করে ডাকে, 'বিনুদা—'

বিনু বলল, 'কী বলছ?'

'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?'

'কষ্ট কেন?'

ঝিনুকের চাপা ঠোঁটের মাঝখানে হাসির একটু আভা ফুটে উঠেই চকিতে মিলিয়ে যায়। সে বলে, 'সারাদিন বাড়িতে আটকে আছ বলে—'

চোখমুখ কুঁচকে বিরক্ত রাগ-রাগ গলায় বিনু বলতে থাকে, 'সমস্ত দিন বাড়ি বসে থাকতে কারো ভাল লাগে!'

'ঠিকই তো।'

'দিদার কি যে ভয়, রাস্তায় বেরুলে এত লোক থাকতে বাঘ এসে আমাকেই শুধু গিলে ফেলবে।'

কয়েক পলক বিনুর দিকে তাকিয়ে থেকে গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেলে ঝিনুক, 'একা বেরুতে পারছ না। তার ওপর—'

'তার ওপর কী?'

'ঝুমাদের বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না। ঝুমাদের বাড়ি যেতে পারলে এত কষ্ট এত রাগ হত না। না বিনুদা?'

চোখের তারা স্থির করে ঝিনুকের দিকে তাকায় বিনু। বুঝতে চেষ্টা করে মেয়েটা কি কিছু আভাস পেয়েছে? বলে, 'তোমার কি মনে হয়, রাস্তায় বেরুলেই আমি ঝুমাদের বাড়ি যাই।' বিনুর গলা অল্প অল্প কাঁপে।

ঝিনুক হঠাৎ উদাস হয়ে যায়, 'কি জানি—'

আর বিনু এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়ায় না। বড় বড় পা ফেলে আবার এ-ঘর ও-ঘরে এবং উঠোনে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে ভাবে, ঝুমাই শুধু না, এই ঝিনুক মেয়েটাই কি কম রহস্যময়ী!

বাঘের উৎপাত দিন দিন বেড়েই চলল। রক্তের স্বাদ যখন একবার সে পেয়েছে তখন কি সহজে থামবে?

এদিকে থানা থেকে ঢেঁড়া দিয়ে পনের কুড়ি মাইলের ভেতর যত গ্রাম-গঞ্জ আছে, সব জায়গায় লোককে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। বাঘ মারবার জন্য মোটা টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

এত এত ব্যাপার যখন ঘটে গেল তখন কি আর আনন্দ চুপ করে বসে থাকতে পারে? বাঘ মারার দায়িত্ব সে নিজের কাঁধে তুলে নিল। একদিন দুপুর বেলা বিনুরা দেখতে পেল, পুকুরের ওপারে চারদিকের গ্রামগুলো থেকে কয়েক শ' যুবক এবং প্রৌঢ়কে জড়ো করে ফেলেছে সে। এই মুহূর্তে তার পরনে পুরোপুরি শিকারীর বেশ। কাঁধ থেকে বন্দুক ঝুলছে, গলায় টোটার মালা। কোমরে মস্ত ভোজালি।

মাঘের মাঝামাঝি এই সময়টায় মাঠে জল নেই। ধানও কাটা হয়ে গেছে। আনন্দকে ঘিরে বিরাট জনতা ধানকাটা মাঠের ওপর গোল হয়ে বসে পড়ল।

এত লোক যখন রয়েছে তখন ভয়ের কোন কারণ নেই। স্নেহলতাকে বলে বিনু ধানখেতে ছুটল।

জনতার বেশীর ভাগই চাষী শ্রেণীর মানুষ; দুর্ভিক্ষে হেজেমজে যাবার পর যারা কোন রকমে টিকে আছে তারাই ছুটে এসেছে। উৎকণ্ঠিতের মতন লোকগুলো আনন্দের দিকে তাকিয়ে ছিল।

আনন্দ বলছিল, 'বাঘটাকে তোমরা মারতে চাও, এই তো?'

সবাই সমস্বরে বলল, 'হ সায়েববাবু। হালার বাঘের লেইগা পরানে শান্তি নাই। কোন্‌দিন কার বাড়িত্ গিয়া যে আকম্ম কইরা আইব।'

'সায়েববাবু' সম্ভাষণটা খুব সম্ভব আনন্দর হ্যাট-বুট-প্যাণ্ট এবং গুলী বন্দুকের সম্মানে।

আনন্দ বলল, 'সে ত ঠিকই।'

বাঘ কার কি ক্ষতি করেছে, তাদের কতখানি দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এরপর লোকগুলো সে সব কাহিনী বলে যেতে লাগল।

সব শুনে আনন্দ বলল, 'বাঘ আমি মেরে দিতে পারি। তবে—'

'তয় কী?' জনতা উন্মুখ হল।

'আমার কথামত তোমাদের চলতে হবে।'

'নিশ্চয় চলুম।'

এর পর উদ্দীপ্ত ভাষায় ছোটখাটো একখানা বক্তৃতা দিল আনন্দ। তার সারমর্ম এই রকম। প্রথমত সবাইকে লাঠি এবং সড়কি বানিয়ে নিতে হবে। ঘরে ঘরে শাঁখ, কাঁসর, নিদেনপক্ষে একটুকরো টিন মজুদ রাখতে হবে। কেউ যদি বাঘটাকে দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গিয়ে খবর দেবে। আর খবর পেলেই যত শাঁখটাখ আছে একসঙ্গে বাজাতে হবে। এক গ্রামের বাজনার আওয়াজ গেলেই আরেক গ্রাম বাজাতে শুরু করবে। এই ভাবে চারদিকের গ্রামগুলো সতর্ক হয়ে যাবে।

শুধু শাঁখ-কাঁসর বা টিন বাজালেই চলবে না। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ধ্বনিও দিতে হবে, 'বন্দে মাতরম' কিংবা যার যা খুশি। ধ্বনিটা কানে গেলে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না; প্রতিধ্বনিও দিতে হবে। তারপর লাঠি সড়কি নিয়ে সব দিক থেকে বাঘটাকে ঘিরে পিটিয়ে মেরে ফেলা হবে। তাতেও যদি সুবিধে না হয়, আনন্দ এবং তার বন্দুক তো আছেই।

পরিকল্পনার কথাটা বলে ঘুরে ঘুরে সগর্বে জনতাকে একবার দেখে নিল আনন্দ। তারপর আবার শুরু করল, 'ফন্দিটা কেমন?'

সবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সায় দিল, 'চোমৎকার সায়েববাবু, চোমৎকার—'

'এবার বাঘের আর নিস্তার নেই বুঝলে'

'হ।'

এ রকম চমকপ্রদ একখানা পরিকল্পনার পর বাঘের আয়ু যে নেহাতই ফুরিয়ে এসেছে, সে সম্বন্ধে জনতার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না। উৎসাহে উদ্দীপনায় তাদের চোখ চকচক করতে লাগল।

আনন্দ বলল, 'তা হলে ঐ কথাই রইল—'

'হ।'

হঠাৎ এই সময় একজন বলে উঠল, 'বাঘেরে আমরা যখন ঘিরা ধরুম, আপনে অমোগো লগে থাকবেন তো?'

বাঁ হাতের তালুতে প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে আনন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই। আমি না থাকলে তোমাদের চালাবে কে?'

লোকগুলো একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। নিজেদের ভেতর তারা বলাবলি করতে লাগল, 'সায়েববাবু আমাগো লগে থাকব। হালার বাঘের এইবার যম আইছে!'

আনন্দ বলল, 'কথা হয়ে গেল। এখন তোমরা বাড়ি যাও। আর হ্যাঁ, যতদিন না বাঘটা মারা পড়ছে, প্রতি সপ্তাহে রবিবার করে এখানে মীটিং হবে। দুপুরবেলা তোমরা চলে আসবে। যদি বাঘ মারার অন্য কোন ভাল ফন্দি মাথায় আসে, তোমাদের বলে দেব।'

'আইচ্ছা।'

বাঘের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যে যার বাড়ি চলে গেল। হতভাগ্য প্রাণীটা জানতেও পারল না, তার বিরুদ্ধে কি ভীষণ ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে।

মীটিং শেষ হলে আনন্দকে ধরে বাড়ি নিয়ে এল বিনু। সুধা-সুনীতি উঠোনেই ছিল। ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে সুধা বলল, 'বাবা, একেবারে বীরবেশে যে! দ্যাখ দিদি, দ্যাখ—'

সুনীতি চোরা চোখে আনন্দকে দেখে নিয়ে মুখ নীচু করল, তারপর নখ খুঁটতে লাগল। তার মুখে মৃদু কৌতুকের একটু হাসি আলতো ভাবে লেগে রইল।

সুধা এবার এগিয়ে এসে চোখ বড় বড় করে বলল, 'বন্দুক, টোটার মালা, ভোজালি —যেভাবে সেজেছেন, তাতে বাঘটাকে না মারলেও চলবে।'

ভুরু অল্প কুঁচকে আনন্দ বলল, 'কেন?'

'এই বীরবেশ একবার যদি বাঘটাকে দেখিয়ে দিতে পারেন, রাজ্য ছেড়ে সে পালিয়ে যাবে।'

আনন্দ কি বলত যাচ্ছিল, বলা হল না। স্নেহলতা কোথায় ছিলেন, আনন্দকে দেখতে পেয়ে ছুটে এলেন। বললেন, 'এসো দাদা, এসো—'

তারপর যতক্ষণ আনন্দ এ বাড়িতে রইল, সুধা তার পেছনে লেগে থাকল।

দু-চারদিনের ভেতর দেখা গেল, রাজদিয়া এবং চারপাশের গ্রামগুলোতে একটা সুপুরি গাছ কিংবা বয়রা বাঁশও আর আস্ত নেই। সব লাঠি এবং সড়কি হয়ে গেছে।

সেদিন সভা ডাকার পর বেশ কিছুদিন বাঘটাকে আর দেখা গেল না। তার বিরুদ্ধে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে, এ খবর কি বাঘটা জেনে ফেলেছে? যাই হোক, মানুষ খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে, তবে সতর্ক আছে। সন্ধ্যের আগে আগেই যথারীতি ঘরে ঢুকে খিল দিচ্ছে তারা। এইভাবেই চলছিল।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা বারুইবাড়ির প্রাণবল্লভ মাঠের দিক থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এবং চেঁচাতে চেঁচাতে হেমনাথের বাড়ি এসে হাজির, 'খাইছে রে খাইছে, আমারে খাইয়া ফ্যালাইল রে—'

পূর্ব - পশ্চিম - উত্তর - দক্ষিণ, চারদিকের ঘর থেকে সুধা-সুনীতি বিনু ঝিনুক অবনীমোহন হেমনাথ বাড়ির সবাই ছোটাছুটি করে বেরিয়ে এলেন।

উদ্বিগ্ন মুখে হেমনাথ শুধোলেন, 'কী হয়েছে প্রাণবল্লভ, কী হয়েছে?'

প্রথমটা কথা বলতে পারল না প্রাণবল্লভ। হাত পা ঠোঁট, তার সারা শরীর ভয়ে থর থর কাঁপছে। হাত ধরে তাকে বারান্দায় বসালেন হেমনাথ। বললেন, 'আগে শান্ত হ, পরে বলবি।'

কাঁপা ভাঙা ভাঙা গলায় প্রাণবল্লভ বলল, "এট্টু জল বড় কত্তা—'

জল খেয়ে খানিকটা শান্ত হল প্রাণবল্লভ। তারপর যা বলল, সংক্ষেপে এই রকম। ভোরবেলা সুস্বাদু সুন্দি কচ্ছপের সন্ধানে সে ধানকাটা মাঠে গিয়েছিল। আলের ধারে ঘুরে ঘুরে দু-চারটে যোগাড়ও করেছিল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, দক্ষিণের চকে মাঠের মাঝখানে গুটিসুটি মেরে বাঘটা শুয়ে আছে।

প্রাণবল্লভের কাহিনী শুনে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে হেমনাথ বললেন, 'সুধা দিদি, সুনীতি দিদি, শিগ্গির শাঁখ বাজা। বাঘের খবর পেলেই আনন্দ শাঁখ-টাখ বাজাতে বলেছিল না?' সেদিনকার মীটিং-এর কথা কারো জানতে আর বাকি নেই।

সুধা-সুনীতি ছুটে গিয়ে ঘর থেকে শাঁখ বার করে আনল; তারপর দুই বোন গাল ফুলিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগল।

প্রাণবল্লভের ভয় কেটে গিয়েছিল। লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে আকাশে হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্দে মাতরম্—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এ-বাড়ি ও-বাড়ি এ-পাড়া সে-পাড়া এবং দূর-দূরান্ত থেকে শাঁখ কাঁসর এবং টিন পেটাবার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু শোনা যেতে লাগল, 'বন্দে মাতরম্'—

'কালী মাঈকি জয়'—

মুসলমান পাড়ার দিক থেকে আওয়াজ আসতে লাগল, 'আল্লা হো আকবর—'

তারপরেই হো-হো চিৎকারে দিগ-দিগন্ত তোলপাড় করে অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে পড়ল। সবার হাতে লাঠি আর সুপুরি কাঠের সড়কি।

হেমনাথ প্রাণবল্লভকে বললেন, 'যা শিগ্গির, আনন্দকে বাঘের খবরটা দিয়ে আয়।'

স্নেহলতা বললেন, 'যা চেঁচামেচি আর কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ তাতে খবর পেতে কি তার বাকি আছে?'

'তবু যাক।'

প্রাণবল্লভ রামকেশবের বাড়ি ছুটল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে খবর দিল, সে একাই নয়, আরো অনেকে আনন্দকে বাঘের খবর দিতে গিয়েছিল। কিন্তু আনন্দকে পাওয়া যাচ্ছে না।

হেমনাথ বললেন, 'সে কি! কাজের সময় সেনাপতিই নিরুদ্দেশ!'

প্রাণবল্লভ কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। হেমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

তার মনের কথাটা যেন পড়তে পারলেন হেমনাথ। বললেন, 'কিছু বলবি?'

'হু—'

'বল না—'

'অপরাধ যদি না নেন, কথাখান কই—' বলে হাত জোড় করল প্রাণবল্লভ।

হেমনাথ অবাক, 'অপরাধ নেব কেন?'

হাত জোড় অবস্থাতেই প্রাণবল্লভ বলল, 'আমার মনে হইল সায়েববাবু (আনন্দ) বাড়িতেই আছে; ভিতরে তেনার গলাও য্যান পাইলাম। কিন্তুক মা ঠাইরেনরা কইয়া দিল, তেনি নাই—'

হেমনাথ ধমকের গলায় বললেন, 'কি যা তা বলছিস!'

'বিশ্বাস যান না বড় কত্তা?'

'না।'

'বিশ্বাস না যাওনেরই কথা। কিন্তুক—'

'কিন্তু কী?'

'সাক্ষী আছে।'

'কে সাক্ষী?'

প্রাণবল্লভ একে একে নাম করে যেতে লাগল, 'গণকবাড়ির মহেন্দ্র, কামারবাড়ির নিমাই, সোনারুবাড়ির অনন্ত, কলিমুদ্দি মাঝি, বরাতুল্লা নিকারী—কত মাইনষের নাম কমু—'

'এত লোক আনন্দর খোঁজে গিয়েছিল!' হেমনাথের চোখেমুখে এবং কণ্ঠস্বরে বিস্ময়।

'হ। বাঘ দেখলে তেনিই তো খপর দিতে কইছিল।'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, 'আচ্ছা তুই যা এখন—'

প্রাণবল্লভ চলে গেল।

ওদিকে আরেক কাণ্ড চলছিল। লাঠি-সড়কি নিয়ে রাজদিয়ার লোক তো মাঠের দিকে ছুটেছিলই। দিগন্তের ওপারের কৃষাণ গ্রামগুলো থেকে শত শত মানুষ ছুটে আসছিল; তাদের হাতেও লাঠি-সড়কি এবং নানারকম অস্ত্র।

শাঁখ কাঁসর এবং টিন পেটাবার আওয়াজ তো আসছিলই। সেই সঙ্গে মুহুর্মুহু শোনা যাচ্ছিল, 'বন্দে মাতরম্—'

'কালী মাঈকী জয়—'

'আল্লা হো আকবর—'

ধানকাটা শীতের মাঠ পানিপথ কি হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্রের চেহারা নিতে শুরু করেছে।

বিনু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'আমি মাঠে যাব দিদা—'

'মাঠে কেন রে দাদাভাই—' স্নেহলতা চমকে উঠলেন।

'বাঘ মারা দেখতে যাব।'

'না—না, ওখানে তোমাকে যেতে হবে না।' জোরে জোরে প্রবলবেগে হাত নাড়তে লাগলেন স্নেহলতা; চোখেমুখে তাঁর ভয়ের ছায়া পড়ল।

'আমি যাবই—' ঘাড় গোঁজ করে পা ছুঁড়তে লাগল বিনু। শাঁখ-কাঁসরের শব্দ, ঘন ঘন 'বন্দে মাতরম' আর 'আল্লা হো আকবর' তার রক্ত চঞ্চল করে তুলেছে।

'ওখানে কী হবে, কেউ বলতে পারে? বাঘটা যদি কোনরকমে ছিটকে তোর কাছে চলে আসে—'

'আমি ঐ হিজলগাছের মাথায় চড়ে দেখব—' দূরে মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল বিনু।

স্নেহলতা বললেন, 'গাছে টাছে চড়তে হবে না। তুই ঘরে গিয়ে বোস্। জানলা দিয় যেটুকু দেখা যায় তার বেশি দেখবার দরকার নেই।'

বিনু শুনল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠের দিকে ছুটল। আজ আর তাকে বাড়িতে আটকে রাখা গেল না। মাঠজোড়া রণভূমি তাকে বিপুল আকর্ষণে টেনে নিয়ে গেল।

পেছনে স্নেহলতার ভীত ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল, হেমনাথ আর অবনীমোহনকে তিনি বলছেন, 'তোমরা ছেলেটাকে আটকালে না। আজ কী যে হবে! যাও যাও, ওকে ফেরাও—'

হেমনাথেরা কী উত্তর দিলেন, বিনু শুনতে পেল না। তার আগেই ছায়াচ্ছন্ন ঝুপসি বাগান পেরিয়ে মাঘের নিস্তরঙ্গ পুকুর পেছনে ফেলে, ফসলশূন্য ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল।

চারদিক থেকে জনতা গোল হয়ে ছুটছে। সম্মোহিতের মতন তাদের পিছু পিছু চলতে লাগল বিনু।

দক্ষিণের চকে এসে দেখা গেল, সত্যি-সত্যিই মাঠের মাঝ-মধ্যিখানে বাঘটা শুয়ে আছে। চার ধার থেকে গোল হয়ে জনতা ঝড়ের মতন নেমে আসছিল। বাঘটা যখন সিকি মাইলের মতন দূরে সেই সময় কেউ যেন মন্ত্র পড়ে হঠাৎ তাদের থামিয়ে দিল।

একধারে সারি সারি অনেকগুলো হিজল গাছ। বিনু আর দেরি করল না, সব চাইতে উঁচু গাছটার মগডালে চড়ে বসল। ভাটির দেশে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবার আগে বিনুকে গাছে চড়া শিখিয়ে দিয়েছিল যুগল।

শাঁখ কাঁসরের আওয়াজ থেমে গেছে? 'কালী মাঈকী জয়' কিংবা 'আল্লা হো আকবর'ও আর শোনা যাচ্ছে না। জনতা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছে।

হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'সায়েববাবু কই?'

আট-দশটা লোক চিৎকার করে করে বলল, 'বাড়িত্ নাই।'

'অখন কী করা?'

'সায়েববাবু তো কইছিল, বাঘ দেখলে তেনারে খপর দিতে। তেনি নাই; আমরা ফিরাই যাই।'

'সগলেরে তাইলে ফিরনের কথা কইয়া দ্যাও। বাঘ মারণ বইলা কথা। সায়েববাবু না থাকলে আমাগো চালাইব কে?

একটা লোক চিৎকার করে ফেরবার কথা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাজিতপুরের জোয়ান ছেলে হালিম বলল, 'কিছুতেই না। অ্যাদ্দুর আইসা ফিরণ যাইব না। সুযুগ যখন পাইছি, শালার বাঘেরে নিকাশ করুম।' বলেই আকাশের দিকে হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে চেঁচাল, 'আউগাও (এগোও) ভাই সগল—'

নিমেষে জনতার ভেতর সাড়া পড়ে গেল।

'আল্লা হো আকবর—'

'কালী মাঈকী জয়—'

তারপরেই বাঘটাকে ঘিরে মানুষের বৃত্ত ছোট হয়ে এল। কিন্তু জন্তুটা যখন তিন শ গজের মতন দূরে, লোকগুলো আবার থেমে গেল।

আনন্দ নেই। সেনাপতিত্ব আজ হালিমের দখলে। প্রেরণা দেবার জন্য পেছন থেকে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল, 'আউগাও—'

ঠেলে ঠেলে জনতাকে আরো অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেল হালিম। কিন্তু বাঘটা যখন একশ গজ দূরত্বে তখন আর পারা গেল না।

এতদূরে থেকে লাঠি-সড়কি দিয়ে অন্তত বাঘ মারা যায় না। হালিম [illegible]

ছ্ুটতে ছ্ুটতে সমানে চেঁচাতে লাগল, 'আউগাও আইয়া, আউগাও—'

কিন্তু এত অনুপ্রেরণাতেও কাজ হল না। লোকগুলো একেবারে অনড়; কেউ যেন পেরেক ঠুকে মাটিতে তাদের পা আটকে দিয়েছে

ওদিকে আরেক ব্যাপার ঘটল। বাঘটা ঘুমিয়ে ছিল; হঠাৎ এত চেঁচামেচি শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

হিজল গাছের মাথা থেকে বিনুর মনে হল, বাঘটা দশ হাতও না বারো হাতও না, ছ' সাত হাতের মতন। হলুদ শরীরে তার লম্বা লম্বা কালো ডোরা।

কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাবার জন্য খুব সম্ভব বাঘটা বিরক্ত হয়েছিল এবং এত লোকজন দেখে কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা হতচকিত। সে সামনের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে শ'খানেক লোক অস্ত্র-টস্ত্র ফেলে প্রাণ-পণে ছুটল; এবং নিমেষে দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার বাঘটা তাকাল ডান দিকে তক্ষুনি দু-আড়াই শ' লোক আর নেই। অনেকে মালকোচা দিয়ে লুঙ্গি পরে এসেছিল, ছুটবার সময় কাছা খুলে যাওয়ায় লুঙ্গিতে পা আটকে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। ধান কেটে নিয়ে যাবার পর যে গোড়াগুলো মাঠময় ছড়িয়ে আছে তাতে হোঁচট খেয়েও অনেকে পড়ে যাচ্ছে। পড়েই তক্ষুনি উঠে পড়ছে; এবং পেছনে দিকে সভয়ে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার ছুটছে।

সামনে-পেছনে, যে দিকেই বাঘটা তাকাচ্ছে, এক অবস্থা। মুহূর্তে সব ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে তাকাতে তাকাতে সেনাপতির সঙ্গে একবার তার শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একটা ডোরাকাটা লাল লুঙ্গি আর সবুজ জামা প্রায় উড়ে গিয়ে আধ মাইল দূরের একটা খালে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কেউ যখন আর নেই, সেই সময় বাঘটা অলস পায়ে চকের এক প্রান্তে উলুখড়ের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল। তারপর হিজল গাছ থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরে এল বিনু।

এর ভেতর বাঘ শিকারের ব্যাপারটা দিকে দিকে রটে গেছে।

হাসতে হাসতে হেমনাথ বললেন 'যেমন আনন্দটা তেমনি তার সংশপ্তক বাহিনী।'

বিনু শুনতে পেল, সবার কান বাঁচিয়ে সুধা সুনীতিকে বলছে, 'আজ্ঞা বীরপুরুষের গলায় মালা দিবি দিদিভাই—'

সুনীতি মুখ তুলতে পারছিল না; মাটির সঙ্গে সে যেন মিশে যেতে চাইছে।

পরের দিন খবর পাওয়া গেল বাঘটা মারা পড়েছে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব লঞ্চে করে রাজদিয়া আসছিলেন; নদীর বাঁকে বাঘটাকে দেখে গুলী করে মেরেছেন।

●

বাঘের ভয়ে আনন্দ যে বাড়ি থেকে বেরোয় নি, এই কথাটা কেমন করে যেন চারদিকের গ্রামগঞ্জগুলোতে রটে গিয়েছিল। খবরটা যে শুনেছে সে-ই হেসেছে।

এদিকে সেদিনকার সেই মজার ঘটনাটির পর আনন্দর আর দেখা নেই। আগে দিনে দু-বার করে হেমনাথদের বাড়ি আসছিল, এখন রামকেশবের বাড়ির একটা ঘরে সে নাকি নির্বাসন বেছে নিয়েছে।

একদিন হেমনাথ গিয়ে আনন্দকে ধরে আনলেন। রগড়ের গলায় বললেন, 'আরে দাদা তোমার এত লজ্জাটা কিসের?

আনন্দ খুবই বিব্রত বোধ করছিল, উত্তর দিল না।

হেমনাথ আবার বললেন, লজ্জার কিছু নেই, বুঝলে ভাই। বড় বড় সেনাপতি যারা—যেমন ধর রোমেল, মন্টোগোমারি, দ্য গল—ফ্রন্টে হেঁপজি পেঁপজি সোলজারের গায়ের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কি লড়ে? তারা দূরে বসে কলকাঠি নাড়ে। তুমি ঘরে বসে থেকে আদর্শ জেনারেলের মতন কাজ করেছ।' একটু থেমে আবার বললেন, 'ভয় নেই, এর জন্যে সুনীতিদিদি বরবদল করবে না। কি বলিস রে দিদিভাই—'

সুধা-সুনীতি-বিনু-ঝিনুকরা কাছেই ছিল। সুনীতি ছুটে পালিয়ে গেল।

সুধা চোখের তারায়, ঠোঁটের প্রান্তে ধারাল হাসিটি হেসে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, 'কি বীরপুরুষ, বোঝা গেল। কাঁধে বন্দুক, কোমরে ভোজালি, গলায় টোটার মালা ঝোলানোই সার।'

●

মাঘের শেষ তারিখে বিয়ের দিন পড়েছে। একই লগ্নে সুধা-সুনীতির বিয়ে। রাত থাকতে থাকতে কাকপক্ষী জানবার আগে দুই বোনকে বিছানা থেকে তোলা হল। শুরু হল 'অধিবাসে'র কাজ।

সুধা-সুনীতিকে নতুন কাপড় পরানো হল, গলায় দেওয়া হল তুলসী কাঠের মালা, কোমরে নতুন লাল ঘুনসি, কপালে চন্দন কুমকুমের ফোঁটা, চোখে কাজলের টান, সারা গায়ে ঝকমকে নতুন গয়না, হাতে নতুন শাঁখা।

মেয়ে সাজাবার পর নতুন পিঁড়িতে তাদের পাশাপাশি বসিয়ে শ্বেত-পাথরের থালায় খাবার খেতে দেওয়া হল—খই, চিঁড়ে, মুড়কি, ক্ষীর, দই, চিনি-বাতাসা। বিনু-ঝিনুকও ওদের সঙ্গে বসে গেল। এর পর সারাদিন বিয়ের কনেরা আর কিছু খাবে না। খাবে সেই রাত্রিবেলা—বিয়ের পর।

সুধা-সুনীতিকে খেতে বসিয়ে তিরিশ-চল্লিশজন এয়ো নিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীর ঘাটে 'জলসই'তে গেলেন স্নেহলতা। সঙ্গে সঙ্গে সাঁনদার (সানাইবাদক) আর ঢুলী বাজাতে বাজাতে চলল।

'জলে ঢেউ দিও না গো সখি
ঢেউ দিও না, ঢেউ দিও না,
আমরা জলের চাতকী।
জলের কালোরূপ নিরখি
জলে ঢেউ দিও না গো সখি।
আগে সাঁখ, পাছে গো সখি
মধ্যে রাধা চন্দ্রমুখী।'

স্নেহলতারা যতক্ষণ না ফিরছেন, সুধা-সুনীতি পাত্র ছেড়ে উঠবে না। এই হচ্ছে রীতি।

কিছুক্ষণ পর স্নেহলতারা নদী থেকে নতুন কলসীতে জল ভরে ফিরে এলেন। যে কলসীটায় জল আনা হয়েছে সেটার নাম মঙ্গল কলস। পাঁচজন এয়ো একসঙ্গে কলসীটা ধরে উলু দিতে দিতে মাটিতে স্থির করে বসালেন। একজন তার তলায় আগেই ধানদূর্বা দিয়েছে। বাকিরা গান ধরল।

'ওগো মঙ্গলো আসিছে দুয়ারে
মঙ্গলো অবনী আজ।
মঙ্গলো জলধর, মঙ্গলো কলসে
পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে এসো হরষে,
অতিথি, ভূপতি, দেবতা, স্বদেশে,
মঙ্গলো অবনী আজ।'

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল, বেলা চড়তে লাগল। দুপুরের খানিক আগে পুরুত এল। অবনীমোহন মেয়ে সম্প্রদান করবেন; পুরুত তাঁকে নিয়ে 'বৃদ্ধি'তে বসে গেল। 'বৃদ্ধি'র সময়ও মেয়েরা গান ধরল।

'ওগো বৃদ্ধির কাজে কী কী লাগে?
ষোল মোণ চাউল লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল বিড়া পাম লাগে গো।
ওগো বৃদ্ধির কার্যে কী কী লাগে?
ষোল মোণ গুয়া লাগে গো।'

'বৃদ্ধি'র পর এয়োরা শিলে কাঁচা হলুদ বেটে সুধা-সুনীতিকে মাখাল। তারপর মাথায় ধানদূর্বা দিয়ে উলু দিতে দিতে স্নান করাতে লাগল। সেই সঙ্গে গান:

'তোরা আয় লো সকলে
আমার সীতাকে স্নান করাব
সুশীতল জলে।
কস্তুরী মিশায়ে জল ঢেলে দাও গো
রামের শিরে।
সখি সকলে আন গো মাজ কেটে আরো
কুর হরিদ্রা বেটে আনো—'

সুধা-সুনীতির স্নান হয়ে গেলে 'অধিবাসে'র তত্ত্ব নিয়ে হেমনাথ আর বিনু বেরিয়ে পড়ল। দু বাড়িতে তত্ত্ব যাবে। মাছ, পান, তামার পরাতে পরাতে নানা-

রকমের মিষ্টি: এত জিনিস হাতে করে তো নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই ভবতোষের ফাইটনটা সকাল বেলাতেই আনিয়ে রেখেছিলেন হেমনাথ।
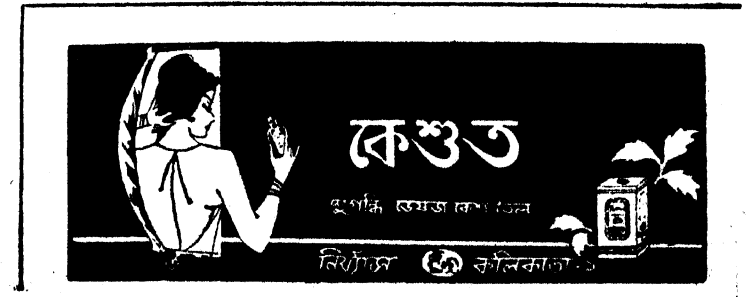
প্রথমে বিনুরা গেল হিরণদের বাড়ি। সেখানে বেশিক্ষণ বসল না; তত্ত্ব নামিয়ে দিয়ে সোজা রামকেশবের বাড়ি চলে এল।

এখানেও সানাই বাজছে, ঢাক বাজছে। মাঝে মাঝে শাঁখ এবং কল কল উলুর আওয়াজ আসছে।

বিনুরা বাড়ির ভেতর আসতেই সাড়া পড়ে গেল। ঝুমা কোথায় ছিল, ছুটতে ছুটতে সামনে এসে হাজির।

আজ দারুণ সেজেছে ঝুমা। অন্যদিন ফ্রক পরে থাকে। আজ হলুদ রংয়ের সিল্কের শাড়ি আর লাল টুকটুকে একটা জামা পরেছে। শাড়িটার গায়ে ছোট ছোট নীল ময়ূর। কপালে আগুনের ফুলকির মতন কুমকুমের একটি টিপ। টিপটাকে গোল করে ঘিরে চন্দনের বিন্দু। চোখে কাজলের টান। গালে এবং ঠোঁটে লালচে রং। আঙুলে সবুজ পাথর বসানো লম্বা আংটি, গলায় হার, হাতে সোনার চুড়ি, বাঁ হাতের সুডোল নরম কব্জিটাকে বেষ্টন করে সরু ফিতেতে বাঁধা চৌকো ঘড়ি।

ঝুমার সাজটাজ নিয়ে ঠাট্টা করতে যাচ্ছিল বিনু। তার আগেই ঘাড়খানা বাঁকিয়ে গালে একটি হাত রেখে ঝুমাই বলে উঠল, 'বাবা, কি সাজটাই না সেজেছে! একেবারে বরবেশ।'

চমকে নিজের দিকে তাকাল বিনু। তার পরনে ধবধবে পাটভাঙা ধুতি, দুধ-রং সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে নতুন পাম্প-শু। সাজসজ্জা তারও কিছু কম না। বিব্রত হেসে বিনু বলল, 'না মানে—'

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঝুমা বলতে লাগল, 'যা সেজেছ, এখন কারো সঙ্গে মালা-বদল করিয়ে দিলেই হয়—'

বিনুর আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল: হাসতে হাসতে বলল, 'আমার আপত্তি নেই। একজন যদি রাজী থাকে আজই—' বলে চোখের তারায় ইঙ্গিত করল।

ইঙ্গিতটা বুঝেছে ঝুমা। ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'আহা-হা, আহ্লাদ কত—'

বিনু হাসতেই লাগল।

ঝুমা আবার বলল, 'ওবেলা তোমাদের বাড়ি যাচ্ছি।'

'বরযাত্রীদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, বাসর জাগব। তোমাকেও জাগতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'বাসরে তোমার কী হাল করি, দেখো।'

'আচ্ছা।'

একটু ভেবে ঝুমা বলল, 'বাসর তো সেই রাত্রিবেলায়। তখন যা হবার হবে। এখন একটু মজা করি—'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কী করবে?'

উত্তর না দিয়ে ছুটে কোথায় যেন চলে গেল ঝুমা। পরক্ষণেই ফিরে এসে বিনু কিছু বোঝবার আগেই এক গাদা হলুদ তার [illegible]-পাঞ্জাবিতে মাখিয়ে দিল।

বিনু বলতে লাগল, 'কী করছ! কী করছ?'

ঝুমা বলল, 'একদিন তো মাখতেই হবে। মাখলে কেমন লাগে, দ্যাখো—'

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। বেলা থাকতে থাকতেই দুই বর এসে পড়ল। বেশিক্ষণ তাদের বসতে হল না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের আসরে নিয়ে যাওয়া হল। সানাই, ঢোল, কাঁসি আর শাঁখের বাজনা, ঘন ঘন উলুধ্বনি—এর মধ্যে পর পর দুই মেয়েকে সম্প্রদান করলেন অবনীমোহন। সাত পাক ঘোরাবার সময় এয়োরা গান ধরল।

'আমতলায় ঝামুর ঝুমুর কলাতলায় বিয়া,
আইল গো সুন্দরীর জামাই মুকুট
মাথায় দিয়া।
মুকুটের তলে তলে চন্দনের ফোঁটা
চল সখি সবাই মিল্যা জামাই বরি গিয়া।
ও রাধে ঠমকে ঠমকে হাঁটে
শ্যামচাঁদের কাছে যেমন ময়ূরে প্যাখম ধরে।
আগে যায় গো শ্যাম রাজা
পাছে যায় গো রাধা,
তারও পাছে যায় গো পুরুত
ভৃঙ্গার হাতে লইয়া।
এক পাক, দুই পাক, তিন পাকও যায়,
সাত পাক গিয়া রাধা নয়ন তুইলা চায়।'

বিয়ের আসর থেকে সোজা বাসর-ঘরে। পাশাপাশি দুই বাসর-ঘর সাজানো হয়েছে। সেখানে মেয়েদেরই শুধু ভিড়। ঠাট্টা, ঠিসারা, বিদ্যুৎ চমকের মতন হাসাহাসি, ঠেলাঠেলি—এর মধ্যেই দুই ঘরে চাল খেলা, যো-খেলা হয়ে গেল। তারপর শুরু হল জামাই নাজেহাল-করা ধাঁধা। ধাঁধার পর স্নেহলতা রঙ্গিণী মূর্তি ধরলেন। দুই বাসরে ঘুরে ঘুরে মাথায় আড়-ঘোমটা টেনে মাজা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে গাইতে লাগলেন।

'ওগো বর এলাম তোমার বাসরে
একটা গান গাও না শুনি,
গান যদি না গাও, আমার নাতনীর
ধর পাও,
নহিলে মিলবে না সোনার চাঁদবদনী।'

এত ভিড়ের ভেতর ছুঁচের পেছনে সুতোটির মতন বিনুর পেছনে ঝুমা লেগেই আছে। আর ঝিনুক? জল খেলা, চাল খেলা, ধাঁধা, নাচ, গান, ঠাট্টা, রগড়—কিছুই যেন বুঝতে পারছিল না সে। পলকহীন ঝুমা আর বিনুর দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

এ বিয়ের আরো একটা দিক আছে। সেটা এইরকম। হেমনাথ রাজ্যসুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে এসেছিলেন, বিয়ে দেখার নেমন্তন্ন। কিন্তু খাবার জন্য তাদেরই ডেকেছিলেন যারা দেশজোড়া আকালে আর মন্বন্তরে একটু ফ্যানের আশায় রাজদিয়ার রাস্তায় রাস্তায় প্রেতমূর্তির মতন ঘুরে বেড়ায়।

সন্ধ্যে থেকে হেমনাথ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে তদারক করে খাওয়াচ্ছিলেন।

সকাল থেকেই লারমোর এ বাড়িতে আছেন। তিনি বলেছেন, 'এ কি করছ হেম! না খেয়ে খেয়ে ওদের পেট মরে গেছে। আর ওপর ভালমন্দ পড়লে আর দেখতে হবে না। সটান যমরাজার দরবারে গিয়ে হাজির হবে।'

হেমনাথ বলেছেন, 'এমনিও মরবে, অমনিও মরবে। না খেয়ে মরে কী হবে, খেয়েই মরুক।'

●

সুধা-সুনীতির বিয়ের মাসখানেক পর একদিন দুপুরবেলা ভয়ানক শ্বাসকষ্ট শুরু হল সুরমার। এক্ষুনি লারমোরকে ডেকে আনার জন্য করিমকে পাঠানো হল। কিন্তু লারমোর পৌঁছুবার আগেই সব শেষ।

এ বছর পুজোর পর থেকেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন সুরমা। চলাফেরা দূরের কথা, উঠে বসবার শক্তিটুকু পর্যন্ত তাঁর ছিল না। অদৃশ্য রক্তশোষা দেহের সব সার যেন চুষে নিয়ে একটা বাজে সাদা কাগজের মতন সুরমাকে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

এ বাড়ির লোকেরা মনে মনে অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়ে ছিল, বুঝতে পারছিল, সুরমা খুব বেশিদিন বাঁচবে না। দ্রুত আলো নিভে আসার মতন তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছিল। যা অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী, আজ দুপুরবেলা তা ঘটে গেল।

খবর পেয়ে সুধা-সুনীতি-হিরণ-আনন্দ ছুটে এল। শুধু কি ওরাই, কুমোরপাড়া-কামারপাড়া, যুগীপাড়া তিলিপাড়া সারা রাজদিয়া, রাজদিয়াই বা কেন, মৃত্যু-সংবাদ কানে যেতেই চারদিকের গ্রামগঞ্জগুলো থেকে অসংখ্য মানুষ মলিন মুখে হেমনাথের বাড়ির দিকে আসতে লাগল।

সমস্ত বাড়িখানা জুড়ে কান্না ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। সুধা-সুনীতি সুরমার অসাড় বুকে মুখ গুঁজে অবোধ শিশুর মতন কাঁদছিল, 'তুমি আমাদের ফেলে কোথায় গেলে মা?'

সুরমার শিয়রের কাছে বসেছিলেন স্নেহলতা আর শিবানী। সজল চোখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় তাঁরা বলছেন, 'আমাদের কাঁদাবি বলেই কি এতদিন পর রাজদিয়া এসেছিলি মা?'

একধারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ঝিনুক। আরেকধারে হেমনাথ এবং অবনীমোহন ঘন ঘন হাতের পিঠে চোখ মুছছিলেন। তাঁদের চোখ ফোলা ফোলা, আরক্ত, জলপূর্ণ।

এত কান্নার মাঝখানে বিনু কিন্তু একটুও কাঁদতে পারছিল না। বুকের ভেতর পাষাণভারের মতন কি যেন চেপে আছে, চোখ ফেটে যাচ্ছে কিন্তু এক ফোঁটা জলও বেরুচ্ছে না। এত লোকজন, এত কান্না, শোকোচ্ছ্বাস—কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছিল না সে। দেখতে বা বুঝতে পারছিল না। বিনুর সমস্ত অনুভূতি বুঝিবা অসাড় অবোধ হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে গেল।

ওদিকে কারা যেন কুড়োল দিয়ে বাগানের বুড়ো একটা আমগাছ কেটে ছোট ছোট খণ্ড করে ফেলল। তারপর

পুকুরের ওপারে উঁচু মতন জায়গাটায় চিতা সাজাল।

এদিকে স্নেহলতারা সিঁদুরে-চন্দনে এবং রাশি রাশি ফুলে সুরমাকে সাজিয়ে দিলেন। তারপর কারা যেন হরিধ্বনি দিয়ে তাঁকে কাঁধে তুলে পুকুরপারের দিকে নিয়ে গেল। হেমনাথ বিনুর একটা হাত শক্ত করে ধরে শবযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। সুধা-সুনীতি - স্নেহলতা - শিবানী - অবনীমোহন—কেউ বাড়ি থাকল না। সবাই চলেছে আর অভিভূতের মতন বুক ফাটিয়ে কাঁদছে।

বিনুর মনে হল, সে যেন মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছে না, হাওয়ার ভেতর ভারহীন হাল্কা শরীর নিয়ে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে।

চিতায় তুলবার আগে সুরমাকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হল। পুরুত জোরে জোরে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছিল। শব্দগুলো কানে আসছিল ঠিকই, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিল না বিনু।

একটু পর সুরমাকে চিতায় তোলা হল। এবার মুখাগ্নির পালা। বিনুকেই তা করতে হবে। কে যেন সাদা ধবধবে এক গোছা পাটশোলার মাথায় আগুন ধরিয়ে তার হাতে দিল। হেমনাথ তাকে শুদ্ধ চিতার চারধারে প্রদক্ষিণ করাতে লাগলেন। পুরুতটা মন্ত্র পড়তে পড়তে আগে আগে চলতে লাগল। বিনুর মনে হতে লাগল, তার চারপাশে সমস্ত চরাচর যেন দুলছে।

চিতাটাকে কবার প্রদক্ষিণ করেছে, বিনু মনে করতে পারল না। এক সময় পুরুতের কথায় মন্ত্রচালিতের মতন সুরমার মুখে পাটকাঠির আগুন ছোঁয়াল।

শবযাত্রীরা চারদিক থেকে চিৎকার করতে করতে বলতে লাগল, 'বল হরি—' 'হরি বোল—'

তার পরেই চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

কতক্ষণ আর? চৈত্র মাসের রাত গাঢ় হবার আগেই সুরমার রুগ্ন শীর্ণ দেহ চিতাধূমে বিলীন হয়ে গেল।

আগুন নিভে গেলে চিতা ধুয়ে শবযাত্রীরা পুকুরে স্নান করল, বিনুকেও স্নান করানো হল; তারপর নতুন কোরা কাপড়ের তেউনি পরানো হল তাকে; গলায় লোহার চাবি-বাঁধা ধড়া ঝুলিয়ে দেওয়া হল। হাতে দেওয়া হল এক টুকরো কম্বলের আসন।

পরদিন থেকে শুরু হল হবিষ্যি। ঘরের এক কোণে নিজের হাতে নতুন মালশায় আলো চালের একসেদ্ধ ভাত রাঁধে বিনু। কাছে বসে বসে সজল চোখে দেখিয়ে দ্যান স্নেহলতা। রাতে একটু দুধ আর ফলটল খেয়ে খালি মেজেতে এক টুকরো নতুন কাপড় পেতে শুয়ে পড়ে।

রাজদিয়ার সব বাড়ি থেকে হবিষ্যির উপকরণ পাঠাচ্ছে—আলো চাল, কাঁচা দুধ, ঘরে বাটা ঘি, আলু, কাঁচকলা ইত্যাদি।

দেখতে দেখতে শ্রাদ্ধ চুকে গেল। শ্রাদ্ধের পরদিন মৎস্যমুখী। রাজদিয়ায় হেন মানুষ নেই যে সুরমার শ্রাদ্ধে না এসে পেরেছে।

বিনুদের সংসারে এই প্রথম মৃত্যু। একটি মৃত্যুই বিনুর চোখে জগতের রূপ একেবারে বদলে দিয়ে গেছে।

এখন, এই চৈত্র মাসে হিজল গাছগুলো ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতে শুরু করেছে। ঝাউ গাছের ডালে ডালে গুটি ধরেছে। মান্দার আর শিমুল গাছগুলো সারা গায়ে থোকা থোকা আগুনের মতন লাল টকটকে ফুল ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাগানের আম গাছগুলোতে গাঢ় সবুজ রঙের আম লম্বা বোঁটায় সারা দিন দোল খায়। পরিষ্কার করে মুছে নেওয়া আয়নার মতন আকাশটা ঝকমকে। সকালে-দুপুরে-বিকেলে পুকুরের ওপারে শূন্য মাঠের মাথায় কত রকমের পাখি যে উড়তে থাকে—কানিবক, পানিকাউ, টিয়া, বক-বুলি, ধবধবে গো-বক।

যে দিকেই চোখ ফেরানো যাক, এখন শুধু রঙের সমারোহ। লাল-নীল-সবুজে মনোহর এই বসুন্ধরা বিনুকে আজকাল আর আকুল করে না। যুগল চলে যাবার সময় ধানের খেত, শাপলা বন, জলসেঁচি শাকের ঘন জঙ্গল, উলুখড়ের বন, কেয়া ঝোপ, বেত ঝোপ, বনতুলসীর চাপ চাপ অরণ্য—জলা বাংলার সজল শ্যামল ভূখণ্ডের সবটুকু উত্তরাধিকার তার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিল। এই সেদিনও একা একা শূন্য মাঠের আলপথ ধরে মোহাচ্ছন্নের মতন হেঁটে যেতে তার ভাল লাগত। আকাশ জুড়ে ফিনফিনে পাতলা ডানায় ফড়িংদের ওড়াওড়ি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে যেত। চনচনে সোনালি রোদ, উল্টোপাল্টা বাতাস, গাছপালা, বনানী, নরম তৃণদল—সব যেন জাদুকরের মতন তাকে সম্মোহিত করে ফেলত।

কিন্তু আজকাল সারা দিনই প্রায় পুবের ঘরের পৈঠেয় চুপচাপ বসে থাকে বিনু। পুকুরের ওপারে ধু-ধু ঐ দক্ষিণের চক, অনেক দূরের দিগন্ত, আকাশ, বনভূমি—সব মিলিয়ে যেন এক অপরিচিত মহাদেশ। ওখানকার কোন কিছুই সে জানে না, চেনে না। কোনদিন ওখানে সে যেন যায় নি, যাবার আকর্ষণও বোধ করে না।

দিনের বেলায় একটা দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে বিনুর। সুরমাকে যেখানে পোড়ানো হয়েছে তার পাশেই উঁচু বাজে-পোড়া সুপুরি গাছটার মাথায় সমস্ত দিন একটা শঙ্খ চিল ডানা মুড়ে বসে থাকে; সন্ধ্যে হলেই পাখিটা উড়ে যায়।

শুধু দিনের বেলাতেই না, রাত্রিরেও ঐ পৈঠেটিতে বসে থাকে বিনু। তার চোখের সামনে একটি দুটি করে তারা ফুটতে ফুটতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে যায়। এক সময় চাঁদও ওঠে।

রাজদিয়ায় আসার পর হেমনাথ তাকে নক্ষত্র চিনিয়েছিলেন। ঐ তারাটা অরুন্ধতী, ঐটা লুব্ধক, ঐটা শতভিষা। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে বিনু শুনেছিল, মানুষ মরে গেলে নাকি আকাশের তারা হয়ে যায়। ঐ সুদূর জ্যোতিষ্কলোকের কোন্ তারাটি মা, কে জানে।

প্রায় রোজই ঝিনুক তার পাশে এসে নিঃশব্দে বসে পড়ে। কখন যে মেয়েটা আসে টেরও পাওয়া যায় না। হঠাৎ এক সময় আধফোটা ঝাপসা গলায় সে ডেকে ওঠে, 'বিনুদা—'

বিনু মুখ ফেরায় না। উদাস গলায় বলে, 'কী বলছ?'

'মাসিমার জন্যে তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না!'

বিনু চুপ।

ঝিনুক আবার বলে, 'জানো বিনুদা, মায়ের জন্যে আমারও খুব কষ্ট লাগে।'

হঠাৎ বিনুর মনে হয়, ঝিনুকের সঙ্গে এক জায়গায় তার ভারি মিল। মেয়েটাকে বড় আপনজন মনে হয় তার।

সুরমার মৃত্যুর ব্যাপারে অনেক দিন স্কুল কামাই হয়েছে। প্রায় মাসখানেক পর আজ স্কুলে গেল বিনু।

সেটেলমেন্ট অফিসের কাছে আসতে ঝুমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আচমকা বিনুর মনে পড়ল, মায়ের মৃত্যুর পর রাজদিয়ার সব মানুষ তাদের বাড়ি গেছে। শুধু ঝুমা ছাড়া।

ঝুমা বলল, 'তুমি খুব রোগা হয়ে গেছ বিনুদা।'

অন্যমনস্কভাবে কি উত্তর দিয়ে বিনু বলল, 'মা মরে গেল। তুমি তো আমাদের বাড়ি একদিনও এলে না।'

দুই হাত এবং মাথা জোরে জোরে নেড়ে ঝুমা বলল, 'তোমাদের বাড়ি গেলেই তো কান্নাকাটি; ও-সব আমার ভাল লাগে না।'

পলকে মুখখানা মলিন হয়ে গেল বিনুর। মনে হল, ঝুমা বড় দূরের মানুষ।

●

সুরমার মৃত্যুর মাস দুই পর সুনীতিকে নিয়ে আনন্দ কলকাতায় চলে গেল। তাদের সঙ্গে শিশিররাও গেলেন। কলকাতার অবস্থা নাকি এখন ভাল। জাপানী বোমার ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল সব ফিরে আসতে শুরু করেছে।

যাবার আগের দিন সুনীতিরা দেখা করতে এসেছিল; ঝুমাও এসেছিল ওদের সঙ্গে।

আড়ালে ডেকে নিয়ে ঝুমা বিনুকে বলেছে, 'আমরা যাচ্ছি। কলকাতায় গিয়ে চিঠি দেব। তুমিও কিন্তু চিঠি লিখবে।'

আস্তে করে ঘাড় কাত করেছে বিনু।

সুনীতিরা চলে যাবার পর দুটো সপ্তাহও কাটল না। একদিন সকালবেলা হিরণ এসে হাজির।

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, 'কী ব্যাপার হিরণচন্দ্র?'

'একটা কথা ছিল দাদু—'

'নির্ভয়ে বলে ফেল।'

খানিক ইতস্তত করে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হিরণ বলল, 'আমি কলকাতায় একটা ভাল চাকরি পাচ্ছি দাদু—'

হেমনাথের ভুরু কুঁচকে গেল, 'কিসের চাকরি?'

'ওয়ারের। অফিসার র‍্যাঙ্কের চাকরি। নেব?' হিরণের চোখ চকচক করতে লাগল।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হেমনাথ, 'ওয়ারের চাকরি নিবি বলেই কি তোকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম! তুই চলে গেলে কলেজের কী হবে? ছি-ছি, লোভটাই বড় হল?'

হিরণের মুখ কালো হয়ে গেল।

এর পর অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকলেন হেমনাথ। বুঝলেন, হিরণকে আটকাবার চেষ্টা বৃথা। যুদ্ধের চাকরি তার অসীম শক্তি দিয়ে হিরণকে রাজদিয়া থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবেই। এক সময় গম্ভীর গলায় হেমনাথ বললেন, 'ইচ্ছে যখন হয়েছে যাও। তবে এতে আমার ভীষণ আপত্তি—' হেমনাথকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। খুবই হতাশ আর করুণ।

দিন কয়েক পর সুধাকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেল হিরণ।

●

দেখতে দেখতে আরো ক'মাস কেটে গেল।

সুরমা নেই। সুধা-সুনীতি চলে গেছে। হেমনাথের বাড়িটা এখন আশ্চর্য নিঝুম। কিছুদিন আগেও হৈ-চৈ, হুল্লোড় এবং জীবনের নানা প্রাণবন্ত খেলায় এ-বাড়িতে সব সময় উৎসব লেগে থাকত। এখন তাকে ঘিরে অপার শূন্যতা নেমে এসেছে যেন।

মাঝে মাঝে শিবানী আর স্নেহলতা সুরমার জন্য বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন। অবনীমোহন আর হেমনাথ উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন।

এখন বর্ষা।

মেঘ-বৃষ্টি-বাজ আর ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমক—চতুরঙ্গে আকাশ সারা দিন সেজেই আছে। ক'বছর ধরেই বিনু দেখছে, বর্ষা নামলেই পুকুরের ওপারের মাঠ ভেসে যায়। তার মাঝখানে কৃষাণ গ্রামগুলো দ্বীপের মতন কোন রকমে মাথা তুলে থাকে। মাটির তলায় কোথায় যে শাপলা-শালুক আর পদ্মের বীজ লুকিয়ে থাকে, কে বলবে? জল পড়লেই লাফ দিয়ে তারা বেরিয়ে আসে। সাদা সাদা শাপলা ফুলে, থালার মতন বড় বড় গোল পদ্মপাতায় আর লাল টুকটুকে শালুকে জলপূর্ণ চরাচর ছেয়ে যায়। গাঢ় সবুজ রঙের ধান আর পাটের চারাগুলো বর্ষার জলের ওপর দিয়ে মাথা তুলে থাকে। মাঝে মাঝে এক আধটা নিঃসঙ্গ বন্যা গাছ; কোথাও বা হিজলের জনতা।

এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। উত্তরে-দক্ষিণে-পুবে-পশ্চিমে, যেদিকেই তাকানো যাক, চোখ জুড়ে বর্ষার সেই পরিচিত জলছবি।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বিনু আর ঝিনুক পুবের ঘরে পড়তে বসেছিল। সামনে আড়াইতলা পিলসুজে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। অবনীমোহন এবং হেমনাথও এ ঘরেই ছিলেন। আজকের স্টিমারে যে খবরকাগজখানা এসেছে, দুজনে ভাগাভাগি করে পড়ছেন। সুরমার মৃত্যুর পর খবর কাগজ নিয়ে আজকাল আর এ-বাড়িতে আসর বসে না।

বাইরে অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল। হঠাৎ ঝুম ঝুম আওয়াজে বিনুরা মুখ তুলে তাকাল।

চোখের সামনে থেকে কাগজ নামিয়ে হেমনাথ বললেন, 'এই বৃষ্টিতে আবার কে এল?'

ততক্ষণে বিনু দেখতে পেয়েছে। উঠোনের মাঝখানে ঝিনুকদের ফীটনটা এইমাত্র এসে থামল।

বিনু বলল, 'মনে হচ্ছে ভবতোষ মামা এসেছেন—'

সত্যিই ভবতোষ। একটু পর তিনি ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

ভবতোষের দিকে তাকিয়ে সবাই চমকে উঠল। চুল এলোমেলো, চোখ দুটো লাল টকটকে এবং ফুলে ফুলে অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেছে। মনে হয়, যে কোন সময় সে দুটো ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। চোখের কোলে গাঢ় কালির ছোপ। কণ্ঠার হাড় ফুটে বেরিয়েছে। জামায় বোতাম নেই; বুকটা হাট করে খোলা; কোঁচার দিকটা অনেকখানি খুলে মাটিতে লুটোচ্ছে।

কেউ কিছু বলবার আগেই ভাঙা ভাঙা ঝাপসা গলায় ভবতোষ বললেন, 'কাকাবাবু, আপনার বৌমা সেই লোকটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে—' তাঁর চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়তে লাগল।

হেমনাথ চকিত হলেন, 'সে কি! বৌমা তার বাপের বাড়ি ছিল না?'

'হ্যাঁ। ওখান থেকেই গেছে। আচ্ছা, আমি যাই—' বলেই প্রায় ছুটতে ছুটতে ফীটনটায় গিয়ে উঠলেন।

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন একটুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ভব—ভব—'

ভবতোষ সাড়া দিলেন না। ঝুম ঝুম আওয়াজ কানে ভেসে এল। অর্থাৎ ফীটনটা চলতে শুরু করেছে।

কী করবেন, হেমনাথ যেন ভেবে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর চোখ এসে পড়ল বিনুর ওপর। দ্রুত শ্বাস টানার মতন করে বললেন, 'যা তো দাদা, ভবর সঙ্গে যা। ছেলেটা আবার ঝোঁকের বশে এক কাণ্ড না করে বসে! সব সময় ওর কাছে কাছে থাকবি। যদি তেমন বুঝিস, আজ রাত্তিরে আর ফিরতে হবে না।'

বিনু ছুটে গিয়ে যখন ফীটনটা ধরল তখন সেটা বাগান পেরিয়ে রাস্তার ওপর চলে এসেছে।

ভবতোষ বললেন, 'এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তুমি আবার এলে কেন?'

বিনু ভয়ে ভয়ে বলল, 'দাদু পাঠিয়ে দিলেন।'

শব্দ করে অদ্ভুত হাসলেন ভবতোষ, 'কাকাবাবুর ভয়, আমি বুঝি আত্মহত্যা করব। তা বোধহয় করব না। আচ্ছা, এসেছ যখন ওঠ—'

বিনু গাড়িতে উঠল।

তারপর চমকপ্রদ ব্যাপার ঘটল। পথে যত বাড়ি পড়ল সব জায়গায় গাড়ি থামিয়ে থামিয়ে জড়িত ভাঙা গলায় স্ত্রীর চলে যাবার কথা বলতে লাগলেন ভবতোষ। মানুষের বেদনা প্রকাশের রূপ কি বিচিত্র!

সারা রাজদিয়া ঘুরে ভবতোষ যখন তাঁর বাড়ি ফিরলেন তখন অনেক রাত। বাকি রাতটুকু কেউ আর ঘুমলো না। বিনুকে সামনে বসিয়ে সমানে স্ত্রীর কথা বলে যেতে লাগলেন ভবতোষ। সমস্ত শুনে বিনু যা বুঝল, সংক্ষেপে এই রকম।

বিয়ের আগেই ঝিনুকের মায়ের সঙ্গে একজনের ভালবাসা ছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর বাপ-মা এক রকম জোর করেই ভবতোষের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়েছেন। এ বিয়ে মেনে নিতে পারেন নি ঝিনুকের মা; সংসারে নিয়ত ঝগড়া-ঝাটি, অশান্তি লেগেই ছিল। পরিণামে একদিন তিনি বাপের বাড়ি চলে গেলেন। আজ সকালে খবর এসেছে, ভালবাসার সেই লোকটির সঙ্গে তিনি চলে গেছেন।

সমস্ত রাত ভবতোষের কাছে কাটিয়ে সকালবেলা বাড়ি ফিরল বিনু। ফিরেই দেখল, একা একা বসে ঝিনুক কাঁদছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিনু। ঝিনুককে দেখতে দেখতে অপার মমতায় তার মন ভরে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে ঝিনুকের পাশে গিয়ে বসে পড়ল সে। খুব কোমল গলায় বলল, 'কেঁদো না ঝিনুক, কেঁদো না—'

দু' হাতে মুখ ঢেকে ঝিনুক ফোঁপাতে লাগল, 'আমার মা চলে গেছে।'

বিনু বলল, 'আমার কথা একবার ভাবো তো; আমারও মা নেই।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে জলভরা গভীর চোখে বিনুর দিকে তাকাল ঝিনুক।

(ক্রমশঃ)

শুধুই মেয়েরা

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার

দক্ষিণ কলকাতায় সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের শাখা অফিসটি অনেকের মনেই কৌতূহল জাগায়। পরিচিত ব্যাঙ্কের সঙ্গে এর বিরাট অপরিচয়। আদান-প্রদান সমান চলছে। কেরাণী-অফিসার-পিয়ন সবই আছে। অথচ আমাদের এই ব্যাঙ্ক আমাদের পরিচয়ের গণ্ডীর মধ্যে নয়। এই শাখা অফিসটি অনেকখানি স্বতন্ত্র। আর সে স্বাতন্ত্র্যের কথা বলতে সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া ভাল। না হলে সবটাই ধোঁয়াটে থেকে যাবে।

১৯২৫ সালে মহীশূর রাজ্যে সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের গোড়াপত্তন। খুবই সাধারণভাবে। মোটামুটি পারিবারিক লেন-দেনই ছিল এর উদ্দেশ্য। তাই মূলধনও ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্যটি ছিল অন্য। যার সঙ্গে অন্যান্য ব্যাঙ্কের অনেকখানি ফারাক।

সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীটি এ পাই চেয়েছিলেন এই ব্যাঙ্কের কাজকর্মে মেয়েরা প্রাধান্য পাবে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, আমাদের দেশের মহিলারা সংস্কার কাটিয়ে ধীরে ধীরে জীবিকা ও পেশায় উৎসাহী হচ্ছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ভারতীয় ললনার এই আত্মপ্রকাশ আরো ব্যাপক হোক। গোড়া থেকে এরকম আকাঙ্ক্ষার মূলেই তিনি জলসিঞ্চন করেছেন। তিনি আরো জানতেন, মেয়েদের দায়িত্বজ্ঞানে ব্যাঙ্কের কাজ উন্নত পর্যায়ে পৌঁছুতে সক্ষম।

তখনও পর্যন্ত এ ধরনের চিন্তা আর কারো মাথায় আসে নি। ব্যাঙ্কের কাজকর্মে মহিলা কর্মীদের প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে তিনি প্রায় পথিকৃতের সমতুল। সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক তাঁর এই চিন্তার সম্যক মূল্য দিয়েছে। সারা দেশে ছড়ানো তাদের অসংখ্য শাখা অফিসে শতকরা পঁচিশজনেরও বেশি নারী-

ব্যস্ত কাউণ্টার

কর্মী নিযুক্ত রয়েছে। এর চেয়েও বড় গর্ব সিণ্ডিকেটের ব্যাঙ্কের প্রাপ্য। সেকথা বলার জন্য আবার গোড়ায় ফিরে আসতে হয়।

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের কাছে সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের এই শাখা অফিসটিতে জনাছয়েক কেরাণী এবং তিনজন অফিসার। এঁরা সবাই মহিলা। যা কিনা আমাদের একান্ত অপরিচিত। শুধু এটিই নয়। এরকম ব্রাঞ্চ সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের আরো ছ'টি আছে। কলকাতার এই শাখাটি মর্যাদায় সপ্তম। অষ্টমের মর্যাদা পাবে বোম্বাই। এ মাসেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

বলতে গেলে ব্যাঙ্কের কাজ-কারবারের ক্ষেত্রে এঁরা এরকম একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা ভেবেই। প্রথম শাখাটি স্থাপিত হয়েছিল বাঙ্গালোরে। সব মহিলা কর্মী। এটা ছিল অনেকখানি পরীক্ষামূলক। উদ্দেশ্য ছিল, যদি সফল হওয়া যায় তবে ভবিষ্যতে পরিকল্পনার বিস্তৃত রূপায়ণ করা হবে। পরীক্ষা সফল হয়েছে। শুধু সফল নয়, এখান থেকেই তাঁরা আরো প্রেরণা পেলেন এ ধরনের শাখা অফিস স্থাপনের। যার ফলশ্রুতি দক্ষিণ কলকাতার শাখা অফিসটি।

ব্যাঙ্গালোরের শাখা অফিসটি স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালে।

দক্ষিণ কলকাতায় এ ধরনের একটি ব্যাংক হতে দেখে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, এটি শুধু মহিলাদের উদ্দেশ্যেই খোলা হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই এখানে লেন-দেন করতে পারেন। এমন কি অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে একজন শিশুরও সে অধিকার আছে। পাড়ার মধ্যে ব্যাংক তাই লেনদেনের সময়ও বেশ বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। শনিবার ছাড়া রোজই সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত এজন্য সময় নির্দিষ্ট। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে টাকা তোলা বা জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা। এতে পল্লীবাসীদেরও অনেক সুবিধা।

আসল উদ্দেশ্য আরো গভীরে, পুরোপুরি মহিলা কর্মী নিয়োগ করে ব্যাংকের কাজকর্মে তাঁদের উৎসাহসঞ্চার। এজন্য সিণ্ডিকেট ব্যাংক ধন্যবাদ দাবী করতে পারে। সেই সঙ্গে এই নিদারুণ অভিজ্ঞতাও স্মরণীয়। ১৯৬৫ সালে সিণ্ডিকেট ব্যাংকের কলকাতা অফিস স্থাপিত হয়। এখানে বেশী মহিলা কর্মী নিয়োগ করার ইচ্ছে কর্তৃপক্ষের ছিল। সে অনুযায়ী খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। কিন্তু কোন মহিলা কর্মীর আবেদনপত্র জমা পড়ে নি। এঁরা দমলেন না। আবার বিজ্ঞাপন দিলেন। এলো তেরটি আবেদনপত্র। সবাইকে নিয়োগ করা হলো। মাত্র চার বছর আগের কথা। ইতিমধ্যে অবস্থার অনেকখানি উন্নতি হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন এই শাখা অফিসটি সম্পূর্ণ মহিলা-কর্মী নিয়ে শুরু হয় তখন আর তাঁদের সে রকম অসুবিধায় পড়তে হয় নি। বরং উল্টোটাই হয়েছে। এখনও চাকরির জন্য মেয়েদের কাছ থেকে অসংখ্য আবেদন আসে।

মেয়েরা ব্যাংকের কাজকর্ম চিরকাল ভয় পায়। লেজারের খাতায় বিশাল আয়তন তাঁদের রীতিমত ভাবিয়ে তোলে। তাছাড়া হিসাব-কিতাবে কোথায় ভুলভ্রান্তি ঘটে যায় তার ঠিক-ঠিকানা নেই। যে কাজ নিয়ে পুরুষেরা হিমসিম খেয়ে যায় সেখানে মেয়েরা থই পাবে কি করে। এরকম চিন্তাধারার জন্যই মেয়েরা প্রথমে ব্যাংকের কাজে উৎসাহ দেখায় নি। সে ভুল তাঁদের ভেঙেছে। এখন ব্যাংকের কাজে এঁরা রীতিমতো উৎসাহী।

এ ব্যাপারে সিণ্ডিকেট ব্যাংক যতখানি উৎসাহী অন্যান্য ব্যাংকে সে উৎসাহের অভাব অনেকখানি। কোন কোন ব্যাংকে ইদানীং মহিলাকর্মী দেখা যায়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ তাঁদের দেওয়া হয় না। ব্যাংকের খুব সাধারণ কাজেই তাঁরা বহাল হন। সিণ্ডিকেট ব্যাংকের মতো এ ব্যাপারে তাঁরা উৎসাহ প্রকাশ করলে ফল ভালই হবে। একথা বলা কোনমতেই অন্যায় হবে না।

ব্যাংকের কাজকর্মে প্রথমে মেয়েরা যে উৎসাহ প্রকাশ করে নি সেজন্য শুধু বাংলাদেশ দায়ী নয়। কমবেশী সর্বত্র একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে বাংলা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারতের মহিলারা স্বভাবতই রক্ষণশীল। চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটাতে এঁদের একটু সময় লাগে। সেটুকুই যা অপেক্ষা। তারপর এঁদের মতো দক্ষ কর্মী খুঁজে পাওয়া ভার। এই রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে আছেন পাঞ্জাবের মহিলারা। কাজকর্মে তাঁরা দারুণ উৎসাহী। অফিসের কাজে তাঁরা দরজায় দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে প্রস্তুত। বাঙালী মেয়েরা এতে ঠিক এখনও অভ্যস্ত হতে পারে নি।

ব্যাংকের কাজকর্মে মেয়েদের উৎসাহ প্রকাশের মাধ্যমে এঁদের সংকোচ কাটানোও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলা অথবা লেনদেন করা অনেকখানি মনের জোরের দরকার। এই মনের জোর সঞ্চয় করতে পারে নি বলেই দীর্ঘদিন এই কাজে তাঁরা নিস্পৃহ ছিল। এবার সুযোগ যখন পেয়েছে তখন তার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে তবে ছাড়বে।

মেয়ে কর্মী নিয়োগের আর একটা উদ্দেশ্য হলো ভাল ব্যবহার। ব্যাংকে যাঁরা আসেন তারা বিনয়ের উপর গুরুত্ব বেশি দেন। বিনয়ী এবং ভদ্র ব্যবহারে মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই অভ্যস্ত। সহজে তাঁরা চটেনও না। এদিক থেকে ব্যাংকের সুনাম বাড়ে। এর ফলে ব্যাংকের কাজকর্মের প্রসার ঘটে। ব্যাংকের উন্নতি হয়। মূলধন বাড়ে।

ম্যানেজার শ্রীমতী ললিতা শেটীর ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। জানতে চাইলাম, হঠাৎ দক্ষিণ কলকাতার প্রায় নিভৃত অঞ্চলে এই অফিস খোলা হলো কেন?

উত্তরে তিনি জানালেন, সঞ্চয় বাঙালী মেয়েদের অনেক পুরনো অভ্যাস। এই শাখায় আমরা সেই সুযোগটি কাজে লাগাতে চেয়েছি। সে জন্য জমজমাট অফিস পাড়া বা অন্য অঞ্চল ছেড়ে এখানকার উপরই আমরা গুরুত্ব দিয়েছি বেশি।

কথাটা এতক্ষণ মনে ছিল না। সত্যি তো জমানো আমাদের একটা মস্ত বড় অভ্যাস। লক্ষ্মীর কৌটো থেকে শুরু করে নানাভাবে আমরা জমাই। এই বিপদে-আপদে বড় কাজে আসে। হঠাৎ টাকার প্রয়োজন হলে এখানে হাত পড়ে। বাড়ির পুরুষেরা এই জমানোর কথা জানতেও পারে না। আজকাল অবশ্য এভাবে জমানোর রেওয়াজ কমে আসছে। সবাই কোন না কোন ভাবে টাকা বিনিয়োগ করছে। তবু অভ্যাসটি পুরোপুরি বদলায় নি। পল্লীর মধ্যে ব্যাংক খোলায় এখানেও টাকা জমানোর সুযোগ পাওয়া যাবে। আর এই টাকা এমনি না বসে থেকে কিছু সুদও আসবে। মেয়েদের এই সঞ্চয়-অভ্যাসকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এঁরা আরো একটি উপায় স্থির করেছেন। পিগমী ডিপোজিট নামে এক ধরনের সঞ্চয়ব্যবস্থা এঁরা চালু করেছেন। এখানে প্রাত্যহিক সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে। পঁচিশ পয়সা থেকে শুরু করে যেকোন টাকা এখানে জমানো যায়। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো পিগমী ডিপোজিট বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করা হবে। এর ফলে সঞ্চয় ব্যবস্থা আরো উন্নত হবে এবং সঞ্চয়ে উৎসাহও বাড়বে।

দক্ষিণ কলকাতায় সিণ্ডিকেট ব্যাংকের এই শাখা অফিসটি ইতিমধ্যেই পাড়ায় বেশ উৎসাহের সঞ্চার করেছে। কাউন্টারে স্ত্রী-পুরুষের-ভিড় থেকেই সেকথা অনুমান করা চলে। এঁদের পরিকল্পনা আছে, কলকাতা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধরনের শাখা খোলার। আপাতত এঁরা ব্যস্ত বিভিন্ন রাজ্যের মূল শহরগুলি নিয়ে, যেখানে এখনো মহিলা পরিচালিত শাখা খোলা সম্ভব হয় নি।

জানতে চেয়েছিলাম শ্রীমতী ললিতা এই ব্রাঞ্চে সরাসরি ম্যানেজার হয়ে এসেছেন কিনা?

১৯৬৬ সালে তিনি সিণ্ডিকেট ব্যাংকে যোগদান করেন। পনের মাস ট্রেণিং নেন, মহীশূরে ব্যাংকেরই স্টাফ ট্রেণিং কলেজে। এখানে সকল কর্মচারীরই ট্রেণিংয়ের ব্যবস্থা আছে। তারপর নিয়োগ। প্রথমে যোগদান করেন মণিপল অফিসে—সিণ্ডিকেট ব্যাংকের হেডকোয়ার্টার। তারপর অনেক জায়গা ঘুরেছেন। তবে এই ব্যাংকের গোড়া থেকেই তিনি এর ম্যানেজার।

রীতিমতো উৎসাহব্যঞ্জক। শ্রীমতী ললিতা চাকরি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সারা দেশ। আর আমরা চাকরি করলেও কলকাতা ছাড়তে রাজি নই। মহিলা তো বটেই। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদেরও এরকম মনোভাব।

আমরা কি সত্যি পিছিয়ে পড়ছি?

আমার মনের কথা বোধহয় তিনি আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই অন্য প্রসঙ্গ আনলেন। এই ব্যাংকে যাঁরা অ্যাকাউন্ট খোলেন তাঁদের নানাভাবে সাহায্য করা হয়। কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, টাকা তুলতে হবে প্রভৃতি নানা ব্যাপারে ব্যাংক তার কাস্টমারদের সাহায্য করে। তাছাড়া সঞ্চয়ব্যবস্থায় সকলকে উৎসাহী করা এঁদের কর্মসূচীর অঙ্গ।

সম্প্রতি এঁরা উদযাপন করছেন সঞ্চয় সপ্তাহ। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে। নামে সপ্তাহ হলেও চলবে মাসভর। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধী তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এঁরা যে উৎসাহ প্রদান করে চলেছেন তাও সফল হবে প্রথম

পুরোপুরি মহিলা কর্মী নিয়ে ব্যাঙ্ক শুরু প্রচেষ্টার মতোই। স্থানীয় মেয়েদের ব্যাঙ্কের কাজে টেনে নিয়ে মহিলা পরিচালিত ব্যাঙ্কের গৌরবে যেমন তেমনি সঞ্চয় ব্যবস্থার উৎসাহদানেও এঁরা পথিকৃতের মর্যাদা দাবী করতে পারবেন, আশা করা যায়।

—প্রমীলা

মহিলা শিল্পী মহল

'মহিলা শিল্পী মহল' এখন নিজস্ব বাসগৃহে সু-প্রতিষ্ঠিত। কড়েয়া রোড থেকে গরচা ফার্স্ট লেনে নিয়মিত এখন এঁদের অধিবেশন বসছে। কিছু প্রবীণা শিল্পী (এখন আর দুঃস্থা নন) এখানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিজ গৃহের স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছেন। সেদিন গিয়ে দেখি নতুন বইএর রিহার্শ্যাল চলছে। মলিনা দেবী, মঞ্জু দে, নীলিমা দাস 'মঞ্জরী অপেরা'র রিহার্শ্যালে মশগুল। পাশের ঘরে কানন দেবী, নমিতা সিংহ, সাধনা রায়চৌধুরী, অনুভা গুপ্তা হিসেবপত্র দেখছেন।

আর একটি ঘরে সকলের 'মাসী' (অন্যতমা আশ্রয়প্রাপ্তা শিল্পী) চা তৈরী করছেন সবার জন্য। যেন বিরাট এক সংসারে প্রতিটি মানুষ নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বাস করছে। চারিদিক ঝকঝকে, নতুন বাড়ীটি যেন লক্ষ্মীশ্রী।

আজ যা সহজ-সুন্দর তার পেছনে আছে কত দিনের পরিশ্রম, স্বপ্ন-সাধনা। 'এই মহিলা শিল্পী মহলের প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে?'—প্রশ্ন করতেই সবাই বললেন, 'ঐ ত আমাদের হেড অফিস—কাননদি বসে। ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন—সব জানতে পারবেন।' অগত্যা কানন দেবীর কাছে যাই এতবড় পরিকল্পনার উৎস সন্ধানে।

কানন দেবী বললেন, 'অনেক দিন আগের কথা ছবির কাজ তখন চলছে। এক-দিন স্টুডিওতে গিয়ে গাড়ী থেকে নামতে যাব হঠাৎ সারা মুখ ঘোমটায় ঢাকা এক মহিলা শুধু নীরবে হাতটা আমার সামনে পেতে দাঁড়ালেন। একটু আশ্চর্য লাগল—চাওয়ার অভিনবত্ব দেখে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝলাম সাধারণ দীন-দুঃখী ইনি নন—হাত-পাততে আত্মসম্মানে বাধছে বলেই অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকা। সেদিন বেশী টাকা সঙ্গে ছিল না। ব্যাগ হাতড়ে যা পেলাম, জোর পাঁচ কি সাত টাকা তাঁর হাতে দিতেই দু হাত তুলে মাথাটি সামনের দিকে হেলিয়ে নমস্কার জানিয়ে চলে গেলেন।' একটু থেমে যেন এক ঝলক অতীতের পানে দৃষ্টি বুলিয়ে কানন দেবী বলে চললেন, 'পরে জেনেছি ইনি এককালে প্রখ্যাতা অভিনেত্রী ছিলেন—আজ ভাগ্যের ফেরে এই অবস্থা।

সারাদিন ধরে কাজকর্ম করছি, কিন্তু সেই ঘোমটা-ঢাকা মূর্তির ছবি ভুলতে পারছি না। কত যে এলোমেলো চিন্তা মনের কোণে ভীড় করছে। যে সব শিল্পীরা লক্ষ লক্ষ দর্শককে আনন্দ দেন, তাঁদের কাছে আনন্দ গ্রহণ করতে কারো সঙ্কোচ নেই, সঙ্কোচ শুধু তাঁদের মানুষের অধিকার ও সম্মান দিতে। প্রচুর আয় করে স-সম্মানে যাঁরা সু-প্রতিষ্ঠিত সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বাদ দিলে কি গ্লানিভরা জীবনযাপন করতে হয় অধিকাংশ শিল্পীকে। 'দেহপট সনে নট সকলই হারায়' তাই! কিন্তু কেন হারাবে? এ-কথা শিল্পীদেরই চিন্তা করতে হবে। স-তীর্থ-দের কথা তাঁরা না ভাবলে কে ভাববে! উপরি উক্ত প্রার্থী ছাড়াও মাঝে মাঝে অনুরূপ দুঃস্থা শিল্পীরা আমার কাছে আসতেন, সাধ্যমত কাউকে বিমুখ করিনি। কিন্তু সে সাহায্য কতটুকুই বা? মরুভূমিতে জলবিন্দুর মত। এঁদেরই কাছে শুনেতাম সাহায্য চাইতে বেরিয়ে নানান নিগ্রহ ও অপমানের কাহিনী। মনে বড় লাগত, আজ আমার যদি ঐ অবস্থা হোত? এর কি উপায় করা যায়? একবার মনে হোল গভর্ণ-মেন্টের সাহায্য চাই। তারপরই ভাবলাম তার আগে আমরা 'মহিলা-শিল্পী'রা একবার যদি চেষ্টা করে দেখি? অবসর সময়ে রিহার্শ্যাল দিয়ে নাটক তৈরী করে 'অল ফিমেল কাস্ট'—রূপে যদি মঞ্চস্থ করা যায় অন্ততঃ নতুনত্বের আকর্ষণেও ত লোক আসবে? পরে না হয় কিছুটা এগিয়ে সরকারের শরণাপন্ন হওয়া যাবে। উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা সম্বন্ধে অপরকে কনভিন্স করার স্টেজে না আসা পর্যন্ত অর্থ সাহায্য না চাওয়াই ভাল। আমি, চন্দ্রা, মলিনা, সরযূ, সুনন্দা সবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে আমার পরিকল্পনার কথা বলতে ওরা খুব উৎসাহিত হোল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহও প্রকাশ করল 'মাত্র কয়েকজন মহিলা মিলে এতবড় কাজে হাত দেওয়াটা একটু বেশী দুঃসাহসিক হবে না কি?' 'ভাল কাজের চেষ্টা যদি বিফলও হয়, তাতে লজ্জার কোনো কারণ নেই। কিন্তু যদি সফল হয়—সারা ভারতবর্ষের সামনে বাংলার মহিলা শিল্পী মহল একটা আদর্শ রেখে যাবে। নিরাশ্রয় শিল্পীদের লোক শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখবে।'

তারপর সবাই মিলে 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'—পণ করে কাজ সুরু করলাম—সার্থকতা আশাতীত। বড়রা ছাড়াও নমিতা, মঞ্জু, সাধনা, অনুভা প্রথমের দিকে কি অমানুষিক পরিশ্রম করেছে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আজ আমাদের স্বপ্ন সার্থক। কলকাতার যাকে বলে ইম্পর্ট্যান্ট কোয়ার্টার সেখানে মেয়েরাই মেয়েদের আশ্রয়গৃহ নির্মাণ করল।

এ কি ভাবা যায়? আর এটা সম্ভব হোল মহিলা শিল্পী মহলের প্রতিটি সভ্যর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং এই সমিতির প্রতি ভালবাসার দরুণ। ছোটদের কাছে যে শ্রদ্ধা আনুগত্য পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। কিন্তু মলিনা, সরযূ এঁরা এত বড় বড় শিল্পী হয়েও সব সময় সব কাজে আমার সিদ্ধান্তকেই হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। এটা আমার কোনো বিশেষ গুণে নয় নিজে-দের স্বভাব-মাধুর্যে—এ কথা আমি কখনও ভুলি না।' —একটু চপ করে আবার বলেন, 'একটা ছোট্ট ঘটনা ভুলতে পারছি না। বাড়ী কেনার পর আমাদের ফান্ড একটু অভাবগ্রস্ত হওয়ায় আমরা চিন্তা করছিলাম কি করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়? আমাদের সমিতিরই একজন সভ্য যিনি সাধ্যাতীত পরিশ্রম করে যাত্রা, থিয়েটার, ফিল্ম থেকে যা আয় করেন, তা ঐ হাড়ভাঙ্গা খাটনীর তুলনায় কিছুই না। কিন্তু সেই টাকা থেকে তিনি পঞ্চাশ টাকা এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমার টাকাটা সমিতির কাজে লাগলে খুশী হব।' —সমিতি বহু টাকা তুলেছে, তুলবেও। কিন্তু ঐ টাকার দাম আমার কাছে পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশী। —এছাড়া জনসাধারণ এবং বিশেষ করে প্রেস ও সংবাদপত্রগুলি সীমাহীন আমায়িকতায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের কাজকে যেন একশ বছর এগিয়ে দিয়েছেন। এঁদের সাহায্য না পেলে স্বপ্ন আজ স্বপ্নই থেকে যেত।'—'এর পরের অধ্যায় সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন?'—সাগ্রহে প্রশ্ন করি।

'এরপরের কাজ সত্যিই যাঁরা নিরাশ্রয় তাঁদের সম্মানে এই গৃহে আশ্রয়দান করা, হসপিটালে অসুস্থদের জন্য বেড-এর ব্যবস্থা করা। কারণ শিল্পীদের নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখাশুনা, সেবা করা যেমনভাবে করা দরকার হয়ত হয়ে ওঠে না। এছাড়া অবসর সময়ে সেলাই, নানা হাতের কাজ ও অন্যান্য কাজে সময়টার সদ্ব্যবহার ও সমিতির অর্থাগমের চেষ্টা যাতে করেন, সেদিকে নজর দেওয়া হবে। এঁদের মনকে সুস্থ ও প্রফুল্ল রাখবার জন্য মাঝে মাঝে বাইরের শিল্পীদের এনে একটু গান-বাজনা, কোনো অধ্যাপক বা পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করে গীতা ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা করার ইচ্ছে আছে।

'আমি এখনও লক্ষ্যে পৌঁছেছি বলে মনে করি না এটা একটা উৎসাহদ্দীপক অধ্যায় মাত্র। সত্যিকারের কাজ এইবার করতে হবে।'

কানন দেবী থামলেন—তারপর একটু হেসে বললেন, 'সেদিন এক দর্জির দোকানে যেয়ে বললাম পুজো আসছে আপনার ত স্টক-ক্লিয়ার করবেন, আমাদের গরীব শিল্পীদের জন্য কিছু জামা ভিক্ষা দিন। বলার সঙ্গে সঙ্গে ১০।১২টা ব্লাউজ পেলাম। এই রকম সাহায্য সবাই-ই করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আর সবার ওপর আপনারা সংবাদপত্র বিভাগ ত রইলেনই, আর রইল দেশবাসীর ভালবাসা। কাজেই আমাদের মত ভাগ্য কটা সংস্থার হয়?' হাতজোড় করে যেন সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালেন। হৃদয়ের এই ব্যাপ্তি—এই অপর আত্মার সঙ্গে একাত্মতা বোধই হয়ত কানন দেবীর সার্থকতার রহস্য।

—সুধ্যা সেন

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

২৭

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন

মেঘমুক্ত

চন্ডী মন্ডল

মুহূর্তেই সেই অতীত আজই সকালে ঘটা ঘটনার মত আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কলকাতায় তখন আমি আরো ভীষণ একা। লোকের কাছে পরিচিত অন্তরঙ্গ হবার জন্যে এবং বন্ধুত্ব করার জন্যে প্রয়োজনীয় কোন গুণেই আমার ছিল না। দিনে দিনে শরীর ভেঙে পড়ছিল। কালীঘাটের প্রায় আলোবাতাসহীন মেসের নোংরা অসুস্থ পরিবেশ আমার প্রাণশক্তি জীবনের সকল আনন্দ তিলে তিলে গ্রাস করছিল। বিস্বাদ আর বিষাদে ক্রমশ আমি ক্লান্ত অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম। শীঘ্রই একটা মারাত্মক অসুখ আমাকে নিশ্চয়ই নিঃশেষ করে দিত। কিন্তু একটি রবিবারের কাগজের বিজ্ঞাপন সেই যাত্রায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিল।

পুরোনো বালিগঞ্জের একটি অভিজাত পাড়ায় মার্জিত পরিবেশের নির্মল আলো-বাতাস—প্রাচুর্যে চমৎকার শৌখিন একটি মেসে উঠে প্রাণভরে আমি সুস্থ জীবনের স্বাদ উপভোগ করলাম। দোতলার একটি ফ্ল্যাটে আমাদের সেই মেস। সামনের খোলা বারান্দার প্রায় মুখোমুখি একই বাড়ীর অন্য একটি ফ্ল্যাট। একই সিঁড়ি মেসের লোক-জনের এবং ঐ ফ্ল্যাটের ফ্যামিলির ওঠানামার পথ।

ছোট সেই ফ্যামিলির অনেক খবর দু দিনেই আমার শোনা হয়ে গেল। গৃহকর্ত্রী যদিও তিন বছরের একটি কন্যার জননী কিন্তু ভদ্রমহিলা বয়েসে প্রায় তরুণী। নানান কারণে ভদ্রমহিলা নাকি অসুখী। স্বামী ভদ্রলোকটিকে দেখলাম, ভীষণ রোগা লম্বা, অনেক বয়েস হয়েছে মনে হয়, নুয়ে পড়েছেন, নোংরা জামাকাপড় পরেন, সুরুচি সংস্কৃতির প্রতি মারাত্মক রকম উদাসীন। অথচ ভদ্রলোকের নাকি অনেক টাকা, একটা বেশ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসার মালিক। কিন্তু ভীষণ কৃপণ। মুখ ভেঙে গেছে, চোখে মুখে চালচলনে এমন একটা অপ্রীতিকর রুক্ষ ভাব, অথচ, ওঁর স্ত্রী, তিনি আশ্চর্য সুন্দরী, দেখলে মনে হবে তিনি নিশ্চয়ই উচ্চ-শিক্ষিতা, চেহারায় প্রকাশে এমন একটা মুগ্ধ মাধুর্য এমন একটা আশ্চর্য স্নিগ্ধতা পবিত্র রুচির এমন একটি আলোকিত প্রকাশ তিনি,

যে কেউ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হবেই। আমি দু' দিনেই নিঃসন্দেহ হলাম ঐ ভদ্রলোক ঐ মুগ্ধ উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বময়ী ভদ্রমহিলার স্বামী হবার কিছুতেই উপযুক্ত হতে পারেন না। শুধু টাকার প্রাচুর্যে অমন সুন্দরী স্ত্রীকে অধিকার করে আছেন। ভদ্রমহিলাকে দেখেও আমার তাই মনে হল—ঐরকম একটি অনভিপ্রেত পুরুষের স্বামীত্ব যেন দুর্বিসহ বোঝার মত তাঁকে ক্লান্ত পঙ্গু করছে। স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার তীব্র ইচ্ছায় প্রতিনিয়ত মনে মনে পীড়িত হচ্ছেন। নিদারুণ বিতৃষ্ণায় আপন মনেই অহরহ জ্বলছেন কিন্তু প্রকাশ্যে কোনরকম প্রতিবাদ করছেন না, করতে পারছেন না। তাই আরো ভীষণ চাপা ক্ষোভ ও অভিমানে তিনি অন্তরে গুমরে মরছেন। শেষ পর্যন্ত এই দুঃখকে স্বীকার করে এক বিচিত্র সান্ত্বনার পথে নিজেকে শান্ত সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। জীবনের যে স্বপ্ন আশা সার্থকতার বিশ্বাস একদিন সজীব ছিল সেই সমস্ত একে একে তিনি ভুলে যাচ্ছেন। দুঃস্বপ্নের মত স্বামীর কাছে চিরদিনের মত আত্মসমর্পণের জন্যে তিলে তিলে অদ্ভুতভাবে নিজেকে তৈরী করছেন।

অথচ এখনও ভদ্রমহিলার মুখে চেহারায় ব্যবহারে ভঙ্গীতে যে দুর্লভ কাব্যিক সৌন্দর্যবোধ ও আশ্চর্য আভিজাত্যের ইঙ্গিত লক্ষ্য করি তা অনুসরণ করে বিয়ের পূর্বে তাঁর মন কেমন ছিল তা আবিষ্কার করে আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হই। তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে ক্ষোভে বিদ্রোহে আমিও মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। ভদ্রলোক টাকা আর ব্যক্তিগত দৈহিক সুখভোগ ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই বোঝেন না। স্ত্রীর মনের কোন খবরই রাখেন না। সে চেষ্টা বিন্দুমাত্র করেন না। তিনি সকালে বেরিয়ে যান, অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফেরেন। বাচ্চা মেয়েটিকে নিয়ে ভদ্রমহিলা সারাদিন একা থাকেন। অতীতে দেখা ভবিষ্যতের সেই স্বপ্ন কল্পনা আশাগুলোর হাত থেকে এখনও সম্ভবত তিনি নিষ্কৃতি পান নি, সারাদুপুর সারা বিকেল ধরে বারান্দায় পায়চারি করেন আর যেন গভীরভাবে কত কী ভাবেন। অন্তরের দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা তাঁর মুখে আশ্চর্য করুণ বেদনাবিধুর বিষণ্ণতা এ'কে দেয় নিবিড়ভাবে, আমি তা লক্ষ্য করি। দুপুরে একটা স্কুলে আমার পড়ানোর চাকরী। বিকেল থেকে আমার অসীম অবকাশ, মেসের অন্যান্য লোকজনের কেউ সন্ধ্যের আগে ফেরে না, সারা বিকেল ধরে ফাঁকা মেসের মধ্যে একলা ভদ্রমহিলাকে দেখা লক্ষ্য করা আমার গভীর কৌতুহলের কাজ, যার নেশা ক'দিনেই আমাকে অদ্ভুত মোহে আবিষ্ট করল।

ভদ্রমহিলাকে কোনদিন কোথাও যেতে দেখি না। তাঁর বাড়ীতেও কখনো কোন আত্মীয় স্বজনকে আসতে দেখি নি। মাঝে মাঝে ছোট মেয়েটির ওপর বিরক্ত হয়ে তাকে ধমকাতে থাকেন, একটুতেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। সন্তানকে নিষ্ঠুরভাবে ধমক দেবার মধ্যে তাঁর জীবনের ব্যর্থতা নৈরাশ্য পীড়ার যন্ত্রণার অনুরণন আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারি। ক্রমশ বুঝতে পারি ভদ্রমহিলা সত্যিই একটুও সুখী নন। কোনদিন একবারের জন্যেও যথার্থ ভালো শাড়ি পরেন না, কোনদিন একটু সাজেন না, চুলটাও কোনদিন বাঁধেন না, ভালো করে আঁচড়ানই না,—সারাক্ষণ উদাসীন অন্যমনস্ক বিষণ্ণ। আমি স্থির বিশ্বাসে সিদ্ধান্ত করলাম তিনি এই স্বামী এই সংসার কোনদিন চান নি। তাঁর অন্য স্বপ্ন ছিল। অন্য প্রকৃতির, তাঁর মনেরই সমধর্মী পুরুষের স্বপ্ন তিনি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। বিকেল থেকে সন্ধ্যা অনেক রাত্রি পর্যন্ত এমন কি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে আমি ভদ্রমহিলার কথা ভাবি। তাঁর প্রতি এক আশ্চর্য সহানুভূতিতে আমার মন আপ্লুত হল। সেই সহানুভূতি ক্রমশ এক আশ্চর্য দুর্বার আকর্ষণে আমাকে পৌঁছে দিল। এমন হল যে ভদ্রমহিলাকে বেশিক্ষণ না দেখতে পেলে আমি স্থির থাকতে পারি না। অন্য কোন কাজে অন্য কোন ভাবনায় আমি আর মন দিতে পারি না। প্রায়ই শরীর ভাল নেই বলে ক্লাস ফেলে রেখে মেসে চলে আসি। মাঝে মাঝে স্কুলে যাওয়াও বন্ধ করলাম।

একদিন মনে হল তাঁর প্রতি আমার এই দুর্বলতার কথা ভদ্রমহিলা বুঝতে পেরেছেন। চেয়ে চেয়ে তাঁকে দেখছি, তাঁর সঙ্গে হঠাৎ চোখাচোখি হলে আমি লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিই, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাঁর প্রতি মুখ না তুলে পারি না। অবাক হয়ে দেখি তিনিও আমার মুখের দিকে চেয়েছেন। কেমন করে জানি না, হাজার অদ্ভুত হলেও ব্যাপারটা আমার কাছে খুব স্বাভাবিক সঙ্গত মনে হল, আমি ভাবলাম আমিই ভদ্রমহিলার স্বামী হবার উপযুক্ত ছিলাম। ভদ্রমহিলার যেটুকু পরিচয় আমি শুনেছি তাঁকে দেখে কল্পনায় যেটুকু জেনেছি তাতে আমার বিশ্বাস দৃঢ় হল তাঁর সঙ্গে আমার মন রুচি চিন্তাভাবনা স্বপ্নের মিল আছে। আমি তাঁকে ভালোবেসে ফেললাম। আর তাঁকে পাবার বাসনায় আমার স্বপক্ষে আমি নিজের মনে মনে যুক্তির পর যুক্তি সাজাতে লাগলাম। ও'র স্বামী ও'র মনের আসল পরিচয় কিছুই জানেন না, ও'কে আনন্দ সুখ শান্তি কিছুই দিতে পারেন নি, ওঁর কোন স্বপ্নকে সার্থক করতে পারেন নি বরং ও'র সমস্ত স্বপ্নই ভেঙে দিয়েছেন, দিচ্ছেন। ওঁর সম্পূর্ণ অনিচ্ছাতেই দিনের পর দিন ওঁকে ভোগ করে করে ওঁর সমস্ত সম্ভাবনা গ্রাস করছেন। কিন্তু ও'র স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য থাকা উচিত। কল্পনা মত সুখী হওয়ার অধিকার ওঁর আছে। এই নিশ্চিত ক্ষয় থেকে আত্মরক্ষার দাবী ওঁর ন্যায়সঙ্গত অধিকার। প্রতিজ্ঞা করলাম আমি ওঁকে উদ্ধার করব। সুখী করবই। এক আশ্চর্য মানসিক ঘোরে আমি সারাক্ষণ আন্দোলিত হতে লাগলাম। ওঁর প্রতি দুর্বার আকর্ষণের উদ্দাম উত্তেজনায় আমার শরীর মন অহরহ পুড়তে লাগল। রাত্রিতে ঘুমতে পারি না। দিনে কোথাও গিয়ে শান্তি পাই না। কোথাও কিছুতেই স্থির থাকতে পারি না। শরীর খারাপের অজুহাতে আমি কিছুদিনের ছুটি নিলাম। সারা দিনরাত্রি মেসেই থেকে গেলাম।

ক্রমশ যা আশা করেছিলাম, যে সময়ের প্রতীক্ষায় আমি ব্যাকুল হয়ে ছিলাম সেই সময়ে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম ভদ্রমহিলাও রীতিমত আগ্রহের সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করছেন। আমার মনের অবস্থার খবর আগেই তাঁর জানা হয়ে গেছে। এখন দেখছি আমার প্রতি তিনি গভীর আকর্ষণ অনুভব করছেন। দুপুরে প্রায় তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ান, আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। অভিভূতের মত তাঁকে দেখতে দেখতে মুখে এক ব্যঞ্জনাময় রক্তিম হাসির মায়া রচনা করি আমি, ভদ্রমহিলার মুখেও তার প্রতিফলন। মনে হল আমাকে অদ্ভুত আবেশে আত্মপ্রত্যয়ে নিশ্চিত করে তিনি সত্যিই আমাকে ভাবছেন।

পরবর্তী সূচী হিসেবে আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই করলাম। দুর্বার আবেগ কোন মানসিক বাধাই গ্রাহ্য করল না, অনুকূল পরিবেশ আমাকে সাহায্য করল। আর ভদ্রমহিলার আবিষ্ট দু চোখ আমাকে প্রভূত প্রশ্রয় দিল। সহজ আলাপের পথ ধরে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার অপূর্ব মোহে আমি নিবিড়ভাবে আত্মসমর্পণ করলাম।

দুদিনেই তাঁকে আমি আমার অনেক কিছুই জানালাম। তিনিও তাঁর অনেক খবর আমাকে শোনালেন। তাঁর নাম নীলিমা সেন। কলেজে দু বছর পড়েছিলেন। গান গাইতেন, সেতার শিখতেন। এখন আর কিছুই করেন না, কিছুই ভালো লাগে না। আমি গভীর অনুসন্ধানী মনে, মনে আশ্চর্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে তাঁর প্রতিটি কথা, কথা বলার ভঙ্গি কণ্ঠস্বর অনুধাবন করে আবিষ্কার করলাম তাঁর বিবাহপূর্ব জীবনের নানান স্বপ্ন কল্পনা, এখন যার সমস্তই মিথ্যা হয়ে গেছে, এখন তিনি কত ভীষণ অসুখী, দুঃখী। ক্রমশ আরো আলাপের মধ্যে দিয়ে আমি আমার হৃদয়ে আশ্চর্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসিয়ে তাঁকে আমার একান্ত নিভৃত সান্নিধ্যে উপলব্ধি করেছি। সঠিক জেনেছি তিনিও আমার প্রতি দুর্বার আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করে আমাকে ভালোবেসেছেন। অনেক আগেই আমি তাঁকে ভালোবেসেছি, জেনেছি এই ভালোবাসা থেকে আর কোনমতেই আমার মুক্তি নেই। দিনের পর দিন অনুভব করেছি ও'র মনের অবস্থাও আমারই মত। ক্রমশ তাঁকে নিজের করে পাওয়ার স্পর্ধা এমনভাবে আমাকে পেয়ে বসল, কেমন করে জানি না আমি ভুলে গেলাম তিনি বিবাহিতা, তাঁর স্বামী জীবিত, একটি সন্তানও আছে। প্রকাশ্যে মুখে আমরা কেউ কাউকে আমাদের ভালোবাসার কথা বলিনি। কিন্তু তবু আমি নিশ্চিত নীলিমাও এখন বিন্দুমাত্র সন্দেহ দ্বিধারও অতীত—আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি। মিলিত হতে চাই।

আমি অদ্ভুত পরিকল্পনায় মেতে উঠলাম কেমন করে আমাদের ইচ্ছাকে সফল করব। কেমন করে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষিত

স্বপ্নের নীড় গড়ব। উত্তেজনায় ভাবনায় উদ্বেগে আমার শরীর ক্লান্ত হতে লাগল। কোন পথ আমি আবিষ্কার করতে পারলাম না। অনুভব করতে লাগলাম নীলিমা অসহায়, সে আমার ওপর নির্ভর করে আছে। সে প্রতিনিয়ত চাইছে আমি যেমন করেই হোক তাকে যেন তার বর্তমানের এই দুর্বিসহ জীবন-যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে আমার ভালোবাসার সান্নিধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত করি। সে মুখে আমাকে কিছু না বললেও তার মুখ দেখে আমি তার অন্তরের সমস্ত কথাই সঠিক বুঝতে পারলাম। অথচ আমি তাকে কেমন করে সাহায্য করব? তার জীবিত স্বামী, তার সন্তান, আমার সামান্য চাকরী—আমি কী করব? কী পথ আছে কী উপায় আছে ভেবে ভেবে আমি দিশাহারা হতে লাগলাম। আশায় নিরাশায় আমি উদ্বিগ্ন পীড়িত যন্ত্রণায় ভেঙে চুরে যেতে লাগলাম।

হঠাৎ কিসের ছুটিতে যেন মেসের সকলে যে যার দেশের বাড়ীতে চলে গেল। সেই চমৎকার সুযোগকে আমি সমস্ত হৃদয়-মন দিয়ে অবলম্বন করলাম। স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলাম আজ দুপুর বিকেল ধরে নীলিমার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা করে একটা না একটা পথ আবিষ্কার করবই। আর সেই পথ যতই বিপদসংকুল হোক সেই পথেই আমি নীলিমাকে উদ্ধার করব—আমাদের আমার ভালোবাসাকে জয়ী করবই।

দুপুরে কয়েকটা সাধারণ কথাবার্তার পর নীলিমা আশ্চর্য শান্ত সংযত ভাবে অদ্ভুত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলল, আগামীকাল আমরা এ বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমস্ত হতাশা ব্যর্থতা একসঙ্গে আমাকে গ্রাস করে আমার অস্তিত্ব শূন্য করে দিল। কী অবস্থায় কতক্ষণ তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, এক সময় আমি ছুটে কোথায় বেরিয়ে চলে গেলাম। কলকাতার পথে পথে সারাদিন ঘুরে বেড়ালাম। কত নিঃস্ব আমি! আমি কী ভীষণ একা! আমি কোথায় সান্ত্বনা পাব! নীলিমাকে ভালোবেসেছিলাম, সে ছাড়া আমার আর কেউ ছিল না। সে চলে যাবে, যাবেই। আমি তাকে কোনদিন পাব না। পাব না। আমি কেমন করে বাঁচব? আমাকে যদি আরো অনেক বছর বেঁচে থাকতে হয়—সেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অসংখ্য মুহূর্তগুলোর প্রতিটি মুহূর্ত আমি কেমন করে বেঁচে থাকব! ভয়ংকর উদ্বেগের পীড়নে আমি মারাত্মক আহতের মত আর্তনাদ করতে করতে পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। অথচ কোন পথের সন্ধান পেলাম না। ক্রমশ মাথাটা ভীষণ ভারী হয়ে উঠল। চিন্তাভাবনাগুলো জট পাকিয়ে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। শরীর কাঁপতে লাগল। সেই অবস্থাতেও ভাবলাম একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে। করতেই হবে। কী করার আছে কী করতে পারি কী করব কিছুই জানি না। শুধু ভাবতে লাগলাম একটা কিছু করতেই হবে। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়েও অদ্ভুত এক ঘোর মানসিক অবস্থায় টলতে টলতে যখন মেসে ফিরলাম তখন অনেক রাত্রি হয়ে গেছে। দেখলাম মেস অন্ধকার। আলো নিভিয়ে আমাদের চাকর ঘুমিয়ে পড়েছে। চেয়ে দেখি নীলিমাদের ফ্ল্যাটও অন্ধকার। তাদের যে দরজাটা সারাক্ষণ বন্ধ থাকে অন্ধকারেও দেখতে পেলাম সেটা আজ খোলা আছে। কোথা থেকে বাতাস এসে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে দরজার কপাট দুটোকে একবার একটু বন্ধ করে দিচ্ছে পরক্ষণেই আবার খুলে দিচ্ছে। পাগলের মত ছুটে গেলাম। তাদের সেই বারান্দা যেন অন্ধকারে মরে পড়ে আছে। ব্যাকুলভাবে সুইচ বোর্ড হাতড়ে একটা সুইচে চাপ দিতেই ঝাঁঝালো আলো শূন্য বারান্দায় খোলা দরজা জানলা দিয়ে নীলিমার ঘরের শূন্য ভিতরটায় হো হো হা হা করে হেসে উঠল! আলো নিভিয়ে অন্ধকারে বুকের মধ্যে সেই হো হো হা হা-র ধ্বনি শুনতে শুনতে সারারাত নীলিমার ঘরে পায়চারী করতে করতে আমি কী খুঁজেছিলাম, আজ সঠিক মনে নেই। পরের দিন সকালেই আমি সেই মেস ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা মেসে গিয়ে উঠেছিলাম।

তারপর দীর্ঘ সাত বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে আমি একটা কলেজে পড়ানোর চাকরী পেয়েছি, আমার জীবনে কত ঘটনাই ঘটে গেছে।

এতক্ষণে আমি আবার একবার ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকালাম। না আমার চিনতে ভুল হয়নি। নীলিমা সেন নিশ্চয়ই। একটু বেশী ফর্সা আর রোগা হয়েছেন। কিন্তু আজও দেখছি সেই সাত বছর আগের মত তরুণীই আছেন। শত বছর আগেকার তিন বছরের সেই মেয়েটি, যার পাশে বসে আছে, সুন্দরী কিশোরী হতে চলেছে। আর একটি সুন্দর বাচ্চা তিন বছরের হবে, নীলিমার কোল আলো করে বসে আছে। ট্রামে করে গ্রীষ্মের এই দুপুরে নীলিমা কোথায় চলেছেন? ওঁর স্বামীকে দেখছি না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই এখনও সারাদিন নিজের ব্যবসায় ডুবে থাকেন। আমার সঙ্গে নীলিমার দু' তিনবার চোখোচোখি হল। আমি আশা করেছিলাম নীলিমা আমাকে চিনতে পারবেন, দু'একটা কথাও হয়ত বলবেন, অন্তত আমাদের সাধারণ কুশল সংবাদ বিনিময় হবে। কিন্তু নীলিমা আমাকে চিনতে পরলেন না। আমি তাঁকে দেখছি জানার পর থেকেই কেমন অস্বস্তিবোধ করছেন। একবার বিরক্ত হয়ে আমার দিকে ভ্রূকুটিও করলেন। আমি লজ্জিত হয়ে খুব অপ্রস্তুত হলাম, আমার যে ঠিক কী হল ভালো করে বুঝতে পারলাম না। তবে আমার স্টপে পৌঁছবার আগেই কী ভেবে আমি নেমে পড়লাম। অনভিপ্রেত স্টপে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়তে পুড়তে চেয়ে চেয়ে দেখলাম ক্রমশ ধুধু করতে করতে কত দূরে ট্রামটা মিলিয়ে গেল।

অনুভব করলাম, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। আজ আর কলেজে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না। অথচ সামনেই ছাত্রদের পরীক্ষা, এই সময় ক্লাস না নিলে হয়তো ছাত্রদের অসুবিধা হবে। তারা আমার কাছে অনেক কিছু আশা করে। কিন্তু তবু আজ আর ক্লাস নিতে যেতে আমার যে একটুও ইচ্ছে করছে না। কিন্তু এই দুপুরে আমি যাব কোথায়? ঘরে ফিরতে পারব না। সারাটা নির্জন দুপুর ধরে সেই একাকিত্বের যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারব না। অসীমার প্রতি অবোধ অভিমানে আমার নিঃসঙ্গ বুক গুমরে উঠল। আশ্চর্য! নিজের একটু বেশী সুখ একটু বেশী স্বাচ্ছন্দ আর স্বাধীনতার জন্যে আদর্শের সংঘাতজনিত সাময়িক মনোমালিন্যের অজুহাতে অসীমা আমাকে একা ফেলে রেখে আমাকে নিঃশেষে ভুলে গিয়ে আবার বিয়ে না করলে পারত না? কিছুতেই কি পারত না? হয়তো সত্যিই কিছুতেই পারত না। প্রত্যেকেরই সুখী হওয়ার অধিকার আছে। প্রত্যেকেরই আরো বেশী সুখী হওয়ার অধিকার আছে।

কিন্তু এই প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আমি এমনি পুড়ব? পুড়তে পুড়তে কোথায় যাব? একবার চেয়ে দেখলাম, না, আকাশের কোন দিকে কোথাও এক-টুকরো মেঘের চিহ্ন নেই। মেঘের কোন লক্ষণই নেই। অগত্যা, কোথাও না কোথাও যখন যেতেই হবে, সেই অসহ্য রোদেই নেমে পড়লাম।

রেডিওর স্টক ক্যারাকটার বলে একটা কথা আছে। এঁরা রেডিওর নিজস্ব চরিত্র। সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রোতারা এঁদের সকলকে ভালোভাবে চেনেন, এঁদের এক একটা সুস্পষ্ট ছবি শ্রোতাদের মনে আঁকা থাকে। এঁদের কণ্ঠস্বর শুনলেই সেই ছবিগুলি তাঁদের মনে জ্বলজ্বল্ করে ওঠে। তাতে এঁদের সম্পূর্ণ অবয়ব—হাবভাব, চালচলন, শিক্ষাদীক্ষা, রুচি সমস্ত কিছুই ফুটে ওঠে।

এঁরা বিভিন্ন আসরে, মহলে, ভবনে, মণ্ডলীতে থাকেন। যেমন—কৃষিকথার আসরে মোড়ল, সদাশিব, কাশীনাথ, মোহনলাল প্রভৃতি; মজদুরমণ্ডলীতে শেখর, বসন্ত ইত্যাদি।

মোড়ল বলতেই সেই গ্রাম্য, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটির ছবি ফুটে ওঠে, যিনি গ্রামের সমস্ত খবরাখবর রাখেন, বাইরেরও অনেক খবর থাকে তাঁর কাছে। তিনি ধীর স্থির বিচক্ষণ, গ্রামবাসীদের কল্যাণ-সাধনের চিন্তায় ও কাজে নিরত। কিসে চাষ-আবাদ ভালো হয়, কোন্ সময়ে কোন্ ফসল লাগাতে হয়, কীভাবে লাগালে বেশি ফলন পাওয়া যায়, কেমন করে সেচ-সার দিতে হয়, কীভাবে গাছগাছালি আর ফসলকে রোগপোকার হাত থেকে বাঁচাতে হয়—সেই চিন্তাই তাঁর সর্বক্ষণ, আর তার ব্যবস্থা। শুধু চাষ-আবাদ নয়, মানুষেরও চিন্তা—মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, রোগ প্রতিরোধ, মনোরঞ্জন, মানসিক প্রসার, ধর্মে মন, প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, প্রতিবেশীর সাহায্যে এগিয়ে আসা সব কিছু নিয়েই তাঁর কাজ। আবার কলহ-বিবাদ মেটানোও। ...দীর্ঘকাল ধরে মোড়লের এই ছবিটি শ্রোতাদের মনে তৈরি হয়েছে।

এমনি করে অন্যসব চরিত্রের ছবিও তৈরি হয়েছে—সদাশিবের, কাশীনাথের, মোহনলালের, শেখরের, বসন্তের, আরও অনেকের। সদাশিব বলতে সেই সাদামাটা লোকটার ছবি ফুটে ওঠে, যার বুদ্ধি মোটা, রগচটা, কথায় কথায় ঝগড়া করে আবার সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়েও নেয়। কাশীনাথ বলতে মনে পড়ে সেই খুনসুটি করা চরিত্রটি, যে ফাঁক পেলেই সদাশিবকে খোঁচা দেয়, নিজে অনেক কিছু জানে বলে ভাব দেখায়, ধনাদেবী যাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে সঙ্কটমোচনের পথ বলে দেন। মোহনলাল আধুনিক-কালের ছেলে—গ্রামের ছেলে, লেখাপড়া জানে, দেশবিদেশের খবরাখবর রাখে, তার লেখাপড়া আর শিক্ষা-দীক্ষা গ্রামের লোকদের কল্যাণে ব্যবহার করে। শেখরেরও জ্ঞান আছে, বুদ্ধি আছে; দেশের জন্য সে ভাবে, দেশের উন্নয়নের বিষয়ে সে চিন্তা করে। বসন্ত তার সাগরেদ, শেখরের কাছে জিজ্ঞাসা করে সব জেনে নেয়, দেশের কাজ করতে চায়।

এখন এই মোড়লকে যদি কোনো প্রেমের নাটকে নায়কের ভূমিকায় দেখা যায় অথবা খল নায়কের, তাহলে কেমন লাগে? সঙ্গে সঙ্গে মোড়লের ইমেজটা নষ্ট হয়ে যায়। শ্রোতারা কিছুতেই নাটকের কোনো চরিত্রে তাঁকে মেনে নিতে পারেন না, সর্বক্ষণ তাঁদের চোখের সামনে মোড়লকে [illegible]। নাটকের চরিত্রের প্রতিটি কথা মোড়লের কথা বলে মনে হয়। নাটকের নায়ক অথবা খল নায়ক কিংবা অন্য কোনো পার্শ্বচরিত্র তখন মোড়লে রূপান্তরিত হয়ে যায়। নাটকটা মার খায়।

সেই রকম সদাশিব, কাশীনাথ বা মোহনলালও যদি কোনো নাটকে রূপকে বা নকশায় কোনো ভূমিকায় অভিনয় করেন তখন তাঁদেরও আলাদা করে নেওয়া যায় না, সেই চরিত্রের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যান। যিনি ঘোষক, তিনি কাশীনাথ, তিনিই নাটকে রূপকে নকশায় অন্য চরিত্র—এটা ভাবতে কষ্ট হয়।

নিত্য মজদুরমণ্ডলী পরিচালনা করেন যিনি, তিনিই যদি আবার শেখরের রূপ ধারণ করেন তাহলে শেখর বেচারার পালিয়ে না গিয়ে উপায় থাকে না। মজদুরমণ্ডলীর পরিচালক হিসাবে তাঁকে যেমন প্রত্যহ দেখা যায়, ঠিক সেই রকম কণ্ঠস্বর, স্বরক্ষেপণ, ভাবভঙ্গি যদি শেখরও গ্রহণ করে তাহলে শেখরকে আলাদা করে চিনে নেব কেমন করে? শুধু শেখর নামটা শুনে? নিত্য যাঁকে অনুষ্ঠান ঘোষণা করতে শুনছি তিনি যদি এসে বলেন, "আমি বসন্ত" তাহলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না কি?

অহরহ যাঁদের ঘোষক-ঘোষিকার ভূমিকায় দেখছি তাঁরা যদি কখনও বিনয়, হরিহর, গজপতি, ঊর্মিলা, সুমিতা হয়ে শ্রোতাদের সামনে হাজির হন তাহলে ঐ বিনয়, হরিহর, গজপতি, ঊর্মিলা, সুমিতার স্বাতন্ত্র্য থাকে কি? তারাও কি সঙ্গে সঙ্গে ঘোষক-ঘোষিকায় পরিণত হয়ে যায় না? অনুষ্ঠানের উৎকর্ষহানি হয় না? শ্রুতিসৌকর্য নষ্ট হয় না? মাধুর্য হারায় না?

তাই কোনো স্টক ক্যারাকটারের অন্য কোনো চরিত্র গ্রহণ করা উচিত নয়, কোনো ঘোষক-ঘোষিকারও কোনো নাটকে নকশায় রূপকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা ঠিক নয়। মানে, নিত্য এক রূপে যাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, পারতপক্ষে তাঁদের নিজেদের অনুষ্ঠান ছাড়া অন্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। কারও কারও পক্ষে এই লোভ সংবরণ করা একটু কঠিন হতে পারে, কিন্তু অনুষ্ঠানের উৎকর্ষের দিকে তাকিয়ে এই লোভ সংবরণ করতে হবে।

অবশ্য একথা সত্যি যে, মাঝে মাঝে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যখন ঘোষক-ঘোষিকাদের নাটকে নকশায় রূপকে আলোচনায় না এনে পারা যায় না। হয়তো কোনো শিল্পী শেষ মুহূর্তে কোনো কারণে আসতে পারলেন না; হয়তো কোনো এমার্জেন্সি প্রোগ্রাম করতে হবে, বাইরের শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানাবার সময় নেই—তখন ঘোষক-ঘোষিকাদের দিয়ে ঠেকা কাজ চালানো ছাড়া উপায় থাকে না। এইরকম সব অবস্থায় ঘোষক-ঘোষিকাদের আনা যদিও সমর্থন করা যায়, কিন্তু স্টক ক্যারাকটারদের কিছুতেই না। কারণ, ঘোষক-ঘোষিকাদের তেমন বিশেষ কোনো ইমেজ থাকে না, স্টক ক্যারাকটারদের থাকে। স্টক ক্যারাকটাররা এইরকম সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের ইমেজ যেমন নষ্ট করে দেন তেমনি সেইসব অনুষ্ঠানের চরিত্রগুলির।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২৬শে অগস্ট রাত ৮টায় 'গান্ধীজীর স্মৃতি' এই পর্যায়ে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের একটি সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারে শ্রীরায় বেশ মনোরমভাবে তাঁর প্রথম গান্ধী-দর্শনের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি গান্ধীজীকে গান শোনাতে গিয়েছিলেন। গান্ধীজীর সংগীতপ্রীতি সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না, গান্ধীজী যে সংগীত ভালোবাসতে পারেন তা তিনি ভাবতেই পারেন নি। তবু তিনি তাঁকে গান শোনাতে গিয়েছিলেন। শুনিয়েছিলেন। গান্ধীজী খুশি হয়েছিলেন। গান্ধীজীর খুশিতে তাঁর আনন্দও উপচে পড়েছিল।... পরেও তিনি তাঁকে অনেক গান শুনিয়েছেন।

সংগীত ও আর্ট সম্বন্ধে গান্ধীজীর একটা নিজস্ব ধারণা ছিল। সেই ধারণাও শ্রীরায় তাঁর এই স্মৃতিচারণে আত্মকথার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যক্ত করার মধ্যে একটা দার্শনিক ভাব ছিল। তাঁর স্মৃতিচারণে গান্ধীজীর দর্শনের সঙ্গে তাঁর নিজের দর্শন এসে মিশেছিল। তাতে অনুষ্ঠানটা মর্মগ্রাহী হয়েছিল।

সাক্ষাৎকারের গোড়ায় শ্রীঘোষ শ্রীরায়কে 'এ যুগের শ্রেষ্ঠ মণীষীদের অন্যতম একজন' বলে সম্বোধন করে তাঁকে একটু অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিলেন বলে মনে হয়েছিল। সামনাসামনি এই রকম প্রশংসায় অস্বস্তি বোধ করারই কথা। আর 'অন্যতম একজন', দুটো শব্দ এক সঙ্গে চলে কী করে?

এইদিন সকাল সওয়া ৮টায় আধুনিক গান শুনিয়েছেন শ্রীমতী অসীমা ভট্টাচার্য। আধুনিক ন্যাকামি ছিল না তাঁর গানে, তাঁর গান সহজ, স্বাভাবিক শ্রুতিমধুর।

রাত সওয়া ১০টায় নাটক ছিল 'লালন ফকির'। কাহিনী শ্রীরণজিৎকুমার সেন, বেতার নাট্যরূপ শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লালন ফকির। নামটা শুনলেই মনের ভিতরকার বাউলটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, গান গেয়ে উঠতে চায়। লালনের গান রবীন্দ্রনাথকেও চঞ্চল করেছিল। লালন যে আজও বেঁচে আছেন তার মূলে রবীন্দ্রনাথের দান বড়ো কম নয়। রবীন্দ্রনাথ লালনের কণ্ঠে গান শুনে মোহিত হয়েছিলেন, বাউল গান সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন।

লালনের গান লালনের কণ্ঠে শোনার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমরা শুনেছি অন্যের কণ্ঠে, ২৬শে অগস্ট রাত সওয়া ১০টার নাটকে শ্রীঅমর পালের কণ্ঠে। শ্রীঅমর পালের কণ্ঠে লালনের গানগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নাটকে গানের সংখ্যা ছিল কম। লালনের নাটকে লালনের গান যদি প্রাধান্য না পেল তাহলে আর কী হল? কিন্তু এই নাটকে গান প্রাধান্য পায় নি, গান এখানে হয়েছে সহযোগী।

এই নাটকের অভিনয়ের দিকটাও উল্লেখযোগ্য। প্রায় সকলেই ভালো অভিনয় করেছেন—লালনের ভূমিকায় শ্রীরথীন মজুমদার, শীতলের ভূমিকায় শ্রীঅমিতাভ মাইতি, হরিনাথের ভূমিকায় শ্রীমনু মুখোপাধ্যায়, সাইজীর ভূমিকায় শ্রীমণি শ্রীমানী পদ্মর ভূমিকায় শ্রীমতী বন্দনা দেবী সাগিদার ভূমিকায় শ্রীমতী বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, দয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাকিনার ভূমিকায় শ্রীমতী রেখা আঢ্য।

অভিনয়ে সবচেয়ে বেশি দক্ষতা দেখিয়েছেন শ্রীরথীন মজুমদার, শ্রীমতী বাণী গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীমতী বন্দনা দেবী।

কিন্তু ভালো গান, ভালো সংলাপ আর ভালো অভিনয় সত্ত্বেও নাটকটি শ্রোতাদের মনে কোনো ইমপ্রেশন রাখতে পারে নি, লালনের দর্শনটা ভালো করে ফোটে নি।......নাটকটা শুনেছি, ভালো লেগেছে, ভুলে গেছি। কী যেন ছিল না এতে, কী যেন ফাঁক ছিল। তাই শেষ হয়ে যাবার পর কোনো রেশ ছিল না, টান ছিল না।

২৭শে অগস্ট রাত ৮টায় ছিল যুব-গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান—গান্ধীজী ও আমরা'। গান্ধীজী সম্পর্কে আধুনিক কালের যুবক-যুবতীদের যে চিন্তাধারা তা-ই নিয়ে এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছিলেন শ্রীআশিসতরু মুখোপাধ্যায়। পরিচালনার মধ্যে মুন্সিয়ানা ছিল, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী যুবকযুবতীদের কাছে তিনি এমন সব প্রশ্ন করেছিলেন যার উত্তরে সমগ্র যুবসমাজের মনের প্রতিফলনটা পাওয়া যায়, তাদের চিন্তার ধারাটা জানা যায়। তবে তাঁর ভূমিকাটা আর একটু সংক্ষেপ হলে ভালো হত। এই রকম সব অনুষ্ঠানে দীর্ঘ ভূমিকা একঘেয়ে হয়ে পড়ে, অনাবশ্যক মনে হয়।

এইদিন রাত সাড়ে ৮টায় সংবাদ বিচিত্রার বিষয় ছিল দুটি: কবি বিষ্ণু দে'র সঙ্গে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, আর মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীতকলার অধ্যাপকরূপে যোগ দিতে যাবার প্রাক্‌কালে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে আকাশবাণীর প্রতিনিধির কিছু কথা। প্রথমটির জন্যই সময় বরাদ্দ ছিল বেশি, দ্বিতীয়টির জন্য কম—অনেক কম, মিনিট দু-তিনের বেশি নয়। অর্থাৎ অনুপাতটা ঠিক ছিল না। শ্রীঘোষের যেন আরও কিছু বলার ছিল, সময়াভাবে বলা হল না। বাকি রয়ে গেল, অনুষ্ঠানটা অপূর্ণ থেকে গেল।

প্রথম ভাগে সময় বেশি পাওয়ার সাক্ষাৎকারটা বেশ পূর্ণই হয়েছিল।

এইদিন রাত ৭টা ৫০ মিনিটে স্থানীয় সংবাদ প্রচার মাঝে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ৮টায় যুবগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানও খানিকক্ষণ আসে নি, ১০টায় সংবাদ পরিক্রমাও অল্পক্ষণ শোনা যায় নি। যান্ত্রিক গোলযোগ? ঘোষণা করা হয় নি তো কিছু? বলা হয়নি তো, 'যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য...টা...মিনিট থেকে...টা...মিনিট পর্যন্ত ৪৪৭-৮ মিটারে কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করতে না পারায় আমরা দুঃখিত?'

রাত সওয়া ১০টায় ছিল 'পুর্বাঞ্চল প্রসঙ্গ'। ...বাইরের অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং আরও স্পষ্ট, আরও শ্রুতিগোচর হওয়া দরকার, নইলে এই অনুষ্ঠান প্রচারের কোনো সার্থকতা নেই।

২৮শে অগস্ট শ্রীমতী দীপা সেনের আধুনিক গানের অনুষ্ঠান করা হয়েছিল ১০টা ২০ মিনিটে। এবং তিনটি গানের স্থলে দুটি গান প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষে ঘোষক ঘোষণা করলেন, 'আধুনিক গান তিনখানি গেয়ে শোনালেন শ্রীমতী দীপা সেন।'

৩০শে অগস্ট বিকেল সাড়ে ৫টায় মহিলামহলে শ্রীঅদ্রীশ বর্ধনের বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্পটি সুন্দর। শ্রীমতী [illegible] ভাদুড়ীর 'ধন্যবাদ' কবিতাটিও ভালো লাগল।

—[illegible]

চুম্বন ও নগ্নতা

অমৃতের ১২ই ভাদ্র, ১৩৭৬ সংখ্যায় বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত "চুম্বন ও নগ্নতা" লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। খোসলা কমিটির যে রিপোর্টটি নিয়ে সম্প্রতি এত হৈ চৈ হচ্ছে তারই ভিত্তিতে রচিত আলোচনায় লেখক যে সকল মন্তব্য করেছেন সবগুলোর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বলে এ চিঠির অবতারণা।

আমাদের দেশে বর্তমানে সিনেমায় চুম্বন ও নগ্নতা নেই। কিন্তু যা আছে তা নিশ্চয়ই চুম্বন ও নগ্নতার চেয়েও বেশী। ভারতীয় সিনেমায় বিশেষ করে হিন্দী ছবিতে সোজাসুজি চুম্বন দেখায় না সত্যি কথা। বদলে যে সমস্ত ইঙ্গিত, প্রতীক বা অঙ্গভঙ্গী দেখায় তা চুম্বনের চেয়েও মারাত্মক। খোলাখুলি প্রকাশ এক জিনিস, আর কুৎসিতভাবে দর্শকদের মনকে আকর্ষণ করা অন্য জিনিস। নগ্নতা ভারতীয় ছবিতে নেই ঠিকই। অর্ধনগ্ন বা প্রায়-নগ্ন যে সব নায়িকা প্রযোজক-পরিচালকদের ব্যবসা-বুদ্ধিতে শান দিয়ে অভিনয় করে দর্শকদের পকেট কাটে তার প্রভাব যে কত গভীর সে কথা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়। সে তুলনায় নগ্নতা অনেক ভাল।

এ তো গেল একদিক। অন্যদিকে হচ্ছে বর্তমানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা অসংখ্য সিনে-ক্লাব। এসব ক্লাবের সভ্যরা সেন্সর না-করা বিদেশী ছবি দেখার সুযোগ পায়। এদের সভ্যসংখ্যা অর্থাৎ দর্শকসংখ্যা সারা ভারতে কি হারে বেড়ে চলেছে তা একটা প্রাথমিক হিসেব নিলেই জানা কষ্টকর হবে না। তারা সেইসব বিদেশী ছবিতে কী দেখছে না? সক্রিয় যৌন-দৃশ্যও নাকি আকছার দেখার সুযোগ ঘটে। এতে কি সমাজ দূষিত হচ্ছে না? আর এটাই বা কোন্ ধরনের গণতান্ত্রিক [illegible] যে একশ্রেণীর লোক শুধুমাত্র পয়সার জোরে শিল্পের এ ক্ষেত্রেও [illegible] সুবিধা উপভোগ করবে। তর্কের খাতিরে সেরকম দর্শকের সীমা-[illegible] কথা উল্লেখ করলেও সে সংখ্যা তো [illegible] আবদ্ধ থাকছে না—দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। শুধু [illegible] কথা না-ই উল্লেখ করলাম। তা ছাড়াও ইংরেজী ছবির আমদানি প্রদর্শন কি আমাদের দেশে থেমে গেছে? ওতে চুম্বন নেই? তার ফলে কি [illegible] কোন প্রতিক্রিয়া ঘটছে না?

পরিবার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য যে ছবিতে চুম্বন ও নগ্নতার প্রচলনে ব্যর্থ হবে এ ধরনের একটা হাস্যকর উক্তি লেখক কেন করলেন বুঝি না। নইলে বর্তমান ছায়াছবি, সাহিত্য, পত্র-পত্রিকা এমন কি বিজ্ঞাপনের মধ্যেও কি ধরনের বিকৃতির ছড়াছড়ি তা কি আমাদের নজরে পড়ে না? এসবের প্রভাবেও তো তাহলে পরিবার পরিকল্পনার কিছু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে। দেশের উন্নতির জন্যে আমাদের এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে—সে কথা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু তাই বলে ছায়াছবিতে চুম্বন ও নগ্নতার প্রবেশে তা আর সম্ভব হবে না এ যুক্তিই বা কি করে মেনে নেয়া যায়! তাছাড়া আইন করে কিছু কি শেষ পর্যন্ত আটকে রাখা যায়? শিল্প-মাধ্যমে বাধ্যবাধকতা বা সীমা টেনে দিলে তা থেকে কখনই মহৎ কিছু সৃষ্টি হতে পারে না। যুগে যুগেই তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সিনেমাও আজকের যুগের এক স্বীকৃত শিল্পমাধ্যম। এ শিল্পের যিনি প্রকৃত শিল্পী তিনিই ভাল বুঝবেন কোথায় শুরু করতে হবে আর কোথায় থামতে হবে। শিল্পের বিষয়বস্তু যখন মানুষ, আর মানুষের ভালবাসার প্রকাশের একটা রূপ যখন চুম্বন, তখন সিনেমায় সত্যিকারের জীবনকে দেখাতে গিয়ে তা বাদ দিলে কি পূর্ণতা থাকে? প্রয়োজনের খাতিরে সেভাবেই নগ্নতাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিমিতিজ্ঞান যাঁর আছে তিনিই শিল্পী। সুতরাং ভারত সরকার যদি খোসলা কমিটির রিপোর্ট গ্রহণ করেন তাহলে শিল্পীই হবেন এর প্রয়োগ-কর্তা এবং তিনিই বুঝবেন কতখানি দরকারী আর কতখানি দরকারী নয়। বাইরের লক্ষ্য থাকবে যাতে বাড়াবাড়ি উচ্ছৃঙ্খলতা না ঘটে। আইন বা আন্দোলন করতে হলে সে জন্যেই করতে হবে। আসলে যখন নতুন কিছু শিল্পে আসে তখন চারদিকেই একটা গেল গেল রব শোনা যায়। তারপর আস্তে আস্তে সেটাও গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। অর্ধ-উলঙ্গ নারীমূর্তি দেখে কাপড় ছাড়ছে যেমন বলা যায়, তেমনি পরছেও বলা যায়। তফাৎ শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর। এও তাই। গেল গেল রব না তুলে কি গেল, কেমন করে গেল তা ঠিক করে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত এর অপপ্রয়োগ যেন না ঘটে।

[illegible],
[illegible], পুরুলিয়া।

'অমৃতের' ১২ই ভাদ্র, ১৩৭৬ সংখ্যায় বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত 'চুম্বন ও নগ্নতা' সম্পর্কে আলোচনাটি পড়লাম। আমি অমৃতের একজন নিয়মিত ও আগ্রহী পাঠক। সমস্ত না হলেও অমৃতের বেশির ভাগ লেখাই আমার পাকাহাতের ও উচ্চ-মানের বলে মনে হয়। কিন্তু, 'বিশেষ প্রতিনিধি' লিখিত এই বিশেষ লেখাটি আমার কাছে প্রথম লিখতে-শেখা এক ছেলে মানুষের লেখা বলে মনে হল। চুম্বন ও নগ্নতা বর্তমান সমাজের চলচ্চিত্রে অনু-মোদিত হওয়া উচিত নয়, এ সম্পর্কে প্রতিনিধি মহাশয় কোন বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসিদ্ধ কারণ না দেখিয়ে শুধুমাত্র ভারতীয় আদর্শ বলে অশ্রুপাত করেছেন। আসলে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে কেন এ-গুলির এত প্রচার, এবং কেন আমাদের দেশের চলচ্চিত্রে তা দেখান উচিত নয় তার কোন সঠিক বিশ্লেষণ তিনি দেননি। প্রতিনিধি মহাশয় আরেকটি ভুল (ইচ্ছাকৃত?) করেছেন। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সত্যজিত রায়ের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সত্যজিত রায়, তপন সিংহ প্রভৃতি খ্যাতনামা পরিচালকের, এবং উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রীর 'চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা' সম্পর্কে অভিমত আমার কাছে 'কিছুটা' অপরিষ্কার ঠেকলেও, তাঁরা মোটামুটি খোসলা কমিটির পক্ষেই রায় দিয়েছেন, অনেক 'যদি', 'কিন্তু' রেখে। সত্যজিত রায়ের এই 'যদি-কিন্তু' সম্বলিত উদ্ধৃতিটিই প্রতিনিধি মহাশয় তুলেছেন, পুরো বক্তব্যটি তোলেননি, তুললে দেখা যেত, শ্রীরায়ের বক্তব্যও খোসলা কমিটিকেই অনুমোদন করে। যাই হোক, যুক্তি ভিন্ন হলেও 'চুম্বন ও নগ্নতা' সম্পর্কে আমার বক্তব্যও প্রতিনিধি মহাশয়ের অনুরূপ।

ভদ্রলোক চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতাকে ভারতীয় আদর্শের বিরোধী বলেছেন। তাঁকে স্মরণ করিয়ে দি, খেজুরাহোর মন্দিরগাত্রে কামকলাসম্পন্ন চিত্রের অভাব নেই; রামায়ণ-মহাভারতে নরনারীর শৃঙ্গার দৃশ্যের বিশদ বর্ণনা আছে; অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। সংস্কৃত কবিরা তো নারীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে সংযম হারিয়ে ফেলতেন। অধিক উদাহরণ ও তৎসহ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের [illegible] ও [illegible] [illegible]

গ্রন্থে আদিরসের এত প্রাচুর্য থাকলে, চলচ্চিত্রে দেখানোর আপত্তি থাকবে কেন?

আপত্তি থাকবে এবং নিশ্চয় থাকবে। তবে যুক্তিটা ভারতীয় আদর্শের নয়, যুক্তিটা শিল্পের, যুক্তিটা সভ্যতার, যুক্তিটা সংস্কৃতির। শিশু কর্তৃক মাতৃস্তনপানের দৃশ্য, মাতাপুত্রের পবিত্র চুম্বনের দৃশ্য কিংবা দুর্ভিক্ষের সময় কংকালসার নগ্নদেহের দৃশ্য কী চলচ্চিত্রে আপত্তিজনক? সেটাও কী ভারতীয় আদর্শবিরোধী?

কিন্তু ধনীব্যক্তির বেডরুমের কেলেংকারী, পেটিকোট পরিহিতা উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর ছবি, কিংবা অভিজাত ককটেল পার্টিতে উন্মত্ত নারী-পুরুষের চুম্বন ও আলিঙ্গনের দৃশ্য নিশ্চয়ই শিল্পসম্মত নয়। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক চেতনায় সচেতনভাবে সুড়সুড়ি দেয়াই এ সবের কাজ।

অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে, চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতার প্রয়োগ দু'রকম হতে পারে; এবং সমস্ত ব্যাপারটা প্রয়োগের ওপরই নির্ভরশীল। এখন প্রশ্ন, ভারতীয় চলচ্চিত্র এর কোনটিকে গ্রহণ করবেন? অর্থাৎ, প্রযোজক-পরিচালকরা গ্রহণ করবেন? আঙুলে গোনা যায় এমন কয়েকজনকে বাদ দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বেশির ভাগ প্রযোজক-পরিচালকদের শিল্পগত মান কতখানি উঁচু, সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সন্দেহ প্রকাশ করা চলে; এবং বুকিং অফিসের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি ও শ্রুতির বহুল আনাগোনার দিকে তাকিয়ে এইসব প্রযোজক-পরিচালকদের শিল্পসচেতনাকে এক কথায় নাকচ করে দেয়া যায়। বিশেষ করে হিন্দী চলচ্চিত্রের কর্তাব্যক্তিদের (অবশ্য বাংলা চলচ্চিত্রও যে একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা, সে কথা আমি বলছি না)।

জয়ন্ত চৌধুরী
ছাড়োয়া
২৪-পরগণা

শ্রীপারুল দাশগুপ্ত গত সংখ্যায় (১৮শ) 'চুম্বন ও নগ্নতা' প্রসঙ্গে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্র এবং ভারতবাসীর প্রতি সত্যিকারের দরদী-মনের পরিচয় দিয়েছেন।

এই ডাইনামিক পৃথিবীতে বাস করে সংস্কারের নামে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতির শ্বাসরোধ করে রেখেছি। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী ইত্যাদি পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব ব্যাপারে (বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, খেলাধূলা ইত্যাদি) ভারত যখন সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে তখন এ সামান্য ব্যাপারটাকে (চুম্বন ও নগ্নতা) ঝুলিয়ে না রেখে ফিল্ম সেন্সর কমিটি আজ ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আজ আমরা (বিশেষ করে যারা জন্মে ভারতীয়, কিন্তু মনেপ্রাণে বিদেশী) আমাদের বিদেশী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মুক্তগলায় বলতে পারব, 'দেখ আমরা কোন ব্যাপারেই তোমাদের পেছনে পড়ে নেই—আমরা কত ডায়নামিক হয়েছি।'

এ প্রসঙ্গে আমার আর একটা কথা বলার আছে। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশগুলিতে শুনেছি প্রকাশ্য জায়গায় চুম্বন-এবং রেস্তোঁরা বা নাইট-ক্লাবে নগ্নতা একটি সাধারণ ব্যাপার। এছাড়া শোনা যায় কোন কোন দেশে আজকাল প্রায় নগ্ন বা অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় মেয়েরা রাস্তা-ঘাটে ঘোরাফেরা করেন—সুতরাং তাঁদের দেশে চলচ্চিত্রে চুম্বন বা নগ্নতা সম্বন্ধে বিতর্কের কোন অবকাশই নেই। —আমার মনে হয় আমাদের দেশেও সিনেমায় 'চুম্বন ও নগ্নতা' আনার আগে আমরাও যদি প্রকাশ্য সামাজিক জীবনে কিছুটা অনুকূল পরিস্থিতি চালু করে দিতে পারি, তাহলে সিনেমাতেও এ ব্যাপারগুলি আনলে, যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি এবং প্রগতির শ্বাসরোধ করে রেখেছেন তাঁদের বলার কিছু থাকবে না।

আমি এ ব্যাপারে শ্রীপারুল দাশগুপ্ত বা তাঁর মতের সমর্থক সকলকেই অন্তত ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ উজ্জ্বল করার জন্য এবং আমার বক্তব্যকে আরো জোরাল করার জন্য লেখনী ধারণ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

রঞ্জন চৌধুরী
কলকাতা-১৯

খোসলা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর থেকে চলচ্চিত্রজগৎ এবং তার দর্শকদের মধ্যে উপরিউক্ত বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। কেউ কেউ প্রকাশ্যে সমর্থন করছেন আবার কেউ কেউ মনে মনে সমর্থন করে মুখে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি'র বুলি আওড়ে একটু 'আমতা আমতা' করছেন। সে যাই হোক মনে প্রাণে শতকরা নব্বুইজন সমর্থন করছেন—ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন এবং নগ্নতা আসুক।

অনেকদিন আগে একটা হাঙ্গেরীয়ান ছবি দেখেছিলাম। 'দি হোপলেস ওয়ান'। সর্বহারাদের দুঃখের মধ্য দিয়ে, ঐতিহাসিক পটভূমিকায় অত্যাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের জোটবাঁধা সংগ্রাম, এই হল মূল বক্তব্য কাহিনীটির। একটি দৃশ্য উপস্থাপনায় কথা আমি এখনো ভুলতে পারি নি। কতগুলো মেয়েকে ধরে আনলো শাসকশ্রেণী। তাদের নগ্ন করা হল। বিশেষ একটি কারণে—একটি মেয়েকে দুর্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। শাদা দেওয়াল, ধু-ধু মাঠের পেছনে পড়ে রইল দুর্গ, নিস্তব্ধতা—চোখ-ধাঁধানো সাদা পর্দা। তারপর দুর্গের ওপর থেকে পশুর মতো চিৎকার করে জনৈকের আত্মহত্যা—অন্যদিকে সারি-সারি বেতধারি সৈন্যের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়েটাকে মারতে মারতে ছোটানো এবং অবশেষে মেয়েটি মারা যায়। চতুর্দিকে সবুজ... মধ্যস্থানে সাদা...একটুখানি—মেয়েটা মরে পড়ে আছে। চতুর্দিকের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে একান্ত প্রতিবাদ যেন।

আমার তো মনে হয় এখানে নগ্ন দেহ দেখানোর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং পরিচালক ঠিকই করেছেন। কোন সংস্কার বা ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে শিল্পগুণের শ্বাসরোধ করবার কি কোন প্রয়োজন আছে? এযাবত হিন্দি ছবি যা দেখিয়ে আসছে তা থেকে চুম্বন এবং নগ্নদেহ দেখানো অনেক রুচিসম্মত। এতদিন যখন এইসব দেখে [illegible] যায় নি, তখন এখনো যাবে না—সংস্কারপন্থী লোকেদের উদ্দেশ্যে আমার এই সবিনয় নিবেদন।

স্বপনকুমার ঘোষ
কলিকাতা-৪

অমৃতের ১৭ সংখ্যায় খোসলা কমিটির বিতর্কিত রিপোর্ট নিয়ে 'চুম্বন ও নগ্নতা' শীর্ষক আলোচনার সূত্রপাত করে আপনারা আর একবার রুচিশীল মনোজগতের পরিচয় দিলেন। আজকের দিনে সমস্যা জর্জরিত। নানাভাবে মানুষ বিব্রত। তার রেশ সামলাতে আমাদের সকলকে ল্যাজেগোবরে হতে হচ্ছে, এ তো গেল ব্যক্তিগত দিক। তাছাড়াও দেশের অস্থির রাজনীতি ক্রমেই আমাদের সকলকে ভাবিয়ে তুলছে। আর ঠিক তখনই খোসলা কমিটির রিপোর্ট। ফিল্মে চুম্বন এবং নগ্নদেহের ফলাও করবার পাত্তার জন্য কমিটি সুপারিশ করেছে। এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। এমনিতেই ফিল্মে অশ্লীলতার দৌরাত্ম্যে সবাই পরিত্রাহি চীৎকার জুড়েছে। তখনই আবার অশ্লীলতার ছাড়পত্রের জন্য নির্দেশ।

ভাবতে অবাক লাগে, এরকম একটি সুপারিশ তাঁরা কেন করলেন। কারণ তাঁরা দেখিয়েছেন, পৃথিবীর সব দেশেই সেন্সরশিপের কড়াকড়ি অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। চুম্বন এবং নগ্নদেহর প্রদর্শন তাঁরা খুব একটা আপত্তি করেন না। সে তো তাদের ব্যাপার, আমাদের নিশ্চয়ই নয়। এ সম্বন্ধে আমাদের কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হলে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরিবেশ ভেবে নিতে হবে। এদিক থেকে চুম্বন এবং নগ্নতা সম্পর্কে খুব সমর্থন মেলে না। আবার পাশ্চাত্য দেশগুলি চুম্বন ও নগ্নতার অধিকার মেনে আজ ভীষণভাবে অস্থির। সে দেশের তরুণতরুণীরা এখন কুরুচির পরিচয় দিচ্ছেন যে সকলের মাথায় হাত দিয়ে বসার উপক্রম। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের দেশে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দিতে পারি না। এমনিতেই কুরুচিতে দেশ ছেয়ে গেছে। ফিল্মী গান এবং নাচের উদ্দীপনা আমাদের তরুণতরুণীদের এমন পেয়ে বসেছে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কথা ভাবতে হচ্ছে। এবং আমরা মনে করি, ফিল্মের মাধ্যমেই এই উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। বোম্বাই ফিল্মের স্বৈরাচারের মধ্যেও কয়েকজন যথার্থ শিল্পরুচির পরিচয় দিচ্ছেন। ভারতের বাইরে অনুষ্ঠিত নানা উৎসব থেকে তারাই জয়মাল্য নিয়ে আসছেন, নাচ-গান আর অঙ্গভঙ্গীর কুৎসিত বিজ্ঞাপনে ভরা ছবিতে আমাদেরই বিরক্তি জন্মায় তো রসিকদের স্বীকৃতি পাবে কি করে? তারপর নগ্নতা যদি বাড়ে তো কথাই নেই। তারচেয়েও বড় কথা, মুষ্টিমেয় নিষ্ঠাবান চলচ্চিত্রকার আর তখন পাত্তাই পাবেন না। নগ্নতার উপর নগ্নতা দিয়ে সবাই বক্স অফিস হিট করা ছবি করার কথাই ভাববেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চলচ্চিত্রের গৌরবময় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটবে।

তাপস রায়
কলিকাতা—১৫

প্রেক্ষাগৃহ

অনমোল মোতি
মনুষ্যত্বই হচ্ছে অমূল্য রত্ন—

দুর্মূল্য মুক্তোর চেয়ে মনুষ্যত্বের দাম বেশী, এই কথাটি দর্শকদের শোনাবার জন্য প্রৌঢ় গোকুলকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিউ ওরিয়েন্ট পিকচার্স নিবেদিত নারাঙ ফিল্মস-এর অনমোলী মোতির নায়ক নায়িকা যেভাবে জীবন বিপন্ন করে সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত যেতে হয়েছে, এবং অকটোপাসের দৃঢ় বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্যে রীতিমত লড়াই করতে হয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এরকম লোমহর্ষক দৃশ্যাবলী যে ভারতীয় ছবিতে অদৃষ্টপূর্ব, একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য। বাস্তবিকই ডুবুরি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক হিসাবে এই ছবির বহু পাত্র-পাত্রী যে জলক্রীড়া এবং শুক্তির সন্ধানে সমুদ্রগর্ভে পর্যন্ত ধাবমান হবার দৃশ্যগুলি উপস্থাপিত করেছেন, মাত্র তাই প্রত্যক্ষ করবার জন্যে বহু চিত্রামোদী যে উৎসুকভরে ছবিখানি দেখবেন, এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। মুক্তো সংগ্রহের জন্যে আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিতা এক বিদেশিণীর সঙ্গে ভারতীয় ডুবুরী মেয়ের জলের মধ্যে মারামারির দৃশ্যটিও অল্প কৌতূহলের সৃষ্টি করে না। কিন্তু সবচেয়ে উত্তেজনার সঞ্চার করে ছবির সেই অংশটি, যেখানে তরঙ্গ-সংকুল সমুদ্র-বক্ষে ভাসমান নৌকার ওপর প্রৌঢ় গোকুল সহসা অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ে এবং তার শিশু নাতনী অসহায়ভাবে কাঁদতে কাঁদতে একবার তার সংজ্ঞাহীন দেহকে নাড়াতে চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত নৌকার দোলায় টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে ও মাত্র শিশু হস্তের মুঠির সহায়তায় নৌকাটিকে আঁকড়ে ধরে নিজেকে ডুবে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করে। অন্য লোকের সাঁতরে এসে যতক্ষণ না তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত দর্শক স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন না। জলের ওপর এবং জলের ভিতর—এই উভয় প্রকারের চিত্রগ্রহণে এমন অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত প্রথম পদক্ষেপের জন্যে অনমোল মোতির প্রযোজক-পরিচালক এস ডি নারাঙ এবং চিত্রশিল্পী সুধীন মজুমদার ভারতীয় চলচ্চিত্রেতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

'অনমোল মোতি'র কাহিনীভাগে খুব বেশী অভিনবত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। ডুবুরি-ঘরের মেয়ে রূপার সঙ্গে ধনী ব্যবসায়ী হরি সিংয়ের ছেলে বিজয়ের প্রেম হিন্দী ছবির প্রচলিত পথেই অগ্রসর হয়। চিরাচরিতভাবেই ওদের বিবাহে বাধা আসে ধনী পিতার আপত্তির রূপ ধরে; হরি সিং বলে, সমানে সমানে কুটুম্বিতা হয়। রূপার ঠাকুর্দা গোকুল বলে, তাই হবে। এক প্রকাণ্ড মুক্তো সে তুলে নিয়ে এল সমুদ্রগর্ভ
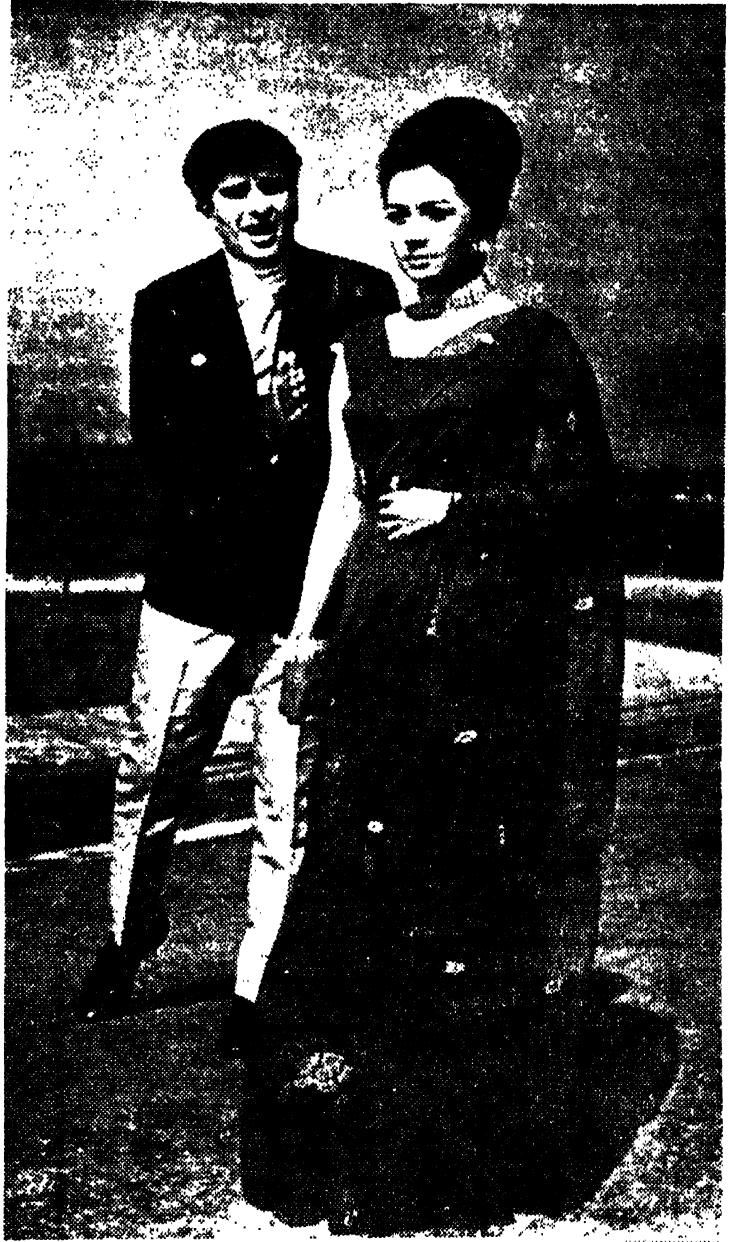
থেকে। আর তাকে ঠেকায় কে? বিবাহ হয় হয়, এমন সময়ে হরি সিংয়েরই চক্রান্তে সেই মুক্তো চুরি করল শয়তান চরণদাস। শোকে, ক্ষোভে পাগল হবার উপক্রম হল গোকুল। শেষ পর্যন্ত সে আবার ডুব দিল সমুদ্রের তলদেশে, নিয়ে এল আবার এক বিরাট মুক্তো। এবার হরি সিং হার মানল।

এ ছবিতে অভিনয় জিনিসটা প্রধান নয়, প্রধান হতে পারে না। তবু এতে কাহিনীর চাহিদা অনুযায়ী সু-অভিনয় করেছেন জয়ন্ত (গোকুল), জীতেন্দ্র (বিজয়), ববিতা (রূপা), রাজেন্দ্রনাথ (হাস্যরসবিতরণকারী মোতি), অরুণা ইরানী (বাসন্তী), সপ্রু (হরি সিং), জীবন (চরণদাস), জাগীরদার (পুরোহিত) প্রভৃতি সকলেই।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগে উচ্চ প্রশংসা লাভের মতো কুশলতা প্রদর্শিত হয়েছে। ছবির সংলাপ বহুস্থানেই পরিস্থিতি অনুযায়ী উপভোগ্য। গানগুলির কথা ও সুর কোথাও পরিস্থিতি অনুযায়ী আবহ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে এবং কোথাও চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের এমনি একখানি গান হচ্ছে মহেন্দ্র কাপুর গীত এ হুসনে বেখবর তুঝে তকনে কো ইক নজর ঝুকতা তো হোগা

মোজ ভেরে ঘর পে মহতাব ইয়ে জানে চমন'।

ইস্টম্যান কলার রঞ্জিত 'অনমোল মোতি' দর্শক চিত্তবিনোদনের একটি নবতর পথের উন্মোচন করে ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে একটি নতুন স্তম্ভ রূপে কীর্তিত হবে।

এই সেই স্থান, যেখানে মানুষ আর মানুষ থাকে না

জ্যাকোলিন সুসানকে ধন্যবাদ, তিনি ব্রডওয়ের (এবং কিছুটা ইঙ্গিতমূলকভাবে হলিউডেরও) মর্মরপ্রাসাদকে ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছেন, ওখানকার শো বিজনেস'এর

কৃত্রিমতা রূপসী গায়িকা এবং অভিনেত্রীদের জীবনকে কি মর্মন্তুদভাবে ব্যর্থতার ব্যথায় ভরিয়ে তোলে, তা নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন তাঁর ভ্যালি অব দি ডলস উপন্যাসের মাধ্যমে। নীলা ওহারা, জেনিফার নর্থ, অ্যান ওয়েলস ও হেলেন লসন—এই চারটি নারীর জীবনযাত্রা গ্ল্যামারের অন্বেষণে কি শোচনীয়ভাবে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং ঘুমের বড়ি, ক্ষুধার বড়ি, দেহকে নির্দিষ্ট পরিমাপের রাখার জন্যে বড়ি, নানাবিধ মাদক বড়ি প্রভৃতি ব্যবহারের ফলে আত্মঘাতী অস্বস্তিকরতায় ভরে ওঠে, তার আনুপূর্বিক বিবরণ পাঠে শিহরিত হতে হয়।

প্রায় বৎসরাধিক ধরে আমেরিকায় সর্বাধিক বিক্রয়ধন্য এই ভ্যালি অব দি ডলস উপন্যাসটিকে বেশ কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্জন করে রঙীন চলচ্চিত্রের রূপ দিয়েছেন যুগ্মভাবে পরিচালক মার্ক রবসন ও প্রযোজক ডেভিড উইজবার্ট। এই উত্তেজক ছবিটিতে ব্রডওয়ের গ্ল্যামার যা জাঁকজমক, বিভিন্ন নবাগতাকে আকর্ষণীয় 'শো গার্ল'-এ পরিণত করবার জন্যে এজেন্ট এবং অনুষ্ঠান-প্রবর্ধকদের বহুরকম নিয়ন্ত্রণ-প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে দেখাবার পরে তাদের ওপরে এইসব প্রক্রিয়ার কি বিষময় প্রতিক্রিয়া ঘটে, তাও দেখানো হয়েছে। তবে কাহিনীটি বহুমুখী হওয়ায় চারজন নারীর জীবনের ট্র্যাজিডি একই সঙ্গে যথেষ্ট ঘনীভূত হতে পায়নি। তবে অসামান্য প্রতিভাময়ী নীলী ও'হারার কারুর অবিমিশ্র ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হবার আর্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার দুঃখব্যঞ্জক চিত্রটি 'দি মিরাকল ওয়ার্কার' ছবিতে বালিকা হেলেন কেলার-এর ভূমিকাভিনেত্রী প্যাটি ডিউক যে-বিস্ময়কর নাটনৈপুণ্যের মাধ্যমে চিত্রিত করেছেন, তা এই ছবিটিকে চিত্ররসিক মাত্রেরই

কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবে। ব্রডওয়েতে নবাগতা অ্যান ওয়েলস-এর ভূমিকায় বারবারা পার্কিন্স-এর অভিনয় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। অপরাপর ভূমিকায় শ্যারণ টেট (জেনিফার নর্থ), সুসান হেওয়ার্ড (হেলেন লসন), পল বার্ক (লায়ন বার্ক) প্রভৃতির অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী পরিবেশিত অবশ্যদর্শনীয়।

যাত্রা জগৎ

আশা ও আনন্দের কথা, বাঙলার একান্ত নিজস্ব লোক-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতম বাহন যাত্রাভিনয়ের প্রতি বর্তমানে বিদগ্ধসমাজের কৃপাদৃষ্টি বর্ষিত হতে শুরু করেছে। শহর কলকাতার আলু-পোস্তা এবং বিভিন্ন বাজার অঞ্চলে পেশাদারী যাত্রাভিনয়গুলি সীমাবদ্ধ না থেকে শোভাবাজার রাজবাড়ী, বিশ্বরূপা ও রঙমহল রঙ্গমঞ্চ, মহাজাতি সদন, ত্যাগরাজ হল, এমনকি রবীন্দ্রসদনে পর্যন্ত এ'দের আসর বসছে। যাত্রাসম্প্রদায়গুলির মালিকেরা যুগরুচি পরিবর্তন সম্পর্কে সজাগ হয়ে দর্শকদের চিত্তবিনোদন জন্যে শুধু যে অভিনেয় পালার বিষয়বস্তুতেই অভিনবত্ব আনয়নে যত্নবান হয়েছেন, তাই নয়, তাঁরা নাট্যপ্রযোজনা এবং সাংগঠনিক ব্যাপারেও অনেক গুণীজ্ঞানীর পরামর্শ গ্রহণ করছেন। তাই দেখি, একদিকে তাঁরা যেমন রাজা রামমোহন, হিটলার, মাইকেল মধুসূদন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি, বিনয়-বাদল-দিনেশ প্রভৃতি জীবনীমূলক নাটক এবং বিরাজ বৌ, ছেলে প্রভৃতি শরৎসাহিত্যের নাট্যরূপ পরিবেশনে আগ্রহী হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনই তারা কমল মিত্র, দীপক মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র প্রভৃতি প্রথিতযশা মঞ্চ ও চলচ্চিত্র শিল্পীকে গোষ্ঠীভুক্ত করেছেন, নাট্যনির্দেশনায় সাহায্য-গ্রহণ করছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমর ঘোষের।

●

গেল ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অন্যতম পেশাদারী যাত্রাসংস্থা তরুণ অপেরা মহাজাতি সদনে সৌরীন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'রাজা রামমোহন' পালানাটকটিকে মঞ্চস্থ করেছিলেন। বাস্তব ঘটনা কিংবদন্তী ও কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত নাটকখানিতে স্থানে স্থানে নাট্যআবেদন রীতিমত অনুভূত। দর্শকের কৌতূহলকে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করে একেবারে চূড়ান্ত ক্লাইমাক্সে পৌঁছে দেবার মতো করে নাটকীয় ঠাসবুনানি রচনাটির মধ্যে মোটামুটি ভালোই আছে দেখতে পাওয়া গেল। অবশ্য যাত্রাপালার যা বিশিষ্ট অঙ্গ, সেই গানের দিক দিয়ে এতে বেশ কিছুটা দৈন্য রয়ে গেছে। অভিনয়ে শান্তিগোপাল (রামমোহন), অমর ভট্টাচার্য (রামকান্ত), সুদেশকুমার (গুরুদাস), অজিত দত্ত (ডেভিড হেয়ার), বাবলু চৌধুরী (গোলাম আব্বাস), বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায় (সলিমা), পুতুল দত্ত (তারিণী), সুপর্ণা মন্ডল (উমা) গীতা দত্ত (জয়া), আরতি দত্ত (অলকমঞ্জরী) প্রভৃতি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সুদর্শন সেনের গানগুলি উপভোগ্য।

স্টুডিও থেকে

'আর কতকাল থাকবো বসে
দুয়ার খুলে,
আমার বঁধুয়া'......

প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেলা গলায় রিন-রিন সুরে গেয়ে উঠল লাইন কটা। সুর ও কথা অতুলপ্রসাদের বাংলা ছবির জগতে নির্মিয়মান ছবির লিস্টে আর একটা নাম বাড়ল। শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরী ফিরে এলেন কিছুদিন বাদে। এবার ও'র হাতে শুধু স্ক্রিপ্টের খাতাই নেই, বাঁশী আর নোটেশন দুই-ই আছে। ছবির নাম 'যদুবংশ' ওপরের গানটি এই ছবির জন্যই। কাহিনী বিমল করের, আর মোটামুটি আপাতত সিলেক্টেড নটনটী হলেন সুভেন্দু, সৌমিত্র আর অপর্ণা। শুনছি শর্মিলার নামটাও আসছে তালিকায় এবং সঙ্গে পার্থপ্রতিমেরও বুঝি বা।

পর পর কয়েকটা ছবির নাকানি-চোবানি খাবার পর আবার এক নতুন ছবির মহরৎ নতুন কি আশার আলো দেখালো সেটা আসল কথা নয়, আনন্দের ব্যাপার হোল তরুণ পরিচালক আবার অন দি ট্রাক। একে 'যদুবংশ'। আজকের সময়ের এক নামকরা বই। তায় আবার পার্থপ্রতিমের মত পরিচালক! দুয়ে মিলে এক নতুন পরীক্ষার সঙ্গে নতুন অ্যাডভেঞ্চারও বটে! সাম্প্রতিক কালে কাহিনী নির্বাচনে পরিচালকদের দেখা যাচ্ছে একটু বেশী মাত্রায় নবীনতম সাহিত্যের প্রতি বিশেষ ঝুঁকি। সলিল দত্তর 'অপরিচিত', আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'এপার-ওপার', সত্যজিৎ রায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি', হীরেন নাগের 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' ইত্যাদি থেকেই যে আঁচ পাওয়া যায়।

নতুনের প্রতি এ অতি আগ্রহ কেন? চিত্রপরিচালকরা কি অকস্মাৎ সবাই 'আধুনিক' হয়ে উঠলেন? সমকালীন সমস্যা কি তাঁদের হঠাৎ মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়াল? হয়ত বা গুটি কয়েকের কাছে। কিন্তু আর সবাই? 'যদুবংশ' ছবির প্রথম অনুষ্ঠানে বসে এ কথাটাই মনে আসছিল বার বার। পার্থপ্রতিমবাবুর নাট্যকার হিসাবে সুনাম কম নেই। নিজের দলও আছে। 'শুভা ও দেবতার গ্রাসে' তাঁর স্বাধীন পরিচালনার শুরু। যাই হোক, সমকালীন চিন্তা, সমাজ ও সমস্যা কি শ্রীচৌধুরীকেও পীড়িত করল?

বিমল করের 'যদুবংশ' আজকের যুব-সমাজের অস্থির মানসিকতার আংশিক প্রতিচ্ছবি। সমকালীনতার যথেষ্ট মাল-মশলা আছে গল্পে। এবং তার সঙ্গে পরিচালকের চিন্তার অনুপ্রবেশের প্রয়োজন। 'যদুবংশ', 'অরণ্যের দিনরাত্রি' বা 'এপার-ওপার' নিয়ে একথা বলছি না। কিন্তু সিনেমায় সম-সাময়িক চিন্তার প্রতিফলন থাকলে তা যথার্থ শিল্প হয়ে উঠতে পারে এটা অনস্বীকার্য।

কিছুদিন আগে একজন খ্যাতনামা পরিচালকের সঙ্গে কথা বলেছিলাম এ ব্যাপারে। তিনি বলেছিলেন ঐতিহাসিক পৌরাণিক যে ঘটনাই হোক না তা কালের বেড়া ভেঙে সমকালীন শিল্প হয়ে উঠতে পারে যদি বর্তমানের 'সমস্যা সংকট সংঘাতের' সঙ্গে সেকালের আত্মিক যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। মোট কথা গল্পে ও চরিত্রে একালের সুর যেন বেজে ওঠে। আসল ব্যাপার কাহিনী যে কালেরই হোক না কেন, কিভাবে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে, কি ঢং-এ তার বিশ্লেষণ হচ্ছে সেখানেই তার কনটেম্পোরালিটি।

এভাবে দেখলে মৃণাল সেনের 'বাইশে শ্রাবণ' যে পর্যায়ে পড়ে, সত্যজিৎ রায়ের 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'ও সেই একই তালিকায়, আবার পার্থপ্রতিমের 'ছায়াসূর্য'ও বাদ পড়বে না। সুতরাং একটা কথা পরিচালকদের মনে রাখার প্রয়োজন যে কাহিনী আজকের জনপ্রিয় তরুণ লেখকদের গরম গরম কাহিনী নিয়ে ছবি করলেই তা কনটেম্পোরারি আর্টের পর্যায়ে হয়ত নাও পড়তে পারে।

সাবিত্রী দেবীকে (চট্টোপাধ্যায়) আজকাল আর স্টুডিও পাড়ায় বিশেষ নজরে পড়ে না। অবশ্য ও'র হাতে ছবিও খুব কম। মাত্র তিনটে। সলিল দত্তর 'কলঙ্কিত নায়ক', অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নিশিপদ্ম' আর অজিত গাঙ্গুলীর 'মুক্তিস্নান'। গত সপ্তাহে এন-টির এক নম্বরে 'নিশিপদ্ম'র সেট পড়েছিল। সুন্দর সাজানোগোছানো ঘরের দৃশ্য। ক্যামেরা মিড ক্লোজে রয়েছে। একটা গানের টেক হলো।

সাবিত্রী দেবীর হাতে খাবার থালা। উত্তমকুমারের হাতে মদের বোতল। বার কয়েক লিপ মিলিয়ে নেবার পর আলোগুলো জ্বলে উঠল সব। সাউন্ড রেডি। সঙ্গে সঙ্গে সেটের পেছনে গানের ফিতে ঘুরতে শুরু করল।

'ওরা যে যা বলে বলুক,
ওদের কথায় কি আসে যায়।
ওরাই রাতের ভ্রমর হয়ে
নিশিপদ্মের মধু খায়।'

উত্তমকুমার গানটির সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে গেলেন সুন্দরভাবে। তার সাথে সাবিত্রী দেবীর চোখ-মুখের অভিব্যক্তিও নিপুণ

শিল্পীর পরিচয় দেয়। হঠাৎ মনে এল 'টাকা আনা পাই', 'পাশের বাড়ী'র সাবিত্রী দেবীকে। সেই ক্ষীণাঙ্গী ছটফটে যুবতী আজ যৌবনের মধ্যযামে। তিনি যে কত নিপুণ প্রতিভাধর শিল্পী তার প্রমাণ 'বধূ', 'ভ্রান্তিবিলাস' ইত্যাদি বহু ছবিতেই পাওয়া গেছে। এই নতুন ছবি 'নিশিপদ্ম'ও তাঁর অভিনয় জীবনের এক স্মরণীয় অভিনয় হয়ে থাকবে। সাবিত্রী দেবীর অভিনয় সৌকর্যের আর এক দফা পরিচয় মিলবে এ ছবিতে।

●

গত শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করে জানালো মিনার, বিজলী, ছবিঘরের বিরুদ্ধে তারা হয়ত আবার আন্দোলনে নামবে যদি 'গুপী গাইন'-এর পর ঐ তিনটে হলে 'আরোগ্য নিকেতন' মুক্তি না পায়। এ ব্যাপারে পাঁচ দফা কর্মসূচী তারা গ্রহণ করেছেন। (১) মিনার, বিজলী, ছবিঘরের সামনে প্রতীক ধর্মঘট, অবস্থান ধর্মঘট ও সবশেষে অনশন ধর্মঘট। (২) হল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ ইত্যাদি। এদিন সম্মেলনে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন পরিজাত বসু ও বিজয় চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বারোজন সদস্যের কমিটির সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে হল কর্তৃপক্ষ ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিচ্ছেন হয়ত, কিন্তু এর আশু ফলতো ভালো নয়—এটা সবাই-ই বুঝবেন। এতদিন বাদে যখন স্টুডিও পাড়ায় একটু মৃদু মিলনের হাওয়া বইবার তোড়জোড় করছিল তখন আবার নতুন সমস্যার সৃষ্টি কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বাণী শোনাবে?

মঞ্চাভিনয়

নাটক সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা আজ প্রতিমুহূর্তেই ভাঙছে, বিষয়বস্তু আর আঙ্গিক পরিকল্পনায় অপ্রত্যাশিত রূপান্তর নাট্য-আন্দোলনের ব্যাপ্তি আর গভীরতায় যে সাহায্য করছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপে সম্প্রতি এক নতুন ধরনের নাটক অভিনীত হচ্ছে যেখানে প্রতিমুহূর্তে চলতি নাট্যচিন্তা নতুন পথে বাঁক নিয়ে দর্শকের বুদ্ধিবৃত্তি ও দীর্ঘদিন ধরে লালিত শিল্পবোধকে কখনো আন্দোলিত বা প্রশ্নমথিত করছে। সমালোচকদের ভাষায় এই নাটকগুলোকে বলা হয়ে থাকে 'অ্যান্টি-প্লে'। সম্প্রতি 'গান্ধার' প্রযোজিত চাণক্য সেনের 'তারারা শোনে না'র মধ্যে অ্যান্টি-প্লে'র যথার্থ শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পেরেছে। বোধ হয় 'গান্ধার'ই প্রথম অ্যান্টি-প্লে বাংলায় পরিবেশন করার গৌরব অর্জন করতে পারল। পূর্ব প্রযোজনার সব বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে 'তারারা শোনে না' নতুন এক স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং এই সূত্রে বাংলা দেশের নাট্য-নিরীক্ষায় 'গান্ধার' পেয়েছে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা।

নাট্যকার চাণক্য সেন বলেছেন—'এটা নাটকও নয় আবার উপন্যাস নয়। এটা সরল এবং সহজভাবে একটি 'অ্যান্টি-প্লে'। কোন বাঁধাধরা নায়ক-নায়িকা এতে পাবেন না, যদি কাউকে পান তাহলে তা আমার বা আপনার খণ্ডিত এক ছায়া।' নাট্যকারের নিজের কথা থেকেই এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, 'তারারা শোনে না' নাটকের মধ্যে কাহিনীগত কোন বৈচিত্র্য নেই, যা আছে তা হল জটিল বিংশ শতকের যন্ত্রণাক্রান্ত কিছু জ্বলন্ত এবং বিষণ্ণ অনুভব। জীবনের বিচিত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন আবর্তে পড়ে নাটকের মূল চরিত্র অর্থাৎ "আমি" যেন কেমন একটা অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে, কোন কিছুরই মধ্যেই সে পরিপূর্ণতার আলো দেখতে পায় না। কেননা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে বারবার সহস্রমুখী জটিলতা এসে জীবনকে নানা রঙে উপলব্ধি করার প্রবণতাকে প্রচণ্ড জোরে আঘাত দেয়, সে আঘাতে মানুষ ক্লান্ত হয় এবং জন্ম ও জীবন সম্পর্কে উদ্দীপ্ত সব দৃষ্টিই তার স্তিমিত হয়ে আসে সঙ্গত কারণেই। জীবনের মূল্যবোধের অপচয়, সৃষ্টিশীল প্রতিভার অপমৃত্যু, রাজনীতি ও সাহিত্য নিয়ে ছেলেখেলা—সব বিষণ্ণ ছবিই তাকে ক্লান্ত করে এবং মাঝে মাঝে তার চোখে আনে জল। ফেলে-আসা দিনগুলিতে মাধবীর সঙ্গে অনুভব-মেশা রঙীন মুহূর্তগুলো তার মনে এসে দোলা দেয়, তখন ক্ষণিকের জন্য সে হয়ে ওঠে কোমল এক স্বাপ্নিক। কিন্তু পরমুহূর্তেই বাস্তব জীবনের রূঢ়তা তাকে কঠিন করে দেয় মূল্যহীন হয়ে যায় তখন অনুভবের দোলা। মনে হয় নাট্যকার চাণক্য সেন আজকের যে মানুষ আলো-অন্ধকার এবং স্বপ্ন এবং বাস্তবের প্রতিনিয়ত সূক্ষ্ম সংঘাতে বিপর্যস্ত তাকেই রূপ দিতে চেয়েছেন 'তারারা শোনে না' নাটকে।

নাটকের সংলাপ অত্যন্ত জোরালো। তবু কথার নাটকে মাঝে মাঝে [illegible] গভিকতা এসে যায়, কিন্তু নাট্যকার এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন বলে 'তারারা শোনে না' নাটক এ শৈথিল্য থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে। মাঝে মাঝে [illegible] [illegible]

ভাবিক আবেগ, আবার কখনো বা হয়েছে চলতি পথের চেনা কথায় মুখর। সমাজে প্রচলিত ব্যবস্থা, সাহিত্যের নামে ব্যভিচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে নাট্যকারের তীব্র বিদ্রুপ বর্ষিত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে সংলাপ রচনায় তাঁর শৈল্পিক কৌশল নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। আপাত-দৃষ্টিতে কয়েকটি সংলাপকে অশ্লীল বলে মনে হলেও, আসলে তা কিন্তু গভীর চিন্তাশক্তিরই পরিণত ফসল।

নাট্য-প্রযোজনার ক্ষেত্রে 'গান্ধারের'র শিল্পীরা এর আগে যে সূক্ষ্ম শিল্পবোধের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, 'তারারা শোনে না' নাটকে তা তো আছেই, বরঞ্চ কোন না কোন বিষয়ে এবার তাঁরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পেরেছেন। নাট্য-নির্দেশনায় অসিত মুখার্জি আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় রেখেছেন, তাঁর সংযমবোধ এবং জীবনধর্মী শিল্পচিন্তা আমাদের মুগ্ধ করেছে। 'আমি'; 'মাধবী' ও 'মরমী' চরিত্রের ক্ষোভ ও যন্ত্রণাকে নিখুঁতভাবে মঞ্চে মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন নির্দেশক অসিত মুখার্জি ও গীতা চক্রবর্তী। এঁদের অভিনয়ের স্বাভাবিকতা এবং প্রাণোচ্ছলতা আমাদের স্পর্শ করেছে। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন— সীতানাথ চৌধুরী, মলি মুখার্জি, শ্যামল মুখার্জি, অচিন্ত্য চক্রবর্তী। আবহসঙ্গীত সৃষ্টিতে ভাস্কর মিত্র তাঁর স্বকীয় শিল্প-চিন্তার নজীর রাখতে পেরেছেন, নাটকের গতি আরো অনেক বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে তাঁর সুরসৃষ্টির মূর্ছনায়। আলোকসম্পাত আর মঞ্চসজ্জায়ও পিন্টু বসু ও সুরেন দত্ত যে শৈল্পিক সুষমা মঞ্চে এনেছেন, তার তুলনাও বিরল। কিন্তু নাটকের মধ্যে নৃত্য-পরিকল্পনার দৃশ্যটি মনে হয় কিছু ছন্দোপতন ঘটিয়েছে, ঐ মুহূর্তটি না সৃষ্টি করলে মূল নাটকের বক্তব্যের দিক থেকে খুব একটা ক্ষতি হত কি?

গত ৩০ আগস্ট 'অনীক' গোষ্ঠীর প্রযোজনায় সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের 'অথবা কে ও কি' ও 'জ্বালা' একাঙ্ক দুটি মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকার নিজেই পরিচালনা করেন। মঞ্চসজ্জা সুন্দর। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন চন্দন রায়, কাজল বাগচী, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, রীণা সেনগুপ্ত, বিঠু, দীপা এবং টুটু প্রমুখেরা অভিনয় দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' একটি অনবদ্য নাটক। এই নাটকটির মঞ্চায়ন 'অনীক' গোষ্ঠীর দুঃসাহসিকতার পরিচয়। শিল্পীদের মধ্যে কাজল বাগচী, বাবু দাসগুপ্ত, অজিত রায়, বিতান রায় সংযত ও মার্জিত।

পৃথিবী কি আজ একটা পাগলামির পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে? কিংবা কিছু ধনী ও মতলববাজ ব্যক্তি গোটা পৃথিবীর লোককেই কোনো-না কোনো রকমে পাগল সাজিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন?— প্রশ্নটা জেগেছে সেদিন মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে 'প্রতিবিম্ব' নাট্য-[illegible] ও [illegible] পরিচালিত 'ঝিঁঝিঁ পোকার কান্না' নাট্যাভিনয়টি দেখে। নাট্যকার 'অগ্নিদূত' গোটা দর্শকসমাজকেই ত উঠতি-পাগল, আধ পাগল ও বদ্ধ পাগল আখ্যায় ভূষিত করলেন!

নাট্যকাহিনীতে আছে, একটি উন্মাদ আশ্রমের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা ব্যাপারে রোগীদের মনে অভিযোগ জমা হয়ে উঠলেও আশ্রম পরিচালক বড়সাহেব চাবুকের জোরে সকলকে দাবিয়ে রাখতে চান। আশ্রমের সবাই যে যথার্থ পাগল, তাও না; কাউকে কাউকে বিভিন্ন কারণে পাগল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন দার্শনিক কুমারেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীর অব্যবস্থার কথা জানিয়ে বহু লোকের পাগল হওয়ার সঠিক কারণ নির্ণয় করেন। অন্যদিকে উন্মাদ-আশ্রম সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান করতে এসে নাট্যকার রঞ্জিত বসু বড়বাবু দ্বারা পাগল বলে সাব্যস্ত হয়ে আশ্রমে বন্দী হন। এমন সর্বশক্তিমান বড়বাবু পরিচালিত আশ্রমটি কোথায়, তা অনুমান করা কঠিন। যদি বৃহত্তর সমাজের প্রতীক হিসেবে এই আশ্রমটি হয়, তাহলে নাটকে প্রতীকধর্মিতা স্পষ্ট নয় ও বিভিন্ন চরিত্র উপস্থাপনে ত্রুটি আছে।

সামগ্রিক অভিনয়ের দিক দিয়ে নাট্যাভিনয়টি অত্যন্ত সাফল্যপূর্ণ।

বিবিধ সংবাদ

গত ২৩ আগস্ট কমার্শিয়াল অডিট রিক্রিয়েশন ক্লাবের একাদশ বার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী এন এম দত্ত। বিচিত্রানুষ্ঠানের শেষে বনফুলের 'নব সংস্করণ' ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রংয়ের দিন' একাঙ্ক দুটি মঞ্চস্থ করে ক্লাবের সদস্যবৃন্দ। সুঅভিনীত এ নাটক দুটির শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণ মৈত্র, অসীম বাগচী, রঞ্জিত ভট্টাচার্য, মোহিত ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

মেরী অর্ব/সুনীল দত্ত ও ওয়াহেদা রহমান

জামশেদপুরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মোসুমী তাঁদের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি উৎসবের আয়োজন করেছিল গত ৭ ও ৮ সেপ্টেম্বর স্থানীয় মিলনী মঞ্চে। উৎসবের প্রথম সন্ধ্যায় মোসুমী সন্দ্ধ্যা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নবারীতির আধুনিক নাটক 'কন্ঠনালীতে সূর্য' মঞ্চস্থ করে। আঙ্গিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোসুমীর নাট্যবিভাগ যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয়াংশও সাবলীল ও সজীব। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন দিলীপ পাল, গৌর বিশ্বাস, [illegible] বসু, [illegible] মুখোপাধ্যায়, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় ও অনুপম গুপ্ত। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় কলকাতার এন বি এন্টারপ্রাইজ নিবেদন করলেন সন্তোষকুমার ঘোষের অসাধারণ নাটক 'অজাতক'।

●

এই সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ভিত্তিতে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উদ্যোগে সরকারীভাবে আমাদের দেশে রুমানিয়ার চলচ্চিত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দিল্লী, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি শহরের পরে আমাদের এই কলকাতা শহরে সপ্তাহব্যাপী রুমানিয়া চলচ্চিত্রোৎসবের উদ্বোধন হল স্থানীয় ম্যাজেস্টিক সিনেমায় গেল ১২ সেপ্টেম্বর। উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু।

●

গেল ৭ সেপ্টেম্বরে মহাজাতি সদনে যাত্রাপ্রতিষ্ঠান তরুণঅপেরার পক্ষ থেকে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীকে এক সম্বর্ধনা জানান হয়। শ্রীচৌধুরীর নট-জীবনের শুরু হয় সৌখীন যাত্রার আসরে। প্রদত্ত মানপত্রে তাই তরুণ অপেরার শিল্পীরা দাবী করেন শ্রীচৌধুরী 'আমাদেরই লোক'। এই প্রীতি-পূর্ণ অনুষ্ঠানটিতে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও ডঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

●

সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ক্রেমস অফিস ড্রামাটিক ক্লাব গেল ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্বরূপ রঙ্গমঞ্চে বাঙলা রঙ্গালয়ের সুমহান নট সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানীবাবুর) জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে তাঁরই শেষ অভিনয়কীর্তির বাহন অনুরূপা দেবী রচিত এবং অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নাট্যরূপায়িত 'পোষ্যপুত্র'কে মঞ্চস্থ করেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে। নাট্য-প্রগতির যুগেও 'পোষ্যপুত্রে'র মতো নাটকের যে শাশ্বত আবেদন আছে, তা এঁদের অভিনয়সাফল্যই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করেছে।

●

গত বছর আগস্ট মাসে বৈতানিকের বিংশতিবর্ষ পূর্তি উৎসব শুরু হয়ে এ বছর ৩১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পাঁচদিনব্যাপী অনাড়ম্বর ভাবগম্ভীর মনোরম ঘরোয়া পরিবেশে তার সমাপ্তি ঘটে।

৩১ আগস্ট ডঃ দেবেন্দ্রনাথ বসু এবং ১ সেপ্টেম্বর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতিত্ব করেন। ২ সেপ্টেম্বর শ্রীমন্মথ রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতিথি শ্রীশম্ভু মিত্র সারগর্ভ ভাষণ দেন।

৩ সেপ্টেম্বর অবনীন্দ্র জন্মোৎসবে নির্ধারিত সভাপতি শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর লিখিত মূল্যবান ভাষণটি পড়ে শোনান হয়।

৪ সেপ্টেম্বর বিংশবর্ষ পূর্তি উৎসবের সমাপ্তি দিনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীভূপতি মজুমদার।

সমাপ্তি সন্ধ্যায় সর্বশ্রী সুমিত্রা সেন, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, আলপনা মিত্র, অমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শৈলেন ঘোষের রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশনে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হন। বৈতানিকের শিল্পীরা সম্মিলিত কণ্ঠে 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল মম তব অকৃপণ করে' সমাপ্তি সঙ্গীত এখনও কানে লেগে আছে। [illegible]

যেন ভুলে না যাই

জিন হারলো

মায়ের নামে নাম—জিন হারলো। বিয়ের পর মায়ের এই নামটি যাতে মুছে না যায় সেইজন্য মা তাঁর মেয়েকে নিজের নামটা দিয়ে গেলেন। আসলে মেয়ের নাম ছিল হারলিন কারপেন্টিয়ার। ১৯১১ সালের ৩ মার্চ আমেরিকার কানসাস শহরে জিন হারলো তাঁর ঠাকুর্দার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ বয়সে নাতনিকে পেয়ে ঠাকুর্দা তো পাগল। আনন্দের অন্ত ছিল না। নিজের ব্যবসা ফেলে সারাদিন নাতনিকে নিয়েই তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন, নানান আব্দারের রসদ যোগাতেন। হারলোর বাবা কিন্তু মেয়ের এই বাড়াবাড়িটা মোটেও পছন্দ করলেন না। বরং তিনি এই নিয়ে হারলোর ঠাকুর্দাকে অনেক কথা শুনিয়ে রাগ করে এখান থেকে চলে গেলেন। তখন জিন হারলোর বয়স মাত্র দু'বছর।

জিন হারলোর বাবা ছিলেন ডাক্তার। ডাক্তারী নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। মায়ের তাগিদেই সাত বছর বয়সে ঠাকুর্দার কাছ থেকে হারলোকে চলে আসতে হল। হারলো ভর্তি হলেন স্কুলে। লেখাপড়া শুরু হল। বয়স বাড়তে থাকল। কিন্তু একটা ব্যাপারে হারলোর মনে সন্দেহ জাগল। এ বাড়িতে বাবার অনুপস্থিতির কারণটা এই বয়সে কিছুতেই তিনি অনুমান করতে পারলেন না। তাই মাঝে মধ্যে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলে হারলোর মা মেয়েকে কোন কথা মুখ ফুটে বলতে পারতেন না, শুধু নীরবে কাঁদতেন। মায়ের দুঃখ কোথায় তা বুঝতে না পারলেও মাকে কাঁদতে দেখে হারলো বাবার প্রসঙ্গে আর কোনদিন জানতে চাননি। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাবা মাকে ত্যাগ করেছেন।

স্বামীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে জিন হারলোর মা ক্যালিফোর্ণিয়ায় চলে এসে মেয়েকে হলিউডে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ হারলোকে মুগ্ধ করে। ফেলে আসা দুঃখের দিনগুলো এই পাহাড়ে ঘেরা রাশি রাশি সৌন্দর্যের মেলায় হারলোর জীবন রঙিন হয়ে উঠল। শুধু প্রকৃতিই নয় মাঝে মাঝে পথ চলতে চলতে হঠাৎ চিত্রতারকার সঙ্গে হারলোর মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত। হয়ত এই চিত্রতারকা-দর্শনের মধ্যে দিয়েই ভবিষ্যতে তারকা হবার একটা স্বপ্ন তাঁর শিশুমনে দাগ কেটেছিল। স্কুল-বোর্ডিংয়ে থেকেই হারলো পড়ালেখা চালিয়ে যেতে লাগলেন। সপ্তাহে একবার করে তিনি মাকে দেখে আসতেন। আর বাকি কটা দিন বোর্ডিংয়ে থেকেই কেটে যেত। স্কুলের দিনগুলো বেশ সুখের ছিল। প্রত্যেক শুক্রবার এই স্কুলে নাচের হাট বসত। এই বিশেষ দিনে নাচের আসরে মেয়েরা তাদের পুরুষ-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করত। এমনি এক নাচের দিনে হারলোর এক সহপাঠি চাক চার্লসের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দিল। চাকের ব্যবহারে হারলো মুগ্ধ হলেন। ক্রমশ তাকে ভাল লাগল। একদিন নাচের তালে তালে দুটি হৃদয় একাত্ম হলে ভাল-বাসার কথা জানাল। ওরা প্রেমে পড়ল।

জিন হারলোর আর দেরি সইল না। এক-দিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে নিজেই মায়ের কাছে ছুটে এলেন। সঙ্গে চাকও হাজির। মা সব শুনে বললেন, 'তোমার জীবন তুমিই বেছে নাও, তবে আমার মনে হয় বিয়ের বয়স এখনও তোমার হয়নি। বলতে গেলে মায়ের অমতেই সেই রাতেই হারলো তার প্রিয়তম চাক চার্লস এক ম্যাকগ্রুকে জোর করে বিয়ে করলেন। এ বিয়ের সাক্ষী হলেন প্রতিবেশী একজন মন্ত্রী, তাঁর স্ত্রী এবং কিছু পড়শী। মাত্র ষোল বছর বয়সে জিন হারলো বাইশ বছরের চাককে স্বামীরূপে গ্রহণ করলেন। লেখাপড়া সব শিকেয় তুলে লস এঞ্জেলস-এ স্বামীগৃহে হারলো হ্যানিমুন করতে চলে গেলেন।

বিবাহিত জীবন প্রথম সবারই সুখের হয়, যেমন হয়েছিল জিন হারলোর। কিন্তু ভালবাসার মোহ কেটে গেলেই একদিন হারলো অনুভব করলেন, তিনি সাজান পুতুল ছাড়া আর কিছুই নন। চাক তাকে শুধু ঘরের বউ করে সাজিয়ে রেখেছে। স্বাধীনভাবে কিছু করার পেছনে চাকের কোন উৎসাহ নেই। সাড়া নেই। ফলে এই বন্দী জীবন জিন হারলোর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। হারলোর মত দুরন্ত মেয়ের পক্ষে এমনিতর নীরস জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। কোনরকম মীমাংসায় পেঁছিতে না পেরে হারলো তাঁর মাকে সব খুলে জানালেন। মা এসে আবার হারলোকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন।

জিন হারলো যেন আবার প্রাণ ফিরে পেলেন। যৌবনের উন্মাদনায় তিনি উপচে পড়লেন। যৌবন যেন আর কিছুতেই বাঁধ মানছে না। তাঁর সারা অঙ্গে কামাবেগ ফেটে ফেটে পড়তে চাইছে। ঠিক এমনি সময়ে আর এক দোসর জুটে গেল। পারিবারিক বন্ধু লুসিলি লি হারলোকে বোঝালেন, তাঁর উপযুক্ত ক্ষেত্র হল চলচ্চিত্রাভিনয়। সিনেমায় অভিনেত্রী হতে পারলে তাঁর দুঃখ ঘুচে যাবে। এমন যৌবনকে নষ্ট করা কোনমতেই উচিত নয়। সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে হারলো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। সিনেমায় অভিনয় করার প্রথম যোগাযোগ লুসিলি-ই করে দিলেন। হারলোকে নিয়ে তিনি চল

স্টুডিওর শিল্পী-নির্বাচন দপ্তরে হাজির হলেন। হারলোর অদ্ভুত রূপ দেখে স্টুডিওর লোকেরা তাঁকে তালিকাভুক্ত করলেন। জিন হারলোর বিবরণে লেখা হল ঃ বয়স বোল। সুন্দরী, যৌবনবতী। সাঁতার, নাচ, ঘোড়ায় চড়া, মটর গাড়ি চালান থেকে শুরু করে টেনিস খেলা পর্যন্ত সব কিছুতেই তিনি পারদর্শী। বিবাহিতা।

কয়েকদিনের মধ্যেই স্টুডিও থেকে জিন হারলোর ডাক এল। প্রথমে তিনি এক্সট্রা-র চরিত্রে কাজ পেলেন। হারলোর সুঅভিনয় এবং সুকণ্ঠের পরিচয় পেয়ে প্যারামাউন্ট স্টুডিও তাঁকে ছবিতে কাজ দিলেন। এরপর 'হল রোক' স্টুডিও হারলোকে ডেকে পাঠিয়ে পাঁচ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করল।

১৯২৮ সাল থেকে জিন হারলোর চলচ্চিত্রাভিনয় শুরু। ইউনাইটেড হল রোকের পর পর কয়েকটি কমেডি ছবিতে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করলেন হারলো। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবিটি হল ঃ 'সারকা'। এইসব ছবিতে হারলোর যৌবনকে বেশি করে দেখান হয়েছিল। ফলে চাক হারলোর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। এইসব অশ্লালীন দৃশ্যে তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে তিনি নিজেই হারলোর কাছে ছুটে এসে বললেন, 'তুমি জান না—এ তুমি কি করছ! ছবিতে তোমার নামা উচিত নয়। সিনেমায় নামা তুমি ছেড়ে দাও।' হারলো তো একথা শুনে একেবারে চটে গেলেন। তিনি চাককে নিজের পথ দেখতে বললেন। বিবাহ বিচ্ছেদ চাইলেন। চাকের কোন কথা তিনি কানে তুললেন না। একদিন যার প্রেমে হারলো পাগল হয়েছিলেন আজ তার সান্নিধ্য তাঁকে বিষিয়ে তুলল। বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হল।

নানান অশান্তির মধ্যে একটা বছর গড়িয়ে গেল। চলচ্চিত্রের সঙ্গেও জিন হারলোর বৈধব্য চলল কিছুদিন। তারপর আবার যোগাযোগ। চলচ্চিত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। এইসময় খৃস্টি স্টুডিওর জিন হারলোর সঙ্গে যেন লায়ন এবং জেমস হল-র পরিচয় হল। তখন তাঁরা 'হেলস এঞ্জেল' ছবিটি নির্মাণ করার পরিকল্পনা করছিলেন। এ ছবির নায়িকা-চরিত্রে হারলো মনোনীত হলেন। ১৯৩০ সালে ইউনাইটেড আর্টিস্ট-এর পক্ষ থেকে 'হেলস এঞ্জেল' হলিউডে মুক্তি পেল। ছবিটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করল। সেই সঙ্গে জিন হারলো-ও নাম করলেন। তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। তিনি খুব বড় অভিনেত্রী হিসেবে পরিচিতি পেলেন। জিন হারলোর অসাধারণ সাফল্যের পরিচয় পেয়ে মেট্রো-গোল্ডেন-মেয়ার তাঁকে ডেকে পাঠালেন। এই সংস্থার প্রযোজক পল বার্ন তাঁকে 'দি সিক্রেট সিক্স' ছবিতে মনোনীত করলেন। জিন হারলো এ ছবিতে ওয়ালেস বেরি এবং নবাগত নায়ক ক্লার্ক গেবল-এর সঙ্গে অভিনয় করলেন।

পল বার্নের চেষ্টায় জিন হারলো এম-জি-এম-এর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। এ সংস্থার হয়ে হারলো 'দি আইরন ম্যান', 'দি পাবলিক এনিমি', 'গোল্ডি', 'প্ল্যাটিনাম ব্লণ্ড', 'দেয়ার ওয়াইজ গার্লস', 'রিন্ট অফ দি সিটি', 'ডিনার অ্যাট এইট', 'রেড-হেডেড ওম্যান', 'রেড ডাস্ট', 'হোল্ড ইয়োর ম্যান', 'ব্লন্ড বমশেল', 'দি গার্ল ফ্রম মিশন', 'রেকলেস', 'চায়না সিজ' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করলেন। এইসব ছবিতে জিন হারলো যাঁদের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চিত্রতারকারা হলেন ঃ ওয়ালেস বেরি, ক্লার্ক গেবল্, জন ব্যারিমুর, লিয়নেল ব্যারিমুর, মেরি ড্রেসলার বিলি বুক, মেজ ইভানস, লি ট্রেসি, স্পেনসার ট্রেসি, রবার্ট টেলর ও ক্যারি গ্রান্ট। ১৯৩২ সাল থেকে এ ছবিগুলো মুক্তি পেতে থাকে। এত অল্পদিনের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা খুব কম অভিনেত্রীর জীবনে ঘটেছে। অবশ্য জিন হারলোর এই সাফল্যের মূলে পল বার্নের অবদান বড় একটা কম নয়।

দেখতে দেখতে জিন হারলো আবার পল বার্নের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে পড়লেন। পলের ভদ্র, নম্র এবং মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে হারলো তাঁকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললেন। হারলো বুঝতে পারলেন পল না থাকলে তিনি এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারতেন না। হারলো তাই আরও একান্ত-ভাবে পলকে পাবার জন্য বিবাহের প্রস্তাব আনলেন। পল বার্ন এ বিয়েতে রাজি হলেন। দ্বিগুণ বয়সের পলকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে জিন হারলো খুশিতে ভরে উঠলেন। এতদিনে হারলো বিবাহিত জীবনের সত্যিকারের আনন্দ খুঁজে পেলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবতা হারলোর প্রতি যেন কিছুটা বিরূপ। তাই হঠাৎ একদিন প্রিয়তমাকে শেষ চিঠি লিখে পল বার্ন আত্মহত্যা করলেন। এই মৃত্যুর রহস্যটা চিরদিনই অজানা হয়েই রইল।

পল বার্নের মৃত্যুতে জিন হারলো খুবই ভেঙে পড়লেন। বিবাহ তাঁর কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। ভালবাসা কিছুতেই তাঁর জীবনে চিরস্থায়ী হল না। মনের দুঃখে হারলো মদ খেতে শুরু করলেন। রাতে ঘুম হয় না। শুধুই পলের স্মৃতি তাঁকে ব্যথিত করে? ভাবিত করে তোলে। তাই এক রাশ দুঃখ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য জিন হারলো সারাদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করলেন। একসঙ্গে অনেক ছবিতে কাজ নিলেন। দিন-রাত শুটিং করে চললেন। কলা-কুশলীদের সঙ্গে আরও বেশি করে সময় কাটাতে লাগলেন। হারলোর বর্তমান অবস্থার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আলোক-চিত্রশিল্পী হল রসন বিয়ের প্রস্তাব আনলেন। এই সময় 'ব্লণ্ড বমশেল' ছবির দৃশ্যগ্রহণ চলছিল। এ ছবির কাজ শেষ করে জিন হারলো তাঁর বিয়েতে মত দিলেন। হারলোর বয়স তখন বাইশ আর হল রসনের আটাত্রিশ। কিন্তু এ বিয়েও বেশিদিন টিকল না। আবার বিবাহবিচ্ছেদ।

জিন হারলো জীবনের শেষ প্রান্তে এসে বড় নিঃসঙ্গ অনুভব করলেন। বাকি দিনগুলো কিছুতেই যেন শান্তি নিয়ে এল না। শুধু শূন্যতা আর হতাশা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। শেষ সময়ে কৌতুক অভিনেতা উইলিয়ম পাওয়েলের উপস্থিতিতে এই চরম দুঃখের দিনে জিন হারলো নিজেই কৌতুক অনুভব করলেন। তিনি আবার ভালবাসলেন। কিন্তু বড় শেষ সময়ে। দারুন অত্যাচারের ফলে তাঁর গল ব্লাডার আক্রান্ত। ডাক্তাররা তাঁকে বিশ্রাম নিতে বললেন। কিন্তু উপায় নেই। শুটিং চলছে পুরোদমে। এম-জি-এম-এর 'সারাটোগা' ছবির শেষ পর্যায়ে এসে একদিন হঠাৎ অভিনয় করতে করতে ক্যামেরার সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন জিন হারলো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। শেষ পর্যন্ত তাঁকে আর বাঁচান গেল না। হারলো দেহ রাখলেন।

১৯৩৭ সালে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে জিন হারলো মারা গেলেন। দশ বছরের অভিনয়-জীবন শেষ হল। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত জনপ্রিয়তা মেরিলিন মনরো ছাড়া আর কোন হলিউডের নায়িকার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মেরেলিন মনরো-এর মতই জিন হারলো চলচ্চিত্র-গগনে আজও উজ্জ্বল। দুজনেই ছিলেন যৌবনের দেবী। চলচ্চিত্রের পূজারী।

জিন হারলো অভিনীত শেষের দিকের উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো হল ঃ রিফ র‍্যাফ, ওয়াইফ ভার্সাস সেক্রেটারী, পার্সনাল প্রপারটি, সুজি, ল্যায়বেল্ড লেডি এবং স্যারাটোগা।

—চিত্রলেখা

শঙ্করবিজয় মিত্র

মধুর হাসির আড়ালে কি আগুন ঢাকা রয়

একখানি সুন্দর মুখ। নীল গভীর চোখে রহস্য ভরা চাউনি। লম্বা বাদামি চুল লাল ফিতার বাঁধনে বন্ধ। সুঠাম লাবণ্য-মণ্ডিত দেহ—দৌড় প্রতিযোগিতার চেয়ে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতাতেই যেন মানায় ভাল। এমনি একটি মেয়ে কোলেট বেসন। গত অক্টোবর মাসে মেক্সিকোর ওলিম্পিক নগরীর দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টি সেদিন তার ওপর নিবদ্ধ হয়েছিল—বেসন সেদিন মেয়েদের ৪০০ মিটার দৌড়ে ব্রিটেনের বিখ্যাত দৌড়ানিয়া মেয়ে লিলিয়ান বোর্ডকে পরাজিত করে অকস্মাৎ খ্যাতির মঞ্চে উঠে এলেন এবং কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই ফ্রান্সের জন্য একটি স্বর্ণ পদক জয় করে নিলেন।

ফ্রান্সের পতাকা উড়িয়ে বেসন যখন বিজয় মঞ্চে দাঁড়ালেন সপ্রশংসে দর্শকরা যেন সমস্বরে বলে উঠলেন এত নবনীত তনুতে এত শক্তি—এই সুন্দর হাসির আড়ালে এত তেজ! সত্যি বেসন এক বিস্ময়কর মেয়ে।

মেক্সিকোর দর্শকদের মত তার স্বদেশের লোকেরাই কোলেটের এই এ্যাথলিট জীবন সম্পর্কে বিশেষ গা করে নি। তরুণ বয়সে এমনি ত কত আগ্রহ হয় মেয়েদের। দৌড়-ঝাঁপটা ত কোলেটের তেমনি একটা শখ। এখন খানিকটা মাতামাতি করছে, আপনি আবার ছেড়ে দেবে। এই রকম মনোভাব ছিল তার অভিভাবক ও ক্রীড়া মহলের। কিন্তু নমনীয় কান্তির মধ্যে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পে ভরা মন ছিল মেয়েটির। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটেছে, ক্রীড়া ক্ষেত্র থেকে সরে ত আসেননি, প্রবলভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন কোলেট। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় যেন নিজেকে সকলের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এ্যাথলেটিকস থেকে তিনি একটুও সরেন নি। এই অটুট সংকল্পের জোরেই তিনি ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে বিশ্ব এ্যাথলিটের পর্যায়ে উঠেছেন এবং অবশেষে সব এ্যাথলিটের স্বপ্ন-স্বর্গ বিশ্ব ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার প্রাঙ্গণ থেকে স্বর্ণ পদক আহরণ করে এনেছেন।

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে কোলেট যখন ৪০০ মিটার দৌড়ে ফ্রান্সে জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বিনী মোনিক নইরটকে হারিয়ে দিয়েছেন, তখন অবশ্য অনেকে ভেবেছেন এটা অকস্মাৎ একটা ব্যতিক্রমের ঘটনা, আপ সেট ছাড়া আর কিছু নয়। পরবর্তী প্রতিযোগিতাকেও কোলেট যখন তিনি নইরটকে পুনরায় পরাজিত করেন তখন ক্রীড়া মহলে ধরে নেওয়া হয়েছে [illegible] 'ফ্লুক' হারিয়েছেন। এটাই যে সত্য তাও কেউ যাচাই করেন নি। ঐ সুন্দর মেয়েটি যে অবিচল নিষ্ঠায় ও সাধনায় তার এ্যাথলিট জীবনকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করে চলেছে একথাটা কারও মনে তখন উদয় হয়নি। এ বিষয়টি জানা ছিল একটি লোকের—তিনি হচ্ছেন কোলেটের ট্রেনার ডুরাণ্ড সেন্ট ওমার। এই প'য়তাল্লিশ বছর বয়সের শিক্ষকটি নিজেও একজন ৪০০ মিটার দৌড়বীর ছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব সময় ছিল ৫০-৩ সেকেণ্ড। তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত কঠোর, বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে তা উপযোগী নয় বলে সরকারী প্রশিক্ষকরা মনে করতেন। কিন্তু ডুরাণ্ড নিজস্ব পন্থায় ছিলেন অবিচল।

এই ডুরাণ্ডের সঙ্গে কোলেটের পরিচয় ঘটে ১৯৬০ সালে। কোলেটের বয়স তখন মাত্র চোদ্দ বছর। বোর্ডোর নিকটস্থ রোয়ান শহরের এক স্কুলের ছাত্রী হচ্ছেন এই কোলেট। ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল-বর্তী রোয়ান শহর ভ্রমণকারী ও চেঞ্জারদের মধ্যে বেশ পরিচিত ও জনপ্রিয়। স্কুলের ছাত্রী হিসাবে কোলেট ট্রায়থেসন প্রতি-যোগিতায় যোগ দিয়েছে। উপকূলের জন-বহুল ও বিলাসবহুল পরিবেশে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে মনযোগ রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কেলেট কিন্তু আরও মনযোগে তার বিষয়গুলিতে বেশ ভাল ফল দেখায়। ডুরাণ্ডের দৃষ্টি পড়ে এই মেয়েটির প্রতি এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি আস্থান্বিত হয়ে ওঠেন। ডুরাণ্ডের আশ্বাস-বাণীতে কোলেটের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং জুনিয়ার প্রতিযোগিতার পর্যায়ে ভাল ফল দর্শান। ১৯৬৪ সালে ২০০ মিটার দৌড় শেষ করতে বেসনের সময় লাগে ২৫·৪ সেকেণ্ড। এই সাফল্যে বেসন নিজেও মনে মনে উৎসাহ বোধ করেন এবং এ্যাথলিট হিসাবে একটা স্থান করে নেবার বাসনা এই সময় থেকেই তাঁর মনের কোণায় উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে।

১৯৬৫ ছিল বেসনের স্কুল জীবনের শেষ বছর। শারীর শিক্ষার এই ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে এ্যাথলেটিকসে বেসন বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। প্যারিসে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে তিনি ভর্তি হন। প্যারিসে এসে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ অনুভব করতে থাকেন, নূতন কোন বন্ধুও হয়নি তখন। ভাল না লাগায় কয়েক মাস পরে আবার রোয়ানে ফিরে আসেন। অল্পকাল পরেই লা-রিয়ল নামক স্থানে এক স্কুলে বেসন শারীর শিক্ষার শিক্ষয়িত্রীর কাজ পান। এখানেই তিনি [illegible] জায়গাটা বোর্ডো থেকে চল্লিশ মাইলের মত দূরে।

১৯৬৬ সালে বেসন জাতীয় পর্যায়ের এ্যাথলিট হিসাবে নিজের স্থান করে নেন। ফরাসী জাতীয় চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতি-যোগিতায় একেবারে অখ্যাত এই মেয়েটি যখন নামকরা দৌড়ানীয়া মোনিক নইরটের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলেন তখন তাঁর প্রতি সকলের দৃষ্টি পড়ে। মোনিক নইরট খুব স্বল্প ব্যবধানে (৫৪·২ সেকেণ্ড সময়ে) বেসনকে পরাজিত করেন। বুডাপেস্টে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপের জন্য বেসন যথারীতি নির্বাচিত হন কিন্তু সাময়িকভাবে তাঁর 'ফরম' পড়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় দল থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়। এই প্রতিযোগিতায় পূর্বেকার দুইটি দৌড়ে (৪০০ মিটার) তাঁর সময় ছিল ৫৬-৬ ও ৫৭ সেকেণ্ড। অত্যন্ত মনক্ষুণ্ণ হয়ে বেসন রোয়ানেই থাকেন। এদিকে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে মোনিক নইরট ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন করেন, ৫৪ সেকেণ্ডে সময়ে নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করে। চেকোশ্লোভাকিয়ার আনা শ্মেলকোভা ৫২-৯ সেকেণ্ডে এই পথ অতিক্রম করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এই ঘটনার পর কোলেট এ্যাথলেটিকস একেবারে ছেড়ে দেবেন বলে স্থির করে ফেলেন। প্রশিক্ষক ডুরাণ্ড অনেক রকম করে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে এ থেকে নিরস্ত করেন। তাই ১৯৬৭ সালে কোলেট যখন প্রতিযোগিতায় নামেন দ্বিধার ভাবটা তখনও তাঁর মন থেকে সম্পূর্ণভাবে কাটে নি। এই সময় তাঁর শ্রেষ্ঠ সময় ছিল ৫৪-১ সেকেণ্ডে, কাজেই এই সময় থেকে উন্নতি করে নিজেকে বিশ্ব-পর্যায়ে উন্নীত করতে পারবেন বলে বেসনের মনে তেমন ভরসা তখনও দানা বাঁধেনি। তাঁর কোচ তাঁকে উৎসাহিত করতে থাকেন।
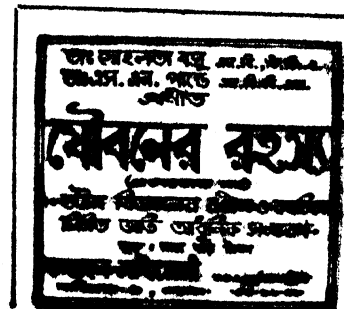
আন্তর্জাতিক ১,৫০০ মিটার দৌড়ে রাশিয়ার খ্যাতনামা দৌড়বীর মিখাইল জেলো-বোভস্কি (৩৩২ নং) প্রথম স্থান লাভ করেছেন।

চুপিসাড়ে বিবাহ সারতে চেয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। বিবাহ রেজিস্ট্রি অফিসে প্রায় পঞ্চাশজন সাংবাদিক, ফটো-গ্রাফার এবং টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান সকাল থেকেই তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করছিলেন। সোবার্স অবশ্য তাঁর নববধূকে নিয়ে তাঁদের সামনে উপস্থিত হন। নটিং-হামশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক হলেন সোবার্স। তবে ভবিষ্যতে অস্ট্রেলিয়াতে স্থায়ীভাবে তাঁর বসবাস করার বাসনা আছে।

ঠিক এই মুহূর্তে সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সোবার্সের পরিসংখ্যানটি চোখে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে : টেস্ট খেলা ৭৬, ইনিংস ১৩২, নট-আউট ১৭ বার, মোট রান ৬৭৭৬, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৬৫ নট-আউট (বিশ্বরেকর্ড), সেঞ্চুরী ২১, ক্যাচ ৯৬ এবং গড় ৫৮-৯২; বোলিং : বল ১৭৪২৬, মেডেন ৭০৩, রান ৬৬৭৭, এবং উইকেট ১৯৩টি।

আমেরিকান লন টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৬৯ সালের আমেরিকান ওপন লন টেনিস প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার পুরুষদের সিঙ্গলস খেতাব জয়-লাভের সূত্রে দু'বার 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' সম্মান পেলেন। আন্তর্জাতিক টেনিস খেলার ইতিহাসে দু'বার এই 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়ী হয়েছেন একমাত্র রড লেভার। একই বছরে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, উইম্বলেডন এবং আমেরিকান—বিশ্বের এই চারটি প্রধান টেনিস প্রতিযোগিতার সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সমষ্টিগত নামকরণ 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়। এখানে উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনজন খেলোয়াড় মোট চারবার 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়ী হয়েছেন—১৯৩৮ সালে ডোনাল্ড বাজ (আমেরিকা), ১৯৫৩ সালে কুমারী মরীন ক্যাথোরিন কনোলী (আমেরিকা) এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৯ সালে রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া)।

রড লেভার এই আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব জয়ী হয়ে ১৬,০০০ ডলার অর্থাৎ ১,২০,০০০ টাকার প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন। বিশ্বের খেলাধুলার আসরে এই পুরস্কারের পরিমাণই সব থেকে বেশী।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়া ৫টি বিভাগেরই ফাইনালে খেলে খেতাব জয়ী হয়েছে ৪টি বিভাগে। তবে তারা যে মিক্সড ডাবলসে খেতাব পেয়েছে তার মধ্যে ভাগীদার আছে আমেরিকা।

এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট ১৯৬৯ সালের টেনিস মরসুমে অস্ট্রেলিয়ান, ফ্রেঞ্চ এবং আমেরিকান সিঙ্গলস খেতাব পেয়েছেন। উইম্বলেডন খেতাব না পাওয়াতে তিনি দুর্লভ 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' সম্মান পেলেন না। তিনি কয়েক-বারই তিনটি করে খেতাব পেয়ে শেষ পর্যন্ত 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' হাতছাড়া করেছেন।

ফাইনাল ফলাফল

পুরুষদের সিঙ্গলস : রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৭-৯, ৬-০, ৬-২ ও ৬-২ গেমে টনি রোচকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) ৬-২ ও ৬-২ গেমে কুমারী নান্সি রিচেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : কেন রোজওয়াল এবং ফ্রেড স্টোলে (অস্ট্রেলিয়া) ২-৬, ৭-৫, ১৩-১১ ও ৬-৩ গেমে ডেনিস রলস্টন এবং চার্লস প্যাসারেলকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : কুমারী ফ্রাঁসোয়াজ ডুরা (ফ্রান্স) এবং শ্রীমতী ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং শ্রীমতী ভার্জিনিয়া ওয়েডকে (ইংল্যান্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : শ্রীমতী মার্গারেট কোর্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং মার্টি রিসেন (আমেরিকা) ৭-৫ ও ৬-৩ গেমে কুমারী ফ্রাঁসোয়াজ ডুর (ফ্রান্স) এবং ডেনিস রলস্টনকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

লেভারের 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়

১৯৬২ সাল :

রড লেভার অস্ট্রেলিয়ান সিঙ্গলস ফাইনালে ৮-৬, ০-৬, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে রয় এমার্সনকে (অস্ট্রেলিয়া), ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস ফাইনালে ৩-৬, ২-৬, ৬-৩, ৯-৭ ও ৬-২ গেমে রয় এমার্সনকে, উইম্বলেডন সিঙ্গলস ফাইনালে ৬-২, ৬-২ ও ৬-১ গেমে মার্টিন মুলিগানকে (অস্ট্রেলিয়া) এবং আমেরিকান সিঙ্গলস ফাইনালে ৬-২, ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে রয় এমার্সনকে পরাজিত করে প্রথম 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব পান।

১৯৬৯ সাল :

রড লেভার অস্ট্রেলিয়ান সিঙ্গলস ফাইনালে ৬-৩, ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে এ্যান্ড্রুস গিমেনোকে (স্পেন) ফ্রেঞ্চ সিঙ্গলস ফাইনালে ৬-৪, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে কেন রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া), উইম্বলেডন সিঙ্গলস ফাইনালে ৬-৪, ৫-৭, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে জন নিউকম্বকে (অস্ট্রেলিয়া) এবং আমেরিকান সিঙ্গলস ফাইনালে ৭-৯, ৬-১, ৬-২ ও ৬-২ গেমে টনি রোচকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করে দ্বিতীয়বার 'গ্র্যান্ড স্ল্যাম' খেতাব জয়ের গৌরব লাভ করেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২১শ সংখ্যা
মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 26th September 1969 শুক্রবার, ৯ই আশ্বিন, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ শ্রীদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

মোথরা প্রসঙ্গ

বিগত ১৯শে ভাদ্র অমৃত পত্রিকায় শ্রীআশীষকুমার বসু মহাশয়ের 'আসামের কারুশিল্প' বিষয়ক রচনাটি পড়লাম। শ্রীবসু মহাশয় লোকসমক্ষে শ্রীমুরতার (মোথরা নয়) ভুল পরিচিতি দিয়েছেন। শ্রীহট্টীয় উপভাষায় 'মোথ্‌রা' শব্দের অর্থ অন্যরকম এবং তা সুশালীন নয়। আর বসু মহাশয় মুরতাকে ঘাস বলে অভিহিত করেছেন। মুরতা কখনও ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ নয়, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ এবং আকারে লাঠির মতন। বর্ণ কালো, কিন্তু পাকলে তাম্র বর্ণ হয়। লম্বায় ৭।৮ হাত হয়। এর শরীর খুবই মসৃণ এবং জাতিতে বেত। মুরতার জন্মস্থান শ্রীহট্ট। শ্রীহট্ট জেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে মুরতা উৎপন্ন হয়। একদা শ্রীহট্টের বালাগঞ্জের মুরতা বেতের শীতলপাটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিল। একটি খুব বড় শীতল-পাটী সার্টের পকেটে (জেব) নেওয়া যেত। ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিকটোরিয়াকে একটি মুরতা বেতের শীতলপাটী উপহার দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, স্পেন প্রভৃতি দেশেও বালাগঞ্জের শীতলপাটীর চাহিদা ছিল। শীতলপাটী ছাড়াও এই মুরতা বেত দ্বারা সাধারণ পাটী ও চাটী প্রস্তুত হয়। ঘর-বাড়ি তৈরী করতে বা কোনও কিছু বাঁধতে হলে মুরতার একান্ত প্রয়োজন হয়। শ্রীহট্টে মুরতা হল নিত্যব্যবহার্য জিনিস। সুন্দর সুন্দর মুরতা দ্বারা ছেলেরা লাঠিও তৈরী করে। তবে মুরতার আঘাত গুরুতর। প্রত্যেকের বাড়ীতেই মুরতা জন্মে। সাধারণতঃ ছায়াতে এবং জলা জায়গায় মুরতা বেশি জন্মে। বৈশাখ মাসে মুরতায় ফুল আসে। ফুল যুঁই ফুলের মত সাদা এবং গন্ধযুক্ত। মৌমাছিরা মুরতা ফুলের পরাগ দিয়ে মৌচাক তৈরী করে। বৈশাখ মাসে পুষ্পিত ও গন্ধময় মুরতা-বনের দৃশ্য বড়ই চিত্তাকর্ষক। মুরতা ফুল মাঙ্গলিক কাজেও ব্যবহৃত হয়।

সুরেশচন্দ্র দেবনাথ,
কীডগঞ্জ,
এলাহাবাদ।

ড্রীমল্যাণ্ড

'অমৃতে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীনির্মল সরকারের 'ড্রীমল্যাণ্ড' নিয়মিত পড়ছি। ড্রীমল্যাণ্ড আমাদের এমন মুগ্ধ করেছে যে তার প্রকাশের দিনটির জন্য অপেক্ষা করি।

উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রচিত্রণ নিখুঁত ও বর্ণনায় অনবদ্য। গল্পের গতি ও আবেগ স্বভাবতই আমাদের মুগ্ধ করেছে। এটাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের উপন্যাস বললে বোধ হয় ভুল হবে না। বাস্তব ভিত্তির উপর রচিত এ উপন্যাস বাংলা উপন্যাস জগতে নিশ্চয় আলোড়ন সৃষ্টি করবে। তাই লেখক এবং অমৃত কর্তৃপক্ষকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

নারায়ণচন্দ্র ঘটক,
প্রীতি ঘটক,
কলিকাতা—৩১।

(২)

ড্রীমল্যাণ্ড উপন্যাসটির জন্য লেখককে ধন্যবাদ। লেখকের রচনাশৈলী প্রশংসনীয়। যে ধারায় রহস্যের সূত্রপাত হোল, এক-কথায় তা অপূর্ব। প্রত্যেকটি চরিত্র যেন জীবন্তরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত। প্রতিটি সপ্তাহে এর জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি।

অনেকদিন পর নিমাই ভট্টাচার্যের 'ডিপ্লোম্যাট' উপন্যাসটি প্রকাশের জন্য শুভেচ্ছা জানাই।

অমৃত-এর ক্রমোন্নতি উল্লেখযোগ্য। ভবিষ্যতে আরো ভালো হবে এই আশা রাখি।

সীতা রায়চৌধুরী,
কলিকাতা—২০

দিল্লীর যুব কেলেঙ্কারী

সম্প্রতি দিল্লীর রবীন্দ্র রঙ্গশালায় ঘটে গেল এক ন্যক্কারজনক ঘটনা। কমনওয়েলথ যুব-উৎসব উপলক্ষে সেখানে হাজির হয়েছিলেন দিশি-বিদেশি প্রায় শ'আটেক ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী। উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতি চর্চা। কিন্তু দেখা গেল বেলেল্লাপনার চূড়ান্ত।

দুর্ভাগ্যবশত, রবীন্দ্রনাথের নাম জড়িত রঙ্গালয়েই এই ইতরামি ঘটে গেল। নারী-দেহ নিয়ে চলল লোফালুফি। গোটা জাতির মুখেই চুনকালি পড়ল। হল দোকানপাট লুঠ, খুন-জখমও। কান্নায় ভেঙে পড়া এই সব লাঞ্ছিত বিপন্ন মেয়েকে উদ্ধার করতে শেষ পর্যন্ত পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হল। কিন্তু দিল্লীর কালচার-পাণ্ডাদের এই 'মহৎ কীর্তিতে' রাজধানীর কর্তাদের তেমন কিন্তু টনক নড়েছে বলে মনে হচ্ছে না। কালচারের নামে এই অন্ধকারের জীব-গুলির 'সভ্যতা' রক্ষার প্রয়াসও এই প্রথম নয়। প্রসঙ্গত, ৬৭-র শেষ রাত্রের কনট প্লেসের কথা মনে পড়ে। নববর্ষ উৎসবের নামে খাস রাজধানীতে চলেছিল বেহেড লম্পটদের ইতরামির হোলিখেলা। প্রকাশ্যেই চলেছিল নারীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি।

আসলে পৈশাচিক উৎসবে মত্ত হওয়াই বোধ হয় দিল্লীর এক শ্রেণীর সংস্কৃতি-বাহকদের 'পবিত্র কর্তব্য'।

তবে দুর্ভাগ্য আমাদের। কলকাতায় অর্থাৎ বাংলাদেশে সামান্য ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেই (কেউই চায় না কোন ইত ঘটুক) সারা ভারত জুড়ে 'গেল, গেল' পড়ে যায়। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তিলকে। করা হয়। কলকাতার বাইরের খব কাগজের পাতায় পাতায় ছাপা হয় আজগুবি ঘটনা। কুৎসার বেসাতি চ অনেকেই দেন উপদেশের অমৃত-ভাষণ।

অথচ দিল্লীতে এই যে কেলেঙ্ক ঘটে গেল, মেয়েদের মান-ইজ্জত খোয়া গে বেলেল্লাপনার 'মহৎ উৎসব' সংঘটিত হ তা নিয়ে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ এবং অন্য রাজ্যে ভাইয়েরা নীরব কেন? কোথায় গেল তাঁদে মানবিকতা? নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে আকুল আর্তনাদ? না, দিল্লী রাজধানী বলে তার কলঙ্ক আদৌ কলঙ্কই নয়?

রঞ্জন বিশ্বাস,
নৈহাটি,
২৪ পরগণা।

বাংলা ভাষা ব্যবহার

সেদিন বাংলা ভাষা সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য আইন তৈরী হলো অথচ এবারকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লটারীর টিকেট থেকে বাংলা ভাষা অন্তর্হিত হল। ব্যাপারটা লঘু করে দেখার নয়—কারণ, প্রতিটি রাজ্য সরকারই লটারীর টিকেট বাজারে ছেড়েছেন—কিন্তু প্রত্যেকটি টিকেটে সেই রাজ্যের ভাষাও সসম্মানে স্থান পেয়েছে, একমাত্র ব্যতিক্রম বাংলাদেশ।

ভাষার জন্য অন্যান্য প্রদেশ বা সরকার কতটুকু কি করেছেন ভাবলে অবাক হয়। যথা:—

(১) অন্যান্য রাজ্য শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম নিয়েছে সেই রাজ্যের ভাষা। প্রমাণ—সম্প্রতি পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি যে, 'বাংলা ভাষার মাধ্যমের স্কুলগুলি থেকে অন্য রাজ্য সরকারগুলি মনোনয়ন তুলে নেবেন।

(২) বৈদেশিক দপ্তরের কর্মীদের এক-মাত্র 'একটি বিশেষ ভাষা' মাত্র ব্যবহারের নির্দেশ।

(৩) উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে 'রাজ্য সরকারের সর্বস্তরে একমাত্র রাজ্য ভাষার ব্যবহার—এমনকি পরিবহণ ব্যবস্থায়ও (গাড়ীর নম্বরাদিসহ) একমাত্র রাজ্য ভাষায়। এখানে মাত্র কয়েকটি বিশেষ উদাহরণ—যে-গুলির জন্য সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত—দেয়া হলো।

করবী চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন।

কেয়া পাতার নৌকো

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত ধারা-বাহিক উপন্যাস 'কেয়াপাতার নৌকো'র লেখক শ্রীপ্রফুল্ল রায়কে তাঁহার লেখার জন্য শুধু ধন্যবাদ নয়, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। আমি চট্টগ্রামের লোক, যে

চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গে বিরল। এক সঙ্গে এত কাছাকাছি সবুজ পাহাড়, সমতলভূমি, নদী ও সমুদ্র পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও আছে কিনা জানি না। যে নেতাদের আদর্শে আমরা অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা ও স্বপ্ন সফল করার জন্য চরম আত্মত্যাগ করেছিলাম, সেই নেতাদের কলমের খোঁচায় খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতার বিনিময়ে আমরা পূর্ববঙ্গবাসীরা বলিদান হলাম। আজ পর্যন্ত 'উদ্বাস্তু', 'বাস্তুহারা', 'নতুন ইহুদি' ইত্যাদি নানা ধরনের উপাধিতে ভূষিত হয়ে ছিন্নমূল পরিবারের মতো বর্তমান ভারতের নানা জায়গায় জীবন-ধারণের জন্য কঠোর সংগ্রাম করে চলেছি।

বাস্তবের সংঘাতে সেই কিশোরী বয়সের জন্মভূমি 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়, ছোট ছোট গ্রামগুলি' আজ প্রায় ভুলতে বসেছি। সেই দেশ আজ স্বপ্নলোকে বর্তমান। আর কোনদিন যাওয়ার আশা সুদূরপরাহত বলে মনে হয়। হঠাৎ 'কেয়াপাতার নৌকো'য় ভেসে যেন আবার সে দেশে পৌঁছে গেছি। সব যেন অতি-পরিচিত—খুবই চেনা। সেই দেশে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের মধ্যেও বুকভরা আশা নিয়ে সুদিনের অপেক্ষায় ছিলাম। সেই আশার প্রধান কারণ ছিল নিজের দেশ ও জন্মভূমিতে বাস। কিন্তু ভারত-ভাগের বলি হয়ে সব ধূলিসাৎ আজ। প্রাণে হয়তো বেঁচে আছি, মনের দিক থেকে মৃতবৎ। 'Past is always golden' এই নীতি হয়তো এর কারণ হ'তে পারে। কিন্তু থাক, যা মনের ব্যাপার তা একান্তই মনের। তাকে বাস্তবের আইন-কানুনে মাপা যায় না। ১৯৪০ সালের পটভূমিকায় আরম্ভ শ্রীরায়ের উপন্যাস আমাদের স্বপ্নের দেশ যেন আবার আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। লেখক '৪১-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, '৪২-এর ভারত-ছাড় আন্দোলন, '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সূচনা সবগুলোকে অতি-সুনিপুণ চিত্রকরের মতো তাঁর লেখনী দ্বারা চিত্রায়িত করেছেন। শ্রীরায়ের মত খ্যাতনামা সাহিত্যিককে উপদেশ দেওয়ার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। সেইহেতু শ্রীরায়ের নিকট আমার বিনীত আবেদন, যেন এই উপন্যাসের গতিবিধিকে তিনি 'ভারত-ভাগ' পর্যন্ত টেনে না নেন, কারণ আমার মন সুরমা, সুনীতি, স্নেহলতার সুখী পরিবারকে নিয়ে সর্বনাশী দাঙ্গা ও ভারত-ভাগের শিকার হয়ে আবার উদ্বাস্তু হতে রাজী নয়। বাস্তবের উদ্বাস্তু জীবনের তিক্তকর অভিজ্ঞতার কাহিনী উপন্যাসের মাধ্যমে পড়ার মতো ধৈর্য আর আমাদের নেই!

মাধুরী চৌধুরী
কলিকাতা—৩৭

(২)

আপনাদের সাপ্তাহিক অমৃতের আমি একজন একনিষ্ঠ পাঠক। অমৃতের প্রত্যেকটি বিভাগই আমাকে কম বেশী আকৃষ্ট করে, কিন্তু আমার সবচাইতে ভাল লাগে বিখ্যাত লেখক প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকো' উপন্যাসখানি। ওই উপন্যাসটিই বর্তমানে আমার কাছে সবচাইতে বড় আকর্ষণ। প্রফুল্লবাবুর ওই উপন্যাসটি আমি প্রথম থেকেই বেশ আগ্রহের সঙ্গে পড়ে আসছি। কিন্তু ক্রমশই যেন তা আমাকে আরও বেশী করে আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। এই উপন্যাসটি পড়ে আমরা একদিকে যেমন গ্রামজীবনের একটা চমৎকার চিত্র পাচ্ছি, তেমনি শহুরে পারিবারিক চিত্রও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই যেন আমাদের অতি পরিচিত, অতি নিকটের। বিশেষ করে বিনু যেন আমাদেরই ছোটবেলার এক জীবন্ত ছবি। প্রতি সপ্তাহের 'অমৃত' হাতে পেয়েই ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করি আমার প্রিয় উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘোষণা তাতে আছে কিনা।

অভিমন্যু গোস্বামী,
ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

বইকুণ্ঠের খাতা

অমৃত পত্রিকায় বইকুণ্ঠের খাতা বিভাগটি এক অপূর্ব সংযোজন। এই বিভাগ মাধ্যমে যে সব প্রশ্নের আলোচনা করা হয় তা যেমন নিরপেক্ষ তেমনি মনোজ্ঞ। বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে গ্রন্থ-রচয়িতার আলাপ আলোচনা থেকে গ্রন্থ-রচনার পেছনে লেখকের মানসিকতা জানতে পেরে পাঠকরা উপকৃত হতে পারেন। নিঃসন্দেহে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে অমৃত কর্তৃপক্ষ এক অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন যা সমালোচনা সাহিত্যকে যথেষ্ট সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলবে। তাছাড়া, যাঁরা কলকাতা কিংবা বাংলার বাইরে থাকেন তাঁদের পক্ষে বাংলা বইয়ের নির্বাচন ব্যাপারেও বিশেষ প্রতিনিধির মতামত যথেষ্ট সহায়তা করবে। তবে গত ৯ই শ্রাবণ সংখ্যায় বিশেষ প্রতিনিধির ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গ্রন্থখানির আলোচনায় সামান্য ভুল নজরে এলো। গ্রন্থখানির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন,...'দিনাজপুরের আদিনা মসজিদ থেকে কৃষকদের লড়াই...' ইত্যাদি। এস্থলে জানাই, আদিনা মসজিদের অবস্থান যতদূর জানি, দিনাজপুরে নয়। ওটা হোল মালদহ জেলায়। সম্ভবতঃ ভুলটি অন্যমনস্কতাবশত।

প্রমথেশ ভট্টাচার্য, গোপবন্ধুনগর,
ভুবনেশ্বর।

মানুষগড়ার ইতিকথা

আমি আপনার 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত পাঠকদের অন্যতম।

ধারাবাহিকভাবে যে 'মানুষগড়ার ইতিকথা' নামক প্রবন্ধে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রকাশিত হচ্ছে, তা একটি ঐতিহাসিক দলিলের নথি হয়ে থাকবে, আশা করি।

এই তথ্যাদি প্রকাশের জন্য শ্রীসন্ধিৎসুকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

প্রসঙ্গত আমার অনুরোধ, যদি বিদ্যালয়ের তথ্যাদি আরো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করা যায় এবং বিদ্যালয়পরিচালনার ক্রমবিকাশের ইতিহাস ঠিক ঠিক পরিবেশন করা হয় তবে তা আমাদের বহু উপকারে আসবে।

এই সঙ্গে যদি ঐ সব বিদ্যালয়ের কৃতী শিক্ষকগণের জীবনী প্রকাশ করা হয়, তবে তা আমাদের শিক্ষকজীবনে আলোকপাত করতে পারে বলে মনে হয়।

নির্মলকুমার ভট্টাচার্য,
শিক্ষক, শিবরাম উচ্চ বিদ্যালয়,
শুকদেবপুর, ২৪ পরগণা।

পুরনো গান

১২ই ভাদ্র প্রকাশিত অমৃত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তিনটি আগমনী সঙ্গীতের সম্পূর্ণ পদ জানতে চেয়েছিলেন। ২৬শে ভাদ্র প্রকাশিত অমৃত পত্রিকায় শ্রীদীনেশচন্দ্র অধিকারী এবং শ্রীমতী নমিতা সিংহ দুটি করে গান প্রকাশ করে অর্ধেন্দুবাবুর তথা বহু পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল নিরসন করেছেন। উভয়েই 'এবার আমার উমা এলে' গানখানি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উভয়ের প্রকাশিত গানে কোন কোন স্থানে বেশ অমিল রয়েছে। উপরন্তু শ্রীমতী সিংহের প্রকাশিত শেষের দু' লাইন দীনেশবাবুর গানে একেবারেই স্থান পায়নি। একটা গানের মধ্যে যদি এত অমিল থাকে তাহলে অন্য গানগুলিও ঠিক আছে কিনা স্বভাবতই সন্দেহ জাগে। তাই এ বিষয়ে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকার পক্ষ থেকে সঠিক গানগুলি প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানালাম, যাতে আমাদের মত সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয়।

শান্তিময় মিত্র,
ডায়মণ্ডহারবার, ২৪ পরগণা।

সাদা চোখে

যুক্তফ্রন্টের সমস্যার অন্ত নেই। শরিকী কোঁদল নিয়ে বিব্রত ফ্রন্ট আবার নতুন করে একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। সেটি হচ্ছে দপ্তর পুনর্বণ্টনের প্রশ্ন। রাজনীতি নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, এমনি কিছু লোকের ধারণা, আন্তর্দলীয় সংঘর্ষের উপর জোর দিয়ে কিছু ফ্রন্ট অংশীদার আখেরে দপ্তর পুনর্বণ্টনের প্রশ্নটিকে বড় করে তোলার জন্যে পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করছেন। তাঁদের ধারণা অমূলক বলে মনে হয় না। কারণ, ইতিমধ্যেই একটি বড় দলের লোকেরা অন্যান্য ছোট শরিকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলকে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) ছেড়ে দেওয়ার জন্য যে ওকালতি করেছিলেন এখন তার মাশুল দিতে হবেই। এমন কি ব্যঙ্গ করে বলেছেন, তখন ত বিপ্লবী সেজেছিলেন, এখন ঠ্যালা সামলান। বলা বাহুল্য, শরিকী সংঘর্ষের মাশুল ছোট বড় সকল দলকেই অল্পবিস্তর দিতে হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও দিতে হবে। গত্যন্তর নেই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই যে শ্রীঅজয়ের সঙ্গে তদানীন্তন উল্‌ফ্‌ ও পাল্‌ফ্‌ যুক্তভাবে জয়লাভের পর এক রাত্রির মধ্যে সমস্ত কিছু সমাধা করে লালদীঘির লালবাড়ীর উপর কব্জা জমিয়েছিলেন, এবারের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করার পরও তা সম্ভব হয় নি। কারণ, বিপুল সংখ্যায় জয়লাভ হওয়ার ফলেই অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। কেননা রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে দলীয় প্রশ্ন প্রত্যেক পার্টি নেতাদের মনেই অতি বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ফলে দপ্তর বণ্টনের অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। টান কষাকষি এমন এক চরম পর্যায়ে উঠেছিল যে ফ্রন্টের আত্মিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হতে বসেছিল। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি বৃহত্তম দল হিসাবে পরিগণিত হওয়ার ফলে তাঁরা যে সমস্ত দপ্তরের দাবী জানিয়েছিলেন তা তখন বৃহত্তর ঐক্যের প্রশ্ন তুলে অনেক শরিকই বাধা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালীর যে ভূমিকা ছিল ঠিক অনুরূপভাবেই অনেকগুলি ছোট দল মার্কসবাদীদের দাবীর সমর্থন করেছিলেন। অবশেষে ফয়সালাও হয়েছিল। তবে, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সকলকেই মিটমাটের জন্য দিল্লী-কোলকাতা দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছিল।

যে প্রশ্ন সেদিন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল সেটা হচ্ছে স্বরাষ্ট্র বিভাগ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকতে হবে। মার্কসবাদীরা ও তাঁদের সহযোগীরা সেদিন বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রিত্ব স্বাভাবিকভাবেই সি পি এম দলের ভাগে পড়া উচিত। কেননা তাঁদের সদস্যসংখ্যা ফ্রন্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল বাংলা কংগ্রেসের চেয়ে আড়াই গুণ বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর পদই যখন ছেড়ে দিচ্ছেন অতএব তাঁদের স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেওয়া হবে না কেন? প্রশ্নটা যুক্তিসহ। এবং এই দাবীকে কোনরকমেই উপেক্ষা করা যায় না। মার্কিস্ট কম্যুনিস্টরা ও তাঁদের সহগামীরা আরও বলেছিলেন যেহেতু তাঁদের সদস্যসংখ্যা অনেক বেশী সেইহেতু তাঁদের দায়িত্বও সর্বাধিক। অতএব, সরকার গঠনের পর দল হিসাবেও তাঁদের কর্তব্যের পরিধি অনেক বেড়ে যাবে। সেইদিকে দৃষ্টি রেখে দপ্তর বণ্টিত হওয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেশী। তিনি ইচ্ছা করলে সমস্ত দপ্তরের উপরই নজর রাখতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ তলবও করতে পারেন। এমন কি ফ্রন্টের কর্মসূচী পালনে অবহেলার অজুহাও দিয়ে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়—যে কোন মন্ত্রীকেই অবলীলাক্রমে "মোরারজী-ভাই" করে দিতে পারেন। কিন্তু ফ্রন্ট সরকার বলেই হয়ত শ্রীমুখোপাধ্যায় ততদূর এগুবেন না। কিন্তু ইচ্ছা করলে তিনি তা করতে পারেন। মার্কিস্ট কম্যুনিস্টরা "মোরারজী কাহিনী" ঘটতে পারে এই ধ্যান-ধারণা থেকে দূরে থেকেও স্বরাষ্ট্র দপ্তর নেওয়ার জন্য বলেছিলেন যে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করলে মন্ত্রিসভা ভেঙেও দিতে পারেন। অতএব, এহেন ক্ষমতা শ্রীমুখার্জির হাতে ন্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কেন স্বরাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে দেওয়া হবে না? বাংলা কংগ্রেস নিমরাজী হয়ে রণে ভঙ্গ দিলে ফরওয়ার্ড ব্লক ও কম্যুনিস্ট পার্টি কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাখবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করেছিলেন। যাহোক, আখেরে স্বরাষ্ট্র দপ্তর শ্রীজ্যোতি বসুর হাতেই গেছে।

সেদিন যে সমস্ত ছোট দল সত্যিই মার্কসবাদীদের হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেওয়ার জন্য ফ্রন্টে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন এখন তাঁরা অনেকেই মত পাল্‌টিয়েছেন। এবং যে অভিযোগ ফ্রন্টের সভায় তাঁরা করেছেন তা সত্যিই ভয়াবহ। বেশীর ভাগ ফ্রন্ট সদস্য এই অভিযোগই করেছেন—সমস্ত পুলিশ-বাহিনী মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির বিস্তৃতিলাভের জন্য শুধু সহায়তা করছে না অধিকন্তু অন্য দলের লোকদের নাজেহাল করবার জন্য সদাউদ্যত হয়ে আছে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে আর এস পি ও এস এস পি এই দুটি দলও তখন মার্কসবাদীদের স্বরাষ্ট্র দপ্তর দেওয়ার স্বপক্ষে ছিলেন। কিন্তু সেই আর এস পিও আজ পুলিশের পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে সোচ্চার। এস এস পিও একথা বলছে তবে তাঁরা বর্তমানে ফ্রন্টে আসেন নি। কেন্দ্রীয় নির্দেশে তাঁরা ফ্রন্টকে সমর্থন করছেন।

কাজেই আন্তর্দলীয় সংঘর্ষের চেয়েও যে প্রশ্ন বড় হয়ে উঠেছে সেটা হচ্ছে পুলিশের পক্ষপাতিত্ব ও অবস্থা বুঝে নিষ্ক্রিয়তার ভূমিকা অবলম্বন করা। যদিও অন্যান্য দপ্তর সম্পর্কেও আলোচনার কথা উঠেছে এবং ফ্রন্ট মন্ত্রীরা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সুসংহতভাবে কাজ করছেন না বলেও অভিযোগ এসেছে তা সত্ত্বেও পুলিশের ভূমিকার উপর অংশীদাররা যে-ভাবে জোর দিয়েছেন তাতে পুলিশমন্ত্রীর প্রতি পরোক্ষে একদেশদর্শিতার অভিযোগ আনা হয়েছে এবং তা নিঃসন্দেহে শ্রীজ্যোতি বসুর প্রতি অনাস্থার ভাবই সূচিত করছে। এবং ফ্রন্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটি দিন ধার্য করে এ নিয়ে আলোচনা হবে—এতে প্রথম দফায় ফ্রন্টের কিছু শরিক নিঃসন্দেহে বাজীমাৎ করেছেন। পুলিশই মুখ্য আলোচনার বস্তু হওয়ার ফলে অন্য যে সব বিষয় ফ্রন্টের ঐক্যের পক্ষে হানিকর তা গৌণ হয়ে পড়েছে।

পরবর্তী বৈঠকে খাদ্য নিয়ে আলোচনার কথা হয়েছিল এবং সেইভাবে বিষয়-সূচী স্থিরীকৃত হয়েছিল। কিন্তু আবার সেই আন্তর্দলীয় কোঁদলের ব্যাপার নিয়েই ফ্রন্টকে সেদিনের সভায় ব্যাপৃত থাকতে হল। আর আন্তর্দলীয় প্রশ্ন আনার অর্থই হচ্ছে—আর একবার পুলিশের ও পুলিশ-মন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করা। এবং সেদিন শ্রীজ্যোতি বসুই নাকি ফ্রন্ট শরিকদের কাছে কোন সমস্যায় কিভাবে পুলিশকে কাজে লাগাবেন তার জন্য গাইডলাইন চেয়েছেন। ফ্রন্ট সভার গতি-প্রকৃতি থেকে মনে হয় পুলিশ নিয়ে শ্রীবসু বেশ একটু বেকায়দায় পড়েছেন। অবশ্য পুলিশ যদি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকত তবে এবার পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গেল তার ঠ্যালা সামলাতে হয়ত শ্রীঅজয় মুখার্জিকে এতদিন কমণ্ডলু হাতে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করতে হত। শরিকদের সমালো-

চলার ঠেলায় শ্রীমুখার্জির প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। নয় মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলের শরিকী আচরণের মধ্যেই উপরিউক্ত মন্তব্যের উত্তর নিহিত আছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যদি ধরে নেওয়া যায় অন্যান্য শরিকরা শ্রীজ্যোতি বসু বা মার্কসবাদীদের কাছ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর হাতবদলে সমর্থ হয়েছেন—তা হলে বর্তমানে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার সমাধান হবে কি? অন্য শরিকের হাতে গেলেই পুলিশ একেবারে চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করে আইনানুগভাবে চলতে শুরু করবে এমন গ্যারান্টি কোথায়? আর ভাবী মন্ত্রী যে পুলিশকে কাজে লাগাবেন না—এমন আশ্বাস কে দিতে পারে? 'সমদর্শী' অনেকবারই বলেছেন—পুলিশ কয়েকজন বরখাস্ত হওয়ার পর তাঁদের প্রভুভক্তি আরও মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়তে বাধ্য। তখন যদি রদবদল হয়ে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী কিংবা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর আসে তবে পুলিশ কি পাল্টাবে? যদি তাঁদের কড়া নির্দেশে তাঁদের দলের কাউকে কোন অভিযোগের জন্য গ্রেপ্তার করবার আগে পুলিশ নথিপত্র সাজিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারে যে সেই ব্যক্তি নির্দোষ। অতএব, অন্যায়ভাবে তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কি করে? তখন শ্রীলাহিড়ীর পক্ষেও ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে পুলিশকে দিয়ে একজন 'নির্দোষ' ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করানো। অবশ্য ফ্রন্টের অন্য শরিকরা এখন যেমন চেঁচাচ্ছে তখনও শ্রীলাহিড়ীর বিরুদ্ধে ঠিক এমনিভাবেই চেঁচাবেন, এর ট্র্যাডিশন একইরকম চলতে থাকবে। ব্যত্যয় ঘটবে না।

কিন্তু রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে একটু টানা-হ্যাঁচড়া—আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি করে শ্রীজ্যোতি বসুকে কিঞ্চিৎ নিরস্ত করে রাখা হবে মাত্র। আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে খাদ্য, ভ্রমণ এবং আরও কয়েকটি দপ্তর পুনর্বণ্টনের চাপ সৃষ্টি করা। চোদ্দটি শরিকসম্বলিত যুক্তফ্রন্টের ৩১ জন মন্ত্রী ও তিন-পোয়া মন্ত্রীকে জনতার সেবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দপ্তরের পর দপ্তর ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হয়েছে। এমন কি সকল শরিককে সন্তুষ্ট করবার জন্য দুধ একদিকে গরু একদিকে,—মাছ একদিকে—ভাত একদিকে ইত্যাকারের দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব মুশকিল আসান হয় নি। এক শরিক এস এস পি এখনও মন্ত্রীত্বে আসেন নি। তাঁরা যদি আসেন তবে তাঁদের একজন পূর্ণাঙ্গ ও একজন তিনপোয়া মন্ত্রীর জন্য "দুধ সরবরাহ" ও সমাজ-শিক্ষা দপ্তর বরাদ্দ হয়েছে। অবশ্য, পশুপালন ইতিমধ্যেই আর একজনের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই গরুর দুধ আছে কি নেই তা না জানা সত্ত্বেও দুধের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে হবে। তেমনি চাল আছে কি নেই—মৎস্যমন্ত্রীকে মৎস্য যোগাতে হবেই। অবশ্য দুধ-গরুর সম্পর্ক এই বিষয়ে না থাকলেও একটা রসলাসিক্ত ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িত আছে। কিন্তু চাল না থাকলেও মাছ পাওয়া যেতে পারে। কিংবা মাছের অভাব হলেও

চাল মিলতে পারে কিন্তু গরু না থাকলে দুধ? তাও পাওয়া যায়।—কোথা থেকে? আমেরিকার গুড়ো দুধ। কিন্তু ফ্রন্ট সরকার আমেরিকার গুড়ো দুধের উপর নির্ভর করবে একথা ভাবতেও রোমাঞ্চ লাগে। আবার কৃষিমন্ত্রী উৎপাদন বাড়াবেন—সেচের ব্যবস্থা হলো কি হলো না—এই তথ্য না জেনে। আবার সেচমন্ত্রী জলের বন্যা বয়ে দেবেন কৃষির কাজে কি লাগবে তা হয়ত না জেনেও। এ অবস্থায়ও ফ্রন্টের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলেছেন দপ্তর নাকি খুব বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে খণ্ডিত করা হয়েছে। যাহোক, যদি ফ্রন্ট শরিকরা মন্ত্রীসংখ্যা *কমিয়ে দপ্তরগুলি সত্যিই বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভাগ করে নিতেন তবে মন্ত্রিসভা ছোটও হত, সুসংবদ্ধও হত। আর মন্ত্রিসভার বৈঠক একটি "মিনি-আইনসভায়" পর্যবসিত হত না।*

যাহোক—দুই মন্ত্রীর পদত্যাগের ফলে আবার দপ্তর বণ্টনের প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন, তাঁর দলের হাতে যে সমস্ত দপ্তর আছে তা ছাড়ার ত কোন প্রশ্ন ওঠে না। অধিকন্তু খাদ্য দপ্তর যা বর্তমানে তাঁদের হাতে এসেছে তাও ছেড়ে দেবার কোন যৌক্তিকতা নেই, কেননা—পূর্বতন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমারকে তাঁরাই খাদ্য দপ্তরটি ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন, যদি আর সি পি আই-এর কেউ মন্ত্রী হয়ে আসেন তবে একটি দপ্তর তাঁর দল ছেড়ে দিতে পারে। যুক্তিটা অকাট্য। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর হাতে এস এস পি'র বরাদ্দ করা পশুপালনের দুগ্ধাংশ ও সমাজ-শিক্ষা দপ্তর এবং বলশেভিক পার্টি থেকে লব্ধ ভ্রমণ বা পর্যটন দপ্তর গচ্ছিত আছে। অতএব, সি পি এম বৃহত্তম দল হিসাবে যদি একটি দপ্তর হাতে রাখে তবে কারও আপত্তি করবার কিছুই নেই। আবার পুনর্বণ্টনের প্রশ্নে একথাও বলা হয়েছে যে পরিষদের সদস্যসংখ্যার অনুপাতে সি পি এম দপ্তর হিসাবে কমই পেয়েছেন। কাজেই কম্যুনিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক বা এস ইউ সি কিংবা বিদ্রোহী পি এস পি ইত্যাদি দল সে সমস্ত দপ্তর পেয়েছেন এই আনুপাতিক দিক থেকে তা অনেক বেশী। অতএব, নতুনভাবে দপ্তর বণ্টিত হলে এসব দল আর কোন নতুন দপ্তরের ভার পেতে পারে না। শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন, আর এস পি ও বাংলা কংগ্রেস যে-দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে গচ্ছিত আছে তা ভাগ করে নিতে পারে। অতএব, মনে হচ্ছে সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য বা প্রত্যাক্রমণ করবার জন্য *শ্রীদাশগুপ্ত আগে থেকেই আক্রমণের ঢঙে বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করছেন, এবং তাঁর বক্তব্যকে আরও জোরদার করবার জন্য 'কম্যুনিস্ট পার্টি যে পশ্চিমবাংলায় ও যুক্তফ্রন্ট ভাঙবার কাজে অগ্রণী হয়েছেন তার কথা জনসমক্ষে বলে জনমত গঠনে* উদ্যোগী হয়েছেন। বরানগরের ঘটনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে কম্যুনিস্টরা অভিমানবশত ফ্রন্টের সভায় একদিন যোগদান না করার পরই যুক্তফ্রন্টে কালাপাহাড় হয়ে পড়েছেন। কারণ, কেরলে নাকি ফ্রন্ট সরকারকে গদীচ্যুত করবার জন্য নাটের গুরু সেজেছে ঐ ডাংগেপন্থীরা। কিন্তু আর এস পির সংগে আলিপুরদুয়ারে হানাহানির পর আর এস পি মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের কম হেনস্তা করে নি। এমন কি হালেও শ্রীজ্যোতি বসুর পুলিশ দপ্তর সম্পর্কে সরব আলোচনা করে প্রকৃত তথ্য নির্ধারণের ওপর জোর দিচ্ছিলেন। অথচ, কেরলে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বিশেষ করে বামপন্থী কম্যুনিস্টদের অপদস্থ করার মূলে এই আর এস পি ভূমিকা মোটেই নগণ্য নয়—একথা অবশ্য মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের। কিন্তু তাদের সম্পর্কে পশ্চিমবাংলায় কোন বিরূপ সমালোচনা করছেন না মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট, অথচ আরও বেশী দপ্তর দেওয়ার কথা সুপারিশ করছেন। এর হেতু জানতে চাওয়া হলে একজন মার্কসবাদী নেতা মন্তব্য করেন যে সারা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে আর এস পির কোন ভূমিকা নেই। আর দ্বিতীয়ত কেরল ও পশ্চিমবাংলা আর এস পির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ আছে। আর এস পি পশ্চিমবাংলায় মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের বন্ধুভাবাপন্ন দল। কাজেই তাঁদের নতুন দপ্তর দেওয়ার পক্ষে মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু বেশীর ভাগ ফ্রন্ট সদস্য যদি দপ্তর বণ্টনের প্রশ্নটাকে ফয়সালা করতে চান তবে "কনসেনসাসের" জোরেও একটি *সিদ্ধান্ত করতে পারেন, কিন্তু "কনসেনসাস" ফ্রন্টে অচল। সংখ্যায় বেশী হলে চলবে না—দলের ওজন দেখতে হবে।*

যতই কঠিন হোক না কেন, দপ্তর পুনর্বণ্টনের সমস্যারও ফয়সালা হয়ে যাবে। ফয়সালার অর্থ হচ্ছে মনপুত না হলেও কিছু দলকে যা ঘটবে তা মেনে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ কিছু ঘটলেও ফ্রন্টের ওপর কোন আঘাত আসতে পারে না। কারণ শরিকদের পরিষদীয় সদস্য সংখ্যাটা এতই ভয়ংকর সুন্দর যে এদিক ওদিক করে কারও পক্ষে কোন লাভ হবে না। অতএব, বড়ভাইরা যা দেবেন তাই ছোটদের আনন্দের সংগে গ্রহণ করতে হবে। শুধু শুধু রাজনীতির কৌশল দেখিয়ে কিছু দল অযথা সময় নষ্ট করছেন মাত্র। অবশ্য সকলেরই কালিমা ঢাকবার উদ্দেশ্যে তখন সকলেই বলবেন, পরিবর্তনের সময় কিনা—তাই এমনি একটু ঘটবেই। আখেরে সব ঠিক হয়ে যাবে। বার বারই এই ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে—সত্যিকারের ঠিক কবে হবে সে আশায় সকলেই অপেক্ষা করছেন।

—সমদর্শী
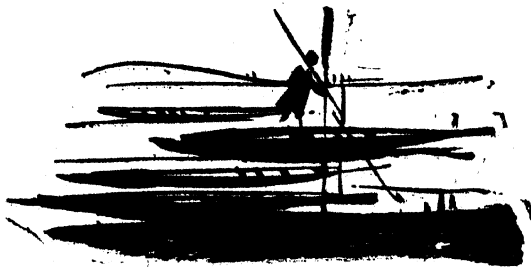
দেশেবিদেশে

আসামের দাবী

আসামে দ্বিতীয় আর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত তৈল শোধনাগার স্থাপনের দাবীতে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের কোন ভূমিকা না থাকলেও এটা স্পষ্ট যে, এই আন্দোলনের পিছনে ঐ রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের প্রশ্রয়, সহানুভূতি এমনকি সহায়তাও আছে। কমিউনিস্ট পার্টি, পি-এস-পি, এস-এস-পি, এস-ইউ-সি প্রভৃতি দল এই আন্দোলন আরম্ভ করেছে ঠিক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আসন্ন আসাম সফরের প্রাক্কালে। হাজার হাজার সত্যাগ্রহী এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেছেন। ভারতের পূর্বাঞ্চলে একমাত্র আসামেই এখন পর্যন্ত কংগ্রেসের দখলে রয়েছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রাক্কালে কংগ্রেস সরকারের সমর্থনপুষ্ট এই আন্দোলন কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করছে।

আসামে আর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত তৈল শোধনাগার স্থাপনের দাবীতে সেখানকার রাজ্য সরকার অনেক দিন যাবৎই নয়াদিল্লীতে দরবার করে যাচ্ছেন। এই দাবী জানিয়ে গত মার্চ মাসে আসামের বিধানসভায় যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার মধ্য দিয়েই আসামের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল। ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে। আসাম সরকার ও আসাম বিধানসভার সুস্পষ্ট অভিমত উপেক্ষা করে এবং সমগ্র আসাম উপত্যকায় যে ব্যাপক আন্দোলন চলছে, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নয়াদিল্লীর পক্ষে ঐ দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করা খুবই কঠিন। অথচ, অন্যদিকে খবর হচ্ছে এই যে, আসামের এই দাবী বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিলেন, সেই কমিটি আসামে দ্বিতীয় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত তৈল শোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছেন। এখন যদি আসামের দাবী মেনে নিতে হয়, তাহলে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ নাকচ করে দিয়ে তা করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অবশ্য যে তা করতে পারেন না তা নয়। রাজনৈতিক কারণে বিশেষজ্ঞদের অভিমতের বিরোধী কাজ করার নজীর রয়েছে। আসামের গৌহাটীতে যে রাষ্ট্রায়ত্ত তৈল শোধনাগার রয়েছে, সেটি স্থাপিত হয়েছে 'বর্শিংট কমিটি'র সুপারিশ না মেনে। গৌহাটীর এই শোধনাগারই প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত শোধনাগার যা আমাদের দেশে চালু হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের আট মাস পরে, ১৯৬২ সালের জানুয়ারীতে এটি চালু হয়। চালু হওয়ার পরই এই শোধনাগার নিয়ে অনেক মুস্কিল গেছে।

আসামের বক্তব্য এই যে, তার যে তৈল সম্পদ রয়েছে তা যদি রাজ্যের মধ্যেই শোধন করা যায়, তাহলে শোধিত উপাদানগুলির ভিত্তিতে সেখানে কতকগুলি পরস্পর- [illegible]

এইভাবে তার প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তার পশ্চাৎপদ অর্থনীতিকে টেনে তোলা যেতে পারে। দেশবিভাগের ফলে একদিক থেকে আসামের অর্থনীতি দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অন্য দিকে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদের দায় তার উপর চেপেছে। এই রাজ্যের অধিবাসীদের মাথা-পিছু আয় অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্যের তুলনায় কম। তার উপর আবার যখন ঐ সীমান্তবর্তী রাজ্যে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে নিরাপত্তার প্রশ্ন তোলা হয়, তখন রাজ্যের অধিবাসীরা ক্ষুব্ধ হন।

আসাম সরকার তাঁদের দাবীর সপক্ষে সংসদের "রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবসায় সংক্রান্ত কমিটি"র একটি অভিমতও উদ্ধৃত করেছেন। উত্তর বিহারে একটি শোধনাগার স্থাপনের পক্ষে যুক্তি দিয়ে কমিটি তাঁদের ঐ অভিমতে বলেছিলেন, "এতে একটি পশ্চাৎপদ এলাকায় শিল্পপ্রসারের সুযোগ হবে।"

আসামে দ্বিতীয় তৈল শোধনাগার স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার পৃথক্ সমীক্ষা করেছেন। দুই পক্ষই পৃথক্ হিসাব দিয়েছেন এবং পৃথক্ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

সবার আগে যে প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে, সেটি হল : আসামে দ্বিতীয় একটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অশোধিত 'ক্রুড' ঐ রাজ্যের মধ্য থেকে পাওয়া যাবে কিনা? এই বিষয়ে ডেরা-

ডনস্থিত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটট্যুট অব পেট্রো-লিয়াম যে হিসাব করেছেন, তাতে দেখান হয়েছে, ১৯৭০ সালে আসামে ৪৩ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশী 'ক্রুড' পাওয়া যাবে না। আসাম সরকার ইনষ্টিট্যুটের এই হিসাব মানেন না। অয়েল ইণ্ডিয়া উজান আসামের ডমডমায় ও নেফার লিজ্ঞারতে তেলের সন্ধান করছে। অনুসন্ধানের ফলাফল এখন পর্যন্ত উৎসাহজনক বলে জানা গেছে। রুদ্রসাগরে তেল আহরণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে, পালেকিতে প্রচুর পরিমাণ তেল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেখানে খুব দ্রুতগতিতে কাজ হচ্ছে। দক্ষিণ আসাম টিপতাকায়ও তেল আহরণের কাজ এ বছর আরম্ভ হওয়ার কথা আছে। সুতরাং ভবিষ্যতে আসাম রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে 'ক্রুড' পাওয়ার আশা আছে। আসাম সরকার বলেছেন যে আসামে যদি আর একটি তৈল শোধনাগার স্থাপন করা হয় তাহলে তার জন্য [illegible] যোগানের [illegible] ১৯৭৫ সালে [illegible] তখন আসামে [illegible] ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনের তৈলক্ষেত্রগুলি থেকে কমপক্ষে তিন লক্ষ মেট্রিক টন 'ক্রুড' পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

আসাম সরকারের আর একটি বক্তব্য এই যে বারৌনির তৈল শোধনাগারটি আসামের 'ক্রুড' শোধন করার জন্যই তৈরী হয়েছিল [illegible]। পার্লামেণ্টের এস্টিমেটস কমিটি একটি রিপোর্টে উল্লেখ করে দেখান হয়েছে যে বারৌনির তৈল শোধনাগারে বিদেশ থেকে আমদানী করা 'ক্রুড' ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি উঠেছে সেটা হল : [illegible]

না, গৌহাটীতে স্থাপন করাই বেশী লাভ-জনক? ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটট্যুট অব পেট্রো-লিয়ামের একটি সমীক্ষায় প্রকাশ, যে, গৌহাটিতে কুড়ি লক্ষ মেট্রিক টন তেল শোধনের ক্ষমতাসম্পন্ন আর একটি শোধনা-গার স্থাপন করতে এককালীন খরচ হবে ৭০ কোটি টাকা আর বারৌনিতে সেই একই কাজে খরচ হবে মাত্র ৪৫ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, ইনষ্টিট্যুটের সমীক্ষায় দেখান হয়েছে, বারৌনির তুলনায় গৌহাটীতে পরিচালনার ব্যয় দেড়গুণ হবে। বলা হয়েছে যে বারৌনিতে এক মেট্রিক টন তেল শোধনের খরচ পড়বে (পরিবহনের ব্যয়সহ) গড়ে ৩৪ টাকা আর গৌহাটীতে সেই খরচ পড়বে ৬১ টাকা, শিবসাগরে ৭০ টাকা।

ইনষ্টিট্যুটের এই হিসাব আসাম সরকার মানেন না। তাঁদের হিসাবে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন তেল শোধনের উপযোগী শোধনাগার নির্মাণ করতে বারৌনিতে খরচ (ক্রুড ও পাইপলাইন সহ) পড়বে ১২৭ কোটি টাকা। আর যদি গৌহাটীর তৈল শোধনাগারের ক্ষমতা সাড়ে সাত লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বাড়িয়ে ২২.৫ লক্ষ মেট্রিক টন করা হয়, তাহলে খরচ পড়বে মাত্র ৮৮ কোটি টাকা। এই হিসাবের উত্তরে ভারত সরকারের বক্তব্য হচ্ছে, যে ১২৭ কোটি টাকা খরচ করতে হবে তার মধ্যে একটা অংশ ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে আছে। সুতরাং, আসাম সরকার যে ৩৯ কোটি টাকা বাঁচাবার কথা বলছেন সে টাকা তো বাঁচবেই না, উপরন্তু ১৫ থেকে ৩০ কোটি টাকা অতিরিক্ত লগ্নী করার প্রয়োজন হবে।

এ ছাড়া, কোথায় কি আকারের শোধনা-গার তৈরী করতে [illegible]

মোমের ভাগ বেশী থাকায় টাকার অঙ্কে তার কি অসুবিধা হতে পারে এসব বিষয়ে দিল্লী ও গৌহাটীর মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তাছাড়া ক্রুড পরিবহণের খরচ ও শোধিত দ্রব্য পরিবহণের খরচের তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্নও আছে। আর একটি প্রশ্ন হল ক্রুডের উপর আসাম সর-কার যে, বিক্রয়-কর আরোপ করেন (ভারত সরকারের মতে প্রতি মেট্রিক টনপিছু ১২ টাকা আসাম সরকারের মতে ১০ টাকা) তাতে গৌহাটীর তৈল শোধনাগার সম্প্র-সারণের প্রস্তাবটি অলাভজনক হয়ে যায় কিনা।

সব কিছু বিবেচনা করে ভারত সরকার এক সময়ে আসামে দ্বিতীয় তৈল শোধনা-গার স্থাপনের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু আসাম তার দাবী ছাড়তে রাজী হয় নি। গত মার্চ মাসে এই দাবীতে আসামে প্রায় দশ হাজার মানুষ 'গণ-অনশন' করেন। ঐ মাসেই রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। তারপর ভারত সরকার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে অভিমত দেওয়ার জন্য পাঁচজন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন।

এই কমিটি কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুণা সেনের কাছে তাঁদের রিপোর্ট দিয়েছেন। রিপোর্টে কি বলা হয়েছে তা যদিও সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয় নি, তাহলেও জানা গেছে যে, কমিটি আসামে দ্বিতীয় তৈল শোধনা-গার স্থাপনের প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে-ছেন। তাঁরা অবশ্য পেট্রোলিয়াম-নির্ভর কতকগুলি রাসায়নিক শিল্প আসামে

পশ্চিমবঙ্গের নতুন শিক্ষানীতি

পশ্চিম বাংলার শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় শিক্ষাক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আনতে আগ্রহী। আগে আমাদের এই রাজ্য শিক্ষা নিয়ে গর্ব করতে পারত। ইংরেজী শিক্ষার আলোক প্রথম বাংলাদেশের অধিবাসীরাই পেয়েছিল। তার দৌলতে অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল এখানে। কিন্তু বাপ-পিতামহের ঐশ্চর্য ভাঙিয়ে যেমন উত্তরপুরুষের বেশিদিন চলে না, আমাদেরও হয়েছে সেই দশা। শিক্ষিতের হার গণনায় সারা ভারতে পশ্চিম বাংলার স্থান এখন প্রথম নয়, নবম। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিও এ রাজ্যে কম। সুতরাং একথা বলা যেতে পারে যে, শিক্ষা নিয়ে যত আলোচনাই হক এবং আমরা যতই বড় বড় পরিকল্পনা করি না কেন, অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আমরা দেশবাসীকে মুক্ত করতে পারি নি।

শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে। শিক্ষার প্রসার ও লালনের দায়িত্ব সরকার নেবেন, এই প্রস্তাব খুবই প্রশংসার যোগ্য। ইতিমধ্যেই তামিলনাদে মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার প্রস্তাব হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও শিক্ষা অবৈতনিক। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষার জন্য অকাতরে ব্যয় করেন। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে উচিত কাজই করেছেন। অবশ্য টাকার সংস্থানের প্রশ্ন আছে। এর জন্য যে-অতিরিক্ত ষোল কোটি টাকা ব্যয় হবে তার ৬০ শতাংশ শিক্ষামন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী করেছেন। এই দাবী পশ্চিম বাংলার শিক্ষক মহলে অনেক দিন থেকেই করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার হয়তো নীতিগত আপত্তি এতে তুলবেন না। কিন্তু টাকা কোথায়? টাকা না পাওয়া গেলে কি প্রস্তাব কার্যকর হবে না। এরকম সৎ প্রস্তাব অনেক সময়েই অর্থাভাবের অজুহাতে মাঝপথে এসে পরিত্যক্ত হয়। পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে তা হবে না, এটা আমরা আশা করি।

এই প্রসঙ্গে আমরা শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি বিষয়ে অগ্রাধিকার দেবার জন্য দাবী করব। তা হল সারা রাজ্যে সর্বজনীন আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন। দুনিয়ার ৮০ কোটি নিরক্ষরের মধ্যে ৩৬ কোটি নিরক্ষরের বাস ভারতে। নিরক্ষরতা দূর না করতে পারলে গণতন্ত্র অর্থহীন। আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা এই সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, সংবিধান প্রবর্তনের দশ বছরের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সমস্ত বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। সেই সদিচ্ছা কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে। কাজ মোটেই এগোয় নি। পশ্চিম বাংলার শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে সারা ভারতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেন। যারা ইতিমধ্যেই স্কুলে পড়বার সুযোগ পাচ্ছে তাদের শিক্ষা অবৈতনিক করে দিলে একটি উত্তম কল্যাণকর কাজই করা হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা একেবারেই লেখা-পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না, নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে আছে, আমাদের মনে হয়, রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের প্রতি আরও বেশি। অগ্রাধিকারের প্রশ্ন হিসাবে দেখলে আবশ্যিক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাই এখন সবচেয়ে জরুরী। এর জন্য অর্থ প্রয়োজন এবং অনেক নতুন স্কুল খুলতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, আগামী জানুয়ারী থেকে তিনি সারা রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবেন। তার সঙ্গে আমরা যুক্ত করতে চাই একটি প্রস্তাব, এই শিক্ষা আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক করা হক যত শীঘ্র সম্ভব। অর্থাৎ নিরক্ষরতা দূর করার কাজে পশ্চিমবঙ্গ হ'ক সকলের অগ্রণী। এ-সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রীকে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি এ নিয়ে আজীবন আন্দোলন করেছেন। ১৯৭০ সালে তিনি গ্রামাঞ্চলে দেড় হাজার নতুন প্রাথমিক স্কুল খোলার যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা থেকেই মনে হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও আবশ্যিক করারই প্রথম ধাপ এটা। অর্থ যখন সরকারের হাতে সীমাবদ্ধ তখন এই অর্থব্যয়ের অগ্রাধিকার বিবেচনা করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানীতিকে সুষ্ঠু রূপ দেওয়াই কর্তব্য। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নানা সমস্যা আজ শিক্ষায়তনগুলোকে অচল অবস্থায় এনে ফেলেছে। ছাত্র অসন্তোষ দেখা দিচ্ছে নিত্যনতন আকারে। অন্যদিকে অশিক্ষার অন্ধকারে বিক্ষিপ্ত জনসাধারণ নতুন পথের সন্ধান করতে পারছে না। তাই আমরা সর্বাগ্রে চাই নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সে কাজের উপায় হল সর্বাগ্রে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও আবশ্যিক করা। তা করতে পারলে জনজীবনে সত্যিকারের

অঙ্গীকার ॥

সতীকান্ত গুহ

কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে
মাঝরাতে পাখপাখালির
ভয়ার্ত জটিল কোলাহল। যেন এক'শ পাথার
হা-হুতাশ আর হাহাকার।
ভয় এসে দূরে সরে যায়;
পাখিদের চোখে ঘুম ঢেলে
সে রাত্রি স্তব্ধতা ফিরে পায়
অন্ধকার শাখায় শাখায়।

আরো পাখি দেখি অদৃশ্য খাঁচায়,
দিনে রাতে ডানা ঝাপটায়।
আমি তাকে দিতে পারি সোনালী আকাশ,
দেবতার নিশ্বাসের মতন বাতাস।

তবু পাখি কেন অন্ধকারে
ডানা ঝাপটায় বারে বারে।
এ জীবনে সোনার খাঁচায়
মেটেনি কি আজো অঙ্গীকার।।

আবর্তন ॥

অনন্ত দাস

জলের উপর জাহাজের মত
শুয়ে আছি আমি তিরিশ বছর
কম্পাসে ভুল দিকনির্ণয়
চারিদিকে যেন প্রলয় প্রখর

প্রপেলারে ঘোরে আহ্নিক গতি
তারকাখচিত হাতছানি, ঘর
কোথাও ছিল কি? অথবা ছিল না
পাটাতনে কাঁপে জীবনের স্বর

প্রখর সূর্য-মাথার উপরে
নখের আঁচড়ে দগ্ধ দিন
গর্জায় রোষে ফাটলের চোখে
বাহুর পেশীতে রক্তের ঋণ

ঝড়ের পাখিরা ফিরে যায় ঘরে
সামনে আমার ঘূর্ণির জল

খাট

গোপাল সামন্ত

রোয়াকে সামান্য একটুখানি ঘেড়া ঘেরা রান্নাঘর। তার বাইরে উঠোন। সেখানে বসে বালতির তোলা উনুনটায় হাওয়া দিতে দিতে সুলতা ভাবছিল—নাঃ আর নয়! এটাতে আর কাজ চলবে না—হপ্তা অন্তর মাটি লেপেও কোন লাভ নেই। উনুনটার একটা পাশ মরচেতে পলকা হয়ে এমন দুমড়ে গিয়েছে যে একটু কাৎ হয়েই ওটা দাঁড়ায়।

ওপরে সাজান কয়লাগুলোও গড়িয়ে গড়িয়ে আসে—আজকের কয়লাটাও প্রায় রোজকার মতই পাথুরে ঢেলা, ঘুঁটেগুলো তেমনি ভিজে আর মাটি-মেশানো। প্রাণপণে পাখা চালাতে চালাতে সুলতার মনটা নিতান্তই ব্যাজার হয়ে ওঠে। এই সাত-সকালেই ও ঘেমে একেবারে নেয়ে উঠেছে,

খুঁজে বের করল, উঠোনটা পার হয়ে কল-তলার দিকে এগিয়ে গেল।

উঠোন বলতে, গলি বলতে এই এই-টুকুনই। চওড়ায় হাত তিনেক, লম্বায় অনেকটা—যতটা দূর এপাশের এক নম্বর থেকে ন নম্বর, অথবা অন্যপাশের দশ থেকে আঠারো নম্বর। দুপাশের এই আঠারোটা ঘরের মাঝখানে যে ফালি জায়গাটা পড়ে আছে তাকেই উঠোন বলা হয়। ওর একমাথায় একটা জলের কল। বেঁটেখাটো ওই কলটার চারধার ঘিরে একটা চৌবাচ্চার মত নিচু জায়গা, তার মাঝখানেই বাড়ি-অলার কলের জল সারাদিন ছিরছির করে পড়ে—এতই ক্ষীণ তার ধারা যে সকালে বা দুপুরে তার কোন তফাৎ বোঝা

যেন থালা উল্টে সব এঁটোকাঁটা ওই কল-তলায় ফেলে গেছে, থিতোনো জলের তলায় ভাতে আর ছাইয়ে ভর্তি, ওপরে ডাঁটার পচা ছিবড়েগুলো ভাসছে। সুলতার সামনে এ-রকমভাবে কলতলা নোংরা করলে সুলতা দুকথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ত না, কিন্তু চোখে না দেখে কাকেই বা কী বলা যায়!

ওই নোংরার মধ্যে পা ডুবিয়ে গিয়ে জল ধরতে সুলতার ঘেন্না এল, গেলাসটা হাতে নিয়ে একটুখানি দাঁড়িয়ে রইল, শুধু মনে মনেই যেন গর্জন করে বলল—কতদিন বলেছি, এ বাড়িটা ছাড়ো, যেখানে খুশি চলো! না সেই এককথা—এই ভাড়াতে বস্তিতেও আজকাল ঘর পাওয়া যায় না,

না এই যে এক লাইনে ন ন-টা করে ঘর! তার মাঝে এই টুকরো গলি, রান্নাঘর বলতে সবাইকার বারান্দায় একটুখানি বেড়ার মতো ঘেরা—এটাই কি বস্তি নয়? না, বাড়ির দেয়ালটা টিনের, ছাদটা টালির আর মেঝে নিমকি-ভাঙা সিমেন্টের হলেই তা বস্তিবাড়ি হতে পারে না! নয়তো কি ভদ্রলোকের পাড়ার কাছে বলে?—ধীরেন তো সেই বাঁধা বুলিটাই যেন মুখস্তের মত বলে—জানো, পাড়াটা বেশ ভাল কিন্তু, ভদ্রলোকের পাড়া তো!

ধীরেন সামনে উপস্থিত নেই, তবু তার ওপর এক ধরনের রাগ এসে সুলতার মনের মধ্যে গর্জন করতে থাকে—গেলাসটা হাতে নিয়ে সে আবার উনুনটার দিকে ফিরে আসে। মনে হয়, যে বাড়িতে এক গেলাস জল ধরে রাখার উপায় নেই সেটাই কিনা বাড়ি হলো!—সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথা মনে পড়ে যায়, আর মুহূর্তেই আজকের সব রাগ কোথায় মিলিয়ে যায়—খাটটা আজই আসবে। ধীরেন কালই অফিস থেকে ফিরে এসে বলেছে—জানো, বায়নাটা দিয়ে এলাম। তিরিশ টাকায় রাজি হয়েছে, বলেছে কাল দেবে।

ধীরেন আজ অফিস থেকে ফেরবার সময় খাটটা নিয়ে বাড়ি আসবে! ওঃ আজই আসবে! একটা খুশির রেশমী পতাকা যেন সুলতার মনে পত পত করে উড়তে থাকে—সুলতা জোরে জোরে উনুনটায় পাখা চালাতে লাগল। তখনই পিছন থেকে কে যেন এসে ওর পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়াল। ছোট্ট দুটো হাত—হতে পারে চাঁপার, হয়তো বা পিলুর। না, চাঁপা নয়—পিলুই!

একটু আগেই সুলতা ওদের ঘুম ভাঙাতে গিয়েছিল। পিলুর হাত ধরে টেনে তুলতে যেতেই কেমন একটা অদ্ভুত মায়া লেগেছিল ওদের দুজনের জন্যেই। ধীরেন উঠে যাওয়ায় তার খালি জায়গাটায় চাঁপা গড়িয়ে গিয়ে ঘুমোচ্ছে। দেয়ালের ধারে যে কাঠের বাকসটার ওপরে ওদের দুটো টিনের বাকস বসানো থাকে তারই গায়ে ওর মাথাটা হেলে আছে, পিলুও গড়িয়ে গড়িয়ে চাঁপার কাছটায় চলে গেছে, তার গায়ের ওপর একটা হাত রেখে হাঁটু দুমড়ে ঘুমোচ্ছে—এমনিই ওদের শোয়া! দুটো পাগল ছেলে-মেয়ে সুলতার! আহা ঘুমোক ওরা আরও একটু! কাল রাত্তিরে সেই কতো দেরিতে ওরা ঘুমিয়েছে, জেগে জেগে কতোক্ষণ ওরা ফিসফাস করছিল—খাট আসবে—খাট আসবে—বকবক আর ফিস-ফাস। শেষে ধীরেন ধমক দিল। তারপর একটুখানি একেবারে চপচাপ। কিন্তু কিছুটা পরেই আবার সেই ফিসফিস। তারও অনেক বাদে ওরা ঘুমিয়েছে। এত-ক্ষণে একজন উঠলেন! চাঁপা এখনও উঠল কিনা কে জানে! সুলতা বলল—কী, ঘুম ভাঙল বাবুসায়েবের?—মন ভাল থাকলে পিলুকে সুলতা বাবুসায়েব বলে।

পিলু কথাটার কোন জবাব দিল না। মায়ের কাঁধটা ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলল—আজই তো খাটটা আসবে, না মা?

খাটের কথা ছাড়া আজ আর কি কথাই বা থাকবে! সুলতার মনেও তো কতো কথা কতো প্রশ্ন ভিড় করে আছে। কাল রাত্তিরে পিলু-চাঁপার কথার শব্দ থেমে যাবার পরে সেও তো পিলুরই মতো ছেলেমানুষি প্রশ্ন করেছিল—হ্যাঁ গো, ওরা কাল ঠিক দেবে তো?

ধীরেন বলেছিল—দেবে না মানে? পাঁচ টাকা বায়না দিয়ে এসেছি না? সরকার-বাবু চাইছিলেন পঁয়ত্রিশ টাকা, শেষে বড়বাবুকে বললাম, বড়বাবু বলে দিলেন—আচ্ছা তিরিশেই দিও ওকে।

—কিন্তু বেশ মজবুত হবে তো?

—নিশ্চয়ই! বড়বাবু বলেছেন। আমি বললাম, বাবু ওদের বলে দেবেন যেন একটু মজবুত করে তৈরি হয়। বাবু ওদের বললেন—দেখো এরটা যেন খাঁটি শাল কাঠ দিয়ে তৈরি হয়, আর আল-বিঁধগুলোও যেন ভালো হয়। আমাকে বললেন, আচ্ছা যাও—প্রায় অর্ডারীর মত হবে।

সুলতা এসব কথার কিছুই বুঝতে পারেনি, তবু প্রশ্ন করেছিল—অর্ডারির মতো মানে? তুমি তো টাকা দিয়েই বায়না করে এসেছ?

অন্ধকারের মধ্যে ওর মুখটা সুলতা দেখতে পায়নি তবু ধীরেনের গলার শব্দেই ওর মুখের হাসি আর গর্বে মেশানো চেহারাটা যেন দেখাও যাচ্ছিল—ধীরেন বলেছিল—ওসব তুমি বুঝবে না, একেবারে অর্ডার দিয়ে করালে পঞ্চাশ টাকারও বেশি দাম হয়। এটা রেডিমেডই, তবু অর্ডারির মতই মজবুত হবে।

তারপর কাল রাত্তিরে অনেককাল পরে একটা সুখের হাত পিলু-চাঁপাকে পেরিয়ে এসে ওর আশার হাতটা ধরেছিল—সেই কতোকাল আগের মতই, যখন সারারাত ধরে গল্প করতে করতে ওরা জানতেই পারত না যে ওদের কথার ফাঁকে ফাঁকে গুটি গুটি পায়ে রাতটা কখন পালিয়ে গিয়েছে, শেষে পাশের খাটালটায় যখন বালতির ঠং ঠাং শব্দ আর দুধ দোয়ানোর ছ্যাঁক ছ্যাঁক আওয়াজ উঠত তখন সুলতাই হয়তো বলে উঠত—দেখেছো, রাত একেবারে ভোর!

কালও ওরা তেমনি গল্পের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল—চাঁপার কেমন বিয়ে হবে, পিলু মানুষ হবে—ও খুব লেখাপড়া শিখবে! কোন অভাব আর থাকবে না। সত্যি, পিলুই তো ওদের আশা-ভরসা। কিন্ত পিলুর জন্য সুলতার বড্ডই মায়া হয় বড্ডো রোগা যে! কাল রাত্তিরেও ধীরেনকে ও আবার বলেছিল—হ্যাঁগো, তোমার তো এ বছরই মাইনে বাড়বে, না? এক পোয়া দুধের রোজ না করলে পিলুর শরীরটা একটুও সারছে না!

পিলুর কথায় আবার মনে পড়ে—কী যে পাগল ছেলে পিলু! রোজই সকালে উঠে মাকে একবার জড়িয়ে ধরা চাই! এই আজ-কের মতন—সুলতা মাথাটা ফেরাবার চেষ্টা করে, বলে—আঃ ছাড় ছাড়! ঘুঁটেটা বড্ডো ভিজে, পাখা করতে করতে হাত একেবারে ব্যথা হয়ে গেল!

সুলতা ওকে পাখাটা দেবে না। পি- ওটা নেবার জন্য টানাটানি করতে করা বলল—মা, খাটটা সত্যিই আজ আ- তো

সুলতার হাসি পায়। খাটের ক- পিলু কিছুতেই ভুলতে পারছে না। সুলতার মনের মধ্যেও তো সেই কথাই ঘুরছে! ওরও কাউকে জিজ্ঞাসা ইচ্ছে করছে অমনি করেই বার বার—সত্যিই আজ আসবে তো? ধীরেন বা- এখনই বাজার থেকে ফেরে আর পিলু-চাঁপা যদি সামনে না থাকে তাহলে সেও তো ওই প্রশ্নটাই করবে—হ্যাঁগো, সত্যিই আজ আসবে তো? তবু পিলুর কাছে তাকে গম্ভীর হতে হবে। বলে—যা যা, ওই একটা কথার জবাব কতোবার দোব?

পিলু বালতিটার কাছে মুখ ধুতে এগিয়ে গেল টিনের মগটা দিয়ে ওতে একটু খড়খড় করল, তারপর সুলতাকে না বলেই বালতি-হাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—এমনিই করে পিলু! ওর যখন মেজাজটা ভাল থাকে তখন ওকে কোন কাজের জন্য বলতে হয় না, খোসামোদ করতে হয় না—নিজে নিজেই এমনি করে কাজে এগিয়ে আসে—জল আনতে যায়, এমন কি বিকেলবেলায় এক একদিন খেলতে না গিয়ে সুলতার সঙ্গে ঠোঙা তৈরি করতে বসে পড়ে। বারণ করলেও কি শোনে পিলু!

অবশ্য জল এনে দেওয়ার ব্যাপারটা আলাদা। গলির প্রায় মোড়ের কাছে যে টিউব-ওয়েল ওখানে অত লোকের ভিড়ের মধ্যে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে সুলতার লজ্জা করে। তাই ধীরেনই জলটা এনে দেয়। কিন্তু সে যদি না ঘরে থাকে অথবা শরীর তার খারাপ হয় তাহলে পিলুই ভরসা। ওইটুকু ছেলের হাতে বালতি-ভর্তি জল দেখে সুলতার মনে ওর জন্য দুঃখ হয়, মায়া লাগে, কিন্তু কী করবে সুলতা! তখন ওর মনে হয়—জায়গাটা একেবারে একটা বস্তি হলেই ভালো হতো, এটুকু লজ্জার দোহাই পেড়ে ওইটুকুন ছেলেকে পাঠাতে হতো না।

সুলতা একটু আনমনাই হয়ে গিয়েছিল, হাতের পাখাটা তবু বাতাস করেই যাচ্ছিল, এখন হঠাৎ উনুনটায় তাকিয়ে দেখল যে কয়লার ফাঁকে ফাঁকে ধোঁয়াগুলো কখন কমে গিয়ে ছোট্ট ছোট্ট আগুনের জিভগুলো তার মধ্যে থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। পাখাটা নামিয়ে রেখে সে ঘরের মধ্যে গেল। দেখল, চাঁপা তখনও ঘুমোচ্ছে, ঘুমের মধ্যেই সে এবারে বিছানার পায়ের দিকে এসে পড়েছে—এমনিই চরকি-পাক খায় চাঁপা। সুলতা ভাবে—কিন্তু আজ থেকে যে খাটের ওপর শোবে, তখন ওকে কি করে সামলানো যাবে? কিন্তু সে-সব পরের কথা! এখন ওকে ঘুম থেকে তোলা দরকার। এমনিতে না উঠলে হাত ধরে টান দিয়ে তুলতে হবে—কিন্তু যা রাগী মেয়ে! জোর করে ঘুম ভাঙালে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাঁদতেই থাকবে। সুলতা ভাবছিল—কী করবে? তখনই রোয়াকে বালতির শব্দ হলো, বোঝা গেল, পিলু ফিরে

[...] তখনই ঘরের মধ্যে ঢুকল। যেন [...] কাণ্ড হয়ে গেছে এমনিভাবে [...]—জানো, জানো মা! আজ না! [...] আমাকে দেখেই বলল কী! [...] তো জল নিচ্ছিল! আমাকে [...]—পিলু তোর বালতিটা বসিয়ে [...] টিপে দিচ্ছি।

[...]গুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলে [...] একটু দম নিল, তারপরই আবার—[...] পণ্টুবাবু না! ওই যে গোল গোল [...]লানো চশমা—

সুলতা জানে যে পণ্টুবাবু আর কালোবুড়ি অর্থাৎ বুধনের মা এই দুজনকেই পিলু ভয় করে। কালোবুড়িকে অবশ্য তার মুখের জন্য অনেকেই ভয় করে, কিন্তু পণ্টুবাবুকে পিলুর ভয় শুধুমাত্র তাঁর গোল ঝোলানো চশমার জন্যই। পিলু বলে যাচ্ছিল—পণ্টুবাবু বললেন কি—হ্যাঁ, পিলু ছোট ছেলে, ওকেই আগে ছেড়ে দাও।

—দেখলি, তোকে আমি কতদিন বলেছি, তুই শুধু শুধুই ওঁকে ভয় পাস! শুধু চশমা দেখেই কি—

পিলুর ওসব শোনবার ধৈর্য নেই—বলতে লাগল—মা, কালোবুড়ি আর পণ্টুবাবু দুজনেই খুব ভালো, না?

সুলতার উত্তরের কোন অপেক্ষা না রেখেই ও আবার বলল—ও'দের গিয়ে বলে আসব মা?

—ও'দের আবার কী বলবি?

পিলুর মুখে একটু লজ্জার হাসি। কেন, ওই যে নতুন খাটটার কথা!

—ও মা, তুই এ কী পাগল রে? খাটের কথা আবার লোককে কি বলতে যাবি?

অথচ সুলতা জানে যে তারও ইচ্ছে করছে পিলুর মত—এ বাড়ির এই আঠারোটা ঘরের সবাইকে ডেকে বলতে, আর রাস্তার সব লোককেই গিয়ে জানিয়ে আসতে—শোনো, তোমরা সব শুনে যাও—আজ আমাদের খাটটা আসবে। কিন্তু তা করা যায় না। আসুক খাটটা! তখন সবাই নিজেই দেখতে পাবে।

সুলতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বারান্দা থেকেই বলল—পিলু, চাঁপাকে ডেকে দে তো, দেখিস আবার কাঁদাসনি যেন!

চাঁপার ঘুম ভাঙানোর উপায়গুলো পিলুরই বেশি রপ্ত। দু-একটা সহজ পদ্ধতির পরে যেটা শেষ উপায় সেটা আরও সহজ। চাঁপাকে কাতুকুতু দিলেই ও লাফিয়ে উঠে বসে, তারপরই দু-হাতে শুধু কীল আর চড়। তাই পিলু একেবারে জানালার কাছে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! আজ চাঁপা ওর দিকে একটুও এগিয়ে এল না— বিছানায় বসে বসেই পিলুর দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর মুখের সামনে চুলগুলো পিছনে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে উঠল—তুই কখন উঠলি রে দাদা?

পিলুর সাহস ফিরে আসে, এগিয়ে এসে বলে—সে তো অনেকক্ষণ! দেখগে আমার জল আনাও হয়ে গেছে। জানিস চাঁপা, আজ হয়েছে কি—

চাঁপারও কিছু শোনার ধৈর্য নেই, পিলুর কথায় মাঝখানেই বলে—খাটটা তো

পিলু গম্ভীর মুখে বলে—হ্যাঁ বিকেলেই আসবে, কিন্তু মা বলেছে খাটে শুধু আমি মা আর বাবা শোবো। তুই শুবি নিচে।

—ওঃ তাই বুঝি! বাবা বলেছে—বাবা মা আর আমি শোব, তুই-ই শুধু বাদ।

এমনিভাবেই ওরা দুজনে দুজনের সঙ্গে লাগে। এর থেকে অন্যদিন হয়তো একটা মারামারিই লেগে যায় কিন্তু আজ সবই অন্যরকম। সহজেই একটা রফা করে দুজনে হাসতে লাগল।

তারপর একসময় যখন চাঁপারও মুখ ধোয়া হয়ে গিয়েছে, ওদের দুজনেরই মুড়ি খাওয়া হয়ে গিয়েছে, সুলতা গিয়েছে কল-তলায় রাতের বাসনগুলো মাজতে, ওরা ঘরের মধ্যে বিছানাটা মাপতে লাগল। ওদের বাবা বলেছিলেন—খাটটা চার হাত-সাড়ে তিন হাত। কিন্তু মাপে তো মেলে না কিছুতেই! পিলু বলল—কিছুতেই হচ্ছে না রে! ঠিক এমন সময়েই সুলতা ঘরে ঢুকল। ওদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল—ও মা, কী করছিস তোরা? বিছানা মাপছিস কেন?

চাঁপার হতাশ দৃষ্টি মায়ের দিকে ফিরল—মাপে তো হচ্ছে না মা! বাবা যে বললেন—চার হাত সাড়ে তিন হাত?

সুলতা এতক্ষণে বুঝল। হেসে বলল—তা বলে কি তোদের হাতের মাপ নাকি? নে সর তো বিছানাটা তুলি, আজ রান্নার কতো দেরি হয়ে গেল, এখনই এসে পড়বেন।

বিছানা তুলতে গিয়েই সুলতার চোখ পড়ল তোষকটার ওপর। ওটার খয়েরী কাপড়টা সে রোজই দেখে। একদিন এটা নতুন চকচকে ছিল কিন্তু এখন এই চোদ্দ বছর ধরে একটু একটু করে কখন ওটা বিবর্ণ হয়ে এসেছে, আরও অনেক তেল-চিটে দাগ লেগেছে ওটায়, তা জানে না। ওরা দু-ভাইবোনেও বড় হতে হতে আরও কতো যে দাগ ধরিয়েছে—সে-সব রোজ রোজ দেখে দেখে ওর চোখের একটা অভ্যাসই হয়ে এসেছিল, কিন্তু আজ ও হঠাৎ দেখল যে ওই কাপড়টা যেখানে সেখানে একেবারেই ফেঁসে ফেটে একাকার হয়ে গিয়েছে, ওর চারপাশ দিয়ে যে কাপড়ের পটিটা ও অনেককাল আগে সেলাই করে দিয়েছিল সেটাও এখানে ওখানে ছিঁড়ে তার ভেতর দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছে। মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। একটা নতুন খাটের সঙ্গে একেবারে নতুন না হোক—তোষকটা আরও একটু ভালো হওয়া উচিত ছিল। নিচের মাদুরটা ছেঁড়া—তাতে ক্ষতি নেই। ওপরের কাঁথাটা পুরনো নয়—কিন্তু তাতেই বা কী? ওর মনে হলো নতুন একটা তোষক এবার চাই। তার জন্যে ধীরেনকে [illegible] ঠোঙা তৈরি করবে। বলল—পিলু, আজ [illegible] আসিস তো?

পিলুও হয়তো তোষকটা দেখে অমনি কথাই ভাবছিল। বলল—আমিও আজ থেকে বিকেলবেলায় ঠোঙায় বসব মা! আর চাঁপাও বসবে, ওকে তুমি শিখিয়ে দিও তো!

চাঁপা একটা উঃ [...] শব্দ করে উঠল।

আড়ালে চলে গিয়েছিল—ভয় ছিল, চাঁপা তৎক্ষণাৎ ওর দিকে তেড়ে আসবে, কিন্তু সে শুধুই দার্শনিকের মত বলল—না, আজ থেকে নয়, আজ ঠোঙা করলে খাটটা ঢোকবার জায়গা হবে না।

চাঁপার কথায় পিলুর আবার সেই খাটের কথাটা মনে আসে। বলে—মা, আজ কিন্তু আমি ইস্কুলে যাব না।

—কেন, ইস্কুলে যাবি না কেন?

—বাঃ ইঁট আনতে হবে না?

অথচ সুলতা কিছুতেই বোঝে না খাটের জন্য ইঁট চাই বলে ইস্কুল কামাই করবার কী দরকার। কাঠের বাকসটার তলায় যে ইঁট আছে সেগুলো যে সবই পুরনো, নতুন খাটের সঙ্গে নতুন ইঁট না হলে কি করে চলে? তবু পিলু আর একবার বলল—মোড়ের কাছে যে নতুন বাড়িটা হচ্ছে, ওখানে অনেক ইঁট পড়ে আছে, ভাঙা ইঁটগুলো নিলে দারোয়ান কিছু বলবে না—গোটা ইঁট তো আর লাগবে না!

সুলতা আর কোন কথা না বলে রান্নায় চলে গেল। তাহলে তো সম্মতিই! পিলুর মনের মধ্যে তখন আনন্দের ঢোলটাই দ্রিম্-দ্রিম্ বাজছে—শুধুই তো ইঁট আনা নয়! আরও কতো কাজ তার আছে। বাবলুকে বলতে হবে—বাবলু ওদের বাড়িতে একদিন এসেছিল, ঘরে ঢুকেই বলেছিল—এ কিরে! তোরা শুস্ কোথায়? খাট তো নেই! এ মা, তোরা মাটিতে শুস্! বাবলুকে বলে আসতে হবে খাটটার কথা—একেবারে নতুন খাট। পিন্টুকেও বলতে হবে। ভোম্বলকেও। আর, আর—কাকেই বা না! ও আর চাঁপা যাবে—ওদের সবাইকে বলবে, আর বলবে গলির মধ্যে ওদের যতো চেনা আছে তাদের সবাইকে। কিন্তু মাকে সেকথা জানালে মা হয়তো বারণই করবে—তখন তো আর বলা যাবে না!

এক একটা দিন আছে যাদের পথ খুব দীর্ঘ হয়। সেই দিনগুলো এগিয়ে এগিয়ে কিছুতেই যেন শেষে পৌঁছোতে পারে না—থেমে থেমে গড়িয়ে গড়িয়ে অনেক কষ্ট পেয়ে তারা চলে। আর কষ্ট দেয় তাদের সঙ্গীদের যারা প্রতীক্ষায় শুধু ভুগতে থাকে যাদের আশা পড়ে থাকে অনেক দূরে। তবু এক সময় হয়তো সেই পথটা শেষও হয়। পিলু, চাঁপা আর সুলতার এই দিনটাও তাই শেষ হলো—বিকেলের রোদ্দুর তখন গাছটার মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে মোড়ের দু-তলা

বাড়িটার আড়ালে মিলিয়ে গেল, পিছনে রেখে গেল না-রোদ না-আলো না-অন্ধকার। এমনিই একটা সময়ে চাঁপা আর পিলু দু-জনেই একসঙ্গে দেখল ওদের বাবা গলিটার মধ্যে এসে ঢুকলেন—পিছনে দুজন লোকের মাথায় বড়ো মতো একটা জিনিস। পিলুই প্রথমে চিৎকার করে উঠল—চাঁপা—খাট!

মুহূর্তেই দুজনে দৌড় দিল বাড়ির ভিতরে। বলল—মা, খাট! বাবা এসে গেছেন!

সুলতাও মুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শুনল—ধীরেনের গলার শব্দ গলির সব আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছে। তখনই ধীরেন এসে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ল। দু-হাত দিয়ে দরজার দুটো পাল্লাকে ফাঁক করে ধরে ও নির্দেশ দিচ্ছিল—নিচু করকে, আউর নিচু! দেখো লাগে গা!

সুলতা ধীরেনকেই দেখছিল। ধীরেন পিছনে ফিরে তাকাচ্ছে না, দরজার পাল্লা-দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। ওই ফাঁকটার সমস্তটাই যেন ও ভরাট করে দাঁড়িয়েছে—সেই ধীরেন নয় যে সুলতার স্বামী—রোজ যে অফিস থেকে ফিরে হাতের ছাতিটা মাটিতে নামাবার আগেই ক্লান্তিতে দীর্ঘশ্বাসে মিশিয়ে আর্তনাদ করে—মা গো! আর পারি না! এই ধীরেন এখন বীরের মতই আদেশ দিচ্ছে—ব্যাস্, সিধা করো!

সুলতা একদিন সিনেমায় ছবিতে এক

যোদ্ধাকে দেখেছিল—এমনিই যেন তার দাঁড়াবার ভঙ্গি, এমনিই আদেশ! সুলতা দেখল—ধীরেন খাটটার একপাশ ধরেছে, অন্যদিকে সেই দু-জন লোক। বলছে—ঠিক হ্যায়, আভি উঁচা করো।

খাটটা ঘরের মধ্যে নামানো হতেই সুলতা একটা পাখা নিয়ে ধীরেনকে বাতাস করতে গেল কিন্তু ধীরেন এখনও অন্যরকম বলল—দাও, আমিই পারব। অন্যদিন ও একথা বলে না।

পিলু বলল—মা, এখনই বিছানাটা পেতে দাও। আগে একটু শুয়ে নিই।

চাঁপা বলল—না, সবচেয়ে আগে আমি শোব।

ধীরেন বলল—এখন কী শুবি? রাত হোক, তখন বিছানা হবে। এখন পড়তে বোস।

সুলতা বলল—সত্যি, বেশ মজবুত হয়েছে, খুব বড়ও—একেবারে যেন ঘর-জোড়া!

এবারে ধীরেন তার হাতের থলিটা ওদের সামনে তুলে ধরল, বলল—বলো দেখি এতে কী আছে?

ওরা সকলেই ধীরেনের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল—আরও কিছু আছে নাকি? আজকের দিনটাই এমন যে এখনও অনেক কিছু থাকতে পারে, অনেক অনেক আশ্চর্য ঘটনাও ঘটতে পারে? তবে কী সেটা? ওদের চোখের সামনের ওই থলিটায় কী?

চাঁপা লাফিয়ে উঠে থলিটাকে ধরল। একটানে সেটার ভেতর থেকে ওদের বিস্ময়কে বের কর আনল—একটা নীল বেডকভার। এরকম জিনিষ ওরা অন্যলোকের ঘরে দেখেছে—কিন্তু তাদেরও একটা! ওঃ এ কী অসহ্য বিস্ময়! কী বিস্ময় সুলতার। আর পিলুর। আর চাঁপার।

ধীরেন বলে যাচ্ছিল—জানো, আজ টিফিনের পরেই সায়েব ছুটি দিয়েছে, গেলাম বড়বাজারে, অন্তত একটাকা সুবিধে হলো, তারপর এলাম কাঠগোলায়। নীল রংটাই তো তোমার পছন্দ, না?

সুলতা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। পিলুর দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠল—ও কিরে পিলু! তুই কী করছিস?

পিলু খাটের ওপর হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কী যেন দেখছিল। বলল—দেখো মা, ঠিক যেন পালিশ!

তারপর সময় যখন খুশির পালক পাখায় লাগিয়ে তর-তর করে ভেসে যাচ্ছে, ঘটনা যখন একটার পর একটা ঘটে যাচ্ছে আঠারোটা ঘরের অনেক মানুষই এসে ওদের খাটটা দেখে গেছে, পিলু আর চাঁপার বন্ধু-দেরও ওরা ডেকে দেখিয়েছে—পিলুর সেই ভদ্রলোক-পাড়ার বন্ধু বাবলুও এসেছিল, তার সংগে পিলু আর চাঁপা খাটের কথা বলতে বলতে বাইরে চলে গেছে, তখনই সুলতা হঠাৎ শুনল পিলুর গলার একটা চিৎকার। আর প্রায় সংগে সংগেই চাঁপার কান্নার শব্দ।

সুলতার বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা রেলগাড়ী চলে গেল। কী হলো? এত অসহ্য ভাল দিন সুলতার কপালে কী—? তখনই তো কেমন যেন ধোঁকা লেগেছিল ওর! কী যে করে এখন! ধীরেনও কোথায় যেন বেরিয়েছে! সুলতারও বুকের মধ্যে একটা চিৎকার নড়ে উঠতে চাইল। এক দৌড়ে ও বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে এসে সুলতা দেখল যে ওদের বাড়ির থেকে সামান্যই দূরে ওই গলির রাস্তার ওপরেই পিলু মাটিতে শুয়ে আছে, ওর ওপরে আর একটা ছেলে ওকে চিৎ করে বসে আছে। চাঁপা তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদছে আর সেও ওই ছেলেটাকে—।

দৌড়েই সুলতা ওদের কাছে পোঁছে গেল। দেখল—দেখে ওর বুকের ঢিপঢিপ এখন একটু কমে আসছে—পিলুর ওপরে বসা ওই ছেলেটা সেই বাবলুই। কিন্তু এ কি? সুলতা অবাক হলো ভেবে—একটু আগেই তো দু-জনে বেশ গল্প করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, এখন আবার কী হলো ওদের মধ্যে? আর বাবলুর মতো বড়ো ছেলের সংগে সুলতার রোগা নিরীহ পিলুর লাগারও তো কোন কথা নয়! কিন্তু সুলতা আরও অবাক হচ্ছে দেখে যে বাবলুর বেশি শক্তি শুধু ওই যা ওপরে বসে থাকার মধ্যেই প্রকাশ। পিলু তার নিচে থাকলেও ওর দুটো হাত ফুলঝুরির ফুলকির মতই বাবলুর মুখে মাথায় গিয়ে পড়ছে, আর চাঁপাও কিছু কম নয়—চিৎকার করে সে কাঁদছে বটে, কিন্তু বাবলুর চুলগুলো দু-মুঠিতে ধরে সে এমনভাবে টেনে রেখেছে যে ওর ঘাড়টা পিছনে হেলে গিয়েছে, মাথাটা একটু নাড়াবার তার সাধ্য নেই।

সুলতা ওদের ছাড়িয়ে দিতে বাবলুকে টেনে আনল। বাবলুই যেন পিলুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচল। কিন্তু তবুও পিলু ওকে ছাড়বে না—সুলতা কখনও পিলুর এ মূর্তি দেখেনি—বার বার বাবলুর ওপর লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে—বাবলু সুলতার আড়ালেই আশ্রয় নিয়েছে।

পিলুকেই ধরল সুলতা। বলল—আঃ কী হলো এর মধ্যে? তোরই তো দেখছি বেশি দোষ, ও তো তোকে কিছু করছে না, নে পিলু থাম।

পিলু মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আবার বাবলুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু না পেরে তখনই কান্নায় ভেঙে পড়ল। হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁদিতে কাঁদিতে দম নিতে নিতে সে এতক্ষণে কথা বলতে লাগল। কথা নয়—নালিশ। নালিশও নয়—আক্রোশ। —ওই বাবলুটা জানো, বলছে কিনা ওটা খাট নয়! বলছে কি ওটা চৌকি! বলছে—বলছে ওটা রেডিমেড! বলছে—বলছে কি ভিরিশ টাকায় আবার খাট হয়! বলছে ওটায় পালিশ নেই! বলছে কি—দু-দিনেই ওটা ভেঙে যাবে!

পিলু আবার বাবলুর দিকে এগিয়ে যেতে চাইছে—চোখে তার সেই বন্য আক্রোশ।

গলির মধ্যে ওদের চারপাশে অনেক লোক জমা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এক-জনকে পিলুকে ধরতে দিয়ে সুলতা বাবলুর মুখ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল- এখানে ওখানে কিছু ফোলা দাগ আর নখের আঁচড়—বাবলুকে পিলু অনেক শাস্তি দিয়েছে!

তারপর এল পিলুর কাছে। ওর সারা গা রাস্তার ধুলোতে-মাটিতে মাখামাখি। কিন্তু সুলতাকে কিছুতেই ঝাড়তে দেবে না। সে তখনও একটা দাঁড়ানো রেল-ইঞ্জিনের মত ফুলে ফুলে ফুঁসে ফুঁসে কাঁদছে।

সুলতা বলল—আঃ থাম পিলু তোর তো কিছুই লাগেনি।

পিলুর কান্না তবু থামছে না।

সুলতা আবার বলল—বলেছে তো হয়েছে কী? আচ্ছা, আগে চুপ কর! এখনই গিয়ে বিছানা পেতে দেব। তুই-ই আগে শুবি।

পিলুর কান্না কমে এল। পায়ের আর প্যান্টের ধুলো নিজের হাতেই ঝাড়তে ঝাড়তে একটু অবিশ্বাসের সুরে বলল—বাবা কিছু বলবে না তো?

—না আমি বলে দেব এখন, চল বাড়িতে চল।

পিলু চলল ওদের বাড়ির দিকে. যে বাড়িতে মাঝে তিনহাত উঠোনের দু-পাশ দিয়ে দু-সারিতে আঠারোটা ঘর, আর তারই মধ্যে একটা ঘরে, সিমেন্ট ভাঙা মেঝের মাত্র একহাত উঁচুতেই ওর স্বর্গ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

।। বাইশ ।।

যারা একটানা সাড়ে পাঁচ শতাব্দী ধরে শাসকের জাত ছিল তারা পলাশীকে মনে করেছিল একটা সাময়িক বিপর্যয়। তাই এক শতাব্দীকাল কেঁদেছিল ও দিন গুনেছিল। ইংরেজী শেখেনি, ফিরিঙ্গীর চাকরি নেয়নি, ঊনবিংশ শতাব্দীকেই স্বীকার করে নি।

তারপরে সিপাহীবিদ্রোহে যোগ দিয়ে ভাবে এইবার চাকা ঘুরে যাবে। আবার মুঘল বাদশাহী। আরো সাড়ে পাঁচ শতক। কিন্তু ইংরেজরা অতি নিষ্ঠুরভাবে তাদের মোহ ভঙ্গ করে। লাল কেল্লার অনেকগুলি মহল কামানের গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেয়। মুঘল বংশের উত্তরাধিকারীদের বধ করে। আর বাদশাহকে ভারতের বাইরে নির্বাসন দেয় রেঙ্গুনে। মুসলমানরা আর কখনো মাথা তুলতে পারবে না এই ছিল নতুন শাসকদের নীতি।

ইতিমধ্যে হিন্দুরা বাস্তববাদীর মতো ইংরেজী লেখাপড়া শিখেছে, চাকরি নিয়েছে, যুগের সঙ্গে পা মিলিয়েছে, অন্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে রয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহের পর মুসলমান সমাজের নেতারা দেখেন যে জীবনের ও জীবিকার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুরা পেয়ে গেছে পঞ্চাশ বছরের স্টার্ট। প্রতিযোগিতায় ওদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। মুসলমানদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা চাই। আর সেটা সম্ভব ইংরেজদের সঙ্গে যদি সদ্ভাব বজায় রাখা যায়। এই নতুন নীতির জনক স্যর সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপনীত করেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় এঁর অক্ষয় কীর্তি।

কংগ্রেসকে স্যর সৈয়দ সন্দেহের চোখে দেখতেন। কংগ্রেসই একদিন ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে। অপোজিশনই তো আখেরে গভর্নমেণ্ট হয়। তখন মুসলমানের কী দশা হবে? "ইংরেজ রাজত্ব যাক" বলে একশো বছর প্রার্থনা করার পর স্যর সৈয়দের মতো লোকের প্রার্থনা হলো "ইংরেজ রাজত্ব থাক।" ইংরেজকে তাড়াবার জন্যে যারা কোমর বেঁধেছিল তারাই কোমর বাঁধল তাকে রাখতে। পরের ধাপ মুসলিম লীগ গঠন। তারই একটু আগে বাংলাদেশের পার্টিশন।

তখনকার দিনে বেঙ্গল বলতে যা বোঝাত তার মধ্যে পড়ত বিহার ওড়িশা ও মাঝখানে কিছুকাল আসাম। সেই বেঙ্গল একান্ত অশাসনীয় হয়ে পড়ায় তার একাংশ নিয়ে নতুন একটা প্রদেশ গড়ার কথাবার্তা লর্ড কার্জনের পূর্বেও চলছিল। নতুন প্রদেশটা হবে ওড়িশার কতক অংশ ও ছোটনাগপুরের কতক অংশ নিয়ে। ঝাড়খণ্ড কি ওইরকম কী একটা নাম হবে তার। কার্জন একবার ময়মনসিং সফরে যান। সেখান থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট দেন যে পদ্মানদীই হচ্ছে স্বাভাবিক সীমান্তরেখা। তার দুদিকে দুই প্রদেশ হলে ভালো হয়। নতুন প্রদেশটির নাম হবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম। খরচ বাঁচবে, কারণ আসাম তো আগে থেকে ছিলই।

নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা সত্যি অশাসনীয় ছিল। লাটসাহেব তো দূরের কথা চুনো-পুঁটিরাও ও অঞ্চলে পা দিতেন না। ঢাকা রাজধানী হলে পদার্পণ করতে বাধ্য। কার্জনের প্রস্তাবের উত্তর এলো সেক্রেটারি অফ স্টেট বুঝতে পারছেন না কেন ঝাড়খণ্ড না কী যেন ওর নাম পরিত্যক্ত হবে। যখন এতকাল ধরে ওই লাইনে কাজ করা হয়েছে ও এগিয়ে রয়েছে। তখন পূর্ববঙ্গ ও আসামের কেসটাকে জোরালো করার জন্যে কার্জন তাঁর ঝুলি থেকে বেড়াল বার করেন। ওটা হবে একটা মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ।

কেই বা জানত যে বাঙালীরা ইতিমধ্যে এক 'নেশন' হয়ে উঠেছে। কথাটা আমার নয়, পার্টিশন রদ করার জন্যে যে ইস্তাহার রচনা হয় তার রচয়িতাদের। শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। বোমা ফাটে। রিভলভার ছোটে। সাহেব মেম মারা যায়। তখন কাটা বাংলা আবার জোড়া লাগে, কিন্তু বিহার ওড়িশা আসাম আলাদা হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ইংরেজরা তাঁদের পলিসি ঘুরিয়ে দেন। সাম্প্রদায়িক কারণে প্রদেশ ভাগ করা আর নয়, সাম্প্রদায়িক কারণে নির্বাচকমণ্ডলী ভাগ করাই সুবুদ্ধি। এতে মুসলমানকে শিখকে কোনো কোনো জাতের হিন্দুকে সন্তুষ্ট করা হয়, অথচ অন্যান্যদের অসন্তুষ্ট করা হয় না।

স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর দাবী তোলা হয় নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের তরফ থেকে। মহামান্য আগা খান নিবেদন করেন লর্ড মিন্টোকে, ভবিষ্যতের নির্বাচনগুলিতে হিন্দুরা ভোট দেবে হিন্দু প্রতিনিধিদের, মুসলমানরা ভোট দেবে মুসলিম প্রতিনিধিদের। লর্ড মর্লি তখন সেক্রেটারি অফ স্টেট। বড়লাটের সুপারিশ তিনি মেনে নেন। উপর থেকে তাই মনে হয়। ভিতরের খবর শুনছি উল্টো। অর্থাৎ মর্লিই নাকি ওটা চেয়েছিলেন।

পার্লামেন্টের ডেমক্রাসীর পত্তন হলো গোড়ায় গলদ নিয়ে। এ যেন জরাসন্ধের জন্ম। দুই আধখানা শিশু। একে পূর্ণাঙ্গ করার সাধনারই নাম ভারতীয় জাতীয়তার সাধনা, ভারতীয় গণতন্ত্রের সাধনা। কর্তারা যেন বিধান দেন কংগ্রেস হবে হিন্দুর, লীগ হবে মুসলিমদের, আর উপর থেকে যখনি যা পাওয়া যাবে তার আধখানা নেবে কংগ্রেস ও আধখানা পাবে লীগ। তারপর তাকে জুড়ে একাকার করলেই হবে জরাসন্ধের একতা।

তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সব সম্প্রদায়ের রাজনীতিক যোগ দেন, বেশীর ভাগই রাজভক্ত, কিন্তু চরমপন্থীরাও বাদ যান না। অপরপক্ষে লীগে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই রাজভক্ত তবে সেখানেও দুটি একটি স্বাধীনচেতার প্রবেশ ঘটে। যেমন ঝীণা সাহেবের। তিনি কংগ্রেসেও স্থান পান ও সামনের সারিতে আসন নেন। লাল, বাল, পালের মতো চরমপন্থী না হলেও ঝীণা ও মিসেস বেসান্ট ছিলেন তাঁদেরই কাছাকাছি। অবশেষে টিলকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লখনউ চুক্তির ঘটকালি করেন ঝীণা।

সে সময় তাঁর মনোভাব কেমন ছিল তার একটি নিদর্শন তাঁর এই উক্তি—

"The main principles on which the first all-India Muslim political organisation was based was the retention of the Muslim communal individuality strong and unimpaired in any constitutional readjustment that might be made in India in all the course of its political evolution. The creed has grown and broadened with the growth of political life and thought in the community. In its general outlook and ideal as regards the future the all-India Muslim League stands abreast of the Indian National Congress and is ready to participate in any patriotic efforts for the advancement of the country as a whole".

তখনকার দিনের আর কোনো মুসলিম রাজনীতিক তাঁর চেয়ে দেশভক্ত ছিলেন না। তিনিই সেদিনকার বিচারে ন্যাশনালিস্ট মুসলিম। আলীগড়পন্থীদের থেকে ভিন্ন।

আরো এক শ্রেণীর মুসলিম নেতা ছিলেন যাঁরা আলীগড়ের পলিসিও মানতেন না, লীগের পলিসিও না। তাঁরা পার্লামেন্টারি পলিটিকসে বিশ্বাস করতেন না, সরকারের কাছে চাকরিবাকরিও চাইতেন না। তাঁরা কাজ করতেন ইসলামের গৌরবের জন্যে। কী করে বিশ্বময় ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি হয়, এই ছিল তাঁদের ধ্যান। আর শক্তি বলতে রাজনৈতিক শক্তি, সামরিক শক্তিও বুঝতেন। ভারতে তাঁদের যে স্থান সেটা ভারতীয় হিসাবে ততটা নয়, যতটা মুসলমান হিসাবে। যে মুসলমান সাড়ে পাঁচ শতাব্দী জুড়ে রাজত্ব করেছিল। আরো দীর্ঘকাল করত, যদি না ফিরিঙ্গীরা শত্রুতা করত। ফিরিঙ্গীদের এ'রা ক্ষমা করেননি। এখনো এ'দের আশা যে তুরস্কের অভ্যুদয় ইরানের অভ্যুদয়, আফগানিস্থানের অভ্যুদয়, ভারত থেকে ফিরিঙ্গীদের হটতে বাধ্য করবে।

হিন্দুদের সংগে এ'দের সম্পর্ক ক্ষীণ। সাধারণ ভূমি তো কিছু নেই। এ'রা যেদিন রাজত্ব ফিরে পাবেন হিন্দুরা এ'দের রাজভক্ত প্রজা হবে। কংগ্রেস যে ইংরেজের উত্তরাধিকারী হবে এটা এ'দের কাছে অবিশ্বাস্য। যদি হয় তবে ওই ইংরেজদেরই বেনামদার হবে, গুরু যখন ইংরেজ। ইংরেজী শিক্ষায় এ'দের ঘোর বিরাগ ছিল। আলীগড় এ'দের চোখে ইংরেজীস্থান। মুসলিম রাজনীতিকদের এ'রা শ্রদ্ধা করতেন না। ঝীণা তো মুসলমানই নন। আগা খানই বা কিসের মুসলমান!

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজভক্ত মুসলমানরা তুরস্কের বিপক্ষে যান, কেউ কেউ অস্ত্র ধরেন। সে সময় বিশ্ব ইসলামীরা বিপাকে পড়ে যান। ইংরেজের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে গিয়ে অনেকের জেল হয়। অনেকের নির্বাসন। অনেকে আবার দেশত্যাগ করেন। সাধারণ মুসলমান টু' শব্দটি করে না। এ'রা যে কত বিচ্ছিন্ন এ'রা সেই প্রথম উপলব্ধি করেন। সাধের তুরস্ককে পরাজয় থেকে রক্ষা করতে না পেরে এ'রা রব তোলেন খলিফার অধীনেই ইসলামের ধর্মস্থান সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু সংরক্ষণ করবে কে? কী দিয়ে সংরক্ষণ করবে? তার জন্যে অস্ত্র চাই, শস্ত্র চাই। সেসব কোথায়? যেখানে হাতী-ঘোড়া গেল তল, স্বয়ং তুরস্কই হেরে গেল, সেখানে খেলাফতীরা বলেন কত জল।

তাঁদের সেই দুঃসময়ে আসমান থেকে অবতীর্ণ হন গান্ধী। তাঁর হাতে সত্যাগ্রহ নামে নতুন এক অস্ত্র। খেলাফতীরাই তাঁকে ধরে নিয়ে তাঁদের নেতা করেন। অসহযোগ প্রথমে খেলাফতীদের জন্যে কল্পিত হয়। পরে কংগ্রেস ওটা গ্রহণ করে। গান্ধীজী আগে খেলাফতীদের নায়ক, পরে কংগ্রেসীদের।

তাঁর নেতৃত্ব অবশ্য সত্যাগ্রহ দিয়ে শুরু। সে সময় সেটা কংগ্রেসের তরফ থেকে নয়। তখন তার জন্যে ছিল অন্য প্রতিষ্ঠান। সত্যাগ্রহ সভা।

দেখতে দেখতে কংগ্রেসটাই একটা সত্যাগ্রহ সভায় পরিণত হয়। তখন পূর্বতন তাঁদের একজন। মালবীয় আরেকজন। মিসেস বেসান্ট আরো একজন। এ'রা অসহযোগ, গণ-সত্যাগ্রহ ইত্যাদি সমর্থন করতেন না। বিশেষ্য পদের সামনে 'অহিংস' বলে একটি বিশেষণ পদ বসিয়ে দিলে কী হবে, সাধারণ লোক তার জন্যে প্রস্তুত নয়। আর ধর্মকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আনা কেন? হিন্দুত্বই হোক আর ইসলামই হোক, ও জিনিস আধুনিক যুগে আর কোনো দেশের রাজনীতির সংগে মিশ খায় না। জনগণকে অবশ্য ও দিয়ে আকর্ষণ করা যায়। দল ভারী হয়। কিন্তু ফল যা হয় তাতে ধর্মেরও মহিমা বাড়ে না, রাজনীতিরও শিক্ষা হয় না।

এ'রা যে কারাভয়ে ভীত বলে চলে গেলেন সেটা ভুল। কিংবা আদালতের মায়া বা আইনসভার মায়া কাটাতে না পেরে। এ'রা আবহাওয়াটাই পছন্দ করলেন না বলে চলে গেলেন। কিন্তু চলে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। গান্ধীমার্গী কংগ্রেস এত

বেশী শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে এ'দের বাদ দিয়েও তার বলহানি হয় না। বিকল্প যতগুলি দল সব নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ঝীণা সাহেব ছিলেন দুই নৌকার মাঝি। একটা নৌকার থেকে পা সরিয়ে নিয়ে আরেকটাতেও কি টি'কতে পারলেন?

সেকালে গান্ধীতে ঝীণাতে চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল। ঝীণাই তো একদিন বারদোলীতে গিয়ে মহাত্মাকে সতর্ক করে দেন যে গণসত্যাগ্রহ দমন করার জন্যে সরকারপক্ষ সৈন্য আনিয়েছেন। তার চেয়ে বড়লাট লর্ড রেডিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার শ্রেয়। ঝীণাই ঘটকালি করবেন।

গণসত্যাগ্রহ বন্ধ হলো. খেলাফতীরা হতাশ হলেন, ধীরে ধীরে গান্ধীনেতৃত্ব থেকে সরে গেলেন। যে কয়জন মুসলমান কংগ্রেসে থেকে গেলেন তাঁদের মোহভঙ্গ হয় কামাল পাশার হাতে খলিফার হাল দেখে। তাঁরা বিশ্ব ইসলাম ছেড়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে মনোনিবেশ করেন। সাম্রাজ্যবাদ একদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আরেক দিকে। তাঁরা দুটোর থেকে একটাকে বেছে নেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ গান্ধীজীর সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যান। তেমনি খান আবদুল গফফর খান। তেমনি হাকিম আজমল খান। তেমনি ডাক্তার আনসারী।

এখন এ'দের মতো সহকর্মীদের পথে বসিয়ে গান্ধীজী ঝীণার কথায় কাজ করবেন এটা কী করে হয়? এ'রাই তাঁর আপনার লোক। সুখে-দুঃখে তাঁর সাথী। এ'দের সঙ্গে পরামর্শ না করে হিন্দু মুসলিম সমস্যার মীমাংসা করা তাঁর রীতি নয়। ফলে ঝীণা নিরাশ হন। শেষের দিকে মহম্মদ আলী শওকত আলী এ'রাও। মহাত্মা তাঁর এককালের সহযাত্রীদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছিলেন, কিন্তু পরামর্শ যখন নিতেন তখন তাঁর সবচেয়ে একনিষ্ঠ মুসলমান বন্ধুদের। আজমল খাঁর, আনসারীর, আজাদের, আবদুল গফর খাঁর।

এর মধ্যে হিন্দুয়ানী কোথায়? মহাত্মার এইসব বন্ধুরা কি হিন্দু? এ'রা কি মুসলমান হিসাবে নিরেস? এ'দের পরামর্শ কি ইসলামবিরোধী, মুসলিম স্বার্থ-বিরোধী? কংগ্রেসে সব সময়েই একদল মুসলমান ছিলেন যাঁদের এক নম্বর শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। তাকে আগে নিপাত করো, তারপরে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উঠবে। তার সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে যেয়ো না। তার হাত যাতে শক্ত হয় তেমন কিছু কোরো না। মহাত্মাই এ'দের মনের মানুষ। হিন্দু বলে নয়। এক নম্বর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলে।

তারপর এ'রা বিশ্বাস করতেন না যে হিন্দুরা মুসলমানদের শত্রু। পঞ্চাশ বছর স্টার্ট পেয়ে গেছে, তার জন্যে হিন্দুদের দোষ দিয়ে কী হবে? দৌড়লে ওদের ধরে ফেলা যায়। তাছাড়া চাকরিই মানুষের জীবনে মোক্ষ নয়। তাই যদি হতো এত ছেলে অসহযোগ করত কেন? ঢের বড়ো বড়ো প্রশ্ন আছে যেখানে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়, সবাই ভারতীয়, বেশীর ভাগই দরিদ্র। সেইজন্যই তো গান্ধীজীর গঠনের কাজ। পার্লামেন্টে যাওয়া তো নিপীড়িতদের স্বার্থে। পার্লামেন্ট থেকে চলে আসাও তেমনি বৃহত্তর স্বার্থে।

গান্ধীজী সব মুসলমানকে কংগ্রেসে যোগ দিতে ডেকেছিলেন। সব মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিলে তার দ্বারা প্রমাণ হতো যে ভারতীয়দের সকলের সাধারণ স্বার্থ এক। কিন্তু মুসলিম মাইনরিটির বিশেষ স্বার্থও তো ছিল। প্রতিযোগিতায় তারা হিন্দুদের সমকক্ষ নয়, বিশেষ ব্যবস্থা না করলে আপিসে আদালতে কাউন্সিলে ক্যাবিনেটে কোথাও যথেষ্ট সংখ্যায় প্রবেশ পেতো না। স্কুল-কলেজেও তাদের সংখ্যা যথেষ্ট হতো না। এইসব কারণে বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন মুসলমান রাজনীতিকরা কংগ্রেসের বাইরেও একটা প্রতিষ্ঠান থাকা আবশ্যক বোধ করতেন। সেই আবশ্যকতা বোধ থেকেই লীগের উৎপত্তি। কিন্তু এটাও তাঁরা জানতেন যে তাঁদের বিশেষ স্বার্থ ভারতীয়দের সাধারণ স্বার্থের উপরে নয়। তাই কংগ্রেসেও তাঁদের কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন। দুই নৌকায় পা দেওয়া বারণ ছিল না। পরে ওটা আপনা থেকে অপ্রচলিত হয়। কারণ বিশেষ স্বার্থের পক্ষে কংগ্রেসের চেয়ে ব্রিটিশ সরকারই অনুকূল। কংগ্রেস তো স্বরাজের আগে কোনো কমিটমেন্টই করবে না।

অপরপক্ষে কংগ্রেসের বা গান্ধীজীর অভিজ্ঞতা হলো যখনি তাঁরা কিছু দিতে রাজী হয়েছেন ব্রিটিশ সরকার নীলাম দর চড়িয়ে দিয়েছেন। আগাম দিয়েছেন। আর মুসলমানরা ইংরেজের দান পকেটে পুরে কংগ্রেসের দিকে হাত বাড়িয়েছেন তারও বেশীর জন্যে। বেশীর ভাগই তো হিন্দুর যোগ্যতার পাওনা থেকে। এই পদ্ধতির মধ্যে কোনো চূড়ান্ততা নেই। মুসলমানরা বলছেন না যে এই তাঁদের শেষ দাবী। যখনি একটা দাবী মিটিয়ে দেওয়া হয় তখনি আর একটা হাজির হয়। কংগ্রেস যা দেয় ব্রিটিশ সরকার তার চেয়ে বেশী দেয় বা দেবার আশা দেয়।

ক্রমে উপলব্ধি হয় যে এ খেলা কংগ্রেসের বাইরে থেকেই ভালো চলে, ভিতর থেকে নয়। বিশেষ স্বার্থ সম্বন্ধে যাঁরা সচেতন, তাঁরা কংগ্রেসের বাইরেই থাকবেন ও তাঁদের একটা হাত সব সময়েই ইংরেজের দিকে প্রসারিত থাকবে, আর-একটা হাত কংগ্রেসের দিকে। কংগ্রেস সাধারণ স্বার্থের উপরে নিবদ্ধ দৃষ্টি। লীগ বিশেষ স্বার্থের উপর নিবদ্ধ দৃষ্টি। কেউ কারো দিকে তাকায় না। তাকাবার সময় বয়ে যায়। কংগ্রেস তার ভিতরকার মুসলমান সভ্যদের অগ্রস্থান দেয়, লীগ মুসলিমদের স্থান তার পরে। আর লীগ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকেই অগ্রস্থান দেয়, কংগ্রেসকে তার পরে। এমনি করে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন অসম্ভব হয়। লীগের যে হাতটা কংগ্রেসের দিকে প্রসারিত ছিল সেটা সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়।

লর্ড কার্জন যে ভাগ্যচক্র প্রবর্তন করেছিলেন সেটা চল্লিশ বছর পরে পূর্ণবৃত্ত হয়ে ঘুরে এলো। বেঙ্গল পার্টিশন থেকে সেপারেট ইলেকটোরেট, তার থেকে ইন্ডিয়া পার্টিশন।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

এক শ্রেণীর কাহিনী আছে যার জন্ম-লগ্নে লেখক-বিধাতা তার কপালে অভিশাপ চিহ্ন এঁকে দেন। প্রথম পদক্ষেপেই পাঠক সহজে বুঝে নেন লেখাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। স্প্যানিস লেখক এডুয়ার্ডো মালিয়া রচিত উপন্যাসের (ইংরাজী অনুবাদ) নাম-করণ করা হয়েছে 'অল গ্রীন স্যাল পেরিস' —বাংলায় 'সবুজ সংহার' হয়ত বেমানান হবে না। উপন্যাসটি নতুন রীতির, এর আঙ্গিক বিচিত্র।

এই নামকরণের ভিতরই কাহিনীর গোপন কথাটির সন্ধানসূত্র নিহিত। বইটির পৃষ্ঠা খুললেই যতদূর চোখ যায় ধূ ধূ মরু প্রান্তর। নিকানোর ক্রুজ আর আগাটা দীর্ঘ পনেরোটি বছর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সহাবস্থান করে আছে তবে এই কালটিতে দুজনের মধ্যে একটা বিরাট প্রাচীর গড়ে উঠেছে, সে এক প্রচণ্ড ব্যবধান। দুটি মৃত আত্মা—কোনো প্রকার মৃতসঞ্জীবনীর পরশে তাদের আর চেতনা সঞ্চার করা সম্ভব নয়।

মোটামুটি কাহিনীটি স্বাদহীন সরল। একটি বন্দর নগরীতে আগাটা বিষণ্ন বিধুর তরুণীর মত ধীরে ধীরে বড় হয়। তার বৃদ্ধ পিতা একজন ডাক্তার, প্রচুর মদ্যপান তাঁর বৈশিষ্ট্য, রোগীদের নানারকম চুটকী গল্প শুনিয়ে শান্ত করতে ওস্তাদ।

আগাটা ক্রুজকে বিবাহ করেছিল আর ক্রুজ তার সমস্ত উৎসাহ ব্যয় করল একটা জনহীন উপত্যকায় একটা খামার গড়ে তুলতে। বছর বছর ফসল ফলে না, ফি সন অজন্মা আর আকাল। বিবাহের তরণী চড়ায় ঠেকে যায়। স্বামী অনুশোচনা আর অস্বস্তিতে ভরা এবং স্ত্রী মর্মান্তিক আহত। শেষ পর্যন্ত একদিন ঠাণ্ডা লেগে ক্রুজ মারা গেল। আগাটা বন্দর-নগরীতে ফিরে এল।

সাটারোর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর কয়েকটি ধাবমান সপ্তাহ কাটলো প্রেমের জোয়ারে। কিন্তু এই প্রেম একটা উন্দামতা মাত্র—লোকটা চিরতরে শহর ছেড়ে চলে গেল আর আগাটা বিনা কারণেই আশাহত হয়ে উন্মাদিনীর মত হয়ে রইল।

এই সামান্য বিষয়বস্তু নিয়ে এডুয়ার্ডো মালিয়া ১৬০ পৃষ্ঠায় এক তিক্ত-মধুর কাব্য রচনা করেছেন। সকল রকমের মহৎ উপ-ন্যাসের উপাদানটুকুর সারমর্ম হল মানবিক সংযোগের অন্বেষা। কেউ কেউ দস্তয়ভস্কীর মত আকাশের তারায় পৌঁছাতে চেষ্টা করেন—দুটি আত্মার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ বিভেদ তাঁদের কাম্য। অনেকে আবার কাফকার মত গোড়া থেকেই ধরে নেন এ চেষ্টার অতীত, নাগালের বাইরে। পারস্পরিক অবিশ্বাসের কুয়াশা কাটিয়ে উঠতে পারবেন এই বিশ্বাসটুকুও তাঁদের নেই, এমন কি বক্তব্যটুকু বোধগম্য করে তুলতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে তাঁরা সংশয়াচ্ছন্ন। অনেকে সামুয়েল বেকেটের মত মনে করেন অন্বেষাই নিরর্থক—কোনো সংযোগ সম্ভব নয়। কথা হল একটা ভাঁওতা, বিভ্রান্ত করার চেষ্টা—স্তব্ধতাই হল একমাত্র বস্তু। কথা শেষ হলে নীরবতা—নয়ত কথা কানে কানে।

মালিয়ার আঙ্গিকে পার্থক্য আছে। সংযোগ সম্পর্কে তাঁর মাথা ব্যথা নেই, তিনি একরকম প্রাচীনপন্থী রোমান্টিক কথার যাদুতে তিনি আচ্ছন্ন। মোহগ্রস্ত। আগাটা স্তব্ধতার আশ্রয় নিতে পারে। মনের কপাট বন্ধ করে সে বসে থাকতে পারে। কিন্তু সেই কপাট জোর করে খুলে ফেলে লেখক দেখছেন ব্যাপারটা কি—

> "She knew well the Sad Substitutes for conversation The stardust sky, the hilltops, the forbidden trees, the very darkness had for her a distinct presence. There she had taken her questions, complaints and disappointments during the last five years".

তারা, আর পাহাড় আর অরণ্য, তাদের সঙ্গে কথা। এই রস অতি ঘন, তা চুঁইয়ে পড়ে না।

সবুজ সংহার

আগাটা সামান্য বেড়াতেও পারে না, পাখিদের কান্ড দেখতে পারে না, ডিনার টেবিলে বসার উপায় নেই, এমন কি শুতেও পারে না বিছানায়, যেখানেই যাবে পিছনে এক জোড়া চোখ নিয়ে মালিয়া তাকিয়ে আছেন। আর মাঝে মাঝে উঁকি-ঝুঁকি নয়, লেখক একেবারে নায়িকার মর্মমূলে প্রবেশ করছেন। এই রকম পরিস্থিতি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কথাটা কে বলছে—লেখক স্বয়ং না তার সৃষ্ট চরিত্র—

"What power impelled her from her home, forced her out, and delivered her to that man whom she did not love at all, of whom she know so little".

এমন এক একটি মুহূর্ত আসে যখন মালিয়া এমন দৃশ্য দেখে ফেলেন, অসতর্ক মুহূর্তের এক ঝিলিক আগাটার অসহায়ত্বের সুযোগে লেখক দেখছেন—

"She shut her ears to the deep song that dwells within us, like a river, sometimes heard, sometimes voiceless She let the strange river flow within her but did not hear it"

মালিয়া শুধু যে এই নদীর মানচিত্রটুকু এ'কেই ক্ষান্ত তা নয় তিনি সেই নদী-তরঙ্গের ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য উপলব্ধি করেন। এ সেই নদী যার তরঙ্গ বিভঙ্গ অসীম ঐশ্বর্যের সন্ধান দেয়—মালিয়া সেই সবই সংগ্রহ করে তুলে নিয়েছেন। যারা চোখে শুধু দেখে আর রিপোর্ট রচনা করেই খুশী থাকে মালিয়া সেই জাতের মানুষ নন। যা দেখেন তা নিয়ে মনে মনে ভাবেন—তিনি আমাদের চিন্তার খোরাক দেন—আর সেই পরমান্ন বেশ তৃপ্তিকর এবং পুষ্টিকর। আগাটা হাসছে। মালিয়া তখনই বুঝছেন যে, এ হাসি মুখের হাসি, বুকের নয়। শুধু ঠোঁটের আগায় লেগে আছে। তৎক্ষণাৎ উত্তপ্ত পরমান্ন বানিয়ে লেখক তা পরিবেশন করেন—

"Oh! the abyss. the inner abyss, and its inhabitant, the tyrant of the soul that never rests, the Sombre lunatic who scratches at us from within!".

আগাটা তার ঘরের নিরাভরণ দেয়ালের গায়ে তাকিয়ে আছে—আর সেই দেয়াল-গাত্রের কর্কশতা অনুভব করছে। মালিয়া তৎক্ষণাৎ সূত্র পেয়ে গেলেন, ফলে আর এক হাতা পরমান্ন পরিবেশিত হল। তিনি বললেন—

"There is no greater ruthlessness than that of things"

আগাটা একটি বারান্দার ছাদে আঁটা একটি পুরোন লোহার পেরেকের দিকে তাকিয়ে আছে—হয়ত একদা এই পেরেক অবলম্বন করে কেউ দড়িতে ঝুলেছে—

আগাটা তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যার কথা ভাবে, সেই নিয়ে মনে মনে গুঞ্জরণ জাগে। আবার মালিয়ার পরমান্ন পরিবেশিত হয়—

"Those who mean to kill themselves have only one great compensation, and it is that while our destiny is an eternal obscure conjecture, a crossroads and an uncertainty, they know, all of a sudden, that they are the masters of their future. They know it and govern it—since they are going to stop it".

বেচারী ক্লজ ত মারা গেল। আগাটা বন্দর-নগরীতে ফিরে এল যেন তার পুরোন সত্তার প্রেতাত্মা। সোটেরোর কথা আগে উল্লিখিত হয়েছে, লোকটা উকীল, তার সঙ্গে একটা যোগাযোগ ঘটল, এতকাল মুদিত থাকার পর সে যেন সহস্রদল কমলের মত বিকশিত হয়ে উঠল। কিন্তু সে দুর্বল, ক্ষীণ। লেখক ছাড়বার পাত্র নন, তিনি আবার কিছু পরমান্ন পরিবেশন করবেন তার আহ্বান আসে—, তিনি বলছেন—

"It is the mirage of the solitary ones: they all take desolation for roughness and the sad heart experiences the rapture of its own greatness".

আগাটার আর মুখ খুলতে হয় না, তাকে শুধু চোখ মেলতে হয়—আর তার গোপনতম চিন্তাও তিনি ধরে ফেলেন—ধরা দেয় আগাটা অসহায় ভঙ্গীতে লেখকের জালে,

"Sometimes what comes into a look is all our unconfessed life. the great substance of living dreams, hopes, hunger. No look is more intense than that of animals who look at us voicelessly"

আগাটা আর সটোরোর মত প্রাণী সমাজেও কি প্রেমলীলা চলে? একদিন আগাটা সংক্ষেপে তার কথা প্রেমিককে শোনায়—তার মধ্যে আছে কাব্যিক অলংকার আর দার্শনিক অঙ্গরাগ। মালিয়া নায়িকার কথা বলছেন—

"I thought myself a heroine. I thought the world was an enormous flight of birds, and that I had only to strech my hands to stop the one I wanted. Then one sees that the bird is one-self, and that the world is the hand that claims one".

যা আসন্ন সে বিষয়ে আগাটার মনে একটা শঙ্কা জেগেছে—সোটোরোর আকস্মিক চলে যাওয়া অপ্রত্যাশিত না হলেও কিঞ্চিৎ মেলোড্রামাটিক, বিশেষ করে আগাটার যে মনোবিকার ঘটল তাতে তাই মনে হয়। আগাটা নিজের অন্তরে বন্দিনী, কি করে সে মুক্তি পাবে। ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিন্ন। এই উপন্যাসটিতে নতুনত্ব আছে কিন্তু অতিরিক্ত দার্শনিক প্রলেপ পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করে। তার দ্বারা উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হয় না—ফলে নায়িকার মত কাহিনীও উৎপীড়িত হয়, নায়িকার মত কাহিনীও 'a kind of total abstraction'.

বর্তমানের সব উপন্যাসের মধ্যেই এই সামগ্রিক বিমূর্ততাই প্রধান হয়ে উঠেছে।

—অভয়ঙ্কর

ALL GREEN SHALL PERISH—(a Novel) By EDUARDO MALLEA: Translated from the Spanish by John B. Hughes: Publishers: CALDER & BOYARDS, (London). Price-25 Shillings:

সাহিত্যের খবর

আমেরিকার সমকালীন কবিদের মধ্যে রবার্ট লোয়েল ও জেমস ডিকে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। সম্প্রতি এই দুজন কবিকে নিয়ে বেশ কয়েকটি আলোচনা বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এর কারণ, সম্প্রতি এই দুজন কবির কয়েকটি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে লোয়েলের 'নিয়ার দি ওশান' (ফেরার, ১৯৬৭) বিশেষ উল্লেখ্য। ডিকের অবশ্য একটি গ্রন্থই প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম 'পোয়েমস'। প্রকাশ করেছেন ওয়েসলিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস। এ'দের সম্বন্ধে সব সমালোচকই যে রায় দিয়েছেন, তা হলো, এ'রা আমেরিকার সাম্প্রতিক কাব্য-আন্দোলনে একটা নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য একদিকে উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। লোয়েলের কবিতার অন্যতম গুণ নাটকীয়তা। 'দি ওল্ড গ্লোরি' প্রকৃতপক্ষে তিনটি নাটকের সংকলন। আমেরিকার ইতিহাসের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যকে লেখক শ্রদ্ধার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'প্রোমিথিউস আনবাউণ্ড' বইটিতে সেই দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথাই বলা হয়েছে। গ্রীক

ঐতিহ্যের প্রতিও তাঁর যে একটা আগ্রহ আছে, তা ঐ গ্রন্থটির ভূমিকাতেই স্বীকার করেছেন। তিনি ভূমিকায় লিখেছেন--'প্রোমেথিউস আনবাউন্ড' সম্ভবত সমস্ত ক্ল্যাসিক্যাল গ্রীক ট্রেজেডিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গীতিময়। এটি খুবই অনাটকীয়ও। ...অনুবাদে মূলের গীতিময়তা অনেকটা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয় এবং চরিত্রগুলি অনেকটা গতিহীনের মত প্রতিভাত।... অনুবাদে অনেক স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। অর্ধেকের বেশী লাইনই মূলে ছিল না।

'নিয়ার দি ওশান' কিন্তু ভিন্নধর্মী। এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ওয়াকিং আর্লি সান-ডে মরণিং' একটি উল্লেখ্য কবিতা। এতে আশা আর হতাশার এক অপরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এবং যতদূর মনে হয়, শেষ পর্যন্ত হতাশারই জয়গানই গেয়েছেন।

বোম্বাইয়ের সর্দার বল্লভভাই বিশ্ব-বিদ্যালয় কয়েকটি অভিনব কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যেই গুজরাটি ভাষায় সাত খণ্ডে একটি শব্দকোষ প্রকাশ করেছেন। এখন হিন্দীতে এর অনুবাদ হচ্ছে। দুই খণ্ড এরই মধ্যে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্রখ্যাত তামিল সাহিত্যিক সুব্রহ্মণ্য ভারতীর জন্মদিন উৎসব কয়েক দিন আগে মাদ্রাজ শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে মাদ্রাজে তামিল কবিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রী কে কামরাজ। তামিল সাহিত্যে ভারতী এক'ট যুগের স্রষ্টা। বস্তুতপক্ষে তিনিই তামিল সাহিত্যে সঞ্চার করেন নতুন আবেগ। তাই তাঁকে জাতীয় কবি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। 'অমৃতে' এর আগে তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা দেশের সঙ্গে ভারতীর সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা কতদূর গভীর ছিল, তা তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ 'রবীন্দ্র দিগ্বিজয়ম' পাঠ করলেই অনুধাবন করা যায়। প্রবন্ধটি ১৯২১ সালের ২২ আগস্ট প্রকাশিত হয়।

প্রেমের গল্প রচনার ক্ষেত্রে হাসপাতালের ভূমিকা কতদূর তা নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি উপন্যাসের শেষরক্ষা করেছে হাসপাতাল। যেমন রেচেল হারভের উপন্যাসটির কথা ধরা যাক। উপন্যাসটির নাম 'ডিয়ারেস্ট ডক্টর'। প্রকাশক 'হার্স্ট' এন্ড ব্ল্যাকেট' কোম্পানী। এই উপন্যাসটির নায়িকার নাম রোজমেরী। যেমন হয়ে থাকে, খুব সুন্দরী সে। প্রেমে পড়েছিল এক যুবকের। সে তাকে নিয়ে গেল তার গ্রামের বাড়িতে বিধবা মায়ের সঙ্গে ভাবী স্বামীর পরিচয় করিয়ে দিতে। কিন্তু সেখানেই ঘটল অঘটন। মায়ের প্রেমেই পড়ল তার প্রেমিক। বিয়েও হয়ে গেল যথারীতি। তারপর? রোজমেরি উন্মাদের মত হয়ে গেল। তাকে চিকিৎসা করে সুস্থ করল এক ডাক্তার। সেই ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে শেষ পর্যন্ত রোজমেরির।

দ্বিতীয় যে উপন্যাসটির কথা বলা হচ্ছে, সেটিও হাসপাতালের গল্প। লেখক নোরা সি জেমস। এই বইয়ের গল্পাংশে অবশ্য একটু বৈচিত্র্য আছে। কারণ এর গল্প গড়ে উঠেছে এক দম্পতিকে নিয়ে। জুডিথ আর ডেনিস—স্বামী আর স্ত্রী। বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়েছিল প্রায় ছয় বছর আগে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, দুজনেই চাকরী নিল একই হাসপাতালে। তারপর যা হবার হলো। আবার মিলন।

তৃতীয় আর একটি উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যাচ্ছে। এই উপন্যাসেও হাসপাতালেরই প্রাধান্য। উপন্যাসটির নাম 'দি প্রোটেজ ফর নার্স জুডে'। লেখক মার্জরি রাইলটোন। একজন নার্সের জীবনের বিচিত্র কাহিনী এতে লিপিবদ্ধ। এই উপন্যাসগুলির কোনটিই তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। অতিসাধারণ রোমান্টিক কাহিনীর পরিবেশন।

এপারে হাওড়া, অন্যপারে মেদিনীপুর। মাঝখানে রূপনারায়ণের রূপোলি জলধারা। উভয়কে সংযুক্ত করেছে রূপনারায়ণ সেতু। বর্তমান নাম: শরৎ-সেতু। দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষিত নাম। পূর্ব উপকূল ধরে উভয় দিকে মাইল কয়েক হাঁটলেই পানিত্রাস। শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-বিজড়িত গ্রাম। ওখানেই দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন শরৎচন্দ্র। লিখেছেন জনপ্রিয় উপন্যাসগুলি। কাছেই 'পল্লী-সমাজ'-এর ঘোষালদের বাড়ী। শরৎচন্দ্রের বাড়ীর বারান্দা থেকে দেখা যায় রূপনারায়ণের সেতু। সেকালে অনেক বিস্তৃত ছিল রূপনারায়ণের জলধারা। গত ১৭ সেপ্টেম্বর পশ্চিম বাংলা সরকার এই সেতুটির নাম রেখেছেন 'শরৎ-সেতু'। রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু এটি। একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানে তার স্মারকশিলার আবরণ উন্মোচন করেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন বাংলা দেশের বহু খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিক। যথাক্রমে মনোজ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত, বিশু মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত বিভাগের প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় বলেন, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বিদ্রোহী মনের ভাষাকে রূপ দিয়েছেন। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর মন রূপনারায়ণের মতো উদ্বেল হয়ে উঠত। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী বলেন, শরৎচন্দ্র নিপীড়িত, অভুক্ত মানুষের মর্মবেদনাকে তাঁর সাহিত্যে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। আজ বিদেশী সরকার বদল হয়েছে। স্বদেশী সরকার এসেছে। কিন্তু মানুষের মুক্তি হয়নি। অজ্ঞানতা আর অন্নাভাব সর্বগ্রাসী রূপ নিচ্ছে। সভায় অন্যান্য বক্তা ছিলেন শ্রীজ্যোতিষ ঘোষ, স্থানীয় এম-এল-এ বিভূতি ঘোষ, মানিক মুখোপাধ্যায়, হরিপদ ভারতী প্রমুখ।

স্মারক-শিলায় শরৎচন্দ্রের কয়েকটি কথা লেখা আছে:

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিনু ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই...।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীরা ও অগ্নি-বীণার শিল্পীগণ কাজী নজরুল ইসলাম ও উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা শরৎচন্দ্রের ওপর কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, জাতীর কল্যাণে শরৎচন্দ্রের চারটে বাসভবনই জাতীয় সদনে পরিণত করাতে হবে। তার মধ্যে কলকাতা অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ী সরকার নিয়ে নিয়েছেন। শৈশবের বাসভূমি হুগলী-দেবানন্দপুরের বাড়ী শীঘ্রই সরকারী তত্ত্বাবধানে আনা হচ্ছে। বাজে শিবপুরের বাড়ীর যে অংশে তিনি থাকতেন ১৪ হাজার টাকা দিয়ে সরকার তা কিনে নিয়েছেন। পাণিত্রাসের বাড়ীটিও জাতীয় সদনে পরিণত করা হবে। শরৎ-সেতু নির্মাণ করতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দৈর্ঘ্য ৩৩০০ ফুট।

বিপ্লবী মেদিনীপুর বিনয়জীবন ঘোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম চার টাকা।

ঊনিশ শতকের বাঙলায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতের স্মরণীয় পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর জন্মভূমি মেদিনীপুর পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল মেদিনীপুরের বহু বিপ্লবী এক সময় বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর কাছে ছিলেন আতঙ্ক বিশেষ। তিনজন সিভিলিয়ান মারা গেল বিপ্লবীদের গুলিতে। ছয়জন বিপ্লবীর নিষ্ঠুর হত্যালীলা এবং মেদিনীপুরবাসীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার বিপ্লবীদের নিস্তব্ধ করতে পারল না। ফাঁসির মঞ্চে ক্ষুদিরামের আত্মদান যেন তাঁদের চোখ খুলে দিয়েছিল। বিপ্লবীদের মধ্যে—প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত, অনাথবন্ধু ধারা, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ ও নবজীবন ঘোষের নাম স্মরণীয়। শুধু সংহিংস নয়, অহিংস বিপ্লবেও মেদিনীপুর বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল।

বিপ্লবী বিনয়জীবন ঘোষ তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'বিপ্লবী মেদিনীপুরে' স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিশেষ অধ্যায়কে চিত্রিত করেছেন। তাঁদের পরিবারের যতিজীবন, নির্মলজীবন, নবজীবন, যোগজীবন সেকালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। শ্রীঘোষ বিপ্লবীদের আত্মোৎসর্গের রক্তাক্ত কাহিনী লিখেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি জেলার ভূমিকা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, বই-এ তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বইটি সমাদৃত হবে।

●

ছোটদের সেরাগল্প —বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার। কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

বাঙলা কিশোর সাহিত্য আজ আর কোন অংশেই দুর্বল নয়। খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের অবদানে সাহিত্যের এই বিশেষ ক্ষেত্রটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি বিশ্বনাথ দের সম্পাদনায় সেরা গল্পের যে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে, তা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জরাসন্ধ, প্রমথনাথ বিশী, রাধারাণী দেবী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, স্বপনবুড়ো, আশাপূর্ণা দেবী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, শৈলেন ঘোষ, আশা দেবী, সত্যজিৎ রায়, নীলিমা ঘোষ এবং চিরঞ্জীব সেনের লেখা ঊনিশটি বিভিন্ন স্বাদের গল্প নির্বাচনে সম্পাদক যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। হাসির গল্প, ভৌতিক কাহিনী, রূপকথা, আজগুবী গল্প, করুণ গল্প আর গোয়েন্দা কাহিনীর এই সংকলনটি ছোটদের শুধু নয়, বয়স্ক পাঠকদেরও আকৃষ্ট করবে।

●

বাংলার বিদুষী (জীবনী)—অনিলচন্দ্র ঘোষ। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী। ১৫, কলেজ স্কোয়ার। কলকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা।

অত্যন্ত সহজ ভাষায় লেখা বাংলার কয়েকজন বিদুষী নারীর জীবনালেখ্য। বইখানিতে চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী, বৈজয়ন্তী, প্রিয়ংবদা, দ্রবময়ী, স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রসন্নময়ী দেবী, প্রিয়ংবদাদেবী, সরলা দেবীচৌধুরাণী, উমা দেবী, তরু দত্ত, বেগম রোকেয়া, সরোজিনী নাইডু এবং লীলা রায়ের জীবনকথা লেখক নিষ্ঠার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সঙ্গে ছবিও আছে।

●

রাগপ্রধান (কাব্যগ্রন্থ)—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ।। বাক সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯ ।। দাম ঃ তিন টাকা

সাম্প্রতিক কবিতার পরিমন্ডল থেকে মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করেন। অনুভবের গভীরতা ও টেকনিকের বৈচিত্র্য সম্পর্কে তিনি উদাসীন। প্রথাগত কাব্যিক প্রকরণে তাঁর আসক্তি। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি পংক্তি স্মরণ করা যেতে পারে ঃ 'জল পড়ে।/ আকাশে মেঘ। ঘট নড়ে।/রাজাভিষেক।'

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

লেখা ও রেখা (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬)—সম্পাদক ঃ ভাস্কর মুখোপাধ্যায়। ১২।১সি পাইকপাড়া রো। কলকাতা-৩৭। দাম এক টাকা।

বাঙলা দেশে লিটল ম্যাগাজিনের অভাব নেই। কিন্তু সুসম্পাদিত হয়ে এদের খুব কম সংখ্যক পত্রিকাই প্রকাশিত হয়ে থাকে। লেখা ও রেখার কবিতা গল্প বা প্রবন্ধ পড়লে সহজেই একটি কথা মনে হয় সম্পাদনায় একটি আদর্শ আছে, সুস্থ চিন্তা আর পরিচ্ছন্ন পত্রিকাটির সমস্ত অঙ্গে জড়িয়ে।

●

কালি ও কলম (আষাঢ় ১৩৭৬)—সম্পাদক ঃ বিমল মিত্র। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

বিমল মিত্র সম্পাদিত কালি ও কলম পত্রিকাটি সুধী পাঠক সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ গল্প কবিতা ধারাবাহিক উপন্যাস নিয়ে প্রকাশিত পত্রিকাটির প্রতিটি সংখ্যাই বেশ আকর্ষণীয়।

●

যুগ [শ্রাবণ ১৩৭৬]—সম্পাদক ত্রিদিবকুমার দাশশর্মা ও যোগজীবন চট্টোচট্টোপাধ্যায় ।। ১০বি/টি রোড, বার্ণপুর, বর্ধমান ।। পঞ্চাশ পয়সা

শিল্পাঞ্চল থেকে প্রকাশিত হলেও 'যুগ' সম্পাদকীয় ভাবনায় ও রচনানির্বাচনে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পেরেছে। কলকাতার কবি-সাহিত্যিকরাই অবশ্য পত্রিকাটির অধিকাংশ পাতা দখল করে আছেন। এ সংখ্যায় লিখেছেন মণীন্দ্র রায়, গণেশ বসু, সমরেশ দাশগুপ্ত, আবদুল রহিম, সুভাষ সিংহ, অরবিন্দ ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ সেন, অনিলকুমার মোদক এবং আরো কয়েকজন। গালিব ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের ওপর লেখা আলোচনা দুটি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

জীবন সত্যের সন্ধানে বাংলা ছোটগল্প

'সাহিত্যিক হবার ইচ্ছে ছিল না। চাকরী করতেই এসেছিলাম।' —নিস্পৃহ, আবেগহীন কণ্ঠে বললেন সুবোধ ঘোষ, 'ব্যবসা করতাম। নানা রকম ব্যবসা। হয়তো ওভাবেই কেটে যেত। সুরেশ মজুমদার নিয়ে এলেন পত্রিকার কাজে। পেশা হিসেবে গ্রহণ করলাম সাংবাদিকতা।'

'সাহিত্যের ক্ষেত্রে এলেন কি করে?' বিনীত প্রশ্ন করলাম আমি।

—প্রায়ই ট্র্যানস্লেশান করতাম তখন। বন্ধুবান্ধবরা বললেন, টাকার দরকার থাকলে গল্প-উপন্যাস লিখুন। অন্য কিছুতে টাকা নেই। আলোচনা-সমালোচনা লিখে তেমন টাকা পাওয়া যায় না। আমাদের একটা সাহিত্য-সভা ছিল। কয়েকজন সাংবাদিক মিলে ওই সভা করেছিলেন। আমি গল্প লিখতে পারতাম না। তবু আমাকে দলে টেনে নিলেন তাঁরা। একেক দিন একেক জন সাহিত্যিকের বাড়িতে সভার আয়োজন হত। খাওয়া-দাওয়া হত প্রচুর। সকলেই কিছু না কিছু লিখে নিয়ে যেতেন। কেউ গল্প, কেউ উপন্যাস। তাই পড়া হত। আলোচনা হত। আমাকে বললেন, আপনিও লিখে নিয়ে আসুন যাই হোক কিছু। এটা তো কেবল খানাপিনার আসর নয়, সাহিত্যের সভা। আমি ফ্রয়েডীয়ান সাইকোলজি নিয়ে এক-দিন কথা বলেছিলাম। ও'রা বললেন, তাই লিখে নিয়ে আসুন। পরের দিন লিখে নিয়ে গেলাম একটা গল্প।

কি নাম সেই গল্পের?

—'ফসিল'। আমার প্রথম গল্প। অনুরোধে লেখা। সকলে খুশি হয়ে বললেন, আরো লিখুন। লিখলাম, আমার দ্বিতীয় গল্প 'অযান্ত্রিক'। 'ফসিল'-এর প্রায় সমকালে লেখা।

বিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করতে ভুলে যাচ্ছিলাম। বাংলাদেশে এমন সাহিত্যিক কমই আছেন যিনি জীবনের প্রথম লেখাটিকে নিজের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরূপে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অতসী মামী' লিখে 'বিচিত্রা'র সম্পাদককে চমকে দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, ভালো গল্প। কিন্তু শ্রেষ্ঠ গল্প লিখেছেন অনেক পরে। প্রথম প্রকাশিত রচনায় শরৎচন্দ্র নাম করেছিলেন। তারাশংকর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন প্রথম যৌবনে। কিন্তু সকলেই হাত পাকিয়েছিলেন, গদ্যপদ্য বহু অন্য লেখা লিখে। সুবোধ ঘোষের স্বাতন্ত্র্য এদিক থেকে স্মরণীয়।
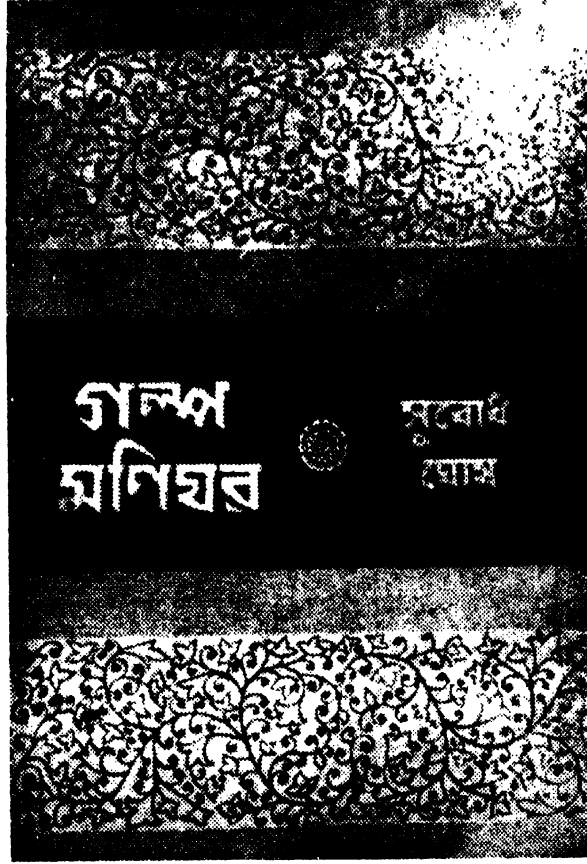
সুবোধবাবু, একটু থেমে বললেন, সেই থেকে আমার লেখা চলছে।

সম্প্রতি তাঁর 'গল্প মণিঘর' পড়ছিলাম। ছোটগল্পের সংকলন। নতুন লেখা নয়। পুরনো চারটে ছোটগল্পের বই একসঙ্গে ছাপা হয়েছে নতুন নামে। অনেকেই হয়তো বইগুলি পড়েছেন। তাদের নাম—'দিগঙ্গনা', 'সায়ন্তনী', 'নিত্যসিন্দুর' ও 'মনোবাসিতা'। কিন্তু সকলেই পড়েছেন, বলা যায় না। ছোটগল্পের বই আর কজনেই বা কেনে?

এদিক থেকে এটা নতুন বই। অন্তত আমার কাছে।

'গল্প মণিঘর'-এ আছে মোট চব্বিশটি গল্প। প্রথম গল্প 'স্বর্গ হস্তে বিদায়'। শেষ গল্প 'মানবিক'।

আমি প্রথম গল্প পড়েই অবাক। আবিষ্কার করলাম 'ফসিল' আর 'অযান্ত্রিক'-এর শিল্পীকে। লক্ষ্য করেছি, তাঁর চিত্র-নির্মাণের কৌশল আর জীবনদর্শনের ভিন্নদৃষ্টি। শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে কলম ধরেছেন তিনি। অথচ জীবনকে ছুঁয়ে আছেন প্রতি মুহূর্তে।

সৈয়দ মুজতবা আলি গল্পটি পড়ে অবিভূত। চার পৃষ্ঠার দীর্ঘ চিঠি লিখে অভিনন্দন জানিয়েছেন সুবোধ ঘোষকে। হিন্দী, ইংরেজী, তামিল প্রভৃতি কয়েকটি ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে গল্পটি। সুবোধবাবু বললেন, 'ফসিল'এর চেয়েও জনপ্রিয় হয়েছে 'স্বর্গ হতে বিদায়'।

কী আছে গল্পটিতে

আছে একটা নিটোল কাহিনী—ব্যক্তির নয়, ব্যক্তিত্বের সংকট। আছে জীবন, প্রতিকূল ঘটনার মধ্য দিয়েও যা বহমান। আর আছে ছবি। অনাবশ্যক কিংবা বিচ্ছিন্ন নয়, পরস্পর সংলগ্ন—একটা ধারণাকে নির্মাণ করে এই ছবিগুলি। গল্পের নায়ক প্রশান্ত হিতেশ কেরানীর মেয়েকে বিয়ে করেছে,

ভালোবেসে নয়, ভালোলাগার খেয়ালে। এই মোটা ও সরল গল্পটা কত সহজে পথ-পরিবর্তন না করেই ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর ইঙ্গিতে সমাপ্ত হয়েছে। অভিনব কথা বলেন নি সুবোধবাবু। সম্পূর্ণ নতুন তাঁর ট্রিটমেন্ট। লক্ষ্য করেছি তাঁর পরিমিতি-বোধ ও শব্দ-ব্যবহার। প্রশান্তর বিভিন্ন প্রেমিকার মতো নানা সাজে সেজেছে অরুণা, হিতেশ কেরানীর সেই ক্লাস নাইনে পড়া মেয়েটি। কখনো বীরপুরে কোলিয়ারীর চৌধুরী সাহেব নন্দা চৌধুরীর মতো, কখনো কাপুর সাহেবের শ্যালিকা সোহিনার মতো, কখনো ড্রাইভার রামকুমারের ভাইয়ের বেটী চামেলীর মতো। তার এই সাজ-বদল প্রশান্ত দেখেছে বারবার, আর চমকে উঠেছে মুহূর্তের জন্য। কিন্তু আমল দেয়নি। শেষ-বারের মতো মেক-আপ নিয়ে আসে অরুণা। প্রশান্তর মুখের আর চোখের হাসি যেন ভয়ানক একটা পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে : 'এ কী ব্যাপার, অরুণা? তুমি যে দেখছি, ঠিক সেই লতিকার মত সাজ করেছ।'

হ্যাঁ, ঠিক সেই লতিকার মতোই আধ-ময়লা একটা হলদে রঙের ধনেখালি পরেছে অরুণা। ঘাড়ে পিঠে উসকো-খুসকো চুলের গোছা। চোখে শান্ত, শান্ত দৃষ্টি। মুখে হাসি নেই। লতিকার সেই মনিভূষণের মতো খিনয়বাবুর সঙ্গে চলে যায় অরুণা।

নিতান্ত ছোটখাট গল্প নয়। পাইকা হরফে চব্বিশ পৃষ্ঠা। কোনো অংশ অনা-বশ্যক নয়। প্রতিটি পংক্তি চরম মুহূর্তের দিকে অগ্রসরমান।

সুবোধবাবু বলেন, গল্পে নাটক থাকা দরকার। অন্তত ড্রামাটিক ফর্ম না থাকলে গল্প দুর্বল হয়ে পড়ে। গল্পের বিন্যাসই হলো আসল কথা। আসল কৌশল।

আপনি গল্প লেখেন কি ভাবে? আগে থেকে কোনো আইডিয়া কাজ করে, না চরিত্র?

—আমার প্রত্যেক গল্পেরই একটা সেন্ট্রাল আইডিয়া আছে। কোনো লেখাই স্কেচ নয়। কখনো মাথার ভেতরে কোনো আইডিয়া এলে উপযোগী চরিত্র ও ঘটনা দিয়ে তাকে গল্পের আকার দিই। আবার কখনো কোনো চরিত্র আমাকে উৎসাহিত করে। তার থেকেও আমি গল্প লেখার প্রেরণা পাই।

আপনি কখন লেখেন?

—বাইরের তাগিদ না থাকলে লিখি না। প্রায় সব সময়ই কেউ না কেউ গল্প চায়। ভয়ানক আলস্যে আমি। দেশ-আনন্দবাজারে কয়েকটা গল্প লিখেছি শেষ মুহূর্তে। কখনো রাত জেগে। অন্য সময় আবার চুপচাপ।

চায়ের অর্ডার দিলেন সুবোধবাবু। বললেন, আমার কথাই বলে যাচ্ছি। এবার আপনার কথা বলুন।

বললাম, পেশার কথা। নেশার কথা। যখন যা মনে হয় লিখি। কফি হাউসে আড্ডা দিই, কিংবা অন্যত্র। ঝগড়া-ঝাটি করি আর কি?

—আড্ডা দিয়ে সাহিত্য হয় না। সুবোধ-বাবু বললেন, সাহিত্য করতে হয়, লোনলি, নির্জনে। একা একা। সেখানে আর কারো জায়গা নেই। আমরা ফরাসীদের জানি। দারুণ আড্ডাবাজ। চায়ের দোকানে, রেস্তোঁরায়, কফি হাউসে আড্ডা দেয় ফরাসীরা। তাতে লাভ হয়নি তাঁদের। জা ককতো বলতেন, আড্ডার জন্য ফরাসী সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ কখনো সাহিত্যিক আড্ডা পছন্দ করতেন বলে শুনিনি।

বাঙালি সাহিত্যিকদের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সুবোধবাবু। বললেন, আমি তো আনন্দবাজারে আছি। অনেক সাহিত্যিক এখানে আসেন। আমার ঘরে আসেন না। কারণ, আমি তো লেখা ছাপতে পারি না। আসলে, এঁরা সাহিত্যিকই নন। না হলে, খবরাখবর নিতেও কেউ আসতেন। হয়তো ভাবতেন, আরেকজন সাহিত্যিক আছেন এখানেই। কেউ দেখা করার দরকারও বোধ করেন না।

আপনার সমকালীন সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের কথা বলুন।

—আমার সাহিত্যিক বন্ধু কেউ নেই। চেনাশোনা আছে অনেকের সঙ্গে। এই তো সেদিন তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা হলো। তা ছাড়া, আমি আড্ডা দিতে পারি না। কখনো কারো বাড়িতে যাই নি। দশ পনের জন সাহিত্যিককে একসঙ্গে দেখলে আমার আতঙ্ক হয়। কোনো বাড়িতে বেশী সাহি-ত্যিক নিমন্ত্রিত হলে আমি যাই না।

আপনার গল্পে প্রায়ই প্রকৃতির বর্ণনা পাই। কলকাতা কেমন লাগে আপনার কাছে।

—কলকাতায় প্রকৃতি কম। খারাপ লাগে না। লন্ডনও ভালো লাগে। টেমসের তীরে বসে প্রকৃতি দেখা যায়। কিন্তু আমাকে যদি বস্তীতে থাকতে হতো, তা হলে ভালো লাগত না নিশ্চয়ই। দার্জিলিং-এ প্রকৃতি আছে। বস্তীতে থাকতে হলে ভালো লাগত না। কলকাতাও তাই। একটু ভালোভাবে, ভদ্র এলাকায় থাকলে এখানেও আরাম আছে।

কলকাতায় না এলে কি আপনি গল্প লিখতেন?

—না, লিখতাম না।

আপনাকে অতীতে কখনো বিতর্ক হয়নি? বিশেষ করে, 'গল্প মণিঘর'এর কোনো গল্পকে কেন্দ্র করে?

—আমি কোনো দলভুক্ত নই বলে আমার হয়ে ঢাকে কাঠি বাজাবার কেউ নেই। অনেকেই বিপক্ষে। 'ফসিল', 'অযান্ত্রিক' লেখার পর জনৈক সমালোচক গল্পটির প্রশংসা করেছিলেন একটা প্রবন্ধে। 'তিলা-ঞ্জলি' বেরুবার পর তাঁর একটি সমালোচনার বই বেরোয়। দেখলাম, তিনি আমার সম্পর্কে নীরব রয়েছেন। এখন সেই সমালোচকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো।

গল্প-উপন্যাস নিয়ে আজকাল নানা রকম আন্দোলন হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

—সাহিত্য নিয়ে আবার আন্দোলন কি? ক্রিয়েটিভ আর্ট হলো পিওরলি পার্সোনাল। আন্দোলন করে অসাহিত্যিকরা। তাঁদেরই সেটা কাজ। যাঁরা সমালোচনা লেখেন, তাঁরাই আন্দোলন করবেন। সৃজনশীল সাহিত্যিক লিখে যাবেন।

আজকাল তো কেউ সাহিত্যের কোনো শাশ্বত সত্য আছে বলে বিশ্বাস করে না। আপনি কি বলেন?

—নিশ্চয়ই আছে। জীবনে যদি শাশ্বত কিছু থাকে, তাহলে সাহিত্যেও তা আছে। বাপ ছেলেকে ভালোবাসে, মা আদর করে— ওটা শাশ্বত। যাঁরা তা অস্বীকার করে, ভুল পথ বেছে নিয়েছেন। এ জন্যে আমি এখনকার লেখা পড়ি না। এখনও কত কি পড়বার আছে। কি হবে, ওসব পড়ে? আসলে কি জানেন, মানুষ বোকা হলে কিছু আসে যায় না, সিনসিয়ারিটির অভাব হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। লাইফ থাকে না। সাহিত্য ব্রেনের সৃষ্টি নয়, হৃদয়ের সৃষ্টি।

আমি কথা বলতে বলতে 'গল্প মণিঘর'-এর বিভিন্ন গল্পের কাহিনী ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। 'চতুর্ভুজ ক্লাব' নামে একটা আশ্চর্য গল্প আছে এই সঙ্কলনে। সুবোধ-বাবু নিজেই গল্পটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললেন, সাহিত্যে আমি লাইফ চাই। সম-বেত সন্ধানে তার স্পর্শ পাওয়া যায় না। চতুর্ভুজ ক্লাবে আমি সে কথা বোঝাতে চেয়েছি।

বৈঠকী ঢঙে শুরু হয়েছে গল্পটি। বেশ স্মার্ট, ঝকঝকে বর্ণনায় ও সংলাপে আরম্ভ। সারাটা গল্পেই এক ধরনের চতুর শব্দের উপস্থিতি। উত্তম পুরুষে লেখা। বিনু, দীপু, নরু আর আমি—এই চারজন

মানুষকে নিয়ে গড়ে উঠেছে পুরো গল্পটি। সমবেতভাবে কাজ করার একটা সংকল্প নিয়েই গড়ে উঠেছিল এই ক্লাব। স্কুলে একজন পড়া না পারলে বাকি কজন চুপচাপ থাকত। অন্যান্য কাজেও তাই। শেষ পর্যন্ত আলাদা হয়ে গেল সকলেই। রুচি, প্রবৃত্তি, দৃষ্টিকোণ ও জীবনজিজ্ঞাসায় ওরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। এক ছাঁচে ঢালাই করতে গেলে চলবে কেন? তাছাড়া রয়েছে ব্যবহারিক প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধা।

গল্পের শেষদিকে সিদ্ধান্ত করেছেন : 'চতুর্ভুজ ক্লাব ভেঙেই যায়, পৃথিবীতে চতুর্ভুজ ক্লাব বোধ হয় হতেই পারে না।'

শিল্পীর এই সমস্যা। শিল্পেরও।

আমি অভিযোগ করলাম, আপনি গত কয়েক বছর প্রায় লেখেননি কিছুই। এজন্যে পাঠকদের মনে দারুণ ক্ষোভ আছে। শুনছি, এবার তো অনেক লিখছেন?

--বরাবরই আমি কম লিখি। এবারও বেশী লিখছি না। গতবার দুটো উপন্যাস লিখেছিলাম টাকার প্রয়োজনে। অফিসে স্ট্রাইক চলছিল। এবার লিখছি দুটো উপন্যাস। একটা আনন্দবাজারে "বাসবদত্তা", দ্বিতীয়টি উল্টোরথে ';বন্ধু, গোলাপ"। ১৯৬২ সালে বিদেশ থেকে ঘুরে এসে নেফা গিয়েছিলাম চীনা আক্রমণের সময়। তার কয়েক মাস পরে লিখলাম, 'জিয়া ভরলি' উপন্যাস। এরপর লিখিনি প্রায় চার বছর। এমন অবস্থা আমার আগেও হয়েছে। ১৯৪৫ থেকে ৫০ সাল পর্যন্ত কিছুই লিখিনি। এখন একটা সাহিত্যের কাগজে লেখা হয়, "অন্য প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরা যখন যথাসম্ভব কম লিখছেন, তখন সুবোধ ঘোষ গণ্ডায় গণ্ডায় প্রসব করে যাচ্ছেন।" পত্রিকাটির পরের সংখ্যায় অবশ্য সম্পাদক ত্রুটি স্বীকার করেছিলেন। আমার সম্পর্কে এমন ভুল অনেকেই করে থাকেন।

সামান্য থেমে বললেন, মাঝে মাঝে জমি পতিত থাকা ভালো।

আমি তাঁর গদ্যভাষা সম্পর্কে প্রশংসা করে বললাম, আপনার শত্রুরাও কিন্তু আপনার ভাষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। চরিত্র ও বিষয় অনুযায়ী এমন চমৎকার ভাষার ব্যবহার খুব কম সাহিত্যিকই করতে পেরেছেন। বললাম, 'ভারত প্রেমকথা'র সংলাপ ও বর্ণনার কথা।

—লিখতে বসে আমার মনে হয়েছে, বাংলা গদ্য ভারি দুর্বল। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ আজকের যুগের উপযোগী ভাষা সৃষ্টি করতে পারেননি। যেমন, ধরুন আমাকে বর্ণনা করতে হবে স্টক একসচেঞ্জের একটা ছবি কিংবা টাটা রাস্ট ফার্নেসের দৃশ্য। বাংলায় সেসব জীবন্ত করার মতো আর্টের ভাষা নেই। আমি তা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছি। এটাই দরকার ছিল। অতীতের কথা বলতে হলেও নিজেকে সেই যুগের পটভূমিকায় নিয়ে যেতে হবে।

আপনার প্রিয় গল্প কোনটি?

কি করে বলি কোনটা প্রিয় গল্প? একেকটা অ্যাসপেক্ট থেকে লেখা। কোনটায় প্যাথোজ আছে, অন্যটায় অন্য কিছু। অনেক রাবিশ গল্প লিখেছি। অন্তত আমার কাছে তাই মনে হয়েছে। কিন্তু পাঠকের কাছে তা মনে হয়নি। অনেকে সেসব গল্পর প্রচুর প্রশংসা করে চিঠি দেন। বেশ বড় বড় চিঠি। কোন্ গল্প কে কিভাবে নেয়, তা কে জানে।

বললাম, এমনও তো হতে পারে, আপনাকে খুশি করার জন্য অনেকে এসব চিঠি দেন। একটা বড় কাগজে কাজ করেন।

—না। অনেককেই আমি চিনি না। তাঁদের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। আর আমাকে তেলিয়ে কি হবে! আমি তো কারো কোনো সুবিধে করে দিতে পারব না।

কোন কোন ভাষায় আপনার লেখা অনুবাদ হয়েছে?

—হিন্দী, ইংরেজী, জার্মান, ডাচ, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি ভারতীয় ও অভারতীয় ভাষায়। ফরাসীতে অনুদিত হয়েছে 'অযান্ত্রিক' গল্পটি।

আমি 'গল্প মণিঘর'-এর আরেকটা গল্প 'রাতের পাখি'র সঙ্কেতময়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আপনার এই ইঙ্গিতে সমাপ্তি দারুণ ভালো লেগেছে। বিশ্লেষণ না করে আপনি যে এমনভাবে গল্পটাকে শেষ করবেন, তা ভাবতেই পারিনি।

এ গল্পের প্রধান চরিত্র অক্ষয়বাবু। বৃদ্ধ, রিটায়ার্ড ভদ্রলোক। ছেলেকে বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মারা যায় অল্পবয়সে। বিধবা পুত্রবধূর দিকে তাকাতে পারেন না। তিনি। ছেলের অনুপস্থিতিতে রয়ে গেছে তারই লাগানো একটা নিমগাছ। ছেলের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা যায় এই গাছটাকে। সমাপ্তির দিকে দেখা যায়, সেই গাছটি আর নেই। বিশু মালী তার শুকনো কাঠগুলোকে কেটে চেলা করে রেখে দিয়েছে।

আর পুত্রবধূ তপতী?

সে দুমকা গিয়েছে। ফিরে আসেনি। আসবে না। শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রথম বেশ চিঠি দিত। পরে কমে গেছে চিঠি লেখা। অক্ষয়বাবু গোয়ালাদের বস্তিতে বাঁশির শব্দ শুনলেন সারা রাত। সকালবেলা স্ত্রীকে বললেন, মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্ত্রীর (সুচারু দেবী) চোখ জলে ভরে যায়, কবে ?

—এই তো পঞ্জিকাটা এখানেই রয়েছে। একবার দেখে নিলেই তো পার।

'রাতের পাখি' জনপ্রিয় হয়েছে বাংলাদেশে। ভারতের অন্যত্রও অনাদর হয়নি। অনেকগুলি ভাষাতেই অনুবাদ হয়েছে তার। 'সুন্দর' গল্পটি অনুদিত হয়েছে তামিলে। পাঞ্জাবীতেও অনুদিত হয়েছে কোনো কোনো গল্প।

আজকের সাহিত্য-সমালোচনা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

—সমালোচনা কোথায়? সমালোচনার নামে আছে প্রোপাগান্ডা। তাতে যার প্রশংসা করা যায়, তারও ক্ষতি হয়। আর, নিন্দা করা হয়, তারও ক্ষতি হয়। উপকার হয় না কারো। কেউ কেউ তরুণ সাহিত্যিকদের দিয়ে সমালোচনার নামে কুৎসা ছড়ান। অবশ্য সকলে নন, দু-একজন।

সাংবাদিক জীবন কি আপনার সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিবন্ধক নয়?

—না, তা হবে কেন? বঙ্কিমচন্দ্র ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তাতে কি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাহত হয়েছে? তবে, সময় পাওয়া যায় না। সংবাদপত্রে কাজ করি বলে সারা পৃথিবীর খবরাখবর পাই। তাতে তো উপকারই হয়। খবরের কাগজ সাহিত্যের কমপ্লিমেণ্টারী।

—বিশেষ প্রতিনিধি

ড্রীমল্যান্ড

নির্মল সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাবলু চলে গেলে মিঃ ঘোষ সুব্রত চৌধুরীকে বললেন—সুব্রত, তুমি বুনো হাঁসের পিছনে ছুটছ কেন? তোমার ধারণা কি; মিসেস মুখার্জি নার্সের ঘরে গিয়ে তাকে ইনজেকসন দিয়েছে।

হেসে উঠলেন মিঃ ঘোষ। তাঁর মোটা, কালো দেহটা কেঁপে উঠল বারবার হাসির দমকে। সুব্রত তাকাল তার দিকে। তারপর বলল—কেতকী ড্রাগঅ্যাডিক্ট ছিল একথা যদি সত্যি হয় তাহলে মিসেস মুখার্জি তাকে সাহায্য করার ছলে ইনজেকসন দিতে পারেন। যারা ওষুধের নেশা করে তাদের অনেকেরই ডাক্তারের সাহায্যের দরকার হয়। তার পেটের যন্ত্রণা বন্ধ করার জন্য প্রথমে সে নানারকমের যন্ত্রণানিবারক ট্যাবলেট ব্যবহার করত। কিন্তু শেষে সেগুলোতেও যখন আর কাজ দিত না তখন সে মরফিন আর পেথিডিন ইনজেকসন নেওয়া শুরু করেছিল। এতে কাজ হত বেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা একটা দারুণ নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নেশার খোরাক কেতকী যোগাড় করত নানা উপয়ে। বেশী দাম দিয়ে বাইরে থেকে কেনা ছাড়াও নার্সিংহোমের ওষুধগুলো কাজে লাগাত সে। তার হাতসাফাই অবশ্য কেউ ধরতে পারেনি। এমনকি সন্দেহ পর্যন্ত করা যায় নি তাকে। কেতকী যে ড্রাগঅ্যাডিক্ট ছিল তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট থেকে। তার দেহে ইনজেকসনের অসংখ্য চিহ্ন ছিল। আমার ধারণা সনৎকে ভাল করে জেরা করলে সব বেরিয়ে পড়বে। তুমি এটা বুঝতে পারছ না কেন যে সনৎ মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত। দাদার হিংসায় সে ছোটবেলা থেকেই অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে একটু একটু করে। অবসেসন আর ম্যানিয়া থেকে মানুষ অনেক দুষ্কৃতি করে থাকে একথা ভুলে যেও না।

মিঃ ঘোষ অনেকদিন চাকরী করছেন। তিনি সুব্রত চৌধুরীকে স্নেহ করলেও কারণে অকারণে তাকে উপদেশ দেন অযাচিতভাবে। তার বিরুদ্ধেও ভাববার কথা আছে। স্বীকার করল [illegible] একে পঙ্গু তায় দাদার পাশে সে চিরকাল হেরে এসেছে। সুতরাং সরিৎ বিপদে পড়লে তার চেয়ে বেশী খুশী আর কেউ হবে না। একথা অস্বীকার করা যায় না।

তা ছাড়া মিঃ ঘোষ বললেন—কেতকীকে নিয়ে দু' ভায়ের মধ্যে যে বিরোধ জমে ছিল তার মূল্যও কম নয়। সনতের রাগ শুধু তার দাদার উপর নয়, কেতকীর ওপরও তার একটা দারুণ বিতৃষ্ণা এসেছিল।

বিতৃষ্ণা কেন—সুব্রত তাকাল মিঃ ঘোষের দিকে।

কি মুশকিল, এটা আর বুঝলে না; কেতকী সনতের সঙ্গে ফ্লার্ট করে সরিৎকে টানার চেষ্টা করছিল। সনৎ বোকা নয়। তার দাদার পাশে সে যে কি তা সে ভালভাবেই জানে। [illegible]

ব্যবহার করছে—এটা অনুমান করা তার পক্ষে শক্ত হয়নি।

আপনার যুক্তি জোরালো সন্দেহ নেই কিন্তু সরিতের কথাটা ভাবুন। তার মনে দুটো ভাবের উদয় হতে পারে, প্রথমত হিংসা দ্বিতীয়ত স্নেহ।

স্নেহ কার ওপর? মিঃ ঘোষের গলার ক্ষীণ আওয়াজটা আরও তীক্ষ্ন হল।

সনতের ওপর। ছোট থেকেই সনৎকে সে মানুষ করেছে। পঙ্গু ভাইকে সংসারেব অনাদর আর তাচ্ছিল্য থেকে রক্ষা করে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে। এটা কম কথা নয়।

সুব্রত, ওদের বাবার টাকা এবং মায়ের গয়নার সংবাদ আমরা জানি। সুতরাং মানুষ করার প্রশ্ন কি আছে।

আছে, শুধু টাকাতেই একজন অসহায় পঙ্গু ছেলে মানুষ হতে পারে না। তার ওপর নজর রাখতে হয়। তাকে আশ্রয় আর উৎসাহের যোগান দিতে হয় প্রচুর। শুধু তাই নয়, দীনার সঙ্গে বিয়ের পরও সরিৎ সনৎকে ছাড়ে নি।

তাতে আর একটা সমস্যা আসত সুব্রত। বাবার টাকা আর মায়ের গয়নার উচিত ভাগ দিতে হত ভাইকে পৃথক করতে গেলে।

প্রথম থেকে সরিৎ সেটা করলে তার পরিশ্রম, ব্যয় আর দুর্ভাবনার বোঝা অনেক কমে যেত।

মিঃ ঘোষ চুপ করে কি ভাবলেন। তারপর বললেন বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলাম যে সরিৎ তার ভাই সনৎকে স্নেহ করত। তাহলে সব জিনিসটা ভেবে দেখতে হয় গোড়া থেকে। কেতকীর মৃত্যু তিনজন চেয়েছিল—সরিৎ, দীনা আর সনৎ—কেমন।

হ্যাঁ, কিন্তু রাকেশ অ্যাডভানী আর বাবলু মন্ডলকেও বাদ দেওয়া যায় না। কারণ সহকারী হিসাবে বা নিজের স্বার্থের জন্যও তারা ও কাজ করতে পারে। রাকেশকে টেলিফোনে দীনা এ ধরনের ইঙ্গিত করেছে বলে রাকেশ স্বীকার করেছে। দীনা পাঞ্জাবী মেয়ে। রাকেশের সঙ্গে তার পূর্বে যোগাযোগ ছিল। হিংসার বশবর্তী হয়ে রাকেশকে দিয়ে সে এ কাজ করাতে পারে।

কিন্তু সুব্রত, উপায়ের কথাটা ভাব। রাকেশ একজন অপরিচিত লোক। সে কেতকীর ঘরে গিয়ে তাকে ইনজেকসন করে মারবে আর কেতকী চুপ করে থাকবে, এটা অসম্ভব নয় কি?

সুব্রতকে আরও বুদ্ধিমান বলে জানতেন মিঃ ঘোষ। সুব্রত কি যেন ভাবল কয়েক মুহূর্ত, তারপর বলল—কেতকীর ঘরের অবস্থাটা লক্ষ্য করেছিলেন। সব জিনিসপত্র চতুর্দিকে ছড়ানো। আর সবচেয়ে বড় কথা হল তার গয়না বা টাকা সব অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে—এটা কি করে সম্ভব।

তাহ'লে বাবলু কিংবা রাকেশকে ধরতে হয়। দুজনেই ও বিদ্যায় পারদর্শী। বললেন মিঃ ঘোষ।

হ্যাঁ, ওরা দুজনে মিলেও করতে পারে কারণ দুজনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল। আর দুজনেরই টাকার জরুরি প্রয়োজন ছিল একথা আমরা জানি। উৎসবের পর জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেলে ওরা হয়ত ওৎ পেতে ছিল কেতকীর জন্য। কিন্তু আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না—।

কি কথা? মিঃ ঘোষ তাকালেন সুব্রতর দিকে।

কেতকী কেন গান গাইল।

ইচ্ছে হয়েছিল, আর তাছাড়া সুপর্ণার পরেই সে গান গেয়ে সনতের কাছে প্রমাণ করে দিল যে সে সুপর্ণার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

ঠিকমত জবাব দিতে পেরে খুশী হলেন মিঃ ঘোষ।

কিন্তু কেতকীর সঙ্গে ত' সুপর্ণার পরিচয়ই নেই। তার কথা কেতকী জানল কি করে।

মেয়েদের তুমি চেন না সুব্রত। এখনও বিয়ে করলে না। সুন্দর চেহারা নিয়ে ফিল্মে না নেমে পুলিশে চাকরী নিয়েছ। মেয়েদের সঙ্গ এড়িয়ে যাও। তুমি ওদের মনস্তত্ত্বের কথা জানবে কি করে। হেসে উঠলেন মিঃ ঘোষ।

সুব্রত লাজুক মুখে বসে রইল চুপ করে। তার মনের মধ্যে কিন্তু একটা কথাই ঘুরছে বারবার। কেতকী কেন গান গাইল।

সুপর্ণা বাড়ীতে বাবার কাছে বসেছিল চুপ করে। তার মনটা হঠাৎ যেন দমে গিয়েছে। অবসাদ এসেছে দুশ্চিন্তার ফলে। সনৎকে পুলিশ যে টানাটানি করছে, তার ধনী বড় ভাই যে তাকে অপমান আর মিথ্যা দোষারোপ করে, এ সব জেনে সে যে শুধু দুঃখিত হয়েছে তা নয়, সনতের ওপর তার সমবেদনার মাত্রাটাও বেড়ে গিয়েছে। অসহায় লোকটাকে সাহায্য করতে কেউ প্রস্তুত নয়। বরঞ্চ তাকে ফাঁদে ফেলার জন্যই যেন সকলে উদগ্রীব হয়ে আছে বলে মনে হ'ল তার। কেতকী দেখতে সুন্দর ছিল তা সে নিজেই লক্ষ্য করেছে। গানও গাইত অপূর্ব। কিন্তু সুপর্ণা তার মধ্যে হিংসা করার মত কিছু পায় নি। সনতের কাছে সে সবই প্রায় শুনেছে। দীণা কেতকীকে হিংসে করত। করার কারণও ছিল যথেষ্ট তা সে বুঝেছে। কিন্তু একটা নার্সের অপমৃত্যুর দায়ে সনৎকে জড়াবার কোন সঙ্গত কারণ সে খুঁজে পায় নি এ পর্যন্ত। সনৎ কেতকীকে ভাল মনেই সিরিঞ্জটা দিয়েছিল নার্সিং হোমের কাজে লাগাবার জন্য। সেই কারণে তাকে অভিযুক্ত করার কি থাকতে পারে? যে মেয়ের উপর দাদার আসক্তি রয়েছে তার সঙ্গে জেনেশুনে ছোট ভাই নিজেকে জড়াবে কি রকম করে তাই ভেবে পাচ্ছিল না সুপর্ণা। সনৎকে ইদানীং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হয়েছে তার। ভদ্রলোক একেই ত মুখচোরা লাজুক প্রকৃতির তার ওপর এই ধরনের ব্যাপারে তার নাম জড়িত হয়ে পড়াতে সকলেই যেন তার ওপর বাঁকা দৃষ্টি হানছে অনবরত। কেউ কেউ আবার দু-একটা মন্তব্য করেছে বলেও শুনেছে সে।

ভবতোষবাবু লক্ষ্য করছিলেন তাঁর মেয়েকে। সে যেন একটা অজানা গভীর অরণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে হল তাঁর। তিনি বললেন, কি হল তোমার, অত ভাবছ কি?

না, কিছু নয়, ভাল লাগছে না যেন—উত্তর দিল সুপর্ণা।

শরীর ভাল আছে—মেয়ের দিকে তাকালেন ভবতোষবাবু।

হ্যাঁ, ভালই আছে।

অফিস যাবে না?

তাই ভাবছি। কেমন যেন যেতে ভাল লাগছে না।

ওটা তোমার আলস্য। অফিস চলে যাও। বাড়ীতে থাকলে আরও খারাপ লাগবে।

তাই যাই, উঠে পড়ল সুপর্ণা।

আর সে ছেলেটির খবর কি? ভবতোষবাবু সনতের কথা জানতে চাইলেন।

একই রকম। এখনও হাঙ্গামা চলছে।

ওকে একবার এখানে আসতে বল আজ।

অফিসে গিয়ে সুপর্ণা দেখল সনৎ অফিসে যায় নি। কয়েকজন সহকর্মী তার দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল। তারা
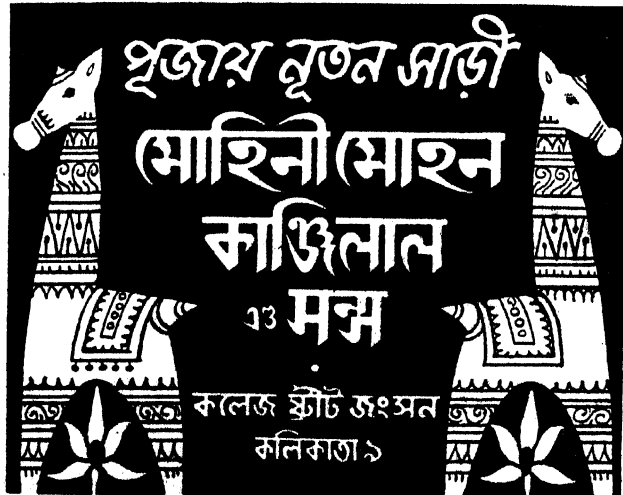
জানতে চায় সনতের দুরবস্থার কথা। পুলিশের কবলে সে পড়েছে এটা তারা আন্দাজ করে নিয়েছে। এখন অভিযুক্ত হলেই তারা খুশী হয়। একটা কেচ্ছার খোরাক হলে তাদের মন আনন্দে মেতে ওঠে।

সুপর্ণা একবার ভাবল অফিস থেকে সনৎকে ফোন করবে। কিন্তু অফিসের লোকদের কথা মনে পড়াতে নিরস্ত হল সে। ছুটি হতে সনৎদের বাড়ীর দিকে রওনা হল। বাড়ীটা সে ঠিক চেনে না। তবে ঠিকানাটা সনতের কাছে শুনেছে সে। তাই শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল বাড়ীটা। অত বড় বাড়ী আর লন দেখে সংকোচ হল তার প্রথমে, এমন কি ভয়ও পেয়ে গেল। একবার ফিরে যাওয়ার কথাও ভাবল। কিন্তু শেষে মনে জোর এনে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সনৎ তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল। অফিসে রোজই তার সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু সুপর্ণা বাড়ীতে আসাতে মানেটা অন্য রকমের হল। অনেক গুরুত্ব এল তার উপস্থিতির।

সনৎ তাকে আহ্বান জানিয়ে বলল—আপনি আসবেন আমি আশাই করতে পারিনি।

কিন্তু অফিসে যান নি কেন? চেয়ারে বসল সুপর্ণা।

সংকোচ বোধ হয়, সকলেই যেন তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

তাকালেই বা, ক্ষতি কি? বাড়ীতে বসে থাকলে আরও মন খারাপ হবে। বাবা আজ সেই কথাই বলছিলেন আমাকে।

কেন, আপনারও অফিস কামাই করার ইচ্ছে হয়েছিল?

হ্যাঁ, আজ ভেবেছিলাম, বাবার সঙ্গেই গল্প করে কাটিয়ে দেব সারাদিনটা।

সত্যি উনি খুব ভাল গল্প করতে পারেন, আমারও বেশ ভাল লাগে—বলল সনৎ।

সুপর্ণা সনতের ঘরের চারিদিক একবার দেখে নিয়ে বলল—অতবই পড়েছেন?

বই পড়তে ভালবাসি আমি। স্বীকার করল সনৎ।

আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আপনি একজন লেখক। তাছাড়া না পড়লে লিখবেন কি করে। সুপর্ণা নিজেই উত্তরটা দিয়ে দিল।

বই-এর র‍্যাক থেকে সুপর্ণার দৃষ্টিটা তিব্বতী মুখোশগুলোর দিকে গিয়ে থেমে গেল। বলল—কি বিকট দেখতে ওগুলো, দেখলে ভয় করে!

আমার কিন্তু ভাল লাগে। সনৎ তাকাল সেগুলোর দিকে তারপর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল—কি আশ্চর্য, আপনি অফিস থেকে এসেছেন অথচ চা পর্যন্ত দিই নি আপনাকে।

আপত্তি জানাবার আগেই সে ঘরের বাইরে চলে গেল।

সুপর্ণা উঠে ঘরের চারিদিকটা দেখল ভালভাবে। টেবিলের ওপর কতকগুলো টুকিটাকি জিনিস পড়ে ছিল। সেগুলো সাজিয়ে রাখল ঠিকভাবে।

সনতের ঘরের পরিবেশ ভাল লাগল সুপর্ণার। ঐশ্বর্যের অহংকার নেই, কিন্তু মধ্যবিত্তের পরিচ্ছন্নতার চিহ্ন আছে সেখানে। পুরুষমানুষের ঘর যে ধরনের হয় তাই খুব গোছানো নয়। কিন্তু তার মধ্যেই রুচির পরিচয় পেল সুপর্ণা। তিব্বতী মুখোশগুলোর দিকে আবার তাকাল সে। এমন বীভৎস মুখভঙ্গিকে সনৎ ভাল বলল কি করে তাই ভেবে আশ্চর্য হল সে। সুপর্ণা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল সনতের কথা ভেবে। মানুষের মানসিক দুর্বলতার কথা সে জানে। কিন্তু সনতের সব ব্যবহার আর কথাগুলো মনে করে তাকে ঠিক সুস্থ বা স্বাভাবিক বলে মনে হল না তার। কোথায় যেন সনতের মনের মধ্যে একটা জগদ্দল পাথর চেপে বসে আছে। সেইটাই সনতের কাছে একটা সুরক্ষিত দুর্গ। তার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে সে যেন আত্মরক্ষা করছে দিনের পর দিন। জগদ্দল পাথরটা কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিতে পারছে না যে তার ভারে সনৎ নিপীড়িত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। হয়ত একদিন নিষ্পিষ্ট হয়ে যেতে পারে তার প্রচণ্ড চাপে।

সনতের পরিচিত পায়ের আওয়াজটা শোনা গেল। চায়ের ট্রে সে নিজেই নিয়ে এসেছে।

আপনি নিজেই আনলেন—কুণ্ঠিত হল সুপর্ণা।

আপনি আমার সম্মানীয় অতিথি, সেবার আনন্দটা আমারই প্রাপ্য।

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে সুপর্ণা বলল—আজ আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।

কেন?

বাবার আদেশ। হাসল সুপর্ণা।

আপনি চাটা খেয়ে নিন ততক্ষণ, আমি কাপড়টা পাল্টে নিই।

পাশের ঘরে ঢুকল সনৎ।

সনৎ আর সুপর্ণা যখন বাড়ী গিয়ে পৌঁছাল তখন বেশ দেরী হয়ে গিয়েছে। ভবতোষবাবু বাইরের ঘরে বসে কয়েকখানা পুরানো পঞ্জিকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। তাঁর মুখভঙ্গি লক্ষ্য করে সুপর্ণা আর দেরী করল না, ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল চা করতে। এখনও ভবতোষবাবু যে চা পাননি সেটা আন্দাজ করে নিয়েছে সে।

আপনি আমায় ডেকেছিলেন। বলল সনৎ।

ও, হ্যাঁ। এতক্ষণ পরে তিনি সনৎকে ভাল করে লক্ষ্য করলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—সুপর্ণা কোথায় গেল, তাকে দেখছি না।

তিনি বোধহয় ভিতরে গিয়েছেন—উত্তর দিল সনৎ।

দেখুন আপনার সঙ্গে আজকাল প্রায়ই দেখা করতে ইচ্ছে করে আমার।

ভবতোষবাবুর কথাটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হল সনতের। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল তাঁর দিকে।। আমারও মনে হয় আপনার সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করি। আমি আপনার কথা শুনতে খুব ভালবাসি।

সুপর্ণা চা নিয়ে এল। ভবতোষবাবু চাটা খেলেন একটু একটু করে। মুখে একটা তৃপ্তির ভাব এলো তাঁর। মনটা সরেস হয়ে উঠল সেই সঙ্গে।

কবে আমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে? এই দেখ, তুমি বলে ফেললাম—হাসলেন ভবতোষবাবু।

তাতে কি হয়েছে, আমার কিন্তু শুনতে খুব ভালো লাগল। কিন্তু মাছ ধরার ব্যাপারে আমি একেবারে আনাড়ি।

তা হোক, তাতে কোন ক্ষতি হবে না। ইচ্ছেটা হচ্ছে আদত, ধৈর্য চাই আর তার সঙ্গে একাগ্রতা।

ও দুটোই আছে আমার—মৃদুস্বরে বলল সনৎ।

ব্যাস, ব্যাস, ওতেই হবে—উৎসাহে সোজা হয়ে বসলেন ভবতোষবাবু। তারপর বললেন—মাছ ধরা শুধু নেশা নয়—এটা একটা উঁচু দরের স্পোর্ট। এমন কি আর্ট বলতেও ক্ষতি নেই। বিলেতে দস্তুরমত মেছুড়েদের ক্লাব আছে। আমাদের দেশ কিন্তু, যে তিমিরে সেই তিমিরে। আর হবেই বা কি করে, পলিটিসিয়ানদের মধ্যে স্পোর্টসম্যান কজন? উত্তরের জন্য একটু অপেক্ষা করে নিজেই বললেন—একজনও নয়—হয় পেট-মোটা চারগুণ বেশী ওজনের না হয় শুকনো কাঠির মত মুড়প্রায় শরতানের দল। সে থাক, একটা মাছ ধরার গল্প বলি শোন—

তখন অল্পবয়স। মাছ ধরতে যাবার কথা ঠিক হল ইটখোলাতে। ধু ধু করছে জল চতুর্দিকে। নৌকোতে করে নিয়ে গিয়ে একটা বাঁশের মাচার ছেড়ে দিয়ে আসা হল। নির্জন দ্বীপে বসে মাছ ধর সারাদিন। মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টি-রোদ চলে যাবে, কোন খেয়ালই থাকবে না। এমন কি সময়টা যে কি ভাবে কেটে যাবে তাও বুঝতে পারবে না তুমি।

কিন্তু খাওয়া-দাওয়া—জিজ্ঞাসা করল সনৎ।

সঙ্গে যা ইচ্ছে নাও। তবে কি জান, তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ থাকে না। সে যাই হোক, গিয়ে তো বসলাম। বাঁশের মাচানে চার ফেলে বঁড়শি বেঁধে টোপ লাগিয়ে একটু ঝিমে ফেললাম সুতোটা, ফাতনাটা জেগে রইল জলের ওপর।

ঝিমটা কি? প্রশ্ন করল সনৎ।

ঝিম মানে একটু গভীর জলে আর কি। উত্তর দিলেন ভবতোষবাবু।

তার কৌতূহল জাগল সনতের। তারপর আর কি, সারাদিন তাকিয়ে আছি ফাতনার দিকে, কখন সেটা ডোবে।

ডুবলে কি হয়?

ফাতনা ডুবলেই বুঝবে মাছ টোপ খেয়েছে। তখন মারো খ্যাঁচ। হাতদুটো একত্রিত করে এমনভাবে টান মারলেন ভবতোষবাবু যে সনতের মনে হল তিনি ঘরে বসেই একটা প্রকাণ্ড মাছ ধরে ফেলেছেন।

—বঁড়শিটা আটকে যাবে মাছের মুখে, সুতোয় টান পড়বে,—উত্তেজনায় বলতে লাগলেন ভবতোষবাবু যে আর কড়-কড় কড়-কড় করে আওয়াজ হতে থাকবে হুইল থেকে।

আওয়াজ কেন? আবার সনৎ প্রশ্ন করল বোকার মতন।

কি মুশকিল, সুতোটা টানলে ত আওয়াজ হবেই। ওহো বুঝেছি, তুমি বোধহয় হুইল দেখনি।

সনৎ স্বীকার করল। ভবতোষবাবু, শুধু হুইল নয়, ছিপ, বঁড়শি, ফাতনা ইত্যাদি মাছ ধরার যাবতীয় সাজসরঞ্জাম সনৎকে দেখিয়ে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন: তারপর আবার তাঁর গল্পটা শুরু করলেন। তারপর কি হল শোন। হঠাৎ নজর পড়ল, মাচানের অপরপ্রান্তে একজন সাহেব চার করে বসেছেন। তার চারে যে একটা বড় মাছ ফুট কাটছে তা সে বুঝতে পারছে না। আমি আর থাকতে পারলাম না। সাহেবকে গিয়ে যেচে বললাম কথাটা। সাহেব একবার সেদিকে তাকিয়ে সিগারেট ফুঁকতে লাগল। একটু পরে ফাতনা ডুবল। সাহেবের একটা হাত ছিপের ওপর ছিল তাই রক্ষে। সাহেব তখন দুহাতে ছিপ ধরে আমায় ডাকছে প্লিজ হেলপ্, প্লিজ হেলপ্। অগত্যা কি আর করি। নিজের ছিপটা তুলে নিয়ে সাহেবকে সাহায্য করতে গেলাম। হাতে ছিপ নিয়েই বুঝেছি কি ব্যাপার। ছিপটা ধনুকের মতন বেঁকে গিয়েছে তখন। আর হুইলের ডাক শোনা যাচ্ছে কড়-কড় করে। তার বেগে মাছ ছুটে চলেছে সোজা ভাবে। প্রথমে খানিকটা খেলতে দিলাম। তারপর সুতো গোটাতে লাগলাম একটু একটু করে। আবার ছুটে চলে গেল অনেক দূরে। এইভাবে খেলিয়ে খেলিয়ে মাছটা যখন ক্লান্ত হয়ে গেল তখন তাকে ডাঙ্গায় তোলা হল অতিকষ্টে।

কত ওজন ছিল?

প্রায় এক মণ। কথাটা আস্তে করে বললেন ভবতোষবাবু। বাবা এ'র দেরী হয়ে যাচ্ছে—বলল সুপর্ণা।

অপ্রস্তুত হয়ে বললেন ভবতোষবাবু—তাই ত তোমার দেরী হয়ে গেল যে।

না, এমন আর কি। সনৎ উঠল।

তাহলে একটা পুকুর ঠিক করে ফেলি, কি বল।

হ্যাঁ করুন, তবে রবিবারে।

নিশ্চয়; তাছাড়া তোমার সময় কোথায়?

সনৎ আর দেরী করল না, বাইরে বেরিয়ে পড়ল। সুপর্ণাও তার সঙ্গে গেল।

মাছ ধরার এই গল্পটা বাবা সকলকেই বলেন। সুপর্ণা হেসে বলল। এতে ওঁর ক্লান্তি নেই। কিন্তু আপনি কি সত্যি বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবেন?

তাই ভাবছি। তখন ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম বটে, তারপরেই মনে পড়ল, মাথার উপর এখনও খড়্গ ঝুলছে।

মিথ্যে দুশ্চিন্তা করবেন না। সুপর্ণা সান্ত্বনার সুরে কথাটা বলল। তার মধ্যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত রয়েছে সুস্পষ্ট।

বাড়ী ফিরে এসে একটা খবর শুনে অবাক হয়ে গেল সনৎ। সরিৎ আর দীনা একসঙ্গে অনেকদিন পরে বেড়াতে বেরিয়েছে। সনতের নিজের মনটাও অনেক যেন হালকা হয়ে গিয়েছে। তার মনের ভারসাম্য সম্বন্ধে তার নিজেরই সন্দেহ আছে। কখনও কখনও দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় তার মন যেন অসাড় হয়ে যায়। কারণ সম্বন্ধে বিচার করার মত

...টুকুও থাকে না। কখন যে তার অগোচরে কালোমেঘের ঘনঘটায় তার মনের আকাশে দুর্যোগের সূত্রপাত করে তা সে নিজেই জানে না। আবার হয়ত তুচ্ছ কারণে ...তারার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পরক্ষণে। সনৎ নিজেকে নিয়ে কি করবে ভেবে পেল না।

সরিৎ খবরটা পুলিশ থেকেই পেয়েছিল। প্রথমে সে কথাটা বিশ্বাসই করতে পারে নি। দীনা তাকে এত সাংঘাতিক কথাটা লুকিয়েছে কেন তাই চিন্তা করছিল সে। রাকেশ আডভানীর সঙ্গে দীনার পরিচয় সম্ভব ছিল। কিন্তু সেটা যে এককালে গভীর প্রেমে দাঁড়িয়েছিল আর তাই নিয়ে রাকেশ এতদিন পরে দীনাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে এই সংবাদটা জেনে সরিৎ হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। খবরটা লুকিয়ে রাখার কারণ মনে মনে বিশ্লেষণ করল সে। দীনার মানসিক শক্তি প্রচুর; তাছাড়া সে জেদী আর রাগী, একথাও সরিৎ জানে। হয়ত সেই কারণে দীনা নিজেই ব্যাপারটার মোকাবিলা করতে চেয়েছে। কিংবা অবিবাহিত জীবনের দুর্বলতা বা ছেলেমানুষীকে সে জানতে দিতে নারাজ তাকে, এও একটা কারণ হতে পারে। আর একটা চিন্তাও তার মনে এল। দীনা কি এখনও রাকেশের প্রতি অনুরক্ত? তাও হতে পারে, ভাবল সরিৎ। কিন্তু যাই হোক, সমস্ত জিনিসটা তাকে পরিষ্কার করে নিতে হবে দীনার সঙ্গে। তাতে তার সঙ্গে যদি আরও তিক্ততার সৃষ্টি হয় তাও স্বীকার করতে হবে শক্ত হয়ে।

সেদিন সরিৎ নিজেই কথাটা পাড়ল দীনার কাছে। তোমাকে রাকেশ আডভানী ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। এ কথা জানাওনি কেন?

সরিৎ তাকিয়ে রইল দীনার দিকে।

জানিয়ে কি হবে। একটা বাজে জিনিস নিয়ে অযথা ঝামেলা করার দরকার নেই। শান্তগলায় উত্তর দিল দীনা।

চিঠির বদলে অ্যাডভানী কত টাকা চেয়েছে?

দীনা একবার সরিতের দিকে তাকাল। আশ্চর্য হল সে। সরিৎ জিনিসটাকে এত শান্তভাবে নেবে এটা তার ধারণার বাইরে ছিল। দীনা ভেবেছিল সরিতের কানে এ কথাটা গেলে নিশ্চয় সে দীনাকে অন্য-চোখে দেখবে, তাকে নীচ আর সামান্য মেয়ে বলে ধারণা হবে। দীনার সে ভয় কেটে গেল। সে উত্তর দিল—দশ হাজার টাকা।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সরিৎ তারপর বলল—তোমায়ও আমি একটা কথা গোপন করেছি।

কি কথা?

সনৎ যে অপারেশন থিয়েটারে আমার সঙ্গে কেতকীর ধস্তাধস্তির কথা বলেছিল তার কারণটা আমি গোপন করেছিলাম। কেতকী মরফিনের নেশা ছিল। নারসিংহোম থেকে নিয়মিতভাবে সে চুরি করছিল ওগুলো। সেদিন তাকে আমি হাতে-নাতে ধরেছিলাম। যখন ধরেছি তখন তার একহাতে মরফিন অন্যহাতে সিরিঞ্জ।

বল নি কেন আমায়?

বললে অনেক দিক দিয়ে ক্ষতি হতে পারত। তুমি হয়ত এ নিয়ে একটা সিন ক্রিয়েট করতে। হয়ত তাকে বিদায় করতে হত। তাতে বদনাম হোত নারসিংহোমের।

কথাটা শুনে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়ল দীনা। তারপর নিজের মনেই বারবার মৃদুস্বরে বলতে লাগল—ভুল করেছি আমি, ভুল করেছি।

সরিৎ একবার তার দিকে দেখে নেমে গেল নীচে! অনেক কাজ বাকী আছে তার।

গাড়ী নিয়ে প্রথমে সে অসীম ব্যানার্জীর নারসিংহোমে রাকেশ আডভানীর বাবা নারানদাস অ্যাডভানীর সঙ্গে দেখা করলে। নারানদাস এখন অনেক ভাল আছেন। কিছু দিনের মধ্যে তাঁকে ছুটি দেওয়া হবে। ডাঃ সরিৎ মুখার্জীকে দেখে তিনি অবাক হলেন একটু। কারণ সম্প্রতি তাঁর ডাক্তারের কোন প্রয়োজন নেই। এখন তিনি রোগমুক্ত। সরিৎকে দেখে খুশী হয়ে তিনি বললেন—ডাক্তারসাহেব, কি খবর—আমার বেটী কেমন আছে?

ভালই আছে। আপনার কাছে কিন্তু আমি নিজের প্রয়োজনে এসেছি আজ।

নিজের প্রয়োজন! অবাক হলেন নারানদাস।

আপনার ছেলে রাকেশের ব্যাপারে আপনার কাছে একটু পরামর্শ নিতে এসেছি।

কি হয়েছে খুলে বলুন আমাকে। অমঙ্গল আশংকায় নারানদাস ভয় পেয়েছেন।

রাকেশের কাছে দীনার পুরনো কতগুলো চিঠি আছে। তারই সুযোগ নিয়ে টাকা চাইছে সে দীনার কাছে।

কথাটা শুনে নারানদাস স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর একটু পরে সামলে নিয়ে বললেন—মানুষ যে কত নীচ হতে পারে, আমার পুত্র রাকেশকে না দেখলে তা বোঝা যাবে না।

আমি ভাবছি পুলিশের সাহায্য নেব কিনা।

তাতে কিছু লাভ হবে না ডাক্তারসাব। অন্য পন্থা অবলম্বন করতে হবে আপনাকে। আপনার স্ত্রীর সম্মান আপনাকেই রক্ষা করতে হবে।

কি করে? সরিৎ অবাক হয়ে তাকাল নারানদাসের দিকে। ওর কাছ থেকে জোর করে আপনাকে কেড়ে নিয়ে আসতে হবে চিঠিগুলো। এতে পুলিশ কিংবা নালিশ মোকদ্দমায় কাজ হয় না, নিজেকেই করে নিতে হয়। কথাটা বলে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন—আমার যদি বয়স কম আর স্বাস্থ্য ঠিক থাকত তাহলে আমিই এর ব্যবস্থা করতে পারতাম। এর চেয়ে ভাল ওষুধ নেই ডাক্তারসায়েব। ও ধরনের লোক ঐ ভাষাটাই বুঝতে পারে শুধু আর ভয়ও করে বিলক্ষণ।

সরিৎ উঠে পড়ল। নারানদাস তাকে ঠিকই উপদেশ দিয়েছেন। তার স্ত্রীর সম্মান তাকেই রক্ষা করতে হবে।

ডাঃ সরিৎ মুখার্জী শক্ত লোক। এমনিতে সহজ সাধারণ ভদ্রলোক, কথা কম বলে কিন্তু একবার গোঁ ধরলে তাকে পেরে ওঠা শক্ত। দীনাও তার চরিত্রের এদিকটা দেখে নি।

সরিৎকে কয়েকটা শক্তি পরীক্ষা দিতে হয়েছে জীবনে। ডাক্তার হিসাবে তার সাধারণ ব্যবহার ভদ্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভদ্রতার জন্য সে সম্মানকে ক্ষুন্ন হতে দেয় নি কখনও। সরিতের মনে পড়ল তখন সে হসপিটালের এমার্জেন্সী অফিসার। একদিন রাত্রে ডিউটিতে রয়েছে এমন সময় একজন ছুরিকাহত লোককে আনা হল। লোকটাকে দেখে গুন্ডাদলের লোক বলে মনে হল সকলের। মারাত্মকভাবে তাকে আহত করা হয়েছে। চিৎপুর এলাকায় তাকে এই অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। তার পরিচর্যা শেষ করে যখন সে রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত তখন একজন পশ্চিমীলোক তার কাছে এসে দাঁড়াল। মুখ তুলতেই সরিৎকে সে বলল—ডাক্তারসায়েব, রিপোর্টটা একটু হাল্কা করে লিখুন।

লোকটার স্পর্ধা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল সরিৎ। তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলেছিল—আমার যা লিখবার তাই লিখব।

ডাক্তারসায়েব, হাল্কা করে রিপোর্ট না লিখলে বিপদ হবে।

কার? জিজ্ঞাসা করেছিল সরিৎ।

আপনার। উত্তর দিয়েছিল লোকটা বিনাদ্বিধায়।

তার কথায় কান দেয়নি সরিৎ। নিয়মমতই রিপোর্ট লিখেছিল সে। সরিতের মনে আছে, তখন গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলায় তার ছুটি হল।

(ক্রমশঃ)

কি এবং কেন (১১) : নাইলন

আজকাল নাইলন কথাটির সঙ্গে প্রায় সকলেই পরিচিত। মোজা, ব্রাশ, দড়ি, গেঞ্জি, জামার কাপড়, প্যারাসুটের কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্য নাইলন অপর্যাপ্ত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই নাইলন এক জাতীয় প্লাস্টিকস। ইতিপূর্বে প্লাস্টিকস প্রসঙ্গে আলোচনায় আমরা জেনেছি, এক জাতীয় ক্ষুদ্র অণু বহু গুণিত হয়ে যৌগিক বহুগুণিতক বা অতিকায় অণুর (হাই পলিমার) সৃষ্টি করে। কিন্তু নাইলনের সৃষ্টি কৌশল একটু ভিন্ন রকমের। প্রখ্যাত রসায়নবিদ ওয়ালেশ এইচ ক্যারোসার হচ্ছেন নাইলন-এর আবিষ্কর্তা। তিনি হেকসা-মিথিলিন ডাইঅ্যামিন এবং অ্যাডিপিক অ্যাসিড এই দুটি রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া ঘটিয়ে নাইলন তৈরী করেছিলেন। এই প্রক্রিয়ায় দুটি ভিন্ন জাতীয় অণুর মধ্যে পরস্পর বিক্রিয়ার ফলে একটি জলের অণু বেরিয়ে যায়। তখন নতুন বৃহত্তর অণুটির সঙ্গে প্রথমোক্ত অণু দুটির আবার বিক্রিয়া ঘটে। তার ফলে বৃহত্তর অণুটির দুই প্রান্তে ঐ দুটি ক্ষুদ্রতর অণু জুড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে দুটি জলের অণু আবার বেরিয়ে যায়। এভাবে বৃহত্তর অণুটির কলেবর ক্রমশ আরো বড় হতে থাকে। এই রকম বিক্রিয়ার বার বার পুনরাবৃত্তির ফলে পরিশেষে একটি অতিকায় অণুর সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ঘন-বহুগুণন বা কনডেনসেশান পলিমারিজেশন।

নাইলনের অতিকায় অণুগুলি হাইড্রোজেন অণুর তুলনায় প্রায় দশ হাজার গুণ ভারী। এ থেকে হিসাব করে দেখা যায়, ৫০টি হেক্সামিথিলন ডাইঅ্যামিন এবং ৫০টি অ্যাডিপিক অ্যাসিড অণু পরস্পর জুড়ে নাইলনের এক-একটি অতিকায় অণু সৃষ্টি করে এবং এই প্রক্রিয়ায় ১০০টি জলের অণু বেরিয়ে যায়।

নাইলনের সুতো খুব শক্ত এবং টেকসই। একে টেনে ছেঁড়া খুব কঠিন। নাইলন জলে ভেজে না, একারণে নাইলনের জামা-কাপড় কাচবার পর সহজে শুকিয়ে যায়। সাধারণ সুতোর তুলনায় নাইলন অধিকতর নমনীয় ও প্রসরণশীল হওয়ায় মোজা, শৌখীন জামা, শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরীর জন্যে নাইলনের ব্যবহার আজকাল খুব ব্যাপক। এছাড়া বিশেষ স্থিতিস্থাপক গুণের জন্যে তন্তু হিসাবে নাইলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্লাস্টিক শিল্পে ছাঁচে ব্যবহারের উপযোগী পাউডার হিসাবেও নাইলনের ব্যবহার দিনের দিন বেড়েই চলেছে।

এই প্রসঙ্গে টেরিলিন বা ডেক্রনের কথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। টেরিলিনও নাইলনের মতো ঘন-বহুগুণিতক। তবে এগুলি হচ্ছে এস্টার জাতীয় পদার্থ। গ্লাইকল এবং টেরিথেলিক অ্যাসিডের সংযোগে এদের সৃষ্টি। অ্যালকোহল এবং অ্যাসিডের মধ্যে পরস্পর বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় বলে এদের সাধারণ নাম পলি-এস্টার। আজকাল টেরিলিন ও ডেক্রনের জামা-কাপড় ও পোশাকে বাজার ছেয়ে গেছে। শুধুমাত্র শাদা নয়, নানা রংয়ে রঞ্জিত নাইলন, টেরিলিন ও ডেক্রনের পোশাক-পরিচ্ছদ আজকাল পাওয়া যায়। টেরিলিন সুতোর সঙ্গে তুলোর সুতো মিশিয়ে টেরিকট সুতোয় তৈরী পোশাকও বাজারে চালু হয়েছে। কৃত্রিম তন্তু সম্পর্কে বর্তমানে যে ব্যাপক গবেষণা চলছে তাতে ভবিষ্যতে আরও কত রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ আমরা দেখতে পাব।

কাচ-মৃৎশিল্প

আমরা সকলেই জানি, কাচ হচ্ছে এক রকম স্বচ্ছ ভঙ্গুর কঠিন পদার্থ। যদিও আমরা সাধারণত কাচকে কঠিন পদার্থ বলে মনে করি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে কাচ হচ্ছে আসলে একরকম অতিশীতলীকৃত তরল পদার্থ যার সান্দ্রতা অত্যধিক। স্বাভাবিক অবস্থায় আকৃতিগত দিক থেকে কাচের স্থায়িত্ব যদিও বজায় থাকে, কিন্তু প্রত্যেক রকম কাচের একটা তাপমাত্রা স্তর আছে যে স্তরে কাচের উপাদানগুলির কেলাসন ঘটে। ইংরেজীতে কাচের এই কেলাসনকে বলা হয় 'ডি-ভিট্রিফিকেশন'। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বা মুখে ফুঁ দিয়ে কাচকে আকৃতি দেবার সময় যদি এই কেলাসন ঘটে, তার ফল হয় মারাত্মক। এই অবস্থায় শুধু যে কাচকে আকৃতি দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে তা নয়, সেই সঙ্গে কাচের ভৌত ধর্মেরও বিকৃতি ঘটে এবং সেই কাচ অকেজো হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যদি নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কাচের এই কেলাসন ঘটে, তাহলে কাচের ভৌত ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায় এবং সেই কাচ নানা কাজে বিশেষ উপযোগী হয়ে ওঠে।

নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কাচের কেলাসন সঙ্ঘটনের মূলরহস্য হচ্ছে, কাচকে এমন ভাবে কেলাসিত হতে দেওয়া যাতে কেবলমাত্র কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বিন্দুতে কাচ কেলাসিত না হয়ে সমগ্র আয়তনের বহুসংখ্যক বিন্দুতে এই কেলাসন ঘটে। এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় কাচের মধ্যে তামা, রুপো, সোনা বা প্লাটিনামের ক্ষুদ্র ধাতব কণিকা ছড়িয়ে দিয়ে—যে ধাতব কণিকাগুলিকে কেন্দ্র করে কেলাসন দানা বাঁধে। আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে কাচের মধ্যে টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড, ফসফরাস পেন্ট-অকসাইড বা জারকোনিয়াম অকসাইড ইত্যাদি ধাতব অকসাইড স্বল্প পরিমাণে অন্তর্মিশ্রিত করে। যদিও এই রাসায়নিক পদার্থগুলি গলিত কাচে দ্রবণীয় এবং কাচ ঠাণ্ডা হবার সময় দ্রবণীয়ই থেকে যায়, কিন্তু যদি উপযুক্ত তাপমাত্রায় কাচকে আবার উত্তপ্ত করা হয় তাহলে দুটি স্তরে পৃথক হয়ে যায়। এর পর আরও উত্তপ্ত করলে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় কাচের কেলাসন ঘটে, যার ফলে আণুবীক্ষণিক আকারের বহু-কেলাসিত নতুন একরকম কাচ সৃষ্টি হয়। এই নতুন ধরনের কাচকে ইংরেজিতে বলা হয় গ্লাস-সেরামিকস—বাংলায় বলতে পারি কাচ-মৃৎশিল্প।

গ্লাস-সেরামিকস প্রস্তুতের প্রণালী হচ্ছে প্রথম উপাদানগুলিকে অর্থাৎ বালি, অ্যালুমিনিয়াম অকসাইড, ম্যাগনেশিয়াম অকসাইড এবং ক্ষারীয় কার্বোনেটকে দানা-বাঁধার মাধ্যমে অর্থাৎ টাইটেনিয়াম ডাই-অকসাইড, ফসফরাস পেন্ট-আকসাইডের সঙ্গে গলিয়ে ফেলা। তারপর সেই গলিত কাচকে ছাঁচে ঢেলে, চাপ দিয়ে,

ফুঁ দিয়ে বা রোলারের মধ্যে চালিয়ে ইচ্ছামত আকৃতির দ্রব্যে পরিণত করা ও তারপর ধীরে ধীরে ক্রমশ ঠাণ্ডা করা। এই অবস্থায় কাচ স্বচ্ছ থাকে এবং তাতে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা যায় না। এর পর কাচের জিনিসগুলিকে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রার স্তরে রাখা হয়। এই নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় প্রথমে তাপমাত্রা এমনভাবে বাড়ানো হয় যাতে দানা বাঁধার কেন্দ্র গড়ে ওঠে এবং তারপর তাপমাত্রা আরও বাড়ানো হয় যাতে কেলাসন সম্পূর্ণ হতে পারে।

এইভাবে গঠিত বহু কেলাসিত কাচের ধর্ম উপাদানিক জিনিসগুলির ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সবচেয়ে চোখে-পড়া পার্থক্য হচ্ছে কাচ-মৃৎশিল্প সাধারণত অনচ্ছ বা তার মধ্য দিয়ে আলো ভেদ করলেও অস্বচ্ছ হয় এবং তার আভ্যন্তরীণ কেলাস-বিন্দু থেকে আলো বিকিরিত হয়ে থাকে। কিন্তু কয়েক রকম কাচ-মৃৎশিল্প আছে যেগুলি যদিও বিশেষভাবে কেলাসিত অথচ স্বচ্ছ। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে আলো বিশেষ বিকিরিত হয় না। কারণ এদের কেলাস খুব ছোট এবং প্রতিসরণাঙ্ক সাধারণ কাচের সমপর্যায়ের।

সাধারণ কাচের তুলনায় গ্লাস-সেরামিকস বা কাচ-মৃৎশিল্প অনেক বেশী শক্ত, অর্থাৎ চাপ ও ভার সহ্য করার ক্ষমতা বেশি। এই শ্রেণীর কাচের আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় অনেক বেশী তাপমাত্রার মধ্যে এদের তাপীয় প্রসরণাঙ্কের তারতম্য ঘটানো যায়। বৈদ্যুতিক অন্তরক-উপাদানের চেয়েও এদের এই তাপমাত্রার স্তর অনেক ব্যাপক। পোর্সিলেন (চীনা মাটি) বা অ্যালুমিনিয়াম-ঘটিত মৃৎশিল্পের চেয়ে কাচ-মৃৎশিল্পের বৈদ্যুতিক অন্তরক-ক্ষমতা অনেক বেশী।

কাচ-মৃৎশিল্পের বিশেষ বিশেষ গুণের জন্যে আজকাল নানা কাজে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্লাস-সেরামিকস-এর তাপীয়

সাধারণ কাচ এবং কাচ মৃৎশিল্পের নিদর্শন : এ-সাধারণ কাচ, বি-অনচ্ছ কেলাসিত কাচ মৃৎশিল্প, সি-স্বচ্ছ কেলাসিত কাচ মৃৎশিল্প
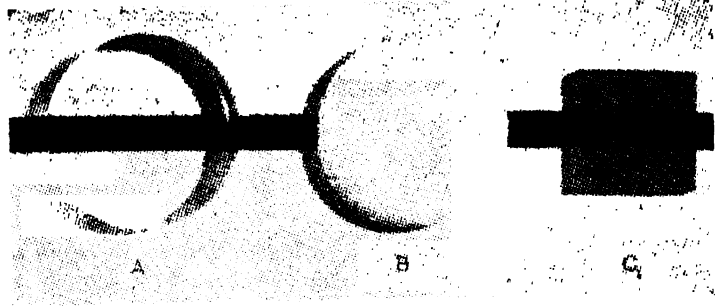
প্রসরণাঙ্ক যেমন খুব কম তেমনি তার দৃঢ়তা বেশি। এজন্যে রান্নার কাজে ব্যবহৃত পাত্রাদি প্রস্তুতের পক্ষে এটি বিশেষ উপযোগী। এই ধরনের পাত্র রেফিজারেটর থেকে উত্তপ্ত প্লেটে বসালেও এতে কাচের মতো ফাটল ধরে না। এছাড়া এর মসৃণ পৃষ্ঠদেশ সহজে পরিষ্কার করা যায় বলে এটি স্বাস্থ্যের দিক থেকে বেশ সুবিধাজনক।

কাচ-মৃৎশিল্পের পাত্র সহজে ভাঙে না এবং ঘষা-মাজায় এর বিশেষ ক্ষয় হয় না বলে কাপ ডিশ তৈরীর পক্ষে এটি বিশেষ উপযোগী।

কোনো কোনো ধরনের কাচ-মৃৎশিল্প এনামেলের মতো ধাতুর ওপর প্রলেপ হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে। এইভাবে প্রলেপ-লাগানো ইস্পাতে যেমন মরিচা রোধ করতে পারে তেমনি তাপও রোধ করে। একারণে রাসায়নিক ও খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের শিল্পে ব্যবহারের পক্ষে এই কাচ-মৃৎশিল্প খুবই উপযোগী।

কাচ-মৃৎশিল্পের উৎকৃষ্ট বৈদ্যুতিক ধর্মের জন্যে উন্নত ধরনের অন্তরক হিসাবে এর বিশেষ ব্যবহার হতে পারে। যেক্ষেত্রে অন্তরক উপাদান কোনো ধাতুর সঙ্গে এমন দৃঢ়ভাবে জোড়া দরকার যাতে বায়ুশূন্য হয় সেক্ষেত্রে কাচ-মৃৎশিল্প খুবই উপযোগী।

আগেই বলা হয়েছে, কাচ-মৃৎশিল্পের দ্রব্যাদি তাপে একেবারেই প্রসারিত হয় না বললেই চলে। এছাড়া, এর কেলাসগুলি অতিক্ষুদ্রাকার এবং একে খুব ভালোভাবে মসৃণ করে তোলা যায়। এই সমস্ত গুণের জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বৃহদাকার দূরবীনের দর্পণ প্রস্তুতের পক্ষে কাচ-মৃৎশিল্প বিশেষ উপযোগী।

সাম্প্রতিককালে সমুদ্র-বিজ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে পড়েছে। সমুদ্রগর্ভে গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি এমন উপাদানে তৈরী হওয়া দরকার যা বেশি চাপ সহ্য করতে পারে এবং সেই সঙ্গে যার মরিচা প্রতিরোধের ক্ষমতাও খুব বেশি। এদিক থেকে বিচার করলে গ্লাস-সেরামিকস বা কাচ-মৃৎশিল্প হচ্ছে এক্ষেত্রে আদর্শ উপাদান। কাচ-মৃৎশিল্পের বিশেষ গুণের জন্যে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রাদি প্রস্তুতের আরও নানাক্ষেত্রে এটি যে ভবিষ্যতে ব্যবহৃত হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আন্তর্জাতিক সমুদ্রতাত্ত্বিক সম্মেলন ও প্রদর্শনী

আজ মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা যেমন দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে, তেমনি অসীম সমুদ্রগর্ভে অজানা তথ্যের সন্ধানে বিজ্ঞানীদের অভিযান এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডের ব্রাইটনে প্রথম আন্তর্জাতিক সমুদ্রতাত্ত্বিক সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয়ে গেছে। বিশ্বের ২৫টি দেশের দেড় হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে সামুদ্রিক গবেষণার যন্ত্রপাতি ও তথ্যানুসন্ধান, সমুদ্রতলে পর্যবেক্ষণ ও যোগাযোগ, সামুদ্রিক খনিজ-দ্রব্য, সমুদ্র থেকে শক্তি আহরণ ও সমুদ্রের মৎস্য সংগ্রহ সম্পর্কে ১০০টি গবেষণা-নিবন্ধ পঠিত হয়। ১৪টি দেশের প্রায় ১৫০টি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। প্রদর্শনীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল একটি ব্রিটিশ শিল্প-প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত সমুদ্রগর্ভে পর্যবেক্ষণের বিশেষ উপযোগী 'এস-বি-ভি' নামে একটি অভিনব যান। এই যানটির পুরো নাম 'সী বেড ভেহিকল'। সমুদ্রগর্ভে ৬০০ ফিট পর্যন্ত নিমজ্জিত থেকে এই যানটি কয়েক-দিনব্যাপী পর্যবেক্ষণ-কাজ চালাতে পারবে। মাতৃজঠরে শিশুর পরিপুষ্টি যেমন তার নাভির সঙ্গে যুক্ত অপর একটি নাড়ীর মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি সমুদ্রের বুকে ভাসমান মূলযানের সঙ্গে একটি বিশেষ ধরনের যোগাযোগসূত্রের মাধ্যমে 'এস-বি-ভি' যান সমুদ্রগর্ভে চলাচলের শক্তি আহরণ করবে। সমুদ্রতলে নেমে চলাচলের জন্যে এই যানে বিশেষ ধরনের চাকা যুক্ত থাকবে। পর্যবেক্ষকরা যাতে সমুদ্রগর্ভে স্বাচ্ছন্দে ঘুমোতে ও রান্না করতে পারেন তার ব্যবস্থাও এই যানে থাকবে।

এক সংবাদে প্রকাশ যে, যারা বাবা হতে চলেছেন তাদের জন্যে মিউনিখে একটি স্কুল খোলা হয়েছে। বক্তৃতা ও চলচ্চিত্রের সাহায্যে এখানে সম্ভাব্য জনকদের একটি নবজীবনের কিভাবে সূত্রপাত হয় থেকে শুরু কোরে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া ও কিভাবে তাকে প্রতিপালন করতে হয়, সব কিছুই শেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিউনিখ হাসপাতাল সংলগ্ন এই স্কুলে তরুণ স্বামীদের ভীষণ ভীড় হচ্ছে। আরেকটি খবর পশ্চিম জার্মাণীর এই মিউনিখ হাসপাতালেই শুধু প্রসবের সময় স্বামীকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া হয় যদি স্ত্রীর ব্যক্তিগত আপত্তি না থাকে। অবশ্য এই হাসপাতালে প্রসূতিদের জন্যে আলাদা আলাদা কামরা আছে।

— [illegible]

তাঞ্জাম

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কয়েকটি ছেলেমেয়ে খানিকটা দূরে একটা ঝাঁকড়া আমগাছ তলায় খেলা করছিল, একটি বছর দশেকের মেয়ে এসে কলকেটা তুলে নিয়েছে, স্বরূপ হেসে বলল—'গদার মা এইটিকে বসিয়ে গেল দা'-ঠাকুর নিজের জায়গায়।'

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে ভেংচি কেটে একটু কড়া চোখে চেয়ে হন হন করে চলে যেতে আবার একটু হেসে উঠল স্বরূপ। প্রশ্ন করলাম—'নাতনী বুঝি?'

"ছোট মেয়ে সৈরভীর প্রেথম মেয়ে। গুড়ি গেল তা বুঝতে তো দিলে না যে গেছে, এইটি হয়েছে পাটরাণী, সব ছোট তো। বললে খেপে যায়।"

বললাম—"হওয়ার মতনও পাটরাণী, ফুটফুট করচে।"

'গদার মাও যে এসেছিল ঠিক এই রকমটি...মানে, য্যাখন এই রকম বয়েসেরটি তো... "

স্মৃতির উদ্বেলে গলাটা হঠাৎ ভারি হয়ে এসে একটা ঢোঁক গিলে চুপ করে গেল স্বরূপ। মুখটা নামিয়ে কাপড়ের খুঁটে চোখ দুটো মুছে নিল। একটু চুপচাপই গেল। মেয়েটি আর নিজে না এসে একটি ছোট ছেলেকে দিয়ে কলকেটা পাঠিয়ে দিয়েছে, সুবিধা হোল আমার একটু, সমবেদনার কথা যে খুঁজে পাচ্ছি না। নিঃশব্দেই খানিকটা টেনে গেলাম, স্বরূপ বাঁখারি-কাতা তুলে নিয়েছে। এরপর, কড়া তামাকই তো, চাপা দেওয়া সত্ত্বেও গোটা তিন চার কাশি বেরিয়ে পড়তে স্বরূপেরও যেন একটু সুবিধেই হোল, বলল—"দেন, সাদ্যি কি ও দা-কাটাকে সায়েস্তা করবার?' হুঁকো ফাৎ করে দিতে কলকেটা তুলে নিল। আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসার সুযোগ পেয়ে বললাম—"জামাই তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থাটুকু ভালোই করে দিলে "

'আপনিও ভাল বলবেন?'—কলকেটা নিজের হুঁকোয় বসাতে বসাতে আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল। একটু যে থতমত খেয়ে গিয়ে উত্তর খুঁজছি, তার মধ্যে ও নিজেই বলল—"সেই তো জামাইয়ের অন্ন-দাস হয়েই থাকা দা'ঠাকুর। উপায় নেই, মেনে নিতে হোল, তবে মন তো মেনে নিতে পারে না, পারে কি, আপনিই কন না?"

আরও ধাঁধায় পড়ে উত্তর হাতড়াচ্ছি, স্বরূপ গোটাকতক টানের পর ধোঁয়া ছেড়ে নিজেই আবার শুরু করল—

"তবে, হোল ব্যবস্তা, আবার ভেতরটা দেখে নিয়ে ব্যবস্তা করবার মতন ঐ ওপরে একজন বসে আছে তো। সে ভেতর-বার সব খুঁটিয়ে দেখে যে ব্যবস্তাটুকু করলে তাতে আর কারুর কিছু বলবার রইল না। দেরিও করলে না, দা'ঠাকুর। তারপর দিনই পাতঃকালে, চাকা ত্যাখন এই হাত কয়েক উঠে এসেচে পুবের আকাশে, আট বেয়ারার এক ডুলি হুম—হুম শব্দ করতে করতে সদর দরজায় এসে নামল, সঙ্গে একজন পাইক। শব্দ শুনে আম্মো হাতের পাট ছেড়ে বেইরে এয়েচি, দামোদর চৌধুরীও নেমে ভুঁয়ে দাঁড়াল, আমায় দেখে সুদোলে—'ঠাকুরমশায় বাড়িতে আচেন?'

স্বরূপ ছেড়ে দিয়ে আমায় প্রশ্ন করলে—"দামোদর চৌধুরীর কথা আপনাকে যেন বলেচি বলে মনে হচ্ছে দা'ঠাকুর।"

আমি একটু স্মৃতি-মন্থন করে উত্তর করলাম—"শুনেচি যেন মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেচি বৈকি, সেই ওর মেয়ের বিয়ে নিয়ে এদিককারই কোন জমিদারের সঙ্গে গোলমাল হয়—কলকাতা থেকে গড়ের বাদ্যি এসেছিল, শেষে..."

'কুসমীর জমিদার মিত্যুঞ্জয় রায়। বলেচি তাহলে আপনেকে। সেই যে দামোদর চৌধুরী এক বোষ্টম বুজরুকের পাল্লায় পড়ে অমন দুর্দান্ত শাক্ত জমিদার থেকে রাতারাতি কণ্ঠী নিয়ে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পরের ভালো করবার জন্য মেতে উঠল—বোতলের নেশা বন্ধ করে দানের নেশা আর পরের ভালো করার নেশায় গোটা জমিদারীটা পেরায় লাটে তুলে দিয়ে, শেষে একমাত্তর মেয়েকে কুসমীর ঐ মিত্যুঞ্জয়ের অপদাত্থ দোজবর ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলে—পড়চে মনে?'

বললাম—"হ্যাঁ, মনে পড়ছে। ত্যাগের একেবারে চূড়ান্ত করে ফেলবার জন্যে। কুসমী আবার এঁদের প্রবল শত্রু—তাই না? মনে পড়ছে। তোমার বাবা আবার তখন দামোদর চৌধুরীর খানসামা। পুরুষানুক্রমে চাকরী এঁদের কাছে। শেষে, আর কোন উপায় না দেখে রাণীমা মেয়েকে এনে তোমার বাবার পায়ে সঁপে দিয়ে বললেন—না বাঁচাতে পারো, গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিও।—এই রকম নয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"— এগিয়ে নিয়ে চলল কাহিনীটাকে স্বরূপ— "বিয়ের আগের দিনের ব্যাপার। শাক্ত বংশের ছাওয়াল, বুজরুক বৈরিগীর শিষ্যি হয়েই তো এই দশা; পরের দিন সব ঠিক-ঠাক, গোরার বাদ্যি করতে করতে কুসমীর বরযাত্রী এগিয়ে এসেছে—হঠাৎ সব গেল উল্টে একটি মন্তরে। আজ্ঞে মন্তর আর কিছু নয়, সন্দোকাল, পূর্বে দামোদর চৌধুরীর এই সময়টা বিলিতি মালের ব্যবস্থা ছেল, মায়ের পুজোয় সুদ্যু করা কারণবারি তার জায়গায় আজকাল এক গেলাস সরবৎ বরাদ্দ দাঁইড়্যেচে, বোষ্টোম তো? সেইটুকু চুমুক দিয়ে বরযাত্রীদের অভ্যাত্থনা ক'রতে বেরুবে, বাবা ইষ্টিদেবতার শরণ করে, সরবতের রূপোর গেলাসে এক নম্বর বিলিতি মাল ঢেলে এগিয়ে দিলে। আজ্ঞে মাস দুয়েকের উপোস, একেবারে চড়াং করে মাথার বেম্মতলে উঠে যাবে না সে জিনিস?

সঙ্গে সুমুন্দী মনাগাচির চিন্তামণি ঠাকুর রয়েছে—তিনিই জুগিয়ে এনেছেল বাবাজীকে—তানারও হাড়ির হাল ক'রে ছেড়ে দেচে। —এক গেলাস করে ঐ নরা সরবৎ পেটে পড়তে যেটুকু দেরি, তার পরেই শালা-ভগ্নীপোতের শুধু 'লে আও!' আর 'লে আও।' হুকুম বাবাকে—জিবের সেই পুরনো তার ফিরে এয়েচে তো। ইরই সঙ্গে ওদিকে সেই গোরার বাদ্যি। কুসমীর জমিদার মেয়ে কেড়ে নিতে আসচে শুনে—আজ্ঞে, ত্যাখন তো আর জ্ঞানগম্যি নেই—বাবাও সাজ্যেগুজ্যে সেই রকম ক'রে তুলে দেচে কানে—আর রক্ষে আচে? জেলেপাড়া, মণ্ডলপাড়া, বাগদীপাড়ার জমিদারি নেটেলরা—যারা লাঠি ছেড়ে এই আমার মতন ছিপচাচা নিয়ে পড়েছেল—বাবা সব ঠিক ক'রেই রেখেছেল, একেবারে ডাকাতের কুক্‌কি মেরে ঘাড়ে যেয়ে পড়ল কুসমীর বরযাত্রীদের...'

—দুলে দুলেই হেসে উঠল স্বরূপ।

মসনে গ্রাম নিয়ে স্বরূপের অনেকগুলি কাহিনীর অন্যতম, ঘটনাটা খুবই কৌতুক-জনক। —ওদিকে কেল্লা থেকে আনানো গোরার ব্যান্ডের সঙ্গে অত জাঁকজমক ক'রে আসা কুসমীর দু'শো লোকের বরযাত্রী ছত্রভঙ্গ, কে কোথায় পালাবে প্রাণ নিয়ে ঠিক নেই, এদিকে খাঁজা মিলিটারী-গোরারা, এই বুঝি এদের বিয়ের রেওয়াজ মনে ক'রে সমস্ত রাত পুরোদমে ব্যান্ড বাজিয়ে যাচ্ছে—মনে পড়ে গিয়ে আমারও হাসি সংবরণ করা দুষ্কর হ'য়ে উঠল।

খানিকটা এইভাবে কাটার পর স্বরূপ কলকেটা আবার আমার হুঁকায় বসিয়ে দিয়ে শুরু করল।

'ব্রেজঠাকরুণ গঙ্গাস্নানে গেছে, বাবা-ঠাকুর আহ্নিক সেরে এইবার তাক্ থেকে পুঁথিপত্তর নাব্যে নেকাপড়া করতে বস্‌বে, দামোদর চৌধুরী আর এন্তালার ওপিক্কে না ক'রে আমার সঙ্গে চলে এসে উঠোনে দাঁইড়ো বলল—'আমি এলুম ন্যায়রত্নমশাই, একটা বিশেষ প্রেয়োজনে।'

বাবাঠাকুর হন্তদন্ত হয়ে নেমে এল। একটা ঘর আসবাবে সাজানো রয়েচেই, নিয়ে গিয়ে একটা গদি-আঁটা চেয়ারে বসতে বলতে উনি একবার ঘরটার ওপর নজর বুলিয়ে নিয়ে বলল—'একেবারে যে সায়েব-বাড়ি ক'রে দিয়েচে দ্যাবা। না, আমি সেকেলে মানুষ, নীচেই বসি।'

ব'সে পড়ে হাতটা বাড়িয়ে বললে—'আগে একটু পায়ের ধুলো দিন।'

নিয়ে হাতটা বুকে কপালে ঠেকিয়ে বললে—'একটা বিশেষ প্রেয়োজনে এয়েচি ঠাকুরমশাই, ফিরিয়ে দিলে বাড়ি না গিয়ে ঘোষপুকুরে আপ্তহত্যে হব।'

সবটা কানে কেমন-কেমন ঠেকতে আমি ওর মুখের পানে সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়েছি, স্বরূপ বলল—'সবটুকু না শুনলে বুঝবেন না তো। বোষ্টম বুজরুকের হাত থেকে নিস্কিতি পেয়ে দামোদর চৌধুরী আবার সেই নিজের সাবেক চাল ধরেচে, সব্বদাই আবার সেই কমবেশ ক'রে আগেকার মতন রঙে থাকত। য্যাখন হয়তো খেলে না—আবার কারণ বের করে পুরুতঠাকুর দেবে তবে তো—ত্যাখনও পূর্বেকার জের একটু একটু থাকতই লেগে। নামল যা পাল্‌কি থেকে ঐ অবস্থাই। চেহারাটাও ছেল তেমনি, ইয়া লম্বা-চওড়া, টকটকে রঙ, গালপাট্টা। নামল, রেতের জেরে টানাটানা চোখ দুটো একটু লাল, পা দুটোও অল্প টলছে, কথা-কটা ব'লে গালচের ওপর বসে পড়ে মুখের পানে চেয়ে রইল বাবা-ঠাকুরের।

'বাবাঠাকুর যে ভেবড়ে গেল তার জন্যে এমন নয়। ত্যাখনকার দিনে পেরায় তাবৎ জমিদারের এই হাল দা'ঠাকুর। এক এনাদের রায়চৌধুরীদের দুই সরিক কি ক'রে বে'চে গেছল। অনেকে বলে, জামাই-বাবু যে বে'চে গেছল, কালেজে ইঞ্জিরি পড়া পড়েও সেটা কলকাতায় গিয়ে ওবধি ঐ যে এক বিদ্যেসাগরী হুজুগে পড়ে গিয়েছিল—য্যাতো বিধবাদের বিয়ে দিতে হবে, তার জন্যেই। কাকা নিশিকান্তও কি করে বাদ প'ড়ে গেছল। হয়তো দেখলে, ভাইপো যা পথ ধরেচে, উনি বেসামাল হ'লে তাকে আর সামলানো যাবে না। তবে অনেকে আবার বলে তাঁরও লুকিয়ে-চুরিয়ে চলত কখনও কখনও—তবে নাকি নেহাৎ কোন পালে-পাব্বনে। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন দা'ঠাকুর। আমি তো কখনও বে-চাল দেখি নি তানাকে।

ও-সব তেমন কিছু নতুন নয় বাবা-ঠাকুরের কাছে, দু'-চার ঘর জমিদার জজমানও তো ছেল বাইরে বাইরে, যেন কিছুই নয়, এইভাবে সুদোলেন—'ফিরবে কেন, তবে প্রেয়োজনটা কি তা' না বললে তো বুঝতে পারচি নে।'

না, 'জীবনে তো কিছু করতে পারলুম না ঠাকুরমশাই, এদিকে সময়ও হয়ে এলো, ভাবচি সেখানে গিয়ে জবাবটা কি দোব?'

—ভাব এসে গেলে মাতালরা আসোল কথা বলবার পূর্বে যেমন ইনিয়ে-বিনিয়ে শুরু করে আর কি। 'ওফ্' করে একটা দীগঘ নিঃশ্বেস ফেলে মাথাটা নীচু ক'রে কপালের চুলগুলো খামচে ধরলে। বাবা-ঠাকুর বললে—'বয়েস তোমার এমন আর কি? তবু, সবাইকেই তো একদিন যেতেই হবে। তা কি ঠিক করেচ?'

না,—'মায়ের নামে একটা টোল ক'রে দোব। আপনাকেই তার ঝক্কি নিতে হবে, আমি কোন মতেই শুনচি নে। আমি সব ব্যবস্তা ক'রে দোব, আপনার কোন রকম অসুবিধে হোতে দোব না। আমি কথা নিতে এয়েচি আপনার, না নিয়ে উঠচি নে।'

বাবাঠাকুর চুপ ক'রে রইল খানিকক্ষণ, উনিও মাথা নীচু ক'রে বসে আচে—তারপর—'কি আদেশ?' —বলে মাথা তুলতে বললে —'আমার তো আপত্তি কিছুই ছিল না দামোদর, তবে কাল রাত্তিরে দেবনারায়ণ বাবাজী এসে অন্য রকম ব্যবস্থা করে গেল—সে না রাজী হলে...'

শেষও করে নি ঠাকুরমশাই, ইনি চোখ দুটো পাকো উঠল একেবারে—'দ্যাবা শালা আপনাকে কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে! তার বুকের পাটা কম নয় তো' আমি শুনেচি কিছু কিছু। লোকে মনে করে, আবাগের ব্যাটা নেশাপত্তর নিয়ে পড়ে থাকে। আমি শুনেচি, ওরা দুজনে এসে ভালোমানুষ পেয়ে আপনের কাছ থেকে বাড়িটা হাতিয়ে নিয়ে গেছে ভুজুংভাজুং দিয়ে—আবার মতলব জোগাবার নতুন এক সঙ্গী পেলে তো।'

বাতা চাঁচতে চাঁচতেই বলে যাচ্ছিল স্বরূপ, মাঝখানেই ছেড়ে দিয়ে আমার পানে চেয়ে একটু হেসে বলল—'হ্যাঁ, বুঝেচি, আবার খানিকটে ধোঁকায় পড়ে গেচেন দ্যাবা শালা, তারপর আবার দিদি-মণিকেও তো টানলে মতলব জোগাবার নতুন মনিষ্যি বলে—ত্যাখন-ত্যাখনই না টেনে আসুক, মাতালেরই মেজাজ তো, ত্যাখনও খোঁয়ারিটে সম্পূন্ন ভাঙে নি, বেমক্কা মুখ দে' বেইরে যেতে কতক্ষণ?'

মন্তব্যটুকু ক'রে জিভ কাটল স্বরূপ, মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে নেড়ে বলল—'আজ্ঞে না, তা' কখনও পারে? ছটাকে মাতাল নয় তো। বলল যে তা ওনার বলবার হ'ক আচে বলেই কিনা, বিয়ের পর দিদিমণিকে টেনেও বলবার হক হয়েছে। আরও বেশি ক'রেই বলতে পারতো, তা নেহাৎ নাকি বাপই, ওনার সামনে এটুকু ব'লেই ছেড়ে দিলে। হক্ রয়েচে, উনি আবার খানিকটে দূর সম্পর্কে জামাইবাবুর বোনাই হয় যে। এ গেল এই দিকের কথা। তারপর ঐ যে সাত সকালে এসে—'আমার মায়ের নামে টোল করচি, আপনাকেই বসতে হবে,—তার মধ্যেও রহস্য রয়েচে তো।'

একটু হেসে আমার মুখের পানে চাইল স্বরূপ, কতকটা যেন আমি নিজে থেকে সেটা আবিষ্কার ক'রে নিতে পারি কিনা দেখবার জন্যে। আমি সে-চেষ্টা না ক'রেই প্রশ্ন করলাম —'কী সেটা?'

স্বরূপ আবার বাঁখারি-কাতা তুলে নিয়ে বলে চলল—'সেটা প্রেকাশ পেল অনেক পরে, তাও খুব জানাজানি হয়ে নয়, এখনও কেউ বলে সত্যি, কেউ বলে মিথ্যে। প্রেকাশ পেল, আমার বাবা চৌধুরী মশাইয়ের খাস চাকর ছেল বলে। সেই যে সিদিন আমি বাবাঠাকুর আর মাসীমা ব্রেজঠাকরুণের বিধবা-বিয়ের পরামর্শ দিতে চারজনে চার দিকে পালাল, জামাইবাবু সোজা গিয়ে চৌধুরী মশাইয়ের বাড়ী উঠল কিনা। এনাদের দেউড়ি যেমন মসনের উত্তর দিকে ওনাদের আবার একেবারে দক্ষিণ দিকে—মাঝখানে তো প্রায় কোশ খানেকের তফাৎ। সেখেনে ওনার খাস-কামরায় বসে দুজনে ঐ পরামর্শ হোল। বুঝলেন না? —তিনজনে একজোট হয়ে বাবাঠাকুরকে না হয় রাজী করালে, কিন্তু জামাইবাবু তো বুঝলে ব্যবস্তাটুকু কোন মতে মনঃপুত হ'তে পারে না শ্বশুরঠাকুরের। য্যাতই না কেন মনকে চোখ ঠারা হোক, আখের সেই তো মেয়ে-জামাইয়ের অন্নদাস হয়ে তাদের আশ্রয়ে থাকা। এ যা শেষ পর্যন্ত ব্যবস্তা হোল তাতে বাবাঠাকুর যেমন 'মায়েক' বাড়িটা যৌতুক দিলে—আজ্ঞে ধাপ সুদ্যাই বৌকি—ইদিকে দামোদর চৌধুরী মায়ের নামে টোল খুলবে বলে বাড়ি খুঁজতে,

জামাইবাবু ঋণ থেকে খালাশ করে বাড়িটা তানার হাতে বিক্রী করে দিলে। এর পর তো আর মেয়ে-জামাইয়ের সম্পত্তি রইল না। তারপর টোল বসিয়ে নফর, পাচক-বামুন, সব কিছুরই ব্যবস্তা চৌধুরী-মশাইয়ের নামেই হোল তো। এর মধ্যে কতখানি জামাই আর দিদিমণির হাত রয়েচে সেকথা প্রেকাশ পেল না বটে, তবে ধম্মত আর লোকত তো ভালোই হোল, যেমনটি ওনারা চেয়েছিল...'

প্রশ্ন করলাম—'আর বেজঠাকরুণ, তাঁর ব্যবস্থাটা?'

স্বরূপ বলল—'এবার তানার কথাতেই এসচি দাঠাকুর। তানাকে তো আরো চেপে চুপে ধরলে দু'জনেই। বাবাঠাকুরের পেটে ইলিম আচে, ঘর কয়েক শিষ্যিও আচে, এনার তো কিছুই নেই, অবলা মেয়েমানুষ— দিদিমণি বিস্তর কান্নাকাটি করলে, জামাইবাবু বললে—আপনার মেয়ে সংসারের কিছুই জানে না, পড়েও গেল একা, তাকে অন্তত কয়েকটা বছর শিখিয়ে পড়িয়ে দিন বাড়িতে থেকে—তারপরের ব্যবস্তা পরে। মানে আট্‌কে ফেলতে চায় আর কি, তারপর তো নিজেই মায়াতে আটকে যাবে! বেজঠাকরুণ রাজিও হোল না, গররাজীও হোল না। একেবারে দেউড়ির মধ্যে থেকে জামাইয়ের অন্নের গেরাস তুলবে সে ধরনের মেয়েছেলেই নয়, সম্বন্ধে উনি আবার বাবাঠাকুরের চেয়ে খানিকটা দূরেই তো। তবে মেয়ে-জামাইয়ের দেওয়া কিছু স্পর্শই করব না, এ ধরনের কোট্‌ করেও বসে রইল না। বললে—'বাবা, আমি মেয়ে-ছেলে, শাস্তোরে নাকি বলে শুনেচি—তাকে ছেলেবেলায় বাপমার তাঁবেয় থাকতে হবে, বয়েসকালে সোয়ামীর, তারপর শেষ বয়সে ছেলের। তা ছেলে বলতে আমার তো তুমিই, যা বলবে তা থেকে তফাৎ হবো কেন? তোমারই খাব, তোমারই পড়ব। তবে বয়েস হয়েচে, কোনকালেই ভগবান সংসারে জড়ালেন না, শেষ বয়সে আর তোমরা জড়াও কেন? দামোদর চৌধুরী কেমন টোল করে দিয়েচে মায়ের নামে, নেত্যও তেমনি মায়ের নামে একটা সদাব্রত করে দিক—উরির পাশে হলেই ভালো—আমি সেইটে দেখাশুনো করে, তোমাদের কল্যাণে যা্যতটুকু পারি পরকালের কাজ করি আর তোমাদের আশীব্বাদ করতে থাকি। তোমাদের সেবা নেওয়ার কথা বলচ, এর চেয়ে ভালো করে তোমাদের সেবা আর কি নেওয়া যায়?'

তাই করে দিল জামাইবাবু, আজ্ঞে, যেমন তেমন করে নয়। খিড়কির পুকুরটা কাটে সে এক রীতিমতো সরোবর হয়ে গেল; এপার-ওপার দু দিকে দুটো ঘাট। এদিকে এনাদের বাড়ি, তার পাশে টোলের আটচালা, তার পাশেই পুষ্করিণীর ওপারে সদাব্রতশালা, পাশেই বেজঠাকরুণের থাকবার বাড়ি। কোটা বইকি, তবে ছোট, দরকার নেই তো বড় বাড়ির। দুখানা ঘর, পুজোর ঘর, রান্নাঘর, শান বাঁধানো ঝকঝকে উঠোন। সদাব্রতশালার সব আলাদা ব্যবস্তা, হেঁসেল, থাকবার ঘর। চাকর, রসুইয়েও আলাদা। এদিকে বেজঠাকরুণের হেঁসেলের জন্যে একজন আলাদা বিধবা-বামুনের মেয়ে, একজন ঝি। সেই ভাঙা মন্দিরটা, যার মধ্যে সেই বিষ্টির রেতে জামাইবাবু দিদিমণির শাড়ি পরে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি গেল—বিয়ের অনেক আগে, মনে আচে নিশ্চয় আপনার—সেটারও তো গতি হয়ে গেল। মসনের কতকটা বাইরের দিকেই টিমটিম করছেল একটা পুরুতের বাড়ি, কেউ ঘুরেও চায় না—মাস কয়েক যেতে না যেতে ভোল পাল্টে গেল। এদিকে টোলে বাবাঠাকুরের শিষ্যির দল—যা্যখন শোন অং-বং সংস্কেত বুলি—উদিকে সদ্যাব্রেতশালায় অতিথিবৎসলের দল, আসছে-যাচ্ছে, ইদিকে মন্দিরে মেয়ে-পুরুষের যাওয়া আসা, সকাল সন্ধ্যেয় পুজো-আরতি—একটা তিথিস্থান হয়ে উঠল মসনের দক্ষিণপাড়া।

মাঝে মাঝে দিদিমণির পাল্কি এসে নামচে—হপ্তায় অন্তত পাঁচটা দিন তো বটেই। জামাইবাবুরও কোন না তিনটে-চারটে দিন?'

জিভ কেটে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ল স্বরূপ। বলল—'আজ্ঞে না, তা কি পারে শ্বশুরের কাচে বিলিতি পোষাকে ঘোড়ায় চড়ে এসে ইস্টাইল দেখাতে? এ তো আপনার বিলিতি কায়দায় শ্বশুরের সঙ্গে পাঞ্জা কষে হা-ডু-ডু খেলার জামাই নয়। দেখতুম পেরায় সন্দের সময়েই এসতো; নেমে মন্দির, ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি, টোল, সদাব্রেতশালা, সব ঘুরে আবার চলে যেত। যদি মাসীমা রইল তো তানার সঙ্গেও দেখা ক'রে।

আর দেখতে হয় তো মাসীমা বেজ-ঠাকরুণকে দেখুন। রুদয়াম্ভ যেন চরকি ঘুরে বেড়াচ্চে—বাবাঠাকুরের বাড়ির তাবৎ ব্যবস্তা, সদাব্রেত, পারলে তো মাঝখানে টোলেও একটু উঁকি মেরে গেল—আজ্ঞে না, নিস্‌পেক্‌টারি নয়—ঝাঁট-পাট আর সব ব্যবস্তা ঠিক আচে কিনা—তারপর দেউড়ি।

কথায় বলতে বোনঝির কাচে রইল না বটে, সংসার কি করে সাজাতে হয় তার টেনিংও দিলে না, তবে বাঁকিও তো কিছু রাখল দেখলুম না। পেরায়ই হুকুম হোত—স্বরূপে, যা গিয়ে পাল্‌কিটা নিয়ে আয় গে।"

ঘন্টাখানেক ঘন্টাদুয়েক কাটো, খবরাখবর নিয়ে চলে এল। তারপর আবার দিমিণির কোল আলো করে যা্যখন..."

(ক্রমশঃ)

মানুষগড়ার ইতিকথা
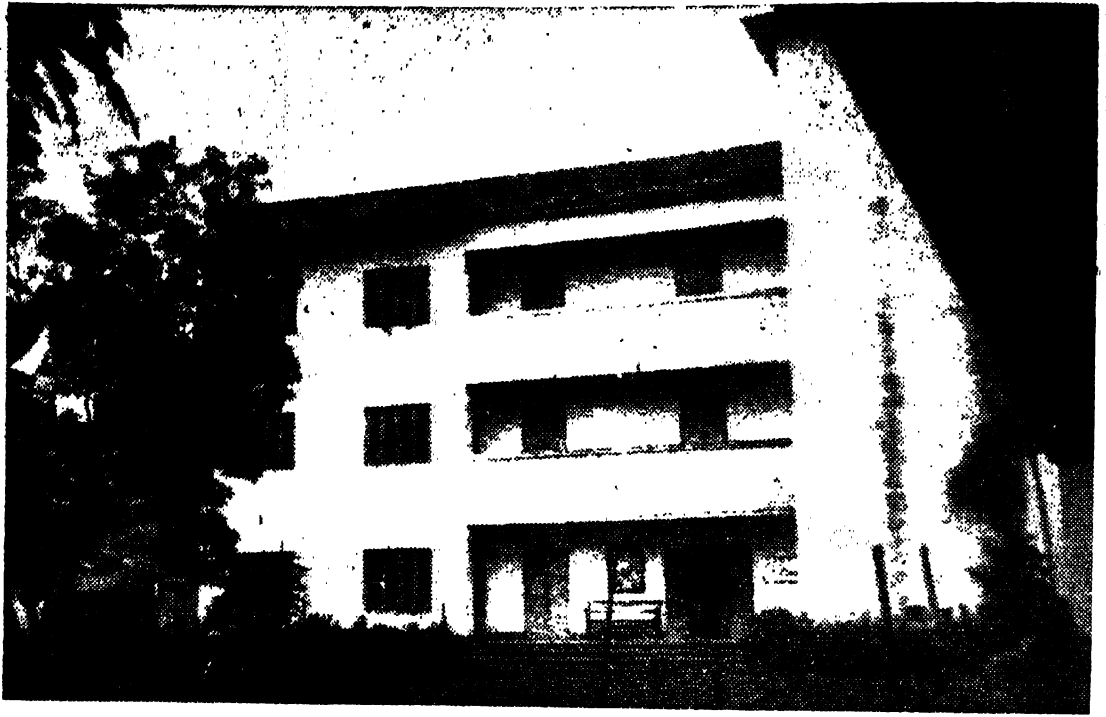
হঠাৎ একদিন আমাদের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আদেশ দিলেন—চলো কমল কুটিরে। সারিবন্ধভাবে দাঁড়িয়েছি—কতটার সময়, কি বার সবই ভুলে গেছি—মনে গাঁথা আছে সারিতে দাঁড়িয়ে আমরা ফিস ফিস করছি কারণ জানবার জন্য। সামরিক নিয়মে কর্তৃপক্ষের আদেশ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবার রীতি নাই। মার্চ করবার সময় অন্যদিকে তাকাবার হুকুম নাই। বিস্মিত হয়ে আমরা তাকিয়ে দেখলাম পদ্মফুল লাল, সাদা স্তূপীকৃত। পাঁচশ জোড়া চোখ ঐ পদ্মফুলের দিকে। কল্পনার চোখে আজও দেখতে পাই পদ্ম হাতে পদ্মের মত মুখগুলি বৌবাজারের রাস্তা দিয়ে সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে সারিবন্ধভাবে একজন একজন করে। তখনকার দিনে রাস্তায় মেয়েদের ঘোরা বিশেষ দেখা যেত না। এই দৃশ্য অনেকেই উপভোগ করেছিল। কমল কুটিরের ইংরেজী নাম ছিল লিলি কটেজ, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের বসতবাটী। জ্যেষ্ঠা কন্যা কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী ঐ বাটী বিদ্যালয়কে দান করেন। সেদিন আমরা উপনীত হলাম সুনীতি দেবীর সামনে। (প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী ননী ঘোষের স্মৃতিকথা)।

সেদিন সেই যে মেয়ের দল বৌবাজারের ঠিকানা ছেড়ে আপার সার্কুলার রোডে চলে এলেন, আর কোনদিন তাদের বাসা বদল করতে হয় নি। প্রতিষ্ঠাতার পুণ্য স্মৃতি-বিজড়িত বাসস্থানেই স্কুল স্থায়ী আশ্রয় পেল প্রতিষ্ঠার ছাপ্পান্ন বছর পরে। অথচ এই ছাপ্পান্ন বছরে কতবার যে স্কুলের ঠিকানা পাল্টেছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। শুধু কি ঠিকানা? না—পাল্টেছে প্রায় সব কিছুই। সেই আমূল পরিবর্তনের ইতিহাস জানতেই গিয়েছিলাম দিন কয়েক আগে ভিকটোরিয়া ইনস্টিটিউশনে।

রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর উল্টো দিকে আপার সার্কুলার রোড আর কেশব সেন লেনের মোড়ে রাস্তার ওপরে বাস স্টপের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে এক জোড়া তেতলা বাড়ি। বাড়ি দুটিকে যোগ করেছে দেড় মানুষ উঁচু লোহার গেট। আধ ভেজানো লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই সেই চিরন্তন পদ্মফুলের এলোমেলো অসংখ্য পাপড়ির রাশ দেখলাম সিঁড়িতে বারান্দায়, সান বাঁধানো রাস্তায়, ভেতরের ছোট লনে ছড়িয়ে রয়েছে। দেউড়িতে দারোয়ান মতোয়ান ছিল। পরিচয়-চিরকুট তার হাতে সঁপে জানালাম, আমি খোদ কর্ত্রীর সাক্ষাৎ প্রার্থী। ভয় ছিল, এত শত হালকা পলকা পদ্মের পাপড়ি জুড়ে যিনি গোটা শতদলের জন্ম দেন, না জানি বাইরের আবরণে তিনি কত রুক্ষ। বুকে ভয়, হাতে ফাইল, অফিসের কাউন্টারের এপারে দাঁড়িয়ে ঘাম মুছছিলাম। খবর এল, অন্দরে প্রবেশের ছাড়পত্র মিলেছে।

পুরু-পর্দার নিষেধাজ্ঞা সরিয়ে ভেতরে পা বাড়াতেই, বড় টেবিলের ওপাশ থেকে চেয়ার ছেড়ে যিনি উঠে দাঁড়ালেন তাঁর যুক্ত করের আড়ালে স্মিত হাসির প্রলেপ মাখানো মুখ দেখে মনে হল, আমি নিশ্চিন্ত। ছিমছাম গড়নের মানুষটির পরণের সাদা খোল শাড়ির নিপুণ পরিচ্ছন্নতা সারা অবয়ব জুড়ে। চশমার কাঁচ দুটির আড়ালে করুণার টলটল সরোবর। এই সরোবরের স্নিগ্ধতায় লালিত হচ্ছে আমাদের ঘরেরই শত শত কমল, মাত্র শতাব্দীকাল আগেও যে কমল অনাদরে অবহেলায় পাঁকের অন্ধকারে তিল তিল করে মৃত্যুবরণ করত, যার কথা কোনদিনও পুরুষপ্রধান বাঙালী সমাজের ভেতর বাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়ে বারবাড়ির সদরে এসে পৌঁছোত না। সেই অনাদৃত পুষ্পের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু যিনি রোধ করেছিলেন তাঁর কথা দিয়েই এই ইনস্টিটিউশনের অতীত কাহিনীর বর্ণনা শুরু করলেন বর্তমানের অধ্যক্ষা সুপ্রভা চৌধুরী

বিদ্যাসাগরের বয়স তখন পঞ্চাশ। শিশু রবীন্দ্রনাথ সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। এদেশে মহারাণীর শাসন-বয়স তেরো পেরিয়ে চোদ্দোয় পা দিয়েছে। এই তেরো বছরে কত পরিবর্তন ঘটে গেছে এদেশে। বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। বেথুনে স্কুলে মিস মেরী কার্পেন্টার শিক্ষয়িত্রী

তৈরীর জন্য খুলেছেন নর্মাল স্কুল। ঘরে-বাইরে নিত্য-পরিবর্তনের পূর্ণ জোয়ারে যুগসঞ্চিত সব অন্ধ কুসংস্কার ভেসে যাচ্ছে। নিঃশব্দে লোকচক্ষুর অগোচরে এক নতুন শক্তি জন্মলাভ করছে ঘরে ঘরে। যে শক্তির উদ্বোধন সাধনায় রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের সারাটা জীবন অতিবাহিত হয়েছে, সেই শক্তির নবজাগরণের সূচনায় দেশ পেল এক নতুন ঋত্বিককে। তিনি স্বয়ং কেশবচন্দ্র।

১৮৭০ সাল। বত্রিশ বছর বয়সে বিলেত গিয়েছিলেন কেশবচন্দ্র। 'কয়েক মাস পরে ইংলন্ড হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই নানা নূতন কাজের প্রস্তাব করিলেন। ইন্ডিয়ান রিফরম এ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে টেম্পারেন্স, এডুকেশন, চীপ লিটারেচার, টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন।

'এই সময়কার সর্বপ্রথম কার্য 'ভারত আশ্রম' স্থাপন। কেশববাবু ইংলন্ডে ইংরাজদের গৃহকর্ম দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া আসিয়াছিলেন। সর্বদা বলিতেন, মিডল ক্লাস ইংলিশ হোম-এর ন্যায় ইনস্টিটিউশন পৃথিবীতে নাই। তাঁহার মনে হইল কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারকে একত্র রাখিয়া, কিছুদিন, সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম, সময়ে কাজ, সময়ে উপাসনা—এইরূপ নিয়মাধীন রাখিয়া, শৃঙ্খলা মতো কাজ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার সেই ভাব লইয়া গিয়া চারিদিকের ব্রাহ্ম পরিবারে ব্যাপ্ত করিতে পারে। এই ভাব লইয়া তিনি ভারত আশ্রম স্থাপন করিলেন। ......আশ্রম স্থাপিত হইয়া প্রথমে কিছুদিন ১৩ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীট ভবনে ছিল।' (আত্মচরিত : শিবনাথ শাস্ত্রী)

আশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রী শিক্ষার প্রসার। তবে স্ত্রী শিক্ষা বলতে কেশবচন্দ্র কখনো কলেজী এডুকেশনকে বোঝেন নি। স্ত্রী শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট : "স্ত্রী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রকৃতি। উভয়ের স্বভাব ভিন্ন এবং অধিকারও ভিন্ন। দুই-জনেরই উন্নতির পথে চলিবার অধিকার এবং উভয়েরই তদুপযোগী স্বভাব আছে। কিন্তু এ অধিকার ভিন্ন, যদিও পরিমাণে সমান। বলসাপেক্ষ কার্য পুরুষ জাতির অধিকার, দয়া মমতার কার্য স্ত্রীজাতির কোমল প্রকৃতির উপযোগী।......স্ত্রীজাতির যথার্থ উন্নতি করিতে হইলে তাহাদের স্বাভাবিক কোমলতা ও মধুরতা রক্ষা করিতে হইবে। কাঁঠালকে আম্র বা আমড়াকে নিম্ব করিলে তাহাকে উন্নতি বলা যায় না। প্রকৃতি বিনাশ উন্নতি নহে। প্রকৃতি রক্ষা করা সর্বতোভাবে আবশ্যক। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা উচিত যে প্রকৃতি সঙ্গত শিক্ষা হইতেছে কি না?......ইতিহাস, অঙ্ক, ন্যায় প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া নবদ্বীপের পন্ডিত হওয়া যায়, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে সম্ভ্রান্ত লোকের বাটিতে বিদায় লাভ করা যায়, এক একজন স্ত্রী জগন্নাথ তর্ক পঞ্চাননের ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারেন। কিন্তু ইহা স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা, বিশুদ্ধ ভগ্নী হওয়া স্ত্রী জাতির জ্ঞানলাভের এই উদ্দেশ্য।"

এই উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলার জন্য মির্জাপুর স্ট্রীটের বাড়িতেই আশ্রমের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন একটি স্কুল, বুধবার, ১ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭১। আদিতে কি নাম ছিল, সঠিকভাবে জানা না গেলেও কখনো এই স্কুলটিকে বলা হয়েছে ফিমেল নর্মাল অ্যান্ড অ্যাডাল্ট স্কুল, কখনো দি নেটিভ লেডিজ নর্মাল অ্যান্ড অ্যাডাল্ট স্কুল। স্কুলের সভাপতি হলেন স্বয়ং কেশবচন্দ্র। সহ-সভাপতি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত।

নাম থেকেই বোঝা যায় যে স্কুলের দুটি অংশ ছিল—বয়স্কা মেয়েদের জন্য অ্যাডাল্ট স্কুল যেখানে আশ্রমিকদের স্ত্রী, বোন মেয়েরা পড়তে পারবে, নর্মাল স্কুল—শিক্ষয়িত্রী-শিক্ষণ কেন্দ্র। সেই সুদূর অতীতে যখন স্ত্রী শিক্ষার আদৌ কোন প্রসার এদেশে হয় নি তখনই কেশবচন্দ্র অনুভব করেছিলেন যে, স্ত্রী শিক্ষাকে পপুলারাইজ করতে হলে মেয়েদের দিয়েই মেয়েদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। চোখের সামনে বেথুন স্কুলে মিস মেরী কার্পেন্টারের ব্যর্থতা দেখেও তিনি নিরস্ত হন নি। জানতেন সাফল্য দূর-অস্ত।

তিনটি ক্লাসে চোদ্দটি মেয়ে স্কুল শুরু হোল। সিলেবাস কেশবচন্দ্র নিজেই তৈরী করলেন। প্রারম্ভিক শ্রেণীর পাঠ্য হল পি সি সরকারের ফিফথ বুক অব রিডিং, লেনির ইংরেজী গ্রামার, বাংলা গদ্য ও পদ্য, ইতিহাস, ভূগোল, বাল্মীকি রামায়ণ ও অঙ্ক। ম্যাককুলাকের কোর্স অব রীডিং, গ্রামার, ভূগোল, ইতিহাস, গদ্য, পদ্য (বাংলা), দর্শন ও অলঙ্কার শাস্ত্র হল দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ানো হত লেথব্রিজের সিলেকশন অব হায়ার ইংলিশ অ্যান্ড পোয়েট্রি, পদার্থ বিদ্যা, শারীর বিদ্যা, প্রাকৃতিক ভূগোল, পদ্মিনী উপাখ্যান ইত্যাদি. এ ছাড়া কণ্ঠসঙ্গীত, বাদ্যসঙ্গীত, সেলাই ও চিত্রাঙ্কন। সর্বোচ্চ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট হোল শেকসপীয়ারের নাটক, শ্রেষ্ঠ ইংরেজ লেখকদের গদ্য ও পদ্য রচনা এবং এ'সে।

এই সিলেবাস নিয়েই তাঁর সঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর মতবিরোধ হয়। শিবনাথ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বর্ষে স্কুলে জয়েন করেন। তাঁর সমসময়ে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় স্কুলে পড়াতে শুরু করেন। মতবিরোধের ঘটনাটি আত্মচরিতের পাতায় শাস্ত্রীমশাই উল্লেখ করেছেন 'আশ্রমে যে মহিলা বিদ্যালয় ছিল, তাহাতে কেশববাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি অনুসারে শিক্ষা দিবার বিরোধী ছিলেন। এমন কি, জ্যামিতি পড়ানো লইয়াও তাঁহার সহিত আমার তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। আমি জ্যামিতি, লজিক ও মেটাফিজিকস পড়াইতে চাহিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, এ সকল না পড়াইলে প্রকৃত চিন্তা শক্তি ফুটিবে না।' কেশববাবু বলিলেন, 'এ সকল পড়াইয়া কি হইবে? মেয়েরা আবার জ্যামিতি পড়িয়া কি করিবে? তদপেক্ষা এলিমেন্টারি প্রিন্সিপলস অব সায়েন্স মুখে মুখে শিখাও।' এই মতবিরোধের ঘটনাটি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, কেশবচন্দ্র স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে কলেজী এডুকেশনের বিরোধী ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা ও বিশুদ্ধ ভগ্নী তৈরী করা।

স্কুলের ছাত্রী তালিকায় প্রথম বছর যে কটি নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে রাধারাণী লাহিড়ী, রাজলক্ষ্মী সেন ও সৌদামিনী খাস্তগিরের নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে স্বয়ং কেশবপত্নী জগন্মোহিনী দেবী এ সময়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর ছাত্রী ছিলেন।

বছর শেষ হওয়ার আগেই ছাত্রী সংখ্যা চোদ্দ থেকে বেড়ে দাঁড়াল চব্বিশ। এই চব্বিশটি ছাত্রীকে পড়াতেন মিসেস দত্ত, মিস নিকলসন, পন্ডিত বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও পন্ডিত অঘোরনাথ গুপ্ত। এ সময় স্কুলের জন্য মাসে প্রায় দেড়শো টাকা ব্যয় হোত। পুরো টাকাটাই আসত ডোনেশন থেকে ঐ ডোনেশনের ওপরে নির্ভর করেই ঐ বছরের শেষের দিকে ডিসেম্বর মাসে লেডিজ স্কুলের সঙ্গে একটি গার্লস স্কুল

খোলা হোল। অল্পবয়সী মেয়েদের জন্য গার্লস স্কুল, বয়স্কাদের জন্য অ্যাডাল্ট স্কুল ও শিক্ষিকা গড়ে তোলার জন্য নর্মাল স্কুল—একই স্কুলের তিনটি বিভাগে তিন স্তরের পড়াশোনা চলতে লাগল।

ইতিমধ্যে স্কুল তার ঠিকানা পাল্টেছে। মির্জাপুরের বাড়ি ছেড়ে কাঁকুড়গাছিতে মহারাণী স্বর্ণময়ীর বাগান বাড়িতে আশ্রম উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলও উঠে যায়। এটা পরের বছর অর্থাৎ ১৮৭২ সালের ঘটনা। এ সময় শুধু নর্মাল স্কুলের মাসিক ব্যয় দাঁড়ায় একশো আশী টাকা। অ্যাডাল্ট স্কুলে চারটি ক্লাসে তখন চব্বিশটি মেয়ে পড়ছে। গার্লস স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোটে ছয়। তিনটি স্কুলই চলছে ডোনেশনের টাকায়। কিন্তু শুধু ডোনেশন নির্ভর করে যে এরকম একটা পরিকল্পনা কখনই সার্থক হতে পারে না, কেশবচন্দ্র তা জানতেন। তাই সরাসরি ছোট-লাট ক্যাম্পবেলকে পুরো ব্যাপার জানিয়ে একটা চিঠিতে সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সরকার কেশবচন্দ্রের অনুরোধে রাজি হয়ে অ্যাডাল্ট ও নর্মাল স্কুলের জন্য বছরে দু হাজার টাকা সাহায্য করতে সম্মত হলেন, তবে একটি শর্তে। শর্তটি হোল, সরকার যেমন বার্ষিক দু হাজার টাকা সাহায্য দেবেন তেমনি স্কুলকেও বার্ষিক দু হাজার টাকা যোগাড় করতে হবে বেসরকারী সোর্স থেকে।

পরের বছর ছাত্রী সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। অ্যাডাল্ট স্কুলে হল আটাশ আর গার্লস স্কুলে চল্লিশ। তখন ছ'জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা স্কুলে পড়াচ্ছেন। সুপারিনটেনডেন্ট মিসেস উইনস্। প্রথম বছর যারা স্কুলের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী ছিলেন সেই রাজলক্ষ্মী সেন ও রাধারাণী লাহিড়ী তখন পিউপিল-টিচার হিসাবে স্কুলে পড়াচ্ছেন।

বছর বছর ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে চলল। শুধু আশ্রমিকদের নয়, বাইরের ব্রাহ্মদের স্ত্রী, বোন, মেয়েরাও তখন স্কুলে পড়তে আসছে। সংখ্যার সঙ্গে তাল রেখে স্কুলের সুনামও বেড়েছে বহুগুণ। এই সুনামের কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায় বামাবোধিনী পত্রিকার ১৮৭৫ সালের মে সংখ্যায়ঃ 'ভারত সংস্কার সভায় শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৫ বৎসর চলিতেছে এবং এখানে যতগুলি বয়স্কা হিন্দু ছাত্রী অধ্যয়ন করে, বঙ্গদেশের আর কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। অধিক বয়স্কা শিক্ষার্থিনী ভদ্র রমনীগণের থাকিবার জন্য ভারতাশ্রম উপযুক্ত স্থান সমাবেশ করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের এতদূর উন্নতি হইয়াছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা যে ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন করেন, ইহার ছাত্রীরা তাহাই করিতেছেন।'

স্কুল চলছিল ঠিকই কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের ভেতরের ঝগড়ার ফলে ১৮৭৮ সালে আশ্রম ও স্কুল দুই বন্ধ হয়ে গেল। একদিকে ব্রাহ্মদের নিজেদের ঝগড়া অন্যদিকে সরকারী অনুদারতা। ঠিক এই সময়ে সরকার জানালেন যে স্কুলে ভাল মত পড়াশোনা হচ্ছে না বলে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করা হোল। ঠিক এর এক বছর আগে কেশবচন্দ্র আপার সার্কুলার রোডে মিস পিগটের স্কুল বাড়ি, লিলি কটেজ, কিনে নেন। জীবনের শেষ সাতটি বছর এই বাড়িতেই কেশবচন্দ্র কাটিয়েছেন। লিলি কটেজের নাম পাল্টে রাখেন কমল কুটির।

আভ্যন্তরীণ ঝগড়ার ফলেই শেষ পর্যন্ত ভারত আশ্রম বন্ধ হয়ে যায়, উঠে যায় স্কুল। কিন্তু হার জীবনে কখনো মানেন নি কেশবচন্দ্র। তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে আর তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবেন, তাও কি কখনো হয়? আশ্রম উঠে গেছে, গভর্ণমেণ্ট গ্র্যান্ট বন্ধ করে দিয়েছে তো কি হয়েছে, কেশব নতুন উদ্যমে উঠে-পড়ে লাগলেন। ঐ আটাত্তর সালেই তাঁর সদ্যমৃত স্কুলটিকে বাঁচিয়ে তুললেন মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল নামে। কাঁকুড়গাছির স্কুল নতুন নামে নতুন ঠিকানায়, বর্তমান রাজাবাজার ট্রামডিপোর জায়গায় ১০ নম্বর আপার সর্কুলার রোড লিলি কটেজের উল্টো দিকে যাত্রা শুরু করল। স্কুল চালু হোল তবে নর্মাল সেকশন উঠে গেল। নতুন স্কুলে প্রথম বছরই ত্রিশটি ছাত্রী ভর্তি হোল। সেদিন যাদের সহৃদয় সাহায্যে কেবশচন্দ্র তাঁর স্বপ্নকে বাঁচাতে পেরেছিলেন তাঁরা হলেন পাইকপাড়ার রাজা কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও কুমার কার্তিকচন্দ্র সিংহ। দুজনে দেড় হাজার টাকা সাহায্য করেছিলেন। নতুন স্কুলের সেক্রেটারী হলেন প্রসন্নকুমার সেন (প্রাক্তন ছাত্রী রাজলক্ষ্মী সেনের স্বামী ও বিশিষ্ট প্রচারক)।

স্কুল ফের গড়ে উঠলেও শিক্ষয়িত্রী বিভাগটি বাদ গিয়েছিল। সে কথা কেশবচন্দ্র ভোলেন নি। ভোলেন নি যে ঐ স্কুলটিই ছিল সেকালে এ দেশের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা পাওয়ার একমাত্র জায়গা। তাই চার বছর পরে ১৮৮২ সালে মহিলাদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার জন্য কেশবচন্দ্র একটি স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন—ইনস্টিটিউশন ফর দি হায়ার এডুকেশন অব নেটিভ লেডিজ। ইনসটিটিউশনের ঠিকানা হোল ৩২ নম্বর আপার সার্কুলার রোড মেয়েদের স্কুলের পাশাপাশি বয়স্কা মহিলাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য নিয়মিত লেকচার-ক্লাসের আয়োজন করতে লাগল ইনসটিটিউশন। ফি সপ্তাহে শনিবার শনিবার স্কুল বাড়িতে (১০ আপার সার্কুলার রোড) লেকচার শুনতে গড়ে প্রায় চল্লিশজন মহিলা উপস্থিত থাকতেন। আর বক্তৃতা দিতেন কারা? স্বয়ং কেশবচন্দ্র নীতি বিষয়ে, বিজ্ঞান বিষয়ে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার লাফোঁ, ইতিহাসে কেশবচন্দ্রের ছোট ভাই কৃষ্ণবিহারী সেন, নারীজীবন সম্পর্কে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শারীরবিদ্যা বিষয়ে ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির, প্রাচীন আর্য নারীদের আচার ব্যবহার সম্পর্কে পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র রায়।

পরের বছর ফিমেল স্কুল ইনসটিটিউশনের সঙ্গে মার্জ করে গেল। যুক্ত স্কুলের নতুন নাম রাখা হোল ভিকটোরিয়া কলেজ। 'মহারাণী ভিকটোরিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এই নাম রাখা হয়।' প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে নামে কলেজ হলেও এর সঙ্গে ইউনিভার্সিটির কোন যোগ ছিল না।

ফিমেল স্কুলের অস্তিত্বের দুটি বছরে যেসব ছাত্রী এখানে পড়েছেন, তার মধ্যে দুটি নাম চিরদিনই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে—ক্ষান্তমণি দত্ত ও মোহিনী খাস্তগির। মোহিনী পরবর্তী জীবনে কেশবচন্দ্রের পুত্রবধূ হন। ক্ষান্তমণি ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ দত্তের স্ত্রী।

ক্ষান্তমণি, মোহিনীর মত ছাত্রীরা যখন স্কুলের সুনাম দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে ৮ জানুয়ারী, ১৮৮৪ কমল কুটিরের সরোবরে পদ্মফোটার উৎসব চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্যে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়সে মারা যান কেশবচন্দ্র। তখন তাঁর স্কুলের বয়স মোটে চোদ্দ।

কেশবচন্দ্র চলে গেলেন, কিন্তু পিছনে রেখে গেলেন তাঁরই আদর্শে বিশ্বাসী ইস্পাত কঠিন একদল খাঁটি মিশনারী। এই মিশনারীরা সেদিন প্রতিষ্ঠাতার সমপরিমাণ স্নেহ, প্রেম ও মমতায় বুক দিয়ে রক্ষা করেছিলেন চোদ্দ বছরের কিশোরীটিকে। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর পাঁচ বছর প্রসন্নকুমার সেন ও পরবর্তী পাঁচ বছর প্রাণকৃষ্ণ দত্ত সম্পাদক হিসাবে স্কুলের সেবা করেছেন। এ সময়ে মিস পিগট কিছুদিন স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। ১৮৮৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক জয়কৃষ্ণ সেন এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ে যাঁরা ভিকটোরিয়ায় পড়েছেন তাঁদের মধ্যে কেবশচন্দ্রের মেয়ে সুচারু দেবী, উমেশচন্দ্র দত্তের মেয়ে শান্তশীলা দেবী ও প্রচারক অমৃতলাল বসুর মেয়ে চিত্তবিনোদিনী বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্কুলের প্রায় যাবতীয় খরচাই যোগাতেন সুচারু দেবীর বড়দি কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী (মাসিক তিনশো টাকা পর্যন্ত)।

ঠিক এই সময়ে পুরোনো ১০ নম্বর আপার সার্কুলার রোডের বাড়ি ছেড়ে স্কুল উঠে গেল ২০ নম্বর বিডন স্ট্রীটের একটা দোতলা বাড়িতে। একতলায় কলেজ ও স্কুলের ক্লাস হত। কথা ছিল দোতলায় হবে বোর্ডিং। স্কুলের সুপারিনটেনডেনট তখন মিসেস স্ট্যানলী। সুপারিনটেন্ডেনট ছাড়া আরো তিনজন টিচার ছিলেন। কলেজে পড়ানো হোত ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এছাড়া
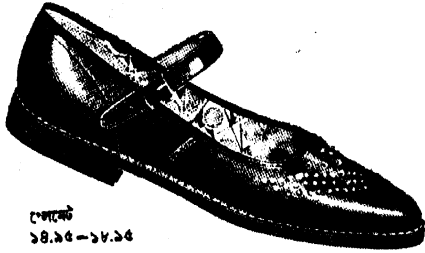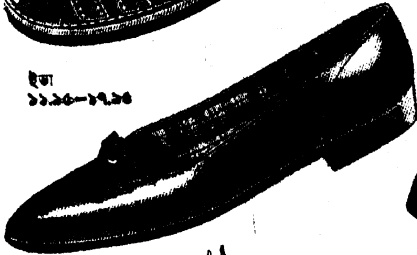
দাপাদাপি, হুড়োহুড়ি…
সকল রকম ধকল
সইতেই তৈরি
বাটার ছোটদের জুতো
পায়ের আকারে ও জুতোর গঠনে যখন যথার্থ মিল,
জুতো তখনই হয় আরামের আধার, আর
রীতিমতো টেকসই। বাটার ছোটদের জুতোর
যে নকশা তার মূলে আছে এই আরামনীতি।
তাই স্কুলের পথে বা খেলার মাঠে ছোটদের পায়ে
বাটার জুতো আজীবন খুশি পায়ে চলার সহায়।
সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা,
খাপ খাওয়ানো গোড়ালির গড়ন, আর
নমনীয় তলি—বাটার জুতোর এইসব বৈশিষ্ট্যের
গুণেই সুঠাম গঠনে বেড়ে ওঠে ছোটদের পা।
রঙের বাহারে নকশায় অসংখ্য জুতো এখন মজুত
বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন
আপনার বাচ্চাদের, এদের খুশি পায়েই
শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।
Bata
প্লেমেট
১৪.৯৫—১৮.৯৫
সম্বা
১২.৯৫—১৪.৯৫
ইভা
১১.৯৫—১৭.৯৫
পিন্টু
৬.৮০—১২.৯৫
সুপারটাফ
১৩.৯৫—২২.৯৫

ছবি আঁকতে বাজনা বাজাতে শেখানো হত। সপ্তাহে ক্লাস হত পাঁচদিন।
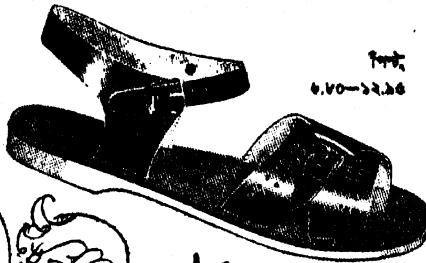
কিন্তু সবার চেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমশই কলেজের অবস্থা হয়ে উঠেছিল সঙ্গীন। আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাবে স্কুল সেকশন প্রায় উঠে যায় যায়। সুনীতি দেবীর যথাসাধ্য সাহায্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কলেজ উঠে গেল। গত শতাব্দীর শেষ দুটি বছরে কলেজের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আজ আর পাওয়া যায় না।

বছর দুয়েক বন্ধ থাকার পর কলেজ আবার খুলল, ১১ আগস্ট ১৯০১। বন্ধ থাকার কারণ হিসাবে মনে করা হয় আর্থিক অস্বাচ্ছল্য ও সহরে প্লেগের ভয়াবহ আক্রমণ। গত শতাব্দীর শেষ দশকে যাদের সাহায্যে ও সক্রিয় সহযোগিতায় কোন রকমে কলেজ টিকে ছিল, তারাই অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে আবার নতুন করে কলেজের হাল ধরলেন। ইতিমধ্যে কলেজের ঠিকানা আবার পাল্টেছে। ১৮৯৫ সালে বিডন স্ট্রীট ছেড়ে ২৪ পটলডাঙ্গা স্ট্রীটে উঠে এসেছে স্কুল। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে ৬৪।২ মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে কলেজের নবযাত্রার দিনগুলি শুরু হোল। সুপারিনটেনডেনট হলেন ব্রজগোপাল নিয়োগী। শুরুতেই সতেরোটি মেয়ে ভর্তি হোল।

নতুন পর্যায়ে কলেজের নাম পাল্টে রাখা হোল ভিকটোরিয়া ইনস্টিটিউশন। নামধাম পাল্টেও ইনস্টিটিউশন তার সাবেকী চরিত্র বজায় রাখে। আগের মতই লেকচার ক্লাসের আয়োজন করা হল। আগে হত সপ্তাহে একদিন, শনিবার। এবার সপ্তাহে তিনদিন। কলকাতা ও শহরতলী থেকে গড়ে প্রায় শতখানেক মহিলা প্রতিটি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতেন। এসব ক্লাসে মেয়েদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কলেজের ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহার করা হোত। আজ থেকে ষাট সত্তর বছর আগেও সম্ভ্রান্ত বাঙালী হিন্দু সমাজের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এই ভিকটোরিয়া ইনস্টিটিউশন। বাঙলার লেকচার কোর্সের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হত। কলেজী শিক্ষা ব্যবস্থা তখনো আজকের মত এত পপুলার হয়নি। একথা মনে রাখা দরকার।

কিন্তু এক যুগও পার হোল না ইনস্টিটিউশনের ক্যারেকটার আমূলে পাল্টে গেল। কেশবচন্দ্র নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে এসে এদেশের আর পাঁচটা স্কুলের মত ভিকটোরিয়া ইনস্টিটিউশন ও ইউনিভার্সিটি প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাই অনুসরণ করল। ধীরে ধীরে লেকচার কোর্স উঠে গেল, ইনস্টিটিউশন একটি পুরোদস্তুর মডার্ণ স্কুলে পরিণত হল, ১৯১১ সাল। এবছর থেকেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরী করা শুরু হোল। প্রতিষ্ঠা ইস্তক চল্লিশ বছর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিও এদেশের শত শত স্কুলের তালিকায় আর একটি সংযোজন হল মাত্র। অবিশ্যি তখন পুরোনো দিনের শেষ যোগসূত্রটিও ছিন্ন হয়ে গেছে। ফিমেল অ্যাডাল্ট ও নর্মাল স্কুলে শিবনাথ শাস্ত্রীর সম-সময়ে যে মানুষটি কাঁকুড়গাছির ভারত আশ্রমে পড়তে এসেছিলেন, নীরবে শত বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে দীর্ঘ ঊনচল্লিশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের পর তিনিও এবার বিশ্রাম নিলেন। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মারা যান ১৯১১ সালে। তখন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সেক্রেটারী প্রশান্তকুমার সেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাঃ আর এল দত্ত, এন সি সেন, ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রভৃতি।

দু বছর পরে ইউনিভার্সিটির অনুমোদন পেল স্কুল। ঐ বছর মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে ২০ নম্বর বিডন স্ট্রীটের বাসায় স্কুল উঠে এল। পরের বছর প্রথম এ স্কুলের ছাত্রীরা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলেন। প্রথমবার দুজন ছাত্রী ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। ঐ চৌদ্দ সাল থেকেই স্কুল নিয়মিত ভাবে দুশো তিরিশ টাকা সরকারী সাহায্য পেতে থাকে, যে সাহায্য একদিন সম্পূর্ণ বাজে অছিলায় সরকার দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। এই সময়ে স্কুলে হেড মিস্ট্রেস ছিলেন লীলাবতী ঘোষ। যতদিন স্কুল পুরোনো আদর্শ বজায় রেখে চলেছে ততদিন স্কুলের পরিচালক পদটির নাম ছিল সুপারিনটেনডেন্ট। নতুন হেডমিস্ট্রেস হলেন স্কুলের সর্বাধিনায়ক।

পনেরো সালে ঠিকানা আবার পাল্টাল। বিডন স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে স্কুল উঠে গেল বৌবাজার স্ট্রীটে। ১৫৯এ ও ১৬০ নম্বর বাড়ি দুটিতে স্কুলের জায়গা হল। এই ঠিকানাই স্কুলের শেষ অস্থায়ী আস্তানা।

এই অস্থায়ী আস্তানায় একটি যুগ কেটেছে স্কুলের। এ সময়ে যাদের সুযোগ্য পরিচালনায় ও শিক্ষকতায় প্রতিদিন স্কুল উন্নতি লাভ করেছে, তাঁদের অন্যতমা ছিলেন হেডমিস্ট্রেস নির্ঝরপ্রিয়া ঘোষ। লীলাবতীর পরই নির্ঝরপ্রিয়া স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হন। আঠারো সালে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য লন্ডনে দুবছর থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে অ্যাকটিং হেডমিস্ট্রেস হিসাবে স্কুল চালান শ্রীমতী জে ঘোষ। একুশ সালে নির্ঝরপ্রিয়া আবার স্কুলে পুরোনো পোস্টে ফিরে এলেন। পরের বছর স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেন সরযূ ঘোষ। কিন্তু সরকারও এই সময়ে স্কুলে জয়েন করেন। তখন মেয়েদের গান শেখাতেন স্বয়ং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধীরে ধীরে স্কুলের চেহারা পুরোটাই পাল্টে গেল। আশ্রমের পুরোনো অ্যাটমসফিয়ার জায়গা করে দিল নতুন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থাকে। এখন আর বয়স্কা মহিলারা লেকচার ক্লাস শুনতে আসেন না, তার বদলে স্কুলের গাড়িতে চেপে টালা টু টালিগঞ্জ গোটা শহরের মেয়েরা আসে স্কুলে পড়তে। এত মেয়ের জায়গা হয় না বৌবাজারের বাসায়। ম্যানেজিং কমিটি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন। তখন স্কুলের প্রেসিডেন্ট সুনীতি দেবী। একটা কিছু করা দরকার। ভাড়া বাড়িতে আর কতদিন চলে? ধার-কর্জ করে সদ্য গড়ে ওঠা নিউ পার্ক স্ট্রীটে কিছুটা জমিও কেনা হয়েছে। সেই দেনা কি করে মেটানো যাবে, এই চিন্তায় তখন স্কুল রীতিমত বিব্রত। আর ঠিক তখনই সেই আশ্চর্য সুন্দর ঘটনাটি ঘটল।

প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর আদেশ ছাত্রীরা শুনতে পেল—চলো কমল-কুটিরে। বৌবাজার থেকে আপার সার্কুলার রোড, হয়তো ফুট, গজ, মাইলে দূরত্ব এমন কিছু নয়। কিন্তু সেদিন এই পথটুকু যার সাহায্যে ছাত্রীরা অতিক্রম করেছিলেন তিনি কেশবচন্দ্রেরই মেয়ে সুনীতি দেবী। সাতাশ সালের জুন মাসে মহারাণী সাড়ে চার বিঘা জমি সমেত কমল-কুটির কিনে নিয়ে ইনস্টিটিউশনকে দান করলেন। তখনকার দিনেই এই সম্পত্তির দাম ছিল আড়াই লাখ টাকা। "এই সম্পত্তির সঙ্গে অবশ্য এক লক্ষ টাকার ঋণভার বিদ্যালয়কে গ্রহণ করতে হয়েছিল। পার্কসার্কাসের (অর্থাৎ নিউ পার্ক স্ট্রীটের) জমি বিক্রয় করে এই ঋণ শোধের ব্যবস্থা হয়।"

স্কুলের নবলব্ধ সম্পত্তির ঠিকমত দেখাশোনার জন্য একটি ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করা হল। সদস্য হলেন স্যার রাজেন মুখার্জি, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, তুলসীচরণ গোস্বামী ও প্রমথলাল সেন। ট্রাস্ট বোর্ড গঠনের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হল। প্রেসিডেন্ট হলেন সুনীতি দেবী, সেক্রেটারী সুচারু দেবী।

স্কুল নয়া আস্তানায় সাজিয়ে-গুছিয়ে বসতে না বসতে হারাল তার দীর্ঘদিনের পরিচালিকাকে। আটাশ সালে নির্ঝরপ্রিয়া আমেরিকা চলে যান। তাঁর জায়গায় এলেন ঋষি অরবিন্দের ভাইঝি, অকসফোর্ডের ছাত্রী ডঃ লতিকা ঘোষ। চার বছর লতিকা এই স্কুল চালিয়েছেন। সে সময়ে ঊনত্রিশ, ত্রিশ, ও একত্রিশ সালে পর-পর তিন বছরে মোট ছত্রিশটি মেয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয় ভিকটোরিয়া থেকে। এদের মধ্যে বাইশজন ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছিল। ঊনত্রিশ সালে ভিকটোরিয়ার ছাত্রী কলকাতার

মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট ও গোটা বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে সেকেণ্ড হয়েছিল। শুধু কি লেখাপড়ায়? খেলাধুলাতেও ভিকটোরিয়ার মেয়েরা কোনদিনই পিছিয়ে ছিল না। তখন স্কুলে মেয়েদের লাঠিখেলা, ছোরা খেলা শেখাতেন পুলিন দাস। মেয়েদের জুজুৎসু শেখানোর জন্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চেষ্টায় স্কুল একজন ইনস্ট্রাকটারকে পেয়েছিল।

লতিকা ঘোষ যখন হেড মিস্ট্রেস তখন ত্রিশ সালে হেমন্তশশী সেনকে নিয়ে এলেন স্কুলে ইংরেজী পড়ানোর জন্য। ঊনত্রিশ বছর হেমন্তশশী এই স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। এত ভাল ইংরেজীর শিক্ষক সে যুগেও বিরল ছিল। পুরোনো টিচারের কথা বলতে গিয়ে সুপ্রভা দেবী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। ছাত্রী অবস্থায় ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলে ওর কাছে পড়েছি। পরবর্তী জীবনে এখানেই পেয়েছি ওকে সহকর্মী হিসাবে। হেমন্তদির মত আদর্শ শিক্ষিকা যে কোন স্কুলের গৌরব। শুধু হেমন্তদি কেন? বিভুদি, সরযূদির মত টিচারদের পেয়েছিল বলেই ভিকটোরিয়ার সুনাম অতীতের মত বর্তমানেও অক্ষুণ্ণ আছে। আর এরা ছিলেন বলেই তো মিসেস ব্যানার্জি কলেজের ইম-প্রুভমেন্টের জন্য সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পেরেছিল।

বত্রিশ সালে ইনস্টিটিউশনে ইনটার-মিডিয়েট আর্টস ক্লাস খোলা হল। কথা ছিল লতিকা দেবী হবেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ইনস্টিটিউশনের কনস্টিটিউশনও তাই বলে। যিনি স্কুলের হেড মিস্ট্রেস হবেন তিনিই হবেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কিন্তু রাজ-নৈতিক কারণে লতিকার ওপরে সরকারী কর্তারা সন্তুষ্ট ছিলেন না। পাছে তিনি প্রিন্সিপ্যাল হলে কলেজ সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়, তাই স্বেচ্ছায় লতিকা ঘোষ প্রিন্সিপ্যালের পদ ছেড়ে দিয়ে লেকচারার হয়ে রইলেন। আর তাঁর জায়গায় এলেন লীলালতিকা ব্যানার্জি।

পঞ্চাশ সালে রিটায়ার করেছেন লীলা-দিবী। আঠারো বছরে স্কুল কলেজ মিলিয়ে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে দিয়ে গেছেন ভিকটোরিয়া ইনস্টিটিউশনকে। তাঁর অবসর গ্রহণের পরই সুপ্রভা দেবী হয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল। বাষট্টি সাল পর্যন্ত একই সংগে কলেজ ও স্কুলের পরিচালন দায়িত্ব বহন করেছেন। কিন্তু ঐ বছর ইনস্টিটিউ-শনের পুরোনো নিয়ম বাতিল করে স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র হেডমিস্ট্রেস নিয়োগ করা হয়। নতুন নিয়মে হেডমিস্ট্রেস হলেন পারুল মুখার্জি। যুগ্ম-শাসনের অবসানে দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা চালু হলেও আজো ভিক-টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের দুটি প্রধান অঙ্গ স্কুল ও কলেজ মনে-প্রাণে পরস্পরের পরি-পূরক। কেশবচন্দ্রের অ্যাডাল্ট স্কুলের ছাত্রী আসত গার্লস স্কুল থেকে যেমন এ-যুগে ভিকটোরিয়ার কলেজে ছাত্রী আসে স্কুল থেকে। সম্পর্কে কোথাও কোন চিড় ধরেনি। ধরবে কি করে? গত সাঁইত্রিশ বছর ধরে দুটি সংস্থাই পাশাপাশি সুখে-দুঃখে গড়ে উঠেছে একই পরিচালন সংস্থার অধীনে যার প্রাণ-পুরুষ ছিলেন স্বয়ং বিধানচন্দ্র। এই ইনস্টিটিউশনকে বড় করে তোলায় পেছনে বিধানচন্দ্রের দান অপরিসীম। সেই যে ট্রাস্ট বোর্ড গঠিত হল সাতাশ সালে সেই থেকে বাষট্টি সালে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই ইনস্টিটিউশনের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন।

বিধানচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই আটত্রিশ সালে কেশবচন্দ্রের জন্ম শত-বার্ষিকীতে কলেজের আর্টস বিল্ডিং তৈরী হল। নতুন বাড়িতে কলেজ উঠে গেলে পুরোনো বাড়িতে স্কুলের প্রাইমারী সেকসন বসতে থাকে। কলেজের প্রয়োজনে কমল কুটিরের গায়ে এই পুরোনো বাড়িটি বত্রিশ সালেই ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

পঞ্চাশ সালে স্কুলের দোতলা প্রাইমারী বিল্ডিং উঠল। ততদিনে ছবির মত সুন্দর কমল কুটিরের পরিবেশ গেছে অনেক পাল্টে। পুকুর বুজিয়ে সেখানে ছোট্ট খেলার মাঠ তৈরী হয়েছে। স্কুল ও কলেজের মেয়েরা সেখানে খেলে। প্রয়োজনের তাগিদেই ছাপ্পান্ন সালে মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উঠল তেতলা মালটি পারপাস ব্লক। এই ব্লক তৈরী হতেই সাতান্ন সাল থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থা চালু হোল স্কুলে, চারটি স্ট্রীম সমেত—সায়েন্স, হোম সায়েন্স হিউম্যানিটিজ ও ফাইন আর্টস।

স্ট্রীম চারটি হলে কি হবে, মেয়েরা মেইনলি পড়ে দুটি স্ট্রীমে—সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ। এখানেও সেই প্রয়োজনের চিরন্তন খেলা। কলেজে বা চাকরীর বাজারে হোম সায়েন্স বা ফাইন আর্টসের কদর কোথায়? নিরুপায় মেয়েরা দলে দলে তাই ভর্তি হয় বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে। ইচ্ছা থাকলেও ফাইন আর্টসে বা হোম সায়েন্সে নাম লেখাতে সাহস পায় না—ভবিষ্যত যে অন্ধকার।

ভবিষ্যত অন্ধকার তবু ফি বছরই দুটি চারটি মেয়ে পড়ে এই দুটি স্ট্রীমে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম পাশের হার গড়ে শতকরা নব্বুই ভাগেরও বেশী। ভেবে-ছিলাম রেজাল্ট যখন এত ভাল তখন নিশ্চয়ই স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা কম হবে, বড় জোর শ-পাঁচেক। আমার অনুমান ব্যর্থ প্রমাণ করে হাসি মুখে পারুল দেবী বললেন, না, সাড়ে এগারোশ মেয়ে পড়ে আমার স্কুলে। অবিশ্যি প্রাইমারী সেকেণ্ডারী মিলিয়ে। একান্নজন শিক্ষিকা আছেন সাড়ে এগারোশ মেয়ের জন্য। একজন লাইব্রেরী-য়ানও আছেন। বিশেষভাবে মেনশন করলাম, কারণ যে দেশে সরকারী স্কুলগুলোতে লাইব্রেরীয়ানের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বই পায় না, সেখানে ভিকটোরিয়াতে গড়ে সপ্তাহে হাজার বই ইস্যু হয়। বইয়ের কোন অভাব নেই। এগারো হাজার বইয়ের বিশাল লাইব্রেরী। আর আলমারীগুলোতে মরচে ধরা তালা ঝোলে না।

ফাইলে মুখ গুঁজে নোট নিচ্ছিলাম, প্রশ্নটি কানে আসতেই খাড়া হয়ে বসলাম। সুপ্রভা দেবী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—শুধু স্ট্যাটিসটিকসই নেবেন, স্ট্যাটিসটিকসের আড়ালে জ্যান্ত মানুষ-গুলোকে দেখবেন না? বললাম—সুযোগ পেলে খুসী হব। ন্যাচারাল সারাওনডিংয়ে মানুষ গড়ার কারিগরদের ওয়ার্কশপটা দেখতে পেলে চোখ সার্থক হবে। নিজের হাতে গোটা কয়েক জরুরী কাজ ছিল তাই সুপ্রভা দেবী অনুরোধ করলেন—পারুল, তুমি ওঁকে আমাদের স্কুল দেখিয়ে দাও।

ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ক্লাস দেখালেন পারুল দেবী। লাইব্রেরী থেকে ল্যাবরেটরী, শিশু শ্রেণী থেকে ক্লাস ইলেভেন। আলাপ হল ক্লাস সেভেনের অপর্ণা ঠাকুর, এইটের বিদিশা কাঞ্জিলাল, নাইনের সাবিহা সুলতানার সংগে। সাবিহা থাকে কলু-টোলায়। এই স্কুলে খুব ছোটবেলা থেকেই পড়বার সখ। ঝকমকে চেহারায় খোলা তরোয়ালের ঝিলিক মেয়েটির চোখে মুখে। বিদিশা সেলাই ক্লাসে বসে একমনে একটা ব্লাউজের হাতা বানাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করাতে লজ্জা পেয়ে বলল, দিদিমণি দেখিয়ে দিয়েছেন, আমি তাই দেখে দেখে বানাচ্ছি। বিল্ডিংয়ে বিল্ডিংয়ে ঘুরে ক্লাস দেখছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল নীচের সবুজ লনে একদল ছোট্ট চড়ুই নেচে নেচে গান গেয়ে ফিরছে। ওদের দিদিমণি আজ স্কুলে আসেননি, এটা খেলার ক্লাস তাই ক্লাস প্রিয় মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের ক্লাস চালাচ্ছে।

ঝকমকে ইউনিফর্মে সদ্যফোটা পদ্মকলি মুখের পরিচ্ছন্নতার সবটুকু সৌন্দর্য দু-চোখে এঁকে, সবুজ লনটুকু পায়ে পায়ে মাড়িয়ে ফিরে এলাম প্রিন্সিপ্যালের ঘরে। আমায় ঢুকতে দেখে সুপ্রভা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন—কি দেখা হল ওয়ার্কশপ? বললাম —ওয়ার্কশপ নয়, মন্দির দেখে গেলাম। এই মন্দিরেই একদিন বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্যা, বিশুদ্ধ ভগ্নী গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন কেশবচন্দ্র। হয়তো সাড়ে আটানব্বই বছরে তাঁর নির্দিষ্ট পথ থেকে অনেকটা সরে এসেছে ভিকটোরিয়া ইনস-টিটিউশন, তবু বিশ্বাস করি, কমল কুটিরের কমল কলিদের মাঝেই তাঁর স্বপ্ন আজো বেঁচে আছে—অনাগত ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবে।

—সন্দিগ্ধবসু

পরের সংখ্যায়ঃ সাউথ সাবারবন স্কুল

তাপের ছবি

গোলোকেন্দু ঘোষ
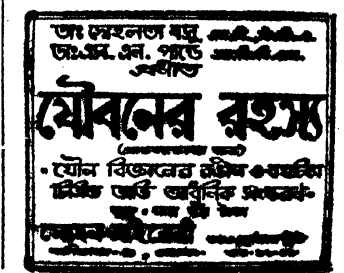
১৬৬৬ খৃঃ স্যার আইজাক নিউটন এক যুগান্তকারী পরীক্ষা করলেন। অন্ধকার ঘরের জানালার ফুটো দিয়ে আসা সূর্যের রশ্মির পথে একটা ত্রিকোণ-কাঁচ (প্রিজম্) রাখলেন। সূর্যের শাদা রশ্মি যখন প্রিজম্ থেকে বেরিয়ে এল তখন একটি শাদা রশ্মির জায়গায় কয়েকটি রঙিন রশ্মি বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে এল; এক প্রান্তে লাল, অন্য প্রান্তে বেগনি। এই প্রথম সূর্যের আলো বিশ্লেষ করা গেল এবং প্রমাণিত হল সূর্যের শাদা আলো রঙিন রশ্মির সমন্বয় মাত্র।

১৮০০ খৃঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যর উইলিয়ম হার্শেল নিউটনের পরীক্ষার অনুরূপ প্রিজম্ দিয়ে সূর্যের রশ্মিকে বিভিন্ন রঙে বিশ্লেষ করে প্রত্যেক রশ্মিতে থার্মোমিটার বসিয়ে রঙ অনুযায়ী তাপের তারতম্য দেখতে চাইলেন। দেখলেন, লালের তাপ সর্বাধিক। লাল রঙ ছাড়িয়ে অল্প দূরে একটা থার্মোমিটার রাখলেন; দেখলেন, পারার দাগ আরও ওপরে উঠে গেছে অর্থাৎ তাপ আরও বেশি। বোঝা গেল, এই অঞ্চলে রশ্মি আছে, তার তাপও আছে অথচ সে রশ্মি চোখে দেখা যায় না। এই রশ্মির নাম অবলোহিত (ইনফ্রা-রেড) রশ্মি। হার্শেল আরও দেখালেন যে, অবলোহিত রশ্মি চোখে দেখা না গেলেও চোখে-দেখা রশ্মির নিয়মকানুন মানে অর্থাৎ এ রশ্মিকে আয়না দিয়ে প্রতিফলিত করা যায়, লেন্স দিয়ে ফোকাস্ করা যায়।

১৮০১ সনে জার্মান বিজ্ঞানী জোহান উইলহেলম্ রিটার অপর প্রান্তের বেগনি রঙ পেরিয়ে আর এক রশ্মির সন্ধান পেলেন। অবশ্য থার্মোমিটারে এ রশ্মি ধরা পড়ল না। তিনি জানতেন, সিলভার ক্লোরাইড নামে একটি রাসায়নিক পদার্থে সূর্যের আলো পড়লে এর শাদা রঙ কাল হয়ে যায়। (ফটোগ্রাফিক প্লেটে সিলভার ক্লোরাইড-এর ব্যবহার আছে)। রিটার বেগনি রঙের সীমা পেরিয়ে যেখানে চোখে-দেখা কোন রশ্মি নেই, সেখানে খানিকটা সিলভার ক্লোরাইড রেখে দেখলেন যে, অনেক দ্রুত সিলভার ক্লোরাইড-এর শাদা রঙ কাল হয়ে যাচ্ছে। আর একটি অদৃশ্য নতুন রশ্মি ধরা পড়ল, এর নাম অতি বেগনি (আলট্রা-ভায়লেট) রশ্মি।

অবলোহিত, আলো, অতিবেগুনি রশ্মিগুলি একই ধরনের, তবে স্বভাবে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন, অবলোহিত রশ্মি তাপ বিকিরণ করে অথচ চোখে দেখা যায় না। আলোর রশ্মিও তাপ বিকিরণ করে এবং তা চোখে দেখা যায়। এ সবই একটি তরঙ্গের প্রকাশ; এর নাম ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ। তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের তারতম্যে রশ্মির স্বভাব নির্ভর করে। দৃশ্যমান রশ্মির মধ্যে লালের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সর্বাধিক —এক ইঞ্চির চল্লিশ হাজারের এক ভাগ; বেগনির সর্বনিম্ন—এক ইঞ্চির সত্তর হাজারের একভাগ। প্রত্যেকটি রঙের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই : আমাদের চোখ রঙ বলে যা দেখে তা আসলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ। সত্যিই ব্যাপারটা ভারি বিস্ময়ের— আমরা এমন ক্ষমতার অধিকারী যে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তারতম্যটা ভিন্ন ভিন্ন রঙ বলে আমরা চিনে নিতে পারছি।

ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গের প্রকাশ আরো আছে যেমন, বেতার তরঙ্গ, এক্স্-রে, গামা রশ্মি, কস্মিক রশ্মি। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী এদের স্বভাবের পার্থক্য।

একটা মজার কথা হল, জগতে আমরা সবাই, জীবন আছে এমন প্রত্যেকেই ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গ সৃষ্টি করছি। কিছু প্রাণী আছে যেমন জোনাকি, কিছু গভীর জলের মাছ, এরা দৃশ্যমান আলোও বিচ্ছুরণ করে। নক্ষত্র যে শুধু দৃশ্যমান আলোর উৎস নয়, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক তরঙ্গেরও (সকল দৈর্ঘ্যের) উৎপত্তিস্থল, একথাও আমরা জানি।

আমরা আলোর সাহায্যে ক্যামেরাতে ছবি তুলি। ক্যামেরার প্লেটে লাগান আছে সিলভার ব্রোমাইড-এর পাতলা একটা আস্তরণ। ক্যামেরার মুখ খুললে লেন্সের ভেতর দিয়ে আলো এসে পড়ে প্লেটে। এ আলো সূর্যের প্রত্যক্ষ আলো নয়। সূর্যের আলো বস্তুতে (যে বস্তুর ছবি তোলা হচ্ছে) পড়ার পরে সে বস্তুটি যে আলোর বিচ্ছুরণ করছে সেই আলো। বস্তুটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রঙের (এবং বিভিন্ন তাপেরও বটে)। তার ফলে বস্তুটির বিভিন্ন অংশ থেকে যে আলো বিচ্ছুরিত হবে তা সর্বত্র সমান তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের নয়, কোথাও বেশি, কোথাও কম, বস্তুটির রঙের পার্থক্য অনুযায়ী। এই কমবেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো প্লেটের সিলভার ব্রোমাইড-এর আস্তরণের বিভিন্ন অংশে পড়ে সিলভার ব্রোমাইড-এর সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় রাসায়নিক প্রক্রিয়া করছে। কাজেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পার্থক্যের জন্যই বস্তুটির একটা সামগ্রিক রূপ প্লেটে ধরা পড়ে। এইভাবে আলোর সাহায্যে ক্যামেরায় ছবি তোলা হয়।

বিজ্ঞানীরা এমন প্লেট আবিষ্কার করেছেন যাতে কেবল অবলোহিত তরঙ্গই রাসায়নিক প্রক্রিয়া করতে পারে। আলোর তরঙ্গের চেয়ে অবলোহিত রশ্মির তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেশি, তাই এ-কাজটা করা সম্ভব হয়েছে; অর্থাৎ এই বিশেষ প্লেটটা কেবল দীর্ঘতর অবলোহিত রশ্মির দ্বারাই প্রক্রিয়া করবে, হ্রস্বতর কোন আলোর রশ্মি দ্বারা নয়। অবলোহিত রশ্মির তরঙ্গ সৃষ্টি করে তাপ আছে এমন সব বস্তুই। ধরা যাক, একই বস্তুর বা দৃশ্যের দুটো ছবি তোলা হল—একটি আলোর রশ্মির সাহায্যে, অপরটি অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে। দ্বিতীয় ছবিতে আমরা পাব বস্তুর বা দৃশ্যের বিভিন্ন অংশে তাপের যে তারতম্য আছে তারই ছবি। তাপের এই তারতম্যটা মানুষ আজ নানাভাবে নিজের কাজে লাগাচ্ছে।

চারদিকে বরফ পড়ছে, যুদ্ধের রসদ মজুদ আছে, এমন একটি জঙ্গলে একটি শত্রুচর লুকিয়ে আছে এমনভাবে যে চোখে তাকে দেখা যায় না। সাধারণ আলোয় তোলা ছবিতে তা ধরা পড়ল না। এই পরিস্থিতিতে যদি অবলোহিত রশ্মিতে ছবি তোলা যায়, তাহলে সে ছবিতে তা ধরা পড়বেই। কারণ লোকটি যে তাপ অর্থাৎ অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করছে, তা কোন মতেই লুকানর উপায় নেই। চেহারা যতই লুকিয়ে রাখুক না কেন, শত্রুচরটি তার দেহের ৩৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপ লুকাবে কি করে?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে আকাশের বিভিন্ন অংশের ছবি তুলে এমন অজস্র নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছেন, যা সাধারণ আলোয় তোলা ছবিতে ধরা পড়েনি। অবলোহিত রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে বেশি। মহাকাশে হ্রস্বতর তরঙ্গগুলি দীর্ঘতর তরঙ্গের অপেক্ষা অনেক বেশি বিপর্যস্ত হয় নানা কারণে। ফলে দীর্ঘতর অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে তোলা ছবিতে মহাকাশের অনেক বেশি নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সাধারণ আলোয় দেখা অতি শক্তিশালী টেলিস্কোপেও তা সম্ভব হয় না।

বিজ্ঞানীরা নানাভাবে অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে তোলা ছবির ব্যবহার করছেন। প্লেন থেকে অবলোহিত রশ্মিতে তোলা ছবি দেখে তাঁরা বুঝতে পারেন জঙ্গলের কোন অংশে কি ধরনের গাছ আছে। গাছপালার ছবি তুলেও বুঝতে পারেন, কোন কোন গাছ রোগগ্রস্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং পুরান পুঁথি বা শিল্পার পাঠোদ্ধারে অবলোহিত রশ্মিতে তোলা ছবির প্রচুর ব্যবহার হচ্ছে।

অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে ক্যামেরাতে শুধু স্থির চিত্র তুলে ক্ষান্ত হন নি বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, বস্তুর তাপ-বিবরণ অর্থাৎ তাপের ছবি চলচ্চিত্রের মত চোখের সামনে ভেসে আসবে। এই ব্যবস্থার নাম থার্মোগ্রাফি। থার্মোগ্রাফিতে আলোর রশ্মির সাহায্যে বস্তুটির চোখে-দেখা চলন্ত দৃশ্যের পরিবর্তে আমরা পাব বস্তুটির অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে পাওয়া তাপের তারতম্যের চলন্ত দৃশ্য।

তাপের বিনিময় চলছে সর্বত্র। উচ্চ তাপের বস্তু থেকে তাপ সঞ্চালিত হচ্ছে নিম্নতাপের বস্তুতে। গরম চায়ের কাপে বরফের টুকরা ফেললে বরফ যেমন গলতে থাকে, চায়ের উত্তাপও তেমন কমতে থাকে। বরফ সম্পূর্ণ গলে গেলে আমরা পাই শীতল চা। আরো কিছুক্ষণ ঐভাবে চা রেখে দিলে আমরা দেখব যে সে চা আর শীতল চা নেই; বাইরের আবহাওয়ার যে তাপমাত্রা ঐ শীতল চা সেই তাপমাত্রায় পৌঁছে গেছে। সামান্য পরিমাণে হলেও বাইরের আবহাওয়াও শীতল হয়েছে।

কিছু বস্তু আছে যা অন্য বস্তুর তুলনায় বেশ খানিকটা অবলোহিত রশ্মি গ্রহণ করে নিতে পারে, রশ্মি প্রতিফলিত করে না যেমন গাছের ত্বক এই শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে পড়ে। যে-বস্তু যতটা অবলোহিত রশ্মি গ্রহণ করতে পারে, সেই অনুপাতে বস্তুটি অবলোহিত রশ্মি বিকিরণও করতে পারে। ফলে বস্তুটির উত্তাপ সম্পর্কিত খবরাখবর পাবার সুবিধা হয়েছে।

এই খবরাখবর পাওয়া সম্ভব হয় থার্মোগ্রাফ যন্ত্র থেকে। থার্মোগ্রাফ যন্ত্রের লেন্সে বস্তু থেকে আনুপাতিক বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। এই আনুপাতিক বিদ্যুৎ-প্রবাহ থেকে পাওয়া যায় পর্দার ওপর তাপের চলন্ত চিত্র যেমন পাওয়া যায় টেলিভিসনের পর্দার ওপর চলন্ত চিত্র। থার্মোগ্রাফের পর্দায় চলন্ত চিত্র ফুটে ওঠে শাদা ও কালোর বিন্দুর সমন্বয়ে। বস্তুর যে-অংশে উত্তাপ বেশি, পর্দায় সে-অংশ ধরা পড়বে শাদা বিন্দুর আকারে, শীতল অংশ কাল বিন্দুর আকারে; মধ্যবর্তী তাপ-যুক্ত অংশ আধা-শাদা আধা-কালো বিন্দুর আকারে। এইভাবে বস্তুটির একটি তাপ সম্পর্কিত চিত্র পাওয়া যাবে থার্মোগ্রাফের পর্দায়।

থার্মোগ্রাফ বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে পারে। এমন থার্মোগ্রাফ যন্ত্র আছে যা—১৫° সেন্টিগ্রেড থেকে ৫০° সেন্টিগ্রেড তাপের ছবি ধরতে পারে—এই ধরনের যন্ত্র এক ডিগ্রির তিন ভাগের একভাগ তাপের তারতম্যও ধরে দিতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রভূত প্রয়োজনে লাগে এই যন্ত্র। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বা অংশের ত্বকের তাপ বিভিন্ন। মানুষের মুখের থার্মোগ্রাফ ছবি থেকে কথাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাবে। কানটা, গালের সামনের দিকটা, নাকের ছেঁদাটা কাল দেখাবে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত শীতল, মুখের অন্য অংশ হবে শাদা অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থা এই থার্মোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা যাবে। ক্যানসার স্থলটির উত্তাপ সন্নিহিত ত্বক থেকে দু-এক ডিগ্রি বেশি থাকে। ভেঙে-যাওয়া হাড়ের স্থান নির্ণয় করার এবং আরো নানা ধরনের চিকিৎসায় এই যন্ত্রের প্রয়োগ হচ্ছে।

আর এক ধরনের থার্মোগ্রাফ যন্ত্র আছে যা তাপের এত সূক্ষ্ম তারতম্য ধরতে না পারলেও তাপ-মাপার ব্যাপ্তি তার অনেকটা —২৯° সেন্টিগ্রেড থেকে ১৮৪° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। এমন ব্যবস্থাও থার্মোগ্রাফ যন্ত্রে করা যেতে পারে যে, থার্মোগ্রাফের চলন্ত ছবি ফিল্মে তুলে রাখা হল, তারপর সিনেমার মত তা পর্দায় ফেলে দেখা যেতে পারবে। থার্মোগ্রাফ যন্ত্রের এমন উন্নতিও করা হয়েছে যে, পর্দায় বিভিন্ন তাপ বিভিন্ন রং-এর আকারে ধরা পড়বে। শাদা-কাল ছবির পরিবর্তে রঙিন ছবি থেকে তাপের অনুশীলন করা অনেক সহজ ও নিখুঁত হবে।

থার্মোগ্রাফ যন্ত্রের বেশ ব্যাপক ব্যবহার চালু হয়েছে নানা ক্ষেত্রে। এয়োপ্লেনের গঠনের খুঁত আবিষ্কারে বা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য রাস্তার ধারে টাঙ্গান তারের ত্রুটি ধরবার জন্যে যন্ত্রটির ব্যবহার হচ্ছে। আমেরিকার অর্ধেকের বেশি রাজ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী তারের ত্রুটি ধরার জন্য থার্মোগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা ট্রাকের ওপর যন্ত্রটি বসিয়ে রাস্তা ধরে ট্রাক চালিয়ে যাওয়া হয়, যন্ত্রের লেন্সটি তারের দিকে লক্ষ্য করে ধরে থাকা হয়। তারের কোন অংশের অধিকতর তাপের ছবি যদি থার্মোগ্রাফ যন্ত্রের পর্দার ওপর ভেসে ওঠে, তারের সেই অংশের ত্রুটিটা সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে। তারের সঙ্গে তারের জোড়মুখে দোষ থাকতে পারে, আরো অনেক রকম দোষ থাকতে পারে। এসব যদি সময়মত ধরে মেরামত বা সংশোধন করা যায়, তাহলে বড় রকমের বিদ্যুৎ সরবরাহের বিঘ্ন এড়ান যায়। হেলিকপটারে যন্ত্রটি চড়িয়েও এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থায় গবেষণার কাজে যন্ত্রটির উপযোগিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। একটি পরীক্ষায় এক হাজার ওক কাঠের মদের বাক্সয় আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। প্রত্যেক বাক্সয় সওয়া শ' লিটার করে মদ। অগ্নি নির্বাপক দল জল দিয়ে আগুন নিভানোর চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ধ্বংসের হাত থেকে কিছুই বাঁচান গেল না। অন্য একটি আগুন নিভানোর পরীক্ষায় যেখানে থার্মোগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, থার্মোগ্রাফ যন্ত্র থেকে সংকেত পাওয়া গেছে, কোন্ নতুন জায়গায় আগুন লাগার সম্ভাবনা আছে; সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে আগুন নিভানোর ব্যবস্থা চালু করে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

মহাকাশ গবেষণায় এবং মহাকাশ যানের গঠনের ও প্রয়োজনীয় নানা সাজসরঞ্জামে থার্মোগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। চাঁদের ত্বক পরীক্ষাতেও থার্মোগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। চাঁদের একটি জ্বালামুখের নাম টাইকো জ্বালামুখ। চন্দ্রবিদরা লক্ষ্য করলেন এই জ্বালামুখের তাপ বেশি। এই তাপ চাঁদের অভ্যন্তরের তাপ কিনা তা নিরীক্ষা করার জন্যে একটি বিশেষ থার্মোগ্রাফ যন্ত্র তৈরি করা হল। এই বিশেষ থার্মোগ্রাফ যন্ত্র থেকে অবশেষে নিরসন হল যে, টাইকো জ্বালামুখের তাপ চাঁদের অভ্যন্তরের তাপ নয়। এ তাপ প্রতিফলিত তাপ। চাঁদের জ্বালামুখগুলি যে উল্কাপাত থেকে উৎপত্তি হয়েছে, নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির মুখ নয়, এই তত্ত্বের একটি সমর্থন পাওয়া গেল।

পরচর্চা

দুর্লভ চক্রবর্তী

লক্ষ করবেন, পরচর্চাকে যাঁরা ব্ল্যাক লিস্টে ফেলে থাকেন আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। না, আমার যুক্তি এ নয় যে, সংসারটা এখনো নন্দন কানন হ'য়ে যায়নি, এবং আমরা হ'তে পারিনি দেবতুল্য মানুষ, অতএব কেউ কেউ পরচর্চায় ব্যাপৃত হয়ে চারিত্রিক দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলবে এটা স্বাভাবিক। না, মোটেই তা নয়। পরচর্চাকে আমি আসলে খুব একটা চারিত্রিক পতন হিসেবেই দেখতে রাজি নই। বরং আমার ধারণা, সময়ে সময়ে পরচর্চায় রত হওয়া মানুষ হিসেবেই আমাদের একটা বিশেষ কর্তব্য।

কথাটা ভালো করে বুঝে নেবার চেষ্টা করছি।

ধরুন আমি একটা উপন্যাস পড়ছি। উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে বুঝব আমি কী ভাবে? নিশ্চয়ই তারা যা করবে এবং বলবে তাই থেকে। এবং তাদের বিষয়ে লেখক যদি কিছু খবর দিয়ে থাকেন তা থেকেও বটে। কিন্তু সেইটুকুই কি সব? আমার তো অন্তত তা মনে হয় না। একটা চরিত্রকে ভালো করে আন্দাজ করতে হলে সে নিজে কী করছে এবং বলছে, আর তার বিষয়ে লেখক কী মন্তব্য করছেন, তারই সঙ্গে দরকার, সেই চরিত্রটির বিষয়ে বইয়ের অন্য চরিত্রগুলো কী ভাবছে এবং বলছে তার খোঁজ নেওয়া। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অন্য চরিত্রগুলো এই চরিত্রটির বিষয়ে যা ভাবছে এবং বলছে তা যতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়েই বলা হোক, পরচর্চা ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মধ্যে ঠাট্টা আছে, শ্লেষ আছে, এমন কি ক্রোধ বা ঘৃণাও বাদ যায় না। কিন্তু কখনোই সে সব শুনে বা জেনে আমাদের অন্যায় কিছু মনে হয় না। তার কারণ, আমরা জানি যে, শাদাকালো ছবিতে যেমন আলো আর ছায়াকে দরকারমতো সুবিন্যস্ত না করলে মুখের ডৌল ভালো করে ফোটে না, তেমনি চরিত্রকে ভালো করে উপলব্ধি করতে হলেও প্রয়োজন তার অন্ধকার দিকের খোঁজ নেওয়া। আর এই অনালোচিত অপ্রকাশ্য দিকের উদ্ঘাটনই হল পরচর্চার আসল উদ্দেশ্য। অতএব কাজটা যে জরুরী তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

এবং কেবল জরুরী নয়, উপকারীও।

মনে করুন বাল্যকালে মাস্টার মশাইরা ক্লাসে পড়া না পারলে আমাদের বিষয়ে যা বলতেন, তার সবটাই কিন্তু প্রশংসা ছিল না, বেশির ভাগই ছিল নিন্দা এবং সমালোচনা। আর শাদা চোখে দেখলে কাজটা যে নেহাতই পরচর্চা ছাড়া আর কিছুই নয় তা স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু তা কি অন্যায় হ'য়েছিল বলা যাবে? নাকি এভাবে মাস্টার মশাইরা যদি 'পরচর্চা' না করতেন সেইটেই হত বেশি অন্যায়? আশাকরি এ প্রশ্নের উত্তর আর আমাকে বিশদ করে দিতে হবে না। কিন্তু এ থেকে আমরা যে 'মরাল' পেলাম সেটাও আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

সেটা যে কী বিরাট আর গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে পারি যেই আমরা ঘটনাটি স্কুলের ক্লাস রুম থেকে নিয়ে আসি বৃহত্তর সমাজের পটভূমিতে। না তখন টেকনিক্যাল অর্থে মাস্টারমশাই কেউ থাকেন না। কেননা এদিনে আমরা কেউই অন্যের গুরুমশাই-গিরি বরদাস্ত করতে রাজি নই। কিন্তু তাই বলে সমালোচনা আর তিরস্কারের হাত কি এড়াতে পারি আমরা? আজকের এই গণতন্ত্রের যুগে এমন আবদার একেবারেই অচল। কেননা, পরস্পরের ওপর সতর্ক নজর রাখা এবং অন্যে বেচাল হলে সে বিষয়ে আপত্তি জানানো, এ না হলে সমাজ-জীবনে বাঁধুনিই বা থাকবে কী করে। আর আমরা এগিয়ে চলতেই বা পারব কী করে!

কিন্তু এ সব ভারিক্কী কথা না হয় বাদই দিলাম, আমাদের আটপৌরে জীবনেও কি পরচর্চার প্রভাব কিছু কম? স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে যতোই ভালোবাসুক, দরকার হলে ইনি ওঁ'র বিষয়ে বেশ একটু 'চর্চা' যে না করেন তা নয়। ব্যাপারটা তো কম কঠিন নয়, দুটি লোক সারাজীবন একসঙ্গে থাকবেন? তাঁদের মধ্যে কখনো-সখনো তিক্ততা এবং অন্যমনস্কতা অবশ্যম্ভাবী। তা'ছাড়া কাছাকাছি থাকার ফলে দু'জনের স্বভাবে স্খলন-ত্রুটিও অন্যের নজরে পড়ে সবার চেয়ে আগে। 'পরচর্চা' হল সেই সব ব্যাধিরই 'শক্ থেরাপি'। স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর ব্যবহারে এই ধরনের নিন্দা ও সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে যদি 'রাগ করে না-খেয়ে কাজে বেরোনো' জুটে যায়, কিম্বা স্ত্রীর পক্ষ থেকে যদি প্রয়োগ করা হয় কান্না এবং চোখে-আঁচল, তা'হলে ওষুধটা যে তন্ত্রোক্ত ফেৎকারিনী কবচের চেয়েও বেশি মোক্ষম হয়ে ওঠে তা বলাই বাহুল্য।

অপিচ লক্ষ্য করবেন, নাটকের বিদুষকও ঠিকই এই কাজটিই করে থাকে। অবিশ্যি তার পদ্ধতিটা একেবারেই অন্য রকম: সেখানে রাগ বা অশ্রুপাতের কোনো ঠাঁই নেই। বরং হাসি আর আনন্দই জোটে সেখানে নগদ পাওনা। কিন্তু সমালোচনা বস্তুটাতে কোনো ঘাটতি থাকে না। ঠাট্টা, রসিকতা, ব্যাজস্তুতি আর দ্ব্যর্থক শ্লেষের ভেতর দিয়ে স্বয়ং রাজাধিরাজই সে আঘাত করে অবলীলাক্রমে। আর রাজমুকুট যিনি মাথায় পরেছেন সে ব্যক্তিটি হয়তো তাতে সংশোধিত হন না, কন্তু আমরা পাই তাতে অপরিসীম আনন্দ।

কেন?

আমার মনে হয়, সেটা এই কারণে যে, বিদুষক এমন একটা দিকের পর্দা তুলে ধরে, এমন একটা দিকের ঘাটতি ব্যর্থতা বা প্রতিবাদের কথা বলে, যা সে না বললে আমরা কখনোই শুনতে পেতাম না, কিন্তু সে কথা না শুনতে পেলে আমাদের বুকের মধ্যে জমে উঠত সমুদ্রপ্রমাণ অস্থিরতা। কেননা, বিদুষক যে কথা বলে সেটা আসলে আমাদেরই কথা। আমরা মানে তারা যারা বসে থাকি মঞ্চের বাইরে, অর্থাৎ কিনা যারা হলাম অন্য দিকের মানুষ। এই অন্য দিকের কথা, গানের ভাষায় যাকে হয়তো বলা যায় কাউণ্টার পয়েণ্ট, সেইটেই হল পরচর্চার আসল মাহাত্ম্য। বাস্তবিক, পরচর্চা উবে গেলে আমাদের এই গোটা জীবন-যাত্রাটাই হবে দ্বিমাত্রিক ছবির মতো ফ্ল্যাট, তাতে ভরাট কোনো ডাইমেনশন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমি অন্তত তাই পরচর্চার স্বপক্ষে। অবিশ্যি নিশ্চয়ই তা আদালত বা পুলিশ-ডাকার মতো মারাত্মক কিছু ঘটার আগে পর্যন্তই।

বিকার

কৃষ্ণা দত্ত

আমি বুঝতে পারছি আমি আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছি। যে ভয়াবহ অসামাজিক বেআইনী ইচ্ছেগুলো আগে ছিল অলস বিরল কল্পনাবিলাস, এখন সেগুলো থেকে থেকেই প্রচন্ড বেগে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। বুঝতে পারছি আমার সামাজিক আমি, ভদ্র-শান্ত-মিষ্ট-ভাষী-সম্মানিত আমি, গভীর ফুটন্ত লাভার আগুনের চাপে থর থর করে কাঁপছে। ফেটে পড়তে চাইছে। যে কোনদিন, যে কোন মুহূর্তে। আমি যেন চাইছি সেই মুহূর্ত-গুলি আসুক। চুরমার করে দিক। একটা ক্ষত-বিক্ষত বীভৎস চেহারা নিয়ে সবাইকে হতবাক করে দিতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে সাংঘাতিক কিছু একটা মেলো-ড্রামাটিক করি। দেয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে রক্ত বার করে দিই। অফিস টাইমের ডাল-হাউসীর ফুটপাথে পা ছড়িয়ে বসে দু হাতে চুল ছিঁড়ে লোক জমিয়ে চিৎকার করে কাঁদি। গম্ভীর সিনেটের সভায় বস্তির কাচাখিস্তি করে সবাইকে লজ্জায় বিস্ময়ে অধোবদন করে দিই। আমার আরো একটা সাংঘাতিক ইচ্ছে আছে—না, ঐ সমর আসছে। ওর পায়ের শব্দ আমি বুঝতে পারি। ও বেল টিপলে আমি বুঝতে পারি ওই এসেছে। আমার অস্থির আঙুলগুলো ওর পায়ের শব্দে স্থির হয়ে গেল।

সমর ঘরে ঢুকে আলো জ্বালালো না। আমার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে আমার দু-হাত ওর শক্ত মুঠোয় নিয়ে বললে, শান্তা, তুমি কেমন করে একা-একা বসে থাক!

কেন, তোমার কথাই তো ভাবছিলাম। একলা হল বুঝি?

তুমি এমন করে আমার সঙ্গে জড়িয়ে যেও না শান্তা। দুঃখ পাবে। শুধু শুধু দুঃখ পাবে।

আমি মিষ্টি হেসে বললাম, ভালবাসার দুঃখ তো আনন্দেরই। নিলামই বা দু-হাত ভরে।

সমর এবার বসল। সিগারেট ধরাল। বলল, তুমি এত শান্ত-স্থির, এত সৌম্য আমার মত পাগলাকে কি করে ভালবেসে ফেললে বল তো!

আমার ভেতরটা এবার হা-হা করে হেসে উঠল। আমি স্নিগ্ধ হেসে বললাম, তুমি পাগল বলেই বোধহয়।

সময় এতক্ষণ পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাসল। বলল, চল বেড়িয়ে আসি। কোলকাতার বুকেও যে বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে। দেখবে চল।

এই তো [illegible] অন্ধকার হয়ে আসা ঘরে তোমার সঙ্গে বসে কথা বলতে আরো অনেক ভাল লাগছে।

তাহলে কিন্তু আমি এক্ষনি তোমাকে ভীষণ ভালবেসে ফেলব। সময়ের চোখে কামনার আলো। আস্তে আস্তে ওর চোখ ছোট হয়ে আসছে। মুচকি হাসলাম মনে মনে। সময় উঠে দাঁড়িয়েছে।

বস বস। আমি একটু আতঙ্কিত হয়ে বললাম, এখুনি আমার একটি পুরনো ছাত্র এসে পড়বে।

কে। সময় রুক্ষ হয়ে বলে।

ঐ যে প্রবাল বলে—

ওঃ, সেই ভীতু গোবেচারা মুখ-তুলে-কথা-বলতে-না-পারা ছেলেটা। সত্যি কি যে তোমরা তৈরী কর। এত বছর পাশ করে বেরিয়েছে, এখনও মুখ তুলে তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে পারে না। যতো সব—

ছেলেটি, কিন্তু বুদ্ধিমান। আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ করলাম।

সব বাঙ্গালী ছেলেই বুদ্ধিমান। বুদ্ধি দিয়ে সব ঘাস কাটছে। ও চাইছে কি ?

ও কী একটা সেমিনার করবে কমিউ-নিকেশনের ওপর, তাই—।

আর তুমি অমনি রাজী হয়ে গেলে তোমার জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিতে। সত্যি শান্তা, এত বয়স হল তোমার তবু তুমি মানুষ হলে না। সবাই যে তোমাকে এক্সপ্লয়েট করে তুমি বোঝ না ?

তুমিও তো করছ। আমি হেসে হাত বাড়িয়ে বললাম।

আজকে আর এক্সপ্লয়েট করতে দিলে কোথায়। সময়ও হেসে আমার হাত ধরে টেনে ওর বুকে জড়িয়ে ধরল।

আমি তো তোমারই, ওর বুকে মাথা রেখে গাঢ়স্বরে বললাম, যা তোমার তা নিয়ে তুমি কি করবে সেতো তোমার মাথাব্যথা।

নাটক বেশ জমে উঠছে। সময় আরো নিবিড় করে এগিয়ে এল আমার দিকে। বুঝলাম ওর অহংকারকে আমি সন্তুষ্ট করতে পেরেছি। ওর কামনা আস্তে আস্তে আবার দানা বেঁধে উঠছে। আমার আবার হাসি পেল। সময় ওর চিবুক আমার মাথায় রেখে বললে, জান শান্তা, একেক সময় মনে হয় আমিও তোমাকে একটু ভালইবেসে ফেলেছি।

তুমি তো, সুমিত্রা, চিত্রা, রিক্তা, মিতা সবাইকেই একটু একটু একটু ভালবাস! আমি অভিমান করে সরে যেতে চাইলাম।

সময়ের আলিঙ্গন শিথিল হয়ে এল।

তোমরা আমাকে কেউ বুঝতে পার না। এক সময়ে মনে হয়েছিল তুমি বুঝবে। তুমি বোঝ। কিন্তু তোমরা মেয়েরা সবাই সমান। যে যত বিদুষীই হও না কেন! সোসিও-লজিতে ডকটরেট। বিলিতী ডিগ্রী!

শেষের কথাকটি সময় ছুঁড়ে মারতে চাইল। আমি লুফে নিয়ে হাতের আঙুলে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগলাম। হাসিটা এবার সেই তালে তালে ঝমঝম করে উঠল। চোখ [illegible] হেলান দিয়ে [illegible] সময়ের

হাত আমার দুই কাঁধে নেমে এল। ওর উষ্ণ নিশ্বাস আমার বাঁ-ঠোঁটের কোণে।

তুমি এখনও কত সুন্দর দেখতে শান্তা। আশ্চর্য সুন্দর! সময়ের চোখ আমার ভেতরকার সেই সৌন্দর্য পান করতে চাইছে যেন।

আমার বুক থেকে কঠিন হাসি খল-খল করে উঠল। হ্যাঁ, আমি আশ্চর্য সুন্দর-লাভার আগুনের মত, ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্তের মত, স্বার্থসন্ধানী খল নীচ ক্রুর বীভৎস নির্মম লোভী মানুষের মত সুন্দর আমি। সেক্স পারভারটেড কোনো লেখকের উপন্যাসের নায়িকার মতো আশ্চর্য সুন্দর আমি।

আমার নরম সুন্দর হাত সময়ের ঘাড়ে গলায় কানে কপালের একটুখানিতে চঞ্চল ব্যাকুল হয়ে উঠছে। নিস্তব্ধ, উষ্ণতর নিশ্বাসে কম্পিত সময় শক্তি সঞ্চয় করছে যেন। ঘরের অন্ধকার যেন নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। ও আচমকা ঝড়ের মত আমাকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিতে যাবে—

বেল বেজে উঠল। আমার হাসি এবার তীক্ষ্ণ বিষের ফলার মত বুকে খচ করে উঠল। আমি সময়কে সরিয়ে উঠতে চাইলাম।

না না। শান্তা না। সময়ের গলা বন্ধ হয়ে এসেছে।

আমার নরম দেখতে হাতে জোরও ছাই অনেক। সময়কে দুই হাতে সরিয়ে পাশ কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

প্রবাল এসে গেছে।

দূর করে দাও ওকে। আজ শুধু তুমি আমার—!

ঠোঁটের কোণটা কিছুতেই বাঁকতে দিলাম না। সুন্দর হেসে বললাম, লক্ষ্মীটি আরেকদিন! প্রবাল কতদূর থেকে এসেছে। ওকে আমি ফিরিয়ে দিতে পারব না।

বেশ প্রবাল—প্রদীপই তোমার থাক। সময়ের ব্যাহত কামনা রাগে জ্বলে উঠল। দুমদাম করে ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বলল, তুমি মুহূর্তকে কোনদিন দাম দিতে শিখলে না। বেশ, আবার ডেকে দেখ'খন।

বেচারা সময় দেখে যেতে পারল না যে ওর পিছনে অপার তাচ্ছিল্যে বাঁকা ঠোঁট দুটো আমার কেমন অসুন্দর হয়ে গেছে!

আসব শান্তাদি। ভারী পর্দার ওপারে প্রবালের কুণ্ঠিত কণ্ঠস্বর।

এস প্রবাল। আমি ততক্ষণে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছি।

বস।

আপনাকে বিরক্ত করলাম না ?—ছেলেটা সময়কে দুমদাম করে চলে যেতে দেখেছে নিশ্চয়।

আমিই তোমাকে এ সময়ে আসতে বলেছিলাম। শান্ত হেসে বললাম। দেখি কি তৈরী করে এনেছ ?

প্রবাল সমীহ ভরা গলায় বললে, আপনাকে সেমিনর ওপেন করতে হবে কিন্তু।

[illegible]

আমরা মগ্ন হয়ে গেলাম আলোচনায়। কমিউনিকেশন—মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ আমার অতি প্রিয় বিষয়। আমার বুকে শয়তান কিছুক্ষণের জন্য আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে। ওর অস্তিত্ব ভুলেই গিয়ে-ছিলাম অধ্যাপকীয় কথার স্রোতে।

বিজ্ঞাপনের জনসংযোগই বল আর পরিবার নিয়ন্ত্রণের শ্লোগানই বল, কিংবা একজনের সঙ্গে আরেকজনের কথাবার্তা, আলাপ পরিচয়ই বল—এর আসল কথা হচ্ছে পরিবর্তন আনা, এ্যাটিটিউডের পরিবর্তন। ভাবের, চিন্তার, অনুভূতির সাড়া জাগানো। এই জন্য মঞ্চের বক্তৃতার চেয়ে একটি গ্রুপের আলোচনা অনেক বেশী শক্তিশালী অস্ত্র।

কিন্তু মঞ্চের বক্তৃতা দিয়েই তো জন-সাধারণকে জাগানো হয়।

আপাতচোখে মনে হয় মঞ্চের বক্তৃতাতেই হয়। আসলে তা নয়। ওর ভিত গড়ে ওঠে ছোট ছোট চক্রের বৈঠকে, কাজে। আমাদের দেশের সমস্যাই হচ্ছে সংযোগের সমস্যা। এই হাজার বছরের ঐতিহ্যের চেপে বসে থাকা পাথরে নাড়া দেয়া যায় কি করে। এই সংযোগের এ্যাপ্রোচটা তোমাকে ঠিক করতে হবে প্রবাল। এই ধর তোমার নতুন চাষের রীতির ওপরে যে স্কীমটা করেছ, কই আরেকবার দেখি ?

প্রবাল খাতা খুলে আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটতে লাগলাম। অন্য হাতে পেন্সিল কাটার ছুরিটা এতক্ষণ পরে যেন একটু স্থির হল।

কলম্বিয়া ইউনির্ভাসিটিতে চান্স পেয়েছি। আর চার সপ্তাহ পরেই চলে যাব আমি।—প্রবাল বলল।

আরে, লাল পেন্সিল নামিয়ে রেখে বললাম, এতক্ষণ বলতে হয়! খুব খুশি হলাম শুনে।

আমার কিন্তু মনে হয় শান্তাদি সংযোগের মূলে কথা হচ্ছে প্রীতি। বিশ্বাস। ভালবাসা।—প্রবাল ধীর শান্ত গলায় বললে।

আমি মুখ তুলে ওর চোখের দিকে তাকালাম। ও দৃষ্টি সরিয়ে নিল না। আচমকা পেন্সিল কাটার ছুরিটা অন্য হাতে ছটফট করে উঠতে লাগল। আমিও চোখ নামাতে পারলাম না, আশ্চর্য হয়ে দেখলাম এত বছরের চেনা সেই ছাত্রটি আর আমার সামনে বসে নেই, বসে আছে বলিষ্ঠমনা, কুণ্ঠাহীন এক পুরুষ।

সংযোগের কৌশল, মানবমন সম্বন্ধে জ্ঞান নিশ্চয় দরকার পরিবর্তন আনতে। সে হিটলারের গোয়েবেলসেরও ছিল। কিন্তু, প্রবাল খাতা গুছিয়ে নিতে নিতে বললে, ভালবাসা যদি না থাকে, প্রীতির আন্ত-রিকতা যদি না থাকে, যা করতে যাচ্ছি তাতে বিশ্বাস যদি না থাকে তবে সব কৌশল সব জ্ঞানই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে [illegible]

আমি তা বলি নি সংযোগ-প্রীতিহীন হবে প্রবাল, আমি অধ্যাপকীয় গাম্ভীর্য ফিরিয়ে এনে আবার বোঝাতে গেলাম, কথা হচ্ছে—

কিন্তু আপনি তা কোন কিছুকেই, কোনদিনও, কোন কাউকেই ভালবাসেন নি শান্তাদি! আপনার জীবনটাই তো, প্রবাল খাতা হাতে উঠে দাঁড়িয়ে সোজা আমার চোখে তাকিয়ে বলল, একেবারে সংযোগহীন নিঃসঙ্গ নির্জন একটি দ্বীপ।

উঃ! [illegible] আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটি শব্দ। হাতটা ছুরিতে কেটে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। জোরে আরো জোরে টেবিলের তলায় চেপে ধরলাম ছুরিটা হাতের মুঠোয়। সেই প্রবল ভয়াবহ বেআইনী ইচ্ছেটা আমাকে যেন এক্ষুনি উন্মাদ করে দেবে। আমি পাগলের মত উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেল।

[illegible] করে উঠল, আপনার [illegible] রক্তে ভিজে গেছে? শান্তাদিদি

তুমি এবারে এস প্রবাল। আমি সপ্রে সপ্রে বসে পড়ে শান্ত কণ্ঠে বললাম।

প্রবাল ছাত্রের মতই মাথা নীচু করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

আমার বুকের ভেতরটা অদ্ভুত এক হাসিতে মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল।

রক্ত কি আশ্চর্য সুন্দর! আমার রক্ত!
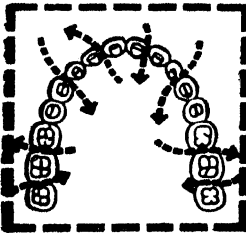
এরোট্রেনের কংক্রিটের লাইন

সাগরপারের খবর

দিলীপ মালাকার
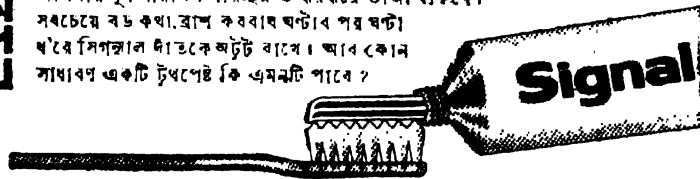
বিশ্বের সর্বত্রই ট্রেনের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ভারত। গত বিশ বছরে ভারতীয় ট্রেনের কোনো কোনো লাইনে গতির কোনো পরিবর্তন হয় নি। কোনো কোনো লাইনে ট্রেনের গতি আগের চেয়ে কমান হয়েছে। সেদিক দিয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ট্রেনের মধ্যে জাপান এখন প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। জাপানের মেল ট্রেনগুলোর গতি এখন ঘণ্টায় ১২৫ থেকে ১৭৫ কিলোমিটার। ফ্রান্সের দুটো মেল ট্রেনের গতি ঘণ্টায় ১২৫ ও ১৫০ কিলোমিটার।

ট্রেনের গতিতেই এরা সন্তুষ্ট নয়। বড় বড় শহর ও শহরগুলির মধ্যে যোগাযোগ সংযোগকারী স্বল্পদৈর্ঘ্যের এরো ট্রেনের ব্যবস্থাও করেছে। এরো ট্রেন চালু করেছে প্রথমে জাপান, এবার চালু করল ফ্রান্স। পরীক্ষামূলকভাবে এরো ট্রেন চালু হয়েছে প্যারিস থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে অরলিয়ঁ শহরে। অরলিয়ঁ শহরতলীর এই এরো ট্রেনের গতি ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার। এরো ট্রেনের ইঞ্জিনটা চালিত হয় জেট ইঞ্জিনে। বর্তমানে মাত্র একটি বগীতে আশীজন যাত্রী নিয়ে ট্রেনটা চলবে। পরীক্ষামূলকভাবে পঞ্চাশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য পথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ট্রেনের লাইন সাধারণ লাইনের মতন ইস্পাতের নয়। পুরো একটা কংক্রিটের লাইনের ওপর দিয়ে শোঁ-শোঁ শব্দে ছুটে চলে এরো-ট্রেন ঘণ্টায় ২৫০ কিলোমিটার গতিবেগে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সবচেয়ে দ্রুতগতি বিমানের ঘণ্টায় গতিবেগ ছিল তাই। এখন ট্রেনের গতিও বিমানের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে। জাপান এখন এ বিষয়ে পথ-প্রদর্শক।

আকাশপথ—স্থলপথে যানবাহনের গতিবেগ বাড়ছে। তাই বলে জলপথের যানবাহনগুলো হাত গুটিয়ে নেই। সেখানে বিস্ময়কর পরিবর্তন এসেছে। ইদানীংকালে নতুন সংযোজন 'হুভারক্র্যাফট' ও 'নেভিপ্লেন'। বৃটিশদের হুভারক্র্যাফট ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া শুরু করেছে গত বছরে। হুভারক্র্যাফট ডাঙা থেকে সোজা জলের ওপর দিয়ে গিয়ে আবার ডাঙায় চলতে পারে। এই নৌকায় অন্য জলযানের মতন প্রপেলার নেই। একটি বড় রবারের বাতাস ভর্তি গদির ওপর বসান এই নৌকো। জলের ওপর ভাসে এই রবারের গদিটি। ওপরে রয়েছে জেটচালিত ইঞ্জিন। গতি এর ঘণ্টায় ১২৫ কিলোমিটার। শদেড়েক যাত্রী বইতে পারে এই হুভারক্র্যাফট।

হুভারক্র্যাফটের মতন অনুরূপ একটি জলযান নির্মাণ করেছে ফরাসীরা। তার নাম দিয়েছে তারা নেভিপ্লেন। এটি চলে ঘণ্টায় ৮০ কিলোমিটার। ফরাসীরা নেভিপ্লেন চালু করেছে অরলিয়ঁ শহরের কাছে লোয়ার নদীতে। ফরাসীদের নেভিপ্লেন এখন কিছুকাল চালান হবে শুধুমাত্র টুরিস্টদের জন্যে। লোয়ার নদীর দুই ধারে অসংখ্য ঐতিহাসিক প্রাসাদ। সেগুলো দেখান হবে টুরিস্টদের নেভিপ্লেনে করে।

হুভারক্র্যাফট ও নেভিপ্লেনের মতনই গতিসম্পন্ন জলযান আমি দেখেছি মস্কো শহরের গায়ে মস্কোভা নদীতে। জেটচালিত মোটর বোট চলে ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে। যাত্রী নেয় দেড়শ-দুশজন। আর যেগুলো ছোট, চার কি ছজন যাত্রী নেয় সেগুলো চলে ঘণ্টায় দেড়শ কিলোমিটার বেগে। এই ধরনের কিছু মোটর বোট ভারত সরকার কিনবে বলে জানিয়েছে।

শুধু মস্কোভা নদী নয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু নদীতে আজকাল এই ধরনের মোটর বোট দেখেছি। বড় বড় শহরের কাছেই এই ধরনের মোটর বোট চালু করা হয়েছে। এগুলো অনেকটা বড় বাসের মতন কাজ করে। রাস্তা দিয়ে না গিয়ে জলের ওপর দিয়ে চলে দ্রুতগতিসম্পন্ন জল-বাস। রাস্তার ওপর লোকজনের ভিড়, যানবাহনের ভিড়। নদীর ওপর সে দুর্ভাবনা নেই। মোটর বোটগুলো নির্বিঘ্নে এবং জোরে চলতে পারে। ফলে যাত্রীরা নির্দিষ্ট সময়ে ও অল্প সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। এখন দেশে দেশে এক রব গতি আর গতি বাড়াও। সময় অপচয় কমাও। একমাত্র ব্যতিক্রম আমাদের স্থবির দেশ। যে দেশে ট্রামে-বাসে, ট্রেনে গতিবেগ কমান হচ্ছে। অদ্ভুত এই দেশ।

গত কয়েক বছর যাবৎ ইউরোপের সংবাদপত্রে প্রায় নিয়মিতভাবে রসাল সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে রাজা-মহারাজা-রাণী-রাজকুমারীদের কেচ্ছা নিয়ে। ইউরোপে রাজা-মহারাজাদের দিনকাল গেছে। যে ক' দেশে রাজতন্ত্র নামে বজায় আছে সেখানে রাজারা ঠুঁটোজগন্নাথ। যে সব দেশে রাজতন্ত্র নেই কিন্তু রাজপরিবারের অবশিষ্টাংশ বর্তমান রয়েছে এখনও সেখানে রাজ-পরিবারের কেচ্ছা-কাহিনী নিয়ে সংবাদপত্রে রসাল সংবাদ পরিবেশন করা হয়।

কিছুকাল যাবৎ পূর্ব এশিয়ার তিন রাজাকে নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে একটি ফরাসী সিনেমা ডিরেক্টর এই তিন রাজার সঙ্গীতানুশীলন নিয়ে ছবিও তুলতে শুরু করেছে।

কম্বোডিয়ার রাজা সিহানুক (সংস্কৃত: সিংহলোক), বাজান পিয়ানো, থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিফল (বাংলায়ও তাই), বাজান স্যাক্সোফোন আর অবিভক্ত ভিয়েৎনামের প্রাক্তন সম্রাট বাও দাই বাজান গীটার।

ভিয়েৎনামের সিংহাসনচ্যুত সম্রাট বাও দাই এখন দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে জীবন যাপন করছেন। গত বছরে দক্ষিণ ফ্রান্সের আন্টিব শহরে আন্তর্জাতিক গীটার ও জ্যাজ সম্মেলন প্রতিযোগিতায় বাজিয়েছিলেন সম্রাট বাও দাই। শুনেছিলাম তিনি ভালই গীটার বাজান এবং তিনি জ্যাজ সঙ্গীতের ভক্ত।

থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিফল ভিন্ন ক্ল্যাসিকধর্মী। তিনি ক্ল্যাসিক ইউরোপীয় সঙ্গীতের সুর বাজান। সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও সঙ্গত করে থাকেন। তবে শোনা যায় যে, তিনি যখন ইউরোপে বেড়াতে আসেন তখন তিনি আধুনিক জ্যাজ সঙ্গীতেও যোগ দেন।

তবে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে কম্বোডিয়ার রাজা সিহানুক। তিনি একজন জিনিয়াস। একাধারে রাজা-প্রধানমন্ত্রী। তার ওপর তথ্য মন্ত্রণালয়ের ভারও তাঁর ওপর। তাই তিনি ডকুমেন্টারী ছবি যেমন তোলেন নিজের হাতে ক্যামেরা নিয়ে, তেমনি বড় প্রেমের ছবিও তোলেন। কিছুদিন আগে তাঁর তোলা একটি বড় ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল তাঁরই কন্যা রাজকুমারী ভূপা দেবী। তিনি নাচেও পারদর্শী। কম্বোডিয়ার জাতীয় সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে অতিআধুনিক সঙ্গীত-এর সুরও তিনি বাজান বিভিন্ন যন্ত্রে। এশিয়ার রাজাদের মধ্যে তিনি সত্যি জিনিয়াস। এই নিয়ে ইউরোপীয় সংবাদপত্রে বেশ রসিকতা চলে নিয়মিতভাবে।

আগের ঘটনা ।

[চল্লিশের পূর্ব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বর্গের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ার বিদায়ের করুণ রাগিণী। এবার আনন্দ-শিশির-ঝমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ও'রা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। যুদ্ধের হাওয়া চারদিকেই। রাজদিয়াতেও। এরই মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল সুধা-সুনীতির।

কিশোর বিনুও পেশৌছে গেছে যৌবনের দ্বারে।

সুরমাও মারা গেলেন একদিন।

বিনু একা। বড়ো নিঃসঙ্গ।

।। চুয়ান্ন ।।

আরো একটা বছর ঘুরে গেল।

এর ভেতর বিনু ম্যাট্রিক পাশ করে রাজদিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে। ঝিনুক ক্লাস এইটে পড়ছে।

সুরমার মৃত্যুর পর অনেকদিন এই বাড়িটার ওপর দিয়ে উদাস হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল। তখন বিনুর মনে হত, পৃথিবীর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতি বুঝি চিরদিনের জন্য থেমে গেছে। মনে হত, চোখের সামনের মনোহর দৃশ্যময় জগতের কোথাও উজ্জ্বল রঙ নেই। সব দীপ্তিহীন ধূসর হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে দুঃখের তীব্রতা কমে এসেছে। শোকটা এখন আর অনুভূতিতে নেই, স্মৃতি হয়ে গেছে।

সুধা নেই, সুনীতি নেই, সুরমা মৃত। একদিন এই বাড়িটা ঘিরে সব সময় যেন উৎসব লেগে থাকত। হিরণ আসত, আনন্দ আসত, রুমা-ঝুমারা আসত। জাপানী বোমার ভয়ে যারা দেশে পালিয়ে এসেছিল, তারা আসত। গান-বাজনা-নাটক এবং হুল্লোড়ে বাড়িটা গম গম করত।

ভরা কোটালের পর প্রবল ভাঁটার টানে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাড়িটা আজকাল আশ্চর্য নিঝুম। যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক, শুধু শূন্যতা।

সুধা-সুনীতি সেই যে কলকাতায় চলে গিয়েছিল, তারপর আর রাজদিয়ায় আসে নি। মাঝে মধ্যে এক আধখানা চিঠি লিখে সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখছে তারা।

সুধা-সুনীতির কথা থাক, নতুন সংসার পেয়ে তারা বিভোর হয়ে আছে। এখান থেকে যাবার পর ঝুমাটা খুব চিঠি লিখত বিনুকে—সপ্তাহে দুটো করে। কবে থেকে চিঠি আসা কমতে কমতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, বিনু লক্ষ করে নি।

সময়টা জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি। বাগানের আম গাছগুলো কবেই নিঃস্ব হয়ে গেছে, ডালে ডালে পাতা ছাড়া আর কিছুই নেই। কালোজাম, গোলাপজাম, রোয়াইল আর লটকা ফলের গাছগুলোরও এক অবস্থা। শুধু আষাঢ়ি আমগাছগুলো সারা গায়ে কিছু কিছু ফল সাজিয়ে রেখেছে। তবে বেতঝোপের দিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়, হাল্কা বাদামী রঙের গোল গোল থোকা থোকা বেতফলে ঝোপগুলো ছেয়ে আছে।

গরম শেষ হয়ে এল। এর মধ্যেই আকাশ জুড়ে কালো কালো ভবঘুরে মেঘেরা হানা দিতে শুরু করেছে। কদিন আর? আষাঢ় মাস পড়লেই মেঘের টুকরোগুলো ঘন হয়ে জমাট বেঁধে চরাচর ছেয়ে ফেলবে। তারপর শুরু হবে বর্ষা, আকাশ থেকে লক্ষ কোটি বৃষ্টির ধারা সারাদিন ধরে, সারারাত ধরে শুধু নামতেই থাকবে।

চৈত্র-বৈশাখে যে মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, নতুন বর্ষা তাদের জুড়িয়ে দেবে। তপ্ত তৃষিত বসুন্ধরা স্নিগ্ধ হতে থাকবে। চারদিকে বর্ষা তার সজল ছায়া ফেলতে শুরু করেছে।

একদিন দুপুরে অবনীমোহন কোথায় যেন গিয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে হেমনাথকে বললেন, 'মামাবাবু একটা কথা বলছিলাম'—

হেমনাথ আর বিনু পুবের ঘরে বসে ছিল। স্নেহলতা এইমাত্র এ-ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ, 'কী কথা অবনী '

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে অবনীমোহন বললেন, 'আমি আসাম যাব।'

'হঠাৎ আসামে?' হেমনাথ অবাক।

তক্ষুনি উত্তর দিলেন না অবনীমোহন।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'কদিনের মধ্যেই বৃষ্টি নেমে যাবে। জমিতে হাল-লাঙল নামাতে হবে। এ সময় তুমি আসাম যেতে চাইছ!'

'হ্যাঁ, মানে—'

'কী?'

'এ বছর আমি চাষ করবে না।'

'তবে জমির কী হবে?'

'ভাবছি বর্গাদারদের কাছে ভাগচাষে দিয়ে দেব।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর হেমনাথ বললেন, 'আসাম থেকে ফিরছ কবে?'

'কিছু ঠিক নেই।'

'ওখানে যাবার কী কারণ ঘটল, বুঝতে পারছি না তো।'

'আমি একটা কনট্রাকট ধরেছি—'

'কিসের কনট্রাকট?'

'মিলিটারির।'

'কই, আমাকে আগে কিছু বলনি তো—'

'আজই তো পেলাম, আগে বলব কি করে?' অবনীমোহন হাসলেন।

'হেমনাথ বললেন, 'কনট্রাক্ট তো নিয়েছ। আসামে গিয়ে কী করতে হবে?'

'মিলিটারিদের জন্যে রাস্তাঘাট আর পাহাড়ের ওপর ব্যারাক ট্যারাক তৈরি করতে হবে।'

'তোমার এসব করার অভিজ্ঞতা আছে?'

'বিন্দুমাত্র না।'

'তা হলে?'

'করতে করতেই অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে।'

হেমনাথ বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকলেন।

অবনীমোহন বলতে লাগলেন, 'রাজদিয়ায় আসবার আগে চাষ-আবাদের কিছু কি জানতাম? করতে করতেই শিখে গেলাম।'

হেমনাথ এবারও কী উত্তর দেবেন, যেন ভেবে পেলেননা।

অবনীমোহনের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল বিনু। বাবাকে সে চেনে। তাঁর মধ্যে কোথায় যেন একটা চঞ্চল যাযাবরের বাস, দুটো দিনও সেটা তাঁকে স্থির থাকতে দ্যায় না, নিয়ত ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়।

যৌবনের শুরু থেকে কত কী-ই তো করেছেন অবনীমোহন। অধ্যাপনা-ব্যবসা-চাকরি, একটা ধরেছেন, আরেকটা ছেড়েছেন। নির্ভর করার মতন কিছু হাতে পেলে মানুষ তাকে ঘিরেই জীবনকে পুষ্পিত করে তোলে। অবনীমোহনের স্বভাব আলাদা। অনিশ্চয়তার ভেতর ছুটে বেড়ানোতেই তাঁর যত আনন্দ।

এই প্রৌঢ় বয়েসে বসুন্ধরার এক কোণে অনেকখানি ভূমি পেয়েছেন তিনি, চারদিক শস্যে-স্বর্ণে পরিপূর্ণ। কোথায় পা পেতে বসে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন, তা নয়। রক্তের ভেতরে সেই যাযাবরটা তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে।

চার পাঁচ বছরের মতন রাজদিয়া তাঁকে মুগ্ধ সম্মোহিত করে রেখেছিল। জল-বাঙলার এই সরস শ্যামল জায়গাটার আর সাধ্য নেই অবনীমোহনকে ধরে রাখে। তার সম্মোহনের মন্ত্র বৃথা হয়ে যেতে শুরু করেছে।

দিনকয়েক পর অবনীমোহন আসাম চলে গেলেন।

●

অবনীমোহন চলে যাবার পর সময় যেন ঝড়ের গতিতে ছুটতে লাগল। যুদ্ধের প্রথম দিকে দুর্ধর্ষ জার্মান বাহিনী সমস্ত পৃথিবীকে পায়ের নীচে নামিয়ে এনেছিল। এখন তারা পিছু হটছে, দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে মিত্রশক্তির জয়ধ্বনি।

একদিন খবর এল লাল ফৌজ বার্লিনে ঢুকে পড়েছে এবং জার্মানী আত্মসমর্পণ করেছে। পূর্ব গোলার্ধে তখনও যুদ্ধের আসর জমজমাট। হঠাৎ আরেকদিন খবর হল হিরোসিমা নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা পড়েছে। এবং এই দুটি বোমাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ওপর যবনিকা টেনে দিল।

অবনীমোহন সেই যে খবর কাগজ আনার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, এখনও তা চলছে। তিন মাস পর পর হেমনাথ টাকা পাঠিয়ে দ্যান, ডাকে খবর কাগজ চলে আসে।

একদিন বিনু দেখল প্রথম পাতা জুড়ে বড় বড় অক্ষরে খবর বেরিয়েছে।

'বিশ্বযুদ্ধের অবসান: মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্ম-সমর্পণ : জাপ সম্রাটের ঘোষণা।'

'পটাসডাম ঘোষণার সমস্ত শর্ত স্বীকার। মিকাডো কর্তৃক পারমাণবিক বোমার ধ্বংসলীলার কথা উল্লেখ।'

'প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ও মিস্টার এটলীর বিবৃতি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় মিত্রপক্ষ বাহিনীর প্রতি যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ।'

'নিউইয়র্ক, ১৫ই আগস্ট—সম্রাট হিরো-হিতো অদ্য বেতারে সরাসরি জাপ জাতির উদ্দেশে এক বক্তৃতায় বলেন যে, পটাসডাম চরমপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতির উদ্দেশে সম্রাটের সরাসরি বক্তৃতা এই প্রথম।'

একধারে ছোট হরফে আরেকটা খবর রয়েছে।

'পরাজিত জাপানের প্রতি মিত্রপক্ষের প্রথম আদেশ জারী। জেনারেল ম্যাক-আর্থারের প্রতি দূত প্রেরণের নির্দেশ। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি মিত্রবাহিনী কর্তৃক দখলের আয়োজন।'

তার তলায় আরেকটা খবর।

'জাপানী সমরসচিবের আত্মহত্যা। যুদ্ধে পরাজয়ের জের।'

'লণ্ডন, ১৫ই আগস্ট—জাপানী নিউজ এজেন্সির খবরে প্রকাশ যে, জাপানের সমর-সচিব কোরেচিকা আনামি গতরাত্রে তাঁর সরকারী বাসভবনে আত্মহত্যা করেছেন।'

কোথায় গ্রেট ব্রিটেন, কোথায় আমেরিকা কোথায় নরওয়ে, কোথায়ই বা ফ্রান্স আর রাশিয়া। মিত্রবাহিনী জেতার ফলে সে সব জায়গায় নাকি উৎসবের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধজয়ের ঢেউ অখ্যাত নগণ্য রাজদিয়াতেও এসে পড়ল।

মিলিটারি ব্যারাকগুলো আলোর মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। রঙীন কাগজ দিয়ে বড় বড় তোরণ তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো থেকে লাল-নীল কাগজের ঠোঙায় অসংখ্য লণ্ঠন ঝুলছে। আর উড়ছে পতাকা—মিত্রশক্তির সবগুলো দেশের পতাকা রাজ-দিয়ার আকাশে সগর্বে মাথা তুলে আছে।

যুদ্ধজয়ের আনন্দে সারাদিনই ব্যারাক-গুলোতে হুল্লোড় চলছে। নাচগান, আর অবিরাম জ্যাজ বাজনার শব্দে রাজদিয়ার স্নায়ু বুঝি ছিঁড়েই পড়বে। নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-মাণিকগঞ্জ থেকে কত যুবতী মেয়ে যে আনা হয়েছে তার লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া মদের ঢল বয়ে যাচ্ছে। মিলিটারি ব্যারাকের একটি প্রাণীও এখন সুস্থ বা স্বাভাবিক নেই। দিনরাত্রি নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন।

মাসখানেক প্রমত্ত উৎসব চলল। তারপর একদিন রাজদিয়াবাসীরা দেখতে পেল, ধূসর রঙের সেই বড় স্টিমারটা এসে জেটিঘাটে ভিড়েছে। বিশাল জলপোকার মতন এই স্টিমারটা করেই নিগ্রো আর আমেরিকান টমিরা রাজদিয়ায় এসেছিল, তাদের লরী-ট্রাক-কামান-বন্দুক-গোলাগুলী এবং অসংখ্য সরঞ্জাম এসেছিল।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। রাজদিয়াবাসীরা এবার দেখল, জীপ-ট্রাকের চাকাটাকা খুলে এবং বড় বড় লোহার পেটিতে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে স্টিমারে তোলা হচ্ছে। একদল টমিও স্টিমারে উঠল।

সকালের দিকে স্টিমারটা এসেছিল, বিকেলে চলে গেল।

এরপর থেকে রোজ সকালবেলা স্টিমারটা রাজদিয়া আসতে লাগল এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম আর একদল করে টমি নিয়ে চলে যেতে লাগল। দশদিনের ভেতর চারদিক ফাঁকা হয়ে গেল। যুদ্ধের স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতি-কায় প্রাণীর কঙ্কালের মতন রাজদিয়া জুড়ে পড়ে থাকল কতকগুলো শূন্য ব্যারাক এবং লম্বা লম্বা পীচের রাস্তা।

যুদ্ধের মাঝামাঝি দু তিনটি বছর রাজদিয়ার জীবন খুব চড়া তারে বাজছিল, আবার পুরনো স্তিমিত ঢিমেতালের দিন-যাপনের মধ্যে ফিরে গেল সে।

●

যুদ্ধের শেষ দিকে বিস্ময়কর একটা খবর এসেছিল—সুভাষচন্দ্রের খবর।

বিনুর মনে পড়ে, তারা রাজ-দিয়া আসার কিছুদিন পর সুভাষ-চন্দ্র কলকাতার বাড়িতে অন্তরীণ হয়েছিলেন। সেই অবস্থাতেই একদিন তাঁকে পাওয়া গেল না। সমস্ত দেশ স্তম্ভিত বিস্ময়ে একদিন শুনল, ব্রিটিশের সতর্ক বিনিদ্র পাহারার মধ্য দিয়ে তাঁর রহস্যময় অন্তর্ধান হয়েছে। কিভাবে, কোথায়, কোন দুর্গমে অদৃশ্য হয়েছেন, কেউ জানতেও পারল না। সারা দেশের কাছে সুভাষচন্দ্র এক চমকপ্রদ লিজেন্ডের নায়ক হয়ে থাকলেন।

তার ক'বছর পর যুদ্ধের যখন শেষ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য, সেই সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ওপার থেকে টুকরো টুকরো যেসব খবর আসতে লাগল তাতে শৃঙ্খলিত দেশের হৃৎপিণ্ড বিপুল আশায় দুলতে লাগল।

রূপকথার চাইতেও সে এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। কলকাতা থেকে অন্তর্হিত হয়ে প্রথমে আফগানিস্তান, সেখান থেকে বার্লিন, তারপর টোকিও গেলেন সুভাষ-চন্দ্র। পদানত দেশ তাঁকে যেন অস্থির উন্মাদ করে তুলেছে।

বীর নায়ক রাসবিহারী বসু তখন আজাদ হিন্দ সংঘ সৃষ্টি করেছেন। সুভাষ-চন্দ্র তাতে প্রাণসঞ্চার করে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। 'আজাদ হিন্দ সংঘ' হল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ইতিহাসের সে এক পরম শুভক্ষণ। একই পতাকাতলে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত এসে হাত মেলাল। সুভাষচন্দ্র সেদিন থেকেই নেতাজী।

তারপর শুরু হল শৃঙ্খলমুক্তির অভি-যান। জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে উর্ধ্বশ্বাসে রক্তমুখে সে এক দুরূহ ব্রত-পালন। দেখতে দেখতে সিঙ্গাপুরে জাতীয় পতাকা উড়ল। তারপর বর্মা পেরিয়ে ইম্ফল পেছনে ফেলে ঝড়ের গতিতে কোহিমা পর্যন্ত এল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

ঐ কোহিমা পর্যন্তই। এদিকে জাপানের তখন করুণ অবস্থা। রসদ নেই, খাদ্য নেই, সুভাষচন্দ্রের বড় সাধের 'দিল্লী চল' স্বপ্ন হয়েই রইল।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মরণপণ অভিযান পরাভূত বিধ্বস্ত হয়ে যায়। 'জীবন-মৃত্যু'কে যাঁরা তুচ্ছ করেছিলেন সেই ভয়লেশহীন বীর সন্তানেরা বন্দী হয়ে একে একে দিল্লীর লালকেল্লায় কারারুদ্ধ হয়েছেন। ধীলন শাহনওয়াজ, সায়গল—পরাধীন জাতির ইতিহাসে নামগুলো সোনার অক্ষরে লিখে রাখবার মতন।

বিনুর মনে আছে, দিনকয়েক আগে খবরের কাগজে পড়েছিল, আজাদ হিন্দ

ফৌজের অভিযুক্ত সেনানীদের বিচারের জন্য সামরিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে এবং বন্দীরা আপীল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

ট্রাইব্যুনাল গঠনের পর তিন সপ্তাহ বিচার স্থগিত ছিল, আজ লালকেল্লায় তার প্রহসন শুরু হবে। একরকম অনায়াসেই এই বিচারের রায় আগে থাকতে বলে দেওয়া যায়।

সমস্ত দেশের প্রাণপুরুষ এই বীর সেনানায়কদের জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে। আসমুদ্র হিমাচল বিশাল ভারতবর্ষের এমন কেউ নেই, মনে মনে যে লালকেল্লার সেই পুরুষ কটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। সামরিক ট্রাইব্যুনালের সামনে বীর সন্তানদের মুক্তির জন্য সওয়াল করতে ছুটে গেছেন ভুলাভাই দেশাই। দীর্ঘ দু যুগ পর ব্যারিস্টার বেশে জওহরলাল আজ ভুলাভাইর পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন।

কোথায় কলকাতা, কোথায় বোম্বাই, কোথায় দিল্লী—সমস্ত ভারতবর্ষ আজ অস্থির, উত্তেজিত। বিচারের আগের মুহূর্তে দেশের আত্মা যেন বজ্রকণ্ঠে দাবী জানাচ্ছে, স্বাধীনতার সৈনিকদের সসম্মানে মুক্তি চাই।

দূর সমুদ্রকল্লোল এই রাজদিয়ায় এসেও ধাক্কা দিয়েছে। বিনুরা কলেজে স্ট্রাইক করল, দুটো প্রাইমারি স্কুল, ছেলেদের হাইস্কুল এবং মেয়েদের হাইস্কুলেও স্ট্রাইক হয়ে গেল। তারপর ছাত্রছাত্রীরা ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে নিয়ে মিছিল বার করল। সারা শহর ঘুরতে ঘুরতে তারা শ্লোগান দিতে লাগল :

'আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের—'

'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।'
'জয় হিন্দ—'
'বন্দে মাতরম—'
'নেতাজীকি—'
'ভারত মাতাকি—'
'জয়।'
'শাহ্‌নওয়াজ-ধীলন-সায়গল কি?'
'জয়'।

একে একে এল রসিদ আলী ডে, বোম্বাইতে নৌবিদ্রোহ। সারা দেশ ঝড়ের দোলায় দুলতে লাগল।

●

আজাদ হিন্দ সৈনিকদের মুক্তির জন্য আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ, রসিদ আলী ডে—বিদ্যুৎচমকের মতন দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

এদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিক সরকার ঘোষণা করলেন, একটি ক্যাবিনেট মিশন এদেশে পাঠাবেন। উদ্দেশ্য, কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তার সূত্র উদ্ভাবন করা।

উনিশ শ ছেচল্লিশের তেইশে মার্চ ক্যাবিনেট মিশন ভারতে এসে পৌঁছল। এঁদের তিনজন সদস্য—লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং মিস্টার এ ভি আলেকজান্ডার।

ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষে এসেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনা শুরু করল।

লাহোর প্রস্তাবের পর মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতবর্ষের দেহ ছিন্ন করে একটি সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্র গড়তেই হবে। লীগ নেতাদের ভয় দেশ স্বাধীন হলে সংখ্যালঘু মুসলমানদের নিরাপত্তা থাকবে না, 'হিন্দু রাজ' তাদের ধ্বংস করে দেবে।

কিন্তু ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যরা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, দেশভাগে তাঁদের বিন্দুমাত্র সায় নেই। তখন মোটামুটি স্থির হয়, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা এবং সুশাসনের জন্য ফেডারেল গভর্ণমেণ্ট তৈরী করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব। এ বি এবং সি—দেশকে তিনটি অংশে ভাগ করে যত বেশি বিষয়ে সম্ভব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে।

'বি' বিভাগে থাকবে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বৃটিশ বেলুচিস্তান। এই অংশটিতে নিরঙ্কুশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা। 'সি' বিভাগে থাকবে বাঙলা ও আসাম। এখানেও মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন হাতে পেলে মুসলমানদের সন্দেহ ও উৎকণ্ঠা অন্তত থাকার কথা নয়। তবে জাতীয় ঐক্যের দিকে দৃষ্টি রাখতেই হবে।

মুসলিম লীগ শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। কংগ্রেসেরও এতে আপত্তি ছিল না। সফলকাম ক্যাবিনেট মিশন দেশে ফিরে গেল।

ক্যাবিনেট মিশন চলে যাবার পর ক'দিন আর। আবার পুরনো সংশয় ঘৃণা এবং পারস্পরিক বিদ্বেষে আকাশ বিষাক্ত হয়ে উঠল। মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত নিল, কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে যোগ দেবে না, বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে প্রতিনিধিত্ব করবে না। জিন্না ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ডাক দিলেন।

ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট ইতিহাসের এক অন্ধকার দিন। সারা দেশ জুড়ে আত্মঘাতী দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। কোথায় কলকাতা, কোথায় বিহার, কোথায় নোয়াখালি—সমস্ত ভারতবর্ষ রক্তের সমুদ্র হয়ে দুলতে লাগল। কে বলবে মাত্র ক'দিন আগে নৌবিদ্রোহ ঘটে গেছে, কে বলবে রসিদ আলী ডে কিংবা আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানীদের মুক্তির জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সেদিন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আন্দোলন করেছিল ঃ

খবর কাগজ খুললে এখন শুধু আগুন-হত্যা-ধর্ষণ। ভারতবর্ষ যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে বর্বর যুগের কোন আদিম উষায় ফিরে গেছে।

আসমুদ্র হিমালয় একখানা আগুনের চাকা যেন ঘুরে চলেছে। এই ছোট্ট রাজদিয়াতেও তার আঁচ এসে লাগল।

মিলিটারি ব্যারাকে সাপ্লাই দেবার জন্য রজবালি শিকদার মমতাজ মিঞার যে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে গুদাম করেছিল, এখন সেটাই মুসলিম লীগের অফিস। তার থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলে হাইস্কুলের গা ঘেঁষে কংগ্রেসের অফিস।

আজকাল রোজই হয় মুসলিম লীগ, না হয় কংগ্রেস রাজদিয়ায় মিটিং করছে।—মিটিংয়ের পর দু-দলই মিছিল বার করে।

সবুজ পতাকা উড়িয়ে লীগের সমর্থকরা শ্লোগান দেয় ঃ

'লড়কে লেঙ্গে'—
'পাকিস্থান।
'কায়েদে আজম—'
'জিন্দাবাদ।'

কংগ্রেসের মিটিঙে মোতাহার হোসেন সাহেব আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা দেন, 'আমরা হিন্দু-মুসলমান যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বাস করছি। বাস করবও। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এদেশকে কোনদিনই ভাগ করতে দেওয়া হবে না। এক বছর, দু বছর, দশ বছর, হাজার বছর পরও এদেশ একই থাকবে।'

সারা দেশ যখন অস্থির, উন্মাদ, তখন মোতাহার হোসেন সাহেবের কথা কার কানে ঢুকবে? দেশজোড়া উন্মত্ততা 'জল-বাঙলার' এই স্নিগ্ধ শ্যামল ভুবনেও একদিন রক্তের সমুদ্রকে টেনে নিয়ে এল।

●

ঘটনাটা এইরকম।

সেদিন হেমনাথের সঙ্গে সুজনগঞ্জের হাটে গিয়েছিল বিনু। নৌকো থেকে নেমে ওপরে উঠতেই তারা শুনতে পেল, বিষহরিতলার ওধারে বিশাল মাঠখানায় মিটিঙ চলছে। হাটের বেশির ভাগ লোক ওখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে।

কিছুটা আপনমনে হেমনাথ বললেন, 'আজকে আবার কিসের মিটিঙ'।

বিনু বলল, 'কি জানি—'

বেগুন ব্যাপারী গয়জদ্দি পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, হেমনাথ ডাকলেন।

গয়জদ্দি দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, 'কী কন হ্যামকত্তা?'

'অমন দৌড়চ্ছিস কেন?'
'মিটিনে যাই—'
'কিসের মিটিঙ রে?'

'ঢাকা থনে বড় মাইনষেরা আইছে, তেনারা কি সগল কইব। যাই—বলে আর দাঁড়াল না গয়জদ্দি, আবার ছুটল।

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বিনুকে বললেন, 'মিটিঙে যাবি নাকি দাদাভাই?'

'চল। ঢাকার লোকেরা কী বলছে, শুনেই আসি।'

(ক্রমশঃ)

আলাপ আলোচনা

ভদ্রমহিলা দক্ষিণ ভারতীয়। প্রায় আকস্মিক পরিচয়। অল্পেই জমে ওঠে। তারপর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ। আলাপে ঘন হবো। উভয়ের একই বাসনা। কিন্তু ঘটলো অন্যরকম।

যথারীতি নিমন্ত্রণ রেখেছি। নির্দিষ্ট সময়ের দু-পাঁচ মিনিট আগেই গিয়ে পেঁাচেছি। সঙ্গে সঙ্গে সাদর সম্ভাষণ। আরো জনাতিনেক ভদ্রমহিলা বসে। আঁচ করা গেল, সবাই এক-একটি রাজ্যের প্রতিনিধি। সকলের সঙ্গে পরিচয় হলো। একজনের দৌলতে এতজনের সঙ্গে পরিচয়ে আমি রীতিমত গর্ব অনুভব করতে শুরু করেছি। সে রেশ কাটতে না কাটতেই হঠাৎ যেন ভাবনা থমকে দাঁড়ালো।

ও'রা নিজেরাই আলোচনা করছিলেন। একজন মত প্রকাশ করলেন, বাঙালী মেয়েরা ভীষণ ঘরকুনো। বাইরে এক পা বাড়াতে রাজি নয়। নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যেই সবসময় আটকা পড়ে থাকে।

কথাটা খট করে কানে ধরলো। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। পাশ থেকে আরেকজন বললেন, শুধু বাংলাদেশ নয়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট মায় দক্ষিণ ভারতেও একই অবস্থা। এ'রা সবাই একই নৌকার যাত্রী। খুব একটা দায়ে না পড়লে কেউ ঘর ছেড়ে বেরুতে চান না।

সঙ্গে সঙ্গে সেই দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রমহিলা প্রতিবাদ করলেন, এই তো আমি দেশ ছেড়ে এখানে এসে রয়েছি।

আরেকজন জবাব দিলেন, সে তো তোমার চাকরির দায়ে।

এবার দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রমহিলা সরব হলেন, আমরা চাকরির জন্য সব জায়গায় যেতে প্রস্তুত। শুধু চাকরি নয়, আমরা প্রয়োজনের দাস। কিন্তু বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে আমি কথা বলে দেখেছি, তাঁরা কিছুতেই কলকাতা ছাড়তে রাজি নয়। বাইরে বদলির আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনের চাকরিতে ইস্তফা দেওয়ার ঘটনাও আমার জানা আছে। তাঁরা অজুহাত দেখায়, বুড়ো মা-বাবাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। কিন্তু ও'রা সমাজের কথা একবারও ভাবে না। আমরাও তো বাড়ি-ঘর মা-বাবা ছেড়ে এখানে পড়ে আছি। একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে এবার তিনি একটু থামলেন।

ও প্রান্ত থেকে একজন শুরু করলেন, একথাও ঠিক যে সবার আগে বাঙালীরাই বিভিন্ন প্রদেশে যাতায়াত শুরু করে। সত্যি [illegible] কি, এ'রাই বিভিন্ন [illegible] ভারতে সেতুবন্ধ। পরিবর্তন যা হয়েছে সে তো হালে।

এবার দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রমহিলা মুখ খোলেন, সে তো নিশ্চয়ই। বাঙালীদের ঘর-কুনো বলে যত বদনামই দিই একদিন এ'দের মধ্যে থেকেই এসেছিলেন সরোজিনী নাইডুর মতো নেত্রী। কিন্তু আজকে আর সেকথা ভাবাও যায় না।

আমার পাশে বসা ভদ্রমহিলা সে কথায় সমর্থন জানিয়ে বল্লেন, একদিন বাংলাদেশ সবাইকে নেতৃত্ব দিতো। আর আজ সেই জাত পিছিয়ে পড়েছে। ভাবলেও কষ্ট হয়। তাছাড়া প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গে খোদ বাংলাদেশের বাসিন্দাদের যেন কোন মিলই নেই। বিভিন্ন রাজ্যে প্রবাসী বাঙালীরা আজো আমাদের প্রেরণা। ও'দের দিকে তাকিয়ে শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। কিন্তু কলকাতায় এসে সে ধারণা পুরোটাই বদলে যায়। এ'রা যেন ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছেন।

আমি নির্বিকার শ্রোতা। চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলাম। কোন মন্তব্য না করে। এবার মুখ খুলতে হয়। এতক্ষণে সকলের মনোযোগও আমার দিকে। বাধ্য হয়েই আমাকে শুরু করতে হলো, বাঙালীরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে একথা ঠিক। আর আমরা কিছুটা ঘরকুনোও বটে। অতীতে যে ভূমিকা আমরা নিয়েছিলাম আজ আর সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য আমরা দায়ী নিশ্চয়ই সেই সঙ্গে পরিবর্তিত অবস্থাও। তবে এর মধ্যেও আশার আলো, আমরা ক্রমেই মোহ কাটিয়ে উঠছি। ঘর সংসারের যে চিরন্তন মোহ তা অক্ষুণ্ন রেখেও আমরা কিছুটা এগিয়েছি বলা চলে। বাংলাদেশ থেকে পর পর অনেকগুলি পর্বত অভিযান হলো। বাঙালী মেয়েরাই অভিযাত্রী। এবারও এ'রা যাচ্ছেন সিগারি অভিযানে। প্রথমবারে রোন্টি শৃঙ্গ জয়ে এদের কৃতিত্ব প্রমাণ হয়েছে। শুধুমাত্র পর্বতাভিযানের জন্য মেয়েদের স্বতন্ত্র সংগঠন 'পথিকৃৎ' এর উদ্যোক্তা। তাছাড়া পর্বত অভিযানে ট্রেলার গিরিবর্ত্মে নিহত অনিমা সেনের নামটাও নিশ্চয়ই ভুলে যাওয়ার নয়। এতো শুধু একটা দিক। এমনি আরো নানা দিকে বাঙালী মেয়েরা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছে। আশা করা যায়, অচিরেই পথের সন্ধানও তাঁরা পাবে।

আমার কথায় উপস্থিত সকলেই খুশি। তাঁরা এ খবরগুলো জানতেন বলে মনে হলো না। বাঙালী মেয়েদের অগ্রগতির সংবাদে তাই তাঁদের পুলকিতই মনে হলো।

এরপরই প্রসঙ্গ পরিবর্তন। চা-কফিতে আসর সরগরম।

দেশের মেয়ে বিদেশে

শ্রীমতী কনিকা বসুর নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল, বি-বি-সির 'বিচিত্রা'য় তাঁর কণ্ঠস্বর মাঝে মধ্যে শুনেছি। মনের মধ্যে একটা 'ইমেজ' তৈরী হয়েছিল অনেকদিন। দেখবার বাসনা আর কৌতূহলও। ছ সপ্তাহের জন্যে দেশে ফিরেছেন শুনে উৎসাহিত হলাম। কলকাতা থেকে ষোল কিলোমিটার দূরে সোদপুরে মিগ হাউসিং এস্টেটে তাঁর নিজস্ব বাড়িতে হঠাৎ একদিন হাজির হলাম সাক্ষাৎ-আলাপের উদ্দেশ্যে।

পাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। খবর পেয়ে দ্রুতপায়ে এসে হাজির। মুখে মিষ্টি হাসি, সাদামাটা আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মতো চেহারা। দেখে ভালো লাগল। একুশ বছর ব্রিটেন-বাসের কোন চিহ্ন কোথাও—না চেহারায় না আচার আচরণে—প্রগলভ হয়ে ওঠেনি।

'অমৃত' পত্রিকার তরফ থেকে এই সাক্ষাৎকার। কতকগুলো প্রশ্ন রেখেছিলাম তাঁর সামনে উত্তরটা উত্তমপুরুষেই তাঁর মুখে শুনুন।

ব্রিটেনে আছি একুশ বছর। বি-বি-সি'র বাংলা বিভাগের প্রযোজক শ্রীকমল বসুর সহধর্মিণী হয়েই এখানে আসি। উনি ১৯৪৭ লন্ডন থেকে এসে বিবাহ করেই ঊনিশ দিনের মাথায় আবার লন্ডনে আমাকে নিয়ে ফিরলেন। খুব থ্রিলিং লেগেছিল। বিবাহ তারিখটা একটা স্মরণীয় দিন—নেতাজী সুভাষের জন্মদিনঃ ২৩ জানুয়ারী।

প্রথম সাত বছর ঘরসংসার নিয়েই ছিলাম। এখানে 'মা' হলাম। ছেলে একটু বড় হতেই পড়াশোনার তাগিদ অনুভব করতাম। সংসারের কাজের পর প্রচুর সময় পেতাম। অবশ্য এই তাগিদের পর আর একজনের তাগাদা কম ছিল না। পড়াশোনা শুরু করলাম। আমি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক। এতে সুবিধাই হল। এই পড়াশোনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল ঘরে-বাইরের হাজারো ধরণের কাজ আর দায়-দায়িত্ব। না 'মেড' নেই। নিজের হাতেই সব করতাম—রান্নাবান্না, বাজার-হাট, ঘরদোর পরিষ্কার, অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়ন—সব কিছুই। আজও করি।

ব্রিটেনের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করি। এজন্যে বিশেষ শিক্ষা নিতে হয়েছে। স্কুলের

মতো ফুটফুটে ছেলেমেয়েদের কার না ভালো লাগে বলুন। কলকাতায় একান্নবর্তী বিরাট পরিবারে আমি মানুষ হয়েছি। এই পরিবারের অসংখ্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমি মেতে উঠতাম। ভালো লাগতো আমার। কলকাতায় বাচ্চাদের স্কুলেও আমি পড়িয়েছি। ব্রিটেনে আমার চার্জে আছে জনা-চল্লিশ ছেলেমেয়ে। বয়স তাদের অল্প। ছয়-সাত। তাদের সবকিছুই শেখাতে হয়। পড়াশোনা তো বটেই—খেলাধুলা, গান,ছবি আঁকাও। গান অবশ্য ভারতীয় গান নয়। গীটার জানতাম। এদেশে এসে পিয়ানো শিখলাম। গানের ওপর আকর্ষণ এসেছে আমার পারিবারিক সূত্রেই।

ওদেশের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে এদেশের তফাৎটা বড় রকমের। শুধু পুঁথিগত বিদ্যে নয়—কেবল বানান, গ্রামার, উচ্চারণ ইত্যাদি শিখিয়েই ওখানে শিক্ষিকার কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। আরো এক ধাপ এগুতে হয়—যেতে হয় মূলের উৎস-সন্ধানে। বাচ্চাদের স্বাভাবিক না-শেখার পিছনের তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে হয়। বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে হয় পিতা-মাতার সম্পর্কের পটভূমিকা। অসুস্থ পারিবারিক জীবনের শিকার হয় শিশুরা—শুধু ব্রিটেনে নয়—সব দেশেই।

শিক্ষাব্রতী হিসেবে আমার মতো বেশ-কিছু বাঙালী মহিলা ব্রিটেনে বসবাস করছেন। 'কালার বার' কখনো কদাচিত চোখে পড়ে। এজন্য আমাকে অসুবিধায় কখনও পড়তে হয় নি। বরং সহকর্মীরা সহৃদয়তায় ঘনিষ্ঠ। শিক্ষয়িত্রীদের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার দাবীতে আমিও শ্বেতকায় অশ্বেতকায়দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লণ্ডনের রাজপথে প্রতিবাদ শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছি।

ওদেশের সঙ্গে এদেশের তফাৎ অনেকখানি।

ব্যক্তিজীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও সমৃদ্ধ করার সব আয়োজন ব্রিটেনে যেন থরে থরে সাজানো। আমাদের দেশে ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রটা ভয়ানকভাবে সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ। আর সেইজন্যেই তরুণ ও তরুণতর সমাজে বহু অবাঞ্ছনীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। আমার একমাত্র ছেলে কল্যাণের (বাবলু) কথাই ধরুন। সে এই বছর লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে পড়ছে। ডক্টরেট পাবার প্রস্তুতি সেই সঙ্গেই চলছে। কলকাতায় থাকলে সেও আর পাঁচটা বাঙালী ছেলের মতোই পড়ত। কিন্তু ব্রিটেনে থাকার দরুন সুবিধে হয়েছে পড়ার সঙ্গেই সমান আগ্রহে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলেছে। সে ভালো সাঁতারু, রাগবী ও ফুটবল প্লেয়ার—ওখানকার আর্সেনাল ক্লাবের (কলকাতার মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল) 'ফ্যান'। বোয়িংয়ে দক্ষ—বোট রেসে তার দারুণ উৎসাহ। প্লেন চালাতে শিখেছে, এক চান্সে ড্রাইভিং পাশ করেছে। আর-এ-এফ (রয়াল এয়ার ফোর্স : এখানকার এন-সি-সি আর কি)-এ আছে। সময় ও সুযোগ পেলেই বোট নিয়ে 'এক্সকারসন'-এ বেরিয়ে পড়ে—জীবনকে বৈচিত্রভাবে বিকাশ করে দেবার মেলে ধরবার যে সুযোগ ছাত্র ও তরুণদের জন্যে সাগ্রহ অপেক্ষায় আছে ব্রিটেনে, কিন্তু এখানে—আমাদের এই উপমহাদেশে ঠিক তার বিপরীত চিত্র। এতটুকু সুযোগ কোথাও—কি ছোট কি বড় কারুর জন্যেই নেই।

পাঁচ বছর পরে কদিনের জন্যে দেশে ফিরে তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুক শুকিয়ে উঠেছে। দুঃখ পেয়েছি তার চেয়েও বেশি—বৃহত্তর জীবনের স্বাদ থেকে আমার দেশের ছেলেমেয়েদের অকারণে বঞ্চিত হতে দেখে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের আশ্বাস কোথাও এতটুকু তাদের জন্যে নেই। শিশু ও কিশোরদের সেই একই হাল।

আমি আছি ব্রিটেনে একুশ বছর। আমার স্বামী আছেন ছাব্বিশ বছর। ভারতীয় নাগরিকত্ব বিসর্জন দেবো কেন? অবশ্য ব্রিটেনে নাগরিক অধিকার আমরা পুরোপুরিভাবে ভোগ করছি — 'ভোটিং রাইট' আছে আমাদের। আছে ব্রিটেনের যে কোন জায়গায় বসবাসের এবং সম্পত্তি কেনার। সবাই কিনতে পারেন। আমি কিনেছিও। লণ্ডন থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে ঠিক এই সোদপুরের মতো জায়গায় রেলস্টেশনের কাছে চমৎকার বাড়ি কিনেছি। বিরাট বাগান আপেল আর গোলাপের। বাংলা-ভারতের বড় মাপের মানুষজনেরা বিশেষ করে সাহিত্য ও সংবাদ-জগতের যাঁরা শিরোভূষণ তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই পায়ের ধুলো পড়েছে আমাদের বাড়িতে। প্রশ্নের শ্রীতুষারকান্তি ঘোষও গেছেন। লণ্ডনে এলেই আমি বাঙালী রান্না—যাকে সাধু বাংলায় বলে 'পঞ্চব্যঞ্জন' — করে তাঁকে পরিতৃপ্ত করেছি। সবই পাওয়া যায় এখানে। পাঁচফোড়ন পর্যন্ত। বাংলা দেশের মিঠে জলের মাছও। তবে দাম বেশি. পটলের কে-জি দশ টাকা। এই হিসেবটা সামনে রাখলেই অন্যগুলির দাম বোঝা যায়।

আমি 'রাঁধি এবং চুলও বাঁধি'। সব মেয়েদেরই এখানে তাই করতে হয়। এজন্যে বিশেষ কৃতিত্ব আমার কিছু নেই। অনেককাল আছি বলেই আমাকে এবং আমার স্বামীকে অনেক সময় 'লোকাল গার্জেনে'র ভূমিকা নিতে হয়—বিশেষ করে পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে। খবরদারি করতে হয়, 'চোখ' রাখতে হয় যাতে তারা এই শ্বেতদ্বীপে চিরজীবনের জন্যে বন্দী না হয়ে পড়ে।

ব্রিটেনে মেয়েদের অজস্র সমস্যা। বিবাহ-বিচ্ছেদ এখানে যেন ডাল-ভাত। এই বিচ্ছেদের পথ ধরেই হানা দেয় নানা বিপত্তি। আমাদের দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার পর ব্রিটেনের বিষণ্ন ছবির প্রতিচ্ছায়া এখানে জায়গায় জায়গায় দেখেছি। বিবাহ-বিচ্ছেদ ভালো কি মন্দ সে বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি এই ব্যবস্থায় আমার মনের সায় নেই। যদি বলেন 'ব্যাক-ডেটেড'—এ প্রতিবাদ মাথা পেতে নেব। ওদেশে মন বলে যেন কিছু নেই—মায়া-মমতাও না। আজকে আমাদের দেশে একান্নবর্তী পরিবারের কাঠামোটা ভেঙে পড়লেও মা-পিসিমা-ঠাকুমা-দিদিমারা এখনও আমাদের সংসারে ঠাঁই পান। ব্রিটেনে ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলেই মা-বাবাকে ছেড়ে আলাদা সংসার পাতে। শরীরে সামর্থ্য থাকলে বয়োবৃদ্ধারা 'ল্যাণ্ডলেডি' হয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করেন। অশক্ত হয়ে পড়লে আছে 'এজেড হোম'—শেষদিনগুলো এঁদের বড় মর্মান্তিক অবস্থায় মধ্যে কাটে। 'এজেড হোম'-এর নিঃসঙ্গ শয্যায় দুরবস্থার মধ্যে এঁরা মৃত্যুর পথ চেয়ে থাকেন। সুখ নেই ওদেশের কোথাও—অ-সুখ বিস্তর।

অনেক কিছুই আছে ওদের তবু ওরা অসুখী। বুঝেছে মনের শান্তি প্রাচুর্যের মধ্যে নেই। তাই বুঝি ওরা মুখ ফিরিয়েছে ভারতের দিকে জীবনের নবতর উৎস-সন্ধানে। গ্রহণ করেছে ভারতীয় জীবন-বেদ—বৈষ্ণবধর্মে আর বেদান্তে নিচ্ছে দীক্ষা। সম্প্রতি নামকরা বিটল জর্জ হ্যারিসনের একটা পপ-সঙ্গীতের রেকর্ড বেরিয়েছে : 'হরেকৃষ্ণ' ওরা মস্তক মুণ্ডন করে নামজপ শুরু করেছে আর সবচেয়ে আশ্চর্য তখন আমরাই আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে 'ইংরেজ' বনবার মারাত্মক চেষ্টা প্রাণ-পণে করে যাচ্ছি। উনি অবসরগ্রহণ করলেই আমরা স্বদেশে ফিরে আসব—সেই স্বপ্নই দেখছি।

প্রতিবেশী হিসাবে আপনি কি ভাল?

ভাল প্রতিবেশী হওয়া মানে কেবল পাশের বাড়ীর লোকের সঙ্গে মিষ্টি হেসে কথা বলাই বোঝায় না, কিংবা মাঝে মাঝে একটু আধটু উপকার করে দেওয়া বোঝায় না।

'প্রতিবেশী' মানে আমরা প্রত্যেকে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করবো, কাজ করবো, খেলা করবো, প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো। ভাল প্রতিবেশী হতে হলে সকলের সঙ্গে খুশিমনে মানিয়ে চলতে হয়। নীচে একটি টেস্ট দেওয়া হলো, যা দিয়ে আপনি যাচাই করে দেখতে পারেন,—আপনি সত্যি সত্যি ভাল প্রতিবেশী কি না।

'হ্যাঁ' অথবা 'না' জবাব দিয়ে যান। সবশেষে নম্বর হিসাবের নিয়ম দেওয়া আছে, পরে সেদিকে তাকাবেন।

১। আপনি দেখান যেন আপনি বাড়ীর লোকজন এবং বন্ধুবান্ধবের কাজের মর্ম বোঝবার চেষ্টা করেন, সবকিছু এক-কথায় মেনে না নিয়েও।

২। আপনি বাইরের সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যেমন সৌজন্যপূর্ণ সামাজিক ভদ্রতা নিয়ে উপস্থিত থাকতে পারেন, তেমনি নিজের, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের বাড়ীতেও পারেন।

৩। আপনি বাড়ীর লোকজন এবং বন্ধুবান্ধবকে যা করতে বলেন বা তাদের কাছে যা আশা করেন, তা সব সময়ে বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবেই করেন।

৪। আপনি অন্য সকলের ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। আপনি আশা করেন না যে, সবকিছু আপনার জন্যেই বিশেষভাবে বন্দোবস্ত করা হবে।

৫। আপনি বিশ্বাস করেন যে, আপনার সঙ্গে মতের মিল না হলেও প্রত্যেক লোকের নিজস্ব অভিমত বা প্রয়োজনের মূল্য আছে।

৬। আপনি ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন এবং অন্য লোকের অসুবিধা বোঝবার জন্যে নিজেকে অন্য লোকের অবস্থায় ভাবতে পারেন।

৭। আপনি সহজে ভুলতে এবং ক্ষমা করতে পারেন।

৮। আপনি শান্তি আনতে পারেন, তাছাড়া সকলের মধ্যে প্রীতি বন্ধুত্ব এবং সহনশীলতা জাগাতে পারেন।

৯। আপনি মানুষের মনে এই আত্ম-বিশ্বাস জাগাতে পারেন যে, তাদের সকলেরই মূল্য ও মর্যাদা আছে এবং সকলে তাদের ভালবাসে।

১০। আপনি সহজেই বুঝতে পারেন লোকে কখন আপনার কাছ থেকে একটু বেশী মনোযোগ চাইছেন, আপনার সহানুভূতি খুঁজছেন এবং কখন তাঁরা অসুস্থ, অবসন্ন ও আশাহত হয়ে আছেন।

১১। আপনি বেশ মন দিয়ে লোকের কথা শুনে থাকেন এবং নিজেকে জাহির করার থেকে অন্য সকলের বক্তব্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

১২। আপনি আপনার শত কাজের মধ্যেও দুর্বল, অনভিজ্ঞ, লাজুক, একগুঁয়ে, বৃদ্ধ এবং অসহায় মানুষের সহায়তায় ছুটে যেতে পারেন।

১৩। আপনি অপছন্দের মতা-মতকে অনভিজ্ঞ মনে করতে পারেন, কিন্তু বিরক্ত না হয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করে অথবা রূঢ়তা না দেখিয়ে তাদের কথা বেশ মন দিয়ে শুনে থাকেন।

১৪। আপনি অন্য সকলের জন্যে কি করছেন বা করেন, তা নিয়ে কথা বলেন না।

১৫। আপনি পাঁচজনকে সাহায্য করেন, কারণ আপনি তা ভালবাসেন, লোককে কৃতজ্ঞ করে রাখার উদ্দেশ্যে আপনি সাহায্য করেন না।

১৬। আপনি সাহায্যের জন্যে দ্রুত হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন—ডাকার অপেক্ষা করেন না।

১৭। আপনি পাঁচজনের একজন হয়ে কাজ করে আনন্দ পান। আপনি কোন ব্যাপারে কর্তা হয়ে কাজ করতে চান না।

১৮। আপনি কোন প্রতিশ্রুতি দিলে লোকে তার ওপর নির্ভর করতে পারে—সে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে হয়তো আপনার কাজের বোঝা এবং ঝঞ্ঝাট বাড়ে, এমন কি অপ্রীতিকর কিছু করতেও হয়।

১৯। আপনি কোন লোকের বিরুদ্ধ সমালোচনা করার আগে জানবার চেষ্টা করেন তিনি সমালোচনা শুনতে চেয়ে কোনো প্রশ্ন করছেন কি না। আপনি প্রথমেই এমন একটা কিছু খোঁজবার চেষ্টা করেন যা প্রশংসার যোগ্য। আপনার সমালোচনা গঠনমূলক।

২০। আপনি মানুষকে ভালোবাসেন।

প্রত্যেক 'হ্যাঁ' জবাবের জন্যে ৫ নম্বর ধরুন। ৭০ নম্বরের বেশি পেলে ভাল, ৬০ থেকে ৭০ হলে সন্তোষজনক, ৫০ থেকে ৬০ হলে মন্দ নয়। ৫০-এর নীচে খারাপ।

যদি কম নম্বর পান, তাহলে পাঁচজনের কাজে-কথায় আগ্রহ বাড়াবার অভ্যাস শুরু করুন, আর নিজের ব্যাপার নিয়ে দিনরাত মশগুল হয়ে থাকা কমিয়ে ফেলুন।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, ভাল প্রতিবেশী হওয়া খুবই বুদ্ধিমানের কাজ, একথা সকলেরই জানা কথা। কিন্তু এর জন্যে চেষ্টা করতে হয়, আর তাহলে বেশ বোঝা যায় আনন্দময় সমাজজীবনে এর গুরুত্ব কত বেশী।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

২৮

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন

সুরের সুরধুনী

বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

কৌকভ খাঁ সাহেবের স্বর্গলাভের পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ কেরামৎউল্লা সংগীত সংঘে ১০।১২ বৎসর শিক্ষাদান করেছেন, তাছাড়া কৌকভের বিখ্যাত ধনী শিষ্যদের মধ্যে কলকাতার খ্যাতিমান ও বিত্তশালী শিষ্যরা সকলেই কৌকভের তালিম সম্পূর্ণ করবার জন্য কেরামৎউল্লার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে হরেন শীল সুরবাহার ও সেতারে, কালী পাল এস্রাজে, ধীরেন বসু সরোদে, ও গগনবাবু বেহালায় শিক্ষালাভ করেছেন। হরেন শীলের হাত বড়ই সুরেলা ছিল। পাণ্ডিত্যে কালী পাল, ধীরেন বসু এবং খাঁ সাহেবের শেষবয়সে শ্রীক্ষিতীশ লাহিড়ী যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন। নাটোরের মহারাজা যোগীন্দ্রনাথও খাঁ সাহেবের এক প্রতিভাসম্পন্ন শিষ্য ছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে মহারাজা সরোদ বাজনায় দক্ষতালাভের পরে রেওয়াজের দিকে বেশী মন দিলেন না—শুধু মজলিসেই তৃপ্ত থাকলেন। ক্ষিতীশ লাহিড়ী ও কালী রায়ের (হরেন শীলের কর্মচারী) মাধ্যমে বাবা খাঁ সাহেবের ঘরের প্রায় একশত গৎ সংগ্রহ করেন; কিন্তু তাঁর বাজনা আমাদের বাড়ীতে কদাচিৎ কখনো অনুষ্ঠিত হতো। সংগীত সংঘের সহ-সভাপতিরূপে সেখানকার নানা উৎসবে বাবা তাঁর বাজনা শুনতে যেতেন। আমার কৈশোরে ও পরে কলেজে অধ্যয়নের সময় আমি খাঁ-সাহেবের বাজনা বাইরের জলসায় ও আমাদের বাড়ীর কোনো কোনো সংগীতানুষ্ঠানে শোনবার সুযোগ পেয়েছি। খলিফা আবেদ হোসেনের তবলার সঙ্গে কেরামৎউল্লার সরোদের সঙ্গত নানা ছন্দের বৈচিত্র্য অতীব আকর্ষণীয় ছিল। মনে হতো যেন দুটি বুলবুলি খেলার ছলে লড়াই করছে। প্রতি জলসাতেই খাঁ-সাহেব ইমন-কল্যাণ রাগের আলাপ বাজিয়ে সংগীতসভা জমিয়ে তুলতেন; কিন্তু রাত্রি ১০টা বা ১১টার সময় তিনি কোমল রেখাবের কোনো প্রচলিত বা অপ্রচলিত রাগের আলাপ ও গৎ বাজাতেন, যার সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। আমি সারাজীবনে কেরামৎউল্লার পঞ্চমকুসুম শুদ্ধকোষ, বসন্ত (শুদ্ধ 'ধা' যুক্ত), ও কয়েকটি আরবী রাগের যে আলাপ ও গৎ তাঁর হাতে শুনেছি, আজও তার তুলনা কোথাও পাই না। আমি সর্বপ্রথম ধনী অ্যাটর্নী নিমাই বসুর বাগানবাড়ীতে বাবার সঙ্গে কেরামৎউল্লার বাজনা শুনতে গিয়েছিলাম। তারপর সংগীত সংঘের বিবিধ উৎসবে তাঁর বাজনা শোনবার সুযোগ আমার ঘটেছে। একটি উৎসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন; তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী খাঁ-সাহেব সুরট্ রাগ বাজান। রবীন্দ্রনাথ ও খাঁ-সাহেব সমবয়সী ছিলেন; উভয়ের মধ্যে বেশ রসিকতাও চলতো। খাঁ-সাহেবও রবীন্দ্রনাথের মতো মজলিসী ছিলেন। তাছাড়া প্রথম যৌবনে নেপালে অবস্থানকালে তিনি ভারতীয় গান্ধর্ব ও মার্গ সংগীতের নানা তত্ত্ব ও পুরাণের নানা কাহিনী বিশেষভাবে জানতেন এবং এই সকলে তাঁর বিশ্বাসও যথেষ্ট ছিল। তাছাড়া তিনি আরব ও পারশ্য দেশেও বার বছর তাঁর যৌবনকাল কাটিয়েছেন। আরবের অনেক অবহেলিত লুপ্তপ্রায় সংগীততত্ত্ব তিনি আয়ত্ত করেছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে পারশ্য সুফী সম্প্রদায়ের সৌন্দর্যের সাধনা তাঁকে গোঁড়ামি থেকে বাঁচিয়েছিল। তানসেনের বংশধরদের ন্যায় খাঁ-সাহেব হিন্দু-মুসলমান সাধনা ও সংগীতের ঐতিহ্য একই সূত্রে গেঁথেছিলেন। তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন ও মজলিসে নানা জ্ঞানগর্ভ ও সরস আলাপে সকলকেই মুগ্ধ করতেন। বাদবিসম্বাদ তাঁর স্বভাবেই ছিল না এবং স্থানীয় ও আগন্তুক ওস্তাদদিগের যথেষ্ট আর্থিক উপকার তিনি করে গেছেন। পক্ষান্তরে এঁর কনিষ্ঠ কৌকভ অতিথিবৎসলতা ও পরোপকারে যথেষ্ট ব্রতী থাকলেও মজলিসে বীরদর্পে বাজাতেন। বন্ধুর ন্যায় ব্যবহারে কৌকভের নরম মন ও পরদুঃখকাতরতা প্রকাশ পেত; কিন্তু কোনো ওস্তাদ বা সংগীতের পৃষ্ঠপোষক তাঁর পিছনে লাগলে,—তিনি সিংহবিক্রমে ব্যাঞ্জো ও সরোদ বাজিয়ে প্রতিপক্ষকে মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ করে দিতেন। কেরামৎউল্লা অতটা উগ্র ছিলেন না; কিন্তু তাঁর নিরীহ প্রকৃতি প্রতিপক্ষদের ঠাট্টা-তামাসার সুযোগ দিত,—এর কারণও আছে।

আমি স্বর্গীয় সংগীতকলাকার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় সংগীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় হরেন শীল, সম্প্রতি স্বর্গতঃ ধ্রুপদী অমর ভট্টাচার্য, বর্তমানে জীবিত মৃদঙ্গাচার্য শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ মিত্র, গোয়াবাগানের ব্যায়ামবীর গোবরবাবু পালোয়ান, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ লাহিড়ী ও স্বর্গীয় কালী পালের নিকট কৌকভ-কেরামৎউল্লা ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্বন্ধে একই মতামত ভালরূপে জেনে নিয়েছি। এঁরা সকলেই বলেছেন যে, সরোদীদের মধ্যে কেরামৎউল্লার বিদ্যা ছিল অগাধ। তিনি বহু রাগ-রাগিণী, গৎ ও প্রচলিত রাগ সকলের প্রত্যেকটির দশ-বারোটি করে গৎ পিতা নিয়ামৎউল্লার কাছে শিখেছিলেন। প্রথম বয়সেই বাম আঙ্গুলির নখগুলির ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় তিনি যখন আঁশ প্রভৃতি অলংকারের জন্য বাম তর্জনী ও মধ্যমায় রূপার কৃত্রিম নখ ব্যবহার করতেন, তখন বিলম্বিত আলাপে শ্রুতির ব্যবহারে একটু-আধটু সূক্ষ্ম সুরের তারতম্য ঘটতো। কিন্তু রূপার নখ খুলে যখন শুষ্ক চামড়ার দ্বারা জোড়, ঝালা ও ঠোক বাজাতেন, তখন তাঁর বাজনায় যৎসামান্য সুরের ত্রুটিও প্রকাশ পেত না। তাঁর ভ্রাতা কৌকভ অতি দ্রুত বাদনেও পরিষ্কার সুরেলা অথচ বীররসব্যাঞ্জক বাদ্যে শ্রোতার চিত্ত অভিভূত করে ফেলতেন। কিন্তু বিদ্যার জন্য কনিষ্ঠ কৌকভ জ্যেষ্ঠ কেরামতের উপদেশ গ্রহণ করতেন। আমাদের সময় থেকেই নিজেদের পছন্দসই ওস্তাদ ভিন্ন অন্য ওস্তাদকে বেসুরো বলে হাস্যাস্পদ করার রেওয়াজ চলে এসেছে। কথায় বলে—'যারে না দেখতে নারি তার চলনখানি বাঁকা'। বয়স ৬০ বৎসর পার হলে শতকরা ৯০ জন ওস্তাদেরই শ্রবণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুমণ্ডলীতে কিছু না কিছু উপসর্গ দেখা দেয়। গিরিজাবাবু ও হাফিজ আলীর ন্যায় সুরের বাদশাহগণেরও ষাট বৎসর অতিক্রম করার

দের গান-বাজনায় সুরের তারতম্য লক্ষ্য করা গেছে। উজির খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ প্রভৃতি দিকপাল বৃদ্ধবয়সেও যে সুরে কায়েম থাকতেন, তার কারণ—প্রথম যৌবনে অভ্যাসের ও সাধনার অত্যুৎকর্ষের ফলে এ'দের আঙুলগুলি স্বতঃই রাগানুযায়ী শ্রুতি ও স্বর স্পর্শ করতো। জাকরুদ্দিন, আল্লাদিয়া প্রভৃতি গায়ক কণ্ঠ-সংগীত সাধনায় এতই সময় অতিবাহিত করেছেন, যে তাঁদের কণ্ঠে কখনো এতটুকুও বেসুরো স্বর প্রকাশ পেত না। প্রবীণ গুণীদের বয়সসুলভ সুরের যৎসামান্য ত্রুটি ধরে, তা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করার মধ্যে শোভনতা কিছুই নেই।

বর্তমানে অধিকাংশ ওস্তাদ, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা সাতটি শুদ্ধ ও পাঁচটি বিকৃত স্বর অবলম্বনে বিভিন্ন রাগ প্রকাশ করে থাকেন। বিশেষতঃ খেয়াল গানে ও সেতার, সরোদ প্রভৃতি বাজনায় এই কয়েকটি স্বরের ব্যবহারই প্রকাশের জন্য যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু এইভাবে গান বা বাজনায় ভারতীয় সংগীতের রস, ভাব ও আসল রূপ, রহস্যই ঢাকা পড়ে যায়। হারমোনিয়ামের সুর নিয়ে সব রাগের ব্যবহার অসম্ভব। কোমল, অতি-কোমল, শিকারি, তীব্র, তীব্রতর, তীব্রতম সুরগুলি হারমোনিয়ামের বারো সুরে কখনোই প্রকাশ পাবে না। আলাপ, ধ্রুপদ, ধ্রুপদাঙ্গ খেয়ালে অনেক রাগেই ঐ সকল সুর ব্যবহার করা একান্ত দরকার। তাই সংগীতশাস্ত্রে বাইশ শ্রুতির বিবরণ রয়েছে। ভারতীয় সংগীত শুদ্ধ তানবাজির ক্ষেত্র নয়; প্রতি রাগের অন্তর্নিহিত রস ফোটাতে হলে শ্রুতি-জ্ঞানের পরিচয় অত্যাবশ্যক; যেমন হারমোনিয়ামের কোমল গান্ধার অপেক্ষা এক শ্রুতি বাড়িয়ে মালকোষ রাগের গান্ধার প্রয়োগ করতে হয়। আশাবরীর রেখাব ও ললিতের 'মা' ও 'ধা' সুরের ব্যবহারে যে বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন তা শুদ্ধ ঠাট অনুযায়ী হারমোনিয়ামের সুরে প্রকাশ পেতেই পারে না। আজকাল শুদ্ধ বারো সুরের মধ্য থেকে সুর নির্বাচনে অধিকাংশ গায়ক ও বাদক নিশ্চিন্ত হয়ে যান। তাই ভারতীয় সংগীত পূর্বাপেক্ষা অনেক খেলো হয়ে পড়েছে; অবশ্য ইমন, খাম্বাজ, কাফী, ভৈরবী প্রভৃতি রাগে হারমোনিয়ামের সুরের ব্যবহারই যথেষ্ট। কিন্তু বড় বড় রাগেই অন্যান্য সুরের ব্যবহার প্রয়োজনীয়। আমাদের বাইশ শ্রুতির মধ্যে সব রাগের সব সুরই প্রকাশিত হয় যাঁরা ভারতীয় সংগীতের এই রহস্য জানেন না,—তাঁরা বারো সুরের অতিরিক্ত শ্রুতির ব্যবহারে অনভিজ্ঞ। কানে সে সব সুরকে বেসুরো মনে করতে থাকেন।

কেরামৎউল্লার বাজনায় রাগ অনুযায়ী শ্রুতি সকল প্রকাশ পেত; কেননা তিনি ধ্রুপদের পাকা বনিয়াদের উপর বিভিন্ন সুরে ও ছন্দে বিভিন্ন রাগ বাজাতেন। প্রচলিত খেয়াল, ঠুংরির গায়করা ও সেতার-সরোদের বাদকরা কেরামৎউল্লার রাগ-রাগিণীতে শ্রুতির ব্যবহার বুঝতে না পেরে কেরামৎউল্লাকে 'বেসুরাৎউল্লা' বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে হরেন শীল ও ক্ষিতিশ লাহিড়ী আমার চোখ ফুটিয়ে দেন। ওস্তাদজী নিজেও বলতেন 'মূর্খেরা জ্ঞানের অভাবে রাগ-রস না বুঝে প্রচলিত সুরের বাইরে আমার শ্রুতির ব্যবহার নিয়ে যে হাসাহাসি করেন, তাতে আমি বিচলিত হই না। বেদ বুঝতে হলে যেমন অনেক সাধনা দরকার, আমাদের রাগ-রাগিণীর রূপ ও রস উপলব্ধি করতে হলে দীর্ঘকাল সংগীত সাধনা করা দরকার।' বারানসী সংগীত মহাসম্মিলনীর পূর্বে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী তাঁর লিখিত পুস্তকের প্রতিপাদ্য দশ ঠাট, বাদী-সংবাদী, আরোহী, অবরোহীর সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন ওস্তাদদের মতামত জানতে চেয়েছিলেন। এর উত্তরে কেরামৎউল্লা ভাতখণ্ডেজীর নিকট একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন; তাতে খাঁ-সাহেবের মতামত স্পষ্টরূপে লেখা ছিল। সর্বসাধারণের উপযোগী উচ্চাঙ্গ-সংগীতের প্রথম শিক্ষার সময় বারো সুর নিয়ে বিভিন্ন ঠাট রচনা উপযোগী হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত গুণী বা কলাকার হতে হলে আরো গভীরে ডুবতে হবে। গ্রাম, মূর্ছনা, বাইশ শ্রুতি না জানলে ভারতীয় সংগীতের মর্মস্থানে পৌঁছানো অসম্ভব।

লেডী চৌধুরীর পরলোকগমনের পর সংগীত সংঘের আর্থিক পরিস্থিতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথের লোকান্তর ঘটে; হরেন শীলেরও আর্থিক বিপুল ক্ষতি ঘটে যায়। বেচা চন্দ্রেরও (স্বর্গীয় নির্মলচন্দ্রের ভ্রাতা) মৃত্যু ঘটে। খাঁ-সাহেবের প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের অভাবে তাঁর পক্ষে কলকাতা বাস অসম্ভব হয়ে ওঠে। ১৯২৫ সালে তিনি তাঁর এলাহাবাদের পৈতৃক বাড়ীতে ফিরে যান। যাওয়ার পূর্বে এনায়েৎ খাঁ কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) ও অন্যান্য বহু গুণী তাঁর জন্য জলসার দ্বারা কয়েক হাজার টাকা তোলেন এবং সেই টাকা খাঁ-সাহেবের হাতে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদান করেন। কিন্তু খাঁ-সাহেবের মন এলাহাবাদ বাসে পরিতৃপ্ত ছিল না। মহম্মদ আলী খাঁ-সাহেবের দেহত্যাগের পর যখন আমি সেনী-ধ্রুপদ ও যন্ত্রসংগীতের অনুসন্ধানে আলাউদ্দিন, হাফিজ আলী, মেহেদী হোসেন প্রভৃতি গুণীমণ্ডলীর নিকট থেকে সংগীত সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলাম, তখন ক্ষিতিশ লাহিড়ী আমাকে বললেন,—'তুমি বিশিষ্ট ওস্তাদের নিকট থেকে অনেক কিছু রত্ন সংগ্রহ করেছ; এখন সেনী মহম্মদ আলীর পর একমাত্র কেরামৎউল্লা খাঁ সরোদী রবাবের তালিম জানেন। অন্যান্য গুণী সুরশৃংগার এমন কি বীণাও শিখাতে পারবেন। এখন বৃদ্ধ ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁ সরোদ-যন্ত্রের রবাবের ছন্দোময় বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত আলাপ যেভাবে বাজান, সেই শিক্ষা কেউই পাননি। এখন খাঁ-সাহেবের বয়স ৭০ বছরের কাছাকাছি; তাঁর আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। কালী পাল, হরেন শীল, গোবরবাবু ও আমি তাঁকে কলকাতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই। এজন্য তোমার মাথার উপরে অতিরিক্ত টাকার বোঝা পড়বে না। তাঁর আসার খরচ ও প্রথম মাসে ৫০০-০০ টাকা তুমি দাও। তারপরে আমরা সব ব্যবস্থা করে নেব।'

আমি ক্ষিতিশবাবুর কথাই শিরোধার্য করে নিয়েছিলাম।

ঋষভদেব জীবনী   ম্যুরাল : ইন্দ্র দুগার

২ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে রাখাল দাসের ২৩খানি প্যাস্টেল ড্রয়িং প্রদর্শিত হল। রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্মচারী এই শিল্পীর এটি ১৭ নম্বরের প্রদর্শনী। শ্রীদাসের প্যাস্টেল পরিচালনার রীতি বেশ পরিণত। অনেকগুলি নিসর্গ দৃশ্যে বিভিন্ন টোনের সবুজের মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট ছোট লাল বা কালোর বিন্দুর মত ফিগার বসিয়ে একটা উজ্জ্বল রূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে এইভাবে ফিগারের ব্যবহার ছবির মেজাজে পুনরাবৃত্তি দোষ আমদানী হয়েছে। তবু শহরতলীর নিসর্গ দৃশ্যের রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে উপস্থাপন দেখতে মন্দ লাগে না। তাঁর ৬, ১৩ এবং ১৬ নম্বরে নিসর্গ দৃশ্য কটি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তবে আধুনিক রীতি নিয়ে তাঁর পরীক্ষাগুলি সাফল্য লাভ করেনি।

●

বি আর পানেসর তাঁর ২৩ খানি জলরঙের ছবি ৮ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত করেন। শ্রীপানেসরও প্রধানত নিসর্গ দৃশ্য নিয়েই ছবি এঁকেছেন, তবে তাঁর কাজের গতি অ্যাবস্ট্রাকশনের দিকে এগোচ্ছে। ভিজে কাগজে উজ্জ্বল রঙ ছেড়ে অথবা প্রায় ড্রাই ব্রাশে কাজ করে তিনি কোথাও স্পেস সৃষ্টি করেছেন কোথাও-বা ক্যালিগ্রাফিক ডিজাইন তৈরী করেছেন। তাঁরও কয়েকটি নিসর্গ দৃশ্যের প্রতি শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী মূলত রোমান্টিক যেমন 'টুইলাইট ফেস্টিভ্যাল' বা 'দি হাউস অব উশে'র' ধরনের কাজগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ক্যান ইউ টেল দি ডান্সার ফ্রম দি ডান্স' অ্যাবস্ট্র্যাক্ট এক্সপ্রেশানিজমের দিকে অনেকখানি ঝুঁকেছে বলে মনে হল। 'দি বিগিনিং অব এ রাইড'-এ অনেকখানি কম এঁকে অনেক বেশী গতিবেগ সঞ্চারিত করা হয়েছে। আবার 'দি ড্রীম অব এ স্পাইডার' জাতীয় ছবিতে নিছক ক্যালিগ্রাফির প্রাধান্যটাই বেশী দেখা যায়। শিল্পীর রঙের ওপর দখল এবং কম্পোজিশনের বৈচিত্র্য প্রশংসনীয়।

বিড়লা অ্যাকাডেমিতে ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান পেন্টার্স' '৬৯ প্রদর্শনীটি ৬ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় এবং এটি খোলা ছিল ২১ তারিখ পর্যন্ত। সারা ভারতবর্ষের আঠারোজন শিল্পীর ৪৫ খানি ছবি বাছাই করে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রতিভূস্থানীয় প্রদর্শনী কলকাতার দর্শকদের সামনে উপস্থিত করাই ছিল ম্যাক্সমুলার ভবনের উদ্দেশ্য। উদ্বোধনী ভাষণে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে অ্যাকাডেমির পরিচালককে ধন্যবাদ দিয়ে বলা হয় যে তাঁরা তাঁদের কয়েকজন পরামর্শদাতা শিল্পীর সাহায্যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন এবং আমন্ত্রিত শিল্পীরা নিজেদের ছবি নিজেরাই নির্বাচন করেছেন। বর্তমান প্রদর্শনীর অনুরূপ প্রদর্শনী ভবিষ্যতে তাঁদের আয়োজন করবার বাসনা আছে। বিড়লা অ্যাকাডেমির নতুন পরিচালক বলেন যে, বর্তমান প্রদর্শনীর আয়োজনে তাঁর কোন হাত নেই, তিনি কোন ছবি নির্বাচন করেন নি এবং শিল্পীর স্বনির্বাচিত ছবি সবসময় তাঁর ভাল ছবি হয় না। নবজাতকের প্রতি মাতার স্নেহের মত নিজের নবীনতম সৃষ্টির প্রতি শিল্পীর দুর্বলতাও কিছু কম হয় না। তিনি স্বয়ং এ ধরনের প্রদর্শনী করতেন না। বর্তমান ভারতীয় শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধেও তিনি খুব আশান্বিত নন। ৫০।৬০ বছর আগে ইয়োরোপে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গিয়েছে তারই চর্চা এখানে চলছে। বিশ্বের আধুনিক শিল্পআন্দোলনে ভারতবর্ষের কোন দান যে আছে তা তিনি তাঁর সংগ্রহের দু হাজার ভলুম বইয়ের মধ্যে খুঁজে পেলে আনন্দিত হতেন। ন' বছর যাবৎ বিদেশে তিনি শিল্প নিয়ে যেসব অধ্যয়ন ও অনুশীলন করেছেন তার যৎকিঞ্চিৎ ফলস্বরূপ অল্পকাল বাদেই একটি ভাল প্রদর্শনী কলকাতায় দেখাতে পারবেন বলে আশা করেন। বিদেশ থেকে অনেকগুলি আধুনিকতম শিল্পনিদর্শন অ্যাকাডেমির সংগ্রহশালায় স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত হবে।

প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় এতখানি বিতর্কমূলক আলোচনা শুনে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল হয় ভীষণ ভাল বা ভীষণ খারাপ কিছু একটা দেখতে পাবো। অকুস্থলে গিয়ে দেখা গেল খুব সুসজ্জিতভাবে থোড় বড়ি-খাড়া এবং খাড়া-বড়ি-থোড় পরিবেশন করা হয়েছে। প্রধানত বিমূর্ত রীতির ছবিই অধিক মাত্রায় পরিবেশন করা হয়েছে। ফিগারেটিভ কাজ যেটুকু আছে তার মধ্যে ইউরোপের অতিপ্রাচীন ও অতিআধুনিক সুরিয়্যালিজম-এর চর্চার প্রভাবই বেশী। অম্বা দাসের ছবিতে রঙীন ক্যালিগ্রাফির চর্চাই প্রধান। সুনীল দাসের তীর, সাপ ইত্যাদি প্রতীক নিয়ে নানা টেক্সচারের জমির ওপর ডিজাইন সৃষ্টির মধ্যে ৬ নম্বরের বৃহৎ ক্যানভাসের মূলত শাদার ব্যবহার ও সোনালি ফ্রেমের বাহার উল্লেখযোগ্য। বীরেন দে'র একখানি ক্যানভাসের টেকনিকালার ডিজাইন যেন [illegible] এনলার্জ-করা ডিজাইনের

শিল্পী : মহিম রুদ্র

ভিত্তিতে করা বলে মনে হয়। এম এফ হুসেনের রুইতনের গঠনে করা দুটি ক্যানভাসের কালো ও ধূসর টোনে বিভাজিত ক্ষেত্রের ওপর গরুড়মূর্তি ও সেতারবাদনের চিত্র দুটির মধ্যে দক্ষতার ছাপ যতটা রসের আবেদন ততটা পাওয়া গেল না। একটুখানি কমার্শিয়াল বিজ্ঞাপনের মেজাজ কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল। ভূপেন খাকারের টাঙ্গার সামনে দাঁড়ান হুসেন এবং ফুল কুকুর ও ইংরেজ পরিষ্কার রুশো দুয়ানিয়ের রীতির অনুকরণ। নিসর্গ দৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে রামকুমার যেকটি রূপসৃষ্টি করেছেন সেগুলির বর্ণসংযম ও গঠনবিন্যাস তৃপ্তিদায়ক। তায়েব মেটার প্যাস্টেল শেডে করা ফিগার ও মুখাবয়ব নিয়ে করা কয়েকটি রূপ খুব পাকা কাজ নয়। রেড্ডেপ্পা নাইডু ছাপা ছবির টুকরো, রুপোলি ফয়েল এবং দেব-দেবীর কিছু কিছু লক্ষণাদি নিয়ে যে ছোট ছবিগুলি তৈরী করেন তার মধ্যে 'রঙচঙে ভাবটাই প্রধান। কে সি এস প্যানিকর অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ওপর অক্ষর ও কোষ্ঠির নক্সা ইত্যাদি বসিয়ে যে কম্পোজিশনগুলি দিয়েছেন তার প্রতীকধর্মিতা যতই গভীর হক স্থায়িত্ব কতটা তা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। পরিতোষ সেনের বৃহদাকার উপবিষ্ট মূর্তি তাঁর গত প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে। এ রামচন্দ্রনের লম্বা ক্যানভাসগুলির মধ্যে ম্যুরালধর্মিতা প্রধান। তাঁর রেজারেকশন ছবির কবন্ধমূর্তিগুলি ফ্রান্সিস বেকনের ধাঁচে। জি কে সুব্রহ্মনিয়ণের 'ইন্টিরিয়র' নামে ছবি দুটির রঙ ও প্যাটার্ণ সংযত ও সুপরিকল্পিত কাজ। জে স্বামীনাথনের আইকন এ্যান্ড দি লোটাস এবং অ্যালোন ইন হার্মনি চড়া পর্দার রঙের নক্সা এবং এস জি বসুদেবের ফ্যান্টাসী মামুলী ধরনের কাজ। জেরাম প্যাটেলের তক্তা পুড়িয়ে ফর্মিকল ও এনামেল লাগান ছবি তিনটিতে নূতনত্বের উত্তেজনা আর নেই। সূর্যপ্রকাশ কতকটা ক্যান্ডিনস্কীর ধরনের উজ্জ্বল রঙের অ্যাবস্ট্র্যাকশন সৃষ্টি করেছেন। কৃষ্ণ খান্না গৃহাভ্যন্তরের দৃশ্য এবং পাখীর কয়েকটি ফটোগ্রাফ কতকটা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কম্পোজিশনের মত সাজিয়ে উপস্থিত করেছেন। গণেশ পাইনের তিনখানি ছোট ছবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ফ্যান্টাসীর সুঅঙ্কিত নমুনা।

সমগ্র প্রদর্শনীতে দেখা গেল যে, ভারতের সব প্রদেশেই মোটামুটি একই মানের কাজ হচ্ছে। আর আশ্চর্যের বিষয় কলকাতা থেকে নীরদ মজুমদার বা সুনীলমাধব সেনের মত শিল্পীদের কোন কাজের নমুনা নেই। যেসব শিল্পীদের কাজ দেখান হয়েছে তাদের অন্তত তাঁদের আরো বেশ কয়েকজন শিল্পী কাজ করেছেন। কোন রহস্যময় কারণে তাঁদের ছবি বাদ গেল জানি না। বোধহয় বৈদেশিক সাহায্যে স্বদেশের শিল্পের পরিচয় লাভ করতে গেলে এ ধরনের বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক।

১৩৯ নম্বর কটন স্ট্রীটের শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর পঞ্চায়েতি মন্দিরে সম্প্রতি শিল্পী ইন্দ্র দুগড় জৈনধর্মের প্রথম তীর্থংকর ঋষভদেবের জীবনালেখ্য নিয়ে একটি ম্যুরাল অংকিত করেছেন। ১৫ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ৩ ফুট ২ ইঞ্চি চওড়া ম্যাসোনাইটের ওপর গ্লু টেম্পারায় আঁকা এই ম্যুরালের বাঁদিকে ঋষভদেব জননী মরুদেবীর স্বপ্ন ও তীর্থংকরের জন্ম দেখানো হয়েছে। নীচে বাঁদিকে কল্পবৃক্ষ এবং তার পাশে রাজাসনে আসীন ঋষভদেব। উর্ধে তাঁর দুই কন্যা ব্রাহ্মী ও সুন্দরী যাঁদের তিনি লিপি, গণিত ও শিল্প শিক্ষা দেন। নীচে প্রতীকের সাহায্যে তিনি পৃথিবীতে যে অসি, মসী, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদির প্রচলন করেন তা দেখান হয়েছে। তার নীচে ঋষভদেবের সংসার ত্যাগ ও তপস্যান্তে পারণের দৃশ্য দেখান হয়েছে। প্যানেলের ডান দিকে তীর্থংকররূপী ঋষভদেবের মানুষ, দেবতা, পশু ও পক্ষীদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের দৃশ্যাবলী দেখানো হয়েছে। মধ্যে নির্বাণের দৃশ্য শিল্পী কিছুটা জৈন পুঁথিচিত্রণ ও নব্য-ভারতীয় রীতির মিশ্রণে ছবিগুলি এঁকেছেন। পরিচ্ছন্ন ডেকরেটিভ কাজের মাধ্যমে তীর্থংকরের জীবনকাহিনী পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে।

অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে ১৫ থেকে ২১ তারিখ অবধি মহিম রুদ্রের ১৮ খানি মাঝারী ও ছোট মাপের ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল। শ্রীরুদ্রের ছবিতে ইদানীং যে পরিণত ভঙ্গী দেখা গিয়েছে বর্তমান প্রদর্শনীতে তার নিদর্শনের অভাব নেই। মূলত একটি রঙের জমির ওপর বিভিন্ন রঙের মোজাইক বুনে কয়েকটি ছবিতে তিনি যে স্পেস সৃষ্টি করেছেন তা বিশেষ প্রশংসনীয়। সবুজ, হলুদ, কমলা, বেগুনী ইত্যাদি রঙের ছোপ এবং ছাপ কোন কোন ক্যানভাসে অ্যাবস্ট্র্যাকশনের মধ্যেও একটা নিসর্গ দৃশ্যের রূপ ধারণ করেছে যেমন ১০, ১৫ এবং আরো কয়েকটি ছবি। তাঁর ৮ নম্বরের স্টিল লাইফের হাল্কা উজ্জ্বল প্যাস্টেল শেডের মত কাজ প্রশংসনীয়। এছাড়া ৭, ৩, ১১ এবং ১২ নম্বরের ছবিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

●

৮ বছরের ছেলে পাপু (সুব্রত মজুমদার) গত জানুয়ারীতে মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়। এইটুকু বয়সেই সে অজস্র ছবি কবিতা ইত্যাদি এঁকে গিয়েছে। তার অনেক নিদর্শন সদ্যপ্রকাশিত পাপুর বইয়ে পাওয়া যায়। তার বাছাই-করা ৮০ খানি ছবির একটি সুন্দর প্রদর্শনী ৩১ থেকে ১৯ তারিখ অবধি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে অনুষ্ঠিত হল। পাপু সাধারণত ক্রেয়ন, ফাউন্টেন পেন এবং জলরঙে কাজ করেছে। শহরের নৈমিত্তিক কোন উত্তেজনাই যেন তার নজর এড়াতো না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বাস পোড়ান, প্রতিমা বিসর্জন, ডকে মাল তোলা, মজুরদের মিছিল, জেটিতে যুদ্ধজাহাজ থেকে শুরু করে বেড়ালের ইঁদুর ধরা পর্যন্ত কিছুই সে আঁকতে বাকী রাখে নি। তার কয়েকটি কালী মূর্তি একটু অসাধারণ লাগে। কালি-কলমের ছবির পরেই জলরঙের দু-একটি কাজের দক্ষতা চোখে পড়ে বিশেষ করে 'অর্কেস্ট্রা' ছবির রঙ ও রেখার ওপর তার ক্ষমতা সৃষ্টি এড়ায় না। তার ছবির হিউমারের দিকটা সহজেই চোখে পড়ে। কালো ক্রেয়নে আঁকা পেটমোটা পুলিশ এবং পণ্ডিতমশাই ছবি দুটিতে খুব অল্প এঁকে অনেকখানি দেখানো হয়েছে। একটি অনুভূতিসম্পন্ন ছোট ছেলের জগতের প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রদর্শনীটি মূল্যবান।

—চিত্ররসিক

সি বি আই

আপনার হয়ত অনেক টাকা। ব্যবসা-পত্তর আর সংসার নিয়ে বেশ দিন কেটে যায়। হঠাৎ একদিন আপনার ছেলেটি কোথায় উধাও। সঙ্গে টাকা পয়সা নেই। বাড়ীর সবই ঠিক আছে। গেল কোথায়! কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হতাশ হয়ে বাড়ীতে বসে আছেন। এমন সময় ডাকপিওন এল। হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। তাতে লেখা অমুক জায়গায় নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে বিশ হাজার টাকা নিয়ে হাজির হলে সন্তানকে ফেরৎ পাবেন। পুলিশে খবর দিলে বা সঙ্গে কেউ থাকলে পরদিন বাড়ীর সামনে মৃত অবস্থায় পাওয়া যাবে ছেলেকে। সন্তানকে ফেরৎ পেতে টাকা দিতে বাধ্য হলেন। এ ধরনের ঘটনা ভারতের সর্বত্র প্রায়ই ঘটে থাকে।

সি বি আই-কে এ খবর জানালে আসামীদের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আবিষ্কৃত হতে পারে সমাজদ্রোহীদের এক বিরাট চক্রান্ত। সমস্ত ভারত জুড়ে ব্যবসা। ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে আছে এদের জাল। মনে রাখতে হবে এ কোন বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তির কাজ নয়। বিরাট পরিকল্পনার অংশমাত্র। শুধু এই নয়, সি বি আই আরো অনেক রকমের কাজ করে থাকে।

নাগপুরের মডেল মিল একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী। কোম্পানীর টাকা পয়সা কারচুপির ব্যাপার নিয়ে সি বি আই তদন্ত করে। ১৯৬৮ খৃঃ-এর ঘটনা এটি। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দশ বৎসর কারাদণ্ড এবং ৭,৩০,০০০ টাকা জরিমানা হয়। আর চারজনের একদিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এদের মোট জরিমানার পরিমাণ ছিল ৫,২৭,০০০ টাকা।

কোলকাতার একজন বিখ্যাত ধনী কয়লাখনির মালিক সরকারী কর্মীকে টাকা এবং অন্যভাবে ঘুষ দিয়ে সি বি আই-এর তদন্তে পড়েন। ১৯৬৬ খৃঃ তদন্ত শেষের পর কয়লাখনির মালিক এবং সেই ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার যিনি ঘুষ নিয়ে সরকারী কর্তব্যে অবহেলা করেছিলেন, তাদের কারাদণ্ড এবং জরিমানা হয়।

আমেরিকার দানিয়েল হেলি ওয়ালকট এবং তার সহযোগী জাঁ ক্লদ দেনেজ আন্তর্জাতিক চোরাকারবারী দুজন বোম্বাই-এ ধরা পড়ে। সি বি আই তদন্তের পর তাদের পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কিন্তু কে এই সি বি আই? কে এর কর্তা? কি কাজ করে এই সংস্থা? কোথায় এর দপ্তর? প্রশ্ন মনে জাগে। প্রায় প্রতিদিনই কাগজ পড়া যায় নানা ঘটনায় কিভাবে সি বি আই মোকাবিলা করছে।

দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের জাল। এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে, এমন কি ভারতের বাইরেও এদের কার্যপরিধি বিস্তৃত। তাছাড়া আছে আইনভঙ্গকারী, অপরাধী, খুনী, আয়কর ফাঁকিদানকারী ছড়িয়ে আছে সারা দেশময়। এই ধরনের ঘটনা নিয়ে প্রয়োজন পড়ে গভীর তদন্তের। যা অনেক সময় রাজ্য পুলিশ দপ্তরের পক্ষে হয়ত সম্ভব হয়ে ওঠে না। একটি কেন্দ্রী সংস্থার পরিচালনায় যাবতীয় দুষ্কর্মের প্রতিকার সম্ভব। সেকাজ করতে এগিয়ে এসেছে সি বি আই। অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন।

প্রয়োজন অনুভব করেই ভারত সরকার ১৯৬৩ খৃঃ এপ্রিল মাসে সি বি আই গঠন করেন। সংস্থার কার্যাবলী এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি সনদ তৈরি করা হয়। সরকারী কর্মীদের অসাধুতা, তাদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত বেআইনী সঞ্চয় ও কালো টাকা উপার্জন এবং কেন্দ্রীয় আইনকে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতার ওপর সি বি আই প্রথম থেকেই নজর দেয়। ইন্টারপোল অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিন্যাল পুলিশ অর্গানিজেশনের কার্যক্রমের সঙ্গে সি বি আই এর যোগ আছে। আন্তর্জাতিক অপরাধীদের খোঁজ-খবর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের তালিকা সি বি আই ইন্টারপোলের সাহায্যে পেয়ে থাকে। দেশের ভেতরে অপরাধের পরিসংখ্যান তৈরি করা, অপরাধের প্রকৃতি বিচার, অপরাধ ও অপরাধীর যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা সি বি আই-এর একটি প্রধান কাজ। বিশেষ কোন ধরনের অপরাধ, যার সঙ্গে সমাজ জীবনের মূলগত কোন প্রশ্ন জড়িয়ে আছে, যা রাজ্য সরকার এবং ভারত সরকার উভয়েরই পরিধির মধ্যে পড়ে অথবা আন্তর্জাতিক কোন ব্যাপার সে সম্পর্কে সি বি আই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান চালায়। পুলিশ সংক্রান্ত বিষয়ের গবেষণা পরিচালনা করা, অপরাধের সঙ্গে জড়িত আইন নিয়ে গবেষণা করা অথবা এসব আইনের পুনর্বিন্যাসের কাজের সঙ্গে সি বি আই জড়িত। জটিল কোন ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তদন্তে সাহায্যও করে।

সি বি আই-এর বর্তমানে পাঁচটি ভাগ রয়েছে। সদর দপ্তর দিল্লীতে। বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্ম বেশ বৈচিত্র্যময়। ১ বিশেষ পুলিশ বিভাগ, ২। আইন বিভা ৩। নীতি বিভাগ, ৪। টেকনিক্যা বিভাগ, ৫। অপরাধ তথ্য সংগ্রহ বিভা ৬। পরিসংখ্যান বিভাগ, ৭। গবেষ বিভাগ, ৮। ইন্টারপোল বিভাগ এবং ; প্রশাসন বিভাগ।

পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম বহুব্যাপ সরকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, পা পোর্ট নিয়ে প্রতারণা, জুয়াচুরি, চিঠি উৎকোচগ্রহণ, আয়কর ফাঁকি, শুল্কে ফাঁ বৈদেশিক আইন ফাঁকি, ওষুধপত্র সংক্রা আইন ফাঁকি দেওয়া, অবৈধভাবে খাদ্য মজ প্রভৃতির ব্যাপারে তদন্ত করা এবং ত সরবরাহ করে সি বি আই-এর এই বিভা গুলি পারস্পরিক সহযোগিতায় বেআই কার্যকলাপ এবং অপরাধ নিবারণের চে করে।

সি বি আই-এর অফিসাররা য শিক্ষা এবং যোগ্যতার অধিকারী। র সরকারের পুলিশ বিভাগ, কেন্দ্ সরকারের আয়কর বিভাগ, রেল, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ এবং অন্যান্য গুরুত্বপ বিভাগের অফিসাররা সি বি আই-এর স কাজ করে থাকেন। অফিসারদের বি ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমে ভারত ভাষাগুলি তাদের শিখতে হয়। বি রাজ্যের সি আই ডি এবং অ্যান্টিকরাপ ব্যুরোতেও সি বি আই-এর অনু শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে আজকাল।

সি বি আই একা কোন কাজ করে মন্ত্রীদের দপ্তর, বিভিন্ন সরকারী দপ এর সহযোগিতায় কাজ করে। এযাবৎ বি আই যা কাজ করেছে, তার মধ্যে ৭০ ভাগই জনগণের সহযোগিতায়। বি রাজ্যে এর শাখা আছে। কোন গোপ তথ্য বা সংবাদ যে কোন নাগরিকের থাকলে, তিনি সি বি আই-কে তা জান পারেন। সি বি আই ঐ সংবাদ ব সত্যতা বিচার করে, সে বিষয়ে গোপনে প্রকাশ্যে তদন্ত করতে পারেন। এর সমাজদেহ অনেক সুস্থ ও স্বাভাবিক হ

—বিশেষ প্রতিনিধি

আর্ট থিয়েটার

কর্মমুখর কলকাতা শহরের নাট্যানুশীলনে যে প্রাণচাঞ্চল্য উদ্বেল হয়ে উঠছে, তার ঢেউ গিয়ে লেগেছে আজ মফঃস্বলের সীমানায়। সেখানকার মানুষদের নাট্য-চেতনাও আশাতীতভাবে ব্যাপ্তি পাচ্ছে এবং অনুপ্রেরণার আবেগদীপ্ত মুহূর্তে গড়ে উঠছে বেশ কিছু নাট্যগোষ্ঠী যার শিল্পী-দের একমাত্র চিন্তা কিভাবে যথার্থ শিল্পের আলোয় বাংলা থিয়েটারের চিরন্তন এক রূপকে আভাসিত করে তোলা যায়। মফঃস্বলের যে কয়েকটি নাট্যগোষ্ঠী এই চিন্তাকে কাজে রূপায়িত করে বাংলার নাট্য-আন্দোলনকে সীমাহীন বেগ ও আবেগে সমৃদ্ধতর করে তুলতে নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটারের নাম প্রথম সারিতেই স্মরণযোগ্য। কলকাতা থেকে ছেচল্লিশ কিলোমিটার দূরে কাঁচড়াপাড়া। এই কাঁচড়াপাড়ার সাংস্কৃতিক জীবনকে দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে নতুন এক অর্থ-ময়তায় সমুন্নত করতে আর্ট থিয়েটারের যে আন্তরিক প্রয়াস তাকে প্রতিটি সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষই অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাবেন নিশ্চয়ই।

সময়টা ছিল ১৯৫০। ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটকের অলৌকিকতা ও ঐশ্বর্য থেকে সরে এসে বাংলা নাটক সবেমাত্র জীবনের কল্লোলকে ভাষা দিতে শুরু করেছে। চারদিকে চলছে তখন বাস্তব জীবন-সচেতনতার পটভূমিকায় সাহিত্য গড়ে তোলার প্রয়াস। নাটকও সে পথে একটা বিশিষ্ট দিক চিহ্নিত করতে পারে, এমন ধারণা স্পষ্টতায় তখন মূর্ত হয়ে উঠতে চাইছে। এই পরিবেশেই কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটারের জন্ম (২৯ মার্চ, ১৯৫০)। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ প্রথম দিকে এই নাট্যগোষ্ঠী গড়ার কাজে যথেষ্ট উদ্দীপনা দিয়েছিল, এমন কি তাদের কাছ থেকে যে কোন ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতার কোন অভাব হয় নি কখনো। আর্ট থিয়েটার গড়ার ব্যাপারে সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াস শিল্পীরা সবাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে থাকেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ই হলেন এই নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

সবার শুভেচ্ছাকে পাথেয় করে আর্ট থিয়েটার নাট্য প্রযোজনার কাজে ব্রতী হল। প্রথম থেকেই এই গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল যা কিছু নাটক তাঁরা করবেন, তার প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রতিফলিত হবে সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবন। জীবনমুখী নাটকের মঞ্চরূপায়ণের মধ্য দিয়েই নাট্যশিল্পের প্রকৃত গভীরতা এঁরা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের নাটক আর্ট থিয়েটারের শিল্পীরা অভিনয় করেছেন এবং প্রতিটি নাটকেই পরিস্ফুট হয়েছে এই প্রবণতা। এঁদের অভিনীত নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'ঢেউ', 'নাটক নয়', সলিল চৌধুরীর 'অরুণোদয়ের পথে', পানু পালের 'বিচার', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', তুলসী লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার", 'ছেঁড়া-তার', 'দুঃখীর ইমান', 'ঝড়ের মিলন' 'নায়ক', 'নাট্যকার', 'মণিকাঞ্চন', মন্মথ রায়ের 'আজব দেশ', 'সাঁওতাল বিদ্রোহ', ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' 'মোকাবিলা', 'জীবনস্রোত', পরেশ ধরের 'শুধু ছায়া', 'কালপুরী', সুকুমার রায়ের 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী', রামনারায়ণ রায়ের হিন্দী নাটক 'অধুরা স্বপ্ন', শীতল সেনের 'মুক্তি' ও 'কৃষ্ণকলি'। এই সব নাটকের প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর্ট থিয়েটারের গানের অনুষ্ঠান; সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লাঙল যার, জমি তার' নামক ব্যালে নৃত্যানুষ্ঠান।

কাঁচড়াপাড়া আর্ট থিয়েটার সম্ভবত প্রথম মফঃস্বল নাট্যসংস্থা যাঁরা মফঃস্বলে নিয়মিত নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করে। ১৯৬১ সালের জানুয়ারীতে তাদের এই নিয়মিত নাট্যাভিনয় শুরু হয় কাঁচড়াপাড়া স্পিনিং মঞ্চে। অভিনয় হত প্রতি শনিবার। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও বেশ কিছুদিন এঁরা নিয়মিত অভিনয় চালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরম অর্থাভাবে এই বিরাট প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। এই প্রসঙ্গে আর্ট থিয়েটারের মুখপাত্র শ্রীহাবু লাহিড়ী বলেছেন, 'আমাদের এখনও ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে নিয়মিত অভিনয় শুরু করার এবং তা করব ঐ কাঁচড়াপাড়াতেই। শহরের জন্য তো সবাই আছে, আমরা মফঃস্বলের জন্য।'

বহু সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের আনন্দ-বেদনা আর্ট থিয়েটারের উনিশ বছরের জীবনকে ঘিরে আন্দোলিত হয়েছে। নাট্যানু-রাগীদের স্বীকৃতি যখন শিল্পীরা পেয়েছেন তখন তাঁরা আরও নতুন কিছু করার দিকে নিজেদের সচেষ্ট করেছেন। আবার যখন প্রতিকূলতার ঝড় এসেছে তখন তাঁরা বাধা পেয়েছেন, কিন্তু প্রয়াসে শৈথিল্য আসে নি। বিভিন্ন দিকে আর্ট থিয়েটারের এগিয়ে যাওয়াতে যাঁরা নিজেদের সমর্থন ও সহ-যোগিতাকে অনাবিলভাবে মিশিয়ে দিয়েছে তাঁরা হলেন 'তুলসী লাহিড়ী, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, সলিল চৌধুরী নির্মলেন্দু চৌধুরী, ভূপেন হাজারিকা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ক্ষিতীশ বসু, দেবব্রত বিশ্বাস, উৎপল দত্ত, শোভা সেন, সুচিত্রা মিত্র, নিবেদিতা দাস, সাধনা রায়-চৌধুরী, মমতাজ আমেদ, কালী ব্যানার্জি এবং আরো অনেক বিশিষ্ট শিল্পী ও নাট্যকার। আর্ট থিয়েটার কাঁচড়াপাড়া ছাড়াও বোম্বাই, জামালপুর, ধানবাদ, রাণীগঞ্জ, রামপুরহাট প্রভৃতি জায়গায়ও সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। এছাড়া কলকাতার 'বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন' ও 'নাট্য-সম্মেলনে' আর্ট থিয়েটারের আমন্ত্রণ ছিল।

আর্ট থিয়েটারের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল 'ছেঁড়াতার' নাটকটিকে নতুন আঙ্গিকে যাত্রায় রূপান্তরিত করা। ১৯৬৩ সালে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যাত্রা মহোৎসবে তাঁরা প্রথম 'ছেঁড়াতার' নাটককে যাত্রায় উপস্থিত করে বহু যাত্রানুরাগীকেই চমক লাগিয়ে দেন। এই গোষ্ঠীর একজন সভ্য বলেছেন, 'এই অভিনয়ের পর 'সত্যম্বর অপেরা'র কর্মবীর গৌরকিশোর বসাক স্বীকার করেন যাত্রার মঞ্চে এটা বিপ্লব এবং এই অভিনয়ের প্রেরণা থেকেই 'সত্যম্বর অপেরা'র 'একটি পয়সা'।

নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা নিয়ে আর্ট থিয়েটার উনিশ বছর ধরে তিল তিল করে একটি স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে চলেছে। নাটক সম্পর্কে তাঁদের কোন গোঁড়ামি নেই। আবার নাটকের মধ্যে কোন জটিল দর্শনের বেশ একটা ভারী বোঝা চাপিয়ে তাকে অপ্রয়োজনে ইনটেলেকচুয়াল যে করে তুলতেই হবে, এমন শর্ত মানতেও তাঁরা রাজী নন। তাঁদের ধারণা, বুদ্ধিবৃত্তির দীপ্তি নিশ্চয়ই থাকবে নাটকে, কিন্তু তা থিওরি হিসেবে বাইরে থেকে আরোপিত হবে না, তা উঠে আসবে আজকের বিংশ শতাব্দীর জীবন-জটিলতার আবর্ত থেকে। তাঁরা বলেন, 'যে নাটকে মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা আছে, যাতে আমরা আমাদের দেখতে পাই, তাই আমরা মঞ্চস্থ করি।'

আর্ট থিয়েটারের আগামী প্রযোজনা হল 'তুলসী লাহিড়ীর বহু বিতর্কিত নাটক 'ভিত্তি'।

দার্জিলিং ও কালিম্পং শহরের পট-ভূমিকায় রচিত এই নাটকটি কয়েকটি পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করার জন্য নিয়েও শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিশ্রুতি রাখতে অসমর্থ হয়েছেন। আশা করা যায় 'ভিত্তি' নাটকের প্রযোজনার মধ্য দিয়ে আর্ট থিয়েটার নাট্যচর্চার নতুন এক বৈশিষ্ট্য উপস্থিত করতে পারবে।

দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে আর্ট থিয়েটার যেভাবে নাট্যানুশীলন করে চলেছে তাতে এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ় হয়েছে যে, এই গোষ্ঠী প্রয়াসে মফঃস্বলের নাট্যচর্চা ব্যাপ্তি পেয়েছে এবং এই সূত্রেই বাংলার নাট্য-আন্দোলনও সুসংহত হবার পথে অনেকটা এসেছে এগিয়ে।

—দিলীপ মৌলিক

রাজভবনে নজরুলগীতি ও কবিতা আবৃত্তির এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনারত কাজী সব্যসাচী। সঙ্গে রয়েছেন কাজী অনিরুদ্ধ, কল্যাণী কাজী এবং অন্যান্য শিল্পীরা।

রবীন্দ্র সদনে কথাকলি নৃত্য

কথাকলি ফেস্টিভ্যাল কমিটি নিবেদিত রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বিত প্রফেসর ভি বিজয়ণ ও সি বি মেননের পরিচালনায় কথাকলি নৃত্যের দুটি সন্ধ্যা কলকাতা-বাসীকে ভারতের এক প্রান্তে অবস্থিত সুদূর কেরালার সযত্ন রক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যকে আস্বাদ করবার এক দুর্লভ সুযোগ দান করেছে। এজন্য প্রথমেই সংস্থা সভ্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

প্রথম সন্ধ্যায় পঞ্চবটী বনে শূর্পণখা-বধ থেকে শুরু করে 'বালিবধ' (রামায়ণ) এবং দ্বিতীয় সন্ধ্যায় কেরালার জনপ্রিয় উপাখ্যান 'দুর্যোধন-বধ' ছিল এ'দের পরিবেশিতব্য বস্তু। কবিগুরুর 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' ১৯৬১-তে রবীন্দ্র শত-বার্ষিকীতে প্রদর্শন করার জন্য শ্রীবিজয়ণ সরকার প্রদত্ত এক সুবর্ণপদক সম্মান লাভ করেন। এখানে তাঁরই শিল্পসম্মত প্রয়োগ অনুষ্ঠানটির মর্যাদা বাড়িয়েছে এবং বাংলা-দেশের সঙ্গে কেরালার সাংস্কৃতিক বন্ধনের প্রতি আলোকপাত করেছে।

সারা দিনের পর গ্রামের বুকে সন্ধ্যার আঁধার নেমে আসছে—, নারকেল তেলের প্রদীপের উজ্জ্বল শিখায় চারিদিক উদ্ভাসিত। 'কেলিকুত্তু' তথা চেন্ডা ও মণ্ডলমের গুরুগম্ভীর নাদ দূরে-দূরান্তে নৃত্যানুষ্ঠানের বার্তা ঘোষণা করছে। এমন সময় মঞ্চে 'তিরশিলা' পর্দা হাতে দুই পুরুষের প্রবেশ। এবং সেই পর্দার আবরণ ভেদ করে অহঙ্কার, বীর্য, ঐশ্বর্য, অভিমান ভূষিত চরিত্রগুলি চরিত্রোচিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে তালবাদ্যের ছন্দে ছন্দে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন অর্থ-নৈতিক মুদ্রা—বীরত্ব-ব্যঞ্জক পৌরুষদৃপ্ত পদক্ষেপ 'কুড়িয়াট্টম' দ্বারা পুরুষপ্রধান আখ্যান যেন কথা বলে উঠল বিভিন্ন রং-বেরং-এ রঞ্জিত মুখাবয়ব জমকালো মুকুট ও পরিচ্ছদে প্রতি চরিত্রটি যেন মুখর। প্রতিটি শিল্পীর অভিনয়ে মানুষের আদি ও অকৃত্রিম চরিত্রবৃত্তির অনাবৃত রূপ তার বিশালতা, হিংস্রতা, লোভ ও মহত্ত্বের তীব্রতায় প্রাণশক্তির উদ্দাম প্রকাশ মনকে অভিভূত না করে পারে না। তালবাদ্যপ্রধান হওয়ার কারণ নৃত্যের অন্তর্নিহিত বীর-রসের প্রাধান্য। বিভিন্ন চরিত্রগুলি জীবন্ত করে তোলেন সর্বশ্রী ভেম্বানাজী নাম্বু নায়ার, কলামণ্ডলম বসুদেবম, সদানম কৃষ্ণ কুট্টি নায়ার, কলামণ্ডলম নারায়ণ কুট্টি এবং কলামণ্ডলম গোবিন্দম কুট্টি। সঙ্গীতে টি রামন কুট্টি নায়ার ও টি ভি অচ্যুত ভারিয়ার, কেক-আতন এবং সি শ্রীধরণ নম্বুদীরা। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সাফল্যের কৃতিত্ব এ'দের সবারই প্রাপ্য।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্য স্বাক্ষরিত অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের স্ব-রচিত নৃত্যনাট্যর ব্যাপ্তিসমৃদ্ধির দীপ্তিতে আজ কলকাতার তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতি জগৎ আলোকিত। কিন্তু তাঁর বিরাট কীর্তিস্তূপের অন্তর্নীল গভীরতা কল্পনাপ্রবণ শিল্পীদের নিত্য-নতুন সৃষ্টিতে অনুপ্রেরিত আজকের যুগের রবীন্দ্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজোর মত কবির কাব্য, কথিকা ও উপাখ্যান অবলম্বনে নতুন কিছু করার উদ্যমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর ছিল ত্রিবেণীর ঋতু উৎসব। রবিরশ্মীর 'শ্রাবণ সন্ধ্যা' সৃজনের ঋতুপত্র। সাংস্কৃতিকীর 'শেষ সাহানা'। তারই সঙ্গে যুক্ত আরও একটি পালা রয়ী প্রযোজিত 'স্বপ্নবিলাস'। দেবব্রত বিশ্বাস পরিকল্পিত 'স্বপ্নবিলাস' ভাব-কল্পনার এক নৃত্যগীতোচ্ছল বিস্তার দেখলাম রবীন্দ্র সদন মঞ্চে। শ্রীবিশ্বাসের ভাষায় 'স্বপ্ন-বিলাস' এক অনাঘ্রাত পুষ্পসম কুমারী হৃদয়ের 'স্বপ্ন' রাজ্যের কাব্যসুন্দর রূপ, যার স্থূল বাস্তবের বন্ধনমুক্ত মন, আকাশ-চারী হতেই চেয়েছিল। কিন্তু কল্পলোকের শরিক হয়েও তার রঙিন মন পুরোপুরি তার সঙ্গে একাত্ম হতে পারল না। 'স্বপ্ন' স্বপ্নই রয়ে গেল তাই স্বপ্নের বাস্তবায়ন

ঘটল না। সেটা হল বিলাস। সঙ্গীত ও নৃত্য যে ছকে-বাঁধা, কৃত্রিম এবং প্রাণহীন না হয়ে এক প্রকাশোন্মুখ চিত্তের নেচে চলে যাওয়ার চিত্তগ্রাহী ছবিখানি হয়ে উঠতে পেরেছে তার কারণ দেবব্রত বিশ্বাসের সু-নির্বাচিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত 'নিশীথে কি কয়ে গেল', 'আমায় যায় নিয়ে যায়', 'নীল দিগন্তে', 'ওরে যায় না কি জানা' দিয়ে ক্রমপ্রসারী হয়ে থামল 'শেষের দিনের রেশ নিয়ে কানে'র সুন্দর সমাপ্তিতে। শ্রীবিশ্বাসের মুক্তকণ্ঠের আবেগঢালা সঙ্গীত এই একাঙ্ক নাট্যের বিশেষ আকর্ষণ তাঁর সুযোগ্যা শিষ্যা পদ্মিনী দাশগুপ্তের গানে গুরু শিক্ষাপ্রসূত বৈশিষ্ট্যের ছাপ ছিল। অলকানন্দার স্বাভাবিক রূপসুষমার সঙ্গে তার নৃত্যছন্দের লালিত্য, প্রতিটি পদক্ষেপ, হাতের গতির ইসারা আয়ত-নয়নের চাউনি মিলে প্রতিটি গান হয়ে উঠেছিল চিত্রকল্প। সাধন গুহর নৃত্য রচনার কৃতিত্বের অবদানও উল্লেখের দাবীদার।

একক ভূমিকার অবশ্যম্ভাবী একঘেয়েমি এড়ানো হয়ত সম্ভব হয় নি কিন্তু কনিষ্ক সেনের আলোকপাত, পূর্ণিমা মুখার্জির সজ্জা পরিকল্পনা এবং মঞ্চসজ্জা এ ঘাটতির যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ ঘটিয়েছে।

উদয়ন আসরের চন্ডালিকা

মহাজাতি সদনে উদয়ন প্রযোজিত 'চন্ডালিকা' সম্প্রতিকালের রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্যের অধ্যায়ে এক উজ্জ্বল সংযোজন। 'উজ্জ্বল' এই জন্য যে, নৃত্যমান ও সঙ্গীত-মান এখানে ছন্দসাম্যে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থহীন প্রথার নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে পিষ্ঠ অস্পৃশ্য চন্ডালদুহিতার অসহায় কান্না দিয়ে কাহিনীর সুরু ক্লাইমেক্স অবহেলিতা চন্ডালকন্যার কাছে বুদ্ধ শিষ্য আনন্দর একটি গণ্ডূষ জলপ্রার্থনা ও দীক্ষাদান 'যেই মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা'—যা প্রকৃতির এই জীবনেই জন্মান্তর ঘটালো। মানবত্বের সঙ্গে অন্তরে প্রেমের জাগরণ এবং তারই অমোঘ আকর্ষণে জননীর যাদুমন্ত্রে আনন্দকে আহ্বান। পথ ভুল হলেও চাওয়ার আন্তরিকতায় কোন খাদ ছিল না। বলেই জননী কন্যা উভয়ের মহৎ উত্তরণে হোল কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

উদয়শঙ্করের যুগবিপ্লবী প্রতিভাজাত 'প্রকৃতি আনন্দ'র আশ্চর্য ব্যতিক্রমকে বাদ দিলে 'চন্ডালিকা'র এমন সার্থক রূপায়ণ (বিশেষ যে নৃত্যে কোনো স্টার শিল্পী নেই।) সহজদৃষ্ট নয় বলেই মনে এমন দাগ কেটেছে। প্রকৃতির ভূমিকায় সুমিতা গুইন-এর নৃত্য উপযুক্ত মানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভোলা যায় না প্রকৃতি জননীর ভূমিকায় আরতি মজুমদারের, প্রেরণাদীপ্ত উচ্ছল নৃত্যাবেগ। কন্যাস্নেহে উতলা, তারই মুখের কারণে দেহ ও মনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষে উজাড় করে দেবার অধীরতা, চকিত ক্লান্তি, বেপরোয়া উন্মত্ততার মর্মদ্রাবী কারুণ্যে উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে গতি-[illegible] [illegible], মুদ্রার ব্যঞ্জনায়—

ভূপেন হাজারিকার সুরে দুখানি গান গেয়েছেন রুমা গুহঠাকুরতা। এবারের, পুজায় প্রকাশিত হবে রেকর্ডে এই দুটি

গান। যেন সাগরের ঢেউ-এর মত উত্তাল হয়ে উঠেছে।

তিনি সত্যিই প্রকৃতি জননী হয়ে উঠেছেন এইটেই পরিবেশনযোগ্য সংবাদ। দৈ-ওলার ভূমিকায় শক্তি নাগ, চুড়িওলা গণেশ দত্ত এবং আনন্দরূপী ধূর্জটি চরিত্রানুগ সুশীল দাসের আলোকপাত যথাযোগ্য। কিন্তু সমবেত কোনো কোনো শিল্পীর (ফুলবালার ভূমিকায়) সজ্জায় শালীনতার অভাবের জন্য আমরা দায়ী করব শিবচরণ দাসকে। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে 'সজ্জা' নিছক সজ্জাই নয় নাট্যসৌন্দর্যের অঙ্গ এটা ভুলে যাওয়া অন্যায়।

সঙ্গীতের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন সুচিত্রা মিত্র (প্রকৃতি), মায়া সেন (জননী), সন্তোষ সেনগুপ্ত। সুচিত্রা মিত্রের গানে অন্যান্যদিনের তুলনায় সামগ্রিক সংহতির কিছু তারতম্য থাকলেও এক-একটি গানে বিদ্যুঝলকের মত শিল্পী স্বাক্ষর চমকে দিয়েছে।

মায়া সেনের আশ্চর্য সুন্দর সঙ্গীত পরিবেশন সকলের অকুণ্ঠ তারিফ পেয়েছে। 'উদয়ন'-এর লোকান্তরিত প্রাণ-স্বরূপা সভ্যা—বীণা ভট্টাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ 'চন্ডালিকা'র মত এক উপভোগ্য নৃত্যনাট্য পরিবেশনার জন্য উদ্যোক্তারা ধন্যবাদার্হ।

রাগরঙ্গের 'চিত্রাঙ্গদা'

গত ৭ সেপ্টেম্বর রাগরঙ্গের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' মঞ্চস্থ হ'ল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে। নতুন সাংস্কৃতিক সংস্থা হিসাবে রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য পরিবেশনায় এ'রা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সঙ্গীত পরিচালিকা হিসাবে হিমানী সরকার যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। অর্জুনের চরিত্রের সঙ্গীতে কণ্ঠদান করেছেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। বনানী ঘোষের কন্ঠে চিত্রাঙ্গদা সুরূপার গানগুলিও সুগীত। কিন্তু সব চাইতে অবাক করে দিয়েছেন পরিচালিকা হিমানী সরকার স্বয়ং। ইনি কন্ঠদান করেছেন কুরূপা চিত্রাঙ্গদার চরিত্রের সঙ্গীতে। নৃত্যাংশ অত্যন্ত দুর্বল। নৃত্য পরিচালনায় সাধন গুহ কোন শিল্পাকৃতি দেখাতে পারেন নি। সুরূপা 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্রে পলি গুহ যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। গীতা সরকারের কুরূপাও চরিত্রানুগ। এছাড়া প্রদীপ ঘোষের ভাষ্য পাঠ ও চিত্রশিল্পী নিতাই ঘোষের মঞ্চসজ্জা অত্যন্ত মনোগ্রাহী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানাস্তে ধীরেন বসুর নজরুল গীতি, গীতা সরকারের ভারত-নাট্যম এবং প্রদীপ ঘোষের রবীন্দ্র কবিতা থেকে পাঠ এক প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান।

রাগ-রূপ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

রাগ-রূপ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে গত রবিবার, ৭ সেপ্টেম্বর সকালে বনহুগলী আনন্দম প্রেক্ষাগৃহে। শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সফল ছাত্র-ছাত্রীদের মানপত্র প্রদান করেন।

কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রীর একক সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর সেদিনের বিশেষ অনুষ্ঠান সূচী 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। ছাত্রীদের অভিনীত এই নৃত্যনাট্যটি দর্শকদের মুগ্ধ করে। সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যের মিলন প্রশংসাযোগ্য। প্রায় প্রত্যেক চরিত্র সুঅভিনীত। তবু ওদের মধ্যে মিতালী দত্ত (দুষ্মন্ত), ছন্দা চন্দ (মেনকা), বুড়ন সমাদ্দার (শকুন্তলা), নমিতা ভট্টাচার্য (বিশ্বামিত্র), আলো পাল (বৈখানস) ও বিভা ভট্টাচার্যের (দুর্বাসা) উল্লেখ-যোগ্য। ভোলা যায় না জেলে-জেলেনীর চরিত্রাভিনেত্রী কল্পনা আইচ ও তাপসী আইচকে। প্রলয় গুহের নৃত্য পরিকল্পনা সুন্দর। উৎপল সরকার ও মিতালী বোসের গ্রন্থনা যথাযথ। সঙ্গীত পরিচালনায় শৈলেন গাঙ্গুলী মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কৃতিত্ব কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ বোস ও কেকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

গত ১৪ আগস্ট, সন্ধ্যায় হাওড়ায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের এক মনোজ্ঞ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী শেখর রায়, শিপ্রা গাঙ্গুলী, কৃষ্ণা মৈত্র, শ্রাবণী দে ও স্বপ্না ঘোষাল। অনুষ্ঠান প্রারম্ভে যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি দে সকলকে স্বাগত জানান। সহ-সম্পাদক শ্রীসুবীর চৌধুরী অনুষ্ঠান শেষে সকলকে ধন্যবাদ জানান।

আগামী ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে, উক্ত ক্লাবের সৌজন্যে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীবৃন্দের দ্বারা 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা অনুষ্ঠিত হবে। নৃত্যনাট্য পরিচালনায় : কানাই মজুমদার, উপদেষ্টা : নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, 'নৃত্যনাট্য' রচয়িতা : শ্রীবাদল রায়।

—চিত্রাঙ্গদা

বিতর্কিত আলোচনা

বর্তমানে চলচ্চিত্রে একটা বিস্ময়কর প্রসঙ্গের উদ্ভব ঘটে চলতে চলেছে তা হচ্ছে চুম্বন ও নগ্নতা। বিস্ময়করই বটে। যা স্বাধীনতার আগে ছিল নিভৃত ঘরের গন্ডীর মধ্যে তা যদি এখন সর্বসাধারণের সামনে চলচ্চিত্রের পর্দায় দেখানো হয় তা হলে বর্তমানের তরুণ তরুণীরা কতটা নিম্নস্তরে নামার প্রেরণা পাবে তা কল্পনা করা যায় না। এমনিতেই তো ভারতীয় তরুণ তরুণীরা নানাবিধ হিন্দী ছায়াচিত্র দেখে কুৎসিত নাচ ও গান নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করছে। এরপর যদি প্রকাশ্য চুম্বন ঐ সব আগ্রহী তরুণ তরুণীরা সিনেমার পর্দায় দেখে, তাতে তাদের চিত্তবিনোদন তো হবেই না বরঞ্চ 'প্রাইভেট' চুম্বন পথে ঘাটে দেখা যাবে। এই চুম্বন-নগ্নতা প্রকাশ্য হতে পারে বাইরের দেশে অর্থাৎ ইংলন্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে। ভারতীয় নরনারী (বিশেষ করে যারা অতিরিক্ত ছায়াচিত্র দেখে থাকে) চলচ্চিত্রের সংস্পর্শে আজ কোথায় নেমে এসেছে তা একবার ভেবে দেখেছেন কি? গৌরবময় ভারতীয় ঐতিহ্য আজ বিলুপ্ত ঘটতে চলেছে। সমাজ বলে যে একটা জিনিস ছিল বা আছে তাও হয়ত আর থাকবে না।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয়দের অর্থনৈতিক দিকে আয় যৎসামান্য। এই সামান্য আয়ের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজের শ্রান্তক্লান্ত মনটাকে শান্ত করার জন্যে সিনেমাঘরে প্রবেশ করে পর্দায় ঐ সব নিম্নস্তরের অশালীন কার্যকলাপ দেখে, তাহলে তাদের চিত্তে কি খুব সুখানুভব ঘটবে? ফিল্ম সেনসরশিপ তদন্ত কমিটির সভাপতি শ্রীজি ডি খোসলা কিভাবে বর্তমান তরুণ সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত না করে এই অভাবনীয় পরিকল্পনায় রায় দিলেন তা খুবই আশ্চর্যের কথা। তাঁর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি একটু ভেবে দেখলেন না যে ভারতীয় জীবনে প্রকাশ্যে চুম্বন ও নগ্নতার প্রদর্শন কতটা ক্ষতিকর হতে পারে!

মহঃ একরাম নবী, বিদ্যাসাগর কলেজ, নবদ্বীপ
নদীয়া

অমৃতে প্রকাশিত "চুম্বন ও নগ্নতা" বিষয়ক একাধিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা ও সমালোচনা প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকাকেই আলোড়িত করছে সন্দেহ নেই। জনৈক পাঠিকারূপে ঐ প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশনের ইচ্ছা রাখি।

খোসলা কমিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ঐ কুৎসিত, বিশ্রী পাশ্চাত্য অনুকরণ হিন্দী সিনেমার স্থান পাবে (পাবেই!) আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলার চিন্তাশীল, শক্তিমান পরিচালকবৃন্দ, সুরুচিসম্পন্ন অভিনেতা-নেত্রীকুল ও সর্বোপরি সংস্কৃতি রক্ষণশীল দর্শক সমাজ কি করে চুম্বন ও নগ্নতার নগ্নরূপ পর্দায় প্রতিফলিত করে ও তার সাহায্য করে বাংলার ভবিষ্যৎকে অবশ্যম্ভাবী প্রচন্ড সর্বনাশের পথে যেতে দেবেন ভেবে দিশাহারা হচ্ছি।

প্রসঙ্গক্রমে, বাংলার চিরজাগ্রত ও অসংখ্য কৃতীর দাবীদার ছাত্রগোষ্ঠী তথা তরুণকুলের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা অন্তত আমাদের সুমহান সংস্কৃতিকে বাঁচাবার আয়োজন করুন। ঐ সব পাশ্চাত্য প্রভাব বাংলায় ঢোকার পথ বন্ধ করুন। এটা সুনিশ্চিত যে চুম্বন ও নগ্নতাকে ভারতীয় সিনেমাশিল্পে দেখানোর অনুমতি যুবসমাজের প্রগতিপূর্ণ জাতীয় কর্তব্যের লিপ্সা ও সংগঠনমূলক কর্মের আকাঙ্ক্ষাকে সাময়িক ভাবে বিচলিত করবে। এই ক্ষতির কথা বাংলা দেশের ছাত্রজগতের ভেবে দেখতে হবে। ব্যবসায়িক স্বার্থে সত্যি সত্যি যদি ঐ সমস্ত বিকৃত জঘন্যতা বাংলা ছবিতে স্থান পায় ছাত্রসমাজের এবং বাংলার যুবকদের উচিত হবে দলে দলে সিনেমা বয়কট করে গুটিকয়েক অর্থপিশাচ ব্যবসায়ীকে উচিত শিক্ষা দেওয়া। যাঁরা ছায়াচিত্রে "চুম্বন ও নগ্নতা"র হুজুগে বাংলার সহজ সরল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে মাতিয়ে তাদের সামান্য অর্থ লোটা ও প্রচুর সম্ভাবনাময় ছাত্র ও যুবগোষ্ঠীর শাণিত মেধাকে ভোঁতা করে তোলার পরিকল্পনা করছে তাঁরা এটা করতে যেন বিরত থাকেন।

নারী সমাজের একজন হয়ে বাংলার অভিনেত্রীদের কাছে আমার আকুতি তাঁরা যেন বাঙালী নারীর ঐতিহ্যের দিকে একটিবার নজর দিয়ে ঐ সমস্ত নোংরা আচরণে অভিনয় করতে সায় না দেন।

ব্রততী মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা।

খোসলা কমিটি রিপোর্টের পরিপেক্ষিতে চলচিত্রে চুম্বন ও নগ্নতার দৃশ্য পরিবেশন নিয়ে যে বিতর্কিত আলোচনা শুরু হয়েছে সেই প্রসঙ্গে উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান প্রদত্ত এক বিবৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত খোসলার মতে, যদিও রিপোর্টটি লোকসভায় পেশ করা হয়েছে কিন্তু এর পূর্ণ বয়ান এখনো পত্রপত্রিকায় ছাপা হয় নি, কিছু সারাংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই সারাংশের ভিত্তিতে গোটা রিপোর্টটি বিচার হয়তো ঠিক হবে না।

শিল্পসৌকর্য রক্ষার্থে এবং গল্পের সঠিক চিত্রায়নের প্রয়োজনে চুম্বন ও নগ্নতার দৃশ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পক্ষপাতী হয়েও তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিতান্ত অর্থকরী প্রয়োজনে অশ্লীল দৃশ্যাদি প্রপ্রয়োগের ঘোরতর বিরোধী। নিতম্ব ও বক্ষ দোলানো নৃত্যাদি, পোষাকের স্বল্পতা, আসঙ্গলিপ্স অঙ্গভঙ্গী, মর্দন, পেষন ইত্যাদি এবং ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধহীন ও প্রাথমিক ভাবেই অশ্লীল মনে হয় এই সব দৃশ্যের কিছু কিছু বাদ দিয়ে গোটা চিত্রটিকে 'ইউ' ছাড়পত্র প্রদান এবং বাজারে চালু করারও তিনি পক্ষপাতী নন। এমন কি প্রয়োজন বোধে এবম্বিধ বাজে মানের গোটা ছবিটাকেই সেন্সার বোর্ড বাতিল করবেন, খোসলা কমিটি তাই চান। আমার তো মনে হয় উক্ত কমিটির সুপারিশগুলিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করা হলে তা ভারতীয় চলচিত্রে একটা যুগান্তর এনে দেবে।

পরিশেষে একটা কথা বলে শেষ করবো। কাহিনীর চিত্ররূপায়নে পরিচালক ছবিতে চুম্বন ও নগ্নতার দৃশ্য বাদ দিয়েও হয়তো বা ঘটনাটা দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কাহিনীর পাঠকবর্গ পর্দায় চিত্রায়িত সেই কাহিনী দেখে সন্তুষ্ট হবেন তো?

—চিত্তরঞ্জন কর্মকার।
কলকাতা—১১।

ফ্যাক্টস অফ লাইফ অর্থাৎ জীবন-সত্য শিল্পের পরিপন্থী নয়, কিন্তু জীবন-ভাষ্যকে শিল্পের পর্যায়ে উত্তরণ করাই মহৎ-শিল্পের অবশ্যকৃত্য। আমাদের জীবনের মূল কর্মকান্ডে যেমন বাস্তববাদের প্রাধান্য আছে তেমনি রূপ রস রুচির একটা স্থায়ী যদিও বিতর্কমূলক আসন নির্দিষ্ট আছে। এই বস্তুবাদ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির সমন্বয় হল যথার্থ শিল্পের তাৎপর্য। আমাদের ভারতীয় জীবন-দর্শনে প্রকাশ্যে চুম্বন ও নিরাবরণ দেহের প্রদর্শন নিতান্ত কঠিন অনুশাসন দ্বারা আজো নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু একথা কে অস্বীকার করবেন, আমাদের বেশ বাস অংগসজ্জা ভারতীয় রূপ ও রুচির অনুগামী নয়। স্বল্প অ-পর্যাপ্ত বেশ বাস ও তরুণদের বুশসার্ট ও প্যান্টের মিছিল নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যভাবমুখী। সেক্ষেত্রে অন্তত সীমিত ক্ষেত্রে চুম্বনের সীমারেখা মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত। যদি তা অবশ্য প্রয়োগ শিল্পগুণে সুষমামন্ডিত হয়। তবে বহুলতা সর্বদাই বর্জন করতে হবে, কারণ তাতে দর্শকদের রুচিকে অসুস্থ করে তুলতে পারে।

অন্যদিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে নিরাবরণ দেহ দেখানো চালু করা যুক্তিসহ কিনা সে সম্বন্ধেও বিতর্কের যথেষ্ট অবকাশ আছে। পশ্চিমী দেশের দর্শকরা যে দৃষ্টিকোণ থেকে নগ্নতার বিচার করবেন আমাদের [illegible] মন নিশ্চয়ই তা বিরূপ মন্তব্য দ্বারা প্রত্যাখ্যান করবেন।

অজন্তা কোণারকের ভাস্কর্য শিল্পরীতিকে নিরাবরণতার উজ্জ্বল উদাহরণ বলে মেনে নেওয়ার কোন যুক্তিসহ ব্যাখ্যা নেই, কারণ যা নির্বাক নিশ্চেতন রূপ-রীতির অলংকৃত সৌন্দর্য মাত্র, তার সঙ্গে সজীব দেহের সৌন্দর্যবোধের ব্যাখ্যার তারতম্য আছে, মানসিক চাঞ্চল্যের বিভেদ আছে।

তবে, আগেই বলেছি, সীমিত ক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োজন চুম্বন ও নগ্নতা চলতে পারে।

করুণাময় বসু, টাকী, ২৪ পরগণা।

অমৃতে গত তিনটি সংখ্যায় (১৭শ, ১৮শ এবং ১৯শ) সম্প্রতি খোসলা কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতার পক্ষে যে রায় দিয়েছেন—তারই উপর বিতর্কিত আলোচনাগুলো পড়লাম। এই ব্যাপারে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে আলোড়ন উঠেছে—তা খুবই সুস্পষ্ট। একদল বলছেন এটা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিরোধী, কোনোমতেই এটাকে মেনে নেওয়া যায় না। অপরপক্ষে অন্য একদল বলছেন, প্রস্তাবটা সময় উপযোগী এবং সুবিবেচনাপ্রসূত।

১৭শ সংখ্যায়, বিশেষ প্রতিনিধি খোসলা কমিটির রিপোর্টে খুব বেশী আশ্চর্য (!) হয়ে পড়েছেন। তিনি একজন ভারতীয় হ'য়ে সোচ্চারে বলতে পারেন (অবশ্যই বলতে পারেন, বলবার অধিকার আছে) এটা মোটেই অভিনন্দনযোগ্য নয়। তিনি আরও লিখছেন—"ভাবতে অবাক লাগে, এখনও কত কাজ বাকি! আমরা স্বাধীনতা পেয়েও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারিনি। আমাদের অধিকাংশ লোকেরা যেখানে নিরক্ষর, দরিদ্র, সেখানে কত কাজ করার রয়েছে। গ্রামকে আমরা উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারিনি"—ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন ভাবাবেগ-বশতঃ। বস্তুত তিনি সেন্সর বোর্ডের এই ভয়াবহ রিপোর্ট পড়ে শংকিত হয়েছেন।

অমৃতের পরবর্তী সংখ্যায় জলপাইগুড়ি থেকে পারুল দাশগুপ্ত লিখছেন, "শ্রীখোসলা এই রিপোর্টে যথার্থ সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি প্রকৃতই ভারতীয় চলচ্চিত্রের উন্নতি চান।" তাঁর মতে "সংস্কার এবং সংস্কৃতি যে এক নয় সেকথা আমরা ভুলতে বসেছি। তাই ডাইনামিক পৃথিবীতে বাস করেও আমরা সংস্কারের নামে সংস্কৃতির শ্বাসরোধ করছি। এদিক থেকে খোসলা রিপোর্ট অকুণ্ঠ অভিনন্দন-যোগ্য।" একই সংখ্যায় রতীনকুমার চন্দ্র প্রস্তাবের বিপক্ষে কিছু মতামত রেখেছেন। তাঁর মতে (১) দর্শকসাধারণ এখনও সত্যি-কারের দর্শক হয়ে ওঠেনি, আর অশিক্ষিতের হার এখনও সত্তর শতাংশেরও বেশী। আর্ট কী, তাই বোঝে না অনেকে, সিনেমা যে আর্ট তা বোঝা দূরের কথা! শেষে তিনি এই ভেবে আশান্বিত হয়েছেন ('কলকাতা-বোম্বাইয়ের চিত্রমহল যতই গুঞ্জন করুন তা গুজবেই পরিণত হবে' ব্যাপারটা গুজবে পরিণত হবে।

অমৃতের পরবর্তী সংখ্যায় প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী আসাম থেকে এবং কোলকাতা থেকে মাধুরী চৌধুরী, প্রায় খোসলা কমিটির অনুকূলে মত প্রকাশ করেছেন।

এ ব্যাপারে সত্যজিৎ রায় যা বলতে চেয়েছেন তা হলো এই "এর ঠিকমতো ব্যবহার পরিচালকের উপর নির্ভর করছে।" এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য (একজন সিনেমার দর্শক হিসেবে) খোসলা কমিটির রিপোর্টে আমি আতঙ্কিত নই, বা এটাকে একটা গুজব বলে মনে করি না। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু 'চুম্বন ও নগ্নতা' ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রবেশ করবেই এবং সেটা আর্টের খাতিরে। দ্বিতীয়ত ভারতীয় চলচ্চিত্র বিশেষ করে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প হিসেবে এখন উন্নত হতে চাইছে সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সাধারণও প্রকৃত দর্শক হয়ে উঠছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমিও তপন সিংহের মতো মনে করি, দর্শক তৈরী করে নিতে হবে পরিচালকদের। দর্শকদের রুচি অনুযায়ী পরিচালক ছবি তুলবেন না, তুলবেন নিজের রুচি অনুযায়ী এবং সেই রুচিতে (অবশ্যই তা পরিচ্ছন্ন রুচি।) দর্শকদের রুচি এসে মিলবে বা মিলতে চেষ্টা করবে। প্রসঙ্গত 'ছুটি' ছবির কথা উল্লেখ করছি। এর পরিচালক নতুন, অরুন্ধতী দেবী। দর্শকরা 'ছুটি'র যথোচিত মর্যাদা দিয়েছেন। ঠিক এই ছবিতেই একটি চুম্বনের দৃশ্য অমল ও ভ্রমরের মধ্যে প্রয়োজন ছিল। তাতে ক'রে ছবিটা আরও সুন্দর হ'য়ে উঠতো। অপরপক্ষে একটা হিন্দি ছবিতে ('নীলকমল') দর্শকদের আড়াল করে নায়ক নায়িকাকে চুম্বন করছে, এটার কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে করি না।

মধু বসুর জীবনাবসান

জনপ্রিয় প্রবীণ চলচ্চিত্র পরিচালক মধু বসুর জীবনাবসান হয়েছে। ইতিপূর্বে তাঁর স্মৃতিকথা 'আমার জীবন' ধারাবাহিকভাবে অমৃতে প্রকাশিত হয়। আগামী সংখ্যায় আলোচনা থাকবে।

অনেকের মত, চুম্বন ও নগ্নতা দেখালে ছেলেমেয়েরা বিগড়ে যাবে। এটা একটা অহেতুক আতঙ্ক। ছেলে-মেয়েদের নাগালের মধ্যই বিগড়ে যাবার অনেক, অনক জিনিস রয়েছে। যদি আজও তারা গোল্লায় গিয়ে না থাকে, তবে এই ব্যাপারেও যাবে না। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, সরকার কলেজ পর্যায়ে বাধ্যতামূলক ভাবে যৌন-বিষয়ক শিক্ষা দেবেন। প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য। নগ্নতাকে যদিও একটু দেরী করে ছবিতে আনা যায়, চুম্বনকে এখনই জায়গা দিতে হবে। (আর হিন্দী ছবিতে নগ্ন হতে বাকী রয়েছে কোথায়?) এ ব্যাপারে আমি পরিচালকদের শিল্পগুণের উপর বা তাঁদের শিল্পমানের উপর আস্থা রাখছি।

—সুধীর পান
রসুলপুর, বর্ধমান।

বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃত' পত্রিকার আমি নিয়মিত পাঠক। প্রতিটি বিভাগের অভিনবত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। বর্তমান সংখ্যায় (১২ই ভাদ্র, ৭৬-১৭শ সংখ্যায়) বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত 'চুম্বন ও নগ্নতা' শীর্ষক আলোচনাটি বারবার পড়লাম।

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী এই মতবাদ কীভাবে উচ্চজ্ঞান-সম্পন্ন ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটির কর্মকর্তাদের অনুমোদন লাভ করল সেটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। শিল্পকলায় ভারতের সুনাম স্মরণাতীত কাল থেকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। চলচ্চিত্র নির্মাণেও বর্তমান ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। কিন্তু সেই চলচ্চিত্র সৃষ্টির নামে কিছু ন্যক্কারজনক যৌনআবেদনধর্মী সৃষ্টি শুধু যে সাধারণ মানুষের মনে বিকৃত বাসনারই প্রভাব বিস্তার করবে তা নয়, এর ফল বিষবৃক্ষের বীজের মত সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়বে। কারণ বর্তমান সমাজে চলচ্চিত্রের প্রভাব অভাবনীয়।

সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ের যে সন্ধিক্ষণে আজ আমরা বাস করছি তাতে ভারতীয় সংস্কৃতিবিরুদ্ধ এই সুপারিশ আমাদের যে কোন অতলে তলিয়ে নিয়ে যাবে তা ভাবতেও কষ্ট হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় আমাদের বাংলাদেশেরই সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্রতারকারা অনেকেই না কি এই সুপারিশকে স্বাগত জানিয়েছেন। যুক্তি হিসেবে অবশ্যি কেউ-কেউ সার্থক শিল্পসৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। এমন কি চুম্বনের আগে নায়ক-নায়িকার ডাক্তারী রিপোর্ট দেখানোর একটি হাসাহাসির সুড়সুড়ি দেওয়া মতবাদের কথাও কোনও কোনও চিত্রাভিনেতা বা অভিনেত্রী উল্লেখ করেছেন।

উপরিউক্ত কথাগুলো অবশ্যি সংবাদ-পত্রের মারফৎ জানা গেছে, জানি না স্বপ্ন-রাজ্যের তারকাদের মনের বাসনা কী! তবুও প্রশ্ন জাগে, এই ডাক্তারী রিপোর্টের ফলে হয়ত তাঁরা বীজাণুমুক্ত হতে পারবেন, কিন্তু যে বিষাক্ত বীজাণু এর ফলে সমাজের সুকুমারমতি বালক-বালিকা থেকে শুরু করে প্রতিটি রক্তমাংসের মানুষের হৃদয়ে স্থান পাবে সেটা কোন্ ডাক্তারী চিকিৎসায় শোধরানো যাবে! চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নদেহ দেখানোর ভয়াবহ পরিণামের কথা পাশ্চাত্যের বহু দেশ থেকেই আজ আমরা জানতে পারছি। সব রকমের অশ্লীলতার বিরুদ্ধেই সেসব দেশে আজ জনমত সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

তাই ভারতীয় চলচ্চিত্রে চিত্রতারকাদের চুম্বন ও নগ্নতার অবাধ স্বাধীনতা বা বিচারপতি শ্রীখোসলা সাধারণ মানুষের চোখের সামনে মেলে ধরার সুপারিশ করেছেন, তাতে আসল শিল্পসত্তার অপমৃত্যুই ঘটবে। বিশেষভাবে অর্থলোলুপ বিপথগামী চলচ্চিত্রনির্মাতারা সমাজের কথা চিন্তা না করে নিজেদের ব্যবসায়িক লাভের জন্যই এই সুপারিশকে কাজে লাগাবে।

সুতরাং ফিল্ম সেন্সারশিপ তদন্ত কমিটির এই সুপারিশের বিরুদ্ধে বাংলার যুব-সমাজ ও ভারতীয় চলচ্চিত্রের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের সচেতন হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানানো প্রয়োজন।

কমল লাহিড়ী
সোদপুর, চব্বিশ পরগণা

অরণ্যের দিন-রাত্রি/সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং শর্মিলা ঠাকুর। পরিচালনা ঃ সত্যজিৎ রায়। ফটো ঃ অমৃত

প্রেক্ষাগৃহ

রাজু থেকে রাজা সাহেব

অনাথ আশ্রমে মানুষ হওয়া ছেলে রাজু—গুণে ছিল অসমসাহসিকতা এবং বাঁশী বাজাতে ও গান গাইতে পারা। কিন্তু বিপদ হয়েছিল তার ঐ রাজু যা রাজা নাম হওয়ায়। সে প্রায়ই স্বপ্ন দেখত, মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করত যে, সে সত্যিই একদিন এক রাজকুমারীকে বিবাহ করবার সৌভাগ্য লাভ করবে। এবং শেষ পর্যন্ত করলও তাই। এক নেটিভ স্টেটের খামখেয়ালী রাজার কাছে 'তেল-মালিশ'ওয়ালা হিসেবে পৌঁছোনোর পরে-তারই খেয়ালের বশে রাজুকে এক রাজকুমারীর কাছে রাজাসাহেবের ভূমিকায় অভিনয় করতে হল এবং তাই করতে গিয়েই সে পড়ল রাজকুমারীর প্রেমে; রাজকুমারীও অনেক ঘটনা এবং অনেক ভুল বোঝাবুঝির পরে রাজুর ঐকান্তিক সারল্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভালোবেসে ফেলল। এর পরে গরীব রাজুর সংগে ঘর বাঁধবার জন্যে রাজকুমারী পুনাম সকল সুখৈশ্বর্যকে কেমন অবহেলায় ত্যাগ করে এল, তাই নিয়েই লাইমলাইট (অ্যান অ্যালোসিয়েটেড ফিল্মস অ্যাণ্ড ফিনান্স কর্পোরেশন)-এর নিবেদন ইস্টম্যান কলার-রঞ্জিত "রাজা সাব" ছবিটির শেষের আবেগবহুল উত্তেজক দৃশ্যগুলি রচিত।

অধুনা নির্মিত সাধারণ হিন্দী ছবি থেকে "রাজা সাব"-এর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, এই ছবিটিতে কোনো ক্রূরবুদ্ধিসম্পন্ন ভীলেন নেই এবং সেই কারণে ভীলেন দ্বারা নায়িকা বা নায়ক হরণ ও তার উদ্ধার প্রাপ্তির জন্যে খুন-জখম, মারামারি, ধস্তাধস্তি, রক্তারক্তির ছড়াছড়ি নেই। এবং নেই অযথা নাচগানের ক্যাবারে দৃশ্য। সোজাসুজি একটি ধনীর সুন্দরী মেয়ের সংগে গরীব ছেলের প্রেমের ছবি, যে প্রেমের জন্যে ধনীকন্যা তার প্রাসাদের সুখী জীবন ত্যাগ করে চলে আসে ঐ গরীব ছেলের কাছে। কিন্তু তাই বলে কি ছবিটি আমাদের বাঙলা "উদয়ের পথে"র সংগে তুলনীয়? কিংবা সি, এল, ধীর লিখিত ছবির কাহিনীর প্রতিটি পর্যায়কে বাস্তবধর্মী বলব? —না, তা আদৌ বলতে পারা যায় না। সদ্যআগত 'তেল-মালিশ'ওয়ালাকে নিয়ে রাজা প্রতাপ সিং যা করলেন, তা অতি বড়ো কৌতুকপ্রবণ খামখেয়ালীর পক্ষেও কল্পনাতীত। রাজা প্রতাপ সিংয়ের ইঙ্গিতে রাজকুমারী পুনামের সামনে বারংবার তোতাপাখীর মতো যে মুখস্থ বুলি বলে যায়, তাও অতি বড়ো নির্বোধের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ধরনের নানা অবাস্তবতায় ছবির কাহিনীটি কণ্টকিত। সাধারণের কাছে যা উপভোগ্য বোধ হবে, সে হচ্ছে ছবিটির আবেগপ্রবণতা ও কিছুটা কৌতুককর পরিস্থিতি এবং সর্বোপরি ছবির সামগ্রিক বক্তব্যটি। এর জন্যে ব্রিজ কাটিয়াল লিখিত সংলাপ এবং আনন্দ বক্সী লিখিত গীতগুলি বহুলাংশে দায়ী।

ছবির অভিনয়াংশও মোটের ওপর উপভোগ্য। নায়ক শশী কাপুর ভূমিকাটিতে যতটা সম্ভব বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তবে বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, প্রযোজকরা তাঁকে তাঁর দাদা শাম্মী কাপুর করে তুলতে বদ্ধপরিকর। নন্দা রাজকুমারী পুনাম বেশে চরিত্রের আবেগপ্রবণতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজা প্রতাপ সিংয়ের ভূমিকাটিকে রাজেন্দ্রনাথ একটি উপভোগ্য অভিনবত্ব দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় আগা, আজুরা, নাজ, কমল কাপুর প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে শিল্পনির্দেশনাটি উচ্চপ্রশংসার যোগ্য। রঙীন চিত্রগ্রহণ সর্বত্র সমান নয়—রঙকে সমান স্তরে রাখা সম্ভব হয়নি। ছবিটিতে সাতখানি গান আছে। গানগুলির ভাষার প্রশংসা আগেই করা হয়েছে। সুরেও অভিনবত্ব এনেছেন কল্যাণজী-আনন্দজী। "সজনা কে তেরে বিন সজনা জিয়া জ্বলজ্বল যায়ে" এবং "জিনকো কিসমত মে কাঁটে"—গান দুখানি সুর ও গাওয়ার মাধুর্যে নিশ্চিত জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

লাইমলাইট-এর "রাজা সাব" [illegible] [illegible] চিত্তবিনোদনে সক্ষম [illegible]

রুমানিয়ার চলচ্চিত্রোৎসব

গেল ১২ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর, সাতদিন ধরে ম্যাজেস্টিক সিনেমার রুমানিয়া দেশ-জাত চলচ্চিত্রের যে উৎসব হয়ে গেল, তাতে প্রদর্শিত সাতখানি কাহিনী চিত্র দেখে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, ১৯৪৪ এর ২৩ আগস্ট তারিখে রুমানিয়া জাতির বন্ধনমুক্তির দিন থেকে শুরু করে মাত্র পঁচিশ বছরের চেষ্টায় রুমানিয়ার চলচ্চিত্র-শিল্প সামগ্রিকভাবে যে সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে এর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। সঙ্গে সঙ্গে এও স্বীকার করতে হয়, বাস্তবধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে ওদের তুলনায় ভারত—বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং বাঙলা মিলিতভাবে—অনেক, অনেক পিছিয়ে আছে, যদিও ভারত স্বাধীনতালাভ করেছে রুমানিয়ার মাত্র তিন বছর পরে, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট।

প্রথমেই বলি, একমাত্র রঙীন কাহিনী-চিত্র **"কোডিন"**-এর কথা। এমন একটি সহজ, সরল অথচ প্রাণস্পর্শী ছবি আমরা আর কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না। একটি বাচ্ছা, সরলমতি, নিষ্পাপ, বছর আট-দশেকের ছেলের সংস্পর্শে এসে একজন দুর্ধর্ষ অপরাধী কেমন করে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে গেল, তারই একটি প্রাণস্পর্শী কাহিনী ছবিটির মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। সুন্দর স্বাভাবিক গ্রাম্য দৃশ্যসমৃদ্ধ ছবিটিতে একটি ফুলের মতো সুন্দর ছেলে অপর সকল অভিনেতা অভিনেত্রীর সঙ্গে যে-আশ্চর্য অভিনয় করেছে, তার তুলনা কদাচিৎ পাওয়া যায়।

এর পরেই উল্লেখ্য, সাদা-কালো ফিল্মে তোলা **"দি দানিয়ুব গোজ্ ইটস্ ওয়ে"**। নাৎসীদের প্রহরায় একটি স্বয়ংচালিত বোটে করে যুদ্ধসরঞ্জাম নিয়ে যাবার ভার পড়ে একটি সদ্যবিবাহিত মিহাইয়ের উপর। সে তার স্ত্রী আনাকেও সঙ্গে নেয় এবং সাহায্যকারী হিসেবে নেয় তথাকথিত জেল ফেরৎ টোমাকে, যে আসলে একজন রুমানিয়ার মুক্তিসেনার পদস্থ কর্মী। ঐ বোট থেকে লুকিয়ে অস্ত্রশস্ত্র পাচারের সময়ে টোমাকে দূর থেকে দেখতে পায় আনা। সেও টোমাকে পরে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। ফলে মিহাই টোমা এবং আনা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলে আনা মিহাইয়ের সন্দেহ ভঞ্জন করে। মাইন-পাতা দানিয়ুবের উপর দিয়ে দুঃসাহসিক অভিযান চালানোর সঙ্গে সঙ্গে মিহাই-আনা-টোমার ব্যক্তিগত কাহিনীটিকে আশ্চর্যভাবে খাপ খাইয়ে এই আশ্চর্য বাস্তবধর্মী চিত্রটিকে অতিমাত্রায় হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন ছবিটির পরিচালক।

"ফোর স্টেপস্ টু দি ইনফাইনাইট" হচ্ছে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য চিত্র। একজন মুক্তিসেনার যোদ্ধা ডিনামাইট দিয়ে নাৎসী-দের যুদ্ধসরঞ্জাম বোঝাই একটি লরীকে গুড়াতে গিয়ে আহত হয়ে একজন সার্জেনের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সার্জেন শুশ্রূ-

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স পরিবেশিত **ভ্যালি অফ দি ডলস** চিত্রে নীলা ও'হারার ভূমিকায় প্যাটি ডিউক।

চিকিৎসা দ্বারা তাকে বাঁচিয়ে তোলেন এবং যতদিন না সে ভালো হয়ে উঠছে, ততদিনের জন্যে তাকে তাঁরই আশ্রয়ে থাকতে দিতে রাজী হন। কিন্তু জার্মানদের সন্দেহ দৃষ্টি তাঁর বাড়ীর ওপর পড়ায় ডাক্তারের স্ত্রী তাকে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলে। ইতিমধ্যে কিন্তু ডাক্তারের তরুণী কন্যা তার তার প্রতি সহানুভূতিপ্রবণ হয়ে পড়েছে। সে সকলের দৃষ্টির অন্তরালে ছেলেটিকে বাড়ীর চিলেকুঠুরীতে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু মেয়েটির আত্মদানকে মুক্তিযোদ্ধা নিজের বিপন্ন জীবনকে মনে রেখে গ্রহণ করতে পারে না। সে মেয়েটিকে মুক্তির দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে। মুক্তির দিন যখন আসন্নপ্রায়, তখন কিন্তু ছেলেটি সার্জেনের স্ত্রীর চোখে পড়ে যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ নাৎসীদের সংবাদ দেন। নাৎসীদের গুলিতে ছেলেটি মারা যায় এবং মেয়েটি নিজের মনকে স্থির রাখবার জন্যে ছেলেটির পূর্ব পরামর্শ মতো গুনতে থাকে : এক, দুই, তিন......এগারো! এ ছবিতেও একটি বাস্তব পটভূমিকায় একটি সুন্দর প্রেমের আবেগধর্মী চিত্রকে একটি সুলিখিত চিত্র-নাট্য এবং অপূর্ব সুন্দর অভিনয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

"সানডে অ্যাট সিক্স ও'ক্লক" ছবিটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছবি বলা যেতে পারে। নাৎসীবিরোধী গুপ্ত আন্দোলনের সময়ে একটি কমনীয় দেশভক্ত যুবক একটি মেয়েকে ভালোবেসেও সমকালীন নৈরাশ্যের মধ্যে কিছুতেই তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে পারল না এবং শেষ পর্যন্ত মেয়েটি শোচনীয় মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হল, এই কাহিনীটিই বহু শব্দ ও চিত্রকল্পের সাহায্যে চিত্রিত হয়েছে এই ছবিটিতে। মনে হয়, এর পরিচালক প্রতীকধর্মিতায় আধুনিক প্রয়োগরীতির

নায়া কাম্বিন্তা/বেবীরাণী

একটি চ্যালেঞ্জরূপে (বিশেষ করে ফরাসী পরিচালকদের সামনে) উপস্থাপিত করেছেন।

"বম্‌ব্‌ ওয়াজ স্টোলন্‌" ছবিটি প্রধানত কৌতুকমূলক ও কিছুটা কল্পনা-ধর্মী। জনৈক সাদাসিধে পথচারী ভদ্র-লোকের হাতে এমন একটি ব্যাগ এসে পড়ে, যার মধ্যে একটি বিধ্বংসী বোমা রাখা ছিল। যারা বোমাটিকে ওর মধ্যে রেখেছিল, তারা শত চেষ্টা সত্ত্বেও বোমাসমেত ব্যাগটিকে হাত করতে পারছে না। আর ভদ্রলোক ঐ নিদারুণ জিনিসটির অস্তিত্ব সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ হয়ে ব্যাগটিকে যখন-তখন ছোঁড়াছুঁড়ি করে চলেছেন। এইটিই হচ্ছে মূল কাহিনী। শেষে ঐ পারমাণবিক বোমার অংশ বিতরণ এবং তাদের কল্যাণকর প্রয়োগে সমস্ত জায়গা ফুলে-ফলে ভরে যাওয়ার দৃশ্য হচ্ছে ফ্যান্টাসির পর্যায়ভুক্ত।

"স্টেপস্‌ টু দি মুন"-এ পৃথিবীর মানুষের পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে পাড়ি দেবার আগ্রহ বহু যুগের, এই কথাই নানা ঐতি-হাসিক ঘটনার ভিতর দিয়ে, কতক বা আঁকা ছবির সাহায্যে চিত্তাকর্ষকভাবে রূপকথাচ্ছলে দেখানো হয়েছে। মানুষের বেলুন-যাত্রা এর একটা উল্লেখযোগ্য পর্যায়।

"দি স্কাই হ্যাজ নো বার" ছবিটির মাধ্যমে বলতে চাওয়া হয়েছে, মানুষকে বন্দী করা যায়, কিন্তু তার মনকে বেঁধে রাখবার মতো শক্তি কারুরই নেই। একজন চিত্রকর ফ্যাসিস্টবিরোধী হবার ফলে শেষ পর্যন্ত কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল; কিন্তু কারাগৃহের ছোট্ট জানলার কাছে চোখ রেখে সে দেখল, আকাশ অনন্ত এবং তাকে বন্দী করা যায় না। ছবিটিতে বহু অন্তরস্পর্শ-কারী দৃশ্য গোড়ার দিকে থাকলেও শেষ পর্যন্ত এটি যেন সাম্যবাদী দেশের সরকার নিয়ন্ত্রিত ছবিগুলির মতোই শুষ্ক প্রচার-ধর্মী হয়ে উঠেছে।

বোম্বাই থেকে

সেদিন এমন একখানি ছবি দেখলাম যা দেখলে মন আনন্দে ভরে ওঠে। ছবি-খানি ছোট, দু'রীলের একটি ডকুমেন্টারী। নাম হল টেগোর পেইন্টিংস—অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথের শিল্পকলা। প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন আমাদের বাংলাদেশেরই একটি গুণী ছেলে রণবীর রায়। নামটি অনেকের কাছেই নতুন কারণ এখনও তিনি কোনো পূর্ণাঙ্গ ছবি করেন নি, তবে শিগ্‌গীর করবেন বলে রণবীরবাবু আমাদের জানিয়েছেন। এর আগে তিনি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর চিত্র সম্বন্ধে একখানি ডকু-মেন্টারী করেছেন। সেটি এবং টেগোর পেইন্টিংস দুখানি ছবিই ফিল্মস ডিভিসন রিলিজ করবেন যথাসময়ে।

রেখায় এবং রঙে রবীন্দ্রচিত্রগুলি যেমন অনবদ্য এবং বিরাট প্রতিভার আর একটি নিদর্শন তেমনি সেগুলি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে অপূর্ব বর্ণসমারোহের মাধ্যমে যা চোখকে তৃপ্ত করে এবং মনকে ভরিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আঁকা ছবি সম্বন্ধে যখন যা বলেছেন শুধু সযত্নে সংগৃহীত সেই বাণীগুলিকেই পরিচালক ধারাবিবরণী রূপে ব্যবহার করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করেছেন। চিত্রগুলির মূলে সুরের সঙ্গে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আবহসঙ্গীত প্রয়োগ করেছেন বাহাদুর খাঁ. সব মিলে 'টেগোর পেইন্টিংস' একখানি স্মরণীয় ছবি আর সেজন্য শ্রীরণবীর রায়কে আমাদের অভি-নন্দন জানাই।

বাঙালী পরিচালকদের প্রশংসায় এখন বোম্বায়ের চিত্রজগত মুখরিত। বহু বাঙালী পরিচালক এখন এখানে ছবি করছেন। প্রযোজক হিসেবে শশধর মুখার্জির নতুন পরিচয় দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর পরিবারের সুবোধ মুখার্জি, রাম মুখার্জি, শঙ্কর মুখার্জি এখন আবার তাঁর ছেলে জয় মুখার্জিও পরিচালনা ক্ষেত্রে নামছেন—অবশ্য নায়ক তো থাকবেনই, উপরন্তু পরিচালকও হচ্ছেন। তারপর আছেন শক্তি সামন্ত, প্রমোদ চক্রবর্তী,—এ'দের ছবি প্রচুর পয়সা দেয়। অসিত সেনের নামডাক খুব এখানে। তাঁর 'মমতা'র পরে 'দীপ্‌ জেলে যাই'এর হিন্দী) 'অনোখী রাত' চিত্রপ্রিয়দের চিত্ত-জয় করেছে। এখন করছেন 'খামোশী' এবং এর পরে করবেন 'চলাচলে'র হিন্দি। পরিচালক তরুণ মজুমদারের হিন্দি 'রাহগীর' শিগ্‌গীর মুক্তিলাভ করবে এ ছবিখানির জন্যে এখানকার দর্শক উদগ্রীব হয়ে আছে। তাঁর বাংলা ছবি "বালিকা বধূ"র কথা এখানকার সব লোকের মুখে মুখে। তরুণ পরিচালক অজয় বিশ্বাসের মাত্র একখানি হিন্দি ছবি ('সম্বন্ধ') মুক্তি-লাভ করেছে—কিন্তু ইতিমধ্যে ২।৩ খানি ছবির কন্ট্রাক্ট তিনি ইতিমধ্যে করেছেন। ফণী মজুমদার তো দীর্ঘদিন ধরে বোম্বায়ে আছেন, তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব এবং [illegible] জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

এখানে পিঞ্জর-এর সেটে যাত্রিক-এর অনাতম পরিচালক অভিনেতা দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন ও দোলচাঁপা দাশগুপ্তকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ফটো : অমৃত

সত্যেন বসুর বেশ কয়েকটি ছবি হিট করেছে—তিনিও ক্রমাগত ছবি করছেন। তাঁর বর্তমান ছবির নাম 'জীবনমৃত্যু'। তপন সিংহমশায়ও বোম্বাই এসেছেন 'আপনজনে'র হিন্দি সংস্করণের বন্দোবস্ত করতে। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়ও সম্প্রতি বোম্বাই এসেছিলেন প্রাণ এবং জয় মুখার্জি'র সঙ্গে চুক্তি করতে তাঁর 'সোনাই দীঘি' ছবির জন্য। তিনিও নাকি আগামী বছরের গোড়ার দিকে একখানি হিন্দি ছবির কাজ এখানে আরম্ভ করবেন। হ্যাঁ, আর দুজনের কথা বলতে ভুলে গেছি—একজন হলেন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়—তাঁর অনেকগুলি ছবি চিত্রসিকদের ভাল লেগেছে,—রাষ্ট্রপতি পদকও পেয়েছে। সম্প্রতি তাঁর 'পিয়ার কা-স্বপ্না' মুক্তিলাভ করেছে এবং এখন তিনি করছেন 'সত্যকাম' ধর্মেন্দ্র ও নন্দাকে নিয়ে। অপরজন হলেন দুলাল গুহ—যাঁর সদ্যমুক্ত ছবি, 'ধরতি কহে পুকারকে' মহারাষ্ট্র প্রদেশে প্রমোদ কর বর্জিত হয়ে সগৌরবে চলছে। এ ছাড়াও আছেন বাসু ভট্টাচার্য যিনি 'তিসরী কসম' তুলে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনিও একখানি ছবি প্রায় শেষ করে এনেছেন। এঁরা ছাড়া কলাকুশলী এবং শিল্পী হিসাবে বহু বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখবার চেষ্টা করছেন এখানে। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করব।

জনৈকা খুব নামকরা অভিনেত্রী যাঁর পিতা ভারতীয় চিত্রজগতের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক—তাঁর সম্বন্ধে বলছি। বছর দুই আগে ইনি একজন আমেরিকান যুবকের প্রেমে পড়েন এবং বিবাহ করে চলে যান আমেরিকায়। সেই সময় তাঁর হাতে বেশ কয়েকখানি ছবি ছিল। সেই সময় যে সমস্ত চিত্রনির্মাতা তাঁদের ছবিতে এই শিল্পীর কাজ শেষ করতে পেরেছিলেন তাঁরা বেঁচে গেছেন, কিন্তু যাঁরা পারেন নি তাঁরা এখনও এই শিল্পীর আসায় পথ চেয়ে বসে আছেন। বহু চেষ্টা করেছেন শিল্পীটিকে ফিরিয়ে আনবার, মন্ত্রীদের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। অনেকে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয়নি। এবার খবরে প্রকাশ শিল্পী ফিরে আসছেন ভারতে। কারণ তাঁর মার্কিন স্বামীর সঙ্গে আর বনিবনা হচ্ছে না। বিবাহ-বিচ্ছেদও আসন্ন। বিয়ের আগে শোনা গিয়েছিল যে এই মার্কিন ভদ্রলোকটি নাকি কোটিপতি, পরে জানা গেল যে সেটা গুজব মাত্র। এতদিনে সেইসব অসমাপ্ত ছবির প্রোডিউসারদের মুখে হাসি ফুটেছে।

বোম্বাইয়ের এখন সবচেয়ে ব্যস্ত তারকা হলেন সঞ্জয়—এঁর আসল নাম আব্বাস, অভিনেতা ফিরোজ খাঁর ভাই। এঁর হাতে এখন যে ছবিগুলি আছে তাদের নাম করছি : নরেন সায়গলের 'মহারাজা', প্রাডিউসার সোরাবের 'সোনে-কি-হাত', মোহনের 'উপাসনা' কে পি এস মুভিজের 'বেটী', এছাড়াও তিনি কাজ করছেন 'রবি নাগাইচে'র 'হাসিনো কী দেবতা', রাম মহেশ্বরীর নতুন ছবি (এখনও নামকরণ হয়নি)। এ ছবিগুলির কাজ শেষ করে তিনি আগামী বছরের গোড়ার দিকে ইরান যাবেন প্রডিউসার রাধাকৃষ্ণন ও প্রডিউসার পঞ্ছীর দুখানি ছবির জন্যে। এ ছবি দুটির লোকেশন হল ইরান। এতগুলি ছবি একসঙ্গে হাতে থাকলে সাধারণত মাথা ঘুরে যাবার কথা, কিন্তু সঞ্জয় বড় মিষ্টিস্বভাবের ছেলে—সব সময় হাসিখুশী, হৈহুল্লোড় নিয়ে থাকেন—অর্থ এবং সাফল্য এখনও তাঁকে নষ্ট করতে পারেনি। —প্রবাসী

হিন্দী হাইস্কুলে অ্যান্টনী কবিয়াল নাটকের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে (সাহায্যার্থে) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, অনিল বাগচী, তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়, অসিতবরণ, কেতকী দত্ত, সীতা মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী ঘোষ, শ্যামমোহিনী দেব সবিতাব্রত দত্ত এবং অন্যান্য শিল্পী ও কলাকুশলীরা। ফটো : অম

মঞ্চাভিনয়

'বিশ্বরূপায়' তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ক্রৌঞ্চ নিষাদ কথা' নাটকটির অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন 'উত্তরপাড়া'র প্রগতি-শীল নাট্যগোষ্ঠী 'আমরা'র শিল্পীরা। সমাজের চাপে ক্ষুব্ধ চারটে যুদ্ধবিধ্বস্ত সৈনিকের নিঃসীম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে নাটকটি আমাদের সামগ্রিক অনুভূতিকে আন্দোলিত করেছে, তাই প্রতিটি দৃশ্যেই আন্তরিকতা দিয়ে প্রশ্ন করেছি—কেন এমন হোল ?

'ক্রৌঞ্চ নিষাদ কথা' নাটকে কোন একটি মাত্র কাহিনী নেই। রণক্লান্ত চারজন সৈনিক একদিন গভীর রাতে শিবিরে বিশ্রাম নিতে নিতে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে চাইলো। সেই সূত্রে আমরা দেখলাম কেমন করে এবং কেন এই চারজন সাধারণ অভ্যস্ত জীবনযাত্রার স্তর থেকে সৈনিকের বৃত্তি গ্রহণ করতে এসেছে। প্রত্যেকের ব্যাপারেই দেখা গেছে যে, সৈনিক হওয়ার ব্যাপারে কোন উজ্জ্বল আদর্শ কাজ করে নি; মোটা-মুটি অভাবের তাড়নাতেই এই সৈনিকের পোশাক তাদের নিতে হয়েছে। এরা কেউ যুদ্ধের ক্লান্তি শরীর ও মনে মেখে সুখী নয়, সব সময়েই এরা ভাবছে ফেলে আসা দিনের কথা। মন-প্রাণ দিয়ে চাইছে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাক। যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত শেষ হোল, ঘোষণা এলো—শান্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যুদ্ধ এখন বন্ধ হোল। কিন্তু দেখা গেলো ঘোষণার একটু আগে শত্রুপক্ষের গুলিতে এই চারজন সৈনিককেই জীবন দিতে হোল। 'আমরা'র শিল্পীরা আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে নাটকটির অনুভূতিকে সবার মনে গেঁথে দিতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে নির্দে-শক তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের নিষ্ঠা এবং শিল্পবোধ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। প্রতিটি শিল্পীই চরিত্রের মর্মকথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অভিনয় করতে পেরেছেন বলেই 'আমরা'র নাট্য প্রযোজনা বহু দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যাচিত হোতে পেরেছে। মেজর, সুবীর, মাধব, ভানু চরিত্রে তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন গঙ্গোপাধ্যায়, অলোক গুপ্ত স্বকীয়তা আরোপ করতে পেরেছেন। উদয় ভট্টাচার্যের 'রঞ্জন' প্রাণবন্ত চরিত্র চিত্রণের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, 'মনোরমা'র আনন্দ বেদনা আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে পরিস্ফুট করে তুলেছেন মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়। তাপসী মুখোপাধ্যায় 'সুস্মিতা' চরিত্রের অভিনয়ে খুব একটা মনকে স্পর্শ করতে পারেন নি। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন সলিল কুন্ডু, তপন ভৌমিক, নারায়ণ লস্কর, অজয় জাঠী, অধীন বসু, বিমল বসু। শ সংযোজনায় ছিলেন নন্টু ধর। 'আমর শিল্পীরা এই প্রথম কলকাতার রঙ্গম অভিনয় করে নাট্য প্রযোজনার গুণগ বৈশিষ্ট্যের যে নজীর রাখলেন, তাতে ভ যাতে এঁদের কাছ থেকে আরো গভীর কিছু পাবার আশায় রইলাম।

বেঁচে থাকতে গেলে নিশ্চয়ই অ প্রয়োজন, কিন্তু এই অর্থপ্রাপ্তি ব্যাপা যখন একটা প্রচন্ড মোহ বা লোভে র নেয় তখন বিপর্যস্ত হয় মানুষের স্বাভা জীবনযাত্রার ছন্দ। সৌজন্যবোধ, যা মা মমতা, ভালোবাসা, প্রীতি স্নেহ, প্রভৃ সৎ প্রবৃত্তিগুলো হয় তখন অর্থহীন; অ ভব দিয়ে গড়ে তোলা জীবনে তখন না নানা রকম দুর্যোগের অন্ধকার। এই সং টিকেই বোধ হয় সম্প্রতি 'কিশোর ন বীথি' প্রযোজিত রবীন ব্যানার্জির 'র বারোটা' নাটকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ক হয়েছে। রঙমহলে পরিবেশিত 'রাত বারো নাটকের মধ্যে বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের দিক দি কোন নতুনত্ব না থাকলেও উপরোক্ত সত্য ভাষা দিতে নাট্যকারের নিষ্ঠার অভাব পরি লক্ষিত হয় নি। নাটকীয় মুহূর্ত সৃ করতে গেলে যে কটি পরিচিত উপা আছে, তার কোনটিরই অনুপস্থিতি এই নাটকে। তবে একথা ঠিক সংলা আর গতিবেগে 'রাত বারোটা' দুর্ধার হ উঠতে পারে নি কোথাও; এর কারণ না কার যতো বেশী বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য ভ ভারণা করার চেষ্টা করেছেন, ততখ মনযোগ দেন নি সব মিলিয়ে একটা সুসং বোধ তৈরী করার দিকে। নাট্যকার

পি ডব্লু ডি রিক্রিয়েশন ক্লাব অভিনীত লবণাক্ত নাটকের একটি দৃশ্যে শৈলেন্দ্রকুমার মৌলিক, শিবপ্রসাদ রায়, মুকুল নাগ, দুর্গাপদ সমাদ্দার, চিত্রা ঘোষ, গঙ্গাধর পাল।

য়গার চলতি সমাজ ব্যবস্থাকেও প্রচ্ছন্ন ূপ করেছেন। নাটক সুগ্রথিত না হলেও ভনয় দিয়ে সে ফাঁকফে ভরিয়ে দেওয়া ।। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই 'কিশোর নাট্য থি'র শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভিনয়ে সে র্তা ছিল না। তাই প্রথম থেকেই নাটকে টা নিদারুণ অস্বস্তিবোধ করেছে। নাট্য-র্দশক সুনীল ভট্টাচার্য হয়তো নিষ্ঠার ন শৈথিল্য দেখান নি, কিন্তু মঞ্চের ওপর ল্পীরা নির্দেশককে প্রত্যাশিত সহযোগিতা ত পারেন নি।

শ্রীঅজিত সাহার 'ডাঃ রুদ্ররূপ বসু' ও াতা দাসের 'বিন্দু'ই শুধু দুটি উল্লেখ-গ্য চরিত্রচিত্রণ হয়েছে। প্রেম আগরওয়ালের াপ চৌধুরী' অসহ্য, শিল্পীর 'স' ারণে বিকৃতি মনকে রীতিমত পীড়া য়ছে। চরিত্রটি গভীরতা এতটুকু তাঁর ভনয়ে ফুটে ওঠে নি। মিহির ভট্টাচার্য ও না চক্রবর্তী 'শেখর' ও 'ইলার' ভূমিকায় ভঙ্গীমায় অভিনয় করেছেন, তাতে মনে ছে দুজনেরই চরিত্রোপলব্ধির অনেকটা ী আছে। 'গীত ও শ্রী' অর্কেস্ট্রা সাধ্য-া নাটকের শিথিল মুহূর্তগুলোকে য়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। একটি কথা রশেষে বলতে চাই যে, আজ নাটক নিয়ে াবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তাতে যে-ন গোষ্ঠীরই এমন নাটক প্রযোজনা করা ত যার মধ্যে সাম্প্রতিক নাট্যচিন্তার ্ত থাকে। 'কিশোর নাট্য বীথি'র ্পীদের এটা বোধ হয় প্রথম অভিনয়, তু প্রথম আবির্ভাব তো আরও শিল্প-মায় ভরে ওঠা উচিত ছিল। কেন তা ল না, এ বিষয়ে সংস্থার কর্ণধারদের ীরভাবে একবার ভেবে দেখার প্রয়োজন ছ বলে মনে করি।

শ্রীশচীন সেনগুপ্তের মঞ্চসফল নাটক টনীর বিচার' কিছুদিন আগে ৪৬, ারাম বাবু স্ট্রীটে এক ঘরোয়া পরিবেশে রবেশিত হোল। এই অতি পরিচিত নাটকটির অভিনয়ের আয়োজন করেন 'রঙ্গরাজমে'র শিল্পীরা। প্রথমেই বলা যেতে পারে যে, নাটকটির মধ্যে বিষয়বস্তুগত যে সংঘাত আছে, তা শিল্পীদের সংঘবদ্ধ অভি-নয়ে স্বাভাবিকভাবে মূর্ত হয়ে উঠতে পারে নি। নাটকের চরিত্রের মানসিকতার সঙ্গে বোধ হয় দু-একজন ছাড়া কোন শিল্পীই নিজেকে বিলীন করে দিতে পারেন নি; তাই মঞ্চে যা কিছু মুখরতা, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা হয়েছে কৃত্রিম। মঞ্চের ওপর চলাফেরার ভঙ্গি কখনো কারো চরিত্রপযোগী হয়ে ওঠে নি এবং সেই কারণে নাটকের গতি বারবার হয়েছে ব্যাহত। সিনেমার কায়দায় গান গাওয়ার ব্যাপারটিও নাটকের মেজাজকে বিপর্যস্ত করেছে। মোটের ওপর বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত নাটকীয় মুহূর্তগুলোর মধ্যে কোন একটা সংহতিবোধ কোথাও দানা বেঁধে ওঠে নি বলে 'রঙ্গরাজমে'র এই নাট্য-প্রযোজনাটিকে সফল -বলতে দ্বিধা বোধ করছি। আঙ্গিক পরিকল্পনার দিক দিয়ে পরিচালক বীরেন্দ্র মল্লিক কিছুটা নৈপুণ্যের পরিচয় রাখতে পেরেছেন। তিনিই অভিনয় করেছেন নাটকের মূল চরিত্র ডাঃ ভোঁসের ভূমিকায়। বলা যেতে পারে একমাত্র শ্রীমল্লিকই এই জটিল চরিত্রে প্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পেরেছেন। 'তটিনী' ও 'সমরে'র ভূমিকায় কৃষ্ণা রায় ও সুজিত ব্যানার্জি যেভাবে অভিনয় করেছে, তাতে স্বাভাবিকতা কোথাও খুব একটা প্রতিহত হয় নি। কিন্তু রোমান্টিক নায়ক 'বসন্ত' চরিত্রে সলিল সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, মূল চরিত্র এবং শ্রীসরকারে অভিনয়—দুয়ের মাঝে ব্যবধান থেকেছে বিরাট। শ্যামলী দাশ-গুপ্তের ললিতা ও নীরেন্দ্র মল্লিকের 'শৈলেশ' আমাদের মুগ্ধ না করলেও, হতাশ করে নি। স্তুতি সান্যালের গাওয়া আবহ-সংগীতটি ভালো লেগেছে, কিন্তু গানটির নাটকের পক্ষে খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। আলোকসম্পাতও মূল নাটকের সাথে তাল মিলিয়ে হয় নি।

পি-ডবলিউ-ডি রিক্রিয়েশন ক্লাবের নাট্যচর্চার যে গভীরতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তাদের প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা 'বারো ঘণ্টা'র মধ্যে তা আরো ব্যাপ্তি পেলো, আরো সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠলো এঁদের দ্বিতীয় প্রযোজনা 'লবণাক্ত' নাটকের সংঘাতের মধ্যে প্রকৃত সুযোগ আর শিক্ষার অভাবে যারা সমাজে 'অপাংক্তেয়' বলে আখ্যা পায়, তাদের প্রকৃত মানবতার আলোয় আলোকিত করলে সামাজিক প্রগতি তাদের দিয়েও সম্ভব। বোধহয় পৃথ্বীশ সরকারের 'লবণাক্ত' নাটকটি এই সত্যের দিকে আমাদের আকৃষ্ট করেছে।

'মহাজাতি সদনে' পরিবেশিত এই নাটকের প্রযোজনা নিঃসন্দেহে শিল্পীদের অভিনয় নৈপুণ্যের কথা সোচ্চারে ঘোষণা করেছে। এই প্রসঙ্গে নাট্যনির্দেশক শ্রী শৈলেন্দ্রকুমার মৌলিকের নিষ্ঠা ও আন্ত-রিক শিল্পবোধ আমাদের মুগ্ধ করেছে। যাঁদের সাবলীল অভিনয় সামগ্রিক প্রযো-জনাকে পরিপূর্ণ করেছে তাঁরা হলেন শৈলেন্দ্রকুমার মৌলিক (মিঃ সেন), শিব-প্রসাদ রায় বিনয়), মুকুল নাগ অরুণ), গঙ্গাধর পাল বিজয়), পাঁচুগোপাল মুখো-পাধ্যায় (ব্রজনাথ সরখেল), কৃষ্ণা দে (মা), কালীপদ গুপ্ত, নিতাইপ্রসাদ গুপ্ত। অন্যান্য ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেছেন চিত্রা ঘোষ, দুর্গাপদ সমাদ্দার, কার্তিক সিনহা, অরুণ মুখোপাধ্যায়, পাঁচুগোপাল সিনহা, নিত্যানন্দ সরকার, রবীন সাধুখাঁ, সাধনা পাল, মৃণালকান্তি পাল, বিজয় চক্রবর্তী, অশোক মন্ডল, গৌর ঘটক, ক্ষেত্র-মোহন দাস, সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য।

সম্প্রতি ব্যপীন মেমোরিয়াল ক্লাবের সভ্যরা বাৎসরিক সম্মিলনী উপলক্ষ্যে দুটি একাংক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন প্রতাপ মেমো-রিয়াল হলে। নাটক দুটি ছিল অচিন্ত্য

গান্ধার প্রযোজিত চাণক্য সেনের অ্যান্টিগনে তারারা শোনে না-র একটি দৃশ্য

সেনগুপ্তের 'উপসংহার' ও পার্থপ্রতীম চৌধুরীর 'লাশ কাটা ঘর'। দুটি নাটকের অভিনয় দর্শকদের মোটামুটি স্বীকৃতি পেয়েছে। কয়েকটি চরিত্রে যাঁরা বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁরা হোলে প্রবাল দাস, বিমান পালচৌধুরী, স্বপন মাম্না, প্রণব দাস, প্রফুল্ল দাস, প্রবীর দত্ত, কল্যাণ চক্রবর্তী।

বিবিধ সংবাদ

ডি-ভি-সি বোকারোর সংঘশ্রী মহিলা সমিতির সভ্যারা গত ১২ সেপ্টেম্বর বোকারো ক্লাবের প্রযোজনায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। শ্রীমতী তৃপ্তি করের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর কুমারী মিত্র ঠাকুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীমতী সবিতা মুখার্জির কন্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করে কুমারী শম্পা তরফদার। পরে শম্পার সঙ্গে দ্বৈতভাবে ওই সমবয়সী বন্ধু সুদীপা ভট্টাচার্য ও 'জিপসি' নৃত্য পরিবেশন করে। শ্রীমতী সবিতা মুখার্জির কাজী নজরুলের 'নারী' কবিতা আবৃত্তির পর শ্রীগোপালচন্দ্র দে-র পরিচালনায় নাট্য-করা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাকা-দেখা' নাটিকাটি সাফল্যের সঙ্গে সঙ্ঘের মহিলা শিল্পীরা মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে যাঁরা অংশ নেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন হেনা দাস, মিনতি সিংহরায়, সর্বানী মাজি, বেলা ভট্টাচার্য, রেবা ভট্টাচার্য প্রমুখ। মঞ্চ, রূপ-সজ্জা এবং আবহসঙ্গীতে ছিলেন যথাক্রমে সর্বশ্রী সুবীর রায়, সদানন্দ মাজি এবং সুহৃদ নিয়োগী। এ অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে বোকারো ক্লাবের সভ্যারা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মজয়ন্তী পালন করেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখেন কবি তরুণ সান্যাল এবং প্রাণগোবিন্দ গুহ। নজরুলের গান এবং আবৃত্তি যথাক্রমে পরিবেশন করেন শ্রীমতী তৃপ্তি কর, সাধন দত্ত এবং কুমারী সীমন্তী চ্যাটার্জি। সবশেষে বোকারো ক্লাবের সভ্যারা নাট্যকার বনু ঘোষের 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন।

ভয়ানক বীভৎস রসের ছবি

সংস্কৃত আলংকারিক রস-সমাজে ভয় ও বীভৎসকে স্থান দিয়েছেন। সেই তুলনায়, সংস্কৃত সাহিত্যে ভয়ানক দৃশ্য যদিবা কিছু আছে, বীভৎস রসাশ্রিত বর্ণনা নিতান্তই সংখ্যালঘু। গ্রীসের অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডী প্রসঙ্গে ভয়কে জাগানোর কথা বলেছেন; কিন্তু বীভৎসের প্রসঙ্গে রোমান হোরেসের কঠোর নির্দেশ ছিল : 'পাবলিকের সামনে মিডিয়া যেন স্বপুত্রদের হত্যা না করে।'

অবশ্য এ-সাবধানবাণী কোনদিনই য়োরোপ গ্রাহ্য করেনি। সেনেকার 'ব্লাড অ্যান্ড থান্ডার ট্র্যাজেডী' থেকে আরম্ভ করে হ্যালফিলের পারীর বিকৃত ক্রোকশো 'বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট' পর্যন্ত রক্তাক্ত বীভৎস রসের স্রোত নিরবচ্ছিন্নভাবে উচ্ছলে উঠেছে। বীভৎসের সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশেছে ভয়ানক রস; ধর্ষণকাম ও মর্ষণকাম শিল্পীপ্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হয়েছে।

চলচ্চিত্রের পাড়ায় এই দুই রসের পাকাপাকিভাবে আমদানী করেন মার্ক সেনেট তাঁর 'কীস্টোন কমেডি' সিরিজে। প্রচণ্ড মারধোর, মুখ থেঁতলে গলগল করে রক্ত বার করে দেওয়া, যন্ত্রের মধ্যে হাত-পা-মুণ্ডু ঢুকিয়ে পিষে ফেলা—এই সব ছিল তখনকার কমিক বিষয়। সেনেটের কাছে হাতেখড়ি চ্যাপলিনের। বীভৎস-ভয়ানককে যে কতোভাবে আর্ট করা যেতে পারে, তার পরিচয় দিলেন একাধিক দৃষ্টান্তে—বিশেষভাবে উল্লেখ্য 'গোল্ডরাশ'এর সেই মুরগি হয়ে যাওয়ার অবিস্মরণীয় দৃশ্য।

আর্টের আরও গভীরে প্রবেশ করলেন জার্মানীর রবার্ট ভাইনে ১৯১৯-এ তোলা 'দ্য ক্যাবিনেট অফ ডাঃ ক্যালিগরী'র মাধ্যমে। এক পাগলা ডাক্তার কালো জাদুর মাধ্যমে একটা মৃতদেহকে জাগিয়ে তুলত, আর সেই জাগ্রত প্রেত একের পর এক নিষ্ঠুর হত্যা করত। বীভৎস ও ভয়ানক রসের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যে পরিচালক সেট-মেক-আপ-পোষাক-অভিনয় আলোকসম্পাত, সর্বব্যাপারে এক 'অস্বাভাবিক' শিল্প-রীতির আশ্রয় নেন, যাকে বলা হয় 'এক্সপ্রেশনিজম'। সমালোচক কসোয়ার এই ক্যালিগরীর মধ্যে দেখেছেন হিটলারের পূর্বছায়া।

ক্যালিগরী পাগলা-গারদের কাহিনী: যে বলছে, সে নিজেও পাগল। কিন্তু ফ্রিৎস ল্যাংএর 'ডাক্তার মাবুসে' বাস্তবের মানুষ—জোচ্চোর, জালিয়াত, জাদুকর জুয়াড়ী দইয়াদ খুনে। কতকগুলো কারিগরকে অন্ধ করে দিয়ে তাদের সাহায্যে নোট জাল করে; সম্মোহনবিদ্যার মাধ্যমে শত্রুকে হত্যা করে; পুলিশের সঙ্গে পথ-যুদ্ধ করে। শেষে, ধরা পড়ে পাগল হয়ে যায়।

ভাইনে আর-এক ধরনের ভয়ানক-বীভৎস রসের ছবির জনক। 'ভ্যাম্পায়ার' বা রক্তশোষা জীব—য়োরোপের বহু পুরোনো জনশ্রুতি। ওকে আশ্রয় করে তোলেন 'দ্য টেল অফ এ ভ্যামপায়ার' : জেনুইন নামে একটি আপাত-সুন্দরী মেয়ে আসলে একটি রক্তশোষা গোষ্ঠীর কন্যা। রাতের বেলা ঘুমন্ত মানুষের ঘাড়ে দাঁত ফুটিয়ে রক্ত পান করে; দিনের বেলা বন্ধুদের উত্তেজিত করে তোলে খুন-খারাপীর জন্যে। এই পর্যায়ের সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি, মুরনোর 'দ্য ভ্যামপায়ার' বা ড্রাকুলা : গাড়োয়ানের চাল-চলন দেখেই হাটারের সন্দেহ হয়েছিল, চলছে না, যেন উড়ছে। বনের মধ্যে পুরনো প্রাসাদটা নির্জন, নিজে থেকেই খুলে যায় বিরাট পাল্লা! সন্দেহ আরও দৃঢ় হয় নিয়োগকর্তা কাউন্ট অরলককে দেখে; চোখ দুটো জ্বলছে হিংস্র জানোয়ারের মতো! সন্দেহ পরিণত হয় ভয়ে ভয়ংকর রাতের নির্জনতায় ও আবিষ্কার করে : কাউন্ট আসলে ভ্যামপায়ার 'নাসফেরাতু'! সেই রাতেই চাকরী ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসে হাটার; নাসফেরাতু ওকে অনুসরণ করে। একটিমাত্র অনুচর—প্রভুর দেহটা কফিনে পুরে জাহাজে তোলে; মাঝদরিয়ায় কফিন থেকে কিলবিল ইঁদুর বেরিয়ে জাহাজীদের মধ্যে প্লেগ ছড়িয়ে দেয়; কফিনের ঢাকা খুলে সোজা উঠে দাঁড়ায় নাসফেরাতু রক্ত-পানের প্রবল তৃষ্ণায়। জাহাজ এসে পৌঁছয় হাটারের দেশে, ড্রাকুলা ওর বাড়ীর সামনে আর-এক বাড়ীতে ডেরা বাঁধে। মৃত্যু হাতছানি দেয়। কে যেন বলে : একমাত্র প্রেমই হাটারকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারে।

ওর স্ত্রী রাতে জানলা খুলে রাখে, ভ্যাম্পায়ররা আসে : মেয়েটি ভালবাসার অভিনয় করে; খুশী-খুশী নাসফেরাতু নির্বিবাদে ঘাড়ে দাঁত ফুটিয়ে রক্ত পান করে, ভালবাসার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। খেয়াল হয় না, ওদিকে কখন রাত ফুরিয়ে ভোর হয়ে এসেছে। ছটফট করে ও পালাতে যায়, পারে না, মৃতদেহ আছড়ে পড়ে ঘরের মেঝেয়। ভ্যামপায়ারের মতো জারিজুরী রাত্রে, দিনের আগে ঘরে ফিরতে না পারলে অনিবার্য মরণ।

জার্মানীতে যেমন ভ্যামপায়ার, জাপানী রূপকথার তেমনি নানান অদ্ভুত দৈত্যদানা : উড়ন্ত রোডান, হামাগুড়ি দেওয়া খিদেরো, বরফের চাংগড় গজদিল্লা। আধুনিক বিজ্ঞানের ছলাকলার সংগে মিশিয়ে এদের নিয়ে বিচিত্র সব ছবি উঠেছে। তারও মধ্যে কিম্ভুত সৃষ্টি হিসেবে তানাকার 'গামেরা বনাম বারুগোঁ' : ভয়াবহ পাথিকচ্ছপ গামেরাকে রকেটে বেঁধে মহাশূন্যে ছুঁড়ে দেওয়া হয় মৃত্যুর মুখে। এক বিরাট উল্কাপিন্ডে ঠেকে গামেরার দেহ পৃথিবীতেই ফিরে আসে; ক্রুদ্ধ জীবটির হিংস্র দাপটে শহরের পর শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, শবদেহে আকীর্ণ হয় মাটি। ওদিকে এক বিরাট ডিম থেকে জন্ম নেয় কুমীর-ডাইনসর বারুগোঁ—লম্বায় ১৩০ ফিট, পিঠে বড় বড় সাতটা কাঁটা, তা থেকে সাত রঙের আলো বেরিয়ে গলিয়ে দেয় কঠিন কংক্রিট, পুরু ইস্পাত, নিঃশ্বাসে জমে যায় সমুদ্রের জল, বুকের হৃৎপিন্ড। হত্যার তান্ডবলীলায় দিগন্ত জুড়ে বীভৎস দৃশ্য। অবশেষে লড়াই বাধে গামেরা বনাম বারুগোঁ—পৃথিবী কেঁপে ওঠে, আকাশ ভেঙে চুরমার, পাতালে ওলোট-পালোট। দশদিক জুড়ে ধরাতলশায়ী দুই বিকট ঘটোৎকচ। পরিচালকের কল্পনা বেশ স্থূল। কিছু বুদ্ধির পরিচয় তবু আছে ইনোশিরা হোণ্ডার 'সাতাংগো'য় : ঝড়ে ধাক্কা খেয়ে সাতজন জাহাজী এসে ওঠে এক জনহীন দ্বীপে। সুন্দর দেখতে এক ধরনের গাছ খেতেও সুস্বাদু, সারা দ্বীপ জুড়ে। একজন বেশ তারিয়ে তারিয়ে খায়; দেখতে দেখতে সেই গাছ হয়ে যায়। আর একজন খায়, গাছ হয়ে যায়। আর একজন। সপ্তম ব্যক্তি কোনরকমে পালিয়ে দেশে ফিরে আসে। কিন্তু মানুষ গাছ হয়, একথা কে বিশ্বাস করবে! লোকটা শেষে পাগল হয়ে যায়!

এজাতীয় ছবির জন্যে জাপান ঋণী হলিউডের (কিংকং) কাছে। হলিউড ঋণী জার্মান ছবির কাছে। ডাঃ মাবুসের অনুকরণে 'গ্যাংগসটার ফিলমস' হলিউড তৈরি করতে থাকে তিরিশের দশক থেকে। ভ্যামপায়ার সিরিজও নতুন করে তোলা হয় 'ড্রাকুলা' নামে। এই পর্যায়েরই 'ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড'। জার্মান পরিচালক পল ওয়েগনার তুলেছিলেন 'গোলেম' : রাব্বি লোইড তাল তাল মাটি দিয়ে তৈরি করেন বিরাটাকার দৈত্য গোলেমকে। গোলেম তার কথা শোনে না, [illegible] ত্রস্ত জনপদে। হলিউডেও 'গোলেমস' উঠেছে। তবে, এই সিরিজের সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি 'ফ্রাংকেসটাইন'—দেখতে দেখতে আতঙ্কে শিউরে উঠেছে বয়স্করাও!

এই ধরনের আতঙ্ক ছিল 'ইনভিজিবল ম্যান'এ—একটা লোক অদৃশ্য হয়ে গিয়ে সব গোলমাল বাধিয়ে দিচ্ছে। মিশরের মমিও বাদ যায়নি—হাজার হাজার বছরের ঘুম ভেঙে জেগে-ওঠা ক্রুদ্ধ ক্ষুধার্ত মৃত-আত্মা শোধ নেয় বিগত অন্যায়ের—বিদগ্ধ পন্ডিত, জমজমাট শহর, সুন্দরী নারী, কোনকিছুই তার হাত থেকে রেহাই পায় না।

কিংকঙ, অদৃশ্য মানুষ, ড্রাকুলা, ফ্রাংকেস্টাইন—ফ্যাশনের নিয়মে আজ পুরনো হয়ে গেছে। এসেছে গ্রহান্তরের জীব, যেমন দেখতে কদাকার, তেমনি অসীম ক্ষমতাশালী, ভয় ধরিয়ে দিয়েছে সরল জনচিত্তে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সেই বেতার-নাটকের কথা অনেকেই নিশ্চয় জানেন, যা শুনে নিউইয়র্কের ভীত ত্রস্ত মানুষ ঘর ছেড়ে দলে দলে পালিয়েছিল!

সম্প্রতি মহাকাশজয়ের পটভূমিকায়, স্পাই ফিল্ম-ও গ্রহান্তরের প্রাণীও অন্যতম প্রধান চরিত্র। সেই সংগে, ভয়ধরানো টরচার-চেম্বার; যেমন, মিকি স্পিলানস্ অবলম্বনে 'কিস্ মী ডেড্‌লি'-তে। ইদানীং স্ট্রীপ্ কার্টুন থেকেও ভয়ংকর সব ছবি হচ্ছে : 'মডেস্টি ব্লেজ, বারবারেল্লা, ম্যাসাকার, লেডী ভ্যামপায়ার, অ্যাডভেঞ্চার অফ জোদেল্লে' ইত্যাদি। আদিম কৃত্যানুষ্ঠান, সায়েনস্ ফিকশান, প্রগল্ভ নাচ-গান, নগ্নতা, বিকৃত যৌনাচার—সব মিশিয়ে ভয়ানক বীভৎস রসের, ফরাসী ককটেলের বেহুদা পরিবেশন। গোদারের 'আল্‌ফাভিল'-এও এইসব উপকরণ অল্পবিস্তর আছে; কিন্তু সে-ছবির ভিন ঘরানা, রস অন্যতর।

ইংলন্ডবাসী পোলিশ পরিচালক রোমান পোলান্‌স্কীর 'দ্য ভ্যাম্পায়ার কিলার্স' আসলে ভ্যাম্পায়ার-থীমের প্যারডি। অধ্যাপক অ্যাব্রনসিয়াস ও তস্য সহকারী আলফ্রেড এসেছেন ট্রানসিলভানিয়ার এক গ্রামে রক্তচোষা ভ্যামপায়ারের সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে একটা সরাইখানায়। দেখেন : সরাইওলার মেয়ে সারা আর তার সংগে বিকটদর্শন একটা লোক; লোকটা সবেমাত্র সারার গলায় ফুটো থেকে রক্তাক্ত দাঁতটা খুলে নিচ্ছে! একটু পরে সারা চলে যায়। খুঁজতে খুঁজতে দুজনে হাজির এক বাড়িতে—সেই বিকটদর্শন লোক অর্থাৎ ভ্যামপায়ারদের কলোনী! আলফ্রেড সারার সংগে ভাব করে, রক্তচোষাদের কাছাকাছি আসে। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

যেহেতু, জীবনে ও মানসে ইত্যাকার বাসনা বাসা বেঁধে তো রয়েছেই। কোথাও প্রকাশ্য, কোথাও অবদমিত। মানুষের মধ্যেকার এই পশুত্বকে ন' মিনিটের একটি ছোট ছবির মাধ্যমে আশ্চর্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন জাপানী পরিচালক য়োজি কুরি। গত নভেম্বরেই দেখলাম 'আওস' : একটা বিদ্‌ঘুটে দেখতে যন্ত্র, তার মধ্যে পিষে চোলাই ধোলাই হচ্ছে মানব-মানবী, হাত-পা-ব্রেন-হৃৎপিন্ড, বিচিত্র রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে, আবার ঢুকছে; সমস্ত শরীরটাই যৌনাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে অথবা শুধু মাথা বা পেট! কান্না, চিৎকার, গোঙানি—জন্মের যন্ত্রণা, মৃত্যুর যন্ত্রণা, সংগমের যন্ত্রণা।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

১৯৬৮ সালের অলিম্পিক সটপুটে স্বর্ণপদক বিজয়ী আমেরিকার র‍্যান্ডি ম্যাটসন

খেলার কথা

খেলাধুলায় শক্তির পরিচয়

ক্ষেত্রনাথ রায়

মানুষের এমন একটা সময় গেছে, যখন এক জায়গার মালপত্র অন্যত্র নিয়ে যেতে নিজেদেরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়েছে। এ কাজে মানুষ ছাড়া অপর কারও সাহায্য পাওয়ার উপায় ছিল না। মানুষ তার মাথা, কাঁধ, পিঠ, কোমর, পা এবং হাত দিয়ে বোঝা বয়েছে। এক-কথায় মানুষ তার নিজের বোঝার নিজেই বাহক ছিল। দৈহিক ক্লেশ এবং খাটুনি লাঘবের উদ্দেশ্যে মানুষ শেষ পর্যন্ত শান্ত প্রকৃতির জীব-জন্তুদের গড়ে-পিটে তাদের ভারী বোঝার বাহক করে নিয়েছে। আজ বিজ্ঞানের দৌলতে বিরাট আকারের ভারী মালপত্র অতিসহজে দূর-দূরান্তরে স্থানান্তরিত করা সম্ভব। তবুও একাজে মানুষ এবং জীবজন্তুর প্রয়োজন একেবারে ফুরিয়ে যায় নি। যন্ত্রশক্তির কাছে মানুষের দৈহিক শক্তি আজ নিষ্প্রভ হলেও অবস্থা-বিশেষে দৈহিক শক্তির ডাক পড়বেই।

এই দৈহিক শক্তিই মানুষের রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন, কাজকর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং কায়িক ও মানসিক সুখ-শান্তির প্রধান উৎস। আবার খেলাধুলাই এই দৈহিক শক্তি সঞ্চয়ের প্রধান অবলম্বন। আন্তর্জাতিক খেলাধুলার আসরে মানুষের দৈহিক শক্তির পরিচয় কি? এখানে ভারো-ত্তোলন, হ্যামার, ডিসকাস এবং সটপুট—খেলাধুলার এই চারটি অনুষ্ঠান বেছে নিয়ে মানুষের দৈহিক শক্তির পরিচয় দেওয়া হল।

ভারোত্তোলনের হেভীওয়েট বিভাগের ওপরই সকলের দৃষ্টি বেশী। যাঁদের দেহের ওজন ৯০ কিলোর বেশী তাঁরা হেভী-ওয়েট বিভাগে পড়েন। অলিম্পিকের হেভী-ওয়েট বিভাগে এ পর্যন্ত স্বর্ণপদক পেয়ে এই ৮টি দেশ—আমেরিকা ৩টি (উপর্যুপরি), রাশিয়া ৩টি (উপর্যুপরি), ইতা ২টি এবং একটি করে স্বর্ণপদক পে ডেনমার্ক, গ্রীস, জার্মানী, চেকোশ্লোভাকি এবং অস্ট্রিয়া। অলিম্পিকে উপর্যু দুবার স্বর্ণপদক পেয়েছেন আমেরিকার ডেভিস (১৯৪৮ ও ১৯৫২) এবং রাশি লিওনিদ ঝাবোতিনস্কি (১৯৬৪ ১৯৬৮)। অলিম্পিকের হেভীওয়েট বি ১০০০ পাউন্ড ওজনের বেড়া অতিক্রম করেন আমেরিকার জন ডেভি তিনি ১৯৫২ সালে ১,০১৪ পাউন্ড ও তুলে স্বর্ণপদক বিজয়ী হন এবং সেই নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেন। ১৯ সালে রাশিয়ার য়ুরি ভ্লাসফ ১,১ পাউন্ড ওজন তুলে ডেভি অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙে দেন। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পি ভ্লাসফ মোট ৫৭০ কে জি তুলে রৌ পদক পান। আর স্বর্ণপদক জয়ী রাশিয়ারই লিওনিদ ঝাবোতিনস্কি। স্বর্ণপদক জয় নয়, ঝাবোতিনস্কি ৫৭২·৫ কে জি ওজন তুলে নতুন অলিম্প এবং বিশ্বরেকর্ড করেন। ১৯৬৮ সা মেকসিকো অলিম্পিকে ঝাবোতিনস্কি ৫৯০ কে জি ওজন তুলে স্বর্ণপদক পেয়ে এবং সেই সঙ্গে যে নতুন অলিম্পিক বিশ্বরেকর্ড করেন তা আজও অক্ষ আছে। এই দিক থেকে বর্তমান বি ঝাবোতিনস্কি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুরু তাঁকে মনুষ্যজগতে হিমালয় পর্বত ব চলে—দেহের উচ্চতা ৬ ফিট ২ ইঞ্চি ওজ ১৫০ কে জি, বুকের ছাতি ৫৫ ইঞ্চি

আলফ্রেড ওর্টার (আমেরিকা)—অলিম্পিকের সটপুটে উপর্যুপরি চারবারের স্বর্ণপদক বিজয়ী

পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি ২০ বার বিশ্ব-রেকর্ড ভেঙেছেন; এর মধ্যে স্ন্যাচ পর্যায়ে ১০টি। ঝাবোতিনস্কির বর্তমান বয়স ৩০। তিনি তাঁর মাত্র চোদ্দ বছর বয়সেই আধ টন ওজনের একটা ষাঁড়কে দূরে নিক্ষেপ করে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞান যেভাবে মানুষের দৈহিক শক্তি-বৃদ্ধির দিকে নজর দিয়েছে তাতে ঝাবো-তিনস্কির দৃঢ়ধারণা, অদূরভবিষ্যতে মানুষের পক্ষে ভারোত্তোলনের হেভীওয়েট বিভাগে মোট ৭০০ কে জি ওজন উত্তোলন করা অসম্ভব হবে না।

এবার ভারী জিনিস নিক্ষেপে মানুষ কি পরিমাণ দৈহিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে তার আলোচনায় আসা যাক। অলিম্পিকের হাতুড়ি (হ্যামার) নিক্ষেপে আমেরিকা সর্বাধিক ৭ বার স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। উপর্যুপরি তিনবার স্বর্ণপদক পেয়েছেন একমাত্র আমেরিকার জন ফ্ল্যানাগ্যান (১৯০০, ১৯০৪ ও ১৯০৮)। হাতুড়ি নিক্ষেপে ২০০ ফিট দূরত্ব প্রথম অতিক্রম করেন আমেরিকার হ্যারোল্ড কনোলী; তিনি ১৯৫৬ সালে ২০৭ ফিট ৩½ ইঞ্চি দূরত্বে হাতুড়ি নিক্ষেপ করে স্বর্ণপদক জয়ী হন এবং সেই সঙ্গে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেন। এ বিষয়ে তাঁর বিশ্বরেকর্ড ছিল ২২৫ ফিট ৪ ইঞ্চি। হাঙ্গেরীর জিভোতস্কি বর্তমানে হাতুড়ি নিক্ষেপে

সটপুটের লোহগোলক—ওজন ১৬ পাউণ্ড

হ্যামারের লোহগোলক—ওজন ১৬ পাউণ্ড

ভারোত্তোলনের হেভীওয়েট বিভাগে অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) এবং অলিম্পিক ও বিশ্বরেকর্ডধারী লিওনিদ ঝাবোতিনস্কি।

অলিম্পিক এবং বিশ্বরেকর্ডধারী। তাঁর অলিম্পিক রেকর্ড ২৪০ ফিট ৮ ইঞ্চি (১৪-৯-৬৮)। হাতুড়ির ওজন ১৬ পাউণ্ড (৭·২৫৭ কে জি)।

অলিম্পিকের সটপুটে আমেরিকার পুরুষ এ্যাথলীটরা বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ১৬ বারের অলিম্পিক আসরে আমেরিকা মোট ১৪ বার স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। গত ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক সটপুটে স্বর্ণপদক জয়ী হন আমেরিকার র‍্যাণ্ডি ম্যাটসন। বাছাই পর্বে তিনি ৬৭ ফিট ১০¼ ইঞ্চি দূরত্বে লোহার বল নিক্ষেপ করে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেন। সটপুটে তাঁর অলিম্পিক এবং বিশ্বরেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। সটপুটে লোহার বলের ওজন ১৬ পাউণ্ড (৭·২৫৭ কিলো-গ্রাম)।

অলিম্পিক ডিসকাস নিক্ষেপে আমেরিকা সর্বাধিক ১২ বার স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে। বাকী চারটি স্বর্ণপদক পেয়েছে ৩টি দেশ—ফিনল্যাণ্ড ২, হাঙ্গেরী ১ এবং ইতালী ১। আমেরিকার আলফ্রেড ওর্টার উপর্যুপরি চারবার (১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮) অলিম্পিক সটপুটে স্বর্ণপদক জয়ী হয়ে এ্যাথলেটিকস বিভাগে অভূত-পূর্ব নজির সৃষ্টি করেছেন। এ্যাথলেটিক-সের অপর কোন বিষয়ে একই ব্যক্তির পক্ষে উপর্যুপরি চারবার, এমন কি মোট চারবার স্বর্ণপদক জয়ের নজির নেই।

ডিসকাস নিক্ষেপে আমেরিকার আলফ্রেড ওর্টার ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে অলিম্পিক রেকর্ড (২১২ ফিট ৬½ ইঞ্চি) করেছেন এবং আমেরিকার এল সিলভেস্টার ১৯৬৮ সালের ২৫শে মে বিশ্বরেকর্ড (২১৮ ফিট ৩ ইঞ্চি) করেন। চাকতির ওজন ৪ পাউণ্ড ৬ আউন্স (২ কিলোগ্রাম)।

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের ১৯৬৯ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলায় মোহনবাগানের লেফ্‌ট আউট প্রণব গাঙ্গুলী হেড দিয়ে তাঁর দ্বিতীয় তথা দলের তৃতীয় গোল দিয়েছেন। খেলায় মোহনবাগান ৩—১ গোলে জয়ী হয়।

খেলাধুলা

দর্শক
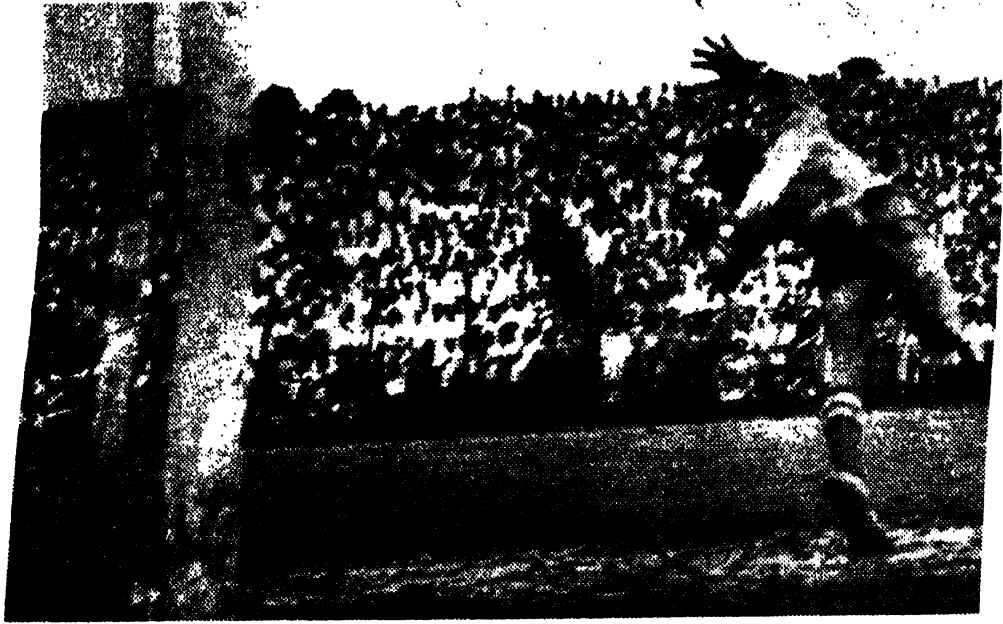
আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল

১৯৬৯ সালের প্রখ্যাত আই এফ এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মোহনবাগান ৩-১ গোলে তাদের পুরাতন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে ৯ বার আই এফ এ শীল্ড জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এই নিয়ে মোহনবাগানের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে ১৯ বার খেলা হল। তাদের এই ১৯ বারের ফাইনাল খেলার ফলাফল দাঁড়িয়েছে : সরাসরি জয় ৮ বার, যুগ্ম জয় একবার (১৯৬১ সালে) এবং পরাজয় ৭ বার। বাকী ৩ বারের ফাইনাল খেলার ফলাফল : ড্র যাওয়ার পর তিনবার খেলা পরিত্যক্ত। একবার (১৯৫৯ সালে) খেলার আসরই বসে নি। অপর দিকে ইস্টবেঙ্গল দলের বিগত ১৬টি আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলার ফলাফল : সরাসরি জয় ৮ বার, যুগ্মজয় একবার (১৯৬১), পরাজয় ৫ বার। তাদের বাকী ২টি ফাইনাল খেলার ফলাফল : ড্র যাওয়ার ফলে দুটি খেলা পরিত্যক্ত। একবার (১৯৫৯ সালে) ফাইনাল খেলাই হয় নি।

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে এ নিয়ে যে ১০ বার আই এফ এ শীল্ড খেলা হল তার ফলাফল : ইস্টবেঙ্গলের জয় ৫ বার, মোহনবাগানের জয় ২ বার, ড্র যাওয়ার পর খেলা পরিত্যক্ত ২ বার এবং যুগ্ম-বিজয়ী একবার (১৯৬১ সালে)।

১৯৬৯ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা উপলক্ষ্য করে সারা দেশের ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে উত্তেজনা এবং উদ্বেগ তুঙ্গে উঠেছিল। মোহনবাগান এ বছরে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং ইস্টবেঙ্গল অপরাজিত অবস্থায় রানার্স-আপ হয়েছিল। লীগের দুটো খেলার মধ্যে মোহনবাগান একটা খেলায় ইস্টবেঙ্গল দলের কাছে ০-১ গোলে হেরে-ছিল এবং এই দুই দলের লীগের দ্বিতীয় খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র ছিল। সুতরাং শক্তির দিক থেকে দুই দলকে উনিশ-বিশ বলা যায়।

ফাইনাল খেলার দিন বৃষ্টি হওয়াতে মাঠের অবস্থা উন্নত খেলার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবু মোহনবাগান মাঠের এই অবস্থাটা ঠিক মানিয়ে নিয়ে ইস্টবেঙ্গল দলকে পর্যুদস্ত করেছিল। প্রথমার্ধের খেলায় মোহনবাগান ৩—০ গোলে অগ্রগামী হয়। প্রথমার্ধের খেলার ১৫ মিনিটে প্রথম ২৭ মিনিটে দ্বিতীয় এবং ৩২ মিনিটের মাথায় তৃতীয় গোল হয়। মোহনবাগানের পক্ষে লেফট আউট প্রণব গাঙ্গুলী প্রথম ও তৃতীয় গোল দেন। সুকল্যাণ ঘোষ-দস্তিদার দিয়েছিলেন দ্বিতীয় গোল। খেলা ভাঙার পাঁচ মিনিট আগে ইস্টবেঙ্গল দলের কানন একটা গোল শোধ করেন। এখানে উল্লেখ্য, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত আই এফ এ শীল্ডের ফাইনাল খেলায় এক পক্ষের তিনটি গোল দেওয়ার নজির এই প্রথম। অনেকের ধারণা ইস্টবেঙ্গল দলের এই শোচনীয় পরাজয়ের প্রধান কারণ [illegible] ক্রীড়াপদ্ধতির [illegible] রাজের ত্রুটিপূর্ণ খেলা এবং স্নায়বিক দুর্বলতা। এককথায় ইস্টবেঙ্গল দল তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারে নি।

মোহনবাগানের 'ডাবল খেতাব'

১৯৬৯ সালে ফুটবল লীগ ও আই এফ এ শীল্ড জয়ের সূত্রে মোহনবাগান এই নিয়ে পাঁচবার ফুটবল খেলায় 'ডাবল' সম্মান পেল (অর্থাৎ একই বছরে লীগ চ্যাম্পিয়ান ও আই এফ এ শীল্ড জয় ১। ১৯৬৯ সালটি মোহনবাগানের ইতিহাসে তথা বাংলা দেশের খেলাধুলোর আসরে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এই কারণে যে, ১৯৬৯ সালে মোহনবাগান 'ডাবল' খেতাব জয়ী হয়েছে ক্রিকেট, হকি এবং ফুটবল খেলায়, যা অপর কোন দলের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

শীল্ড জয়ের পথে

১৯৬৯ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ৬-১ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ৪-০ গোলে রাজস্থান, ৫-২ গোলে মহমেডান স্পোর্টিং এবং ফাইনালে ৩-১ গোলে ইস্টবেঙ্গল দলকে পরাজিত করে।

খেলোয়াড়বৃন্দ

মোহনবাগান : বলাই দে; ভবানী রায়, কল্যাণ সাহা, চন্দ্রশেখর প্রসাদ এবং আলতাফ; নঈম এবং প্রিয়লাল মজুমদার; সীতেশ দাশ, সুকল্যাণ ঘোষ-দস্তিদার, হাবিব এবং প্রণব গাঙ্গুলী।

ইস্টবেঙ্গল : থঙ্গরাজ; সুধীর কর্মকার, প্রশান্ত সিংহ, এম জন এবং শান্ত মিত্র; কানন গুহ এবং কাজল মুখার্জি; সুভাষ ভৌমিক, অশোক চ্যাটার্জি (অধিনায়ক), [illegible] দে এবং [illegible]

মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল

৪৫	ইস্টবেঙ্গল	১ :	মোহনবাগান	০
৪৭	মোহনবাগান	১ :	ইস্টবেঙ্গল	০
৪৯	ইস্টবেঙ্গল	২ :	মোহনবাগান	০
৫১	ইস্টবেঙ্গল	০, ২ :	মোহনবাগান	০, ০
৫৮	ইস্টবেঙ্গল	১ :	মোহনবাগান	০
৬১	মোহনবাগান	০ :	ইস্টবেঙ্গল	০
৬৪	মোহনবাগান	১ :	ইস্টবেঙ্গল	১
৬৫	ইস্টবেঙ্গল	০, ১ :	মোহনবাগান	০, ০
৬৭	মোহনবাগান	০ :	ইস্টবেঙ্গল	০
৬৯	মোহনবাগান	৩ :	ইস্টবেঙ্গল	১

আই এফ এ শীল্ডে জয়-পরাজয়

হনবাগান (ফাইনাল ১৯ বার) : জয় (৯ বার) : ১৯১১, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬০, ১৯৬১ (যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৬২ ও ১৯৬৯।

ার্স-আপ (৭ বার) : ১৯২৩, ১৯৪০, ১৯৪৫, ১৯৪৯, ১৯৫১, ১৯৫৮, ১৯৬৫।

লা পরিত্যক্ত (৩ বার) : ১৯৫২ (রাজস্থানের সঙ্গে), এবং ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালে।

ালকাটা এফ-সি (ফাইনাল ১৭ বার) : জয় (৯ বার) : ১৮৯৬, ১৯০০, ১৯০৩, ১৯০৪, ১৯০৬, ১৯১৫, ১৯২২—২৪।

নার্স-আপ (৮ বার) : ১৯০৫, ১৯০৭, ১৯১০, ১৯১৪, ১৯১৬, ১৯১৯ ১৯২৭ ও ১৯৩৬।

স্টবেগল (ফাইনাল ১৬ বার) : জয় (৯ বার) : ১৯৪৩, ১৯৪৫, ১৯৪৯—৫১, ১৯৫৮, ১৯৬১ (যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৬৫-৬৬।

নার্স-আপ (৫ বার) : ১৯৫২, ১৯৪৪, ১৯৪৭, ১৯৫৩, ১৯৬৯।

লা পরিত্যক্ত (২ বার) ১৯৬৪ ও ১৯৬৭ সালে (বিপক্ষে মোহনবাগান)।

লহৌসী (ফাইনাল ৬ বার) : জয় (২ বার) : ১৮৯৭ ও ১৯০৫।

নার্স-আপ (৪ বার) : ১৯০০, ১৯০২, ১৯২২ ও ১৯২৮।

মেডান স্পোর্টিং (ফাইনাল ৬ বার) : জয় (৪ বার) : ১৯৩৬, ১৯৪১, ১৯৪২ ও ১৯৫৭।

নার্স-আপ (২ বার) : ১৯৩৮ ও ১৯৬৩।

য়াল আইরিশ রাইফেলস (ফাইনাল ৫ বার) : জয় (৫ বার) : ১৮৯৩-৯৪, ১৯০১, ১৯১২-১৩।

র্ডন হাইল্যাণ্ডার্স (ফাইনাল ৩ বার) : জয় (৩ বার) : ১৯০৮—১০।

রউড ফরেস্টার্স (ফাইনাল ৩ বার) : জয় (৩ বার) : ১৯২৬—২৮।

রয়াল (ফাইনাল ৩ বার) : জয় (১ বার) : ১৯৪০।

নার্স-আপ (২ বার) : ১৯৫৫-৫৬।

শীল্ড ফাইনালে উপর্যুপরি পাঁচবার

ালকাটা এফ-সি (১৯০৩—৭) : জয় (৩ বার) : ১৯০৩-৪ ও ১৯০৬।

নার্স-আপ (২ বার) : ১৯০৫ ও ১৯০৬।

ইস্টবেঙ্গল (১৯৪২—৪৭) : জয় (২ বার) : ১৯৪৩ ও ১৯৪৫।

রানার্স-আপ (৩ বার) : ১৯৪২, ১৯৪৪ ও ১৯৪৭।

দ্রষ্টব্য : ১৯৪৬ সালে প্রতিযোগিতা স্থগিত ছিল।

মোহনবাগান (১৯৫৮—৬২) : জয় (৩ বার) : ১৯৬০—৬২।

রানার্স-আপ (একবার) : ১৯৫৮।

খেলা পরিত্যক্ত : ১৯৫৯।

উপর্যুপরি ৩ বার শীল্ড জয়

(১)	গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স	(১৯০৮—১০)
(২)	ক্যালকাটা এফ সি	(১৯২২—২৪)
(৩)	শেরউড ফরেস্টার্স	(১৯২৬—২৮)
(৪)	ইস্টবেঙ্গল	(১৯৪৯—৫১)
(৫)	মোহনবাগান	(১৯৬০—৬২)

দ্রষ্টব্য : ১৯৬১ সালে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল যুগ্ম-বিজয়ী।

ডেভিস কাপ

আমেরিকার ক্লিভল্যাণ্ডে আয়োজিত ১৯৬৯ সালের আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপ লন টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড অর্থাৎ ফাইনালে আমেরিকা ৫-০ খেলায় রুমানিয়াকে পরাজিত করে ২১ বার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করেছে।

এখানে উল্লেখ্য, ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৭০ বছরের ইতিহাসে (১৯০০—৬৯) মাত্র এই চারটি দেশ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে : অস্ট্রেলিয়া ২২ বার, আমেরিকা ২১ বার, গ্রেটবৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। ১৯৬৯ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া যে খেলে নি তা প্রতিযোগিতার ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। কারণ ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত (মাঝে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ৬ বছর খেলা বন্ধ ছিল) অস্ট্রেলিয়া একনাগাড়ে ২৫ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে ১৬ বার ডেভিস কাপ জয়ী হয়েছে। এই সময়ে আমেরিকা বাকী ৯ বার ডেভিস কাপ পেয়েছে।

১৯৬৯ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড

প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলস খেলায় আমেরিকা জয়ী হয়ে ২-০ খেলায় অগ্রগামী হয়। নিগ্রো খেলোয়াড় আর্থার এ্যাস ৬-২, ১৫-১৩ ও ৭-৫ গেমে নাস্তাসেকে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে স্ট্যান স্মিথ ৬-৮, ৬-৩, ৫-৭, ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে টিরিয়াককে (রুমানিয়া) পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের ডাবলসে আমেরিকার বব লুৎজ এবং স্ট্যান স্মিথ ৮-৬, ৬-১ ও ১১—৯ গেমে টিরিয়াক এবং নাস্তাসেকে (রুমানিয়া) পরাজিত করে স্বদেশকে জয়যুক্ত করেন।

তৃতীয় দিনের প্রথম সিঙ্গলসে স্ট্যান স্মিথ তিন ঘন্টা খেলে ৪-৬, ৪-৬, ৬-৪, ৬-১ ও ১১-৯ গেমে ইলি নাস্তাসেকে পরাজিত করেন। শেষ সিঙ্গলস খেলাটি অসমাপ্ত থেকে যায়, কারণ রুমানিয়ার টিরিয়াক খেলা শেষ হওয়ার আগেই কোর্ট ত্যাগ করে যান। এই সময় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকার আর্থার এ্যাস ৬-৩, ৮-৬, ৩-৬ ও ৪-০ গেমে অগ্রগামী থাকায় বিজয়ী হন।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড সংক্ষিপ্ত ফলাফল (১৯০০—৬৯)

	মোট খেলা	জয়	পরাজয়
অস্ট্রেলিয়া	৩৭	২২	১৫
আমেরিকা	৪৫	২১	২৪
গ্রেটবৃটেন	১৬	৯	৭
ফ্রান্স	৯	৬	৩
ইতালী	২	০	২
স্পেন	২	০	২
বেলজিয়াম	১	০	১
জাপান	১	০	১
মেক্সিকো	১	০	১
ভারতবর্ষ	১	০	১
রুমানিয়া	১	০	১

দাবার আসর

ঘোড়া : আগের একটি সংখ্যায় ঘোড়ার গতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এই সংখ্যায় ঘোড়ার গতি চিত্র সহকারে বুঝিয়ে দেওয়া হোল।

ঘোড়ার গতি দুভাবে বর্ণনা করতে পারা যায়। বলতে পারা যায় যে, ঘোড়া যে ঘরে রয়েছে সেখান থেকে সামনে পিছনে বা পাশাপাশি দু-ঘর গিয়ে নতুন জায়গা থেকে পুনরায় ১ ঘর পাশাপাশি যাবে। অথবা বলতে পারা যায় যে যে ঘরে ঘোড়া রয়েছে সেখান থেকে সামনে পিছনে বা পাশাপাশি ১ ঘর গিয়ে নতুন ঘর থেকে আবার কোনাকুনি ১ ঘর যাবে (যে ঘর ঘোড়া ছেড়ে আসছে তার থেকে দূরের দিকে।)। ১ নং চিত্র দেখুন।

ঘোড়াই দাবার একমাত্র ঘুঁটি যে স্বপক্ষের বা বিপক্ষের ঘুঁটির ওপর দিয়ে লাফিয়ে চলতে পারে। ঘোড়া যে ঘরে গিয়ে বসবে সে ঘরে বিপক্ষের ঘুঁটি থাকলে তা মারা যাবে।

ক্যাসলিং : ক্যাসলিং রাজা এবং নৌকার একটি মিলিত চাল। দাবাখেলায় সবসময়ই একবারে একটি ঘুঁটি চালার নিয়ম, কিন্তু ক্যাসলিং হচ্ছে এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। এবং ক্যাসলিংয়ের সময় রাজা আর নৌকা পরস্পরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যায়। এই লাফানোটাও রাজা ও নৌকার পক্ষে ব্যতিক্রম। রাজাকে সহজে দুর্গবন্ধ করার জন্যে এবং নৌকাকে দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে আনবার জন্যে ক্যাসলিং প্রথার উদ্ভব।

১ নং চিত্র
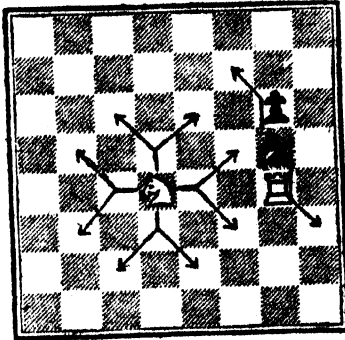
ঘোড়া ১ ঘর পাশাপাশি বা ওপরে নীচে গিয়ে আবার কোনাকুনি ১ ঘর যায়। সুতরাং যে ঘরে ঘোড়া বসেছে, সেখান থেকে তীরচিহ্ন রয়েছে, একমাত্র সেই ঘরগুলিতেই ঘোড়া যেতে পারবে। ঘোড়া যে ঘুঁটি ডিঙিয়ে যেতে পারে, তা পাশে দেখান হোল।

ক্যাসলিং দুদিকে হতে পারে—রাজার দিকে অথবা মন্ত্রীর দিকে। রাজার দিকে ক্যাসলিং করলে সাদা রাজাকে তার নিজের ঘর থেকে দু'ঘর ডানদিকে সরিয়ে বসাতে হবে এবং নৌকাকে (রাজার দিকের) আনতে হবে দু ঘর বাঁ দিকে। নৌকা রাজাকে ডিঙিয়ে আসবে। কালোর দিক থেকে কালো রাজাকে সরাতে হবে দু'ঘর বাঁ দিকে এবং নৌকা আসবে দু'ঘর ডানদিকে।

মন্ত্রীর দিকে ক্যাসল করলে সাদা রাজা নিজের ঘর থেকে দু'ঘর বাঁ দিকে সরে যাবে এবং মন্ত্রীর দিকের সাদা নৌকা সরে আসবে ডান দিকে তিন ঘর। সেই রকম কালোর দিক থেকে কালো রাজা ডান দিকে সরে যাবে দু'ঘর এবং মন্ত্রীর দিকের নৌকাটি বাঁ দিকে তিন ঘর সরে আসবে।

২ নং চিত্র
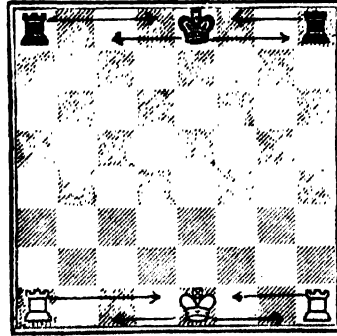
ক্যাসলিংয়ের সময় রাজা এবং নৌকা যে ঘরে যায়, তা তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে।

ক্যাসলিং করার সময় সবসময়ই প্রথমে রাজাকে আগে নড়াতে হবে, তারপরে নৌকার চাল হবে। অর্থাৎ আগে নৌকাকে দু'ঘর সরিয়ে পরে রাজাকেও দু'ঘর সরালেন —এইভাবে ক্যাসল করতে পারবেন না। সব সময় মনে রাখবেন যে ক্যাসলিংয়ে দুটো ঘুঁটি একত্রে চালা হলেও চালটাকে রাজার চাল হিসেবেই ধরতে হবে এবং ক্যাসলিং করার ইচ্ছে হলে প্রথমে রাজার দু'ঘর চাল দিয়েই ক্যাসলিং করতে হবে। অন্য কোন ভাবে ক্যাসলিং করা যাবে না। এ সম্বন্ধে বিশ্ব দাবা সংস্থা কর্তৃক প্রণীত আইন অত্যন্ত পরিষ্কার।

কিন্তু ক্যাসলিং করার কতগুলি শর্ত আছে। প্রথমত, যে চালে কিস্তি পড়েছে সেই চালে ক্যাসল করা যাবে না। কিস্তি সামলে নেওয়ার পরে আপনি ক্যাসল করতে পারেন কিন্তু নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানা চাই:—(ক) ক্যাসলিংয়ের আগে রাজা একবারও না নড়ে থাকা চাই, যে নৌকার

৩ নং চিত্র
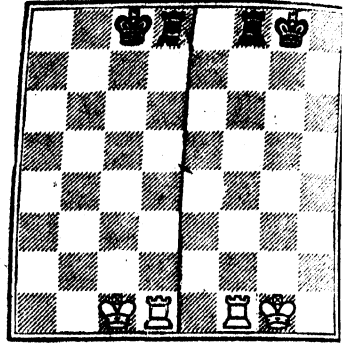
মন্ত্রীর দিকে ক্যাসল করার পরের অবস্থা রাজার দিকে ক্যাস[ল] করার পরের অব[স্থা]

সঙ্গে ক্যাসল করছেন সেই নৌকা একবা[র] না নড়া চাই। (খ) রাজা বিপক্ষের আ[ক্রম]... আছে এমন কোন ঘর অতিক্রম করে যে[তে] পারবে না। (গ) যে ঘরে গিয়ে রাজা বস[বে] সেই ঘরে বিপক্ষের কোন ঘুঁটির আক্র[মণ] না থাকা চাই। (ঘ) রাজা এবং যে নৌকা সঙ্গে ক্যাসল হচ্ছে, সেই নৌকার মধ্যবর্তী ঘরগুলিতে স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কো[ন] ঘুঁটির অবস্থান না থাকা চাই। ২নং এ[বং] ৩নং চিত্র দেখুন।

* * *

গত ২০শে জুলাই থেকে কলকাত[া] নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউটে যে দা[বা] প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছিল, তা সম্প্র[তি] শেষ হয়ে গেল। ক্রম অনুসারে প্রথম ১০ স্থানাধিকারী খেলোয়াড়ের নাম দেও[য়া] হোল :—(১) শ্রীকরুণা ভট্টাচার্য, (২) অসিত মৈত্র, (৩) স্বপন দাশ, (৪) বীরে[ন] বোস, (৫) শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, (৬) নরে[ন] মাঝি, (৭) ব্রজেশ্বর মুখার্জি, (৮) নীহ[ার] ব্যানার্জি, (৯) সরসী কুন্ডু, এবং (১০) বিশ্বনাথ দত্ত।

প্রতিযোগিতা ভালভাবেই পরিচালি[ত] হয়েছে, কিন্তু কর্তৃপক্ষ মুলতুবী খেল[ার] তারিখ স্থির করা নিয়ে খেলোয়াড়দে[র] অহেতুক স্বাধীনতা দিয়েছেন, যার ফ[লে] পরবর্তী রাউন্ড সুরু হবার আগে পূ[র্ব]বর্তী রাউন্ডের সমস্ত খেলা শেষ করা য[ায়] নি (যা সুইস সিস্টেমের পক্ষে অত্যাবশ্যক) ফলে বিশেষ করে শেষের দিকে অনে[ক] খেলোয়াড় কর্তৃপক্ষের উদারতার সুযো[গ] নিয়ে খেলার ফলাফল গড়াপেটা করার অনা... সুযোগ নিয়েছেন। আমরা আশা ক[রি] রাজ্য চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় এইর[ূপ] শৈথিল্য দেখা যাবে না এবং কর্তৃপক্ষ খেলোয়াড়দের যদৃচ্ছ স্বাধীনতা দেবেন [না] কারণ আমরা বার বার দেখেছি খেলোয়াড়[রা] স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ২২.০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০.০০	টাকা ১১.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫.০০	টাকা ৫.৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৯ম বর্ষ · **অমৃত** · ২২শ সংখ্যা

২য় খণ্ড · মূল্য ৪০ পয়সা

Friday, 3rd October, 1969 শুক্রবার, ১৬ই আশ্বিন, ১৩৭৬ **40 Paise**

সূচীপত্র

গান্ধী প্রসঙ্গে

আপনাদের চিঠিপত্র বিভাগে প্রায়ই 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক লেখা সম্বন্ধে পাঠকের মতামত প্রকাশ হতে দেখি। কিন্তু শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের 'গান্ধী' নামক এমন একটি উৎকৃষ্ট রচনা সম্বন্ধে খুব বেশি আলোচনা আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। এটা বড়ই দুঃখের। চিন্তাশীল লেখা সম্বন্ধে আমাদের দেশে পাঠকের আগ্রহ বড় কম মনে হয়। গান্ধীর নাম আজ আমাদের কাছে অতিপরিচিত। কাজেই বর্তমানে আমাদের দেশের লোকের কাছে ও-নামের আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও আলোড়নের মোহ থিতিয়ে গেছে। কারণ, গান্ধীকে আমরা বড় কাছ থেকে দেখেছি। কিন্তু অন্নদাবাবু গান্ধী-জীবনী নিয়ে যেমন 'বাক্যং রসাত্মং কাব্যং' করছেন, এটা তাঁর মত পাকা শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। কোথায়ও গান্ধী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইতিহাসের ভিতর ঢুকে পড়েছেন, কোথায়ও অতীত রোমন্থন করতে গিয়ে সাময়িক রোমান্টিক চিত্রকে ইতিহাস-ধর্মী করে তুলেছেন, আবার কোথায়ও হিউমার করতে গিয়ে জীবনের উপর নতুন আলোকসম্পাত করেছেন। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জীবন-চরিত সেখানে বাহুল্য হয়ে গেছে। তিনি যুক্তি দিয়ে তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে দেশের পক্ষে গান্ধীর নেতৃত্ব ও জীবনের সামগ্রিক রূপ আলোক-দীপ্ত, উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছোট ছোট সরল বাক্য রচনায়। অন্নদাশঙ্করের বাংলা ভাষা বাইবেলী ইংরেজীর মত সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। সহজ সুরে সহজ কথা বলেন বটে, কিন্তু গভীর অর্থজ্ঞাপক। রসজ্ঞ পাঠক তাঁর লেখার একটি বাক্যাংশ নিয়ে দূর হতে দূরে চলে যান অনেক গভীরে। জানি, দীর্ঘকাল বাংলা-সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত অন্নদাশঙ্কর সামান্য পাঠকের প্রশস্তির অপেক্ষা রাখেন না। তবু গান্ধী-জীবনী নিয়মিত 'অমৃত' পত্রিকায় পড়ে ভাল লাগছে একথা জানিয়ে মানসিক তৃপ্তিবোধ করছি। কামনা করি তিনি আরও দীর্ঘদিন বাংলা-সাহিত্যের সেবা করুন।

শিশির সেন
কলিকাতা—৯।

মানুষ গড়ার ইতিকথা

নিত্য নতুনের স্বাদ পরিবেশন করে সাপ্তাহিক 'অমৃত' যেভাবে আমাদের মত সাধারণ মানুষের মন কেড়ে নিচ্ছে দিনের পর দিন, তার জন্যে 'অমৃত'কে শুভেচ্ছা জানাই। 'অমৃত' যেন প্রতিদিনই এই বিশাল পৃথিবীর অনন্ত কৌতূহলের অদম্য জিজ্ঞাসার উত্তর পরিবেশন করে আমাদের প্রাণের বন্ধু হয়ে থাকে। সপ্তাহান্তে অমৃত হাতে এলেই প্রথমেই পড়ি সন্ধিৎসু লিখিত ফিচার 'মানুষগড়ার ইতিকথা'। তাঁর লেখার গুণে প্রত্যেকটি ফিচার এমনই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে যে পড়ার শেষে মনে হয় কি যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম, পেয়েছি সন্ধিৎসুর লেখার মুনসীয়ানায়।

কিন্তু গত ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৭শ সংখ্যা 'অমৃতে' হাওড়া জেলা স্কুল প্রসঙ্গে সন্ধিৎসু জানিয়েছেন যে প্রাক্তন কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও বর্তমানে রাজস্ব বোর্ডের সদস্য আই-সি-এস শ্রীকরুণাকেতন সেন হাওড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন। তথ্যটি ভুল। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন (ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল থেকে। কোন সালে পাশ করেছিলেন তা আমাদের ঠিক মনে নেই। মনে হয় ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে। তখন নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। তৎকালীন স্কুলের হেডমাস্টার-মশায় ছিলেন শ্রীযুক্ত তারানাথ দে। তাঁর আমলেই সেই স্কুল থেকে শ্রীসেন ম্যাট্রিকে প্রথম হয়েছিলেন। এবং শ্রীজয়ন্ত গুহ দ্বিতীয় হয়েছিলেন। তারপরে তৃতীয়, চতুর্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছিলেন সেই স্কুলের ছাত্ররা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি তাঁদের নাম আমাদের ঠিক মনে নেই। আমরা এসব তথ্য পেয়েছি স্কুলের বাৎসরিক মুখপত্র 'অরুণিমা' থেকে। এ-ছাড়াও স্কুলের সমস্ত কৃতী ছাত্রদের নামের তালিকা হেডমাস্টার-মহাশয়ের ঘরে একটি বোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা আছে। আর এতে লেখা আছে, সমস্ত কৃতী ছাত্ররা স্কুলের তরফ থেকে আজীবন ১০ টাকা করে বৃত্তি পেয়ে যাবেন। এই নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল স্থাপিত হয় ১৮৪০ খৃস্টাব্দে। আমরা যথাক্রমে ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে ঐ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছি একটানা ১০ বছর পড়ে অর্থাৎ ক্লাশ ওয়ান হ'তে ক্লাশ টেন পর্যন্ত। ১৯৬২ সালে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল বারশ।

নিত্যরঞ্জন সাহা ও নৃপেন্দ্ররঞ্জন সাহা,
চক্রধরপুর (বিহার)

আপনাদের 'অমৃত পত্রিকাকে' একটি উচ্চ স্তরের পত্রিকা বলা যেতে পারে। এতে উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে নানারকম গল্প এবং বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা খুবই সুন্দর। আপনাদের অমৃতে কয়েক মাস হ'তে 'মানুষ গড়ার ইতিকথা' নামক একটি বেশ সুন্দর আলোচনা থাকে। এটা খুব গর্বের কথা। আমরা যে স্কুল সম্বন্ধে জানতাম না তা আপনারা আমাদের সামনে তুলে ধরছেন প্রতি সপ্তাহে। এর জন্য সন্ধিৎসু মহাশয়ের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। আমার অনুরোধ আপনারা পাড়া-গাঁয়ের স্কুলগুলি সম্বন্ধেও যেন অমৃত পত্রিকাতে আলোচনা করেন। সন্ধিৎসু এক 'মানুষ গড়ার ইতিকথায়' সূচনায় কঠিন কাজ আরম্ভ করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। চেষ্টা সফল হোক। এটাই কামনা করি।

আলিমুজ্জমান,
মুর্শিদাবাদ, রায়পুর।

কেয়াপাতার নৌকো

'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস 'কেয়াপাতার নৌকো' নিয়মিতভাবে পড়ে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত এই উপন্যাস প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত প্রকাশিত চিঠিগুলো পড়েছি। ২য় মহাযুদ্ধ শুরু হবার অল্প আগে পূর্ব বাংলার একটি গ্রামে আমার জন্ম হয়েছিল। যুদ্ধের সময়ের কথা কিছু কিছু মনে করতে পারি। প্রতিদিন সন্ধ্যের পর আমাদের বাড়ীর বারান্দায় আসর বসত। গ্রামের বহু হিন্দু-মুসলমান মাতব্বর লোক এসে জমা হতেন। আমার বাবাকে কার্যোপলক্ষে প্রতিদিন শহরে যেতে হতো এবং আসার সময় তিনি শহর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসতেন (কাগজের নাম মনে নেই)। সেই কাগজ পড়ে আসরের সকলকে শোনাতেন আমার বাবা, কাকা অথবা আমার দাদু। অনেক রাত্রি পর্যন্ত যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা চলত, আর হাত থেকে হাতে হুঁকো ঘুরত। 'কেয়াপাতার নৌকো'য় বর্ণিত চিত্রের সঙ্গে আশ্চর্যরকম মিশে যাচ্ছে আমাদের বাড়ীর চিত্র। 'কেয়া-পাতার নৌকো'য় বর্ণিত অনেক ঘটনার সঙ্গে আমাদের বাড়ী ও আমাদের গ্রামের অনেক কিছুরই হুবহু সাদৃশ্য দেখে চমকৃত হতে হয়। মনে হয় লেখক আমাদের গ্রামের কথাই লিখছেন। পূর্ব বাংলার একটি বাড়ী ও একটি গ্রামের ইতিহাস যেন প্রতিটি বাড়ী ও গ্রামের ইতিহাস।

রাজদিয়ায় মিলিটারীদের ক্যাম্প বসানোর বর্ণনা পড়তে পড়তে মনে পড়ে আমাদের বাড়ীর সামনের বড় রাস্তা দিয়ে মিলিটারী গাড়ীর সারি যাওয়ার দৃশ্য। যখন মিলিটারী গাড়ীর সারি চলত (কখনো কখনো সার বেঁধে মিলিটারীরা হেঁটেও যেত) তখন দাদু, বাবা অথবা কাকাদের দেখতাম বাড়ীর মেয়েছেলেদের ঘর থেকে বেরুতে নিষেধ করতেন। [illegible] আড়ালে

আবডালে থেকে মিলিটারীদের মার্চ করে যাওয়া কিংবা কুচকাওয়াজ যাওয়া দেখত। মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়ে ঝাঁক বেঁধে এরোপ্লেন যাওয়াও দেখতাম। তারপর একদিন যুদ্ধ থেমে যাওয়ার কথা শুনেছি। মিলিটারীদের যাতায়াত বন্ধ হতে দেখেছি। তার কিছু পরে এই রাস্তা দিয়েই ভোটের মিছিল দেখেছি। হিন্দুদের মিছিল। মুসলমানদের মিছিল। তারপর দেশভাগের কথা শুনলাম। দাঙ্গা দেখেছি। একদিন দেশবাড়ী সব ফেলে চলে এলাম আমরা হিন্দুস্থানে। সবকিছু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দাদু আঘাত সহ্য করতে পারলেন না। ভারতে এসে কিছুদিন পরেই মারা গেলেন। কাকারা ছড়িয়েছিটিয়ে পড়লেন নানা দিকে। এখানেই শেষ হয়ে গেল জীবনের একটি অধ্যায়। সেদিন আমার বালকমন ঘটনার গতি-প্রকৃতি ও গুরুত্ব না বুঝলেও সবকিছু মনে গাঁথা হয়ে আছে।

'কেয়াপাতার নৌকো'র লেখক দেশভাগ পর্যন্ত উপন্যাসটিকে টেনে আনবেন কিনা জানিনে। যদি আনেন তবে সার্থক উপন্যাসের ভিতর একটি যুগের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

লেখককে শুধু একটি প্রশ্ন করতে চাই। পূব-বাংলার প্রায় প্রতিটি গ্রামের লোক একটি বাউল, বৈষ্ণব, অথবা পীর চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত আছে। কিন্তু কেয়াপাতার নৌকোয় কোথায়ও সেরকম চরিত্রের উল্লেখ দেখলাম না। এটা কি রাজদিয়ার পূর্ণাঙ্গ চিত্রের একটি ত্রুটি নয়?

কিন্তু এ অতি সামান্য কথা। লেখকের কৃতিত্ব অসীম। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

অসীম সেন
এস এস কলেজ,
হাইলাকান্দি (আসাম)

লোকগীতি না লোক্‌গীতি?

আমি আপনার পত্রিকার একজন পাঠক, আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত মাননীয় 'শ্রবণক' মহাশয়ের 'বেতার-শ্রুতি' বিভাগটি প্রত্যেক বারই নতুন করে আমাদের মনে আশার আলোর উৎস সন্ধানের প্রেরণা দেয়। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয়, বেতার কর্তৃপক্ষ যেন তাদেরই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে অটল। এবং বেশ কিছুটা উদাসীন। বেতার কেন্দ্রে ঘোষকের ভুল ঘোষণা, অনুষ্ঠানে বিঘ্ন, এসব তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

যাক আমি গত কয়েকদিনের একটি হিসাব দিয়ে একটি প্রশ্ন মাননীয় শ্রবণক মহাশয়ের তথা আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে সুধীজনের অবগতির জন্য দিচ্ছি।

গত ১০ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর প্রতিদিন সকাল আটটায় প্রত্যেক ঘোষিকাই বললেন, "এখন আপনাদের 'লোক্‌গীতি' শোনাচ্ছেন ...কিন্তু আবার ১৩ তারিখ ঘোষিকা বললেন, 'লোকগীতি'; আবার ১৫ রাত্রে ঘোষক বললেন, 'লোক্‌গীতি', ১৬ই আটটায় ঘোষিকা বললেন, 'লোকগীতি'।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'লোকগীতি' না 'লোক্‌গীতি' উচ্চারিত হবে?

আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতির নির্দেশে দেখতে পাই, (এই নির্দেশ শিক্ষিত সুধীসমাজ স্বীকৃত) শব্দের শেষে সাধারণত 'হস্‌-চিহ্ন' দেওয়া হবে না। আবার একথাও বলা আছে যে যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে 'হস্‌-চিহ্ন' বিধেয়।

'বেতার জগৎ' দৃষ্টে আমরা পাই লোকগীতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে লোক্‌গীতি আর লোকগীতিতে কোনই ব্যবধান নেই। কিন্তু বিভিন্ন ঘোষকের উচ্চারণের তারতম্য আমাদের মনে পীড়া দেয়। এবং শ্রুতিকটুও বটে।

অতএব শ্রবণক মহাশয়ের নিকট আশা করব যে আপনার পত্রিকার মাধ্যমে এই উচ্চারণ সমস্যার সমাধানের তিনি যথাসাধ্য প্রয়াস করবেন এবং একই সঙ্গে আমরা বেতার-যন্ত্রে নির্দিষ্ট অভ্রান্ত উচ্চারণ শ্রবণ করব।

সমীর ভট্টাচার্য
বিধানগড়, কলিঃ-২৪।

বেতারশ্রুতি

গত ১লা আগস্ট বেলা তিনটার সময় শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী রায় পরপর দুটি আধুনিক বাংলা গান গেয়ে শোনালেন। গানদুটির প্রথম কলি যথাক্রমে—'কথা দিয়েছিলে তুমি আসবে বলে' এবং ২য়—'হৃদয় বনে কত ফুল ফুটেছে কেন জানি না'।—গানদুটির রচয়িতা হলেন অরুণ সেন। কিন্তু গান শুরু হবার, পূর্বে ঘোষিকা (নবাগতা?) ঘোষণা করলেন, 'অরুণ রায়ের লেখা আধুনিক বাংলা গান শোনাচ্ছেন...'

নিজের নামের পদবীতে ভুল থাকায় প্রথমটায় ভেবেছিলাম পরবর্তী ঘোষণায় ঘোষিকা তাঁর ভুল সংশোধন করে দেবেন। কিন্তু ভুল সংশোধনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যখন অরুণ সেন (গান দুটির রচয়িতা) অরুণ রায়ই থেকে গেলেন তখন আমি মর্মাহত হলাম।

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঐ একই ঘোষিকা আরো দুটি মারাত্মক ভুল ঘোষণা করেছিলেন। মঞ্জুশ্রী রায়ের পূর্বে 'বেহালা বাদন' অনুষ্ঠানে বলা হয়েছিল 'গীটার বাজিয়ে শোনালেন।' এবং তিনটে পনেরো মিনিটের সময় যিনি অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে শোনালেন তাঁর নামের পদবীতে দু'বার দু'রকম ঘোষণা শোনা গেল—প্রথমে 'মৈত্র' এবং পরে 'মিত্র'।

আশা করি সহৃদয় সম্পাদক মহাশয় জনসাধারণের কাছে এবং বেতার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নাম-বিভ্রাট সমস্যাটি 'অমৃত'-এর পাতায় তুলে ধরবেন।

অরুণ সেন
টাকী, ২৪-পরগণা।

(২)

আমি অমৃতের নিয়মিত পাঠিকা এবং গ্রাহিকা। বেতার-শ্রুতির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। এই প্রসঙ্গে একটা অনুযোগ নিবেদন করি। কোলকাতা 'গ'-এ বাঙলা অনুষ্ঠানে প্রচারিত রেকর্ডগুলো প্রায় সবগুলোই কাটা। প্রতিদিনই একটা না একটা কাটা রেকর্ড বাজবেই—লক্ষ্য করে দেখেছেন কী? মনে হয় এই বাঙলা অনুষ্ঠানটি কাটা রেকর্ড বাজিয়ে পরখ করে দেখার জন্যই প্রচারিত। আপনারা তো প্রতি সংখ্যায় আলোচনাতে রেকর্ড প্রচারের আগে বাজিয়ে দেখে নিতে বলেন। সেই অনুরোধেই এই ব্যবস্থা আর কি।

কিন্তু আরও মজা হচ্ছে—কোলকাতা 'ক'-য়ে কাটা রেকর্ড বাজিয়েই ঘোষক-ঘোষিকা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে দুঃখ প্রকাশ করেন। গ-তে সে বালাই নেই। কারণ বোধহয় গ হিন্দী রাজ্য। এখানে বাংলা প্রচারই যথেষ্ট—ভুলভ্রান্তি সহ্য করেই তা শুনতে হবে।

চিত্রা সান্যাল,
বিদেহনগর, কানপুর।

মেঘমন্দ্র প্রসঙ্গে

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক আমাদের প্রিয় 'অমৃত'র নিয়মিত পাঠক হিসেবে গত ২য়া আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীচণ্ডী-মণ্ডলকৃত 'মেঘমন্দ্র' গল্পটি পড়লাম। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের এই গল্পটি আমার খুবই ভাল লেগেছে। গল্পের যবনিকাপাত যেভাবে তিনি করেছেন, তাতে গল্পটি সার্থক গল্পের পর্যায়ে পড়ে এবং এতে মননশীল লেখকের বুদ্ধিমত্তার ছাপ স্পষ্ট। গতানুগতিক চিন্তাধারায় বর্তমান গল্প-উপন্যাস পড়তে পড়তে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। মনে হচ্ছিল বাংলা সাহিত্যে নতুনত্ব বুঝি শেষ হয়ে গেল। তখনই শ্রীমণ্ডলের এইরূপ মননশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হলাম। তাঁকে আমার অভিনন্দন জানাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। মাঝে মাঝে এইরূপ নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে খুশী হবো।

শ্যামসুন্দর ঘোষ
বাটানগর, ২৪-পরগণা।

সাদা চোখে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম উভয়েই ভারতের সমস্ত অঙ্গরাজ্যের ভূমি সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করার জন্য সুপারিশ করে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র দিয়েছেন। এমন কি শ্রীরাম আসন্ন মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে জমির পুনর্বন্টন কি উপায়ে সুসম্পন্ন করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করারও ইচ্ছা রাখেন। ভূমি সমস্যা সমাধানের সঙ্গে খাদ্য সমস্যা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। দেশে কোন জাতীয় খাদ্যনীতি গ্রহণ করতে হলে উৎপাদনের ব্যবস্থার প্রতি নজর রেখেই তা করতে হবে। কিন্তু অদ্যাবধি বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন আইন পাশ হলেও জমির পুনর্বন্টনের সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। ফলে, একটি সুসম উৎপাদন ব্যবস্থাও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু কোথাও কোথাও "গ্রীন রেভলিউশন" বা "সবুজ বিপ্লব" ঘটেছে বটে। তবে তাতে সরকারী কৃতিত্বের চেয়েও একজন সাধারণ কৃষকের ভূমিকা অনেকখানি। গুরুত্বপূর্ণ। আবার সেই কৃষকও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে "সবুজ বিপ্লব" করার জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নামেননি। দেশব্যাপী খাদ্যশস্যের আকালজনিত মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ কৃষকের মনে যে ব্যবসাসুলভ মনোবৃত্তির সৃষ্টি করেছিল "সবুজ বিপ্লব" তারই সহজাত ফসল। সরকারী বেশী উৎপাদনকারী বীজ কিঞ্চিৎ সাহায্য করেছে মাত্র।

আগেও অনেকবার বলা হয়েছে যে, এই অভাগা দেশে খাদ্যমন্ত্রী নামে কোন মন্ত্রী নেই। যিনি খাদ্যমন্ত্রীর তকমা এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি একজন সংগ্রাহক মাত্র। কেন্দ্রীয় বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হবে আর সেই টাকা দিয়ে মন্ত্রী মশায় বিদেশ থেকে খাদ্য ক্রয় করে এনে দেশের অভ্যন্তরে তাঁর বিবেক অনুযায়ী বন্টন করবেন। এই অফিসিয়াল ডিউটি ছাড়া আর অন্য কাজ হচ্ছে ভাষণ প্রদান। ভাষণের বিষয়বস্তু খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, অপচয় বন্ধ ও কম খাওয়া ইত্যাদি। এই দুই কাজ সমাধানের জন্যই খাদ্যমন্ত্রক। অবশ্য, বিদেশ থেকে ভিক্ষালব্ধ অন্ন আমদানীও এই মন্ত্রকের অন্তর্ভুক্ত। তবে অন্যান্য মন্ত্রীরাও ঐ মহৎ কর্মে খাদ্যমন্ত্রককে সাহায্য করে থাকেন।

কেন্দ্রীয় সরকার নীতিগতভাবে ভূমি বন্টনের কথা মেনে নিলেও অদ্যাবধি সুস্পষ্টভাবে এই বক্তব্য রাখেননি। ব্যাংক জাতীয়করণের পর শ্রীমতী গান্ধী এই প্রথম ভূমি সমস্যা সমাধানের উপর জোর দেওয়ার জন্য সকলকে অবিলম্বে উদ্যোগী হতে বলেছেন। তিন তিনটি পরিকল্পনার পর কৃষি উৎপাদনের উপর নজর দেওয়ার কথা এইবারই ঘোষণা করা হয়েছে। এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে কৃষকদের মধ্যে লগ্নীর ব্যবস্থা বাড়াবার কথাও এখন বলা হচ্ছে। দীর্ঘ বিশ বৎসর ধরে জাতীয় আয়ের এক বৃহদংশ খাদ্যশস্য খরিদের জন্য ব্যয়িত হয়েছে। ফলে জাতীয় মূলধন বাড়তে পারেনি। আর দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ মানুষ যাঁরা ভূমির উপর নির্ভরশীল তাঁদের অবস্থা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। নবজীবনের স্পন্দন তাঁরা অনুভব করতে পারেন নি। এবং শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে জীবনতরু শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। প্রত্যেক দেশের খাদ্যনীতি যখন স্থির করা হয় তখন আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের হিসাবনিকাশ করে জাতির সামনে বক্তব্য উপস্থাপিত করার নিয়ম আছে। কেবল মাত্র এই বিচিত্র ভারতবর্ষের নিয়ম হচ্ছে বিদেশ থেকে কত খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে তার ভিত্তিতে নীতি নির্ধারণ করা। দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন এই নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে নিতান্তই গৌণ ভূমিকা পালন করে মাত্র।

যা হোক, প্রধানমন্ত্রীর ভূমি সমস্যা সমাধানের আগ্রহ দেখে অন্য কেউ আগ্রহান্বিত হয়েছে কিনা জানি না, তবে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়েছেন। শ্রীকোঙার প্রধানমন্ত্রীর আবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘ এক পত্রে সমগ্র দেশে কিভাবে ভূমি সমস্যার সমাধান করা যায় সেই সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করেছেন। যদিও মন্ত্রী হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের নয়, কিষাণ নেতা হিসাবে ভূমি সংস্কারের যে পরিকল্পনা বর্তমান অবস্থায় কার্যকর করা সম্ভব, তা নিয়ে এই অত্যল্প দিনের মন্ত্রীত্ব কালে শ্রীকোঙার পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এবং সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের অনুশীলন করে শ্রীকোঙার শ্রীমতী গান্ধীকে যে পত্র দিয়েছেন তার মধ্যে কিছু অত্যন্ত বাস্তবানুগ সুপারিশ করেছেন।

আইনগত প্রশ্নের কথা বাদ দিলেও শ্রীকোঙার দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। একটি হচ্ছে, ভূমি বন্টনের প্রশ্নে শ্রীকোঙার জমির পরিমাপের উপর জোর দেননি। এতদিন পর্যন্ত এই কথা অর্থনীতিবিদরা বলে এসেছেন যে, জমির পুনর্বন্টনের অর্থ এই নয় যে কৃষকের কাছে 'uneconomic holding' বরাদ্দ করা। অর্থাৎ এমনভাবে জমি বন্টন করতে হবে যাতে চাষ করলে সেই জমি থেকে লোকসান না হয়। আরও একটু পরিষ্কার করে বললে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, জমির মালিকের ভরণপোষণ হওয়ার পর খরচা উঠে কিছু লাভও থাকবে জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের মূল্যে। যদি এ হেন লাভের জমি না হয় তবে নাকি কৃষকের জমির প্রতি মমতা বাড়ে না, ফলে চাষ না হয়ে জমি অনাবাদী পড়ে থাকে। উৎপাদন ব্যাহত হয়। শ্রীকোঙার এই বুনিয়াদী তথ্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পত্র, বা স্মারকলিপি যাই বলা হোক না কেন, তাতে এই কথা উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ভূমিহীনদের মধ্যে যে জমি সরকার বন্টন করেছেন কিম্বা কিষাণরা বলপূর্বক দখল করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন, তার পরিমাপ ভূমিহীন কৃষক পরিবার পিছু কোনক্রমেই তিন বিঘার বেশী নয়। এবং কখনও কখনও তার চেয়েও কম জমি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। এই কথা বলে শ্রীকোঙার তাঁর অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন যে এত কম পরিমাণের জমি দেওয়া সত্ত্বেও এহেন বন্টিত জমি পশ্চিম বাংলার কোথাও অনাবাদী পড়ে নেই। বরঞ্চ তাঁর কাছে রিপোর্ট আসছে যে ঐ বন্টিত জমির ফসল অন্যান্য জমির চেয়ে কোনক্রমেই বেশী হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। এই স্বল্প পরিসর জমি চাষ করবার জন্য কিভাবে হাল-বলদের সংস্থান হলো তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। শ্রীকোঙার বলেছেন এই অসাধ্যসাধন হওয়ার মূলে রয়েছে জমিপ্রাপ্তির আনন্দ ও নতুন জীবনবোধ। কারণ, সে সমস্ত ভূমিহীন এই জমি পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শুধু মাটির মায়া দানা বেঁধে ওঠেনি, অধিকন্তু জীবনের নিরাপত্তাবোধ গভীরভাবে দেখা দিয়েছে। তাই শ্রীকোঙার তাঁর স্মারকে সুপারিশ করেছেন যে জমির পরিমাপের কথা না ভেবে ভূমিহীনদের মধ্যে যে জমিই পাওয়া যায় তার তাড়াতাড়ি বন্টন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হবে না বরং বাড়বে। খাদ্য সঙ্কট নিরসনে সাহায্য করবে। অবশ্য, শ্রীকোঙার বলেছেন এহেন চাষীদের পুনর্বাসনের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এবং সেই আর্থিক অনুদান থেকেই তাঁরা হাল, বলদ, বীজ নিয়ে জীবনসমুদ্রে পাড়ি দেবেন। শ্রীকোঙার অতীব জোরের সঙ্গে তাঁর এই অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে স্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন বলে অন্য বক্তব্য রাখার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। তবুও "সমদর্শী" বলতে চায় যে নিশ্চয় দু'তিন বিঘা জমি পেলে কোন কৃষক পরিবারের [illegible] হতে পারে না। প্রথম বছর জমি পাওয়ার আনন্দ, জীবনে নিরাপত্তার একটি [illegible]

হয়ত কৃষককুলের মনে আনন্দের জোয়ার আনতে পারে। কিন্তু যে উৎপাদন সেই স্বল্প পরিসর বণ্টিত জমি থেকে হবে তাতে কৃষকের মনে যে চাহিদার সৃষ্টি করবে তা কোনপ্রকারে পূরণ করতে পারবে না। কারণ মানুষ যখন জীবনের আস্বাদ পেতে শুরু করে তখন সে জীবনমান উন্নয়নের জন্য মরীয়া হয়ে উঠে। তার চাহিদা বাড়তে থাকে, কাজেই একটু জমি পাওয়ার পর আপাতত যে নিরাপত্তা এসেছে বলে মনে হচ্ছে তা আদৌ নিরাপত্তা নয়। এতে সেই ভূমিহীন কৃষকের জমির ক্ষুধা আরও বাড়বে। ফলে অশান্তিও বাড়তে বাধ্য, 'সমদর্শী' একথা বলতে চায় না যে জমি যা পাওয়া যাচ্ছে তা বন্টন না করে রেখে দেওয়া হোক। 'সমদর্শী'র বক্তব্য হচ্ছে যে অল্প জমি দিয়ে আখেরে সেই ভূমিহীন কৃষকের কিছুই সুরাহা হবে না যদিনা তার বিকল্প গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা করা যায়। 'সমদর্শী' পশ্চিমবাংলার মাননীয় ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীকে এই প্রশ্নটা একটু বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছেন মাত্র। এইভাবে জমি বন্টন হলে আবার পুনর্বন্টনের প্রশ্ন নতুন করে দেখা দেবে বলেই 'সমদর্শী' মনে করে।

শ্রীকোণ্ডারের দ্বিতীয় প্রস্তাব আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যে অনেকগুলো আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন কতটুকু কার্যকর হয়েছে তার সমীক্ষার জন্য ভারত সরকার ফোর্ড ফাউণ্ডেসনের একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছেন। সেই অফিসার মিঃ লেজেনেস্কি তাঁর রিপোর্টে নাকি বলেছেন, আইন প্রণয়ন হয়েছে বটে, কাজের কাজ কিছু হয়নি। অর্থাৎ ভূমি বন্টন ত দূরের কথা—সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। আর আইনগুলোও হয়েছে "ভূস্বামী-ঘেঁষা" মিঃ লেজেনেস্কি এই মন্তব্য করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের খতিয়ানের পাতা ওল্টালেই এই বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। ১৯৬৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই রাজ্যে কংগ্রেস গদীতে আসীন ছিল। কংগ্রেস জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ বিল পাশ করে জমির উচ্চসীমা নির্ধারিত করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই আইনে ফাঁক থাকার ফলে অনেকেই সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছেন। ৭৫ বিঘা ধানী জমির পরিবর্তে বেনামী করে পুত্র, পৌত্র ও কলত্রাদির নামে অনেক জমি কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। এবং আইনের সাহায্য নিয়েও ইনজাংশান জারীর মাধ্যমে সরকারকে জমি দখলে নিরস্ত করে রেখেছিলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই সব কারসাজি ব্যর্থ করবার জন্য পরিবারপিছু জমির সীমানা নির্ধারণ করেছেন, এবং সেই ৭৫ বিঘার মধ্যে বাস্তু, বাগান ইত্যাদি যুক্ত করে দিয়েছেন। দেবোত্তর কিম্বা অন্য কোন অজুহাতেও জমির সীমানা বাড়ানো যাবে না বলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীকোণ্ডার শ্রীমতী গান্ধীকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে অনুরূপ আইন পাশ করার সুপারিশ করেছেন। এবং এ সত্ত্বেও যাঁরা বেনামী জমি রেখেছেন তার উদ্ধারের জন্যে প্রত্যেক রাজ্যে যেখানেই কৃষকদের সংগঠিত সংস্থা আছে তাদের মাধ্যমে উদ্ধার অভিযান চালাবার সুপারিশ করেছেন। এটাই শ্রীকোণ্ডারের স্মারকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য।

শ্রীকোণ্ডার সংবিধানের একটি ধারা পরিবর্তনের কথাও বলেছেন। সেই ধারায় জমির ক্ষতিপূরণের কথা লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীকোণ্ডার বলেছেন, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন আইনানুগ জমি সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। কেউ যদি বেনামীতে জমি লুকিয়ে রেখে আইনকে ফাঁকি দেয় ও সরকারের জমি চুরি করে নিজের হেফাজতে রাখে তবে সেই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে কি? সরকারের আদেশ অমান্য করলে তার শাস্তির কথা ভারতীয় পেনাল কোডে বিধিবদ্ধ আছে। জমির ব্যাপারে সরকারের আদেশ অমান্য করা সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এই অবস্থা চলতে থাকলে শেষপর্যন্ত সকল অপরাধীই সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারে।

শ্রীকোণ্ডার আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, শ্রীকোণ্ডারের মতে, সংবিধানের বুনিয়াদি অধিকারের অপব্যাখ্যা। সংবিধানে সম্পত্তি রাখার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রীকোণ্ডার বলেছেন, অস্থাবর সম্পত্তি বিশেষ করে জমির বেলায় সরকার সম্পত্তি রাখার প্রশ্নকে অস্বীকার না করে শুধু কতটুকু জমি বা সম্পত্তি রাখতে পারবে তার সীমানা নির্ধারণ করছে মাত্র। কিন্তু শ্রীকোণ্ডারের মতে স্বাধিকারের অপব্যাখ্যা করে সরকারকে জমির দখল নিতে নিরস্ত করা হচ্ছে। এই সব বন্ধ করার কথা তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই দুই সুপারিশ মেনে নেওয়ার প্রশ্নে মতান্তর ঘটবে এমন আশঙ্কা করার খুব একটা কারণ নেই। কারণ, সংবিধান জনতার জন্যই। অতীতে জনকল্যাণের চিন্তা মনে রেখে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে, বর্তমানেও হতে পারে। কিন্তু যে সুপারিশের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী তা হচ্ছে জমি উদ্ধারের প্রশ্নে কৃষক সংগঠনকে সরকারী প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করে জমি দখলের আন্দোলনকে জোরদার করা।

পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে সমস্ত জমি দীর্ঘদিন ধরে আইনের খবরদারীর জন্য সরকার দখল করতে পারেনি সংগঠিত কৃষক তা অবলীলাক্রমে দখল করে বন্টন করে নিয়েছে। এবং চাষও করেছে। উল্লেখ্য যে একজনও বেনামদারী জমির মালিক স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে আইনভঙ্গের অপরাধ স্বীকার করে সরকারের হাতে উদ্বৃত্ত জমি ফিরিয়ে দেন। বরঞ্চ আদালতের আশ্রয় নিয়ে জমি দখলে রাখার অপচেষ্টা করেছেন মাত্র। সরকারের পক্ষে আদালত অবমাননা সম্ভব নয়। কিন্তু আমজনতা যেখানে মারমুখী সেখানে কে কার খোঁজ রাখে। জমি উদ্ধার হয়েছে বটে, কিছু কিছু স্বজাতি সংঘর্ষও হয়েছে। কারণ কৃষকরাও ত সকলে শুধু কৃষক নন। তাঁদের কারো কারো জমি আছে। কাজেই লড়াই হয়েছে। কিন্তু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজ্যে এহেন লড়াইয়ের সূত্রপাত করতে শ্রীমতী গান্ধী রাজী হবেন কি? এ হেন জমি দখলের লড়াই শ্রেণী সংঘর্ষের নামান্তর নয় কি? শ্রেণী সমন্বয়ে বিশ্বাসী শ্রীমতী গান্ধী এহেন একটি কর্মপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না। বিশেষ করে এ' নীতি যখন কংগ্রেস আদর্শের পরিপন্থী। কংগ্রেসীরা আইন পাশ করেছিলেন অথচ জমি দখলের এই কৌশল তাঁদের জানা ছিল না, একথা বলা যায় না; বরং একথাই বলা যায় যে, বেশীরকমভাবে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী বলে কংগ্রেসীরা ভূমিসংস্কার আইন পাশ করে কার্যকর করার জন্য আমলাদের হাতে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। জমি পুনর্বন্টন হোক বা না হোক আইন ত পাশ করেছিলেন। এই সুখেই কংগ্রেস সরকার মশগুল ছিলেন।

শ্রীকোণ্ডার যে সমস্ত সুপারিশ করেছেন তাকে কেউ বিপ্লবী কর্মপন্থা বলে আখ্যা দেবে না। শ্রীকোণ্ডার তা বলেননি। তবুও দীর্ঘদিন ধরে ভূমিব্যবস্থায় যে অচলায়তন সৃষ্টি হয়ে আছে তার সাধারণভাবে পুনর্বিন্যাসের উপর জোর দিয়ে এই বুভুক্ষাপীড়িত নিরন্ন দেশের খাদ্য সংস্থানের কথা ভাবা হয়েছে। কিন্তু এইটুকু পরিবর্তন করতে গেলেও প্রতিক্রিয়ার কালোপাহাড় এসে শ্রীমতী গান্ধীর মসনদ টলিয়ে দেবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। শ্রীকোণ্ডার নিজেও খুব আশাবাদী নন। তবুও আশানিরাশার দোলায় দুলে শ্রীকোণ্ডার শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে আলোচনা করে ভারতের অগণিত ভূমিহীন কৃষককে আলোয় আনবার চেষ্টায় নয়াদিল্লী যাচ্ছেন। ভারতবাসী আলোচনার ফলাফলের জন্য উন্মুখ হয়ে রইল।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

প্রধানমন্ত্রীর সফর

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যদি তাঁর নতুন নেতৃত্বের শক্তি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর ভারত ভ্রমণের কর্মসূচী প্রস্তুত করে থাকেন তাহলে বলতেই হবে যে, তাঁর এবারকার পূর্ব ভারত সফর সার্থক হয় নি। এমন কি তাঁর প্রতিপক্ষ বলতে পারেন, এই সফর একটা বিপর্যয়ে পরিণত হয়েছে—যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে, মণিপুরে আট মাস বয়সের কংগ্রেসী মন্ত্রি-সভার পতন। বিপর্যয় বলা হোক বা না হোক, এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে, আজকের ভারতবর্ষে যে বিরাট, জটিল ও বহুমুখী সমস্যাগুলি তাঁর নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করছে সেগুলি সম্পর্কে গভীরতর ধারণা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবাদ কিভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, একটা অর্থনৈতিক প্রশ্নও কিভাবে গভীর ভাবাবেগমিশ্রিত রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে, কংগ্রেসের ভিতরকার দলাদলি কিভাবে পূর্ব ভারতের বাকী কয়েকটি কংগ্রেস শাসিত অঞ্চলেও অস্থিরতা ডেকে আনছে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষ এখনও কত সহজেই সমগ্র সমাজদেহে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে, এই সব কিছুরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন শ্রীমতী গান্ধী।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর "পুষ্পক" বিমান এবার ঝড়ো আবহাওয়ার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে আকাশযাত্রায় বেরিয়েছিল। এই ঝড়ো আবহাওয়া উভয় অর্থেই; প্রকৃতির ঝড়ও বটে, আবার রাজনীতির ঝড়ও বটে। যাত্রার সূচনাতেই এল বাধা। সফরে বেরোবার প্রাক্কালে "নোগ কমিটি" রিপোর্ট পেশ করলেন। আসামে দ্বিতীয় একটি রাষ্ট্রায়ত্ত তৈলশোধনাগার স্থাপনের জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ যে দাবী তোলা হচ্ছিল সেই দাবী বিবেচনা করে দেখার জন্য ভারত সরকার এই বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছিলেন। নয়াদিল্লীতে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট পেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আসামে দ্বিতীয় তৈলশোধনাগার স্থাপনের দাবীতে ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করতে লাগলেন। তাঁদের জিগির, আসামের সম্পদ আসামেরই উন্নয়নে ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। যদিও বাহ্যত অকংগ্রেসী বাম-পন্থী দলগুলি এই আন্দোলন পরিচালনা করছে তাহলেও এ কথা অস্পষ্ট থাকল না যে, এই আন্দোলনে আসামের কংগ্রেস সরকারের সহানুভূতি আছে। (কলকাতায় আসামের শিল্পমন্ত্রী শ্রীবিশ্বদেব শর্মা বলেছেন যে, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস কর্মীরা এই আন্দোলনে যোগ দিতে চাইছেন।) ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রীর আসাম সফর করার কথা ছিল। ২৬ সেপ্টেম্বর গৌহাটিতে তাঁর জনসভায় বক্তৃতা করার কথা। তৈলশোধনা-গার সংগ্রাম পরিষদ ঐদিন "গৌহাটি বন্ধ"-এর আহ্বান দিলেন। আগে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, সফরে বেরোবার আগে প্রধান-মন্ত্রী পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে পরামর্শ করে নোগ কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। এমনও খবর বেরিয়েছিল যে, ডঃ সেন শিলং-এ টেলিফোন করে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত করবেন সেটা আসামের পক্ষে "সন্তোষজনক" হবে। কিন্তু "পুষ্পক"-এ ওঠার আগে শ্রীমতী গান্ধী সম্ভবত মনস্থির করতে পারলেন না। ফল হল এই যে, শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁর আসাম সফরের পরি-কল্পনা বাতিল করতে হল।

এই হল প্রথম বাধা।

দ্বিতীয় বাধা এল প্রধানমন্ত্রী তেজপুরে গিয়ে পৌঁছাবার পর। এবারকার বাধা প্রাকৃতিক। কথা ছিল, তিনি তেজপুর থেকে হেলিকপ্টারে করে নেফার তাওয়াং-এ যাবেন। কিন্তু আকাশ বাম। ঐ দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে হেলিকপ্টার ওড়াবার মত পরিষ্কার আব-হাওয়া পাওয়া গেল না। অগত্যা, প্রধানমন্ত্রী ঐ রাত কাটালেন শিলং-এ। সেখানে যখন মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর আলোচনা হল তখন তিনি নিশ্চয়ই আঁচ পেয়ে গেলেন, আসামে তৈল শোধনাগার স্থাপন সম্পর্কে সেখানকার সরকারী মহলের মনোভাবও কত গভীর।

শিলং থেকে উড়ে আসা আগরতলায়। ১৯৫২ সালে পিতার সঙ্গে প্রথমবার, ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস সভাপতির রূপে দ্বিতীয়বার এবং তারপর এই তৃতীয়বার শ্রীমতী গান্ধীর আগরতলায় আসা। যদিও আগরতলায় আসাম রাইফেল প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় এক অভূতপূর্ব জনসমাবেশ তাঁকে সম্বর্ধনা জানাল তাহলেও যে রাজ-নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে তিনি এসে পৌঁছলেন সেটা সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল না। অন্তত দুটি কঠিন সমস্যা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রথম, পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতির জন্য ত্রিপুরার দাবী। এই দাবী ত্রিপুরার সব রাজনৈতিক দলের, এমন কি ত্রিপুরার সরকারের। ত্রিপুরা এখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। যদিও তার বিধানসভা ও মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে যে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, পদে পদে পার্লামেন্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হয় বলে রাজ্য সরকারের কাজকর্মে অসুবিধা হচ্ছে। স্মারকলিপিতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, চার লক্ষ অধিবাসী নিয়ে নাগাল্যান্ড যদি একটি রাজ্য হতে পারে তাহলে ১৬ লক্ষ অধিবাসী নিয়ে ত্রিপুরা একটি রাজ্য হতে পারবে না কেন?

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আগরতলায় শ্রীমতী গান্ধীর জন্য অপেক্ষা করছিল সেটি হচ্ছে বিধানসভায় কংগ্রেস দলের মধ্যে বিভেদ। শ্রীমতী গান্ধী আগরতলায় পা দেওয়ার কয়েকদিন আগে থেকেই এই বিভেদ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিল। দলের মধ্য থেকে দাবী তোলা হয়েছিল, নেতৃত্ব থেকে শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহকে সরাতে হবে। এই 'বিদ্রোহীরা' শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবী জানিয়েছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী তাঁদের কি পরামর্শ দিয়ে এসেছেন তা জানা যায় নি। তবে, স্পষ্টতই, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ খুব নিরাপদ বোধ করছেন না।

আগরতলা থেকে ইম্ফল। ত্রিপুরা থেকে পার্শ্ববর্তী মণিপুর। ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী যে দুটি বড় রাজনৈতিক সমস্যা দেখতে পেয়েছিলেন ঠিক সেই দুটি রাজনৈতিক সমস্যাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল মণি-পুরে। সেটা অবশ্য যতখানি টের পাওয়া গেল তিনি মণিপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর সেখানে যাওয়ার আগে তত অনুমান করা যায় নি। আর যখন টের পাওয়া গেল তখন ইম্ফলে জনতায়-পুলিশে সংঘর্ষ হয়ে গেছে, গুলি চলেছে, মিলিটারী ডাকা হয়েছে এবং বিরোধীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কংগ্রেস দলের বিদ্রোহীরা কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছেন। ইম্ফলে পোলো ময়দানে প্রধান-মন্ত্রীর জনসভায় যে গোলযোগ হয় তার মূলে ছিল মণিপুরকে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবী। প্রধানমন্ত্রীর এই সভায় তাঁর উপস্থিতিতেই গোলযোগ বাধে। পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেলের গাড়ী-সহ কয়েকটি গাড়ীতে বিক্ষুব্ধ জনতা

আগুনে লাগিয়ে দেয়, পুলিশ লাঠি ও গুলি চালায় এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশের একজন পুলিশ সহ তিনজন মারা যান। এই সভায় মাত্র দশ মিনিট সময় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা করতে পেরেছিলেন। পৃথক রাজ্যের জন্য যাঁরা এরকম সভ্যতা-বর্জিত আন্দোলন চালাচ্ছেন তাঁদের ভর্ৎসনা করার বেশী আর কিছু প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন নি। পরে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, এই ঘটনা পূর্ব-পরিকল্পিত এবং এই ধরনের একটা কিছু যে ঘটতে পারে সেবিষয়ে সরকারের কাছে আগে থেকে খবর ছিল।

পরের দিন প্রধানমন্ত্রী ইম্ফল ছেড়ে কোহিমা অভিমুখে যাত্রা করার পরই কইরেঙ্গ সিং-এর মন্ত্রিসভা বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হলেন। নয়জন কংগ্রেস সদস্য 'বিবেক' অনুযায়ী ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দাবী করে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধতা করলেন। ফলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটল।

ইম্ফল থেকে কোহিমা যাওয়ার পথে প্রধানমন্ত্রী আবার বাধা পেলেন—প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাধা। ডিমাপুর থেকে হেলিকপ্টার রওনা হয়েও ফিরে এল। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তিনি কোহিমায় গিয়ে পৌঁছেছেলেন—নির্দিষ্ট সময়ের সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে। নাগাল্যান্ড একটি পৃথক রাজ্য হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার পর এই প্রথম দেশের প্রধানমন্ত্রী পূর্ব প্রান্তের এই রাজ্যে এলেন। যেন এই উপলক্ষকে চিহ্নিত করার জন্যই মণিপুরের উখরুল মহকুমার এক জায়গায় চোরাগোপ্তা হামলা করে বিদ্রোহী নাগারা মণিপুর রাইফেলসের চারজন জওয়ান ও একজন সহকারী কম্যান্ডারকে গুলি করে হত্যা করল।

কথা ছিল, প্রধানমন্ত্রী কোহিমা থেকে রাজধানীতে ফিরবেন। কিন্তু আবার যাত্রা বদল ঘটল। পুষ্পক উড়ে গেল কোহিমা থেকে নয়াদিল্লীতে নয়—দাঙ্গা উপদ্রুত আমেদাবাদে—দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিমে লম্বা পাড়ি। এই লম্বা পাড়ির শেষে শ্রীমতী গান্ধীকে রাজভবনে গিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলা হল। তিনি রাজী হলেন না। বিমান বন্দর থেকেই তিনি সোজা বেরিয়ে গেলেন শহরের দাঙ্গা-উপদ্রুত এলাকাগুলি দেখবার জন্য। প্রথমে তিনি গেলেন জগদীশ মন্দিরে, যেখান থেকে দাঙ্গার সূত্রপাত। ৯০ বছর বয়সের মহান্ত স্বামী সেবানন্দজী তাঁকে সেখানে অভ্যর্থনা করলেন। অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়ে মন্দিরের যে ক্ষতি করা হয়েছে তা তিনি দেখালেন। রাজ্যপাল শ্রী শ্রীমন নারায়ণ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইয়ের সঙ্গে একত্রে তিনি 'মরিয়ম বিবি কী মসজিদ' দেখতে গেছেন। সরু গলির মধ্যে ঢুকে তিনি শ্রমিক বস্তিগুলির পোড়া টিন দেখতে পেলেন। শাহীবাগে উদ্বাস্তু শিবিরে গিয়ে তিনি সর্বস্বান্ত মহিলাদের করুণ কাহিনী শুনলেন। শুনতে শুনতে তাঁর মুখের রেখা কঠিন হয়ে গেল।

এইভাবে ঘণ্টা দুয়েক শহরে ঘুরে প্রধানমন্ত্রী রাজভবনে ফিরে এলেন। তারপর তিনি সাংবাদিকদের কাছে যা বললেন তাতে বোঝা গেল, দাঙ্গা দমনের জন্য গুজরাট সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেটা যথেষ্ট বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করতে পারছেন না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সরকার যা করেছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট কিনা। উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, রাজ্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন সেটা যথেষ্ট কিনা তা তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব নয়।। সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশ্য একথাও বলেন যে, গোড়ায় যা ঘটেছিল তা থেকে যে এরকম একটা পুরোদস্তুর সাম্প্রদায়িক হানা-হানি হয়ে যাবে এমন কথা কেউই আগে অনুমান করতে পারেন নি।

প্রধানমন্ত্রী আমেদাবাদ থেকে নয়াদিল্লীতে ফিরে আসার পর ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটি বিবেচনা করে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর একটি জরুরী বৈঠক হবে।

জোয়ান অব আর্ক, আইরিশ

কেউ বলেন, 'আইরিশ 'জোয়ান অব আর্ক'', কেউ নাম দিয়েছেন 'মিনি-স্কার্ট পরা 'ফিডেল কাস্ত্রো', আবার কেউ ডাকেন 'ক্ষুদে টাইম বোমা' বলে। বয়স ২১ বছর মাত্র, লম্বায় মোটে পাঁচ ফুট। এই বেঁটেখাট তরুণীর নাম বার্ণাডেট ডেভলিন। তিনি একই সঙ্গে বিদ্রোহী তরুণ ও বিদ্রোহী ক্যাথলিক আলস্টারের প্রতীক। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সর্বকনিষ্ঠ এই সদস্যা সংবাদ সৃষ্টি করেই চলেছেন। সম্প্রতি তিনি আমেরিকায় গিয়ে সেদেশের অধিবাসীদের বৃটিশ পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানিয়ে এসেছেন।

অল্পবয়সী এই মেয়েটি দেশশুদ্ধ লোককে চটিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। প্রোটেস্টান্টরা তাঁর উপর চটা, তাঁরা বেলফাস্ট শহরের প্রোটেস্টান্ট এলাকায় শ্রীমতী ডেভলিনের একটি বিকৃত মূর্তি তৈরী করে পাথর উপর বসিয়ে রেখেছেন। সংবাদপত্রের পাঠকরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে চিঠি লিখছেন, বিদেশে বৃটিশ পণ্য বর্জনের আহ্বান জানাবার দরুন তাঁর পার্লামেন্টের সদস্যপদ খারিজ করে দেওয়া হোক। বৃদ্ধরা তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ, কেন না তিনি তাঁদের বড় বেশী পাত্তা দিতে চান না।

শ্রীমতী ডেভলিন ইতিমধ্যেই অনেকগুলি রেকর্ড করেছেন। তিনিই সবচেয়ে কম বয়সে বৃটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছেন। যেদিন তিনি সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। সেদিনই তিনি পার্লামেন্টে প্রথম বক্তৃতা দেন। তাঁর আগে আর কেউ এই সুযোগ পায় নি। পার্লামেন্ট তাঁর কিরকম লাগল জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'কোন কোন সদস্য নিতান্ত মূর্খ।'

পার্লামেন্টের ঘরে আটকে থাকার মেয়ে শ্রীমতী ডেভলিন নন। সম্প্রতি উত্তর আয়ার-ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক অধ্যুষিত এলাকায় তাঁকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ইট ছুঁড়তে দেখা গেছে বলে খবর আছে। ক্যামেরুন তদন্ত কমিশন তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'এটা তাঁর সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাই হোক না কেন, যে সমস্ত ঘটনায় হিংসাত্মক কার্য-কলাপ হয়েছে সেই সব ঘটনায়ই তিনি উপস্থিত ছিলেন।'

এই মন্তব্যের উত্তরে শ্রীমতী ডেভলিন বলেছেন, 'আমি কখনও অস্বীকার করি নি যে, আমি একজন জঙ্গী সমাজতন্ত্রী এবং আইরিশ শ্রমিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই আমার লক্ষ্য।'

তাঁর পার্লামেন্ট পদ খারিজ করে দেওয়ার দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে, তিনি শীগগিরই পার্লামেন্টে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনকে ভেংচি কাটবার ও তাঁকে কাপুরুষ বলে অভিহিত করার আশা রাখেন।

তারপর তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন, '২১ বছর বয়সের একটি মেয়েকে যদি পার্লা-মেন্টের আদি জননী ক্লক টাওয়ারে আটকে রাখেন তাহলে পাশ্চত্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি কি বলবে সেকথা অনুমান করতে পারেন কি?'

মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর জন্মশতবর্ষপূর্তি এই শতাব্দীর অন্যতম স্মরণীয় ঘটনারূপে চিহ্নিত হবে। তাঁর জীবন ও আদর্শ বর্তমান যুগের মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ভারতবর্ষের মানুষের মনে তিনিই প্রথম এনেছিলেন আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষাকে তিনিই দিয়েছিলেন একটি সামগ্রিক রূপ। গান্ধীজী রাজনৈতিক আসরে আবির্ভূত হবার আগেও স্বাধীনতার জন্য তীব্র আন্দোলন হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের এই বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন এবং বিপ্লবীদের সংগঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক চেতনার প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু সেই আন্দোলন ছিল সীমাবদ্ধ, তা গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে পারেনি। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে এসে গান্ধীজীই ভারতের অগণিত মূক জনতার কাছে স্বাধীনতার বাণী নিয়ে যান। গ্রামে-গাঁথা ভারতবর্ষের মূলে শক্তির উৎস কোথায় তা তিনি জানতেন। তখন থেকেই তাঁর আশ্চর্য জীবনের অগ্রযাত্রার শুরু। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের অল্প কিছুকাল পরে এক শোকাবহ ঘটনায় তার পরিসমাপ্তি।

গান্ধীজীর জন্মের শত বৎসর পূর্তি সারাদেশে উদযাপিত হচ্ছে। দূর-দূরান্তরের মহাদেশেও এই মানুষটির নাম আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয়। কারণ তিনি শুধু ভারতবর্ষের মানুষই ছিলেন না, ভারতের নর-নারায়ণকে সেবা করে তিনি দুনিয়ার বঞ্চিত, পীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। অহিংসার মন্ত্রে তিনি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন জগতকে এবং তাঁর দেশবাসীকে। তাতে তিনি কতটা সফল হয়েছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু সশস্ত্র ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে একটি নিরস্ত্র জাতিকে সংগঠিত করবার জন্য এর চেয়ে বড় শক্তি আর ছিল না। গান্ধীজী নিজের জীবনে, কর্মে ও রাজনীতিতে মনের অদম্যশক্তি ও আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত অহিংসা নীতির উদ্বোধন করে গেছেন। এই বিশাল দেশে নানা বিরুদ্ধশক্তি ও নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও তিনি কংগ্রেসকে গণ-আন্দোলনের প্রধান সংগঠনে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং নীতির জোরেই। বহুবার জনতা তাঁর নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে, গান্ধীজী তার জন্য নিজে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। রাজনীতিকে তিনি জীবননীতি বা সমাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখেননি। তাই শুধু একটি কৌশল বা ক্ষমতা লাভের উপায় হিসাবে তিনি রাজনীতি করেননি। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন, আত্মিক, বৈষয়িক এবং রাজনৈতিক। স্বরাজ বলতে তিনি তাই বুঝতেন। ভারতের সমাজব্যবস্থার জাতিভেদ প্রথা মহাত্মাকে ব্যথিত করত। তাই তিনি অস্পৃশ্যতা দূর করাকে জীবনের অন্যতম মহান ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্ম-বিদ্বেষ এই জাতির প্রাণশক্তিকে বারংবার আঘাত করেছে। এই জাতির অবমাননার অন্যতম কারণ পারস্পরিক অবিশ্বাস, অসহিষ্ণুতা এবং হানাহানি। তাতে ইন্ধন জোগাত বিদেশী শাসকরা। মহাত্মাজী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সাধনের লক্ষ্যকে গ্রহণ করেছিলেন জীবনের ধ্রুবতারারূপে। মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা আর মমতায় তাঁর হৃদয় ছিল আপ্লুত।

ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে মহাত্মাজীকে দেখে যেতে হয়েছে নিদারুণ ভ্রাতৃঘাতী কলহ যার পরিণামে হয়েছে দেশভাগ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের সর্বনাশ। এই রক্ত ও অশ্রুর বিনিময়ে তিনি স্বাধীনতা চাননি। তাঁর জীবনের সকরুণ ট্র্যাজেডি এইটিই। তাই আমরা দেখেছিলাম দিল্লীতে যখন স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলিত হচ্ছে, সারাদেশ আনন্দ উৎসবের অংশভাগী, তখন এই মানুষটি বিচরণ করেছেন নোয়াখালির পথে পথে, কাজিরখিলে, রামপুরে, চৌমোহানীতে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সর্বহারা মানুষের পাশে পাশে। সেখান থেকে তিনি ছুটে গিয়েছেন বিহারে আর্ত মানুষের কান্না সহ্য করতে না পেরে। ধর্মোন্মত্তদের হাতেই তিনি প্রাণ দিলেন। জীবনে তিনি ছিলেন মহাত্মা, মৃত্যুতেও তিনি হলেন বরণীয় শহীদ। মহাত্মার জীবন ও মৃত্যু এযুগের মহাকাব্যের মতো অনন্ত বিষাদে মহিমান্বিত।

তাই আজ তাঁর শতবর্ষের জন্মজয়ন্তী উৎসবে সেই নিঃসঙ্গ সর্বত্যাগী মানুষটিকে আমরা কীভাবে স্মরণ করব? আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর কোনো ইচ্ছাই পূর্ণ হয়নি। তাঁর স্বপ্নের ভারত, স্বপ্নের পৃথিবী এখনও অনেক দূরে। মহাত্মাজী বলতেন, প্রতিটি মানুষের চোখের অশ্রু মোছানোই আমার সবচেয়ে বড় কাজ। সেই অশ্রুহীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন সফল হয়নি। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য তিনি আত্মবিসর্জন দিয়ে গেছেন। সেই সম্প্রীতি এখনও আমাদের অনায়ত্ত। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর বাণী তিনি প্রচার করে গেছেন। আজ তাঁর জন্মজয়ন্তী বৎসরে তাঁরই জন্মস্থান গুজরাটে সাম্প্রতিককালের বীভৎসতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় শত শত মানুষের প্রাণ বিনষ্ট হল। অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। আজও এদেশে অস্পৃশ্যকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। তবে আমরা কী দিয়ে মহাত্মার স্মৃতি পূজা করব? বেদীতে মালা দিয়ে, তাঁর প্রতিকৃতি উপাসনা করে? তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিয়ে? আজ আমাদের আত্মানুসন্ধানের দিন। মহাত্মারা আসেন এবং চলে যান। তাঁদের বাণী শাস্ত্রবাক্যে পরিণত হয়। কিন্তু জীবনের মধ্যে যে দীনতা, হিংস্রতা ও কুটিলতা তাকে আমরা দূর করে সেই মহাত্মার যোগ্য উপাসনা কখনো করে উঠতে পারি না।

জয়তু
মহাত্মা গান্ধী

তারিখটা আমি স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু তারিখের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো ঘটনাটা। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রায় মাঝামাঝি সময়। কলকাতা পরিদর্শনে এলেন গান্ধীজী। তখন তাঁর বিরাট নাম ও খ্যাতিকে অনেক দূর প্রসারিত করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর দেশবাসীর মানবাধিকার ও আত্মসম্মানের জন্য সংগ্রাম আর অহিংসার আদর্শকে উন্নীত করতে গিয়ে বিনাদোষে দুঃখ-বরণের কাহিনী। সংবাদপত্রে প্রচারিত হল, তাঁর কলকাতা পৌঁছানর খবর। জনসাধারণ তাঁকে দেখার জন্য ও তাঁর কাছ থেকে উপদেশ ও প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে ভারি ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল।

তখন সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছি। দূর থেকে হলেও, আমার বয়সী অন্য যুবকদের মতো আমিও মহাত্মাজীর খানিকটা সংস্পর্শে আসার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েছিলাম। কলকাতায় একটা কমিটি গঠন করা হলো, মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। কাশিমবাজারের মহারাজা স্বর্গত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আপার সার্কুলার রোডের বাসভবনে, এখন তার নাম পাল্টে রাখা হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, একটা পাবলিক মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সভার সময় স্থির করা হয় বিকেলে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সকলেই আশা করছিলাম, সস্ত্রীক গান্ধীজী একটা প্রকাণ্ড গাড়ীতে করে আসবেন। তিনি চাননি যে কেউ তাঁকে গিয়ে নিয়ে আসুক। তখনও তিনি মহাত্মাজী হিসেবে পরিচিত হননি। আমরা যখন তাঁর আগমনের জন্য অপেক্ষা করছি, কে একজন বিশুদ্ধ শাদা ধুতি, কুর্তা আর চাদর-পরা একজন বেঁটেখাটো ভদ্রলোকের দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে উঠলেন। খালি পা, কিন্তু মাথায় গুজরাটী পাগড়ী। হাতে বেড়াবার ছড়ি। ফুটপাথ বরাবর দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছিলেন প্রধান ফটকের দিকে। সেখানে তাঁর আপ্যায়নকারীরা অপেক্ষা করছিলেন। প্রত্যেকেই সেই মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ছুটে গেল। নমস্কারের ভঙ্গিতে তিনি তাঁর দুহাত উপরে তুললেন। তাঁকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর উদ্দেশে দেওয়া হল একটা ভাষণ। তিনি বললেন, ইংরেজীতে। এই মহামানবের সঙ্গে এ হল আমার প্রথম সামান্য পরিচয়।

কলকাতা পরিদর্শনের সময়, মহাত্মাজী বিশ্ববিদ্যালয় বাড়ীর সামনে কলেজ স্কোয়ারের (গোলদীঘির) একটি জনসভায় ভাষণ দেন। পরনে ছিল সেই শাদা ধুতি, কুর্তা ও পাগড়ী। কিন্তু এবার বললেন তিনি হিন্দীতে। তাঁর ভাষা ছিল গুজরাটীর মুখে হিন্দী। তাতে অনেক গুজরাটী শব্দের মিশাল ছিল, আর বলবার ভঙ্গি ছিল গুজরাটী। তাঁর হিন্দী এই ধরনের ছিল, যেমন—'সংস্কৃত ভাষা কী দীকরী হমারে উত্তর ভারত কী ভাষাও' (সংস্কৃতের দুহিতা আমাদের উত্তর-ভারতীয় ভাষা-সমূহ)। দর্শক খুব বেশী ছিল না। নিকটে ছিল কলকাতা পুলিশের একটা দল। কিন্তু সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কথা শুনছিলেন মনোযোগ সহকারে।

পরে শুনলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মিস্টিক ('রহস্যবাদী') নাটক 'ডাকঘর'-এর অনুষ্ঠান দেখার জন্য মহাত্মা গান্ধী আমন্ত্রিত হয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, ভাইপো গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ তাতে অংশ গ্রহণ করেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের সংগে। মহাত্মাজী অভিনয় দেখে দারুণ খুশি। কস্তুরবাও।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯২১—২২ সালে কাগজে পড়লাম, অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, অহিংসা, জাতীয় পুনর্বাসন আর স্বাধীনতার জন্য মহাত্মাজীর নোতুন আন্দোলনের কথা। এসব ছিল আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রথম দিককার কৌশল থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা এর আগে কেবল জানতাম, বাংলা মহারাষ্ট্র আর পাঞ্জাবের 'অ্যানার্কিস্ট' আর 'টেররিস্ট' স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের। সত্যাগ্রহ ও অহিংসার এই নোতুন পদ্ধতির চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে তখন কিছুটা ভ্রান্তি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নোতুন ভাব বা চিন্তাধারাটি গৃহীত হল। বিস্তৃত কর্মসূচীর কতকগুলি ব্যাপারে মতভেদ হল, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ও গণচেতনার জাগরণে চরকার আবেদন সামান্যই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে, যদিও কবির বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মূল্য সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন। তবু শ্রদ্ধা ও সম্মানহানি হয়নি কখনো কারো দিক থেকে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ওপর ছিল মহাত্মাজীর অপরিসীম শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি তাঁকে 'বড়দাদা' বলে ডাকতেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মহাত্মাজী স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে তাঁর নিজের লোকদের মধ্যে কাজ করতে এলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্য শান্তিনিকেতনের দরজা খুলে দেন। শান্তিনিকেতনের বাঙালি-অবাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সমর্থন ছিল মহাত্মাজীর কাজে। নন্দলাল বসুও গান্ধীজীর কতকগুলি আদর্শকে গ্রহণ করেন এবং শিল্পের মাধ্যমে সেগুলিকে তুলে ধরেন।

পরবর্তী ঘটনায় গান্ধীজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, ১৯৪০-এর কিছুকাল পরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিদর্শনের সময়। সে সময়ে তিনি স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যিনি একা-একা বাংলা ভাষায় বিরাট এনসাইক্লোপিডিয়া 'বিশ্বকোষ' প্রণয়ন করেছিলেন। বসুর কাজের প্রতি গান্ধীজীর আন্তরিক প্রশংসার ফলে বাংলা বিশ্বকোষের মতো প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরীর আন্দোলন শুরু হয়। গান্ধীজী সাহিত্য পরিষদে এলে, গভর্ণিং বডির সদস্য হিসেবে আমি তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলাম। যেহেতু আমি সামান্য হিন্দী জানতাম, সেজন্যে আন্দাজ করেছিলাম হয়তো আমাকে দোভাষীর কাজ করতে হবে। সে সময়ে মহাত্মাজী কুর্তা ও পাগড়ী ছেড়ে দিয়েছিলেন, কোমরে খাটো ধুতি আর গায়ে চাদর আর পায়ে চপ্পল প'রতেন। তাঁর বাঁ কাঁধে ছিল একটা খদ্দরের ছোট্ট ঝোলানো ব্যাগ। কোমরে দুলছিল কালো সুতোয় বাঁধা তাঁর ঘড়িটি ধুতির আড়ালে। পৌঁছবার পর, তাঁর সঙ্গে সকলের পরিচয় করানো হল। জিজ্ঞেস করা হল তিনি বাংলা বুঝতে পারেন কিনা। তিনি বললেন, বলতে না পারলেও বুঝতে পারেন ভালোভাবেই। রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য-দের কয়েকটা গানও তিনি ভালোবাসেন। সেজন্যে দোভাষীর আর প্রয়োজন ছিল না। আমিও আশ্বস্ত হলাম। আমার হিন্দীজ্ঞান ছিল অনুল্লেখ্য। আমরা প্রধানত জনকল্যাণ, চরকা ও খদ্দরের গুরুত্ব—এমনি সব বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে করতে বিভিন্ন ঘর আর গ্যালারির মধ্য দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করছিলাম। মেজাজের দিক থেকে মহাত্মাজী সাদাসিদে। ইতিহাস আর পুরাণ, শিল্প আর নৃতত্ত্বের মতো বিষয়ে ছিল তাঁর সামান্য কৌতূহল। পরিষদ মিউজিয়ামে যখন প্রাচীন ভারতীয় কয়েকটা সুন্দর ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন তিনি তাঁদের প্রতি একটা নম্র দৃষ্টিপাত করলেন মাত্র। কিন্তু আগ্রহ প্রকাশ করলেন সেইসব কাজে, যার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের সাহিত্যিকদের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করছিলাম, গ্যালারিতে তাঁদের পোর্ট্রেট টাঙিয়ে, তাঁদের রচনাবলীর পুনর্মুদ্রণে ও অনুশীলনে। বাস্তব জিনিস তাঁকে অধিকতর আগ্রহী করেছিল, পণ্ডিতী অনুধ্যানের চেয়ে। যা নিয়ে আমাদের পণ্ডিতরা

সাধারণত ব্যস্ত থাকেন, তার উৎপত্তি আর বিকাশের অনুশীলনের চেয়েও নৈতিক কিংবা দার্শনিক আদর্শ যা আমাদের জীবনের কিছুটা পরিচালক, তাই তাঁকে বেশী পরিমাণে কৌতূহলী করেছে। ঐ একই মনোভাব লক্ষ্য করেছিলাম আমরা, যখন তিনি আমাদের প্রকাশিত বই নিয়ে, মন্তব্য-পুস্তকে সই করে সাহিত্য পরিষদ থেকে পরিদর্শন শেষে বেরিয়ে যান, তখন। বাইরের জনতা হাত জোড় করে ধ্বনি দেয়—'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়'। হিন্দুস্থানী বা বাজারিয়া হিন্দীতে তিনি একটা ছোট্ট ভাষণ দেন। বলেন : 'মনে হচ্ছে, এখানে তোমরা বেশীর ভাগই, কলকাতার মজদুর বা শ্রমিক। তোমরা সরল মানুষ। সকলে চেষ্টা করবে, সরল, সৎ ও ভালো থাকতে। একই সঙ্গে তোমাদের দরিদ্র ভাইবোনদের সাহায্য করবে। আর চেষ্টা করবে নিজের দেশের মধ্যে স্বরাজ আনতে। তোমাদের সকলকেই খদ্দর পরতে হবে। তা ছাড়া, তোমরা ঘর, বাড়ী ছেড়ে দূরে এসেছ, কলকাতায় আছো। কখনো মদ ভাঙ দারু তাড়ি খাবে না। সহজ জীবন যাপন করবে। সর্বোপরি, চেষ্টা করবে সৎ হতে। আর নিয়মিত রামনাম করবে। কখনো রামনাম করতে ভুলবে না।'—ভাষণটি ছিল অত্যন্ত সহজ, আর সমবেত সাদাসিধে মানুষগুলির হৃদয়স্পর্শী। আমি জল দেখেছি কারো কারো চোখে—গান্ধীজীর এই সরল উপদেশে। তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বলে উঠলো : 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়'।

আমি অভিভূত হয়েছিলাম মহাত্মাজীর কমনীয় ব্যক্তিত্বে আর আমাদের শ্রমিক শ্রেণীর ওপর সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাব লক্ষ্য ক'রে। তিনি ঝগড়া-বিবাদের প্রতিকূলে শ্রমিকদের শান্তিপ্রিয়তা আর পারস্পরিক মৈত্রীর আগ্রহের প্রতি আবেদন জানিয়েছিলেন।

১৯৩৫ সালে য়ুরোপ যাবার পথে বোম্বাই যাচ্ছিলাম ট্রেনে করে। সেখান থেকে ধরব জেনোয়ার জাহাজ। মনে হয়, মহাত্মা গান্ধীও বোম্বাই যাবার জন্য ট্রেনে ওঠেন ওয়ার্ধা থেকে। আমার কামরায় ছিলেন একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক। তিনি বললেন, গান্ধীকে দেখতে যাবেন তিনি পরের স্টপে। স্বভাব বশে ভাবলেন, গান্ধীজীকে দেখার জন্য তাঁর ভদ্র পোষাক পরা উচিত। তিনি তাঁর কোট পরলেন। আমি পরেছিলাম ধুতি-কুর্তা। মহাত্মাজী আর তাঁর সঙ্গীরা যে-গাড়ীতে যাচ্ছিলেন, সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় গেলাম পরের স্টেশনে। দেখলাম, জানালার ধারে নয়, মহাত্মাজী বসে আছেন একটা মাঝের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে। গাড়ীর জানালা বরাবর প্ল্যাটফর্মের ওপর একটা জনতা গান্ধীজীর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। গান্ধীজীকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে যান্ত্রিকভাবে কথা বলে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর সহগামীদের একজন স্বেচ্ছাদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ নিচ্ছিলেন আর কাপড়ের থলির মধ্যে পুরে রাখছিলেন।

আমি কোনোরকমে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করলাম। কথা বলার সুযোগ পেলাম ট্রেন ছেড়ে দেবার পর। সাহিত্য পরিষদ পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। বললাম, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ধ্বনি-বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভারতীয় বিভাগের সভাপতিত্ব করার জন্য লণ্ডন যাচ্ছি। কিন্তু লণ্ডন যাবার পথে আমি কন্টিনেন্ট ঘুরে যাব। অন্যান্যদের সঙ্গে, ভিয়েনায় চিকিৎসারত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা করব। তিনি হিন্দীতে বললেন, "আমি আনন্দিত যে তুমি সুভাষকে দেখতে যাচ্ছ। তাকে আমার শুভেচ্ছা দিও। আর বলো, ক্রমাগত অসুস্থ হয়ে থাকলে চলবে না। তাকে শীঘ্র সুস্থ হতে হবে। কারণ, দেশ তাকে চায়।"

বছর কয়েক পরে গান্ধীজী আবার কলকাতায় এলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বড় মেয়ে শ্রীমতী অপর্ণা রায়, যিনি গান্ধীজী ও কস্তুরবার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিতা, তিনি মহাত্মাজী ও তাঁর সঙ্গীদের স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানালেন নিজের ও ব্রজ-মাধুরী সঙ্ঘের সভ্যদের গাওয়া বাংলা বৈষ্ণব-কীর্তন শোনার জন্য। বাংলা কীর্তনের বিকাশ ও বিস্তারের জন্য তিনি সঙ্ঘটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহাত্মাজী সানন্দে সম্মত হলেন। এর জন্য একটা দিন ঠিক হল। শ দুয়েক মাত্র লোকের ব্যবস্থা। অপর্ণা দেবী মহিলাদের সতর্ক করে দিলেন যেন অনুষ্ঠানে কেউ দামী গয়না পরে না আসেন। তিনি জানতেন, মহাত্মাজী হরিজনদের কাজের জন্য দান করতে বলবেন। আর, তাঁরা চিন্তাভাবনা না করেই গয়নাগাটি যা থাকবে, তাই দান করবেন। হয়তো পরে এর জন্য অনুতাপ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী অপর্ণা দেবী তাঁর জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনা আমাদের বলেন। তাঁর প্রথম ছেলে, শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় যখন শিশু, তখন এ ঘটনা ঘটে। অপর্ণা দেবীর পিতা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যখন ব্যারিস্টারী করতেন, যখন তিনি তাঁর প্রথম দৌহিত্রকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢেকে দেবার মতো এক সেট দামী সোনার গয়না দেন। একদিন তাঁর বাড়ীতে মহাত্মাজী এলেন দেশবন্ধুকে দেখার জন্য। সন্তান-গর্বে গর্বিতা ছেলেমানুষ মাতা, প্রিয় দাদুর দেওয়া সমস্ত অলঙ্কারসহ মহাত্মাজীর কোলে তাঁর ছেলেকে তুলে দিলেন আশীর্বাদের জন্য। কস্তুরবাও সেখানে ছিলেন। মহাত্মাজী শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করে বললেন, "তুমি জানো না শিশুকে কিভাবে সাজাতে হয়।" তারপর তিনি শিশুটিকে বিছানার ওপর রেখে তার গা থেকে সমস্ত গয়না খুলে ফেলতে লাগলেন আর এক টুকরো কাপড়ের উপরে তা স্তূপী-কৃত করলেন। কস্তুরবা প্রতিবাদ করলেন : "কী নিষ্ঠুর তুমি, এই সুন্দর ছোট্ট শিশুটির গা থেকে গয়নাগুলি খুলে নিচ্ছ!" গান্ধীজী হেসে বললেন, "তুমি বুঝতে পারছ না। দেখো, আমি কী করছি।"

এর পর যখন শিশুর গা অলঙ্কারহীন হলো, তখন তিনি তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বললেন, "এখন তাকে দেখা যাচ্ছে নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে। সমস্ত গৌরব নিয়ে সম্রাটের মতো।" বলতে থাকেন, "এ শিশুর নামে আমি এসব নিয়ে যাচ্ছি হরিজনদের কাজে তার উপহার হিসেবে। এখন আমাকে তোমার গয়নার বাক্সটা এনে দাও।" অপর্ণা দেবী বললেন, তাঁর চোখ দিয়ে প্রায় জল বেরোবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সংযত করে তিনি তাঁর নির্দেশ অনুসারে মহাত্মাজীর কাছে গয়নার বাক্সটি এনে দিলেন। মহাত্মাজী জিনিসগুলি পরীক্ষা করে কয়েকটা ভারি গয়না বেছে নিলেন। কয়েকটা দেখলেন হাতে ওজন করে। তার পর সেগুলি নিয়ে বললেন, "দেখো, একজন মহাপুরুষের, বড় বাপের মেয়ে হিসেবে তুমি বুঝতে পারবে। এগুলি আমি তোমার কাছ থেকে নিচ্ছি হরিজন আন্দোলনের জন্য। প্রতিশ্রুতি দাও, তোমার কাছ থেকে আজ আমি যেসব জিনিস নিচ্ছি, সেসব আর কখনো নতুন করে তৈরী করাবে না।" অপর্ণা দেবী আমাকে বললেন, এর পর তিনি একটা গভীর আরাম, আনন্দ ও শান্তির স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছেন।

কিন্তু তিনি জানতেন না, অনুরূপ অভিজ্ঞতা অন্যেরা কিভাবে গ্রহণ করবে। সেজন্যে নিমন্ত্রিত মহিলারা কীর্তনের দলে এলেন অতিরিক্ত গয়নাগাটি না পরে। যা না হলে নয়, তাই তাঁদের সঙ্গে ছিল—তার বেশী নয়। মহাত্মাজী প্রাচীন বাংলা কীর্তন শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলে, আমি ডজনখানেক গান, যা অপর্ণা দেবী ও অন্যেরা গাইবার জন্য ঠিক করেছেন, সেসব নাগরীতে লিখে দেবার প্রস্তাব করি আর মুখে মুখে যেসব ধুয়াসহ তার অনুবাদ। অপর্ণা দেবী এই আইডিয়া পেয়ে দারুণ খুশী। আমি গানগুলি নিজের হাতে লিখে একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে বেশ বেগ পেয়েছিলাম।

পূর্বনির্ধারিত দিনে মহাত্মাজী এসে পৌঁছলেন তাঁর দলবল নিয়ে। অপর্ণা দেবী ও তাঁর স্বামী প্রখ্যাত ব্যারিস্টার স্বর্গত সুধীর রায় অতিথিদের অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু কিছুটা অসুবিধা দেখা দিল। দর্শনার্থী জনতার ভিড়ে সারা পথ ভর্তি। সকলেই মহাত্মাজীর দেখা পেতে ব্যগ্র। কোনোরকমে আমরা তাঁকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এলাম। ফটকগুলি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। তাঁকে ওপরতলায় নিয়ে যাওয়া হল গান শোনাবার জন্য। অল্পক্ষণের মধ্যে গান শুরু হল। কিন্তু আমি অসহায়ভাবে দেখলাম, নাগরী লিপিতে আমার লেখা মূল বাংলা গান ও তার হিন্দী অনুবাদ সেখানে নেই। খোঁজখবর নিয়ে তাঁর সেক্রেটারীর কাছে জানলাম, ভুলক্রমে পাণ্ডুলিপিটি মহাত্মাজীর বাসায় ফেলে আসা হয়েছে। শ্রীসুধীর রায় তৎক্ষণাৎ তাঁর গাড়ীতে করে একজনকে পাঠালেন। আধঘণ্টার মধ্যে আনানো পাণ্ডুলিপিটি আনানো হলো। আমি

ও আমার বন্ধুরা খুব খুশী যে মহাত্মাজী এখন মূল ও অনুবাদ মিলিয়ে সমস্তই ভালোভাবে বুঝতে ও উপভোগ করতে পারবেন। ধৈর্যের সঙ্গে বসে বসে তিনি সব শুনলেন। অনুষ্ঠান ঘণ্টা দুয়েক চলল।

তারপর এল চরম মুহূর্ত। মহাত্মাজী হিন্দীতে বললেন, "কীর্তন তো শুনায়া। বহুৎ আচ্ছা। অব হরিজনকে লিয়ে কুছ দান তো দো" (কীর্তন তো শোনালে। বেশ লাগল। এখন হরিজনদের জন্য কিছু দান তো দাও।) চারদিক থেকে টাকাকড়ি, কারেন্সি নোট আসতে শুরু হল—দশ টাকা, পাঁচ টাকা—কখনো তার চেয়েও কম। এভাবে সংগৃহীত হল বেশ কিছু টাকা। তারপর শুরু হল, অন্যভাবে এই চাঁদা সংগ্রহ। এক তরুণী মহিলা কানের দুল দুটো খুলে গান্ধীজীর পায়ের কাছে রাখলেন। ধন্যবাদ দিয়ে তিনি সেগুলি ঝুলিতে পুরলেন। অন্যেরা অনুসরণ করলেন তাঁকে। বেশ কয়েক জোড়া কানের দুল এভাবে থলিস্থ হল। তারপর একজন মহিলা দান করলেন তাঁর সোনার বালা এবং আরো কিছু। মহাত্মাজী হরিজনদের জন্যে এসব পেয়ে বেশ খুশী হলেন।

এ সময়ে বাইরের জনতা উঠল অস্থির হয়ে। লোহার গেট ভেঙে তারা ঢুকে পড়ল বাড়ীর ভেতর। কম্পাউণ্ডের ঘাসের জমি আর ফুলের বাগান লোকে ভর্তি হয়ে গেল। মহাত্মাজী খোলা বারান্দায় এসে দু দুবার জনতাকে শান্তভাবে থাকতে ও আচরণ করতে বললেন। তাঁর বারবার অনুরোধ : "আপ-লোগ শান্ত হো জাইয়ে" (আপনারা শান্ত হোন)। কারো কানেই গেল না তাঁর কথা। "মহাত্মাজী কী জয়" ধ্বনিতে তাঁর কণ্ঠস্বর ডুবে গেল। ভীষণ অসুবিধা হল, জনতার মধ্য দিয়ে তাঁকে নিয়ে গাড়ীতে তুলতে।

অন্য কয়েকটা উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। সেগুলি জাতীয় ভাষার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত তাঁর কলকাতা পরিদর্শনের সময়। মহাত্মাজী ভাবতেন যে, সকল হিন্দুস্থানী—এক ধরনের বাজারিয়া হিন্দী, স্বাভাবিক আরবী-ফার্সী সব রকম শব্দসহ—উত্তর-ভারতীয় জনসাধারণের উপযুক্ত ভাষা হতে পারে। তাকেই তিনি ভারতের "রাষ্ট্রভাষা" হিসেবে গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তখন অসুবিধাগুলি বিচার করার জন্যে যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়নি, যাতে হিন্দী এলাকার বহির্ভূত অন্য ভারতীয় ভাষা-ভাষীরা তাঁদের বক্তব্য জানাতে পারেন, অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের বাংলা-আসাম-উড়িষ্যা, —উত্তরের কাশ্মীর ও পশ্চিমের সিন্ধু এবং দক্ষিণের বিরাট এলাকা, যেখানে আছে তেলুগু, কানাড়া, তামিল আর মালয়ালাম ভাষা। কিন্তু মহাত্মাজীর দৃষ্টিতে সমস্যাটি ছিল অত্যন্ত সহজ। এমন কি এই সহজ সমস্যাটির মীমাংসা করতে তাঁকে উত্তর-ভারতেই অসুবিধায় পড়তে হল। জাতীয় প্রয়োজনে উর্দুভাষী মুসলমানদের সমর্থন লাভ করার উদ্দেশ্যে মহাত্মাজী প্রস্তাব করলেন ভারতের "রাষ্ট্রভাষা" নাগরী ও ফার্সী উভয় লিপিতে লেখা হবে। তার শব্দ-ভাণ্ডারে থাকবে সংস্কৃত আর আরবী-ফার্সী উভয়বিধ শব্দ। কিন্তু লিপির ব্যাপারে এই সমাধানের প্রস্তাব আমার মতো অনেকেরই মনঃপূত হল না। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে কলকাতায় দু তিনবার দেখা করি, এবং যাঁরা উর্দু লিপিতে অভ্যস্ত নয়, তাদের অসুবিধার কথা আমি বিনীতভাবে তাঁর গোচরে আনি। বললাম, ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো অসুবিধা বোধ করি না, কারণ, নিজের ভাষা বাংলার লিপির মতোই স্বচ্ছন্দে আমি আরবী লিপিতেও লিখতে পারি—যদিও আরবী ফার্সী উর্দুতে আমার দখল অতি নগণ্য। কিন্তু মহাত্মাজী তাঁর ধারণার তীব্র অবিচলিত বিশ্বাসে, কিছুটা অধৈর্যের সঙ্গে, আমার আপত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন : "আমি যা বলি, দয়া করে তার একটা পরীক্ষা করতে দাও। আমি স্থির বিশ্বাস করি যে এটা সত্যসম্মত। কেবল তা সফল করতে তুমি তোমার ইচ্ছাকে আমার সঙ্গে মানিয়ে নাও।"

মহাত্মাজীর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার সামগ্রিক ধারণা এই যে, নিজের বিশ্বাস ও ভাবনায় মধ্যে তিনি একজন মহাপুরুষ। জনগণের প্রতি ছিল তাঁর প্রকৃত ভালোবাসা। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁরা সৎ জীবনযাপন করুক, দৈহিক ও আত্মিক দিক দিয়ে পৃথিবীতে উন্নত হোক। মানুষকে যা আরাম এনে দেয়, সেরকম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে গান্ধীজীর কোনো বিশ্বাস ছিল না। তিনি মানুষের দেহ, মন ও আত্মার উন্নতি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। এই ছিলেন মহাত্মাজী—সেই রকমের মানুষ, যার আবির্ভাব বহু-যুগের পর মাত্র পৃথিবীতে একবারই হয়ে থাকে। ভারতবাসী হিসেবে আমরা ভাগ্যবান যে এরকম একজন মানবপ্রেমিককে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের মধ্যে, এমন একজন সুদূরদ্রষ্টা যিনি আমাদের ঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। *

* মূল প্রবন্ধটি ইংরেজিতে লিখিত, বাংলায় অনুবাদ করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ ভৌমিক।

।। একুশ ।।

ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত করতে হবে, মুসলিম লীগের এই প্রস্তাব এক খাকসার বাদে আর কোনো মুসলিম দল সমর্থন করেননি। সে প্রস্তাবের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দুই পাখী মারা। একটি তো কংগ্রেসের মিশ্র নেতৃত্ব, আরেকটি লীগ বহির্ভূত মুসলিম নেতৃত্ব। পাকিস্তানের ইস্যুতে নির্বাচনে নামলে কংগ্রেসী মুসলমানদের তো হারিয়ে দেওয়া যাবেই, কৃষক-প্রজা, ইউনিয়নিস্ট, আহ্‌রার প্রভৃতি মুসলিম দলগুলিকেও নিশ্চিহ্ন করা যাবে। তখন দুটিমাত্র একচেটে দল থাকবে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। হিন্দু নির্বাচকদের প্রতিনিধি কংগ্রেস, মুসলিম নির্বাচকদের প্রতিনিধি মুসলিম লীগ। একটির সর্বাধিনায়ক গান্ধী, অপরটির সর্বাধিনায়ক ঝীণা। দুই দলের দুই হাই-কমান্ডও থাকবে। দুই পার্লামেন্টারি বোর্ড।

সত্যি সত্যি পার্টিশন হবে মুসলিম লীগ নেতারা কেউ অতদূর দেখতে পাননি বা চাননি। তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন যে মেজরিটি রাজত্ব চলবে না। মেজরিটি মাইনরিটি মিলে একপ্রকার দ্বৈরাজ্য স্থাপন করতে হবে, যাতে উভয়ের মর্যাদা ও ক্ষমতা সমান সমান। যেমন এক সিংহাসনে দুই রাজা। ব্রিটিশ রাজের দুই উত্তরাধিকারী। কেউ বড়ো নয়, কেউ ছোট নয়। তোমার ভোটসংখ্যা বেশী বলে তোমার কথায় কাজ হবে, আমার কথায় হবে না, এমন নয়। তোমার যেমন মেজরিটি ভোট, আমার তেমন মাইনরিটি ভীটো। মোটের উপর তোমাতে আমাতে প্যারিটি। বিরোধ বাধলে নিষ্পত্তি করবার জন্যে মাথার উপরে একজন থাকবেন। তিনি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি।

তবে সেটা এ ব্যবস্থা একেবারেই বিকল হয়। যদি ইংরেজরা সত্যি সত্যি অপসারণ করে তবে পার্টিশন ভিন্ন আর কোনো সমাধান মুসলিম লীগ গ্রাহ্য করবে না। আর মুসলিম লীগ গ্রাহ্য না করার অর্থ মুসলিম সম্প্রদায় গ্রাহ্য করবে না। মুসলিম

অন্নদাশঙ্কর রায়

সম্প্রদায় কেন বলা হবে? বলতে হবে মুসলিম নেশন। যার জন্যে স্বতন্ত্র হোমল্যান্ড চাই। যার একটা নিজস্ব রাষ্ট্র, নিজস্ব সৈন্যদল, নিজস্ব মিত্রগোষ্ঠী। হিন্দুরাও তেমনি হিন্দু নেশন, তাদের স্বতন্ত্র হোমল্যান্ড, নিজস্ব রাষ্ট্র, নিজস্ব সৈন্যদল, নিজস্ব মিত্রগোষ্ঠী। এই তো কেমন চমৎকার বন্দোবস্ত। দ্বিকেন্দ্রীকরণ।

এইপর্যন্ত পৌঁছতে ঝীণা সাহেবের বহুর দশেক লেগেছিল। রোম যেমন একদিনে নির্মিত হয়নি তেমনি ঝীণা সাহেবও একদিনে দ্বৈরাজ্য থেকে দ্বিকেন্দ্রীকরণে উপনীত হননি। কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব নেয় তখন তিনি ছিলেন দ্বৈরাজ্যবাদী। যখন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধকালীন অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের পন্থা ধরে তখন কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেসের হাতে আসার আশঙ্কায় তিনি হন দ্বিকেন্দ্রীকরণবাদী।

গোল টেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজীর কথাবার্তা শুনে ঝীণা সাহেবের মনে ধাঁধা লাগে। তার কারণও ছিল। গান্ধী ইতিমধ্যে বহু মুসলমানকে কংগ্রেসে আনতে পেরেছেন, তাঁরা তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রামও করেছেন, সংগ্রামের শেষে যখন সংগ্রামের ফল পরিবেশনের সময় আসবে তখন তাঁদের একভাগ না দিয়ে আর কোনো মুসলিম দলকে তো দিতে পারা যাবে না। তাই তিনি কোনোরূপ কমিটমেন্ট করেন না। ঝীণা চোখে অন্ধকার দেখেন।

গোল টেবিলের পর ঝীণা বিলেতেই বসবাস করতে শুরু করেন। চারবছর বাদে লিয়াকৎ আলী খান তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন ও মুসলিম লীগের পুনর্গঠন হয়। সেই চারবছর ঝীণা যে কেবল প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করছিলেন তা নয়, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ও গভর্নমেন্টের গতিগতি অনুধাবন করেছিলেন। ব্রিটিশ পলিসি তিনি যেমন বুঝতেন গান্ধীজী তেমন নয়। আর ব্রিটিশ শাসনতান্ত্রিক নিয়মকানুন ও কনভেনশন ছিল তাঁর নখদর্পণে। যেটা গান্ধীর মতো পার্লামেন্টারি প্রথাবিরোধীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ঝীণা কল্পনাও করতে পারেননি যে গান্ধী একদিন প্রাদেশিক মন্ত্রিমন্ডল গঠনে সায় দেবেন ও সর্বপ্রকার পার্লামেন্টারি কনভেনশন উপেক্ষা করে পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামকেও একটা সংগ্রামে পরিণত করবেন। ওটাও যেন ইংরেজে কংগ্রেসে যুদ্ধ। মাঝখান থেকে মুসলিম মাইনরিটির স্বার্থ অবহেলিত। তারা তো লড়াই করতে যায়নি, গেছে মন্ত্রিত্বের ভাগ নিতে, ক্ষমতার অংশীদার হতে। আর এটাও ওরা আশা করেছে যে ওদের যারা আস্থাভাজন তারাই হবে মন্ত্রী। হিন্দুদের যারা আস্থাভাজন তারা কেন হবে?

ঝীণা সাহেব বরাবরই বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সাধারণ স্বার্থ যেমন সত্য মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থও তেমনি সত্য। একটার কাছে আরেকটাকে বলি দিতে তিনি চাননি, চেয়েছেন সামঞ্জস্য। কিন্তু গোল টেবিলে গিয়ে দেখেন সাধারণ স্বার্থ ভিন্ন

আর কোনো বিষয়ে গান্ধীর আগ্রহ নেই, আর সবই অপেক্ষা করতে পারে। আগে তো স্বাধীনতার সংগ্রাম সারা হোক। কিন্তু ঝীণার চিন্তাধারা সেরূপ নয়। স্বাধীনতার পূর্বেই মাইনরিটিদের অভয় দিতে হবে যে মেজরিটিই সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে না। মাইনরিটি যে দেশে আছে সেদেশে ঢালা গণতন্ত্র চলতে পারবে না। বিশুদ্ধ মেজরিটি রুল সেদেশের জন্যে নয়। স্বরাজের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত অনেকরকম চেক আর ব্যালান্স। স্বরাজ চাই ঠিক, কিন্তু তার আগে স্থির হয়ে যাক চেক আর ব্যালান্স।

ভারতবর্ষ বিলেত নয় যে রক্ষণশীল ও শ্রমিকদলের মতো কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পালা করে গভর্নমেন্ট গঠন করবে ও দেশ শাসন করবে। এদেশের নির্বাচকমণ্ডলী এমনভাবে ভাগ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ও ছয়টি প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম লীগ কোনোদিনই মেজরিটি পাবে না, সুতরাং অন্যনিরপেক্ষভাবে সরকার গঠন করতে পারবে না। অপরপক্ষে কংগ্রেস চিরদিন মেজরিটি পাবে ও অন্যনিরপেক্ষ-ভাবে সরকার গঠন করতে পারবে।

তাহলে মুসলিম লীগের দৌড়ে বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক আইনসভা ও বাকী পাঁচটি প্রাদেশিক সরকার পর্যন্ত। এদের মধ্যে আসাম ঠিক মুসলিম মেজরিটি প্রদেশ নয়। কিন্তু ইউরোপীয় ও পার্বত্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে জোট পাকানো যায়। আর উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যদিও কংগ্রেসের অনুগত তবু ইসলামের নামে আবেদন করলে পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দেওয়া যায়। মুসলিম লীগের প্রভাব পাঞ্জাবেও নেই, কিন্তু হতে কতক্ষণ, যদি পাকিস্তানের প্রলোভন সামনে তুলে ধরা হয়। আর বাংলাদেশে কোনো মতে একবার কৃষকপ্রজাদের হাত করতে বা কাৎ করতে পারলেই হলো। বাকীটা ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের সৌজন্য।

ঝীণা সাহেব মনে মনে ধরে নেন যে পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে হটে যাবে, আর ইউনিয়নিস্টরা পাঞ্জাব থেকে। সিন্ধু নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। সিন্ধু তাঁর ভাগে। বাংলা নিয়েই ভাবনা। ফজলুল হক অতি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি যাতে লীগে ফিরে আসেন সেই চেষ্টা হবে। তাহলে আর বাংলা নিয়ে ভাবনা থাকবে না।

এমনি করে পাঁচটি প্রদেশে সরকার গঠন করতে পারলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রায় সমকক্ষ হবে। কংগ্রেসের ছয়, লীগের পাঁচ। এমন কী তফাৎ! এরই জোরে লীগ কি দাবী করতে পারে না যে কেন্দ্রীয় সর-কারে কংগ্রেস ছটা আসন পেলে লীগ পাঁচটা আসন পাবে? ছ'জন মন্ত্রী তো আর পাঁচ-জন মন্ত্রীকে কথায় কথায় পরাস্ত করতে পারেন না। তেমন যদি করেন তবে বড়লাট হস্তক্ষেপ করবেন। নয়তো লীগ দাবী করবে পার্টিশন।

কিন্তু এটা একটা চরম দাবী। ঝীণা সাহেব জানতেন যে পার্টিশন মানেই মুস-লিম লীগের নিজের পার্টিশন, মুসলিম সম্প্রদায়ের নিজের পার্টিশন। লীগ রাজী হবে কেন? সম্প্রদায় সম্মত হবে কেন? কতক লোকের লাভ হবে ঠিক, কিন্তু কতক লোকের লোকসানও তো হবে। কেমন করে তিনি বলবেন যে পাকিস্তানই মুসলমান মাত্রের কাম্য, মুসলমানমাত্রের বাসভূমি?

কাজেই দ্বিধা তাঁর আপনার অন্তরেই ছিল। লীগের ১৯৪০ সালের প্রস্তাবেও পাকিস্তান শব্দটা ব্যবহার করা হয়নি। তার জায়গায় ছিল 'মুসলিম ইন্ডিয়া'। তাও একটা নয়, একাধিক। অন্তত বাঙালী মুসলমানদের তাই বুঝতে দেওয়া হয়। তাঁদের সকলের আশঙ্কা ছিল কেন্দ্রটা হিন্দুর একচেটে করবে। তাই তাঁরা যা চেয়েছিলেন তা একটিমাত্র কেন্দ্র নয়, তা সোজাসুজি দ্বিকেন্দ্রীকরণ।

আঠারো দিন ধরে গান্ধী ঝীণা সংবাদ চলে। গান্ধীই বার বার ঝীণার বাড়ী যান। ঝীণা একবারও আসেন না। পরিশেষে কথাবার্তা ভেস্তে যায়।

হিন্দু আর মুসলমান এক নেশন না দুই নেশন এ নিয়ে বিস্তর কথাকাটাকাটি চিঠি চালাচালি হয়। কিন্তু কাজের কথা অতি সামান্য। যেটা হলে পার্টিশন নিবারিত হতো সেদিক দিয়ে গান্ধীজী যান না, সেটা হলো কংগ্রেস লীগ পার্টনারশিপ। অর্থাৎ কেন্দ্রে ও প্রত্যেকটি প্রদেশে কংগ্রেস লীগ কোয়ালিশন গভর্ণমেন্ট। পার্টনার-শিপের বিকল্প যে পার্টিশন এটা কে না জানে? পার্টনারশিপও নয়, পার্টিশনও নয়, এমন কোন ব্যবস্থা যদি থাকে তবে তার নাম রোটেশন। অর্থাৎ পাঁচ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করবে, পাঁচ বছর লীগ রাজত্ব করবে। চক্রবৎ পরিবর্তিত হবে দেশের কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক সরকার।

তা নয়, গান্ধীজী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা পেশ করেন। ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর আবার ওই প্রস্তাবের একটি সূত্র উত্থাপন করেন তিনি। বেলুচীস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এই তিনটি মুসলিমপ্রধান প্রদেশ আর বাংলা, আসাম পাঞ্জাব এই তিনটি প্রদেশের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে পারা যায়, তারা ভোট দিয়ে বলবে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের

সর্বোদয়

গান্ধীজির সামাজিক ও অর্থনৈতিক দর্শন

মনকুমার সেন

গান্ধীজি তখন এক মামলা নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছেছেন: চলেছেন জোহান্সবার্গ থেকে ডারবানে। ট্রেনে চব্বিশ ঘন্টার পথ। যেতে যেতে পরমসুহৃদ হেনরী পোলক গান্ধীজিকে পড়তে দিলেন একখানি চটি বই : জন রাসকিনের 'আনটু দিস্ লাস্ট'। গান্ধীজী বইটি পড়তে গিয়ে অভিভূত হলেন. বক্তব্যের মৌলিকতা, অভিনবত্ব ও গভীরতা তাঁর সমগ্র সত্তাকে এক বৈপ্লবিক চেতনায় অনুপ্রাণিত করে তুলল। শ্রম ও সাম্যের আধারে গঠিত জীবনই যে সত্যিকার জীবনশিল্প, এর আগে এমনভাবে আর কোন লেখায় গান্ধীজি সন্ধান পাননি। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর 'আত্মকথা অথবা অক্ষয় সত্যের প্রয়োগ' গ্রন্থে মহাত্মাজী এই বইটির 'সম্মোহনী প্রভাব' শিরোনামা দিয়ে লিখলেন 'ট্রেনটি সন্ধ্যায় গন্তব্যস্থলে পৌঁছল। সারারাত আমি একবিন্দু ঘুমুতে পারলাম না। সেই মুহূর্তে সংকল্প করলাম বইটিতে যে আদর্শের জীবন তুলে ধরা হয়েছে আমার জীবনকে আমি তদনুসারে পরিবর্তিত করব।' পরে এই 'আনটু দিস লাস্টের' এক গুজরাটী সারানুবাদ করেন গান্ধীজি নিজে এবং তার নামকরণ করেন 'সর্বোদয়'। আক্ষরিক অনুবাদে বইটির শিরোনামা হওয়া উচিত ছিল অন্ত্যোদয়,—যে সবার অন্তে বা শেষে থাকে তার উদয়। গান্ধীজি এই ভাবটিকে একটি 'পজিটিভ' ব্যাপকতা দিয়ে অনুবাদের শিরোনাম করলেন সর্বোদয়। বললেন, অন্ত্যোদয় হয়েছে যেখানে সেখানে 'সর্বোদয়' তো স্বতঃসিদ্ধ। সবার পিছের, সবার নীচের মানুষটিরও যদি উত্থান হল, তাহলে সমাজের উত্থানের আর বাকী রইল কি?

রাসকিনের এই ভাবাত্মক বইটির মূলগত প্রেরণা হল বাইবেলের একটি গল্প। এই গল্পে বলা হয়েছে : একবার একজন আঙুরক্ষেতের-মালিক বেকার লোকদের গুমটি থেকে কিছু লোক সংগ্রহ করে ক্ষেতের কাজে লাগান, দৈনিক মজুরী এক পেনী। কিছু বাদে আরও কিছু বেকার শ্রমিক এল, তিনি তাদেরও কাজে লাগালেন,—এবং তারও পরে আর একদলকেও। বেলা-শেষে সবাইকে এক পেনী করে মজুরী দিলেন। যারা পরে এসে কাজে লেগেছে তাদেরও এক পেনী করে মজুরী দেওয়ায় আগেকার শ্রমিকরা অভিযোগ করে বললেন —এ আপনার কেমন ধারা বিচার? আগে-পরের সবার সমান মজুরী? মালিক হেসে বললেন, 'বাপু হে তোমার মজুরী তো তুমি ঠিক পেয়েছ, এবার তুমি যাও।......' আদর্শ-মালিকের এই দৃষ্টান্ত থেকে এই শিক্ষাই দিতে চাওয়া হয়েছে যে, প্রয়োজন সবারই সমান, ক্ষুধাতৃষ্ণা সব মানুষেরই হয়, —অথচ কাজ সকলে পায় না, সব সময়ে পায় না এবং সমান মজুরীও পায় না। কাজ মানুষ পায় না তার জন্য সমাজ দায়ী, অথচ পেটের ক্ষুধার জন্য মানুষ দায়ী নয়। আর সব কর্মের মর্যাদা সমান, কর্মের রকমভেদে মজুরী রকমফের করা অসংগত। তাই গান্ধীজির সুস্পষ্ট অভিমত ছিল : একজন ক্ষৌরকার আর একজন উকিলের পারিশ্রমিকে কোন তারতম্য হতে পারে না। সমাজে দুজনারই প্রয়োজন আছে, দুজনারই কর্মগত মর্যাদা সমান।

এই হচ্ছে গান্ধীজির সামাজিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টি। প্রেমের পথে যে নতুন সমাজ রচনার ধ্যানধারণা গান্ধীজিকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরিচালিত করেছে সর্বোদয় কথাটির মধ্যে তার একটি আশ্চর্য অভিব্যক্তি রয়েছে। সর্বোদয় মানে সর্বের উদয়, সকলের সর্ববিধ বিকাশ : শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক কল্যাণ। এই সর্ব মানে গোটা মানবজাতি তো বটেই, —সমগ্র জীবজগৎ বললেই ঠিক বলা হবে। হাজার হাজার বছর আগে ভারতীয় ঋষি ও মনীষীরা বসুধাকে, সমগ্র বিশ্বকে কুটুম্বরূপে কল্পনা করেছেন,—শান্তি কামনা করেছেন বনস্পতির পর্যন্ত, প্রার্থনা করেছেন সকলে সুখী হউক।

ভারতীয় সংস্কৃতির ও জীবনাদর্শের এই মহান উত্তরাধিকারই এক বৈপ্লবিক প্রাণবন্যারূপে প্রমূর্ত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে। আদর্শে 'সর্বে'-র বা সকলের কল্যাণের আদর্শে যিনি মনেপ্রাণে অনুরক্ত, জাতি ও ধর্ম, ভুগোল ও ইতিহাসের তৈরী কৃত্রিম বেড়া ও বন্ধনকে যিনি মানেন না, তাঁর কাছে এই মন্ত্রকে সত্য করে তুলবার একমাত্র পন্থা ও উপায় হচ্ছে অহিংসা।

সর্বমানবে তথা সর্বজীবে একাত্মতা যিনি প্রত্যহ, প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করেন, তার দ্বারা নিজের জীবনকে অনুরঞ্জিত করেন, তিনি কি করে হিংসাত্মক হয়ে অপর একটি প্রাণে বা এক অখণ্ড আত্মারই অপর একটি অংশে আঘাত করবেন? সেই আঘাত শতগুণ হয়ে তাঁকেই কি আঘাত করবে না? নিজ পরিবারের মধ্যেই এই আত্মিক একতা, ও আত্যন্তিক সমবেদনা আমরা সহজে অনুভব করি। যাঁদের আদর্শে নিষ্ঠা আছে,— প্রতিদিনের জীবনে আচরণের মধ্য দিয়ে পরিবারের গণ্ডী ছাড়িয়ে নিজের পৃথিবীকে ক্রমেই প্রসারিত করবার প্রয়াস আছে, মাত্র তিনিই মনে মনে উপলব্ধি করেন এই আত্মীয়তার ব্যাপকতা, মানুষে মানুষে নিগূঢ় টানের রহস্য। জীবনের এই তপস্যায় যাঁরা আরো এগিয়েছেন, তাঁরা মানবেতর ক্ষুদ্রতম জীবনের জন্যও সমান বেদনা ও করুণা অনুভব করেন।

যদিও যুগ-যুগান্ত ভারতীয় সংস্কৃতির শিরায় শিরায় রয়েছে সর্বোদয়-এর অনুপ্রেরণা এবং গান্ধীজী এই আদর্শে অনুপ্রাণিত বিশ্ববন্ধু ভারতীয়, সর্বোদয় সমাজ রচনার বৈপ্লবিক কর্মকৌশলটি কিন্তু তিনি অনেকাংশে আহরণ করেছেন বিদেশ থেকে। যন্ত্র-বিপ্লবের পর পাশ্চাত্যের বিকৃত সভ্যতার বিভীষিকা গান্ধীজীকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে শুধু নয়, গোটা মানবসভ্যতা সম্বন্ধে ভাবিয়ে তুলেছিল, তিনি আকুল হয়ে ভাবছিলেন এক নতুন জীবনদর্শন, সভ্যতার এক নতুন লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর পন্থা সম্বন্ধে। লক্ষ্য ও পন্থা, সাধ্য ও সাধনের অদ্বৈতের জন্য এই একাগ্র মননের মধ্যেই ইংল্যাণ্ডের মনীষী জন রাসকিন তাঁকে আলোকবর্তিকা দেখালেন। রাসকিনের 'Unto This Last' বইটি পড়ে তিনি জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে শোষণমুক্ত ও সৌন্দর্যসম্মত একটি নতুন কল্পনার সন্ধান পেলেন।

অনুবাদের ভূমিকায় গান্ধীজি বলছেন, 'পাশ্চাত্যের লোক সাধারণভাবে মনে করে মানুষের সমস্ত কর্তব্য হল মানবজাতির অধিকাংশের সুখ বিধান করা, আর এই সুখ মানে দৈহিক সুখ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এই সুখের সন্ধানে যদি নীতিধর্মের অনুশাসনগুলোকে ভঙ্গ করা হয়, তাতে তেমন কিছু আসে যায় না। আবার, যেহেতু অধিকাংশের সুখ হচ্ছে উদ্দেশ্য, সেইহেতু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অল্পাংশের স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া পাশ্চাত্যবাসিগণ কিছুমাত্র অন্যায় বলে মনে করেন না। এই ধরণের চিন্তাধারার পরিণাম ইউরোপের জীবনে প্রকাশ পাচ্ছে। নীতিধর্মকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র শারীরিক ও অর্থনৈতিক সুখের সন্ধান ঈশ্বরের বিধানের বিরোধী, যা পাশ্চাত্যের কয়েকজন প্রজ্ঞাশীল পুরুষ দেখিয়ে গেছেন। এঁদের একজন হলেন জন রাসকিন যিনি তাঁর 'আনটু দিস লাস্ট' গ্রন্থে বলেছেন, 'নৈতিক বিধান মানা করলে তবেই মানুষ সুখী হতে পারে।'

লক্ষ্যণীয়, পাশ্চাত্যের এই বিকৃত জীবনের পৃষ্ঠভূমিতে গান্ধীজী নীতিধৃত এক নতুন জীবন এবং সেই জীবন সাধনার সংকেত পেয়েছেন পাশ্চাত্যেরই তিনজন মনীষীর কাছ থেকে। ইংল্যাণ্ডের জন রাসকিনের কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন নীতিধৃত গোটাজীবনের শিল্পরূপ, রাশিয়ার লিও টলষ্টয়ের কাছ থেকে পেয়েছেন সর্বাত্মক প্রেম বা সর্বজয়ী ভালবাসা, আর আমেরিকার হেনরী ডেভিস থোরোর কাছ থেকে পেয়েছেন 'নিরস্ত্র প্রতিরোধ' বা সত্যাগ্রহের সূত্র।

গান্ধীজীবনে সত্য হচ্ছে সাধ্য আর **অহিংসা হচ্ছে** সাধনা, একটি হচ্ছে উদ্দেশ্য অপরটি হচ্ছে উপায়। অহিংসারই প্রয়োগ-**কৌশল** বা কর্মকৌশল হচ্ছে সত্যাগ্রহ। পূর্ণসত্য বলতে বুঝি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে। নিঃসন্দেহে অন্তরে অন্তরে গান্ধীজী তাঁর বিচিত্র জীবনের বহুমুখী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে **ব্রহ্মকেই** খুঁজেছেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে **সমগ্র** মানব-সমাজই ছিল তাঁর এই ধ্যেয় **ব্রহ্ম-স্বরূপ**। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী **বিবেকানন্দের** বেদান্ত ব্যবহারিক রূপ **পেয়েছে** গান্ধীজীর এই সমগ্র সেবাদর্শন ও **তার** বৈপ্লবিক রূপায়ণের মধ্যে। স্বামীজী **'কটিবদ্ধ** পরিহিত' যে মহাত্মার কল্পনা করে-**ছিলেন** কোটি কোটি দুঃখী মানুষের দহনকে **হৃদয়ে** ধারণ করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী **অবতরণ** করেছিলেন সেই ধ্যানলোক থেকেই।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে যে সমগ্র-জীবনদর্শনকে আমরা বলি বেদান্ত, বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেটিই হচ্ছে সর্বোদয়। বেদান্তবাদী এবং সর্বোদয়ীরা বৈপ্লবীক চিন্তাধারার এই ধারাবাহিকতাকে পুরোদস্তুর অনুধাবন করে কার্যক্ষেত্রে দুইটি শক্তির মধ্যে মিলন ঘটালে এক অপরাজেয় সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্ভব হবে। বিনোবাজী যখন বার বার বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয়ের কথা বলেন, তখন ভারতীয় জনজীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বেদান্ত ও সর্বোদয়ের মিলনের ইঙ্গিতই যেন আমরা তার মধ্যে পাই। আজও উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই কিন্তু অবিরোধ ও মিলনের মধ্যে সহস্র-যোজন ব্যবধান। যাক্—সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

সাধারণতঃ বিনোবাজীর ভূদান-গ্রামদান আন্দোলনকে, অর্থাৎ ১৯৫১ সনের ১৮ এপ্রিল তাঁর প্রথম ভূমিদান প্রাপ্তির পর-বর্তীকালকে 'সর্বোদয়ের যুগ' বলে অনেকে অভিহিত করলেও প্রকৃতপক্ষে 'সর্বোদয়' শব্দের যিনি উদ্ভাবক তাঁর প্রয়োগ তিনিই শুরু করে গেছেন।

'আনটু দিস লাস্ট'-এর অনুবাদে গান্ধীজী 'অন্ত্যোদয়' শব্দটি গ্রহণ না করে সর্বোদয় শব্দটি কেন করেছিলেন, তার তাৎপর্য অবশ্য লক্ষ্য করবার মতো। নিত্য ধ্যানের ক্ষেত্রে তিনি রেখেছেন 'সর্বোদয়'কে অর্থাৎ সর্বাশ্রয় ও সর্বব্যাপক জীবন-দর্শনকে। কিন্তু প্রাত্যহিক আচরিত কর্মের ক্ষেত্রে দিয়েছেন অন্ত্যোদয়ের মন্ত্র যে অন্তে আছে, সবার পিছে ও সবার নীচে আছে, তাকে আগে দেখবার, সর্বাগ্রে তার সেবা করার মন্ত্র। এই কারণেই ভাঙ্গী বা মেথর-দের মুক্তির জন্য এই মহাকর্মীর প্রাণ অহর্নিশ কেঁদেছে, তাদের মধ্যে থেকে আত্মায় আত্মায় অনুভব করতে চেয়েছেন মানুষ মানুষের কি ভয়ংকর ও দুরপনেয় অপমান করতে পারে। তাঁর চরকাও এই 'অন্ত' মাটির আর্ত মানুষদেরই অন্নসংস্থান ও আত্মপ্রত্যয়ের সাধন।

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর সহকর্মীদের পরিষ্কার নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন : 'আমি তোমাদের একটি রক্ষাকবচ দিচ্ছি—

'যদি কখনও কোন সংশয় জাগে কিংবা অহংকার প্রবল হয় তাহলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে দেখো তোমার দেখা দরিদ্রতম ও অতিদুর্বল মানুষটির মুখ স্মরণ কোরো এবং নিজেকে জিজ্ঞাসা কোরো : যে-কাজের কথা তুমি ভাবছো, তাতে তার কোন উপকার হবে কিনা। সে কি এই কাজের দ্বারা লাভবান হবে? এর ফলে সে কি তার জীবন ও ভাগ্যের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবে? অন্য কথায়, এর ফলে কি লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত ও উপবাসী মানুষের জন্য স্বরাজ আসবে? তাহলে দেখবে তোমার সংশয় ও তোমার অহমিকা দূর হয়ে গেছে।'

সর্বোদয় দর্শনেরই কর্ম-দর্শন হচ্ছে অন্ত্যোদয়। অন্ত্যোদয়ে সমাজ ও জাতির জীবনের ভিত্ নির্মাণ আগে, এটি হচ্ছে নীচতলা তৈরী করে জাতীয় জীবনের মহাসৌধ গড়ার নিতান্ত বাস্তববাদী ও বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াস। বাকিগুলো থেকে নীচু-তলা বা দুঃস্থতম মানুষের সেবায় দেশের অশেষ আত্মিক সমৃদ্ধি। তাতে দিন দিন কানায় কানায় ভরে ওঠে তার কল্যাণ পথ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন শতদলের মত ফুটে ওঠে।

অন্ত্যোদয়ের সূত্র সর্বোদয়ের এই বৈপ্লবিক কর্মসাধনায় এক অভিনব রূপে প্রকাশ পেয়েছে গান্ধীজীর উত্তরসাধক যুগযাত্রী আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান গ্রামদানের মধ্যে।

এই আন্দোলন সমাজকে নিজেদের সমস্ত অর্থনৈতিক-সামাজিক বিপ্লবের দরজায় দাঁড় করিয়েছে, তা ইতিহাসে অভিনব। বিনোবাজীর চলার পথে, দূর-দূরান্তের গ্রামে যাঁরা তাঁর সহযাত্রী হয়েছেন, তাঁর প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছেন, স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগত মালিকানা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া ও পরিণাম লক্ষ্য করেছেন, জনবিরল গ্রামেও তাঁর আগমন উপলক্ষ্যে হাজার হাজার মানুষের সম্মিলন, সম্মিলিত চিন্তাও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় আত্মপ্রত্যয়, নৈতিক মূল্য ও সমবায়ের উপর দাঁড়িয়ে নতুন জীবনের মন্ত্র নিয়ে অগ্রসর হতে দেখেছেন, তাঁরাই জানেন সর্বোদয়ের অনুকূলে কী বিরাট লোকশক্তি ও নৈতিক জাগরণ সৃষ্টি হয়ে চলেছে ভারতের হাজার হাজার গ্রামে। শহর বন্দরের কৃত্রিমতার কোলাহলে আমরা বধির, তার ধুলোয় আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, কায়িক শ্রমের অভাবে ও সহজলভ্য যানের কল্যাণে পদযুগল জীবদ্দশাতেই প্রায় নিশ্চল। কিন্তু যুগ ও জনজীবন এগিয়ে চলেছে এবং সর্বোদয়ের দাবী না মেটা পর্যন্ত চলবে। আমরা আজও একবার নিজেদের প্রশ্ন করে দেখতে পারি—সত্যা-গ্রহী গান্ধীর বিপ্লবী জনতার এই সর্বোদয় তীর্থযাত্রার শরিক আমরা হব কিনা। যদি হই, তবে শতবর্ষে গান্ধী-স্মরণ সার্থক।

সারা
ভারতে
তারিফ পেয়েছে
পানামা
Panama
20
CIGARETTES
সত্যিই কী চমৎকার সিগারেট!
কী অপূর্ব স্বাদ আর সোনালীবর্ণের
ভার্জিনিয়া তামাকের কী অপূর্ব গন্ধ!
তাই ত' পানামা সারা ভারতের
এত প্রিয়। আপনিও ওকে আপনার
একান্ত প্রিয় করে তুলুন।
GTC
GOLDEN TOBACCO COMPANY PRIVATE LTD.
গোল্ডেন টোব্যাকো কোং, প্রাইভেট লিঃ
বোম্বাই-৫৬
ভারতের এই ধরণের বৃহত্তম
জাতীয় উদ্যম

শানপুকুরের রানার পাশে সেই স্থলপদ্ম গাছটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক সে-রকমটা বলতে একটু ভুল হলো বৌকা, একটু ঝুঁকে, জলের ওপর মুখ দেখতে লেগেছে। বয়েস হলে মানুষের কোমরের কাছটা ভারি হয় আর গাছের হয় কাঁধ—কাঁধের ওপরের মাথা। তাবলে সব গাছের নয়। এই স্থলপদ্ম-ফদ্ম গাছের, জাম-জামরুল গাছের, লিচু গাছের। গাছটার গোড়ার মাটি জলে খেয়েছে। শেকড়ও তাই চলে চেপে বসেছে জলের ভেতরে, পাঁকের বুকে। স্থলপদ্ম জলজ গাছ নাকি?

ও যেখানে মুখ দেখছে, জলের ওপর, সেখানটায় দিনভর ছায়া। দিনভর একটা জায়গায় রোদ না ঢুকলে, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে না, একটা পর পর ভাবে জায়গাটা আপাদমস্তক জুড়ে থাকে—তার বুকে পা দিতে ভয় করে, মুখ দেখে বিশ্বাস করার উপায় থাকে না—এইসব কতোরকম চেনাঅচেনা কথা মনে পড়ে। পুকুরের ঐসব ছায়াঢাকা অঞ্চলের তলাতেই থাকে যখের ধন, ত্রিশূল আর মহাকালের মন্দির। সাঁতার কাটতে কাটতে অন্যমনস্কের পায়ে ওরকম টান পড়ে। আর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেইসব গল্পকথা শুনতে বলতে গায়ের রোম খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরের বাতাস? তার সাধ্য কি শীতের আগে গায়ের বাবলাগাছ ভাসিয়ে বাগানে এসে দাঁড়াবে? সুতরাং মিথ্যে নয়— আছেন,—ওঁরা আছেন। পুকুরের বুক শুকিয়ে গেলে ওঁরা পাতালে গিয়ে অপেক্ষা করেন। ওঁদের তো আর যেতে আসতে যানবাহনের দরকার হয় না—পায়ে চলা পথেরও তেমন একটা প্রয়োজন নেই। সুতরাং......

নিরুপম সুধার হাতে টান দেয়। কী এখন সাঁতার শিখবে মশাই? নাকি বেবাক ঘাবড়ে গেলে?

ধ্যুৎ, ঘাবড়ে যাবো কেন? ওতো গল্প।

সুধা কেমন ভয় মাখা হাসে। তোমার দাদু তোমাকে ওরকমটা বুঝিয়েছিলেন—যাতে না যখন তখন জলে এসে ঝাঁপাই জোড়ো। ঠিক কিনা বলো?

কিছুই বলতে হলো না নিরুপমকে। পেছনের খুঁটে খসা দেওয়ালের মটকায় যে টিকটিকি ছিলো। সে বললো ঠিক, ঠিক ঠিক। সুধা তালুর ওপর তালু পেতে সহাস্য। তিন সত্যি।

পুকুরের পশ্চিমপাড়ে রোদ্দুর পড়ে থাকত বহুক্ষণ, তাই শাঁকালুর চাষ হতো। দাদুই লাগিয়েছিল। আমি একটা খোঁচানি নিয়ে সকাল বিকেল গিয়ে সেই বুনো গন্ধ শাঁকালু তুলতুম। তোমার মনে আছে সুধা সেই ছড়াটা?—পরম দয়ালু, শীতকালে খান শাঁকালু। কে যে অমন একটা ছড়া বানিয়েছিলো। তুমি কখনো শীতকালে শাঁকালু খেয়েছো?

শাঁকালু কিরে?

একরকম আলু আর কি—আমার মনে হয় শাঁখের মতন বড় বলেই ওর অমন নাম। ইস, খাওনি তুমি? চলোতো দেখি—এখনো এক আধটা পাওয়া যেতে পারে। আমি তো আর খুঁটিয়ে তুলে নিই নে সব!

নিরুপম বাল্যগতি পায় চলনে। সুধা তার পেছনে বলতে বলতে এগোয়, আমাদের জন্যে কিছু রেখেছো? ইস, তখন আমরা কোথায় ছিলাম। জন্মাইনি আট-অল। আছে তো এমনিই আছে।

শাঁকালুর পাড়ে পৌঁছাতে পথে কতো রকম গাছ-গাছালি। নিরুপম আঙুলে তুলে দেখায়, ওর নাম সজনে, ওটা গাব-গাছ, ওই তো চালতে—তোমরা বলো চালতা, শহুরে লোক তো? তাই। আচ্ছা, এটা কি গাছ বলো তো সুধা, এই যে—কই কোথায়—এই যে তোমার ডানহাতি, ওর নাম ফুটুস...ফুটুস? এঃ, ফুটুস কেন হতে যাবে? ও তো বাদামগাছ। কোটোবাদাম চীনেবাদাম কাঠবাদাম। ও হলো শেষের জাত। ওর কথা তোমায় অনেক বলবো পরে। তুমি নকুলদানা খেয়েছো কখনো? নকুলদানা আবার কিরে? ওহোহো, নকুল-দানা জানো না—তোমায় নিয়ে তো ভারি মুশকিল দেখছি। কতো কি খাওয়াতে হবে তোমাকে—কতো কি চেনাতে হবে—অনেক সময় লাগবে, নাঃ।

গরমের সময় পুকুরের জল কতো নেমে যেতো। তখন শুধু টিকির মতন জায়গাটায় আঠার মত গাঢ় জল। গাঢ় আর পাঁক্‌ভর্তি। মাছফাছ যা-কিছু থাকতো, সব ঐ টিকির গায়ে লেপটে। পানা ছিলো না একেবারে। আজই দেখছো, পানা ভর্তি হয়ে গেছে। কেউ সরে না যে, তাই। পুকুর, বাড়ি আর মানুষ—তাতে কেউ না সরলে তার অপো-দশা হয়। যা বলছিলুম, ঐটুকুন জল, তাও আবার পানায় ভর্তি। পানা কি জানো সুধা? পানা হলো বনজঙ্গল, ডালপালা, বাঁশকাণ্ড। জলে ফেলে রাখলে চুর করে জাল-দেওয়া মুশকিল। চোরা পানায় জালের সুতো আটকে যাবে, কাঠি আটকে থাকবে। জাল ছিঁড়ে ফাঁদরাফাই। মাছ ধরতে এসে জাল খুইয়ে বসা। আমাদেরও পানা দেওয়া থাকতো গরমের সময়টাতে। বর্ষার সময় দরকার হতো না। তখন তো টইটম্বুর জল। জাল হদিশ পেতো না মাছেদের। শীতেও না। বর্ষায় আবার মাছ বেরিয়ে যায় অনেক পুকুরে। মানুষ যেমন সংসার কেটে যায়, মাছও তেমনি। জলের সঙ্গে গা ভাসিয়ে বাদা-বনে বেরিয়ে যায়। তাই জানু কেটে দিতে হয়। পাড়ের একটা অংশ, যার পেছনে বাদা, কেটে দিলে জলের বেরুবার পথ দিতে হয় আর মাছ যাতে বেরিয়ে না যেতে পারে, তাই জালের মুখে সরু কাঠির আটল পেতে রাখতে হয়। আমাদের এই পুকুরেও অমন জানু কেটে দিতে হতো। না, সব বছর নয়, এক-আধ বছর। যে-বছর নাবী হয় বর্ষা, সে-বছর।

নিরুপম মনে মনে কতো কথা বলে যায়, সুধা এরই মধ্যে যে স্মৃতিসোচ্চার তা ধরে বিস্মিত হতে থাকে। এতো জানে নিরুপম, এতো কথা বলে। তাকে জানতো সুধা স্বভাবতই গম্ভীর। এখানে এসে সে যেন এক মর্মস্পর্শী কোলাহল হয়ে উঠেছে। সব কথা বুঝুক না-বুঝুক, সুধার তাতে কিছুই এসে যায় না। সে এক তন্ময় শ্রোতার মতো নিরুপমের পাশটিতে ঘোরা-ঘুরি করে।

জল শুকিয়ে গেলে চতুর্দিকের পাড় জেগে ওঠে। আর তখন!

তখন কি? সুধা চমকে প্রশ্ন করে।

তখনই তো আসল মজা। দারুণ মজা। নিরুপম দুষ্টুমি-ভরা চোখ নিয়ে সুধার দিকে নির্বাক চেয়ে থাকে। বুঝতে পারলে না?

কিসের কি বুঝবো? আমি কিছু জানি নাকি ছাই?

এখন দেখতে পাবে না, তাহলে, গরম-কালে তোমায় আর একবার নিয়ে আসবো এখানে।

ব্যাপারটা কী বলো তো? গরমকালে না হয় আর একবার এলাম।

ধরে দেখাতে হবে যে!

কী?

পাখি।

পাখি? কী মজা, সত্যিই মজা হবে। এখন ধরা যায় না?

এখন? নাঃ। এখন যে কোথায় থাকে, তাই-ই জানি না। কেউ জানতে পারে না অবশ্য, শীতকালে মাছরাঙা কোথায় থাকে!

কেউ পারে না?

কই পারে? শুধু গরমকালে, পুকুরের পাড় জেগে উঠলে মাছরাঙা করে কী জানো,

পাড়ে ফুটো করে। ফুটো মানে গর্ত আর কি! সেই গর্তে ডিম পাড়ে, তার থেকে ফুটে ছানা বেরোয়—সে কি দারুণ বঙ তাদের গর্তের ভেতরে। গর্তের গায়ে চোখ লাগালে মনে হয় একটা দর্জির দোকান। কতো রঙিন কাপড়ের টুকরোর মতন কতো পাখি থুবু হয়ে বসে। বাইরে এলে তাদের রঙ জল-হাওয়া-রোদ্দুরে অনেকটা করে খেয়ে নেয়। তাও যা থাকে—সে অনেক। একবার হয়েছিলো কি জানো? হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি গর্তের ভেতর। তারপর কিসে ঠোক্কর লেগে চমকে হাত যেই বের করেছি অমনি কোথা থেকে এক ঝাঁক মাছরাঙা আমার পিঠে হুড়মুড় করে এসে পড়লো। আমি চলে যেতেও দেখি তাদের কান্না থামে না। দাদু এসেছিলেন শানপুকুরে, তিনি ব্যাপারটা টের পেলেন। কিছু না বলে আমাদের খাপাল হৈরেকে ডাকলেন। হৈদর সেই গর্ত থেকে একটা বিশাল সাপ টেনে বের করলো। মাছরাঙাদের কান্না থামলো। আমিও জলে গিয়ে হাতটা আচ্ছা করে ধুয়ে ফেললাম। হাতে-লাগা হিম-ঠাণ্ডা স্মৃতির কথা দীর্ঘদিন ভুলিনি।

আমি পয়সা চুরি করতুম। দাদুর পয়সা বাড়ির চতুর্দিকে ছড়ানো থাকতো। অনেক পয়সা ছিলো বলে দাদুর কিছুই মনে থাকতো না। চুরি করার আগে আমার মনে হতো, দাদু তো আমার জন্যেই এখানে রেখেছে। বেশির ভাগ সময়ে আমি তোষকের নিচে যে পেট-মোটা গদি থাকতো, তার ওপরকার চুড়-করা পয়সা পকেটে পুরে নিতাম। পয়সার পাশাপাশি থিক থিক করতো দাদুর পোষা ছারপোকার দল। পয়সার সঙ্গে তারাও পকেটে ঢুকে কোমরের নিচে আর বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি জায়গায় সব কামড়াতো। তখন আমি ন্যাংটো হয়ে বাথরুমে যেতুম, সেখান থেকে এক-দৌড়ে পুকুরঘাট, কাঁধে-ফেলা পেন্টুল নিয়ে দৌড়ে ফলসা গাছের মগডালে। গাছ ন্যাংটো, আমি ন্যাংটো। তখন গোটা বাড়িতে আর কেউ থাকতো না বলে আমি এরকম উজবুকের মতন হয়ে গিয়েছিলুম।

সুধা লজ্জা পায়। তারপর কথা ঘোরাতে বলে, পয়সা চুরি করতে কেন?

বারে, পয়সা দিয়ে টেনিস-বল কিনতুম যে! আমি ছিলুম আমার টিমের ক্যাপ্টেন। পয়সার জোরেই ক্যাপ্টেন হতুম—আমি ছাড়া ওরা সবাই খেলতো ভালো। আমি একদম খেলতে পারতুম না। সুতরাং নন্-প্লেয়িং ক্যাপ্টেনের পয়সাটাই বড়ো কথা। কতো টুর্ণামেণ্টে নাম দিতুম। পেটেন খেতুমও দাদুর কাছে বিস্তর। ইস্কুলে যেতুম না। বাড়িতেই পড়াশুনো হতো নমো-নমো করে। আর সবাই ইস্কুলে যেতো। ওরা হাড়ি-কাওরা আর ওপাড়ার সব ছেলে। ওদের সঙ্গে মেলামেশা বারণ ছিলো বলে একটা পেয়ারার চতুর্দিক চারজনে কামড়ে খেতুম।

ওরা সব কোথায় এখন?

কারা সব? সেই ওবেলার বন্ধু-বান্ধব? জানি না। আমিই তো দেশে এলাম বহু বছর পর। তাও তুমি এতো ঝুঁকেছিলে বলেই না আসা হলো। এসে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে।

তাহলে আমায় ধন্যবাদ দাও।

তা দিচ্ছি। সত্যিই ভীষণ ভয় ছিলো। কেমন লাগবে কে জানে—এই ভয়ে এতোদিন আসতে চাইনি। ঐ যে, সিঁড়ির নিচে অন্ধকার মতো জায়গাটা তোমায় দেখিয়েছিলাম, এখন সত্যি বলে ভাবতে পারি যে আমি ঐখানে জন্মেছিলাম। মা আমায় জন্ম দিয়েই মরেছিলেন। আমি আমার বাবাকে কোনোদিন দেখিনি। শুনেছি আমি আমার বাবা-মার ভালোবাসার সন্তান। আমাকে আঈ-মা মানুষ করেন। তিনি স্যাকরার মেয়ে। আমি স্যাকরার বুকের দুধ খেয়ে মানুষ। তাঁর সমাধিও তো তোমায় দেখিয়েছি। ঐ যে বাগানের এক কোণে মন্দির-মতন একটা থুপরি। ঐখানে তিনি আছেন।

সুধা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে থাকে নিরুপমের দিকে। ওকে ভূতে পেলো নাকি? একী অসম্ভব কথা আপনমনে বলে চলেছে সে। নিরুপম...নিরু

হ্যাঁ, যা বলছিলুম তোমায় সুধা। আমি সব পুরুষমানুষের ভেতরে আমার বাবাকে খুঁজে বেড়াই। একটু মাঝবয়সী লোক দেখলেই আমি তাঁর গায়ের পাশে দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকে জন্তুর মতো বুঝে নিতে চেষ্টা করি। এক ধরনের অসুখ এটা। তবে এখন অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছি। এখানে এসে বাবার কথা নতুন করে মনে হলো। বাবা আর মা। শুনেছিলুম বাবা এই বাড়ির আশ্রিত ছিলেন। এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ছিলেন। বড়ো হবেন, কথা ছিলো। হয়তো বড়ো হয়েওছেন। শুধু ছোটোবেলায়, ইস্টিশানের পাশে রেল-লাইনে কেউ কাটা পড়েছে শুনলেই দৌড়ে যেতুম। লোকটা হয়তো আমারই বাবা। আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমায় দেখে তাঁর মরতে ইচ্ছে হয়েছে। সেই থেকে নিজেকে ভালো করে গড়ার চেষ্টায় মন দিয়েছি। বাকিটা তোমার দখলে।

এমন মন্ত্রোচ্চারণের মতো নিবিড় ভাষায় সুধার ঘুম-ঘোর। সেই ঘোর ভাঙলো নিরুপমের চীৎকারে, সাপ সাপ...সরে এসো সুধা, সরে এসো

গাছের ফাঁকে বসে নিরুপম সুধাকে হিঁচড়ে টেনে তোলে উপরে আর ফণা-তোলা সাপ মাটিতে ছোবল মেরে, হয়তো বা উগরে বিষ, পাশের বাদায় দ্রুতবেগে নেমে যায়। সুধা ফুঁপিয়ে কাঁদে।

এই ভুতুড়ে জায়গায় তুমি আমায় নিয়ে এসেছো কেন নিরুপম? তোমার মা-বাবার মতন আমাকে মারবে বলে? তোমরা সব পারো—তোমার রক্তে বিষ আছে, ভালোবাসা নেই।

আর তখন পাথর নিরুপম সুধাকে দু' হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে রেখেছে। কানের কাছে মন্ত্রের মতো কথা বলছে: আমি আমার মা-বাবার ভালোবাসার সন্তান সুধা। তোমাদের সমাজে-সংসারেই যতো পাপ, তাঁদের মনে কোনো পাপ ছিলো না, বিশ্বাস করো।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মহাজীবনের কথা

গান্ধীজীকে কে মহাত্মা এই সম্মান-জ্ঞাপক অভিধা দান করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে দেখা গেল। ১৯১৯ খৃঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই খর্বাকৃতি কৃশতনু মানুষটির অভ্যুদয়ের কাল থেকে ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের কাল পর্যন্ত তিনি ভারতভূমিতে মহাত্মা হিসাবে উচ্চ-নীচ সব শ্রেণীর মানুষের কাছে স্বীকৃতি ও পূজা পেয়েছেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে অবতার মনে করেছে। গান্ধীজীর অপর নাম গান্ধী মহারাজ। গান্ধীজী অবিচল থেকেছেন। ভক্তিরসে ভেসে গিয়ে ধর্ম-গুরুতে রূপান্তরিত হন। কিংবা নিন্দা বা সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে গালি বর্ষণ করে আহত অভিমান তৃপ্ত করেন। এই কারণেই মহামতি আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন—

> "Generations yet unborn will wonder whether such one as Gandhi did in truth walk the earth in flesh and blood."

গান্ধীজীও তাঁর হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এক পাশুপত অস্ত্র। তার নাম অহিংসা অসহযোগ, আর এ হাতিয়ার-ই রঁমা রঁল্যার মত মনীষীকে আকৃষ্ট করেছিল গান্ধীজীর প্রতি। রঁল্যার কাছে গান্ধীজী কালের দাবী পূরণে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বজাতির মনোভঙ্গীর তিনি প্রতি-মূর্তি। এই কর্মের মধ্যে আপনাকে উৎসর্গ করে তিনি সাংসারিক প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হতে পেরেছিলেন। রঁল্যা বলেছেন—

> "His doctrines are an expression of the deepest and most ancient longings of the race."

মহাত্মাজীর বাণীকে রঁল্যা গ্রহণ করে-ছিলেন। তাই বলেছেন—

> Nothing is worthwhile unless it is strong, neither good nor evil. Absolute evil is better than emasculated goodness. Moaning pacifism is the death knell of peace; it is cowardice and lack of faith. Let those who do not believe, who fear, with draw ! The way to peace leads through self sacrifice."

এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৪ তখনই রঁল্যা লিখেছিলেন শুধু একটি জিনিসের অভাব তার নাম ক্রস। চব্বিশ বছর পরে ১৯৪৮ খৃঃ গান্ধীজী যখন নিহত হলেন আততায়ীর হাতে তখন রঁল্যা আর বেঁচে নেই।

গান্ধী শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ভারত সরকারের পাব্লিকেসনস ডিভিসন অনেক রকম গান্ধী জীবনী ও সাহিত্য প্রকাশ করছেন। রঁমা রঁল্যা কৃত 'গান্ধী জীবনী' ও মার্কিন লেখক ভিনসেণ্ট সী আনের 'গান্ধী জীবনী' এই গ্রন্থমালার মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

পাশ্চাত্য জগতের দুই প্রতিষ্ঠাবান লেখকের দৃষ্টিতে গান্ধীজীর এই মূল্যায়ন গান্ধীজীর জন্মশতবর্ষে সুলভে পাওয়ার ব্যবস্থা করে' পাব্লিকেসনস্ ডিভিসন সু-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

ফরাসী মনীষী তার গ্রন্থটির উপনাম-করণ করেছেন—

> "The Man Who Became One With The Universal Being".

আর মার্কিন লেখক সীআন তাঁর গ্রন্থের উপনামকরণ করেছেন—

> "A Great Life in Brief."

বলা বাহুল্য ফরাসী লেখক রঁল্যা গান্ধীজীর জীবনের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশ্লেষণেই অধিকতর প্রয়াসী। আর ভিনসেণ্ট সীআন সংক্ষেপে মহাজীবনের কাহিনী বিবৃত করেছেন। তার ভিতর থেকে বিকশিত হয়ে উঠেছেন মহাত্মা গান্ধী আপন মহিমায়। দুটি গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু সাদৃশ্যও কম নেই। রঁল্যা গান্ধীজীর জীবনের পরিচয় দিয়েছেন, সেই জীবন ১৮৯৩ খৃঃ থেকে ১৯২২ খৃঃ পর্যন্ত। তাঁর গ্রন্থটির তিনটি পর্ব। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর জীবনের প্রথম পর্ব এবং ভারত-বর্ষে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন। এই আন্দোলনের অর্থ এবং অভিসন্ধি এবং ১৯২১ খৃঃ গোড়া থেকে ১৯২২ খৃঃ শেষাং-শের মধ্যে এই আন্দোলনের বিবর্তন, এই কালেই তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। রঁল্যার গ্রন্থ ১৯২২ খৃঃ বিচার এবং তার ফলে তার কারাদন্ডের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই শেষ হয়েছে, কারণ এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ কাল ১৯২৪ খৃঃ।

ভিনসেন্ট সীআনের মহাজীবন সংক্ষিপ্ত বটে কিন্তু সংক্ষিপ্ত হলেও এই গ্রন্থে গান্ধীজীর জীবনের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত বাদ পড়েনি। এই গ্রন্থ সন তারিখ কন্টকিত বিবরণ বহুল তথ্যপঞ্জী নয়। মহাত্মাজীর জীবন ও ব্যক্তিত্ব তাঁর চিন্তাধারা এবং অভীপ্সা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন সীআন। সীআনের এই গ্রন্থটি ১৯৫৪ খৃঃতে প্রথম প্রকাশিত হয় নং—১। জীবনী হিসাবে এই গ্রন্থটি অনন্য সাধারণ। গান্ধীজী প্রসঙ্গে সীআন বলেছেন—

> "He had no equal in our time — he was the wisest and the best."

গান্ধীজীর জীবনকালেই সারা বিশ্বে তাঁর কর্মের পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মূল্যায়নের অনেকখানিই হয়েছে তাঁর জীবদ্দশায়। গান্ধীজীর জীবন এক অলৌকিক এবং অতিপ্রাকৃত ব্যাপার! কিন্তু কি করে তা সম্ভব হল। তিনি প্রশ্ন করছেন—

"To what then, are we to assign the phenomenon, to what shall we attribute the magic."

এই প্রশ্নের জবাবও তিনি সুন্দর ভঙ্গীতে দিয়েছেন—

"We come at last to the mystical explanation as the only one heat fits the case. It fits because it presupposes the unknown and beyond that the unknowable."

সীআনের বিশ্বাস গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছিল তাঁর ঈশ্বর-চেতনার ফলে। সীআন তাই বলেছেন—

"He did actually hear an 'inner voice' throughout the greater part of his life (like Socrates did), and though he was an exceedingly practical man who never discussed mysteries if he could help it, these is no doubt in my own mind that the essence of his effective being, effective that is upon mankind, was and always will be a mystery"

সীআনের গ্রন্থের প্রারম্ভিক অংশে এই মন্তব্য আছে। তিনি একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় বলেছেন—

"His death fulfilled his life, in the manner that has been the Central Characteristic of religious drama since the beginning of history. No less than Jesus of Nazareth, he died for all the mankind."

র‍ঁলার গ্রন্থেও গান্ধীজীবনের এই দিকটির প্রতি বিশেষ গুরুত্বদান করা হয়েছে। তাঁর গ্রন্থ যেখানে শেষ হয়েছে তার অনেক কাল পরে গান্ধীজীর দেহান্ত ঘটেছে, তথাপি র‍ঁলা লিখেছেন—

The only thing lacking is the Cross."

র‍ঁলা গান্ধীজীকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, তাঁর সম্পর্কে সুগভীর আগ্রহ ছিল তাঁর। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু ও দিলীপকুমার রায় প্রভৃতি যেসব ভারতীয় মাঝে মাঝে র‍ঁলার সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁদের সঙ্গে র‍ঁলার গান্ধীজী সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং তিনি সেইসব আলোচনায় নিজের বিশ্বাস এবং মতকেই ধরেছিলেন, কোনো কিছুতেই সেই মত থেকে সরে আসেননি।

গান্ধী শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এই দুখানি গ্রন্থ চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেরই পাঠ করা কর্তব্য।

—অভয়ংকর

(1) MAHATMA GANDHI: By Romain Rolland. Translated from the French by Catherine D. Growth. Publications Division, Govt. of India — Price - Rupees Two only.

(2) MAHATMA GANDHI: By Vincent Sheean. Publications — Division, Govt. of India — 1969, Price Rupees 4.00 only.

সাহিত্যের খবর

এ বছর বিভিন্ন জায়গায় বিভূতিভূষণের জন্মজয়ন্তী প্রতিপালিত হয়, এবং তাঁর প্রতি যেসব সভায় শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, ব্যারাকপুর স্টেশন রোডস্থ 'আরণ্যক' ভবনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটির কথা। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নৈহাটি শাখার সভাপতি শ্রীঅতুলচরণ দে পুরকায়স্থ এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বিভূতিভূষণের সাহিত্যচর্চা ও স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করেন ও কলকাতার একটি রাস্তার নাম পরিবর্তন করে বিভূতিভূষণ সরণী করার জন্য কলকাতার পৌরসভা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রীহেমন্তকুমার বন্দোপাধ্যায়, শ্রীদেবীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস প্রমুখও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

'সংস্কৃতি সংসদ' এবং ঘাটশিলার বিভূতি জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগেও অনুরূপ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কানাডার সাহিত্য আন্দোলনের গতি প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় তেমন নেই। অথচ কানাডা বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে রীতিমত বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। কানাডার ভাষা হচ্ছে ইংরেজি আর ফরাসী। উভয় ভাষারই সাহিত্য রীতিমত সমৃদ্ধ। সম্প্রতি কানাডার ইংরেজি সাহিত্যের উপর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম লিটারেরি হিস্ট্রি অব কানাডা। সম্পাদনা করেছেন কার্ল কে ক্লিংক। প্রকাশ করেছেন টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয়। কানাডার বিশিষ্ট লেখক এবং অধ্যাপকদের রচনা এতে গৃহীত হয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন ডেভিড গলোওয়ে, ভিকটর জি হোপউড, আলফ্রেড জি বেইলি, ফ্রেড কজওয়েল, জেমস টালম্যান প্রমুখ উনত্রিশজন লেখক। প্রথম খন্ডে আলোচিত হয়েছে, এদেশের প্রাচীনকালে যেসব ভ্রমণকারী বা আবিষ্কারক এসে শেষ পর্যন্ত সেখানেই স্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করেন। তাদের লিখিত ডায়েরীর উপর আলোচনা। দ্বিতীয় খন্ডে আছে ১৬৭০ খৃঃ পরবর্তী সাহিত্যের মূল্যায়ন। এমন সময়ের উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন হ্যালিবার্টন। তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ডে আলোচিত হয়েছে আধুনিক কালের ইতিহাস। সাংবাদিকতার সূত্রপাত এই সময়েই। এই সময়ের একজন উল্লেখ্য সাংবাদিক হলেন চার্লস আর টাটল। বিশ শতকের কানাডিয়ান সাহিত্য অতএব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার প্রকাশও এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যারা কানাডার সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী, তাদের কাছে গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান বলে মনে হবে।

অনুরূপ আর একটি প্রয়াস হলো যুগোশ্লাভ গল্পের ইংরেজি অনুবাদ সংকলন প্রকাশ। এই সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন আগাস্টিন স্টিপেকভিক। এই সংকলনে যাদের লেখা অনূদিত হয়েছে, তাঁদের সকলের লেখার মধ্যেই একটা বিষয়ে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। সব কয়টি গল্পে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বা যুদ্ধের কথা আছে। যেমন দি টেল অব দি স্যাড পোস্টম্যান (লেখকঃ মিস্কো কানজেক), বা 'লাক' (লেখক সিরিল কসম্যাক) প্রভৃতি গল্পে যুদ্ধ কিভাবে জাতীয় জীবনকে বিষাক্ত করেছে, তার নগ্ন চিত্রই অঙ্কিত। অনুবাদে অন্তত যেটুকু ধরা পড়েছে, তাতে দেখা যাবে, টেকনিকের দিক থেকে গল্পগুলি বৈশিষ্টপূর্ণ নয়। তবু যুগোশ্লোভিয়ার গল্পের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণায় উপনীত হতে গ্রন্থটি সাহায্য করবে।

প্রখ্যাত উর্দু কবি মীর্জা আসাদুল্লা খান গালিবের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব গত ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ লন্ডনের ডোমিনিয়ন সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে যে মুশায়ারার আয়োজন করা হয়, তাতে বিখ্যাত উর্দু কবি এবং চিত্রতারকারা অংশগ্রহণ করেন। কবিদের মধ্যে যাঁরা মুশায়ারা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কানুয়ার মহিন্দার সিং বেদী, বেকল উটাশি, শেরি ভোপালি, বেগম জামিলা বানু, হিলাল শেরাভি প্রমুখ। সঙ্গীতাংশে অংশগ্রহণ করেন নার্গিস দত্ত, ওয়াহেদা রহমান, দিলীপকুমার, সাধনা নায়ার, সুনীল দত্ত, ওমপ্রকাশ প্রমুখ।

বাংলার বৈষ্ণবসমাজ সংগীত ও সাহিত্য (আলোচনা)—বাসন্তী চৌধুরী। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড। ১ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলকাতা-৬। দাম—বার টাকা।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বাংলা দেশে বৈষ্ণবধর্ম নতুন রূপ নেয়। শ্রীচৈতন্যের অমৃতময় জীবনোপাখ্যান লেখা হতে থাকে। বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে বহু বই বাঙলা ও সংস্কৃতে লেখা হয়। তত্ত্বান্বেষী গবেষক এবং ভক্ত মানুষ পরবর্তীকালে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। সুদীর্ঘকালের এই ধর্মমতের সূক্ষ্মকালভেদ সব সময় ধরা পড়ে না। কিন্তু গবেষকগণ সেই সময়কে ধরে ধর্ম ও সাহিত্যের কাল বৈচিত্র্য ও বিভেদক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন। শ্রীমতী বাসন্তী চৌধুরী আঠার শতকের পূর্বার্ধের বৈষ্ণব সাহিত্য সমাজ ও সংগীতের আলোচনা করেছেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকায়। এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকা আলোচিত হয়েছে। এ সময়ের বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র মাধুর্য পদাবলীসাহিত্যের মত প্রবল ভাবে কীর্তিত [illegible] হয়েছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রাধামোহন ঠাকুর, যদুনন্দন, নিত্যানন্দ দাস, ঘনশ্যাম, [illegible], বিশ্বনাথ [illegible] ঠাকুর, প্রেমানন্দ দাস, নরহরি চক্রবর্তী [illegible] অবদান সে যুগে কোন অংশে কম নয়। বিস্তৃত বিশ্লেষণের সাহায্যে শ্রীমতী চৌধুরী এ যুগের বৈষ্ণব পদকর্তা, চরিতকার এবং রসশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতাদের সাহিত্যিক স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। শ্রীমতী চৌধুরীর এই [illegible] গ্রন্থরচনার অন্যতম উদ্দেশ্য বৈষ্ণব সমাজ, সংগীত ও সাহিত্যে যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে [illegible] ভাবে অভিব্যক্ত তা প্রমাণ করা। কীর্তন গানের অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য লেখিকা প্রচুর তথ্য ও প্রমাণসহ তুলে ধরেছেন। কীর্তন গানে নরহরি চক্রবর্তীর অবদান এবং তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আঠার শতকের রাজনৈতিক পটভূমিকা আলোচনাটি ছোট হলেও বেশ মূল্যবান। বিস্তৃতভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তীর্থ ও শ্রীপাট আলোচিত হয়েছে। পরিশিষ্টে আঠার শতকের পুঁথিধারে অমুদ্রিত পুঁথির তালিকাটি বেশ মূল্যবান।

যুগের আলো (আলোচনা) অনল রায়। মৈত্র প্রকাশনী। ২৬।২ বি বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা—৯। দাম—নয় টাকা।

মার্কসবাদ সম্পর্কে একখানি যুক্তিপূর্ণ আলোচনার বই 'যুগের আলো'। বেশ কয়েক বছর আগে বইটি বেরিয়েছিল। অল্প কয়েকদিনে সেই সংস্করণটি শেষ হয়ে যায়। সোভিয়েত বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আবার বেরিয়েছে। মার্কসবাদ একটি বহুমুখী তত্ত্ব। ইতিহাসের ভিত্তিতে তারই আলোচনা করা হয়েছে যুগের আলোয়। প্রতিটি বিষয়কে যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাতে সহজেই এই দুরূহতত্ত্বকে সহজবোধ্য রূপ দিয়েছে। সমাজ বিবর্তন ও বুর্জোয়া শ্রেণীর অভ্যুত্থান সমাজে ধর্মের উদ্ভব হোল কেন, ভাববাদ ও বস্তুবাদ, উদ্ভাবনের স্বরূপে দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থ-বিজ্ঞান সমাজ বিবর্তনের ধারা, শ্রেণী সংঘাত, রাষ্ট্রশক্তি, বিপ্লব, ফ্যাসীবাদ ও সমাজতন্ত্রী দল, বুর্জোয়াগণতন্ত্র, শ্রমিকের একনায়কত্ব, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা, সাম্যবাদী সমাজে নারীর স্থান। মার্কসবাদের পথ যে সহজ ও সুখের নয়, বিভিন্ন আলোচনায় তারও একটি রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মার্কসবাদী সাহিত্য যে উদ্দেশ্য প্রধান নয়, শেষের অধ্যায়ে লেখক তার বিভিন্নদিক বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কসবাদীকে যাঁরা জানতে চান, তাঁদের কাছে বইটি সমাদর পাবে।

মঙ্গলের দিন (উপন্যাস) নিমাইকুমার ঘোষ। মোহন লাইব্রেরী, ৩৫এ, সূর্য সেন স্ট্রীট। কলিকাতা—৯। দাম— ৫ টাকা।

কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি, বিষয়বস্তু ইত্যাদি ব্যাপারে এই গ্রন্থখানি পাঠকের কাছে সায়ান্সফিকশান বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু এটি আদৌ কোন সায়ান্সফিকশান নয়। অথচ সায়ান্সের বহু প্রসঙ্গকে ভিত্তি করে লেখা একটি আদর্শবাদী আখ্যায়িকা। লেখকের বিশ্বজগত ও মানুষ এই বিষয়ে যে দার্শনিক চিন্তাধারা আছে, তা তিনি বিজ্ঞানের বহু সূত্র অনুসারে সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। অবশ্য লক্ষ্য করা গেল পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি নিজস্ব কিছু ধারণাও প্রয়োগ করেছেন। তবে সব মিলিয়ে এটি নিঃসন্দেহে উপভোগ্য ও শিল্পরসসম্মত হয়ে উঠেছে। গ্রহান্তরের মানুষ এবং মহাকাশযাত্রার বিচিত্র ঘটনাবলী কাহিনীর টান কোথাও ব্যাহত

হতে দেয় নি। মাঝেমাঝে তাঁর বর্ণনাভঙ্গীর চমৎকারিত্বে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। ধীমান তাঁর নায়ক। তাঁর এই মানস সন্তান-রূপী নায়কের ভাবনার সঙ্গে পাঠকও অলক্ষ্যে মন মিলিয়ে ফেলে আর বিশ্বজগতের অপার রহস্যের গভীর মায়ায় আবিষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রন্থখানি আজকের ছন্নছাড়া সমাজের ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার মহৎ প্রয়াসের দাবী রাখে। সেই সঙ্গে মানুষকে তার ভবিষ্যতের কথা ভাবায়।

প্রভু অন্ধকারে আমি একা (কাব্যগ্রন্থ)— রণজিৎ দেব। ত্রিবৃত্ত প্রকাশন, ১, ত্রিবৃত্ত সরণি, কুচবিহার। দাম : তিন টাকা।

উত্তরবঙ্গের তরুণতম কবিদের মধ্যে রণজিৎ দেব সাংগঠনিক দক্ষতায় ও কবিতার প্রচারে অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছেন। কবি হিসেবেও মোটামুটি সকলের কাছেই তিনি পরিচিত। চিরকালীন বাংলা দেশের সহজ সারল্য তাঁর কবিতার বহিরাবয়ব নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ভাব-প্রবাহেও লক্ষ্য করা যায় এক ধরণের সতেজ উচ্ছ্বাস।

বিভিন্ন কবিতায় তিনি কবিসত্তার সার্থক জাগরণ ঘটাতে পেরেছেন। 'অপাপ দুঃখের স্রোতে চক্ষু যায়' 'প্রথম কিশোরী' 'স্থায়ী' 'পুরনো উঠোনতলা' প্রভৃতি কবিতাগুলি প্রথম প্রকাশের দীপ্তিতে উজ্জ্বল। একটু পরিশ্রমী হলে তিনি ভবিষ্যতে আরো ভালো কবিতা লিখবেন।

বইটির ছাপা বাঁধাই চমৎকার। প্রচ্ছদ এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়।

বৃত্ত থেকে (কবিতা) — শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রাণী। ৩৮ বাগবাজার স্ট্রীট, কলিঃ—৩। মূল্য—এক টাকা।

চৌদ্দ পৃষ্ঠার ষোলটি ছোট ছোট কবিতা নিয়ে শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা সঙ্কলন 'বৃত্ত থেকে'। নিতান্ত বৈশিষ্ট্যহীন ছন্দ ও শব্দের অবয়বে কবির আন্তরিকতা ও বক্তব্য স্পষ্ট।

স্বর্গপ্রেম (কাব্যগ্রন্থ)— **পশুপতি প্রধান। প্রকাশক: সন্তোষকুমার ভক্ত। পোঃ শ্রীরামপুর, মেদিনীপুর। আড়াই টাকা।**

আধুনিক কবিতা নয়। পুরোনো পদ্য-ছন্দে নিজের মনের আবেগ প্রকাশ করেছেন। কারো কারো কাছে ভালো লাগতে পারে। অবশ্য আধুনিক পাঠক-পাঠিকারা বিরক্ত-বোধ করবেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

চতুষ্কোণ (শ্রাবণ ১৩৭৬)— সম্পাদক মন্ডলী কর্তৃক সম্পাদিত।। ৭৭।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯ দাম—এক টাকা।

উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধের জন্য 'চতুষ্কোণ'-এর বরাবরই একটা সুনামের অধিকারী। বিশেষ করে, প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ণের ঝোঁক পত্রিকাটির সর্বাধিক। এ সংখ্যায় নজর দেওয়া হয়েছে বাংলা কবিতার দিকে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আলোচনা লিখেছেন মণীন্দ্র রায় (বাংলা কবিতার পাঠক-বিচ্ছিন্নতা), কৃষ্ণ ধর (আধুনিক কবিতায় জীবন-জিজ্ঞাসা), তপোবিজয় ঘোষ (চাই উজ্জ্বল রৌদ্রের গান), ও 'হাল আমলের বাংলা কবিতার একটি দিক', সম্পর্কে লিখেছেন শ্যামসুন্দর দে। সাম্প্রতিক কবিতার নিদর্শন হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে একগুচ্ছ কবিতা। লিখেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, কণক মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, শিশির সামন্ত, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। গত পাঁচ বছরের কবিতার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। কবি ও কবিতা পাঠকের কাছে সংখ্যাটি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

অনুক্ষণ (জ্যৈষ্ঠ - ভাদ্র ১৩৭৬) — সম্পাদক রথীন ভৌমিক।। বি. কে. চ্যাটার্জি রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দাম—এক টাকা।

কবিতা প্রধান সাহিত্যের কাগজ। লিখেছেন অনেকেই। প্রায় সব কবিই তরুণ। কবিতা বিষয়ে নিজস্বতায় বিশ্বাসী। হৈ হট্টগোল পছন্দ করেন না কেউ। সম্পাদক লিখেছেন "জীবনসত্য বলে সাহিত্যে কিছু নেই। সত্য মাত্রই আপেক্ষিক।' অতএব আমরা কারো নির্দেশ মানতে রাজী নই।"

সাপ্তাহিক বাঙলা কবিতা—সম্পাদনা : শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড। কলকাতা—৯।

বছর দুয়েক আগে বাঙলা কবিতার প্রথম সাপ্তাহিকী বেশ কিছুকাল ধরে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদনা করেছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি তাঁরই সম্পাদনায় আবার 'সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে ও এখনও নব পর্যায়ে পত্রিকাটির ছ'টি সংখ্যা আত্ম-প্রকাশ করেছে। এই পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা কিছুদিনের মধ্যেই কবি বিষ্ণু দে-র ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটি একযোগে সম্পাদনা করবেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শান্তি লাহিড়ী ও সমীর দাশগুপ্ত।

দি স্পুটনিক (প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা)— সম্পাদক অশোক কুশারী।। মাড়োয়ারী বাগান, নব ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা।। দাম ২০ পয়সা।।

ইংরেজী নামের বাংলা বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা। নব ব্যারাকপুর উচ্চতর বালক বিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্ররা প্রকাশ করে থাকেন। প্রথম সংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যাটির রচনা নির্বাচন উন্নত হয় নি। তবে প্রচ্ছদের পারিপাট্য বেড়েছে।

কালি ও কলম (শ্রাবণ ১৩৭৬ — সম্পাদক — বিমল মিত্র। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা—১২।। দাম—পঁচাত্তর পয়সা।

'কালি ও কলম' নিয়মিত বেরিয়ে যাচ্ছে মাসে মাসে। ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণই পত্রিকার প্রধানতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ সংখ্যায় লিখেছেন চুনীলাল রায়, দিলীপ মালাকার, অখিল নিয়োগী, অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়, অদ্ভুত চট্টোপাধ্যায়, চিত্তব্রত পালিত, জ্যোৎস্না গুহ, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ভট্টাচার্য, ছবি মুখোপাধ্যায়, গৌর শাণ্ডিল্য, পুলিনবিহারী সেন ও মৃণালেন্দু অধিকারী।

যে কবি মোটর চালান

শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন বৃহত্তর জন-জীবনের শরিক হতে পারেননি বলে। যে-মানুষ কাজ করে কলকারখানায় গ্রামে গঞ্জে শহরে-বন্দরে—যে-কৃষক ধান বোনে মাঠে মাঠে, লাঙল চালায়—তার পরিপূর্ণ অংশীদার হতে পারেননি তিনি। অথচ, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছিল তাঁর অগাধ। দূর থেকে দেখেছেন তিনি তাদের। কখনো কাছে যেতে পারেননি। সেজন্যেই বোধহয় লিখতে পেরেছিলেন—

যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে-কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

রবীন্দ্র-আকাঙ্ক্ষিত সেই ধরনের একজন কবির খোঁজ পেয়েছিলাম আমি দিল্লীতে গিয়ে। তাঁর নাম মাধবন নাম্বুদিরি পালুর। বয়স ছত্রিশ। পেশা, মোটর চালনা। লেখা শুরু করেছেন একটু বেশি বয়সে। জন্ম কেরালায়। বাল্য-কৈশোরের চাপল্য অতিক্রম করে কবিতায় এনেছেন যৌবনের উত্তাপ ও জীবনের স্পর্শ। ১৯৬০-এর গোড়ার দিক থেকে লিখতে শুরু করেন বেশী পরিমাণে। এদিক থেকে তিনি ষাটের কবি। প্রথম কবিতা প্রকাশের দিক থেকে পঞ্চাশের।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মালয়ালাম বিভাগ তাঁর ওপর একটি বিশেষ আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন গত পয়লা সেপ্টেম্বর। আলোচনাটি সীমাবদ্ধ থাকে তাঁর কবিতার আঙ্গিক, বিষয়, বৈশিষ্ট্য ও সাম্প্রতিক কাব্যান্দোলনে তাঁর ভূমিকার ওপর। কেরালা ক্লাব ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর সম্মানে ও অভ্যর্থনায় বিশেষ অনুষ্ঠানের।

তাঁর এই সম্মানলাভে খুশি হলেও বিস্মিত হয়েছিলাম আমরা অন্য কারণে।

এর আগেও বহু কবি-সাহিত্যিক বেরিয়ে এসেছেন সমাজের নিচুতলা থেকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাইটালিটি রক্ষা করতে পারেননি অনেকেই। বিস্মৃত হয়েছেন

পুরনো জীবন। প্রতিষ্ঠার মোহ গ্রাস করেছে অভিজ্ঞতার সঞ্জীবতাকে।

মাধবন নাম্বুদিরি সে-রকম কবি নন। এখনো তিনি সামান্য ড্রাইভার। সাম্প্রতিক বাঙালি তরুণ কবিরা যখন অনেকেই সামাজিক জীবন ও জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতাকে কাব্যরচনায় প্রায় তুচ্ছ ব্যাপার বলে গণ্য করতে চেষ্টা করছেন, তখন ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের এই মালয়ালাম কবি পুরনো পথ ও পদ্ধতিকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ নতুন জীবনমুখী কবিতার প্রবর্তনে নজীর সৃষ্টি করতে ব্যাপৃত।

তরুণ মালয়ালাম কবিদের মধ্যে তাঁকে চিহ্নিত করা হয় 'আভাঁ গার্দ' কবি হিসেবে।

স্বপ্নবিলাস, মায়াবী মন্ত্রোচ্চারণ কিংবা রোম্যাণ্টিকতায় বিশ্বাসী নন মাধবন নাম্বুদিরি। বাংলাদেশের চল্লিশের কবিদের মতো তিনি সমাজ-বিশ্বাসী। জীবনের সংগে তাঁর যোগ কেবল বাইরের দিক থেকে নয়, বরং ভেতর দিক থেকেও।

তিরিশে আগস্ট রাত প্রায় এগারোটা। পুরনো দিল্লীর একটা হোটেলে বসে কথা হচ্ছিল জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে। নামটা মনে করতে পারছি না। বেশ কয়েকবার মুখস্থ না করলে আমি অবাঙালি নাম মনে রাখতেও পারি না। একটা ইংরেজী দৈনিকের রিপোর্টার। বেশ সাহিত্যরসিক মানুষ। বললেন, ভেতো বাঙালির মতো চেহারা নয় মাধবনের (আমি ভাতের খোঁজেই গিয়েছিলাম সেই হোটেলে)। শৌখীন মানুষ তিনি। দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। মানুষকে দূরে থেকে দেখা তাঁর অভ্যাস নয়। বস্তুসত্তার গভীরে না পৌঁছে কোনো কথাই বলেন না তিনি।

বেশ চোস্ত ইংরেজীতে কথা বলছিলেন ভদ্রলোক। আমি বললাম, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু কি?

—আজকের নগর-জীবন তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য। ক্লান্তি, বিষাদ, ক্ষোভ, দুঃখ সবই আছে। তবে আশাবাদী কবি তিনি। ব্যক্তিজীবনের অনিশ্চয়তা ও অনির্দেশ্যতাকে আদৌ মান্য করেন না। গণ-সাহিত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তাঁর কবিতার প্রথম শেষ পংক্তি লেখা। সমাজকে উপেক্ষা করে সার্থক কবিতা লেখা যায় না বলে তিনি বিশ্বাস করেন। সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজনকে যেমন তিনি প্রাধান্য দেন, তেমনি নির্মাণ করেন জীবন দর্শনের একটা বলিষ্ঠ অবয়ব। ব্যক্তিকে তুচ্ছ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারকে কবিতার সরসতা বলে স্বীকার করেন না তিনি।

আমার কৌতূহল তখন ক্ষিধের যন্ত্রণা ভুলিয়েছে। বললাম, তা হলে তো বেশ পরিশ্রমী কবি বলা যায় মাধবনকে? তাঁর কবিতা লেখার পদ্ধতি কি?

—হ্যাঁ, সারাদিন পরিশ্রম করেন তিনি। কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকেন। কবিতা থাকে জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে। 'কবিতা লিখব বলে' সারাদিন পংক্তি সাজাবার কৌশল আয়ত্ত করেন না তিনি। কবিতার পেছনে সময় দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করেন না। তিনি লেখেন কমিটমেন্টের কবিতা। ফলে, যতক্ষণ না কোনো বিষয় মাথার ভেতরে আঘাত করে, ততক্ষণ লেখা বন্ধ। যখনই কোনো অনুভব তাঁর ভেতর জন্ম নেয়, তখন কবিতা লিখতে দেরী হয় না তাঁর। সহজ, স্বাভাবিক অভিব্যক্তির মতো পংক্তির পর পংক্তি বেরিয়ে আসে তাঁর কলমের মুখে। অথচ, কি আশ্চর্য, সরল ও অভিনব তাঁর উচ্চারণ।

পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ১৯৬২ সালে বেরোয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ আঠারটি দীর্ঘ কবিতার সংকলন। 'আকাশবাণী' থেকে সম্প্রচারিত হয়েছে কয়েকটি কবিতা।

জন্মসূত্রে মাধবন নাম্বুদিরি পুরোহিতের ছেলে। তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই করতেন যজমানী ব্যবসা। মাধবনও হয়তো তাই করতেন। ঘটনাক্রমে হয়ে গেলেন অন্য মানুষ।

নয় বছর বয়সের সময় তিনি আলওয়ের কাছাকাছি গুরুকুলে যান সংস্কৃত ও বেদ-অধ্যয়নের জন্য। শঙ্করাচার্য জন্মেছিলেন আলওয়ে-তে। কিন্তু এসব ভালো লাগত না তাঁর। আড়াই বছর বাদে ঠিক করলেন, কথাকলি নাচ শিখবেন। গেলেন ওত্তম পালাম-এ। গুরু পি রাভুন্নি মেননের কাছে শিখতে শুরু করলেন কথাকলি নাচ। এমনি করে পেশা ও নেশা বদল করে কাটিয়ে দিলেন আরো কয়েক বছর।

সতেরো বছর বয়সে ত্রিচুরে যান তিনি মোটর মেকানিকের শিক্ষানবিশী করার জন্য। অল্প দিনের মধ্যেই শিখে ফেললেন মোটর চালানোর কাজ। কিন্তু টাকা না হলে দিন চলে না। কাজ নিলেন একজন সাহায্যকারীর। মনের ভেতরে তখন তাঁর পড়াশোনার ঝোঁক। অবসর সময়ে বাল্মীকি আর কালিদাস পড়েন। বাল্য বয়সে সংস্কৃত শেখার ফলে, পুরনো মহাকাব্যগুলি পড়া হয়ে গেল তাঁর।

১৯৫৪ সালে তিনি সাক্ষাৎ করেন সংস্কৃত পন্ডিত ও লেখক কে পি নারায়ণ পিশোরোদির সঙ্গে। ত্রিচুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন ভদ্রলোক। মাধবনের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন একজন কবি মানুষকে। মাধবনও নিজেকে ছেড়ে দেন কে পি নারায়ণ পিশোরোদির হাতে। তখন তিনিই ছিলেন মাধবনের পরিচালক ও উপদেষ্টা।

বছর এগারো আগে, ১৯৫৮ সালে, মাধবন বোম্বে যান চাকরীর খোঁজে। পকেটে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। ওখানেই চাকরী পান তিনি। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একটা যাত্রীবাহী গাড়ীর ড্রাইভার হিসেবে। এখনো তিনি ঐ একই কাজে বহাল রয়েছেন।

নতুন চাকরীতে মাধবন অসুখী নন। দেশী-বিদেশী কত কবি-সাহিত্যিক নানাজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় তাঁর। পৌঁছে দিচ্ছে তিনি গন্তব্যস্থানে। ১৯৬০ সালে পরিচিত হন জনৈক ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের সঙ্গে। তাঁরই প্রেরণায় ও সাহায্যে তিনি পড়াশোনা করেন স্টিফেন স্পেন্ডার, ডবলিউ এইচ অডেন, আর টি এস এলিঅটের কবিতা।

প্রথাগত প্রকাশভঙ্গি ও পুরনো বিষয়কে বর্জন করে তিনি সাম্প্রতিক মালয়ালাম কবিতায় ইংরেজী কাব্যের স্পিরিট ও উপাদানকে প্রয়োগ করেছেন সার্থকভাবে। শুধু জনপ্রিয়তাই নয়, মাধবন নাম্বুদিরি পালুর তাঁর স্বদেশী কবিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

—গৌরাঙ্গ ভৌমিক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডিউটি শেষ করে হাসপাতালের পাশের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। রাস্তার পিচ গরম গলে গিয়েছে তখন। সূর্যের প্রখর উত্তাপে যেন ঝলসে গিয়েছে সারা শহরটা। সেই দুপুরে একমনে হাঁটছে সরিৎ। সে ধারণাও করতে পারে নি, তার জন্য ওৎপেতে তিন-জন লোক অপেক্ষা করছে। রাস্তাটা যেখানে বেঁকে গিয়েছে সেখানে লোক তিনটে অপেক্ষা করছিল। নির্জন রাস্তাটা পার হতে যাওয়ার মুখে তিনজনই তাকে ঘিরে দাঁড়াল। ভয় পেল না সরিৎ, রুখে দাঁড়াল সে। প্রথম লোকটা তাকে লক্ষ্য করে ছুরি তুলতে সরিৎ তার পেটে সজোরে ঘুঁষি মারল একটা। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। সরিৎ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অপর দুজনের অপেক্ষায়। তারা দুজনেই এবার একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। ধরাশায়ী হল সরিৎ কিন্তু দমল না তাতে। উঠে দাঁড়িয়ে সে আর একটাকে কাবু করল তার ঘুঁষির ঘায়ে। অপরটা আর দাঁড়াল না পালিয়ে গেল প্রাণভয়ে।

সরিতের সাহস আছে, প্রয়োজনে সে তার সদ্ব্যবহার করে থাকে। কাপুরুষের মত পিছিয়ে আসে না প্রাণ ভয়ে। নারানদাস অ্যাডভানী তাকে পুনর্নির্দেশ করেছেন।

নিউ মার্কেটে অ্যাডভানী ক্লোজেস খুঁজতে দেরী হল না তার। রাকেশ কাউ-ন্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে ধূমপান করছিল। সরিতকে দেখে তার মুখটা পাংশু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

আপনি একবার বাইরে আসবেন—সরিতের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

আমি এখন ব্যস্ত আছি। পাশ কাটাতে চেষ্টা করল রাকেশ।

বেশী দেরী হবে না আপনার। সাধারণ-ভাবে কথা বলতে চেষ্টা করল সরিৎ।

অগত্যা বাইরে বেরিয়ে এল রাকেশ।

কি বললেন। আঙুলে-ধরা সিগারেট কাঁপছে তার।

আমার সঙ্গে চলুন। তার বাহুটা বজ্র-মুষ্টিতে ধরল সরিৎ।

আমি যাব না, কাজ আছে আমার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রাকেশ।

ডোন্ট বি এ ফুল—আপনি জানেন, আমি আপনাকে না নিয়ে যাব না।

আমি তাহলে চিৎকার করব। ভয় দেখাল রাকেশ।

তাতে কিছুই হবে না, কেউ তোমায় বাঁচাতে আসবে না; সঙ্ঘব্যবসায়ীরা তোমায় যথেষ্ট চেনে।

কি করবে তুমি। ভয়ের মধ্যে সাহস দেখাতে চেষ্টা করল রাকেশ।

কিছু নয়; তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। ভয় পাবার কিছু নেই।

আমি ভয় পাই না, আমি বাঙালী নই। বুকটা চিতিয়ে কথাটা বলল রাকেশ।

তাহলে এস আমার সঙ্গে।

গাড়ীর কাছে এসে সরিৎ বলল—উঠে পড় গাড়ীতে।

রাকেশ মোটরে উঠল।

তুমি থাকো কোথায়? গাড়ী চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করল সরিৎ।

কড়েয়ার, কেন?

দীনার চিঠিগুলো কোথায় রেখেছ?

পুলিশ নিয়ে গেছে।

মিথ্যে কথা, সেগুলো তোমার কাছেই আছে। আমি পুলিশের কাছ থেকে খবর পেয়েছি।

গাড়ীটা ময়দানের দিকে নিয়ে চলল সরিৎ। তারপর একটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে মাঠের মধ্যে সোজা এগিয়ে চলল।

এখানে কোথায় যাচ্ছ? মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে রাকেশের।

একটু ফাঁকা জায়গায় নিরিবিলিতে তোমার সঙ্গে আলাপ করব; নেমে এস।

লিভ মি অ্যালোন—ধাক্কা দিল রাকেশ সরিৎকে।

একটু পিছিয়ে গেল সরিৎ তারপর—তার হাত ধরে টেনে গাড়ী থেকে বার করল জোর করে।

হাউ ডেয়ার ইউ—আমার গায়ে হাত দেওয়া। সজোরে সরিতের বুকে একটা ঘুষি মারল রাকেশ।

শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে গেল সরিতের। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর প্রচণ্ড বেগে নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল রাকেশের ওপর। দুজনে একসঙ্গেই ধরাশায়ী হল। দুজনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলল। এক সুযোগে দাঁড়িয়ে উঠল সরিৎ। তার সঙ্গে রাকেশও। কিন্তু সে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সরিতের প্রচণ্ড ঘুষি তার মাথার ওপর এসে পড়ল। রাকেশ সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর লুটিয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল সরিৎ তার দিকে লক্ষ্য রেখে। রাকেশের নাক আর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে বিন্দু বিন্দু। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়াল। তখন সরিৎ আর দেরী করল না, তার শার্টের কলারটা দুমুঠিতে ধরে বলল—রাকেশ এখানে যদি একটা লাশ পড়ে থাকে, তাহলে সেটা খুঁজতে একটু সময় লাগবে—সে-কথা জান?

লাশ?

হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তোমার মৃত্যুর কোন কারণও খুঁজে পাবে না পুলিশ।

তার মানে? ঠোঁটদুটো কাঁপছে রাকেশের।

তার মানে, নার্স কেতকীরও মৃত্যুর কোন কারণ খুঁজে পায়নি ওরা। চীৎকার করে হেসে উঠল সরিৎ।

তাহলে, তুমিই মেরেছ কেতকীকে?

একটা যে মারতে পারে, তার কাছে আর একটাও কিছু নয় রাকেশ।

একটু এগিয়ে গেল সরিৎ তার দিকে।

আমি চীৎকার করব।

কেউ নেই কোথাও, তোমার চীৎকার শুনবে কে? আবার তার শার্টের কলারটা জোর করে ধরল সরিৎ। তারপর চাপা গলায় বলল, রাকেশ, চিঠিগুলো দাও।

চিঠি! ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় রাকেশ।

হ্যাঁ, কোথায় রেখেছ? শার্টের কলারে আরও চাপ দেয় সরিৎ। দিচ্ছি দিচ্ছি, আমার কাছেই আছে, কিন্তু আমায় ছেড়ে দাও। কাকুতি করে বলল সে।

আগে দাও তারপর ছাড়ব। সরিৎ বজ্র-মুষ্টিতে রাকেশের কলার ধরে ঝাঁকি দিল কয়েকটা।

শার্টের ভিতরের পকেট থেকে একটা পুরানো খাম বার করে সরিতের হাতে দিল সে। খাম থেকে একবার চিঠিগুলো বার করে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল সরিৎ। না, রাকেশ ঠকায়নি তাকে।

সরিতের গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছিল রাকেশ। বাধা দিয়ে সরিৎ বলল—একটু হাঁটো রাকেশ, হাঁটলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

তারপর গাড়ীটা একটু এগিয়ে যেতে পিছু ফিরে আবার বলল—একটা কথা জেনে রেখো রাকেশ, বাঙালীর চেয়ে তোমার সাহস কম।

রাকেশ তাকে একটা অশ্লীল কটূক্তি করল, সরিৎ তখন অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে।

বাড়ীতে এসে সরিৎ দেখল, দীনা ঘরে চুপ করে শুয়ে রয়েছে। কি হয়েছে দীনাকে জিজ্ঞাসা করল সরিৎ। না কিছু নয়—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে সে।

খামশুদ্ধ চিঠিগুলো তার কাছে রেখে সরিৎ বলল—রাকেশের কাছ থেকে চিঠিগুলো নিয়ে এসেছি।

উঠে বসে পড়ল দীনা। তারপর সরিতের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল—একি, তোমার মুখে রক্ত। ঠোঁট কেটে গিয়েছে কি করে?

তাড়াতাড়ি এসে সরিতের একটা হাত ধরল সে। ও কিছু নয়। রাকেশের সঙ্গে একটু দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেছি।

বস চুপ করে। এক নিমেষে সব জড়তা কেটে গিয়েছে দীনার। তুলো আর জল নিয়ে কাটা জায়গাগুলো ড্রেস করে দিল দীনা। শুধু ঠোঁটে নয়, সরিতের পা এবং হাতের কয়েক জায়গাতেও কেটে গিয়েছে। কাজটা হতে সে চিঠিগুলো নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। তারপর সরিতের দু' কাঁধের উপর দুটো হাত রেখে হাসল একটু। অনেকদিন পর দীনার মুখে মিষ্টি হাসি দেখল সরিৎ।

আজ রাকেশ অ্যাডভানীর দিনটা বড় খারাপ যাচ্ছে। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল তাই ভাবছিল সে মনে মনে। সরিৎ তাকে এভাবে জব্দ করে চিঠিগুলো নিয়ে যাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। তবে এছাড়া তার উপায়ও ছিল না। ডাক্তারটা যে খুনী তা সে নিজেই স্বীকার করেছে। অথচ তারই পিছনে এখনও পুলিশ কেন যে লেগে রয়েছে জোঁকের মত তা সে বুঝতে পারে না। কলকাতার ওপর তার ঘৃণা এসে গিয়েছে; এখানকার সবই খারাপ, বাজে—বুদ্ধি। সাধারণ মানুষ থেকে পুলিশ পর্যন্ত সবাই বিলকুল বেকুব। তার পেটে যদি কয়েক পেগ পড়ত তাহলে সে ডাক্তারকে বুঝিয়ে দিত কত ধানে কত চাল। খালি পেটে রাকেশের মন দুর্বল থাকে, শরীরের জোর কমে যায় একথা সে জানে। রাগে ফুলতে ফুলতে রাকেশ ময়দানের মধ্য দিয়ে হেঁটে যখন নিউ মার্কেটের দোকানে পৌঁছুল তখন অনেকটা দেরী হয়ে গিয়েছে। রাকেশ ক্লান্ত হয়ে বসল একটা চেয়ারে।

রাকেশের রক্তাক্ত মুখের অবস্থা দেখে তার দোকানের কর্মচারীরা এগিয়ে এল তার সাহায্যে। এতখানি রাস্তা সে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে কোনমতে এসেছে। মুখ ধুয়ে এবং প্রতিষেধক শুধু লাগিয়ে রাকেশ আরশিতে যখন নিজের চেহারা দেখল তখন আর সে নিজেকে চিনতেই পারল না। মুখটা তার ফুলে রয়েছে। ভ্রূর একদিকে ঠিক চোখের ওপরে লম্বাভাবে অনেকটা কেটে গিয়েছে। তাছাড়া তার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে বদমাইশটা।

একটু পরে আর এক আপদ জুটল। পুলিশ থেকে সুব্রত চৌধুরী আর মিঃ ঘোষ এসে পৌঁছুল তার খোঁজে।

মিঃ অ্যাডভানী, বাইরে আসুন, একটু কথা আছে—। তাকে ডাকল সুব্রত আস্তে-আস্তে।

উঠে এল রাকেশ। সর্বাঙ্গে তার ব্যথা হয়ে গিয়েছে।

কি ব্যপার, কার সঙ্গে মারামারি করলেন? জিজ্ঞাসা করল সুব্রত চৌধুরী।

সেই খুনী ডাক্তারটার সঙ্গে। ভাঙা গলায় উত্তর দিল রাকেশ।

কেন কি হয়েছিল?

সে আমাকে দোকান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরেছে, আমি তার বিরুদ্ধে কেস করব।

নিশ্চয়ই করবেন। এসব কি অন্যায় কথা। সমবেদনার সুরে বললেন মিঃ ঘোষ।

কিন্তু আপনারা কি করছেন?

- আমরা কি করব?

ডাক্তার মুখার্জি নার্সটাকে মার্ডার করেছে একথা জানেন?

তাই নাকি। আশ্চর্য হলেন মিঃ ঘোষ।

হ্যাঁ, আমার কাছেও স্বীকার করেছে সেকথা আর বলেছে যে পুলিশের সাধ্য নেই মৃত্যুর কারণ খুঁজে বার করে।

সুব্রত চৌধুরী আর মিঃ ঘোষ পরস্পরের দিকে তাকাল। সুব্রত চৌধুরী বলল, আমরা সে বিষয়ে এখনও তদন্ত চালাচ্ছি। কিন্তু উপস্থিত আপনার কাছে আমরা আর একটা খবর নিতে এসেছি।

কি খবর? আপনাদের কি খবর নেওয়া শেষ হবে না?

আপনি বিরক্ত হচ্ছেন মিঃ অ্যাডভানী, অবশ্য বিরক্ত হবারই কথা। আপনার এখন শরীর-মন দুই-ই খারাপ।

সুব্রতর কথায় কণ্ঠের ছোঁয়াচ লক্ষ্য করে রাকেশ বলল,—ওসব বাজে কথা ছেড়ে কি জিজ্ঞাসা করবেন করুন।

নার্স কেতকীর গয়না আর টাকাগুলোর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

নার্সের গয়না বা টাকার কথা আমি জানি না।

বাবলু মণ্ডলের সঙ্গে এ বিষয়ে কোন আলাপ হয়েছিল আপনার?

না। ভ্রুকুটি করে দাঁড়িয়ে রইল রাকেশ।

আমাদের ধারণা যারা নার্স কেতকীর গয়না আর টাকা চুরি করেছে তারাই তার হত্যাকারী।

আমাকে বাজে বকাবেন না, আমার মেজাজ খুব খারাপ।

তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

তাহলে, যদি অ্যারেস্ট করতে চান করুন, নয়ত কেটে পড়ুন।

তার আগে আপনাকে একটা খবর জানাচ্ছি মিঃ অ্যাডভানী।

আবার কি খবর? সুব্রতর দিকে এক-চক্ষু হরিণের মত তাকাল রাকেশ কারণ তার অপর চোখটা প্রায় ঢেকে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

কাড়েয়ার জুয়ার আড্ডার লোকেরা আপনার খোঁজ করছে। কথাটা আলতো-ভাবে বলে সুব্রত আর দাঁড়াল না, এগিয়ে গেল মিঃ ঘোষের সঙ্গে।

রাকেশ আডভানীর পাদুটো কাঁপতে লাগল ঠক-ঠক করে। আর একটু হলেই পড়ে যেত সে। দোকানের একজন কর্মচারী ধরে ফেলল তাকে ঠিক সময়ে।

আডভানীদের সময় ভাল যাচ্ছে না। সরিতের মুখে ছেলের অপকীর্তির কথা শোনার পর থেকেই নারানদাস আডভানীর শরীরটা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। দুবৃত্ত রাকেশ তাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে। বহুবার নাকাল হয়েছেন তিনি ছেলের হাতে। কিন্তু কলকাতায় তার অবস্থিতির সংবাদ জেনেও রাকেশ দীনাকে এভাবে পীড়ন করছে জেনে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। সারা রাত দারুণ দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগে ঘুম হল না তাঁর।

নারানদাস আরোগ্যের দিকে অনেকটা এগিয়েছিলেন। এবারে সেটা শুধু আহতই হল না, তাঁর এই মানসিক দুর্যোগের ফলে অনেকগুলো অবাঞ্ছিত উপসর্গ এসে জুটল। ব্লাডপ্রেসারে একটু ঊর্ধ্বগতিই ছিল। এবার সেটা সুযোগ পেয়ে মাথাচাড়া দিল। হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এতদিন সুচিকিৎসা আব দীর্ঘ বিশ্রামের ফলে সেটা আয়ত্তের মধ্যে এসে গিয়েছিল। এবার সেটাও বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিডনীও চুপ করে রইল না। নানাভাবে বিকৃতি এনে দিল দেহের মধ্যে। রক্ত দূষিত হয়ে উঠল। শরীরের গ্লানি বার করতে নারাজ হয়ে ধর্মঘট করল পৌরপ্রতিষ্ঠানের মত। ফল একই হল। নারানদাস আ্যাডভানী নিজের দেহের গ্লানিতে ডুবতে লাগলেন একটু একটু করে।

দীনা আর সরিৎ তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়ে তখনই এসে পড়ল ডাঃ ব্যানার্জির নারসিং হোমে। তাদের দেখে খুশী হলেন নারানদাস। দীনার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন—বেটি তুমি এসে গিয়েছ।

হ্যাঁ বাবুজী, আজ থেকে আমিই তোমার নার্স।

ডাক্তারসাব, সেই চিঠিগুলো। সরিতের দিকে তাকালেন তিনি।

পেয়েছি, তুমি ঘুমোও বাবুজী। দীনাই উত্তর দিল সরিতের হয়ে।

তুমি আমায় ক্ষমা কর বেটী। আমার পাপেই তুমি কষ্ট পাচ্ছ। ও আমার ছেলে নয়, পাপ। চোখদুটো সজল হয়ে উঠল তাঁর।

নার্স কেতকীর ঘরটা সুব্রত চৌধুরী আর মিঃ ঘোষ আবার তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন। সুব্রতর মনে পড়ল, কেতকীর মৃত-দেহ আবিষ্কারের সময় ঘরের অবস্থার কথা। আলমারির পাল্লা দুটো খোলা। তার থেকে ড্রয়ার বার করে খাটের ওপর কাপড়-জামা থেকে শুরু করে নানারকম মেয়েলী টুকিটাকি ছত্রাকার করে ছড়ান ছিল। সমস্ত ঘরটা কে যেন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে যথেচ্ছচারে। শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে কয়েকটা তাৎপর্যপূর্ণ জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে। বইয়ের আলমারির পিছন দিক থেকে পেন্টোথ্যাল, ফ্ল্যাক্সিডিল, পেথিডিন প্রভৃতি ওষুধের অনেকগুলো খালি অ্যাম্পেল পাওয়া গিয়েছে। এই সঙ্গে একটা বড় সিরিঞ্জ ছিল। ডাক্তার সরিৎ মুখার্জি রুগীকে অজ্ঞান করার সময় এই ওষুধগুলোই ব্যবহার করে থাকেন।

আবিষ্কারের ফলে মিঃ ঘোষ প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। ওভাবে লুকোনো অবস্থায় ওগুলো রাখার মানে কি হতে পারে? বললেন তিনি—আর একবার ডাঃ মুখার্জিকে জেরার মুখে ফেললে কেমন হয়?

ভাল হয়। উত্তর দিল সুব্রত চৌধুরী—কিন্তু তার আগে আমি একবার কেতকীর ডায়েরীটা পড়ে নিতে চাই।

পড়ুন; অবিবাহিত যুবকের পক্ষে অনেক মুখরোচক জিনিস থাকতে পারে হয়ত। মিঃ ঘোষের ক্ষীণ কণ্ঠে রসিকতার ইঙ্গিত রয়েছে।

উত্তরে সুব্রত কিছু বলল না শুধু খাতাটা নিয়ে পড়তে শুরু করল।

...জানুয়ারী—সোমবার। ডাঃ দীনা মুখার্জির স্মার্টনেস অসহ্য লাগে আমার কাছে। একে আমি স্মার্টনেস বলি না। বেশী কথা বলা, অযথা লোককে ধমকানো বা তাড়াতাড়ি কাজ করার নাম স্মার্টনেস বলে আমি মনে করি না। হ্যাঁ শুধু তাই নয়, ও জিনিসটা শিক্ষা করে কেউ আয়ত্তে আনতে পারে না। সরিৎ কিন্তু তাতেই মুগ্ধ! আজ পরপর দুটো অপারেশন হল। একটা ওভারিয়ান টিউমার আর একটা সিস্ট। ও অপারেশন যে কোন সাধারণ ডাক্তারও করতে পারেন। কিন্তু ডাক্তার দীনা মুখার্জি আত্মপ্রচারের মুখোস বড় একটা ছাড়েন না। অপারেশনের পর ওভারিয়ান টিউমারটা একটা গামলাতে নিয়ে রুগীদের ও ভিজিটারসদের সেটার ওজন এবং কিরূপ দক্ষতার সঙ্গে কিভাবে অপারেশন করা হয়েছে তার একটা বিশদ বিবরণ দিলেন। আমার ইচ্ছে হল ওঁকে মনে করিয়ে দিতে যে, মেডিকেল কলেজে একবেলায়, এর চেয়ে অনেক বড় টিউমার, খুঁজলে বেশী পাওয়া যায়। ভদ্রমহিলার দম্ভ দেখলে হাসি পায়। পেটের যন্ত্রণা আজ সকাল থেকে তিনবার হল। এবার দুটো করে ট্যাবলেট খেয়েও কিছু হচ্ছে না। সরিৎ তুমি জান না, আমি কত সহ্য করেছি। দেহে মনে আমি জর্জরিত হয়ে গিয়েছি। তোমার কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই! এখন ওই পাঞ্জাবী মেয়েটাই তোমার কাছে সব। কিন্তু সেদিনের কথা ভুলে গেছ। যেদিন তোমার জন্য আমি শত অপমান আর লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। তোমার শুভ-কামনায় রাতের পর রাত কাটিয়েছি বিনিদ্রায়।

বাবলু মণ্ডল মালতীদির ছেলে বলে কিছু বলি না। কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলে রিপোর্ট করতে হবে ওর বিরুদ্ধে। স্পর্ধার শেষ নেই লোফারটার।

একটা জুতো কিনলাম। একটু বেশী দাম পড়ল কিন্তু খুব পছন্দ হয়ে গেল। সরিতের ভাই সনৎকে আজ প্রথম দেখলাম। ঠিক সরিতের মত দেখতে। তবে বেচারার একটা পা খোঁড়া। ভদ্রলোক কেমন যেন লাজুক প্রকৃতির বলে মনে হল। মুখের দিকে চেয়ে কথা বলতেই পারেন না।

মিসেস দত্তের একটা ছেলে হয়েছে। সিজারিয়ান অপারেশন হল। মিঃ দত্ত সকলকে এক এক বাক্স সন্দেশ উপহার দিয়েছেন।

মঙ্গলবার — আজ অনেক সকালে উঠেছি। অন্য কোন কারণ নেই, রাতে ভাল ঘুমোতে পারি নি। কেমন দুঃস্বপ্ন দেখেছি। একটা স্বপ্ন বেশ মনে আছে।

সরিৎ যেন বিলেত থেকে নিজের অসুস্থতার জন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। কি হয়েছে, তা কিন্তু বলে নি। বিলেতে পৌঁছে কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ঠিকানা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। আমি শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি ঠাণ্ডায়। দারুণ শীত করছে আমার। একটা ফুলের দোকানে

গিয়ে বসলাম আমি। সুন্দর গন্ধ চতুর্দিকে। একটা মোটা লোক এসে আমার কানের কাছে চুপি-চুপি বলল যে সরিৎ হাসপাতালে আছে। কথাটা শুনে আমি যেন আরও ভেঙে পড়লাম। তবুও গেলাম সেখানে। নার্সরা আমাকে ভীষণ খাতির করল। তারপর সঙ্গে করে নিয়ে গেল সরিতের কেবিনে।

সরিতের চেহারা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম — তুমি আমার এতদূরে টেনে নিয়ে এলে কেন? সে উত্তর দিল— 'বিয়ে করব বলে। কিন্তু তার আগে তোমাকে আমার অবস্থাটা দেখাতে চাই।' কথাটা বলে সে নিজেই গায়ের ওপর থেকে চাদরটা সরিয়ে নিল। দেখে আমি চিৎকার করে কেঁদে উঠলাম। সরিতের দুটো পাই কেটে গিয়েছে।

ঘুমটা ভেঙে গেল। বাথরুমের কল থেকে টপ টপ করে বালতিতে জল পড়ছে শুনতে পেলাম। একঘেয়ে আওয়াজটা, একটুও বিরাম নেই তার। হু-হু করে ঠাণ্ডা আসছে। তাকিয়ে দেখলাম জানালা খুলে গিয়েছে কখন। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে জানাল বন্ধ করে দিলাম। পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। দুটো ট্যাবলেট খেলাম। তাতেও কিছু হল না। একটা মরফিন ছিল; সেটা আর নিলাম না। কাজ শেষ করে সেটা নিয়ে একটু ঘুমনো যাবে। মরফিন আজকাল আমায় প্রায়ই নিতে হয়। যন্ত্রণাটাকে ভোলাবার জন্য একটা গান শুরু করলাম আস্তে আস্তে। অদ্ভুত অনুভূতি! পেটের যন্ত্রণা, ঘুমের ওষুধ আর ললিত রাগ মিশে গেল একসঙ্গে। নিজের কাছে নিজের গলাই ভাল লাগল। হঠাৎ আজগুবি স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ল। কি অদ্ভুত স্বপ্ন! এমন আবার হয় নাকি?

আজও সনৎবাবু এসেছেন। স্যাকারিন দিয়ে এক কাপ কফি করে দিতে খুব আশ্চর্য হলেন। আমি কিন্তু আগেই জেনেছি, উনি চিনি খান না। কারণ সেদিন আমি শুনেছি নারসিং হোমের বেয়ারাকে বিনা চিনির চা আনতে দিতে। ভদ্রলোক ঠিক সরিতের মত দেখতে। থুতনির কাছটা টেপা, ঠোঁটদুটো পাতলা, কিন্তু খুব টাচী।

ডাক্তার দীনা আজ একটা পার্টি কিম্বা কোন নিমন্ত্রণে যাচ্ছে, সঙ্গে সরিৎও রয়েছে। পাঞ্জাবী মেয়ে দেখতে সুন্দর। তার ওপর অনেকরকম পালিশ করা হয়েছে। ভালই লাগছে দেখতে। সরিৎ আর্দির পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি পরেছে। এসাজটা আমার ভাল লাগে না। মনে হয় সাহেব বিবি গোলামের ছোটবাবু যেন জুড়ি থেকে সদ্য নামলেন।

ব্রাউজগুলো কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না। সেগুলো খুঁজতে গিয়ে সরিতের দেওয়া একটা ব্রোচ খুঁজে পেলাম। এটাই ওর প্রথম উপহার। দেবার সময় মুখটা এমন কাচু-মাচু করেছিল যে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল।

এই সেই সরিৎ। কি আশ্চর্য পরিবর্তন! এখন ও আমাকে মাইনেকরা নার্স ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। শুধু ওর নয়, ওর পাঞ্জাবী স্ত্রীরও দাসী আমি। সেদিন টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলে দীনা একটা চেয়ারে গম্ভীর হয়ে বসে রইল। কার সঙ্গে কথা কইল বুঝতে পারলাম না। তবে কোন রুগী বা বন্ধুবান্ধব বলেও মনে হল না। একটু পরেই সরিৎ ফোন করল ডাঃ অসীম ব্যানার্জির নারসিং হোম থেকে। আমিই ফোনটা ধরেছিলাম। ফোন আসার কথাটা বলতেই দীনার মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তবে সরিতের কথা বলতে যেন আবার স্বাভাবিক হল। কি ব্যাপার কে জানে। সরিৎ এখন আমায় নার্স বলে ডাকে। নার্স আমার মাস্ক, নার্স আমার ইথারের বোতলটা' — অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক শয়তান। একটা মেয়ের জীবন, ওধরনের লোকের কাছে কিছুই নয়। তাকে পায়ের তলায় দলে ওর মত লোক সচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারে নিজের রাস্তায়। কিন্তু রাস্তাটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে?

বুধবার—আজ সকালে আর বিকেলে মরফিন নিয়েছি। আজকাল না নিলে থাকতে পারি না, কেমন যেন অসহ্য লাগে। এখন শুধু যন্ত্রণার জন্য নয়। না নিলে মনটা খারাপ হয়, শরীর অসহ্য লাগে। পেটের ব্যথার তুলনায় এটা আরও মারাত্মক। তা হোক, মরফিন আমায় বাঁচিয়েছে। শুধু তাই নয়, রাতে এখন বেশ ঘুম হচ্ছে। কিন্তু শরীরটা যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে ক্রমশ ওজন এত কমে গেছে কেন বুঝতে পারছি না।

একটা রিস্ট-ওয়াচ কিনেছি। সরিৎ যেটা দিয়েছিল, সেটা সোনার। তুলে রেখেছি সেটা আমি ওকে যে টাইপিন দিয়েছিলাম সেটা নর্দমায় ফেলে দিয়েছে হয়ত। কিন্তু সেটাও সোনার ছিল। তাহলে ফেলবে না। গলিয়ে পাঞ্জাবী স্ত্রীর আর একটা গয়না গড়িয়ে দিয়েছে নিশ্চয়।

বৃহস্পতিবার — দীনা যদি মরে যায়। সরিৎ আমাকে বিয়ে করবে? অসম্ভব। কলকাতার এখন ও একজন নামজাদা ডাক্তার। সাধারণ একটা নার্সকে বিয়ে করতে যাবে কোন দুঃখে। সোসাইটির প্রজাপতিদের দলে গিয়ে ভিড়ে যাবে নিশ্চয়। আর দীনার মতই আর একটা বেছে নেবে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সরিৎ যদি মরে যায়, তাহলে? খুব ভাল হয়। আর কিছু না হোক আমি নিশ্চিন্ত হব।'

...আর থাকতে পারলেন না মিঃ ঘোষ। এতক্ষণ উসখুস করছিলেন। বললেন, এতটা পড়ে কি পাওয়া গেল।

কেতকীর মনের কিছু যে আভাস পাওয়া গেল। উত্তর দিল সুব্রত চৌধুরী।

মানে, সাইকোলজী বলছ।

হ্যাঁ, কেতকীর ডায়েরী থেকে মনে হচ্ছে ওর ভিতরে [illegible] একটা আগুনের [illegible]।

কোন সন্দেহ নেই। ডায়েরী না পড়লেও তো বোঝা গেছে। কিন্তু নতুন কোন রাস্তা পাচ্ছ।

হয়ত পাব। যারা রোজ ডায়েরী লেখে তাদের কাছে এটা দৈনন্দিন জীবনের একটা অভ্যাস মাত্র নয়, এটা তাদের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত। এটা নিজের কাছে কথা বলে মনকে হাল্কা করার একটা পন্থা বলতে পারেন।

বেশ তাই হল। কিন্তু তুমি কি আশা করছ, এর মধ্যে কেতকী লিখে রেখে গিয়েছে, কে তাকে মারতে চেষ্টা করছে? মিঃ ঘোষ একটু বিরক্ত হয়েছেন যেন।

না তা নয়। তবে একটা ছবি পাওয়া যাবে। হয়ত অস্পষ্ট হতে পারে কিন্তু তা থেকে কিছু নির্দেশ পাওয়া অসম্ভব নয়।

বেশ, তাহলে পড়। মিঃ ঘোষ চোখ দুটো বন্ধ করলেন। ঘুমের আমেজ আসছে তার।

সুব্রত চৌধুরী আবার পড়তে শুরু করল।

...রোজই সনৎবাবু আসছেন। আমি তাঁকে কফি করে দিচ্ছি আর হিসাব দেখার ছলে তিনি আমার সঙ্গে গল্প করছেন। ভদ্রলোক আবার সাহিত্য করেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে বারবার দেখছেন তিনি। খারাপ লাগছে না ওঁকে। কিন্তু ভদ্রলোকের অবস্থা সঙ্গীন বলে মনে হচ্ছে। একটা মতলব এসেছে মাথায়। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

শুক্রবার—সকালে উঠেই মরফিন নিতে হল। যন্ত্রণা একটু মনে হলেই ইনজেকসন নিয়ে নিই আজকাল। হাতের কাছে উপায় থাকলে সহ্য করার কোন মানে হয় না। শুধু শরীরের দিক দিয়ে নয়, মনের বিষয়েও একথাটাও খাটে। মুখ বুজে সহ্য করার দিন চলে গিয়েছে।

আজ একটা শক্ত অপারেশন করল দীনা। টিউবের মধ্যে বাচ্চা হয়েছে। রুগীর অবস্থা শোচনীয়। শেষ অবধি অপারেশনটা উৎরে গেল। মরে গেলে ভাল হত। দুজনকে নিয়ে টানাটানি করত ওরা। রুগী একজন নামজাদা নেতার মেয়ে। ভদ্রলোক সহজে ছাড়তেন না।

সনৎবাবুর ডুবু-ডুবু অবস্থা। আমিও চালিয়ে যাচ্ছি সমানে। সিনেমায় যাওয়ার কথা বললাম কিন্তু তিনি এড়িয়ে গেলেন কায়দা করে। লজ্জা পাচ্ছেন হয়ত, কিন্তু গেলে আমার উদ্দেশ্য সফল হ'ত।

শনিবার—মালতীর রান্না আর খাওয়া যায় না। অবশ্য ওর বিশেষ দোষ নেই। মেমসাহেব যা হুকুম করবেন তাই করবে ও। একটা জগ্গলসেদ্ধ, জলের মত ডাল, দুটো হ্যাংলা ট্যাংরা মাছ, এই দিয়ে সাড়ে তিনটার সময় কড়কড়ে ভাত খেলাম। রাতে আর একটা মরফিন নেব। ভাল থাকি এটা নিলে।

কি এবং কেন(১২): অ্যান্টিবায়োটিক্স্

বিশ্বযুদ্ধের সময় নতুন নতুন মারণাস্ত্র নির্মাণের জন্যে যুদ্ধরত বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেমন তীব্র প্রতিযোগিতা চলে, সেই সঙ্গে নতুন নতুন ভেষজ বা ওষুধ প্রস্তুতের জন্যেও সবিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এইভাবে যে ওষুধগুলি সাধারণ মানুষের কাছে ধন্বন্তরী হয়ে দেখা দিয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন, অরিওমাইসিন, সিবাজোল ইত্যাদি। এই ওষুধগুলি এক বিশেষ শ্রেণী ভেষজের অন্তর্গত—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যান্টি-বায়োটিক্স।

এই অ্যান্টি-বায়োটিক্স কথাটির সঙ্গে আমরা সকলেই আজ সুপরিচিত। গ্রীক শব্দ 'বায়োস্'-এর অর্থ হচ্ছে জীবন আর 'বায়োসিস্' শব্দের অর্থ জীবনীশক্তি। তাহলে অ্যান্টি-বায়োটিস্ বলতে বোঝায়, এমন জিনিস যা দিয়ে জীবনীশক্তি খর্ব করা যায়। কিন্তু কার জীবনীশক্তি খর্ব করা? মানুষের তো নয় নিশ্চয়ই। আমরা জানি, ভাইরাস ইত্যাদি বহু অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে মানুষের নানারকম রোগ-অসুখ হয়ে থাকে। মানুষের এই অদৃশ্য শত্রুগুলির জীবনীশক্তি খর্ব করার জন্যে যেসব ওষুধ ব্যবহৃত হয়, সেগুলিই হচ্ছে অ্যান্টি-বায়োটিক্স। একদিকে যেমন পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, অরিওমাইসিন ইত্যাদি ছত্রাকঘটিত উপাদানগুলি এর পর্যায়ে পড়ে, আবার তেমনি স্যালভারসন, সিবাজোল, প্রণ্টোসিল ইত্যাদি সালফোনেমাইড জাতীয় রাসায়নিক উপাদানগুলিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এই অ্যান্টিবায়োটিস্ আবিষ্কারের কাহিনী রূপকথার মতোই কৌতূহলোদ্দীপক। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, অতি আকস্মিকভাবে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফল লাভ করা গেছে, কিন্তু এদের আবিষ্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্যে বহু যুগ ধরে বহু বিজ্ঞানী ও গবেষকের প্রয়াস চলেছিল। সুদূর অতীতে প্রাচ্যদেশে কোনো কোনো ছত্রাক যে ওষুধরূপে ব্যবহৃত হত তার উল্লেখ নানা দেশের প্রচলিত উপাখ্যানে পাওয়া যায়। তিন হাজার বছর আগে চৈনিক ভিষকগণ ফোঁড়া ও দূষিত ক্ষত নিরাময়ের জন্যে ছত্রাকসহ সয়াবিনের ময়দার পুলটিশের ব্যবস্থা দিতেন। আর ভারতীয় চিকিৎসকেরাও আমাশয় রোগ নিরাময়ের জন্যে ছত্রাকঘটিত ওষুধের বিধান দিতেন।

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী বিজ্ঞানী পাস্তুর সর্বপ্রথম দেখতে পান, একশ্রেণীর জীবাণু, অন্য গোষ্ঠীর জীবাণু কে ধ্বংস বা খর্ব করার ক্ষমতা রাখে এবং কাজেই এদের সাহায্যে মানুষের জীবাণুঘটিত রোগ নিরাময়ের সম্ভাব্যতা আছে। কিন্তু একটা সমস্যা দেখা দিল, আপাতদৃষ্টিতে মানুষের বন্ধু জীবাণুও পরবর্তীকালে শত্রুরূপে অন্য রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই বিজ্ঞানীদের প্রয়াস চললো খোদ জীবাণুর পরিবর্তে তাদের দেহনিঃসৃত রাসায়নিক উপাদানকে মানুষের কাজে লাগাতে ১৮৮৯ সালে আর একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ভিলেমাঁই এরকম জীবাণুর বিষ প্রতিরোধক রাসায়নিক উপাদানের নামকরণ করেন 'অ্যান্টি-বায়োটিকস্' বা 'জীবাণুর জীবনীশক্তি প্রতিরোধক উপাদান।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রায় ৪০ বছর এদিকে আর বিজ্ঞানীদের নজর পড়ে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর আগে লণ্ডনে সেণ্ট মেরী হাসপাতালের একটি ছোট গবেষণাগারে এক আকস্মিক ঘটনার ফলে এই বিস্মৃতপ্রায় গবেষণার দিকে বিজ্ঞানীদের আবার দৃষ্টি পড়ে। ঐ হাসপাতালে স্কচ বিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং রক্ত-দূষ্টিকর স্ট্যাফাইলোকক্কাস নামে জীবাণু-কৃষ্টির পেট্রিডিশে লক্ষ্য করেন, কোনো অজানা কারণে সূক্ষ্ম অদৃশ্য সবুজ পদার্থ এসে ছাতার মতো গজানোতে ঐ জীবাণুর বংশবৃদ্ধির ফলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উপনিবেশগুলিতে ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। তারপর তিনি বারবার অন্য পেট্রিডিশে অক্ষত উপনিবেশগুলির ওপর ঐ ছত্রাকের কিছুটা সংক্রামিত করবার পর ঐ ছত্রাকের 'স্টাফ' ধ্বংসকারী ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। এই ছত্রাক 'পেনিসিলিয়াম নোটাটাম' নামে অভিহিত। এ থেকেই অপূর্ব ফলপ্রদ ভেষজ পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়। ফ্লেমিং-এর এই যুগান্তরকর গবেষণা ইংলণ্ডে সফল হলেও তার উৎপাদন-সাফল্য কিন্তু অর্জিত হয় আমেরিকায়।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালে রাসায়নিক অ্যান্টিবায়োটিকস সালফা জাতীয় ওষুধের আবিষ্কারে জীবাণুঘটিত রোগজয়ে সাফল্য লাভ ঘটলো। পেনিসিলিন আবিষ্কারের চেয়ে সালফা জাতীয় রাসায়নিক অ্যান্টিবায়োটিকস-এর আবিষ্কার কম চমকপ্রদ নয়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার, পেনিসিলিন ইত্যাদি অ্যান্টিবায়োটিকস মূলত রাসায়নিক উপাদান হলেও সেগুলি ছত্রাক বা জীবাণুদেহ নিঃসৃত। কিন্তু সালফা জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিকস জীবাণুদেহ নিঃসৃত নয়, সেগুলি রাসায়নিক উপায়ে উৎপন্ন হয়। সালফা জাতীয় অ্যান্টি-বায়োটিকস আবিষ্কারে পল এর্লিক, গেরহার্ড ডোমাক,

বজ্র রোধক গাড়ি

গিয়ার্দ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এরপর ১৯৪৪ সালে ওয়াকসম্যান ও তাঁর সহযোগীরা একটি ব্যাধিগ্রস্ত মুরগীর গলায় আটকে থাকা চটচটে মাটির ডেলার মধ্যে গজানো স্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস নামে একরকম নতুন ছত্রাকের সন্ধান পান এবং তা থেকে আবিষ্কৃত হয় স্ট্রেপ-টোমাইসিন।

ছত্রাঘটিত অব্যর্থ ফলপ্রদ ওষুধ পেনি-সিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদির আবিষ্কারে বিজ্ঞানীদের চোখে একটি সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত রাজ্যের রুদ্ধ দ্বার খুলে গেল। তারপর থেকে নতুন নতুন অ্যান্টিবায়োটিকস-এর সন্ধানে তাঁরা আত্ম-নিয়োগ করেন। তার ফলে ক্লোরামাইসেটিন, অরিওমাইসিন (বা সুবামাইসিন), টেরা-মাইসিন, অ্যাক্রোমাইসিন, স্টেকলিন, প্যান-মাইসিন, ব্যাসিট্র্যাসিন ইত্যাদি বহু নতুন অ্যান্টিবায়োটিকস আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মার্কিণ প্রবাসী ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ সুব্বা রাও-এর নাম উল্লেখ-যোগ্য। অরিওমাইসিন মূলত তাঁরই আবিষ্কার। আমাদের দেশে পুণার কাছা-কাছি পিম্প্রিতে হিন্দুস্থান অ্যান্টি-বায়োটিকস কারখানায় যে সমস্ত অ্যান্টি-বায়োটিকস প্রস্তুত হয় তা আমাদের চাহিদা অনেকখানি পূরণ করছে।

জন্মশতবর্ষে জগদানন্দ রায়

বাংলা ভাষার বিজ্ঞান-সাহিত্যে জগদানন্দ রায় একটি বিশেষ স্মরণীয় নাম। গত ২০ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষা-দানের ক্ষেত্রে জগদানন্দ ছিলেন ঘনিষ্ঠ সহ-যোগী। তিনি ছিলেন এক আদর্শ শিক্ষক। শিক্ষাদানের আগ্রহেই তিনি বাংলা ভাষায় একাধিক বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি যখন বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার জন্যে লেখনী ধারণ করেন তখন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই, বিশেষ করে ছোটদের জন্যে, প্রায় অজানা ছিল বলতে গেলে। তিনি একে একে বৈজ্ঞানিকী, প্রাকৃতিকী, বাংলার পাখী, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছপালা, পোকা-মাকড় ইত্যাদি যেসব বিজ্ঞানের বই লিখে গেছেন তা বাংলা ভাষার বিজ্ঞান-সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। এক সময় তাঁর রচিত এই সব বই ছোটদের অবশ্যপাঠ্য ছিল। আজকালকার ছোট ছেলেমেয়েরা বোধহয় তাঁর লেখার সঙ্গে 'বিশেষ পরিচিত নয়। কিন্তু তাঁর লেখা এই সব বিজ্ঞানের বই পড়লে আজকের ছেলেমেয়েরাও নিঃসন্দেহে মুগ্ধ হবে। তাঁর লেখার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও সাবলীল, রচনা তেমনি বিজ্ঞাননিষ্ঠ ও তথ্য-পূর্ণ। আমরা এক সময় তাঁর লেখা এই সব বই পড়ে বিশেষ প্রেরণা লাভ করেছিলাম এবং বিশ্বজগৎ ও আমাদের পারিপার্শ্বিক জীব-জন্তু ও গাছপালা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পেরেছিলুম। আজ জন্মশত বার্ষিকীতে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের এই অন্যতম পুরোধার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বিবিধ সংবাদ

বজ্ররোধক গাড়ি

ঝড়বাদলার দিনে পথে গাড়ি চালানো মুস্কিল। অনেক সময় গাড়িতে বাজ পড়ার ভয় থাকে। সম্প্রতি পশ্চিম জার্মাণীতে এমন একরকম গাড়ি উদ্ভাবিত হয়েছে, তাতে বাজ পড়ে না, আর পড়লেও গাড়ির গা বেয়ে বিদ্যুৎশক্তি মাটিতে চালান করা যায়। ফলে চালক বা আরোহীদের কোনো বিপদ হয় না। ইতিমধ্যেই এই মোটর গাড়ি পরীক্ষায় পাশ করেছে। তবে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বৃষ্টি বাদলার দিনে খোলা রাস্তায় গাড়ি চালাবার সময় বাজ পড়লে গাড়িকে পথের ধারে দাঁড় করিয়ে রাখাই শ্রেয়।

অতি শক্তিশালী ভিটামিন-ডি

অস্থি সংক্রান্ত রোগে যাঁরা ভোগেন তাঁদের পক্ষে ভিটামিন-ডি বিশেষ প্রয়োজনীয় ভেষজ। সম্প্রতি মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের ম্যাডিসন রাজ্যের উইসকনসিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীরা 'সুপার ভিটামিন-ডি' নামে এক ধরনের অতি শক্তি-শালী ভিটামিন আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, শিশুদের রিকেট রোগ এবং ঐ ধরনের অস্থি সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধে ও নিরাময়ে সাধারণ ভিটামিন-ডির তুলনায় 'সুপার ভিটামিন-ডি' ৪০ গুণ বেশি কার্য-কর বলে দেখা গেছে। কাজেই এই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক যাঁরা অস্থি সংক্রান্ত রোগে ভুগছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে উপকৃত হবেন।

ইঁদুরের বংশনাশের অভিনব পন্থা

বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করার পদ্ধতি আজকাল পৃথিবীর নানাদেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলভুক কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী নির্মূল করার জন্যেও নানা দেশে এই অভিনব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, পুরুষ-জাতীয় ইঁদুরকে 'ক্লোরো-হাইড্রিনস' নামে একরকম রাসায়নিক দ্রব্য খাওয়ালে ঐ জাতীয় ইঁদুর চিরকালের জন্যে বন্ধ্যা হয়ে গেলেও তার যৌন আবেগ হারায় না। তাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতীয় ইঁদুরের মিলনে মিথ্যা গর্ভ সঞ্চারও হয়ে থাকে। ঐ সময়ে স্ত্রীজাতীয় ইঁদুরেরা অন্য পুরুষ ইঁদুরদের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। এর ফলে নতুন ইঁদুরের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসবে এবং পরিশেষে এদের বংশ নির্মূল করা সম্ভব হবে। তবে এই রাসায়নিক উপাদানটি এখনও বাজারে ছাড়া হয় নি। কারণ এখনও এ বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাকী রয়েছে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঞ্জাম

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একটি বড় গোছের বিরতি এসে গেল এবার। সেই মেয়েটি—সেই 'পাটরাণী' আরও পাঁচ-ছ'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বাড়ি থেকে এসে উপস্থিত হোল। ওর হাতে একটি বড় কাঁসিতে এক কাঁসি সন্দেশ, একজনের হাতে কয়েক রকম কাটা-ছাড়ানো ফল, একজনের হাতে এক ঘটি মুখ-হাত ধোওয়ার জল, একজনের হাতে এক গেলাস পান করবার জন্যে। সবচেয়ে ছোটটি একটি পানের ডিবে নিয়ে রয়েছে।

এসেছে বেশ জলুস করে, খালি হাতেও কয়েকটি রয়েচে।

বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম—"কাণ্ড-খানা কি স্বরূপ? একজনে এতগুলো খেতে পারে, তাও এই অসময়ে?"

স্বরূপ একবার দেখে আন্দাজ ক'রে নিয়ে বলল—"খেতে তো কেউ বলচেও না দা'ঠাকুর। আর, সবগুলো যদি আপনিই খেয়ে ফেলবে যদু পালের গুটে্ঠাউরের মতন, তা হ'লে আর সবাই যে হা-পিত্যেস করে রয়েচে পেসাদের জন্যে, তাদের দশাটা কি হবে?"

নিজের রসিকতায় একটু হাসল। আমি বললাম—"তা হ'লে বলো, একটা রেকাবি আনুক, দুটো তুলেনি আমি।"

স্বরূপ বলল—"আজ্ঞে না, ও কাঁসি দুটো থেকেই আপনাকে তুলে নিতে হবে শ্রীহস্ত দিয়ে, নৈলে আর পেসাদ হোল কি ক'রে ......তা আপনি য্যাত কম নেন, ত্যাতই তো মঙ্গল।"

আবার শেষের রসিকতাটুকুতে একটু হাসল।

অবশ্য, "য্যাত কম নেন ততোই মঙ্গল—" সে আর হোল না। বেশ কয়েক কুঁচি ফল আর গোটা পাঁচেক সন্দেশ, স্বরূপের ভাষায়, সেবায় লাগাতে হোল। এর পর সরবৎটুকু শেষ ক'রে একটা পান মুখে দিয়ে বললাম—"হ্যাঁ, তারপর?"

"তারপর আটকে যাওয়ার কথা বল-ছেলাম না ব্রেজঠাকরুণের? অত যে গা-ঝাড়া দেওয়ার মতলব, তা দিদিমণির কোল আলো ক'রে য্যাখন খোকাবাবু........."

হঠাৎ কি যে হোল, আমার মনে হোল, এ কাহিনীর এইখানেই যেন আপাততঃ পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলেই ভালো হয়।...... একটি দরিদ্র, নিঃসহায় পণ্ডিত-ব্রাহ্মণের ক্ষুদ্র পরিবার—নিজের বিবেকের নির্দেশে বিধবা-বিবাহে পৌরোহিত্য ক'রে গ্রামের এক অংশের বিরাগভাজন হ'য়ে বিপন্ন—ঘর জ্বালিয়ে দিতে এসেছে দল বেঁধে—নৃত্যকালী দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে একা দাঁড়িয়ে, সম্বল মাত্র বাপের তেজ—ব্রজ-ঠাকরুণ এসে নামলেন বলদের গাড়ি থেকে। তারপর কত ঘটনা—সংঘাত, কত সুখ-দুঃখের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে আজ সেই নৃত্যকালী—স্বরূপের 'দিদিমণি'। স্বরূপের দৃষ্টিতে রাজরাণী হয়ে রাজপুত্র কোলে নিয়ে বসেছে। কোল আলো করা শিশু। এ রূপকথাটা এই পর্যন্তই থাক না।

বললাম—"সে আর একদিন শুনব স্বরূপ, এ পর্যন্ত তো হোল বেশ খাসাই—আরও ভালোরই পথ ধরলে......"

ছেলে-মেয়েগুলো তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, গুছিয়ে গাছিয়ে নিচ্ছে, আমায় নিয়ে কৌতূহলের জন্য খানিকটা গুঁড়মসি ক'রেই; আমি বড় মেয়েটির দিকে একটু চেয়ে নিয়ে বললাম—"এবার তোমার 'পাট-'রাণী' সেই দিদিমণির তাঞ্জামে চ'ড়ে আসার কথা বলো শুনি। আমায় তাঞ্জামের কথা শুনতে হবে।"

এবার ডাগর চোখ দুটির বক্র কটাক্ষ আমার ওপর এসে পড়ল, তারপর মেয়েটি সবাইকে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

একটু হাসল স্বরূপ, বলল—"আজকাল চ'টে যায়, বড় হয়েচে কিনা খানিকটে!"

তারপর কাতা-বাখারি তুলে নিয়ে আরম্ভ করল—"গদার-মার তাঞ্জামে ক'রে আসার কথা না বললে সেদিনকার ব্রেজঠাকরুণ, দিদিমণি, জামাইবাবু, দশ-আনীর নিশি-কান্ত—এনাদের কথাও খানিকটে থেকে যায় দা-ঠাকুর। তবে, প্রেথমে এসে পড়ে সেই কুসমী জমিদার ধনঞ্জয়ের কথা। দামোদর চৌধুরীমশায়ের মেয়ে সুধা ঠাকুরুণের বিয়ে সেই রাত্তিরেই সুভলাভাসি হ'য়ে গেল। বাবার কথামতো রাণীমা রাজাপুরে খবর দিয়েই রেখেছিলেন, কত্তার হুকুমে কুসমীর বরযাত্রীদের ওপর বাগদী-মণ্ডলপাড়ার লেঠেলরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উল্টোদিক থেকে এনারাও বর নিয়ে উপস্থিত হল। উদিকে "মার! মার!" শব্দ, ইদিকে পুরুতমশাই নারায়ণ শীলার সামনে বর-কনে একত্তর ক'রে বিয়ের মন্তর পড়িয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে বাইরের দেউড়ি জুড়ে ভোজের হাল্লা—"লে যাও, আর লে—আও"-এর চোটে কান পাতা যায় না। মসনেতে এ ধরনের একটা উদ্ভুটে বিয়ের রাত আর কেউ দেখেনি।

বিয়ের ব্যাপার চুকে-বুকে গেলে সেই রাত্তিরেই রাণীমা বাবাকে ডেকে পাঠে বললে—'শিবদাস, আজ তুমি চৌধুরীবাড়ীর ইজ্জৎ যেভাবে বাঁচালে—নিজের গর্দানা বাঁধা রেখেই বাঁচিয়েছ তো—তাতে তোমার ঋণ সমস্ত জমিদারীটা নিকে দিলেও শোধ হবার নয়; তবু তুমি কিছু চাও, তোমার যা খুশী, যত খুশী। জোচ্চোর বাবাজীর পাল্লায় প'ড়ে চৌধুরী বাড়ি একরকম নিঃসম্বল আজ। তবু তুমি চাও, আমি গায়ের গয়না বেঁচেও দেবো তোমায়।'

বাবা বললে—"মা, আপনি একটি সও-য়ালের জবাব দেও, তারপর চাইব, যেমন আদেশ করচ।'

না, 'কি? বলো শুনি।'

না, 'এই যে, এই শরীলটে পুরুষাণু-ক্রমে চৌধুরী বংশের নুন খেয়ে নুনে জ'ড়ে রয়েছে, সে-ঋণের একটুও কি শোধ হ'য়েচে?"

লাখ টাকার কথা তো দা'ঠাকুর, রাণীমা একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে—'কথাটা তোমার উপযুক্তই হয়েচে শিবদাস, জানতুমই, এই ধরনের কথাই কিছু বেরুবে তোমার মুখ দিয়ে। তবে কি জান? আজকের আমার যা আনন্দ, কিছু একটা না করতে পারলে যেন সেটা সম্পূর্ণ হ'তে চাইচে না, তাই এটা তুমি ধরো, অমান্য কোর না।'

একখানি দানপত্র দা'ঠাকুর, দরজার আড়াল থেকে হাতটা বাড়িয়ে ধরলে সেরেস্তার শীলমোহর, মায় কত্তার দস্তখৎ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। যাওয়ার সময় মসনে থেকে বেইরেই ডানদিকে একটা বড় পুষ্করিণী দেখবে আপনি, বিঘে চারেকের ওপর, তার উদিকে বিঘে পনেরোর একটা ধানজমির চাকলা, সেও দেখবে মা-লক্ষ্মী যেন আঁচল পেতে বিচিয়ে ব'সে আছে। নিষ্কর। আজ তিনপুরুষ ধ'রে ভোগ-দখল করছি।"

বললাম—"সেকালের জমিদারী মেজাজ..."

"তার সঙ্গে রূপোয় মোড়া একটা তাঞ্জাম"—হাত থামিয়ে স্বরূপ বলল। চকিত-বিস্মিত হয়ে চাইতে বলল—"ওটা যেন দিলেন কত্তা নিজের দিক থেকে।...আজ্ঞে না, নেশার ঝোঁকে নয়, সাদা চোখে, বাহাল-তবিয়তে। যা মোক্ষম সরবৎ খাইয়েছেল বিয়ের সে রাত্তিরে তো আর দেখা করতেও হেম্মৎ হয়নি, নিজেও ডেকে পাঠায়নি। বাবা এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেল, পরের দিন স্নানাহার ক'রে পালঙ্কে উঠেচে, বাবা [illegible] তোয়ের ক'রে

পালঙ্কের আড়াল থেকেই নলচেটা বাড়িয়ে ধরেছে, উনি ডাকলে—"শিবে নাকি?"

বাবা গলায় গামছাটা জড়িয়ে হাতজোড় ক'রে সামনে এসে বললে,—"আজ্ঞে, অধীন।"

'ছেলি কোথায় তুই?'—ব'লে মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর থেকে আর নেশা করেনি, ফুরসৎও ছেল না তার, সকালেও নয়, বর-কনে বিদেয় করার হিড়িকেই কেটে গেল তো, তবু কান থেকে কান পজ্জন্ত টানা একজোড়া পদ্ম-পলাশলোচন, সে তো একেবারে সাদা থাকত না কখন, তায় রাত্তিরের ধকোলটাও গেচে, বাবার দিকে একঠায় চেয়ে রইল। বাঘের চোখ থেকে চোখ ফেরাবারও উপায় নেই, পা দুটো একটু একটু কাঁপতেও লেগেচে, জিগোলে —'কাল কি ভুলটা ক'রে বসেছিলি? ঐ তোর গোপীরমণের চন্নাম্নেত দেওয়া সরবৎ ছেল?"

বাবা সেই থেকেই কি কথা বললে কি কথায় জবাব দেবে রাত জেগে আওড়াচ্চে মনে মনে, বললে—'কুসমী থেকে সোনার পিতিমে নুটে নিয়ে যেতে এসেচে, হুঁস-জ্ঞান তো কিছুই ছেল না হুজুর, কি দিতে কি দিয়ে ব'সে আচি।'

দুটো টান দিলে গড়গড়ায় এতক্ষণে জিগোলে—'তারা এসেছেল, না?' চোখ দুটো একটু দপ ক'রে জ্বলে উঠতে বাবা ভরসা পেয়ে বললে—'একেবারে দোর পজ্জন্ত ঠেলে এসেছেল, গোরার লড়াইয়ে বাদ্যি বাজাতে বাজাতে।'

ঝক্কাট-টক্কাট মিটে গিয়ে ইদিকে মাথাটাও পাস্কার হয়ে এয়েচে, চোখদুটো আরও একটু জ্বলে উঠল মনে পড়ে গিয়ে। বললে—'এসেছেল, না? দাওয়ানজীকে ডাক্।'

দাওয়ানজী এলে সুদোলে—'কাল কুসমীর বেটারা যে বাজিয়া ক'রতে এসে-ছেল গোরার বাদ্যি বাজিয়ে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেচে তো ভালয়-ভালয়?...... খোঁজ রেখেচেন তার?'

ঠাট্টা, বুঝলেন না? বাবাজীর পাল্লায় পড়ে এই দু'মাস ধ'রে জমিদারির যে হাল হোল—পেরায় তো যেতেই বসেছেন, তার ওপর এই সব্বনাশ—হ'য়ে বসেই ছেল তো একরকম—তা নিজের কমজোরিটা স্বীকার না ক'রে একজনের ওপর ঝালটা ঝাড়তে হবে তো?—তাই ঐ ঠাট্টা—বলি, তোমরা তো দিব্যি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেলে—এত কান্ড যে হোল, খবর-টবর কিছু রাখো?

নেশার মুখের হুকুম নয়, সব দোষটুকু চাপো মিষ্টি জুতো মারা। ওনাদেরও অনেকরকম মেজাজের আবহাওয়া দেখা,

দাওয়ানজী বললে—"ভালোয় ভালোয় ফিরে গেলে হুজুরের কাছে আজ এসে মুখ দেখাতে পারতুম?'

'তা' হ'লে?'—সুদোলে চৌধুরী মশাই।

না,—বাস ক'খানা রেখে গেচে এখনও পুরোপুরির হিসেব পাইনি, তাল্লাসি চলচে, তবে জিনিসপত্তরের যা সঙ্গে এনেছেল তার আর বেশি ফিরিয়ে নে যেতে হয়নি—আসা-সোঁটা, ঘোড়ার সাজ, বাজনা-বাদ্যির সরঞ্জাম, সব তোষাখানায় জমা হ'য়ে গেচে, আরও আসচে কিছু কিছু। আর সবচেয়ে যে দামী জিনিসের মায়া-কাটিয়ে যেতে হয়েছে বাছা-ধনদের—তা হচ্চে ঐ তাঞ্জামটা, যাতে ক'রে নাকি বর আট বেয়ারার কাঁধে চড়ে......"

বেশ তাতিয়ে দিয়ে বলবে তো, উঠে-ছেলও তেতে চৌধুরীমশাই, বললে—'থাক্, হয়েচে। তা'হলে তাঞ্জামটা পড়েছে আটক? ও তাঞ্জাম যাবে শিবের হিস্যেয়। যান।'

দাওয়ানজী তো অবাক; বাবা পজ্জন্ত। এ তো আর নেশার মুখের হুকুম নয়। জিনিসটেও এমন হেলাফেলার নয় যে এক কথায় দিয়ে দিলেই হোল। দাওয়ানজী সন্দোটা মিটিয়ে নেওয়ার জন্যে সুদোলে—'ওটা তা হলে শিবদাসের বাড়ি পাটো দোব?'

চৌধুরীমশাই গড়গড়া টানা থামো বললে—'আপনাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছে। ঐ তাঞ্জাম শিবের বাড়ি রেখে থোওয়া আর তার বাড়িতে ডাকাত নেমন্তন্ন ক'রে আনা এক নয়? ওটা থাকবে সরকারী তোসাখানায়, তবে সম্পত্তিটে হবে শিবের। দানপত্রে চড়িয়ে দিন।"

"দেখেছ তুমি সে তাঞ্জাম?"—একটু অন্যমনস্কভাবেই প্রশ্ন করলাম আমি, মনটা সেই কোন্ খেয়ালের যুগে গেছে চ'লে যখন, যেন কাড়া তেমনি দান করা—সবই বে-হিসাবের মাপে চলত। স্বরূপ বললে—"দেখেছি কি কন? সেই তাঞ্জামে করেই তো পদার-মা বিয়ের কনে এসে কুঁড়ে ঘরে উঠল।"

বললাম—"হ্যাঁ, ঠিক কথা, ভুলে গিয়ে-ছিলাম। তা হ'লে সেই তাঞ্জামে করেই এলে তুমি বিয়ে ক'রে?"

"পড়েই থাকত দাঠাকুর যেখেনকার জিনিস সেখেনে। বাবাঠাকুর মাঝে মাঝে বলত না? শত্থের ভগবান, কোথায় নাকি আচে একজন, তবে তার সাথে কারুর কোন সম্বন্ধ নেই। তাঞ্জামটাও তেমনি শত্থের ভগবানের মতন এককোণে পড়েই থাকত—শিবে মন্ডলের বেটা স্বরূপে তাঞ্জামে চ'ড়ে বিয়ে ক'রে আসবে, বদ্দ পাগল না হ'য়ে গেলে তো এমন খেয়াল কারুর মাথায় আসতে পারে না, হোল যা তা কুসমীর ওনাদের বাড়াবাড়ির জন্যেই কিনা।"

"ওরা বুঝি ভুলতে পারেনি?"—প্রশ্ন করলাম আমি।

"পারে কখনও? অত বড় অপমান, তার-পর ক্ষেতিটা যা হবার তাতো হোলই। তবে, মাঝা ভেঙে গিয়েছে, লোক-লস্কর নিয়ে এসে পাল্টা জবাব দেবে, সে ক্ষামতাও তো নেই, খুনসুটিপনা শুরু করলে, তাতে মনের আক্রোশ যাতোটা মেটে। সামনে চোৎ মাসের গাজন। তাইতে সঙ বের করলে দামোদর চৌধুরীর নামে। অবিশ্যি, পষ্ট নাম ধ'রে নয়, তবে দু' বগলে আর হাতের দু' মুঠোয় মদের বোতল নিয়ে টলছে এমন এক মাতালকে রাতারাতি ভন্ড বেষ্টম-বাবাজী ক'রে দিয়ে এক সেবাদাসী দাঁড় কইর্যে এমন ঢলাঢলির এক সঙ্ দিলে যে, কারুর আর বুঝতে বাকি রইল না যে, উপলক্ষটি কে। সেকালে ঐ একটা অস্তোর ছেল দাঠাকুর, সঙ বের করা। তাই না হয় ভালোর দিকটাও দেখা, ভন্ডবাবাজীর পাল্লায় প'ড়ে চৌধুরীমশাই ভুল ক'রেই হোক বা যা ক'রেই হোক, দান-ধ্যান এই সবে কিছু ভালো কাজও করেছেন। সে সব কিছু নয়, মনগড়া এক বোষ্টমী জুটিয়ে খানিকটে রং-তামাসা ক'রে ওদিকটে একেবারে চাপা দিয়ে দিলে। এদিকে নামাবলীর ভেতর মদের বোতল লুকুনো আচে, এদিক-ওদিক চেয়ে চুকচাক ক'রে টানাও আচে, খুব একটা জমাটি সঙ বের ক'রে দিলে।

এটা জুড়ুতে না জুড়ুতে ছড়া বানিয়ে কাগজে ছাপিয়ে হাতে হাতে বিলি করা। দিন কতক খুব একটা ঘোঁট পাকিয়ে তুললে কুসমী।"

আমি প্রশ্ন করলাম—"দামোদর চৌধুরী হজম ক'রে গেলেন?"

"তা কখনও পারে?"—উত্তর করল স্বরূপ। বলল—"সিংগি তো একটা। তায় এতদিন ঘুমিয়ে থাকার পর আবার জেগে উঠেচে। হজম করতে পারে কখনও? তবে, পাল্টা জবাবটা যা দেবে সেটা আবার তেমনি হওয়া চাই তো, যাতে আর মাথা তুলতে না পারে। উপযুক্ত লোক রেখে তার বয়ান তোয়ের করা, তারপর যারা নামবে তাদের মহলা, আপনারা আজকাল যাকে বলচেন রিহার্সেল—একদিনে হওয়ার নয়তো। এ ছাড়া আবার দিন-ক্ষ্যাণ দেখেও তো নামানো চাই, নৈলে জমবে কেন? সেকালে সঙ বেরুত বছরে তিনবার ক'রে, এক ঐ চোৎ সংক্রান্তি, তারপর রাস, তারপর একেবারে পোষ-সংক্রান্তি। এনারা ঠিক করলে কুসমীর সঙ বের করবে রাশের সময়। তোড়-জোড় খুবই চলছেল, অবিশ্যি ভেতরে ভেতরে, বেইরে গেলে তার তো আর কোন রস থাকবে না, কিন্তুক শেষ পর্যন্ত আর হোলই না। হোল না যে, তার কারণ মাস-খানেকের মাথায় কুসমীর মিত্যুঞ্জয় রায় অক্কা পেয়ে গেল। শোনা যায় বিয়ে দিতে এসে যে হাঙ্গামাটা বাধল, তাতে তিনি নাকি বেয়াড়া রকম ঘায়েল হ'য়ে পড়ে। বিছেনা নিয়েই ছেল—সেখন থেকেই যত-রকম কুমতলব—আরও কিসব আঁটছিল শোনা যায়, কিন্তু সেসব আর এখেনে হাঁসিল ক'রতে হোল না, মাথায় করেই ওপারে পাড়ি জমাতে হোল।"

হাত থামিয়ে নিজের রসিকতায় একটু হাসল স্বরূপ। আমি বললাম—"তা'হলে তো চুকেই গেল ল্যাঠা।"

স্বরূপ বলল—"আপনি-আমি হলে তাই হোত। যা হওয়ার হ'য়ে গেল, কে আর মাথা ঘামায় ও নিয়ে? মানুষের কাজকম্ম আচে তো। তা সেকেলের জমিদার, তানাদের কাজ-কম্মই তো ছেল ঐ, খাও-দাও, নেশা করো আর মোসাহেবদের নিয়ে কুমতলব আঁটো কার সঙ্গে কি একটা বাঁধিয়ে দেওয়া যায়। সমানে-সমানেই যায় সবাই, যার জন্যে জমিদারে-জমিদারেই লাগত বেশি, আর, একবার যদি একটা কিছু নিয়ে লাগল তো পুরুষাণুক্রমে চলত—ছেলে থেকে নাতি, নাতি থেকে নাৎকুড়—আজ্ঞে, যেমন গেরস্ত-বাড়ির নারায়ণ-শীলের পুজো আর কি, ছেড়ে দিলেই অমঙ্গল। আপনি হাসলেন, কিন্তুক ধরে না থাকলে আমলা-মোসায়েবদের তো রুজি থাকে না। একটা কিছু গুচিয়ে বাধাতে পারলেই খরচের ফিরিস্তি, আর লুটতেই তাদেরও লক্ষ্মী। সোতরাং অমঙ্গলের দোহাই পেড়ে নারায়ণ-শীলের মতন কারে ছেলের পর নাতি, নাতির পর নাৎকুড় পজ্জন্ত আগলে না রাখলে সে নিরীহ-নিদ্দুষী বেচারিরা যে মারা যায়। সেহ্য কথা কিনা বলুন না!"

আমি হেসে বললাম—"না মেনে উপায় কি?"

স্বরূপ বলল—'এখানেও তাই হোল। বরঞ্চ বাড়াবাড়িই খানিকটে, তা আপনার বেশ খানিকটেই বলতে হবে বৈকি। কথায় বলে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়; আপনাকে পূর্বেই বলেছি, মিত্যুঞ্জয়ের ছাওয়াল ধনঞ্জয় ছেল দেখতে যেমন কদাকার, এদিকে মতলব-বাজিতে তেমনি শয়তান। মোসায়েব সবও জুটেছিল তেমনি এক সে এক! বুঝলেন না?—আপনি যেমন হবেন আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ সবও তেমনি তো। ওর বিয়েটা ঐ রকম করে ভেস্তে যেতে ওর আঘাতটাই সবচেয়ে গুরুচরণ হোল তো—কোথায় একেবারে চাঁদে হাত দিয়ে পড়েছেল—ও যেন বাপের মিত্যুর জন্যে ওপিক্ষে করেই ছেল, ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে একেবারে নুন-আদা খেয়ে কাজে নেমে পড়ল। আজ্ঞে, শত্রুরও যশ গাইতে হয়, ও আবার পাল্টা যেভাবে আরম্ভ করলে, সারা মসনেকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিলে কিনা।"

থেমে গিয়ে আমার দিকে চোখ তুলে প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে চাইল স্বরূপ, তারপর আবার আরম্ভ করল—"একদিন ঠিক এমনি সময় আর কি, সন্ধ্যেও নয়, রাত্তিরও নয় যে, লোক বলবে বেচে বেচে চৌধুরী-মশাইয়ের নেশার সময়টিতে এস উপস্থিত হয়েচে, ভাঁওতা দেওয়াটা যাতে সহজ হয়। ও-সময়টা যেদিকে মন টলাতে চাইবে সেই দিকেই টলবে তো। মিত্যুঞ্জয় রায় মশাই মারা যাওয়ার ঠিক আট দিন পরের কথা। এমনি প্রাতঃকাল, ঘণ্টাখানেক আগে ঘুম থেকে উঠে চানটান সেরে দামোদর চৌধুরী বার-বৈঠকখানার বারান্দায় এসে বসেচে, এই সময়টা জমিদারির কাগজপত্র দ্যাখে একটু, জনাকয়েক কম্মচারী এসে দাঁইড়েচে, যে-যার নথি নিয়ে, নায়েবমশাইও রয়েচেন, এমন সময় সিংদরজা পেরিয়ে একটি পাল্কি এসে উঠোনে নামল। বাবা কাছে কাছেই মোতায়েন থাকে, চৌধুরীমশাই বললেন—'শিবে, দ্যাখতো কে আসে।' বাবা এগিয়েচে, পাল্কির সওয়ারি তার আগেই নেমে দাঁড়াল ভুঁয়ে। আজ্ঞে, ধনঞ্জয় রায়ই; কালো তেলের কুপো বলে আমি পদে আচি, সে চেহারা তো ভুল হওয়ার নয়। তবু একটু ধোঁকা লাগল প্রথমটা, রুক্ষ বেশ, গলায় কাচা, খালি পা, রায় মশাইয়ের মিত্যুর কথা মনে পড়ে গিয়ে আন্দাজ ক'রে নিতে যেটুক বিলম্ব হয়েচে, তার মধ্যে খানিকটা এগিয়েও এয়েচে তিনি। তবু তো ধোঁকা কাটতে চায় না কারুর। আর সবাই ছেড়ে হঠাৎ ধনঞ্জয় রায়ের এসময় শুভাগমন কেন? অবাক মেরে হাঁ করে রয়েচে সবাই, তার মধ্যে উনি গদাই-লস্করী চালে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে, বলা নেই কওয়া নেই, দামোদর চৌধুরীর সামনে একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়ল। হাতদুটো সামনে জোড় ক'রে পড়েই আচে, ভারি শরীর, ভুঁড়ি গেচে কোলাব্যাঙের মতন চেপটে—সবার শিক্ষিনেই সবার আগে হুজুর চৌধুরীমশায়ের দিকে চেয়ে হাতজোড় ক'রে বললে—'হয় না হয়, বাবামশাই বোধহয় হুজুরের শ্বারস্ত হ'তে এয়েচেন অতবড় সর্বনাশটা হয়ে গেল তো আকাশের একটা তারা খসে পড়া!'

জমিদারের নফর, যেমন করে বাজিয়ে সাজিয়ে বলতে হয়।

চৌধুরীমশাই যেন একেবারে শিউরে উঠল, খানিকটা চটেও গেল, বললে—'এাঁ, মিত্যুঞ্জয় দাদা মারা গেচেন! তা কৈ তোরা আমায় জানাসনি তো?'

এইখানে চৌধুরী মশাইয়ের আর একটু পরিচে না দিলে ঠিকমতন বোধগম্য হবে না ব্যাপারটা আপনার, যদিও এর আগে খানিকটা পেয়েচেন। মানুষটি ছেল যেন হাউই-তুবড়ি, জ্বললে উঠল তো একেবারে আকাশ-ফুঁড়ে উঠে গেল, সে ভাবটা গেল তো এত নরম যে আর তানাকে চিনতেই পারা যায় না। মোসায়েবদের হাতে পড়ে সেকালের সব জমিদারদেরই ঐ রকম মেজাজ ছেল, তার মধ্যে ওনার আবার একটু বেশী। সেই যে বলে ক্ষ্যাণে রুষ্টু, ক্ষ্যাণে তুষ্টু, রুষ্টু-তুষ্টু ক্ষ্যাণে-ক্ষ্যাণে। ঐ যে সাষ্টাঙ্গ হয়ে এসে পড়েচে, আগেকার সব বাথা, তারপর এই সিদিনের সঙ বের করা, সব গেল ভুলে। জমিদারে-জমিদারে যদি একজাত হোল তো একটা না একটা কিছু সম্বন্ধ থাকতই, যেখানে সত্যিকার কিছুই নেই, সেখেনে মনগড়াই,—কুসমীর সঙ্গে নিত্যি-কার গালাগালের সম্পর্কের সঙ্গে একটা দাদা—ছোট ভেয়ের সম্পর্কও গড়ে উঠেছেল, তরোয়ালের ওপর মখমলের খাপের মতন আর কি। এদিকে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ হতে থাক, মুখ দেখাদেখি বন্ধ, তারই মধ্যে আবার এটা-সেটা উপলক্ষ্য ক'রে দেখা-সাক্ষাৎও তো হ'চ্ছে, নরম-গরম একটা ডাকনার সম্পর্ক ধ'রে না থাকলে চলে না। রায়মশাই ছেল বয়সে বড়, সোতরাং দাদা। বিয়ের কথাবার্তার সময় আবার খানিকটা দহরম-মহরম হয়ে এসেছেল তো দু' দেউড়িতে।

(ক্রমশঃ)

ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে

বিশ্বের প্রায় সবদেশেই নারীসমাজের প্রতি একটা অজ্ঞতার সংস্কার দীর্ঘদিন বলবৎ ছিল। অথচ প্রায় নানা দেশেই মেয়েরা সংকট সময়ে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। বেশি দূরে না গিয়ে আমাদের দেশের কথাই বলা যেতে পারে। রাজপুতানার নারী-কুল দেশরক্ষা থেকে শুরু করে রাজ্যশাসন সকল ব্যাপারেই পুরুষের সমান দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের সেই কীর্তিগাথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। এমনি আছে আরো নানা দেশে। প্রাচীন স্পার্টা ও গ্রীসের রমণীদের বীরত্ব এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করেছিল। সে কাহিনী আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না। সে দেশের নারীরা নিজেদের মর্যাদা তুলে দিয়ে পুরুষের সঙ্গে তুলনা টেনে কাজ করেছিলেন। তাই ইতিহাস পর্যালোচনায় নারীসমাজের অনেক ঐতিহ্যমণ্ডিত কীর্তি ধরা আসবে।

তারপর ইতিহাসের পট-পরিবর্তন হলো। সেদিনও আমাদের সামনে এসব নজীর ছিল। সবাই সগর্বে নারীদের অতীত কাহিনী আউড়ে গেছেন। কিন্তু সে শুধু কথার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কোণঠাসা করে রাখতেও কেউ ভুল করেননি। সবাই প্রায় মানবজাতির এই অর্ধাংশের অস্তিত্বই অস্বীকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব হয় নি। প্রয়োজনের সময়ে নারী আবার বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। হিটলারী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুশ ললনাদের অপূর্ব বীরত্বের কথাই ধরা যাক। সেদিন রুশ ললনারা অকুতোভয়ে দেশরক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন। সর্বস্ব পণ করেছিলেন নাৎসী আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য। স্বামী-পুত্র সবাইকে যুদ্ধে পাঠিয়ে নিজেও অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে গেছেন। শত্রুর আক্রমণ বিপর্যস্ত হয়েছে। দেশ রাহুমুক্ত হয়েছে। অবশ্য বিপ্লবোত্তর রুশিয়ায় নারীর সার্বিক অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁরা আজ প্রগতির পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। এমন কি শীর্ষস্থানের অধিকারীও বলা চলে। প্রথম মহিলা নভোচর শ্রীমতী তেরেস্কোভা সে দেশেরই মেয়ে। তাছাড়া দেশের সকল কাজকর্ম এমনকি শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত নারীর সমানাধিকার সম্প্রসারিত। অধিকার ক্ষেত্রে রুশ ললনা ইংলন্ড এবং আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। প্রগতির ক্ষেত্রে শেষোক্ত দুই দেশের রমণীকুল যদিও বরাবরই উল্লেখ্য ছিল। কিন্তু অনেক অধিকার লাভ করতে এদের অপেক্ষা এবং আন্দোলন করতে হয়েছে যথেষ্ট।

এমন কি রাষ্ট্রপুঞ্জের দিকে তাকালেও আমাদের বেশ হতাশ হতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম হলেও এ পর্যন্ত মাত্র দুজন মহিলা রাষ্ট্রপুঞ্জের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন। একজন আমাদের দেশের শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং অপরজন লাইবেরিয়ার কুমারী এঞ্জি এলিজাবেথ ব্রুকস। এটি দ্বিতীয় ঘটনা এবং উল্লেখযোগ্য যে, কুমারী এঞ্জি এলিজাবেথ সভাপতির সম্মানীয় আসনে বসেই রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্যকর্মের তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন। অবশ্যই নারীর অধিকার সম্প্রসারণ করার ব্যাপার নিয়ে তিনি কোন মন্তব্য করেননি। কিন্তু এ সম্পর্কেও তাঁর মন্তব্য করা উচিত ছিল। কারণ, রাষ্ট্রপুঞ্জ নারীর অধিকার বাড়ানোর জন্য খুব একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি। তাই এ ব্যাপারে এঁদের উদ্যোগী হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে কুমারী এঞ্জির সুস্পষ্ট মতামত থাকা বাঞ্ছনীয়।

এসব সত্ত্বেও সকল পেশায় মেয়েদের দেখা পাওয়া দুষ্কর। সে যে দেশেরই হোক না কেন। কিন্তু মেয়েরা যে পেশায় যাচ্ছেন সেখানেই সাফল্য অর্জন করছেন। এমনি ঘটনা ইদানীং পৃথিবীর অনেক দেশেই ঘটছে। যেমন, ধরা যায় জার্মানীর কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সে দেশের পুরুষসংখ্যা হ্রাস পায় মারাত্মকভাবে। সবাই মহাচিন্তায় পড়েছিলেন কিভাবে এই ফাঁক পূরণ করা যায়। অনেক ভেবেও তাঁরা সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। দেশজোড়া শুধু মহিলা। তাঁদের কারো স্বামী নেই, কারো পুত্র নেই। দেশভরা হাহাকার আর দেশ পুনর্গঠনের চিন্তায় নেতারা হাঁপিয়ে উঠলেন। অবশ্য ম্যান-পাওয়ারের ঘাটতি পূরণের জন্য মেয়েদের বেছে নিলেন। পুরুষদের সকল পেশায় মেয়েদের কাজ করার সুযোগ দেওয়া হলো।

মেয়েদের অবাধ কাজের সুযোগ দিয়ে পশ্চিম জার্মানী প্রায় অসাধ্যসাধন করেছে। অফিসে স্টেনো-টাইপিস্টের কাজে মেয়েদের যেমন ঘাড় গুঁজে কাজ করতে দেখা যায় তেমনি নকল দাঁত তৈরির কারখানায়ও তাঁরা আছেন এবং নিশ্চিন্তভাবেই কারো সহযোগী হিসেবে নয়। একান্তভাবে পুরুষের কাজ ছিল কারখানার বিরাট বিরাট চিমনিগুলো রঙ করা। সেখানেও এখন মেয়েদের দেখা যায় এবং সংখ্যায়ও তাঁরা নগণ্য নন। এমনি আরো কত কাজে তাঁরা ছড়িয়ে আছেন।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের নবনির্বাচিত সভানেত্রী মিস অ্যাঞ্জি ব্রুক্স।

সেই কবে থেকে একটা ধারণা ছিল জাহাজে মেয়ে থাকা মানেই অমঙ্গল। বিশেষভাবে নাবিকদের মধ্যে এই সংস্কার খুব বেশি। পশ্চিম জার্মানী এই সংস্কারেরও গোড়ায় ঘা দিয়েছে। এখানেও সেই একই সমস্যা, পুরুষের অভাব। সবকিছুর মতো এখানেও মেয়েদের নানা কাজে নিয়োগ করা হতে থাকে। এর ফলে কিন্তু অমঙ্গলের চেয়ে মঙ্গলের মাত্রাটাই বেশি। নাবিকদের চারিত্রিক উন্নতি ঘটেছে। তাঁরা কথাবার্তা, আচার-আচরণে অনেক ভদ্র ও সংযত হয়েছেন।

পশ্চিম জার্মানীর জাহাজে জাহাজে কর্মরত মেয়ের সংখ্যা প্রায় শ'খানেক। প্রায় সাড়ে তিনশো মেয়ে কাজ করে প্রমোদ-তরণীগুলিতে। জাহাজী মালিকসংঘের খবরে প্রকাশ, একশো দশজন মেয়ে রান্নাবান্না করে, প্যাসেঞ্জার উপকূলীয় জাহাজে সাধারণ নাবিকের কাজ করে আর অনেকে নেয়ে কাজ করে ডেকবয় হিসেবে। এছাড়া কয়েকজন রেডিও অপারেটরও আছে। তবে ক্যাপ্টেনের সংখ্যা মাত্র একজন। তাঁর নাম এনেলীজ টিটজে।

—প্রমীলা

পাহাড়ে মেয়েরা

হাত চালাই। গোটা বারো চোদ্দ এখনও রয়েছে। হাতে থাবড়ে চটপট তাওয়ায় ছেড়ে দিচ্ছে পারুল। কাঠের আগুনে রুটি ফোলাতে মহা ঝকমারী। পাশের উনোনে ডিমের অমলেট করছে আমাদের পাচক—মোহন। দুই হাতে দুই উনোন সামাল দেয়া তার বহুদিনের অভ্যেস। তবে সে ক্ষেত্রে রুটিগুলো হয় বিভূতি বিভূষিত কৃষ্ণকালো। তাই ভোরের দিকে আমরা দু-একজন হাত লাগাই। জলখাবার খেয়ে দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে ট্রেনিংয়ে বেরুব। পৌনে সাতটা বাজে।

ইন্সট্রাক্টাররা তাড়া লাগায়। আটটার মধ্যে না বেরুলে ফিরতে সন্ধ্যে হবে। পাহাড়ে আঁধারে ঘোরা বারণ।

ধীরে ধীরে চলেছি। শিবিরের পূবে রাকি পিক। শিখরে উঠবো। প্রান্তিক গ্রাব-রেখার ওপর দিয়ে চলেছি। নানা রংয়ের পাথরের মেলা—হলুদ, বাসন্তী, ছাই, সাদা। কত যে রকমারী আকৃতি—দু ইঞ্চি থেকে দশ বারো ফুট—সব সাইজের আছে। কোনটা শক্তভাবে আটকে আছে। কোনটা টলমল করছে। আমরা চলেছি—পাথর মাড়িয়ে, ডিঙিয়ে, বেয়ে আর আছাড় খেয়ে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহের পূব পার ঘেঁষে পাহাড়টি। খাড়া চড়াই ভাঙা শুরু হল। অনেকের কষ্ট হচ্ছে। কষ্টটা প্রথম দিকেই বেশী হয়। ধীরে ধীরে হাঁফ ধরা ভাবটা কমে আসে। ইন্সট্রাক্টাররা থামতে দেয় না। পেন্ ডাউন্, থুড়ি সিট ডাউন হতে দেয় না। বরং গো স্লো বা ওয়াক্ টুরুলে কর। আস্তে আস্তে হাঁটলে হৃদপিণ্ড একটা নির্দিষ্ট ছন্দে রক্ত সঞ্চালন করতে পারে, ফুসফুস নিয়মিতভাবে বাতাস টেনে নিতে পারে।

নিলু মাঝে মাঝে টুপি খুলে নিজের মাথায় হাত বুলোচ্ছে। সেই সঙ্গে অস্ফুট কাতরোক্তি, "উঃ আঃ।" পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজছে। "মাথা ব্যথা করছে? নোভাল্‌জিন খুঁজছো? দাঁড়াও দিচ্ছি।" ট্যাবলেট আর ওয়াটার-বটল ওর সামনে মেলে ধরে সুতপা—শেরপাদের ডাক্তার দিদিমণি। হাতে একটু জল নিয়ে মাথায় বুলিয়ে নিল। আর মাথায় হাত পড়তেই ডুকরে কেঁদে উঠলো, "কী সর্বনাশ হল আমার! এত সাধের লক্‌স, টুপির চাপায় বিলকুল ঝাঁটার কাঠি হয়ে গেছে।" বাঁ হাতের মুঠি মেলে ধরলো চোখের সামনে। ডান হাতে মিনি-আয়না—এটাই খুঁজছিল এতক্ষণ। আয়না সামনে ধরে ভিজে-চুল পোষ মানাতে চেষ্টা করে। হতাশ হয়ে আবার ডুকরে ওঠে, "উঃ, আমার হেয়ার স্টাইল।"

"একটা যদি এক্‌স্ট্রার ভূমিকাও পেতিস। করিস তো বিনে মাইনেয় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টারের কাজ। কবরী চর্চা তোর কোন কাজে লাগবে শুনি?" মন্তব্যটা ছুড়ে দিয়ে কল্পনা আর দাঁড়ায় না।

সদাহাস্যময়ী নিলু রাগ করে না। এম-এ পরীক্ষা দিয়ে একদিনও বসে থাকে নি। সিনেমা লাইনে কাজ শেখার চেষ্টা করছে। আর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ায়, তার ব্যবসাও দেখাশুনো করে।

পাহাড়টা পাথুরে নয়। মাটি আছে, ঘাস আছে। আর আছে হাতখানেক লম্বা ছোট ছোট গাছ, তার মধ্যে শুকনো লালচে ফুল। এই গাছের শিকড় বেশ শক্ত। দরকার মতো আঁকড়ে ধরে ওঠা যায়।

কিছুটা উঠে আসার পর, পাহাড় প্রদক্ষিণ শুরু হল। পুরো পাহাড়টা ট্র্যাভার্স করে অন্য পাহাড়ে চলেছি। খুব সরু পথ। ফুটখানেক চওড়া হবে। বেসিকের মেয়েরা ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে। ভাগ্যিস রুকস্যাক নেই। পাহাড়ের গায়ে লাগলে টাল সামলানো যেতো না। আর পড়লে সোজা তিনশ ফুট নিচে, প্রান্তিক গ্রাবরেখায় ওপর।

সুজয়া গুহ

যাক সরু পথ শেষ হল। শুরু হল চড়াই ভাঙা। এটা কী? ক্রীসমাস্ বো নাকি? বিবর্ণ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে সাদা রিবনের বো। মধ্যিখানে লালচে ফুল। হাতে তুলে নিই বোটি। আঙুল শিরশির করে উঠলো। টপ টপ করে ঝর পড়ছে জলের ফোটা। বো-টি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে গেল, মিলিয়ে গেল। ভেজা ফুল ফেলে দিয়ে রুমালে হাত মুছি। বরফের বো—এক মাপের, ঠিক বোয়ের মতো গড়ন। একটি নয়—তিন চারটি। ধরার ফুলকে ঘিরে আকাশের হিমানীর মিতালী। রাতের গভীরে নিবিড় প্রীতির বাঁধন।

অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি। এখনও গোমুখের শিবির দেখা যাচ্ছে। খুব ছোট্ট দেখাচ্ছে। শিবিরের উত্তরে পাথরের প্রাচীর। তার ওপাশে কারা? তাঁবু মনে হচ্ছে। সারি সারি চারটি তাবু। নির্ঘাৎ কালিন্দী খাল-দাদাদের দুর্গ। কালরাত্রে তাহলে ওরা ফিরে এসেছেন। ওদের দুজন কুলি কাল দুপুরেই পৌঁছেছিল। আগুন পোয়াতে পোয়াতে আমাদের শেরপাদের সঙ্গে গল্প করছিল। বরফ পড়া শুরু হতেই দাদারা আর এগোতে পারেননি। বাসুকীর নিচ থেকে ফিরে আসছেন। বাসুকী থেকে কালিন্দী খাল তিনদিনের পথ। দাদারা কলকাতার। কলকাতায় বরফ পড়ে না।

এ বছর কলকাতা থেকে বহু দল এদিকে এসেছেন গোমুখ বা কালিন্দী খাল দেখার বাসনা নিয়ে। কিন্তু আমরা কাউকে কালিন্দী খালের কাছাকাছি পৌঁছুতে শুনলাম না। বোধহয় দূরত্ব ও দুর্গমতার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকায় ও'রা বিভ্রান্ত হচ্ছেন, রসদ কম পড়েছে। পথও বেশ খারাপ। পাথুরে আর চড়াই।

দাদাদের ক্যাচ্ করে, খবরটা নিলে হত না? স্বপ্না উৎসাহিত হয়ে ওঠে, "কতদূর গিয়েছিল? কলকাতায় ফিরে হয়তো ছাপার হরফে পড়বো—আবহাওয়ার জন্য বাসুকী অভিযান পরিত্যক্ত—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এক এক সমস্যা। পাহাড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িত থাকে সাফল্যের প্রশ্ন। গন্তব্যস্থলে একজন পৌঁছুতে পারলেই জয়জয়কার। আর সবাই মিলে তিনশ ফুট নিচু থেকে ফিরে এলে কেউ নামও জানবে না। তাই অভিযাত্রীদের কাছে ব্যর্থতার সমস্যা বিরাট। ফলে দেখা দিয়েছে আরও বড় সমস্যা। সদলবলে 'ঘন্টি' বিজয়ে বেরুলাম। শিখরের পাদমূলে পৌঁছে দেখি এ সাধ আমাদের অসাধ্য। তাহলে 'মন্টি'র শিখরে ওঠা যাক। অথবা 'ঘন্টি'র কাঁধ থেকে ফিরে এলেই বা ক্ষতি কি? রানার ছুটলো খবর নিয়ে—ঘন্টি বিজয়। হৈ হৈ ব্যাপার। সারা বাংলা জুড়ে

জয়ধ্বনি। মনুষ্যের জোর থাকলে তো কথাই নেই। কেই বা দেখতে চাইছে প্রামাণ্য ছবি বা জানতে চাইছে পথের খুঁটি নাটি।

অনেকটা উঠে এসেছি। ক্লান্ত লাগছে। কথা কমেছে, হাসি কমেছে। বেড়েছে শুধু সঘন নিঃশ্বাসের শব্দ।

পাহাড়টা যেন শেষ হল। এবারে ঢালু চত্বর, ঘন ঘাসে ছাওয়া। ধুপ ধাপ করে সবাই গড়িয়ে পড়ি। জায়গাটার উচ্চতা পনেরো হাজার ফুট। বেসিক কোর্সের মেয়েরা এখান থেকে ফিরে গেল নিচে।

এখন লীড্ করছে স্বপ্না। বেশ তাড়াতাড়ি হাঁটে। আমরাও গতিবেগ বাড়িয়ে দিলাম। পাহাড়ের গঠন পালটে গেছে। কঠিন শিলাময়। এখন আর হাঁটা নয়। আরোহণ। এতদিনের শেখা শিলারোহণের কৌশল কাজে লাগাচ্ছি। দুপায়ে কুলোচ্ছে না, চার হাত পায়ে উঠছি। একটার পর একটা ধাপ। নিশ্চিন্তে দুটি মুহূর্তও দাঁড়াবার উপায় নেই। সার্থকনামা রকি পিক।

একেবারে খাড়া দেয়াল। অনেক উঁচুতে ভাঙাচোরা খাঁজ। কি করে উঠবো? পা তুলে কোথায় রাখবো বুঝতে পারছি না। ফাটলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে শক্ত করে আঁকড়ে ধরি। সোজা ওপরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই। মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে শরীরের ভার ওপরের দিকে ঠেলে দিই। একটা ফাঁড়া কাটলো।

দক্ষিণ-পূর্ব শিরশিরা বেয়ে উঠছি। আরেকটি দেয়াল। এখানে ফাটল নেই—ভাঙা চোরা খাঁজ আছে। আঙুলের ডগা দিয়ে চিমটি কেটে ধরি। পা তুলতে গিয়ে নেমে যাই। দেয়ালের পাতলা স্তর গুঁড়িয়ে চোখের ওপর এসে পড়ছে—আঙুল ফসকে গেছে। তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করে দেয়ালে ঠেস দিই। মাঝে মাঝেই এই কান্ড হচ্ছে। পাহাড়ের এই দিকটা বেশ জীর্ণ। কোমরে দড়ি নেই। পড়লে একাই পড়বো, গড়াবো, তালগোল পাকিয়ে যাব।

মেশিনের মতো শরীরটা আপনা থেকেই কাজ করে চলেছে। ক্লান্তি বোধও নেই। বোধহয় চিন্তা ও অনুভব শক্তি খানিকটা কমে এসেছে। শুধু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, ঘাড়টা ব্যথায় টনটন করছে।

থমকে দাঁড়াতে হল। সামনে সুউচ্চ মসৃণ দেয়াল—মাঝখান দিয়ে চেরা। ফুট তিনেক চওড়া ফাটল। গলা বাড়িয়ে দেখি। ফাটলের তলা চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে এলোমেলো পাথরের টুকরো আর বরফের কুচি। এই ফাটলই হল আমাদের এগোবার পথ। শুনেই মাথা ঘুরে গেল। কিন্তু নান্য পন্থাঃ, নান্তেব্য গতিরন্যথা।

অনেক ওপর থেকে জামিতের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে, 'ভয় পাচ্ছ? চিমনী ক্লাইম্ব করতে হবে।'

ভয় প্যাচ্ছি বইকি। তবে সে কথা তো স্বীকার করা যায় না। অতএব মরীয়া হয়ে পা বাড়াই। একটু বেঁকে ঢুকলাম সেই গহ্বরে। একটা পাথরে দাঁড়িয়ে, একদিকের দেয়ালে হেলান দিলাম। প্রথমে একটি, তারপর দ্বিতীয় পাটিও তুলে দিলাম অপর দেয়ালে। এবার পিঠে ভর দিয়ে, ঘষে ঘষে একটু ওপরে উঠলাম, আর বিপরীত দেয়ালে জুতো ঘষে পা ওপরে তুলে আনলাম। একবার পিঠ আর একবার জুতো ঘষে ক্রমাগত ওপরে উঠছি।

নিচের দিকে তাকাই না। মাথা ঘুরে খাদে তলিয়ে যাবো। খুব সাবধানে উঠছি। খুব ধীরে ধীরে—

উঃ! কোমর ছোঁপে যাচ্ছে। মাথা টনটন করছে। মনে হচ্ছে অনাদি অনন্তকাল ধরে আমরা উঠছি আর উঠছি। চিমনী ক্লাইম্ব এমনিতেই সবচেয়ে কঠিন, তার ওপরে এই উচ্চতায়, ক্লান্ত শরীরে।

হঠাৎ ফাটলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এক ঝলক আলো—দেবলোক থেকে আসা আশার আলো। মুখ তুলে তাকাই। ফাটলের শেষ প্রান্তে এক ফালি আলোয় ভরা আকাশ।

ফাটলের কিনারা আঁকড়ে বেরিয়ে এলাম। ছোট্ট একটি ছাদ। শুকনো, পরিচ্ছন্ন। মাটি নেই, ঘাস নেই, বরফ নেই। মসৃণ কঠিন ছাদ। ঘন হয়ে বসলাম। মাথার উপরে উজ্জ্বল নীলাকাশ। হাত বাড়ালেই বোধ হয় ছোঁয়া যায়। চারিপাশে শিখরের ঢেউ—তুষারে ঢাকা শ্বেত শুভ্র, পাথরে ভরা ধূসর, দেওদারু আর পাইনে ছাওয়া গাঢ় সবুজ। পরম প্রশান্তিতে দেহ-মন জুড়িয়ে যায়।

'নাও চটপট ফর্মালিটি সারো। এখুনি নামতে হবে।' ঘড়ি দেখি, মাত্র দেড়টা। কাগজে নামক্ষণ লিখে একটি ছোট গর্তে ঢুকিয়ে রাখি। হলই বা সতেরো হাজার, শিখর তো।

নামার কথায় আতংক সংক্রামিত হয়। তবু নামছি। কখনও সামনে ফিরে, কখনও পেছন ফিরে। সেই খাড়া জায়গাটায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। প্রায় আশী ডিগ্রী ঢাল। নামা অসম্ভব।

'দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।' জামিত দড়ির গোছা মোহনের কাঁধ থেকে নামিয়ে নিল। সমান দুভাগে ভাগ করে দড়ির মধ্যভাগ লটকে দিল, খিলানের মতো একটি পোক্ত পাথরের গায়ে। খাড়া দেয়াল বেয়ে দড়ি ঝুলছে। দড়ি ধরে দেয়ালে পা দিয়ে ভারসাম্য রেখে, নেমে যেতে হবে দড়ির শেষ প্রান্তে। স্বপ্না আগে গেল। দড়ি শেষ হবার মুখে, নিরাপদ একটি জায়গা বেছে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার আমার পালা। দাঁড়ালাম এসে স্বপ্নার পাশে। স্বপ্না বলে, 'এখানে তো আর জায়গা নেই। কাছাকাছি আর দ্বিতীয় জায়গাও দেখছি না। ওরা নেমে দাঁড়াবে কোথায়? চলো আমরা নিচে নেমে যাই।'

খাড়া ঢাল। তবে মাটি আর কাঁকড়। পাথর নয়। একটানা অনেকটা নামতে হবে। শিলারোহণে অসুবিধে হবে বলে তুষার গাঁইতি আনিনি। গাঁইতি গেথে সহজে ব্রেক কষা যায়। স্বপ্না ইতিমধ্যে নামতে শুরু করেছে। আমিও পিছু নিই। স্বপ্না বেশ তাড়াতাড়ি নামছে। এই খাড়া দেয়ালে গতি বেড়ে গেলে কি আর নিজেকে সামলাতে পারবে? দেখি স্বপ্না স্লিপ কাটতে কাটতে নেমে যাচ্ছে। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো। কি করবো ভেবে ঠিক করতে পারি না। ওপরে মুখ তুলে আওয়াজ দিই। 'তোমরা একজন নেমে এস।'

আমি এখন নামছি না দাঁড়িয়ে আছি, মাথা নেই। দেখছি স্বপ্না বলের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে, আর আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিছু আঁকড়ে ধরার, কিন্তু পারছে না। কারণ এত তীব্রগতিতে নামছে যে ঘাস, আগাছা যা ধরছে তাই শেকড় শুদ্ধ উঠে আসছে।

ধুপধাপ করে নেমে এল মোহন। দড়ি ছেড়ে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ওর গতি হঠাৎ এত বেড়ে গেল কেন? স্লিপ কাটছে। সামলাতে পারছে না। ডিগবাজী খাচ্ছে না, তবে হুড়হুড় করে নেমে যাচ্ছে। প্রায় স্বপ্নার গায়ের ওপর এসে পড়ল। এক্ষুনি ওর ঘাড়ে পড়বে। ওই ঢালের ওপর এর ধাক্কা খেয়ে স্বপ্না কোন অতলে তলিয়ে যাবে কে জানে।

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। গলার কাছে একটা ব্যথা টনটন করে ওঠে। রোল্ করতে করতেই স্বপ্না পেছন ফিরে চাইল। ওর ভবিষ্যৎ ওর কাছে নিশ্চয়ই পরিষ্কার। তবু কোন আর্তনাদ শোনা গেল না। নীরবে গড়িয়ে চললো। আমি আর চেয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ বুজে অপেক্ষা করছি অন্তিম মুহূর্তের।

অখণ্ড স্তব্ধতা। চোখ খুলে যায়। ওরা দুজনেই থেমে রয়েছে।—ছোট্ট একটি সমতল জায়গায়। দুজনেই কোন মতে ব্রেক কষেছে। স্বপ্না উপুড় হয়ে আছে। মোহন নিজের পিঠে নিজেই হাত বুলোচ্ছে। জানি না কখন আমি হাঁটি হাঁটি পা পা করে নেমে এসেছি। তাড়াতাড়ি স্বপ্নার কাছে যাই। তুলে ধরি মুখখানি। নাঃ, অজ্ঞান হয়নি। কিন্তু মুখের কি ছিরি হয়েছে। ধুলোয় ধূসরিত, তার মধ্যে ফুটে বেরুচ্ছে লাল-নীল আভা। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। ওর খুবই মনের জোর। তাই সামলাতে পেরেছে। অবশ্য এখানে

পাথর থাকলে মাংসপিণ্ড ছাড়া আমরা আর কিছুই পেতাম না।

মোহন বলল, জায়গাটা পতনের জন্য বিখ্যাত। অসংখ্য পতনের একটি সাক্ষী ও নিজেই। গত বছরই ওর পা ভেঙেছে এখানে, বেসিক কোর্স করার সময়।

কমলারা নামতে সময় নিচ্ছে। বোধহয় একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

বসে আছি চুপচাপ। অকস্মাৎ দৃষ্টি যায় দক্ষিণে। সমান্তরাল দুই গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়ে বয়ে আসছে একটি সুদীর্ঘ সুবিস্তৃত ধূসর নদী। অগণিত স্তব্ধ ঢেউ, এঁকে বেঁকে নেমে আসছে। এই তো ঘন-সন্নিবদ্ধ ফাটল অলংকৃত গঙ্গোত্রী হিমবাহ। কি বিশাল। গোমুখ থেকে এই হিমবাহের কিছুই দেখা যায় না। তীর্থযাত্রীরা তাই মোরেনে মোড়া উদ্ মুখ দেখে ক্ষুণ্ণমনে ফিরে যায় ঘরে।

গঙ্গোত্রী হিমবাহ। ষোল মাইল লম্বা আর ষোল মাইল চওড়া। চৌখাম্বার পশ্চিমে ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে—প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণ-পূব থেকে উত্তর—উত্তর-পশ্চিমে। দুই পাশে সংখ্যাতীত শিখর। প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম পাড়ে দক্ষিণ থেকে দেখা যাচ্ছে নন্দানী, খর্চাকুণ্ড, কেদারনাথ পর্বত ও স্তম্ভ শিবলিঙ্গ ও মেরু। পূব পারে মন্দাকিনী, সতোপন্থ, বাসুকী, চন্দ্র-পর্বত, ভাগীরথী, শ্রীকৈলাস, মাতৃ ও সুদর্শন।

পর্বতমালা বেয়ে নেমে এসেছে কত তুষারধারা, ছোট-বড় হিমবাহ। চতুরঙ্গী আর রক্তবরণের সঙ্গম এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওরা বিলীন হয়ে গেছে গঙ্গোত্রী হিমবাহে, যে-হিমবাহ বয়ে নিয়ে চলেছে ওদের পার্শ্বিক ও প্রান্তিক প্রস্বরেখা। অগণিত পাথরের ধারা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। তৈরি হয়েছে পাথরের পুরু আচ্ছাদন। হিমবাহের হিম-কান্তি ঢাকা পড়ে গেছে। ধূসর হিমবাহ। বিরাট, ভয়াল, নীরব।

উত্তর ভারতের আবহাওয়ায় আর্দ্রতা কম। ঘাস লতা গুল্ম সহজে জন্মায় না। নগ্ন রুক্ষ পাহাড় তাই তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যায়। ভাঙে বেশী, পাথর ছড়ায় বেশী। মোরেনের পরিমাণ তাই এত বেশী।

পূর্ব হিমালয়ে আর্দ্রতা বেশী। তুষারপাতের পরিমাণও বেশী। সকালের কয়েকঘণ্টা বাদে আকাশ সারাক্ষণ মেঘাচ্ছন্ন। তাই সেখানকার হিমবাহ অপেক্ষাকৃত শুড়-পাথরের প্রাধান্য কম।

সিকিমের রাথং হিমবাহে অনেকদিন ট্রেনিং নিয়েছি আমরা। উত্তরে রাথং পর্বত থেকে দক্ষিণে চৌরিকিয়াংয়ের দিকে প্রবাহিত হয়েছে এই হিমবাহ। এর পূবে কাবরু—দক্ষিণ কাবরু, স্তম্ভ ও ফর্ক শিখর। পশ্চিমে রাথং,—দক্ষিণ কোকটাং ও আরও কত অনামী পাহাড়ের সারি। দু পাশের তুষারমৌলী থেকে নেমেএসেছে শুভ্র তুষার-ধারা। কুসুমিত কাপাস ক্ষেতের মত ফেনিল ঢেউ তুলে নেমে এসেছে ছোট ছোট হিমপ্রপাত।

রাথং হিমবাহে ফাটলের কোন নিয়ম নেই। কোথাও আড়ে, কোথাও সমান্তরাল-ভাবে অসংখ্য তুষারগহ্বর চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। বিকট বিস্তৃত বদন, পিচ্ছিল বরফের মেঝে। নিশ্চিন্ত চলাফেরা করার কোন অবকাশ নেই এখানে। গঙ্গোত্রী থেকে অনেক ছোট কিন্তু অনেক বেশী ভয়াবহ।

প্রহরে প্রহরে দেখি রাথংয়ের রূপান্তর। দুপুর গড়াতেই গর্জন ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে, বুম্ বুম্ বুম্ বুম্। অস্থির আলোড়নে সমস্ত অঞ্চল তোলপাড়। সামনের নেড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসছে বরফ পাথর আর মাটির মিছিল। মহাকলরোলে জোট বাঁধলো পাহাড়ের পাদ-মূলে। আবার ছড়িয়ে ছত্রাখান হলো। দাঙ্গা লেগেছে যেন। আবার স্লোগান উঠলো, বুম্ বুম্ বুম্ বুম্।

তুষারের মুকুট-পরা নেড়া গোছের শিখরটি নচে উঠলো। মুকুট ভেঙে স্তূপীকৃত তুষার শতধা বিভক্ত হয়ে, হিংস্র বেগে নেমে আসছে। চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আসছে—তুষার চূর্ণের কুজ্ঝটিকায়। আবার স্লোগান—বুম্ বুম্। ঐ যে বরফের নিরেট কঠিন দেয়ালে চিড় ধরেছে। দেয়াল ভেঙে বিরাট একটা অংশ আর্তনাদ করে নেমে এল। প্রতিধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হল—বুম্ বুম্, বুম্ বুম্। অনুরণন ক্ষীণ হবার অবকাশ পায় না। আবার কাড়ানাকাড়া বেজে ওঠে।

গরজে গম্ভীর নাচে কম্বু
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভু
সে-নাচ হিল্লোলে জটা আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।

অস্ফুট কণ্ঠে আবৃত্তি করি নজরুলের কবিতা। সঙ্গে গলা মেলায় রেখা পারেখ, গুজরাতী মেয়ে, কিন্তু বাংলা গানের অনু-রাগী। আমরা মাত্র ছ'টি মেয়ে শিবির করে আছি। তিন মাইলের মধ্যে অন্য কোন জন-প্রাণী নেই। সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এল।

আমরা বিহ্বল হয়ে দেখতে থাকি, দুই পাশের পর্বতমালার সেই অশান্ত প্রলয় নাচন। আর শুনতে থাকি, আকাশ-বাতাস মুখর-করা সেই পাঞ্চজন্য নিনাদ।

হিমবাহ ভয়াবহ তবু রমণীয়। ১৯৬৫ সালে দেখেছিলাম ঐ অঞ্চলে একটি তুষার-অলিন্দ। আধো আলো আধো আঁধারে ঢাকা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ। পোর্সেলিনের মত মসৃণ ঝকঝকে বরফের মেঝে, বরফের দেয়াল, বরফের ছাদ—অমল অম্লান। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি হিমস্তম্ভ। ওদের গায়ে স্ফটিকের স্বচ্ছতা। আরও ভেতরে, দেয়ালের গায়ে জমাট বেঁধে আছে আকাশের নিলীমা।

ছাদের কার্ণিশ বেয়ে নেমে এসেছে বটগাছের ঝুড়ির মত শীর্ণ কঠিন হিম-তন্তু। হিমানীর মনোরম জাফরী। হাওয়ায় দুলছে। ঝড়ে পড়ছে ভাঙা টুকরোগুলি। হিমশিলায় প্রতিহত হয়ে মৃদু শব্দ হচ্ছে টক্ ঠক্, টক্ ঠক্। অকৃত্রিম অলিন্দের অপরূপ সৌন্দর্যে আমরা অপলক।

আরও বর্ণাঢ্য তুষার গুহা দেখেছিলেন নীলকণ্ঠের অভিযাত্রীরা। গুহা নয়, ১৯৯৭০ ফুট উঁচুতে বরফের ঘর। তার দেয়ালে প্রকৃতির ভাস্কর্য। তালপাতার টুপি মাথায় একটি লোক কেটলী থেকে জল খাচ্ছে। প্রাণবন্ত একটি মুখাবয়ব, উজ্জ্বল তার দৃষ্টি। আবার কোন দেয়ালে শিং উঁচিয়ে দাড়ি ঝুলিয়ে রামছাগল। বিশ্ব-কর্মার খেয়ালীপনা। বছরের পর বছর বরফ জমছে, বরফ গলছে—ফুটে উঠছে নতুন নতুন মূর্তি।

ভাবি হিমালয়ের বৃহত্তম হিমবাহ-গুলো না জানি কেমন। সিয়াচেন (৪৫ মাঃ), বায়াফো (৩৯ মাঃ), হিস্পার (৩৮ মাঃ), বালতোরো (৩৬ মাঃ)—আরও কত অশান্ত, কত ভয়ঙ্কর, কত সুন্দর। কারা-কোরামের এই হিমবাহগুলো বিশ্বের বৃহত্তম উপত্যকাবাহী হিমবাহদের অন্যতম। সুদূর অতীতে এরা ছিল আরো অতিকায়। গঙ্গোত্রী হিমবাহই তো হর্ষিল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা। সে অবশ্য লক্ষাধিক বছর আগের কথা।

এইসব বৈচিত্র্যময় হিমবাহ সাধারণের অগম্য। পর্বত-অভিযাত্রী ছাড়া ঐ দুর্গম অঞ্চলে পাড়ি দেবার মত উপকরণ ও আয়োজন করাই বা থাকে। তাই ট্যুরিস্টরা যান কুমায়ুনের পিণ্ডারী ও কাফনী, কাশ্মীরের বাজওয়াস্ ও কোলহাই। জনপদের কাছাকাছি ছোটখাটো হিমবাহে।

জনপদঘেঁষা হিমবাহ অনেক সময় জনজীবনে দুঃস্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। মনে পড়ে ১৯৬৪ সালের কথা। সুরক্ষিত জোজিলা গিরিবর্ত্মের পথ, সাড়ে তেরো হাজার ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে। আমরা চলেছি সেই পথে। পথের পাশে দেখি বিশ ফুট চওড়া একটি হিমবাহ—নেহাত গো-বেচারার মত পড়ে আছে। কয়েক বছর আগে তার সে কি ভীম বিক্রম। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাঁচ হাজার ফুট নিচে—বালতাল গ্রামে। ছোট্ট গ্রাম। তখন গ্রামবাসী ছাড়াও বহু গুর্জর তাঁবু ফেলেছিল সেখানে। সঙ্গে ছিল ওদের বিরাট পশুবাহিনী। কয়েক মুহূর্তে সবকিছু নিঃশেষে মুছে গেল ধরা-পৃষ্ঠ থেকে।

ফিরে চলেছি সেই পাথরের প্রবাহে। আবার সেই অবস্ট্যাকল্ রেস। শিবির বেশী দূরে নয়। সাড়ে তিনটে বাজে। কতক্ষণে আগুনের মুখোমুখি বসে গরম মগে চুমুক দেবো, হঠাৎ নজর পড়ে সামনে, বিরাট হলদে পাথরের ওপর। বাদামী-সাদায় মেশানো একগোছা কর্কশ লোম। শুঁয়ো-পোকা? এত বড়? জুতো দিয়ে নেড়ে দেখি। ঝরে পড়ে লোমগুচ্ছ। মনে পড়েছে, ঠিক এই জিনিসই দেখেছিলাম চিরবাসের পথে। মেজর চিনিয়ে দিয়েছিলেন—কস্তুরী মৃগের লোম। কত কথা আর কত কাহিনীর কেন্দ্র এই মৃগ। একদিন চকিতে চোখাচোখিও হয়েছে—দেড় থেকে দু ফুট লম্বা।

সব থেকে উল্লেখযোগ্য ওদের নাভি—বহু রোগের ধন্বন্তরী। দুষ্প্রাপ্য, তাই দুর্মূল্য। পুরুষ হরিণের পেটের তলায়, পাতলা চামড়ার আবরণে নাভিটি ঢাকা থাকে। অতি তীব্র এর গন্ধ। এত তীব্র যে, এদের নাভিটি কোন হিংস্র পশুই খায় না—ফেলে রেখে দেয়।

সঙ্গিনীর জন্যে উন্মুখ হলে, নাভি-মূলের ছিদ্র বিস্ফারিত হয় আর কস্তুরীর সুবাসে প্লাবিত হয় সমস্ত বনাঞ্চল। বাতাসে ভেসে চলে সেই প্রেমপত্র। চঞ্চল হয় হরিণী। সুবাসের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। মিলিত হয় দুজনে—বাসা বাঁধে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে। জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে হরিণ-শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

কস্তুরী মৃগ প্রকৃত পর্বতারোহী। প্রতি-দিন নেচে কুঁদে পর্বত পরিক্রমা করা চাইই। আর উঁচুতে ওদের যত আনন্দ। ষোল হাজার ফুটেও ওদের দেখা গেছে। যত উঁচুতে ওঠে, ওদের উচ্ছলতাও তত বাড়ে। ইচ্ছে করেই ওরা বেছে নেয় খাড়া পিচ্ছিল গোলমেলে পাথুরে পথ। ঝড়, মেঘ, কুয়াশা—কোনটাই বাধা নয় ওদের কাছে।

গ্রীষ্মে আর বর্ষায় ওরা সারারাত ঘোরে। ঊষার নবীন আলোয় ওরা নেমে আসে নিচের রোডোডেনড্রন ও জুনিপারের কুঞ্জ-বনে। সেখানে সারাদিন বসে শুধু নিভৃত কূজন। সন্ধ্যা সমাগমে, সুবাসিত বেশে আবার সেই নিশি-অভিযান।

'সুজয়দার মনে আছে সতেরো হাজার ফুট উঁচুতে, ক্যাম্প থেকে ডিম চুরির কথা? সে নিশ্চয়ই কস্তুরী মৃগের কাণ্ড।'

স্নো শিখরের পথ। পুরু বরফে মোড়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আমাদের এক নম্বর শিবির। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বরফ আর বরফ। চার পাঁচ মাইলের মধ্যে জীবনের কোন স্পন্দন নেই। একদিন সকালে ঘুম ভেঙেই শুনি—হৈ হৈ। উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু কিচেন-টেন্ট। কোন মতে স্লীপিং ব্যাগের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে, তাঁবুর দরজার গলে বেরিয়ে এলাম। বিরাট ক্লাইম্বিং বুট দিয়ে, বরফে ততোধিক বড় বড় দাগ কেটে হাজির হলাম অকুস্থলে।

পাচক ফুরী, উত্তেজিত হয়ে, শেরপা ভাষায় কি যেন বলে চলেছে। চারিদিকে শেরপার ভিড়। সবাই বিস্ময়ে হতবাক। আরেক দফা কসরৎ করে, বরফের উঁচু চৌকাঠ ডিঙিয়ে রান্নাঘরে ঢুকি। তিনদিকে বরফের দেয়াল—মাথায় ত্রিপল। ফুরীর নির্দেশিত জায়গায় তাকিয়ে আমরা স্তম্ভিত। ডিমের ঝুড়ি কাৎ। ডিমগুলি সব বাইরে। একটাও ভাঙেনি—তবে সবকটাই ফুটো, আর ভেতরটা ফাঁকা। প্রশংসনীয় কৌশলে ডিমগুলো অন্তঃসারশূন্য করা হয়েছে। কে সেই চতুর চূড়ামণি? আমাদের অনাদৃত নিশিকুটুম্ব!

কিন্তু এক রাত্রে অতগুলো ডিম! আমাদের এতজনের চারদিনের রসদ। পুরু-রাতী নিরামিষাশীদের আবার পরম প্রিয়। ওদের তো কেঁদে ফেলার যোগাড়।

বেরিয়ে এলাম কিচেন থেকে। দেখতে পেলাম পায়ের ছাপ—বড় কুকুরের মত ছাপ। মূলশিবিরের দিক থেকে খাড়া চড়াই বেয়ে সেই ছাপ উঠে এসেছে। নেমেও গেছে সেই পথে। পায়ের মাপটা একটু বড়সড় হলে ভাল হত। ইয়েতি বলে হৈ চৈ করে শোকাতুর পর্বতারোহিণীদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করতাম।

গল্পের মাঝেই দেখি কমলা আর স্বপ্না জোর কদমে ছুটতে শুরু করেছে। শিবিরের রঙ-বেরঙের তাঁবুগুলো তুমুল-ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। ভেতর থেকে সোসকের মেয়েরা বিস্রস্ত বেশে ছিটকে বেরিয়ে আসছে। ছুটছে কিচেনের দিকে। খাবার জন্যে নয়। দূরে থেকে দেখি রাম-নাথ চিঠির তাড়া হাতে হেঁকে চলেছে—শেফালী চকরবর্তি, কামলা সাহা, সোয়াপনা নান্দী......

মানুষগড়ার ইতিকথা
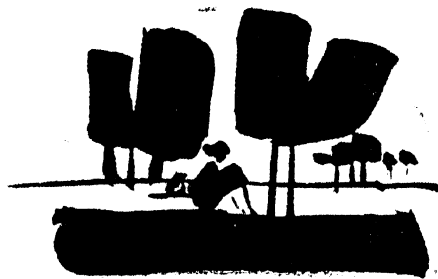
সাউথ সাবারবন স্কুল

চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালীর শহর এই কলকাতা। চাকরী চাই, তাই চাই শিক্ষা। তাই এত স্কুল, কলেজ। আজ পশ্চিমবঙ্গে একত্রিশ শোর ওপর উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল আছে। অথচ মাত্র পঁচানব্বই বছর আগেও সারা দক্ষিণ কলকাতায় হাইস্কুল ছিল মোটে একটি। অবিশ্যি আজ যে অর্থে দক্ষিণ কলকাতা শব্দ দুটি আমরা ব্যবহার করি, নিশ্চয় সে আমলে আধুনিক ব্যঞ্জনার সঙ্গে বাসিন্দাদের পরিচয় ছিল না। লোয়ার সার্কুলার রোডের দক্ষিণে সবটুকু এলাকাই ছিল সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সাউথ সাবারবন মিউনিসিপ্যালিটির আওতায়।

কিন্তু হুল হাকিকৎ সব পাল্টে গেছে। ভবানীপুর, কালীঘাট, আলিপুর, বালিগঞ্জের কথা ছেড়েই দিন আজ টালিগঞ্জও করপোরেশনের ট্যাকস গোনে। শহর আজ দক্ষিণমুখী। ক্রমশ আমাদের এই বহু চেনা অথচ অজানা শহর, সকলের অজান্তে আরো দক্ষিণে ছড়িয়ে যাচ্ছে। যদি জিজ্ঞাসা করি এর কারণ কি? অসংখ্য কারণ দেখানো যেতে পারে। সেই কারণের গোলকধাঁধায় প্রবেশ না করেও খুব সহজেই বলা যায় যে, চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত বাঙালীকে আজ আর ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য স্কুল-কলেজের কথা ভাবতেই হয় না। দক্ষিণের যে কোন বড় মোড়ে দাঁড়িয়ে যেদিকে ইচ্ছা তাকান, একটা না একটা স্কুল বা কলেজ চোখে পড়বেই। অথচ প্রায় দেড়শো বছর আগেও এই স্কুলের অভাবেই রামতনু লাহিড়ীর দাদা কেশবচন্দ্র চেতলা ছেড়ে ছুটেছিলেন কলুটোলায় হেয়ার সাহেবের কাছে, যদি ছোট ভাইটাকে কোনরকমে সাহেবের স্কুলে ভর্তি করা যায়।

তারপর কেটে গেছে প্রায় পঞ্চাশ বছর। ধীরে ধীরে কলকাতা পুরোনো সীমানা ছাড়াতে শুরু করেছে। চৌরঙ্গী রোড ধরে সরল রেখায় এই সীমানা বিস্তারের কাজ হয়েছে শুরু। লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড় পেরুলেই রসা পাগলা রোড। সে আমলে ঐ মোড়ের কাছে রসা পাগলা রোডের ওপরেই ছিল লন্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুল। দক্ষিণের একমাত্র হাইস্কুল। গত শতাব্দীর ষাট-সত্তরের যুগে রীতিমত নামডাক ছিল এই স্কুলের। কিন্তু একটা হাইস্কুলকে কি উঠতি বসতির প্রয়োজন মেটে। অবিশ্যি প্রাইমারী ও মিডল ইংলিশ স্কুল সে সময় ভবানীপুর, কালিঘাটে ছিল বেশ কিছু। কিন্তু হাই-স্কুল ঐ একটি। ফলে অধিকাংশ ছাত্রকেই ছুটতে হোত উত্তরে কলকাতায়। আজকের মত যাতায়াত সে যুগে এত সহজ বা সুলভ ছিল না। কলকাতার স্কুলে পড়াতে হোলে গার্জেনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাড়িভাড়া করে থাকতে হোত। এত হাঙ্গামা বা হুজ্জত পোয়ানো কি চাট্টিখানি কথা।

তাই ক্রমবর্ধমান দক্ষিণের মধ্যবিত্ত বাঙালীর চিরন্তন চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এলেন দক্ষিণেরই কয়েকজন খ্যাতনামা বাসিন্দা—অন্নদাপ্রসাদ ব্যানার্জী, ডাঃ গঙ্গা-প্রসাদ মুখার্জি, ডাঃ যাদবচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীমোহন রায়, রায়বাহাদুর কুঞ্জলাল ব্যানার্জী, মহেন্দ্রনাথ বোস, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, মোহিনীমোহন রায়, রাধাগোবিন্দ মল্লিক, ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী ও স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কালি-ঘাট ও ভবানীপুরের দুটি মিডল ইংলিশ স্কুল জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হোল একটি হাইস্কুল, ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪। এলাকার অর্থাৎ সাউথ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটির নাম ধারণ করে স্কুলের নামকরণ হোল সাউথ সাবারবন স্কুল। ইউনিভার্সিটির অনু-মোদনও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল। পরি-চালনার জন্য যে একজিকিউটিভ কমিটি গঠিত হোল তার প্রেসিডেন্ট হলেন স্বয়ং স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও সেক্রেটারী অন্নদা-প্রসাদ ব্যানার্জী।

স্কুল শুরু হোল হাজরা পুকুরের (বর্তমান হাজরা পার্ক) ধারে একটা ভাড়া বাড়িতে। এলাকাটা মূলত কালিঘাটে পড়ায় তখন স্কুলের পুরো নাম ছিল 'সাউথ সাবারবন স্কুল, কালিঘাট'। স্কুলের প্রথম হেডমাষ্টার নিযুক্ত হোলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। 'আত্মচরিত'-এর পাতায় শাস্ত্রীমশাই এই নিয়োগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "......আমার শুভানুধ্যায়ী তৎকালীন স্কুল-সমূহের ডেপুটি ইনসপেকটর রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় আমাকে ভবানীপুরের নব প্রতিষ্ঠিত সাউথ সাবারবন স্কুলের হেড-মাষ্টার করিয়া আনিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, আমি ১৮৭৪ সালের শেষভাগে ঐ স্কুলে আসিলাম।" কিন্তু স্কুলের পুরোনো রেকর্ডে স্পষ্ট লেখা আছে যে, শাস্ত্রী-

মশাই ১৮৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, "শেষ ভাগে" নয়, স্কুলে জয়েন করেছিলেন।

সে বিতর্ক থাক। হেডমাস্টারমশাই সমেত দশজন শিক্ষক নিয়ে স্কুল শুরু হোল। প্রথম বছরেই বারোজন ছাত্র এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিল। পাস করেছে দুজন। দুজনেই সেকেন্ড ডিভিশনে। প্রথম বছর যে দুজন এনট্রান্স পাস করেছিলেন, তাঁরা হোলেন—চিন্তামণি বসু ও রাজনারায়ণ বসু।

শাস্ত্রীমশাই মাত্র দুটি বছর সাউথ সাবারবনে ছিলেন। ছিয়াত্তর সালের এপ্রিল মাসে "ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুল হইতে আমার উৎসাহদাতা ও সহায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখুজ্যে মহাশয় আমাকে হেয়ার স্কুলে আনিলেন।" শাস্ত্রীমশাই চলে যাওয়ার আগেই দু বছরে দুবার স্কুলের ঠিকানা পাল্টেছে, নামও পাল্টেছে স্কুলের। গোড়ায় সরকারের শিক্ষা দপ্তর ও সাউথ সাবারবন মিউনিসিপ্যালিটি সামান্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস সাহায্য দিয়েই হঠাৎ তারা হাত গুটিয়ে নিলেন। এই নিদারুণ অর্থকষ্টের সময় প্রতিষ্ঠাতারাই আবার স্কুলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। চুয়াত্তর সালে স্কুল হাজরা পুকুরের আস্তানা ছেড়ে উঠে যায় সামান্য উত্তরে গোবিন্দ ঘোষাল লেনে। পরের বছর এমপ্রেস থিয়েটারের (বর্তমান রূপালী সিনেমা) উত্তরে রসা রোডের ওপর মৌলবী হবিবুল হোসেনের বিশাল ব্যারাক বাড়িতে স্কুল উঠে আসে। এই ঘন ঘন বাড়ি বদলানোর সম-সময়ে স্কুলের নামও সামান্য বদলে যায়। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল অ্যাকট অনুযায়ী ভবানীপুরে কলকাতার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্কুলের পুরোনো নাম বদলে রাখা হোল—'সাউথ সাবারবন স্কুল, ভবানীপুর।' নামটাম পাল্টে মৌলভী সাহেবের বাড়িতে ১৮৯০ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত স্কুল বসেছে। তারপর?

তারপরের কথা বলার আগে মাঝের ষোলটি বছরের হিসাব নেওয়া দরকার। শিবনাথ হেয়ার স্কুলে চলে গেলেন ছিয়াত্তর সালের এপ্রিল মাসে। তাঁর জায়গায় অফিসিয়েটিং হেডমাস্টার হোলেন আশুতোষ বিশ্বাস। বিশ্বাসমশাই মাত্র দুটি মাস এই দায়িত্ব বহন করেছেন—মে, জুন। জুলাই মাসে নতুন হেডমাস্টারমশাই এলেন। যশোদানন্দন প্রামাণিক। ঐ বছরই প্রথম স্কুলের ছেলেরা এনট্রানসে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করল। পরীক্ষার্থী আটটি ছাত্রের মধ্যে তিনজন ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে।

এর ঠিক তিন বছর পরেই ১৮৭৯ সালে স্কুলের রেজাল্ট শুনে গোটা দেশ চমকে উঠল। গেজেটে পরীক্ষার ফলাফল বেরুলে দেখা গেল সাউথ সাবারবনের ছেলে এনট্রানসে সেকেন্ড হয়েছে। স্কুলেরই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছেলে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই অভাবনীয় রেকর্ডের স্রষ্টা। মজার ব্যাপার সাউথ সাবারবনের ছেলে এনট্রানসে সেকেন্ডে হলেও সে বছর স্কুলের সাধারণ ফলাফল তেমন কিছু ভাল হয়নি; পাসের হার ছিল শতকরা বাষট্টি ভাগ। একুশজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছিল তেরোজন—দুজন ফার্স্ট ডিভিশনে। অথচ আগের বছরে স্কুলের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে পাশ করেছিল শতকরা উনআশীজন। আশুতোষ যে বছর স্ট্যান্ড করলেন, তখন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। আটাত্তর সালে যশোদাবাবু স্কুল ছেড়ে চলে যান।

ক্ষেত্রমোহন মোট সাড়ে তিন বছর হেডমাস্টার হিসাবে কাজ করেছেন। আটাত্তর সালের মে মাস থেকে একাশী সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সাড়ে তিন বছরে সাতাত্তরটি পরীক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা সাতষট্টি জন পাশ করেছে, ফার্স্ট ডিভিশনে পাঁচজন। একাশী সালে স্কুলের অপর কৃতী ছাত্র অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এনট্রানসে টেনথ প্লেস পান। ঐ বছরই ক্ষেত্রমোহনের জায়গায় হেডমাস্টার হয়ে এলেন বেণীমাধব গঙ্গোপাধ্যায়। দুটি টার্মে মোট পঁচিশ বছর বেণীমাধব এই স্কুলে হেডমাস্টারী করেছেন। তাঁর সময়েই স্কুলের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার ভিৎ রচনা শুরু হয়।

বিরাশী থেকে পঁচাশী সাল আবার সাতাশী সাল থেকে বর্তমান শতাব্দীর নয় সাল পর্যন্ত হেডমাস্টার ছিলেন বেণীমাধব। তাঁর সময়েই স্কুল মৌলভী সাহেবের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজস্ব আস্তানায় উঠে আসে। স্কুলের নিজস্ব আস্তানাটুকু গড়ে তোলার পেছনে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভূমিকা স্মরণীয়। বছর বছর যে স্কুল থেকে ছেলেরা স্ট্যান্ড করে, পাশের হার রীতিমত উঁচুপর্দায় বাঁধা, স্বাভাবিক নিয়মেই অভিভাবকরা ছুটে আসতেন সেই স্কুলে ছেলে ভর্তি করতে। কয়েক বছরেই স্কুলের প্রায় ছাপাছাপি অবস্থা। শয়ে শয়ে ছাত্র আসছে পড়তে। ১৮৮০ সালে নটি ক্লাসে মোট চারশো তিরিশটি ছেলে পড়ত এই স্কুলে। নব্বই সালে এই সংখ্যা দাঁড়াল ছশো তিরাশী। আর জায়গায় কুলোয় না ব্যারাকবাড়িতে। তাই ১৮৮৮ সালে স্কুল কমিটি বর্তমান ১৬ নম্বর গোপাল ব্যানার্জি স্ট্রীটের দেড় বিঘা জমি কিনলেন।

জমি কিনলেন, কারণ এতদিন শুধু যে ছাত্রসংখ্যাই বেড়েছে তা নয়, স্কুলের সঙ্গতিও বেড়েছে যথেষ্ট। আশী সালে নটি ক্লাসের গড় বেতন ছিল দেড় টাকা। অ্যাভারেজ কষার দরকার কি, পুরো হিসাবটাই তুলে ধরছি—ফার্স্ট ক্লাস টু থার্ড ক্লাস মাস মাইনে দু টাকা, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ দেড় টাকা, আর সেভেন্থ টু নাইনথ, অর্থাৎ আজিকের দিনে ক্লাস ফোর থেকে টু পর্যন্ত ফ্ল্যাটরেটে এক টাকা। পঁচাশী সালে এই রেটের সামান্য অদল-বদল হয়। সবচেয়ে নীচের ক্লাস দুটির মাইনে অপরিবর্তিত (অর্থাৎ এক টাকা) রেখে ফোর্থ, ফিফথ ও সিকসথ ক্লাসের টিউশন ফি করা হয় দেড় টাকা ও ওপরের চারটি ক্লাসের দু টাকা। ছাত্রবেতন থেকে স্কুলের আয় সে আমলে নেহাৎ কম ছিল না। সমস্ত খরচ-খরচা বাদ দিয়েও প্রতি বছরই কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হতে থাকে। ঐ টাকাতেই সেদিন জমি কেনা হয়েছিল।

এই জমির ওপরেই দু বছরের মধ্যে স্কুলের নিজস্ব বাড়ি উঠল। এই বাড়ি করতে সে আমলেই প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হয়। এই টাকার অধিকাংশই এসেছে জনসাধারণের চাঁদা থেকে। বিশেষ করে কারো নাম উল্লেখ করতে হোলে রাজা দিগম্বর মিত্র ও মোহিনীমোহন রায়ের নাম করতে হয়। এঁদের সহৃদয় সাহায্য ছাড়া স্কুলের নিজস্ব বাড়ি এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। বাড়িটি তৈরী করেছিলেন একজন ইটালিয়ান ইনজিনিয়ার, মিঃ ফার্নার্ডো। প্যাটার্নের দিক থেকে সাউথ সাবারবন স্কুল বাড়ি সে যুগের পক্ষে ছিল যথেষ্ট মডার্ন। বিশাল হলঘর মাঝে রেখে একতলায় দুপাশে সারি সারি ক্লাসঘর। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠুন। ব্যালকনির বারান্দা ধরে দুদিকে একতলার মতই ক্লাস ঘর। আলো হাওয়া যাতে যথেষ্ট খেলতে পায়, সেদিকে সাহেবের যে রীতিমত নজর ছিল, আজো মেন বিল্ডিং সেই সাক্ষ্য বহন করছে। বাড়ি তৈরী হতে স্কুল ভাড়াবাড়ি ছেড়ে স্থায়ীভাবে নিজস্ব ভিটেয় উঠে এল, জুন, ১৮৯০।

স্কুলের নিজস্ব জমি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে গোটা শহরে। প্রতিষ্ঠার সময় যা কল্পনারও অতীত ছিল, তা সবই সম্ভব হয়েছে মাত্র ষোলটি বছরে। বছর নয় যেন ষোলটি মুহূর্ত—কবে কখন কিভাবে কেটে গেছে টেরও পান নি অন্নদাপ্রসাদ। স্বপ্নের ঘোরে ছিলেন। গড়বার স্বপ্ন। স্কুল গড়বেন। নর্থের নামী স্কুলগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন স্কুল। তোলেন নি গোটা সাউথের সুনাম নির্ভর করছে তাঁর স্কুলের ওপর। কারণ সাউথ সাবারবনই তখন সাউথের সবেধন নীলমণি—মিত্র, জগবন্ধু বা চেতলা স্কুলের তখনো জন্ম হয়নি। স্বপ্ন সফল হওয়ার মুখে মুখেই বিদায় নিলেন অন্নদাপ্রসাদ, স্কুল সেই বছরই উঠে এল রসারোড ছেড়ে গোপাল ব্যানার্জী স্ট্রীটে। অন্নদাপ্রসাদের শূন্য আসন পূর্ণ করলেন রাধাগোবিন্দ মল্লিক।

প্রসঙ্গত এখানে বলা দরকার যে, স্কুল শুরু হয়েছিল পাব্লিক ইন্সটিটিউশন হিসাবেই। রেজিস্ট্রি করানো বা ট্রাস্ট গঠনের কথা এতদিন কারো মাথায় আসেনি এবার নিজস্ব জমি, বাড়ি হতে উননব্বই সালে তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি ট্রাস্ট বোর্ডের হাতে স্কুলের সমস্ত সম্পত্তির দায়িত্ব ন্যস্ত হোল। ট্রাস্ট ডীড অনুযায়ী সদস্যরা আমৃত্যু অছিগিরি করবেন। কোন সদস্যের মৃত্যু হোলে অপর সদস্য বা সদস্যরা শূন্য আসন পূরণের জন্য অপর কাউক মনোনীত করত পারবেন। ট্রাস্টীবোর্ডের প্রথম তিনজন সদস্য ছিলেন শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী, মন্মথনাথ মিত্র ও রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

ট্রাস্টের কথা থাক, স্কুলের ভেতরের কথায় ফিরে আসি। যে সুনামটুকু মূলধন করে স্কুলের থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে, তার মূলে ছিলেন বেণীমাধব ও তাঁর আদর্শনিষ্ঠ সহকর্মীরা। তাঁদের সমবেত চেষ্টায় স্কুলের রেজাল্ট-রেকর্ড চিরদিনই ছিল অমলিন। আশুতোষ এনট্রানসে সেকেন্ড হয়েছিলেন, দশ বছর পরে তাঁর স্কুলেরই অপর ছাত্র দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় হলেন ফার্স্ট। ইতিমধ্যে পঁচাশী ও ছিয়াশী সালে এ স্কুলেরই ছাত্র গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পর পর [illegible]

ও নাইনথ্ স্ট্যান্ড করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। নিজস্ব বাড়িতে উঠে আসার পরবর্তী দশ বছরে সাউথ সাবারবনের ছেলেরা স্ট্যান্ড না করলেও একবার সেকেন্ড গ্রেড ও সাতবার থার্ডগ্রেড সমেত মোট আটটি স্কলারসিপ পেয়েছে।

স্কুলের সুনামের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই তখন ছাত্রসংখ্যা বেড়ে চলেছে। বর্তমান শতাব্দীর সূচনা-বর্ষে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় সাতশো পঁচানব্বই। আজকের দিনের দেড়-দু হাজারী অতিকায় স্কুলগুলির কাছে এ সংখ্যা হয়তো কিছুই না, কিন্তু সে আমলে কলকাতার খুব কম স্কুলেই এত ছাত্র পড়ত। ছাত্রসংখ্যা ও সময় সময় টিউশন ফির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সময় স্কুলের রিজার্ভ ফান্ডে যথেষ্ট সঞ্চয় হয়। এই সঞ্চয়টুকু স্কুলের নিজস্ব প্রয়োজনীয় উন্নতি ছাড়াও স্থানীয় শিক্ষা সমস্যার সমাধানে স্কুল কমিটি ব্যয় করেন।

সাউথ ক্যালকাটায় সত্তর বছর আগেও মেয়েদের, বিশেষ করে হিন্দু মেয়েদের পড়াশোনার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির পুরোনো স্কুল ল্যান্সডাউন রোডে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সেন্ট জনস ডায়োসেশান ছাড়া অন্যকোন স্কুল বলতে গেলে ছিল না। এই অভাব দূর করবার জন্য সাউথ সাবারবন স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট স্যার রমেশচন্দ্র ১৮৯৭ সালে 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। এই বালিকা বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠা ও গোড়ায় প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে সাউথ সাবারবন স্কুলের দান অনস্বীকার্য। সেদিনের সেই বালিকা বিদ্যালয়টি আজ আদৌ বালিকা নয়, একডাকে সবাই চেনে,—স্যার রমেশ মিত্র স্কুল।

চব্বিশ বছরে পূর্ণ সাবালক হয়ে উঠেছে স্কুল। শুধু নিজের নয়, অন্যের দায়িত্বও ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। অথবা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে নিজেকেই ছড়িয়ে দিয়েছে, পূর্ণ হয়েছে পূর্ণতর। অন্নদাপ্রসাদ স্কুলের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেখে গিয়েছিলেন, রমেশচন্দ্র তার বিস্তারের স্তরবিন্যাসের সঙ্গে ছিলেন জড়িত। তাঁর চেষ্টায় হাজরা পুকুরের সেই ছোট্ট স্কুলটিই হয়ে উঠেছে সাউথের, শুধু সাউথের কেন, গোটা শহরের অন্যতম সেরা স্কুল। একটা স্কুল থেকে জন্ম নিয়েছে আর একটি স্কুল। এ সবই তিনি দেখে গেছেন। দেখে গেছেন বলা ভুল হোল, সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে স্কুলের নিত্য নব রূপায়ণের নেপথ্যে রূপকার ছিলেন স্বয়ং তিনিই। হয়তো আরো কোন ব্যাপকতর পরিকল্পনা তাঁর ছিল। কিন্তু তার আগেই বেজে ওঠে সমাপ্তির বাঁশী। ১৮৯৯ সালে রমেশচন্দ্র মারা যান। তাঁর জায়গায় স্কুলের প্রেসিডেন্ট হোলেন স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

বেণীমাধব তখনো স্কুলের হেডমাস্টার। আরো দশ বছর এই দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। এই দশ বছরে তিন তিনবার স্কুলের ছেলেরা স্ট্যান্ড করেছে এনট্রান্স পরীক্ষায়। ১৯০১ সালে হরিহরপ্রসাদ সিং হলেন সেকেন্ড, পরের বছর সতীশচন্দ্র সরকার টেনথ ও পাঁচ সালে কৃষ্ণপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ফোর্থ হন। বছর বছর ছাত্ররা স্ট্যান্ড করছে, স্কলারসিপ পাচ্ছে, অভিভাবকদের ভর্তির আবেদনও পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে সাউথ সাবারবনে বছরে গড়ে নশো ছাত্র পড়ত। এত ছাত্রের জায়গা মেন বিল্ডিংয়ে হোত না বলেই, মেন বিল্ডিংয়ের উত্তরে বর্তমান ১ নম্বর গোপাল ব্যানার্জী স্ট্রীটে কাঠা পনেরো জায়গা কেনা হোল। ঐ জায়গায় স্কুলের আর একটি বাড়ি উঠল ১৯০৮ সালে। প্রাইমারী সেকশন উঠে এল এই বাড়িতে। পরের বছর ডিসেম্বরে বেণীমাধববাবু রিটায়ার করলেন। তাঁর জায়গায় হেডমাস্টার হলেন দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়।

১৯০৫ সালে সাউথ সাবারবনে জয়েন করেন দেবকিশোর। হেডমাস্টার হওয়ার আগে পাঁচটি বছর তিনি ছিলেন স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট। পঁচিশ বছর এই স্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন দেবকিশোর। বেণীমাধবের মত ইনিও দু দফায় প্রায় কুড়ি বছর হেডমাস্টার ছিলেন সাউথ সাবারবনে। এই কুড়ি বছরে মোট আটবার স্ট্যান্ড করেছে ম্যাট্রিকে সাউথ সাবারবনের ছেলেরা। পাশের হার শুধু একটিবার ছাড়া কখনো শতকরা সত্তরের নীচে নামে নি। গড়ে শতকরা পঁচাশীটি ছেলে এ সময় পাশ করেছে। রেজাল্ট-রেকর্ডের শুকনো সংখ্যায় শুধু নয়, অসংখ্য প্রাক্তন ছাত্রের মনের পাতায় আজো সেই দেবতুল্য মানুষটির স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

দেবকিশোর যে বছর স্কুলের হেডমাস্টার হলেন, তার আগের বছরই স্যার চন্দ্রমাধব স্কুলের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে রিটায়ার করেন। নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন স্কুলেরই প্রাক্তন কৃতী ছাত্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। আমৃত্যু আশুতোষ এই দায়িত্ব বহন করেছেন। এ সময় স্কুল পরিচালন ব্যবস্থায় বেশ কিছুটা অদল-বদল হয়। স্কুলের পরিচালন ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশীদারত্ব বাড়াবার জন্য পঞ্চাশজন সদস্য নিয়ে গঠিত হল জেনারেল কমিটি। এই জেনারেল কমিটির সদস্যদের নিয়েই গঠিত হল রমেশ মিত্র গার্লস স্কুল ও সাউথ সাবারবনের একজিকিউটিভ কমিটি। স্যার আশুতোষ জেনারেল কমিটি ও সাউথ সাবারবন স্কুল কমিটি, দুটিরই ছিলেন প্রেসিডেন্ট।

১৯০৯ থেকে ১৯৩০, সাউথ সাবারবন স্কুলের পঁচানব্বই বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়। স্কুলের প্রেসিডেন্ট তখন স্বয়ং স্যার আশুতোষ, হেডমাস্টার দেবকিশোর। যে ভাগীরথী প্রবাহকে রমেশচন্দ্র, অন্নদাপ্রসাদ, শিবনাথ, বেণীমাধব পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, পরবর্তী জেনারেশন সেই অমৃত প্রবাহকে করলেন বহুধা বিস্তৃত। ১৯১৬ সালে দক্ষিণ কলকাতার একমাত্র কলেজ, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির কলেজ ডিপার্টমেণ্ট গেল উঠে। হাহাকার পড়ে গেল সাউথে—ছেলেরা তবে পড়বে কোথায়? নর্থে নামী নামী কলেজের অভাব নেই সত্যি, তাই বলে ঘরের কোনের আলোটুকুও নিভিয়ে দিতে হবে? না—আলো নিভবে না। নতুন করে প্রদীপ আবার জ্বলবে। সেই প্রদীপ জ্বালানোর দায়িত্ব নিলেন সাউথ সাবারবন স্কুল কমিটি। ঐ বছরই প্রতিষ্ঠিত হল সাউথ সাবারবন কলেজ। প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরেই স্কুলের রিজার্ভ ফান্ড থেকে হাজার কুড়ি টাকা ব্যয় করা হোল কলেজের জন্য। ধীরে ধীরে কলেজ দাঁড়িয়ে গেল। সেই কলেজটিই আজ আমাদের কাছে পরিচিত অন্য নামে—আশুতোষ কলেজ।

শুধু মেয়েদের স্কুল বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি সাউথ সাবারবন স্কুল কমিটি। চক্রবেড়িয়া মিডল ইংলিশ স্কুলটির দায়িত্বও তাঁরা গ্রহণ করলেন, ১৯২১ সালে। দক্ষিণের অন্যতম প্রাচীন এই এম-ই স্কুলটির তখন শোচনীয় অবস্থা। অর্থ ও সামর্থ্যের অভাবে প্রায় উঠে যায় যায়। সেদিন যদি এই প্রাচীন এম-ই স্কুলটির পাশে এসে সাউথ সাবারন স্কুল না দাঁড়াত, তাহলে আজ হয়তো আমরা চক্রবেড়িয়া স্কুলটিকে পেতাম না।

চক্রবেড়িয়া স্কুল শুধু নয়, পেতাম না আরো একটি স্কুলকে, যেটি আজ সাউথ সাবারবন ব্রাঞ্চ স্কুল নামে আমাদের কাছে পরিচিত। আসলে এটি ছিল লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুল ডিপার্টমেণ্ট। ছাব্বিশ সালে সোসাইটি বন্ধ করে দিল স্কুলটি। তখন এর ছাত্রসংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। এত ছাত্রকে স্থানীয় অন্যান্য স্কুলে জায়গা দেওয়াও অসম্ভব। অথচ সুযোগের অভাবে এতগুলো ছেলের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যাবে, সাউথ সাবারবন স্কুল কমিটি তা চান নি। তখন কমিটির প্রেসিডেন্ট স্যার রমেশচন্দ্রের ছেলে স্যার প্রভাস মিত্র। স্যার প্রভাসের ইচ্ছায় স্কুল কমিটি এই গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য এগিয়ে এলেন। নবরূপে জন্ম

জন দক্ষিণের আর একটি নামী স্কুল—সাউথ সাবারবন ব্রাঞ্চ স্কুল।

১৮৭৪ থেকে ১৯২৬, মাত্র বাহান্নটি বছর। নিরবধিকালের তুলনায় কতটুকুই বা সময়। অথচ এই সামান্য সময়ে রচিত হয়েছে এক অসামান্য ইতিহাস। একটি স্কুলকে কেন্দ্র করে জন্ম নিয়েছে একটি মেয়েদের স্কুল, দুটি প্রাচীন স্কুল ফিরে পেয়েছে হৃত প্রাণ, গড়ে উঠেছে একটি কলেজ। এই অসামান্য ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব যদি কারো প্রাপ্য হয় তাঁরা হলেন এই সাউথ সাবারবন স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও পরিচালকরা।

ইতিহাস যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেবে, বিনিময়ে যার যা দেওয়ার আছে সেটুকু তুলে নেবে। পঁচিশ বছরের অনলস পরিশ্রমে ক্লান্ত দেবকিশোর অবসর নিলেন তিরিশ সালে। স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলেন বিনোদবিহারী চ্যাটার্জী। ছেচল্লিশ সাল পর্যন্ত একটানা ষোল বছর চাটুজ্যেমশাই সাউথ সাবারবনে হেডমাস্টারী করেছেন। তিনি যে বছর স্কুলে এলেন, সে বছর স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ছিল তেরোশ একানব্বই। সে বছর স্কুলের আয় হয়েছে ছাত্রবেতন থেকে তেষট্টি হাজার একশো পঞ্চান্ন টাকা আট আনা। ব্যয়ও প্রায় সমান সমান। আর হবে নাই বা কেন। তিপ্পান্নজন শিক্ষক তখন স্কুলে পড়াচ্ছেন। বাইশ সাল থেকে স্কুলে কন্ট্রিবিউটারী প্রভিডেন্ট ফান্ড স্কীম চালু করেছেন একজিকিউটিভ কমিটি। শুধু তাই নয় যে সব প্রাচীন শিক্ষক এই স্কীমের সুবিধা না পেয়ে আগেই রিটায়ার করেছেন তাদের জন্য চালু হয়েছে পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থা এই সেদিন গভর্ণমেন্ট চালু করেছেন সারা দেশে, সাউথ সাবারবন স্কুলে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই তা চালু হয়েছিল। এই স্কুল দাঁড়িয়েছে শিক্ষকদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠায়, বিনিময়ে শিক্ষকদের প্রতি দায়িত্ব পালনে স্কুল কখনো মুখ ফেরায় নি। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল একবার একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, যে কোন স্কুলের উন্নতি নির্ভর করে স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও পরিচালক সমিতির সুস্থ সহজ সম্পর্কের ওপর! সাউথ সাবারবন স্কুল সেই সুস্থ ও সহজ সম্পর্কের জ্বলন্ত উদাহরণ।

সেই স্বাভাবিক সম্পর্কের সুমহান ঐতিহ্য দেবকিশোর পরবর্তী অধ্যায়েও যে পূর্ণমাত্রায় অটুট ছিল তার প্রমাণ মিলবে স্কুলের রেজাল্টে। পঁয়ত্রিশ সালে সাউথ সাবারবনের ছাত্র বিশ্বনাথ মজুমদার নাইনথ হয়েছিলেন ম্যাট্রিকে। পাঁচ বছর পরে চল্লিশ সালে হরপ্রসাদ বিশ্বাস হন সেকেন্ড। নিশ্চয়ই আজো বিশ্বনাথ, হরপ্রসাদ ও তাদের শত শত প্রাক্তন সহপাঠীদের মনে আছে একটি মানুষের কথা। মানুষটি তাঁদেরই একজন শিক্ষক। পঁচিশ সালে পড়াতে এসে, যৌবনের প্রায় বারো আনাই তিনি ফার্নার্ডো সাহেবের বানানো সেই আশ্চর্য বাড়িটিতে কাটিয়ে গেছেন। শিক্ষক হিসাবে মানুষ গড়ার কারিগরদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের শরিক ছিলেন তিনি। সেই মানুষটিই এ যুগের নামী কথা-সাহিত্যিক মনোজ বসু। দেবকিশোর, বিনোদবিহারী দুজনের সঙ্গেই কাজ করেছেন। তাঁর সময়ে দেবকিশোর রিটায়ার করেছেন, আর গল্প লেখকের কলম যখন তর-তর করে এগিয়ে চলেছে তখন বিনোদবাবু চালাচ্ছেন স্কুল। সেই বিনোদবাবু রিটায়ার করলেন ছেচল্লিশে। নতুন হেডমাস্টার হলেন অমরনাথ মজুমদার। মাত্র তিন বছর অমরবাবু এই স্কুলে ছিলেন। তাঁর বিদায় বর্ষে উনপঞ্চাশ সালে স্কুলের সুনাম বজায় রেখে ম্যাট্রিকে ফিফথ হলেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

অমরবাবুর জায়গায় এলেন গোপীবাবু। গোপীপদ চট্টোপাধ্যায়। আজ থেকে মাত্র চার বছর আগেও গোপীবাবু ছিলেন সাউথ সাবারবনের হেডমাস্টার। ষোল বছর এই স্কুল তিনি চালিয়েছেন। এই ষোল বছরে অনেক পরিবর্তন এসেছে স্কুলের জীবনে। দীর্ঘ একাশী বছর একসঙ্গে থাকার পর পঞ্চান্ন সালে সরকারী নির্দেশে আলাদা হয়ে গেল প্রাইমারী সেকশন। এর ঠিক তিন বছর পরেই হাই স্কুল রূপান্তরিত হল হায়ার সেকেন্ডারীতে। গোড়ায় ছিল শুধু দুটি স্ট্রীম—সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ। পরের বছর উনষাট সালে কমার্স সেকশন খোলা হোল। আজ তিনটি স্ট্রীমে সেকেন্ডারী সেকশনে প্রায় পৌনে এক হাজার ছাত্র পড়ে এই স্কুলে। তিনতলা মেন বিল্ডিং ও মেন বিল্ডিংয়ের দক্ষিণে একফালি ন্যাড়া মাঠের গায়ে দোতলা জিওগ্রাফী সেমিনারীর বিল্ডিংয়েই ক্লাস হয়। কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারীর ঝামেলা প্রচুর। দরকার আরো ক্লাসঘর। কারণ মেনবিল্ডিংয়ের তিনটি তলায় তিনটি ঘর ছেড়ে দিতে হয়েছে কেমিস্ট্রি, ফিজিকস্ ও বায়োলজির ল্যাবরেটরীর জন্য। তাই কমার্সের জন্য বাষট্টি সালে মেনবিল্ডিংয়ের পেছনদিকে তিনটি তলায় মোট ছটি অতিরিক্ত ঘর তোলা হয়েছে।

সেকেন্ডারীর মত প্রাইমারীর অত ঝামেলা নেই। ১৯০৮ সালের সেই পুরোনো বাড়িটি আজ তিনতলা। তাতেই জায়গা হয়ে যায় সোয়া চারশো ছেলের। প্রাইমারী সেকেন্ডারী মিলিয়ে চৌদ্দশ ছাত্রের জন্য স্কুলে আছেন ষাটজন শিক্ষক। শুধু সেকেন্ডারীতেই পড়ান সাইত্রিশজন। এই প্রসঙ্গে সনৎবাবু বললেনঃ আমাদের প্রাইমারীর তেইশজন টিচারই মহিলা।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় পঁয়ষট্টি সাল থেকে সাউথ সাবারবনের হেডমাস্টার। স্কুলের গত পঁচানব্বই বছরের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র প্রধান শিক্ষক যিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পোস্ট থেকে প্রমোশন পেয়ে এই পদে আসতে পেরেছেন। পঁয়ত্রিশ সাল থেকে এই স্কুলে পড়াচ্ছেন সনৎবাবু। তাঁর থেকে বয়সে না হলেও সার্ভিসে সিনিয়র দেবব্রত রায়চৌধুরী, বর্তমান অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার। দুই প্রবীণ শিক্ষকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল স্কুলের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে। মনে হল, অতীত যেন আজো এদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে, তুলনায় বর্তমান অনেক ধূসর, ধুলো বালিতে ঢাকা। কেন এই হতাশা বা ক্লান্তি তা জানবার চেষ্টা করেছি। ভেবেছিলাম স্কুলের রেজাল্ট বোধহয় আর আগের মত উজ্জ্বল নয় তাই বুঝি শিক্ষকরা দুঃখিত। কিন্তু তা তো নয়। এই তো সেদিন বাষট্টি সালে এদের ছাত্র সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় সায়েন্স স্ট্রীমে সেভেথ স্ট্যান্ড করেছে। সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ ও কমার্স মিলিয়ে গড় পাশের হার শতকরা সত্তর ভাগ। রেজাল্টের দিক থেকে শুধু দক্ষিণে নয়, গোটা শহর কলকাতাতেই অগ্রণী স্কুলগুলির মাঝে সাউথ সাবারবনের আসন অতীতের মতো আজো অটল।

শুধু লেখাপড়ায় নয়, খেলাধূলাতেও এই স্কুলের ছেলেরা সাউথের অন্যান্য স্কুলের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে মান বজায় রেখে চলেছে। নিজস্ব মাঠ নেই তাতে কি? ময়দানে, হরিশ পার্কে, লেকের মাঠে ঘুরে ঘুরে এরা প্র্যাকটিশ করে, ম্যাচ খেলে। আর তাই আমরা পাই সুকুমার সমাজপতি, টি কর, সুনীল চ্যাটার্জির মত এযুগের নামী ফুটবলারদের। শুধু ফুটবলে নয়, এন সি সি স্কাউটেও সাউথ সাবারবনের ছেলেদের সুনাম যথেষ্ট। সব দিকেই তো সাউথ সাবারবনের জয়-জয়কার। তবু কেন শিক্ষকরা দুঃখিত? তাঁর কারণ নিশ্চয়ই আমরা সবাই জানি। সেই সবার জানা কারণের ঘুণপোকাটাই আজ আমাদের বিশ্বাসের, ভালোবাসার, শ্রদ্ধার ভিত্তি কুরে কুরে শেষ করে দিচ্ছে। আমরা দেখছি, বুঝতে পারছি সবই, অথচ কোন প্রতিবাদ করছি না। একদিন হয়তো চীৎকার করে সত্যিই প্রতিবাদ জানাব, সেদিন হয়তো প্রতিবাদের বদলে আমাদের গলা থেকে আর্তনাদের করুণ কান্না ঝরে পড়বে। তার আগে কি কিছু করা যায় না?

এ প্রশ্ন শুধু সাউথ সাবারবনের শিক্ষকদের নয়, গোটা দেশের অধিকাংশ স্কুলের শিক্ষকদেরই আজ এই প্রশ্ন। জবাব মিলবে কি মিলবে না জানি না। সমাজের দায়িত্ব সমাজপতিরা পালন করবেন। আমি ফিরে এসেছি সেদিন স্কুল থেকে এই প্রশ্নটি নিয়ে। ফেরার পথে গলিপথটুকু পায়ে পায়ে ফুরিয়ে গেল একসময়। বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালায়। এই রাস্তার নাম আজ আশুতোষ মুখার্জী রোড। অথচ সাউথ সাবারবন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রটি যখন স্কুলে পড়তেন তখন এই রাস্তার নাম ছিল রসা পাগলা রোড। সামনেই স্যার আশুতোষের বাড়ি। একটু উত্তরে আজো পুরোনো এমপ্রেস থিয়েটারের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে রূপালী সিনেমা। নেই সেই ব্যারাক বাড়ি। দক্ষিণে, দেখা যায় না, তবু জানি তিনটি স্টপ পেরুলেই, হাজরা পার্ক। একদিন ঐ পার্কই ছিল পুকুর। সেদিন গোটা ভবানীপুর, কালীঘাট চাপটে কোন হাইস্কুল ছিল না। আজ এত স্কুল, এত কলেজ। তবু কেন ভ্রূণ-কেন্দ্র সংশয়ে মলিন?

—সন্দিৎসু

পরের সংখ্যায় : সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউট।

LEX
LEX
LEX
LEX
LEX
LEX
Extra

আগের ঘটনা

চল্লিশের পূব বাঙলা। এক স্বপ্নের জগৎ। কলকাতার ছেলে বিনু সেই স্বপ্নের দেশেই বেড়াতে গেল। বাঙলার রাজদিয়া হেমনাথদাদুর বাড়ি। সঙ্গে মা-বাবা আর দুই দিদি। সুধা-সুনীতি। হেমনাথ আর তাঁর বন্ধু লারমোর সকলেরই বিস্ময়। যুগলের ভালোবাসায় বিনুও অবাক।

দেখতে দেখতে পুজো এসে গেল। এরই মধ্যে সুধার প্রতি হিরণের রঙীন নেশা, সুনীতির সঙ্গে আনন্দের হৃদয়-বিনিময়ের প্রয়াসে কেমন রোমাঞ্চ।

কিন্তু পুজোও শেষ হল। গোটা রাজদিয়ার বিদায়ের করুণ রাগিণী। এবার আনন্দ-শিশির-ঝমা প্রমুখ পাড়ি জমাল কলকাতার পথে। অবনীমোহন তাঁর স্বভাব মতোই রাজদিয়ায় থাকবার মনস্থ করলেন হঠাৎ। অনেকেই তাজ্জব।

ওঁরা থেকেই গেলেন স্থায়ীভাবে।

দেখতে দেখতে বছর ঘুরল। যুদ্ধের হাওয়া চারদিকেই। রাজদিয়াতেও। এরই মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল সুধা-সুনীতির।

কিশোর বিনুও পৌঁছে গেছে যৌবনের দ্বারে।

সুরমাও মারা গেলেন একদিন।

বিনু একা। বড়ো নিঃসঙ্গ।

ছেচল্লিশের কথা। শুরু হল বিভীষিকা র রাজত্ব। আত্মঘাতী দাঙ্গা। ঢেউ এসে লাগল তার রাজদিয়াতেও।

সুজনগঞ্জের হাটে ছিল সেদিন মিটিঙ। হেমনাথও গেলেন শুনতে। সঙ্গে বিনু।

।।পঞ্চান্ন।।

তামাকহাটা, মরিচহাটা, আনাজহাটা পেছনে রেখে বড় বড় পা ফেলে বিষহরি-তলার কাছে এসে পড়ল বিনুরা।

আশ্চর্য, লারমোর চেয়ার-টেবিল পেতে যথারীতি রুগী দেখতে বসেছেন। এক পাশে ওষুধের মস্ত বাক্স। আরেক পাশে সুজনগঞ্জ হাটের অনেকগুলো অসুস্থ রুগ্ন মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। সামনের বিশাল মাঠ জুড়ে যে অতবড় একটা মিটিং চলছে, অসংখ্য হাটুরে মানুষ যে ভিড় জমিয়েছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লারমোরের। নিজের কাজের মধ্যে তিনি ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে এত অস্থিরতা, এত উত্তেজনা, কলকাতা-বিহার-নোয়াখালি রক্তের নদী হয়ে যে দুলছে—লারমোরের দিকে তাকালে সে কথা কে বিশ্বাস করবে?

পেট টিপে টিপে একটা রুগীকে পরীক্ষা করছিলেন লারমোর। হেমনাথ ডাকলেন, 'লালমোহন—'

লারমোর মুখ তুললেন। খুসী গলায় বললেন, 'আরে হেম যে, কখন এলে হাটে?'

'এই সবে। নৌকো থেকে নেমে সোজা আসছি।'

'বসবে তো? না হাট-টাট সেরে আসবে?'

'বসবও না, হাটও সারব না—'

'তবে কী করবে?'

সামনের বিশাল জনতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হেমনাথ বললেন, 'ওখানে মীটিং হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।' লারমোর ঈষৎ মাথা হেলিয়ে বললেন, 'অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি। শুনেছি ঢাকা থেকে কারা এসে বক্তৃতা দিচ্ছে।'

'আমিও তাই শুনলাম। আর শুনেই এদিকে এলাম—'

'মীটিংএ যাবে নাকি?'

'হ্যাঁ। তুমিও চল—'

'আমার যাবার সময় কোথায়? দেখছ না, ওরা বসে গেছে। এখন উঠে গেলে আমাকে খেয়ে ফেলবে।' লারমোর তাঁর রুগীদের দেখিয়ে দিলেন।

হেমনাথ বললেন, 'তুমি তা হলে যাবে না?'

'না। ওসব কচকচি আমার খুব খারাপ লাগে। নিজের কাজ আর এইসব গরীব মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই ভাল লাগে না। ঢাকার লোকেরা এসে কী-ই বা বলবে? তাতে এখানকার মানুষের উপকার কিছু হবে?'

হেমনাথ হাসতে লাগলেন, 'তার মানে এদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাও না তুমি?'

'না।'

'রাজ-সিংহাসন দিলেও না?'

'না।'

'তবে তুমি এদের নিয়েই থাকো। আমরা মীটিঙে যাই—'

'যাও। মীটিং শুনে এখানে আসবে তো?'

'আসব।'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে লারমোর বললেন, 'হাট থেকে তুমি কখন বাড়ি ফিরবে, হেম?' হেমনাথ বললেন, 'বিকেল নাগাদ—'

'আমিও তোমার সঙ্গে যাব?'

'সে কি, আজ এত তাড়াতাড়ি! তুমি তো হাট ভাঙবার পর সেই রাত্রিবেলা রাজদিয়া ফের।'

'আজ শরীরটা খুব ভাল লাগছে না।'

হেমনাথকে উদ্বিগ্ন দেখাল, 'কী হয়েছে?'

'তেমন কিছু না।' লারমোর হাসলেন, 'এই একটু জ্বর জ্বর মতন। আচ্ছা তোমরা মীটিঙে যাও। এরপর গেলে হয়তো কিছুই শুনতে পাবে না।'

শেষ পর্যন্ত সামনের ঐ বিশাল মাঠে, বিপুল জনতা যেখানে উদ্‌গ্রীব দাঁড়িয়ে আছে, হেমনাথদের যাওয়া হল না। লারমোরের অস্থায়ী হাসপাতাল থেকে সবে দু পা এগিয়েছেন, মীটিং ভেঙে গেল। তারপরেই জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা ঢলের মতন জনতা ছুটল হাটের দিকে।

মীটিং থেকে যারা ফিরছে তারা সবাই উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্ত। সমানে তারা চিৎকার করছিল, 'মার শালাগো—'

'মার শালাগো—'

মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল, 'লড়কে লেঙ্গে—'

'পাকিস্থান—'

হেমনাথ আর বিনু দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

আগেও ঐ মাঠে অনেকবার হাটুরে মানুষদের ভিড় করতে দেখেছে বিনু। হরিন্দ যখন দেশ-দেশান্তরের খবর এনে ওখানে ঢেঁড়া দিত, একটা মানুষও আর হাটের চালার তলায় থাকত না। যুদ্ধের সময় সেনাদলে রিক্রুটমেন্টের জন্য এস, ডি, ও কি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কিংবা মিলিটারি অফিসাররা যখন আসতেন তখনও মরিচহাটা তামাকহাটা নৌকোহাটা

ঝাঁকে ঝাঁকে সবাই ওখানে ছুটে যেত। কিন্তু এমন উত্তেজনা নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতন কেউ ফিরত না।

জনতা উন্মত্তের মতন ছুটে যাচ্ছে। চেনাজানা লোকগুলো তাদের কী হয়েছে, কে জানে। বিনুরা বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকল।

কিছুক্ষণের ভেতর দেখা গেল, হাটের একটা চালাও আর অস্ত নেই। বাঁশের খুঁটিগুলো জনতার হাতে হাতে মারণাস্ত্র হয়ে ঘুরছে।

দেখতে দেখতে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। সমস্ত সুজনগঞ্জের হাট জুড়ে কয়েক হাজার লাঠি আকাশের দিকে উঠেই নেমে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে উঠছে চিৎকার, আর্তনাদ। লোকের পায়ে পায়ে হাটের ধুলো মাথার ওপর মেঘের মতন জমে রয়েছে।

অনেকক্ষণ পর আপন মনে হেমনাথ বললেন, 'কী সর্বনাশ!'

বিনু খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। নিজের চোখে আগে আর কখনও দাঙ্গা দ্যাখে নি সে। ভীরু গলায় ডাকল, 'দাদু—'

'কী বলছিস?' অন্যমনস্কের মতন সাড়া দিলেন হেমনাথ।

'আমরা কেমন করে বাড়ি যাব?'

হেমনাথ বুঝিবা তার কথা শুনতে পেলেন না। বলতে লাগলেন, 'অন্য অন্য জায়গায় দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু এ পাপ তো এখানে ছিল না—'

বিনু কি বলতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে লারমোরের গলা ভেসে এল, 'হেম হেম—'

হেমনাথ ঘুরে দাঁড়ালেন; বিনুও ঘুরল। চোখাচোখি হতেই লারমোর বললেন, 'এখানে এসো—'

হেমনাথরা লারমোরের কাছে চলে এলেন।

উদ্বিগ্ন সুরে লারমোর বললেন, 'কান্ডটা দেখেছ?'

'হুঁ—' গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন হেমনাথ।

এই সময় হাটের দিক থেকে ছুটতে ছুটতে মজিদ মিঞা এসে হাজির। তাকে পাগলের মতন দেখাচ্ছে। অস্থির গলায় সে বলতে লাগল, 'এ কী হইল ঠাকুরভাই, এ কী হইল?'

হেমনাথ কী বলবেন, ঠিক করে উঠতে পারলেন না। অত্যন্ত বিচলিত আর চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তিনি।

মজিদ মিঞা আবার বলল, 'একটা কিছু বিহিত করেন ঠাকুরভাই। আপনের চৌখের সামনে এমুন খাওয়াখাওয়ি মারামারি হইব! কোনখানে কার দোষে দাঙ্গা হইছে, হেয়াতে আমাগো কী? আমরা চিরকাল যেমুন একলগে আছি, তেমুনই থাকতে চাই। আপনে অগো থামান ঠাকুরভাই। সারা জীবন যা দেখি নাই, এই শ্যাষ বয়েসে হেই খুনাখুনি দেখতে হইব? তার থিকে আমার মরণ ভাল।'

হেমনাথ কিছু বলবার আগেই লারমোর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ দাঙ্গা চলতে পারে না। যেভাবেই হোক, থামাতে হবে। চল—' বলেই হাটের মাঝখানে যেখানে তান্ডব চলছে, সেদিকে ছুটলেন।

মজিদ মিঞা, বিনু এবং হেমনাথও লারমোরের পিছু পিছু ছুটলেন। সব চাইতে প্রথমে পড়ে আনাজহাটা। সেখানে এসে দেখা গেল অনেকগুলো লোকের হাত-পা ভেঙে গেছে; মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। রাশি রাশি ঝিঙে-পটল-আলু-বেগুন, চারধারে ছত্রখান হয়ে আছে। আহত লোকগুলো যন্ত্রণায় ক্ষত-স্থান চেপে ধরে কাঁদছিল, ককাচ্ছিল, গোঙানির মতন শব্দ করে চিৎকার করছিল।

ডানদিকে মরিচহাটা, বাঁ ধারে মাছের বাজার। দু জায়গাতেই সমানে লাঠি চলছে। আর বৃষ্টির ধারার মতন ঢিল পড়ছে। সেই সঙ্গে ক্রুদ্ধ হিংস্র মারমুখী জনতা চেঁচাচ্ছিল—

'মার শালারে—'

'মার বউয়ার ভাইরে—'

'মাইরা মাইরা সুমুন্দির পুতেরে শ্যাষ কইরা দে—'

হঠাৎ গলায় সবটুকু শক্তি ঢেলে সুজনগঞ্জের হাটটাকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন লারমোর, 'থামো, থামো—তোরা মারামারি থামো—'

মজিদ মিঞাও চেঁচাচ্ছিল, 'ভাইয়ে ভাইয়ে এমুন খুনাখুনি করিস না তরা।'

চিৎকার করতে করতে একবার মরিচ-হাটা, একবার মাছের বাজার, একবার গো-হাটার দিকে ছুটছিলেন লারমোর। তাঁর পেছনে ছিল বিনুরা।

উন্মত্ত জনতা মজিদ মিঞা বা লারমোরের কথা কানেই তুলছিল না। হিংস্র এক ডাকিনী তাদের যেন মন্ত্র পড়ে ছেড়ে দিয়েছে। সমানে তারা লাঠি চালিয়ে যাচ্ছিল, ঝাঁক ঝাঁক ঢিল ছুঁড়ছিল। তাদের চোখে হত্যা যেন ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে।

ছোটাছুটি করতে করতে তামাকহাটায় এসে হঠাৎ লারমোরের চোখে পড়ল, একটা বুড়ো লোকের মাথার ওপর তিন-চারটে লাঠি উদ্যত হয়ে আছে। পলক পড়বার আগেই নেমে আসবে।

লারমোর লাফ দিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মারিস না ওকে, মারিস না। ঐ লাঠির একটা বাড়ি পড়লে ও মরে যাবে।'

যারা মারবার জন্য লাঠি তুলেছিল তাদের ভেতর থেকে একজন খ্যাস খ্যাস করে হেসে উঠল, 'ভালই তো, বেশি কষ্ট করতে হইব না। এক বাড়িতেই যমের দুয়ারে পাঠাইয়া দিতে পারুম। তুমি যাও সাহেব—'

'না; কিছুতেই না—' মা-পাখি যেমন করে তার বাচ্চাকে ডানা দিয়ে ঘিরে রাখে তেমনি করে দু হাত দিয়ে বুড়ো লোকটাকে আগলে রাখলেন লারমোর।

সেই লোকটা আবার বলল, 'সর সাহেব; শালারে নিকাশ কইরা দেই—'

'না। ক'দিন আগে কালাজ্বরে ও মরতে বসেছিল, কত কষ্ট করে ওকে মরার ঘর থেকে ফিরিয়েছি। আমার চোখের সামনে ওকে কিছুতেই মারতে দেব না।'

'ভাল চাও তো সইরা যাও সাহেব—'

'না।' লারমোর অনড় হয়ে রইলেন; তাঁর চোখে কঠিন প্রতিজ্ঞা জ্বলছে যেন।

সেই লোকটা উগ্র গলায় আবার বলল, 'শালা বিদ্যাশী, এইখানে আইসা মাদবরী (মাতব্বরী) ফলাও—'
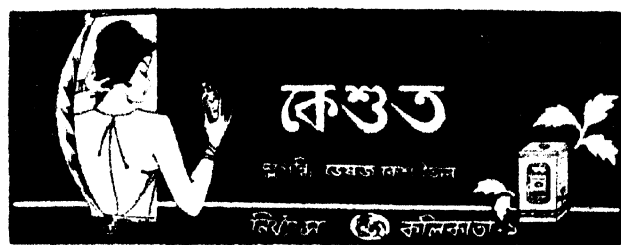
লারমোর চমকে উঠলেন, 'আমি বিদেশী!'

'নিচ্চয়!'

কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না লারমোর। আবার প্রতিধ্বনি করলেন, 'আমি বিদেশী, আমি বিদেশী—'

'তয় কি তুমি এই দ্যাশের নাতিন জামাই? গায়ের রংখান দেখছ?'

সেই লোকটার সঙ্গীগুলো অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। তাদের একজন বলল, 'প্যাচাল না পাইড়া সইরা যাও সাহেব—'

স্থির শিখার মতন দাঁড়িয়ে ছিলেন, লারমোর। বললেন, 'না—'

'তয় মর শালা—'

কেউ কিছু বুঝবার আগেই একটা লাঠি এসে পড়ল লারমোরের মাথায়। চড়াত করে শব্দ হল একটা। তারপরেই রক্তের ফোয়ারা ছুটল। মাথায় একটি হাত দিয়ে পলকে লুটিয়ে পড়লেন লারমোর।

বিনু চিৎকার করে উঠল, 'লাল-মোহন দাদুকে মেরে ফেলল, মেরে ফেলল—'

মজিদ মিয়া আর্দ্র আকুল গলায় কপালে চাপড় মারতে মারতে বলতে লাগল, 'হায় হায়, এই কি সব্বনাশ করলি ডাকাইতরা!'

হেমনাথ কিছুই বললেন না। ধীরে ধীরে বসে লারমোরের রোগা দুর্বল দেহ-খানা কোলে তুলে নিলেন। হেমনাথের শরীর অশ্চর্য কঠিন; শুধু ঠোঁট দুটো থরথর করছে।

এই সময় ওদিক থেকে কারা যেন সন্ত্রস্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিশ আইছে, পুলিশ আইছে—'

নিমিষে সামনের সেই লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু তারাই না, যারা দাঙ্গা করছিল, সুজনগঞ্জ হাটের সীমানার ভেতর তাদের কারোকেই আর দেখা গেল না।

আঘাত লাগার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন লারমোর। দিনের আলো থাকতে থাকতেই অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে নিয়ে হেমনাথেরা রাজদিয়ায় ফিরলেন; একেবারে সোজা গীর্জায় নিয়ে তুললেন।

লারমোর আজকের দাঙ্গায় শিকার হয়েছেন, এই খবরটা কেমন করে যেন দিগ্বিদিকে রটে গিয়েছিল। রাজদিয়ার কুমোর-পাড়া, কামারপাড়া, যুগীপাড়া, মুধাপাড়া, নিকারীপাড়া, সর্দারপাড়া—শুধু কি রাজ-দিয়া, চারপাশের গ্রামগঞ্জগুলো শূন্য করে কত মানুষ যে লারমোরকে দেখতে এল! বিষণ্ণ করুণ মুখে তারা আজকের এই নিদারুণ ঘটনাকে ধিক্কার দিতে লাগল, 'আ রে সব্ব-নাইশারা, তরা মারনের লেইগা মানুষ বিচরাইয়া পালি না? লালমোহন সাহেব যে আমাগো বাপের লাখান ভালবাসছে। হ্যায় যে আমাগো বাপ—'

কেরামুদ্দি আর সুখার মা (দু জনেই লারমোরের আশ্রিত) অবোধ শিশুর মতন কাঁদছে। কাঁদছে আর ভাঙাগলায় বলছে, 'সাহেবের যদি ভালমন্দ কিছু হয়, আমরা কই যামু? আমাগো কী হইব? কে দেখব আমাগো?' চোখের জলে তাদের বুক ভেসে যাচ্ছিল।

খবর পেয়ে স্নেহলতাও ছুটে এসেছেন। শিবানী আসতে চেয়েছিলেন; বাড়ি একে-বারে ফাঁকা থাকবে বলে আসেন নি। লার-মোরের শিয়রের কাছে বিষণ্ণ প্রতিমার মতন বসে আছেন স্নেহলতা।

এদিকে এই বিপদের সময় হেমনাথ কিন্তু অভিভূত হয়ে পড়েন নি। রাজদিয়ায় ফিরেই ডাক্তার আনতে মজিদ মিয়াকে কমলা-ঘাট পাঠিয়ে দিয়েছেন। কমলাঘাটের বন্দরে বড় ডাক্তার আছে।

সন্ধ্যের পর, ডাক্তার নিয়ে তখনও মজিদ মিয়া ফেরে নি, লারমোরের জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে ক্ষীণ দুর্বল স্বরে তিনি ডাকতে লাগলেন, 'হেম—হেম কোথায়?'

হেমনাথ লারমোরের পায়ের দিকে বসে ছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, 'এই যে ভাই, এই তো আমি—'

'আমি আর বাঁচব না—'

'ছিঃ, ও কথা বলতে নেই। তোমার অনেক কাজ, বাঁচতে তোমাকে হবেই!' হেম-নাথের কণ্ঠস্বর অসহ্য আবেগে কাঁপছিল।

লারমোর বিচিত্র হাসলেন, তারপর অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'বাঁচতে আমি চাই না হেম, চাই না। ওরা আমাকে বিদেশী বলল! আমি বিদেশী, আমি বিদেশী!'

হেমনাথ বললেন, 'কে বললে তুমি বিদেশী?'

তার কথা বোধহয় শুনতে পেলেন না লারমোর। আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'কবে এ দেশে এসেছিলাম, মনেও পড়ে না। জীবনের সবটুকুই এখানে কাটিয়ে দিলাম। এখানকার অন্ন-বস্ত্র-ভাষা সমস্তই মাথায় তুলে নিয়েছি। এখানকার মানুষকে বুকে জায়গা দিয়েছি। তবু আমি বিদেশী, আমি বিদেশী—'

হেমনাথ তাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলতে লাগলেন, 'কেন তুমি কষ্ট পাচ্ছ লালমোহন? তুমি যদি বিদেশীই হবে এত লোক তোমাকে দেখতে এসেছে! ঐ দিকে তাকাও—' লারমোরের খবর পেয়ে যারা ছুটে এসেছিল উদ্বিগ্ন মুখে এখনও তারা গীর্জায় ভিড় করে আছে। হেমনাথ তাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন।

লারমোরের দুরন্ত অভিমান একটুও শান্ত হল না। ক্লান্ত সুরে তিনি বলতে লাগলেন, 'একজন বললেও তো 'বিদেশী' বলেছে—' বলতে বলতে শিশুর মতন ফুঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে মুক্তোর দানার মতন ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে লাগল।

বিনু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লারমোরের দিকে তাকিয়ে অপার বিস্ময়ে তার মন ভরে যাচ্ছিল। এমনিতে এই মানুষটি ধীর, স্থির, সংযত। জগতে ঈশ্বরের দূত হয়ে তিনি যেন নেমে এসেছেন। কিন্তু 'বিদেশী' এই একটিমাত্র কথায় কি নিদারুণ অস্থিরই না হয়ে উঠেছেন। মানুষের হৃদয়ে কোথায় যে দুর্বল আবেগ প্রোথিত হয়ে থাকে।

হেমনাথ বলতে লাগলেন, 'কেঁদো না,—শান্ত হও—'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুব ক্লান্ত সুরে লারমোর বললেন, 'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে হেম—'

'বেশ তো, ঘুমোও না—'

'একটা কাজ করবে হেম?'

'কী?'

'হল ঘরে যেশাসের পায়ের কাছে আমাকে নিয়ে যাবে? ওখানে গেলে আমি একটু শান্তি পেতাম।'

ধরাধরি করে হেমনাথরা খাটসুদ্ধু লার-মোরকে হল ঘরে নিয়ে এলেন। পূব দিকের দেয়ালে যেখানে জ্যোতির্ময় মানবপুত্রের বিশাল ছবিটা টাঙানো রয়েছে, তার তলায় তাঁকে রাখলেন।

লারমোর বললেন, 'এবার একটু ঘুমোই হেম।' ধীরে ধীরে তাঁর চোখ এবং কণ্ঠস্বর বুজে এল।

অনেক রাত্রে কমলাঘাট থেকে ডাক্তার নিয়ে ফিরল মজিদ মিয়া। বড় ডাক্তার লার-মোরের গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠলেন। গম্ভীর গলায় জানালেন, লারমোরের চোখে চিরনিদ্রা নেমে এসেছে। মানুষের সাধ্য নেই এ ঘুম ভাঙায়।

একধারে দাঁড়িয়ে বিনু দেখল, ক্রুশবিদ্ধ যীশুমূর্তির তলায় এ কালের লাঞ্ছিত রক্তাক্ত অপমানিত আরেক ক্রাইস্ট।

খুব অল্পদিনের ভেতর পর পর দুটো মৃত্যু দেখল বিনু। সুরমার এবং লার-মোরের। সুরমার মৃত্যু বিনুর ব্যক্তিগত ক্ষতি। কিন্তু এ মানুষটি কোথা থেকে এসে জল-বাঙলার প্রতিটি বৃক্ষলতা, পশু-পাখি, তৃণদল এবং মানুষের হৃদয়ে ব্যাপ্ত হয়ে ছিলেন। সমস্ত চরাচর শূন্য করে তিনি চলে গেলেন।

গীর্জার একধারে তাঁর সমাধি দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গাটায় একটা বেদী তৈরী করে দিয়েছেন হেমনাথ; তার ওপর শ্বেত পাথরের ফলক রয়েছে। তাতে লেখা ঃ

'ডেভিড লারমোর'
জন্ম—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ, ১৯শে মে।
মহাপ্রয়াণ—১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ, ২২শে ডিসেম্বর।
মানবতার প্রতীক, আর্তজনের বন্ধু, মহাপ্রাণ এই মানুষটি এখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ফিরে যাবার পথে ভীল মেয়েটিকে দেখে পুষ্পকুমারী দাঁড়ালেন।
তুমি কি মহারাণীকে দেখতে এসেছ ?
না, শুধু ফুল পাড়তে।

মহারাণীর সঙ্গে আমাকেও তোমরা আশ্রয় দিয়েছিলে, সে কথা কোন দিন ভুলব না।

সে কথা থাক। তোমার মুখ এমন ছাই-ঝাড়া কেন ?

কই না ত'!

নিজের মুখ ত' দেখতে পাও না। তোমার খোঁপায় দুটো ফুল পরাব?

কি হবে ফুলে? আচ্ছা ইচ্ছে হয়েছে ত' দাও।

কি তোমার দুঃখ আমায় বলবে?
বলার কিছু নেই।

আমার কাছে লুকিও না। কিছু কি তোমার হারিয়েছে?
হারালেও তুমি কি করবে ?

হয়ত কিছু করতে পারি।

না, যা হারিয়েছি তা ফিরে পাবার নয়।

কেন নয়, কি এমন হারিয়েছ হার, কঙ্কন, আংটি ?
এ সব তুচ্ছ। হারালে আবার গড়ানো যায়। আমি যা হারিয়েছি তা অমূল্য।

ফিরে আসা ॥

মানস রায়চৌধুরী

নিজেকে কেবলি ভুল বোঝা
ভুলে ভরে ওঠে ঝাঁপি দিনান্তের বোঝা
পায়ের তলায় কাঁপে মাটি ও আগাছা।

ঘরের দাওয়ায় কাঁপে চৈত্র হাওয়া, ময়নার খাঁচা
ছবির ফ্রেমের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত দোলে
ঘুম যেন কুয়াশা কাজলে
হয়ে ওঠে অসম্ভব স্বপ্ন-সঞ্চারিত, চেয়ে দেখি
বুকের ভিতরে সব পুরোনো দুঃখের সুখ ফিরে এসেছে কি?

নিজেকে কেবলই চিনে রাখা।
দীর্ঘ বৃক্ষ আপন নৈরাজ্যে ভাঙে শাখা
ঝড় নেই, প্রাকৃতিক দস্যুতাও নেই কোনখানে
মর্মে তৃষ্ণা ফিরে আসে পানীয়ের অমোঘ আহ্বানে।

লক্ষ্যের বুড়িটা ছুঁতেই হ'বে ॥

পশুপতি তরফদার

কবে একদিন কৈশোরের শুরুতে
বন্ধুদের সঙ্গে কানামাছি খেলায় মেতে,
তখন থেকে শক্ত হাতে বাঁধা চোখে
ক্রমাগত ছুটেই চলেছি।...
কখন হারজিতের দ্রুত তালে
আবেগমধুর সমর্পিত স্বপন,
নরম আলোর মিষ্টি রোদ্দুর, তালদীঘির স্বচ্ছ জল
গাছগাছালি, পাখীর কিচিরমিচির
মন্টুদা, বকুলদি, টুনিমাসীরা সব
দৃশ্যপট পরিবর্তনের সঙ্গে
পর্দার আড়ালে হারিয়ে গেছে—
তারপর ছুটেছি তো ছুটেছিই!

ইতিমধ্যে অচেনা নতুন দৃশ্যের ভীড়ে
কখন সামান্য আঘাতে
শুরু হ'য়েছে অবিরাম রক্তক্ষরণ,
ঝরছে তো ঝরছেই নিঃশব্দে
কোন বহিঃপ্রকাশ নেই!
আমার কিন্তু এখনও চোখদুটো
শক্ত ক'রে বাঁধা,
কান পাতলে এখনও শুনতে পাই
'কানামাছি ভাই, তোমার সঙ্গে আড়ি।'
অথচ ওদের কাউকেই ছুঁতে পারি না।

এবং এই অভিমানের তপ্ত নিঃশ্বাসগুলো
আজীবন সঙ্গী ক'রে সুখে-দুঃখে
অপথ-বিপথ ও কখনও সাময়িক উত্তরণে
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এখনও ছুটে চলেছি!......
শক্ত ক'রে চোখ বাঁধা—
তবু থামার আগে যেমন ক'রেই হোক,
লক্ষ্যের বুড়িটা ছুঁতেই হবে।

ময়নার ঘুম আসছিল না। তাই ময়না খোলা দরজা দিয়ে দুপুর দেখছিল। পা-লুটে খুটেখুটে দুপুর, ঝলমলে রোদ, আতাগাছের ছায়া, দু' একটা ধুসর চড়ুইয়ের ডানার ঝটপটানি। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছিল না ওর। না রোদ না ছায়া না চড়ুই। তাই অকারণে পা দোলাচ্ছিল চিৎ হয়ে শুয়ে। হাঁটু মুড়ে দু হাতের গাঢ় আলিঙ্গনে পা দুখানা জোড় লাগিয়ে। ডোরাকাটা লাল শাড়ীর পাড় স্বাভাবিকভাবে কনুইয়ের উপর উঠে, পায়ের মাংসল ঢেউয়ে চাপ হয়ে বসেছিল। লাল নীল হলুদ রঙের কাচের চুড়িগুলো ঠুন-ঠুন করে বাজছিল। আর পা দোলাতে দোলাতে ময়না ভাবছিল সাপুড়েরা [illegible] হাঁটু, দোলায়, ওঠায় আর নামায়, দ্রুত সরিয়ে নিয়ে আসে অদ্ভুত কৌশলে। সেও যেন সাপ নাচাচ্ছে। সাপ? কে? মা। ফিক্ করে হেসে ফেলল ময়না। হাত দুখানা আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল। টুপ করে পায়ের পাতা মাটিতে পড়ে গেল। আর পড়ে যেতেই টান টান করে সে মেলে দিল তার লম্বা দুখানা মাংসল পা। হাত দুখানিও ছড়িয়ে দিল। চিৎ হয়ে শোয়ায় চোখ দুখানা উপরে। কালিপড়া খড়, বেঁকারি, কঞ্চি দেখা যাচ্ছে চালের, মাছধরা লালচে জাল, পাশে পেরেকে লাগান ঝুড়ি টোকা পেছো। ওদিকে কুলুঙ্গিতে একরাশ শিশি, বোতল, আয়না, চিরুনি, পাউডারের কৌটা, কাজললতা। দেখতে দেখতে বার কয়েক চোখ বন্ধ করল। যেন খেলা করছে সে। ঘুম নেই। চোখে তার ঘুম নেই। 'আয় ঘুম আয় ঘুম বাগ্দীপাড়া দিয়ে গুন গুন করে সারা মুখ তার হাসিতে ভরে উঠল। আহা সে যেন ছোট মেয়ে।

মা বলছে, দুয়ারে আর মাথা য়াস না ময়না। শুয়ে থাক ঘরে। একটুক্ষণ ঘুমো।

মা এখন ওদিকে কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। মাথাটা বুকের দিকে ঢোকা। শ্বাসের শব্দ উঠছে। ওঠানামা করছে শরীরটা। লালপেড়ে শাড়ী আলগা করে গায়ে। লম্বা চওড়া মোটা সোটা মায়ের শরীর, মাথায় একরাশ ঘন কালো চুল, সিঁথিতে দগদগে সিন্দুর, হাত ভর্তি চুড়ি, গলায় পেতলের মোটা সোটা হার কানে দুল।

এখন গোঁসাইপুকুরের পাড়ে বাবলাগাছের কালো ডালে সবুজ পাতার আড়ালে সবুজ টিয়া ঝুলছে। খেয়াল মত মাঝে মাঝে ডাকছে। তালগাছের পাতায় বাতাস লেগে কট কট খর খর শব্দ উঠছে। ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ করে তীক্ষ্ম কর্কশ শব্দ তুলে ট্যাঁসকোণাটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বন পায়রা ডাকছে। চারিদিকে গনগনে দুপুর, রোদ,

ছায়া। চারিদিকে শালিখ চড়ুই কাকের ওড়াওড়ি। চারিদিকে গরু ছাগল ভেড়া।

শুধু ময়না—শুধু ময়না এখন ঘরে। ময়না তু ঘুমো। ময়না তু ঘরের বাইরে যাবে নাই। মায়ের রাগ রাগ চোখের দৃষ্টির বিশাল পাঁচিল তোলা। এপারে ময়না। অথচ ওপার থেকে বারবার ডাক, আয় ময়না, আয়রে।

ময়না উঠে বসল। দরজা খোলা। মা এখন ঘুমুচ্ছে। আয় ময়না বাইরে বেরিনু আয়? ই বাবা এখুন ঘরে থাকে কে লো! মায়ের দিকে তাকাল। চোখ বন্ধ, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কপালের উপর চুল এসে পড়েছে, মোটা সোটা একখানা হাত লম্বা হয়ে আছে। হাতটার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিতে হল। যেন ওই হাত এক্ষুণি ঝটপট তার চুলের মুঠি ধরে ফেলবে, তারপর জোরে জোরে বারকতক ঝাঁকুনি দিয়ে বলবে, আঁ ভরদুকুরে তু ঘর থেকেন বেরুচ্ছিস। তুর কি ভয়ডর নাই গো। আর লয়, ই বার তুকে বেঁধে আমি পাঠিন দুব তুর শ্বশুরঘর। উদের বৌ বাটিশ উদের ঘর কর গা। এতেক জ্বালা পুহাতে লারব।

আসলে বড় ভয় মায়ের তাকে নিয়ে। মা বলে, আঁ এমুন আগুন ঘরে কে রাখে গো। ময়না নিজে বুঝতে পারে না কেন সে আগুন। বুঝতে পারে না মায়ের ভয় কেন এত তাকে নিয়ে। বাপ বলে থাকুক। থাকুক কেনে। একটাই ত মেয়ে বটেক। শ্বশুরঘর যাবেক এখুন।

শ্বশুরঘরের নামে আপনা থেকেই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। বুকের ভিতরটাকে যেন মুঠো করে জোরে চেপে ধরে। ময়না দাঁড়াতে পারে না, বসতে পারে না, শুতে পারে না। ময়নার শ্যামলা প্রাক যৌবনের দীঘল ছন্দময় দেহের পুরুষ্ট হাত, মাংসল মসৃণ পা, বাহু, অনুপম কাঁধ, বয়সকে অতিক্রম করে ভারী শরীরের মাদকতাময় যৌবন সম্ভার থর থর করে কাঁপে। চোখের উপর ভাসে মাটির ঘর দাওয়া এক চিলতে উঠোন, পাশে আঁকড়ের ঝোপ আর একরাশ অচেনা পুরুষ রমণী। তাদের মধ্যে বন্দী সে। দু চোখ তার জলে ভেসে যাচ্ছে। শাড়ীর ভিতরকার শরীরটা দর দর করে ঘামছে। পাশেই একটা মানুষ! বর! তার বর। আবার কান্না। কালো মোটাসোটা শরীর লোমে ভর্তি গা পাটল বুক, ইয়া মুখ, মোটা ঠোঁট, বড় বড় চোখ। ওই তার বর। পাল্কির ভিতর হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে যেতে যেতে বাঁধের উপর দিয়ে আমবাগান ধানক্ষেত শাল শিমুল মহুয়ার জঙ্গল সাঁকো পার হতে হতে এক পলকের সেই দেখার পর মানুষটা বলেছিল, অয় কাঁদছ কেনে তুমি। ময়না চিৎকার করে বসে উঠতে চেয়েছিল, আমি যাব নাই। যাব নাই। তুমার ঘর করব নাই। কিন্তু বলতে পারেনি। সারা শরীর ঠক ঠক করে কেঁপেছে। দু চোখ ভেসে গিয়েছে। বাপের কাছে বলতে কিন্তু সে কাঁপেনি। বাপ বলেছে, ঠিক আছেক গো, তুমাকে যেতে হবেক নাই।

তারপর আর যেতেও হয়নি তাকে। বছর ঘুরে গেল কিন্তু ময়না তার সেই আজন্মের ঘর পুকুর আমবাগান ঝোপঝাড় কাঁদর জঙ্গলের মধ্যে আগেকার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। শুধু মায়েরই বার বার সেই ব্যথা, শুনছ গো—ই ভাল ঠেকছেস নাই। সুহাগ দিয়ে মেয়ে ঘরে রাখলে ত হবেক নাই। তুমি যাও একদিন। তাদের মেয়ে পাঠানুর ব্যওস্থা কর।

পা টিপে টিপে চোরের মত সন্তর্পণে নিঃশব্দে হেঁটে ঝুপ করে চৌকাঠের বাইরে পা দিল ময়না। পিছন ফিরল না। তরতর করে উঠোনের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। ফুড় ফুড় করে চড়ুই উড়ল। এঁটো বাসনের সামনেকার কাকটা কা কা করল। পেয়ারার ডালে ফিঙে নাচছিল একটা। ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল। বুকভরা শ্বাস ফেলল ময়না। গায়ের কাপড় ঠিক করে নিল। বুকটা এখনও ধড়ফড় করছে। ঠিক যেন হাতুড়ি পিটুচ্ছে কেউ। গা ঘামছে। মাথার উপরে দগদগে সূর্য। ভীষণ আলো আর নিদারুণ উষ্ণতা নিয়ে সে চারদিক পোড়াচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। চতুর্দিকে ধু ধু শূন্যতা। নিম অশ্বত্থ আর বাবলার সারির পাশেই গোঁসাইপুকুরের উঁচু পাড়ে দীর্ঘ তালগাছগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে। সামনেই খেজুর গাছ। তার পাশেই একটা নাড়া গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় চাকায় মাটি লাগা। ময়না চাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল। কতদিন থেকে তার যেন সাধ ছোট ছোট চাকার একখানা গাড়ী করবে। গাড়ীটা চলবে গড় গড় গড় গড়। ময়না এখন শিকারী বিড়ালের খুট করে শব্দ শোনার পর কান খাড়া করার মত এমন ভাবে ঘাড় কাৎ করে, চোখের তারা বড় বড় করে কান পাতল যেন গাড়ীটা চলছে। যেন সে শব্দ শুনছে।

কোথায় যাব! ঘটঘটে দুপুরে শুকনো ঘাসের উপর ছোট্ট ছায়া ময়নার। তার পরনে সারগাদা। জঞ্জালের স্তূপ। কোথায় যাব! ধুলোর উপর পা ঘষতে থাকল। রোদটা পিটপিট করে এখন লাগছে। শাড়ীর ভিতর জ্বালা জ্বালা ভাব। শাঁখার ঘরে যেতে পারলে হত। দুজনে শুয়ে শুয়ে তাহলে গল্প করতে পারত।

কিন্তু শাঁখারঘর যাবার উপায় নেই! না কোন উপায় নেই। শাঁখাদের ঘর যেতে হলেই পড়বে ফটিক? ফটিক! ময়না ভাবতে গিয়েই হেসে ফেলল। ফটিকের চেহারাখানা যেন চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে! কালো নয় বাদামী রং গায়ের, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, লম্বাটে মুখ, পেশীবহুল হাত পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঘর করে না ফটিকের বৌ। বাপের ঘরে বৌ থাকে। ফটিক বলে, লুব না, উকে আর ঘরে লুব নাই আমি! কিন্তু ময়নাকে ফটিক? ভাবতে গিয়ে ময়নার সারা শরীরময় অজস্র পিঁপড়ের ঘোরাঘুরি কানের দু পাশে ঝাঁ ঝাঁ। বুকের ধড়াস ধড়াস শব্দ। চোখ বন্ধ হয়ে আসা। শিরাউপশিরায় রক্তের কলকল ছলাৎ ছলাৎ। এই নির্জনতায় এই নিস্তব্ধতায় চতুর্দিক থেকে ভেসে আসা তার কণ্ঠস্বর ময়না... ম য়...না...আ...আ ঘরে আয় আমার...।

একদিন শাঁখেদের বাড়ী যেতে যেতে ময়না ফটিকের ঘরের দিকে অজান্তেই পা বাড়িয়ে দিয়েছিল। দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে তারপর হিম, একেবারে হিম হয়ে গিয়েছিল শরীর। ছুটে পালাতে পারে নি, কিন্তু হটতে পারেনি, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি। ফ্যাল ফ্যাল চোখে চেয়ে দেখেছিল ওদিককার বাবলার ঝোপ, মাঝে মাঝে নরম আতাগাছের খয়েরী ডাল, সবুজ পাতা। দুটো মুরগী কি যেন খুঁটে খাচ্ছিল। উঠোনের উপর খুঁটিতে বাঁধা একটা গরু শুকনো খড় চিবুতে চিবুতে তার দিকে তাকাচ্ছিল। কেন এল! কেন এল ময়না ঘরের সামনে, ভেবে পায়নি সে। ফটিক ঘর থেকে বের হয়নি, ময়নাকে দেখতেও পায়নি। তবু ময়না সমগ্র দেহমন দিয়ে অনুভব করেছিল ফটিক যেন তাকে ধরে ফেলেছে।

তারপর থেকেই ও পথ যাবার নামে বুক কাঁপে। ময়না যায় না ওপথে। তবে ও পথে না গেলে কি হবে, ফটিক বারবার তার চোখের সামনে দাঁড়ায়। পুকুরের ঘাটে, ধান ক্ষেতের আলে, গাঁয়ের পথে সব সময় ফটিক যেন ছায়ার মত তার সঙ্গে। ময়না বুঝতে পারে না কোথায় থেকে আসে, কেমন করে আসে। বুকের মধ্যে মাদলের তীব্র শব্দ নিয়ে সে শুধু শোনে ফটিকের কথা। ফটিকের বারবার ময়না তু আমার ঘরে আয়। তুকে ছাড়া বাঁচব নাই ময়না। তু আমার বুকটি ভিতর ঢুকে গেইছিস। তাবাদে খালি ছিঁড়ছিস। খালি ছিঁড়ছিস।

খেয়াল নেই কখন পায়ে পায়ে ধানক্ষেতে এসে পড়েছে। চারিদিক অলসভঙ্গীমায় পড়ে আছে ক্ষেতগুলো। দু-একটা অবহেলিত খড়, নিপুণভাবে কেটে নেওয়া ধানের গোড়া, লালচে শামুক আর উল্টে থাকা ঝাঁকড়ার সাদা দেহ ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে। ময়না আলগুলো পার হতে থাকল। খানিকটা এগুলেই সারিবন্দী সতেজ সবুজ সবুজ নধর বুয়ানের ঝোপ। ওদিকটাকে পাঁচিলের মত আটকে রেখেছে। তবে ময়না জানে বুয়ানর তীব্র গন্ধ মেলানর আগেই পড়ে আছে এক চিলতে জলের একটা ডোবা। পাড় নেই ডোবাটার। ঢালু ধানক্ষেতগুলো বর্ষায় হুড়হুড় করে জল নামিয়ে ওই ডোবাটা তৈরী করেছে।

আয় ময়না আয়। এতেক দেরী হল কেনে তুর? বুয়ানের লম্বা পাতা সরু ডাঁটিতে শরীর ঢাকা দিয়ে ডাক পাড়ল, আয় ময়না।

ময়না চোখে চোখ ফেলেই পাথর। পিছু ফিরে ছোটার উপায় নেই। বুক হিম। মাদলের শব্দ। তার সঙ্গের ছায়া কখন যেন শরীর পেয়েছে।

ইদিক আয়। নরম চুড়িপরা হাত ধরে বুয়ান ঝোপের এ পাশে টেনে আনল। তারপর বলল, বস।

কাঁকরের উপর বসে পড়ল ময়না। যেন অলৌকিক অত্যাশ্চর্য এক জগতে সে বন্দী। যেন তার বোধবুদ্ধি সব ওই মানুষটার শক্ত হাতের মুঠোয়।

ফটিক পাশেই বসল। বলল, এতেক দেরী কেনে তুর? আমি ভাবছি এখুনি আসবি, এখুনি আসবি।

মুখে কোন কথা নেই। মাথার ভিতর

উপশিরায় নিদারুণ উষ্ণ স্রোতের ঘূর্ণিপাক। ফটিক ! সে কি তবে ফটিককে কথা দিয়েছিল ভরদুপুরে বয়ানের ঝোপের আড়ালে আসবে ! মনে পড়ে না। মনে পড়ে না ! সারা শরীর পুড়ছে, গলছে। চোখে জ্বালা। বুকে মাদলের শব্দ। মাথার উপরে এখনও সূর্য জ্বলছে। চতুর্দিকে আশ্চর্য শূন্যতা। অনেকটা দূরে একটা গরুর পাল। একটা ঘুঘু দুপুর কাঁপিয়ে ডাকছে।

ময়না !

ময়না এখনও নীরব।

তু এমন কেনে করিস ময়না ! আমার কাছে আসিস কিন্তুক...।

ফটিক মুখের গোড়ায় শ্বাসের শব্দে কথাটা টেনে রাখল। তারপরই ময়নার মাংসল নরম কাঁধে হাতের পাতা বসাল। ফিসফিস করে বলল, তুর ডর লাগে ময়না ?

ময়না এবারও কথা বলল না ? ভয় ? ভয় কি সত্যিই লাগছে তার ফটিককে ? ভয় কি লাগে ফটিককে ? ময়না জানে না ? বুঝতে পারে না।

আমাকে তুর কুনু ডর নাই। ফটিক যেন আশ্বস্ত করল। তারপর বলল, শুন ময়না আর লারছি আমি। তু ইবার কথা দে। তারি লেগেই এখুন দুখার বিলাতে তুকে ডাকা !

ময়না কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, আমাকে তুমি ডেকেছ।

অয় দেখ্। ফটিক হেসে ফেলল। ঘাম চকচকে মুখে হাসিখানা অনেকক্ষণ ধরে রাখল। তারপর বলল, সকাল বেলাতে পুখোর ঘাটে তুকে বললাম না?

তাই বুঝি ময়না এত আনমনা হচ্ছিল, দুপুরে ভাল লাগছিল না, ঘরের মধ্যে মন তার ছটফট করছিল। আর বাইরের আকাশ-বাতাস পাখির ডাকের মধ্যে বারবার সে বাইরে এসে, দাঁড়ানর আহবান পাচ্ছিল শুনতে! ময়না কিছু ভাবতে পারছিল না এখন। চারিদিকে খাঁ খাঁ দুপুর। সামনে ঘোলাটে জলের ডোবায় সূর্যের ঝিকিমিকি। বুয়ানের কেমন যেন গন্ধ। কোথা থেকে যেন একটা ডাহুক খাববার ডেকে যাচ্ছে। সামনের মাঠে নির্ভয়ে কয়েকটা বনপায়রা খুটে খুটে বেড়াচ্ছে।

ময়না!

উঁ।

তু রাজী হ। দশের কাছে কথাটা আমি বলি। ফটিক একটু সরে বসল। বুয়ানের ঝোপের ছোট্ট ছায়া। শরীর ঢাকা পড়ছে না। রোদটা পায়ের পাতায় বসে হাঁটু অব্দি উঠেছে।

কিসের রাজী। ময়না তাকাল না। মাথা নীচু করে বলল। গায়ের কাপড় ঠিক করল। চুড়ির ঠুনঠুন শব্দ হল একটু।

বিয়ার। বিয়াতে রাজী। ফটিকের সারা মুখমন্ডল জুড়ে হাসির ফোয়ারা। বলল, তু সবি বুঝিস ময়না, কিন্তুক এমন করিস যি মুনে লেয় তু কুচ্ছু জানিস না। আমার মুন বুঝতে তুর বাকী আছেক নাকি?

না বাকী নাই ময়নার ফটিকের মন বুঝতে। তাই তো ওর নামে তার সারা শরীরে আলোড়ন। তাই তো ওর ডাকে এখানে আসা। কিন্তু তবু কি যেন থেকে যায় মনের ভেতর তার। কি যেন সব গোলমাল করে দেয়। ভয় করে কি ফটিককে? না ভয় নয়। তবে? তবে কেন সে সামনে দাঁড়াতে পারে না? তবে কেন সে দুপা এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে, আবার এগিয়ে যায়, আবার পিছোয়! কেন? কেন?

বিয়া! আমার বিয়া! ময়না আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল।

তু খেপী আছিস। ফটিকের সুখের হাসি মুখে। গলায় আবদেরে সুর। বলল, খেপী আমার, রাণী আমার! গা ঘেঁসে এল ময়নার। ময়না সরে গেল। ফটিকের তাতে অবশ্য হাসি মুছল না। সে আরও এগিয়ে ময়নাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করল না। বলল, আগে বিয়া হোক তাবাদে কথা।

আমার ত বিয়া হচ্ছেক! ময়না শ্বাস বন্ধ করে যেন বলে ফেলল।

খলখল করে হেসে উঠল ফটিক। বন-পায়রাগুলো ফরফর করে উড়ে গেল সামনের মাঠ থেকে। ময়না ভয় পেয়ে বড় বড় চোখ করে তাকাল। ফটিক সেই হাসির ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে বলল, উ বিয়া তুর ত ছাড়াছাড়ি হুনগেইছেক।

সোয়ামী তুর আসেক না। তু সোয়ামীর ঘর করিস না। আর আসবেকও না।

কেনে?

ই বাবা আবার আসবেক? ফটিক মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল।

ময়না কোন উত্তর দিল না। ফটিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টিতে। রোদে তার গা পুড়ছে। আর কোন ভয় নয়, ফটিকের কথা তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন ঘোরাফেরা করছে। ময়না স্পষ্ট করে ধরতে পারছে না। কিন্তু সেই ঘোরাফেরায় দেহের অভ্যন্তরের নরম মাংসপিন্ডগুলোয় ঘষা খাওয়ায় কেমন যেন জবালা উঠে আসছে।

আর আসবে না। ফটিক নিজেই উত্তর দিল। তারপরই গলার স্বর পালটে গভীর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে বলল, উসব কথা বাদ দে ময়না। তু আমার ঘর আলা করে থাকবি। তু আমার রাণী হবি।

ময়নার মাথার ভিতর হাতুড়ির শব্দে বাজছে আসবেক না, আসবেক না। ডাহুকের ডাকের এই নির্জন রোদ ঝলমল মধ্যাহ্নের মাঠ ঘাট দূরে অদূরের আম খেজুরের নিঝুম শরীর পাশের ফটিকের দিকে তাকিয়ে ময়না দু' কান ভরে শুনতে পাচ্ছে শুধু একটা কথা। বার বার একটা কথা। গা জ্বলছে। পিট পিট করে যেন ফুটছে আকাশের জ্বলন্ত সূর্যটা কয়েক লক্ষ অতি সুক্ষ্ম সূচ নিয়ে। বসে থাকা যায় না।

কেনে আসবেক না? ময়না নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল।

অয় দেখ। বাড়া বুকা বটিস ফটিক ময়নার কণ্ঠস্বরেই বোধকরি ভেতরে ভেতরে কেমন যেন দুর্বল কেমন যেন সন্দিগ্ধ কেমন যেন বিস্মিত হল। মুখে একটা শব্দ করল। তারপর বলল, অয় দেখ ইঁদুরের দড় রইছেক আলের উপর। এখুন বিবাক ইঁদুর দড় ছেড়ে পালিক-ছেক। মাঠে ধান নাই, কিসের লেগে থাকবেক? ঐ দড়ে এখুন সাপ আছেক।

ময়না আশ্চর্য হয়ে দেখল সামনের ধান ক্ষেতের আলের গর্ত। ধানের সময় ইঁদুর এসে ও গর্ত তৈরী করে। কিন্তু ফটিকের ওকথা কেন মুখে?

জানিস ময়না দড় খালি থাকে না কিন্তুক। পুরুষ মানুষের মুন দড়ের পারা বটেক। উ কি খালি থাকে? তু ছিলি তখুন উর মনে। এখুন চলে এসেছিস। ব্যস দেখগা কেনে তুর সেই দড়ে অন্য কি ঢুকে গেইছে। বুঝলি? ফটিক বুঝতে পেরে ভয়ানক প্রফুল্ল হল। আসলে বোকা মেয়েকে এমন করে না বোঝালে বুঝবে কেন? বলল, এই দেখ কেনে আমার বৌ চলে গেইছেক। আমার মুনে তু। আমার মুন আলা করে তু। দেখগা তুর ঘর আলা করে কে ঢুকে গেইছেক। উ আর আসে? আমি যেছি বৌ আনতে? আমি ত তুকে বিয়া করব। তু ময়না, তু আমার রাণী আমার পরাণ।

আমার ঘর। আমার ঘর। ময়না যেন হাহাকার করে উঠল।

এই যে। এই যে তুর ঘর। ফটিক নিজের বুকের উপর হাত রাখল।

না। না। ময়না মাথা ঝাঁকাল। বুক যেন পুড়ে যাচ্ছে তার। গলার স্বর কে যেন চেপে ধরছে। তার প্রিয় পুতুলকে কে যেন ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার হাত থেকে। ময়না স্পষ্ট করে কোন কিছু বুঝল না। শুধু বারবার মনে হচ্ছে কি যেন খোয়া গেল তার। তার আপন বস্তু তার অধিকারের বস্তু কে যেন গ্রাস করে নিল। ময়না কিছু দেখতে পাচ্ছে না এখন চোখের উপর? হারানর তীব্র বেদনায় চারদিক তার চোখে ধূসর অস্পষ্ট অস্বচ্ছ। তার ঘর? তার ঘর? মুড় মুড় মুড় মুড় করে কে ঢুকছে তার ঘরে। দেবে না ময়না তাকে ঢুকতে? সরে যাও। সরে যাও। ময়নার চুড়ি পরা হাত ঠুন ঠুন করে বেজে উঠল। সারা শরীর কাঁপতে থাকল পাতার মত।

ময়না? ময়না!

উঠে পড়ল। ময়না। ফ্যালফ্যালে চোখে ভুতে পাওয়া মানুষের মত ফটিকের দিকে তাকাল।

তুর কি হল? কি হল তুর? ফটিক হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইল ময়নাকে।

ময়না অতিদ্রুত বুয়ানের ঝোপ দু হাতে সরিয়ে ও প্রান্তে চলে এল। তারপর কোনদিকে চাইল না। দ্রুত ছুটতে থাকল।

বিস্মিত বিমূঢ় ফটিক ময়নার ছুটন্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে বুয়ানের ঝোপের মধ্যে থেকে ডাকল, ময়না আয়। ময়না আয়। আয়।

ময়না পিছন ফিরল না। দাঁড়াল না। দ্রুত ছুটতে থাকল। শাড়ীর আঁচল উড়ছে। কাচের চুড়ি ঠুন ঠুন করে বাজছে। বুকে মাদলের ভীষণ শব্দ। পায়ের তলায় উঁচু নীচু মাটির ধানক্ষেত, ধানের গোড়া, পাথরের টুকরো, শামুকের বিবর্ণ খোল ধাক্কা মারছে। বাথায় টান টান করে তুলছে পায়ের শিরা। মাথার উপরকার সূর্য দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্নিবৃষ্টি করছে। শরীর যেন জ্বলন্ত অগ্নিকান্ড। দর দর করে ঘাম। অসহ্য জালা। কিন্তু কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ নেই ময়নার। ডাহুক ডাক'ছ। বসে থাকা বক চটপট করে উড়ে গেল। একটা বাকে তীক্ষ্ম স্বরে ডাকতে থাকল। চড়ুই আর ময়নাগুলো কানের পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল। একটা ট্যাসকোণা তীরের মত তার মাথা বরাবর নেমে ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করে গেল। ময়না তবু ছুটছে। তার ঘর। তার ঘর। বুক পুড়ে যাচ্ছে। সারা দেহ জুড়ে অসহ্য বাথার ভাব। সরে যাও। সরে যাও ময়না কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কোন ছবি না কোন স্মৃতি না কোন কথা না। ভীষণ ঝড়ে সব-কিছু যেন ছিন্নভিন্ন। পাতার মত উড়ছে সব কিছু। ময়না দাঁড়াতে পারছে না। ছুটে দারুণ ক্লান্ত হয়ে সারা শরীরময় তীব্র যন্ত্রণা আর জবালা নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ময়না মায়ের ঘুমন্ত শরীরকে জোরে নাড়া দিয়ে সবশেষ ধ্বনির মত শুধু বলে, মা মাগো আমি ইখানে আর থাকব নাই। কুচ্ছুতে আমি থাকব নাই। থাকব নাই।

আপনি কি আদর্শ শাশুড়ী

শাশুড়ী হিসাবে জামাইকে নিয়ে যেটুকু আদরযত্ন বা বাঙ্গ-কৌতুক করা দরকার, সেটুকু করতে আপনার মন চায় না কেন? ধোঁয়া থাকলে যেমন আগুন থাকবেই, তেমনি আপনার এ অসোয়াস্তিরও একটা কারণ আছে।

নিজের মেয়েকে আপনি যে ভালোবাসেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। জামাই-টিকেও যে ঠিক মনের মতো ঐভাবে গড়ে নিতে পেরেছেন, একথা কি আপনি জোর করে বলতে পারেন? নিচের প্রশ্নগুলির জবাব খোলা মনে দিন; দেখবেন, আপনার মনের অনেক গোপন রহস্য আপনার কাছে ধরা পড়ে গেছে। পছন্দমত 'ক' কিংবা 'খ'তে টিক লাগান এবং পরে দেখুন আপনি কত নম্বর পেয়েছেন।

১। (ক) আপনি কি আপনার জামাইকে আপনার পরিবারের একজন অতিরিক্ত সদস্য বলে মনে করেন?

(খ) আপনি কি তাকে এমন একজন লোক ভাবেন, যে আপনার মেয়েকে আপনার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে?

২। (ক) যখন খুসী মেয়ের বাড়ি গিয়ে তার সংগে দেখা করার জন্য কি আপনি তৈরী থাকেন?

(খ) না, নিমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করেন?

৩। (ক) মেয়ে-জামাইয়ের ঝগড়ার মধ্যে নাক ঢোকানো কি আপনি পছন্দ করেন না?

(খ) তাদের ঝগড়া-ঝাঁটি মেটাবার জন্য তাদের মধ্যে গিয়ে হাজির হন?

৪। (ক) আপনি কি মনে করেন, আপনার জামাই আপনার মেয়ের পক্ষে উপযুক্ত স্বামী?

(খ) অন্য কোনও লোকের সংগে বিয়ে হ'লে আপনার মেয়ে বেশী সুখী হতো?

৫। (ক) মেয়ে-জামাইয়ের ঝগড়ায় আপনি কি মেয়েকে স্বামী ছেড়ে আপনার কাছে থাকতে উৎসাহিত করেন?

(খ) স্বামীর পাশেই স্ত্রীর উপযুক্ত স্থান—এই বলে মেয়েকে কি প্রেরণা দেন?

৬। (ক) জামাইয়ের রোজগার খুবই কম। বিয়ের আগে আপনার মেয়ে যেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতো, সেরকম সুখে আপনার জামাই আপনার মেয়েকে রাখতে পারেন না। এরজন্য আপনার মেয়ে জামাইকে কোনোরকম অর্থ বা অন্যরকম সাহায্য করে থাকেন কি?

(খ) মেয়েকে সুখে রাখতে পারে না বলে, আপনি জামাইকে প্রায়ই বিদ্রূপ করেন কি?

৭। (ক) ঘরজামাই হয়ে থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য কি আপনি আপনার জামাইকে প্রশংসা করেন?

(খ) আপনি কি তাকে অত্যন্ত মূর্খ এবং স্বার্থপর মনে করেন?

৮।(ক) আপনি কি প্রায়ই আপনার মেয়েকে সংসারের প্রধান বলে থাকেন?

(খ) জামাইকেই সংসারের প্রধান বলে মেনে নিতে কি আপনার মেয়েকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন?

৯।(ক) আপনি কি আপনার মেয়েকে সঞ্চয়ী ও মিতব্যয়ী হাতে উপদেশ দেন?

(খ) স্বামীর কাছ থেকে যতদূর সম্ভব বেশী টাকাকড়ি আদায় ক'রে নিয়ে যথেচ্ছ-ভাবে খরচ করতে মেয়েকে কি প্ররোচিত করেন?

১০। (ক) কোন জায়গায় বেড়াতে যাবার সময়ে, আপনার জামাই যদি আপনাকে সংগে নিয়ে যেতে চায়, তাহ'লে কি আপনি আনন্দ পান?

(খ) বিনা নিমন্ত্রণে মেয়ে-জামাইয়ের সংগে বেড়াতে যাবার অধিকার যে আপনার আছে—এই কথাই কি আপনার মনে জেগে ওঠে?

উত্তর—(প্রত্যেক সঠিক উত্তরের জন্যে পাঁচ নম্বর):

প্রশ্ন নং—১ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক, ৭-ক, ৮-খ, ৯-খ, এবং ১০-ক। সর্বোচ্চ সংখ্যা—৫০।

আপনি যদি ৪০ থেকে ৫০ নম্বর পান, তাহলে বুঝতে হবে সত্যি আপনি একজন আদর্শ শাশুড়ী এবং নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে, আপনার মেয়ে কোনদিন আপনার জামাইয়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হবে না।

২৫ থেকে ৩৫ নম্বর পেলে ভাববেন যে, যতোই ভুল করুন না কেন, মোটের ওপর আপনি একজন ভালো শাশুড়ী। আরো একটু ভালো হ'তে চেষ্টা করুন, দেখবেন আপনার জামাই শুধু আপনার মেয়েকেই ভালোবাসবে না, ভক্তি সহকারে আপনাকেও ভালোবাসবে।

২০ নম্বরের নিচে পেলে ভাববেন, মেয়ে-জামাই আপনার সম্বন্ধে যেসব বিরূপ সমালোচনা করেন, তার সব মিথ্যে নয়। খুব তাড়াতাড়ি আপনার স্বভাব যদি আমূল পরিবর্তন না করেন, তাহলে আপনার মেয়ে-জামাইয়ের ভবিষ্যৎ খুব সুখকর ও শান্তিময় হবে না। ভবিষ্যতে সব কিছু দোষ বা অন্যায় আপনার ওপরই এসে পড়বে।

মধু বসু ঘটনাবহুল জীবনের অবসান

বসুন্ধরা বোধ করি সম্প্রতি আর কোনো প্রিয় সন্তানের বিয়োগে এমনভাবে অশ্রুবিসর্জন করেননি, যেভাবে তিনি করেছিলেন ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁর অন্যতম প্রিয় সন্তান মধু বসুকে হারিয়ে। যে-মুহূর্তে শ্রীবসু শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই ক্ষণ থেকেই তাঁর মুখের ভাব হয়ে ওঠে থমথমে; মনে হল, যেন তিনি হৃদয়াবেগকে সংযত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলেন না; তাঁর দু চোখ ফেটে জল ঝরে পড়ল অঝোর ধারায়। এক-একবার সংবরণের চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না; পরমুহূর্তে দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হয় অশ্রুরাশি। এইভাবেই চলেছিল প্রায় সারাটা দিন। ধারিত্রীর বেদনাহত হৃদয়ের এমন পুঞ্জীভূত প্রকাশ আমরা মনে হয় আর কখনও দেখি নি।

আমরা সকলেই জানি, মধু বসু ছিলেন মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের একজন কৃতী প্রযোজক ও পরিচালক। আরও জানি, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্যে তাঁর দক্ষতার কথা। তাঁরই পরিচালিত 'আলিবাবা' ছবিতে মর্জিনা রূপিনী সাধনা বসুর বিপরীতে আবদাল্লার ভূমিকায় শ্রীবসুর নৃত্য-গীত-অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন নি, এমন দর্শকের

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

আজও সাক্ষাৎ পাই নি। সম্ভ্রান্ত পরিবারের তরুণ-তরুণীদের নিয়ে তিনি যখন ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স নামে নাট্য-প্রতিষ্ঠান গঠন করে ১৯২৮-এর জানুয়ারী মাসে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান রক্সী সিনেমা), তখন প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল দলের মধ্যে যে তীব্র প্রতিবাদের আলোড়ন [illegible]

হই নি। একে সম্ভ্রান্ত সমাজের ছেলে-মেয়েদের সম্মিলিত অভিনয়, তায় নাটক হচ্ছে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহু-অভিনীত একটি নিম্নস্তরের গীতাভিনয় 'আলিবাবা'। কিন্তু শ্রীবসু অকুতোভয়। অভিনয়ের মধ্যে যে পরিমার্জিত রূপ দেখতে পাওয়া গেল, তাতে অতিবড়ো নীতিবাগীশও কুরুচির সামান্য মাত্র ছায়াও আবিষ্কার করতে পারলেন না। আবদাল্লা ও মরজিনার ভূমিকায় মামা-ভাগ্নী—মধু বসু ও সুনীতা রায় (শ্রীবসুর মেজদির মেয়ে) নাচে-গানে-অভিনয়ে দর্শকদের সেদিন করেছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ। এই অভিনয়ে যে পাঁচটি মেয়েকে নিয়ে 'ব্যালে' (নর্তকী সঙ্ঘ) তৈরী হয়েছিল, তর মধ্যে ছিলেন তেরো বছর বয়েসের মেয়ে সাধনা সেন। অবশ্য এর আগেই তিনি তাঁদের রাঁচীর বাড়ীতে তাঁরই মা [illegible]

প্রযোজনা করে আত্মীয় মহলে এমন বাহবা পেয়েছিলেন যে কলকাতায় মিসেস পি কে রায়ের (সরলা রায়—যাঁর স্মৃতির উদ্দেশে গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে আছে সরলা-হলো মেমোরিয়াল হল) প্রস্তাবে তাঁর মহিলা সমিতির সাহায্যের জন্যে এই 'প্রহ্লাদ' ও টাবলোতে 'রামায়ণ' তাঁরই প্রযোজনা ও পরিচালনায় অভিনীত হয়েছিল এম্পায়ার থিয়েটারে ১৯২৭-এর ৭ জানুয়ারী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে।

১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অভিনয় সম্পর্কে প্রথম পাঠ পাওয়া ছেলে মধু নিজের মায়ের দিকের উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন একটি পরিচ্ছন্ন শিল্পমন এবং নাট্যাভিনয়প্রীতি। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ও মযূরভঞ্জ রাজ্যের গরুমহিষাণীর লোহা আকরের আবিষ্কারক (যার ফলে টাটা লৌহ শিল্পের জন্ম) প্রমথনাথ বসু ও নবম ও কনিষ্ঠ সন্তান ও সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত আই সি এস-এর দৌহিত্র মধু বসু এমন একটি পরিবেশে মানুষ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, যেখানে ছিল না কোনো ধর্মীয় ও সামাজিক সংকীর্ণতা। ইংরেজী শিক্ষিত প্রগতিশীল সমাজের অর্থাৎ ইঙ্গবঙ্গ সমাজের পুরোভাগে স্থান ছিল এঁদের দেশী-প্রথম বসুর পরিবারের। তাই হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এঁদের কেউই ছিলেন না কোনও বন্দী বা রক্ষণশীলতাপন্থী। সে সময়ে এমন কোনো সাংস্কৃতিক পরিবার ছিল না, যার সঙ্গে কোনো না কোনো প্রকারে এঁদের যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। এবং এঁদের ধর্মতলার বাড়ী সে সময়ে ছিল সংস্কৃতির কেন্দ্র-স্বরূপ। প্রতি সন্ধ্যায় হত গান, আবৃত্তি, সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা। কলেজে পড়বার সময়ে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে শ্রীবসুর সুযোগ হয়েছিল অধ্যাপক মন্মথকুমার ভাদুড়ীর কাছ থেকে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে পাঠ নেবার। কলেজ ছাড়বার পরে তাই আরও পাঁচজনের মতো সওদাগরী অফিসের চাকরীতে বা ব্যবসায় তিনি কোনো দিনই মন বসাতে পারেন নি। তিনি গোড়া থেকেই চেয়েছিলেন নিছক শিল্পীর জীবন যাপন করতে। সুযোগও জুটে গিয়েছিল। ১৯২৪ সালে জাহাঙ্গীর ম্যাডানের পরিচালনায় তোলা একটি নির্বাক ছবিতে তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করলেন নায়িকা পেসেন্স কুপারের বিপরীতে। এর পরে ১৯২৫-এর মার্চ মাসে তিনি 'লাইট অব এশিয়া' ছবির নির্মাতাদের প্রোডাকসান বিভাগে যোগ দিলেন টুটু ঘোষ ও হিমাংশু রায়ের সহায়তায়। শ্যুটিং শেষ হবার পরে তিনি জার্মানী মিউনিক শহরে 'এমেলকা' স্টুডিওতে মুভী-ক্যামেরার কাজ শিখতে গিয়েছিলেন। সেইখানে ক্যামেরাম্যান কফম্যানের পরামর্শে একটি প্যাথে ক্যামেরা নিয়ে ফটোগ্রাফী ও ডেভেলপিং বিষয়ে অভ্যাস করতেন। ঐ মিউনিকেই যখন আলফ্রেড হিচকক গিয়েছিলেন একটি ছবির বহির্দৃশ্য তুলতে, তখন শ্রীবসু তাঁদের ইউনিটে দোভাষীর কাজ করতে করতে তাঁর ক্যামেরাম্যান ভেন্টিমেগ্লিয়ার কাছ থেকে ক্যামেরা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করেছিলেন। এর পরে যখন তিনি বার্লিনের 'উফা' স্টুডিওতে বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান কার্লফয়েন্ড-এর কাছে কাজ শেখবার সুযোগ পান, সেই সময়ে পারিবারিক কারণে তাঁকে লণ্ডনে চলে আসতে হয়। এখানে হিচককের ইউনিটের ক্যামেরাম্যান ভেন্টিমেগ্লিয়াএর সহকারীরূপে কাজ করতে করতে হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়ায় তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। আরোগ্যলাভের পরে তাঁর প্রথম কাজ হয় বাঙলার লাট লর্ড লিটনের কুচবিহারে বাঘ শিকারের ছবি তোলা। এই চলচ্চিত্র দেখে খুশী হয়ে লাটসাহেবের মিলিটারী সেক্রেটারী শ্রীবসুকে একটি সার্টিফিকেটও দেন। এর পরে কিছু দিনের জন্যে তিনি রেঙ্গুনের ইস্টার্ণ ফিল্ম কোম্পানীর ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করেন। হিমাংশু রায়ের পরবর্তী ছবি 'থ্রো অব এ ডাইস'-এ কাজ করবার জন্যে আহ্বান পেয়েই তিনি এই কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতা চলে আসেন এবং তাঁর দলে যোগ দেবার আগেই গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলের গৃহনির্মাণ তহবিলে সাহায্যের জন্য ১৯২৮-এর জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত 'আলিবাবা' মঞ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। ১৯২৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২৯-এর মার্চ পর্যন্ত 'থ্রো অব এ ডাইস'-এর সঙ্গে প্রোডাকসান ম্যানেজার অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টার এবং অন্যতম অভিনেতারূপে যুক্ত থাকবার পরে কলকাতায় ফিরে তিনি প্রথম কাজ পেয়েছিলেন ম্যাডান থিয়েটারে চিত্র-পরিচালক হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের 'মানভঞ্জন' গল্পটিকে তিনি নির্বাক ছায়াচিত্রে 'গিরিবালা' নাম দিয়ে রূপায়িত করেন। ছবিটি ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারীর শেষে বা মার্চের গোড়ায় ক্রাউন সিনেমায় (বর্তমানে উত্তরা) মুক্তিলাভ করে। 'গিরিবালা'র কাজ শেষ করার পরেই শ্রীবসু তাঁর সি-এ-পি'কে দিয়ে 'দালিয়া' মঞ্চস্থ করেন নিউ এম্পায়ারে ১৯৩০-এর ১৬ এপ্রিল। এতে দালিয়া ও তিমির ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীবসু ও সাধনা সেন। এর পরে পাঞ্জাব ফিল্ম কোম্পানীর হয়ে 'খাইবার ফ্যালকন' পরিচালনার জন্যে তিনি লাহোরে যান। এই ছবির শ্যুটিং শেষ করবার পরে ডিসেম্বরে তিনি কলকাতায় আসেন এবং ১৫ তারিখে তাঁর বাকদত্তা শ্রীমতী সাধনাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পরে সস্ত্রীক লাহোরে ফিরে গিয়ে ছবিটির সম্পাদনা করবার মাঝেই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন গরম কাল পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে। স্ত্রীকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবার পরে ছবির সম্পাদনা শেষ করতে না করতে শ্রীবসু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দৈবানুকূল্যে এক বন্ধুর সাহায্যে কলকাতায় ফিরে আসতে সমর্থ হন। ১৯৩১-এর মাঝামাঝি থেকে ১৯৩২-এর শেষ পর্যন্ত তাঁর কেটে যায় পুনরায় সুস্থ হয়ে উঠতে। ডাঃ

বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত দেখে অনুরোধ করেন ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউসানের সাহায্যে একটি মঞ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা করতে। এরই ফলে 'দালিয়া'র দ্বিতীয় অভিনয় হয় এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে ১৯৩৩-এর ১৬ ফেব্রুয়ারী। ঐ সালেই শ্রীবসু তাঁর প্রথম সবাক ছবি 'সেলিমা' (উর্দু) পরিচালনা করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে। এক দিকে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবার মতো মেয়ের অনুসন্ধান চলতে লাগল, অন্যদিকে সি-এ-পি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে থাকল 'জোরণা' (৭ ও ৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৩), আলিবাবা (ফেব্রুয়ারী ও মার্চ, ১৯৩৪)। ১৯৩৪-এর মাঝামাঝি থেকে 'সেলমা'র শ্যুটিং শুরু হল এবং ছবিটি মুক্তি পেল ১৯৩৫-এ। এরপরে শ্রীবসু তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে বেঙ্গল টকীজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুরোধে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ রচিত কাহিনী অবলম্বনে নির্মাণ করেন উর্দু ছবি 'ওয়ান ফেটাল নাইট' (বলা-কি-রাত); দুঃখের বিষয় ছবিটি হয়েছিল শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতা শ্রীবসুকে কিছু দিনের জন্যে সম্পূর্ণভাবে মঞ্চাভিনয়ের দিকে মনঃসংযোগ করতে বাধ্য করেছিল এবং তারই দরুণ 'ক্যালকাটা অ্যামেচার প্লেয়ার্স', 'ক্যালকাটা আর্ট প্লেয়ার্স'-এ রূপান্তরিত হয়ে এম্পায়ার থিয়েটারে মঞ্চস্থ করে 'মন্দির' (১৯৩৬)। ঐসালেরই জুন মাসে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের সঙ্গে শ্রীবসুর চুক্তি হয় 'আলিবাবা' চলচ্চিত্রে করবার জন্যে। এই সময় থেকে শুরু হল শ্রীবসুর সাফল্যের পথে জয়যাত্রা। ১৯৩৭-এর ১৩ ফেব্রুয়ারী রূপবাণীতে 'আলিবাবা' মুক্তিলাভ করার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল। তার পরেই এল 'অভিনয়' (১৯৩৮-এর ৩ সেপ্টেম্বর রূপবাণীতে মুক্তিপ্রাপ্ত)। ছবির কাজের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল সি-এ-পি'র বিভিন্ন মঞ্চাভিনয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'ওমরের স্বপ্নকথা', 'বিদ্যুৎপর্ণা' 'রাজনটী' আরও তৈরী হল সাধনা বসুর 'নৃত্যনাট্য' সম্প্রদায়—সাধনা বসুর ব্যালে। বাঙলা থেকে শ্রীবসু দিলেন পাড়ি বোম্বাইয়ে সাগর মুভীটোনের হয়ে দোভাষী ছবি 'কুমকুম' করবার জন্যে ১৯৩৯ সালে। ১৯৪০-এর ফেব্রুয়ারী ছবিটির বাংলা সংস্করণ মুক্তি পেল রূপবাণীতে এবং মার্চে হিন্দী সংস্করণটি বোম্বাইয়ের ইম্পিরিয়াল সিনেমায়। শ্রীবসুর পরের ছবি হচ্ছে ওয়াদিয়া মুভীটোনের ত্রিভাষী চিত্র 'রাজনর্তকী'র (বাঙলা ও হিন্দী) ও কোর্ট ড্যান্সার (ইংরাজী)। ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ ভারতীয়দের দ্বারা ইংরাজী ছবি প্রথম তৈরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন শ্রীবসু। বোম্বাইয়ের রয়্যাল অপেরা হাউসে ছবিটির হিন্দী সংস্করণ মুক্তি পায় ১৯৪১-এর ১৮ ফেব্রুয়ারী। এবং বাঙলা সংস্করণটি মুক্তিলাভ করল ঐ বছরই ৮ মার্চ কলকাতার উত্তরা সিনেমায়। রাজনর্তকীর শ্যুটিং শেষ হবার পরেই সাধনা বসু তাঁর নাচের দল নিয়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের সুরাট, বরোদা, আহমেদাবাদ, বোম্বাই, নাগপুর, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর ও হায়দরাবাদে প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করেন। ১৯৪১-এর মাঝামাঝি শ্রীবসু কলকাতার নিউ থিয়েটার্স সংস্থার হয়ে 'মীনাক্ষী' দোভাষী ছবিটির শ্যুটিং শুরু করেন এবং ১৯৪২-এর এপ্রিলে শেষ করেন। এই শ্যুটিংয়ের মাঝেই ১৯৪১-এর ২ অক্টোবর কলাম্বিয়া পিকচার্সের পরিবেশনায় মেট্রো সিনেমায় ইংরাজী 'কোর্ট ড্যান্সার' মুক্তিলাভ করল। ১৯৪২-এর ১১ জুন 'মীনাক্ষী'র বাংলা সংস্করণ মুক্তি পেল চিত্রায়। এর পর কিছু কালের জন্যে শ্রীবসু ভারত সরকারের ফিল্মস ডিভিসনের সঙ্গে যুক্ত থেকে 'ড্যান্সেস অব ইণ্ডিয়া' 'মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেণ্টস অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন। এবং এই ১৯৪২ সালেই শ্রীবসুর দাম্পত্যজীবন বিঘ্নিত হয় এবং শ্রীমতী বসু তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র বাস করতে শুরু করেন। সম্পূর্ণ শিল্পিমনা শ্রীবসুর ভাবপ্রবণ হৃদয়ে এই ঘটনা এমন একটি বিরাট ক্ষত সৃষ্টি করে, যা কোনোদিনই ভালো হয়েছিল কিনা, কে জানে! কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মন কষাকষি হওয়ার ফলে ১৯৪৫-এর মার্চ মাসে শ্রীবসু ইনফর্মেশন ফিল্মস-এর পরিচালকের পদ ত্যাগ করেন। এর পরে তিনি হায়দরাবাদের একজন ধনী শিল্পপতির হয়ে হিন্দী 'গিরিবালা' ছবিটি পরিচালনা করেন ১৯৪৬ সালে। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে ছবিটি নির্মিত হওয়ায় সাফল্যলাভ করতে পারেনি। কলকাতার তখন ভয়াবহ অবস্থা, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় জন্যে মানুষ নিশ্চিন্তে পথ চলতে পারে না। এই সময় ভগ্নস্বাস্থ্য সাধনা বসু কিছুদিনের জন্যে শ্রীবসুর কাছে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যে সুস্থ হয়েই তিনি আবার পৃথক হলেন। এর পর শ্রীবসুর ছবি হচ্ছে আই-এন-এ পিকচার্সের মণি গুহ প্রযোজিত 'মাইকেল মধুসূদন', এই ছবিতেই উৎপল দত্ত অবতীর্ণ হয়ে যশস্বী হন। ছবিটি ১৯৫০-এর ১৪ জুলাই লাইটহাউসে মুক্তি পায়। ১৯৫২র শেষাশেষি শ্রীবসু প্রায় একসঙ্গে তিনটি ছবি পরিচালনা করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হন, এর মধ্যে সুপ্রভাত ফিল্মস-এর 'রাখী' ও প্রভা পিকচার্সের 'শেষের কবিতা' শ্রীবসুকে সার্থকতা এনে দেয়, কিন্তু জীবন দত্ত প্রযোজিত 'বিক্রমোর্বশী' অসাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯৫৪তে তিনি আবার পরিচালনা করেন তিনখানি ছবি : শুভলগ্ন, পরাধীন ও মহাকবি গিরিশচন্দ্র। এর মধ্যে শেষেরটিই দর্শকদের কাছ থেকে যথোচিত প্রশংসালাভ করে। ১৯৫৬র ১ জুন ছবিখানি রাধা, পূর্ণ ও প্রাচীতে মুক্তিলাভ করে। এর পর শ্রীবসু আর একখানি জীবনীচিত্র করেছেন, সেটি হল সেবক চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রযোজিত ও ১৯৬৪র ১ মে'তে রাধা ও পূর্ণায় মুক্তিপ্রাপ্ত 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'। কিন্তু এরই মাঝে ১৯৫৭ সালের শেষাশেষিও ১৯৫৮ সালের জানুয়ারীর গোড়ার দিকে যখন শ্রীবসু সি এ পিকে পুনরুজ্জীবিত করে 'ঘরে বাইরের' নাট্যরূপটিকে সাফল্যের সঙ্গে কলকাতা ও কুলটি, বার্ণপুর, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি স্থানে মঞ্চস্থ করেছিলেন এবং সেই নাট্যাভিনয়ের আগে সাধনা বসুর একক নৃত্য 'দ্রৌপদী' অনুষ্ঠিত হয়, তখন চিত্তরঞ্জন থেকে ফিরে হাওড়া স্টেশনেই শ্রীমতী বসু মূর্ছিত হয়ে পড়েন। সেই কারণে তাঁকে তাঁর নিজ বাসস্থানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় শ্রীবসু তাঁর অ্যাস্টোরিয়া হোটেলেই নিয়ে আসেন এবং যথোপযুক্ত চিকিৎসা করান। কিন্তু সুস্থ হয়ে ওঠবার পরেও শ্রীমতী বসুর আর তাঁর নিজের বাসস্থানে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি দৈবের ইচ্ছায় শ্রীবসুর কাছেই থেকে যেতে হয়।

শ্রীবসুর শেষ উল্লেখযোগ্য ছবির কাজ হচ্ছে অমৃতবাজার পত্রিকার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে নির্মিত দু রীলার তথ্যচিত্র 'শতবর্ষের সেবা'—অমৃতবাজার পত্রিকার একশো বছরের ইতিহাস। ছবিটি ১৯৬৮র ফেব্রুয়ারীতে প্রথম মুক্তিলাভ করে। এর ইংরাজী সংস্করণটি লন্ডনে প্রদর্শিত হয়।

শ্রীবসু ১৯৫৮র ১ এপ্রিল থেকে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ কারণানী স্টেটের একটি ছোট ফ্ল্যাটে শ্রীমতী বসুকে নিয়ে বাস করছিলেন। শেষ কয়েক বছর তিনি ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সিনে সেন্ট্রাল সংস্থার সভাপতি ছিলেন। কলাকুশলীদের প্রতিষ্ঠান সিনে টেকনিসিয়ান্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতির পদও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অলংকৃত করে গেছেন।

তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি হচ্ছে তাঁর স্বলিখিত আত্মজীবনী 'আমার জীবন'। এই বইটি যখন আমাদের 'অমৃত'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই তাঁর পারিবারিক সম্পর্কগুলি, ব্যক্তিগত জীবনের রোমান্টিক অধ্যায়গুলি এবং সৌখীন অভিনয় ও চলচ্চিত্র জগত সম্পর্কে বহু তথ্য ও মন্তব্য বহু বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁকে এনে দিয়েছিল অজস্র প্রশংসা।

এবার যখন তিনি রোগে শয্যাগত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে কয়েকদিন দেখেই আমাদের মনে হয়েছিল, তাঁর জীবনীশক্তি ক্ষীয়মান। তবু বুঝতে পারিনি, ২৫ সেপ্টেম্বর বেলা ১০টাতেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হবে। মানুষ অমর নয়, তবু শ্রীবসুর মতো একজন আমাদের পরমাত্মীয় শিল্পী যদি আমাদের ছেড়ে চলে যান, তাহলে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীবসুর ওপর একান্ত নির্ভরশীলা শ্রীমতী বসুকে আমরা কি সান্ত্বনাবাণী শোনাব, ভেবে পাই না। শ্রীবসুর আত্মা শান্তি লাভ করুক।

বেশ মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে একটি খবরের কাগজের চিঠিপত্র বিভাগে একজন পত্রলেখিকার একটি চিঠি বেরিয়েছিল তাতে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'নজরুল ইসলামের গান কি বেওয়ারিশ......?'

পত্রলেখিকার ভাষাটা একটু সোজাসুজি হলেও কথাটা মিথ্যে নয়। বেশ কিছুকাল ধরে বেতারে আর গ্র্যামোফোন রেকর্ডে যে ধরনের নজরুল গীতি শোনা যাচ্ছে তাতে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

নজরুলের গানের প্রতি যে নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে তাতে অনেক নতুন গায়ক-গায়িকা এসেছেন। তাঁদের মধ্যে অধিকারীও আছেন, অনধিকারীও আছেন। উৎসাহের প্লাবনে অধিকারী-অনধিকারীর ভেদাভেদ ঘুচে গেছে।

যাঁরা এতকাল আধুনিক গান গেয়ে এসেছেন, যাঁদের কণ্ঠে আধুনিক গানই মানায় ভালো, তাঁরা এখন নতুন প্লাবনে নতুন হুজুগে নতুন করে নজরুল-গীতি গাইতে শুরু করেছেন। নজরুলের গানের কথা ও সুর বদলে খোদার উপর খোদকারি করছেন।

নজরুলগীতির নতুন জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গানগুলির অপহানি হচ্ছে, বিশেষ করে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে—যে, কেন্দ্র নজরুলের কাছে অশেষ ঋণী।

নজরুলের গানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, এমন কেউ কি আকাশবাণীর সঙ্গীত বিভাগে নেই? নজরুলের কণ্ঠে নজরুলের গান শুনেছেন, অথবা নজরুলের কাছে নজরুলগীতি শিখেছেন এমন কারও কণ্ঠে শুনেছেন, এমন কেউই কি আকাশবাণীর সঙ্গীত বিভাগে নেই? তাহলে নজরুলের গানের এমন বিকৃতি হয় কী করে? গায়ক-গায়িকারা কলি বাদ দিয়ে ইচ্ছেমতো সুরে যা খুশি তা-ই করে নজরুলগীতি গাইতে পারেন? এবং তা প্রচার হতে পারে? আকাশবাণী এত তাড়াতাড়ি নজরুলের ঋণ ভুলল কী করে?

নজরুলের গানগুলিকে এই ব্যাপক নিধনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ কী করেছেন কাগজে পত্রে সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও?

বাইরের লোকেরাই বা কী করেছেন? নজরুলের কাছে গান শিখেছেন এমন অনেক শিল্পী এখনও বর্তমান আছেন। কেন তাঁরা প্রতিবাদ করেন না? নজরুল অ্যাকাডেমিক বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁদের কর্তব্য কী?

রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী কয়েকজন ছিলেন, তাই তাঁর গানগুলি বেঁচেছে, তাদের খাঁটি রূপ পাওয়া যাচ্ছে। নজরুলের ভাণ্ডারীরা থাকতে কেন নজরুলের গানগুলির অপমৃত্যু ঘটবে? কেন তাঁরা গানগুলিকে বাঁচাবেন না?

যেভাবে নজরুলগীতির বিকৃতি ঘটছে তাতে অচিরে এমন দিন আসবে, যখন নজরুলগীতিকে নজরুলের গান বলে চেনা যাবে না। গবেষকরা অনেক মাথা খাটিয়ে হয়তো দু-একটা গানের খাঁটি রূপ আবিষ্কার করে ডক্টরেট পাবেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় সেকালের একজন জনপ্রিয় গায়ক নিজের ইচ্ছেমতো সুরে 'আমার মাথা নত করে দাও' গানটি গেয়েছিলেন গ্র্যামোফোন রেকর্ডে। রবীন্দ্রনাথ সেই রেকর্ডের বিক্রি বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। এবং দীনু ঠাকুরকে দিয়ে গানটি রেকর্ড করিয়েছিলেন, তাঁর গানকে বিকৃতি থেকে রক্ষা করেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রক্ষা করার জন্য এখন বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড আছে, নজরুলগীতিকে রক্ষা করার জন্য কি কেউ থাকবে না?

আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যদি চেষ্টা করেন তাহলে অনেকখানি হতে পারে। তাঁরা গুণী ব্যক্তিদের দিয়ে নজরুলগীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে পারেন। আর, একদা যাঁরা নজরুলের তত্ত্বাবধানে বা তাঁর দ্বারা অনুমোদিত হয়ে নজরুলগীতির রেকর্ড করেছিলে, সেই জ্ঞান গোস্বামী, শচীন দেববর্মণ, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, পদ্মরাণী, রাণু সোম, সুপ্রভা সরকার, ইলা মিত্র, ভবানী দাস, ধীরেন মিত্র, মৃণালকান্তি ঘোষ—এঁদের গানের রেকর্ড বেশি করে প্রচার করতে পারেন।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২৩শে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে বলা হ'ল—'সংসদ সদস্য ইন্দুলাল ইয়াগ্নিক...।" ২৫শে সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৭টায় দিল্লী থেকে প্রচারিত বাংলা খবরে ঐ ঘোষিকার মুখেই আবার শোনা গেল — "ইন্দুলাল ইয়াগ্নিক।"...ইন্দুলাল শব্দের অর্থ স্পষ্ট, কিন্তু ইয়াগ্নিকের? জানি না, এমন কোনো শব্দ আছে কিনা। এই নামে কোনো সংসদ-সদস্য আছেন কিনা, তা-ও না। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক বলে একজন আছেন জানি। এবং মনে হয়, যাজ্ঞিক আকাশবাণীর ঘোষিকার মুখে ইয়াগ্নিক হয়েছেন। কেমন করে? "য"-কে আমরা "জ" উচ্চারণ করলেও আসল উচ্চারণ তো অনেকটা "ইয়"-র মতো। তাই "যা" হয়েছে "ইয়া", ইংরেজীতে ya ইংরেজীতে "জ্ঞ" লেখা হয় jn—তাই যাজ্ঞিক হয় ইয়ানিক এবং যেহেতু খবরটা ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে, তাই যাজ্ঞিক হয়েছে ইয়াগ্নিক। কিন্তু ইংরেজী "জে" কী করে "জি" হয়ে বাংলা "গ" হ'ল, বোঝা গেল না।

এইদিন রাত ৮টা ১৫ মিনিটে শ্রীঅর্ঘ্য সেনের নজরুল গীতির অনুষ্ঠান ছিল, টেপটা বেজেছে হেঁচকা টান দিয়ে দিয়ে। শেষ গানটায় এই হেঁচকা টান বড়ো বেশি স্পষ্ট হয়েছে—গানটা কখনও জোর হয়েছে, কখনও আস্তে হয়েছে, কখনও টান পড়েছে, কখনও ছাড় পড়েছে।

...যন্ত্রপাতিগুলো আর একটু ভালোভাবে রাখা যায় না? ব্রডকাস্টের আগে আর একটু ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া যায় না?

৮টা ৩০ মিনিটে অতুলপ্রসাদের গান শুনিয়েছেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাস,—কাঁপা গলা, সুর-লয় তালগোল পাকানো।...পরিতাপজনক।

২৪শে সেপ্টেম্বর রাত সাড়ে ৮টায় ছিল সংবাদ বিচিত্রা। বিষয় ছিল চারটি—গান্ধী শতবার্ষিকী, ভারতের প্রথম উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার, সবুজ বিপ্লব, আর পরিবার পরিকল্পনা।

গান্ধী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়ার পরে আর যাঁরা বলেছেন, বড়ো দ্রুত বলেছেন। শুনে বোঝার সময়টুকু পর্যন্ত দেন নি। নির্জনে আপন মনে আপনার জন্যে বক্তৃতা দিলে এমন দ্রুত বক্তৃতায় কারও আপত্তির কিছু থাকে না, কিন্তু আর দশজনকে শোনাবার জন্যে যে বক্তৃতা, সে তো একটু ধীর স্থির হওয়া প্রয়োজন, তড়বড় করলে কথাগুলো শোনা যায় বটে, কিন্তু বুঝতে অসুবিধে হয়। শ্রোতারা সেই অসুবিধে মানতে রাজী নন বলে শোনাটাকেও মুক্তি দেন।

কলকাতা থেকে অনতিদূরে মগরায় যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মিডিয়ম ওয়েভ ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছে তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কিছুটা অংশ শোনানো হয়েছে এই সংবাদ বিচিত্রায়। অনুষ্ঠানের প্রথমে ছিল গান, তারপর বক্তৃতা—কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রীর, আর সোভিয়েট প্রতিনিধির। সোভিয়েট সহযোগিতায় এই ট্রান্সমিটারটি বসানো হয়েছে বলে সোভিয়েট প্রতিনিধির বক্তৃতা ছিল। তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী জানালেন, এই রকম উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মিডিয়ম ওয়েভ ট্রান্সমিটার ভারতে আর নেই, তবে রাজকোটে অনুরূপ একটি ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হবে। মগরার এই ট্রান্সমিটারটি পূর্বাঞ্চলের একটা বড়ো চাহিদা পূরণ করবে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় একটা বৃহদঞ্চলে ভারতের বাণী পৌঁছে দেবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এই ট্রান্সমিটারটি স্থাপনে সহযোগিতা করতে পারায় সোভিয়েট প্রতিনিধি তাঁর দেশের তরফ থেকে আনন্দ প্রকাশ করলেন, ভারত-সোভিয়েট বন্ধুত্বের উপর জোর দিলেন।

সবুজ বিপ্লব মানে কৃষি বিপ্লব। আকাশবাণীর প্রতিনিধি একজন প্রগতিশীল কৃষকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় জানালেন, বাংলা দেশে আর যাতে খাদ্যাভাব না থাকে তার জন্য অধিক ফসল উৎপন্ন করার বিপ্লব। প্রগতিশীল কৃষককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই বিপ্লব সম্বন্ধে তিনি কী মনে করেন। তাঁর মনে করাটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল, আকাশবাণীর প্রতিনিধির সমস্ত প্রশ্নের তিনি প্র্যাকটিক্যাল উত্তরই দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্নগুলি কখনও কখনও ঠিক প্র্যাকটিক্যাল হয় নি, কোনো কোনো প্রশ্নে কৌতুক বোধ হয়েছে। প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করলেন, বড়ো বড়ো জমি ছাড়া যে ট্র্যাকটর চাষ করা যায় না, কৃষকটি তা জানেন কিনা। কৃষকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "কেন, পাঁচ কাঠা জমিতেও তো ট্র্যাকটর চালানো যায়!" একটু বিস্ময়ে প্রশ্নকর্তা বললেন, "এতে তো খরচ বেশি পড়বে!" উত্তরদাতা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "খরচ যেমন বেশি পড়বে, ফসলও তো তেমনি বেশি হবে।" প্রশ্নকর্তা স্বর নামিয়ে জবাব দিলেন, "ও, তা তো বটে।"... অনুষ্ঠানটা শুনে মনে হ'ল, প্রশ্নকর্তা যে বিষয়ে প্রশ্ন করতে গেছেন সে বিষয়ে তিনি নিজেই বিশেষ খবরাখবর রাখেন না। তাহলে এমন প্রশ্নোত্তরের সাক্ষাৎকারে কার কী লাভ?

শেষের অনুষ্ঠান পরিবার পরিকল্পনা। পরিবার পরিকল্পনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হ'ল শিশুদের কান্না আর হৈ হুল্লোড় দিয়ে। বেশ জমেছিল, তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল। ডাঃ সুভাষ বসুর ভাষণটিও ছাপিয়ে গিয়েছিল।

সমগ্র সংবাদ বিচিত্রাটির এডিটিংকে বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। অনেক সময় 'ফেডার' তোলার দোষেই সম্ভবত গোড়ার কয়েকটি কথা কেটে গেছে কিংবা এত আস্তে এসেছে যে, বোঝা যায় নি। আবার অনেক সময় 'ফেডার' নামানো হয়েছে তাড়াতাড়ি।

রাত ১০টা ১৫ মিনিটে ছিল পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গ। একে পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গ না বলে নাগাঞ্চল প্রসঙ্গ বললেই বোধ করি ঠিক হত, কারণ মিনিট তেরোর এই অনুষ্ঠানে মিনিট এগারোই গেছে নাগা নেতাদের ইংরেজী ভাষণে, বাকি দু মিনিট ভাতখণ্ড সম্বন্ধে বাংলা একটা ন্যারেশন অনুষ্ঠানটা শুনে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, কাদের জন্য এই অনুষ্ঠান? এটা বাংলা অনুষ্ঠানে ইংরেজীর অনুপ্রবেশ, না ইংরেজী অনুষ্ঠানে বাংলার অনুপ্রবেশ? তবে একটা জিনিসের এবার প্রশংসা করা যায়—সে ঐ বাইরের রেকর্ডিংয়ের। পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গে বাইরের রেকর্ডিং বড়ো ভালো হয় না, বোঝা যায় না। এবার ভালো হয়েছিল, বোঝা গিয়েছিল। গ্রন্থনাংশেও এবার কিছুটা প্রাণ ছিল।

—শ্রবণক

চতুর্মুখ

দিলীপ মৌলিক

পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুর্গম পথে চলতে চলতে যারা আজ পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাসে উৎসাহিত হবার মতো আলোর দীপ্তি দিয়েছেন তাদের মধ্যে 'চতুর্মুখে'র নাম খুব সংগত কারণেই স্মরণযোগ্য। শুধু নাটক অভিনয় করে প্রযোজনার সংখ্যা বাড়িয়ে দীর্ঘস্থায়িত্বের নজীর রাখলেই যে নাট্যচর্চার ব্যাপারে অনেক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করা যায় না, এ-সত্য সম্পর্কে 'চতুর্মুখ' যাত্রা শুরুর প্রথম ক্ষণ থেকেই অতি মাত্রায় সচেতন। দীর্ঘ এগারো বছরের এদের নাট্য-প্রযোজনার প্রতিটি পদক্ষেপের নেপথ্যে রয়েছে সুচিন্তিত এক শৈল্পিক বোধ যা নাটকের বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ পরিকল্পনায় নতুনত্বের স্বাদ আনতে পেরেছে। তাই বাংলা নাটকের অগ্রগতির যে ইতিহাস আজ রচিত হোতে চলেছে, 'চতুর্মুখে'র নিষ্ঠা-জড়ানো প্রয়াস তার গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ে বেশ কিছুটা নতুন প্রাণসংযোগ করতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সময়টা ছিল ১৯৫৮। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাট্যজগতের অলৌকিকতা থেকে দূরে সরে এসে বাংলা নাট্য-প্রযোজনা তখন সবে মাত্র নতুন দিকের সন্ধান দিতে শুরু করেছে। জীবনরস সমৃদ্ধ নাটকের দিকে ক্রমশঃ যেন নাট্যানুরাগীর দৃষ্টি হোচ্ছে সঞ্চারিত। এই আলোকিত পরিবেশেই 'চতুর্মুখে'র আবির্ভাব আর এই আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছেন অসীম চক্রবর্তী, দীপক রায় ও শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য। শুরু থেকেই সংস্থার সভ্যদের লক্ষ্য হোল সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে ঘেরা জীবনের নানা সংঘাতকে মঞ্চের আলোয় মূর্ত করে তুলতে হবে, তবেই হবে নাট্যগোষ্ঠীর অস্তিত্বের সার্থকতা। এই পরিকল্পনাকে সামনে রেখে এঁরা প্রথমেই অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'থানা থেকে আসছি' নাটকের অভিনয় করলেন সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদ মঞ্চে। অভিনয়ের তারিখ ছিল ১৯৫৯-র ২৮ ফেব্রুয়ারী। বাস্তবধর্মী নাটকের অপূর্ব সুন্দর অভিনয় নাট্যানুরাগীদের মুগ্ধ করলো এবং এতে দ্বিগুণ উৎসাহিত হোলেন দলের শিল্পীরা। এই উদ্দীপ্ত মানসিকতাই একটি মুখর মুহূর্তে 'রঙমহলে'র মঞ্চে তুলে ধরলো পরবর্তী নাটক—শিবরাম চক্রবর্তীর 'যখন তারা কথা বলবে'। এই নাটকটি প্রায় ত্রিশ বছর অপরিচিতির অন্ধকারে ছিল, কিন্তু 'চতুর্মুখে'র সভ্যদের ধারণা ঠিক সময়ে এ নাটক মঞ্চস্থ হোলে নব-নাট্য-আন্দোলনের একটি নতুন দিগন্ত বহুদিন আগেই উন্মোচিত হোতে পারতো। যাই হোক, এই নাটকটিকে মঞ্চরূপায়ণের সুযোগ দিয়ে, 'চতুর্মুখে'র শিল্পীরা একটি ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনই করেছেন বলতে হবে। এর পরের পর্যায়ের নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', শিবরাম চক্রবর্তীর 'চাকার নীচে', অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নির্বোধ' ('ডেস্টোয়েভস্কি'র 'ইডিয়ট' অবলম্বনে) ও 'নচিকেতা'। 'নির্বোধ' নাটকের অসাধারণ অভিনয় 'চতুর্মুখ'কে অনেক পরিচিতি দেয় এবং বাংলা দেশের নাট্যগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ আসন দেয়। 'নচিকেতা' নাটকে পৌরাণিক নচিকেতার আধুনিক রূপ দেখানো হয়েছে. নাটকটিতে ফর্মের দিকেও যথেষ্ট নতুনত্ব ছিল। 'নচিকেতা' ও 'নির্বোধ' নাটকদুটি দুমাস ধরে তাও সপ্তাহে দুদিন করে পরিবেশিত হয় 'মিনার্ভা' রঙ্গমঞ্চে। এই সময়ে চতুর্মুখ ভারত সরকারের 'গ্র্যান্ট' পায়। পরের নাটক 'পথের দাবী' পরিবেশন করে আবার ভারত সরকারের 'গ্রান্ট' লাভ করে সংস্থা। মহারাষ্ট্রের থিয়েটারের রূপ-রীতি দেখবার জন্য আমন্ত্রণ পেয়ে ১৯৬৩তে 'চতুর্মুখে'র শিল্পীরা সেখানে যান। এ পর্যন্ত 'চতুর্মুখে'র যে যাত্রাপথ তাতে হঠাৎ একটু ছেদ পড়লো, ব্যক্তিগত কারণে শুদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য ও দীপক রায় দল ছেড়ে চলে গেলেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে শুধু রইলেন অসীম চক্রবর্তী ; দল ও নাটক পরিচালনার দায়িত্ব এবার স্বভাবতই পড়লো শ্রীচক্রবর্তীর ওপর। বেশ কিছু নতুন সভ্যও এলো এই সূত্রে ; দলের শক্তি বৃদ্ধি হোল।

এই রূপান্তরিত পরিবেশে নাটক হোল 'জনৈকের মৃত্যু'। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আর্থার মিলারের 'ডেথ অফ সেলস ম্যানে'র অনুপ্রেরণায় নাটকটি রচনা করেছেন অসীম চক্রবর্তী। এই নাটকটির প্রযোজনা থেকে 'চতুর্মুখ' চলার একটি নতুন ছন্দ খুঁজে পেয়েছে, এবং এই প্রযোজনাই সংস্থাকে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিয়েছে। আজ পর্যন্ত ৯৪টি অভিনয় এ নাটকের হয়েছে। 'জনৈকের মৃত্যু' আজকের মধ্যবিত্ত মানুষের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, আবার বড়ো আবেগ ও প্রচণ্ড ব্যর্থতার একটি নিখুঁত ছবি। বিভিন্ন স্তরে ফ্লাশ-ব্যাক পদ্ধতির ব্যবহার এবং পূর্ব-স্মৃতির অসংলগ্ন সংলাপের মধ্য দিয়ে একটি সাধারণ মানুষের রিক্ততার রূপ দেখানো হয়েছে নাটকে। এ নাটক আমেরিকার একদিন তুমুল ঝড় তুলেছিল—পরে ইউরোপেও এটা বহুল আলোচিত নাটক হিসেবেও স্বীকৃতি পায়। মনে হয় রঙ্গরূপে আর্থার মিলারের নাটক 'চতুর্মুখে'র শিল্পীরাই প্রথম অভিনয় করেছেন।

এর পরের নাটক এ এ মিলনের 'মিঃ পিম পাসেস বাই' অবলম্বনে 'সন্দেশ'। দর্শককে নিছক আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে যেসব সৎ নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ হয়েছে 'সন্দেশ' তার মধ্যে অন্যতম। হাস্যরস এর প্রধান অবলম্বন। 'চতুর্মুখে'র আশ্চর্য নাটক 'জনৈকের মৃত্যু' যাঁদের অভিভূত করেছে, 'সন্দেশ' করেছে তাঁদের বিস্মিত। কতোগুলো জীবন্ত চরিত্রের দুরন্ত অভিনয় করে সংস্থার শিল্পীরা প্রমাণ করেছেন সিরিয়াস নাটকে যেমন, হাসির নাটকেও তেমনই দক্ষতার স্বাক্ষর রাখা যায়। এই নাট্য-প্রযোজনা সম্পর্কে বলা হয়েছে—'একটা অভিযোগ আমরা শুনেছি হাস্যরস বিতরণের উদ্দেশ্যে যদি কোন নাটক প্রযোজনা করতে হয়, সেক্ষেত্রেও আমরা কেন বিদেশী নাটকের ঋণ স্বীকার করেছি। আমাদের পক্ষে মাত্র একটিই বক্তব্য—কোন নির্দিষ্ট মানসিকতায় এই নাটক খুঁজে বের করা হয়নি। খোঁজার পথে পছন্দমতো একটা নাটক পেয়ে আমরা উপহার দিয়েছি।'

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নীল রঙের ঘোড়া' 'চতুর্মুখের আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এই নাটকের প্রযোজনায় কিমাত্ত ও বাস্তব মঞ্চরীতির মিশ্রিত প্রয়োগের নিরীক্ষা করা হয়েছে। নাট্যকার নাটকটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ "নাটকটির বিষয় বিপর্যস্ত আত্মার বিপন্ন শ্বাসকষ্ট। জীবনের এই দুরারোগ্য অসুখে অস্তিত্বের অভ্যন্তরে যে তীব্রতম দাহ, আর্তনাদ ও অস্থিরতা, নায়ক সোমনাথ চরিত্রে তা স্পষ্ট। লাভ, স্লিম, ভাইব্রেশন ; এই তিনের মিলিত আলোড়নে সোমনাথও অন্য সকলের মতো একটি উজ্জ্বল স্ফূর্ত জীবন চেয়েছিল। ক্রমশঃ এরা যখন তাকে ধীরে ধীরে ত্যাগ করে যেতে লাগলো, সোমনাথ অনুভব করলো তার আত্মা ব্যাধির মারাত্মক আক্রমণে পঙ্গু হোতে চলেছে। তাঁর স্বপ্নের নীল ঘোড়া তাঁকে ছেড়ে উপদ্রুত পদক্ষেপে তখন পলায়নমান। প্রেমহীনতা, বয়সের বিষণ্ণতা আর চতুর্দিকের স্তূপাকার বিমর্ষ বর্ণহীনতার মধ্য থেকে সে শেষ চীৎকার করে ওঠে— 'My blue horse! a horse, a horse, my kingdom for a horse:

নীল রঙের ঘোড়া'র পর অভিনীত হয় আর্থার মিলারের 'আফটার দি ফলে'র অনুপ্রেরণায় রচিত 'পতনের পর' নাটক। মানুষের নিজের তৈরী করা মিথ্যার ভিত্তি নিজেকে কেমন করে কিভাবে নষ্ট করে চলেছে তারই উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এই নাটক। ত্রিমাত্রিক মঞ্চরীতিতে অভিনীত হয় 'পতনের পর'। এই নাটকের দু-একটি সংলাপ তুলে ধরছি।......

'আমি আজ নিজেকেই বিশ্বাস করি না বিপাশা—বিশ্বাসবোধ আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে—তাই যে কোন প্রতিশ্রুতির কথা উচ্চারণ করতে গেলেই অবিশ্বাস আমার কন্ঠরোধ করে।'.........

'......আর তাই—তাই কি রোজ সকালে আমি শিশুর মতো জেগে এখনো বিশ্বাস করার চেষ্টা করি এই পৃথিবীকে আবার ভালবাসতে পারবো। কিন্তু বিশ্বাসেই কি পাওয়া যায়। কুহক জেনেও কি আমরা খুশী হয়ে ভাবি ঐ অভিশপ্তকে আমরা দেখেছি —কল্পনায় নয়, স্বপ্নে নয়—আঁকা গাছের ওপর মোমের ফল হাতে নিয়ে আদম কালেও নয়—মিথ্যার স্বর্গে—আর শুধু পতনের পর—তারপর—তারপর —মৃত্যু— অনেক মৃত্যু।'

'পতনের পর' নাটকটির সফল অভিনয়ের পর কয়েকটি সার্থক একাংকিকা নাটক অভিনীত হয়। নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে 'আজকের উত্তর', 'নবদূর্বাদল শ্যাম' 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে', 'সোনালী সকাল' প্রভৃতি। এইভাবে বলিষ্ঠ নাটক প্রযোজনা করে 'চতুর্মুখের শিল্পীরা ১৯৬৮র সীমারেখায় এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু একটা দুর্যোগ তখন এলো, নানা কারণে প্রচন্ড গতিতে চলার বেগ স্তিমিত হোল ; প্রতিহত হোল উদ্দীপনার জোয়ার। প্রায় এক বছর তাই 'চতুর্মুখ' নতুন নাটক উপহার দিতে পারলো না। যাই হোক আবার ১৯৬৯-এ অর্থাৎ চলতি বছরে মঞ্চসফল নাটক 'জনৈকের মৃত্যু' দিয়ে আবার পুনরুজ্জীবিত হোল 'চতুর্মুখ'। এবারে এঁদের আশা অনেক, পরিকল্পনা বিচিত্রমুখী।

'চতুর্মুখে'র আসন্ন প্রযোজনার মধ্যে রয়েছে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অথ মালতী বৃষভ কথা' (ব্রেখটের সেন্ট জন অফ স্টকইয়াড অনুপ্রাণিত), উৎপল দত্তের 'হিম্মৎবাই', অসীম চক্রবর্তীর 'আমি একা' (কামুর 'কালিগুলো' অনুপ্রাণিত)। সভ্যরা পরিকল্পনা নিয়েছেন ১৯৭০-এর মধ্যে এই তিনটি নাটকের প্রযোজনা শেষ করবেন। এই তিনটি নাটক নির্বাচন প্রসঙ্গে এঁরা বলেছেন ঃ 'সাধারণ মানুষ যদি সংখ্যায় অনেক হয়ে ঐক্যবদ্ধ হোতে পারত তবে শোষণ হয়তো চিরতরে লুপ্ত হোত। কিন্তু প্রধান অন্তরায় তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ। যদি বিশ্লেষণমূলক নাট্যরূপায়ণে এই বিচ্ছিন্নতাবোধক দর্শকদের সামনে সমালোচকের দৃষ্টিভংগিতে তুলে ধরা যায়, তবেই হয়তো তারা সহজ স্বাভাবিকভাবে মিলে শোষণ এবং বাইরে থেকে চাপানো যুদ্ধের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। 'চতুর্মুখ' নাটক যখন করে তখন এই ভেবেই করে যে দর্শকদের সামনে তার কিছু বলার আছে আর দর্শকদের কিছু শোনা দরকার।'

আজকের নাট্যগোষ্ঠী কিন্তু শুধু মাত্র মঞ্চের ওপর নাট্যশিল্পের চর্চা করেই ক্ষান্ত হবে না, একটি সুগভীর সামাজিক দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে। চতুর্মুখের সভ্যরা মনে করেন যে এখন সমাজে মানুষের মনে একটা frustration এসে গেছে—কেন frustration, কোথায় এর উৎস, কি ভাবে একে দূর করে মনকে সজীব করে তোলা যায়, তার আভাস নাটকেও ধ্বনিত করতে হবে, কেননা নাটক তো জীবনেরই এক শিল্পিত রূপ। এই প্রেক্ষাপটে চিন্তাকে সুগ্রোথিত করে 'চতুর্মুখের সভ্যরা উপরোক্ত তিনটি নাটক নির্বাচন করেছেন এবং এঁরা মনে করেন এই নাটক তিনটির মধ্য দিয়ে নতুন কিছু কথা বাংলাদেশের দর্শককে এঁরা শোনাতে পারবেন।

চতুর্মুখে'র সভ্যরা এবার সিরিয়াস নাট্যচর্চার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁদের এই ব্যাপক পরিকল্পনার মধ্যে বৃহৎ আকারের একটি আন্তর্জাতিক নাট্য-সম্মেলনের আয়োজন আছে। নাট্য নির্দেশক অসীম চক্রবর্তীর কাছে জেনেছি আগামী ১৯৭২ সালে এই নাট্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর চারদিকে আজ নাটক নিয়ে যে চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তার কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত কণিকা আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু তা সংহত হয়ে কোন পরিপূর্ণ বোধের জন্ম আজো দিতে পারেনি। এই আন্তর্জাতিক নাট্য-সম্মেলন বাংলা দেশের নাট্যানুরাগীদের বিশ্বের প্রতিটি প্রগতিশীল দেশের নাট্যচর্চার ধারার সঙ্গে আন্তরিকভাবে পরিচিত করাবে এবং সেই সূত্রে দেশের নাট্য ঐতিহ্যকেও নতুন গৌরবে বিভূষিত হয়ে ওঠার একটি উদ্দীপ্ত সুযোগ পাবে। 'চতুর্মুখে'র সভ্যরা ঠিক করেছেন এই নাট্যসম্মেলনে ১৮টি নাটক পরিবেশন করবেন, বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রখ্যাত নাট্যকারের নাটক পরিবেশিত হবে তাতে মূল নাটকেরই রূপ, রীতি, মেজাজকে অটুট রাখা হবে, আক্ষরিকভাবে শুধু অনূদিত হবে নাটক, এই রকম করার উদ্দেশ্য হোল মৌলিক নাটকটির সঙ্গে দর্শকের উপলব্ধির এক নিবিড় সেতুবন্ধন রচনা করা। এতে বাংলা ও সংস্কৃত ক্লাসিকাল নাটকও মঞ্চস্থ হবে বাংলা দেশে এই ধরণের ব্যাপক পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অভিনব। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ রূপ পেলে বাংলা নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হবে।

চতুর্মুখ' আজ যে সীমায় এসে পৌঁছেছে, সেখানে আসতে অনেক প্রতিবন্ধকতা পার হোতে হয়েছে একে। এই প্রসঙ্গে 'জনৈকের মৃত্যু' নাটকের একটি দিনের অভিনয়কে ঘিরে একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। মুক্তঅংগনে 'জনৈকের মৃত্যু' নাটক মঞ্চস্থ হবে। সব প্রস্তুত। হঠাৎ বিকেলের কিছু আগে শোনা গেলো 'মুক্ত-অংগনে'র দরজা বন্ধ। অর্থাৎ কি একটা গন্ডগোল থাকায় মালিক তাতে তালা বন্ধ করে চলে গিয়েছেন। এখন উপায়। অনেকে বললেন অভিনয় বন্ধ করে দিতে হবে। কিন্তু না, অভিনয় বন্ধ হোল না। চতুর্মুখের সভ্যদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নাটক করতেই হবে। 'মুক্ত-অংগনে'র বিপরীত দিকে একটি পেট্রোল পাম্পের কাছে একটি বিস্তৃত জায়গা ছিল। সেখানেই মঞ্চ তৈরী করা হোল, 'জনৈকের মৃত্যু' মঞ্চস্থ হোল সেখানেই, নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে। দর্শকরা অকুন্ঠ অভিনন্দন জানালেন 'চতুর্মুখে'র শিল্পীদের। বাংলা নাট্য-প্রযোজনার ইতিহাসে এমন ঘটনার নজীর খুব বেশী একটা চোখে পড়ে না।

তাই 'চতুর্মুখের প্রয়াস সম্পর্কে আমরা আশাবাদী। মন্মথ রায়ের আন্তরিক অভিনন্দন—'চতুর্মুখে'র নাট্যচর্চা মানের নবনব পরীক্ষা-নিরীক্ষা' উপলব্ধির আলোয় আরো দীপ্তি পেলে সামগ্রিকভাবে বাংলা নাটকই তাতে সমৃদ্ধতর হবে।

জলসা

রবীন্দ্রসদনে গীতবীথি পরিবেশিত শাপ মোচনে গৌর সেন ও কমলিকার ভূমিকায় নরেশকুমার এবং সুচন্দ্রমা।

গিরিজাশঙ্কর সংগীত সম্মেলন

চারজনের এক সংগীত সম্মেলনে বাংলার সংগীত অধ্যায়ের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগের শিল্পী ও সংগীতনায়ক গিরিজা-শঙ্কর চক্রবর্তীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাতরং সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তারা। স্থানীয় প্রধান শিল্পীদের প্রায় সকলেই এই সংগীতোৎসবে যোগদান করে শ্রীচক্রবর্তীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই আবার স্বর্গত গিরিজাবাবুর শিষ্য। দিল্লী থেকে শ্রীমতী নয়না দেবী এসেছিলেন। ইনিও গিরিজা-বাবুর শিষ্যা। কণ্ঠসংগীতের আসর মাত করে দিয়েছেন শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী। ইনি গেয়েছিলেন ৺সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সৃষ্ট 'নন্দকোষ' রাগ। বিলম্বিত, মধ্যলয় ও দ্রুতের সকল অঙ্গ স্বল্পপরিসরের মধ্যে শিল্পী-জনোচিত দক্ষতায় একাধারে যেমন ব্যঞ্জনাদীপ্ত হয়েছে তেমনই রসোচ্ছল তার তানবৈচিত্র্য। বোলতানের বাহার তথা গানের ভাবরূপের অপূর্ব উন্মোচন। কণ্ঠস্বরের শক্তি ও মাধুর্য ত আছে।

গিরিজা-শিষ্য সুখেন্দু গোস্বামীর "রাগেশ্রী"তে গুরুর গায়নশৈলীর উচ্চমান সুপ্রদর্শিত।

যামিনী গাঙ্গুলীর "বাহার" এর দ্রুত ও ঠুংরীর মাধুর্যে শিল্পীর উচ্চমান স্বাক্ষরিত। শ্রীমতী নয়না দেবীর দুটি ঠুংরী উপভোগ্যই হয়েছে। এ কাননের 'আভোগী'ও তাঁর সুনামে প্রতিষ্ঠিত। আতা হোসেনের শিষ্যা শ্রীমতী প্রকৃতি ভট্টাচার্য পরিবেশিত 'যোগ' সুবিন্যস্ত বিস্তার, তান এবং দ্রুতে শিক্ষা ও লয়-দক্ষতা প্রশংসনীয়। বীরেশ রায় সুকণ্ঠ। আর একটু গোছানো হলে এঁর অনুষ্ঠানকে নির্দ্বিধায় প্রশংসা করা যেত। মানস চক্রবর্তীর "আভোগী", তারাপদ চক্রবর্তীর শিক্ষা এবং শিল্পীর নিজস্ব রেওয়াজের এক প্রশংসাযোগ্য অনুষ্ঠান। আমিনুদ্দিন সাগারের ধ্রুপদ "দাগার" ঘরাণার বৈশিষ্ট্য পরিবেশিত হয়েছে। যন্ত্রসংগীতের প্রধান আকর্ষণ ছিল শিশিরকণা ধরচৌধুরীর বেহালা। ইনি বাজান 'মারুবেহাগ'। ধ্রুপদী আঙ্গিকের বিস্তৃত আলাপে প্রতিটি অঙ্গ শিল্পীর ধ্যানবৈভব ও মননশীলতায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গতের অঙ্গে বিভিন্ন তানের রকমারী ছন্দবৈচিত্র্য, সুকঠিন তেহাই এবং শক্তিশালী ছড়ের প্রতিটি টানে শুদ্ধ স্বরশ্রুতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভব আবেগ মিশে যে রসঘন পরিবেশ রচিত হয়েছিল তা অনেকদিন মনে থাকবে।

সংযত শিল্পীর প্রকাশাবেগ যেন আকুতি হয়ে উঠে প্রতিটি শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করেছে। মণিলাল নাগের 'যোগিয়া আশাবরী' এক সুখশ্রাব্য অনুষ্ঠান। গোকুল নাগের বিদেশী শিষ্য পিটার রো পরিবেশিত "বেহাগড়া"তে যন্ত্রের ওপর তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ রেওয়াজজাত দখলের পরিচয় ছিল তবে 'রাগবিশ্লেষণ' এখনও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারেনি। কথক নৃত্যে মায়া চট্টোপাধ্যায় ঠাট, ভাও, কধক-মধক, গৎ, টুকরোতে প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন . এবং চমকে দিয়েছেন সুরেলা ঠুংরী গেয়ে—যা এ নৃত্যের অঙ্গ হলেও সচরাচর শোনা যায় না।

গীতিবীথিকার 'শাপমোচন'

শ্রান্ত সৌন্দর্যের মোহমুক্ত অচঞ্চল অন্তরেই নিত্যনতুন, চিরপুরাতন জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব সম্ভব: দুঃখের আগুনে পুড়ে চিত্তশুদ্ধি না ঘটলে চিরসুন্দরকে পাওয়া যায় না। কবিগুরুর "শাপমোচন"-এর এই মর্মভাবের এক নৃত্যগীত রূপ রবীন্দ্র সদন মঞ্চে উপহার দিলেন গীত-বীথিকা প্রতিষ্ঠানের উৎসবকর্তারা.

পটভূমিকায় অরুণেশ্বরের বক্তব্য সংগীতরূপ পেয়েছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। বিরহাক্রান্তা কমলিকার গান এক করুণ কোমল রসমূর্তি লাভ করেছে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে। আর একটি প্রতিশ্রুতিদীপ্ত তরুণ কণ্ঠে "জাগরণে যায় বিভাবরী" গানটি সকলের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

শক্তি নাগ ও বকুল সেনগুপ্তের নৃত্য ও সংগীত-পরিচালনার গুণে, উপভোগ্য নৃত্যে চরিত্রগুলিকে সার্থক করে [illegible] অরুণেশ্বরের ভূমিকায় শক্তি নাগ, সৌর-সেনরূপী নরেশকুমার, কমলিকার চরিত্রে সুচন্দ্রমা। সখীদের মধ্যে যে বিশেষ একটি তরুণ শিল্পী নৃত্যলালিত্য ও সুষমায় আপনাকে সকলের গোচরে আনতে পেরেছেন তাঁর নাম পূর্ণিমা চট্টোপাধ্যায়। অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্যপাঠও প্রশংসার দাবী করতে পারে। নৃত্যোৎসব শুরু হয় শিশুশিল্পীদের নটরাজ বন্দনা দিয়ে। এ ছাড়া দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, গোরা সর্বাধিকারী, সুমিত্রা সেন ও কল্যাণী ঘোষের একক সংগীত আপনাপন যোগ্যতায় সকলকেই খুশী করেছে। তবে ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলার অভাবের জন্য প্রথমের দিকে দর্শকবৃন্দের বিরক্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেটা না ঘটলে আরো প্রাণ খুলে প্রশংসা করা যেত।

বিদেশ প্রত্যাগত ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ

পিতা ও গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে আলি আকবর খাঁ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ২০শে সেপ্টেম্বর কোলকাতায় এসে পৌঁছান এবং পরের দিনই মাইহার যাত্রা করেন।

মাইহার থেকে ফিরে আসার পর খাঁ সাহেবের কাছে জানা গেল আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ।

আমেরিকায় আলি আকবর কলেজের শাখায় প্রতি গ্রীষ্মে ১২০ জন করে শিষ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের ভারতীয় সংগীতশিক্ষায় অগ্রগতি লক্ষ্য করবার মত। উপস্থিত ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য ও আশীস খাঁর ওপর শিক্ষার ভার দিয়ে তিনি এসেছেন। অন্যান্য ছাত্র এবং শিক্ষকরা এঁদের সাহায্য করবেন।

—চিত্রাঙ্গদা

বিতর্কিত আলোচনা

(১৫)

'জীবনকে অনুবীক্ষণের তলায় পরীক্ষা করলে ভয়াবহ মনে হতে পারে...কিন্তু জীবনের আসল কথা হল প্রেম।'

সারানুবাদ (চ্যাপলিন)

খোসলা কমিটির মতামতের পর চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা নিয়ে কাগজে, বেতারে প্রখ্যাতদের পক্ষে বিপক্ষে বহু যুক্তি পাওয়া গেছে। তবু সামগ্রিক আলোচনার অভাব বোধ হয়েছে।

প্রথা হিসাবে চুম্বন খুবই প্রাচীন জিনিষ। পৃথিবীর আদি ও জীবনের প্রথম চুম্বন অবশ্যই অবিস্মরণীয়। যতদিন জীবন থাকবে এবং বিধাতাপুরুষ ভালোবাসার প্রক্রিয়ার বিশেষ পরিবর্তন না ঘটাবেন, দুটি ঈষৎ কম্পিত, উষ্ণ হৃদয়ের অব্যক্ত ভাষা হিসাবে চুম্বন অনবদ্য অনুভূতি হয়ে থাকবে।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে এই প্রথার আবির্ভাব হবার আগে ভারতীয় মন ও মানের বিচার প্রয়োজন। বিচারের জন্য তিনটি মূল বিষয় বিচার্য—(১) বেশ, (২) বিবাহপ্রথা, (৩) সঙ্গীত।।

(১) বেশঃ—চুম্বনের সঙ্গে নারী বস্ত্র দেখেই ভারতীয় নারীদের শাড়ি নিয়েই বলা যাক। শাড়ি জিনিষটা তিন হাত না হয়ে দশ হাত হল কেন? প্রথমত কৌলীন্যরক্ষা, দ্বিতীয়ত দেহ জিনিষটায় (স্তরে স্তরে দেহের খুব নতুনত্ব নেই দেখেই) রহস্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা। এক দেহ, কিন্তু ভিন্ন রং, ঢং ও লালিত্য; ভিন্ন রুচি, প্রকাশ, ব্যক্তিত্ব। পশ্চিম জগত যতই বুক থেকে এবং জঙ্ঘা থেকে আবরণ সরিয়ে দেহকে প্রকাশ করছে, আমরা প্রথমে, অতি পুলকিত হলেও এখন দেখছি যেন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যান্ত্রিক পুতুলের মিছিল। যেমন হয়ে থাকে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায়।

কিন্তু ভারতীয় মন জানে, ক্ষণিক দর্শনে আসে অনুভূতি, বিস্ময় ও রোমাঞ্চ। অতিরিক্ত দর্শনে আসে অতিরিক্ত আগ্রহ ও পরে ক্লান্তিকর বিরক্তি, অবসাদ। ভারতীয় কিশোর বা কিশোরীর মনে বাল্যকাল থেকে যে রহস্যের জন্ম তা যৌবন পর্যন্ত ঘিরে রাখে, (আমি অতিরিক্ত গোঁড়ামির কথা বলছি না, ওটা ব্যতিক্রম) এক অদ্ভুত মাধুর্যে। এই মাধুর্য সমাজজীবনের বিরাট শক্তি। আজ পশ্চিম দুনিয়ায় স্ত্রী-পুরুষ এই মাধুর্য উপলব্ধির শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, তাই চলছে অবারিত 'ম্যারিয়ুয়ানা'র স্রোত, নিদ্রার ওষুধের প্রয়োগে আত্মহনন, স্নায়বিক স্পন্দন, আর বিবাহ বিচ্ছেদের মেলা।

(২) যৌবনে পৌঁছে মনকে ভারত বেঁধেছে গার্হস্থ্যে অপূর্ব বিবাহপ্রথায়। অচেনা, অজানা দুটি মন বিবাহের ভেতর দিয়ে নিবিড় অবলম্বনের পথে যাত্রা সুরু করে। বেদমন্ত্র পাঠ, সাত-পাক ঘুরে এসে মিলন হয় চোখে চোখে। কারণ—

'The eye is the most spiritual portion of the body".

গ্রামের লোক বলে দুহাত চারহাত হল। তারপর রঙ্গ রসিকতা, বন্ধু-আত্মীয়-বান্ধবের মাঝখানে কিঞ্চিৎ হাসি-ঠাট্টায় কিছু কাছে আসা, ধীরে ধীরে যৌন চেতনাকে সইয়ে নিয়ে রাত গভীরে রাগিণীর আলাপ সাক্ষী করে কুসুমের আঘ্রাণে দম্পতির প্রথম অসংলগ্ন আলাপ...মনের হাত ধরে দেহের দরজায় প্রথম আঘাত—ভারতীয় প্রথা প্রমাণ করে যে দেহকাতরতা, লালসা একমাত্র সত্য নয়—মন ছাড়া লালসা অসুস্থ স্থবির প্রলাপ মাত্র। এখানেও ভারতীয় চেতনা সেই সত্যই মানছে যে দেহ বৈচিত্র্যময় নয়, মনই বিচিত্র, তার দাক্ষিণ্য ছাড়া 'দেহপট' মিথ্যা জঞ্জাল।

(৩) এই একই ভাবকে অতি সূক্ষ্মভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সঙ্গীতে। সঙ্গীত অনুভূতির অঙ্গ হিসাবে শৃঙ্গার-রসকে অস্বীকার করেনি, করেছে লালসাকে। পূর্বরাগ - অনুরাগ - কাতর - রাধিকাকে সঙ্গীতের চেতনা 'প্রজাপতির' পাখার মত খণ্ড-বিখণ্ড করে বিচার করেনি। বিরহ, অভিসার, দাদুরী, হতাশা, মেঘ, দর্শন, মান ও মানভঞ্জনের শেষে রাধাকৃষ্ণ মিলন, তবু সে মিলন বিচ্ছেদের ভূমিকা। রাধার দেহলতা ও গোপিনীদের দেহবল্লরীতে তফাৎ নেই, তফাৎ প্রাণের আকুলতায়, যে আকুলতার নিশ্চিন্ত আশ্রয় কৃষ্ণ। ভারতীয় সঙ্গীত মানবপ্রেমের সূক্ষ্ম ধারক ও বাহক হয়েও শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। রাধার বক্ষে কৃষ্ণের নখরের আঘাতে সঙ্গীত আগ্রহী নয়, বক্ষের গভীর বেদনা অনুভূতিলোকে তার গতি।

এই হল ভারতীয় চেতনা—যা দেহকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু দেহের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে অসীমতায় নিতে চেয়েছে। বড় দুঃসাহসী এই যাত্রা। সে জানে অধরের স্পর্শ দেয় এক অব্যক্ত বোধ যার বাইরে যেতে চায় মানুষ, সে জানে দেহের মিলনের অন্তিম মুহূর্তে কি সে বোধ যা, স্ত্রী পুরুষের লৌকিক সংজ্ঞা ঘুচিয়ে দেয়। দর্শন এখানে সুরু, ব্যবহারিক জগৎ শেষ। এই চিরন্তন রহস্যকে জানতে পেরেছে দেখেই ভারতবর্ষের কাছে দেহ প্রয়োজন, কিন্তু শেষ কথা নয়। দেহের মিলন একটি ব্যক্তিগত প্রথা, চুম্বন যার প্রাথমিক ভিত্তি।

কথা হল, চুম্বন বা নগ্নদেহ জৈবিক ব্যাপারের তাগিদে, না অনুভূতির অঙ্গ হিসাবে। তার চাইতেও বড় কথা হল, ভারতীয় চলচ্চিত্র ভারতীয় মনকে প্রকাশ করবে কিনা। যদি করে তাহলে স্বীকার করতে হবে ভারতীয় মন অনুভূতির ওপর আস্থাশীল এবং সেইহেতু নগ্নতা ও চুম্বন অবধারিত অঙ্গ কিনা। ভালোবাসার অর্থ এই নয় যে যুবকের কলজেটা হাতে করে প্রেমিক এসে প্রেমের নিকুঞ্জে অপেক্ষা করবেন। চুম্বন নগ্নতা বা কামকেলীকে ভারতবর্ষ অত্যন্ত মধুর ব্যক্তিগত কল্পনা ও প্রশ্রয় বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এটা একান্তভাবে দুটি মানুষের, দুটি জীবনের সত্তার আলাপ। উপসংহারে এটাই একটি তৃতীয় কোমল নিষ্পাপ প্রাণের অপেক্ষা। এ তো জনতার নয়, ব্যক্তির, তা না হলে ঠুংরী গানে রাধিকা বলবে কেন—

'হে কৃষ্ণ তুমি লোকসমুখে রং দিয়ে
শাড়ী ভিজিয়ে প্রেম জাহির কোরোনা,
আমাকে হৃদয়ে রাখ'' (অনুবাদ)

তাই, ভারতীয় নারী-পুরুষের চোখ অনাদি কাল থেকে কথা বলেছে, কিশোরের হাতের ছোঁয়া কিশোরীর প্রাণে প্লাবন এনেছে যুগ যুগে। এ সুক্ষ্মতা এশিয়া ভূখণ্ডের গর্ব, ভারত তার প্রাণকেন্দ্র।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বনের অভাব এই প্রমাণ করে না যে ভারতবর্ষ প্রেম বা যৌনবোধ সম্পর্কে উদাসীন, জীবনকে অবহেলা করে ভারতবাসী (হায় জনসংখ্যা) বা যৌনরহস্যের ইঙ্গিতে ভারত অজ্ঞ। আসলে ভারত ইঙ্গিতপ্রিয় দেশ। যৌনতত্ত্ব নিয়ে সে যখন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নেমেছে, আমরা পেয়েছি বাৎস্যায়নকে। যৌনমিলনের শিল্পে, বৈচিত্র্যে কালজয়ী জীবনবেদ সৃষ্টি হয়েছে 'কোনারকে', সৃষ্টিতত্ত্ব সন্ধান করতে গিয়ে দান করেছে, শিবলিঙ্গ, ধ্বংসের উগ্ররূপ সৃষ্টি করেছে ছিন্নমস্তা রূপ। তবু করোটির মালা আবৃত করেছে জননীর মহাযোনি, আর প্রকৃতি তুষারস্তূপে উপহার দিয়েছে অমরনাথের শিবলিঙ্গ।

ভারতীয় পরিচালকদের এটুকু মনে রাখা দরকার যে দেখাদেখি দূরে থাক, ভারতের গ্রামবাসীদের নৈতিকবোধ এত তীব্র যে বেশ্যাবৃত্তি নিয়ে গান রচনা করে গেছে, একটি অশ্লীল পদও সৃষ্টি না করে। তারা জানে আমের রূপ আঁটিতে নয়, রসে নয়, জিহ্বায় নয়, আম্রকল বৃক্ষেই যোজন, বৃক্ষেই তার রূপ। ভারতীয় দর্শন উপেক্ষা ক'রে ভারতীয় মনের প্রতিফলন সম্ভব নয় ছবিতে, আর সেইহেতু 'ভারতীয়' চলচ্চিত্র সম্ভব নয় মহৎ সৃষ্টি দূরের কথা। কারণ মহৎ সৃষ্টি করতে গিয়ে চুম্বন বা নগ্নতার অভাব তো আছেই।

বিশেষ পরিস্থিতিতে সবই সম্ভব (যেমন দুর্ভিক্ষের চিত্রে) বিশেষ মাত্রাবোধ রেখে। মাত্রাবোধ মানবে কে? শিক্ষিত পরিচালক ছাড়া কে নগ্নতা রক্ষা করবেন? আর শিক্ষিত পরিচালক হলে ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই দুটি জিনিষের প্রয়োজন কোথায়? তিনি তো অনুভূতি সৃষ্টি করবেন। কি সে অনুভূতি? যে অনুভূতি দিয়েছে আমাদের পথের পাঁচালী, জলসাঘর, অপুর সংসার, অযান্ত্রিক, সমাপ্তি চারুলতা বা সুবর্ণ-রেখা। অন্তত জলসাঘর, অপুর সংসার, সমাপ্তি, চারুলতা বা সুবর্ণরেখায় চুম্বন ও নগ্নতার উপস্থিতি কি সম্ভব ছিল না?

—সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, আড়িয়েদহ

(১৬)

ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটির রিপোর্টে চুম্বন ও নগ্নতার সমর্থন যে-ব্যাখ্যায় সূচিত হয়েছে, তা অবশ্যই অভিনন্দনীয় এ-দেশীয় পরিপ্রেক্ষিতে।

গল্পে উপন্যাসে চুম্বন কথাটা নিষিদ্ধ নয়। রসিয়ে রসিয়ে লেখক গল্প জমিয়ে তোলেন নায়ক-নায়িকার দেহ বর্ণনা থেকে শুরু করে রতিবিলাস পর্যন্ত সবিস্তার প্রসঙ্গ তুলে। অধরে অধরে ঘর্ষণ, চুম্বনের চূড়ান্ত—সবই লেখনীচিত্রে ফুটিয়ে তুলুন আপত্তি নেই—যত আপত্তি ছবিতে মানে ছায়াছবিতে ওসব দেখালেই। মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যে চুম্বনের অধিবেশন দেখলেও ক্ষতি নেই, ক্ষতি নেই চিত্রাঙ্কনেও সে-দৃশ্য দেখার, ক্ষতি শুধু ছায়াচিত্রে ওটুকু প্রত্যক্ষ করার। এ-দেশের মাটিতে বসেই বিদেশী ছায়াছবিতে চুম্বনের ঘনঘটা দেখতে কোন বাধা নেই, কিন্তু এ-দেশীয় ছায়াচিত্রে অমন কাণ্ডটা ঘটলে অশুদ্ধ হয়ে যায় গোটা মহা-ভারতখানিই। আজব কথা নয় কি?

প্রণয়াভিসার দৃশ্যে ঘন আলিঙ্গনবদ্ধ নায়ক-নায়িকাকে তুলে ধরার রেওয়াজ যখন হামেশাই দেখি ছবির পর্দায়, তখন চুম্বন দৃশ্যটুকু পরিহার করার জোরদার যুক্তিই বা কোথায়? জীবনের রূপারোপ যখন চলচ্চিত্রের অন্যতম লক্ষ্য, তখন চুম্বনকে বর্জন করে কতখানি বাস্তবতা রক্ষা পায় তাও একটা প্রশ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে বৈকি!

আসল কথা হল 'মোটিভ'। বিশেষ মোটিভ নিয়ে যে-কোন শিল্পমাধ্যমেই নগ্নতা ও যৌনাচার যদি সোচ্চার হয়ে ওঠে, তবে তা নিন্দনীয় অবশ্যই। কারণ সেখানে তা শিল্পের প্রয়োজনে প্রযুক্ত নয়, সাধারণকে আকর্ষণ করার এক অপ-কৌশলেই তা ব্যবহৃত। তাই পর্ণোগ্রাফী কখনো সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে ওঠে না।

এদেশে বিগতকালে স্বনামধন্য চল-চ্চিত্রকার প্রমথেশ বড়ুয়া 'মুক্তি' 'অধিকার' প্রভৃতি নিউ থিয়েটার্স চিত্রে যেসব নগ্ন ও যৌন দৃশ্যের শিল্পসম্মত প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন, তা বাস্তবিকই উচ্চ প্রশংস-নীয়। সেকালে বড়ুয়া সাহেবের বৈপ্লবিক শিল্প-চেতনা বারে বারে এদেশীয় গোঁড়ামিকে আঘাত করেছিল যে দুঃসাহসে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। 'মুক্তি' ছবির সেই অর্ধনগ্ন মডেলের ক্লোজ-আপ, 'অধিকার' ছবিতে আলিঙ্গন দৃশ্যের বিগ্-ক্লোজ, বস্তীবাসী তরুণীর মুখের সংলাপ —'বল তুমি আমায় চুমু খাওনি?'— একাধিকবার উচ্চকিত করে শোনানো ইত্যাদি সেই ত্রিশ দশকে অসমসাহসিক ছিল নিঃসন্দেহে। লক্ষণীয় এই যে, এসব দৃশ্যের ব্যবহার ছিল নিতান্তই কাহিনীর প্রয়োজনে যা শৈল্পিক সুষমায় অভি-ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল প্রমথেশের শিল্প-মনীষার প্রভাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য পরিচালক এ-ব্যাপারে তাঁকে অনু-সরণ করতে গিয়ে শুধু ব্যর্থতার পরিচয়ই দিয়েছেন। নগ্নতার প্রয়োগ তাঁদের ছবিতে সেই শিল্পমানে কখনো উত্তীর্ণ হতে পারেনি, পরন্তু শুধু আবিলতার সৃষ্টিই করেছে। আর আজ তো নগ্নদৃশ্যের ব্যবহার একটা সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এখন নগ্নতা দেখানোর জন্যই নগ্নদৃশ্যের ব্যবহার, শিল্পের প্রয়োজনে নয়। তবু চুম্বন দৃশ্য এদেশে নৈব নৈব চ!...

আমার তাই মনে হয় চুম্বন ও নগ্ন দৃশ্য সিনেমা-শিল্পের প্রয়োজনে নিশ্চয়ই থাকা উচিত।

ফিল্ম সেন্সর বোর্ডই নিরপেক্ষ বিচারে রায় দেবেন, কোন্ ক্ষেত্রে বিধির অপপ্রয়োগ হচ্ছে এবং তা কাঁচি দিয়ে উড়িয়ে দিতেও দ্বিধা করবেন না—এটাই তো কাম্য। শুধু চুম্বন দৃশ্য বলে কথা নয়, যে-কোন নগ্ন বা যৌনদৃশ্য চলচ্চিত্রধর্মে ও ঘটনা-বিন্যাসের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তাও লক্ষ্য রাখা বোর্ডের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। কিন্তু বোর্ড যদি কর্তব্যে অবহেলা করেন, কোনভাবে যদি প্রভাবিত হয়ে পড়েন এই আশংকায় করণীয়টুকু বাতিল করে দিতে হবে—এ কেমন কথা? বিচারক সুবিচার করবে না বলে বিচার্য-বিষয়ের গুরুত্ব নিশ্চয়ই হ্রাস পায় না। এক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে বোর্ড আপন কর্তব্যে অবিচল থাকতে পারেন, সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারেন, কোন-ভাবে বিক্রীত না হয়ে পড়েন! এদিকেই মনোযোগ দিতে হবে সরকারী ও সিনেমার অধিকর্তাদের, শৈল্পিক প্রয়োজনে বাঞ্ছিত চুম্বন ও নগ্নতা-দৃশ্যের পরিহারের দিকে নয়!...

সমর বন্দ্যোপাধ্যায়
বেলুড়, হাওড়া

(১৭)

কিছু ব্যক্তি ছায়াছবিতে চুম্বন ও নগ্নতার বিরোধিতা করছেন। তাঁদের মোটামুটি বক্তব্য, ভারতের যে সুমহান সংস্কৃতি রয়েছে, তার মধ্যে এইভাবে যৌন আবেদন আমদানি করলে সেটার ভিত নড়ে উঠবে, এবং তার ফলস্বরূপ সমাজের স্তরে স্তরে পঙ্কিলতার ঘুণ ধরে যাবে।

আমার বক্তব্য তথাকথিত সেই সব ব্যক্তির উদ্দেশ্যে। ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমিও সচেতন। কিন্তু সংস্কৃতি কি কতকগুলো কুসংস্কারের মধ্যেই নিহিত থাকে? ভারতের সংস্কৃতির ঐতিহ্য কিন্তু সংস্কারমুক্ত মনেরই স্বচ্ছ প্রকাশ। সেখানে সংকীর্ণতার নামমাত্র লেশ নেই। সেই সুমহান সংস্কৃতির অধিকারী হয়ে আমরা কুসংস্কারবশত ছায়াছবিতে চুম্বন ও নগ্নতার প্রচলনকে কেন নোংরা বলে অভিহিত করে দূরে সরিয়ে রাখব?

আজকাল হিন্দী ছবিতে অর্ধউলঙ্গ অবস্থায় বীভৎস কামনার যে রূপ প্রদর্শিত হচ্ছে এবং যে চেতনা আমাদের সত্তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে, পূর্ণ নগ্নতার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই বিপদ কাটিয়ে উঠব বলে আমার বিশ্বাস। অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থা পূর্ণ নগ্নতার চেয়ে বিপজ্জনক এবং উত্তেজক—এই সত্যকে স্বীকৃতি দিতে গেলে ছায়াছবিতে নগ্নতার প্রচলনকে সাদরভাবে অভ্যর্থনা করা যেতে পারে। এবং কোন সুস্থ মানুষেরই এর বিরুদ্ধে কোন বক্তব্য থাকতে পারে না।

উপরন্তু শিল্প হিসাবে চলচ্চিত্র জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক রূপকে প্রকাশ করবে, এটাই প্রত্যেকের কাম্য। শিল্পে চুম্বন ও নগ্নতাকে ভারতের সংস্কৃতি উদার মনে গ্রহণ করেছে। এখানেও (চলচ্চিত্রশিল্পেও) কোন দ্বিধা থাকতে পারে না। তবে দেখতে হবে যে নগ্নতা ও চুম্বন শিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শন স্বরূপ যেন ব্যবহৃত হয়—সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর কাহিনীর মত ওর প্রকাশ যেন সুস্থ মনের বিরোধী না হয়ে ওঠে।

—দেবব্রত বসু,
কোকাভেল কলোনী, দুর্গাপুর।

(১৮)

বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃতে' (১২ই ভাদ্র) বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত বিতর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে চুম্বন ও নগ্নতা সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী আলোচনার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।

খোসলা কমিটির এই ধরনের রুচিহীন সুপারিশের জন্য আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। চুম্বন ও নগ্ন দৃশ্য সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সমাজ ক্রমশ অধঃপাতের দিকে এগিয়ে চলেছে। যদি আবার তার ওপর থেকে বিধি-নিষেধ তুলে নেওয়া হয় তবে সমাজের অসুস্থতা বাড়বে বৈ কমবে না। আদিরসাত্মক যৌনদৃশ্য এবং চুম্বন যে আমাদের সামাজিক কাঠামোয় ঘুন ধরাতে কি পরিমাণ সাহায্য করবে তা ভাবতেও বিভীষিকা লাগে। ঐ ভয়ংকর কু-রুচিকর প্রস্তাব বাংলা তো নয়ই ভারতের শিল্প-কলারও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। আজকের বিষবৃক্ষ আমাদের ভুলে সযত্নে রোপিত হলে তার বিষময় ফল আমাদেরই ভক্ষণ করতে হবে। সুতরাং সেন্সর বোর্ড কর্তৃক খোসলা কমিটির এই সুপারিশ গৃহীত না হওয়াই উচিত।

ছবি রায়
রাউতড়া, হাওড়া।

প্রেক্ষাগৃহ

যাত্রায় আধুনিকতা

রবীন্দ্র সদনে যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে পুরো ষোলটি আসরের মাধ্যমে। পুরোপুরির ষোলটি আসরে উপস্থিত থাকবার মতো সময় আজকের দিনে খুব কম যাত্রা রসিকেরই হাতে আছে। তবে ওরই মধ্যে দু'পাঁচটি আসরে বেছে বেছে উপস্থিত হলেই কারুর বুঝতে বাকী থাকে না যে, আমাদের পেশাদার যাত্রাদলগুলিও করণে-কারণে, ধরণে-ধারণে আধুনিক হবার ত্রুটি করছে না। ধরুন, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে আমরা দু'দিন আগেও দেখতুম, সোনাই দীঘি, বাঙালী, সাধক রামপ্রসাদ গোছের নাটক। আর আজ দেখছি কিনা হিটলার, রাইফেল, মাস্টারদা, বিনয়-বাদল-দীনেশ, ফাঁসীর মঞ্চে, বারুদ, মরেও যারা মরে না, আন্দোলন, দিগ্বিজয়, মাইকেল মধুসূদন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নাটক। প্রায় প্রতিটি নাটকে আজ প্রধান সুর হচ্ছে জনতার জয়গান, কৃষক-শ্রমিকদের একতাবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তির কথা। নাটকের উপস্থাপনাতেও আজ যাত্রা এগিয়ে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, যন্ত্রী দলের উপস্থিতি সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি দল টেপ রেকর্ড ব্যবহার করছেন বহু রকম 'এফেকট সাউন্ড' অর্থাৎ আবহসৃষ্টিকারী ধ্বনিকে নাটকীয়ভাবে কাজে লাগাবার জন্যে। যেখানে ইলেকট্রিসিটি ব্যবহারের সুযোগ আছে, সেখানে কোনো কোনো দল আলোর কমবেশী করে মুড সৃষ্টির প্রয়াসী হচ্ছেন, মুখচোখের এক্সপ্রেসানকে দর্শকচক্ষে প্রকট করবার জন্যে ফোকাসের ব্যবহারও বাদ যাচ্ছে না। এর পরে আছে শিল্পী নির্বাচন। আজ যাত্রাকে জাতে তোলবার জন্যে কমল মিত্র থেকে শুরু করে মহেন্দ্র গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য, দীপক মুখোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, শিপ্রা মিত্র, ইরা চক্রবর্তী পর্যন্ত মঞ্চ-শিল্পীদের দলভুক্ত করা হয়েছে। এ-ছাড়া যাঁরা পুরোনো নামকরা যাত্রাশিল্পী, তাঁদেরও অনেককেই দেখছি পুরোনো স্টাইলকে দূরে রেখে নতুন অভিনয়-পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। ভারতী অপেরার সুজিত পাঠককে দেখা গেল, মৃত্যুঞ্জয় সূর্য সেন-এ মাস্টারদার ভূমিকায় একেবারে সুরবর্জিত বাস্তব অভিনয় করতে এবং দেখে আনন্দ হ'ল। আবার কাউকে কাউকে দেখলুম, সুর বর্জনের চেষ্টা করেও পুরো সফল হতে পারছেন না এবং এই দলের শিল্পীই বেশী। বরং বলব, অভিনেত্রীরা এ বিষয়ে ঢের বেশী আন্তরিকতা দেখিয়েছেন এবং তাঁরা ক্রমেই যাত্রা দলের বিশিষ্ট আকর্ষণ হয়ে উঠছেন।

কিন্তু অভিযোগ আছে। কয়েকটি পালা দেখলুম, যেখানে কৃষক সমাজ বা সাঁওতালদের নিয়ে কাল্পনিক কাহিনী খাড়া করা হয়েছে বেশীর ভাগই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের। সেখানে ধনী জমিদার, বাংলার নবাব, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাহেব, পুলিশ প্রভৃতিকে জড়ো করা হয়েছে। কৃষক বা সাঁওতাল নায়ক খুব লম্ফ-ঝম্প করছে সবই মুখে, কিন্তু কাজে দেখা যাচ্ছে ইংরেজের বা পুলিশের অত্যাচার যখন তাদের পদদলিত করছে, তখন তারা ঈশ্বরের, খোদার বা কালীর দোহাই পাড়ছে, লাঠি ধরে বা গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে না। ফলে সমস্ত কাহিনীটাই অবাস্তব ও হাস্যকর হয়ে উঠছে। কাজেই এ রকম কাহিনী অবলম্বনে গঠিত নাটক ও তার অভিনয় আজকের বিদগ্ধ দর্শককে কোনো মতেই খুশী করতে পারছে না। যাত্রাকে আধুনিক ছাঁচে ঢেলে বিদ্বজ্জনের দর্শন-যোগ্য ক'রে তুলতে হ'লে কাহিনীকে বিশ্বাস্য করে তুলতে হবে, প্রতিটি চরিত্র ও পরিস্থিতিকে যুক্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে।

মাও ও মেয়ে। মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় এবং সন্ধ্যারাণী। ফটো : অমৃত

নতুন ছবি

সম্প্রতি ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিও[য়] নবগঠিত জয়েন ফিল্মসের প্রথম চিত্রপ্র[য়াস] 'প্রতিজ্ঞা'র শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে[।] সন্দেহ, সংশয় এবং রহস্যমূলক এ[ক] কাহিনীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এ[ই] 'প্রতিজ্ঞা'। শ্রীআর বি মেহতা ক্ল্যাপস্টি[ক] দিয়ে মহরৎ অনুষ্ঠান শুরু করেন। বাস[বী] নন্দী এবং তরুণকুমারকে নিয়ে ছবির প্রথ[ম] দৃশ্য গ্রহণ করেন ছবিটির পরিচালকগোষ্ঠী চিত্রদূত। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে সুনীল চক্রবর্তী অমিয় মুখার্জি ও বিজয় বসু। বাস[বী] নন্দী ও তরুণকুমার ছাড়া শ্যামল ঘোষা[ল] অমর মুখার্জি, নবাগত তৃপ্তিকুমার এ[বং] উপেন্দ্র ছবিটির অন্যান্য চরিত্রে অভিন[য়] করেন। ১ অকটোবর থেকে ছবিটির নি[য়]মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হচ্ছে।

পরিচালক ভূপেন রায় তাঁর পরবর্তী ছবি 'শচীমা'র সংসার'-এর চিত্রগ্রহণ ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। মালবিকা চিত্র নিবেদিত ছবিটির একটানা কুড়ি দিনের সুটিং-এ যাঁরা অংশ গ্রহণ করছেন তাঁরা হলেন : নিমাই—অসীমকুমার, নিতাই—দিলীপ রায়, শচীমাতা—সন্ধ্যারাণী, অদ্বৈতাচার্য—মিহির ভট্টাচার্য, শ্রীবাস—শঙ্কর-নারায়ণ, ঈষাণ—জহর রায়, মালিনী—শমিতা বিশ্বাস, হরিমালী—তরুণকুমার, লক্ষ্মীপ্রিয়া—নবাগতা সংহিতা রায়। ছবিটির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অনন্ত চ্যাটার্জি। মানবেন্দ্র মুখার্জি ছবিটির সুর-কার। সম্প্রতি ছবিটির গানগুলি রেকর্ড করা হয়েছে। গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখার্জি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, প্রতিমা ব্যানার্জি, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, শ্যামলী মুখার্জি, শিপ্রা পালিত ও বত্না রায়। ছবিটির চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে ননী দাস ও অময় মুখার্জি। এস কে ফিল্মস ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

মঙ্গল চক্রবর্তী রচিত-পরিচালিত ইউ-নাইট প্রোডাকসন্স অব ইন্ডিয়ার প্রথম ছবি 'আলেয়ার আলো'র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ। বর্তমানে সম্পাদনা চলছে। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। চরিত্র চিত্রণে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সন্ধ্যা-রাণী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, বনানী চৌধুরী, সাধনা রায়চৌধুরী, জোছনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বারিপদা, ধানবাদ ও বাজাউলি ফরেস্টের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে ভরপুর এই ধারার ছবিটির চিত্র-গ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও বিশ্বনাথ নায়ক। বি পি পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

কিছুদিন আগে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরে-টরীতে রূপশ্রী চিত্রমের প্রথম নিবেদন 'ত্রিনয়নী মা' ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করা হলো। সংগীত পরিচালক অনিল বাগচীর সুরে শ্যামল গুপ্ত রচিত গান-গুলিতে গেয়েছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ঋষিকেশ বন্দ্যো-প্রযোজিত ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পরিচালনায় আছেন পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। চিত্র গ্রহণ ও সম্পা-দনায় আছেন যথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মুখোপাধ্যায়।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে আরেকটি ছবির সঙ্গীত গ্রহণ করা হোল। সেটি হচ্ছে এস এম মুভি-টোনের প্রথম নিবেদন 'অরণ্যকন্যা'। নতুন সংগীত পরিচালক দিলীপ ঘটকের সুরে গান গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেনগুপ্ত। অরণ্যের পটভূমিকায় নতুন আঙ্গিকের এই ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন—সুশীল ঘোষ। শুনেছি অনেক নতুন মুখ আসছে ছবিটায়। পরিচালক শ্রীঘোষ শিগগিরই কলাকুশলীদের নিয়ে বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য রওনা হচ্ছেন।

স্টুডিও থেকে

ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্ত ক্রেণের ওপর ক্যামেরা নিয়ে বসে। সামনে ক্লোজ ফ্রেমে রয়েছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। চিন্তান্বিত মুখে কিছুক্ষণ ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে ড্রয়ার থেকে কাগজ বের করে কি যেন লিখতে শুরু করলেন। অমনি ডান-দিকের খোলা দরজায় চোখ যেতেই উঠে পড়লেন তিনি! জোর পায়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

ক্রেণ ওপরে উঠে গেল। টপ করে দরজার কাছে অনিলবাবু, দরজা বন্ধ করে ওখানে দাঁড়িয়েই সিগারেট ধরালেন। এবার ধীর পায়ে টেবিলের দিকে আসতে লাগলেন। ক্রেণও আস্তে আস্তে নামতে লাগল। অনিল বাবু টেবিলে এসে বসতেই ক্যামেরা স্থির হলো ফ্রেমে।

দু তিনটে কাগজে পর পর কিছু লিখে ফেলে দিলেন আবার। একটা চিন্তামাখা বিরক্তির ছাপ দেখা গেল অনিলবাবুর চোখে মুখে। ধাৎ বলে এক টান দিলেন মুখের সিগারেটে। পরিচালক নির্মল মিত্রের নির্দেশে এই দৃশ্য গ্রহণের ছেদ পড়ল এখানেই।

একটানা এত বড় শট টেকিং সচরাচর চোখে পড়ে না। শুধু একটা আকর্ষণীয় ক্যামেরার এমন বিচিত্র গতি। জিজ্ঞেস করে জেনেছি নায়কের (অনিলবাবুর) মানসিক অস্থিরতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই নাকি ক্যামেরার এই ডন-বৈঠক। হয়তো এই লম্বা দৃশ্যের মাঝে দু একটা ক্লোজ শট ইনসার্ট করা হবে, এবং ফলে নায়কের ইনকুইস-স্টেন্সি ধরা পড়বে পর্দায়। দর্শকরাও একাকার হয়ে যাবেন হয়তো চরিত্রের সঙ্গে।

এ দৃশ্যের টেকিং দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল ক্যামেরা আজকাল অভিনয়কে কত প্রাণবন্তই না করে দিয়েছে! ক্যামেরার বিচিত্র দিকে বিভিন্ন গতি অভিনয় শিল্পকে আজ অনেক সরল করেছে। কুড়ি বছর আগে এমনটি ছিল না। রীতিমত কসরৎ করতে হতো তখন।

তবে একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যান্ত্রিক কৌশল যেমন অভিনয়কে প্রাণ-বন্ত করেছে, আজকের অভিনয়কলাও আগের দিনের চাইতে অনেক বেশী এগিয়েছে। এ নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু অভিনেতা দের মধ্যেও অভিনয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই! পুরোনো কিছু ছবি দেখলেই এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এ ব্যাপারে অভিনেতাদের সঙ্গে এগুলোকেও জড়াতে হয়। কারণ এরা প্রতিটাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

বিশেষ করে আমি বাংলা দেশের ছবির কথাও বলতে পারি যে, বাংলা সিনেমা যত তাড়াতাড়ি উন্নতি করেছে বিশেষ করে বিষয়বস্তু ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের ব্যাপারে তার তুলনায় অভিনয়কলার উন্নতি হয়েছে অনেক বেশী। এবং এ কাজেও সত্যজিৎ রায়ের কৃতিত্বই অনেকটা। 'অপুর সংসার' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রায়ণ প্রচলিত নিয়মনীতি ও প্রথার বাইরে। তথাকথিত সিনেমাটিক ভঙ্গীর পথ ছেড়ে একবারে বাস্তবের পথ ধরেছে অভিনয় তখন থেকে। এতদিন যাঁরা স্টারের গৌরব পেয়ে আস-

নিশিপদ্ম উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং অসীম চক্রবর্তী।
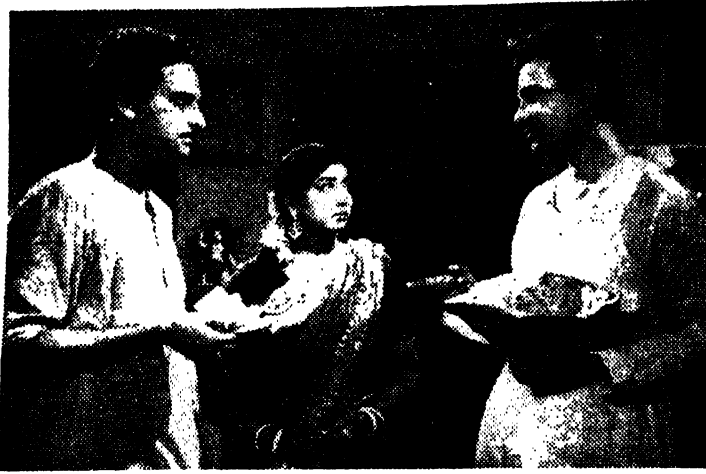
ছিলেন নিজেদের অতিনাটকীয় ভঙ্গীর চাতুর্যে তাঁদের মধ্যেও একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল তারপর থেকে।

অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, সৌমিত্রবাবু সবাইকে অভিনয় শেখালেন বরং বলা যেতে পারে অভিনয় শিল্পের এক নতুন দিকের দরজা খুলে দিলেন তিনি। সিনেমাশিল্পী বলতে যে ম্যাটিনি আইডলের ইমেজ দর্শকদের মধ্যে ছিল তাকে ভেঙে দিতে চেষ্টা করলেন অনেকে পরবর্তীকালে। অভিনয়কে এই বাস্তবের মাটিতে টেনে আনার ফলে যান্ত্রিক কারিকুরি বা কসরৎ কমে গেল অনেকটা। অভিনয় শিল্পটাই নতুনভাবে নতুন দিকে মোড় নিল।

আগেকার ছবির কাহিনীতে বাস্তবের ছোঁয়ার চাইতে বেশী ছিল ভাবাবেগ ও নাটকীয় ঘটনা। শিল্পীরা সেই অতিনাটকীয়তার প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পরিচালকের নির্দেশমত সেটুকুর বিশেষ সদ্ব্যবহার করতেন, হাততালি পেতেনও দর্শকদের। এখনও সে শ্রেণীর দর্শক একবারে নেই বলছি না, তবে কিছু সংখ্যক দর্শক এখন জীবনকে দেখতে চায় ছবিতে, অভিনয়কে তারা জীবন্তভাবেই দেখতে চায়।

নির্মল মিত্রের "প্রথম বসন্ত" ছবির যে দৃশ্য গ্রহণের কথা উল্লেখ করলাম সেটা থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, অনিলবাবুর এক্সপ্রেশনের চাইতে ক্যামেরা বেশী কাজ করছে এখানে সিচুয়েশন তৈরী করতে। কিন্তু অভিনয় যখন আজ এগিয়েছে অনেকটা তখনও যান্ত্রিক কৌশলের চাইতে অভিনেতার দিকেই হাত বাড়ানো উচিত বেশী করে।

তাই নয় কি

মঞ্চাভিনয়

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা গিরিশ নাট্য সংসদ এবার মহাকবি গিরিশচন্দ্রের 'পান্ডব গৌরব' নাটকটি অভিনয় করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গিরিশ নাটকের প্রসারের উদ্দেশ্যেই এঁরা দীর্ঘদিন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে 'জনা' এবং 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর' নাটকটি এঁরা অভিনয় করে নাট্যরসিকের প্রশংসাধন্য হয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, বলিদান, নল-দময়ন্তী, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশেম এই পাঁচখানা নাটক এঁরা একে একে অভিনয় করবেন ঠিক করেছেন। 'পান্ডব-গৌরব' নাটকটি সম্প্রতিকালে অভিনয় হয়নি বলা চলে। আর একটি বিশেষত্ব এ'দের এই যে, যাত্রার আঙ্গিকে সব নাটকগুলি অভিনয় করবেন। পান্ডব-গৌরব নাটকে সংসদের কুশলী সদস্যবৃন্দ অংশ গ্রহণ করবেন এবং নাট্য পরিচালনা করবেন শ্রীসতীশ দত্ত ও শ্রীধীরেন চক্রবর্তী। আশা করা যায় গিরিশ নাটকের অভিনয়ে এঁরা দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবেন এবং গিরিশ চর্চার প্রসারের চেষ্টায় এঁরা সফলকাম হবেন।

নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে 'বাণীরূপা'-যে একটি বিশেষ স্থান করে নিতে পেরেছে, এ সত্য যাঁরা প্রতিনিয়ত নাটক দেখেন, তাঁদের কাছে আজ স্পষ্ট। সম্প্রতি 'মুক্ত-অঙ্গণে' সংস্থার শিল্পীরা বাবলু দাশগুপ্তের 'কেন এই অবক্ষয়' ও 'যখন বৃষ্টি নামলো' একাঙ্ক দুটি পরিবেশন করে প্রমাণ করেছেন নাট্যচর্চায় তাঁদের আন্তরিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাকে। দুটি নাটকেরই কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে প্রচন্ড এক জীবন-জিজ্ঞাসা, আর সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যার জটিলতায় বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের স্বপ্নাহত অনুভবের পরিণতি।

মানুষের অত্যধিক লোভই সমাজ-জীবনে অবক্ষয়ের গ্লানি আর অন্ধকার আনে, 'কেন এই অবক্ষয়' নাটকটি বোধহয় এই সত্যের দিকেই নিশ্চিত এক নির্দেশ দিয়েছে। চেনা জানা ছকে নাটকটি এগোয়নি, কোন বাঁধাধরা গল্পের কাঠামো নাটকে অনুপস্থিত, যা কিছু নাটকীয় সংঘাত তা আবর্তিত হয়েছে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে। 'যখন বৃষ্টি নামলো' নাটক হতাশা আর শূন্যতার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের যাত্রাকেই পরিস্ফুট করে তুলেছে।

দুটি নাটকেই শিল্পীদের অভিনয়-দক্ষতার অসাধারণত্ব ধরা পড়ে। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন—বাচ্চু ভট্টাচার্য, বাবলু দাশগুপ্ত, নীলকান্ত চক্রবর্তী, মায়া পাল, প্রদ্যোৎ গাঙ্গুলী, কানু ভট্টাচার্য সুরজিৎ সাহা, ভোলানাথ চক্রবর্তী, মানিক চক্রবর্তী, তপন সেনগুপ্ত, চঞ্চল দত্ত।

'অনীক গোষ্ঠী' সম্প্রতি শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের 'অথবা কে ও কি' এবং ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা' একাঙ্ক নাটকদুটি পরিবেশন করলো প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে। 'জ্বালা' নাটকটি নতুন নয়, আগে বহুবার অভিনীত হয়েছে এ নাটক, কিন্তু নাটকটির বিষয়বস্তু এবং পরিকল্পনায় এমন একটি উপলব্ধি কাজ করছে, যাতে তা কোনদিনই পুরাতনের মন্থরতায় শিথিল হয়ে যাবে না।

'অথবা কে ও কি' নাটকটি চেতন ও অবচেতন জগতের মধ্যবর্তী প্রাচীরকে ভেঙে ফেলার গানকেই প্রতিধ্বনিত করেছে। বহুদিন পরীক্ষা আর গবেষণার পর ডাঃ রবার্টের দুই ছাত্র একদিন এমন একটি সূত্র আবিষ্কার করলো যা মানুষকে বেশ কিছু সময়ের জন্য অবচেতন জগতের রহস্যময় পরিবেশে নিয়ে যেতে পারে। এই সূত্র থেকেই সত্যানুসন্ধানী মন আসল রূপকে তুলে ধরেছে। বিভিন্ন ভূমিকায় সার্থক অভিনয়ের নজীর রাখেন, বিতান রায়,

প্রশান্ত বোস, নীরোদ রায়, শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, বাবু দাশগুপ্ত, মায়া বসু, অজিত রায়, কাজল বাগচী, বন্দনা রায়, রীণা সেনগুপ্ত। অশোক দাসের আলোকসম্পাত নাট্যপ্রযোজনাকে নিঃসন্দেহে পরিপূর্ণতা দিয়েছে।

পথিকের সাম্প্রতিক প্রযোজনা ম্যাকসিম গোর্কির 'মা' (নাট্যরূপ বিষ্ণু চক্রবর্তী) নাট্যজগতে এক বিরাট স্পন্দন জাগিয়েছেন। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের মাটিতে এ নাটকের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজপুর ছায়াবাণী সিনেমা হলে এ'রা উক্ত নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন ১৩ সেপ্টেম্বর। ঐদিনের নাট্য-প্রযোজনার ও উপস্থাপনার প্রয়োগ-পদ্ধতি ও নিষ্ঠাবান শিল্পীবৃন্দের সামগ্রিক অভিনয় ঐক্য উপস্থিত সুধী দর্শক সাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হয়। নির্দেশনায় ছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ।

বিবিধ সংবাদ

'বিচিত্রা লিশনার্স' ক্লাবের সদস্যরা আসছে ৫ অকটোবর সন্ধ্যায় দেশবন্ধু শিশু বিদ্যালয়ে (১০৫ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬) এক সভায় মিলিত হচ্ছেন। সভাপতি হচ্ছেন মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের পরিচালক স্বামী সোমানন্দ।

উত্তরে ও মধ্য কলকাতার ছাত্র-ছাত্রী এবং সাধারণ মানুষদের কথা স্মরণে রেখে প্রযোজক শ্রীমতী সরকার প্রাক-পূজার আকর্ষণ হিসেবে আসছে ১১ অকটোবর শনিবার সন্ধ্যায় ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে ভারতের প্রথম মহিলা যাদুকর কুমারী উমা দাশগুপ্তের নৃত্য-সংগীতসমৃদ্ধ অপূর্ব ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের এক আয়োজন করেছেন। 'জাদুকরের জন্ম', 'বৈদ্যুতিক করাতে তরুণী দ্বিখণ্ডন', 'শূন্যে ভাসমান বালিকা' ইত্যাদি পুরোনো খেলার সংগে নতুন আরো কয়েকটি আকর্ষণীয় খেলা যুক্ত হচ্ছে এ অনুষ্ঠানে।

আগামী ৬ অকটোবর সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার সর্বাধুনিক মঞ্চ রবীন্দ্রসদনে তরুণ অপেরার শিল্পীরা 'হিটলার' পালা অভিনয় করবেন। এ দলের নিজস্ব প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র-সদনে এই অভিনয় আয়োজন।

হরবোলা শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি জয়নগরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্ন ফিচারের মাধ্যমে মুখ দিয়ে নানান রকমের ডাক শুনিয়ে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেন। রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত গবেষক শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়কে ঐ অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

কুচবিহার উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদের সাংস্কৃতিক সংস্থা 'বাণীরূপা' শিক্ষক দিবস উপলক্ষে স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে 'নাম-না-জানা তারা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এ বছরে বাণীরূপার এটি দ্বিতীয় নাটক। মফঃস্বলেও যে উপযুক্ত স্টেজের ও উপকরণের অভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নাটক মঞ্চস্থ করা যায়, বাণীরূপার কৃতী শিল্পীরা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তা প্রমাণ করলেন। কোকিলা দেবী ও খনা চরিত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন প্রতিমা চক্রবর্তী ও রীতা ঘোষ। স্টেশন মাস্টারবেশী গৌরী দাস, কলেজের ছাত্রীরূপে অপর্ণা দাস ও অধ্যাপকের বন্ধু উদয়ের ভূমিকায় কণক দত্ত যথাযথ অভিনয় করেন। পরিচালনায় ছিলেন শ্রীমতী আরতি গুহ।

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার, ইন্ডিয়া ১৩৮ শরৎ বসু রোডস্থ এ'দের শিক্ষাকেন্দ্রে ২ অকটোবর সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় "গান্ধী শতবার্ষিকী" উৎসব পালন করবেন। এ'দের ৬ষ্ঠ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন প্রেক্ষাগৃহে ৪ অকটোবর সাড়ে ছটায়। এবং শরৎ বসু রোডস্থ শিক্ষাকেন্দ্রে শিল্প ও কারিগরী প্রদর্শনী হবে ৬ থেকে ১২ অকটোবর, প্রত্যহ বিকাল ৫টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

৫ সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনের মঞ্চে শিল্পীগোষ্ঠী মঞ্চস্থ করেন সুভাষ বসুর 'মিছিল' নাটক এবং কবিগুরুর নৃত্যনাট্য 'শাপমোচন'। দুটি অনুষ্ঠানের জনাই শিল্পীগোষ্ঠী সাধুবাদ পাবেন। 'মিছিল' নাটকে অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত অভিনয় মনোগ্রাহী। পরিচালনায় পরাগ দত্ত সুন্দর। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন—অপূর্ব রায়, নিতাই সুরাই, অরুণ বাগ, প্রশান্ত দাস, নিরঞ্জন দে প্রমুখ। 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যে অংশ নিয়েছিলেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইরা রায়। নৃত্যে ঊর্মিলা বোস প্রশংসনীয়। জয়শ্রী দেবীর কমলিকা সুন্দর। অন্যান্য নৃত্যাংশে ছিলেন শেলী সেনগুপ্তা, রিতা দাস, ইন্দ্রাণী রায়।

গত ৩০ এবং ৩১ আগস্ট পাটনা রবীন্দ্রপরিষদ কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে 'রক্তকরবী' নাটক সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন—কল্পনা সামন্ত, মীণাক্ষী দে, রবি ঘোষ, ত্রিপুরারী সেনগুপ্ত, অদ্বৈত সেনগুপ্ত, সুভাষ সেন, বীরেন সেন, অলোক মজুমদার, শঙ্কর মজুমদার প্রমুখ।

টালিগঞ্জ আদি বারোয়ারী সার্বজনীন দুর্গোৎসবের পঁচাত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, বাউল সম্মেলন, যাদু প্রদর্শনী ও কবি সম্মেলন। আগামী ১০ অক্টোবরের মধ্যে নাট্য-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরা অনিল দে, ৪৭, গোবিন্দ ব্যানার্জি রোড। কলিকাতা—৩৩ যোগাযোগ করতে পারেন।

চার্লি চ্যাপলিন

সাহিত্য বলুন, সঙ্গীত বলুন, চিত্রকলা বলুন, ভাস্কর্য বলুন, এ রকম একটি তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে নটরাজ পৃথিবীতে আর কখনো উদয় হয়নি। এঁর প্রতিভা অতুলনীয়। বাগ্দেবী এঁর কণ্ঠে, উর্বশী পদযুগে, এঁর দক্ষিণ হস্তে বিষ্ণুর চক্র (গ্রেট ডিকটেটর), বাম হস্তে দাক্ষিণ্যের বরাভয় (সিটি লাইট)। ইনি বিশ্বকর্মা (মডার্ণ টাইমস), ইনি নীলকণ্ঠ (মঁসিয়ো ভের্দু)। 'অতি বড় বৃদ্ধ' বলেই ইনি সিদ্ধিতে নিপুণ এবং লগন এলে শংকরের মত - নবীন বেশে সজ্জিত হতে জানেন (লাইম লাইট)।

রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে শরৎচন্দ্র একদা বলেছিলেন, 'তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই।' সেই রবীন্দ্রনাথ সিন্ধুপারের হিস্পানী বিদেশিনীকে দেখে মুগ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন,

'সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনাহীনারে।'

চার্লির দিকে তাকিয়ে সর্বক্ষণ এটি মনে পড়ে।

চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলো বলেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। আমরাও তাই বলি। ঢিলেঢালা ট্রাউজার, আঁটসাঁট কোট, বাউলার টুপি, ছড়ি আর বিটকেল-ঢাউস-জুতো বিশিষ্ট সেই ভবঘুরে ক্ষুদে মানুষটিকে পৃথিবীর কে না চেনেন। বিশ্বজোড়া তাঁর নাম। ভুবনভরা তাঁর খ্যাতি। প্রিয়-প্রিয়তর-প্রিয়তম হয়ে তিনি সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে বিরাজ করছেন। এই মহান মানুষটির নাম ভুলে যাবার নয়। তিনি সবার মাঝে, সবার কাছে বিশ্বরসিক বাউল হয়ে বেঁচে থাকবেন। যেমন আজও আছেন।

ছবির পর্দায় ভূমিষ্ঠ ঢিলেঢালা বালিশের খোলপরা মানুষটি সম্বন্ধে চার্লি চ্যাপলিন নিজেই বলেছেন, জীবনসংগ্রামে ঐ মানুষটি সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত, মানুষের হাতে গড়া নিয়তির নির্যাতনে পরাজিত এই বুভুক্ষু পৃথিবীতে ঐ মানুষটি যেন গ্রহান্তরবাসী কোন অনধিকার প্রবেশকারী, ও অনাহূত, অবাঞ্ছিত। কেউ ওকে চায় না, কেউ পোঁছেও না। তবু ওঁর আচরণে, মাথার টুপি একটু বাঁকা করে উঁচিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে যাওয়ার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সব কিছুকে উপেক্ষা করার একটা স্পর্ধা প্রচ্ছন্ন থাকে। ও কাউকে তোয়াক্কা করে না।

চার্লি চ্যাপলিনের জন্ম-মুহূর্তটি চলচ্চিত্র ইতিহাসের একটি স্মরণীয় বছর। চার্লির যে বছরে জন্ম ঠিক সেই সময়েই আমেরিকায় টমাস আলভা এডিসন সমস্ত পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করলেন, আবিষ্কার করলেন 'কাইনেটোস্কোপ'। নাইট্রেট সেলুলোজ অবলম্বনে ইস্টম্যান যে কোডাক ফিল্ম তৈরি করলেন তারই সাহায্যে এডিসন প্রথম চলচ্চিত্র দেখালেন। ১৮৮৯ সালটি চলচ্চিত্রের একটি ঐতিহাসিক বছর। এই সালের ১৬ই এপ্রিল চার্লি চ্যাপলিন লন্ডন শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে ষোল বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কুমারী মেয়ে লিলি হার্লি নাম নিয়ে ইংলন্ডের ছোট-বড় নাচিয়ে দলের সঙ্গে যিনি নাচ-গান করে বেড়াচ্ছিলেন তাঁরই সন্তান চার্লি চ্যাপলিন। বাপ মা দুজনেরই পেশা ছিল নাচ-গান। একদল ছেড়ে আর একদলে চাকরি করেই এঁদের সংসার চলত কোন রকমে। পাঁচ বছর বয়সে চার্লির নাট্যজীবনের হাতেখড়ি। নাটকীয়ভাবেই তাঁর আগমন। হঠাৎ মায়ের অসুখ হয়ে পড়ল, অভিনয় করা সেদিন তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। মার পরিবর্তে চার্লিকেই সে ভূমিকা নিতে হল। চার্লির বাবা ছেলেকে জোর করে স্টেজের ওপর ঠেলে ঢুকিয়ে দিলেন। চার্লি তো প্রথমে একগাদা দর্শকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়েই জড়সড়, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কি হল কে জানে—হঠাৎ চার্লি চেঁচিয়ে উঠলেন, গলা ফাটিয়ে গান শুরু করে দিলেন। সবাই চার্লির কান্ড দেখে তো অবাক। এতটুকু ছেলে! কিন্তু কি অদ্ভুত অভিনয় করার ক্ষমতা! দর্শকরা অডিটোরিয়াম থেকে স্টেজের ওপর টাকা-পয়সা ফেলতে লাগলেন আর বারবার অভিনন্দন জানাতে থাকলেন। চার্লি তো দিশে না পেয়ে একটার পর একটা গান গেয়েই চললেন। শেষ পর্যন্ত বাবা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চার্লিকে স্টেজ থেকে ঠেলে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন।

এইভাবে চার্লি চ্যাপলিনের নাট্যজীবনের শুরু। তাঁর জীবনসংগ্রাম বিচিত্র পট-ভূমিকায় বিস্তৃত। চরম দারিদ্র্যে পরম পরিতৃপ্তির জন্য অত্যধিক মদ্যপানের ফলে চার্লির বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মা তখন দুই নাবালক ছেলেকে নিয়ে কেনিংটন বস্তিতে এসে উঠলেন। অভিনয় করে তিনি কোনরকমে সংসার চালাতে লাগলেন। সেইসঙ্গে মায়ের দুঃখ ঘোচাতে চ্যাপলিন নিজে কখনো ঘরের কাগজ বিক্রি করছেন, কখনো ছেঁড়া নেকড়া, ছোবড়া, ফুটো টিনের কৌটো কুড়োচ্ছেন, আবার কখনো পুতুলের কারখানায় কাজ করছেন। আট বছর বয়সের সময় তিনি ল্যাংকাশায়ার ল্যাডস নামে একটি শিশু-নৃত্য প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেলেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘ ছ'বছর থেকে চার্লি একজন দক্ষ শিল্পী এবং গায়ক হয়ে উঠলেন। এর মধ্যে বড় ভাই সিডও একটি নাট্য প্রতিষ্ঠানে শিল্পী হিসেবে চাকরি পেয়ে গেলেন।

চার্লি চ্যাপলিন তাঁর মায়ের সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন, আমার মার সম্বন্ধে ওরা যা খুশি বলুক আমি গ্রাহ্য করি না। আমার অভিনেত্রী, শিল্পী মার অপরকে অনুকরণ করার, নকল করার অসম্ভব পটুতা ছিল। আমি যা কিছু শিখেছি সবই আমার সেই দুঃখিনী মায়ের দান। তিনি ছিলেন অসীম ক্ষমতাশালিনী এক বিরাট অভিনেত্রী। জীবনে কখনো আমি তাঁর পায়ের নখের যোগ্যও হতে পারব না। আর মা হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আমাদের দুই ভাইকে মানুষ করার জন্য তিনি যে তিলে তিলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সেটা এতটুকু মিথ্যে নয়।

তখনকার দিনে ফ্রেড কার্নো ইংলন্ডের মিউজিক হল-এর প্রযোজকদের মধ্যে সর্বময় কর্তা ছিলেন। এঁরই প্রতিষ্ঠানে চার্লি চ্যাপলিনের বড় ভাই সিড তখন চাকরি করছেন। একদিন চার্লিকে নিয়ে ফ্রেড কার্নোর কাছে হাজির হলেন সিড। কিন্তু প্রথমটায় চার্লির আগমনে কার্নো সাহেব তেমন আকৃষ্ট হলেন না। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চ্যাপলিন নির্বোধ ভাঁড়ের ভূমিকা নিয়ে জিমন্যাস্টিকের কসরৎ খেলায় এমন মূকাভিনয় শুরু করলেন যে ফ্রেড কার্নো না হেসে পারলেন না। জহুরীর জহর চিনতে আর দেরি হল না। সেইদিনই কার্নো চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে দীর্ঘকালের এক চুক্তিতে সইসাবুদ করলেন।

১৯১০ সালে ফ্রেড কার্নোর দলে যোগ দিয়ে চার্লি চ্যাপলিন রাতারাতি ইংলন্ডের দর্শকহৃদয় জয় করে ফেললেন। চ্যাপলিনের অভূতপূর্ব সাফল্যের পরিচয় পেয়ে কার্নো তাঁকে আমেরিকায় পাঠান। আমেরিকায় তখন সদ্য আবিষ্কৃত চলচ্চিত্র বাজার মাৎ করে রেখেছে। কিন্তু শুধু প্রেম আর ভালবাসার ছবি দেখে দর্শকরা হাঁপিয়ে উঠেছে। হাল্কা রসের হাসির ছবি তারা চাইছে। একমাত্র ম্যাক সেনেট ছাড়া তখন সেখানে আর কেউই হাসির ছবি তৈরি করছিলেন না। তাঁর দলে ছিলেন ফোর্ড স্টারলিং, বাস্টার কিটন, ফ্যাটি আরবাকল, ম্যাবেল নরম্যান্ড, কিস্টোন কপস প্রভৃতি বাঘা বাঘা কৌতুক অভিনেতা। কিন্তু এত সব গুণী শিল্পীরা থাকা সত্ত্বেও ম্যাক সেনেট মনের মত রসিক ব্যক্তিকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চার্লির আগমনে তাঁর সে অভাব পূর্ণ হল। এর আগে অবশ্য তিনি তাঁর অভিনয় দেখেছিলেন কিন্তু তেমন আকৃষ্ট হননি। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি

আবার চ্যাপলিনকে মনোনীত করলেন। ১৯১৪ সালে সেনেট কিস্টোন প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে এক রীলের ছবি 'মেকিং এ লিভিং' করলেন। চার্লি সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হল। তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন। অনুশোচনায় চার্লিকে জড়িয়ে ধরলেন। চ্যাপলিনও স্তম্ভিত হলেন। বহু বিনিদ্র রজনীর গবেষণায় তিনি তাঁর ভবঘুরে ঐ বিশ্ববিখ্যাত চেহারাটি আবিষ্কার করে ঢিলেঢালা পোশাকে দ্বিতীয় 'সিড অটো রেসেস অ্যাট ভেনিস' খণ্ডাংশ ছবিতে প্রথম আবির্ভূত হলেন।

ভবঘুরের চেহারায় বিশ্বখ্যাতি পেলেন চার্লি চ্যাপলিন। ম্যাক সেনেটের সহযোগিতায় কিস্টোন প্রতিষ্ঠানের হয়ে তিনি প'য়ত্রিশখানা ছবিতে অভিনয় করলেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ম্যাবেলস স্টেঞ্জ প্রেডিকামেন্ট, বিটুইন সাওয়ার্স, এ ফিল্ম জনি, ট্যাঙ্গো ট্যাঙ্গলস, হিজ ফেভারিট পাস্টটাইম, ক্রুয়েল ক্রুয়েল লাভ, দি স্টার বোর্ডার, ম্যাবেল অ্যাট দি হুইল, টোয়েণ্টি মিনিটস অফ লাভ, কট ইন এ ক্যাবারে, কট ইন দি রেন, এ বিজি ডে, জেণ্টলম্যান অফ নার্ভ, হিজ মিউজিক্যাল ক্যারিয়ার, হিজ ট্রাইস্টিং প্লেস, টিলিজ পাংচার্ড রোমান্স, গেটিং অ্যাকোয়েণ্টেড এবং প্রিহিস্টরিক পাস্ট।

কিস্টোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এক বছর যুক্ত থাকার পর ১৯১৪ সালে চার্লি চ্যাপলিন এসানি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। এখান থেকে এক এবং দু রীলের অনেকগুলো ছবিতে অভিনয় করলেন। ছবিগুলোর নাম হল : হিজ নিউ জব, এ নাইট আউট, দি চ্যাম্পিয়ন, ইন দি পার্ক, দি জিটনি ইলোপমেন্ট, দি ট্রাম্প, বাই দি সী, ওয়ার্ক, দি ফ্যাটাল ম্যালে, হার ফ্রেণ্ড দি ব্যাণ্ডিট, দি নক আউট, ম্যাবেলস বিজি ডে, ম্যাবেলস ম্যারেড লাইফ, লাফিং গ্যাস, দি প্রপার্টি ম্যান, দি ফেস অন দি বার-রুম ফ্লোর, রিক্রিয়েশন, দি ম্যাস্কেরেডার, হিজ নিউ প্রফেশন, দি রাউণ্ডার্স, দি নিউ জ্যানিটর, দোজ লাভ প্যাংস, ডাফ অ্যাণ্ড ডিনামাইট, দি পনশপ, বিহাইণ্ড দি স্ক্রিন, দি রিনক, ইজি স্ট্রীট, দি কিওর, দি ইমিগ্র্যান্ট এবং দি এ্যাডভেঞ্চারার।

মিউচুয়াল প্রতিষ্ঠানে চার্লি চ্যাপলিন ১৯১৬ সালে যুক্ত হলেন। এখান থেকে তিনি যে ছবিগুলো করলেন তার মধ্যে অন্যতম হল : দি ফ্লোরওয়াকার, দি ফায়ারম্যান। দি ভ্যাগাবণ্ড, ওয়ান এ এম, দি কাউন্ট, দি আইডল ক্লাশ, পে ডে ও দি পিলগ্রিম।

মিউচুয়াল-এর পর চার্লি চ্যাপলিন ১৯১৮ সালে ফার্স্ট ন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানের হয়ে যে কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করলেন তা হল : এ ডগস লাইফ, দি বণ্ড, শোল্ডার আর্মস, সানিসাইড, এ ডেজ প্লেজার, দি কিড, এ উওম্যান, দি ব্যাঙ্ক, সাংহাইড, এ নাইট ইন দি শো, কারফিউ, পোলিশ এবং ট্রিপল ট্রাবল।

চার্লি চ্যাপলিন প্রথম বিয়ে করলেন মিলড্রেড হ্যারিসকে ১৯১৮ সালের ২৩ অকটোবর। মধুচন্দ্রিকার পর ও'রা হলিউডে সংসার পাতলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দু' বছর গড়াতে না গড়াতেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটল। এই সময় চ্যাপলিন 'দি কিড' ছবিটি করছিলেন। ১৯২১ সালে এটি মুক্তি পাবার পর তাঁর খ্যাতি আরও প্রসারিত হল। ছ' রীলের এ ছবিটিতে তিনি এক অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেন। চ্যাপলিন এর পর ১৯২৩ সালে ইউনাইটেড আর্টিস্ট প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে কয়েকটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিতে অভিনয় করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি 'এ উওম্যান অফ প্যারিস'-এ চ্যাপলিন নিজে অভিনয় না করে পরিচালনা করলেন। এটি কমেডি না হয়ে ট্র্যাজেডি হল। নতুন ভাবধারা এবং নিপুণ আঙ্গিকের প্রয়োগে এটি সে যুগের সেরা ছবি হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পায়। এ ছবির পর এ সংস্থার দ্বিতীয় 'দি গোল্ডরাশ' ছবিতে অভিনয় করে চার্লি চ্যাপলিন বিশ্বজোড়া নাম পেলেন। অনেকের মতে এটি চ্যাপলিনের শিল্পী-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ ছবির নায়িকা লিতা গ্রে-র সঙ্গে ১৯২৪ সালের ২৪ নভেম্বর দ্বিতীয়বার চার্লি চ্যাপলিনের বিয়ে হয়। কিন্তু এ বিয়ে মাত্র তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল।

চলচ্চিত্র শিল্পের বিরাট বিপ্লব ঘটিয়ে ছবিতে কথা ফুটল ১৯২৮ সালে। কিন্তু চ্যাপলিন ছবিতে ভাষাকে প্রাধান্য দিলেন না। তাঁর মতে ভাষা সিনেমার মূক-অভিনয়ের মৌলিকতাকে ক্ষুণ্ণ করবে। তাই তিনি 'দি সার্কাস' ছবিতে কথা না বলে মূকাভিনয় করলেন। ১৯৩১ সালে ইউনাইটেড আর্টিস্ট-এর পরের ছবি 'সিটি লাইটস'-এ চ্যাপলিন কাহিনীকার, পরিচালক, অভিনেতা এবং সঙ্গীত-পরিচালক হলেন। একসঙ্গে এতগুলো বিভাগে দায়িত্ব পালন করার নজির চার্লি চ্যাপলিন চলচ্চিত্রে প্রথম দেখালেন। এরপর 'মডার্ণ টাইমস' ছবিটি করার সময় চ্যাপলিন এ ছবির নায়িকা পলেট গর্ডাডকে ১৯৩৬ সালে বিয়ে করলেন। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে চার্লি ১৯৪০ সালে 'দি গ্রেট ডিক্টেটর' ছবিতে ভাষা জুড়লেন। এটি তাঁর জীবনে লম্বা ছবি। এটির দৈর্ঘ্য হল ১৩ রীল।

যুদ্ধের কয়েকটা বছর চার্লি চ্যাপলিন ছবি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে রাজনীতিতে মন দিলেন। এই সময় ১৯৪৩ সালের ১৬ই নভেম্বর বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ও'নীল-এর অষ্টাদশ বছরের কন্যা উনা ও'নীলকে চ্যাপলিন শেষবারের জন্য বিয়ে করলেন। আজও তিনি উনার সঙ্গেই রয়েছেন। সুখেই দিন কাটাচ্ছেন। যুদ্ধ থামার পরে ১৯৪৭ সালে চ্যাপলিন 'মঁসিয়ে ভের্দু' ছবিতে অভিনয় করলেন। এ ছবিতে তাঁর ভবঘুরে পোষাকটি ছিল না। এরপর ১৯৫৩ সালে 'লাইম লাইট', ১৯৫৭ সালে "দি কিং ইন নিউইয়র্ক" এবং ১৯৬৭ সালে 'এ কাউন্টেস ফ্রম হংকং' ছবিগুলি করলেন চার্লি চ্যাপলিন। শেষ ছবিটি দেখে বিদেশের সমালোচকরা চ্যাপলিনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করে লিখেছেন, চ্যাপলিন বুড়ো হয়ে গেছেন। ও'র টেকনিক এখন সেকেলে। প্রতিবাদ স্বরূপ সমালোচকদের উদ্দেশ্যে চার্লি চ্যাপলিন নিজেই বলেছেন, সমালোচকদের মতামতের আমি বিন্দুমাত্র মূল্য দিই না। আমি ক্যামেরাকে দোলাইনি, ঘোরাইনি, লেন্স নিয়ে ম্যাজিক দেখাইনি বলে আমি ব্যাকডেটেড। কয়েকজন লোক জীবনটাকে যেহেতু জটিল করে তুলেছে, সেহেতু শিল্পকেও তারা জট পাকাতে চায়। সাধারণ মানুষ চায় সরলতা। আমিও চাই। আরও চাই মনুষ্যত্ব এবং ব্যক্তিত্ব। তাই অভিনয় আমার কাছে ক্যামেরার ম্যাজিকের চেয়ে অনেক বড়। বলতে পারেন এটা আমার মঞ্চাভিনয়ের প্রভাব। একজনের নাকের কাছে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া অনেক সোজা, কিন্তু অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা অনেক কঠিন, অনেক বড় আর্ট। মনে রাখবেন, অভিনয় এবং পরিচালনা দুটোই আমার রপ্ত আছে। বলতে পারেন, অভিনেতা চার্লির চেয়ে পরিচালক চ্যাপলিন অনেক উঁচুতে।

আশ্চর্য! সুদীর্ঘ বছর ধরে যে-বিশ্ব-ভবঘুরে কোটি কোটি মানুষের মনকে মাতিয়ে রেখেছেন, তাঁর সম্বন্ধে আজ আমাদের এতটুকু মমতা নেই! স্রষ্টার সৃষ্টিকে স্বীকৃতি দেবার কণামাত্র উদারতা নেই! হায়রে সৃষ্টি! হায়রে স্রষ্টা! এ-যুগের সাহিত্যে, কাব্যে, ভাস্কর্যে এমনকি রঙ্গমঞ্চে কেউই চার্লি চ্যাপলিনের বৈচিত্র্য, বিস্তার এবং গভীরতা সর্বজনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হননি। সুতরাং চার্লিকে আজ আমরা অস্বীকার করি কোন মুখে? আমাদের কি কৃতজ্ঞতাবোধ একেবারেই লোপ পেয়েছে।

মানুষ অকৃতজ্ঞ বলেই হয়ত চার্লি চ্যাপলিন দুঃখ করে বলেছেন, আমার সারা-জীবনের সাধনা লোককে হাসিয়ে বেড়ানো, একটু আমোদ করা এবং দুঃখীর জীবনে ক্ষণিক হাসি ফোটানো। কিন্তু এরা আমাকেও হাসিয়েছে। আমি নাকি শত্রু, দেশদ্রোহী, নিরীশ্বরবাদী।

পৃথিবীর মানুষ কি বুঝেও বুঝবে না যে চ্যাপলিন কম্যুনিস্টও নন, ক্যাপিটালিস্টও নন। তিনি সব ইজমের উর্ধ্বে। তিনি মানব-দরদী এক বিচিত্র প্রতিভা। তিনি বিশ্ব-বাউল। তিনি মহাকবি। আজ গান্ধী-শতবার্ষিকী মহালগ্নে চলচ্চিত্রের গান্ধীবাদী চার্লি চ্যাপলিনকে স্মরণ করি। তাঁর সুস্থ শতায়ু জীবনের কামনা করি।

কমল ভট্টাচার্য

উত্তর কলকাতায় স্টেডিয়াম একটি নাম

"হাউ লাভলী! এ যে ইডেনের মাঠকেও হার মানায়।" প্রায় চল্লিশ বছর আগে ক্যালকাটা ক্লাবের ল্যাগডেন সাহেব দেশবন্ধু পার্কে খেলতে এসে কথাটা বলেছিলেন এরিয়ান্সের প্রফুল্ল মুখার্জিকে। কথাটা সাহেব বাড়িয়েই বলেছিলেন। তবে কলকাতার ময়দানের মধ্যে ইডেনের পর দেশবন্ধু পার্কের নাম অনায়াসেই পাড়তেন তখনকার দিনের ক্রীড়ানুরাগীরা। বড় খেলার আসরের বহু ছিটেফোটা দেশবন্ধু পার্কেও এসে পড়ত।

মাঠ দেখে সেদিন সাহেবরাও খুব খুশী। —"মুখুজ্যে, এ মাঠ দেখাশুনো করে কে ?"—এরিয়ান্সের প্রফুল্ল মুখুজ্যের একগাল হাসি—"কেন ? আমরা! তোমার খুব পছন্দ হয়েছে সাহেব।" সাহেব ল্যাগডেন পিঠ চাপড়ে দিলেন—"খুব। কিপ্ ইট্ আপ।" ব্যাস প্রফুল্ল মুখুজ্যের একেবারে বুক দশ হাত।

রাওলাপিন্ডি থেকে একটা শক্ত দল এল দেশবন্ধু পার্কে এরিয়ান্সের সঙ্গে খেলতে। একেবারে স্পোর্টিং পীচ। দেখে খেলো রাণ পাবে। বোলিংয়ের কারসাজি থাকলেই উইকেট ওপড়াতে পারবে—এই মনোভাব নিয়েই সেদিনের দেশবন্ধু পার্কের ক্রিকেট চলতো। আর এই মাঠেই সেদিনের এরিয়ান্সের ছোনে মজুমদার, ফকির মুখুজ্যে, টগর মুখুজ্যে, কালাধন মুখুজ্যের দল বড় বড় দলগুলিকে দেশবন্ধু পার্কে ধরে নিয়ে আসতেন। সফরকারী রাউলপিন্ডী দলটির খুব নামডাক। তাই মাঠটিকে আরও ঘষামাজা করে রাখলেন যাতে বদনাম না হয়। খেলে ম্যাচ জিতে নিয়ে যাও—তাতে লজ্জার কি! তাই বলে চোদ্দ রানে অল্ আউট। ভিজিটিং টিমের ফাষ্ট বোলার গোলাম মহম্মদ তাজা কচকচে ফাষ্ট পীচ দেখে একেবারে ডান্ডা উড়িয়ে দিয়েছেন এরিয়ান্সের সেই হেন বাঘা বাঘা খেলোয়াড়দের। এ ব্যার্থতায় তাঁদের কিন্তু মান খোয়া যায় নি। বরং বাইরের দল এনে যেচে তাঁরা নিজেদের ভুল শুধরে নিতেন। হ্যাঁ—হাতেনাতে

দুঃখীরাম মজুমদার (উমেশ)

না ঠেকলে কি ভুল শোধরান যায়। সুরু হোল ফাস্ট বোলিংয়ের মহড়া। সবাই নাছোড়বান্দা। ছাড়াছাড়ি নেই। কারুর মুখে রা কাটবারও উপায় নেই। স্যারের কথা মনে করেই তাঁরা মহড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। স্যার দুখীরাম মজুমদারের চোখে তখন ঘুম নেই। খেলোয়াড় গড়া ত' তাঁর কাজ। ঐ রাওলপিন্ডীর ফাষ্ট বোলার গোলাম মহম্মদ যা পারল তা আমাদের ছেলেরা পারবে না কেন ? বেশ কিছুকাল কাটলে পর স্যার সুঁটে ব্যানার্জীকে ধরে নিয়ে এলেন দেশবন্ধু পার্ক থেকেই। বললেন সুঁটেকে—"শুধু জোর বল দিলেই হবে।" মাটি থেকে একটা ঢেলা কুড়িয়ে এনে ছুঁড়লেন বাতাসে। ঢেলাটি হাওয়ায় এদিক-ওদিক বেঁকে চললো। স্যার বোঝালেন—দ্যাখ নতুন বল যদি কায়দা করে ছুঁড়তে পারিস তাহলে সেটাও এই ঢেলার মতন বাতাসে ঘুরবে। স্যার যাঁকে ছুঁতেন তাঁর হাতেই সোনা ফলত এমনই হাতযশ তাঁর! সেকালের একমাত্র শিক্ষাগুরু দুখীরাম মজুমদার। ভাল নাম উমেশ। সবাই তাঁকে গুরু বলে ডাকতেন। বলতেন স্যার।

●

উত্তর কলকাতায় একটা স্টেডিয়াম চাই। আর সেটা দুখীরাম মজুমদারের নামে করা হোক। আজকের তরুণ যুবক গোষ্ঠীর দল এই স্টেডিয়ামের জন্যেই দাবী তুলেছেন।

গড়ের মাঠে সাহেবদের খেলার মাতামাতি। আর আমাদের খেলার আড্ডা এই উত্তর কলকাতাতেই। গড়ের মাঠে সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিতে বাংলার খেলোয়াড়েরা মরণপণ করে খেলতেন এই উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কে, টালা পার্কে, আবার মার্কাস স্কোয়ারেও। বলার মত কথা, শ্যাম স্কোয়ারের ছোট্ট চত্বরের মধ্যেও নামী ও দামী খেলোয়াড়েরা এসে খেলে গেছেন। কলকাতার উত্তরেই খেলার উৎস—কি ফুটবল কি ক্রিকেট। আর এই সব মাঠ ঘুরে ঘুরে স্যার খেলোয়াড় বাছতেন নিজের জন্যে। মহড়ার সুবিধে হবে বলে নিয়ে যেতেন এরিয়ান্স

ক্লাবে। লোকে ভুল বুঝতেন স্যর দুখী-রামকে। বলতেন নিজের দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্যেই ছেলেদের এরিয়ান্স ক্লাবে ধরে নিয়ে যেতেন। তখনও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলে এরিয়ান্স ক্লাবের খেলোয়াড়দের ভাঙিয়েই শক্তি বৃদ্ধি হোত। স্যর যাঁকে ভাল বুঝতেন ছেড়ে দিতেন। অর্থাৎ তালিম শেষ না হলে সে খেলোয়াড় জাতে পেঁছবে না। তবে হাতে গড়া ছেলে তৈরী হবার আগে ছিনিয়ে নিয়ে গেলে তিনি ভেঙ্গে পড়তেন। তবে কিছু বলতেন না।

একবার কুমারটুলি পার্কে এরিয়ান দলের শিবদাস-বিজয়দাস ভাদুড়ীর খেলা দেখতে মাঠ ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু তাঁরা খেললেন না। স্যর বুঝলেন শিবদাস-বিজয়-দাস হাতছাড়া হোল। স্যর রাগে বলে উঠ-লেন--"তোরা খেলে যা কিছু ভাবিসনি। কুমারটুলী থেকে পুতুল এনে খাড়া করছি।"

পূর্ণিয়া থেকে সামাদকে ধরে নিয়ে এলেন কলকাতায়। মুসলমানকে একেবারে বাঙালী সাজালেন। মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর খেলার গুপ্তিমন্ত্র ঢাললেন সামাদের ওপর। স্যরের কাণ্ডকারখানা দেখে গোঁড়া মানুষেরা কানাকানি করেছিলেন। কিন্তু স্যর বললেন —খেলোয়াড়ের আবার জাত কি ?

এইভাবেই স্যর নিয়ে আসেন দানাপুর থেকে হামিদ আর আজিজকে। বহরমপুর থেকে ধরে নিয়ে আসেন করুণা ভট্টাচার্যকে।

জহুরি যেমন জহর চেনে, স্যরও নাকি তেমনিভাবে খেলোয়াড় বাছতেন। একটা এমন ঘটনার কথা আজও আমি ভুলিনি। শ্যামবাজারের সিকদারবাগানে রাস্তায় গুলি খেলছে ছেলেরা। স্যর ঐ পথ দিয়েই সাই-কেলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নেমে পড়লেন। একমনে গুলি খেলা দেখলেন। খেলা শেষ হলে তিনি একটি ছেলেকে ডেকে বললেন—"খোকা শোনো, কোন বাড়িতে থাকো?" ছেলেটি ঐ যে বলে একটি বাড়ি দেখিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল। স্যরও আর কথা না বলে চলে গেলেন। ঠিক পরের দিন সকাল বেলায় এসে হাজির। ছেলেটির বাড়িতে দরজায় ঘা দিলেন। একজন বয়স্ক মানুষ বেরিয়ে এলেন এবং স্যরকে দেখে চিনতে পারলেন। হেসে বললেন : "কি ব্যাপার! দুখীরাম যে। কোন খবরটবর আছে নাকি।" স্যর আর ভূমিকা না করে বললেন—"একটা রোগা পাতলা ছেলে এই বাড়িতেই থাকে। সম্ভবতঃ তোমার ছেলেদের মধ্যে একজন হবে। তাকে আমার চাই।" ভদ্রলোক মুস্কিলে পড়লেন—"বলো কি? আমার যে ছটি ছেলে। কাকে চাও। আর সাইকেল টেঙিয়ে এসেছ যখন তাকে না নিয়ে গিয়ে কি আর ফিরবে তুমি?" ভদ্রলোক বাড়ি ঢুকে ছটি ছেলেকেই টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এলেন। একটু হেসে তিনি বললেন—"নাও দুখীরাম বেছে নাও।" স্যর ছেলেটির দিকে তাকাতেই ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে নিল। ভদ্রলোক সন্ধিগ্ধ মনে বললেন—"দুঃখীরাম তুমি ভুল করোনিতো। ওটা তোমার কি কাজে লাগবে? এর দ্বারা কিন্তু খেলাটেলা হবে না বলে রাখলাম।" স্যর কথা বাড়ালেন না। চুপি চুপি ছেলেটাকে কি বলে চলে গেলেন।

মাঠেঘাটে স্যরের সঙ্গে ছেলেটিকে দেখে অন্য খেলোয়াড়দের মনেও সংশয় জাগলো। আর থাকতে না পেরে স্যরকে কথাট বললেন—"ঐ প্যাংলা ছেলেটিকে আপনার কি কাজে লাগবে স্যর।" স্যর হাসলেন। বললেন—"ওকে মস্ত ক্রিকেটার বানাব।" সবাই ভাবলেন স্যর বুঝি তামাসা করছেন। তাই তাঁরা উপেক্ষার হাসি হাসলেন। আর থাকতে পরলেন না। ক্ষেপে উঠে বললেন—"দ্যাখ হে, দুখীরাম কখনও চালে ভুল করে না। আজ থেকে দু'বছর বাদে ওকে আমি মাঠে নামাব। এখন বল কুড়োচ্ছে —কুড়োক্‌।" মাত্র পনের বছর বয়সে স্যর জিদ বশেই সেই ছেলেটিকে ম্যাচ খেলালেন একেবারে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে। অনেকে এই নিয়ে মন্তব্য করতে ছাড়েন নি। বলে-ছিলেন স্যরের বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে।

এরপর স্যর আর দু এক বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু ঐ অল্প সময়ে তিনি যা শিক্ষা দিয়ে গেছিলেন তার মূল্য অনেক। এ ঋণ শোধ করা যায় না। আমিই সেই ছেলেটি—ক্রিকেট খেলেছি, তবে খেলার মাপকাঠি বিচারে সে যত কমই হোক আমার কাছে তা মণিমুক্তার মত মূল্যবান। আজ চল্লিশ বছর বাদে সে কথা অকপটে জানাতে পেরেছি, বলেছি বলে আমি গর্বিত বোধ করছি।

স্যর প্লাম্বারির কাজ করে যা উপায় করতেন, সব ঢালতেন খেলার পিছনে। বিবাহ করেন নি খেলার জন্যেই। খেতেন স্বপাকে। খেলার জন্যে এতবড় আত্মত্যাগ এ দেশে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। আরও কিছু দিতে পারতেন। কিন্তু অকাল মৃত্যু তাঁকে ডেকে নিল। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে ১৯২৯ সালের ১৬ই জুন তিনি বিদায় নেন। অগণিত শিষ্য তাঁর জন্যে ডুকরে কেঁদে উঠল। পিতৃহারার মত বুক চাপড়ে আক্ষেপ করতে লাগল।

এই লেখা শেষ করার আগে একটা অনুরোধ জানিয়ে রাখলাম। দুখীরাম মজুমদারের স্মৃতিরক্ষার্থে ময়দানে তাঁর মূর্তি রাখার প্রয়োজন। কারণ আজও যে কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করছি কিছুদিন বাদে তাও সম্ভব হয়ত হবে না।

দর্শক

দলীপ ট্রফি

সেমি-ফাইনাল খেলা

নাগপুরে আয়োজিত দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতার প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলায় গত বছরের বিজয়ী পশ্চিমাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের রান সংখ্যার ভিত্তিতে মধ্যাঞ্চল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে উঠেছে। এই নিয়ে পশ্চিমাঞ্চল দল ৯ বছরের দলীপ ট্রফি প্রতিযোগিতায় ৮বার ফাইনালে উঠলো।

মধ্যাঞ্চল দলের অধিনায়ক হনুমন্ত সিং টসে জিতে পশ্চিমাঞ্চল দলকে ব্যাট করতে পাঠান। পশ্চিমাঞ্চল দলের সূচনা খুব ভাল হয়েছিল। এক সময়ে স্কোর বোর্ডে দেখা গেল একটা উইকেট খুইয়ে ১০৬ রান উঠেছে। কিন্তু পরবর্তী ৯০ মিনিটের খেলায় তাদের আরও ৭টা উইকেট মাত্র ৪৬ রানের বিনিময়ে পড়ে যায়। দলের ২য় উইকেট ১০৬ এবং ৮ম উইকেট ১৫২ রানের মাথায় পড়েছিল। প্রথম দিনের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল দল ৮ উইকেটের বিনিময়ে ২০২ রান সংগ্রহ করে।

দ্বিতীয় দিনে ২২১ রানের মাথায় পশ্চিমাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। এইদিন তারা ৪৬ মিনিট খেলে বাকি দুটো উইকেটের বিনিময়ে আরও ১৯ রান যোগ করেছিল। মধ্যাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের আরম্ভ ভাল করেও শেষ পর্যন্ত অজিত পাই এবং উদয় যোশীর বোলিং সামলাতে পারেনি। ১২৯ রানের মাথায় মধ্যাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। অজিত পাই ৪২ রানে ৭টা এবং উদয় যোশী ৫৩ রানে ৩টি উইকেট পান। পশ্চিমাঞ্চল দল ৯২ রানে অগ্রগামী হয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে এবং একটা উইকেট খুইয়ে বাইশ রান সংগ্রহ করে। ফলে তারা ১১৪ রানে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনটা ছিল বোলারদের সাফল্যের দিন। ৩৩০ মিনিটের খেলায় ১৩টা উইকেট পড়ে—পশ্চিমাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের দুটো, মধ্যাঞ্চলের প্রথম ইনিংসের দশটা এবং পশ্চিমাঞ্চলের দ্বিতীয় ইনিংসের একটা।

তৃতীয় দিনে অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে পশ্চিমাঞ্চল দলের অধিনায়ক চান্দু বোরদে দলের ১৮৫ রানের (২য় উইকেটে) মাথায় ২য় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। চেতন চৌহান (৭৩ রান) এবং অজিত ওয়াদেকার (৮২ রান) শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। তাঁরা ৩য় উইকেটের জুটিতে ১১৫ মিনিটে দলের অতি মূল্যবান ১৪০ রান তুলে দেন। অজিত ওয়াদেকার ২য় ইনিংসে তাঁর নট আউট ৮২ রানের মধ্যে যখন ৩১ সংগ্রহ করেন তখন দলীপ ট্রফির খেলায় তাঁর ১০০০ রান পূর্ণ হয়। বর্তমানে তাঁর মোট রান দাঁড়িয়েছে ১০৫১।

খেলার বাকি ১৫০ মিনিট সময়ে যেখানে মধ্যাঞ্চল দলের জয়লাভের জন্যে ২৭৮ রান করার প্রয়োজন ছিল সেখানে তারা ৪ উইকেট খুইয়ে ১১৭ রান তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পশ্চিমাঞ্চল : ২২১ রান (এস পি গাই-কোয়াড় ৪ এবং এ ভি মানকাদ ৪৭ রান। খাটোনি ৪৬ রানে ৪ এবং সি ঁস যোশী ৫০ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৮৫ রান (২ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। চৌহান ৭৩ নট-আউট এবং ওয়াদেকার ৮২ নট-আউট)।

মধ্যাঞ্চল : ১২৯ রান (সেলিম দুরানী ৩৮ রান। অজিত পাই ৪২ রানে ৭ এবং উদয় যোশী ৫৩ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১১৭ রান (৪ উইকেটে। হনুমন্ত ৫৩ নট-আউট। বুন্ধ ১৯ রানে ২ উইকেটে)।

মাদ্রাজে আয়োজিত দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলায় উত্তরাঞ্চল দল ৯৮ রানে শক্তিশালী দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। উত্তরাঞ্চল এই প্রথম দলীপ ট্রফির ফাইনালে উঠলো।

প্রথম দিনের খেলায় উত্তরাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস ১০০ রানের মাথায় শেষ হয় এবং দক্ষিণাঞ্চল দল প্রথম ইনিংসের সাতটা উইকেট খুইয়ে ১০৩ রান সংগ্রহ করে।

ডিসকাস থ্রোতে বিশ্বরেকর্ড স্রষ্টা আমেরিকার স্কুলশিক্ষক জে সিলভেস্টার (বয়স ৩০)। ১৯৬৮ সালের ২৫শে মে তারিখে ২১৮ ফিট ৪ ইঞ্চি দূরত্বে ডিসকাস নিক্ষেপ করে তিনি যে বিশ্বরেকড করেছিলেন তা আজও সরকারীভাবে অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রথম দিনের খেলায় বোলাররাই প্রাধান্য বিস্তার করে।

দ্বিতীয় দিনে ১১১ রানের মাথায় দক্ষিণাঞ্চল দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে তারা মাত্র ১১ রানে এগিয়ে যায়। উত্তরাঞ্চল দলের অধিনায়ক বিষেণ সিং বেদী ১৯ রানে সাতটা এবং এস চক্রবর্তী (সার্ভিসেস) ৫৬ রানে ৩টে উইকেট নিয়ে শক্তিশালী দক্ষিণাঞ্চল দলকে কাবু করেছিলেন। বেদীর বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ১৭ ওভার, ১৩ মেডেন, ১৯ রান ও ৭ উইকেট।

দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকী সময়ে উত্তরাঞ্চল দল দ্বিতীয় ইনিংসের ৬টা উইকেট খুইয়ে ২২০ রান সংগ্রহ করে। এই রানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাটা খেলোয়াড় অশোক গনদোত্রের ৭৩ রান।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে উত্তরাঞ্চল দল ২৫৫ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। তৃতীয় দিনে উত্তরাঞ্চল দল ৪৫ মিনিট ব্যাট করেছিল। দক্ষিণাঞ্চল দল ২৭৫ মিনিটের খেলা হাতে নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামে। জয়লাভের জন্যে তাদের ২৪৫ রানের দরকার ছিল। কিন্তু মাত্র ১৪৬ রানের মাথায় তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ফলে উত্তরাঞ্চল দল ৯৮ রানে জয়ী হয়। উত্তরাঞ্চল দলের এই জয়লাভের মূলে ছিল মিডিয়াম-ফাস্ট বোলার এস চক্রবর্তীর বোলিং—তিনি ৪২ রানে ৬টা উইকেট পান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

উত্তরাঞ্চল: ১০০ রান (ভি লাম্বা ৫৪ রান। চন্দ্রশেখর ৩৬ রানে ৫ উইকেট)।

ও ২৫৫ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। অশোক গানদোত্র ৭৩ রান। আবিদ আলী ৬০ রানে ৩ এবং চন্দ্রশেখর ৬১ রানে ৩ উইকেট)।

দক্ষিণাঞ্চল : ১১১ রান (আবিদ আলি ৩২ রান। বেদী ১৯ রানে ৭ এবং এস চক্রবর্তী ৫৬ রানে ৩ উইকেট)।

ও ১৪৬ রান (বিশ্বনাথ ৫১ রান। এস চক্রবর্তী ৪২ রানে ৬ এবং বেদী ৫৩ রানে ২ উইকেট)।

ভারত সফরে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ড বনাম সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের তিনদিনের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। নিউজিল্যান্ড দলের অধিনায়কত্ব করেন ভিক্টর পোলার্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ দলের অম্বর রায়।

প্রথম দিনে নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৬৮ রাণ তুলেছিল। দ্বিতীয় দিনে তারা ৩১৯ (৯ উইকেটে) রাণের মাথায় প্রথম ইনিংসের

১৯৬৮ সালের ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকার খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলাপরত প্রেসিডেন্ট রিচার্ড এম নিক্সন (বাঁ দিক থেকে ৪র্থ)। ১৯৬৯ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলে আমেরিকাকে যাঁরা ডেভিস কাপে জয়যুক্ত করেছেন এই ছবিতে তাঁদেরও পাবেন—আর্থার আস (বাঁ দিক থেকে প্রথম), স্ট্যান স্মিথ (ডান দিকে প্রথম) এবং বব্ লজ (ডান দিকে দ্বিতীয়)।

সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিন সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের ১ম ইনিংসের খেলায় ৬টা উইকেট পড়ে ১৬৫ রান উঠেছিল। খেলার এই অবস্থায় তারা নিউজিল্যান্ড দলের থেকে ১৫৪ রাণের পিছনে ছিল এবং হাতে জমা ছিল ৪টে উইকেট। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মন্থর গতিতে রাণ উঠেছিল—সারাদিনে মোট ২১৬ রাণ।

তৃতীয় অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ২১৩ রাণের মাথায় সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৬০ রাণ করেন অধিনায়ক অম্বর রায়। অপর দিকে সর্বাধিক ৫টা উইকেট পান ইউল। নিউজিল্যান্ড ১০৬ রাণে অগ্রগামী হয়ে ২য় ইনিংস খেলতে নামে এবং ৭১ রাণের (৩ উইকেটে) মাথায় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার এই অবস্থায় সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের জয়লাভের জন্যে ১৭৮ রাণের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল ১৩৫ মিনিটের খেলা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় দল এই সময়ে ৪টে উইকেট খুইয়ে ১২১ রাণ পর্যন্ত তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড : ৩১৯ রাণ (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। টার্নার ৫০, কংডন ৭১ এবং বাজেস ৭৮ রান। যোশী ৯৬ রানে ৫ উইকেট)

ও ৭১ রান (৩ উইকেটে ডিক্লেঃ। ঘাটানি ১৬ রানে ২ উইকেট)

সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় : ২১৩ রান (অম্বর রায় ৬০ রান। ইউল ৫১ রানে ৫ উইকেট)

ও ১২১ রান (৪ উইকেটে। গণদোত্র ৫৮ নটআউট)

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ড

ভারতবর্ষ এবং নিউজিল্যান্ডের মধ্যে যে তিনটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ হয়ে গেছে তার ফলাফল : ভারতবর্ষের রাবার জয় ৩ (১৯৫৫-৫৬, ১৯৬৫ ও ১৯৬৮ সালে)। টেস্ট খেলা ১৩—ভারতবর্ষের জয় ৬, নিউজিল্যান্ডের জয় ১ এবং ড্র ৬।

টেস্ট ক্রিকেটের বিবিধ রেকর্ড

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ : ৫৩৭ (৩ উইঃ ডিক্লেঃ), মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬

নিউজিল্যান্ড : ৫০২, ক্রাইস্ট চার্চ, ১৯৬৮

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

ভারতবর্ষ : ৮৮ রান, বোম্বাই, ১৯৬৫

নিউজিল্যান্ড : ১০১, অকল্যান্ড, ১৯৬৮

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

ভারতবর্ষ : ২৩১ রান—ভিনু মানকাদ, মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬

নিউজিল্যান্ড : ২৩৯ রান—গ্রাহাম ডাউলিং, ক্রাইস্ট চার্চ ১৯৬৮

সেঞ্চুরী—২৬

ভারতবর্ষ ১৬টি এবং নিউজিল্যান্ড ১০টি

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

নিউজিল্যান্ড : ৬১১ রান (৯ ইনিংসে এবং গড় ৮৭·২৮)—বার্ট সার্টক্লিফ, ১৯৫৫-৫৬

ভারতবর্ষ : ৫২৬ রান (৫ ইনিংসে এবং গড় ১০৫·২০)—ভিনু মানকাদ, ১৯৫৫-৫৬

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক উইকেট

ভারতবর্ষ : ৩৪টি (গড় ১৯·৬৭)—সুভাষ গুপ্তে, ১৯৫৫-৫৬

নিউজিল্যান্ড : ১৫টি (গড় ১৮·৪০)—ব্রুস টেলর, ১৯৬৫ এবং ডিক মজ, ১৯৬৮

দাবার আসর

দাবার পরিভাষা

দাবার চাল শেখার পর পাঠকদের উচিত দাবার পরিভাষার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। সুতরাং এই সংখ্যায় দাবার পরিভাষা ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া হোল।

আলগা বড়ে বা একক বড়ে:—যে বড়েকে স্বপক্ষের অন্য কোন বড়ে দ্বারা জোর দেওয়া যায় না, তাকে বলে আলগা বড়ে বা একক বড়ে। আলগা বড়ে বেশীর ভাগ সময়ই দুর্বলতার চিহ্ন, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে আলগা বড়ে বেশ শক্তির পরিচয় দিতে পারে। ইংরাজীতে আলগা বড়েকে বলে আইজোলেটেড পন।

উত্তীর্ণ বড়ে:—ইংরাজীতে বলে পাসট পন। যে বড়ের অগ্রগতি রোধ করতে সেই ফাইলে বা দু পাশের কোন ফাইলে বিপক্ষের কোন বড়ে থাকে না, সেই বড়েকে বলে উত্তীর্ণ বড়ে। উত্তীর্ণ বড়ে বিপক্ষের অন্য কোন বড়ে দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয় না বলে সহজেই এগিয়ে যেতে পারে এবং বিপক্ষের দারুণ ক্ষতি করতে পারে। তখন একে সামলাতে বিপক্ষকে বড় ঘুঁটির সাহায্য নিতে হয়. ফলে সামান্য একটা বড়েকে আটকাতে গজ, ঘোড়া বা নৌকাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। উত্তীর্ণ বড়ে অষ্টম ঘরে গিয়ে পৌঁছে মন্ত্রীতে রূপান্তরিত হলে তার জন্যে বিপক্ষকে অনেক সময় গজ বা ঘোড়াকেও বিসর্জন দিতে হয়।

জিত-বদল বা লাভজনক বদল: দাবা খেলায় সব ঘুঁটির মূল্য সমান নয়. মন্ত্রী এবং নৌকাকে গজ ও ঘোড়ার চেয়ে বেশী শক্তিমান ধরা হয়। গজ বা ঘোড়ার সঙ্গে বিপক্ষের নৌকার বদল হলে তাকে প্রথমোক্ত খেলোয়াড়ের পক্ষে 'জিত-বদল' বলা যায়। সেই রকম ১টি নৌকার বদলে মন্ত্রী পেলে তাকেও জিত-বদল বলা যায়। ইংরাজীতে এই রকম বদলকে বলে 'বেটার এক্সচেঞ্জ।'

চাপা:—কোন ঘুঁটির ওপর বিপক্ষের কোন ঘুঁটির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে স্বপক্ষের কোন ঘুঁটি আক্রমণকারী ঘুঁটির রোখের মধ্যে যে কোন ঘরে বসিয়ে আড়াল দেওয়ার বা বিপক্ষের সেই ঘুঁটির আক্রমণ প্রতিরোধের নাম—চাপা। ধরুন আপনার গজ উঠে গিয়ে বিপক্ষের মন্ত্রীকে আক্রমণ করল। জোরে থাকার ফলে আপনার গজকে মন্ত্রী মারতে চাইছে না, মন্ত্রী তার ঘর থেকে নড়তেও চাইছে না। এক্ষেত্রে মন্ত্রীকে বাঁচানোর জন্যে গজের আক্রমণ-পথের কোন ঘরে বিপক্ষ তার একটি ঘোড়াকে বসিয়ে দিল। ঘোড়াটি তাহলে চাপায় পড়ে গেল, কারণ এ সরলেই মন্ত্রী বিপক্ষের ছোট ঘুঁটির কাছে মারা পড়বে। চাপার ইংরাজী হচ্ছে পিন। ইংরাজীতে ঘোড়াটিকে বলা হবে 'পিনড পিস' এবং গজটিকে বলা হবে 'পিনিং পিস'। দাবা খেলোয়াড়দের পক্ষে 'পিন' একটি সুন্দর অস্ত্র।

কিস্তি:—ইংরাজী 'চেক'। কোন ঘুঁটির দ্বারা বিপক্ষের রাজাকে আক্রমণ করাকে বলে কিস্তি দেওয়া। কিস্তি দিলে 'কিস্তি' বা 'চেক' কথাটা উচ্চারণ করে বিপক্ষকে সাবধান করে দেওয়া একটা রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। এটা সাধারণ ভদ্রতা মাত্র, সাবধান করতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা কিছু নেই।

কিস্তি তিন প্রকারে সামলান যেতে পারে:—(১) বিপক্ষ ঘুঁটির আক্রমণের পথ থেকে রাজাকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোন ঘরে চেলে। (২) রাজা ও আক্রমণকারী ঘুঁটির মধ্যে কোন স্বপক্ষের ঘুঁটি চাপা দিয়ে। কিন্তু ঘোড়া বা বড়ের কিস্তিতে কোন ঘুঁটি চাপা চলে না। (৩) আক্রমণকারী ঘুঁটিকে মেরে নিয়ে।

কিস্তি মাৎ বা মাৎ:—কিস্তি পড়ার পর কিস্তি সামলানোর কোন উপায় না থাকলে রাজা মাৎ হয়ে গেল। মাৎ হলেই খেলা সমাপ্ত হয়ে গেল, এবং যে পক্ষের রাজা মাৎ হোল সে পক্ষকে পরাজয় বরণ করতে হয়। রাজাকে মাৎ করাই দাবা খেলার উদ্দেশ্য। ইংরাজীতে মাৎকে বলে চেকমেট বা শুধু মেট।

উঠ কিস্তি:—কোন ঘুঁটি চালার ফলে যদি স্বপক্ষের অন্য কোন ঘুঁটির আক্রমণ খুলে গিয়ে বিপক্ষের রাজার ওপর কিস্তি পড়ে, তাহলে একে বলা হয় উঠ-কিস্তি। এক্ষেত্রে একটি ঘুঁটি উঠে যাবার বা সরে যাবার ফলে স্বপক্ষের অন্য একটি ঘুঁটি দিয়ে আপনা থেকে বিপক্ষের রাজার ওপর কিস্তি পড়ে যায়। ইংরাজীতে উঠ-কিস্তিকে বলে 'ডিসকভারড চেক।'

ডবল কিস্তি:—উঠ-কিস্তির সময় এমন হতে পারে, যে ঘুঁটিটি উঠে যাওয়ার ফলে কিস্তি পড়ছে, সেই ঘুঁটিটিও এমন কোন ঘরে গিয়ে বসল যেখান থেকে তার দ্বারাও বিপক্ষের রাজার ওপর কিস্তি পড়ে। এক্ষেত্রে একই সময়ে দুটো ঘুঁটির কিস্তি পড়ছে বলে একে বলা হয় ডবল কিস্তি। ডবল কিস্তি সামলানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে রাজাকে সরানো। ডবল কিস্তি একটি অতি মারাত্মক অস্ত্র এবং সাধারণত ডবল কিস্তি দেওয়ার পরে বিপক্ষের আর কোন খেলা থাকে না।

রাগের কিস্তি:—খেলা চলাকালীন এমন অবস্থা আসতে পারে যে এক পক্ষ কয়েক চালের মধ্যেই মাৎ হয়ে যাবে অথবা তার খেলা এত খারাপ হয়ে যাবে যে মাৎ অবশ্যম্ভাবী। সেই পক্ষ হয়ত কোন ঘুঁটি দিয়ে জিত-পক্ষের রাজাকে কয়েকটা কিস্তি দিতে পারে। জিত-পক্ষ এই সব কিস্তি সামলে নেওয়ার পরে বিপক্ষকে হারিয়ে দেবেই। জিত-পক্ষকে বিপরীত পক্ষ এই যে কয়েকটি অনর্থক কিস্তি দিচ্ছে, এই সমস্ত কিস্তিকে বলে রাগের কিস্তি। রাগের কিস্তি দেওয়ার ফলে খেলাটা অনর্থক কয়েক চাল বিলম্বিত হয়। ইংরাজীতে রাগের কিস্তিকে বলে স্পাইট চেক।

চটা খেলা:—যে খেলায় কোন পক্ষই বিপরীত পক্ষকে মাৎ করতে পারে না, তাকে বলে চটা খেলা। ইংরাজীতে বলে ড্র। খেলা নানা কারণে চটে যেতে পারে। যেমন, দুপক্ষের সব ঘুঁটি মারা গিয়ে শুধু রাজা অবশিষ্ট থাকলে কোনদিন মাৎ হবে না। সব ঘুঁটি মরা না গেলেও ঘুঁটি এত কমে যেতে পারে যে কখনও মাৎ করা সম্ভব নয়। যেমন, একটি মাত্র ঘোড়া বা গজ দিয়ে কখনও বিপক্ষের নির্বল রাজাকে মাৎ করা যায় না। দুপক্ষেরই একটি করে গজ বা ঘোড়া মাত্র অবশিষ্ট থাকলে মাৎ হবে না। অনেক সময় একটি গজ এবং বড়ে থাকলেও বিপক্ষের নির্বল রাজাকে মাৎ করা যায় না। তাছাড়া, 'পঞ্চাশ চালের নিয়ম' এবং 'চালের পুনরাবৃত্তি' বলে দুটি জিনিষ আছে যাতে খেলা চটে যায়। এই দুটি নিয়ম সম্বন্ধে পরে বিশদ ব্যাখ্যা করব।

চাল মাৎ:—খেলা চলার সময় কোন পক্ষের এমন অবস্থা আসতে পারে যে সেই পক্ষের কোন ঘুঁটি চালার আইনসঙ্গত কোন ঘর নেই, এক্ষেত্রে সেই পক্ষ চাল-মাৎ হয়েছে বলা হয়। কোন পক্ষ চাল-মাৎ হলে খেলা চটে যায়। ইংরাজীতে একে বলে স্টেলমেট।

গয়বি খেলা:—ইংরাজী 'ব্লাইণ্ডফোল্ড চেস।' গয়বি খেলা হচ্ছে ছক না দেখে দাবা খেলা। অনেক পাকা খেলোয়াড় আছেন যাঁরা ছক না দেখে শুধু চাল শুনে এবং জবাবে মুখে মুখে চাল বলে দাবা খেলতে পারেন। গয়বি খেলায় প্রত্যেক চালে ঘুঁটিগুলির নতুন অবস্থিতি মনে মনে বুঝে নিয়ে খেলোয়াড়কে তার জবাব মুখে বলে দিতে হয়। দর্শকগণের দেখবার জন্যে এবং হার-জিতের মীমাংসার জন্যে অন্যত্র দূরে একটি ছকে ঘুঁটি সাজানো থাকে। গয়বি খেলোয়াড়ের মুখে তাঁর চালটি শুনে সেই ছকে চালটি দেওয়া হয়। তারপর বিপক্ষের চালটি গয়বি খেলোয়াড়কে শুনিয়ে দিলে তিনি পুনরায় নিজের চাল বলেন—এইভাবে খেলা চলে। গয়বি খেলতে গেলে চাই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা এবং মনঃসংযম।

বিশ্ব বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মধ্যে পিলসবেরী, এ্যালেখাইন এঁরা একসঙ্গে ২০।৩০টি ছকে গয়বি খেলে গেছেন। কিন্তু গয়বি খেলায় বিশ্ব রেকর্ড করেছেন মিগুয়েল নাইদর্ফ ১৯৪৭ সালে ব্রাজিলে একসঙ্গে ৪৫টী ছকে গয়বি খেলে এবং বেশিরভাগ খেলাই জিতে। ভারতবর্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যে গয়বি খেলায় সুনাম অর্জন করেছিলেন কিষণলাল, এম জি মহাণ্ডেল, এস ভি খোডাস, মদন চট্টরাজ, শশীভূষণ ঘোষ, নিখিলনাথ মৈত্র প্রমুখ খেলোয়াড়গণ। বাংলাদেশের জীবিত খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ কুণ্ডু এবং কালিদাস সমাজদারও গয়বি খেলতে পারেন।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

নূতন বই নূতন বই

ভ্রমণ

নির্মলকুমার মহলানবিশের

কবির সঙ্গে য়ুরোপে

৭৫ খানি আর্টপ্লেট সহ, বিপুল গ্রন্থ

॥ দাম মাত্র দশ টাকা ॥

বাসুদেব বসুর

নেফা, সুন্দরী নেফা ৪॥

উপন্যাস

বিমল করের **সঙ্গিনী ৪,**

সন্তোষকুমার ঘোষের **ত্রিনয়ন ৪,**

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

মুক্তাসম্ভবা ৫,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কন্যাকুমারী ৬,

জীবনকথা

লীলা মজুমদারের

সুকুমার রায় ৪॥

প্রবন্ধ

মহাত্মা গান্ধীর

সত্যাগ্রহ ৭॥

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গান্ধীজীর গঠনকর্ম ৪॥

ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদদের রচনাসমৃদ্ধ

গান্ধী পরিক্রমা ১৫,

ছেলেদের

লীলা মজুমদারের

নেপোর বই ৩॥০

সুখলতা রাওর

নতুনতর গল্প ২,

সুমথনাথ ঘোষের

কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥

লীলা মজুমদারের

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

আর কোনখানে ৫,

॥ নূতন চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল ॥

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

বাঙালী জীবনে রমণী ১০,

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

যাত্রাগানে রামায়ণ ৯, (সচিত্র)

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের

পুণ্যতীর্থ ভারত (ভারতের সমস্ত তীর্থভ্রমণ) **১০,**

প্রবোধকুমার সান্যালের

উত্তর হিমালয় চরিত ১১,

অবধূতের

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮॥

জ্যোতিকুমার চৌধুরীর

ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর ৪॥

শঙ্কু মহারাজের

গহন গিরি কন্দরে ৬, পঞ্চপ্রয়াগ ৫,

নীল দুর্গম ৬॥ উত্তরস্যাং দিশি ১০,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

মনে ছিল আশা (নূতন মুদ্রণ) **৪॥**

বহ্নিবন্যা ৮॥ দহন ও দীপ্তি ৬,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দৃষ্টিপ্রদীপ (নূতন মুদ্রণ) **৭,**

'কথাসাহিত্য' শারদীয় সংখ্যা অন্য অন্য বছরের মতো এবারেও শ্রেষ্ঠ লেখকদের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনায় সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইল।

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্ততঃ ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ২২.০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১০.০০	টাকা ১১.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫.০০	টাকা ৫.৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৯ম বর্ষ
২য় খণ্ড

২৩শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 10th October, 1969 শুক্রবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীআর কিশোর যাদব

কয়েকটি কাগজের বিজ্ঞাপনে অসাধুতা

এবারের শারদীয় পত্র-পত্রিকার কয়েকজন কর্মকর্তার বাড়াবাড়ি মনোবৃত্তির প্রসঙ্গ আপনার গোচরে আনতে চাই। এই সময়ে এমন কতগুলো পত্র-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে যার রচনা সংকলনের রুচি এবং শালীনতা সম্পর্কে বিদগ্ধ পাঠক সন্দিগ্ধ। বলা বাহুল্য এইসব সংকলনে বেশীর ভাগই তরুণ ও অপরিণত পাঠকদের নিম্নস্তরের উত্তেজনার খোরাক জোগানোর চেষ্টা হয়ে থাকে। এইসব শারদ-সংখ্যার সম্পাদক অথবা কর্মকর্তারা নানারকম উত্তেজক ও চটকদার বিজ্ঞাপনে চপল-মতি পাঠকদের দৃষ্টি এবং কৌতূহলে আকৃষ্ট করে পুজো মৌসুমে বেশ কিছু পয়সা আত্মসাৎ করে থাকেন।

এবারে তাঁরা আরও কিছু গহিত পন্থা অবলম্বন করেছেন। বাংলা সাহিত্যের কিছু নামী বা চালু লেখক তাঁদের শিকার হয়েছেন। ওইসব পুজোসংখ্যার আকর্ষণ হিসাবে ওই লেখকদের নাম জনপ্রিয় সাহিত্য-পত্রে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপিত হয়েছে। অথচ কোন কাগজে লিখেছেন বলে সেই লেখকবৃন্দ নিজেরাও জানেন না। এই গোছের শিকার এবারে আমি নিজেও হয়েছি। 'যৌবন' নামে একটি শারদসংখ্যার লেখক হিসাবে আমি আমার নিজের নামের চটকদার বিজ্ঞাপন দেখেছি। এই কাগজে আমার কিছু লেখার প্রতিশ্রুতি ছিল না, বা আমি কিছু লিখিও নি। কিন্তু পুজোসংখ্যা যৌবন উল্টে দেখলাম 'প্রগতিভস্ম' নামে আমার একটি পুরনো বড় গল্প ওই সংকলনে ছাপা হয়েছে। এই গল্পটি প্রথমে কোন সাহিত্য-পত্রে ছাপা হয়েছিল এবং পরে সেটি 'মিত্র-ঘোষ' প্রকাশিত আমার 'সাঁঝের মল্লিকা' গল্পগ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু যৌবনের সম্পাদক বা কর্মকর্তারা এ জন্যে আমার কোনরকম অনুমতি নেওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করেন নি। আরো তাজ্জব কথা, এটি যে পুনর্মুদ্রিত গল্প, (পাঠকদের ভাঁওতা দেবার জন্য?) এই স্বীকৃতিও কোথাও চোখে পড়ে নি।

কপিরাইট-অ্যাক্ট-এ এই গর্হিত এবং ধৃষ্ট আচরণের ফল কি সেটা ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু আপনাদের মত বহুজনাদৃত সাহিত্য-পত্রের দরবারে উপস্থিত হলে এর কি বিচার?

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা-২৬

দিল্লীর যুব উৎসব

এই সপ্তাহের (২রা আশ্বিন, ১৩৭৬) অমৃতে 'অপ্রীতিকর যুব উৎসব' সম্পাদকীয়টি পড়লাম। পড়ে দুঃখবোধ করছি। একথা সত্য যে, রবীন্দ্রসরোবরের নামে বহু অপপ্রচার ভারতে হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে যথারীতি অপদস্থ ও হেয় করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে পাল্টা প্রতিশোধ হিসাবে রবীন্দ্র-রঙ্গশালার ব্যাপার নিয়ে বাড়িয়ে বলা হবে এবং তা নিয়ে হৈ-চৈ করা হবে, একথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে উৎসবের শেষদিনে রবীন্দ্র-রঙ্গশালায় কি ঘটেছিল, তা জানানো আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি।

৮ই সেপ্টেম্বর ছিল কমনওয়েলথ যুব-উৎসবের শেষ দিন। ঐদিন স্থানীয় একটি পাক্ষিক পত্রিকা 'ডেটলাইন দিল্লী' একটি টিট সো-এর আয়োজন করে রঙ্গশালায়। শো যথারীতি চলতে থাকে এবং রাত ৯টা পর্যন্ত কোন গোলমাল হয় নি। ৯টার সময় হঠাৎ কিছু (অনাদশেক) ছেলে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং চিৎকার করতে করতে ও শ্লোগান দিতে দিতে স্টেজের দিকে ছুটে যায়। একজন গিয়ে মাইক কেড়ে নেয় এবং বাকিরা কয়েকজন আর্টিস্টকে ধরে মারতে থাকে। কিছু লোক তখন আর্টিস্টদের সাহায্যার্থে এগিয়ে যায়। কিন্তু উক্ত ছেলেরা তাদের বাধা দেয় এবং গোলমাল বাধে। এই সময় বাইরেও গোলমাল শোনা যায়। আমরা কয়েকজন বন্ধু গিয়ে দেখি কয়েকটি গুণ্ডা-শ্রেণীর লোক একটি মেয়ের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছে। আমরা তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করি, এবং আমাদের ডাকাডাকিতে আরও কিছু লোক আমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। তাদের সাহায্যে আমরা গুণ্ডাদের পুলিশের হাতে সমর্পণ করি। অবশ্য একজন পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল যে একজন মেয়েকেই সেদিন বিরক্ত করা হয়েছিল, মেয়েদের সামগ্রিকভাবে কিছু করা হয় নি।

'অমৃতে' এক স্থানে লেখা হয়েছে 'রাজধানীতে মেয়েরা কতটা নিরাপদ এবং কলকাতার রাস্তায় মেয়েরা যত নিরাপদে ঘুরে বেড়ায়, সন্ধ্যার পর রাজধানীর রাজপথে মেয়েরা তা পারেন কিনা তা যাচাই করে দেখুন।' এই উক্তিটা পড়ে একটু অবাক হয়েছি। আমি তো জানি দিল্লীর মত নিশ্চুপ স্থান (বিশেষ করে সন্ধ্যার পর) দুনিয়ায় আর নেই এবং এখানে মেয়েরা যখন খুশি, যেভাবে খুশি, যেখানে খুশি একলা চলাফেরা করতে পারে। কলকাতাতেই বরং দেখেছি মেয়েরা সন্ধ্যার পর গোলমালের ভয়ে একলা পথে বেরোয় না বা বেরোতে চায় না। অবশ্য এ নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে। তাছাড়া কলকাতার মত দিল্লীতে আড্ডাবাজি নেই এবং 'ইভটীজিং'ও আনুপাতিকভাবে কম।

'অমৃত'-এ একস্থানে কমেক্স-৩'কে ইউরোপীয় যুবদল বলা হয়েছে। একথা ঠিক নয়। কমেক্স ৩-এ কমনওয়েলথের সব দেশেরই ছাত্রছাত্রীই ছিল।

পরিশেষে জানাই প্রথম দিন বিশ্ব-ভারতীর চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ের কথা থাকলেও পরে প্রোগ্রাম পরিবর্তনের জন্য প্রথম দিন চিত্রাঙ্গদা অভিনয় হয় নি, পরে হয়েছিল। এতে পক্ষপাতিত্বের বা বিশ্বভারতীর প্রতি অভদ্র আচরণের বা সাংস্কৃতিক অধঃপতনের প্রশ্ন ওঠে না।

প্রতীক রায়
নয়াদিল্লী-১

(২)

সম্পাদকীয় বিভাগে (৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড ২০শ সংখ্যা) 'অপ্রীতিকর যুব উৎসব' শীর্ষক প্রবন্ধে এবং একটি প্রকাশিত পত্রে রাজধানী দিল্লীর রবীন্দ্র রঙ্গশালার অপ্রীতিকর ঘটনা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কমেক্স—৩ নামে দিল্লীতে যে আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এবং সেই আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীর মিলন ক্ষেত্রে শেষ দিকে যে ধরনের উন্মত্ত তাণ্ডবলীলা ঘটেছে, তা যে কোন সভ্য দেশের এক চরম কলংক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দিল্লীর পত্রপত্রিকা দায়সারা গোছের একটু সংবাদ ছাপিয়েই কর্তব্য পালন করেছেন। অথচ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা নিয়ে দিল্লী ও অন্যান্য হিন্দী এলাকার পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশ তথা বাঙালী সমাজের কলঙ্ক প্রচারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। একখানা হিন্দী সাপ্তাহিক পত্রিকা ব্লক দিয়ে ছেপে অনেক কেচ্ছা কাহিনী লিখে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন কোথায় গেল তাঁদের সেই উৎসাহ? কোথায় গেল মা-বোনেদের সম্ভ্রম রক্ষার সেই আর্ত চিৎকার? কলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলিরও উচিত দিল্লীর এই ঘটনাবলীর ছবি ছেপে সারা ভারতে ছড়িয়ে

দেয়া। দেখিয়ে দিক সারা ভারতের জনসাধারণকে দিল্লীওয়ালারা মেয়েদের শালীনতা রক্ষায় কতটুকু যত্নবান?

বিজয়কুমার ধর
হাইলাকান্দি, আসাম

প্রাচীন গান

৯ই আশ্বিন প্রকাশিত 'অমৃতে'র চিঠিপত্র বিভাগে শ্রীশান্তিময় মিত্র ২৬শে ভাদ্র সংখ্যা 'অমৃতে' শ্রীদীনেশচন্দ্র অধিকারী এবং শ্রীমতী নমিতা সিংহ উভয়ের প্রকাশিত 'এবার আমার উমা এলে' গানখানির মধ্যে কোন কোন স্থানে বেশ অমিল রয়েছে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সঠিক গানটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। দীনেশবাবু দুটি গানের সম্পূর্ণ পদ প্রকাশ করেছেন, (১) গিরি! গৌরী আমার এসেছিল ও (২) গিরি! এবার আমার উমা এলে। তিনি জানিয়েছেন এই গান দুখানি তিনি বহু পুরাতন রেকর্ড কাকলীর জীর্ণ পাতা থেকে গানগুলি সংগ্রহ করেছেন। শ্রীমতী নমিতা সিংহও দুখানি গানের সম্পূর্ণ পদ প্রকাশ করেছেন, (১) যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী ও (২) গিরি! এবার আমার উমা এলে। কোথা থেকে গান দুখানির সম্পূর্ণ পদগুলি পেয়েছেন তার উল্লেখ করেন নি, শুধু লিখেছেন 'গান দুখানি আমার জানা ছিল'। দীনেশবাবু ও শ্রীমতী নমিতা সিংহ দুজনেই একই গান, 'গিরি! এবার আমার উমা এলে', লিপিবদ্ধ করেছেন, কিন্তু দুঃখের মধ্যে কিছু অমিল রয়েছে ত বটেই, শ্রীমতী সিংহের প্রকাশিত এই গানের শেষের দু লাইন দীনেশবাবুর দেওয়া গানে নেই। আমার কাছে ১৩১২ সালে প্রকাশিত শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত সুবৃহৎ 'বাঙ্গালীর গান' নামে একখানি বই আছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪৮। এতে বহু গীত-রচয়িতার গান ও জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এতে রামপ্রসাদের 'গিরি। এবার আমার উমা এলে' গানখানির বয়ান যা প্রকাশিত হয়েছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তা উদ্ধৃত করছি। মনে হয় গানখানির এটিই প্রামাণ্য বয়ান। এই বয়ানের সঙ্গে দীনেশবাবুর ও শ্রীমতী সিংহের উভয়ের বয়ানে কিছু গরমিল লক্ষিত হবে।

পিলু বাহার-জৎ

গিরি! এবার আমার উমা এলে,
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ,
কারো কথা শুনব না।।
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া,
জামাই ব'লে মানবে না।
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়;
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে,
ঘরের ভাবনা ভাবে না।।

দীনেশবাবু 'গিরি! গৌরী আমার এসেছিল' গানটির যে পূর্ণপদ দিয়েছেন, 'বাঙালীর গান' গ্রন্থে পরিবেশিত রামপ্রসাদের এই গানের বয়ানেও কিছু গরমিল আছে। 'বাঙালীর গানে' এর পূর্ণপদ এইরূপে দেওয়া আছে ঃ—

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকালো।।
কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল;
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো।।
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার!
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার,
আবার ভাবি, গিরি! দোষ কি অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হ'লো।।

'বাঙালীর গানে' অর্দ্ধেন্দুবাবুর তৃতীয় গানটির, 'যাও, যাও গিরি আনিতে গৌরী', কোন উল্লেখ পাই নি, সুতরাং শ্রীমতী সিংহ এর যে বয়ান দিয়েছেন তাহা সঠিক কি না সন্ধানী পাঠক জানাবেন।

অনিল সোম,
জামসেদপুর—৫

বিদেশে কলম বন্ধু

ভারতবর্ষে আমি একজন কলম-বন্ধু চাই। আমার বয়স ১২ বছর। আমার ঠিকানা নিচে দিলাম। চিঠি দিতে পারেন।

কুমারী কুরিয়ে পিনাইয়া লিণ্ডা

ঠিকানা—
Miss Kuriepinaia Linda
Apartment no 12.
House no. 23
Likhackerskoe Shosse Street
Town Dolgopruduv-2
Moscow (U.S.S.R).

বইকুন্ঠের খাতা

৯ই আশ্বিন প্রকাশিত সাপ্তাহিক অমৃতে সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষের সঙ্গে উক্ত পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধির সাক্ষাৎকার আমাকে মুগ্ধ করেছে। এমনিভাবে যদি বিভিন্ন সাহিত্যিকের জীবন জিজ্ঞাসা, আদর্শ, লেখক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, রুচি এবং স্বাতন্ত্র্যবোধকে সঠিকভাবে বিশেষ প্রতিনিধি 'বইকুন্ঠের খাতা' মারফৎ আমাদের সামনে প্রতি সংখ্যায় তুলে ধরেন তাহলে আমার মত সাহিত্যানুরাগী অনেক পাঠকই বিশেষ উপকৃত হবেন।

নিয়মিত পাঠক হিসাবে উক্ত পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চাই বলেই কথাটা উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম। ধন্যবাদ জানাই 'অমৃত' কর্তৃপক্ষকে, তাঁদের নতুন সংযোজনকে এবং সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীকে। এই ধরনের আলোচনার ফলে বাংলাসাহিত্য তথা লেখককে জানার সুযোগ ঘটবে বলেই মনে করি।

নিতাই অধিকারী
শান্তিপুর, নদীয়া

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

গত ১৫ অগাস্টের 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' বিভাগে শ্রদ্ধেয় অভয়ংকরের বিশ্বনাট্য প্রসঙ্গটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। শ্রীজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'আধুনিক বিশ্বনাট্য প্রতিভা' নামে যে পুস্তকটির প্রকাশনার উপলক্ষ্যে তিনি এই আলোচনাটি করেছেন সেই বইটি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতীয় সাহিত্যে বিশ্বনাট্য প্রসঙ্গে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সত্যই অভিনন্দনযোগ্য। তবে অভয়ংকরের আলোচনায় একটু তথ্যগত ভুল থেকে গেছে। তিনি লিখেছেন লেখক বার্ণার্ড শ'কে দূরে ও সীঙ্গ বা অস্কার ওয়াইল্ডকে অনুপস্থিত রেখেছেন। আলাদা ভাবে আলোচনা না করলেও লেখক শ'কে কাব্যনাট্য রচয়িতাদের দলে ফেলেছেন (দ্রঃ পৃঃ ৬১—৬৩)। এটি একটি নতুন আইডিয়া এবং গবেষণার বিষয় হতে পারে। কারণ শ'এর সব নাটক সামাজিক গদ্যনাট্যধর্মী নয় (যেমন এ্যাপ্‌ল্‌কার্ট' 'ক্যানাডিডা', 'মরুস্' ইত্যাদি)। সীঙ্গ আলোচিত হয়েছেন (পৃঃ ৫১—৫৩) 'কাব্যিক' নাট্যকার হিসাবে (মনে পড়ে 'রাইডার্স টু দ্য সী'-এর সেই কাব্য-মধুর বেদনা-বিধুর পটভূমি!)। অস্কার ওয়াইল্ড (পৃঃ ৬৪) আরো বিস্তৃত আলোচনার অধিকারী। তবে শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় রচিত 'বার্ণার্ড শ' ও 'অস্কার ওয়াইল্ড' নামক দুটি বাংলা বইতে এই দুজন খ্যাতনামা নাট্যকার সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তা এই বিষয়ে উৎসাহী পাঠকের জ্ঞান-স্পৃহাকে সম্পূর্ণ নিবৃত্ত করতে সক্ষম বলেই মনে হয়।

বিমল চক্রবর্তী
নয়াদিল্লী।

ঠিকানা বদল

সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ি বদলিয়েছেন। তাঁর এখনকার ঠিকানা হল—৩।সি, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯।

সাদা চোখে

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস রাজনীতি করতে শুরু করেছে ইন্দিরা সম্বর্ধনা জমায়েতে কে সভাপতি হবেন বা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে কেন সভাপতিত্ব করতে দেওয়া হবে না—ইত্যাকারের কাগজে লড়াইয়ের পর সকলে ভাই-ভাই হলেও একটু 'কিন্তু' থেকে গিয়েছিল। কারণ, পূর্বতম মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের একদা লৌহমানব শ্রীঅতুল্য ঘোষকে নিমন্ত্রণ কেন করা হয়নি, এই প্রতিবাদ তুলে প্রধানমন্ত্রীর সভায় যোগদানে বিরত থেকে ক্ষান্ত হলেন না। পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় সফর করে কর্মীদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার পথনির্দেশ দেবেন বলে হুংকার ছাড়লেন। অবশ্য, সুখের বিষয়—নেতায় নেতায় এই লড়াই বেশী দিন চলতে দেওয়া হয়নি। সকলেই মন দেয়া-নেয়া করে একটা ফয়সালা করেছেন বলে মনে হয়। এই সমঝোতার ফলে কংগ্রেস সংগঠন হুহু করে এই রাজ্যে বেড়ে যাবে এমন কথা ভেবে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে নৃত্য করার মত কোন কারণ নেই। অতীতে যেমন ব্লক লেভেল পর্যন্ত নেতৃত্বের লড়াই ছিল, উপরে যতই চুনকাম করা হোক না কেন, সে লড়াই চলবে। অন্তর্দলীয় নেতৃত্বের এই লড়াই অবশ্য কোনো রাজনীতিক দলের পক্ষে খুব বিপদের ঝুঁকি সৃষ্টি করে না—যদি কর্মীদের আদর্শগত সংযোগসূত্র দৃঢ় হয় এবং বিশ্বাস থাকে যে তাঁদের দলই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম। অন্তর্দলীয় নেতৃত্বের লড়াই অনেক সময় দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। তবে, লড়াইয়ে পরাজয়ের পর যদি অরাজনৈতিক মনোবৃত্তি রাজনৈতিক সচেতনাকে আচ্ছন্ন করে স্বার্থান্ধতার মানসিকতাকে মনোমুকুরে বিরাট করে প্রতিফলিত করতে শুরু করে তখন হতাশা দানা বেঁধে উঠে। রাজনীতিবিদদের তখনই পরাজয় শুরু হয়। বিকৃত অরাজনৈতিক চিন্তা বিপথগামী করে তোলে। আদর্শচ্যুতি ঘটে। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে এই রাজ্যে এ হেন চিন্তা অনেক সময় প্রাধান্য লাভ করার ফলে রাজনৈতিক দল হিসাবে যে আদর্শ তার কর্মীদের সামনে হাজির ছিল তাও ধোঁয়াটে হয়ে গেছে। তাই দলগত ঐক্যের চেয়ে ব্যক্তিগত প্রাধান্য বিস্তারের ঝোঁক বেশী করে দেখা যাচ্ছে।

যাহোক, যা বলা হচ্ছিল, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস রাজনীতি শুরু করেছে এটা সত্যি। এবং ঐক্যবদ্ধভাবেই সেই রাজনীতি শুরু হয়েছে। হালে গৃহীত রাজ্য কংগ্রেস কমিটির একটি প্রস্তাব তারই সাক্ষী দিচ্ছে। প্রস্তাবে এক জায়গায় বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের দশ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন সেইজন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব যখন পুনর্গঠিত করা হয়েছিল তখন অনেকেরই ধারণা ছিল যে যতই ঢেলে সাজা হোক না কেন অতুল্যপন্থীরাই কমিটি দখল করে আছেন। কথাটা কিন্তু অমূলক নয়। সেদিনের সভায় ২২ জন সদস্যের মধ্যে 'একা কুম্ভ' শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা নাকি 'নকল বুঁদিগড়' রক্ষা করেছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে যে, ইন্দিরাজীকে সমর্থন জানিয়ে তবে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল কি করে? ঐখানেই আসল রাজনীতি। 'সমদর্শী' আগেই বলেছিলেন যে রাজনীতিতে শ্রীঅতুল্য ঘোষ অত্যন্ত পাকা লোক। ইন্দিরাজীর পালে হাওয়া লেগে যদি তাঁর নৌকো তীব্রগতিতে এগিয়ে যায় তবে শ্রীঘোষ সেই নৌকোয় উঠতে একবিন্দুও দ্বিধা করবেন না। ইন্দিরাজীর প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসের এই অভিনন্দনমূলক প্রস্তাব শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও তাঁর সহযাত্রীদের কৌশল পাল্টাবার ইঙ্গিত বহন করছে। অবশ্য, আগে শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের মধ্যে একসঙ্গে চলার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর—ইন্দিরাজীকে অভিনন্দন জানানো অতীব সহজ হয়েছে বলেই অনেকের ধারণা। কিন্তু আসলে তা নয়। রাজনীতি কখনও সোজা পথ ধরে চলে না। কাজেই ঐ প্রস্তাবের পিছনে অনেক অদৃশ্য হস্তের অবদান যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। কেন সন্দেহ করা হচ্ছে, তার একটি উদাহরণ দিলেই হয়ত সব জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাবে। কংগ্রেসের মুখপত্র দৈনিক জনসেবক পত্রিকাটির প্রকাশ হালফিল বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে বহু পূর্ব থেকেই। কংগ্রেস যখন গদীতে ছিল তখন এই দৈনিকের প্রতি কারও তেমন দরদ ছিল না। থাকবারও কথা নয়, কারণ কংগ্রেসের প্রচার চালাবার জন্য মাধ্যমের অভাব ছিল না। সেই জনসেবকের সংগঠনের দিকে নজর না থাকলেও ঐ পত্রিকার আর্থিক ব্যাপার কংগ্রেসের মধ্যে একটি বিরাট প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছে। মোট কত টাকা কোন দিকে চলে গেল তার এখনও সঠিক হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রবীণ তুর্কী শ্রীবিজয়সিং নাহার নাকি পত্র মারফৎ এই বলে শাসানি দিয়েছেন যে যদি পুরোপুরি হিসাব না পাওয়া যায় তবে তিনি সন্দেহজনক ব্যক্তির বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। দীর্ঘদিন ধরেই এই 'জনসেবক' নিয়ে ফয়সালার কথা শোনা যাচ্ছে কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না। কারণ শ্রীশুক্লারা রাজ্য কমিটিতে সংখ্যায় বেশী নন। অতএব, সংখ্যাধিক্যের জোরে যে ইন্দিরাজীর অভিনন্দনমূলক বক্তব্য প্রস্তাবে সংযোজিত করা হয়েছে শ্রীশুক্লারা তা কোনক্রমেই দাবী করতে পারেন না। তাহলে 'জনসেবকে'র ফয়সালাও করে নিতে পারতেন। কাজেই অতুল্যপন্থীরা যে যথা পথ বদল করছেন একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

এ গেল কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি। আবার বিরোধী দল হিসাবেও কংগ্রেস রাজনীতি শুরু করেছে। রাজ্য কমিটির প্রস্তাবটি তার সূচক। বামপন্থী স্টাইলে বিশেষ করে কম্যুনিস্টদের মতই রাজনীতি আরম্ভ করেছে কংগ্রেস। তাঁদের প্রস্তাবে রাজ্যের রাজনৈতিক চিত্রের এক অবয়ব তুলে ধরে একথা বলা হয়েছে যে মানুষের জীবনের প্রতি স্তরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, অরাজকতায় দেশ ছেয়ে গেছে। চারিদিকে বামকম্যুনিস্টদের দলীয় খবরদারি করছে পুলিশ, আর তার ফলে সাধারণ নাগরিক বা পল্লীজীবন সন্ত্রস্ত বিপর্যস্ত। যেখানে সেখানে জবরদখল করা হচ্ছে। এবং এই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মূলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। অতএব কংগ্রেসের দাবী, শ্রীবসু পদত্যাগ করুন। শ্রীবসুর ভাগ্য ভাল। কারণ কংগ্রেসীরা শ্রীবসুকে বিদেশী পুঁজিপতিরা যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন তা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। বিদেশী পুঁজিপতিরা বলেছেন, শ্রীবসু একজন দক্ষ প্রশাসক ও ভাল মানুষ। পুঁজিপতিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে শ্রীবসু দেশের সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছেন—এমন অভিযোগ প্রস্তাবে সংযোজিত করে যদি দেশবাসীকে জাগ্রত হবার অনুরোধ জানাতেন তবে হয়ত প্রস্তাবটি আরও ধারালো ও পূর্ণাঙ্গ হত। যাহোক, কংগ্রেসীরা শ্রীবসুর পদত্যাগ দাবী করেছেন শ্রীবসুদের স্টাইলেই। শ্রীবসুরা কখনও নন্দজীকে আবার কখনও চ্যাবনজীকে—অর্থাৎ যাঁরাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তাঁদেরই বারবার পদত্যাগের দাবী জানান। কারণ সেই নন্দজী আর চাবনজীই নাকি খারাপ লোক। কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে এক্‌সান নেওয়ার জন্য তাঁরাই দায়ী। অতএব নন্দজী চাবনজীর ভাবমূর্তি বিনষ্ট

দেশে বিদেশে
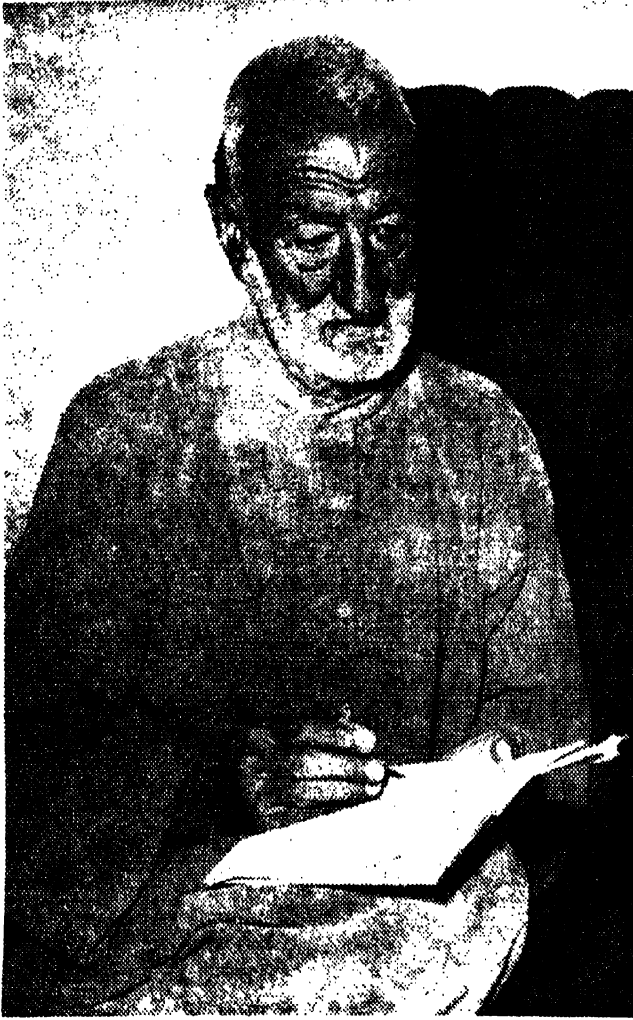
গান্ধীর দেশে গান্ধী

মহাত্মা গান্ধীর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সূচনার জন্য ভারতবর্ষ যখন প্রস্তুত হচ্ছে, ঠিক তার প্রাক্কালে তাঁর জন্মভূমি গুজরাটে একটা প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল এবং ঐ অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য এলেন এমন একজন যাঁকে ভিন্নদেহধারী আর একজন ভারতীয় গান্ধী বলে ভারতবর্ষের মানুষ দীর্ঘকাল ধরে জেনে এসেছে, অথচ দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর যাঁকে আর আমরা ভারতীয় বলে দাবী করতে পারি না। এই ঘটনাগুলির যোগাযোগ যেন বিধাতার অঙ্গুলিনির্দেশে গান্ধী-পরবর্তী ভারতবর্ষের পরিষ্কার ছবিটি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। গান্ধীজী বেঁচে থাকতেই আমরা যে তাঁকে অস্বীকার করেছি তার সবচেয়ে জ্বলজ্বলামান প্রতীক খান আব্দুল গফুর খান, যাঁকে আমরা 'নেকড়ের মুখে' ফেলে দিয়েছি। গান্ধীজীর মৃত্যুও ত তাঁকে অস্বীকার করার চেষ্টারই পরিণাম। আর আজও যে এই দেশের মানুষ তাঁকে প্রতিনিয়ত অস্বীকার করে চলেছে তার একটা বাস্তব প্রতীক হয়ে উঠল গান্ধী শতবার্ষিকীর প্রাক্কালে গান্ধীজীর জন্মভূমিতে সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা।

তবুও দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্য দিয়ে, ভারতবর্ষের জনগণের রাষ্ট্রীয় চেতনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়ে গান্ধীজী এই দেশের মানুষের মনে যে স্থান করে নিয়েছেন, তাতে তাঁকে ভুলতে চাইলেও ভোলা সহজ নয়, অস্বীকার করতে চাইলেও তাঁকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

সেই কারণেই, আমেদাবাদে দাঙ্গার আগুন নিভতে না নিভতেই আমরা গান্ধীজীকে স্মরণের আয়োজন করি। এবং সবরমতীর আশ্রমে মুসলমান গান্ধী-শিষ্যের জীবন যখন বিপন্ন হয়, তার অব্যবহিত পরেই আমরা আর এক গান্ধী শিষ্য খান আব্দুল গফুর খানকে আমাদের মধ্যে সম্বর্ধনা জানাই।

গান্ধীজীর নিজের দেশে তাঁকে অস্বীকার করে আমরা আর এক গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানাই। তাই, স্বাভাবিকভাবেই, আমরা একই সঙ্গে বাদশা খাঁর ভৎর্সনা ও প্রীতি লাভ করেছি। ভারতবর্ষের প্রতি ও ভারতবর্ষের মানুষের প্রতি আজও তাঁর হৃদয়ে যে গভীর অনুরাগ রয়েছে, সে-কথা প্রকাশ করতে তাঁর যেমন বিলম্ব হয়নি, তেমনি দিল্লীর বিমানবন্দরে পা দিয়েই তিনি তিরস্কার করেছেন : "আপনারা যখন গান্ধীজীকেই ভুলে গেছেন তখন আমি আর আপনাকে কি বলতে পারি?"

গান্ধী-সহকর্মীদের অনেকেই লোকান্তরিত, অনেকে ক্ষমতার সুখাসনে অধিষ্ঠিত, আবার অনেকে অবসর যাপন করছেন। কিন্তু খান আব্দুল গফুর খানের এখনও ছুটি মেলেনি। স্বাধীনতার যুদ্ধে যিনি ছিলেন অগ্রণী সৈনিক, তিনি সেই স্বাধীনতার ফলভোগ করতে পারেননি। তিনি ও তাঁর খুদাই খিদমৎগার বাহিনী দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করেও ভাগ্যের পরিহাসে পাকিস্তানে নিক্ষিপ্ত হলেন। আর সেই পাকিস্তানে সীমান্ত গান্ধীর ২২ বছরের মধ্যে ১৫ বছর কাটল কারাবাসে। আশী বছরের এই মানুষটি পাঠানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্য, পাকিস্তানী শাসকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে অক্লান্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

"অ্যামনেস্টি ইণ্টারন্যাশনাল" নামক একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার আন্দোলনের ফলে গফুর খান ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পান। মুক্তিলাভের পর তিনি চিকিৎসার জন্য লণ্ডনে যান। লণ্ডন থেকে তিনি আর দেশে ফেরেননি। আত্মনির্বাসনের পথ বেছে নিয়ে তিনি আফগানিস্তানে বাস করছেন। গত পাঁচ বছরে তাঁর এই নির্বাসনের কালে

কোন কোন ভারতীয় নেতার সঙ্গে গফুর খানের যোগাযোগ হয়। ১৯৬৪ সালের শেষে তিনি লণ্ডন থেকে গান্ধীজীর শেষ সেক্রেটারী প্যারেলালকে লেখেন—"হয়ত আপনি আমাদের ভুলে গেছেন, কিন্তু আমরা আপনাদের ভুলিনি। মানুষ সুখে থাকলে বন্ধুদের ভুলে যায়, কিন্তু দুঃখে থাকলে ভোলে না। আমাদের দুঃসময়ে আমরা আপনাদের কথা ভাবি। যদি মহাত্মাজী বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের মনে রাখতেন ও আমাদের সাহায্যে আসতেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তিনি নেই আর সবাই আমাদের ভুলে গেছে।"

পালাম বিমানবন্দরে এসে যখন সীমান্ত গান্ধী নামলেন, তখন সেখানে তাঁকে দেখবার জন্য যে-জনতার সমাবেশ হয়েছিল এবং বিমানবন্দর থেকে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডের বাসভবনে যাওয়ার পথের দুধারে যে-জনতা সমবেত হয়ে তাঁর জয়ধ্বনি করেছিল, তা থেকে যদি কোন কিছু প্রমাণ হয়, তাহলে নিশ্চয়ই খান আবদুল গফুর খান এই আশ্বাস পেতে পারেন যে, গান্ধীর দেশের মানুষ আর এক গান্ধীকে ভোলেনি। যাঁরা সেদিন ঐ মানুষটিকে দেখার জন্য, তাঁর নামে জয়ধ্বনি দেওয়ার জন্য জমায়েত হয়েছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই এর আগে আর কখনও খান আব্দুল গফুর খানকে দেখেননি। বাইশ বছর যিনি এদেশে আসেননি, তাঁর সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ স্মৃতি মধ্যবয়সী মানুষ ছাড়া আর কারও থাকা সম্ভব নয়। তবুও তাঁরা গিয়েছিলেন। গত ২২ বছরে আরও অনেকবার হয়ত এমনভাবে রাজধানীর মানুষ বিমানবন্দরে গিয়েছেন বিদেশী অতিথিদের স্বাগত জানাতে। কিন্তু খান আব্দুল গফুর খানের আগে আর কোন ভি আই পি-কে তাঁরা দেখেছেন প্রধানমন্ত্রীর 'পুষ্পক' বিমান থেকে নামতে হাতে-বোনা ও ঘরে-কাচা মোটা খাদির শালোয়ার ও কুর্তা পরে ও সুতীর একখানা শাল গায়ে জড়িয়ে? এর আগে আর কোন বিদেশী অতিথি নিজস্ব সম্বল বলতে মাত্র একখানা শালোয়ার ও কুর্তা ন্যাকড়ার পুঁটলিতে জড়িয়ে নিজের হাতে করে নিয়ে বিমান থেকে নেমেছেন? তাঁর আগে আর কোন মান্য আগন্তুকের জন্য লাল জাজিম এমন বেমানান মনে হয়েছে?

আজকের ভারতবর্ষ কি এই মানুষের প্রীতি ও শ্রদ্ধার অধিকারী? খান আব্দুল গফুর খানকে বিমানবন্দরে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে সম্বর্ধনা সমিতির সভাপতি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দুজনই ভুলতে পারলেন না যে, এই সেদিন গুজরাটে সাম্প্রদায়িক অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলেছে। শ্রীমতী গান্ধী বললেন যে, চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে খান আব্দুল গফুর খান পথ দেখাবেন বলে তাঁরা আশা করেন।

সীমান্ত গান্ধী সম্বর্ধনার উত্তরে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে এখন হিংসা। ভারতবর্ষ গান্ধীজীর পথ ত্যাগ করেছে। বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন দলের ভারতীয়রা তাঁর কাছে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছুটা ঐক্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এই ঐক্য বাস্তব নয়। ভারতবাসীরা বিভক্ত এবং চারদিকে হিংসা চলছে। গান্ধীজী আমাদের এই শিক্ষা দেননি। যেখানে হিংসা সেখানে কোন প্রগতি হতে পারে না।

২ অক্টোবর গান্ধী-জয়ন্তীর দিন দিল্লীর রামলীলা ময়দানে যে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে খান আব্দুল গফুর খান ঘোষণা করলেন যে, ভারতবর্ষে যে-হিংসার আবহাওয়া চলছে, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি তিন দিন অনশন করবেন।

২২ বছর পরে তিনি কেন ভারতবর্ষে এসেছেন! তিনি নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললেন :—

"আমি আপনাদের কাছে টাকা চাইতে আসিনি। পাখতুনিস্তানের আন্দোলনে আপনাদের সাহায্য চাইতে আমি আসিনি। আমরা প্রায় নিশ্চিত যে, আমাদের স্বপ্নের পাখতুনিস্তান আমরা পাব। আমি শুধু এসেছি গান্ধীজী আপনাদের যে-শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার কথা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে। আমি ভারতের জনগণের সঙ্গে মিলিত হতে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে, আপনারা জাতীয় জীবনে গান্ধীজীকে কতখানি গ্রহণ করেছেন, তা দেখতে আমি এসেছি। আমার প্রতি ভারতবর্ষের মানুষের ভালবাসা এবং গান্ধীজীর স্মৃতিই আমাকে এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।"

এই সভায় সীমান্ত গান্ধী আরও জানান যে, ভারত সফরে আসার আগে কয়েকজন ভারতীয় ও পাকিস্তানী তাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষে না এসে তাঁর ভারতবর্ষের বাইরে থেকেই সেখানে যা চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু তাঁদের সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি স্থির করেন যে, ভারতবর্ষে এসে স্বচক্ষে দেখেই তিনি যেটুকু প্রতিবাদ করার তা করবেন।

সীমান্ত গান্ধী কর্তৃক তিন দিন অনশন পালনের ঘোষণা ভারতীয় নেতাদের বিচলিত করল। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়। পথশ্রমে তিনি এত ক্লান্ত যে, ১ অক্টোবর সন্ধ্যেবেলায় রাজঘাটে 'গান্ধী দর্শন' প্রদর্শনীর উদ্বোধন করার জন্য তিনি সেখানে যেতে পারেননি। চিকিৎসকরা তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিশ্রাম নেওয়ার ও হাল্কা খাদ্য খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁরা তাঁর স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে অনশন করতে নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় আর একটি উদ্বেগের কারণ কোন কোন মহল থেকে আভাষে-ইঙ্গিতে উল্লেখ করা হল। সীমান্ত গান্ধীর এই উপবাসকে পাকিস্তান ও অন্যান্য মুশ্লিম-দেশ ভারত-বিরোধী প্রচারের কাজে লাগাতে পারে।

কিন্তু খান আব্দুল গফুর খান তাঁর সঙ্কল্পে অটল। তিনি তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের বললেন, গান্ধীপন্থায় আত্মশুদ্ধি করার জন্য তিনি কৃতসঙ্কল্প। তিনদিনের জন্য এই অনশনে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। গান্ধীজী এর চেয়ে বেশী দিন অনশন করেছেন। দ্বিতীয় উদ্বেগের কারণটি প্রশমন করার জন্য অনশন আরম্ভ করার আগে তিনি ঘোষণা করলেন যে, গুজরাটের ঘটনা সম্পর্কেই তিনি এই ব্রত পালন করবেন তা নয়, সাধারণভাবে দেশের মধ্যে যে হিংসার আবহাওয়া দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর এই অনশন।

'লিট্‌ল্ কোয়ালিশন'

পশ্চিম জার্মানীর শাসনে এবার ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (সি ডি ইউ) ২০ বৎসরব্যাপী আধিপত্যের অবসান ঘটতে চলেছে এবং সেখানকার দুই বৃহত্তম দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এস পি ডি) তিন বৎসরব্যাপী 'গ্র্যান্ড কোয়ালিশন' এর স্থলে ভিন্নতর একটি কোয়ালিশন শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে।

সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে যে ষষ্ঠ সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল, তার পর উইলি ব্রান্টের এস পি ডি ও ভাল্টার শিলের এফ ডি পি (ফ্রি ডেমোক্র্যাটিক পার্টি) ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা নূতন 'বুন্ডেস্টাগ'-এ (পার্লামেন্টে) কোয়ালিশন গঠন করবেন ও

হেড ব্রান্ট চ্যান্সেলারের পদপ্রার্থী হবেন। নতুন 'বুন্ডেস্টাগ' এর ৪৯৬ জন সদস্যের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যা ২৪২। (ব্যাভেরিয়ায় সি এস ইউ নামে একটি ছোট দল আছে। সেই দল বরাবরই সি ডি ইউ-এর সঙ্গে আছে। পার্লামেন্টে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যা গণনার সময় সি এস ইউ সদস্যদেরও যুক্ত করে দেখান হয়। পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান কিসিঙ্গার সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ফ্রানৎস জোসেফ স্ট্রাউস সি এস ইউ-এর লোক।) সোস্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যা ২২৪ এবং ফ্রি ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যা ৩০। অর্থাৎ এস পি ডি ও এফ ডি পি-র কোয়ালিশন নতুন 'বুন্ডেস্টাগ'-এ জন-দশেক সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে। প্রধানমন্ত্রী কিসিঙ্গার মন্তব্য করেছেন, এই কোয়ালিশন পাটিগণিতের দিক দিয়ে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু রাজনীতির দিক দিয়ে অসম্ভব।

পশ্চিম জার্মানীর রাজনীতিতে সি ডি ইউ, এস পি ডি ও এফ ডি পি এই তিন পার্টির অবস্থান একটা কথায় বৃটেনের কনজারভেটিভ পার্টি, লেবার পার্টি ও লিবারেল পার্টির মত। অপর দুই দলের কোয়ালিশনের অর্থ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের দক্ষিণপন্থী প্রভাবের অবসান ও বামপন্থী ঝোঁক প্রবর্তিত হওয়া।

পশ্চিম জার্মানীর ঘরোয়া পরিস্থিতিতে ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তনের কতকগুলি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা জার্মান মার্ক-এর আন্তর্জাতিক মূল্যমান বৃদ্ধি করার জন্য, পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে সেতুবন্ধন করার জন্য, প্রয়োজন হলে 'পোলাণ্ড নীতি' বিসর্জন দেওয়ার জন্য (এই নীতি অনুযায়ী পশ্চিম জার্মানী সাধারণভাবে সেইসব রাষ্ট্রের সঙ্গেই কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখে যারা পূর্ব জার্মানীকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয় না), কলকারখানার পরিচালনায় শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকতর অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং তাঁদের মুনাফায় ভাগ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পশ্চিম জার্মানীর এই সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, চরম দক্ষিণপন্থী এন-পি-ডি অর্থাৎ ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক দল শতকরা পাঁচটির কম ভোট সংগ্রহ করে সেদেশের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী কোন প্রতিনিধিই পাঠাতে পারেনি। এই পার্টির মধ্যে অনেকে পুরানো নাৎসী পার্টির ছায়া দেখে এবং জার্মানীর দশটি রাজ্য বিধান সভার মধ্যে সাতটিতে এই দল তাদের প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে পাঠাতে সমর্থ হওয়ার পর, অনেকে পশ্চিম জার্মানীতে নাৎসী পুনরভ্যুত্থানের আশঙ্কা করছিলেন। নতুন 'বুন্ডেস্টাগ'-এ ঐ দলের একজন প্রতিনিধিও না আসায় এই সব পর্যবেক্ষক আশ্বস্ত হবেন। কিন্তু তাঁরা উদ্বেগের সঙ্গে এও লক্ষ্য করবেন যে, এন-পি-ডি প্রার্থীরা গত নির্বাচনের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ ভোট পেয়েছেন।

বাদশা খান

আমাদের মহাসৌভাগ্য সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফর খানকে আবার ফিরে পেয়েছি। গান্ধীজীর শততম জন্মজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে তিনি এসেছেন ভারতে। আবদুল গফ্ফর খান এমন একটি নাম যা একমাত্র গান্ধীজীর সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। এই কারণেই তাঁকে বলা হয় সীমান্ত গান্ধী। অবিভক্ত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠান জাতির নেতা তিনি। দুর্ধর্ষ পাঠানদের তিনি গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত করে খুদার সেবক বা খুদাই খিদমতগারে রূপান্তরিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙালীদের মতোই পাঠানরা চরম নির্যাতন ভোগ করেছে। বৃটিশ শাসকরা পূর্ব সীমান্তের বাংলাদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পাখতুন দেশের প্রতি সতর্ক নজর রাখত। কারণ তারা ছিল অদম্য, অকুতোভয় এবং আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। ইতিহাসের পরিহাসে এই দুটি জাতাই ভারতের স্বাধীনতালাভের বিনিময়ে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে। বাংলাদেশ ভেঙে দুটুকরো হয়েছে। বৃহৎ টুকরো গেছে পাকিস্তানে। সীমান্ত গান্ধীর দেশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পুরোটাই পাকিস্তানের কুক্ষিগত।

এই বেদনা বিস্মৃত হবার নয়। আবদুল গফ্ফর খান মর্মাহত হয়ে স্বাধীনতালাভের পনেরোদিন আগে দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর কাছে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁর নিজের দেশে, সীমান্তের পাঠান জাতির মধ্যে। তিনি এবং গান্ধীজী কেউই এটা স্বপ্নেও ভাবেননি যে, ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে স্বাধীনতা পেতে হবে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক গান্ধীজী এবং আবদুল গফ্ফর খান যে-আদর্শের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন সেই আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে সেদিন কংগ্রেস নেতারা মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুইটি স্বতন্ত্র, সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন দেশ ভাগ হয়ে গেলে সাম্প্রদায়িক হানাহানির অবসান হবে এবং দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতায় বাস করবে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে অবিশ্বাস ও ঘৃণা থেকে যে-দেশ বিভক্ত হয় তাদের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য সহজে স্থাপিত হয় না। তা ছাড়া উভয় দেশেই রয়ে গেল সংখ্যালঘু সমস্যা। পাঁচ কোটি মুসলমান ভারতে এবং এক কোটি হিন্দু পূর্ব পাকিস্তানে। সমস্যা বাড়ল ছাড়া কমল না। গত বাইশ বছরের স্বাধীনতার ইতিহাসে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের মানুষ তা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

বাদশা খান সত্যের ও সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক। পাকিস্তান হবার পর তিনি সেখানে পাখতুনদের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছেন। তিনি গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন। বৃটিশ শাসকরা তাঁর উপরে যে রকম নির্যাতন করেছিল পাকিস্তানের নতুন শাসকরাও তেমনি অত্যাচার করেছে এই সত্যাগ্রহী অহিংসবাদী দেশপ্রেমিকের উপর। ১৪ বছর তার কেটেছে পাকিস্তানের জেলে। বৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় তাঁকে অবশেষে মুক্তি দিয়ে পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করা হয়। এই বাইশ বছরে তিনি আর ভারতবর্ষে আসেননি। আজ তিনি ভারতে এসেছেন গান্ধীজীর প্রতি ভালবাসার টানে, তাঁর শতবার্ষিকী উদযাপন উৎসবে যোগদানের জন্য। কিন্তু আমরা কি তাঁকে স্বাগত জানাবার যোগ্যতা অর্জন করেছি? তিনি দুঃখ করে বলেছেন, ভারতবর্ষ গান্ধীজীকে ভুলে গেছে। গান্ধীজীর নামে রাস্তা, পার্ক, ঘাট তৈরী করলেই কি তাঁর স্মৃতিপূজা হয়? জয়প্রকাশ নারায়ণ নির্মম ভাষায় আত্মসমালোচনা করে বলেছেন, গান্ধীজীকে এই বাইশ বছরে আমরা বহুবার হত্যা করেছি? গান্ধীজীর নামোচ্চারণই যথেষ্ট নয়, পারস্পরিক মৈত্রী, অহিংসা ও সত্যানুসরণের যে-পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন তা যদি আমরা গ্রহণ না করি তাহলে মিথ্যাই এই উৎসবের আড়ম্বর। বাদশা খানের উপস্থিতি আমাদের সেই সত্যের স্মারক। আমরা তাঁর প্রতি যথার্থ সম্মান দেখাব তখনি যখন পারস্পরিক অবিশ্বাস ও হানাহানির ঘটবে চিরঅবসান।

আরও একটি কর্তব্য আছে আমাদের বাদশা খানের প্রতি। তিনি পাখতুনদের জন্য আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন। ১৯৪৭ সালে আমরা তাঁকে এবং তাঁর দেশবাসীকে পাকিস্তানী নেকড়ের মুখে নিক্ষেপ করে দিয়েছি। পাকিস্তানের শাসকরা বর্বরতম অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে পাখতুনদের উপর। বাদশা খান চান সমস্ত পাখতুনদের নিয়ে পাখতুনিস্তান গঠন। তাদের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি আজ আন্তর্জাতিক জগতেও প্রচারিত। বাদশা খান সত্যের পূজারী। তিনি ক্ষমতালিপ্সু নন। তিনি পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণ চান, যেমন তিনি কল্যাণ চান ভারতের। কিন্তু পাখতুনরা যে এতকাল অত্যাচার সহ্য করল, রক্ত দিল তার বিনিময়ে কী পেল তারা? আয়ুব-ইয়াহিয়ার দাসত্ব। স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু, এই মন্ত্রে পাঠানদের যিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন সেই সর্বত্যাগী, সত্যাগ্রহী খান আবদুল গফ্ফর খান বেঁচে থাকতে পাখতুনদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোকশিখা নিভবে না। তাঁর জয় কামনা করি আমরা। ভারত-পাখতুন মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর জীবন-স্মৃতি 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' প্রকাশিত হয়েছে কিছুকাল আগে। দ্বিতীয় পর্যায়ের স্মৃতিচারণ বর্তমান সংখ্যা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে।

দর্পণে মুখ দেখি। নিজের মুখ। চুয়াত্তর বছর বয়সের একজন পরিণত পুরুষের মুখ।

তবু কেমন যেন অপরিচিত মনে হয় মনে হয় অচেনা, অজানা কারো মুখ দর্পণে ভাসছে।

কেন এ বিভ্রান্তি!

চেয়ে থাকি অবাক বিস্ময়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুখের প্রতিটি রেখা লক্ষ্য করি। তারপর এক সময় প্রতিবিম্বের মধ্যে থেকে নিজেকেই আবিষ্কার করি। প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই বলি, আমিই তো অহীন্দ্র চৌধুরী।

বিস্মৃতির আগল খুলে যায়। স্মৃতির পর্দায় প্রতিফলিত হয় একটি সুন্দর শিশুর মুখ। যে শিশুটি বাঁশী বাজাবে বলে বায়না ধরেছিল।

—হ্যাঁরে অহীন, বাঁশী কী হবে?

—কেন, বাজাবো।

—বাঁশী বাজাতে নেই, ফুসফুস খারাপ হয়।

—না, আমায় বাঁশী কিনে দাও।

একটা খেলনার বাঁশী এনে দিয়েছিলেন বাবা। শিশু অহীন সেই খেলনার বাঁশীতেও সুর ফুটিয়েছিল।

সেই বাঁশীর সুরটা এখনো কান পেতে শুনি। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা সেই সুর। অথচ স্পষ্ট।

সেই বাঁশী নেই, কিন্তু সুর আছে। সেই শিশুর অবয়ব নেই, কিন্তু তার মনটা আছে আমার মধ্যে।

সেই মন এখনো খেলনার বাঁশী খুঁজে বেড়ায়।

জীবনে কি চেয়েছিলাম জানি না। তবে পেয়েছি অনেক। যা চাই নি, তাও পেয়েছি। তবে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব কোনদিন রাখি নি। হিসেব রেখে কী হবে! জীবনটা তো অঙ্ক নয়।

আজ অপরাহ্নের আলোয় দাঁড়িয়ে একটা কথাই ভাবি, যে একদিন আমার পৃথিবীতে সূর্য উঠেছিল। যে সূর্য এখনো আলো দিচ্ছে।

জানি, ওই সূর্য হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিন শেষ হবে। কিন্তু ওইখানেই তো শেষ নয়। অন্ধকার পেরিয়ে আবার সূর্য-সারথি আলোর খবর নিয়ে আসবে।

আমিও তো ভেবেছিলাম, আর নয়—এবার হারিয়ে যাবো। কিন্তু সত্যি কি হারিয়ে যেতে পেরেছি? পারি নি। হারিয়েই যদি যাবো, তবে নিজেকে খুঁজে বার করবো কেমন করে!

শুধু আজই নয়, জীবনে নিজেকে নিয়ে বার-বার লুকোচুরির খেলা খেলেছি। ভেবেছি এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকবো—কেউ খুঁজে পাবে না। কিন্তু খেলায় হার মেনেছি আমি, নিজেই ধরা দিয়েছি। লুকিয়ে থাকতে পারি নি।

সেই সব কথাই আজ মনে পড়ে, যেসব কথার মধ্যে শুনতে পাই আমার কণ্ঠস্বর, সেই সব ছবিই আমার স্মৃতির পর্দায় ভাসে, যেসব ছবির মধ্যে দেখতে পাই আমারই প্রতিচ্ছবি। এক আমি, অজস্র 'আমি'র মধ্যে ছড়িয়ে আছি। সে এক বিচিত্র ছায়া-নাটক। এক অহীন্দ্র চৌধুরী কতো-রূপে এসে দাঁড়িয়েছে পাদ-প্রদীপের আলোয়। নিজেই ভাবি, এ-আমি কি দেখছি!

পরমুহূর্তে মনে হয়, আমি নট, আমি অভিনেতা। এই বিচিত্র রূপসজ্জায়, বহু-বিচিত্র রূপ দেওয়াই তো আমার ধর্ম।

আজ যখন অভিনয় ছেড়েছি, চার দেয়ালের ঘরের মধ্যে আমার পৃথিবীটাকে বন্দী করেছি, তখনো বিস্মৃতির আগলটা সন্তর্পণে খুলে দিয়ে স্মৃতির দরজায় মুখ বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। দেখতে পাই, আমারই সামনে দিয়ে বিচিত্র এক মিছিল চলেছে। পুরাণ, ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে এই শতাব্দীর মানুষেরাও রয়েছে সে মিছিলে। কতো বিচিত্র তাদের রূপসজ্জা, কতো বৈচিত্র্য তাদের কণ্ঠস্বরে, কতো বৈচিত্র্য তাদের সংলাপে।

এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই তো মিশে আছি আমি।

আমি নট, আমি অভিনেতা। আমার যতো কথা সে তো নাটক আর অভিনয়ের কথা। এই নাটক আর অভিনয় নিয়েই তো আমার জীবন।

জীবনের সেই কথাই আমি বলতে চেয়েছি। 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'তে। বলেছিও এর আগে। যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সব কথা তো বলা হয় নি। সেই না-বলা কথাই এবারে বলবো।

আমার মধ্যে প্রচণ্ড একটা ঘূর্ণি ছিল। যা আমাকে মাঝে মাঝে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াতো। জানি, ভুল করছি, তবুও নিজের রাশ নিজে টেনে ধরতে পারতাম না। নয়তো এমন হবে কেন।

মনে পড়ে, সেবারে হঠাৎ কি খেয়াল হলো, স্টার থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। পিছনের দিকে ফিরে চাই নি একথা বলবো না, তবে পিছন ফিরে তাকিয়েও পিছুটানে থমকে দাঁড়াই নি।

কোথায় যাবো, কি করবো—ঠিক-ঠিকানা একেবারে নেই, তা নয়—তবে নির্দিষ্ট কোন পথ আমার সামনে ছিল না। নির্দিষ্ট ঠিকানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম অনির্দিষ্ট ঠিকানায়।

এ-যেন নিজের কাছ থেকে নিজের হারিয়ে যাওয়া।

হারিয়ে যাওয়াই বটে!

একদিকে আমার ঘর-সংসার, অন্যদিকে আমার কর্মক্ষেত্র — সমস্ত কিছু থেকেই আমাকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলেছে আমার ভাগ্য, আমার ভবিতব্য, আমার নিয়তি। সেই যে 'কর্ণার্জুনে' একটা গান আছে না—'আমি কখন গড়ি, কখন ভাঙি নেইকো ঠিকানা'। আমার তখন ভাঙার পালা, বিলুপ্তির পালা, ছুটে ছুটে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর পালা। আজ জানি এসব ভবিতব্য ছাড়া আর কী? নইলে তখন যদি নিজের মনকে শক্ত করে বলতাম, ঠিক আছে, আর্ট থিয়েটার যদি 'কেস' করে করুক, আমি যা ভালো বুঝেছি তাই করেছি। আমি নট, আমি শিল্পী, আমার রঙ্গান্তর গ্রহণ তো ভূমিকান্তর গ্রহণেরই সামিল। আমি স্টার ছেড়ে মিত্র থিয়েটার যেতে চাই, ওখানে যেতেই আমার প্রাণ চাইছে—এতে বাপু অন্য লোকের মাথা-ব্যথা কেন?

কিন্তু মুস্কিলটা হলো যে, আমি যে মনে মনে স্টারকেও ভালবাসতাম—ওদিকে মিত্রদেরও সাদর আহ্বানও উপেক্ষা করার শক্তি আমার ছিল না। এই দোটানার মধ্যে পড়ে মনের মধ্যে এই যে অন্তর্দ্বন্দ্ব—এতে ক্ষতবিক্ষত হতে-হতে মানুষের দুশ্চিন্তা কেমন যেন স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়—আমার ঠিক সেই অবস্থা। আমার মনটা যেন তখন দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একজন আরেকজনকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে দেখছে আর অদ্ভুত কৌতুক অনুভব করছে। এক মন দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াবার নেশায় মেতেছে, আরেক মন সুচতুর গোয়েন্দার মত চুপি চুপি তাকে অনুসরণ করে চলেছে। কখন যে এ-মন সে-মনকে গ্রেপ্তার করে জানি না।

আপাতত মনের এই বিচিত্র লীলাখেলা চলেছে।

আমি যে সময়ের কথা বলছি সেটা হল ১৯২৭ সাল।

স্টার থিয়েটারে 'কর্ণার্জুন' থেকে শুরু করে 'চিরকুমার সভা' পর্যন্ত বহু নাটকই হয়ে গেছে এবং 'অহীন্দ্র চৌধুরী' বলে একটি নাম নাট্যরসপিপাসুদের মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। এমন কি কেউ যদি পুরনো দিনের পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে দেখেন তবে দেখতে পাবেন যে, শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে যেন তুলনামূলক সমালোচনাও শুরু হয়ে গেছে।

এমন দিনে সেই 'অহীন্দ্র চৌধুরী' হঠাৎ হারিয়ে গিয়েছিল। হারিয়ে গিয়েছিল পাদ-প্রদীপের সামনে থেকে, কিন্তু জেগে-ছিল গুণগ্রাহী দর্শক সাধারণের মনে। 'মিত্র থিয়েটার' বলে একটি প্রতিষ্ঠান তখন গড়ে উঠেছে, তাঁরা আমাকে তাঁদের মধ্যে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলেন। অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা এবং নতুন নতুন নাটকে বিভিন্ন রসাশ্রয়ী চরিত্রে অভিনয়ের নেশা আমার মন মিত্র থিয়েটারের দিকেই ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের জটিলতা-কুটিলতা যে কত গভীর তা তখন বোধগম্য হয় নি—শিল্পীরা এইভাবেই বিপদে পড়ে আর বুদ্ধিজীবীদের হাতের হাতিয়ার হয়ে পড়ে।

'মিত্ররা' আমাকে চাইলেও 'স্টার' আমাকে ছাড়বেন কেন? অতএব 'মিত্ররা' বললেন—আপনি আপাতত কিছুদিনের জন্য স্রেফ গা-ঢাকা দিন।

স্টার-এর প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয়ের সঙ্গে আমার এমন একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে, যে আইনের দিক থেকে জয়-লাভ করা অতিসহজ হলেও হৃদয়ের জাল থেকে পলায়ন করা সহজ ছিল না। ছেলে যেমন বাপ-মা-দাদার কাছ থেকে অভিমান করে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, আবার বেশ কিছুদিন পরে ফিরে আসে—আমারও হয়ে-ছিল প্রায় তেমনি অবস্থা।

একদিন 'মিত্রদের'ই লোক শিশির মিত্র মশাই আমাকে নিয়ে 'রেলে' করে পাড়ি দিলেন। অথচ, আমার যদি বাস্তব বুদ্ধি তখন পরিণত হতো, তাহলে বুঝতাম, এ পলায়নের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ স্টারের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট নিয়ে যে গোলমালের সম্ভাবনার কথা মিত্ররা মনে করছিলেন তাতে সাক্ষ্য ও প্রমাণসাপেক্ষে জয়লাভ আমার সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু আমার প্রকৃত মনের ভাব ছিল অন্য। যদি একবার কোনরকমে প্রবোধবাবুর সামনা-সামনি পড়ে যাই, আর তিনি তাঁর সম্মোহিনী ভঙ্গীতে বলেন, স্টারে ফিরে যেতে—তখন আমি কিছুতেই না বলতে পারব না—সুড়সুড় করে তাঁর পিছন পিছন স্টারে গিয়ে ঢুকতে হবে— মাইনে বাড়ানোর কথা পর্যন্ত তখন মুখ দিয়ে বেরুবে না। মিত্ররা আমার এ দুর্বলতার কথা জানতেন, তাই তাঁরা

আমাকে কলকাতায় না রেখে বাইরে বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

অবশ্য ঘুরে বেড়ানোটা আমার একটা নেশা—একথা হয়ত অনেকেই জানেন না। যখনই সময় পেয়েছি—এখান-ওখান ভ্রমণ করেছি আর এই ভ্রমণ থেকে কত বিচিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছি, এবং তা থেকে কতভাবে যে নিজেকে শিল্পকর্মে প্রস্তুত করতে পেরেছি, সে শুধু আমিই জানি।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম।

চৈত্র মাস হবে সে সময়টা। কলকাতার বাইরে পশ্চিম অঞ্চলে তখন কি রকম গরম পড়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তবে দিনের বেলাটায় গরম হলেও রাত্রের শেষের দিকটা বেশ শীত-শীত করে।

শিশির মিত্রের সঙ্গে আমি একদিন হাওড়া স্টেশনে এসে একটি ট্রেনে চেপে বসলুম—অধিকার করলুম দুজনে দুখানি বেঞ্চে সেকেন্ড ক্লাস কামরায়। ট্রেনে উঠবার আগে জিজ্ঞেস করেছিলুম : কোথায় যাচ্ছি আমরা?

সংক্ষিপ্ত উত্তর এলো শিশির মিত্রের কাছ থেকে : দেখা যাক।

যাক। আমার আর কোনো কৌতূহল রইল না। আমার মন তখন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পাগল। যাযাবর মন আমার তখন 'ভ্রমণের নেশায়' প্রমত্ত। চলুক না যেখানে খুশী—দিল্লী, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ। নইলে শিশিরবাবুকে চেপে ধরলে কি আর তিনি না বলে পারতেন।

যাই হোক, ট্রেনটা ফাঁকাই ছিল—আমরা দুজনে দুখানি বেঞ্চিতে বিছানাটি বিছিয়ে বেশ দিব্যি টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লুম। রাত্রের ট্রেন, বাড়ী থেকে খাওয়া-দাওয়া করেই বেরিয়েছিলুম— সুতরাং সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ট্রেন ছেড়ে দিল।

গাড়ী ছুটে চলল অন্ধকারের বুক চিরে। জানালার বাইরে অন্ধকার ধু-ধু প্রান্তর, কিম্বা গাছপালা, কিম্বা ঘর বাড়ী সব একের পর এক মিলিয়ে যাচ্ছে—তারপর এক এক করে ভেসে উঠছে প্রবোধ গুহমশাইয়ের মুখ, অপরেশবাবুর মুখ, স্টার থিয়েটারের আর সব সহকর্মীদের মুখ—আর অন্যদিকে ম্যাডান কোম্পানীর ফ্রামজী, রুস্তমজী প্রভৃতির মুখও ভেসে উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে তাদের মুখগুলিও ঝাপসা, অস্পষ্ট হয়ে গেল—আমি আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন আবছা আবছা ভোর হয়েছে—কী একটা স্টেশনে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে দেখি শিশিরবাবুও উঠে বসেছেন। বাইরে হকাররা হেঁকে যাচ্ছে—চা—চাই, চা—গরম চা।

শিশিরবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—চা খাবেন নাকি?

—মন্দ কী? বলতে বলতে উঠে বসলাম জিজ্ঞাসা করলাম—কী স্টেশন এটা?

শিশিরবাবু বললেন—রাণীগঞ্জ।

বেঞ্চ থেকে নেমে বাথরুম ঘুরে আসতে আসতে ট্রেন ছেড়ে দিল, চা খাওয়া আর হলো না।

শিশিরবাবু বললেন—ঠিক আছে আসানসোলে খাওয়া যাবেখন। সামনেই আসানসোল।

এলো আসানসোল। চায়ের হকারকে ডাকবার জন্যে উসখুস করছি, এমন সময়

আবার পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও তার দহরম-মহরম ছিল যথেষ্ট।

যাক, যে কথা বলছিলাম!

তখন কি আর ছাই জানতাম এ-সব কথা? জানলে মিছিমিছি এত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে আসতাম না আসানসোল থেকে।

যাক, সন্ধ্যার পর দমদম স্টেশনে এসে তো পৌঁছুলুম—শিশিরবাবুর পরামর্শে শেয়ালদহে নামলুম না যদি কেউ চিনে ফেলে এই ভয়ে।

মনটা কি রকম করে উঠল। বললাম—সে কী হে? কলকাতা যাবো না? একবার বাড়ী যাবো না?

শিশিরবাবু বললেন : দাঁড়ান, সব হবে। তবে সোজাসুজি যাওয়া চলবে না। আসুন তো আমার সঙ্গে। আপনাকে আগে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। কি জানি বাপু, যদি চেনাশোনা লোক কেউ দেখে ফেলে!

আমার অবস্থা তখন হয়েছে যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মতো। ওর কথামতো জনবিরল ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসে রইলাম। শিশির খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে-টুরে ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলাম—এখন কি করবো? এমন ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকব আর কতক্ষণ?

শিশিরবাবু বললেন—ঘাবড়াবেন না। একটা প্রাইভেট কারের বন্দোবস্ত করেছি। কলকাতা যাবো, আবার রাত্তিরেই ফিরে আসব।

—বাড়ী একবার যাবো না? উদ্বিগ্ন-ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

শিশিরবাবু বললেন—বাড়ীতেই তো যাবো। একবার দেখা করে চট্ করে চলে আসতে হবে।

তাই হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা কালো রং-এর গাড়ীতে উঠে বসলাম। শিশিরবাবু আমার পাশে বসে ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন ঃ চলো কলকাতায়।

প্রথমেই বাড়ী যাওয়া হলো না। গাড়ী ঘুরে ঘুরে গিয়ে পৌঁছুলো মিত্র থিয়েটারে (অর্থাৎ পুরনো মনোমোহন থিয়েটার)। সেখানে জ্ঞান মিত্র, শিশির বোস—এঁদের সঙ্গে দেখা হলো। শিশির বোস ছিলেন 'ভগ্নদূত' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'মিত্র'দের আত্মীয়। সেখানে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে বাড়ীর দিকে রওনা দিলাম—সঙ্গে রইলেন এবার আর শিশির মিত্র নয়, শিশির বোস।

বাবা কোন খবর না পেয়ে স্বভাবতই একটু উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁকে সব কথা খুলে বললুম। পালিয়ে পালিয়ে কেন বেড়াতে হচ্ছে সে কথাটাও তিনি বুঝলেন সম্ভবত। বললাম ঃ কিছু ভাববেন না—সঙ্গে শিশির রয়েছে—ও আমার কোনো কষ্টই হতে দেবে না।

শিশিরও বাবাকে অনেক করে বুঝিয়ে বললে—কোন ভয় নেই। সেরকম দরকার মনে করলে থিয়েটারে খবর করবেন। ওখানে মালিক জ্ঞান মিত্র রইলেন। পার্টনার শিশির মিত্র রইলেন। কখন কোথায় থাকি না থাকি—ও'রা ঠিক খবরাখবর পাবেন।

বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাৎ করে কিছুক্ষণ পরেই আবার রওনা—সেই মোটরেই। গাড়ীতে উঠে শিশিরকে বললাম—ভালো ভালো জায়গায় ঘুরব, একটা ছোটখাটো ক্যামেরা কিনে নিলে হত।

ও বললে—তা মন্দ কী?

বললাম—চৌরঙ্গীতে ক্যালকাটা ক্যামেরা হাউসে গাড়ীটা একটু দাঁড় করাবে?

—চেনাশোনা দোকান?

আমি বললাম—হ্যাঁ—তা বলতে পারো।

শিশির বললে—চেনাশোনা থাকলেই তো বিপদ! প্রবোধবাবু আবার খবর পেয়ে যাবে না তো!

হেসে বললাম—আরে না, না। সন্ন্যাসী-বাবুকে টিপে দিলেই হবে—কাক-কোকিলও টের পাবে না।

—তাহলে চলো।

সন্ন্যাসীবাবু দোকানে ছিলেন। পছন্দ-মতো ছোট-খাটো একটা ক্যামেরা কিনে নিয়ে আবার গাড়ীতে উঠলাম। বললাম—ভোঁস এবার আমি তোমার হাতে। চল এবার কোথায় যাবে।

শিশির বোসকে আমি ভোঁস বলে ডাকতাম। ও হেসে উত্তর দিলে—সোজা এবার দমদম। ওখান থেকে রাত দশটার গাড়ীতে সোজা একেবারে খুলনা।

—খুলনা?

হ্যাঁ।

—বেশ। তাই সই। খুলনাই চলো। কোনোদিন যাইনি—দেখাও হবে জায়গাটা।

রাত্রি দশটা নাগাৎ খুলনা ট্রেনে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কমরায় উঠে পড়া গেল।

সকাল বেলা খুলনা পৌঁছে নেমে জিজ্ঞেস করলুম ঃ কোথায় থাকবে হে?

ভোঁস উত্তর দিলে—কেন, ডাকবাংলো

বেশ খোলামেলা জায়গাটা। মনটাও নিশ্চিন্ত। এখানে বেশ ঘুরে-টুরে দেখা যাবে সব। এখানে আর আমাকে চিনছে কে?

কিন্তু বিধি বাম। দেখি বাইরে একজন দুজন করে লোক জমতে শুরু করেছে—আর এদিক থেকে ওদিক থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।

শিশিরকে বললাম—সে কি হে, চিনে ফেলেছে নাকি?

মনে পড়লো, খুলনায় একবার কোনো একটা দল এসেছিল 'প্লে' করতে। আমি দলের মধ্যে ছিলাম না, আমি তাদের চিনি না পর্যন্ত—অথচ তারা পোস্টারে আমার নাম দিয়েছিল। আমার অনুপস্থিতি আবিষ্কার করতে এখানকার লোকের দেরী হল না, কারণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার ছবির সঙ্গে লোকে ততদিন পরিচিত হয়ে গেছে। আর যায় কোথায়? অভিনয়ের সময় ইঁট-পাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি—সে এক কান্ড!! তাই বলছি, এখানে আমাকে চিনে ফেলাটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়।

শিশির বললে ঃ হতে পারে। তোমার ছবি তো আমরা আমাদের কাগজে নিয়মিতই ছাপছি।

ওদের কাগজ মানে 'ভগ্নদূত' সাপ্তাহিক। ভগ্নদূতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি খুব ছাপা হোত। তখন ক'খানাই বা কাগজ ছিল—ভগ্নদূত ছাড়া ছিল সচিত্র শিশির, বাংলা, আত্মশক্তি ও নাচঘর। এঁরাই সাধারণত নাট্যজগত সম্বন্ধে আলোচনা করতেন।

যাই হোক, শিশিরের মুখে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। যদি আমার আসার খবরটা রটে যায়, আর সেকথা গিয়ে যদি প্রবোধবাবুর কাছে পৌঁছয়, তাহলে তাঁর আর এখানে ছুটে আসতে কতক্ষণ?

শিশির সেদিন সন্ধ্যা নাগাদ একটা ছ্যাকড়া গাড়ী নিয়ে এলো। সেই গাড়ীতে চুপি চুপি উঠে খড়খড়ি তুলে দিয়ে চারদিক ঢেকেঢুকে ঘাটের দিকে চললুম—জেনানা সোয়ারীর মতো। তারপর গাড়ী থেকে উঠলাম একটা বড় নৌকোয়। শিশির একটা গোটা নৌকাই ভাড়া করে ফেলল আমাদের জন্যে। গ্রীষ্মকাল—জলের ওপরে বেশ আরামে থাকা যাবে। যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—ঘাট পর্যন্ত আর কে ধাওয়া করছে—নৌকো থেকে না নামলেই হলো।

রাত তো কাটলো। দিনও যায় যায়। দিনের বেলায় আমরা নৌকা খুলে দিয়ে মন্থর গতিতে ভাসতে লাগলুম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই একটা দুরন্ত কালবৈশাখী ঝড় উঠলো। অতিকায় দুটো ডানা মেলে যেন একটা প্রকান্ড কালো পাখী ঝাঁপ দিয়ে পড়ল নদীর ওপর। প্রবল কল্লোলে নদীর রূপও হয়ে উঠল ভয়ংকরী।

নদীর পাড়গুলো বেশ উঁচু, মাঝে মাঝে সেই উঁচু পাড় ভেদ করে খালের রেখা চলে গেছে। আমাদের মাঝি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নৌকাখানা খালের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। ঝড়টা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি—তা হলেও মাঝির দক্ষতার জন্যই নৌকার বা আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

ঝড় থেমে যাবার পর পাড়ে দাঁড়িয়ে নতুন ক্যামেরা দিয়ে অনেক ছবি তুললাম। নানান দৃশ্যের মনোমত ছবি—যেমন নৌকো পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে, আকাশের বুকে ভেসে চলেছে এক ঝাঁক বক, নৌকার সারি চলেছে নদীর বুকে ইত্যাদি।

(ক্রমশঃ)

আশপাশে আলো মরে এলে, দূরাগত যানবাহনের শব্দ বিজনতা প্রকট হলে ঠিক ভয় নয়, ঠিক লজ্জাও নয়, কেমন একটা অস্বস্তি যেন সিপ্রাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। সে বুঝতে পারে না এ ধরনের অনুভূতি তার আর কোনদিন হয়েছিল কিনা, না কি এই প্রথম, এই নতুন? জায়গাটা যতই অচেনা হোক, কাজটা কি অজানা, না, যার জন্যে প্রতীক্ষা তার প্রতি অবিশ্বাস? কি জানি কেন সিপ্রা কিছুতে মনের অস্বস্তিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে না, সেই ফিরে-ফিরে দেহ মনে অনুভূতিটা কানামাছির মত ঘুর ঘুর করে।

প্রভাত দেবসরকার

অবেলা

না, সিপ্রা ভয় পাবার মেয়ে নয়; লজ্জা পাবার মেয়ে নয়, যে কাজের জন্যে এই বিজনে সে এসেছে সে-কাজ নিয়ে অনুশোচনা করবার মেয়েও সে নয়। আর কাজটা তার জীবনে এই প্রথমও নয়। এর আগে অনেকবার সে এমনিভাবে একা একা নির্জনে, নিভৃতে—

না, বারের হিসেবটা আর মনে থাকে না, আর হিসেব করেও না সিপ্রা—জীবনে কেউ কি ভেবে দেখে, হিসেব করে, যতদিন সে বাঁচে, কতবার সে ঘুমিয়েছে কি, জেগেছে, কতবার সে রোগভোগ করেছে কি, সুস্থ হয়েছে, কতবার সে বিপদে পড়েছে কি, সেই বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছে কি, রক্ষা পেয়েছে? না, জীবনে এসব হিসেব কেউ করে না, হোক না সে জটিলতার হিসেব, কি, জটিল কান সে-জীবন! এসব হিসেব মনে করলে কেউ কখনো বাঁচতে পারে, না, জয়ী হতে পারে জীবনে? কত লাভ, কত লোকসান, কত ভাল-মন্দ, কত পাপ-পুণ্য পেরিয়ে না জীবন।

না না, এখানে আসার জন্যে আজ মনে কোন 'স্কুপল' নেই সিপ্রার! আর স্কুপল কিছু থাকবে কেন, অন্যায়-অধ্যায়, সৃষ্টি ছাড়া কিছু সে করছে না! নতুনও তো কিছু নয়, যা তার নিজের কাছে গর্হিত মনে হবে, নিজ-সত্তা বা অন্তকালে বিবেকের দংশন অনুভব করবে! নিজের কাজ নিজের কাছে, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে, বিলাস কিংবা জীবিকার জন্যে, জীবন নির্বাহের জন্যে—মাথা গুঁজার জন্যে!

মনে মনে সিপ্রা হেসে ফেলে। আজ হঠাৎ এসব কি আবোল-তাবোল চিন্তা সে করছে! ভাবনাটা বড় অদ্ভুত যেন আজ—

আষাঢ়ের বেলা অনেক বড়। তাও কখন শেষ হয়ে গেছে, গাছে-পালায় রোদ মুছে গেছে। কখন যেন আপিস থেকে সিপ্রা বেরিয়ে এসেছিল, তখন চৌরঙ্গীপাড়ায় রোদ খট খট করছিল। আষাঢ় মাসে এবারে অনেক দিন বৃষ্টি হল না: চাষীদের ভাবনা হোক, চাকুরে বাবু-বিবিদের নিভাবনা—ছাতা নিয়ে ট্রামে-বাসের ভিড়ে আরেক ঝামেলায় পড়তে হয় না!

না, সিপ্রার সে-ভাবনা নেই, তার ছাতাটা হ্যান্ডব্যাগের মধ্যে দিব্যি পুরে ফেলা যায়। সে যদি ট্রামে-বাসে উঠতে পারে ছাতার জন্যে তাকে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে না, ঝামেলাও কিছুমাত্র নয়! ছাতাটা আজকাল একটা বোঝাই নয় মেয়েদের।

দু-তিন বছর আগে বিমানবাবু কোন বিদেশ দেশ থেকে ঘুরে এসে ফোল্ডিং ছাতাটা সিপ্রাকে প্রেজেন্ট করে বলেছিলেন, এখনো কলকাতার বাজারে ওঠে নি, আপনিই প্রথম মাথায় দেবেন, কোন অসুবিধে নেই,

এই, এই মুড়লেন—একেবারে হাতের চেটোর মধ্যে এসে গেল, ছাতা নিয়েছেন কি একটা 'পেন-নাইফ' ধরছেন বুঝতেই পারা যাবে না!

সত্যি, সিপ্রা খুবই আশ্চর্য হয়েছিল, খুবই পুলকিত বোধ করেছিল। বিমানবাবুর উপহারে কৃতজ্ঞ বোধ করেছিল। বিমানবাবু আস্তে আস্তে ছাতাটার সংকুচন বিমুক্ত করতে সিপ্রা বিস্ফারিত বিস্ময়ে বিকশিত পুষ্পের রূপ-দর্শনজনিত হর্ষ-পুলকে বলেছিল, বাঃ, বেশ তো! ঠিক যেন পদ্মের পাপড়ির মত!

খুশীতে বিমানবাবু হেসে বলেছিলেন, হংকং পোর্ট থেকে এনেছি; মনে হয়েছিল আপনার জন্যে কিনি—জিনিসটা দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল।

সচরাচর সিপ্রা যা করে না, বিমানবাবুর হাতটা কাঁধের ওপর টেনে ঘন সান্নিবিষ্ট হয়ে অশ্লেষে বলেছিল, আমার কথা আপনার তা হলে মনে থাকে? সত্যি?

বিমানবাবু সুযোগ নষ্ট না করে বিস্ফারিত ছাতাটা সরিয়ে নিয়ে সিপ্রাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে বলেছিলেন, সত্যি না তো মিথ্যে?

না, তারপরে অনেক কিছু উপহার অবশ্য সিপ্রা বিমানবাবুর কাছ থেকে পেয়েছিল, অনেকবার বিমানবাবু তাকে নির্ধারিত চুক্তিবদ্ধ অর্থের অনেক বেশি দিয়েছিলেন। টাকা-পয়সা নিয়ে কোনদিন বিমানবাবুর সঙ্গে দ্বিতীয়বার কথা বলতে হয় নি। বিমানবাবু কথার মানুষ, যাকে বলে খদ্দের লক্ষ্মী!

বিমানবাবুর উপহারের অনেক জিনিস এখনো সিপ্রার ঘরে আছে, কিন্তু বিমানবাবু নেই; একদিন চিরকাল মনে রাখার কথা বললেও আজ ভুলে গেছেন। তাতে অবশ্য আজ সিপ্রার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নেই, তারপর অনেক বিমানবাবু এসেছেন গেছেন, আরো কত আসবেন—এই তো আজ যেমন—

সিপ্রা ঘড়ি দেখলে, সাতটা বেজে গেছে। আরো কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? কি মুশকিল!

হ্যাঁ, ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে এখানে এই অশ্বত্থ-পাকুড় আর নিমগাছের তলায় এসে দাঁড়াবার কথা ছিল, আধ ঘণ্টা না হয়, চল্লিশ মিনিট, তার বেশী কখনোই নয়! খুব জোর গলায় ওপারে টেলিফোনে ভদ্রলোক বলেছিলেন, তারপর গাড়িতে টুক করে আপনাকে তুলে নেবে! রেস্ট এ্যাসিয়োরড্!

নিশ্চিন্ত হলেও, সিপ্রা কিন্তু কিন্তু করেছিল। মানে, যদি ভদ্রলোক না আসেন, যদি কোন কারণে কোথাও আটকে যান, কি দেরী করেন—

ওপারে টেলিফোনে সঙ্গে সঙ্গে পুলকিত কণ্ঠে ভদ্রলোক বলেছিলেন—বেশ, আপনি বিমলের কাছ থেকে আপনার পাওনাটা আগাম চেয়ে নিন। না না, কিন্তুর কিছু নেই, বিসনেজ ইজ বিসনেজ!

না, সিপ্রা কিন্তু ঠিক ব্যবসাদারী করতে পারে নি। বিমলবাবুর সুপারিশই তো যথেষ্ট, আবার আগাম কেন—না না, ছি ছি, কি করে সে বলতো, না মশাই, টাকাটা আগে দিয়ে দিন—সেজেগুজে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো আর যদি না আসেন আপনার ভদ্রলোক, তখন—

ছি ছি, সিপ্রা কিছুতে বিমলবাবুকে ওকথা বলতে পারতো না। কখনো পারবেও না। বিমলবাবু যতই জানুক কিসের টাকা, কেন টাকা, কি জন্যে টাকা, কার টাকা! আর লোক যত বড়, যেমনই হোক না কেন, দেখা-সাক্ষাতের আগে টাকা কখনো নেওয়া যায়? না না, বিশ্রী! আগাম? বায়না? এসব ব্যাপারে? ছি—তাছাড়া বিমলবাবুই বা কি ভাবতেন, আগ্রহ করে উদ্যোগী হয়ে তিনি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন, টেলিফোনে আলাপ হলেও সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের চেয়ে কম কিছু নয় এসব ব্যাপারে। মাঝখানে একজন চেনা-জানা পরিচিত লোক থাকলেই হল! স্থান, কাল জানলেই যথেষ্ট, তারপর পাত্র তো স্বশরীরে উপস্থিত হবেই। না হলে মধ্যবর্তী লোক আছে!

বিমলবাবু যা বলেছিলেন, লোকটি খুব পয়সাওলা। মানুষটাও ভাল। ঐ একটু ইয়ে আর কি, মানে আজকাল বড়লোক যা চায়! ভয়ের কোন কারণ নেই, জায়গা ঠিক করাই আছে, ফার্ণিশড্ রুমে, বাথ, প্যান্ট্রি কোন কিছুর অভাব নেই। মনে করবেন আপনার ঘর, কারো কোন সম্পর্কই নেই; লোকজন গোলমালও কিছু নেই—একেবারে নির্জন, সিকোয়েসটেড—

সিপ্রা ফাইল থেকে মুখ তুলে ভয়-চকিত কণ্ঠে বলেছিল, তা হলেই তো ভয় আরো বেশি! যদি খুন করে রাখে, কেউ জানতে পারবে না, চেঁচালেও কেউ সাহায্য করতে ছুটে আসবে না! সে তো আরো ভয়ের কারণ—

বিমলবাবু বলেছিলেন, না না, সে সব পার্টি এঁরা নয়। আর শুধু শুধু আপনাকে খুন করতে যাবে কেন!

সত্যি ভয়ের কোন প্রকৃত কারণ নেই, সিপ্রা হেসে বলেছিল, না তাই বলছি যদি—

বিমলবাবুও জানেন সিপ্রার মত অভিজ্ঞ মহিলার মুখে কথাটা ঠিক ভয়ের নয়। বলেছিলেন, যখন আমি আছি আপনাকে খুন-জখম সম্বন্ধে গ্যারান্টি দিতে পারি, মিস্টার প্যাটেল সেরকম লোকই নন। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন বিসনেজ করতে, বাড়ীটা রেখেছেন কখন কি দরকার হয়! পাড়াও ভাল, খাস চৌরঙ্গী, হার্ট অফ দি সিটি!

সিপ্রার মনে হয়েছিল, তারা আস্তে কথা বললেও, আশ-পাশের সহকর্মীরা যেন কান পেতে আছে। আপিসে তার সম্বন্ধে অনেক আগেই খারাপ ধারণা হয়ে গেছে: এই তো চাকরি, তার আবার এত জাঁক-জমক কিসের! সাজ-গোজও তো করে যেন, কত হাজার টাকা মাইনে পায়! আসে কোত্থেকে? ইত্যাদি।

উঠে যাবার সময় বিমলবাবু বলেছিলেন, তা হলে অবাঙ্গালীতে আপনার যদি আপত্তি থাকে সে আলাদা কথা! কিন্তু প্যাটেলজী বাঙ্গালীর চেয়ে হাজার গুণে ভাল, দেখবেন মিশলে একবার—

টেলিফোনে কথাবার্তা তো ভালই লেগেছিল। হিন্দী, বাংলা, ইংরেজী মিশিয়ে প্যাটেলজী যা বলেছিলেন, তাতে কোন অশোভনতাই প্রকাশ পায় নি। বরং সাক্ষাতের সময়টার নির্দিষ্টতা নিয়ে সিপ্রা কিন্তু করতেই, একেবারে পাকা ব্যবসায়ীর মত শ্রীপ্যাটেল তার পারিশ্রমিক আগাম দিতে চেয়েছিলেন: আমি যদি না এসে পৌঁছতে পারি আপনাকে ডিপ্রাইভ করবো কেন? বিমলবাবুকে বলে দিচ্ছি টাকা আগাম দিয়ে দেবে!

সিপ্রা এই নিয়ে আর কিছু বলবার আগেই ওদিকে মিস্টার প্যাটেল রিসিভার
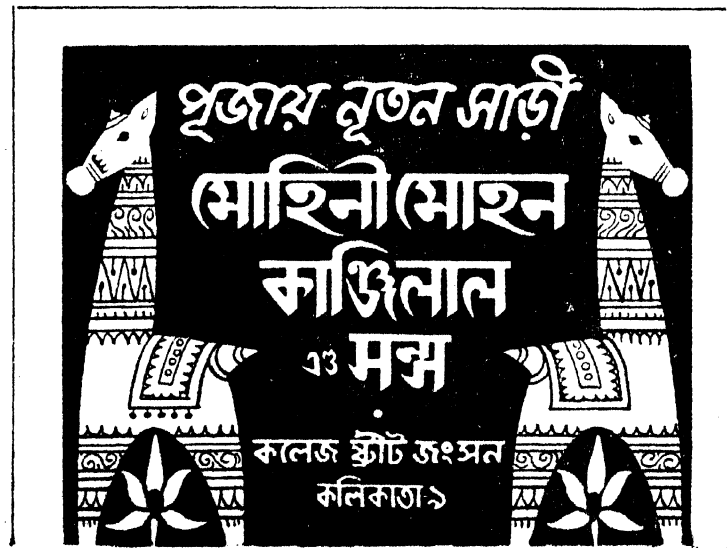
রেখে দিয়েছিলেন, তারপর আর সিপ্রা বিমলবাবুকে কিছু বলেনি। এর মধ্যে পারিশ্রমিকের কথা হওয়া উচিতও নয়। পরিশ্রমই কিছু হল না তো পারিশ্রমিক!

কিন্তু বিমলবাবুকে তখন বলা হয়নি, আজকাল সিপ্রা আপন পারিশ্রমিকটা ঘন্টা হিসেবে ঠিক করেছে। প্যাটেলজী যেখানে খুশী, যেমন খুশী তার সাহচর্য নিন কিন্তু সময়টা বেঁধে নিতে হবে, সারা রাত তো আর কেউ বাইরে থাকতে পারে না, তার ঘর আছে, সংসার আছে, স্বজন-বন্ধুও আছে।

না, সাতটা পনের হয়ে গেল! পাকুড়-অশ্বত্থের তলাটা বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, অদূরে পথের আলোটা কেমন যেন সান্ধিগ্ধ চোখের মত এই দিকেই চেয়ে আছে, দু-একটা মোটর গাড়ি নির্জন রাস্তায় অযথা হর্ণ বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছে, চমকে দিচ্ছে উৎকট শব্দে!

সঙ্গে কি বিমলবাবু আসবেন? সে-রকম কথা কি ছিল? সিপ্রার কিছু মনে পড়ছে না—জায়গাটা নতুন, লোকটি চেনে তো? কি দরকার ছিল আলাদা আলাদা আসবার, একেবারে আপিস থেকে বেরিয়ে—

না, সে-কথা উঠলেও সিপ্রাই আগে থেকে বিমলবাবুকে মানা করে দিয়েছিল—আপিস-টাপিসে কাউকে আনবেন না, টেলিফোনে বা লোক মারফৎ যা হয় করবেন। আপনি জানেন জানুন, তা বলে আর কেউ জানবে— না না—

নির্জনে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে সিপ্রার যেন এই প্রথম মনে হল, কোন মানে হয় না অত লুকানো-ছাপানর, আপিস-আদালতের ভয়ও অমূলক! নিজের মনকে আঁখি-ঠারা।

এতদিন কথাগুলো যেন এমনিই বলে এসেছে। এই নির্জনে নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে তাকে যেন আজ বড় প্রকট করে দিয়েছে, নিজের কাছে নিজেকে সিপ্রার মনে হচ্ছে, নির্লজ্জ, বেহায়া উপযাচিকা!

বিমলবাবুর ওপরও সিপ্রা চটে যায়। বলেছিল বলে কি এমনি ভাবে তাকে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে? না কি ভেবেছিলেন যতক্ষণ খুশি যেমন খুশি তাদের দাঁড় করিয়ে রাখতে পারবেন রাস্তাঘাটে?

এখন যদি সিপ্রা চলে যায়? অলাভ কার? বিমলবাবুর কি এর মধ্যে কিছু লাভ নেই? কি ভেবেছিলেন তাকে, এভাবে এই নির্জনে এ সময় অপেক্ষা করতে বলে?

পাকুড়-অশ্বথ-নিম গাছের তলায় একটা বসবার জায়গা যেন কে তৈরী করেছিল—কোথা থেকে একখন্ড পাথর বয়ে এনে ছিল। সহজ মসৃণ সরল নয় পাথরটা, তবু বেশ বসা যায়—দেখে-শুনে বসলে বুঝি দুজনেরও জায়গা হয়, তেঁতুল পাতায় বসার মত না অবশ্য।

কি মনে হল সিপ্রার—এর আগে তার মত কেউ এখানে এসে কারো জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বসেছিল নাকি? কতক্ষণ বসেছিল? আর কতদিনই বা? দুজনের পক্ষে মেলামেশার জায়গাটা কিন্তু বেশ! হয়তো সেই জন্যেই বিমলবাবু প্যাটেলজীর [illegible] সাক্ষাতের স্থান হিসেবে এইটাই স্থির করেছেন? একদিক থেকে ভালই করেছেন। একেবারে আপিস থেকে বেরিয়েই গাড়ি চড়ে কারো ডেরায় গিয়ে ওঠা মানে উদ্দেশ্যটা বড় স্পষ্ট হয়ে যাওয়া। যেন পয়সা দিয়েছি যখন তখন যা করবার তা এখনই হয়ে যাক, আর দেরী কেন? লজ্জার কিছু নেই।

না সেদিক থেকে রয়ে-সয়ে কাজটা মেলামেশার মধ্যে করাই উচিত। সঙ্গ দেওয়া মানে তো সব সময়—

বিমলবাবু বলেছিলেন কিছু না, আপনাকে কেবল 'কম্পানি' দিতে হবে... লোক খুব ভাল, আপনার কোন ভয় নেই... সে সব কিছু করবে না...কলকাতায় 'লোনলি' 'ফিল' করেন কিনা!

সিপ্রা মনে মনে হেসেছিল, ভয় নেই! সবাই প্রায় ঐ একই কথা বলে, ভয়ের কোন কারণ নেই! কেবল 'কম্পানি' চায়, মানে একটু—বড় একা-একা বোধ করে সব! বেচারা!

সে মানেটা এতদিনে সিপ্রা বুঝে গেছে, সঙ্গ আর আসঙ্গের তফাৎটা জেনেছে, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে এ ব্যাপারে! বিমানবাবুই হোক, বিমলবাবুই হোক, আর মধুসূদনবাবুই হোক কাউকে অত বুঝিয়ে বলতে হয় না আর সিপ্রাকে!

প্রথম প্রথম এই সঙ্গ দেওয়ার ব্যাপারে বেশ অসুবিধা হত। আসঙ্গলিপ্সু ব্যক্তিটি বাঙালী হলে অবশ্য বুঝতে বা বোঝাতে কোন অসুবিধে হত না, কিন্তু অবাঙালী হলে সিপ্রা একটু মুশকিলে পড়তো—কথা আরম্ভ করা যায় কিভাবে, কি বলে মন-পাওয়া যায়? কথার পিঠে কি কথা বলা যায়? ভাষা নিয়েই যত গন্ডগোল!

না, তবু যেন অসুবিধে নয়—দু-একবারেই সিপ্রা বুঝেছে তার যা কাজ তাতে ভাষাটা কোন বাধাই নয়, ভাবটা আসল, আর তো উভয়েই অনেক আগে থেকেই হৃদয়ঙ্গম করে বসে থাকে, প্রস্তুত থাকে। আর চলনসই ইংরেজী কাজ চলার পক্ষে যথেষ্ট!

কে জানে এ লোকটি কেমন। ইংরেজী জানেন তো? না, কেবল হামকো-তোমকো বলে কথা বলতে হবে? রাষ্ট্রভাষায় নাকি আজকাল প্রেমালাপ ভালই জমে—মহব্বৎ, প্যার আরো কত কি সব প্রতিশব্দ আছে ভালোবাসার, ভাব-সাবের। হিন্দীটা শিখে নিলে বেশ হয়—দু-একখানা গান সেই সঙ্গে।

ছি-ছি, চিন্তাটা আজ অদ্ভুত ছেলেমানুষের খেয়ালের মত করছে সিপ্রা! যত সব উদ্ভট চিন্তা—গান গেয়ে মন-ভোলাতে যাবে কোন দুঃখে? ভাবনা নাকি তার মানুষজনের? এখনো সে অবস্থা হয়নি—ভাল রোজগার তার আছে।

কিন্তু এই নির্জন বনেই গান গেয়ে একদিন বুঝি মনোভাব প্রকাশে সিপ্রা বিশেষ আগ্রহী ছিল। বেশ মনে আছে, সে গান কিছু জানতো না, কোনদিন বাল্যে কি কৈশোরে গানের কোন চর্চাই করেনি—বলে পরণের কাপড়ই জুটতো না, তার শখ-শৌখিনতা, বাবা রাতদিন বলতেন ওসব হবে না, লেখাপড়া শিখতে চাও শেখ। মার খুব ইচ্ছে ছিল, মেয়েরা গান শিখবে, নাচ শিখবে, আরো কত কি শিখবে!

কিন্তু সেই একদিন সিপ্রাকে হিমাংশুর সঙ্গে বেড়াতে এসে আড়ালে গান গাইতে হয়েছিল। হিমাংশু কিছুতে ছাড়েনি। সিপ্রা কত বলেছিল, আমি গান জানি না, তাল জানি না, সুর জানি না—

তা হোক। যা পার গাও—

সেই প্রথম, সেই শেষ—গলায় আর গান আনার চেষ্টা করেনি সিপ্রা। আশ্চর্য, সেদিন কিন্তু গানটা তার গলায় সহজেই এসে গিয়েছিল। খুশি হয়েছিল, খুশি করেছিল। হিমাংশু তাকে কাছে টেনে বলেছিল, এই তো বেশ গাইলে, এতক্ষণ কেবল না-না করছিলে।

কে জানে কি করে সিপ্রা গান শিখেছিল, কোনদিন কোন চেষ্টা করেছিল বলে তো তার মনে পড়ে না। বরং তাদের বাড়ীতে গান নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল—বাবা, কাকা কেউ-ই গান ভালবাসতেন না। সিপ্রা জ্ঞান হয়ে দেখেছে তাদের বাড়ীতে কেবল বাসরঘরে যা কিছু গান হয়েছে। একটা গানের কটা কলিও এখনো যেন মনে আছে: আমি কি গাহিব গান, আমারে মিছে গাহিতে বল গো—

না, তারপর আর মনে নেই। দূর-র, আজকাল কোনো আধুনিকা কষ্ট করে আর গান শেখে নাকি? গান শুনে আর মোহিত হবার কাল নেই।

সাজ-গোজ, চলন-বলন, দেহচর্চা এই সবই এখন নারীত্বের উপাদান! ওসব গান-বাজনার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা, আলাদা আসর, আলাদা জায়গা আছে। স্থান, কাল আর পাত্রেরও অনেক প্রভেদ।

তবু সেদিন হিমাংশুর অনুরোধে সিপ্রা গান গেয়েছিল, অনুরাগে বেদনায় লজ্জায় আনন্দে কেমন যেন শিহরণ বোধ করেছিল। কি গান, কি সুর, কি ভাব, আজ বুঝি তার কিছু মনে নেই।

বিয়ের পরে কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। যত ভাব, যত ভালবাসা, যত আত্মীয়তা আশা করেছিল সিপ্রা তার অর্ধেকও বিবাহিত জীবনে সে পায়নি। দু'দিনেই যেন মনে হয়েছিল মস্ত ভুল করেছে। তবু মানিয়ে নেবার মেনে নেবার অনেক চেষ্টা করেছে কিছুতেই কিছু হয়নি—শৌখিন পেয়ালা যেমন ভেঙ্গে গেলে আর জোড়া লাগে না, জোড়া লাগলেও আর কাজে লাগে না। বাঁধাবাঁধি আর বিধি-নিষেধের মধ্যে মানুষ হলেও ছেলেবেলা থেকেই সিপ্রা একটু স্বতন্ত্র ধরনের সেনসিটিভও! ওদিকে হিমাংশুও তাই। পরস্পরের অজানা রহস্য জানা হয়ে গেলে বিরোধের দেরি হয়নি।

তা দেখতে দেখতে অনেকদিন হয়ে গেল তারা ছাড়াছাড়ি হয়েছে। কোর্টে না গেলেও লিখিতভাবে বিচ্ছেদটা পাকা করে নিয়েছে, সিপ্রা ছেলেমেয়ে মানুষ করার ভার নিয়েছে। হ্যাঁ তা ছ' বছর হয়ে গেল। তুতুলের বয়েস এই আট বছর হলো। তাদের বিয়ে হয়েছিল—

বেশ জোর আলো দিয়ে একটা মোটর গাড়ি যেন অনুসন্ধানের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। পাকুড়তলার পাথরটার ওপর থেকে উঠে সিপ্রা গাছের গুঁড়ির আড়ালে সরে দাঁড়াল—সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে শ্বাপদের মত ওৎ পেতে রইল।

না, গাড়িটা দাঁড়াল না। বুঝি গাছতলাটা লক্ষ্য করেছে, সিপ্রার অবস্থিতি টের পেয়েছে। না, গাড়িটা প্যাটেলজীর নয়, গাড়ির মধ্যে তারই মত একটি মেয়ে আছে, সঙ্গের পুরুষটি এমনভাবে তাকে জড়িয়ে আছে যেন হর-গৌরী! গাড়ীটাই তো বেশ নির্জন, আবার এই উন্মুক্ত নির্জনতার মধ্যে আসা কেন? ওরা কি জানে না, কাপড়ের পাড়ের মত গাছপালার এই বিজনতা আজকাল আরো বেশি মুখর! এই পাকুড়-অশ্বত্থ-নিমের পর মেহগনি, কৃষ্ণচূড়া কি গুলমোহর যে-কোন গাছতলা এখন আর ফাঁকা নেই, সবুজ ঘাস পাণ্ডুর হয়ে গেছে অনেক পায়ের আঘাতে।

সিপ্রার মনে পড়ল কয়েকবার মোটরগাড়িতে করেও সে সম্পাদান করেছে। অনেক দূরে চলে গেছে তারা শহর ছাড়িয়ে। প্রথম প্রথম বড় ভয় আর অস্বস্তি লাগতো, গাড়ির মধ্যে তাকে নিয়ে যেন কুকুরছানা, বিড়ালছানার মত ব্যবহার করতো, তারপর—

ইস্-স, মনে পড়ে গা-টা যেন কেমন ঘিন ঘিন করে উঠলো। বড় নোংরা আর অশুচি মনে হলো নিজেকে। অস্ফুটে মুখ দিয়ে ধিক্কারের মত বেরিয়ে এল, বেশ্যা! বারবনিতা! ভোগ্যা—

সিপ্রা ঘড়ি দেখলো সাড়ে সাতটাও অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না, করলেও নিজের কাছে মান থাকে না; কি ভাববে লোকটি নির্দিষ্ট সময়ের পরে তাকে মনোহারিণীর ভূমিকায় অপেক্ষা করতে দেখলে?—ভাববে নেহাৎ-ই—

এই করে খায়? এই জীবিকা? শিক্ষিতা, ভদ্র, আলোকপ্রাপ্তা, স্বাধিকার-প্রমত্তা—

বিমানবাবুকে একবার যেন সিপ্রা জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, আপনারা আমাদের কি ভাবেন বলুন তো?

কি আবার ভাববো! শিক্ষিতা, আপটু-ডেট, কালচার্ড—কেন বলুন তো?

না, তাই জিজ্ঞেস করছি। পয়সা দিলেই আমাদের পাওয়া যায় কি বলেন?

বিমানবাবু আর উত্তর দেননি। কিন্তু ভদ্রলোক কোনোদিন তেমন কোন ব্যবহার করেননি যাতে সিপ্রার মনে হতে পারে কেবলমাত্র অর্থ দিয়ে সিপ্রাকে পাওয়া গেছে, সে ভোগ্যা হয়েছে। হ্যাঁ, বিমানবাবু ভালবাসতেন, বেশ আদর-যত্নও করতেন—অন্ততঃ তাই মনে হতো সিপ্রার। তবু—

এসব আদর-আপ্যায়নের মধ্যে ভালবাসার ছিটেফোঁটা নেই। লীলাদির কথাই ঠিক, ওসব বুঝি না, যেখানে পয়সা পাবো সেখানেই—ওসব ভাব-সাব, ভালবাসা কিছু নয়! অনেক তো করে দেখেছিস, আর কেন, এবার গুছিয়ে নে। ভালবাসার লোক তো ভোগা দিয়েছে!

বুকের মধ্যে একটা ব্যথার মত কথাটা সিপ্রার লেগেছিল। সত্যিই হিমাংশু তাকে বড় দাগা দিয়েছিল। সে হিমাংশুর সম্বন্ধে কিন্তু কোনদিন বিপরীত ধারণা করেনি। হিমাংশুকে কত মনোহর করে মনের মধ্যে গড়ে তুলেছিল। মা-বাবা, ভাই-বোন সবাইকে সে একদিন অকাতরে ফেলে এসেছে, পর করে দিয়েছে! যেন হিমাংশুর সঙ্গে মিললেই তার প্রকৃত মুক্তি, ভালবাসার স্বপ্নে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে।

কিন্তু অকালে ফুল-ফল সব নষ্ট হয়ে গেছে, ফুল ঝরে গেছে। হিমাংশু বড় স্বার্থপর আর আত্মসুখী। সব ব্যাপারে ইদানীং বড় বাড়াবাড়ি করছিল। খুঁত ধরছিল, তার স্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ করছিল।

স্বাতন্ত্র্য! কথাটা কেমন যেন। চাকরি করে বলে কি সে স্বাধীন, সে কারো কথার ধার ধারে না? না, সংসারে নিজের মতে চলবার তার অধিকার হয়েছে? এই আজ তার সেই স্বাধীনতাটা কোথায় রইল? সেই একজনের কথার ওপর নির্ভর করে আষাঢ়ের দীর্ঘ বেলা বইয়ে দিয়ে নিভৃত কুঞ্জে অপেক্ষা করছে! যদি সে না আসে? ছি, ছি—

সেদিন বড় জোর গলায় হিমাংশুকে বলেছিল স্বাধীন সে, স্বতন্ত্র সে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি—এখন?

কে জানে হিমাংশু তার বর্তমান স্বাধীন জীবনের কোন খোঁজ রাখে কিনা! সামান্য চাকরিতে তার কি করে চলছে তারও খবর রাখে কিনা!

গাছতলা থেকে উঠে সাপের পিঠের মত রাস্তাটায় পা দিয়ে যেন ফুৎকার দিয়ে সিপ্রা বললে, ভাবলে তো বয়েই গেল। বেশ করবো, আমার যেমন খুশী চলবো। কারো কথায় ধার ধারি না—

হঠাৎ সামনে একটা গাড়ী বড় জোর আলো জেলে ছুটে এল। সিপ্রার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কেমন থতমত খেয়ে গাড়িটার সামনে গিয়ে পড়ল। ভাগ্যিস গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়েছিল—

মুহূর্তের ব্যবধান, এক চুল মাত্র তফাৎ—তারপর? জীবনের লীলাটা যেন মুহূর্তে, চোখের নিমেষে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে ছায়া-ছবির মত। কত বেদনা যেন সে-জীবনের, কত আগ্রহ যেন তাকে ধরে রাখার, ভোগ করার—

আগে অনেকবার সিপ্রার মনে হয়েছে, মরে গেলেই ভাল! কি লাভ প্রেমহীন জীবনে? তাছাড়া কি করে সে বাঁচবে—একশ' উনপঞ্চাশ টাকায় কখনো চলে? ভাগ্যে সে-সময় লীলাদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, প্রাণ খুলে তাকে সব কথা বলেছিল। বড় লজ্জা? বড় সংকোচ? বড় যেন—তবু—

তার বর্তমান জীবনের গ্লানিটা যেন এই সম্ভাব্য দুর্ঘটনার আলোকে সিপ্রা স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। ছি ছি, একি করেছে সে? নিজেকে তা বলে এত ছোট করেছে, তুচ্ছ করেছে, হেয় করেছে জীবিকার জন্য? না না, লীলাদি যতই বলুক, যতই তার অর্থের প্রয়োজন হোক—

যেন সত্যিই সিপ্রা চলন্ত গাড়ির তলায় চাপা পড়ে গেছে। সারাদেহে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, মন বলে তার আর কিছু নেই, সবকিছু থেঁতলে চুরমার হয়ে গেছে! ইস্-স্ তার আশেপাশে কত লোক জড় হয়েছে! ভিড়ের মধ্যে কত লোক যেন তার অঙ্গ নিয়ে সমবেদনায় মুখর হয়ে উঠেছে। চারিদিকে থেকে একটা আহা-উহু শব্দ উঠছে! মরে গিয়ে সিপ্রা সব যেন বুঝতে পারছে।

কতক্ষণ পরে সিপ্রার সম্বিৎ ফিরে এল। ত্রস্ত, কম্পিত দেহটাকে সংযত করে সিপ্রা মাঠ পেরিয়ে হাঁটতে লাগল। আজ এই যে গাড়ি-চাপা পড়া থেকে রক্ষা পেল, এর জন্যে সে কাকে ধন্যবাদ দেবে, নিজেকে না ঐ গাড়ির চালককে? আজ কে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে? এইখানে এভাবে অপঘাতে মৃত্যু হলে লোকে কি ভাবতো? স্থান, কাল, পাত্র নিয়ে কত গবেষণাই না হতো।

মাঠের মধ্যে বৃষ্টিহীন আকাশে জ্যোৎস্নাটা কেমন যেন আলোকিত ঘষা কাচের মত। পূর্ণিমা করে গেছে, সিপ্রা জানে না, কিন্তু গাছতলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে করতে টের পেয়েছে চাঁদ উঠেছে,

দূরে থেকে রাস্তা পেরিয়ে মাঠটা ভাটা-শেষ নদীতটের মত মনে হচ্ছে। চাঁদের আলোর চেয়ে নিওন আলোর জোর অনেক বেশি —সিঁদুর পড়লে কুড়নো যায়।

কি ভেবে সিপ্রা আকাশে মুখ তুললে, তার মতই চাঁদটা যেন আজ ঘর্মাক্ত বিধ্বস্ত, কলঙ্করেখাগুলো বড় স্পষ্ট।

মাঠ পেরিয়ে যানবাহনের রাস্তায় উঠে সিপ্রার মনে হল কে যেন তাকে এতক্ষণ অনুসরণ করছিল। হঠাৎ বুকের মধ্যে বেদনার সঙ্গে মনে হল, হিমাংশু নয় তো? কিন্তু এতদিন পরে তার চলা-ফেরার ওপর নজর রাখবে কেন?

বড় আত্মসচেতন হয়ে ওঠে সিপ্রা, যেন তার সারাদেহে কিসের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সবার দৃষ্টি থেকে সেগুলোকে ঢাকবার জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে সে সামনে এগিয়ে যায় ভিড়ের মধ্যে মিশতে চায়। কথাটা সিপ্রার মনে পড়ল, একদিন কে যেন বলেছিল, যতই করুক, যেমন ভাবেই থাকুক, ওসব মেয়েকে দেখলেই চেনা যায়, ওদের চাল-চলনে কেমন একটা—

এই যে শুনছেন? এই যে এদিকে—

সিপ্রা কটমট করে পিছনে ফিরে তাকালে, তারপর আহ্বানকারীকে যেন ভর্ৎসনা করে বিড় বিড় করে বললে, কে আপনি? কাকে ডাকছেন? আপনাকে চিনি না তো।

বিমলবাবু কেমন যেন অবাক হয়ে হাসতে লাগলেন। সিপ্রা আর দাঁড়াল না।

।। তেইশ ।।

এক হাতে তালি বাজে না। এক পক্ষ যদি অহিংস হয় অপর পক্ষ হিংসার দ্বন্দ্ব একা একা চালাতে পারে না। আপনা হতেই নিরস্ত হয়। তেমনি এক পক্ষ যদি অসাম্প্রদায়িক হয় তবে অপর পক্ষ সাম্প্রদায়িকতার কুস্তি একা একা লড়তে পারে না। আপনা হতেই থামে।

কিন্তু এক পক্ষ অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক হলে তো? অগাস্ট অভ্যুত্থানের সময় থেকেই লক্ষ করি অহিংসার উপর থেকে লোকের বিশ্বাস চলে গেছে। যদিও গান্ধীর উপরে আছে। ওটাও একটা প্যারাডক্স। তারপর আরো চমৎকৃত হই যখন শুনি সুভাষচন্দ্র নেতাজীরূপে সশস্ত্র সৈন্যদল নিয়ে ভারতের অভিমুখে অভিযান করছেন। সরকারী কর্মচারীদের বাড়ীর মেয়েরাও গাইতে শুরু করেছেন "কদম কদম বাড়ায়ে যা"। হিংসার তেমন মরসুম আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। মহাত্মার অহিংসার শিক্ষা কারো মনে বসেনি।

তেমনি সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে দিকে দিকে মাথা তুলছে সাম্প্রদায়িকতা। ওই ১৯৪৪ সালেই আমি ছুটি নিয়ে বিহারে কিছুদিন থাকি। সেখানে শুনি একদিকে যেমন খাকসার অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ সশস্ত্রভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। শস্ত্র অবশ্য তেমন কিছু নয় যাকে ইংরেজরা ভয় করে। তাই সরকার থেকে নিষেধ নেই। কিন্তু সাধারণ হিন্দু তো ভয় করে। সাধারণ মুসলমান তো ভয় করে। আমার বন্ধু একজন সরকারী অফিসার। তিনি তখনি আমাকে বলেন যে ইংরেজ চলে যাবার সময় সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে।

এই হচ্ছে গান্ধী জিন্না সংবাদের সমসাময়িক অবস্থা। জিন্না কেমন করে বিশ্বাস করবেন যে হিন্দুরা অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক থাকবে, তাদের ব্রুট মেজরিটি দিয়ে পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে মাইনরিটিকে দাবিয়ে রাখবে না? তিনি যদি তাঁর সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকেন সেটার জন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় কি?

স্বাধীন মানুষ যখন খুশি খেলার নিয়ম পালটে দিতে পারে। আজ তোমার খেলার নিয়ম অহিংসা ও সত্যাগ্রহ। কাল যখন ইংরেজ থাকবে না, তার বেয়োনেট থাকবে না, তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে হিংসা ও হত্যাগ্রহ। আজ তোমার খেলার নিয়ম পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র। কাল যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রভাব থাকবে না, অঙ্কুশ থাকবে না, তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে ডিক্টেটরশিপ ও রণতন্ত্র। আজ তোমার খেলার নিয়ম জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী। কাল যখন আধুনিক যুগের থেকে দেশ কয়েক শতক পেছিয়ে যাবে তখন হয়তো তোমার খেলার নিয়ম হবে হিন্দুরাষ্ট্র ও মুসলিম দলন। মেজরিটি যখন বৈদেশিক অঙ্কুশমুক্ত হবে তখন সে যে মাইনরিটির সঙ্গে কখন কী ব্যবহার করবে তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। এমন কি সংবিধানে লিপিবদ্ধ সেফগার্ডও যথেষ্ট নয়। মেজরিটি ইচ্ছা করলে সংবিধান ছিঁড়ে ফেলতে পারে। নাঙ্গা তলোয়ার দিয়ে দেশ

অন্নদাশঙ্কর রায়

শাসন করতে পারে। তখন মাইনরিটি পালাবার পথ পাবে না। পাকিস্তান হচ্ছে সেই পালাবার পথ। সেখানে পালাবার জন্যে সমুদ্র পার হতে হবে না, গিরিসংকট পার হতে হবে না। একবার পা চালিয়ে দাও, তারপর পাকিস্তান।

এর অনুরূপ দাবী আয়ারল্যান্ডেও উঠেছিল। জিন্না সাহেব তা জানতেন। আলস্টার কবুল না করে আইরিশ ন্যাশনালিস্টদের গতি ছিল না। কংগ্রেসকেও তেমনি পাকিস্তান কবুল করতে হবে। নইলে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন পাশ করবে না। বেআইনী স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা কঠিন। আর্মির লয়ালটি পাওয়া সহজ হবে না। অন্তত মুসলিম রেজিমেণ্টগুলির লয়ালটি তো নয়ই। সৈন্যবলহীন স্বরাজ আকাশকুসুম।

এখন তাঁর প্রথম কাজ হচ্ছে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রগুলিকে দিয়ে মুসলিম লীগের পাকিস্থান প্রস্তাব সমর্থন করিয়ে নেওয়া। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রগুলি যদি একবাক্যে পাকিস্তানের সমর্থন করে তবে তো অর্ধেক লড়াই ফতে। বাকী অর্ধেক হবে হাটে বাটে মাঠে। এডওয়ার্ড টমসনকে জিন্না তার আভাস দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। তখন কেউ সেটাকে [illegible]নি। কিন্তু ক্রমেই আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছিল যে ইংরেজ থাকতে যদি মিটমাট না হয় তো পরে কুরুক্ষেত্র বাধবে।

শেষ পর্যন্ত ওটা একটা উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব। ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকারী কে হবে? ষোল আনা ভারতীয় প্রজা? না বারো আনা হিন্দু প্রজা? জিন্না সাহেবের মতে ষোল আনা ভারতীয় প্রজার কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যেটা তেমন দাবী করে সেটা প্রকৃতপক্ষে বারো আনা হিন্দুর প্রতিষ্ঠান। ষোল আনা ভারতীয় প্রজার কোনো যৌথ ইলেকটোরেট নেই, আছে মুসলিমদের স্বতন্ত্র ইলেকটোরেট, ফলে হিন্দুদেরও স্বতন্ত্র ইলেকটোরেট। আর্মিতেও স্বতন্ত্র মুসলিম রেজিমেন্ট, শিখ রেজিমেন্ট, রাজপুত রেজিমেন্ট। এই যে দেশের চেহারা সেখানে কনস্টিট্যুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি ডেকে কী হবে? নিচের দিক থেকে সংবিধান তৈরি করতে চাইলে হবে কেন? মেজরিটি রুল অচল। এদেশে মেজরিটি বলতে পলিটিকাল মেজরিটি বোঝায় না, বোঝায় সাম্প্রদায়িক মেজরিটি। আইনসভায় কংগ্রেসের মেজরিটি কার্যত হিন্দু নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছেই দায়ী। মুসলিম নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটারদের কাছে দায়ী নয়। কংগ্রেস মুসলিমরা ব্যতিক্রম।

কায়দে আজম সাধারণ নির্বাচনের উপর দৃষ্টি রেখে কাজ করছিলেন। সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম নির্বাচকরা অধিকাংশ স্থলে তাঁর পার্টিকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দেয়। কিন্তু কার উপরে জিতিয়ে দেয়? হিন্দুদের উপরে নয়, শিখদের উপরে নয়, অন্যান্য মুসলিম পার্টিগুলির উপরে। এইসব পার্টির অপরাধ এরা পাকিস্থান চায় না। এদের পক্ষেও অনেক ভোট পড়েছিল, তবে অপেক্ষাকৃত কম। লীগ যদি শতকরা ৫১টা ভোট পায় তাহলে নির্বাচনে জয়ী হতে পারে, কিন্তু তার মানে এ নয় যে শতকরা ৪৯টা ভোট যারা পেলো তারা মুসলিম নয় বা তাদের মতের দাম নেই। তাছাড়া বহু মুসলিম ভোটার ছিল নিরপেক্ষ। বহু মুসলিম ভোটার না বুঝে ভোট দিয়েছিল। বহু মুসলমান ভোটাধিকার পায়নি। ভোটাধিকার প্রাপ্তবয়স্কমাত্রের অধিগত ছিল না। সব মুসলমান মুসলিম লীগের পেছনে ছিল এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অনেকেই জানত না পাকিস্থান হলে তারা অবশিষ্ট ভারতে এলিয়েন হয়ে যাবে।

তা হলেও জিন্না সাহেবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে তাঁর পেছনে অধিকাংশ মুসলিম ভোট। এখন তাঁকে হিন্দু শিখের সম্মতি পেতে হবে, আর যদি তিনি মনে করেন যে তাদের সম্মতি অবান্তর তা হলে তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জয়ী হতে হবে। এটা তত সহজ নয়। তবু তিনি সে ঝুঁকিও নিতেন। কারণ তিনি জানতেন যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মার খেলেও তিনি সেটাকে পাকিস্থানের পক্ষে একটা যুক্তি বলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করতে পারতেন। পাকিস্থান না হলে মাইনরিটির জান মাল নিরাপদ নয়। [illegible]

সাধারণ নির্বাচনের পরে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের তিনজন মন্ত্রী ভারতবর্ষে আসেন সরেজমিনে অবস্থাটা দেখতে ও দেখে ব্যবস্থা করতে। কংগ্রেস লীগ যাতে একমত হয় সেটাই তাঁদের মিশন। সেটা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যা করবার তা করতেন। তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কথাবার্তা চালান, কারণ ততদিনে কংগ্রেস ও লীগ নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ করেছে। তাঁরা গান্ধীজীর সঙ্গেও পরামর্শ করেন, তবে সেটা ঠিক নেগোশিয়েশনস বলতে যা বোঝায় তা নয়। এখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে ইংরেজরা গান্ধীর উপরে আগুন হয়ে রয়েছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস কংগ্রেস তো ভালো ছেলের মতো ক্রিপস প্রস্তাব গিলতে যাচ্ছিল, গান্ধীই তার কান ধরে টান দিলেন। গান্ধীর থেকে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করাই তার পর থেকে ব্রিটিশ পলিসি। তাই গান্ধীকে তাঁরা বাপ হিসাবে সম্মান দেখালেও ছেলেকে হাত করার তালে ছিলেন। তাতে কংগ্রেসের কদর বেড়েছিল, লীগের কমেছিল।

ক্যাবিনেট মিশন কারো উপরে কিছু চাপিয়ে দিতে পারতেন না। শুধু প্রস্তাব করতে পারতেন। সে প্রস্তাব কেউ গ্রহণ করতেও পারে, না করতেও পারে। তবে তাঁদের থলিতে ছিল একটি লোভনীয় জিনিস। সেটি তাঁরা তাকেই দেবেন যে তাঁদের প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করবে। এবার বড়লাট তাঁর শাসন পরিষদ ঢেলে সাজাবেন। তাতে জঙ্গীলাট থাকবেন না। ভারতীয়রাই সব ক'টি পদ পাবেন। ওটা হবে সত্যিকারের একটা ক্যাবিনেট। বড়লাট পররাষ্ট্র বিভাগও বিলিয়ে দিয়ে রাজসন্ন্যাসী হবেন। হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে, কিন্তু সাধারণত প্রয়োগ করা হবে না। এর নাম ইন্টারিম গভর্নমেন্ট।

হ্যামলেটের প্রশ্ন, টু বী অর নট টু বী। কংগ্রেসেরও তেমনি, টু গো অর নট টু গো। লীগেরও তাই। কারণ ক্যাবিনেট মিশন যে প্রস্তাব সামনে রেখেছিলো সে যে ছুঁচো গেলার প্রস্তাব। গিলবে কি গিলবে না?

ক্যাবিনেট মিশন আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভারতীয়রা মিলেমিশে যে সংবিধান প্রণয়ন করবে ব্রিটেন সেই সংবিধানই স্বীকার করবে। নিজের জন্যে কিছু হাতে রাখবে না। এখন ভারতীয়দের একমত হওয়া চাই। একটি পার্টি যেন আরেকটি পার্টির উপর মেজরিটির সিদ্ধান্ত চাপাতে না চায়। অপর পক্ষে মাইনরিটিও যেন মেজরিটির পথ রোধ না করে। দু'পক্ষের বিবেচনার জন্যে ক্যাবিনেট মিশন যে পরিকল্পনা দেন তার সার কথা ভারতের জন্যে একটাই কেন্দ্র হবে, দুটো নয়। সেই একমাত্র কেন্দ্রের হাতে থাকবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রবিভাগ, চলাচল ও সেসব বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ। আর সমস্ত বিষয় তুলে দেওয়া হবে তিনটি প্রদেশগোষ্ঠীর হাতে। একটি গোষ্ঠীতে থাকবে মাদ্রাজ, বম্বে, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা। আরেকটিতে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। শেষেরটিতে বাংলা, আসাম। এই তিন গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি গোষ্ঠী স্বতন্ত্রভাবে স্থির করবে কোন কোন বিষয় গোষ্ঠীর সকলের পক্ষে সাধারণ বিষয়, কোন কোন বিষয় সাধারণ নয়, প্রদেশের নিজস্ব। গোষ্ঠীতে যোগ দিতে কাউকে বাধ্য করা হবে না, যোগ দিলে বেরিয়ে যেতেও পারবে। কিন্তু গোড়ায় যোগ দেওয়া চাই। তেমনি দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধেও পরিকল্পনায় ব্যবস্থা ছিল।

প্রথমটা বুঝতে পারা যায়নি যে ওর ভিতরে একটু কৌশল ছিল। ওদিকে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর এদিকে আসাম অর্থাৎ উত্তরপূর্ব সীমান্ত প্রদেশ দুই যাচ্ছে লীগের বগলে। লীগ পাচ্ছে পাঁচটা প্রদেশ। ব্যালান্স অফ পাওয়ার। তাছাড়া সীমান্ত দুটোর অবস্থানগত গুরুত্ব যেমন তাতে লীগের বল বাড়বে। বারগেনিং পাওয়ার।

এটা গান্ধী আজাদের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ নয়, কায়েদে আজমের পরিকল্পিত দ্বিকেন্দ্রীকরণ নয়, এটা দুয়ে এক, একে দুই। দুই পাশে দুই পাকিস্থান, মধ্যিখানে হিন্দুস্থান। মাথার উপরে কেন্দ্রস্থান। তাতে দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরাও থাকবেন, কিন্তু তাঁরা মনোনীত না নির্বাচিত তা পরিষ্কার নয়। শিখদের ভাগ্যও অনিশ্চিত।

এ পরিকল্পনা মেনে নিলে আসাম ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মায়া কাটাতে হয় কংগ্রেসকে। গান্ধী তাতে রাজী হতে পারেন না। তাহলে কি ক্যাবিনেট মিশনকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে। তা যদি হয় তবে ব্রিটেনের দিক থেকে আর কোনো প্রস্তাব আসবে না। নেগোশিয়েশনস ছিন্ন হয়ে যাবে। কিছুদিন বাইরে থেকে কংগ্রেসকেও ফিরতে হবে জেলে। কেন্দ্রে কোনোরকম পরিবর্তন না ঘটলে শুধুমাত্র প্রাদেশিক সরকার চালিয়ে কংগ্রেসের মানসম্মান থাকবে না। লোকে হাসবে। বামপন্থীরাও বিদ্রোহ করবে।

তাহলে কি ক্যাবিনেট মিশন স্কীম গিলতে হবে? অগত্যা। গান্ধীরও ইচ্ছা নয় অসময়ে আবার এক গণ-আন্দোলন করা। জোয়ারের লক্ষণ ছিল না। যেটা ছিল সেটা অরাজকতার। তিনি আর অগাস্ট অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি চান না। তাঁর মতে কংগ্রেসের পার্লামেন্টারি প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়াই ভালো। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির প্ল্যান মেনে নেওয়াই ভালো, তবে আসাম সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা যে অন্যরূপ এটাও তিনি জানিয়ে রাখেন। ওদিকে লীগও স্কীম গিলতে রাজী ছিল। যাতে ইন্টারিম গভর্ণমেন্টে যাওয়া সুগম হয়।

কিন্তু ইন্টারিম গভর্নমেন্ট নিয়ে দুই পক্ষের বোঝাপড়া হলো না। লীগ চায় কংগ্রেসের সঙ্গে প্যারিটি। প্যারিটি না পেলে ভীটো। কংগ্রেস চায় লীগের চেয়ে অন্তত একটা আসন বেশী পেতে। ভীটোতে কংগ্রেস নারাজ। বড়লাট চোদ্দটা আসনের থেকে লীগকে অফার করেন পাঁচটা, কংগ্রেসকে ছটা, তার মধ্যে একটা আসন হরিজনের জন্যে সংরক্ষিত। কংগ্রেস বলে সে তার ছ'জনের মধ্যে একজন মুসলমানকেও নেবে, কারণ কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের দল নয়, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলের। লীগের ঠিক এইখানেই গলায় কাঁটা। সে অমন সরকারের থাকবে না। বড়লাট কিছুতেই দু'দিক মেলাতে পারলেন না। তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তখন অ্যাটলী। তিনি ওপার থেকে নির্দেশ পাঠান যে লীগ যোগ দিক আর নাই দিক ইন্টারিম গভর্নমেন্ট করতেই হবে। না করলে কংগ্রেস হয়তো আবার সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স বাধাবে। তিনি আর সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স চান না। সুতরাং বড়লাটকে যে আজ্ঞা করতে হয়। জবাহরলালকে আমন্ত্রণ করতে হয় ক্যাবিনেট গঠনে সাহায্য করতে। তিনিই তখন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি কায়দে আজমের সঙ্গে মোলাকাৎ করেন ও কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাব তোলেন।

জিন্না ইতিমধ্যে মুসলিম লীগের মিটিং ডেকে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম খারিজ করেছিলেন। কাজেই ইন্টারিম গভর্নমেন্টে যোগ দিতে পারেন না। আসলে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পিত বিকেন্দ্রীকরণ তাঁর দাবীর পরিপূরণ নয়। তিনি চেয়েছিলেন দ্বিকেন্দ্রীকরণ। একটিমাত্র কেন্দ্র যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন সেখানেও মেজরিটি মাইনরিটির দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। মেজরিটি তার বাড়তি ভোট দিয়ে মাইনরিটিকে পরাস্ত করবে। গণতন্ত্রের নিয়ম যদি খাটে তো কংগ্রেস প্রত্যেকবার জিতবে। সেইজন্যে তিনি চেয়েছিলেন প্যারিটি। আপাতত বড়লাটের পরিষদে। সেইজন্যে তিনি চেয়েছিলেন ভীটো। আপাতত বড়লাটের উপস্থিতিতে। পরে বড়লাটের অবর্তমানে তিনি হয়তো কাস্টিং ভোট চেয়ে বসতেন। তা নইলে কোয়ালিশন পোষায় না। তাছাড়া তাঁর পক্ষে একটি জীবনমরণ প্রশ্ন, কে মুসলমানদের প্রকৃত প্রতিনিধি? লীগ না কংগ্রেস? লীগ যদি সব মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি না হয়ে থাকে তবে কোয়ালিশনে লীগের আগ্রহ নেই। কংগ্রেসী মুসলমানের সঙ্গে এক টেবিলে বসলে লীগ মুসলমানের জাত যাবে।

ইন্টারিম গভর্নমেন্টে তাঁর দাবী মিটবে না। কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তাহলে কেন আর পিছুটান? তারপর সবচেয়ে বড়ো কথ বড়লাটের শাসনপরিষদে সব পারিষদের

সমান মর্যাদা। কেউ প্রধানমন্ত্রী নন। জবাহরলাল ধরে নিয়েছেন যে তাঁকে কার্যত প্রধানমন্ত্রী করা হবে। ওয়েভেলও সেটা ধরে নিয়েই তাঁকে গভর্নমেন্ট গঠনে সহায়তার ভার দিয়েছেন। ঠিক যেমন বিলেতে হয়। কিন্তু দেশটা তো বিলেত নয়। এখানে এখনো সেরকম কোনো কনভেনশন গড়ে ওঠেনি। কংগ্রেস থেকে একজন প্রধানমন্ত্রী হলে লীগের উপর সর্দারি করবেন। লীগের মান ইজ্জত থাকবে না। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে গোটা ক্যাবিনেট পদত্যাগ করে। সেটাও মুসলিম লীগ মেনে নেবে না।

ঝীনা তাঁর চালগুলো ঠিক করে রেখেছিলেন। একটার পর একটা ক্রমশ প্রকাশ্য। জবাহরলালকে তিনি 'না' বলে দেন। তখন বড়লাট তা শুনে দ্বিধাগ্রস্ত হন। ব্রিটিশ পালিসি নয় লীগকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কংগ্রেসকে ক্ষমতা দেওয়া। গান্ধী গিয়ে ওয়েভেলকে মনে করিয়ে দেন যে তিনি প্রতিশ্রুত। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে পরিণাম ভালো হবে না। ওয়েভেল বেকায়দায় পড়ে জবাহরলালের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গভর্নমেন্ট গঠন করেন। গান্ধীর কাছে সেটি একটি স্মরণীয় দিবস। তাঁর মনে বিজয়োল্লাস।

ওদিকে ঝীণার কাছে ওটি একটি কালো দিন। ইতিমধ্যেই তিনি লীগকে দিয়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। শুরু হয়ে গেছল 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান।' চারদিনেই পাঁচ হাজার নিহত। এক কলকাতায়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

হাজার বছরের বাংলা কবিতা

বাংলা কবিতার ফসল নিয়ে বাঙালী গর্ব করতে পারে। এই বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদই ত' একদিন এশিয়ার মধ্যে এই বাংলা ভাষাকেই নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল। পুরস্কার মুখ্য নয়, স্বীকৃতিটাই বড় কথা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা অনুবাদ করতে সুরু করেন তখন আর কিছু করার ছিল না তাই, তিনি নিজে বলেছেন—

"বাংলা গীতাঞ্জলীর কবিতা আপন মনে ইংরেজীতে তর্জমা করেছিলুম। শরীর অসুস্থ ছিল আর কিছু করার ছিল না। কোনওদিন এগুলি ছাপা হবে এমন স্পর্ধার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। তার কারণ প্রকাশ-যোগ্য ইংরাজী লেখার শক্তি আমার নেই—এই ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল ছিল।"

অনেকের মনে এই সংশয় থাকে তার ফলে অনেক মূল্যবান রচনার অনুবাদ হয় না, আর অনুবাদ হয় না তাই যাঁরা বাংলা ভাষাভাষী নন সেইসব ভারতীয় এবং অভারতীয় আমাদের রচনার মধ্যে যে সম্পদ আছে তার যথাযথ মূল বিচার করতে পারেন না।

এই কারণে, বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সুখের বিষয় বর্তমানে ট্রানস্লেটারর্স সোসাইটি সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে এই কাজে নেমেছেন, আর ব্যক্তিগত-ভাবে একক প্রচেষ্টায় অনেকে ব্রতী হয়েছেন। এই সূত্রে স্মরণ করা কর্তব্য যে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার একটি ইংরেজী অনুবাদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, এছাড়া হুমায়ুন কবিরের প্রচেষ্টায় আমেরিকার বিখ্যাত 'পোয়েট্রি' পত্রিকায় একটি বাংলা কবিতার অনুবাদ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় বাংলার বর্তমানকালের অনেক বিশিষ্ট কবির অনুবাদ ছিল এবং হুমায়ুন কবির স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব'র কবিতাটি অনুবাদ করেন। এছাড়া আমেরিকান সাহিত্যপত্র 'হারপারস ম্যাগাজিনে'র একটি ভারতবর্ষ সংক্রান্ত ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংখ্যাটিতে অনেক বাঙালী লেখকের গদ্য ও পদ্য রচনার অনুবাদ ছিল।

কিন্তু, সম্প্রতি প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক, কবি ও সাংবাদিক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত দশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত প্রতিনিধি স্থানীয় বাঙালী কবিদের যে অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন তা সম্ভবত দ্বিতীয় রহিত।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত এই অনূদিত সংকলন গ্রন্থে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক পর্ব পর্যন্ত বাংলা কবিতার একটা রূপরেখা প্রকাশ করেছেন। ১০৬জন কবির ১২৬টি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ এই গ্রন্থে সংযোজিত। তন্মধ্যে স্বয়ং সম্পাদক অনুবাদ করেছেন ৬৫টি কবিতা। বিদেশী অনুবাদকদের মধ্যে আছেন এডুইন আর্নল্ড চ্যাপম্যান, কাওয়েল, টমসন, উইলিয়াম আর্চার, টায়ার, মোলেন, মিসেস নাইট, মার্টিন কার্কম্যান, জেমস বার্টলে, লীলা রায় প্রভৃতি। এছাড়া বাকী কবিতার অনেকগুলির অনুবাদ মূল কবিতা থেকে কবিরা অনুবাদ করেছেন। দিলীপকুমার রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য হরিনাথ দে, অতুলচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসাদ ঘোষ, ও সি দত্ত প্রভৃতির কয়েকটি অনুবাদ ছাড়া বাকী কবিতা অনুবাদ করেছেন পল্লব সেনগুপ্ত, রথীন চট্টোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, শংকর রায়, অশোক ফকির প্রভৃতি। অনুবাদকদের নামের তালিকা থেকেই অনুমান করা সম্ভব যে অনুবাদগুলি বিশেষ যত্নের সঙ্গে কৃতী সাহিত্যিকরাই অনুবাদ করেছেন। ফলে অনুবাদের মাধ্যমে মূলের ভাবধারা যথা-সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে এই হাজার বছরে তিনটি পর্ব আছে, প্রাচীন বাংলা (৯০০-১৩৫০), মধ্যযুগের বাংলা (১৩৫০-১৮০০) এবং তৃতীয় পর্বে আধুনিক বাংলা ঃ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সূচনা হয়েছে আধুনিক বাংলা এবং মধ্যপর্বে বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজবুলিতে গীতিকাব্য রচনা করেছেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে উইলকিনস এবং কর্মকারের প্রচেষ্টায় যখন প্রথম মুদ্রণোপযোগী বাংলা বর্ণমালা তৈরী হল তখন থেকেই বাংলা অক্ষরের বর্তমান আকৃতি ঘটে এবং এই কাল থেকেই গদ্য রচনার সূত্রপাত।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল সাংবাদিকতায় ব্রতী, তিনি তার পূর্বে শিক্ষকতা করেছেন কিছুকাল। একদা বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে যে কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়, নন্দগোপাল তার সঙ্গে সম্পাদনাসূত্রে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া সাহিত্য আলোচনামূলক নিবন্ধ রচনায় তিনি একটি ধারার প্রবর্তক। নন্দগোপাল স্বয়ং কবি, সাংবাদিক বলে তাঁর কবি-কৃতীর গৌরব হয়ত কিঞ্চিৎ হ্রাস করেছে কিন্তু বিচারশীল পাঠকমাত্রেই স্মরণ

করবেন কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা। এছাড়া নন্দগোপাল অনেক ইংরাজী কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছেন। চোখের ওপর তাঁর অনূদিত মনোমোহন ঘোষ, সরোজিনী নাইডু এবং সেক্সপীয়রের কবিতা ভাসছে। নন্দগোপাল-কৃত ইংরাজী অনুবাদ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে, তবে একত্রে ৬৫টি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক সে কথা বলা বাহুল্য।

এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য যে পাটনার 'সার্চলাইট' পত্রিকার সম্পাদক সুভাষচন্দ্র সরকার বিদ্যাপতির অজস্র কবিতা, কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা এবং কিছু কিছু আধুনিক কবিদের কবিতা অনুবাদ করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাঁর অনুবাদ করা দু-একটি কবিতা এই সংকলনে থাকলে ভালো হত, আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে নীলিমা দেবীর অনূদিত বাংলা কবিতা, একদা 'ত্রিবেণী' পত্রিকায় 'কল্লোলে'র অনেকগুলি কবির কবিতা তিনি ধারাবাহিকভাবে অনুবাদ করেছেন, এবং তাঁর অনুবাদও সেকালে অভিনন্দিত হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে এই সব কবিতার কিছু সংযোজিত হলে ভালো হয়।

এই গ্রন্থে যে কবিতাগুচ্ছ অনূদিত ও সংযোজিত হয়েছে সম্পাদক স্বয়ং তা নির্বাচন করেছেন। সম্পাদক স্বীকৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন--

> "The editor's selection, however, was guided by two principles: easy translatability and quick receptivity, so that readers not in the know of our traditions and local colour also might fully grasp them. We do not therefore pretend to have culled and collected the best that was ever written in Bengal as poetry".

সম্পাদকের নিবেদনটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। বিদেশীর কাছে কি সহজবোধ্য হবে, বা মনে লাগবে তা বুঝে অনুবাদ করাই সর্বপ্রধান কর্ম। সম্পাদক তাই চেষ্টা করেছেন বাংলা কবিতার একটা নমুনা দানের এবং সেই কর্মে যে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য। এই সংকলন কর্মে স্বয়ং অধিকাংশ কবিতা অনুবাদ ছাড়া, প্রাচীন যুগের অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি থেকে তিনি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ সংকলন করেছেন, এই কবিতাগুলি কালক্রমে লোকচক্ষের অন্তরালে চলে যেত।

সম্পাদক লিখিত ভূমিকা অংশটুকুতে তিনি সামগ্রিকভাবে বাংলা কবিতার ধারা ব্যাখ্যা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা কেন এই সংকলনে সংযুক্ত হয়নি তা বলেছেন। এই গ্রন্থে সূচনাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কবিতার যে ধারা তার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এবং ১৯২৬-এর পর যে সব বাঙালী কবিদের জন্ম হয়েছে তাঁদের কবিতা এই সংগ্রহে দেওয়া সম্ভব হয় নি।

এই গ্রন্থটির 'ক্রনোলজি' অংশে বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং বিশেষতঃ কবিতার বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণ আছে। ১০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যে বিস্তীর্ণ কালের মধ্যে চর্যাপদ, কাহ্নপাদ প্রভৃতি প্রাচীন বাংলা রচনা পাল রাজাদের কালে সুরু হয়েছে তার কথা, পরবর্তীকালে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি জয়দেব, ১৪০০ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, নারায়ণ দেব, বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কথা, ১৫০০-১৬০০ খৃষ্টাব্দে দীন চণ্ডীদাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস প্রভৃতি পদকর্তাদের কথা, আরাকানের সভাকবি আলাওল ও দৌলত কাজীর পরিচয়, ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, দাশরথি, হরু ঠাকুর নিধুবাবু, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রামমোহন, অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয়কাল, তাঁরা বলিষ্ঠ গদ্য রচনা করেছেন আর আবির্ভূত হয়েছেন মধুসূদন, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র। নবীন সেন, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র প্রভৃতির অবিস্মরণীয় অবদানে এই কালটি চিহ্নিত।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় জাগরণের সূচনা। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ লিখেছেন গণ-জাগরণের গান। রবীন্দ্রনাথ কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখেছেন অজস্র। প্রভাতকুমারের গল্প, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ আর সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয়ে বাংলা সাহিত্যের নবজন্ম সূচিত হল। প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' আর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' সাময়িকপত্রের মাধ্যমে নবজাগরণের বার্তা আনলেন। সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন বাগচী, করুণানিধান, প্রভৃতি রবীন্দ্রানুসারী কবিবৃন্দের ঐতিহ্যাশ্রয়ী কবিতার পর অভ্যুদয় ঘটল যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল প্রভৃতি শক্তিমান কবিকুলের। ১৯২৪-এ কল্লোল পত্রিকা প্রকাশিত হল দীনেশরঞ্জন দাশ ও গোকুল নাগের সম্পাদনায়। কাব্যসাহিত্যে নতুন রীতির প্রকাশ দেখা গেল, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রভৃতির রচনায় আর একালের শক্তিমান উপন্যাসকার তারাশংকর, শৈলজানন্দ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্যকুমার প্রভৃতির অভ্যুদয় এই কালেই। সম্পাদক অতি সংক্ষেপে এই ধারাবাহিকত্বের বিবরণ দিয়েছেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে কাহ্নপাদ থেকে সুরু করে সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬) পর্যন্ত প্রায় সকল বাঙালী কবিবৃন্দের কবিতা এই অনুবাদ সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে, এই গ্রন্থটি তাই এক বিশিষ্ট সংযোজন।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এবং মুদ্রণ সুরুচি সম্মত। —অভয়ঙ্কর

A BOOK OF BENGALI VERSE (10th to 20th Century) compiled and Edited by Sri NANDA GOPAL SEN GUPTA: Published by Indian Publications: Calcutta-1.
Price —Rupees Fifteen only.

সাহিত্যের খবর

পশ্চিম জার্মানীর কয়েকজন তরুণ নাট্যকার একটি 'লেখক সমবায়' গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। বড় বড় প্রকাশকরা তরুণদের গ্রন্থ প্রকাশ করতে তেমন উৎসাহবোধ করেন না, যদি কোনও ব্যবসায়িক লাভের সম্ভাবনা না থাকে। তাছাড়া খুব পরীক্ষামূলক বইয়ের প্রকাশক পাওয়াও কঠিন। অথচ তরুণ লেখকদের রচনা এবং পরীক্ষামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত না হলে, কোনও দেশের সাহিত্যই শক্তি সঞ্চয় করতে পারে না। এই ধরনের উদ্দেশ্য নিয়েই এই সমবায় সংস্থাটি গঠিত হয়েছে। কার্লহেইনজ ব্রুযাম ও উল্ফগ্যাঙ উইন যুগ্মভাবে এই সংস্থাটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এঁরা বলেছেন, ভারতের 'কেরল লেখক সমবায়' সংস্থার সাফল্য দেখেই নাকি তাঁরা এ ব্যাপারে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। পশ্চিম জার্মানীর আর একটি প্রকাশন সংস্থা, 'জার্মান বুক ট্রেড' প্রতি বছর একজন জার্মান লেখককে শান্তি পুরস্কার দেবেন বলে স্থির করেছেন। ১৯৬৯ সালের এই পুরস্কার পেয়েছেন ফ্রাঙ্কফুর্টের একজন অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী। নাম আলেকজাণ্ডার ও মার্গারেট মিশ্চারলিব। যে গ্রন্থটি লিখে এই পুরস্কার লাভ করেছেন তার নাম 'দ ইনএ্যাবিলিটি টু গ্রীভ'।

সিডনিতে প্রতি বছরই অস্ট্রেলীয় লেখকদের জন্য একটি কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোক্তা সিডনীর 'ফারমার এণ্ড কোং লিমিটেড'। এ বছরের প্রতিযোগিতার ফলাফল গত মাসে ঘোষিত হয়েছে। 'ক' বিভাগটি ছিল সকলের জন্য। ষাট লাইনের উপর লিখিত একটি বা একই ভাবধারায় লিখিত একাধিক কবিতা এই বিভাগে বিবেচিত হয়। পুরস্কার লাভ করেছেন মেলবোর্ণের খ্রীস ওয়ালেস ক্র্যাবি তাঁর 'ব্লাড ইজ দি ওয়াটার' কবিতাটির জন্য। পুরস্কারের মূল্য ২৫০ ডলার। 'খ' বিভাগের প্রতিযোগিতাটি ছিল ২৫ বছরের নিচের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। এই পুরস্কারটি লাভ করেন সিডনির জন ব্র্যা। পুরস্কারের মূল্য ১০০ ডলার। 'গ' বিভাগে কেবল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাই অংশগ্রহণ করেছেন। পুরস্কার লাভ করেছেন ক্যানবেরার জন কারডিফ। পুরস্কারের মূল্য ২০ ডলার। বিচারক ছিলেন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ট্রেলীয় সাহিত্য বিভাগের প্রধান লিওনাই ক্র্যামার।

হাওড়ার 'বিশ্বনাথ মিশনের' উদ্যোগে গান্ধীশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১—৪ অকটোবর কলকাতার ওয়াই এম সি এ হলে একটি পাঠ্য পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ভারত এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন সংস্থা বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং কলাবিষয়ক পাঠ্য গ্রন্থ প্রদর্শনীর জন্য পাঠান। আ-

দের দেশের অনেক ছাত্রকেই পাঠ্য-পুস্তক এবং পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ খুঁজে অকারণে সময় নষ্ট করতে হয়। ছাত্রদের এই অযথা সময় নষ্টের হাত থেকে বাঁচানোই উল্লেখ্য প্রদর্শনীর নাকি উদ্দেশ্য।

আমেরিকার তরুণতর কবিদের মধ্যে রবার্ট ব্লাই একটি বিশিষ্ট নাম। তাঁর সম্পাদিত 'সিক্সটিজ' পত্রিকাটি বেশ কয়েক বছর ধরে নতুন কবিদের কবিতা প্রকাশ করে আসছে। ষাটের দশকের আমেরিকান কবিতার আন্দোলনে এই পত্রিকাটির অবদান অসাধারণ। কবি হিসেবে ষাটের দশকে তাঁর স্থান নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তিনি যে এই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, তার অস্বীকার করবার উপায় নেই। সম্প্রতি লন্ডন থেকে তাঁর 'দি লাইট আরাউন্ড দি বডি' নামে একটি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকায় প্রকাশক অবশ্য বলেছেন—'রবার্ট ব্লাই—কবি, তার্কিক এবং 'সিকসটিজ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ত্রিমুখী দক্ষতায়—মনে হয়, সাম্প্রতিক আমেরিকান কাব্য জগতে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ব্যক্তিত্ব।' ব্লাইয়ের প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে ওয়েস-লিয়ান ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির নাম ছিল 'সায়লেন্স ইন দি স্নোয়ি ফিল্ডস'। এই গ্রন্থের কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আমাদের এই পরিচিত জগৎ থেকেই যেন অনেক অচেনাকে আবিষ্কার করে তিনি বিস্ময়াবিভূত হয়েছেন। তিনি আনন্দিত হয়েছেন এই ভেবে যে, তাঁর চোখ মেলবার কিংবা হেঁটে যাওয়ার মুহূর্তে এই প্রাকৃত জগৎ বিঘ্নিত হয়নি। প্রবৃত্তি এবং যুক্তির মধ্যে অনুভূতির সূক্ষ্ম-প্রকাশই এই গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। 'দি লাইট অ্যারাউন্ড দি বডি' বইটিতে এই অনুভূতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

'একটি মুখের দিকে তাকিয়ে' কবিতাটিতে লিখেছেন—

কথোপকথন আমাদের এত নিকটে এনেছে!
দেহের ফেণাসমূহ উল্টে করে
মাছগুলিকে সূর্যের কাছে এনে
এবং সমুদ্রের মেরুদন্ডকে কঠিন করে।

একটি মুখে আমি কয়েকঘন্টা
ঘুরে বেড়ালাম,
অন্ধকার অগ্নিশিখাগুলিকে অতিক্রম করে
একটি শরীরে আরোহণ করলাম,
যার এখনও জন্ম হয়নি,
শরীরের চারপাশে আলোর মতো
যা বিরাজমান,
যার ভেতরে শরীর হেলে পড়া
চাঁদের মতো এগিয়ে চলে।'

এখানে ব্লাইয়ের কবিতার সিম্বলিক উচ্চারণ লক্ষণীয়। আলোচ্য গ্রন্থটি তিন-খন্ডে বিভক্ত। ব্লাইয়ের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তাঁর সুররিয়্যালিজমের ব্যবহার। কিন্তু এই সুররিয়ালিজমের স্বরূপ কি? এক বেতার সাক্ষাৎকারে তিনি ডেভিডওসমানকে এ সম্বন্ধে বলেছেন—'সুররিয়্যালিজম হল, অবচেতন থেকে চিত্র-কল্পের গভীর ব্যবহার' এবং যেখানে, 'চিত্রকল্প স্বভাবতই এগিয়ে আসে আর ইঙ্গিতে বলা হয় বেশি। সুররিয়্যালিজম তাই মনের সচেতন এবং বুদ্ধিদ্বারা প্রভাবিত কাঠামোকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং চিত্রকল্পের মাধ্যমে অন্তর্লোকের অভিজ্ঞতার আরেকটি সত্যকে তুলে ধরে।'

প্রখ্যাত উর্দু ছোটগল্প লেখক ও ঔপন্যাসিক এবং আঞ্জমান আরবার-এ আদাব'এর সভাপতি শ্রী এস আউস আহমদ হোসেন গত ২৭ সেপ্টেম্বর লক্ষ্ণৌয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বৎসর।

গত ১১ সেপ্টেম্বর কুচবিহারের জেলা তথ্যাধিকারীর করণে একটি সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন সর্বশ্রী নগেন্দ্রনাথ দাস, সমীর চট্টোপাধ্যায়, কান্তি গুপ্ত, শ্যামলী ভট্টাচার্য প্রমুখ। গল্প পাঠ করেন রণজিৎ দেব ও রবীন সরকার। কুচবিহারের লোক-সংস্কৃতির উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু দে। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন—'গল্পের বিষয় নির্বাচনই আসল কথা। কবিতা বা রম্য-রচনার বিষয় গল্পে রূপ দিতে গেলে গল্প ক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।'

অভিশপ্ত সুন্দরবন (শিকারকাহিনী) —বিশ্বনাথ বসু।। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬।। চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সুন্দরবন অঞ্চলের টুকরো টুকরো শিকারকাহিনীগুলোতে বাস্তবতার হদিস মেলে। বিশ্বনাথবাবু তীক্ষ্ণ ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন ঘন অরণ্যে বিচরণশীল হিংস্র শ্বাপদকুলকে, পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের গতিপ্রকৃতি এবং সেইসঙ্গে সুন্দরবনের নোনামাটি, জল-জঙ্গল আর রাজবংশী মৎস-জীবী মালোদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাত্রা।

কাহিনীগুলো অতিকথার দীর্ঘায়ত পথ না ধরে সরাসরি শিকারের ঘটনায় এসে পড়েছে। কৃত্রিম উপায়ে রোমাঞ্চ বা ত্রাসের সঞ্চার ঘটানো হয়নি। প্রতি ক্ষেত্রেই পাঠকের মনে জাগাবে ব্যাঘ্র আগমনের স্বাভাবিক কৌতূহল আর আতঙ্ক। আবার, ব্যাঘ্রের আত্মগোপন ও আত্মপ্রকাশের ব্যাপারটা স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। একটানা সফলতা অর্জনের ঘটনা কাহিনীতে নেই। যদি থাকত, তাহলে শিকারকাহিনী উত্তেজনা ও সাসপেনস হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ত। অর্থাৎ, স্বাভাবিকভাবেই চোখে পড়ে শিকারীদের অনবধানতাজনিত ভুল-ভ্রান্তি আর ব্যর্থতা। ফলে কাহিনীগুলো সংগতি রক্ষা করে এগিয়ে গেছে এবং রসোত্তীর্ণ হয়েছে। গভীর অরণ্যের ভয়ালতার সঙ্গে সুন্দরবনের আরণ্যক ব্যাঘ্রের দুর্ধর্ষ হিংস্র প্রকৃতিটি সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পাঠকের মনকে একই সঙ্গে আতঙ্ক ও আনন্দের জগতে সম্মুখীন করাবে। প্রচ্ছদ-পট, ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

●

অজয় নদের বাঁকে (উপন্যাস)—অশোক সেনগুপ্ত।। ডি লাইট বুক কোং, ১৭৩।৩, বিধান সরণী, কলকাতা—৬।। তিন টাকা।

ক্ষুদ্রায়তন এই উপন্যাসটির অঙ্গসজ্জা, উৎসর্গপত্র, স্বীকৃতি-পত্র ইত্যাদিতে একটা হেলাফেলার ভাব আপাতদৃষ্টিতে লক্ষ্য করা গেলেও লেখকের মুন্সীয়ানায় খুশি হতে হয়। চমৎকার কাহিনীর বাঁধুনি, গল্প বলার কৌশল। বীরভূম-বাঁকুড়ার পটভূমিতে উপন্যাসটি লেখা। সংলাপে বর্ণনায় আঞ্চলিকতার স্বাদগন্ধ পুরোপুরি ধরতে

পারেননি লেখক। তবু জীবন্ত ও বিশ্বাস্য মনে হয় গ্রামীণ চরিত্রগুলি। আউল, বাউল, ধর্মঠাকুরের দেশের মানুষ বলে চেনা যায় তাদের।

●

ঝিন্দের বন্দী (নাটক) নবকুমার গরাই, নবনাট্য নিকেতন, শ্রীরামপুর, হুগলী। মূল্য চার টাকা।

'ঝিন্দের বন্দী'র কাহিনীর সঙ্গে বাংলা দেশের পাঠকের পরিচিতি আছে একথা স্মরণে রেখেই শ্রীনবকুমার গরাই নাটকটি রচনা করেছেন। এই নামের একটি উপন্যাস থেকে নাটকটি শ্রীগরাই প্রথম লেখেন ১৯৫৪ সালে। সেই সময়ে নাটকটি বহুল জন-প্রিয়তাও অর্জন করে। কিন্তু আকস্মিকভাবে কোন কারণে নাটকটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পরও দ্বিতীয়বারের মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। যাই হোক এ বছর মূল ইংরেজী কাহিনী অ্যান্টনী হোপের 'দি প্রিজনার অফ জেন্দা' অবলম্বন করে শ্রীগরাই আবার লিখেছেন 'ঝিন্দের বন্দী'। নাট্যকার তাঁর পূর্ব নাট্যরূপ থেকে অনেক সংলাপ, দৃশ্যসজ্জা এবং বেশ কিছু বিশেষ নাট্যমূহূর্ত আরোপ করেছেন এই নাটকে। তিনি নিজে বলেছেন—'আমার বিশ্বাস...বর্তমান নাটক আরও গতিশীল, আরো সুসংবদ্ধ, আরো বর্ণাঢ্য।' তবে একটি কথা, নাট্যমূহূর্ত সৃষ্টির ব্যাপারে নাট্যকারের যে তীব্র সচেতনতা মূর্ত হয়ে উঠেছে, সংলাপ রচনায় তা কিন্তু প্রত্যাশিতভাবে ভাষা পায়নি। এই শৈথিল্য মাঝে মাঝে ব্যাহত করেছে দুরন্ত নাট্যগতিকে।

●

পুষ্পবাসর (কাব্যগ্রন্থ)—কমল চট্টোপাধ্যায়।। ডি লাইট বুক কোং, ১৭৩।৩, বিধান সরণী, কলকাতা-৬।। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।।

●

চোখে মনে অনুভবে (কাব্যগ্রন্থ)—পরিতোষ বসু।। ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৬।। দু টাকা।।

লেখার ঢঙে, শব্দের ব্যবহারে, দুজন কবিই পুরানোপন্থী। কমল চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা মানসিকতার দিক থেকে প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের। পরিতোষ বসু অবশ্য সাম্প্রতিক সমস্যায় পীড়িত, দুঃখিত, ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত। ফর্ম ও কনটেন্টের ব্যাপারে সচেতন হলে তিনি ভালো কবিতা লিখতেন।

●

প্রতিবিম্ব [কবিতা সংকলন]—তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। ৩৫ পি, সি, ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৫৭। পঞ্চাশ পয়সা।

দেখতে-শুনতে সাময়িকপত্রের মতো চেহারা। তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের আটটি কবিতার বাংলা-ইংরেজী সংকলন হলো এই পুস্তিকাটি। অনুশীলন অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে কবি ভালো কবিতা লিখবেন। গ্রন্থন, মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি ব্যাপারে সতর্ক থাকলে পাঠক হিসেবে আমরা খুশি হতাম।

●

হচ্ছে যা তাই (নাটক) সুকুমার ঘোষ। সুবোধ বুক স্টল, ৭১।২বি, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬, মূল্য—দুই টাকা।

জীবনের চলমানতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেসব ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে তার প্রতিটি মুহূর্তের অংশীদার হয়ে উঠছি আমরা। বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলোকে একটি দর্পণে প্রতিফলিত করলে, তাতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে আজকের যুগ এবং ভেসে উঠব আমরা। সুকুমার ঘোষের 'হচ্ছে যা তাই' নাটকটিতে এই সত্যই ভাষা পেয়েছে। হাস্যরসাত্মক সংলাপের মধ্য দিয়ে আজকের কিছু কিছু নীতিহীন কার্যকলাপকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। আবার জটিল জীবনসমস্যায় ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের অসহায়তা নিয়েও সৃষ্টি করা হয়েছে কিছু নাটকীয় সংঘাত। দৃশ্যসজ্জায় খুব একটা জাঁকজমক নেই, সংলাপ হয়েছে প্রাঞ্জল। আর সবচেয়ে লক্ষ্য-নীয় হোল আলোচ্য নাটকে কোন স্ত্রীভূমিকা নেই, সুতরাং অনায়াসে যে কোন অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী নাটকটিকে মঞ্চে তুলে ধরতে পারেন।

সংকলন ও পত্র-পত্রিকা

তৃতীয় চিন্তা (দ্বিতীয় সংকলন)—সম্পাদক কমল বসু।। ৪।১০এ, যোগেন্দ্র বসাক রোড, কলকাতা।। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

এ সংকলনের উল্লেখযোগ্য রচনা আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আত্মরতিঃ ইন্দ্রিয়ে বিকৃতি দর্শন'। অন্যান্য লেখা লিখেছেন শর্মিষ্ঠ নারায়ণ বসু, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, প্রণব চক্রবর্তী, কণাদ গঙ্গোপাধ্যায়, অসীম রেজ, সুকল্প চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ সান্যাল প্রমুখ অনেকে।

●

শ্লোক [২য় বর্ষ, ২য় সংকলন]—সম্পাদক : শিপ্রা ঘোষ ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। ৩৪।৪ গোয়ালপাড়া রোড, শ্রীমা পল্লী, বেহালা, কলকাতা ৬০। দাম : একটাকা

সুন্দর প্রচ্ছদ ও ছিমছাম মুদ্রণে শ্লোকের বর্তমান সংকলনটি বেশ আকর্ষণীয়। কবিতা ছাড়াও কবিতা-বিষয়ক আলোচনা লিখেছেন কয়েকজন। গোটের 'ফাউস্ট' (অংশ) অনুবাদ করেছেন গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। কবিতা লিখেছেন সুনীল হাজরা, তৃষ্ণা হালদার, গৌতম গুহ, মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। প্রবন্ধ লিখেছেন সমীর চক্রবর্তী প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

চিত্রবীক্ষণ [আগস্ট, ১৯৬৯]—সম্পাদক : জয়সুন্দর গুপ্ত। ২ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৩। দাম : দু' টাকা।

চলচ্চিত্র আলোচনার নিয়মিত মাসিক পত্রিকা 'চিত্রবীক্ষণ'-এর এ সংখ্যাটি বেরিয়েছে 'সোভিয়েত চলচ্চিত্র সংখ্যা'রূপে। বিভিন্ন লেখক রুশ ছায়াছবির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। সেমিয়ন গিনসবার্গের 'ইতিহাসের পাতা' শীর্ষক রচনাটি একটি অপূর্ব লেখা। বিপ্লবপূর্ব-কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত রুশ চলচ্চিত্রের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়া হয়েছে এই মূল্যবান সুদীর্ঘ আলোচনায়। এ ছাড়া লিখেছেন সফী আহমদ (দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ ও সোভিয়েত চলচ্চিত্র), পরিমল মুখোপাধ্যায় (চলচ্চিত্রে লেনিন), ইয়েভগেনি বেরেচিকভ (চলচ্চিত্রে মহাকাল), স্বলতা সান্যাল (যুদ্ধোত্তর সোভিয়েত চলচ্চিত্র) ও ছোটদের সিনেমা সম্পর্কে একটি আলোচনা। অজস্র আর্ট প্লেট মুদ্রিত হয়েছে। প্রচ্ছদ অসাধারণ। এই সংখ্যাটি সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র আলোচনার একটি মূল্যবান সংকলন হিসেবে বিবেচিত হবে।

●

সুপ্রিয়া—প্রথম বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা। সম্পাদক—অশোক বসু, ২১ মদন বড়াল লেন, কলকাতা—১২। মূল্য এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

সিনেমার প্রতি সাধারণ তরুণ-তরুণীর বিশেষ ঝোঁককে মূলধন করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নগ্ন ও অর্ধনগ্ন ছবি ছেপে যে সব সিনেমা-পত্রিকা বাজার মাত করার চেষ্টা করে সুপ্রিয়া তাদেরই একটি। এ সংখ্যায় নাম তরুণ-তরুণী সংখ্যা দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না। বইটি আগাগোড়া মুদ্রণপ্রমাদে ভর্তি।

●

বেঙ্গলী লিটারেচার (আগস্ট ১৯৬৯)—সম্পাদক আশিস সান্যাল।। ৫৩, বিধান পল্লী, কলকাতা-৩২।। দাম : দু টাকা।

বাংলা সাহিত্যের ইংরেজী ত্রৈমাসিক বেঙ্গলী লিটারেচারের এ সংখ্যাটি প্রবন্ধে-নিবন্ধে ও মৌলিক রচনায় সমৃদ্ধ। গোপাল ভৌমিক ও সুখরঞ্জন রায় লিখেছেন দুটি মূল্যবান আলোচনা। স্বাধীনোত্তর বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে গোপাল ভৌমিকের আলোচনাটি সকলেরই ভালো লাগবে। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ ধর, গণেশ বসু, অন্নদাশংকর রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ আরো অনেকে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি উপন্যাসের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। অন্যান্য রচনার মধ্যে কয়েকটি বাংলা বইয়ের আলোচনা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। আন্তর্জাতিক বিভাগে স্থান হয়েছে দেশী-বিদেশী বহু কবির কবিতা।

জনশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশে যে-কজন লেখক অতি অল্প সময়ের মধ্যে শুধু সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্যে নয়, জনপ্রিয়তায়ও সারা দেশে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এই মুহূর্তে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের নামই আমার সবার আগে মনে পড়ছে। এর কারণ হয়তো তাঁর বয়সের তারুণ্য এবং নিকট-বর্তমানের জাগ্রত উপস্থিতি। কলকাতার কাগজপত্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তো এই সেদিনের ঘটনা। সম্ভবত ১৯৬৩ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন কাগজপত্রে লিখতে আরম্ভ করেন প্রচুর পরিমাণে। বক্তব্যের সারল্য ও অভিজ্ঞতার সজীবতায় চোখ ফিরিয়ে তাকান সাহিত্যের পাঠক। এই পাঁচ বছরে তিনি গল্প লিখেছেন অজস্র, উপন্যাসের সংখ্যাও কম নয়—আটটি।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর 'পলাবন' পড়ে দারুণ খুশি হয়েছিলেন। ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। সিরাজের মুখেই শুনেছি, তাঁর অন্যতম বড় গল্প 'কালসিন্ধু' অমৃতে ধারাবাহিক বেরোবার সময় নাকি একজন কবি আরেক নতুন সাহিত্যিককে বলেছিলেন, বাংলা দেশে না হয়ে এ গল্প পৃথিবীর অন্য কোনো উন্নত দেশে লেখা হলে রীতিমতো হৈ-হুল্লোড় পড়ে যেতো। বছর তিনেক আগে আমি একটি লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদককে জিজ্ঞেস করেছিলুম, এ সময়ের মধ্যে সবচাইতে প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গল্পকার কে? ভদ্রলোক কয়েকজনের নাম করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সিরাজের নাম ছিল শীর্ষ স্থানে।

তারপর সিরাজের সঙ্গে দেখা হয়েছে নানা জায়গায়। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। নানারকম কথাবার্তা হতো কফি হাউসে কিংবা অন্যত্র। অমৃতে আসতেন প্রায়ই। এখনো আসেন। গল্প হতো সাহিত্যের ব্যাপারে। তিনি বলতেন, অতীত জীবনের কথা। বানানো গল্প নয়। অথচ, উপন্যাসের চেয়েও মনোরম, ঘটনাবহুল—কলকাতার মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য এবং চমকপ্রদ।

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অষ্টম উপন্যাস 'কিংবদন্তীর নায়ক'। এসম্পর্কে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে। তিনি শোনালেন, আত্ম-কাহিনী। বললেন, আমার কোনো লেখাই জীবনবিচ্ছিন্ন নয়। অভিজ্ঞতার বাইরে আমি যেতে পারি না। বিশেষ করে, 'কিংবদন্তীর নায়ক' আমার বাল্য-যৌবনে দেখা রাঢ় অঞ্চলের কাহিনী।
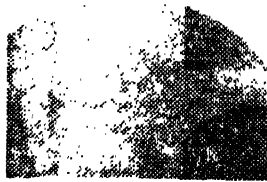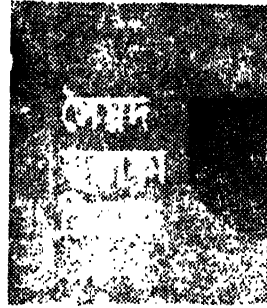
বললাম, বলুন, আপনার নিজের কথাই শুনতে চাই।

বলবার জন্যে প্রস্তুত হলেন মুস্তাফা সিরাজ। মুহূর্তের জন্যে নীরব রইলেন। বর্তমানের দেয়াল পেরিয়ে তাঁকে অতীতে ফিরে যেতে হবে। আচমকা নিজেই বললেন, এটা আমার প্রথম উপন্যাস, প্রথম লিখিত গদ্য। তার আগে কোনো উপন্যাস তো দূরের কথা, ছোটগল্পও লিখিনি। প্রকাশকালের বিচারে অষ্টম।

অনেকটা সহজ হয়ে এলেন তিনি, পনেরো বছর আগেকার স্মৃতির জগতে। বললেন, বাল্যকালে আমি ভয়ানক বাউণ্ডুলে প্রকৃতির মানুষ ছিলাম। ঘুরে বেড়াতাম নানা জায়গায়, নানাজনের সঙ্গে। ঘর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সান্ত্বনা দিয়েছিল প্রকৃতি। ইস্কুলের পড়াশোনা শেষ করে পালিয়ে এসেছিলাম কলকাতায়। সাত-আট মাস ছিলাম। থাকতাম মির্জাপুর স্ট্রীটে, বঙ্গীয় মুসলমান সমিতির মেসে। অনেক বছর আগে এখানে নজরুল ছিলেন বেশ কিছুকাল। বাড়ি থেকে ধরে নিয়েছিল আমি মারা গেছি। বেশ একটা বোহেমিয়ান লাইফ, ফ্রাস্ট্রেটেড। কি করবো, না করবো তার কোনো পরিকল্পনা নেই। সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছি না। সুরাবর্দীর কাগজ 'ইত্তেহাদ' বেরোত তখন। সাব-এডিটরের চাকরী নিলাম। কিন্তু শেষের দিকে ও'রা টাকা দিতে পারছিলেন না। কবিতা লিখতাম মাঝে মাঝে। ছাপাও হতো। ও'রা বলতেন, কবিতা লিখে কিছু হবে না। গল্প-উপন্যাস লেখো। 'দেশ' পত্রিকায় কবিতা লিখেছিলাম

একটা। সাগরবাবু বললেন, গল্প লিখতে না পারো, প্রবন্ধও তো লিখতে পারো? লিখলাম, বাউলদের ওপর একটা আলোচনা। দশ টাকা পেলাম তার জন্য। তখন রুটির দাম ছিল সস্তা। সে টাকায় কয়েকদিন চললো।

আমি তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। 'কিংবদন্তীর নায়ক' লেখার প্রস্তুতিকালের কাহিনী এসব। তারিখটা মনে নেই। সেদিন নেহেরু এসেছিলেন কলকাতায়। আমি ময়দানে ছুটলাম বক্তৃতা শোনার জন্য। তার আগে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি ময়দানের সবুজ কাঁচ ঘাসগুলিকে দেখছিলাম। আমার মনটা হু-হু করে উঠলো। সে যে কি অনুভূতি বোঝাতে পারবো না। শরৎকালের প্রকৃতির ডাক আমি শুনতে পেলাম। ময়দানের গাছপালা কি সজীব, সবুজ হয়ে উঠেছিল। আমি ছুটে এলাম মির্জাপুরের মেসে। সুটকেসটাকে পাঁচ টাকায় বিক্রী করে দিলাম। কম্বলটা দিলাম, একজনকে দান করে। অজ্ঞাতবাসের দিন শেষ হলো। দেশে ফিরে গেলাম।

বলার ঝোঁকে ছিলেন সিরাজ সাহেব। আমার দু-একটা প্রশ্ন ছিল, জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। তিনি নিজেই সব বলে যাচ্ছিলেন। অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। বললেন, মা ছিলেন না। আমার ছোট বয়সে মারা গেছেন। সে অভাব পূরণ করতেন মাসি। স্নেহযত্নের অভাব ছিল না। তবু কেমন বাউন্ডুলে হয়ে রইলাম। ভালো বাঁশি বাজাতে পারতাম, নাচতেও পারতাম, যাত্রা-আলকাফের নাচ। কলকাতা থেকে ফেরার পর প্রায় সারাদিনই মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো বসে থাকতাম রাস্তার ধারে, গাছের তলায়। একদিনের ঘটনা। পথের ধারে বসে আছি, দেখলাম, সাইকেলে চড়ে একটা মেয়ে আসছে, বেশ বড় বড় চুল, গায়ে ফ্রক। আমি তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, মেয়েটি কে? —সে তাকে ডাকলো। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, মেয়ে নয়, একটি ছেলে। আলকাফের দলে নাচবার জন্যে তাকে ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের মতো কথাবার্তা, আচার-আচরণে অভ্যস্ত করে তোলা হয়েছে। নতুন মোড় ঘুরল আমার জীবনে। ১৯৪৯ থেকে ৫৬ সাল পর্যন্ত মোটামুটি আলকাফের জগতে ঘুরে বেড়াতাম। গান লিখতাম তখন নাচ শেখাতাম, বাঁশি বাজাতাম। দরকার হলে নিজেও নাচতাম। বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, সাঁওতাল পরগণার দুমকা অঞ্চল ও মালদহ চষে বেরিয়েছি দলের সঙ্গে 'সিরাজ ওস্তাদ' নামে পরিচিত হলাম। সকলেই এক ডাকে চিনতো আমাকে। পেশাদার ওস্তাদ হয়ে গিয়েছিলাম। টাকার বিনিময়ে এদলে-ওদলে গান লিখে দিতাম, নাচ শেখাতাম। অনেকে বলতো, 'সিরাজ মাস্টার'। এখনো আমার নামে ভনিতা দিয়ে গান গায় অনেকে।

বললাম, সেই আবর্ত থেকে আপনি বেরিয়ে এলেন কি করে?

—তখনো কবিতা লিখতাম মাঝে মাঝে। আমার একটা বাঁধানো খাতা ছিল। ভাবতাম, এভাবে আর চলে না। আমাকে লিখতে হবে। কবি হতে হবে। বোধহয়, এ-ধারণাই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। আরেকটি কারণ ছিল, আমাদের পারিবারিক লাইব্রেরী। আমার বাবা সাহিত্যিক ছিলেন, গল্প লিখতেন মাঝে মাঝে। পুরনো দিনের প্রায় সব পত্র-পত্রিকাই আমাদের বাড়ীতে যেতো। আমার বাবার নাম সৈয়দ আবদুল রহমান ফেরদৌসী। মা কবিতা লিখতেন বিচিত্রা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ এবং মুসলিম সম্পাদিত সব কাগজেই। আমার মায়ের নাম মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম। যার জন্য আমি কখনো চাকরী-বাকরীর কথা ভাবিনি। আট-ন বছর বয়সেই প্রথম কবিতা লিখেছিলাম পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময়। অ্যামবিশন ছিল, আমাকে লিখতে হবে।

একটু থেমে বললেন, আলকাফের দল ছেড়ে দিলাম। সেই ছেলেটাকে বললাম, তুই-ও আমার সঙ্গে চল। যোগ দিলাম, যাত্রার দলে। এসময়ে আমি একটি মেয়েকে ভালোবেসে ফেললাম। বর্তমানে আমার স্ত্রী হাসনে-আরা বেগম। সে আমার সবই জানতো। নিজেও ছিল নাচ-গানের প্রতি আসক্তা। বিয়ে করলাম। কিন্তু চাকরী-বাকরী না হলে সংসার চলে না। চাকরী পেলাম কো-অপারেটিভ-এ। স্ত্রী বলতো, তুমি লিখছো না কেন? লেখো। তারই তাগাদায় লেখা শুরু করি।

জিজ্ঞেস করলাম, এ উপন্যাস কি তাঁরই তাগাদায় লিখতে শুরু করেন

—অংশত তারই। তবে সে আরেক ঘটনা। আমার কাজ সকালে তিন ঘণ্টা, বিকেলে তিন ঘণ্টা। তখন শীতকাল। ফেব্রুয়ারী মাস। মাঠ থেকে ধান উঠে গেছে। আমি প্রত্যেকদিন এই ফসলকাটা শূন্য মাঠের উপর দিয়ে, পাকা রাস্তা ধরে সকাল-বিকেল অফিস যেতাম এবং ফিরে আসতাম। সেই মাঠে ফসল কুড়োতে আসত নিম্নবিত্তের মেয়েরা, অধিকাংশই অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দু। তাদের বলা হতো 'মাঠ-কুড়োনী' বা 'মাঠ-কন্যা'। এরা হলো, কুনাই পাড়ার মেয়ে। তখন আমি খুব মদ খেতাম, তাড়ি না হলে গ্রীষ্মকালেও জলতেষ্টা মিটতো না। ফলে, ভদ্রলোকের সমাজে যেমন, অন্ত্যজ সমাজেও তেমনি আমার মেলামেশা ছিল। সেই সময়ে তাদের একটা মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। অন্য গাঁয়ের মেয়ে। সদ্য বিয়ে হয়ে এ গাঁয়ে এসেছে। আমি তার কথা 'কিংবদন্তীর নায়ক'-এ লিখেছি। নাম বদল করিনি। মেয়েটির মায়ের নাম তরঙ্গবালা (সিন্ধাই ডাকিনী)। এদের সঙ্গে আমার এ উপন্যাসের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর।

আমি আমার অজ্ঞাত, রহস্যময় এক রূপকথার জগতের গল্প শুনছিলাম। চুপ করে রইলাম। চা এল আরেক প্রস্থ। মুস্তফা সিরাজ পূর্বকথার খেই ধরে বললেন, একদিন সকাল নটা, অফিস ফিরতি দেখলাম নেত্যকালী সদ্য-শিশিরমুক্ত একটা গাছের নিচে বসে আছে। মাঠ-কন্যার জীবন তার ভালো লাগতো না। দুজন মেয়ে তাকে ধরে টানাটানি করছিল। নেত্যকালীর কণ্ঠ কান্না-ভেজা, আর্দ্র এবং অভিমানের : মা আমাকে 'বেসর্জন' দিয়েছে। হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেল। ভাবলাম, কে ওদের বাঁচিয়ে চলেছে? এই নিসর্গ আশ্রিত মানুষগুলিকে? এরা গাছের তলা থেকে ফল কুড়োয়, ফুল কুড়োয়। মাঠ থেকে কুড়িয়ে আনে ফসলের দানা। মাঠ-ঘাট অরণ্য এদের বাঁচিয়ে রেখেছে। প্রকৃতির প্রতি আমি গভীর আকর্ষণ বোধ করলাম। কতোদিন জেলেদের সঙ্গে কাটিয়েছি নদীর বুকে। রাত্রিতে শুনেছি জলের কল-কল শব্দ। সে এক অদ্ভুত জগৎ। এতদিন যেখানে ছিলাম। যে-প্রকৃতির দিকে তাকাইনি, নেত্যবালার কান্নাভরা আর্তি সেই জগতের দিকে আমার দৃষ্টি ফেরাল। আমি নিজের ভেতরে জেগে উঠলাম। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললাম, চা দাও। আমি লিখবো। আমার একটা বাঁধানো খাতা ছিল। লিখতে শুরু করলাম। 'কিংবদন্তীর নায়ক' আমার সেই উপন্যাস। শুরু করলাম 'জাগাল'-এর কথা দিয়ে। রাত্রি জেগে যে-সব মানুষ ফসল কাটার সময় মাঠ পাহারা দেয়, তাদেরই মুর্শিদাবাদে 'জাগাল' বলা হয়। তিন মাস লাগলো উপন্যাসটি শেষ করতে। চার মাসও হতে পারে। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত। অবশ্য তারপর কাটাছেঁড়া করেছি অনেক। আরো এক বছর গেছে উপন্যাসটির পেছনে। বর্তমান রূপ পেতে সময় লেগেছে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। এরপর ছোট-গল্পের কথা ভাবি। ছোটগল্প লিখেছি উপন্যাস শেষ করে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আপনি কিরূপ বলে মনে করেন?

—গ্রামের বাইরে যে-প্রকৃতি তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দাসের মতো। প্রকৃতি সেখানে সম্রাট। মানুষ তার আশ্রিত। জনপদে প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক জটিল।

আপনি কি নিজেকে জীবনবাদী সাহিত্যিক বলে মনে করেন?

—নিশ্চয়ই। আরেকদিনের একটা গল্প বলি। তখন আমি ফ্রাস্ট্রেটেড অবস্থার দিন কাটাচ্ছিলাম। জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ।

ঠিক করলাম, সুইসাইড করবো। আমাদের গ্রামে একটা গাছ ছিল। বহু লোক তাতে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। সেজন্যে তার নাম হয়েছিল 'গলায় দড়ে'। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। গাছটার নিচে গিয়ে বসলাম। চারদিকে অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য, হাজার হাজার পোকা-মাকড়ের আওয়াজ, পাখির ডাক, কিচির-মিচির, নাম না জানা জন্তু-জানোয়ারের শব্দ। এত অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো, আমার ভেতরে। কেন, আমি আত্মহত্যা করতে এসেছি. কেন? এই অরণ্য প্রকৃতির আশ্রয়ে ও প্রতিকূলতায় যদি এরা বেঁচে থাকতে পারে, তাহলে আমিই বা পারবো না কেন? আমি জীব-জগতের রহস্য জানতে উদগ্রীব হলাম। আত্মহত্যা করা আর হলো না। জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে ফিরে এলাম। আসলে আমি অস্তিত্বে বিশ্বাসী। অজস্র গল্পে আমি এ-ঘটনাটির কথা বলেছি। সম্প্রতি রেডিয়োতে যে গল্পটি পড়লাম ('একটি মানুষের গল্প'), তাতেও আমি তা উল্লেখ করেছি। এটাই আমার লেখার ফিলজফি। এদিক থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো-বা মিস্টিক-ও।

এ উপন্যাসটির ওপর আপনার আশা-ভরসা কতখানি?

আমার নিজেরই প্রবল আপত্তি আছে এর ভাষা সম্পর্কে। কনডেনসানেল। আমার কোনো উপন্যাসে এত চরিত্র নেই। এতে আছে একশোর বেশি চরিত্র। প্রতিটি চাপটারের নাম আলাদা। চার বছরের ঘটনা
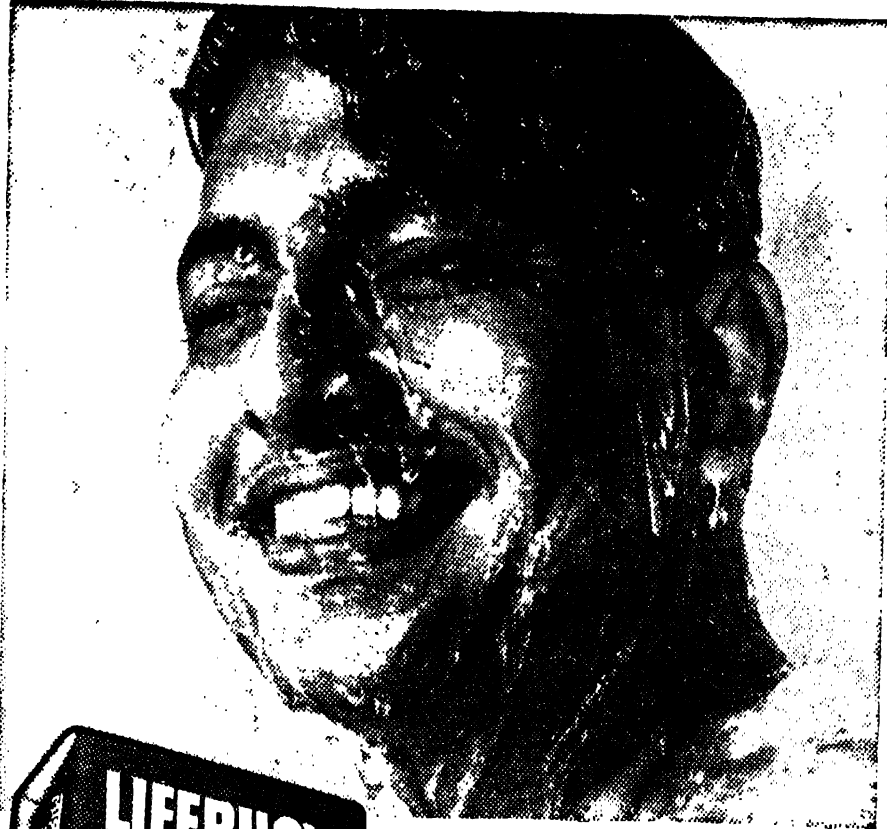
নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী সমাপ্ত। সমসাময়িক গ্রাম জীবনের একটা সার্বিক চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের। জমিদারী প্রথা উঠে যাবার পর ওদের সংশয় ও সংকটের কথাও বলেছি। এ উপন্যাসের অন্যতম নায়ক শরদিন্দুর আধুনিক জীবন-চেতনা, ট্রাকটারে চাষ, ল্যাবরেটরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবই জমিদারী ব্যবস্থায় ও সামন্তবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। লাইসেন্সের খিয়োরী অনুসারে সে উৎপাদন করতে চায়। আদর্শবাদী পুরুষ। কিন্তু সাম্যবাদী নয়। তার বাবা ছিল সুদখোর মহাজন। জনসাধারণের বিরুদ্ধে তার আক্রোশ যতো, ভালোবাসা তার চেয়ে একটুকু কম নয়। তা ছাড়া সবত্রই জায়গা জুড়ে আছে মাঠকথা, জোতদার আর নিম্নশ্রেণীর মানুষের কথা। তারই আমার উৎস ও এবং প্রেরণা।

আপনার লেখায় কি তারাশঙ্করের প্রতিধ্বনি আছে?

তারাশঙ্করকে আমি খুব বড় লেখক বলে মনে করি। তিনি আমাদের জাতীয় সাহিত্যিক। আমার ওপরে তাঁর প্রভাব আছে। তবে তিনি চরিত্র বিশ্লেষণে অনেক সরল। আমি ভেতরে ঢুকতে চেয়েছি। স্মৃতিচারণা আমার মধ্যে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সকলের সেদুর্গেশ অংশ আছে, যাকে আমি ইতিহাস-চেতনা দিয়ে বিচার করতে পারি না, তার প্রথম দিক নির্দেশ পাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। অবশ্য আমার লেখায় তাঁর কোনো প্রভাব নেই। আমি বরং তারাশঙ্করকেই অনুসরণ করছি।

এতদিন উপন্যাসটি শেষ করেননি কেন?

—আমার সংশয় ছিল। আমি যখন উপন্যাসটি লিখি, তখন কলকাতার সাহিত্য-জগৎ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কলকাতায় এসে দেখলাম, সব ওলটপালট। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের লেখা গল্প-উপন্যাস হচ্ছে চারদিকে। পুরোনো প্রথাকে অস্বীকার করে সকলেই নতুন ধরনের লেখা লিখে যাচ্ছেন। এক বছরের মধ্যেই আমি সাহিত্যের এই নতুন জগতে ফিরে এলাম। তখন আমি আমার সেই পুরনো পাণ্ডুলিপির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

কলকাতার সাহিত্য জগতে ফিরে এলেন কবে? কোনো সংকট অনুভব করেছেন কি?

১৯৬৩ থেকে কলকাতার কাগজে ছোট গল্প লিখতে শুরু করি। ১৯৬৬-তে এসে মনে হলো, এতদিন আমি যাকে নতুন রীতি বলে মনে করেছি, তাও এক ধরনের শুচিবাই। আধুনিকতার শুচিবাই। প্রশ্ন হলো, লেখা আধুনিক, না লেখক আধুনিক। তখন লেখার চেয়ে লেখকের মধ্যেই ব্যাপারটা বেশি দেখতে পেলাম। আমার লেখা সেরূপ কিনা, তাই আমার বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠল।

এজন্যেই কি আপনি উপন্যাসটি প্রকাশে সাহসী হয়েছেন?

—তাহলে আমার বর্তমান কথা বলতে হয়। আমি এখন ভীষণ সফিস্টিকেটেড। এ অবস্থা আমার লেখা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আমি ১৯৬৬তে ম্যানাস্ক্রিপট খুলে দেখলাম, পুরনো জগতে আর ফিরে যেতে পারছি না। উপন্যাসটির সংশোধনের কথা ভেবেছিলাম। আমার মনে থেকে গেছে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। একদিন কথাশিল্পের অবনীবাবু বললেন, যদি কিছু লিখেছেন বলে মনে করেন, তাহলে আমাকে দেবেন। আমি ছাপবো। তাঁকেই দিলাম। উনিই প্রকাশ করলেন শেষ পর্যন্ত। আমি আমার পুরনো জগৎ নিয়ে আর কিছু লিখতে পারছি না, অথচ তার প্রতি মোহ আছে। আমার মনে হয়, এমন লেখা আর কোনোদিন আমি লিখতে পারবো না। বাকি জীবন যা লিখতে চেষ্টা করবো, তা এ বইতে যা অপূর্ণ রয়ে গেছে, তাকেই পূর্ণ করার প্রয়াস। এদিক থেকে এ বই আমার জীবনের দিকনির্দেশক।

কোন্ লেখা আপনাকে প্রথম জনপ্রিয় করেছে?

—'তরঙ্গিনীর চোখ' নামে একটা ছোট গল্প। পরে টাইমস অব ইন্ডিয়ার 'সারিকা' পত্রিকায় গল্পটি অনুদিত হয়েছে। দ্বিতীয় গল্প বেরোয় অমৃতে—'সীমান্ত থেকে ফেরা'। তৃতীয় গল্প দেশ পত্রিকায় 'ভালোবাসা ও ডাউন ট্রেন'। এই তিনটি গল্পই আমাকে পাঠক মহলে পরিচিতি এনে দিয়েছে।

জনপ্রিয় কাগজের মধ্যে কোন পত্রিকা আপনাকে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা দিয়েছে?

—অমৃতে আমার প্রথম ধারাবাহিক উপন্যাস বেরোয় 'বন্যা'। ছোটগল্পও কম লিখিনি। ঔপন্যাসিক হিসেবে আমার যা কিছু জনপ্রিয়তা, তার মূলে অমৃতের উৎসাহ। একবার আমি 'অমৃতে' একটা গল্প দিই শারদীয় সংখ্যার জন্য। ভেবেছিলাম, ছাপা হবে। বেরোলে দেখলাম, হয়নি! সেজন্যে আমার খুব অভিমান হয়েছিল। মণীন্দ্রবাবু আমাকে ফোনে অনেক কথা বললেন, উৎসাহ দিলেন। আমার সমস্ত অহংকার ভেসে গেল। তিনি আমাকে দাদার মতো স্নেহ-মমতায় টেনে নিয়েছিলেন। আমি সেদিন চোখের জল রোধ করতে পারিনি। কেঁদে ফেলেছিলাম। একজন অখ্যাত লেখককে খ্যাতির আসনে বসিয়েছে 'অমৃত'ই। 'অমৃতে' আমার লেখা ধারাবাহিক না বেরোলে হয়তো অনেকের নজরেই পড়তাম না। 'কিংবদন্তীর নায়ক' পড়ে শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন, আমি আরেকজন তারাশঙ্করকে এগিয়ে আসতে দেখতে পাচ্ছি।

আপনার প্রিয় গল্প কি কি?

—'মাটিমুটি ইতিপোস ও ঘাটবাবু', 'পলাতক', 'জাতীয় মহাসড়কে' প্রভৃতি। এসব গল্পে আমি সত্যভাষী।

এখন কি লিখছেন?

—অমৃতে লিখছি 'তৃণভূমি' আর ঘরণীতে 'হৃদয়হীনা' নামে দুটো উপন্যাস। ছোটগল্প তো লিখতেই হচ্ছে প্রায় সব সময়ই।

আপনার সেই যাত্রা-আলকাপের বন্ধুরা কি সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের কথা জানে?

—অনেকেই লেখাপড়া জানে না। কদাচিৎ দুচারজন জানতে পারে। তারা এখনো আমাকে মাস্টারমশাই বা ওস্তাদ বলেই জানে। গত বছর সেই আলকাপের ছোকরাটা জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের কথা লিখবেন কবে? সে এখন চুল কেটে ভদ্রলোক হয়েছে। সাইকেল মেরামতীর কাজ করে। বিয়ে করেছিল, বউ থাকেনি। ডিভোর্স হয়ে গেছে। ওর জীবন বড়ো ট্রাজিক। ওদের কথা আমাকে লিখতেই হবে একদিন।

—বিশেষ প্রতিনিধি

প্রিয়পছন্দ শোভন জুতো
সব মেজাজের সকল সাজে
সমান শোভন
দিনের পর দিন পায়ে দিন, এই-যে দেখছেন সুঠাম ছিমছাম জুতোগুলো, এদের জৌলুশ থাকবে অনেকদিন। কাজে বা মজলিশে, সব মেজাজের সকল সাজে, সমান শোভন এইসব বাহারে জুতো। পছন্দসই রঙে-নকশায় নমনীয় উপকরণে তৈরি বাটার এই জুতোগুলো পায়ে সত্যি ভালো লাগবে আপনার—সবাই যেমন তারিফ করবে, তেমনি পায়ে দিয়েও তেমন আরাম। আজই আসুন, দেখতে পাবেন এ-রকম কত-না জুতোর মেলা ব'সে গেছে আপনার প্রিয় বাটার দোকানে।
১৪.৯৫ — ১৮.৯৫
১১.৯৫–১৭.৯৫
১৪.৫০
Bata
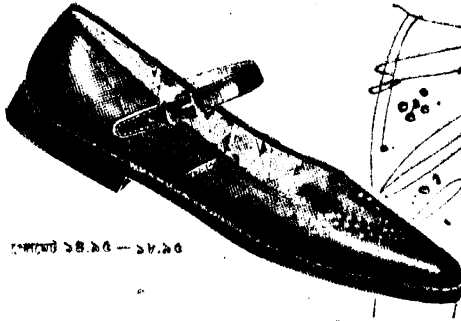
ড্রীম ল্যান্ড

নির্মল সরকার
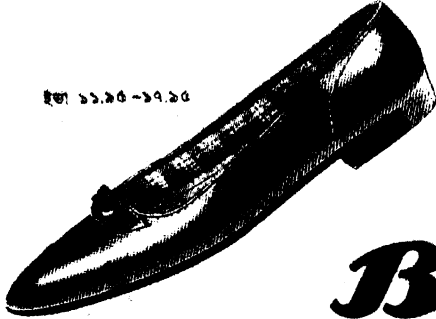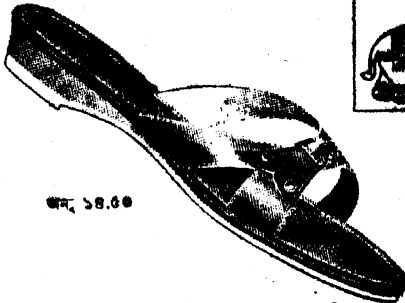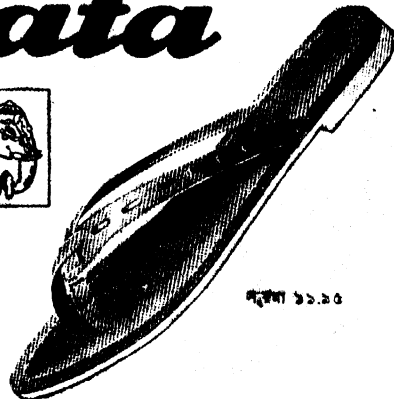
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ মার্কেটে গিয়েছিলাম একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কিনতে। অনেক দাম নিল, প্রায় বারো টাকার মত। সেই সংগে কিছু চিজ বিস্কুটও নিলাম সনৎবাবুর জন্য। কাল কফির সংগে দেব। বেশ মজা লাগছে আমার।

রবিবার—মিসেস পোচকানওয়ালাকে খুব খাতির করছে দীপা। মার্কেট থেকে ফুল, ওয়ালডর্ফ থেকে লাবত—তোয়াজ করছে প্রচুর! এক নম্বরের ধাড়িবাজ মেয়ে-ছেলে। কি করে বাগাতে হয় বেশ জানে।

সনৎবাবুর সংগে অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। ভদ্রলোক আজ পাঞ্জাবি আর পায়-জামা পরে এসেছিলেন। খোঁড়া পাটা যাতে দেখা না যায় তার জন্য পায়জামার ঝুলটা একটু বেশী। সরিতের দিকে আর তাকাই না, সনৎ ত রয়েছে। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটবে।

হঠাৎ বাধা দিলেন মিঃ ঘোষ। কি ব্যাপার হে শেষপর্যন্ত কেতকীও পড়ল নাকি?

কেতকীর উদ্দেশ্য তা নয়। উত্তর দিল সুব্রত চৌধুরী। সরিৎকে সে জব্দ করতে চায় সনতের সংগে ঘনিষ্ঠতা করে। সরিতের উপেক্ষার শোধ নিতে চায়। এটা সরিতের নজরে এলে সে সহ্য করবে না।

কেন? জেলাসি বলছ। ভ্রূকুটি করলেন মিঃ ঘোষ।

বিরক্ত হবার অন্য কারণ আছে। নার-সিংহোমে এ ধরনের ঘটনা ঘটলে বদনাম ছড়িয়ে পড়তে দেরী হয় না। তাছাড়া ছোটভাই, নার্সের সংগে তারই নার-সিংহোমে বসে প্রেম করছে এটাও প্রীতি-পদ নয়। ডায়েরীর মাঝের কয়েকটা পাতা ছেড়ে দিচ্ছি। মেয়েলী ব্যাপার, সুতরাং আমাদের তাতে কোন প্রয়োজন নেই।

ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার—মরফিন, পেথি-ডিন জোগাড় করতে কষ্ট হচ্ছে। আমাদের নারসিংহোমের জন্য যা আসে, তা থেকেও সরাচ্ছি। এমনকি যাদের ইনজেকসন দেবার কথা তাদের ওটা না দিয়ে ডিস্টিলড্ ওয়াটার দিয়ে দি আর সেটা আমি নিজেই নিয়ে নি। রুগীদের যন্ত্রণা আমার চেয়ে অনেক কম—না দিলে বড়জোর ওদের ঘুম হবে না। আমার না নিলে কি হবে ভাবতেও ভয় পাই।

একজন নূতন নার্স এসেছে। আমায় শুধু দিদি দিদি করে, কাজের কিছুই বোঝে না। আমারই ডবল খাটুনি। মরফিন পেথিডিন স্টক থেকে কমে যাচ্ছে বলে ওরা সন্দেহ করছে।

বুধবার—যা ভেবেছি তাই। সনৎবাবুকে ওরা গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে মরফিন পেথিডিনের চোর ধরতে। সনৎবাবু আমাকেই জিজ্ঞাসা করে বসলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাবলুর নামটা করে দিলাম। তাঁরই সামনে যে চোর দাঁড়িয়ে রয়েছে তা তিনি বুঝবেন কি করে। কফি তৈরী করতে করতে নিজের মনেই হাসতে লাগলাম আমি। আজ আর একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সন্ধ্যার সময় দরজা বন্ধ করে ঘরেই ছিলাম। হঠাৎ দেখি কিচেনের জানালা দিয়ে সরিৎ ঘরের মধ্যে এসে হাজির। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি তাকে দেখে। প্রথম থেকেই আমাকে ধমকাতে শুরু করল তার ভাই-এর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য। আমি নাকি তাকে নিয়ে খেলা করছি। আমিও বললাম যে সেও এককালে আমাকে নিয়ে খেলা করেছে। আর এত যদি ভয়, ভাইকে তালাবন্ধ করে ঘরে রেখে দিতে বললাম। বেশ কিছুক্ষণ তর্কবিতর্ক হ'ল। শেষে শাসিয়ে গেল প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে বলে। দেখা যাক ডাঃ সরিৎ মুখার্জির কাছে প্রাণের দাম কত?

বৃহস্পতিবার—আজ মরফিন অ্যাম্পুল নিতে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়ে গিয়েছি। আমাকে বোধহয় সরিৎ প্রথম থেকেই সন্দেহ করছিল। তা না হ'লে এত সকালে সে নারসিংহোমে আসবে কেন? একহাতে আমার সিরিঞ্জ অপর হাতে মরফিন—আমিও ছাড়ব না, সরিৎও ছাড়বে না। কি ভাগ্যিস কেউ দেখে ফেলেনি।

শুক্রবার—আজ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। অপারেশনের সময় পেটে মাথা ধরতে দীণা কি চেয়েছিল, ঠিক শুনতে পেলাম না। যন্ত্রটা নিয়ে সজোরে সে ছুঁড়ে মারল আলমারিতে। কাঁচ ভেঙে ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে। এত রাগ কেন বুঝলাম না। সরিৎ হয়ত মরফিনের ব্যাপারটা বলে থাকবে। কি করবে তোমরা? নিজেরাই জ্বলে মরবে। ভাইএর সঙ্গে একটু মেলামেশা করতেই ছটফট করে উঠেছে। ভ্রাতৃপ্রেম নাকি? হতেও পারে। কিন্তু এখনও বাকী আছে। রবিবার আমাদের নারসিং হোমে ফাংসান হবে। স্বামীস্ত্রী দুজনের মধ্যে বাক্যালাপ নেই। সনৎ বাবুও আসছেন না। বুঝতে পারছি সবই সরিতের কাজ।

আর সহ্য করতে পারছি না। যন্ত্রণাটা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। মরফিন পেথিডিনেও কাজ হচ্ছে না। ডাঃ সেনকে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। কালকে শনিবারে দেখাতে যাব। সনৎবাবুর জন্য সন্ধ্যে অবধি অপেক্ষা করলাম—এল না। ভাবছি কাল ওর অফিসে হানা দেব কিনা। যেরকম করে হোক সরিৎকে জব্দ করতে হ'বে। অস্থির করে তুলব ওকে নানাভাবে। নারসিং হোমের অ্যানিভারসারীর জন্য খুব তোড়জোড় চলছে। দীণা ফরফর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে।

শনিবার—এখন আর কিছু মনে পড়ছে না শুধু নিজেকেই ভাবছি। আজ ঠিক সময়ে ডাঃ সেনের চেম্বারে পৌঁছেছিলাম। লেক রোডের এমন জায়গায় বাড়ী যে বাসে যাওয়ার উপায় নেই। ডাঃ সেন আমায় ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। আমি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম সারাক্ষণ। মুখের ভাব দেখে মনে হ'ল রোগটা সাধারণ নয়। ডাঃ সেন হাত ধুতে গেলে একজামিনেশন টেবিলের ওপর শুয়ে একটা নামই মনে পড়তে লাগল বারবার। আশ্চর্য, আমার মনটা হঠাৎ শান্ত হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষায় বসে প্রশ্নপত্র পেলে প্রথমে প্রবল উত্তেজনা আসে কিন্তু উত্তর লিখতে আরম্ভ করলে মনটা শান্ত হয়ে যায়। আমার অবস্থাও তাই হ'ল। প্রশ্নের উত্তর আমার এইটুকু সময়ের মধ্যেই তৈরী হয়ে গিয়েছে। ডাঃ সেন আমায় হাসপাতালে ভর্তি হ'তে বলছেন। আমি বললুম, উনি সোমবারে খবর পাবেন। ওঁর কাছে গচ্ছিত রাখবার জন্য একটা প্যাকেট দেব। অপারেশন নির্ভুল হবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রণাম করে বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি করলাম। ভারি ভাল লাগল সন্ধ্যেটা। ব্যথাটা কেন আর অনুভব করতে পারছি না, বুঝলাম না। কিন্তু মরফিন সকাল থেকে একটাও নিইনি। লেক রোড থেকে সোজা মার্কেটে গিয়ে দীণার মত একটা শাড়ী কিনলাম। লাইট গ্রীন রঙের শাড়ীটা। এর সঙ্গে ম্যাচকরা ব্লাউজ আর কিছু টয়লেটও কিনলাম। কাল আমি সাজব। এমন সাজব যে কেউ দীণার দিকে তাকাবে না। কাল ফাংসানে কি কি করব সব ভেবে রেখেছি। একটুও ভুল যেন না হয়, তাহ'লেই বিপদ। নিখুঁতভাবে সব করতে হবে মাথা ঠাণ্ডা করে।

রবিবার—আজ নারসিং হোমের ফাংসান হোল। আমি সারাদিন নিজের পরিচর্যা করেছি। মাথায় শ্যাম্পু দেওয়া থেকে শুরু করে নখে নেলপালিশ পর্যন্ত। মেয়েরা বিয়ের দিন বোধহয় বিকাল থেকে এইভাবেই তৈরী হয় দেহ আর মনের দিক থেকে। আমার জীবনের বিয়ের চেয়ে আজকের দিনের মূল্য অনেক বেশী কারণ, বিয়ের ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত, আমার বেলায় কিন্তু সেকথা খাটবে না। হলটা মনোরমভাবে সাজান হয়েছে। আমার সাজ শেষ হবার আগে অর্কেস্ট্রার বাজনা শুনতে পেলাম। পর পর দুটো পরিচিত সুর বাজাল ওরা।

হলের মধ্যে ঢুকতেই সকলের সন্ধানী দৃষ্টি আমার দিকে পড়ল। আমি দীণার মুখটা লক্ষ্য করলাম। ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ডাঃ দীণা মুখার্জি। অনেকেই চিনতে পারল না আমাকে। এই সজ্জা একটা সামান্য নার্স পেল কোথায়? কোথায় শিখল এই সূক্ষ্ম রুচিবোধ! যেচে আলাপ করলেন অনেকে। প্রথম পর্যায়ে জয়ী হ'লাম আমি। ডাঃ সেন আমায় দেখতে পেয়ে আমায় টেনে নিয়ে গেলেন সামনের সারিতে। তাতেও দীণা স্তব্ধ হ'ল বুঝলাম। এটা আমার উপরি পাওনা।

সুপর্ণা নামে একটা মেয়ের নাম ঘোষণা করল দীণা, গান গাইবার জন্য। এবার আমার দ্বিতীয় চাল দেবার সময় এসেছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা হ'ল না আমার। দীণাকে বললাম, আমি গান গাইব। ডাঃ সেন মাথা নেড়ে সায় দিলেন আমার কথায়। মেয়েটির গান শেষ হ'তে দীণা আমার নাম অ্যানাউন্স করল। তবে আমি যে একজন সামান্য নার্স একথাটা আমার নামের আগে জুড়ে দিতে ভুলল না। ও জানে না যে আমি ওদের চেয়ে অনেক উপরে দাঁড়িয়ে আছি। আমি এখন স্বাধীন। একেবারে নোঙরছেঁড়া নৌকা। আমায় আটকায় কে? পরপর দুটো গান গাইলাম। শেষে ধরলাম কবীরের ভজন। এইখানে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম, তন্ময় হয়ে ডুবে গেলাম সুরের মূর্ছনায়। গান শেষ হ'তে ডাঃ সেন আমায় জড়িয়ে ধরলেন—তাঁর চোখে জল। দীণার মুখের অবস্থা বর্ণনাতীত। সরিতের চোখের ভাষা অর্থহীন আর সনৎবাবু বসে রইলেন নির্লিপ্ত হয়ে। আমার দ্বিতীয় জয়, তৃতীয় এবং শেষ জয়ের সূচনা করল। নিয়মে আমার শ্রদ্ধা আছে। খুঁটিনাটিগুলোর ওপর তাই নজর রয়েছে আমার।

ডাঃ সেনকে প্যাকেট দিয়ে ফিরে এলাম হলে। তারপর ফাংসান শেষ হ'তে ঘরে এসে সনৎবাবুর জন্য অপেক্ষা করে রইলাম। তাঁকে যে কেন ডেকেছি তার কারণটা তিনি বুঝতেই পারবেন না। ঘরের অগোছালো অবস্থা দেখে তিনি অবাক হলেন। তাঁকে এককাপ কফি খাইয়ে বিদায় দিলাম একটু পরে। আমার ব্যবহারে তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়লেন যেন। এবারে জিনিসগুলো সাজিয়ে ফেললাম এক এক করে।

—সুব্রত চৌধুরী চুপ করল। মিঃ ঘোষ তাকালেন তার দিকে, বললেন,—তাহ'লে এর পরে কি করবে? ডাঃ সেনের কাছে যেতে হবে একবার—অন্যমনস্কভাবে বলল সুব্রত চৌধুরী।

ড্রীমল্যান্ড নার্সিংহোমে একজন নতুন নার্স এসেছে। সবিতার বয়স কম। রঙটা ময়লা কিন্তু স্মার্ট। কাজ ভাল করে। অপারেশন শেষ হবার পর দীপার অ্যাপ্রণটা খুলে নিল সে। তারপর তাড়াতাড়ি দু কাপ কফি ঢেলে দিলে সবিৎ আর দীপাকে।

কফির পর দীপা বেডগুলো দেখতে চলল।

মিসেস সেন, কেমন আছেন? জিজ্ঞাসা করল দীপা।

ভালই, কিন্তু—থেমে গেলেন মিসেস সেন।

কি হয়েছে? মিসেস সেনের মাথায় হাতটা রাখল দীপা।

এমন কিছু নয় চোখে ঐ আলোটা লাগে।

তাই নাকি। বলতে হয়।—আলোটায় একটা শেড্ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হ'ল।

লিপিকা, তুমি কেমন আছ? আর ভয় নেইত।

না, কবে ছাড়বেন? সলজ্জ মুখে তাকাল লিপিকা।......

তুমি যেদিন যেতে চাইবে—কাল, পরশু, কেমন। (আগামীবারে সমাপ্য)

মানুষগড়ার ইতিকথা

উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিম যেদিক থেকেই আসুন, আপার চিৎপুর রোড আর বি কে পাল অ্যাভিনিউর ক্রশিংয়ে পুরোনো চারতলা বাড়িটা চোখে পড়বেই। একতলায় বাড়িটার তিন দিকেই সারি সারি দোকান। এই দোকান-রহস্য ভেদ করে, কোলাপশিবেল গেট পেরিয়ে যে কোনদিন দুপুরে বাড়িটার ভেতরে একবার ঢুকে পড়ুন—সামনে ছোট একফালি সান-বাঁধানো উঠোন। উঠোন পেরুলে সরু এক মানুষ ওঠার মত সিঁড়ি পাবেন। এই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠুন। সব তলাতেই একই প্যাটার্ণ। থার্ড ব্র্যাকেট-এর মত ঘোরানো প্যাসেজের গায়ে গায়ে ছোট ছোট ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, আয়তক্ষেত্র, রম্বস। দেয়াল টু দেয়াল কালো কালো মাথা, সংখ্যার পুনোক্তিতে খুব কম করেও বারোশ হবে। একটু কান পাতুন, ঘরে ঘরে চোখ মেলে দিন দেখবেন ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য মুহূর্তে মুহূর্তে রঙীন ছবির মত মনের পর্দায় দুত অথচ স্পষ্ট দাগ ফেলে ফেলে ছুটে চলেছে। কোথাও কোন হেঁয়ালি নেই; সব রহস্যই এখানে পরিষ্কার হয়ে যায়, সব প্রশ্নের মেলে উত্তর। কারণ এটি একটি স্কুল।

কি বলছেন? এটা যে স্কুল তা না বললেও চলত। কারণ ঢুকবার আগেই আপনি বাড়িটার গায়ে সাঁটা পুরোনো সাইনবোর্ডটা পড়ে ফেলেছেন, কালো ক্যানভাসের গায়ে গোটা গোটা সাদা অক্ষরে যেখানে লেখা রয়েছে—সারদাচরণ এরিয়ান ইনসটিটিউট, স্থাপিত ১৮৮৮। আর স্কুলের নামটা দেখে নিশ্চয়ই আপনার সেই মানুষের মত মানুষটির কথা, যিনি নিজেই ছিলেন একটি ইনসটিটিউশন, মনে পড়ে গেছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সারদাচরণের কথাই বলছি। সেই যে তেরো বছরে বাপ, মা, দাদা সব হারানো হুগলী জেলার পানি শেহলা গাঁয়ের অতিদুঃস্থ ছেলেটি, যে কলকাতার কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ত। তখনো সরকারীভাবে হেয়ার স্কুলের ঐ নামই ছিল। হেডমাস্টার প্যারীচরণ সরকার ছেলেটিকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। গত শতাব্দীর অন্যতম সেরা বাঙালী শিক্ষকের ভালোবাসা যে যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হয়েছিল, তার ইতিহাস তো ইউনিভার্সিটির গেজেটের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার ন বছর আগে জন্মে নবম এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল এই ছেলেটিই। শুধু কি এনট্রান্সে? না, এফ-এ, বি-এ, পরপর ফার্স্ট হয়ে গেছেন। শুধু এম-এতে থার্ড। বাইশ বছরেই প্রেমচদ রায়চাঁদ স্কলার। তারপর? তারপর প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক হিসাবে শুরু হোল চাকরী জীবন। বছর কয়েক মাত্র। অধ্যাপনা ছেড়ে ল পাশ করে, শুরু করলেন ওকালতি। এর মধ্যে বিয়ে করেছেন। ছেলেপুলে হয়েছে। ছাব্বিশেই দু ছেলের বাপ।

তখনো সারদাচরণ জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র হন নি, হাইকোর্টের একজন জুনিয়র উকিল মাত্র। বয়স মোটে ত্রিশ। ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্র, হাইকোর্টের রাইজিং প্লীডার মনে মনে প্ল্যান আঁটলেন—একটা স্কুল খুলতে হবে। যে স্কুল কেরাণী তৈরী করবে না, বরং হাজার হাজার বছর আগে ফেলে-আসা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের হাতে-গড়া আধুনিক ভারতের মাঝে সেতু হিসাবে কাজ করবে। ছাত্ররা আধুনিক শিক্ষার ক্রমবর্ধমান ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েও নিজের অতীত ইতিহাস কখনো বিস্মৃত হবে না। আধুনিক ভারত যেন কোনদিনই না ভোলে তার প্রাচীন ঐতিহ্য, যেন বিস্মৃত না হয় যে সে প্রাচীন আর্য জাতিরই বংশধর।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই স্কুল খুললেন সারদাচরণ। নাম রাখলেন ক্যালকাটা এরিয়ান ইনসটিটিউশন। ১০২ নম্বর শোভা-বাজার স্ট্রীটে (পরে রাজা জানকীনাথ রায়ের বাড়ি) ভাড়া বাড়িতে স্কুল শুরু হোল। স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দের সহপাঠী ভোলানাথ বোস।

ঠিক কত ছাত্র নিয়ে স্কুল শুরু হয়েছিল তা জানা না গেলেও গত শতাব্দীর পুরোনো নথিপত্র থেকে এটুকু জানা যায় যে, ১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯৭ সালের মধ্যে বারোশ ছাত্র এই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অর্থাৎ বছরে গড়ে একশো কুড়িটি করে ছাত্র স্কুলে ভর্তি হত। ছিয়ানব্বই সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় একশো তিপ্পান্নয়। চার বছর পরে নতুন শতাব্দীর সূচনা বর্ষে স্কুলে নতুন ভর্তির সংখ্যা দাঁড়াল একশো বিরাশী।

সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্‌টিটিউশন

প্ল্যান মাফিক ছাত্রদের গড়ে তুলবেন বলে গোড়া থেকেই কিছু ছাত্র নিয়ে শুরু করেছিলেন বোর্ডিং। সরাসরি শিক্ষকের সংস্পর্শে থেকে ছাত্ররা যাতে গড়ে উঠতে পারে তাই এই ব্যবস্থা। বাঙলা দেশে মিশনারীদের কিছু স্কুল বাদ দিলে, প্রাইভেট ম্যানেজমেন্টে প্রথম রেসিডেনসিয়াল স্কুল এই এরিয়ান ইনসটিটিউশন। স্কুলের নামটি ইংরেজী হলেও নীচের ক্লাসগুলিতে পড়ানো হোত বাঙলার মাধ্যমে। ক্লাস থ্রি থেকে শুরু হোত ইংরেজী পড়ানো। সেই সর্বইংরেজীময় যুগে কলকাতার এটিই বোধ-হয় একমাত্র হাইস্কুল ছিল যেখানে ইংরেজীর থেকে মাতৃভাষাই বরাবর প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। ব্যাপারটা সে যুগের পক্ষে রীতিমত অভাবনীয়।

সারদাচরণ নিজেও পড়াতেন। কর্মব্যস্ত জীবনে কখনো কোন ফাঁক পেলেই ছুটে আসতেন স্কুলে। পড়াবেন বলেই নিজে খান-কয়েক টেকসট বইও লিখেছিলেন। লিখেই ক্ষান্ত হন নি। নিয়মিত খোঁজ-খবর নিতেন প্রতিটি ছেলের। কার কি প্রয়োজন, সেদিকে ছিল তাঁর খরদৃষ্টি। কারণ স্কুলকে তিনি ভালবাসতেন। এই ভালবাসায় যে কোন ফাঁক ছিল না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নিজের ছেলে শরৎকুমারকে এরিয়ানেই ভর্তি করেছিলেন। ইচ্ছা করলেই সে যুগের সেরা দুটি স্কুল হিন্দু বা হেয়ারে তিনি ছেলেকে পড়াতে পারতেন। কিন্তু সেটা তো ভাবের ঘরে চুরির সামিল। স্কুল যার জীবনের স্পন্দন সে কেমন করে নিজেকে ফাঁকি দেবে? ফাঁকি শব্দটির সঙ্গে যে তাঁর কোনদিনই পরিচয় হয়নি।

ফাঁকি দূরে থাক, স্কুলের আয়-ব্যয়ের ফাঁক পূরণেই তাঁর লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। একটা হাইস্কুলের ব্যয় তো নেহাৎ কম নয়। নটা ক্লাসে বছর বছর শয়ে-শয়ে ছেলে পড়ছে। তার জন্য বাছাই-করা শিক্ষক-দের নিযুক্ত করেছিলেন সারদাচরণ। একদিক থেকে খুবই লাকি ছিলেন তিনি। নইলে কটি স্কুলের ভাগ্যে ইংরাজীতে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, অঙ্কে দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বা সংস্কৃতে রজনী কাব্য-তীর্থের মত শিক্ষক জোটে। সবার উপরে ছিলেন ভোলানাথ বসু, হেডমাস্টার। এই সব বাঘা-বাঘা শিক্ষককে খুঁজে-পেতে এনেছিলেন সারদাচরণ। ছাত্র বেতন যা সামান্য আদায় হোত, তাতে স্কুলের এক মাসের খরচও পোষাত না। বোর্ডিংয়ের অবস্থাও তথৈবচ। সমস্ত খরচ-খরচা আড়াল থেকে নীরবে বহন করেছেন তিনি।

তেত্রিশটি বছর এই স্কুল ছিল তাঁর স্বপ্ন, তাঁর বিশ্বাসের বনিয়াদ। ছত্রিশ বছরের জুনিয়র উকিল শেষ যৌবনে একদিন জজ সাহেবের রোব পড়ে এজলাসে এসে বসে-ছেন। জজিয়তির দায়িত্বপূর্ণ কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝেও সময় পেলেই ছুটে গেছেন তাঁর যৌবনের উপবনে, যেখানে চিরতারুণ্য বিরাজমান, বার্ধক্যের প্রবেশ নিষেধ। ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠাতা নিজেই টের পান নি কখন প্রৌঢ়ত্বের চৌকাঠ মাড়িয়ে বার্ধক্যের দিকে পা বাড়িয়েছেন, কিন্তু স্কুল যে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের পথে ছুটে চলেছে এ বিষয়ে তাঁর হুঁশ ছিল। তাই আঠারোয় পা দিতে না দিতেই ম্যানেজিং কমিটির ওপর তুলে দিলেন স্কুলের দায়িত্ব, ১৯০২ সাল। ম্যানেজিং কমিটির প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং, সেক্রেটারী এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র শরৎকুমার মিত্র।

ইতিমধ্যে বার-কয়েক ঠিকানা বদলেছে স্কুলের। শোভাবাজার ছেড়ে মাঝে কিছু-দিন হরি ঘোষ স্ট্রীটে উঠে গিয়েছিল স্কুল। কারণ স্থানাভাব। ছাত্র বাড়ছে। পুরোনো বাড়িতে জায়গা হয় না। জায়গা হরি ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতেও হয় না। তাছাড়া অনেকটা দূরে। বয়স হয়েছে সারদা-চরণের। গ্রে স্ট্রীট থেকে অত দূর গিয়ে স্কুলের খবরা-খবর নেওয়ার বড় অসুবিধে হচ্ছিল। তাই হরি ঘোষ স্ট্রীটের পাট চুকিয়ে স্কুল চলে এল ১৯৭বি গ্রে স্ট্রীট (বসুমতীর পুরোনো অফিস)। এ বাড়িতেও কয়েকটা বছর কেটেছে স্কুলের। কিন্তু জায়গা সমস্যার কোন সমাধান হল না। তাই শেষ পর্যন্ত গ্রে স্ট্রীটের আস্তানা গুটিয়ে পুরোনো পাড়ায় আবার ফিরে এল স্কুল।

৮৭ নম্বর শোভাবাজার স্ট্রীটে ইস্টবেঙ্গল রিভার স্টীম নেভিগেশনের বহুপরিচিত জাহাজ বাড়ি হল স্কুলের ঠিকানা।

ততদিনে স্কুল রীতিমত সুপ্রতিষ্ঠিত। শহর কলকাতার নামী স্কুলগুলির তালিকায় প্রথম দিকেই স্থান করে নিয়েছে এরিয়ান ইনসটিটিউশন। গাছের পরিচয় যেমন ফলে, স্কুলের পরিচয় তেমনি ছাত্রে। শরৎকুমার মিত্র, শিশিরকুমার দত্তের মত স্বনামখ্যাত ছাত্ররা গত শতাব্দীতে এই স্কুলে পড়েছেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকে যে সব নামী ছাত্র এই স্কুলে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে এ কটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—প্রখ্যাত শিক্ষক হরিদাস বোস, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, রাজনৈতিক নেতা হেমন্ত বোস (হরিদাস বোসের ছোট ভাই), বিখ্যাত ফুটবলার গোষ্ঠ পাল প্রমুখ। ফি বছর স্কলারশিপ বাঁধা ছিল স্কুলের কপালে। আর বাঁধা ছিল বলেই আহিরীটোলা, বেনিয়াটোলা, শোভাবাজার, কুমারটুলী, বাগবাজার, দর্জিপাড়া ঝেঁটিয়ে ছেলেরা পড়তে আসত এই স্কুলে। সামান্য কয়েকটি ছাত্র নিয়ে যে স্কুল গত শতাব্দীর শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠার তেত্রিশ বছরের মধ্যেই তা হয়ে উঠল গোটা শহরের বিশেষ করে উত্তরের অন্যতম সেরা স্কুল।

স্কুলের সুনাম হয়েছে, প্রতিষ্ঠা হয়েছে—সবই দেখে গেছেন সারদাচরণ। তাঁর স্বপ্নের বাস্তব রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করে গেছেন। ১৯১৭ সালে উনসত্তর বছর বয়সে মারা যান সারদাচরণ। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল বাদেই স্কুলের নাম ঈষৎ পাল্টে রাখা হল সারদাচরণ এরিয়ান ইনসটিটিউশন।

সারদাচরণের মৃত্যুর পর স্কুলের প্রেসিডেন্ট হলেন অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। পরবর্তী বছর পঁচিশ কখনো মন্মথমোহন কখনো বা সারদাচরণের বড় ছেলে বসন্ত-কুমার অদল-বদল করে স্কুলের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। মেজ ছেলে শরৎকুমার সেই ১৯০২ সাল থেকে এই সেদিন (১৯৬৬) পর্যন্ত আমৃত্যু চৌষট্টি বছর সম্পাদক হিসাবে স্কুলের সেবা করে গেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে স্কুলের ইতিহাসে ঘটে গেছে বিপুল পরিবর্তন।

গোড়াতেই বলা যাক স্কুলের ঠিকানা বদলের বাকি ইতিহাস। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে শোভাবাজার স্ট্রীটের জাহাজ বাড়িতে স্কুল উঠে এসেছিল। বেশ কয়েক বছর এ বাড়িতে কাটানোর পর ১৯২৫-২৬ সাল নাগাদ স্কুল ঐ বাড়ি ছেড়ে ৬৯ নম্বর বেনিয়াটোলা স্ট্রীটে উঠে আসে। এই ঠিকানা বদলের মুখে মুখেই দীর্ঘ চল্লিশ বছরের একটানা পরিশ্রমের পর রিটায়ার করলেন ভোলানাথ বাবু। তাঁর যায়গায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারী থেকে এলেন মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য। মোহিনীবাবু বেশী দিন এ স্কুলে থাকেন নি। মাত্র দেড়টি বছর ছিলেন। শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি

ওকালতি ব্যবসায় নামলেন। তাঁর জায়গায় স্কুলের হেডমাস্টার হলেন যোগেশচন্দ্র দত্ত।

ঘন ঘন হেড অব দি ইনস্টিটিউশন পোস্টে পরিবর্তনের ফলে যে আদৌ ভাল হয় নি তার প্রমাণ মিলবে স্কুলের রেজাল্ট রেকর্ডে। ১৯২২ থেকে ২৫ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর শতকরা পঁচাত্তরটি ছেলে পাশ করেছে ম্যাট্রিকে। কিন্তু ছাব্বিশ ও সাতাশ সালে ঐ গড় নেমে এসে দাঁড়ায় পঞ্চাশে। তবে পরিবর্তনটুকু নেহাতই সাময়িক। কয়েক বছরের মধ্যেই স্কুল আবার সব সামলে নিয়ে পুরোনো সুনাম ফিরে পেল। যোগেশবাবু এগারো বছর এ স্কুলে হেডমাস্টারী করেছেন। এই এগারোটি বছর স্কুলের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম এক অধ্যায়। তাঁর সময়েই প্রথম স্কুলের ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। বছরে চারবার বেরুতো। সে সময়ে প্রধানত শিক্ষকদের আগ্রহই ছিল বেশী। কারণ ছাত্রদের কাছে ম্যাগাজিন বস্তুটি নতুন হলেও শুরুতেই খুব একটা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নি। এ ব্যাপারে ফি বারই সম্পাদকীয় স্তম্ভে সম্পাদকদের হা-হুতাশ নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছিল। স্কুলের স্কাউট দল তখন রীতিমত গড়ে উঠেছে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলো, শরীরচর্চা সবই চলেছে জোর কদমে। সাঁইত্রিশ সালে যোগেশবাবু রিটায়ার করেন। তাঁর শূন্য আসনে এসে বসলেন এ স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষক হরিদাস বোস।

হরিদাস বোস সাঁইত্রিশ সাল থেকে ছাপ্পান্ন সাল পর্যন্ত এ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। মোটমাট একচল্লিশ বছর তিনি এ স্কুলে পড়িয়েছেন। ছাপ্পান্ন সালে রিটায়ার করার পরেও, রেকটর হিসাবে আজো তিনি স্কুলের সংগে জড়িত আছেন। হরিদাসবাবু ও যোগেশবাবুর হাতে গড়া কৃতী ছাত্রদের মধ্যে আজ যারা সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের মধ্যে ডঃ মদনমোহন গোস্বামী, ডঃ মনোমোহন রায় ও ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সময়েরই আর একটি ছাত্রের নাম অনন্তের ক্রিকেটরসিকদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত—পংকজ রায়।

সাঁইত্রিশে হরিদাসবাবু হেডমাস্টার হলেন। আটত্রিশের সামার ভেকেশনের সময়ে স্কুল একযুগের পুরোনো ভাড়া বাড়ি ছেড়ে উঠে এল বর্তমান ঠিকানায়। ঠিক এই বছরই মেদিনীপুর থেকে আই-এস-সি পাশ ডি এম ট্রেণ্ড ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক এলেন এই স্কুলে ক্লাস ওয়ানের টিচার হয়ে। মাইনে পনেরো টাকা। সেই মানুষটিই হরিদাসবাবুর রিটায়ারমেন্টের পর হয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলে পড়ানোর অবসরে সময় ও সুবিধামত একটি একটি করে পরীক্ষার বেড়া অতিক্রম করেছেন। অবিচল ধৈর্য ও নিষ্ঠার এক জ্বলন্ত উদাহরণ এই মানুষটি—লক্ষ্মীনারায়ণ মিশ্র, হেডমাস্টার, সারদাচরণ এরিয়ান ইনস-টিটিউশন।

আপনি তো গোটা স্কুল বাড়িটা ঘুরে দেখলেন। নিশ্চয়ই হেডমাস্টার মশায়ের সংগে একবার দেখা করবেন। দোতলার পশ্চিম কোণের ঘরটিতে বসেন লক্ষ্মীবাবু। জায়গা নেই, তাই অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার প্রণববাবুও বসেন একই ঘরে। এ ত তবু ভাল। দশ বাই দশ ফুট ঘরে দুজন বসেন। একবার টিচার্স রুমটা দেখুন। দোতালারই পুবে কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরীর পাশেই ছোট্ট ঐ ঘরটা। দেড় মানুষ বাই এক মানুষ একফালি ঘরে চল্লিশজন শিক্ষককে বসতে হয়। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ তো হেডমাস্টার মশাইকে জিজ্ঞাসা করুন। ওঁর মুখেই তো শুনেছি অধিকাংশ মাস্টারমশাই তাঁদের সামান্য অবসরের সময়টুকুও বসবার জায়গার অভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা পায়চারী করে কাটিয়ে দেন।

থাক এসব কথা। সমস্যার তো কোন শেষ নেই। ফিরিস্তি দিতে বসলে জায়গায় কুলোবে না। তারচেয়ে বরং জরুরী একটা ব্যাপার জেনে নেওয়া যাক। এরিয়ান তো আবাসিক স্কুল ছিল, এর বোর্ডিংটা কোথায়? নেই। কারণ বত্রিশ সালে নন-কোঅপারেশন মুভমেন্টে স্কুলের ছেলেদের ঘন ঘন অংশ গ্রহণ করায় বিরক্ত হয়ে সরকার বোর্ডিং উঠিয়ে দিতে বলেন। সেই থেকে বোর্ডিং উঠে গেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে সারদাচরণের স্বপ্ন-ঈগলের দূর আকাশে ডানা মেলে ওড়বার দুরন্ত সাধ।

সে সাধ আর কোনদিনও পূরণ হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য থেকে সময়ের স্রোতে স্কুল অনেক দূরে আজ সরে এসেছে। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে এরিয়ান ইনস্টিটিউট এদেশের আর পাঁচটা স্কুলের মতই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে আজ অনুসরণ করে চলেছে। কোথাও আজ আর কোন পার্থক্য নেই।

পার্থক্য নেই বলেই অন্যান্য আর পাঁচটা স্কুলের মত এখানেও আজ হায়ার সেকেণ্ডারী ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ঊনষাট সালে সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ এবং একষট্টিতে কমার্স স্ট্রীম খোলা হল স্কুলে। কমার্স ও বিজ্ঞানের জন্য স্কুল সরকারের কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সাহায্য পেয়েছে। এই টাকায় গড়ে উঠেছে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজির ল্যাবরেটরী। কিন্তু জায়গার অভাবে বিল্ডিং গ্রান্টের প্রথম কিস্তির প্রায় বারো হাজার টাকা আজ আট বছরের কাছাকাছি সময় ধরে পড়ে আছে। কথাটা ঠিক হল না। জায়গা স্কুলের আছে। তবে তা না থাকারই সামিল। গ্রে স্ট্রীটের ওপর চল্লিশ কাঠা জায়গা স্কুল কিনেছিল বাষট্টি সালে দেড় লাখ টাকায়। ইচ্ছা ছিল বাড়ি বানিয়ে ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নিজের ভিটেয় উঠে যাবে স্কুল। ভিত্তিপ্রস্তর পর্যন্ত স্থাপনা হয়ে গেছে। কিন্তু আজো জমির দখল পায়নি স্কুল। পাবে কি করে? পুরোটাই একটা বস্তি। বস্তিবাসীরা উঠতে রাজী নন। যে কয়েক ঘর উঠে গেছেন তাদেরই ক্ষতিপূরণ বাবদ স্কুলের প্রায় পৌনে এক লক্ষ টাকা সেলামী গুনতে হয়েছে। আর যারা আছেন তারা উঠতে চান না। নিরুপায় হয়ে স্কুল তাই এবার সরকারের শরণাপন্ন হয়েছে— দয়া করে ঐ জমিটুকু সরকার অ্যাকুয়ার করে দিন। বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ চায় না স্কুল। তাঁদের জন্য বিনা ক্ষতিপূরণে পাঁচ কাঠা ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত। গত মে মাসে সরকারের ঘরে স্কুল তার আর্জি পেশ করেছে। এদিকে পুজো এসে গেল, কিন্তু সরকারী জবাব আজো আসে নি। আর আসে নি বলেই সেকেণ্ডারীর বারোশ ও প্রাইমারীর চারশো ছাত্র ঐ ভাঙা বাড়ির খোপে কোনরকমে মাথা গুঁজে জীবন গড়ার প্রাথমিক পাঠ নিয়ে চলেছে।

একদিকে জায়গার অভাব, অন্যদিকে অর্থের নিদারুণ টানাটানি। পঁচাশী বছর এক পয়সাও সাহায্য নেয় নি সরকারের কাছ থেকে এই স্কুল। কিন্তু আর চলছে না। গত বছর স্কুলের ব্যয় আয় ছাপিয়ে গেছে। নিরুপায় হয়ে স্কুল এবার আবেদন করেছে সরকারের কাছে—অর্থ সাহায্য চাই। এতদিনে অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যটুকুও যেতে বসেছে। কিন্তু উপায় কি?

এত সমস্যার মধ্যেও কিন্তু স্কুল তার রেজাল্টের মান বজায় রেখে চলেছে। তিনটি স্ট্রীম মিলিয়ে পাশের হার শতকরা আশীর ওপর। বিশেষ করে সায়েন্সের রেজাল্ট খুবই ভাল। পড়াশোনার সঙ্গে সমান তালে খেলার মানও বজায় রেখে চলেছে স্কুল। নিজের মাঠ নেই, কুমারটুলী পার্কে ভাগাভাগি করে খেলে। অদূরে গঙ্গায় এদের ছেলেরা সারা বছরই ঝাঁপাঝাঁপি করছে। গত কয়েক বছরে যে সব কৃতী খেলোয়াড় ছাত্র এ স্কুল থেকে বেরিয়েছে তাঁদের মধ্যে সাঁতারে বেণীমাধব তালুকদার, ফুটবলে দিলীপ পালের নাম সবারই জানা আছে। হেডমাস্টারমশায়ের ঘরের কোণে ছোট একটা আলমারীর মাথায় ঢাউস ঢাউস শীল্ড কাপ থরে থরে সাজানো। বলার দরকার নেই, তবু একবার চোখ বোলালেই পুরো ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অথচ কি ভীষণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এরা পুরস্কার ছিনিয়ে আনে, ভাবলেও অবাক লাগে।

অবাক হওয়ার কিন্তু কিছু নেই। এটাই বৈশিষ্ট্য এই স্কুলের। পঁচাশী বছর ধরে এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে স্কুল। গোটা দেশ যখন ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঢলে পড়েছিল, তখনও এই স্কুল অতীত ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয় নি। বরং চেয়েছিল অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানের রেখাচিত্র ফুটিয়ে তুলতে। হয়তো প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য থেকে স্কুল আজ অনেকটা পথ সরে এসেছে, তবু শহর কলকাতার উত্তরাংশের বাসিন্দারা নিশ্চয়ই একবাক্যে স্বীকার করবেন এ স্কুলের কাছে তাঁদের ঋণ। কত হাজার হাজার ঘরের কোণে জ্ঞানের প্রথম প্রদীপ জ্বেলেছে এই স্কুল, কত গৃহকোণে আশা ও বিশ্বাসের বাণী বহন করে নিয়ে গেছে, তার কোন লিখিত দলিল নেই সত্য, তবু বলা ভুল হবে না যে, এই শহর যে কটা স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তারই একটা এই সারদাচরণ ইনস্টিটিউশন।

—অনিরুদ্ধ

পরের সংখ্যায়ঃ সেন্ট জন্স ডায়োসেসান গার্লস হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের পানে চোখ পাকো চেয়ে বললে—'দাদা মারা গেছেন, তা তোরা আমায় কোন খবর দিসনি তো?'

আজ্ঞে, খবর পেয়েছেল বৈকি। অমন জাঁদরেল একটা খবর পেতে কি আর দেরী হয়? তবে, মোসায়েবরা রয়েছে কি করতে? তবু খানিকটে মানানসই করে বলা, ধনঞ্জয় মুখপাতেই এসা চাল দিয়েছে এক, একেবারে গলিয়ে দিয়েছে কিনা।

আমাদের ঐ কথা ব'লে—আজ্ঞে একটু ব্যাজার দেখিয়েই বৈকি—আমাদের ঐকথা বলে ধনঞ্জয়কে বললে—ওঠ বাবাজী, অমন করে পড়ে থাকে না। তা তোমারও তো খবরটা দেওয়া উচিৎ ছেল—দাদা মারা গেচেন—অত স্নেহ পেয়েছি তাঁর কাচে।'

ধনঞ্জয় উঠে, হাতে একটা কম্বলের আসন ছেলই, যেমন অশৌচকালে রাখতে হয় সঙ্গে—সেটা পাশের চৌকির ওপর পেতে বসল। এরমধ্যে কায়দা ক'রে চোকেও একটু জল টেনে এনেচে, যেন কতবড় একটা গুরুজন মারা গেচে, মুচে নিয়ে বললে—'কোন্ মুখ নিয়ে খবরটা দিই কাকাবাবু, আর কোন্ মুখ নিয়ে এসি—বাবা গুরুজন, তায় এখন সঙ্গে, মুখে আনতে নেই—কিন্তু শেষ জীবনে কিরকম ব্যাভারটা করলেন আপনার সঙ্গে। আসবার মুখ ছেল কি? আসতামও না, তবে মিত্যুকালে তাঁর শেষ আদেশটা তো ঠেলেও রাখা যায় না। য্যাখন দেখলে কাল্ হ'য়ে এসেচে, আমায় ডেকে নিয়ে পাশে বসিয়ে বললে—'বাবা ধনা, আর যা পাপ করলুম তার খালাস আচে, কিন্তু দামুর মতন আপনভোলা নিদ্দুষী মানুষের মনে যে ব্যথাটা দিয়ে যাচ্চি তার তার খালাস নেই। তোর তো কাকাই, তুই হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে নিবি, যেন তার মনে কিছু না থাকে, তা নাহলে আমি যেখেনে যাচ্ছি, শান্তি পাবনা। তারপরেই শিবনেত্র হ'য়েই বাক্‌রোধ, যেন ঐ কটা কথা বলতেই বেঁচে ছিলেন।'

দামোদর চৌধুরী নায়েব মশায়ের পানে চেয়ে বললে—'শুনুন নায়েব মশাই। কী এমন করেছিলেন তিনি?'

ধনঞ্জয় বললে—'সে আপনি-আমি বুঝলুম।' কিন্তু তাঁর মনে তো আঘাতটা খুবই লেগেছেল। ঐ ক'টা কথা বলে চোখ বুজলেন। সামনেই দশদিনের মাথায় তাঁর কাজ, আমি ঠিক করে আচি সেটা হয়ে যাক্, ভালোয়-ভালোয়, তারপর একদিন কাকাবাবুর পায়ে গিয়ে আছড়ে পড়বো। তারপর কাল-রাত্তিরে হঠাৎ এক স্বপ্ন।

চৌধুরী মশাই সুদোলেন—'দাদাই ছিলেন?' ধনঞ্জয় বললে—'আমিই কি আগে চিনতে পেরেছিলুম বাবা বলে? অমন দশাসই চেহারা, অমন কাঁচা সোনার রং, সব কোথায় গিয়ে যেন কালি মেরে গেচেন, আচে শুধু হাড় ক'খানি......'

আমি একটু বাধা দিলাম—'তা স্বরূপ, চৌধুরী মশাই সেকেলের জমিদার, না হয় খোসামোদে—ভাঁওতায় ভুলে গেলেন, কিন্তু আর কারুর মনে কোন সন্দেহ জাগল না—যে কিছু একটা মতলব ঠাউরেই একেবারে এত নীচু হয়ে উপস্থিত হয়েচে ধনঞ্জয় রায়?'

স্বরূপ বলল—'সে কি ক'ন আপনি! তারা বুঝবে না? তাদের পেত্তোকে বুঝেছে। কিন্তুক আপনি ভুল বুঝচ, একথা মুখ-ফুটে ব'লে বুদ্ধিমান সাজতে যাবে এমন বোকা তো ছেল না তাদের মধ্যে কেউ। এমন বুদ্ধিমানের তো জমিদার সেরেস্তার কাজ করা চলে না। হাওয়া বুঝে পানাটি তুলে দিতে হবে, নয় তো ঘরে গিয়ে বসো গে।'

তবু তারই মধ্যে একজন ছেল বৈকি, শিবদাস মন্ডল, অধীনের বাবা। সবুদাই কাচে কাচে থেকে, বেফাঁস হয়ে গেলেই—গালমন্দ, ধমকটা-আসটা খেয়ে খেয়ে কেমন যেন ঘাঁচড়া হয়ে গেছল। সামলে-সুমলেই ছেল, তারপর স্বপ্নের কথায় এসে ধনঞ্জয় য্যাখন বললে—সেখানে যেয়ে রায়মশাই একেবারে মানোকষ্টে কালি-লেপা হাড় ক'খানা হ'য়ে গেচে, বাবা আর সাঁহ্য করতে না পেরে সুদোলে—'সেখেনকার অন্য কেউ ছেল না তো তিনি?'

সেখেনকার মানে যমপুরীর আর কি, রঙ-বেরঙের অনেকসব রয়েছে তো সেখেনে যমদূত থেকে আরম্ভ ক'রে।

খাপ্পা হ'য়ে উঠল চৌধুরী মশাই। ঘুরে চোখ পাকো বললে—'সেখেনে তোর সব জানা শোনা আচে নাকি? তা হ'লে তোকেও পাটিয়ে দিই, গিয়ে একটা ব্যবস্তা করবি। বেয়াদব কোথাকার, যা, যা, কাজ করছিলি করগে, মুড়ুলি করতে হবে না।'

বুঝুন, কার গরজ পড়েচে, এ হুজ্জুৎ মাথা পেতে নেওয়ার? বাবা— ঐ যে বললুম ঘাঁচড়া হয়ে গেছল, দূরে যেতনা, সরে গিয়ে একটু আড়াল হয়ে দাঁড়াল। চৌধুরী মশাই ধনঞ্জয়ের দিকে চেয়ে সুদোলে—হ্যাঁ, তারপর দাদা কি বললেন?'

ধনঞ্জয় বললে—'দেখলুম, খুব চটে রয়েচেন বাবা, বললেন—'শুনলিনে তো আমার কথা? কালই যাবি, দামু আসরে না দাঁড়ালে এত পরিশ্রম তোর সবই পন্ড হবে। তোর হাতের এতটুকু জল আমার গলা দিয়ে নামবে ভেবেচিস?'

বললে—'সকাল না হতেই বেরিয়ে পড়েচি কাকাবাবু। এখন আপনি গিয়ে আমায় এই পিতৃদায় থেকে উদ্ধার না করলে তো সব পন্ড হয়ে যায়।'......কলকেটা একবার নোব দা'ঠাকুর।'

হুঁকা বাড়িয়ে দিতে কলকেটা তুলে নিয়ে কয়েকটা দম দিলে স্বরূপ, তারপর একবার নাত্‌নীদের একজনকে হাঁক দিয়ে সেটা আবার সেজে আনতে বলে শুরু করল—সেই দিনই আবার আরম্ভ হোল। সেই দিনই বেশ ঘটা ক'রে একটা বড় ভুজ্জি পাটো দেওয়ার হুকুম হ'য়ে গেল কুসমীতে—আতপ-চাল, গাওয়া-ঘি, তরি-তরকারী ফল-ফুলুরি, ছ্যানা, দাধ, মিষ্টান্ন—ভুজ্জির তাবৎ দ্রব্য; তা একটা মাঝারি গোচের ছেরাদ্দ সামলে যায় এই পরিমাণ। তারপর ঘাটের দিন একবার ঘুরে এসে, ছেরাদ্দর দিন রুদয়াস্ত সেখেনেই থেকে ছেরাদ্দ থেকে ইস্তক সেই ভোজ পজ্জন্ত যেভাবে ঘুরেঘুরে তদারকী করে এল চৌধুরী মশাই, নিজের বাপের ছেরাদ্দতে ততটা করেনি। সারা কুসমী আর মসনেতে একটা রব উঠে গেল, যার মুখে শুনুন ঐ কথা—কী যাদু ক'রলে ধনঞ্জয় রায় যে অত বড় অপমানের কথাটা ভুলিয়ে দিয়ে একেবারে বশ করে ফেললে চৌধুরীমশাইকে। অনেকে অনেক রকম আন্দাজ করচে, তার মধ্যে একটা এই যে, ওসব কিছু নয়, যদি যাদুই হয় তো সে সেই বোষ্টম বাবাজীর যাদু, যে নাকি তৃণের চেয়েও নীচু হয়ে ভালো হওয়া, ভালো করবার নেশা লাগিয়ে জমিদারীটা লাটে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেল, যার জন্যে এই ধনঞ্জয়য়ের হাতেই নিজের সোনার প্রিতিমে মেয়েকে তুলে দেওয়ার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছিল চৌধুরী মশাই। তারপরে বাবার কারচুপিতে, সেই কুসমীর বরযাত্রীকে মেরে পাট ক'রে দেওয়া হোল বটে, আবার সাবেকের মতন মিছরির সরবতের মতো খাঁটি মাল ধ'রে সেই সাবেক দামোদর চৌধুরী, ফিরে এল বটে, তবু কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা—বোষ্টমবাবাজীর মন্তর মনের আনাচে-কানাচে কিছু কিছু আটকে গেছল, ধনঞ্জয় এসে ছেরাদ্দর নাম

ক'রে আছড়ে পড়তে আবার বেইরে এল—ভালো করতে হবে, ভাল হ'তে হবে।

অবিশ্যি আন্দাজ, ত্যাখন রকম সকম দেখে সকলে এইটেই ধ'রে নেছল, আজ্ঞে শুনে শুনে আম্মো, ত্যাখন ছেলেমানুষই তো, কতই বা বয়েস। ইদিকে সেরেস্তার আমলাদের কথা বলতে পারিনে, তাদের তো মুখ খোলবার উপায় ছেল না, ভেতরে যাই থাকুক। তবে একজন একেবারেই মেনে নিতে পারেনি, এবারেও সেজন সেই শিবদাস মন্ডল, অধীনের বাপ।'

আমি প্রশ্ন করলাম—'বললে তোমার বাবা চৌধুরী মশাইকে?'

স্বরূপ উত্তর ক'রল—'বাবার ঘাড়ে দুটো তো মাথা ছেল না দা'ঠাকুর যে কর্তার ওপর মুরুবিবয়ানা করতে যাবে। সুদোবেন, জানলে কি করে তুমি, জানলুম, বোতল-ঝাড়া একটু-আধটু যা পেসাদ থাকত সেটুকু খেয়ে রেতে য্যাখন বাড়ি ফিরত বাবা—খাঁটি মাল, নেশা লেগে থাকতই, নিজের মনেই গরগর করত—'একটা ধাক্কা বাঁচোচি, প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে, এবার আবার যেমন গোড়া বেঁধে এগুচ্চে মিত্যুঞ্জয় রায়ের ব্যাটা, এবার যে রামধাক্কা দেবে, শিবির বাবারও সাদ্যি থাকবে না বাঁচবার—এটা তুই দেখে নিস্ রূপোর—মা।' আজ্ঞে মাকে সাক্ষী মেনে; কথাটা পেটে গুজগজ করচে, কোনখানে বের ক'রে দিতে হবে তো। মা চুপ করেই থাকত। কোনদিন যদি বললে—'তুমি দেখে যাওনা চুপ ক'রে, যে জেনেশুনে দেবেই পা বাড়িয়ে ফাঁদে তাকে বাঁচাবে কি করে? ক'বারই বা বাঁচাবে?'—তাহলে বেঁধেও যেত মার সঙ্গে।...'তুই চুপ কর্, আর বুদ্ধি দিতে হবে না, দশ হাত কাপড়ে কাচা জোটেনা তোদের, তোরা পরকে বুদ্ধি জোগাবি। সাত-পুরুষ ধ'রে যাদের নুন খেয়ে এসছি—আগুনে নিয়ে খেলা করতে দেখলে ব'লতে হবে না? বলা কি, বাচ্চা ছেলের মতন হিড়হিড় ক'রে পেছনে টেনে আনবো—যাতই কেন চোমাক,—যেমন ছেলেবেলায় নে'সতুমই টেনে—তাতে চাক'র থাকে বা যায়......'

দু'দিন কর্তার কানেও একটু তুলেছেল বৈকি। য্যাখন সাদা চোখে ত্যাখন তো উপায় নেই, য্যাখন একটু রঙের মুখে। রঙের মুখে সেবার কথাটা ব'লে মেজাজ ঘুরিয়ে দিয়ে দিদিমণিকে বাঁচ্যে দিলে তো। বেশি নয়, একটু মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া আর কি। একদিন দাঁও বুঝে বললে—'কুসমীতে নাকি গুজোব, রায়মশাই নাকি আবার কিসব নতুন মতলব আঁটচে ভেতরে ভেতরে।'

সেদিনকে বেশি কিছু নয়, চোখ দু'টোকে একটু পাক্যে শুধু শাসিয়ে দিলে চৌধুরী মশাই—ওসব গুজবে কান দিবিনে শিবে, খবরদার বলচি।'

ইতিমধ্যে দহরম-মহরম বেড়েই যেতে থাক্,—যাওয়া-আসা, খোঁজ-খবর, তত্ত্ব-তাবাস, তারপর সহ্যির বাইরে গিয়ে পড়তে আবার একদিন না টুকে পারলে না বাবা। নেশাটি জমে এসেচে গোলাপী-গোচের হয়ে, ঠিক সেই তালের মাথায়। চৌধুরী মশাই গেলাসটা হাতে ক'রে চোখ তুলে একটু চেয়ে রইল, তারপর বললে—'নায়েব মশাইকে ডেকে আন্।'

রাত্তিরে, নায়েব মশাই তানার বাসায়, বাবা তো আহ্লাদে একরকম হাওয়ায় উড়ে গিয়ে তানাকে ডেকে নিয়ে এল, আজ বুঝি আবার সিদিনের মতন পালটাল মত। দু' জনে এসে দাঁইড়েচে, ইদিকে গেলাসটা খালি ক'রে হাতে নিয়েই ব'সে ছেল চৌধুরী-মশাই, বাবার হাতে তুলে দিয়ে ওনাকেই দেখিয়ে নায়েব মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললে—'জ্যাঠামশাইয়ের মাইনে-টাইনে সব চুকিয়ে বিদায় ক'রে দেন, ও'র মুখ আমার যেন আর দেখতে না হয় কাল থেকে।'

একে আর সহ্যিই হচ্ছেল না, তার ওপর য্যাখন অন্যরকম আশা করছিল, একেবারে এই উলটো উৎপত্তি, বাবাও মরিয়া হয়ে ছেড়েই দেবে কাজ, নায়েবমশাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠান্ডা করলে।—'পুরুষাণুক্রমে নুন খেয়ে আসচ শিবনাথ, এককথায় ছেড়ে যেও না দেউড়ি। রাণীমাকেই চুপি-চুপি খবর পাঠেছেল, তিনিও ডেকে নিয়ে দোরের পাশে দাঁইড়ে কাকুতি-মিনতি ক'রে বললে—'একটা অমন বিপদ সামলালে, আর একটা হয়তো তার চেয়ে বড়ই ঝুলছে মাথার ওপর—সবদাই কাচে-কাচে থাকো, নজর রাখতে পার, আমরাও কতকটা নিশ্চিন্দ থাকতে পাই, এ-অসময়ে তুমি ছেড়ে যেও না আমাদের শিবনাথ, মনিব হ'য়ে ব্যাগ্যতা করচি তোমায়।' এরপর আর ছেড়ে যাওয়া চলে না। পরের দিন আবার য্যাখন গড়গড়া সেজে হাজির হোল, চৌধুরী মশাই বললে—'শুনলাম নাকি রূপোর তাঞ্জাম হাঁকিয়ে দেউড়ি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছিলি?'

আজ্ঞে, রূপোর তাঞ্জামটা তোষাখানাতেই রাখা ছেল কিনা, তাই নিয়ে ঠাট্টা।

বাবা কিছু জবাব না দিয়েই, যেমন দেয়, গড়গড়ার নলটা বাইড়ো ধরলে।

তাই বলছিলুম, এক শিবনাথ মন্ডল ধাপ্পা-বাজিটা মেনে নিতে পারেনি, চেস্টাও করেছেন যতটুকু সাদ্যি।

মেনে নিতে পারেনি আর একজন। সে হ'ল দিদিমণি, নেত্য ঠাকরুণ।

আমি ত্যাখন নোঙর-ছেঁড়া নৌকো। রয়েচি অবিশ্যি সেই পুরোনো জায়গাতেই বাবাঠকুরের কাচে, তবে তানার জন্যে আলাদা ঠাকুর-চাকর রয়েচে, কাজ-কম্ম তেমন কিছু নেই, সেই কেলাগাইও নেই যে চাড়িয়ে বেড়াতে হবে; কখনও এখানে, কখনও দিদিমণির ওখানে, কখনও মেজ-ঠাকরুণের ওখানে, এই ক'রে টহল দিয়ে বেড়াচ্চি, নিজের খেয়াল-খুশী মতো।

আবার কখনও ই[illegible] হ'ল তো চৌধুরী বাড়ি গিয়েও বাবার সঙ্গে কাটো এনু খানিকক্ষণ।

একদিন বিকেলে দিদিমণির বাড়ি গেচি— বেশির ভাগ জামাইবাবুর বেড়াতে যাওয়ার পরই যেতুম—একথা সেকথার পর দিদিমণি বললে—'হ্যাঁরে স্বরূপে, গুজব শুনচি, কুসমীর ধনঞ্জয় রায় নাকি আবার চৌধুরীমশায়ের সঙ্গে খুব মাখামাখি লাগিয়েচে? মতলবখানা কি বল দিকিন? তুই তো যাস্ তোর বাবার কাচে, একটু খোঁজ নিয়ে বলিস্ তো। জপালে কি করে বল দিকিন্?'

তারপর নিজেই বললে—'হ্যাঁ, মাতাল-মানুষ একটা, তাকে জপানো নাকি শক্ত!'

বললু—'সবাই তো তাই বলচে।'

তারপর আমার কি মনে হ'ল—দেখতাম তো, জনাকয়েক বাদ দিয়ে সব জমিদারেরই ঐ রোগ—বললু—'জামাইবাবু যেন নেশা-পত্তর না ধরে বসে দিদিমণি, কাঁচা বয়েস তো।'

দিদিমণি চোখ বড় বড় ক'রে আমার কথাগুলো শুনছেল, হঠাৎ খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, বলল—'পাকা বুড়োর মতন কেমন ব'লছে দ্যাখো কাঁচা বয়সের কথা!'

তারপর গম্ভীর হ'য়ে গিয়েই বললে—'না রে!—হয় বৈকি ভয়—হেন জমিদারটা নেই যার এই রোগটা নেই, তবে এ বাড়ীর এরা অন্য ধাতেরই মানুষ।'
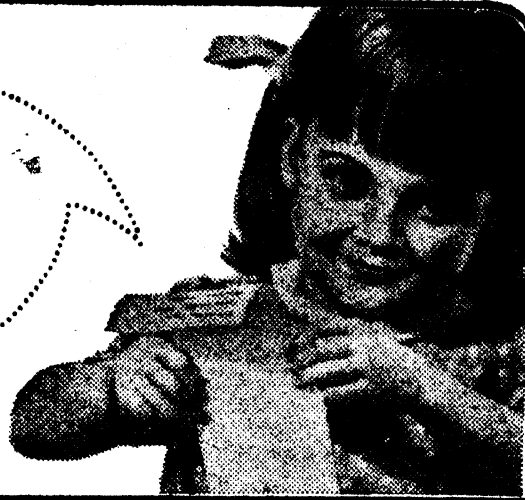
বলতে পারিস,
মায়ের
বাজার ফর্দে
প্রথম নামটি
কি?
কুসুম
ছাড়া
আবার কি!
KPK 5248A
KUSUM
VANASPATI
খেতে ভালো আর পুষ্টিকর
— এমন খাবার রাঁধতে হলে চাই
কুসুম
বনস্পতি
কুসুম প্রোডাক্টস লিমিটেড, কলিকাতা-১

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে একটু যেন ঠোঁট-গুটিয়ে হেসে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কতকটা নিজের মনেই বললে—'যা নেশা এক ধ'রে গেচে তাই সামলাক আগে।'

তারপর, পাছে—সে নেশাটা কি তা বোকার মতন জিজ্ঞেস ক'রে বসি, আবার নিজেই বললে—'বাড়সাই খাওয়ার অব্যেস আচে তো—কলকেতার কলেজে পড়া ছেলে—সেই নেশার কথা বলছিলুম। তা দেখিস, আমি এও ছাড়াব, তবে আমার নাম। আমি হ'চ্চি অনাদি ন্যায়রত্নের মেয়ে।'

আমি বললুম—'তার জায়গায় বরং বাবাঠাকুরের মতন নাস্য ধরিও দিদিমণি।'

আবার খিলখিল করে হেসে উঠল দিদিমণি, মন ভালো থাকলে একটুতেই হেসে হেসে উঠত, বলল—'মর ছোঁড়া, ও আবার রোগের চিকিচ্ছে বাৎলাতে এল। হোন বাবা, দু'চোক্ষের বালাই ও-নেশা। বাবা বলে সইতে হোত, তা' বলে আর কেউ হলে সইতে হবে নাকি? টান মেরে ফেলে দেবো না নর্দমার ডিবে? কোন অসৈরণ সইতে দেখেচিস আমায়, তোর জামাই-বাবুই হোক আর যেই হোক?'

হঠাৎ থেমে গেল স্বরূপে। একটু লজ্জিতভাবেই বলল—যা হয় তাই আর কি দাঠাকুর। তাখন অত বুঝতুম না, আমারও তো মিষ্টিই লাগত, শুনেই যেতুম। এখন তো বুঝি, জামাইবাবুর কথা কোন দিক দিয়ে উঠলেই কি রকম যেন যেতেই চাইত না দিদিমণির মুখ থেকে। অবিশ্যি, যদি আমাকে বলবার জন্যে পেল। বড্ড ভালবাসত, তায় ছেলেমানুষ, অতশত বুঝি না, সুবিধে ছেল। কি এক রাজযোটক যে দেখেছিনু, এই চারকুড়ি বয়সের মধ্যে তো আর চোখে পড়ল না তেমনটি।

খুব পোরোতন কথা, ঠিক সরণ হচ্ছে না, তবে যদ্দুর মনে পড়চে, এর পেরায় মাস দুই পরের ব্যাপার। দিন কতকের জন্যে কোথায় যেন গেছনু, তারপর প্রেথম বৌটা মারা গেল, বিলম্ব করেই গেচি সেবার দিদিমণির ওখানে। বিলম্বের হেতুটা জিগ্যেস করতে বোয়ের মিত্যুর কথাটা শুনে একটু হাঁ করে চেয়ে রইল আমার পানে। তারপর সুদোলে—'তার হয়েছেল কি?'

বলনু—'ম্যালেরিয়ায় ধরেছেল, ভুগছেল, তারপর মরে গেল।'

দিদিমণি গালে একটা আঙুল টিপে বললে—'অবাক করলে ছোঁড়া! বউ মরে গেচে—খবর দিলে যেন কিছুই নয় ব্যাপারটা, যেমন রোজকার নাওয়া-খাওয়া সেই রকম। তা হ্যাঁরে, মারা গেল কোন কষ্ট হয়নি তোর মনে? কেঁদেছিলি একটুও?'

আজ্ঞে, সাত বছরের একটা মেয়ে, বিয়ের সময় একবার আড়চোখে দেখেছিনু, তারপর ক'টা মাসের মধ্যে আর দেখনু কোথায় যে কাঁদব? বার দুই নিয়ে আসবার কথা হয়েছেল, খবর এল ভুগচে, তারপর তো মরেই গেল।

আমার কিন্তু কেমন একটু পুরুষালি ভাব দেখাবার ইচ্ছে হোল এই মোকায়, ওসব কথা না বলে বলনু—'যাঃ, ব্যাটাছেলে হয়ে কেউ বউ মলে কাঁদে?'

দিদিমণি বললে—'শোন কথা ছোঁড়ার, ব্যাটাছেলে হলে তার নাকি বোয়ের জন্যে কাঁদতে নেই!'

খানিকক্ষণ চুপ করে একটু বসেই রইল অন্যদিকে চেয়ে, তারপর নিজের কথা নিয়ে মনে মনে তোলপাড় করচি,—কি এমন বেমক্কা বলে বসেচি, উনি আবার ঘুরে চেয়ে বললে—'তোরা তো এমনিই বটেরে, মুখ-সাপটুকুই আচে শুধু।'

আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়ার পর সবটুকু যেন গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—'যাক্‌গে, কেউ না কাঁদে, না কাঁদবে, মরে গেল। তোকে খুব একটা দরকারী কথা বলব বলে ঠিক করেছিলুম স্বরূপে, ডাকিয়েই পাঠাব-পাঠাব করছিলুম, তুই নিজেই এসে পড়লি।'

আবার একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বললে—'দ্যাখো, কি কথা ভুলেই গেলুম, এমন আদাড়ে এক বউ মরার খবর এনে বসল ছোঁড়া, পেটে আসচে, মুখে আসচে না কথাটা। ......হ্যাঁ এই হয়েছে! কাউকে বলবিনি কিন্তু; বলবিনি তো?'

বললুম—'না! তোমার কথা ক্যা বলিনে কাউকে।'

বললে—'সেই! খুব লুকিয়ে কথা হয়েছেল ওদের। ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ টের না পায়।'

এরপর একটু গলাটা নাবো এনে বললে—'মিত্যুঞ্জয় রায়ের ব্যাটা এখান পজ্জন্ত ধাওয়া করেছেন—হ্যাঁ, ঐ ধনঞ্জয়। কী সুশ্চমন চেহারা রে, জমিদার ঘরে যে অমন চেহারা হয় জানতুম না! কাল রাত্তিরে কাকার বাড়িতে খাওয়া ছেল, খেয়ে-দেয়ে দুপুরবেলা ঘুমুচ্ছিলুম তোর জামাইবাবু ঢোকে, তুললে—ওগো ওঠ, কুসমীর ধনঞ্জয় রায় এসেচে, বাইরের বৈটক-খানায় বসাতে ব'লে আমি মেরজাইটা গায়ে দিয়ে আসচি ওপর থেকে, তুমি ভালো করে একটু খাবার-টাবারের ব্যবস্থা করে দাও তাড়াতাড়ি।'

আমি ঝিকে ডেকে সব বলেটলে দিয়ে হলঘরের ভেতরদিকের জানলার ঝিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম—দেখতে হবে তো সুধা ঠাকুরঝির কি রকম লোকের সঙ্গে বিয়ে হ'তে যাচ্ছেল। তার সঙ্গে এটাও তো রয়েছে—অত দাঙ্গা, অত হুজ্জুৎ, তারপর ওর বাপ আজ কান্না করলে চৌধুরীমশায়ের [illegible] আবার এ তাঁদের বাড়ি গিয়ে জুটেছে, ক্রোমে এবার আমাদেরও বাড়ি, একটা সম্বন্ধ রয়েচে জেনেও,—দেখতে হয়তো লোকটাকে। কী কিচ্ছিৎ রে স্বরূপে! মেয়েটা বেঁচে গেচে, নৈলে গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছেল না। আমি ষ্যাতক্ষণে গিয়ে দাঁড়িয়েচি—ঠিক-ঠাক ক'রে দিতে খানিকটে সময় তো গেলই—ত্যাতক্ষণে 'আসুন—বসুন'—হয়ে গিয়ে কথাও অনেকখানি এগিয়ে গেচে। গোড়াটা তো শোনা হোল না, তবু আমি গিয়ে কান পেতে দেওয়া মাত্তোর যা কানে গেল তাইতেই গা যেন হিম হ'য়ে গেল। আন্দাজ কর দিকিনি কি কথা? পারবিনে আন্দাজ ক'রতে। বিধবা-বিয়ের সেই হুজুগ আবার এনে ফেলতে চায় গাঁয়ে। বলচে—'বিধবা-বিবাহ কত দরকার আজ তা তোমায় তো বোঝাতে হবে না। তুমিই একদিন সমস্ত জেলাটা তোলপাড় ক'রে তুলেছিলে,—'সে কী গলা, কি বক্তিমে। হুগলীতে কেশব সেনের বক্তিমেও শুনেচি—দাঁড়াতে পারে না কাচে। তা অমন ভালো জিনিস, জুড়িয়ে যাচ্চে—কি করা যায়, কি করা যায় ভাবতে শেষে তোমার কথাই মনে পড়ল—আমাদের ছ'আনী তরফের ভায়াকে ধরা যাক্ গিয়ে। তুমি নাবো দিকিন আবার। বলবে, নিজে ক'রলে না, লোকে এখন সেই কথাই বলবে। তা হ'লে তো বিদ্যেসাগর মশাইকেও বিধবা-বিয়ে করতে হয় একটা। তাছাড়া করনি, করনি; এই যে একটা মানুষকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করলে এটাও তো একটা কম কাজ নয়। আর করনি বলে যে করবে না এমন কথাও নয়। সায়েবদের মতন একটা বিয়ে করলে, আর করতে পারবো না—এমন উদ্ভুটে বিধান তো দিয়ে যাননি আমাদের মুনি-ঋষিরা......'

শুনে রাখ স্বরূপে, গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে করবারও বিধেন দিয়ে মস্ত বড় উপকার ক'রে গেছল মুনি-ঋষিরা! ভুগতে তো হোত না তাদের।'

আমি মাঝখান থেকে জিগ্যেস ক'রে বস্নুম—'তা জামাইবাবু হোল না রাজি?'

দিদিমণি আবার থেমে গিয়ে একটু চোখ পাকো বললে—'তার মানে? রাজি হ'লে খুব ভালো হোত বলতে চাস, তুই?'

কথাটা তাই দাঠাকুর। আমি বিধবা-সধবা অত কি বুঝি বল? হুজুগটা তো মন্দ ছেল না, নিত্যি একটা না একটা কিছু লেগেই থাকত গেরামে। কিন্তুক ওনার চোখ-পাকানি দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে আমতা-আমতা ক'রতে করতে একটা বুদ্ধি এসে গেল সামলে নেবার; বলনু—'তাইতেই তো তুমিও এসে পড়লে এখানে; সেই কথা কইছিনু।'

একটু যেন থমকে গেল দিদিমণি। সত্যিই, ও হুজুগ না উঠলে তো এ-বিয়ের যোগাযোগটা হয় না, তা সে যে ক'রেই হোক। একটু চুপ করে ভাবলে, তারপর নাকটা একটু কুঁচকে বললে—'নেঃ, ওরকম আদাড়ে হুজুগ না উঠলে নাকি আসতুম

না! আমার জন্ম-জন্ম তপিস্যে ক'রে তবে এখেনে আসা; রোকে কার সাদ্যি?'

তারপর আবার গা থেকে সবটুকু ঝেড়ে ফেলে বললে—'শোন মন দিয়ে, যা বলচি। দরকারি কথা, মাঝখান থেকে এক একটা ফিকড়ি বের ক'রে অন্যমস্ক ক'রে দিবিনি বলচি।'

তারপর আবার চোখ পাক্যে জিগ্যেস—'হ্যাঁরে তুইও নাকি ওকে একবার বলেছিলি—তোর বোয়ের বিধবা বিয়ে দেওয়াবি?'

একবার বলেছিনু দা' ঠাকুর। আপনার মনে আচে কিনা জানিনে। জামাইবাবু তাখন ঐ নিয়ে খুব মেতে উঠেচে. একদিন বিকেলে বিভীষণের মন্দিরের কাছে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতে—মন্দোদরীকে বিধবা-বিয়ে করার জন্যে ওনার এক মন্দিরও ক'রে দেচল তো—হঠাৎ দেখা হয়ে গল্প করতে করতে আসচি—ওনার মন রাখার জন্যে বললুম—'আচ্ছা বউ বিধবা হলে বিয়ে ক'রতে বলে যাব।'

বলেছিনু, কিন্তুক দিদিমণির চোখ পাক্যে চেয়ে থাকা দেখে বলনু—'কিন্তুক বো-তো ল্যাঠা চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে, দুঃখু করে কি হবে?'

ভয় পাওয়ার জন্যে বেশ গুছিয়ে ব'লতে পারনু নাতো। দিদিমণি চেয়েই রইল খানিকটে। তারপর কি ভেবে একটু হেসেই ফেললে, বললে—'হতভাগার কথা শোন না—দুঃখু ক'রে কি হবে!......শোনু একেবারে বাজে কথা এনে ফেলবিনি। তোর জামাই-বাবু দৌড়ে ফিরে এলে বলবার সময় পাবো না। কি যে বলছিলুম—হাঁ, মন্দোদরী বললে—ইচ্ছে করলে তো বিধবা বিয়ে করতেও পারে; তোর জামাইবাবুর আর কি। ও বলে যাচ্ছে, তোদের জামাইবাবু মাথা হেঁট ক'রে শুনে যাচ্ছে—যা কীর্তি করেচেন এক কালে। উত্তুর তো জোগাচ্চে না, শেষে এক সময় মাথা তুলে কতবড় যেন দুষীর মতন করে বললে—'আর সে রকম সময় পাইনে দাদা, তাখন জমিদারির কাজ ছেল কাকার হাতে—এখন সবটাই নিজেকে সামলাতে হয়—'

ধনঞ্জয় বললে—'শোন' কথা! যে বাঁধে সে চুল বাঁধে না! বড় বড় লড়াইয়ে সেনাপতিরা নিজে কতটুকু করে? একবার শুধু চালু ক'রে দেওয়া, তারপর আপনি গড় গড় ক'রে চলে যাবে। এই বোষ্টমদের দেখো না—'

তোর জামাইবাবু বললে—'কিন্তু টাকে কই ওদের বিয়ে? সেবার তিরিশটে দিয়ে-থবর নেছলুম, তার মধ্যে সাতাশটে নাকচ করে ফেললে।'

ধনঞ্জয় বললে—'একেবারে কাঠবদন; অত হালকা করে ফললে চলে না, তার সংগে দুটো মন্তর, একটা নারায়ণশীলা—এই সব দিয়ে একটু ঠাট বজায় রাখতে হয়। সে তোমায় আমি ভালো লোক দোব, কিচ্ছু করতে হবে না তোমায় শুধু একটু, চাঁদা তোলা ঝিনিসটেকে। একটা অতবড় লোক এর জন্যে প্রাণান্ত করছে, তোমরা শিক্ষিত ছেলে, সম্পত্তিও আছে, না করলে করবে কে?"

সে কতরকমভাবে যে জপানো। মেড়ে কি চায়? শেষে 'দেখি ভেবে দাদা, তুমি যখন বলচ'—বলে তাকে খানিকটে যেন আশা দিতে তবে বিদেয় হোল।'

চটিয়ে দিয়েছিলুম, আমি এবার একটু বুদ্ধি খাটিয়ে সুরটা পালটে দিলুম—বললুম—'তা হলে নামবে নাকি আবার দিদিমণি? তুমি একটু নজর রেখো রায়-মশাই লোকটা বড্ড পাজি আর ফিচেল তো।'

দিদিমণির মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছে, বললে—'নামবে! ওকে বিদেয় করে ফিরে আসতেই ধরলুম। আর লুকোচুরি কিসের? বললুম, আমি সব শুনেচি লোকটা কি রকম তাই দেখতে এসে। তুমি যদি আবার বিধবা-বিয়ের হিড়িকে নামো ওর পাল্লায় পড়ে, আমি বিষ খেয়ে সুবিধে করে দোব তোমায়—নিজে করনি বলে তোমারও আফশোষ থাকবে না, লোকেও দুর্নাম রটাতে পারবে না।'

মুখটা শক্ত করে একদিকে চেয়ে বসেই রইল খানিকটে। তারপর সেভাব কতকটা কেটে গিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললে—"বেশ ভয় পেয়ে গেছে স্বরূপ। আমিও মুখভার করে কথা কমিয়ে কাটিয়ে দিলুম তো রাতটা—খাওয়াও, সে নামমাত্র, অনেক বলাতে-কইতে। মনে হয় না তো আর ও দিক মাড়াবে। বলছিলও দিনকতক মহালে গিয়ে বসে থাকি। যায় তো আমিও সংগে যাবো। তোকে ডাকাব-ডাকাব ভাবছিলুম—লোকটা একনম্বর শয়তান। তুইতো বাবু তোর বাবার কাছে, ও এসেচে খবর পেলেই হাজির হবি, তোর বাবাকেও বলে দিবি, চোখ-কান খুলে রাখতে। তাছাড়া দাদা-বাবুর সঙ্গে শিবনাথ তো কুসমীতে যায় মাঝেমাঝে, তুইও যাবি খবর পেলে; সেখানে কি হচ্ছে না-হচ্ছে লুকিয়ে লুকিয়ে খবর নিবি।'

জামাইবাবু ঘোড়সওয়ার করে ফিরে এল। আমায় দেখে বললে—এই যে রূপ-চাঁদ দেখচি। তোর বাবা শিবনাথের সঙ্গে দেখা হল দামোদরদার বাড়ীতে। বললে—তোর বৌটা নাকি মারা গেছে; ম্যালেরিয়ার কথা উঠতে বললে। যাঃ, তোর আর তাকে দিয়ে বিধবা-বিবাহ করান হোল না।'

দিদিমণি বললে—'ও আশা ছাড়োনি। দেখচ জামাইবাবু আবার তোড়জোড় করে নামচে।'

দোতলার দিকে যেতে-যেতেই শুনেছেল জামাইবাবু। ওনার দিকে চেয়ে একটু হেসে মুখটা ঘুইরে নিয়ে উঠে গেল।

দিদিমণি বললে—'তুই এবার যা স্বরূপে সাজ-গোজ পালটাবে, ওপরে যাই আমি।...দাঁড়া, ঝিকে বলে দিই তোর খাবারের কথা। খেয়ে তবে যাবি।'

ঝিকে ডেকে বলে দিয়ে উনিও উঠে গেল।...একবার হুঁকোটা এইগ্যে ধরতে হবে দা'ঠাকুর। পাশে বসে যেতে খানিকটা এখনও, পারিনে যে এমন নয়। তবে সামনে থাকলে মনটা কেমন যেন আনচান আনচান করতে থাকে।' একটু হাসল।

(ক্রমশঃ)

সাপুড়ে ॥

শান্তি লাহিড়ী

আমার ঝাঁপিতে ছিল সাপ, আমি এক সুদক্ষ সাপুড়ে
চিতে-বোরো-শঙ্খচূড়-কালনাগিনীরা নানা জাতি,
এক সময় দর্শক ভোলাতে ঝাঁপি খুলে ছড়িয়ে দিলাম
ফেরাতে পারিনি সবগুলি।
এখন আমারি চারপাশে সেইসব ঝাঁপি-মুক্ত নানা কালনাগিনীর দল
কেবল আমাকে খুঁজে ফেরে,
আক্রোশে ছোবল মারে বিষ-দাঁত বসায় কলজেয়।

এখন আমি তো আর বাজাই নে সাপুড়ের বাঁশি
তবু কেন থামে না ওদের সেই ভয়ঙ্কর বিষ নাচ,
এখন আমি তো আর সুদক্ষ সাপুড়ে শুধু নই,
এখন আমিও কোন নৃত্য-পরায়ণ চিতে শঙ্খচূড়!

ফেরা ॥

কবিরুল ইসলাম

তুমি আরও একটু খুলে যাও
আরও একটু ছেড়ে দাও সুতো—
ঘর ছেড়ে বারান্দায় কিংবা ছাদে
আকাশের অবাধ ছুটিতে।
তুমি আরও একটু হাত খুলে মেলে দাও
যেন লালপাড় শাড়ি হলুদজমিন
সবুজ রেলিং-এ
খেলা করে রোদ্দুরে হাওয়ায়।

তুমি আরও একটু গলা ছেড়ে খুলে গাও।
তুমি শামুকের মধ্যে কেন?
খোলশ বিদীর্ণ করে হাওয়ায় রোদ্দুরে
হেঁটে চলো :
মশানজোড় বক্রেশ্বরে চলে যাও
জয়দেব-নান্নুরে
শান্তিনিকেতনে চলো—

'চলো চলো' জলেস্থলে বাঁশি বাজছে, শোনো!
তুমি সব ছেড়ে-ছুড়ে আকণ্ঠ রোদ্দুরে
কণ্ঠেযন্ত্রে
আলাপে-বিস্তারে
তুমি ফিরে নিজেকে বানাও।।

নৈসর্গিক ॥

সুমিত চক্রবর্তী

কোজাগরী রাত, রোমাঞ্চময় পটে
আলো-আঁধারির মর্মীয়া পরিচয়
নির্জন বনে হিমানী বাতাস লোটে
তুষারশৃঙ্গে মেঘের অবক্ষয়।

এখানে বিপাশা নিখুঁত সূত্রকার
পাষাণখণ্ডে নিহিত স্বয়ংবর
অরণ্যানির প্রতীক নিবিড়তার
ঐতিহাসিক কালজয়ী স্বাক্ষর।

ভারতবর্ষ, অঙ্গে তোমার সোনা
মুখের রেখায় অনন্য বিস্ময়
নদীর বক্ষে তারার দৃষ্টি গোনা
শৈলপ্রাচীরে চিরায়ত প্রত্যয়।

নিঝুমে উপত্যকায় দাঁড়িয়ে বুনি
কেলুর শাখায় দেশজ জ্যোৎস্না-জালি
সহসা আকস্মিকের আঘাতে শুনি
দূরবিস্তৃত ভাঙনের হাততালি।

তাই কি ভ্রূকুটি প্রতি নিঃশ্বাসে নামে?
আশীর্বচনে আশঙ্কাদের স্মৃতি?
অথচ স্বদেশ কিনেছে অর্থে দামে
এ নৈসর্গে প্রেরণার উদ্ধৃতি।

নিমাই ভট্টাচার্য

—আট—

কবি রবার্ট ফ্রস্ট রসিক ছিলেন। কবির মতে ডিপ্লোম্যাটরা মহিলাদের জন্মদিন মনে রাখেন, ভুলে যান্ তাঁদের বয়স। জন্মদিনের ঐ আনন্দটুকু, ঐ রস টুকুই কূটনীতিবিদ-দের প্রয়োজন; কালের যাত্রায় বিলীয়মান যৌবনের হিসাব রাখতে তাঁদের আগ্রহ নেই।

ডিপ্লোম্যাট হয়েও অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জী মহিলাদের জন্মদিনই মনে রাখেন না, স্মরণ রাখেন তাঁদের বয়স। বিলীয়মান যৌবনের হিসাব। শুধু আনন্দ, শুধু রস, শুধু মধু পান করেই উনি নিজের মনকে খুশী রাখতে পারেন না। বেদনাবিধুর আবছা অন্ধকার মনের কথাও তিনি জানতে চান।

হঠাৎ দেখলে ঠিক টপ্ কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট বলে মেনে নিতে মন চায় না। আর পাঁচজন ডিপ্লোম্যাটের মত চাকচিক্য, স্মার্টনেস্, গ্ল্যামার একেবারেই নেই। মাথায় টপ হ্যাট বা হাতে লম্বা সরু ছাতা না থাকলেও পরণে পুরনো কালের ইংরেজদের মত ঢিলেঢোলা থ্রি-পিস্ স্যুট্। সিলভার চেন'এর সঙ্গে মোটা পকেট ওয়াচ্ না ব্যবহার করলেও অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জীকে অনেকটা কেম্ব্রিজের বিখ্যাত সেলউইন কলে-জের ওরিয়েন্টাল ফিলসফির অধ্যাপক মনে হয়।

সবাই যে অ্যাম্বাসেডর রঘুবীর হবেন তার কি মানে আছে? ভরা যৌবনের আই সি এস হয়ে দেশে ফেরার বছরখানেকের মধ্যেই রঘুবীর ডেরাডুনের ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট হলেন। মাস ছয়েক ঘুরতে না ঘুরতে লাহোরের স্যার বীরেন্দ্রবীরের পুত্র রঘু-বীর প্রভুভক্তির অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। গান্ধীজী ও সঙ্গীদের 'টিল দি কোর্ট রাইজ' পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

ঘটনাটা নেহাতই সামান্য। তবু এমন সুযোগ তো বার বার আসে না! মীরাট থেকে মজঃফরনগর, রুরকি, ডেরাডুন হয়ে গান্ধীজী মোটরে মুসৌরী যাচ্ছিলেন। মীরাট আর মজঃফরনগরে মিটিং ছিল, কিন্তু রুরকি বা ডেরাডুনে কোন প্রোগ্রাম ছিল না। তবে অভ্যর্থনার জন্য ডেরাডুন শহরের ধারে বেশ ভীড় হয়েছিল।

রঘুবীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে রিপোর্ট পাঠালেন, ডেরাডুন শহরে মিলিটারী একা-ডেমীর ছেলেরা হরদম ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাই চান্স গান্ধীজী যদি ক্লক টাওয়ারের পাশ দিয়ে যাবার সময় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন তবে মিলিটারী একাডেমীর ছাত্ররাও নিশ্চয়ই......। তাছাড়া যেমন অভ্যর্থনার উদ্যোগ আয়োজন হচ্ছে তাতে রিস্ক না নেওয়াই ঠিক হবে।

সুতরাং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট টম জোনস-সাহেবের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রঘুবীর আদেশ জারী করলেন, মিঃ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ইজ হিয়ার বাই নটিফায়েড দ্যাট ইন দি ইন্টারেস্ট অফ সিকিউরিটি অফ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ল অ্যাণ্ড অর্ডার ইন দি রিজিয়ন আপনি ও আপনার সাঙ্গপাঙ্গরা ডেরাডুন শহরে যাবেন না।

ডেরাডুন শহরের প্রান্তে কয়েক শ' দেশী-বিদেশী সিপাহী নিয়ে রঘুবীর মহাত্মাজীকে অভ্যর্থনা জানালেন।

গাড়ী থেকে নেমে একটু মুচকি হেসে গান্ধীজী বললেন, কত দিনের জন্য অতিথি হতে হবে?

রঘুবীর জানালেন, না, না ওসব কিছু না। তবে স্যার, ডেরাডুন শহরটা এড়িয়ে যান।

গান্ধীজী আইনজীবীর মত পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আপনার মহামান্য সরকার মুসৌরী যাবার জন্য নতুন কোন রাস্তা তৈরী করে-ছেন নাকি?

নো স্যার, দিস ইজ দি ওনলি রোড টু মুসৌরী।

তবে কি আমি উড়োজাহাজে......?

গান্ধীজী দলবল নিয়ে এগিয়ে যেতেই রঘুবীর গ্রেপ্তার করে কোর্টে নিয়ে গেলেন। বিচারে 'টিল দি কোর্ট রাইজ......।'

সেই রঘুবীর স্বাধীন ভারতবর্ষের অ্যাম্বাসেডর হয়ে আমেরিকায় গিয়ে বল-লেন, তোমাদের আব্রাহাম লিংকন আর আমাদের গান্ধীজী বিশ্বমানব-সমাজের মুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত। ইতালীতে অ্যাম্বাসে-ডর হবার পর ভ্যাটিকান-প্রধান পোপের কাছে পরিচয়পত্র দেবার সময় বলেছেন, ত্রাণকর্তা যীশুকে আমি দেখিনি। কিন্তু ভারত-ত্রাণকর্তা মহাত্মা গান্ধীকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এই মহামানবের জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়ে আমি মহাপ্রাণ যীশুকে উপলব্ধি করেছি।

রঘুবীর সাহেব অ্যাম্বাসেডর হয়ে নানা-ভাবে দেশসেবা করেছেন। পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। আমরা বাঙালীরা বড়বাজার—পোস্তার হোলসেলার দেখেই কুপোকাৎ। সুতরাং জার্মান-ভারতের সে বাণিজ্য চুক্তির হিসেব রাখাই আমাদের পক্ষে দায়। একশ' পঁয়ত্রিশ বেসিকের কেরাণী বা একশ' পচাত্তরের লেকচারার হয়েই মাটি'র পৃথিবী থেকে যাঁদের উদাস দৃষ্টি নীল আকাশের কোলে উড়ে যায় তাঁদের পক্ষে কি শত-শত সহস্র সহস্র কোটি টাকার বিজনেসের অনু-মান করা সম্ভব? ও'রা বলেন মিলিয়ন, বিলিয়ন। বাঙালী ইন্টেলেকচুয়ালরা খবরের কাগজের প্রথম পাতা পড়েই গরম হন। কিন্তু, যাঁরা ঐ মিলিয়ন-বিলিয়নের প্রসাদ পান তাঁরা খবরের কাগজের প্রথম পাতার চাইতে ভিতরের পাতার স্টক এক্সচেঞ্জ ও কোম্পানী মিটিং'এর রিপোর্ট বেশী পড়েন।

অ্যাম্বেসেডর রঘুবীরের জীবন-সঙ্গি-নীর আদরের ছোট ভাইও খবরের কাগজের ঐ ভিতরের পাতার পাঠক ছিলেন। ভাগ্যবান ছোট শালাবাবু জিজাজীর কাছে একবার আব্দার করেছিলেন, ইন্দো-জার্মান ট্রেডের কিছু একটা পাওয়া যায় না?

'হোয়াই নট? একটু মনে করিয়ে দেবার জন্য দিদিকে বলে দিও।'

রাইন নদীর জলে ওয়াটার জেট লঞ্চে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে দূরের কারখানার চিমনিগুলো চোখে পড়তেই মিসেস রঘুবীর স্বামীকে বলেছিলেন, তোমার মনে আছে আমার ঐ ছোট্ট ভাইয়ের কথা?

'হাঁ জী।'

ক'দিন বাদেই বিখ্যাত এক জার্মান ফার্ম থেকে কোয়েরি এলো, মিলিয়ন মিলিয়ন মার্ক'এর মেসিনারী ইণ্ডিয়াতে পাঠাতে হবে কিন্তু আমরা অফিস খুলব না, রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ ও এজেন্সী দিতে চাই।

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে পাইপটা নামিয়ে রাখলেন রঘুবীর। তারপর বেশ চিন্তিত হয়ে বললেন, এত বড় একটা ব্যাপার, আমাকে একটু ভাবতে হবে।

'বেশ তো ভাবুন না। তবে দেখবেন ঐ ফার্ম যেন আর কোন ফেমাস ওয়েস্টার্ণ এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের কাজ না করে।'

অ্যাম্বাসেডর হাসতে হাসতে বললেন 'ইউ আর মেকিং মাই টাস্ক মোর ডিফিকাল্ট।'

'ইওর একসেলেনসী, অ্যাম্বাসেডর্স আর নট ফর অর্ডিনারী—!'

এক সপ্তাহ পরে তাগিদ এলো অ্যাম্বাসেডরের কাছে। খবর গেল, ইণ্ডিয়াতে খোঁজ-খবর নেওয়া হচ্ছে।

তিন সপ্তাহ পরে অ্যাম্বাসেডর রঘুবীর রিকমেণ্ড করলেন জলান্ধরের ছোট শালার ফার্মকে।

ফরেন সার্ভিসের দুঁচারজন বিশ্বনিন্দুকেরা বলেন, ছোট শালাবাবু গুরু দক্ষিণা স্বরূপ জামাইবাবুকে দিল্লীতে ফ্রেন্ডস কলোনীর একটা আড়াই লাখ টাকার কটেজ উপহার দিয়েছেন।

রঘুবীরের মত আরো অনেক আদর্শ-হীন বীর আছেন ইণ্ডিয়ান ফরেন-সার্ভিসে। অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জী একটু ভিন্ন ধাতুতে গড়া। টেবিলে যদি ফাইলের স্তূপ না থাকে তবে সহকর্মীদের নিয়ে বৈঠক জমান নিজের ঘরে। নানা কথার পর থার্ড সেক্রেটারী হঠাৎ বলে ওঠেন, স্যার, আপনার মত সহজ সরল মানুষ ইণ্টারন্যাশনাল ডিপ্লোম্যাসীতে যে কিভাবে সাকসেসফুল হলেন, তাই ভেবে অবাক হই।

হাসতে হাসতে অ্যাম্বাসেডর জবাব দেন, ভেরী সিম্পল রঙ্গস্বামী।

"To Thomas Moore'এ বায়রন বলেছেন,

Here's a sigh to those who love me.
And a smile to those who hate;
And, whatever sky's above me,
Here's a heart for any fate.

আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—
নিজেরে করিতে গৌরবদান
নিজেরে কেবলই করি অপমান
আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া
ঘুরে মরি পলে পলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।।

এই হচ্ছে ব্যানার্জী সাহেবের জীবন দর্শন। দৃষ্টিটা একটু সুদূর প্রসারী। তাইতো মিশ্র সাহেবের মাতলামীর পিছনে তাঁর অশান্ত স্নেহকাতর পিতৃ-হৃদয়টাই ওর চোখে পড়ে।

'জান তরুণ, এর চাইতে বড় সর্বনাশ, বড় ট্র্যাজেডী মানুষের জীবনে আর নেই। শিশুর জন্মের পর মায়ের বুক স্তন্যরসে ভরে যায়। কিন্তু ভাগ্যের দুর্বিপাকে যদি সে শিশু মায়ের কোল খালি করে হঠাৎ চির-কালের জন্য লুকিয়ে পড়ে তবে ঐ বুকের যন্ত্রণায় মা পাগল হয়ে ওঠেন।'

এবার মুখটা উঁচু করে মিঃ ব্যানার্জি বলেন, ওটা শুধু দেহের যন্ত্রণা নয়, ওর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যর্থ মাতৃত্বের বেদনা।

তরুণ কথা বলতে পারে না। শুধু মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জীর দিকে।

ইন্টার-সেশন পিরিয়ডে ইউনাইটেড নেশনস্ হেড কোয়ার্টার্সে বেশী ভীড় থাকে না। এমন কি ঐ ছোট্ট ক্যাফেটেরিয়াটাও ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যায়। অধিকাংশ দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি-অ্যাম্বাসেডররা হয় ছুটিতে না হয় বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন। ...দের ডিপ্লোম্যাটরাও একটু ঢিলে দেন কাজকর্মে।

সেদিন সকালে ট্রাস্টিশিপ্ কাউন্সিলের একটা ছোট্ট সাব-কমিটির মিটিং ছিল। আধ ঘন্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ...বোই শেষ হয়ে গেল। কয়েক মিনিটের ...ধ্যে অত বিরাট ইউনাইটেড নেশনস হেড-কোয়ার্টারটা প্রায় খালি হয়ে গেল। আট ...লায় ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের ঘরে মিঃ ব্যানার্জী আর তরুণ বসে কথা বলছেন। ...ন্তর্জাতিক রাজনীতির নোংরামি থেকে ...ং যেন ইউনাইটেড নেশনস্ হেড-কোয়া-র্টার্স একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে। তাইতো ...ের কথা, প্রাণের ভাষা বলতে পারছিলেন অ্যাম্বাসেডর সাহেব।

দৃষ্টিটা হাডসন নদীর এপার-ওপার ...য়ে ঘুরিয়ে এনে নীল আকাশের কোলে ...দ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন মিঃ ব্যানার্জী। ...ভলভিং চেয়ারটা একটু নাড়াতে নাড়াতে ...ললেন, মিশ্রকে দেখলে বড় কষ্ট হয়। ...কে কাছে পেলে ওর মনের শূন্যতা, ব্যর্থ ...ত্বের জ্বালা যেন আমাকে আরো বেশী ...পসেট করে দেয়।

মিসেস ব্যানার্জী ভারতে পারেননি ...নার্জী সাহেব এখনও ইউ এন'এ আছেন। ...দের ফ্ল্যাটে ফোন করে জবাব না পেয়ে ভাবলেন নিশ্চয়ই ওরা দুজনে কোন জরুরী কাজে আটকে পড়েছেন। ওদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়েই এয়ারপোর্ট রওনা হতে হবে। তাইতো মিশ্রকে ফোন করলেন। 'ভাইসাব, ব্যানার্জী সাহেবের কি খবর বলো তো?'

'কেন এখনও ফেরেননি?'

'না। কোন জরুরী কাজে গিয়েছেন কি?'

'তেমন কোন জরুরী কাজের কথা তো আমি জানি না। আচ্ছা একবার তরুণকে ফোন করছি।'

'তরুণও বাড়ীতে নেই......!'

মিসেস ব্যানার্জীর কথা শেষ হবার আগেই মিঃ মিশ্র বললেন, দেন ডোণ্ট ওরি। দুজন সেন্টিমেন্টাল বেঙ্গলী ঠিক কোথাও বসে আকাশ দেখছেন, না হয় আমার দুঃখের ব্যালান্স-সীট মেলাচ্ছেন।'

মিশ্রের কথা শুনে মিসেস ব্যানার্জীও হেসে ফেলেন। 'তাহলে ভাই একটু দেখুন না। আবার তাড়াতাড়ি লাঞ্চ খেয়ে রীণাকে আনতে...।'

'তাতে ব্যানার্জী সাহেবের কি? সে তো আমার আর আপনার চিন্তা।'

মিশ্র টেলিফোন নামিয়ে রেখে আর দেরী করলেন না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির হলেন ইউ এন'এ। গাড়ী পার্ক করতে গিয়ে দেখল দুটি পরিচিত গাড়ী প্রায় পাশাপাশি রয়েছে। অ্যাম্বাসেডর সাহেবের ড্রাইভারটাও কোথাও আড্ডা দিতে গেছে। মিশ্র দুষ্টুমি করে এমনভাবে নিজের গাড়ীটা পার্ক করলেন যে ঐ দুটি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। লিফট দিয়ে উঠতে উঠতে যদি ঐ দুজন সেন্টিমেন্টাল বাঙালী নেমে আসেন, তাহলে বুঝবেন, যার সুখ-দুঃখের ব্যালান্স-সীট তৈরী করতে ওরা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন, সে এসে গেছে।

অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জীর ঘরের সামনে এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে দাঁড়ালেন মিঃ মিশ্র। একবার ভাবলেন নক্ করবেন; আবার ভাবলেন, না-না ওসব ফর্মালিটির কি দরকার।

আস্তে দরজাটা ঠেলে মিশ্র ভিতরে ঢুকতেই দুজনেই অবাক!

অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জী আর তরুণ প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'মিশ্র ইউ আর হিয়ার?'

হাসি মুখে মিশ্র জবাব দেয়, 'হোয়াট এলস কুড আই ডু?'

একবার নিজের হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মিশ্র অ্যাম্বাসেডর সাহেবকে বললেন, 'স্যার মিসেস ব্যানার্জি বলছিলেন আপনাকে খাইয়ে-দাইয়ে তবে উনি এয়ার-পোর্ট—!'

'ও, তাই তো!'

তাড়াহুড়ো করে সবাই উঠে পড়লেন। নীচে এসে গাড়ীতে উঠবার সময় মিঃ ব্যানার্জী বললেন, তোমরাও বরং আমার ওখানেই চল। হোয়াট এভার ইজ দেয়ার, উই উইল শেয়ার ইট।'

মিশ্র হাসতে হাসতে বললেন, 'স্যার, রীণাকেই যখন প্রায় আমাকে দিয়ে দিয়েছেন তখন আর খাওয়া-দাওয়া শেয়ার করতে লজ্জা কি?'

মিশ্র আর মিসেস ব্যানার্জী এয়ারপোর্টে হাজির হবার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, বি-ও-এ-সি অ্যানাউন্স দি অ্যারাই-ভাল অফ ফ্লাইট সিক্স-জিরো-ওয়ান ফ্রম লণ্ডন!

রীণা টিপ করে মাকে একটা প্রণাম করেই মিঃ মিশ্রকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি জানতাম আংকল, তুমি আসবেই!'

রীণার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে মিশ্র উত্তর দিলেন, 'তোমরা যা এক-একটা বিচ্ছু শত্রু! তোমাদের কি চোখের আড়ালে রাখা যায়?'

রীণা আংকলের মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলছে।

মিশ্র একগাল হাসি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ডোণ্ট ওরি ডিয়ার ডার্লিং মামি!'

মিসেস ব্যানার্জীর মুখ খুশীর আলোয় ভরে গেলেও একটু যেন বিরক্তির সুরে বললেন, 'আংকলকে বিরক্ত করা শুরু হলো, তাই না?'

আংকল মনে মনে হাসেন। ভাবেন, পৃথিবীর সব রীণারাই যদি ওর গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে কানে ফিস ফিস করে অমন আব্দার করত, তাহলে হয়ত অমলাকে—!

সেদিন রাত্রে মিশ্রের থার্টি-টু স্ট্রীট ও ইস্টের ফ্ল্যাটে বিরাট উৎসবের আয়োজন হলো রীণার অনারে। অ্যাম্বাসেডর ও মিসেস ব্যানার্জী ছাড়াও ইণ্ডিয়ান ডেলি-গেশনের প্রায় সবাই এলেন।

নবাগত ইনফরমেশন অ্যাটাচি ভার্মা তরুণকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল 'কি ব্যাপার, মিঃ মিশ্রের এমন ডিনারে কোন ড্রিংকস নেই?'

'রীণার সামনে উনি ড্রিংক করেন না।'

'কেন?'

'বলে মেয়ের সামনে ড্রিংক করা উচিত না। তাছাড়া—!'

'তাছাড়া কি?'

'তাছাড়া বলেন, রীণাকে কাছে পেলে ও'র আর কোন দুঃখ থাকে না, সুতরাং ড্রিংক করবেন কেন?'

এত বিরাট ব্যাপক আয়োজন। তরুণ খাবে কি? শুধু মুগ্ধ হয়ে দেখে মিশ্রকে। কপালের সেই চিন্তার রেখাগুলো কোথায় যেন লুকিয়ে পড়েছে, ক্লান্ত মানুষটির বিষণ্ণ শূন্য দৃষ্টি যেন আর নেই। কাজকর্মের পর যে মিশ্র রোজ সন্ধ্যার পর নিজেকে ভুলে যায়, স্থবির হয়ে বসে বসে শুধু বোতল বোতল মদ গেলেন, তিনি যেন নব-যৌবন ফিরে পেয়েছেন। কত চঞ্চল, কত প্রাণবন্ত! কত সুন্দর, কত প্রিয়!

তরুণ এগিয়ে গেল অ্যাম্বাসেডর ব্যানার্জীর কাছে। 'স্যার, আপনি বাড়ী যাবেন না? রাত্রেই তো সব পেপার্স ঠিক-ঠাক করে রাখতে হবে, নয়ত কাল যাবেন কি করে?'

'যাব কি, এখনও খাওয়াই হয়নি।'

'সে কি?'

'আজ কি আমাকে দেখার সময় আছে মিশ্রের?' অ্যাম্বাসেডর হাসতে হাসতেই বললেন।

তরুণও হাসে। 'তা ঠিকই বলেছেন স্যার। রীণাকে কাছে পেলে উনি প্রায় পাগল হয়ে ওঠেন।'

একটা ছোট্ট চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন অ্যাম্বাসেডর। তারপর বললেন, 'রীণাকে নিয়ে ওর মাতামাতি দেখতে বেশ লাগে। জান তরুণ, নিজের স্ত্রীকে, নিজের সন্তানকে তো সবাই ভালবাসে। কিন্তু যখন আর পাঁচজনে ওদের ভালবাসে তখনই তো সত্যিকার সার্থকতা।'

তরুণ কোন জবাব দেয় না। অ্যাম্বা-সেডর ব্যানার্জীর হৃদয়বত্তা মুগ্ধ করে ওকে।

'তাছাড়া আর একটা দিক আছে। যাঁরা অন্যের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, স্নেহ করে তাঁদের মহত্বের কি তুলনা হয়?'

ডিসআর্মামেন্ট কন্ট্রোল কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য মিঃ ব্যানার্জী পরের দিন জেনেভা চলে গেলেন।

রীণার পনের দিনের ছুটি ফুরোতেও সময় লাগল না। মিশ্র আবার ফিরে পেলেন তাঁর পুরানো দিনের যন্ত্রণা আর মদের বোতল। তরুণ ফিরে পেল তাঁর ছন্দহীন জীবন।

পনেরো দিন তরুণ শুধু দেখেছে মিশ্রের পাগলামী, আত্মভোলা মানুষটির অন্ধ স্নেহ। মনে মনে ভক্তি করেছে, শ্রদ্ধা করেছে ঐ মাতালটিকে, যাঁকে একদল ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টস বলে ডিবচ, স্কাউণ্ড্রেল ও আরো কত কি!

টেলিভিশনের পর্দায় বেস বল খেলা নিয়ে অতগুলো লোকের হৈ-চৈ শুনতে বড় বেসুরো লাগল। সুইচটা অফ করে কোনার সিঙ্গল সোফাটায় চুপ করে বসে পড়ল তরুণ।

আকাশ-পাতাল চিন্তা এলো মনে। আস্তে আস্তে চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে গেল। দুনিয়াটা ধোঁয়াটে, ঘোলাটে মনে হলো। ভাবতে ভাবতে কোথায় তলিয়ে হারিয়ে গেল ডিপ্লোম্যাট তরুণ মিত্র। আস্তে আস্তে মনের পর্দায় কতকগুলো আবছা মূর্তি এসে ভীড় করল। কখন যে ঐ ভীড় সরিয়ে ইন্দ্রাণীর মূর্তিটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল, তরুণ তা বুঝতে পারল না।

নিঃসঙ্গ তরুণ মাঝে মাঝেই এমনি দেখা পায় ইন্দ্রাণীর। মনে মনে কত কথা বলে, ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখে। মাঝে মাঝে ওর ফাঁকা ফ্ল্যাটে এমন চিৎকার করে যে পাশের ফ্ল্যাটের মিসেস রজার্স না ছুটে এসে পারেন না।

'মিট্রা! ইউ অয়ার শাউটিং টু সামবডি?'

লজ্জিত তরুণ বলে, 'আই অ্যাম সরি, মিসেস রজার্স।'

'সরি হবার কিছু নেই, তবে তুমি তো ভীষণ চুপচাপ থাকো। তাই হঠাৎ তোমার চেঁচামিচি শুনে।'

সেদিন বোধহয় রজার্স পরিবার কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। তাই মিসেস রজার্স ছুটে এলেন না। 'বাজারের আওয়াজ শুনে তরুণের চিৎকার থেমে গেল। তারপর দরজা খুলে যাঁকে দেখল, তিনিই মিঃ মিশ্র।

'তুমি ইন্দ্রাণীকে এত ভালবাস?'

তরুণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মিঃ মিশ্রের প্রশ্নের কি জবাব দেবে সে? চুপ করে রইল।

মিঃ মিশ্র তরুণের কাঁধে দুটি হাত রেখে একটু ঝাকুনি দিয়ে বললেন, এত ভালবাসা তোমার মধ্যে চাপা আছে? আমি তো বোতল বোতল মদ খেয়েও ঐ অমলার মুখখানা ভুলতে পারি না। তুমি তো আমার মত মাতাল নও কিন্তু কি করে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে এই জ্বালাকে চেপে রাখ তরুণ?'

তরুণ এবার মুখ তুলে জানতে চায়, 'আমি কি খুব বেশী চিৎকার করছিলাম?'

মিশ্রের মুখেও হাসির রেখা ফুটে ওঠে। 'চল চল ভিতরে গিয়ে বসা যাক।'

তরুণের পিছন পিছন প্যাসেজ দিয়ে ড্রইংরুমের দিকে এগুতে এগুতে মিশ্র বলেন, 'আমিও মাঝে মাঝে একলা থাকলে চিৎকার করে অমলাকে কত কথা বলি।'

'তাই বুঝি?'

ড্রইংরুমে বসার পর মিশ্র বললেন, 'অমলা মারা গেলেও হারিয়ে যায়নি আমার জীবন থেকে, মন থেকে। কথা না বলে থাকব কেমন করে বলো?

হঠাৎ মিশ্র পাল্টে গেলেন। 'যাকগে ঐ হতচ্ছাড়ী বোকা মেয়েটার কথা বলতে গেলেও আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। বাদ দাও ওসব। গিভ মী এ গ্লাস অফ স্কচ।

দু' গেলাস স্কচ নিয়ে এলো তরুণ।

মিশ্র স্কচের গেলাসটা তুলে ধরে বললেন, ফর এ্যান আর্লি অ্যাণ্ড হ্যাপি রি-ইউনিয়ন অফ টরুণ উইথ হিজ ইটারনাল লাভার, ইন্দ্রাণী!

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। সেণ্টার টেবিলে গেলাসটা নামিয়ে রেখে তরুণ এগিয়ে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে ধরে বলল মিট্রা হিয়ার।...কে? মালকানী? ইয়েস খবর কি?

মালকানীর কথা শুনে তরুণ বলল 'এক্ষুনি মেসেজ এলো? দ্যাটস অল? থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই তরুণ মিশ্রকে জানাল, 'মালকানী' জানাল এক্ষুনি মেসেজ এসেছে আমাকে বার্লিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে।'

মিশ্রও গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন 'তাহলে তুমি চললে!'

তরুণ দৃষ্টিটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবছিল।

'এমার্সনের Conduct of Life পড়েছো তো নিশ্চয়ই। মনে পড়ে সেই লাইনটা?

তরুণ জবাব দেয় না, চুপ করেই বসে রইল।

মিশ্রও উত্তরের অপেক্ষা না করে আপন মনে আবৃত্তি করল,

He who has a thousand friends has not a friend to spare.

একটু চুপ করে স্কচের গেলাসে এক চুমুক দিল। 'আমারও হয়েছে তাই।'

এবার তরুণ একটু হেসে গেলাসটা তুলে নিল। এক চুমুক দিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিল। 'এমার্সন তো ওমর খৈয়ামকে বেস করেই ঐ কথা লিখেছেন। ওমর খৈয়ামের আরো কটা লাইন মনে পড়ছে—

মিশ্র কোন কথা না বলে আবার এক চুমুক খেয়ে চেয়ে রইল তরুণের দিকে।

তরুণ আবৃত্তি করল:

The Moving Finger writes; and having writ
Moves on: nor all our Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a line.
Nor, all ... Tears wash out a Word of it.

'ঠিক বলেছ তরুণ, ডিপ্লোম্যাট হয়েও স্বীকার করতে বাধ্য হই যে সব কিছুই যেন বিধির বিধান!'

।। ছাপ্পান্ন ।।

সারমোরের মৃত্যুর পর ক'মাস আর। ভারতবর্ষের ভাগ্য একদিন স্থির হয়ে গেল। কত কালের সুপ্রাচীন এই দেশ! সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট তাকে কেটে দু টুকরো করে ফেলা হবে। এক ভাগ হবে পাকিস্তান। আরেক ভাগ হবে আবহমান কালের পুরনো নামটাই ধরে থাকবে—ভারত।

খবর পেয়ে মোতাহার হোসেন সাহেব ছুটে এলেন। রাস্তা থেকে বাগানে পা দিয়েই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন 'হেমদাদা—হেমদাদা—'

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। দেশভাগ নিয়ে বিনুর সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। চমকে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন 'কে, মোতাহার?'

'হ্যাঁ।'

'আয় আয়—'

মোতাহার সাহেব ঘরে এসে তক্তপোষে বসলেন। তাঁকে খুবই বিমর্ষ দেখাচ্ছে। বললেন, 'খবর শুনেছেন?'

কোন্ খবরের কথা তিনি বলছেন হেমনাথ বুঝতে পারলেন। বললেন, 'শুনেছি। তোর ছাত্রের সঙ্গে তা-ই নিয়েই আলোচনা করছিলাম।'

মোতাহার সাহেব বললেন, 'শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ আর জিন্নারই তা হলে জয় হল।'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন হেমনাথ, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন হেমনাথ, 'কী?'

প্রথমটা উত্তর দিলেন না মোতাহার সাহেব; অন্যমনস্কের মতন জানলার বাইরে ধু-ধু ধানখেতের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত সুরে বলতে লাগলেন, 'দেশটা দু'টুকরো হবে বলেই কি এত দিন ধরে এত মানুষ সংগ্রাম করল, এত মানুষ জেল খাটল, হাজার হাজার সোনার ছেলে প্রাণ দিল। না হেমদাদা এ আমরা চাই নি। এ আমরা চাই নি।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না, বিমর্ষ মুখে নীরব বসে রইলেন।

মোতাহার সাহেবের উত্তেজনা অস্থিরতা ক্রমশ বাড়তেই লাগল। তিনি বলতে লাগলেন, 'কোন্ থিওরীর ওপর দেশটা ভাগ হতে চলেছে, ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

বুঝতে না পেরে হেমনাথ শুধোলেন, 'কোন থিওরীর কথা বলছিস মোতাহার?'

'জিন্নার টু নেশন থিওরী।' প্রবল আক্ষেপের গলায় মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন 'সারা জীবন একতার কথা বলে শেষে কিনা দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষ গিলতে হল।'

হেমনাথ চুপ।

মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, দেশভাগই যদি মেনে নেওয়া হল, আগে মানলেই হত। এত রক্তারক্তি, এত দাঙ্গা, এত এত হত্যা-ধর্ষণ-আগুন—কোনটাই ঘটত না।'

'তা ঠিক।'

'নেতারা খেয়ালের বশে যা করলেন তার পরিণাম ভাল হবে না। দেশভাগের পেছনে কী আছে লক্ষ্য করেছেন হেমদাদা?'

'কী আছে?'

'ঘৃণা, বিদ্বেষ আর শত্রুতা।'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন হেমনাথ।

মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'দেশ যদি সত্যি সত্যিই ভাগ হয়, হিন্দু-মুসলমানকে চিরকাল ঐ তিনটে জিনিসের জের টেনে চলতে হবে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর মোতাহার সাহেবই আবার শুরু করলেন, 'আপনার কী মনে হয় হেমদাদা?'

'কি ব্যাপারে?'

'দেশভাগ কি শেষ পর্যন্ত হবে?'

'তার মানে—' হেমনাথ অবাক, সব স্থির হয়ে গেছে। একটা সেটেলড্ ফ্যাক্টকে আনসেটেল্ড করা যাবে কি করে?'

হেমনাথের কথা বুঝি বা শুনতে পেলেন না মোতাহার সাহেব। তাঁর বুকের ভেতর এই মুহূর্তে কোন্ হাওয়া বইছে, কে জানে। দূরমনস্কের মতন তিনি বললেন, 'আমার কি মনে হয় জানেন হেমদাদা?'

'কী?'

দেশটাকে আটকে যাবে।'

'দেশের মানুষ। নেতাদের এই হঠকারি তারা কিছুতেই কোনমতেই মেনে না। আপনি দেখে নেবেন।' মোতা সাহেবের চোখ জ্বলতে লাগল। হাত মু বন্ধ; চোয়াল কঠিন।

এমনিতেই মোতাহার সাহেব মান বেশ গম্ভীর। তাঁর চোখ এত উজ্জ্বল গভীর যে, সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় দেখলেই ভয় লাগে, আবার ভক্তিও

কিন্তু খুব কাছাকাছি এলে টের প যায় গাম্ভীর্যটা আসলে তাঁর ছদ্ম মাটির ঠিক তলাতেই সুশীতল রয়েছে; সামান্য খুঁড়লেই ফিনকি ফোয়ারা বেরিয়ে আসবে।

বাইরে কঠিন ভেতর সরস, এই মা আজ কিন্তু অস্থির, উদভ্রান্ত, দুরন্ত মাটি খুঁড়লে আজ আর ফোয়ারা না; পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আগুন হয়ে আসবে।

●

শেষ পর্যন্ত দেশজোড়া রক্তাক্ত স গায়ে সেই দিনটি ভূমিষ্ঠ হল—প আগস্ট, উনিশ শ সাতচল্লিশ। দেশের ওপর দিয়ে স্বাধীনতার ঘর্ঘরিয়ে।

মোতাহার সাহেব দেশবাসীর ভরসা রেখেছিলেন; তারা দেশভ করবে। জননীর মতন গরীয়সী এই ভূমির দেহে ছুরি বসাতে দেবে না। সব বৃথা, সব বৃথা। হায় রে দুর্ভাগ

এই মুহূর্তে দেশের সব মানু অন্ধ, আচ্ছন্ন। দু হাতে দুরের জি বার মতন শক্তিটুকু পর্যন্ত তাদের জননীদেহ কেটে-কুটে ভাগাভাগি নেওয়া ছাড়া তারা আর কিছু পারছে না।

মোতাহার সাহেবের মতন চারজন আছেন, যাঁদের দৃষ্টি সময়ের সমস্ত অন্ধকার, সংশয় এবং সরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছয় শুধু অসীম দুঃখে দুরন্ত মূক হয়ে গেছেন। এ তাঁরা চান না

যাই হোক, পনেরই আগস্ট ভোর কয়েক ঘণ্টা আগে 'পাকিস্তান ডে করা হয়েছিল।

চোদ্দই আগস্টের মাঝরাত রাজদিয়ার চোখে আর ঘুম নেই। থেকে কত ব্যান্ড পার্টি যে আনা এই নগণ্য শহরের সব রাস্তা ঘুরে তারা বাজিয়ে চলেছে।

রাজদিয়ার চোখ থেকে ঘুম তো ঘরেও আর কেউ নেই। বাজনার সবাই সদরে বেরিয়ে এসেছে। বিনু বিনুকে নিয়ে হেমনাথও বাগান ক'বার যে রাস্তায় এলেন তার নেই।

এক সময় ভোর হল।

এবার ব্যান্ড পার্টির সঙ্গে মিছিল। মিছিল কি এক-আধটা! পোশাক-পরা ছোট ছোট কিশোর

যুবতীদের মিছিল। প্রতিটি মিছিল চাঁদ-তারা-আঁকা সবুজ পতাকা আর নেতাদের ছবি দিয়ে সুসজ্জিত।

মিছিলগুলো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ধ্বনি দিচ্ছে।

'কায়েদে আজম—'

'জিন্দাবাদ।'

'পাকিস্তান—'

'জিন্দাবাদ—'

যেভাবে আর যে মূল্যেই হোক, স্বাধীনতা এসেছে। যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর কণ্ঠস্বর আর ব্যান্ড-পার্টির বাজনা আকাশে-বাতাসে বিচিত্র উন্মাদনা ছড়িয়ে দিচ্ছিল। হেমনাথ আর বাড়ি বসে থাকতে পারলেন না। বিনুকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

মিছিলের পর মিছিল পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এবং শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে এক সময় সারি সারি মিষ্টির দোকান, স্টিমারঘাটা, বরফ কল পেরিয়ে তাঁরা স্কুলবাড়ির কাছে চলে এলেন।

মিষ্টির দোকান, স্টিমারঘাটা, বরফ কল কিংবা রাজদিয়ার যত বাড়িঘর—সবার মাথায় সবুজ পতাকা উড়ছে। স্টিমারঘাটটাকে ফুল-পাতা আর রঙীন কাগজ দিয়ে চমৎকার করে সাজানো হয়েছে। তা ছাড়া রাস্তায় কুড়ি পঁচিশ হাত দূরে দূরে একটা করে তোরণ চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু মঞ্চ বানিয়ে নহবত বসানো হয়েছে। সেখানে সানাই বাজছে।

আজকের এই দিনটা যে আর সব দিনের চাইতে আলাদা, রাস্তায় পা দিয়েই তা টের পাওয়া যায়। এই রাজদিয়ার ওপর দিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ দিন এসেছে, গেছে। কিন্তু এমন দিন আর কখনও আসে নি। উদাসীনভাবে অন্যমনস্কের মতন একে যেন পেতে নেওয়া যায় না, বিপুল সমারোহে একে বরণ করে নিতে হয়।

যাই হোক স্কুলবাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'হেম-দা—হেমদাদা—'

বিনুরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিক-ওদিক তাকাতেই ডানধারে তারা মোতাহার হোসেন সাহেবকে দেখতে পেল।

স্কুলবাড়ির ঠিক গায়েই কংগ্রেস অফিস ...ক দরজায় মোতাহার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই তিনি হাতছানি দিলেন। মোতাহার সাহেব এবং তাঁর দু-একজন সঙ্গী ছাড়া কংগ্রেস অফিস এখন একেবারে ফাঁকা।

বিনুরা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল।

মোতাহার সাহেব বললেন, 'আজ এত কাল সকাল বেরিয়ে পড়েছেন হেমদাদা?'

হেমনাথ হাসলেন, 'ব্যান্ড পার্টির আওয়াজে আর মিছিলের চিৎকারে ঘরে থাকা গেল না যে—'

'আপনাকে যেন ভারি খুশী দেখাচ্ছে—'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে হেমনাথ বললেন, 'রাজদিয়ার সব লোক বেরিয়ে পড়েছে। আমি আর কি করে ঘরে বসে থাকি বলুন?'

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ গলায় মোতাহার সাহেব বলতে লাগলেন, 'এত বড় একটা ট্র্যাজেডি ঘটে গেল, যার পরিণাম কী হবে কেউ বলতে পারে না। আর আপনি মিছিল দেখবার জন্যে, আনন্দ করবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন! আপনার কাছে এ কিন্তু আশা করিনি হেমদাদা—'

একটু চুপ করে থেকে হেমনাথ বললেন, "যা হবার তা তো হয়েই গেছে। তার জন্যে মনে দুঃখ রেখে কী লাভ? হয়তো এতে ভালই হবে। দেশজুড়ে যে রক্তারক্তি আর হত্যা চলছিল তা চিরদিনের মতন বন্ধ হয়ে যাবে। যা এসেছে তাকে প্রসন্ন মনেই গ্রহণ কর মোতাহার।'

মোতাহার সাহেব খুব একটা সান্ত্বনা পেয়েছেন, এমন মনে হল না। ক্ষোভ, বিষাদ, দুঃখ—সব একাকার হয়ে তাঁর মুখখানাকে মলিন করে রাখল।

বিনু অবাক হয়ে হেমনাথকে দেখছিল। আজই শুধু না, রাজদিয়ায় আসার পর থেকেই দাদুকে দেখছে সে। ভালমন্দ শুভাশুভ যাই সামনে এসে দাঁড়াক তাকে তিনি সানন্দে, পরম উদারতার সঙ্গে বুকে তুলে নিতে পারেন। তাঁর চরিত্রের মূলমন্ত্র এখানে প্রোথিত।

হেমনাথ বললেন, 'এখন চলি রে মোতাহার—'

মোতাহার হোসেন উত্তর দিলেন না।

হেমনাথ আবার বললেন, 'আমাদের সঙ্গে তুই যাবি?'

নীরস সুরে মোতাহার সাহেব জানালেন, 'না।'

আবার বড় রাস্তায় এসে পড়ল বিনুরা। পূর্বদিকে খানিকটা গেলেই সেটেলমেণ্ট অফিসের পাশে মুসলিম লীগের অফিস। লীগের অফিসটাকে আজ আর চেনাই যায় না। ফুলে পাতায় রঙীন কাগজে আর অসংখ্য সবুজ পতাকায় তার চেহারা বদলে গেছে। কত মানুষ যে সেখানে ভিড় জমিয়েছে লেখাজোখা নেই। লীগের অফিসটা ঘিরে এই মুহূর্তে যেন মনোহর এক উৎসব চলছে।

হঠাৎ কংগ্রেস অফিসটার কথা মনে পড়ে গেল বিনুর। একটু আগেই সেখান থেকে তারা এসেছে। মুসলিম লীগের এই উৎসব-মুখর জমকালো বাড়িটার তুলনায় তার দৃশ্য বড় করুণ, এবং নিষ্প্রভ অথচ কদিন আগেও কংগ্রেস অফিসেই ভিড় লেগে থাকত, রাতারাতি সব বদলে গেছে।

লীগ অফিসের কাছে আসতেই রজবালি সিকদার ছুটে এল। তার দেখাদেখি আরো অনেকে। এসেই রজবালি হেমনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। সে বলল, 'আপনে আইছেন হ্যামকত্তা।' দেখেও সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

সহজ গলায় হেমনাথ বললেন, 'হ্যাঁ, এলাম। পার্টিশনের পর এ দেশ যদি পাকিস্তান হয়ে থাকে, আমরা তা হলে পাকিস্তানী। এমন দিনে আমরা আসব না?'

অভিভূত স্বরে রজবালি সিকদার বলল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়—'

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে কেউ গা আছস, গুলাপ (গোলাপ) জল লইয়া আয়, হ্যামকত্তারে দে—'

একজন ছুটে গিয়া রুপোর পিচকিরিতে গোলাপ জল এনে বিনুদের মাথায় ছিটিয়ে দিল। শুধু বিনুরাই নয়, হিন্দু-মুসলমান যারাই লীগ অফিসের কাছে আসছে তাদেরই বুকে জড়িয়ে ধরা হচ্ছে, গোলাপ জলে সিক্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

রজবালি বলল, 'পাকিস্থান হইয়া গেছে। আইজ থনে আপনাগো লগে আমাগো কাইজা বন্ধ।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার সঙ্গে কিন্তু কোনকালেই কারো ঝগড়া নেই।'

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে রজবালি বলল, 'আপনের কথা কই না হ্যামকত্তা—'

'তবে?'

'হিন্দু গো কথা কই।'

'আমি বুঝি হিন্দু না!'

রজবালি বলল, 'আপনের লগে কার কথা! আপনে হিন্দুও না, মুসলমানও না। আপনে সগলের হ্যামকত্তা—' তার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপতে লাগল।

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হেমনাথ বললেন, 'এখন যাই রে রজবালি—'

'এখনই যাইবেন?'

সূর্য উঠে গিয়েছিল। সকালের নরম সোনালী রোদ নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে টলমল করে চলেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে শঙ্খচিল উড়ছিল। মাসটা যদিও শ্রাবণ, আজকের আকাশ আশ্চর্য উজ্জ্বল, পালিশ-করা নীল আয়নার মতন তার গা থেকে দীপ্তি ঠিকরে বেরুচ্ছে। আর আছে ভারহীন ভবঘুরে মেঘ। উল্টোপাল্টা পুবে বাতাস তাদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে একবার এদিকে, আবার ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে।

হেমনাথ বললেন, 'সেই কখন বেরিয়েছি কত বেলা হয়ে গেছে।'

রজবালি বলল, 'এমনে এমনে শুকনামুখে যাইতে পারবেন না, আইজের দিনে উট্টু মেঠাই মুখে দিয়া যাইবেন।'

'এখন মিষ্টিটিষ্টি খেতে পারব না বাপু।'

'তয় বাইন্ধা দেই, বাড়িত নিয়া যাইবেন।'

হেমনাথ হাসতে হাসতে বললেন, 'ছাড়বি না যখন, তখন দে। বাড়ি নিয়েই যাব।'

দেখা গেল, হেমনাথদেরই শুধু না, যারাই লীগ অফিসের কাছে আসছে মিষ্টিমুখ না করে কেউ ছাড়া পাচ্ছে না।

রজবালি নিজের হাতে মিষ্টির একটা হাঁড়ি এনে হেমনাথকে দিল। তারপর বলল, 'বিকালবেলা কোর্টপাড়ার মাঠে আইসেন।'

রাজদিয়ায় ফৌজদারি আর দেওয়ানী আদালত দুটো পাশাপাশি। তার সামনে মস্ত মাঠ। হেমনাথ শুধোলেন, 'সেখানে কী?'

বিজ্ঞানের কথা

কি এবং কেন (১৩) : কৃত্রিম রাবার

আধুনিক জগতে রাবার একটি অতি-প্রয়োজনীয় বস্তু। বিশেষকরে যানবাহনের ক্ষেত্রে রাবার প্রায় অপরিহার্য। এই রাবার বস্তুটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর। আমরা ইতিহাসে পড়েছি, কলম্বাস ভারত-বর্ষের পথ খুঁজতে গিয়ে আমেরিকায় এসে পৌঁচেছিলেন এবং সেই দেশটিকেই তিনি "ভারতবর্ষ" বলে ভেবেছিলেন। সেখানকার অধিবাসীদের একরকম গাছের রস ব্যবহার করতে তিনি দেখেছিলেন —যার কয়েকটি বিশেষ গুণ তাঁকে আকৃষ্ট করে। যেমন—কোন বস্তুর ওপর ঐ রসের প্রলেপ শুকিয়ে নিলে সেটা জলে ভেজে না, আবার ঐ রসের জমানো টুকরো মাটিতে ফেললে সেটা লাফিয়ে ওঠে। (আমরা আজ জানি এই গুণকে স্থিতিস্থাবকতা বলা হয়)। আবার ঐ রসের জমানো টুকরো দিয়ে ঘষে কালি বা পেন্সিলের দাগ মুছে ফেলা যায়। এই শেষোক্ত গুণটির জন্যে বস্তুটির নাম দেওয়া হয় রাবার।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর বহু যুগ কেটে গেছে। তারপর নানা স্থানে রাবার গাছ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তার চাষ হচ্ছে। রাবারের বহু গুণ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার জন্যে আজকাল রাবারের মূল্য ব্যব-সায়িক এবং বৈজ্ঞানিক উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট বেড়ে গেছে। কিন্তু বর্তমানে রাবা-রের যা চাহিদা তা প্রকৃতিতে উৎপন্ন রাবারের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয় এবং সব দেশে রাবার গাছ পাওয়াও যায় না বা চাষ করা সম্ভব নয় বলে কৃত্রিম উপায়ে রাবার প্রস্তুতের জন্যে বিজ্ঞানীদের চিন্তা করতে হয়।

কৃত্রিম উপায়ে রাবার প্রস্তুতের জন্যে প্রায় এক শতাব্দী ধরে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা চিন্তা ও পরিশ্রম করেছেন। ১৮২৬খৃষ্টাব্দে মাইকেল ফ্যারাডে প্রথম প্রাকৃতিক রাবার বিশ্লেষণ করে দেখান, কার্বন এবং হাই-ড্রোজেন এই দুটি মৌলের দ্বারা রাবার গঠিত এবং এদের অনুপাত হচ্ছে ৫ : ৮। অর্থাৎ প্রাথমিক সূত্র হিসাবে বলা যায় একটি রাবার অণুতে আছে ৫টি কার্বন এবং ৮টি হাইড্রোজেন পরমাণু। পরবর্তী কালে ডুমাস, হিমলি, লিবিগ, ডালটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ফ্যারাডের আবিষ্কার সমর্থন করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে গ্রেভিলে উইলিয়ামস প্রথম রাবার থেকে ৫টি কার্বন ও ৮টি হাইড্রোজেন পরমাণু সমন্বয়ে গঠিত বস্তুটি পৃথক করতে সমর্থ হন এবং এক নাম দেন 'আইসোপ্রিন।' পরবর্তীকালে দেখা গেল, রাবারে এইরকম লক্ষাধিক আই-সোপ্রিন একক রয়েছে। এই আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন—যেহেতু [illegible] লক্ষাধিক আইসোপ্রিন পাওয়া (কৃত্রিম উপায়ে তৈরী) সংযোগ করা যায়, তাহলে কৃত্রিম উপায়ে রাবার প্রস্তুত করা যেতে পারে। রসায়নশাস্ত্রের ভাষায় এই সংযোগ ক্রিয়াকে বলা হয় বহুগুণন প্রক্রিয়া বা পলিমারিজেশন এবং এই প্রক্রিয়ায় যে যৌগিক বস্তুটি উৎপন্ন হয় তাকে বলে পলিমার।

কৃত্রিম রাবার প্রথম প্রস্তুত হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। ওয়ালাক নামে জনৈক বিজ্ঞানী দেখান, অনেকদিন ধরে যদি আই-সোপ্রিন (যা তিনি তার্পিন তেল থেকে তৈরী করেছিলেন) আলোয় একটা বন্ধ কাঁচের পাত্রে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে সেটা ক্রমশ শক্ত রাবারের মতো বস্তুতে পরিণত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে টেলডেনও আইসোপ্রিন থেকে কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত করেন।

জার্মানীতে হফম্যান এবং কাউটেল আইসোপ্রিনকে ৮দিন ধরে ২০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম করে কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত করেন। ১৯১০ সালে হ্যারিস অ্যাসেটিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে আই-সোপ্রিনকে ৮ দিন ধরে ১০০ ডিগ্রী সেঃ তাপমাত্রায় গরম করে কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত করেন।

আইসোপ্রিন শ্রেণীর আর একটি সভ্য হচ্ছে বুটাডাইন, এর অণু ৪টি কার্বন এবং ৬টি হাইড্রোজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত। ১৯১০ সালে রাশিয়ায় লেবেডেভ বুটাডাইন থেকে কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত করেন। রাশিয়ায় বেশির ভাগ কৃত্রিম রাবার এই উপায়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে। আর এক-জন রুশ বিজ্ঞানী অস্ট্রোমিসলেনস্কি আই-সোপ্রিন এবং অ্যালকোহল থেকে এক উন্নত-তর উপায়ে কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত করেন।

যদিও কৃত্রিম রাবার প্রস্তুতের গবেষণা বিশেষভাবে রাশিয়ায় ও ইংলণ্ডে চলেছিল, কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এর উৎপাদন প্রথম জার্মেনীতেই হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মেনীতে প্রাকৃতিক রাবার রপ্তানি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। জার্মেনীতে রাবার ব্যবসায়, বিশেষকরে প্রতিরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরীর কাজ শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছয়। তখন জার্মানীতে কৃত্রিম রাবার প্রস্তুতের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। এই সময় জার্মেনীতে ডাই-মিথাইল বুটাডাইন থেকে মিথাইল রাবার নামে একরকম কৃত্রিম রাবার চালু হয়। কিন্তু এই রাবারের উপযুক্ত গুণাবলী না থাকার দরুন সেটি পরে পরিত্যক্ত হয়।

১৯২১ সালের আগে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রে কৃত্রিম রাবার প্রস্তুতের দিকে নজর দেওয়া হয়নি। জার্মেনী ও রাশিয়ায় এবিষয়ে সাফল্য দেখে যুক্তরাষ্ট্রে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৯৩০ সালে থায়কল এবং ১৯৩১ সালে নিওপ্রিন নামে কৃত্রিম রাবার চালু হয়। এরপর দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের সময় বুটাইল রাবার এবং বুটা-ডাইন স্টাইরিন রাবার প্রস্তুত হয়। ১৯৪৪ সালে সিলিকোন রাবার, ১৯৪৭ সালে কোল্ড রাবার এবং ১৯৫১ সালে অয়েল একসটেনডেড রাবার প্রস্তুত হয়। তারপর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে নানারকম কৃত্রিম রাবার প্রস্তুত হচ্ছে।

যদিও আমাদের দেশে রাবার ব্যবসায় এখনও পর্যন্ত বিশেষ প্রসারলাভ করেনি, তবে কয়েক বছর আগে উত্তরপ্রদেশের বেরিলীতে সরকারের তত্ত্বাবধানে একটি কৃত্রিম রাবার প্রস্তুতের কারখানা চালু হয়েছে। এখানে বুটাডাইন স্টাইরিন রাবার প্রস্তুত হচ্ছে। এছাড়া ব্যক্তিগত মালিকানায় কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি নতুন রাবার প্রস্তুতের কারখানাও চালু হয়েছে।

কৃত্রিম উপায়ে ধানের চারা সৃষ্টি

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব চাল-বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে বাঙালী তরুণ-বিজ্ঞানী ডঃ শিপ্রা মুখোপাধ্যায়ের একটি অনন্য কৃতিত্বের সংবাদ জানা গেছে। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় পরাগের পুং-রেণু থেকে কৃত্রিম উপায়ে ধানের চারা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। এতদিন এই ধরনের কাজ অসম্ভব বলেই বিবেচিত হত। এর আগে কৃত্রিম উপায়ে ধানের চারা সৃষ্টির নজির পাওয়া যায়নি।

কৃত্রিম চারা সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি ডঃ মুখোপাধ্যায় সম্মেলনে হাতে-কলমে দেখান। এই প্রক্রিয়াটিকে একটিমাত্র পুং-বীজের সাহায্যে গবেষণাগারে মানবশিশু সৃষ্টির অনুরূপ [illegible] যায়। তিনি প্রথমে একটি বীজকে নিয়ে পরীক্ষা চালান। জাপানে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইভাবে পুং-বীজের সাহায্যে ধান বা গমের চারা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। সম্প্রতি আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগারে ঐ পদ্ধতিতে নতুন ধরনের ধানের চারা উৎপাদন সম্পর্কে গবেষণা চলছে। ডঃ মুখোপাধ্যায় এবিষয়ে অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

সম্মেলনে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের এই কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণাকে যুগান্তকারী ঘটনা বলে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। সম্মেলনে সমাগত বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এই পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষানিরীক্ষা [illegible] পরামর্শ দিয়েছেন।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের [illegible] অধিকর্তা ডঃ এস এস স্বামীনাথন [illegible] বলেন, আগামী ২।৩ বছরের [illegible] নতুন আবিষ্কারের ফলাফল পুরোপুরি বোঝা যাবে। এবিষয়ে ব্যাপক গবেষণার জন্যে তাঁরা বর্তমানে উদ্যোগী হয়েছেন।

কলকাতার কাছে উচ্চশক্তির নতুন ট্রান্সমিটার

গত ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার [illegible] হুগলী জেলার মগরায় কেন্দ্রীয় তথ্য [illegible] প্রচার মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ আকাশ[illegible] বাণীর সর্বাপেক্ষা উচ্চশক্তিসম্পন্ন [illegible] নতুন ট্রান্সমিটার আনুষ্ঠানিক[illegible]

সহযোগিতায় প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয়ে এটি নির্মিত হয়েছে।

এই নতুন ট্রান্সমিটারটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বেতার প্রচারের কাজে সহায়তা করবে। দিনের বেলায় সাধারণত দু' হাজার থেকে আড়াই হাজার কিলোমিটার এবং রাত্রের দিকে পাঁচ থেকে ছয়শো কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানগুলিতে বেতার প্রচার এই নতুন ট্রান্সমিটারে সহজ হবে। এর সাহায্যে ব্রহ্মদেশ, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ার অংশবিশেষ, পূর্ব-ইন্দোচীন, তিব্বত, সিকিম, ভুটান, নেপাল এবং দক্ষিণ চীনে প্রচার স্পষ্ট ধরা পড়বে।

পাঁচ বছর আগে সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতায় এই ট্রান্সমিটার নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই তা সম্পূর্ণ হয়েছে। কুড়িজন রুশ এবং শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কুড়িজন আকাশবাণীর ইঞ্জিনীয়ার এই ট্রান্সমিটার স্থাপনের কাজ চালান।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী শ্রীসিংহ বলেন, এই ট্রান্সমিটারটি স্থাপিত হওয়ায় ভারতের আকাশবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা হলো। দিল্লীস্থ সোভিয়েট দূতাবাসের উপরাষ্ট্রদূত শ্রীস্টেপনোভ লিওনিড বলেন, এই ট্রান্সমিটার স্থাপনের ফলে সোভিয়েত ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতু দৃঢ়তর হবে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রয়

মানব সান্যাল
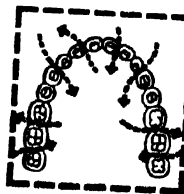
অফিসে এসেই কাঁচরাপাড়া টি বি হাসপাতাল থেকে বোন মাধুরীর চিঠি পেলাম একটা।

আজও সারাদিন অপেক্ষায় থাকিয়া আপনার কোন চিঠি পাইলাম না। অথচ প্রায় দু-সপ্তাহ হইল আপনাকে একখানি দীর্ঘ পত্রে আমার বর্তমান অবস্থার কথা সবই জানাইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে হঠাৎ খুব সর্দি-কাশি হইয়াছিল। ঘর-পোড়া গরু। তাই সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম। এক্স্‌রে করা হইয়াছে। বুকে আর কোন দোষ পাওয়া যায় নাই। আমাদের ওয়ার্ডের ডাক্তারবাবু কাল আমার বুকের ছবি দেখিয়া বলিয়াছেন--আমার রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে। তবে এখনও কিছুদিন সপ্তাহে একদিন করিয়া বুকে বাতাস ভরিতে হইবে। বড় ডাক্তারবাবু গত মাসেই আমাকে বেড ছাড়িয়া দিবার নোটিশ দিয়াছেন। আমার বুকেতে আর কোন দোষ না থাকায় বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য তাগাদা দিতেছেন। বড়-ডাক্তারবাবু কাল সকালে রাউণ্ডে আসিয়া আমাকে খুব কড়া করিয়া বলিয়াছেন—আমি যেন অবিলম্বে বাড়ীর লোকজনদের খবর পাঠাই। সাতদিনের মধ্যে বেড ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু আপনাদের জামাই-এর মতিগতি বুঝিতে পারিতেছি না।

রাঙ্গাদা, আমার বড় ভয় করিতেছে। আমাদের ওয়ার্ডের পাঁচ নম্বর দিদির স্বামী আপনাদের জামাইয়ের সঙ্গে একই অফিসে কাজ করেন। পাঁচ নম্বর দিদির মুখে শুনিলাম ওঁর স্বামী নাকি বলিয়াছে আপনাদের জামাই আমাকে ত্যাগ করিয়া ওদের অফিসের একটি মেয়েকে বিবাহ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। কথাটা শুনিয়া পর্যন্ত ভয়ে ভাবনায় আমার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়াছে। এখন মনে হইতেছে, মরিলেই ভাল ছিল। আপনাদের জামাইকে পর পর তিনখানি চিঠি দিয়াও কোন উত্তর পাই নাই। মাস ছয়েক আগে আমাকে দিয়া চেক সহি করাইবার জন্য একবার এখানে আসিয়াছিলেন। তাও আমার সঙ্গে দেখা না করিয়া ওয়ার্ডের বাহিরে হইতে নার্স সুধাদির হাত দিয়া চেকটা আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

তাহার পর এই ছয় মাসে একখানি দু-লাইনের পোস্টকার্ড পর্যন্ত দেন নাই।

রাঙ্গাদা, এখন মনে হইতেছে—পাঁচ নম্বর দিদির কথাই সত্যি। আপনাদের জামাই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আগে তাও মাঝে মাঝে দু-দশ টাকা পাঠাইতেন। গত দু-মাস যাবৎ তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন এমন দুরবস্থা যে তেল-সাবান কিনিবার পয়সা পর্যন্ত নাই। ব্লাউজ, সায়া—সব ছিঁড়িয়া গিয়াছে। লজ্জার মাথা খাইয়া আপনাকে এসব কথা জানাইতে বাধ্য হইলাম। গত জন্মে বোধহয় অনেক পাপ করিয়াছিলাম। এ জন্মে তার ফল ভোগ করিতেছি। এখন কি করিব, কোথায় যাইব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি পত্রপাঠ মাত্র আপনাদের জামাই-এর সহিত দেখা করিয়া আমার বাড়ী ফিরিবার ব্যবস্থা করিবেন। নচেৎ গলায় দড়ি দিয়া মরা ছাড়া আর কোন পথ নাই। আপনি এই রবিবারে একবার আসিতে পারিবেন? আপনি ও বনানী বৌদি আমার প্রণাম জানিবেন।

ইতি আপনার হতভাগিনী
মাধুরী

মাধুরীর চিঠিটা আমাকে দারুণ ভাবিয়ে তুলেছে।

মাধুরী আমার নিজের বোন নয়। পিসতুতো বোন। তাও সম্পর্কটা খুব কাছের নয়। বাবার মাসতুতো বোন টুনুপিসিমার মেয়ে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে— মাধুরী এই সহজ সত্যটা বুঝতে চায় না, ক্রমশঃই অবুঝ হয়ে উঠছে। অবশ্য ওর উপায়ই বা কি আছে! ওর নিজের দুই দাদার ভাবগতিক দেখে মনে হয় না যে ওদের মাধুরী নামে একটা বোন আছে এবং সেই বোন যক্ষ্মা-হাসপাতালে শুয়ে ওদের কাছে আর কিছু না হোক্ মাঝে মাঝে দু-দশটা টাকা কিংবা দু-চার লাইনের চিঠিও প্রত্যাশা করতে পারে। মাধুরীর ভাল-মন্দের সব দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ওরা পরম নিশ্চিন্তে বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার করছে। ইদানীং স্বামীর ওপরেও ভরসা রাখতে পারছে না মাধুরী। অথচ আমিই বা ওর জন্যে আর কি করতে পারি? দূর-সম্পর্কের পিসতুতো বোনের জন্যে এতাবৎ আমি যা করেছি—তার একটা সহজ ব্যাখ্যা অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে। একজন অসুস্থা আত্মীয়াকে বিপদের দিনে সাহায্য করার স্বাভাবিক মানবিক প্রেরণা থেকেই যে আমি রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছোটাছুটি করে মাসখানেকের মধ্যেই কাঁচরাপাড়া টি বি হাসপাতালে মাধুরীর জন্যে একটা ফ্রি-বেডের ব্যবস্থা করে ফেলেছিলাম— আমার নিজের আচরণের এই সহজ ব্যাখ্যা কিন্তু আমার স্ত্রী বনানীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ আমার এই মানবতা-বোধের প্রেরণা আমাকে আরও কয়েক টাকা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে যেখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল—বনানীর দৃষ্টিতে তা খুব স্বাভাবিক মনে হয়নি। বলতে গেলে আমিই মাধুরীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম। ওর স্বামী অনন্ত নিতান্ত অনিচ্ছায় আমার সঙ্গী হয়েছিল। আর এই দেড় বছরে মাধুরীর চিকিৎসার যা কিছু দায়-দায়িত্ব—সবই আমারই কাঁধে এসে পড়েছে। মাসে একবার, কখনও বা দুবারও মাধুরীকে দেখতে ফলের ঠোঙ্গা হাতে করে হাসপাতালে গিয়েছি। মাধুরীর সঙ্গে আমার নিয়মিত চিঠিপত্রের যোগাযোগ আছে।

কিন্তু ইদানীং অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মাধুরীকে নিয়ে আমার সাংসারিক জীবনে একটা দারুণ জটিল সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর হয়ে আমাকে বিব্রত করে তুলেছে। মাধুরীকে আমার স্ত্রী বনানী আর কিছুতেই সহ্য করতে রাজী নয়।

প্রকৃতপক্ষে আমি ভেবে দেখেছি—মাধুরীকে নিয়ে আমার জীবনে কোন জটিল সমস্যা-সৃষ্টির কারণই থাকতে পারে না। মাধুরীর নিজের দুই সক্ষম দাদা আছে। ওর স্বামী অনন্ত আছে। স্বভাবতঃই আশা করা যায়—মাধুরীকে সুস্থ করে হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরিয়ে আনায় যা কিছু দায়-দায়িত্ব সবই তার নিজের দুই দাদা এবং স্বামী অনন্ত কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে এই অবাঞ্ছিত জটিল পরিস্থিতি থেকে রেহাই দেবে।

অথচ মাধুরীর দাদা-বৌদিদের কাছে ওর কথা তুললে ওরা এমন নিরাসক্ত ভংগীতে দু-চারটে আলগা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে চুপ হয়ে যায়—যেন মাধুরী আমারই নিজের বোন এবং মাধুরীর ব্যাপারে তাদের কোন দায়িত্বশীল ভূমিকাই নেই। আর অনন্ত তো আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এই দেড় বছর আশ্চর্য কৌশলে আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে অনন্ত।

বিয়ের পর কিন্তু অনন্তকে দারুণ সিনসিয়ার আর লয়াল মনে হয়েছিল। অথচ মাধুরীর অসুখটা ধরা পড়ার পর থেকেই ওর ব্যবহারটা প্রায় নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার স্ত্রী বনানী প্রথম থেকেই ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখেনি। মাধুরীর জন্যে আমার দুর্ভাবনা, ব্যস্ততা এবং ওর চিকিৎসার ব্যাপারে আমার একনিষ্ঠ প্রয়াস বনানীর চোখে যথেষ্ট বাড়াবাড়িই মনে হয়েছে। ইদানীং ও মাধুরীকে জড়িয়ে আমার সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে—সে সব প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে ক্রমশঃই কষ্টকর হয়ে উঠছে।

বনানীর মনের মধ্যে একটা দারুণ সন্দেহ—মাধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা স্বাভাবিক নয়। অনন্তর সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে হওয়ার আগে থেকেই যে আমার সংগে মাধুরীর একটা অস্বাভাবিক এবং অনভিপ্রেত সম্পর্ক ছিল এবং বিয়ের পরেও যে মাধুরীর সঙ্গে আমার সেই সম্পর্কটা বিদ্যমান আছে বনানীর মনের মধ্যে এই ধরণের একটা চাপা সন্দেহ ইদানীং প্রায় বিশ্বাসে পরিণত হতে চলেছে।

বনানী সুযোগ পেলেই মাধুরীকে নিয়ে আমার চরিত্রের ওপরে এমন সব ইংগিত করে যে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। আমি যে বনানীকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করিনি তা নয়। মাধুরীকে যে ছোটবেলা থেকে নিজের বোনের মতই দেখে আসছি এবং মাধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা যে ভাই-বোনের স্বাভাবিক স্নেহ-ভালবাসার ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে—আমার এই সব কৈফিয়ৎ বনানীর অবিশ্বাসে এতটুকুও ফাটল ধরাতে পারেনি।

কারণ বনানীর ধারণা মানুষের যৌন-জীবনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

—দূর সম্পর্কের মাসতুতো-পিসতুতো ভাইবোনের মধ্যে যে অস্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, আমার এবং মাধুরীর সম্পর্কটা তার ব্যতিক্রম নয়।

তাছাড়া বনানীর মনের মধ্যে সবসময় একটা সন্দেহজনিত ভয় কাজ করে। ওর দারুণ ভয়—আমার এই পিসতুতো বোনটি শেষ পর্যন্ত আমার কাঁধেই চেপে বসবে এবং আমিও আমার এই পীরিতের বোন-টিকে আদর করে ঘরে তুলে নেওয়ার জন্যে এক পা বাড়িয়েই বসে আছি।

বনানী আমাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেছে—মাধুরী বাড়ী ফিরছে কবে? যতদূর শুনেছি—অনন্তবাবু তো মাধুরীর খোঁজ-খবর পর্যন্ত নেন না। তা শেষ পর্যন্ত পোকায়-খাওয়া বৌটাকে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কেটে পড়ার মতলব নেই তো?

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বনানী যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেছে—তবে এও তোমাকে বলে রাখছি—এ বাড়ীতে মাধুরীর জায়গা হবে না। বোনকে যদি এ বাড়ীতে এনে তোল তো আমিও ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমার পথ দেখব। মুরোদ থাকে তো ঘর ভাড়া করে বোনকে রেখে প্রাণ-ভরে ফূর্তি কর। কিন্তু আমার চোখের ওপরে ওসব বেলেল্লাপনা চলবে না।

বনানীর চোখে-মুখে এমন একটা হিংস্রতার ছায়া পড়েছে যে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছে। তবুও আমি ক্ষীণকন্ঠে ওকে আশ্বাস দিতে চেয়েছি, কি পাগলের মত যা-তা বলছ! আমি কেন মাধুরীর দায়িত্ব কাঁধে নিতে যাব? অনন্তর সঙ্গে কথা বলে দেখি। ওর বৌএর দায়িত্ব ওকেই নিতে হবে।

কিন্তু অনন্তর সঙ্গে বার বার কথা-বার্তা বলতে চেষ্টা করেও ওর কাছ থেকে কোন উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া না পেয়ে মনটা দমে গিয়েছে। অথচ বনানীকে আমি ইচ্ছে করেই সে সব কথা বলিনি। কারণ বনানীর রি-এ্যাকশনকে আমি ভয় পেয়েছি।

মাধুরীকে যে শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মায় ধরল কেন—সেটা আমার কাছে আজও একটা দারুণ মিস্ট্রি হয়ে রয়েছে। মাধুরীকে তো সেই ছোটবেলা থেকেই দেখছি। খুব বড় একটা অসুখ ওর কোনদিন হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না। ওর শরীরটা চিরদিনই একটু রোগাটে ধরণের। কিন্তু ওর হাত-পা-গাল-গলা-বুক সবই এমন পেলব আর ভরাট ছিল যে ওকে দেখে কোনদিনই মনে হয়নি ও রুগ্ন কিংবা ওর ভেতরে কোন
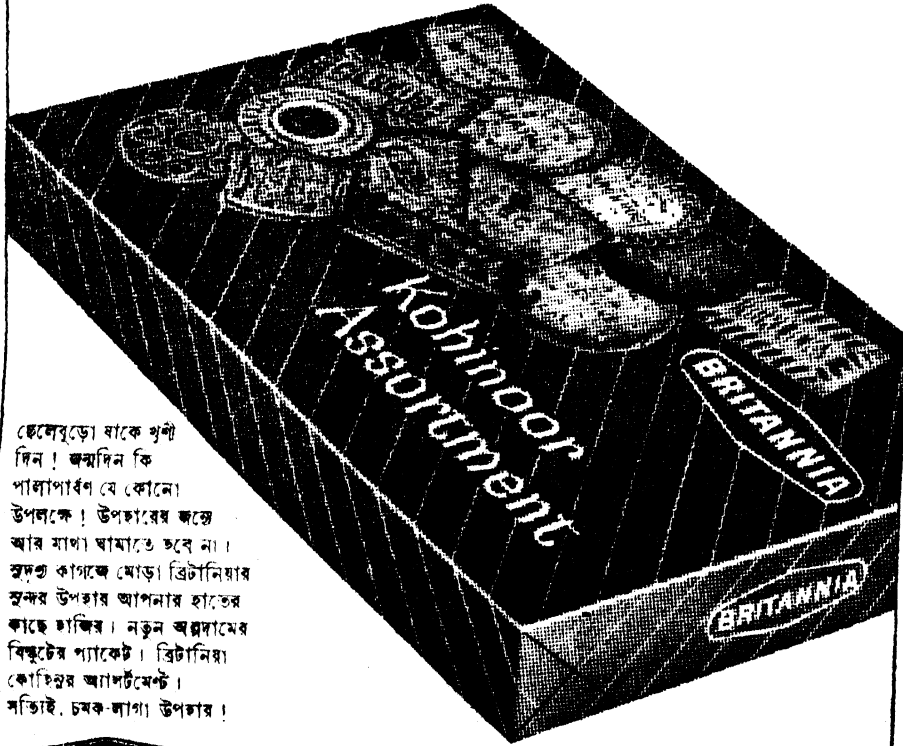
সাংঘাতিক অসুখ লুকিয়ে আছে। বরং ওর মসৃণ শরীরে এমন একটা স্নিগ্ধ স্বাস্থ্যের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে থাকত যে আমার নিঃসঙ্গ মনের মুগ্ধ কল্পনায় ও একটা গোপন বাসনার জন্ম দিয়েছিল।

আমি বোধহয় মাধুরীর মত কোন একটি মেয়েকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম।

তা না হলে আমার স্ত্রী বনানী—নিজের সৌন্দর্য সম্বন্ধে যার দারুণ গর্ব—আমাকে কোনদিনই যথেষ্ট আকর্ষণ করতে পারেনি কেন?

বনানীর শরীরটাও খুব মোটাসোটা নয়। বরং মাধুরীর তুলনায় ওকে রোগাই বলা যায়। অথচ বনানীর রোগা, ধারালো শরীরটা আমার মনে এক ধরণের হতাশা সৃষ্টি করেছে—যাকে আমি ঠিক ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারব না। বনানীর গায়ের রং—যাকে বলে ক্যাটকেটে ফরসা। ওর চোখের তারাদুটোকে ঠিক ব্রাউন বলা যায় না। তবে মাধুরীর চোখের মত কালোও নয়। ওর মুখের গড়নটা যে আমার খুব খারাপ লাগে তা নয়। বেশ লম্বাটে ধরনের উজ্জ্বল ঝকঝকে মুখ। কিন্তু ওর গালদুটো বড় বেশী কঠিন, ধারালো। মাধুরীর গাল-দুটো যেমন মসৃণ এবং ঢল-ঢলে ছিল ঠিক সে রকম নয়। বনানীর কাঁধের দুপাশে দুটো উদ্ধত পাখনা থেকে ঈষৎ রোমশ সূক্ষ্ম নীল শিরার রেখাংকিত ধবধবে ফরসা হাতদুটো শিথিলভাবে ঝোলে। আমার অনেকদিন মনে হয়েছে বনানীর ঘাড়-গলা-বুক কাঁধের পাখনা, শিরবহুল দুটো হাত এবং ঈষৎ পাণ্ডুর দুটো রুক্ষ গালে আরও একটু মেদ কিংবা মাংস লাগলে ও বোধহয় দেখতে আরও সুন্দর, আরও রমণীয় হত। অথচ ওকে সকালে রুটির সঙ্গে একটু মাখন মাখিয়ে নিতে বললে—ও এমন অদ্ভুত চোখে আমার দিকে চেয়ে হেসেছে যেন আমি ওর কাছে একটা দারুণ বোকামী করে ফেলেছি। বন্ধুদের সামনেই বনানী আমাকে ব্যাক্-ডেটেড্ বলে ঠাট্টা করেছে। বন্ধুরাও ওর কথায় সায় দিয়েছে। আমার বন্ধুদের মতে বনানীর মত শিলম ফিগার বাংলাদেশে নাকি রেয়ার এবং অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেটের প্রতি অনাসক্তি এবং পরিমিত আহারই ওকে এই শিলম ফিগারের দুর্লভ ঐশ্বর্য দিয়েছে। অথচ বনানীর শরীর যে সুস্থ নয়—তা আমার থেকে আর ভাল কে জানে?

বিয়ের পর থেকেই এমন দিন গেল না যে—বনানীর মুখে শুনলাম—ও ভাল আছে, সুস্থ আছে।

আমরা দুজনে দুই অফিসে কাজ করি। সারাদিন তো প্রায় বিচ্ছিন্নই থাকি। অফিস থেকে ফোনে সংসারের দরকারী কাজ সেরে নিই। কিন্তু রাত্তিরে একসঙ্গে শুয়েও শান্তি নেই। শরীর নিয়ে একটা না একটা অভিযোগ লেগেই আছে ওর মুখে।

বেশ বুঝতে পারি—আজকাল ওর যা কিছু মায়া-মমতা, স্বার্থত্যাগের ইচ্ছা-শক্তি—সবই ছেলে-মেয়েদের সংকীর্ণ জগতে কেন্দ্রী-ভূত হয়ে গিয়েছে।

আমার ভাল মন্দ, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়ার প্রতি ওর উদাসীনতা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। তাছাড়া আবার মা হওয়াতেও ওর দারুণ ভয়। ওর কাছে আমারও যে কিছু সঙ্গত এবং স্বাভাবিক দাবী আছে আজকাল বনানী তা বুঝতেই চায় না। আমাকে কাছেই ঘেষতে দেয় না। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ভাজা-মৌরী চিবতে চিবতে বিছানায় উঠে বনানী বলে—আমার দারুণ ঘুম পাচ্ছে। উঃ, অফিসে আজকাল যা খাটুনি।

অথচ রোজই অফিসে বার হওয়ার সময় বনানীর হাতে হয় একটা ঢাউস উপন্যাস আর না হয় সদ্যোপ্রকাশিত হাল্কা সিনেমা পত্রিকা দেখা যায়।

নিজের দুই ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বনানী যে একটি সংকীর্ণ স্বার্থের জগৎ গড়ে তুলেছে—সেখানে আমিই যখন ক্রমশঃ অবা-ঞ্ছিত হয়ে পড়ছি, তখন মাধুরীর প্রবেশ যে সে জগতে একেবারেই নিষিদ্ধ—এ বিষয় আমার কোনই সন্দেহ নেই।

কিন্তু অনন্তকেও তো আমি কিছুতেই চেপে ধরতে পারছি না। পাঁকাল মাছের মত কেবলই আমার হাত ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

অনন্তর সঙ্গে যেদিন প্রথম মাধুরীকে হাসপাতালে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম—সেদিনই বুঝেছিলাম, অনন্ত আর কোনদিনই হাসপাতালের পথ তো মাড়াবেই না, আমা-কেও এড়িয়ে এড়িয়ে চলবে।

অনন্তকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন সাংঘাতিক কোন বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার ভয়ে বুকের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস সব বন্ধ করে রেখেছে। খুব জোরে রুমালটা নাকের ওপরে চেপে-ধরে এমন সন্তর্পণে ও ও হাসপাতালের করিডোর দিয়ে হাঁটছিল যেন যে কোন মুহূর্তে এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসের মুখোমুখী হয়ে ছুটে পালিয়ে যাবে। অনন্ত ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকতেই যায়নি। মাধুরীকে আমিই হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বেডের ওপরে শুইয়ে দিয়েছিলাম।

মাধুরী বোধহয় চারপাশের বেডগুলোতে চাদরে ঢাকা স্থির, নিঃশব্দ শরীরগুলোকে দেখে খুবই ভয় পেয়েছিল। তাছাড়া তখন ওর থেকে দুটো বেড পরেই একজন পেশে-ন্টের মুখ দিয়ে রক্ত উঠছিল।

মাধুরীর খুব শক্ত-মুঠোয় আমার ডান হাতটা চেপে ধরে বলেছিল—রাঙ্গাদা, আমি বোধহয় আর বাঁচব না। ও কি ভেতরে আসবে না! ওকে শেষবারের মত খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

আমি মাধুরীকে আশ্বাস দিয়ে অনন্তকে ডাকতে গিয়েছিলাম। অনন্ত সামনের ছোট মাঠটাতে নাকে রুমাল চেপে ধরে দাঁড়িয়ে-ছিল। কিন্তুতেই ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকতে চায় নি।

বরং —আমাকেই তাগাদা দিয়েছিল রাঙ্গাদা, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। চলুন, বেরিয়ে পড়ি।

অনন্তর নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা আমাকে দারুণ ক্রুদ্ধ করেছিল। দাঁতে দাঁত চেপে হিংস্র আক্রোশে বলেছিলাম তোমাকে ওয়ার্ডের মধ্যে যেতেই হবে।

তারপর খপ্ করে অনন্তর একটা হাত ধরে ফেলে টানতে টানতে ওকে ওয়ার্ডের দিকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

অনন্ত অনেক চেষ্টা করেও আমার শক্ত মুঠো থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে বলেছিল—রাঙ্গাদা হাতটা ছেড়ে দিন। কথা দিচ্ছি। পালাব না।

ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে রুমাল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে মাধুরীর বেডের থেকে বেশ দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে ছিল অনন্ত। মাধুরী কেঁদে কেঁদে কি যেন সব বলেছিল ওকে। অনন্ত মাথা নেড়ে কয়েকবার হুঁ হাঁ করে মিনিট কয়েকের মধ্যেই বেশ দ্রুত-পায়ে ওয়ার্ড ছেড়ে বেরিয়ে সোজা মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটিতে শুরু করেছিল।

আমি আরও কিছুক্ষণ মাধুরীর সঙ্গে ছিলাম। অনন্ত আগেই বেশ জোর পায়ে হেঁটে কল্যাণী স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি লাইনের ওপরে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলাম—অনন্ত প্ল্যাটফর্মের ওপরে কলের ওপরে বসে জলের ধারায় হাত-পায়ে ঘাড়ে-মুখে খুব জোরে জোরে সাবান ঘষছে। সাবা-নের সাদা ফেনায় ওর মুখটা ঢেকে গিয়েছিল। আর বিকেলের পড়ন্ত রোদের লালচে আলোয় সেই চিক্‌চিকে সাদা ফেনার ওপরে একটা আশ্চর্য লাল আভা ফুটে উঠছিল। আমার চোখের ওপরে হঠাৎ যেন একটা শকুনের রক্তমাখা মুখের ছবি ভেসে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে দারুণ ঘৃণা করতে ইচ্ছে হয়ে-ছিল অনন্তকে। একলাফে লাইন ছেড়ে প্ল্যাটফর্মের ওপরে উঠে প্রায় ছুটে গিয়ে-ছিলাম অনন্তর কাছে। অনন্ত তখন অতি সন্তর্পণে সারা দেহে ডেটল মাখছে।

অনন্তর একেবারে সামনে এগিয়ে গিয়ে সেদিন চিৎকার করে উঠেছিলাম—ব্রুট, ক্রিমি-নাল, মার্ডারার। চাবুকে তোমার পিঠের ছাল তুলে দিতে ইচ্ছে করছে।

অনন্তকে যে সেদিন ধিক্‌কার দিয়ে-ছিলাম—সেই থেকে ও আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছে।

এই দেড় বছরে আমি অনেকবার মাধু-রীর কাছে গিয়েছি। অথচ মাধুরী কোনদিন অনন্ত সম্পর্কে আমার কাছে কোন অভি-যোগ করেনি বরং ওর মুখেই শুনেছি—অনন্ত মাঝে-মাঝেই দু দশটা টাকা মণিঅর্ডার করে পাঠিয়েছে। খুব অনিয়মিত হলেও চিঠি-পত্রে অনন্ত মাধুরীর খোঁজ-খবর নিয়েছে। তবে মাধুরীকে দেখতে একদিনও হাস-পাতালে আসেনি।

অনন্ত যে মাধুরীর অসুখকে দারুণ ভয় করে—সেটা আমার কাছে নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা মনে হলেও আমি ভাবতেই পারিনি—মাধুরী সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও ওকে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অনন্ত এমন গড়ি-মসি করবে।

অথচ মাধুরী দু'সপ্তাহের মধ্যে পর পর দুটো চিঠিতেই অনন্তর নীরবতা এবং ঔদাসিন্য সম্পর্কে যে সব অভিযোগ করেছে তাতে আমি দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

মাধুরীর দারুন উদ্বেগ এবং ভয়কে যে আমি বুঝতে পারিনা তা নয়। মাধুরী খুব ভাল করেই জানে—ওর নিজের দুই দাদার ঘরে ওর জায়গা হবে না।

অনন্তকে ধরতে না পেরে আমি নিজেই দিন সাতেক আগে মাধুরীর বড়দার কাছে গিয়েছিলাম। স্নেহলতা-বৌদিদিই চায়ের কাপ হাতে করে বাইরে ঘরে ঢুকেছিলেন। আমার বাস্তব বুদ্ধিই আমাকে সচেতন করে দিয়েছিল—মাধুরীর সম্পর্কে যা কিছু কথা-বার্তা স্নেহলতা-বৌদির সঙ্গেই বলতে হবে মাধুরীর বড়দা স্নেহলতা বৌদির ছায়ামাত্র। অথচ মাধুরীর বাড়ী ফেরার সমস্যা এবং অনন্তর হৃদয়হীনতার ওপরে আমি একটা করুণ কাহিনী ফেঁদে বসার আগেই স্নেহলতা-বৌদিদি যে কি আশ্চর্য বুদ্ধি দিয়ে আমার উদ্দেশ্যটা ধরে ফেললেন। আমি অবাক হয়ে স্নেহলতা-বৌদির গোল-গাল তেল-চুকচুকে মুখটার দিকে চেয়ে রইলাম। স্নেহলতা-বৌদিদি আমার হাতে চায়ের কাপটা তুলে দিয়ে আমার মুখের ওপর কঠিন ধারালো চোখের দৃষ্টি রেখে রুক্ষ কঠোর গলায় বললেন—দ্যাখ, রাঙ্গা-ঠাকুরপো, আমি ওসব রেখে-ঢেকে কথা বলা একেবারেই পছন্দ করি না। দুখানা দশ-বাই-বার ঘরের মধ্যে একপাল ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মাধুরীকে বাড়ীতে জায়গা দিয়ে মা হয়ে ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ আমি ডেকে আনতে পারব না।

তারপর খুব নীচু-গলায় বিজ্ঞ আইনজ্ঞের মত আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—অনন্তকে শক্ত করে চেপে ধর। দরকার হলে মাধুরীর নামে উকিলের নোটিশ দাও ওকে। বাছাধন যাবে কোথায়? মামলা-মকদ্দমার ভয় দেখালেই শুড় শুড় করে বৌ-এর কাছে গিয়ে হাজির হবে। স্নেহলতা-বৌদিদির উপদেশ মাথায় করে সেদিন বাড়ী ফিরে এসেছিলাম। মাধুরীর ছোড়দা অমিতাভর কাছে আর ধর্ণা দেওয়ার ইচ্ছে হয়নি।

কিন্তু মাধুরীর স্বামী অনন্ত—যে অনন্ত মাধুরীকে দেখে ওকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল—এবং বিয়ের পরে মাধুরীকে ছেড়ে একা থাকতে হবে ভেবে বাংলা দেশের বাইরে একটা শাঁসালো চাকরী পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল—সেই অনন্তও আজ মাধুরীকে এমন নির্মম অবহেলায় জীবন থেকে ছেঁটে ফেলে দিতে চাইছে কেন?

অন্ততঃ আমার নিজের জীবনে এরকম একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখে অনন্তর এই নিষ্ঠুর বিবেকহীনতার কোন সুস্পষ্ট অর্থ আমি খুঁজে পাইনি। বনানীকে আমি অনেকদিন মাধুরীর জায়গায় ভাবতে চেষ্টা করেছি। অনন্তকে মাধুরীর প্রতি যেরকম সিনসিয়ার এবং লয়াল মনে হয়েছিল—বনানীর প্রতি আমার যে সেই পরিমাণ সিনসিয়ারিটি এবং লয়ালটির যথেষ্ট অভাব আছে—সেটা আমিও যেমন জানি, বনানীর কাছেও তা খুব অস্পষ্ট নয়। অথচ আমি ভেবে দেখেছি—বনানী যদি টিবি হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরত—তাহলে ওকে আমি মোটেই কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারতাম না।

তাছাড়া এই দেড় বছরে হাসপাতালে অখণ্ড বিশ্রাম, নিয়মিত অ্যান্টি-বায়োটিকস এবং দুধ-ডিম-মাছ-মাংসের কল্যাণে মাধুরীর শরীরটা মেদ-মাংস রক্তে এমন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে যে আমি হলপ করে বলতে পারি—মাধুরীকে দেখলেই অনন্তর রক্তে আগুন ধরবে।

অথচ অনেক চেষ্টা করেও এতদিন আমি অনন্তকে ধরতে পারিনি। টেলিফোনে যে ওর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি—তা নয়।

কিন্তু আমার অফিসে কিংবা বাড়ীতে এসে মাধুরীর ব্যাপারে খোলাখুলি কথা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েও অনন্ত সে প্রতিশ্রুতি রাখেনি।

গতকাল অনন্ত নিজেই আমাকে ফোন করেছিল। অনন্ত কথা দিয়েছে—আজ অবশ্যই অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

অবশ্য কালই টেলিফোনে ওর কথাবার্তার ধরন-ধারণ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম—মাধুরীকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনায় ওর দারুণ আপত্তি। কোন এক ডাক্তারবন্ধুর সঙ্গে কনসাল্ট করে ও নাকি জানতে পেরেছে বছর পাঁচেক মাধুরীর ছেলে-পুলে হওয়া বন্ধ রাখতে হবে। তাছাড়া মাধুরী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেও বছর দুয়েক ওর সঙ্গে কনজুগ্যাল লাইফ লিড করা চলবে না। অনন্ত এমন ইঙ্গিতও করেছে—মাধুরী রাজী থাকলে মাধুরীর খোরপোষ বাবদ মাসে শ'খানেক করে টাকা দিতেও অনন্ত অরাজী নয়।

আমার কোনই সন্দেহ নেই—অনন্ত নামে একটা ধড়িবাজ পাকাল মাছ এতদিন পরে আজ নিজের স্বার্থেই আমার হাতে ধরা দিতে আসছে। অনন্ত আমার মারফৎ মাধুরীকে লিগ্যাল সেপারেশনের প্রস্তাবটা জানাতে চায়।

কিন্তু মাধুরী কোথায় যাবে? কে ওকে আশ্রয় দেবে? আমিই কি ওকে নিজের বাড়ীতে জায়গা দিতে পারব? আমারও তো বনানী আছে, দুই ছেলে-মেয়ে মণি আর মোহন আছে।

অথচ আজ অফিসে এসেই মাধুরীর চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর থেকেই ওর জন্যে এত মায়া হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে অনন্তর নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার কথা ভেবে আমি ক্রমশঃই এত ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ছি যে, অনন্তকে হয়তো আজ শান্তমনে গ্রহণ করতে পারব না। ভয় হচ্ছে উত্তেজনার মুহূর্তে শেষ পর্যন্ত হয়তো অফিসের মধ্যেই একটা আগুলি সিন্ ক্রিয়েট করে ফেলব।

মাধুরীকে নিয়ে আমার ভাবনা তো শুধু আজকের নয়। মেয়েটা চিরদিনই খুব শান্ত আর চাপা ধরনের। ওর ভাসা ভাসা দুটো আয়ত চোখের তারা এমন এক আশ্চর্য পবিত্রতার স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত যে ও আমার দিকে চোখ মেলে চাইলেই আমার বুকের মধ্যে এক আশ্চর্য বোধের জন্ম হয়—সেই বোধ কষ্টের না মমতার—আজও তা আমি বুঝে উঠতে পারি না।

বস্তুতঃ, বনানী যখন মাধুরীকে জড়িয়ে আমার চরিত্রের ওপরে ভালগার ইঙ্গিত করে—সেই বিষণ্ণতার মুহূর্তগুলোতে স্মৃতির জগতে সন্ধানী আলো ফেলে মাধুরীর সঙ্গে আমার সুখ-দুঃখের দিনগুলোর কথা আমি ভেবেছি। আমার মনের আয়নায় এক আশ্চর্য সুন্দর সরল পবিত্র মুখের ছবি ভেসে উঠেছে। সেই মুখে শুধুই মায়া, শুধুই মমতা। স্নিগ্ধ গোধূলীর আলো মাখানো একখানি আনত বিনম্র মুখ।

আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, অনেক নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মাধুরী আমার সুখ কল্পনার সাথী হয়ে আমাকে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে। মাধুরী স্বভাবতঃ উচ্ছল না হলেও ওকে কোনদিন আমার খুব বিষণ্ণ মনে হয়নি। শুধু ওর সুখ-দুঃখের প্রকাশগুলো চিরদিনই খুব ধীর, সংযত। তবুও আমার সব সময় মনে হয়েছে—ওর বুকের মধ্যে একটা চাপা দুঃখ লুকিয়ে আছে। আর সেই দুঃখটাকে সযত্নে বুকের মধ্যে লালন-পালন করেই ও বেড়ে উঠেছে। অথচ ওর প্রশান্ত মুখমণ্ডলে সেই দুঃখের কোন ছায়াপাত ঘটেনি। শুধু ওর ভাসা ভাসা আয়ত দুটি চোখের তারায় অকস্মাৎ যেন এক জলভরা মেঘের ছায়া ঘনিয়ে আসত। আমার বুকের মধ্যে একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল মাধুরী হয়তো কোন এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় আমাকে সেই দুঃখের জগতে ডাক দেবে। সেই আশ্চর্য সন্ধ্যায় কি গভীর মমতা বুকে নিয়ে যে আমি মাধুরীর হাত ধরে এক দুঃখের জগৎ পেরিয়ে হেঁটে যাব এক পবিত্র আনন্দলোকে! আমার সেই অনুপ্রাণিত প্রত্যাশা আজও পূর্ণ হয়নি। তাই বোধহয় আজও বার বার মাধুরীর কাছে ছুটে যাই। মাধুরী ডাক দিলে আমার বুকের মধ্যে সেই অপূর্ণ প্রত্যাশা চঞ্চল হয়ে ওঠে। বনা

নীর অনুরাগ এবং শাসনের বেড়াজাল দিয়ে ঘেরা এক সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জগতের সব বাধাকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে মাধুরীর পাশে গিয়ে দাঁড়াই।

অথচ মাধুরীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আজও কঠিন সংযমের শিকল দিয়ে বাঁধা। মাধুরী ছোটবেলা থেকেই আমাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করে। আর সেই শ্রদ্ধাকে আমি কোনদিন অসংযমের আঘাত দিয়ে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে পারিনি। মাধুরীর চোখে ছোট হয়ে যাব—এই শংকিত ভাবনা আমাকে মাধুরীর একান্ত সান্নিধ্যেও সংযমের কঠিন শাসনে বেঁধে রেখেছে। সিনেমা হলে মাধুরীর পাশাপাশি বসেও উত্তেজনার মুহূর্তে হঠাৎ উচ্ছল হয়ে ওর শরীরের সান্নিধ্য ঘন হয়ে আসতে পারিনি।

মাধুরীও কোনদিন আমার কাছে এমন কিছু দাবী জানায়নি, ওর নীরব চোখের জিজ্ঞাসায় এমন কোন বাসনার ছায়া ফুটে ওঠেনি—যা আমার সংযমের কঠিন নির্মোককে ভেঙে দিয়ে আমার হৃদয়ের কোন্ এক অন্ধকার গুহায় সযত্নসঞ্চিত সেই আশ্চর্য মমতার জমাট বাঁধা বরফকে দুরন্ত কামনার উত্তাপে গলিয়ে দিতে পারত আর সেই গলিত মমতার দুর্বার ধারায় আমরা দুজনেই ভাসতে ভাসতে হয়তো একসময় হারিয়ে যেতাম উত্তাল দেহ-সমুদ্রের অন্ধকার গভীরে।

একবার, শুধু একবারই মাধুরী আমাকে এক আশ্চর্য প্রশ্ন করে চমকে দিয়েছিল।

অনন্তর সঙ্গে ওর বিয়ের কথাবার্তা তখন পাকা হয়ে গিয়েছে। কেন জানি না আমার মনে হয়েছিল অনন্ত ওকে খুবই ভালবাসবে। প্রেম দিয়ে, মমতা দিয়ে, চিরদিনের মত মুক্তি দেবে সেই গোপন দুঃখের বেদনা থেকে।

আমি এক হাল্‌কা খুসী মন নিয়ে মাধুরীদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছিলাম। বার দরজার মুখে আমাকে আগ্‌লে দাঁড়াল মাধুরী। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে এক আশ্চর্য রহস্য ঘিরে ধরেছিল আমাকে। খুব শান্ত, নরম গলায় মাধুরী আমাকে প্রশ্ন করেছিল—রাঙাদা বিয়েটা ভেঙে দেয়া যায় না? মাধুরীর প্রশ্নে আমি চমকে উঠেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে ভয় উঠেছিল। আমি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম—মাধুরীর জীবনে দুঃখ-মুক্তির যে দুর্লভ মুহূর্ত এসেছে—মাধুরীর নিজের ভুলে সেই দুর্লভ মুহূর্তকে হারিয়ে যেতে দেব না।

আমি ওর ঘামে ভেজা ঠাণ্ডা নরম একটা হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে ওকে আশ্বাস দিয়েছিলাম—মাধু এ বিয়েতে তোর ভালই হবে। অনন্ত তোকে সুখী করবে।

অন্ধকারে সেদিন আমি মাধুরীর দু-চোখে সজল মেঘের ছায়া দেখতে পাইনি। শুধু ওর কান্না-ভেজা কথাগুলো চোখের জল হয়ে আমার বুকের মধ্যে ঝরে পড়েছিল—রাঙাদা, তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই বাঁচ—না? তোমাকে এত করে বললাম—আমাকে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দাও। আমার পড়াশুনা করার এত ইচ্ছে। ম্যাট্রিকটাও পাশ করতে পারলাম না। বড় সাধ ছিল—কলেজে পড়ব। বি-এ পাশ করব। তারপর......।

কথাগুলো শেষ করতে পারেনি মাধুরী। কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। তারপর? তারপর কি হবে—সেদিন মাধুরীই কি তা জানত?

আজ হাসপাতালের বেডে শুয়ে বিনিদ্র চোখে হয়তো অনিশ্চিত অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজে মাধুরী।

কিন্তু আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেব কি দিয়ে? বনানীর শক্ত মুঠোয় বাঁধা হাত ছাড়িয়ে আমি কেমন করে পালিয়ে যাব মাধুরীর দুঃখের জগতে? অথচ মাধুরীকে......।

সামনের টেবিল থেকে হেডক্লার্ক পান্নালালবাবু আমাকেই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে না?

কি? আমার ফোন এসেছে?

হ্যালো—হ্যাঁ-হ্যাঁ আমি রাঙাদা কথা বলছি। কি হে অনন্ত আজ আবার কি হল? কি-কি বললে? জোর গলায় স্পষ্ট করে বল—ফোনটা বোধহয় ঠিকমত কাজ করছে না। কি বললে হাসপাতাল থেকে টেলিগ্রাম এসেছে? অ্যাঁ—মাধুরীর অবস্থা খুব খারাপ? হঠাৎ রাত থেকে গ্যালোপিং বিগ্রচিং শুরু হয়েছে, গলা দিয়ে দারুণ রক্ত উঠছে। অনন্ত,—অনন্ত—হ্যালো, হ্যালো—অনন্ত—শুনতে পাচ্ছ—তুমি অন্ততঃ এই শেষবারটার অনন্ত কথা বলছ না কেন? হ্যালো হ্যালো...।

নাঃ, অনন্ত ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

আমার বুকের মধ্যে কি এখনও খুবই কষ্ট হচ্ছে? কৈ—না তো। মাধুরী নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুকের রক্তে স্নান করে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। আঃ, কি শান্তি। অনেক দিনের জমাট বাঁধা একটা বেদনার ভার আস্তে আস্তে বুকের খাঁচা ছেড়ে উড়ে আসছে সহজ, সচ্ছন্দ প্রশ্বাসের মুক্ত পাখী হয়ে। আমি খুব জোরে নিঃশ্বাস টানলাম। বুকের খাঁচায় অনেক বাতাস ভরে নিলাম।

রমেশ দত্তের রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

চিত্রকল্পনা- প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে- চিত্রসেন

প্রদর্শনী পরিক্রমা

রবীন্দ্র ভারতী সমিতি এবং অবনীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে বিচিত্রা ভবনে ১৮ই সেপ্টেম্বর গগনেন্দ্রনাথের ১০২তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হল। এই উপলক্ষ্যে গগনেন্দ্রনাথের ২৪খানি ছবির একটি ছোট প্রদর্শনী হয়। তাঁর বিভিন্ন সময়কার আঁকা ছবি ও ব্যঙ্গচিত্রের একটি নির্বাচিত সংগ্রহ এখানে দেখানো হয়েছিল। দার্জিলিং-এর দৃশ্যাবলী, হিমালয়, চৈতন্যলীলা এবং পরবর্তী যুগের ফ্ল্যাট কিউবিজম ঘেঁষা ছবি —যা গগনেন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তার কয়েকখানি বাছাই করা কাজ দেখার সৌভাগ্য নিমন্ত্রিতদের হয়েছিল। তাঁর ইম্প্রেশনিস্টিক কাজ দার্জিলিং-এর ফুলের প্রদর্শনী এবং কলকাতার প্রতিমা নিসর্জন নাটকীয় ছবি আলোকমন্দির এবং কিউবিজম ঘেঁষা দ্বারকা-পুরীর চিত্রে রংয়ের প্রয়োগ ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার মত। জাপানী ব্রাশ ড্রয়িং-এর টেকনিকে হুঁকো খাওয়া, পুরোহিতমণ্ডলী এবং কুটীরের দৃশ্যে তাঁর মুন্সীয়ানার আরেকদিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যঙ্গচিত্রগুলির মধ্যে সামাজিক সমস্যার প্রতি কশাঘাত এবং সিঁড়ি, রাতের শহর ইত্যাদি ছবির মধ্যে তাঁর কল্পনা-বিলাসী মনের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রদর্শনীগৃহের আলোর ব্যবস্থার দৌলতে অনেক সময় ছবির কাচে দর্শকের প্রতিবিম্বটাই প্রকট হয়ে ওঠে। আরেকটি কথা এই যে প্রদর্শনী সন্ধ্যায় বেশীক্ষণ খোলা না থাকায় অনেকেই ছবি দেখার সুখে বঞ্চিত হন। বহু-কাল যাবতই গগনেন্দ্র অবনীন্দ্রের ছবির একটা স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থার জন্যে অনেকেই বাসনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন ব্যবস্থাই যে কি কারণে হয়ে উঠছে না সেটা একটু পরিষ্কার হওয়া উচিত। বছরে এক-বার অল্পক্ষণের জন্যে এঁদের অল্প কয়েকটি ছবির প্রদর্শনী আয়োজন ছাড়া অবনীন্দ্র পরিষদের কি আর কোন কর্তব্য নেই? কখনো কখনো আবার এসব ছবির পরি-চিতিতেও ভুল থেকে যায় যেমন পিলগ্রিমস অব পুরী বলে যে ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে সেটি সম্ভবত আসলে কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের দৃশ্য। যাই হোক আমরা এ আশা কি করতে পারি যে কোন বিদেশী রসিকের জন্যে অপেক্ষা না করে আমাদের দেশের শিল্পরসিকরা গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র সম্বন্ধে প্রামাণ্য ও সহজলভ্য পুস্তকাদি রচনায় এবং তাঁদের মূল চিত্রকে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা করবেন। অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তবু কিছু লেখা হয়েছে কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনেক কাজই এখনো বাকী এবং বিলম্ব করলে অনেক কিছু করা হয়ত সম্ভবই হবে না।

●

২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর সোসাইটি অব কন্টেম্পরারি আর্টিস্টস কলকাতা তথ্য-কেন্দ্রে গ্রাফিকস্ ও ড্রইং-এর একটি প্রদর্শনী করলেন। ১২ জন শিল্পীর ৩৪ খানি ছোট কাজে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রকাশভঙ্গীর বৈচিত্র্য দেখা গেল। তবে এবারকার প্রদর্শনীতে সোমনাথ হোড়, শ্যামল দত্তরায় এবং গণেশ পাইনের কাজগুলিই সবচেয়ে সুদৃশ্য মনে হল। মূলতঃ লাল ও কালো বা ধূসর বর্ণে করা সোমনাথ হোড়ের লিথোগ্রাফি তিনটি রঙের ঔজ্জ্বল্যে এবং অনতিরিক্ত ক্যালি-গ্রাফিক ফিগারের বাহারে খুব সুসজ্জিত ছবি হয়েছিল। সনৎ করের তিনখানি এচিং-এ ঈষৎ চাপা রঙের জমিতে স্বচ্ছন্দ ক্যালিগ্রাফিক পরিচালনায় ফিগারের আভাস এনে যে কম্পোজিশন তৈরী হয়েছে তার মধ্যে 'রিক্লাইনিং ফিগার'টি মন্দ হয়নি। শ্যামল দত্তরায়ের দুটি রঙীন এনগ্রেভিং ও এচিং-এ রেখার অতি স্পেসের বিভাজন এবং কোথাও উজ্জ্বল নীল কোথাও হলুদের আভাসে বা বিভিন্ন ধূসর বর্ণের ছাপে এক একটি চিত্তাকর্ষক ডিজাইন তৈরী হয়েছে। সুহাস রায়ের রঙীন এচিংগুলি ছোট ছোট পিরামিড আকারের প্যাটার্ণের ওপর করা বৃক্ষবিরল নিসর্গ দৃশ্য—বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় নেই। শৈলেন মিত্রের মিশ্র মাধ্যমে করা অনেকগুলি শাদা জমির ওপর বর্ণাঢ্য নকশার ডেকোরেটিভ চেহারাটা একটি চটকদারি ডিজাইন। সুনীল দাসের ঘোর রঙের ড্রয়িং তিনটিতে দুটি করে মুখমণ্ডল একটু হাল্কা রঙে কতকটা নামাবলী ঘেঁষা প্যাটার্ণের জমির ওপর বসানো। হয়ত কালীঘাটের তীর্থযাত্রীর আদল এর মধ্যে পাওয়া যেতে পারে। বিকাশ ভট্টাচার্য একখানি এচিং ও দুখানি পেন্সিল ও ক্রেয়নে আঁকা মুখমণ্ডলে মানুষের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীর সাদৃশ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর কাউন্ট ও কাউন্টেসের ড্রয়িং দুটি খুব ফিনিশড কাজ কিন্তু কেমন একটা ভাপ বিলিতী বইয়ের ইলাস্ট্রেশনের মত লাগে। মাঝে মাঝে মনে হয় শিল্পসৃষ্টির জন্যে আঁকা না লাভাটারের ফিজিওনমি জাতের কোন বইয়ের জন্যে করা ছবি। লালু শার রঙীন এচিংগুলির রঙের ঔজ্জ্বল্য বিশেষ করে চোখে পড়ে। অনিলবরণ সাহার প্রিমি-টিভ ফর্ম নিয়ে করা ষাঁড়ের ছবিটি মন্দ হয়নি। গণেশ পাইনের সরু লাইনের ড্রয়িং ও ওয়াশ করা তিনটি ছবির রেখার কারি-কুরি এবং ডিজাইনের বাহাদুরী প্রশংসনীয়। বিশেষ করে 'ইউনিয়ন' ছবির ফুলের প্যাটার্ণের টোনের কাজ এবং উয়োম্যান ছবির ডিজাইন সুন্দর। দীপক ব্যানার্জির দুটি অ্যাবস্ট্রাক্ট এচিং পূর্বপ্রদর্শিত বলে মনে হয়। মনু পারেখের পেন্সিল ও কালির অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ড্রয়িং বিশেষ আকর্ষণ করলো না।

—চিত্ররসিক

শিল্পী : বিকাশ ভট্টাচার্য

সংগ্রামের আঙ্গিনায়

হ্যাঁ শেষপর্যন্ত আমাকে লটারীর টিকিট নিয়ে ফুটপাথে বসতে হয়েছে। এ যেন আমারও ভাগ্যের খেলা। জানি না কবে কত দুইয়ে ভোর হবে। তবে সুদিন যে আসবে আমি নিশ্চিত। এ মেঘ কেটে যাবেই।

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলে থামলেন ভদ্রমহিলা। আমার আপনার যাওয়া-আসার পথের ধারেই উনি বসেন। তাই আমাদের অন্ততঃ চোখে দেখা। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই সেদিন হাজির হয়েছিলাম তাঁর ঠিকানায়। টেলিফোন ভবনের একটি ফুটপাথে। সামান্য কিছু লটারীর টিকিট টেবিলের উপর সাজিয়ে বসেছিলেন। আশপাশে ভিড়ও বিশেষ নেই। পরিচয়ের সুবিধাই হলো। তবে বুঝলাম, বিক্রিটা খুব একটা সুবিধার নয়। প্রথম পরিচয়ের জের কাটিয়ে প্রশ্নই জিগ্যেস করলাম, লটারীর টিকিট বিক্রি করতে ফুটপাথ বেছে নেওয়ার তাঁর দুঃসাহসের কারণ। সে এক করুণ ইতিহাস।

স্বামী ছিলেন কোলিয়ারীর বড় চাকুরে। বছর তিনেক আগে হঠাৎ তাঁর করোনারী অ্যাটাক হয়। তারপর প্যারালিসিস। তিনটি মেয়ে আর একটি ছেলে নিয়ে চোখেমুখে তিনি পথ দেখতে পান না। টাকাপয়সা যা অফিস থেকে পেয়েছিলেন তাও নিঃশেষ। এবার তিনি কি করবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবনা শুরু অবশ্য স্বামী অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই। এবার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ।

আত্মীয়স্বজন প্রচুর ছিল এবং এখনও আছে। তাঁদের অনেকেই বেশ খ্যাতিমান। কারো কারো দোরে ধর্ণা দিলেন। লাভ হলো না। বুঝলেন, নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। এদিকে লেখাপড়া খুব একটা নয়। স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত পড়েছিলেন। পরীক্ষা দেননি। তবু কোনক্রমে স্কুলে একটা মাস্টারীর চাকরি জুটিয়ে নিলেন। কিন্তু টিকলো না। কিছুদিন পরেই জবাব হয়ে গেল। শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব। তকমা নেই। ব্যবহারিক যোগ্যতা তাই মূল্যহীন। তিনি তবু দমলেন না। সাহসে বুক বাঁধলেন। এবার নতুন পরীক্ষা। ঘাবড়ালে চলবে না। তাঁরই ওপর ভরসা করে আছে চারটি কচি মুখ আর অসুস্থ স্বামী।

এবার এলেন নার্সিং-এ। এখানেও ট্রেনিং ছিল না। তবু কাজ চালিয়ে নিলেন। আবার সেই সমস্যা। জবাব হয়ে গেল। তিনি এবার চোখেমুখে অন্ধকার দেখলেন। কি করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না। হঠাৎ মনে হলো, সামনে এগিয়ে যাবার সব রাস্তাই বুঝি বন্ধ। আর পথ নেই। এবার ভাগ্যের মাথা ঠুকে মরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হতাশ হয়েও হাল ছাড়েননি। নতুন পথের নিশানা খুঁজে চলেছেন সমানে। যদি পথ পাওয়া যায়!

পথ পেলেন। লটারীর টিকিট নিয়ে ফুটপাথে বসা। এই জায়গাটিই মনে ধরলো। অফিসপাড়া। লোকজনে সবসময় গমগম করছে। এখানে বসলে হয়তো সুরাহা হতেও পারে। কিন্তু পুঁজি সামান্য। তাই টিকিটও কম। যেরকম চলা উচিত ছিল সেরকম চলছে না। ঠুটিয়ে-মুটিয়ে চলছে। জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, ওঁর কোন টিকিটে প্রাইজ উঠেছে কিনা। জিগ্যেস করতে হলো না। নিজেই জবাব দিলেন। অনেকেই টিকিট নিয়ে যায়। কেউ এসে আর কোন খবর দেয় না। আর কাউন্টার পার্টগুলোও তিনি সযত্নে রাখেন না। বুঝতে অসুবিধা হলো না, জীবিকা ধারণ নিয়েই তিনি ব্যস্ত। তাই লটারীতে কারো ভাগ্য ফিরলো কিনা সে নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁর নেই। এ প্রশ্নেরও জবাব মিললো। সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, হয়তো লটারীর টিকিটও আমার ভাগ্যের মতো ক্রেতাদের প্রবঞ্চিত করে চলেছে।

আবার তিনি নিজের কথায় এলেন। কলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থেকেই তিনি ব্যবসা চালাচ্ছেন। স্বামী, ছেলে-মেয়ে সব থাকে অন্যত্র। ছেলেটি বি-কম পড়ছে। মেয়ে তিনটি স্কুলে। খরচ তাঁকেই চালাতে হয়। মেয়েদের পরীক্ষা এসে গেছে। এখনও বই কেনা হয়নি। স্কুলের মাইনে তো বাকি আছেই। এদিক থেকে ছেলেটির জন্য তাঁর ভাবনা কম। কলেজে স্কলারশিপ পেয়ে সে পড়াশোনা করছে। আর অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা তো একরকম বন্ধ। যতদিন হাসপাতালে ছিল ততদিনই চিকিৎসা চলছিল। তারপর আর কিছু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আর সম্ভব হবেই বা কি করে। স্বল্প আয়ে সংসারই চলতে চায় না। তবে যেদিন টিকিট বেশি বিক্রি হয় মনে আশা জাগে, স্বামীর চিকিৎসা আবার নতুন করে শুরু করবেন। কিন্তু পরের দিনে বিক্রিতে আবার হতাশ হতে হয়। রোজ বিক্রি একরকম নয়।

খদ্দেরপত্র এমনিতেই কম। তাই আলাপ আরেকটু ঘন হয়। একটি খাতা খোলেন। পাতার পর পাতা উল্টে যান। কবিতা লেখেন। মাঝে মাঝে ভালো ভালো ডিজাইনও কিছু চোখে পড়লো। ফুটপাথে বসে টিকিট বিক্রির অবসরে এমনি করেই সময় কাটান।

লটারীর টিকিট বিক্রি করে নিজের লটারী যদি সফল না হয় তাই তিনি চুপ করে বসে নেই। কলকাতা কর্পোরেশন থেকে ভ্যাকসিনেশন ট্রেনিং নিয়েছেন। সামনেই পরীক্ষা। পাশ তিনি করবেন। তবু চাকরির ভরসা নেই। একই আশায় পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি একাধিক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন। কোন সুরাহা হয়নি। তারপর নিজেই বলেন, প্রার্থী তো আমি একা নই। আমার চেয়েও অভাবী আছে। শোনালেন এক করুণ কাহিনী। দু'খানা মাত্র রুটি নিয়ে আসেন বাড়ি থেকে। সারাদিনের জন্যে তাও তিনি নিজে খেতে পারেন না। একে তাঁকে দিয়ে দেন। ওঁরা যে একদমই খেতে পায় না।

কথা বলতে বলতে ভদ্রমহিলা কিরকম উন্মনা হয়ে যাচ্ছিলেন। বারবার হয়তো পুরনো কথা তাঁর মনে এসে ভিড় করছিল। দু'একটি কথার প্রকাশও ঘটছিলো। খুলনার টাকী-শ্রীপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের বউ আজ ফুটপাথে লটারীর টিকিট বিক্রি করছে। আর ভাবছে নতুন কি করে সংসার চালানোর পথ খুঁজে পাওয়া যায়।

হঠাৎ বললেন, সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই এখানে ছোট করে চা বিক্রির ব্যবস্থা আমায় করতেই হবে। সংসার আর চলছে না। ভদ্রমহিলাকে খুব ক্লান্ত মনে হলো।

টেবিলের একপাশে টাঙানো ছিল পশ্চিমবঙ্গ স্টেট লটারীর সদ্যসমাপ্ত ফলাফল। ভাবছিলাম, ভাগ্যবানদের তালিকায় যদি ওঁর টিকিটের নম্বরটা থাকতো। পরক্ষণেই মনে হলো, হয়তো উনি টিকিট কেনেন না। অনবরত লড়াই করে ভাগ্যের উপর আস্থা হারিয়েছেন। এবার তাই সরাসরি পথ খুঁজছেন।

—প্রমীলা

কলকাতা কেন্দ্রে হিন্দীর আধিপত্য বিষয়ে ইতিপূর্বে এই বিভাগে লেখা হয়েছে। ফল কিছু হয়নি। শিগ্‌গির হবে, এমন আশাও দেখা যাচ্ছে না। দৌরতে হবে, এমন লক্ষণও না। বাংলাদেশে যেভাবে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে তাতে কোনোদিন হবে, এমন কথাও বলা যায় না।

ইডেন গার্ডেনে আকাশবাণী ভবনের প্রবেশদ্বার থেকে শুরু করে অন্তর্দেশ পর্যন্ত কোথাও একটি বর্ণও বাংলা নেই। আছে হিন্দী আর ইংরেজী। বাংলা অনুষ্ঠানগুলিও সব নির্ভেজাল বাংলা নয়, মাঝে মাঝে হিন্দীর মিশেল থাকে। বাংলা নামাঙ্কিত অনুষ্ঠানে নির্ভেজাল হিন্দী থাকে, বাংলার সঙ্গে হিন্দীর সহাবস্থান থাকে।...কিন্তু হিন্দী "কারিয়ক্রমে" ভুলেও এক বর্ণও বাংলা স্থান পায় না। সেখানে শুধু হিন্দী, বিশুদ্ধ হিন্দী। বাংলা নাম-ধাম যদি কখনও কোনো কারণে অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাহলে তা হিন্দীরূপেই উচ্চারিত হয়।

জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' হিন্দী 'কারিয়ক্রমে' গাওয়া হয় না, দিল্লী থেকে অথবা অন্য সব কেন্দ্র থেকে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে যখন গাওয়া হয়, হিন্দী উচ্চারণেই গাওয়া হয়। 'জনগণমন' অনেকটা 'জ্যান্যাগ্যাণ্যাম্যান্যা' হয়—বাংলায় সঠিক উচ্চারণ লিখে দেখানো সম্ভব নয়। বেতারের সেই বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি শুনলে বোঝা যাবে। এমনকি, যে-কোনোদিন রাত্রে অনুষ্ঠানশেষে কলকাতা কেন্দ্র থেকেও শোনা যাবে।

'জনগণমন' বাঙালীর লেখা এবং বাংলায় লেখা, হিন্দীওয়ালারা তা না-ও জানতে পারেন; রবীন্দ্রনাথ নামে এই বাংলাদেশে এমন একজন কবি ছিলেন, তা-ও তাঁদের না জানা থাকতে পারে (দিল্লীর হিন্দীওয়ালারা যেমন সম্প্রতি রামায়ণের বিশ্লেষী সমালোচনার হিন্দী অনুবাদ প্রকাশ নিয়ে গোলযোগের আগে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম পর্যন্ত শোনেননি, এবং রামায়ণকে 'অপমান' করার অপরাধে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে হাতকড়া পরিয়ে ধরে আনার হুকুম দিয়েছিলেন).—কিন্ত বাঙালীরা তো জানেন! বাংলাদেশে (এবং বাংলার বাইরেও) প্রতি বছর পাড়ায় পাড়ায় সরস্বতী পুজোর মতো ঘটা করে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করা হয়, অনেক ভালো ভালো বক্তৃতা দেওয়া হয়, গান গাওয়া হয়,—সুতরাং রবীন্দ্র-জয়ন্তীর দৌলতে অন্তত বাংলাদেশের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, এমনকি অশিক্ষিত সমাজেরও একটা বৃহদংশে রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেননি, গান শোনেননি এমন একজনও বোধহয় পাওয়া যাবে না। যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে এত মাতামাতি করেন, সেই শিক্ষিত সমাজের সংগঠকেরা কেন তাঁর রচিত 'জনগণমন' গানের বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান না? কেন প্রতিদিন রাত্রে অনুষ্ঠানশেষে বাংলাদেশের বেতারকেন্দ্র থেকে হিন্দী উচ্চারণে 'জনগণমন' গাওয়া হবে? কেন বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের গানের তথা বাংলাভাষার অপমান করতে দেওয়া হবে?

আমি জানি, এখানে হয়তো কেউ বলবেন, হিন্দীভাষীদের মুখে ভালো বাংলা উচ্চারণ হয় না, তাই তাঁরা বাংলা গান হিন্দী উচ্চারণে গেয়ে থাকেন।...কিন্তু এ-যুক্তি অচল। যে হিন্দীভাষীর মুখে বাংলা উচ্চারণ হয় না, তিনি বাংলা গান গাইবেন না—জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন' তো নয়-ই।

হিন্দীভাষীর বাংলা উচ্চারণ হয় না, এ-কথাও সর্বদা সত্য নয়। বোম্বাইয়ের চিত্রজগতে কয়েকজন হিন্দী গায়ক-গায়িকা আছেন যাঁরা সুন্দর বাংলা গান গেয়ে থাকেন। বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁদের 'প্লেব্যাক' শোনা যায়, কলকাতা বেতার-কেন্দ্র থেকে তাঁদের বাংলা গানের রেকর্ড প্রায়ই বাজানো হয়।

আসলে হিন্দীর কর্তৃত্বাধীন সরকারী যন্ত্রে রয়েছে ষড়যন্ত্র—হিন্দী কায়েম করতে হবে, হিদী ছাড়া অন্য সমস্ত ভাষাকে ছলে-বলে-কৌশলে অবদমিত করে হিন্দী পাকা করতে হবে। বাংলার উপর তার আক্রোশ বেশি, কারণ বাংলাভাষা সমৃদ্ধ ভাষা, বাংলার তুলনায় হিন্দী অনুন্নত। হিন্দীভাষীদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকারের পণ্ডিত, ভাষাপ্রেমী, সাহিত্যরসিক, তাঁরা বাংলা থেকে সম্পদ আহরণ করে হিন্দীকে পুষ্ট করছেন, সমৃদ্ধ করছেন। বাংলাকে তাঁরা স্নেহ করেন, ভালোবাসেন, আপন বলে মনে করেন।...এমন লোক অল্প হলেও আমি দেখেছি।

আবার বাংলার নাম শুনলে জ্বলে ওঠেন, এমন তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দীভাষীও আমার চোখে পড়েছে। অনেক পড়েছে। শিক্ষকদের মধ্যেই পড়েছে।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর হিন্দীওয়ালারাই এখন কেন্দ্রীয় সরকারে প্রাধান্য লাভ করেছেন, এবং তাঁদেরই নির্দেশে সরকারী যন্ত্রে অন্য ভাষাকে পেষণ করে হিন্দীর প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। আকাশবাণী এই রকম একটি সরকারী যন্ত্র। তাই সেখানে হিন্দীর আধিপত্য।

জাতীয় সঙ্গীত বাংলা 'জনগণমন' যে আকাশবাণীতে হিন্দী উচ্চারণে গাওয়া হয় এবং কলকাতা থেকেও হয়, সে হিন্দীরই আধিপত্যের কারণে। এই আধিপত্যের স্বরূপ আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

আজ থেকে প্রায় সাত-আট বছর আগেকার কথা। আকাশবাণী দিল্লী থেকে একজন সঙ্গীত প্রযোজক এসেছিলেন কলকাতায় কলকাতার শিল্পীদের দিয়ে 'জনগণমন' রেকর্ড করিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। যেদিন রেকর্ড হয়, সেদিন আমি কার্যোপলক্ষে রেডিওর স্টুডিওয় উপস্থিত ছিলাম।

আমি দেখেছিলাম, শিল্পীদের মধ্যে একজনও অবাঙালী ছিলেন না। সকলেই বাঙালী, এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রথিতযশা গায়ক-গায়িকা। তাঁদের অনেকেরই ভালো হিন্দী উচ্চারণ হয় না। রেকর্ডিংয়ের আগে হিন্দীভাষী সঙ্গীত-প্রযোজক যখন তাঁদের দিয়ে হিন্দী উচ্চারণে মহলা দেওয়াচ্ছিলেন, তাঁরা অনেকেই অভ্যাসবশে বাংলা উচ্চারণ করে ফেলছিলেন। প্রযোজকমশাই নিজে হিন্দী উচ্চারণে গেয়ে তাঁদের দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। শিল্পীরা তাঁকে অনুকরণ করার চেষ্টা করছিলেন, কৌতুক বোধ করছিলেন, নিজে-দের মধ্যে হাস্য-পরিহাস করছিলেন। একবারও কাউকে বলতে শুনিনি, 'বাংলা গান আমরা বাংলা উচ্চারণে গাইব, তা সে হিন্দী কেন্দ্র থেকে বাজানো হলেও—জাতীয় সঙ্গীতের বিকৃতি আমরা হতে দেব না।'

সেই মহলা আর রেকর্ডিংয়ের সময় কলকাতা কেন্দ্রের সঙ্গীত-বিভাগের একজন বাঙালী কর্তাব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও এই হিন্দী উচ্চারণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি, বরং শিল্পীদের হিন্দী উচ্চারণে 'জনগণমন' গাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছিলেন।

আমি আর থাকতে না পেরে চলে গিয়েছিলাম, আকাশ-বাণীর একজন মুখপাত্রকে 'জনগণমন'র হিন্দীকরণের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'দিল্লীর নির্দেশ।'

দিল্লীর নির্দেশে সেদিন বাঙালী শিল্পীরা নির্বিবাদে হিন্দী উচ্চারণে 'জনগণমন' রেকর্ড করেছিলেন, হয়তো সেই রেকর্ডই এখন আমরা কলকাতা থেকেও শুনছি।

বাঙালীর হাতে বাংলা মার খেল, প্রতিবাদ জানাবার ভাষা জোর হবে কেমন করে?

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

২৫শে সেপ্টেম্বর রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে দ্বিজেন্দ্রগীতি শোনালেন শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত।...তিনি যে দ্বিজেন্দ্রগীতির সুযোগ্যা উত্তরাধিকারিণী, আর একবার তা প্রমাণ করলেন। খুব প্রাণস্পর্শী হয়েছিল তাঁর এই দিনের অনুষ্ঠান।

২৬শে সেপ্টেম্বর বেলা আড়াইটের 'বিদ্যার্থীদের জন্য' অনুষ্ঠানে 'বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ' এই পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বললেন শ্রীসুভাষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথিকাটি থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার মোটামুটি একটা বিশ্লেষণ পাওয়া গেল, তাঁর সাহিত্যকর্মের একটা সরল সহজ চিত্র। দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট।

পরে এই অনুষ্ঠানে 'শিল্প ও বিজ্ঞান' পর্যায়ে মোনো ও লাইনো টাইপ সম্পর্কে শ্রীসুকুমার দাসের কথিকাটিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক হয়েছিল। ছাপাখানার গোড়ার কথা দিয়ে তিনি আরম্ভ করে-ছিলেন, শেষ করেছিলেন বর্তমান মুদ্রণ-পদ্ধতির বর্ণনা দিয়ে। অল্প সময়ের মধ্যে অনেক তথ্য দিয়েছিলেন তিনি।.. বলার ভঙ্গীটাও ছিল ভালো।

এই দিন রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে চিত্র-কলা বিষয়ে 'সমীক্ষা'য় পাপুরে ছবির প্রদর্শনী আর 'ইণ্ডিয়ান পেণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের' শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনীর পর্যালোচনা করলেন শ্রীকালী বিশ্বাস।

পাপুরে ছবি নিয়ে ইতিপূর্বে কাগজে-পত্রে অনেক আলোচনা হয়েছে, তার কিছু ছবিও বেরিয়েছে। কিন্তু তার সমস্ত ছবির কোনো প্রদর্শনী বোধহয় এর আগে আর কখনও হয়নি। এই প্রদর্শনীর দরকার ছিল। এই আলোচনারও। শ্রীবিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি মনোগ্রাহী।

'ইণ্ডিয়ান পেণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের' শিল্পীদের ছবিরও মোটামুটি একটা পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

এই দিন রাত ১৫টা ১৫ মিনিটে ইংরেজী নিউজ রীলের বিষয় ছিল চারটি : চিত্র-পরিচালক শ্রীমধু বসুর মৃত্যু, পশ্চিম-বঙ্গের নতুন রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের কলকাতায় প্রথম সরকারী দিন, সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলন, এবং প্রদীপচন্দ্র সরকারের বাক্সবন্দী হয়ে বঙ্গোপসাগরে অবতরণ।

শ্রীবসুর মৃত্যুতে চিত্র ও মঞ্চজগতের অনেকে শোক প্রকাশ করেছেন, এই নিউজ রীলে প্রবীণ অভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ ও শ্রীতপন সিংহকে শোক প্রকাশ করতে শোনা গেছে।

শ্রীচৌধুরী শ্রীবসুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-গত সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন, তাঁর কাজের ধারার একটা পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীভঞ্জ তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখিয়েছেন। আর শ্রীসিংহ স্বল্প ভাষণে তাঁর উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল এঞ্জি-নীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনে নীতির প্রশ্ন তুলে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার ক্লাই-ম্যাক্সের অংশ থেকে খানিকটা শোনানো হয়েছে এই নিউজ রীলে।

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্বোধনে কলকাতার ম্যাক্সমুলার ভবনের অধিকর্তা ডঃ গিয়র্গ লেচনারের ভাষণটুকু চট করে মন আকর্ষণ করে নিয়েছিল। তাঁর স্পষ্ট, গম্ভীর ইংরেজী উচ্চারণ মন দিয়ে শোনার মতো। শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি তাঁর ভাষণটিকে মোহনীয় করে তুলেছিল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এস-সি ছাত্র শ্রীপ্রদীপচন্দ্র সরকারের বাক্সবন্দী হয়ে বঙ্গোপসাগরের জলে নামার দৃশ্যটি রেডিওয় দেখা না গেলেও তার বিবরণ গভীর উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছিল। শ্রীসর-কারকে যখন বাক্সবন্দী করে সমুদ্রে নামানো হচ্ছিল, তখন দর্শকদের প্রবল উৎসাহ আর উদ্দীপনা জলে যখন নামানো হল, তখন শ্বাসরোধকারী নীরবতা, তারপর যখন তিনি বাক্স থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর সে কী আনন্দ আর উচ্ছ্বাস! এই দৃশ্যের যাঁরা দর্শক ছিলেন, তাঁরা প্রত্যক্ষ আনন্দ লাভ করেছেন, আর যাঁরা রেডিওয় শুনেছেন তাঁরা পরোক্ষে হলেও আনন্দের ভাগ থেকে বাদ পড়েননি।

নিউজ রীলটি সুসম্পাদিত, সুগ্রথিত। রেকর্ডিংও ভালো।

২৭শে সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় লোক-গীতি শোনালেন শ্রীঅমরকৃষ্ণ পাল।... ভালো লাগল। পল্লীর সুরটি পাওয়া গেল।

বেলা ৩টেয় নাটক—'রাতারাতি'। কাহিনী পরশুরাম, বেতাররূপ ও প্রযোজনা শ্রীমতী বিনতা রায়।

নাটকটির প্রথমাংশ মোটেই জমেনি—শুধু কথোপকথন মনে হয়েছে। শেষাংশে কিছু অ্যাকশন ছিল, নাটকীয়তা ছিল—খানিকটা জমেছিল।

অভিনয়ও প্রথমাংশে খানিকটা অসহজ, শেষাংশে অনেকটা স্বাভাবিক।

নাটকের আরম্ভে 'হেঁই মারো, মারো টান, আরও জোরে—' ইত্যাদি ডাকের কী প্রয়োজন ছিল, বোঝা গেল না।

২৮শে সেপ্টেম্বর বেলা ১টায় 'রূপ ও রঙ্গের' আসরে প্রচারিত হল শ্রীগৌরীশ মুখোপাধ্যায় রচিত কৌতুক-নক্শা—'কলির পেন'।

নক্শাটিতে নতুনত্ব না থাকলেও পরি-চ্ছন্নতা ছিল। শ্রীমুখোপাধ্যায় কৌতুকসৃষ্টির নামে ছ্যাবলামি করেননি কোথাও। সংলাপে বেশ একটা মার্জিত ভাব ছিল।

কিন্তু অভিনয়ে চিৎকার হয়েছে বড়ো বেশি। শিল্পীরা জোর দিয়ে, যেন কষ্ট করে সংলাপ বলেছেন। রেকর্ডিংও স্বচ্ছ নয়। নক্শাটির উপর সারাক্ষণ একটা অনচ্ছতা চেপে ছিল।

৩০শে সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় লোক-গীতি শোনালেন শ্রীপ্রদ্যোতনারায়ণ, ঘোষিকা ঘোষণা করলেন প্রদ্যুৎনারায়ণ—একবার নয়, দুবার নয়, তিন-তিনবার।

—শ্রবণক

বিতর্কিত আলোচনা

(১৯)

ভারতে ফিল্ম সেনসরশিপ সম্বন্ধে খোসলা কমিটি যে সমস্ত সুচিন্তিত সুপারিশ করেছেন তা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান সেনসরশিপ ব্যবস্থার বিভিন্ন অসঙ্গতি সম্পর্কে বহু পূর্বেই এই অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা উচিত ছিল।

কমিটির যে সুপারিশ সম্প্রতি দেশব্যাপী বিতর্কের সৃষ্টি করেছে তা হলো ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা প্রদর্শন সম্পর্কে। কমিটির মতে, গল্পের জন্য যুক্তিসঙ্গত, প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় হলে চুম্বন বা নগ্ন মানবদেহ প্রদর্শনের দৃশ্যে আপত্তির কিছু নেই, যদি উক্ত দৃশ্য আর্টিসটিক বা শিল্পসঙ্গতভাবে দেখানো হয় এবং তাতে অযথা বাড়াবাড়ি কিছু না থাকে। কমিটির এই বলিষ্ঠ সুপারিশে আপত্তিজনক কিছুই নেই। এই সুপারিশের মূল উদ্দেশ্য হলো, আধুনিক চলচ্চিত্র পরিচালকদের আরও বেশী স্বাধীনতা দেওয়া, যাতে তাঁরা তাঁদের সৃজনক্ষমতার প্রকাশ ঘটিয়ে আরও উপযুক্তভাবে চলচ্চিত্র মাধ্যমকে ব্যবহার করতে পারেন এবং আমাদের দেশের চলচ্চিত্রের মান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতির সমপর্যায়ে আনতে পারেন।

চুম্বন ও নগ্নতা অমানবিক ধারণা নয়। চুম্বন মানুষের ভালোবাসা ও স্নেহের এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। ভারতীয় চলচ্চিত্রে এখনো পর্যন্ত মা তাঁর সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রকাশের জন্য সন্তানকে চুম্বন করতে পারেন না। চলচ্চিত্রে-চুম্বন সম্বন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গি একান্তই অবাস্তব ও হাস্যকর।

অপ্রাপ্তবয়স্করা যাতে প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী ছবি দেখতে না পায় তার জন্য কমিটি মারালিটির প্রতি গার্ড হিসাবে চলচ্চিত্রগুলি তিনটি বিভাগে ভাগ করেছেন।

তাছাড়া, কমিটি বর্তমান কেন্দ্রীয় চলচ্চিত্র সেনসর বোর্ডের আমূল পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের সুপারিশ করেছেন। এই সুপারিশ সেনসরশিপ নীতিতে সঙ্গতি ও সমতা আনবে, বর্তমান ব্যবস্থায় যার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা প্রদর্শন সম্পর্কে খোসলা কমিটির উদার দৃষ্টিভঙ্গি ভাল না খারাপ সে সম্বন্ধে এখনই সুস্পষ্টভাবে কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু তবু এই দৃষ্টিভঙ্গিকে নিন্দা করা উচিত নয়, কারণ, এক্সপেরিমেন্টের মধ্য দিয়েই যে কোনো বিষয়ে পারফেক্‌শন আসে।

স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো সুস্থ ব্যক্তিই আর্টের নামে পর্ণগ্রাফিকে সমর্থন করবেন না এবং কোনো পরিচালকই রূপালী পর্দায় পর্ণগ্রাফিকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হবেন না, যদি না তাঁর মানসিক অসুস্থতা থাকে।

ভুবনেশ্বর বা কোনারকের মন্দির-গাত্রের দৃশ্যসমূহ যদি মানুষের স্বাভাবিক নৈতিক গুণগুলি নষ্ট না করে, তাহলে চুম্বন ও নগ্নদেহের দৃশ্য সংযমের সঙ্গে ও আর্টিসটিক্‌ বা শিল্পসঙ্গতভাবে প্রদর্শিত হলে তা মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটাবে এমন কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

যদি চলচ্চিত্র-নির্মাতাগণ সেক্‌স্‌, ভায়োলেন্‌স প্রভৃতি বিষয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করেন তাহলে দর্শকরা অর্থাৎ জনসাধারণই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন।

শৈবাল বসু, কলকাতা—৫৪।

(২০)

বর্তমানে খোসলা কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে যে বাদবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তার সম্পর্কে কিছু মতামত না জানালে নিজের স্বাধীন নাগরিকত্বে আঘাত লাগে। অমৃত পত্রিকায় যে দুইটি চিঠিতে পারুল দাশগুপ্ত ও রতীনকুমার চন্দ্রের মতামত প্রকাশিত হয়েছে সেই দুটি চিঠির মধ্যেই আমাদের প্রকৃত মতামতকে জানতে পারবো বলে মনে হয়। প্রথমেই পারুল দাশগুপ্তের কথা মনে আসে। তাঁর আধুনিকত্বের প্রকাশে হতভম্ব হয়ে পড়ি। তিনি বলতে চেয়েছেন (যতদূর মনে হয়), বর্তমান পৃথিবীতে আমরা আমাদের সংস্কারের মধ্যেই ডুবে আছি। অন্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে চুম্বন ও নগ্ন দৃশ্যের প্রস্তাবকে সমর্থন করতে হবে। নইলে ভারতীয় ফিল্ম আত্ম-জাগরণের সুযোগ পাবে না। কিন্তু শ্রীমতী দাশগুপ্তের এই মতই কি সমস্ত ভারতবাসী মেনে নেবে? চুম্বন ও নগ্ন দৃশ্য প্রকাশের মধ্যে দিয়েই কি ভারতবর্ষের সংস্কারমুক্ত মনের মুক্তি মিলবে? কিন্তু এ তথ্যকে সত্য মনে হয় না। স্বামীজীর ভারতবর্ষের, নেতাজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষের আত্মমুক্তির পথ এটা নয়। তাই যদি হতো তাহলে রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষকে, নেতাজীর ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবী চিনতো না। সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মনকে নাড়া দিত না। মানুষের মনকে জাগাবার জন্যে চুম্বন ও নগ্নতার পথই কেবল একটা মাত্র আত্মমুক্তির পথ নয়। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় সংস্কারের অনেক কিছু আছে। আমাদের দেশের অন্ধকার দিকটায় যদি একটুখানি চেয়ে দেখেন তাহলে পারুল দেবীর গলি থেকে রাজপথে পৌঁছবার মত এই সহজ পথটায় পৌঁছবার মনোবিলাস ত্যাগ করবেন। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষার মুখ দেখেনি, যে দেশের মেয়েরা আত্মসম্মান বজায় রেখে পথ চলতে পারে না, যে দেশে মা-বোনেরা একসঙ্গে বসে বই দেখতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে আসে, সবশেষে যে দেশের মাটিতে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা ঘটে, সে দেশে খোসলা কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হলে মা-বোনেরা আত্মীয়-পরিজন নিয়ে কেমন করে এই ধরনের বই দেখতে পারবেন সে বিষয়ে মনে প্রশ্ন জাগছে। শুধুমাত্র মা-বোনেরা নন। কতজন মার্জিত রুচিসম্মত তরুণী এই ধরনের ফিল্ম দেখতে পারবেন সেকথাও ভাবতে হবে। এ বিষয়ের আলোচনায় জামালপুরের রতীনকুমারকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, আর পারুল দাশগপ্তকে বলি ভারতবর্ষের আত্মমুক্তির সম্বন্ধে তিনি যেন একটু কম চিন্তা করেন।

অরুণা মজুমদার কলকাতা-৪।

(২১)

চুম্বন ও নগ্নতা শীর্ষক বিতর্কিত আলোচনাটি পড়লাম। রচনাটি যুক্তিপূর্ণ। খোসলা কমিটির রিপোর্ট সমগ্র দেশে এক আলোড়ন এনেছে। এদেশের ভাবধারায় চুম্বন ও নগ্নতা সত্যই সমর্থনযোগ্য নয়। এর এক ভয়ঙ্কর প্রভাব আমাদের সমাজ-জীবনকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করবে সন্দেহ নেই। তবুও এ কথা ঠিক, এই ধরনের চিন্তাধারা থেকে সমাজকে অদূর-ভবিষ্যতে রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। বর্তমানে আমাদের সমাজজীবনে এক বিশৃঙ্খল আবহাওয়া বইছে। সামাজিক মূল্যবোধ নেই, নৈতিক চরিত্র প্রতিদিন নেমে চলেছে। জাতির সামনে সার্থক আদর্শ-চরিত্রের অস্তিত্ব নেই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, সৌজন্যবোধ, স্বাভাবিক ভব্যতা, সমস্ত সদ্‌গুণ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। প্রগতির নামে আজকাল অনেক নোংরা জিনিস সমাজে সম্মান লাভ করছে। মেয়েদের ব্লাউজ এখন কাঁচুলির রূপ নিয়েছে। মদ্যপান, সিগারেট খাওয়া তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে আভিজাত জীবনের অঙ্গ বলে গণ্য হচ্ছে। কিন্তু সিনেমার পর্দায় নায়ক-নায়িকারা যা করেন তাতে চুম্বন ও নগ্নতার প্রদর্শনে বাকীই বা কী থাকছে? কাজেই মনে হচ্ছে বাধা দিলেও তা সফল হবে না। ভারতের সংস্কৃতি, ধর্ম? এসব অনেক আগেই এদেশে সম্মান জাগিয়েছে। প্রথম প্রথম চুম্বন ও নগ্নদেহের প্রদর্শন কিছুটা অস্বস্তি সৃষ্টি করবে সন্দেহ নেই। তবে ক্রমশ অনেকিছুর মত সব সহনীয় হয়ে উঠবে। এটা যুগধর্ম। একে অস্বীকার করা সম্ভব হবে কী?

—বিদ্যুৎকুমার চট্টোপাধ্যায়,
আমতা, হাওড়া

প্রেক্ষাগৃহ

বৈষ্ণবী প্রেম রসে জারিত কমললতা

শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব"-এ কথিত মুরারিপুরের বৈষ্ণবী আখড়ার কমললতাকে এমনভাবে রূপে-রসে জীবন্ত দেখতে পাব, চারুচিত্র নিবেদিত ও হরিসাধন দাশগুপ্ত পরিচালিত "কমললতা" দেখবার আগে এ কথা ভাবতেও পারিনি। সকালবেলা গ্রাম পথে সদলবলে কীর্তন গেয়ে কমললতা আখড়ার জন্যে চাল সংগ্রহ করে আনে। তারপর শুরু হয় নিত্যকারের রাঁধা-বাড়া, জল-তোলা, কুটনো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাপড়ছোপানো ইত্যাদি। এর ওপর আছে সকাল-সন্ধ্যায় পুজোর সময়ে বিগ্রহের সামনে কীর্তন-গাওয়া। এমনই করেই চলে কমললতার সাধনভজন। দেবপদে উৎসর্গিত প্রাণ কমললতা কিন্তু মানুষকেও ভালোবাসে। বালবিধবা কমললতা মানুষকে ভালোবেসে, বিশ্বাস করেই দুঃখ পেয়েছিল। সেই দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই সে করেছিল শ্রীবৃন্দাবনধাম যাত্রা। তারপরে বহু তীর্থ, বহু পথ পরিক্রমার পরে সে এসে পড়েছে দ্বারিকাদাস বাবাজীর ঐ মুরারিপুরের আখড়ায়। এখানে এসে তার পরিচয় হয়েছিল মুসলমান ফকির সম্প্রদায়ের বংশধর কবিপ্রাণ গহরের সঙ্গে। এবং তারই সূত্র ধরে পরে আলাপ হয় বৈরাগীর মন নিয়ে জন্মানো শ্রীকান্তের সঙ্গে। কোন বাল্যকালে ঐ শ্রীকান্ত নামধারী একটি লোকের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল বলে সে শ্রীকান্তকে নাম ধরে ডাকতে পারলনা, তাকে সম্বোধন করল—নতুন গোঁসাই বলে। কমললতার একটুও স্বীকার করতে বাধলনা যে, সে দুটো দিনের মধ্যেই শ্রীকান্তকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু সে ভালোবাসা হচ্ছে, "রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়"। তাই শ্রীকান্ত যখন জিজ্ঞাসা করল, "তোমার জপতপ, তোমার কীর্তন, তোমার রাত্রিদিনের ঠাকুরসেবা, এসবের কি হবে বলত?" তখন বৈষ্ণবী কমললতা অনায়াসে উত্তর দিল, "এরা আমার আরও সত্যি, আরও সার্থক হয়ে উঠবে।" কমললতা নিশ্চয় করে জানত "যার পাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছি, দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেন না।" গহরের সঙ্গে মেলামেশা নিয়ে দুর্নাম রটায় কমলকে যখন আখড়া ছেড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল, তখন তার নিরাশ্রয় হবার ভাবনায় শ্রীকান্ত অস্থির হয়ে উঠলে সে তাকে মিনতি করেছিল, "আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ করোনা গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।"—এই কমললতা মূর্ত হয়ে উঠেছে কমললতা চিত্রে। কমললতার চিত্ররূপ দিতে গিয়ে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত যে "শ্রীকান্ত চতুর্থ-পর্ব"-এর রাজলক্ষ্মী চরিত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে মাত্র "গহর-কমললতা-শ্রীকান্ত" অংশটিকে ব্যবহার করেছেন, এর মধ্যে তাঁর রসজ্ঞানেরই পরিচয় পাই। বৈষ্ণবী ভক্তির রসসায়রে কমললতা ফুটতে পেয়েছে অবলীলাক্রমে।

অভিনয়ের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বহুদিন পরে চরিত্রের সঙ্গে তন্ময় হওয়া প্রত্যক্ষ করলুম নাম-ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের অভিনয়ের মাধ্যমে। বাচনে, ভঙ্গীতে তিনি অপরূপা, কমললতার রসরূপকে তিনি আশ্চর্যভাবে মূর্ত করে তুলেছেন। শ্রীকান্তের ভূমিকায় উত্তমকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাবলীল অভিনয় করেছেন। কমললতার নামে মিথ্যা দোষারোপে শ্রীকান্ত যেখানে উত্তেজিত সেখানে তাঁর আবেগপ্রবণ অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। দ্বারিকদাস বাবাজীরূপে পাহাড়ী সান্যাল একটি মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন। গহরের উদার চরিত্রটি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে নির্মলকুমার দ্বারা। গহরের নবীন চাকরের টাইপ ভূমিকায় সার্থক রূপদান করেছেন তরুণকুমার। এ ছাড়া সমরকুমার (যতীন), ছায়া দেবী (আখড়ার ক্ষ্যাপা বৈষ্ণবী), যূঁই বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্ম), রমি চৌধুরী (পুঁটু), জহর রায় (পুঁটুর দাদু), বিজন ভট্টাচার্য (ক্ষ্যাপ

অগ্নিযুগের কাহিনী চিত্রে জহর রায়।

মহাজাতি সদনে সদারঙ্গ সংগীত সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী রবী দত্ত রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান এবং প্রধান অতিথি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

ফটো : অমৃত

ধারক) প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে একটি উচ্চমান পরিলক্ষিত হয়। চিত্র গ্রহণে—বিশেষ করে কমললতার ক্লোজ আপগুলিতে আলোছায়ার খেলা আশ্চর্য-ভাবে সার্থকতা লাভ করেছে। ছবির অর্ধেকেরও বেশী অংশ জুড়ে রয়েছে দ্বারিকাদাস বাবাজীর বৈষ্ণবাশ্রম বা আখড়া। এই আখড়া রচনায় শিল্পনির্দেশক অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

"কমললতা" ছবির একটি প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এর সংগীতাংশ। এর আরম্ভ ভাগে পরিচয়লিপি থেকে শুরু করে আগাগোড়া এতে ছড়িয়ে আছে কীর্তনাঙ্গের গান। এক গানের রেশ শেষ হতে না হতে অন্য গান আরম্ভ হয়ে যায়—কানে সারাক্ষণ ধ্বনিত হতে থাকে গানের সুর। এক গান থেকে আরেক গানের মিশ্রণকে এমন সহজ করে তোলার মধ্যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। গানের পরে গান এসে যে মাধুর্যময় পবিত্রতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতেই কমললতা শ্রীকান্তর প্রেম অপার্থিব হয়ে উঠতে পেরেছে এবং সেই সঙ্গে দর্শকজনের উপভোগ্যভাবে গ্রহণীয়।

চারুচিত্র নিবেদিত 'কমললতা' একটি স্মরণীয় চিত্ররূপে কীর্তিত হবে।

বোম্বাই থেকে

সম্প্রতি একটি সুখবর শোনা যাচ্ছে: [illegible] রাজ্য সরকার তাঁদের এলাকায় স্টুডিও নির্মাণে বিশেষ সহযোগিতা করবেন বলে সংবাদে প্রকাশ। অন্ধ্রদেশে রামানন্দ [illegible] ইতিমধ্যে স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। কেরালা সরকারও এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করছেন। মহারাষ্ট্র সরকারও বোম্বাইয়ের কাছাকাছি একটি ফিল্ম সিটি নির্মাণের জন্য জমি দেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার গাজিয়াবাদে একটি স্টুডিও নির্মাণের জন্য সব রকম সুবিধা দেবেন বলে জানা গেছে। বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা সুনীল দত্ত এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী হয়েছেন। ইউ পি সরকার এজন্য ২০ লক্ষ টাকা ঋণ স্বরূপ দেবেন বলে প্রকাশ ইউ পি ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের মারফৎ। এই বিষয়ে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অনুমতিও দিয়েছেন শ্রীদত্তকে। এই প্রতিষ্ঠানের তৈরী সব ছবিকে প্রমোদকর স্বরূপ সরকারী অংশের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ দেওয়া হবে প্রথমে একবছর, পরে এর মেয়াদ আরও বাড়ানো যেতে পারে তবে পাঁচ বছরের বেশী নয়। এই প্রতিষ্ঠানকে বিনাশর্তে চিত্রগৃহ নির্মাণের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারেও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। স্বয়ংসম্পূর্ণ স্টুডিও নির্মাণের জন্য ২০০ একর জমিও দেওয়া হবে কেবল ক্রয়মূল্যে। স্টুডিও তৈরীর সমস্ত যন্ত্রপাতিও নির্বাচিত মূল্যে ক্রয় করার সুবিধা দেওয়া হবে।

শুধু এই নয়, এ ছাড়াও আছে। চিত্র নির্মাণের জন্য প্রথম পাঁচ বছর যে লাভ হবে তার আয়করের ব্যাপারেও যথেষ্ট সুবিধা দানের কথা ইউ-পি সরকার বলেছেন ডকুমেণ্টারী এবং টেলিভিশন ছবির ব্যাপারেও যদি এই সংস্থার দর প্রতিযোগিতা মূলক হয় তাহলে সে সমস্ত ছবির দায়িত্ব এই সংস্থা পাবেন।

শুনতে এবং কাগজে পড়তে এগুলি খুব ভাল, কিন্তু কার্যত কতদূর গড়াবে সেইটাই দেখা দরকার।

অনেক সময় অসম্ভবও সম্ভব হয়: একজন নবাগতর পক্ষে এক সঙ্গে ১৭ খানি ছবিতে সাক্ষর করা অসম্ভব নয় কি?—তার মধ্যে আবার কতকগুলিতে নায়কের ভূমিকা। এঁর প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হল 'মন-কা-মীত'। এতে ভিলেনের ভূমিকা। এই ছবি মুক্তি পাবার আগে থেকেই তাঁকে চুক্তিবদ্ধ করলেন জ্ঞানী সোনি এবং শ্যাম রালহান তাঁদের 'প্রীতম এবং চৌকিদার' ছবির জন্য। তারপর "মন-কা-মীত" মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে দুজন বড় প্রোডিউসারের সঙ্গে তিনি চুক্তি-

বন্ধ হলেন—এক মনোজকুমার তাঁর 'পূরব পশ্চিম' ছবির জন্যে এবং শক্তি সামন্ত তাঁর 'জানে অজানে' ছবির জন্যে। তারপর তিনি একে একে সই করলেন 'সাচ্চা ঝুটা', 'এক হাসিনে দো দিবানে' এবং 'মার্ডার অন হাওড়া ব্রিজ'। এ ছাড়াও তিনি সই করেছেন অঞ্জনা সফর এবং হোমি ওয়াদিয়ার ছবি 'ম্যয় আউর মেরা গায়া' (এটি নায়কের ভূমিকা তনুজার বিপরীতে) এবং শ্রী ফিল্মসের একখানি ছবিতে নায়কের ভূমিকায়। অভিনেতাটির বয়স মাত্র ২৩ বছর, প্রথম ছবি মুক্তি পাবার সাত মাসের মধ্যে ১৭ খানি ছবিতে স্বাক্ষর করা অসম্ভব শোনায় না কি? অভিনেতাটির নাম বিনোদ খান্না।

আর একজন নবাগতার কথা বলছি। এর নাম রেখা। শত্রুজিৎ পালের 'মেহমান' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এ ছাড়াও 'অনজানা সফর' এরও নায়িকা ইনি। সম্প্রতি কয়েকজন সাংবাদিক তাকে কিছু প্রশ্ন করেন। তাঁর সরল ও নির্ভীক উত্তরদানে সবাই বেশ চমৎকৃত। সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে বেশীর ভাগ অভিনেত্রীরাই এড়িয়ে যান কিংবা 'সাপও মরে—লাঠিও না ভাঙে' এই ধরনের উত্তর দেন। কিন্তু এই দক্ষিণ ভারতবাসিনী

মন নিয়ে চিত্রে সুপ্রিয়া দেবী এবং উত্তমকুমার।

নায়িকাটি কি রকম চটপট জবাব দিয়েছেন শুনুন—

'আপনার প্রিয় নায়ক কে?'

'জিতেন্দ্র।'

'কোন বিশেষ কারণ?'

'কারণ নায়কদের মধ্যে সেই সব থেকে ছোট।'

'এবং অবিবাহিত!' একজন সাংবাদিক বললেন।

'এটা একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না কি?' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন রেখা।

'আপনার প্রিয় অভিনেত্রী কে?'

'আশা পারেখ।'

'কোন বিশেষ কারণ?'

রেখা বললে ঃ 'কারণ তাকে ভারী সুন্দর দেখতে।'

তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো 'আপনি কি চিত্রে চুম্বনের পক্ষপাতী?'

'হ্যাঁ যদি চিত্রে প্রয়োজন হয়। তবে চুম্বনের সময় মেয়েদের শাড়ী বা মাথার 'গাজরা' না পরে রাত্রিবাস পরাই ভাল।'

অনেকই প্রশ্ন করলেন, 'কেন, কেন? গাজরার অপরাধ কি?'

'কারণ সুবিধের জন্যে। নায়িকা মাথার চুল সামলাবে না সিনের প্রয়োজন মেটাবে?'

'আচ্ছা, আপনি তো ৩।৪ খানা দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে অভিনয় করছিলেন, তবে হিন্দী ছবিতে এলেন কেন?'

'টাকার জন্যে। হিন্দী ছবিতে বেশী টাকা পাওয়া যায় বলে।'

'আচ্ছা, আপনি কি রকম স্বামী পছন্দ করেন?

'আমার স্বামী হবেন ডাক্তার। সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেন রেখা।

'কেন, ডাক্তার কেন?' দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীদের ডাক্তারের প্রতি এত মোহ কেন?

'কারণ চুম্বনের দৃশ্য অভিনয়ের পরে হাতের কাছে একজন ডাক্তার থাকা ভাল নয় কি? কোন রকম রোগের বীজাণু যাতে আমার কোন ক্ষতি করতে না পারে সেদিকটাও তো দেখতে হবে।'

'আপনার এই চুম্বনের দৃশ্য দেখে আপনার স্বামীর প্রতিক্রিয়া কি হবে বলুন তো!'

'তার মন হবে উদার।'

'কিন্তু আপনি যদি দেখেন আপনার স্বামী কোন স্ত্রীলোককে চুম্বন করছেন তাহলে আপনি কি করবেন?'

'তার গালে ঠাস করে এক চড় মারব।' হাসতে হাসতে বললেন রেখা।

সত্যি কথা বলবার সৎসাহস আছে মেয়েটির।

মঞ্চাভিনয়

কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা রঙ্গশ্রী সম্প্রতি দিল্লীতে স্থানীয় চেনামহল গোষ্ঠীর আমন্ত্রণে তিনদিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবে বেনজদু, আমেন এবং এলেম নতুন দেশে নাটক তিনটি মঞ্চস্থ করে সেখানকার নাট্যরসিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তিনটি ভিন্ন স্বাদ ও আঙ্গিকের এই তিনটি নাটকই সর্বস্তরের দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়। মঞ্চসজ্জা, আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতও দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। অভিনয়ে স্ত্রী-চরিত্রগুলির মধ্যে রেণু ঘোষ ও সন্ধ্যা পাল এবং পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে নিশীথ ব্যানার্জি, সত্য চ্যাটার্জি, শিশির চ্যাটার্জি, কেষ্ট দাস, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, প্রণব সিনহা, গোপাল ঘোষ, বিশ্বনাথ সাঁতরা, সূর্য দাস, দেবাশিস চক্রবর্তী ও রমেন লাহিড়ী বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। নাটকগুলির রচয়িতা ও পরিচালক হিসাবে শ্রীলাহিড়ী স্থানীয় কয়েকটি নাট্যসংস্থা কর্তৃক বিশেষভাবে সম্বর্ধনা লাভ করেন। আলোকসম্পাত ও আবহসঙ্গীতের কৃতিত্ব যথাক্রমে বিশ্বনাথ পাল ও অরুণ দাসের। স্থানীয় ফাইন আর্টস হলে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়।

মুকুট নাট্য সংস্থা আয়োজিত '৬ষ্ঠ বার্ষিক সারা বাংলা পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতা' ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হবে। নাট্যকার, পরিচালক ও শিল্পীদের নিয়ে গঠিত বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থার নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, সহ-অভিনেতা, সহ-অভিনেত্রী, শিশু অভিনেতা ও আরও অন্যান্য বিষয়ে পুরস্কৃত করা হবে। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দুটি সংস্থাকে যথাক্রমে ১০১ টাকা ও ৫১ টাকা পুরস্কৃত করা হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৯। যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২০, ব্যানার্জি পাড়া, পোঃ নৈহাটি, জেলা ২৪-পরগণা।

মানুষের দুর্দম জয়যাত্রার অনন্য বৃত্তের বিতর্কমূলক ও দুঃসাহসী ধারাকে 'কালপুরুষে'র প্রযোজনার পর আকাদেমী অব আর্টস অ্যান্ড কালচার ২২ অক্টোবর, রবিবার সন্ধ্যায় তার পরবর্তী নাটক 'ফেরার' নিয়ে উপস্থিত হচ্ছেন আকাদমী অব ফাইন আর্টস হলে। অবক্ষয়ের উজান-পেরোন জীবনের কথা নিয়ে এই নাটক রচনা করেছেন বিভাস ঘোষ। সঙ্গীত, আলো ও আঙ্গিক উপদেষ্টারূপে আছেন যথাক্রমে কুমার কিশোর, স্বরূপ মুখোপাধ্যায় ও রবি চ্যাটার্জি। বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিচ্ছেন শঙ্কর, নীল মিত্র, রজত মুখোপাধ্যায়, সত্য চট্টোপাধ্যায়, সিপ্রা সাহা, বেবী মুখোপাধ্যায়, নমিতা মণ্ডল, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিল্টু ঘোষ ও নির্মল সেন। নাটকটি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন নির্মাল্য সেনগুপ্ত।

লোকয়নের নতুন প্রযোজনা দুটি একাংক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'বাজপাখী' ও তুলসী লাহিড়ীর 'চৌর্যানন্দ' মঞ্চস্থ হচ্ছে আগামী ১৭ অকটোবর '৬৯ সকাল ১০টায় মুক্ত অঙ্গণে।

নির্দেশনায় আছেন অরুণ রায়। লোকায়নের আগামী পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা লোকনাথ ভট্টাচার্যের "কোলকাতা! কোলকাতা! কোলকাতা!"—মঞ্চস্থ হচ্ছে আগামী ডিসেম্বর মাসে কোলকাতার কোন প্রখ্যাত মঞ্চে।

কলকাতা মেলা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সৌজন্যে ভারতীয় শিল্পী পরিষদের অনন্যসাধারণ মঞ্চ সৃষ্টি অতীনলাল পরিকল্পিত "শ্রীচৈতন্য" নৃত্যনাট্য-এর আগামী অভিনয় ২৩ অকটোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মহাজাতি সদনে। রচনা রাখাল ভট্টাচার্য। সঙ্গীত কানাই বন্দ্যোপাধ্যায়। আলো অনিল সাহা।

কৃষ্ণনগর শাখার সেন্ট্রাল এক্সাইজ অ্যান্ড ল্যান্ড কাস্টমসের কর্মীরা কিছুদিন আগে স্থানীয় রবীন্দ্র-ভবনে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। পরমেশ সেনগুপ্ত নির্দেশিত নাটকের কয়েকটি চরিত্রে সার্থক রূপ দেন মলয় সোম, অনিমেশ মুখার্জি, অজন্তা সিনহা, বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী, অনিলরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুকান্ত লাহা, যূথিকা চ্যাটার্জি।

পাটনার প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'চতুরঙ্গ' সম্প্রতি উৎপল দত্তের 'ঘুম নেই', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নানা রঙের দিন' ও রবীন ভট্টাচার্যের 'রক্তে রোয়া ধান' নাটক তিনটি অভিনয় করে। 'ঘুম নেই' নাটকের প্রযোজনাই সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছিল এবং এই সুপ্রযোজিত নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন অসিত বাগচী, ফল্গু ঘটক, নিখিল ঘোষ, স্বর্ণকমল মুখার্জি, বরুণী সরকার, আশিষ ঘোষাল, মৃণাল কর,

ইত্তেফাক চিত্রে রাজেশ খান্না এবং নন্দা।

ভূমিকায় থাকবেন রাজেশ খান্না। ছবিটি মাস কয়েকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মডার্ণ হাইস্কুল ফর গার্লস-এর ছাত্রীরা 'ম্যান অব ফেথ' (ভগবৎ বিশ্বাসী মানুষ) নাম দিয়ে মহাত্মাজীর জীবনী, শিক্ষা এবং আদর্শকে নৃত্য-গীত ও নেপথ্য ভাষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন উৎফুল্ল দর্শকদের সামনে গেল ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অকটোবর সন্ধ্যায়। সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী এবং ইংরাজী ভাষায় অনূন ষোলো-সতেরো গান ও তার সঙ্গে উপযুক্ত আলোকসম্পাত ও ছায়া দৃশ্যের সহযোগিতায় একটি নতুন জগতের সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীজীর জন্ম থেকে শুরু করে তাঁর বাল্যবিবাহ, তাঁর মাতৃভূমিকে ধর্ম ও সমাজের সংকীর্ণতাকে মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা, প্রথম ইয়োরোপীয় সমরে ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা, জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে গান্ধীজীর ক্ষোভ এবং ইংরাজের প্রতি অবিশ্বাস, অসহযোগ আন্দোলন, নির্বিশেষে ভারতীয়দের মধ্যে একতা স্থাপন, 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গ্রহণ, দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালি ভ্রমণ, ভারতের স্বাধীনতা লাভ, প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজীর আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ ইত্যাদি ঘটনাকে ইংরাজী নেপথ্য ভাষণের মাধ্যমে বিবৃত করা হয় এই নৃত্য-গীতকে অর্থবহ করবার জন্যে। প্রায় ষাটটি মেয়েকে বিভিন্ন নাচে অংশ গ্রহণ করানো এবং বাইশটি মেয়েকে সমবেতভাবে গাওয়ানোকে সার্থক করে তোলা একটি অসাধারণ সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় বহন করে। আমরা এই অসাধ্য সাধনে সাফল্য লাভ করবার জন্যে অনুষ্ঠান পরিচালিকা মঞ্জুলিকা দাশ এবং কণ্ঠসঙ্গীত-পরিচালিকা সুনন্দা দাশগুপ্তাকে সাধুবাদ জানাই। সামগ্রিক উপসনাটিও শিল্পসম্মতভাবে সৌন্দর্যময় হয়েছিল।

শিশু স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান মহাজাতি সদনে, রবিবার (১২ই অকটোবর) সকাল ন'টায়। এদিন যাদুকর এস, কে. মাহার যাদু প্রদর্শন এবং অগ্রত স্কাউট (১২শ পূর্ব কলিকাতা) কর্তৃক শিশু নাটক "রূপকথার দেশে" পরিবেশিত হবে।

গত ১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণীর উদ্যোগে এক ব্রহ্মসংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন 'ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তনের শিল্পীগোষ্ঠী। উক্ত অনুষ্ঠানে রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যদুভট্ট, গুণেন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির ব্রহ্মসংগীত পরিবেশিত হয়। সংগীতাংশে ছিলেন সুপর্ণা চৌধুরী, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, জয়শ্রী ভট্টাচার্য, সুরশ্রী দাস, ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী, প্রসূন দাশগুপ্ত, অরূপরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক ঠাকুর, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীশ নায়েক।

কস্তুরী ফিল্মস-এর পতাকাতলে চিত্র-শিল্পী-পরিচালক দীনেন গুপ্ত যে ছবিটির নিয়মিত শ্যুটিং আসছে মাস থেকে আরম্ভ করবেন, সেটি হচ্ছে আশাপূর্ণা দেবীর মধুর কাহিনী অবলম্বনে "প্রথম প্রতিশ্রুতি"।

স্টুডিও থেকে

এন টি'র দু নম্বর দুটো ফ্লোরই এখন একবারে গড়ের মাঠ। এই ক'দিন আগে অব্দি দুটো ফ্লোরেই কাজ হয়েছে একসঙ্গে। ডান দিকের ফ্লোরটার সামনের বেঞ্চিতে বসে কথা বলছিলাম একজন উদীয়মান নায়কের সঙ্গে। পুজোয় কোথায় যাচ্ছেন জিগ্যেস করায় জবাব দিলেন—'কি আর করি বলুন, কন্টিনেন্ট টুরের তো আর আশা নেই, কাছাকাছি সিমলা বা নৈনীতালই ঘুরে আসব ভাবছি।'

ঃএখনও ঠিক করেন নি যাবেন কিনা?

—না। স্যুটিং-এর ডেট তো প্রায় চোদ্দ তারিখ অব্দি রয়েছে। ট্রেনের রিজার্ভেশন হয়তো পাবো না, প্লেনেই যেতে হবে দেখছি। বছর খানেক আগেও এই শিল্পী (স্টার হননি তখনও) ছবিতে অভিনয় করার জন্য বেশ এদিক-ওদিক ঘুরতেন। কিন্তু আজ?

ক'দিন যাবৎ স্টুডিও পাড়া ঘুরে স্টার-দের মুখে শুনলাম শুধু 'আমার শাশুড়ি এবার চকোলেট গ্রীন কাটা ভয়েল দিচ্ছেন,' 'ওর আবদার গাড়ীটাকে এবার এয়ারকণ্ডি-শনড করিয়ে নিতেই হবে, নইলে...' 'সিঙ্গাপুর থেকে স্মাগলিংয়ে কি একটা পাথর এনে দিয়েছে একজন, আংটিই করব একটা', 'ফ্ল্যাটটা চেঞ্জ করে লেক প্লেসেই চলেই আসব ভাবছি পুজোয়' ইত্যাদি ইত্যাদি ধরনের।

তবে পরিচালকের মধ্যে থাকছেন কয়েক-জন, কয়েকজনের ছবি রিলিজ হচ্ছে এ সপ্তাহে আর আসছে সপ্তাহে। সুতরাং সাফল্য অসাফল্যের দোলায় দুলতে দুলতে পুজোয় তাঁরা কলকাতার ভিড়েই হয়ত থাকবেন, কিন্তু অন্য জগৎ অন্য সমাজ অন্য আনন্দ তখন।

●

টেকনিসিয়ানে একটানা স্যুটিং চলছিল 'এখানে পিঞ্জর' ছবির। পরিচালক দিলীপ মুখোপাধ্যায় আগে থেকেই বলে রেখে-ছিলেন। স্টুডিওর এক নম্বর ফ্লোরে ঢুকে দেখি সেট পড়েছে এক সাধারণ ঘরের। শোবার ঘর, খাটের ওপর বসে আছেন অর্পণা দেবী। সামনের একটা চেয়ারে উত্তম কুমার। যাত্রিক গোষ্ঠীর অন্যতম শরিক তপেশ্বরবাবু স্ক্রিপ্ট পড়াচ্ছেন অর্পণা সেনকে। উনি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে।

ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্ত আলো ঠিক করছেন। ঘরের দেওয়ালের ওপর লাইট নিয়ে বসে রয়েছে কয়েকজন আলোকসম্পাতকারী (ক্রেডিট টাইটেলের ভাষায়)। বার কয়েক রিহার্সালের পর দৃশ্যগ্রহণ হলো। তারপরই পরিচালকের নির্দেশে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি (ব্রেক ফর লাঞ্চ স্টুডিওর ভাষায়)। বেরিয়ে এলাম সেট থেকে।

উত্তমকুমার চলে গেলেন ডানদিকের মেক-আপ রুমে আর অর্পণা সেন পা বাড়ালেন সামনের একফালি ঘরের জমি পেরিয়ে ওপাশের বিশেষ মেক-আপ রুমে। অর্পণার সঙ্গে তখন সহচরী হয়েছেন শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের স্ত্রী, পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যে ছেঁড়া ছেঁড়া কথাগুলো কানে এলো বুঝলাম পুজোর হাওয়া লেগেছে।

যে দৃশ্যটার টেক হলো তা অত্যন্ত ভাইটল। তাই মনে পড়তেই ডায়ালগটা পুরোপুরি তুলে নেবার জন্য ফিরে গেলাম ফ্লোরে ঢুকে দিখে ফ্লোরে দিলীপ বাবু নেই। বাঁদিকের কোণটায় একটা আলো জেবলে ক'জন কুশলী ছোট টিফিন বাক্স খুলে 'লাঞ্চ' খাচ্ছেন রুটি আর আলুভাজা দিয়ে। আমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেলেন ওরা। জিজ্ঞেস করলেন একজন (এর নাম বহু ছবির পরিচিতিতে দেখা গেছে পর্দায়) 'ফিরে এলেন আবার?'

প্রসঙ্গ বদলে বললাম—'না, এমনিই। এখানেই খাচ্ছেন কি ব্যাপার?' কিছুই উত্তর দিলেন না কেউ। বুঝলাম বলার অনেক আছে তাই ওরা চুপচাপ। তাই আবার প্রশ্ন করি—'পুজো তো এসে গেল।'

মুখ খুললেন এবার অন্য একজন। বলল—'হ্যাঁ দাদা! প্রতিবারই তো আসে। আজ বেরোবার সময় বাচ্চা মেয়েটা বলছিল বাবু, আমার জন্য জামা আনবে বাবু।'

বললাম—'ভালোই তো, নিয়ে যাবেন!'

উত্তরে জানালেন—'বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঘরে তো সাতটা পেট। মাইনে পাই ক' টাকা! আচ্ছা দাদা, এই পুজোটুজো ব্যাপারগুলো বাদ দেওয়া যায় না! কি হয় এসব করে?

কি উত্তর দেবো ভেবে পেলাম না।

অগ্রগামীর বিলম্বিত লয় চিত্রে নির্মলকুমার এবং উত্তমকুমার। —ফটো : অমৃত

অজয় বসু

মস্তো নাম মার্সিয়ানো!

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা কে? প্রশ্নটি ঘিরে মুষ্টিযুদ্ধ অনুরাগী মহলে নিরন্তর আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক চলছে। এক কথায় প্রশ্নটির সদুত্তর কেউ দিতে পারেননি এবং কোনো মতই সর্ব-সম্মত নয়।

কেউ বলেন, সবার সেরা জ্যাক ডেমপ্‌সি। কারুর মত, জো লুই। শীর্ষ সংজ্ঞা পেতে আরও দাবীদার আছেন! যথা জ্যাক্ জনসন, একালের ক্যাসিয়াস ক্লে এবং সাম্প্রতিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত রকি মার্সিয়ানোও।

কিছুদিন আগে মার্কিন মুলুকে সর্ব-কালের সেরা মুষ্টিযোদ্ধাকে বেছে নেওয়ার জন্যে কম্পিউটারের ডাক পড়েছিল। নানা তথ্য জুগিয়ে কম্পিউটারকে যখন সর্বশ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা নির্বাচনে আহ্বান জানানো হয়, তখন যন্ত্রটি রায় দেয় মার্সিয়ানোরই অনুকূলে।

জানি না, কম্পিউটারের গণনা নিখুঁতে পৌঁছেছিল কিনা। তবে এ-কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সর্ব-কালের সেরা মুষ্টিযোদ্ধারূপে স্বীকৃত হবার দাবী যে-ক'জন রেখেছেন, রকি মার্সিয়ানো অবশ্যই তাঁদের অন্যতম।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের শিরোপা মাথায় নিয়ে তিনি খুব বেশী দিন রিংয়ে থাকতে চাননি এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের কেউ নিজেদের ক্ষমতায় তাঁর শীর্ষাসন টলাতে পারেননি। রকি নিজের ইচ্ছাতেই রিং থেকে সরে দাঁড়ান। অবসর নেন অপরাজিত অবস্থাতে। টাকা-পয়সা এবং খ্যাতি, কোনো কিছুতেই তাঁর অস্বাভাবিক লোভ ছিল না। তাই নামডাক খ্যাতিতে যখন তুঙ্গে তখনই তিনি অবসর নেন।

ইচ্ছে করলে রকি মার্সিয়ানো আরও বেশ কিছুদিন রিংয়ে থেকে যেতে পারতেন। কারণ, যে সময়ে তিনি অবসর নেন, সে-সময়ে আশেপাশে এমন উপযুক্ত প্রতি-দ্বন্দ্বী একজনও ছিলেন না, যিনি হারানো তো দূরের কথা, রকিকে এক মুহূর্তের জন্যে বেকায়দায় ফেলার সামর্থ্য ধরতেন। তাই পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে লাখ-চল্লিশ ডলার উপার্জন করেই তিনি তাঁর নিজের পরিবারে ফিরে গিয়েছিলেন।

কোনোদিনই উড়নচণ্ডী ছিলেন না। তাই রিংয়ে উপার্জিত অর্থ নিজের ব্যবসায় খাটিয়ে রকি মার্সিয়ানো উত্তরপর্বে অতি সুস্থ জীবনযাপন করেছেন। স্ত্রী, কন্যা ও জননী নিয়ে তাঁর সংসারের মুখে বিমান দুর্ঘটনায় রকি মারা যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হাসি লেগেই ছিল।

রাত অবধি নাইট ক্লাবে কাটানো বা ধূমপান, মদ্যপান, উঁচু গলায় লম্বা লম্বা কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন না। নিজের ঢাক নিজেও কোনোদিন পেটাননি। ১৯৫১ সালে প্রাচীন জো লুইকে অষ্টম রাউণ্ডে নক আউট করার পর রকি নিজেই সবচেয়ে দুঃখবোধ করেছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, পাঁচ দশকের জো লুই তিন-চার দশকের ছায়াও নন। অর্থাভাবেই জো লুইকে আবার রিংয়ে ফিরতে হয়েছে। তাই প্রায় অথর্ব এক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এক-কালের সেরা মুষ্টিযোদ্ধাকে হারিয়ে রকি সেদিন কোনো তৃপ্তি পাননি। জিতেও তাঁকে নিজের বিবেকের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে! সব মিলিয়ে রকি মার্সিয়ানো এমন এক আদর্শ খেলোয়াড়।

লড়তে লড়তে যখন নিরবচ্ছিন্ন জয়ের ধারা ধরে রাখছেন, তখনও রকি মার্সি-য়ানোকে বিরূপ সমালোচনা শুনতে হয়ে-ছিল। বক্সিংয়ে বিদগ্ধ এক সমালোচক প্রকাশ্যে লিখেছিলেন : 'রকি মার্সিয়ানো মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে জাতেই পড়েন না। তাঁর রণরীতি অগোছালো, নড়াচড়া, রিংয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গী এবড়োখেবড়ো। দু হাত বাড়িয়েও দূরের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাগাল পান না।' এমন হৃদয়হীন সমালোচনার তোপের মুখে দাঁড়িয়েও কিন্তু রকি নিজের সমর্থনে টুঁ শব্দটিও করেননি। শুধু অলক্ষ্যে সাধনা করেছেন এবং সেই সাধনার সুফল ধরে রাখতে একটি একটি করে অগুন্তি প্রতি-দ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করেছেন রিংয়ে আবির্ভূত হয়েই।

রকি মার্সিয়ানোর ব্যক্তিগত সাফল্যও নজীর মনে রাখার মতো। পেশাদার হিসেবে তিনি রিংয়ে নেমেছেন উনপঞ্চাশবার। প্রতি-বারই জিতেছেন। তার মধ্যে তেতাল্লিশ জন প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি হারান নক আউট করে। অবিমিশ্র সাফল্যের এমন রেকর্ডের দাবী আর ক'জনই বা রাখতে পারেন!

মজার কথা এই যে, অবসর নেবার আগে পর্যন্ত রকির ব্যক্তিগত সাফল্যের এই নজীরটি অনেকেই নজরে আনতে চাননি। যেদিন হঠাৎ অবসর নিলেন, সেদিন ওই নজীরের দিকে তাকিয়ে সবাই হা-হুতাশ করে বলে উঠেছিল, এতো তাড়াতাড়ি সরে গেলেন কেন! হা-হুতাশ বেশি অবশ্য শ্বেতাঙ্গদেরই। কারণ, মুষ্টিযুদ্ধে অশ্বেত-কায় প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করতে শ্বেতাঙ্গ রকি মার্সিয়ানো এগিয়ে এসেছিলেন অনেক যুগ পরে। তিন দশকের পর শ্বেতাঙ্গ রকি মার্সিয়ানোই সবেধন নীলমণি। তাই এতো তাড়াতাড়ি তাঁকে হাতছাড়া করতে শ্বেতাঙ্গ মন প্রস্তুত ছিল না।

সাধারণ মুচির ঘরের সন্তান রকি মার্সিয়ানো। পিতৃপুরুষেরা মার্কিন মুলুকে এসেছিলেন ইতালী থেকে। সেনাবাহিনীতে থাকার সময় রকি মুষ্টিযুদ্ধে হাত পাকান এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থামার পর ফৌজী-জীবন থেকে সরে আসার সুযোগে তিনি মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে পেশাদারী বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন ১৯৪৭ সালে। সেই থেকে ১৯৫৬ সালের ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত তাঁর অগ্রগতি অব্যাহত।

১৯৫২ সালে নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা জার্সি জো ওয়ালকটকে নক আউট করেই রকি মার্সিয়ানো বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পান এবং তারপর আরও ছ'বার রিংয়ে নেমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রাখেন। শেষ লড়াই তাঁর ১৯৫৬ সালে আর্চি মুরের সঙ্গে। রকি আর্চি মুরকে নবম রাউণ্ডে নক আউট করে দেন।

যেসব প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলায় রকি মার্সিয়ানোকে গা ঘামিয়ে মেহনত করতে হয়েছে, তাঁদের মধ্যে জার্সি জো ওয়ালকট

ও এজার্ড চার্লসের নামই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। চার্লস ও ওয়ালকট, দুজনেই কোনো না কোনো সময়ে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। সেই স্বীকৃতি তাঁরা হয়তো নিজেদের অধিকারে দীর্ঘদিন রেখেও দিতে পারতেন যদি না এই সময়ে মার্সিয়ানো রিংয়ে এসে হাজির হতেন।

রকি মার্সিয়ানো ওয়ালকটকে প্রথম হারান ত্রয়োদশ রাউণ্ডে নক আউট করে এবং দ্বিতীয়বার এক রাউণ্ডের মধ্যেই। প্রথম লড়াইয়ে রকিকে সত্যিই প্রাণপাত করতে হয়েছিল। বয়স বেশ বেশি হলেও, দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধা হিসেবে ওয়ালকটের তখন জগৎজোড়া খ্যাতি। কায়দা-কৌশলে এবং পরপর ঘুষি চালিয়ে ওয়ালকট তো প্রথম দিকে রকিকে একেবারে কোণঠাসা করে রেখেছিলেন। ওয়ালকটের প্রচণ্ড ঘুষির ঘায়ে রকিকে একবার মাটিতে পড়েও যেতে হয়েছিল।

কিন্তু ধাক্কা সামলে রকি শেষ পর্যন্ত ওয়ালকটকেই নক আউট করে দেন। রকি মার্সিয়ানোর রণরীতি যাঁরা পছন্দ করতেন না, তাঁরাও কিন্তু তাঁর সহ্যশক্তি দেখে অবাক হয়েছেন। মার হজম করে পাল্টা ঘুষি ছুঁড়তে এমন সিদ্ধকর্ম যে আর কেউ নন, এটা তাঁদেরই অকুণ্ঠ অভিমত। ওয়ালকট মস্তো মুষ্টিযোদ্ধা। তবুও তিনি রকির সামনে তেরো রাউণ্ডের বেশি টিঁকতে পারেননি।

পুরো পনেরো রাউণ্ড পর্যন্ত টিঁকে গিয়েছিলেন একমাত্র এজার্ড চার্লসই একবার। কিন্তু দ্বিতীয়বার লড়াই হলে রকি চার্লসকে অষ্টম রাউণ্ডেই 'খতম' করে দেন।

কেন জানি না, মার্সিয়ানো যখন লড়তেন, তখন তাঁর কৃতিত্বকে বরাবরই ছোট করে দেখার প্রয়াস পাওয়া হোতো। এর কারণ হয়তো তাঁর আকৃতি তেমন বিশাল ছিল না এবং দর্শনধারী স্টাইল বলতে যা বোঝায় যুদ্ধরীতিতেও তার চিহ্ন থাকতো না। কিন্তু অবসর নেবার পর ওয়াকেফহাল মহল থেকে তাঁর ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন করে ঘোষণা করা হয় যে, রকি সত্যিই সর্বকালের সেরা পর্যায়ের মুষ্টিযোদ্ধাদের একজন।

তবু ভাল যে, বিলম্বে হলেও এ-স্বীকৃতি শেষ পর্যন্ত তিনি পেয়েছেন। নইলে সমালোচকদের একচোখোমীকে ইতিহাস কোনোদিন ক্ষমা করতো না।

মুষ্টিযুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক স্মরণীয় চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগই নিরহঙ্কার, মিতবাক নন। তাই তাঁদের আচরণবিধির সঙ্গে খেলোয়াড়ী মনোভাব ও ভূমিকার বিরোধ বেধেছে নিত্যই। তবু সান্ত্বনা এই যে, ওই মহলেও ব্যতিক্রম রয়েছে। রয়েছেন জো লুই ও রকি মার্সিয়ানোরা। তাই হয়তো ঘুষোঘুষির নামে যে খেলা তাও সুস্থমনা মানুষদের কাছেও আজও আবেদন ছড়াতে পারছেন। ও'দের না পেলে মুষ্টিযুদ্ধের আসর যে নিঃস্ব হয়ে পড়তো, তাতে সন্দেহই বা কি!

অনেক কাল পরে এক সাংবাদিক রকি মার্সিয়ানোকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'সনি লিসটন বা ক্যাসিয়াস ক্লের সঙ্গে আপনার লড়াইয়ের ব্যবস্থা হলে ফলাফল কি হোতো?' কিছুক্ষণ ভেবে রকি মার্সিয়ানো বলেছিলেন, 'বোধহয় আমি ও'দের হারাতে পারতাম। তবে দোহাই আপনার, এ কথা আমি বলেছি ঘুণাক্ষরে যেন তা কেউ না জানতে পারে!'

নিজের কথা নিজের মুখে অন্যকে জানাতে মার্সিয়ানোর এমনই আপত্তি ছিল বলেই তাঁকে আজ আমরা এক আদর্শ খেলোয়াড় বলে মেনে নিয়ে আনন্দ পাচ্ছি।

দর্শক

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট খেলা

ভারতবর্ষ : ১৫৬ রান (ওয়াদেকার ৪৯ রান। হেডলি ১৭ রানে ৩ এবং কংডন ৩৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৬০ রান (পতৌদি ৬৭ এবং ওয়াদেকার ৪০ রান। টেলর ৩০ রানে ৩ এবং হেডলি ৫৭ রানে ৩ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড : ২২৯ রান (কংডন ৭৮ রান। প্রসন্ন ৯৭ রানে ৪ এবং বেদী ৫১ রানে ২ এবং পাই ২৯ রানে ২ উইকেট)

ও ১২৭ রান (ডাউলিং নট-আউট ৩৬ রান। বেদী ৪২ রানে ৬ এবং প্রসন্ন ৭৪ রানে ৪ উইকেট)

বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষ ৬০ রানে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে। ভারতবর্ষ এই জয়লাভের সূত্রে নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ৭টি এবং আন্তর্জাতিক সরকারী টেস্ট ক্রিকেট আসরে ১৪টি খেলায় জয়ী হল।

প্রথম দিনেই ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৫৬ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৪ ঘন্টা ৫০ মিনিট স্থায়ী ছিল। এই সময়ে ৬৭·২ ওভার খেলা হয়েছিল। ভারতবর্ষের এই শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ নিউজিল্যাণ্ডের উন্নত ফিল্ডিংয়ের সামনে ভারতীয় খেলোয়াড়দের অস্থিরতা। ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র ভাল খেলেছিলেন ন্যাটা খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার (৪৯ রান)। তাঁর পর নবাগত টেস্ট খেলোয়াড় চেতন চৌহান (১৮ রান) এবং অশোক মানকাদের (নট-আউট ১৯) রান যা উল্লেখযোগ্য। প্রথম দিনের বাকি ৩৫ মিনিটের খেলায় নিউজিল্যাণ্ড ২১ রান সংগ্রহ করে কোন উইকেট না-খুইয়ে।

দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে নিউজিল্যাণ্ডের রান দাঁড়ায় ২০৪ (৬ উইকেটে)। ফলে নিউজিল্যাণ্ড ৪৮ রানে অগ্রগামী হয় এবং তাঁদের হাতে প্রথম ইনিংসের ৪টে উইকেট জমা থাকে। নিউজিল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন কংডন ৭৮ রান করে ব্যাটিংয়ে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। প্রথম দিনে তিনি ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের খেলায় বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন—৩৩ রানে ৩টে উইকেট এবং চমৎকার ৩টে 'ক্যাচ'।

তৃতীয় দিনে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ২২৯ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ৭৩ রানে এগিয়ে যায়। খেলার বাকি সময়ে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের ৪ উইকেট খুইয়ে ১২৭ রান সংগ্রহ করে। ফলে খেলার গতি নিউজিল্যাণ্ডের অনুকূলে যায়।

চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংস ২৬০ রানের মাথায় শেষ হয় এবং নিউজিল্যাণ্ড একটা উইকেট খুইয়ে ১২ রান সংগ্রহ করে। ফলে খেলায় জয়লাভের জন্যে নিউজিল্যাণ্ডের ১৭৬ রানের প্রয়োজন হয়। হাতে জমা থাকে এক দিনের খেলা এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ৯টা উইকেট। জয়লাভের পক্ষে এই রান মোটেই কঠিন ছিল না।

কিন্তু পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ১২৭ রানের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ ৬০ রানে জয়ী হয়। লাঞ্চের পর এক ঘন্টা খেলা হয়েছিল। বেদী এবং প্রসন্নের মারাত্মক বোলিংয়ে ভারতবর্ষের বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম জয়লাভের আশা নির্মূল হয়ে যায়।

টমাস কাপ

জয়পুরে আয়োজিত ১৯৬৯ সালের টমাস কাপ বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার

এশিয়ান জোনের খেলায় ইন্দোনেশিয়া ৭-২ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে পরবর্তী পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

প্রতিযোগিতায় মোট খেলার সংখ্যা ছিল ৯টি—সিঙ্গলস খেলা ৫টি এবং ডাবলস খেলা ৪টি।

প্রথম দিনের ৪টি খেলার মধ্যে (সিঙ্গলস ২ ও ডাবলস ২) ইন্দোনেশিয়া ৩টি এবং ভারতবর্ষ একটি খেলায় জয়ী হয়। ফলে ইন্দোনেশিয়া ৩—১ খেলায় এগিয়ে যায়। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রাক্তন এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান দীনেশ খান্না ১৮-১৪ ও ১৫-১২ পয়েন্টে বর্তমান এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান ও ইন্দোনেশিয়ার ২নং খেলোয়াড় মুলজাদিকে পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনে বাকি ৫টি খেলার মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ৪টি এবং ভারতবর্ষ ১টি খেলায় জয়ী হয়। ভারতবর্ষের পক্ষে দীপু ঘোষ এবং রমেন ঘোষ শেষ ডাবলসের খেলায় জয়ী হন।

ইন্দোনেশিয়ার এই বিরাট সাফল্যের মূলে ছিলেন এই দুই খ্যাতিমান খেলোয়াড় —রুডি হার্টোনো এবং মুলজাদি। রুডি হার্টোনো উপর্যুপরি দু'বার অল-ইংল্যান্ড সিঙ্গলস খেতাব জয়ের সূত্রে বর্তমানে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন খেলার আসরে বিশ্ব খেতাবধারী এবং মুলজাদি হলেন বর্তমান সময়ের এশিয়ান সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ান। ভারতবর্ষের বিপক্ষে আলোচ্য প্রতিযোগিতায় রুডি হার্টোনো ৪টি খেলায় (সিঙ্গলস ২টি এবং ডাবলস ২টি) অংশ গ্রহণ করে প্রতিটিতে জয়ী হন। এখানে উল্লেখ্য, টমাস কাপ বিশ্ব ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপ

এথেন্সে আয়োজিত নবম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় পূর্ব জার্মানী (জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক) পদক জয়ের তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছে (স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৭)। দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে রাশিয়া (স্বর্ণ ৯, রৌপ্য ৭ ও ব্রোঞ্জ ৮) এবং তৃতীয় স্থান ইংল্যান্ড (স্বর্ণ ৬, রৌপ্য ৪ ও ব্রোঞ্জ ৭)।

ইংল্যান্ডের কুমারী লিলিয়ান বোর্ড ৮০০ মিটার দৌড় এবং ৪×৪০০ মিটার রিলে রেস জয়ের সূত্রে প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীটের সম্মান লাভ করেছেন।

গত ১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে ইউরোপের পক্ষে যাঁরা স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই আলোচ্য নবম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মেক্সিকো অলিম্পিকের স্বর্ণপদক বিজয়ীদের মধ্যে যাঁরা আলোচ্য অনুষ্ঠানেও স্বর্ণপদক পেয়েছেন তাঁদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম :

নবম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় মহিলাদের ৮০০ মিটার দৌড়ে স্বর্ণপদক বিজয়িনী বৃটেনের কুমারী লিলিয়ান বোর্ড (৯৮ নং)

পুরুষ বিভাগ : ৮০ কিলোমিটার ভ্রমণে ক্রিস্টোফ হোনি (পূর্ব জার্মানী), জাভেলিন নিক্ষেপে জেনিস লুসিস (রাশিয়া) এবং ট্রিপল জাম্পে ভিক্টর সানেইয়েভ (রাশিয়া)। **মহিলা বিভাগ :** হাই-জাম্পে মিলোস্লাভা রেজকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) এবং জাভেলিন নিক্ষেপে এ্যাঞ্জেলা রাঙ্ক-নেমেথ (হাঙ্গেরী)।

আলোচ্য নবম ইউরোপীয়ন এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ইউরোপের যে ২০টি দেশ যোগদান করেছিল তাদের মধ্যে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে এই ১১টি দেশ—পূর্ব জার্মানী **১১টি, রাশিয়া ৯টি, বৃটেন ৬টি, ফ্রান্স ৩টি,** চেকোশ্লোভাকিয়া ২টি, পোল্যান্ড ২টি এবং একটি করে স্বর্ণপদক—হাঙ্গেরী, সুইজারল্যান্ড, ইতালী, অস্ট্রিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া।

বিশ্বরেকর্ড

নীচের বিষয়গুলিতে বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পুরুষ বিভাগ

হ্যামার থ্রো : আনাতোলি বন্দারচাক (রাশিয়া) দূরত্ব : ৭৪·৬৮ মিটার

মহিলা বিভাগ

সটপুট : নাদেজদা চিজোভা (রাশিয়া) দূরত্ব : ৬৭ ফিট ০¾ ইঞ্চি

নবম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার পোলভল্টে স্বর্ণপদক বিজয়ী পূর্ব জার্মানীর উলফগ্যাং নরডুইগ। তিনি ৫·৩০ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করেন।

৪০০ মিটার দৌড় : বেসন এবং ডাকলস (ফ্রান্স) **সময় :** ৫১·৭ সেঃ

৪×৪০০ **মিটার রিলে : বৃটেন সময় : ৩** মিঃ ৩০·৮ সেঃ

১,৫০০ **মিটার দৌড় :** জরোশলাভা জেলিচোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) **সময় :** ৪ মিঃ ১০·৭ সেঃ

ডাঃ বি সি রায় শীল্ড

রবীন্দ্রসদন স্টেডিয়ামে আয়োজিত ডাঃ বি সি রায় শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়। এই ফাইনালে খেলেছিল হাওড়ার অক্ষয় শিক্ষায়তন এবং উত্তরবঙ্গের সেন্ট জোসেফ স্কুল। শেষ পর্যন্ত টসে অক্ষয় শিক্ষায়তন জয়ী হয় এবং সেই সূত্রে দিল্লীতে এ বছরের সর্বভারতীয় সুব্রত কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি হিসাবে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় দল হিসাবে সুব্রত কাপে খেলতে যাবে গত বছরের সুব্রত কাপ বিজয়ী কলকাতার কুমার আশুতোষ ইন্সটিটিউট। ডাঃ বি সি রায় কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে কুমার আশুতোষ ইন্সটিটিউশন এ বছর কালকাটা মাদ্রাসার কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিমবাংলা থেকে এ-পর্যন্ত সুব্রত কাপ জয়ী হয়েছে এই তিনটি স্কুল—রাণী রাসমণি স্কুল ২ বার এবং একবার করে বাটা হাইস্কুল এবং কুমার আশুতোষ ইন্সটিটিউশন।

প্রথম প্যাসিফিক গেমস

টোকিওর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রথম প্যাসিফিক কনফারেন্স গেমস্ প্রতিযোগিতায় মোট ৩১টি স্বর্ণপদকের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ১৫টি স্বর্ণ পদক জয়ী হয়ে বিরাট সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিল প্যাসিফিক মহাসমুদ্রের সংলগ্ন এই ৫টি দেশ অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডা, জাপান এবং নিউজিল্যান্ড। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ২৫০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার দুজন প্রতিনিধি দুটি বিষয়ে স্বর্ণপদক বিজয়ী হন—ট্রিপল ও লং-জাম্পে ২৪ বছরের এ্যাথলীট ফিল মে এবং ২০০ মিটার দৌড় ও ৪×২০০ মিটার রিলেতে পিটার নর্মান। ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক পোলভল্টের স্বর্ণপদকবিজয়ী বব্ সীগ্রেন (আমেরিকা) পরাজিত হয়ে সকলকে হতবাক করেছিলেন। পোলভল্টে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন জাপানের প্রতিনিধি—যা জাপানের পক্ষে একমাত্র স্বর্ণপদক জয়ের নজির।

স্বর্ণপদক জয়ী

১ম অস্ট্রেলিয়া—১৫, **২য় আমেরিকা**—১১, ৩য় কানাডা—৩, ৪র্থ নিউজিল্যান্ড—**২ এবং ৫ম জাপান**—১।

ইউরোপীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

প্রথম ইউরোপীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পূর্ব জার্মাণী পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পূর্ব জার্মাণী পুরুষ বিভাগে পেয়েছে ১৩৬ পয়েন্ট এবং মহিলা বিভাগে ১৩৮ পয়েন্ট। রাশিয়া পুরুষ ও মহিলা বিভাগে **২য় স্থান** লাভ করেছে—পুরুষ বিভাগে ১২৪ পয়েন্ট এবং মহিলা বিভাগে ৯০ পয়েন্ট। প্রতি বিভাগেই আটটি করে দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল।

নাদেজদা চিজোভা (রাশিয়া) : **নবম ইউ**রোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় মহিলাদের সটপুটে ৬৭ ফিট ০½ ইঞ্চি **এবং** দূরত্ব অতিক্রম করে স্বর্ণপদক জয় **এবং** বিশ্ব রেকর্ড করেছেন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

১ম বর্ষ
২য় খণ্ড

২৪শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 17th October, 1969. শুক্রবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীগোপীনাথ দাস

বেতারশ্রুতি

আমি একবার বেতারশ্রুতি বিভাগে 'ফলশ্রুতি' শব্দটি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেই প্রসঙ্গে শ্রীসামসুল হক 'প্রতিশ্রুতি' শব্দের সমাস; 'গবাক্ষ' 'স্বদেশ' ও 'শ্বশুর' শব্দের অর্থ; 'ফলশ্রুতি' শব্দের 'ভিন্নার্থ'; সমীভবনের নিয়ম; 'লক্ষ্মণ সেন' ও 'সুলক্ষণ রায়ের' উচ্চারণ এবং 'গম্ভীর' শব্দের পদপরিবর্তন বিষয়ে প্রশ্ন করে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই চিঠি এবং আমার উত্তর ৮ই অগাস্টের অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হয়েছিল।

শ্রীহক আমার উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে আমার প্রতি কিছু বিদ্রূপ, কিছু কটাক্ষ ও কিছু অবজ্ঞা প্রকাশ করে আবার একখানি চিঠি দিয়েছিলেন, এবং সে চিঠি ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে ছাপা হয়েছে। শ্রীহকের প্রথম চিঠিখানির ভাষা শিষ্ট ও সংযত, কিন্তু দ্বিতীয় চিঠিখানির ভাষা তা নয়। কারও উত্তর পছন্দ না হলেই যে তাকে আক্রমণ করতে হবে, এটা বোধ হয় ঠিক নয়।

এখন শ্রীহকের দ্বিতীয় চিঠির বক্তব্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

শ্রীহক লিখেছেন—"না, তিনি বৈয়াকরণ নন, রাম-শ্যাম-যদুর মতোই একজন। যথেষ্ট উৎসাহ নিয়েই তাঁর সঙ্গে ব্যাকরণের আলোচনায় নেমেছিলাম।"...

আমি যে বৈয়াকরণ নই সে তো সবিনয়ে স্পষ্ট করেই স্বীকার করেছিলাম। এবং আমিও এক যুগ না হলেও "স্কুল-কলেজ সেই করে" শেষ করে বসে থাকলেও তাঁর মতো 'মাস্টার' হতে পারি নি, শিক্ষার্থী হয়েই আছি। তিনি যদি আমাকে নির্ভুল শিক্ষা দিতে পারতেন, আমি বিনম্র চিত্তে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তিনি তা পারেন নি।

তিনি বলেছেন, 'যথেষ্ট উৎসাহ নিয়েই' তিনি আমার সঙ্গে ব্যাকরণের আলোচনায় নেমেছিলেন। কিন্তু তাঁর জানা উচিত ছিল সাময়িক পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগের ক্ষুদ্র পরিসরে একখানি চিঠি লিখে "যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে" ব্যাকরণের আলোচনা যথেষ্টভাবে করা যায় না।

শ্রীহক 'প্রতিশ্রুতি' শব্দকে মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস বলেছেন, এবং 'প্রতি'-র অর্থ সম্পর্কে শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এখানে বলা দরকার, 'প্রতি' উপসর্গের শাস্ত্রের এই অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়। 'প্রতিশ্রুতি' কোনোমতেই মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস নয়। 'প্রতিশ্রুতি'কে আদতে সমাসই করা যায় না। করলে অর্থ হয় না। তবু যদি করতেই হয়, আমি যা বলেছিলাম—"প্রতিগতা শ্রুতি এইরূপে প্রাদি তৎপুরুষ সমাস"—তা ছাড়া আর কিছু করা যায় না। আমি কখনও জোর দিয়ে 'প্রতিশ্রুতি'-কে প্রাদি তৎপুরুষ সমাস বলি নি—প্রতিগতা শ্রুতি এইরূপে প্রাদি তৎপুরুষ সমাস বলা যায় অর্থাৎ বলা যেতে পারে বলেছিলাম।

শ্রীহক তাঁর চিঠিতে 'শ্বশুর' শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় মানতে চান নি। চাইলে নিশ্চয়ই দিতে পারতাম, এবং তাঁর বিদ্রূপের লক্ষ্য হতাম না। বরং তাঁর চেয়ে একটু বেশিই দিতে পারতাম—শু (নানার্থক অব্যয়) —অশ্ (ব্যাপ্ত + উরচ্) নিপাতন। কিন্তু 'শ্বশুর' শব্দের যে অর্থ তিনি দিয়েছেন—"যিনি শীঘ্র খান"—তা আমি দিতে পারতাম না, কারণ ও অর্থ আমি কোথাও পাই নি। ও অর্থ হয় বলে আমি জানি না। আমি জানি, 'শ্বশুর' শব্দের পূর্বে অর্থ "পতির পিতা", বর্তমানে অর্থ সম্প্রসারিত হয়ে "পতি অথবা পত্নীর পিতা" হয়েছে। 'শ্বশুর' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "যিনি শীঘ্র খান" নয়, "যিনি নিজেকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাপ্ত করেন"।

শ্রীহক লিখেছেন—"আমি বলেছিলুম, 'ফলশ্রুতি'র অর্থ—'কোন বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যপাঠে মনের উপরে মোটামুটি যে ফল হয়'। উত্তরে তিনি বলেছেন: 'না, ও অর্থ হয় না।' সাহিত্য-সংসদ প্রকাশিত অভিধানে আমার অর্থটি আছে। তাহলে 'শ্রবণক' নিশ্চিতভাবে দয়া করে বলুন যে, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত ভুল।"

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ভুল বলার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু 'সংসদ বাঙলা অভিধান' ছাড়া অন্য কোনো অভিধানে 'ফলশ্রুতি' শব্দের ও অর্থ আমি পাই নি, কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির কাছেও না। 'সংসদ বাঙলা অভিধান' ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সংকলিত বা প্রণীতও নয়, শুধু সংশোধক হিসাবে তাঁর নাম আছে। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তির সম্পাদিত গ্রন্থেও তো ভুল থাকে। সংসদ অভিধানে 'ফলশ্রুতি' শব্দের যে ভিন্নার্থ আছে— "(আধুনিক বাঙালা সমালোচনায়) কোনও জাতীয় সাহিত্যের পাঠে মনের উপরে তাহার মোটামুটি যে ফল হয়"—তা যে অভ্রান্ত এমন কথা বলা চলে কী করে? আজ পর্যন্ত এই অর্থের প্রয়োগ আমি কোথাও দেখি নি। 'ফলশ্রুতি'র 'শ্রুতি'কে অনুপস্থিত রেখে কী করে অর্থ করা যায় তা-ও আমি জানি না।

শ্রীহক লিখেছেন—'গম্ভীরতা' লিখলে পুরো মার্ক দেবো না। কিন্তু 'ফলশ্রুতি'র ক্ষেত্রে তিনি যে সংসদ অভিধানের দোহাই দিয়েছেন, সেই সংসদ অভিধানেই বিশেষ্য রূপে 'গম্ভীরতা' আছে, এবং 'গাম্ভীর্য' শব্দের 'গম্ভীরতা' অর্থ। অন্য সব অভিধানেও আছে।

শ্রীহক যখন 'গম্ভীর' শব্দের পদপরিবর্তনে 'গম্ভীরতা' লিখলে পুরো মার্ক দেবেন না লিখেছেন তখন 'উদার' শব্দের পদপরিবর্তনে 'উদারতা' কিংবা 'অস্থির' শব্দের পদপরিবর্তনে 'অস্থিরতা' লিখলেও নিশ্চয় দেবেন না! তাহলে এর পরে ছাত্রদের কি আর তাঁর কাছে যাওয়া ঠিক হবে?

আর, তিনি যে "...থোড়াই কেয়ার করি। আমার এই চিঠিতেই হয়তো হাজার গন্ডা ব্যাকরণ ভুল রয়েছে।" লিখেছেন, এই 'থোড়াই কেয়ার' কথাটা কি ঠিক হয়েছে? কারণ, এর একটু আগেই তিনি জানিয়েছেন, "...আজ প্রায় বারো বৎসর ধরে প্রাণের দায়ে অন্যদের আমাকে তা জানাতে হচ্ছে।" অর্থাৎ তিনি যে শিক্ষকতা করেন তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ...কিন্তু শিক্ষকতা করতে গেলে একটু কেয়ার তো করতেই হবে। একটা চিঠিতে 'হাজার গন্ডা ব্যাকরণ ভুল' থাকলে তো চলবে না।

পরিশেষে বলি, একটা অ্যাকাডেমিক আলোচনা করতে গিয়ে কলহে প্রবৃত্ত হবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই, সময়ও নেই। তাই আমি এখানেই ছেদ টানলাম।

শ্রবণক

কলকাতা-১৯

(২)

আপনার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকার ৯ বর্ষ, ১২শ সংখ্যায় (৯ই শ্রাবণ, ১৩৭৬) বেতারশ্রুতি বিভাগে শ্রবণক লিখেছেন '৭ই জুলাই সকাল সাড়ে ৭টায় দিল্লীর খবরে ঘোষক 'সুয়েজ উপসাগরে' লড়াই হবার কথা ঘোষণা করলেন। সুয়েজ উপসাগরও একটা আছে নাকি? কোথায়? কোন দেশে?'

এ প্রসঙ্গে জানাই, ভূগোল পাঠ্যপুস্তকে 'সুয়েজ উপসাগর' কথাটা অনেক দেখেছি। সেদিন ৬ষ্ঠ শ্রেণীর একখানা ইতিহাস বই-এ 'সুয়েজ উপসাগর'-এর উল্লেখ দেখলাম। বইখানার নাম 'মানব

ইতিহাসের ধারা'। লেখক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী এম-এ, ডি-ফিল। এই বই-এর (দ্বাদশ পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৬৯) ৫২ পৃষ্ঠার প্রথম অনুচ্ছেদের শেষে লেখা আছে, 'তাহারা (ফিনিসীয় বণিকেরা) সুয়েজ উপসাগর হইতে রওনা হইয়া ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া নীল নদের মোহনায় পৌঁছিয়াছিল।'

সত্যি সত্যিই 'সুয়েজ উপসাগর' বলে কিছু আছে কিনা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তা জানতে চাই।

তাপস বর্ধন
গড়বেতা, মেদিনীপুর

(৩)

অমৃতের 'চিঠিপত্র' বিভাগে নবম বর্ষের ২০ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসামসুল হকের 'বেতারশ্রুতি' লেখাটি আমাকে আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু শ্রী'শ্রবণক'র সঙ্গে তো বটেই, এমন কি হক সাহেবের মতামতের সঙ্গেও আমি একমত হতে পারলাম না। যতদূর জানি 'সন্দেশ' অর্থ সম্প্রসারণের উদাহরণ নয়। সন্দেশ অর্থে 'মিষ্টান্ন অর্থই বহুল প্রচলিত'—এটি যথার্থ নয়। সন্দেশ একটি বিশেষ ধরনের মিষ্টি—যে কোন মিষ্টিকে নিশ্চয় সন্দেশ বলা হয় না! 'জানালা আর গবাক্ষ সমার্থক শব্দ'—এটিতেও কিছুটা ফাঁকি রয়েছে। গবাক্ষ= গো-অক্ষ (আগেকার দিনে গরুর চোখের মত ছোট জানালা থাকতো)—ছোট জানালা। আবার শ্বশুরের ক্ষেত্রেও অর্থ সম্প্রসারণ ঘটেছে। আগে শ্বশুরের অর্থ ছিল 'পতির পিতা।' এখন স্বামীর পিতাও স্ত্রীর শ্বশুর, আবার স্ত্রীর পিতাও স্বামীর শ্বশুর।

'সাহিত্য সংসদ, প্রকাশিত অভিধানকে অস্বীকার না করেই বলছি যে, শ্রীরাজশেখর বসু সংকলিত 'চলন্তিকা' অভিধানে 'ফলশ্রুতি'র অর্থ রয়েছে—'কোনও পুণ্যকর্ম করিলে যে ফল হয় তাহা শ্রবণ বা তাহার বিবরণ।' 'গম্ভীরতা' শব্দটি হিন্দীতে চলে। বাঙলায় শব্দটি বেমানান। যখন আমাদের শব্দকোষে 'গাম্ভীর্য' শব্দটি রয়েছে তখন 'গম্ভীরতা' ব্যবহার না করাই সমীচীন।

আবার 'মার্ক' ও 'নাম্বার' দুটি শব্দই বিদেশী। 'নাম্বার'কে কাট-ছাঁট করে বাঙলায় 'নম্বর' তৈরী করা হয়েছে। তবে এগুলির ব্যবহারের কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

আশীষকুমার সিংহ
পাটনা—৬

মানুষ গড়ার ইতিকথা

আমি সাপ্তাহিক 'অমৃত' নিয়মিত পড়ি। 'মানুষ গড়ার ইতিকথা' নামক ফিচার আমি প্রথমে পড়ে থাকি এবং আমার খুব ভাল লাগে। 'সন্ধিৎসু'কে তাঁর আকর্ষণীয় লেখাগুলির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৯ম বর্ষ, ২য় খন্ড, ২২শ সংখ্যা 'অমৃতে' সাউথ সাবারবন স্কুল ভবানীপুরের প্রসঙ্গে যে লেখাটি প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। সন্ধিৎসু লিখেছেন যে, ১৯৪৯ থেকে ১৯৩০ অবধি হেডমাস্টার ছিলেন দেবীকিশোর মুখোপাধ্যায়। কিন্তু ১৯২২ বা ১৯২৩ সালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় ডঃ নলিনীমোহন সান্যাল। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 'রামধনু' মাসিকপত্রে (পৌষ, ১৩৫০) 'আচার্য নলিনীমোহন' শীর্ষক প্রবন্ধে যা লিখেছেন, সেটা এখানে তুলে দিচ্ছি। ...'শুধু বড় পন্ডিত নন, মানুষ হিসাবেও নলিনীমোহনের মত লোক বেশী দেখা যায় না। তিনি যখন ভবানীপুরে সাউথ সুবার্বন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তখন তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আজও সে জন্য আমি গর্ব অনুভব করি।'...

তাছাড়া আচার্য নলিনীমোহনের দৌহিত্র শ্রীঅচিন্ত্য চৌধুরীর (রৌরকেলা স্টীল-প্ল্যান্টের সিনিয়র লাইব্রেরীয়ান) কাছে আচার্যদেবের জীবনী পড়েছি। এই প্রসঙ্গে আরও জানাই যে, আচার্যদেব ৬০ বৎসর বয়সে (১৯২৯ সালে) আরও একবার এম-এ পরীক্ষার্থী হয়েছিলেন—পরীক্ষার বিষয় ছিল হিন্দী ভাষা ও সাহিত্য। এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে তিনি স্বর্ণপদক পান। তাঁর পূর্বে ভারতবর্ষের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেউ হিন্দীতে এম-এ পাশ করেনি। ৮৩ বৎসর বয়সে হিন্দী ভাষায় গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে নলিনীমোহন আচার্য অর্থাৎ ডক্টর (পি, এইচ, ডি) উপাধি পান—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে আলোচনায় জানলাম যে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আচার্যদেবকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীর পোস্ট গ্রাজুয়েট লেকচারার করে নিয়ে আসেন এবং পরে তাঁকে সাউথ সাবারবন স্কুলে প্রধান শিক্ষক করেন।

শৈলজা বাগচী
রাউরকেলা-৩

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-বিজ্ঞান শাখার সুবর্ণ জয়ন্তী

একটি আবেদন

বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে। সম্ভবত ভারতবর্ষে এ বিষয়ে প্রাচীনতম বিভাগ হল এটি। আসছে নভেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে ৬ তারিখ পর্যন্ত তার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হবে। সারা ভারতে এখন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ছড়িয়ে আছেন। সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা দুরূহ। সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বে উৎসাহী সকলের কাছেই আমরা সুবর্ণ-জয়ন্তী অনুষ্ঠান-তহবিলে সাহায্য পাঠাবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

এ আর দেশাই
সামজবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান,
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যায়
বোম্বাই—২

ছোটগল্প প্রসঙ্গে

'অমৃতে' প্রকাশিত ছোটগল্পগুলি আমি সাগ্রহে পড়ে থাকি। কোনও গল্প পড়ে পাই কবিতা পড়ার অনুভূতি, আবার কোনও গল্পের অপূর্ব মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাকে মুগ্ধ করে। বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা ও ভাবের ব্যঞ্জনায় ভরপুর এই গল্পগুলির লেখকগণ প্রায় সবাই নতুন। এসব শক্তিমান নতুন লেখকদের গল্প ক্রমাগত প্রকাশিত করার জন্য সাধুবাদ অবশ্যই 'অমৃতে'র প্রাপ্য। পরিশেষে অনুরোধ করছি, "অমৃতে'র প্রতি সংখ্যায় ছোটগল্পের সংখ্যা সম্ভব হলে বাড়ান হোক।

নীলাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়
কলকাতা—৪০

ড্রীমল্যাণ্ড

আমি সাপ্তাহিক অমৃতের একজন নিয়মিত পাঠক। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে অমৃতের নির্মল সরকার রচিত 'ড্রীমল্যাণ্ড' উপন্যাসটা। অমৃত হাতে পেয়ে আমি সর্বপ্রথম খুঁজি 'ড্রীমল্যাণ্ড' উপন্যাসটা। আমার মনে হয় 'ড্রীমল্যান্ড' উপন্যাসটার সমস্ত চরিত্রগুলি জীবন্ত। নির্মলবাবুর রচনাটি সত্যই প্রশংসা কুড়িয়েছে।

উত্তম সরকার
ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি

সাদা চোখে

যুক্তফ্রন্টের আন্তর্দলীয় কোঁদল ক্রমে ক্রমে ধূমায়িত হয়ে শরিকী লড়াই-এ পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে তা আরও বিস্তৃতিলাভ করে পুরোপুরি কনফ্রন্টেশানের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এবং শুধু তাই নয় শরিকরা একে অপরের চরিত্রহননের কাজে নিপুণতার সঙ্গে অগ্রণী হয়েছেন। বিবৃতি, প্রতি-বিবৃতি এবং সর্বোপরি একের প্রতি অন্যের বক্রোক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি ধীরে ধীরে যেন এক স্তরে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে যে হয়ত আর সেদিন বেশী দেরী নেই যখন অনেক শরিকের মধ্যে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ যুক্তফ্রন্টের শরিকরা যতই রাজনীতির কারবারী হন না কেন, তাঁরাও মানুষ। এবং তাঁদের সহিষ্ণুতারও একটি সীমারেখা আছে। কিন্তু ক্রমাগত বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হওয়ার ফলে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। আর সেই অশুভ লগ্নে যদি রাজনৈতিক হানাহানি শুরু হয় তবে আশ্চর্যের কিছুই থাকবে না। বরঞ্চ ঘটনার ক্রমাবনতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার ফলে জনতা সেই অঘটনের দিনে স্তম্ভিত হওয়ার সুযোগ পাবে না। হা-হুতাশ করবার জন্য অপেক্ষা করবে না। স্বাভাবিক ঘটনার সহজ পরিণতি বলে ধরে নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বড়জোর দীর্ঘশ্বাস ফেলবে মাত্র।

শরিকী লড়াই বন্ধ করা প্রকল্পে তৈরি করে কাজ শুরু করবার আগেই বাংলা কংগ্রেস আন্তর্দলীয় লড়াইকে পুরোপুরি-ভাবে সাধারণ রাজনৈতিক সংঘর্ষে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁদের প্রস্তাবে দল বিস্তৃতির অভিপ্রায়ে এক দল অপর দলকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য লড়াই করছেন কিনা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে সোজাসুজি যুক্ত-ফ্রন্টের প্রশাসনিক ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির মারাত্মক সমালোচনা করেছেন। শুধু সমালোচনা করে বাংলা কংগ্রেস ক্ষান্ত থাকে নি, সরকারের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত থেকেও বিরোধী দলের মতো ঘোষণা করেছেন যে এই অরাজক অবস্থার অবসান করার জন্যে তাঁরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবেন। আর এই আন্দোলনের সর্বাধি-নায়ক হবেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীত্ব ত্যাগ না করে আন্দোলন করা কঠিন। কাজেই অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটলে হয়ত তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করতেও এতটুকু দ্বিধা করবেন না।

কয়েকবার দেখা গেছে, শ্রীমুখোপাধ্যায় যখনই বজ্রের মত কঠোর হয়েছেন তখনই অন্যান্য শরিকরা নতমস্তকে তাঁর অভিমত শিরোধার্য করে নিয়েছে। এই সম্পর্কে সব-চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো, শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণ। তখন যে কোন অছিলাতেই সর্বত্রই একটি ঘেরাও-এর ঢেউ উঠেছিল। এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ঘেরাও করবেন বলে স্থির করেছিল কয়েকটি শরিক দলের কর্মীরা। শ্রীমুখোপাধ্যায় সেদিন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, যদি কেউ তাঁকে ঘেরাও করে তবে তিনি পুলিশের সাহায্যে সমুচিত শিক্ষা দেবেন। এবং তাঁর বক্তব্য সমস্ত দলকে পূর্বাহ্ণেই জানিয়ে দেওয়ার কথা তিনি বলে দিয়েছিলেন। যেমন ঘোষণা, তেমন কাজ। টুঁ শব্দটি না করে দলীয় নেতারা তাঁদের উত্তরবঙ্গের ইউনিটগুলিকে মুখ্যমন্ত্রীর অভিপ্রায় জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতি, ঘেরাও নয়, এমন কি বিশেষ মিছিল পর্যন্ত হল না মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করবার জন্য।

কাজেই, মুখ্যমন্ত্রীর দল বাংলা কংগ্রেসের এই ভয়ানক প্রস্তাব যুক্তফ্রন্টের উপর যে একটি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাজ্যে অরাজকতা বৃদ্ধি, কয়েকশ' লোকের মৃত্যু, নারীর অমর্যাদা, শিল্পে উৎপাদন হ্রাস এই সমস্ত ভয়াবহ ঘটনার উল্লেখ করে বিরোধী দলের মত বাংলা কংগ্রেস যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। মুখ্য-মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজের অঙ্গে কালিমা লেপনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নি। অধিকন্তু, পরে তিনি বলেছেন যে প্রস্তাবে যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তার সমর্থনে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত ও তথ্য বাংলা কংগ্রেসের হাতে মজুদ আছে।

কিন্তু যাই বলা হোক না কেন বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবের একটি মাত্র রাজনৈতিক অর্থ হচ্ছে যে, বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্ট সরকারের প্রতি সম্পূর্ণ অনাস্থার ভাব পোষণ করে। আর শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজেই নিজের সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করলেন। এহেন অবস্থায় শ্রীমুখো-পাধ্যায়ের কতোটা নৈতিক অধিকার আছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদ আর একদিনের জন্যও অলংকৃত করে থাকার সেটা তর্কের বিষয়। প্রস্তাব পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমুখার্জি যদি পদত্যাগ করতেন সেটাও অস্বাভাবিক হত না। বরং তাতে এটাই স্পষ্ট বোঝা যেত যে শ্রীমুখার্জি পশ্চিম বাংলার এই 'ভয়াবহ চিত্রের' কথা প্রণিধান করে একজন গান্ধীবাদী হিসাবে সঠিক পথই অবলম্বন করেছেন। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কাছে আর একটি পথও খোলা আছে। সেটা হচ্ছে, যে সব মন্ত্রীর জন্য এ হেন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাঁদের অবিলম্বে অপসারিত করা। ফ্রন্ট সরকার হলেও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বাধিক, অতএব, ফ্রন্টের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী যাঁরা রূপায়ণে বাধা দিচ্ছেন কিম্বা সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের জন্য ফ্রন্টের সার্বিক ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করছেন তাঁদের বিষয়ে দ্বিতীয় চিন্তা মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই করতে পারেন।

বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবে কোনো শরিকের নামোল্লেখ না থাকলেও এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কয়েকজন মন্ত্রীর (যথা, স্বরাষ্ট্র, ভূমি ও ভূমি সংস্কার, শ্রম ও শিক্ষা, তাঁদের) বিরুদ্ধেই এই প্রশাসনিক অরাজকতার অভিযোগ আনা হয়েছে। কাজেই অন্য দলগুলি কিছু বলবার আগেই মার্কিস্ট দলের পলিটব্যুরো এক বিস্তৃত বক্তব্য মারফৎ বাংলা কংগ্রেসের রাজনৈতিক চরিত্র চিত্রায়িত করে ঐ দল অহেতুক কুৎসা প্রচার করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এহেন লড়াইয়ের পটভূমিকাতেও মুখ্যমন্ত্রী কম্যুনিস্ট মার্কিস্ট মন্ত্রীদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবেন না। কারণ মার্কিস্টরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং তাঁদের বাদ দিয়ে সরকার চালানো সম্ভব নয়। অতএব, শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সম্ভাব্য পথ হচ্ছে নিজেকেই আবার 'কামরাজ' করা, মার্কস-বাদীদের 'মোরারজী' করা নয়।

অন্যদিকে কঠোর ভাষায় বাংলা কংগ্রেসকে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো অভিযুক্ত করে বলেছেন, একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল ও জোতদারদের প্রতিনিধিরাই ফ্রন্টের বিরুদ্ধে এহেন কুৎসা প্রচার করতে পারেন। অন্য কেউ নয়। পলিটব্যুরো আরও বলেছেন যে এর আগে একমাত্র কংগ্রেসই এ ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কথাটা সত্য। অদ্যাবধি একই সুরে কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মূল্যায়ন করেছেন। অন্যান্য শরিকদলের নেতারাও একে অপরের বিরুদ্ধে বিবৃতি বা বক্তৃতা মারফৎ এহেন অভিযোগ অনেকবার গণ-সমীপে পেশ করেছেন, তবে দলগতভাবে প্রস্তাব পাশ করেনি। দলগতভাবে প্রস্তাব পাশ করলেই দায়িত্ব সমধিক বেড়ে যায়। কারণ তখন তা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হিসাবে পরিগণিত হয়। এবং সে সিদ্ধান্তের পরি-

প্রেক্ষিতে কার্যসূচী গ্রহণ করতে হয়। বাংলা কংগ্রেস তাই করেছেন। শুধু সিদ্ধান্ত করেন নি, অধিকন্তু কিভাবে এই অসহনীয় অবস্থার অবসান ঘটাবেন তাঁর শুধু ইঙ্গিত নয় কর্মপন্থা পর্যন্ত ঘোষণা করেছেন। তবে অবশ্য এইটুকু যে ঐ কর্মপন্থা বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রয়োজনীয়তা [illegible] থাকবে কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ করা হবে দলের বার্ষিক সম্মেলনে বাঁকুড়া শহরে। এবং সেই নভেম্বর মাসের ১লা ও ২রা তারিখ নিশ্চয় যুক্তফ্রন্টের কাছে ভয়াবহ দিন। যদি সব মিটে যায় তবে ভাল। নয়তো পশ্চিম বাংলার মানুষকে এক নয়া রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরো সখেদে বলেছেন যে, বাংলা কংগ্রেস ফ্রন্টের আমলে শ্রমিক কৃষক, শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছেন প্রস্তাবে তার কোন উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। পলিটব্যুরো আশ্চর্য হয়ে গেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গেছে বলে বাংলা কংগ্রেস অশ্রু বিসর্জন করছে। কিন্তু গুজরাটের দাঙ্গা, বিহার ও উড়িষ্যার অরাজক অবস্থা, তেলেঙ্গানা আন্দোলনের ভয়াবহ চিত্র, শিবসেনার দৌরাত্ম্য এবং সারাদেশে দুর্নীতি নারীর অমর্যাদার কথা বাংলা কংগ্রেস উল্লেখ করে নি। পলিটব্যুরো বলতে চেয়েছেন যে, উল্লিখিত রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার বিশেষ কোন অবনতি কিছুই ঘটেনি। এবং মনে হয় এই সমস্ত বক্তব্য দিয়ে ফ্রন্ট সরকারকে পলিটব্যুরো একটি সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কিন্তু নিশ্চয় শ্রী[illegible] [illegible] পড়েছে। কারণ তিনিই মুখ্যমন্ত্রী।

কিন্তু পলিটব্যুরোর এই বক্তব্য সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। কংগ্রেসের পরিচালিত রাজ্যসমূহে কি ঘটছে তাকেই মানদণ্ড করে ফ্রন্ট সরকার ভাল কাজ করছে এমন অন্তত সমদর্শী বলতে নারাজ। কংগ্রেস শাসনে ঐ সমস্ত জিনিস ঘটেছে বলেই জনসাধারণ ফ্রন্টকে গদীতে বসিয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে যা ঘটছে তার তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে [illegible] ভয়াবহতা অনেক কম এহেন মূল্যায়ন ভয়ংকর। বাংলা কংগ্রেস এই রাজ্যের দল। কংগ্রেসীরা অন্য রাজ্যে কি অঘটন ঘটিয়ে দিচ্ছে তা নিশ্চয় বাংলা কংগ্রেসের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ১৪ শরিকের একাংশ হিসাবে বাংলা কংগ্রেসও ফ্রন্ট সরকার গঠন করেছিল, তার হিসাব-নিকাশ করে সিদ্ধান্তে আসার অধিকার নিশ্চয় বাংলা কংগ্রেসের আছে। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হয়েছে ভীষণভাবে, আর পশ্চিমবঙ্গে সেই-ভাবে সাম্প্রদায়িকতা হয়নি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করবার কোন হেতু নেই। কংগ্রেস রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্তত বামপন্থী অধ্যুষিত যুক্তফ্রন্টের পক্ষে উচিত নয়। কাজেই খুঁটিয়ে দেখলে একথা বলা যায়, বাংলা কংগ্রেস নিজেদের আত্মসমালোচনা করেছেন। এবং অন্যান্য রাজ্যে অনেক অশুভ ঘটনা ঘটছে বলে পশ্চিমবঙ্গের ঠিক অনুরূপ ছোটখাট ঘটনাগুলির সমালোচনা করা যাবে না, এহেন মনোভাব পোষণ করাও মারাত্মক। কারণ তা পরিবর্তনকামী ও সৃজনধর্মী মনকে জরা-গ্রস্ত করে দেয়। মানস চক্ষুকে দিশাহীন করে তোলে।

শরিকী লড়াই অনুষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পরেই সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে যে বিবৃতি আসে সেগুলি আরও বেদনাদায়ক। একে অপরকে প্রতিমুহূর্তে জোতদারের দালাল কিম্বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির এজেন্ট ইত্যাদি বলে গালিগালাজ শুরু করেন। পরে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসে—'আমরা ঝগড়াও করি, আবার কাজও করছি।' এ ধরনের ছেলেমানুষি উক্তি রাজ-নৈতিক নেতাদের পক্ষে সাজে কি?

কিন্তু [illegible] বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব, কম্যুনিস্ট দলের প্রধান শ্রী[illegible] [illegible] ভ্রমণ ও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষের [illegible] থেকে বিবৃতি আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন হলেও কোথাও একটি নিবিড় যোগসূত্র আছে বলে বাংলার রাজনৈতিক আকাশে গুঞ্জন উঠেছে। যোগ-সূত্র থাকুক বা না থাকুক শান্তির সনদ স্বাক্ষরিত হয়ে কালি শুকোতে না শুকোতেই যেভাবে ভাইয়ের রক্ত ঝরছে তা ও অসহ্য নয়। কেরালার ঘটনা আর পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে [illegible] সহজে উপলব্ধি যে একটি অশুভ ইঙ্গিত বহন করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য শোনা যাচ্ছে, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির দলের শাখা প্রশাখার কর্মীবৃন্দকে নেতৃবৃন্দেরা নাকি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিকদের উত্তেজিত করা [illegible] উচিত নয়। তাঁদের মনে রাখতে হবে যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সরকার গঠন করতে [illegible] এইভাবে [illegible] [illegible]। বিশ্লেষণ করলে এই অর্থই দাঁড়ায় যে বাম কম্যুনিস্টরা যুক্তফ্রন্টের উপযোগিতা আর বিশেষ নেই এই কথাই সুস্পষ্ট করে দল মারফৎ জনসাধারণকে হয়ত বোঝাবার চেষ্টা করছেন। যদি সত্যিই তাঁরা এই প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন, তবে তা খুবই ভাল। কারণ তা হলে একটি স্বচ্ছ রাজনৈতিক চিত্রের প্রকাশ ঘটবে। এহেন পাঁচমিশেলী ফ্রন্ট দীর্ঘদিন থাকাও উচিত কিনা তা তর্কের বিষয়। এতে ঝগড়াই বাড়ছে, গণ-কল্যাণ যে হারে হওয়া উচিত তা হয়নি বা হতে পারছে না।

আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটছে, এবং রাজনৈতিক মহলের ধারণা—কেরলে যদি মিটমাট না হয় তবে পশ্চিমবাংলায়ও তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। অবশ্য মার্কসবাদী দলের নেতা শ্রীপি সুন্দরাইয়াও ঐ কথাই বলেছেন। যাতে মার্কসবাদীরা পশ্চিমবঙ্গে কেরলের মত বেকায়দায় না পড়েন তজ্জন্য শ্রীজ্যোতি বসুকে নাকি তাঁরা আগেভাগেই সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে তিনি পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে পারেন। অন্যদিকে পলিটব্যুরো শ্রীনাম্বুদিপাদের প্রত্যাবর্তনের উপর নির্ভর করে আছেন। শ্রীনাম্বুদিপাদের অনুপস্থিতিতে মার্কিস্টরা কোন কর্মসূচী গ্রহণে অক্ষম এমন নয়। শ্রীনাম্বুদিপাদ কি বার্তা বহন করে আনেন তার অপেক্ষাতেই আছেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে শ্রীডাঙ্গের মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীডাঙ্গে বলেছেন যদি একান্তই অবস্থা ঘোরালো হয়ে ওঠে তবে দুই পার্টির একেবারে উপর-তলার নেতারা মিলিত হয়ে সমস্যার একটা [illegible] করবেনই। তবে বক্তব্য হচ্ছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অনুগামীদের সংখ্যা যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছয় যে তাঁরা একত্রিত হয়ে সরকার গঠনে সক্ষম তবে সমস্যার জন্য বৈঠকের প্রয়োজন হবে না। তখনই অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করবার জন্য অথবা 'মেজরিটি' করবার জন্য হয়তো তোড়জোড় পড়ে যাবে। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এই দৃশ্য পরিবর্তনের সময় যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে বলে মনে হয়। কারণ ড্রপসিন ইতি-মধ্যেই অপসারিত হয়ে গেছে।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

রাবাতের জের

রাবাতের অপমান সারা ভারতবর্ষের মানুষেরই গায়ে বেজেছে। ভারতীয় প্রতিনিধি দল সেখানকার ইস্লামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন এক রকম দরজা ভেঙে। আর তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হলেন অপদস্থ হয়ে। নিমন্ত্রণবাড়ীতে পাতা পেতে তারপর পাত থেকে উঠে আসতে হলে যে অবস্থা হয় রাবাতে ভারতের প্রায় সেই হাল হয়েছে।

এই অপমানের প্রতিকারের জন্য একটা কিছু যে করা দরকার সেটা এতদিনে বোধ হয় ভারত সরকারের হুঁশ হয়েছে। কিন্তু কি যে করা যাবে সে বিষয়ে এখনও সরকার কোন কিছু স্থির করে উঠতে পারেন নি বলে মনে হচ্ছে। ইতিমধ্যে অবশ্য এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যেগুলি স্পষ্টতই রাবাতের জের অথবা সে রকম অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনাগুলি হল :—

(১) নিউইয়র্কে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংহের সঙ্গে ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বা ইবানের আলোচনা হয়েছে। এই প্রথম দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হল। যদিও ইজরায়েলকে ভারতবর্ষ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে তাহলেও আরব দেশগুলির মুখ চেয়ে নয়াদিল্লী এখনও তেল আভিভের সঙ্গে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে প্রতিনিধি বিনিময় করে নি। খবর এই যে, শ্রীদীনেশ সিং-এর সঙ্গে আব্বা ইবানের কথাবার্তায় রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের প্রসঙ্গটি উঠেছিল।

(২) এশিয়ার দেশগুলির একটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীবলীরাম ভগতের তেহেরানে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি সেখানে যান নি, অথচ তিনি দামাস্কাসে গেছেন। ভারত ঐ মেলার একজন অংশীদার এবং এই উপলক্ষে তেহেরানে আসার জন্য শ্রীভগৎকে ইরানের জাতীয় অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। (রাবাতে পাকিস্থানের সঙ্গে যোগ দিয়ে যেসব দেশ ভারতকে বাদ দেওয়ার জন্য বেশী সচেষ্ট হয়েছিল ইরান তাদের অন্যতম।)

(৩) ইরানের শাহের যমজ ভগ্নী প্রিন্সেস আশরফ পহলবী তাঁর ভারত সফরের সূচী শেষ হওয়ার দু'দিন আগেই এ-দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়েছে যে, মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে। কিন্তু কৈফিয়ৎ যাই হোক না কেন, দিল্লীতে গান্ধী দর্শন প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিনে প্রিন্সেস আশরফ বসেছিলেন পিছনের সারির একটি আসনে এবং গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তাঁকে ডাকাই হয় নি। অথচ গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যই তাঁকে এদেশে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল এবং সেই আমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন ভারত সরকারে শিক্ষা বিভাগ।

(৪) জর্ডান থেকে কিছু রক ফসফেট আমদানীর প্রস্তাব ভারত সরকার বাতিল করে দিয়েছেন।

(৫) মরোক্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীগুরুবচন সিংকে দেশে ডেকে পাঠান হয়েছে এবং খবর এই যে, সম্ভবত তিনি আর রাবাতে ফিরে যাবেন না।

এই ঘটনাগুলি সবই যে একটা ছক অনুযায়ী ঘটেছে তা নয়। এমন কি, রাবাতের জবাব কিভাবে দেওয়া হবে তার একটা ইঙ্গিত এই ঘটনাগুলির মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করলেও হয়ত ভুল হবে। বরং, একথা বলাই হয়ত ঠিক হবে যে, এই ঘটনাগুলি রাবাতের অপমানের স্বতঃস্ফূর্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া। যেমন, পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে জানান হয়েছে, শ্রীভগৎ কর্তৃক তেহেরান সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব ব্যাপার, এ বিষয়ে পররাষ্ট্র বিভাগ থেকে পরামর্শ চাওয়াও হয় নি, দেওয়াও হয় নি।

রাবাতের অপমানের পর নয়াদিল্লীতে যে বিভ্রান্তি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সৃষ্টি হয়েছে তার একটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে উপরের মহলের কতকগুলির পরস্পর-বিরোধী বিবৃতির মধ্যে। রাবাত সম্মেলন থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেই ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ঝটাঝট এক বিবৃতি দিয়ে বলে ফেললেন, রাবাতে যা হয়ে গেল তার ভিত্তিতে ভারতের বৈদেশিক নীতি ঢেলে সাজা দরকার হয়েছে। কিন্তু কয়েক দিন পরেই মাদ্রাজে এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বললেন, ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তিগুলি বদলাবার মত কোন ঘটনাই ঘটে নি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংহ নিউ-ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন থেকে ফিরে এসে নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "আমি এমন কথা বলব না যে, রাবাতের ঘটনার ফলে আমাদের বৈদেশিক নীতির কোন মৌলিক পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।" তবে তিনি একথা স্বীকার করেন যে, ভারতের পররাষ্ট্রনীতির ফলাফল কি হচ্ছে তার বিচার করার পথ সব সময়েই খোলা রাখতে হবে। দেশের পররাষ্ট্র নীতির পুনর্মূল্যায়ন নিরন্তরই করা দরকার।

কিন্তু রাবাতে ঠিক কি ঘটেছিল! ভারত সরকারও বোধ হয় এখনও তার পরিষ্কার ছবি পান নি। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেসব ভারতীয় প্রতিনিধি আছেন তাঁদের কাছ থেকেও খবর নেওয়া হচ্ছে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুর রহমান তাঁর নিজের দেশে ফিরে নাকি বলেছেন যে, মরোক্কোর রাজা তাড়াহুড়ো করে ভারতকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েই গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছিলেন। পাকিস্থান ভারতের উপস্থিতিতে আপত্তি করে এবং এই প্রসঙ্গে আহমেদাবাদের কথাও তোলে। টুঙ্কু আবদুর রহমান নাকি একথাও বলেছেন যে, তাঁর প্রস্তাব মত ভারত নিজেই সম্মেলন থেকে সরে থাকতে রাজী হয়েছিল; কিন্তু ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ পরে মত বদল করেন।

এদিকে শ্রীদীনেশ সিং বলেছেন যে, নিউইয়র্কে যেসব পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে তাঁদের মধ্যে একমাত্র পাকিস্থান ছাড়া অন্য সব দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে বলেছেন, রাবাতে যা হয়েছে, সেটা অন্যায় এবং তার জন্য তাঁরা দুঃখিত। যেসব রাষ্ট্রপ্রতিনিধি একথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে জর্ডান ও ইরানের প্রতিনিধিও আছেন। যদি তাই হয় তাহলে রাবাতের সম্মেলন থেকে ভারতকে বাদ দেওয়ার পাকিস্থানী প্রয়াসে অন্যান্য দেশগুলি বাধা দিল না কেন? শ্রীসিং বলছেন, অন্য দেশগুলির কৈফিয়ৎ হচ্ছে, ঘটনা এমন দ্রুত ঘটেছিল যে, কিছু করতে গেলে সম্মেলন ভেঙে যেত।

ইতিমধ্যে আর একটি খবর এই যে, রাবাতের ঘটনা সম্পর্কে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের অভিমত বুঝিয়ে বলার জন্য প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁর একজন ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠিয়েছেন।

এদিকে মরক্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা এখনও ভারতকে ইস্লামী সম্মেলনের সদস্য বলে মনে করেন এবং আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হওয়ার কথা আছে তাতে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতকেও আমন্ত্রণ জানান হবে।

কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের ঐ বৈঠকে ভারতের যোগ দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠবে না। কেননা, যদিও পরিষ্কারভাবে

স্বীকার করা হচ্ছে না, তাহলেও নয়াদিল্লীর সাউথ ব্লক সম্ভবত এটা এখন বুঝতে পেরেছেন যে, রাবাত সম্মেলনের একখানা আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার জন্য আকুলিবিকুলি করা ও সেই পত্র পাওয়া মাত্র পাতা পেড়ে বসবার চেষ্টা করা ভারতের পক্ষে ভুল হয়েছে। গোটা তিনেক ভুল ধারণার উপরে ভিত্তি করে ঐ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ও যাতে যোগ দিতে পারা যায়, সেজন্য আমন্ত্রণ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। এক নম্বর ভুল ধারণা হল : আরবদের বড় বন্ধু কে সেটা প্রমাণ করার জন্য ভারতবর্ষকে সর্বদাই পাকিস্থানের সঙ্গে টক্কর দিতে হবে। দুই নম্বর ভুল ধারণা—ভারতীয় মুসলমানদের কাছে ভারত সরকারকে প্রমাণ করতে হবে যে, আল আকসা মসজিদে আগুন দেওয়ার ঘটনার প্রতিকারের সন্ধানে তাঁরা অন্য কোন দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে নেই। (পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এরকম একটা খবর বার করে দেওয়া হয়েছে যে, রাবাত সম্মেলনের প্রাক্‌কালে ভারতের বিভিন্ন মুসলিম সংস্থাগুলি থেকে ভারত সরকারের কাছে দাবী আসছিল, ভারতকে রাবাত সম্মেলনে যোগ দিতে হবে। তাছাড়া, ভারত সরকারের আইন বিভাগের উপমন্ত্রী ইয়ুনুস সেলিম এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়ে নয়াদিল্লীস্থিত সৌদি আরব দূতাবাসের মারফৎ সে দেশের রাজা ফৈজলের কাছে বার কয়েক আবেদন পাঠিয়েছিলেন যাতে ভারতকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ

জানান হয়।) তিন নম্বর ভুল ধারণা হল: রাবাত সম্মেলনে যোগ দিতে পারলেই বুঝি প্রমাণ হবে যে, ভারত একটি বৃহৎ শক্তি।

কিন্তু এই ভুল ধারণাগুলির দ্বারা পরিচালিত না হলে ভারত সরকারের এটা নজরে পড়ত যে, রাবাত সম্মেলন ছিল মূলত ধর্মীয় সম্মেলন। ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে সরকারী স্তরে এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ভারতের ছিল না। এই সম্মেলনে শুধু সেই সব দেশেরই যোগ দেওয়ার কথা ছিল যেসব দেশের রাষ্ট্রপতি মুসলমান অথবা যেসব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই দুই সংজ্ঞার কোনটির মধ্যেই ভারতবর্ষ পড়ে না। রাশিয়া ও চীনে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও ঐ দুটি দেশ ত রাবাত সম্মেলনে স্থান লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করেনি।

দ্বিতীয়ত নয়াদিল্লীর নেতারা এটাও লক্ষ্য করতে পারতেন যে রাবাত সম্মেলনের আয়োজন করায় সেই সব দেশেরই বেশী উৎসাহ ছিল, যেসব দেশের সরকার প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক শাসন বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন এবং সেদিক থেকে নতুন আরব জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানকে ভয়ের চোখে দেখছেন। আল আকসা মস্‌জিদের জন্য [illegible] [illegible] জন্য [illegible] [illegible] [illegible] বয়স্ক এই সুযোগে ঐস্লামিক ঐক্যের ধ্বজা তুলে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তা-বাদের শক্তিকে একটা আঘাত দেওয়ার চেষ্টা। ইরান ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সৌদি আরব ইজরায়েলের সঙ্গে লড়াইতে কুটোগাছটি নেড়েও আরব পক্ষকে সাহায্য করেনি। এই সব দেশই ছিল রাবাত সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। লিবিয়া ও সুদানের সাম্প্রতিক অভ্যুত্থানে ঐস্লামিক ঐক্যের ধ্বজাধারী সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলি ভীত। ইয়াহিয়া খানের দেশ পাকিস্তানের পূর্বাংশে ছাত্ররা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির জন্য দাবী জানাচ্ছে। রাবাতের সম্মেলনে এদের প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু ভারতের কি প্রয়োজন? ভারতকে যদি রাবাত সম্মেলনে যোগ দিতে দেওয়া হত তাহলেও সে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রজোট গড়বার এই অপপ্রয়াসে সার্থকভাবে বাধা দিতে পারত না; বরং সম্মেলনে তার উপস্থিতি ইউ-এ-আর-এর মত ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী দেশের পক্ষে বিব্রতকর কারণ হত। ভারত সরকারের যে মহল রাবাতে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা এসব বিষয় আদৌ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেন নি।

আল আকসার পরবর্তী কালে মধ্য এশিয়ায় ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে চাঙ্গা করে তোলবার এই নতুন চেষ্টার কুফল ইতি-মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। সৌদী আরবের রাজা ফৈজল প্রভৃতির অনুগ্রহপুষ্ট 'তাহ্‌রির' নামক যে সংস্থাটি দুনিয়ার সকল মুসলমান-প্রধান রাষ্ট্রকে খলিফার অধীনে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করবার জন্য কিছুকাল যাবৎ আন্দোলন চালিয়ে সুবিধা করে উঠতে পারছিল না তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। জর্ডানে এই দল সেখানকার সরকারের বিরুদ্ধে একটা অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে।

রাবাত সম্মেলনের এই কেলেঙ্কারির ফলে দেশের পররাষ্ট্র নীতির উপর কোন স্থায়ী ছাপ রেখে যাবে কিনা তা দেখার জন্য দেশের মানুষ অপেক্ষা করে আছেন। কোন কোন মহল মনে করছেন ভারত সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপমানের ধুলো ঝেড়ে ফেলে গোটা ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। নিউইয়র্কে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিংয়ের সঙ্গে পাকিস্তানের [illegible] [illegible] আলোচনা হয়েছে এবং পাকিস্তান যে কোন রকম পূর্ব শর্ত ছাড়াই ভারতের সঙ্গে যাবতীয় বিরোধ নিয়ে আলোচনা করতে রাজী হয়েছে তার মধ্যে শ্রীসিং সে দেশের মতি বদলের লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন। রাবাতে পাকিস্তান যা করল তার পর এত তাড়াতাড়ি তার মতি বদলের কাহিনী দেশের মানুষ সহসা মেনে নেবে বলে মনে হচ্ছে না।

আগামী ১৭ নভেম্বর সংসদের অধি-বেশন আরম্ভ হলে রাবাতের ধাক্কা সেখানে ভালভাবেই লাগবে। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট নেতা শ্রীমধু লিমায়ে ইতিমধ্যে জানিয়েছেন যে, রাবাত সম্মেলনের কেলেঙ্কারির পরি-প্রেক্ষিতে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে একটি নিন্দা প্রস্তাব আনবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বা-চনের সময় যে বিভাজনের নজীর স্থাপিত হয়েছে তার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী তাঁর দলের সকলের নিঃশর্ত সমর্থন আশা করতে পারেন না। সুতরাং এবার অনাস্থা প্রস্তাব এলে তাঁকে আত্মরক্ষার জন্য সম্ভবত কম্যুনিস্টদের ভোটের উপর নির্ভর করতে হবে।

১০-১০-৬৯

সামনে পুজোর দিন

দেখতে দেখতে আবার পুজো এসে গেল। বাংলাদেশে পুজো মানে দুর্গাপুজো যাকে আমরা জাতীয় আনন্দের উৎসবরূপেই গণ্য করি। আজ থেকে প্রায় আশী বৎসর আগে এমনি এক আশ্বিন মাসে শিলাইদায় পদ্মার বোটে বসে রবীন্দ্রনাথ পুজোর দিনের যে-বর্ণনা দিয়েছিলেন তা উদ্ধৃত করে পাঠকদের কাছে এই চিরন্তন উৎসবের একটি চিত্র তুলে ধরতে চাই। তিনি লিখেছিলেন, "আজ দিনটি বেশ হয়েছে। ঘাটে দুটি একটি করে নৌকো লাগছে, বিদেশ থেকে প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে পোঁটলাপুঁটলি বাক্স-ধামা বোঝাই করে নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে সম্বৎসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম, একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নতন কোঁচানো ধুতি পরলে; জামার উপর সাদা রেশমের একটি চায়না কোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহু যত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে, ছাতা ঘাড়ে করে গ্রামের অভিমুখে চলল।"

এই দৃশ্য আজও গ্রামের দিকে গেলে দেখা যাবে নিশ্চয়ই। কারণ, আমরা খুব বেশি বদলাইনি। যেটুকু বদল তা বাইরের, মনের দিকে আমরা এখনও পুজোর দিনে একইভাবে সাড়া দিই। শরৎকালে বাংলাদেশ সুখের ও আনন্দের স্থিরচিত্র। দুর্গোৎসব মানুষের ধ্যানে বিশ্বকল্যাণের উৎসবরূপে চিত্রিত। তাকেই শিল্পী রূপ দিয়েছেন মমতাময়ী এক জননীর প্রতিমায়। তিনি অসুরসংহারিণী; তাঁর দশভুজে দশ আয়ুধ। তিনি রণরঙ্গিনী। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি এক সুখী পরিবারের মাতা এবং জায়া। তাঁর স্বামী এক আত্মভোলা সন্ন্যাসী। এই মহেশ্বরকেও বাংলাদেশ একান্ত আপন বলেই জেনেছে। তিনি সদাতুষ্ট, আশুতোষ। দরিদ্র বাঙালীর মতোই তিনি চালচুলোহীন। অথচ ঘরে তাঁর স্বয়ং অন্নপূর্ণা। অপূর্ব এক মানবিক করুণা, মমতা আর দাম্পত্যজীবনের ছবি পাই আমরা বাংলার ভক্ত কবিদের হর-পার্বতী, উমা-মহেশ্বরের বন্দনায়। এই লোকায়ত কল্পনাই বাঙালীর কাছে পরমপ্রিয়, পরম আকর্ষণের।

রামপ্রসাদ, কমলাকান্তের দৃষ্টিতে উমার এক স্নেহাতুর রূপ দেখি আমরা। তিনি যেন মানবীকন্যা, আমাদের ঘরেরই মেয়ে। 'এবার উমা এলে গিরি, আর উমায় পাঠাব না।' সম্বৎসর পর তার পিত্রালয়ে আগমনের প্রতীক্ষায় জননীর হৃদয় আকুল। পথচেয়ে তার দিন যায়। কবে সেই নয়নের মণি, ভালবাসার ধন আসবে পতিগৃহ থেকে পিত্রালয়ে। এ তো বাংলার মাতৃহৃদয়ের কান্নাই উৎসারিত হয়েছে আগমনী গানের ছত্রে ছত্রে। একে চিনতে আমাদের ভুল হয় না এ তো আমাদেরই মা, বোন, কন্যা। শুধু বৈকুণ্ঠের তরে এ গান লিখিত হয়নি। শুধু অপার্থিব বাসনায় আয়োজিত হয়নি এ উৎসব। বাংলা দুর্গোৎসব তাই বাঙালীর প্রাণ-নিঙরানো বাৎসল্য রসের উৎসব। দেবীর ধ্যানমূর্তিতেও আমরা পাই এক বিশ্বকল্যাণময়ীর রূপ। তিনি অকল্যাণকে ধ্বংস করেন, ভীত প্রাণে দেন অভয়, অনুগতকে দেন আশ্রয় ও সান্ত্বনা। সামাজিক দিক থেকেও এই উৎসবে সকল মানুষের অন্তরঙ্গ মেলামেশার সুযোগ। কেউ পর নয়, কেউ দূরের নয়, কেউ অনাহূত নয়। এ উৎসব সকলেরই উৎসব। যাঁরা দূর প্রবাসী তাঁরাও এই উৎসবের নামে চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এখন তাঁদের ঘরে-ফেরার সময়। শরৎকাল এলেই বাঙালীর মনে জাগে এক আনন্দের শিহরণ। শিউলি ফুটতে শুরু করলেই তার গোনা আরম্ভ হয়, পুজোর কত দেরী। আশ্বিন এক আশ্চর্য মাস। সাগরপারের বাঙালীরাও তাই এই সময়ে আয়োজন করেন উৎসবের। এর মধ্য দিয়েই তাঁরা যেন নিজেদের দেশের, বাড়ির পরিবারের কল্যাণস্পর্শ ফিরে পান।

বাস্তবজীবনে আমরা সুখের স্পর্শ খুব বেশি পাই না। দেশে অভাব অনটন, বিরোধ লেগেই আছে। নানা সংকটের মধ্যে বাস করতে হচ্ছে আমাদের। সবার মুখে আমরা হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারিনি। তবুও আমরা প্রার্থনা করব, বাংলার ঘরে ঘরে আজ যে উৎসবের আয়োজন তার অন্তর্নিহিত সত্য যেন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের মন থেকে সব দুঃখ, ভয়, হিংসা, দ্বেষ যেন দূরে হয়ে যায়। যে-কল্যাণময়ীর ধ্যানমূর্তি সামনে রেখে আমাদের উৎসব আয়োজন তা যেন বাস্তব জীবনে আমাদের সকলের জীবনে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি এনে দিতে সহায়ক হয়। এই আনন্দোৎসব যেন আমাদের সংযত ও সুন্দর করে। আমরা যেন মানুষকে তার মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত না হই। লোভ, হিংসা ও তিক্ততার মনোভাব বিসর্জন দিয়ে আমরা যেন সত্যিকারের পূজারী হই। দুর্গোৎসব আমাদের এই দ্বিধা-বিদীর্ণ, সংকটাপন্ন সমাজকে শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধির আলোকিত জগতে উত্তরণে সহায়তা করুক। আমরা যেন বিশ্বমানবের কল্যাণে নিজেদের আত্মোৎসর্গ করে কৃতার্থ হতে পারি।

বাঙালীর দুর্গোৎসব

ত্রিপুরাশংকর সেন

'দুর্গা' শব্দের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন—

'কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদে 'দুর্গা' শব্দটির উল্লেখ দেখা যায়। যাজ্ঞিকা উপনিষদে প্রোক্ত 'দুর্গি' শব্দটিও দুর্গা শব্দের সহিত অভিন্ন বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করেন। সুতরাং 'দুর্গা' শব্দটি যে অতিশয় প্রাচীন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই'।

আমরা জানি, সিন্ধু সভ্যতায় বৃষ, শিব ও দুর্গাদেবীর চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য, কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সিন্ধু সভ্যতার এই আয়ুধধারিণী দেবী দুর্গা নন। আবার আমাদের দেশের পৌরাণিক সাহিত্যে ও তন্ত্রে যে দুর্গা-পূজার স্তব-স্তুতির উল্লেখ পাই, সেই দেবী কবে কোন্ সাধকের ধ্যানমূর্তিতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা নিশ্চয় করে বলার উপায় নেই। তবে, একথা সত্য যে, বাংলা দেশে প্রতি বৎসর যে দুর্গোৎসব হয়ে থাকে (কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে রাজা কংসনারায়ণ এই পূজার প্রথম প্রবর্তক), তার মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট রূপ ফুটে উঠেছে। বাঙালীর এই দুর্গোৎসবের তাৎপর্য অনুধাবন করলে দেখা যায় বাঙালী কখনো মায়াবাদী হতে পারে নি, সে চেয়েছে পরিপূর্ণ জীবন,—চেয়েছে শত্রুবিজয়, চেয়েছে সম্পদ ও কল্যাণ, চেয়েছে পরা ও অপরা বিদ্যা, চেয়েছে দৈহিক ও মানসিক বল, চেয়েছে সর্ব কর্মে সিদ্ধি। কারো কারো মতে এই দুর্গাদেবীর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্য-শক্তি ও শূদ্রশক্তির সমন্বয় ঘটেছে।

বাঙালীর ভাব-দৃষ্টির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বিশ্বব্যাপিনী চৈতন্যময়ী জগজ্জননীর মধ্যে সে আপন ঘরের স্নেহময়ী, মমতাময়ী কন্যাকে প্রত্যক্ষ করেছে। পৌরাণিক পটভূমিকার ওপর শ্রীরামপ্রসাদ যে আগমনী ও বিজয়ার গান রচনা করেছেন, তাতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ-চিত্র প্রতিফলিত হলেও তার আবেদন সার্বজনীন। শ্রীরামপ্রসাদই এই আগমনী ও বিজয়ার গানের প্রবর্তন করে শাক্ত পদাবলীকে বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত করেছেন, আর এই বাৎসল্যরস বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্যরসের চাইতে অধিক মর্মস্পর্শী। বাস্তবিকই আগমনী ও বিজয়ার গান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আগমনীর গানে যেমন কন্যা-মিলনের আনন্দ আসন্ন বিরহের বেদনায় দ্বারা অভিষিক্ত, বিজয়ার গানে তেমনি বিচ্ছেদের বেদনা পুনর্মিলনের আশ্বাসের দ্বারা কথঞ্চিৎ লঘূকৃত।

পাশ্চাত্য ভাবধারায় নিষ্ণাত মধুসূদন অন্তরে ছিলেন খাঁটি বাঙালী, তাই তিনি এই গানগুলির প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন নি। মেঘনাদ-বধ ও প্রমীলার চিতা-রোহণের পর লঙ্কার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

'বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে
সপ্ত দিবানিশি লংকা কাঁদিল বিষাদে'।

'নবমীর নিশি' নামক চতুর্দশপদী কবিতার ভেতর দিয়ে মা মেনকার হৃদয়-বেদনা কী চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করেছে—

'যেয়ো না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে।
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে;
পেয়েছি উমায় আমি; কি সান্ত্বনা ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ লো তারাকুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে'।

ইত্যাদি

এই সনেটটি নবমীর নিশির প্রতি মাতা মেনকার উক্তি।

বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার এক অভিনব তাৎপর্য প্রকাশিত হয়েছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যান-দৃষ্টিতে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' আফিঙ্গসেবী কমলাকান্ত অহিফেন প্রসাদাৎ সহসা দিব্যদৃষ্টি লাভ করে উপলব্ধি করছেন—দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী দুর্গাই হচ্ছেন তাঁর দেশমাতৃকা, হিরন্ময়ী বঙ্গভূমি। তিনি এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা! কমলাকান্তের অন্তর থেকে আকুল প্রার্থনা ধ্বনিত হোলো—'ওঠো মা হিরন্ময়ী বঙ্গ-ভূমি, ওঠো, আবার আমরা আলস্য ইন্দ্রিয়া-সক্তি ত্যাগ করবো, সাত কোটি সন্তানে মাকে 'মা' বলে ডাকবো, তোমায় আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবো। আর যদি তা না পারি, তবে জীবন বিসর্জন দিব, কেননা, মাতৃহীনের জীবনে প্রয়োজন কি'?

নবযুগের নব্যতান্ত্রিক বঙ্কিমচন্দ্র দেশজননীর ভেতর চৈতন্যময়ী বিশ্ব-জননীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী,
কমলা কমলদল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং'।

'আনন্দমঠে' সত্যানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে দেশমাতৃকার মন্ত্রে দীক্ষাদান করার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গাদেবীর মূর্তির এক অপূর্ব তাৎপর্য উদ্ঘাটিত করেছেন। তিনি বলেছেন—মা যা ছিলেন, জগদ্ধাত্রী হচ্ছেন তার প্রতীক, দুর্ভিক্ষ-

পীড়িতা মা যা হয়েছেন, শ্মশানবাসিনী কঙ্কালমালিনী কালী হচ্ছেন তারই প্রতীক, আর অনাগত যুগের মাতা—যিনি আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবেন—তারই প্রতীক হচ্ছেন দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী দুর্গা, যাঁর দক্ষিণে আছেন লক্ষ্মী ভাণ্ডাররূপিণী, বামে আছেন বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে আছেন বলরূপী কার্তিকেয় ও কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। অর্থাৎ সেদিন দেশমাতৃকার সন্তানেরা সম্পদ, বিজয়, পরা ও অপরা বিদ্যা, দৈহিক ও মানসিক বল ও সর্ব কর্মে সিদ্ধিলাভ করবেন।

বঙ্কিমের এই ধ্যানমূর্তি যাঁদের কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছিল, তাঁদের ভেতর উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও শ্রীঅরবিন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দের 'ভবানীর মন্দির' 'আনন্দমঠের' ভাবধারায় অনুপ্রাণিত।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'দি মাদার' পুস্তিকায় যে শক্তিসাধনার কথা বলেছেন, তা হচ্ছে দিব্যভাবের সাধনা। এই সাধনার মূল কথা জগন্মাতার চরণে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ লক্ষ্য — মানব-জীবনের দিব্য রূপান্তর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, আমি গাড়ী, তুমি এঞ্জিনীয়ার আমি রথ তুমি রথী, যেমন করাও, তেমনি করি যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও, তেমনি বলি'। যিনি বাস্তবিক প্রপন্ন বা শরণাগত জগন্মাতা স্বয়ং তাঁর ভার গ্রহণ করেন।

এই জগন্মাতাই মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী অর্থাৎ দেবীর তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী মূর্তি। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় মহেশ্বরী হচ্ছেন কমপ্যাশনেট বাট ওয়াইজ, তাঁর ভেতর জ্ঞান ও করুণার মিলন ঘটেছে। মহাকালী হচ্ছেন বল, শক্তি ও মন্যু বা সমর—নিষ্ঠুরতার প্রতীক। মহালক্ষ্মী হচ্ছেন মোহিনী শক্তি, কোমলতা, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক। আর মহাসরস্বতীর ভেতর ঘটেছে কর্মশক্তি, পূর্ণতা ও শৃঙ্খলার প্রকাশ।

কাজী নজরুল ইসলামের দেবীস্তুতি

সম্প্রতি কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'দেবীস্তুতি' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকে কবি শ্রীশ্রীচন্ডীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন—

'যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই পরমাত্মা। অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তি যেমন অভিন্ন, জল ও তাহার শীতলতা যেমন অভিন্ন, পরমাত্মা ও আদ্যাশক্তিও তেমনি অভিন্ন।

পরব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির দ্বিতীয় অবতার মহালক্ষ্মীরূপে। এইরূপে তিনি মহিষাসুর বধ করেন। আমাদের দেশে শ্রীদুর্গারূপে ইনি পূজিতা হন। প্রথম অবতার মহাকালীরূপা পরমাত্মার সংহার-শক্তি, দ্বিতীয় অবতার মহালক্ষ্মী রাষ্ট্রীয় শক্তি। এই মহাভারত যখনই তাহার রাষ্ট্রীয় শক্তি হারাইয়াছে, তখনই মহালক্ষ্মীরূপিণী শ্রীদুর্গার শরণাপন্ন হইয়া সে তাহার বিলুপ্ত শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র এই রূপেই পূজান্তে বরলাভ করিয়া রাবণকে নিহত করিয়া ভারতের ধর্ম-অর্থ-শ্রীসম্পদরূপিণী সীতার উদ্ধার করেন। ইনি সমস্ত দেবতার একীভূতা শক্তি-স্বরূপা। পরাজ্ঞান বা শুদ্ধজ্ঞান ব্যতীত কামনার অবসান হয় না। তাই শুদ্ধ-জ্ঞানরূপিণী মহাসরস্বতী জগতের কল্যাণের জন্য, জীবের আর্তি-নিবারণের জন্য কাম ও লোভের প্রতীক শুম্ভ-নিশুম্ভকে অর্থাৎ বৈশ্যশক্তি ও শূদ্রশক্তিকে নিহত করিলেন। অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাকালীর শরণ লইলে পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রাহ্মী স্থিতি হয়; সত্ত্বগুণ তাহার ধর্ম। শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মীর শরণ লইলে দেবশক্তি সম্পন্ন ক্ষত্রিয় হয়। শ্রীশ্রীমহাসরস্বতীর শরণ লইলে বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব দোষ বিনষ্ট হয়। এই তিন শক্তির 'ত্রিবেণী-তীর্থে' জন্মগ্রহণ করেন সত্যকার ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মর্ষি।

মহাকাল দেন তেজ ও ব্রাহ্মণের তপস্যা, মহালক্ষ্মী দেন প্রেম, মহাসরস্বতী দেন জ্ঞান। এই সৎ চিৎ আনন্দরূপিণী ত্রিধারা শক্তিই পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা'।

কাজী নজরুল যে দেবী-স্তুতি রচনা করেছেন, তাতে একদিকে শ্রীশ্রীচণ্ডীর ও অপর দিকে বাঙালী ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষণীয়।

'প্রণমামি শ্রীদুর্গে নারায়ণি
গৌরি শিবে সিদ্ধি বিধায়িনি।
মহামায়া অম্বিকা আদ্যা শক্তি
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনি।
শুম্ভ-নিশুম্ভ বিমর্দিনি চণ্ডি
নমো নমঃ দশপ্রহরণধারিণি
দেবি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বিধাত্রি
জয় মহিষাসুর-সংহারিণি।
যুগে যুগে দনুজদলনি মহাশক্তি
যোগনিদ্রা মধুকৈটভ নাশিনি
বেদ-উদ্ধারিণি মণিদীপবাসিনি
শ্রীরাম-অবতারে বরাভয়দায়িনি'।

বিশ্বসারতন্ত্রে শ্রীদুর্গাস্তব

বিশ্বসারতন্ত্রে আমরা যে দুর্গাস্তব দেখতে পাই, তার মূলে ভাবটি এই—দেবী দুর্গা সর্বব্যাপিনী, বিশ্বরূপা, জগত্তারিণী, জ্ঞান-স্বরূপিণী, আনন্দস্বরূপা, অখিল বিঘ্নবিনাশিনী, অমেয়া, অজেয়া, ক্রোধহীনা, আবার ক্রোধশীলা। তিনি বাকশক্তি, তিনিই কুণ্ডলিনী শক্তি, তিনিই ঐশ্বর্য, আবার তিনিই কালরাত্রি। যিনি ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র পাঠ করেন, সর্ববিধ দুর্গতি থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে তাঁর কোনো বিপদ থাকে না। ভক্তদের তিনি অমোঘ ফল দান করেন।

এই স্তবটি অনেকে আপদুদ্ধারের জন্যে পাঠ করে থাকেন। একে বলা হয়েছে শ্রীদুর্গাস্তবরাজ। এতে রয়েছে বারোটি শ্লোক। আমরা দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি।

'শ্রীদুর্গাস্তবরাজে' ভক্ত সাধক আরাধ্য দেবীর নিকট অন্তরের আকুল প্রার্থনা নিবেদন করছেন—

'অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ক্ষুধার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারকর্ত্রী
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে'।।

হে দেবি, যারা অনাথ, দীন, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধায় কাতর, ভীত ও বদ্ধ; তুমিই তাদের একমাত্র গতি ও নিস্তারকর্ত্রী, হে জগত্তারিণি, তোমায় প্রণাম, তুমি আমায় পরিত্রাণ কর।

'শরণমসি সুরানাম্ সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজ নরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাং।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাবৃতানাং
ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ'।।

হে দেবি দুর্গে, তুমি দেবতাদের, সিদ্ধ ও বিদ্যাধরদের, মুনি, অসুর ও নরগণের, ব্যাধিপীড়িত ও রাজভবনে উপস্থিত অর্থাৎ রাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং দস্যুদের দ্বারা বিপন্ন জনের একমাত্র আশ্রয়, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

এ যুগে আমাদের মহাশক্তির আরাধনা শুধু ব্যক্তিগত ভক্তি ও মুক্তির জন্যে নয়, সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য, জননী জন্মভূমি তথা বিশ্বের হিতের জন্যে। আমরা চাই জাতীয় সংহতি, চাই ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সাম্য, চাই দেশের সর্বাঙ্গীণ ঋদ্ধি ও নিখিল বিশ্বের শান্তি, চাই পরা বিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান এবং অপরা বিদ্যা বা লৌকিক জ্ঞান, চাই দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল ও সকল কর্মে সিদ্ধি। যেদিন আমরা দুর্গোৎসবের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবো, সেদিনই আমরা পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ব্রতে দীক্ষাগ্রহণ করবো। অনাগত যুগের দেশমাতৃকাই হবে আমাদের চোখে জননী দুর্গা, যিনি সর্বাভরণভূষিতা, সর্বৈশ্বর্যশালিনী, রিপুদলবারিণী, বরাভয়দায়িনী। দেশজননীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করাই হবে আমাদের দুর্জয় সংকল্প। অবশ্য উৎসবের আনন্দে আমরা সবার সঙ্গে মিলিত হবো কিন্তু সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমর বাণীকেও সর্বদা স্মৃতিতে জাগরূক রাখবো—

'মাতৃহারা মা যদি না পায়,
তবে আজি কিসের উৎসব'!

আসুন, আমরা সকল ভেদ বিস্মৃত হয়ে দেবী দুর্গার উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের প্রণতি নিবেদন করি—

'প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরু মে দেবি দুর্গে দেবি
নমোহস্তু তে'।।

* তাঁহার প্রথম অবতার মহাকালীরূপে। *

মানুষের জন্ম

...বাবুমশাই কি কখনও পাপ করেছেন?

সত্যি বলতে কী প্রশ্নটা কিম্ভুত তো বটেই, মর্যাদার পক্ষেও মাননসই নয়। চমকে উঠেছিলাম—কিন্তু রাগ করিনি। লোকটার চেহারা এত চেনা, প্রতিটি মুখভঙ্গী বা হাবভাব এত বেশি দেখেছি কোথাও, অথচ স্পষ্ট জানি সেটা বস্তুত অসম্ভব। এ বিভুঁয়ে কস্মিনকালে আমি পা ফেলিনি। ভূগোলের বইতে বা মানচিত্রে এ জায়গার নাম অনুল্লেখিত। রেলস্টেশন থেকে একটা ঢেউ খেলানো শূন্যমাঠের বুক চিরে চলে গেছে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় মহাসড়ক। আহিরপুর চৌমাথায় নেমেছি বাস থেকে। ডাইনে-বাঁয়ে যে সড়ক, তা নিতান্ত মাটি দিয়ে তৈরী। ধুলোয় ভরা এবড়োখেবড়ো অসমতল আর সরু সেকেলে পথ। হয়ত টেস্ট রিলিফের সুবাদে কিছু উঁচু করা হয়েছিল মাত্র। যথাবিহিত ফিনিসিং টাচ দেবার আগেই সম্ভবত ব্লক থেকে স্কীম গুটিয়ে নেওয়া হয়। অনুমান করা যাক, সংশ্লিষ্ট কেউ বা কারা দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। কিংবা পঞ্চায়েতি দলাদলির ব্যাপার।.....

আজকাল গ্রাম বলতে তো এই-ই। কিন্তু এমন বিরক্তিকর গ্রামাঞ্চল আমি দেখিনি, যেখানে এখনও দূর প্রত্যন্তে পৌঁছতে কোন যানবাহন থাকবে না! না রিকসো, না বাস। নন্দদুলালের বাড়ী যে গ্রামে, তা এখান থেকে নাকি কমপক্ষে পাঁচ মাইলেরও বেশি। চৌমাথায় দাঁড়িয়ে যখন দূর ধূসর গ্রামরেখার দিকে তাকিয়ে হতাশ হচ্ছি, আহিরপুরের এক কাঠকুড়োনি বুড়ি কপালে সূর্য আড়ালকরা হাত রেখে বলছিল, ছোটবাবু এলেন গো? 'না' শুনে বুড়ি ফোকলা দাঁতে অসম্ভব হেসে নড়বড়। শেষে গন্তব্যস্থলের হদিস তার কাছেই মিলেছে। চোখবরাবর সিধে এই মেঠো পথ দিয়ে গেলে তবে কিনা চৌধুরীমশায়দের গেরাম কদমডিহি! কতদূর? —তা দু-আড়াই কোশ হবে। কুখ্যাত পাড়াগেঁয়ে 'ডালভাঙা ক্রোশ' নিশ্চয়! ভাবছি, কী করব—ফিরে যাব কিনা। নন্দর বাড়ি যাওয়াটা নিতান্ত প্রমোদভ্রমণের মতলবে। দু-একদিনের বৈচিত্র্য মাত্র। একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচতে চাই। কিন্তু তার জন্যে এই ঝাঁ ঝাঁ খর রোদ্দুরে গরম ধুলোয় হেঁটে মূল্যপরিশোধ! আর নন্দটার একী আশ্চর্য ব্যবহার। কোন লোক রাখেনি, কোন ব্যবস্থা নেই পৌঁছবার! রাগে বিরক্তিতে শেষ অব্দি অপমানিত বোধে ক্ষুব্ধ আমি ফেরার সিদ্ধান্তেই অটুট ছিলাম।

হঠাৎ জাতীয় মহাসড়কের সামনের বাঁক থেকে বিকটকণ্ঠে কার গান প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।... এ ভরা গাঙে চেকন জোসনা ডুব দিয়ে পার হব লো সই......

ঠাহর করে দেখি নরম পীচের ওপর গড়গড়িয়ে আসছে একটা গাড়ি—ছইবিহীন আর শূন্য গরুর গাড়ি। সামনে বসে আছে [illegible] প্রকাণ্ড-[illegible] শরীর—[illegible]

শুকনো বাঁশের মত দুটো বাহু একরাশ সাদাকালো গোঁফদাড়ি ঠোঁটের এপারওপার, খাড়া মোটা নাক, উদ্ধত কালশিটেপড়া কপাল, দুই ভ্রূর মাঝখানে সুস্পষ্ট দুটো শিরায় তিলকচিহ্ন—মাথায় তার ঝাকড়মাকড় কাঁচাপাকা চুলে পেঁচানো আছে একফালি ন্যাকড়া এবং সেই তার শিরস্ত্রাণ। সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর—কেবল কোমরে ময়লা একটু লজ্জানিবারণী —সেটা দারিদ্র্যবশত না হতেও পারে। কাছে আসতেই তার চোখদুটো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। ফ্যাকাশে—অতি ধূসর, অথচ অত বিষণ্ণ চোখ আমি এ যাবৎ দেখিনি কারো। কিন্তু সেমুহূর্তে হঠাৎ কেন যে ওকে অত বেশি চেনা মনে হয়েছিল, বুঝতে পারিনি। সম্ভবত সে কারণেই প্রথমে প্রস্তাবটা আমিই দিয়ে ফেলেছিলাম।...এই গাড়োয়ান, কদম-ডাঁই যাবে? যা ভাড়া চাইবে, দেব।

গাড়ি এবং গান থামিয়ে লোকটা আমায় একটুখানি দেখে নিয়েই বলেছিল, কদমডিহি কার বাড়ি যাবেন?

চৌধুরীদের।

ছোটতরফ, না বড়?

তা তো জানিনে বাপু। যাব নন্দদুলাল-বাবুর ওখানে।

লোকটা হঠাৎ জোড়হাতে নমস্কার করে পিছন ফিরেছিল। তারপর মাথার ন্যাকড়াটা খুলে শশব্যস্তে ছেড়ে চট ঝেড়ে সাফ করল।...আসেন, আসেন। অধীনের নাম শুনলেন—লক্ষ্মণ! আজ্ঞে, এ তল্লাটে সব্বাই আমায় চেনে। বহরমপুরে যেতে আজ না হয় বাস-রিকসো হয়েছে—একদিন লখনা গাড়োয়ান ছাড়া বাবুমশাইয়ের উপায় ছিল না।...হে হে, বসতে কষ্টই হবে। গদির খড় দুই রাক্কসদুটো খেয়ে নিয়েছে কিনা—পিঠে ব্যথা পাবেন বাবু! তবে কতক্ষণই বা কষ্ট! ঘরমুখো বলদ—পা ফেলার চটক দেখছেন? সেই সন্ধেরাতে গিয়েছিলাম দত্তবাবুদের কয়েক টিন গুড় নিয়ে। শহরের বাড়িতে ওনাদের কী ভোজকাজ আছে! ভোজের আগেই আমার অবশ্যি ভোজ খাওয়া হয়ে গেল। সে কী খাওয়া বাবু-মশাই!

হাঃ হাঃ হেসে সে আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছিল। কান করছিলাম না। মাথায় রুমাল ঢেকে বসেছি। হাড়-পাঁজর শিরা-উপশিরা থেকে শব্দ করে মগজ অব্দি নড়ে উঠছে অনবরত। হৃৎপিণ্ড ফুসফুস পিলে ইত্যাদি ঝড়ের সময় গাছের ফলের মত দুলছে।

এ দুঃসহ যাত্রার বিলম্বিত সময়টা এক-সময় দেখি আমার সব অনুভূতি কেড়ে আমায় প্রায় নিরবয়ব করে ফেলেছে। আর লোকটা? অনর্গল কথা বলছে। অবান্তর অসংলগ্ন নানারকম কথা—তার বলদ, গাড়ি, গাড়োয়ানী, দারিদ্র্য —কত কিছু! শুনছি—অর্থাৎ শুনতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ এই স্পন্দন-শীল ভয়ংকর যান আমায় চিন্তাশূন্য করে ফেলেছে।

...এই গাড়োয়ানীই আমায় খেলে বাবু, কুরেকুরে মগজটুকুন ফক্ক করে দিলে। বুঝতে পারি সব, ধরতে পারি একটা চালাকি খেলছেন বিধাতাপুরুষ। কিন্তু মানুষ এত অক্ষম, এত দুর্বল! জীবনটা আমার গাড়ির ওপর বসেই গেল। হয়ত কবে শুনবেন এমনি রোদ্দুরে মাঠের মাঝখানটিতে জোয়ালে মাথা রেখে কালঘুমে শুয়েছি উবুড় হয়ে—দুখানি হাত দুটো বলদের পিঠে, কেমন? আঁ? গাড়িটা যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, যাচ্ছেই......

মুখ ফিরিয়েছে আমার দিকে। শুধু হাসবার চেষ্টা করছিলাম।

...বলদ দুটোর দশা দেখুন। আমার সঙ্গে সঙ্গে ওরাও বুড়ো হয়ে এল। ভালো দানাপানিও জোটে না। যা দিনকাল পড়েছে, আর বলবেন না। লখনার গাড়িতে আর কেউ চাপতে চায় না—মাল পাঠানোরও ভরসা করে না। কারণ কি না, বলদ বদলায় না লখনা! কেন বদলাবো বলুন তো সার? সারাজীবনের সাথী। মুখে বললেই তো আর হয় না সেটা! ইয়াসিন কশাই এখনও লোভ দ্যাখায় দুবেলা—আমি গালাগাল দিই। কে বুঝবে আমার মনের ব্যেথাটা বলুন!

ব্যথার কথায় আমার মন লাগে না। বলি, আর কদ্দুর?

গাড়োয়ানেরও মন লাগে না আমার কথায়। বলে, আপনি কী করেন বাবু?... জবাব না পেয়ে নিজেই জবাব তৈরী করে নেয়।...চাকরী। অনেক টাকা মাইনে! কিন্তু বাবু, একটা কথা ভেবে দেখুন। আমি সামান্য মনিষ্যি, আপনি পণ্ডিত—বলুন তো সার, আপনার যখন ঘেন্না ধরে যাবে চাকরীর ওপর—অথচ চাকরী ছাড়তে পারবেন না, মনে করুন, চাকরী ছাড়লেই আপনার জেল-জরিমানা ফাঁসির হুকুম...পরক্ষণে হেসে মুখ ফেরাল।...এমন হয় না বুঝি?

শুধু মাথা নাড়লাম। সেটা হ্যাঁ-না দুই-ই হতে পারে।

সে বলতে থাকে,...ধরে নিলাম, হয় না। তাহলেও, ঘেন্না তো ধরে! ধরে না?...হুঁ, হুঁ, একই কাণ্ড বাবু, বুঝলেন? আমার একটা আদরের কুকুর ছিল। 'কালু' বলে ডাকলে সে সঙ্গে সঙ্গে হাজির—কিন্তু বাড়ি পাক না দিয়ে এলে তাকে খেতে দিতাম না। থালা হাতে নিজেই বাড়ি পাক দিতাম প্রথম-প্রথম, পিছনে লোভী জানোয়ারটা ঘুরত—তারপর ওটা সে রপ্ত করে ফেলল! ডাকলেই আগে বাড়ি পাক দিয়ে তবে খেত! থালা এগিয়ে দিলেও মুখে দিত না। সবই অভ্যেস!...ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ফের বলে, একদিন বাড়ি পাক দিতে গেছে ঘুরে আর আসবার নাম নেই। খুঁজতে গিয়ে দেখি ভিটের পোস্তায়—পিছন দিকে জঙ্গলে কালু গড়াগড়ি খাচ্ছে, মুখে ঘেউ ঘেউ শব্দ—আর...আর

চমক আমার কণ্ঠস্বরে বেরিয়ে যায়—আর, আর কী?

...আর একটা দুধেখরিস তার পা জড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে চোখের কাছটায় ছোবল দিচ্ছে। সামনে সেদিন কাল পথ রুখেছিল বাবু। বুঝলেন কথাটা?

একটুখানি চুপ। তারপর বলে, আমরা হয়ত সবাই ওই কালু কুকুর ছাড়া কিছু নয়। বাবু কি রাগ করলেন?

মাথা নাড়ি। দুপাশে শস্যশূন্য মাঠে গনগনে রোদ-বাতাসের আলোড়ন। গলা-বুক শুকনো লাগে। তেষ্টা পেয়েছিল। আশে-পাশে কোথাও জলের চিহ্ন নেই। গাছপালাও বিরল।

সে বলে, কত জন্মের পাপে মানুষ কুকুর হয় কে জানে! তবে এটা ঠিক—পাপ ছাড়া এমন কখনও হতে পারে না। যে-যার পাপ নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। পাপ নয় বলছেন? তাহলে কেন এখনও গাড়োয়ানীর নেশা আমার গেল না? কেন বলুন তো সার, এখনও মাঝরাত্তিরে জোসনা হলে ফাঁকা মাঠে গাড়ি চালিয়ে যেতে মন উথাল-পাতাল হয়? এ যন্তন্নার কোন পার নাই গো, এ বিষম সমিস্যে। কিছু নাই, কিছু দেখি না, মগজটা খালি লাগে—অথচ এ কী টান!

এইবার সে হঠাৎ সোজা হয়ে বসে। আমার দিকে ঘুরে হঠাৎ চাপাগলায় সেই বিশ্রী প্রশ্নটা ছুঁড়ে মারে মুখের ওপর।...বাবুমশাই কি কখনও পাপ করেছেন!

এ কী প্রশ্ন! রাগে উত্তেজনায় ফেটে পড়া উচিত ছিল, সেটা ঘটল না। ওর মুখের রঙ ঘোর লাল, কপালের রাজতিলক আরও স্পষ্ট হয়েছে, ঘাম শুকিয়ে নুনের কণা জমে আছে সবখানে, এবং সব মিলিয়ে নরকযন্ত্রণায় আক্রান্ত মানুষের মুখ যেন।

আমার গায়ে কাঁটা দিল। থরথর করে অজ্ঞাত ভয়ে কেঁপে উঠলাম। লোকটা কে? এই দিকসীমানাবিহীন মাঠের রুক্ষ নগ্ন বিস্তারে ঘোরতর নরক জ্বলছে, শিখায়-শিখায় ঝলসে উঠছে খড়কুটো পাখির পালক সাপের খোলস শুকনো পাতা, সামনে কার দারুণ প্রশ্ন ভাসে: কখনও পাপ করেছ তুমি?...এর জবাব তো আমার জানা নেই। কোনটা পাপ, তাও তো বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি-তর্ক দিয়ে বোঝা যায় না। লোকটা আমার হঠকারী স্বপ্নের ছুঁড়ে ফেলেছে এতক্ষণে। মুখ নামিয়ে ছিলাম।

...আমি কিন্তু পাপ করেছিলাম। জেনে-শুনেই করেছিলাম। সেই থেকে আমার কুকুর জন্ম। বাড়ি পাক না দিলে খেতে পাইনে।...বাবুমশাই তো নতুন আসছেন এ তল্লাটে। কদমডিহির চৌধুরী বাড়ির সব খবর আপনার জানা নাই। ওনারা জমিদার ছিলেন কোন পুরুষে—সে আমার বাবা-পিতামো দেখে থাকবে। আমাদের আমলে এলাকার মস্তো জোতদার মাত্তর। তিনখান হালের জমিজিরেত। ভাগচাষীও রাখেন, আবার নিজেও অনেকটা হালমজুর দিয়ে চাষ করান। এই হালমজুরের তদারক যারা করে, তারা কিষাণ-মাহিন্দার। আর তাদের যে দেখাশোনা করে, তার নাম 'হালসানা'। আমি ছিলাম চৌধুরীবাড়ীর হালসানা। লোকে তখন বলত, লখনা হালসানা। মাথায় লাল ফেট্টি, কাঁধে লাল গামছা, পরনে নহেতে মোটা ধুতি আর থানের ফতুয়া, হাতে মস্তো লাঠি—এই হচ্ছে চেহারার নমুনা। খৈনী খাই আর গোঁফ পাকিয়ে ঘুরে বেড়াই। দেহখান তো দেখছেন, হেলা-ফেলার দব্য নয়। তখন সোমত্ত যৈবন—ছাতি ফুলিয়ে মাঠে মাঠে বা খামারে হাঁক-ডাক মেরে ঘুরি। ভয়ে মুনিশ-মাহিন্দার তটস্থ থাকে সারাক্ষণ। সেই সময় একদিন হল কী শুনুন।...

ডাইনের বলদটার লেজে মোচড় দিয়ে সে বলতে থাকে, কদমডিহির ওদিকে বিল আছে একটা—তারপর নদী। আজকাল কোথাও একটুকরো অনাবাদী জায়গা পড়ে নেই—তখন কিন্তু গোটা নাবাল মাঠটাই ছিল অনাবাদী। খড়ের জঙ্গল আর জলা। এমনি খরায় খড়কাটাদের গাড়ির চাকায় একটা পথ তৈরী হয়ে যেত প্রতি বছর। নদীপারের গ্রামের লোকেরাও তখন শহর যাবার সোজা পথ পেত একটা। নদী পেরিয়ে কদমডিহি-আহিরপুর হয়ে সোজা বহরমপুর। কদমডিহি ছোটচৌধুরীর সোমত্ত যুবতী বউ—বয়স একদিন ভাটিতে পড়ল, ছেলেপুলের গন্ধটি নেই। বংশরক্ষে এক সমিস্যে তখন। বড়তরফ ঘোর শত্তুর। চিরটাকাল মামলা-মোকদ্দমা করেই কাটছে। মামলাও এক নেশা মশাই, বিষম নেশা! ছোটবাবু হাসতে হাসতে প্রায়ই বলতেন, লখ্না, মামলা তো বিলেত অব্দি যাবে। এদিকে আমি তার আগেই চোখ বুজব। কে চালাবে রে তখন?...হাসির ছল, কিন্তু বেথাটা বুঝতাম। হঠাৎ আমিই একদিন কথায়-কথায় বললাম, নদীপারে পীরের খানে মানত করে দেখুন না ছোটবাবু। প্রতি বছর জষ্ঠি মাসের শেষ রোববার পীর-বাবার খান 'জাগ্যেশ্বর' হয়—তার মানে পুরোদিনরাত্তির পীরবাবার আত্মা সেখানে উদয় হন। তারপরে চলে যান। ওই সময় মানতসিন্নি নিয়ে লোকেরা যায়। নদীর জলে চান করে থানের ধুলোয় গড়াগড়ি খায় আর 'মানসা' করে।...শুনে ছোটবাবু তো সঙ্গে সঙ্গে রাজী। ছোটগিন্নী লাজুক মানুষ—সাতচড়ে রা নেই, তিনি কোনমতে রাজী হতে চান না। না, না, তা কী করে হয়! এমন ঘরের বৌ-ঝি প্রকাশ্যে হাড়ি-মুচি-ডোমের সঙ্গে ভেজা গায়ে এলোচুলে গড়াগড়ি যাবেন—সেটা অসম্ভব। ছোটবাবু রেগে লাল। তুমি ছেলেপুলে চাও না তাহলে? বেশ—সব বুঝে নিলাম। তা অ্যাদ্দিন বলনি কেন সেটা? খুব দেরী করে ফেলেছ। ছোটবাবু এমন খেপেছিলেন যে ঝোঁকের বশে পিতিজ্ঞা করেই বসলেন, কালই নতুন বউ ঘরে না আনি তো হরেন্দ্র চৌধুরীর ঔরসে জম্মোই হ[illegible]।...বুঝলেন সার, ছোটগিন্নীর রূপের কোন জুটি হয় না—এত সুন্দর চেহারা, এমন স্বাস্থ্য, বয়স ভাটিতে নেমেছে—তবু কী জেল্লা! যেন থমথমে নদীর দহখানি! ঝাঁপ দিলে শত জন্মোর যন্তন্না জুড়োয়। আহা!...

যথারীতি গাড়োয়ানী ভঙ্গীতে গরু ডাকিয়ে সে বলতে থাকে, ছোটবাবু কেন আর বিয়ে করছিলেন না, বোঝা যায়। ছোটগিন্নীর সঙ্গে আমার অল্পস্বল্প দেখা-সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা না হয়েছে, এমন নয়। কখনও তো সামনাসামনি মুখ তুলে তাকাতে পারিনি! আড়চোখে দেখেছি মাত্তর। দেখেই ভয় লেগেছে। ছি, ছি, আমার পাপ হবে, পাপ হবে!

শুনছিলাম। এবার চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম, তারপর?

...অগত্যা ছোটগিন্নীকে রাজী হতে হল। তখন বেশ রাত্তির হয়েছে। দিনমান দুজনে তর্কাতর্কি হয়ে গেছে—রাত্তিরেও তার জের চলেছে, বউ যদি চুপচাপ তো কর্তার মুখে সমানে খই ফুটছে। এদিকে আমি ভয়ে কাঠ। ছি, ছি, কী উড়ো আপদ জুড়ে দিলাম দেখদিকি! এখন শেষরক্ষে হবে কীভাবে? সবে চাঁদ উঠেছে—দু সন্ধ্যা আগে পুর্ণিমা গেছে, তখন হঠাৎ ছোট-গিন্নী বলল, কই, গাড়ী বাঁধতে বলো!... আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল বরং আমিই সঙ্গে যাই গো! যখন লোক-জানাজানির ভয় করছেন ঠাকরান, তখন আমিই একা জানলাম ব্যাপারটা। এতে রেতে পীরের থানেও কেউ থাকবে বলে মনে হয় না।...শুনে ছোটবাবু তারিফ করে বললেন, তুই আমায় বাঁচালি লক্ষ্মণ। ব্যস, গাড়ি ঘরেই থাকে। অত রাত্তিরে বাড়ির ঝি-চাকর সবাই ঘুমে অবশ, আমি চোরের মত গাড়ি বাঁধলাম। ছই পেতে খড়ের নরম গদীতে নরম বিছানা করে দিলাম। ছোটবাবু চোখ মুছে বললেন, তোমার সঙ্গে আমিও যেতাম, কিন্তু ঘরের পাশে শত্তুর—তাতে বড়ঘরের বড় নামডাক। ডাকাত পড়তে পারে। তুমি এসো, লখনা তো সঙ্গে রইল—ভয় নেই। ছোটগিন্নী কেমন হাসলেন মনে হল—সেটা চোখের ভুল হতে পারে।...

চুপ করতে দেখে বললাম, তারপর?

...তারপর তো গাড়ি চলেছে। তেজী মোষের গাড়ি। গ্রাম ছেড়ে মাঠে নামতে দেখি চাঁদের আলোয় ফুল ফুটছে। নাবাল মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছি—তখনও কোন কথা নেই কোন পক্ষে। নদীর বালিতে চাকার শনশন শব্দ উঠতেই ঠাকরান এতক্ষণে বললেন, এসে গেলাম নাকি? বললাম, হ্যাঁ গো। নদীই

বটে। চানটা করে নিন বরং। এখানেই গাড়ি রাখি। ওই তো থান দেখা যাচ্ছে—অশত্থ-বটের গাছ। দেখছেন?...গাড়ি রাখলাম। মোষদুটোকে চাকায় বাঁধলাম। জল দেখে জোরে টান দিচ্ছিল ওরা—পাচনের বাড়িতে ঠেকিয়ে রাখলাম। গিন্নী নেমে হনহন করে বালির চড়ায় হেঁটে দিব্যি জলে নেমে গেলেন।...জোসনা রাত্তির। হু হু করে হাওয়া বইছে। পাড়ের কাশবনে শনশন শব্দ হচ্ছে। কোথাও কোন মনিষ্যি নেই। জলে জোসনোর কাঁপন দেখছি। কাঁপন বাড়ছে।... আমার মাথায় কে শিরশির করে উঠে এল টিকটিকির মত। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলাম জলের দিকে। কী দেখলাম—কী যেন দেখলাম, দুধখরিসের মত সাদা, উঠন্ত বুকে, একেবারে...বাবুমশাই, ঘেন্না করছেন? আমি কুকুর-জন্ম নিতেই ঝাঁপ দিলাম জলে। ইচ্ছে করে, জেনেশুনে, ঝাঁপ দিলাম। দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলাম—তোমাকে অনেক, অনেক ছেলেপুলে দিতে পারি বউ-ঠাকরান, লজ্জা করো না, মনিষ্যির জন্মোর কোন লেখাজোখা নেই—হলেই হল যেথা-সেথা...আর বাবুমশাই, বিশ্বাস করুন, কোন কথা নাই মুখে, কোন বাধা না, যেমন কিনা বেনজ্জনের পিতিমা একখানা...

ঘৃণা? কে জানে কী! অবিশ্বাস? তাও হয়ত নয়। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, তারপর?

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অদ্ভুত হাসল কিছুক্ষণ। কালশিটে আর নুনজমেওঠা শরীরটা দুলল।

এক সময় বলল, মানত করা হয়নি। পাঁজাকোলা করে গাড়িতে চাপিয়ে দিয়েছিলাম ভেজা দেহখানা। সোজা পৌঁছে দিলাম বাড়িতে। বললাম, থানে বুঝি তরাস পেয়ে মুছো গেছেন। জলহাওয়া লাগাতে হবে।...তারপর এক ফাঁকে আমি কেটে পড়েছি। ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে সোজা বহরমপুর শহর। মাখনলালের আড়তে কুলীগিরি করত আমার জ্ঞাতি। তার সঙ্গে আমিও কুলীগিরি করি। মাস যায়, বছর যায়, পুলিশের ভয়ে রাতে ঘুম হয় না। কিন্তু কোন খবর নেই। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে দেখা হয়। তারা বলে, গাঁয়ের খবর সবই ভালো। তা হঠাৎ কেন কুলি খাটতে এলে হে লক্ষ্মণ? শুধু বলি, যার যা পোষায়।...বোঝা গেল, ঠাকরুন ব্যাপারটা লজ্জায় চেপে গেছেন। আহা, বড় লাজুক মানুষ! ইদিকে আমার দেহে কালসাপের বিষ ঢুকেছে। ছটফট করে মরি। মরে যেতেই চাই। মরা তো সহজ কথা নয় বাবুমশাই।

আচমকা একটা কাঁ-অ্যা-চ্ ঘড়াঙ্ ঘড় ঘড় বিকট শব্দ, পরক্ষণে গাড়িটা এক-দিকে কাত হয়ে গেল—পড়তে পড়তে এক-দিকের বাঁশ ধরে সামলে নিলাম। ডাইনের গরুটা ফাঁসি-লাগা হয়ে শূন্যে ঝুলতে লাগল। বাঁদিকের চাকাটা দেখলাম গড়াতে গড়াতে নয়ানজুলিতে গিয়ে পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই কান্ড। লাফ দিয়ে নামতে পায়ে ব্যথা পেলাম। গাড়োয়ান দেখি ডাইনের জোয়াল ধরে ঝুলেছে—বলদটার জিভ বেরিয়ে গেছে হাতখানেক। দৌড়ে কাছে গিয়ে জোয়ালটা নামাতে ওকে সাহায্য করলাম। অনেক কষ্টে বলদদুটোকে মুক্ত করা গেল এক সময়। তারা দিব্যি লেজ নাড়তে নাড়তে নয়ানজুলির দিকে নেমে শুকনো ঘাস চিবুতে লাগল। আমরা প্রচন্ড রোদে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে গাড়িটা দেখছিলাম।

বাকীটা জানবার কৌতূহল আমার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু ওই দুর্ঘটনার পর আর এ নিয়ে কথা তোলবার ইচ্ছে করেনি। অনুমান করে নেওয়া যায়—লোকটা তারপর শহর থেকে একদিন গাঁয়ে ফিরেছিল, হয়ত ছোট-বাবু মারা গিয়ে থাকবে—নয়ত লোকটা কোন একদিন আর স্থির থাকতে পারেনি। ওর প্রকৃতিতে অতিসাহসের প্রাবল্য সহজাত তো বটেই! হয়ত সে সেই জ্যোৎস্নারাতের অতর্কিত পাপের বনা আগাছায় ফুল ফুটেছে কিনা প্রতীক্ষা করে করে অধীর হয়ে উঠেছিল—তাই সবরকম ঝুঁকি নিয়েই ফিরে গিয়েছিল তার গ্রামে।

কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে, তার গাড়োয়ানী। কেন এই পেশা সে বেছে নিল? আমি কি কল্পনা করতে পারি যে, চৌধুরীবাড়ির গিন্নীঠাকরানটিও তার মতই সে নিশীথ-জ্যোৎস্নার অতর্কিত পাপটার মোহে পড়ে গিয়েছিল? হয়ত সেও প্রতীক্ষা করছিল রাতের পর রাত—ফের জ্যোৎস্নার রহস্যময় পথে তারপর থেকে যেখানে মানত দিতে ইচ্ছে করেছে তার, সে-খানের আত্মা স্বয়ং পাপ?

সবই সম্ভব পৃথিবীতে। আর মানুষের জন্ম? লোকটাই জবাব দিয়েছে 'তার তো কোন লেখাজোখা নাই—হলেই হল যেথা-সেথা'। তা না হলে ওর মুখটা কেনই বা আমার অত চেনা মনে হবে? লক্ষ্মণ যেমন মানুষ, আমার বন্ধু নন্দও মানুষ। বায়োলজির কোন হেরফের তো নেই।

...সেদিন আমায় বাকি পথটা হেঁটে যেতে হয়েছিল। প্রথমে গিয়েই কিন্তু আমি নন্দকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলাম। নন্দ বলেছিল, কী দেখছ এত?

বলেছিলাম, তোমায় যেন নতুন করে দেখছি।

শুনে নন্দ হেসে খুন।...আরে, তুমি কি হোমোসেকসুয়াল নাকি?

দুজনেই হাসছিলাম অবশ্য। তারপর কিসে এলাম জেনে সে বলল, লক্ষ্মণের গাড়িতে? সর্বনাশ! যাকে বলে আস্ত পাগল একটা। আরে, লোকটা ছেলেবেলায় আমায় কী জ্বালাতনই না করত। একবার নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল—বাবা খবর পেয়ে উদ্ধার করেন। একবার ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল। মার খেয়ে ওর মগজটাই বিগড়ে গেছে। সেদিনের কান্ড শোন। বিলে নন্দুকের নলটা সবে তুলেছি, কোত্থেকে সামনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর গালমন্দ খেয়ে সে কী কান্না! বলে, খোকাবাবু আমায় মেরে ফেলো। পাগল!...

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শরৎ কাল। আকাশ মেঘহীন। বিত্ত-বিহীন মেঘপুঞ্জ ইতস্তত বিচরণশীল, খানিকটা উদভ্রান্ত ভঙ্গী। ধারাবর্ষণ বেগ বিরাহিত হয়ে সে আজ রিক্ত। আকাশের গায়ে সোনা-ঝরা রঙ — সুতরাং কি যেন পরাণ কি যে চায়। বসন্তকাল নিয়ে বাঙালীর তেমন মাতামাতি নেই যেমনটি হয় শরৎ কাল আর সেই সঙ্গে বিজড়িত শারদোৎসব নিয়ে।

শ্রীশ্রীদুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করে মহোৎসব। আগে বাঙালীর ঘরে অন্ন ছিল, শান্তি ছিল। নিরুদ্বিগ্ন সমাজে দুর্গা-পুজো ধনীর ঘরে অনুষ্ঠিত হত দরিদ্র সেখানে অবহেলিত নয়, যথাযোগ্য সমাদরে সমাদৃত হত। দীয়তাং ভুজ্যতাং দুর্গোৎ-সবের ব্যাপারে যেমনটি হত তেমন বোধ করি বাঙালীর আর কোনো উৎসবে হত না।

প্রবাসী ঘরে ফিরতেন, সঙ্গে আনতেন ছোটদের জন্য লাল শালু বা সাটিনের জামা, রঙচঙে জুতো, বড়দের জন্য প্রণামী হিসাবে কোরা লাল পাড় শাড়ি আর ধুতি নরুণ পাড়, তখনকার দিনের মানুষ তাতেই সন্তুষ্ট। মিষ্টি খাবার ছিল নারকেল নাড়ু, নারকেল সন্দেশ, বড়জোর রসকরা বা ছাবা। এখন অনেক চাহিদা, পুজোয় চাই নতুন জুতো, টেরিলিন-টেরিকট আরো কতকি।—সব নাম আবার সঠিক জানা নেই। সেই সঙ্গে খাবার-দাবার হরেক রকম, তার একটি নাম 'প্রাণহরা'—যা দাম তা নামেরই উপযুক্ত।

তখন ঘরে ঘরে পুজো হত ঘট স্থাপনা করে, ধনীদের বাড়ি প্রতিমা আসত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ধনী সওদাগর-বৃন্দ পুজোর জাঁক-জমক বাড়ালেন। মদ আর মেয়েমানুষের ছড়াছড়ি, সায়েব-সুবোদের নেমন্তন্ন করে খানা-পিনায় উৎকট উল্লাস।

হুতোম লিখেছেন—

'এ শহরে আজকাল দু'-চারজন এজু-কেটেড ইয়ং বেঙ্গলও পৌত্তলিকতার দাস হয়ে পুজো-আচ্ছা করে থাকেন; ব্রাহ্মণ-ভোজনের বদলে কতকগুলি দিল দোস্ত মদে ভাতে প্রসাদ পান। আলাপি ফিমেল ফ্রেণ্ডরাও নিমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। পুজোরো কিছু রিফাইণ্ড কেতা। কারণ অপর হিন্দুদের বাড়ির প্রণামী টাকা পুরোহিত ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য; কিন্তু এঁদের বাড়ির প্রণামীর টাকা বাবুর ব্যাঙ্কে জমা হয়। প্রতিমের সামনে চর্বির বাতি জ্বলে ও পুজোর দালানে জুতো নিয়ে ওঠবার এলাওয়েন্স থাকে।'

হুতোম সেকালের দুর্গা পুজোর অনেক সংবাদ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমরা ইতিপূর্বে তার কিছু কিছু 'অমৃত' পাঠকদের কাছে পরিবেশন করেছি।

শ্রীরামপুরের দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় 'অনুসন্ধান' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন; দুর্গাদাস লাহিড়ীকৃত 'পৃথিবীর ইতিহাস' বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। লাহিড়ী মহাশয়ের পত্রিকায় আশ্বিন ১২৯৭ তারিখে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গোৎসব' নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই নিবন্ধ থেকে একটি চিত্র উদ্ধৃত করা হল—

'কালের মাহাত্ম্য তাই হইছে এবার।
ঊনবিংশ শতাব্দীর পুজো চমৎকার।
বৈদিকতন্ত্রের মতে পুজোর বিধান।
চূড়োমণি, শিরোমণি সবার বিধান॥
মদ দিয়া পুজো হয় 'ডাম' গঙ্গাজলে
মদের হইছে ভোগ মদের বোতলে।
মদের অঞ্জলি আর মদে আচমন।
প্রাণ প্রতিষ্ঠায় মদ মদনমোহন
আহা কিবা অপরূপ মদের মহিমা
বহিছে মদের নদী নাহি কূল সীমা॥'

এখনও প্রায় ঐ একই অবস্থা। যাঁদের এই বিষয়ে সংশয় আছে তাঁরা পুজোর কদিন পাড়ার 'বিলাতী' মদের দোকানগুলির সামনে যে লাইন দাঁড়ায় তা দেখে আসবেন।

অমৃতলাল বসু মহাশয় সেকালের দুর্গোৎসব বিষয়ে অনেক মজাদার ছড়া এবং প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্ভবত অমৃতলাল বসু মহাশয়ই শেষ লেখক যাঁর রচনায় সম-সাময়িক কালের চিত্র পাওয়া যায়। সেই-কালে প্রতি বছর চৈত্র মাসে যে 'জেলেপাড়ার সঙ' বের হত, তার সমস্ত ছড়া গান ছিল রসরাজের রচনা। রসরাজের এইসব রচনায় সমসাময়িককালের রাজনীতি এবং সামাজিক ঘটনার উল্লেখ থাকত।

রসরাজ একটি সুন্দর ছড়ায় পুজোর সময় কার কি আবদার তার এক ফর্দিক দিয়েছেন। যার যেমন বয়স, তার তেমন রুচি। বালিকা আর যুবতীদের চাহিদাই

অতি-সুকঠিন। তাদের মনোরঞ্জন করা কঠিন। অমৃতলাল লিখছেন—

'কুসুম কলিকা যত বালিকার দল।
ফুলেনা ফেরক (ফ্রক) তরে হয়েছে পাগল।
মৌন মুখে মিষ্ট হাসি লাজে সরে যায়
ফোটা ফোটা কলিগুলি বুকে বডি চায়।
যৌবন তুফান অঙ্গে নয়নে অনংগ,
হেসে হেসে পতিপাশে ষোড়শীর রংগ।।'

রসরাজের আবার খেদ উক্তিও আছে। তিনি 'বংগের আর এক রংগ' নামক কবিতায় বলেছেন—

'রাঘব বিজয় স্মরি, দুর্গার প্রতিমা গ'ড়ে
প্রচণ্ডা চণ্ডীর স্তব নাকি করে পাঠ।
বিজয়া দশমী পর্বে, মল্লদল আনি গর্বে,
লাঠি-অসি-খেলা লয়ে নাহি রণনাট।।
ধরেছে নূতন বাই, বীরত্ব উৎসব চাই,
যারে পাই তারে ধরে' নাচি কাছা খুলে
আর্যের আদর্শ উচ্চ, এখন করেছি তুচ্ছ
পুজিনা শ্রীরামে আর চন্দনে কি ফুলে।
সাহেবে করিবে ঠাট্টা—এ ভয় মনে।।'

রসরাজের এই কবিতায় জানা যায় সেকালে বিজয়া দশমীর দিন মল্লদের আমন্ত্রণ করে আনা হত এবং লাঠি-অসি খেলা নিয়ে শৌর্যের পরিচয় দেওয়া হত।

শরৎ কালে দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে একটা দীর্ঘ ছুটির ব্যবস্থা অনেক দিনের প্রথা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের ব্যবস্থা। ১৯৪৬ পর্যন্ত সরকারি ছুটির বাৎসরিক হিসাবে দেখা গেছে সম্পূর্ণ বন্ধ এবং আধা-বন্ধ ছুটির দিন ছিল মোট ৪০ দিন। স্বাধীন আমলে সেই ছুটি কমে-কমে এখন দাঁড়িয়েছে বছরে ষোলো দিন। মা দুর্গার বরাতে মাত্র ৪ দিন।

অথচ একদা এই ছুটি নিয়ে ভীষণ আন্দোলন হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় যে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় তার নাম—

"The Goddess vs The Chamber of Commerce".

চেম্বার অব কমার্সের সুপারিশে ৪ঠা অকটোবর তারিখে ভারত সরকারের একটি নির্দেশে দুর্গাপুজার ছুটি মাত্র চারদিন দেওয়া হবে স্থির হয়। সরকার হুকুম দিলেন আগামী ১৮৮০ থেকে এই আদেশ বলবৎ হবে। অমৃতবাজার লিখলেন—

"Against the great Goddess the object of devout veneration of the Hindoos, the source from which, according to them, springs all prosperity and happiness, the Chamber of Commerce had a charge to make. The great Goddess took up twelve days of the year of Her Majesty's subjects for her worship. In short, she disturbed trade; and as **trade is the God which the Chamber of Commerce worships,** here was a clear case between two Gods, one worshipped by the Hindoos and the other by the Christians. The matter was referred to the Govt. of India for decision" (Amrita Bazar Patrika —20th November 1879).

পত্রিকার এই মন্তব্যটুকুর মধ্যে যথেষ্ট রস এবং জোর আছে। বলা বাহুল্য সেদিনের আন্দোলন সফল হয়েছিল—লর্ড লিটন এই 'ইনজাসটিসে'র বিচার করে একটা সুমীমাংসা করেন মূলতঃ পত্রিকার আরো কয়েকটি মন্তব্যের জোরে।

সেই কালে পত্রিকাদিতে দুর্গাপুজোর সময় নানা প্রকার চটকদার রচনা প্রকাশিত হত, তিরিশের দশকেও অজস্র সাময়িকপত্রের শারদীয়া সংখ্যায় অংগ ছিল ব্যঙ্গ রচনা। এই সব রচনার অধিকাংশ কার্টুন-শোভিত। পরশুরামের গল্পগুলিও একদা শারদীয় সংখ্যার অঙ্গ ছিল।

সেই সময় দৈনিক পত্রাদিতেও নানা রকম রঙ-তামাসা প্রকাশিত হত। সত্যেন্দ্র-নাথ মজুমদার মহাশয় অতি চমৎকার ব্যংগ রচনা লিখতে পারতেন। এই ধরণটি অবশ্য ছিল পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিজস্ব। সত্যেন্দ্রনাথ 'নন্দীভৃংগী' এই ছদ্মনামে এই সব রচনা লিখতেন। ১৯৩২-এর ৬ই অকটোবর তারিখে লেখা 'পূজার সন্দেশ' নামক নিবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত করা হল—

'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে এবার সার্বজনীন দুর্গাপূজার ধূম। স্বয়ং সত্ত্বাধিকারী খোকাবাবু তন্ত্রধারক, এবং শ্রীযুক্ত রসিকলাল পুরোহিত। অস্পৃশ্যতা বর্জনের আনন্দে দাদা কালোশশী ঢাক ঘাড়ে করিয়াছেন। সত্যেনবাবু, সরোজবাবু প্রভৃতি সাহিত্যরথীরা বাজনদার হইয়া-ছেন। ডোমপাড়ার ঠাকুরেরা ভোগ রাঁধিবার ভার লইয়াছেন। শুনিলাম ভট্টপল্লীর আদর্শ ব্রাহ্মণ শ্রীল শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় এই সংবাদে বেসমাল হইয়া অভিশাপ দিতেছেন। কিন্তু নবযুগের নতুন ভাব-স্রোতে বসুমতী সাহিত্য মন্দির উতরোল।'

এই প্যারাগ্রাফে উল্লিখিত খোকাবাবু সতীশ মুখোপাধ্যায়ের ডাক-নাম। দাদা কালোশশী — বসুমতীর সম্পাদক শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, রসিকলাল— ম্যানেজার। 'সত্যেনবাবু - সরোজবাবু'- সত্যেন্দ্রকুমার বসু মাসিক বসুমতীর অন্যতম সম্পাদক, গল্পলেখক, সরোজনাথ ঘোষ গল্পলেখক এবং মাসিক বসুমতীর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, পঞ্চানন তর্করত্ন প্রখ্যাত আচারনিষ্ঠ সনাতনী ব্রাহ্মণ। এই রসিকতার হেতু এই যে, সেকালে বসুমতী গোঁড়া গান্ধীপন্থী ছিলেন। ছুৎমার্গ পরিহার করা নীতি ছিল। এই সময়ে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বসুমতীর সংগে যুক্ত ছিলেন না।

পুরাতন মাত্রেই যে উত্তম সেকথা বলা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে পুরাতনের স্মৃতি যাঁরা প্রবীণ তাঁদের হয়ত ভালো লাগতে পারে আর পুরাতন যুগের মানুষও যে হুল্লোড় ও হুজুগে আনন্দ পেতেন নবীন যুগের মানুষের কাছে তার সামান্য পরিচয় দান।

দুর্গাপূজা বাঙালীর রক্তের সংগে মিশে গেছে—এই উৎসবকে তাই জাতীয় উৎসব বলা হয়ত অসংগত হবে না।

—অভয়ঙ্কর

সাহিত্যের খবর

প্রখ্যাত হিন্দি কবি, ঔপন্যাসিক শ্রীসচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়ন সম্প্রতি বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমেরিকা রওনা হয়ে যান। এত-দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন হিন্দি সাপ্তাহিক 'দিনমানে'র সম্পাদক। অমৃতে তাঁর সংগে একটি সাক্ষাৎকারের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। যাবার পাঁচ দিন আগে তিনি দিল্লির 'ত্রিবেণী কলা সংগম' ভবনে কবিতা বিষয়ক একটি আলোচনা সভায় যোগ দেন। ঐ সভায় তিনি কবিতা বিষয়ে যে ভাষণ দেন তা বিভিন্ন কারণে সহৃদয়-মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সভায় তিনি বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত কবিতার গতি-প্রকৃতির উপর আলোকপাত করেন। কবিতা সম্বন্ধে তিনি বলেন — 'কবিতা হল সর্বাধিক সংবেদনশীল কলারূপ। কিন্তু এর প্রকাশ ঘটে শব্দের বন্ধনে। আর শব্দ প্রতি মুহূর্ত আমাদের অভিব্যক্তি এবং বিচারের আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। তাই কবিতায় শব্দের প্রয়োগ একটি অন্যতম প্রধান বিষয়।' কবিতা প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন—'বেদে কবিতা ছিল মন্ত্রোচ্চারণ। তখন কবিতার যে শুদ্ধ রূপ ছিল, পরবর্তীকালে তা লোপ পায়। তখন সংগীত এসে কবিতার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।' আলোচনা প্রসংগে তিনি আরো জানান যে, পড়ার কবিতা আর শোনার কবিতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বেশ তফাৎ। কবিতা যখন শোনার বিষয় হয়ে যায়, তখন তার কাব্যমূল্য স্তিমিত হয়ে পড়ে। পাঠ্য কাব্যই কবিতাকে শিল্প মহিমায় মহিমমণ্ডিত করতে পারে'। তিনি আরো বলেন—'কবিতার ভাষাই কবি ও পাঠকের মধ্যে সম্পর্ককে নবীনতর করে। আজকের কবিতায় যে নতুন বাক্-প্রতিমা লক্ষ্য করা যায়, তার কারণ কবিরা আজ এক নতুন জগতে এসে উপনীত হয়েছেন।'

বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার জন্য জগদানন্দ রায়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে বাংলা সাহিত্যে। বর্তমান বছরেই তাঁর জন্ম-শতবর্ষ। গত ২০ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীতে তাঁর জন্ম-শতবর্ষের শুভ সূচনা উপলক্ষে একটি সাহিত্য-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে জগদানন্দ প্রদর্শনী, ছোটদের প্রাচীর পত্রিকা 'অধুর' এর জগদানন্দ সংখ্যার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন ডঃ অমিয়-কুমার সেন। এই প্রদর্শনীতে জগদানন্দ রায়ের যাবতীয় গ্রন্থ, সম্পর্কিত গ্রন্থ, জীবন ও সাহিত্যকর্ম-বিষয়ক পোস্টার ও প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়। এই একই দিন

রায়পাড়াস্থ তাঁর জন্মভিটায় স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডঃ অমিয়কুমার সেন।

মধ্য-ত্রিরিশে আমেরিকার সাহিত্যে জ্যাসন স্যামস ঔপন্যাসিক হিসেবে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। সম্প্রতি তাঁকে নায়ক করে একটি উপন্যাস লিখেছেন আইভান গোল্ড। জ্যাসনের ব্যক্তি-জীবনের প্রেম কাহিনীকেই লেখক এখানে চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। জ্যাসন এখানে নিজেই নিজের কাহিনী বলছেন। ক্রিস্টি ম্যারিফিল্ড নামক এক তরুণী চিত্র-শিল্পীর প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। দশ মাস এই তরুণীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কাহিনী যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা প্রধানত কৌতূহলোদ্দীপক হলেও, শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে একটা বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে দেয়। ক্রিস্টার চরিত্রটিও অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে। জ্যাসনের সঙ্গে ক্রিস্টার সম্পর্ক এমন নিবিড় হয়ে গিয়েছিল যে, একের সঙ্গে অপরের খুব একটা পার্থক্য তারা করত না। একই সঙ্গে তারা ঘুমোতো, একে অন্যের ডাইরী খুলে অনায়াসেই লক্ষ্য করত। উপন্যাসটি পাঠক মহলে খুবই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

আলেবেনিয়ার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে পরিচয় আমাদের থাকলেও তার শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় একেবারেই নেই। অথচ ইউরোপীয় সাহিত্যে অ্যাল-বেনিয়ার অবদান অনুল্লেখ্য নয়। 'অ্যাল-বেনিয়ার সাহিত্যের ইতিহাস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন কে বিহিকু। আলবেনিয়ার সাহিত্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থের এক জায়গায় বলা হয়েছে—'প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আলবেনিয়ার মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা স্বাধীনতা, স্বক্ষেত্রে এবং বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছেন। যদিও আলবেনিয়ার জনসাধারণের জীবন এই সংগ্রামেই অতি-বাহিত হয়েছে, তবু সুদীর্ঘ শতাব্দী পরি-ক্রমায় তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।' আলবেনিয়ার সাহিত্য এই সংস্কৃতিরই প্রতিরূপ। আধুনিক কালে এই সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সম্প্রতি মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ডঃ কৃষ্ণ শ্রীনিবাস সম্পাদিত 'পোয়েট' পত্রিকায় আলবেনিয়ার বেশ কয়েকটি সুনির্বাচিত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। যাঁদের কবিতা অনূদিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন নেজিম ফ্রাকুলি (১৭৬০—?), জুল ভারিবোবা (১৭৬২—?), পাশকো ভাসো (১৮২৫—১৮৯২), নেইম ফ্রাশেরি (১৮৪৬—১৯০০), জি মিহাইল গ্রামেনো (১৮৭২—১৯৩১), এইচ আস দেণী (১৮৭২—১৯৪৭) এবং অতি-আধুনিক কালের বল জাকোভা, ইসমাইল কাদারে, এ সেসি প্রমুখ।

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বিদেশে যে সম্প্রতি কিছুটা আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মধ্যেও আবার পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই আগ্রহ বেশী। পূর্ব জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, প্রাকৃত ভাষাসহ আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি পড়ান হয়। এ ছাড়াও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধেও পড়ান হয়ে থাকে। ডঃ রুবেন পাঁচ খণ্ডে 'দি সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অব ইণ্ডিয়া' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। লিপজ্যাগে প্রখ্যাত বৌদ্ধতত্ত্ববিদ ওয়েলার গবেষণা করে চলে-ছেন। প্রাচীন ভারতীয় ভাষার উপর এই গবেষণার কথা আমাদের একেবারে অজানা ছিল না। কিন্তু জানা ছিল না তেমন স্পষ্টভাবে যে আধুনিক ভারতীয় ভাষা নিয়েও ইদানীং বেশ গবেষণা চলছে। যে সমস্ত ভাষা সম্বন্ধে আগ্রহ খুব বেশি, সেগুলি হল বাঙলা, হিন্দি, তামিল ও উর্দু। এই সমস্ত ভাষা পড়াবার বেশ কটি গ্রন্থও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লিপজিগ থেকে এম হলসিগ প্রকাশ করে-ছেন 'গ্রামার গাইড টু হিন্দি'। বার্লিনে এইচ এনটন তামিল কবি সুব্রহ্মণীয় ভারতীর উপর গবেষণা করছেন। আই জহরা বার্লিনে গবেষণা করছেন হিন্দি কবিতার উপর। ভারতীয় গল্পের একটি জর্মান ভাষায় অনূদিত সংকলন সম্পাদন করেছেন ডবলিউ রুবেন। বাঙলা সাহিত্যের অনুবাদ বা গবেষণার কোন খবর আমাদের জানা নেই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদ অনেকদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনাবলী (প্রবন্ধ - সঙ্কলন)। শ্রী অ র বি ন্দ সোসাইটি, কলকাতা ঃ পণ্ডিচেরী—২০।

শ্রীঅরবিন্দ যখন পাকা সাহেব হয়ে বিলাত থেকে দেশে ফিরে বরোদার মহা-রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন (১৮৯৩ খৃঃ) তখন তিনি বাংলায় লিখতে, পড়তে, এমন কি ভাল করে কথাবার্তা পর্যন্ত বলতে পারতেন না। বরোদায় অবস্থান কালেই তিনি বাংলা ভাষার চর্চা শুরু করেন। এই প্রচেষ্টার প্রথম ফল হল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী এবং ক্রমে চন্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রমুখ প্রাচীন কবিদের রচনার ইংরাজী অনুবাদ। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা পত্রাবলীতে। তাঁর সর্বশেষ বাংলা রচনা হল, পণ্ডিচেরীর কয়েকজন সাধিকাকে লেখা চিঠিপত্র। পণ্ডি-চেরী-যাত্রার আগে তাঁর অধিকাংশ বাংলা রচনা প্রকাশিত হয়েছিল ধর্ম পত্রিকায়। পণ্ডিচেরীতে তিনি বাংলা ভাষায় ঋগ্-বেদের কিছু অনুবাদ এবং টীকা লিখে-ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনা সবই প্রবন্ধাকারে। ব্যতিক্রম শুধু 'স্বপ্ন' এবং 'ক্ষমার আদর্শ' নামক দুটি কাহিনী এবং কারা-কাহিনী নামে অপর একটি রচনায় আলিপুরের মামলার আসামীরূপে কারাবাসের দিনগুলির বর্ণনা।

শ্রীঅরবিন্দের বাংলা রচনাবলীর বিষয় এবং উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুসারে কোথাও সংস্কৃত-ঘেঁষা, কোথাও বা সহজ, সরল, কথ্য ভাষায় লেখা। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, গীতা, ধর্ম ও জাতীয়তা ইত্যাদি বিষয়ের উপরে লিখিত প্রবন্ধগুলির ভাষা বিষয়ের গভীরতা অনুসারে সংস্কৃত-ঘেঁষা। আবার কারা কাহিনীর মত রচনা সহজ, সরল, কথ্য ভাষায় লেখা।

প্রধানত ধর্ম-পত্রিকায় লিখিত বাংলা রচনাগুলিকে বিষয় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত করে বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশ করা হয়েছে। অধিকাংশ রচনাতেই সুগভীর দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ। ভাষা ও ভাবের বাহন-রূপে দৃঢ়-সম্বদ্ধ, কিন্তু কোথাও জটিলতা অথবা অস্পষ্টতা নেই: সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল প্রতিটি রচনা।

স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিতে আশ্চর্য সংযম লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি চিঠিতে স্ত্রীকে আপন সাধন-পথে সহধর্মিণীরূপে লাভ করার তীব্র বাসনা পরিস্ফুট, কিন্তু সেই বাসনায় কোন অসংযম নেই।

'কারা-কাহিনী' রচনাটি অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরনের, যদিও সমগ্র রচনাটি পড়লে

শ্রীঅরবিন্দের চেতনার গভীরে এক নতুন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্মলগ্নকে প্রত্যক্ষ করা যায়। নির্জন কারাবাসের দিনগুলিতে শ্রীঅরবিন্দের মানস-জগতে যে রূপান্তর ঘটেছিল— উত্তম পুরুষে লিখিত এই কারা-কাহিনীতে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সাবলীল ভাষায়।

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলা রচনাবলীর এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করে অবশ্যই ধন্যবাদার্হ হবেন। গ্রন্থটিতে একটি ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল। প্রবন্ধগুলির রচনা-কালের কোন উল্লেখ নেই।

প্রকাশকের স্বীকৃতি অনুসারে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। দামের উল্লেখ নেই।

শারদ সংকলন

কিশোরভারতী ১৩৭৬—সম্পাদকঃ দীনেশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন। কলকাতা—৯। দাম—পাঁচ টাকা।

কিশোরভারতী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ থেকেই এর বৈশিষ্ট্য এবং স্বতন্ত্র পরিচ্ছন্ন-রুচিবোধ গুণীজনের প্রশংসিত। আমরা এই পত্রিকাটির শুভকামনা করেছিলাম। মাত্র এক বছরেই কিশোরভারতী কেবল কিশোরদের মনেই শুধু নয়, সমস্ত শ্রেণীর পাঠকের সমাদর লাভ করেছে। এবারের সুবৃহৎ শারদ সংকলনটি বৈচিত্র্যময় রচনা সমাবেশ, অঙ্গসজ্জা এবং মুদ্রণ পারিপাট্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠের দাবী করতে পারে। খ্যাত অখ্যাত লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ এত বড় সংগ্রহ খুব কমই দেখা যায়। এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ চারখানি উপন্যাস, চোদ্দটি উপন্যাসের মত বড় গল্প, ঘনাদার উপন্যাসোপম বড় গল্প। চন্দ্র জয়ের পথে, রোমাঞ্চকর কাহিনী, নানা রসের গল্প, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কাহিনী, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজিৎ বসু, অদ্রীশ বর্ধন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, রেবতীভূষণ ঘোষ, শক্তিপদ রাজগুরু, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, বীরু চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র দত্ত, আশা দেবী, নির্মলেন্দু গৌতম, দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষীরোদ চট্টোপাধ্যায়, শৈলপ্রসাদ হালদার এবং আরো অনেকে লিখেছেন।

অভিনয় দর্পণ (শারদীয়) প্রধান সম্পাদক ঃ ঋত্বিককুমার ঘটক। রোজিনা প্রেস। ১৩১ হরিশ মুখার্জি রোড। কলকাতা—২৬। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

অভিনয় দর্পণ সৌখীন নাট্যগোষ্ঠী এবং নাট্যামোদীদের অতি প্রয়োজনীয় পত্রিকা। মাত্র দুবছরেই পত্রিকাটির সুনাম এবং প্রতিষ্ঠা লক্ষণীয়। এবছরের শারদীয় সংখ্যায় বিভিন্ন রস ভাবপূর্ণ পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখেছেন বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, শ্যামল ঘোষ, সুধাংশু দাশগুপ্ত এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পাঁচটি একাঙ্ক লিখেছেন মন্মথ রায়, বিমল গুপ্ত, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, ঋত্বিককুমার ঘটক এবং তপন রায়। পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'অভিনয় এবং মধ্যবিত্ত জীবন' নিবন্ধটি বক্তব্যপূর্ণ। আর লিখেছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনকুমার ঘোষ এবং গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

অর্ণি ঃ সম্পাদক—অরবিন্দ ঘোষ, দাম—দেড় টাকা।

মূলত গল্প আর কবিতার কাগজ হলেও দুটি দুয়েক আলোচনাও ঠাঁই পেয়েছে এ সংকলনে। জয়ন্ত ভট্টাচার্যের 'চলচ্চিত্র দর্শন' আলোচনাটি ঠিক কোন্ উদ্দেশে প্রকাশিত বোঝা গেল না। কমল চৌধুরীর 'তত্ত্ববোধিনী এবং অক্ষয়কুমার' প্রবন্ধটি কিছু নতুন চিন্তা ও তথ্যের খোরাক দিলেও আলোচ্য সংকলনে নিতান্তই প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। তবে কয়েকটি ভালো গল্প এবং কবিতাও রয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মানব সান্যাল, রমেন্দ্র রায়, দুলেন্দ্র ভৌমিক, তপন দাশ, রবীন সুর, প্রদোষ দত্ত, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, দীপা সেন বিশেষ উল্লেখ্য।

নতুন থিয়েটার (সংকলন)—সম্পাদক ঃ চির-রঞ্জন দাস। ৬৮।৪ যোগীপাড়া রোড। কলকাতা—২৮। দাম—তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নতুন থিয়েটারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর সুলিখিত প্রবন্ধ। নাটকের বিভিন্ন প্রসঙ্গে লিখেছেন নেপাল মজুমদার, দুলাল চৌধুরী, মানবেন্দ্র গোস্বামী, হেমাংগ বিশ্বাস, অরিন্দম সান্যাল এবং অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। চারটি নাটক লিখেছেন দীপু ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক গঙ্গোপাধ্যায়, রজসুন্দর দাস, এবং চিররঞ্জন দাস। বৃটিশ, জার্মান, সোভিয়েত, ভিয়েতনামী এবং আমেরিকান নাটক নিয়ে লিখেছেন জীবন চক্রবর্তী, অশোক সেন, অরুন্ধতী দাশ-গুপ্তা, ভাস্কর দাস এবং প্রদীপ সেন। বেশ কয়েকটি ছবি সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঃ সম্পাদক—সঞ্জীব-কুমার বসু, দাম—তিন টাকা।

ঝকঝকে ছাপা আর রং-চঙ্গে প্রচ্ছদে সাজানো মোটা সাইজের এই শারদ সংখ্যাটি এক ঝলকেই পাঠকের চোখে ধরবে। আলোচনাগুলির শিরোনাম আর লেখকদের তালিকা দেখলেও বেশ মূল্যবান বলেই মনে হবে এই সংকলনটি। সত্যি কথা বলতে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, সনৎকুমার মিত্র ও নন্দগোপাল সেনগুপ্তের আকর্ষণীয় প্রবন্ধগুলি ছাড়া প্রায় সব আলোচনাই বিতর্কিত এবং খণ্ডিত। এর মধ্যে আবার উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের রচনাটি পক্ষপাতহীন হতে পারেনি। সম্পাদক মশাই এসব ব্যাপারে একটু বিশেষ নজর দিলে পত্রিকাটির মান বাড়ত বই কমত না।

কথাসাহিত্য—সম্পাদক ঃ গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ। মিত্র ও ঘোষ। ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা—১২। দাম— সাড়ে তিন টাকা।

কথাসাহিত্যের এই বিপুলায়তন সংখ্যাটি রচনা বৈচিত্র্যে সহজেই মনকে আকৃষ্ট করবে। দুটি সুদীর্ঘ উপন্যাস লিখেছেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং নীহাররঞ্জন গুপ্ত। গল্প লিখেছেন কালিদাস রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, লীলা মজুমদার, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, বাণী রায়, শংকু মহারাজ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, জরাসন্ধ, নলিনীকান্ত সরকার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী এবং বিমল মিত্র। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ও ভ্রমণ কাহিনীকার উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ ভ্রমণ কাহিনী 'কিন্নর দেশে' বর্তমান সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বনফুল, দ্বিজরাম দাস, নিশিকান্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নীলকণ্ঠ পারিজা, শিবদাস চক্রবর্তী, কৃষ্ণা দে, সুনীলকুমার লাহিড়ী, প্রভাকর মাঝি, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, উমা দেবী, উমা দে শীল, অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়, মনোজিৎ বসু, অনিলেন্দু চক্রবর্তী, মায়া বসু, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি এবং হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন কবিতা। প্রখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটি চিঠি এই সংখ্যার একটি মূল্যবান সম্পদ।

আলোক সরণি ঃ সম্পাদক সঞ্জীব সরকার, দাম—দেড় টাকা।

গল্প কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস নাটক থেকে সুরু করে সাহিত্যের সব রকম চাটনিই পরিবেশিত হয়েছে আলোচ্য সংকলনে। কিন্তু চোখে পড়বার মতো লেখার সংখ্যা নেহাতই কম। তবে অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আশাপূর্ণা দেবী, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায় আর প্রিয়রঞ্জন মৈত্রের লেখাগুলি আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

আম খেয়ালী—সম্পাদক ঃ রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। ১১।এ গোকুল মিত্র লেন। কলকাতা—৫। দাম—দেড় টাকা।

এই সংখ্যায় যাঁদের লেখা আছে। ঋষি অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী, প্রমথনাথ বিশী, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের।

নাটকের বই : পাঠক, চাহিদা ও সাহিত্যমূল্য

সাহিত্যের উৎসব শুরু হয়ে গেছে। সামনেই দুর্গাপুজো। তারপর লক্ষ্মীপুজো, দেয়ালী। মোটামুটি নাটকের মরশুমও এটাই। পুরো এক মাস ধরে আনন্দোৎসব হবে। বারোয়ারী ব্যবস্থা। দুর্গাপুজোর বাড়তি চাঁদা দিয়ে হবে জলসা, বিচিত্রা সম্মেলন। আর, সাংস্কৃতিক উৎসবের সঙ্গে থাকবে পূর্ণাঙ্গ কিম্বা একাঙ্ক নাটক।

খোঁজ-খবর নিচ্ছিলাম কলেজ স্ট্রীটের বিভিন্ন দোকানে, কি বই বেরোল এবার যাত্রা কিম্বা থিয়েটারের?

'আধুনিক'-এর ঘরে বসেছিলেন জনৈক প্রকাশক, মদন দত্ত। বললেন, বেরোচ্ছে অনেক। সবে তো মরশুম শুরু। আমাদের কাছে পুরো তালিকা পাবেন না। পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরে দেখুন। দেয়ালে-দেয়ালে নিশ্চয়ই পোস্টার পড়েছে, কোথায় কি বই হবে। অনেক নতুন নাটকের নাম পাবেন। নাট্যকারেরও। প্রতি বছরই দু-দশজন নাট্যকার আসছেন। অবশ্য বিদায়ের হারও কম নয়। তবে নাটক চলছে, চলবে।

ভদ্রলোকের কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম, বলুন, নাটকের বই কখন বেশী বিক্রী হয়?

—পুজোর সময়। মোটামুটি ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক মাসে। তারপর, দু-তিন মাস কিছুটা মন্দা। দ্বিতীয় মরশুম শুরু হবে মাঘ মাসে। চলবে চৈত্র অবধি। অতি-বর্ষা কিম্বা অতি-গরমে নাটক ভালো জমে না। নাটক ও নাট্যকারদের পক্ষে তখন সত্যিকারের দুঃসময়।

নাটকের সমস্যা কিম্বা নাটকীয় সংকট সম্পর্কে আমার ধারণা অকিঞ্চিৎকর। সত্যি কথা বলতে কি, সারা জীবনে আমি খান কুড়ি-পঁচিশ বাংলা নাটকের বই সিরিয়াসলি পড়েছি কিনা সন্দেহ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদারুণ চাপে মাইকেল, গিরীশ ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দীনবন্ধুর নাটক পড়েছিলাম বাধ্য হয়ে। আনন্দ পেয়েছি কিছু কিছু নাটক পড়ে তা সবিনয়েই স্বীকার করব। আর পড়েছি রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সে অন্য ব্যাপার।

একদিন জনৈক তরুণ সাহিত্যিককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাংলা নাটকের কি কোনো পাঠক নেই?

ভদ্রলোক মাঝে মাঝে নাটক-টাটক নিয়ে ভাবেন। তাঁর ঘরে আরেকজন তরুণ বাউণ্ডুলে সাহিত্যিক থাকেন। সে ভদ্রলোকও নাটক-পাগলা। বললেন, মানুষ বই পড়ে কিছুটা সাহিত্যমূল্য থাকলে। আজকের নাটকে সে বস্তুটির নিদারুণ টানাটানি। অনেক অগ্রজ লেখক থেকে হালের লেখক পর্যন্ত ঐ এক দোষ। এক ট্র্যাডিশন।

বললাম, এর কারণ কি?

—কারণ অতি সোজা। সকলেই নাটক লিখছেন মঞ্চের দিকে মুখ রেখে। রবীন্দ্রনাথ নাটককে সাহিত্যের বিষয় করে তুলেছিলেন। সেজন্যে তাঁর নাটক সেকালে সাধারণ দর্শকের উৎসাহ সঞ্চার করতে পারে নি। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের ইতিহাসাশ্রয়ী আবেগপ্রধান নাটকগুলো অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সে সময়।

প্রতিবাদ করে বললাম, তা কেন? রবীন্দ্রনাথের নাটক তো সাফল্যের সঙ্গেই অভিনীত হচ্ছে!

—হচ্ছে ঠিক! তবে তা এখন, বহুরূপীর অভিনয়ের পর।

বাংলা নাটকের বেশির ভাগ লেখক কারা?

—মোটামুটি, সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক ধরনের লেখক। প্রথম জীবনে হয়তো গল্প-কবিতা লিখতেন কেউ কেউ। এখন লেখেন না। পড়েনও না। নাটকের জন্য নাটকীয়তার আমদানি-রপ্তানি করছেন প্রতিনিয়ত। তা ছাড়া আছেন, সৌখীন অভিনেতাদের মতো সৌখীন নাট্যকারের দল। সারাজীবনে একটা-দুটো নাটক লেখেন তাঁরা। অভিনয় করতে গিয়ে নাটক লেখার প্রেরণা পেয়ে যান কেউ। তা ছাড়া আছে, অফিসের বড়বাবু, করণিক, পাড়ার সমাজসেবী ও সংস্কৃতি কর্মীর দল; কাহিনীর জন্য ভাবনা কি? চারদিকে একটু চোখ মেলে তাকালেই কয়েক ডজন পূর্ণাঙ্গ নাটক আর একাঙ্ক লেখার উপাদান মিলে যেতে পারে যে কোনো মুহূর্তে।

গম্ভীর হয়ে বললাম, সিরিয়াসলি বলুন। হাল্কা রসিকতা হচ্ছে।

মুখ ভার করে রইলেন শ্রীনির্মলকৃষ্ণ পাল। মার্জিত রুচিসম্পন্ন মানুষ। একটা ছোটখাট প্রেসের মালিক। বললেন, রসিকতা করছি না। সিরিয়াসলি বলছি, বাংলা নাটকে আর যাই থাক—সাহিত্য নেই। হয়তো, আমার কথাই একমাত্র ধ্রুব বা শেষ কথা নয়। তবে, নাটকের দল করে অনেকে নাট্যকার হয়েছেন, এটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন? আমি ছাপাখানার মালিক। সাহিত্য-টাহিত্য বুঝি না। নাটক ছাপছি হামেশাই। কিন্তু, সত্যি কথা বলতে কি ভালো লাগছে না কোনোটাই। শুনছি, নাটকের বই বিক্রী হয় মন্দ না।

আমি বিষয়টাকে গভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করলাম। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো নাটকেরও নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আছে। তা হলে, বাংলা নাটকের এরকম পাঠক-বিচ্ছিন্নতার কারণ কি?

অবিভক্ত বাংলার জনৈক প্রখ্যাত নাট্যকারকে আমার এই মানসিক সংকটের কথা জানালাম। তিনি বললেন, নাটক হলো অনেকটা আয়নার মতো। মঞ্চে বসে মানুষ দেখে জীবনের দ্বিতীয় রূপ। তা সদ্য-বর্তমান কিম্বা তারই কাছাকাছি সময়ের হলে ভালো হয়। অন্তত প্রতীক হিসাবেও বর্তমানের সঙ্গে তার যোগ থাকলে ভালো হয়। আজকের নাটকে প্রায়ই তা থাকছে না। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে বাইরের কলাকৌশলের। জীবনসত্যে আস্থাশীল নাট্যকার প্রায় নেই-ই। শুনেছি, এখন নাকি চারদিকে অ্যাবসার্ড নাটক লেখার দিকে তরুণ নাট্যকাররা ঝুঁকেছেন। আমি তো কথাটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারি না। বাঙালি জীবনে যখন তেমন কোনো অ্যাবসার্ডিটি নেই, তখন এ ধরনের নাটক কখনই সত্য হতে পারে না। বাজে এলোমেলো, উদ্ভট সব ঘটনার সমাহারে ঘটালেই অ্যাবসার্ড হয় না। ওসব ফাঁকিবাজদের নাচানাচি।

ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলছিলেন তিনি শেষের কথাগুলো। আমি প্রশ্ন না বাড়িয়ে বর্তমান বাংলা নাটকের অবস্থাটা পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করলাম। অবশ্য মনে মনে। বিতর্কে যাবার ইচ্ছে ছিল না আমার। একদিকে আছেন প্রগতিশীল নাট্যকারের দল, অপর দিকে পুরোনোপন্থী নাট্যকারেরা। প্রগতিপন্থীদের আবার দু-তিনটে দল-উপদল আছে কলকাতা শহরে। তাঁরাই বিদেশী নাটককে আশ্রয় করে, অনুবাদ করে কিম্বা কাঠামো পাল্টে দিয়ে মঞ্চস্থ করেন বিভিন্ন মঞ্চে। কাগজে-পত্রে তাঁদের নিয়েই আলোচনা-সমালোচনা হয়ে থাকে সর্বাধিক। প্রযোজক ও নাট্যকার হিসেবে তাঁরা অনেকেই জনপ্রিয়।

গত কয়েক বছরের মধ্যে বহুরূপী অভিনয় করেছেন 'পুতুল খেলা', 'রাজা অয়েদিপাউস', নান্দীকার করেছেন 'শের আফগান', 'মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী', নক্ষত্র করেছেন 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', [illegible]-

সংবাদ' প্রভৃতি। প্রায় সবকটি বই-ই কম-বেশী বিদেশী প্রভাবিত।

এর কারণ কি?— প্রশ্ন করেছিলাম একদিন জনৈক তরুণ নাট্য-সমালোচককে— বাঙালির জীবন থেকে কি নাটক চলে গেছে?

—কারণ একাধিক, উত্তরে বললেন সমালোচক, প্রথমত পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলির তুলনায় বাংলা নাটক অনেক পিছিয়ে আছে। অনুবাদ বা অনুসরণের ফলে সেই ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলা নাটকের সবলতা-দুর্বলতা আর যাই থাক, কিছুটা একঘেয়েমি আছে। বিদেশী নাটকের নাট্যরূপ সেই মনোটনি ভেঙে দিতে পারছে। বাঙালি জীবনেও নিশ্চয়ই নাটক আছে। তাকে আবিষ্কার করা দরকার। সম্ভবত বাংলা দেশে সেরকম তরুণ নাট্যকার নেই। সকলেই প্রায় বিদেশী নাটক পড়ে কিম্বা দেখে তার ভক্ত হয়ে গেছেন।

ভদ্রলোকের শেষের কথাটায় খোঁচা ছিল। আমি এড়িয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনি কি বাংলা নাটকে কোনো জাতীয়-চরিত্রের সন্ধান করছেন?

—নিশ্চয়ই। আমাদের দেশী নাট্যকাররা বিদেশের অনুকরণ করছেন মূলশূন্য। অথচ, সেসব নাটকের সংকটে ও সমস্যার সঙ্গে আমাদের মিল কতটুকু? সমস্ত ব্যাপারটাই কি খানিকটা কৃত্রিম নয়? প্রয়োজনবোধে বিদেশী কাঠামো নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বিদেশী উপাদান নয়। ওভাবে নেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। তাতে আমাদের কোনো লাভ হবে না। কয়েক দিন হৈ-চৈ করা যাবে। জাতীয়-চরিত্রকে না বুঝে নাটক লিখলে, তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

একদিন নাটকের খোঁজে গেলাম, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের সরু গলিটার ভেতর। ওখানকার ছোটখাট কয়েকটা দোকানে নাটকের বই বিক্রী হয় সবরকম। পাওয়া যায় যাত্রা-থিয়েটার-নাটক-নভেল-ভূতপেত্নী প্রভৃতি প্রায় সব রকমের বই। ভিড়ের মধ্যে আমি ও'দেরই জনৈক বিক্রেতার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম নাটকের বাজার সম্পর্কে। ঘন ঘন খদ্দের আসছিল তখন। কেউ জিজ্ঞেস করছেন, স্ত্রী-চরিত্রবর্জিত নাটক আছে? একটা সেট হলেই ভাল হয়। কেউ বা জিজ্ঞেস করছেন, সামাজিক নাটকের কথা।

এক ফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম নাটকের খদ্দের কারা? কি ধরনের নাটক বেশী বিক্রী হয়?

—নাটক কেনে শহর-মফস্বলের নানা শ্রেণীর লোক। সকলেই কোন না কোন ক্লাব, সঙ্ঘ-সমিতি কিম্বা নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন রকম অফিস ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে নাটক অভিনীত হয়। তখন একেকটা ক্লাব বেশ কয়েকখানা করে নাটকের বই কেনে। মহড়া দেয়। নাটক স্থির হলে, একেকটা ক্লাব ছ'-সাতখানা করে বই কেনে। সাধারণত কেউ পড়ার জন্য নাটকের বই কেনে না। তবে বিক্রী হয় বেশী বাজারে জনপ্রিয় নাটকগুলো। কোনো নাটক বেতারে মঞ্চে বেশী অভিনীত হতে থাকলে, সে বই বেশী বিক্রী হয়। সকলেই তা অভিনয় করার জন্য উঠে-পড়ে লাগে। নতুন নাটক সহজে কেউ কিনতে চায় না। দু-দশ জায়গায় অভিনয় না করতে পারলে, সে বই মার খাবার সম্ভাবনা।

অফিস ক্লাবগুলো সাধারণত কি ধরনের বই বেশী কেনে?

—ঐতিহাসিক, আধা-পৌরাণিক কিম্বা মঞ্চসফল ব্যবসাদারী নাটক।

মানে? উদাহরণ দিন।

—দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতন, শাহজাহান, — শচীন সেনগুপ্তের সিরাজদ্দৌলা কিম্বা স্টার বিশ্বরূপা, মিনার্ভায় অভিনীত হয়ে গেছে এমন সব নাটক অভিনয় করার ব্যাপারে অনেকে উৎসাহী। কেউ কেউ পছন্দ করেন বামপন্থী মেজাজের নাটক। তবে রাজনৈতিক শ্লোগান পছন্দ করেন না অনেকে। বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবী গর্জন', 'গর্ভবতী জননী', উমানাথ ভট্টাচার্যের 'ঘূর্ণি', 'ঠগ', অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বাক্ষিদ্বক', 'জীবনযৌবন' প্রভৃতি এ ধরনের নাটক।

আর কার কার নাটক বেশী বিক্রী হয়?

—ইদানীং বীরু মুখোপাধ্যায় (চার প্রহর), শৈলেশ গুহনিয়োগী (ফাঁস, অনশন ভঙ্গ), সলিল সেন (ফাঁদ), গঙ্গাপদ বসু (অঙ্গীকার), ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্রাট, অপারেশন ফাউস্টাস), অগ্রদূত (ঝিঁঝিপোকার কান্না), পার্থপ্রতিম চৌধুরী (ডায়নার দাঁত, ছায়ানায়িকা), জোছন দস্তিদার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় (মিনিস্টার), উৎপল দত্ত (কাকদ্বীপের এক মা, ছায়ানট রাইফেল প্রভৃতি), সুনীল দত্ত, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণ মৈত্র, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, মনোজ মিত্র, রমেন লাহিড়ী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস প্রভৃতি অনেক নবীন-প্রবীণ নাট্যকারের বই ভালোই বিক্রী হচ্ছে।

এসব প্রকাশ করেন কারা?

—মূলত জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, নবগ্রন্থ কুটীর, সিটি বুক এজেন্সী, লিপিকা, —এমনি আরো কেউ কেউ। বিভিন্ন নাটকের দল নিজেরাও বই প্রকাশ করে থাকেন। যেমন—সমকাল বের করেছেন 'রাজার রাজা', নক্ষত্র করেছেন 'বৃষ্টি বৃষ্টি', 'মৃত্যু-সংবাদ', গন্ধর্ব করেছেন 'নীলকণ্ঠের বিষ'।

একাঙ্ক নাটকের চাহিদা কেমন?

—মন্দ নয়। সংকলন না বেরোলে আর আলাদাভাবে কজনই বা একাঙ্ক নাটক ছাপে। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ একাঙ্ক নাটকের কয়েকটা সংকলন বের করেছেন। বিক্রী খারাপ হচ্ছে না।

জনৈক তরুণ শিল্পী বললেন, নাটকের প্রচারে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার ভূমিকাও কিন্তু নগণ্য নয়।

জিজ্ঞেস করলাম, দৈনিক কাগজের বিজ্ঞাপন, সমালোচনা, রিপোর্ট প্রকাশ ইত্যাদির কথা বলছেন কি?

—হ্যাঁ, তাতো বটেই। তার চেয়েও বেশী সাহায্য করছে নির্ভেজাল নাটকসম্পর্কিত আলোচনার পত্রিকাগুলো। যেমন ধরুন, গন্ধর্ব (নৃপেন সাহা সম্পাদিত), বহুরূপী (গঙ্গাপদ বসু সম্পাদিত), প্রসেনিয়াম (উৎপল দত্ত সম্পাদিত), থিয়েটার (শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ইত্যাদি সম্পাদিত), এপিক থিয়েটার (উৎপল দত্ত সম্পাদিত), দর্শক (দেবকুমার বসু, রবি মিত্র সম্পাদিত) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা নাটকের প্রকাশ, সমালোচনা ও আলোচনা প্রকাশ করে দর্শককে নাটক সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলেছে। অবশ্য অনেকগুলি পত্র-পত্রিকাই এখন আর বেরোয় না। আমার মনে হয়, বেরোনো দরকার।

কথাটা ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে দরকার আরো বেশি প্রকাশক ও ভালো নাট্যকার। কারণ বাংলা নাটকের এখন চাহিদা বাড়ছে। এর আর্থিক সাফল্যও এখন রীতি-মতো উৎসাহিত হবার মতো।

—গ্রন্থদর্শী

ম্যাক্সিম গর্কীর ভারত-বিচিন্তা

নরেন্দ্র দেব

সহজাত বুদ্ধিশ্রীদীপ্ত ও কর্মকুশল শিল্পীমনা ভারতবাসীদের ভবিষ্যৎচিন্তা এবং তাদের অতীত যুগের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য মনীষী ম্যাক্সিম গর্কীর দৃষ্টি বরাবরই আকর্ষণ করতো। মহাত্মা টলস্টয়ের মতোই প্রতিভাবান রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গর্কীরও মানব-দরদী ও গুণানুরাগী হৃদয়টি বরাবরই পরাধীন ভারতবাসীদের জন্য গভীর সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ ছিল।

ম্যাক্সিম গর্কীর আন্তরিক চেষ্টাতেই শিক্ষিত রুশ জনসাধারণের মনে ভারতবাসীদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি ভারতের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক শিক্ষা ও অনুশীলনের প্রতি তাদের জাতীয় আচার, আচরণ ও আদর্শ রীতি-নীতির প্রতি এবং বিদেশীর অধীনতা পাশ থেকে মুক্তির জন্য তাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার প্রতি একটা অনুকূল দৃষ্টি আকৃষ্ট করা এবং তাদের সম্বন্ধে সবিশেষ জানবার ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল।

ভারতীয়দের সামাজিক ও সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ অবগত হবার জন্য গর্কীর যে অসীম কৌতূহল দেখা যায় এটা তাঁর জীবনের তরুণ প্রভাতেই, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই জাগ্রত হয়েছে দেখা যায়। এ ইচ্ছাটা তাঁর বিশেষভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রায় প্রাক্কাল থেকেই। গর্কী তখন ইতালির কাপ্রিদ্বীপে অবস্থান করছিলেন। এই সময় বিশ্বের সকল প্রদেশেরই রাষ্ট্রনৈতিক গতি-প্রকৃতির দিকে তিনি প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন। তদানীন্তন ঘটনাবলী সংক্রান্ত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ, তীক্ষ্ন ও তীব্র রচনাবলী এবং প্রবন্ধাদি থেকে এর সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ইংরাজী ১৯১২-১৩ সালে তিনি বিশ্বের ঘটনাবলী সংক্রান্ত তাঁর চিন্তাপূর্ণ আলোচনাসমূহ "Sovramennik' নামে তাঁর পরিচালিত 'সেন্টপিটার্সবার্গ ম্যাগাজিনে' "News Items of Life Abroad" নাম দিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। এই ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির মধ্য 'ভারতবর্ষ" ও ভারতবাসীদের জাতীয় মুক্তির জন্য যে কঠোর সংগ্রাম চলছিল সেই সম্পর্কে তিনটি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ও উদ্দীপক রচনা ছিল। তারই একটিতে গর্কী লিখেছিলেন :—

"There are voices in India which more and more insistently claim that the time has come for the Indian people to set their own hands to social and political endeavour and that the British regime has outlived its day on the banks of the Ganges".

ইংরেজের অধীনতা পাশ থেকে ভারতের মুক্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল।

গণতন্ত্রপ্রেমিক পাঠকদের কাছে ভারতে ইংরেজের পশুর মতো অত্যাচার এবং ভারতীয়দের ভয়াবহ অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র বিশ্বের সম্মুখে তুলে ধরবার চেষ্টায় গর্কী তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে সত্য তথ্য ও প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে-ইংরেজ ধনতান্ত্রিকদের সৃষ্ট অতিসাংঘাতিক আর্থিক অবস্থার জন্য এই শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই ভারতের শ্রমিক সম্প্রদায় বিশেষ করে যারা দিনমজুরী করে খায়, তাদের সংখ্যা দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে আসছে। ভারতের কৃষিক্ষেত্রের চাষীরা বছরে অর্ধেক দিন অর্ধাহারে থাকে।

ভারতীয় শ্রমিক নরনারীদের ভাগ্যে যে দুঃসহ অপমান ও অসহ্য অত্যাচার চলছে এবং তাদের যে কঠোর মর্মবেদনা সারাজীবন সহ্য করতে হচ্ছে—ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের জোয়াল কাঁধে নিয়ে প্রতিদিনের সংসারের পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে, এই মহানুভব রুশ সাহিত্যিক বিশেষ করে সেই নিষ্ঠুর নির্মম তিক্ত দুর্ভাগ্যের কথাই তাঁর দেশবাসীকে বলেছেন। তিনি আপন অন্তরে অনুভব করতে পেরেছিলেন তাদের সেই লজ্জা ও দুঃখ।

ভারতের নানা প্রদেশের রেশম, পশম ও সুতার কলগুলোতে, কার্পেট তৈরির কারখানায়, চা আর তামাক উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের নারীরাই বেশির ভাগ কাজ করে। গর্কী দেখিয়েছেন এই অসহায় দুর্বল নারী শ্রমিকদের জীবনের তরুণ প্রভাতেই তাদের মনুষ্যত্বের অধিকার বোধ একেবারে নিঃশেষে বিনষ্ট করে দিচ্ছে ইংরেজ ধনতন্ত্রের লোভী পিশাচেরা।

গর্কীর চিন্তাশীল প্রবন্ধ নিশ্চয় তৎকালে অত্যন্ত রূঢ় ভাষাতেই ইংরেজদের কঠোর বিদ্রূপের সঙ্গে উপহাস করেছিল। পরবর্তী কালেও কোনও কোনও প্রবন্ধে দেখা যায় তীব্র ও কঠোরতর বিদ্রূপের ভাষাতেই তিনি তাদের অন্যায় অনুচিত কার্যের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বিশ্বের নরনারীকে গর্কী এই কথাই জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন যে, ভারতের শ্রমিকদের সহনশীল হৃদয় তাদের শতবর্ষব্যাপী পুরাতন বৃটিশ অত্যাচারীদের প্রতি যে বিরূপ হয়ে ওঠেনি। এর একমাত্র কারণ ভারতের রাজভক্তির সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। তদানীন্তন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি ভারতের প্রতিভূ শাসনকর্তা লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁর একটি ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'ইংলণ্ডের রাজা তথা ভারতের সম্রাটের ভারত দর্শনে আসার ফলে ভারতের জনসাধারণের মনে একটা বিপুল আনন্দ-উৎসাহ জেগে উঠেছে। বিশেষ করে সারা বাংলা আর কলিকাতা নগরীর অধিবাসীদের অন্তরে যেন নতুন করে আশা ও বিশ্বাসের নির্ভরতা দেখা দিয়েছে!'

এই মিথ্যা ভাষণের প্রতিবাদে গর্কী সেদিন প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়ান সোশিয়লজিস্ট' শীর্ষক পত্রিকার প্রতিনিধিদের দিল্লী থেকে প্রেরিত সত্য সংবাদ উদ্ধৃত করে দেখান যে, তারা লিখেছে—'ভারতের সাম্রাজ্য রক্ষায় নিযুক্ত বৃটিশ পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত কঠোর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বৃটিশ-রাজ তথা ভারতসম্রাটের ভারত পরিদর্শনকালে। ভারতের সকল অধিবাসীর উপর 'পরওয়ানা' জারী করা হয়েছিল যে, 'কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত অনুমতি ব্যতীত কেউ সেদিন বাড়ীর বাইরে বেরুতে পাবেন না।'

উপরোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতীয় নাগরিকদের পৌরপ্রধান স্বরূপ শ্রীযুক্তা কামা, যিনি বিপ্লবী কৃষ্ণ বর্মার অন্তরঙ্গ সঙ্গিনী ও সহচরী স্বরূপা ছিলেন, তিনি ইংরাজ মহিলা লেখিকা শ্রীমতী এ্যানি বেশান্টের সেই সময় ভারতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-নীতির সমর্থনে লেখা প্রবন্ধটির স্বরূপ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। দেশপ্রেমিক শ্রীমতী কামার সেই রচনাটি গর্কী তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন।

এরপর দেখতে পাই গর্কী রাশিয়ার জনসাধারণের পক্ষ থেকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের দুঃসাহসী নেতাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী স্বেচ্ছাচারমূলক কুশাসনের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক কৃষ্ণবর্মা যে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, গর্কী সে প্রবন্ধটিও

আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর ভারত সংক্রান্ত রচনার মধ্যে উদ্ধৃত করেছিলেন। গর্কী তাঁর স্বদেশবাসী রুশ জনসাধারণকে একথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারতের এই দুঃসাহসী নির্ভীক রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা কৃষ্ণবর্মাকে তাঁর ভারতীয় সঙ্গী ও সহচরেরা ইতালির ভুবনবিদিত মুক্তিযোদ্ধা ম্যাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডির সঙ্গেই তুলনা করেন।

ভারতীয় বিপ্লবী জনসাধারণের নেতা বীর সাভারকরের বিরুদ্ধে ইংরেজরা বিচারের নামে যে বর্বরোচিত একটা মিথ্যা মামলার প্রহসন খাড়া করেছিল এবং যার অন্যায় সুযোগ নিয়ে তারা শ্রীযুক্ত সাভারকারকে দফায় দফায় সুদীর্ঘ আটচল্লিশ বৎসর কারারুদ্ধ থাকার অমানুষিক শাস্তি দিয়েছিল, ভারতের সেই সব গৌরবমণ্ডিত সুসন্তানের আদর্শ চরিত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে গর্কী ভারতের প্রতি শিক্ষিত ও সমুন্নত অগ্রগামী রুশ জনসাধারণকে আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ভারতের জন্য গর্কীর প্রীতি ও সহানুভূতির যেন অন্ত ছিল না!

অর্ধশতাব্দী আগে অবশ্য এটা বিশেষভাবেই লক্ষ্যণীয় এবং একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা যেতে পারে যে, আপন দেশের গণতান্ত্রিক চক্রের সঙ্গে ভারতের মুক্তি-আন্দোলনকারীদের যাতে কার্যতঃ একটা কিছু যোগাযোগ ঘটতে পারে গর্কী তার উপায় অনুসন্ধানে বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন। গর্কীর এ প্রচেষ্টার কথা আমরা জানতে পারি তাঁর লেখা একাধিক চিঠিপত্র থেকে যা তিনি ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নির্ভীকা নেত্রী শ্রীযুক্তা 'কামা'কে লিখেছিলেন। এ চিঠিগুলি গর্কীর স্মৃতিভবনে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে।

গর্কী শ্রীযুক্তা কামাকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন রুশ পাঠকদের অবগতির জন্য একটি প্রবন্ধ রচনা করে পাঠান, যার বিষয়বস্তু হবে 'ভারতীয় নারী সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁদের দান কি কি?' গর্কী একথা উচ্চ কণ্ঠেই বলেছিলেন যে, আমি জানতে চাই রুশ গণতন্ত্রের অধিকারীরা এবং রুশ রমণীরা সুদূর ভাগীরথী তীরবর্তী মানুষগুলির মধ্যে যারা সুদীর্ঘ পরাধীনতায় ক্লান্ত হয়ে আজ গণতন্ত্রের পক্ষপাতী, ভারতের ন্যায় ওই বিশাল প্রদেশের নারী সম্প্রদায় বর্তমানে ঠিক কী অবস্থায় রয়েছেন এবং কীভাবে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করবার চেষ্টা করছেন আমি সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সংবাদ জানতে পারলে বিশেষ কৃতজ্ঞবোধ করবো।'

সুদূর রাশিয়ায় বসে ভারত সম্বন্ধে গর্কীর এই যে সঠিক অবস্থা কি এ দেশের সেটা জানবার আন্তরিক আগ্রহ, গর্কীকে একজন প্রকৃত ভারতপ্রেমিক বলেই আমাদের কাছে পরিচিত করেছে এবং কৃতজ্ঞ ভারতবাসীরা তাঁকে আপনজনের মতোই ভালোবেসেছে। রুশ বিপ্লবের অনতিকাল পরেই গর্কীর সুযোগ হয়েছিল ভারতের কয়েকজন শ্রমিক প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ের। একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে ১৯১৮ খৃস্টাব্দে পেত্রোগ্রাদে তাঁদের সঙ্গে গর্কীর দেখা হয়। পেত্রোগ্রাদ তখনও 'লেনিনগ্রাদে' রূপান্তরিত হয় নি। দিল্লী থেকে সমাগত এই ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সাদর স্বাগত সম্ভাষণ জানান। উক্ত সম্মেলনে সমাগত ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন তাঁর বক্তৃতায় রুশ ভ্রাতাদের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানান। ধন্যবাদ দেন এই বলে যে, 'বহু দিনের পদানত শ্রমিক শ্রেণীকে যাঁরা সামাজিক অবহেলার কঠিন নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর রাষ্ট্রীয় অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত হবার পথ প্রদর্শন করেছেন তাঁদের জয় হোক!'

গর্কীকে শ্রমিক প্রতিনিধির এই বক্তৃতাটি এত বেশী প্রভাবিত করে যে, সে আবেগ তিনি ভুলতে পারেন নি! আমরা দেখি গর্কী এর পরই 'সোভিয়েত রাশিয়া ও বিশ্ববাণী' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লেখেন তাতে এই ভারতীয় শ্রমিক প্রতিনিধিদের বক্তৃতার বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় সেই অধিবেশনে গর্কীর হৃদয় দুঃখী ভারতের দিকে গভীর সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হয়েছিল।

যখন ভারতীয় জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য জন-সংগ্রাম ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল এবং ভারতের চতুর্দিকে সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রাথমিক রূপ পরিগ্রহ করছিল গর্কীর দৃষ্টি সেদিন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতোই আজকের এই স্বাধীন ভারতবর্ষের সফল সুখ-স্বপ্ন সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

তৎকালীন যে সব রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ ম্যাক্সিম গর্কী রচনা করেছিলেন তার মধ্যে একথা বেশ সুস্পষ্টভাবেই তিনি বলেছিলেন যে, তিরিশ কোটি ভারতবাসীকে মুষ্টিমেয় বিদেশীরা বেশিদিন আর তার পায়ের তলায় রাখতে পারবে না। মুক্তি আসন্ন।

১৯৩২ খৃস্টাব্দে আমেরিকার জনৈক পত্রলেখকের চিঠির উত্তরে তিনি বেশ স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে, তিরিশ কোটি ভারতবাসীর অন্তর আজ বৃটিশ ব্যবসায়ী, দোকানদার জাতের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও আক্রোশে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর বেশী দিন তাদের অশান্ত চিত্তকে শান্ত করে রাখা মুষ্টিমেয় ইংরেজের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। গর্কী ক্রমশ আরও কৃতনিশ্চয় হয়ে উঠেছিলেন যে, দিন বদলের পালা শুরু হয়েছে। চিরদিন বৃটিশের দাসত্ব করবার লজ্জা আর অপমানের ভূমিকাই ভারতবাসীদের জন্য সৃষ্টিকর্তা কখনই নির্দিষ্ট করে রাখেন নি।

ভারতের ন্যায়সঙ্গত মুক্তি-দাবীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রতিভাবান রুশ সাহিত্যিকের মনে এই যে সুনিশ্চিত ধারণা হয়েছিল এর মূলে ছিল ভারতীয় শ্রমিক জনগণের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে সুদৃঢ় বিশ্বাস, দুর্নিবার আশা আর দুর্জয় আকাঙ্ক্ষার আবেগ তাদের মনের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রচণ্ড জোর এবং মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি প্রত্যেকের অবিচল নিষ্ঠা আর গভীর বিশ্বাস। ঠিক ঐ সময়েই 'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সঙ্ঘ'কে তিনি যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টই লিখেছিলেন :

> "The National Revolution in India was manifested clearly enough. If we turn back to the remoter past the insurrection of the Sepoys is hardly to be explained by Indians habitual resignation to despotism".

যেমন তাঁর দুর্দান্ত যৌবনকালে তেমনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলিতেও গর্কী তীব্র তিরস্কারের সঙ্গে বৃটিশ

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অতি উজ্জ্বল ঔপনিবেশিক আদর্শের ছদ্মবেশ ছিন্ন করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, লুণ্ঠন ও শোষণের সুবিধার জন্যই তারা বহুরূপীর মতো কখনো পৃষ্ঠপোষক সাজে কখনো সাজে Friend of India! যার অন্তরালে গোপন রাখে তাদের সর্বস্ব অপহরণকারী দস্যুর ভয়াবহ রূপটি।

"All an Carthill" এই ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করে যে লেখক "Lost Empire" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন এবং নির্লজ্জের মতো তাতে লিখেছিলেন যে, 'সার্বভৌম শক্তির অধীনে স্বৈরতন্ত্র চালিত শাসন ভারতবাসীরা নিন্দনীয় মনে করে না। কারণ এই দুর্বলচিত্ত প্রাচ্য দেশবাসীরা এক অদ্বিতীয় শক্তিশালী শাসকের নিরাপদ আশ্রয় ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার শাসন পদ্ধতি পছন্দ করে না।' গর্কী এই ছদ্মনামের অন্তরালে আশ্রয় নেওয়া কাপুরুষ লেখককে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক ভাষায় তীব্র ব্যঙ্গ করেছিলেন। তিনি এই ধরনের বিবৃতিকে অত্যন্ত নীচ-প্রকৃতির ও হীনমনোবৃত্তির মিথ্যা প্রচার ও জাতিভেদাত্মক নোংরা স্বভাব বলে নির্দেশ করে তাদের কুৎসিত স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছিলেন।

১৯৩০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে গর্কীর রচনাবলীর মধ্যে একটি প্রবন্ধে দেখা যায় গর্কী লিখেছেন—'সম্প্রতি চার্চহিল সাহেব ঘোষণা করেছেন যে, ভারতবর্ষে প্রায় ৫৪০০০ লোককে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু কত লোককে যে তাঁরা গুলী করে হত্যা করেছেন, লাঠির ঘায়ে আধমরা করেছেন তার কোনও উল্লেখ করেন নি। গর্কী কিন্তু সেই গোপন-করা সংবাদটা বিশ্বের হাটে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন যে, বিপুল সংখ্যক নিরস্ত্র নির্দোষ নরনারী এবং বালক কিশোর ছাত্রছাত্রীকে পাইকারী হিসাবে নির্বিচারে গুলী করে হত্যা করা হয়েছিল। কেন এমন নিষ্ঠুরতা? এই নৃশংসতা? কারণ, যে কোনও মূল্যেই হোক ভারতে বৃটিশ ব্যবসায়ীদের মূলধন রক্ষা এবং নিজেদের শাসনদণ্ড ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতেই হবে।

গর্কী ছিলেন বরাবরই বিপ্লবের সমর্থক। বিদ্রোহকেই তিনি জনগণের অসন্তোষের দুরন্ত প্রকাশ বলে মনে করতেন। কাজেই মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নিরুপদ্রব আন্দোলনের উপদেশ তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তথাপি ভারতের পুণ্য জীবনাদর্শ সত্যব্রত নীতি ও অহিংসা বৃত্তির মহৎ গুণের সঙ্গে এই মহান নেতা রুশ জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া তাঁর অবশ্য কর্তব্য মনে করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯২৩ সালে গর্কী লোকোত্তর-লেখক ও দার্শনিক পণ্ডিত রোমা রোলাঁকে গান্ধীর সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে দিতে তৎকালীন তাঁর প্রধান সম্পাদনায় প্রকাশিত "Beseda" পত্রিকার জন্য। ফরাসী মনীষী রোলাঁ সানন্দে গর্কীর এ অনুরোধ পালনে স্বীকৃত হন এবং সেই বৎসরেই গর্কীর সংবাদপত্রে রোমা রোলাঁ রচিত গান্ধীজীর জীবনীমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় ও সমাজনীতি ক্ষেত্রেই নয়, গর্কীর বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায় ভারতীয় 'পুরাণ' প্রসঙ্গে, 'লোক সঙ্গীতে' এবং গ্রাম্য কবিদের ছড়া ও গানে। এ বিষয়ে গর্কীর লেখা থেকে একটু উদ্ধৃত করছি—'এই যে ভাবানুকূল শব্দ নির্বাচন ও সেই শব্দের ওজোন বুঝে প্রত্যেকটির পরস্পরের সঙ্গে সুনিপুণ বুনুনি—এ ভাষার মাল্যগ্রন্থনের জন্ম হয়েছিল মানব ইতিহাসের প্রথম ঊষায়। এই যে এর নানা বর্ণের রেশমী সুতোর স্বচ্ছন্দ খেই যা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীর বহু দিগ্‌দেশে, তার সেই অননুকরণীয় সৌন্দর্যের বিকাশ সত্যই বিস্ময়কর।'

গর্কীর মতে ভারতীয় লোকশিল্প ও গীতিগাথার মূল উৎস খোঁজ করবার জন্য পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সংস্কৃতিবান ভদ্র সমাজের মধ্যে অথবা ধর্ম কি দর্শন-শাস্ত্রের পুঁথির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক অনুসন্ধানী ঐতিহাসিকই ইতিপূর্বে এ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। গর্কীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, দুনিয়ার শ্রমিক মানুষেরাই তাদের অবসরবিনোদনের জন্য ওই গ্রাম্য শিল্প ও ছড়া-সাহিত্য প্রচলন করেছিলেন, যা আমার মতো একজন রুশ সাহিত্যিককেও অনুপ্রাণিত করেছে। বস্তুত ভারতের অমর শিল্পকলার 'ভিত্তিপ্রস্তর' স্থাপন থেকে বিশ্বস্তুত 'জয়স্তম্ভ' নির্মাণ পর্যন্ত করে গিয়েছিলেন সেই সব গ্রাম্য শ্রমিক শিল্পীরাই, যাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরাম পরিশ্রম করেও ক্লান্তিবোধ করেন নি, বরং সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠে নিজেদের অভাব-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট ভুলে তাঁদের অবসর সময়টুকুও কারুকলার চরণেই হৃষ্টচিত্তে নিবেদন করেছিল।

'ভারতবাসীদের যে আদি বা প্রাচীন মূল সংস্কৃতি তার বিশ্বজোড়া একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে', একথা গর্কী বার বার বলেছিলেন এবং অকপটে স্বীকার করে ছিলেন যে, মানব জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়ার খবর ওইখানেই মিলতে পারে। গর্কী সংস্কৃত ভাষা জানলে হয়ত 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে—' বলেই প্রতীচ্যের সকলকে ডাক দিতেন।

একটি সামান্য দৃষ্টান্ত থেকে জানা যেতে পারে যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে গর্কীর সম্যক উপলব্ধির তথা মূল্যবোধ কতটা ছিল। একখানি সোভিয়েত পত্রিকা নাম "Literaturnaya Uchioba", এরই সম্পাদককে ইং ১৯৩০ সালে তিনি একখানি পত্র লিখে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে গর্কী জোর দিয়ে এই কথাই বলেছিলেন যে, বিশ্বকলাশিল্পের ইতিহাস প্রাক পৌরাণিক কবি হোমারের Illiad এবং Odyssy থেকে শুরু হয়নি। শুরু হয়েছিল প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক কথা-কাহিনী থেকে। এরও আগে গর্কী গত শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন :—

> "India began to seek for its ideal long before other countries, and has progressed further than any in the search".

কী সমাজ-জীবন, কী সাহিত্যক্ষেত্রে একজন চিরচঞ্চল অদ্বিতীয় শিল্পী ম্যাক্সিম গর্কী রুশ জনসাধারণের অধিকাংশের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও কাহিনীর একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনের জন্য বিশেষ প্রয়াস করেছিলেন। "The World Literature" নামে যে প্রকাশক ভবনের তিনিই প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন এবং তাঁরই উৎসাহে ও উদ্দীপনার গুণেই এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। সমগ্র রাশিয়ায় সোভিয়েত শাসন প্রবর্তনের প্রথম বৎসরেই অনেক প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় বিশিষ্ট রচনা রুশ ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হতে থাকে। গর্কীর প্রবর্তিত এই ভারতীয় সাহিত্য অনুবাদের কাজ আজও রাশিয়ায় মহাউৎসাহে চলেছে। ভারতীয় পুরাণ সাহিত্য ও কাব্যের রুশীয় অনুবাদ সারা সোভিয়েত ইউনিয়নের দূর-দূরান্ত প্রদেশগুলিতেও গিয়ে পৌঁছেছে।

যে গভীর আন্তরিক সহানুভূতি ও ঐকান্তিক মনোযোগ এই মহান রুশ-সাহিত্য-সাধক ও বিশ্বমানব-সুহৃদ ম্যাক্সিম গর্কী ভারতের জনসাধারণের মুক্তি-প্রচেষ্টার প্রতি সন্নিবিষ্ট করে ছিলেন এবং তাঁর আজীবনের এই অবিচলিত বিশ্বাস—ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও ভারতীয়দের নব নব সৃজনী প্রতিভাই মনুষ্যকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে পারে। এই বিশ্বাসই গর্কীকে 'ভারতপ্রেমিক' করে তুলেছিল। গর্কীর ভারতের প্রতি এই মহান মনোভাবই সোভিয়েত রাশিয়াকে আজ 'ভারতমিত্রে' পরিণত করেছে।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নৌকোয় বসেই রাত্রে লাল আলোয় ডেভেলাপ করলাম। সলিউশন মিশিয়ে ডিসে ঢাললাম, তাতে কাট ফিল্ম ছেড়ে দিলাম। সময়টা হচ্ছে বৈশাখ মাস, দারুণ গরম। বরফ দেওয়া থাকলে ভালো হত। কিন্তু কিন্তু বরফ পাবো কোথায় এখানে?

তাই ডেভেলাপ করতে করতে দেখা গেল, সলিউশনের ওপরে কালিমতন কীসব যেন ভাসছে। এই সেরেছে, বরফ না হলে ও চলবে না। গেল—সব নষ্ট হয়ে গেল।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। শুয়ে আছি চুপচাপ। আশেপাশে আরো নৌকো এসে জমেছে। মাঝিরা করছে কী! নৌকোগুলোর চালের ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে। এবং সেই যাতায়াতটা আবার ধীরে-সুস্থে নয়, রীতিমত লাফিয়ে লাফিয়ে চলা। ছইয়ের ওপর দিয়ে অমন করে চললে মাথার ওপর একটা মড়মড় শব্দ হবেই। হয়ত একটু ঘুম এসেছে অমনি ঘুমটা ভেঙে গেল, মড়মড় শব্দের সঙ্গে নৌকোটাও আবার টলে গেল। ব্যাপারটা তো বুঝতে পারিনি, তাই ভয় পেয়ে উঠে বসলুম। কী হলো?

মাঝি আমাদের অবস্থা দেখে হেসে বলল—ও কিছু না বাবু, লোক যাইছে।

শুনে আশ্বস্ত হলাম।

শিশিরকে বললাম—আমরা কি নদীর এক জায়গাতেই পড়ে থাকব নাকি? তাহলে নৌকো ভ্রমণের মজাটা কি হলো?

শিশির বলল—ঠিক কথা—চলো রূপসার দিকে যাই।

নৌকো চললো। রূপসা নদীতে ঢুকে বাজার-হাটের দিকে চলে গেলাম খানিকটা। স্কুলবাড়ী কি কলেজবাড়ী, ঠিক মনে নেই—নদীর ঠিক ওপরেই গাছ আছে বাড়ীর লাগোয়া। সেই গাছে দেখি একখানা পোস্টার লাগানো আছে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে দেখি—সর্বনাশ! পোস্টারে যে আমার নাম রয়েছে। সেই যে খুলনায় এর কিছুদিন আগে স্টার থিয়েটার এসেছিল তখনকার পোস্টার—এখনও লাগানো রয়েছে। আমরা কিন্তু পোস্টার দেখে মনে মনে চমকে উঠলুম। নৌকো বাঁধা রইল বটে ঘাটে, কিন্তু মনটা অস্বস্তিতে ভরে রইল। অহীন্দ্র চৌধুরী নামটা যে এরা শুনেছে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে, এখন চেহারা দেখে না চিনে ফেলে! কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম, কয়েকজন ছেলে নৌকো দেখে ঘুরে ঘুরে করতে শুরু করেছে। কার নৌকো—এটা জানাই তাদের কৌতূহল না অন্য কিছু? উঁকি-ঝুঁকি যেভাবে দিচ্ছে তাতে কি আমাকে চিনে ফেলেছে নাকি?

রাত শেষ হলে সকালে উঠে চলে গেলাম রূপসাঘাট থেকে বাগেরহাট। এখানে 'বঙ্গে বর্গী', 'পথের শেষ' প্রভৃতি নাটকের বিখ্যাত লেখক নিশিকান্ত বসু রায়ের বাড়ী। ভদ্রলোক ছিলেন, ওখানকার নামকরা উকিল শিশির বোসদের খুব জানাশোনা। শিশির বললে—চলো দেখা করে আসি। উনি আমাদের লোক, কোনো ভয় নেই।

গেলাম দুজনে তাঁর বাড়ীতে। তিনি তখন বাগেরহাটে ছিলেন না, কর্মোপদেশে বাইরে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। আমরা তখন গেলুম বাগেরহাটের কাছাকাছি সুবিখ্যাত 'ষাট গম্বুজ' দেখতে। ষাটটি বড়ো বড়ো গম্বুজওয়ালা বহু প্রাচীন মসজিদ। রেলপথে বাগেরহাটের আগের স্টেশন এটি। এই মসজিদটির বিশেষত্ব হল, হাঁক দিলে সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি হয়। এর কারুকার্যও দেখবার মতো। বাগেরহাটে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। এখানে প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাতে সুদৃশ্য ঘাটও আছে বাঁধানো। কুমীর আছে দীঘিতে। তাদের নিয়মিত 'মুর্গী' ভোগ দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকরা বলে—কুমীর বলেন না বাবু বলেন 'দেওতা'।

মুরগীর পায়ে দড়ি বেঁধে জলের ধারে খোঁটা বেঁধে রাখে। তারপর 'দেওতার' উদ্দেশ্যে হাঁক দেয়—আয়, আয়। সঙ্গে সঙ্গে দীঘির বুকে ভুস করে ভেসে ওঠে 'দেওতা'। তারপরে সোঁ করে ডুব দিয়ে একেবারে মুরগীটার কাছে এসে ভেসে উঠে হাঁ করে মুরগীটাকে লুফে নিলে। নিয়ে এমন একটা ঘুর দিলে যে দড়িটা পট করে ছিঁড়ে গেল। ব্যস, তারপরই দীঘির অতল তলে তলিয়ে গেল সেই 'দেওতা'।

বাগেরহাট সম্বন্ধে যখনই ভাবি তখনই ঐ বিপুল দেহ 'দেওতা'র কথাই আগে মনে পড়ে। এরপর আমরা নৌকায় ফিরে এলাম বটে, কিন্তু 'দেওতা'র দৃশ্য মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। সব সময় মনে হতে লাগল নৌকার পাশেই বুঝি কোন সময় ভুস করে ভেসে উঠবে 'দেওতা' আর নৌকার গলুই ধরে এমন কামড় দেবে যে নৌকা যাবে উল্টে। তারপর আমাদের কি অবস্থা হবে তা ভাবতেও শিউড়ে উঠতে হয়।

ভোরে উঠে শিশির প্রস্তাব করলে—চলো শ্রীরামপুরে যাওয়া যাক—ওখানকার বাবুদের আমি চিনি বেশ থাকা যাবে ওখানে।

—চলো, যেখানে তোমার খুশী।

শ্রীরামপুরে এসে 'বাবুদের' বাড়ীর কাছে একটা খালের ধারে নৌকো ভিড়িয়ে দিয়ে তোফা ছিলাম। তাঁরা অবশ্য অনেক পীড়াপীড়ি করেছিলেন বাড়ীতে থাকার জন্য আমরাই রাজী হইনি। আমি বললাম—এই তো বেশ আছি—কেমন সুন্দর খোলামেলা। খাওয়া-দাওয়ার সে এক এলাহী ব্যাপার। সকাল বেলার প্রচুর জলখাবারের সঙ্গে তপসে মাছ ভাজা খেতে অতীব সুস্বাদু। দুপুরে বহুবিধ ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে শোল মাছের কালিয়া। এই সব ভূরিভোজের পর নদী পথে একটু বেড়াই ঝড়-জল দেখলে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে যাই। খোলা হাওয়ায় থাকতে থাকতে ক্ষিদেও পেতে লাগল প্রচুর। বিকেলে জলখাবারের পর বেড়াতে বেরুই—তখন মনে করি রাত্রে আর খাব না—কিন্তু রাত্রিবেলায় যখন বেড়িয়ে ফিরি তখন আবার বেশ ক্ষিদে পায়। রাত্রিবেলার খাওয়াটা আসতো বাবুদের বাড়ী থেকে। এইভাবে শুয়ে বসে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে প্রায় ৭।৮ দিন কাটিয়ে দিলুম।

একদিন শিশির বললে—আর তো ভাল লাগছে না—বড্ড একঘেয়ে। চল দেশে যাই। কলকাতা থেকেও কোন চিঠি আসছে না। তার চেয়ে বরং দেশে যাই, সেখান থেকে চিঠি পত্র লেখা যাবে। কি বলো?

আমি আর কি বলব! আমার তো তখন ('হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি তো পথ চিনি না—'
তোমারই উপর করিনু নির্ভর—তোমা বই কিছু জানি না—')

শিশির বোসদের আদি নিবাস বরিশালের একটি গ্রামে। দেশে যাবার জন্যে শিশির বোসের চিত্ত মেতে ওঠা খুব স্বাভাবিক। সে আর দেরী করল না—সেই রাত্রেই টিকিট কেটে বরিশাল এক্সপ্রেস স্টীমারে উঠে বসলাম।

স্টীমার ছাড়তে তখনো কিছু দেরী আছে, চুপচাপ ডেক চেয়ারে বসে আছি সামনের দিকে তাকিয়ে। একখানা নৌকো ছাড়লো ঘাট থেকে। তাতে হ্যাজাকের আলোয় দেখলুম নতুন স্টীলের ট্রাঙ্ক, ঝক-

বুকে কাঁসার ঘড়া ইত্যাদি। টোপর মাথায় সিল্কের জামা গায় বর, গাঁটছড়া বাঁধা লাল বেনারসী পরা নববধূ মুখটি নীচু করে গুটিসুটি বসে আছে। তার লাল বেনারসীর আভা অল্পক্ষণের জন্য দেখার পরই অবশেষে নৌকাটা এক সময় বাঁক নিয়ে বিশাল নদীর বুকে পাড়ি জমাল।

মনটা ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দুপদাপ আওয়াজে যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলাম। কে যেন একজন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। আমার দিকে তাকিয়ে একটু যেন হাঁপ ছাড়ল সে।

আমি তাঁকে দেখে কম অবাক হইনি। তাঁকে যে এখানে এমনি ভাবে দেখতে পাবো, এ আমি ভাবতেই পারি নি।

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটতে উনি বললেন—বেশ মশাই।

আমিও একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে বললুম—কী ব্যাপার?

বললেন—খুলনায় রইলেন অথচ বিন্দু-বিসর্গ জানতে পারলুম না। ভাগ্যিস, মৃগনাভির গন্ধ লুকোনো যায় না। ছেলেরা ঘুর ঘুর করে ঠিকই সন্দেহ করেছিল দেখি। তাই ছেলেরা যখন এসে বললে—অহীন্দ্র চৌধুরী স্টীমারে উঠেছেন—তারা স্বচক্ষে দেখেছে—তখন বেরিয়ে পড়লুম আমার নিত্যসঙ্গী সাইকেলখানা নিয়ে। দেখে এসে একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করি। শীগগির নেমে আসুন। কাছেই আমার বাড়ী পেট্রোল ডিপোর কাছে।

এ মানুষটির নামও 'বিজয়', তবে মুখুজ্যে নয়, ভাদুড়ী। বিজয় ভাদুড়ী—মোহনবাগানের ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী টীমের অন্যতম কৃতী সদস্য। স্টারে আসতেন থিয়েটার দেখতে, সেই থেকে পরিচয়টা ঘনীভূত হয়েছিল। তবে আলাপ ছিল আগে থেকেই। ১৯১১ সালে ইলিয়ট শীল্ড খেলতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছিলুম। যখন আমাকে ধরাধরি করে তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এই বিজয় ভাদুড়ী তাঁবুতে বসেছিলেন। যাঁরা আমাকে 'ফার্স্ট এড' দিয়েছিলেন বিজয় ভাদুড়ী ছিলেন অনেকের মধ্যে অন্যতম।

ওঁর কথার উত্তরে বললাম—বরিশাল যাচ্ছি, সঙ্গে বন্ধু রয়েছে। এখন আপনার বাড়ী যাই কি করে?

বিজয় বললেন—রিফান্ড নিন টিকিট।

বললাম—তা কি হয়? বরং ফিরবার মুখে খুলনায় যখন আসব তখন আপনার বাড়ী যাবো।

উনি আর তখন কি করেন? বললেন—ঠিক? কথা দিচ্ছেন তো?

ওঁর হাত দুটো ধরে বললাম—হ্যাঁ কথা দিচ্ছি।

স্টীমার ততক্ষণে হুইসেল দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি ওঁকে নেমে যেতে হলো। স্টীমার ছেড়ে দিলো একটু পরেই।

সকালবেলা যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখি স্টীমার একটা স্টেশনঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনটার নাম হলো—'হুলারহাট'। রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে দেখি পন্টন

দর্পী রাবণের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী

জীজের টিন উড়ে গেছে। স্ট্রাকচার বেঁকে গেছে। অর্থাৎ কালবৈশাখী তার তান্ডব নৃত্যের কিছু স্বাক্ষর রেখে গেছে।

এই 'হুলারহাটেই' আমাদের নামতে হলো স্টীমার থেকে। স্টীমারের পর এবার নৌকো।

শিশির বললে—স্থল পথেও যাওয়া যায়, তবে হেঁটে নয় পাল্কীতে। অন্য কোনো যানবাহন নেই। তুমি অতদূর হাঁটবে কি করে হে? পাল্কীরও ব্যবস্থা করা নেই—তাই নৌকোই ভাড়া করলাম। বেশ চওড়া খাল—নৌকো করে দিব্যি যাওয়া যাবে। খালটা গেছে বরাবর পিরোজপুর পর্যন্ত। পিরোজপুর একটা মহকুমা শহর।

আমি বললাম—তথাস্তু।

শিশির বললে—এবার একটু আরাম করে নৌকোয় পা ছড়িয়ে বোসো।

চওড়া খালটা বেয়ে অনেকখানি এলুম আমরা। তারপর এক জায়গায় নৌকোটা ডানদিকে বেঁকে একটু সরু খালে গিয়ে পড়লো। ঝোপ-ঝোপ সব বেত গাছ খালের পাড়ে। বেতগাছগুলো সব বেড়ে উঠে জলের ধারে ঝুঁকে পড়েছে। মাঝে মাঝে মাথার ওপর বাঁশের সাঁকো পড়ছে। খালের এপার-ওপার উঁচু করে খানকতক পাশাপাশি বাঁশ ফেলা আছে, তার সঙ্গে ধরে পার হবার জন্যে বাঁশের রেলিং—তাও আবার দুদিকে নয়, মাত্র একদিকে। আমি পার হতে পারতুম কি না জানি না—তবে দেখলাম ওখানকার লোক দিব্যি পার হয়ে যাচ্ছে। আমাদের নৌকা এই রকম গুটি কয়েক বাঁশের সাঁকোর নীচে দিয়ে চলে এলো। বেশ কিছুদূর আসার পর নৌকোটি যেখানে থামল সে গ্রামের নাম হচ্ছে 'রায়ের কাঠি'। সামনেই নব-রত্নের মন্দির। বহু প্রাচীন-কালের মন্দির, জীর্ণ ভগ্নপ্রায়। সেখান থেকে হাঁটা পথে গ্রামে ঢুকলাম। শিশির বোসের পিতার নাম ছিল শ্রীঅশ্বিনী বোস,

তিনি ছিলেন 'ডেপুটি রেঞ্জার অফ কাস্টম' তখন রিটায়ার করেছেন, অধুনা স্বর্গগত।

উঠলুম গিয়ে ও'দের বাড়ী। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে গ্রাম ঘুরতে বেরুলাম। সুন্দর একটি পুষ্করিণী আছে গ্রামে। তার বসবার ঘাটটি সুন্দরভাবে বাঁধানো—তার ওপর বসবার ঘাটের দুদিকেই সাঁকো আছে। আমার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ উপেন মিত্র ও শিশির মিত্র মহাশয়ের পৈত্রিক বাড়ীও এই গ্রামে। শিশির বোস নিয়ে গিয়ে দেখালে। বাড়িতে তালা বন্ধ। বিরাট বাড়ী, 'মিত্র বাড়ী' বলতে এককালে এক ডাকে সবাই চিনতো—এখন সব ভাগ হয়ে গিয়েছে। শুনেছি 'মিত্ররা' দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। তাহলে এই পূর্ববঙ্গের মাঝখানে এলেন কি করে? হয়ত কার্যোপলক্ষে এ'দের কোনো পূর্বপুরুষ এখানে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। সেই থেকে ক্রমে ক্রমে মিত্র বাড়ী গড়ে উঠেছে।

গ্রামটি কিন্তু ভারী সুন্দর—ঠিক ছবির মতো। বেশ কয়েকটা ছবি তুলে ফেললাম—কিন্তু ডেভেলাপ করব কি করে? বরফ নেই—যদি গরমে আবার সব নষ্ট হয়ে যায়? তাই রেখে দিলাম কলকাতায় গিয়ে ডেভেলাপ করব বলে। (হায়, আজ তার একখানা ছবিও কাছে নেই, কোথায় কবে হারিয়ে গেছে কে জানে?)

দিন তিনেক আমরা এই গ্রামে ছিলাম। আরও হয়ত থাকতাম কিন্তু কলকাতা থেকে কী একটা চিঠি পেয়ে শিশির বোস মত বদলে ফেলল। চিঠিটা অবশ্য আমাকে দেখায় নি, তবে বাপের সঙ্গে যেটুকু ফিস-ফাস করেছিল শিশির বোস তাই থেকে বুঝেছিলাম মিত্র থিয়েটারের অবস্থা খারাপের দিকে, স্টারের সঙ্গে যে মামলা চলছিল, তা আজও মেটেনি। এদিকে স্টারের সঙ্গে 'মিত্র'রা যে বেশীদিন মামলা চালাতে পারবেন—তাও মনে হচ্ছে না। তাই এই সব গুরুতর ব্যাপারের জন্যেই কলকাতা যাওয়া দরকার অবিলম্বেই।

হ্যাঁ, এর মধ্যে একদিন পিরোজপুরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভাঁটার টান ছিল সেদিন, সে সময় খালের ধারে ধারে এক হাঁটু কাদা। কাদা পার হলে ঈষৎ উঁচু পাড়। সেই পাড় ঘেঁসে ঘেঁসে উকিলদের বসবার জায়গা। শিশিরের ইচ্ছে ছিল এখানকার জানাশোনা কোনো উকিলের সঙ্গে ওদের জমি জায়গার বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করে। নিজে কাদায় নেমে আমাকেও ডাকতে লাগল।

কিন্তু জল-কাদার অবস্থা দেখে আমার আর নামতে ইচ্ছে করলো না। আমি নৌকোতেই বসে রইলাম, ও চলে গেল।

কী পরামর্শ করলে জানি না, কিন্তু ওর মুখ দেখেই বুঝলাম ব্যাপার খুব সুবিধের নয়। সে সব কথা কিছু না ভেঙে আমার কাছে এসে মুখে জোর করে একটা হাসির রেখা টেনে বললে—বাড়ীর জন্যে মন কেমন করছে তো। এবার চলো, ফিরেই যাওয়া যাক।

মন কেমন করার কথাটা মিথ্যে নয়। তাই বাড়ী ফেরার কথায় উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। এমন কি খুলনায় নেমে যে প্রতিশ্রুতি মতো বিজয় ভাদুড়ীর বাড়ী যাবো—সে ইচ্ছাও হলো না। বাড়ী তখন আমাকে প্রবল টানে আকর্ষণ করছে।

ফিরলাম কলকাতায়—কিন্তু শেয়াল-দহতে না নেমে শিশির জোর করে নামালে দমদমে। বললে—বাইরে গাড়ী আছে, বসবে চল।

আমাকে প্ল্যাটফর্মে রেখে মুহূর্তের জন্য একবার বাইরে গিয়েছিল বটে, হয়ত সেই সময়ই সে গাড়ী ঠিক করে থাকবে। বাইরে গিয়ে দেখি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে বটে, তবে সে গাড়ীর ভিতরে বসে আছেন মিত্র থিয়েটারের ছোটবাবু জ্ঞান মিত্রমশাই। বুঝলাম, শিশির চিঠি (এমন কি টেলিগ্রামও হতে পারে) লিখে-টিখে আগে থাকতেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল 'মিত্র'দের সঙ্গে।

তা করুক, আমার আর আপত্তি কিসের? এখন তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছুতে পারলেই হয়। কিন্তু এ কি? গাড়ী চলছে কোনদিকে?

শিশির বললে—রাজারহাট-বিষ্ণুপুর।

—কেন? ওখানে কেন?

জ্ঞানবাবু বললেন—ওখানেই আপাততঃ তোমরা লুকিয়ে থাকো। মামলা চলছে, প্রবোধবাবু যদি হঠাৎ তোমাদের কলকাতায় দেখে ফেলে?

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর উলুখড়ের প্রাণ যায়। মামলা হচ্ছে স্টার থিয়েটারের সঙ্গে মিত্র থিয়েটারের—আমি ফেরারী আসামী নই, কিছু নই—আমার ব্যক্তিগতভাবে ভয়টা কিসের? ভয় আমার নয়—ভয়টা ও'দের। প্রবোধবাবুর সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তাতে প্রবোধবাবুর খপ্পরে একবার পড়লে তিনি আমাকে দিয়ে যা খুশী তাই করিয়ে নিতে পারেন। হয়ত আগেকার তারিখ দিয়ে একটা কন্ট্রাক্টই সই করিয়ে নিলেন—তখন? তখন 'মিত্র'রা যাবেন কোথায়?

যাই হোক, চুপ করে রইলাম। গাড়ী গিয়ে থামলো রাজারহাট-বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে এক ফার্লং-এর মধ্যে মনোরম ডাক-বাংলোটির সামনে।

বাংলোয় নেমে একটু সুস্থ হয়ে জ্ঞান-বাবুর কাছে মামলার বিষয় বুঝতে চেষ্টা করলাম। তখন যদি বুঝতাম যে, মামলার জন্যে আসলে আমার লুকিয়ে থাকার কোনো দরকার নেই—তাহলে কি এত কষ্ট করে ফেরারী আসামীর মতো লুকিয়ে লুকিয়ে থাকি? এ'রা আমার অপরিণত বাস্তব বুদ্ধির সুযোগ নিয়ে মামলার বিষয় আমাকে জানতেই দিতেন না—এখনও এড়িয়ে গেলেন। বললেন—মামলার খুঁটিনাটি বোঝার মত বুদ্ধি এখনও হয়নি। যা বলছি শোন, এখানে দিন কতক লুকিয়ে থাকো।

অগত্যা, থাকতেই হলো রাজারহাট ডাক-বাংলোয়। একদিন রাত্রে ঘুমুচ্ছি, গভীর রাত—দুটো-আড়াইটের কম হবে না—হঠাৎ একটা গাড়ীর হর্ণের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। ক্রমাগত হর্ণের আওয়াজ শুনে ভাবলাম এত রাত্রে গাড়ী নিয়ে আসবার মত কে আছে? তারপর ভাবলুম—হয়ত অন্য কোনো লোক হবে ডাক-বাংলোর সন্ধানে এসেছে।

খানিকক্ষণ পরেই দরজায় প্রবল ধাক্কা। ঘুমের ঘোর তখনো যেটুকু চোখে লেগেছিল, এই ধাক্কায় সেটুকুও ছুটে গেল। সাড়া দিয়ে বললাম—কে?

বাইরে থেকে বাজখাঁই দরোয়ানী গলায় হিন্দিতে হেঁকে সে বললে—দরওয়াজা খুলিয়ে।

পাশের জানালা দিয়ে দেখি, দূরে একটা মোটরগাড়ী দাঁড়িয়ে, রাস্তায় পড়েছে তার হেড লাইট।

শিশির চিৎকার করে বললে—কৌন হ্যায়? দরওয়াজা খুলেগা কাহে?

সেই বাজখাঁই দরোয়ানী গলায় উত্তর এল: প্রবোধবাবু হ্যায়। প্রবোধ গুহ।

আর যায় কোথায়? যার ভয়ে আসান-সোল-খুলনা-বরিশাল ঘুরে নিজের বাড়ী থাকতেও রাজারহাট ডাক-বাংলোয় পড়ে আছি—সে মানুষ একেবারে এখানে—বন্ধ দরজার ওপারে? কী করে টের পেলেন? সর্বনাশ! কী করা যায় এখন?

শিশির বললে—শিগগীর বাথরুমে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দাও।

তাই করলুম—দুরু-দুরু বক্ষে দাঁড়িয়ে রইলুম বাথরুমের ভেতরে। সে এক মহা অস্বস্তিকর ব্যাপার!

ওদিকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোনো সাড়া-শব্দ নেই। হঠাৎ রাত্রের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে দুজনের বিকট উচ্চহাস্যের শব্দে চারি-দিক মুখরিত হয়ে উঠল। দুটি মানুষই প্রাণখোলা উচ্চ হাসিতে শহরতলীর নৈশ-নির্জনতাকে যেন ভেঙেচুরে খান-খান করে দিচ্ছে।

ব্যাপারটা কি? উৎসুক হয়ে উঠল মনটা জানবার জন্যে।

ঠিক সেই সময় বাথরুমের দরজায় ঘা পড়তে লাগল। শিশিরেরই গলা শুনলুম—অহীন বেরিয়ে এসো।

বেরিয়ে এসে দেখি কোথায় প্রবোধবাবু? তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন জ্ঞান মিত্রমশাই—অর্থাৎ ছোটবাবু—মুখে এক গাল হাসি। বললাম—প্রবোধবাবু কোথায়?

আবার হাসি। হো-হো করে হাসতে হাসতে জ্ঞানবাবু বললেন—প্রবোধবাবু এখানে আসবেন কোথা থেকে? আমি দেখতে এলাম তোমরা সাবধানে আছো কিনা।

এতক্ষণে বুঝলাম—এ দরোয়ানী গলা জ্ঞানবাবুর!

তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—থিয়েটার ভাঙার পর ইচ্ছে হল তোমাদের একবার দেখে আসি—তাই চলে এলাম।

বলা বাহুল্য, বাকী রাতটুকু আর ঘুম হলো না—বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে নানা গল্প-গুজবে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিলাম। সকাল বেলায় উনি বললেন—তোমরা সাবধানে থাকো, আমি চললাম।

আমি বললাম—আপনিও থাকুন না। খাওয়া-দাওয়া করুন। মালতী রাঁধবে'খন।

ছোটবাবুর আবার নিজে রাঁধবার শখ ছিল। একটু ভেবে নিয়ে বললেন—তা মন্দ কথা নয়—রাঁধতে যদি হয় তবে মালতী কেন, আমি নিজে রাঁধব।

সারাদিনটা এভাবেই কাটল, বিকেলের দিকে উনি রওনা দিলেন। যাবার আগে বললেন—এত দূরে কষ্ট হচ্ছে অবশ্যই। এক কাজ করুন বরং। বোসের বাড়ীতে গিয়ে থাকুন। কি হে বোস, তোমার স্ত্রী তো এখন রায়ের কাঠিতে?

শিশির বললে—হ্যাঁ।

জ্ঞানবাবু বললেন—ব্যস সেই কথাই রইলো। অহীন্দ্রবাবুকে তুমি তোমার বাড়ীতে নিয়েই রাখো, এখানে থাকবার দরকার নেই। বাড়ীর বার না হলে আর কে টের পাচ্ছে?

শিশির বোস তখন ভাড়া থাকত রাজা রাজকিষেণ স্ট্রীটে একটু গলির ভিতর। নামজাদা কন্ট্রাকটর ছিল আদিত্যরা, সেই আদিত্যদের বাড়ী ছিল ওটা। আদিত্যকে আমি চিনতাম, আদিত্যটা পদবী, ওর আসল নামটা আজ অবশ্য মনে করতে পারছি না। আমি গিয়ে ওর অতিথি হলাম। শিশির বোসকে তখন মিত্রদের খুব দরকার ছিল বুঝলাম। এ ব্যবস্থায় খাস্ত হলো এই যে, আমিও বন্দী রইলাম, সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকেও পাওয়া গেল। শিশির করিৎকর্মা লোক, থিয়েটার সংক্রান্ত গোলযোগের ব্যাপারে শিশিরের কর্মদক্ষতা 'মিত্র'দের অবশ্যই তখন কাজে লাগবে।

দু-একদিনের মধ্যেই দেখি মণিমোহন এসে হাজির। প্রম্পটার মণিমোহন, অমর দত্ত মশাইয়ের আমলের লোক, শিশির ভাদুড়ী মশাইয়ের থিয়েটারে গোড়া থেকেই ছিল, এখন আছে মিত্র থিয়েটারে।

—কী ব্যাপার?

ও বললে—হাতে 'পার্ট' দেখছেন না? বাবুরা বলেছেন আপনাকে পার্ট বলাতে, তাই এসেছি।

—বেশ, বলাও।

দু-একদিন পার্ট বলার পর একদিন বললাম—ওহে মণিমোহন, পার্ট তো বলাচ্ছ, ওদিকে থিয়েটারের অবস্থা কি রকম?

মণিমোহন নীচু গলায় জবাব দিলে—অবস্থা খুব খারাপ। খুব সম্ভব উঠে যাবে।

—বলো কী?

—হ্যাঁ স্যার। আপনার ওপর তো ইনজাংকশন জারী হয়েছে কোন পক্ষেই যোগ দিতে পারবেন না।

বললাম—তাহলে? পার্ট বলাচ্ছ যে মিছিমিছি।

মণিমোহন বললে—ঐ একটা আশায়। ইনজাংকশনের পর তো আসল মামলা সুরু হচ্ছে। মামলার রায় তো যাহোক কিছু একটা হবেই। তখন হয় আপনাকে স্টারে যেতে হবে, নয় মিত্র থিয়েটারে। তাই পার্ট বলাচ্ছি যদি আপনাকে মিত্র থিয়েটারে আসতেই হয়। অবশ্য ততদিন যদি থিয়েটারও টি'কে থাকে।

মামলার তদ্বিরের জন্যই 'মিত্র'দের দরকার শিশির বোসকে। যদি দাঁড় করাতে পারে কেসটা।

মণিমোহনের কাছ থেকে আরও কাহিনী শুনি। প্রবোধবাবু মামলা নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন। শুধু এ-মামলাই নয়—এছাড়া আরও আছে। 'জনা'র রয়্যালটি নিয়ে শিশির ভাদুড়ী মশাইয়ের সঙ্গেও মামলা জুড়ে দিয়েছেন। 'জনা' গিরীশচন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত নাটক। গিরীশবাবুর একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)। দানীবাবু ছিলেন খুব সাদাসিধে ধরনের মানুষ, কোন ঘোর-প্যাঁচ বুঝতেন না কোনদিনই। দানীবাবু যখন স্টারে ছিলেন তখন প্রবোধবাবু ওঁকে দিয়ে 'জনা'র 'রাইট' লিখিয়ে নেন। ওদিকে এর অনেক আগেই যে 'জনা' শিশিরবাবুকে দানীবাবু দিয়েছিলেন তা তাঁর মনেই ছিল না। সম্ভবতঃ প্রবোধবাবুর ব্যাপারটা জানা ছিল, তাই লিখিত শর্তের মধ্যে এ কথা উল্লেখ করা ছিল যে যে-কেউ 'জনা'র অভিনয় করুক 'রয়্যালটি' প্রবোধবাবুকে দিতে হবে। শিশির ভাদুড়ী মশাই তত জানতেন না—তিনি হঠাৎ 'জনা' খুলে দিলেন। গোটা চারেক রাত্রি অভিনয় হয়ে গেল—প্রবোধবাবু কিছু বললেন না, কিন্তু তারপর বই জমে উঠতেই শিশিরবাবুর শিরে এসে পড়লো উকিলের চিঠি আর মামলার খড়্গ।

কিন্তু এদিকে আমার যে জীবন অসহ্য হয়ে উঠল। 'বন্দী' জীবন যাপন করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলাম। শিশির বোসকে একদিন ধরে বললাম: 'ভৌস, ইনজাংকশন যখন জারী হয়ে গেছে, তখন আর আমাকে আটকাচ্ছো কেন? এখন প্রবোধবাবু ধরলেও স্টারে যোগ দিতে পারছি না, মামলার রায় না বেরুনো পর্যন্ত, ওদিকে বাড়ীতে আমার বুড়ো-বাবা—স্ত্রীপুত্রকন্যা। ভাবো দেখি কথাটা?

ও ভেবে বললে—আচ্ছা, ঠিক আছে।

'মুক্তি' পেলাম, তাও দিন দুই পরে। বাবাকে বললাম সব খুলে একে একে। বাবা বললেন—কাগজে পড়েছি। তা এখন আর লুকিয়ে থাকা কেন?

বললাম—না, এখন বাড়ীতেই থাকব। বেরুলেই তো হাজার লোকের হাজার প্রশ্ন। তার চেয়ে চুপচাপ বাড়ীতে বসে থাকাই ভালো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর। আমার কথা শুনে আমার ভাগ্যবিধাতা নিশ্চয়ই মনে মনে হেসেছিলেন।

বোধহয় ঠিক তার পরের দিনের ঘটনাই হবে। তৎকালীন ম্যাডান থিয়েটারের অন্যতম ডিরেকটার জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই এসে হাজির।

মনে পড়লো বাবা একবার বলেছিলেন বটে। কে যেন ম্যাডান থেকে খুঁজতে এসেছিল—আমি তাই আমতা করে বললাম—হ্যাঁ—বাবা বলছিলেন বটে—

জ্যোতিষবাবু বললেন—আপনি যে ফিরেছেন তা আমি জানার আগেই সাহেব নিজে শুনেছে। আমি যেতেই বললে—এখুনি গিয়ে চৌধুরীকে নিয়ে এস। কী ব্যাপার মশাই আপনার? সেবার যখন এলাম আপনার বাবা বললেন: ওর ঠিকানা আমাদের জানা নেই। এমন উধাও হয়েছিলেন যে বাড়ীতে একটা ঠিকানা পর্যন্ত দেননি?

হেসে বললাম—উধাও হয়েছিলাম কি আর সাধ করে?

জ্যোতিষবাবু আর কথা বাড়ালো না, বললে—যাই হোক, চলুন বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে।

—এখুনি যেতে হবে?

—হ্যাঁ। ভীষণ দরকার। গিয়েই শুনবেন।

মনে মনে অবাক হলুম এই ভেবে যে ম্যাডানের সাহেব আমার আসার খবর জানলেন কি করে? পরক্ষণেই মনে পড়লো—আমাদের বাড়ীর ঠিক সামনেই ম্যাডানের অফিসের এক মাদ্রাজী কর্মচারী ভাড়া থাকতো—'মণি' তার নাম—ছোকরা বয়েস, সুদর্শন চেহারা আর বেশ স্মার্ট—সেই হয়ত খবরটা দিয়ে থাকবে সাহেবকে।

এখানে বলা দরকার যে 'সাহেব' কে? তিনি হলেন ফ্রামজী ম্যাডান—জে এফ ম্যাডানের মেজো ছেলে।

গেলাম একদিন সাহেবের কাছে। সাহেব আমাকে দেখে হেসে বললেন—কোথায় ছিলে?

আমতা আমতা করে বললাম—এই কাজকর্মে—

সাহেব হাসতে হাসতেই বললেন—আমাকে আর লুকোতে হবে না—আমি সব জানি। কেন যে ওসব হাঙ্গামের মধ্যে যাও—।

—এ হাঙ্গামের জন্যে কি আমি দায়ী?

সাহেব বললে—দায়ী তোমার নসীব। মামলা মোকদ্দমা সব নসীবেই করায়। যাক এখন কেন ডেকেছি শোনো—

—বলুন।

সাহেব বললে—তোমার মামলা চলুক—তোমাকে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি মনের আনন্দে নিজের কাজ করে যাও। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' ছবি তুলছি—'রাজসিংহের' ভূমিকা তোমার। কাল রাতেই জ্যোতিষ ব্যানার্জি মশাই তাঁর সমস্ত ইউনিট নিয়ে 'চরখেরী' যাচ্ছেন আউটডোর শুটিং-এর জন্যে। তোমাকেও যেতে হবে। শিয়ালদা থেকে যে এক্সপ্রেস ট্রেনটা দিল্লী যায়, সেই ট্রেনে যেতে হবে।

মনটা কিরকম হয়ে গেল—এই এত দূরে বাড়ী এসে বসলাম—অমনি রওনা!

—কী ভাবছো?

আমতা আমতা করে বললাম—সাহেব, হাতে টাকাকড়ি নেই। বাড়ীতে টাকা দিয়ে যাওয়া দরকার। মাইনে পাইনি ত?' তাই বলছিলাম—

সাহেব তাড়াতাড়ি বললে—এই কথা? কাল সকালেই কেশিয়ারের কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যাও। যদি আর কিছু বেশী দরকার থাকে—স্লিপে লিখে দিও—

(ক্রমশঃ)

অন্নদাশঙ্কর রায়

।। চব্বিশ ।।

ঝীণা মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে, ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের যখন একটা 'ডীল' হবে, তখন তাঁকে তার থেকে বাদ দিলে তিনি অনর্থ বাধাবেন। সেই অনর্থটা কী হতে পারে, তা নিয়ে আমরা দু' বছর আগে বলাবলি করেছি যে, ঝীণা আর যাই করুন ফৌজদারি করবেন না। তাঁর মেজাজটা দেওয়ানি। কিন্তু আমাদের সে-ধারণা যে ভুল সেটা প্রতিপন্ন হয় ১৯৪৬ সালের ১৬ই অগাস্ট। তাঁর কথা হলো তিনি এত-কাল শাসনতান্ত্রিক পথ ধরে কিছু পাননি। এবার দেখাবেন তাঁরও একটা পিস্তল আছে।

তা তিনি দেখিয়ে ছাড়লেন। সাতশো বছর যারা সুখে-দুঃখে একসঙ্গে বাস করে এসেছে, যারা ধর্মে এক না হলেও রক্তে এক, ভাষায় এক, সাধারণ স্বার্থে এক তারাও সাত মাসের মধ্যেই পরস্পরের উপর ঘেন্নায় রাগে অনাস্থায় বলতে লাগল, এর চেয়ে আলাদা হয়ে যাওয়া ভালো। পাঞ্জাবী হিন্দু শিখরাই আওয়াজ তুলল যে, পাঞ্জাব ভাগ করতে হবে। সে আওয়াজ ভারতের পূর্ব প্রান্তেও প্রতিধ্বনিত হলো। বাংলা ভাগ করতে হবে।

ঝীণা সাহেব ভোট নিয়ে মুসলমানের সম্মতি পেয়েছিলেন। এবার পিস্তল দেখিয়ে হিন্দু শিখের সম্মতিও পেলেন। বাকী রইল ইংরেজদের অনুমোদন। সেটার জন্যে পিস্তলের দরকার হবে না। তবে সরকারী খেতাব বর্জন করে একটা প্রতীকী প্রতিরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছিল। তোমরা যদি ধরে নিয়ে থাকো যে আমরা মুসলমানরা চির-কাল ভালো ছেলে হব সেটা ভুল। আমরাও দুষ্টু ছেলে হতে জানি। কেন আমাদের মিউটিনির মুখে ঠেলে দিচ্ছ?

মুসলমানরা ক্ষেপলে তাদের সায়েস্তা করার ক্ষমতা বা রুচি কোনোটাই ছিল না ইংরেজের। সে-কাজ যদি করতে হয় হিন্দুরাই করুক। কিন্তু ইংরেজ থাকতে নয়। তার আগেই ওরা বিদায় নেবে। শুধু-মাত্র কংগ্রেসের সঙ্গেই সেটলমেন্ট হবে— এ-প্রস্তাবে তারা নারাজ। একমাত্র কংগ্রেসই সারা ভারতের প্রতিনিধি এ-ঘোষণায় তারা বিশ্বাস করে না। কংগ্রেসে অহিন্দুরাও থাকতে পারে, তা বলে কংগ্রেসের হাতে অহিন্দুদের সঁপে দেওয়া যায় না।

স্বাধীনতা বলতে যদি বোঝায় বৃটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে ক্ষমতা আত্মসাৎ করা, তবে নেগোশিয়েসনসের কী দরকার? শক্তি থাকে তো কেড়ে নাও। কিংবা ছেড়ে যাচ্ছে, দখল করো। আর যদি বৃটেনের সঙ্গে বন্দোবস্ত বোঝায়, তবে যেটা হবে সেটা ক্ষমতা হস্তান্তর। সেটাতে মাইনরিটিরও একটা অংশ থাকবে। তবে সেটা পাকিস্তান আকারে না অন্য কোনো আকারে সে-প্রশ্নে বৃটেনের মাথাব্যথা নয়। মাইনরিটির পক্ষে কথা বলবার পাত্র মুসলিম লীগ। তাকে বাদ দিয়ে নেগো-শিয়েসনস নয়। তা সে যতই দাঁসাপনা করুক। ডাইরেক্ট অ্যাকশন করতে তাকে বাধা করল কে?

স্বাধীনতা বলতে গান্ধী বুঝতেন ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি। আর ঝীণা বুঝতেন হিন্দু মেজারিটির মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্তি। একজনের প্রতিপক্ষ ইংরেজ অপরজনের হিন্দু মেজারিটি। এঁদের মধ্যে মিটমাট ইংরেজ থাকতে হবার নয়। কিন্তু ইংরেজ গেলেও কি হবার? ইংরেজ গেলে কি হিন্দু মেজারিটি যাবে? হিন্দু মেজারিটি যেত শুধু একটি উপায়ে। সেটি দেশভাগ। সেইজন্যে ঝীণা অমন মরীয়া হয়ে উঠে-ছিলেন। তাঁর পাওনা এক পাউন্ড মাংস তিনি না পেয়ে ছাড়বেন না। কিন্তু খেয়াল ছিল না যে, কংগ্রেসও এক পাউন্ড মাংস চাইবে। প্রদেশভাগ।

তবে কংগ্রেসকে তিনি চিনতেন। গান্ধীর কাছে যেমন নীতি বড়ো, কংগ্রেসের কাছে তেমনি ক্ষমতা বড়ো। একটা সর্বশক্তিমান কেন্দ্র পেলে কংগ্রেস মুসলিম-প্রধান প্রদেশ বা অঞ্চল ত্যাগ করতেও পারে। যদি ইংরেজ সেটা রোয়েদাদ হিসাবে দেয়। স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিও কি কংগ্রেস অমনি নিত! নিল সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ হিসাবে। স্বতন্ত্র ইলেকটোরেট থেকে ক্রমে ক্রমে স্বতন্ত্র নেশন। একই বিবর্তনধারা। খানিকটা গিলবে, বাকীটা গিলবে না, এ কি কখনো হতে পারে? কংগ্রেস যদি গিলতে আপত্তি করে, তবে ইংরেজরা সেটলমেন্ট না করেই বিদায় নেবে। ক্ষমতার হস্তান্তর যদি আইন অনুসারে না হয়, তবে কংগ্রেসকে মানবে কে? মুসলিম সৈন্য কি লয়ালটির শপথ নেবে? মুসলিম রাজপুরুষরাও কি আনুগত্য জানাবেন? মুসলিম প্রজারাও কি বিদ্রোহ করবে না?

সত্যি তাই। নেহরু ও প্যাটেল দেখেন যে, মুসলিম সৈনিক, রাজপুরুষ প্রভৃতির আনুগত্য বড়লাটের শাসন-পরিষদের মুস-লিম সদস্যদেরই প্রতি। কংগ্রেস সদস্যদের তাঁরা আপনার মনে করেন না। এসব ডিস-লয়াল কর্মচারী নিয়ে গভর্নমেণ্ট চলবে কী করে, যখন ইংরেজ থাকবে না? বড়লাট চলে গেলে কি একটা দিনও এদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে? একটা হুকুমও কি এরা মানবে? তাহলে কেন এদের ধরে রাখা? হোক পাকিস্তান। যাক পাকিস্তানে।

ইতিমধ্যে বড়লাট মুসলিম লীগকে বলেকয়ে তাঁর শাসন-পরিষদে নিয়ে এসে-ছিলেন। তা না হলে ত্রিপাক্ষিক কথাবার্তা সম্ভব হতো না। দ্বিপাক্ষিক কথাবার্তা এগোত না। ইংরেজরা কেবলমাত্র কংগ্রেসের সঙ্গেই সেটল করত না। সেটলমেণ্ট বলতে ওরা বুঝত ত্রিপাক্ষিক সেটলমেণ্ট। ওর মধ্যে কোনো নূতনত্ব ছিল না। অন্যান্য বারের শাসন-সংস্কারেও ত্রিপাক্ষিক কথা-বার্তা হয়েছিল। দ্বিপাক্ষিকটা গান্ধীজীর আইডিয়া। যেমন গান্ধী আরউইন চুক্তি। ইংরেজরা একবার মাত্র ওটা হতে দিয়েছে। আর দেয়নি, ও দিত না। তার চেয়ে বিনা সেটলমেণ্টে প্রস্থান করত। গৃহযুদ্ধ বাধলে বাধত। সেটা যে অহিংস ব্যাপার হতো না, ঝীণার ডাইরেক্ট অ্যাকশন তারই প্রস্তাবনা।

ঝীণার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেবার জন্যেই গান্ধীজী নোয়াখালি যাত্রা করেন। সেখানে যদি তিনি হিন্দু-মুসলমানকে শান্তিতে রাখতে পারেন তো গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়ে যায়। তখন যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তা পিস্তলের মুখে নয়, শান্ত মনে। কিন্তু তাঁর নোয়াখালিতে পদার্পণের পিঠ পিঠ ঘটে গেল বিহারের ঘটনাবলী। আরো ভয়ঙ্কর, আরো ব্যাপক। তার কিছুকাল পরে পাঞ্জাবের ঘটনাবলী। আরো পৈশাচিক, আরো ব্যাপক। গান্ধীজী একসঙ্গে ক'টা জায়গায় যাবেন? ক'টা জায়গায় শান্তি স্থাপন করবেন? তাঁর সহকর্মীরা বিহারে

সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু সেখানেও জবাহরলালকে বোমাবর্ষণের হুমকি দিতে হলো। স্টেট ভায়োলেন্স যদি সঙ্গে সঙ্গে চালানো যায়, তাহলে অহিংসার উপর লোকের নির্ভরতা থাকে কোথায়? নোয়াখালিতে দেখা গেল লোকে মিলিটারীর উপস্থিতি চায়। গান্ধী বার বার বারণ করা সত্ত্বেও মিলিটারী গিয়ে সেখানে হাজির হয় ও তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, গান্ধী না থাকলে মিলিটারী থাকে না, সুতরাং মহাত্মা থাকুন, তাঁর থাকার ফলে মিলিটারীও থাকবে। কী সুন্দর লজিক!

গান্ধীর থাকার উপর মিলিটারীর থাকা নির্ভর করছে এটা বুঝতে পেরে নোয়াখালির মুসলমানরা বেঁকে বসে। ওরা বলে, গান্ধীর চলে যাওয়াই উচিত, তাহলে মিলিটারীও চলে যাবে। ওদের দোষে মিলিটারী এসেছে এটা ওরা বুঝবে না। দোষ অস্বীকার করবে। তাহলে আর অন্তঃপরিবর্তন হলো কোথায়? রুস্তুই কতক লোককে ধরে নিয়ে যায়, বিচার করে, কারো কারো সাজা হয়। হিন্দুদের আস্থা ফিরে আসে মুসলমানদের গ্রেপ্তার, বিচার ও সাজা দেখে। কিন্তু তার ফলে মুসলমানদের রাগ চড়ে যায়। তারা আরো জোরসে পাকিস্তান দাবী করে।

গান্ধীজী উপলব্ধি করেন যে, তিনি এতকাল যে-অহিংসা শিখিয়ে এসেছেন সে-অহিংসা বীরের অহিংসা নয়, দুর্বলের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। সে-বস্তু অরাজকতার দিনে কাজ দেয় না। তিনি অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেন। তাঁর, মনে বোধহয় একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে, বৃটেনের সদিচ্ছায় আস্থা হারিয়ে কংগ্রেস-নেতারা ইন্টারিম গভর্ণমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসবেন। তখন মুসলিম লীগের ষাঁড়ের সামনে আর কংগ্রেসের লাল ন্যাকড়া থাকবে না। ষাঁড়ের ষণ্ডামি থামবে। মুসলিম লীগের ষণ্ডামি থামলে হিন্দুরাও নিকম্প হবে। তখন জন বুলের বিরুদ্ধে গণ-সত্যাগ্রহের কথা ভাবা যাবে।

কিন্তু কংগ্রেস-নেতাদের মনোভাব ছিল ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মতো। তাঁরা অনেককাল ভ্রমণ করেছেন। আর ভ্রমণে যাবেন না বলে মনস্থির করে ফেলেছেন। ইংরেজরাও চান না যে, কংগ্রেস-নেতারা পদত্যাগ করে আবার গণ-সত্যাগ্রহে উদ্যোগী হন। দু' পক্ষেই একটা দীয়তাং নীয়তাং ভাব। বড়ো বড়ো সমস্যা ছিল তিনটে কি চারটে। সেগুলোর যদি সমাধান হয়ে যায়, বৃটেন কালকেই চলে যেতে রাজী। গান্ধীজী যে ভেবেছিলেন কংগ্রেস পদত্যাগ করে আবার সংগ্রাম করবে তার দরকারই হয় না।

বড়ো বড়ো সমস্যার প্রথমটা ছিল সিভিল সার্ভিস ও আর্মির ভবিষ্যৎ। স্থির হয়ে গেল যে, যারা অবসর চায়, তারা যদি অভারতীয় হয়ে থাকে, তবে তারা পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ পাবে। যারা কাজ করতে রাজী, তারা যদি অভারতীয় হয়ে থাকে, তবে তারা অবসর নেবার সময় পেনসন তথা ক্ষতিপূরণ পাবে। আর যারা ভারতীয় তাদের কপালে ক্ষতিপূরণ নেই, কিন্তু আর সব আছে। অবসর নিলে তারা পেনসন পাবে। কাজ করলে তারা মাইনে ইত্যাদি আগের মতো পাবে। তাদের প্রসপেকটস বরং আরো ভালো হবে। সুতরাং ক্ষতিপূরণের কথা মুখে এনেছ কি মরেছ!

এর পরের সমস্যা হলো মাইনরিটির ভবিষ্যৎ। তারা যদি তাদের জন্যে আলাদা একটা রাষ্ট্র চায়, তবে কি মেজরিটি তাতে রাজী হবে? এই যে প্রশ্ন এটা ওয়েভেল থাকতে মিটল না। তিনি বা অন্যান্য বৃটিশ আর্মির লোকেরা সৈন্যদল ভেঙে দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কত কষ্টে গড়া হয়েছে, যাকে তাকে কি এককথায় তছনছ করে দেওয়া যায়? ওয়েভেলকে গান্ধী ভুল বুঝেছিলেন, আরো অনেকে ভুল বুঝেছেন। তিনি কিন্তু পার্টিশনের বিপক্ষেই ছিলেন। তাঁর ছিল আজব এক পরিকল্পনা। তাতে বৃটিশ নর-নারীর জীবন নিরাপদ হতো, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের জীবন বিপন্ন হতো। কে জানে হয়তো বিপন্ন হয়েই ওরা নিজেদের মধ্যে একটা ঘরোয়া মিটমাট করত। তৃতীয়পক্ষের সাহায্য নিত না। গান্ধী তো একটা ঘরোয়া মিটমাটই চেয়েছিলেন, তাতে তৃতীয়পক্ষের হাত থাকত না।

কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ওয়েভেলকে সরিয়ে দিয়ে মাউণ্টব্যাটেনকে পাঠালেন ও তার আগেই ঘোষণা করে দিলেন যে, ইংরেজরা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই অপসরণ করবে। ক্ষমতা হস্তান্তর কার হাতে করবে সেটা নির্ভর করবে দেশের নেতারা একমত না একাধিকমত। একাধিকমত হলে একাধিক হাতে, একমত হলে এক-হাতে। তার মানে ভারত ভাগ হয়ে যেতে পারে। যদি কংগ্রেস-লীগ ভিন্নমত হয়। এই ওয়ার্নিংটা পেয়ে কংগ্রেসনেতারা যে লীগ-নেতাদের সঙ্গে হাত মেলাবার চেষ্টা করলেন তা নয়। আর লীগ-নেতারা যে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হলেন তাও নয়। তাঁদের কাছে ওটা ওয়ার্নিং না হয়ে গ্রীন সিগন্যাল। দেশ ভাগ হয়ে যেতে পারে এর মধ্যে আশঙ্কার কী আছে? এ তো পরম আশ্বাসনার কথা।

মাউণ্টব্যাটেন আসার আগেই রব উঠেছিল, পাঞ্জাব ভাগ করা হোক, কিছুদিন যেতে না যেতে প্রতিধ্বনি উঠল, বাংলা ভাগ করা হোক। গান্ধীজীর অমতে কংগ্রেস প্রদেশ ভাগে রাজী হয়ে যায়। মাউণ্টব্যাটেন যখন বলেন যে ঝীণা দেশভাগের বেসিস ছাড়া অন্য কোনো বেসিসে মিটমাট করবেন না তখন কংগ্রেস নেতারা বলেন, বেশ তো সেই সঙ্গে প্রদেশ ভাগও হয়ে যাক। তখন দ্বিতীয় সমস্যাটারও মীমাংসা হলো। একটা নয়, দুটো কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তাদের মধ্যে সরকারী বিভাগগুলো ভাগ করে দেওয়া হবে। অখণ্ড ভারত নয়, দ্বিখণ্ড ভারত। অখণ্ড বঙ্গ নয়, দ্বিখণ্ড বঙ্গ। অখণ্ড পাঞ্জাব নয়, দ্বিখণ্ড পাঞ্জাব। আসামের থেকে সিলেট বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ববঙ্গের সামিল হবে, যদি লোকে তাই চায়। তেমনি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পাকিস্তানের সামিল হবে, যদি লোকে চায়।

অতি সহজ সমাধান। কিন্তু কেউ ভেবে দেখলেন না উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মুসলমানদের কী দশা হবে। তাদের এক্‌লও গেল, ওক্‌লও গেল। তেমনি দুই রাষ্ট্রের মাইনরিটিদের কী হবে। এসব ভাববেন আর কে? সেই গান্ধী। কিন্তু তাঁর সহকর্মীরা যখন মাউণ্টব্যাটেনের সঙ্গে মীমাংসা করে ফেলেছেন আর মুসলিম লীগও যখন সে মীমাংসায় সম্মত তখন তিনি একা কী করতে পারেন? দেশকে ডাক দিয়ে বলতে পারেন, এ সমাধান ঠিক নয়। এটা অগ্রাহ্য
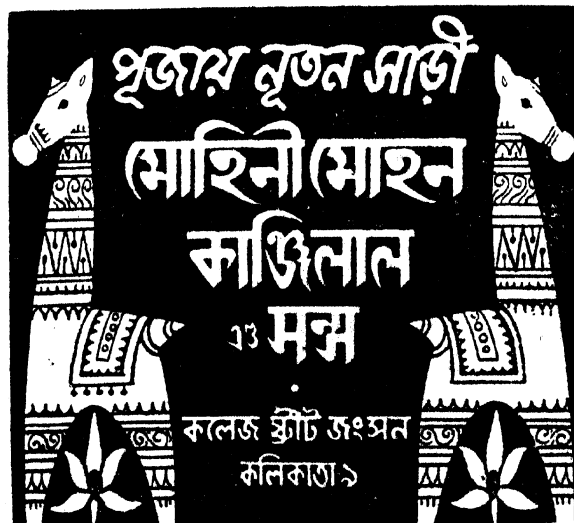
জন্যে। কিন্তু কোন সমাধানটা ঠিক? কোনটা নির্ভুল? ক্যাবিনেট মিশনের সমাধান তো তিনি নিজেই সংশোধন করতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন। আসামের গ্রাম্য না কাটালে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম অপরের গ্রাহ্য হবে না। আর তাতে যে বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা কংগ্রেস নেতাদের অগ্রাহ্য। তাঁরা বরং দ্বিকেন্দ্রীকরণ নেবেন, তবু বিকেন্দ্রীকরণ নয়। কিন্তু দ্বিকেন্দ্রীকরণ নিলে এই শর্তে নেবেন যে বাংলা ও পাঞ্জাব দ্বিধাবিভক্ত হবে।

গান্ধীজী আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে বাংলা অন্তত ভাগ না হয়। তেমনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ঝীণা। তেমনি বাংলার গভর্ণর বারোজ। তিনি ইউরোপীয়দের দিক থেকে। কিন্তু সেটা সম্ভব হতো অন্য একটি ফরমূলা মেনে নিলে। পার্টিশন ফরমূলা নয়, বলকান ফরমূলা। অর্থাৎ ক্ষমতার হস্তান্তর হবে প্রদেশওয়ারি। পরে প্রদেশের সঙ্গে প্রদেশের জোড়া লেগে অখণ্ড ভারতও হতে পারে, দ্বিখণ্ড ভারতও হতে পারে, বহুখণ্ড ভারতও হতে পারে। এই ফরমূলাটিও মাউণ্টব্যাটেনের ঝুলিতে ছিল। তাঁর ইউরোপীয় সাঙ্গোপাঙ্গরা ওটি উদ্ভাবন করেছিলেন। কতকটা ইউরোপীয় স্বার্থে, কতকটা মুসলিম স্বার্থে। ও ফরমূলা মেনে নিলে বাংলা স্বতন্ত্র হতে পারত, আসামও স্বতন্ত্র হতে পারত, দুই মিলে অর্ধ পাকিস্তান হতে পারত। কিন্তু জবাহরলাল জানতে পেরে ওটা নাকচ করেন ও পার্টিশনের ভিত্তিতেই মীমাংসা করেন। দুটো মন্দের মধ্যে যেটা কম মন্দ সেটাই বেছে নেন। জনমতও সেইটের পক্ষে।

এমনি করে দ্বিতীয় বৃহৎ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। মাইনরিটির ভবিষ্যৎ কী হবে তার উত্তর। এর পরে তৃতীয় বৃহৎ প্রশ্ন। ইউরোপীয়দের ভবিষ্যৎ কী? তাঁরা এদেশে দুই-শতাব্দী ধরে ব্যবসাবাণিজ্য করে আসছেন। তাঁদের কি তবে পাততাড়ি গুটোতে হবে? সাম্রাজ্য গুটিয়ে নেওয়া মানে কি বাণিজ্য গুটিয়ে নেওয়া? এর উত্তর, ভারত ও পাকিস্তান ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে কমনওয়েলথে অবস্থান করতে সম্মত। একবার যখন এই প্রশ্নটার মীমাংসা হয়ে গেল তখন মাউণ্টব্যাটেন সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলেন যে ১৫ই অগাস্টের মধ্যে সব কিছু সেরে ভারত থেকে অপসরণ করবেন। আর দেরি করার কারণও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

ইংরেজরা গান্ধীজীর সঙ্গে মীমাংসার আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিছুতেই তিনি মাইনরিটিদের ভবিষ্যতের প্রশ্নে আপস করতেন না। তাঁর মতে ওর মীমাংসা ব্রিটেন থাকতে নয়। ওটা আমাদের ঘরোয়া প্রশ্ন। আমরা দুভাই যেমন করে পারি মেটাব। দরকার হলে লড়ব। আর নয়তো দেশ ভাগাভাগি করব। কিন্তু কেউ আমাদের মাঝখানে থেকে নীলাম দর চড়িয়ে দেবে না। আগে ইংরেজ যাক, হয় কংগ্রেসের হাতে সারা দেশটা দিয়ে যাক, নয় লীগের হাতে। তাঁর ও প্রস্তাব কেউ সমর্থন করে না। ওটা কাজের কথা নয়।

অথচ মাইনরিটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত রেখে ব্রিটেন এদেশ থেকে বেরোতে পারছিল না। দেশীয় রাজাদের সে তাদের নিজেদের হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিল। প্যারামাউণ্ট পাওয়ার নিজেও থাকবে না, আর কাউকেও করবে না। কার্যত ওরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেই জুড়ে যাবে। ওদের জন্যে ব্রিটেনের মাথাব্যথা ছিল না। ছিল মুসলিমদের জন্যে। তার একটা কারণ তো এই যে কংগ্রেসের সঙ্গে সংগ্রামে ওরা মোটের উপর সংগ্রামের বাইরে থেকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে। তা ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল। সেটা আমার এক ইউরোপীয় বন্ধুর মুখে শুনি। পার্টিশন হতে যাচ্ছে এই জন্যে যে, "ওদেশের মিডল ইস্টার্ণ পলিসির অঙ্গ হচ্ছে এদেশের মুসলিম পলিসি। এখানকার মুসলমানদের চটালে মিডল ইস্টে আমরা টিকতে পারব না।"

পার্টিশনে রাজী না হলে যা হতো তা বলকান সৃষ্টি। গান্ধীজীর তাতে আপত্তি না থাক কংগ্রেসের ছিল। রাজনীতিতে সেইটেই বরণীয় যেটাতে কম মন্দ। পরে গান্ধীজীও সেটা বুঝতে পেরে কংগ্রেস নেতাদের সমর্থন করেন। সিদ্ধান্তটা তাঁদের, সমর্থনটা তাঁর। এরপর তিনি নোয়াখালীতে ফিরে যাবার জন্যে রওনা হন। কিন্তু পথে কলকাতায় সুরাবর্দী তাঁকে আটক করেন। কলকাতার মুসলমানরা সন্ত্রস্ত। কে জানে, ১৫ই অগাস্ট কী হয়। হিন্দুরা হয়তো প্রতিশোধ নেবে। তারপর সারা বাংলা জুড়ে হিংসা প্রতিহিংসার তাণ্ডব চলবে। গান্ধীজী কলকাতায় থামেন ও তাঁর অলৌকিক প্রভাবে অবস্থা শান্ত হয়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য

কি এবং কেন (১৪) কৃত্রিম রেশম ও পশম

পুজোর বাজারে আজকাল সুতীর পোশাক-পরিচ্ছদের চেয়ে রেয়ন, নাইলন বা টেরিলিনের পোশাক-পরিচ্ছদের বেশি চলন দেখা যায়। আবহমানকাল থেকে মানুষ তার পরিধেয় কাপড়-জামা তৈরীর জন্যে তিনটি ভিন্নজাতীয় স্বাভাবিক তন্তুর ব্যবহার করে আসছে। এরা হলো তুলা, রেশম ও পশম। এদের মধ্যে তুলা হচ্ছে উদ্ভিজ্জ পদার্থ—কার্পাস গাছের বীজের আবরণ হিসেবে উৎপন্ন হয়। রেশম হচ্ছে রেশম-কীটের মুখ-নিঃসৃত লালা থেকে সৃষ্ট একরকম তন্তু। আর পশম হচ্ছে ভেড়ার লোম থেকে প্রস্তুত তন্তু। তাহলে রেশম ও পশম হচ্ছে প্রাণিজ পদার্থ।

রাসায়নিক বিচারে কার্পাস তুলো হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনঘটিত একটি রাসায়নিক পদার্থ। যাকে বলা হয় সেলুলোজ। রাসায়নিক সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্বেতসার ও শর্করার মতো সেলুলোজও কার্বোহাইড্রেট শ্রেণীর অন্তর্গত একটি পদার্থ। কার্বোহাইড্রেট বলতে আমরা বুঝি, এমন সব পদার্থ যাদের অণু গঠিত হয় কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সমবায়ে এবং এদের অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত থাকে জলে বর্তমান হাইড্রোজেন ও অকসিজেন পরমাণুর অনুপাতের সমান, অর্থাৎ দুভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন। সেলুলোজ হলো একটি অতিকায় অণুগঠিত পদার্থ। প্রায় তিন হাজারটি ক্ষুদ্রাকার একজাতীয় একক অণু পরস্পর জুড়ে এক একটি সেলুলোজ অণু সৃষ্টি করে।

রেশম এবং পশমও সেলুলোজের মতো অতিকায় অণুগঠিত পদার্থ। তবে এদের আণবিক সংযুক্তিতে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু ছাড়াও নাইট্রোজেন পরমাণু বর্তমান থাকে। পশমে অধিকন্তু থাকে গন্ধকের (সালফার) পরমাণু। রাসায়নিক সংজ্ঞা অনুযায়ী রেশম ও পশম হচ্ছে প্রোটিন জাতীয় পদার্থ। রেশমের প্রোটিনকে বলা হয় ফাইব্রোয়াম এবং পশমের প্রোটিনকে বলা হয় কেরাটিন।

বহু ক্ষুদ্রকায় অণু যখন জুড়ে গিয়ে একটি অতিকায় অণু সৃষ্টি করে, তখন তার আকার হয় দীর্ঘ চেন বা সুতোর মতো। সেলুলোজ, ফাইব্রোয়ান এবং কেরাটিন দীর্ঘ চেনের আকার ধারণ করে বলে তন্তু হিসাবে তাদের ব্যবহার করা হয়।

প্রায় চার হাজার বছর আগে চীন দেশে প্রথম কীটের মুখ-নিঃসৃত লালা থেকে উৎপন্ন রেশম দিয়ে কাপড় তৈরী শুরু হয়। পরবর্তীকালে এই রেশমশিল্প জাপানে ও ফরাসী দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

তিনশো বছর আগে ১৬৬৪ সালে বিখ্যাত আইরিশ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল লিখেছিলেন : সম্ভবত এমন কোনো উপায় উদ্ভাবিত হবে যার দ্বারা রেশম কীটের মুখনিঃসৃত লালার মতো আঠালো পদার্থ মানুষ তৈরী করতে পারবে এবং তা থেকে যে তন্তু হবে তা গুণে রেশমের বা রেশমের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হতে পারে।

বয়েলের উক্তির দুশো কুড়ি বছর পরে ১৮৮৪ সালে জোসেফ সোয়ান নামে একজন ইংরেজ যুবক কিছু নাইট্রো-সেলুলোজ (সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন) সিরকায় (ভিনিগার) গুলে সেই দ্রবণ একটি দীর্ঘ নলের বহু সূচীমুখ রন্ধ্রের ভিতর দিয়ে সজোরে সুরাসারের (অ্যালকোহল) মধ্যে নির্গত করেন। এ উপায়ে সৃষ্টি হলো একরকম দীর্ঘ সূক্ষ্ম তন্তু। তা থেকে সুতো তৈরী করে সোয়ান কাপড় বুনতে সক্ষম হন। ঐ কাপড় বাহারে ও স্পর্শে হলো রেশমের মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল। এর নাম দেওয়া হলো কৃত্রিম রেশম। কিন্তু উদ্যমের অভাবে সোয়ান এই কৃত্রিম রেশমকে বাজারে চালু করতে পারলেন না। একাজে সফল হলেন প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের ছাত্র কাউন্ট লুই মেরি হিলেয়ার দ্য সার্দোনে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের আরও কয়েকটি সহজ ও সুলভ উপায় আবিষ্কৃত হলো এবং এই কৃত্রিম রেশম 'রেয়ন' নামে বাজারে চালু হলো।

সস্তা দরের সেলুলোজ হচ্ছে রেয়নের প্রধান উপাদান। রাসায়নিক সংযুক্তিতে সেলুলোজ ও রেয়নে কোনো প্রভেদ নেই। শুধু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সেলুলোজের তন্তুকে রেশমের ভৌত ধর্ম আরোপিত করা হয়। এ কারণে রেয়নকে প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম তন্তু বলা যায় না।

রসায়ন-বিজ্ঞানীরা তাই রেয়ন প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। রসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রকৃত কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুতের জন্যে তাঁরা চেষ্টা চালাতে লাগলেন। এর ফলে ১৯৩৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রসায়ন-বিজ্ঞানী ক্যারোথারস্ বহু ব্যয়ব্যাপী কঠোর পরিশ্রম ও বহু ব্যয়সাধ্য পরীক্ষার পর স্বাভাবিক রেশমের অনুরূপ প্রকৃত কৃত্রিম তন্তু আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত এই কৃত্রিম তন্তু 'নাইলন' নামে অভিহিত (নাইলন বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি)।

বিজ্ঞানীরা কয়েক রকমের কৃত্রিম পশমও প্রস্তুত করেছেন। কৃত্রিম পশম প্রস্তুতের মূল উপাদান হচ্ছে নানা জাতীয় প্রোটিন। আজকাল নানারকম কৃত্রিম পশম চালু হয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুধের প্রোটিন কেসিন থেকে প্রস্তুত লেনিটাল, খাদ্যশস্য করন বীজের প্রোটিন 'ঝিন' থেকে প্রস্তুত ভিকারা এবং চীনা-বাদামের প্রোটিন থেকে প্রস্তুত আর্ডিল। সয়াবিনের প্রোটিন, ডিমের প্রোটিন এবং পাখীর পালকের প্রোটিন কেরাটিনও বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পশমতন্তু প্রস্তুতে ব্যবহার করছেন।

আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে একাধিক রেয়ন প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে উৎপাদন-হার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কৃত্রিম তন্তুর চাহিদা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন, অর্ডিল ইত্যাদি কৃত্রিম তন্তু অচিরে যে স্বাভাবিক তন্তুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

লেসার-রশ্মির সাহায্যে অস্ত্রোপচার পদ্ধতির সামনে অধ্যাপক ভিস্‌নেভস্কি

লেসারের সাহায্যে রোগ নিরাময় ও অস্ত্রোপচার

আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময়কর অবদান লেসার। এই লেসার রশ্মির নানাবিধ প্রয়োগের কথা আমরা শুনেছি ও জেনেছি। সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার আকাদেমী অফ মেডিসিন-এর অধ্যাপক ভিস্‌নেভস্কি লেসারের একটি অভিনব প্রয়োগের কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে একদল রুশ বিজ্ঞানী লেসার রশ্মিকে রোগ নিরাময় ও অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন করেছেন। দেহের ওপর লেসার রশ্মি প্রয়োগের একটা মস্ত বড় সুবিধা হচ্ছে, লেসার রশ্মি দেহের চামড়ার কোনো ক্ষতি করে না। দেহের জীবন্ত সুস্থ কোষ লেসার রশ্মির দ্বারা বিনষ্ট হয় না। কিন্তু লেসার রশ্মির সাহায্যে দেহের রঞ্জকজনিত দাগ, উল্কির দাগ বা মুখের দাগ সহজেই দূর করা যায়।

সোভিয়েত রাশিয়ার ভিস্‌নেভস্কি ইনস্টিটিউটে বিচ্ছিন্ন অক্ষিপট সংযোজনের কাজে লেসার রশ্মি প্রয়োগ করে ইতিমধ্যেই সাফল্য অর্জন করা গেছে। এখন অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে লেসার-রশ্মির প্রয়োগ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। মানুষের দেহের ওপর লেসার-রশ্মির কার্যকারিতা নির্ভর করে কি ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার কর্মক্ষমতার ওপর। জীবন্ত কোষের অবস্থার ওপরও লেসার বিকিরণের কার্যকারিতা নির্ভর করে। খরগোশের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, খরগোশের দুষ্ট অর্বুদ লেসার বিকিরণের দ্বারা নির্মূল করা যায়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের আগে আরও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

তবে ভিসনেভস্কি ইনস্টিটিউটে রুশ বিজ্ঞানীরা অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে লেসার রশ্মি প্রয়োগ করে ইতিমধ্যেই কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছেন। এই কাজের জন্যে তাঁরা যে বিশেষ ধরনের যন্ত্র নির্মাণ করেছেন তাতে কয়েকটি ছোট ছোট নল থাকে এবং নলের ডগায় থাকে দর্পণ ও স্বচ্ছ দণ্ড। এগুলি হচ্ছে আলোক-পরিবাহক এবং প্রয়োজনীয় যে কোনো দিকে এগুলি দিয়ে লেসার রশ্মিকে সঞ্চালিত করা যায়। এগুলির সাহায্যে দেহের যে কোনো স্থানে লেসার-রশ্মি অনুপ্রবিষ্ট করানো যায়। অস্ত্রোপচারের কাজে এই লেসার রশ্মি হচ্ছে শল্য-চিকিৎসকের ছুরির মতন। এই লেসার 'ছুরি' দিয়ে অস্ত্রোপচারের সময় রক্তপাত হয় না বা কোনো রকম যন্ত্রণাও হয় না। এই অভিনব হাতিয়ারের সাহায্যে শল্য চিকিৎসক যেমন দেহ-কলার (টিস্যু) উপরিভাগ দেখতে পান, তেমনি আবার দেহাভ্যন্তরের অস্থি ও অবাঞ্ছিত কোনো বস্তু থাকলে তা-ও দেখতে পান। বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ ব্যবহার করে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ নির্ণয়ও করতে পারেন। কারণ বিভিন্ন রকম বিকিরণ রোগাক্রান্ত দেহ কলা থেকে বিভিন্ন রকম সংকেত চিকিৎসককে জানিয়ে দেয়।

মৎস্যচাষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছের স্থান সর্বাগ্রে। কিন্তু আজকাল মাছ খাওয়া এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও কোনো রকমে মাছ পাওয়া যায়, কিন্তু তার দাম শুনলে পিছিয়ে আসতে হয়। তাই অনেক সময় বিনা মাছেই আমাদের আহার-পর্ব সারতে হয়।

ভারতীয় বিজ্ঞানী ও মৎস্যচাষ বিশেষজ্ঞ ডঃ বি আই সুন্দররাজ এ বিষয়ে আমাদের আশার বাণী শুনিয়েছেন। কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে মাছের চাষ বৃদ্ধি করা যায় সে সম্পর্কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন।

শিঙি মাছ বছরে একবারমাত্র ডিম পাড়ে। তার ডিম পাড়ার সময় বর্ষাকালে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। শিঙি মাছ কেন এই সময়ে ডিম পাড়ে তা নিয়ে ডঃ সুন্দররাজ পাঁচ বছর আগে এক গবেষণায় ব্যাপৃত হন। তাঁর ধারণা, এতদিনে তিনি এর উত্তর খুঁজে পেয়েছেন।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের গবেষণার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, সাধারণত মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত যে সময় সূর্যের আলো দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়, তখন শিঙি মাছের ডিম্বাশয় পরিপুষ্টি লাভ করে। তাই জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ডিম পাড়ার উপযুক্ত সময়।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বৈদ্যুতিক আলো প্রয়োগ করে তিনি বিস্ময়কর ফল পেয়েছেন। বৈদ্যুতিক আলো প্রয়োগের ফলে মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে শিঙি মাছ পাঁচবার ডিম দিয়েছে এবং প্রতিবারই ঐ ডিম থেকে প্রায় ১০ হাজার বাচ্চা পাওয়া গেছে।

ডঃ সুন্দররাজ বলেছেন, রুই মাছের ক্ষেত্রেও এই আলো প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যাবে। রুই মাছ বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে না, একমাত্র স্রোতস্বিনীতেই ডিম পাড়ে। কিন্তু বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে বদ্ধ জলাশয়েও রুই মাছকে দিয়ে ডিম পাড়ানো যায়।

গত জুন মাসে ইতালীর ফ্লোরেন্স শহরে অনুষ্ঠিত এক বিশেষজ্ঞ সম্মেলনে ডঃ সুন্দররাজ তাঁর গবেষণার ফলাফলের কথা জানান। পরের মাসে ভারতের কটক শহরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আলোচনা বৈঠকেও তিনি তাঁর গবেষণার কথা আলোচনা করেন।

তাঁর পরবর্তী গবেষণা হচ্ছে শিঙি মাছকে দিয়ে বছরে পাঁচ বারের বেশি ডিম পাড়ানো যায় কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা। তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমাদের মৎস্য সমস্যার অনেকখানি সুরাহা হবে।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দীপা ঢুকল কেবিনে।

গুডমর্ণিং, মিসেস পোচকানওয়ালা। ফিলিং ফাইন?

থ্যাংকস্, ভালই। একটা অন্যায় করেছেন আপনি। অভিযোগ করলেন মিসেস পোচকানওয়ালা।

কি বলুন—দীপা তাকাল তাঁর দিকে।

আপনি টিউমারটা আমায় দেখাননি।

কি করে দেখাব? আপনি ত তখন অজ্ঞান হয়ে আছেন।

অজ্ঞান অবস্থায় কোন উল্টোপাল্টা কথা বলিনি ত।

না, আপনি কিছুই বলেননি। আশ্বাস দিল দীপা।

আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বললেন মিসেস পোচকানওয়ালা—যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন আপনি। সহজে তিনি প্রশংসা করেন না।

করিডরে দীপার জুতোর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হ'ল। দীপা নীচে নেমে কিচেনে ঢুকল এবার।

ওসমান কি রেঁধেছ আজ?

ফিসফ্রাই, ম্যাগ্রো সুপ আর পুডিং

দেখি পুডিং—।

ওসমান পুডিং ট্রেটা বার করল ফ্রিজ থেকে। তারপর সেটা দীপার সামনে ধরল। নীচু হয়ে একবার ঘ্রাণ নিয়ে দীপা বলল—ভানিলা বেশী দিয়েছ, আর একটু কম দেবে। কিন্তু বেশ জমেছে।

খুশী হল ওসমান।

মালতী, তোমার মেনু কি?

নির্মল সরকার

শুক্তো, ছানার ডালনা, ভেজিটেবল চপ।

ভে-র-রি গুড। খুশী হয়ে কথাটা এইভাবে উচ্চারণ করে দীনা।

দিদিমণি—ডাকল মালতী। মালতী দীনাকে মেমসায়েব বলে না। এ ডাকটা ভাল লাগে দীনার।

কি বল। ফিরে দাঁড়াল সে।

মালতী চুপ করে রইল মাথা হেঁট করে।

বুঝেছি মালতী; কিন্তু বাবলুকে আর চাকরী দেওয়া সম্ভব নয়।

এবারটার মত।

না। কথাটা বলে আর দাঁড়াল না দীনা, সোজা উঠে গেল উপরে।

নারসিং হোম থেকে ফিরে সনতের ঘরের দরজাটা খোলা দেখে দীনা একবার পর্দাটা নাড়া দিল।

এস বৌদি—ডাকল সনৎ।

তুমি আজ অফিস যাওনি।

আজ আমাদের ছুটি।

আমাদের ছুটি নেই ছোড়দা।

নিলেই পার, তোমরা পরের দাসত্ব কর না যখন।

দাসত্বের চেয়ে আরও সাংঘাতিক আমাদের কাজ। সে থাক তুমি কিন্তু অফিস পালিয়েছ বলে মনে হচ্ছে। সম্প্রতি এটা তোমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

শুধু শুধু অফিস পালাব কেন।

তাই নাকি? সাধু সাজছ? গত রবিবার সুপর্ণার সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলে? কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল দীনা।

সুপর্ণা নয় সুপর্ণার বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।

কই, আগে ত এই রোগ ছিল না তোমার।

ভদ্রলোক বললেন, আমি কি করে না বলব বল। কৈফিয়ৎ দিলে সনৎ।

আহা কি লক্ষ্মী ছেলে! একটা মুখ-ভঙ্গি করে মাথাটা নাড়ল দীনা।

হেসে ফেলল সনৎ।

না, হাসি নয়। আজকাল আমি লক্ষ্য করেছি তুমি আমায় সিরিয়াসলি নিচ্ছ না।

সর্বনাশ! তোমায় লাইটলি নেব এমন সাধ্য নেই আমার বৌদি। চোখ দুটো অকারণে বিস্ফারিত করল সনৎ।

বলা যায় না, সঙ্গদোষে সব হয়! সুপর্ণা তোমায় যেমন চালাবে তেমনি চলবে।

এ কথাটা তাহলে তোমার পক্ষেও প্রযোজ্য বৌদি।

নো, ডেফিনিটলি নট। স্বরটা একটু ওঠাতে চেষ্টা করল দীনা। কিন্তু মনটা যেন সায় দিল না তার সঙ্গে। —তোমার দাদাকে চেন না তাহলে। ভাই রাকেশ অ্যাডভানীর সঙ্গে লড়াই করে এল একজন ডাক্তার হয়ে। ওটা আর এমন কি?

বৌদি, তোমরা একটা অদ্ভুত জাত। বোধহয় লড়াইটা তোমার সামনে হলে আরও ভাল হত।

কথাটা শুনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল দীনা। হাততালি দিয়ে ঘুরে গেল এক পাক। তারপর বলতে লাগল

প্রথমে রাকেশ সরিতের বুকে মারল এক ঘুষি। —সনৎ একটু সরে গেল। দীনার ঘুষিটা প্রায় তার কাছাকাছি এসে পড়েছিল। —সরিতের দম বন্ধ হয়ে গেল, বলতে লাগল দীনা—কিন্তু একটু পরেই সরিৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল রাকেশের ওপর —একটা লাফ দিল দীনা সঙ্গে সঙ্গে

বৌদি প্লিজ, আমি রাকেশ নই—আর একটু পিছিয়ে গেল সে।

তুমি বড় ডিসটার্ব কর। তারপর মাঠের ওপর দুজনে গড়াগড়ি শুরু হল।

তাই নাকি? সনৎ উৎসাহ দেবার চেষ্টা করে।

তার এক ফাঁকে সরিৎ উঠে পড়ল। রাকেশও উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সরিৎ আর দেরী না করে রাকেশের মুখের ওপর সজোরে মারল এক ঘুষি—।

ঠিক সময়ে সনৎ মুখটা সরিয়ে নিয়েছে তা না হলে দীনার ঘুষিটা তার মুখেই লাগত।

তোমার বর্ণনা শেষ হয়েছে? দীনার দিকে সভয়ে তাকাল সনৎ।

এখনও আসল কথাই বলা হয়নি।

এখনও আসল কথা!

হ্যাঁ; রাকেশের নাক আর মুখ দিয়ে তাজা রক্ত পড়ছে টপটপ করে, সরিতের ঠোঁট গিয়েছে কেটে—।

তুমি নিষ্ঠুর বৌদি—রক্তলোলুপ।

হোয়াটস দ্যাট, রক্তলোলুপ?

তার মানে রক্তপাতে আনন্দ পাও।

এরকম ক্ষেত্রে সকলেই পায়। অবশ্য বাঙালী মেয়েরা এটা ঠিক অ্যাপ্রিসিয়েট করবে কিনা জানি না। তারা হয়ত ভয়ও পেতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখ ছোড়দা তোমার জন্য একজন লড়ছে—রক্ত পড়ছে—মারামারি করছে তুমুল—

বোম্বে ফিলমের মত?

টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন করে।

টেলিফোনটা তোমার মতই বেরসিক।

দীনা দৌড়ে গিয়ে ধরল সেটা।

হ্যালো, কে—? আ-হা—সুপর্ণা। তোমার জন্য অফিস কামাই করে বসে আছে চোরটা। তুমি চলে এস।

দীনা সনতের ঘরে ঢুকে কোমরে দুটো হাত রেখে সনতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল—তুমি একটা চোর।

কেন, কি হল?

তোমরা দুজনে কোথায় যাচ্ছ?

এমনি একটু বেড়াতে—আমতা আমতা করল সনৎ।

আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জান?

কি?

সুপর্ণার সঙ্গে লড়াই করতে, সরিতের মত।

তার কথা শুনে আর মুখভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল সনৎ।

এ, হাসছে দেখ না—। চোখদুটো বন্ধ করে সনতের দিকে জিভটা একটু বার করল দীনা। তারপর চলে গেল ওপরে।

সরিৎ ডাঃ অসীম ব্যানার্জির নারসিং-হোমের কাজটা করে ট্যাক্সিতে বাড়ী ফিরল। দীনা তখন একমনে সেলাই করছে। অপর পাশে সোফাটার ওপর সরিৎ বসে তার দিকে দেখল কিছুক্ষণ। দীনা কিন্তু একমনে সেলাই করেই চলেছে। ওটা কি সেলাই করছ? আলাপ করার চেষ্টা করল সরিৎ।

দেখতে পাচ্ছ না, তোমার মোজা।

সেলাই করার কি দরকার?

তাই নাকি? খুব বড়লোক হয়েছ বুঝি? এইটুকু ফেটে গিয়েছে আর তাকে ফেলে দেবে?

গাড়ীটা দেখছি না। অন্য প্রসঙ্গে যায় সরিৎ।

আমি নিয়েছি। মুখটা না তুলেই উত্তর দিল দীনা।

তুমি ত এখানে বসে আছ, তুমি নিলে কি করে?

ছোড়দা আর সুপর্ণাকে পাঠিয়েছি পিকনিক করতে।

সনৎ! অবাক হল সরিৎ। এটা একটা নতুন ঘটনা না—। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সরিৎ আবার বলল—চল, আমরাও যাই।

কোথায়? সেলাইটা এবার পাশে রেখে দিল দীনা।

নারানদাস অ্যাডভানী দিল্লী ফিরে যেতে চাইছেন।

কিন্তু বাবুজী এখনও সুস্থ নন। দীনা তাকাল সরিতের দিকে।

সেজন্যই যেতে চাইছেন দিল্লীতে, যাবে?

একটু ভাবল দীনা তারপর বলল— আর একটা কাজ বাকী আছে আমার।

আবার কি?

ছোড়দার বিয়ে।

বেশ, তাহলে তাড়াতাড়ি সেরে ফেল সেটা।

কিন্তু নারসিং হোম?

অসীমকে ভার দিয়ে যাব।

আর পুলিশের ব্যাপারটা।

সেটাও মিটে যাবে। কেতকী এমনভাবে সব সাজিয়েছিল যাতে হত্যার অভিযোগ আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ ধরা পড়ে যায়। ক্যানসারে সে ভুগছিল দু বছর ধরে। সময় হয়ে এসেছে বুঝে আত্ম-হত্যাটাকে ঐভাবে ব্যবহার করেছিল সে।

কি সাংঘাতিক!

হ্যাঁ, সনতের সিরিঞ্জ, আমার সিরিঞ্জ আর ওষুধগুলো রেখে দিয়েছিল এমনভাবে যাতে পুলিশ সহজেই আমাদের সন্দেহ করতে পারে।

কিন্তু ঘরে যে চুরি হয়েছিল।

না চুরি হয়নি। সব গয়না আর টাকা ডাঃ সেনের কাছে গচ্ছিত রেখেছিল কেতকী। আর তাতে নির্দেশ ছিল যাতে সেগুলো দুঃস্থ নার্সদের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

একটু চুপ করে রইল দীনা তারপর বলল—কিন্তু ডাঃ সেন কি কিছুই বুঝতে পারেন নি?

না, তবে পরে একটা কথা থেকে অবশ্য ডাঃ সেনের সন্দেহ হয়েছিল।

কি কথা?

কেতকী বলেছিল, 'সোমবারে আপনি খবর পাবেন'—খবর দেব একথা কিন্তু বলেনি। তা ছাড়া ওর ডায়েরী থেকেও জিনিসটার কিছু আভাস পাওয়া গিয়েছে'

কিন্তু নারসিংহোমের ফাংসানে ওর হঠাৎ গান গাইবার ইচ্ছে হল কেন। আর অত সুন্দর করে সাজারই বা কি দরকার ছিল?

এত সহজ ব্যাপার। কেতকীর মনে যখন আত্মহত্যার প্রশ্ন জেগেছিল তখনই সে ঠিক করে রেখেছিল কি কি করবে। শুধু তাই নয়, মনোরম সজ্জায় সেজে সকলের সামনে গান গেয়ে সে তুষ্ট করেছিল আমাদের। তা না হলে সে ওভাবে টেক্কা দিয়ে সাজত না, কিংবা গানও গাইত না।

কিন্তু, ছোড়দা ফাংসানের পর ওর ঘরে গিয়েছিল কেন, জান?

সেই কারণটাই বুঝতে পারছি না, সরিৎ স্বীকার করল।

আমি কিন্তু জিজ্ঞাসা করে পরে জেনেছিলাম যে ছোড়দাকে এক ফাঁকে কেতকী ফাংসানের পর তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিল। অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সে শুধু প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে ছোড়দাই সবশেষে তার সঙ্গে দেখা করেছে। তখনও অনেক লোক আশেপাশে ছিল; তাদের চোখ এড়ান যাবে না তা সে জানত কেতকী বোকা নয়।

কিন্তু সনৎ তার কি ক্ষতি করেছিল?

হয়ত কিছুই করে নি। কিন্তু কেতকী বুঝেছিল ছোড়দাকে শুধু জড়াতে পারলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে।

ঠিক বলেছ; বিয়ের জ্বালায় কেতকী অস্থির হয়ে পড়েছিল। যে কোন প্রকারে সেটা উগরে দিতে চাইছিল সে। ওসব ছাড়। কবে দিল্লী যাবে তাই বল। অপ্রিয় প্রসঙ্গটা পালটাতে চাইল সরিৎ।

চল; সত্যি, আমারও ভাল লাগছে না আর।

সুপর্ণা আর সনতের বিয়ের কয়েকদিন পরের ঘটনা। সুপর্ণা দীনার ঘরের ভিতরে ঢুকল। শান্তভাবে—দিদি—ডাকল সে।

দিদি, হু ইজ দিদি—আমি দিদি নই শোন দীনা। আর তোমার মাথায় ঘোমটা কেন? মাথার উপর লজ্জা করে হুড় তুলে দিলে খুব ভাল দেখায় বুঝি—। সুপর্ণার মাথার ঘোমটা খুলে দিয়ে সে নিজেই। তারপর বলল—এবার কি বলছ বল।

বলছি, এখন তোমরা যেও না।

তাই নাকি? সুপর্ণার গালে হাতটা আলতোভাবে বুলিয়ে দীনা বলল ইস, আমরা বলে হানিমুনে যাব। তোমাদের আপত্তি শুনব কেন?

হেসে ফেলল সুপর্ণা দীনার বলার ধরন দেখে।

সরিতের গাড়ীর হর্ন শোনা গেল। সরিৎ এসে পড়ল তাড়াতাড়ি। তারপর তাদের দেখে বলল—কি পরামর্শ হচ্ছে?

ও আমাদের হানিমুনে বাধা দিতে চাইছে।

তাই নাকি? হাসল সরিৎ। তারপর আলমারি খুলে একটা বাক্স বার করে দীনার হাতে দিয়ে তাকে চুপি চুপি কি বলল যেন। দীনা সেটা সুপর্ণার হাতে দিয়ে বলল—তোমাদের বিয়েতে যৌতুক দিলাম আমরা।

সুপর্ণা সেটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কি দাঁড়িয়ে রইলে যে পুতুলের মত। নীচে ছোড়দাকে ওটা দিয়ে ওপরে চলে এস তাড়াতাড়ি। একবার ঘরে ঢুকলে ত আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। আমাদের জিনিস গুছিয়ে দেবে কে?

দীনাকে বিশ্বাস নেই। সরিতের সামনেই হয়ত এমন উল্টোপাল্টা কথা বলতে শুরু করে দেবে যে লজ্জায় পড়ে যাবে সে।

সুপর্ণা নীচে গিয়ে সনতের সামনে টেবিলের ওপর বাক্সটা রাখল।

ওটা কি? জিজ্ঞাসা করল সনৎ।

আমাদের বিয়ের যৌতুক—দাদা দিলেন।

কথাটা বলে সুপর্ণা ওপরে চলে গেল। দেরী করল না। দীনাকে ভয় করে সে। আরম্ভ করলেই হল।

সনৎ বাক্সটা খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। বাক্সের মধ্যে তার মায়ের গয়না আর বাবার আমলের ক্যাশ-সার্টিফিকেটগুলো রয়েছে। উঠে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল সে। বাইরে লনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তার জীবনে এই প্রথম। অভূতপূর্ব অনুভূতি একটা। কিন্তু তাতে অনির্বচনীয় আনন্দের স্বাদ ছিল যেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সনৎ। উপভোগ করতে লাগল, রসাস্বাদ করতে লাগল সে একটু একটু করে সেটার। জগদ্দল পাথরটা তার মন থেকে কে যেন সরিয়ে দিয়েছে তার অজান্তে। লনের ঘাস আরও সবুজ লাগছে তার কাছে। আকাশে হালকা মেঘ এতদিন সে লক্ষ্যই করেনি। হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না ওগুলো?

হঠাৎ সাইডটেবিলে রাখা বীভৎস তিব্বতী মুখোশগুলোর উপর নজর পড়ল তার। সেগুলো এক একটা করে খুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল; তার সঙ্গে লজেন্সের কৌটোটাও।

বৌদি—গলাটা পরিষ্কার করে গম্ভীর ডাকল সনৎ। তার ডাকে দীনা সুপর্ণা দুজনেই এসে হাজির হল একসঙ্গে।

হুজুরে বাঁদী হাজির। দীনা কুর্নিশ করল নীচু হয়ে।

এটা তুমি নিয়ে যাও বৌদি—গলার স্বরটা কেঁপে উঠল সনতের।

বেশ নেব। অবস্থাটা বুঝল দীনা। ওটা, আমি আর সুপর্ণাই নেব ভাগ করে, কিন্তু এক সর্তে—

বল তোমার সর্ত—সনৎ তাকাল তার দিকে।

সুপর্ণাকে আরও কাছে টেনে নিজের পাশে দাঁড় করাল দীনা। বলল—ভাল করে দুজনের দিকে তাকিয়ে বল কাকে তুমি পছন্দ কর—আমাকে না সুপর্ণাকে।

তোমাকে। ছোট করে উত্তর দিল সনৎ।

না, ওরকম করে বললে হবে না। ভাল করে বল, তুলনা করে।

আমার কোমর আর সুপর্ণার, আমার পায়ের শেপ আর সুপর্ণার—

দীনা শাড়ীর পাড়টা তুলল একটু।

বৌদি—প্লীজ—অনুনয় করল সনৎ।

তাহলে বল—

তুমি অনন্যা।

এটা আগে বললেই হত। সুপর্ণার গালে একটা চুম্বন করল দীনা।

বলল—এই চোর ওকে যেন আটকে রেখো না।

(সমাপ্ত)

মানুষগড়ার ইতিকথা
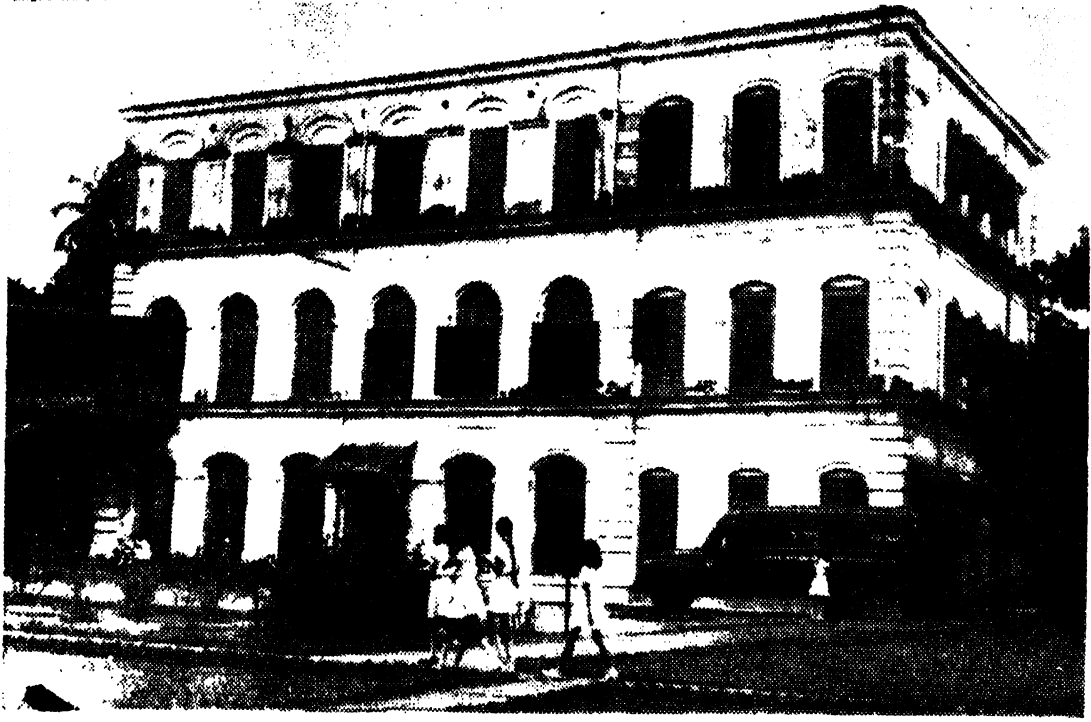
কয়েক বছর আগে মনু চৌধুরীর সঙ্গে ম্যাটিলডা মন্ডলের দেখা হয়েছিল এক বিয়ে বাড়িতে। একই স্কুলে পড়েছিল দুজনে। জানেনই তো নীচু ক্লাসগুলোতে আমলেও ছেলেমেয়েরা একই সঙ্গে পড়ত। বয়সে বোধ হয় ম্যাটিলডাদি সিনিয়র হবেন। অনেক বছর আগের কথা, তা প্রায় পঞ্চাশ বছর তো বটেই। পুরোনো স্কুলের সমসাময়িক পড়ুয়াকে দেখে নিশ্চয়ই ম্যাটিলডা মন্ডল খুশী হয়েছিলেন। খুশী হওয়ারই কথা। কতদিন পরে দেখা। কতটুকু মানুষটা কত বড় হয়েছে। দেশের দশের একজন, সবাই চেনে একডাকে। কার না গর্ব হয় নিজের স্কুলের পুরোনো ছাত্র যদি কৃতী হয় জীবনে। পাঁচজনের কাছে বলতে গিয়ে গর্বে বুক ফুলে ওঠে না? বলতে ইচ্ছে হয় না, দেখ দেখ আমাদের স্কুলের ছাত্রকে দেখ, নাম, অর্থ, যশ সব হয়েছে অথচ ম্যাটিলডাদিকে আজো ভোলে নি। ভুলবে কি? এইটাই তো আমাদের বৈশিষ্ট্য, যতদিন পরে যত বছর পরেই দেখা হোক না কেন, পরস্পরকে চিনে নিতে একটুও ভুল হয় না আমাদের। আমরা যে ডায়োসেশানেরই ছাত্র-ছাত্রী। এক দমকে এতগুলো কথা বলে একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলেন মঞ্জুলা দেবী। মিস মঞ্জুলা মুখার্জী, প্রিন্সিপ্যাল, সেণ্ট জনস ডায়োসেশান গার্লস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল। একটু থামলেন। এই সুযোগে তড়িঘড়ি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি ওদেরই কনটেমপোরারি? হালকা হাসির আলপনায় গম্ভীর মুখ সুস্নিগ্ধ হয়ে উঠল : না, না। আমি কি? আমার দিদিই এখনো ভর্তি হননি স্কুলে যখন ম্যাটিলডাদি বা জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী এই স্কুলে পড়তেন। স্কুল ও কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখন মেরী ভিক্টোরিয়া। মিস্টার জর্জিনা সবে এসেছেন। জাস্ট প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। কুয়ার সিসটাররা তখন এই স্কুল চালাতেন।

মেরী ভিক্টরিয়া? সিসটার জর্জিনা? কুয়ার সিসটার? কলেজ ছিল?—সবই কেমন অজানা ধাঁধার মত, মাথায় ঢুকছিল না কিছুতেই। তাই সবিনয়ে নিবেদন করলাম : ঠিক বুঝতে পারছি না, রহস্যটা একটু পরিষ্কার করুন। কুয়ার সিসটারদের কু কিছুদিন যাতে বুঝতে পারি। পবিত্র সোনালী মুখের ওপর হালকা ফ্রেমের চশমার আড়ালে স্বচ্ছ গভীর চোখদুটো জুড়ে প্রশান্ত কৌতুক যেন জলের মাঝে মাছের মত খেলা করছিল। প্রশ্নের বঁড়শির সামনে চকিতে স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর আস্তে আস্তে অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের সাক্ষী দুটি চোখ হয়ে উঠল বাঙ্ময়।

কোথা থেকে শুরু করব? সব তো জানি না। কিছুটা দেখেছি, বাকিটা শুনেছি তাই দেখাশোনার এই কাহিনীর শুরু হোক নিজেকে নিয়েই। আমার মা পড়েছেন এই স্কুলে। আগেই বলেছি আমার দিদি ও আমি দুজনেই ডায়োসেশানের ছাত্রী। দু জেনারেশন আমরা পড়ছি এই স্কুলে। এই স্কুলই আমাদের গড়েছে। আর আমি তো হয়ে গেছি স্কুলেরই। একদিন পড়েছি এখানে তারপর তিন যুগ ধরে পড়াচ্ছি। এই স্কুলের বয়স আজ পঁচাত্তর। এই পঁচাত্তর বছরের মধ্যে চুয়াল্লিশ বছর আমি জড়িয়ে আছি এই স্কুলের সাথে। আর যদি মাকে ধরি তাহলে এ স্কুলের শুরুর সময় থেকেই এর সঙ্গে আমরা জড়িত। আমি ভর্তি হয়েছিলাম সেই পঁচিশ সালে। দাঁড়ান। চুয়াল্লিশ বছর আগের কথা আমার চেয়েও যে ভাল বলতে পারবে তাকেই ডাকি। বলতে বলতে বাজারটা টিপে দিলেন। — বেয়ারা আসতে বললেন আউলাদকে ডেকে দাও।

বেয়ারা চলে গেল। স্যুইং-ডোর তখনো ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। মিস মুখার্জি বলতে শুরু করলেন : আউলাদ আমাদের স্কুলের সবচেয়ে পুরোনো দারোয়ান। পুরো নাম আউলাদ খান। আপকান্তি মুসলমান আউলাদ বিয়াল্লিশ বছর কাজ করছে এই স্কুলে। ওর চেয়ে পুরোনো কর্মচারী এই স্কুলে বর্তমানে আর কেউ নেই। বলতে বলতে একটু থামলেন মিস মুখার্জী। ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকাতে চোখে পড়ল ধূলিধূসরিত একজোড়া খালি পা। মুহূর্তে দরজা ঠেলে ভেতরে এসে যে দাঁড়াল, তার পরণে ধুতি, সার্ট, মাথাজোড়া টাকের নীচে ভুরু গোঁফ সব সাদা। বুঝলাম এই সেই আউলাদ খান। আউলাদই একমাত্র মানুষ এই স্কুলে রয়েছে যে স্কুলের বর্তমান

সেণ্ট জনস ডায়োসেশান গার্লস স্কুল

প্রিন্সিপ্যালকেও ফ্রক পরে, বেণী দুলিয়ে স্কুল কমপাউনডে ছুটে ছুটে খেলতে, বই হাতে হোস্টেল থেকে ক্লাসরুম ও ক্লাস থেকে হোস্টেলের পথে ব্রস্ত পায়ে ছুটে যেতে দেখেছে। এস আউলাদ, আলাপ করিয়ে দিই। এক বহু প্রাচীন সম্পর্কের প্রীতি স্নিগ্ধ সুর বেজে উঠল মলিনা দেবীর আহবানে। ইনি আমাদের স্কুল সম্পর্কে জানতে চান, কাগজে লিখবেন।

আখবর? আখবরের লোকদের চেনে আউলাদ। চিনবে না কেন? আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে বীণা দাসকে অ্যারেস্ট করতে পুলিশ যখন এই স্কুলেরই হোস্টেলে এসেছিল, তখন কত আখবরের লোক দেখেছে আউলাদ। তাই আস্তে আস্তে ঠান্ডা গলায় উর্দু, হিন্দী, বাংলা মেশানো ভাষায় জিজ্ঞাসা করল: কি জানতে চান বাবু? বললাম—যা দেখেছ, যা শুনেছ, এই স্কুলের পুরোনো দিনের সব কথা জানতে চাই।

সর্টহান্ড জানি না। আউলাদ সেদিন যা বলেছিল, হুবহু তার নোট নেওয়া সম্ভব হয়নি। যেটুকু নিতে পেরেছি তাই এখানে পেশ করছি। "আমার দাদা ছিলেন এ স্কুলের দারোয়ান। মেরী ভিকটোরিয়ার আমল থেকেই এই স্কুলে কাজ করেছেন। আমি যখন এলাম তখন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল ডরোথি ফ্রান্সিস। দেশ থেকে দাদাই নিয়ে আসেন আমাকে। সিসটারকে বলে কয়ে স্কুলের চাকরীতে ঢুকিয়ে দিলেন। তখন আমার ওমর আর কত হবে, বড় জোর সতেরো-আঠারো। তখন স্কুলের উল্টোদিকে ওধারে একটা বড় বস্তি ছিল। ওই বস্তির এক বুড়ো ভিস্তিওয়ালার কাছে শুনেছিলাম, এই স্কুল যখন প্রথম শুরু হয়, তখন গোটা তল্লাটে মোটে দুটি বাড়ি ছিল—মিস হোর-এর মিশন স্কুল বিল্ডিং আর নাটোর রাজার বাড়ি। চারপাশে ধানক্ষেত, মাঝে মাঝে দু-একটা খড়ের চালা।"

আজ থেকে আশী-নব্বই বছর আগে ল্যান্সডাউন রোড অর এলগিন রোডের পথ অ্যাংলো-বেঙ্গলী পাড়ার এই ছিল ভৌগোলিক চেহারা। শহর তখন সবে লোয়ার সার্কুলার রোড ছাড়িয়ে দক্ষিণে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে শহরের রইসরা ঘিঞ্জি উত্তর ছেড়ে দক্ষিণের খোলামেলা পরিবেশে প্রচুর জমি-জায়গা কিনে বাড়ি বানিয়ে চলে আসছেন। লোক-সংখ্যা বাড়ছে দক্ষিণের। বিশেষ করে ভবানীপুর, কালিঘাটের। অথচ ছেলেমেয়েদের পড়ানোর মত উপযুক্ত স্কুল বলতে কয়েকটি বাংলা ও ইংরাজী মিডল স্কুল (ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত) ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ভুল হল। দুটি হাই-স্কুল ছিল। যেমন লন্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুল, ছেলেদের ও মেয়েদের। আর ছিল সাউথ সাবারবণ স্কুল। মেয়েদের হাই-স্কুল বলতে তখন ঐ একটি লন্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুল। ঠিক এই সময় বিলেত থেকে এসেছিলেন মিস হোর। প্রোটেস্টাইন খৃশ্চান। খোলাখুলি বলাই ভাল, সে যুগে ভারতে খৃশ্চান মিশনারীদের আগমনের একটিই উদ্দেশ্য ছিল—অজ্ঞ, অন্ধ ভারতীয়দের অন্ধকার হতে আলোর পথে নিয়ে যাওয়া। মিস হোরও এসেছিলেন এই কারণেই। পূর্ববর্তী মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের সুনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে তিনিও একটি স্কুল খুললেন। গত শতাব্দীর আশীর যুগের কথা এসব। স্কুলটি প্রয়োজনে ল্যান্সডাউন রোডের ওপর দোতলা একটা বাড়ি গড়ে উঠেছিল। এই বাড়িটিই এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের বহু পরিচিত মিস হোরের মিশন স্কুল। কেউ কেউ বলত লোয়ার স্কুল। ইউনিভার্সিটির অনুমোদন সম্ভবত মিস হোরের স্কুল পায়নি, তাই হাই-স্কুলের পঠন-পাঠন এখানে সম্ভব ছিল না। এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ ইংলিশ মিডিয়ম জুনিয়র স্কুল। তাই লোকে বলত লোয়ার স্কুল।

বেশী দিন এ স্কুল চালাতে পারেন নি মিস হোর। বয়স হয়েছিল। আর পারছিলেন না। গত শতাব্দীর শেষ দশকের মাঝামাঝি স্কুলের ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়ে হঠাৎ দেশে চলে গেলেন। স্কুলের দায়িত্ব তখন তুলে নিলেন কলকাতার বিশপ। কিন্তু সম্পত্তির দায়িত্ব বহন করা এক কথা, আর একটা স্কুল চালানো ভিন্ন ব্যাপার। বিশেষ করে সে যুগে মেয়েদের স্কুল চালানো চাট্টিখানি কথা ছিল না। উপযুক্ত শিক্ষিকা পাওয়া যাবে কোথায়? ঠিক এই সময়ে, যখন কর্তৃপক্ষ স্কুল নিয়ে রীতিমত বিব্রত, বিলেত থেকে এলেন সিসটার মেরী ভিকটোরিয়া। ইংলন্ডের রাজারাণীদের সামার প্যালেস যে উইন্ডসরে সেখানকারই ক্রুয়ার গ্রাম থেকে ইনি এলেন। সন্ন্যাসিনী ভিকটোরিয়া, মহারাণী ভিকটোরিয়ার রাজত্বের শেষ দিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী কলকাতায় এসে পৌঁছোলেন। তাঁর হাতে স্কুলের দায়িত্বভার তুলে দিয়ে কর্তৃপক্ষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। নতুন করে আবার চালু হোল মিস হোরের মিশন বা লোয়ার স্কুল নতুন নামে—ডায়োসেশান স্কুল।

ডায়োসেশান কথাটি ডায়োসিন শব্দটিরই বিশেষণ রূপ। ডায়োসিন মানে বিশপের ধর্মীয় শাসনাধীন প্রদেশ বা এলাকা। কলকাতার বিশপের প্রত্যক্ষ শাসনে নতুন করে স্কুলটি চালু হল, তাই নাম হোল ডায়োসেশান স্কুল। ১৮৯৪ সালে সিসটার মেরী ভিকটোরিয়া জনা দশ-বারো ছাত্রছাত্রী নিয়ে শুরু করলেন এই স্কুল।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে মহা-সমুদ্রের বুকে ভাসমান ছোট্ট দ্বীপময় দেশটির গ্রামবাসিনী এই সন্ন্যাসিনী নির্ঘাৎ যাদু জানতেন। তাঁর হাতে ছিল নিশ্চয়ই সেই আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ। তাই পুরাতন শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই মিস হোরের লোয়ার স্কুলটিকে তিনি হাই-

স্কুলে পরিণত করলেন। স্কুলের মেয়েরা দল বেঁধে চলল এনট্রান্স পরীক্ষা দিতে। গোড়ার দিকে যে সব মেয়ে এনট্রান্সের চৌকাঠ অতিক্রম করেছিলেন তাঁদের নামের তালিকা আমায় দিতে না পারলেও মলিনা দেবী মুখে মুখে বললেন : এই স্কুলেরই ছাত্রী ডরোথী লাভডে এই সেঞ্চুরীর গোড়ার বছরগুলোতে আমার "মাকে" বাড়িতে পড়াতেন। ডরোথি লাভডের বাড়ি ছিল আসামে। এই স্কুল থেকেই এনট্রান্স পাস করেছিলেন। পাশ করার পর আমার মাকে পড়িয়েছেন কিছুদিন।

দাদামশায় ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থাকতেন ষোল নম্বর ল্যান্সডাউন রোডে, বলে চলেন মলিনা দেবী। সে যুগের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ধর্মে খৃশ্চান। বাড়ির কাছে মিশনারী সিসটারদের পরিচালিত স্কুল দেখে খুশী হয়ে মেয়েকে ভর্তি করে দিলেন। চপলা চ্যাটার্জি ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছেন এই স্কুলে। যার মুখে মলিনা দেবী শুনেছেন মেরী ভিকটোরিয়ার অসামান্য পরিচালন দক্ষতার কথা। সিসটারকে চিনতেন না এমন নামী বাঙালী সে যুগে কলকাতায় ছিলেন না বললেই চলে। এই স্কুলের ব্যাপারেই তাঁর সাথে ঠাকুরবাড়ি, চৌধুরী-বাড়ি, ভবানীপুরের মুখুজ্যে বাড়ির সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বয়ং স্যার আশুতোষ সিসটারকে শ্রদ্ধা করতেন। আর এই শ্রদ্ধার সম্পর্কই শেষ পর্যন্ত তাঁকে কলেজ খোলার পারমিশন এনে দেয়। ১৯১২ সালে ডায়োসেশান স্কুলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল সে যুগের কলকাতার অন্যতম নামী ও গার্লস কলেজ—ডায়োসেশান কলেজ।

ততদিনে স্কুল আরো এগিয়ে গেছে। স্কুলের পড়ানোর সুনাম, রেজাল্টের কথা শহরবাসীর মুখে মুখে। বিশেষ করে অভিজাত বাঙালীর ঘরের মেয়েদের পড়া-শোনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র তখন এই স্কুল। ছাত্রী সংখ্যা বছর বছর বেড়ে চলেছে। পুরোনো বাড়িতে জায়গা হয় না। কলেজের জন্যও চাই নতুন বাড়ি। তাই জায়গার অভাব মেটানোর জন্য তিনতলা দু-দুটো বাড়ি গড়ে উঠল স্কুল কমপাউন্ডে। বর্তমানে স্কুলের হোস্টেল যে বাড়িতে আছে, ওটিই ছিল কলেজ বিল্ডিং আর বর্তমান কে-জি ও মিশন বিল্ডিংয়ে বসত স্কুলের ক্লাস। ব্যাপার স্যাপার রীতিমত বৃহৎ হয়ে উঠেছে। একা সিসটার ভিকটোরিয়া আর পেরে ওঠেন না। তাই সাহায্য করবার জন্য কুয়োর গ্রাম থেকে এলেন সিসটার জর্জিনা। দুই সিসটারের সযত্ন চেষ্টায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গার্লস স্কুল।

প্রধান শব্দটি আদৌ অত্যুক্তি নয়। কারণ যে স্কুল থেকে এক যুগের মধ্যে চারু দাস (১৯১২), গোখেলের প্রিন্সিপ্যাল সুলেখা রায় (১৯২৩) ও প্রখ্যাত লেখিকা লীলা মজুমদারের (১৯২৪) মত ছাত্রীরা পাশ করে বেরিয়েছেন, সেই স্কুলকে অগ্রণী আখ্যা দেওয়া নিশ্চয়ই অপরাধ না। স্কুল মিশনারীদের হলেও, এর মিশন ছিল মানুষ গড়া, ধর্মান্তরিত করা নয়। প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক উদ্দেশ্য থেকে অনেক অনেক দূরে সরে এসেছে স্কুল বিশ-পঁচিশ বছরে। শুধু কলকাতার মেয়েরাই যে এখানে পড়ত তা নয়, সারা দেশের মেয়েদের জন্যই উন্মুক্ত ছিল স্কুলের দরজা। বিশেষ করে খৃশ্চান মেয়েদের জন্য হোস্টেল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকলেও, ভিন্ন প্রদেশের অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যও জায়গা দিতে স্কুল কখনো কার্পণ্য করেনি। আর করেনি বলেই এই স্কুলে আসামের প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক লক্ষ্মী-কান্ত বেজবড়ুয়ার মেয়ে দীপিকা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন। দীপিকা এ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন ১৯২৬ সালে। ঠিক তার আগের বছর স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে কুয়োর গ্রাম থেকে এসেছেন সিসটার ডরোথি ফ্রানসিস।

ভিকটোরিয়া আগেই অবসর নিয়ে-ছিলেন। তাঁর জায়গায় প্রিন্সিপ্যাল হয়ে এতদিন কলেজ ও কলেজিয়েট স্কুলের দায়িত্ব বহন করেছেন জর্জিনা। পঁচিশ সালে অধুনালুপ্ত দার্জিলিংয়ের মেয়েদের স্কুল সেন্ট মাইকেলের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে চলে গেলেন জর্জিনা। তাঁর জায়গায় এলেন ডরোথি ফ্রানসিস। ঐ বছরই স্কুলে ভর্তি হলেন মলিনা মুখার্জি।

ভগবান চন্দ্রের মেয়ে চপলার বিয়ে হয়েছিল সে যুগের বি সি এস চিত্তরঞ্জন মুখার্জির সঙ্গে। বদলির চাকরী। সারা-জীবনই ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, এ জেলা থেকে সে জেলা। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খুবেই ক্ষতি হোত। তাই চপলা দেবীর পরামর্শে বাবা তিন মেয়েকেই ভর্তি করে দিলেন ডায়োসেশান কলেজিয়েট স্কুলে। বড়দি মৃণাল সম্ভবত (ঠিক সালটা মলিনা দেবীর আজ মনে নেই) ১৯২০-২১ সালে ভর্তি হয়েছিলেন। ছোড়দি মলিনা ভর্তি হলেন ১৯২৫ সালে। মেজো বোনও পড়েছেন এই স্কুলে। সব বোনই থাকতেন হোস্টেলে।

এই স্কুল থেকেই টকাটক বোনেরা পাশ করেছেন—ঊনত্রিশ সালে মৃণাল আর একত্রিশে মলিনা। এ সময়েই আর একটি নামী ছাত্রী স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে বেথুনের প্রিন্সিপ্যাল মিনি ব্যানার্জী সাতাশ সালে এই স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম মলিনাদেবীকে : আপনা-দের প্রিন্সিপ্যাল সম্বন্ধে কিছু বলুন। মুখে না বলে ডায়েরীর পাতা খুলে কয়েকটা লাইন দেখিয়ে দিয়ে বললেন পড়ে দেখুন। পড়ে দেখি আজকের প্রিন্সিপ্যাল পঁয়তাল্লিশ বছর আগের প্রিন্সিপ্যাল সম্বন্ধে লিখেছেন : "আমি এসেছি সিসটার ডরোথি ফ্রানসিসের সময়। অমন প্রতাপশালিনী মহিলা খুব কম দেখা যায়। তাঁকে না ভয় করত এমন লোক খুবই কম দেখা যায়।" ডায়েরীর পাতা থেকে চোখ তুলতেই হেসে বললেন, 'সিসটাররা ছিলেন স্ট্রিক্ট ডিসিপ্লিনার-য়ান। খেতে শুতে বসতে ইংরাজী বলতেন। ফলে আমাদেরও ইংরাজী বলা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ওরা ভাল বাংলা বলতে পারতেন না। মনে আছে একবার সিসটার ডরোথিকে শুনেছিলাম স্কুলের মালিকে বলতে—'পক্ষী বৃক্ষ খাইয়াছে (অর্থাৎ মুরগী ফুলগাছের চারাগুলো মুড়িয়েছে)।'

একত্রিশে মলিনা দেবী স্কুল থেকে পাশ করে কলেজে ঢুকলেন। থাকেন তখনো সেই হোস্টেলে। এই সময়ে সারা দেশের চোখ পড়ল ডায়োসেশান কলেজের হোস্টেলের ওপর। সেই চোখে-পড়ার ঘটনাটি ডায়েরীর পাতায় লিখে রেখেছেন মলিনা দেবী : 'এখানকার ইতিহাস বিচিত্র। বীনা দাস ডিগ্রী আনতে গিয়ে কনভোকেশনে গভর্ণরের উপর গুলি চালালেন। আমি তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। বীনাদিদের বিদায় অভিনন্দন দেওয়ার জন্য তখন উৎসবের আয়োজন চলছে। রান্নায় আমরাও হাত লাগিয়েছিলুম। ... তারপর বিদায় সভায় যাব বলে উপরে গেছি পোষাক পরতে, এমন সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি পুলিশ ভ্যান থেকে নামছেন বীনাদি। বাস সমস্ত আয়োজন পন্ড। সে রাতে কেউ জলস্পর্শ করতে পারেনি। নীচে রিভলবার শুদ্ধ ধরা পড়ল জ্যোতিকণা দত্ত। ধরা পড়ল বনলতা দাসগুপ্ত।'

ব্যাপারটা যে সেদিন বিদেশী সরকারের আদৌ ভালো লাগেনি, তারই জ্বলন্ত প্রমাণ ডায়োসেশান কলেজের অবলুপ্তি। ১৯৩৫ সালে কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। কলেজের কথা থাক। স্কুলের কথাই বলি। সিসটার ডরোথি পনেরো বছর এই স্কুল চালিয়েছেন। চল্লিশ সালে সিসটার দেশে চলে যান। ঠিক তার আগের বছর স্কুলের অ্যাসিসট্যান্ট টিচার পোস্টে জয়েন করেন মলিনা দেবী। মাস দশেক ছিলেন। ব্যক্তিগত কারণে সেবার বেশী দিন স্কুলে পড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ডরোথির জায়গায় প্রিন্সিপ্যাল হয়ে কুয়োর গ্রাম থেকে এলেন সিসটার হিলডা ফ্রানসিস। ইনিই ডায়োসেশান স্কুলের শেষ কুয়োর-সিসটার-প্রিন্সিপ্যাল। পাঁচ বছর

হিলডা এই স্কুল চালিয়েছেন। হঠাৎ মনে হোল একটি কথা জানা হয়নি। তাই জিজ্ঞাসা করলাম : স্কুলের নাম তো গোড়ায় ছিল মিশন স্কুল, পরে হোল ডায়োসেশান, সেন্ট জনের নাম কেন যুক্ত হোল? জবাব পেলাম : সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট খৃশ্চানদের আরাধ্য মহামানব। যার সম্বন্ধে স্বয়ং যীশু বলেছেন 'মাতৃগর্ভজাত মহাপুরুষদের মধ্যে ইনিই পুরুষোত্তম।' জন জীবনে অশেষ লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন। রাজা হেরড অ্যান্টিপাস সংভায়ের স্ত্রী হেরোডিয়াসকে অসৎভাবে গ্রহণ করেছিলেন বলে জন তাঁকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। হেরড সে অপমান কোন দিনও ভোলেন নি। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তাই হেরোডিয়াসের মেয়ে সালোম যখন সংবাপের কাছে যা চাইবে তাই পাবে, এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে জনের কাটামুণ্ডু প্রার্থনা করল তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার অজুহাতে ইতিহাসের সেই জঘন্যতম অপরাধটি সংঘটিত হোল। পূর্ব অপরাধের প্রতিশোধ নিলেন হেরড। সেই শহীদ মহাপুরুষ জন দি ব্যাপটিস্ট কুয়ার সিসটারদের আরাধ্যদেব। যেহেতু গোড়া থেকে এই সেদিন পর্যন্তও তাঁরাই এই স্কুল চালিয়ে এসেছেন, তাই তাঁদের আরাধ্য মহামানবের নাম অঙ্গে ধারণ করে স্কুল সার্থক হয়ে উঠেছে।

মাত্র চব্বিশ বছর আগেও কুয়ার সিসটারদের প্রত্যক্ষ পরিচালনা ব্যবস্থায় ছিল স্কুল। হিলডা ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর সময়েই তেতাল্লিশ সালে মলিনা দেবী আবার স্কুলে জয়েন করলেন। চুয়াল্লিশ সালে হিলডা দেশে ফিরে যেতে স্কুলের প্রথম ভারতীয় প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হলেন এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্রী ও শিক্ষিকা চারু দাস। পরবর্তী পনেরো বছর তিনিই ছিলেন এই স্কুলের সর্বময়ী কর্ত্রী। তাঁর সময়ে অতীতের সুনাম বজায় রেখে অসংখ্য কৃতী ছাত্রী এই স্কুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। নামের তালিকা দিয়ে পাতা না ভরিয়ে শুধু একটি নাম উল্লেখ করব এখানে—কেতকী কুশারী। বিগত দশকে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির অন্যতম সেরা ছাত্রী কেতকী এই স্কুলেই পড়েছেন পঞ্চাশের যুগের শুরুতে।

চারু দেবীর সময়েই হাই-স্কুল হোল হায়ার সেকেন্ডারী। সাতান্ন সালে এই পরিবর্তন হল। শুরু থেকেই স্কুলে সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ ও কমার্স তিনটি স্ট্রীম খোলা হয়েছে। সায়েন্সের প্রয়োজনে ছাপ্পান্ন সালে সরকারী সাহায্যে স্কুল কমপাউন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উঠেছে এল-প্যাটার্ণের দোতলা সায়েন্স ব্লক। ষাট সালে এ স্কুলের মেয়েরা প্রথম হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় বসল। ঐ বছরই চারু দাস রিটায়ার করেন। তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করলেন তাঁরই ছাত্রী ও সহকর্মী মলিনা মুখার্জি।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম মলিনা দেবীকে আপনার স্কুলের সাম্প্রতিক সময়ের রেজাল্ট কেমন? অতীত ঐতিহ্য কি বর্তমান যুগের ছাত্রীরা বজায় রাখতে পেরেছে। প্রম্পট জবাব পেলাম : গত ন বছরে তিনটি স্ট্রীম মিলিয়ে হায়ার সেকেন্ডারীতে সতেরোবার স্ট্যান্ড করেছে আমাদের মেয়েরা। কমার্সে, ষাট, একষট্টি ও বাষট্টি সালে তিনবারই ফার্স্ট হয়েছে ডায়োসেশান। আর পাশের শতকরা হার জানতে চান? ষাট থেকে আটষট্টি এই ন বছরে শুধু দুবার তেষট্টি ও পঁয়ষট্টি সালে আমাদের পার্সেন্টেজ নব্বইয়ের নীচে নেমেছিল। তবে হ্যাঁ ঐ দু বছরও গড়ে শতকরা ছিয়াশীটি মেয়ে পাশ করেছে।

শুধু পড়াশোনায় নয়। আমাদের মেয়েরা খেলাধুলাতেও পিছিয়ে নেই। টেবিল টেনিসে ডায়োসেশানের মেয়েদের তো দেশজোড়া নাম। উষা আয়েঙ্গার ও শকুন্তলা দত্ত এই স্কুলেরই ছাত্রী। জানতে চেয়েছিলাম কি কি খেলার সুযোগ আছে আপনার স্কুলে? উত্তর নিজে না দিয়ে উঁচু ক্লাসের দুটি মেয়েকে ডেকে আনিয়ে বললেন—এদের জিজ্ঞাসা করুন। ওরাই বলুক কি কি খেলবার সুযোগ পায়। জয়ন্তী বিশ্বাস, নূপুর রায়চৌধুরী দুজনেই হিউম্যানিটিজের ছাত্রী। অতীত ইতিহাস ও জীয়ন্ত বর্তমানের প্রশ্ন-উত্তরের ধূসর আস্তরণ এক নিমেষে সরিয়ে দিয়ে রৌদ্রস্নাত প্রজাপতির মত ঘরে ঢুকল দুজনে। প্রশ্নের জবাবে হেসে বলল ওরা, ইনডোর, আউটডোর সবরকম মেয়েদের উপযোগী খেলার ব্যবস্থাই স্কুলে আছে। টেনিকয়েট, বেসবল, ক্যারম, টেবিল-টেনিস, বাস্কেট, ব্যাডমিন্টন সব, সব আছে। বললাম সব তো তোমাদের আছে, বলবে কি নেই তোমাদের কি কি জিনিস? তোমাদের অভাবের কথা? ভবিষ্যতে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ার ইচ্ছে জয়ন্তীর। জার্ণালিজম পড়ার সখও আছে। সুযোগ পেলে হার্ভার্ডেও যেতে পারে। দাঁতে নখ খুঁটে নিঃসঙ্কোচে প্রিন্সিপ্যালের সামনে বলল—আমাদের লাইব্রেরীতে মডার্ণ রাইটার বই বড় কম। বিশেষ করে ইংরেজী বই! জানতে চাইলাম কার কার বই পড়তে চাও? মম, হেমিংওয়ে, চটপট উত্তর পেলাম জয়ন্তীর। নূপুরও জানাল একই অভাবের কথা। ওরা চলে যেতে মলিনা দেবী বললেন, বই প্রতি বছরই প্রচুর কেনা হয়। তবে বাংলা বই বেশী। কারণ টিচাররা বাংলা বইয়ের ডিম্যান্ডই জানান বেশী। তবে মেয়েদের অভাব তিনি নিশ্চয়ই মেটাবেন বললেন।

প্রায় চার মাস আগে এই অভাবের কথা শুনে এসেছিলাম। নিশ্চয়ই এতদিনে জয়ন্তী-নূপুরদের চাহিদা মিটিয়েছে স্কুল। কারণ সে সামর্থ্য স্কুলের আছে। স্কুলের আর্থিক সঙ্গতি যথেষ্ট ভাল। গ্র্যান্ট ইন এড তালিকায় নাম থাকলেও কখনো সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হয়নি স্কুলের। গত পঁচাত্তর বছর ধরে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে স্কুল নিজের সঙ্গতির জোরে। সঙ্গতির কথাই যখন উঠল তখন একবার টিউশন ফির কথা বলা যাক। কিন্ডার গার্টেন থেকে ক্লাস ফোর পর্যন্ত মাইনে মাসে তেরো টাকা, ফাইভ টু এইট পনেরো। সায়েন্সে ক্লাস নাইন টু ইলেভেন আঠারো টাকা। কমার্স ও হিউম্যানিটিজে নাইন ও টেনের টিউশন ফি ষোল এবং ইলেভেনে আঠারো। বারোশ ত্রিশটি মেয়ে আজ এই স্কুলে পড়ে। ছাত্রী সংখ্যা এখুনি ডবল করা স্কুলের পক্ষে কিছুই না। ফি বছর শয়ে শয়ে ভর্তির অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ে। কিন্তু ভর্তির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ রীতিমত কড়া। অ্যাডমিশন সম্পর্কে এরা যেমন স্ট্রিকট্ তেমনি তীক্ষ্ণ নজর পঠন-পাঠনের বিষয়েও। নার্সারী, প্রাইমারী, সেকেন্ডারী মিলিয়ে উনপঞ্চাশ জন শিক্ষিকা বারোশ ছাত্রীর ভবিষ্যত গড়ার দায়িত্ব বহন করছেন। ও'দের সম্মিলিত ইচ্ছার ওপর আজ নির্ভর করছে স্কুলের সুনাম ও অতীত ঐতিহ্য, যার বুনিয়াদ গড়ে দিয়ে গেছেন কুয়ার সিসটাররা। তাঁরা আজ এদেশে নেই, কিন্তু তাঁরা আছেন। ভিকটোরিয়া মারা গেছেন। কিন্তু জর্জিনা, ডরোথি, হিলডা কুয়ার গ্রামে বৃদ্ধাদের ইনফারমারিতে নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের বোঝা আজো বহন করে চলেছেন। তাঁদের অশ্রুত আশীর্বাদ নিশ্চয়ই সবার অলক্ষ্যে বর্ষিত হয় উত্তর-সূরীদের উদ্দেশ্যে। ডায়োসেশান স্কুলের আম, জাম, জারুলের ছায়ামাখা পিচবাঁধানো পথে, সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে, মাঠে, এপাশে ওপাশে ছড়ানো ছিটোনো ছ' ছটি স্কুল-বিল্ডিংয়ের ঘরে ঘরে কান পাতলে আজো সেই আশীর্বাদের অনুরণনটুকু অনুভব করা যায়। ঐ আশীর্বাদটুকু রক্ষাকবচের মত ঘিরে রয়েছে এই স্কুলটিকে। প্রার্থনা করি, চারিদিকের ঊষর মরুর মাঝে একটুকু সরসতা যেন চিরদিন বজায় রাখেন সেই মহামানব —সেন্ট জন দি ব্যাপটিস্ট।

—সন্ধিৎসু

পরের সংখ্যায় : টাউন স্কুল
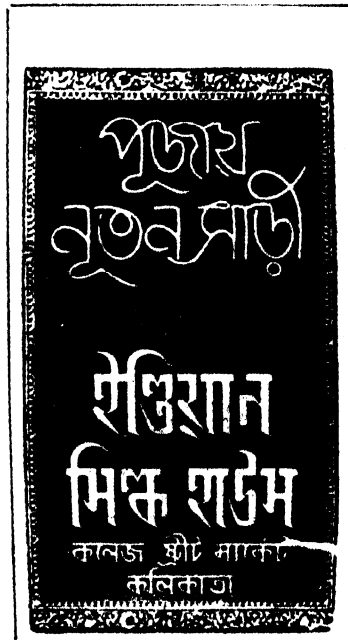
পালা শেষ

সত্যানন্দ ভট্টাচার্য

বিস্মৃত-আপনাকে—

জীবনের সঙ্গে ঢের খেলেছি খেলা।
হাতে সংবাদের ফেনিল মদ
সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-আবিল কাব্যতরঙ্গ
সৃষ্টি করে—
দহমরঙ্গী পতঙ্গের মেলা।

জীবন রসে করতে কায়েম ওই মহল আসনাভিত্তি
শৃঙ্খলা শান্তির বাণী
সর্বমতের মায়ামৃগ আমদানী
শিল্প ভাণ্ডারে—
উত্তাল আদিম যৌনরস ঢালা।

অবসান সহসা অস্থির প্রতীক্ষা
মরণাসক্ত উঠেছে ফুঁসে
পূজা আর নয়, নয় তো ভিক্ষা
প্রাণকোষ জাগে রন্ধ্রে রন্ধ্রে
ভাঙতে শিখেছে ভাবের ঘরের তালা।

সুপ্তিবিহীন স্বপ্ন গেছে ভেঙে
চললো না সমন্বয়ের পালা।

পূজা

অমল ভৌমিক

যে মন্দিরে পূজা দিতে ভুলে যাই
প্রতিদিন
সকাল সন্ধ্যায়। সে মন্দির
অপমানে রিক্ত হ'ল আজ। সন্ন্যাসীর
ব্যর্থ অনুরাগে বুকের অর্গল খুলে
লজ্জায় কাঁদে না আর অরণ্যবিগ্রহ

সূর্যকে অস্পৃশ্য ব'লে দূরে রাখি।
মন্ত্র উচ্চারণ করি গতানুগতিক
অতীন্দ্রিয় লালসায়
মুহূর্তে স্বীকার করি
আপনার অন্তরালে নিজেরে হারাই।

শিথিল শরীরে নিয়ে অবসন্নতায়
রক্তে রক্তে আলিঙ্গন
নির্মোহ সংসার
নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় শূন্য ক'রে আড়ম্বর
সহসা প্রণাম করি জীবনবেদিতে।

ভেসে যায় কবে

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কিশোরীর সরু হাড়ে মাংস জমে জমে
সতেজ যৌবন তৈরী হয়;
আশ্চর্য জাদুতে দেখি সিড়িয়ে ছোঁড়াটা
পরিণত শোভন পুরুষে।

মাটির নীচের রস শুষে,
কদম শাখায় জাগে রোমাঞ্চিত যে মহাবিস্ময়,
আমি তার কিনারা খুঁজি না।
আমি জানি পৌঁছে গেছি সে এক যতিতে,
যেখানে চূড়ান্তে উঠে অবাধ গতিতে,
সমস্ত নূনের দাম শোধ করে দিতে,
শাদা-চুল, ছানি-চোখ, নড়বড়ে দাঁতের পাটিতে

মাটি জল আলো শস্য থেকে
আমার এ সত্তা রক্তময়,
যতটা নিয়েছি টেনে ততটা ঝরিয়ে দিতে হবে।
সেই খাদ্যপ্রাণ দিয়ে বার বার তবে,

যুবতীর চুল চোখ বুক,
মাটিতে বকুল আর খালেবিলে পদ্মের কৌতুক,

গড়া হবে, ঝরে যাবে আবার উদ্ভিদ।
পুনরাবর্তিত বৃত্তে প্রথমের উজ্জ্বল উৎসবে

জীবনের পূর্ণঘট, আর যতিচিহ্ন,
তারপর খালি ঘড়া কোথায় যে ভেসে যায় কবে!

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঝুঁকিয়ে ধরতে কলকেটা হুঁকো থেকে তুলে নিয়ে কয়েক টান দিয়ে আবার আরম্ভ করলে—

"এরপর ঠিক মাস দুই পরের কথা—

দিদিমণির অমন করে ভয় দেখানোর জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক, জামাইবাবু দিনকতকের জন্যে মহালে যেয়ে বসে রইল; আজ্ঞে, তা পেরায় হপ্তা তিনেক বৈকি। ওনার বুভয়-সংকট, এককালে উনিও নাচো-ছেল সবাইকে, এখন সম্পূর্ণ গা-ঝাড়া দিতে পারেন না; অথচ ইদিকে সেরকম আটাও নেই, তার ওপর দিদিমণি! কিছুদিন বাইরে কাট্যে দিলে অজ্ঞাতবাসে। এর মদ্যে বারদুয়েক রায়মশায় এসেছেল। আমলাদের টেপা ছেল, কোন্ মহালে উনি গিয়ে বসে আচে, সন্ধান দিলে না। বললে—আমাদের তো বলে যাননি, হয়তো কলকাতাতে গিয়েই হালচাল বুঝচেন। আজ্ঞে, জমিদারী সেরেস্তার কম্মচারী একটু মনের মতন করে বলবার তো লোকের অভাব নেই, অবিশ্যি ভেতরে রইল অন্য অর্থ। ওদের তরফে এই। তারপর হবি-তো-হ' একদিন কাকাবাবু নিশিকান্ত রায়চৌধুরীর সঙ্গেও আচমকা দেখা হয়ে গেল। জামাইবাবু নেই, উনি প্রায় রোজই একবার করে কোন সময় এসে দেখাশোনা করে ঘুরে যেত। দিদিমণি যায়নি মহালে, ওটেই আসত, বেশি দূর তো নয়। সিদিনকে রায়মশাই পাল্কি থেকে নেমে উনিও সিংদরজা দিয়ে ঢুকল। সঙ্গে একজন পাইক থাকত, দু'জনায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। কাচে এসে উনি বললে—'ধনঞ্জয় যে! দিদির কাচে এয়েচ, কিন্তু সে তো নেই এখানে। তা দরকারটা কি?'

একটু ঘাবড়ে গেচে, একেবারে বাঘের মুখে পড়ে যাবে ভাবতে পারেনি তো! একটু ভেবে মনগড়া উত্তুরটা দেবে, কাকাবাবু বললে—'তা না হয় তাকেই বলবে'খন সে এলে। এসো আমার সঙ্গে বৈটকখানায়।' একজন কম্মচারী ছেল পাশে দাঁইড়ো, তাকে বললে—'বৌ-রাণীকে গিয়ে খবর দাও।'

তার মানে খাবার-টাবারের জোগাড় করতে আর কি।

আম্মো এসে পাশে দাঁইড়োচি। দিদিমণি বলে গেছল, রোজই আসচি তো ত্যাখন।

বললুম—"আমিই না হয় যাচ্চি। কোন্ ঘরে আচে, এখন—' বলতে বলতে পা বাইড়োচি, উনি বললে—'তাই যা, তাহ'লে।'

ধনঞ্জয়কে বললে—'এসো বাবাজী।'

আজ্ঞে, দৌড়েইচি তো, ইচ্ছে করচে লাফেই গিয়ে পড়ি—তারই মধ্যে একবার ঘাড়টা একটু উলটে দেখনু, ধনঞ্জয় যেন ফাঁসির কাঠে উঠতে যাচ্চে, জল্লাদের পেছনে পেছনে।

আমি তো বারান্দায় উঠে ছুটে ভেতরে চলে গেনু। ঝি ছেল উঠোনে, তাকে জিগোতে সে বললে দিদিমণি শোবার ঘরে চুল বাঁধচে। তিন লাপে সিঁড়িগুলো টপকে, ঘরের মধ্যে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললু—'দিদিমণি, শিগ্গীর এসো, খাঁচায় ইঁদুর পড়েচে।'

হঠাৎই তো, ঘুরে প্রেথমটা হকচাকিয়ে গিয়ে, দিদিমণি বললে—'দেখগে, যেন পালায় না। বড্ড জ্বালিয়েচে।'

বললু—'সে ইঁদুর নয়, কুসমীর ধনঞ্জয় রায় এয়েচে। পাল্কি থেকে নাবা, উদিকে কাকাবাবু পেছন থেকে পাইক দিয়ে তাকে পাকড়াও করে বৈঠকখানায় এনে তুলেছে। তুমি চুন-হলুদ তোয়ের করতে বলে দ্যাও।'

মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেল ওনার। কম কথা নয়তো দা'ঠাকুর, কাকাবাবু রাগী মানুষ, হাতের মুঠোয় পেয়েছে, এদিকে জামাইবাবু বাইরে, মুখটা একেবারে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেচে দিদিমণির, একবার শুধু—'বলিস কিরে!' বলেই বাক্‌রোধ হয়ে আমার পানে চেয়ে আচে, এমন সময় ঝি উঠে এল আস্তে-আস্তেই, তবে ওরই মধ্যে একটু তরস্ত। বললে—'কাকাবাবু বলে পাঠালেন রাণীমা, কুসমীর ধনঞ্জয় রায় এয়েছেন, একটু ভালো করে খাবার-টাবারের আয়োজন করে পাট্যো দিতে।'

দিদিমণি একবার কটমটিয়ে আমার পানে চাইল, দাঁতে-দাঁত পেষারও শব্দ হোল একটু। তবে বোধহয় আমিই শুনলুম সেটা, টগর ঝি মোটা মানুষ, দূরে থেকেই বলল, সব সিঁড়িগুলোও ওঠেনি। ওকে যেতে বলে, যেই না সিঁদে নেমে গেচে, চড় উঁচিয়ে এগিয়ে এল দিদিমণি—'এই তোর জন্যে চুন-হলুদের ব্যবস্থা করচি এবার। ছোট কথা বলতেই শেখেনি হতভাগা? বুকটা এখনও ধড়াস-ধড়াস করচে, এখুনি বুঝি কেলেঙ্কারিটে হয়—বাড়িতে!'

আমি ঘুরে আবার তিন লাপে নেমে পাইলে এলুম। এসে বৈটকখানার দরজার আড়ালে কান পেতে ওৎপিক্ষে করতে লাগলুম, কি কথা হয় শুনতে হবে। উনি যে বিধবা-বিয়ে নিয়ে জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করেছেল এটা জামাইবাবু আর দিদিমণি ছাড়া বাইরের শুধু আমিই জানতুম। দিদিমণি সব কথাই আমায় বলত, ভালোমন্দ যাই হো'ক। গোপনীয় হলে আমায় চাউর করতে মানা করে দিত, আর সেইগুনোই আগে চাউর করার জন্যে আমার পেট ফুলত। এর জন্যে ওনার হাতে মারও খেতুম, আবার তেমন জাঁকাল খবর হলে বলেও দিত, আমিও লোক বুঝে তুলে দিতুম কানে। এই করে চলছেল আমাদের। সিদিনকে কতক্ষণ দাঁইড়ো রয়েচি কান পেতে, কাকাবাবু ভালো করে ব্যবস্তা করতে বলে দেছে, দিদিমণিরও বিলম্ব হচ্চে কিন্তুক বিধবা-বিয়ে নিয়ে কোন কথাই নেই রায়মশায়ের মুখে। জমিদারীর কত রকম সমিস্যের কথা, আরও সব কত রকম কথা হচ্চে—কুচ্ছিৎ হোক, হারামজাদা হোক একজন জমিদারই তো, বাড়ি বয়ে এয়েচে, তায় বাড়ির কত্তা নেই, বেশ খাতিরের সঙ্গেই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে কাকাবাবু, এদিকে আমার মন আনচান করচে। এইবার জলটল খেয়েই বিদায় হবে, অমন জাঁকাল খবরটা চাপাই থেকে যাবে? শেষে আর ধৈয্য ধরে না থাকতে পেরে এক কাণ্ড করে ব'সনু, হঠাৎ দরজার আড়াল থেকে সামনে এসে বললুম—'দিদিমণি সুদোলে, উনি সিদিনকার মতন বিধবা-বিয়ে নিয়ে কিছু নতুন কথা বলতে এয়েছিলেন? তা'হলে বলে যান তো উনি লিখে পাট্যো দেন মহালে, জামাইবাবু তাড়াতাড়ি চলে আসেন।'

বেশ গুচো ভালমানুষের মতন মুখ করে বলে গেনু। সে ক্ষ্যামতাটুকু ছেলই।

ত্যাখন ঠিয়েটার সবে নতুন শুরু হয়েচে দা'ঠাকুর। রাজবাড়ির পর্দা, একটা ঘরে রাজা-মন্ত্রী-পাত্রমিত্র সব বসে গপ্প করচে, এমন সময় একজন দূত এসে যুদ্ধের খবর দিতে সব চুপ-চাপ একেবারে! এও ঠিক সেইরকমটা হোল দা'ঠাকুর। অত তো গলায়-গলায় হয়ে আলাপ হ'চ্ছেল, একেবারে আর সাড়া নেই। কাকাবাবুর মুখটা একেবারে রাঙা হয়ে গিয়েচে, রায়মশাই কি

বলতে গিয়ে ওনার চেহারা দেখে মাথাটা নাব্যো নিয়েছে, এই সময় চাকর বেজেন শ্বেত পাথরের বড় রেকাবি করে খাবার নিয়ে এসে টেবিলে রেখে তক্ষুনি ফিরে গিয়ে জলের গেলাস রেখে গেল। কাকাবাবু ওনাকে বললে—'খেয়ে নাও বাবাজী।'

আজ্ঞে, তা বেশ নরম গলাতেই, ঝাড়ল জমিদার, সামলে নিতে দেরীও হবে না তো।

কথা কইবার কিছু পেয়ে রায়মশাইও যেন বাঁচল। তবে কথা কি আর সেই রকম খোলসা করে বেরোয়? নতুন জামাইটির মতন একবার চোখ তুলে চেয়ে নিয়ে মাথা হেঁট করেই বললে—

'এত্তো?'

কাকবাবুর বলল—'এত্তো আর কোথায়? খেয়ে নাও।'

গলা দিয়ে নাবে কখনও? কোনরকমে সরবৎটুকু খেয়ে গোটা দুই মিষ্টি মুখে দিয়ে হাত ধুয়ে উঠে পড়ে বললে—'উঠি কাকাবাবু, অনেকগুলো কাজ ফেলে এসেচি।'

উঠেচে, কাকাবাবু টুকলো—'বিধবা-বিয়ে নিয়ে কি জিগ্যেস করছিল, বললে না তো?'

রায়মশাই রুমালে হাত মুছতে মুছতে আমতা-আমতা করে বললে—'ও, হ্যাঁ, তুলেছেল বটে কথাটা সিদিন দেবনারায়ণ। তা বলবি, আমিই তাকে লিখে দেবো'খন।'

ঠিক এই সময় দিদিমণিও পা টিপে টিপে দরজার আড়ালে এসে দাঁইড়োচে। দেখচি, গোঁফ জোড়াটা ফুলে উঠেচে কাকাবাবুর। তবে এবারেও সামলেই নিলে, শুধু আওয়াজটা নাকি ভয়ংকর গম্ভীর ছেল, আরও একটু ভরাট হয়েই উঠলো, বললে—'বিধবা-বিবাহ নিয়ে আমার ছেলের চেয়েও আপনার ভাইপোকে পৃথক করে দিতে হয়েছিল, ধনঞ্জয়। আবার যদি তাই নিয়ে উঠতে চায় তো বুঝব তোমার এতে যোগসাজোস আচে।'

সিংদরজা পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়ে পাল্কিতে তুলেও দিলে। তারপর, কাকাবাবু বেইরেচে, সেরেস্তার কর্মচারীরা সব নেবে এয়েচে, দারোয়ানও পেতল-বাঁধানো লাঠিটা নিয়ে বেইরে এয়েচে—উনি একবার সবার ওপর দিয়ে আগুনের ভাঁটার মতো চোখ দুটো ফিরিয়ে এনে বললে—'কুসমীর ধনঞ্জয়ের পাল্কি এলে সিংদরজা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয়।'

সবাই হাত জোড় করে কথাটা শুনে নিলে। দারোয়ান চৌবেজী ডান হাতটা চিতিয়ে গোঁফ জোড়ার ওপর ঘেঁসে দিলে আস্তে আস্তে।

কাকাবাবু আর ভেতরের দিকে না গিয়ে ওখান থেকেই ঘাটের দিকে চলে গেল।

দিদিমণি, বৈঠকখানার দরজার পাশে চোখ বড় বড় করে দাঁইড়োছেল, যেন যাত্রার দলের গান্ধারী দূত মুখে কুরুক্ষেত্রের খবর শোনবার জন্যে বেইরে এয়েচে। আমি যেতেই সুদোলে—'বিধবা-বিয়ের কথা কি বলচেন কাকাবাবুরে স্বরূপে, ওদিকটা শোনা হয়নি আমার।'

বলনু—'নিজেই বাহাদুরী করে শোনালে যে রায়মশাই। এখন সামলাক্ গিয়ে। হুকুম হয়ে গেল, কুসমীর পাল্কি এলে সিংদরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

'সে কিরে!! একি সব্বনাশ!!'—বলে একেবারে শিউরে উঠল দিদিমণি। ভয়ে যেন পড়ে যেতে গিয়ে দরজাটা চেপে ধরে সামলে নিলে। বললে—'কি করি বলতো এখন স্বরূপে? যা রাগী মানুষ! এদিকে তোর জামাইবাবু নেই, আমি একলা মেয়েছেলে—কিচ্চু যে আসচে নারে মাথায়!'

তবে বেশীক্ষণ ঘাবড়ে থাকবার মেয়ে ছেল না তো। সেখেনে দাঁইড়ো-দাঁইড়োই ডাগর চোখ দুটো ঘুরিয়ে কি ভেবে নিয়ে বললে—'তুই এক কাজ কর স্বরূপে, দরজায় পাল্কি আনতে বলে আয়। যাই ছুটে একবার, কাকীমাকে গিয়ে বলি সব। ও-হতভাগার যা হওয়ার হবে, হওয়া উচিতও, এদিকে আমরা যে মারা যাই। কাকাবাবু ওদিক থেকেই ওদিকে চলে গেল—একবার এসে জিজ্ঞেস করলে না কি ব্যাপার—এ যে আমাদের ওপরই চটে যাওয়ার লক্ষণ। নিয়ে আয় পাল্কি, গিয়ে কাকীমাকে বুঝিয়ে সব বলি, ও হতভাগা এসেই জপাবার চেষ্টা করে, পষ্ট জবাব দিয়ে তোর জামাইবাবু ওর হাত থেকে নিষ্কিতি পাওয়ার জন্যে মহালে গিয়ে বসে আচে। যা, দৌড়ে নিয়ে আয়। আমি চুলটা বেঁধে ফেলিগে তাড়াতাড়ি। কি ফ্যাসাদে পড়া গেল বাবা।'

ব'কে যাচ্চে আতালি-পাতালি হয়ে, কিন্তু শুনচে কে বলুন? আমার মনে ত্যাখন অন্তঃসলিলে বয়ে চলেচে এদিকে। বুঝচেন না? —দিদিমণি মজ্জানী দেউড়িতে গিয়ে কথাটা পাড়লেই সব প্রেথমে তো এই সওয়াল উঠবে, গেল কি করে কাথাটা কাকাবাবুর কানে। কেউ তুলুক আর নাই তুলুক উনিই তো বলবেন, আমি বলেচি। শুধু তো তাই নয়, আমি আবার বলেচি, দিদিমণিই আমায় দিয়ে বলে পাঠেচে। তাহ'লেই তো আমি গেনু! ব্যাপারটা যেমন ঘোরাল হয়ে দাঁইড়োচে, এবার তো চক্ক-চাপড়ে কুলোবে না।

আজ্ঞে, গলদ্‌ঘর্ম হয়ে উঠেচি। দিদিমণি আরও দু'বার তাড়া দিতে আরও দু'পা এইগেচি ত এমন সময় ঝাঁ করে রেজেস্টারুপের কথা মনে পড়ে গেল। বললে, 'একবার মাসীমাকে জানালে হয় না দিদিমণি?'

দিদিমণি একেবারে উল্সে উঠলো, যেন হাতে স্বগ্গ পেয়েছে। হাসি হাসি মুখে আমার পানে চেয়ে বললে—'ঠিক বলেচিস্ রে স্বরূপে, লাখ টাকার কথা বলেচিস্। ঐ একটি মানুষ যে সব সমিস্যে মিটিয়ে দিতে পারে। কেন যে মনে পড়ে নি এতক্ষণ? —মাথার কি ঠিক আচে যে পড়বে মনে। তাছাড়া মাসীমা ছেলও না তো, সেই জন্যেই বোধ হয় আরও মনে পড়েনি। আজ নিশ্চয় আসবেও, য্যাতক্ষণ না এসে পড়ে। তা দরকার কি?—তুই পাল্কিটা নিয়ে গিয়ে নিয়েই আয় গে ডেকে। যাক, আমি আর কাউকে ভয় করিনে। আমার সব্ব ব্যাধির ধন্বন্তরি এসে গেচে। নাকি, একটু দেখেই যাবি? না হয় একটা লোক পাটো দেবো পাল্কি নিয়ে।'

আমার মনে তো অন্তঃসলিলে ত্যাখনও বয়েই চলেচে। মাসীমাকে সেখেনে গিয়ে সব ঠিক করে নিতে হবে। দিদিমণির সামনে তো বলা চলবে না। বলনু, 'আমাকেই যেতে দাও দিদিমণি। সবে ফেরেচে বিন্দাবন থেকে, হয়তো কাচের দেউড়িগুলো সেরে নিচ্চে আগে। আমি গেলে সন্ধান নিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ডেকে নে'সব। পেয়াদায় পারবে না।'

বললে—'তা ঠিক বলেচিস্। কি জানিস?—তুই কাচে থাকলে বেশ ভরসা পাই। এই একটা বুদ্ধি বাৎলে দিলি তো। আমি তো একেবারে অকুল-পাথারে পড়ে-ছিলুম। বিন্দাবন থেকে যা যা কিনে এল মাসিমা আমাদের জন্যে সব নে'সতে বলবি।'

আমি বলনু—'আর কিছু আনুক না আনুক, "হরে কেষ্ট, হরে কেষ্ট" নামাবলী নিশ্চয় এনেচে। আমার তো বলাই ছেল। তোমাদের দু'জনের জন্যেও একখানা করে বলে দিছলুম দিদিমণি, বিন্দাবনের সব-চেয়ে বড় সওদা কিনা।'

দিদিমণি বললে—'দিছ্লি তো বলে? —বেশ ভালো করেছিলি স্বরূপে, আমার তো একেবারে খেয়ালই ছেল না।'

কথাটা বলেই আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে থেকে দিদিমণির মুখটা রাঙা হয়ে উঠল, খুব বেশি হাসি পেলে যেমন হোত; তারপরই একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠল। আমি সুদোলুম—'কি হোল গা দিদিমণি?'

দিদিমণি হাসিতে দুলতে দুলতে বললে—'বলেচিস্ তো নে'সতে আমাদের জন্যেও? আমি এবার তোর সাহেব-জামাই-বাবুকে গায়ে দোয়াবো?—দোয়াবই গায়ে, দেখিস্ না—উঃ, আমার সেই রাত্তিরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে,—সেই যে ঘোড়ার চড়ে বিষ্টিতে ভিজে আমাদের পোড়ো মন্দিরটাতে এসে উঠল, —তুই আমার দু'খানা ডুরেশাড়ি নুকিয়ে দিয়ে এলি আমায় না জানিয়ে—একখানা পরে একখানা গায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলে গেল—আমার দেখা হয়নি, এবার দেখব—সায়েবের গায়ে 'হরে কেষ্ট' নামাবলি, উঃ!—সেবারও ঘোড়ার বুদ্দি, এবারেও

তাই—একবার এই বেশে ঘোড়ায় চড়াতে পারবি নে সারেবী পোশাকসন্দু?'
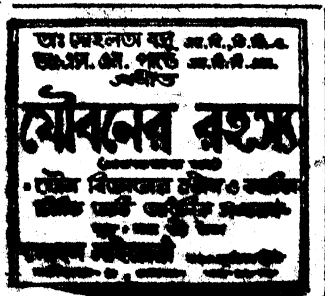
বলে আর হলতে দুলতে হাসতে থাকে, হাসি একবার এলে তো থামতে চাইত না, ঐ রকম আথর বের করে করে হেসেই যেত। ...বেলা হয়ে যাচ্ছে না দা'ঠাকুর? চাকা তো অনেকখানি উঠে এল ওপরে।'

কথাটা বলে আমার দিকে চাইল, স্বরূপ। বললাম—'তোমার দেরি হচ্ছে না তো নাওয়া-খাওয়ার?'

উত্তর করল—'আমার সেই একটা-দুটো। দেউড়িতে সবার হয়ে গেলে তবে তো? সেই প্রয়োজনে অভ্যেস চলেচে এখনও।'

বললাম—'তাহলে চলুক না। বেশ জমিয়েছ। গদাইয়ের মায়ের তাঞ্জামে করে আসার কথাটাও তো শোনা হয়নি এখনও।'

একটু হাসল স্বরূপ, তারপর একটি নাতনীকে ডেকে কল্‌কেটা সেজে আনতে দিয়ে আবার আরম্ভ করল—'তা যদি বললেন তো এক হিসেবে উনি এই ব্যাপারের মধ্যে এসে পড়াতেই গদার মার এখেনে আসা ঘটল, নৈলে গদার-মার তো অন্য জায়গায় নেকা ছেলই, আরও সব কি কি যে কাণ্ড হোত বলা যায় না।

আমি য্যাখন গেলুম, মাসীমা ত্যাখন কোথা থেকে এসে রকে দাঁইড়ো পা ধুচ্ছে, ঘরে যাওয়ার জন্যে। আমায় দেখে বললে—'তোকেই খুঁজছিলুম স্বরূপ, নেত্যর ওখানে গিয়ে পাল্‌কিটা নিয়ে আসবি। এদিকে ঠাকুরবাড়ি, অতিথশালা, অনাদির ওখান—এসব সারা হয়ে গেল আমার, এবার নিশ্চিন্দি হয়ে ওর ওখানে গিয়ে বসব। ছেলি কোথায় তুই?'

কথাটা যা বলব তাতে বেশ সাহস পাচ্ছিনে তো, উনি থামলে বললুম—'দিদিমণির ওখানে ছেলুম, উনি পাল্‌কি পাঠ্যে দিলে আপনাকে। —যাবার জন্যে।'

সন্দোলে —'দিয়েচে? চল্ যাই কাপড়টা ছেড়ে নিয়ে। একটা দরকারী কথাও আচে।'

আমি সুবিধেই খুঁজছিলুম, বললুম—'তানারও একটা ভীষণ দরকারী কথা আচে, ভীষণ বিপদে পড়েচেন কিনা।'

'সে কিরে—ভীষণ বিপদ!!—ভালো আচে তো সবাই?' ভেতরে যেতে যেতে একেবারে ঘুরে দাঁড়াল মাসীমা। 'শরীল-গতিকে সবাই ভালো আচে'—বলে গোড়া থেকে আমি সিদিনের সব ঘটনা পজ্জন্ত বলে গেলুম একধার থেকে। আজ্ঞে, হুবহু যেমন হয়েছিল, ইস্তক আমিই যে মিথ্যে দিদিমণির নাম করে জানিয়ে দিলুম কাকাবাবুকে, রায়মশাই ভয়ে ভয়ে বিধবা-বিয়ের কথাটা চাপা দিতে চায় দেখে—সেটা পজ্জন্ত। এক মিথ্যে বলে যা হাল হয়েচে, আর বলবার সাধ নেই তো। এও বললুম যে, দিদিমণিকে বলেচি, রায়মশাই নিজেই বাহাদুরী করে বলেচে কাকাবাবুকে, আমি নয়।

—বলতে বলতে ওদিকে জমা ভয় দুশ্চিন্তে, ইদিকে এমাকে পেয়ে একটা ভরসা—সব মিলিয়ে মনটা উথলে উঠে কাঁদ-কাঁদ হয়ে হাতজোড় করে বললুম—'আমি বলেচি, দিদিমণিকে একথা বললে আমায় আস্ত রাখবে না। রায়মশাই চাপতে চায় দেখে ওনার নাম করে দিচে বলল আপনি বিন্দাবন থেকে সদ্য এয়েচ পুণ্যি করে, আপনার মিছে কথা বললে পাপ হবে না।'

—বলতে বলতেই আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে উঠলুম। মাসীমা এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে, আজ্ঞে, মনে স্নেহ জাগলে আচার-অনাচার জ্ঞান তো ঠাঁই পেত না। পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—'চুপ কর্ স্বরূপ, চুপ কর্। যাঁর ওখেন থেকে এলুম তিনি নিজেই শঠের শিরোমণি, ভালো কাজের জন্য যে কত মিচে কথা বলেছেন তার হিসেব আচে? চুপ কর, পাপ হবে না তোর। আমি সব সামলে নোব এদিকে সেখেন থেকে • যা শুনে এলুম, যা ভাবতে ভাবতে এলুম, গিয়েই নেত্যকে বলতে হবে। সব যেন মিলেও যাচ্চে। চল্ যাই।'

এরপর থেকেই থমথমে ভাব, আর কোন কথা নয়, শুধু বেয়ারাদের বললে—'একটু পা চালিয়ে যাবে।'

ওনার পাল্‌কি খোলাই থাকত। বেয়ারা-দের সঙ্গে আমি দরজার সামনে ছুটে ছুটে চললু, আমাকেও আর কোন কথা নয়।

দেউড়িতে দরজার কাছে পাল্‌কি থেকে নামতে দিদিমণি পা ধুয়ে এলো চুল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে উঠতেও বিশেষ কোন কথা নয়, শুধু থুতনিতে হাত বুলিয়ে চুমো খেয়ে—'ভালো আচিস্ তো সবাই?'

কথা বেরুলো একেবারে য্যাখন দিদিমণি ওপরে নিয়ে গিয়ে বসাল; প্রেথম কথা —হ্যাঁরে নেত্য, বলি, আমি মেয়েছেলে, শুনে সেখেন থেকে ছুটে এলুম, আবার কি অঘটন ঘটায় মিত্যুঞ্জয়ের ব্যাটা এবার কোনখানে, আর এদিকে বড় বড় মন্দরা সব নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্চেন?'

একে ওনার থমথমে ভাব দেখে হত-ভম্বই হয়ে গেছল, নিজে থেকে একটা কিছু বলতে পারে নি, তার ওপর গোড়াতেই এই অভ্যত্থনা, দিদিমণি কি উত্তর দেবে ঠাহর করতে না পেরে হাঁ করেই চেয়ে রইল একটু, তারপর একটা ঢোঁক গিলে বললে—'কি শুনে ছুটে এলে মাসীমা? আমার তো ভয়ে হাত-পা আসচে না।'

মুখটা শুকিয়ে গেচে, ভয়ে-ভাবনায় ওনারও পেরায় আমার মতন অবস্থা, কাঁদ-কাঁদ হয়ে এসেচে, মাসীমা হুবলো ধর্‌তা-টুকু একেবারে বড় চড়া হয়ে গেচে, একটু চুপ করে থেকে নরম হয়ে বললে—'না তোদের আর ভয় কি? তবে একেবারে নয়ই বা কি করে বলি?—কথায় বলে যাবে ছুঁলে আঠার ঘা; এই তো যেমন স্বরূপের মুখে শুনলুম, খুড়ো-ভাইপোতে আবার একটা বাধাবার জোগাড় করে গেচেই। তা ভয় নেই, ফেজ-বামনী এসে গেচে, ও কতবড় শয়তান এইবার দেখে নোব আমি। ঝিকে গোটা কতক পান সেজে আনতে বল্, তাড়াতাড়িতে ডিবেটা আনতে ভুলে গেচি।'

'আমি সেজে আনচি মাসীমা, ঝি কেন?' —বলে উঠতে যাচ্ছেল দিদিমণি, উনি বললে —'না, তুই বোস্। কাজেকম্মে কাজের জন্যে আমার পেট জ্বলচে। স্বরূপে, হেঁকে বলে দে। তুইও সব্বখটে আচিস্ তো, শোন্।'

ত্যাখন খোসামোদের মুখ তো। ত্যাখন-কার দিনে পেনিটীর পানের খুব নাম ছেল, কাজেকম্মে জমিদারদের বাড়িতে আসত, আমি সিঁড়ি থেকে হেঁকে বললু—'মাসীমার জন্যে দিব্যি পেনিটীর পান সেজে আন টপাটপিসি। উনি বিন্দাবন থেকে এল।' এসে দেখি দুজনেই মুখ নীচু করে হাসচে। আমি যেতে মাথা তুলে মাসীমা একটু ধমক দিয়ে বললে—'ছোঁড়ার সে রোগ গেল না, ছোটকথা কইতে জানে না। গঙ্গা পেরিয়ে ছুটবে পেনিটীর পান আনতে।'

বলতে বলতে আবার হেসেও ফেললে। তারপর আবার ভারিক্কে হয়ে বললে—'খবরদার কাজের কথার মধ্যে বাজে কথা এনে ফেলে হাসাবিনে এমন করে। বিন্দাবন থেকে এল, তার পেনিটীর পান না হলে চলবে না! শোন্ নেত্য, আগে মথুরাটা সেরে বিন্দাবনে এসে বসবো দিন কতকের জন্যে, এইরকম ঠিক করে গেছলুম। তিথিধ্ব জায়গা, একবার গিয়ে বসলে কি পাপ শরীল নিয়ে নড়তে ইচ্ছে করে? মথুরাতেই সাত আট দিন লেগে গেল। তার মধ্যেই বার দুই বিন্দাবনটা চক্কর দিয়ে গেলুম, দূর তো নয়। একটা থাকবার জায়গাও ঠিক করে গেলুম, আগাম দিয়ে।

মথুরা সেরে বিন্দাবনে এসে বসলুম গোছগাছ করে, মাসখানেক পরে একেবারে রাসটা দেখেই ফিরব। কাটলও দিন দশেক বেশ; বেশ মানে —মনের পাপ নুকুনো তো মহাপাপ নেত্য—বেশ, তবু দোটানাই বৈ কি! এখানেও মনটা পড়ে রয়েচে—সদাব্রত, ঠাকুর-বাড়ি, ওখানে অনাদি—একলাই বলতে হবে তো, আপনভোলা ব্রাহ্মণ; এদিকে তুই, একলাই বৈ কি, ছেলেমানুষ, এতবড় একটা সংসার মাথায়—পড়েই থাকত মনটা দোটানায়

মধ্যে; তাই ঠাকুর বললেন—ঐ মন নিয়ে তুই রাস দেখতে এসেচিস্? রোস্, দেখাচ্ছি!

একদিন গোপীনাথের মন্দির থেকে আরতি দেখে বেরুচ্চি, হঠাৎ কানে গেল, 'ওমা, আপনি এখেনে!'

ঘুরে দেখি জনা পাঁচেকের একটি ছোট দল, তার মধ্যে পেরায় আমারই বয়সী এক-জন কথাটা বলেচে, বললুম—'এয়েচি ক'দিন হোল এখেনে, কিন্তু চিনলুম না তো দিদি আপনাদের কাউকে।'

একটু বেঁকা-গোছের মানুষটা। ঠোঁটে একটু হাসি চেপে সবার দিকে চেয়ে বললে—'আমাদের কে চিনবে দিদি? কোন দরের মানুষ আমরা? তবে আপনাকে আমরা সবাই চিনি বৈ কি। মসনের ব্রেজঠাকরুণ তো? পাশেই শিবতলায় আমাদের বাড়ি।'

—কেমন যেন একটু ঠেস দিয়ে কথাটা। আমি তবু হেসে ভালো ভাবেই বললুম—'সেসলমে দিদি পাপের শরীলটে একবার টেনে।'

দলের দিকে চেয়ে বললে—'শোন্ গো তোরা, দিদির হোল পাপের শরীল। তাহলে তো আমাদের তিত্থি-ধম্ম করেও কোনও আশা নেই। যাক্, আমি যা বলছিলুম—আপনি এখেনে, আর উদিকে স্বয়ং বিন্দাবন যে আপনাদের গেরামে গিয়ে আবিবভাব হয়েচেন। ব্রেথাই কষ্ট করে আসা।'

বললুম, 'বুঝলুম না তো দিদি, স্বয়ং বিন্দাবন, সে আবার কি?

গল্প করতে করতে আমরা মন্দির থেকে সরে এসেচি। বললে—'কেন, ব্রেজনিধি মহারাজ গো। বিন্দাবন বলতে তো আমরা এখন তাকেই জানি; গেচেন, অন্ধকার দেখচি। আমরা কেন, সবার মুখেই এই কথা। মসনেতে দিন কতকের জন্যে শিষ্যি-বাড়ী গেচেন।'

নামটা যেন কোথায় শোনা। জিজ্ঞেস করলুম—'কোথায় তাঁর শিষ্যিবাড়ি, নাম কি শিষ্যির?'

না, 'কেন, দামোদর চৌধুরী, অবাক করলে যে আপনি!'

ঝাঁ করে মনে পড়ে যেতে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম রাস্তার মাঝখানে। বুঝলিনে, সেই বোষ্টম বাবাজী, যে একবার মাথার ওপর ভর করে সব্বসান্ত করে এনেছেল দামোদরকে। শেষে এমন অবস্থা যে মেয়েটাকেও বুঝি এই শয়তান ধনঞ্জয়ের হাতে তুলে দেয়। সেই হোল্লা এদের স্বয়ং বিন্দাবন, তাহলে কি ধরনের দলটা বোঝা গেল। মাথায় ত্যাখন আগুন ধরে উঠেছে। তবু ভাবলুম, কাজ কি, তিত্থি জায়গায়। ঘুরে পা বাইয়েচি, ওদের মধ্যে একজন বললে—'দিদির যে সাড়াই পাওয়া গেল না কোন?'

এরকম করে খুঁচিয়ে তুললে আর চুপ করে থাকা যায়, বল নেত্য? আর, মুখ খুলে গেলে ব্রেজবামনী কারুর খাতির রেখে বলবার পাত্তোরও নয়। বললুম—'দামো-দরের গুরু সেজে এক বোষ্টমবাবাজী তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দেওয়ার চেষ্টা করেছেল বটে, যদি সেই হয়—'

এই পজ্জন্তই বলা, জলদস্যু সব ঝাঁউ-ঝাঁউ করে উঠল ক্যাপা কুকুরের মতন—'আপনি ব্রেজের মাটিতে দাঁইড়ো ব্রেজনিধির নামে এই বলচ!' তা যতই বড় দল হোক তোদের, আমিও ব্রেজ বামনী, হয়ে গেল একচোট রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে। অনেকদিন ঠান্ডা হয়ে আচি, পুরো দম, সবকটাকে কথার চাবুকে ঠান্ডা করে আমি তাড়াতাড়ি বাসায় চলে এলুম। নিজের মাথাতেও তো আগুন ধরে গেচে, একটু ঠান্ডা হতে প্রেথমটা মনে হোল—মরুকগে, মাতাল মানুষ, মতিস্থির নেই, য্যাখন যেই দিকে ঝোঁকে ত্যাখন সেইদিকে ঢলে, ওদের এই দশাই হবে। তার জন্যে আমি আর কি করব? তারপর য্যাতই সময় যেতে লাগল মনটা আনচান করে উঠতে লাগল। হোক মাতাল, তবু মানুষটা তো শিশুর মতই নিরীহ, তাছাড়া আমাদের জন্যেও তো কম করলে না। কিছুই হয়তো পারবো না করতে, তবু দূরে সরে থাকি কি করে? চৌধুরী গিন্নীর মুখখানাও পড়তে লাগল মনে। বেচারি যেন আরও অসহায়, কোন ভরসা পায় না।

সমস্ত রাত ঘুম হোল না নেত্য। সকালেই গাড়ি। 'যদি অপরাধ হয়তো খোর না ঠাকুর'—বলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে চলে এলুম।

এসেই লোক পাঠিয়ে চৌধুরী বাড়ি থেকেই পাল্কি আনিয়ে আগে ওখেনে গিয়েই উপস্থিত হলুম। গিন্নী তো যেন বর্তে গেলেন। বললেন—'আমি যে কি অকূলে পড়েচি মাসীমা, শেষে কোন উপায় না দেখে এখুনি দশআনি দেউড়িতে কাকা-বাবুর কাচে যাচ্ছিলুম, এমন সময় আপনার লোক এসে হাজির। বললুম, তহলে আগে মাসিমাকেই নিয়ে আয়, আমার বোধহয় আর কারুর কাচে যেতেও হবে না।'

সব বেশ মিলে যাচ্চে, আমি জিজ্ঞেস করলুম—'তা সে বিটলে কোথায় উঠেচে এসে? একবার চেহারাটা দেখতুম কেমন!'

গিন্নী একটু অবাক হয়েই আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—'কে, কার কথা বলচেন মাসীমা?'

বললুম—'কেন, সেই ভন্ড বোষ্টম-বাবাজী, সেবারে এসে যে অমন গোলমালটা বাধিয়ে গেল। সে এখেনে এয়েচে শুনেই তো আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম!'

গিন্নী বললেন—'কৈ, সে তো আসেনি। সেবারে এসে সে এখেনেই উঠে আপনার বোনপোর কাছে কিসব মন্ত্র ফেড়ে ঐ হাল করে গেছল। এবারে তো সে নয়; একেবারে খোদ কুস্মীর সেই ধনঞ্জয় রায়, যার হাতে মেয়েটাকে তুলে দেওয়ার জন্যে ওর বাপ অমন মেতে উঠেছিলেন। এবারে নতুন রূপ আবার, সেই পুরোনো —বিধবা-বিয়ের হুজুগ। কত্তাকেই নাচিয়েচে। সাষ্টাঙ্গ হয়ে কমাটেমা চেয়ে একেবারে অন্য মানুষ। আপনার বোনপো যে সেবার অমন সব-ত্যাগী বোষ্টম বনে গেছল, ধনঞ্জয় তার থেকেও গেচে ছাড়িয়ে। যাওয়া-আসা, দেওয়া-থোওয়া—গলাগলির আর কোন হিসেব নেই। একটা আরও গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে, বুঝচি; বলতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে আসুন। শিবনাথটা ভরসা ছেল, বলতে গিয়ে পেরায় চাকরীই খুয়ে বসে। এবার আর নতুন চাল, নেশা ছাড়াবার দিকে যায়নি, বরং আরও বেড়েই গেচে এদিকে।'

মাসীমা বলে—গিন্নী বলে যাচ্ছেন, আমি ইদিকে মনে মনে নিজের আন্দাজ করে যাচ্ছি, নেত্য। যেন মিলেও যাচ্চে বেশ। তবে ওঁকে আর সেকথা বললুম না। ওঁকে বললুম—'এই সদ্য এয়েচি বিন্দাবন থেকে, ঠিক তো বুঝতে পাচ্চি না, তবে আপনি কিছু ভাববেন না। আমি গিয়ে চান করে জপটপগুলো সেরে নিই। আপনি শুধু শিবনাথকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দেবেন।'

শিবনাথ এলে আমার আন্দাজটা তাকেই বললুম, কেন, কি করে আমি হঠাৎ বৃন্দাবন থেকে চলে এলুম, আগে সেকথা বলে নিয়ে। বললুম, আমার আন্দাজ শিবনাথ, সেবারেও এই বাবাজীই পেছন থেকে কল-কাঠি নেড়েছেল। এগুতে নেশাপত্তর সব ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে বৈরিগী করে তুললে একেবারে, তারপর যখন দামোদরের কপনী নেবার মতন অবস্থা, তখন ধনঞ্জয়ের বাপকে ঠেলে দিলে, এবার মেয়েটার কথা পাড়ো গিয়ে, আর 'না' বলবার মতন কিছুই রাখিনি। এরপর যা হল তুমি তো সব জানই শিবনাথ, শেষ পজ্জন্ত সামলালেও তুমিই। আমার বিশ্বাস, এবারেও ঐ বিটলে বাবাজী রয়েচে পেছনে। এবার তো আর সামনে আসার হেস্মৎ নেই, কোথাও ঘুপটি মেরে লুকিয়ে বসে আচে। এবার পন্থাতিটেও বদলে দিয়েচে—আর ত্যাগের মহিমে নয়, যেমন নেশা-ভাং নিয়ে আচে, থাকুক—সেও নিশ্চয় ওরই কুটবুদ্ধি। ধনঞ্জয়টা শুনেচি, মুখ্যু, কাঠগোঁয়াড়, ওর মাথায় এ ধরনের সূক্ষ্ম চাল আসবে না। এবার উল্টে ওকেই দীনহীন বোষ্টম সাজিয়ে পাঠিয়েছে—মহা-জনরা যেমন বলেন তিনের চেয়ে নীচু হতে হবে, আবার তরুর মতন সহিষ্ণুও—এদের মতন মতলববাজদের অসৎদের জন্যে ভালো কথাগুলো নিজের কাজে লাগাতে তো দেরী হয় না—সেইরকম তালিম দে পাঠিয়েচে, —সব মানমর্য্যোদা খুইয়ে, বাপ যে অপরাধটা করে গেল, সংটং বের করে, তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে জমিটা ঠিক করে রাখো, তারপর আমি আচি।' (ক্রমশঃ)

আপনাকে যখন সবাই চাইবে

সুন্দর চেহারা থাকলে নিজেকে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। কিন্তু মনোমুগ্ধকর চাহনি ও পরিপাটি এবং ফিটফাট চেহারার ওপরেই আকর্ষণ নির্ভর করে না। আমাদের অনেকের এ দুটোই আছে, তবুও আমাদের ওপর কারও আকর্ষণ না থাকতেও পারে।

নিজের জীবনকে আপনি কিভাবে দেখেন, আর মানুষের ওপর আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া কি রকম, এই দুটি জিনিষের সাহায্যেই আপনার ব্যক্তিগত আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই আকর্ষণ মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নেয় এবং পরস্পরকে জানতে ও চিনতে সাহায্য করে।

নীচের পরীক্ষাটি একবার চেষ্টা করে দেখুন—আপনার কেমন লাগে তা প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবে বলুন, 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'।

(১) যেসব লোকের সংস্পর্শে আসেন তাদের সকলকেই কি আপনি পছন্দ করেন? তাদের কাছ থেকে আপনি কি আনন্দ পান?

(২) প্রত্যেক লোককে কি সহজেই নিজের মত করে নিতে পারেন?

(৩) লোকে কি আপনাকে দেখে বলে, "আপনার সঙ্গে আবার দেখা হলে বড়ই আনন্দ পাবো?"

(৪) বেশিরভাগ সময় বিরক্ত হয়ে থাকেন, না হাসিমুখে থাকেন?

(৫) আপনার মধ্যে এমন কোন রসবোধ আছে, যাতে আপনি নিজেও হাসতে পারেন, আবার অপরকেও হাসাতে পারেন?

(৬) লোকে কি সহজে নিঃসংকোচে আপনার কাছে আসে?

(৭) অপরিচিত লোকের সঙ্গে খুব পরিচিত লোকের মত মিশতে পারেন কি?

(৮) আপনার অনেক বন্ধু এবং অনেক পরিচিত লোক আছে কি?

(৯) লোকের অন্যায় খুব সহজেই ভুলে গিয়ে তাকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন কি?

(১০) লোককে আনন্দ করতে দেখলে আপনার মনে কি আনন্দ হয়?

(১১) লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা আর তাদের মাতিয়ে রাখা কি আপনার পক্ষে খুব সহজ মনে হয়?

(১২) অধিকাংশ লোক যা চান আপনিও কি ঠিক তাই চান?

(১৩) সব সময়েই কিছু না কিছু বিষয়ে কি আপনি আলোচনা করতে পারেন?

(১৪) লোকের কাছে আপনি কি সর্বদা একই রকম থাকেন?

(১৫) ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের কাছে কি আপনি খুব প্রিয়?

(১৬) বৃদ্ধ এবং বয়স্ক লোকেরা কি আপনাকে স্নেহ করেন?

(১৭) যে কথা বললে লোকে অসন্তুষ্ট হবেন, সেটা কি অবুঝের মত প্রকাশ করে দেন, না, বিচক্ষণের মতো সেটা গোপন করে রাখেন?

(১৮) আপনাকে কি প্রায়ই নিমন্ত্রণ করা হয়, পার্টিতে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়, আপনার কাছ থেকে অনুগ্রহ চাওয়া হয় বা ক্ষমা চাওয়া হয়?

(১৯) নিজের ভদ্র আচরণ এবং সুন্দরভাবে কথা বলার দিকে কি আপনার নজর আছে?

(২০) আপনি কি পছন্দ করেন যে, লোকে আপনাকে পছন্দ করুক এবং জনপ্রিয় হয়ে কি আনন্দ পান?

প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ' উত্তরের জন্য ৫ নম্বর যোগ করে যান। যদি আপনি ৮০ নম্বর পান, তাহলে খুবই ভালো। ৭০ থেকে ৮০ পেলে, সাধারণ ভালো; ৬০ থেকে ৭০ সন্তোষজনক। ৬০ নম্বরের নীচে পেলে, সন্তোষজনক নয়।

জনপ্রিয় লোকেরা এইভাবেই সামাজিক জীবন উপভোগ করে থাকেন। তাঁরা লোক ভালবাসেন। তাঁরা চান যে, সবাই তাঁদের ভালোবাসুক এবং সকলের ভালোবাসা পাবার জন্যে তাঁরা সৎ আচরণ, মিষ্টি কথা ও অন্যান্য কৌশল আয়ত্ত করে সকলের ভালবাসা পাবার চেষ্টা করেন। এটা শিখতে পারা তাঁদের পক্ষে খুবই সহজ, কারণ অধিকাংশ লোকের যা পছন্দ, তাঁরাও তাই পছন্দ করেন।

আপনার নম্বর যদি কম উঠে থাকে, তাহলে মনমরা হবার কারণ নেই। আজ থেকে খারাপ লোককে ঘৃণা করা ছেড়ে দিন আর যতদূর সম্ভব সকলকে ভালোবাসতে শুরু করুন। কোথায় কি খারাপ এবং অসুন্দর আছে, তা না খুঁজে করে, সুন্দর লোকের খোঁজ করুন, সুন্দর ব্যবহার শিখতে থাকুন, মধুর কথা বলার কৌশল শিখুন, সেগুলি প্রয়োগ করে নিজেকে সকলের কাছে জনপ্রিয় করে তুলুন। দেখবেন, কদিনেই আপনার গুণগান গুনগুনিয়ে উঠবে চারধারে।

মধ্যে; তাই ঠাকুর বলেলেন—ঐ মন নিয়ে তুই রাস দেখতে এসেচিস্? রোস্, দেখাচ্চি!

একদিন গোপীনাথের মন্দির থেকে আরতি দেখে বেরুচ্চি, হঠাৎ কানে গেল, 'ওমা, আপনি এখেনে!'

ঘুরে দেখি জনা পাঁচেকের একটি ছোট দল, তার মধ্যে পেরায় আমারই বয়সী এক-জন কথাটা বলেচে, বললুম—'এয়েচি ক'দিন হোল এখেনে, কিন্তু চিনলুম না তো দিদি আপনাদের কাউকে।'

একটু বেঁকা-গোছের মানুষটা। ঠোঁটে একটু হাসি চেপে সবার দিকে চেয়ে বললে—'আমাদের কে চিনবে দিদি? কোন দরের মানুষ আমরা? তবে আপনাকে আমরা সবাই চিনি বৈ কি। মসনের ব্রেজঠাকরুণ তো? পাশেই শিবতলায় আমাদের বাড়ি।'

—কেমন যেন একটু ঠেস দিয়ে কথাটা। আমি তবু হেসে ভালো ভাবেই বললুম—'নেসলুম দিদি পাপের শরীলটে একবার টেনে।'

দলের দিকে চেয়ে বললে—'শোন্ গো তোরা, দিদির হোল পাপের শরীল। তাহলে তো আমাদের তিত্থি-ধম্ম করেও কোনও আশা নেই। যাক্, আমি যা বলছিলুম—আপনি এখেনে, আর উদিকে স্বয়ং বিন্দাবন যে আপনাদের গেরামে গিয়ে আবিব্ভাব হয়েচেন। সেথাই কষ্ট করে আসা।'

বললুম, 'বুঝলুম না তো দিদি, স্বয়ং বিন্দাবন, সে আবার কি?

গল্প করতে করতে আমরা মন্দির থেকে সরে এসেচি। বললে—'কেন, ব্রেজনিধি মহারাজ গো। বিন্দাবন বলতে তো আমরা এখন তাকেই জানি; গেচেন, অন্ধকার দেখচি। আমরা কেন, সবার মুখেই এই কথা। মসনেতে দিন কতকের জন্যে শিষ্যি-বাড়ী গেচেন।'

নামটা যেন কোথায় শোনা। জিজ্ঞেস করলুম—'কোথায় তাঁর শিষ্যিবাড়ি, নাম কি শিষ্যির?'

না, 'কেন, দামোদর চৌধুরী, অবাক করলে যে আপনি!'

ধাঁ করে মনে পড়ে যেতে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম রাস্তার মাঝখানে। বুঝলিনে, সেই বোষ্টম বাবাজী, যে একবার মাথার ওপর ভর করে সব্বসান্ত করে এনেছেল দামোদরকে। শেষে এমন অবস্থা যে মেয়েটাকেও বুঝি এই শয়তান ধনঞ্জয়ের হাতে তুলে দেয়। সেই ব্যাটা এদের স্বয়ং বিন্দাবন, তাহলে কি ধরনের দলটা বোঝা গেল। মাথায় তাখন আগুন ধরে উঠেছে। তবু ভাবলুম, কাজ কি, তিত্থি জায়গায়। ঘুরে পা বাইরেচি, ওদের মধ্যে একজন বললে—'দিদির যে সাড়াই পাওয়া গেল না কোন?'

এরকম করে খুঁচিয়ে তুললে আর চুপ করে থাকা যায়, বল নেত্য? আর, মুখ খুলে গেলে ব্রেজবামনী কারুর খাতির রেখে বলবার পাত্তোরও নয়। বললুম—'দামো-দরের গুরু সেজে এক বোষ্টমবাবাজী তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দেওয়ার চেষ্টা করেছেল বটে, যদি সেই হয়—'

এই পজ্জন্তই বলা, জলদস্যু সব ঝাঁউ-ঝাঁউ করে উঠল ক্যাপা কুকুরের মতন—'আপনি ব্রেজের মাটিতে দাঁইড়ে ব্রেজনিধির নামে এই বলচ!' তা যতই বড় দল হোক তোদের, আমিও ব্রেজ বামনী, হয়ে গেল একচোট রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে। অনেকদিন ঠান্ডা হয়ে আচি, পুরো দম, সবকটাকে কথার চাবুকে ঠান্ডা করে আমি তাড়াতাড়ি বাসায় চলে এলুম। নিজের মাথাতেও তো আগুন ধরে গেচে, একটু ঠান্ডা হতে প্রেথমটা মনে হোল—মরুকগে, মাতাল মানুষ, মত্তিস্থির নেই, য্যাখন যেই দিকে ঝোঁকে ত্যাখন সেইদিকে ঢলে, ওদের এই দশাই হবে। তার জন্যে আমি আর কি করব? তারপর য্যাতই সময় যেতে লাগল মনটা আনচান করে উঠতে লাগল। হোক মাতাল, তবু মানুষটা তো শিশুর মতই নিরীহ, তাছাড়া আমাদের জন্যেও তো কম করলে না। কিছুই হয়তো পারবো না করতে, তবু দূরে সরে থাকি কি করে? চৌধুরী গিন্নীর মুখখানাও পড়তে লাগল মনে। বেচারি যেন আরও অসহায়, কোন ভরসা পায় না।

সমস্ত রাত ঘুম হোল না নেত্য। সকালেই গাড়ি। 'যদি অপরাধ হয়তো ধোর না ঠাকুর'—বলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে চলে এলুম।

এসেই লোক পাঠিয়ে চৌধুরী বাড়ি থেকেই পাল্কি আনিয়ে আগে ওখেনে গিয়েই উপস্থিত হলুম। গিন্নী তো যেন বর্তে গেলেন। বললেন—'আমি যে কি অকুলে পড়েচি মাসীমা, শেষে কোন উপায় না দেখে এখুনি দশআনি দেউড়িতে কাকা-বাবুর কাচে যাচ্ছিলুম, এমন সময় আপনার লোক এসে হাজির। বললুম, তাহলে আগে মাসিমাকেই নিয়ে আয়, আমার বোধহয় আর কারুর কাচে যেতেও হবে না।'

সব বেশ মিলে যাচ্চে, আমি জিজ্ঞেস করলুম—'তা সে বিটলে কোথায় উঠেচে এসে? একবার চেহারাটা দেখতুম কেমন।'

গিন্নী একটু অবাক হয়েই আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলে—'কে, কার কথা বলচেন মাসীমা?'

বললুম—'কেন, সেই ভন্ড বোষ্টম-বাবাজী, সেবারে এসে যে অমন গোলমালটা বাধিয়ে গেল। সে এখেনে এয়েচে শুনেই তো আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এলুম।'

গিন্নী বললেন—'কৈ, সে তো আসেনি। সেবারে এসে সে এখেনেই উঠে আপনার বোনপোর কানে কিসব মন্ত্র ঝেড়ে ঐ হাল করে গেছল। এবারে তো সে নয়, একেবারে খোদ কুলাঙ্গার সেই ধনঞ্জয় রায়, যার হাতে মেয়েটাকে তুলে দেওয়ার জন্যে ওর বাপ অমন মেতে উঠেছিলেন। এবারে নতুন রূপ আবার, সেই পুরোনো—বিধবা-বিয়ের হুজুগ। কত্তাকেই নাচিয়েচে। সাষ্টাঙ্গ হয়ে কমাটমা চেয়ে একেবারে অন্য মানুষ। আপনার বোনপো যে সেবার অমন সব-ত্যাগী বোষ্টম বনে গেছল, ধনঞ্জয় তার থেকেও গেচে ছাড়িয়ে। যাওয়া-আসা, দেওয়া-থোওয়া—গলাগলির আর কোন হিসেব নেই। একটা আরও গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে, বুঝচি; বলতে গেলেই দাবড়ানি খেয়ে ফিরে আসুন। শিবনাথটা ভরসা ছেল, বলতে গিয়ে পেরায় চাকরীই খুয়ে বসে। এবার আর নতুন চাল, নেশা ছাড়াবার দিকে যায়নি, বরং আরও বেড়েই গেচে এদিকে।'

মাসীমা বলে—গিন্নী বলে যাচ্ছেন, আমি ইদিকে মনে মনে নিজের আন্দাজ করে যাচ্ছি, নেত্য। যেন মিলেও যাচ্চে বেশ। তবে ও'কে আর সেকথা বললুম না। ও'কে বললুম—'এই সদ্য এয়েচি বিন্দাবন থেকে, ঠিক তো বুঝতে পাচ্ছি না, তবে আপনি কিছু ভাববেন না। আমি গিয়ে চান করে জপটপগুলো সেরে নিই। আপনি শুধু শিবনাথকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দেবেন।'

শিবনাথ এলে আমার আন্দাজটা তাকেই বললুম, কেন, কি করে আমি হঠাৎ বৃন্দাবন থেকে চলে এলুম, আগে সেকথা বলে নিয়ে। বললুম, আমার আন্দাজ শিবনাথ, সেবারেও এই বাবাজীই পেছন থেকে কল-কাঠি নেড়েছেল। এগুতে নেশাপত্তর সব ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে বৈরিগী করে তুললে একেবারে, তারপর যখন দামোদরের কপনী নেবার মতন অবস্থা, তখন ধনঞ্জয়ের বাপকে ঠেলে দিলে, এবার মেয়েটার কথা পাড়ো গিয়ে, আর 'না' বলবার মতন কিছুই রাখেনি। এরপর যা হল তুমি তো সব জানই শিবনাথ, শেষ পজ্জন্ত সামলালেও তুমিই। আমার বিশ্বাস, এবারেও ঐ বিটলে বাবাজী রয়েচে পেছনে। এবার তো আর সামনে আসার হেম্মৎ নেই, কোথাও ঘুপটি মেরে নুকিয়ে বসে আচে। এবার পন্থাটাও বদলে দিয়েচে—আর ত্যাগের মহিমে নয়, যেমন নেশা-ভাং নিয়ে আচে, থাকুক—সেও নিশ্চয় ওরই কূটবুদ্ধি। ধনঞ্জয়টা শুনেচি, মুখ্যু, কাঠগোঁয়াড়, ওর মাথায় এ ধরনের সূক্ষ্ম চাল আসবে না। এবারে উল্টে ওকেই দীনহীন বোষ্টম সাজিয়ে পাঠিয়েছে—মহা-জনরা যেমন বলেন তিনের চেয়ে নীচু হতে হবে, আবার বজ্রের মতন কঠিনও—এদের মতন মতলববাজদের মুখে ভালো ভালো কথাগুলো নিজের কাজে লাগাতে তো দেরী হয় না—সেইরকম জমিন যে পাটিয়েচে, —সব মান্দ্যোমা ঘুইয়ে, বাপ যে অপরাধটা করে গেল, সংটং বের করে, তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে জমিটা ঠিক করে রাখো, তারপর আমি আচি।' (ক্রমশঃ)

আপনাকে যখন সবাই চাইবে

সুন্দর চেহারা থাকলে নিজেকে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। কিন্তু মনোমুগ্ধকর চাহনি ও পরিপাটি এবং ফিটফাট চেহারার ওপরেই আকর্ষণ নির্ভর করে না। আমাদের অনেকের এ দুটোই আছে, তবুও আমাদের ওপর কারও আকর্ষণ না থাকতেও পারে।

নিজের জীবনকে আপনি কিভাবে দেখেন, আর মানুষের ওপর আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া কি রকম, এই দুটি জিনিষের সাহায্যেই আপনার ব্যক্তিগত আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই আকর্ষণ মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নেয় এবং পরস্পরকে জানতে ও চিনতে সাহায্য করে।

নীচের পরীক্ষাটি একবার চেষ্টা করে দেখুন—আপনার কেমন লাগে তা প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবে বলুন, 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'।

(১) যেসব লোকের সংস্পর্শে আসেন তাদের সকলকেই কি আপনি পছন্দ করেন? তাদের কাছ থেকে আপনি কি আনন্দ পান?

(২) প্রত্যেক লোককে কি সহজেই নিজের মত করে নিতে পারেন?

(৩) লোকে কি আপনাকে দেখে বলে, "আপনার সঙ্গে আবার দেখা হলে বড়ই আনন্দ পাবো?'

(৪) বেশিরভাগ সময় বিরক্ত হয়ে থাকেন, না হাসিমুখে থাকেন?

(৫) আপনার মধ্যে এমন কোন রসবোধ আছে, যাতে আপনি নিজেও হাসতে পারেন, আবার অপরকেও হাসাতে পারেন?

(৬) লোকে কি সহজে নিঃসঙ্কোচে আপনার কাছে আসে?

(৭) অপরিচিত লোকের সঙ্গে খুব পরিচিত লোকের মত মিশতে পারেন কি?

(৮) আপনার অনেক বন্ধু এবং অনেক পরিচিত লোক আছে কি?

(৯) লোকের অন্যায় খুব সহজেই ভুলে গিয়ে তাকে আপনি ক্ষমা করতে পারেন কি?

(১০) লোককে আনন্দ করতে দেখলে আপনার মনে কি আনন্দ হয়?

(১১) লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা আর তাদের মাতিয়ে রাখা কি আপনার পক্ষে খুব সহজ মনে হয়?

(১২) অধিকাংশ লোক যা চান আপনিও কি ঠিক তাই চান?

(১৩) সব সময়েই কিছু না কিছু বিষয়ে কি আপনি আলোচনা করতে পারেন?

(১৪) লোকের কাছে আপনি কি সর্বদা একই রকম থাকেন?

(১৫) ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের কাছে কি আপনি খুব প্রিয়?

(১৬) বৃদ্ধ এবং বয়স্ক লোকেরা কি আপনাকে স্নেহ করেন?

(১৭) যে কথা বললে লোকে অসন্তুষ্ট হবেন, সেটা কি অবুঝের মত প্রকাশ করে দেন, না, বিচক্ষণের মতো সেটা গোপন করে রাখেন?

(১৮) আপনাকে কি প্রায়ই নিমন্ত্রণ করা হয়, পার্টিতে যোগদান করতে অনুরোধ করা হয়, আপনার কাছ থেকে অনুগ্রহ চাওয়া হয় বা ক্ষমা চাওয়া হয়?

(১৯) নিজের ভদ্র আচরণ এবং সুন্দরভাবে কথা বলার দিকে কি আপনার নজর আছে?

(২০) আপনি কি পছন্দ করেন যে, লোকে আপনাকে পছন্দ করুক এবং অনুগত হয়ে কি আনন্দ পান?

প্রত্যেকটি 'হ্যাঁ' উত্তরের জন্য ৫ নম্বর যোগ করে যান। যদি আপনি ৮০ নম্বর পান, তাহলে খুবই ভালো। ৭০ থেকে ৮০ পেলে, সাধারণ ভালো; ৬০ থেকে ৭০ সন্তোষজনক। ৬০ নম্বরের নীচে পেলে, সন্তোষজনক নয়।

জনপ্রিয় লোকেরা এইভাবেই সামাজিক জীবন উপভোগ করে থাকেন। তাঁরা লোক ভালবাসেন। তাঁরা চান যে, সবাই তাঁদের ভালোবাসুক এবং সকলের ভালোবাসা পাবার জন্যে তাঁরা সৎ আচরণ, মিষ্টি কথা ও অন্যান্য কৌশল আয়ত্ত করে সকলের ভালবাসা পাবার চেষ্টা করেন। এটা শিখতে পারা তাঁদের পক্ষে খুবই সহজ, কারণ অধিকাংশ লোকের যা পছন্দ, তাঁরাও তাই পছন্দ করেন।

আপনার নম্বর যদি কম উঠে থাকে, তাহলে মনমরা হবার কারণ নেই। আজ থেকে খারাপ লোককে ঘৃণা করা ছেড়ে দিন আর যতদূর সম্ভব সকলকে ভালোবাসতে শুরু করুন। কোথায় কি খারাপ এবং অসুন্দর আছে, তা না খুঁজে করে, সুন্দর লোকের খোঁজ করুন, সুন্দর ব্যবহার শিখতে থাকুন, মধুর কথা বলার কৌশল শিখুন, সেগুলি প্রয়োগ করে নিজেকে সকলের কাছে জনপ্রিয় করে তুলুন। দেখবেন, কদিনেই আপনার গুণগান গুনগুনিয়ে উঠছে চারধারে।

রমেশ দত্তের
রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র
রূপায়ণে-চিত্রসেন

তেজসিংহ মেয়েটির কথায় অবাক হল।

তেজসিংহ দারুণ উত্তেজনায় ভীল মেয়েটির হাত চেপে ধরলেন।

লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চি

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

১৫১৯ খৃষ্টাব্দের এক বিষণ্ণ নিদাঘ অপরাহ্নে ফ্রান্সের এমবাইস নামে একটি গ্রামে একটি বিচিত্র শোক-শোভাযাত্রার অবিস্মরণীয় আয়োজন হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ষাটজন গ্রামবাসী প্রদীপ্ত মশাল জেলে এগিয়ে চলেছেন, পেছনে সেন্ট-ফ্লোরেনটাইন গীর্জার যাজকেরা এক পরদেশীর শবাধার বহন করছেন। নিজ জন্মভূমি থেকে বহু দূরে জীবনদীপ নির্বাপিত সেই পরদেশীকে তাঁরা নিজেদের রাজা-রাণী ও অভিজাতদের সঙ্গে একই সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ করবেন। সেই বিদেশীই হচ্ছেন জগতের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবিনশ্বর পুরুষ লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চি।

সেই রাত্রে লিওনার্দোর প্রিয়তম ছাত্র ফ্রানসেস্‌কো মেলজি লিওনার্দোর ভাইকে সেই মহামৃত্যুর বার্তা জানিয়ে লিখলেন, 'এমন এক ব্যক্তির মৃত্যুতে সকলেই শোকে মুহ্যমান যাঁর সমতুল্য আরেকজনকে সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রকৃতির নেই।' এই উক্তি এক শোকাভিভূত শিষ্যের আতিশয্য নয়। এ সেই মহাশিল্পী সম্পর্কে তাঁর এক অন্তরঙ্গের শোকআলোড়িত হৃদয়উত্থিত পরম সত্য-বাণী। মানব ইতিহাসে লিওনার্দো দা ভিন্‌চির স্থান শুধু অবিস্মরণীয় নয়, অতুলনীয়!

লিওনার্দোর জন্ম ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেনসের উপান্তে ভিন্‌সি গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিত্তবান ব্যবহারজীবী, মাতা অবিবাহিতা ষোড়শী চাষীকন্যা। তখনকার দিনের দস্তুর অনুযায়ী কিছু অর্থের বিনিময়ে সেই কুমারী মাতা তাঁর সন্তানকে তার জন্মদাতার হাতে তুলে দিয়ে আরেকজন ছুতোরকে বিয়ে করে সুখে সংসার করতে লাগলেন। তের বছর বয়স পর্যন্ত বালক লিওনার্দো তাঁর পিতামহের এক পার্বত্য খামারবাড়ীতে মানুষ হতে লাগলেন। তারপরে তাঁকে তাঁর পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

ইতিমধ্যে তাঁর পিতৃদেব চারবার দার-পরিগ্রহ করে এগারোটি পুত্রকন্যার এক বৃহৎ সংসার গড়ে তুলেছেন। সেই এগারোটি বৈমাত্র ভাইবোন এই নবাগন্তুককে প্রথম থেকেই দ্বেষ ও হিংসার চোখে দেখতে শুরু করলো। কিন্তু কিশোর লিওনার্দোর ওসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাববার সময় ছিল না। এই বিচিত্র বিস্ময়ভরা বিশ্বের নানা সমস্যার সমাধানে চিন্তায় তিনি মশগুল। তাঁর কৌতূহলী মন তখন পাথরের গঠনপ্রণালী, নদীর উৎস, ফুলের বর্ণবৈচিত্র্য, উড়ন্ত পাখির ডানার সঞ্চালন, মানুষের মুখের ছাঁদ, কীটপতঙ্গের জীবনরহস্য প্রকৃতি নিরীক্ষণেই সমানিয়োজিত। যা তিনি দেখেন প্রায় সবই তিনি আঁকেন কিম্বা কাদায় প্রতি-মূর্তি তৈরী করেন। প্রকৃতি ছাড়া আর দুটি বিষয় সম্পর্কেও তাঁর হৃদয়ে অগাধ ভালো-বাসা ও আকর্ষণ, এক সংগীত, দুই গণিত। কিন্তু তাঁর নির্ধারিত পাঠ্য গ্রীক ও লাতিনের প্রতি তাঁর অনীহা। তাই শেকস্‌-পীয়ারের মত তাঁর সম্পর্কেও বলা চলে যে, He had little Latin and less Greek. তাঁর পিতা চেয়েছিলেন যে, তিনি ওকালতী কিম্বা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত পেশায় শিক্ষিত হবেন। কিন্তু কিশোরের মনের প্রবণতা লক্ষ্য করে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁকে ফ্লোরেনসের তদানীন্তন খ্যাতিমান শিল্পী এনড্রিয়া ডেল ভেরোচিওর (১৪৩৫-১৪৮৮ খৃঃ) কাছে শিক্ষানবীশ হিসাবে পাঠালেন। তখন তাঁর বয়স ষোল।

দুর্গ-মিনার, গীর্জা-গম্বুজেই শুধু নয়, আন্তর্জাতিক ব্যবসায় কেন্দ্র হিসাবেও ফ্লোরেনস তখন বিরাট কর্মমুখর ব্যস্ত শহর। সেখানে তখন ব্যাঙ্কের সংখ্যাই তেত্রিশ, সিল্কের দোকান তিরাশিটি, অন্যান্য পণ্যশালা দুশো সত্তর। ভিনসি গ্রামের শান্ত পরিবেশের সেই কৌতূহলী তরুণ-শিল্পীর নিঃসন্দেহে এই অভিনব পরি-বেশকে নব-নব অভিজ্ঞতায় সম্ভাবনায় অন্তহীন মনে হয়েছিল।

ভেরোচিও ছিলেন গুণগ্রাহী ও হৃদয়-বান শিক্ষাগুরু। কিন্তু তাঁর পক্ষে লিও-নার্দোর শিক্ষাভার গ্রহণ ছিল অনেকটা কাকের পক্ষে কোকিলশাবক পালনের মত। স্বল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল যে সেই অনন্যসাধারণ তরুণ সর্ব বিষয়ে তাঁর গুরুকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন।—একটি চলতি কাহিনী অনুযায়ী ভেরোচিও ভ্যালমব্রোসোর যাজকদের কাছ থেকে 'সেন্ট জন খৃষ্টকে ব্যাপটাইজ করছেন' এই বিষয়বস্তু চিত্রায়ণের একটি বায়না পেলেন। হাতে অন্য কাজ থাকায় তিনি লিওনার্দোকে ছবির একটি দেবদূত আঁকতে দিলেন। লিওনার্দোর আঁকা শেষ হলে দেখা গেল তাঁর সৃষ্ট দেবদূত ছবির আর সব মূর্তিগুলিকে সৌন্দর্যে ও মহিমায় ম্লান করে দিয়েছে। যোগ্য শিষ্যের হাতে সেই পরাভবের আনন্দে ভেরোচিও এমন মুহ্যমান হয়ে গেলেন যে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে জীবনে আর তুলি স্পর্শ করবেন না। এরপর ভাস্কর্যের সাধ-নায় তিনি জীবনের বাকি দিন অতিবাহিত করেন। সেই অভাবিত ঘটনায় কিন্তু গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের অবসান ঘটে নি। কুড়ি বছর বয়সে লিওনার্দো শিল্পীসঙ্ঘের অনুজ্ঞাপত্র পান। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ভেরোচিওর চিত্রশালাতেই থেকে যান।

শিল্পী-জীবনের প্রভাতেই লিওনার্দো রঙের অন্তরালে ছায়ার এবং আলোছায়ার দ্বারা অঙ্কিত বস্তুকে নিটোল ও সত্য দেখানোর কৌশল আবিষ্কার করেন। পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি 'সেন্ট জেরোম', 'দি এডরেশন অব দি মেজাই' এবং 'ভারজিন অব দি রক্‌স' নামে যে তিনখানি ছবি আঁকেন তাতে তাঁর সেই নব আবি-ষ্কারের পরিচয় ভাস্বর। ছবিগুলি এখন যথাক্রমে ভ্যাটিকান এবং প্যারিসের লুভ ও ফ্লোরেনসের উফিৎজি চিত্রশালে সংরক্ষিত। ঐ সময় নিঃসন্দেহেই তিনি আরো ছবি এঁকেছিলেন। কিন্তু তার সবই লুপ্ত হয়ে গেছে।

চিত্রশালায় ছবি আঁকা ছাড়াও তিনি ঐ সময় স্কেচ বই হাতে ফ্লোরেনসের পথে পথে ঘুরে আঁকতেন কোথায় কোন অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে তার করাল মুখভঙ্গী, কোথায় শিশুরা গান গাইছে তার সরল সুন্দর মুখ, কোথাও বা বোবা-কালাদের আপ্রাণ ইঙ্গিত অভিব্যক্তি। সকর ওপর অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীমনে তিনি নব নব সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন এবং বিচিত্র অভিক্রিয়ায় তার সত্যতা নির্ণয় প্রয়াস করছেন। আর অবসর সময়ে নিজের তৈরী বিচিত্র পোশাক পরিধান করে 'পুষ্পমঞ্জরীর' রাজপথে ঘুরছেন। বলগাহীন দামাল ঘোড়াকে কি করে বাগে আনতে হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছেন।

ঐতিহাসিক ভাসারি লিখে গেছেন, 'কদাচিৎ ভগবান কোন কোন মানুষকে এমন শ্রী সৌন্দর্য ও শক্তি অকৃপণভাবে দান করেন যে তিনি যাই করেন তার দ্বারা অন্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটা বিপুল পার্থক্য সৃষ্টি করে যেন দেখিয়ে দেন যে তাঁর প্রতিভা ঈশ্বরদত্ত, মানবিক সাধনার নয়। লোকে এই লিওনার্দো-দা-ভিন্‌চির মধ্যে এমন সুকুমার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতো যার অতিরঞ্জন বর্ণনা সম্ভব নয়। অথচ তাঁর দৈহিক শক্তি এমন অনন্যসাধারণ ছিল যে একটি লোহার পাতকে তিনি শুধু হাতে ঘোড়ার খুরের মত বেঁকিয়ে দিতে পারতেন।' —তবু ঐ অমানুষিক শক্তিধরের হৃদয়টি কি করুণার্দ্র। পথে চলতে চলতে খাঁচায় বন্দী পাখি দেখলে তাদের কিনে নিয়ে তিনি মুক্ত করে দিতেন।

লিওনার্দোর প্রথম উল্লেখ্য বায়না আসে ফ্লোরেন্সের পৌর প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেন্ট [illegible] গীর্জার আরাধনামণ্ডপের একাংশ [illegible] ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লিওনার্দোর কাজ আরম্ভ হবার অল্প-কালের মধ্যেই এক [illegible] রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে [illegible] বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

তখন ফ্লোরেনসের রাষ্ট্রক্ষমতার অধি-নায়ক ছিলেন মেদিচি পরিবারের লোরেনজো দি ম্যাগনিফিসেন্ট। মেদিচিদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ফ্রানসেসকো দি প্যাৎসি [illegible]

আরেক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি ফ্লোরেনসের ক্যাথিড্রালের কয়েকজন যাজকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করলেন যে রবিবারে যখন লরেন্‌জো এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র গিউলিয়ানো উপাসনার জন্যে গীর্জায় যাবেন তখন আচম্বিতে তাঁদের একই সঙ্গে হত্যা করা হবে।

অবশেষে সেই ভয়ঙ্কর রবিবার এলো। ক্যাথিড্রালে উপাসনায় এক মৌন মুহূর্তে অকস্মাৎ ষড়যন্ত্রীরা উদ্যত ছুরি হাতে তাদের শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। বালক গিউলিয়ানো সেইখানেই ঘাতকের হাতে প্রাণ দিলেন। কিন্তু লরেন্‌জো সেই দারুণ বিভ্রান্তি ও হট্টগোলের মধ্যে পালিয়ে গিয়ে নিজ দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ফ্লোরেনসের রাস্তায় রাস্তায় লড়াই ও দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। পরে লরেন্‌জো আবার সৈন্যসামন্ত জড়ো করে বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিয়ে নগর দখল করলেন।

ইতিমধ্যে ক্যাথিড্রালের চূড়ায় কয়েক দিন অনাহারে আত্মগোপন করার পর যখন ষড়যন্ত্রের প্রধান ভাড়াটে ঘাতক গ্রেপ্তার হয়ে টাউন হলের সম্মুখে ফাঁসিকাঠে ঝুললো তখন একটি সরকারী ঘোষণা লিওনার্দোর কানে এলো যে মৃতের চিত্রকর সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত হবেন। ঘোষণা শুনে তিনি পট ও পেন্‌সিল নিয়ে টাউন হলে গেলেন মৃতের স্কেচ আঁকতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরেকজন শিল্পীকে সরকার মনোনয়ন করলেন।

ওদিকে ফ্লোরেনসের দুর্গতি তখনো শেষ হয়নি। রাষ্ট্রবিদ্রোহের উথালপাথালে এমন একজন যাজক মারা গেছেন। যিনি নেপলসের রাজা ফার্ডিনান্ডের বন্ধু। তাই ক্রুদ্ধ নেপলরাজ হুমকি দিচ্ছেন যে তিনি ফ্লোরেন্স আক্রমণ করে বন্ধুহত্যার শোধ তুলবেন স্বভাবতই এহেন দুর্দৈবে আত্মরক্ষাই মানুষের প্রাথমিক চিন্তা হয়ে ওঠে। ফ্লোরেনসের পৌর প্রতিষ্ঠানও তাই শিল্প-কর্মে অর্থব্যয় আপাতত স্থগিত রেখে সমরাস্ত্র তৈরীতে মন দিলেন। লিওনার্দো কর্মচ্যুত হলেন।

নগর আক্রান্ত হবার আশংকা আর পাঁচজনের মত লিওনার্দোকেও চিন্তিত করে তুললো। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে, তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে না-থেকে নতুন অস্ত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। সেই নতুন পরিকল্পনার একটি ছিল বহুনালাযুক্ত বন্দুক। রাষ্ট্রনায়ক লরেন্‌জো কিন্তু লিওনার্দোর পরিকল্পিত অস্ত্রের কথা শুনে হেসে উড়িয়ে দিলেন। অথচ এমন হওয়া খুবই সম্ভব ছিল যে, সেই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করলে লরেন্‌জো যারা ইতালীর সবচেয়ে শক্তিশালী শাসকে পরিণত হতে পারতেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই লিওনার্দো ফ্লোরেনসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভাগ্যান্বেষণে মিলান যাত্রা করলেন।

মিলানে

১৪৮১ খৃষ্টাব্দ থেকে ষোলটা বছর লিওনার্দো মিলানে কাটান। তাঁর সেই ষোল বছরে সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু উৎকর্ষতায় অবিস্মরণীয় শিল্পকীর্তিই হচ্ছে মিলানের শ্রেষ্ঠতম সাংস্কৃতিক গৌরব। পরবর্তীকালে নগরবাসীরা নগরীর কেন্দ্রে তাঁর এক মূর্তি স্থাপন করে সেই গৌরবকে প্রতিমূর্ত করেছেন।

আজকের মত সেদিনও ফ্লোরেনস যেমন ইতালীর সাংস্কৃতিকেন্দ্র, মিলান তেমনি শিল্পকেন্দ্র। তখনকার দিনে তার প্রধান শিল্প ছিল অস্ত্রনির্মাণ। মিলানের রাষ্ট্রক্ষমতা তখন লডভিকো সফরজা নামে ডিউকের হাতে। তিনি রাজ্যের প্রকৃত মালিক তাঁর ত্রয়োদশ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে শাসন পরিচালনা করতেন। তাঁর গায়ের রঙ ছিল তাম্রাভ। তাই লোকে তার নাম দিয়েছিল ইল্ মরো বা 'মূর'। সেই মূর ছিলেন ক্ষমতালোভী, নিষ্ঠুর ও ষড়যন্ত্রী। কিন্তু শিল্পীর সঙ্গে তিনি মোটের ওপর সহৃদয় ব্যবহারই করেছিলেন। শিল্পী যখন ডিউকের প্রথম দর্শনলাভ করেন তখন এক সম্ভবপর রাজনৈতিক ঝড়ের চিন্তায় তিনি বিভ্রান্ত। অতএব শিল্পীকে প্রায় বিফল মনোবাসনা নিয়ে ফিরতে হলো। কিন্তু রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পাহাড়ের ঢল দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ তাঁর চিন্তা উদ্দীপিত হয়ে উঠলো। তাঁর মনে হলো শিল্পী হিসাবে তাঁকে খুব উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ না করলেও অস্ত্রকার ও রণকৌশল যন্ত্রবিদ হিসাবে হয়তো ডিউক তাঁকে গ্রহণ করবেন। অতএব তিনি এক দীর্ঘ চিঠিতে ডিউককে লিখলেন :

"আমি শত্রুদের আক্রমণের জন্যে, অথবা শত্রুদের কাছ থেকে পশ্চাদপসরণের উপযোগী স্থানান্তরযোগ্য খুব হাল্কা সেতু নির্মাণ করতে পারি। অন্য এমন সেতু-নির্মাণ কৌশলও আমার জানা আছে যা আগুনতে অদাহ্য এবং স্থানান্তর সহজ-সাধ্য। ঘেরাও এবং দখল করবার কাজের সুবিধার জন্য আমি পরিখা থেকে জল সরিয়ে দিতে পারি এবং অসংখ্য ধরনের মই এবং অন্যান্য যন্ত্র তৈরী করতে পারি।

আমি খুব সুবিধাজনক এবং স্থানান্তর-যোগ্য বোমা তৈরী করতে পারি যা ক্ষেপণ করলে শত্রুদের ওপর টুকরো টুকরো অস্ত্রের বৃষ্টি নামবে এবং বিপুল ধূম্রজাল সৃষ্টি করে শত্রুদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করবে।

আমি নিঃশব্দে পথ ও পরিখা খননের কৌশল জানি এবং যে কোন নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজন হলে নদীর তলা দিয়েও পৌঁছোতে পারি।

আমি এমন মজবুত ও সর্বপ্রকার আক্রমণ ব্যাহত করার উপযোগী যান তৈরী করতে পারি যা সবচেয়ে শক্তিমান লোকদের তৈরী ব্যূহ ভেদ করেও শত্রু-শিবিরের মধ্যস্থলে পৌঁছোতে পারে এবং পদাতিকরা সহজেই সেই যানের পেছনে পেছনে শত্রুদের মধ্যে গিয়ে আক্রমণ চালাতে পারে। যুদ্ধে ব্যবহৃত সাধারণ অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে অনেক সুন্দর ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র আমি তৈরী করতে পারি।

নৌ-যুদ্ধের জন্যে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের উপযোগী অগণিত অস্ত্র আমি তৈরী করতে পারি... তাছাড়া আমি বারুদ ও বাষ্প দিয়ে ধোঁয়ার যবনিকা সৃষ্টি করতে পারি।

শান্তির সময় আমি যে-কোন স্থাপত্য-কর্মের সঙ্গে তুলনীয় স্থাপত্যকর্ম করতে পারি। আমি সরকারী অথবা বে-সরকারী ইমারৎ তৈরীর পরিকল্পনা করতে পারি। অধিকন্তু আমি মর্মর, ব্রন্জ ও টেরাকোটার ভাস্কর্য-কাজ করতে পারি। চিত্রাঙ্কনেও আমি এমন পারদর্শী যে, আমার কাজ পৃথিবীর যে-কোন শিল্পীর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।

যদি মনে করেন উপরোক্ত বিষয়গুলির কোন একটিও অসম্ভব, তবে যে-কোন স্থানেই আদেশ করুন আমি গিয়ে তার পরীক্ষা দিতে রাজি আছি।"

—বলা বাহুল্য ইল্ মূর সেই তাজ্জব দাবীসম্বলিত দরখাস্ত পেয়ে অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিলেন। ভেবেছিলেন সেই ফ্লোরেনস নাগরিক শুধু শিল্পী নন, আজগুবি সব ধারণাও তাঁর মাথায় বাসা বেঁধে আছে। অবশ্য লিওনার্দোর ক্ষমতার প্রতি ঐ অবিশ্বাসের জন্যে ইল্ মূরকে দোষ দেওয়াও যায় না। প্রকৃতির কোন খেয়ালে লিওনার্দো তাঁর উপযুক্ত সময়ের পাঁচশ বছর আগে জন্মে গিয়েছিলেন।

পাঁচশ বছর আগে জন্মে তিনি তাঁর চিন্তাভাবনাকে পাঁচ হাজার পৃষ্ঠার এক বিপুলাকৃতি পুঁথিতে কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে উলটো অক্ষরে লিখে গেছেন? সে লেখা আয়নার সামনে ধরেই শুধু পড়া যায়! তাতে এক স্থানে তিনি লিখেছেন, 'সূর্য স্থির। তার গতি নেই।' অর্থাৎ কোপার্নিকাসের সিদ্ধান্ত তিনি আগেই অনুমান করে গিয়েছেন। আরো পরে গ্যালিলিও সেই তথ্য প্রচার করতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়েন।

অন্তত পক্ষে ত্রিশটি মৃতদেহ নিজ হাতে কেটে ও চিরে তিনি মানুষের দেহের গঠন ও আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে অনেক তথ্য আবিষ্কার, লিপিবদ্ধ ও এঁকে গেছেন। তিনিই প্রথম মাতৃগর্ভে শিশুর বৃদ্ধি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা করেন। মানবদেহের রক্তসঞ্চালন সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রায় নির্ভুল। শারীরবিদ্যায় লিওনার্দোর দান অবিনশ্বর। স্রোতের গতি ও বায়ুর প্রবাহ সম্পর্কেও অনেক তথ্য তিনি উদ্ঘাটন করে গেছেন। উড়োজাহাজের প্রথম বাস্তব পরিকল্পনা তাঁরই।

শিল্পের দিক থেকে দেখতে গেলে লিওনার্দোর ঐ বিচিত্র উদ্ভাবনী প্রতিভা ক্ষতিকরই হয়েছে। কারণ তাঁর সেই উদ্ভাবনী প্রতিভার কোন যোগ্য সমাদর হয় নি। প্রায় সকলেই উদ্ভট বলে উড়িয়ে দিয়েছে। অথচ সেই আবিষ্কারগুলি নিয়ে তিনি এতই ব্যস্ত থেকেছেন যে, শিল্পকর্ম অবহেলিত হয়েছে। তাঁর মত একজন কালজয়ী শিল্পনায়ক সারাজীবনে যা করে গেছেন তা উৎকর্ষে অতুলনীয়। কিন্তু

সংখ্যায় সামান্য, আজ নিশ্চিতভাবে লিওনার্দোর শিল্পকীর্তিভাবে পরিগণিত চিত্রের সংখ্যা কুড়িরও কম।

ইল মুর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে লিওনার্দো একটু দমে গেলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। ওদিকে তাঁর অর্থ-সঙ্গতিও কমে আসছে। ভাগ্যক্রমে মিলানের শিল্পগোষ্ঠী তাঁদের সেই অনন্যসাধারণ সহযোগীর লোকোত্তর প্রতিভার মর্ম বুঝেছিলেন। তাই এমব্রাগ ও ডি প্রেডিস্ নামে স্থানীয় এক শিল্পী শুধু তাঁকে মাননীয় অতিথি হিসাবেই গ্রহণ করলেন না, নিজ ব্যবসায়ে অংশীদারও করে নিলেন। মিলানের শিল্পীসমাজে তাঁর পরিচয় হলো মাস্তারো লিওনার্দো। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মিলানের শিল্পগোষ্ঠীর তখন বড়ই আকাল। চারিদিকে যুদ্ধের গুজব। মিলানের ধনিকদল তাই শিল্পের পৃষ্ঠ-পোষকতা করার চেয়ে আত্মরক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত।

মধ্যে প্লেগের কাল-মৃত্যু এসে মিলানকে চরম বিপন্ন করে তুললো। মৃত্যু-ভয়শঙ্কিত ডিউক নগরত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করলেন। সেই দারুণ দুর্বিপাকে লিওনার্দো নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি নগরীকে রোগমুক্ত করবার জন্যে এক নব-নগর পরিকল্পনা করলেন। তিনি ডিউকের উদ্দেশে লিখলেন, 'জনসাধারণ এখন ছাগলের পালের মত গাদাগাদি করে বাস করে তাতে বাতাস ও পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে প্লেগ ও মৃত্যুর বীজানু ছড়ায়। আপনি তাদের বিকেন্দ্রীভূত করে অনেকগুলি উপনগরীর মধ্যে ছড়িয়ে দিন।'—লিওনার্দোর উপনগরীগুলিতে থাকবে পাঁচ হাজার গৃহ আর ত্রিশ হাজার অধিবাসী। জানালাগুলি যতটা সম্ভব বড় হবে: ফলে প্রচুর আলো-বাতাস এসে ঘরে ঢুকবে। এমনভাবে চিমনি তৈরী হবে যাতে সব ধোঁয়া বাইরে চলে যেতে পারে। শহর-গুলিতে থাকবে সরকারী উদ্যান ও অন্তর্বাহী নালা।— আজ পাঁচশ বছর পরেও লিওনার্দোর উপনগরী আমাদের তো বটেই, লন্ডন - প্যারিস - বার্লিন-রোমের পৌর প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হতে পারে।

যথা প্রত্যাশিত লিওনার্দোর সামরিক যন্ত্রবিদ্যা পরিকল্পনার মতই সেই মহৎ বাস্তুকার-পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হলো। তবু পরবর্তীকালে ম্যালেরিয়ার উৎস পানা ডোবা ভরাট ও জলসরবরাহের ব্যবস্থা প্রভৃতি অনেক পৌরকল্যাণমূলক কাজ করে লিওনার্দো মিলানবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছিলেন।

এদিকে দেখতে দেখতে বছরের পর বছর গড়িয়ে যেতে লাগলো। ডিউকের দরবার থেকে শুধু মাঝে মাঝে লিওনার্দোর ডাক পড়ে উৎসব আর পালা-পার্বণে—প্রাসাদ ও রঙ্গমঞ্চ সজ্জার। লিওনার্দো তাঁর অবাক উদ্ভাবনী প্রতিভায় নানা ধরনের যান্ত্রিক কৌশলে ও রুচি-জ্ঞানে এমনভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন যে, চারিদিকে বিস্মিত প্রশংসার কলরব

লন্ডনের ন্যাশনাল গ্যালারীর ভারজিন অব দি রকস্।

ওঠে। কিন্তু যে শিল্পকর্মের সন্ধানে তাঁর মিলানে আসা তাই যখন কোন যোগ্য কাজের অভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবার মত অবস্থা, তখন মিলানের ক্যাথিড্রালের পুনর্গঠন করবার একটি পরিকল্পনা তৈরীর জন্যে লিওনার্দোর ডাক পড়লো। কর্তৃপক্ষের স্বপ্ন হচ্ছে ইউরোপের বৃহত্তম ও সুন্দরতম ক্যাথিড্রাল গড়ে তোলা। সেই উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তরের স্থপতিদের ডাক পড়েছে। —এহেন ক্যাথিড্রালের পরি-কল্পনার আহ্বান পেয়ে লিওনার্দো উৎফুল্ল হলেন। ধৈর্য ও কল্পনার সঙ্গে তিনি একটি কাঠের সুন্দর মডেল তৈরী করলেন। কর্তৃপক্ষ তা পেয়ে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বাস্তব রূপ নিলো না। এমন কি বহুবার তাগাদা দিয়েও লিওনার্দো তাঁর মডেলটি পর্যন্ত ফেরত পেলেন না। সেই আশা ভঙ্গ লিওনার্দো কখনো ভোলেন নি।

অবশেষে একদিন সহসা মনে হলো লিওনার্দোর ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। ডিউক ইল মুর সফরজা বংশের একটি স্মরণ-স্তম্ভ নির্মাণের জন্যে লিওনার্দোকে আহ্বান জানালেন। সফরজা বংশের সেই স্মরণস্তম্ভ নির্মাণের পরিকল্পনা বহু দিনের। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে সেই উদ্দেশ্যে ফ্লোরেনসের স্থপতিরা একটি অশ্বারূঢ় যোদ্ধার পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁদের পরিকল্পিত স্মরণস্তম্ভটির জন্য ব্রঞ্জের প্রয়োজন হতো এক হাজার পাউন্ড। লিওনার্দোর পরিকল্পনায় প্রয়োজন বিশ হাজার পাউন্ড। সফরজা কথাটার অর্থ 'শক্তি'। এক বিরাট প্রবল অশ্ব-প্রতিমূর্তির মধ্যে সেই শক্তিকেই তিনি বিধৃত করবেন।

মিলানের বিভিন্ন অশ্বশালায় ঘুরে ঘুরে লিওনার্দো তেজস্বী অশ্বের স্কেচ শুরু করে দিলেন এবং মাঝে মাঝে দরবারে গিয়ে ডিউককে নিজ পরিকল্পনার পরিবৃত্তির কথা জানিয়ে আসতেন। ব্যাপার দেখে ডিউক একটু সন্দিহান হয়ে গোপনে গোপনে ফ্লোরেন্সে নতুন স্থপতির খোঁজ করতে লাগলেন। ভাগ্যক্রমে লিওনার্দো ডিউকের সেই সন্দেহের কথা জানতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে আরেকটি দরবারী জলুস সজ্জার ভার নিয়ে লিওনার্দো আবার বহু

বিচিত্র যান্ত্রিক ভেল্‌কি দেখিয়ে ডিউকের চিত্ত প্রসন্ন করলেন। ডিউক স্মরণ স্তম্ভ নির্মাণের ভার লিওনার্দোর ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত রইলেন। কিন্তু লিওনার্দোর চিত্তে আবার কলা ও বিজ্ঞানের স্পন্দন দেখা দিল। তিনি স্মরণ স্তম্ভের কাজ ছেড়ে নানান বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মত্ত হয়ে উঠলেন।

তবুও শেষ পর্যন্ত তিন বছর পরে সফরজা স্মরণস্তম্ভের অশ্বের কাদার কাজ সারা হলো। স্থির হলো তার আবরণ উন্মোচন করে জনসাধারণকে দেখানো হবে। তখনকার দিনে শিল্পকর্মের উদ্বোধন ছিল একটা উৎসবের মত। হাজার হাজার লোক সেই উদ্বোধনে জড়ো হতো। কিন্তু এবার তারা যা দেখলো তা আর কখনো দেখে নি। মিলানের কবি ব্যালডাসার ট্যাকোনে লিখলেন, "আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি এবং সে বিশ্বাস ভ্রান্ত নয় যে, গ্রীস ও রোমও এর চেয়ে মহৎ কিছু দেখে নি।" উৎফুল্ল ডিউক একটি চিঠিতে লিখলেন, "প্রতিভাধর পুরুষ একজন মাত্রই আছেন, —তিনি হচ্ছেন লিওনার্দো দা ফ্লোরেনটাইন। তিনি ডিউকের ঘোড়ায় ব্রঞ্জের আস্তর লাগাবেন।"

কিন্তু আস্তর শুরু হবার আগেই মিলানের আকাশে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো। ১৪৯৪ সালে ফরাসীরাজ অষ্টম চার্লস সসৈন্যে আল্পস লঙ্ঘন করে নেপলস জয়ে চলেছেন। পথে তিনি মিলান অতিক্রম করে যাবেন। ইল মুরের ভ্রাতুষ্পুত্র মিলানের প্রকৃত শাসনকর্তা জিয়ান গ্যালিয়েজো নেপলসের রাজজামাতা। তাই এই সম্ভাবনা ছিল যে, ফরাসীরাজ পথে মিলানে বাধা পাবেন। কিন্তু কাপুরুষ ইল মুর গোপনে ফরাসীরাজের সঙ্গে চুক্তি করে বিনাবাধায় পথ ছেড়ে দিলেন এবং সেই রাষ্ট্র বিপর্যয়ের সুযোগে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করলেন।

সেই রাজনৈতিক আলোড়ন ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র অবশ্য লিওনার্দোকে বিশেষ বিচলিত করেনি। তখন তিনি জলতরঙ্গের গতি-প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে তন্ময়। সেই সময়েই তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে লিখে গেছেন যে জলতরঙ্গের মত বাতাসেও শব্দতরঙ্গ আছে! তারই ওপর ভিত্তি করে বজ্রের হুংকার ধ্বনি শুনে তার দূরত্ব মাপবার যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাছাড়া নদীর স্রোতের শক্তি নিরূপণ করবার যন্ত্র এবং সেই সঙ্গে কি করে নদীর গতিধারা পরিবর্তন করা যায় সে সম্পর্কেও অনেক তথ্য লিখে গেছেন।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণি একটু থিতিয়ে এলে লিওনার্দো আবার স্মরণ স্তম্ভটির কাজ শেষ করার দিকে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু এবার বাধা দুর্জয়। ইলমুর তখন রাষ্ট্রক্ষমতা পুর্ণায়ত্ব করে আরো ক্ষমতালাভের স্বপ্ন দেখছেন। তিনি ইতালীর সব ছোট ছোট নৃপতিদের একত্র করে আল্‌পসের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে ফরাসীদের বিতাড়নের চেষ্টায় আছেন। সেই চেষ্টায় ইন্ধন যোগাতে তিনি মিলান রাজ্যের ওপর নিষ্করুণভাবে কর চাপিয়েছেন। রাজকর্মচারীদের, সেই সঙ্গে রাজশিল্পী লিওনার্দোর, মাইনে বাকি পড়েছে। কিন্তু তার চেয়েও নিদারুণ কথা —কামান তৈরীর জন্যে যতখানি সম্ভব ধাতু ও ব্রন্‌জ সংগ্রহে তৎপর হয়ে উঠেছেন। ফলে স্মরণস্তম্ভের জন্যে লিওনার্দো বরাদ্দ ব্রন্‌জ ও কামান তৈরীর কাজে চলে গেল।

লিওনার্দোর ওপর হুকুম হলো শুধু প্রাসাদ সজ্জার এবং উৎসবায়োজনের। অথচ তাঁর মাইনে বন্ধ। সেই সময় লিওনার্দো ইলমুরকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন তাতে দেখা যায়, তিনি বারংবার তাঁর অভাবের কথা জানাচ্ছেন। এমন কি শেষ পর্যন্ত টাকা না হোক পোশাক ভিক্ষে করছেন। আর রাজ্যের সেই দৈন্য মোচনের প্রকৃত পথ নির্দেশ করে নব নব আবিষ্কারের কথা জানাচ্ছেন। কখনো তা নতুন প্রথায় ঢালাইয়ের কৌশল, কখনো তা কলের মাকু। যার অংশবিশেষ কাজে লাগাতে পারলেও ইংল্যাণ্ডের কয়েক শতাব্দী আগে ইতালীতে শিল্প-বিপ্লব ঘটে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সে সব প্রস্তাব কেউ কানে তুললেন না। —না ডিউক, না মিলানের শিল্পপতিরা।

শেষে লিওনার্দো আবার ডিউককে লিখলেন, তিনি যেন তাঁকে অন্তত ছবি আঁকার সুযোগ দেন। সে সুযোগ পেলে তিনি এমন ছবি আঁকবেন যাতে মিলান চিরকালের জন্য বিখ্যাত হয়ে থাকবে। সৌভাগ্যক্রমে ডিউক এবার তাঁকে সে সুযোগ দিলেন। তারই ফলে অনাগত বহুশতাব্দীর জন্যে মিলান পৃথিবীর শিল্পানুরাগীদের মহাতীর্থ হয়ে দাঁড়ালো।

লাস্ট সাপার

ইলমুর শিল্পীকে তাঁর প্রিয় গীর্জা সান্টা মারিয়া ডেলা গ্রাৎসির যাজকদের ভোজনালয়ের দেওয়ালের একটি ছবি আঁকার দায়িত্ব দিলেন। এই ছবিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম দেওয়াল চিত্র লিওনার্দো-দা ভিন্‌চির 'লাস্ট সাপার।'

চিত্রকল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে, মানব ইতিকথার এক দারুণতম নাটকীয় মুহূর্ত। মানবত্রাতা, দীনদয়াল প্রভু যিশু তাঁর দ্বাদশ শিষ্যকে নিয়ে শেষবারের মত সন্ধ্যা ভোজনে বসেছেন। বাইরে বিজন প্রান্তরে ক্লান্ত সন্ধ্যার করুণ আভাস। অকস্মাৎ তিনি বলে উঠলেন :

> Verily I say unto you, that one of you shall betray me

'তোমাদের একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করবে—এ আমি জানি। কাল প্রভাতে কুক্কুট রবের আগেই সেই কাজ অনুষ্ঠিত হবে।'

শান্ত, সমাহিত, ক্ষমাসুন্দর ও করুণার প্রতিমূর্তি প্রভুর সেই কটি কথায় ঘরের মধ্যে যেন আচম্বিতে বজ্রপাত হলো। প্রলয়ের দ্বার খুলে গেল। চিরচঞ্চল কালের গতি রুদ্ধ হলো। একটি নিমেষ তার সরণি জুড়ে দাঁড়ালো। চকিত, স্তব্ধ, ক্রুদ্ধ, আতঙ্কিত, অভিভূত তাঁর দ্বাদশ শিষ্য সেই মর্মান্তিক মুহূর্তে শুধু একটি প্রশ্নই করতে পারলো :

প্রভু সে কী আমি? (ম্যাথিউ ২৬ অঃ, ২১-২) বিপর্যয়ের সেই ভয়াল মুহূর্ত চিত্রায়িত করতে গিয়েও লিওনার্দো এতটুকু বিশৃঙ্খলা দেখান নি। বস্তুতপক্ষে, সংযত ও সুষমার এমন অপরূপ সমন্বয় পৃথিবীতে আর কোন শিল্পীর তুলিতেই এমন নিরুপম-ভাবে প্রমূর্ত হয়নি। বারোজন শিষ্য চার-জনের তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রতিটি দল স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ অঙ্গভঙ্গী ও অভিব্যক্তির দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংহতিবন্ধ। কেন্দ্রে খৃষ্টের প্রতিমূর্তি অবিচল, অবিশঙ্ক,—সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। তবু তাঁরই অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণেই সবাই তদ্গত। এই ছবিটির মধ্যে লিওনার্দো হাতের বিচিত্র ভঙ্গীতে মানুষের তীব্র হৃদয়াবেগকে অভিব্যক্ত করার আঙ্গিককেও চরমোৎকর্ষতা দান করেছেন। দিনের পর দিন তিনি তাঁর খাতায় হস্তভঙ্গীর স্কেচ এঁকেছেন। তারপর যখন মনের ভাবটিকে সেই ভঙ্গীতে চরমভাবে মূর্ত করতে পেরেছেন বলে মনে করেছেন তখন তাকে তাঁর ছবিতে প্রয়োগ করেছেন।

৪৬০×৮৮০ মিটার ছবিটিতে শুধু সেই ত্রয়োদশ মানবমূর্তি নয়, প্রতিটি উল্লেখ্য ও তুচ্ছ বস্তুও যেন মহানাটকের নট ও নটি। অমঙ্গলের প্রতীকস্বরূপ উল্টানো নুনের পাত্র, ইতস্তত ছড়ানো রুটি টুকরো, প্লেটের ওপর কাটা মাছ ও ফল, পাত্রে মদের স্বচ্ছতায় প্রতিবিম্বিত ম্লান আলো, —কিছুই নিষ্প্রয়োজনীয় নয়, সবারই একটা যেন ভূমিকা আছে। —জেস্তেও একই বিষয়বস্তু নিয়ে এঁকেছেন কিন্তু তাঁর টেবিল শূন্য। সেই হিসাবে লিওনার্দো জগতের প্রথম সার্থক স্টিল লাইফ শিল্পী।

আলোর আশ্চর্য ব্যবহার হচ্ছে এই মহৎ ছবিটির আরেক অনুধাবনীয় বিষয়। দিনান্তের বিলীয়মান আলো প্রতিভাত হয়ে মূর্তিগুলিকে নিটোল ও সুডোল দেখাচ্ছে। সেই আলোই যিশুর সৌম্যকান্তির চারিদিকে এক জ্যোতির্ময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সেই আলোই সেন্ট পীটারের মূর্তিতে ব্যহত হয়ে অপরাধী জুডার ওপর কালো ছায়া ফেলেছে। আরেকটি বিষয়ও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে লিওনার্দো কোথাও সনাতনী ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করেন নি।

একটি কাহিনী প্রচলিত যে, শিল্পী ছবিটি শেষ করতে অতিরিক্ত সময় নিচ্ছেন এবং গড়িমসি করছেন ভেবে গীর্জার যাজকেরা ডিউকের কাছে অভিযোগ করেন। ডিউক স্বয়ং তদন্তে এসে শিল্পীকে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। শিল্পী উত্তর দিলেন যে, অভিযোগ কতকটা সত্য। কারণ অপরাধী জুডার উপযুক্ত একটি মুখের সন্ধানে তিনি খুনে, ডাকাত ও বোম্বেটেদের আড্ডায়-আড্ডায় ঘুরছেন। কিন্তু যদি খুবই তাড়াতাড়ি থাকে তাহলে তিনি যাজকদের একজনের

মুখাকৃতি সেখানে এ'কে দিতে পারেন। —উচ্চ হাস্যরোলের মধ্যে ডিউক শিল্পীকে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে বলে চলে যান।

কোন মহৎ সৃষ্টিই হঠাৎ খেয়ালের বশে হয় না। লিওনার্দোর 'লাস্ট সাপার'ও তাঁর কোন খেয়ালী সিম্ধান্তের ফল নয়। লিওনার্দোর স্কেচের খাতায় সাক্ষী মেলে যে, তিনি মিলানে আসার আগেই বারবার ঐ মহাচিত্রটি ধ্যান করেছেন। ছবিটি শেষ করতেও তাঁর সময় লেগেছে দু বছরের ওপর। সম্ভবত যাতে প্রয়োজনীয় রদবদল করা সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং নিজের নব নব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে শিল্পী ফ্রেসকো আঁকার পুরনো পদ্ধতি (সদ্য প্লাসটার বা আস্তরের ওপর ডিম ও আঠার গোলা লাগিয়ে আঁকা) ত্যাগ করে শুকনো দেওয়ালের ওপর তেলে গোলা রঙ লাগিয়ে টেম্পারা প্রথায় আঁকেন। তার ফল হয় মারাত্মক। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই কতকটা ঐ ধরনের রঙের জন্যে, কতকটা ঐ বিশেষ কক্ষটি ভ্যাপসা ও স্যাঁৎসেঁতে ছিল বলে ছবিটির রঙ উঠে যেতে লাগলো। পরবর্তী-কালে সংরক্ষণের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ছবিটি আজ তার অন্তিম দশায় এসে পেঁৗচেছে।

'লাস্ট সাপার' শেষ করার পর মিলানে লিওনার্দোর বড় কাজের মধ্যে হচ্ছে 'চিত্র-শিল্পের অনুশীলন' নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা। সেই সময়টায় শিল্পীর আর্থিক স্বচ্ছলতাও দেখা দেয়। ডিউক তাঁকে একটি বাড়ী ও দ্রাক্ষা ক্ষেত্র দান করেন। কিন্তু স্বচ্ছলতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ অষ্টম চার্লস মারা গেলে দ্বাদশ লুই তাঁর উত্তরা-ধিকারী হলেন। মিলানের ডিউকের বিশ্বাসহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণে তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাই রাজ্যাভিষেকের সময় তিনি উপাধি গ্রহণ করলেন, 'ফ্রান্সের রাজা, মিলানের ডিউক'। অচিরে তিনি মিলান আক্রমণ করলেন। মিলানের ডিউক রাজ্য ত্যাগ করে পলায়ন করলেন।

শোনা যায়, দ্বাদশ লুই মিলানে সান্টা-মারিয়া ডেলা গ্রাৎসি গীর্জায় 'লাস্ট সাপার' দেখে এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি সেই গীর্জার সমস্ত দেওয়ালটিকে ফ্রান্সে নিয়ে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু ছবিটি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যাবে শুনে ক্ষান্ত দেন।

ইতিমধ্যে লিওনার্দো একদিন দেখলেন যে, তাঁর অসমাপ্ত সফরজা স্মরণ স্তম্ভের ঘোড়াটির দেহে তীর ছুঁড়ে ফরাসী সৈন্যরা চাঁদমারী অভ্যাস করছে। ক্রোধে লিওনার্দো মিলান ত্যাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু লিওনার্দো তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, একদিন নেপোলিয়নের নেতৃত্বে আরেক দল ফরাসী সৈন্য এসে সান্টা মারিয়া ডেলা গ্রাৎসি গীর্জার যে ভোজনালয়ে লাস্ট সাপার এ'কেছেন তা ঘোড়ার আস্তাবল হিসাবে ব্যবহার করবে এবং মিলানের দুষমনদের আজার ছুঁড়ে ছুঁড়ে তিনি যে জুডার মুখোচ্ছবি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তার প্রতি জুতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ছবিটিকে ক্ষতবিক্ষত করবে। সেই ঘটনার কিঞ্চিদধিক সোয়াশ বছর পরে ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে মিলানের ওপর দারুণ বোমাবর্ষণের সময় গীর্জার এই কক্ষটির তিনটি দেওয়াল বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কিন্তু কোন অসম্ভবপ্রায় কারণে শুধু ঐ মহাচিত্রায়িত দেওয়ালটি রক্ষা পায়।

মিলানোত্তর জীবন

মিলান থেকে লিওনার্দো গেলেন ভেনিসে। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। তুর্কীদের সংগে জলযুদ্ধে ভেনিস তখন বিপর্যস্ত। লিওনার্দো আবার যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার ও যুদ্ধজয়ের পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠলেন। তারপর হঠাৎ কোন দুজ্ঞেয় কারণে ভেনিস ত্যাগ করে দীর্ঘ ষোল বছর পরে বাল্যের নগরী ফ্লোরেনসে ফিরে গেলেন। সারা ফ্লোরেনসে অকৃত্রিম অনুরাগ ও আগ্রহে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। শিল্পী ফিলিপ্পিনো লিপ্পী তখন সার্ভিতে যাজকদের একটি গীর্জার বেদী চিত্রাচ্ছাদিত করছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি সেই গৌরবের কাজ লিওনার্দোকে ছেড়ে দিলেন। কাজ হাতে নিয়ে লিওনার্দো আবার তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে মেতে উঠলেন। ক্ষুব্ধ যাজকেরা হতাশায় দিন গুনতে লাগলেন।

এই সময়ে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি রোমাগনার শাসক সীজারে বর্জিয়ার সামরিক বিভাগে ইনজিনিয়ার হিসাবে যোগ দিলেন। ইতালীর ইতিহাসে সেই রক্তক্ষরা নিষ্ঠুরতার দিনেও সীজারে বর্জিয়ার মত জীঘাংসু যুদ্ধবাজ ছিল দুর্লভ। নিজের জন্মপ্রদেশের বিরুদ্ধে ঐ ধরনের একজন নরপিশাচের সৈন্যবিভাগে লিওনার্দোর যোগদানের কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা দুষ্কর। হয়তো তার একটা কারণ এই হতে পারে যে, একজন প্রাযুক্তিক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের আগ্রহ লিওনার্দোর অন্তরে চিরদিনই প্রবল ছিল। সীজারে বর্জিয়া তাঁকে সেই প্রতিষ্ঠা-লাভের সুযোগ দিয়েছিলেন।

সীজারে বর্জিয়ার পতনের পর লিওনার্দো আবার ফ্লোরেনসে ফিরে এলেন। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। ফ্লোরেনসের জন-সাধারণ তাঁর সব অপরাধ ভুলে আবার তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। পৌর কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর চেয়ে তেইশ বছরের ছোট মিকেল্ এনজেলো নামে এক প্রতিভাধর শিল্পীর সংগে গ্রানড কাউনসিল চেম্বারের দেওয়াল সজ্জার ভার দিলেন। যদিও মিকেল এনজেলো তখনো তরুণ এবং তাঁর শিল্প-প্রতিভার পূর্ণ পরিণতি হতে তখনো দেরী ছিল তবু জগতের শিল্প-ইতিহাসে অমন দুই মহানায়কের প্রতিযোগিতা আর কখনো দেখা যায় নি।

লিওনার্দো তাঁর বিষয় বস্তু স্থির করলেন এ্যানঘিয়ারীর সমর। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে ফ্লোরেনস সেই যুদ্ধে মিলানকে পরাভূত করে। আক্রমণোদ্যত অশ্ব ও যোদ্ধা বাহিনী, অস্ত্র সংঘাত ও মরণ মহোৎসবের এক প্রলয় ঘূর্ণীকে লিওনার্দো চেমবার গাত্রে চিরস্থির-চিরচঞ্চল করে রাখবার বিপুল কল্পনা করলেন। আর মিকেল এনজেলো স্থির করলেন যে, তিনি আঁকবেন মহা আহত শেষে রণজয়ী ক্লান্ত সৈন্যরা নির্মল নীল জলাশয়ে স্নান করছে। এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, লিওনার্দোর কল্পিত দ্বেষ ও মত্ত হিংসার রুদ্র ছন্দকে ম্লান করে দেবার অভিপ্রায়েই এনজেলো সেই শান্তি ও বিশ্রামের ছবিটি আঁকার সিম্ধান্ত করেন। লিওনার্দোর বিরুদ্ধে মিকেল এনজেলোর মনে বহু

অভিজ্ঞান ও অভিযোগ। আজ তার যোগ্য উত্তর দেবার সুযোগ সমাগত।

দুঃখের বিষয় গ্রানড কাউনসিলের চেম্বারের সেই অবিস্মরণীয় প্রতিযোগিতা শেষ হলো না। রোম থেকে পোপ মিকেল এনজেলোকে ডেকে পাঠালেন। আর লিওনার্দো আত্মকথার রং নিয়ে নতুন পরীক্ষা করতে গিয়েছিলেন। সেবার তিনি রঙের সঙ্গে মোম মিশিয়ে তরল অবস্থায় দেওয়ালে প্রয়োগ করতে লাগলেন। ফল হলো মর্মান্তিক। ছবিটি শেষ হবার আগেই সেটি গলে যেতে লাগলো। কয়েকটি আশ্চর্য ড্রইং ছাড়া সেই ছবির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই ভাবে একটি মহান শিল্পসম্ভাবনা অকালে ব্যর্থ হয়ে যাওয়াতে ফ্লোরেন্সবাসীর বিপক্ষে আশা ভঙ্গের হতাশা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু লিওনার্দো নিজে যে খুব ব্যথিত হয়েছিলেন তা মনে হয় না। কারণ যশের চেয়ে শিল্প সমস্যার সমাধানই ছিল তাঁর কাম্য।

রহস্যময়ী মোনা লিসা

গ্রান্ড কাউন্সিলের দেওয়ালে যুদ্ধ কাহিনী চিত্রায়িত করবার সময়েই লিওনার্দো ফ্রানসেসকো ডেল গিওকনডো নামে এক বিত্তবান ফ্লোরেনসবাসীর স্ত্রী ম্যাডোনা লিসার একটি প্রতিকৃতি আঁকবার বায়না নিয়েছিলেন। যখন রাজা রাজমহিষী, আমীর ওমরাহরা লিওনার্দোকে দিয়ে একটি প্রতি-কৃতি আঁকিয়ে নেবার জন্যে তাঁর দ্বারে বৃথা ধর্ণা দিয়ে ফিরছিলেন তখন কোন সৌভাগ্যবলে যে ম্যাডোনা লিসা শিল্পীর অজর তুলির টানে অমর হয়ে থাকবার সুযোগ পেলেন তা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। কেউ কেউ বলেছেন যে, শিল্পী লিসাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু লিওনার্দো যে সেই পরস্ত্রীকে কিম্বা কোন স্ত্রীলোককেই কখনো ভালোবেসে ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

ম্যাডোনা লিসা, সংক্ষেপে মোনা লিসা (প্যারিসের লুভ চিত্রশালার তালিকায় লা গিওকনডা) এক স্বাস্থ্যবতী মহিলার প্রতি-কৃতি। তাঁর হাত দুটি কোলের ওপর আড়াআড়িভাবে ন্যস্ত। প্রশান্ত মুখাবয়ব ও উন্নত প্রশস্ত ললাটে চূর্ণ অলোকগুচ্ছ ও উড়ন্ত উড়নীর অংশ বিশেষ। ছবিটির পটভূমিকায় লাস্ট সাপারের মতই এক বিজন প্রান্তর, যেন শিল্পী সৃষ্টির কোন আদি উৎস সন্ধান প্রয়াসী।

মোনা লিসার সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে যে সে শুধু পটে লিখা নয়। সে যেন জীবন অনুভূতিতে সত্য ও প্রাণ স্পন্দন-ময়ী। তার সামনে দাঁড়ালে মনে হয় সে যেন সত্যিই আমাদের দিকে জীবন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হাসছে। তার সে চিঠি ও হাসিতে [illegible] কৌতুক কখনো বিদ্রূপ, কখনো [illegible] আছই রহস্যময় তার সুস্মিত [illegible] চারশো বছর ধরে মানুষকে আকৃষ্ট, বিভ্রান্ত ও তন্ময় করেছে। কিন্তু কোন যাদুমন্ত্রে লিওনার্দো আত্মজা [illegible] প্রতিকৃতিতে ঐ অপ্রতিরোধনীয় আকর্ষণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেন? শিল্প সাধনার এক অনন্য-বিশেষ পূর্ব সমস্যার মীমাংসা করেই লিও-নার্দো এই অমর কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। তিনি তাঁর প্রতিকৃতির সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে না এঁকে অনেকখানিই দর্শকদের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণত প্রতিকৃতি মাত্রেরই অভিব্যক্তির সাফল্য দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এক মুখের কোন, দুই চোখের কোল। ঠিক ঐ দুটি স্থানকেই লিওনার্দো স্বেচ্ছায় অস্পষ্ট রেখেছেন তারা ঘনায়মান ছায়ায় ক্রমশ মিলিয়ে গেছে। আর ঠিক সেইজন্যে মোনা লিসা কি ভাবছে, কেন হাসছে সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত নই। তাইতো তার অমোঘ আকর্ষণে আমরা যতবার তার কাছে যাই ততবার তাকে নতুন করে আবিষ্কার করি।

উপরোক্ত কৌশল ছাড়া লিওনার্দো আরেকটি দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। ছবিটিকে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, তার দুই দিক অসম। এই অসমতা পটভূমির প্রান্তর দৃশ্যে আরো স্পষ্ট। বামের দিগন্তরেখা দক্ষিণের দিগন্তরেখার চেয়ে আরো নীচু। ফলে বামদিক থেকে দেখলে মোনা লিসাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘা-ঙ্গিনী ও ঋজুদেহা বলে মনে হয়। শুধু তাই নয়, তার মুখের আকৃতি ও প্রকৃতি ও দুই দিক থেকে দুরকম দেখায়। সেই সঙ্গে ভিন্ন প্রকৃতি মনে হয় তাদের অভিব্যক্তি। কিন্তু ঐ অস্পষ্টতা এবং অসমতার সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছে তুলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ, যেমন লিসার জামার হাতের খাঁজ ও ভাঁজগুলি। আর তার হাত দুটি বোধহয় শিল্পীর তুলিতে আঁকা সুন্দরতম নারী হস্ত।

লিওনার্দোর অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে দুটি বিখ্যাত ছবি হচ্ছে শীলাসীনা কুমারী বা 'ভার্জিন অব দি রকস', ছবি দুটি একই বিষয়বস্তুর দুটি সংস্করণ। একটি আছে প্যারিসের লুভ গ্যালারীতে, অপরটি লন্ডনের ন্যাশন্যাল গ্যালারীতে। আপাত সাদৃশ্যের মধ্যেও ছবি দুটি বৈশিষ্ট্যে বিচিত্র। নগন উন্নত শীলার গুহা-সদৃশ এক রহস্য-ময় পরিবেশে কুমারী মাতা তাঁর নিরুপম বরাভয় হস্ত প্রসারিত করে উপবিষ্টা। তাঁর পাদদেশে শিশু খৃষ্ট শিশু সেন্টজন দি ব্যাপটিস্টের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। কুমারী মাতার প্রসারিত হাতের আশ্রয়ে শিশু খৃষ্ট আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে আছেন। আর মেরী মাতার দক্ষিণে নতজানু শিশু সেন্টজন জোড় হাতে সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করছেন। কুমারী মাতার ডান হাতখানি সেন্টজনের পিঠের ওপর ন্যস্ত। ছবিটির বামে জিভাহাস্য দেবদূত যিশুকে ধরে আছেন। লুভের সংস্করণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো দেবদূত সেন্টজনের দিকে একটি তর্জনী অঙ্গুলি সংকেতে নির্দেশ করে আছেন। সুস্মিত হাসি দেবদূতের মুখশ্রী লিওনার্দোর সৌন্দর্যাদর্শের প্রতীক এবং তিনি ঐ তর্জনীর অবয়ব বারবার এঁকে গেছেন। সম্ভবত অনুরূপ প্রসারিত অঙ্গুলি সংকেতকেও তিনি কোন বিশিষ্ট অর্থদ্যোতক হিসাবে বহুবার এঁকে গেছেন। লন্ডনের ছবিটিতে সেই অঙ্গুলি সংকেত নেই। সেটি দেবদূত সেন্টজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করছেন। ছবি দুটিতেই মূর্তি-গুলিকে পিরামিডের আকারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে প্রথমেই দ্রষ্টার দৃষ্টি ছবির প্রধানতম আকর্ষণ কুমারী মেরীর মুখশ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আঙ্গিকের দিক থেকেও ছবিটি স্মরণীয়। এর আগে শিল্পীরা রেখার দ্বারা আকৃতিকে পৃথক করতেন। কিন্তু লিওনার্দোই এখানে সর্ব প্রথম আলো-ছায়ার বিন্যাসে আকৃতিকে গড়ে তুলেছেন। ফলে আকৃতিগুলি ভরাট নিটোল ও ত্রিমাত্রার আভাস লাভ করেছে।

লিওনার্দোর পরবর্তী জীবন ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। মোনালিসা আঁকা শেষ হবার আগেই তিনি ফ্লোরেন্সবাসীদের হতাশ করে দ্বিতীয়বার মিলান যাত্রা করলেন। সঙ্গে থাকলো তাঁর সমাপ্ত প্রায় প্রিয়তম সৃষ্টি মোনালিসা। লিওনার্দো যদিও আমা-দের জন্যে খুব বেশি ছবি রেখে যান নি তবু তাঁর ড্রইংয়ের সংখ্যা বহু। তাঁর মত মহাশিল্পীর হাতে সেগুলি সৌন্দর্যে ও সৌকর্যে নিরুপম।

মিলানে ফরসাী সরকারের অধীনে লিও-নার্দো খালকাটা প্রভৃতি জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করে ছিলেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে ফরাসীরা মিলান ত্যাগ করে যেতে বাধ্য হলো। সেই সঙ্গে লিওনার্দো পোপ দশম লিওর অধীনে কাজ করবার জন্যে রোম যাত্রা করলেন। কিন্তু লিও-নার্দোকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা দশম লিওর ছিল না। তাই রোমে লিওনার্দোর দুটি বছর প্রায় অপচয় হলো। শেষে রোম থেকে তিনি গেলেন প্যারিসে। ফরাসী রাজ প্রথম ফ্রান্সিস তাঁকে রাজকীয় সম্মানে অভ্যর্থনা করলেন। জীবনের শেষ কটি বছর তিনি ফরাসী দেশেই শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু তাঁর যে হাত মানব-সংস্কৃতিকে এতখানি সমৃদ্ধ করেছিল জীবন সায়াহ্নে তা পক্ষা-ঘাতে অবশ হয়ে যায়।

মৃত্যুর বহু বছর পরে লিওনার্দোর অবিনশ্বর প্রতিভার নশ্বর আধার তাঁর দেহাবশেষ ঘটনাচক্রে মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের উত্থানপাথলে ক্রুদ্ধ জনতা যখন প্রাসাদ দুর্গ, গীর্জা মিনার ধ্বংস ও দগ্ধ করতে থাকে তখন তারা এমবাইসের সমাধিক্ষেত্রেও হানা দিয়ে সেখানে রাজপরিজন সঙ্গে অন্তিম শয়নে-শায়িত লিওনার্দোর দেহাস্থিও খুঁড়ে বের করে ফেলে। পরে ফরাসী কবি আর্সেন উসে সেই দেহাবশেষ সংগ্রহ করে তা পুনরায় সমাধিস্থ করেন।

নিলামবাজারের কথা

নিলামবাজার। কাছাড় জেলার করিমগঞ্জ থেকে ছ' মাইল দূরে। এটা একটা গঞ্জ। অনেক জিনিসপত্রের আমদানি এবং কেনা-বেচা হয়। তবে এক কথায় নয়। রীতিমত হাঁকডাক, দেখ-শুনে, দর কষাকষি। নিলাম-বাজারের পুরনো দস্তুর।

শুধু জিনিসপত্রের সওদায়ই নিলাম-বাজার এই দীর্ঘদিনের অভ্যাসটি টিকিয়ে রেখেছিল। এবার আরো একটি নতুন অভিজ্ঞতা ঘটেছে তার জীবনে। আর সেটি হলো পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের দৌলতে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রচার, আরম্ভ হলো নিলামবাজারে। প্রথম প্রথম কেউ এদিকে নজর দিতে চাইলো না। দিন যায়। কিন্তু নির্বিকার ভাব কাটে না। এদিকে করিমগঞ্জ জেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ চঞ্চল। সিদ্ধান্ত হলো, জোরদার প্রচারকার্য শুরু হবে। প্রচারপত্র, দেয়াল-চিত্র, সিনেমা, বক্তৃতা, দলবদ্ধ আলোচনা। সবই পর পর ব্যবস্থা হলো। এরপরেও লোকের আগ্রহ বা উদ্দীপনার কোন চিহ্নই নেই। এবার তিনদিনব্যাপী একটি পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হলো। ব্লকের সকল স্তরের পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ডাকা হলো। আর সেই সংগে স্থানীয় লোক এবং নেতৃবর্গকে এই প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা, বক্তৃতা ও সমন্বয় সাধনে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানানো হলো। কর্তৃপক্ষ ধরে নিলেন, হাতে হাতে ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, নিলামবাজারের কষে অভ্যেস করা সেই পুরনো দস্তুরটির কথা।

শুরু হলো আসল খেল। নিলাম-বাজার নিজের পরিচিত রাস্তায় পা বাড়ালো। যদিও নিলামবাজারের ঐতিহ্যের সংগে এর কোন অমিল নেই কিন্তু এর মধ্যে কিছু অন্যস্বাদও আছে। স্থানীয় কিছু মৌলভি, পুরোহিত এবং অন্যান্য ব্যক্তি মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন, পরিবার পরিকল্পনা খোদার উপর খোদকারী। তাঁরা সরাসরি নিলামবাজারের পরিবার পরিকল্পনা প্রচলনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন।

ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আরম্ভ হয়ে গেছে। আপত্তির সংবাদও যথারীতি এসে পৌঁচেছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালকগণ দ্রুত বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলেন। সংবাদ পেয়ে হাজির হলেন কর্তৃপক্ষস্থানীয়-দের অনেকেই। তাঁরা এসেই নিলামবাজারের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও বিভিন্ন শ্রেণীর নেতৃবৃন্দকে নিয়ে পরিবার পরিকল্পনা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি আলোচনাসভায় বসলেন। তাতে যোগ দিলেন পন্ডিত, মৌলভি এবং অন্যান্য অনেক ব্যক্তি।

আলোচনা হলো। দীর্ঘ সময় ধরে। কর্তৃপক্ষেই তরফ থেকে পরিস্কার বক্তব্য রাখা হলো। আমরা যদি আমাদের শিক্ষা, বৃত্তি এবং কিরূপ জীবন যাপন করবো সে সম্বন্ধে বিচারবিবেচনা করে পথ চলি। নির্বাচনের অধিকার আমাদের আছে। এবং তা প্রয়োগও করি। সুতরাং পরিবার পরিকল্পনা মারফত পরিবারের আয়তন নির্ধারণ এবং সন্তান-সন্ততি কয়টি হবে তাও নির্বাচনের অধিকার আমাদের আছে। এবং সে অধিকার প্রয়োগ করতে হবে। এই নির্বাচন আরো গুরুত্বপূর্ণ। এর সংগে জড়িয়ে থাকে কয়েকটি শিশুর ভবিষ্যৎ। সন্তানের জন্মের পর যথোপযুক্ত খাদ্য, যত্ন এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রশ্ন সমানতালে বেড়ে চলে। এসবের সংস্থান করতে না পারা বিরাট সামাজিক অপরাধ। সকল ধর্মেই একথা স্পষ্ট করে বলা আছে।

শুধু ধর্মের দোহাই দিলে চলবে না। প্রমাণও দিতে হবে। নাহলে এঁরা মানবেন কেন? তাই আলোচনার সংগে সংগে চললো ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি। শাস্ত্রীয় বিচারে তাঁরা প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন, পরিবার পরিকল্পনায় ধর্মের কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। বরং সকল শাস্ত্রেই এই নির্দেশ দেওয়া আছে, সন্তানকে উপযুক্ত মানুষ করে তুলতে হবে। এজন্য আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবারের সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যার অর্থ ছোট পরিবার। এর সংগে স্বাস্থ্য এবং এযুগের অন্যান্য পারিপার্শ্বিক প্রশ্নও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে চললো আলোচনা। অনেকে অনেক প্রশ্ন করলেন। এড়িয়ে না গিয়ে সেসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া হলো। প্রশ্নের জবাব শুনে সবাই সন্তুষ্ট। তবু স্পষ্ট কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেলো না। সবাই একটু নড়েচড়ে বসলেন। এ ওর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলেন।

হঠাৎ দেখা গেল, গ্রামসভার সভাপতি উঠে দাঁড়িয়েছেন। সবাই অসীম আগ্রহে তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি কিন্তু কোনদিকে না তাকিয়ে সোজাসুজি বলতে শুরু করলেন, সংসারে তাঁর চারটি ছেলেমেয়ে। এখানে যা শুনলেন সে দায়িত্ব তিনি সন্তানদের প্রতি পুরোপুরি পালন করতে পারছেন না। তাই তিনি সাব্যস্ত করেছেন পরিবার পরিকল্পনা সাহায্য গ্রহণ করবেন। যাতে আর না সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে তাঁর স্ত্রীরও কোন অমত নেই।

এতক্ষণ সবাই চুপচাপ শুনছিলেন। এবার সভার মধ্যে একটা গুঞ্জন। গ্রামপ্রধানের সিদ্ধান্ত সকলেরই মনে ধরেছে। গ্রামপ্রধান এবার সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, নিলামবাজারের নিত্যকার রেওয়াজ সব ব্যাপারেই বিরাট দরদস্তুর করা। গত তিন ঘন্টার আলোচনায় সেটি তো বাকি থাকেনি। তাই এবার সবাই পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসতে পারেন।

গ্রামসভাপতির বক্তৃতার পর উপস্থিত সবাই পরস্পরের দিকে আর একবার তাকালেন। সবাই সকলের মনের অবস্থাটা বুঝে নিতে চাইলেন মুখ দেখে। হয়তো আর একবার ভাবলেন, নিলামবাজারের দর-দস্তুরের রীতি কথা। তারপর আস্তে আস্তে সবাই এগিয়ে এলেন পরিবার পরিকল্পনার সাহায্যে নতুন সংসার গড়ে তোলার আশায়।

এরপর আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু এটুকু না বললে অনেককিছু অসমাপ্ত থেকে যায়। নিলামবাজার পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র এখন বেশ জমজমাট। নতুন সংসার গড়ে এবং পুরনো সংসারকে পরিকল্পনামাফিক চালানোর জন্য নারী-পুরুষের সবাই ভিড় করে এই পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে।
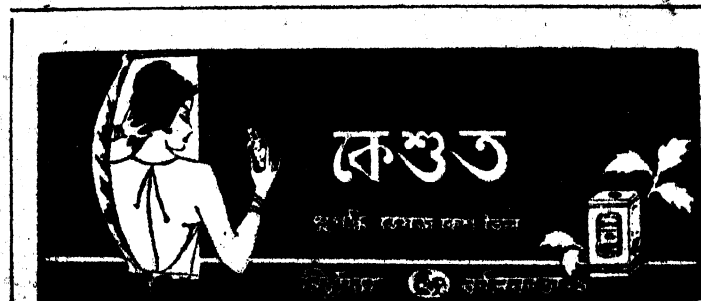
লরেটো হাউসের ছাত্রীরা তাদের স্কুলে একটি নতুন ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ২০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর স্কুলের গৃহে কলকাতা শহরের ওপর ৭ থেকে ১৭ বছরের মেয়েরা বহুরকমের তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী করে। প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রীদের তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্বন্ধে আরো একটু সজাগ করে তোলা। শহরের বিভিন্ন দিক নিয়ে পঁচিশটি বিভাগে ভাগ করে ছাত্রীরা—চার্ট, মডেল এবং পুতুলের সাহায্যে অজস্র তথ্য সংগ্রহ করে প্রদর্শিত করেছে। প্রতিটি বিষয়ের ওপর ছাত্রীরা অনেকগুলি সুদৃশ্য ফোল্ডার তৈরী করে প্রচুর তথ্য পরিবেশন করে। সমগ্র প্রদর্শনীগৃহ অবশ্য প্রদর্শিত বস্তুর প্রাচুর্যে একটু ভারী হয়েছিল। কিন্তু স্কুলের ছাত্রীরা সুদক্ষ শিক্ষয়িত্রীদের পরিচালনায় কতদূরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং একটা প্রোজেক্ট কতখানি সাফল্য লাভ করতে পারে তার বেশ সুস্পষ্ট পরিচয় এই প্রদর্শনী থেকে পাওয়া যায়। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীদের করা লরেটো স্কুলের মডেল একটি প্রধান আকর্ষণ। আরেকটু উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের তৈরী কলকাতার উৎপত্তি ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন বিশেষ সুদর্শন হয়েছে। কলকাতার অবস্থিতি আবহাওয়া উৎসব ও খেলাধুলো নিয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা সুন্দর কাজ করেছে। কলকাতার খাদ্য সরবরাহ, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্ম, যানবাহন, পুলিশ, হাসপাতাল, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, পাট চা ও অন্যান্য শিল্প, কলকাতার বন্দর, কর্পোরেশন সমাজ-কল্যাণ যায় কলকাতার পাখি ও পোকামাকড় পর্যন্ত এদের দৃষ্টি এড়ায়নি। নিউ মার্কেট, ডাক বিভাগ প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় সুন্দর মডেলের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। ৩০০০ খৃষ্টাব্দে কলকাতার কেমন চেহারা হওয়া উচিত তাই নিয়ে করা ভবিষ্যতের কলকাতার মডেল, হুগলীর দ্বিতীয় সেতু ও কলকাতার জল সরবরাহের মডেলগুলি এদের কল্পনাশক্তির প্রকাশের সুন্দর নিদর্শন। প্রদর্শনীটি শুধু ছাত্রছাত্রীদের নয় অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীদের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হয়েছিল। উদ্বোধনকালে মেয়র প্রশান্ত সুর ট্যারিস্ট সপ্তাহে এই প্রদর্শনীর অংশ বিশেষ ভাল করে সাজিয়ে প্রদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

●

আকাদমি অব ফাইন আর্টসে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিকের বাণিজ্য সংস্থার উদ্যোগে প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পীদের ছবিগুলির বহুদৃশ্য প্রতিলিপি দেখানো হয়। এগুলি সংখ্যায় পঞ্চাশখানির অধিক এবং প্রতিলিপিগুলি বিখ্যাত ড্রেসডেন গ্যালারীর সংগ্রহশালার ছবি। এর মধ্যে র‍্যাফেলের সিস্টাইন ম্যাডোনা, রেমব্রান্টের বৃদ্ধের প্রতিকৃতি ও সাসকিয়ার প্রতিকৃতি, দয়ার 'মে রী' সেজানের 'মিল অব পঁতোয়াজ' ইত্যাদি ছবি সকলেরই পরিচিত। তাছাড়া রুবেন্স, ফ্রান্স হাল্স, ভ্যানডাইক, টেনিয়ার্স, টারবরখ মিলে, সেগ্গেল, লিবারমান, বেকম্যান, কোকোসকা, ভানগগ, কোরিন্থ, ফাইনিঙ্গার প্রমুখ শিল্পীদের অনেকগুলি সুপরিচিত কাজের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তবে রিপ্রোডাকশন বাজারের ভাল ছাপা বইয়ের মত।

আধুনিক শিল্পীদের ৪৫খানি বড় এচিং এনগ্রেভিং ও উডকাটের যে নিদর্শনগুলি রাখা হয় সেগুলি কোলভিৎস, ডিক্স, ও গ্রুনডিগ-এর স্টাইলে করা। প্রতিটি ছবিতেই যুদ্ধবিরোধী আওয়াজ তোলা হয়েছে এবং ভিয়েৎনামের প্রতিরোধ-এর একটা বড় অংশ অধিকার করে আছে। ডিক্স-এর আঁকা (২৭) চতুর্ভুজা মাতা তিন হাতে সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে একহাতে যুদ্ধরত স্বামীকে বন্দুক এগিয়ে দেওয়ার ছবিটি ইন্টারেস্টিং। এই শিল্পীর সাত নম্বরের মাতা ও শিশুর সুক্ষ্ম এচিংটি চমৎকার। পরমাণু বোমার বিরুদ্ধে করা কয়েকটি পোস্টারধর্মী গ্রাফিক এবং জার্মানীর মধ্যযুগের ধর্মীয় শিল্পের অন্যতম বিষয়বস্তু 'ডান্স অব ডেথ' নিয়ে আঁকা কয়েকটি ছবির বলিষ্ঠ ভঙ্গী প্রশংসনীয়। বাকি ছবির অধিকাংশই অতিমাত্রায় প্রচারধর্মী। জার্মান শিল্পীর কলকাতা ভ্রমণের কয়েকটি নক্সা যেমন পথের মানুষ ও কুকুর, বাঙ্গালী রমণী ও শিল্পী যামিনী রায়ের প্রতিকৃতি ড্রয়িংগুলি সুন্দর লাগল।

●

ভারতবর্ষে কাগজের প্রচলন কবে হয় তার কোন নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায় না। নিয়ারকাসের সাক্ষ্য মানলে বলতে হয় খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দেও এদেশে কাগজ ছিল। ৭ম শতাব্দীতে পুরোহিতরা কাগজের বুদ্ধমূর্তি তৈরী করতেন বলে শোনা যায়। আবার চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং বলেন যে, ভারতীয় শাস্ত্রের নকল করার জন্যে তাঁকে স্বদেশ থেকে কাগজ ও কালি আনতে হয়েছিল। প্রাচীনতম কাগজের পুঁথি যা ভারতে পাওয়া গিয়েছে তা ১২শ শতাব্দীতে তৈরী। তবে একথা সত্যি যে মুসলমান বিজয়ের শুরু থেকে এদেশে রীতিমত কাগজ তৈরীর প্রচলন হয়। কাশ্মীরের সুলতান জৈন উল্ আবেদীন সমরকন্দ থেকে কাগজ তৈরীর কারিগর আমদানী করেন সেই কারিগরী বিদ্যা ১৯ শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল। ১৫ শতাব্দীর শুরুতে বাঙলায় সুলতানের কাছে যে চৈনিক দৌত্য আসে তার বিবরণে জানা যায় যে, এদেশে গাছের ছাল থেকে একরকম কাগজ তৈরী হত। যাই হোক মুঘল যুগে ভারতের হাতে তৈরী কাগজ যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং বহু জায়গায় কাগজ তৈরী হত। বর্তমানে খাদি বোর্ডের উদ্যোগে এই হাতে তৈরী কাগজের শিল্পটিকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। বাঙলাদেশে যেসব জায়গায় কাগজ তৈরী হয় তার মধ্যে আমতার মৈনান গ্রাম, গড়িয়ার পাটুলী গ্রাম, মেমারির পঞ্চগ্রাম সমবায় কুটির শিল্প, কল্যাণী, দমদমা, মুর্শিদাবাদের গান্ধীন, বর্ধমানের শ্রীরামপুর গ্রাম, পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মহিলা সমিতি (এটি একান্তভাবে মহিলা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান) এবং বারুইপুরের ওয়ার্কার্স কো অপারেটিভ প্রভৃতি জায়গায় উঁচুদরের হাতে তৈরী কাগজ তৈরী হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় উপযুক্ত সংগঠন ও বিক্রয় ব্যবস্থার অভাবে সরকারি সাহায্য পাওয়া সত্বেও কাগজীদের অবস্থা আজ ভাল নয়। এর প্রতিকারকল্পে ওয়েস্ট বেঙ্গল হ্যান্ডমেড বোর্ড অ্যান্ড পেপার মেকার্স অ্যাসোসিয়েশন শিল্পায়ন সোসাইটির সঙ্গে একত্রে ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন। প্রদর্শনীতে বাংলা দেশে যতরকম হাতে তৈরী কাগজ ও বোর্ড তৈরী হয় তার অনেকগুলি সুন্দর নমুনা রাখা হয়। তার ওপর যতরকম ক্যালেন্ডার ও গ্রীটিং কার্ড ইত্যাদি ছাপা যায় তার অনেকগুলি সুদৃশ্য নমুনা শিল্পায়ন সোসাইটি প্রস্তুত করে এইসব কাগজ কতরকম কাজে লাগান যায় তার নিদর্শন সাজিয়ে রাখেন। গান্ধীনে বর্তমানে হাতে তৈরী ফিল্টার পেপার করা হচ্ছে এবং এগুলি বাজারে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। একটি নূতন পরীক্ষার ফলে সংবাদপত্রের একান্ত প্রয়োজনীয় ম্যাট বোর্ডও তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু যথেষ্ট মূলধনের অভাবে ব্যবসায়িকভিত্তিতে প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে না। হলে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচানো যায়। শিল্পীদের ব্যবহারের উপযোগী নানারকমের উঁচুদরের কাগজ দেখা গেল। এগুলির মূল্যও বেশী নয়। কিন্তু বিক্রয়কেন্দ্রের অভাবে অনেক সময় পাওয়া যায় না। যাই হোক এই অ্যাসোশিয়েশন এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন, আশা করি এঁদের চেষ্টা সফল হবে।

●

৬ অকটোবর থেকে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টসে জার্মান ডেমক্র্যাটিক রিপাবলিকের বাণিজ্য সংস্থার উদ্যোগে ডেফা ফিল্ম-এর সম্পর্কে একটি তথ্যমূলক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হল। পূর্ব জার্মানীতে কত রকমের ফিচার ফিল্ম, তথ্যচিত্র, কার্টুন ও ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলা হয় তার কিছু কিছু নমুনা এখানে দেখানো হয়েছে। অনেকগুলি বিখ্যাত চিত্রের স্টিল ও পোস্টার ইত্যাদি এখানে সুসজ্জিতভাবে দেখানো হয়েছে। পূর্ব জার্মানীর রাষ্ট্রীয় ফিল্ম আর্কাইভ হল পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ চলচ্চিত্রের সংগ্রহশালা। বহু বৈদেশিক চলচ্চিত্র এখানে সংগৃহীত আছে। এখানকার ডেফা ফিল্ম পৃথিবীর প্রায় ১০৫টি দেশের ১১০০ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞান সম্পর্কীয় চলচ্চিত্র এই সংস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। চলচ্চিত্র অনুরাগীদের কাছে প্রদর্শনীটির সমাদর হবে বলে আশা করা যায়।

—চিত্ররসিক

সাজঘর

আজকের 'সাজঘর' কিন্তু আঠারো বছর আগে এই নামে চিহ্নিত ছিল না। আকস্মিক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়ে চেনা নাম অচেনার রংয়ে এক আশ্চর্য রূপান্তর লাভ করে; 'উত্তরসারথী' হয় 'সাজঘর'। এই রূপান্তরের ইতিহাসটা সত্যি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। একটি নবগঠিত অপেশাদার নাট্যগোষ্ঠী ১৯৫১ সালের ২১শে জুন 'কালিকা থিয়েটার' মঞ্চে অভিনয় করছিলেন সলিল সেনের 'নতুন ইহুদী'। সোচ্চারে সেদিন উদ্যোক্তারা বলে উঠেছিলেন 'সংস্কারব্রতী লাখো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আমাদের পথ প্রদর্শক নয়; আমরা এসেছি প্রয়োজনের তাগিদে; অপ্রয়োজনীয় প্রমোদ বিতরণ করতে নয়। বর্তমানিক নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে চিত্র-জগতের কুশলী ও শিল্পীদের ঘনিষ্ঠ রাখা এবং প্রাচীন ও নবীন শিল্পীদের মিলন ক্ষেত্র রচনা করাই 'উত্তরসারথী'র মুখ্য উদ্দেশ্য।"

এই দৃঢ় সংকল্পের দীপ্তি উত্তর-সারথী'র প্রথম প্রযোজনাতেই ভাস্বর হয়ে ওঠে। শিল্পীদের নিষ্ঠা ও গভীরতম শিল্পবোধ সেদিন সবাইকেই মুগ্ধ করে এবং জনসাধারণের অকুণ্ঠ অভিনন্দনকে পাথেয় করে 'উত্তরসারথী'র শিল্পীরা নিয়মিত অভিনয়ের আয়োজন করতে থাকেন। রঙ্গমহল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই পেশাদার গোষ্ঠী হিসাবে অভিনয় করার সুযোগ গ্রহণ করা হয়। এই সূত্রে অসীম উৎসাহে এঁরা বিভিন্ন ধরনের নাটক পরিবেশন করতে থাকেন। নিউ এম্পায়ার, রঙ্গমহল, শ্রীরঙ্গম, ম্যানসন ইনস্টিটিউটের মঞ্চে। কলকাতার বাইরে বহরমপুর, জামসেদপুর, কটক, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি বহু স্থানে এঁরা সাফল্যের সঙ্গে নানাধরনের অভিনয় করে নিজেদের নাট্য প্রযোজনার বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেন। 'শরৎ-সাহিত্য সম্মেলনে' নন্দদুলাল চক্রবর্তী রচিত 'শরৎচন্দ্র' নাটক অভিনীত হয় এবং এই নাটকের অপূর্ব অভিনয় উপস্থিত সবাইকে আকৃষ্ট করে এবং সেই সময়ে মোটামুটিভাবে 'উত্তর-সারথী' পরিব্যাপ্ত পরিচিতির আলোয় আসে। সময়টা ছিল তখন ১৯৫৪।

সাফল্যের গতি যখন দ্রুত হোতে চললো, তখনই নানা কারণে আকস্মিকভাবে একটা মন্থরতা এসে যেন উদ্দীপনায় প্রবহমান জোয়ারকে আচ্ছন্ন করলো। প্রায় তিন বছর কর্মচঞ্চল 'উত্তরসারথী' স্তব্ধ হয়ে রইলো, কর্মহীনতায় বিষণ্ণতায় সে তখন ম্লান। কিন্তু ১৯৫৭তে আবার মরা গাঙ্গে বান এলো। কিছু পুরোনো আর নতুন শিল্পীর ঐকান্তিকতা একটি ঐক্যের সূত্রে সংহত হয়ে উঠলো, 'উত্তরসারথী' আবার পেলো চলার বেগ ও ছন্দ। সলিল সেনের 'মৌচোর' নিয়ে আবার নতুন উদ্যমে যাত্রা শুরু হোল। কিন্তু অভিনয়ের দিন কয়েক ঘণ্টা আগে শিল্পীরা জানতে পারলেন যে গত তিন বছরের কর্মহীনতার প্রসারতায় আর একটি গোষ্ঠী 'উত্তরসারথী' নামে রেজিস্ট্রীকৃত হয়েছে। এই আচমকা আঘাতে একটু ব্যথা পেলেও শিল্পীরা অসহায় বোধ করলেননা, সেদিনই অভিনয়ের আগে মঞ্চের ওপর একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হোল এবং সেখানেই সংঘের নতুন নামকরণ হোল 'সাজঘর'। এই নামেই অভিনীত হোল 'মৌচোর'। সময়ের বিচারে 'সাজঘরে'র প্রথম আবির্ভাব হোল ১৯৫৭ সালের ১২ই মার্চ।

সংঘবদ্ধ অভিনয়গুণে 'মৌচোর' সেদিন এক অসাধারণ প্রযোজনা হিসেবে সুখ্যাতি পেলো আর শিল্পীরাও পেলেন সীমাহীন উদ্যম। এরই ফলে অভিনীত হোতে থাকলো ভিন্নধর্মী বেশ কয়েকটি নাটক এবং এই নাট্য প্রযোজনাগুলোর মধ্য দিয়েই সংস্থার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। শুধু নাটক আর নাটকের মহড়া নয়, নিয়মিত সাহিত্য চক্রের আয়োজন করে দেশের তদানীন্তন সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতির এক নিবিড় সেতুবন্ধন করা হোত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে 'সাজঘরে'র শিল্পীরা সুন্দর কয়েকটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করেন এবং তার মধ্য দিয়ে আন্তরিক ও গভীরতম শিল্পবোধই মূর্ত হয়ে ওঠে। ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সাহায্যে শিল্পীরা মঞ্চস্থ করেন 'দিশারী' নাটক।

এরপর 'সাজঘরে'র শিল্পীরা প্রতি মাসে একবার করে অভিনয় করতে থাকেন সলিল সেনের 'সন্ন্যাসী', 'নারীজাতি বিপন্ন' দুটি মৌলিক একাঙ্ক নাটক। 'নারীজাতি বিপন্ন' নাটকের পুরোভাগে বলা হয়েছে—রসবৈচিত্র্য আনতে বিভিন্ন ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে পরীক্ষামূলক এই নাটকে। রসবোধের উদারতার আশ্রয় আমরা সঙ্গত কারণেই আশা করবো। কারণ নির্দোষ আনন্দের ক্ষেত্রে জগতের সমস্ত মানুষ আমরা এক প্রাণ। অন্ততঃ সব ভারতীয়রা রঙ্গে, রসে, আনন্দে, দুঃখে, কর্তব্যে ও প্রেমে এক ও অভিন্ন।' এক নাটকে কোন জ্ঞান নেই, কোন ইঙ্গিত নেই, আছে কেবলমাত্র হাসাবার জন্য অবাস্তব সব হাসির উপকরণ।'

'সন্ন্যাসী' ও 'নারীজাতি বিপন্ন' একাঙ্ক নাটক দুটির সফল প্রযোজনার পর একের পর এক অনেকগুলো নাটক অভি-নীত হয়। তালিকায় আসে রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা', 'শাস্তি', 'মুক্তির উপায়'; সলিল সেনের 'জীবনযাত্রা', 'কিংবদন্তী', 'প্রতিরোধ', 'সারথী', 'শিখা', 'ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড' প্রভৃতি নাটক। এর মধ্যে পরীক্ষামূলক নাটক হিসেবে 'কিংবদন্তী'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নাটকের পূর্বাভাসে লেখা হয়েছে—'সীসেম খুল্-খুল্ হে পাহাড় খোল্ খোল্! আজ তার সীসেম খুল খুল বললে—পাহাড় খোলেনা। অতীতের সব ইতিহাস বুকে আঁকড়ে ধরে পাহাড় আজ নিথর, নিস্পন্দ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'চিচিং ফাঁক' বললে যেটুকু বা পাহাড়ের ভেতরটা দেখা যায় তার সবটাই আজব, সবটাই মজার, সবটাই রঙ্গরসে ভরা। মনে হয় সব কিছুই কাল্পনিক—আর এই কাল্পনিক গাথাই 'কিংবদন্তী'।

এর পর 'সাজঘরে'র শিল্পীরা 'প্রতি-রোধ' আর 'শিখা' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য লাভ করেন। তার ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষামূলক ভ্রমণ সূত্রে বোম্বাইতে যাবার জন্য সংস্থা একটি দলগত বৃত্তি লাভ করে। শিল্পীরা আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে কয়েকটি অভিনয় প্রচার করেন।

তারপর 'সাজঘরে'র শিল্পীরা অভিনয় করেন আলো দাশগুপ্তের 'সুখের পায়রা' নাটক। এই নাটকটিকে একটি সার্থক হাসির নাটক হিসেবে বাংলার নাট্যানু-রাগীরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। সাজঘর 'সুখের পায়রা' প্রায় তিনশ' রজনী অভিনয় করে এবং এই প্রযোজনা সংস্থাকে এক সীমাহীন মর্যাদায় বিভূষিত করেছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হোল সলিল সেনের 'কান্না নয়', এই নাটকটিও পঞ্চাশ রাত্রির বেশী অভিনীত হয়েছে।

'I will not cry to day, I will cry tomorrow'

বোধ হয় এই দর্শনের প্রেক্ষাপটেই 'কান্না নয়' নাটকটি গড়ে উঠেছে। যতো দুঃখ আসুক, যতো ঝড়ঝঞ্ঝা দেখা দিক জীবনে সব কিছুকেই গভীরতম জীবন উপলব্ধির দ্যোতক হিসেবে মেনে নিয়ে আমরা হাসবো, কাঁদবোনা। তাই আজ কোন কান্না নয়। নাটকের নায়িকা চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তেও বোধ হয় বলতে চেয়েছে যা কিছু হতাশা আর শূন্যতা তার সবটাই আনন্দের। সবটার মধ্যেই যেন উপলব্ধির একটা গভীরতম আনন্দ লুকিয়ে আছে, কাঁদলে সে আনন্দের স্বরূপ বোঝা যাবে না, তাই 'কান্না নয়'। 'সাজঘরে'র প্রযোজনার তালিকায় আর একটি নাটকের নাম যুক্ত হয়েছে। নাটকটি হোল আলো দাশগুপ্তের 'রামধনু'।

'সাজঘরে'র শিল্পীরা প্রতিনিয়ত এমন নাট্যচর্চায় বিভোর হয়ে আছেন যা ভারতীয় থিয়েটারের একটি চিরন্তন শৈল্পিক রূপকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পথে যথেষ্ট অনু-প্রেরণা সঞ্চার করবে। 'সুখের পায়রা' ও 'কান্না নয়' নাটকের রূপদাতা 'সাজঘরে'র আগামী দিনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তাই আমাদের আশা অনেক।

—দিলীপ মৌলিক

কিছুদিন আগে "পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ" শেষ হয়েছে। সারা বছরই পরিবার পরিকল্পনা আছে। সারা বছরই রেডিওয় পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বক্তৃতা, আলোচনা, রূপক, নকশা, সাক্ষাৎকার প্রভৃতি হয়; হাসপাতাল, রেল স্টেশন, স্কুল প্রভৃতির দেয়ালে লাল ত্রিকোণ ছাপ দেওয়া, তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখী দম্পতির হাসিখুশিভরা ছবি আঁকা পোস্টার মারা হয়; সিনেমায় স্লাইড দেওয়া হয়; খবরের কাগজে নেতাদের ভাষণ ছাপা হয়।

তবু এই যে বছরে একবার "পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ" পালন করা হয়, এর একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। এবং সে উদ্দেশ্য জনসাধারণের মনে পরিবার পরিকল্পনা অর্থাৎ জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে হঠাৎ সজোরে একটা নাড়া দেওয়া। সারা বছর তো ঢিমেতালে কাজ হচ্ছে, মাঝে একবার চিৎকার করে বলা—"আমরা কাজ করছি।"

কাজ যে কতটা হচ্ছে, কারও অজানা নেই। স্বয়ং সরকারী নেতারাই স্বীকার করেছেন, দেশে পরিবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। আমরাও দেখতে পাচ্ছি।

এত টাকা খরচ করে আশানুরূপ কাজ হচ্ছে না কেন, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সমালোচনাও। তবু অবস্থা অপরিবর্তিত। আসলে আন্তরিকতার অভাব। যাঁদের উপর এই পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের অধিকাংশই অনান্তরিক। তাঁরা শুধু চাকরি করেন—বিদেশীরা যেমন বিজিত দেশে চাকরি করেন!

এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। একটি এখানে বিবৃত করা যেতে পারে।

আমার এক বন্ধু কলকাতার কাছে একটা সরকারী হেল্‌থ্‌ সেণ্টারের মেডিক্যাল অফিসার। একবার যখন তার ওখানে যাই তখন চলছে এইরকম পরিবার পরিকল্পনা সপ্তাহ, কি পক্ষ। দুপুরের পরে তার কোয়ার্টারে সদর থেকে একজন উচ্চপদস্থ অফিসার এলেন। স্বাস্থ্য বিভাগের অফিসার, ডাক্তার—ঐ অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত।

তিনি আমার বন্ধুটিকে নিয়ে কাছের এক গ্রামে যাবেন জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় ও উপকারিতা বোঝাতে। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। কাগজের লোক শুনে একটু আগ্রহ দেখালেন, খাতিরও করলেন একটু। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, "আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে। আমাদের এদিককার গ্রাম তো আপনার দেখা নেই, দেখে আসবেন।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। গেলাম সেই গ্রামে।

গ্রামের একটা স্কুলবাড়িতে সভার আয়োজন হয়েছে। জন কুড়ি পুরুষ (তাঁদের মধ্যে বৃদ্ধই বেশি), জন পনের মহিলা (তাঁদের মধ্যে বৃদ্ধা আর বিধবার সংখ্যাই অধিক—যাঁরা সধবা তাঁদের অনেকেরই যৌবন যাই-যাই করছে, যাঁদের করছে না তাঁরা এক হাত ঘোমটা টেনে মাথা নিচু করে বসে আছেন), পাঁচ থেকে পনের বছর বয়েসের গোটা তিরিশেক ছেলেমেয়ে—এই নিয়ে সভা বসেছে। তাঁদের শিক্ষার মান উঁচু তো দূরের কথা, কারও কারও যে মোটেই নেই তা দেখলেই বোঝা যায়।

সভা শুরু হল। ঐ যে অফিসারটি সদর থেকে এসেছেন, তিনি চকখড়ি নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে নকশা এঁকে, ইংরেজীতে অঙ্ক কষে আর ডাক্তারি কথা লিখে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় ও উপকারিতা বোঝাতে ও সকলে বুঝতে পারছেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। সকলে নীরব। শুধু মাঝে মাঝে পিছনে শিশুর দলের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

সকলের নীরবতা দেখে ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝলেন, সবাই সব বুঝতে পেরেছেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের থিওরি ও কায়দাকানুন সবাই শিখে নিয়েছেন। ঘণ্টাখানেক লেকচার দিয়ে সতৃপ্ত হাসি হেসে তিনি থামলেন।

তারপর কে একজন এসে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলে সভা ভঙ্গ হল। আমরা পেট ভরে সন্দেশ, রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা আর চা খেয়ে রওনা দিলাম। সারাটা পথ আমি ভাবতে ভাবতে গেলাম, এইভাবে যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচার হয় তাহলে দেশটা উৎসন্নে যেতে আর বেশি দেরি নেই।

রেডিওতেও জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয় নিয়মিত অনুষ্ঠান হয়। এবং তার অধিকাংশ অনুষ্ঠানে টেকনিক্যাল ব্যাপার না থাকলেও মনোগ্রাহী হয় না। সেই একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ইনিয়ে বিনিয়ে বলা হয়। একথা সত্যি যে, নিত্যনতুন বলার বিষয় এটা নয়! কিন্তু বলার মধ্যে নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য আনা যায়! এক-একবার এক-একরকম করে বলে একঘেয়েমি কাটানো যায়! এক-একবার এক-একদিক নিয়ে বলা যায়! এক-একবার এক-একশ্রেণীর শ্রোতার জন্য বলা যায়।

রেডিওর পরিকল্পনাবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলি সাধারণত জোলো, একঘেয়ে, অনাকর্ষক মনে হয়। এর একটা ব্যতিক্রম দেখা গেল ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত ৮টায় "বিচিত্রা"য়।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে একটা সিম্পোজিয়ম হয়েছিল, তারই কিছু অংশ এই "বিচিত্রা"য় শোনানো হয়েছে। অংশগুলি সুগ্রথিত ও সুশ্রাব্য।

বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সিম্পোজিয়াম। তাই বলে বিশেষজ্ঞদের জন্য নয়—সাধারণ শিক্ষিত মানুষদের জন্য।...সুন্দর, প্রাঞ্জল, প্রয়োজনীয়। প্রতিটি কথা ওজন করা, যুক্তিপূর্ণ, বিজ্ঞানভিত্তিক। এই রকম উচ্চাঙ্গের আলোচনা রেডিওয় বেশি শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

আলোচনায় ছিলেন ডঃ এ কে সমুদ্দরপ্ত, ডঃ শ্রীমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ডি সি দে ও ডঃ ফাল্গুনী ভট্টাচার্য। শেষে ছাত্ররাও যোগদান করেছিলেন।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৩রা অকটোবর রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে "সমীক্ষা"য় থুম্বা রকেট স্টেশন সম্বন্ধে বললেন ডঃ শান্তিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ সুন্দর লাগল। ভারতের মতো দেশের পক্ষে রকেট উৎক্ষেপণের কী প্রয়োজন, এ প্রশ্ন আজ অনেকের মনেই দেখা দিয়েছে; রকেট যে কেবল মানুষকেই আকাশে-মহাকাশে পাঠায় না, এটা অনেকেরই জানা নেই। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন, তাঁদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করেছেন।

এইদিন রাত ৮টায় গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে "আত্মমন্থন" নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হল। এই অনুষ্ঠানে গান্ধীজীবনের অনেক কথাই বর্ণিত হয়েছে অনেক ঘটনা। অনুষ্ঠানটি তথ্যবহুল। সূত্রধরেরা অনেকটা আন্তরিকভাবেই অনুষ্ঠানটি রূপায়িত করেছেন।

কিন্তু শুক্রবারে এই সময়ে শ্রোতারা একটা পূর্ণাঙ্গ নাটক শোনার জন্যই অপেক্ষা করে থাকেন। বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁদের নিরাশ করেছেন। শুক্রবারের এই সময়টা শুধু নাটকের জন্য বরাদ্দ রাখলেই শ্রোতারা খুশি হবেন। রূপক, নকশা, ফীচার ইত্যাদি শোনাবার জন্য নাটকের ঘাড়ে কোপ না মারলেই ভালো হয়। তার জন্য অন্য সময় বেছে নেওয়া যেতে পারে।

৫ই অকটোবর সকাল সাড়ে ৯টায় "শিশুমহলে" বাপুজীর কথা বললেন শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)।... সুন্দর লাগল। শিশুমহলে শিশুদের মনে ধরার মতো করেই তিনি বলেছেন—ধীরে, সুস্থে, গল্প বলার মতো করে। তিনি যে কেবল শিশু-সাহিত্যিক নন, শিশু-গল্প-বলিয়েও তা আর একবার প্রমাণ হল।

এইদিন বেলা সাড়ে ১২টায় ছিল শ্রীঅংশুমান রায়ের আধুনিক গানের অনুষ্ঠান। ঘোষক শেষ গানটি হঠাৎ শেষ করে দিলেন—মানে শেষ হওয়ার আগেই থামিয়ে দিলেন। নিউজের জন্য? বোধহয় তা-ই। কারণ, এর পরে যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান ছিল—দিলরুবার। তার পরে ছিল নিউজ। আধুনিক আর নিউজের মাঝে একটা "বাফার" অনুষ্ঠান থাকলেও নিউজ আধুনিকের ঘাড়ে কোপ মেরেছে।

৬ই অকটোবর সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে শ্রীসুবিনয় রায়ের রবীন্দ্রসংগীতের টেপটি বেজেছে হেঁচকা টান দিয়ে দিয়ে। গানে স্পীড ভ্যারি করেছে। আজকাল প্রায়ই এমন স্পীড ভ্যারি করছে, যন্ত্রপাতিগুলো সমান তালে চলছে না। এসব দেখার জন্য লোক আছেন নিশ্চয়! তাঁরা দেখছেন তো? তাহলে প্রতিকার হচ্ছে না কেন?

সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে শ্রীমতী অমিতা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে আধুনিক গান ভালো লাগেনি। যেমন কথা তেমনি সুর—খালি কান্না। গান্ধীজীর বিষয়ে গানেও কান্না। কোথাও হাসি না, আনন্দ না।

সকাল সাড়ে ৯টায় ছিল "সংবাদ বিচিত্রা"। বিষয় ছিল বিদ্যাসাগর জন্মোৎসব, গান্ধী-জয়ন্তী, এবং শিশিরকুমার ভাদুড়ীর স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিবসের খণ্ড খণ্ড অনুষ্ঠান গ্রহণ করা হয়েছে এই সংবাদ বিচিত্রায়, এবং খণ্ডগুলি সুন্দর।

গান্ধী-জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার বস্তিতে বস্তিতে সাড়ম্বরে যে 'সাফাই কাজ' হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ান তার একটিতে যোগদান করেছিলেন। কলকাতার বস্তি সম্বন্ধে শ্রীধাওয়ানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। মানুষ কী জঘন্যতম পরিবেশে, কী অমানুষের মতো বসবাস করে, কলকাতার বস্তিতে এসে তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এবং বুঝতে পেরেছেন, কেন আইন ও শৃঙ্খলা মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ে। শ্রীধাওয়ান অকুণ্ঠচিত্তে তাঁর নতুন অভিজ্ঞতার কথা আর উপলব্ধির কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর এই স্বীকারোক্তি নানা কারণে স্মরণীয়। দেশের "গরীব"দের সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছেন, এর আগে আর কোনো রাজ্যপালের মুখে তা বোধ হয় শোনা যায়নি। রেডিও সেই কথাগুলি প্রচার করে সাহস দেখিয়েছেন, কারণ মনে পড়ে, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেতার ভাষণে তৎকালীন স্টেশন ডিরেক্টর সাহেবের অভাবে কলম চালাতে গিয়েছিলেন। এবং তার ফলে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা এখনও অনেকেরই মনে আছে।

শ্রীধাওয়ানের পর এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল-চন্দ্র সেনের ভাষণের অংশবিশেষ শোনানো হয়েছে। সে ভাষণও শ্রবণীয়।

সবশেষে ছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে কলকাতার মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর স্পষ্টই বলেছেন, তাঁর জীবনে নাটক বা ছায়াচিত্র দেখার সুযোগ বেশি হয়নি। তবু নাট্যাচার্যের প্রতি বাংলা-দেশের ঋণ তিনি স্বীকার করেছেন। এবং বলেছেন, সে ঋণ কিছুটা অন্তত পরিশোধ করতে পেরে তিনি ভারমুক্ত বোধ করছেন।

শ্রীশূরের পরে বলেছেন খ্যাতনামা অভিনেতা শ্রীউৎপল দত্ত। তিনিও নাট্যাচার্যের প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেন এবং নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম নায়ক হয়েও বলেছেন যে, শিশিরকুমারকে বাদ দিলে এই আন্দোলন হতে পারে না। হওয়াতে গেলে আন্দোলন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি বেশ প্রাণবন্ত হয়েছিল। গ্রন্থনা ও সম্পাদনাও ভালো ছিল।

৭ই অকটোবর সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে শ্রীমতী ভারতী করচৌধুরীর কণ্ঠে ভজন বেশ লাগল। বেশ নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেল।

—শ্রবণক

কলামন্দিরের অনুষ্ঠানে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, রাণু মুখোপাধ্যায় এবং পিণ্টু ভট্টাচার্য। —ফটো : অমৃত
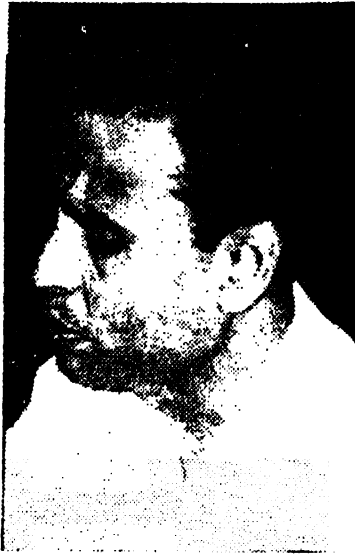
গ্রামোফোন কোম্পানীর শারদ সম্মেলন

গত সপ্তাহে কলামন্দিরে গ্রামোফোন কোম্পানী নিবেদিত এক উৎসব-সন্ধ্যা রঙিন হয়ে ওঠে জনপ্রিয় শিল্পীদের পুজোর গান দিয়ে। এ'রা প্রত্যেকেই পুজো-রেকর্ডের গান পরিবেশন করেছেন। উল্লেখযোগ্য চিত্তস্পর্শী অনুষ্ঠান হোল কাজী সব্যসাচীর কণ্ঠে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের দুটি কবিতার আবৃত্তি ছন্নছাড়া, ও পূব-পশ্চিম। প্রথমটিতে বর্তমান জীবন-বেদনার এক মর্মদ্রাবী ছবি, দ্বিতীয়টিতে পদ্মার এপার ও ওপারের মানুষের অন্তর্লীন অনুরাগ-বন্ধনের ছন্দটি শিল্পীর আবেগের রঙে এবং অনুভবের নিবিড়তায় আশ্চর্য এক রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। আবুল কাশেম রহিমুদ্দিনের স্বরচিত কবিতাপাঠ (মঞ্জুশ্রী)—জীবনের অন্তহীন মুহূর্তগুলি থেকে বেছে নেওয়া বিশেষ একটি মুহূর্তের প্রতি আলোকপাত উপভোগ করবার মত।

আর একটি নতুন অনুষ্ঠান হোল ভূপেন হাজারিকা ও অক্ষয় মোহান্তির কণ্ঠে বেশ কয়েকটি অসমীয়া ও ওড়িষী সঙ্গীত— আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গীত-চিন্তার বিশেষ ভঙ্গীটি ছন্দে ও সুরে শ্রোতাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছেন। সারা প্রেক্ষাগৃহের হর্ষোদ্দীপ্ত করতালি থামতেই চায় না। আসাম-বাংলা-উড়িষ্যার সম্মিলিত হৃদয়াবেগ বুঝি আনন্দের ভাষায় সেদিন কথা বলে উঠেছিল। যোগদানকারী অন্যান্য শিল্পীরা হলেন যথাক্রমে আরতি বসু, আরতি মুখার্জি, বনশ্রী সেনগুপ্ত, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জু গুপ্ত, নির্মলা মিশ্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণু মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহ-ঠাকুরতা, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মিণ্টু দাশগুপ্ত, নির্মলেন্দু চৌধুরী, পিণ্টু ভট্টাচার্য, সনৎ সিংহ, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গাঙ্গুলী। অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রতিমা চৌধুরী ও সুবীর ঘোষ।

পুজোর রেকর্ড

প্রতি বছরের মত এবারও গ্রামোফোন কোম্পানীর শারদীয় উপহার বিষয়-বৈচিত্র্যে এবং সংখ্যাবাহুল্যে আপন আভিজাত্য অব্যাহত রেখেছে। আধুনিক বাংলা ও বোম্বের উজ্জ্বল তারকাদের ছাড়াও মঞ্জু গুপ্তর অতুলপ্রসাদের গান, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তন এবারের বিশেষ অবদান এছাড়া কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের চারটি অতুলপ্রসাদী গীতিও আছে। আধুনিক গানে এবার পপ-সঙ্গীত ও জাজ-সঙ্গীতের চাঞ্চল্য-প্রবণতা যেন বড্ড বেশী। এর সাময়িক *আবেদন অনস্বীকার্য। সম-সাময়িক যুগের ছায়া আধুনিক গানে নিশ্চয় পড়বে। কারণ এ ত পিপলস সং।* তবু বাংলা গানে আমরা আশা করি এমন কোন গভীরতর ভাবসম্পদ যা যুগের সীমা অতিক্রম করে সর্বদেশের সর্ব-কালের এবং সকল শ্রেণীর মানুষের চিত্তে দোলা দেবে। শিল্পীদের কাছে আশা করব জনগণের চাহিদা মিটিয়েও তাঁরা নিজস্ব শিল্পবৈভবের আলোয় শ্রোতাদের রুচির মান উন্নত করবেন। কিন্তু এবারের অধিকা[ংশ] শিল্পী যেন যুগের স্রোতে ভেসে গেছ[েন] আপনাপন বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য করে। এ[টা] কিন্তু সর্বৈব সমর্থনযোগ্য নয়।

মঞ্জু গুপ্ত কি আর চাহিব বল' এ[বং] 'রুমক ঝুমক ঝুমর' — একটি ভাবভা[...] অপরটি আনন্দের ছন্দনূপুরে, বাংলার এ[ক] বিশিষ্ট কবি ও সুরকারের চিরস্মরণ[ীয়] সৃষ্টিকে তুলে ধরেছেন।

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় স্বধর্মের অনু[-] কূল 'ওগো সুন্দরী আজ' গানটি[তে] রাবীন্দ্রিক ভাবমূর্তিকে রূপায়িত করেছেন[।] 'রাত ঝিলিমিল' গানটি ছন্দপ্রধান হ[লে]ও সুরের অমর্যাদা ঘটেনি। কথা গৌরীপ্রস[ন্ন] —সুর শিল্পী স্বয়ং।

সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে হেম[ন্ত] মুখোপাধ্যায়ের 'শোন কোনো একদিন' এ[বং] 'আমায় প্রশ্ন করে' — তাঁর অন্যান্যবারে[র] পুজোর গানের চেয়ে আলাদা ধরনের।

শ্যামল মিত্রর 'ধিন তাক'—গানটি[তে] পুজোমণ্ডপের ঢাকের বাদ্য মুখরিত। 'য[া] ধুয়ে যাক'—ভাবপ্রধান। দুটি গানে শিল্পী গায়নশিল্পী অক্ষুন্ন। কথা ও সুর সলি[ল] চৌধুরী।

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যর 'কাল সারারাত' গানটি ভৈরবীর কোমল-করুণ ছোঁয়ার আবেদনে মধুর। অন্য গানটি হোল 'হাল্কা হওয়া'। কথা সুনীলবরণ, সুর অনিল *চট্টোপাধ্যায়। নির্মলেন্দু চৌধুরীর লোক-গীতি দুটি শিল্পীর স্বভাবানুগ উল্লাস ও নাটকীয়তায় দোলায়িত। রচনা গৌরীপ্রসন্ন সুর—শিল্পী স্বয়ং। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর নিজস্ব সুরে গাওয়া শ্যামল গুপ্ত রচিত দুটি গান শিল্পীর নিজস্ব ঢঙে পরিবেশিত।* তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নচিকেতা ঘোষের সুরে গৌরীপ্রসন্নর দুটি গান সুন্দর গেয়েছেন। তবে 'হা-হাঃ-হাঃ'—সূচক হাস্যধ্বনিটুকু বাদ

দিলে সুরের মর্যাদা আরো বাড়ত। অবশ্য আজকের শ্রোতারা হয়ত এইটিই চান। অতএব সেদিক দিয়ে তিনি ত্রুটিহীন।

কিশোরকুমার রাহুল দেববর্মণের সুরে দুটি গান গেয়েছেন। কিশোর-ভক্তরা তাঁর কাছে যা চান সে সব উপাদানই অকৃপণ প্রাচুর্যে গান দুটিতে ছড়ানো।

এবারের বিশেষ সংযোজন নায়ক বিশ্বজিতের গায়করূপে দুটি গান শ্রোতাদের আগ্রহী করবে। কথা ও সুর সলিল চৌধুরীর। এ ছাড়া রাহুল দেববর্মণের নিজস্ব সুরে গাওয়া শচীন ভৌমিক রচিত দুটি গান আজকের চলমান জগতের যান্ত্রিকতার অন্তরালেও ফল্গুধারার মত প্রবাহিত প্রণয়াবেগের একটি বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গী মনকে স্পর্শ করে। 'মনে পড়ে রুবী রায়' গানটির কথা ভেবেই ওপরের উক্তি। 'ফিরে এসো অনুরাধা' হিন্দী ফিল্মের রুডলিং-এর গঠনে। এ সুর অনেককেই উৎসুক করবে।

মান্না দে, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গানে সুর দিয়েছেন এবং গেয়েছেনও ভাল। নচিকেতা ঘোষের সুরে আরও দুটি গান আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তরুণ শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্যর কণ্ঠে।

মহিলা শিল্পীদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর কণ্ঠসম্পদ আকৃষ্ট করে তিনি হলেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'কে যেন নীলকণ্ঠ পাখীর আহত পালক'—সুরের কারুণ্যে গাইবার বিহ্বল আবেগে প্রথম থেকেই মনকে আকৃষ্ট করে। তবে পাশ্চাত্য সুরে গেয়ে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রলোভন ইনিও সংবরণ করতে পারেননি তাই অন্য গানটি নেচে উঠল হাল্কা ছন্দের উদ্দাম মুখরতায় 'প্রেম শুধু এক মোমবাতি'—গানটি অবশ্য উৎরে গেছে সুষ্ঠুভাবে। তবে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত উচ্চমানের শিল্পী এ গান না গাইলেও তাঁর জনপ্রিয়তার হানি হোত না বলেই আমাদের বিশ্বাস। প্রথম গানটি লিখেছেন বরুণ দাশগুপ্ত, দ্বিতীয়টি সুনীলবরণ। সুর—সুধীন দাশগুপ্ত।

সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে গাওয়া লতা মঙ্গেশকরের দুটি গান—ছন্দে, মাধুর্যে সুরের স্বচ্ছপ্রবাহে শিল্পীকণ্ঠকে অনুভব-গোচর করেছে।

আরতি মুখোপাধ্যায় গীত 'জ্বলে নেবো না'—সুরুতেই জমে গেছে। গানের ছন্দ রবিশঙ্করের বাজানো সিতারখানি গতের বিশেষ একটি আঙ্গিককে মনে করিয়ে দেয়। অন্য গানটি কানে কানে কথা বলার ঢঙে 'লজ্জা মরি মরি এ কি লজ্জায় সুরের ওঠা-পড়া লক্ষ্য করার মত। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কথার সঙ্গে সুরের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন নচিকেতা ঘোষ। ইলা বসুর 'হায় কি যে করি'—ব্রীড়াবনতা নায়িকার প্রণয় ও সঙ্কোচের মধুরতা মাখানো এবং 'কাছে এসে চলে যাও'-তে জনপ্রিয় সুরের অনুরণন—দুটিই সুন্দর বাক্ত। শিল্পীর উচ্ছলতা গান দুটিকে প্রাণবন্ত করেছে। কথা ও সুর সুধীন দাশগুপ্ত। শিপ্রা বসু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি পরিচিত নাম। কিন্তু 'বসন্ত-বন্দনা' সিরিজে তাঁর গাওয়া নজরুল গীতি শিল্পীর প্রকাশ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমাদের

গিরিজাশঙ্কর সঙ্গীত সম্মেলনে কথক-নৃত্য পরিবেশন করছেন মায়া চট্টোপাধ্যায়

অবহিত করেছে। শারদীয় সম্ভারে ইনি অবাক করে দিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে দুটি সুন্দর আধুনিক গান গেয়ে। হেমন্ত-কন্যা রাণু মুখোপাধ্যায় 'কুচকুচে কালো সে' বালসারাকৃত সুর পপ-সঙের এক বাংলা সংস্করণ। একসপেরিমেন্ট হিসেবে সার্থক নিশ্চয় এবং আজকের শ্রোতারা হয়ত লুফেও নেবেন। তবে এ ধরনের গান না হলেও বাংলা গান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হোত না। 'একটি বছর কাটল' সু-গীত এবং তাঁর কাছে অনুরোধ জানাব ভাব ও সুরপ্রধান বাংলা গান গেয়ে তিনি যেন উৎকৃষ্ট শিল্পীর তালিকা বৃদ্ধি করেন। সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে গাওয়া সবিতা চৌধুরীর দুটি গান—মিষ্টি হয়েছে।

ভূপেন হাজারিকার সুরে গাওয়া রুমা গুহঠাকুরতার সুরসমৃদ্ধ কণ্ঠে দুটি স্নিগ্ধ প্রেমের গান এক ঝলক হাওয়ার মত যেন মনকে জুড়িয়ে দেয়। গান দুটি লিখেছেন শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর ও ছন্দের অপূর্ব ভারসাম্য বজায় রেখেছেন হিমাংশু বিশ্বাস। মাধুরী চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'যৌবনে মৌ ঝরে'—গানটিতে নায়িকার রঙিন অন্তর যেমন দুলে উঠেছে তেমনই আকুল হয়ে উঠেছে 'কেন অকারণে দোলা লাগে'। কথা লক্ষ্মীকান্ত রায়। নির্মলা মিশ্রের গাওয়া গান দুটি শিল্পীর কণ্ঠ ও গায়ন বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। সুধীন দাশগুপ্তের সুর ও কথাকে উল্লেখযোগ্য সার্থক-রূপ দিয়েছেন আর এক উদীয়মান তরুণ শিল্পী। ইনি হলেন বনশ্রী সেনগুপ্ত। এই পর্যায়ের গান পরিক্রমার 'মধুরেন সমাপয়েৎ' করব সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া সলিল চৌধুরীর দুটি গানের উল্লেখ করে। শিল্পীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা, কণ্ঠবৈশিষ্ট্য ও গাইবার আনন্দকে যেমন করে সাজালে আকর্ষণীয় হয় ঠিক সেইভাবেই সাজানো

ভবানীপুরে সঙ্গীত সম্মিলনী ভবনের অনুষ্ঠানে (বাম দিক থেকে) ডঃ যামিনী গাঙ্গুলী, রাইচাঁদ বড়াল, মন্মথনাথ ঘোষ, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অসীমা মিত্র
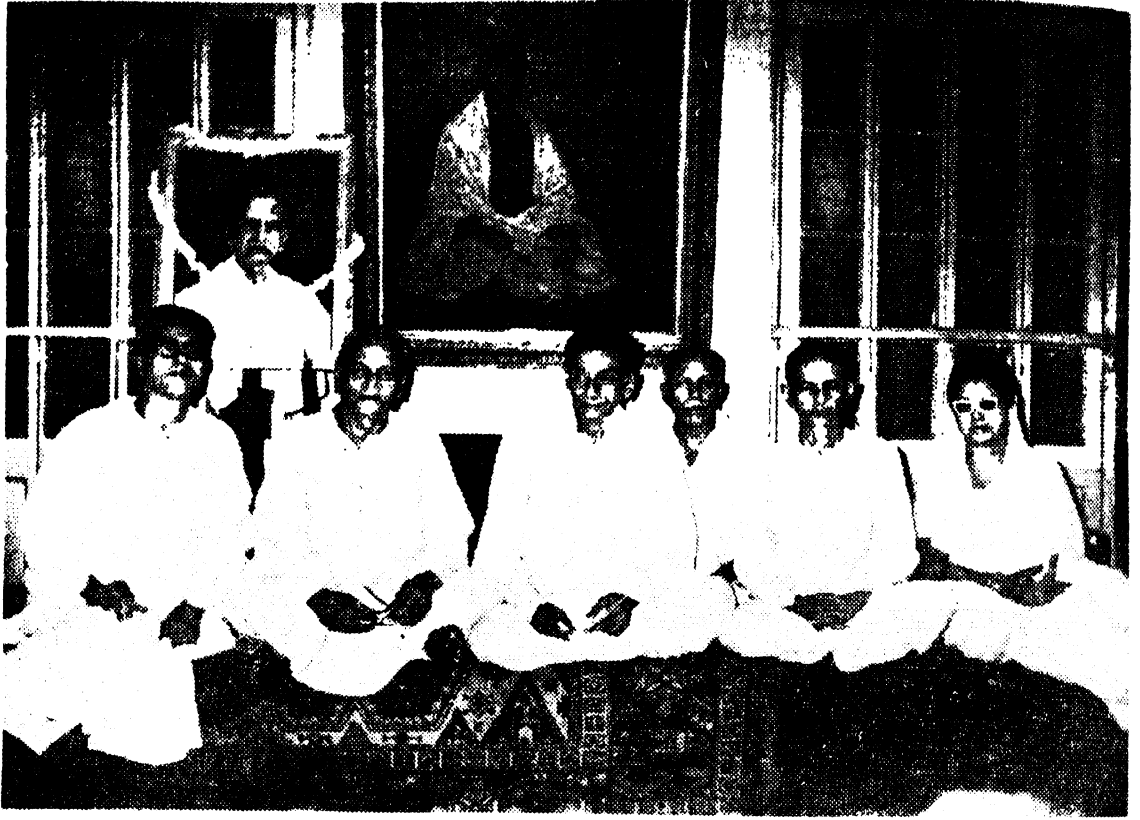
হয়েছে। এ গানের সাফল্য সন্দেহাতীত। গানগুলি ছড়াও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নায়িকা সন্ধানে' কমিক—কৌতুকে ঝলমল। মিন্টু দাশগুপ্তের দুটি কমিক গান বেশ মজার। চারখানি ই-পি রেকর্ডের মধ্যে একটি হোল শচীন দেববর্মনের গাওয়া চারটি গানের সংকলন। কথা মীরা দেববর্মন। সুর—শিল্পী স্বয়ং। জাজ মিউজিকের উত্তাল ছন্দে যখন পরিবেশ বেপরোয়া, তারই মধ্যে এই চারখানি গান বাংলার নিজস্ব ভাব ও চিন্তার এক মূল্যবান রত্নের মত যেন স্রষ্টা ও শিল্পীর কণ্ঠে সযত্নরক্ষিত। শুনে মন শান্ত হয়। হারানো ছন্দকে যেন ফিরে পায়। চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের চারখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর স্ব-মাধুর্যে পরিবেশিত। ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি পালা-কীর্তন 'প্রভাস মিলন'-এ মহাজন পদাবলীর প্রতি গ্রামোফোন কোম্পানীর শ্রদ্ধা প্রদর্শিত। কাজী সব্যসাচী ও আবুল কাশেম রহিমুদ্দিনের আবৃত্তি কিছু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। উভয়ের অবদানসমৃদ্ধ ই-পি রেকর্ড অবশ্যই আকর্ষণীয়। সনৎ সিংহ ও আরতি বসুর চারটি ছড়াগীতি শিশুদের জন্য হলেও বয়স্কদেরও আনন্দ দেবে। গানগুলির রচয়িতা যথাক্রমে প্রসূন বর্ধন, অমিয় দাশগুপ্ত, রঞ্জিত দে, অভিজিৎ। সুর প্রবীর মজুমদার ও অভিজিতের। কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের কন্ঠের চারখানি অতুলপ্রসাদী গান বারবার শোনবার মত।

হিন্দী ফিল্মের গানের ভক্তদের জন্য আছে সুনীল গাঙ্গুলীর গীটারে বাজানো চারটি হিন্দী ফিল্মগীতি।

দুটি লং প্লেয়িং-এর একটিতে প্রথিতযশা শিল্পীদের নানান সময়ের হিট সং-এর এক চিত্তাকর্ষী সংকলন। শিল্পীরা হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরকুমার, আশা ভোঁসলে, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, লতা মুঙ্গেশকর, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর এক অনবদ্য অবদান 'শ্রীরাধার মানভঞ্জন।' শুনে মনে হয় যেন দ্বাপরের সেই বৃন্দাবনে আমরা ফিরে গেছি। গ্রন্থনা ও সংযোজনা প্রণব রায়, সঙ্গীতপরিচালনা রবীন চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা অধীর সেন, সঙ্গীতাংশের বিভিন্ন চরিত্রে আছেন মান্না দে, প্রতিমা, সন্ধ্যা, নির্মলা, শিপ্রা, তরুণ, সমরেশ রায়, সুবোধ রায়। অভিনয়ে—স্মিতা বিশ্বাস, তপতী ঘোষ, রূপক মজুমদার।

●

গত ৫ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যায় রমেশ মিত্র রোডস্থিত সম্মিলনী ভবনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক স্বর্গত অমরনাথ ভট্টাচার্যের চিত্রপ্রতিষ্ঠা শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ কর্তৃক সম্পন্ন হয়। সংগীতাচার্য অমরনাথের ছাত্রী শ্রীমতী অসীমা মিত্র কর্তৃক এই চিত্রখানি প্রদত্ত হয়। এই অনুষ্ঠানে সম্মিলনীর পক্ষ থেকে সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন সঙ্গীতবিদ্ শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে অমরবাবুর জীবনী পাঠ করেন সম্মিলনীর অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সভায় বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

●

গত ২৯ থেকে ৩১ আগস্ট তিনদিন ব্যাপী যাদবপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের রজত-জয়ন্তী উৎসব রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পৌরোহিত্য করেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে কবিগুরুর বর্ষা-মঙ্গল পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীবৃন্দ। দ্বিতীয় দিনের প্রথমার্ধে পরিবেশিত হয় কবিগুরুর চন্ডালিকা, বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীবৃন্দ কর্তৃক, অপরার্ধে পরিবেশিত হয় ভারতের লোক-নৃত্য। তৃতীয় দিনে শিক্ষার্থীগণ পরিবেশন করেন কবিগুরুর "শ্যামা"। অনুষ্ঠান-গুলি হয়েছিল পরিচ্ছন্ন ও সর্বাঙ্গসুন্দর।

—চিত্রাঙ্গদা

বিতর্কিত আলোচনা

(২২)

অমৃতের ১২ই ভাদ্র, ১৩৭৬ সংখ্যায় "চুম্বন ও নগ্নতা" বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। এই প্রবন্ধের পক্ষে ও বিপক্ষে বহু আলোচনাও বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়লাম। ভেবেছিলাম, শুধু পড়েই ক্ষান্ত হবো। কিন্তু বাধ্য হয়েই মসীযুদ্ধে নামতে হোলো।

এত যে হৈ-চৈ তা কী নিয়ে, না খোসলা কমিটি ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন সমর্থন করেছেন।

সাহিত্য, চলচ্চিত্র, নাটক প্রভৃতি সমাজের প্রতিচ্ছবি। সমাজে যা কিছু ঘটে, তা নিয়েই রচিত হয় উপরোক্ত জিনিস-গুলো। কিন্তু চলচ্চিত্রে যদি বাস্তবের কিছু প্রতিচ্ছবি দেখি তাতে করে এত উন্নাসিকতার কোন লক্ষণ দেখি না। বিদেশের সব কিছুকে যদি উদারভাবে গ্রহণ করতে পারি, তবে চলচ্চিত্রে "চুম্বন ও নগ্নতা" সহ্য করবার মতো উদারতা দেখাতে কিসের প্রতিবন্ধকতা? পরিবারভুক্ত লোকের সঙ্গে যদি কোনারক, খেজুরাহো প্রভৃতি মন্দিরগাত্রের মিথুন চিত্র দেখবার মতো মনের জোর থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে কেন থাকবে না?

তাছাড়া, চলচ্চিত্রে সিম্বোলিজম দেখতে দর্শকরা অভ্যস্ত। নিপুণ, রুচিসম্পন্ন পরি-চালক আমাদের দেখালেন কামে মোহান্ধ হয়ে নায়ক যখন নায়িকার ঘরে ঢুকলেন তখন ট্যাপের নীচে পাতা একটা বালতীতে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ছে। নায়ক যখন বেরিয়ে এলেন, দর্শকরা দেখলেন বালতিটা জলে পূর্ণ। অথবা, নায়ক-নায়িকার মনে নতুন রংয়ের ছোঁয়া দেখাতে আমাদের দেখালেন বৃক্ষশাখে কপোত-কপোতী প্রেম নিবেদন করছে। সাধারণ দর্শকরা হয়তো এর অর্থ বুঝলেন না। সেন্সর এগুলো অনুমোদন করলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিচালক এর দ্বারা কি বোঝাতে চাইলেন? আমাদের নষ্ট হয়ে যাবার যদি এত ভয় তাহলে এই সমস্ত সিম্বোলিজমের বিরুদ্ধে কখনো কোনো প্রতিধ্বনি সোচ্চার হয়ে উঠছে না কেন?

আমরা সাধারণ বাঙালী দর্শকরা হয়তো এতটা অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি; একথা ঠিক; কিন্তু চলচ্চিত্রে প্রচলন হয়ে গেলে তখন আর সিঁদুরে মেঘ দেখে ঘর-পোড়া গরুর মতো চমকে উঠবো না। প্রথম প্রথম হয়তো ছবিঘরে সিটি শোনা যাবে, কিন্তু পরে এই দৃশ্য দেখতে হবে না।

সবকিছু নির্ভর করছে পরিচালক কোন পরিবেশে এগুলোর ব্যবহার করলেন, তার ওপর। যদি এর যথাযথ প্রয়োগ দেখান তবে একে মেনে নিতে কিসের এত দ্বিধা, সংকোচ?

রুচিবাগীশরা বলবেন, সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। এটা কোনো যুক্তিই নয়। এতদিন তো চলচ্চিত্রে এগুলো প্রচলিত ছিল না। তাহলে সমাজের এই অধঃপাতের কারণ কি? এর যেমন কোন নির্দিষ্ট কোন কারণ নেই, তেমনি আইন পাশ হলে এটাই প্রধান কারণ না হয়ে অন্য জিনিস মুখ্যস্থান অধিকার করতে পারে।

নতুন পরিবেশ খাপ খাওয়াতে সময় লাগে। কালক্রমে এটাও গা-সহা হয়ে যাবে। তখন ওসব নিয়ে কোনোরকম উত্তেজনার আগুন পোয়াতে হবে না। সবকিছু নির্ভর করছে নিজে কতটা গ্রহণ করতে পারবো তার ওপর।

একটু চিত্তশুদ্ধি করে নিলেই কোন কিছুর সমস্যা থাকবে না। সর্বশেষে খোসলা কমিটিকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বিনয়কুমার কর,
ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

(২৩)

অমৃতে কয়েকটি সংখ্যায় চুম্বন ও নগ্নতা শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লাম। এতে বিভিন্ন মতামত থাকলেও মোটের ওপর বিরোধী মত ব্যক্ত হয়েছে। কেউ কেউ খোসলা কমিটির সিদ্ধান্তকে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থি ও সময়োপযোগী হয়নি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবার অপরপক্ষ শ্রীভি জি খোসলার দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রগতিশীল আখ্যা দিয়েছেন। যাঁরা শ্রীখোসলার সিদ্ধান্তের প্রশংসা করেছেন, তাঁদের কাছে আমার কিছু অভি-মত উপস্থিত করছি।

গত ১৮শ সংখ্যা অমৃতে বর্ণিত নিবন্ধে পারুল দাশগুপ্ত লিখেছেন, "ফিল্মের দৌলতে তরুণ-তরুণী উচ্ছন্নে যাচ্ছে এরকম একপেশে চিন্তা ছেড়ে সামগ্রিক ভাবে চিন্তা করলেই আসল রোগের ডায়াগনোসিস হবে এবং তাঁরা বুঝতে পারবেন প্রতিকারের মন সংস্কার নয়, সংস্কারমুক্ত মন", যে দেশের সত্তর শতাংশ লোকই অশিক্ষিত।, যে দেশের লোকেদের আর্ট সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয়নি, সেই দেশে চুম্বন ও নগ্নতাকে শিল্প বলে চালিয়ে দেয়া কি যুক্তিযুক্ত যে দেশের লোকেদের মন সংস্কার মুক্ত হবেই বা কি করে আর চুম্বন ও নগ্নতা ব্যতীত যে শিল্পের মান ক্ষুণ্ণ হয় একথা তিনি ভাবলেন কি করে? তা হলে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে 'পথের পাঁচালী' 'অপুর সংসার' পুরস্কৃত না হয়ে কয়েকটি হিন্দি ছবিই পুরস্কার পেত।

অমৃত ১৯শ সংখ্যায় বর্ণিত নিবন্ধে শ্রীপ্রসেনজিৎ চক্রবর্তী ভি জি খোসলার সিদ্ধান্তকে প্রগতিশীল বলে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু শ্রীখোসলার প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীটি শুধুমাত্র যৌনতা, চুম্বনের ওপরই সীমাবদ্ধ কেন? আরও তো অনেক কিছুই আছে, যেগুলোর অভাবে শিল্পের মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, সেদিকে তো তাঁর কোন দৃষ্টি নেই। তবে কি তাঁর অভিমত শুধু শিল্পের স্বার্থেই না ব্যবসার চিন্তায়ও আছে তা ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে।

উক্ত সংখ্যায়ই মাধুরী চৌধুরীর লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "পৃথিবীর সব দেশেই যখনই সমাজের রীতিনীতির কোন পরিবর্তন সূচিত হয়, তখনই সমাজের চারিদিকে "গেল গেল" রব ধ্বনিত হয় এবং ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। আবার সেই রীতিনীতি যখনই কোন প্রয়োজনের তাগিদে বা অন্য কোন কারণে সমাজের গ্রাহ্য হয়ে যায়, তখন সকলেই সেটাকে মেনে নেন।" একথার জবাবে আমার শুধু একটি মাত্র প্রশ্নই আছে। কোনো সমাজের রীতিনীতির পরিবর্তন করার পূর্বে তা সমাজের কোনো প্রয়োজনে আসবে কিনা তা' ভেবে দেখা উচিত নয়কি?

অবশেষে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার আলোচনা শেষ করছি। তিনি বলেছেন,—কোনটা শিল্পের প্রয়োজনে, আর কোনটা নয়, সে বিচার করবেন কে? ফলে আসল কথাটা থেকেই যাচ্ছে। অন্যদিকে আবার কিছু কিছু চলচ্চিত্রকার 'বকস অফিস'-এর কথা ভেবে পর্ণগ্রাফির দিকে ঝুঁকে পড়বেন হয়ত। আমি শ্রীরায়ের সংগে আর একটু যোগ করে বলতে চাই, হয়ত নয়, চাইবেই?

বিপুল সেনগুপ্ত
বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।

প্রেক্ষাগৃহ

বাঙলার বিপ্লববাদীদের অসমসাহসিকতার উজ্জ্বল চিত্র

শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র, অশ্বিনী দত্ত, যতীন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পরিচালিত খণ্ডিত সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা একটি সর্ব-ভারতীয় নেতৃত্বলাভে কেন বঞ্চিত হয়েছিল এবং কেন প্রধানত দৈবের প্রতিকূলতাবশে (কিংবা হিসাবের ভুলের ফলে) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, সে প্রশ্ন এখন এখানে তোলা নিশ্চয়ই অবান্তর। কিন্তু তবু বলব, দেশমাতৃকার মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙলার ছেলে-মেয়েরা তাদের একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও সৎসাহসের গুণে সেদিনের ইংরেজ সরকারের মনে যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, তার সর্বাঙ্গীণ স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দীর্ঘ বাইশ বছরের মধ্যে কেন যে লিখিত হয়নি, তার কোনো সদুত্তর কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারবেন না। এরই মধ্যে বেহালার খ্যাতিমান রায় বংশের অন্যতম সুসন্তান, পার্লামেন্টের সদস্য বীরেন রায় লিখিত 'খেয়ালী' উপন্যাস অবলম্বনে গঠিত **দি নিউ এরা পিকচার্সের** প্রথম নিবেদন **'অগ্নিযুগের কাহিনী'** চিত্রটি থেকে আমাদের সেই সোনার ছেলে-মেয়েদের অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপের বেশ কিছুটা পরিচয় পেয়ে আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠেছে। মনে হয়, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কিছু কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে শ্রীরায় তাঁর মূল উপন্যাসখানি রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট বহু চরিত্রের মধ্যেই আমরা আমাদের জানা ও পড়া জীবন্ত বাস্তব চরিত্রগুলিকে উঁকি মারতে দেখেছি। তা ছাড়া ছবির শেষের দিকে উল্লিখিত কালাহাণ্ডির জঙ্গলে যে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পুলিশ বাহিনীর যে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল, সে তো ঐতিহাসিক সত্য। আজ যখন আমাদের স্বাধীন ভারতে ইংরেজ সরকারের আক্রোশের কোনো প্রশ্ন নেই, তখন আমরা অত্যন্ত খুশী হতুম, যদি শ্রীরায় বাঙলার অগ্নিযুগের কাহিনীর চরিত্রগুলিকে তাদের প্রকৃত নামে পরিচিত করতেন এবং কাল্পনিক অংশ ত্যাগ করে মাত্র বাস্তব ঘটনার আশ্রয়ে কাহিনীটিকে গ্রথিত করতেন।

কাহিনীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র হচ্ছে মীরা। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিতা এই মেয়েটি দেশসেবার জন্যে প্রাণকে তুচ্ছ করেছে, প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে গুরুর আদেশের কাছে বলি দিয়েছে, পুলিশের চোখে ধুলি দেবার জন্যে কখনও সেজেছে বাইজী, আবার কখনও বা বৈষ্ণবী। আর একটি চরিত্র হচ্ছে সমীর। সেও দেশগতপ্রাণ। মীরার প্রতি তার দুর্বলতাকে সে জয় করেছিল, যখন সে দেখেছিল যে-কোনও কারণে

জিনতী লোন্ড/কোমল

মীরা তার ডাকে সাড়া দিচ্ছে না। মীরা যে তার বৈমাত্রেয় ভগ্নী, এই সংবাদটি সে কোনও দিনই জানতে পায়নি। কিন্তু মীরার 'ভাই-বোন' হয়ে থাকবার প্রস্তাব তাকে দেশসেবায় বেশী করে উদ্বুদ্ধ করে এবং সে আফগানের ছদ্মবেশে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যখন প্রাণ হারায়, তখন মীরাও শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়ে তারই পাশে লুটিয়ে পড়ে। আর একটি চরিত্র হচ্ছে বালক স্টীল। সেও অসমসাহসিক: সে পুলিশের অত্যাচারে প্রাণ দিল, কিন্তু গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেবার জন্যে মুখ খুলল না। ধনী অসিতের প্রৌঢ় নায়েব ভোম্বলবাবুও একটি আকর্ষণীয় চরিত্র। এবং সবশেষে বলব এই সন্ত্রাসবাদীদের নেতা সুধাংশু সরকারের কথা। ইনি এক সঙ্গে অরবিন্দ ও সূর্য সেন, বিদেশীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে যা-কিছু শিক্ষাদীক্ষা, অনন্য মনোবল, অভ্রান্ত বুদ্ধি ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা—সবই আছে এই সুধাংশু সরকারের মধ্যে।

বহু চমকপ্রদ নাটকীয় পরিস্থিতিতে ভরা 'অগ্নিযুগের কাহিনী'র সবটাই ঠাস-বুনোন নয়; মধ্যে মধ্যে কিছু শ্লথগতিও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবীদের গোটা কাণ্ডকারখানাকে এমনই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ও মোটামুটি নাটকীয়ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে, দর্শকমাত্রেরই ছবিটিকে ভালো না লেগে উপায় নেই। এবং এইখানেই ছবিটির সার্থকতা।

নায়িকা মীরার ভূমিকায় মাধবী মুখোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় অভিনয় করেছেন। দেশের কাজে এগিয়ে যাবার জন্যে চরিত্রটির আকুতি, দলের নেত্রী মনোনীত হওয়ায় তার প্রাথমিক দ্বিধা, নারীর সহজাত প্রেমকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা, অবস্থাবিশেষে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়দান প্রভৃতি মীরা চরিত্রের সকল দিক তিনি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর

শীলা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং মিতা চট্টোপাধ্যায়
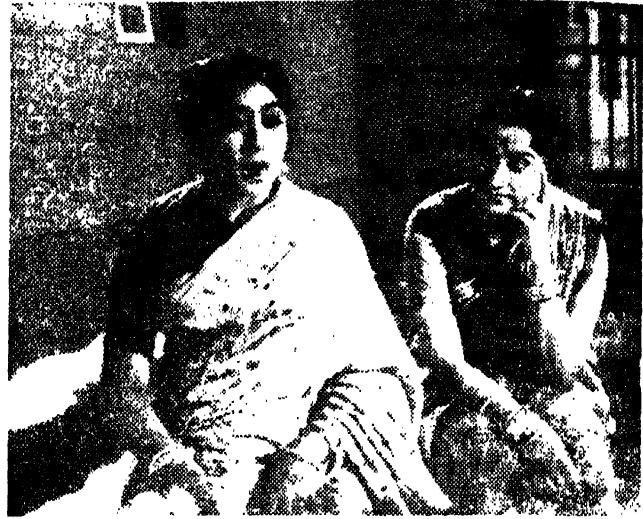
অভিনয়ের মাধ্যমে। দলনেতা সুধাংশু সরকারের চরিত্রটি মূর্ত হয়ে উঠেছে বিকাশ রায়ের নাটনৈপুণ্যের গুণে। '৪২-এর পুলিশকর্তা বিকাশ রায়ের সঙ্গে 'অগ্নিযুগের কাহিনী'র বিপ্লবী নেতা বিকাশ রায়ের কি আশ্চর্য প্রভেদ! অত্যাচারী ইংরাজের প্রতি ঘৃণা যেন তাঁর মুখ-চোখ দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছে। সমীরবেশে দিলীপ রায় চরিত্রটিকে সার্থক করে তুলেছেন। অসিতের নায়েব ভোম্বল চরিত্রটিকে আশ্চর্য ভাবে আকর্ষণীয় করেছেন জহর রায় তাঁর সুঅভিনয় গুণে। এ ছাড়া অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (পুলিশ গোয়েন্দা), অজয় গাঙ্গুলী (অসিত), আনন্দ মুখোপাধ্যায় (অজয়), সুখেন দাস (বিমল), মণিকা (সুলতা চৌধুরী), গীতা দে (মীরার মা), বিজন ভট্টাচার্য (ডাক্তার গোঁসাই) এবং বালক স্টীল ও ইংরাজ পুলিশ অফিসারের ভূমিকাভিনেতার অভিনয় বিশেষ প্রশংসনীয়।

ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ মোটের উপর প্রশংসনীয়। বহির্দৃশ্যে চট্টগ্রামের পটভূমিটি সুকৌশলে দেখানো হয়েছে। কালাহাণ্ডীর খণ্ডযুদ্ধের দৃশ্য-গ্রহণও মুন্সীয়ানার পরিচায়ক। ছবিতে পাঁচটি গান আছে; তার মধ্যে 'আমার সোনার বাংলা' রবীন্দ্র-সঙ্গীত সমেত প্রতিটি গানই সুপ্রযুক্ত এবং সুগীত। তবে মাঝির গানের ভাষা আরও গ্রাম্য হওয়া উচিত ছিল। সংলাপ সম্পর্কেও বলা যায়, প্রথমে চট্টগ্রামের পটভূমিকায় ভাষার মধ্যে কিছুটা আঞ্চলিক রীতি প্রয়োগের অবকাশ ছিল। মেদিনীপুরের দৃশ্যগুলি সম্পর্কেও সমান কথা বল যায়। ছবির আবহ-সঙ্গীত-রূপে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরের ব্যবহার প্রশংসনীয়।

'অগ্নিযুগের কাহিনী' ছবিটি একটি সার্থক দেশমুক্তিসংগ্রামের চিত্র হিসেবে প্রতিটি দর্শকেরই অবশ্যদর্শনীয়।

সর্বনাশী প্রেম

হয় বৈকি। সময় সময় এমনও প্রেম দেখা যায়, যে-প্রেম প্রেমাস্পদকে একান্ত-ভাবে পেতে চায়, যে-প্রেম প্রেমাস্পদের ওপর অপর কোনো ব্যক্তির অণুমাত্র দাবীকেও সহ্য করতে পারে না—হোক সে ব্যক্তি অন্য কোনও প্রেমিক বা প্রেমিকা কিম্বা মা, বাপ ভাই, বোন অথবা কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এই সর্বগ্রাসী প্রেমাকাঙ্ক্ষা প্রেমের পাত্র বা পাত্রীকে অন্য সকলের নাগালের বাইরে রাখতে সদাই তৎপর এবং সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সব সময়েই ভেবে আতঙ্কিত হয়, এই বুঝি প্রেমের পাত্র বা পাত্রীটির ওপরে অন্য কেউ প্রভাব বিস্তার করছে। এই আতঙ্ক থেকে জন্ম নেয় বহু অনাসৃষ্টি কাণ্ড, যেমন হয়েছিল এস এম ফিল্মস-এর সদ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত চিত্র 'মন নিয়ে'র নায়িকা সুপর্ণার ক্ষেত্রে। সে তার সর্বগ্রাসী ভালোবাসা দিয়ে স্বামী অমিতাভ চৌধুরীকে এমনভাবে ঘিরে রাখতে চেয়েছিল, যেখানে অন্য কারুর প্রবেশাধিকার থাকবে না। তাই সে অমিতাভর ছোট বোন, নিউরাসিস-পোলিও রোগ থেকে সবেমাত্র মুক্ত কিশোরী রত্নাকে সহ্য করতে না পেরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিল, নিজের সন্তানকে ভ্রূণাবস্থায় নষ্ট করতে দ্বিধা করেনি, আপন যমজ বোন অপর্ণাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিল। তার সর্বগ্রাসী প্রেম সকলের অগোচরে কি রকম সর্বনাশী হয়ে উঠেছিল, তারই মৃত্যু ঘটানোর দায়ে আদালতে অভিযুক্ত অপর্ণার বিচারের সময়ে সেই তথ্যের রোমাঞ্চকর প্রকাশ দর্শকদের প্রায় অভিভূত করে।

কিন্তু যে-প্রশ্ন আমাদের মনকে উত্যক্ত করছে, সেটি হচ্ছে এই যে, তীর্থ চট্টো-পাধ্যায় রচিত এই কাহিনীটি আদৌ চলচ্চিত্রের উপযুক্ত কিনা। একটি বিশেষ মনস্তত্ত্বমূলক এই কাহিনীটিকে হয়ত

একজন পাঠক তন্ময়চিত্তে অনুসরণ করে প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন, কিন্তু প্রধানত দৃষ্টিগ্রাহ্য চলচ্চিত্রে এই কাহিনীর রূপারোপ দর্শকচিত্তে কি অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে সক্ষম? সুপর্ণার মানসিকতার প্রকাশ ঘটে আদালতের সাক্ষ্য-প্রমাণে, যখন সে নিজে মৃত। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত ছবির ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণ দর্শকচিত্তকে কোথাও স্পর্শ করে কি? কিম্বা দর্শকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে তাকে উত্তরোত্তর বর্ধিত করে কি সকল রহস্যের সমাধান হবার আগে পর্যন্ত? এ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমরা খুঁজে পাই না।

ঘটনাপ্রধান এই ছবিটিতে নাট্যনৈপুণ্য প্রদর্শনের খুব বেশী সুযোগ না থাকলেও সুপর্ণা এবং অপর্ণা—দুই যমজ ভগ্নীর ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরী দুই বিপরীত চরিত্রের অভিনয়ে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। সুপর্ণা ধীর, স্থির, চিন্তাশীল, অন্তর্মুখী, আর অপর্ণা উচ্ছল, চঞ্চল, কেলিপ্রিয় ও বহির্মনা। উভয়ের চারিত্রিক বিশেষত্ব তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে পরিস্ফুট। নায়ক অমিতাভ চৌধুরীবেশে উত্তমকুমার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সুঅভিনয় করেছেন। নিউরাইটিস-পোলিও রোগ থেকে সদ্য-সেরে-ওঠা কিশোরী রঞ্জার ভূমিকায় রেশ্মি চৌধুরীকে দিয়ে একটি অস্বাভাবিক চরিত্র অভিনয়ের প্রয়াস বহুলাংশে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর অযথা চিৎকার সময় সময় অসহ্য হয়ে উঠেছে। অথচ চরিত্রটিকে অনায়াসেই আর্ত-রূপে উপস্থাপিত করে দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণের সুযোগ ছিল। অপরাপর ভূমিকায় নিরঞ্জন রায়, তরুণকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, নন্দ ভৌমিক, ছায়া দেবী, শমিতা বিশ্বাস, শুভব রায়, সুব্রত সেন প্রভৃতির অভিনয় উল্লেখ্য।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে চিত্রগ্রহণ ও শিল্পনির্দেশনায় দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীর দৃশ্যাবলী রচনায় কিছু ইঙ্গিতমূলক শট-এর সাহায্যে একটি সাসপেন্স সৃষ্টির পথে সম্পাদকদের অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। ছবির দুখানি গানের মধ্যে এক রবীন্দ্রসংগীতটি (আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি) ছাড়া অন্য গানগুলি ক্লান্তিকরভাবে দীর্ঘ ও নিরুত্তাপ।

হত্যাকারীর সন্ধানে

'ইত্তেফাক'—এই উর্দু কথাটির আসল বাঙলা অর্থ যাই হোক না কেন, **বি আর ফিল্মস নিবেদিত, বি আর চোপড়া প্রযোজিত** এবং **যশ চোপড়া পরিচালিত ইস্টম্যান কলারে তোলা ফিল্ম 'ইত্তেফাক'** হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে একটি চিচিং ফাঁকের গল্প। দিলীপ রায় নামে একজন চিত্রকরকে তার নিজের স্ত্রীকে হত্যা করার অভিযোগে জেলে দেওয়া হয়। সে কিন্তু স্থির জানে, সে তার স্ত্রীর একগুঁয়েমি নিয়ে খুব ঝগড়া করলেও তাকে সে হত্যা করেনি, হত্যা করতে পারে না। এই চিন্তা তাকে প্রায় পাগল করে তুলল। এই অবস্থায় একদিন সে সুযোগ পেয়ে জেল থেকে পালিয়ে গেল এবং এক অপরিচিত ধনী তরুণীর গৃহে অনেকটা ভয় দেখিয়েই আশ্রয় নিল। কিছুক্ষণ বাদেই সে আবিষ্কার করল, ঐ তরুণীটির স্বামীকে ঐ বাড়ীতেই কিছুক্ষণ আগেই হত্যা করা হয়েছে; কিন্তু একবার মাত্র ঐ নিহত ব্যক্তির শবকে প্রত্যক্ষ করবার কিছু পরেই সে আর ঐ শবকে দেখতে পেল না। পুলিশ অনেক খোঁজাখুঁজি করবার পরে যখন ঐ বাড়ীতে জেল-পালানো পাগলের সন্ধান পায় তখন সে ঐ বাড়ীর হত্যাকাণ্ডের কথা পুলিশের গোচরে আনে। শেষ পর্যন্ত ঐ হত্যাকাণ্ডের হদিশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণিত হয় যে, দিলীপ রায় আসলে নির্দোষ; তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে তার অবিবাহিতা বড় শ্যালিকা।—চিচিং ফাঁক নয়?

ছবির নায়ক দিলীপ রায়ের ভূমিকায় রাজেশ খান্না সম্ভবত পরিচালকের নির্দেশে ছবির প্রথম দিকে প্রচুর চীৎকার ও প্রচুর মুখভঙ্গী করেছেন। শেষাংশে তাঁর অভিনয় স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ধনী তরুণী বেশে শ্রীমতী নন্দা ভীতি দ্বারা পরিচালিতের ভাবটি সুন্দর ফুটিয়েছেন। ডাক্তার ত্রিবেদীর ভূমিকায় জাগীরদার স্বাভাবিক সুন্দর অভিনয় করেছেন। অপর দুটি ভূমিকায় মদন পুরী (সরকারী উকিল) ও সুজিত-কুমার (মিঃ খান্না) উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

প্রযোজক বি আর চোপড়া অত্যধিক টেকনিকের ভক্ত। এই ছবির ভূমিকালিপি আরম্ভেরও আগে নানা রকম রঙীন ডিজাইনের চলমান ছবি যন্ত্রসংগীতের সংগে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল, তবে এর সংগে আসল ছবির কি সম্পর্ক, তা বুঝে উঠতে পারিনি। ছবির ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ট্রেন শব্দ, মেঘের গর্জন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগও লক্ষণীয়। আর লক্ষণীয়, হিন্দি ছবির সাধারণ দৈর্ঘ্যের তুলনায় ছবিটি যথেষ্ট ছোট।

বোম্বাই থেকে

শর্মিলা ঠাকুরের মতে ভারতের ১নং শিল্পী হলেন নূতন। ২নং মীনাকুমারী, ৩নং ওয়াহিদা রেহমান (যিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয়) এবং ৪র্থ হলেন সাধনা। শর্মিলা এখন ফিল্মিস্তান স্টুডিওতে 'সুহানা সফর'-এ নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন, পরিচালনা করছেন আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজয়কুমার। পরিচালক রাম মহেশ্বরী তাঁর নির্মীয়মান ছবির এখনও নামকরণ করে উঠতে পারেন নি যদিও তাঁর ছবির (প্রোডাকশান নং ৪) প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যে তোলা হয়ে গেছে। সম্প্রতি বেশ কিছুদিনের আউটডোর সুটিং বাতিল করতে হয়েছে ক্রমাগত বৃষ্টির জন্যে। এতে অভিনয় করছেন লীনা চন্দ্রভারকর, সঞ্জয়, দুর্গা খোটে, রেহমান, প্রাণ, গজানন জাগীরদার, তেওয়ারী প্রভৃতি। সুর দিচ্ছেন রবি।

বিখ্যাত অভিনেতা ও কণ্ঠশিল্পী কিশোরকুমারকে বোম্বাই-এর এক আদালত থেকে দু'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, কারণ ১৯৬২-৬৩ সালের আয়কর ঠিকমত দাখিল করতে পারেন নি বলে। দেড় লক্ষের কিছু বেশী টাকা তিনি আয় দেখান নি—এই ছিল তাঁর অপরাধ। অবশ্য তিনি আপীল করেছেন। এই মামলার রায়দান প্রসঙ্গে বিচারক বলেছেন যে এটা একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি—যাতে আর কোন চিত্রতারকা আয়কর ফাঁকি দেবার কথা চিন্তা না করেন।

যুগ পালটায় সঙ্গে সঙ্গে পালটায় চিন্তাধারা, সমাজ-ব্যবস্থা, আজকের ফ্যাসান কালকে অচল। আজকে যেটা অশ্লীল ও দৃষ্টিকটু, কাল সেটাই লোকে মেনে নেয়। আজকে যা নতুন, কাল তা পুরানো। আজ যে নায়ক-নায়িকাকে লোকে মাথায় তুলে নাচছে, কাল তাকে আর মনে ধরে না। তখন আবার খোঁজ পড়ে নতুনের।

এখন দেবআনন্দ, দিলীপকুমার, রাজকাপুরদের যুগ যেতে বসেছে—তার জায়গায় আসছে নতুন নতুন মুখ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। সম্প্রতি যে কয়েকজন নতুন নায়ক এসেছেন চিত্রজগতে তাঁদের কারুর চেহারাই ননীর পুতুল নয়—তাঁদের চেহারা হল রুক্ষ, কঠিন, তাঁরা বলিষ্ঠভাবে ঘাড় সোজা করে কথা বলেন—জোর করে আদায় করে নিতে জানেন। এই বলিষ্ঠতার মধ্যেই ফল্গুধারার মতো বয়ে চলে প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, ক্রোধ বা হিংসা। এ'রা হলেন সঞ্জয়, রাজেশ খান্না, দেব মুখার্জি, জিতেন্দ্র ও প্রেম চোপরা। এ'দের প্রত্যেকেরই হাতে প্রচুর ছবি। সঞ্জয়কে দেখা যাবে রাম মহেশ্বরীর নির্মীয়মান ছবি (এখনও নামকরণ হয়নি), বেটী, শর্ত, মহারাজা, বরসাত প্রভৃতি। রাজেশ খান্নার ছবি হল সদ্য সমাপ্ত 'ইত্তেফাক' আরাধনা, কটী পতঙ্গ, ডোলী, সাচ্চাঝুট প্রভৃতি। দেব মুখার্জির সদ্যমুক্ত ছবি 'আঁসু বন গিয়া ফুল' ও 'সম্বন্ধ'তে তিনি প্রমাণ করেছেন যে আগামীকালের তিনি একজন প্রতিভাবান নায়ক। সবচেয়ে কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন জিতেন্দ্র। তাঁর আগামী ছবিগুলির নাম হল ওয়ারিস, জিগরী দোস্ত, বিখরে মোতী, এক হাসিনা দো দিবানে, হামজোলি প্রভৃতি। প্রেম চোপারাকে দেখতে পাবেন ডোলী এবং আরও কয়েকটি ছবিতে।

এ'রা ছাড়াও আছেন দীপককুমার (লেড়কী পসন্দ হ্যায়-এর নায়ক) ও ধীরাজ (রাঁতো কি রাজা, বলরাম শ্রীকৃষ্ণ, আমানত প্রভৃতি ছবির নায়ক)।

নায়িকাদের মধ্যে যাঁরা উঠতি এবং যাঁদের বাড়ীর দরজায় চিত্রনির্মাতাদের লাইন পড়ে গেছে তাঁরা হলেন ববিতা, কুমুদ চুঘানী, লীনা চন্দ্রভারকার, ফরিয়াল, অরুণা ইরাণী, রাখী বিশ্বাস, হেমা মালিনী, বিন্দু প্রভৃতি।

বহুদিন আমরা শচীন দেব বর্মণের কণ্ঠ শুনিনি ছবির পর্দার বুকে। সেই প্রথম যুগে আমরা কিছু বাংলা ছবির পর্দায় তাঁর কণ্ঠ শুনেছিলাম, তারপর তিনি বোম্বাই চলে আসার পর বহু ছবির সুর দিয়ে সেই ছবিগুলিকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠ শোনা গেছে মাত্র গুটি কয়েক ছবিতে। কিন্তু এবার তাঁর দরদী কণ্ঠ শোনা যাবে শক্তি সামন্তর ছবি 'আরাধনা'য়, দেব আনন্দ'র 'প্রেম পুজারী' এবং ও, পি, রালহানের 'তালাশ'-এ।

সঙ্গীতপ্রিয়দের আর একটি বড় খবর হলো যে এতদিন মহম্মদ রফির ভক্তরা তাঁর কণ্ঠে রেডিও, গ্রামোফোন এবং ফিল্মে হিন্দি গানই শুনেছেন—এবার শুনবেন ইংরিজি গান। গানগুলি অবশ্য ছবির নয়, গ্রামোফোনের রচনা করেছেন হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সুর দিয়েছেন শঙ্কর-জয়কিষেণ।

●

আপনারা রূপ কে শোরীর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। অনেক দিন আগে তিনি একখানি ছবি করেছিলেন তার নাম ছিল 'এক থি লেকড়ী' — তাতে 'লারে লাপ্পা আড়ি টাপ্পা' গান এক সময় লোকের মুখে মুখে ফিরত। তিনি পাঞ্জাবে ছবি করেছেন

মা ও মেয়ে/মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়

বাংলা দেশেও করেছেন, এখন বোম্বায়ে যে ছবিটি করছেন তার নাম 'এক থি রিতা'—ছবিখানি আবার হচ্ছে দুটি সংস্করণে—হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায়। ইংরাজী সংস্করণের নামকরণ হয়েছে 'এ গার্ল কলড্ রিতা'। তনুজা এর নায়িকা এবং নবাগত বিনোদ মেহরা এর নায়ক। ইংরাজী সংস্করণের সংলাপ লিখেছেন বিখ্যাত লেখক মুলক-রাজ-আনন্দ। ললিতা চ্যাটার্জিকেও এতে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। শৌরী সাহেব পুরনো দিনের লোক, দেখা যাক ইংরাজী সংস্করণে তিনি কি 'খেল' দেখান।

—প্রবাসী

মঞ্চাভিনয়

সুপরিচিত নাট্যসংস্থা 'পথিক' তাদের আলোড়নসৃষ্টিকারী সাম্প্রতিক প্রযোজনা ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' (নাট্যরূপ বিষ্ণু চক্রবর্তী) মঞ্চস্থ করছেন আগামী ২৬ ও ২৯ অক্টোবর। দ্বিতীয় বার্ষিক পূর্তি উৎসব উপলক্ষে কোন্নগরের নবগ্রাম পাঠচক্র প্রথম দিনের অভিনয়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অভিনয় হবে মহাদেশ পরিষদ ভবনে সন্ধ্যা সাতটায়। দ্বিতীয় দিনের অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বরূপায় সন্ধ্যা ৬-৪৫এ।

১৭ অক্টোবর সকালে রঙমহল মঞ্চে 'খেয়ালী সাংস্কৃতিক সংঘের' নিবেদন অমিত রায় অনুরচিত 'ছুটির খেলা' (মূল রচনা ঃ রুমানিয়ান নাট্যকার মিহাইল সিবাস্তিয়ানের) এবং রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য। নাটক পরিচালনায় আছেন শ্রীজগন্নাথ বসু এবং নৃত্যনাট্য পরিচালনায় আছেন ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কিছুদিন আগে খ্যাতনামা নাট্যসংস্থা রূপদক্ষ মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে অবি সরকারের লেখা 'রঙে রেখায় নির্বাসিত' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। সাম্প্রতিক জীবনের শোষণ-শাসন শাসক-শোষিত এদের নিয়ে এ-নাটক। এ-নাটকে গল্পের চাইতে জোর বেশী দেওয়া হয়েছে দৃশ্য গঠনে। প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে চরিত্রের অনেক না-বলা কথা বাথা যন্ত্রণা আঁকা হয়ে গেছে। এ-কাজে রূপসজ্জাকর গোপাল হালদারের প্রশংসা অবশ্যই প্রথমে করতে হয়। তড়িৎ চৌধুরীর পরিচালনার গুণেই অবশ্য নাটকের গতি অনেক বেড়েছে, তবুও শিল্পীদের এমন সার্থক অভিনয়ও অপেশাদারী সংস্থার মধ্যে খুব একটা চোখে পড়ে না। তরুণীবেশে বিভিন্ন চরিত্রে শাশ্বতী মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। অভিনেতা চরিত্রে মলয় বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রানুযায়ী গাম্ভীর্য আরোপে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে কমল গুপ্ত কমল কুমার রায়চৌধুরী, তড়িৎ চৌধুরী, অর্জুন ভট্টাচার্য, দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় গৌতম ভট্টাচার্য, নিখিল চক্রবর্তী ও নাট্যকার অবি সরকার সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন

কলকাতা মেলা • • • •

বাইরের লোকের ধারণা, কলকাতার যেন আর সেই জৌলুশ নেই। যেন এখানে শুধু অন্ধকারের রাজত্ব। খুন-খারাবি লুঠ-দাঙ্গা, আর আন্দোলনের মধ্যেই নিজেকে হারাতে বসেছে কলকাতা। শুধু বিদেশীর কাছেই নয়, প্রতিবেশী রাজ্যের পর্যটকদের চোখেও কলকাতার যেন সে আকর্ষণ নেই। আকর্ষণ নেই বাঙলা দেশেরও।

কিন্তু সত্যি কথাটা ঠিক তা নয়। আগের মতই সেই ছবিটিই চোখের সামনে তুলে ধরার জন্যে আয়োজন করা হয়েছে কলকাতা মেলার। বিদেশে নানান শহরেই বছরের কোন বিশেষ সময়ে অনুষ্ঠিত হয় মেলা। অনেকটা সেরকম। মেলা বসবে কলকাতাতেও। আর তার জন্যে সময় বেছে নেওয়া হয়েছে এখন—এই শারদোৎসবের দিনগুলিতে। আমাদের প্রতিদিনের চেনা কলকাতা যেন বদলে যায় এ সময়ে। অলিগলি, পার্ক-ফুটপাথ উপছে শুধু মানুষ আর মানুষ। আনন্দের মিছিল। এমন রঙের বাহার, বিচিত্রতার তুলনা ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই। এ সময় কলকাতায় আলোর জোয়ার, প্রত্যেকের মনে জ্বলে খুশির রোশনাই। সোনার কাঠির ছোঁয়ায় কলকাতার এ জাগরণের চেহারা, বাঙলার অন্তর প্রকৃতির অপরূপ শোভা—এর তুলনা নেই।

মেলার আয়োজন করা হয়েছে এই রূপটিও বাইরের অতিথিদের দেখাবার জন্য রয়েছে এই সঙ্গে নাচ-গান-বাজা-থিয়েটার-সিনেমার ব্যবস্থা। বাইরের অতিথিরা এখানে এলে নিজেরাই দেখতে পাবেন কলকাতা শুধু দুঃস্বপ্নের নয়, মিছিলের নয়, আনন্দেরও শহর—কলকাতায় যা আছে ভারতের কোথাও নেই, নেই সারা পৃথিবীতেও। কলকাতাও অনন্যা।

আকাদামি পুরস্কার

সংগীত নৃত্যনাটক আকাদমী এ বছর প্রখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে নির্বাচিত করেছেন।

এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে শ্রীরায়ের প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, পঞ্চাশ বছরের নাট্যকার জীবনে পুরস্কার অনেক পেয়েছি, তাই নতুন করে এ পুরস্কার প্রাপ্তিতে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ক্ষোভের সঙ্গে নাট্যকার জানালেন, ১৯৬৭ সালে 'তারাস শেভচেঙ্কো' নাটক লিখে তিনি রাশিয়া থেকে সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার পান এবং বিদেশের ওই স্বীকৃতির পর স্বদেশের এই পুরস্কার পেলেন। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে শ্রীরায়ের জন্ম ১৯০০ খৃঃ ১৬ জুন।

একুশ বছর বয়সে প্রথম নাটক 'বঙ্গে মুসলমান' লেখেন। নাম ছড়িয়ে পড়ে 'চাঁদ সদাগর' নাটক লেখবার পর। 'মুক্তির ডাক' একাঙ্ক নাটক (স্টারে অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় অভিনীত) দিয়ে শ্রীরায়ের নাট্যকার জীবন শুরু। এরপর বহু নাটক তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে 'কারাগার' নাটকটি রাজরোষে পড়ে অভিনয় বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। শ্রীরায় এখনও নাটক লিখে চলেছেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে আছে মীরকাশিম, মহাভারতী, খনা, অশোক। এ বছর তিনি যাত্রার জন্যও 'দিগ্‌বিজয়' নামে একটি পালা লিখেছেন। 'লালন ফকির' নামে আর একটি পালা লিখে শেষ করেছেন মাত্র কয়েকদিন আগে।
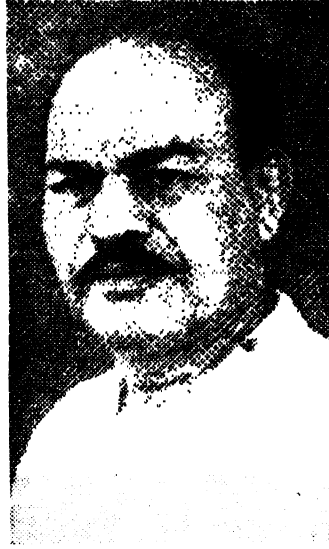
সেনী ঘরানার সুযোগ্য উত্তরসাধক ধ্রুপদী গান ও বীণাশিল্পী মহম্মদ দবীর খাঁ এবার আকাদমি পুরস্কার পেয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

এবারের সদারং সংগীত সম্মেলনে তাঁর সারস্বত বীণের অনুষ্ঠান গুণী মহলের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন পেয়েছে। সদারং-এর উদ্বোধন উৎসবে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ খাঁ সাহেবকে জড়িয়ে ধরে তাঁর মাধ্যমে ধ্রুপদী সংগীত স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাক এই প্রার্থনা জানান।

বিবিধ সংবাদ

গেল ১১ অকটোবর কলা মন্দির ভবনে পুবালী সংস্থা রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের যেটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, সেটি হচ্ছে এই নৃত্যনাট্যে প্রকৃতির ভূমিকায় রুমা গুহঠাকুরতার মঞ্চাবতরণ। শিল্প-সাধিকা শ্রীমতী রুমার পারদর্শিতা যে কত বহুমুখী, তার সাক্ষ্য হয়ে থাকবে এই প্রকৃতির ভূমিকায় তাঁর নীরব অভিনয়ের সঙ্গে অপরূপ নৃত্যগুলি। কত সহজে তিনি যে ভূমিকাটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এই সঙ্গে পলি গুহ (মা), সাধন গুহ (আনন্দ), শম্ভু ভট্টাচার্য (দৈওয়ালা), রামগোপাল ভট্টাচার্য (চুড়িওয়ালা) এবং সমবেত নৃত্যশিল্পীরা নৃত্যনাট্যটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন। গানে অংশগ্রহণকারী ও কারিণীরা এঁদের যথোচিত সাহায্য করেছিলেন। নৃত্যনাট্যটির আগে দেবব্রত বিশ্বাসের একক গান ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি দর্শকদের আনন্দ বর্ধন করেছিল।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্বরূপায় চিল্ড্রেন নভেল থিয়েটার অভিনয় করলেন 'কাগুজে সংঘ', 'রূপকথা' নামের দুটো মুখোশ নাটক। ঐদিনের অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসনে ছিলেন শ্রীমতী ইলা পালচৌধুরী ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। নাটক দুটির সাফল্যের জন্য প্রশংসা পাবেন পরিচালক শ্রীসুশীলচন্দ্র দাস।

গত ২৩ সংখ্যা অমৃত-র 'স্টুডিও থেকে' বিভাগে প্রকাশিত লেখার শেষাংশে একটি লাইন বাদ পড়ে গেছে। লাইনটি হবে '...উচিত ছিল বেশী করে, বিশেষ করে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মত প্রথম শ্রেণীর শিল্পী যখন হাতের কাছেই ছিলেন।' এ-ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

মহিলাদের ৪×১০০ মিঃ মেডলি রিলেতে স্বর্ণপদক বিজয়ী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল

মারতে পারেনি, মেরেছে ওর সাময়িক দুর্বলতার সুযোগে। যে জগৎ প্রথম দিন ৪০০ মিটার হীটে ৫ মিঃ ৪-৩ সেকেন্ডে জিতেছিল, সেই পরদিন ফাইনালে সময় নিল ৫ মিঃ ১৭ সেকেন্ড, অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার কথা যে তা সত্ত্বেও জগৎ দ্বিতীয় স্থান পেল, ওই সময়ের হিসেবে তার স্থান আরো নিচে হলে আমাদের সাঁতারুদের মান বাড়তো।

সেদিনই সকালে ১৫০০ মিটারের হিট টানতে হয়েছিল জগৎকে। বাঁশপাতার মত চেহারার জগৎ আইচের দেহে তারপর আর ঘণ্টাকয়েক বাদে ৪০০ মিটার টেনে উৎকর্ষ প্রদর্শন সম্ভব ছিল না।

তবু জগৎকে আমি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাঁতারু বলেছি। এম এস রাণা এবারকার সার্ভিসেস প্রতিযোগিতায় যাই করুন, জাতীয় প্রতিযোগিতার ১৫০০ মিটারের বর্তমান বিজয়ী জগৎ এইবারের জাতীয় প্রতিযোগিতায় রাণাকে ছেড়ে কথা কইবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে এবার সবচেয়ে কৃতিত্ব রমেন দাসের। ২০০ মিঃ ব্রেস্ট-স্টোক যেখানে সে আগে ৩ মিঃ ৯ সেকেন্ডের নিচে নামতে পারেনি, সেখানে সে করেছে ৩ মিঃ ৬-১ সেকেন্ড এবং বিজয়ী প্রণয় ব্যানার্জীর সমান এবং ১০০ মিটারে স্টেট চাম্পিয়ান প্রণয়কে মেরেছে।

ব্যাক-স্ট্রোক চ্যাম্পিয়ান সুশীল ঘোষের কৃতিত্বও অনস্বীকার্য। তবু সুশীল আমাদের আশা পূর্ণ করতে পারেনি। মরশুমের একেবারে প্রথম প্রতিযোগিতায় ন্যাশনালে যখন ও ১০০ মিটারে এক মিঃ ১৫-৩ সেকেন্ড সময় করলো তখন আমি আশা করেছিলাম যে রাজারাম সাহুর ১৯৪২-এর রেকর্ড (১ মিঃ ১৫ সেকেন্ড) এবার ও ভাঙবে। কিন্তু তিন তিনবার ১ মিঃ ১৫-৩ সেকেন্ড করার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে হীটে ও শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩ সেকেন্ড নামিয়ে রাজারামের সমান করলো, সে রেকর্ড ভাঙা আর হল না এবং যেহেতু ওর ১ মিঃ ১৫ সেকেন্ড হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় বাঙলার রাজ্য রেকর্ডে তা ঠাঁই পাবে না। অর্থাৎ রাজারাম সাহু পূর্বগৌরবে অনাহত থেকে গেল। আরও দুঃখ সুশীল ঘোষ ফাইনালে সময় নিল ১ মিঃ ১৫-৯ সেকেন্ড।

এবারকার আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম কৃতী বিজয়ী বোম্বাই-এর ১০০ মিঃ বাটারফ্লাই সাঁতারু ডি এইচ ট্যাকলে। হিটেই সে অরুণ সাহার জাতীয় রেকর্ড (১ মিঃ ৯-৯) ভেঙে করলে ১ মিঃ ৯-৮ সেকেন্ড এবং পরের দিন ফাইনালে ১ মিঃ ৮-৮ সেকেন্ড করে অরুণ সাহাকে এক সেকেন্ডের ওপরে মারলে। অতএব এবার জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার ১০০ মিঃ বাটারফ্লাই যে ট্যাকলে জিতবে নতুন রেকর্ড-টাইমে এমন ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসঙ্কোচে করা যেতে পারে।

এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কৃতিত্বের বিচারে আসা যাক। অনুষ্ঠান পরিচালনা অনবদ্য হয়েছে। ঘড়ির কাঁটার আগে আগে চলেছে বরং পিছোয়নি কোথাও। তবে ঘোষকদের মধ্যে একজনের বিকৃত ইংরেজী উচ্চারণ এবং ইংরেজী ও বাঙলা উভয় ঘোষণাতেই ভাষা ব্যবহারের ব্যাভিচার শ্রোতাদের তো পীড়া দিয়েছেই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাহানি করেছে।

কলকাতার কোন সাঁতারে কখনো এত লোক সমাগম হয়নি, ভারতের অন্যত্র হয়েছে কিনা সন্দেহ। বেলেঘাটার মত অনগ্রসর অঞ্চলে অবাধ প্রবেশ ব্যবস্থায় তামাশা দেখবার জন্যই যে এত লোক জড়ো করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে স্থানীয় সচেতন যুব সমাজে ওখানে ইউনিভার্সিটির পুল নেওয়া ও এতবড় অনুষ্ঠান আয়োজন বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি করেছে একথাও অনস্বীকার্য।

পুল তৈরি করেছে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের এঞ্জিনীয়ার। তারা পূর্ত ও স্থাপত্য বিভাগে পণ্ডিত হলেও আধুনিক খেলাধুলা ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞ নন, তাই তিন মিটার ডাইভিং বোর্ডটি এমনভাবে করেছে যে তাতে ফালক্রাম বসানো যাচ্ছে না ফলে তা ব্যবহারের অযোগ্য থেকে যাচ্ছে।

পুলটিতেও জনতা ঠেকানোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি। শৈবাল গুপ্ত পরিকল্পিত পুলটি হস্তান্তরের তাড়ায় ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট অনেক কিছু কাজ বাকী রেখেই ওটির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সম্পত্তি বাড়াবার ও ব্যক্তিবিশেষের গ্ল্যামার বাড়াবার আগ্রহে তড়িঘড়ি করে ওটির দখল নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবহার সুরু করেছে। অমন একটি আধুনিক পুল পাকা স্টেডিয়াম ছাড়া অসম্পূর্ণ। দর্শক জনতাকে সংযত রাখার এবং তাদের যথেচ্ছ চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে, একথা মনে রাখা দরকার। একজন বিকৃতমস্তিষ্ক দর্শক রেফারীকে ঘুষি মেরে পরে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিল যে পরিবেশে, তা প্রতিরোধ করার মত ব্যবস্থা করতে না পারলে কোন ভবিষ্যৎ নেই পুলটির। অথচ স্থানীয় যুব সমাজ বা দর্শকসাধারণ ওই উগ্রতার বিরুদ্ধাচরণ করতে চেয়েও পারেনি।

পুলের চারপাশে স্টেডিয়াম, ভিতরেও কিছু দেয়াল দরজা প্রভৃতি থাকা উচিত। এবং ব্যবস্থা এমন থাকা উচিত যাতে চারপাশে বসে দর্শকমণ্ডলী জলে পা ডুবিয়ে থাকার আগ্রহ মেটাতে না পারে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ডের সদস্যদের অধিকাংশ সংখ্যকের অনুপস্থিতি সন্দেহ জাগিয়েছে আমার মনে যে চেয়ারম্যান শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ একক প্রচেষ্টায়, অথবা কর্মভিনার অধ্যাপক শ্রীসত্যব্রত দাশগুপ্তের একক সহযোগিতায় পুলটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সদ্ব্যবহার করতে পারবেন কিনা।

ইয়ান তালটস (রাশিয়া) ঃ সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় হেভীওয়েট বিভাগের স্বর্ণপদক বিজয়ী।

দর্শক

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

পোল্যাণ্ডের ওয়ারশতে আয়োজিত বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট রাশিয়া ৩টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ৩টি ব্রোঞ্জ পদক জয়ের সূত্রে পয়েন্টের চূড়ান্ত তালিকায় প্রথম স্থান লাভ করেছে। রাশিয়ার থেকে অনেক পয়েন্টের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে পোল্যাণ্ড এবং তৃতীয় স্থান জাপান। সদ্য সমাপ্ত এই বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ৩৭টি দেশের ১৬৬ জন প্রতিনিধি।

প্রতিযোগিতায় প্রধান আকর্ষণ ছিলেন অলিম্পিক হেভীওয়েট বিভাগের দুবারের (১৯৬৪ ও ১৯৬৮) স্বর্ণপদক বিজয়ী রাশিয়ার লিওনিদ ঝাবোতিনস্কি। ইনি আবার হেভীওয়েট বিভাগে বিশ্ব রেকর্ড-ধারী। কিন্তু তিনি আলোচ্য প্রতিযোগিতায় ভারোত্তোলন করার সময় বাঁ-পায়ের মাংস-পেশীর টানে আক্রান্ত হয়ে প্রতিযোগিতা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। বিশ্ব হেভী-ওয়েট বিভাগে স্বর্ণপদক জয়ী হন রাশি-য়ারই প্রতিনিধি, নাম ইয়ান তালটস।

এখানে উল্লেখ্য, বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার সঙ্গে যে ইউরোপীয়ান ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা হয়ে গেল, রাশিয়া সেখানেও সর্বাধিক পদক জয়ী হয়ে প্রথম স্থান লাভ করে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বেলেঘাটাস্থ সুইমিং পুলে আয়োজিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তিনটি বিভাগে প্রথম স্থান লাভ করেছে—ছাত্র বিভাগ, ডাইভিং এবং ওয়াটার পোলোতে। এখানে উল্লেখ্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ে উপর্যুপরি তিনবার ছাত্র বিভাগের সাঁতার এবং ওয়াটার পোলোতে প্রথম স্থান পেল। ডাইভিংয়ে তারা শেষ খেতাব পেয়েছিল

১৯৬৩ সালে। আলোচ্য প্রতিযোগি[illegible] মোট ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড ভেঙেছে

দলগত পয়েন্ট তালিকা

ছাত্র বিভাগ ঃ ১ম কলকাতা ([illegible] পয়েন্ট), ২য় বোম্বাই (২৩ পয়েন্ট), [illegible] যাদবপুর (১৯ পয়েন্ট) এবং ৪র্থ কেরা[illegible] (৮ পয়েন্ট)।

ছাত্রী বিভাগ ঃ ১ম বোম্বাই ([illegible] পয়েন্ট), **২য়** কলকাতা (৪০ পয়েন্ট) [illegible] ৩য় পাঞ্জাব (৪ পয়েন্ট)।

ডাইভিং ঃ ১ম কলকাতা (৬০২-[illegible] ২য় দিল্লী (৪৩৮-৬০ পয়েন্ট) এবং বেনারস (৩১১-০৫ পয়েন্ট)।

ওয়াটার পোলো ফাইনাল ঃ কলক[illegible] ৯ ঃ বোম্বাই ৪

সন্তোষ ট্রফি

আসামের নওগাঁয় **২৬তম** জা[illegible] ফুটবল প্রতিযোগিতা বর্তমানে [illegible] ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। একদি[illegible] সেমি-ফাইনালে খেলবে মহীশূর [illegible] সার্ভিসেস এবং অপর দিকের সেমি-ফাইন[illegible] বাংলা ও অন্ধ্রপ্রদেশ। সেমি-ফাইনালে [illegible] দলকে দু'বার করে খেলতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য, মহীশূর গত দ[illegible] সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে এবং মহীশূ[illegible] কাছে এই দু'বারই রানার্স-আপ হ[illegible] বাংলা। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগি[illegible] সূচনা থেকে (১৯৪১) এ পর্যন্ত বা[illegible] ১১ বার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়ে সর্বা[illegible] বার ট্রফি জয়ের রেকর্ড করেছে। [illegible] উপর্যুপরি তিনবার সন্তোষ ট্রফি পেয়ে[illegible] **একমাত্র বাংলা (১৯৪৯-৫১)।**

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ড দলের দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট খেলার একটি দৃশ্য : খেলার চতুর্থ দিনে আবিদ আলি তাঁর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কুনিসের বল খেলে স্লিপে দণ্ডায়মান কংডনের হাতে 'ক্যাচ' তুলে শূন্য রাণে আউট হয়েছেন।
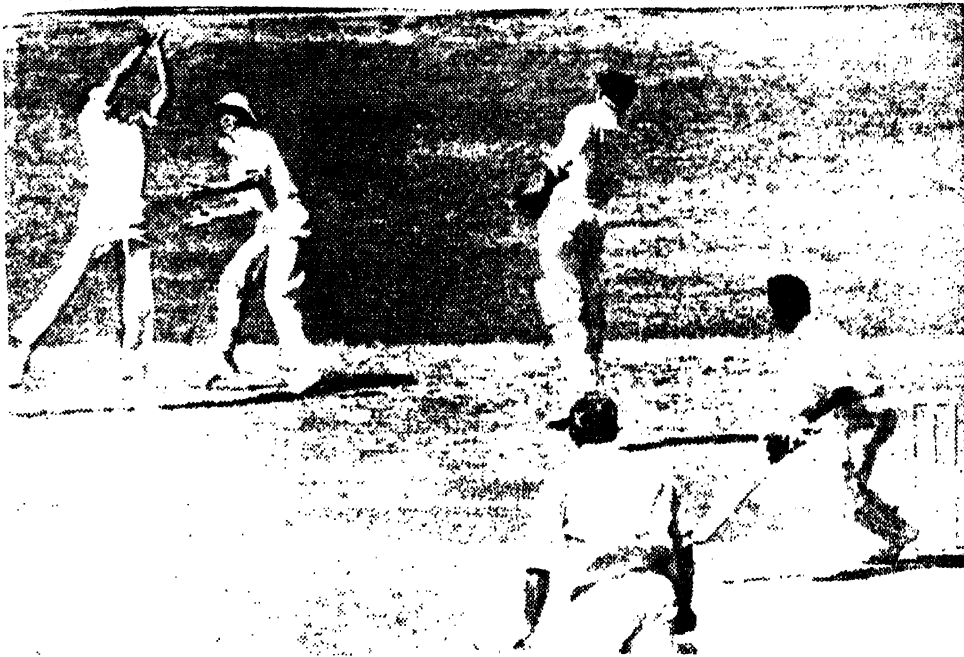
নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত

দ্বিতীয় টেস্ট ক্রিকেট

নিউজিল্যান্ড : ৩১৯ রান (বার্জেস ৮৯, ডাউলিং ৬৯ এবং কংডন ৬৪ রান। বেদী ৯৮ রানে ৪ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৫৯ রানে ৩ উইকেট)

ও ২১৪ রান (গেলন টার্ণার ৫৭ এবং হেডলি ৩২ রান। ভেঙ্কটরাঘবন ৭৪ রানে ৬ এবং প্রসন্ন ৬১ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ২৫৭ রান (আবিদ আলি ৬৩, অম্বর রায় ৪৮ এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ার ৪০ রান। হাওয়ার্থ ৬৬ রানে ৪ এবং বার্জেস ২৩ রানে ৩ উইকেট)

ও ১০৯ রান (পতৌদির নবাব ২৮ রান। হাওয়ার্থ ৩৪ রানে ৫ এবং পোলার্ড ২১ রানে ৩ উইকেট)

নাগপুরে ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় নিউজিল্যান্ড ১৬৭ রানে জয়ী হয়েছে। এই দুই দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত ১৫টি সরকারী টেস্ট খেলায় নিউজিল্যান্ডের এই নিয়ে দ্বিতীয় জয়। ভারতবর্ষের বিপক্ষে তাদের প্রথম জয় ৬ উইকেটে, ক্রাইস্ট চার্চ মাঠের ২য় টেস্ট, ১৯৬৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে।

নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম দিনের খেলায় নিউজিল্যান্ড প্রথম ইনিংসের ৫টা উইকেট খুইয়ে ২৫২ রান সংগ্রহ করেছিল। বার্জেস ৬৬ রান করে অপরাজিত থাকেন। নিউজিল্যান্ডের খেলার ভিত খুব শক্ত হয়েছিল। ৭৪ রানের মাথায় ১ম উইকেট পড়েছিল। নিউজিল্যান্ডের রান ছিল লাঞ্চের সময় ৬৭ (কোন উইকেট না-পড়ে) এবং চা-পানের সময় ১৮৫ (২ উইকেটে)।

কংডন (৫৪ রান) এবং বার্জেস (২৮ রান) চা-পানের সময় অপরাজিত ছিলেন। এক সময়ে তাঁরা মাত্র ৫৩ মিনিটে ৬২ রান যোগ করেছিলেন।

হেডলে হাওয়ার্থ

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতবর্ষের পরাজয়ের অন্যতম কারণ তাঁর ১০০ রানে ৯টি উইকেট।

দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের ১৩ মিনিট আগে ৩১৯ রানের মাথায় নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। এই দিন বাকি পাঁচ উইকেটে তারা মাত্র ৬৭ রান যোগ করেছিল। বার্জেস দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৮৯ রান করেন। তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলায় এই ৮৯ রানই সর্বোচ্চ। এই রান তুলতে তাঁর ১৮৩ মিনিট সময় লাগে এবং বাউণ্ডারী করেন ১৩টা।

দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ে ভারতবর্ষ ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৪৩ রান সংগ্রহ

অম্বর রায়

খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ৪৮ রাণ করেন।

ভিক্তর সানেইয়েভ (রাশিয়া) : নবম ইউরোপীয়ান এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার ট্রিপল জাম্পে স্বর্ণপদক বিজয়ী। ইনি ১৯৬৮ সালের (অক্টোবর ১৭) মেক্সিকো অলিম্পিকের ট্রিপল জাম্পে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছিলেন এবং সেখানে ১৭-৩৯ মিটার (৫৭ ফিট ⅜ ইঞ্চি) দূরত্ব অতিক্রম করে যে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন তা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।
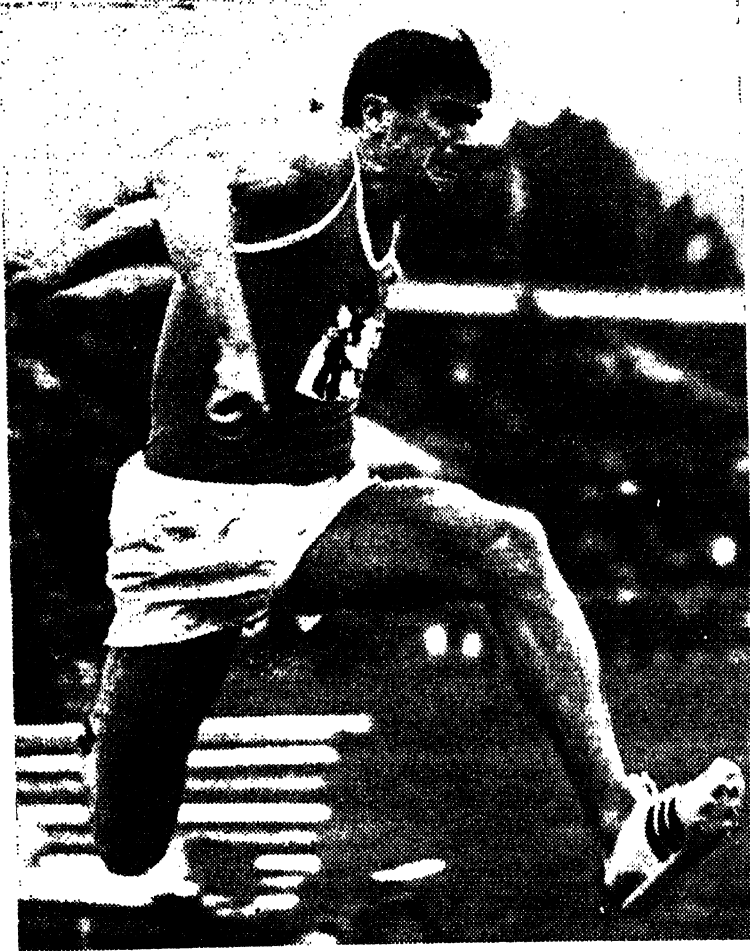
করেছিল। চা-পানের সময় ভারতবর্ষের রান ছিল ৮৬ (১ উইকেটে)। ভারতবর্ষের চারটে উইকেট এইভাবে পড়েছিল—১ম উইকেট ৫৫ রানের, ২য় উইকেট ৯৫ রানের, ৩য় উইকেট ১৩৯ রানের এবং ৪র্থ উইকেট ১৪৩ রানের মাথায়।

খেলার তৃতীয় দিনে লাঞ্চের ৩৯ মিনিট পর ভারতবর্ষের ১ম ইনিংস ২৫৭ রানের মাথায় শেষ হয়। অবস্থা খুবই খারাপ দাঁড়ায় যখন ১৬১ রানের মাথায় ৭ম উইকেট পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ৮ম উইকেট-জুটি অম্বর রায় এবং ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ৮৭ মিনিটে দলের অতি মূল্যবান ৭৩ রান তুলে শোচনীয় ব্যর্থতা থেকে দলকে উদ্ধার করেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসের রান ছিল ২৩৪ (৭ উইকেটে)—খেলায় অপরাজিত ছিলেন। লাঞ্চের পর ইঞ্জিনিয়ার (৪০ রান) এবং অম্বর রায় (৩৩ রান)। লাঞ্চের পর ইঞ্জিনিয়ার খেলার প্রথম বলেই হাওয়ার্থের বলে বোল্ড আউট হন। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংসে শেষ আউট হন অম্বর রায়, দলের ২৫৭ রানের মাথায়। দলের অতি সংকট সময়ে অম্বর রায় তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে যে ৪৮ রান করেন তা তাঁর পক্ষে খুবই কৃতিত্ব এবং দৃঢ়তার পরিচয়। তিনি তাঁর এই ৪৮ রানে ১০টা বাউন্ডারী করেন, মোট ১৩৫ মিনিট খেলে।

নিউজিল্যান্ড ৬২ রানে অগ্রগামী হয়ে ২য় ইনিংসে খেলতে নামে এবং তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ৪ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৮১ রান সংগ্রহ করেছিল। ফলে তারা ১৪৩ রানে এগিয়ে যায়।

চতুর্থ দিনে নিউজিল্যান্ডের ২য় ইনিংস ২১৪ রানের মাথায় শেষ হয়। ভারতবর্ষের ফিল্ডিংয়ের দোষেই [illegible] উঠেছিল। ভারতবর্ষের পক্ষে জয়লাভের জন্যে ২৭৭ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল ৩৮৫ মিনিটের মত খেলার সময়। কিন্তু চতুর্থ দিনে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট পড়ে গিয়ে মাত্র ৮৬ রান দাঁড়ায়। খেলার এই অবস্থায় পরাজয় থেকে মুক্তি পেতে ভারতবর্ষের আরও ১৯০ রানের প্রয়োজন ছিল। এদিকে হাতে জমা ছিল মাত্র ৩টে উইকেট। উইকেটে অপরাজিত ছিলেন অধিনায়ক পতৌদির নবাব (২৭ রান) এবং ইঞ্জিনিয়ার (২ রান)। বাকি নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানরা আউট হয়ে যান। ইঞ্জিনিয়ার আবার গোড়ালিতে চোট খেয়ে আহত ছিলেন। সুতরাং খেলায় অঘটন ঘটার সম্ভাবনাও কম ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষকে এই শোচনীয় দুর্দশায় ফেলেছিল হাওয়ার্থের মারাত্মক বোলিং এবং নিউজিল্যান্ড দলের খেলোয়াড়দের নিখুঁত ফিল্ডিং।

পঞ্চম অর্থাৎ খেলার শেষ দিনে ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস মাত্র ৪০ মিনিট স্থায়ী ছিল। ভারতবর্ষের ২য় ইনিংস ১০৯ রানের মাথায় শেষ হয়। ফলে নিউজিল্যান্ড ১৬৭ রানে জয়ী হয়। ভারতবর্ষের মাটিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট ক্রিকেট খেলায় নিউজিল্যান্ডের এই প্রথম জয়।

ভারতবর্ষের এই পরাজয়ের মূলে ছিল প্রধানতঃ এই তিনটি কারণ—ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিকৃষ্ট শ্রেণীর ফিল্ডিং, নিউজিল্যান্ডের টসে জয়লাভ এবং তাদের নিখুঁত ফিল্ডিং।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের আসর বসবে জয়পুরে। চারটি অঞ্চলের চ্যাম্পিয়ান দলই এই চূড়ান্ত পর্যায়ে লীগ প্রথায় খেলবে। এই চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে পূর্বাঞ্চল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমাঞ্চল থেকে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরাঞ্চল থেকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণাঞ্চল থেকে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়।

টেস্টে ওয়াদেকারের ১০০০ রাণ

ভারতবর্ষের ন্যাটা ক্রিকেট খেলোয়াড় অজিত ওয়াদেকার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে ১৬ রান করলে তিনি সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ১০০০ রান করার গৌরব লাভ করেন। বর্তমানে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ওয়াদেকারের মোট রান দাঁড়িয়েছে—১০০৭। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান : খেলা ১৫, ইনিংস ৩০, নট-আউট ১বার, মোট রাণ ১০০৭, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৪৩ (বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ক্রাইস্ট চার্চ, ১৯৬৮) এবং [illegible])।

দাবার আসর

ডেসক্রিপটিভ নোটেশন

বর্তমান সংখ্যায় আমরা ডেসক্রিপটিভ বা বর্ণনামূলক নোটেশন নিয়ে আলোচনা করব। এই নোটেশন প্রত্যেক দাবা খেলোয়াড়ের জেনে রাখা উচিত কারণ এর ফলে নিজের বা অন্যের খেলা লিখে রাখা যায় এবং দাবার বই পড়ে বুঝতে পারা যায়। প্রত্যেক দাবা প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়কে নিজের খেলা লিখে রাখতে হয় এবং তার একটা বা দুটো কপি টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হয়।

বর্ণনামূলক নোটেশন বুঝতে হলে জানতে হবে (১) ঘুঁটিসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম এবং (২) ছকের প্রতিটি ঘরের বর্ণনামূলক নাম।

ঘুঁটিসমূহের সংক্ষিপ্ত নাম :—প্রত্যেক ঘুঁটির আদ্যাক্ষর হোল সেই ঘুঁটির সংক্ষিপ্ত নাম। সুতরাং রাজার সংক্ষেপ হোল রা। অর্থাৎ দাবার প্রসঙ্গে রা বললেই রাজা বুঝতে হবে। এইভাবে মন্ত্রী=ম, নৌকা=ন গজ=গ, ঘোড়া=ঘ, বড়ে=ব। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে ইংরাজী নামগুলিরও সংক্ষেপ দেওয়া হোল : কিং=কে (রাজা), কুইন=কিউ (মন্ত্রী), রুক=আর (নৌকা), বিশপ=বি (গজ), নাইট=কেটি বা এন (ঘোড়া) পন=পি (বড়ে)। কিন্তু ছকে একাধিক নৌকা, গজ, ঘোড়া এবং বড়ে থাকার জন্য এই ঘুঁটিগুলিকে আরো বিশেষিত করা হয়েছে। খেলা সুরু হওয়ার সময় রাজা ও মন্ত্রীর অবস্থানের ভিত্তিতে ঘুঁটিগুলি দুভাগে ভাগ করা যায় :—রাজার দিকের ঘুঁটি এবং মন্ত্রীর দিকের ঘুঁটি। রাজার দিকে যে গজ থাকে তাকে বলে রাজাগজ বা রা গ। এইভাবে আমরা পাই রাজা ঘোড়া বা রা ঘ। অনুরূপভাবে, রাজানৌকা= রা ন, মন্ত্রীগজ=ম গ, মন্ত্রীঘোড়া=ম ঘ, এবং মন্ত্রীনৌকা=ম ন। প্রত্যেক ঘুঁটির আগের অক্ষরকে সেই ঘুঁটির বড়ে বলে। এইভাবে আটটা বড়ের নাম হচ্ছে রা ন ব রা ঘ ব, রা গ ব, রা ব, ম ব, ম গ ব, ম ঘ ব, ম ন ব। এইভাবে আঁ পাসাঁ বা চলতি বড়ের মারের সংক্ষেপ হচ্ছে 'চ ব মা' বা আরো সংক্ষেপে শুধু 'চ'। কিস্তির সংক্ষেপ 'কি'।

ছকের ঘরসমূহের নামকরণ :—ছকের ঘরগুলির নাম দেওয়া হয় র‍্যাঙ্কগুলির নম্বর এবং ফাইলগুলির নাম অনুসারে। পাশাপাশিভাবে ছকে যে আটটা সারি থাকে তাদের বলা হয় র‍্যাঙ্ক। খেলোয়াড়ের নিকটতম র‍্যাঙ্কটির নম্বর হচ্ছে ১। তারপর ওপরের দিকে র‍্যাঙ্কগুলির নম্বর যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, এবং ৮। ১নং র‍্যাঙ্কের প্রতিটি ঘরের নম্বরই হচ্ছে ১, ২নং র‍্যাঙ্কের প্রতিটি ঘরেরই নম্বর হচ্ছে ২। সাদার পক্ষে যেটা ১নং র‍্যাঙ্ক কালোর পক্ষে তা হচ্ছে র‍্যাঙ্ক ৮। সাদার ২নং র‍্যাঙ্ক হচ্ছে কালোর ৭নং র‍্যাঙ্ক।

লম্বালম্বিভাবে (অর্থাৎ ওপর থেকে নীচুতে বা নীচু থেকে ওপরে) ছকের যে আটটা সারি আছে সেগুলিকে বলে ফাইল। ফাইলগুলির নাম দেওয়া হয় খেলার শুরুতে ১নং র‍্যাঙ্কে যে ঘুঁটি থাকে, সেই ঘুঁটি অনুসারে। খেলা শুরু করার জন্য ছক সাজিয়ে নিয়ে দেখুন রাজা নৌকা যে ঘরে অবস্থিত, সেই ফাইলটির নাম রা ন ফাইল। এইভাবে আমরা পাই রা ঘ ফাইল, রা গ ফাইল, রা ফাইল, ম ফাইল, ম গ ফাইল, ম ঘ ফাইল, এবং ম ন ফাইল। প্রতি খেলোয়াড়ের নিজের দিক থেকে রা ফাইলের ১নং র‍্যাঙ্কের ঘরটির নাম রা ১। এইভাবে ওপরের দিকে রা ফাইলের বাকী ঘরগুলির নাম হচ্ছে রা ২, রা ৩, রা ৪, রা ৫, রা ৬, রা ৭ এবং রা ৮। প্রতিটি ফাইলের অন্যান্য ঘরগুলির নামও একই পদ্ধতিতে হবে। চিত্র দেখুন।

ঘুঁটি নিজের ফাইল ছেড়ে গেলেও সেই ফাইলের ঘরগুলির নামের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু বড়ের নাম মাঝে মাঝে পাল্টে যেতে পারে। যেমন, রা ঘ ঘরের বড়েটি খেলা চলাকালীন বিপক্ষের ঘুঁটিকে মেরে ধরুন ম ফাইলে এসে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ফাইল অনুসারে এর নাম হয়ে যাবে ম ব।

চাল লেখা—চাল লেখার সময় প্রথমে উল্লেখ করতে হবে যে ঘুঁটি চালা হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত নাম। তারপরে একটি ছোট দাগ দিয়ে লিখতে হবে ঘুঁটিটি যে ঘরে যাচ্ছে সেই ঘরের নাম। যেমন সাদা যদি রাজা গজ বড়েটা দু ঘর ঠেলে খেলা শুরু করে তাহলে লিখতে হবে (১)ব—রাগ ৪। উত্তরে কালো যদি রাজাবড়েটি দুঘর ঠেলে তাহলে লিখতে হবে (১)...ব—রা ৪। সাদা তখন বড়ে দিয়ে বড়েটিকে মেরে নিতে পারে। তাহলে সাদার ২নং চাল হবে (২) ব×ব। (গুণচিহ্ন দিয়ে ঘুঁটি মেরে নেয়া বোঝায়)। সাদা কালো দুজনাকেই সাদার চাল লিখতে হবে সাদার দিক থেকে হিসাব করে এবং কালোর চাল লিখতে হবে কালোর দিক থেকে হিসাব করে। ক্যাসল করার সাঙ্কেতিক চিহ্ন হচ্ছে রাজার দিকে 0-0 এবং মন্ত্রীর দিকে 0-0-0, ধরুন কোন বড়ে রা-৮ ঘরে পৌঁছে মন্ত্রী হোল, তাহলে লিখতে হবে ব—রা-৮=ম। কিস্তির সংক্ষেপ কি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু যোগচিহ্ন+দিয়েও কিস্তি বোঝানো যায়। অন্যান্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন হোল :— ভাল চাল—! খুব ভাল চাল—!! খারাপ চাল—?

কিন্তু চাল লেখার সময় আরো দুয়েকটা সমস্যা আসতে পারে। যেমন ধরুন, আপনার গজ রা-৪ ঘরে রয়েছে এবং বিপক্ষের একটি ঘোড়া রয়েছে ম গ-৩ ঘরে, অপর ঘোড়াটি আছে রা ঘ-৩ ঘরে। অর্থাৎ গজটি দুটি ঘোড়ার যে কোণটিকেই মেরে নিতে পারে। শুধু গ×ঘ লিখলে বোঝা

যাবে না কোন ঘোড়াটি মারা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মার খাওয়া ঘোড়াটি যে ঘরে ছিল, সেই ঘরটিও উল্লেখ করে দিতে হবে, যেমন—গ×ঘ (ম গ-৩) বা গ×ঘ (রাঘ-৩)। কিন্তু হয়ত আপনার দুটি নৌকার একটি আছে রা-৫ ঘরে এবং অপরটি আছে রা-১ ঘরে। বিপক্ষের একটি গজ আছে আপনার রা-৩ ঘরে। যে কোন নৌকাই গজটিকে মেরে নিতে পারে কিন্তু শুধু ন×গ লিখলে বোঝা যাবে না কোন নৌকাটি মারছে। লিখতে হবে ন (রা-৫)×গ বা ন (রা-১)×গ। সেই রকম যদি দুটো ঘোড়ার উভয়েই কোন একটি ঘরে যেতে পারে তাহলে যে ঘোড়াটি চালা হোল, সেই ঘোড়াটি যে ঘরে অবস্থিত ছিল, সেই ঘরের নামও ঘোড়াটির সঙ্গে উল্লেখ করে দিতে হবে।

ভারতের অষ্টম জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশীপ 'এ' প্রতিযোগিতা সম্প্রতি বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত হোল। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান দখল করে তামিলনাড়ুর শ্রীম্যানুয়েল এ্যারন নূতন জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়ন হলেন। অবশ্য শ্রীএ্যারন এই প্রথম যে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হলেন তা নয়, এর আগেও দুবার (১৯৫৯ এবং ১৯৬১) তিনি এই প্রতিযোগিতা জিতেছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার আখ্যাপ্রাপ্ত শ্রীএ্যারন ইতিপূর্বে বহুবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। দাবা খেলোয়াড় হিসেবে রাশিয়াও পরিভ্রমণ করেছেন প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মহারাষ্ট্রের শ্রীম্যাডানের সঙ্গে।

বাংলার খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে শ্রীএ্যারনের যেন একটা অদ্ভুত 'ইমিউনিটি' আছে। বাংলার কোন খেলোয়াড়ই আজ পর্যন্ত এ্যারনকে হারাতে পারেন নি। বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা করে খেলার জন্যে শ্রীএ্যারনের খ্যাতি আছে। তাঁর বিরুদ্ধে মাদ্রাজের কস্তুরী টুর্ণামেন্টের এক খেলায় প্রাক্তন বাংলা চ্যাম্পিয়ন শ্রীএস এন দত্ত একবার দুটো মন্ত্রী নিয়েও জিততে পারেন নি। অদ্ভুত কায়দায় চালমাৎ করে এ্যারন সে খেলাটি ড্র করে নেন। বর্তমান প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিযোগী শ্রীডি শেঠ শ্রীএ্যারনের বিরুদ্ধে জিত-অবস্থা এনেও শেষ পর্যন্ত হেরে যান। দুঃখের বিষয় শারীরিক আঘাত পাওয়ার ফলে শ্রীশেঠ অসুস্থ ছিলেন এবং এর ফলে প্রতিযোগিতা থেকেই নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

শেষ পর্যন্ত মোট ১৪ জন খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে ১টি করে গেম খেলেছেন। নীচে চূড়ান্ত ফলাফল দেওয়া হোল। (১) এ্যারন ৮২/২, (২) নাসির আলি ৮, (৩) সাখালকার ৭, (৪) শামসুল হাসান ৭, (৫) খালিব ৭, (৬) শালিগ্রাম

টুর্ণামেন্ট, গোটা পৃথিবীকে এই উপলক্ষে ১০।১২ জোনে ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে একটি হোল পূর্ব এশিয়া জোন। এই জোনের মধ্যে আছে ভারত, ইজরায়েল, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া। আগামী নভেম্বরে সিঙ্গাপুরে এই জোনাল খেলা হবে। ভারতের হয়ে অংশ গ্রহণ করবেন

কালো

মন্ত্রীর দিক রাজার দিক

মন ১ / মন ৮	মঘ ১ / মঘ ৮	মগ ১ / মগ ৮	ম ১ / ম ৮	রা ১ / রা ৮	রাগ ১ / রাগ ৮	রাঘ ১ / রাঘ ৮	রান ১ / রান ৮
মন ২ / মন ৭	মঘ ২ / মঘ ৭	মগ ২ / মগ ৭	ম ২ / ম ৭	রা ২ / রা ৭	রাগ ২ / রাগ ৭	রাঘ ২ / রাঘ ৭	রান ২ / রান ৭
মন ৩ / মন ৬	মঘ ৩ / মঘ ৬	মগ ৩ / মগ ৬	ম ৩ / ম ৬	রা ৩ / রা ৬	রাগ ৩ / রাগ ৬	রাঘ ৩ / রাঘ ৬	রান ৩ / রান ৬
মন ৪ / মন ৫	মঘ ৪ / মঘ ৫	মগ ৪ / মগ ৫	ম ৪ / ম ৫	রা ৪ / রা ৫	রাগ ৪ / রাগ ৫	রাঘ ৪ / রাঘ ৫	রান ৪ / রান ৫
মন ৫ / মন ৪	মঘ ৫ / মঘ ৪	মগ ৫ / মগ ৪	ম ৫ / ম ৪	রা ৫ / রা ৪	রাগ ৫ / রাগ ৪	রাঘ ৫ / রাঘ ৪	রান ৫ / রান ৪
মন ৬ / মন ৩	মঘ ৬ / মঘ ৩	মগ ৬ / মগ ৩	ম ৬ / ম ৩	রা ৬ / রা ৩	রাগ ৬ / রাগ ৩	রাঘ ৬ / রাঘ ৩	রান ৬ / রান ৩
মন ৭ / মন ২	মঘ ৭ / মঘ ২	মগ ৭ / মগ ২	ম ৭ / ম ২	রা ৭ / রা ২	রাগ ৭ / রাগ ২	রাঘ ৭ / রাঘ ২	রান ৭ / রান ২
[illegible]	মঘ ৮ / মঘ ১	মগ ৮ / মগ ১	ম ৮ / ম ১	রা ৮ / রা ১	রাগ ৮ / রাগ ১	রাঘ ৮ / রাঘ ১	রান ৮ / রান ১

মন্ত্রীর দিক রাজার দিক

সাদা

সাদা এবং কালো উভয়কেই সাদার চাল সাদার দিক থেকে এবং কালোর চাল কালোর দিক থেকে হিসাব করে লিখতে হবে।

৭, (৭) মহম্মদ হাসান ৭, (৮) ফারুক আলি ৬, (৯) ভাচা ৬, (১০) সাপ্রে ৬, (১১) ওয়াহি ৬, (১২) শুক্লা ৫২/২, (১৩) দাণ্ডেকর ৫, (১৪) দেবগন ৫।

১৯৭২ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে বর্তমান বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন শ্রীবোরিস স্পাসকির বিরুদ্ধে কে খেলবেন তা নিরূপণের জন্যে পৃথিবীব্যাপী খেলোয়াড় বাছাই হবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। এই সমস্ত প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায় হোল জোনাল

শ্রীম্যানুয়েল এ্যারন এবং শ্রীনাসির আলি। রিজার্ভ থাকবেন শ্রীসাখালকার।

স্টকহলমের এক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে রাশিয়ার শ্রীআনাতোলি কারপভ বিশ্ব জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ১৮ বছর বয়স্ক শ্রীকারপভ মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে রাশিয়ার একমাত্র বোরিস স্পাসকি ছাড়া আর কেউই জুনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন নি।

—গজানন্দ বোড়ে

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

প্রমথনাথ বিশীর নূতন উপন্যাস

বিপুল সুদূর তুমি যে ৭৷৷

লালকেল্লা ১৪৲ কেরীসাহেবের মুন্সি ৮৷৷

আশাপূর্ণা দেবীর নূতন উপন্যাস

বিজয়ী বসন্ত ৬৲

প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲ সুবর্ণলতা ১৩৲

বিমল করের নূতন উপন্যাস

বাড়িবদল ৪৲ পান্থশালা ৩৷৷

পরবাস ৪৷৷ সীমারেখা ৪৷৷

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

নতুন তোরণ ৪৷৷

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নূতন উপন্যাস

রাত্রি নিশীথে ৭৲
সূর্য তপস্যা ১০৲
কন্যা কুমারী ৬৲

বিমল মিত্রের

কলকাতা থেকে বলছি ৬৲
একক দশক শতক ১৪৲

প্রবোধকুমার সান্যালের

উত্তর হিমালয় চরিত ১১৲

শংকু মহারাজের নূতন ভ্রমণ কাহিনী

উত্তরস্যাং দিশি ১০৲

বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা ৭৲

অবধূতের বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী

নীলকণ্ঠ হিমালয় ৮৷৷

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের অবধূতের

রমনীর মন ৫৷৷ একাঘ্নী ৪৲

স্বামী দিব্যাত্মানন্দের

পুণ্যতীর্থ ভারত ১০৲

স্বামী তত্ত্বানন্দের

তপস্বী ভারত ১০৲

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রথম বাঙলা বই

বাঙালীজীবনে রমনী ১০৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

নগরপারে রূপনগর ১৪৲
বাজীকর ৮৲ স্বয়ংবৃতা ৬৲

লীলা মজুমদারের অমৃত স্মৃতিকথা

আর কোনোখানে (নূতন মুদ্রণ) **৫৲**

মন্মথনাথ ঘোষের নূতন উপন্যাস

বনরাজিনীলা ৭৲ নীলাঞ্জনা ৭৷৷

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উপন্যাস

ইষ্ট বাকল্যাণ্ড রোড ৮৲

প্রফুল্ল রায়ের

পূর্ব্ব পার্ব্বতী ১১৲ কিন্নরী ৪৷৷

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাজিত ১০৲ দৃষ্টিপ্রদীপ ৭৲

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর

কুটিল কুমায়ূন ৫৲

জরাসন্ধের অসাধারণ রচনা

সমগ্র লৌহকপাট ২০৲

কালিকারঞ্জন কানুনগোর রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত

রাজস্থান কাহিনী ৮৷৷

টলস্টয়ের

ওয়ার এণ্ড পীস (১ম—৬৷৷০ ২য়—৬৲ ৩য়—৬৷৷০)

আনা কারেনিনা ৩৷৷

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

শুকসারীকথা ৮৷৷ গন্নাবেগম ৮৲

প্রশান্ত চৌধুরীর

আলোকের বন্দরে ৪৷৷ গোধূলি রঙ্গীন ৫৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

গঙ্গাবতরণ ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-৩৪৯২, ৩৪-৮৭৯১

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১ অমৃতে প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধাবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২ প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩ রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য অমৃতের কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃতের কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পিতে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে অমৃতের কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০-০০	টাকা ২২-০০
ষান্মাষিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫-০০	টাকা ৫-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৯ বর্ষ
২য় খণ্ড

২৫শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 31st October, 1969. শুক্রবার, ১৪ই কার্তিক, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীতুষার সান্যাল

গীতবিতান ও রবীন্দ্র সংগীত

আজ (১৯-১০-৬৯) সকালে বেতারে শ্রীমতী স্বপ্না ঘোষালের কণ্ঠে 'আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ওকে' এই রবীন্দ্র-সঙ্গীতটি শুনলাম। তিনি গাইলেন—'ছেলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।' আমার মনে হয় কথাটা 'ছেলেরা' না হয়ে 'ফুলেরা' হবে। অবশ্য বিশ্বভারতীর ১৩৭৩-এর সংস্করণে গীতবিতানে—'ছেলেরা' ছাপা হয়েছে কিন্তু সেটা নিতান্তই ছাপার ভুল—শুদ্ধ পাঠ হবে 'ফুলেরা'। প্রমাণস্বরূপ পূর্বতন ১৩৫২-র সংস্করণ দেখুন। সেখানে আছে :

ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে
পাখিরা পাখায় তারে নিল এঁকে।

১৩৫২-র পরে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে কবি এখানে 'ছেলেরা'-ই বলতে চেয়েছিলেন, 'ফুলেরা' নয়। 'ছেলেদের' কথা তো পরের দু ছত্রেই বলা হয়েছে :

ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।

ভাবের দিক থেকে বিচার করে দেখলেও স্পষ্ট হবে, কথিত পাঠ 'ছেলেরা' না হয়ে 'ফুলেরা' হবে।

গীতবিতানে ছাপার ভুল অনুসরণ করে শিল্পীরা বেতারে গান গাইবেন আর সে ভুল কর্তাব্যক্তিদের লক্ষ্যের বাইরে থাকবে এটা অত্যন্ত দুঃখজনক।

আনন্দা সেনগুপ্ত
কলকাতা—২৬

মানুষগড়ার ইতিকথা

৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৭শ সংখ্যা 'অমৃতে' হাওড়া জেলা স্কুল প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছিলাম কেরুনা কেতন সেন, আই-সি-এস এই স্কুলের ছাত্র। তথ্যটি ভুল। কে কে সেন নন, কে কে হাজরা আই-সি-এস ঐ সময়ে হাওড়া স্কুলের ছাত্র ছিলেন। ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পত্রলেখক চক্রধরপুরের নিত্যরঞ্জন সাহা ও নৃপেন্দ্ররঞ্জন সাহার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তবে ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২৪শ সংখ্যা 'অমৃতে' রাউরকেলা থেকে শৈলজা বাগচী যে চিঠি লিখেছিলেন তার জবাবে জানাই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় দুই খেপে (প্রথমবার জানুয়ারী, ১৯১০ থেকে জুন, ১৯২১ ও দ্বিতীয়বার জানুয়ারী ১৯২৬ থেকে জুন, ১৯৩০) মোট ষোল বছর সাতিশ সাধারণ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর দুটি টার্মের মধ্যবর্তী সময়ে শ্যামাচরণ বোস ও নলিনী-মোহন সান্যাল হেডমাস্টার হিসাবে এই স্কুলের সেবা করে গেছেন। শ্যামাচরণবাবু ১৯২১ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ছিলেন অফিসিয়েটিং হেডমাস্টার। নলিনীবাবু আসেন ১৯২২ সালের মার্চ মাসে। ছিলেন ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত। তাই শৈলজাবাবু যে লিখেছেন '১৯২২ বা ১৯২৩ সালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় ডঃ নলিনীমোহন সান্যাল' তার ঈষৎ সংশোধন প্রয়োজন। স্বর্গত সান্যালমশাই ১৯২২ এর মার্চ থেকে ১৯২৬ এর জানুয়ারী পর্যন্ত এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এ ব্যাপারে 'বা' 'কিন্তু'র কোন স্থান নেই কারণ স্কুল রেকর্ডেই এসব লেখা আছে। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য খুবই স্পষ্ট : আমি স্কুল-গুলির বিবর্তনের মোটামুটি ইতিহাস পরিবেশনের চেষ্টা করছি। অজস্র খ্যাতনামা শিক্ষকের নামই নিরুপায় হয়ে আমাকে বাদ দিতে হচ্ছে। এর কারণ স্থানাভাব, আমার শ্রদ্ধাহীনতা নয়।

সবশেষে ৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২৪শ সংখ্যা অমৃতে প্রকাশিত 'সেণ্ট জনস ডায়োসেশান স্কুলের' প্রবন্ধটিতে কয়েকটি ছাপার ভুল আমার চোখে পড়েছে। সব ভুল সংশোধন চিঠিপত্রের মাধ্যমে সম্ভব নয়। সহৃদয় পাঠকের অনুমানের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। যেমন প্রথম প্যারাগ্রাফের শেষে ছাপা হয়েছে 'মিসটার জর্জিনা'। ওটা 'সিসটার' হবে। সপ্তম প্যারাগ্রাফের 'প্রোটেস্টাইন খৃশ্চান'-এর জায়গায় পাঠ হবে 'প্রোটেস্টাণ্ট খৃশ্চান'। অষ্টম প্যারাগ্রাফে ছাপা হয়েছে 'ডায়োসেশান কথাটি ডায়োসিস শব্দটিরই বিশেষণ রূপ।' ডায়োসিন নয় হবে 'ডায়োসিজ।' পাছে এ বিষয়ে আবার কোন পত্রাঘাত হয় তাই এই সাবধানতা অবলম্বন করলাম। ধন্যবাদান্তে—

—সন্ধিৎসু
কলকাতা

(২)

আমি আপনাদের সাপ্তাহিক অমৃতের একজন উৎসাহী ও অনুরাগী পাঠক। অমৃতের প্রতিটি বিভাগই আমার কাছে আকর্ষণীয়। কিছুদিন যাবত অমৃতে 'মানুষগড়ার ইতিকথা' প্রকাশিত হচ্ছে। আমার মনে হয় বিদ্যালয়ের ইতিহাস নিয়ে লেখা এরকম প্রচেষ্টা বাংলাভাষায় এর আগে আর হয়নি। সেদিক দিয়ে এটি একটি অভিনব প্রচেষ্টা। সন্ধিৎসু নামের অন্তরালে যে শক্তিশালী প্রবন্ধকার একটির পর একটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে চলেছেন, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ। যেভাবে তিনি নিজের প্রচেষ্টায় এইসব বিদ্যালয়ের অতীত এবং বর্তমান ইতিহাস সংগ্রহ করে তা আমাদের সামনে তুলে ধরছেন তাতে তিনি সত্যিই ধন্যবাদার্হ।

পরিশেষে আমার একটি অনুরোধ, এই বিভাগের মাধ্যমে যেভাবে কলকাতার এবং তার আশেপাশের বিদ্যালয়গুলির চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে, ঠিক সেইভাবে যদি উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলির ইতিহাসও উপস্থাপিত করা হয়, তবে অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণ খুবই উপকৃত হবেন। কলকাতার মত উত্তরবাংলাতেও বহু বিখ্যাত এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত বিদ্যালয় আছে এবং তাদের ইতিহাসও কম আকর্ষণীয় নয়।

অভিজিত গোস্বামী
ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি

(৩)

আমি 'অমৃত' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। এই পত্রিকার নিত্যনূতন বৈচিত্র্য ও রচনা-শৈলী আমাকে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে সন্ধিৎসু লিখিত 'মানুষগড়ার ইতিকথা' নামক নূতন বিভাগটি আমাকে এখন আকৃষ্ট করেছে সবচেয়ে বেশী। এই পর্যায়ের প্রতিটি লেখা আমি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি এবং প্রচুর আনন্দ আর তার সঙ্গে অনেক না জানা জিনিসও লাভ করেছি। সন্ধিৎসুর লেখাগুলি পড়ে মনে হল তিনি বিদ্যালয়গুলির স্থাপনাকালের ক্রমানুসারে সেগুলি প্রকাশ করছেন। তাই তাঁকে আমার একান্ত অনুরোধ তিনি যেন চন্দননগরের 'কানাইলাল বিদ্যামন্দির' বিদ্যালয়টির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে এই পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। বিদ্যালয়টির স্থাপনাকাল ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। আমি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম এবং ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করেছি। শুধু পঠনপাঠনই নয়, অন্যান্য নানাদিক থেকেও এই বিদ্যালয়টি নানা ঐতিহ্যের অধিকারী।

অশোক বিশ্বাস
কলকাতা—৪

(৪)

'অমৃতের ১৩ই ভাদ্র সংখ্যায় 'মানুষ-গড়ার ইতিকথায়' হাওড়া জেলা স্কুলের কথা পড়লাম। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আপনাকে জানাচ্ছি। আমি ইং ১৯১৪ সালের প্রারম্ভে হাওড়া জেলা স্কুলের সর্ব-নিম্ন ক্লাসে (তৎকালীন সপ্তম-বি এবং

বর্ত্তমান ক্লাশ থ্রি) ভর্ত্তি হই। অমৃতের লিখিত বর্ণনায় মনের স্মৃতিপটে অনেক কথারই উদয় হয় এবং তা আপনার মারফৎ প্রকাশ করছি। আমি অবশ্য 'ভে এম মুখার্জি' মহাশয়ের সময় ভর্ত্তি হই। প্রথম-বার দিনে আমার অল্পবয়সের কথাবার্ত্তায় তিনি আমাকে ভর্ত্তি করে নেন। সে সময় তাঁর চারটি পুত্র স্কুলে পড়ছিলেন। চতুর্থ পুত্র শ্রীজগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি বর্ত্তমানে হাওড়ার খ্যাতনামা দন্তচিকিৎসক, আমার সহপাঠী ছিলেন। দীর্ঘ কয় বৎসর পাঠ্যাবস্থায় বহু সহপাঠীর কথা আজ মনে পড়ে। কেউ জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, কেউ পারেন নি। কেউ-বা গত হয়েছেন। একজন ছাত্র শ্রীসত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ থেকে উচ্চ পদে কাজ করে অবসরগ্রহণ করেছেন।

শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় হাওড়া জেলা স্কুল ছেড়ে আই আর বেলেলিয়াস ইন্‌স্টিটিউশানে যান। সে সময়ে নরসিংহ দত্ত কলেজের কোন অস্তিত্বই ছিল না। বর্ত্তমান কলেজবাড়িতে বেলিলিয়াস সাহেবের বন্ধ্যা পত্নী থাকতেন (তাঁরা ইহুদী ছিলেন)।

স্কুলের প্রথম ডিসিপ্লিন শিক্ষা আরম্ভ হয় শ্রীবৈদ্যনাথ রায় মহাশয়ের আমলে। তিনি ক্লাশ আরম্ভ হবার ঘন্টা পড়লে বাইরের মাঠে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছাত্রদের একে-একে ক্লাশের মধ্যে ঢোকার ব্যবস্থা ক'রে যান এবং ছুটি হলে এইভাবেই একে-একে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৯১৫ সালে স্কুলের মেন বিল্ডিং-এর পশ্চিমের দ্বিতল বাড়ীর দুইখানা ঘরে ম্যানুয়াল ট্রেনিংয়ের ক্লাশ খোলা হয়। আমাদের নিজের হাতে তৈরি বহু কাঠের সামগ্রী স্মৃতিস্বরূপ সেই সব কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হাওড়া ময়দানে যে সম্মেলন ও প্রদর্শনী হয় এবং যাতে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান বক্তা হন, সেখানে হাওড়া জেলা স্কুলের একটি দোকান নেওয়া হয়েছিল। ছেলেদের হাতে তৈরী বহু সামগ্রী সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল।

আমার মনে পড়ে শ্রীআদ্যনাথ রায় একবার ছেলেদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য পরীক্ষার সময় বিনাগার্ডে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আরও কয়েকটি কথা মনের স্মৃতিপটে জেগে উঠল। এই স্কুলে শ্রীপুলিনবিহারী দে সে সময় ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটিতে ইংরাজীতে ৯০ শতাংশেরওপর নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। শ্রীরূপে-কেতন হাজরা এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন, যিনি আই সি এস পাশ করেছিলেন। আমাদের পরবর্তীকালে স্বর্গত সুব্রত মুখোপাধ্যায় ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এই স্কুলেরই ছাত্র ছিলেন। শীল পরিবারের শ্রীনারায়ণলাল শীল ও শ্রীমদনাথ শীল কিছুদিন আমাদের সহ-পাঠী ছিলেন। বিখ্যাত অভিনেতা শিশির ভাদুড়ী এবং তাঁর ভ্রাতা এক বৎসর এই স্কুলে ছিলেন। হাওড়া মোটরের শ্রীসুনীল-কুমার দে বাল্যকাল থেকে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন।

স্কুলের উত্তর দিকের হাওড়া পোস্ট-অফিসের সংলগ্ন দ্বিতল বাড়ীটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হয়।

স্বর্গত জোটিলাল দত্ত (জ্যোতিলাল নয়) হাওড়ায় ঈশ্বর দত্ত লেনে পৈতৃক বাড়ীতে থাকতেন এবং তিনি ঈশ্বর দত্তের পুত্র ছিলেন। আজ আমার সেই সব শিক্ষক-দের স্নেহ ও শিক্ষাধারা মনে পড়ে। স্কুলে আমাদের কিরূপে ভালবাসার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন মনে করে মনে আনন্দ পাই ও তাঁদের সকলকে প্রণাম জানাই। শ্রীকালীনাথ আঢ্য মহাশয়ের সঙ্গে কিছুদিন পূর্বে সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তিনি আমাদের যথেষ্ট আশীর্বাদ করলেন।

শিশিরকুমার ঘোষ
জগজ্জীবননগর, ধানবাদ

কেয়াপাতার নৌকো

সাপ্তাহিক 'অমৃতে' প্রকাশিত 'কেয়া-পাতার নৌকা' উপন্যাসটির জন্যে লেখক শ্রীপ্রফুল্ল রায়কে আমাদের ধন্যবাদ এবং আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাবেন। লেখকের রচনা-শৈলী অনবদ্য। এটাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের উপন্যাস বললে ভুল বলা হবে না। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রই যেন আমাদের অতিপরিচিত, অতিনিকটের। বিশেষ করে বিনুর চরিত্র, কী এক মায়ায় যেন জড়িয়ে গেছি ওর সঙ্গে। মনে হয়েছে এ যেন আমাদেরই দ্বিতীয় কোন সত্তা। আর সুরমা? সে যেন আকাশময় সোনা ছড়িয়ে দেওয়া বিদায়সূর্য। ফলে তার জন্য আশ্চর্য বিষণ্ণতায় অশ্রুসজল হয়ে উঠি।

অমৃতের ক্রমোন্নতির জন্যে কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

তুষারকান্তি দে ও প্রাক্তনী দে
হাওড়া—৪

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আপনাদের নববর্ষ, ২০ সংখ্যার পত্রিকাটিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে একটি ত্রুটি চোখে পড়ল। পৃষ্ঠা ৫৮৮-এর শেষ পর্যায়ে লেখা আছে—'বিপ্রদাসের' ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটেছিল বিপ্লবীদের মাসিক পত্র 'বেণু'তে। কিন্তু 'বিপ্রদাসে'র ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটে 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। সালটা যতদূর মনে পড়ে ১৩৩৫ সাল। ঐ মাসে ঐ পত্রিকার ঐ সময় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালি', রবীন্দ্র-নাথের 'যোগাযোগ', উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্তরাগ' উপন্যাস ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে' ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ হচ্ছিল। এ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টিদানের অপেক্ষা রাখি।

জনৈক পাঠক
জলপাইগুড়ি

পাহাড়ে মেয়েরা

বহুদিন পূর্বে কয়েকটি সংখ্যায় এই লেখাটি পড়ে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। বাঙালী মেয়েরা পর্বতারোহণ শিক্ষা করছে এতে আনন্দ এবং গর্ব অনুভব করছি। এ বিষয়ে আমার কোনরূপ ধারণা নেই। গঙ্গোত্রীর পর্বত অভিযান আমি খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়েছি। এ সম্বন্ধে আরো একটু বিশদভাবে লিখলে আনন্দ পেতাম। অভিযাত্রিনীরা গঙ্গোত্রী যাওয়া এবং আসার পথে দিল্লীতে কখনও পদার্পণ করেন কিনা জানি না। করলে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের মুখ থেকে প্রত্যক্ষ বিবরণ শোনা যেত। আমাদের সমিতির প্রত্যেকেই এ বিষয়ে খুব আগ্রহী।

শোভা সেনগুপ্ত
নিউ দিল্লী—২৩

বইকুণ্ঠের খাতা

৯ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১৩৭৬ সালের ১২ ভাদ্র শুক্রবারের অমৃতে বৈকুণ্ঠের খাতায় বিশেষ প্রতিনিধি মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনায় ৩৪৬ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বিষয়টি লিখেছেন ঃ রমেশবাবু প্রতিনিধি মহাশয়কে বলেছেন — বৈদিক সাহিত্যে, পুরোহিত নারীকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বামী-ছাড়া আর ক'জন পুরুষের সঙ্গে তিনি সহবাস করেছেন? নারী উত্তর দেন—পাঁচজন। এই স্বীকৃতির ফলেও নারী সমাজচ্যুত হন নি।

বৈদিক সাহিত্যের কোথায় পুরোহিতের এই জিজ্ঞাসা এবং নারীর এই উত্তর আছে জানতে ইচ্ছা করি।

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়
আলিকপাড়া, মেদিনীপুর

সাদা চোখে

ফি-বছর ধান কাটার মরশুম শুরু হওয়ার আগে মারপিটের আশংকা প্রবল হয়ে উঠে। এবং এ আশংকা অমূলকও নয়। কারণ, অবিভক্ত বাংলায় ধান কাটাকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের চরের জমির ফসল ঘরে তোলার ব্যাপার নিয়ে যদি সংঘর্ষে বেশ কিছু লোক না মরত তবে দারোগাবাবুদের দুঃখের সীমা থাকত না। কারণ, আইনশৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা তাঁরা যথাযথ পালন করার সুযোগ তাহলে পেতেন না এবং বামহস্তও সঙ্কুচিত করে রাখতে হত। কাজেই ফসল কাটার মরশুমে সংঘর্ষ কিছু নতুন নয়।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এবার ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে জোর লড়াই হবে বলে ইতিমধ্যেই অনেকে ভীষণ আশংকা প্রকাশ করেছেন। আগে আগে অত্যাচারী জমিদাররা প্রজার কাছ থেকে ফসল কেড়ে নিতেন আর গুন্ডা দিয়ে দুর্বিনীত প্রজাদের শায়েস্তা করে রাখতেন এমন কি দরকার হলে সাধনোচিত ধামে পাঠাতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামে গ্রামে কিষাণরা সংগঠিত। জমিদার এখন জোতদারে রূপান্তরিত। আবার কিষাণ তথা মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিরা সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তবুও এবার জোর আশংকা ইতিমধ্যে খবরের কাগজে স্থান পেয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার এই সম্ভাব্য হাংগামা ও সংঘর্ষ দমনে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন, আবার যুক্তফ্রণ্টের বিভিন্ন শরিক দলগুলি নতুন করে শপথ নিয়ে বলেছেন যে, তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়াবেন যাতে কিষাণকুল তাঁদের ন্যায্য ফসল গোলাজাত করার ব্যাপারে বাধাবিপত্তির সম্মুখীন না হন। ফ্রণ্ট সরকার যাঁরা কৃষকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার দুরভিসন্ধি পোষণ করছেন তাঁদের সমুচিত সাজা দেবার মানসে ইতিমধ্যেই পুলিশ-বাহিনীকে কিভাবে ব্যূহ রচনা করে এগিয়ে যেতে হবে তার নির্দেশও দিয়েছেন। আবার কোন কোন জিলায় অর্থাৎ যেখানে নকশাল-পন্থীরা কব্জা জমিয়েছেন বলে পুলিশী-সূত্রে গোপন রিপোর্ট লালদীঘিতে এসে পৌঁচেছে সেখানে আরও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ধান কাটা মরশুমের মারপিটের খতিয়ান দেখলে বিগত কয়েক বছরে তেমন কোন ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। অবশ্য এমনও হতে পারে যে তখন হয়ত মেহনতী মানুষের সরকার গদীতে না থাকার ফলে যা ঘটেছে তা আলোকে আসে নি। এবার যেহেতু শ্রমিক-কৃষকের নিজেদের লোকেরা রাষ্ট্রের কর্ণধার সেইহেতু জোতদারদের সম্ভাব্য ভয়ংকর আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য আগে থেকেই যুগপৎ মানসিকতা ও প্রকল্প প্রস্তুতির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। অবস্থা-দৃষ্টে মনে হয় এবার যদি জোতদাররা অন্যায় কিছু করবার এতটুকু চেষ্টা করেন তবে ধনেজনে সর্বনাশ অপরিহার্য। অতএব, জোতদার শ্রেণী সাবধান।

এত ঘটা করে ধান কাটা মরশুমের সংঘর্ষ দমাবার পরিকল্পনা ঘোষণা করা সত্ত্বেও একটি প্রশ্ন হয়ত স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগে যুক্তফ্রণ্টের শরিকরা সকলে একতাবদ্ধ থাকলে কি জোতদাররা এহেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষককুলকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে সনাতন পদ্ধতিতে বঞ্চিত করবার সাহস করবেন। গুণীরা যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন পশ্চিমবঙ্গে ফ্রণ্টের প্রায় সমস্ত শরিক একজোট হয়ে হালফিল অনেকগুলি ধর্মঘট করেছেন বিভিন্ন শিল্পে। যথা, পাট, চা, ইঞ্জিনীয়ারিং ও বস্ত্র ইত্যাদি। এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেছেন। এই সমস্ত শিল্পে একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং ছাড়া—শ্রমিকদের চেয়ে মালিকরা বেশী সংঘবদ্ধ। তবুও সরকারী আনুকুল্য ও শ্রমিক ঐক্যের একাত্মতার সামনে মালিকরা দাঁড়াতে পারেন নি। হার স্বীকার করতে হয়েছে। অতীতে দেখা গেছে এ হেন লড়াই কখনও কখনও সংগঠিত হয়েছে তবে মালিকশ্রেণীর সংঘবদ্ধতা শ্রমিক লড়াই ব্যর্থ করে দিতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু জমির প্রশ্নে জোতদাররা তেমন সংগঠিত নন। অদ্যাবধি যা আলোকে এসেছে একমাত্র বর্ধমানেই জোতদাররা নাকি "সবুজ সেনা" তৈরী করে যুগপৎ আক্রমণ ও আত্মরক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। কাজেই এই পটভূমিকায় চিন্তা করলে পশ্চিমবাংলার কৃষক জমায়েৎগুলি অনেক সংঘবদ্ধ। তদুপরি সরকারী ছত্রছায়া থাকার ফলে কিষণারা আরও অধিক বলবান। অতএব, কৃষকদের ন্যায্য পাওনা থেকে জোতদার বঞ্চিত করবার সাহস এখনো রাখেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। অবশ্য, মরণ কামড় যে দেবে না একথা খুব জোর করে বলা যায় না। বরং শেষ আঘাত হানার চেষ্টা স্বাভাবিক।

কিন্তু 'সমদর্শী'কে প্রতিক্রিয়াশীল কি প্রগতিশীল যে নামেই আখ্যাত করুন না কেন—সমদর্শী যে আশংকা করছে সেটা হচ্ছে—ধান কাটার মরশুমে শরিকী লড়াই আরও জোরদার হবে। আর সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, জমি দখলের লড়াই যেখানে হয়েছে সেখানে জোতদার দু' একজন মরেছে কিনা সন্দেহ। মরেছে ফ্রণ্টের শরিক দলের সভ্য ও সমর্থকরা। নিশ্চয় একথা সত্য যে, জমি জোতদারের। কাজেই দখলের লড়াইয়ে বঞ্চিত হবার ব্যথায় জোতদারই লড়াই করার কথা, কিন্তু দেখুন লড়াই করল ফ্রণ্ট শরিকরা। মরল তারা। এই ঘটনার অর্থ করলে এই দাঁড়ায় যে, হয়ত জোতদারের জমি দখল করে কোন দলের লোকেরা ভোগে লাগাবে এই জন্য শরিকী লড়াই—নয়ত জোতদার কোন দলে মিশে গিয়ে পার্টির বেনামে জমি রক্ষার লড়াই লড়ে যাচ্ছেন। এই দুই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যা করা খুবই শক্ত ব্যাপার। যাহোক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করলে ঘটনাটা এইভাবে বলা যায়—অর্থাৎ দলীয় শক্তিবৃদ্ধির জন্য বা অন্য দলকে উৎখাত করার জন্য জমি দখলের মাধ্যমে ক্ষমতাবৃদ্ধির লড়াই। এ সংগ্রাম পশ্চিমবাংলায় তীব্রভাবে চলছে—তবু জমির ক্ষেত্রে নয়—শ্রমিক ইউনিয়নের দখলের ব্যাপারেও একই রকম সংগ্রাম চলছে। এবং উভয় ক্ষেত্রে মালিক বা জোতদারের গায়ে আঁচ লাগছে না। মরছে, গৃহহীন আর সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাধারণ কৃষক আর মজুর। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা যেখানে জমি দখলের লড়াই তীব্র আকার ধারণ করে তীব্রতরভাবে শরিকী সংঘর্ষে পর্যবসিত হয়েছে সেখানেও অনেক কৃষকের বাড়ী পুড়ে ছাই হয়েছে। প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট দলের নেতারা বিবৃতি মারফৎ এই অভিযোগই উত্থাপন করেছেন যে, অন্য দল জোতদারদের সঙ্গে যোগসাজসে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করেছেন। যে দলের প্রচারযন্ত্রের উপর কণ্ট্রোল বেশী কিম্বা সাংবাদিকদের নয়া ব্যবস্থা মোতাবিক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন তাঁরাই দুর্বল দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন যে, দুর্বল দলপতিদের মালিকের সঙ্গে যোগসাজস আছে বলেই এই সমস্ত বিশৃংখলা ঘটছে। নতুবা শ্রেণী সংগ্রাম ঠিক পথেই চলত। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে ঘরবাড়ী যাঁদের পুড়ে গেল তাঁরা সেই মেহনতী মানুষই।

আসানসোলে হালফিল এস এস পি, সি পি আই ও বাংলা কংগ্রেসের বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে মার্কস্ট কম্যুনিস্ট-দের জোর লড়াই হয়েছে। মার্কস্ট নেতারা অভিযোগ করছেন যে, তাঁদের প্রতিপক্ষ দলগুলি মালিকের সঙ্গে যোগসাজস করে খনি অঞ্চলে তান্ডব শুরু করেছেন। আর তাঁরা শ্রমিকদের হয়ে এই চক্রান্ত ভেঙে দিচ্ছেন বলেই অন্যরা তাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করছেন। শ্রীপুর কয়লাখনি অঞ্চলে সম্প্রতি যে নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল যে কোন সত্য মানুষের সেই ঘটনার নিন্দা করবার মত ভাষা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একজন ফ্রণ্টমন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে, সাক্ষ্যসবুদ সংগ্রহ করে বলেছেন যে, কারফিউকে উপেক্ষা করে পুলিশের উপস্থিতিতে মার্ক্সিস্টরা শ্রীপুর কয়লাখনি অঞ্চলের শ্রমিকদের উপর আক্রমণ চালায়। প্রায় একশত শ্রমিকের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রায় দুশো ঘর লুণ্ঠন করা হয়েছে। এমনকি মেয়েদের অলঙ্কারাদি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীকে একজন "মিথ্যুক" বলে প্রতিপন্ন করে দিলেন বর্ধমানের জেলাশাসক শ্রীতরুণ দত্ত। মার্কিস্টমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার শ্রীতরুণ দত্তের রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেছেন যে, শ্রীদত্তর রিপোর্ট থেকে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, শ্রীধাড়ার বক্তব্য সম্পূর্ণ অসত্য। জেলাশাসক বড় না মন্ত্রী বড় কিম্বা জেলাশাসক মিথ্যাবাদী কি মন্ত্রী মিথ্যাবাদী এই প্রশ্নে না গিয়ে যে কথা জনসমক্ষে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস পাব সেটা হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন দলীয় নেতার বক্তব্য সত্ত্বেও একটা সত্য থেকে যাচ্ছে যে, আসানসোল রেলওয়ে স্টেশনে ও অন্যান্য প্রান্তে অনেক সহস্র শ্রমিক পরিবার অনাহারে, অর্ধাহারে দিন যাপন করছেন। আর তারা আসা—শ্রীপুর গ্রুপ কোলিয়ারীর শ্রমিক অত্যাচারিত হয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছেন। শ্রীপুর কোলিয়ারীর ইস্ট নিমচা ও খাণা ইত্যাদি খনিতে মার্কিস্টদের ইউনিয়ন আছে বলে তাঁরাও দাবী করেননি। মার্কসবাদীরা শুধু চেয়েছেন মালিকের সংগে প্রতিপক্ষ দলগুলির যোগসাজস ভেঙে দিয়ে সুস্থ শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করবার জন্য। কিন্তু সুখের বিষয় শ্রীপুর গ্রুপ কয়লাখনির মালিক-গোষ্ঠী আগুনের আঁচ লাগে নি। শুধু কয়েক সহস্র শ্রমিকই সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এবং এই শাস্তি নিশ্চয় তাঁদের প্রাপ্য। কারণ কোন সাহসে এতদিন তারা মালিকের সংগে যোগসাজস করে শ্রমিক আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিচ্ছিলেন? অতএব, এই সংগ্রামে শ্রমিকদের সাজা পাওয়া যে একান্ত কর্তব্য কোন সুখের বিপ্লবীও এর যাথার্থ্য অস্বীকার করতে পারবে না। পারবে কি?

সামনের ধান কাটার মরশুমেও এহেন শ্রেণীসংগ্রাম চলবে বলে অনেকে আশংকা করছেন। বিশেষ করে ছোট ছোট শরিকগুলি বর্তমানে রীতিমত ভাবনায় পড়েছেন। তাঁরা অনেকেই মনে করছেন যে জমি দখলের লড়াইএ যে পুলিশবাহিনী অংশ গ্রহণ করে মার্কিস্টদের শ্রেণীসংগ্রামের সামিল হয়েছিল ঠিকভাবেই ফসল কাটার সময়ও একই ভূমিকা গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে অভিযোগ প্রবলতর হয়েছে যে সুযোগ বুঝে জোতদাররা ক্ষমতাশালী দলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কাজেই যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের পূর্বাহ্নেই সতর্কমূলক ব্যবস্থার তথাকথিত ঘোষণা—শরিকী লড়াই থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টামাত্র বলেই অন্য শরিকের কিছু কিছু অংশ মনে করছেন। এবং তাঁদেরও ঘোষণা যে তাঁরাও কৃষকের সংগে থাকবেন—তার অর্থ এই যে তাঁদে দলের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষক সংগঠনগুলি যে জমি দখল করেছে তার ফসল অন্য দলের কৃষকরা কাটতে এলেই লড়াই বাঁধবে। কাজেই পরিবেশ দেখে মনে হচ্ছে ধান কাটার মরশুমে যে লড়াই হবে সেখানে জোতদারের ভূমিকা গৌণ। আসলে শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম চলবে। আর ফ্রন্টের কিছু শরিকের ভাষায় বলতে গেলে পুলিশ-বাহিনী এই শ্রেণীসংগ্রামের নয়া হাতিয়ার মাত্র।

এই ভয় করেই এবং গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই প্রায় সমগ্র সক্রিয় ফ্রন্টশরিক স্বরাষ্ট্র পুলিশ দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করতে চেয়েছেন এবং দ্বিধাহীনচিত্তে পুলিশকে যে সোজাসুজিভাবে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির দলীয় স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগানো হচ্ছে—এই অভিযোগ আনা হয়েছে। মার্কসবাদী দলের সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত স্বরাষ্ট্র দপ্তর সম্পর্কে আলোচনা তোলার পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে যতই আলোচনা করুন না কেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) দপ্তর ছেড়ে দেবে না। তাঁদের অন্যতম নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙার হুংকার দিয়ে বলেছেন, যদি তাঁর দলকে বাইরে রেখে অন্যরা সরকার গঠনে প্রয়াসী হন তবে পশ্চিমবাংলায় মিলিটারী শাসন চালু রাখতে হবে। অর্থাৎ পুলিশ দপ্তর নিয়ে মনকষাকষি এমন পর্যায়ে এসেছে যে যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়ত আত্মহত্যাও করে বসতে পারে। তবে গোটা ভারতের রাজনৈতিক পরিবেশ যে রূপ রঙ ধারণ করেছে তা থেকে মনে হয় আত্মহত্যা না করে শুধু হত্যার পথেও ফ্রন্ট সরকার এগিয়ে যেতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিভিন্ন শরিকরা পুলিশ নিয়ে দিন ধার্য করেও আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে উঠতে পারছেন না। কারণ, অন্য ফ্যাকড়া উঠে সব বিসমিল্লা গলদ হয়ে যাচ্ছে। বাংলা কংগ্রেসের যে প্রস্তাব এবং তথ্য তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ব্যর্থতা প্রমাণ করা। কিন্তু বুদ্ধিমান শ্রীসুকুমার যে সমস্ত দল ঐ সমস্ত তথ্যের পক্ষে যেতে পারেন তাঁদের আন্দাজ করে নিয়েই আগেভাগে সমস্ত দলকে "জনবিরোধী" আখ্যা দিয়ে লড়াইয়ের পরিধি বিস্তৃত করে দিলেন। ফলও হাতে হাতেই পাওয়া গেছে। কেন আমাদের "জনবিরোধী" বলা হল তার কৈফিয়ৎ তুলবেই দিন যায়—রাত আসে। এমনিভাবেই বর্ষ গড়িয়ে যাচ্ছে। আর যুক্তফ্রন্টও চলছে। এর ফাঁকে আসল প্রশ্নই ধামাচাপা পড়ে গেল।

শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির যাঁরা সন্ধান রাখেন তাঁরাই জানেন শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেই মালিকরা প্রায়ই লক-আউট ঘোষণা করেন। আর সংগে সংগেই শ্রমিক আন্দোলনের মোড় ঘুরে যায়। অর্থনৈতিক দাবীদাওয়া ছেড়ে তখন লক-আউট তুলতে তুলতে হবে বলে শ্লোগান উঠে। আর আখেরে লক-আউট তোলার প্রশ্নকেই কেন্দ্র করে চুক্তি হয়। দাবীদাওয়া একআধটুকু পাওয়া গেলেও ভাল। না হলেও চলে। ঠিক এমনিতরভাবেই তখন কেন আমাদের "জন-বিরোধী" বলা হল তার জন্য ক্ষমা চাও—ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলন শুরু হলো। আর পুলিশের ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে যে মূল আলোড়ন চলছিল তা ধামাচাপা পড়ে গেল। সত্যিই মার্কস-বাদীরা ডায়েলিকটিক্স আয়ত্ত করেছেন। তা না হলে ব্যুরোক্রাটরা ও পুলিশরা যা রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন তাই কিভাবে সত্য বলে চালাতে পারছেন। ১৯৬৭ সালে শ্রীঅজয় মুখার্জির পুলিশের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল এখনও তাই আছে। তবু বর্তমানে তা ধোপে টিকছে না যে। কারণ, ইতিমধ্যে ব্যুরোক্রাটদের ও পুলিশের মনে যে বিপ্লব হয়েছে তা তাঁদের সংগে কথা বললেই বুঝতে পারবেন। কিছুদিন আগেও যাঁরা গান্ধীদর্শন সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করতেন তাঁরা এখন মার্কবাদ-লেনিনবাদ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। একেই বলে বিপ্লব! নিয়তির পরিহাস নয়?

দেশে বিদেশে

কেরলে দ্বিতীয়বার

কেরলে দশ বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার শ্রীই এম শঙ্করম্ নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার পতন ঘটল এবং চেষ্টা করলে ১৯৫৯ ও ১৯৬৯ সালের এই দুই ঘটনার মধ্যে ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির কিছু উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। যথা :—

প্রথম, ১৯৫৭ সালে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কেরলে যে প্রথম কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল তার হাজার রাত্রি কাটেনি; এবারও হাজার রাত্রি প্রভাত না হতেই বিদায়। গতবারে আয়ু ছিল ৮৪৬ দিন, এবার ৯৬৪ দিন।

দ্বিতীয়, সেবারকার মন্ত্রিসভার পতনের আগে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি অভিযোগ এসেছিল এবং কম্যুনিস্ট শাসনে রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে সমালোচনা হয়েছিল। এবারও একই ধরণের অভিযোগ এসেছে।

দুই দশকের ঐ দুই ঘটনায় মিল অবশ্য ঐ পর্যন্তই। বাকী সবটুকুই গরমিল। যথা :

প্রথম, সেবার শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির আদেশে বরখাস্ত হয়েছিলেন। এবার বিধানসভার ভোটে মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ ও তাঁর সমর্থকদের হার হয়েছে।

দ্বিতীয়, সেবার বিধানসভায় সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মন্ত্রিসভার সমর্থক দল শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল। এবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্ট শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকল না।

তৃতীয়, সেবার নাম্বুদ্রিপাদের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এসেছিল দলের বাইরে, প্রধানত কংগ্রেসের তরফ থেকে। এবার অভিযোগগুলি এসেছে যুক্তফ্রন্টেরই শরিক দলগুলির ভেতর থেকে। সেবার কেরলের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে কি স্থানীয় কংগ্রেসের, কি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল মুখ্য ও প্রত্যক্ষ। এবার তার যদি কোন ভূমিকা থাকে—ত্রিবান্দ্রমেই হোক অথবা নয়াদিল্লীতেই হোক—তাহলে তা নিতান্ত গৌণ ও পরোক্ষ।

দশ বছর ব্যবধানে এই দুই ঘটনার কতকগুলি তাৎপর্য ইতিমধ্যে পরিস্ফুট। সেদিন শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ লাভ করেছিলেন শহীদ হওয়ার মর্যাদা আর এবার তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে কিছুটা পরাজয়ের অমর্যাদা। সেদিন কেরল মন্ত্রিসভার পতন দেশের রাজনীতিকে কংগ্রেস-সমর্থক ও কংগ্রেসবিরোধী দুই মেরুতে বিভক্ত হতে সাহায্য করেছিল আর আজকের এই পতন বামপন্থী শিবিরের অনৈক্যকে প্রকট করে তুলে ঐ মেরু-বিভাগের প্রক্রিয়ায় ভাটার টান আনছে। সেদিন ভারতীয় রাজনীতির মূল কথাটা ছিল নেহরু-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের আধিপত্য আর আজ ভারতীয় রাজনীতির মূল ঘটনা হতে চলেছে বিভক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির দুই অংশের তাত্ত্বিক বিরোধ ও বাস্তব দ্বন্দ্ব।

প্রকৃতপক্ষে, কম্যুনিস্ট পার্টির ঐ দুই অংশের অর্থাৎ সি পি এম ও সি পি আই-এর বিরোধ এবার কেরলের যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপর প্রায় প্রথম থেকেই একটা গভীর ছায়া বিস্তার করে রেখেছিল। সি-পি-আই দলভুক্ত শিল্পমন্ত্রী শ্রীটি ভি টমাস রাজ্যে শিল্পবিস্তারের জন্য জাপানের সহযোগিতা লাভ করার চেষ্টা করেছেন, সি-পি-এম সেজন্য তাঁর সমালোচনা করেছে। ঐ দলেরই অন্তর্ভুক্ত কৃষিমন্ত্রী শ্রীএম এন গোবিন্দন ফসল বাড়াবার উদ্দেশ্যে খেত-খামারে কলের লাঙল চালু করার চেষ্টা করেছেন, কৃষি শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়বে বলে সেই চেষ্টায় বাধা দিয়েছে সি পি এম। ইডিক্কি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ধর্মঘট করিয়ে ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত করিয়ে মার্কসবাদী-প্রভাবিত ইউনিয়ন শিল্পমন্ত্রী শ্রীটমাসকে অপদস্থ করার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ হয়েছে, সি-পি-এম দলভুক্ত রাজস্বমন্ত্রী শ্রীমতী গৌরী টমাস বেছে বেছে তাঁর নিজের দলের লোকদের মধ্যে জমি বিলি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ হয়েছে।

শুধু কার্যপদ্ধতি নয়, মূলগত নীতি নিয়েও দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ হয়েছে। সি-পি-এম যখন বলেছে যে, ভিতর থেকে সংবিধান ধ্বংস করার জন্যই তারা সরকার গঠন করেছে তখন সি-পি-আই এই বিশ্বাস ঘোষণা করেছে যে, সংবিধানের যেসব ভাল দিক রয়েছে সেগুলির সাহায্যে জনসাধারণের যথাসম্ভব কল্যাণ করা ও তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে সাহায্য করাই যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের উদ্দেশ্য। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি যখন কেন্দ্র-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তুলতে চেয়েছে তখন ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি কেরলে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে নিজেদের কলহবিবাদ দূর করার উপর জোর দিয়েছে।

কেরলের যুক্তফ্রন্টের ভিতর যতক্ষণ মুসলিম লীগ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির দিকে ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য সি-পি-আইয়ের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার পক্ষে ভয়ের কারণ ছিল না। মুসলিম লীগ শেষপর্যন্ত কেন সি-পি-এম-এর পক্ষ ত্যাগ করল তার কোন নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছে, মুসলিমপ্রধান মালাপ্পুরম্ জেলার পত্তন করিয়ে নেওয়ার পর নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের কাছ থেকে মুসলিম লীগের আর কিছু পাওয়ার ছিল না। অপর দিকে এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কৃষি সংস্কার বিল গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার পরই বড় বড় মুসলিম ভূম্যধিকারীদের স্বার্থে মুসলিম লীগ পক্ষ পরিবর্তন করেছে।

এবিষয়ে ভুল নেই যে, কেরলে সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে সি-পি-আই। সি-পি-আই যে শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে তার কারণ হচ্ছে, তারা ফ্রন্টের মধ্যে সি-পি-এমকে কোণঠাসা করতে সমর্থ হয়েছে। ২৪ অকটোবর বিধানসভায় নাম্বুদ্রিপাদ শেষবারের মত যে ভোটাভুটির সম্মুখীন হলেন তাতে দেখা গেল, সি পি আই-এর সঙ্গে সামিল হয়েছে মুসলিম লীগ, আর-এস-পি ও আই-এস-পি এবং মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে রয়েছে কেরল
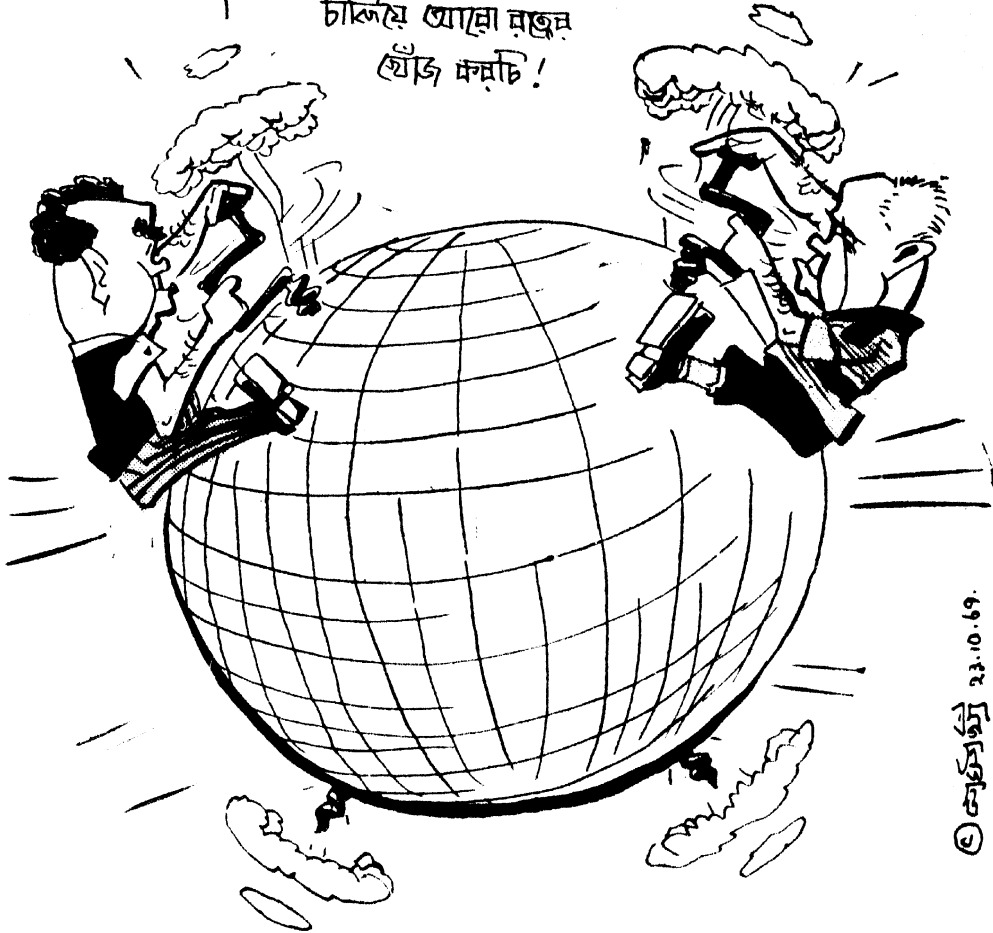
সোস্যালিস্ট পার্টি ও কার্যক তোড়িলাশি পার্টি নামে দুটি ক্ষুদ্র দল এবং সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের যে ভগ্নাংশ এখনও ঐ রাজ্যে এস-এস-পি-র নামে কাজ করছেন তাঁরা (অন্য একটি ভগ্নাংশ ভারতীয় সমাজ-তন্ত্রী দল বা আই-এম-পি নাম নিয়ে কাজ করছিলেন)।

সি-পি-আই-এর দিককার ঐ চারটি দলকে সংবাদপত্রে যুক্তভাবে নাম দেওয়া হয়েছে 'মিনি-ফ্রন্ট' বা 'ক্ষুদে ফ্রন্ট'। এই ক্ষুদে ফ্রন্টের সবগুলি দলেরই একটা সাধারণ অভিযোগ ছিল এই যে, মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলগুলিকে কোনরকম পাত্তাই দিচ্ছে না এবং এমন কি তারা সরকারী যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে অন্যান্য দলগুলিকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। সি-পি-আই-এর তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সি-পি-এম দলভুক্ত পরিবহণমন্ত্রী শ্রীইমবিনি বাসা একজন কম্যুনিস্ট কর্মীর হত্যার ব্যাপারে জড়িত আছেন। আই-এস-পি দলভুক্ত অর্থমন্ত্রী শ্রীপি কে কুঞ্জু অভিযোগ করেছেন যে, যে-সরকারী কর্মচারীকে তিনি শাস্তি দিয়েছেন তাঁকে মার্কসবাদীরা প্রশ্রয় দিয়েছেন ও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছেন। মুস-লিম লীগের শ্রীসি এইচ মহম্মদ কয়া অভি-যোগ করেছেন, রাজ্যের ভিজিল্যান্স কমি-শনার যখন তখন যে কোন সরকারী দপ্তরে গিয়ে শাসিয়েছেন এবং এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করেছেন যেন মার্কসবাদী মন্ত্রীদের সম্মতি ছাড়া অন্য কোন মন্ত্রীর কথা সরকারী অফিসারদের শোনার দরকার নেই।

মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের প্রশ্নটি এই মার্কসবাদী প্রভুত্বপরায়ণতার অভিযোগের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল বলেই এই নিয়ে সংকট এমন তীব্র হয়ে উঠল এবং পরিণামে নাম্বুদিপাদ মন্ত্রিসভার পতন হটল। অভি-যোগ ছিল অনেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই। মার্কসবাদী দলের মন্ত্রীরাও বাদ ছিলেন না। বিধানসভায় ও বিধানসভার বাইরে উত্থাপিত এসব অভিযোগ আত্মীয়স্বজন অথবা দলের লোকদের সরকারী চাকরী বা ঠিকা পাইয়ে দেওয়ার, উৎকোচ গ্রহণ, সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি প্রসঙ্গ ছিল। কিন্তু ১০ মে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বেছে বেছে শুধু একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই অভিযোগ সম্পর্কেই তদন্তের আদেশ দিলেন। তিনি হলেন অর্থমন্ত্রী শ্রীপি কে কুঞ্জু। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি তদন্তের ভার দেওয়া হল কেরল হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতির উপর। প্রতিবাদ উঠল, বেছে বেছে একজন মন্ত্রীর সম্পর্কে অভিযোগ-গুলির তদন্ত করা হবে কেন? মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ বললেন, অন্যান্যদের সম্পর্কে অভিযোগগুলি পরীক্ষা করে তদন্ত করার মত কিছু পান নি। তিনি আরও বললেন—এবং তাঁর দল তাঁকে সমর্থন করলেন—কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করার মত অভিযোগ আছে কিনা তা মুখ্যমন্ত্রী ঠিক করবেন

তিনিই স্থির করবেন। অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা বললেন, শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ করছেন না। তিনি তাঁর দলের প্রতিনিধি রূপেই কাজ করছেন এবং যেহেতু তাঁর নিরপেক্ষতায় তাঁদের কোন আস্থা নেই সেহেতু কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তদন্ত করার মত কোন অভিযোগ আছে কিনা তা স্থির করার ভার মুখ্যমন্ত্রীর উপর ছেড়ে না দিয়ে সেই ভার একজন বিচারপতিকে দিতে হবে। সি-পি-এম বলল, বিচার বিভাগের অফিসারদের নিরপেক্ষতায় তাদের আস্থা নেই এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আচরণ সম্পর্কে তদন্তের ভার বিচারপতিদের উপর ন্যস্ত করতে তাদের আপত্তি আছে। সি-পি-এম একথাও বলতে আরম্ভ করল যে, মুখ্যমন্ত্রীর উপর আস্থা না থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হোক। একথা জানা ছিল যে, বিরোধী দলভুক্ত কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেস দলের সাহায্য না নিলে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগীদের ভোটে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সি-পি-এম বলল যে, মার্কসবাদীদের বাদ দিয়ে ও কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে কেরলে অন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য সি-পি-আই উদ্যোগী হয়েছে। মার্কসবাদীরা বললেন, এটাই হচ্ছে আসল কথা দুর্নীতির তদন্ত সম্পর্কে যে হাঁকডাক তোলা হয়েছে সেটা একটা আবরণ মাত্র।

শ্রীকুঞ্জুর বিরুদ্ধে তদন্তের আদেশ দেওয়ার তিনদিনের মধ্যে তিনি পদত্যাগ করলেন।

আগস্ট মাসে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন এবং পরে চিকিৎসার জন্য পূর্ব বার্লিনে গেলেন।

ইতিমধ্যে কেরলে শরিকী ঝগড়া বেড়ে চলল।

"ক্ষুদে ফ্রন্ট" বিধানসভায় আঘাত হানলেন ৩ অক্টোবর তারিখে। তাঁদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আনা হল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীবি উইলিংডন সম্পর্কে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত চাই। বিরোধী পক্ষ থেকে কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেস দল ঐ প্রস্তাব সমর্থন করল। বিধানসভায় দারুণ হৈ-হট্টগোলের মধ্যে স্পীকার শ্রীদামোদর পটু ঘোষণা করলেন যে, ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে।

শ্রীউইলিংডন নিজে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির লোক না হলেও তাঁর দল কার্যক তোড়িলালি পার্টির সঙ্গে সি-পি-এম-এর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। কেরলের প্রথম কম্যুনিস্ট মন্ত্রিসভার আমলে ইনি অবশ্য ঘোরতর কম্যুনিস্ট-বিরোধী ছিলেন এবং কম্যুনিস্ট-বিরোধী ফ্রন্টের নেতৃত্ব করেছেন। কিন্তু এবার তিনি ও তাঁর দল সম্পূর্ণরূপে সি-পি-এম-এর ছত্রছায়ায়। তাঁকে আক্রমণের লক্ষ্য করে "ক্ষুদে ফ্রন্ট" একটি রাজনৈতিক চাল চাললেন। তাঁরা সঠিকভাবেই অনুমান করলেন যে, সি-পি-এম তাদের এই সমর্থককে রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলবে।

সি-পি-এম প্রথমে বলবার চেষ্টা করল যে যেহেতু ভোট নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় নি সেহেতু ৩ অকটোবরের প্রস্তাবটি বৈধভাবে গৃহীত হয় নি এবং মন্ত্রিসভা ঐ প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য নন। তারা স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনারও উদ্যোগ করল। কিন্তু পরে সি-পি-এম তাদের মনোভাব বদল করল। ১০ অকটোবর রাজস্বমন্ত্রী শ্রীমতী গৌরী টমাস বললেন যে, সমস্ত দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কেই অনুসন্ধান করা হবে।

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদের দেশে ফেরার সময় হল। আশা করা হতে থাকল, তিনি তিনি ফিরে এসে এই সংকট থেকে পরিত্রাণের একটি সূত্র খুঁজে বের করতে পারবেন। ১৩ অকটোবর শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ত্রিবান্দ্রমে পৌঁছলেন। ১৫ অকটোবর সি-পি-এম-এর সঙ্গে সি-পি-আইয়ের একটি বৈঠক হল, কিন্তু তাতে ফল কিছু হল না। ১৭ অকটোবর মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে শ্রীউইলিংডনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত হবে; তবে তাঁর সঙ্গে আরও তিনজন মন্ত্রীকে তদন্তের সম্মুখীন হতে হবে। ঐ চারজন হলেন সি পি আই-এর শ্রী এম এন গোবিন্দন নায়ার ও শ্রী টি ভি টমাস এবং আই এস পি'র শ্রী পি আর কুরুপ।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হল দ্রুত ও তীব্র। ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষুদে ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত সব কয়টি দলের সব কয়জন মন্ত্রী (মোট চারজন) ইস্তাফা দিলেন। 'স্বাধীনভাবে তদন্তের সম্মুখীন হওয়ার জন্য' শ্রীউইলিংডনও পদত্যাগ করলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার উপর বিতর্কে যোগ দিয়ে শ্রী টি ভি টমাস বললেন, 'কেরলের জন্য আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু আমি লজ্জাবোধ করি এই কারণে যে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন, তাঁর নিজের দলের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির ওজন অন্যান্য দলের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির তুলনায় রতি-খানেক কম।'

তিন দিনব্যাপী ঐ বিতর্কের শেষে এল নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার পতন। সি পি আই-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব আনা হল যে, নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রীসভার বাকী চারজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও (মুখ্যমন্ত্রী বাদে) অভিযোগের তদন্ত করা হোক। 'ক্ষুদে ফ্রন্ট'-এর সদস্যরা এবং কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেসের সদস্যরা একযোগে ভোট দিয়ে ৬৯—৬০ ভোটে ঐ প্রস্তাব পাশ করালেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগ-পত্র পেশ করলেন।

শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ আগেই বলে রেখেছিলেন, বিধানসভায় যে কোন প্রস্তাব তাঁর বিরুদ্ধে গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করবেন। সি পি আই ও তার সহযোগী দলগুলি যদি নাম্বুদ্রিপাদ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনত তাহলে তাদের বিরুদ্ধে এই সমালোচনা করা চলত যে, তারা কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ঘটিয়েছে। যেভাবে তারা প্রস্তাব এনেছে তাতে তারা ঐ সমালোচনার অবকাশ রাখে নি। যদিও এই প্রস্তাবের পরিণাম নিশ্চয়ই তাদের অজানা ছিল না। তাহলেও শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের পদত্যাগের সংবাদ পাওয়ার পর সি পি আই নেতারা ছদ্ম বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, 'উনি পদত্যাগ করলেন কেন? আমরা ত মন্ত্রিসভার পতন চাই নি।'

সি পি আই চাক বা না চাক, সি পি এম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচনের সম্মুখীন হতেই উৎসুক বলে মনে হচ্ছে। কেননা তাদের বিশ্বাস, নির্বাচনে তাদের দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে অন্য কোন দলের সাহায্য না নিয়েই অথবা শুধু কে এস পি বা কে টি পি'র মত ক্ষুদ্র দলের সমর্থন নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারবে। সেদিকে তাকিয়েই সম্ভবত সি পি এম বলেছে যে, সে বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনে উদ্যোগী হবে না। বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন ও রাষ্ট্রপতির শাসন এড়াবার দায়টা অন্য তরফের উপর ছেড়ে দেওয়াই সি পি এম-এর পক্ষে সুবিধাজনক। কেননা কংগ্রেস ও কেরল কংগ্রেসের সাহায্য না নিয়ে মার্কসবাদীদের বাদ দিয়ে কোন মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব নয়। এরকম মন্ত্রিসভা গঠন করতে 'ক্ষুদে ফ্রন্টের' অন্তর্ভুক্ত সব দলের সায় নেই এবং কোন দলের পক্ষেই রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। সুতরাং একমাত্র যে সম্ভাবনা বাকী থাকে সেটা হল রাষ্ট্রপতির শাসন ও অন্তর্বর্তী নির্বাচন। বহু রাজনৈতিক অস্থিরতার সাক্ষী কেরল রাজ্য অকটোবর মাসের শেষে প্রায় অনিবার্যভাবেই সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

শুভ বিজয়া

দুর্গোৎসবের শেষে সকলকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ। সকলের কল্যাণ ও শান্তি কামনাই বিজয়া-দশমীর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ কল্যাণী শক্তির বিজয়ই শুভ বিজয়া। এই প্রতীকী উৎসবেই দেশবাসী মনপ্রাণ দিয়ে যোগ দিয়ে আনন্দকে সর্বজনীন করে তুলেছেন। এবারের উৎসবে লক্ষ্যণীয় ছিল সুশৃংখলা। মণ্ডপে মণ্ডপে শিল্পশ্রী, রুচিপূর্ণ কারুকর্ম ছিল দর্শণীয় বস্তু। উৎসবে যোগদানকারী জনতাও ছিল সুশৃংখল। কর্তব্যরত পুলিশ এবারে প্রশংসনীয়ভাবে জনতার ভীড় নিয়ন্ত্রণ করেছেন। সরকার আয়োজিত 'কলকাতা মেলা' সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে নাচ, গান, নাটক ও চিত্র প্রদর্শনীতে। বিদেশী পর্যটকও এবার কিছু এসেছিলেন বাংলার জাতীয় উৎসবের বর্ণাঢ্য আয়োজনের চাক্ষুষ পরিচয় পেতে। মহানগরীর আলোকসজ্জা ছিল সত্যিই নয়নমনোহর। কর্পোরেশন কর্তৃক পুজোর আগেই রাস্তা থেকে স্তূপীকৃত জঞ্জাল অপসারণ করে পথচারীদের যাত্রা সহজ ও স্বচ্ছন্দ করেছিলেন। এর জন্য তাঁরা সাধুবাদ পাবেন। তবে যে-কাজ প্রতিদিনের কর্তব্য তা শুধু উৎসব উপলক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটা আশা করা বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না।

এবারের উৎসবে মাইকের ব্যবহারও ছিল সীমিত। উৎসব আয়োজনকারীরা সত্যি সত্যিই এবার সংযত রুচিবোধের পরিচয় দিয়ে মহানগরীর উৎসবকে সুন্দর করে তুলেছেন। কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়রের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি শ্রেষ্ঠ প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জার জন্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করে উৎসব আয়োজনকারীদের উৎসাহ বাড়িয়েছেন। আশা করা যায় আগামী বৎসর এই প্রতিযোগিতা কলকাতার সর্বজনীন পুজো উৎসবকে সুন্দরতর করে তুলতে প্রেরণা জোগাবে।

অশুভ হিংসা

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, দুর্গোৎসব সারা বাংলার শান্তিতে অতিবাহিত হলেও প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে কলকাতার নিকটবর্তী জগদ্দল শিল্প-এলাকায় এক শোচনীয় এবং মর্মান্তিক গোলযোগ ঘটে গেছে। এই জগদ্দলে এর আগেও এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। এবারের ঘটনায় পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কথা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সচিব নিজে বলেছেন। বাংলাদেশে একদিকে যেমন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শহরে এবং গ্রামে তীব্রতর হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি সামান্য কারণে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। শুধু বাংলাদেশে নয় ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এই অশুভ হিংসাশক্তির তাণ্ডব আমরা লক্ষ্য করছি। সরকারের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য নানাবিধ চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু সমাজের ভিতরে এই বিষ আত্মগোপন করে আছে। দেশভাগ হল এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জন্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশত্যাগী হয়েছে। বহু মানুষের প্রাণ গেছে, বহু সম্পত্তি হয়েছে বিনষ্ট। কিন্তু এই অশুভ শক্তির বিনাশ এখনো হয়নি। বাদশা খান এসে বার বার এ কথাই বলছেন যে, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নয়, মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্বে। কিন্তু সে কথা কে শোনে। রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি বার বার ধর্মকে কাজে লাগিয়েছে। তাতে ক্ষতি হয়েছে সাধারণ দরিদ্র মানুষের। বড়লোকের গায়ে, রাজনৈতিক ফন্দিবাজদের গায়ে আঁচড় লাগেনি। সম্প্রতি শ্রীনগরে বিভিন্ন রাজ্যের তথ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে দেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হলে এদেশের সামাজিক উন্নতি কোনোরূপেই সম্ভব নয়। কাশ্মীরের রাজ্যপাল শ্রীভগবান সহায় যথার্থই বলেছেন যে, দেশের আবহাওয়া আজ হিংসা, অসন্তোষ ও উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। এই সুযোগ নিয়েই সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দেয়। তাঁর মতে সাম্প্রদায়িকতার জের সমাজে থাকবার কারণ সামন্ততান্ত্রিকতা। আমাদের সমাজ এখন অনগ্রসর, অনড় এবং প্রগতিবিমুখ। এই পরিবেশেই গোঁড়ামি, ধর্মীয় সংস্কার ও অন্ধতা বেড়ে ওঠার সুযোগ। রাজনৈতিক শ্লোগান যতই আওড়ান হোক, যতই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা হক, ধর্মীয় বিদ্বেষ মানুষের মন থেকে দূর করা সম্ভব হয়নি। তা হয়নি বলেই আমাদের হতভাগ্য দেশের এই দুরবস্থা। দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এ সম্পর্কে সচেতন হবার সময় এসেছে। একে বাড়তে দেওয়ার অর্থ গোটা জাতির আত্মহত্যার সামিল।

সামনে প্রকাণ্ড চড়াই। উঠতে উঠতে হাঁফ ধরে যায়, দম আটকে আসে, বুকে চাপ ধরে বসে পড়ে রমা। মায়াপাহাড়। স্থানীয় লোকেরা বলে মায়া আছে এখানে। দূর থেকে দেখতে চমৎকার। আশপাশের অসংখ্য মেঘমালার মতো পাহাড়শ্রেণী ভেদ করে সোজা উঠে গেছে ওপরে। মাঝবরাবর পর্যন্ত ঘাস-পাতা গাছ-পালার চিহ্ন চোখে পড়ে, তারপরই একেবারে ন্যাড়া। ন্যাড়া এবং খাড়া। প্রকাণ্ড চড়াই। সবটা কোনদিনই উঠতে পারে না রমা। অনিমেষ পারে, মৃগেন পারে, অনিমেষের আর দুটি বন্ধুও পারে। কি-যে নেশা ধরে গেছে তাদের এই পাহাড়টায় রোজই একবার করে ওঠা চাই।

রমা উঠতে পারে না। সম্প্রতিই শক্ত অসুখে ভুগে উঠেছে সে। অল্প পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে পড়ে। আর তাই রোজই ওরা তাকে এইখানে বসিয়ে রেখে যায়। এইখানে—বড়ো বড়ো কটা পাথরের চাঁইয়ে বাধা পেয়ে পাহাড়ে চড়বার রাস্তাটা আকস্মিক একটা বাঁক নিয়ে ঘুরে গেছে যেখানে, আর ঠিক সেই বাঁকের মুখটাতেই নীচু পাঁচিলে ঘেরা ছোট একটা সেকেলে প্যাটার্ণের বাংলো-বাড়ী। ছোট্ট একটু হাতা, সবুজ রং করা। মজবুত লোহার গেট। গেটের মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ সাদাটে-বেগুনী ফুলের মঞ্জরীতে ভরা কি একটা লতা। ভারী সুন্দর মাদক একটা মিষ্টি গন্ধে জায়গাটা ভরে থাকে এসময়।

এইখানে রোজ বসে থাকে রমা। এই পর্যন্ত এসেই হাঁপিয়ে পড়ে সে। আর অনিমেষরা তাকে বসিয়ে রেখে চলে যায় আরও ওপরে। না ভয় করে না তার। বাংলোটা ছোট, ফুল, লতা-পাতা, অচেনা গাছপালা, আর বুনো আতার ঝোপে প্রায় ঢাকা হলেও ভেতরে লোক আছে বুঝতে পারে সে। যদিও কাউকে দেখতে পায়নি কোনদিন, তবু বোঝা যায়। ভেতর থেকে চলাফেরার আওয়াজ, দরজা কিংবা জানলা বন্ধ করার মৃদু শব্দ, কখনও বা এক আধটা জামা-কাপড়ও শুকোতে দেখেছে সে। আর তাই নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে, ছোটনাগপুরের এই প্রায় নিরালা, জনবিরল স্বাস্থ্য-নিবাসটির না-গ্রাম না-শহর জনপদটুকুর অনেক ওপরে, মায়াপাহাড়ের পায়ের গোড়ায় একলাটি চুপ করে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়েই বসে থাকে সে। নীচের দিকে অনেক দূরে চিকচিক করে ছোট্ট একটুখানি নদী। পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে সাজানো ধান-ক্ষেতগুলি দলমল করে হাওয়ায়। নদীর ধারে জঙ্গলের পাশে পাশে চরতে থাকে গরুর পাল। এতদূরে থেকেও তাদের গলার ঘণ্টার টুং-টাং আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পায় রমা। তার ব্যথাকরা পা-দুটো আরাম পায়। শ্রান্ত শীর্ণ চোখে মুখে কপালে ঝিরঝির করে লাগতে থাকে পাহাড়ী বাতাস। পড়ন্ত রোদের তেজ ক্ষীণ হতে হতে একেবারে নিভে যায়। আগুনের গোলার মত লাল সূর্যটা দপ-দপ করতে করতে টুপ করে নেমে পড়ে একসময় পশ্চিমের ঐ প্রকাণ্ড তিন-চুড়ো পাহাড়টার আড়ালে। আর তখনই কলরব করতে করতে ফিরে আসে অনিমেষের দল, রমাকে সঙ্গে নিয়ে নেমে চলে যায় আবার নীচে নিজেদের বাসার দিকে।

আজ কিন্তু দেরী হচ্ছিল, বড়ো বেশী দেরী হচ্ছিল ওদের। সূর্য ডুবে গিয়েছিল। তিনচুড়ো পাহাড়ের মাথায় তার আরক্ত অবশেষটুকু লেগেছিল শুধু তখনও। নীচের ছোট্ট শহর চাপা পড়ে গিয়েছিলো আবছা অন্ধকারে। অন্ধকার ঘন হয়ে জমছিল বড়ো বড়ো আম, নিম, শাল, সেগুনের মাথায় মাথায়। আর এখন—এইবার, রমার মনে হচ্ছিল ঘন কালো শীত-শীত কুয়াশাময় সেই অন্ধকার পাহাড়ের নীচের খাদ, নদী, গাছপালা ছাড়িয়ে ওপরের দিকে উঠছিলো। ছায়া-ছায়া হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে নিচ্ছিল কয়েক শত ফুট উঁচুতে ছড়িয়ে থাকা বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই, ফুল ফোটা কাঠচাঁপার গাছ, আর বুনো আতার ঝোপ-ঝাপ। আর একটু হলেই রমাকেও ছুঁয়ে নেবে ঢেকে ফেলবে সেই অন্ধকার।

শীত শীত করছিলো রমার। এই সায়াহ্ন বিকেলেই মৃদু মৃদু হিমের স্পর্শ পাচ্ছিল সে। ভয়ও করছিল। এদিকটা একেবারে নির্জন। উঁচু-নীচু খানা-খন্দ এদিকে বেশী। ঝোপ-ঝাপ জঙ্গলে ঢাকা চারিধার। স্বাস্থ্য-সন্ধানী চেঞ্জারের দল এতদূরে আসে না। মামুলী উঁচু ছোট বন্ধু পাহাড় পেরিয়ে আরানদীর দিকেই তাদের যাতায়াত বেশী। তাই সন্ধ্যে হবার আগেই যেন রাত নামছিল এখানে। আর একা একা এই নির্জন পথে জঙ্গলাচ্ছন্ন এক বাংলোবাড়ীর সামনে বসে ভয় করছিল রমার। ভয়ের সঙ্গে শীতের শিহরন মিশে শিরশির করে উঠছিল সারা গা।

মনে পড়ে যাচ্ছিল বুড়ো মালীটার কথা—মায়াপাহাড়ে ভয় আছে বাবুজী,

সন্ধ্যের পর আর থাকিনেন না ওখানে। মায়া-পাহাড়ে মায়া আছে। সন্ধ্যে হলেই বাঁশী বাজিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে। কখনো কখনো সুন্দর হরিণ সেজে ময়ূর সেজে আসে। পিছু পিছু দৌড় করিয়ে নিয়ে যায় চুড়োয়। তারপর অন্যমনস্ক হয়ে পা ফসকে চুড়ো থেকে গড়িয়ে পড়ে মানুষ। হাত-পা মাথা ভেঙেচুরে মরে যায়।

অনিমেষ বিশ্বাস করে না এসব কথা। বলা বাহুল্য রমাও করে না। প্রথম দিন থেকেই এই পাহাড়টার ওপরেই তাদের আগ্রহ বেশী। রেলগাড়ী থেকেই এটাকে দেখা যায়। প্রথম দিন দেখেই মুগ্ধ হয়েছে তারা। হাতীর পিঠের মত ঢালু হয়ে উঠতে-থাকা গা, আর তার পরেই হঠাৎ একেবারে ন্যাড়া আর খাড়া হয়ে নৈবেদ্যের চুড়োর মত সোজা ওপরে উঠে যাওয়া। আর সব-চেয়ে চমৎকার ওর সেই সুউচ্চ চুড়োর ঠিক ওপরে, একেবারে মাঝখানটিতে ঝাঁকড়া পুষ্পিত একটা রাধাকরবীর গাছ। দূরে থেকে দেখতে কি অপূর্ব। সবুজ ঘন পাতায় ভরা গাছটা ভরে ফুটে থাকা অসংখ্য হলুদ ফুল, দূর থেকে দেখায় যেন একরাশ তারা। হঠাৎ বুঝি খসে পড়েছে পাহাড়ের মাথায়।

অত চড়াই ভেঙে অত উঁচুতে উঠতে রমার সাধ্যে কুলোয় না। কিন্তু কি নেশায় পেয়েছে অনিমেষকে, রোজ তার ওঠা চাই। আর নেমে আসবার সময় রমার জন্যে হাতে করে নিয়ে আসবে একগোছা ঐ রাধাকরবীর ফুল। গাঢ় হলুদ রং, ঘন পাতা, হালকা ঝাঁঝালো গন্ধ একটা।

কতবার হেসে বলেছে অনিমেষ, দেখ দিকিনি কি কাণ্ড—এমন সুন্দর পাহাড়টা—কি একটা কুসংস্কার তার গায়ে দেগে দিয়ে অপাংক্তেয় করে রেখে দিয়েছে তাকে। বেড়াবার এমন জায়গা আর আছে নাকি এখানে। যতো সব বাজে—ফুলিশ।

ফুলিশ। রমারও মনে হয়। কিন্তু এখন আর মনে হচ্ছিল না। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিল। পিছনে বাংলোর নীচু গেটে আর পাঁচিলে ছেয়ে থাকা সেই লতাটায় সাদা আর বেগুনি ফুলগুলো ফুটে উঠছিল এক এক করে। তীব্র মধুর একটা মাদক সুগন্ধে ভারী হয়ে উঠছিল বাতাস। আর এখন, এই পরিবেশে, পাহাড়তলীর এই নির্জন অন্ধকারে একা বসে কোনো এক বাঁশী-বাজানো মায়ার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল রমার।

ভয় হচ্ছিল, রাগও হচ্ছিল অনিমেষের ওপর। পথের মাঝখানে একা তাকে বসিয়ে রেখে ফিরতে এত দেরী কেন করছে সে! তার কারণ অনুমান করবার চেষ্টা করতে গিয়ে দুশ্চিন্তাও হচ্ছিল তার। কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো না তো? কোনো ভোলানো বাঁশীর সুর, কিংবা স্বপ্নীল হরিণের বিভ্রম?

আর তখনই ঠিক তার পেছন থেকে অতি মৃদু, অত্যন্ত সুরেলা, অথচ গম্ভীর কণ্ঠে দূরাগত ঘণ্টাধ্বনির মতো উচ্চারিত হলো—"বাইরে কেন, ভেতরে এসে বসুন।"

চমকে উঠে পেছন ফিরে চাইলো রমা। আচমকা অত জোরে চমকটা খেয়ে বুকের মধ্যেটা যেন ধড়ফড় করে উঠলো তার, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো এক মুহূর্তের জন্য। তার পরেই সহজ হয়ে স্বস্তিতে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেললো সে।

মায়া নয়, মানুষ। আবছা অন্ধকারে ভাল দেখা গেল না আগন্তুককে। শুধু তার ছন্দিত দীর্ঘদেহ, আর কপালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া একরাশ রুখু চুলের আড়াল ভেদ করে, শ্যামল মুখে আকর্ণ বিস্রান্ত একজোড়া নীলাভ-পিঙ্গল চোখ স্পষ্ট দেখতে পেলো সে।

আবার সেই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর যেন পর্দায় পর্দায় বেজে উঠলো, "আসুন, ওঁদের বোধহয় কোনো কারণে দেরী হচ্ছে, আপনি ততক্ষণ ভেতরে এসে বসুন।"

একটুও শব্দ না করে খুলে গেলো সবুজ রংকরা লোহার গেট, একটিও কথা না বলে ভেতরে ঢুকলো রমা, নিঃশব্দেই বন্ধ হয়ে গেল আবার।

একটি মাত্র সোফাসেটে পাতা অসজ্জিত ড্রয়িংরুমের মাঝখানের টেবলে দুই পলতের বড়ো টেবল ল্যাম্প জ্বলছিল একটা। কিন্তু তার চারদিকে লাল কাগজের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢাকা। প্রায় মুখ আঁধারী, লালচে, সেই ভৌতিক আলোয় মুখোমুখি বসলো তারা দুজন।

চা খাবেন? জিগোস করলেন ভদ্রলোক।

মাথা নাড়লো রমা।

খেলে করে দিতে পারি। অবশ্য আমাকে নিজেই করতে হবে। চাকর-বাকর কেউ নেই এখানে, আমি একাই থাকি।

একাই থাকে—! মনে মনে চমকালো রমা। নির্জন বাড়ি, অন্ধকার ঘন হচ্ছে নিঃশব্দে। সে একা মেয়েছেলে, আর একেবারে অপরিচিত এই......

নিজের অজান্তেই নজর গেল দুই হাতের পানে। মকর-মুখো বালা, রিস্টওয়াচ, গলার লম্বা চেনে আটকানো চুনিবসানো মস্ত সোনার লকেটটা—নেই নেই করেও ক-ভরি সোনা আছে তার গায়ে।

বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন কেমন হিম-হিম ঠেকলো রমার। সারা জীবনের যতো জানা কিংবা শোনা চুরি-ডাকাতি আর খুনোখুনির খবরগুলো যেন ছায়া হয়ে ছবি হয়ে কিলবিল করে নড়েচড়ে উঠলো মাথার ভেতরে। তার কাছ থেকে মাত্র ক-হাত দূরে বসে থাকা ওই মানুষটা তীব্রোজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে—রমার মনে হলো এখনই বুঝি চীৎকার করে উঠবে সে। কিন্তু বন্ধ গলায় আওয়াজ নেই। শুধু ঝিনু-ঝিনু ঘামে ভেসে গেল সারা গা। আর সেই অবস্থাতেও ওপাশের ওই বারান্দাটা—অনুমান করতে চেষ্টা করলো রমা, গলা টিপে মারা একটা মেয়ের দেহ যদি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যায় ওখানটা থেকে কয়েকশো ফুট নীচে ওই পাহাড়ী জঙ্গলে, কেউ খুঁজে পাবে কি?

বারান্দাটা দেখছেন? নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ভদ্রলোক। আমার বারান্দাটা সত্যি খুব সুন্দর। এখন রাতে বোঝা যাবে না। কিন্তু দিনের বেলায় ওর ভিউ অপূর্ব। প্রায় আড়াইশো ফিট নীচে কঙ্কনা নদী, তার পাড়ের গ্রাম, পশ্চিমগামী রেললাইন সব এমন দেখা যায় যেন ছবি। মানুষজন গরু-বাছুর সব যেন এতটুকু পুতুল। তার পরেই ঘাড় ঘুরিয়ে গলাটা একটু বাঁকিয়ে বললেন—এবার বোধহয় ওঁরা আসছেন।

আসছেন! আপনি কি করে—কিন্তু বিস্মিত হবার সময় পেলো না রমা, তার আগেই ঢালু নির্জন পাহাড়ী পথের নিস্তব্ধতা ভেঙে ক-জোড়া জুতোর মসমস্ শব্দ আর অনিমেষের গলায় ব্যগ্র ব্যাকুল উঁচু আওয়াজ শুনতে পেলো সে—

রমা, রমা, র-মৃ-মা...

একটি কথাও না বলে, একবার ফিরেও না তাকিয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলো রমা, প্রায় দৌড়ে পার হলো হাতা, শব্দ করে খুলে ফেললো লোহার গেট, উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিলো, এই যে, এই যে আমি, এই এখানে......

চলতে চলতে বিরক্ত গলায় অনিমেষ বললো, আর বলো কেন, যতো সব উড়ো আপদ। ওপাশের খাড়া দিকটা দিয়ে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে মৃগেনের বুকপকেট থেকে মানিব্যাগ পড়ে গেলো একেবারে নীচে। ব্যাগে প্রায় দেড়শো টাকা। ভাগ্যিস ওদিকটায় লোকজনের চলাচল তেমন নেই। আবার নেমে সেই ব্যাগ খুঁজে বার করে, পাহাড় ঘুরে তবে এদিকে আসি।

হড়-বড় করে আরও কি সব বলে যাচ্ছিল অনিমেষ। একটা কথাও শুনতে পেলো না—পাচ্ছিল না রমা। অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর একবার শুধু অতি সন্তর্পণে পিছন ফিরে দেখলো সে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, তবু তার মনে হলো খুলে গেছে সবুজ লোহার গেট, আর সেই গেটের পাল্লা লম্বা গড়ন মজবুত আঙুলের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কে। তাকে দেখা গেল না, শুধু রমা অনুভব করলো একজোড়া নীলাভ পিঙ্গল চোখের স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টি এগিয়ে চলেছে তার পিছনে পিছনে, তারই পায়ে পায়ে।

আলো-ঝলমল দিনের বেলায় আবার সেই ভয়টাকে এত অকারণ, এত অবাস্তব মনে হতে লাগলো যে নিজের কাছে নিজেরই যেন লজ্জা করতে লাগলো তার। লজ্জা করলো নিজের কালকের আচরণের কথা মনে করে। ভদ্রলোক উপযাচক হয়ে এসেছিলেন, ডেকেছিলেন, ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে চা পর্যন্ত খাওয়াতে চেয়েছিলেন। আর সে কিনা এমনই ভয় পেলো যে অনিমেষের ডাক শোনবামাত্র কোনোদিকে না চেয়ে হুড়মুড় করে বেরিয়ে চলে এলো। একটু শিষ্টাচার, মামুলী একটা ধন্যবাদ দেবার কথা পর্যন্ত মনে রইলো না তার।

সন্ধ্যা একটু অনুপাতের তাড়ায় আজ নিজেই বাংলোয় ঢুকলো রমা। রোজকার মতো তাকে সেইখানে বসিয়ে রেখে কলরব করতে করতে চলে গেলো অনিমেষ

মুগেদের দল। আর তখনই আস্তে আস্তে উঠে হাত বাড়িয়ে গেটের লোহার ছিটকিনিটা খুলে ফেললো সে।

লাল কাঁকর ঢালা সরু লম্বা পথ। অযত্নে আগাছা জন্মেছে চারদিকে। তারই মধ্যে একটা-দুটো জিনিয়া ফুটেছে এদিক-ওদিক। রাস্তাটা শেষ করে বারান্দায় ওঠবার ঠিক মুখেই সিঁড়ির দুধারে ঝাঁকড়া দুটো কাঠচাঁপা গাছ। অজস্র ফুলে সাদা হয়ে আছে একেবারে। বারান্দায় অল্প অল্প ধুলো—রমার মনে পড়লো চাকর-বাকর নেই ভদ্রলোক একাই থাকেন বলেছিলেন, কিন্তু—

বারান্দায় উঠে বিমূঢ় হল সে। দরজা বন্ধ। সেদিন যে ঘরটায় তারা বসেছিল সেই ঘরটারই দরজা জানালা দুই আঁটা। তালা নয়, ভেতর থেকে বন্ধ বলেই মনে হলো। ডাকবে কিনা ভাবলো রমা। এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করেছে কি না করেছে—নিঃশব্দে আস্তে যেন আপনিই খুলে গেল দরজা। দীর্ঘ দেহ ঈষৎ আনত করে জোড়হাতে আহ্বান জানালেন ভদ্রলোক, আসুন, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে ছিলাম।

আমার জন্যে! বিস্মিত হল রমা।

হাঁ আমি জানতাম আপনি আসবেন।

বাঁ হাতে দরজার পাল্লা ধরে ডান হাত প্রসারিত করে বললেন, কৈ আসুন—

ঘরে ঢুকেই অস্বস্তিতে পড়লো রমা। সবকটা জানলা বন্ধ। ওপাশে বারান্দার দিকের দরজাটাও। বাইরে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝলমল সুন্দর বিকেল। ঘরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে একটি গুমোট ঝাপসা অন্ধকার। জিগেস করলো, আপনি কি ঘুমুচ্ছিলেন?

না, ছিটকিনি নামিয়ে নামিয়ে একের পর এক জানলাগুলো খুলে দিতে দিতে ভদ্রলোক বলেন, ঘুম ভেঙে গিয়েছিল অনেকক্ষণ, এখন গড়াচ্ছিলাম।

তবে তো আপনাকে বড়ো ব্যাঘাত করলাম।

সুন্দর স্বচ্ছ আলোয় ভরে গেছে ঘর। ওপাশে ইউক্যালিপটাস আর পাহাড়ী ঝাউয়ের মাথায় লুটোপুটি করতে করতে বাতাস আসছে ঘরে। ঘুরে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক, প্রকাণ্ড সেই চোখের পিঙ্গল দৃষ্টি যেন রমার মুখের ওপর বিঁধিয়ে ধরে বললেন 'না'।

গা শিরশির করে উঠলো রমার।

*   *   *

অগোছাল বেডকভারটা টান করে বিছানায় চাপা দিতে দিতে বললেন, আজ একটু চা খাওয়া যেতে পারে কি, বলেন? বসুন, জলটা চড়িয়ে দিয়ে আসি।

আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিল রমা, বাধা দিয়ে তিনি বললেন, সেদিন আপনি ব্যস্ত ছিলেন, উদ্বিগ্ন ছিলেন। যাত্... হয়েছিল অনেকটা। আজ কিন্তু তা নয়। স্বেচ্ছায় আজ আপনি আমার অতিথি। এটুকু আমাকে করতে দিন।

পাশের একটি ছোট দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেলেন তিনি। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় এক ঝলক চেয়ে দেখলো রমা, চওড়া কাঁধ, সরু কোমর, মজবুত ছাতি আর দীর্ঘ সবল রীতিমত শক্তিধর বাহু।

বুকের মধ্যে আবার যেন কেমন শিরশির করে উঠলো তার।

ঘরের মধ্যে স্টোভ সোঁ সোঁ করছিল। পেছনের বারান্দার রেলিং ধরে একা দাঁড়িয়ে ছিলো রমা। বাস্তবিক এদিককার দৃশ্য ভারী চমৎকার। চমৎকার এবং ভয়ংকরও বটে। খাড়া পাহাড় নেমে গেছে প্রায় দু-তিনশো ফিট। নীচে অস্পষ্ট পুতুলের সারির মতো মানুষজন, ঘরবাড়ি। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যায় যে, ওইটেই বাজার। ওর মাঝখানের চওড়া রাস্তাটা ধরে খানিকটা এগোলেই ডামহ্যাতি ভাদের বস্তী। ভারী অবাক লাগছিলো রমার ঘর-বাড়ি, দোকানপাট সব আবছা, যেন অবাস্তব এক ধোঁয়াটে ছবির মতো দেখাচ্ছিল। ধোঁয়া উড়ছিল দোকানে কিংবা কোনো কোনো বাড়ির মাথা থেকে। লম্বা চুড়োওয়ালা মহাবীরের মন্দিরটি এবং তার মাথার তিন-কোণা লাল ঝাণ্ডাটাও দেখা যাচ্ছিল এখান থেকে, স্পষ্ট, ছোট্ট কিন্তু সুন্দর।

চোখ ঘোরালো রমা। ডান পাশে অপেক্ষাকৃত ছোট হাতীর পিঠের মত ঢালু আর একটি পাহাড়। আগাগোড়া ঢাকা কচি শালবনে। নতুন গজানো জঙ্গল। গাঢ় সবুজ পাতার সারি হাওয়ায় দুলছিল, ঝলমল ঝলমল করে উঠছিল বিকেলের আলোয়। তন্ময় হয়ে দেখছিল সে। ওপারে লাল সূর্য অস্ত যাবার আয়োজন করছিল। এখন আলোয় ঝাপসা হয়ে আসছিল আশপাশের পাহাড়। চাপ চাপ লাল আর আগুনে মেঘে ভরে গিয়েছিল পশ্চিম দিগন্ত।

...হঠাৎ ভীষণভাবে চমকে উঠলো রমা। চমকে রেলিং ছেড়ে সরে এলো একেবারে দু হাত। ঘাড়ের ওপরে কার যেন গরম নিশ্বাস। আর...! যেন মনে করবার চেষ্টা করছিল রমা পিঠের নীচে শিরদাঁড়ার ওপরে মৃদু একটা হাতের ধাক্কাও কি...?

বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছিল তার। বিবর্ণ মুখ ফেরাতেই নজরে পড়লো। বারান্দা আর ঘরের মাঝখানের দরজায় হাত রেখে স্মিতমুখে ভদ্রলোক। বললেন, দেখছেন বারান্দাটি সত্যি সুন্দর। যখনই সময় পাই আমি তো এইখানেই বসি।

...মাঝখানে প্রায় তিন-চার হাতের ব্যবধান। এক সেকেণ্ডের মধ্যে অতটা সরে যাওয়া সম্ভব কি? তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর অবস্থানের দূরত্বটা যেন মাপতে চাইলো রমা, কিন্তু—পাংশুমুখে শুকনো একটা ঢোক গিললো সে।

কাছে এগিয়ে এলেন ভদ্রলোক। স্বরে উদ্বেগ মিশিয়ে বললেন, কি হল আপনার? অসুস্থ বোধ করছেন নাকি—

সামলালো রমা। লজ্জিত মুখে ঘাড় নেড়ে বললো, না না, এই—মাথাটা একটু...

ওরকম হয়, আশ্বস্ত করতে চাইলেন ভদ্রলোক। বেশী উঁচু থেকে নীচের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে ওঠে অনেক সময়। হেসে বললেন, বিভ্রান্তিও হয় অনেক রকম। মনে হয় হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে, পেছন থেকে কেউ ধাক্কা দিলো বলেও মনে হয় অনেক সময়।

লজ্জা পায় রমা। তাড়াতাড়ি কথা খুঁজে না পেয়ে একটা অবান্তর প্রশ্ন করে বসে, বারান্দার একপাশে প্রকাণ্ড একটা কপিকলে দড়ি গুটোনো ছিল, দড়ির ডগায় ঝুড়ি বাঁধা। আঙুল দিয়ে সেইদিকে দেখিয়ে বলে —আচ্ছা ওটা কি জল-টল তোলবার ব্যবস্থা নাকি?

কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ভদ্রলোকের মুখ। বলেন, ওটা হল আমার বাজার সরকার।

বাজার সরকার!

হেসে বলেন, দেখবেন? আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি। ঘর থেকে এক টুকরো কাগজে লিখে নিয়ে এলেন কি যেন। ছোট একটা কৌটোয় কাগজটা ভরে রাখলেন ঝুড়িতে। হুড়হুড় করে দড়ি নামাতে নামাতে বললেন, অনেক নীচে ঐ বাজার। আমার এই ঝুড়িটি গিয়ে থামবে সবচেয়ে বড়ো মুদী দোকান-খানার সামনে। দোকানদারকে বলাই আছে সে এসে দেখবে। ফর্দ মিলিয়ে জিনিস তুলে দেবে ঝুড়িতে। দড়িতে টান পড়লেই তুলে নেবো আমি। মাসের শেষে টাকা নিয়ে যাবে দোকানদারের লোক এসে। পায়ে হাঁটার পরিশ্রমটা বাঁচলো, বাজারও করা হলো আমার।

কৌতুকে বিস্ময়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো রমা। বললো, বাঃ বেশ তো, কৈ কৈ দেখি...

ঝুড়ি ততক্ষণে নেমে গেছে। একটু পরেই টান পড়ে, হড় হড় শব্দে গুটিয়ে উঠে আসতে থাকে দড়ি। এক প্যাকেট বিস্কুট ঝুড়িতে।

ভদ্রলোক বলেন, আসুন, চা এতক্ষণে ভিজে গেছে নিশ্চয়ই। আজ এই বিস্কুট দিয়েই অতিথি সৎকার করা যাক।

* * *

হাসিতে আলাপে কথায় কেটে গেল কয়েকটা ঘণ্টা। একটু আগের সেই গা শির-শির ভাবটা যেন হাওয়ায় উড়ে গেল বাষ্প হয়ে। দ্বিতীয়বারের চায়ে চুমুক দিতে দিতে রমা বলে, দেখুন তো কি কাণ্ড এত আলাপ হল অথচ এখনও আপনার পরিচয়ই নেওয়া হয়নি ভাল করে। না নামই জিগ্যেস করা হয়েছে।

একটু গম্ভীর হলেন ভদ্রলোক পেয়ালায় চামচে ডুবিয়ে নাড়তে নাড়তে বললেন, এখানকার লোকে কুমারসাহেব বলে আমাকে।

কুমারসাহেব! চকিত হল রমা, আপনি কি...

না, মাথা নাড়লেন কুমার, হাসলেন একটু। ঝকঝক করে উঠলো সাদা সুসংবদ্ধ দাঁতের সারি—কোনো রাজ্য বা রাজার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। এরা এমনিই বলে, ভালবেসেই বলে বোধহয়।

আর কিছু বললেন না তিনি। রমা লক্ষ্য করলো তার নাম বা পরিচয় জানতেও কোনো কৌতূহল দেখালেন না। সে-ও কথা বাড়ালো না আর।

আলাপ জমছিল না। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, অনিমেষরা ফিরবে এখনি। উঠে দাঁড়ালো রমা, চলি তাহলে কেমন—

আসুন—দীর্ঘদেহ আনত করলেন কুমার, হাতজোড় করলেন, আবার আসবেন, অবশ্যই আসবেন, আমি অপেক্ষা করবো আপনার জন্যে।

দরজা খুলে ধরলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সাহায্য করলেন। বাড়িয়ে দিলেন হাত। মুহূর্তের জন্য শান্ত স্বস্থ বলিষ্ঠ একটি মুঠোর মধ্যে বাঁধা পড়লো নরম-গরম কোমল হাতখানি।

গেটের বাইরে এসে দু' হাত জুড়লো রমা নমস্কারে—

নমস্কার...মৃদু গম্ভীর সুরেলা স্বর ফিসফিস করে কানের কাছে—প্রায় মুখের ওপর বাজে তার।

বুকের মধ্যে আবার গুর গুর করে ওঠে তার।

সেই রাত্রে স্বপন দেখে রমা। কোথায় কোন এক অচেনা পাহাড়ে ছুটে চলেছে সে। গাঢ় লাল রংয়ের ছোট ছোট ফুলে ঢাকা সেই পাহাড়, বেগুনী আর সাদা ফুলে ফুলন্ত লতায় ভরা। সামনে এক হরিণ। তার গায়ের সোনালী রংয়ের ওপরে কালোর ফোঁটাগুলো অস্তগামী সূর্যের আলোয় যেন জ্বলছে। আর দূরে, অনেক দূরে কোথায় বাজছে এক বাঁশী। মৃদু কিন্তু মোহময় তার সুর। ক্রমে বাঁশীর সুর পরিণত হলো ঘণ্টার আওয়াজে। আর তখনই কোনো এক খাড়া পাহাড়ের চূড়া থেকে পা ফসকে হঠাৎ পড়ে গেলো রমা। চীৎকার করতে চাইলো, বন্ধ গলায় শব্দ নেই। পড়ছে পড়ছে পড়ছে, কেবলই পড়ছে। অসীম অনন্ত শূন্য। সে-শূন্যের শেষ নেই, পড়ারও শেষ নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে পরিণাম-হীন সেই পতনের স্বস্তিতে গা এলিয়ে দিলো সে।

* * *

স্ত্রীর মুখে সব শুনে অবাক হল অনিমেষ। বললো, বল কি, চেনা নেই, জানা নেই সেই লোকটার বাড়িতে তুমি গেলে?

কি জানি কি হলো, হঠাৎই যেন জ্বলে উঠলো রমা। বললে, যাবো না! কি ভাবো কি তুমি আমাকে শুনি! বেড়াতে বেরুলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে তোমার। সেই নিঃবান্ধব পুরীতে আমাকে এক বসিয়ে রেখে গেলে, ফিরতে যার নাম এক প্রহর রাত। ভাগ্যি ভদ্রলোক ডেকে বসিয়েছিলেন, নইলে ভয়ে হার্টফেল করেই মরতুম আমি।

চুপ করে গেল অনিমেষ। এক প্রহর রাত সেই একদিনই হয়েছিল, মৃগেনের বাগ পড়ে গিয়ে বিভ্রাট বাধলো সেদিন। নইলে সন্ধ্যাবরই সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসে তারা। কিন্তু রমা সেদিনের পরেও গিয়েছে সেখানে। কয়েকবারই গিয়েছে। বসেছে, চা খেয়েছে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এতদিন অনিমেষকে বলেও নি এতসব কিছু। অনিমেষ জানলো আজ—এই প্রথম।

কিন্তু কি ভেবে সে-সব কথা আর এখন তুললো না সে। শুধু কি বুঝলো কে জানে, মায়াপাহাড়ে যাওয়ার প্রোগ্রামটা বন্ধ

করে দিলো একেবারে। বেড়াতে যেতে লাগলো অন্যদিকে। ঢাল ধরে ঝকঝকা নদীর ধারে ধারে। দূরে দেহাতের দিকে। শুধু মায়াপাহাড়ে আর নয়।

অস্থির হয়ে উঠলো রমা। দিনের পর দিন যায় আর ভেতরে ভেতরে কি এক অপ্রতিরোধ্য অস্বস্তির জ্বালায় ছটফট করে সে। প্রতিদিন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে কি এক কঠিন গূঢ় আকর্ষণে টানতে থাকে তাকে মায়াপাহাড়। সেই তার ঢালু তল-ভূমি, ন্যাড়া খাড়া শিখর, আর...আর সেই শিখরে চড়বার রাস্তাটা যেখানে একটা আকস্মিক বাঁক নিয়েছে, সেইখানে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে সবুজ রং-করা একটা লোহার গেট, কাঠচাঁপা আর বন-গোলাপের গন্ধে ভরা নেহাৎই পুরোনো ধরনের সেকেলে বাংলোবাড়ী একটা, কিন্তু—

কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না রমা। মায়াপাহাড়ের উল্লেখ মাত্রে তীব্র ভ্রূকুটি ঘনাতে দেখেছে অনিমেষের কপালে। তবুও ভরসা করে ঠাট্টার ছলেই বলেছিল একদিন, কি গো, একেবারেই যে ছেড়ে দিলে মায়াপাহাড়ে যাওয়া। আমার জন্যে তোমার ঐ অত সাধের পাহাড়টাকে পরিত্যাগই করলে নাকি?

গম্ভীর অনিমেষ বলেছিল, 'করলাম।'

রমা বলেছিল, দরকার নেই, অতটা সইবে না। চলো না হয় আর একদিন ওদিকে।

কেমন একরকম দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়েছিল অনিমেষ। শান্ত কিন্তু কঠিন স্বরে বলেছিল, আমার আর সখ নেই। তোমার থাকে তো বল নিয়ে যাচ্ছি। তবে মায়াপাহাড়েই নিয়ে যাবো। পথের মধ্যে-খানে সেই বাড়ীটাতে নয়।

চুপ করে গিয়েছিলো রমা। আর কিছু বলেনি সে। বলবার ছিল না কিছু। বুঝতে পেরেছিল মনের গোপন আগ্রহ ধরা পড়ে গেছে অনিমেষের কাছে। চেপে রাখবার আর কোনো উপায় নেই।

তারপর...সময় কাটতে লাগলো, দিন চলে যেতে লাগলো। বেড়ানো-চেড়ানো, ঘোরাঘুরি, পাহাড়তলীর জংলা পেরিয়ে সাত দেওতার দহে গিয়ে মাছধরা, দূরে দেহাতের হাট থেকে সস্তায় মাংস আর মুরগী কিনে বন্ধু পাহাড়ে চড়ুইভাতি সবই হয়ে চললো নিয়মমত। শুধু যে-কারণে এই এতদূরে, এত খরচ, ঝঞ্ঝাট করে আসা—সেই রমার শরীর ভাল হলো না কিছুতেই। প্রতি দিন শুকিয়ে উঠতে লাগলো সে, কৃশ বিবর্ণ হতে লাগলো একটু একটু করে। শরীর থেকে রক্তের আভাস সরে গেলো। পাংশু বিবর্ণ মুখে দেখা দিল একটা অসুস্থ উজ্জ্বল দীপ্তি। আর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চোখ। পিঙ্গল দীপ্তি হেনে যেন সদা-সর্বদা ধক্ ধক্ করে জ্বলতে লাগলো সে চোখ। ইদানীং ভাল করে ঘুমোতেও পারছিলো না সে। সতর্ক কান পেতে রেখে সারারাত জেগে থাকতো, আগ্রহে উন্মুখ —যেন কি একটা কিছু একটা শুনতে পাবার আশায়।

চিন্তিত হয়ে উঠলো অনিমেষ। কিছুই বুঝতে পারছিলো না সে। ভাল খাওয়া দাওয়া যত্ন বিশ্রাম—সবই হচ্ছে যথারীতি। তবু শরীর ভাল হচ্ছে না কেন রমার তার কোনো কারণ কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিল না সে। প্রথম কয়েকটা দিন ভালই ছিল, তার-পরে যে কি হলো—কেন হলো তার কিছু আন্দাজও ছিল না তার কাছে।

অথচ এই চেঞ্জে আসার জন্যে ঝঞ্ঝাট কম পোয়াতে হয় নি তাকে। অফিসে ছুটি নিতে হয়েছে। ছেলেমেয়ে দুটোর স্কুল কামাই হবে বলে তাদের আনা যায় নি। অথচ একা বুড়োমানুষ মা তাদের সামলাতে পারবেন না, তাই চব্বিশ ঘন্টার একটা লোকের বন্দোবস্ত করতে হয়েছে। এবং সবশেষ—বিদেশে একা রোগী নিয়ে এসে থাকার অসুবিধে চিন্তা করে প্রায় খোসা-মোদ করেই রাজী করাতে হয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে আসার জন্যে। আর এই সব করতে কর্মাতে খরচ খরচাব ব্যাপারটা না হয় উহাই থাক। অথচ এখন কি না!—

অনেক ভেবেচিন্তে কলকাতা ফিরে যাওয়াই স্থির করলে অনিমেষ। রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর বিছানায় গড়িয়ে কথাটা পাড়লো সে রমার কাছে।

শুনে এক পলকের জন্যে সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো রমার। তার পরেই আস্তে আস্তে রোদ ঝকঝকে আকাশে মেঘ চাপা পড়ার মতো ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেল সে মুখ। অনেকক্ষণ পরে খুব আস্তে করে সে বলল। কেন? এখানে তো আমি বেশ ভালোই আছি।

কমানো হ্যারিকেনের আলোয় মুখ আঁধারী ঘরে কিছুই লক্ষ্য করলো না অনিমেষ। আদর করে তাকে কাছে টেনে নিয়ে মুখটি তার গলার মধ্যে গুঁজে দিতে দিতে বললো, না রমি—যতটা ভাল হওয়া উচিত ছিলো তার কিছুই হওনি তুমি। বরং আরও খারাপই হচ্ছে তোমার শরীর দিন দিন। তার চেয়ে চলো আমরা ফিরেই যাই। আর—একটু থামলো অনিমেষ, গলটা অন্যমনস্ক শোনালো তার—মিন্টু মিঠুও অনেকদিন ছেড়ে রয়েছে আমা-দের। নিশ্চয় মন কেমন করছে ওদের। তোমার করছে না? আর হঠাৎ এতদিন পরে যেন আচমকাই ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ে গেল রমার। মনে পড়তেই মন কেমন করে উঠলো। আশ্চর্য, এতদিন তাদের ছেড়ে রয়েছে কি করে? ভাবলো সে। ছেলে-মেয়েকে দেখবার, তাদের কাছে পাবার, বুকে চেপে ধরবার একটা প্রবল ইচ্ছা মনের মধ্যে অনুভব করলো রমা। প্রাণ ছটফট করে উঠলো তার সেই পুরোনো প্রিয় পরিচিত পরিবেশটুকুতে ফিরে যাবার জন্যে। অনিমেষের আরও কাছে সরে এলো, সর্বাঙ্গ দিয়ে তার নিবিড় সান্নিধ্যটুকু অনুভব করতে করতে অস্ফুট জড়ানো গলায় বার বার বললো, সেই ভাল, সেই ভাল, চলো চলো তাড়াতাড়ি ফিরে যাই আমরা।

আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল, মাত্র দু মাসের জন্য এসেছিল তারা। কিন্তু সংসারখানি এর মধ্যেই ছড়িয়েছে অনেক। গুছিয়ে তুলতে, বাঁধতে ছাঁদতে প্যাক করতে কদিন ধরে হিমশিম খেয়ে যেতে লাগলো অনিমেষ আর তার বন্ধুরা। ওরাও খুশীই হয়েছে। আসলে এখানে আর কারুরই ততো ভাল লাগছিল না। খাস কলকাতার মানুষ তারা, বাইরে গিয়ে বেশীদিন থাকতে পারে না। তা সে যতই কেননা পাহাড় জঙ্গল আর নদীর দেশ হোক। পাহাড়-জঙ্গল দুদিন ভাল লাগে; তারপরেই এক-ঘেয়ে হয়ে যায়। আকর্ষণ থাকে না নুড়ি ছিটানো পাহাড়ী নদী কিংবা ঝোপের আড়ালে নামনাজানা অখ্যাত ঝরনার। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে শহরে ফিরে যাবার জন্যে। দুটো মানুষ দেখতে, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। সকালে অফিস, সন্ধ্যায় ক্লাব, নাটকের রিহার্সাল, কিংবা চায়ের দোকানে দু-কাপ চা চারজনে ভাগ করে ঘন্টার পর ঘন্টা তর্কের আকর্ষণ অনেক বেশী বলে মনে হয় এসবের চেয়ে।

কাজেই সকলেই উৎসাহিত। বাঁধাছাঁদা চলতে থাকে পুরোদমে। সেই সঙ্গে প্রত্যা-বর্তন-পূর্ব আনুষঙ্গিক কিছু কিছু কেনা-কাটা। গাঁ থেকে ঘি আনানো হল। চাকরকে দিয়ে ভালো প্যাঁড়া, আতা এক টুকরি। সস্তার চাল কিছু বিছানার বাণ্ডিলের মধ্যে ভরে নেওয়ার প্রস্তাবও মৃগেন দিয়েছিল। ঝঞ্ঝাটের কথা ভেবে রাজী হল না অনিমেষ। স্থানীয় বাজারে দেহাতীদের তৈরী কাঠের খেলনা পাওয়া যায়, ছেলেমেয়েদের জন্যে তাও কিনলো রমা।

আর এইসব উদ্যোগ-আয়োজন যত এগোতে লাগলো, ফিরে আসবার দিন ঘনিয়ে আসতে লাগলো কাছে, ততোই... রমার মনে হতে লাগলো তার সর্বাঙ্গ—সারা মস্তিষ্ক জুড়ে পাথুরে জাঁতার মতো কঠিন একটা ভার যেন চেপে বসছে নিঃশব্দে। বুকের অতল থেকে উঠে এসে এক নিষ্ঠুর যন্ত্রণা, একপাল ক্রুদ্ধ মৌমাছির মতো তীক্ষ্ন বিষাক্ত হুল ফুটিয়ে বিঁধিয়ে বিপর্যস্ত করে তুলতে চাইলো তাকে। রমা করতে পারলো না কিছু, বলতে পারলো না কিছু, শুধু ভেতরে ভেতরে একটা জ্বরের মতো, জ্বালার মত কঠিন শক্ত অনির্দেশ্য এক ব্যাধির পীড়নে যেন ক্ষয় হয়ে যেতে লাগলো ক্রমশঃই।

চলে যাবার আগে শেষবেশ একটা বেড়ানোর প্রোগ্রাম করে নিতে চাইলো মৃগেন। দলের মধ্যে ঘোরাঘুরির উৎসাহটা তারই সব চেয়ে বেশী। যেখানকার যতো অখ্যাত অজ্ঞাত পাহাড় জঙ্গল আর ঝরনা খুঁজে বার করে সেখানে আউটিং করার মধ্যে এক রোমান্সের স্বাদ খুঁজে পেতো সে। আজকেও খোঁজ করে করে সেইরকমই এক সন্ধান নিয়ে এলো। এখান থেকে আট মাইল দূরে জেনায়ালা দেবী পাহাড়। মন্দির আছে জেনায়ালা দেবীর। পুজো হয়, পুজক

এ অঞ্চলের যতো গোয়ালার দল। জোয়ালা দেবী আসলে ব্যাঘ্র দেবী। মানুষের শরীরে বাঘের মুখ বসিয়ে একটি প্রতীক প্রতিমা তৈরী করা হয়েছে। বাঘ নেকড়ে হায়না প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকুলের তিনি অধিশ্বরী। প্রবাদ দেবীর পুজো করলে এরা সন্তুষ্ট থাকে, মানুষ কিংবা গরু বাছুরের ওপর হামলা করে না আর।

সাঁওতাল পরগণার এইসব অঞ্চলে হিংস্রজন্তুর উৎপাত আজও আছে। নেকড়ে হায়না তো বটেই, বড়ো চিতা কিংবা মাঝারী ডোরাকাটা কেঁদোবাঘও দেখা যায় কখনও কখনো।

কাজেই দেবীর পসারও আছে। বিশেষ করে গোয়ালাদের মধ্যে। পুজো ঘটা করেই হয়। প্রতি শনি মঙ্গল বারে এ এলাকার তাবৎ গোয়ালা গিয়ে জড়ো হয় মন্দির-প্রাঙ্গণে। ঢাক বাজে, আরতি চড়ান হয়। প্রকান্ড মাটির হাঁড়ায় প্রচুর পরিমাণ দুধ আর আলোচাল ফুটিয়ে ক্ষীর করে ভোগ নিবেদন করা হয়, প্রসাদ পায় উপস্থিত-জন। বিকেল হলেই চলে আসতে হয়। সন্ধ্যের পর আর ওখানে থাকবার নিয়ম নেই।

অনিমেষ বললে, কেন?

মৃগেন বললে, রাত্রে ওখানে বাঘ আসে। দেবীর মন্দির নাকি বাঘেই পাহারা দেয়। দূরে থেকে তাদের ডাক শোনা যায়। দিনের বেলা মাটিতে গাছের গায়ে প্রকান্ড থাবার নখের আঁচড় দেখা যায়। কিন্তু রাত্রে থাকবার নিয়ম নেই। প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসতে হবে না তাহলে।

রমা বললে, ও বাবা!

অনিমেষ এসব ব্যাপারে একটু ভীতু। বিশেষ করে অচেনা জায়গায় এগিয়ে গিয়ে বিপদ নিতে তার নেহাৎ অনিচ্ছা। বললে দরকার নেই, থাক বাপু। তারপর এতগুলো মানুষের সাড়া শব্দ, আর গায়ের গন্ধে উৎসাহ পেয়ে জ্যান্ত বাঘ দেবতা হালুম বলে এসে পড়লেই গেছি আর কি। তার চেয়ে—

মৃগেন বললে, দূর, পাগল নাকি। আমরা কি একা যাচ্ছি? পরশু মঙ্গলবার আছে, ঐ দিন চলো। গোয়ালাদের ভিড় হবে পুজো দেওয়ার জন্যে। আমরাও ঐ দিনই দেখে আসি। সারাদিন থেকে একটা চড়িভাতি মতো করে সন্ধের আগেই রওনা দিয়ে দেওয়া যাবে। অত লোক থাকলে ভয় কি। আর বাঘ কি দিনের বেলা বেরোয়—

অনিমেষ বললে, কিন্তু—

আর কিন্তু নয়। চলো হে চলো। বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে, গল্প করার মত। তাছাড়া জায়গাটাও নাকি শুনলাম খুব সুন্দর। ছোট একটা ফলস্ আছে, শতঝোরা নাকি— এই আরা নদীটাই বেঁকে গিয়ে ওখানে অনেকগুলো মুখ হয়ে একটা পাহাড় থেকে পড়ছে নীচে। ফলস্‌টা ছোট বটে কিন্তু তার সিনারি নাকি অপূর্ব।

অনিমেষ বললে কিন্তু বুধবারে আমরা রওনা হচ্ছি, আর তার আগের দিনই আবার এতটা—

মৃগেন বললে তাতে কি। রওনা হচ্ছি তো আমরা রাত্তিরে। বাঁধাছাঁদা সব মোটা-মুটি রেডি করাই থাকবে। যেটুকু বাকী থাকবে বুধবার সারাদিনে সেরে ফেলা যাবে। চলো চলো, ঘরে আসা যাক—তুমি আর আপত্তি কোরো না—

আপত্তি করা গেল না। প্রায় জোর করেই মৃগেন ব্যবস্থা করে ফেললে সব। কাছের গাঁ থেকে গরুরগাড়ী ভাড়া করে আনা হলো দুখানা। লুচি তরকারী ফল মিষ্টি ভরে নেওয়া হল টিফিন ক্যারিয়ারে। বাস্কেটে চা চিনি গুঁড়ো দুধ, ফ্লাস্কে গরম জল, স্টোভ কেতলি, সব নেওয়া হল গুছিয়ে। সূর্য ওঠবার আগেই গরুরগাড়ী এসে হাজির দরজায়। গাড়োয়ান তাগাদা দিলো। অনিমেষ বললো নাও নাও শীগগীর তৈরী হও, আর দেরী করলে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।

আর তখন...হঠাৎ রমা বললে, আমি যাবো না।

যাবে না! অবাক হল সবাই।
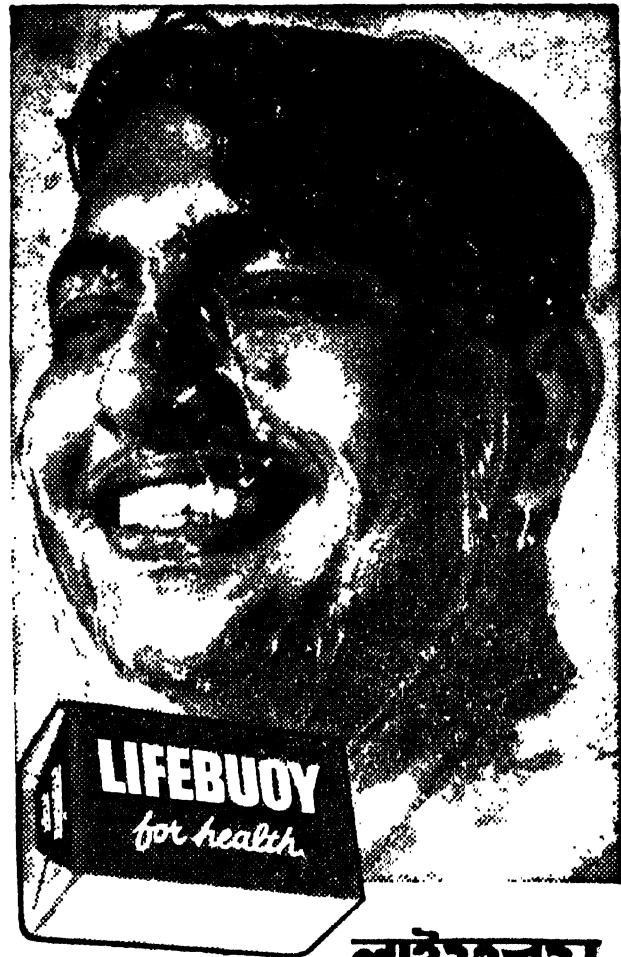
মা আমার শরীর খারাপ লাগছে।

শরীর খারাপ—উদ্বিগ্ন হল অনিমেষ। বললে, তবে থাক, আমিও না হয় আর—ওরাই যাক।

সে কি কথা, ব্যস্ত হলো রমা। তুমি যাবে না কেন, আমার এমনি একটু...মানে বিশেষ কিছু নয়, মাথাটা একটু ধরেছে। রাতে ঘুম হয় নি তো ভাল। তার ওপরে গরুর গাড়ীতে এতটা পথ যাওয়া—স্ট্রেন হবে। কাল আবার রওনা, সেই জন্যেই বলছি।

অনিমেষ তবু ভরসা পায় না। রমা বললে, ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্তে যাও। আমি খেয়েদেয়ে লম্বা এক ঘুম দেবো। বিকেল-বেলা শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে।

মগেন বললে, সেই ভাল। মালী রয়েছে চাকর রইলো, ভয়টা কিসের। আর আমরা তো সন্ধ্যে হতে না হতেই ফিরে আসছি। তবু ইতস্ততঃ করছিল অনিমেষ। কিন্তু ব্যবস্থা সব হয়ে গেছে। গরুরগাড়ী দুয়োরে এসে খাড়া। তখন আর না করা সম্ভব নয়। কাজেই মন খুঁতখুঁত করলেও যেতেই হল অনিমেষকে। রমাকে অনেক উপদেশ দিয়ে, মালীকে অনেক বুঝিয়ে, চাকরকে সাবধান করে, মাইজীর একটুও শরীর খারাপ হচ্ছে বুঝলেই বাজারের ধারের ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে বলেও বেশ একটু অনিচ্ছুক মনেই রওনা দিলো সে।

...আর তখন—ঠিক তখনই রমার মনে হলো বুকের মধ্যে যেন ধড়াস্ করে একটা বাড়ি পড়লো তার। নিঃশ্বাস বন্ধ, চোখ ঝাপসা বলে ঠেকলো। আর মনে হলো—এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো এখনও সময় আছে, এখনও অনিমেষরা চলে যায় নি। দুলকি চালে চলতে থাকা তাদের গাড়ী দুটো সবে বাঁক নিয়েছে পথের মোড়ে, হারিয়ে যায় নি, চোখের আড়াল হয়ে যায় নি। পাহাড় আর জঙ্গলের ছোট বড়ো উঁচু নীচু জটাজটিল গোলোকধাঁধায়। এখনো ছুটে যাওয়া যায়, ধরতে পারা যায় তাদের। আর্ত হাতে অনিমেষকে আঁকড়ে ধরে বলা যায়, না না কিছু হয় নি আমার, কিছু না। আমাকে নিয়ে চল, সঙ্গে নাও তোমাদের। ফেলে রেখে যেও না এই একলা, নির্জনে, অসীম অপ্রতিরোধ্য এক সর্বনাশের চোরাস্রোতের টানের সামনে।

কিন্তু কিছুই করা হলো না। করতে পারলে না রমা। পাঁচিলের ওপর ঝুঁকে পড়া পেয়ারা গাছটার একটা ডালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলো স্তব্ধ হয়ে। গরুর-গাড়ীটা তেমনই চলতে লাগলো, হেলে দুলে ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ তুলে। অনিমেষের দলও দূরে চলে যেতে লাগলো। ক্রমে আবছা হল, ধূসর হল, অস্পষ্ট হয়ে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেলো। এক সময়।

ছুটে গিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে পড়লো রমা। দু হাতে আঁকড়ে খামচে ধরলো বালিশ চাদর। অস্থির অস্ফুট আর্ত গলায় কেবলই বলে যেতে লাগলো, না না না, আর নয়, কিছুতেই নয়। আর সব, কিন্তু মায়াপাহাড় নয়। নির্জন সেই সরু পথ, আঁকাবাঁকা উঠে যাওয়া, আর পথের মোড়ে প্রকাণ্ড কটা পাথরের চাঁইয়ে আড়াল করা একটা সবুজ লোহার গেট, আর কাঠচাঁপা আর বন গোলাপের গন্ধে ভরা পুরোনো নির্জন সেই সেকেলে বাড়ীটা নয়, কিছুতেই নয়। কিন্তু—

কিন্তু বেলা বাড়লো। সময় কাটতে লাগলো। অবসন্ন হেমন্তের হালকা দুপুর শেষ হয়ে গেলো পলকেই। আর রমার মনে হতে লাগলো তার সারা শরীর জুড়ে, মাথা মস্তিষ্ক জুড়ে সেই ভার, সেই যন্ত্রণাটা যেন নেমে আসছে আবার। চেপে চেপে বসছে, ধারালো ছুরির ফলার মতো কেটে কেটে টুকরো টুকরো করতে চাইছে তার অস্তিত্বকে।

রমা অন্যমনস্ক হতে চাইলো। রমা বই পড়লো, বাগানে বেড়ালো। বাঁধা জিনিসপত্র খুলে ছড়িয়ে বাঁধতে বসলো আবার। মিছে কাজের মিথ্যে আড়াল সৃষ্টি করে লুকোতে চাইলো নিজেকে।

তারপর কখন বিকেল হলো। বিকেল গড়ালো। হেলে পড়া রাঙা রোদ তার শেষ তাপটুকুও বিতরণ করে ঠান্ডা হয়ে গেলো একসময়। গাছপালায় পাহাড়ের গায়ে আসন্ন সন্ধ্যায় ছায়া নিয়ে নামতে লাগলো শীত শীত বিষণ্ণ অন্ধকার।

তখনই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো রমা। তার সারাদিনের বিশ্রামহীন আরক্ত আবিল দৃষ্টি দিয়ে যেন দেখে নিলো মায়াপাহাড়ের গায়ে আঁকা এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া সেই পথটি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে এবার। আর একটু পরেই অন্ধকারে একেবারে ঢেকে যাবে। তার বিহ্বল মস্তিষ্ক যেন আর্তনাদ করে বলে দিলো, এই শেষ। এই এই আজই সব শেষ। এর পরে আর কেউ নেই, কিছু নেই। আর একটু পরেই সন্ধ্যা হবে, অনিমেষরা ফিরবে। রাত বাড়বে, রাত ঘন হবে, রাত শেষ হয়ে যাবে তারপর। তারপর কাল দিনের শেষে, ক্রূর নির্মম একটা রেল-গাড়ী কঠিন দূরত্বের মত বিছিয়ে রাখা লোহার লাইনের ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলে যাবে তাকে। এই গ্রাম, ওই পাহাড়, সেই ভারী সবুজ লোহার গেট, বনফুল আর বুনোলতার গন্ধে ভরা পুরোনো একটা বাংলোবাড়ীর একখানা ঘর, আর দূরাগত ঘন্টা ধ্বনির মতো একটি আশ্চর্য কণ্ঠস্বরের স্বপ্ন থেকে দূরে, অ-নেক দূরে।

রমা চঞ্চল হলো, রমা উদভ্রান্ত হয়ে উঠলো। তার চুল বাঁধা হলো না, তার কাপড় ছাড়া হলো না। তার চোখে মুখে কিংবা শরীরে কোথাও পড়লো না প্রসাধনের এতটুকু লেশমাত্র। ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে উঠোন, উঠোন পেরিয়ে, বাগানের পাঁচিলের গায়ে ছোট কাঠের ফটক খুলে রাস্তায় নামলো সে।

চাকর রান্নাঘরে রইলো। মালী খুরপি নিয়ে বাগানে ডালিয়া আর গোলাপের পরি-চর্যায় ব্যস্ত রইলো। কেউ দেখলো না, কারও লক্ষ্য পড়লো না, সেই আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে, দিশেহারা নিঃসঙ্গ এক ছায়া-মূর্তির মতো মায়াপাহাড়ের নির্জন পথ ধরে উঠে গেল রমা— একা—

গায়ে কয়েক ডিগ্রী জ্বরের তাপ নিঃশ্বাসে আগুন, বুকে গলায় জিভ তালুর তলায় একশো বছরের ধুলো ঘেঁটে দেওয়া পিপাসা। রমা এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে।

গেট খোলা। লাল কাঁকরের সরু পথখানি কে যেন মেজেঘসে পেতে রেখেছে পায়ের তলায়। থর থর কাঁপা আঙুল, ঘামে ভেজা অবশ হাত—দরজায় ঘা দিলো কি না দিলো রমা—নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা যেন আকা একখানি ছবির মতো। ঘরের মধ্যে নরম রমণীয় অন্ধকার, ঝড়ে পাওয়া, মারখাওয়া, তীরবেঁধা একটা পাখীর মতো ছিটকে পড়লো রমা ভেতরে।

অন্ধকারে মজবুত একজোড়া হাত এসে কুড়িয়ে নিলো তাকে। বলিষ্ঠ দুটি বাহুর বাঁধনে বাঁধা পড়লো তার দেহ। মুখের ওপরে কার গরম নিঃশ্বাসের আগুন হলকা, বুকের আর্তনাদ পিষে দিয়ে ঠোঁটের ওপর নেমে এল একজোড়া কঠিন উত্তপ্ত জ্বলন্ত অঙ্গার-স্পর্শ।

রমা কিছু বলতে চাইলো, পারলো না। অন্ধকারে আতুর চোখ মেলে কাউকে খুঁজতে চাইলো, পেলো না। রমা তার সুদীর্ঘ মন মস্তিষ্কের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখার শেষ চেষ্টাটুকুও করে ব্যর্থ হলো। তার সারা শরীর জুড়ে হাজার বিদ্যুতের স্ফুরণ শিথিল করে দিলো তাকে। তার মাথার মধ্যে ঝড়ের সমুদ্রের একটানা গর্জনে অসাড় অবশ হয়ে এলো সে। ইন্দ্রিয়ের প্রতি কোষে উপকোষে আশ্চর্য এক আনন্দের অনুভূতি যেন মৃত্যুর মতো, মাদকের মতো ছড়িয়ে পড়লো তার। আর তখন তার সেই প্রায় মূর্ছিত চৈতন্যের শেষ প্রান্তটি পর্যন্ত আবরিত করে দুলতে দুলতে দুলতে নামতে লাগলো কালো, কোমল, কাঁচা, মোহময় অন্ধকার।

অনেক রাত্রে পুলিশ এনে দরজা ভেঙে যখন ঘরে ঢুকলো অনিমেষ রমা তখন ঘুমোচ্ছে। কপালে তখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম, শ্বেতপাথরের মতো সাদা মুখে এক অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তি। খোলা চুল এলোমেলো ছড়িয়ে আছে ঘাড়ে বুকে পিঠের তলায়। অগোছালো আঁচলখানি খা ছড়িয়ে মেঝের ওপর লম্বমান।

চীৎকার করে নাম ধরে ডেকে ছুটে গিয়ে তার গায়ে ধাক্কা দিলো অনিমেষ।

রমা সাড়া দিলো না, ঘুমও ভাঙলো না তার। আবার ডাকলো অনিমেষ, আবার আবার ঝুঁকে পড়ে তার মুখ দেখলো কপালে গালের ওপর হাত রাখলো, তারপর সেইখানেই—সেই ককেকার অন্ধকারে এক হাঁটু ধুলো ময়লা আর চামচিকের নোংরার ওপরেই বসে পড়লো অনিমেষ, আস্তে আস্তে—

অন্নদাশঙ্কর রায়

।।পঁচিশ।।

অবশেষে এলো সেই অমৃতময় দিন যেদিন আমরা জেগে দেখলাম যে আমরা স্বাধীন। দু'শো বছরের বিদেশী রাজত্ব কখন এক সময় স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে। যাবার সময় ইংরেজরা আমাদের হৃদয় জয় করে গেল। আমরাই মাউন্টব্যাটেনকে আরো কিছুদিনের জন্যে ধরে রাখলুম, যাতে দেশীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক শান্তিপূর্ণ হয়।

গান্ধীজী যখন কুইট ইণ্ডিয়া বলেছিলেন তখন কি তিনি জানতেন যে ইতিহাস তার অন্যরকম অর্থ করবে? ভারতেরই একাংশ হবে পাকিস্তান। সেখান থেকে কুইট করে আসবেন যাবতীয় হিন্দু ও শিখ রাজকর্মচারী। আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এক কোটি হিন্দু ও শিখের জনতা। তিনি যদি কলকাতায় একটি মিরাক্ল না ঘটাতেন তবে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরাও বহু পরিমাণে পশ্চিম পাকিস্তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করত। আর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও।

অপরপক্ষে ভারতের যে অংশ নিজের নাম হিন্দুস্থান না রেখে ভারত রাখে সেখান থেকেও কুইট করে যান অধিকাংশ মুসলিম রাজকর্মচারী, কিন্তু কতক থেকে যান এই কারণে যে ভারত ঘোষণা করেছে তার রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সেকুলার স্টেট। সেখান থেকেও কুইট করে যায় অর্ধ কোটি মুসলমানের জনতা কিন্তু তার বহুগুণ থেকে যায় এই জন্যে যে ভারত কেবল হিন্দুদের দেশ নয়, এদেশ ধর্মনির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর।

গান্ধীজী যখন কলকাতায় বসে পূব দিকটা সামলাচ্ছেন তখন পশ্চিম দিকটা সামলাবার জন্যে তাঁর মতো কেউ ছিলেন না। মাউন্টব্যাটেনের ধারণা গান্ধী যদি সে সময় পাঞ্জাবে থাকতেন তা হলে অত বড় একটা বিপর্যয় সেখানে ঘটত না। অহিংসার চরণে নৌ-সেনাপতি ও রাজবংশীয় পুরুষের এই নতিস্বীকার সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীকে আখ্যা দেন 'ওয়ান ম্যান বাউণ্ডারী ফোর্স'।

কিন্তু পাঞ্জাবে বাংলার সঙ্গে এমন কয়েকটা তফাৎ ছিল যা মনে রাখলে পশ্চিমের ট্র্যাজেডীর হেতু বোঝা যায়। সেখানে কাজ করছিল তিন পক্ষের উচ্চাভিলাষ। শিখ, মুসলমান ও হিন্দু। প্রত্যেকেই ষোল আনার মালিক হবে। তার জন্যে হাতিয়ার সংগ্রহ করা সাত বছর ধরে চলেছিল। শেষের দিকে প্রদেশভাগের রব ওঠে, সেটা কিন্তু মুসলমানের তরফ থেকে নয়। মুসলমান তার ষোল আনার দাবীতে অটল। তারপর ভাগাভাগি প্রস্তাব যারা তোলে তারা ভেবেছিল তাদের খুশিমত ভাগ হবে, অন্তত লাহোরটা তাদের ভাগে পড়বে। হলো নিরপেক্ষভাবে, শিখ ও হিন্দুদের বিস্তর প্রিয় স্থান ও প্রচুর ভূসম্পত্তি মুসলমানের ভাগে পড়ল। লাহোর—রণজিৎ সিংহের লাহোর—শতবর্ষ পরে শিখরা ফিরে পেলো না, তাদের বদলে পেলো মুসলমান। ওটা যেন কলকাতা শহর পাকিস্তানকে দেওয়া। সেরূপ ক্ষেত্রে বাংলা দেশও কি লালে লাল হয়ে যেত না?

পাকিস্তানের নেতারা হিন্দু ও শিখকে পাকিস্তানেই রাখতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁদের জাতীয় পতাকার এক-তৃতীয়াংশ সফেদ। ঝীণা সাহেব তো পাকিস্তানের গভর্নর জেনারল হয়ে ব্যক্তিগতভাবে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এখন থেকে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলিম নয়, সকলেই পাকিস্তানী, সকলের জন্যেই পাকিস্তান। কিন্তু সেই তিনিই সরকারীভাবে পাকিস্তানকে ইসলামিক স্টেট আখ্যা দিয়ে মুসলমানকেই দেন তার প্রথম শ্রেণীর নাগরিকত্ব। যারা মুসলমান নয় তারা হলো জিম্মি। না, মূর্তিপূজক যারা তারা জিম্মি হবারও যোগ্য নয়। অনেকেই জানেন না যে ইসলামিক স্টেট মূর্তিপূজকদের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, যেমন স্বীকার করে খৃস্টান ও ইহুদীদের অস্তিত্ব। ইসলামিক স্টেটে মূর্তিপূজা যারা করে তারা হয় ওকাজ ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করবে, নয় দেশত্যাগ করবে, নয় কোতল হবে। চতুর্থ পন্থা নেই।

তবে কার্যত এর প্রয়োগের বেলা উদারতা আসে। ভারতের মাটিতে মূর্তিপূজকদের সংখ্যা এত অধিক, আর তাদের হাতে এত বেশী অস্ত্রশস্ত্র যে তাদের সবাইকে মুসলমান করা সম্ভব হয় না। কোতল করাও কাজের কথা নয়। চাষ করবে কে? খাজনা দেবে কে? আর দেশত্যাগ করে যাবেই বা তারা কোথায়? মুসলিম সুলতানরা ক্রমে দেশের রীতিকেই রাষ্ট্রের নীতি করেন। যার যার ধর্ম তার তার। তবে তাঁরা ইসলামকেই করেন রাজধর্ম। অর্থাৎ ভারতের মাটিতে যা গড়ে ওঠে তা ধর্মরাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রধর্ম। ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হয়েই ক্ষান্ত হয়, ধর্মরাষ্ট্র সংস্থাপনের স্বপ্ন বিসর্জন দেয়। মুঘল বাদশাহ আকবর তো তাকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদাও দেন না, তবে সেটা পরবর্তী আমলে ফিরে আসে।

এতকাল পরে আবার শোনা গেল ইসলাম যা দেড় হাজার বছর আগে গড়তে চেয়েছিল, কিন্তু সাতশো বছর হলো পারে নি, সেই জিনিসই আবার গড়বে পাকিস্তান। ঐসলামিক ধর্মরাষ্ট্র বলতে গেলে সাতশো বছরের ভারতীয় ইতিহাসকেই সে উল্টে দিয়ে ইসলামের ইতিহাসকেই পুনঃপ্রবর্তন করবে। এতকাল মন্দির ও মসজিদ পাশাপাশি দেখা গেছে, যেমন মুসলিম রাজ্যে তেমনি হিন্দু রাজ্যে। মুসলিম রাজার হিন্দু প্রজারা প্রাণভয়ে হিন্দু রাজ্যে পালায় নি। হিন্দু রাজার মুসলিম প্রজারাও মুসলিম রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে নিরাপত্তা চায় নি। সাতশো বছর পরে কী এমন হয়েছে যে, হিন্দু শিখরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ভারতরাষ্ট্রে ছুটে আসবে আর মুসলমানরা পা তুলে পাকিস্তানে দৌড় দেবে? এমন যদি চলতে থাকে তবে তো পাকিস্তান অচিরেই হিন্দুশূন্য হবে, আর ভারতরাষ্ট্র মুসলিমশূন্য।

এপারেও একদল ধুয়ো ধরলেন যে, ভারতরাষ্ট্রকেও করতে হবে হিন্দুরাষ্ট্র আর হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম। এটাও সেই পাকিস্তান দুই নেশনতত্ত্বের অনুসরণ, ভারতীয় এক নেশনতত্ত্বের অস্বীকৃতি। পাকিস্তানীরা যেমনটি করবে এঁরাও ঠিক তেমনটি করবেন। ওরা যদি হাজার বছর পিছিয়ে যায় এঁরাও যাবেন হাজার বছর পিছিয়ে। ওরা যদি আত্মহত্যা করে এঁরাও করবেন আত্মহত্যা। দেশের স্বাধীনতার জন্য ওরা কড়ে আঙুলটি নাড়ে নি, দেশ আবার পরাধীন হলে ওদের কী আসে যায়? কিন্তু এঁরা তো স্বাধীনতার জন্যে দুঃখ পেয়েছেন, তার মূল্য বোঝেন। তবে কেন সেই চোরাবালিতে পা দিচ্ছেন যা একদিন পরাধীনতাতেই পৌঁছে দিয়েছিল ও আবার দিতে পারে? আসলে ওটা ছিল পাকিস্তানকে জব্দ করার ও তার উপর চাপ দেওয়ার কৌশল। সেই কৌশলের অঙ্গ ছিল মুসলমানদের যেতে বাধ্য করা, হিন্দুদের আসতে বাধা করা, বেআইনী ও বেসরকারীভাবে একটা লোকবিনিময় ঘটানো।

হিন্দুরাও যে সমান সাম্প্রদায়িক হতে পারে, হতে পারে রাতারাতি, এটা সেদিন আমাদের চোখে একান্ত বিস্ময়কর ঠেকে। এক-একটা দেশের এক-একটা প্যাটার্ন থাকে। সে প্যাটার্ন বুনে যায় তার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। এদেশের প্যাটার্ন ইংরেজ আসার আগেও ছিল নানা জাতির নানা বর্ণের নানা ধর্মের নানা ভাষার মিশ্র প্যাটার্ন। যা হাজার হাজার বছর ধরে ঘোরতররূপে মিশ্র তাকে আজ হঠাৎ ক্ষমতা

হাতে পেয়ে অমিশ্র করতে পারে কেউ? একজন মানুষ ধর্মে মুসলমান, কিন্তু ভাষায় বাঙালী, পেশায় চাষী, মতবাদে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী। সে কি থাকবে, না যেতে বাধ্য হবে? তাকে বাধ্য করার দায়িত্ব কে নেবে? রাষ্ট্র না বেসরকারী এক সংগঠন না উচ্ছৃংখল এক জনতা?

আমার এক বন্ধু দিল্লী থেকে ঘুরে এসে বলেন, 'কংগ্রেস তো নামেই রাজা। প্রকৃত রাজা আর এস এস। ভোট নিলে দেখা যাবে ওদেরই মেজরিটি, কংগ্রেসের নয়।'

আমি হতবাক হই। যাঁর মুখে শুনি তিনি নিজেই একজন কংগ্রেস মন্ত্রী। তিনি ভাবতেই পারেন নি যে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকার দিল্লীতেই পুত্তলিকা হবেন।

তাঁদের অবস্থা আরো পরিষ্কার হলো যখন খবর এলো ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তব্য করতে গিয়ে আমার আরেক বন্ধু প্রাণ হারিয়েছেন কার হাতে, না তাঁরই স্বধর্মী এক হিন্দু সিপাহীর হাতে। তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মুসলমানের উপর হামলা নিবারণ করতে, তা সে নিবারণের নিবারণ করল নিবারণকর্তাকে গুলী করে।

হামলা চলবে, তাকে নিবারণ করা চলবে না, একদিকে আর এস এস, আরেক দিকে পুলিশ, মাঝখানে ফাঁদে পড়া মুসলমান। গভর্নমেন্ট কি হিন্দু হয়ে হিন্দুকে মারবে? না হিন্দুর সাত খুন মাফ? মুসলমান যেথা ইচ্ছা যাক।

সমুদ্রমন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, তা সেবন করলেন দুই রাষ্ট্রের নতুন দেবগণ। আর যে হলাহল উঠেছিল, তা পান করলেন নীলকণ্ঠ গান্ধী। তিনি তাঁর কলকাতার মিশন সেরে নোয়াখালী যাত্রা করছেন, সেখানে গিয়ে তাঁর অসমাপ্ত ব্রত সমাপন করতে হবে, এমন সময় দিল্লী থেকে এলো জরুরী তলব। সেখানেও হলাহল উঠেছে, পান করার জন্যে নীলকণ্ঠকে চাই। পূব মুখে যাবার মানুষকে পশ্চিম মুখে যেতে হলো। কে জানত যে অগস্ত্য যাত্রা!

পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু শিখ-শরণার্থীরা দিল্লীতে এসে মুসলমানদের ঘরবাড়ী মসজিদ দখল করে বসেছে। তাদের ধারণা তারাই ভারতরাষ্ট্রের যথার্থ নাগরিক আর মুসলমানরা এখানে অনধিকারী। বহু হিন্দুর বিশ্বাস যে মুসলমানরা পাকিস্তানের পঞ্চমবাহিনী, তাদের আনুগত্য সীমান্তের ওপারে. সুতরাং তাদের বহিষ্কার ও লোকবিনিময়ই প্রকৃত সমাধান।

মহাত্মাকে প্রতিদিন এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলো। এই অসত্যের বিরুদ্ধে। একটা অন্যায়ের উত্তর যে আরেকটা নয়, হিংসার উত্তর যে প্রতিহিংসা নয়, বহিষ্কারের উত্তর যে বহিষ্কার নয়, সমস্যার সমাধান যে প্রতিশোধে নয় এসব কথা দিনের পর দিন জনসাধারণকে বোঝাতে হলো। দেশ ভাগ হয়ে গেছে [illegible] দুঃখের বিষয়। [illegible] লোকভাগ হবে কেন? জনগণ যে এক ও অবিভাজ্য। জনগণ যদি অবিভক্ত থাকে, তাহলে দেশভাগও তেমন ক্ষতি করবে না, কিন্তু লোকভাগ হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। আর সেটা যদি হয় বে-সরকারী ও বে-আইনী, তার পদ্ধতি যদি হয় নিরীহ নির্দোষ সংখ্যালঘু প্রতিবেশীর উপর প্রতিশোধ তবে তা সম্পূর্ণ অহিতকর।

এ যেমন তাঁর জনসাধারণের প্রতি উপদেশ, তেমনি রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি পরামর্শ তাঁদের সেকুলার পলিসিতে স্থির থাকা, পাকিস্তানের কাছে সমান সদাচার প্রত্যাশা করা, তার বদ আচরণের জবাব বদ আচরণ নয়। এক্ষেত্রেও যা করবার তা একতরফাভাবেই করতে হবে। কিন্তু এইখানেই তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মতভেদ ঘটে। তাঁদের মতে আন্তর্জাতিক খেলার নিয়ম হলো রেসিপ্রোসিটি। একপক্ষ যা দেবে, অপরপক্ষ তার পাল্টা দেবে। ভালোর বদলে ভালো। মন্দের বদলে মন্দ। বদলা নেওয়াই আন্তর্জাতিক নীতি। নইলে ওরা এদের দুর্বল ভাববে। অন্যায়ের উপর আরো বেশী অন্যায় চাপাবে।

হিংসা প্রতিহিংসার, অন্যায় পাল্টা অন্যায়ের দুষ্ট চক্র ভঙ্গ করাই হলো গান্ধীজীর কাজ। তিনি রাষ্ট্রনায়ক নন। কিন্ত মন্ত্রণাদাতা। জবাহরলাল সেকুলার স্টেটের রাষ্ট্রীয় শক্তির সদ্ব্যবহার করলেন। শান্তিস্থাপনের জন্যে ডাক দিলেন মাদ্রাজী সৈন্যদের। তারা গুলী চালিয়ে হামলা বন্ধ করল। রাষ্ট্র পরিষ্কারভাবে সংখ্যালঘুর পক্ষ নিল।

হিন্দুদের জন্যেই হিন্দুস্থান, না ভারতীয়দের জন্যে ভারত, এই প্রশ্নের সংঘাত গান্ধীজীর উত্তরজীবনকে যেমন মহিমাময়, তেমনি ট্র্যাজিক করে। হিন্দুর দেশে হিন্দুর উপর গুলী চলছে দেখে কংগ্রেসেরই একভাগ জবাহরলালের বিপক্ষে চলে যায়, আর গান্ধী যেহেতু জবাহরলালের পক্ষে, সেহেতু গান্ধীরও বিপক্ষে। যাঁরা ছিলেন পরম গান্ধীভক্ত তাঁরাও তাঁর উপর বিরক্ত হয়ে ভাবেন তাঁর হিমালয়ে চলে যাওয়াই ভালো। কিংবা আর কোথাও। তাঁদের স্বাধীনতায় যেন তিনি হস্তক্ষেপ না করেন। স্বাধীনতাটা যে গান্ধীরই পুণ্যবলে অর্জিত এটা ভুলে যেতে বেশীদিন লাগে না। গান্ধীর পণ, তিনি মাইনরিটিকে পরিত্যাগ করবেন না। দিল্লীর মাইনরিটিকে স্বস্থানে ও সসম্মানে রেখেই তিনি নোয়াখালীর মাইনরিটিকে স্বস্থানে ও সসম্মানে রাখবেন। অপরপক্ষে তাঁর সমালোচকরা মনে করেন যে পাকিস্তানের উপর চাপ দিলেই কার্যোদ্ধার হবে, আর যদি নাও হয় তাতে কী হয়েছে? যাক না এখানকার মাইনরিটিরা ওখানে। আসুক না ওখানকার মাইনরিটিরা এখানে। এই তো হিন্দুর আপনার দেশ! আর ওই তো মুসলমানের আপনার রাষ্ট্র। যেন ওটাও হিন্দুর আপনার দেশ নয়, এটাও মুসলমানের।

শত্রুর অভাব ছিল না। তারা তো শেল হানবেই। বন্ধুরও অভাব ছিল না, তারা কিন্তু হাত ধরাধরি করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ান না। তাঁর চার দিকে অভেদ্য ব্যূহ রচনা করেন না। জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি স্বজনপরিত্যক্ত অথচ সংকল্পে অটল। তাঁর বন্ধুরা ইচ্ছা করলেই তাঁর অনশনের পূর্বক্ষণেই তাঁর দাবীগুলো মিটিয়ে দিতে পারতেন, অথবা সঙ্গে সঙ্গে। আটাত্তর বছর বয়সের একটি বৃদ্ধকে ছ'দিন ধরে অনশন করতে হলো, তার কারণ সরকারী সহকর্মীদের হৃদয় পাষাণ হয়েছিল। বাইরের সমধর্মীদের হৃদয়ও। লোকের ধারণা তিনি পাকিস্তানকে জিতিয়ে দিচ্ছেন।

ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্তানের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলি দুটি রাষ্ট্রের একটিতে বা আরেকটিতে যোগ দিলেও হায়দরাবাদের নিজাম ও কাশ্মীরের মহারাজা মনঃস্থির করতে পারছিলেন না। সুযোগ বুঝে একদল ট্রাইবাল কাশ্মীর আক্রমণ করে ও তাতে পাকিস্তানের যোগসাজস ছিল জেনে মহারাজা ভারতে যোগ দেন। তৎক্ষণাৎ ভারতীয় সৈন্য গিয়ে কাশ্মীর উদ্ধার করে। হায়দরাবাদে যেরূপে রজাকরদের উপদ্রব চলেছিল তা অন্য উপায়ে না মিটলে সেখানেও সৈন্য পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু গান্ধী কি সেটা সমর্থন করবেন? সরকারী মহলে ক্রমেই একটা ধারণা দৃঢ় হচ্ছিল যে গান্ধী থাকতে বলপ্রয়োগের স্বাধীনতা নেই, সুতরাং গান্ধীর থাকাটা অনাবশ্যক। তাঁর ও তাঁর অহিংসার ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তেমনি গান্ধীজীরও মনে হয় যে কংগ্রেসেরও ঐতিহাসিক প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

লবণ যদি তার লবণত্ব হারায়, তবে আর কিসে তাকে লবণাক্ত করবে? কংগ্রেস তার লবণত্ব হারিয়েছে। গান্ধীমতবাদ পরিত্যাগ করেছে। এখন পরিত্যাগ করছে গান্ধীকেও। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়তেই তার অস্তিত্ব। সাম্রাজ্যবাদ আর নেই। লড়াইও চুকে গেছে। এখন তাহলে কংগ্রেসকে লোকসেবক সংঘে রূপান্তরিত করতে হবে। ক্ষমতা যে জনকয়েক নেতার হাতে কেন্দ্রীভূত হবে এটা তা তিনি চাননি, যেমন ধনসম্পদ যে গুটিকয়েক পরিবারে কেন্দ্রীভূত হবে এটাও তিনি চাননি। তাঁর পরিকল্পনা ছিল বিকেন্দ্রীকরণ, হয়ে দাঁড়াল দ্বিকেন্দ্রীকরণ। তিনি জনগণের হাতেই ক্ষমতার হস্তান্তর কামনা করেন।

জীবনের শেষদিনের আগের দিন মার্গারেট বুর্ক-হোয়াইট তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বলেন, তিনি যে একশো পঁচিশ বছর বয়স অবধি বাঁচবেন সে-আশা তিনি হারিয়েছেন, কিন্তু কেন? মার্কিন লেখিকা ও ফোটোগ্রাফার জানতে চান।

"Because of the terrible happenings in the world. I do not want to live in darkness and madness I cannot continue...." He paused and I waited.

Thoughtfully he picked up a strand of cotton, gave it a twist, and ran it into the spinning wheel. "But if my services are needed," he

went on, "rather I should say, if I am commanded, then I shall live to be one hundred and twenty-five years old".

এর পরে আরো কয়েকটি প্রশ্ন। তারপরে পরমাণু বোমার প্রশ্ন। পরম হিংসার প্রশ্ন। পরমাণু বোমার সঙ্গে তিনি কিভাবে মোকাবিলা করবেন?

"Ah, ah!" he said, "How shall I answer that"! The charkha turned busily in his agile hands for a moment, and then he replied: "I would meet it by prayerful action". He emphasised the word "action", and I asked what form it would take.

"I will not go underground. I will not go into shelters. I will come out in the open and let the pilot see I have not the face of evil against him".

He turned back to his spinning for a moment before continuing.

"The pilot will not see our faces from his great height, I know. But that longing in our hearts that he will not come to harm would reach up to him and his eyes be opened".

পরের দিনই তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। প্রার্থনাপূর্ণ ক্রিয়াসহযোগে তিনি মৃত্যুবাণের সম্মুখীন হন। সম্পূর্ণ প্রস্তুতভাবে ভগবানের নাম করেন, "হে রাম! হে রাম!" তাঁর মুখমণ্ডলে মন্দের আভাস নেই। তাঁর সাধনা সার্থক। তাঁর জীবন সুসমাপ্ত। এই তাঁর ক্রুশিফিকশন।

২০শে আগস্ট, ১৯৬৯

টেলস্ ফ্রম মশনাভী

জালাল-আল-দিন রুমীর নাম এদেশে অপরিচিত নয়। প্রাচ্যদেশীয় মরমী কবিদের মধ্যে রুমীর স্থান অনেক উচ্চে. সুফীবাদের তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় প্রবক্তা। মধ্য-এশিয়ার বাল্খ অঞ্চলে ১২০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম এবং তুরস্কের কোনইয়াতে ১২৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। জালাল-আল-দিন রুমীর 'মশনাভী' বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরমী কাব্য হিসাবে স্বীকৃত লাভ করেছে। এইসব কবিতা রচিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাধারণ মানুষকে সহজে বোঝানোর জন্য অধ্যাত্ম তত্ত্বকে অতিশয় সরস ভঙ্গীতে প্রকাশ করাই এই জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য। মশনাভীতে আছে অজস্র গল্প. আর সেই গল্পের মধ্যে আছে প্রচ্ছন্ন 'ময়্যাল' বা নীতিবাক্য।

সম্প্রতি বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ অধ্যাপক এ কে আরবারি অনেক আরবী এবং ফারসী ধ্রুপদী সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। তিনি কাইরো বিশ্ববিদ্যালয়ে হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অব ক্ল্যাসিকস্ ছিলেন। লন্ডনে ফিরে তিনি কিছুকাল ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গ্রন্থগারিক ছিলেন। সম্প্রতি 'টেলস্ ফ্রম মশনাভী' এই নামে মৌলানা রুমীর বিখ্যাত পারসিক কবিতার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। মশনাভীর কয়েকটি কাহিনীর বঙ্গানুবাদ এই সঙ্গে দেওয়া গেল—

শিকারী ও পাখী

একজন ধূর্ত শিকারী ফাঁদ পেতে একটি পাখী ধরেছিল। পাখীটা লোকটিকে বল্‌ল—মহাশয়, আপনি ত' অনেক ষাঁড় ও ভেড়া ভক্ষণ করেছেন, অনেক উট বলিদান করেছেন, তথাপি আপনার তিয়াসা মেটেনি। আমার দেহের ক্ষীণ হাড় আপনাকে নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত করতে পারবে না। যদি অনুমতি করেন, আপনাকে তিনটি উপদেশ দিতে চাই। তার দ্বারা আপনি বুঝবেন আমি জ্ঞানী কি মূর্খ! প্রথম উপদেশ আমি আপনার হাতে বসে দেব, দ্বিতীয় উপদেশ দেব আপনার পলেস্তারা করা ছাদে, আর তৃতীয় উপদেশ দেব বৃক্ষশাখায়। এই তিনটি উপদেশ থেকেই আপনার ভাগ্য ফিরে যাবে। আপনার হাতে বসে বলতে চাই যে, কারো তরফ থেকে কোনোরকম অসম্ভব ব্যাপারকে বিশ্বাস করবেন না। এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বাণী দান করে পাখিটা ফুড়ুক করে উড়ে ছাদে গিয়ে বসল তারপর বলল—

অতীতের ব্যাপার নিয়ে অনুশোচনা করবেন না. এই আমার দ্বিতীয় উপদেশ। আপনার ক্ষমতার পরিধি থেকে কিছু যদি পার হয়ে যায় তাহলে তা নিয়ে অনুতাপ করবেন না।

তারপর পাখী বল্‌ল—আমার অঙ্গে একটি গোপন মুক্তা আছে, প্রায় দশ দারহেম ওজন হবে। জীবন্ত প্রাণী হিসাবে আপনি যেমন নিশ্চিত বস্তু, এই মুক্তা আপনি ও আপনার ভবিষ্যৎ বংশীয়দের সৌভাগ্য উৎপাদক। এখন আপনি এই মুক্তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন. কারণ আপনার ভাগ্যে নেই এটি ভোগ করা ; এইরকম মুক্তা আর কুত্রাপি পাওয়া যাবে না।

প্রসববেদনায় কাতরা রমণীর মত শিকারী আকুল হয়ে বিলাপ করতে থাকে।

পাখী বলে—কি মশায়? আমি ত' আপনাকে বলেছি অতীতের ব্যাপার নিয়ে শোক করতে নেই। এখন যখন যা হওয়ার হয়ে গেছে তখন আর অনুশোচনায় লাভ কি? হয় আপনি আমার উপদেশ ঠিক বুঝতে পারেননি. নতুবা আপনি বধির।

এর পর আপনাকে আমি বলেছি যে, অসম্ভব উক্তি বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হবেন না। আমার নিজের ওজনই তিন দারহেম হবে না. তাহলে আমার সঙ্গে দশ দারহেম ওজনের মুক্তা থাকবে কি করে?

এতক্ষণে মানুষটার চৈতন্য উদয় হ'ল। সে তখন বল্‌ল—আচ্ছা বাপু, এইবার তোমার তৃতীয় উপদেশটা বলে ফেল।

পাখী বল্‌ল—আমি যে দুটি উপদেশ আপনাকে দিয়েছি তার যা চমৎকার প্রয়োগ আপনি করেছেন. তারপর আর অযাচিত উপদেশ দানে কি লাভ?

বেদুইন ও তার কুকুর

কুকুরটা মৃত্যুমুখে, তার বেদুইন প্রভু কান্নায় আকুল। সে অঝোরে কাঁদছে।

—হায়! হায়! কি হল রে—এইভাবে বিলাপ করছে।

একজন পথিক প্রশ্ন করে—কি ভাই, ব্যাপার কি? এত শোক কেন? কার জন্য এই বিলাপ-প্রলাপ?

বেদুইন জবাব দেয়—আমার একটি চমৎকার কুকুর ছিল, ভারী সুন্দর স্বভাব। দেখুন না, পথের ওপাশে পড়ে মরছে। দিনের বেলা ও ছিল আমার শিকারী, রাতে পাহারাদার—কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি. অতিশয় সচেতন, সদাসতর্ক থেকে চোর তাড়াত।

লোকটি প্রশ্ন করে—আহা! তা কি হয়েছিল কুকুরটার? বেদনা আঘাত-টাঘাত লেগেছিল নাকি?

বেদুইন বল্‌লে—না মশাই. আঘাত-টাঘাত নয়. কেবল প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় কুকুরটা মরছে।

পথিক বলে—তাহলে কিছুক্ষণ একটু ধৈর্য ধরুন। এই যন্ত্রণা ও কাতরতা সহ্য করুন। ঈশ্বরের করুণায় সমস্ত দুঃখ দূরে হয়। কিন্তু মহাশয় আপনার ওই পেটমোটা ঝোলাটায় কি আছে?

বেদুইন বলে—কিছু রুটি আর গত-রাত্রের ভোজনের পর যা অবশিষ্ট ছিল তাই। ওগুলি সঙ্গে রেখেছি আমার শরীরে ত' তাগদ দরকার।

—তাহলে কুকুরটিকে কিছু রুটি আর খাবার ত' দিতে পারেন!

—আমার ভালোবাসা আর ঔদার্যের সীমা অতদূরে প্রসারিত নয় ভাই। বিনা পয়সায় পথে ত' আর রুটি কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। অথচ চোখের জল একেবারে নিখরচায় পাওয়া যায়। তাই চোখের জল ফেলছি।

অতিথি ও গৃহিণী

জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ি অনেক বিলম্বে এক অতিথি এসে হাজির। গৃহস্বামী ত' তাকে আনন্দে গলা জড়িয়ে ধরলেন, খানার টেবল সাজানো হল এবং আতিথ্য ও আপ্যায়নের বান ডেকে গেল। এখন সেই রাতেই পাড়ায় এক জায়গায় সুন্নত উৎসবের ভোজের দাওয়াত ছিল।

গোপনে কর্তা গৃহিণীকে বললেন—আজ রাতে দুটি বিছানা বানাবে। আমাদের বিছানাটা হবে দরজার দিকে—আর অতিথির বিছানাটা দেয়ালের এপাশে।

স্ত্রী বললেন—হে আমার নয়নমণি, তোমার উক্তিই আমার কাছে আদেশ। তাই হবে।

এই বলে, তিনি দুটি পৃথক বিছানা

রচনা করে পাড়ায় দাওয়াত খেতে গেলেন। ভোজসভায় তাঁকে অনেকক্ষণ থাকতে হল, এদিকে তাঁর স্বামী ও সম্মানিত অতিথি বাদাম সহযোগে প্রচুর মদ্যপানে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হলেন। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দুজন ভদ্রলোক গল্প করলেন, যে যার ইতিহাস এবং তার অন্তর্গত ভালো ও মন্দ কথা সবই বলতে লাগলেন। তারপর অতিথি ক্লান্তি ও ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে দ্বারপ্রান্তের বিছানায় আশ্রয় নিলেন। কর্তামশাই ভারী লাজুক। বন্ধুকে তিনি বলতে পারলেন না। সংকোচবশে যে—মশাই আপনার বিছানাটা এই পাশে। হে মহামান্য অতিথি ওদিকে নয়।

এইভাবে স্ত্রীর ব্যবস্থা ওলট-পালট হয়ে গেল। অতিথি বিছানায় শুয়ে পড়লেন। সেই রাতে আবার প্রচন্ড বর্ষণের ফলে ও মেঘের আওয়াজে পুরুষরা বিভ্রান্ত।

গৃহিণী ফিরলেন অনেক রাতে। তিনি অনুমান করলেন দ্বারপ্রান্তের বিছানায় স্বামী আছেন। তিনি নগ্ন গাত্রে বিছানায় প্রবেশ করে একেবারে কম্বলের আশ্রয় গ্রহণ করলেন ও অতিথিকে কয়েকবার চুমা খেলেন।

তারপর মৃদুগলায় বললেন, প্রিয়তম আমি এই আশংকাই করেছিলাম। যা ভয় করেছি তাই হল। এখন এই জল-বৃষ্টিতে অতিথি আটকে পড়লেন। সরকারি সাবানের মত এখন হাতে লেগে থাকবে। এই জল-কাদায় ও বিদায় হবে কি ভাবে? তোমার ঘাড়ে এখন বোঝা হয়ে চেপে রইল।

অতিথি তৎক্ষণাৎ উঠে বসে বললেন—নারী! তুমি থামো! আমার ভালো বুট জুতো আছে। জল-কাদার ভয় করি না। আমি চললাম। তোমাদের ভালো হোক। এই পৃথিবীর যাত্রাপথে তোমাদের যেন এক মুহূর্তও সুখভোগ না হয়। যেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তোমরা যথাস্থানে ফিরে যাও—(অর্থাৎ মৃত্যু হোক)।

এই অতুলনীয় অতিথি যখন উঠে চলে গেলেন, তখন গৃহিণী তাঁর উত্তর জন্য অনুশোচনা করতে লাগলেন।

তিনি বহুবার বললেন—হে মহামান্য অতিথি, আমার রসিকতাকে আপনি ভুল বুঝবেন না।

অতিথি কোনো অনুনয়ে কান না দিয়ে চলে গেলেন।

হে যুবক! তোমার এই দেহ একটা অতিথিশালা। সেখানে প্রতি প্রাতে অতিথি আসছেন দৌড়ে। সাবধান, যেন বলো না, এই অতিথি আমার ঘাড়ে বোঝা। কারণ সে অসীমে মিশিয়ে যাবে। অদৃশ্য জগত থেকে যা আসে সে তোমার অতিথি, তার যথাযোগ্য আপ্যায়ন করো।

এই জাতীয় অজস্র সুন্দর কাহিনীতে 'মশনাভি'র প্রতিটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

—অভয়ংকর

TALES FROM MASNAVI : Translated by : A J ARBERRY : Published by GEORGE ALLEN & UNWIN Ltd: London: 35 Shillings

মহাসংগম (উপন্যাস) — বিমলেন্দু চক্রবর্তী। অভ্যারন ২২।২এ বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা—৩। দাম : পাঁচ টাকা।

মধ্যযুগের বাংলা দেশে যখন পর্তুগীজদের লুন্ঠতরাজ ও দাস-ব্যবসায় অবাধে চলেছে, তখন অন্যদিকে তান্ত্রিক সন্যাসীরা পঞ্চমকারের গুহ্যসাধনায় নিজেরা যেমন ব্যাপৃত, গৃহী মানুষেরাও তেমনি তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতায় অভিভূত। এই পট-ভূমি ও পরিবেশের ওপর গড়ে উঠেছে 'মহা-সংগমে'র কাহিনী। তরুণ পর্তুগীজ আলভেরা কুনাল শ্যামল বাংলার মাটিতে একদা তারই সাক্ষাৎ পেল, যাকে সে তার পূর্বপুরুষদের ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে আসা শিল্প-দ্রব্যের মাঝে এর অপরূপ মিনিয়েচারে চিত্রিতা দেখেছিল—এমন কি নিজের অজ্ঞানিতে যাকে সে ভালবেসেও ফেলেছিল। এমন একটি ট্রাজেডি-কমেডি মিশ্রিত অপরূপ স্নিগ্ধ কাহিনী যার বিষয়বস্তু, তা বর্ণনার জন্য স্বভাবত লেখক কাব্যিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। সেদিক থেকে লেখকের কণ্ঠস্বর আগাগোড়া দূর মৃদু ও মধুর কবিতা পাঠের মত পাঠককে আবিষ্ট করে ফেলে। তন্ত্রসাধনার বহু বীভৎস দৃশ্য সত্ত্বেও সেই শিল্পীর স্নিগ্ধতা আর রোমান্সের সুগন্ধ উপ-ন্যাসটিকে উপভোগ্য করে রাখে। লক্ষ্য করা গেল, লেখক শুধু নিতান্ত কল্পনার ওপরই কলম ছেড়ে দেন নি, বস্তুনিষ্ঠ করার জন্য তন্ত্রসাধনা ও সেকালের বাংলা দেশের ইতি-হাসের বহু তথ্যও সংগ্রহ করেছেন। লেখকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পাঠক আশান্বিত হতে পারবেন।

আরব্য রজনীর (গল্প প্রথম ও দ্বিতীয়) : তারাপদ রাহা। প্রকাশক : রূপা অ্যান্ড কোম্পানী, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলকাতা-১২। দাম : প্রতি খন্ড ৫-০০।

বোন দুনিয়াজাদীর অনুরোধে বাদশা শাহরিয়ারের অনুমতি নিয়ে শাহরাজাদী গল্প শুরু করলো। গল্প শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নিজেদের হারিয়ে ফেললাম। যে-গল্প শোনার জন্য বাদশা বেগমের গর্দানার হুকুম দিতে পারেন না, সে-গল্প তো অমৃত সমান। তাই আরব্য রজনীর গল্প আমরা শুনেছি সেই কবে থেকে। এককালে এই গল্প বাংলা-সাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে ছিল। তবু আমরা ক্লান্ত হইনি। এখনও সমান উৎসাহে আরব্য রজনীর গল্প শুনি।

আরব্য রজনীর গল্প শোনানোর দায়িত্ব নিয়েছেন শ্রীতারাপদ। কিশোর-রচনায় ইতি-মধ্যেই তিনি বেশ খ্যাতি কুড়িয়েছেন। দুটি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। মোট ষোলটি গল্প। বেশ ঝরঝরে। পড়তে পড়তে নেশা ধরে যায়। এখানেই শ্রীরাহার মুন্সিয়ানা! তবে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। অসংখ্য খণ্ডে আরব্য রজনীর গল্প প্রকাশ না করে গল্প-সংখ্যা বাড়িয়ে খণ্ড-সংখ্যা কমানো যেতো নাকি?

দুর্গম-সুন্দর (ভ্রমণ-কাহিনী) — পরেশ ভট্টাচার্য। অভিজিৎ প্রকাশনী ২।১ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম : ছয় টাকা।

ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার কায়দা-কৌশল ইদানীং পাল্টে গেছে। কেবল বর্ণনা নয়, গল্প-পরিবেশনের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন প্রায় সকলেই। স্থানকালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর আমদানী বা চরিত্র সৃষ্টি করে বহু লেখক উপন্যাসের স্বাদ আনতে ইচ্ছুক বলেই মনে হয়। পরেশ ভট্টাচার্য অবশ্য 'দুর্গম-সুন্দর'-এ মাত্রা বজায় রেখেছেন আগাগোড়া। বইটির প্রথম দিকে মুদ্রিত হয়েছে অমরনাথের কয়েকটি ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য ছবি। আর গ্রন্থারম্ভ হয়েছে পাহাড়ী এলাকার বর্ণনা দিয়ে। নিছক ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ বই লেখেন নি। পুণ্য সঞ্চয়ের আবেগে অমরনাথে যান নি লেখক। গিয়েছেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষায়। তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দেখেছেন বিচিত্র পার্বত্য পরিবেশ, সকাল-সন্ধ্যায় রূপবৈচিত্র্য, গিরিখাতের দৃশ্য, পাইন আর ভূর্জ চন্দন অরণ্যের অপরূপ ছবি। বর্ণনার গুণে, অনুভবের গভীরতায় ও দৃষ্টিশক্তির স্বাতন্ত্র্যে বইটি স্বীকৃতি পাবে বলেই আমাদের ধারণা।

শারদ সাহিত্য

সাপ্তাহিক বসুমতী—সম্পাদক: জয়শ্রী সেন। ১৬৬, বিপিনবিহারী গাংগুলী স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম তিন টাকা।

তিনটি উপন্যাস লিখেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন হাজরা এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। গল্প কবিতা প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল হালদার, অন্নদাশংকর রায়, শংকরীপ্রসাদ বসু, আশাপূর্ণা দেবী, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, আশা দেবী, দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, লীলা মজুমদার, হরপ্রসাদ মিত্র, জসীমউদ্দীন, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, দিনেশ দাস, মণীশ ঘটক, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দুর্গাদাস সরকার, সতীশ পাকড়াশী, অনন্ত সিংহ, অরবিন্দ পোদ্দার, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, বিশ্বু মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, প্রাণতোষ ঘটক, অশোক সেন, নারায়ণ চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, অজয় বসু, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

লোকসেবক — সম্পাদক: সুধাংশু রায়। ৮৬এ, আচার্য জগদীশ বসু রোড কলকাতা-১৪। দাম তিন টাকা।

লিখেছেন নেপাল মজুমদার, মুজফ্ফর আহমদ, দুর্গাদাস সরকার, নিবেদিতা দাস, হো-চি-মিন, শংকর সেনগুপ্ত, দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, দীপালি সিংহ এবং আরো অনেকে।

চিকিৎসক সমাজ—সম্পাদক: অমল ঘোষ হাজরা। ১৫১, ডায়মণ্ডহারবার রোড। কলকাতা-৩৪। দাম দু টাকা।

চিকিৎসকসমাজের এই বিশেষ সংখ্যায় লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, বনফুল, বিশ্বনাথ রায়, শক্তিপদ রাজগুরু, নির্মল সরকার, সতু বদ্যি, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কালীকিংকর সেনগুপ্ত, আনন্দকিশোর মুন্সী এবং আরো অনেকে। সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয়।

দৃশ্যপট সম্পাদক—তরুণ সেন ও শিবেন চট্টোপাধ্যায়।। ১৪৩।৭, শিবপুর রোড, হাওড়া-২।। দাম: প'চাত্তর পয়সা।

অনেকগুলি কবিতা ও একটি মাত্র গদ্য আলোচনা নিয়ে বেরিয়েছে দৃশ্যপটের একাদশ সংকলনটি। কবিতা লিখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগদীশ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, বিতোষ আচার্য, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন রায়, তুলসী মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব মুখোপাধ্যায়, এবং আরো অনেকে। আমেরিকার প্রথম নিগ্রো দাস-মহিলা-কবি সম্পর্কে একটি সুন্দর আলোচনা লিখেছেন সুনীলকুমার নাগ।

মানব মন—সম্পাদক: ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩২।১এ, বিধান সরণী। কলকাতা-৪। দাম আড়াই টাকা।

মনোবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক ধারা পরিচায়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যায় লিখেছেন রাজেন্দ্রকুমার পাল, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, কালিদাস বসু, বিষ্ণুরঞ্জন গুহ, মনোবিদ, গেরম্যান এলকিন, জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, নিকোলাই মিনায়েভ। কুইকসটের পূর্ণাঙ্গ নাটক, 'নটক ও ভূমিকা' বর্তমান সংখ্যার আকর্ষণ।

লেখা ও রেখা—সম্পাদক: ভাস্কর মুখোপাধ্যায়।। ২২।১সি, পাইকপাড়া রো, কলকাতা-৩৭।। দাম: দু টাকা।

সুনির্বাচিত কবিতা, গল্প ও আলোচনার পত্রিকাটি আকর্ষণীয়। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, মণীশ ঘটক, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, কৃষ্ণ ধর, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, তুলসী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন। গল্প লিখেছেন চিত্ত ঘোষাল, অমল দাশগুপ্ত, তপোবিজয় ঘোষ, অশোককুমার সেনগুপ্ত, সত্যপ্রিয় ঘোষ ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। বৃহৎ সংবাদপত্রের ভূমিকা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন রণেন নাগ। এ সংখ্যার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ হলো 'গ্রন্থবীক্ষণ' পর্যায়ে প্রকাশিত গত এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সমালোচনা। সমালোচিত গ্রন্থগুলির নাম দেখে মনে হয়, কম-বেশি প্রতিষ্ঠিত লেখকদের ব্যাপারেই সম্পাদক বিশেষভাবে আগ্রহী।

মহুয়া: সম্পাদক—সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩বি ৭, গোয়ালাপাড়া রোড। বেহালা। কলকাতা ৩০। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, নচিকেতা ভরদ্বাজ এবং আরো কয়েকজন।

কৃশানু—সম্পাদক: দীনেশচন্দ্র সিংহ।। ১৮, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২।। দাম: এক টাকা।

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জার ব্যাপারে উদাসীন হলেও রচনা নির্বাচনের ব্যাপারে রীতিমত সিরিয়াস। পূর্ব বাংলার সাহিত্যের একটা পূর্ণ চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন সম্পাদক। বেশ কিছুসংখ্যক মৌলিক গল্প কবিতার পুনর্মুদ্রণে সংখ্যাটি মূল্যবান। লিখেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ, আহসান হাবীব, আবুবকর সিদ্দিকী, ফজল শাহাবুদ্দীন, শওকত ওসমান, বন্দে আলী মিয়া, আবুজাফর শামসুদ্দীন, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, নারায়ণ চৌধুরী, কৃষ্ণ ধর, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। আমরা সম্পাদককে অভিনন্দন জানাই।

কালি ও কলম—সম্পাদক: বিমল মিত্র। ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট: কলকাতা-১২। দাম প'চাত্তর পয়সা।

কালি-কলমের এই সুবৃহৎ বিশেষ সংখ্যাটি আকর্ষণীয় রচনায় সমৃদ্ধ। গল্প কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন গোপাল হালদার, সুধীন্দ্রলাল রায়, প্রভাকর মাঝি, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, বিভূতি পট্টনায়ক, তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, কুমারেশ ঘোষ, তাপসকিরণ রায়, ওংকার গুপ্ত, শশাংকশেখর সিংহ, অশোককুমার সেনগুপ্ত, নকুল চট্টোপাধ্যায়, ছবি মুখোপাধ্যায়, যজ্ঞেশ্বর রায়, নমিতা চক্রবর্তী, শিউলী সেনগুপ্ত, অজিতকৃষ্ণ বসু, স্মরজিৎ দত্ত, সুন্দরলাল ত্রিপাঠী, রবীন্দ্রনাথ দাস, পুলিনবিহারী সেন। রবীন্দ্রনাথের তিনটি চিঠি এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ রচনা সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সুধীন্দ্রলাল রায়ের 'ওয়েভেল ও সুভাষচন্দ্র বসু' প্রবন্ধটি নতুন তথ্যের ওপর আলোকপাত করেছে।

অপ্সরা—সম্পাদক: শান্তনু দাস। ৭।১, কালীচরণ ঘোষ রোড। কলকাতা-৫০। দাম সাড়ে তিন টাকা।

অপ্সরার এই প্রথম সংখ্যাটি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, সন্তোষকুমার ঘোষ এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। গল্প লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, রমাপদ চৌধুরী, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, গোপাল সামন্ত এবং চিরঞ্জীব সেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আমার স্মৃতিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিচারণটি বেশ মূল্যবান। অন্যান্য নানা প্রসঙ্গে লিখেছেন পরিমল গোস্বামী, সাগরময় ঘোষ, প্রাণতোষ ঘটক, মণীন্দ্র রায়, সুশীল রায়, উত্তমকুমার, বিশ্বজিৎ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, শমিত ভঞ্জ, সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা সেন, সুনীল মজুমদার, বিভূতি লাহা, অজয় কর, পীযূষ

বসু, সতীশনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, পিটার থম্পরাজ এবং আরো কয়েকজন।

শ্রীমতী—সম্পাদক : আভা পাকড়াশী। ২৯, ওয়াটারলু স্ট্রীট। কলকাতা-১। দাম তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, চারনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্র মিত্র। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনা লিখেছেন বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী, সমরেশ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

অভিযান—সম্পাদক : নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। ৫।৪, দমদম রোড। কলকাতা-৩০। দাম সাড়ে তিন টাকা।

অসংখ্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর রঙীন ছবিতে পূর্ণ এই পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। উপন্যাস লিখেছেন শক্তিপদ রাজগুরু, সুমথনাথ ঘোষ এবং মানবেন্দ্র পাল।

দরবারী সম্পাদক কল্যাণ চক্রবর্তী। ৩০, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। দাম : দু টাকা।

আর্ট বোর্ডের কভার। সুন্দর প্রচ্ছদ। লিখেছেন অরুণকুমার রায়, রূপেন রায়-চৌধুরী, জহুরী সদাগর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ ধর, তুলসী মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় দাশগুপ্ত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অশোককুমার সেনগুপ্ত, কুমার মিত্র, রণজিৎ সিকদার এবং আরো অনেকে। আলোচনার ধারা ও রচনা-নির্বাচনের পদ্ধতি উভয়ই নতুন।

যষ্টিমধু সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ, ২৮।৩। আর, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪। দাম : দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

হিউমার স্যাটারের মাসিক পত্রিকা হিসেবে যষ্টিমধুর নাম আছে। বিশেষ রম্য রচনার সংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে এ-সংখ্যাটি। লিখেছেন ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় থেকে হাল আমলের অনেক নবীন-প্রবীণ লেখক-লেখিকা। অধিকাংশ রচনাই পুনর্মুদ্রিত। এই চড়াগন্ডার দিনে পত্রিকাটি কারো কাছেই মন্দ লাগবে না।

ঊষা সম্পাদিকা : বাণী চট্টোপাধ্যায়। ৩৩বি, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলকাতা-৯। দাম : এক টাকা।

লিখেছেন : সুধীর গুপ্ত, পরিমল বিশ্বাস, বিশ্বেশ্বর নন্দী, অশোক দে, হরপ্রসাদ মিত্র, অমরনাথ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। গল্প-কবিতা-প্রবন্ধনিবন্ধ সবই আছে।

বৈতানিক সম্পাদক : ভবানী মুখোপাধ্যায়। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২ এবং ৩।১।৪এ, বেচারাম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৩৪। দাম : দু টাকা।

প্রবন্ধনিবন্ধ ও অন্যান্য মৌলিক রচনায় শারদীয় বৈতানিক একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সংকলন। নাটক ও বড় গল্প লিখেছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, নির্মল সরকার, অশোককুমার সেনগুপ্ত, নির্মলেন্দু গৌতম, রণজিৎ পাল, রমাপতি বসু ও প্যার লার্গেরকভিস্ট। কবিতা মুদ্রিত হয়েছে অনেকগুলি। লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, ভবানী মুখোপাধ্যায়, গণেশ বসু, দুর্গাদাস সরকার, সুধীর করণ এবং আরো অনেকে। প্রবন্ধগুলি বেশ উন্নতমানের। 'রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশী শিকার' সম্পর্কে একটা স্মৃতিচারণামূলক রচনা লিখেছেন প্রবোধকুমার সান্যাল। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে আছেন ডঃ রমা চৌধুরী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রামজীবন ভট্টাচার্য ও সন্তোষকুমার অধিকারী। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা সুন্দর।

সারস্বত—সম্পাদক : অমিয়কুমার ভট্টাচার্য। ২০৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৬। দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এই সুমুদ্রিত প্রচ্ছদশোভন পত্রিকাটি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লিখেছেন : বিনয়কৃষ্ণ দত্ত (আমাদের শিক্ষা-চিন্তাহীনতা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা), অশোক দেবচৌধুরী (প্রেমের কাব্য : ডান), তারাপদ মুখোপাধ্যায়, সুনীল সেন, রণেন নাগ, দেবপ্রসাদ ঘোষ (একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ও বাঙলার পট), বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, দুর্গাদাস সরকার, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, বিভাষ আচার্য, তরুণ সান্যাল, গণেশ বসু, তুলসী মুখোপাধ্যায়, গৌরী ঘটক, মিহির সেন, রাম বসু এবং আরো অনেকে। দুটো বিদেশী গল্পের অনুবাদ ছাপা হয়েছে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের দুটো ছবি ছাপা হয়েছে। রচনা নির্বাচন উন্নত মানের।

অন্বিষ্ট সম্পাদক : বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ৯।১।১এ লক্ষ্মী দত্ত লেন, কলকাতা-৩। দাম : এক টাকা।

লিখেছেন দেবপ্রসাদ কড়ুরী, অসিত ঘোষ, বীরেন্দ্র দত্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ দাস, নিরঞ্জন ভট্টাচার্য, শুভাশিস গোস্বামী এবং আরো কয়েকজন।

লা পয়েজি সম্পাদক : বার্ণিক রায়। ৫, গগন সরকার রোড, কলকাতা-১০। দাম : দেড় টাকা।

দেশী-বিদেশী কবিতা নিয়ে লা পয়েজির এ-সংখ্যাটি পাঠক-পাঠিকার কাছে সংগ্রহযোগ্য মনে হবে। কবিতা লিখেছেন বিষ্ণু দে, মণীশ ঘটক, গোপাল ভৌমিক, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, রত্নেশ্বর হাজরা, বিশ্বেশ্বর সামন্ত এবং আরো অনেকে। ইয়েটস, এডোয়ার্ড লুসি স্মিথ, ইয়েভতুশেংকো, পল এলুয়ার ও জর্জ শেহদে-র লেখার অনুবাদ ছাপা হয়েছে। এ-সংখ্যার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য রচনা হলো তিনটি প্রবন্ধ এবং দুটি দীর্ঘ কবিতার আলোচনা। বাঙলা কবিতার কয়েকটি ইংরেজী অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে।

বিচিন্তা ভারতী—সম্পাদক : নন্দদুলাল চক্রবর্তী। ৭১এ, নেতাজী সুভাষ রোড, রুম নং ডি ২৭, কলকাতা-১। দাম : দু টাকা।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে তিনটি সুন্দর লেখা লিখেছেন জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, সুধীর গুপ্ত, স্বপনবুড়ো ও চিত্রিতা দেবী। পাঁচটি গল্প ছাপা হয়েছে। কবিতা লিখেছেন যতীন্দ্রপ্রসাদ ভাচার্য, গোপাল ভৌমিক, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, নচিকেতা ভরদ্বাজ, কার্তিক দেবনাথ, বকুল চৌধুরী, উমা শীল এবং আরো কয়েকজন। পত্রিকাটি সাধারণ পাঠকের কাছে মন্দ লাগবে না।

জাগৃহি সম্পাদক : দুলাল তপাদার। কাটজুনগর, কলকাতা-৩২। দাম : এক টাকা।

প্রচ্ছদ ভালো। প্রবন্ধনিবন্ধ উচ্চ মানের। লিখেছেন অন্নদাশংকর রায়, নেপাল মজুমদার, বিজয় চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তি লাহিড়ী, হেনা হালদার, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, মিহির সেন, দিব্যেন্দু পালিত, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নিরুদ্দেশ' গল্পটি সত্যকারের একটি ভালো লেখা।

উত্তরদিগন্ত—সম্পাদক : সন্তোষকুমার চক্রবর্তী। মালদহ কালচারাল ইউনিট। মালদহ।

গল্প, কবিতা এবং প্রবন্ধ লিখেছেন মনীশ ঘটক, হরপ্রসাদ মিত্র, গৌরকিশোর ঘোষ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত, হেনা হালদার, শুভাশিস গোস্বামী, তরুণ সেন, শিবশম্ভু পাল, অশোক পালিত, আশাপূর্ণা দেবী, অরূপ বাগচী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মানবেন্দ্র পাল, সুবোধ ভট্টাচার্য, দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়, দুর্গাদাস ভট্ট, মানস দাশগুপ্ত, বাণী রায়, সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপদ লাহিড়ী এবং আরো অনেকে।

প্রাপ্তিস্বীকার

ইঙ্গিত—সম্পাদক : চম্পক দাস। ১৩, মুরারিপুকুর রোড, কলকাতা-৪। দাম : পঁচাত্তর পয়সা।

নহবৎ—সম্পাদক : ফণিভূষণ আচার্য। ৫০, স্টেশন রোড, কলকাতা-৩১। দাম : এক টাকা।

নবরূপ কাল—সম্পাদক : উৎপল হোমরায়। ৩৫।১এ, বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭। দাম : এক টাকা।

ক্ষপণক—সম্পাদক : বরুণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৫৯বি, প্রতাপাদিত্য রোড। কলকাতা-২৬। দাম এক টাকা।

ত্রিভুজ—সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত। মায়া ভাণ্ডার। কৈলা শহর। ত্রিপুরা। দাম এক টাকা।

ভুঁইচাঁপা—সম্পাদক : সুবলকুমার মাঝি। নীলা ধর্মতলা। বাটানগর। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

জনমত—সম্পাদক : মুকুলেশ সান্যাল। জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত। দাম দু টাকা।

সন্ধানিক—সম্পাদক : সুশীলকুমার বশিষ্ঠ। ১৪এ, মালিকপাড়া লেন। ভদ্রকালী, হুগলী।

স্বকাল—সম্পাদক : তিনু দাস এবং নীলিমা চক্রবর্তী। শ্রীদুর্গা প্রেস। গরিফা। চব্বিশ পরগণা। দাম একশ' পঁচিশ পয়সা।

তন্দ্রা—সম্পাদক : সুধাংশু ঘোষ এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সন্তোষপুর গভর্নমেণ্ট কলোনী। মহেশতলা। ২৪ পরগণা।

আশ্যাবরী—সম্পাদক : শিশিরকুমার মাইতি। ২৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন। সাঁত্রাগাছি। হাওড়া। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

একাল—সম্পাদক : নকুল মৈত্র এবং ভবতে সিংহ। ২৪, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড। কলকাতা-৩৭। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

সাহিত্যসেতু—সম্পাদক : স্মৃতি সেন। বাঁশবেড়িয়া। কুণ্ডুগলি। জেঃ বাঁশবেড়িয়া। হুগলী।

উদ্দীপ্ত—সম্পাদক : সুভাষচন্দ্র পাল। ৭৩এম।৪, নিউ কেবল টাউন। জামসেদপুর-৩। দাম এক টাকা।

অভিনব অগ্রণী—সম্পাদক : দিলীপকুমার বোস ৫৩, গোপাল ব্যানার্জি লেন। হাওড়া। দাম এক টাকা।

বরেণ্য (প্রথম সংকলন)—প্রকাশক অশোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫৩এ, ব্লক জি, নিউ আলিপুর, কলকাতা।। পঁচিশ পয়সা।

মানসী (প্রথম সংখ্যা)—সম্পাদক কানু চক্রবর্তী।। দেবালয়, ২৪ পরগণা।

নরকের তাপ (দ্বিতীয় সংকলন)—সম্পাদক: নান্দু ঘোষ ও তাপস ঘোষ।। ৮৮, পিলখানা রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।। পঞ্চাশ পয়সা।

অরুণাভা — সম্পাদক : অমূল্য গঙ্গোপাধ্যায়। সারাঙ্গাবাদ। বজবজ। ২৪ পরগণা।

নোবেল পুরস্কার

স্যামুয়েল বেকেট

এবার নিয়ে মোট তিনবার তিনজন আইরিশ নোবেল পুরস্কার পেলেন। দুবার সাহিত্যে, একবার পদার্থবিজ্ঞানে। ১৯২৩ খৃঃ কবি ডবলু বি ইয়েটস নোবেল পুরস্কার পান সাহিত্যে। ১৯৬৯ খৃঃ পেলেন স্যামুয়েল বেকেট। ১৯৫১ খৃঃ পদার্থবিজ্ঞানে কৃতিত্বের জন্য পান অধ্যাপক ই টি ওয়াল্টসন।

সুইডিশ আকাদমি বলেছেন যে, বেকেটকে তাঁরা তাঁর সেইসব রচনার জন্য পুরস্কৃত করেছেন, যা উপন্যাস ও নাটকের নতুন আঙ্গিকে আধুনিক কালের চরম অন্তঃসারশূন্যতা থেকে মানুষের উত্তরণ ঘটাচ্ছে।

বেকেটকে বলা যায় আধুনিক নাটকের অগ্রদূত। তাঁর অতি-বিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে আছে দুটি নাটক : ১৯৫২ খৃঃ রচিত ওয়েটিং ফর গোদো এবং ১৯৬৩ খৃঃ রচিত ও দা গুড ডেইজ। বেকেট নাটক, উপন্যাস, কবিতা লিখেছেন। সর্বত্রই তাঁর প্রতিভার একটি পরিণত রূপ চোখে পড়বে। ১৯৩০ খৃঃ বেকেটের প্রথম ইংরেজি কবিতা প্রকাশিত হয়। জন্মস্থান আয়ারল্যান্ড ছেড়ে চলে আসেন ফরাসী দেশে। ফরাসীতেই তাঁর অধিকাংশ রচনা। নিজের বই-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। ইংরেজিতে এখনও মাঝে মাঝে লিখে থাকেন। অনুবাদ করেন দু' ভাষাতেই। বন্ধু আইরিশ লেখক জেমস জয়েসের প্রভাব বেকেটের রচনায় চোখে পড়ে বিশেষভাবে। জয়েসের রচনায় ফরাসী অনুবাদ করেছেন।

বেকেটের কাছে উপন্যাস বা নাটকে কোন ভেদ নেই। অসংগতিকেই তিনি প্রথম নাট্যায়িত করলেন। বক্তব্য নিয়ে মাথা ঘামান না। তাঁর কাছে বড় হোল শব্দ। শব্দকে নিয়ে খেলা করেছেন অতি সহজে। ভাষার চমৎকারিত্ব না ঘটিয়ে শব্দের নৈতিক সৃষ্টিতেই যেন তিনি তৎপর।

একটা নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, জীবন সম্পর্কে চরম ঔদাসীন্যের সুর বেকেটের উপন্যাস, নাটক বা কবিতার স্পষ্ট। তিনি নৈরাশ্যবাদী লেখক নন। কিন্তু জীবন সম্পর্কে আবার আশাবাদীও নন তিনি।

বেকেটের কবিতার তেমন কদর নেই। সমসাময়িক কবিদের ওপর প্রভাব পড়েনি দেশে বা বিদেশে কোথাও। কিন্তু নাটক বা উপন্যাসে ভাষা ও উপস্থাপনায় যে-রীতি অবলম্বন করেছেন, আধুনিক লেখকরা তা সাগ্রহে অনুসরণ করেছেন। যে কোন যুগোত্তীর্ণ শিল্পীর পক্ষে এটাই চরম মাপকাঠি।

বেকেটের জন্ম ডাবলিনে ১৯০৬ খৃঃ। ১৯২৮-২৯ খৃঃ তিনি একটি ফরাসী স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন। পরে বিখ্যাত লেখক জেমস জয়েসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং অনুবাদক হন। ১৯৩৮ খৃঃ থেকে ফরাসী-বাসী।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের পরিমাণ ৩,৭৫,০০০ সুইডিশ ক্রাউন (প্রায় ৯০ হাজার ডলার বা ৬,৭৫,০০০ টাকা)। ১০ ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে সুইডেনের রাজা গুস্তাফ ষষ্ঠ অ্যাডলফ পুরস্কার প্রদান করবেন।

—বিশেষ প্রতিনিধি

অন্ধকারের মুখ

দেবল দেববর্মা

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত।

কিছুদিন ধরে ঢিল পড়ছে বাড়িতে। দিনমানে নয়, রাত-দুপুরে।

মাস তিনেক হল ব্যাপারটা চলছে। তাও একটানা নয়, কিংবা ঘন-ঘনও নয়। প্রথমে ঢিল পড়ল হঠাৎ এক নিশীথে। রাত-দুপুরে উঠে হৈ-চৈ, চিল-চিৎকার। তারপর বেশ কিছুদিন চুপচাপ। দ্বিতীয়বার ঢিল পড়ল প্রায় মাসখানেক পরে। তিন দিনের ব্যবধানে দুবার। কিন্তু তারপরই দীর্ঘ বিরতি। আবার ঢিল পড়তে শুরু করেছে গত হপ্তা থেকে। আট-ন দিনের ব্যবধানে তিনবার ঢিল পড়ল বাড়িতে।

ঢিল পড়ার ধরনটা কিন্তু একই রকম।

প্রথমে ছোট সাইজের একটা টুকরো ঢিল। তারপর বড় বড় দুটো। নীপা ঘুম-চোখেই স্বামীকে জড়িয়ে ধরল। অবশ্যই আবেগে নয়......ভীত, কম্পিত হৃদয়ে, বুকের ভিতর রীতিমত ঢিপঢিপানি শুরু হয়েছে তার।

অম্বরেরও ঘুম গাঢ় নয়। বেশ পাতলা। প্রথম ঢিলটা পড়তেই অম্বর সজাগ হল। কিন্তু ব্যস্ত হল না। দ্বিতীয় ঢিল পড়ার পর সে চোখ খুলল।

কানের কাছে ফিস-ফিস করে নীপা বলল—'ওগো, আমার ভীষণ ভয় করছে।'

তৃতীয় ঢিলের শব্দ কানে যেতেই অম্বর বিছানা থেকে নামল। দ্রুত হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল। টেবিল থেকে টর্চটা তুলে দরজা খুলতে গেল!

তৎক্ষণে নীপাও খাট থেকে নেমেছে। অম্বর বাইরে যাচ্ছে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলল—'অমন করে একলা বেরিও না। কেউ যদি অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে।'

অম্বর একটু হাসল। নীপা ভীতু-গোছের মেয়ে নয়। বরং ওর ভয়-ডর কম। কিন্তু রাত-দুপুরে বাড়িতে ঢিল পড়লেই নীপা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। স্ত্রীর মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে অম্বরের মায়া হল। কেমন যেন আতঙ্কের ছায়া। ঠোঁট দুটি রক্তশূন্য। বেচারী!

দরজা খুলে অম্বর উঠোনে এসে দাঁড়াল। কেউ কোথাও নেই। টর্চের আলো ফেলে এদিকে ওদিকে দেখল। ভাঙা ইটের টুকরোগুলি উঠোনময় ছড়িয়ে। অম্বর একটা টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করল। রাত-দুপুরে পাড়া-পড়শীকে জাগিয়ে হৈ-চৈ করা নিরর্থক। ব্যাপারটা সবাই জানে। সুতরাং অম্বর ঘরে ঢুকল। দরজায় খিল তুলে আলো নিভিয়ে দিল। রাতে আর ঢিল পড়ল না।

......শেষ ঢিল পড়ল বুধবারে। একই ব্যাপার। প্রথমে ছোট একটা ঢিল। তারপর বড় সাইজের দুটো,—

অম্বর আলো জ্বালিয়ে বাইরে এল। টর্চের আলো ফেলে উঠোনটা দেখল। ইটের টুকরোগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। অম্বর দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল।

সেদিন রাত্রেও আর চিল পড়ল না।

বৃহস্পতিবারের কথা।

টাউন ক্লাবে নাটকের মহলা সেরে নীপা বাড়ি ফিরছিল। ঘড়িতে সাতটার বেশী। ছটার সময় অম্বরের ডিউটি থেকে ফেরার কথা। এক ঘণ্টারও বেশী সে একলা রয়েছে ভেবে নীপা একটু ব্যস্ত হল। অথচ আজ রিহার্সাল-ঘরে বাবার সময় এত দেরি হবে সে ভাবেনি। নীপার ধারণা ছিল, বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক মহলা চলতে পারে। কলেজের ছুটি হয়েছে চারটের। নীপা মনে মনে একটা হিসেব রেখেছিল। অম্বর ডিউটি থেকে ফেরার আগেই সে ঘরে পৌঁছবে। ভালো করে গা ধোবে......আয়নার সামনে বসে টুকিটাকি প্রসাধন করবে। ছাত্রীর বেশ-বাস বদলে পুরোপুরি গৃহিণীর সাজে ঘর-সংসারে মন দেবে। অম্বর এসে দরজায় কড়া নাড়লেই এক মুখ হাসি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাবে।

মাথার উপর বেয়াড়া সাইজের একটা কালো শামিয়ানার মত মেঘলা আকাশ। শেষ-শ্রাবণের মেঘ-থমকানো সন্ধ্যা। কৃষ্ণপক্ষের রাত,—এমনিতেই ঘুটঘুটে অন্ধকার। কালো মেঘের ছায়া সেই অন্ধকারকে আরো এক পোঁচ রঙ লেপে দেওয়ার মত গাঢ় করেছে। শনশনে হাওয়া বইছে। ঝোড়ো-হাওয়া, রাত বাড়লে হাওয়ার গতি সম্ভবত তীব্র হবে। নীপা মাথা তুলে আকাশের বুকে দুটি একটি তারা খুঁজবার চেষ্টা করল। যদি কাটা কাটা মেঘের ফাঁকে এক-আধটা তারা হঠাৎ নজরে পড়ে যায়। কিন্তু আকাশে এখন কালো মেঘের জমজমাট আসর। তারাগুলি ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা।

পিছন ফিরে রিহার্সাল-ঘরটার দিকে নীপা তাকাল। আলকাতরার মত ঘন অন্ধকারের বুকে রিহার্সাল-রুমটা ঠিক যেন কালো জলের উপর জেগে-উঠা একটা দ্বীপ। ওই দ্বীপের বাসিন্দাদের টুকরো টুকরো সংলাপ, হাসি-কলরব এখনও নীপার কানে বাজছে। রিহার্সাল-রুমে ঢোকার পর তিন ঘণ্টা সময় যেন হুসে করে ফুরিয়ে এল। ছটা বাজার পর নীপার অবশ্য একবার সময়ের খেয়াল হয়েছিল। বাড়ি ফেরার জন্য সে উসখুস করল। কিন্তু নীলাদ্রি নাছোড়-বান্দা। নায়ক-নায়িকার সমস্ত দৃশ্য অন্তত একবার অভিনয় না হলে সে নীপাকে ছুটি দিতে রাজী নয়।

এখন চৈতি গান করছে। কান পেতে গানের কলি শুনতে নীপা চেষ্টা করল। এলোমেলো বাতাস। সুর ভেসে এলেও গানের কথাগুলি বোঝা গেল না। নাটকে দুটো গান আছে চৈতির। মেয়েটার গলা মন্দ নয়। নীপা তা স্বীকার করে। কিন্তু ভীষণ হিংসুটে মন। সন্দেহবাতিক স্বভাব। নীপা কোনো ছেলের সঙ্গে হেসে কথা বললেই মেয়েটার চোখ দুটো কেমন দেখায়। ভ্রু কুঁচকে ওঠে। অক্ষিগোলক থেকে যেন [illegible] নাটকের

নায়ক দেবরাজ মিত্রের সঙ্গে কথা বললে তো আর রক্ষা নেই। চৈতি তখন সর্পিনীর মত ফুঁসবে। সম্ভবত মনে মনে দেবরাজকে প্রেম নিবেদন করে বসে আছে মেয়েটা। ব্যাপারটা নিতান্তই একতরফা বলে নীপার ধারণা। দেবরাজের কন্দর্পতুল্য কান্তি। সুপুরুষ চেহারা। চৈতির মত একটি সাধারণ কালো মেয়ের প্রেমে সে পড়তে যাবে কেন? মেয়েটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নীপা মজা অনুভব করে। গায়ে পড়ে দেবরাজের সঙ্গে দুটো বেশী কথা বলে। সময় বুঝে এক-আধটা পরিহাসও বাদ দেয় না।

চৌকো সাইজের মাঠটা পেরোতেই চওড়া পীচের রাস্তা। নীপাদের বাড়িটা আট-দশ মিনিটের পথ। তবু হাতের কাছে একটা রিক'শ পেলে নীপা উঠে বসত। সময়টা যদি আর একটু সংক্ষেপ করা যায়, দশ মিনিটের পথ যদি দু মিনিটে ফুরিয়ে আসে।

রাস্তায় উঠে নীপা এদিকে ওদিকে তাকাল। একচক্ষু রিক'শর আলো কোনো দিক থেকেই আসছে না। এদিকটা শহরের প্রান্তে। কোর্ট-কাছারি, সরকারী অফি-সারদের ঘর-বাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। বাজার-হাট, কেনাবেচা সব শহরের অন্য-দিকে।

শন-শন বাতাসে শাড়ীটা প্রায় উড়ছে। কাঁধের উপর ঝোলানো চামড়ার ব্যাগটা নীপা ঠিক করল। হাতের উপর সাজানো বই-খাতাগুলো গুছিয়ে নিল, এলোমেলো থাকলে হঠাৎ ফস্কে গিয়ে হাতের ফাঁকে খাতা-বই গলে যাওয়া বিচিত্র নয়। একবার পড়ে গেলে আর দেখতে হবে না। কাদা আর জল মেখে চিত্র-বিচিত্র অপরূপ বস্তু হয়ে উঠবে।

রাস্তার উপরেই মস্ত ছাতিম গাছ। আর কিছুদিন পরেই ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাসে এখানের নৈশ বাতাস মদির হয়ে উঠবে। ছাতিম ফুলের গন্ধ নীপার ভাল লাগে না। কেমন নেশা-ধরানো গন্ধটা,—মাথার ভিতরে ঝিম-ঝিম করে।

অন্ধকারে দৃষ্টি সরে না। তবু নীপার কেমন সন্দেহ হল। ছাতিমগাছের নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে। সিগারেটের অগ্নিবিন্দুটি স্পষ্ট। লোকটা নীপাকে লক্ষ্য করছে কিনা বোঝা গেল না। খুব দ্রুত নীপার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা ভয়ের স্রোত বয়ে গেল। কি মতলব ওর? অন্ধকারে অমন আত্ম-গোপন করে দাঁড়িয়ে কেন?

আশ্চর্য! লোকটা ছাতিম গাছের তলা থেকে রাস্তায় উঠে এল। নীপার বুকের রক্তে একটা অবাক আলোড়ন শুরু হল। তবে কি কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা তার দিকে এগোচ্ছে? আত্মরক্ষার জন্য নীপা শক্ত হল। রিহার্সাল-রুমটা দূরে নয়। নীপা চীৎকার করলে লোকজন ছুটে আসবে।

লোকটার গায়ের রঙ এখন রোদে-পোড়া, তামাটে। অথচ এককালে ও রীতিমত ফর্সা ছিল। অযত্নবর্ধিত একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের চাউনিটা অস্বস্তিকর। ওকে চেনা যায়।

নীপা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল,—'তুমি এখানে? গাছের নীচে এমন ভূতের মত দাঁড়িয়ে কেন?'

লোকটা হি-হি করে হাসল। বলল,—'ভূতের মত কেন বলছ? তোমার কাছে আমি ভূতই তো। ভূত অর্থাৎ অতীত।'

বাধা দিয়ে নীপা বলল,—'আস্তে কথা বল। রিহার্সাল-ঘরটা কিছু দূরে নয়। আর আওতি-যাওতি লোকের মধ্যে চেনা-জানা মানুষ থাকতে পারে। তারা কি ভাববে?'

লোকটা আগের মতই হি-হি করে হাসল, বলল,—'তা সত্যি। তুমি এখন অফিসার-গিন্নি, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আড়ালে-আবডালে আমার মত মানুষের সঙ্গে কি কথা বলতে পার?'

—'কি বলবে বল', নীপা ব্যস্ততা প্রকাশ করল। একটু টেনে টেনে বলল,—'আমার কাজ আছে।'

মুখের সিগারেটটা কখন নিভে গিয়ে থাকবে। লোকটা ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে করতলের আড়াল দিয়ে সিগারেট ধরাল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল,—'গাছের তলায় একটু আগে এসে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ তোমার থিয়েটার দেখছিলাম মাইরি। কেমন সুন্দর ঢঙ-ঢাঙ দেখাচ্ছিলে। আর ইয়ে তোমার ঐ নায়কটি। ফার্স্ট ক্লাস অভিনয় করে ছোকরা। চেহারাটাও জব্বর। কথা বলার সময় তোমার দিকে এমন তাকাচ্ছিল'— চোখ নাচিয়ে লোকটা ফের বলল,—'তখন কিন্তু তোমার কাজের তাড়া আছে বলে মনে হয়নি।'

কথার পিছনে বোলতার হুল। নীপা রীতিমত বিরক্ত হল। কিন্তু উপায় নেই। লোকটা তাকে ছাড়বে না। বাক্যবাণ তাকে সইতেই হবে।

ভণিতা ছেড়ে লোকটা এবার আসল বক্তব্যে এল। বলল,—'নদীর ধারে একদিনও এলে না যে?'

নীপা যেন তৈরি হয়েই ছিল। বলল,—'টাকা জোগাড় করতে পারিনি। শুধু হাতে গেলে তুমি নিশ্চয় খুশী হতে না?'

লোকটা ব্যঙ্গ করে বলল,—'তোমার কাছে টাকা নেই, তাই না? মাইরি, তারপর কি বললে? সুন্দরী শুধু হাতে এলে আমি খুশী হতাম না!'

ওর কথা গায়ে না মেখেই নীপা পা বাড়াল। 'পথ ছাড়। আমার কাজ আছে,' সে স্পষ্ট বলল।

লোকটা দু হাত বাড়িয়ে একটা নাটকীয় মুহূর্ত রচনা করল। বলল,—'বা, বেশ মজা মাইরি! আমার টাকাটা না দিয়েই পালাচ্ছ যে।'

হঠাৎ বেকায়দায় পড়ে গেলে মানুষ যেমন অসহায় বোধ করে, নীপার মুখ-চোখ তেমনি দেখাল। অন্য পরিস্থিতি হলে নীপা রাগে ফেটে পড়ত। কিন্তু এখানে সে নিরু-পায়। লোকটার কাছে তার বাঘবন্দী অবস্থা।

ভ্রূ কুঁচকে নীপা বলল,—'টাকা কি আমার সঙ্গে আছে?'

লোকটা রাগল না। বলল,—'বেশ তো! আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, চল। বাড়ি গিয়ে টাকাটা দেবে।'

—'অসম্ভব।' নীপা প্রায় গর্জে উঠল। 'বাড়িতে এখন আমার স্বামী রয়েছেন।'

আশ্চর্য! লোকটা এবার হাসল না, রাগলও না। বরং দৃঢ় হল। শক্ত ভঙ্গিতে বলল,—'টাকা না পেলে আমাকে তোমার স্বামীর কাছেই যেতে হবে।' ক্রূর হেসে সে বলল,—'আমরা সেই ডাকবাংলোতে একটা ছবি তুলিয়েছিলাম, মনে আছে নীপা? তোমার গলায় মালা, আমার গলায় মালা। ঠিক যেন বর-বউ,' লোকটা হি-হি করে হাসল।

নীপা প্রায় চমকে উঠল। মানুষটা সাংঘাতিক। এতদিন পরে সেই ছবিখানা ও বের করতে চায় নাকি? তাহলে নীপার সর্বনাশ হতে আর কি বাকী থাকবে? সাত-আট বছর আগের সেই দিনটার কথা ভেবে নীপার আঙুল কামড়ে মরতে ইচ্ছে করল।

লোকটা এবার ধমক দিল। 'চালাকি ছাড়। টাকাটা রবিবার সন্ধ্যেয় আমার চাই। নদীর ধারের সেই গাছতলায় আমি অপেক্ষা করব। কথাটা মনে রেখো।'

রিহার্সাল-ঘর থেকে সম্ভবত আরো কেউ বেরোল। তাদের কণ্ঠস্বর, টুকরো কথাবার্তা বাতাসে ভেসে এল। ঘাড় বেঁকিয়ে নীপা ওদের চিনতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার। দৃষ্টি সরল না।

ইতিমধ্যে লোকটা অন্ধকারে ভোজ-বাজীর মত মিলিয়ে গেছে। নীপা সামনের দিকে তাকিয়ে ওকে আর দেখতে পেল না। যেত রিহার্সাল-ঘর থেকে লোকজন বেরোতে ও লক্ষ্য করে থাকবে। কিংবা ওর কোন তাড়া আছে। তাই কাজের কথা শেষ করে সরে পড়তে দেরি করেনি।

লোকটা চলে যেতেই নীপা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এতক্ষণ যেন দম-বন্ধ করা একটা বন্ধ খুপরীতে নীপা খাবি খাচ্ছিল। এই মাত্র দরজা খুলে সে মুক্ত বায়ুর স্পর্শে চাঙ্গা অনুভব করছে।

দরজায় তালা ঝুলছে।

এক নজরে সেদিকে তাকিয়ে নীপা রীতিমত বিস্মিত হল। অম্বর কোথায়? হাসপাতাল থেকে ফিরে তার তো বাড়িতেই থাকার কথা। নীপার অবশ্য ফিরতে দেরি হয়েছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে রীতিমত লজ্জা অনুভব করল। প্রায় আটটার মত। নিশ্চয় তার জন্য বেশ কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করে অম্বর কোথাও বেরিয়েছে।

শোবার ঘরে ঢুকে নীপা খাটের উপর ভেঙে পড়ল। কখন সকাল দশটায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে সে বেরিয়েছিল। কলেজে ছটা ক্লাশ করতে হয়েছে। টিউটোরিয়াল নিয়ে তিনটে অনার্সের ক্লাশ। পড়ার চাপে দেহ-মন বিকল হবার অবস্থা। কিন্তু শুয়ে থাকার উপায় নেই। এখনি নীপাকে রান্না-ঘরে ঢুকতে হবে। সংসারে দুটি মাত্র প্রাণী, তাই রান্নার জন্য কোনো লোক এতদিন ছিল না। কিন্তু কলেজে ঢুকে নীপার সময়ের ভাণ্ডারে টান পড়েছে। একবার কলেজে বেরোলেই এদিক-ওদিক করে অনেকখানি সময় চলে যায়। তারপর পড়া-শুনো আছে। পাসকোর্সে ঢুকলে হয়ত এতখানি টানাপোড়েন হত না। অনার্স নিয়েই হয়েছে ফ্যাসাদ। খাতাপত্র আর বইয়ের স্তূপ ঠিক পাহাড়-প্রমাণ বোঝা। কেমন করে সামাল করবে তাই ভেবে নীপা কূল পায় না।

ছোকরা চাকরটা ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। নীপা কলেজে ভর্তি হবার পর অম্বর কোথা থেকে জুটিয়ে আনল ছেলেটাকে। মাইল দশ-বারো দূরে কোন্ গ্রামে বাড়ি। বাপের জমি-জেরাত নেই। তাই কাজ খুঁজতে শহরে এসেছিল। অম্বরের লোকের প্রয়োজন। জানাশুনো কেউ ছেলে-টাকে হাজির করল অম্বরের সামনে। কালো ছিপছিপে গড়ন, নাকের নীচে গোঁফের রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাম জিজ্ঞেস করতে বলল,—দুখু। তার নাম দুঃখহরণ মহাপাত্র।

মাস ছয়েক কাজ করছে ছেলেটা। এই ক'মাসে অবশ্য অবিশ্বাস্য রকম উন্নতি হয়েছে ওর। পুরানো ঘরবাড়ি মেরামতির মত দেহটা যেন ভেঙে-চুরে তৈরি হল। ছিপ-ছিপে গড়নের পরিবর্তে শক্তসমর্থ জোয়ান চেহারা। নাকের নীচের সেই অল্প অল্প গোঁফের রেখা আর নেই। কামানো, পরিষ্কার চকচকে মুখ। নীপার ধারণা দু-একদিন অন্তরই ছোকরা লুকিয়ে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে আসে। বিড়ি-সিগারেট নিশ্চয়ই খায়,—বাজারের হিসাবে ছোটখাটো গরমিল নিত্যদিন লেগে আছে।

আলসেমির সুখটুকু ঝেড়ে ফেলে নীপা উঠল। বিছানার পাশেই প্রমাণমাপের আয়না। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল নীপা। এই আষাঢ়ে পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তার। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে এতখানি বয়স আন্দাজ করাও কঠিন। বড় জোর কুড়ি-একুশ। বেশী ভাবলে বাইশ পর্যন্ত। আর এগোতে সম্ভবত কেউ চাইবে না।

পানের পাতার মত মুখের ডৌল। বাঁ দিকের গালে ছোট্ট একটি কালো তিল। ঝিকিমিকি সাদা একসার দাঁত। ঘন কৃষ্ণ বঙ্কিম ভুরু। বড় বড় চোখ, ঈষৎ লালচে রঙের পাতলা ঠোঁট। রূপমুগ্ধ প্রেমিকের মত নিজের রূপ-সৌন্দর্যকে নীপা অপাঙ্গে দেখছিল।

বিছানার এককোণে কলেজের বই টই সব গাদাগাদি করে পড়ে। দ্রুতহস্তে সেগুলি তুলে নিয়ে নীপা তার পড়ার ঘরের দিকে এগোল। বইখাতাগুলি টেবিলে ঠিকমত গুছিয়ে না রাখলে কাজের সময় আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এদিক ওদিক হারিয়ে পড়ার মেজাজটুকুই নষ্ট হওয়া সার।

আজ কলেজে নীলাদ্রির কাছ থেকে এক-খানা বই এনেছে নীপা। বইখানা তার খাব প্রয়োজন ছিল না। বাংলা সাহিত্যের উপর আলোচনার বই। নীপা ইতিহাসে অনার্স নিয়েছে। অনার্সের নোটগুলি ঠিকমত তৈরি করতেই সে নাকাল। বাংলা পড়তে তার সময় কোথায়? পরীক্ষার দু চারদিন আগে চোখ বুলিয়ে নেবে। এইটুকুই ভরসা। নিজে খেটেখুটে বাংলার নোট তৈরি করতে মজুরী পোষাবে না। কিন্তু নীলাদ্রি সেনের গরজ তার চেয়েও বেশী। সাফল্যের উপযোগী বই-টই নীপার হাতে তুলে দিতে তার উৎ-সাহের কমতি নেই। বাংলার পেপারে নীপা বেশী নম্বর পেলে নীলাদ্রির ছাতিখানি বুঝি দ্বিগুণ ফুলে উঠবে!

নীলাদ্রি সেন পলাশপুর কলেজের বাংলার অধ্যাপক। বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী না। এখনও ব্যাচেলর। সাহিত্য ছাড়াও আর একটি বিষয়ে নীলাদ্রির গভীর অনুরাগ। সেটি হল নাট্যকলার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ। কলকাতায় থাকতে শৌখিন অপেশাদার একটি নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিল নীলাদ্রি। মহানগরীর বিভিন্ন হলে তাদের দলের অভিনয় একসময় রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। কলকাতার সেই নাটক-প্রেমীদের কাছে নীলাদ্রির হাতেখড়ি। কিন্তু গলার স্বরটা ভালো নয় বলে অভিনয়ে তার সুবিধে হয়নি। অভিনেতা হবার আশা ছেড়ে নীলাদ্রি তখন পরিচালক এবং নাট্যকার হতে চেষ্টা করল। কিন্তু পরিচালক হবার সৌভাগ্য কলকাতায় তার অদৃষ্টে জোটে নি। তবে গোটা দুই রেডিওর উপযোগী নাটক লিখে নীলাদ্রি কিছুটা সফল হল। বেতারে নাটক দুটি অভিনীত হবার পর তার ভাগ্যে কিছু প্রশংসা জুটেছে।

পলাশপুরে এসে নীলাদ্রি সেনের স্বপ্ন সার্থক। এখানকার সে অবিসম্বাদী পরি-চালক। কলকাতার নাম-করা নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নীলাদ্রি। বেতারে তার নাটক অভিনীত হয়েছে। সুতরাং পলাশপুরে নীলাদ্রির প্রতিযোগী হতে শক্তি কার? বিশেষ করে কলেজের নাট্যানুষ্ঠানে,—সেখানে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি সর্বাধিক। এখন অবশ্য পলাশপুরের যে কোন ক্লাবের নাট্যানুষ্ঠানে নীলাদ্রির আহ্বান আসে। বলাবাহুল্য প্রস্তুতি-পর্ব থেকেই তার দায়-দায়িত্ব: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাটক পরিচালনায় ভারটা তার। অন্যথা প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে তার নাম বিজ্ঞাপনে ঘোষিত। পরিচালনা ছাড়াও আরো অনেক কাজ নীলাদ্রির। কলকাতার জানাশুনো নাট্যগোষ্ঠী থেকে বইয়ের নায়িকা সংগ্রহ করে আনতে হয়েছে তাকে। খুব কম খরচে ভালো হিরোইন জোগাড় করে পলাশপুরের ছেলেদের কাছে রীতিমত প্রিয় পাত্র হয়েছে নীলাদ্রি।...

পলাশপুরে এসে নীলাদ্রির সঙ্গে তার দ্বিতীয় দর্শন। ব্যাপারটা সম্ভবত কেউ জানে না। আর কারো জানবার নয়। কলেজের ছেলেমেয়েরা তো নয়ই,—এমন কি তার স্বামীও নীলাদ্রিকে চিনবে না। অবশ্য চিনতে পারার কারণও নেই। তাদের আর-পুলি লেনের বাড়িতে নীলাদ্রি কোনোদিন আসেনি। ভগবানের অসীম করুণা। তার সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরে নীলাদ্রি যদি বাড়িতে এসে খোঁজ করত, তাহলে নিশ্চয়ই ভীষণ একটা কান্ড হত। নীপার বাবা তাকে ছেড়ে কথা কইতেন না। গোকুলনগর থেকে পালিয়ে এসে বাবা একেবারে অন্য মানুষ। কথায় কথায় রাগমূর্তি। কারণে অকারণে অসন্তোষ আর উত্তেজনায় ফেটে পড়েন।

সেদিনকার কথা ভাবলে নীপার এখন প্রচণ্ড দুঃখ হয়। কি যে দুর্মতি হয়েছিল তার। গোকুলনগর ছেড়ে আসার সময় বাবা কারো সঙ্গে দেখা করেননি। কাউকে ঠিকানা পর্যন্ত দিলেন না। রণক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখী সৈন্যদের মত তারা সবাই নিঃশব্দে গোকুলনগর ত্যাগ করল। গভীর নিশীথে যখন ট্রেন ছাড়ল, তখন শহরটা মৃতের মত শান্ত।

কলকাতায় এসে প্রথম কয়েক মাস আত্মগোপন। প্রায় বন্দীদশা। ঘরের মধ্যে মুখ বুজে পড়ে থাকা। বাবার কড়া হুকুম,—দরজার বাইরে পা দেওয়া চলবে না। দিনগুলো মন্থর আর খুব ভারী মনে হত নীপার। নিঃশ্বাস নিতে পর্যন্ত কণ্ট হয়, দোতলার কোণের ঘরটায় বসে সে দেখত। গলির পথে মানুষজন হাঁটছে, আসা-যাওয়া করছে। তার মত সব তরুণীর দল কলরব করে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে।

তিন-চার মাস পরে বাবা একটু নরম হলেন। তখন কলেজে ভর্তি হবার মরশুম। কি ভেবে বাবা তাকে কলেজে পাঠালেন। প্রি-ইউনিভার্সিটি ক্লাশে ভর্তি হল নীপা। সকালবেলায় মেয়েদের কলেজ। বাড়ি থেকে দশ মিনিটের পথও নয়। প্রথম কিছুদিন বাবা তাকে কলেজে পেঁছে দিতেন। ছুটির সময় একটা ঝি গিয়ে নিয়ে আসত। ব্যবস্থাটা অল্প কয়েকদিনের। কলেজের ছুটির কোনো স্থিরতা নেই। প্রফেসর না এলে দু-এক পিরিয়ড আগেই ছুটি হয়। নীপা তখন একাই বাড়ি ফিরে আসে। সুতরাং সহচরী-পরিবৃতা হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থাটা বাতিল হতে দেরি হল না।

নীলাদ্রির সঙ্গে পরিচয়টা আকস্মিক কলেজ থেকে বেরিয়ে তার এক বন্ধুর সঙ্গে পথ হাঁটছিল নীপা। মেয়েটার নাম মনে আছে তার, বাণী—বাণী গুহ। আমহার্স্ট স্ট্রীটে ওদের বাড়ি। পার্কটার কাছে বাণী আমহার্স্ট স্ট্রীটে ঢুকবে,—নীপা এগিয়ে যাবে গোলদীঘির দিকে।

হঠাৎ কোথা থেকে নীলাদ্রি এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। নীপার বিব্রত ভঙ্গি দেখে বাণী বলল,—'আয় আলাপ করিয়ে দিই তোর সঙ্গে। আমার পিসতুতো দাদা নীলাদ্রি সেন। বাংলায় এম-এ পড়ছে।'

নীলাদ্রি হাত তুলে নমস্কার জানাল।

নীপার আরক্ত কর্ণমূল, আড়ষ্ট ভঙ্গি দেখে বাণী হাসল।

বলল,—'উদয়ন নাট্য গ্রুপের নাম শুনেছিস? নীলুদা ঐ গ্রুপের মেম্বার। থিয়েটার দেখতে চাস, তো বল,—নীলুদা তোকে ফ্রি পাশ দিতে পারে।

নীলাদ্রি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কি যে লক্ষ্য করল। চট করে সে অন্য এক প্রস্তাব করে বসল,—'নাটক দেখতে চান, নিশ্চয় ফ্রি-পাশ দেব। কিন্তু শুধু দেখবেন কেন? আপনি আমাদের গ্রুপে আসুন না?' একটু হেসে সে ফের বলল,—'অভিনয় করতে ভালোবাসেন না আপনি?'

নীপা কিছু বলবার আগেই বাণী খিলখিল করে হাসল। মেয়েটা বিষম ফাজিল। মুখের আগল বলতে কিছু নেই. যা কিছু মনে আসে তাই বমির মত উগরে ফেলে।

—বাণী বলল,—'বুঝতে পেরেছিস এবার? নীলুদার তোকে ভীষণ পছন্দ হয়েছে। দলে নিতে চায়—'

নীপার ফর্সা মুখটা টম্যাটোর মত লাল হয়ে উঠল।

বাণী হেসে বলল,—'তুমি পাগল হয়েছ নীলুদা? ও যাবে থিয়েটার করতে? ওর বাবা তাহলে আস্ত রাখবেন না। কলেজ ছাড়া অন্য কোথাও যাবার পারমিশন নেই ওর।'

নীলাদ্রি ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গি করল। ঠিক সিনেমা-থিয়েটারের নায়কের ঢঙ। বলল,—'আই অ্যাম সো সরি, কিছু মনে করবেন না। বাড়িতে আপত্তি থাকলে আসবেন কেন? নিশ্চয়—'

পরদিন কলেজে এসে বাণী বলল,—'নীলুদা কি বলছিল জানিস? তোকে নাকি নায়িকার রোলে চমৎকার মানাবে। ভেবে দ্যাখ, রাজী আছিস কিনা—'

নীপা মৃদু আপত্তি জানিয়ে বলল,—'তুই ক্ষেপেছিস! অভিনয়ের আমি কি জানি? আর অমন নামী দলে—'

—'নীলুদা বলেছে অভিনয় ওরা শিখিয়ে নেবে। একদিনেই কেউ কি নাম করে?'

নীপা হাসল। কোনো উত্তর দিল না।

নীলাদ্রির সঙ্গে আবার দেখা হল।

দিন সাতেক পর। কলেজ থেকে নীপা একাই বেরিয়েছে। বাণী ক্লাসে আসেনি। সম্ভবত জ্বর-টর, কিংবা অন্য কোথাও গিয়েছে।

রাস্তার উপর নীলাদ্রি দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় কারো জন্য অপেক্ষা করছে।

নীপা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই নীলাদ্রি বলল,—'আরে! আমাকে চিনতেই পারলেন না যে—'

বাধ্য হয়ে নীপা মুখ তুলল। একটু বিব্রত ভঙ্গিতে বলল,—'বাণী আজ আসেনি।'

'তা জানি!' নীলাদ্রি হেসে বলল।—'আমি তো আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি।'

—'আমার জন্যে?' নীপা বিস্মিত হল।

নীলাদ্রি অর্থপূর্ণ হাসল। 'বাণী একটা বই পাঠিয়েছে আপনাকে দিতে।' একটু থেমে বলল,—'আমাদের গ্রুপে আসার কথা ভেবেছেন নাকি?'

অদ্ভুত সাহস নীলাদ্রির। বইয়ের মধ্যে একটা চিঠি গুঁজে দিয়েছে সে। সাদা খামখানা। নীপা ভেবেছিল বাণী কিছু লিখেছে তাকে। চিঠিখানা খুলে তার রীতিমত বেকায়দায় পড়ার অবস্থা। এপাশে-ওপাশে মেয়েদের ভিড়। কৌতূহলী দৃষ্টিতে কেউ কেউ তাকে লক্ষ্য করছে। তার মুখভাবের পরিবর্তন নিশ্চয় অনেকের নজর এড়ায়নি।

নীপা মুখ তুলে দেখল নীলাদ্রি সামনে নেই। কখন মোমের মত নিঃশব্দে সে ভিড়ের মধ্যে গলে [illegible]ছে।

দীর্ঘ চিঠি[illegible]। উনুনে সেটিকে নিশ্চিহ্ন করে নীপা স্বস্তি পেল।

পরদিন কলেজ থেকে বেরোতেই নীলাদ্রির মুখোমুখি হল সে। কিন্তু নীপা আশ্চর্য হল না। সে জানত নীলাদ্রি আসবে, তার সামনে দাঁড়াবে।

একদিনেই বদলে গেছে নীপা। আজ সে সহজ, কোনো আড়ষ্টতা অনুভব করছে না। নীলাদ্রির দিকে তাকিয়ে সে বলল—'কি, আজও বই-টই এনেছেন নাকি?' নিজের কানেই তার কন্ঠস্বর পরিহাস-তরল শোনাল।

নীলাদ্রি স্পষ্ট উত্তর দিল,—'না, আজ বইটা ফেরত নিতে এসেছি।'

নীপা ফিক করে হাসল। চোখ ঘুরিয়ে বলল,—'বইটা বাণীকেই ফেরত দেব। দুশ্চিন্তা করবেন না।'

শক্তিশালী কোনো গ্রহের মত নীলাদ্রির আকর্ষণ। ওর সঙ্গে নীপা সেদিন অনেকখানি পথ হাঁটল। নীলাদ্রি তাকে এনে তুলল মাঝারি ধরণের একটা রেস্তোরায়। লতা-পাতা আঁকা পর্দা-ঢাকা কেবিনের মধ্যে কেমন স্বচ্ছন্দে এসে বসল সে।

একসময় নীলাদ্রি ওর বাঁ হাতটা স্পর্শ করল। আঙুলগুলি নিজের দুই করতলের মধ্যে চেপে ধরল। নীপা তাতে বাধা দিল না।

●

দরজায় খুট-খুট শব্দ। নীপার ভাবনা-চিন্তা সত্বর বর্তমানে ফিরে এল। নিশ্চয় অম্বর এসেছে। রান্না করে এখনও যেতে পারেনি ভেবে নীপার মনটা বিক্ষুব্ধ হল।

দরজা খুলে নীপা বলল,—'কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

অম্বরের গম্ভীর মুখ। কি যেন ভাবছে সে।

নীপা ব্যগ্র হল। 'ওমা তুমি অমন চুপ করে কেন?'

—'থানায় গিয়েছিলাম একবার।'

—'থানায়? কেন বল তো?'

—'রাত-দুপুরে বাড়িতে ঢিল পড়ছে। ব্যাপারটা কেমন ঠেকছে আমার। পুলিশকে জানিয়ে রাখা ভালো।'

—'পুলিশ কি বলছে?'

অম্বরের কপালে কুঞ্চিত রেখা। ভয়-ভাবনার মিশ্র তরঙ্গে তার মনটা বিক্ষিপ্ত বোঝা যায়।

'বড় দারোগা বলল দুষ্টু লোক কিংবা বাগানোরদের কাণ্ড হতে পারে। কিন্তু এতদিন ধরে তারা ঢিল ফেলে না।'

—'তবে?'

অম্বর খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল,—'কথাটা তোমাকে বলব না ভেবেছিলাম, মিথ্যে ভয় পাবে।'

—'কি কথা?' নীপা বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল।

—'পুলিসের কাছে একটা ঘটনা শুনে এলাম। বছর তিন-চার আগে নতুনবাজারে একটা বাড়িতে এমনি ঢিল পড়ত। প্রায় প্রতি রাতেই। কোনদিক থেকে যে ঢিল আসত কেউ বুঝতে পারেনি।'

—'তারপর?' নীপা জানতে চাইল—

—'ব্যাপারটার নিবৃত্তি হল একটা দুর্ঘটনার পর। বাড়ির বড় মেয়েটি হঠাৎ আত্মহত্যা করল।'

—'বল কি!' নীপার কণ্ঠস্বর ভয়ার্ত শোনাল।

অম্বর গম্ভীর মুখে বলল,—'হ্যাঁ। তারপর থেকেই রাতদুপুরে ঢিল পড়া বন্ধ হল।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কিছু পড়ল উঠোনে। আলো জ্বালিয়ে অম্বর দ্রুত এল, অন্য কোনো বস্তু নয়। একটা ভাঙা ইঁট। সজোরে মাটিতে পড়ে সেটা টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেছে।

(ক্রমশঃ)
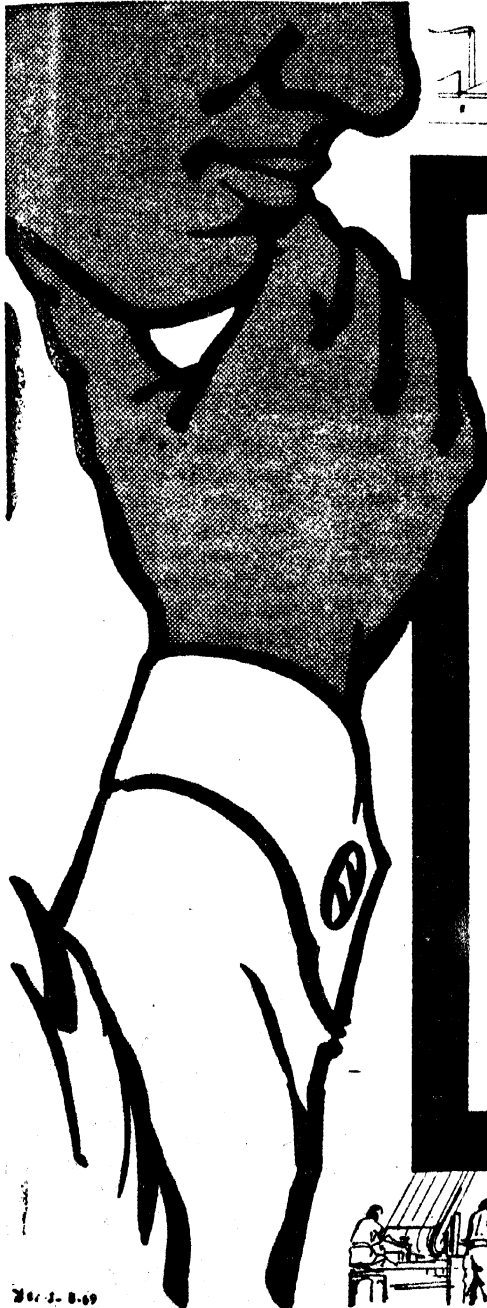
কি এবং কেন (১৫)ঃ আসঞ্জক

আসঞ্জক বলতে আমরা বুঝি এমন এক পদার্থ যা দুটি কঠিন পদার্থকে একত্র থাকতে বা জোড়া লাগতে বাধ্য করে। দৈনন্দিন জীবনে দু টুকরো কাগজকে জোড়বার জন্যে আমরা যে গঁদের আঠা ব্যবহার করি তা-ও একরকম আসঞ্জক। বহু শতাব্দী ধরে মানুষ নানারকম আসঞ্জক (অ্যাডেসিভস) ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু দুটি বস্তু আসঞ্জকের সাহায্যে কেন জোড়া লাগে তার ব্যাখ্যা সাম্প্রতিক কালেই সে পেয়েছে।

আমরা জানি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই পারস্পরিক আকর্ষণ আছে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তু জুড়ে এক হয় না। দুটি পদার্থ জোড়া লাগবার জন্যে বেশ কাছাকাছি থাকা দরকার। কিন্তু পদার্থ দুটি খুব কাছাকাছি থাকলেই যে জোড়া লাগবে, এমন কথা বলা যায় না। তাহলে রেলের চাকা লাইনের সঙ্গে জুড়ে যেত। দুটি কঠিন পদার্থের মধ্যে যে আকর্ষণ হয়, তা পদার্থ দুটিকে জুড়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার জন্যে প্রয়োজন হয় অপর একটি পদার্থের—তাকেই আমরা বলছি আসঞ্জক।

আজকাল আসঞ্জকের দ্বারা এমন সব কাজ হচ্ছে যা আগে কখনও হয়নি। গত কয়েক বছরে এমন সব আসঞ্জকের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা ধাতুর সঙ্গে ধাতুকে খুব ভালোভাবে আটকে রাখতে পারে। এতদিন পর্যন্ত যেসব পদ্ধতির সাহায্যে (যেমন রিভেটিং, বোল্টিং ইত্যাদি) ধাতুর সঙ্গে ধাতুকে জোড়া লাগানো হত, তা আজ পুরনো হয়ে গেছে। বস্তুত পৃথিবীতে এখন খুব কম পদার্থই আছে, যা কোন না কোন রকম আসঞ্জক জোড়া লাগাতে অক্ষম। কয়েক বছর আগে চা বা কফির পেয়ালা ভেঙে গেলে আমরা সেলুলোজ সিমেন্ট ব্যবহার করতুম। কিন্তু আজকাল একাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ইপোক্সি জাতীয় আসঞ্জক। কারণ এই ধরনের আসঞ্জক অনেক ভালো কাজ দেয়।

আসঞ্জন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে নানা মত আছে। একটি মতে আসঞ্জন হচ্ছে দুটি বস্তু (যাদের জোড়া লাগানো হবে) এবং আসঞ্জকের মধ্যে একটি রাসায়নিক বন্ধন। আবার অনেকে বলেন, উভয়ের মধ্যে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ সৃষ্টির ফলে আসঞ্জন হয়। এছাড়া আরও কয়েকটি মত প্রচলিত আছে। তবে কোনো সিদ্ধান্তের দ্বারাই পৃথিবীর সবরকম আসঞ্জন ব্যাখ্যা করা যায় না। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন তা হচ্ছেঃ আসঞ্জন হচ্ছে একটি বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর প্রাকৃতিক শোষণ। এই শোষণে দুটি বস্তুর অণুগুলি উভয় দিকে আকর্ষিত হয়। যে শক্তির সাহায্যে এই কাজ সম্পন্ন হয় তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ভ্যান্ডার-ওয়াল শক্তি।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই আসঞ্জকতা প্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান থাকে। তবে কারো আসঞ্জকতা বেশি, কারো বা কম। আসঞ্জন সফল হওয়ার জন্যে আসঞ্জকের বস্তুটির খুব কাছে থাকা দরকার। খুব ভালোভাবে জোড়বার জন্যে আসঞ্জকের আর একটি গুণ থাকা দরকার। সেটি হলো প্রসারণ। যে আসঞ্জক ভালোভাবে প্রসারিত হয় না, তা কখনই বস্তুর খাঁজে প্রবেশ করতে পারে না এবং দুর্বল আসঞ্জনের সৃষ্টি করে।

আজকাল আসঞ্জকের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আধুনিক বিমানযানে আসঞ্জন প্রক্রিয়ার ব্যবহার রিভেটিং-এর চেয়ে বেশি। বর্তমানে এমন বিমানও তৈরী করা সম্ভব যাতে বাইরের দিককার জোড়ের শতকরা ৭৫ ভাগ আসঞ্জকের সাহায্যে সমাধা করা হয়। শুনলে অবাক হতে হয়, বর্তমানে একটি মোটরগাড়ি যখন কারখানার বাইরে আসে, তাতে দশ কিলোগ্রাম বা তারও বেশি আসঞ্জক ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। ইলেকট্রনিকস্ শিল্পে প্রিটেন্ড বোর্ড সার্কিটে আসঞ্জকের সাহায্যে তামার তার বোর্ডে আটকানো হয়। পরিবাহী আসঞ্জককে ঠান্ডা সন্ডার হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা তার চেষ্টা চলছে। আমরা সুতীর জামাকাপড় সেলাই করি। যদি কোনো আসঞ্জক দিয়ে তা জুড়ে দেওয়া যেত, তাহলে অনেক সুবিধা হত। কিন্তু এখন তা পরীক্ষার স্তরে। আজকাল শল্যচিকিৎসকেরা রক্তবহা নালীতে কোনো ক্ষত হলে বিশেষ ধরনের আসঞ্জক দিয়ে জুড়ে দেন। আসঞ্জক বিজ্ঞানের একটি বড় সমস্যার কিন্তু সমাধান হয়নি। এখন পর্যন্ত আসঞ্জককে ৩৫০ ফাঃ-এর বেশি তাপমাত্রায় কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

মহাকাশ অভিযান

গত জুলাই মাসে চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণের ঐতিহাসিক অ্যাপোলো-১১ অভিযানের পর এই অক্টোবর মাসে সোভিয়েট রাশিয়া মহাকাশ অভিযানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছে। সেটি হচ্ছে সোয়ুজ-৬, সোয়ুজ-৭ এবং সোয়ুজ-৮ এই তিনটি মহাকাশযানের সর্বসমেত সাতজন মহাকাশচারীকে নিয়ে একত্রে পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমা। এর আগে আর কোনো মহাকাশ অভিযানে এত অভিযাত্রী একসঙ্গে পরিক্রমা করেননি। গত ১১ অক্টোবর দুজন মহাকাশচারী জর্জি শোনিন এবং ভ্যালেরি কুবাশিভ-কে নিয়ে সোয়ুজ-৬ মহাকাশে যাত্রা করে। তার একদিন পরে অর্থাৎ ১২ অক্টোবরে তিনজন মহাকাশচারী আনাতোলি ফিলিপচেঙ্কো, ভিক্টর গোরবাৎকো এবং ভ্লাদিস্লাভ ভোলকফ-কে নিয়ে যাত্রা করে সোয়ুজ-৭। আর ১৩ অক্টোবরে দুজন মহাকাশচারী ভ্লাদিমির শাটালফ এবং আলেক্সি ইয়েলিসেয়েফ সমেত সোয়ুজ-৮ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত

সয়ুজ ৬, ৭ ও ৮ এর নভশ্চরগণ। উপবিষ্ট (বাম থেকে ডানে) ভ্যালেরী কুবাসভ, জর্জ শোমিন, ভ্লাডিমির শাতালভ ও আলেক্সি ইয়েলিশেভ। দণ্ডায়মান (বাম থেকে ডানে) ভিক্টর গরবাতকো, আনাতলি ফিলিপচেনকো ও ভ্লাডিস্লভ ভলকভ

হয়। এ'দের মধ্যে শেষোক্ত দুজন এই বছরের জানুয়ারী মাসে সোয়ুজ-৪ এবং সোয়ুজ-৫ অভিযানে অংশগ্রহণ করে-ছিলেন। এবারের এই যৌথ অভিযানের সর্বাধিনায়ক ছিলেন শাটালফ এবং এই অভিযান সপ্তাহব্যাপী পরিচালিত হয়েছিল।

মহাকাশে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই তিনটি মহাকাশযানের জোটবন্ধ পরিক্রমা পরি-কল্পিত হয়। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই যৌথ পরিক্রমাকে পৃথিবীর কক্ষপথে আবর্তনশীল একটি মহাকাশমঞ্চ স্থাপনের প্রথম প্রয়াস বলেই মনে হয়। এবারের অভি-যানের বৈশিষ্ট্য ছিল, কোনো অভিযাত্রীই মহাকাশচারীদের বিশেষ ধরনের পোশাক পরেন নি। তাঁদের মাথায় শিরস্ত্রাণ ছিল না এবং পরণেও আলখাল্লা গোছের মহাকাশ পোশাক ছিল না। তাঁরা সকলেই সাধারণ পশমের পোশাক পরেছিলেন। মাত্র একজনের মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ, কিন্তু সেটা মাথা ঢেকে রাখবার জন্যে নয়। ভূপৃষ্ঠের সংযোগ-কেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলার সুবিধার জন্যে সেটি ব্যবহার করা হয়। কারণ শিরস্ত্রাণের সঙ্গে মাউথপিস লাগানো ছিল।

সপ্তাহব্যাপী এই অভিযান মহাকাশে যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হয়েছিল, তার সমস্ত কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদিত হয়। মহাকাশে থাকাকালে মহাকাশযান তিনটির অভিযাত্রীরা এমন সব পরীক্ষা করেছেন, যা ভবিষ্যতে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণকারী একটি মহাকাশমঞ্চ নির্মাণের কাজে লাগবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মহাকাশে ধাতু জোড় লাগাবার (ওয়েলডিং) কাজ। ভবিষ্যতে মহাকাশ-মঞ্চ নির্মাণের পক্ষে এই কাজটি অত্যাবশ্যক। সোয়ুজ-৬ মহাকাশযানের অভি-যাত্রী শোনিন এবং কুবাসোভ মহাকাশে পরম বায়ুশূন্য ও ভরশূন্য অবস্থায় ধাতু জোড় লাগাবার এই অতি-প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদন করেন।

আমরা জানি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিতে মানুষ এক খণ্ড দণ্ডের সঙ্গে এক খণ্ড প্রস্তর বেঁধে তার শ্রম লাঘবের প্রাথমিক অস্ত্র প্রস্তুত করেছিল। এই প্রস্তর-কুঠার প্রাগৈতিহাসিক মানুষের একটি বড় হাতিয়ার হয়েছিল। বিভিন্ন উপাদান বা বস্তু জোড় লাগাবার কৌশলের এই হল প্রাথমিক সূচনা। এরপর সভ্যতার ক্রমাগ্রগতির সঙ্গে মানুষ জোড় লাগাবার নানা কৌশল উদ্ভাবন করেছে এবং তার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে নানারকম যন্ত্র, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রপদ্ধতি।

ধাতুর ওয়েলডিং বলতে আমরা সাধা-রণত বুঝি এমন এক পদ্ধতি যাতে ধাতুর যে অংশটি আমরা জোড় লাগাতে চাই সেখানটা গলিয়ে জুড়ে দেওয়া। এই গলানোর কাজ হতে পারে গ্যাস, বিদ্যুৎশক্তি, ইলেক-ট্রন রশ্মি এবং লেসার রশ্মির সাহায্যে। কিন্তু ধাতুকে না গলিয়ে ঠাণ্ডা অবস্থাতেও ধাতুর জোড় লাগাবার কাজ করা যেতে পারে।

সোয়ুজ মহাকাশযানে ধাতু জোড় লাগা-বার যে পরীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে তা হচ্ছে এই কোল্ড ওয়েলডিং পদ্ধতি বা ঠাণ্ডা অবস্থায় ধাতু জোড় লাগাবার পদ্ধতি। যথা-যথভাবে বলতে গেলে এই পদ্ধতি হচ্ছে বায়ু-শূন্য অবস্থায় ব্যাপন জোড় (ডিফিউশন ওয়েলডিং)। অ্যালুমিনিয়াম ও তার একাধিক সংকরধাতু, তামা, নিকেল, সীসা, দস্তা, সোনা, রুপা ইত্যাদি যেসব ধাতু প্রচলিত পদ্ধতিতে জুড়তে গেলে যেমন প্রভূত শক্তি, জটিল ও ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, ব্যাপন পদ্ধতিতে তেমন কিছুর প্রয়োজন হয় না। অল্প শক্তির সাহায্যে এই পদ্ধতিতে ধাতু জোড় লাগাবার কাজ সমাধা করা যায়। অথচ এই জোড় হয় যেমন সুদৃঢ় তেমনি নির্ভরযোগ্য। এমন কি, ইস্পাত কাচ, রুপা এবং কোয়ার্টজ বা স্ফটিক ইত্যাদি ধাতু ও অধাতু উপাদানের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে যে জোড় লাগানো অসম্ভব বলে মনে হয়, ব্যাপন পদ্ধতিতে তাদের মধ্যেও জোড় লাগানো যায়।

কোল্ড ওয়েল্ডিং বা ব্যাপন জোড় পদ্ধতির মূল তত্ত্ব বলতে গেলে পরমাণু তত্ত্বের গোড়ার কথা কিছু বলা দরকার। আমরা জানি, পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন এবং তার বহিস্তরে থাকে ইলেকট্রনের দল। ধাতু-পরমাণুর বহিস্তরে যেসব ইলেকট্রন থাকে সেগুলি কেন্দ্রীণের সঙ্গে ক্ষীণভাবে যুক্ত থাকে। এর ফলে ধাতুর পরমাণুগুলি যখন পরস্পরের খুব কাছা-কাছি আসে, তখন তাদের মুক্ত ইলেকট্রন-গুলি একটা সাধারণ ইলেকট্রনমেঘ গড়ে তোলে এবং তার ফলে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

কাজেই যে দুটি ধাতব অংশ জোড় লাগাতে হবে তাদের যদি এক মিলিমিটারের কয়েক লক্ষ ভগ্নাংশের দূরত্বের মধ্যে আনা হয়, তাহলে সে দুটি অংশ দৃঢ়ভাবে জোড় লেগে যাবে। তবে এর জন্যে প্রয়োজন হল, যে দুটি অংশকে জোড়া হবে তাদের পৃষ্ঠদেশ যেন সামান্যতম গ্রীজ বা ময়লার আবরণ থেকে মুক্ত থাকে। ধাতুর পৃষ্ঠদেশ যখন আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার বা মলিনমুক্ত বলে মনে করি, তখনও তাতে অতি সামান্য পরিমাণে গ্রীজ লেগে থাকে। বস্তুত, স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলের অবস্থায় অক্সিজেনায়িত আবরণ (ফিলম্) ছাড়া ধাতুর অস্তিত্ব অসম্ভব বলেই মনে হয়।

জৈব গ্রীজ বা ময়লার আবরণ দূরী-করণের বিভিন্ন উপায় আছে। কিন্তু অক্সিজেনায়িত আবরণ সম্পূর্ণরূপে দূর করা কার্যত অসম্ভব। কারণ আবরণ দূরী-করণ ও জোড় লাগাবার মধ্যে যত কম সময় লাগুক না কেন, স্বাভাবিক অবস্থায় নতুন অক্সিজেনায়িত আবরণ অনিবার্যভাবে গড়ে উঠবে। এক্ষেত্রে বায়ুশূন্যতা বিশেষ সহায়ক। বায়ুশূন্যতা যত বেশি হবে। জোড়ের বন্ধন হবে তত দৃঢ়।

আমরা জানি, মহাকাশে প্রায় পরম বায়ুশূন্যতা বিদ্যমান। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব হচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠে ঘনত্বের তুলনায় ১০ লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। গবেষণা-গারে এই মাত্রার বায়ুশূন্যতা লাভ করা এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।

মহাকাশ অভিযানে ধাতু জোড় লাগাবার বিভিন্ন পদ্ধতি পর্যবেক্ষণের ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান মিলতে পারে। এর মধ্যে প্রধান সমস্যা হচ্ছে ব্যাপন জোড় পদ্ধতি সংক্রান্ত। পৃথিবীতে স্বাভাবিক অবস্থায় শিল্পে যে মাত্রার বায়ুশূন্যতা লাভ করা গেছে তাতেও এই পদ্ধতিতে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেখা যায়। জোড় লাগাবার অংশগুলির পৃষ্ঠদেশে এমন বিশুদ্ধতা লাভ করা গেছে যে পরে কোনো যান্ত্রিক অব-লম্বনের প্রয়োজন হয় না।

ইতিমধ্যেই কয়েক মাইক্রন থেকে কয়েক টন ওজনের অংশবিশেষ জোড়া সম্ভব হয়েছে ব্যাপন পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে জোড় যেমন উচ্চমানের হয়, তেমনি তা স্বয়ং-ক্রিয়ভাবে সম্পাদন করাও সহজ। এই বিষয়টি কেবল পৃথিবীতে কাজের জন্যে নয়, ভবিষ্যতে মহাকাশে প্রদক্ষিণকারী বৃহদাকারের মঞ্চের অংশবিশেষ জোড়ার পক্ষেও বিশেষ মূল্যবান হবে।

ব্যাপন জোড়ের পক্ষে মহাকাশ হচ্ছে আদর্শ স্থান। এ কেবল অতি-উচ্চ বায়ু-শূন্যতার ব্যাপার নয়। অংশবিশেষ জোড় লাগাবার জন্যে সেগুলিকে কিছুটা উত্তপ্ত করার প্রয়োজন হতে পারে। মহাকাশে সেই তাপীয় শক্তি পাওয়া যাবে সূর্যকিরণ থেকে। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতে মহাকাশ মঞ্চ নির্মাণের ক্ষেত্রে বায়ুশূন্য ও ভরশূন্য অবস্থায় ব্যাপন জোড় পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা আছে প্রচুর। আর এই পদ্ধতিতেই সোয়ুজ-৬-এর মহাকাশচারীরা ধাতু জোড়ের পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন।

অন্যান্য যেসব পরীক্ষা রুশ মহাকাশ-চারীরা সম্পন্ন করেছেন তার মধ্যে ছিল মহা-কাশ থেকে পৃথিবীর চিত্রগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ। সোয়ুজ-৮-এর অন্যতম পরীক্ষা ছিল আট-লান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি জাহাজ মারফৎ অভিযান-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ও মহাকাশ-যানের মধ্যে কথাবার্তা বলার মহড়া। পরীক্ষাটি যখন করা হয় মহাকাশযানটি তখন সোভিয়েট রাশিয়ার বেতার-সংযোগের বাইরে ছিল। পরিকল্পিত সকল কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করে সোয়ুজ-৬, সোয়ুজ-৭ এবং সোয়ুজ-৮-এর অভিযাত্রীরা যথাক্রমে ১৬, ১৭ ও ১৮ অক্টোবর পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে নিরাপদে ফিরে আসেন। এই সোয়ুজ অভিযানকে ব্রিটেনের জোডরেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের অধিকর্তা স্যার বার্নার্ড লোভেল মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার এক বিরাট সাফল্যের পরিচায়ক বলে বর্ণনা করেছেন।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বললাম — সাহেব, তাহলে কালকেই রওনা হতে হবে?

সাহেব বললে — নিশ্চয়ই 'রাজসিংহ' ছবি তোলা হবে, অথচ রাজসিংহ না থাকলে চলে? এত ভাবনা কিসের? কালই একটা ফার্স্ট ক্লাশ কামরা রিজার্ভ করিয়ে দিচ্ছি কোনো অসুবিধা নেই, কালই চলে যাও।

বাড়ী এসে বাবাকে বললাম। বাবার মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গেল, বললেন—এই তো বাড়ীতে ফিরলে আবার এখুনি বাইরে যেতে হবে?

—কী করা যায় বলুন? চাকরী তো! তার ওপর ম্যাডান কোম্পানীর চাকরী। বাবা আর কিছু বললেন না।

পরদিন সকালে গিয়ে টাকা নিয়ে এলাম। রাত্রে ট্রেনে চেপে বসলাম।

দিল্লীগামী সেই এক্সপ্রেস গাড়ীর একটা বড়ো রিজার্ভড কম্পার্টমেন্টে ছিলাম আমি, জ্যোতিষ ব্যানার্জি, মিস কুপার ও জাল। মিস কুপার কোরিন্থিয়ানে অভিনয় করে—কিন্তু আসলে সে ছিল নামকরা স্টেজ-ম্যানেজার। স্টেজ-ম্যানেজার হিসাবে সে যে নাম করেছিল তার কারণ হচ্ছে সে ছিল একজন ম্যাজিসিয়ান। ম্যাজিসিয়ান হওয়ার দরুন স্টেজের উপর ট্রিক সিন (যাকে বলে স্টেজ ইল্যুশন)-গুলি সে সুন্দর করত। পৌরাণিক বই কোরিন্থিয়ানে প্রায়ই হোত, এবং কথায় কথায় সব অলৌকিক দৃশ্য দেখাতে হোত। এই কার মুণ্ড কাটা গেল, ঐ কে অদৃশ্য হয়ে গেল—এইসব নানান ম্যাজিক আর কি? আমার সঙ্গে আগে থাকতেই আলাপ ছিল। ও স্টারে প্রায়ই আসতো, আমার কাছ থেকে পাশ নিয়ে আমাদের অভিনয় দেখত। তখন পাশীরা যথেষ্ট পরিমাণে বাংলা নাটক দেখত। এখন অবশ্য সে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে অভিনেতা হয়ে—ওকে দেওয়া হয়েছে মানিকলালের ভূমিকা। তখন তো নির্বাক যুগ—সুতরাং ভাষা সমস্যা ছিল না।

আর চতুর্থ ব্যক্তি জাল (আসল পদবীটা মনে নেই) ছিল ইউনিট ম্যানেজার। ওর কর্মীদল আগেই চলে গেছে চরখেরীতে—এখন ও নিজে যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। বাকী সব লোক উঠেছে সেকেন্ড ক্লাসে। তাদের মধ্যে ছিল পালনজী, প্রোডাকসন ম্যানেজার। পালনজী ছিল কোরিন্থিয়ানে প্রধান শিফটার। আর ঐ কামরায় ছিল ক্যামেরাম্যান হানিফ ও তার জুড়ী মংলু। এই দুজনেই আগে ম্যাডানের প্রভিশন স্টোর্স দোকানে বয়ের কাজ করতো—বিশ্বস্ত কর্মচারী। ফ্রামজী ম্যাডান এদের দুজনকে হাতে ধরে ক্যামেরার কাজ শিখিয়েছিলেন। এখন ওরা দুজনেই ফুল-ফ্লেজেড ক্যামেরাম্যান—দুটি ভিন্ন ইউ-নিটে প্রধান ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ করছে।

দলের বাকী সকলে অর্থাৎ টেকনিসিয়ানরা, বাবুর্চি ইত্যাদি তারা সব আগেই চলে গেছে চরখেরী স্টেটে।

গাড়ী ব্যান্ডেল হয়ে ই আই আর-এর পথ ধরলো। পরদিন দুপুরে নাগাদ এলাহাবাদ পৌঁছলাম। দুপুরের খাওয়া সারলাম রিফ্রেসমেন্ট রুমে। ঐখানে আমাদের ট্রেন বদল করতে হল। আমাদের ট্রেন আবার ছাড়বে প্রায় সন্ধ্যার সময়। ট্রেনটা মানিকপুরে হয়ে ঝাঁসি চলে যায়। ঝাঁসির পথে পড়ে মাহোবা—ঐ মাহোবাতেই আমাদের নামতে হলো। মাহোবা তখন ছিল বুন্দেলখণ্ড রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। এই মাহোবা থেকে সুবিখ্যাত খাজুরাহো যাওয়া যায়। খাজুরাহো যাবার আর একটা পথ আছে, হরপালপুরে হয়ে।

শেষরাত্রের দিকে মাহোবা পৌঁছলাম, দেখি যে চরখেরী স্টেটের লোকজন সব এসে গেছে গাড়ী আর লরী নিয়ে। আমরা ক'জন গাড়ীতেই উঠলাম। গ্রীষ্মকাল—তায় শেষ রাত্রি—গাড়ী করে উঁচু নীচু পথ দিয়ে যেতে বেশ চমৎকার লাগে।

ভোর হয়ে আসছে—বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে—পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে—আবছা আবছা অন্ধকার তখনো মিলিয়ে যায়নি—এইরকম সময় আমরা গিয়ে পৌঁছলাম চরখেরীতে। একটা বিরাট বাড়ীর সামনে এসে গাড়ীটা দাঁড়ালো—শুনলাম ঐটাই স্টেটের গেস্টহাউস। সামনে ফটক, ফটক পার হয়ে গাড়ী ঢোকবার রাস্তা। দোতলায় উঠে গেলুম, চারদিকে ঢাকা বারান্দা, মাঝখানে বড়ো হল। দুদিকে দুটি ঘর। অদূরে দেখা যাচ্ছে সাত-আটশো ফিট উঁচু পাহাড়ের ওপর একটা দুর্গ—র‍্যামপার্ট বা প্রাকার দিয়ে ঘেরা। নীচে চরখেরী শহর—বড় বড় জলাশয় রয়েছে এদিকে-সেদিকে। আমাদের অতিথি-নিবাসের পিছনেই রয়েছে একটি কৃত্রিম হ্রদ। বাড়ীর সেদিকটার অংশের সবটাই সিঁড়ি বলা যায়—ওপর থেকে একেবারে জলের মধ্যে নেমে এসেছে। পাড়গুলি রেলিং দিয়ে ঘেরা। দুটি প্রকাণ্ড বকুল গাছ, তারই ছায়ায় যেন অতিথি-নিবাসটি দাঁড়িয়ে আছে। এই বকুল গাছদুটি থেকে অজস্র ফুল ঝরে পড়ে সমস্ত পরিবেশটাকে আমোদিত করে রেখেছে। ভোরবেলার কথা বলছি—তাই মনে হল যেন এরকম চমৎকার স্থান বোধহয় ভূভারতে নেই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্তণ্ডদেবের তেজ যখন দুঃসহ হয়ে উঠল, তখনই বুঝলাম যে, 'মর্নিং শোজ দি ডে' বলে যে প্রবাদ-বাক্যটি চলে আসছে, সেটা সব সময় স্বতঃসিদ্ধ নয়।

এই অতিথি-নিবাসের নীচে থাকতেন এক সাহেব—নাম ক্যাপ্টেন পেটি—আগে তিনি মিলিটারীতে ছিলেন, এখন স্টেটের পুলিশসুপার। বছর চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বয়স হবে। সাহেবের স্ত্রীও থাকতেন সঙ্গে। খুব ভালো লোক—আমাদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন। আমাদের বললেন—আপনাদের দেখাশোনার জন্য দারোগা মুন্সী আছেন, আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। তিনিও রইলেন, আমিও রইলাম। যা দরকার হবে আমাদের বলবেন।

—ঠিক আছে, ধন্যবাদ।

সকাল হলো। ইতিমধ্যে জিনিসপত্র-সমেত লরীও এসে গেল। আমরা ওপরের বড়ো হলটাই নিলাম। আমি জ্যোতিষবাবু, মীনু ও জাল। পাশের ঘরে রইল পালনজী ও হানিফ। আউট-হাউসে থাকল ড্রেসার, বাবুর্চি ও অন্যান্য সকলে। আমরা বাবুর্চিকে ডেকে রান্না কি হবে তার নির্দেশ দিচ্ছি, এমন সময় দারোগা মুন্সী ছুটে এলেন হাঁ-হাঁ করে। বললেন—সে কী কথা। রান্নাবান্না করবেন কি? আপনারা হলেন সব স্টেটের অতিথি। না না, ওসব করবেন না। আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত ভার আমাদের।

—ঠিক আছে। আপনাদের যা মর্জি।

এরপর আমরা গেস্ট-হাউসের বাথরুমে স্নান না করে সকলে মিলে গেলাম লেকে স্নান করতে। ওরা সকলেই বেশ সাঁতার কেটে লেকে স্নানের আনন্দটা পুরোমাত্রায় উপভোগ করল—আর আমি তো সাঁতার জানি না, জলের ধারে দাঁড়িয়ে মগে করে মাথায় জল ঢেলে স্নান সারলুম।

ফিরে এসে দেখি রাজকীয় ব্রেকফাস্ট। নানান উপাদেয় খাবার ডিসের পর ডিসে সাজানো। সেগুলি সব সদ্ব্যবহার করে খাটিয়ার ওপরে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। মুন্সীজী সব তদারক করছিলেন। ঘরের দরজাগুলি সব কাঁচের। তারপর আছে

একটা জালের দরজা। বাইরের খোরানো ঢাকা-বারান্দার দরজা সব মজবুত কাঠের ঊনি লোক দিয়ে একে একে সব কাঠের দরজা বন্ধ করিয়ে দিলেন। তারপর কাছে এসে বললেন—কাঁচের দরজা ব্যবহার করবেন। এখানে মাছির ভীষণ উৎপাত, মাছি আটকাবার জন্যেই এই জালের দরজা। কাঠের দরজাগুলো খুলবেন না—বাইরে রোদের তাপ বাড়ছে, এখুনি 'লু' চলবে—খুব কষ্ট হবে। এই 'লু' লাগলেই বিপদ। জ্বর হবে, আর বেশী লাগালে মৃত্যুও হতে পারে।

শুনে ত চক্ষু ছানাবড়া। ভোর চারটের পর এখানকার কেল্লায় একটা তোপ পড়ে। এই তোপধ্বনি শোনা যায় বহুদূর থেকে। এই সময়ে চাষী মজুরেরা সব উঠে কাজে বেরিয়ে যায়। তারপর বেলা ন'টার সময় আবার একটা তোপধ্বনি হয়, তখন সব কাজ থেকে ঘরে ফিরে আসে। তারপর সমস্ত দিন আর ঘর থেকে কেউ বার হয় না। শুনলাম যে, আমাদেরও কাজ করতে হবে এই নিয়মে।

বেলা যতো বাড়তে লাগলো, তত মনে হতে লাগল বাইরে প্রচন্ড ঝড় চলেছে। আসলে এইটাই হল 'লু'। এই 'লু' লাগলে আর দেখতে হবে না। যাই হোক, ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে খাটিয়ার ওপর আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকলুম।

দুপুরবেলা কাঁচের দরজা ঠেলে খানসামারা এলো 'লাঞ্চ' নিয়ে। চেয়ে দেখি সে এক এলাহী কান্ড। মাংস, পোলাও, কোর্মা, কাবাব—যাকে বলে একেবারে মোগলাইখানা।

কিন্তু এত গরমে কি এইসব মোগলাই খানা খাওয়া যায়? জল খাচ্ছি, তাও গরম গরম লাগছে। খানসামাকে জিজ্ঞেস করলাম—বরফ আছে?

—নেই হুজুর। মুন্সীজী এলে তাঁকে বলব।

আমরা সামান্য কিছু খেয়ে বাকী সব খাবার ফেরৎ দিলাম। এইভাবে আই-ঢাই করতে করতে দুপুরটা কাটল। বেলা পড়ে আসতে দেখি মুন্সীজী আসছেন, তার পিছনে চারজন ভিস্তিওয়ালা 'মশকে' (চামড়ার থলে) করে জল তুলে আনছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কী ব্যাপার?

মুন্সীজী বললেন—ছাদ ভিজুতে হবে জল ঢেলে। ঘণ্টাখানেক জলে ভিজলে তবে ছাদ ঠান্ডা হবে। তারপর ছাদে রাত্রে খাটিয়া পেতে শোবেন।

—ঘরে শোয়া যাবে না?

মুন্সীজী হেসে বললেন—আরে বাপ্—এই অগ্নিকুন্ডের মধ্যে? তারপর একটু থেমে আবার বললেন—খানসামার কাছে শুনলুম, আপনারা কেউ কিছু খান নি—খানা প্রায় সবই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে।

বললাম—এই গরমে অত মাংস-টাংস কি খাওয়া যায়, আপনিই বলুন?

উনি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন—এখানে তো মাছ-টাছ বড়-একটা পাওয়া যায় না। আচ্ছা, আমি দেখছি কিছু জোগাড় করা যায় কি না। এখন বলুন, হুইস্কি

দশরথের রূপসজ্জায় (উপবিষ্ট) অহীন্দ্র চৌধুরী। সঙ্গে দুর্গাদাস এবং ইন্দু মুখোপাধ্যায়।

আপনাদের ক' বোতল করে লাগবে রোজ?

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম। লোক তো আমরা মোটে চারটি—রোজ ক' বোতল মানে?

জ্যোতিষবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—না না, আমাদের ওসব লাগবে না।

পরে ক্যামেরাম্যান হানিফ আমাদের বলেছিল—চরখেরীতে আগেও শুটিং হয়েছিল। স্টেটের নিয়ম, প্রতিদিন 'গেস্টদে'র জন্য মাথাপিছু এক বোতল করে হুইস্কি। আর যায় কোথায়? খেয়ে কারা সব খুব মাতলামি করেছিল। তাই ফ্রামজী সাহেব হুকুম জারী করেছেন, না ওসব চলবে না।

বিকেলবেলায় একটু ঘুরে আসব মনে করে বেরুবার উদ্যোগ করছি এমন সময় ক্যাপ্টেন পেট্রির সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন—কোথায় যাচ্ছেন?

—এই একটু বেরিয়ে আসি।

—যান, কিন্তু বেশী ঘুরবেন না। কষ্ট হবে।

রোদ্দুর পড়ে গেছে—এখন আবার কষ্ট হবে কেন? রাস্তায় বেরিয়ে বুঝলুম ক্যাপ্টেন কেন ওকথাটা বলেছিলেন। হাওয়া বইছে মন্দ নয় এবং হাওয়া গরমও নয়। কিন্তু যাতে কষ্ট হয় সে হচ্ছে রাস্তার তাপ। রাস্তার তাপ উঠে মুখটা যেন আগুনে ঝলসে যাচ্ছে। যাই হোক এই অবস্থাতেই রাজকীয় বাগান, শহর খানিকটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। পাহাড়ের উপরের দুর্গটি ছাড়া বিশেষত্ত এমন কিছু নেই।

বাজারের এক জায়গায় একটা ফল-ওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফলগুলো সব গরমের চোটে ঝলসে গেছে। একটা জিনিসের দিকে আমার দৃষ্টিটা আকৃষ্ট হলো—লম্বা লম্বা প্রায় আমসির মতোই চুপসে যাওয়া এক বস্তু—রঙটি ঠিক ধরতে পারা যায় না—বেতের বারকোশে সাজানো রয়েছে। এ আবার কী মেওয়া রে বাবা? দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলুম—ইয়ে কৌন চিজ হ্যায়?

দোকানী বললে—এ এক মেওয়া হ্যায়—বায়গন!

—কেয়া!

আমাদের এরকম অবাক হতে দেখে দোকানীও অবাক হলো, বললে—পয়ছানা নেহি? বায়গন?

মানে বেগুন। কী আশ্চর্য তাই ত! লম্বা সরু সরু বেগুন—গরমে চুপসে গিয়ে ঐ রকম চেহারা হয়েছে? এদেশে বেগুন কি না মেওয়ার পর্যায়ে পড়ল! শুনেছিলুম

এদেশে বেগুন শাক মেওয়া হিসেবে বিক্রি হয়।

বাঙালী বলতে আমি আর জ্যোতিষবাবু। আমরা দুজনে হেসে বাঁচিনে! বেগুনের কি খাতির!!

বেড়িয়ে ফিরে এসে আবার সেই লেকে স্নান করা গেল। মুন্সীর সঙ্গে দেখা করে বরফের কথা বললাম। সে বললে, দেখছি চেষ্টা করে।

ক্যাপ্টেন সাহেব কাছেই ছিলেন, তিনি বললেন, একদিন অন্তর বরফ পেলেও পেতে পারেন। ঝাঁসি থেকে আসে। একদিন পাবে রাজার পাত্র-মিত্ররা, অন্যদিন আপনারা। আর না আসে, তো কেউ পাবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম—তুমি নিজে বরফ পাও না?

—না।

—গ্রীষ্মকালে চলে কি করে তোমার?

—খাই না। এমনি জলই খাই।

—গরম লাগে না জল?

সাহেব হেসে বললে—না। বরফ-জল তৈরী করে খাই।

—কী রকম?

—দেখবে এসো। বলে সাহেব তার ঘরে আমাদের নিয়ে গেলো। সেখানে একটা কাঠের বাক্স। তার ডালাটা সে খুলে ফেললো। ঘাসের চাপড়া দিয়ে জলের বোতল সব ঢাকা রয়েছে। জলে ভেজানো। ডালার ওপরে অনেক ফুটো আছে, তাই দিয়ে জল ঢালতে হয়। বাক্সের নীচেও ফুটো আছে সেখান দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। ঘাসের চাপড়া তার নীচে সারি সারি জলের বোতল, আবার ঘাসের চাপড়া, আবার জলের বোতল, সব থেকে নীচে পুরু বালির আস্তরণ।

সাহেব কয়েকটা জলের বোতল বের করলে, বোতলগুলো সব frosted জল খেয়ে দেখলুম, একেবারে ফ্রিজিডেয়ারে বরফ-গলা জল যেন।

বললাম—ওয়াণ্ডারফুল!

সাহেব সেই থেকে তার 'ফ্রিজিডেয়ার' থেকে আমাদের জল খেতে দিত। আমাদের জন্যে যেদিন বরফ আসত, সেদিন তার কিছু অংশ তাকে দিতাম। কিন্তু পিপাসার জলের ঋণ কি এত সহজে শোধ করা যায়?

ক্রমশ সাহেবের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতা বেড়েই গিয়েছিল। একদিন সাহেব বললে—তোমরা কেউ হুইস্কি খেলে না—ও ঠিক মুন্সী চুরি করবে। খাও বা না খাও ও ঠিক খাতায় লিখাবে, তার স্টেটওু পাঠিয়ে যাবে নিয়মিত।

আমাদের মনে হলো—এ কী নিয়ম রে বাবা!

রাত্রে ছাদের কোণে এক কুঁজো জল রেখে যে যার খাটিয়ায় শুয়ে পড়লাম। পায়ের কাছে একটা বাড়তি চাদর রইলো—শেষ রাত্রে দরকার হতে পারে বলে।

এখানে বলা দরকার যে মুন্সীজী চার বোতলের জায়গায় এক বোতল হুইস্কি ও সোডা আমাদের কাছে রেখে দিয়ে গেল। যারা খাবার, তারা অল্প অল্প খেল—আর বাকী তিনটে বোতল চলে গেল মুন্সীজীর বাড়ীতে।

রাত্রে ঘুম আসতে চায় না—এদিকে বকুল ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। কিন্তু ক্রমশ হাওয়াও পড়ে গেল, আবার শুরু হল গুমোট। নীচের ঘরে ঢুকে দেখলাম—মনে হল যেন 'ফার্নেস'।

রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করল এবং ঘুমও বেশ জমে এল। কিন্তু জমলে কি হবে, যেই চারটে বাজল অমনি তোপধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও খতম।

দুই-একদিনের মধ্যে নিজেকে ওদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিলাম। সকালে লেকে স্নান, বিকেলে বাথরুমের নর্দামা বন্ধ করে চৌবাচ্চার মত জল জমিয়ে তাতে গা ডুবিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকতুম। তাতেও কী গরম যায়? সকালবেলায় যা শ্যুটিং হতো তা ২।৩ ঘন্টার বেশী নয়।

ভোরবেলা পাহাড়ের ধারে গিয়ে পেঁৗছোতাম। গ্রীজ পেন্ট, তার ওপর রাজসিংহের রাজপুত স্টাইলের চাপ-দাড়ি এবং রাজসিংহের ভারী পোশাক—এই গরমে যে কি কষ্টকর তা ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারবেন। একদিন তো সেজে-গুজে বসে রইলাম, শ্যুটিং আর হলো না, কারণ বেলা বেড়ে গেল।

রাজসিংহ সৈন্য পরিচালনা করবে, বিপুল সেনাবাহিনী চাই—অশ্বারোহী সৈন্য। রামজীর অনুরোধে স্টেটের রাজা-বাহাদুরই সৈন্য-সামন্ত সব ধার দিয়ে-ছিলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ অবশ্য ম্যাডানের। ঘোড়া ও সৈন্যদের সাজিয়ে নিয়ে লোকেশানে আনতে হিমসিম খেতে হচ্ছে পরিচালক জ্যোতিষবাবুকে।

দূরে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে—রাজাবাহাদুর পাত্র-মিত্রদের নিয়ে আসেন শ্যুটিং দেখতে। শ্যুটিং দেখাও উদ্দেশ্য, আবার যাতে সৈন্যদের বেশী খাটানো না হয় সেটা দেখাও উদ্দেশ্য। রাজাবাহাদুরের নিজের আবার থিয়েটার করানোর সখ ছিল। তাঁর ওখানে কিছুদিন আগে থিয়েটার হয়ে গেছে, স্টেজের কাঠামো তখনো দাঁড়িয়ে।

রাজাবাহাদুরের সখের থিয়েটার দলের দুজন আবার আমাদের পরিচিত বেরিয়ে পড়লো। তারা দুজনেই এক সময় কাঁরিন্থিয়ানে ছিল। দুটি ভাই—নর্মদাশংকর আর ভোলাশংকর। নর্মদা 'হিরো' সাজে, আর ভোলা করে ফিমেল পার্ট। ফিমেল পার্ট করার মতই সুন্দর চেহারা তার—সব সময় সেজেগুজে রাজার পাশে পাশে থাকে—যেন সত্যিই রাজপুত্তুরটি।

একদিন আমরা শ্যুটিংয়ে যাচ্ছি গাড়ী করে এমন সময় দেখি এক বুড়ো রাজপুত একটি জলাশয়ের ধারে বন্দুক নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে চুপচাপ। কাছে-পিঠে আর জনপ্রাণী নেই। কৌতূহলী হয়ে গাড়ী থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কী করছো এখানে?

সাধারণ পথচারী হলে হয়ত উত্তর দিত না, কিন্তু গাড়ী করে যাচ্ছি, তাহলে কোনো 'রেইস আদমী' হবে বোধহয়—তাই ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিলে—ডিউটি করছি।

—কিসের ডিউটি?

লোকটি জলের দিকে নিশানা রেখে সেদিকে মুখ রেখেই বলতে লাগল—কলকাতা থেকে যে বাবুরা এসেছে—তারা মছলী খায়। এখানে তো মছলী পাওয়া যায় না, এই ঝিলে মছলী আছে, তাই বন্দুক দিয়ে মছলী মারব বলে বসে আছি।

বন্দুক দিয়ে মাছ ধরা? কি বিচিত্র দেশ রে বাবা!

কিন্তু লোকটা যে বাজে কথা বলছে না, একটু বাদেই তা টের পেলাম। ভাগ্যক্রমে চোখের সামনেই ঘটল ঘটনাটা। জলের ওপর কালো-কালো হঠাৎ কী দেখতে পেয়ে তার বন্দুক গর্জে উঠল : গুড়ুম।

সত্যিই মছলী মারা পড়লো বন্দুকের গুলীতে। নিজে আবার সে মছলী ছোঁবে না। দুজন চাকর ছুটে এসে মৃত ভাসমান মাছটাকে ধরে নিয়ে এলো—মাছ বেশ বড়োই, সুপক্ক রোহিত মৎস্য। রাত্রে খাবার সময় মনেই হল না যে মাছ খাচ্ছি—মনে হল যেন মাংস খাচ্ছি।

এইবার শ্যুটিং-এর কথায় আসি। প্রথম যেদিন আমার শ্যুটিং হল, সেদিনই হল ভারী মজা। রাজসিংহের ঘোড়া দরকার এবং যেহেতু রাজসিংহের ঘোড়া, সেই জন্য তার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। এ জন্যে এল একটা সাদা ধবধবে ঘোড়া। দেখতে সুন্দর, তাকে সাজানোও হয়েছে ভালো, পায়ে আবার 'মল' দেওয়া। লাল শালুর পটি, তার উপর মল। পিঠের ওপর জমকালো জাজিম তো আছেই। ঘোড়ায় চড়তে আগেই কিছু কিছু শিখেছিলাম। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তো উঠলুম ঘোড়ার পিঠে। কিন্তু চড়ার পর ঘোড়ার কাণ্ড-কারখানা দেখে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। ঘোড়া সামনের দিকে না এগিয়ে নাচতে শুরু করে দিল। আসলে নাচিয়ে ঘোড়া আর কী! সামনে এগোয় না, খালি ঘুরপাক খায়—আর সামনের দিকে পা তুলে দিয়ে ঠমকে ঠমকে নাচে। পেছনে হাজার চাবুক মারলেও কিম্বা পেটের দু পাশে গুঁতো মারলেও ঘোড়া চলতে চায় না। তাড়া দিলেও দৌড়য় না। মিনু কুপার, যে মানিকলাল সেজেছিল, সে তো হেসেই খুন। ওখানে আমার সমস্ত 'সিন'ই ছিল তার সঙ্গে। এ ছাড়া ছিল কয়েকটা যুদ্ধের দৃশ্য—পাহাড়ে ওঠা-নামা এই সব।

জ্যোতিষবাবু এই দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে সেটুকুই তুলে নিই, বাকীটা কলকাতায় গিয়ে মিলিয়ে নেবো। বললাম—এ ঘোড়া কলকাতায় পাবেন কোথায়—যে মেলাবেন?

সত্যিই তো—এই কথায় জ্যোতিষবাবুর হুঁস হলো। সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়ে ঘোটকী বরবাদ হয়ে অন্য ঘোড়া এল। এটি বেশ সুন্দর সাদা ঘোড়া। দ্রুত ছোটে। সুতরাং জ্যোতিষবাবু আর সময় নষ্ট না করে ক্যামে-

রাম্যান এবং আমাদের কি কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিয়ে বললে—স্টার্ট ক্যামেরা।

স্টার্ট আমি নিলুম, ঘোড়াও ছুটল। কিন্তু হলো আর এক বিপদ। পিছনে যে সৈন্য-সামন্তরা ছিল তাদের ঘোড়াগুলো সামনের দিকে না ছুটে সব আমার ঘোড়াটাকে চারদিক থেকে এসে ছেঁকে ধরলো। আমার তো এদিকে প্রাণান্ত ব্যাপার।

জ্যোতিষবাবু ক্যামেরার পাশ থেকে চিৎকার করলেন—কাট, কাট।

কী ব্যাপার? পরে দেখা গেল, আমি যেটিতে চড়েছিলাম সেটি ঘোড়া নয়, ঘোটকী এবং অশ্বকুলে সম্ভবত সুন্দরী শ্রেষ্ঠা। নইলে সব অশ্বরাই এর পেছনে একযোগে ছুটে আসবে কেন?

যাই হোক, আবার ঘোড়া পরিবর্তন করে শ্যুটিং-এর কাজ চলল এবং তিন সপ্তাহ পুরো চরখেরীতে কাটিয়ে আমরা ফিরে এলাম।

রাত্রে একটা ট্রেনে উঠে আমরা সবাই নামলুম এলাহাবাদে। সবাই চলে গেল, কিন্তু জ্যোতিষবাবু ও আমি এলাহাবাদে নেমে গেলুম—উদ্দেশ্য গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম দেখবো—সেখানে স্নান করব। বাকী সকলে চলে গেল।

এলাহাবাদ আমার জানা শহর, এখানে একবার থিয়েটার করতে এসেছিলুম। স্নান-টান সেরে একটু ঘুরে-ঘারে স্টেশনে এসেছি ট্রেন ধরব বলে—হঠাৎ জ্যোতিষবাবু বলে বসলেন—না মশাই, কলকাতা ফিরছি না এখন।

—সে কী?

—কাশী যাবো। কখনো যাই নি। সেখানে তে-রাত্তির থাকবো।

আমি বললাম—কোথায় উঠবেন ওখানে? জানাশোনা কেউ আছে ওখানে?

উনি হেসে বললেন—আছে, মশাই আছে। ম্যাডানদের সিনেমা হাউস আছে ওখানে, তার ম্যানেজারের সঙ্গে আমার খুব জানা-শোনা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও বললাম—বাস তাহলে আর ভাবনা কি? আমিও রইলাম আপনার সঙ্গে। একযাত্রায় পৃথক ফল হতে দিচ্ছি না। তার ওপর নতুন জায়গা—আপনাকে আগলাবার জন্যে একজন লোক দরকার তো। যা গুণ্ডা-বদমায়েসের জায়গা কাশী—

জ্যোতিষবাবু হেসে বললেন — আচ্ছা, বেশ তো। আপনিও চলুন না।

রাত্রের গাড়ীতে তারা মোগলসরাই এলাহাবাদ-বেনারস এক থ্রু ট্রেনে ভোরবেলায় এসে পৌঁছলাম গঙ্গা পেরিয়ে কাশীর রাজঘাট। মালপত্তর নিয়ে নেমে পড়লাম। জ্যোতিষবাবু ছুটলেন টাঙ্গা ভাড়া করতে, আমাকে এদিকে ছেঁকে ধরল বজরাওলার দল।

বজরায় থাকাটা আমার বেশ ভালই লাগল। জ্যোতিষবাবুকে বললাম—দরকার কি হোটেলে গিয়ে—এই দিন-তিনেক আমরা বজরাতেই থাকি। গরমকাল, বেশ আরামে থাকা যাবে।

জ্যোতিষবাবু খুশী মনে বললেন—কথাটা মন্দ বলেন নি। তাই করা যাক।

যাক, বজরা নিয়ে আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটে একটা বটগাছের ছায়ার নীচে বেঁধে রাখলুম।

জ্যোতিষবাবু বললেন—হোটেলে তো উঠলাম না, এখন মধ্যাহ্নভোজনের কি হবে?

আমি বললাম—চরখেরীতে তো এক-দিন খুব মুরগী, পাঁঠা ইত্যাদি খাওয়া গেছে, এবার এ তিন দিন সাত্ত্বিক আহার মানে ফলার করে কাটিয়ে দিই।

রাজী হলেন জ্যোতিষবাবু। মোণ্ডা, মুরকি, কলা, দই দিয়ে দিব্যি ফলার করা গেল। তারপর বিকেলবেলায় বেরুলাম বেড়াতে। জ্যোতিষবাবু গেলেন সেই সিনেমার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে—আমিও সঙ্গে ছিলাম। ম্যানেজারের বয়স কম, সুদর্শন চেহারা—এদিকে খুব চালু। অতিথিসৎকারের সুযোগ না পেয়ে সে একটু ক্ষুণ্ণ হল অবশ্য। সন্ধ্যায় আমরা বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যারতি দেখে ফেরবার পথে পুরী, ভাজী, চাটনি, রাবড়ি আর কিছু খিয়ের খাবার নিয়ে বজরায় ফিরে এলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রে বজরার ছাদে শুয়ে তোফা ঘুম দিলাম। বজরাওলা এপারে ব্যাসকাশীতে এসে নৌকা বাঁধলো। ভোরবেলায় এখানে প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার ওপারে ফিরে গেলাম। ফলাটল কেমন হল। জ্যোতিষবাবুর পছন্দ পানিফল আর ক্ষীর।

এই কাশীতে তে-রাত্তির কাটিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এলুম। কতদিন পরে রাস্তায় আসতে আসতে বাংলা দেশের প্রকৃতির সবুজ সমারোহ দেখে শরীর ও মন দুই-ই জুড়িয়ে গেল।

কলকাতায় এসে শুনলাম যে থিয়েটারকে কেন্দ্র করে আমার পালিয়ে বেড়ানো, সেই মিত্র থিয়েটারই উঠে গেছে। মনোমোহন চলে গেছে স্টার থিয়েটারের অধীনে। বাবা! এই ক'দিনে এত সব বিপর্যয় ঘটে গেছে!

ম্যাডানের অফিসে অর্থাৎ ৫নং ধর্মতলা স্ট্রীট, যেখানে আগে ছিল কোরিন্থিয়ান থিয়েটার এখন অপেরা সিনেমা, গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কিছু টাকার কথা বললাম। তিনি বললেন— ক্যাশিয়ারের কাছে যাও, আমি বলে দিচ্ছি।

ক্যাশিয়ারের কাউন্টারে তখন বেজায় ভিড়। ভিড় দেখে আমি গেলাম মুখুজ্যে-মশাইয়ের ঘরে, মুখুজ্যেমশাই হচ্ছেন আমাদের সেই ফটোপ্লে সিণ্ডিকেটের 'সোল অব এ স্লেভ'-এর পরিচালক মিঃ হেম মুখার্জি। এখানে এখন তিনি পাবলিসিটি অফিসারের কাজ করেন। ফটোপ্লে উঠে যাওয়ার শোক আমাদের যতটা না লেগেছিল ও'র লেগেছিল তার চেয়ে বেশী।

এই সব সুখ-দুঃখের কথা বলতে বলতে থিয়েটারের কথা উঠল। উনি বললেন—মিত্র থিয়েটার তো উঠে গেল, মনোমোহন নিয়ে নিল স্টার—এবার স্টারেই জয়েন করুন আর কি! আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো কেন?

বললাম—দিন কতক দেখি, আবহাওয়াটা একটু বুঝে নিই—তারপর দেখি কি হয়।

আমাদের সময়ে পাবলিক থিয়েটারে মোটামুটি কিছু যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারলে শিল্পী নির্ভাবনায় থাকতে পারতো বলা যায়। হয়ত কোন-কোন সময় দুই-এক মাস বসে থাকতে হতো, কিন্তু তার মধ্যে কোন-না-কোন থিয়েটার তাকে ডেকে নিতই।

তবে এক্ষেত্রে আমার ব্যাপারটা ছিল একটু আলাদা। মিত্র থিয়েটার উঠে স্টারের কবলে গেল বলে স্টারের আধিপত্য বেশী হওয়াটা স্বাভাবিক। তাছাড়া আমার ওপর স্টারের একটা রাগ থাকাটা অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমার অন্য থিয়েটারে কাজ পাওয়াটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। তখন শুধু ছবির জগতকে অবলম্বন করেই কাটাতে হবে। হেমবাবুর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্তা বলার পর গেলাম ক্যাশিয়ারের ঘরে—দেখলাম ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে।

ক্যাশিয়ার লোকটি ভাল — জাতে গুজরাঠী, নাম ঘনশ্যাম। আমি টাকা নিতে গেলেই আমার হাতে একটি চিরকুট ও একটি পেন্সিল ধরিয়ে দিতো—আর আঙুল দিয়ে দেখাতো এক না দুই, না তিন, না চার। অর্থাৎ কোনো থিয়েটারের পাশ লিখে দিতে হবে। আজ অবশ্য পাশের প্রশ্নই উঠল না। আমি টাকা নিয়ে আবার মুখুজ্যেমশায়ের ঘরের দিকে আসছি—এমন সময় ঘটে গেল এক অঘটন।

আমি ক্যাশঘর থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে ধর্মতলার দিকে ফুটপাথের ওপর দিকের চওড়া বারান্দা দিয়ে মুখুজ্যের ঘরের দিকে যাচ্ছি এমন সময় সামনেই এমন একজনকে দেখলুম, যাকে দেখে হঠাৎ ভূত দেখার মতই চমকে উঠলুম। মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হলো না—আমাকে দেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ঘাড়টি ডান দিকে হেলিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। অর্থাৎ ভাবটা হলো এই যে এইবার যাদু কোথায় যাবে। এ ক'দিন আমাকে তুমি বড্ড জ্বালাতন করেছো। তিনি মুখে কিছু না বললেও মনের ভাবটা যেন এই রকমই ছিল। মানুষটি হলেন স্টারের স্বনামধন্য প্রবোধ-চন্দ্র গুহ। আমি যেন 'হিপনোটাইজড' হয়ে গেলাম।

উনি কোনো কথা বললেন না—শুধু এসে খপ করে আমার হাতটা ধরলেন এবং সেটা বেশ জোরেই।

তারপরেই মুখখানা পাশে ফিরিয়ে মুখুজ্যেমশাইকে বললেন—আসামী গ্রেপ্তার।

হেমবাবু হাসতে লাগলেন। প্রবোধবাবু আমার হাত ধরেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দেখি সামনেই সেই স্টারের 'টি' মার্কা ফোর্ড গাড়ী। বললেন—ওঠো।

(ক্রমশঃ)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
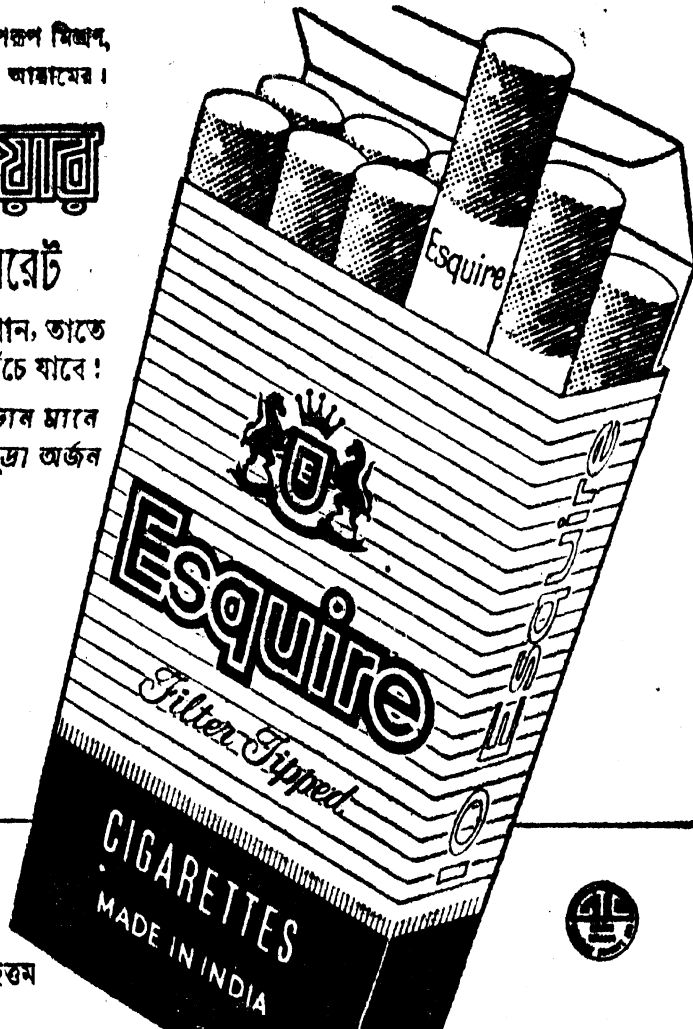
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মাসীমা বলে যাচ্ছেন আমি আর দিদিমণি শুনে যাচ্ছি অবাক হয়ে, টগর ঝি ডিবেয় করে পান সেজে নিয়ে এল। মাসীমা দুটো মুখে ফেলে দিয়ে, খানিকটে দোক্তাও চালান দিয়ে আবার শুরু করলে দাঠাকুর—

'আমি শিবনাথকে বললুম, এ পঙ্কজ্ত আমার আন্দাজ ঠিক বলে মনে হচ্ছে শিবনাথ, কিন্তু এরপর আবাগের ব্যাটার চালটা ধরতে পারচিনে, ছিলাম না তো। শুনেছি নাকি আবার বিধবা বিয়ের সেই ঢো তুলেছে। বুঝতে পারছি না। শুধু এইটুকু বুঝেছি, আবার য্যাখন এয়েচে—নিজে হতেই আসুক, বা, ধনঞ্জয়ই আনাক—এবার মতলবটা আরও খারাপ, আরও বড় রকমের কিছু একটা। তা এসে পড়েচি য্যাখন—রাধারমণ নিজেই পাটো দেচেন বৈ আর কি, আমিও দেখবো কত জিলিপির প্যাঁচ আচে ওদের পেটে। তোমায় ডেকেচি শিবনাথ, তোমায় খোঁজ নিয়ে বার করতে হবে, সে আবাগের ব্যাটা ভূত কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আচে বসে। এটা ঠিক যে মসনেতে নেই, সে গ্রামটাতে নিশ্চয় আচে কোথাও। তুমি বের করো, তারপর আমি যা করবার করব।"

শিবনাথ বললে—'আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন মা, পিঁপড়ের গত্তের মধ্যে সেঁদো বসে থাকলেও আমি তাকে টেনে বের করবই, ব্যাটার ওপর আমারও রাগ আচে, সেবারে কুসমীর বরযাত্রীদের ঠান্ডা করলেও ওর তো নাগাল পেলুম না।'

'তা পারবে নেত্য, ও ঠিক বের করবে দেখিস। এই গেল আজ সকালবেলাকার কথা। তরপর গাড়ীর ধকোলে হারুান্ত হয়ে একটু ঘুমিয়ে উঠে তোর এখানেই আসব, স্বরূপে একেবারে পাল্কি নিয়ে যেয়ে হাজির।'

দিদিমণি ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে চেয়ে শুনছেন, বললে—'কি হবে মাসীমা? আমি তো সেই প্রেথম দিন দরজার আড়াল থেকে সব শুনে সামলে-সুমলে রেখেছিলুম। মাথার দিব্যি দিয়ে তোমাদের জামাইকে সরিয়েও দিলুম এখান থেকে। তারপর আবার এই নতুন ফিকড়ি। খোদ ওর মুখে শুনেই কাকাবাবু যেমন রাগ করে বেরিয়ে গেলেন—আর বাড়িতে না এসে—আপনার জামাইও বাড়িতে নেই—'

—বলতে বলতে দিদিমনি ওনার কোলেই মুখ গুঁজে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

মাসীমা ওনার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললে—'চুপ কর নেত্য, চুপ কর মা। আমি এসে গেচি, আর তোদের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগতে দোব না আমার পেরাণ থাকতে। ওর আসা তো বন্ধই করে দেচেন বেয়াইমশাই, তাঁর মনেও যদি কোন রকম ভুল থাকে যে দেবু এর মধ্যে আচেন, তবে সেটাও আমি গিয়ে মিটিয়ে দিয়ে আসচি। শুধু তাই নয়, বোস্টমবাবাজীটাও যে আবার এয়েচে—হয়তো আচে এর মধ্যে, সেটাও তাঁকে জানিয়ে দেওয়া দরকার, তাল্লাস নেবেন। তুই এর মধ্যে মহালে লোক পাঠিয়ে দেবুকে আনিয়ে নে। বেয়াইকে কথাটা না জানিয়ে তাড়াতাড়ি মহালে গিয়ে বসে থাকাটা তার ভুল হয়েচে। তিনি যদি রাগ বা অভিমান করে থাকেন, এই নিয়েই করতে পারেন। তবে সেটা মিটিয়ে দেওয়া এমন কিছু শক্ত নয়। আমি দেখি। তুই বোস ত্যাতক্ষণ, এখেনেই আবার ফিরে আসচি।'

এবার নাতনীটি তামাক সেজে আনতে একটু দেরীই করল। যখন এলও কলকেটি হাতে করে, এমন কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়াল যেন বিশেষ কিছু একটা বলতে চায়। দেখলাম দরজার কাছেও ছোটদের একটি দল যেন তার দৌত্যের ফলাফলের জন্য কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে। স্বরূপ বলল—'কি যেন একটা বলবি মনে হচ্ছে। তা বল, অমন করে দাঁইড়ো রইলি কেন? কলকেটা বসিয়ে দিবি তো দাঠাকুরের হুঁকোর মাথায়?'

আমি হুঁকোটা কাৎ করে দিতে বসিয়ে দিয়ে মেয়েটি বলল—'তোমায় মা একবারটি ডাকচে।'

'তা বলতে কি? যমে তো ডাকচে না যে ভয়।' নিজের রসিকতায় একটু হেসে উঠে পড়ল স্বরূপ, বলল—'এলুম বলে দাঠাকুর, ত্যাতক্ষণ ধরান।'

একটু দেরী করেই এল, মুখে একটু হাসি। কাছে এসে বলল—'ওকে পাটোচে বলতে। পারে কখনও? এত আস্কারা পাচ্চি, তবু আমারই সাহস হয় না।'

আবার আগের মতো হাঁটু মুড়ে বসে কাতা বাঁখারি তুলে নিল। প্রশ্ন করলাম—'কি এমন কথা স্বরূপ?

'মেয়ের আবদার আপনার, আমি তো তাই বলব, এখন দ্যাবতা যেভাবে নেন। মেয়ে কয়—বাভন দুজ্জন মর্নিষ্যি, উঁদিকে মাথার ওপর রোদ্দুর চচ্চড়িয়ে উঠেচে—যদি আদেশ হয়, এখেনেই আজ দাবতার অন্নপেরাশনের ব্যবস্থাটুকু করে। ইচ্চেটা এই। তবে কথায় বলে—স্তিবুদ্ধি প্রেলংকরি—ওর সঙ্গে বাজে খানিকটে জুড়েও দেচ্ছে মাথা-খাটো—বলো গিয়ে মার কাজটা গেল সিদিন, এখনও জের মেটেনি—উনি বসে যদি একটু পেসাদ করে দেন, মা আমার সেখেনে খুব তৃপ্তি পাবে। আজ্ঞে পঞ্জানুই বৈকি, তার সব ব্যবস্তা বামুন ডেকে এনেই করবে—তা আমি কইলুম......"

আমি বাধা দিয়ে বললাম—'তা, তুমিও তোমার নাতনীর থেকে কম সঙ্কোচ করছ না তো স্বরূপ। গদাইয়ের-মা পুণ্যবতী মেয়েছেলে। ভাগ্যবতীও। (একটু হেসে)—তাঞ্জামে চ'ড়ে, স্বামীর-ঘর ক'রতে এসে-ছিলেন বলেই না; পুণ্যে আর সৌভাগ্যের নিশানা তো চারিদিকেই ছড়িয়ে রেখে গেছেন। তাঁর কাজের উপলক্ষ্য ক'রে খেয়ে যাওয়া, আমি তো ভাগ্য বলেই মনে করি স্বরূপ। তুমি আয়োজন ক'রতে ব'লে এসো, শুধু যেন বাড়াবাড়ি না করে তোমার মেয়ে।'

একটা যেন দারুণ উৎকন্ঠার শেষে একটা স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল স্বরূপের।

কিছু বলতেই যাচ্ছিল, তার আগেই আমি বললুম— 'আর বামন ডাকিয়ে ব্যবস্থা করবার কথা যা বললে সেটা না করতেই যায় আমি তো এইরকমই চাইব, তৃপ্তিও পাব তাতে বেশি। জানি তোমার মেয়ে পঞ্চান্ন ছাড়া কিছুই দিতে চাইবে না—একটা পুরনো সংস্কার, আমি তো চাই না তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে, তবে বলে দাওগে, দু'খানা লুচি আর তদনুরূপ তরকারি ক'রে দিতে, সে যেন বামন ডাকতে না যায়।'

তবু একটু কুন্ঠিত ভাবে সেই হাসিটুকু নিয়ে মাথা নীচু ক'রে বসে আচে দেখে আমি বললাম—'গ্রামে আমায় একঘরে করবে। সে ভয়তো নেই গো, তুমি যাও।'

এবারেও একটু দেরী হোল ফিরতে। এক সময় দরজা থেকে চোখদুটো মুছতে মুছতে বেরিয়ে নিজের মনেই বলতে বলতে এল—'তবু বলবে ভাগ্যধরী ছেল না!'

বসতে, অন্যমনস্ক করে দেওয়ার জন্যে হুঁকোটা কাৎ করে দিয়ে বললাম—"নাও, ধরিয়ে দাও একটু।"

কয়েকটা টান দিয়ে আবার আরম্ভ করল—'বিধেতা পুরুষের মাথায় একটু গোল আচে দাঠাকুর। অমন গঙ্গা বয়ে যাচ্চে, এপার-ওপার খুঁজে আসুন, কোথাও একটি পদ্মফুল ফুটে আচে দেখতে পাবেন না, পদ্মফুল পেতে হ'লে আপনাকে এঁদো ডোবার ধারে যেতে হবে। রেজঠাকরুণ সবাইকে বললে, বোস্টমবাবাজীর তাল্লাস নিতে—দশ-আনীর নিশিকান্ত ঠাকুরকে;

জামাইবাবুকে ডাকিয়ে আনিয়ে, তাকে; চৌধুরী-গিন্নীকেও। অবিশ্যি, ঢাক পিটোলে তো চলবে না, গোপনে গোপনেই।—উঁহু, কারুর দ্বারাই হোল না। হবে কোত্থেকে বলুন না, বিধেতা পুরুষ যে ইদিকে যশের পর্বটি শিবনাথ মণ্ডলের ভাগ্যে ফুটিয়ে রেখেচে।'

'তোমার বাবাই খুঁজে বার করলে শেষ পর্যন্ত'—প্রশ্ন করলাম আমি।

'আজ্ঞে বাবাই বৈকি, বুদ্ধিটা তো আমারই। তারপর, বাপকা বেটা, সেপাই কা ঘোড়া, কিছু নয়তো থোড়া থোড়া—যশের খানিকটা তো অধীনের ভাগ্যে পড়বেই। কাহিনীটে সব শুনলেই বুঝতে পারবেন, কেমন ক'রে কি বিত্তান্ত।

এগুনে বলোচি, জমিদার বাড়ি থেকে বাবা যখন রেতে ফিরত, বোতলঝাড়া যা দু'এক ঢোঁক পেত, গলাদে নাবো চ'লে আসত। বোতলের মহিমে, মেজাজটা একটু তর হয়ে থাকত। সেই সময়টা, আমি যদি রইলুম তো আমায় ডেকে নিয়ে একটু আধটু উপদেশ দিত বাবা। আজ্ঞে, গীতাও নয়, ভাগবতও নয়, নিজেই বা পেলে কবে যে আমায় দেবে? একটু দুনিয়াদারির এলেম শেখাত আর কি। বলত—'রূপো, তোর ভাগ্যিটে ভালো, একটা দেবতুল্যি মানুষের সঙ্গে রয়েচিস্। কাজও একটা বাঁজা গাই চড়ানো, যেমন দুধ দিতেও জানে না, তেমনি আবার গুঁতোতেও জানে না, নাতি ছুঁড়তেও জানে না। আমাদের কপালটা বড় একপেশে। আমাদের হোল জমিদার চড়িয়ে দিন গুজরান্ করা। দুধের কষ্টটা অবিশ্যি দেয় না। তবে কখন কি মেজাজে আছে, কখন গুঁতুবে, কখন নাতি ঝাড়বে, পিতিক্ষণ হিসেব না রেখে চ'লতে পারলেই দফা রফা।

বলবি, তা আমায় এসব কথা কেন, আমি তো নিশ্চিন্দিই আচি বেশ।—তোকে হুঁশিয়ার ক'রে যাওয়ার আচে হেতু। কথায় বলে আদেস্ট জিনিসটে পদ্মপত্রে জল। কখন কোন দিকে গড়ায় কেউই বলতে পারে না। আজ তুই যেখেনে আচিস, দুদিন বাদে হয়তো আমি চোখ বুজলুম, গিয়ে দাঁড়াতে হোল বাপের স্থানে। দুদিন হোক, দু'বছর হোক, দশ বছর হোক। পুরুষাক্রমে জমিদারের ভাত পেটে, কেমন যেন একটা নাড়ির যোগ হয়ে পড়েচে, নেবেই টেনে। সেই জন্যে তোকে খানিকটে করে টেনিং দিয়ে রাখা। শোন—'

ওখেনে সেদিন যেমন কাটত—কি হোল, কি করে সামলে-সুমলে এক ফিকির-ফন্দি করে, সব বলত আমায়, চৌধুরীমশাইয়ের কথা, বা দেউড়ির কথা, বা সেরেস্তার কর্মচারীদের নিয়েই কিছু, আজ্ঞে, চারিদিকে নজর রেখে বত্রিশ পাটি দাঁতের মাঝখানে জিভের মতন থাকাই তো।

সিদিনে কিন্তু ওসব নিয়ে কিছুই নয়। ব্রেজঠাকরুণ ডেকে বলেচে বোষ্টম বাবাজীকে খুঁজে বের করতে হবে, মাথার মধ্যে সেই কথাটাই চক্কর দিচ্ছে তো, একটা যে ভেবে-ভেবে রাস্তাও বের করেচে সেই কথা বললে আমায়। খুব গোপন কথা, হয়তো বলতই না, তবে আমি ছাড়া হওয়ারই নয়, অন্য কাউকে বললে বেইরেই পড়বে কথা, আমাকেই ডেকে নিয়ে বললে।

মতলবটা ভালোই বের করেচে, আমি য্যাখন গেলুম, নিজের মনেই গরগর করচে—'শিবের কাচে পার পাবে। কতবড় গেঁজেল বাবাজী দেখে নিচ্চি আমি।' আমি যেতে বললে—'একাদশী-ঘোষালের সেই গেঁজেল ছেলেটা, কোন আড্ডায় আজকাল যাওয়া-আসা করচে একটু খোঁজ নিতে পারবি? খুব গোপনে কিন্তু।'

বললুন—'তা পারবুনি কেন? খুব পারব।'

আপনের বোধহয় সরণ আচে দা'ঠাকুর, সেই গুলিখোরটা, ছিরু ঘোষাল, যার বাবা রাজীব ঘোষাল, টাকা কর্জ দিয়ে দিয়ে ন্যায়রত্ন মশায়ের টিকিটি পজ্জন্ত কিনে নিয়ে ঐ ছেলের সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে এক-রকম দিয়েই বসেছেল। সে সব ভেস্তে গিয়ে দিদিমণির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর অনেক-দিনই তার দেখা পাইনি। জামাইবাবু কজ্জ মিটিয়ে বাড়িটাও ছাড়িয়ে নিলে, না বাপ, না বেটা—কেউই আর এদিকটা মাড়ায় না। তবে যশ বলে একটা বস্তু আচে তো, ছিরু ঘোষাল যে নিজের নেশাবাজিতে কায়েম হয়ে আছে, বরং ইদিক থেকে নিশ্চিন্দি হয়ে গিয়ে আরও বেপরোয়া হয়ে আরও গা-ঢেলে দিয়েছে, এ খবরটা মাঝে মাঝে পেতুম। মাড়ায় না ইদিককার পথ, এখন একটু শুধু এগিয়ে খোঁজ নেওয়া। বাবাকে বললু—'পারব না কেন? তা বেশ পারব।' টেনিংই দিয়েচে তো ছেলেকে, বাবা ছকটাও বাৎলে দিলে। বললে—'শোন রূপো, শুনে থো। যেমন সাধু খুঁজবে সাধুকে, তেমনি মদের মাতাল খুঁজবে মোদো মাতালকে, গেঁজেল খুঁজবে গেঁজেলকে। খোঁজাখুঁজি করতে হয় না। তোর গবভধারিণীকে জিগোলে জানতে পারবি—বিয়ের সময় ওদের একটা স্তী-আচার আচে, মোনামুনি বলে একরকম ফল এনে ওরা একবাটি জলে ছেড়ে দিয়ে একটু নেড়ে-চেড়ে দেয়, কিছু পরে ঘুরতে ঘুরতে সে দুটো আপনিই যায় একত্তর হয়ে। এও তাই। ছিরে হোল আবার এস্‌পার্ট গেঁজেল, দুজনে একট্টা হবেই। তুই শুধু তল্লাস নে। ছিরে আজকাল বেশি হাঁটাহাঁটি করে কোন পথে। তারপর আমি আচি।'

খোঁজ কিন্তু আর পাওয়া যায় না দা'ঠাকুর। লোচন দাসের গুলির আড্ডায় যেয়ে আনাচ-কানাচ থেকে উঁকি মারি, নেই। সাবুই-এর আড্ডায় যাই, সেখানেও কোন হদিস পাই না। শেষে একদিন একজনকে আড্ডা থেকে বেরুতে দেখে খানিকটে পজ্জন্ত একটু তফাতে তফাতে তার পেছু পেছু যেয়ে, ভরসা করে পাশে গিয়ে সুদোলাম—ছিরু ঘোষাল আসে কিনা। দাইড়ে চোখ পিটপিট করে আমায় দেখলে খানিকক্ষণ, তারপর ওদের সরণ থাকে না তো, সুদোলে—'কোন ছিরু ঘোষাল?' বললু—'রাজীব ঘোষালের ছেলে।'

'এক চড়ে মুণ্ডু এদিক থেকে ওদিক করে দোব শালার!'—বলে আবার টলতে টলতে আড্ডার দিকে কয়েক পা গিয়ে দাঁইড়ে পড়ে বললে। রাস্তা পস্কের করে বেইরে যা বলছি বাপের সুপুত্তুর হয়ে। একাদশী ঘোষালের নাম করে মেহনতের নেশাটুকু দিলে বরবাদ করে শালা। যা, নেকালো! ছিরে আর আসে না।'

আড্ডার দিকে যাওয়াই ছেড়ে দিতে হোল। বাড়িতে যেয়ে খোঁজ নেওয়ার তো কথাই ওঠে না। বিয়ে ভেস্তে গিয়ে বাড়িটাও হাত থেকে ফসকে গেচে, অভ্যথনাটা কিরকম হবে আন্দাজ করেই নিতে পারেন। এরপর বেলাল্লার মতন ঘোরাঘুরি করতে করতে একদিন পাওয়া গেল দেখা। দুপুর গড়িয়ে গেচে, একটা বড় রকম চক্কর দিয়ে গেরামের কতকটা বাইরে একটা তেমাথায় এসে পেঁচেছি, দেখি যে রাস্তাটা কুসমীর দিকে চলে গেচে, একটা আগাছার ঝোপ ঘুরে ছিরু ঘোষাল আর সাতকড়ি পালের ব্যাটা জুটে পাল ঝিমুতে ঝিমুতে এই দিকে চলে আসচে। আমি একটু আড়ালে সরে গিয়ে ওদের এগুতে দিয়ে পেছু নোব, কিন্তু একেবারে আচমকা, তাছাড়া মোড়টা কাচেই, আর সময় পেলুম নি। বাঘের মতন ভয় করতুম, ভাবলুম পালাই-ই-না হয় এবারটা, কিন্তু তার আগেই জুটে দেখে ফেলেছে। হাত তুলে হাঁক দিলে—'এই দাঁড়িয়ে যাবি ছোকরা!'

হয়তো পালাবার চেষ্টা করচি দেখেই। কিন্তু এগুনেই সাপের মুখে শালিক পাখীর মতন আর সাড় থাকত না তো, দাইড়োই পড়লু। দু'জনের মধ্যে ওই একটু ডাকো ছেল, এসে পিটপিট করে আমায় খানিকটে দেখে নিয়ে বললে—'মণ্ডলের পো না? কোথায় ছেলি এতদিন? তোকেই খুঁজছিনু।'

মরেচি, না, মরতে আচি, বললু—'ছেলুম না তো এখেনে। থাকলে নিজেই দেখা করতুম।'

ছিরু ঢুলছেল দাইড়ো দাইড়ো, বললে—'সেরেফ ভাঁওতা, বুড় বার তো গরজটা কি ছেল দেখা করবার?'

জুটে তার দিকে হাতটা তুলে দিয়ে বললে—'তুই থাম, হচ্ছে একে একে, শালা এখুনি জেরায় ধরা পড়বে।'

আমায় সুদোলে—'ছিলিনে, তো গেছলি কোথায়? বিয়েটিয়ে সব ভেস্তে দিয়ে ডুব মারলি, এই তো? পথে আয় এবার।'

ঐ একটা ক্ষ্যামতা তো ছেল দা'ঠাকুর, চরখার সুতোর মতন ফরফরিয়ে আপনি বেইরে আসত মাথা থেকে, আজ্ঞে, য্যাত বিপদ ত্যাত বুদ্ধি।

বললু—'আজ্ঞে, ডুব মারা নয়তো বিন্দাবন গেছলুম ব্রেজঠাকরুণের সাথে।'

একটু যেন চমকে উঠল দা'ঠাকুর, যেন ছিরুও। 'ব্রেজঠাকরুণ ব্রেজঠাকরুণ' করে কপালে দুটো আঙুল চেপে বললে—'নামটা যেন শোনা। তোর মনে আচে ছিরে?'

ছিরু ঢুলতে ঢুলতে একটু ভাবল, তার বাঁ হাতটাও আপনি যেন একবার পিঠের

ওপর গিয়ে পড়ল, বললে—'সেই মা বিধবা-বিয়ের স্বয়ম্বরা হবার জন্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিঠে চেলাকাঠের বাড়ি হাঁকড়ালে সেবার?'

জটে এগিয়ে এসে আমার বাঁ-হাতটা বজ্র-আঁটুনিতে ধরে ফেললে, বললে, 'এ্যাড়া কত জেরা এড়িয়ে যাবি।'

আমার পেরাণ তখন একেবারে কণ্ঠাগত দাঠাকুর। তবে বিধি অনুকূল, জুগিয়েও গেল। বললুম—'আজ্ঞে, সে তো ছেল দাসী রেজ্ঞঠাকরুণের। সেইদিনই মাথা মুড়িয়ে বিদেয় করে দিলে তো মাসিমা—উনি দিদি-মণির মাসিমাই ছেল কিনা—তারপরেই স্বয়ংবর ভেস্তে গিয়ে ওনার মনটা ভেঙে গেল। বিন্দাবন-বিন্দাবনই করছেল, এর মধ্যে দিদিমণির বিয়েটা এসে পড়াতে...'

জটে হাতটা ধরেই ছেল, তবে একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল, আবার একটু ঝাঁকানি দিয়ে বললে—'ঝেড়ে কাশ একটু, ব্যাটা মণ্ডলের পো ভাঁওতার পর ভাঁওতা দিয়ে যাচ্চে। যাখন মাসি হোল না, ছিরে তো তার বোনঝিকেই বে করতে রাজি ছেল, আবার ভেস্তে দিলে কেটা? সেই...'

আজ্ঞে, তাখন আমার আত্মারাম একে-বারে খাঁচাছাড়া হবার দাখিল—বাঁচাতে বাঁচাতেও ওদিকে চেলাকাঠ হাঁকড়াবার সহচরী আর ইদিকে বিয়ে পণ্ড করবার রেজ্ঞঠাকরুণ এক মানুষই হয়ে গেল তো শেষ পজ্জন্ত। কিন্তু ঐ যে বলেচে—রাখে হরি তো মারে কে, এ-ফাঁড়াটাও গেল কেটে। যেন নিম-উচ্ছে একসঙ্গে চিবিয়ে খেয়েছে, এইভাবে মুখটা কুঁচকে ছিরু হাতটা তুলে বললে—'যেতে দে জটে, পণ্ডিতের মেয়েটা ছিলও ভারি ফিচেল, গেচে বালাই গেচে। একটু থির হয়ে দাঁড়া, আমার মাথায় খুব একটা বেশ যুৎসই মতলব আসব-আসব করচে, একটু থিতুতে দে। শালার হাতটা ছাড়িসনে, এঁটে ধরে থাক।'

ওরা দুজনে দাঁইড়ো দাঁইড়ো চলচে, আমি দড়িতে বাঁধা বলিদানের পাঁঠার মতোন কাঁপচি, বেশ খানিকক্ষণ তো এইভাবে যাক, ছিরু একসময় বললে—'শালাকে জিজ্ঞেস করতো রেজ্ঞঠাকরুণ বিন্দাবন থেকে ফিরে এয়েচে, না, সেখেনেই মনের দুঃখে রয়ে গেল।'

ওরা আবার নেশা চটে যাবার ভয়ে কথা কম কয় তো। একটু চুপচাপ যাওয়ার পর জটে একটা নাড়া দিয়ে বললে—'শুনলি কি বলচে?'

আমি মাসীমাকে সে'সব, কি বিন্দাবনেই ছেড়ে দিয়ে বখেরা চুকিয়ে দোব, ভাবছিলুম, নাড়া খেয়ে মুখ দিয়ে একরকম আপনিই বেইরে গেল—'আজ্ঞে, চলেই তো এলো।'

কাজ হোল তাইতেই, সিদিন মা-সরস্বতী যেন স্বয়ং কণ্ঠে এসে বসেছেন দাঠাকুর।

ছিরু উরই মধ্যে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠে চাইল আমার পানে, সুধোলে—'চায় বিধবা বিয়ে করতে, না, এমনি কায়েমী বিধবা হয়ে আগা-গোড়া কাটো দেবে?'

বললু—'চায় বৈকি, আজ হয়তো কালকের জন্যে ওপিক্ষে করে না।'

'তোকে বলেচে?'

বললু—'ভাবটা বোঝা যায় তো।'

আমার পানে একটু পিটপিটিয়ে চেয়ে থেকে বললে—'শালা আবার ভাবুক আচে। শোন, চায় তো বলবি—পাত্তোর আচে একটা এই সময়, ধরে রাখি। খুব সরেস পাত্তোর, তাকে আর ছুটে ছুটে বিন্দাবন যেতে হবে না, সেইখানেই একেবারে শেকড় গেড়ে গাঁটি হয়ে বসতে পারবে। দাঁড়া একটু ভেবে নিই, কি যেন বলতে যাচ্ছিলুম।' দু আঙুলে কপাল চেপে একটু থির হয়ে থেকে বললে—'হয়েচে। রাজি থাকে তো কিন্তু এবার স্বয়ম্বর আর ছান্দনাতলার হ্যাঙ্গাম না করে শুধু কণ্ঠী বদল করেই সেরে নিতে হবে। রাজী?'

বললু—'উনিও তো চান, হ্যাঙ্গাম যত কম হয়। হ্যাঙ্গাম করেও তো বিধবাই থেকে যেতে হোল শেষ পজ্জন্ত।'

'তোকে বলেচে?'

বললু—'ভাবটা টের পাওয়া যায় তো।' আবার একটু পিটপিটিয়ে চেয়ে রইল। তবে এবার আর আমায় কিছু না বলে জটের পানে চেয়ে বললে—'তা হলে আমি বলি জটে, একেবারে ছোঁড়াকে দেখিয়ে দিলে হোত পাত্তোর, গিয়ে রিপোর্ট দিতে পারত, কি রকম পাত্তোর কি বিত্তান্ত। কি বলিস?'

জটে বলল—'উত্তম পস্তাব।'

আমায় জিগোলে —'যাবি? না, বলবি সময় নেই?'

বাবার কথাটা মনে আচে, কতকটা যেন আঁচ পাচ্চি, কে হোতে পারে পাত্তোর। ভেতরে ভেতরে উলসেই উঠব তো, বললু—'ভালো কাজে সময় থাকবে না কেন? নিয়ে চলুন না।'

পা'টাও আপনি উঠে পড়েচে, ছিরু বললে—'দাঁড়া, শালার আর তর সয় না। পাকা করে নে আগে, ছিরে-শালার মতন যে-সে পাত্তোর নয় আর।'

তখন আমার মনটা ফুর্তিতে হাল্কা হয়ে এয়েচে, বললু—'মাসীমার ভাগ্যি তাহলে।' বললে—'কিন্তু চারটে সামনের দাঁত নেই। বাকি সব অবিশ্যি সুপুরুষ।'

ছ্যাঁৎ করে একটু কানে লাগেই। একটু যেন চমকেই উঠলুম, তাখনই কিন্তু খেয়াল হোল সবটাই তো ভুয়ো। বললু—'দাঁত নিয়ে তো আর ধুয়ে খাবে না মাসী। যার নেই, তার নেই, মাসীমার ক্ষেতিটে কি? তানাকে তো নিজের থেকে কজ্জ দিতে হচ্চে না।'

এবার মুখের পানে পিটপিট করে চেয়ে একটু হাসি ফুটলো। মাথাটা তারিফ করবার ভঙ্গিতে একটু দোলালেও, তারপর বললে, 'খাসা বলেচে মণ্ডলের পো, যার নেই তার নেই, মাসীমার ক্ষেতিটে কি?—খাসা বলেচে, দে ওকে একটা সিকি বকশিষ, জটে, বাড়ি গিয়ে নিয়ে নিবি আমার কাছ থেকে।'

জটে ওকে আড়াল করে একটু তেরছা হয়ে দাঁড়াল আমার দিকে ঘুরে। তারপর আমার ডানহাতটা টেনে ওর খালি হাতের মুঠোটা তার ওপর খুলে দিয়ে বললে—'সিকি কেন, একটা গোটা ট্যাকাই নে। কোমরের কষিতে ভালো করে গুঁজে রাখ, ছেলেমানুষ হারিয়ে না ফেলিস।'

রাস্তায় আর কোন কথা হোল না, শুধু মাঝামাঝি গিয়ে ছিরু একবার ঘুরে বললে—'দেখিস মণ্ডলের পো, আমার গুরু, গিয়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে গড় করবি। আর, কোন কথার খেলাপ যেন না হয়, তাহলে তোকে আর আস্ত রাখব না।'

বললুম—'তা হলে তো আমারও গুরুই হোল তিনি। তার ওপর আবার মেশোমশাই হতে যাচ্চে।'

একটু হেসে পিটপিটিয়ে চাইল, বললে—'সেই কথা, মনে রাখবি।'

(ক্রমশঃ)
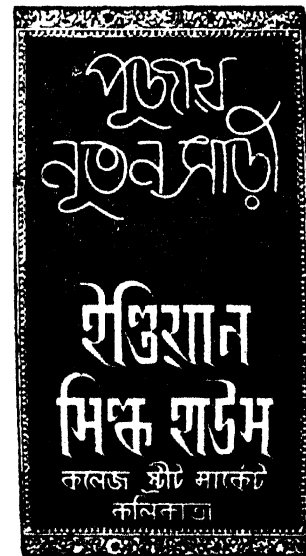
শেষ রাতে স্নেহের দুয়ারে

সমীর দাশগুপ্ত

গল্প শুনেছি তোমার মুখে
শাদা গোলাপের বনে পাহারা দিত
সিংহ, আসলে রাজপুত্র অভিশাপস্পৃষ্ট;
ভয়ংকর নির্বাসন, তবুও তো শাদা গোলাপের
ঘ্রাণ ছিল তার ঘুমের শিয়রে,—

সিংহদ্বারে জেগে থাকে শেষ রাতে নরম গোলাপ।

গল্প শুনেছি তোমার মুখে
দিনে পাথর হয়ে ছিল দুঃখের কুঁড়ি,
পুত্রশোক—সেও নির্বাসন উষর স্তনের বৃন্তে,
তারপর হঠাৎ বৃষ্টি শেষ রাতে কান্নার ফুল
ভেসে যায় তিস্তার অবাধ প্লাবনে
কবরে সামান্য শিশু তখন অনিদ্র, শৃগালের গোরগোল
ভেদ করে চেয়ে থাকে পিতার বুকফাটা বন্দুক।
অভিশপ্ত সিংহশিশু, তবুও তো সারুদের ঘ্রাণ
ছিল তার নির্বাপিত দেহের শিয়রে

বালক পাহারা দেয় শেষ রাতে স্নেহের দুয়ারে।

আমি তোমাকে—

শুভ মুখোপাধ্যায়

একদিন আমি তোমাকে বলেছি,
আবার বহু বছরের ভালোবাসা ফিরে আসুক;
গুঁড়ি মেরে মাধবী লতা পেরিয়ে আমার শৈশব
রয়না ফলের বড় স্পন্দিত দিনগুলোয় ভিড় করুক—
আমি অবিকল মানুষ থাকব।
বিশ্বাস কর, আমাদের সুদিন আসছে!

ডাগর সাহস মুঠোয় ধরে অফুরান ভালোবাসা,
গুচ্ছ গোলাপের নিশ্বাস, আমাদের বুকে
এক মুঠো ওরিয়লের ডানায় দোল খায়।
আসলে শুদ্ধতা ভিন্ন ভালোবাসা নেই।
কখনো বুকের মধ্যে শেষ রাসে নূপুর ভরে শঙ্খমালা পেতে চাই,
সওয়ার নিয়ে এই জমিতেই
মালতী ফোটানো রাত ঠিক বুকের পাশে নিদারুণ স্তব্ধতায়
জড়িয়ে রাখতে চাই।
অথচ এ সব কিছুই গরাদ ভাঙা দাগীর মতো বন্ধ্যা সময়গুলোকে
ঘিরে নিখুঁত ভালোবাসার নামে এক নেশাখোর
জিপসী অন্ধকার। — এখন
অরণ্য উজ্জ্বল হোক, বসন্তে মাদকতা নেই আমার।
ভালোবাসার নামে দু-ডানায়
ক্রুশের ভঙ্গি এঁকে মনের আগুন জ্বলুক।
আলোয় আলোময় সারা দেশ জুড়ে
বসন্ত অন্ধ ঈগলের মতো ছুটে আসুক।
সেই দীর্ঘপথ অতিক্রমণের দিনে তুমি রাজকীয়
দৃপ্ত পদক্ষেপে আমার শৈশবের রয়না ফলের
স্পন্দিত দিনগুলোয় এস।
বিবর্ণ ওষ্ঠ জুড়ে আমার চুম্বন, আহত সময় জুড়ে
আমার তারার স্বপ্ন, সেই সেই রাজপথে
উদ্ভাসিত হোক। শেষতম ভালোবাসার দিনে
মঞ্জরীর স্বপ্নসাধ ঘিরে আমি তোমাকে—
শুধু তোমাকেই—!

টাউন স্কুল

টাউন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু টাউনের ছেলে নন, গাঁয়ের ছেলে। বরিশালের বাকাইল গাঁয়ের জমিদার মহিমচন্দ্র চক্রবর্তীর ছেলে কালীপ্রসন্ন বাবার সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় গ্রাম ছেড়ে একেবারে শহরের শহর কলকাতায় চলে আসেন। তখন তাঁর কতই বা বয়স, বড় জোর কুড়ি-বাইশ। সে যুগের মাইনর পাশ কালীপ্রসন্ন কলকাতায় এসে উঠলেন গ্রামসুবাদে পরিচিত ভুবনমোহন মজুমদারের বাড়িতে। ভুবনমোহন থাকতেন হোগলকুঁড়ের কুঁড়েঘরে। হোগলকুঁড়ে না বলে আধুনিক পরিচিত নামটি বললে জায়গাটি সকলেই চিনতে পারবেন—সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট। পেশায় শিক্ষক ভুবনমোহনের বাড়িতেই ছিল একটি পাঠশালা, ন্যাশন্যাল সেমিনারী। কালীপ্রসন্ন সেমিনারীতে পড়াতে শুরু করলেন।

সেমিনারীতে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন প্রাইভেট টিউশনী। বিবাহিত কালীপ্রসন্নর সেদিন এছাড়া সম্ভবত সংসার চালানোর অন্য কোন উপায় ছিল না। শ্যামবাজারের গাইনবাড়িতে পড়িয়ে যা আয় হোত তাতেই কোনরকমে চলে যাচ্ছিল। পাঠশালায় পড়িয়ে প্রাইভেট টিউশনী করে কেটে যাচ্ছিল দিন। ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ মোড় ফিরল জীবনের। ভুবনমোহনের বয়স হয়েছে। পাঠশালা চালানো আর সম্ভব হচ্ছিল না। ঠিক করলেন কোন উপযুক্ত হাতে পাঠশালার দায়িত্ব সঁপে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন। ভুবনমোহনের ইচ্ছার কথা জানতে পেরে এগিয়ে এলেন কালীপ্রসন্ন কুড়িটি টাকায় পাঠশালার স্থাবর সম্পত্তি যা কিছু ছিল, খানকয়েক চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ কিনে নিলেন। তারপর হোগলকুঁড়ের পাট চুকিয়ে উঠে এলেন বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে।

এই বলরাম ঘোষ স্ট্রীটে ভুবনমোহনের ন্যাশন্যাল সেমিনারীর আসবাবপত্রে সাজিয়ে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর নামে একটি নার্সারী স্কুল খুললেন কালীপ্রসন্ন, ১৮৯৩ সাল। ন্যাশান্যাল সেমিনারীর শিক্ষক, গাইনবাড়ির প্রাইভেট টিউটর বছর পঁচিশেকের এই স্বভাব-গম্ভীর মানুষটির উপর যে স্থানীয় বাসিন্দাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাঁধতে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ছাপাছাপি অবস্থায় পৌঁছে গেল। বলরাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে জায়গা হয় না দেখে শ্যামপুকুরের কাছে তেলিপাড়ায় (বর্তমান শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়ের কাছে) নতুন বাড়ি ভাড়া করে স্কুল উঠিয়ে নিয়ে এলেন কালীপ্রসন্ন। এই বাড়িতেই ১৮৯৪ সালের ২১ নভেম্বর নতুন নামে স্কুল রেজিস্টারড হোল—টাউন স্কুল।

নতুন বাড়িতেও জায়গা হয় না। ষাট, সত্তরটি ছেলে। ঘরতো মোটে একখানি। জায়গার ও সাহায্যকারীর অভাব রীতিমত স্পষ্ট হয়ে উঠল। কারণ ইতিমধ্যে স্কুল সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে মিডল ইংলিশ মান পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি প্রার্থনা করে। সরকারী অনুমোদন জুটতে স্কুল পরের বছর রামধন মিত্র লেনের একটা দোতলা বাড়ির একতলা ভাড়া করে উঠে এল। খান চার-পাঁচ ঘর। এম-ই-স্কুলের বর্ধিত ছাত্রসংখ্যা কুলিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। জায়গা সমস্যা মিটলেও আসল সমস্যার সমাধান তখনো হয় নি। প্রাইমারী পর্যায়ে একা স্কুল চালিয়েছেন কালীপ্রসন্ন। কিন্তু তিনি নিজে মাইনর পাশ। এম-ই-স্কুলের হেডমাস্টার হওয়ার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর ছিল না। তাই স্কুলের মান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ চেহারাও পাল্টাল বিস্তর। এম-ই-স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে এলেন বি-এ পাশ সুরেশচন্দ্র কুণ্ডু। মাস মাইনে কুড়ি টাকা। কুণ্ডু মহাশয়ের সমসময়ে আরো যাঁরা শিক্ষক হিসাবে স্কুলে যোগদান করলেন তাঁরা হলেন, নারায়ণদাস ব্যানার্জি, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য, পশুপতি গাঙ্গুলী ও জগৎনারায়ণবাবু। মাস্টার-মশাইরা বেতন পেতেন বড় জোর পাঁচ-সাত টাকা। এর বেশী মাইনে দেওয়ার ক্ষমতা তখন স্কুলের কোথায়। চার, ছ'আনা ছিল টিউশন ফী। টিউশন ফীর টাকায় স্কুল চালানো খুব সুসাধ্য ছিল না। কালীপ্রসন্ন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে স্কুলের জন্য সাহায্য চাইতেন। তাঁর অনুরোধে শিশুতরুর মূলে সেদিন যাঁরা জলসিঞ্চন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উত্তর কলকাতার বিখ্যাত মিত্র, বোস, গাঙ্গুলী ও শিকদার পরিবারের কাছে স্কুল অশেষ ঋণে ঋণী।

এই স্কুলকে কেন্দ্র করেই কালীপ্রসন্নর সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ছোট ভাই যতীন্দ্রনাথ বসুর। স্কুল তখন জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। বছর বছর ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে। শুধু সংখ্যায় নয় নামের পাল্লাও ভারী হয়ে উঠেছে। উত্তরের বনেদী ঘরের ছেলেরা তখন এই স্কুলে পড়তে আসছে। বাগবাজারের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের ছেলে তুষারকান্তি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষদিকে (নয় বা দশ সাল থেকে) কয়েক বছর এই স্কুলে পড়েছেন। তুষারকান্তির ছাত্রদশায় শ্যামবাজার-বাগবাজার পাড়ায় দুটি স্কুলের তখন রীতিমত রবরবা। একটি হল জগবন্ধু পণ্ডিতের শ্যামবাজার এ-ভি-স্কুল। লোকে বলত বাংলা স্কুল। অপরটি কালীপ্রসন্নর টাউন স্কুল। মিডল ইংলিশ স্কুল বলে লোকের মুখে মুখে যে নামটি ফিরত তা হল সাহেব স্কুল।

সাহেব স্কুলের চেহারায় দেড়যুগের মধ্যে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। বর্তমান শতাব্দীর দশের যুগের সূচনায় স্কুল সরকারী অনুমতিক্রমে হাইস্কুলে উন্নীত হয়। ক্লাস সিকস ছেড়ে ক্লাস টেন। বছর বছর ক্লাস বাড়ছে, ছাত্রও বাড়ছে। ছাত্র-ভর্তির স্তূপীকৃত আবেদনে কালীপ্রসন্ন, সুরেশচন্দ্র হাঁপিয়ে উঠেছেন। এত ছাত্রের জায়গা কি করে সম্ভব ঐ ছোট্ট চার-পাঁচ কামরার ভাড়া বাড়িতে। অথচ ফিরিয়ে দেওয়াও মুস্কিল। প্রায় সবাই মুখচেনা কালীপ্রসন্নর। কাতর অভিভাবকদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা জন্মশিক্ষক কালীপ্রসন্নর সাধ্যাতীত। নিরুপায় হয়ে কালীপ্রসন্ন স্মরণস্থ হলেন যতীন্দ্রনাথ বসুর। শেষমেষ বোসমশাই একটা উপায় বাৎলালেন।

মুস্কিল আসানের চিরাগটির সন্ধান জানতেন যতীন্দ্রনাথ। তিনিই পথ বাৎলে দিলেন। তখন বর্তমান শ্যামপুকুর স্ট্রীট ও বিধান সরণির মোড় থেকে উত্তরা সিনেমা পর্যন্ত বড় রাস্তার উপরেই ছিল বিশাল একটা মাঠ। শ্যামপুকুর বুজিয়ে এই মাঠ তৈরী হয়েছিল। স্থানীয় কচিকাচাদের দিনভোর দাপাদাপিতে উচ্চকিত থাকত এই মাঠ। মাঠের মালিক জোড়াবাগানের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের চারুশীলা দেবী। চারুশীলা ছিলেন ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারীর

শিষ্যা। যতীন্দ্রনাথের পরামর্শে কালীপ্রসন্ন ছুটে গেলেন দেওঘরে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রম তপোবন পাহাড়ে। সেই মহাসাধকের চরণতলে নিবেদন করলেন তাঁর প্রার্থনা। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময়ে চারুশীলা দেবীও গেছেন গুরুজীর দর্শনে দেওঘরে। সব শুনে বালানন্দ শিষ্যাকে অনুরোধ করলেন : মা এর স্কুলের জন্য তোমার জমিতে একটি বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দাও। গুরুর আদেশে এককথায় রাজী হলেন পরমভক্ত চারুশীলা। কালীপ্রসন্নকে বাড়ির প্ল্যান সাবমিট করতে বললেন।

প্রার্থনা মঞ্জুর হতে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কালীপ্রসন্ন। এতদিন ধরে যে শিশুতরুটিকে সকল অযত্নের মলিন স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, বুকভরা ভাল-বাসার নির্যাসে যাকে সিক্ত করেছেন তাই আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ভুবনমোহনের সৌমনারী, কালীপ্রসন্নর নার্সারী, কালী-প্রসন্ন-সুরেন্দ্রচন্দ্রের মিডল ইংলিশ স্কুল দীর্ঘ কুড়ি বছরের ঐকান্তিক সাধনায় হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে। শিশুতরু ডাল-পালা মেলে দিয়েছে আকাশের আঙিনায়। আর তাকে টবে ধরে রাখা চলে না। তার চাই বিপুল বিশাল পৃথিবীর স্পর্শ। সেই স্পর্শটুকুর আয়োজনও দেওঘরে শুরু করে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন কালীপ্রসন্ন।

কলকাতায় ফিরে এসেই দেখা করলেন চারুচন্দ্র শ্রীমানীর সঙ্গে। শ্রীমানীমশাই সে যুগের বি-ই। এক পয়সাও ফি না নিয়ে বাড়ির প্ল্যান করে দিলেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ি তোলার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করলেন। দেখতে দেখতে বছরখানেকের মধ্যে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ধারে পুকুরবোজানো বিশাল মাঠের ওপর মাথা তুলে দাঁড়াল চারতলা বিল্ডিং। চারতলা কেন? আটশো ছাত্রের জন্য এর চেয়ে ছোট বাড়িতে কি করে হবে। ১৯১৫ সালের ৪ নভেম্বর স্কুল তার কুড়ি বছরের পুরোনো আস্তানা ছেড়ে উঠে এল নতুন ঠিকানায়।

ঠিকানা বদলের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের পরিচালনব্যবস্থাও গেছে বদলে। রেজিসট্রেশনের সময় ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হলেও, এতদিন কালীপ্রসন্ন একলাই এই স্কুল চালিয়ে এসেছেন। যতদিন ছোট ছিল, অসুবিধে হয় নি। এবার অসুবিধে দেখা দিল। ব্যাপারস্যাপার এখন রীতিমত বৃহৎ। কালিপ্রসন্ন একা পারেন না। তাই ম্যানেজিং কমিটি আস্তে আস্তে সক্রিয় হয়ে উঠল। স্কুলের তখন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ভূপেন্দ্রনাথ বসু; সেক্রেটারী মন্মথনাথ রুদ্র। সুরেশচন্দ্র হেডমাস্টার আর কালী-প্রসন্ন সুপারিনটেনডেন্ট। শিক্ষকসংখ্যাও বেড়েছে অনেক। প্রায় কুড়িজন শিক্ষক তখন এই স্কুলে পড়াচ্ছেন।

একদিন যৌবন-শুরুতে যে মানুষ অভিমানে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই মানুষটিই সারা যৌবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন মানুষগড়ার বিপুল কারখানা। দেশটা ভারত না হয়ে বিলেত আমেরিকা হলে হয়ত কালীপ্রসন্নর প্রতিভা ব্যক্তিগত সুখ-সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠায় অনুসন্ধানে নিয়োজিত হত। হয়তো বা জন্ম নিতো কোন দ্বিতীয় ফোর্ড বা গুগেনহাইম। কিন্তু এদেশের আলোতে বাতাসে মাটিতে যে ত্যাগ ও তিতিক্ষার সুর অহরহ মিশে থাকে তার আহ্বান যার মর্মস্পর্শ করেছে সে কেমন করে ব্যক্তিগত সুখের সন্ধান করবে? তাই গৃহী হয়েও সন্ন্যাসীর জীবন কাটিয়ে গেছেন কালীপ্রসন্ন। বাঁচেন নি বেশীদিন। মাত্র পঞ্চান্নটি বছর। জীবনের শেষ কটি বছরও অতিবাহিত হয়েছে তাঁর বার্ধক্যের বারাণসী টাউন স্কুলের চারতলার চিলেকোটায়। দেহমন্দির পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। চলতে ফিরতে কষ্ট হোত। তবু ধুতি, সার্ট ও বিদ্যাসাগরী চটির আড়ালে নাতিদীর্ঘ মানুষটি কিন্তু শেষদিন পর্যন্ত এই স্কুল ও ছাত্রদের জন্য নীরবে সেবা করে গেছেন। একদিন আর পারলেন না। তেইশ সাল, নভেম্বর মাস। মাস শেষ হতে আর মোটে চারটি দিন বাকি। টাউন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার নীরব নম্র দুটি আঁখি হতে জীবনের শেষ রৌদ্র-রশ্মি চিরতরে মুছে গেল। ক'দিন পরে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যরা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন : এই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সুপারিনটেনডেন্ট বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তীর মৃত্যুতে শোক-সন্তপ্ত চিত্তে এই সভা শ্রীচক্রবর্তীর পত্নী ও সন্তানদের এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্য গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

একটি অধ্যায় শেষ হোল। অধ্যায় মানে ঊনত্রিশটি বছর। এই ঊনত্রিশ বছরে স্কুলের অগ্রগতির নিখুঁত খতিয়ান লেখা আছে ম্যানেজিং কমিটির প্রসিডিংস বুকে। চব্বিশ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত ম্যানেজিং কমিটির ঊনত্রিশতম বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত বার্ষিক বিবরণী থেকে সেই খতিয়ানের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরছি :...স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বর্তমান বৎসরের (১৯২৪) ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল আটশো আশী। গত বৎসর এই সংখ্যা ছিল আটশো বিয়াল্লিশ। গড়ে মাসিক ছাত্র-উপস্থিতির সংখ্যা সাতশো আটানব্বই। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির নিয়মানুযায়ী যেখানে কমপক্ষে গড়ে বৎসরে শতকরা আশীভাগ ছাত্র-উপস্থিতি প্রয়োজন সেক্ষেত্রে স্কুলের ছাত্র-উপস্থিতির হার শতকরা ৮৯·২ ভাগ।...... এই বিশাল ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে পঞ্চাশটি ছাত্র স্বল্পব্যয়ে বেতনে পড়িবার সুযোগ পাইতেছে।......নয়টি ক্লাসের তেইশটি সেকশনে এই আটশো আশীটি ছাত্র পড়িতেছে।......ছাত্রবেতনের হার উঁচু ও নীচু ক্লাস মিলাইয়া দুই টাকা হইতে চারি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপরের চারিটি ক্লাসের ছাত্রবেতন ছাত্রপিছু মাসিক চারি টাকা, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর (অর্থাৎ বর্তমানের ক্লাস সিকস ও ফাইভ) তিন টাকা ও সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণীর (অর্থাৎ বর্তমানের ক্লাস ফোর ও থ্রি) দুই টাকা।......ছাত্রবেতন, ফাইন ইত্যাদি বাবদ আলোচ্যবর্ষে স্কুলের আয় হইয়াছে সর্বমোট ঊনত্রিশ হাজার আটশো পঁয়ত্রিশ টাকা এগারো আনা নয় পাই......ব্যয় হইয়াছে তেইশ হাজার সাতশো নয় টাকা ছয় আনা তিন পাই। এই ব্যয়ের মোটা অংশই বরাদ্দ হইয়াছে প্রধানত দুইটি খাতে—(১) বাড়ি-ভাড়া—তিন হাজার টাকা (অর্থাৎ মাসিক বাড়িভাড়া সে আমলে ছিল আড়াইশো টাকা); (২) এসট্যাবলিসমেণ্ট—আঠারো হাজার একশো পঁচাশী টাকা ছয় আনা।

চব্বিশ সালের বার্ষিক বিবরণী থেকে সরে এসে এবার হিসাব নেওয়া যাক কেন এসট্যাবলিসমেণ্ট বাবদ স্কুলের এত ব্যয় হয়েছে? কারণ খুবই স্পষ্ট। শিক্ষক-সংখ্যা বৃদ্ধি। তখন একজন সুপারিন-টেনডেন্ট, একজন রেকটর, একজন হেড-মাস্টার ও একজন অ্যাসিসট্যাণ্ট হেড-মাস্টার ছাড়াও ছাব্বিশজন শিক্ষক স্কুলে পড়াচ্ছেন। এছাড়া আছেন তিনজন ক্লার্ক ও একজন দারোয়ান। শিক্ষকরা স্কুলের নিজস্ব স্কেলে মাইনে পেতেন। হেড-মাস্টারমশায়ের স্কেল ছিল একশো থেকে একশো পঁচাত্তর। সুরেশবাবু হেডমাস্টার হিসাবে চব্বিশ সালে বেতন পেতেন একশো ষাট টাকা। গ্রেড টু ছিল পঁচাত্তর থেকে একশো টাকা। এই গ্রেডে অ্যাসিসট্যাণ্ট হেডমাস্টার নগেনবাবু পেতেন নব্বই টাকা। ওয়ান ও টু ছাড়া আরো ছিল তিনটি গ্রেড। গ্রেড থ্রির বেতনক্রম ছিল পঞ্চান্ন থেকে পঁচাত্তর। গ্রেড ফোর—চল্লিশ থেকে পঞ্চান্ন এবং ফাইভের ত্রিশ থেকে চল্লিশ। শিক্ষকদের মধ্যে একুশজন পড়াতেন ইংরেজী বিষয়গুলি, প্রাচীন সাহিত্যের (অর্থাৎ সংস্কৃত, পালি। মুসলিম ছাত্র তিন চারটি ফি বছরই স্কুলে থাকলেও কেউ উর্দু, ফারসী বা আরবী নিতেন না; তাই মৌলভীর প্রয়োজন হয়নি কখনো) জন্য ছিলেন তিনজন ও মাতৃভাষার জন্য দুজন। মোট শিক্ষকসংখ্যার তেরোজন ছিলেন গ্র্যাজুয়েট।

এ ত গেল শিক্ষকদের কথা। ছাত্রদের খবর কি? স্কুলের রেজাল্ট কেমন? ১৯১৪ সালে প্রথম এই স্কুলের ছেলেরা

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়। প্রথম বছরে বাহান্নটি ছাত্র পরীক্ষায় বসেছিল, ফেল করেনি কেউ। স্কুলের রেজাল্ট গোড়া থেকেই উঁচু পর্দায় বাঁধা। ফলাফল বরাবরই চমৎকার বলে অভাবনীয় সাফল্যেও স্কুল কোনদিনই চমকিয়ে যায় নি। কোনরকম উচ্ছ্বাস ছাড়াই চব্বিশ সালের বার্ষিক বিবরণীতে এই ক'টি লাইন লেখা হয়েছে : ১৯২৩ সালে পরীক্ষার্থী আশীটি ছাত্রের মধ্যে উনসত্তরজন পাশ করিয়াছে—সাঁইত্রিশজন ফার্স্ট ডিভিশন, আটাশটি সেকেন্ড ডিভিশন ও চারটি থার্ড ডিভিশন। অন্যতম পরীক্ষার্থী জগন্নাথনারায়ণ ওয়েলিংকার, যে সেকেন্ড ক্লাস (অর্থাৎ বর্তমানের ক্লাস ফোর) হইতে এই স্কুলে পড়িয়াছে, এইবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সকল ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক কুড়ি টাকার একটি বৃত্তি লাভ করিয়াছে। ব্যস! এই ক'টি লাইন মাত্র। এত বড় কৃতিত্বেও স্কুল শান্ত, ধীর ও বিনীত। কালীপ্রসন্ন মারা যাওয়ার আগেই এই ঘটনা ঘটেছে। নিজের চোখে সব দেখে গেছেন তিনি।

কালীপ্রসন্ন চলে গেলেন। কিন্তু রেখে গেলেন তাঁর নিজের হাতে গড়া একদল আদর্শনিষ্ঠ মানুষগড়ার কারিগর। সেই মহান শিক্ষকগোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন কালীপ্রসন্নেরই প্রাক্তন সহকর্মী সুরেশচন্দ্র। সুরেশচন্দ্র আরো এগারো বছর এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। তাঁর সময়ে যে সব পরমশ্রদ্ধেয় শিক্ষক এই স্কুলে পড়িয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্তত এ ক'টি নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন—নগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, হরিভূষণ চ্যাটার্জি, ভবশঙ্কর ব্যানার্জি, কৃষ্ণপদ দীক্ষিত, কালিকান্ত গোতম ও ললিতমোহন ঘোষ। এই মহান শিক্ষকগোষ্ঠীর আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় যে সব ছাত্র বর্তমান শতাব্দীর বিশের যুগ ও তিরিশের যুগের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই স্কুলে জীবনগড়ার প্রাথমিক পাঠের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের সকলের নামের তালিকা পেশ করার মত জায়গা নেই, তাই গুটিকয়েক নাম মাত্র এখানে তুলে ধরছি—লক্ষ্মীকান্ত ওয়েলিংকার (জগন্নাথের ছোট ভাই, পঁচিশ সালে ম্যাট্রিক স্ট্যান্ড করেছিলেন), সুকমলকান্তি ঘোষ (সম্পাদক, যুগান্তর), অশোককুমার সরকার (সম্পাদক, আনন্দবাজার), রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, হিরন্ময় নাথ, সুনীল বসু, প্রাক্তন সংসদ সদস্য কমল বসু, ব্যারিস্টার প্রভাত বসু, ডাক্তার বি কে রায়চৌধুরী, বিখ্যাত ফুটবলার গণেশচন্দ্র দাস, প্রখ্যাত ক্রিকেটার ও বেতার ভাষ্যকার কমল ভট্টাচার্য।

চৌত্রিশ সালে মারা যান সুরেশচন্দ্র। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করলেন ভুবনমোহন ভট্টাচার্য। পঁয়ত্রিশ থেকে সাতান্ন সাল, বাইশ বছর ভুবনমোহন এই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এই বাইশ বছরে কালীপ্রসন্ন-সুরেশচন্দ্রের স্কুল শুধু কলকাতা নয়, গোটা বাংলাদেশের শিক্ষা-মানচিত্রে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। স্কুল যদি নদী হত, বলতাম এবড়ো-খেবড়ো, পাহাড়ে-পাথুরে জমি-জায়গার সংকীর্ণ প্রচণ্ড গতিশীল প্রাথমিক পথ-পরিক্রমার শেষে দিগন্তজোড়া পলিময় শস্যশ্যামল প্রান্তরের বুকে বিশাল প্রসারতার মাধ্যমিক গতি হয়েছে শুরু। এখন দুহাত ভরে প্রসন্ন উদারতায় ফসলের ক্ষেতকে সিক্ত করাই একমাত্র কাজ। স্কুল সেই কাজে যে রীতিমত দক্ষ হয়ে উঠেছে, তারই প্রমাণ পাওয়া গেল বিয়াল্লিশ সালে। টাউনের ছাত্র অলোকপ্রসাদ মিত্র ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়ে স্কুলের ও শিক্ষকদের মুখ উজ্জ্বল করলেন। স্ট্যান্ড যাঁরা করেন, তাঁরা হয়তো স্কুলের মুখাপেক্ষী ততটা নন। ক'বার স্কুলের ছাত্ররা স্ট্যান্ড করেছে পরীক্ষায় তাই দিয়ে নিশ্চয়ই কোন স্কুলের মেরিট বিচার হবে না। স্কুলের পঠন-পাঠনের মানের ব্যারোমিটার আংশিকভাবে হতে পারে গড় ফলাফল। সেদিক থেকে টাউন স্কুল নিঃসন্দেহে এদেশের অগ্রণী স্কুলগুলির অন্যতম। ভুবনমোহনের সময় স্কুলের গড় পাশের হার ছিল শতকরা আশীর ওপর। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আজ যাঁরা যশস্বী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এই ক'টি নাম উল্লেখের দাবী রাখে—কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা তিনজনই চল্লিশের যুগে টাউনের ছাত্র ছিলেন। কবি ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পঞ্চাশ সালে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছেন।

দেখতে দেখতে বাইশটা বছর কেটে গেল। ভুবনমোহন রিটায়ার করলেন। তাঁর জায়গায় হেডমাস্টার হলেন সরোজকুমার চক্রবর্তী। পুরোনো মাস্টারমশাইরা প্রায় সবাই তখন বিদায় নিয়েছেন। অতি-পুরোনোদের মধ্যে আছেন শুধু ললিতমোহন ঘোষ। আর আছেন প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অম্বিকাচরণ মিত্র। বলতে গেলে বাদবাকি সবাই নতুনের দলে। ললিতবাবু কমদিন এই স্কুলে পড়ালেন, পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশী সময়। এই তো সেদিন সাতষট্টিতে রিটায়ার করলেন। আজো মনে পড়ে ললিতবাবুর তেইশ সালে স্কুলের প্রথম ম্যাগাজিন প্রকাশ করার কথা। ছাত্র-সম্পাদক ছিল জগন্নাথ ওয়েলিংকার, শিক্ষক-সম্পাদক তিনি নিজেই। চোখের সামনে দেখেছেন স্কুলের স্কাউট দল গড়ে উঠতে। মনে পড়ে কালীপদ গাঙ্গুলীমশায়ের কথা। স্কাউট-টিচার গাঙ্গুলীমশাই সারাটা জীবন এই স্কাউট দল নিয়েই মেতে ছিলেন। বছরকয়েক আগে তিনি মারা যেতেই কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। স্কাউট দল। শুধু স্কাউট কেন? লাইব্রেরীর গোড়াপত্তনের কাহিনীও ললিতবাবুর জানা আছে। আজো তাঁর মনে পড়ে প্রথম যখন স্কুলের চাকরীতে ঢুকলেন সেই বাইশ-তেইশ সালে হাজার আড়াই বই ছিল লাইব্রেরীতে। ফি বছরই তখন একশ' পৌনে একশ' টাকার বই কেনা হত। আরো কত কথা মনে পড়ে—ক্যালকাটা করপোরেশন টাউন স্কুলের বিল্ডিংয়ে সকালে একটা প্রাইমারী স্কুল খোলবার অনুমতি চেয়েছিল। স্কুল সানন্দে রাজি কিন্তু প্রার্থীর তরফে আর কোন সাড়াশব্দ মেলেনি, তাই পরিকল্পিত করপোরেশন প্রাইমারী স্কুলও আর খোলা হয়নি। কথা বলতে বলতে ললিতবাবু একটু থামলেন। আমি আসব জেনে বর্তমান হেডমাস্টারমশাই তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, স্কুলে আসতে। দীর্ঘদিন এই স্কুলের সেবা করেছেন। অনেক দেখেছেন, জানেন অনেক। রিটায়ার করেও মানুষটি স্কুলের মায়া কাটাতে পারেননি। তাই আজো বিকেল হলেই দেখা যাবে শ্যামপুকুর স্ট্রীট দিয়ে একটি মানুষ আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছেন স্কুলের দিকে। পরনে ধুতি আর গেরুয়া পাঞ্জাবি, সাদা খোঁচা খোঁচা চুল মাথা জুড়ে, চোখে চশমা। বিকেলে স্কুলের শেষে যেসব ছাত্র পড়া বুঝতে চায়, তাদের যত্ন করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই সত্তর বছরের বৃদ্ধ রোজ স্কুলে আসেন। না, এর জন্য কোন পারিশ্রমিক এই বৃদ্ধ শিক্ষক কারুর কাছেই চান না। শুধু নিজেকে উজাড় করে দিয়েই তাঁর তৃপ্তি। তৃপ্তির ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। উনি থামতেই বললাম, পুরোনো দিনের আর কোনো কথা যদি আপনার মনে থাকে, দয়া করে বলুন। হাসির রেখা ফুটে উঠল ললিতবাবুর মুখে : একটা কথা মনে পড়ছে, প্রাসঙ্গিক হবে কিনা জানি না। অধীর আগ্রহে বললাম, এই স্কুলেই তো আপনার জীবন কেটেছে, ফলে আপনার ব্যক্তিগত কথাও এখানে প্রাসঙ্গিক। হাসির রেখা এবার সারামুখে ছড়িয়ে গেল : এই যে আজ স্কুলের ঘরে ঘরে ফ্যান ঘুরছে, প্রথম কবে ফ্যান কেনা হয়েছিল জানেন? শুধু আমি নই, হেড মাস্টারমশাই ও অন্যান্য মাস্টারমশাই যাঁরা ঘরে উপস্থিত ছিলেন, সবাই বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। বাইশ সালে। ঐ বাইশ সালে হাজার টাকায় দশটা ফ্যান কেনা হয়েছিল। ঐ প্রথম স্কুলে ফ্যান এল।

ফ্যান এসেছে বাইশ সালে। ঐ বাইশ-তেইশেই ইউনিভার্সিটির অনুরোধে স্কুল কমিটি ঠিক করেছিল ছেলেদের বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলবার জন্য টাইপ-

রাইটিং, সেলাই ইত্যাদির ক্লাস নেওয়া হবে। যে-কোন কারণেই হোক সেদিন তা আর হয়ে ওঠেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর নতুন করে জোর দেওয়া হল। গড়ে উঠল পরে পরে ইনডাস-ট্রিয়াল ট্রেনিং সেন্টার আর পলিটেকনিক। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার খোলনলচে বদলে ফেলার জন্য প্রবর্তিত হল উচ্চতর মাধ্যমিক ব্যবস্থা। সারাদেশের সব স্কুলই নতুন ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠল। টাউন স্কুলও কোন ব্যতিক্রম নয়। তাই বাট সালে সায়েন্স ও হিউম্যানি-টিজ দুটি স্ট্রীম নিয়ে টাউন স্কুল রূপা-ন্তরিত হল হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে। নতুন ব্যবস্থাতেও স্কুলের পূর্বমান অক্ষুণ্ন থেকেছে। গত সাত বছরে সায়েন্স ও হিউ-ম্যানিটিজে গড়ে শতকরা আশীটি ছেলেই পাশ করেছে। ঐ দুটি স্ট্রীমের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়েই সাতষট্টিতে কমার্স সেকশন খুলেছে স্কুল।
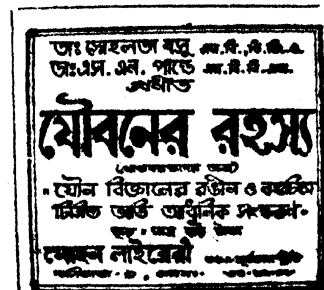
আজ তিনটি স্ট্রীম মিলিয়ে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী ধরে বারোশ' দশটি ছাত্র পড়ছে এই স্কুলে। শুধু সেকেন্ডারীর ছাত্র-সংখ্যাই ন'শো বাট। এই ন'শো বাটটি ছাত্রের জন্য সেকেন্ডারী সেকশনে আছেন ত্রিশজন শিক্ষক। জিজ্ঞাসা করলাম বর্তমান হেডমাস্টার মধুসূদনবাবুকে, অতীতে আপনাদের স্কুলের নিজস্ব স্কেল ছিল। আজো কি আপনারা তাই অনুসরণ করছেন? সরোজবাবু এই বছরই রিটায়ার করেছেন। মধুসূদন রায় ১ অকটোবর তাঁর জায়গায় হেডমাস্টার হয়েছেন। আমার প্রশ্নের জবাবে মধুসূদনবাবু বললেন : না। বর্তমানে গ্র্যান্ট-ইন-এড স্কীম অনুযায়ী আমাদের শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হয়। ফলে এসট্যাবলিশমেন্ট খরচ বেড়ে গেছে ভয়ানক। শুধু টিউশন ফী সম্বল করে ভবিষ্যতে এই দায় মেটানো অসম্ভব। তাই সরকারী সাহায্যের তালিকায় আজ টাউন স্কুলেরও নাম উঠেছে।

গ্র্যান্ট-ইন-এড প্যানেলে স্কুলের নাম উঠেছে। বারোশ' ছাত্র আজ স্কুলে পড়ছে। ত্রিশজন মাস্টারমশাই পড়াচ্ছেন। চারুশীলা দেবীর সেই পুরোনো চারতলা বাড়ীটিতেই আজো অতীতের মত স্কুল বসছে। আজো অতীতের মত ফি বছরই টাউনের ছাত্ররা ভাল রেজাল্ট দেখাচ্ছে পরীক্ষায়। সব আছে, হচ্ছেও কত নতুন জিনিস। শুধু নেই তাঁরা, যাঁরা একদিন এই স্কুল গড়ে-ছিলেন। সেই কালীপ্রসন্ন, যতীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র, কৃষ্ণপদ ও আরো কত শত শত শিক্ষক ও বিদ্যানুরাগী যাঁদের সারাজীবনের সাধনায় গড়ে উঠেছে শহর কলকাতার অন্যতম সেরা বিদ্যালয় এই টাউন স্কুল। স্কুল কিন্তু ভোলেনি তাঁদের কথা। ভোলা কি যায়, না কেউ অতীত ঐতিহ্য অস্বীকার করে? অস্বীকার করে না বলেই তো এবার নভেম্বরে স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সেই উৎসবের কথাই বললেন স্কুলের বর্তমান সুপারিনটেনডেন্ট দেবপ্রিয় গাঙ্গুলী : নভেম্বরের পঁচিশ, ছাব্বিশ ও ডিসেম্বরের বাইশ, তেইশ, চব্বিশ —এই পাঁচদিন ধরে উৎসব হবে। আমাদের শত শত প্রাক্তন ছাত্র আসবেন এই উৎসবে যোগ দিতে। এই তো সেদিন তুষারবাবু, অশোকবাবু, সুকমলবাবু স্কুলে এসে-ছিলেন। এসেছিলেন আমাদেরই আর এক প্রাক্তন ছাত্র ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের প্রেসি-ডেন্ট অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। আরো অনেকেই এসেছিলেন। অনেক সময় ধরে প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা হল। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। আমরা চিঠি পাঠাচ্ছি পুরোনো ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানিয়ে। কেন বলতে পারব না, হঠাৎ এদেরই একটি পুরোনো ছাত্রের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম জগন্নাথনারায়ণ ওয়েলিংকার কি আসছেন? একটা পোস্টকার্ড হাতে তুলে দিয়ে দেবপ্রিয়বাবু বললেন, তাঁকেও চিঠি পাঠিয়েছিলাম, জবাব পেলাম এই সেদিন। চিঠিটির হুবহু অনুলিপি এখানে দিচ্ছি :

জে এন ওয়েলিংকার
'ভিজারাজ', ৮ রু ভিকটর সিমোনেল,
পণ্ডিচেরী—১, সাউথ ইণ্ডিয়া
টেলিগ্রামঃ ওয়েলিংকার আশ্রম
পণ্ডিচেরী, ২৯-৯-১৯৬১

প্রিয় মিঃ গাঙ্গুলী,

আমার বর্তমান পদমর্যাদা ও অবস্থা সম্পর্কে জানতে চেয়ে আপনি যে পোস্ট-কার্ডটি পাঠিয়েছিলেন এ-মাসের বাইশ তারিখে, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সম্পাদক সেটি আমাকে দিয়েছেন।

ভাল কথা, বর্তমানে আমার পদ বলতে কিছু নেই। আর যদি অবস্থার কথা বলেন, তাহলে আমি একজন আশ্রমিক মাত্র। চৌষট্টি বছর পেরিয়ে গেছে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, কথা বলতে কষ্ট হয়। বর্তমান আমি অবসরজীবন যাপন করছি সম্পূর্ণ ভাল। ১-২-১৯৫৫ থেকে আমার স্ত্রী ও সন্তানগণসহ আমি এই আশ্রমেরই সদস্য।

প্রসঙ্গত জানাই ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে যখন আমি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কতকগুলি কয়লাখনির অফিসার-ইন-চার্জ ছিলাম, তখন একবার আমার শিক্ষাদাত্রী টাউন স্কুলে গিয়েছিলাম। পুরোনো স্কুলের সমৃদ্ধি কামনা করে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

ইতি—
জে এন ওয়েলিংকার

—সন্দীপন

পরের সংখ্যায় : মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'মীটিং হইব। ঢাকার থনে বড় মাইনষেরা আইসা বক্তিতা (বক্তৃতা) করব। আইসেন কিলাম।'

'আসব।'

বাড়ি আসতেই স্নেহলতা জানালেন, মীরপাড়া-মধ্যপাড়া সর্দারপাড়া, রাজদিয়ায় যত মুসলমান বাড়ি আছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সব জায়গা থেকে মিষ্টি পাঠিয়েছে।

বিকেলবেলা আদালত পাড়ার মাঠে এসে দেখা গেল, লোকে-লোকারণ্য। রাজদিয়াই শুধু নয়, চারদিকের গ্রামগঞ্জ থেকে মানুষ এসে ভেঙে পড়েছে।

রজবালি কোথায় ছিল, ছুটে এল। তার পর সেখানে শহরের গণ্যমান্য শ্রদ্ধেয় মানুষেরা বসে আছেন, তাদের পাশে দুটো চেয়ারে তাঁকে আর বিনুকে বসালেন।

ঢাকা থেকে নেতারা এসেছিলেন। তাঁরা পাকিস্তান দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। তারপর স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কিছু বলতে অনুরোধ করা হল।

যদিও মুসলিম লীগ এই সভার আয়োজন করেছে, তবু হঠাৎ রজবালি শিকদার বক্তা হিসেবে হেমনাথের নাম প্রস্তাব করে বসল। অগত্যা হেমনাথকে পাকিস্তান সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে হল।

সভা শেষ হতে হতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। তারপর শুরু হল আতসবাজির খেলা। কত রকমের যে বাজি আনা হয়েছে, লেখাজোখা নেই। কোনটা আকাশে গিয়ে আলোর ময়ূর হয়ে যাচ্ছে, কোনটা চিল, কোনটা বাঘ, কোনটা আবার সিংহ। এককেটা হাউই উড়ে গিয়ে আগুনের ফুলকি দিয়ে লিখে দিচ্ছে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' কিংবা 'কায়েদে আজম, জিন্দাবাদ'। তলায় হাজার কণ্ঠে উল্লসিত জয়ধ্বনি উঠছে ঃ

'পাকিস্তান—'
'জিন্দাবাদ।'
'কায়েদে আজম—'
'জিন্দাবাদ।'

বাজি পোড়ানো দেখে হেমনাথরা যখন বাড়ি ফিরলেন, মাঝ রাত পার হয়ে গেছে।

সাতচল্লিশে দেশভাগ হল। তারপর দেখতে দেখতে আরো তিনটে বছর কেটে গেল।

এর মধ্যে বি-এ পাশ করেছে বিনু। ঝিনুক ম্যাট্রিক পাশ করে রাজদিয়া কলেজে ভর্তি হয়ে গেছে।

ওদিকে যুদ্ধের সময় ঝোঁকের বশে সেই যে অবনীমোহন কন্ট্রাক্টরি নিয়ে আসাম চলে গিয়েছিল, সেখানেও বেশিদিন থাকেন নি। যুদ্ধ থামবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শখ মিটে গিয়েছিল। কন্ট্রাক্টরি ছেড়েছুড়ে অবনীমোহন কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, সেখানে বড় চাকরি নিয়েছেন।

কলকাতায় গিয়েই বিনুকে পাঠিয়ে দেবার জন্য হেমনাথকে চিঠি দিয়েছিলেন অবনীমোহন। বিনু যায় নি। তারপর ছেচল্লিশের দাঙ্গার সময় কিংবা দেশভাগের সময়ও যাবার কথা লিখেছিলেন। তখনও বিনু যায় নি। দেশভাগের সময় অবশ্য জমিজমা বিক্রি করে হেমনাথকেও চলে যেতে লিখেছিলেন অবনীমোহন। সুধা-সুনীতি কলকাতাতেই আছে। তারাও ঐ একই কথা লিখত। এখনও নিয়মিত লিখে যাচ্ছে।

•

পাকিস্তান দিবসকে ঘিরে রাজদিয়ার যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল ভাটার টানের মতন ধীরে ধীরে তা স্তিমিত হয়ে গেছে। তার জীবন আবার পুরনো তারে চিমেতালে বাজতে শুরু করেছে।

তিন বছর আগের মতনই চৈত্র-বৈশাখের রোদে মাঠ ফেটে চৌচির হয়েছে, দিগন্তে আগুনের হল্কা নেচে নেচে গেছে। গ্রীষ্মের পর শ্যামল বেশে এসেছে বর্ষা। মাঠ ভাসিয়ে, ধানখেত পাটখেত ডুবিয়ে চারদিকে একাকার করে দিয়েছে। তারপর আকাশে-মাটিতে পরিচিত ছবি এঁকে একে-একে দেখা দিয়েছে শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত। রাজদিয়ার মানুষ তিন বছর আগের মতন পাট বুনেছে, ধান কেটেছে, খেতে নিড়ান দিয়েছে। মাঠ পাড়ি দিয়ে গেছে সুজনগঞ্জের হাটে, কিংবা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে অস্থিসার হয়ে উঠেছে। তিন বছর আগের মতনই তারা ভাসান গান গেয়েছে, সারি-জারি আর রয়ানিতে চারদিক মুখর করে তুলেছে।

তিন বছর আগের মতনই ভেসালের বাঁশে শঙ্খচিল এসে বসেছে। ধানখেতের আশে-পাশে জলসেঁচি শাকের অরণ্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বিলগুলো পানকলস আর জলসিঙাড়ায় ছেয়ে গেছে। পৌষ মাঘ মাসে শীতের দেশ থেকে এসেছে যাযাবর পাখিরা; গরম পড়তে না পড়তেই তারা ফিরে গেছে। কাচের মতন স্বচ্ছ জলের তলায় টাটকিনি আর ভাগনা, গজার আর বজুরী, কাচকি আর বাজারি মাছেরা ডিম পেড়ে পেড়ে রুপালি ফসলে জলবাংলাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

তিন বছর আগের মতই কাউফলের গাছগুলোতে ফুল ধরেছে, বন্যাগাছের দেহ ফলে ফলে ভরে গেছে। কালো কালো মসৃণ মুত্রায় মাথায় অসংখ্য সাদা ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। যেখানেই চোখ ফেরানো যাক,—ধানের খেতে, শাপলাবনে, বেতঝোপে কি খাল-বিল-নদীতে—সর্বদিকেই জলবাংলার এই অপরূপ বসুন্ধরা আগের মতনই রমণীয়। র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের ছুরি ভারতবর্ষকে দুখানা করে কেটে ফেলার পরও রাজদিয়ার কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই। তার আহ্নিক গতি বার্ষিক গতি একই নিয়মে চলছে।

তবে দূর-দূরান্ত থেকে খবর আসছিল পাকিস্তান হবার পরই ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। সাতপুরুষের ঘর-ভদ্রাসন ছেড়ে দলে দলে মানুষ আসাম আর আগরতলায় চলে যাচ্ছে। বেশির ভাগ যাচ্ছে কলকাতার দিকে। নোয়াখালি, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা এমন কি এই ঢাকা জেলার নানা গ্রাম-গঞ্জ থেকে ঐ একই খবর আসছিল।

মোতাহার হোসেন সাহেব মাঝে মাঝে আসেন। বিষণ্ণ সুরে বলেন, 'খবর পাচ্ছেন হেমদাদা?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন হেমনাথ। ঝাপসা গলায় বলেন, 'পাচ্ছি।'

'আপনি তো বলেছিলেন পাকিস্তান হয়ে গেলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু এ কী হচ্ছে?'

হেমনাথ উত্তর দেন না, বিমর্ষ মুখে চুপচাপ বসে থাকেন।

উত্তেজিতভাবে এবার মোতাহার সাহেব বলতে থাকেন, 'সমাধানই যদি হয়ে যাবে, হাজার হাজার মানুষ পূর্ববাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন?'

এবারও হেমনাথ নীরব।

এর ভেতর একটা ব্যাপার ঘটে গেল।

একদিন দুপুরবেলা বিনুরা সবে খেয়ে উঠেছে, বাগানের দিক থেকে খুব চেনা একটা গলা ভেসে এল, 'বড়কত্তা-বড়কত্তা—'

হেমনাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'কে রে?'

'আমি যুগলা—' বলতে বলতে সত্যি-সত্যিই যুগল সামনে এসে দাঁড়াল।

যুগলের গলা পেয়ে স্নেহলতা আর শিবানীও বেরিয়ে এসেছিলেন।

দশ বছর আগে নতুন বৌকে নিয়ে সেই যে ভাটির দ্বিরাগমনে গিয়েছিল যুগল, তারপর এই প্রথম তাকে দেখা গেল।

প্রায় তেমনই আছে যুগল, তেমনি ছিপছিপে বেতের মতন পাতলা চেহারা, তেমনি খাড়া খাড়া চুল। তবে এই মুহূর্তে তাকে অত্যন্ত উদভ্রান্ত আর অস্থির দেখাচ্ছে। কিছুটা বা উত্তেজিত।

এতকাল পর যুগলকে দেখে সবাই ভারি খুশী। স্নেহলতা শিবানী তো চেঁচামেচিই জুড়ে দিলেন, 'বোস যুগল, বোস—'

যুগল বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগল, ' অখন বসুম না ঠাউরমা। আপনেগো লগে দেখা কইরাই যামু গা।'

'যাবি যাবি। কতকাল তোকে দেখি না। সেই যে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলি, ভুলেও আর এদিকে আসিস নি। শ্বশুর-শাশুড়ি পেয়ে আমাদের একেবারে ভুলেই গেছিস। সে যাক গে, এখন এলি কোত্থেকে?'

'ভাটির দ্যাশ থন।'

'শ্বশুরবাড়ি থেকে?'

'হ।'

'ছেলেপুলে হয়েছে?'

'হ।'

'ক'টা?'

'দুই মাইয়া, এক পোলা।'

'একা একা এলি যে? বউ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আনলি না কেন'

একটু চুপ করে থেকে আবছা গলায় যুগল বলল, 'অরা আইছে—'

স্নেহলতা, শিবানী, হেমনাথ—তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'কোথায় রে, কোথায়?'

'ইস্টিমারঘাটায়—'

ইস্টিমারঘাটে বসিয়ে এসেছিস যে তোর আস্পর্ধা তো কম না। ঘরের বৌকে রাজদিয়া পর্যন্ত এনে বাড়িতে তুলিস না!'

মুখখানা কাচুমাচু করে যুগল বলতে লাগল, 'রাগ কইরেন না। অগো আননের সময় আছিল না, আনলেই দেরি হইয়া যাইত। আইজের ইস্টিমার ধরতে পারতাম না।' দ্যাশ ছাইড়া জন্মের মত যাওনের আগে আপনেগো লগে দেখা কইরা গেলাম।'

হেমনাথ উৎকণ্ঠিত হলেন, 'কোথায় চলেছিস দেশ ছেড়ে?'

'কইলকাতা।'

'কলকাতায় কেন?'

'ভাটির দ্যাশে আর থাকন গেল না বড়কত্তা। আগুন দিয়া গেরামকে গেরাম পোড়াইয়া দিচ্ছে, চৌখের সামনা থনে ফসল কাইটা লইয়া যায়। এত অত্যাচার সইয়া থাকন যায় না। হেইর লেইগা যাইতে আছি গা।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। পলকে সমস্ত আবহাওয়াটা বদলে গেল। চারদিক থেকে বিচিত্র এক বিষণ্ণতা সবাইকে ঘিরে ধরতে লাগল।

এক সময় হেমনাথই বলে উঠলেন, 'কলকাতায় কোনদিন যাস নি। অচেনা জায়গায় গিয়ে কী করবি, কোথায় থাকবি, কী খাবি—তার কি কিছু ঠিক আছে? বরং এক কাজ কর, বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে এখানেই চলে আয়। রাজদিয়াতে কোন গোলমাল নেই।'

খানিক ভেবে যুগল বলল, 'না বড়কত্তা, কইলকাতাতেই যামু। রাইজদিয়াতে গণ্ডগোল নাই বুঝলাম, হইতে কতক্ষণ! হেয়া ছাড়া—'

'কী?'

'আমার হউর (শ্বশুর), তিন খুড়া হউর, দুই পিসাতো ভায়রা আর তাগো গুষ্টি আমার লগে যাইতে আছে। তাগো ফালাইয়া আমি কেমনে আসি? এত মাইনষেরে জায়গা দ্যাওন তো সোজা না বড়কত্তা—'

মনে মনে হেমনাথ ভেবে দেখলেন, কথাটা ঠিকই বলেছে যুগল। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনদের ফেলে একা একা সে আসতে পারে না। আবার সবাই এলে এতগুলো মানুষকে আশ্রয় দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

হেমনাথ এবার অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'ভাটির দেশ থেকে কি অনেক লোক চলে যাচ্ছে?'

'মেলা বড়কত্তা, মেলা। যা দশ-বিশ ঘর আছে, তারাও থাকব না। দুই চাইর দিনের ভিতর সাফ হইয়া যাইব।' একটু থেমে যুগল আবার বলল, 'যদি পারেন আপনেরাও যাইয়েন গা।'

হেমনাথ উত্তর দিলেন না।

যুগল এবার বলল, 'আর খাড়াইতে পারুম না, ইস্টিমার ছাড়নের সময় হইয়া আইল। যাই গা ঠাউরমা, যাই বড়কত্তা, চললাম ছুটোবাবু—' হেমনাথ, শিবানী আর স্নেহলতাকে প্রণাম করে একটু পর চলে গেল যুগল।

যুগল চলে যাবার পর পুবের ঘরের তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে তার কথাই ভাবছিল বিনু। ওরা কলকাতায় যাচ্ছে।

দশ বছর আগে বিনুরা যেদিন প্রথম রাজদিয়া এল সেদিনই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কলকাতার কত খবর নিয়েছিল যুগল। কলকাতা তখন তার কাছে স্বপ্ন, তার কল্পনার কলকাতা রমণীয় স্বর্গ হয়ে ছিল।

কিন্তু চল্লিশের কলকাতা আর পঞ্চাশের কলকাতা কি এক? প্রতিদিন ডাকে যে খবর কাগজ আসে তাতে কলকাতার ভয়াবহ ছবি থাকে। সুবিশাল ঐ মহানগর নাকি উদ্বাস্তুতে ছেয়ে গেছে। কোথাও থাকবার জায়গা নেই। তাই ছিন্নমূল নর-নারীর দল রেলস্টেশনে, ফুটপাথে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে।

পঞ্চাশের কলকাতা যুগলকে কোন স্বর্গে পৌঁছে দেবে, কে জানে।

●

যুগল যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিল, অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। একটা মাসও তারপর কাটে নি, রাজদিয়ার মাটি তেতে উঠল।

ঢাকা থেকে এসে কারা যেন সুজনগঞ্জে, মীরকাদিমে, ওদিকে আউটসাহী বেতকা আবদুল্লাপুরে প্রায়ই মিটিং করে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের চালে আগুন লাগছে, মাঠের পর মাঠ পাকা ধান কারা রাতের অন্ধকারে কেটে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু কি তাই, সন্ধে হলেই ঘরের চালে চালে ঢিল পড়ে, দেশ ছেড়ে চলে যাবার জন্য বেনামী চিঠি আসে। এমন চিঠি খানকতক হেমনাথও পেয়েছেন।

ব্যাপারটা এতেই থেমে থাকল না। সুজনগঞ্জের হাট থেকে ফিরবার পথে সেদিন বারুইপাড়ার রাখাল আর গণকপাড়ার প্রাণবল্লভ সড়কির ঘা খেয়ে এল। তারপর যেদিন যুগীপাড়ার কাপালীকে খুঁজে পাওয়া গেল না সেদিন থেকে এই রাজদিয়াতেও ভাঙন শুরু হয়ে গেল। যুগীপাড়া তো বটেই, কুমোরপাড়া, কামারপাড়া, বারুইপাড়া, নাহাপাড়া, সব জায়গা থেকেই দলে দলে মানুষ ভিটে-মাটি ফেলে স্টিমারে করে কলকাতার দিকে চলে যেতে লাগল। হেমনাথ আর মোতাহার সাহেব 'পীস কমিটি' করেও ভাঙন ঠেকাতে পারলেন না।

ইদানীং সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার হয়েছে মজিদ মিঞার। আগে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হেমনাথের বাড়ি আসত সে, আজকাল হাজার ডাকাডাকি করলেও আসে না। দেখা হলে এড়িয়ে যায়। তার সম্বন্ধে নানারকম কথা কানে আসছে। লোকটা অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে।

রাজদিয়ায় ততটা না হলেও আশেপাশের গ্রাম-গঞ্জগুলো থেকে প্রায়ই খুনজখম-আগুনের খবর আসছিল। রাত হলেই উল্লসিত চিৎকার শোনা যায়, অন্ধকার চিরে চিরে মশালের আলো দপদপ করে জ্বলতে থাকে।

একদিন আরো নিদারুণ খবর এল। রাজদিয়া থেকে যে স্টিমারটা গোয়ালন্দে যায়, কোথায় যেন তার ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। ফল হয়েছে এই, স্টিমার সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজদিয়া যেন অজানা দ্বীপের মতন জলবাংলার এই প্রান্তে পড়ে আছে।

শুধু রাজদিয়া বা চারধারের গ্রামগুলোতেই না, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-মানিকগঞ্জ থেকেও গোলমালের খবর আসছিল।

যত শুনছিলেন যত দেখছিলেন ততই যেন স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন হেমনাথ। সমস্ত জগৎ থেকে কিছুদিনের জন্য নিজেকে গুটিয়ে এনে চুপচাপ বসে রইলেন। ঠিক বসে রইলেন না, সেই বড় বড় লোহার বাক্সগুলো খুলে সারাজীবনের সঞ্চয় অসংখ্য ভাল ভাল জিনিস—ময়ূরের পালক, সুন্দর হস্তাক্ষর, চকচকে পাথর, চমৎকার চমৎকার ছবি—দেখে দেখে কাটালেন। মন খারাপ হলেই তিনি ওগুলো নিয়ে বসেন। সারাদিন এসব দেখবার পর সন্ধ্যেবেলা গীর্জায় গিয়ে লারমোরের সমাধিতে বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে আসতে লাগলেন।

দিন কয়েক পর হঠাৎ বুঝিবা হেমনাথের মনে হল, এভাবে নিজেকে সরিয়ে আনা ঠিক হয়নি। আবার আগের মতন তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতে লাগলেন। এই দুঃসময়ে তিনি পাশে থাকলে সবাই ভরসা পাবে।

চারদিক জুড়ে যখন আগুন জ্বলছে সেই সময় একদিন দুপুরবেলা ভবতোষ এলেন। চুল এলোমেলো, চোখের কোলে শ্যাওলার মতন কালচে দাগ, মুখময় তিন-চার দিনের দাড়ি, চোখ আরক্ত। সমস্ত শরীর ঘিরে সীমাহীন বিষণ্ণতা।

দশ বছর ধরে ভবতোষের এই এক চেহারাই দেখে আসছে বিনু।

এসেই ভবতোষ বললেন, 'খুব খারাপ খবর কাকাবাবু—'

হেমনাথ বাড়িতেই ছিলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'ঝিনুকের মা মৃত্যুশয্যায়। শেষ সময়ে ঝিনুক আর আমাকে একবার দেখতে চেয়েছে।'

'কে বললে?'

'সেই খবর পাঠিয়েছে।'

একটু ভেবে হেমনাথ বললেন, 'ঝিনুকের মা এখন কোথায়?'

'ঢাকায়।'

'তোর শ্বশুরবাড়ি?'

'না।'

'তবে?'

'যার সঙ্গে চলে গিয়েছিল তার কাছেই আছে।'

'কিন্তু—'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন ভবতোষ।

হেমনাথ বললেন, 'স্টিমার বন্ধ। চারদিকে গোলমাল চলছে এর ভেতর ঢাকায় যাবি কী করে?'

'আমি একটা বিশ্বাসী মাঝি ঠিক করে রেখেছি, সেই নিয়ে যাবে। ভয়ের কিছু নেই।'

'এ সময় পাঠানো উচিত না। ঝিনুক বড় হয়েছে। তবু ওর মায়ের কথা ভেবে না পাঠিয়েও পারছি না। খুব সাবধানে যাবি কিন্তু—'

ভবতোষ মাথা নাড়লেন।

হেমনাথ আবার বললেন, 'কবে ফিরবি?'

'তিন চারদিনের ভেতর।'

ঝিনুককে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ চলে গেলেন।

তিন-চারদিনের জায়গায় ষোল-সতের দিন কেটে গেল। তবু ঝিনুকেরা ফিরছে না। তাদের কোন বিপদ ঘটল কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। স্নেহলতা শিবানী এবং হেমনাথ অস্থির হয়ে উঠলো। আর বিনু?

কৈশোর আর যৌবনের দশটা বছর ঝিনুকের সঙ্গে একই বাড়িতে কাটিয়ে দিয়েছে সে। মাঝে মধ্যে ভবতোষ ঝিনুককে নিয়ে গেছেন ঠিকই। কিন্তু দু-একদিন পরই ফিরে এসেছে। একসঙ্গে ষোল-সতের দিন তাকে ছেড়ে কখনও থাকে নি বিনু।

ঝিনুক যেন নিশ্বাস-বায়ুর মতন সহজ। কাছে থাকলে টের পাওয়া যায় না। এই দশ বছরে ধীরে ধীরে জীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে সে বসে গেছে, এই প্রথম বুঝতে পারল বিনু। ঝিনুকের জন্য প্রতি মুহূর্তে তার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, হেমনাথ ভবতোষদের খোঁজে ঢাকায় যাবেন। বিনুও সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, হেমনাথ নেন নি। বলেছেন, 'দুজনে গেলে কী করে চলবে? বাড়িতে একজন পুরুষমানুষ থাকা দরকার।'

দিন তিনেক পর ঝিনুককে নিয়ে ঢাকা থেকে ফিরলেন হেমনাথ। কিন্তু এ কোন ঝিনুক? চুল আলুথালু। চোখের দৃষ্টি স্থির, উদভ্রান্ত। গালে-ঠোঁটে-বাহুতে, সমস্ত শরীরের কত জায়গায় যে মাংস উঠে উঠে রক্তারক্তি হয়ে আছে! পরনের জামাটা, শাড়িটা নানা জায়গায় ছেঁড়া। কোন রাক্ষস যেন তার শরীরের সবটুকু সার শুষে নিয়েছে।

ঝিনুককে দেখেই শিবানী স্নেহলতা কেঁদে ফেললেন, 'কী হয়েছে ঝিনুকের? কী হয়েছে? ভব কোথায়?'

হেমনাথকেও চেনা যাচ্ছিল না। বলবান ঋজু মানুষটা একেবারে ভেঙেচুরে গেছেন যেন। তাঁকে একটা ধ্বংসস্তূপ বলে মনে হচ্ছে।

আড়ষ্ট ভাঙা গলায় হেমনাথ বললেন, 'ভব নেই।'

স্নেহলতা চিৎকার করে উঠলেন, 'কী হয়েছে ভবর? বল—বল—'

হেমনাথ এরপর যা বললেন, সংক্ষেপে এই রকম। এখান থেকে ঢাকায় পৌঁছবার পর ভবতোষরা দাঙ্গার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। রাক্ষসেরা ভবতোষকে মেরে ফেলেছে। তারপর ঝিনুককে নিয়ে চলে গিয়েছিল। হেমনাথ ঢাকায় গিয়ে পুলিশ দিয়ে ঝিনুককে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু ভবতোষের মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

শ্বাপদেরা ষোল-সতের দিন একটা বাড়িতে ঝিনুককে আটকে রেখেছিল। যে অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়েছে, তার চাইতে সে যদি মরে যেত।

স্নেহলতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'কেন মরবে, কেন? কী দোষ ওর?'

হেমনাথ ঝাপসা গলায় বলতে লাগলেন, 'কেন যে ওদের আমি ঢাকা যেতে দিলাম! আমি যদি তখন শক্ত হতাম, কিছুতেই ওরা যেতে পারত না। ভবতোষ মরল। তার এই সোনার প্রতিমা আমি নিজের হাতে বিসর্জন দিলাম।'

একধারে দাঁড়িয়ে পালকহীন ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে ছিল বিনু। একটা কথাও বলতে পারছিল না সে। বার বার মনে হচ্ছিল, তীক্ষ্মমুখ অগণিত তীর তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করে যাচ্ছে।

ঢাকা থেকে আসার পর দুটো দিন কিছু খেল না ঝিনুক, ঘুমোল না, এমন কি একটা কথা পর্যন্ত বলল না। দিন-রাত শূন্যচোখে দূরে ধানখেতের দিকে তাকিয়ে স্থির বসে থাকল।

পুরো দুদিন পর ঝিনুক ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'আমাকে তোমরা মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল।'

স্নেহলতা সান্ত্বনা দেবেন কি, নিজেই কাঁদতে লাগলেন। ঝিনুকের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'কাঁদে না দিদি, কাঁদে না—'

'আমার যে আর কিছুই নেই দিদা, আমার বেঁচে থেকে আর কী লাভ?'

'ওসব ভুলে যা দিদিভাই—'

'ভুলতে যে পারছি না।'

উত্তর না দিয়ে স্নেহলতা তার পিঠে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন।

ঝিনুক বলতে লাগল, 'আমি এখানে থাকব না দিদা, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দাও?'

'কোথায় যাবি দিদি?'

'যেখানে খুশি পাঠাও। আমার এখানে বড্ড ভয় করছে।'

'কিসের ভয়, আমরাই তো আছি।'

'না-না, তোমরা কিছু করতে পারবে না।'

যত দিন যাচ্ছে, ঝিনুকের ভয় ততই বাড়তে লাগল। রাত্রিবেলা চারধারের গ্রামগুলো থেকে যখন বর্বর চিৎকার ভেসে আসে কিংবা মশালগুলো দপদপ করে জ্বলতে থাকে, সেই সময় ঝিনুক অস্থির হয়ে ওঠে। স্নেহলতা, শিবানী, হেমনাথ বা বিনু—যেই কাছে থাকে, তাকে জড়িয়ে ধরে

কাঁপতে কাঁপতে বলে, 'আমি আর বাঁচব না, এখানে থাকলে নিশ্চয়ই মরে যাব।'

দেখেশুনে একদিন হেমনাথ বললেন, 'ওর মনের ভেতর ভয় বাসা বেঁধে ফেলেছে। এখানে রাখা আর ঠিক হবে না।'

স্নেহলতা বললেন, 'এখানে তো রাখবে না বলছ; কোথায় রাখবে তাহলে?'

'ভাবছি কলকাতায় অবনীমোহন কি সুধা-সুনীতির কাছে পাঠিয়ে দেব।

'কলকাতায়?'

'হ্যাঁ।'

'নিয়ে যাবে কে?'

'বিনু। এ ছাড়া সত্যিই ওকে বাঁচানো যাবে না।'

বিনু কাছেই ছিল। বলল, 'এক কাজ করা যাক বরং—'

হেমনাথ শুধোলেন, 'কী কাজ?

'বাড়িঘর জমিজমা বেচে চল সবাই চলে যাই।'

দৃঢ়স্বরে হেমনাথ বললেন, 'না, কিছুতেই না। কোন অন্যায় আমি করিনি: বিনাদোষে জন্মভূমি ছেড়ে কেন চলে যাব? দুর্দিন দেখে সবাই যদি পালিয়ে যাই সুদিন আনবে কে? মনে রেখো সব মানুষই পশু হয়ে যায়নি; যেতে পারে না। আগের মতন দিন আবার আসবেই। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

'যা দশ-বিশ ঘর এখনও আছে, আমি চলে গেলে তারাও থাকবে না। তাদের জন্যও আমাকে রাজদিয়া থাকতে হবে।'

'কিন্তু—'

হেমনাথ হেসে ফেললেন, 'তুই কী বলতে চাস, বুঝতে পেরেছি। এর জন্যে যদি মরতেও হয়, আমি রাজী।'

শেষপর্যন্ত স্থির হল, বিনু একলাই ঝিনুককে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে স্নেহলতা বলে উঠলেন, 'কিন্তু—'

'কী?'

'স্টিমার তো বন্ধ; যাবে কী করে?'

হেমনাথ বললেন, 'তারপাশা থেকে দিনে দুটো করে স্টিমার যাচ্ছে গোয়ালন্দে। এখান থেকে নৌকোয় ওরা তারপাশা যাবে। আমি রাজেক মাঝিকে ঠিক করে রেখেছি। সে-ই বিনুদের তারপাশায় নিয়ে স্টিমারে তুলে দিয়ে আসবে।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'ঢাকায় গিয়ে ঝিনুদের যা হাল হয়েছে, তারপাশায় যাবার পথে আবার কিছু হবে না তো?'

'ওদিকে কোন গোলমাল হয়নি। তা-ছাড়া রাজেক খুব বিশ্বাসী। তারপর অদৃষ্ট।'

*

দিন-দুই পর সন্ধেবেলা পুকুরঘাট থেকেই রাজেক মাঝির নৌকোয় উঠল বিনুরা। বিনুরা বলতে বিনু আর ঝিনুক। সারারাত বাইলে ভোরবেলা তারা তারপাশা পৌঁছে যাবে। ঝিনুক তার কোলের কাছে চিত্রার্পিতের মতন বসে আছে।

সবে কার্তিকের শুরু। এখনও মাঠে প্রচুর জল। ধানখেত আর শাপলাবন ঠেলে অনায়াসেই নৌকো নিয়ে বড় নদীতে চলে যাওয়া যাবে।

স্নেহলতা, শিবানী আর হেমনাথ পাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবানী স্নেহলতা খুব কাঁদছিলেন। হেমনাথ রাজেক মাঝিকে সাবধান করে দিচ্ছেন। পাখি পড়ানোর মতন বার বার বলছেন, কিভাবে কেমন করে তারপাশায় নিয়ে যাবে।

রাজেক সমানে মাথা নাড়ছে আর বলছে, 'আপনে নিশ্চিন্ত থাকেন বড়কত্তা, জান থাকতে ছুটোবাবুগো গায়ে কেউ হাত দিতে পারব না। আল্লার কিরা—'

বিনু একদৃষ্টে হেমনাথের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্নেহলতা, শিবানী—কারোকেই যেন দেখতে পাচ্ছিল না সে। তার চোখের সামনের সবকিছু ঘিরে, সমস্ত চরাচর জুড়ে প্রসন্ন পুরুষটি যেন দাঁড়িয়ে আছেন।

হেমনাথকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল বিনু। হঠাৎ দশ বছর আগের সেই দিনটির কথা মনে পড়ে গেল তার। জলবাঙলার এই অখ্যাত নগণ্য জনপদে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজদিয়ায় যেন উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। আর আজ? রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে সবার চোখের আড়ালে চলে যেতে হচ্ছে। নিরানন্দ নিরুৎসব এই বিদায় বিনুর বুক অসীম বিষাদে ভরে দিতে লাগল।

এই মুহূর্তে কত কথাই মনে পড়ছে তার। লারমোর, মজিদ মিঞা, রামকেশব, মনা ঘোষ, গয়জদ্দি ব্যাপারী, রজবালি শিকদার, পতিতপাবন, মোতাহার হোসেন সাহেব, চরের সেই ভূমিহীন কৃষাণের দল, এমনকি ধানের খেতে গা দুলিয়ে দুলিয়ে যে বড়ো সোনালী গোসাপটা আলের ওপর দিয়ে যেত—সবাই চোখের সামনে ভিড় করে এল। আর মনে পড়ছে শরতের উজ্জ্বল নীলাকাশকে, সাদা সাদা ভবঘুরে মেঘ-দলকে, কার্তিকের ধূসর হিমকে। জলসেঁচি শাকের নিবিড় লাবণ্য, বেতঝোপ। মুত্রাবন। বড় বড় পদ্মপাতা, জলসিঙাড়া, কাউ আর হিজলবন, কইওকড়া আর হেলেঞ্চা লতার দাম, শঙ্খচিলের ঝাঁক, গোবক, পানিবক পানিকাউ, শালিক, বুলবুলি, বাচা-ট্যাঙরা-বাজালি-বজুরি মাছেরা—কত যে মনে পড়তে লাগল। এরাই তো তার হাত ধরে কৈশোর থেকে যৌবনে পৌঁছে দিয়েছে। হায়, কৈশোরের এই রম্যভূমি, যৌবনের এই স্বর্গে আর কোনদিন ফেরা হবে কিনা, কে জানে।

জলবাঙলার মনোহর দৃশ্য, পশুপাখি, বৃক্ষলতা খুব বেশিক্ষণ বিনুকে নিজের করে রাখতে পারল না। এবার তার চোখ এসে পড়ল খুব সামনে, একেবারে কোলের কাছে, ঝিনুকের ওপর। মেয়েটাকে দেখতে দেখতে অপার মমতায় তার বুক ভরে যেতে লাগল। এই সময় হঠাৎ মনে পড়ল তার বাবা অবনীমোহন পশ্চিমবাংলার মানুষ, মা পূর্ববাংলার মেয়ে। তার বুকের এক ধারে পূর্ববাংলা, আরেক ধারে পশ্চিম-বাংলা। তার রক্তের এক স্রোত পদ্মা, আরেক স্রোত গঙ্গা। আর কোলের কাছের এই মেয়েটা—এই ঝিনুক? সে তো পূর্ববাংলার লাঞ্ছিত অপমানিত আত্মা। তাকে নিয়েই সে কলকাতায় চলেছে।

হঠাৎ প্রাণের ভেতর কী হয়ে গেল, কে বলবে। বড় মায়ায় ঝিনুককে সে বুকের কাছে নিবিড় করে আনল।

পুকুরপাড় থেকে এক সময় হেমনাথের গলা ভেসে এল, 'আর দেরি করিস না রাজেক; নৌকো ছেড়ে দে—'

মাঝি বলল, 'এই যে ছাড়ি—'

একটু পর জলে বৈঠা পড়ল, একটানা বাজনার মতন ছপ ছপ শব্দ কানে আসছে।

নৌকো অকূলে ভাসল।

সমাপ্ত

কলকাতা মেলাঃ পুষ্পসজ্জা

কলকাতা মেলা বসেছিল। কলকাতাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে রূপবতী করে বিদেশীদের কাছে তুলে ধরা। আপাতজীর্ণ এই শহর যে এখনো বুড়িয়ে যায়নি সেজন্য বিরাট আয়োজন হয়েছিল। এ যেন খোলস মাত্র। আর খোলস ছাড়লেই আসল রূপ। সেখানে যৌবন আজও অটুট। আয়োজন বিরাট। লেখার সময়েও প্রোগ্রাম শেষ হয়নি।

শেয়ালদা থেকে হাওড়া কলকাতাকে অপরূপ করার সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু দু' প্রান্তবিন্দু ছাড়া কোথাও বড় একটা খোলেনি। আর যেখানে যেমন অন্ধকার পুজোর জৌলুষে কিছুটা কমেছিল। তাছাড়া আর কিছু নয়। সাহেবপাড়ায় এখানে-সেখানে কিছু আলোর সমারোহ ছিল। সদ্য নামাঙ্কিত শহীদ মিনার বাদ দিলে তাও এমন কিছু চোখে পড়ার মত নয়। এই এলাকার দু'-একজন নেতার প্রতিমূর্তি ঘিরে কিছু পতাকার সমারোহও ছিল। এই পতাকাই ছিল প্রতি ট্রামে একটি করে। জাঁকজমক অন্তহীন হলেও ধরা তেমন পড়েনি। এতে কি মেলা বসে? অথচ কলকাতা শহরে তখন এমনিতেই মেলা। সমারোহ। বর্ণবৈচিত্র্য।

এসব আমার প্রসঙ্গ নয়। তবু কথা-গুলো এসে গেল। কলকাতা মেলার নেহাতই একজন উৎসাহী দর্শক হিসাবে। আশা পূরণ হয়নি। তাই কিঞ্চিৎ বেদনা। আমাদের মনোরঞ্জন হোক আর না হোক বিদেশীদের হলেই হলো। আসল উদ্দেশ্য তো ওখানেই। না হলে আমরা তো এমনিতেই জানি, এ-শহর এখনও তর-তাজা। এত রূপ রস আর প্রাণ আর কোথাও নেই। মন দেওয়া-নেওয়ার পালায় এ যেমন সরস জোগানদার তেমনটি আর কাউকে পাওয়া দুষ্কর।

হালফিল কলকাতায় পুষ্পসজ্জার আসরে শ্রীমতী উমা বসু বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। কলকাতা মেলায় ফুল সাজানোর মাধ্যমে ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্য তাই তাঁর ডাক পড়েছিল।

আয়োজন তিনি নিখুঁত করেছিলেন। এভাবে বিদেশীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার অন্য কোন চেষ্টা হয়েছে বলে জানা নেই। পুষ্পসজ্জার মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছিলেন বাঙালীর বারো মাসে তেরো পার্বণের কাহিনী।

শারদোৎসবে দুর্গাপুজোই মুখ্য। ঢুকতেই ফুলপাতার বাহারে অসুর-বিনাশিনী দেবীমূর্তির সুন্দর রূপ ধরা পড়ে। মূর্তি নেই। প্রয়োজনও ছিল না। আছে একটি সুন্দর ঘট। এই ঘট হলো বিশ্বচরাচরের প্রতীক। সঙ্গে আছে লাল পদ্ম। স্বর্গীয় মহিমা এবং শক্তি এই ফুলে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। এই পুষ্পসজ্জায় প্রেরণা ছিল সাঁচী স্তূপের তোরণের ঐতিহ্য। আবার ঘট এবং পদ্মের ব্যবহারই সম্ভবত রিক্কা স্টাইলের আদিজননী। এমন সাদাসিধে এবং সহজভাবে দুর্গাপুজোর প্রকাশ দর্শকচিত্তে অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করে। এর সঙ্গেই আছে বিজয়া। অশুভের বিনাশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আন্তরিকতা বড় হৃদয়গ্রাহী।

শুরু করতে হয় গোড়া থেকে। নববর্ষ দিয়েই বাঙালীর উৎসবের জয়যাত্রা। কলা-গাছ, আমপাতা আর সরা দিয়ে বাঙালীর গৃহাঙ্গন সজ্জিত। নববর্ষের রূপকল্পনায় শ্রীমতী বসু সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন। আমরাই তো নিজেদের নববর্ষকে ভুলে বসেছি। তিনি যেমন এই উৎসবটিকে আমাদের মনে পড়িয়ে দিলেন তেমনি বিদেশীদের কাছেও এর আবেদন তুলে ধরলেন। এবার চললো বাঙালীর উৎসবের বিরাট সূচী। জামাইষষ্ঠী, রথযাত্রা, ঝুলন। ঝুলনে এসে বেশ কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াতে হয়। ফুলপাতার বাহারে ঝুলনা অনন্য। রাধাকৃষ্ণ দুলছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের বিমুগ্ধ শিল্পরূপ।

দুর্গাপুজোর সঙ্গে সঙ্গে আসে লক্ষ্মীপুজো। আলপনা আর ধানের ছড়ায় গৃহপ্রাঙ্গন আমোদিত। তারপর অমাবস্যার অন্ধকার ফিকে করে জ্বলে ওঠে হাজার বাতির ঝাড়। দীপান্বিতা। অলক্ষ্মীকে বিদায় করে গৃহবধু বরণ করেন লক্ষ্মীকে। বাজির আলোয় আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দুর্গাপুজায় মর্তলোক পরিভ্রমণান্তে 'পিতৃ-পুরুষেরা ফিরে যান নিজস্ব লোকে। তাঁদের পথ দেখানোর জন্য সেদিন ঘরে ঘরে বাজির সমারোহ। গভীর রাতে কালী-পুজোর আনন্দ। বাঙালী হৃদয়ের এই সংবেদনকে শ্রীমতী বসু প্রকাশ করেছেন অনবদ্য ভঙ্গীতে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় শারদোৎসবের রেশ মোটামুটি শেষ। অনেক পরে সরস্বতী-পুজো। ইতিমধ্যে বাঙালী কিন্তু চুপ করে বসে নেই। আসে বড়দিন। বিদেশী উৎসব। তবু স্বাভাবিক ঔদার্যে আমরা এই উৎসবে মেতে উঠি। মহরম এবং ঈদে হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ভুলে আমরা একাত্ম হই। আলিঙ্গনে ভালবাসার আদান-প্রদান চলে।

শীত শেষ হয়। গাছে গাছে নতুন পত্র-পল্লব। মানুষের মনেও রঙ ধরে। রঙই এই উৎসবের প্রকাশ। হোলিতে আমাদের প্রাণখোলা আনন্দ। সবাই এদিন সমান। ঘরে-বাইরে রঙের ছড়াছড়ি।

এমনি করে ঘুরে চলে বার মাস। সঙ্গে সঙ্গে তেরো পার্বণ। নিজের সঙ্গে অপরের উৎসবেও আমরা সমান অংশীদার। শ্রীমতী বসু অপূর্ব কৃতিত্বের সঙ্গে বাঙালীর এই উৎসবপ্রবণ মনকে উপহার দিয়েছেন আমাদের এবং গোচরে এনেছেন বিদেশী-দের। বহু বিদেশীর সমাগম ঘটেছিল পুষ্পসজ্জার এই আসরে। —প্রমীলা

কী বলব—ওরা যেন এক ঝাঁক উত্তেজনা, কিম্বা ফোয়ারা; যেন এক ঝাঁক বলাকা কিম্বা হরিণী; তবে ওরা প্রত্যেকেই এক-একটা উজ্জ্বল নায়িকা, ওদের আঁচল-প্রান্তে আপনার-আমার অনেকেরই স্বপ্ন-বাঁধা।

ওই যে সোনালি-চোখ ওরই সঙ্গে আমার লেনদেন বেশী—আগে, ইতিমধ্যে ওর সঙ্গেই বেশীবার কথাবার্তা হয়েছে আমার—ও-ই চেনার সময়তালিকায় সিনিয়র। তবে এ-কথা বলে রাখা ভালো যে, রিঙ্কুর জন্যে আমার মনের টানটা কখনো-সখনো বেশী হয় আজকাল। রিঙ্কু—তার শাড়ির এক প্রান্ত শ্রাবণ বাতাসে পতপত করতে থাকলে মনে হয় ও যেন সত্যিই এক ডানা-অলা পরী এবং তার চোখের ভেতর দিয়ে সর্বদা মিটার-মিটার চঞ্চল বিদ্যুৎ বয়ে যেতে দেখে মনে হয় : 'হুঁশিয়ার, ২০ হাজার ভোল্ট!' আর ওই-যে জুলি, সবসময় তার অকারণ চটপটে ভাব—যেন কোথায় কী ইয়ে-দামী কাজ ফেলে এসেছে — এখন অসম্ভব ব্যস্ত (বন্ধুরা বলে, যেন 'সুটিং' ফেলে এসেছে!) আমার ভাল লাগে না! আর এই মমি—মিশরের মমি, না মোম থেকে মমি বোঝা যায় না, সর্বদা তার মাজায় আঁচল জড়ানো এবং অসম্ভব রকম গিন্নি-গিন্নি কথা, ওকে আমার ভয় লাগে। আর আছে কণা—চেহারা তার ছোটখাট, চোখ দুটো তার ঘোলাটে কেন জানি না, মনটা তার কোথায় গভীরে মগ্ন—তাই সবাই যখন কোন ব্যাপার নিয়ে কলকল তরতর ব্যস্ত,

ও তখন একবারমাত্র 'ক্ষতিপূরণ' জাতীয় দৃষ্টি ফেলে লজ্জিত হাসি হাসে, অতঃপর আবার উদাসীন হয়ে যায়। আর শীলা— নীলার দু বছরের ছোট, শক্ত পাথর-নুড়ির মতো ব্যবহার, শক্ত নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর।

আর, আমি? আমি শেখর—কিম্বা শিখর যা-ই হইনে কেন, এরা সবাই আমাকে বলে 'শিখা', আদর করে ডাকে 'শিখু', আর রাগ বা বিরক্ত হয়ে গেলে ওরা ডাকে 'শেখজী'। তবে আমার বন্ধুরা আমাকে শিখু বলেই ডাকে। রমেন বলে, 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো'। কট্টর বিকাশ বলে, 'ওটা তো মেয়েই—মেয়ে না-হলে কি আর ওইরকম মেয়েদের সঙ্গে একটানা মিশতে পারে!' ননী আমার সঙ্গে কথা বলে না। ও বলেছিল : আমি নাকি বৃহন্নলা— ওই ব্যক্তিটি নাকি রূপান্তরিত অর্জুন, বিরাটরাজার অন্তঃপুরের সব মেয়েদের মধ্যে ও থাকত। তবে হ্যাঁ, সুজিত বলেছিল : 'মাইরি শেখর, তুই যা এক দল হেভি পেয়েছিস! তুই সত্যিই লাকি!' তারপর পিঠ চাপড়াত। আমি বলেছিলাম, 'তোকেও ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে দেব।' ও বলেছিল, 'না, সবার সঙ্গে দরকার নেই। কেবল রিঙ্কুর সঙ্গে' আর সেই-জন্যেই কোনদিনই আমার পক্ষে কথা-রাখা সম্ভব হল না। ও অনেকদিন যাবৎ আমাকে তেল দিয়ে দিয়ে নিরাশ হয়েছে। ওর ভাষায় এখন 'আমি নাকি ওদের কুকুর'। মিন্টু তো চিরকাল আমার এই বলাকাবাহিনীকে দু'চোখে দেখতে পারে না। কেবল, কেবলমাত্র ওই একটা ছেলে সঞ্জীব—ও বেশ উদাসীন থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু সে-ই সেদিন বলেছে : 'তুই যে কী করে ওদের মধ্যে মাথা ঠিক রাখিস! আমি তো ভেবে পাই না!' আমি বলেছিলাম : 'তা হলে তুই ভাবিস বল?' — ওর অসম্ভব ঝটিতি উত্তর : 'ওদের নিয়ে ভাবব,—হেঃ, আমার কাজ আছে!'

অতএব আমাকে মিশতে হলে এখন ওদের, মানে ওই নীলাদের, ছাড়া কোন সঙ্গী নেই।

আমি ওদের সবার জন্যে এখন সিনেমার টিকিট কাটতে যাব। রোদে মাথা ফাটবে, একথা যদি নিন্দুকেরা চিন্তা করেন তবে আমি বলব ভুল ভেবেছেন। আমার মাথা সবসময় ঠান্ডা থাকে—আমার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের তৈরি-করে-দেয়া আবহমন্ডলটা সর্বদাই ঘিরে থাকে—মনভাতি' সংলাপের টুকরোগুলো, আহ্-উহ্-বা বাঃ, 'ভালো লাগে না' এই সব নরম খাদের সুরগুলি, 'এটা করে দিবি লক্ষ্মী ছেলেটার মতো,' 'যা-না, যা-না, অত আলসে কেন,' এইরকম চাপানো দায়িত্বগুলো, কারো মুখের টুকরো হাসি কিম্বা চোখের অথই চাহনি বা বিমর্ষ মেজাজ এইসবের সংকলন আমার মনের চাপ-তাপ ঘনত্ব গতিবেগ ইত্যাদি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে তা একটা ঠান্ডা আবহাওয়ার কৃত্রিম পরিমন্ডল — এবং সেই আবহাওয়ায় মন আমার সর্বদা ক্রিয়াশীল, তাই দেহের ওপর বাহ্যিক রোদ-ঝড়-বৃষ্টি আমার অনুভূতিগম্য নয়। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি অসুখ-বিসুখ সবকিছু ছিন্নভিন্ন করে আমি ওদের ফাই-ফরমাশ খাটতে অভ্যস্ত এবং আমার তা ভালো লাগে—কেমনা, দেখেছি দুই-একদিনের অনুপস্থিতি আমার কাছে অসোয়াস্তিকর হয়ে উঠেছে—তখন মনে হয়েছে আমার গুরুত্ব যেন কমে যাচ্ছে বা ওরা আমাকে ভুলে যাচ্ছে—এইরকম আশংকা এমন ছটফট তীব্র দোলানি দিতে শুরু করেছে যে, মন দিয়ে তখন আমার রীতিমতো মুনিদের সংযম-কায়দায় লড়তে হয়েছে। তার চাইতে বাবা এইসব ওদের ব্যাপার নিয়ে ফাই-ফরমাশ খাটার মধ্যে একটা জীবন আছে! এতে আমার চটপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বজায় থাকে এবং আমার একটা আত্মপ্রসাদও জন্ম নেয়—যখন ভাবি ওরা আমার ওপর কত নির্ভরশীল। আপনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো যখন নীলাদের অন্তত কেউ একজন আপনার ওপর নির্ভরশীল হয় তখন আপনার মনের অবস্থা এমন হয় কিনা, আপনি আপনার সব কাজ ফেলে রেখে ওদের খুশী করার জন্যে অসম্ভব দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে পড়েন কিনা! বস্তুত আমি সব পুরুষদের চিনি : তারা একপাশে হাজার পুরুষের দরকব এবং অন্যপাশে একটিমাত্র নীলার প্রয়োজন চাপিয়েও নির্লজ্জ দাঁড়ি-পাল্লার মতো শেষোক্ত দিকে ঝুঁকে পড়েন, তারা অসম্ভবরকম পক্ষপাত-পরোপকারী হয়ে উঠেন— কি যুবক কি প্রৌঢ়-বৃদ্ধ সব পুরুষের ক্ষেত্রে আমার এই মন্তব্য প্রযোজ্য। অতএব আপনারা আমার বন্ধুদের মতো আমাকে নিয়ে হাসবেন না।

আমি সিনেমার টিকিট কাটতে যাব। সাতখানা। নতুন ছবি, ভিড় হবে। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। এক ঝলক ঘুমিয়ে গিয়ে অহেতুক অনেকটা দেরি করে ফেললাম। ইস! দেরি হয়ে গেল। ওরা কলেজ পালিয়ে আসবে কেউ, কেউ আসবে নীলা-শীলার বাড়ী আসছি নাম করে। দেরি হয়ে গেল। টিকিট না-পেলে ওরা যা করবে! গালাগাল দেবে। ওদের গালি আজকাল আমার ভালো লাগে—একথা ওরা ইদানীং টের পেয়ে গিয়েছে। তাই আরো কার্যকরী পন্থা ওরা বেছে নিয়েছে : আজকাল ওরা কোনো লোকবিরল জায়গায় নিয়ে গিয়ে কেউ মারে গুঁতো, কেউ দেয় নোখ দিয়ে চিমটি (মেয়ের হাতে যা নোখ!) এবং নীলা তো ঘাড়ের চুল ধরে টানাটানি করে—আর ছেঁড়া সার্ট গায়ে থাকলে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয় (অবশ্য মাথাঠান্ডা হলে জামার দাম দিতে চায়, আমি নিইনে) আর শীলা তার দিদির বেড়া টপকে দুম করে কিল মারে, আর সবচাইতে নিদারুণ যেটা, সেটা হল রিঙ্কুর জনান্তিকের ওপর রাগ-দেখানো : 'সিনেমার মুড নিয়ে এলাম,— দুত্তোরি, মেজাজটার বারোটা বেজে গেল। আমাকে বললে আমাদের ভজুকে দিয়ে কাটাতাম!' কথা অবশ্য বলে, 'যাক গে। ভালো হল। পয়সা বাঁচল!'...আজ না-জানি কপালে কী আছে। যাহ্, ঘুমোনোটা বেশী হয়ে গেছে। এমন সময় মনে হল : এই নতুন সার্টটা গায়ে চাপানো উচিত হল না—কারণ, আজ টিকিট না-পেলে বরাতে কী আছে তা তো জানা। অতএব বেকার মানুষ আমি বাবার পকেটের দিকটা চিন্তা করে সুনাগরিকের মতো সেটা খুলে হলদে-রঙা ফুটো-ফাটা পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়ালাম— তাড়াতাড়ি প্যান্টটা খুলতে গিয়ে বোতাম ছিঁড়লাম এবং কোনোরকমে পাজামাটা গলাতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম দড়ি ছিঁড়েছে—তখন কাঁহাতক মেজাজ ঠিক থাকে, খপ করে নতুন লন্ড্রী-থেকে-আনা পাজামাটা গলিয়ে নিলাম—ভাঁজটাও ঠিক করা হল না : নতুন সাজ হল না বটে— কিন্তু কী রকম বিসদৃশ লাগছে না?— আয়না কোথায়, ওহো, আমার দাড়ির বয়স ছয় দিন—তা থাকগে—তবে ময়লা পাজামাটা পরতে পারলে মানাত ভালো। যা হোক কোনোরকম ঘড়িটা হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে ছুটলাম : ঘড়ির কাঁটায় চোখ পড়া হয়ে উঠল : যাহ্, এত দেরি! এত করে যখন সিনেমার হলের সামনে এলাম তখন সেই লম্বা লাইন দেখে আমার মেজাজ ঠিক রইল না। শালা! সিনেমাহলের সামনে এলে মনে হয় না দেশে কোনো অভাব আছে। থার্ড ক্লাসের টিকিট তো যেন সিকি মাইল পেরিয়ে গেছে, সেকেন্ড ক্লাসের লাইন অন্তত চল্লিশ গজ ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে এবং বাড়ছে—এখন যা পজিশন দাঁড়ালে টিকিট মিলবে না, ওই লাইট-পোস্টটার কাছে দাঁড়িয়ে একদা ব্ল্যাক টিকিট পেয়েছিলাম। — এসব লাইন-ফাইন দিয়ে কী হবে। মাথায় একটা ফন্দি এল। চট করে টিকিটঘরের ভেতর চলে গেলাম। ভজুকে নিচুগলায় ডাকলাম : 'এই শোনো, এস-ডি-ও সাহেবের মেয়ে-গোষ্টির জন্যে সাতখানা টিকিট লাগবে।' কিন্তু গুল মেরে ফ্যাসাদে পড়লাম। টাকা? নীলারা আমাকে দিয়েছে সাতখানা সেকেন্ড ক্লাসের দাম, আর সাত টাকা লাগবে ফার্স্ট ক্লাসের জন্যে, অলিন্দের জন্যে চোদ্দ টাকা— টাকা অবশ্য ঘরে ছিল, কাছে নেই— ফ্যাসাদে পড়লাম। ভজু বলল : 'অলিন্দ মাত্র খান-চারেক আছে, ফার্স্ট ক্লাস চলবে?' আমি গম্ভীর গলায় বললাম 'ফার্স্ট ক্লাসে কী হবে!' পালিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু এখন কী করি। কপালে অশেষ দুঃখ আছে। রুমাল ভিজিয়ে রোদে দাঁড়িয়ে কী করব ভাবছিলাম। লাইন সব শম্বুক গতিতে এগোচ্ছে—লাইনে দাঁড়ানোর কোনো যুক্তি নেই। কী করি, কী করি। এমন সময় দেখি নীলার দলবল আসছে—ছুটে গিয়ে বললাম, 'শীঘ্রি সাতটা টাকা ছোড়ো, এখনো ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যাবে, সেকেন্ড ক্লাস ফুল।' শীলা বলল, 'টিকিট এখনো কাটা হয় নি?' নীলা আর রিঙ্কু একসঙ্গে বলল, 'যাক গে, যাক গে। বাঁচা গেল!' আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। ব্যাপার কী। রমি বলল : "শেখজী, ছেড়ে দাও। আজ থাক। বাঁচা গেল, কী বলিস নীলা!' কিন্তু ব্যাপার

কী। ওরা কী-একটা ব্যাপারে সবাই চিন্তিত।

ওরা চিন্তিত—তার মানে আপনাদের কোনো বড় ব্যাপারে নয়। রাজনীতিকরা চিন্তিত হলে দেশের সব লোকের চিন্তা তার পেছনে আলোড়িত হতে থাকে, গবেষক বা বুদ্ধিজীবীরা চিন্তিত হলে কিছু ভালো-মন্দ নতুন জিনিস আশা করা যায় এরা চিন্তিত হলে কিন্তু আমিই কেবল নতুন খাটুনি কিম্বা ফ্যাসাদের সম্মুখীন হই। এরা চিন্তিত হয়েছে তার মানে গার্জেনের কাছে কেউ হয়তো বকুনি খেয়েছে কিম্বা খাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, হয়তো কারো 'ডুবে-জল-খাওয়া'টা সমস্যাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তবে আমি হলপ করে বলতে পারি আজ কোনো বেহায়া ছেলে শিস কিম্বা চোখ মারেনি—তা হলে এতক্ষণে আমি আস্ত থাকতাম না—সব শোধ তুলত আমার ওপর দিয়ে—কারণ আমি পুরুষ-জাতটার হাতের কাছের একজন—কিন্তু আমি কী করে বোঝাই যে বন্ধুরা আমাকে পুরুষ বলে মানে না!

ওরা অন্যদিনের মতো বকর-বকর করছিল না, কলকাকলির ফেনা তুলছিল না। এ এমন একটা চুপি-চুপি নিম্নকণ্ঠী কথা-বার্তা, যার মানে আমি যে পিছু-পিছু আসছি তা ওদের যেন পছন্দ নয়। তারপর ওরা সেই ফাঁকা পার্কটায় দুটো বেঞ্চি দখল করে বসল। আমি কী করব ভাবছিলাম, এই সময় মমি বলল : 'শেখজী, তুই দূরে চরে বেড়া—এখানে নয়। যা!' তারপর মোলায়েম করে বলল : 'শিখু, আমাদের গোপন কথা আছে, বুঝলে?' আজ মমির মেজাজটা যেন ভালো আছে। আমি অতএব সরে পড়লাম। কিন্তু দেখছেন, মনটা কেমন ওদের কাছে পড়ে রইল।...রিংকু আজকাল কেমন হয়ে যাচ্ছে। বড্ড খিটখিটে মেজাজে কথা বলে।...কণার আজ অত ছলছল ভয়-ভয় অবস্থা কেন। মরুক গে। রিংকু আজকাল কেমন বদলে যাচ্ছে। নীলার তো ছেলে বাঁধা। এই আমার সঙ্গে একরকম ব্যবহার—সবকিছুতে ওর নেত্রীত্ব ফলানো। এবং আমাকে ও তো পুরোদস্তুর নোকর বানিয়ে ছেড়েছে।—ওর জন্যে কত ফাউ খাটতে খাটতে জীবন গেল। ও আমার সঙ্গে এককালে সবকিছু আলোচনা করত, এমন কি ওর কপিল মিত্তিরের কথাও। কপিলের সঙ্গে নাকি ওর কথা দেয়া আছে। আমাকে একথা ও প্রথম বলেছিল মাস-ছয়েক আগে। আমি তখন ওকে পৃথিবীর সবচাইতে নির্ভরযোগ্য জায়গা বলে মনে করতাম। এই কথা শুনে আমি, ওই যাকে বলে জোর করেও মুখের বা কথাবার্তার স্বাভাবিক অবস্থা এবং ছন্দ ঠিক রাখতে পারি নি—ও আমার মুখের দিকে চেয়েছিল, চোখের মণি ওর জ্বলছিল। আবেগ দিয়ে খুব নিম্নকণ্ঠে ও বলেছিল, 'কষ্ট পেলি? বোকা কোথাকার!...শোন্, রিংকু খুব ভালো মেয়ে, ওর দিকে মন দে। তাই বলে আমাকে যেন ছেড়ে যাবি না। তুই আমার বন্ধু।' ও আমার ঘাড়ের চুল ধরে অতঃপর কিছুক্ষণ মৃদু আদর করল—যেমন ও করে থাকে ওর পোষা বেড়ালটাকে। আমি এত তাড়াতাড়ি ধাক্কা সামলাতে পারছিলাম না—চোখে জল এসে গিয়েছিল। ও আমার মুখের কাছে মুখ এনে আলতো চুমু খেয়েছিল এবং আমি নড়েচড়ে উঠলে ও আমাকে তুলে গেট পার করে দিয়ে বলেছিল, 'কাল আসবে কিন্তু। নইলে ধরে নিয়ে আসব. বুঝলে খোকা!' তারপর ও একে একে সব বান্ধবীর সঙ্গে আমাকে এত মিশিয়ে দিয়েছে এবং ও আমাকে শিখা, শিখু, শেখজী বানিয়ে ছেড়েছে। আর কপিলটা এলে ও কেমন গঙ্গাফড়িং হয়ে যেত, কল্লোলিত সাগর হয়ে উঠত দেখে-দেখে আমি খুব কষ্ট পেতাম। কপিল সম্বন্ধে ওর বান্ধবীরা মধ্যে মধ্যে যাচ্ছে-তাই মন্তব্য করত ওর আড়ালে-আবডালে। সবার বান্ধবীরা মনে হয় তাই করে। কপিলকে একটা মূর্তির মতো ওর বান্ধবীরা দেখত যেন; কোথায় কোন জায়গায় তার সৃষ্টির খুঁত এবং তার কথা-বার্তা ধ্যান-ধারণা দৃষ্টিভঙ্গী সবকিছু নিয়ে ওরা এত মাথা ঘামাত এবং আমার সমর্থন যাচাই করত যে, আমি মনে করি ঈর্ষা বা পরচর্চাতত্ত্বের ওপর একটা সর্বোচ্চ ডিগ্রি ওদের যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্য। কপিলের খুঁত ধরার মধ্যে আমরাও প্রথম প্রথম আনন্দ মিলত, কিন্তু তারপর আর মেলে নি। রিংকুর দিকে প্রথম প্রথম ভয়ে তাকাতাম। কিন্তু ওই রিংকুটা—জানি না নীলার ইঙ্গিত ছিল কিনা, আমাকে ডেকে ডেকে নিত। তার বাড়ী নিয়ে ফুলের গাছ, ফুল, ফলের গাছ ফল এই সব দেখাত। তারপর ওর পড়ার ঘর পর্যন্ত। ও আমার সামনে বসে-বসে চুল বাঁধত, মুখ সাজাত। ফিতের এক পাশ দাঁতে চেপে ধরার পরিবর্তে আমাকে ধরতে বলত টেনে। হাতটা কাঁপলে ও এমন করে তাকাত, কিম্বা হেসে কুটি-কুটি হত। বলত, 'আবার কবিতা লেখা হয়!' তারপর এক সময় ও বলত, 'এইবার বাইরে যাও, আমি কাপড় ছাড়ব।' আমার চিন্তা-করার পাকে-পাকে তখনো নীলা জড়িয়ে আছে। ও এক সময়, সেই সময় অনেকবার বলে উঠত : 'লক্ষ্মী, নীলাকে ভোলো।...এই, নীলার চাইতে দেখতে আমি ভালো নই?' আমি নির্বিধায় মাথা নেড়ে দিতাম : 'হ্যাঁ।' 'তবে?' — ও বলত। আমি তার দৃষ্টির সামনে নির্বিকার হয়ে বলতাম, 'কী।'—'জানো না? কচি খোকা!' সেই থেকে আমি রিংকুর দিকে ঝোঁক দিয়ে দিয়ে নীলার তীব্রতা কমাতে থাকলাম।...এই আমি একটা জিনিস দেখছি—মনটা একসঙ্গে সবাইকে সমান গুরুত্ব দিতে পারে না, কোনো এক-জনের দিকে টানটা সবসময় বেশী থাকেই। মনের এই পক্ষপাতিত্ব আমাকে বহুবার এই দল থেকে যে-কোনো একজনকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। কিন্তু এখনো তার জন্যে দল ভাঙে নি।

আর, কোনো একজনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যেতে পারি নি বলে আজো আমি এই দলে আছি এবং বিস্ময় হয়ে দেখি : কপিলের সঙ্গে নীলার 'হবে' তা সত্ত্বেও নীলা এখনো কত ছেলের মাথা ঘুরায়,—এ যেন তার খেলা। রিংকুও কেমন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে এবং ওই যাকে বলে ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছে। কিন্তু আমিই বা কেন বাধা দেব, কে আমি। এই যে এত গুলো মেয়ে নিয়ে আমার সময় বাঁধা—আমি সর্বদা তাদের জন্যে তাদের প্রয়োজনের জন্যে ব্যস্ত—অথচ আমি যা চাই—কী চাই—পাই না। কিসের একটা বিমর্ষ ভাব। আমি কী চাই। এদের মধ্যে ক্যাপ্টেন না, তাও না। আমি মধ্যে মধ্যে ভাবি যদি দিনের পর দিন এদের সামনে আমার ক্ষমতার চমক রাখতে পারতাম, তখন এর এদের সপ্রশংস দৃষ্টি একটানা আমার ওপর রাখত,—তা হলে আমি হয়তো নিশ্চয় খুশী হতাম। কিন্তু সে-রকম একটানা ওদের কাছ থেকে বাহবা বা গুরুত্ব আদায় করতে হলে আমাকে ঈশ্বরের সমকক্ষ হতে হয়। হাঁ ঈশ্বর হলেই আমি খুশী হতাম।...কিন্তু আমি দিনদিন বারেবার সাধারণ বলে ওদের কাছে চিহ্নিত হচ্ছি। আর, আমার উপস্থিতির প্রাচুর্য এত বেশী যে, আমার কোন দামই নেই।

এমন সময়, এই যখন আমি চরে বেড়াচ্ছি, ওদের সমবেত 'শিখু, শিখু' ডাক শুনলাম। এবং আমি ঠিক ওদের সামনে হাজির হলাম, এবং একটু প্রসন্ন হলাম আমার গুরুত্ব আবিষ্কার করে।...এই যে দেখুন, ওরা সবাই মিলে ওই পাড়ার কুনাল চক্রবর্তীকে ডাকতে বলেছে। এই কুনাল এ একটা কলেজে পড়ায় এখন, কিছুদিন আগে আমার মতো বেকার কিম্বা হাফ-বেকার ছিল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে দামী টিউশানি করে বেকারি সুদে-আসলে উশুল করছিল—শুধু মধ্যে মধ্যে বলত 'এতে লাইফ থাকে না!' কিন্তু ওর গৃহদাত্রী আমাদের কণা প্রায়শ ফুসফাস করে নীলা-দের গঙ্গে গল্প করত, আমি হাজির হলেই অন্য প্রসঙ্গে সরে যেত। বড্ড বেশী ও কুনালদা কুনালদা করত। এখন কুনালকেই ওরা ডাকতে বলেছে—আর, ওই মনমরা কাঁদো-কাঁদো কণাকে নিয়েই এদের এই আলাপন চলেছে তো চলেছেই—ব্যাপার কী।

বললাম : 'কেন ডাকব। কী দরকার।' রিংকু বলল : 'লোকটাকে আমরা ভালো করে দেখব।' মমি বলল : 'আর একটু ভালো করে শিক্ষে দেব।' জুলি : 'ওটাকে চট করে ডেকে আন তো। কেন তোরা দেরি করাচ্ছিস।' কণা কোন কথা বলল না। নীলা, যেন এক যুগ পরে বলল : 'তুই ফাঁকি দিয়ে ব্রিজের এই দিকে ডেকে আনবি—ওই যে রেলব্রিজ, রেলব্রিজ। খবর-দার, আগে-ভাগে যেন না জানে আমরা ডাকছি।'

অতঃপর আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে কুনালের ওখানে হাজির হলাম। ওকে বললাম, এক অপরিচিতা ভদ্রমহিলা, তার মোটরটার ইঞ্জিন বিগড়ে গেছে, তাকে খুঁজছে। ও-ও-ই রেলব্রিজটার কাছে!

কুনাল আকাশ-পাতাল ভাবল, আমি বললাম, 'জলদি!' ও সজোরে হাঁটিতে-হাঁটিতে ভদ্রমহিলা এমন-এমন দেখতে কিনা, চোখে চশমা আছে কিনা, তার নাম জানি কিনা শুধোতে শুধোতে সেখানে পৌঁছে গেল। একেবারে ওদের ব্যূহের ভেতর। চমকাল। ওদের সবার দিকে তাকিয়ে গলায় ব্যক্তিত্ব এনে বলল, 'কী ব্যাপার!'

নীলা : আমরা কণার বান্ধবীরা জানতে চাই কণাকে নিয়ে আপনি মোট কটা মেয়ের ক্ষতি করেছেন।

কুনাল হতচকিত হয়ে উঠল। যুগপৎ বিস্ময় এবং ক্রোধ—মুখ দিয়ে ইংরেজী বেরুল।

রিংকু : মেজাজ দেখাবেন না। আপনার কলেজ আমরা চিনি। সব ছাত্রছাত্রীকে আমরা বলে দেব। পোস্টার মারব।

কুনাল হতবাক হয়ে গেল। এবং একটা নার্ভাসনেস। আরো একটা দাপট মেরেও সুবিধে করতে পারল না। কণাকে বলল : 'কণা তোমার বন্ধুদের দিয়ে এইরকম অপমান করাচ্ছ!'

শীলা : আপনি ওকে চূড়ান্ত অপমান করেছেন। সেই তুলনায়—

কিন্তু দেখেছেন, দেখেছেন—কণা মুখ গুঁজে ফুলে-ফুলে কান্না শুরু করি দিয়েছে! বাহ্! এমন সুলভ কান্নাকাটি! এমন কান্না আজকাল সিনেমায় নেই, গল্প-উপন্যাসে নেই......

সমস্ত টেম্পটো নষ্ট হয়ে গেল। এখন অন্য সুর—অন্য আবহসঙ্গীত। কুনাল ওর ব্যক্তিত্বের বর্ম খুলে দিল—মমি মাত্র একটা মেয়েলি গাল ছুঁড়ল। এবং কুনালের তখন নীলার কাছে যেন আশ্রয়প্রার্থী, এইরকম ভঙ্গি। নীলা বলল : 'কুনালবাবু, আপনি আমাদের বাড়ী চলুন আমাদের সঙ্গে।'

জুলি বলল : 'আমার ভালো লাগছে না, ভাই! আমি বাড়ী যাব।' মমি বলল : 'নীলা, আমারও দেরি হয়ে যাচ্ছে।' অতএব এই দুটোকে আমার ওপর সঁপে দিয়ে নীলা, রিংকু শীলা কণা আর কুনালকে নিয়ে চলে গেল।

জুলি যেতে-যেতে বলল : 'এই মমি আমার ভালো লাগছে না। মন ভালো লাগছে না!' ওর নাকে-কান্নায় মমি মোটেই সহানুভূতি দেখাল না : 'তা লাগবে কেন। তোর তো কোনো লাভার-টাভার নেই!' জুলি ভয়ানক অপমানিত হল। রেগে-মেগে বলল : 'তোমরা এখানে দাঁড়াও, আর যেতে হবে না!' মমি : 'ইস! রেগে গেল নাকি!' জুলি : 'আমাদের বাড়ীর লোক কড়া। ও-সব পছন্দ করে না'...'কিছু মনে করো না তুমি, শেখর!' তারপর জুলি যেন আচমকা কেটে পড়ল।

মমি এবার হাসল : 'ক্ষেপে গেছে!' তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল—আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে : 'সবাই প্রেম করছে!' আমি ওর অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখের দিকে চেয়ে বুঝলাম ও মিটমিট করে হাসছে। বললাম : 'তুমিও করো!'

ও আমার কথার কোনো উত্তর দিল না। কয় সেকেন্ড বাদে গম্ভীর গলায় বলল : 'তুই একটা বুদ্ধু!' আমি চমকালাম : 'কেন!' ও আবার গম্ভীর গলায় হেঁয়ালি-ঢঙে বলল : 'তুই চিনির বলদ।' — 'কেন!' —'হুঁ। এর বেশী আর বলব না। তুই ভেবে দেখিস!...য়ুঃ, কী অন্ধকার! কখন যে আবার আলো জ্বলবে! (আমাদের এখানকার লোকেরা তিন লাখ টাকা বাকি ফেলেছিল বিদ্যুৎ করপোরেশনের কাছে। এখন সরবরাহ বন্ধ)। আর জ্বলে কাজ নেই, কী বলো!... হাতটা ধরো তো!...উঃ, রাস্তায় মোটে খেয়াল দেবে না!' ও এই সময় হুড়মুড় করে এসে গায় পড়ল। আমি ওকে ধরতে গিয়ে পরম একটা স্পর্শ পেলাম। আমার কনুইটার গুঁতো লাগল ওর। ও বলল : 'অসভ্য!' আমি : 'কী হল!' ও : 'জানো না!.. বুদ্ধু। অসভ্য। চিনির বলদ।' তারপর ও ছুটে দিল। বলল : 'ফিরে যা। আর আসতে হবে না।'

ওরা মধ্যে মধ্যে আমাকে কেমন এলোমেলো করে দেয়। আজ যেমন দিয়েছে মমি। এক-একদিন আমি ওদের এক একরূপ আবিষ্কার করি। আমার এমন অবস্থা এখন যে এই কটি মেয়ের কোথায় কোন্ রিড আছে, কোথায় কোন্ বিন্ত হাত পড়লে কোন্ সুর বাজে সবটা আমার জানা।...তবু কত অজানা। এক একদিন ওরা এক-এক রকম। ওদেরকে একটানা অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

এর পরদিন আমি ওদের কাছে যাইনি। মধ্যে মধ্যে এইরকম ডুব মেরে আমি বিশ্রাম করি। নিজের কথা ভাবি। নাহ্ আমার কথায় কোনো গুরুত্ব দিয়ে লাভ নেই। নীলারা মধ্যে মাঝে এইরকম করে। ওদের সাময়িক ক্ষিপ্ততা ওটা। আমি হলপ করে বলছি, পরদিন ও এমন ভাব দেখাবে যেন ওইরকম কিছু ঘটেই নি। যেন কোনোকালে কিছুই ঘটেনি। এই যে পাশাপাশি চলা—এই চলার পথে কখনো-কখনো ওরা কেউ-কেউ আমার খুব কাছে এসে পড়ে—যেন আমার একটা বেড়া টপকে ওরা ভেতরে ঢোকে,—আমিও নতুন নতুন অসম্ভব চিত্তচাঞ্চল্য আর স্বপ্নের শিকার হতাম, বিশেষ একটা 'পেলাম পেলাম' বোধ আমাকে আবেশগ্রস্ত করে তুলত—কিন্তু আজকাল আমি এইসব ব্যাপারের পর খুব সতর্ক হয়ে যাই। সতর্ক হয়ে হয়ে আমি কেমন কঠোর হয়ে পড়েছি। এতগুলো মেয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্যে আমার মন আর স্নায়ু মহড়া দিয়ে দিয়ে এইরকম একটা চিজ হয়ে পড়েছে।

এই দেখুন, বেশীক্ষণ আবার ওদের ছাড়া থাকলে বড্ড বেশী নিজের কথা চিন্তা করে ফেলি। নিজের কথা ভাবতে গেলেই আমি খুব খুব অসহায়বোধ করি।...এখন কুনালের কথা মনে পড়ল। আমি যদি একটা চাকরি পেতাম, তাহলে আমিও হয়তো ওইরকম অনেককে ভুলে যেতাম—তবে আমার তো কোনো 'কণা' আছে বলে মনে পড়ছে না। যা-ই হোক তখন আমার একটা নিজস্বতা আসত, এতগুলোর সঙ্গে সবার হয়ে টিঁকে থাকতে পারতাম না—আমার একান্ত নিজের কিছু-একটা ইচ্ছে প্রবলতর হত। আমি তখন নির্ঘাৎ এদের থেকে দলছাড়া হতে পারতাম, হয়তো কাউকে সঙ্গে নিয়ে। এখন আমি এমন একটা ব্যক্তিত্ব যা ওরা কেউ গিলতে চাইছে না।...এমন সময় আমার চোখে পড়ল টেবিলের ওপর একখানা নামকরা সাহিত্য-পত্রিকা—সকাল থেকে পড়ে আছে আমি খুলে দেখিনি। আমার আজকাল কিছু ভালো লাগে না পড়তে। গল্পও না, কবিতাও না। যদিও মধ্যে মধ্যে আমি জটিল কবিতা লিখে ফেলি—কবিতা—হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল : পত্রিকাটা তুলে এনে দেখি, আমার কবিতা। হঠাৎ আমার মনে একঝলক আলো এসে পড়ল এবং আশ্চর্য, সেই সময় সুইচ ফেলার শব্দ : আলো। ফিরে দেখি জুলি! আশ্চর্য! জুলি! জুলি বলল : 'কবি, অভিনন্দন। তুমি আজ যাওনি কেন!'

আমি ওকে যত্ন করে বসালাম—কিন্তু দেখুন, ও কেন এসেছে তার বিবৃতি দিতে শুরু করল : 'বিকেলে নীলাদের বাড়ী গেলাম। ওরা বলছে, তুমি যাচ্ছ না—তুমি নাকি দাম বাড়াচ্ছ। সোনাবৌদি তোমাকে ডাকছে। আমি এখন বাড়ী ফিরছি, তোমাকে জানিয়ে গেলাম।'

আমি বললাম, 'তুমি যে আমার জন্যে আসনি, তা না-বললেও বুঝতাম।'

ও একগাল হাসি নিয়ে চেয়ে রইল। বলল, 'পাগল!' তারপর : 'আমাকে এমনিতে আসতে হত তোমার কাছে। কালকের ব্যবহারে তুমি কিছু মনে করেছ? হঠাৎ অভদ্রর মতো ক্ষেপে চলে গেছলাম!'

আমি : 'তোমাকে লাভার তুলে খোঁটা দিয়েছে মমি, ক্ষেপে-যাওয়া তো স্বাভাবিক!'

ও : 'হ্যাঁ, বুঝলে, মমিটা একটা বাঁদর!'

আমি চোখ না তুলে অনুনয়স্বরে শুধোলাম : 'বল-না, তোমার লাভারের নাম কী। কে সে।'

জুলি : 'তাকে আমি এত ভালোবাসি যে তার নাম উচ্চারণ করতে আমার বাধে। ...তার নাম পরিমল।'

আমি : 'তোমাদের কবে 'হবে'?'

জুলি বলল : 'তার সঙ্গে আমার কোনোদিন হয়তো বিয়ে হবে না। তবু তবু—'

আমি তড়াক করে সোজা হলাম : 'বল, বল কী ব্যাপার!'

জুলি : 'সে কাউকে বলা যায় না। তবে তুমি কবি তো, তোমাকে একদিন বলব। ...এখন যাই, কেমন? রাস্তায় তো আর আলো নেই—ঘোর হয়ে আসছে। তুমি যাও নীলাদের বাড়ী। সোনাবৌদি ডাকছে।... হ্যাঁ, আর শোনো, কুনাল চক্রবর্তী কণাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে। বাবাঃ। নীলারা কী মেয়ে, ছেলেটাকে ঘাড় ধরে রাজী করিয়ে ছাড়লে!......শোনো, কাউকে কিন্তু আমার এই কাহিনী বলো না!'

সোনাবৌদি ডেকেছে। এই সোনাবৌদি —নীলা-শীলার বৌদি, আমাদের সাধারণ বৌদি। বৌদিদের জন্যে আগে আমার কোনো কৌতূহল ছিল না। দেখুন না, সব গল্প-উপন্যাস যেখানে শেষ হয়, সেখানে নায়িকারা বৌদি হয়ে পড়েন—তারপর তাদের নিয়ে কী আর গল্প থাকতে পারে বলুন। আমি ওদেরকে তাই এড়িয়ে চলতাম। বিয়ে-হওয়া মেয়েদের ওপর আমার কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু সোনাবৌদি আমার নতুন চোখ খুলে দিয়েছে।

সোনাবৌদি—মানে, নীলার দাদার দেয়া মিষ্টি নাম সোনা—কেমন। নীলাদের ভাষায় : 'বৌদি আমাদের ব্যাপারে বড্ড হস্তক্ষেপ করে।' হস্তক্ষেপ আর কি, মধ্যে মধ্যে আমাদের আলোচনা-গবেষণা এবং পরি-কল্পনার মাঝখানে এসে নিজের ভাগ বসার বা নিজেকে যুক্ত করে। আমার প্রতি সোনাদির কেমন নেকনজর। বলে : আমি বুঝি এ-বাড়ীর কেউ নই? ওদের নিয়ে তোর বড্ড মাথাব্যথা!...তা তো হবেই, আমি কুমারী মেয়ে হলে ছেলের নজরে পড়তাম।' বালিশটার ওপর চাপ দিতে দিতে, কখনো বা মুখে স্নো-পাউডারের চুনকাম করতে করতে আয়নায় হরেক অভিব্যক্তির ছবি ফুটিয়ে বলত : 'আমার বড্ড ইচ্ছে করে তোদের সঙ্গে ঘুরি। কোনো বাধা-নিষেধ থাকবে না—যেখানে ইচ্ছে ঘুরব-টুরব। তা না, এমন একটা বাধা এখানে!...ওই নীলাটা কিছুতেই আমাকে সঙ্গে নেবে না। আচ্ছা শেখর, তোরা কিছু এমন করিস-টরিস নাকি। আমাকে সঙ্গে নিতে তোদের বাধে কেন।' আরেকদিন সোনাবৌদি বলেছিল : 'তোদের দাদাটা একটা চামার! হ্যাঁ, চামার! রাতদিন টাকা, টাকা। আমায় চাইতে ভদ্দরলোক টাকা ভালোবাসে। তা ভাই, বল তো, ও আমাকে বিয়ে করতে গেল কেন।' আমার এই সোনাবৌদিকে এ-ও বলতে শুনেছি : 'জানিস শেখর, তোদের দাদাটা একটা কুঞ্জুস। হাল-ফ্যাশানের ওই শাড়িটা বেশ চলছে, কিন্তু আমাকে কিনে দিলে না, নিয়ে এল একটা—ওই দ্যাখ ওখানে। কেমন বাজে দেখতে।' শাড়ির বাজে-টাজে ও-সব কিছু আমি বুঝি না। সোনাবৌদির আবার ক্ষিপ্ত কণ্ঠ : 'বলে কিনা, তাহলে নীলা-শীলাও চাইবে। আচ্ছা বল তো, নীলা-শীলার সঙ্গে ও আমাকে তুলনা করে!' আমি চুপচাপ থাকি—এক্ষেত্রে আমি উশকে দিলে সোনাদিকে আরো আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু আমি করি না।

এখন আমি নীলাদের বাড়ী পেঁছিতেই প্রথম সোনাবৌদির মুখ দেখলাম। 'আয়, আয়। তুই খুব নাম-করা লোক হয়ে যাব। আমি আধুনিক কবিতা খুব ভালোবাসি। তোর ওই লাইনটা খুব ভালো হয়েছে। ওই যে লিখেছিস : 'তোমার স্মৃতিটা পিন, আমার জীবনটা লং-প্লেস-রেকর্ড।' আয়, আয়, তোকে একটা নতুন জিনিস খেতে দেব। আর একটা নতুন মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।...তাকাচ্ছিস কী ওদিকে : শীলা ঘুমুচ্ছে, নীলা কণাকে নিয়ে এখনো ব্যস্ত আছে—বাড়ী নেই। আমার ঘরে আয়।'

সোনাবৌদি খেতে দিতে দিতে বলল, একটু নিম্নকণ্ঠে এবং খুব আগ্রহ অথচ একবুক উদ্বেগ নিয়ে : 'গেছিলি?' আমার মনে পড়ল। সত্যি, মনে ছিল না। মনোজ দত্তর খোঁজ চায় সোনাদি। এই মনোজদাকে সোনাদি এখনো ভোলেনি। কী করে ভুলবে। মনোজ দত্তর অফিসের ঠিকানা সোনাদি আমাকে দিয়েছে। প্রথম প্রথম বলত : 'দূর থেকে দেখবি কেমন আছে। হাসিখুশী, না মনমরা। চেহারাটা কেমন হয়েছে। আমাকে মধ্যে মধ্যে রিপোর্ট দিবি।' তারপর বলত : 'দেখবি তো, আর কোনো মেয়ের সঙ্গে ও মিশছে কিনা।' আমি বানিয়ে বানিয়ে এপর্যন্ত রিপোর্ট দিয়েছি : মনোজবাবু সব সময় বিমর্ষ থাকেন, কারুর সঙ্গে মেশেন না, চেহারা বড্ড রুক্ষ-শুষ্ক। না-না, কোনো মেয়ের সঙ্গে তো মিশতে দেখিনি আজো। সোনাদির তখন প্রতিক্রিয়া দেখতাম। কেমন ছোট্ট মেয়ের মতো শুনত, যথাযথ প্রতিক্রিয়া হাজার সতর্কতা সত্ত্বেও আমার চোখে ধরা পড়ত। আজ ক'দিন ধরে সোনাদি বেশী ঘাড়ে লেগেছে : 'মনোজদার সঙ্গে তুই আলাপ কর।' আমি অবশ্য কোনোদিন মনোজবাবুর সঙ্গে আলাপ করব না।... আমাকে চুপচাপ দেখে সোনাবৌদি বলল : 'কী রে। তুই না কবি! তোর এত সংস্কার, কেন এত দ্বিধা!' আমি তখন কী বলি, ভাবলাম উপসংহার টানি, বললাম : 'সোনাদি, মনোজদাকে কেমন বদলে যেতে দেখছি! আজকাল কেমন খুশী-খুশী ভাব। সেদিন একটা মেয়ের সঙ্গে হাত নেড়ে-নেড়ে কথা বলতে বলতে হাঁটিতে দেখলাম। তাই তো আমি—মানে, তুমি কষ্ট পাবে বলে—' সোনাদিকে দ্রুত চঞ্চল হতে দেখলাম। চোখে কেমন একটা বেদনা-বিস্ময়। একটা অসহ্য বিক্ষিপ্ততা। সোনাদি ঘর থেকে সরে গেল।

আর সেইসময় একটা নতুন মুখ জানলা দিয়ে উঁকি মারল। কিন্তু সোনাদি কোথায় গেল। পাশের ঘরে কি সোনাদি কোথাও কাঁদছে। একমুখ ঝড়ো-মেঘ নিয়ে এক চোখ সজলতা নিয় সোনাদি কোথায় গেল!...মনে হয়, এই হল সেই মেয়েটা —যার সঙ্গে সোনাদি পরিচয় করিয়ে দেবে বলেছিল। সোনাবৌদির ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আর ওই মেয়েটা চকিত হরিণীর মতো শীলার ঘরে ঢুকল। চকিত হরিণী! আমিও শীলার ঘরে ঢুকলাম। কিন্তু দেখেছেন,—মেয়েটা জানলার ধারে পিঠ ঠেকিয়ে কেমন-কেমন দেখছে, চোখে নাচছে ওর মনের লজ্জা। মুখে ওর লজ্জা। আমার হাসি পেল। ও শীলার মাথা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল এবং আমার দিকে ভীরু-ভীরু চোখে তাকিয়ে রইল। সবটা মিলে ও একটা হরিণী। আমার ভালো লাগল। ও আবার শীলার মাথা ঝাঁকাল। আমি বললাম : 'থাক, থাক। ওকে চাই না। ও ঘুমোক।' শীলা পাশ ফিরে আবার চোখ বুজল। মেয়েটি তখন ঘর থেকে হরিণী-পালানো পালাতে গিয়ে নীলার সঙ্গে মুখোমুখি কলিশন ঘটাল। নীলা বলল : 'ধীরে আলো! চোখে দেখিস না!' আমাকে দেখে নীলার নতুন ঢঙের উচ্চারণ : 'ওঃ, আপনি তাহলে এসেছেন!'

নীলা চটেছে। শীলা ঘুম থেকে উঠেছে। বলল : 'অত দাম না-ই বাড়ালে।... এই আলো!...আলোর সঙ্গে আলাপ হয়েছে? আলো, এ হল আমাদের সখা, শিখু, শেখজী।' হাসল শীল। শীলার আজ মুড ভালো আছে।...কিন্তু আলো কোথায়! লুকিয়েছে নাকি! শীলা বলল : 'জানো শিখু, কুনাল চক্রবর্তীর ঘাড় ভেঙে আমরা পিকনিক করছি। তুমি কাল দশটায় এস। তুমি ছাড়া আর গোছাবে-গাছাবে কে।' আমি গেট পেরোলাম। শীলা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল : 'কাল দশটা। আমাদের বাড়ী।' আমি ওদের দেয়ালের গা ঘেঁষে যাবার সময় ওপরে তাকিয়ে দেখি আলো চেয়ে চেয়ে দেখছে। আমি হাসলাম। ও একটা মোচড় খেল। ওর চোখদুটো অন্ধকারে ফাঁদের মতো পাতা।

সত্যিই ফাঁদ। তা না হলে সেই রাতে বারেবার আমি সেই চোখের স্বপ্ন কেন দেখলাম। আরো দেখলাম : সবুজ-সবুজ মাঠে পাল-পাল হরিণী পালিয়ে যাচ্ছে। সারি সারি বলাকা উড়ে যাচ্ছে...আরো কত কী। স্বপ্নের কি আর মাথামুণ্ডু আছে!... নীলাদের দলে বিচিত্র ধাঁচের একটা মেয়ে এসেছে। তার ভিন্নতর স্বাদগন্ধ চাল-চলন। তার মনে অচেনা পুরুষের প্রভাব পৌঁছে যায় ভূমিকা-ছাড়া চকিতে—বেজে ওঠে মনের বীণা। অনেকদিন পরে আমার মনেও একটা সাড়া জেগেছে।

পরদিন আমাদের শহরের দুই মাইল দূরে বড় রাস্তা থেকে একটা নারকোল আমবাগানের অন্তরালে আমরা জায়গা বেছে নিলাম। নীলার নারীবাহিনীর সবাই এসেছে। কুনালও আসবে নাকি, এখন তার কাজ আছে। খাওয়ার আগে ঠিক পৌঁছে যাবেই।

আলো এসেছে। ইতিমধ্যে কয়েকবার সে মুখ ঝলসে হেসে নিয়েছে, মৃদু ময়ূরী-নাচ, হরিণী-নাচ দেখিয়েছে। জুলি প্রথম কয়েকবার কাঁশির মতো হেসেছে। গম্ভীর। শীলাই আজ মাতব্বরী করছে। কণা গিন্নীর মতো চুপচাপ খেটে চলেছে। শীলা কথা বলেনি, তাকায় নি। রিংকু বলেছে, 'কী ব্যাপার। ভুলে যাচ্ছ নাকি, শিখু?' যেখানে যাচ্ছি আলোর চোখ কম্পাসের কাঁটার মতো আমার দিকে নিবদ্ধ। আলোটা যে কী!

আমি এখন কেমন আছি? ভালো থাকার কথা। একমাত্র পুরুষ এদের মধ্যে, অতএব আমার গুরুত্ব স্বাতন্ত্র্য উভয়ই বজায় থাকছে। শুধু ওদের সকলের টুন-মোক্তারি সইতে সইতে মধ্যে মধ্যে বিরক্তির মতো লাগছে।

নীলা আর আমি মুরগী তৈরি করছিলাম। রিংকু বারকয়েক চোখের ইশারায় কাছে ডেকেছে। আমি বললাম : 'নীলা তুমি কথা বলছ না কেন!' নীলা হাসল। এক ঝলক মাত্র হাসি—মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ যেন। তারপর আবার চুপ-চাপ। চিন্তিত এবং কাজে-মগ্ন ভাব। নীলা আমার ওপর রাগ করেছে—বরং বলা যায় : গরম হয়েছে। বললাম : 'তোমার কী হয়েছে।' নীলা : 'না-না, কিচ্ছু না। সব সময় কি আর মন ভালো থাকে বল। এ-এমনিই।' আমি : 'তুমি আমার ওপর চটেছে।'—'নারে, কী যে বলিস!' নীলা বলল : 'জানিস, কপিল ছেলেটাকে কেমন অদ্ভুত লাগছে আজকাল। ক্রমশ আমার কাছ থেকে ও হারিয়ে যাচ্ছে। আগের মতো যেন আর আগ্রহ নেই।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। বলল : 'আমি কাল আচ্ছা গাল দিয়েছি। বলেছি 'কী, অন্য জায়গায় ঘুর ঘুরছ নাকি!' ও অসম্ভব রেগেমেগে গেল। বলল কিনা : 'তুমি এ-সব অনধিকার চর্চা করতে এসো না।' আমি ছাড়ব কেন, বল। আমিও অনেককিছু শুনিয়ে দিয়েছি। টাকার বড়াই করে। দেখতে ভালো সে জ্ঞান ওর টনটনে। বলে দিয়েছি এই-রকম কত কপিল আমার জন্যে তপস্যা করছে।'

নীলা এসব কী বলছে। আমার একটা গুপ্ত বা উপেক্ষিত অধিকার এক্ষুনি সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে টের পাচ্ছি। নীলা, নীলা—নীলা আমার আদিম, আমার প্রথম। মনমরা নীলার ওপর করুণার ঢল নামল।

নীলা : 'কপিল ব্যস্ত হয়ে কাল আমার পিছু-পিছু সিকি মাইল হেঁটেছিল' বল-ছিল, 'রাগ করো না, রাগ করো না!'... আমি ছেলেটাকে দেখে নেব!'

আমি উৎসাহিত হলাম। বললাম : 'দুঃখ করো না। জানতাম তুমি একদিন না একদিন ফিরে আসবে।' আমি ওর হাতটা ধরলাম, মনে হল ও যেন ভাসছে—তাই একটা অবলম্বন দিলাম। এবং নিজের দিকে টান দিতে থাকলাম : যেন ও ডুবে যাচ্ছে, তাই।

কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল! চোখে ওর উদাত চাবুক—বলছে : 'কী ব্যাপার! ব্যাপারটা কী! শেখর! তোমার খুব সাহস, না?'

আমি জড়োসড়ো হয়ে গেলাম। ও বলতে থাকল : 'তুমি সংযত হতে জানো না, তো, কেন মিশতে আস। তুমি যদি আবার আগের মতো করতে চাও, তবে বলে রাখি, আমার সামনে আর এস না। এসব ব্যাপারে আমি বড্ড কড়া!'

আমার রাগে-দুঃখে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসার জো। দেখি রিংকুর চোখে প্রচণ্ড বিস্মিত দৃষ্টি। আমাকে চোখের ইশারায় আবার ডাকল। কিন্তু আমার প্রচণ্ড কান্না পাচ্ছে। ধীরে ধীরে আইরি-ক্ষেতের আড়ালে চলে গেলাম। ক্ষোভে-দুঃখে জল বেরুল চোখ দিয়ে। একটা ফোঁফানি চেপে রাখা গেল না।.....

এখানে আলো শুকনো গাছ কুড়োচ্ছে। আঁচ ধরাবে। আমি সতর্ক হলাম। ও আমাকে দেখেই কাজ ফেলে হাত পাঁচেক মাত্র পালালো, তারপর পেছন ফিরে আরেক-বার দেখে সব লজ্জা চোখে মেখে আবার গাছ গুছোতে শুরু করল। কান আর স্নায়ু সতর্ক পেতে রেখেছে, দেখলে বোঝা যায়। শুকনো গাছগুলো ও পৌঁছে দিতে গেল। আর, সেই সময় নীলার কথা আবার মনে পড়তেই চড়-চড় করে রাগ উঠল। ঘৃণা। প্রতিশোধ নেয়ার দুর্বার ইচ্ছে। আমার জীবনে এই প্রথমবার।

আলো ফিরে এসে বলল, যতটা স্মার্ট হয়ে বলা যায়, 'রিংকুদি আপনাকে ডাকছে।' আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও কাশির মতো হাসল। চোখ নামাল, আবার তাকাল। আমার হাসি পেল—হ্যাঁ, এমন হাসি—যেন শব্দ করে একটা মেঘের বোঝা সরে গেল, যেন সূর্য উঠল। বললাম, 'তুমি খুব লাজুক!' ও নিজের স্নায়ুর ডালপালা আর ইন্দ্রিয়গুলো গুছিয়ে নিয়ে বলল : 'লাজুক মেয়েদের ভালো লাগে না আপনার?'

আমি : 'খুব লাগে। এদের মধ্যে কেবলমাত্র তুমিই মেয়ে। আর, ও-গুলো পুরুষের চাইতেও অন্যকিছু।'

ও ভ্রূকুটি মেরে বলল, 'তাই নাকি!'

আমি মাথা ঝাঁকালাম : 'হুঁ।' এই সময় ওর দুটি মেলা-চোখের আলোয় নিজেকে খুলে ধরতে ইচ্ছে করল। বললাম : 'লাজুক মেয়েরা এক-একটা দামী রেডার যন্ত্র। সামান্য ব্যাপারটুকুও তাদের মনে ছায়া ফেলে। কিম্বা একটা ভূ-কম্পনলেখ যন্ত্র, পুরুষের সামান্য কম্পনটুকুও ধরা পড়ে তার মনে।'

ওর চোখদুটি ছাত্রীর মতো জ্বলছিল। যেন নতুন শুনেছে। ওর দিকে তাকাতেই ও হেসে ফেলল : 'বাবাহ্ পাণ্ডিত আর কাকে বলে!!'

আমি যখন ওর হাতটা ধরলাম খপ করে, ও কেঁপে-কেঁপে উঠল। একগাদা ঢেউ কুলু-কুলু করে ভেঙে গেল। বলল : 'ছাড়ুন, আমার ভয় করছে!'

আমি : 'লজ্জা করছে না?'

ও : 'না। লোকের মধ্যে লজ্জা করে। এখন আবার লজ্জা কিসের!'

বললাম : 'চল, ওইদিকটায় সরে পড়ি।' আমার বারেবার মনে হচ্ছিল নীলা কিম্বা রিংকু আমাকে খোঁজ করতে এসে পড়ল বলে।

আলো : 'দেরি হচ্ছে।'

আমি : 'রাখো তোমার পিকনিক।'

আলো : 'ওদিক গিয়ে কী হবে!'

আমি : 'হাওয়ায় আর আলোয় হাঁটব, গল্প করব, ছুটব।'

আমি ওকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলাম। অবশেষে নিজেই ও একসময় গঙ্গা-ফড়িং-এর মতো হয়ে গেল। আর, আমার মুখ কতদিন পরে যেন লাগাম-ছেঁড়া হয়ে উঠল। কতকিছু দূষিত ক্ষোভ আর না-পাওয়ার ছাই এইসব কথার তীব্র আলোড়নে উচ্ছ্বাসে উত্তাপে পরিশ্রুত হয়ে গেল। আমি নির্মল হলাম, হালকা হলাম।

ও একসময় হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। বলল : 'আহ্। কত দেরি হয়ে গেল। কতদূরে চলে এসেছি। শীঘ্রি চল, শেখরদা।'

আমি বললাম। 'না। ওখানে আর ফিরব না। চল, ওই বড় রাস্তা ধরে হাঁটব, শুধু হাঁটব। তারপর সন্ধ্যা হলে বাসে করে ফিরব।'

ও আবার হাঁটল এবং তারপর আবার দাঁড়াল। বলল : 'বাড়ী ফিরে নীলাদিরা নানান রকম জিজ্ঞেস করবে যে। বকবে। আমার লজ্জা করবে।'

—'সেই লজ্জাটুকুও আমাকে দাও। আমার জন্যে ওটা তোমার দান হোক।' একথা বললে আলো আরেকবার মধুর করে তাকাল। একটু লজ্জা পেল। তারপর......

তারপর আমরা সেই ছায়াঘন বড় রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। আমরা ক্রমশ পেছনে আরো পেছনে ফেলে গেলাম আমাদের শহর আর ওই পিকনিকের জায়গাটা।

তখন সবেমাত্র ডাক্তারি পাস করে বেরিয়েছি। রবীন্দ্রসংগীত শেখবার শখ আগের থেকেই ছিল, পাস করবার পরে শখটা আরো বাড়ল।

গান আমি ছেলেবেলা থেকেই গাইতে পারতাম। দামোদরের বাঁধের ধারে গলা ছেড়ে গাইতাম, অনেকেই গাইতে বলত। যাত্রার ও থিয়েটারের তখনকার দিনের অনেক গানই শিখেছিলাম। কিন্তু বড়ো হয়ে রবীন্দ্রসংগীত শুনে তাই শেখার ঝোঁক হলো। কিন্তু কোথায় কার কাছে তা শেখা যায়? শেখবার মতো কাউকে পেলাম না।

তখনকার দিনে রবীন্দ্রসংগীতের বিশেষ আদর ছিল না। খুব কম লোকেই এ গান গাইত এবং যাও গাইত তাও বিকৃত সুরে, সঠিক সুরগুলি প্রায় কেউই জানত না। সুতরাং বাধ্য হয়ে আমি স্বরলিপি দেখে সুর তুলে নিতে চেষ্টা করতাম। তখনকার কালের দিনেন্দ্র ঠাকুরের স্বরলিপি 'প্রবাসী' পত্রিকাতে মাঝে মাঝে তাঁর স্বরলিপি থাকত, আর এক একটা স্বরলিপির বইও তখন বেরুচ্ছে। তাই দেখে দেখে আমি সুরগুলি রপ্ত করে নিতাম। যথাসাধ্য চেষ্টা করতাম ঠিক সুরটি বের করতে।

যা শিখতাম তা শোনাতাম বন্ধুমহলে। দুজন তার তারিফ করতেন, একজন হলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আর একজন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বোস। এঁরা আগ্রহ করে শুনতেন।

এঁরা প্রায়ই যেতেন 'সবুজপত্রে'র আসরে প্রমথ চৌধুরীমহাশয়ের বাড়িতে। একদিন এঁরাই আমাকে নিয়ে গেলেন সেখানে, আমাকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ালেন। প্রমথ চৌধুরীমহাশয় ও ইন্দিরা দেবী দুজনে শুনে খুশিই হলেন দেখলাম।

রবীন্দ্রনাথও স্বয়ং প্রায়ই যেতেন ওখানে। একদিন বন্ধুদের সঙ্গে যখন গিয়ে পড়েছি তখন তিনিও সেখানে উপস্থিত। চৌধুরীমহাশয় তাঁর কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—ইনি নতুন ডাক্তার হয়েছেন, আবার স্বরলিপি দেখে আপনার গানও গাইতে পারেন।

কবি তাই শুনে হেসে বললেন—তুমি ডাক্তারিও করো আবার গানও করো? খুব ভালো কাজ করো, আমিও তাই করি। বেশ তাহলে শোনাও দেখি কেমন শিখেছ।

কবির সংগে সেই আমার প্রথম পরিচয়।

খুব নার্ভাস হয়ে পড়লাম। কি জানি যদি ভুল শিখে থাকি! অতি ভয়ে ভয়ে দুটি গান গাইলাম—'ঐ আসনতলের মাটির পরে লুটিয়ে রবো' আর একটি হলো 'বক্ষে তোমার বাজে বাঁশি সে কি সহজ গান।'

কবি বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। শেষে বললেন, সুরে ভুল কিছু হয়নি, ছন্দে আর লয়েও কোনো ভুল নেই, আর তোমার গলা ভালো। তবে গানের মধ্যে কোথায় কতটা আবেগের মাত্রা দিতে হয় তা স্বরলিপি থেকে বোঝা যায় না। শুনে শিখতে হয়। তুমি চলে এসো আমার কাছে

পশুপতি ভট্টাচার্য

বোলপুরে গরমের ছুটিতে, দীনুকে বলে দেবো তোমাকে শেখাতে। 'মায়ার খেলার' গানগুলো তোমার গলায় বেশ খুলবে ওখানে গিয়ে সেইগুলো শিখে নেবে। তোমার নিমন্ত্রণ রইল সেখানে। সপরিবারেই যেয়ো, থাকার কোনো অসুবিধা হবে না।

আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। স্বয়ং কবির কাছে গিয়ে থাকব, দীনুবাবুর কাছে গান শিখব এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে।

তখন ডিমনস্ট্রেটরের চাকরিতে ঢুকেছি, গরমের ছুটি হয়েছে প্রায় দুই মাসের। সপরিবারে বোলপুরে চলে গেলাম। কবি আমাদের থাকার জন্য একটা বাংলো বাড়ি দিলেন, সেই বাংলোতে মীরা দেবী থাকতেন যখন সেখানে যেতেন।

গান শেখা প্রথম দিন থেকেই শুরু হলো।

আমাদের পাশের বাড়িতে ছিলেন আরো এক ভদ্রলোক, অধ্যাপক ডক্টর ফণী অধিকারী, সপরিবার। তাঁর সঙ্গে এবং বিশেষত তাঁর তিনটি কন্যার সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হলো, শ্রীমতী ভক্তি, জয়া এবং রাণু (বর্তমানে লেডি মুখার্জি)। এঁরাও গান শিখতেন। আর এঁদের কাছেও আমি কিছু কিছু শিখে নিতাম।

কিন্তু এ পর্যন্ত কেবল গানের কথাই বললাম, কবি যে কেমন ডাক্তারি করতেন সেকথা বলা হয়নি। সেটাই এখন বলছি।

প্রত্যহ সকালে চা-টা খেয়ে আমি চলে যেতাম কবির কাছে। তিনি প্রত্যহই তখন সমাগত রোগীদের ওষুধ দিতেন দেখতাম এবং আমার সংগে আলাপ আলোচনা করতেন অন্তরঙ্গভাবে। এইভাবে তাঁর সংগে আমার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তিনি আমাকে স্নেহপ্রীতির চোখে অনেকটা যেন আপনজনের মতো দেখতে শুরু করেছিলেন। তিনি স্বভাবত সকলের প্রতিই স্নেহশীল ছিলেন।

প্রত্যহই দেখতাম আশ্রমের বাসিন্দাদের ভিতর থেকে রোগীরা আসতো তাঁর কাছে ওষুধ নিতে। টেবিলের উপর থাকত মোটা মোটা হোমিওপ্যাথির বই আর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বাকস। রোগীর মুখে বিবরণ শুনে, কখনো বা বই দেখে আর কখনো বা না দেখেই তিনি ওষুধ নির্বাচন করতেন।

সামান্য সামান্য ধরনের রোগপীড়া। তিনি যা ওষুধ দিতেন তাতে তারা আরোগ্যও হয়ে যেতো। দেখতাম যে তারা খুব বিশ্বাস করে ওষুধ নিয়ে যায়। আমি মনে মনে হাসতাম, মুখে কিছু না বললেও।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করা এক রকমের শখ অথবা নেশা, বিদগ্ধ ও সুকোমল-বুদ্ধিযুক্ত হৃদয়বান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই এটা থাকে। রোগের নিদান প্রভৃতি কিছু না জানা থাকলেও কেবল বই খুলে রোগের লক্ষণ মিলিয়ে ওষুধ দেওয়া, এতে তারা একটা তৃপ্তিলাভ করে, বিশেষত রোগী যখন এসে বলে যে ওষুধে উপকার হয়েছে। আমি মনে করতাম যে কবির ডাক্তারি করা খেয়ালিই একটা মজার ব্যাপার। প্রত্যহ রোগীরা আসছে আর তিনি তাদের ওষুধ বিতরণ করে আত্মপ্রসাদ

লাভ করছেন। আর কাজটাও খুব ভালো।

একদিন মাঝরাত্তির থেকে আমার স্ত্রীর পেটে কলিকের ব্যথা ধরল। আমি মুশকিলে পড়লাম। সে সময়ে কোথায় ওষুধ পাই? গান শিখতে গিয়েছি কবির শান্তিনিকেতনে, এমন অশান্তি হতে পারে ভেবে কোনো ওষুধপত্র সঙ্গে নিয়ে যাইনি। কি করা যায়! একটু বেলা হতেই কবির কাছে গিয়ে বললাম। তিনি শুনে বললেন—চলো একবার দেখে আসি। কিন্তু আমার ওষুধে কি তোমার বিশ্বাস হবে?

আমি বললাম—এখন তা ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই।

কবি নিজেই এলেন আমার স্ত্রীর কাছে। তাকে কেবল কয়েকটা প্রশ্ন করলেন—পেটে চাপ দিলে একটু আরাম হয় কিনা, পা গুটিয়ে শুতে ইচ্ছে হয় কিনা, ইত্যাদি। তারপরে ফিরে গিয়ে একটি মাত্রা ওষুধ দিয়ে বললেন—এখনই এটা খাইয়ে দাওগে। এতেই সেরে যাবে আশা করি।

দিলাম ওষুধটা খাইয়ে। ঘণ্টাখানেক পরে ব্যথা থেমেও গেল।

ওষুধের কাজ দেখে বিশ্বাস করতেই হলো। কিন্তু তথাপি সেটাকে বলব আধা-বিশ্বাস। অর্থাৎ সেই বিশ্বাসের মধ্যে মনে মনে এই কথাটাও উহ্য রয়ে গেল যে পেটের ব্যথা এমনিতেও তো অনেক সময় আপনা হতেই সারে।

আরো একদিনের কথা। সেদিন দেখলাম রোগীদের মধ্যে একটি কিশোর বালককে আনা হয়েছে, পরে জেনেছিলাম সে ওখানকার গ্রন্থাগারিক প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ছেলে। তার মুখের একপাশে ফুলে উঠেছে, সিঁদুরবর্ণ একটা দগদগে প্রদাহ গলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে. সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। দেখেই বুঝতে পারলাম, এ যে ইরিসিপেলাস, মারাত্মক বিসর্প রোগ. যা দ্রুতগতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং তখন আর রোগীকে বাঁচানো যায় না। দেখে চুপ করে থাকতে পারলাম না।

কবিকে বললাম—এর ইরিসিপেলাস হয়েছে, একে এখনই হাইড্রোজেন সিরাম ইনজেকশন দেওয়া দরকার (তখনও পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়নি), তারই ব্যবস্থা করুন।

কবি একটু হেসে বললেন—আমি তো দেখেছি। এখন তো আমারই ওষুধ চলুক, দুদিন দেখাই যাকনা কি হয় তারপরে না হয় তোমারই ব্যবস্থা করা যাবে।

আমি বললাম—এ রোগে দুদিন পর্যন্ত সবুর সইবে কি?

কবি সে কথার কোনো জবাব দিলেন না, নীরবে কয়েক মাত্রা ওষুধ দিলেন।

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখলাম, ছেলেটিকে আবার আনা হয়েছে। ইরিসিপেলাসের লাল প্রদাহের গন্ডী আর বেশি ছড়ায়নি, একটু যেন মরা মরা। জ্বরও একটু কম। গতকালের মতো অতটা মারাত্মক বলে মনে হচ্ছে না।

তারও পরের দিন দেখলাম, প্রদাহ অনেক কমে গেছে, লাল বর্ণটা মিলিয়ে গিয়ে চামড়া কুঁচকে গেছে, ফোলাটা আরোগ্যের দিকেই চলেছে।

আরো দুই-তিন দিনের মধ্যে ছেলেটি একেবারে সুস্থ হয়ে গেল।

আমি তখন কবিকে বলতে বাধ্য হলাম—আপনার চিকিৎসা অতি আশ্চর্য দেখলাম। এমন বড়ো রোগটা আপনি ঐ ছোটো ছোটো গুলির ওষুধ দিয়ে সারালেন, এ-কথা বিশ্বাস না করে কোনো উপায় নেই। চোখেই তো দেখলুম।

কবি হেসে বললেন—তবুও তোমরা আমাকে ডাক্তার বলে মানবে না। আমি কী নিইনা, তাই ডাক্তার নই। যদি মোটা ফী নিতাম তাহলে সবাই বলত এ একজন মস্ত বড় ডাক্তার। তবে একটা গল্প বলি শোনো।

তিনি গল্পটা এইভাবে বললেন :—

"কিছুদিন আগে রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার ডাকঘরে আমার নামে যে সব চিঠিপত্র যেতো তাতে প্রায়ই শিরোনাম থাকত ইংরেজিতে 'ডকটর রবীন্দ্রনাথ টেগোর।' তাই দেখে সেখানকার পোস্টমাস্টার ভদ্রলোক মনে করলে এ বুঝি একজন মস্তবড়ো ডাক্তার। চেনাশোনা লোকদের কাছে কথাটা সে বেশ রটালে। তারপর একদিন এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে আমার কাছে এনে হাজির করলে। বললে, লোকটা বড়ো গরিব, এর জন্যে একটা কিছু উপায় আপনাকে করতেই হবে, একে আপনি ওষুধ দিন। কি আর করি, দিলাম তাকে ওষুধ। ধীরে ধীরে সে অনেকটাই সেরে উঠল। খুব সম্ভব নিজের থেকেই সারল, কারণ সামান্য পক্ষাঘাত হলে আপনিই তা সারে, বেশিরকম হলে তা কোনো কিছুতেই সারে না। কিন্তু তা বললে কি হয়. আমাদের দেশে যখন একটা বিশ্বাস এসে যায় তখন আর রক্ষা নেই। আশপাশের চারিদিক থেকে নানা রকমের রোগীরা প্রত্যহ আমার কাছে আসতে লাগল। যত বলি যে আমি সত্যিকার ডাক্তার নই, ডাক্তারি বিদ্যার কিছুই জানিনা, কিন্তু কে বা শোনে সে কথা। যতদিন ওখানে ছিলাম ততদিন আমাকে রীতিমত ডাক্তারিই করতে হয়েছিল। বিশ্বাসে অনেক ফল হয় তাও আমি দেখলাম। তোমরা হয়তো এ কথা শুনে হাসবে, কিন্তু যদি ডাক্তারি বিদ্যেটা পাস করতাম, নামের সঙ্গে কতকগুলো অক্ষর জুড়ে দিয়ে তোমাদের চেয়ে বড়ো ডাক্তার হতে পারতাম। বিশ্বাস হচ্ছে না?"

আমার বিশ্বাস যতটা হোক আর না হোক, আমার স্ত্রীর কিন্তু তাঁর ডাক্তারিতে খুবই বিশ্বাস হয়েছিল। মাঝে মাঝে তার শিরঃপীড়া হতো, দুই তিন দিন পর্যন্ত শয্যাগত হয়ে থাকত, মাথায় বরফ দিতে হতো। এর জন্যে সে কবির কাছে ওষুধ চাইলে। কবি তখন হোমিওপ্যাথি ছেড়ে বায়োকেমিক চিকিৎসা ধরেছেন। তিনি বলে দিলেন কেলি ফস্ আর ফেরাম ফস্ অদল-বদল ক'রে খেতে। তাইই সে নিয়মিত ভাবে খেয়েছিল বহুকাল পর্যন্ত।

এর পরে কয়েক বছর কেটে গেল। ট্রপিক্যাল মেডিসিন পড়ে আমি ডি-টি-এম্ পাশ করলাম। ওতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ব্যাধিগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। পাস করার পরে কিছুদিন কবির কাছে ছিলাম।

কবি সেই সময়ে আমাকে বললেন—আমাদের দেশের রোগব্যাধি সম্বন্ধে যে বিদ্যা তুমি শিখে এলে তা কেবল অর্থকরী হিসাবে নিজের পেটের মধ্যেই জমা ক'রে রেখোনা, এটা তুমি দেশের কাজে লাগাও। সহজ বাংলাতে এ বিষয় নিয়ে তুমি লেখো। কাজ হবে।

আমি বললাম—বাংলাতে সে সব কথা লেখা খুব কঠিন, অনেক খেটে লিখতে হবে। আর যদিও বা লেখা হয়, সে লেখা কে পড়তে চাইবে?

কবি বললেন—খাটতে তো হবেই, যখন শিক্ষা পেয়েছ তখন সে দায় তোমার। বাংলাতে লেখার দরকার আছে বৈকি, বিশেষ দরকার। শহরের কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু গ্রামে যারা চিকিৎসা করে তারা ইংরেজি ভালো বোঝে না, বেশি পড়েও না। তারা গতানুগতিকভাবে তাদের কাজ চালিয়ে যায়, আর গ্রামের লোকের মরণ-বাঁচন তাদেরই হাতে। বাংলাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান লিখলে তাদের পক্ষে অনেক উপকার হবে, তারা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রণালীতে অনেক ভালো ফল পাবে। তুমি খেটে-খুটে একটা ভালোরকম বই লিখে ফেল। পড়বার লোক অনেক হবে, এখন না হোক দুদিন পরে হবে। তোমার এটা কর্তব্য, ফলের কথা না ভেবে তোমার কাজ তুমি ক'রে যাও।

তাঁর উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বই লিখতে শুরু করলাম। খ্যাতনামা ডাক্তার নীলরতন সরকারও এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিলেন। কেমনভাবে কি কি লিখতে হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট পরামর্শ দিলেন। অনেক সাহায্যও করলেন।

বইটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় দশ বছর সময় লাগল। কবি এ বইএর নামকরণ করলেন—"ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা"।

তিনি এই বইটির জন্য এক সুবৃহৎ ভূমিকা লিখে দিলেন। তাতে যা লিখেছিলেন তা এখনকার দিনেও পুরোপুরি-ভাবেই প্রযোজ্য। আমি তাই তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"ডাক্তারি বইএর ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজদের মানায় ভালো। এ কাজে আমার সত্যকার যদি কোনো তাগিদ থাকে তবে সে রোগীর তরফ থেকে। কিছুকাল থেকে গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছি, দেখেছি

সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের। আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের পত্তন সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আবার সেই কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হয়ে ওঠে। আমরা অনেক সময়ে দোষ দিই বাহ্য কারণকে—কিন্তু রোগজীর্ণতা পুরুষাণুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস করে—গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পোঁছয়। লোকসানের হিসাব বিচারের সময় আমরা নানা নেতার নানা মত, নানা প্রণালী নিয়ে বকাবকি, এমন কি হাতাহাতি করে থাকি, এদিকে রোগে আমাদের শক্তিকে যে চালুনীর মতো শত ছিদ্রময় করে দিয়েছে এই কথাটা যথেষ্ট পরিমাণে আমলের মধ্যে আনিনে। যখন দেখি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয় না, তখন বলি চরকা চালাও, তাঁত বোনো, চাষ করো—কিন্তু যে হাতে এই সব কাজ চলবে সেই হাতে চেপে বসেছে যমের পেয়াদারা। পাঁচজন লোকে বহু কষ্টে দেড়জন লোকের মতো কাজ করে অথচ পাঁচ মুখেই তারা খায় এবং পাঁচখানা দেহকেই কাপড় পরাতে হয়। এতে গরমের দেশে মানুষের উদ্যম সহজেই শিথিল হয় তার উপরে এই উৎপাত।

"বিবিধ উপায়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে এ দেশের লোককে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কি করে রোগকে ঠেকানো যায়। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক সভার অঙ্গীভূত একটি আরোগ্য বিভাগ থাকা উচিত, আরোগ্যরীতির বহুল প্রচারের ভার তার উপরে থাকা চাই। রাশিয়াতে এই প্রচারকার্য কি রকম সম্যকভাবে ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশ জুড়ে চলচে তা দেখে এসেছি। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন সেখানকার চেয়ে অনেক বেশি, অথচ আরোজন নেই বললেই হয়।......

"আমাদের দেশে যে সকল রোগ মানুষের ধন-প্রাণ-মনের গোড়া ঘেঁষে কোপ মারছে শ্রীযুক্ত ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য এই গ্রন্থে তার প্রকৃতি ও প্রতিকার নির্ণয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমার কাছে এই লেখাগুলি অতিশয় ঔৎসুক্যজনক। তার একটা কারণ, রোগের পরিচয়ে শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়।...

"এ দেশে রোগ যত সুলভ ডাক্তার তত সুলভ নয়। চিকিৎসার উপায়-বিরল এই দেশে আনাড়িরাও বাধ্য হয়ে হোমিওপ্যাথি প্রভৃতি চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা সংগ্রহ করে রোগের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করতে চেষ্টা করে। ব্যবসায়ীরা যাই বলুন, কিছু ফল পায়না এ কথা বলা অত্যুক্তি। মন্দ ফল হয়না তাও বলত পারিনে। কিন্তু শহরের বাইরে যেখানে থাকি সেখান থেকে ডাক্তার কত দূরে!—সে দূরত্ব কেবল ভৌগোলিক দূরত্ব নয়, আর্থিক দূরত্ব। তা ছাড়া যে সব ডাক্তার এখানে ওখানে বহু দূরে দূরে ছিটকিয়ে আছেন তাঁদের বিদ্যেতে দ্রুতগতিতে মরচে পড়ে আসচে। ডাক্তার পশুপতির এই বইখানি তাদের কাজে লাগবে।......

"গ্রামে যদি এক-আধজন জনহিতৈষী শিক্ষিত লোক থাকেন, তাঁরাও এই বই-এর সাহায্যে অনেক উপকার করতে পারবেন—আর আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে হঠাৎ ভিষক-ডাক্তার হতে হয়, তার তো কথাই নেই। কিসের দায়? তার দৃষ্টান্ত দিই। সাঁওতাল পাড়ার মা এসে আমার দরজায় কেঁদে পড়ল, তার ছেলেকে ওষুধ দিতে হবে। যতই বলি আমি ডাক্তার নই, ততই তার জিদ্ বেড়ে যায়। জানি, যদি তাকে নিতান্তই বিদায় করে দিই, সে তখনই যাবে ভূতের ওঝার কাছে,—তার ঝাড়ার চোটে রোগ ও রোগী দুই-ই দেবে দৌড়। বই খুলে বসতে হোলো,—বড়াই করতে চাইনে, কেননা পসার বাড়াবার ইচ্ছে মোটেই নেই,—সে রোগী আজও বেঁচে আছে, আমার গুণে বা তার ভাগ্যের গুণে সে তর্কের শেষ মীমাংসা কোনো উপায়েই হতে পারে না। বহুকাল পূর্বে রামগড় পাহাড়ে গিয়েছিলুম; সেখানেও রোগীরা আমাকে অসাধ্য রোগের মতোই পেয়ে বসেছিল,—ঝেড়ে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম, শেষকালে তাদেরই হোলো জিৎ। যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোনো চিকিৎসার উপায় নেই তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এত বড় নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারিনে যে পুরো চিকিৎসক নই বলে কোনো চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরকেও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাঠি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।......

"...একে তো অভিজ্ঞ ডাক্তার বহুমূল্য, তার উপরে তাঁরা প্রায়ই অভিজ্ঞ শুশ্রূষার ব্যবস্থা দাবী করেন। ব্যয় সম্বন্ধে একে বলা যায় ডবল্ ব্যারেল বন্দুক। রোগীরা এই রাস্তা দিয়ে কখনো ধনে কখনো ধনেপ্রাণে মরে। উপস্থিত বইখানি...আর যাই হোক, ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্বাদ করে আমি মাঝে মাঝে পড়ব, এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি শেষের কথাটি যা লিখেছেন তা অতিশয়োক্তি নয়। আমি অতঃপর যখনই তাঁর কাছে গেছি তখনই দেখেছি যে এ বইখানি রয়েছে তাঁর টেবিলে। মাঝে মাঝে তিনি যে পড়েন তাও বুঝতে পারলাম।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা ৩২

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র

রূপায়ণে-চিত্রসেন

আপনার দায়িত্ববোধ কতখানি ?

দায়িত্ব-জ্ঞান না থাকলে নিজের বোঝা অপরের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতা জাগে।

আবার যদি খুব বেশি দায়িত্ববোধ গড়ে ওঠে, তাহলে অপরের বোঝা অহেতুক নিজের কাঁধে তুলে নিতে দেখা যায়।

নীচের টেস্ট দিয়ে যাচাই করে দেখতে পারেন, আপনি এই দুয়ের মধ্যে কোথায় আছেন। প্রশ্নগুলিতে "হ্যাঁ" কিংবা "না" জবাব দিন, তারপরে সব শেষে সঠিক জবাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। কোন কাজ সুরু করলে তা শেষ করার জন্যে আপনি কি বাধ্য বলে মনে করেন কি ?

২। আপনার হাত দিয়ে সবচেয়ে নিখুঁত কাজ যা হতে পারে, তার চেয়ে এতটুকু নিরেস কোন কাজ হলে আপনি কি উদ্বিগ্ন বা অস্বস্তি বোধ করেন ?

৩। অপ্রীতিকর কোন কঠিন কাজ এলে যতদিন সম্ভব তা ঠেলে সরিয়ে রাখার চেয়ে ঠিকমত বাগে এনে সেরে ফেলাই কি আপনার ইচ্ছে ?

৪। যেখানে আপনার যতটুকু দেওয়ার এবং যতটুকু করার, তা কি আপনি বিশেষভাবে মনে রাখেন ?

৫। আপনি চুপচাপ কিছু না করে বসে আছেন, আর অন্য সকলে কাজ করছে, এমন অবস্থায় আপনার কি খুব অস্বস্তি বোধ হয় ?

৬। কথা দিয়ে কোন কারণে যদি আপনি তা না রাখতে পারেন, তাহলে কি খুব উদ্বিগ্ন বোধ করেন ?

৭। আপনি কি মাঝে মাঝে এমন কোন কাজ করেন, যা করতে চান বলে করছেন তা নয়, নিছক কর্তব্যবোধের তাড়নায়, অথবা আপনি মনে করেন ওটা আপনাকেই করতে হবে, কিংবা আপনি না করলে বুঝি আর কেউ করবে না, নয়তো যা' তা করে করবে, তাই সে-কাজ কি করেন ?

৮। যখন কোন বিষয়ে অনুরোধ জানানো হয়, তখন কি আপনার মনে হয়, ব্যক্তিগতভাবে আপনার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়েছে ?

৯। পাঁচজনের জন্যে কোন কাজ করতে বললে আপনার পক্ষে কি তা প্রত্যাখ্যান করা শক্ত হয় ?

১০। বাড়ীর লোকজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে আপনি কি উদ্বেগ বোধ করেন ?

১১। ভালো কাজে দান-ধ্যানের ব্যাপারে আপনি কি আপনার সামর্থ্যের বেশি কিছু করে ফেলেন ?

১২। অন্যদিকে, কোন জিনিস সত্যিই আপনার প্রয়োজন মনে হলেও তা আপনার সামর্থ্যের বাইরে বলে করে আপনি কি কিনতে চান না ?

১৩। অতীতের স্মৃতিজড়িত কোন জিনিস, যেমন পুরনো ফটো, ছবি ইত্যাদি, ফেলে দেওয়ার সময়ে আপনি কি কষ্টবোধ করেন ?

১৪। অনেক দিন আগে যাদের সঙ্গে পরিচয় ছিল, তাদের চিঠি লিখতে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে আপনি কি আকুল হন ?

১৫। কারও কপাল কোঁচকানো বা কারও বদমেজাজ দেখলে তখুনি কি আপনি ভাবতে থাকেন আপনি বুঝি কিছু ভুল করলেন ?

১৬। যখন আপনাকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, তখন কি আপনি উদ্বেগ বোধ করেন ?

১৭। বিলপত্র, ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম এবং লাইসেন্সের টাকা সময় মত মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আপনি কি বেশ সজাগ থাকেন ?

১৮। আপনি কি রাতে মাঝে মাঝে ওপরতলা থেকে নীচে নেমে এসে দেখে যান সদর দরজা বন্ধ হয়েছে কিনা, আলো নেবানো হয়েছে কিনা ?

১৯। আপনি নিজে আঘাত পেলে যা কষ্ট পান, অন্য লোককে অসুখী দেখতে পেলে আপনি কি তার চেয়ে বেশি কষ্ট বোধ করেন ?

২০। আপনি কি লক্ষ্য করে দেখেছেন, বেয়াড়া ধরনের অপ্রিয় লোকজনদের সঙ্গেই আপনার বেশি মেলামেশা করার ঝোঁক এবং অপ্রীতিকর যেসব কাজ সবাই এড়িয়ে যায় সেদিকেই আপনার আগ্রহ বেশি ?

প্রত্যেকটি "হ্যাঁ" জবাবের জন্যে পাঁচ পয়েন্ট করে হিসাব করুন। পাঁচজন মানুষের কথা আমাদের ভাবতে হবে একথা ঠিকই, তা বলে সে-ভাবনা এতো বেশি নিশ্চয়ই করবো না যাতে মনে সর্বক্ষণই একটা উৎকণ্ঠা জেগে থাকে। সেই হিসাবে, মোটামুটি সন্তোষজনক পয়েন্ট হবে ৪০ থেকে ৬০-এর মধ্যে এবং আদর্শের মাপকাঠি হবে ৫০ পয়েন্ট।

যদি আপনি ৬০ পয়েন্টের বেশি পান, তাহলে নিজেই আপনার দায়িত্ববোধ আপনার সামর্থ্যকে অতিক্রম করে যেতে চাইছে। যদি এই ঝোঁকটাকে আপনি দমাতে না পারেন, তাহলে ক্রমশই আপনি দুর্বল হয়ে পড়তে থাকবেন।

যদি ৪০-এর কম পয়েন্ট পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনার দায়িত্ববোধ আর একটু বাড়াতে হবে এবং আপনাকে অন্য দশজনের কথা আরও খানিকটা বেশি করে ভাবতে হবে।

খুব বেশি স্বার্থপর হওয়াও যেমন ভালো নয়, তেমনি অত্যধিক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করাও ঠিক নয়। সহজভাবে যা করতে ভালো লাগে, যা করলে তৃপ্তি হয়, সেদিকে যত্নবান হওয়াই স্বাভাবিক আচরণ। খুব বেশি দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতে গেলে লোকের কাছে বাহবা পাওয়া দূরের কথা, হাস্যাস্পদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সুতরাং, দায়িত্ব ভার বহন করা যখনই কষ্টকর মনে হবে, তখনই আত্মপীড়নের মধ্যে নিজেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে সহজভাবে যতটুকু করা সাধ্যায়ত্ত, ততটুকু করেই ক্ষান্ত থাকা যুক্তিসঙ্গত।

অনেকে আবার এতই হাল্কা থাকতে চান যে, দায়িত্বের ধারে কাছে তাঁরা আসতে চান না। মানুষের অসুবিধে কোথায় সেদিকে তাঁরা ভ্রূক্ষেপই করেন না। এর ফলে তাঁরা সকলের কাছে অপ্রিয় হতে তো থাকেনই, উপরন্তু নিজের দক্ষতা বিকাশের সম্ভাবনাকেও নষ্ট করেন। সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ কখনও কর্মজীবনে বা সামাজিক জীবনে সফল হতে পারে না, কারণ প্রথম প্রথম পরের জন্যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করতে করতে পরে নিজের জন্যও কোনও দায়িত্ব পালনে আর আগ্রহ জাগে না। চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই ধরনের মানুষকে কেউ জায়গা দেয় না।

৩রা অক্টোবর তারিখের অমৃতে চিঠিপত্র বিভাগে প্রকাশিত একটি চিঠিতে শ্রীসমীর ভট্টাচার্য 'লোকগীতি' শব্দটির 'উচ্চারণ-সমস্যা' সমাধানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের ঘোষক-ঘোষিকাদের মুখে 'লোক-গীতি' শব্দের 'লোকোগীতি' ও 'লোক্‌গীতি' দুরকম উচ্চারণ শুনে 'কর্ণপীড়া' অনুভব করে তিনি লিখেছেন :

"...এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 'লোকগীতি', না 'লোক্‌গীতি' উচ্চারিত হবে?

"আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতির নির্দেশে দেখতে পাই (এই নির্দেশ শিক্ষিত সুধী-সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত), শব্দের শেষে সাধারণত হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হবে না। আবার এ কথাও বলা আছে যে, যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়।

"বেতারজগৎ দেখে আমরা পাই লোকগীতি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে লোক্‌গীতি আর লোকগীতিতে কোনই ব্যবধান নেই। কিন্তু বিভিন্ন ঘোষকের উচ্চারণের তারতম্য আমাদের মনে পীড়া দেয়। এবং শ্রুতিকটুও বটে।"...

প্রথমেই বলে রাখি, এখন আর 'উচ্চারণের তারতম্য' নেই। কিছুদিন থেকে কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের সকল ঘোষক-ঘোষিকাই 'লোক্‌গীতি' বলছেন। আগে একজন মাত্র ঘোষিকার কণ্ঠে 'লোক্‌গীতি' শোনা যেত, এখন সকলের কণ্ঠেই যাচ্ছে।

প্রথম যেদিন আমি এটা আবিষ্কার করেছিলাম সেদিন প্রচণ্ড বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলাম। কারণ, ঘোষক-ঘোষিকাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতও কয়েকজন আছেন, এবং বাংলাভাষায় তাঁদের দখল আছে। তাঁরা আগে 'লোকোগীতি' বলতেন। হঠাৎ এমন কী ঘটল যাতে ঐ উচ্চশিক্ষিত ঘোষক-ঘোষিকারাও সমস্বরে 'লোক্‌গীতি' বলতে আরম্ভ করলেন।

আগে যে একজন ঘোষিকা 'লোক্‌গীতি' বলতেন তা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। তবু তিনি 'লোক্‌গীতি' ছাড়েন নি। এত সমালোচনা সত্ত্বেও কেমন করে একজন ঘোষিকা দিনের পর দিন দৃঢ়স্বরে, উদ্ধতভঙ্গিতে 'লোক্‌গীতি' বলে যেতে পারেন যদি কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয় না থাকে।

কিছুদিন আগে সকলের কণ্ঠে 'লোক্‌গীতি' শুনে আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল, নিশ্চয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশ ছাড়া যেসব ঘোষক-ঘোষিকা 'লোকো-গীতি' বলতেন তাঁরা কিছুতেই হঠাৎ দলবেঁধে 'লোক্‌গীতি' বলতে পারেন না।

আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। একজন ঘোষককে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ এই 'লোক্‌গীতি'র প্লাবনের কারণ কী? তিনি বললেন, "ওপর থেকে অর্ডার হয়েছে।" আমার ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল।

আর একজন ঘোষককে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনিও বললেন, কর্তৃপক্ষ আদেশ জারি করেছেন সকলকে 'লোক্‌গীতি' বলতে হবে, নইলে শাস্তি পেতে হবে।—আমার ধারণা আবার সত্য বলে প্রমাণিত হ'ল।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, শাস্তির ভয়ে উচ্চশিক্ষিত ঘোষক-ঘোষিকাদেরও ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'লোক্‌গীতি' বলতে হচ্ছে, এ এক নিদারুণ ট্র্যাজেডি।

এখন শ্রীভট্টাচার্যের চিঠির উত্তর দিচ্ছি। শ্রীভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার নিয়মের যে অংশের উল্লেখ করেছেন তা অসংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দের জন্য। এই অংশে আছে, ঐসব শব্দের শেষে সাধারণত হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হবে না, যেমন—ওস্তাদ, চেক, ডিশ, পকেট। কিন্তু ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যেমন—শাহ্‌, তখত্‌, বল্ড্‌। সুপ্রচলিত শব্দে হস্‌-চিহ্ন না দিলেও চলবে, যেমন—আর্ট, গভর্নমেণ্ট স্পঞ্জ। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যেমন,—কাট্‌মট্‌ তর্‌তর্‌ কল্‌কাল। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যেমন—চট্‌, সার্‌।

এখন সংস্কৃত শব্দ নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক।

সংস্কৃতের স্বরধ্বনি (আদি, মধ্য বা অন্ত্য) বাংলায় কোথাও রক্ষিত হয়েছে, কোথাও লুপ্ত হয়েছে, আবার কোথাও বা অল্প-বিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে।

আদিস্বরলোপ : সাধারণভাবে বলা চলে যে, সংস্কৃত আদি স্বরধ্বনি বাংলায় যথাযথ রক্ষিত হয়েছে। প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলার যুগে যখন অনাদি স্বরে শ্বাসাঘাত পড়ত তখন কোনো কোনো শব্দে আদি স্বরধ্বনি লুপ্ত হয়েছিল। আদি স্বর লুপ্ত হয়েছে এমন কয়েকটি শব্দ বাংলায় চলে এসেছে; যেমন অলাবু—লাউ, অভ্যন্তর—ভিতর, উদুম্বর—ডুমুর।

মধ্যস্বরলোপ : শ্বাসাঘাতের অভাবে পদমধ্যবর্তী স্বরধ্বনি বহু ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়েছে; যেমন সুবর্ণ—স্বর্ণ, প্রেত্নী—পেত্নী, অঙ্গুষ্ঠ—আংটি।

অন্ত্যস্বরলোপ : সংস্কৃতের আ, ঈ, ঊ এই কটি পদান্ত দীর্ঘস্বর অপভ্রংশ স্তরে যথাক্রমে অ, ই, উ-তে পরিণত হয়েছিল। পদান্ত এ, ও হয়েছিল ই, উ। এর ফলে অপভ্রংশ স্তরে পদান্ত

স্বর ছিল মাত্র তিনটি—অ, ই, উ। বাংলাভাষার প্রাচীন যুগে পদান্ত অ, ই, উ—এই স্বরগুলি বর্তমান ছিল। মধ্যযুগে এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সমস্ত পদান্ত স্বরের পরিবর্তনের ধারা নিয়ে এখানে আলোচনা করার দরকার নেই। এখানে শুধু পদান্ত অ স্বরের লোপ নিয়ে আলোচনা করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

পদান্ত অ-লোপের উদাহরণ : মধ্য—মজ্‌ঝ—মাঝ—মাঝ্‌, হস্ত—হত্থ—হাত—হাত্‌, চন্দ্র—চন্দ—চাঁদ—চাঁদ্‌। এগুলি তদ্ভব শব্দের দৃষ্টান্ত। তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দেরও পদান্ত অ সাধারণত লুপ্ত হয়েছে। যেমন—আকাশ্‌, নয়ন্‌, জল্‌, জন্‌।

কিন্তু কোথাও কোথাও তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের পদান্ত অ রক্ষিত হয়েছে। যেমন—চন্দ্র, সর্ব, প্রশ্ন, সত্য, দেহ, বিরহ, অনুগ্রহ, নত, পুলকিত, দেয়, বিধেয়, শ্রেয়, উচ্চতম, গুরুতর, গাঢ়, গাঢ়।

সমাসবদ্ধ পদের প্রথম অংশ তৎসম হলে সেই অংশের অন্ত্য অ-কার রক্ষিত হয়েছে। যেমন—পদ, গণ, দেব, দান, দেশ, মুখ, জ্ঞান, পাঠ, মত প্রভৃতি তৎসম শব্দের বাংলা উচ্চারণ পদ্‌, গণ্‌, দেব্‌, দান্‌, দেশ্‌, মুখ্‌, জ্ঞান্‌, পাঠ্‌, মত্‌ ইত্যাদি হলেও যাঁরা নিয়ম মানেন তাঁরা কখনও পদ্‌সেবা, গণ্‌তন্ত্র, দেব্‌ভূমি, দান্‌বীর, দেশ্‌প্রিয়, মুখ্‌দর্শন, জ্ঞান্‌দায়িনী, পাঠ্‌ভবন, মত্‌ভেদ উচ্চারণ করেন না।

সুতরাং তৎসম শব্দ 'লোক' বাংলায় 'লোক্‌' উচ্চারিত হলেও যখন তা সমাসবদ্ধ হবে তখন 'লোক্‌অ' হওয়া উচিত। যেমন—'লোক্‌অ-ধর্ম', 'লোক্‌অ-মানস', 'লোক্‌অ-সাহিত্য'। কিন্তু বাংলায় এই অ-কারের ও-কার প্রবণতা ঘটে। তাই 'লোকধর্ম' উচ্চারিত হয় 'লোকোধর্ম', 'লোকমানস' উচ্চারিত হয় 'লোকো-মানস', 'লোকসাহিত্য' উচ্চারিত হয় 'লোকোসাহিত্য'।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 'লোকগীতি'র উচ্চারণ হওয়া উচিত 'লোকোগীতি'—'লোক্‌গীতি' নয়।

তাছাড়া আরও একটি কারণে 'লোক্‌গীতি' বলা উচিত নয়। সেটি হচ্ছে, 'লোক' শব্দের ক অঘোষ ধ্বনি, আর 'গীতি' শব্দের গ ঘোষবৎ ধ্বনি—দ্রুত উচ্চারণে 'লোক্‌গীতি' 'লোগ্‌গীতি' হয়ে যায়, এবং তা শ্রুতিমধুর নয়।

অনুষ্ঠান পর্যালোচনা

৮ই অক্টোবর রাত সওয়া ১০টায় অনুষ্ঠানের ঘোষণায় বোধহয় একটু 'ভুল' ছিল। অনুষ্ঠানের আগে ও পরে 'পূর্বাঞ্চল প্রসঙ্গ' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, কিন্তু অনুষ্ঠানটি শুনে মনে হ'ল 'নাগাঞ্চল প্রসঙ্গ'। নাগাভূমির বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অংশবিশেষ শোনানো হয়েছিল এতে। পূর্বাঞ্চল বলতে কেবল নাগাভূমি বোঝাবে কেন?

এইদিন রাত সাড়ে ১০টায় 'রূপ ও রঙের' আসরে কৌতুক নকশার বদলে রবীন্দ্রনাথের 'রসিকতার ফলাফল' নিবন্ধটি পাঠ করে শোনানো হ'ল। পাঠ ভালো হয়েছে বলা চলে না। এই ধরনের প্রবন্ধ একা ধীরে সুস্থে পাঠ করে যে রসগ্রহণ করা যায়, বেতারে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে তা সাধারণ্যে বিতরণ করা যায় না। তাই 'রূপ ও রঙের' আসরে নিবন্ধটির পাঠ উদ্দেশ্য-মণ্ডিত হয়েছে বলা চলে না।

৯ই অক্টোবর রাত সাড়ে ৯টায় 'অখিল ভারতীয় কার্যক্রমে' 'সাবরমতী আশ্রম' নামে একটি রূপকানুষ্ঠান প্রচারিত হ'ল—স্পষ্টত গান্ধীশতবার্ষিকী উপলক্ষে। অনুষ্ঠানটি 'ন্যারেশন' ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে সেই 'ন্যারেশন' একঘেয়ে লাগে নি। আগাগোড়া শোনার মতো হয়েছিল। এর মধ্যে তথ্যও ছিল।

১০ই অক্টোবর সকাল পৌনে ৮টায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনালেন শ্রীমতী স্নিগ্ধা ঘোষ। শ্রীমতী ঘোষের কণ্ঠে সাধারণত নজরুলগীতি শুনতেই আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতেও যে তাঁর সমান পারদর্শিতা আছে, এদিনের অনুষ্ঠানে আবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

এইদিন সকাল সাড়ে ৯টায় ভৈরবী ঠুংরি শোনাচ্ছিলেন শ্রীমতী প্রতিমা বসু। গান মাঝে একবার থেমে গিয়েছিল—বোধহয় যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য। কিন্তু সে কথা স্বীকার করা হয় নি। বেলা সাড়ে ১২টায় গ্রামোফোন রেকর্ডে শ্রীশ্যামল মিত্রের রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানেও একটি রেকর্ড থেমে গিয়েছিল। এবারেও ত্রুটি স্বীকার করা হয় নি। দুঃখ প্রকাশও না। এই ধরনের ত্রুটি স্বীকারের ও দুঃখ প্রকাশের রেওয়াজটা যদি উঠে গিয়ে থাকে, তাহলে ভালোই হয়েছে, কারণ রোজ রোজ বার বার একই ধরনের দুঃখে বিরক্তি ধরে।

১১ই অক্টোবর রাত সাড়ে ১০টায় কলকাতা-খ'য়ে শ্রীমতী অঞ্জলি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কণ্ঠে আধুনিক গান বেশ ভালো লাগল। বেশ স্বচ্ছ, স্বাভাবিক,—ন্যাকামি-হীন, কান্নাহীন।

১৩ই অক্টোবর বেলা আড়াইটায় 'বিদ্যার্থীদের জন্য' অনুষ্ঠানে 'ভ্রমণকাহিনী' পর্যায়ে দীঘা সম্পর্কে বললেন শ্রীঅসিত-বরণ মুখোপাধ্যায়। বেশ মনোগ্রাহী হয়েছিল। তিনি গল্প দিয়ে, কবিতা দিয়ে, প্রাচীনতা দিয়ে, আধুনিকতা দিয়ে বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে বলেছিলেন।

১৪ই অক্টোবর রাত পৌনে ১১টায় পদাবলী কীর্তন গাইলেন শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগ্রহে শোনার মতো। বেশ অন্তরস্পর্শী।

—শ্রবণক

বিতর্কিত আলোচনা

(২৪)

অমৃতের ২রা আশ্বিন, ১৩৬৭ সংখ্যায় স্বপনকুমার ঘোষ (কলিকাতা-৪)-এর 'চুম্বন ও নগ্নতা' সম্বন্ধে চিঠিটি পড়লাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না তিনি কেন এটাকে সমর্থন করছেন? তিনি লিখছেন যে শতকরা নব্বুইজন চান ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা আসুক। কিন্তু আমি যদি বলি শতকরা নব্বুইজন চান না? হয়ত তিনি বলতে চেয়েছেন যে বাস্তবে যেটা হয় সেটা কেন চলচ্চিত্রে দেখান হবে না? কিন্তু বাস্তবে তো অনেক কিছুই হয়ে থাকে, তা বলে সব কিছুই কি দেশের উঠতি যুবকদের, যারা দেশের মেরুদণ্ড তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। হয়ত অনেকেই জানেন না যে বাস্তবে কি হয় আর কি না হয়। কিন্তু চলচ্চিত্রে তারা যদি এই সব দৃশ্য দেখে তবে তাদের উচ্ছন্নে যেতে কতক্ষণ? তা ছাড়া হিন্দী ছবি এখন এত নিম্নস্তরে নেমে যায়নি যে তার বদলে চুম্বন ও নগ্নতা অনেক ভাল। হয়ত হিন্দি ছবিতে এমন কিছু দেখান হয় যা অনেকের উপরেই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তা সাময়িক। অন্যদিকে চুম্বন ও নগ্নতা এক গভীর প্রভাব বিস্তার করবে। আর বাংলা ছবির সম্বন্ধে বলতে গেলে বলব, অমৃতের উপর যেন বিষদান না করা হয়। বিদেশী চলচ্চিত্রে যে সব চুম্বন বা নগ্ন ছবি দেখান হয় সে সম্বন্ধে বলা যায়, বিদেশে নাইট ক্লাবে বা বড় বড় হোটেলে এসব সাধারণ ব্যাপার। তারা এই সব ব্যাপারে অভ্যস্ত। তা ছাড়া চুম্বন দেওয়া বা নেওয়া তাদের রীতি। কাজেই বিদেশী চলচ্চিত্রে চুম্বন বা নগ্নতা তাদের দেশের উপর বা জনসাধারণের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করে না। কিন্তু ভারতবর্ষে চুম্বন দেওয়া-নেওয়া রীতি নয়। হয়ত কোন কোন হোটেলে বা নাইট ক্লাবে হয়ে থাকে। কিন্তু সেটি করে থাকেন কোন গণিকা নারী নেহাতই পয়সার জন্য। তবে এদেশের ছবিতে যদি কোনো দৃশ্যে দেখা যায়, তার পুত্রকে পবিত্র চুম্বন এঁকে দিলেন সেটাকে আমি খারাপ বলব না। কিন্তু কোন নাইট ক্লাবের দৃশ্যে হয়ত নগ্ন নৃত্য বা প্রেমিক-প্রেমিকার চুম্বন দেওয়া-নেওয়া আছে সেটা আপত্তিজনক। সেটা সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শিল্পের দিক দিয়ে ক্ষতিকর। আমার মনে হয়, বাংলা চিত্রজগত তো বটেই এমন কি বোম্বাই চিত্রজগতেরও অনেক তারকা আছেন যাঁরা এতে রাজী নন। এবং রাজী না হওয়াই উচিত। বর্তমানে এমন অনেক চিত্র-নির্মাতা এবং পরিচালক আছেন যাঁরা পয়সার জন্য এটাকে মেনে নিতে পারেন। কিন্তু আমি তাঁদের অনুরোধ জানাচ্ছি, তাঁরা যেন পয়সার জন্য দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতিকে নষ্ট না করেন। যদি তাঁরা চুম্বন ও নগ্নতার পরিবর্তে সুরুচিদ্যোতক দৃশ্য দেন তবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান যে আরও বাড়বে সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা আছে চিরদিন যেন সেই উচ্চ ধারণাই থাকে। ভারতবর্ষ একেই সমস্যাপূর্ণ দেশ তার মধ্যে যদি আবার চুম্বন ও নগ্নতার সমস্যা জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে এমনি করে সমস্যা দিন দিন বেড়েই যাবে। এই সঙ্গে আমি হিন্দি ছবি নির্মাতাদেরও, বলছি তাঁরা যেন হিন্দী ছবির মধ্যে এই সব দিয়ে হিন্দী ছবিকে অবনতির চরম পর্যায়ে নামিয়ে না দেন। আমার বিশ্বাস ভারতীয় চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা অনেকেই স্বাগত জানাবেন না। এবং না জানানোই উচিত।

পঙ্কজকুমার দাস
জামসেদপুর-৪।

(২৫)

আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক 'অমৃত'র পর পর কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত 'চুম্বন ও নগ্নতা' বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের বক্তব্য পাঠ করে আমার মনে কয়েকটি জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। সেই প্রশ্নগুলি আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হলে হয়ত কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সদুত্তর দিতে সক্ষম হবেন, এই আশায় প্রশ্নগুলি পাঠালাম।

১নং খোসলা কমিটির সুপারিশ কোন চুম্বন সম্বন্ধে করা হয়েছে? বর্তমানে অনেক ছবিতেই মাতা-পুত্র, পিতা-পুত্রীর চুম্বন দৃশ্য দেখা যায়! যদি তা না হয়, যদি সেটা যুবক-যুবতীর চুম্বন সম্পর্কে হয় তা হলে উভয়ের মধ্যে চুম্বন দৃশ্য দর্শন ছাড়া কি ভালোবাসার গভীরতা প্রকাশের অন্য কোন মাধ্যম নেই? না, থাকলেও, চুম্বন দৃশ্য কি বেশী মর্মগ্রাহী?

২নং কোনো চলচ্চিত্রে চুম্বন দৃশ্য দর্শনের পর দুইটি কিশোর-কিশোরী যদি পরস্পরকে চুম্বন করে, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমার কর্তব্য কি?

৩নং নগ্নদৃশ্য দর্শনের দ্বারা মানুষের উপলব্ধিকে কতদূর বাড়ানো যায়? এবং এই উপলব্ধি শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে কতদূর বিস্তার লাভ করে?

৪নং আধুনিক সভ্য জগতে চলচ্চিত্র শিক্ষাবিস্তারের একটি অন্যতম মাধ্যম হলে, চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা আমাদের মধ্যে কোন শিক্ষার প্রসার ঘটাবে?

৫নং নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি কিশোর-কিশোরীরা আগ্রহশীল একথা সত্য হলে নগ্নদৃশ্য কি কোনরূপ প্রভাব বিস্তার না করেই বক্তব্যকে মর্মগ্রাহী করতে সমর্থ হবে?

৬নং চলচ্চিত্রে 'চুম্বন ও নগ্নদৃশ্যের' স্বাধীনতা নৈতিক চরিত্রে কোন ক্ষতি না করলে মঞ্চে বা যাত্রাতেও এর প্রয়োগ নিশ্চয়ই অবাঞ্ছনীয় হবে না?

৭নং আমাদের দেশে এতদিন পর্যন্ত চুম্বন ও নগ্নতাকে বর্জন করা হয়েছে কেন?

পরেশনাথ চৌধুরী
কলকাতা-৪২।

(২৬)

চুম্বন ও নগ্নতা সম্বন্ধে অমৃতে আপনাদের বিশেষ প্রতিনিধির রচনা এবং তারপর 'অমৃতে' প্রকাশিত কয়েকখানি চিঠি পড়লাম। আশা করি ঐ সম্বন্ধে আমার এই চিঠিখানি আপনাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে প্রকাশ করে আপনাদের নিরপেক্ষতার ধারা বজায় রাখবেন। আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিগুলি পড়ে একটা জিনিস চোখে পড়ল—দুটি বিপরীত-মুখী চিন্তাধারা, ঐতিহ্যকে সংস্কার দিয়ে ঘিরে রাখা অথবা ঐতিহ্যের বাঁধন আলগা করে নতুন গতিপথে চলা। কিন্তু আসল ব্যাপারটি উভয় পক্ষেরই দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেছে। সেই দিকটা হচ্ছে রাজনৈতিক দৃষ্টি-ভঙ্গি, আজ ভারতবর্ষে প্রতিটি ব্যাপারই রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সময় হয়েছে। যে যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীরা নতুন রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়ে ভারতমুক্তির পথে পদক্ষেপ করছে, ঠিক সে সময়ে চলচ্চিত্রে নগ্নতা ও চুম্বনের প্রবেশ বিরাট রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করছে। হিন্দি ও ইংরেজি ছবিগুলি যখন তরুণ জীবনকে ইতিমধ্যেই গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দিচ্ছে ঠিক সেই সময়ে নগ্নতা ও চুম্বন যুবসমাজকে ভারতের মুক্তির পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্থূল চিন্তাধারার মধ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। অবশ্য অতীতের মোহ ও সংস্কার মানুষকে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন করে রাখতে পারে। তাই প্রয়োজন হয় যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলার। কিন্তু সেভাবে বলতে গিয়ে যদি সুস্থ চিন্তাধারাকে পঙ্গু করে রাখতে হয় তবে সে পথ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। 'ছবির প্রয়োজনে' ছবিতে নগ্নতা ও চুম্বনের প্রবেশ ছবিকে খুব একটা শিল্প-সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে কি? সমাজ-তান্ত্রিক দেশের ছবিগুলি কি যথেষ্ট শিল্প-বোধসম্পন্ন নয়? না সত্যজিৎ রায় বা তপন সিংহের ছবিগুলি কম শিল্পবোধ-সম্পন্ন? তাই আমার মনে হয় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা বিচার করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার সময় হয়েছে—বাংলা কি এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দেবে না?

সমীর সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৫০।

ভুবন সোমের একটি দৃশ্য

মৃণাল সেনের অসাধারণ ছবি ভুবন সোম

প্রেক্ষাগৃহ

মৃণাল সেন প্রযোজিত ও পরিচালিত হিন্দী ছবি "ভুবন সোম" দেখলুম এলিট সিনেমায়। ভুবন সোম—রেলের জবরদস্ত পদস্থ কর্মচারী, হাঁকডাকে সবাই তটস্থ। ঘুষের দায়ে টিকিট চেকারবাবুকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করবেনই করবেন; কিন্তু কেমন একটা অজ্ঞাত চাপা অস্বস্তি মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। ফাইলপত্র সব ফেলে রেখে একঘেয়ে কর্মজীবন থেকে ছুটি নিয়ে সোমবাবু বেরিয়ে পড়েন শিকারের অছিলায়। কাছাকাছি কোথাও নয়, দূরপাল্লার রেলে চেপে তিনি যেন যেতে চান পৃথিবীর এক জনবিরল প্রান্তে, যেখানে আছে বন আর বন এবং সেই বনে আছে বাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি যত বুনো হিংস্র প্রাণী, যাদের এক এক গুলিতে ঘায়েল করে তিনি পরিতৃপ্ত হবেন, পুরমানন্দ লাভ করবেন। কিন্তু দেখা গেল, গরুর গাড়ী চড়ার ধকলেই কাবু হয়ে পড়ে সোমবাবুর শরীর, আর গ্রাম্য মোষের তাড়া খেয়ে তিনি ভয়ে একেবারে এতটুকু। অতএব জীবজন্তুর পরিবর্তে পক্ষীশিকারই শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল। শিকারীর বাহার দেখে গ্রাম্য ললনার মনে জাগে সহানুভূতি; সে রাস্তার ওপরই খাটিয়া বিছিয়ে দেয় তাঁর বিশ্রামের জন্যে, তাঁকে পরামর্শ দেয়, 'তোমার ঐ বিচিত্র ধড়াচূড়ো ছেড়ে আমাদের গ্রামের পুরুষদের পোশাক পরো, আর হাতে ধরো লাঠি, যাতে পাখীগুলো তোমাকে এই গাঁয়ের লোক ভেবে নিশ্চিন্তে বসে থাকে।' কিন্তু যখন শিকারী বীরের গুলি ছোঁড়াই সার হয়ে দাঁড়াল, পাখীর গায়ে একটাও লাগল না, তখন তার ব্যর্থতা গ্রাম্য ললনার মনে সহানুভূতি জাগিয়ে তুলল। সে মোক্ষম উপায় আবিষ্কার করল; শিকারীকে গাছের ডালে ভূষিত করে একটি নকল বৃক্ষে পরিণত করল পাখীদের ধোঁকা দেবার জন্যে। এবারে সাফল্য এল; একটি হাঁস পড়ল; কিন্তু দেখা গেল, গুলিতে নয়, ভয়ে হাঁসটি পড়েছে। এরই ফাঁকে মেয়েটি জেনেছে তার অতিথি রেলে কাজ করে এবং সেই দুর্দান্ত সোমবাবুকেও চেনে, যিনি নাকি তার স্বামীকে ঘুষ নেবার অপরাধে বরখাস্ত করতে বদ্ধপরিকর। তাই অতিথিকে সে অনুরোধ জানায় সোমবাবুর কাছে আর্জি করতে, যাতে তার স্বামীর চাকরীটি থাকে; নইলে বেচারার কোনোদিনই স্বামীর ঘর করা হবে না।—যে ভুবন সোম শিকার অভিযানে রওনা হয়েছিল, শিকার উপলক্ষ্যে সরলা গ্রাম্য ললনার সাহচর্যে দিন কাটানোর পরে সেই ভুবন সোমের পরিবর্তন ঘটেছে—হৃদয়ের পরিবর্তন, অনুভূতির পরিবর্তন, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, কঠিন শামুকের খোল থেকে তার মনটা বেরিয়ে এসে সবার মাঝে তখন ছড়িয়ে গেছে। তাই গ্রাম্য ললনার অনুরোধ রক্ষা করা তার পক্ষে সহজ হয়েছিল।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'ভুবন সোম'-এর চিত্রায়ণে প্রযোজক-পরিচালক মৃণাল সেন একটি অত্যন্ত অভিনব অনন্য রীতি অবলম্বন করেছেন। এই অভিনবত্ব কোথাও টেকনিকে, কোথাও পরিস্থিতি রচনায়, আবার কোথাও-বা সংলাপ ও ব্যবহারের মাধ্যমে চরিত্রচিত্রণে। এর প্রতিটি ফ্রেমে একটি ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত মননশীলতার পরিচয় বিদ্যমান। তবু বলব, ছবির যেখানে গ্রাম্য ললনাটির সঙ্গে সোমবাবুর প্রথম সাক্ষাৎ, সেইখান থেকে শুরু করে তার কাছ থেকে সোমবাবুর শেষ বিদায় গ্রহণ পর্যন্ত অংশটি একটি অশ্রুত সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মতোই অনির্বচনীয় মাধুর্য নিয়ে বিরাজ করছে। স্বীকার করতেই হবে, কিছুটা বাড়াবাড়ি আছে ছবিটির অন্যান্য স্থানে; ট্রেন-লাইন, গরুর গাড়ী চালানো এবং মোষের তাড়া খেয়ে ছোটার দৃশ্যগুলিকে সংক্ষেপিত করবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

ছবিটির দুটি বিশেষ সম্পদের মধ্যে একটি হচ্ছে, প্রাণশক্তিরেশের বীহর্দ্‌শাগুলি এবং অপরটি হচ্ছেন গ্রাম্য ললনার গৌরীর ভূমিকায় কুমারী সুহাসিনী মুলে। বাঙলা ও হিন্দী ছবিতে আজ পর্যন্ত বহু মেয়েকেই গ্রাম্য সুন্দরীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি। কিন্তু সুহাসিনী মুলের মতো এমন অবলীলাক্রমে একজন যথার্থ গ্রাম্য ললনায় রূপান্তরিত হয়ে যেতে আজ পর্যন্ত আর কাউকেই দেখিনি। কি আশ্চর্য সুন্দর তাঁর হাসিটি; সার্থক তাঁর সুহাসিনী নাম। তাঁর প্রতিটি বাচন, প্রতিটি ভঙ্গী, খালি গলায় গান কী অপরূপ মায়াজালেরই না সৃষ্টি করে প্রতিটি দর্শকের মনে! গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বেশে শেখর চট্টোপাধ্যায় বেশে, বাচনে, সঙ্গীতে একটি আস্ত গাড়োয়ানের রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন। গ্রাম্য ললনার পিতা ও পথিকের ভূমিকায় যথাক্রমে রোচক পান্ডিত ও পুণ্য দাস চরিত্র দুটিকে জীবন্ত রূপে প্রতিভাত করেছেন। গ্রাম্য ললনার স্বামী, ঘুষখোর টিকিট-চেকারের ভূমিকায় সাধু মেহের তাঁর চাউনিতে একটি নিরূপায়ধমন্য অপরাধীর চেহারা ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ভুবন সোমের ভূমিকায় উৎপল দত্ত কিছু একজন বলিষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা রূপেই প্রকট হয়েছেন: সব সময়েই মনে হয়েছে, এই বিশিষ্ট ভূমিকা-টিতে তিনি অভিনয় করেছেন বেশ দাপটের সঙ্গে।

ছবির কলাকৌশলের সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, মৃণাল সেন এই ছবির প্রযোজনা ব্যাপারে বর্তমান চল-চ্চিত্রজগতের কোনো পেশাদারী কলা-কুশলীর সাহায্য গ্রহণ করেননি। মাত্র শব্দানুলেখনের জন্যে তিনি নিউ থিয়েটার্সের বিগত যুগের শব্দযন্ত্রী লোকেন বসুকে নিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া অধিকাংশ কলাকুশলীই পুনা ফিল্ম ইন্সটিটিউটে শিক্ষাপ্রাপ্ত। এ'দের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন চিত্রগ্রহণে কে কে মহাজন। সৌরাষ্ট্রের সমুদ্রতীরবর্তী সমতল প্রান্তর ও বেলাভূমির রূপ তিনি যে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফিল্মের মধ্যে ধরেছেন, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। কাহিনীর মেজাজের সঙ্গে তাঁর ক্যামেরা আশ্চর্য সহযোগিতা করেছে। সম্পাদনাতেও প্রচুর মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়; তবে অনুমান করা কঠিন নয়, এর পিছনে শ্রীসেনের নিজস্ব চিন্তাধারা অনেকখানি কাজ করেছে। ছবির ফ্রেমকে ওপর-নীচ থেকে চুপ্স করে ভুবন সোমের মনের কথা বাঙলায় বলানো এই অনুমানের একটি বিশিষ্ট নজীর।

ছবিটির আর একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ হচ্ছে এর সঙ্গীতাংশ।—আবহ সৃষ্টির জন্যে এমন যন্ত্রসঙ্গীত সৃষ্টি ও ব্যবহার আমরা কচিৎ দেখেছি। সঙ্গীত পরিচালক বিজয় রাঘব রাও-এর চলচ্চিত্র-সঙ্গীতরচনা আমা-দের বহু সুরস্রষ্টাকেই নতুন ভাবনায় ভাবিত করবে।

মৃণাল সেন প্রযোজিত-পরিচালিত হিন্দী ছবি "ভুবন সোম" নিঃসন্দেহে শুধু হিন্দীই নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রজগতে একটি নব দিগন্তের সন্ধান দিল।

শরৎ-রচনার নব চিত্রায়ণ

শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া'তে কালো মেয়ের বিবাহ সমস্যা নিয়ে যে ভাবোচ্ছ্বাস আছে, আজকের দিনের পাঠক মহলের কাছে তার আবেদন কতখানি, সে প্রশ্ন না তুলেই বলব, এই উপন্যাসটির প্রথম বাঙলা চিত্ররূপ হবার দীর্ঘ বাইশ বছর পরে বি এন রায় প্রোডাকসন্স-এর সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'মা ও মেয়ে' নামধারী এই দ্বিতীয় চিত্ররূপটি অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার অন্তরের নিভৃত অন্তস্তলে পোষিত আশাটির চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার বেদনা-দায়ক কাহিনীটি প্রকাশে নতুন শিল্প-ভাবনার পথে না গিয়ে চিরাচরিত ধারাতেই অগ্রসর হয়েছে। নতুনত্বের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল, সম্ভবত কিছুটা বৈচিত্র্যের অবতারণার জন্যেই নায়ক অতুলের গ্রাম্য বন্ধুদের এক 'হরিশপুর ড্রামাটিক ক্লাব' সংক্রান্ত কিছু নাটক মহলা দেওয়ার দৃশ্যা-বলী যোগ করা হয়েছে। কিন্তু মূল কাহিনীর অঙ্গীভূত না হওয়ায় এগুলিকে নিতান্ত অবান্তর ছাড়া আর কিছুই মনে করবার উপায় নেই। অনির্দেশ্য কারণে ছবিতে আর একটি নতুনত্ব সংযোজিত হয়েছে; ছবির প্রস্তাবনা এবং উপসংহার দৃশ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় সাধারণভাবে সুসজ্জিত হয়ে শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহে 'অরক্ষণীয়া' পড়া শুরু করলেন এবং শেষ করলেন। যদি এই দৃশ্য দুটি মারফত বলবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে, 'অরক্ষণীয়া'

পড়তে পড়তে পাঠিকা মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানদার সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়লেন অর্থাৎ নিজেকে জ্ঞানদার স্থলাভিষিক্ত করে তার ব্যথা-বেদনা অনুভব করতে চাইলেন, তাহলে বলব, সে-ক্ষেত্রে কাহিনী বিবৃত করার পন্থাটি পরিবর্তন করার প্রয়োজন ছিল। এই দুটি নতুনকে বাদ দিলে কিন্তু চিত্রনাট্য মূলে কাহিনীকে যে যথাযথভাবে চিত্রিত করবার প্রয়াস পেয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে জ্ঞানদা ও তার মা দুর্গামণির ব্যথা-বেদনা যথেষ্টই প্রকাশিত হয়েছে একথা অনস্বীকার্য। এমন কি, হোলির গানের মাধ্যমে (কালা, তোর ওই কালা মুখ দেখাস নে আর) অতুলকে ধিক্কার দেওয়ার প্রচেষ্টাটিও প্রশংসনীয়ভাবে সুন্দর হয়েছে। অবশ্য কাহিনীর গোড়ার দিকেই অতুলের পান নেবার ছলে ঘরে ঢুকে জ্ঞানদার হাতে নিজে চুড়ি পরানোর মধ্যমে প্রেমের কিছুটা অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি শরৎ-রচনাকে অতিক্রম করে গেছে। এই আতিশয্যপূর্ণ ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় এবং মনে হয়, শরৎচন্দ্রের অনভিপ্রেত।

'অনিন্দ্যগঠন, আয়ত চোখ শান্ত স্বভাবের কালো মেয়ে জ্ঞানদা'রূপে মৌসুমী চট্টোপাধ্যাকে সুন্দর মানিয়েছে। আর 'বালিকা বধূ'র রজনী নামে সেই প্রগল্‌ভা মেয়েটির এই ছবির জ্ঞানদা বেশে অত্যন্ত ধীর, শান্ত, আনতনয়না, সংযতবাক চরিত্র-চিত্রণ দেখে আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। জ্ঞানদার

মৌসুমী মন/মিতা
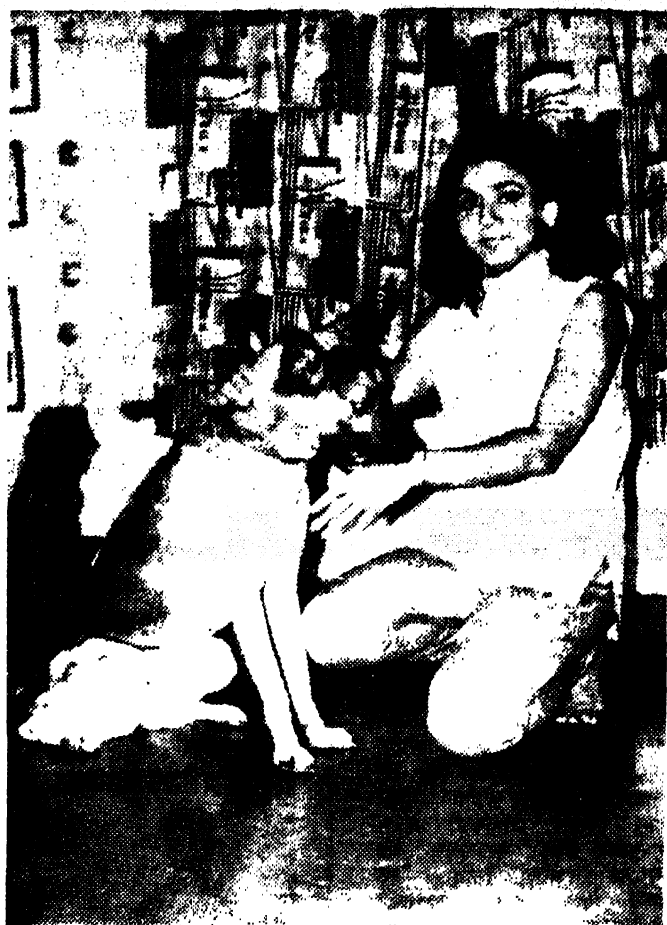
কালো রূপ এবং সংযত আচরণ সম্পর্কে পরিচালক সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব যে অনেকখানি, এটুকু নিশ্চয়ই অনুমান করে নিতে পারা যায়। অতুলের বিশ্বাসঘাতকতা যখন চরমে পৌঁছেছে, তখন আমরা জ্ঞানদার ব্যথিত দৃষ্টিকে প্রত্যক্ষ করেছি বটে, কিন্তু ছবির প্রথমাংশে অতুল সম্পর্কে তার চাপা আবেগ, পরে যখন সে বলছে 'তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে', তখন তার মনের ভিতরকার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব এবং সব শেষে মায়ের মৃত্যুর পরে তার মনের সর্বহারা ভাব শ্রীমতী মৌসুমী শ্যামা চোখের দৃষ্টি বা ভাবভঙ্গীতে আরও সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ ছিল। দুর্গামণি বেশে সন্ধ্যারাণী (অরক্ষণীয়া প্রথম বাঙলা সংস্করণের জ্ঞানদা) অনূঢ়া কন্যার বিবাহ সমস্যাকে ঘিরে চরিত্রটির জ্বালা যন্ত্রণাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানদার বিবাহ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু আত্মজার প্রতি দুর্গামণির অন্তর্নিহিত ভালোবাসা, যে ভালোবাসার বলে দুর্গামণি ভাবতে পেরেছিলেন, 'কে বলে, মেয়ে আমার দেখতে ভালো নয়! একটু কালো, কিন্তু কার মেয়ের এমন মুখ, এমন চোখ দুটি', সেই ভালোবাসার প্রকাশ তাঁর চরিত্র-চিত্রণে অনুপস্থিত। অবশ্য এ সম্পর্কে চিত্রনাট্যকারের দায়িত্বও স্মরণীয়। অতুলের চরিত্রটি শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দুর্বলভাবে অংকিত করেছেন। জ্ঞানদা সম্পর্কে তার পূর্বাপর আচরণের কোনো জবাবদিহি করা যায় না। বলা যেতে পারে, তার কোনো চারিত্রিক দৃঢ়তা নেই। একেবারে কাহিনীর শেষদিকে অপরূপ সাজে সজ্জিত জ্ঞানদার বিবাহার্থিনী পাত্রী রূপে লাঞ্ছনা থেকে শুরু করে দুর্গামণির চিতাবহ্নি নির্বাণের পর পর্যন্ত বিস্তৃত কালের মধ্যে অতুলের মানসিকতার আমূল পরিবর্তনের যে যুক্তিগ্রাহ্য বর্ণনা শরৎচন্দ্র দিয়েছেন, সেই পরিবর্তনকে চিত্রায়িত করবার কোনো চেষ্টাই করেননি 'মা ও মেয়ে'র চিত্রনাট্যকার। ফলে, নায়ক অতুলের ভূমিকায় স্বরূপ দত্তের অভিনয় অনেকটা অর্থহীন ও নির্জীব হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন কাজল গুপ্ত (ছোট বৌ), লীলাবতী (পোড়াকাঠ ভামিনী), প্রশান্তকুমার (অনাথ), গীতা দে (স্বর্ণমঞ্জরী), জীবেন বসু (প্রিয়নাথ), ছায়া দেবী (অতুলের মা) প্রভৃতি।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে শিল্প-

নির্দেশনা। কাহিনীর বেশীর ভাগই ঘটনা পল্লীগ্রামে। কৃত্রিম দৃশ্যপট ও বহির্দৃশ্যগুলি মিলিয়ে এই গ্রাম্য আবহটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। চিত্রগ্রহণও মোটের ওপর ভালো, যদিও আলদার কালো রূপটি সর্বত্র সমান রাখা যায়নি। ছবির চারখানি গানের মধ্যে হোলির গান এবং 'নিঠুর বিধিরে, এ তোমার কেমন বিচার বলো মা' গান দুখানি সুর ও গাওয়ার দিক দিয়ে সার্থকতা লাভ করেছে। আবহসঙ্গীত রচনাতেও নবাগত সঙ্গীত পরিচালক সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

বি এন রায় প্রোডাকসন্স নিবেদিত, অশোকা ফিল্মস পরিবেশিত এবং সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'মা ও মেয়ে' শরৎ-চন্দ্র লিখিত 'অরক্ষণীয়া'র সব চিত্রায়ণ হিসেবে দর্শক অভিনন্দন লাভের যোগ্য।

শিশু দেবদূত

বিজয়া ইন্টার ন্যাশনাল কৃত ও বি এন রেড্ডি প্রযোজিত নবতম চিত্র 'নানহা ফরিস্তা'র বাঙলা নাম হচ্ছে শিশু দেবদূত। হ্যাঁ, ঠিক দেবদূতেরই মতো ঐ গীতা নামে বাচ্চা মেয়েটি তিনটি দুর্ধর্ষ ডাকাতের জীবনে উদয় হয়েছিল এবং উদয় হয়ে তার নিষ্পাপ সরল শিশু মন দিয়ে তাদের হৃদয়কে জয় করেছিল। আজিজ, গোবিন ও জোসেফ—একজন মুসলমান, একজন হিন্দু এবং একজন খৃষ্টান—এরা তিনজনে সামাজিক অন্যায় এবং অবিচারের প্রতিবাদে নির্মম ডাকাতে পরিণত হয়েছে। হত্যা ও লুণ্ঠন হয়েছে এদের জীবনের ব্রত। এই ব্রতপালন স্বরূপ এক ধনী ও তার নর্ম-সহচরীকে হত্যা করবার পরেই তারা উপস্থিত হল ঐ গীতা নামে বাচ্চা মেয়েটির সামনে। সে তখন একা খেলায় ব্যস্ত। মিষ্টি মেয়েটির ভাবভঙ্গী দেখে, তার কথাবার্তা শুনে গোবিনের মন দ্রুত গলতে শুরু করল। আজিজ ও জোসেফ তাকে ফেলেই চলে যেতে চায়, কিন্তু গোবিন নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত তারই আগ্রহে ওরা ওকে তাদের দুর্গে নিয়ে গেল। সেখানে ওদের তিন ধর্মীয় ভজনা শিশু গীতাকে আকৃষ্ট করল। তাদের আদরের মুন্নি তাদের চোখের সামনে হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান বেশে হাজির হয়ে তাদের মন হরণ করল। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল তাকে খাওয়ানো নিয়ে; সে তার আরিমার হাতে ছাড়া খাবে না। ওরা বহু অনুসন্ধান করে ধরে নিয়ে এল তার আরিমাকে। আরিমা গীতাকে পেয়ে, গীতা আরিমাকে পেয়ে পৃথিবী ভুলে গেল। গীতা আর আরিমার কাছ ছাড়া হয় না; ওদের কারুর কাছেই ও যাবে না। ফলে ওরা তিনজনেই মনমরা হয়ে পড়ল। অপরদিকে আরিমা গৌরীর একান্ত চেষ্টা হল, কি করে এই ডাকাতগুলির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। তাদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেওয়া, বিষ প্রয়োগে তাদের হত্যা করা প্রভৃতি চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে গীতাকে নিয়ে লুকিয়ে পালাতে গিয়েও সে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল। এই সময়ে গীতা হঠাৎ পড়ল শক্ত অসুখে। আরিমার কথামত ওরা এসে হাজির করল ডাক্তার রামরতনকে, বলল—যে কোনো উপায়ে আমাদের আদরের মুন্নিকে বাঁচাতেই হবে। ডাক্তার লিখলেন ওষুধের নাম। সেই ওষুধ এল। কিন্তু পেছনে পেছনে এল পুলিশের গুপ্তচর, এসে ওদের আস্তানার সন্ধান নিয়ে গেল। ওষুধ প্রয়োগে মুন্নি বাঁচল, কিন্তু সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে ঘিরল ওদের দুর্গ। চলল গুলি বিনিময়। কিন্তু মুন্নির সাহচর্যে ওদের হয়েছে হৃদয়ের পরিবর্তন। তাই মুন্নিরই অনুরোধে ওরা করল পুলিশের হাতে আত্ম-সমর্পণ পাপের দণ্ড নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে।

কাহিনীটিকে কঠিন বাস্তব রূপ দেবার প্রচুর সুযোগ ছিল। কিন্তু তাহলে নাকি নিখিলজনচিত্তহারী ছবি তৈরী হয় না বলেই ভেবেছিলেন 'রাম ঔর শ্যাম'-এর প্রযোজক বি এন রেড্ডি। তাই নৃত্য, গীত ও লোম-হর্ষক ঘটনায় ঠাসা হয়ে দেখা দিয়েছে বিরাট রঙীন ছবি 'নানহা ফরিস্তা', যা দেখে সাধারণ দর্শকসমাজের উল্লাস গগনভেদী। ছবিটি নিশ্চয়ই গতানুগতিক নয়, এতে সাধারণ হিন্দী ছবির ছকে বাঁধা প্রেমকাহিনী পুরোপুরি অনুপস্থিত। একটি বাচ্চা মেয়ের প্রতি দুর্ধর্ষ ডাকাতদের স্নেহ হচ্ছে এর উপজীব্য এবং দ্রুতলয়বিশিষ্ট এই ছবি এরই সাহায্যে দর্শক হৃদয় জয় করেছে নিঃসন্দেহে। পরিচালক টি প্রকাশ রাওয়ের কৃতিত্ব এই যে, তিনি চিত্রকাহিনীটিকে এমনই দ্রুতগতিসম্পন্ন (ফাস্ট টেম্পোবিশিষ্ট) করেছেন যে, ছবির দোষ-ত্রুটি খুঁটিয়ে দেখবার অবসরই পায় না দর্শক শিশু দেবদূতের সম্মোহিনী কার্যাবলীর প্রতি আকৃষ্ট থাকার দরুণ।

সত্যিই, বাজী মাত করেছে বেবি রাণী ছোট্ট মেয়ে গীতার ভূমিকায়। কি স্বচ্ছন্দ তার আচরণ ও ভঙ্গী, কথাবার্তা ও চলা-ফেরা। অতটুকু মেয়ে যে অমন অনায়াসভাবে অভিনয় করতে পারে, এ চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। সে নেচেছে এবং গেয়েছেও। তিন ডাকাতের মধ্যে নিঃসন্দেহে গোবিনের ভূমিকায় প্রাণের অভিনয় সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আজিজ ও জোসেফ বেশে অজিত এবং আনোয়ার হোসেন তাঁদের গৃহীত ভূমিকার প্রতি সুবিচার করেছেন। আরিমার ভূমিকায় পদ্মিনী চরিত্রানুযায়ী স্নেহ, মমতা, অন্ত-র্নিহিত বেদনা প্রভৃতি প্রকাশ করেছেন। ডাকাতদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে গৌরীর কার্যকলাপ তার চরিত্রের পক্ষে আমাদের কাছে কিছু বিসদৃশই ঠেকেছে। এ ছাড়া বলরাজ সাহনী (ডাঃ রামরতন), মুকরী (ট্রেন প্যাসেঞ্জার হরচরণ চৌবে), সুন্দর (হরবচনের সঙ্গী যদু), পণ্ডরী

অজয় কর পরিচালিত মাল্যদান চিত্রের নায়িকা নন্দিনী মালিয়া। ফটো : অমৃত

বাঈ (অন্ধ নারী) প্রভৃতি উল্লেখ্য অভিনয় করেছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ উচ্চ প্রশংসা দাবি করতে পারে। বিশেষ করে মার্কাস বার্টলের রঙীন চিত্রগ্রহণ এবং এস কৃষ্ণরাওয়ের শিল্পনির্দেশনা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচায়ক। সাহির লুধিয়ানী লিখিত তিনখানি গানই (একখানি গান দুবার গাওয়া হয়েছে) কল্যাণজী আনন্দজী দ্বারা সুরসমৃদ্ধ হয়ে দর্শক-হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছে।

বিজয়া ইন্টার ন্যাশনালকৃত ও দামানী পিকচার্স পরিবেশিত রঙীন ছবি 'নানহা ফরিস্তা' বেবি রাণীর অভিনয়সমৃদ্ধ ও বিরাট পটভূমিকায় রচিত একটি সর্বজন-মনোহারী চিত্র।

আকারগত সৌসাদৃশ্যের জয়জয়কার

দুটি চেহারার আশ্চর্য মিলকে অবলম্বন করে সম্প্রতিকালে অন্তত ডজনখানেক হিন্দী ছবি নির্মিত হয়েছে। বিজয়লক্ষ্মী পিকচার্স (মাদ্রাজ) নিবেদিত এবং সুন্দরলাল নাহাটাও দুন্ডি প্রযোজিত রঙীন ছবি 'জিগরী দোস্ত' ঐ ডজনখানেকের ওপর আর একটি। বলা হয়েছে, পল্লীগ্রামের নিরক্ষর রাখাল গোপী গোয়ালা এবং শহুরে শিক্ষিত উকীল আনন্দের মধ্যে যে আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য, তাকে ভগবানের লীলাখেলা, প্রকৃতির খেয়াল বা স্রেফ আকস্মিক ঘটনা, যা-খুশী বলা চলে। কিন্তু আকস্মিক সাদৃশ্যটি না থাকলে 'জিগরী দোস্ত' কাহিনীটিই রচিত হতে পেত না এবং ঐ সাদৃশ্য আছে বলেই ঐ দুজনের জীবন নিয়ে বহু নাটকীয় পরিস্থিতিকে সম্বল করে একটি চমৎকার উপভোগ্য ছবি সাধারণ্যে উপহার দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অ্যাডভোকেট নারায়ণ প্রসাদ বর্মা ও তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের হবু-জামাই আনন্দের শুভাগমনের জন্যে। কিন্তু আনন্দের বদলে এসে পৌঁছুল গোপী মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তাকে হত্যা করবার চেষ্টার দায়ে আদালতে অভিযুক্ত করবার অভিপ্রায়ে। সস্ত্রীক শ্রীবর্মা এবং তাঁদের মেয়ে শোভা গোপীকে আনন্দ ভেবে নিয়ে খুব খাতির শুরু করে দিলেন। সে বেচারা বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বলবার সুযোগই পেল না যে, সে আনন্দ নয়, গোপী। অন্নপূর্ণা যখন দেখলেন, তাঁর হবু-জামাই লেখাপড়া জানা উকীল হয়েও গরুর দুধ দুইতে ও গরুকে সামলাতে ওস্তাদ তখন তাঁর আর আনন্দ ধরে না।

সারল্যেভরা গোপীকে যখন মনে-প্রাণে ভালোবেসে ফেলেছে, তখন আনন্দ এসে হাজির এবং গোপীকে দেখে সে বিস্ময়ে হতবাক—চেহারার এমন আশ্চর্য মিলও হয়! গোপী নারায়ণ প্রসাদের ভুলের কথা আনন্দের কাছে প্রকাশ করে গ্রামে চলে যেতে চায়। কিন্তু আনন্দ গোপীকে যেতে দিতে চায় না। সে বলে, শোভা যখন তাকে ভালোবেসে ফেলেছে, তখন তার যাওয়া চলে না। কারণ আনন্দ ইতিমধ্যেই চেয়ারম্যান নীলকণ্ঠের মেয়েকে ভালোবেসে ফেলেছে। কিন্তু যখ প্রকাশ পেল যে, ঐ নীলকণ্ঠ আনন্দর বাপে হত্যা করে তার সম্পত্তি ভোগ করছে, তখ আনন্দ পড়ল সংকটে। একদিকে নীলকণ্ঠে মেয়ে ইন্দুর ভালোবাসা, অন্যদিকে বাপে হত্যাকারী নীলকণ্ঠ নিজে। আনন্দের এ সমস্যার সমাধানে গোপী করল অকু সহায়তা; কারণ আনন্দ হচ্ছে গোপীর প্রাণে দোসর, জিগরী দোস্ত। কিভাবে সমস্য সমাধান হল তাই নিয়েই ছবির শেষ উত্তেজ অংশ রচিত।

আনন্দ এবং গোপী—এই উভয় ভূমিকা জীতেন্দ্র দুই বিপরীতমুখী চরিত্র-চিত্র কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অ্যাডভোকেট নারায় প্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণারূপে যথাক্র আগা ও নিরুপা রায় তাঁদের নাটনৈপুণে স্বাক্ষর রেখেছেন। নীলকণ্ঠের আধুনিকা ক ইন্দুর ভূমিকায় কোমল নামে নবাগতা অ নেত্রীটি ভবিষ্যৎ সার্থকতার তার প্রতিশ্রু রেখেছেন। শোভা বেশে মমতাজ যতট অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন, তার সদ্ব্যবহ করবার ত্রুটি করেননি। খল চরিত্র নীলকণ্ ভূমিকায় কে এন সিং স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন। প্রাণখোলা ছেলে কান্ত বেশে জগদীশ তাঁর সাবলীল স্বচ্ছ অভিনয়ে সকলকেই খুশী করেছে

রুক্তুরের ...প্রেমিকারূপে অরুণা ইরাণীও সার্থক অভিনয় করেছেন।

পরিচালক রবি নাগাইচ নিজেই চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব বহন করেছেন। এবং তা অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ভাবেই। একই অভিনেতাকে দুই বিপরীতমুখী ভূমিকায় রেখে সার্থকভাবে চিত্রগ্রহণ রীতিমত দক্ষতার পরিচায়ক। এ ব্যাপারে সম্পাদক এন এস প্রকাশম-এর সহযোগিতাও অবশ্যই প্রশংসনীয়। এস কৃষ্ণরাওয়ের শিল্পনির্দেশনা ছবির একটি বিশিষ্ট সম্পদ। আনন্দ বক্সী রচিত মধুর গানগুলি লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল রচিত সুরে, সমন্বয়ে মোহাম্মদ রফী, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, সুমন কল্যাণপুর প্রভৃতি দ্বারা গীত হওয়ায় যে অত্যন্ত শ্রুতিসুখকর হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

সুন্দরলাল নাহাটা প্রযোজিত 'জিগরী দোস্ত' হিন্দী ছবির সাধারণ দর্শককে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে।

রবীন্দ্রসদনে যাত্রাউৎসব

রসপিপাসু বাঙালী চিত্তের সঙ্গে যাত্রার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন, তাই সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার প্রহরে পালাগানের আবেগ আজকের প্রশ্নমথিত বিংশ শতাব্দীর সীমান্তেও আমাদের মানসিকতাকে আলোকিত করে, উদ্বুদ্ধ করে নতুনতর উপলব্ধির আলোয়। সম্প্রতি 'রবীন্দ্র সদন' মঞ্চে অনুষ্ঠিত যাত্রা উৎসব থেকে এই সত্য কি প্রতিষ্ঠিত হয়নি? নাট্যানুরাগীদের কাছে কুড়ি দিনের যাত্রা উৎসবের ইতিহাস যে বিশেষ একটি গুরুত্ব বহন করছে, সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়। ১৯৬২-র পর আর একটি গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ের উন্মোচন হোল ১৯৬৯-এ। সেদিন যাত্রার আসর ছিল শোভাবাজার রাজবাড়ীতে। আর এ বছর যাত্রা উঠে এলো আসর ছেড়ে মঞ্চে। মাঝের দুটি বছরের পালাগানের যে রূপান্তর তার সবটুকু বৈশিষ্ট্যই এই আনন্দমুখরিত উৎসবের প্রতিটি সন্ধ্যায় প্রাণের সুরে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিজলী আলোকমালায় ভরা শহর কলকাতার প্রাণকেন্দ্র চৌরঙ্গী পাড়ার কাছে যে 'রবীন্দ্রসদন' তাতে যে কুড়িটি সন্ধ্যা পালাগানের উদ্বেল মুখরতায় আনন্দের মেলায় টলমল করে উঠেছে, এ ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে স্মরণযোগ্য। আমাদের এই দেশীয় সংস্কৃতির এই অকৃত্রিম রূপটিকে নতুন করে সবার চোখের আলোয় তুলে ধরে যাত্রা উৎসবের পরিচালকমণ্ডলী সবার আন্তর অভিনন্দন পেয়েছেন।

মোট সতেরোটি পালা অভিনীত হয়েছে এবং পরে আরো চারদিন চারটি পালা হয়েছে পুনরভিনীত। উৎসবের সন্ধ্যাগুলোতে যেমন পুরানো পালা পরিবেশিত হয়েছে, তেমনি দেখেছি নতুন পালার স্বাতন্ত্র্য। নতুন পুরাতনের মেলবন্ধন হয়েছে সর্বাংগসুন্দর। কাহিনী, উপস্থাপনা, চরিত্র বিশ্লেষণ, বক্তব্য এবং আঙ্গিককে ষোলটি পালা নিজেদের মৌল বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। নাট্যানুরাগীরা যেমন এ উৎসবে যাত্রার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে রূপ লাভ করতে দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন সাম্প্রতিক নাটক ও সিনেমার বহু আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যকে। মঞ্চের আলোয় যাত্রা কেমন হবে এ বিষয়ে মনে যে প্রথম একটা সন্দেহ না ছিল এমন নয়, কিন্তু দেখার পর সন্দেহ অপসারিত হয়েছে একথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি।

সব রসেরই পালা যাত্রা উৎসবকে বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছে। সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক বিষয়বস্তুতে রচিত পালাগুলোর প্রায় অর্ধেকই নতুন, অর্থাৎ এ বছরের প্রযোজনা। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নট্ট কোম্পানী নিবেদিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি', সত্যম্বর অপেরার 'দিগ্বিজয়', নিউ প্রভাস অপেরার 'জ্বলন্ত বারুদ', বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজের 'পতিঘাতিনী সতী', ভারতী অপেরার 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন', নিউ গণেশ অপেরার 'মরেও যা মরে না' প্রভৃতি। নট্ট কোম্পানীর 'রামকৃষ্ণ-সারদামণি' একটি সার্থক প্রযোজনা হোতে পেরেছে। দর্শকরা এ পালা দেখতে দেখতে এক অবিস্মরণীয় মহাপুরুষের সহজ ও স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে গিয়ে যেন নিজেরা ধন্য মনে করেছেন। 'দিগ্বিজয়' নাটকের রচয়িতা আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত নাট্যকার মন্মথ রায়। যাত্রার জন্য এই প্রথম তাঁর পালা রচনা। শ্রীরায় যে নাদির শাহকে তাঁর পালায় এঁকেছেন সে কখনো প্রেমিক, কখনো বা আবার ভীষণতম ধ্বংসের সীমাহীন উন্মাদনায় প্রচন্ড দুর্বার। এ পালার প্রয়োগ ও অভিনয় প্রতিটি দর্শককেই প্রায় বিমুগ্ধ করেছে। 'নিউ প্রভাস অপেরার 'জ্বলন্ত বারুদ'ও একটি উল্লেখযোগ্য পালা। বহু দৃশ্যের শিহরণ দর্শকদের মনকে রোমাঞ্চিত করেছে। নাটকীয় আবেগে আর বলিষ্ঠ অভিনয়ে বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজের 'পতিঘাতিনী সতী' আর একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ কয়েকটি শিল্পীর সমন্বয়ে গঠিত এ পালা আরো অনেক বেশী জনপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায়।

মাস্টারদার অমর জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন' নাটকটির অভিনয় এ যাত্রা উৎসবের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। ভারতী অপেরা এ পালা পরিবেশন করে নাট্যানুরাগীর প্রশংসা কুড়িয়েছেন অনেক। কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাতে আর অভিনয়ের বলিষ্ঠতায় নিউ গণেশ অপেরার 'মরেও যা মরে না', মাধবী নাট্য কোম্পানীর 'আগুন নিয়ে খেলা' ও শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানীর 'পথের ছেলে'ও দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছে। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ পালা নাট্যভারতীর 'আন্দোলন'ও প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষ এক শ্রেণীর মতবাদ এ পালায় প্রাধান্য পাওয়ায় সর্বজনীনতা প্রতিহত হয়েছে ঠিক, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জ্যোৎস্না দত্তের আশ্চর্য অভিনয় সব ফাঁক ভরিয়ে দিয়েছে। জনতা অপেরার 'ফাঁসির মঞ্চে', সুশীল নাট্য কোম্পানীর 'রক্তে রাঙা হাঁসুলী ডাঙ্গা', নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরা 'এক টুকরো রুটি' উৎসবে অভিনীত আরো কয়েকটি নতুন পালা।

নতুন পালার সঙ্গে কিছু পুরানো পালায় খুব হয়েছিল যেমন—তরুণ অপেরার 'হিটলার', নবরঞ্জন অপেরার 'মাইকেল মধুসূদন', অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর 'চন্ডীতলার মন্দির', আর নিউ আর্য অপেরার 'রাইফেল'। ষোল দিন পরে আরো চারদিন যে সব পালা পরিবেশিত হয় তা হোল—সত্যম্বর অপেরার 'দিগ্বিজয়', বৈকুণ্ঠ যাত্রা সমাজের 'পতিঘাতিনী সতী', তরুণ অপেরার 'হিটলার', আর নট্ট কোম্পানী 'কংস'।

বিবিধ সংবাদ

কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদামীর ১৯৬৯ সালের পুরস্কার সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছে : নাটক—মন্মথ রায় (নাটক রচনা বাঙলা), হাবিব তানবীর (নাট্য প্রযোজনা, উর্দু), এন এন পিল্লাই (অভিনয়, মালয়লম), গ্রহণচন্দ্র গোস্বামী (ঐতিহ্যবাহী নাট্যকলা, আঁকিয়া নট, আসাম)।

সঙ্গীত—রামচতুর মল্লিক (হিন্দুস্থানী কণ্ঠ) দবীর খাঁ (হিন্দুস্থানী যন্ত্র বীণ), এম এম দন্ডপানি দেসিগর (কর্ণাটক কণ্ঠ), দেবকোট্টাই এ নারায়ণ আয়েঙ্গার (কর্ণাটক যন্ত্র—বীণা)।

নৃত্য—বাঝেনকাতে কুণ্ডু নায়ার (কথাকলি), থাংজামওবা ছাওবা সিং (মণিপুরী), তিরুবলপুত্তুর কে স্বামীনাথ পিল্লাই (ভরতনাট্যম—শিক্ষকতা), সিতারা দেবী (কথক)।

●

স্থির হয়েছে যে, **ভারতের চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসব** এই বছরের ৯ থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হবে নয়াদিল্লীতে। শোনা গেল অন্যান্য বারের মতো এই উৎসব দিল্লীর পরে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতাতে অনুষ্ঠিত হবে না। তবে উৎসবে প্রদর্শিত বিশিষ্ট ছবিগুলি যাতে এই সব শহরেও দেখানো হয়, তার জন্যে চেষ্টা চলছে।

●

গেল ৫ই অকটোবার মহালয়ার সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রযোজক শ্রীমতী সরকার ভারতের 'প্রথম মহিলা যাদুকর' কুমারী উমা দাশগুপ্তের ইন্দ্রজালের এক আসর বসিয়ে ছিলেন। বড় আসরে খ্যাতনামা যাদুকরদে প্রদর্শিত সব খেলাগুলিই কুমারী দাশগুপ্

অনায়াস ভঙ্গিতে দেখিয়ে উল্লাসি দর্শকদের সাধুবা কুড়িয়েছেন। তাঁ সহকারী কিশোর পিংকি, বাচ্চা ছে সন্দীপ এবং ভা তোষ, মনোর কালিদাস, তার প্রমুখেরা বড় খেলাগুলির প্রস্তুতিপর্বে বিরতিটুকু ছোট ছোট যাদুর খেল ভরিয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য এবং মুন্সিয়ান প্রমাণ রাখেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাক্সে মধ্যে বন্দিনীকে মুক্ত করে মুহূর্তমা কুমারী উমার স্বেচ্ছাবন্দিনী হওয়া অ প্রমোদমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান হয়ে দর্শকদ মধ্য থেকে তাঁর পুনরাগমন। সেদিন সন্ধ্যা নৃত্যসঙ্গীতকুশলা কুমারী দাশগুপ্ যাদুবিদ্যায় স্বভাবনৈপুণ্য দেখতে দেখ মনে হচ্ছিল কুমারী দাশগুপ্তের ম 'বাংলার ভানুমতীকে'ই যেন প্রত্যক্ষ করা

গেল মঙ্গলবার : ২১শে অকটো মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সোদপুরে বিজয়া সম্ লন উপলক্ষে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আ বসে। সভাপতি শ্রীব্যোমকেশ ঘোষ বিজয় তাৎপর্য এবং জাতীয় সংহতির ওপর মনে ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি ছি শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য। সঙ্গীতানুষ্ঠ অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী রতন দে, কল্যা ভট্টাচার্য, মিনতি ভট্টাচার্য, রঞ্জিৎ সি প্রমুখ স্থানীয় শিল্পীরা।

●

ফিল্ম অ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস ' ইণ্ডিয়া অনুমোদিত এবং শ্রীনাট্যম সং মঞ্চ পরিচালিত ২য় বার্ষিক শিশিরকু একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা আগামী ডিসেম্বর থেকে বারাকপুরের (জাফর রোড) 'সুভাষ মঞ্চে' অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তা আগামী ১১ নভেম্বর। সাংবাদিক, শিক্ষা শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে গ বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বি বিষয়ে পুরস্কার ও আরকাইভসের অভিজ্ঞ পত্র প্রদান করা হবে। উৎসবের প্রথম গত বৎসরের বিজয়ী সংস্থা ও শিল্পী পুরস্কার বিতরণ করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠ পৌরোহিত্য করবেন রবীন্দ্রভারতী দ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ রমা চৌধ বর্তমান বছরের প্রতিযোগিতায় যোগদ ঠিকানা : ১। আরকাইভস কার্যালয় (৫৫-১৬০০) : ৮১, বিধান সরণি, কলি ২। শৈলেশ মুখোপাধ্যায় (ফোঃ ২৪-৬৪ পানশিলা গভঃ কলোনী, সোদপুর পঃ)। ৩। শ্রীনাট্যম : চন্দনপুকুর, বারাক

জলসা

সদারং সংগীত সম্মেলন

এবার সদারং সংগীত সম্মেলন উদ্বোধন করেন স্বয়ং রাজ্যপাল। প্রধান অতিথি শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মার্গ সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে ধ্রুপদী আসর ও পাখোয়াজের প্রতি জোর দিয়ে ভারতীয় সংগীতের মর্যাদা গম্ভীর অধ্যাত্ম সম্পদের প্রতি আলোকপাত করেন। উপস্থিত সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত সমর্থন পেয়েছে তাঁর সুচিন্তিত এক অনুভব গভীর উক্তি "ভারতীয় সংগীতের কোনো বিশেষ জাতি নেই, ধর্ম নেই এবং নির্দিষ্ট গন্ডী নেই। ভারতীয় সংগীত পরমাত্মার পানে জীবাত্মার ঊর্ধ্বমুখী আকুতির প্রকাশ এবং এই সঙ্গীতের মুক্ত উদার প্রাঙ্গণে আমরা হিন্দু, মুসলমান এবং সকল ধর্মের মানুষ ..জাতিধর্মনির্বিশেষে এক হয়ে বসে রস উপভোগ করি। একমাত্র সংগীতোপভোগের ক্ষেত্রেই আমরা জাতিধর্মনির্বিশেষে মিলিত হতে পারি। এই বিভেদনাশী ব্যাপক সর্বজনীনতাই সঙ্গীতের স্ব-ধর্ম।"

অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্য—সদারং-এর আসর মন্দ্রিত হয়েছিল মহম্মদ দবীর খাঁর ছন্দগম্ভীর সারস্বত বীণের ধ্রুপদী বিস্তারে। এ যন্ত্র প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। তাই সেনী ঘরানার সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে এই প্রাচীন যন্ত্রের অনুষ্ঠান করে সদারং কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সংগীত ঐতিহ্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন।

কণ্ঠসঙ্গীতের আসরের প্রধান আকর্ষণ ওস্তাদ আমীর খাঁ, পন্ডিত ভীমসেন যোশী ও সঙ্গীত অলঙ্কার সুনন্দা পটনায়ক, আপনাপন সঙ্গীত ভাবনার বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল উদাহরণ যোগ করেন। আমীর খাঁর শান্ত সংযম, ভীমসেনের রঙিন ভাবাবেগ এবং সুনন্দার ভক্তি আবেগ ও কল্পনার ঐশ্বর্য শ্রোতাদের অভিভূত করেছিল।

তারাণা—আমীর খাঁর মধ্যলয়ের তারাণা তাঁর বিশেষ গায়কী ব্যক্তিত্ব ও শান্তির-সাধক—সঙ্গীত চিন্তার অনুকূল। এ তারাণা একমাত্র তাঁর কণ্ঠেই সৌন্দর্যদীপ্ত হতে পারে। সুনন্দা পটুনায়ক গোয়ালিয়র ঘরাণার তারাণায় লয়কারী ছন্দ, ত্রিবট পার্শী বোলের বিস্তার তান ও "দ্রি দ্রি"র দ্রুত স্পষ্ট উচ্চারণে যে পান্ডিত্য, দীপ্ত অনায়াসদক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তা শুধু চমকপ্রদই নয় — একমাত্র নিসার হোসেন ছাড়া তারাণায় তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই—প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞগণ এই অভিমত প্রকাশ করেন।

মিশ্র রাগ — প্রচলিত শাস্ত্রীয় রাগানুসারী হয়েও আপন শিল্পভাব ও কল্পনাকে বিস্তৃত করবার প্রচুর স্বাধীনতা ভারতীয় শিল্পীর আছে। তারই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখা গেল সদারং-এর বিশেষ কয়েকজন শিল্পীর অনুষ্ঠানে। পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীত অলংকার সুনন্দা পটুনায়ক যথাক্রমে স্ব-রচিত শ্যাম-কেদার ও সুবর্ণমুখী রাগ বিশ্লেষণ করেন। শ্রীমতী পটুনায়ক প্রচলিত মিশ্ররাগ "কৌষিকী-কানাড়া"ও গেয়েছেন।

এবারের নতুন শিল্পী সুলোচনা যজুর্বেদী, শ্রীকে এন বৃহস্পতি রচিত ইমনি বেহাগ ও অন্যাদা রঞ্জিনী গেয়ে শোনান।

নিখিল ও সুনন্দার শ্যাম-কেদার ও কৌশি কানাড়ায় এবং সুলোচনার ইমনি-বেহাগ শাস্ত্রসম্মতভাবে প্রথম রাগকে প্রধান করে এবং দ্বিতীয়টিকে অনুভাবী রূপে বিস্তার করা হয়।

স্ব-রচিত সুবর্ণমুখীতে সুনন্দা নট, নঞ্জি ও ছায়ার মিলনে আশ্চর্য পরিমিত বোধ প্রদর্শন করেছেন। তবে সুলোচনার অল্প-বিজ্ঞানী সুখশ্রাব্য হলেও রাগরূপ স্বচ্ছ নয়। কখনও পূরিয়া ধানেশ্রী, কখনও পূরিয়া আবার ধিবতে দাঁড়িয়ে প্রভাতী রাগের অভিষিক্ত দিয়েছেন।

বিরজু মহারাজের কত্থক নৃত্য আর এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান। এই প্রথম এবং সদারং সম্মেলনেই সুনন্দা পটুনায়কের সঙ্গে পন্ডিত ভি জি যোগকে বেহালা সঙ্গত করতে দেখা গেল। তবলায় ছিলেন কেরামৎ খাঁ। এ-সমন্বয় সম্মেলনকে বিচিত্রসমৃদ্ধ করেছে।

অন্যান্য অনুষ্ঠান—কণ্ঠসঙ্গীতে বহুদিন বাদে শ্রীমতী দীপালী নাগের উপস্থিতি আসরে বৈচিত্র্য এনেছে। আগ্রা ঘরাণার বৈশিষ্ট্যের এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তাঁর নটবেহাগ। এ কানন—বাগেশ্রী ও যোগশেষ-এর পর ঠুংরি গেয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন। মুণাববর খাঁর দরবারী কানাড়ায় বড়ে গোলাম আলি খাঁর গায়নশৈলী ছাড়াও শিল্পীর গাইবার আন্তরিকতা চিত্তস্পর্শী। তবে দরবারী-কানাড়ার মত রাগে তান-প্রাচুর্যের চেয়ে বিস্তার অঙ্গের ওপর আর একটু জোর দিলেই বোধহয় রাগমর্যাদার প্রতি বেশী সুবিচার হোত। ঠুংরী তরুণ শিল্পীর রঙিন মনের উচ্ছ্বাসে রূপসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

শিবকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর কণ্ঠে একটি অপ্রচলিত রাগ শোনা গেল 'কুসুম'—রাগটি মিষ্টি, পরিবেশনও সুন্দর। তবে, অধিকতর উপভোগ্য হয়েছিলো তাঁর নিধুবাবুর টপ্পা—যা প্রায়-লুপ্ত হতে বসেছে। এ অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক মূল্যও যথেষ্ট।

বাংলার প্রবীণ শিল্পী সত্যেন ঘোষালকে শ্রোতাদের সামনে উপস্থিত করার জন্য সদারং কর্তৃপক্ষ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। শ্রীঘোষালের জীবনব্যাপী সাধনা সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতা ও রাগের অন্তরে অনুপ্রবেশের ফলশ্রুতি তাঁর সেদিনের দরবারী কানাড়া—। বয়সের বাধা আর তাঁর পান্ডিত্য ও নিবিষ্টতাকে ম্লান করতে পারেনি।

সাফল্যদীপ্ত সাংস্কৃতিক অভিযানের পর সদারং-এর প্রথম অনুষ্ঠানে ইমরাৎ খাঁ। বাম দিক থেকে কেরামৎ খাঁ, রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইমরাৎ খাঁ, কালিদাস সান্যাল এবং দীপক মুখোপাধ্যায়

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে উজ্জ্বল সম্ভাবনার আশ্বাস পাওয়া গেছে বেশ কয়েকজনের অনুষ্ঠানে। যেখানে কংকনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা ভট্টাচার্য ও সুভাষ চাকলাদার (যথাক্রমে আমীর খাঁ, কালিদাস সান্যাল ও সুখরঞ্জন চাকলাদারের শিক্ষাধীন)—আপনাপন শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কংকনার শুধু কল্যাণে শান্ত বিস্তার আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত। কণ্ঠও পরিশীলিত। আমীর খাঁর পরিবেশন পদ্ধতির সঙ্গে নিজস্ব মৌলিকতার মিলন ঘটলে প্রকাশভঙ্গী সুস্পষ্ট রূপ নেবে। আমরা সেই আশায় রইলাম। মীরা ভট্টাচার্যের 'কেদার'—সু-বিন্যস্ত পরিচ্ছন্ন।

টি এল রাণার সুযোগ্যা শিষ্যা জয়ন্তী বিশ্বাসের ধ্রুপদ ও ধামারে স্বাচ্ছন্দ্যতা, আঙ্গিক শৈলীর প্রতিষ্ঠা ও লয় দক্ষ বিস্তার গুণীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে।

সুভাষ চাকলাদারের 'মধুমন্তী' সুখশ্রাব্য হয়েছে শুধুমাত্র রাগমাধুর্যের কারণেই নয়। শ্রীচাকলাদার রাগের স্বচ্ছতার প্রতি যেমন দৃষ্টি রেখেছেন তেমনই সযত্নে পরিবর্জিত তার তান।

যন্ত্রসংগীতে — মহম্মদ দবীর খাঁর সারস্বত বীণের কথা ত প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ বছরই ইনি যন্ত্রসংগীতে আকাদমি পুরস্কার পেয়েছেন। এঁর পরই যন্ত্রসংগীতের উজ্জ্বলতম মুহূর্ত পদ্মশ্রী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার। ইনি 'ছায়া' রাগে আলাপ এবং 'শ্যাম-কেদার' রাগে গত্ বাজিয়ে শোনান। ধ্রুপদী আঙ্গিকে আলাপের শিল্পসম্মত বিস্তার শিল্পীর পরিণত ধ্যান ও চিন্তার প্রতি আলোকপাত করেছে।

'শ্যাম-কেদার' সরমপগসা ও সম্পূর্ণ অবরোহীতে বিস্তারের সুবিস্তৃত অবকাশ ছিল। কিন্তু আশ্চর্য সংযমে তা গতের অঙ্গ অযথা প্রলম্বিত না করে বাজনাদীপ্ত রাগ বিশ্লেষণে শুধু পাণ্ডিত্যই নয় সুদক্ষ কারিগরীর যে স্বাক্ষর শিল্পী রেখেছেন—তা রীতিমত অনুধাবনের বস্তু। রাগের মর্যাদা গম্ভীর রসরূপ—উদ্ভেল হয়ে উঠেছে প্রতিবারই র-মা স্পর্শনের পর বৈচিত্র্যময় ভঙ্গীতে মধ্যমে স্থিতি এবং পরক্ষণেই স্পষ্ট তানের বিদ্যুতের চকিত ঔজ্জ্বল্য। ক্লাসিক্যাল ছাঁদ সম্পূর্ণ বজায় রেখে এমন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান সহজলভ্য নয়। তবে দুটি রাগই স্ব-ধর্মে এক হওয়ার দরুন অবশ্যম্ভাবী একঘেঁয়েমোর হাত এড়ানো নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয়নি। উপযুক্ত তবলা সঙ্গতে শিল্পীকে উদ্দীপ্ত করেছেন কানাই দত্ত।

ইমরাৎ খাঁর 'মিঞা-কি-মল্লার' তাঁর বেওয়াজী হাতের দাপট ও মাধুর্য সমভাবে ব্যক্ত। বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর ষষ্ঠেটি অংশের চমকপ্রদ লাগডাটি। তিনটি সপ্তকেই তার বিস্তারে শিল্পীর বিস্ময়কর দক্ষতা প্রশংসা করবার মত। তবে গান্ধারের প্রয়োগ যদি অত্যবেশী প্রকট না হোত বাজনা আরো ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পারত। গৌরবোজ্জ্বল বিদেশ সফরের পর এই তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান। তবুও সরোদী আমজেদ আলি খাঁর "আহির ভিরো" উচ্চমানের। কিন্তু শিল্পীর ঔদ্ধত্য ও অশালীন ব্যবহার তাঁর ভক্তদের এমনভাবে আঘাত করেছে যে উৎসুক মনও বিমুখ হয়ে রসোপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দুই শিল্পীর অনুষ্ঠান কিষণ মহারাজের তবলাসঙ্গত সমৃদ্ধ।

পণ্ডিত ভি জি যোগের 'যোগকোষ' ও ঠুংরী শিশিরকণার শিষ্যা নিভা দাসের বেহালা প্রতিশ্রুতিদীপ্ত। না বলে পারছি না সদারং সংগীত সম্মেলনের মত এমন বিচক্ষণ এবং অভিজাত প্রতিষ্ঠান কর্তারাও বাহাদুর খাঁ ও শিশিরকণার মত সংগীতজগতের দুই উজ্জ্বল তারকাকে বিস্মৃত হলেন কেমন করে?

নৃত্যে—বিরজু মহারাজ সৃষ্ট রসোজ্জ্বল মুহূর্ত এ বছর সদারং-এর বিশেষ অবদান সে কথা ত প্রথমেই বলেছি। এ-ছাড়া রবী দত্ত এবং ভারতী রায়ও কথক নৃত্য পরিবেশন করেন। বিজয় চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা সহ ঠুংরীর অনুষ্ঠানে এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

পূর্বালীর চণ্ডালিকা

১১ অক্টোবর, '৬৯ সকাল দশটায় মহালয়ার দিন পূর্বালীর পরিবেশনায় কলামন্দিরে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা মঞ্চস্থ হয়। নৃত্যনাট্যে প্রথম নৃত্যাংশে অংশ নেন শ্রীমতী রমা গুহ-ঠাকুরতা প্রকৃতির ভূমিকায়। মা ভূমিকায় শ্রীমতী পলি গুহ। সংগীতাংশে শ্রীমতী ঋতু গুহ, শ্রীমতী কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা ও শ্রীঅর্ঘ্য সেন। নৃত্য পরিচালনার দায়িত্ব শ্রীশম্ভু ভট্টাচার্যের। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে একক সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র।

যদুভট্ট সংগীত সমাজের দ্বিবার্ষিক সংগীতানুষ্ঠান

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার সন্ধ্যায় ৮৮বি, দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বিজয় ভট্টাচার্যের সংগীতভবনে যদুভট্ট সংগীতসমাজের সংগীতানুষ্ঠান হয়। রাজা মণীন্দ্র কলেজের উপাধ্যক্ষ শ্রীনন্দলাল কুণ্ডু মহাশয় সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। উক্ত কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। সংগীতসমাজের পক্ষ থেকে কর্মাধ্যক্ষ শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ধ্রুপদ সংগীতের পুনরুদ্ধারকল্পে উপস্থিত বিশিষ্ট কলাকার ও অধ্যাপকগণের মতামত জানতে চান। এই আলোচনায় শ্রীযুক্ত কুণ্ডু ও সংগীতাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। আলোচনার প্রারম্ভে সমাজের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকালী ভট্টাচার্য বৈদিক মাঙ্গলিক স্বস্তিমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। মণীন্দ্র কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ স্বাগত জানান। এরপর সংগীতাচার্য শ্রীসত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি ভাষণে বলেন যে, মাঝে মাঝে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে ধ্রুপদ অনুষ্ঠানের একান্ত আবশ্যক। কলিকাতার বিবিধ সংগীত সম্মিলনীতে ধ্রুপদ অনুষ্ঠানার্থে কর্তৃপক্ষগণের অনুরোধ করারও প্রচেষ্টা আছে। বর্তমানে বি[illegible] পুরের ধ্রুপদ ঐতিহ্যের কলাকার যথোপযোগী গান-বাজনার ব্যবস্থা ক[illegible] জন্য অনুরোধ জানাতে হবে, এজন্য [illegible] পারিতোষিকে তিনি সংগীতানুষ্ঠানের [illegible] প্রস্তুত আছেন। এরপর শ্রীবন্দ্যোপা[illegible] বেহাগ রাগের আলাপ ও জয়-জয়[illegible] রাগের একটি ধ্রুপদ গেয়ে শ্রোতৃবৃন্দের [illegible] তাঁর প্রগাঢ় বিদ্যা ও স্বরসুষমা সঞ্চা[illegible] করেন। তাঁর সঙ্গে সংগতে প্রসিদ্ধ মৃ[illegible] বাদক অধ্যাপক প্রতাপনারায়ণ মিত্র মহ[illegible] পাখোয়াজের সংগতে নিজ বিদ্যা ও [illegible] কুশলতা প্রদর্শন করেন।

উপসংহারে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববি[illegible]দ্যালয়ের ছাত্রী ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগী[illegible] অনুষ্ঠানে শ্রীমতী তপতী চট্টোপাধ্যায় ললিত কণ্ঠে ও অধ্যাপক মিত্র মহা[illegible] সংগতে গান গেয়ে সকলের প্রশংসা [illegible] করেন।

সদারং সংগীত সম্মেলনে সংগীত পরিব[illegible] করছেন সুনন্দা পট্টনায়ক

হরিদাস স্মৃতি সংগীত আসর

পরলোকগত বিখ্যাত সংগীত-[illegible] হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের শিল্পীজী[illegible] অভীপ্সাকে সার্থক রূপদানের [illegible] প্রতিষ্ঠিত "হরিদাস স্মৃতি স[illegible] সংসদ"এর সাধারণ অধিবেশন গ[illegible] অক্টোবর সংগীতাচার্য শ্রীজ[illegible] সান্যালের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী[illegible] বাসন্তী মুখোপাধ্যায়ের উদ্বো[illegible] সংগীতের পর সভার কাজ শুরু[illegible] সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগীতাচার্য হ[illegible] মুখোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গ কণ্ঠ-সংগীত সা[illegible] ক্ষেত্রে বিপুল কর্মকৃতিত্বের প[illegible] রাখেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের ক[illegible]

উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেন্টারে অমলা নন্দী ও তাঁর অনুশীলনরত শিশু ছাত্রীদের সঙ্গে আমেরিকার আধুনিক নৃত্যশিল্পী জোসেফ গর্ডন।

মান সঙ্গীতবিদ্‌দের সঞ্চয়ের ভান্ডার থেকে তিনি সর্বপ্রযত্নে যে মধু আহরণ করেছিলেন তা তিনি মুক্তহস্তে বিতরণ করে গেছেন যে কারণে উত্তরকালে তিনি একজন প্রকৃত গুণী সাধক ও আচার্যের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। আগামী এক বছরের জন্য সঙ্গীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যালের সভাপতিত্বে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে। সেই সমিতির মধ্যে রয়েছেন ওস্তাদ বাহাদুর খান, বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

সংসদের আগামী কর্মসূচীর মধ্যে আছে স্বর্গত সঙ্গীতাচার্যের স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে ত্রৈমাসিক ও একটি বিশেষ বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন, সঙ্গীতাচার্যের নামাঙ্কিত একটি সঙ্গীত-শিক্ষায়তন স্থাপন ইত্যাদি। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল সঙ্গীত পরিবেশন করে সমবেত শ্রোতৃমন্ডলীকে আনন্দদান করেন। অতঃপর সংসদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনে সভার কাজ শেষ হয়।

●

সম্প্রতি ক্যানাডার টরন্টোতে কলকাতার শিল্পী এবং বর্তমানে স্টেট ইউনিভারসিটি অফ নিউইয়র্কের ভারতীয় নৃত্য ও সংস্কৃতির ভিজিটিং অধ্যাপিকা মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের একক নৃত্যানুষ্ঠান একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। এই শিল্পী নিউইয়র্ক প্রদেশে বিশেষ সমাদৃত। এখানে তাঁর অসাধারণ একটি দেড় ঘন্টার অনুষ্ঠানের জন্য ভারতীয় ও অভারতীয় দর্শকদের মনে সেই সন্ধ্যাটির স্মৃতি অনেকদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীর নৃত্যানুষ্ঠানের সূত্রধর ছিলেন মার্কিন শিল্পী শ্রীনিকোলাস কারপ্লাক। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের পটভূমিকায় ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের রঙিন স্লাইডের সাহায্য সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে সৌন্দর্যময় করে তোলে। সঙ্গীতাংশে ছিলো দেবব্রত বিশ্বাস, অনুপ ঘোষাল ও নমিতা ঘোষালের কণ্ঠ। এ'রা নিয়মিতভাবে শ্রীমতী মঞ্জুরীর অনুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে সঙ্গীত রেকর্ড করে পাঠান। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশে ছিলো মণিপুরী ও ভারত নাট্যম। শ্রীকারপ্লাকের বৈষ্ণব কবিতার ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে শ্রীমতী চাকী সরকারের 'বসন্তরাস' নৃত্যটি কাব্যময় হয়ে ওঠে। এর পর মঞ্চে দেখা দেয় দক্ষিণ ভারতের চিদাম্বরম মন্দিরের ভাস্কর্যের চিত্রপট। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী দেখান বিখ্যাত 'নটনম আডিনার' নটরাজের নন্দনতত্ত্বের রূপ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয়াংশে ছিলো রবীন্দ্রনাথের বর্ষা ও বসন্ত-গানের বিভিন্ন রূপে। রাবীন্দ্রিক নৃত্যকলায় এই শিল্পীর সুখ্যাতি যেন আরো উজ্জ্বলতর হলো সেদিন। এই অংশটির সুরু হয় 'নৃত্যের তালে'র নৃত্যরূপ দিয়ে। 'হৃদয় আমার নাচেরে—কোথা যে উধাও—ঝর ঝর বরিষে বারিধারা'—এইসব সঙ্গীতের প্রাণময় ভাবটি অপরূপ হয়ে ওঠে শিল্পীর নৃত্যের ভঙ্গীতে। দেড় ঘন্টার অনুষ্ঠানে দশটি নৃত্যের মাধ্যমে দশভাবে যেন নিজেকে ব্যক্ত করে গেলেন এই শিল্পী। রাবীন্দ্রিক নৃত্যে সুপরিচিতা এই শিল্পীর অসাধারণত্ব নতুন করে যেন প্রকাশ পেলো ভারতীয় ও অভারতীয় দর্শকদের কাছে। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে টরন্টোর ইণ্ডিয়া-ক্যানাডা এ্যাসোসিয়েসন সবার ধন্যবাদ অর্জন করেছেন।

"হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলন"

২৮ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে হিমাংশু সঙ্গীত সম্মেলনের দশম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ঐ দিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সুচিত্রা মিত্রের একক সঙ্গীত। রথীন চৌধুরীর পরিচালনায় হিমাংশু দত্তের সুর সংযোজিত কয়েকটি গান পরিবেশিত হয়েছিল। গানগুলি গেয়েছিলেন মালবিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইরা মুখোপাধ্যায়। পূর্বা সিংহ'র রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রজনীকান্ত'র গান এবং সুমিত্রা বসুর নজরুলগীতিও সবার অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেয়েছে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তমালিকা গুহ, অম্বিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেয়া রায় ও শিবনাথ সাহা। রবীন্দ্র-নৃত্যে শান্তা বসু রায় দর্শকদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ'র সঙ্গে সঙ্গীতে সহযোগিতা করেন গৌতম বসু ও তুষার ভঞ্জ। সঙ্গতে ছিলেন কিশোর নন্দী, দুলাল ভট্টাচার্য ও সুনীল বসু। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ডক্টর শান্তিভূষণ দত্ত। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমতী পুষ্পরাণী দত্ত।

●

গত ২৫ সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে প্রখ্যাত সঙ্গীতায়ণ গীতালির ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব পালিত হল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে সঙ্গীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ও শ্রীঅজিতকুমার সরকার। গীতালির দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পারিতোষিক বিতরণের পর বিচিত্রানুষ্ঠানে যাঁরা প্রশংসার দাবী রাখেন তাঁরা হলেন শান্তা সাহা, ওয়ালিউর রহমান, মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায় ও কল্যাণী দাশগুপ্তা কণ্ঠসঙ্গীতে এবং রণজিৎ রায় ও শিবনাথ সাহা যথাক্রমে বেহালা ও গীটারে। সর্বশেষ পরিবেশিত হয় অনিল দাসের পরিচালনায় ছাড়া নৃত্যনাট্য 'লংকাদহণ'। টীম-ওয়ার্ক প্রশংসনীয়। অভিনয়াংশে উল্লেখযোগ্য হলেন—অনিল দাস, গোপালকৃষ্ণ রায় এবং রাধা গুপ্তা।

—চিত্রাঙ্গদা

টেস্ট ক্রিকেটে রান পরিক্রমা

ক্ষেত্রনাথ রায়

খেলাধুলোর জয়-পরাজয় নির্ধারণের মাপকাঠি একরকম নয়। খেলা অনুযায়ী এই মাপকাঠি ভিন্ন ধরনের। যেমন ফুটবল খেলায় জয়-পরাজয় নির্ধারণের মাপকাঠি গোল, এবং ক্রিকেট খেলায় রানসংখ্যা। ক্রিকেট খেলায় দলগত এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র যতখানি বিস্তারিত অন্য কোন খেলায় সে রকম নয়। ক্রিকেট খেলা নিয়ে ক্রিকেট খেলার জন্মভূমি ইংল্যান্ডে যেমন রসসাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে তেমনি ব্যক্তিগত এবং দলগত চতুর্য অবলম্বন করে পরিসংখ্যানের বিরাট মহাভারত গড়ে উঠেছে। ক্রিকেট অনুরাগীরা ক্রিকেট খেলা দেখে যতখানি আনন্দ পান ঠিক ততখানিই পান এই পরিসংখ্যান থেকে। বর্তমান নিবন্ধে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সংগৃহীত রানসংখ্যা রকমারিভাবে পরিবেশন করা হল।

ক্রিকেট খেলার সময় এই রানসংখ্যা কোথায় এবং কিভাবে রাখা হয়? প্রাচীনকালে কাঠের লাঠিতে দাগ কেটে রাখা হত। বর্তমানে রাখা হয় বিশেষ ধরনের খাতায় এবং সাময়িকভাবে দেখান হয় খেলার মাঠের স্কোর বোর্ডে এবং ছাপানো স্কোর কার্ডে।

বিশ্ব রেকর্ড

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

৯০৩ রান (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) — ইংল্যান্ড (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), ওভাল, ১৯৩৮

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(পুরো এক ইনিংসের খেলায়)

২৬ রান — নিউজিল্যান্ড (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), অকল্যান্ড, ১৯৫৪-৫৫

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান

৩৬৫ রান (নট আউট) — গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), বিপক্ষে পাকিস্তান, কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮

এক সিরিজে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

৯৭৪ রান — ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩০ (খেলা ৫, ইনিংস ৭, নট আউট ০, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, সেঞ্চুরী ৪, গড় ১৩৯·১৪)

উপর্যুপরি ইনিংসে ৫টি সেঞ্চুরী

এভার্টন উইকস্ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) : (১) ১৪১ কিংস্টন) বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৪৭-৪৮; (২) ১২৮ (নিউদিল্লী), (৩) ১৯৪ (বোম্বাই), ১৬২ ও ১০১ (কলকাতা) বিপক্ষে ভারতবর্ষ ১৯৪৮-৪৯

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান

(ব্যক্তিগত রান)

৩০৯ রান — ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস, ১৯৩০ সালের ১১ই জুলাই।

প্রথম দিনের ৩৪০ মিনিটের খেলায় দলের ৪৫৮ রানের মধ্যে ব্র্যাডম্যান তাঁর নিজস্ব এই ৩০৯ রান সংগ্রহ করেছিলেন। অর্থাৎ পুরো একদিনের খেলার নয়। আরও উল্লেখ্য, তিনি লাঞ্চের আগেই সেঞ্চুরী (১০৫ রান) করেন এবং চা-পানের বিরতির সময় তাঁর রান দাঁড়ায় ২২০ এবং প্রথম দিনের খেলার শেষে নট আউট ৩০৯ রান।

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান

(এক দলের পক্ষে)

৫০৩ রান (২ উইকেটে) — ইংল্যান্ড (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা), লর্ডস, খেলার ২য় দিন (জুলাই ৩০), ১৯২৪

একদিনের খেলায় সর্বাধিক রান

(দুই দলের খেলায়)

৫৮৮ রান (৬ উইকেটে) : ইংল্যান্ডের ৬ উইকেটে ৩৯৮ এবং ভারতবর্ষের ১৯০ (কোন উইকেট না পড়ে) ম্যাঞ্চেস্টার, খেলার ২য় দিন (জুলাই ২৭), ১৯৩৬

লাঞ্চের পূর্বে সেঞ্চুরী

(প্রথম দিনের খেলায়)

এপর্যন্ত নীচের তিনজন খেলোয়াড় লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশেষ উল্লেখ্য যে, এই তিনজনই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় এবং তাঁরা ইংল্যান্ডেরই মাটিতে খেলে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে এই বিশেষ সেঞ্চুরী করেছেন :

(১) ভিক্টর ট্রাম্পার (১০৪ রান), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯০২

(২) চার্লস ম্যাকার্টনি (১৫১ রান), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস, ১৯২৬

(৩) ডন ব্র্যাডম্যান (৩৩৪ রান), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস, ১৯৩০

দ্রষ্টব্য : খেলোয়াড়দের নামের ডান দিকে বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল খেলোয়াড়দের পুরো ইনিংসের রান।

একটি খেলায় সর্বাধিক মোট রান

(দুই দলের রান সমষ্টি)

১৯৮১ রান (৩৫ উইকেটে) : দক্ষিণ আফ্রিকা (৫৩০ ও ৪৮১ রান) বনাম ইংল্যান্ড (৩১৬ ও ৫ উইকেটে ৬৫৪ রান), ডারবান, ১৯৩৮-৩৯

একটি খেলায় সর্বনিম্ন মোট রান

(পুরো চার ইনিংসের রান সমষ্টি)

২৯১ রান (৪০ উইকেটে) : ইংল্যান্ড (৫৩ ও ৬২ রান) বনাম অস্ট্রেলিয়া (১১৬ ও ৬০ রান), লর্ডস, ১৮৮৮

একদিনে সর্বনিম্ন রান

৯৫ রান (১২ উইকেটে) : অস্ট্রেলিয়া (৮০ রান) বনাম পাকিস্তান (২ উইকেটে ১৫ রান), করাচি, ১৯৫৬-৫৭

চতুর্থ ইনিংসে সর্বাধিক রান

৬৫৪ রান (৫ উইকেটে) : ইংল্যান্ড (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা), ডারবান, ১৯৩৮-৩৯

সর্বাধিক রানে জয়

এক ইনিংস ও ৫৭৯ রানে : ১৯৩৮ সালে ওভাল মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের এক ইনিংস ও ৫৭৯ রানে জয়।

৬৭৫ রানে : ১৯২৮-২৯ সালে ব্রিসবেন মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ৬৭৫ রানে জয়।

সর্বাধিক ব্যক্তিগত সেঞ্চুরী

২৯টি — ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) — ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১৯টি, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪টি, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ৪টি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ২টি।

একটি ইনিংসে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৫টি—অস্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কিংস্টন, ১৯৫৫ সালের জুনে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এই ইনিংসে সেঞ্চুরী করেন—সি সি ম্যাকডোনাল্ড (১২৭), নীল হার্ভে (২০৪), কিথ মিলার (১০৯), রন আর্চার (১২৮) এবং রিচি বেনো (১২১)। অস্ট্রেলিয়া এই ইনিংসে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ৭৫৮ রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই ৭৫৮ রানই (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এক ইনিংসের খেলায় সর্বাধিক রানের রেকর্ড।

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী

(উভয় দলের খেলায়)

৭টি : অস্ট্রেলিয়া (৫টি সেঞ্চুরী) বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২টি সেঞ্চুরী), কিংস্টন ১৯৫৫ সালের জুনে।

৭টি : ইংল্যান্ড (৪টি সেঞ্চুরী) বনাম অস্ট্রেলিয়া (৩টি সেঞ্চুরী), নটিংহাম ১৯৩৮ সালের জুনে।

একটি সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী

৫টি : ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫

একটি সিরিজে দুবার খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

১২৬ ও ১১০ রান (ত্রিনিদাদ) এবং ১৫৫ ও ১১০ রান (কিংস্টন) : ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৪-৫৫

দ্রুততম সেঞ্চুরী

৭০ মিনিটে : জ্যাক গ্রেগরী (অস্ট্রেলিয়া) বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯২১-২২

উপর্যুপরি ইনিংসে 'ডাবল' সেঞ্চুরী

২৫১ (সিডনি) ও ২০০ (মেলবোর্ন) ওয়ালী হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯২৮-২৯

২২৭ (ক্রাইস্ট চার্চ) ও ৩৩৬ নট আউট (অকল্যান্ড) : ওয়ালী হ্যামন্ড (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড ১৯৩২-৩৩

৩০৪ (লিডস) ও ২৪৪ (ওভাল) : ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া); বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ১৯৩৪

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউন্ডারী

৪৬টি (৩৩৪ রানের মধ্যে) : ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, লিডস ১৯৩০

এক ইনিংসে সর্বাধিক ওভার বাউন্ডারী

১০টি (নট আউট ৩৩৬ রানের মধ্যে)

ওয়ালী হ্যামণ্ড (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, অকল্যান্ড, ১৯৩২-৩৩

এক ওভারে সর্বাধিক রান

২৫ রান (৬ ৬ ০ ৬ ১ ৬ ০ ০) **:** ১৯৫৩-৫৪ সালের জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার হাগ জোসেফ টেফিল্ডের এক ওভারের খেলায় নিউজিল্যান্ডের বার্ট সাটক্লিফ ১৯ রান এবং আর ডবলিউ ব্লেয়ার ৬ রান (চতুর্থ ওভার-বাউন্ডারী) করেন।

একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী

টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে এপর্যন্ত ২০ জন খেলোয়াড় মোট ২৩ বার একটি টেস্ট খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন। দু'বার করে করেছেন ইংল্যান্ডের হার্বার্ট সাটক্লিফ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের জর্জ হেডলে এবং ক্লাইভ ওয়ালকট।

একটি টেস্ট সিরিজে দু'বার করেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্লাইড ওয়ালকট এবং একটি খেলায় ডাবল সেঞ্চুরী এবং সেঞ্চুরী করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ডগলাস ওয়ালটার্স (২৪২ ও ১০৩ রান, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, সিডনি, ১৯৬৮-৬৯)।

টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে সর্ব প্রথম

প্রথম রান, বাউন্ডারী ও সেঞ্চুরী : অস্ট্রেলিয়ার চার্লস ব্যানারম্যান মেলবোর্ণ মাঠে ১৮৭৭ সালের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় (যা পৃথিবীর মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলা) প্রথম রান, প্রথম বাউন্ডারী এবং প্রথম সেঞ্চুরী করার গৌরব লাভ করেন।

প্রথম 'ডাবল' সেঞ্চুরী : ২১১ রান—ডবলিউ এল মার্ডক (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ওভাল, ১৮৮৪

প্রথম 'ট্রিপল' সেঞ্চুরী : ৩২৫ রান—এ্যান্ড্রু স্যাণ্ডাম (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৩০

এক ইনিংসে প্রথম ৫০০ রান : ৫৫১—অস্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), ওভাল ১৮৮৪

এক ইনিংসে প্রথম ৬০০ রান : ৬০০ রান—অস্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ইংল্যান্ড), মেলবোর্ণ ১৯২৫

এক ইনিংসে প্রথম ৮০০ রান : ৮৪৯ রান—ইংল্যান্ড (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কিংস্টন, ১৯২৯

এক ইনিংসে প্রথম ৯০০ রান : ৯০৩ রান (৭ উইঃ ডিক্লেঃ)—ইংল্যান্ড (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), ওভাল, ১৯৩৮

উভয় ইনিংসে প্রথম সেঞ্চুরী : ১৩৬ ও ১৩০ রান—ডবলিউ বার্ডসলে (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যান্ড, ওভাল, ১৯০৯

উভয় ইনিংসে প্রথম 'গোল্লা' : জি এফ গ্রেস (ইংল্যান্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ওভাল, ১৮৮০

এক ইনিংসে প্রথম ৩টি সেঞ্চুরী : ১৮৮৪ সালে ওভাল মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের ৫৫১ রানে এই তিনটি সেঞ্চুরী—মার্ডক ২১১ রান, ম্যাকডোনেল ১০৩ এবং স্কট ১০২ রান।

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক রান

(বিভিন্ন দেশের পক্ষে)

পক্ষে	রান	বিপক্ষে	স্থান	বছর
ইংল্যান্ড	৯০৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ)	অস্ট্রেলিয়া	ওভাল	১৯৩৮
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৭৯০ (৩ উইঃ ডিক্লেঃ)	পাকিস্তান	কিংস্টন	১৯৫৭-৫৮
অস্ট্রেলিয়া	৭৫৮ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কিংস্টন	১৯৫৪-৫৫
পাকিস্তান	৬৫৭ (৮ উইঃ ডিক্লেঃ)	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ব্রিজটাউন	১৯৫৭-৫৮
দঃ আফ্রিকা	৬২০	অস্ট্রেলিয়া	জোহানেসবার্গ	১৯৬৬-৬৭
ভারতবর্ষ	৫৩৯ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ)	পাকিস্তান	মাদ্রাজ	১৯৬০-৬১
নিউজিল্যান্ড	৫০৫	দঃ আফ্রিকা	কেপটাউন	১৯৫৩-৫৪

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান

(বিভিন্ন দেশের পক্ষে)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৩৬৫*	গারফিল্ড সোবার্স	পাকিস্তান	কিংস্টন	১৯৫৭-৫৮
ইংল্যান্ড	৩৬৪	লেন হাটন	অস্ট্রেলিয়া	ওভাল	১৯৩৮
পাকিস্তান	৩৩৭	হানিফ মহম্মদ	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ব্রিজটাউন	১৯৫৭-৫৮
অস্ট্রেলিয়া	৩৩৪	ডন ব্র্যাডম্যান	ইংল্যান্ড	লিডস	১৯৩০
দঃ আফ্রিকা	২৫৫*	ডেরিক ম্যাকগ্লিউ	নিউজিল্যান্ড	ওয়েলিংটন	১৯৫২-৫৩
ভারতবর্ষ	২৩১	ভিনু মানকাদ	নিউজিল্যান্ড	মাদ্রাজ	১৯৫৫-৫৬
নিউজিল্যান্ড	২৩৯	গ্রাহাম ডাউলিং	ভারতবর্ষ	ক্রাইস্টচার্চ	১৯৬৭-৬৮

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রান

(বিভিন্ন দেশের পক্ষে)

পক্ষে	রান	বিপক্ষে	স্থান	বছর
নিউজিল্যান্ড	২৬	ইংল্যান্ড	অকল্যান্ড	১৯৫৪-৫৫
দঃ আফ্রিকা	৩০	ইংল্যান্ড	পোর্ট এলিজাবেথ	১৮৯৫-৯৬
	৩০	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	১৯২৪
অস্ট্রেলিয়া	৩৬	ইংল্যান্ড	বার্মিংহাম	১৯০২
ইংল্যান্ড	৪৫	অস্ট্রেলিয়া	সিডনী	১৮৮৬-৮৭
ভারতবর্ষ	৫৮	অস্ট্রেলিয়া	ব্রিসবেন	১৯৪৭-৪৮
	৫৮	ইংল্যান্ড	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯৫২
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৭৬	পাকিস্তান	ঢাকা	১৯৫৮-৫৯
পাকিস্তান	৮৭	ইংল্যান্ড	লর্ডস	১৯৫৪

এক সিরিজে সর্বাধিক মোট রান

(বিভিন্ন দেশের পক্ষে)

এক ইনিংসে

মোট রান	খেলোয়াড়	বিপক্ষে	সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	গড়	বছর
৯৭৪	ডন ব্র্যাডম্যান (অ)	ইংল্যান্ড	৩৩৪	৪	১৩৯·১৪	১৯৩০
৯০৫	ওয়ালী হ্যামণ্ড (ইং)	অস্ট্রেলিয়া	২৫১	৪	১১৩·১২	১৯২৮-২৯
৮২৭	ক্লাইড ওয়ালকট (ও)	অস্ট্রেলিয়া	১৫৫	৫	৮২·৭০	১৯৫৪-৫৫
৭৩২	জর্জ ফক্নার (দ)	অস্ট্রেলিয়া	২০৪	২	৭৩·২০	১৯১০-১১
৬২৮	হানিফ মহম্মদ (পা)	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৩৩৭	১	৬৯·৭৭	১৯৫৭-৫৮
৬১১	বার্ট সাটক্লিফ (নি)	ভারতবর্ষ	২৩০*	২	৮৭·২৮	১৯৫৫-৫৬
৫৮৬	বিজয় মঞ্জরেকার (ভা)	ইংল্যান্ড	১৮৯*	১	৮৩·৭১	১৯৬১-৬২

টেস্ট খেলায় সর্বাধিক রান

(বিভিন্ন দেশের পক্ষে)

দেশ	রান	খেলা	খেলোয়াড়	সর্বোচ্চ রান	সেঞ্চুরী	গড়
ইংল্যান্ড	৭২৪৯	৮৫	ওয়ালী হ্যামণ্ড	৩৩৬*	২২	৫৮·৪৫
অস্ট্রেলিয়া	৬৯৯৬	৫২	ডন ব্র্যাডম্যান	৩৩৪	২৯	৯৯·৯৪
ওয়েস্ট ইন্ডিজ	৬৭৭৬	৭৬	গ্যারী সোবার্স	৩৬৫*	২১	৫৮·৯২
পাকিস্তান	৩৮১২	৫১	হানিফ মহম্মদ	৩৩৭	১২	৪৫·৩৮
ভারতবর্ষ	৩৬৩১	৫৯	পলি উমরীগড়	২২৩	১২	৪২·২২
দঃ আফ্রিকা	৩৪৭১	৪২	ব্রুস মিচেল	১৮৯*	৮	৪৮·৮৮
নিউজিল্যান্ড	৩৪৩১	৫৮	জন রিড	১৪২	৬	৩৩·৩১

* নট আউট

দর্শক

সন্তোষ ট্রফি

নওগাঁয় আয়োজিত ২৬তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাংলা ৬—১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, বাংলা এই নিয়ে ২০ বার ফাইনাল খেলে ১২ বার সন্তোষ ট্রফি পেল। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বাধিক বার ফাইনালে খেলা এবং সর্বাধিকবার সন্তোষ ট্রফি জয়ের রেকর্ড বাংলারই। তাছাড়া একমাত্র বাংলা দলই উপর্যুপরি তিনবার (১৯৪৯—৫১) সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে। এবারের ফাইনালে বাংলার ৬ গোল সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে সর্বাধিক গোল দেওয়ার রেকর্ড।

ফাইনালে সার্ভিসেস দলের বিপক্ষে বাংলার এই বিরাট জয়ের মূলে ছিল মহম্মদ হাবিবের ব্যক্তিগত সাফল্য। বাংলার ৬টি গোলের মধ্যে হাবিব একাই হ্যাটট্রিক সহ ৫টি গোল দেন। এবারের প্রতিযোগিতায় হাবিব দুটি হ্যাটট্রিক করেছেন। তাঁর প্রথম 'হ্যাটট্রিক' মাদ্রাজের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালে। আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় পাঁচটি খেলায় বাংলা মোট ২৮টি গোল দিয়ে মাত্র ২টি গোল খেয়েছে; গোয়াকে ৪—০, মাদ্রাজকে ৮—০, সেমি-ফাইনালে অন্ধ্রপ্রদেশকে ৪—১ ও ৬—০ এবং ফাইনালে সার্ভিসেস দলকে ৬—১ গোলে বাংলা পরাজিত করে।

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ড

তৃতীয় টেস্ট খেলা

নিউজিল্যাণ্ড : ১৮১ রান (মারে ৮০ এবং ডাউলিং ৪২ রান। প্রসন্ন ৫১ রানে ৫ এবং বেদী ৫২ রানে ২ উইকেট)

ও ১৭৫ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেঃ। ডাউলিং ৬০ রান। আবিদ আলী ৪৭ রানে ৩, প্রসন্ন ৫৮ রানে ৩ এবং ভেঙ্কটরাঘবন ৪০ রানে ২ উইকেট)

ভারতবর্ষ : ৮৯ রান ভেঙ্কটরাঘবন নট-আউট ২৫ এবং বেদী ২০ রান। হ্যাডলি ৩০ রানে ৪ এবং কিউনিস ১২ রানে ৩ উইকেট)

ও ৭৬ রান (৭ উইকেটে। পানধোত্রা ১৫ রান। কিউনিস ১২ রানে ৩ এবং [illegible] ৩১ রানে ৩ উইকেট)

হায়দরাবাদের লালবাহাদুর স্টেডিয়ামে আয়োজিত ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্ট ক্রিকেট খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়াতে উভয় দলের ১৯৬৯ সালের ৪র্থ টেস্ট সিরিজও ড্র গেল। ভারতবর্ষ বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে ৬০ রানে এবং নিউজিল্যাণ্ড নাগপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ১৬৭ রানে জয়ী হয়েছিল।

নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক গ্রাহাম ডাউলিং টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার দান নেন। তাদের প্রথম ইনিংসের সূচনা খুব ভাল হয়েছিল। লাঞ্চের সময় কোন উইকেট না পড়ে ৮০ রান ছিল। কিন্তু চা-পানের সময় দেখা গেল ৪টে উইকেট পড়ে ১৩২ রান দাঁড়িয়েছে। প্রথম উইকেটের জুটি ডাউলিং এবং মারে দলের ১০৬ রান সংগ্রহ করেছিলেন। খেলার একসময় যেখানে কোন উইকেট না পড়ে নিউজিল্যাণ্ডের ১০৬ রান ছিল, সেখানে দেখা গেল ১৩৬ রানের মাথায় তাদের ৭ম উইকেট পড়ে গেল। ভারতবর্ষের অফ্‌স্পিনার এরাপল্লী প্রসন্ন ৫১ রানে ৫টা উইকেট নিয়ে নিউজিল্যাণ্ডের এই হাল করেছিলেন। প্রথম দিনে নিউজিল্যাণ্ডের বাকি ২টো উইকেট নিয়েছিলেন বেদী। নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের ১৮১ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিনে বৃষ্টির দরুন খেলা হয়নি।

তৃতীয় দিনে ১৮১ রানের মাথায় নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়। ভারতীয় মহলে বেশ উল্লাস দেখা দেয়। কিন্তু তাঁদের কেউ ভাবেন নি, ভারতবর্ষের কপালে আরো বেশী দুর্ভোগ লেখা আছে। চা-পানের সময় স্কোর বোর্ডে ভারতবর্ষের অতি করুণ চেহারা দেখা গেল—৯টা উইকেট পড়ে মাত্র ৫০ রান। হাতে আর মাত্র একটা উইকেট জমা। উইকেটে অপরাজিত আছেন দুই বোলার—ভেঙ্কটরাঘবন এবং বেদী। অতীতের অনেক খারাপ অবস্থা লোকের মনে পড়তে লাগলো—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে দুবার ৫৮ রানের মাথায় ভারতবর্ষের ইনিংস শেষ হয়েছে। আর নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে এক ইনিংসের খেলায় ভারতবর্ষের সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ৮৮ (বোম্বাই, ১৯৬৫)। নিউজিল্যাণ্ডের কাছে ভারতবর্ষ আবার কি মাথা হেঁট করবে? শেষ পর্যন্ত শেষ ১০ম উইকেট জুটি ভেঙ্কটরাঘবন এবং বেদী অতি মূল্যবান ৪০ রান সংগ্রহ করে ভারতবর্ষকে সে হেনস্তা থেকে রক্ষা করেন। ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস ৮৯ রানের মাথায় শেষ হয়। মাত্র এক রান বেশী করার ফলে ভারতবর্ষ কোনরকমে মুখরক্ষা করেছে। খেলা ভাঙ্গার নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা আগে ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হলেও দর্শকদের বিক্ষোভে নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে এইদিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করা সম্ভব হয়নি।

চতুর্থদিনে নিউজিল্যাণ্ড ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৭৫ রান তুলে ২৬৭ রানে অগ্রগামী হয়। ভারতবর্ষের খারাপ ফিল্ডিংয়ের ফলে নিউজিল্যাণ্ড যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল।

পঞ্চম দিনে নিউজিল্যাণ্ড আর ব্যাট ধরেনি। তারা দ্বিতীয় ইনিংসের ১৭৫ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার এই অবস্থায় ভারতবর্ষের জয়লাভ করতে ২৬৮ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ছিল ৩৩০ মিনিটের খেলা। ভারতবর্ষ কিন্তু মোটেই জয়লাভের জিদ নিয়ে খেলেনি। প্রথম ইনিংসের মতই ভারতবর্ষ দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। দ্বিতীয় ইনিংসের ৭টা উইকেট খুইয়ে তারা মাত্র ৭৬ রান সংগ্রহ করে। খেলার আর মাত্র তিনটে উইকেট পড়তে বাকি। ভারতবর্ষ পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে; নিউজিল্যাণ্ডের কাছে প্রকৃতপক্ষে আত্মসমর্পণই করেছে; খেলার এই অবস্থায় একমাত্র ভরসা বৃষ্টির দেবতা বরুণদেব। তিনি যদি মুখ তুলে তাকান তবেই ভারতবর্ষের মুখরক্ষা হয়। শেষ পর্যন্ত বরুণদেবের কৃপাতেই ভারতবর্ষ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়। লাঞ্চের ৭০ মিনিট পর ভারতবর্ষের ৭৬ রানের (৭ উইকেটে) মাথায় বৃষ্টি নামে। এবং এই বৃষ্টিই ভারতবর্ষের মাটিতে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম জয়লাভের আশা নির্মূল করে দেয়।

বর্তমানে ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল দাঁড়া[illegible] : ভারতবর্ষের 'রাবার' জয় ৩ (১৯৫৫-৫৬, ১৯৬৫ ও ১৯৬৮) এবং 'রাবার ড্র' ১ (১৯৬৯)। টেস্ট খেলার ফলাফল : খেলা ১৬, ভারতবর্ষের জয় ৭, নিউজিল্যাণ্ডের জয় ২ এবং ড্র ৭।

ব্যাটিং ও বোলিংয়ের গড়

১৯৬৯ সালের সদ্য সমাপ্ত টে[illegible] সিরিজে নিউজিল্যাণ্ডের অধিনায়ক গ্রাহা[illegible] ডাউলিং উভয় দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গ[illegible] তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছেন- খেলা ৩, ইনিংস ৬, নটআউট ১ বার, এ[illegible] ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৬৯, মোট রান ২৪[illegible] এবং গড় ৪৮.৮০। ভারতবর্ষের প[illegible] ব্যাটিংয়ে শীর্ষস্থান পেয়েছেন অজি[illegible] ওয়াদেকার (মোট রান ১৬৭ এবং গ[illegible] ২৭.২৮)। আলোচ্য সিরিজে এক ইনিংসে খেলার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান করেছেন নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে বার্জেস (৮৯ রা[illegible] এবং ভারতবর্ষের পক্ষে পতৌদির নব[illegible] (৬৭ রান)। বোলিংয়ে সর্বাধিক উইকে[illegible] পেয়েছেন—ভারতবর্ষের পক্ষে প্রসন্ন (৫[illegible] রানে ২১ উইকেট এবং গড় ২১.৬৫) এ[illegible] নিউজিল্যাণ্ডের পক্ষে হ্যাডলি (২১১ রা[illegible] ১৩ উইকেট এবং গড় ১৬.২৩)।

তিনটি বিশ্বরেকর্ড

ভারতবর্ষ বনাম নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ক্রিকেট খেলায় প্রতিষ্ঠিত তিনটি বিশ্ব রেকর্ড :

১৯৫৫-৫৬ সালে মাদ্রাজের ৫ম টেস্ট খেলায় ভারতবর্ষের ভিনু মানকাদ এবং পংকজ রায় ৪১৩ রান তুলে প্রথম উইকেট জুটির বিশ্ব রেকর্ড করেন।

১৯৫৫-৫৬ সালের টেস্ট সিরিজের পাঁচটি খেলায় ভারতবর্ষ ৬টা ইনিংস খেলেছিল এবং প্রতি টেস্ট ম্যাচের কোন না কোন ইনিংসে ৪৩০ 'রানের' বেশী রান তুলেছিল। পাঁচটি খেলা নিয়ে একটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রতিটি খেলার কোন-না-কোন ইনিংসে ৪০০ রান বা তার বেশী করার রেকর্ড টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ভারতবর্ষই প্রথম করেছে এবং আজও তার দ্বিতীয় নজির নেই।

১৯৬৫ সালে কলকাতার ২য় টেস্টে নিউজিল্যান্ডের ব্রুস টেলর তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে ১ম ইনিংসে ১০৫ রাণ করে এবং ভারতবর্ষের ১ম ইনিংসের খেলায় ৮৬ রানে ৫টা উইকেট পেয়ে বিশ্বরেকর্ড করেন। সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ব্রুস টেলর ছাড়া অপর কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করা এবং এক ইনিংসের খেলায় ৫ উইকেট নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ডাঃ বি সি রায় ট্রফি

কটকের বরবাটি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৮তম জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা গোলশূন্য অবস্থায় ড্র যাওয়াতে উড়িষ্যা এবং কেরালাকে ডাঃ বি সি রায় ট্রফির যুগ্ম-বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।

সেমি-ফাইনালে উড়িষ্যা ১—০ গোলে গত দু বছরের বিজয়ী বাংলাকে পরাজিত করেছিল। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে কেরালা ২—১ গোলে পরাজিত করেছিল অন্ধ্রপ্রদেশকে।

পূর্ববর্তী বিজয়ী

১৯৬২ বাংলা, ১৯৬৩ দিল্লী ও মহীশূর (যুগ্ম বিজয়ী), ১৯৬৪ রাজস্থান, ১৯৬৫ দিল্লী, ১৯৬৬ অন্ধ্রপ্রদেশ, ১৯৬৭ বাংলা, ১৯৬৮ বাংলা।

জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

নয়াদিল্লীর এন আই এস পুলে আয়োজিত ২৬তম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে সার্ভিসেস, মহিলা বিভাগে মহারাষ্ট্র, বালক বিভাগে বাংলা এবং বালিকা বিভাগে দিল্লী দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে।

পাঁচদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় ১৭টি ইউনিটের ৩০০ জনের বেশী সাঁতারু অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং মোট ১১টি ভারতীয় রেকর্ড ভেঙেছিল। রেকর্ডভঙ্গকারীদের মধ্যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সার্ভিসেস দলের ১৯ বছরের যুবক মহীন্দরসিং রাণা। তিনি এই তিনটি বিষয়ে—২০০, ৪০০ এবং ১,৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে রেকর্ড ভাঙেন। তাছাড়া ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে নতুন রেকর্ড করতে সার্ভিসেস দলকে সাহায্য করেন। ৪×২০০ মিটার রিলেতে স্বর্ণপদক বিজয়ী সার্ভিসেস দলেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর পরই মহারাষ্ট্রের তিনকোরী খাটাউয়ের নাম উল্লেখযোগ্য, যিনি তিনটি বিষয়ে রেকর্ড ভাঙেন।

চূড়ান্ত পয়েন্ট তালিকা

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১৫০ পয়েন্ট), ২য় বাংলা (৪৮ পয়েন্ট), ৪র্থ মহারাষ্ট্র (৪৩ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ১ম মহারাষ্ট্র (৮৬ পয়েন্ট), ২য় দিল্লী (৪৯ পয়েন্ট), ৩য় গুজরাট (২৬ পয়েন্ট), ৪র্থ পাঞ্জাব (৫ পয়েন্ট)।

বালক বিভাগ : ১ম বাংলা (৯৪ পয়েন্ট), ২য় মহারাষ্ট্র (৪৯ পয়েন্ট), ৩য় দিল্লী (৪৭ পয়েন্ট), ৪র্থ রাজস্থান (১২ পয়েন্ট)।

বালিকা বিভাগ : ১ম দিল্লী (৫১ পয়েন্ট), ২য় মহারাষ্ট্র (৪৫ পয়েন্ট), ৩য় কেরালা (১৭ পয়েন্ট), ৪র্থ পাঞ্জাব ও বাংলা (৪ পয়েন্ট)।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা

জয়পুরে আয়োজিত আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ের খেলায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গোলের গড়পড়তায় চ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করে স্যার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড জয়ী হয়েছে। এই চূড়ান্ত লীগ পর্যায়ের খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় দল—পূর্বাঞ্চল বিজয়ী কলকাতা, পশ্চিমাঞ্চল বিজয়ী বোম্বাই, উত্তরাঞ্চল বিজয়ী পাঞ্জাব এবং দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ী মহীশূর। লীগ পর্যায়ের খেলায় পাঞ্জাব, মহীশূর এবং কলকাতা প্রত্যেকেই চার পয়েন্ট করে সংগ্রহ করেছিল। ফলে চ্যাম্পিয়নশীপ নির্ধারণের জন্যে গোল এভারেজের আশ্রয় নিতে হয়। এই দিক থেকে পাঞ্জাব চ্যাম্পিয়ান এবং মহীশূর রানার্স আপ হয়েছে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আশুতোষ মুখার্জি শীল্ড জয়ী হল।

সন্তোষ ট্রফি হাতে বাংলার অধিনায়ক শান্ত মিত্র। তাঁর নেতৃত্বে বাংলা দল ২৬তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ৬-১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে।

দাবার আসর

মাং প্রকরণ

দাবার শিক্ষানবীশের পক্ষে ঘুঁটিচালার নিয়ম শেখার পরেই শিখতে হবে বিভিন্ন ঘুঁটি দিয়ে বিপক্ষের একক রাজাকে মাং করার কায়দা। কারণ এই কায়দা না জানা থাকলে কখনোই অপরপক্ষকে মাং করা যায় না।

বিপক্ষের রাজাকে মাং করতে গেলে অন্ততপক্ষে নিম্নলিখিত ঘুঁটিসমূহের মিলিত প্রয়াস দরকার। (১) ২টি নৌকা, (২) মন্ত্রী এবং রাজা, (৩) ১টি নৌকা এবং রাজা, (৪) ২টি গজ এবং রাজা, (৫) ১টি গজ, ১টি ঘোড়া এবং রাজা। কেবলমাত্র ১টি গজ ও রাজা কিংবা ১টি ঘোড়া এবং রাজা দিয়ে বিপক্ষের একক রাজাকে মাং করা যায় না। ২টি ঘোড়া এবং রাজা দিয়ে মাং করা যায় না কারণ বিপক্ষের একক রাজা চালমাং হয়ে যায়। কিন্তু বিপক্ষ রাজার সঙ্গে ১টি বড়ে থাকলে ২টি ঘোড়া এবং রাজা দিয়ে মাং হয়, কারণ এক্ষেত্রে বিপক্ষের বড়ের চাল থাকায় আর চালমাং হয় না। ৩টে ঘোড়া দিয়ে মাং হয়, বলা বাহুল্য, এই সমস্ত ঘুঁটির সঙ্গে অন্য কোন অতিরিক্ত ঘুঁটি থাকলে মাং করা আরো অনেক সহজ হয়।

৫০ চালের সীমা

দাবা খেলায় একটি নিয়ম আছে, কোন সময় কোন পক্ষ যদি দেখাতে পারে যে ৫০টি চাল খেলা হয়েছে অথচ এই ৫০ চালের মধ্যে কোন বড়ে চালা হয়নি (স্বপক্ষের বা বিপক্ষের) এবং কোন ঘুঁটিও কাটাকাটি হয়নি, তাহলে সেই পক্ষ ড্র দাবী করতে পারে। এই দাবীর ফলে খেলাটিকে ড্র বলে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। (যখনই কোন বড়ে চালা হবে বা ঘুঁটি কাটাকাটি হবে তারপর থেকে আবার নূতন করে ৫০ চাল গুনতে হবে।) যখন বিপক্ষের কেবলমাত্র রাজা অবশিষ্ট আছে এবং আপনার দিকে কোন বড়ে নেই কিন্তু মাং করার মত ঘুঁটি আছে, এমন অবস্থায় মাং করতে হলে তা ৫০ চালের মধ্যেই করতে হবে কারণ কোন বড়ের চাল হবার বা ঘুঁটির মার খাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কোনো কোনো অবস্থায় ৫০ চালের সীমা বাড়িয়ে দেওয়া যায় (যেমন, এক পক্ষে ২টি ঘোড়া এবং রাজা, অপরপক্ষে ১টি বড়ে এবং রাজা), তবে আইনে বলা আছে টুর্ণামেণ্ট কমিটিকে খেলা সুরু করার আগে স্পষ্ট নির্দেশ দিতে হবে কোন কোন অবস্থার জন্যে তাঁরা ৫০ চালের সীমা বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। টুর্ণামেণ্ট কমিটির কোনো স্পষ্ট নির্দেশ না থাকলে সমস্ত অবস্থাতেই ৫০ চালের মধ্যে মাং করতে হবে।

মন্ত্রী, নৌকা কিংবা ২টি গজ দিয়ে সহজেই ৫০ চালের মধ্যে মাং করা যায়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে খুব হিসাব করে চাল না দিলে ৫০ চালের সীমা পেরিয়ে যেতে পারে। যেমন, (১) একপক্ষে ১টি গজ, ১টি ঘোড়া এবং রাজা, অপরপক্ষে শুধু রাজা, (২) একপক্ষে রাজা এবং মন্ত্রী অন্যপক্ষে রাজা এবং নৌকা।

রাজা এবং মন্ত্রীর মাং

আমরা প্রথমে রাজা এবং মন্ত্রী দিয়ে মাং আলোচনা করব। ক্রমশ অন্যান্য ঘুঁটির মাং নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

মন্ত্রী একা কখনো মাং করতে পারে না, রাজার সাহায্য নিতে হয়। রাজার সাহায্য নিয়েও ছকের মাঝখানে বিপক্ষ রাজাকে মাং করা যায় না। এর জন্যে দরকার বিপক্ষ রাজাকে ছকের একেবারে প্রান্তে নিয়ে যাওয়া।

মন্ত্রী একাই বিপক্ষের রাজাকে ছকের শেষপ্রান্তে নিয়ে যেতে পারে। এটি সম্পন্ন করার পরে আমরা ধীরে ধীরে স্বপক্ষের

কালো
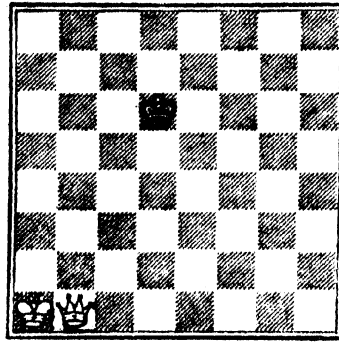
সাদা

এই অবস্থা থেকে ২টি উপায়ে কালো রাজাকে মাং করা যেতে পারে।

রাজাকে বিপক্ষের রাজার কাছাকাছি আনতে পারি এবং তারপরে মন্ত্রী দিয়ে মাং করতে পারি। এটা হোল ১নং কায়দা।

১নং কায়দার বর্ণনা (ছবি দেখুন)

সাদার রাজা রয়েছে মন্ত্রী নৌকো ১ ঘরে এবং মন্ত্রী আছে মন্ত্রী ঘোড়া ১ ঘরে। কালোর রাজা আছে কালোর মন্ত্রী ৩ ঘরে। মন্ত্রীকে এমন ঘরে বসাতে হবে যে ঘরে ১টি ঘোড়া বসালে বিপক্ষের রাজার ওপর কিস্তি পড়ে। এইভাবে আমরা সহজেই কালো রাজার ঘর কমিয়ে আনতে পারি। সুতরাং সাদার প্রথম চাল হোল (১) মন্ত্রী—গজ ৫। এইবার কালো রাজা কি করবে? কালো রাজা যাবার ৩টি মাত্র ঘর আছে :—গজ ৩, গজ ২, এবং রাজা ২। গজ ২য়ে গেলে মন্ত্রী বসবে রাজা ৬ ঘরে, রাজা ২ ঘরে গেলে মন্ত্রী বসবে ঘোড়া ৬ ঘরে। কালো ছকে প্রান্তের দিকে না গিয়ে ছকের মাঝের দিকে থাকতে চাইল, অর্থাৎ সাদার (১) মন্ত্রী—গজ ৫ চালের জবাবে কালোর চাল হোল (১) রাজা—গজ ৩। এরপর থেকে চাল গুলি হবে এইরকম :—(২) মন্ত্রী—রাজ ৫ : রাজা—ঘোড়া ৩ (৩) মন্ত্রী—মন্ত্র ৫ : রাজা—গজ ২ (৪) মন্ত্রী—রাজ ৬ : রাজা—ঘোড়া ২ (৫) মন্ত্রী—মন্ত্র ৬ : রাজা—গজ ১ (৬) মন্ত্রী—রাজ ৭ : রাজা—ঘোড়া ১। রাজাকে শেষপ্রান্তে বন্দী করার পর এবার আমরা সাদা রাজাকে নিয়ে আসব। সুতরাং (৭) রাজা—ঘ ২ : রাজা—গজ ১ (৮) রাজা—ঘো ৩ : রাজা—ঘোড়া ১ (৯) রাজা—ঘো ৪ : রাজা—গজ ১ (১০) রাজা—ঘো ৫ : রাজা—ঘোড়া ১ (১১) রাজা-ঘোড়া ৬ : রাজা—গজ ১ (১২) মন্ত্রী—মন্ত্রী গজ ৭ মাং।

২নং কায়দা :—সাদা রাজাকে প্রথমে ছকের মাঝের দিকে নিয়ে গেলে ম... কম চালে মাং করা যেত। যেমন :— (১) রাজা—ঘোড়া ২ : রাজা—ম... ৪ (২) রাজা—গজ ৩ : রাজা—... ৪ (৩) মন্ত্রী—রাজা ঘোড়া ৬। অনর্থক কিস্তি দিয়ে লাভ নেই। মন্ত্রীকে স... সময়ই এমনভাবে চালতে হবে যা... বিপক্ষের রাজার চাল কমে ... (৩) রাজা—গজ ৫ (৪) রাজা—ম... ৪ : রাজা—গজ ৬ (৫) মন্ত্রী—ঘোড়া ... রাজা—গজ ৭ (৬) মন্ত্রী—ঘোড়া ৪ : রা... —রাজা ৮ (৭) মন্ত্রী—ঘোড়া ২ : রাজা—মন্ত্রী ৮ (৮) রাজা—মন্ত্রী ৩ : রাজা—গজ ৮ (৯) মন্ত্রী—গজ ২ মাং।

এক্ষেত্রে সাদার ৭নং চাল মন্ত্রী—ঘ... ২ না হয়ে (৭) রাজা—রাজা ৩ ... পারত। এভাবেও মাং হবে। (৭) রাজা—... ৮ (৮) মন্ত্রী—ঘোড়া—৬ : রাজা—... ৮ (৯) মন্ত্রী—রাজা ঘোড়া ১ মাং। ... খেয়াল রাখতে হবে সাদার (৮) মন্ত্রী ঘোড়া ৩?? চাল হলে কালো চাল মাং ... খেলাটি ড্র হয়ে যাবে।

মন্ত্রী দিয়ে মাং করার সময় সময়ই এই চালমাংকে সাবধানে এ... যেতে হবে। প্রথম কায়দায় ১২ চালে মাং দেখানো হয়েছে তাতে ... অবস্থাতেই চালমাতের সম্ভাবনা ... সুতরাং একেবারে কাঁচা খেলোয়াড়ের ... প্রথম কায়দায় মাংটা শেখাই সুবিধে।

রাজ্যদাবা প্রতিযোগিতা

১৯৬৯ সালের রাজ্যদাবা চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতা আগামী ৭ই নভেম্বর হচ্ছে। নাম দেবার জন্যে নে... সুভাষ ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যোগাযোগ ... পারেন। ঠিকানা—৩০৩।১, আচার্য প্র... চন্দ্র রোড, কলকাতা—৯। ফোন—... ৩৯৯১।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।

যে মুখখানির দিকে
সবাই তাকিয়ে আছে
তিনিই বলবেন

কারণটা ঃ

হেজলীন স্নো

হেজলীন স্নো-র মোলায়েম হাল্কা পরশ সেরা বিউটি ক্রীমেরই মতন।
আপনার মুখখানিকে দিব্যি সুন্দর নিটোল লাবণ্যে ভ'রে দেয়।
অপরূপ তরুণ কোমল কান্তিতে আপনার মুখখানি নির্মল হয়ে ওঠে।
ছোটোখাটো দাগ অতি স্বচ্ছন্দে ঢাকা পড়ে যায় - আপনার মুখে
ফুটে ওঠে এক স্নিগ্ধ কমনীয় আভা।
আজই আপনার হেজলীন স্নো-র সঙ্গে পরিচয় হোক - দিনের পর দিন
সে পরিচয়ের সার্থকতা আপনার মুখখানিকে ফুলের মত সহজ
সুন্দর ক'রে তুলবে।

Bensons/3580-Ben

হেজলীন স্নো-তরুণের স্বপ্নমাখানো স্বাভাবিক কান্তির উৎস

॥ অনুবাদ সাহিত্যে নতুন সংযোজন ॥

এমিনেস্কুর কবিতা

শ্রীমতী অমিতা রায় অনুদিত

রুমানিয়ার কাব্য জগতে এক নতুন যুগের সূচনা করেন মিহাই এমিনেস্কু (১৮৫০—১৮৮৯)।...হতাশা ও বেদনা এমিনেস্কুর কবিতায় মূল সুর হলেও এর প্রধান উপজীব্য প্রেম ও প্রকৃতি। ভারতীয় দর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাবও তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়।......পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে এমিনেস্কুর কবিতা। বাংলা তথা ভারতে মূলে রুমানিয়ান থেকে এমিনেস্কুর অনুবাদ এই প্রথম। মূল্য ঃ তিন টাকা।

অ্যান ফ্রাঙ্কের ডায়ারী

অরুণকুমার সরকার ও অংশুকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুদিত। ৪-৫০ টাকা

[জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত]

জেনারেল বুকস্ এ-৬৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের

বিচিত্র কাহিনী

(৪র্থ সংস্করণ)

নবীন ও প্রবীণদের সমান
আকর্ষণীয়
অজস্র চিত্র সম্বলিত
বিচিত্র গল্পগ্রন্থ। মূল্য ঃ দুই টাকা

লেখকের
আর একখানা বই

আরও বিচিত্র কাহিনী

অসংখ্য ছবিতে পরিপূর্ণ
দাম ঃ তিন টাকা

প্রকাশক ঃ
এম সি সরকার এণ্ড সন্স
প্রাইভেট লিমিটেড
সকল পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

মস্কো থেকে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকা

এই জনপ্রিয় পত্রিকাটি ইংরেজী, হিন্দী ও উর্দুতেও প্রকাশিত হচ্ছে। সোভিয়েত দেশ ও তার জনগণের জীবনের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাঠকদের সামনে উপস্থিত করবে এই পত্রিকাটি।

উপহার প্রত্যেক গ্রাহককে একখানা করে ১৯৭০ সালের বহুবর্ণ রঞ্জিত ১২ পৃষ্ঠার ক্যালেণ্ডার দেওয়া হবে। ক্যালেণ্ডার সংখ্যা সীমিত। এখনই গ্রাহক হোন।

চাঁদার হার	১ বৎসর	...	৭.০০
	২ বৎসর	...	১১.০০
	৩ বৎসর	...	১৪.০০
	প্রতি সংখ্যা	...	০.৭৫

প্রতিযোগিতা

৫০ জন থেকে	২৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহকারীকে			রাশিয়ান কাঠের পুতুল
২৫১ "	" ৪০০	"	"	এলার্ম ঘড়ি
৪০১ "	" ৮০০ "	"	"	বৈদ্যুতিক ক্ষুর
৮০১ "	" ১৫০০ "	"	"	হাত ঘড়ি
১৫০১ "	" ২৫০০ "	"	"	ক্যামেরা
২৫০০ গণের অধিক		"	"	ট্রানজিস্টার রেডিও

সংগ্রহকারীরা নিজস্ব পুরস্কার ছাড়াও ১৯৭০ সালের একটি ডায়েরী পাবেন।

পত্রিকা না পেলে, অথবা কোন গোলযোগ হলে, অথবা ঠিকানার পরিবর্তন হলে, সংশ্লিষ্ট এজেন্টকে লিখুন।

ADMARK

অনুমোদিত এজেন্টবৃন্দ
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ, ৪।৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী (প্রাঃ) লিঃ, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২।

নিয়মাবলী

লেখকদের প্রতি

১। 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে সমস্ত রচনার নকল রেখে পান্ডুলিপি সম্পাদকের নামে পাঠান আবশ্যক। মনোনীত রচনা কোনো বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের বাধ্যবাধকতা নেই। অমনোনীত রচনা সঙ্গে উপযুক্ত ডাক-টিকিট থাকলে ফেরত দেওয়া হয়।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক দিকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লিখিত রচনা প্রকাশের জন্যে বিবেচনা করা হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে 'অমৃতে' প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি-পি'তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা মণিঅর্ডারযোগে 'অমৃতে'র কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ২০.০০	টাকা ২২.০০
ষাণ্মাষিক	টাকা ১০.০০	টাকা ১১.০০
ত্রৈমাসিক	টাকা ৫.০০	টাকা ৫.৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৩

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

৯ম বর্ষ
২য় খণ্ড

অমৃত

২৬শ সংখ্যা
মূল্য
৪০ পয়সা

Friday, 7th November, 1969. শুক্রবার, ২১শে কার্তিক, ১৩৭৬ 40 Paise

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীপুলক মণ্ডল

সুয়েজ উপসাগর

১৭ই অকটোবরের 'অমৃত' জনৈক পত্র-লেখক বিশেষজ্ঞদের জানাতে অনুরোধ করেছেন যে সুয়েজ সত্যিই আছে কিনা। আমি কোন বিশেষজ্ঞ নই। তাহলেও সুয়েজ উপসাগরের অবস্থান সম্পর্কে যা জানি নিবেদন করতে চাই। আশা করি এটা ধৃষ্টতা হবে না।

সুয়েজ উপসাগর সত্যিই আছে। এটি হলো সংকীর্ণ একটি জলভাগ যা লোহিত সাগর ও সুয়েজ খালের সংযোজক। সুয়েজ উপসাগরের পূর্বদিকে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সিনাই উপদ্বীপ, পশ্চিমেও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র। উত্তরে সুয়েজ বন্দর থেকে সিনাই উপদ্বীপের দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য। সুয়েজ খাল কাটার পর যে জলভাগের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল তা হলো সুয়েজ উপসাগর। এডেন বন্দর থেকে সংক্ষিপ্ততম জলপথে ভূমধ্যসাগরে যেতে হলে পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করতে হয় লোহিত সাগর, সুয়েজ উপসাগর ও সুয়েজ খাল।

সব্যসাচী সেনগুপ্ত
কলকাতা—৩।

শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস

এ সপ্তাহের 'অমৃত' পত্রিকার পৃষ্ঠায় জলপাইগুড়ি থেকে জনৈক নামহীন পত্র-লেখক কুড়ি সংখ্যায় 'অমৃত' পত্রিকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রকাশিত আমার শরৎচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধটি থেকে নিম্নলিখিত উধৃতি দান করেছেন—

"বিপ্রদাসের ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটেছিল বিপ্লবীদের মাসিক পত্র 'বেণু'তে।"

পত্রলেখক উপরোক্ত তথ্যটি ঠিক নয় এই মন্তব্য করে 'বিপ্রদাস' 'বিচিত্রায়' প্রকাশিত হয় লিখেছেন। এই পত্রলেখকের সংশয় নিরসনার্থে 'বেণু' সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় মহাশয়ের রচিত 'সবার অলক্ষ্যে' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম পর্ব থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উধৃত করছি :

"বেণু" ছাড়া সেইকালে অন্য কোন কাগজে লেখা দেবার বড়একটা সময় হত না তাঁর (শরৎচন্দ্রের)—'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানি ধারাবাহিক রূপে বার হতে লাগল 'বেণু' পত্রিকায়। সে উপন্যাসের লিখনভঙ্গিই ছিল আলাদা।...'বেণু'র 'বিপ্রদাসে'র ভাষা ও লিখনভঙ্গি যুবরক্তে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। 'বেণু' পুলিশের আক্রমণে বন্ধ হয়ে যায় ১৯৩২ সালে। তারপর বিপ্রদাস বেরিয়েছে মাসিক বিচিত্রায়। — (সবার অলক্ষ্যে—১ম পর্ব—পৃঃ ১২৯-৩০) পত্রলেখক এই বিষয়ে "দৃষ্টিদানে"র জন্য বলেছেন, তাই তাঁর জ্ঞাতার্থে এই সূত্রে 'শরৎ-সাহিত্যসম্ভার' (৬ষ্ঠ সম্ভার) নামক গ্রন্থাবলীর গ্রন্থপরিচয় অংশের নিম্নলিখিত তথ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি—

"বিপ্রদাস প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ হইতে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বেণু পত্রিকায় সর্বপ্রথম 'বিপ্রদাসে'র দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তৎপরে উহা পূর্ণাঙ্গ আকারে প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়। বিচিত্রায় প্রকাশ কাল—১৩৩৯ সালের ফাল্গুন-চৈত্র, —১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও আশ্বিন-ফাল্গুন এবং ১৩৪১ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ-ভাদ্র-কার্তিক-মাঘ। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৩৪১-এর মাঘ মাস। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫।"

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বিচিত্রায় 'বিপ্রদাস' পুর্ণমুদ্রণ এবং পূর্ণাঙ্গ প্রকাশের আরও কিছুকাল পূর্বে সেখানে 'পথের পাঁচালী', 'পথে-প্রবাসে' ও 'যোগাযোগ' প্রকাশিত হয়েছে। 'বেণু' পত্রিকায় 'বিপ্রদাস' প্রকাশের আর এক দিক আছে, কিন্তু সেই বিষয়টি বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়।

অভয়ংকর
কলকাতা—৩৪

ছোটগল্প প্রসঙ্গে

অমৃত সাপ্তাহিকে প্রকাশিত ছোটগল্পগুলি আমি পরিপূর্ণ আগ্রহ ও কৌতূহল নিয়ে পড়ে থাকি। কোনও গল্প পড়ে পাই কাব্যিক অনুভূতি, আবার কোনও গল্পের অভূতপূর্ব সাইকোলোজিক্যাল বিশ্লেষণ আমাকে গভীরভাবে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। নানা রকম আঙ্গিকে ও ব্যঞ্জনায় ভরপুর এই কাহিনীগুলির রচয়িতাগণ প্রায় সকলেই তরুণ উদীয়মান। এই সকল শক্তিমান তরুণ গল্প লেখকদের গল্প একের পর এক "অমৃতে" প্রকাশ করবার জন্য শত ধন্যবাদ অমৃতের প্রাপ্য। অবশেষে অনুরোধ করছি অমৃতের প্রতি সংখ্যায় প্রবাসী বাঙালী উদীয়মান গল্পকারদের ছোটগল্প যেন প্রকাশ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ছোটগল্পে আমরা বর্তমান কালের যুবকযুবতীদের ভালবাসা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিফলিত হবে আশা করছি।

নারায়ণচন্দ্র অধিকারী
হীরাকুদ, ওড়িষা।

বেতারশ্রুতি

'জন-গণ-মন' গানটি বিকৃত হিন্দী উচ্চারণে গাওয়ার বিরুদ্ধে অনেকদিন থেকেই আমাদের মনে অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সম্ভবত জাতীয় সংগীতের মর্যাদার কথা ভেবে লোকে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চায় না। অমৃত-র পাতায় বহুদিনের বহুজনের এই অভিযোগটি শ্রবণক যে তুলে ধরেছেন এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

কেবলমাত্র বিকৃত উচ্চারণে জাতীয় সংগীত প্রচার করেই আকাশবাণী ক্ষান্ত হয় নি। এই বিকৃত উচ্চারণ বাংলাদেশের ছোট ছেলেমেয়েরা যাতে গোড়া থেকেই রপ্ত করতে পারে তারও ব্যবস্থা করেছে। এই ঘটনাটি বোধ হয় শ্রবণকের জানা নেই। গত বছর স্বাধীনতা দিবসের আগে গল্পদাদুর আসরে জাতীয় সংগীত কয়েক দিন শেখানো হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। তিনি গোড়াতেই জোরের সঙ্গে ছোটদের জানিয়ে দিলেন যে, গানটি স্বাভাবিক উচ্চারণে গাইলে ভুল হবে কারণ এটি জাতীয় সংগীত। উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে 'ভাগ্যবিধাতা' না বলে বলতে হবে, 'ভাগ্গিয়ে উয়িধাতা'। এই রকম আরও।

আমাদের প্রশ্ন, সংবিধানে জাতীয় সংগীতের যে স্পেসিফিকেসন দেওয়া আছে তাতে এই উচ্চারণ বিকৃতি নির্দিষ্ট করা আছে কি না। যদি তা না থাকে তো রবীন্দ্রনাথের গানের উপর এ অত্যাচার কেন ? আর বাংলাদেশের সুধীরাই বা আর কতদিন চুপ করে থাকবেন ?

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা—১৯

মানুষগড়ার ইতিকথা

গত ১৬ই আশ্বিনের অমৃতে "মানুষগড়ার ইতিকথায়" সাউথ সুবারবান স্কুল সম্বন্ধে সুলিখিত রচনাটি পড়ে বিশেষ আনন্দিত হলাম। কারণ আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে (১৯২১—২৫) ঐ স্কুলের ছাত্র হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তবে উক্ত প্রবন্ধটিতে সামান্য একটু তথ্যগত ভুল থাকায় এখানে তার উল্লেখ করছি।

প্রবন্ধে রয়েছে শ্রদ্ধেয় দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৯০৯ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত হেডমাস্টার ছিলেন। কথাটা ঠিক

নয়। ১৯২১ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর কোন কারণে তিনি স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন, পরে ১৯২৫ সালে আবার যোগদান করেন। মাঝখানের এই ৪।৫ বৎসর, অর্থাৎ আমি যে সময়ে ছাত্র ছিলাম। তাঁকে আমরা পাই নি। ১৯২১ সালের শেষ দিকে আমি যখন ঐ স্কুলে ভর্তি হই তখন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীশ্যামচন্দ্র বসু (এস সি বোস নামেই সমধিক পরিচিত) অস্থায়ীভাবে প্রধান শিক্ষকের কাজ করছিলেন। এ'র রচিত বীজগণিত ও পাটিগণিত (স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুক্তভাবে রচিত) সে যুগে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বার্ধক্যের জন্য ১৯২২ সালে ইনি অবসর নিলে সেই বৎসরেরই গোড়ায় ডকটর নলিনীমোহন সান্যাল (তখনও ডকটর হন নি) প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন এবং ১৯২৫ সালের গোড়া পর্যন্ত বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে স্কুল পরিচালনা করেন। ইনি পূর্বে সরকারী স্কুলে হেডমাস্টার ছিলেন এবং কিছুদিন বিভাগীয় স্কুল ইনস্পেকটরের পদেও কাজ করেছিলেন। সান্যাল মহাশয় হিন্দী সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন এবং স্কুলের অ্যাকাডেমিক দিক ছাড়াও এক্‌সট্রা-অ্যাকাডেমিক দিকে ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। এ'রই সময়ে স্কুলে ম্যাগাজিন চালু হয়: বিতর্ক সভা, ছাত্রসংসদ ইত্যাদিও চালু হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফলাফলও এ'র সময়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের বছরই চারজন ছাত্র স্কলারশিপ পান এবং তেরজন ছাত্র স্টার মার্ক পেয়ে পাশ করেন। এ'দের মধ্যে শ্রীবিভূতি ঘোষ (বর্তমানে মুরলীধর কলেজে ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক) বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করে কম্‌প্লিট করেন। অন্যদের মধ্যে ছিলেন শ্রীপরেশ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি), অবসরপ্রাপ্ত জিলা জজ শ্রীতারাগতি ভট্টাচার্য, প্রেসিডেন্সী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার রায়, আশুতোষ কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত দার্জিলিং গভঃ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, কার্নাল মিল্ক ডেয়ারী রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডিরেকটর ডঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় পোল্যান্ডের ওয়ারস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ হিরণ্ময় ঘোষাল প্রভৃতি কৃতী ছাত্রবৃন্দ। আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন ষাট বৎসরে বয়সে নলিনীবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হিন্দী সাহিত্যে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেন। (আগেও তিনি অন্য বিষয়ে এম এ ছিলেন)। ১৯২৫ সালের শুরুতে স্কুলের তৎকালীন সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) মহাশয়ের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি স্কুল ত্যাগ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করে। তখন তাঁরই শূন্যপদে দেবকিশোরবাবু পুনরায় প্রধান শিক্ষক রূপে যোগদান করেন।

আচার্য সান্যাল ৮৩ বছর বয়সে থিসিস লিখে (হিন্দী সাহিত্যে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি উপাধি পান। এ থেকেই তাঁর আজীবন বিদ্যাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময় শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায়ের সভাপতিত্বে শান্তিপুরে (আচার্য সান্যাল শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন) তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয় এক মহতী সভায়। সাউথ সুবারবান স্কুলের ইতিহাসে স্বল্পস্থায়ী হলেও এই বিদ্যোৎসাহী এবং কৃতী পুরুষের নামোল্লেখ না থাকায় এই চিঠি দেওয়া কর্তব্য মনে করছি।

বলরাম ঘোষ
কলকাতা—৪৭

মানুষের জন্ম

সাপ্তাহিক 'অমৃত' ছাড়া আরো কয়েকটি সাপ্তাহিক সাহিত্যপত্রিকা আমি নিয়মিত পড়ি। এই সব পত্রিকার ছোটগল্পগুলি আমি সাগ্রহে পড়ি। নামী ও অনামী লেখকের বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা ও মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ভরপুর এই গল্পগুলি ভাল লাগলেও মুগ্ধ করতে পারে না সব সময়। উঁচু মানের হলেও অধিকাংশ লেখাই গতানুগতিক।

কিন্তু অনেকদিন পর ৩০শে আশ্বিনের 'অমৃতে' সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের "মানুষের জন্ম" গল্পটি গতানুগতিকতার বাইরে একটি অস্পষ্টতা এবং অবাস্তবতার আভরণের ভিতর থেকে চরম সত্যকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছে। গল্পের কাহিনী ও বলার ভঙ্গি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের লেখার গুণে প্রতিটি চিন্তাশীল পাঠককে মুগ্ধ করবে। গল্পটিতে আগাগোড়া এক মানসিক সক্রিয়তার সুরে পাঠকের মনকে টেনে নেয়। লক্ষ্মণ গাড়োয়ানের স্পর্শকাতর মন বহির্বিশ্বের বাস্তবতার সংস্পর্শে গল্পটির প্রতিটি মুহূর্তে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে, তা প্রতিটি পাঠককে গভীর ভাবে নাড়া দেয়। লখনা গাড়োয়ানের আত্মযন্ত্রণা যুক্তিনির্ভর। তার মানসিক যন্ত্রণা ও কণ্ঠস্বর আমাদের সত্তাকে চমকিত ক'রে, হৃদয়কে উন্মুখ করে এবং সমস্ত চেতনাকে জাগ্রত ক'রে জীবনের এক অভিনব এবং অনাবিষ্কৃত জগতে নিয়ে যায়।

—বিশ্বনাথ ঘোষ,
সানাই সাহিত্য সংস্থা
রসুলপুর, বর্ধমান।

সাগরপারে

ভারতের বাইরে বাঙালী মহলে অমৃত পত্রিকা বহুল প্রচলিত। তাই চিঠিটা ছাপা হলে ভালো হয়।

সাগরপারের বাঙালীরা মিলে লন্ডন থেকে বাংলা ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা ছাপাবার ব্যবস্থা করছেন। জানুয়ারী মাস থেকে ছাপা হবে। পত্রিকার বিষয়বস্তু হবে সাধারণ সংবাদ ও সাহিত্য। তাছাড়া থাকবে প্রবাসী বাঙালীর কথা, বিশেষ করে যাঁরা ভারতের বাইরে থাকবেন। 'সাগরপারে'র কাজ হবে, তাঁদের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখা। তাঁদের সংগতি ও সমস্যার কথা আলোচনা করা। তাঁদের ছেলেমেয়েরা যাতে বাংলা ভাষা একেবারে ভুলে না যায় তাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

গ্রাহক ছাড়াও আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ইয়োরোপ, আমেরিকা, কানাডা, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশের বাঙালী প্রতিষ্ঠানের খবর। এবং চাই বিশেষ প্রতিনিধি যাঁরা প্রবাসী বাঙালীর খবর পাঠাতে পারবেন। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া বাঙালীর সহযোগিতাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

এ বিষয়ে আগ্রহীরা অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

—হিরণ্ময় ভট্টাচার্য, সাগর।
5 Avondale Crescent Redbridge,
Essex England.

ঠিকানা পরিবর্তন

১ তারিখ থেকে শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী তাঁর বাড়ীর ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন। বর্তমান ঠিকানা হোল ১৭ কানুনগো পার্ক (পদ্মশ্রী সিনেমার সামনে)। রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক রোড। পোঃ গড়িয়া। ২৪ পরগণা।

সাদা চোখে

কেরলে নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভার পতনের পর যুক্তফ্রণ্ট গঠনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে নতুন করে বিচার বিবেচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে বামপন্থীঅধ্যুষিত যুক্তফ্রন্টগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার কালোমেঘ রাজনৈতিক দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। অবিশ্বাস সংশ্লিষ্ট দলগুলির মধ্যে নিত্য সাথী হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে নিম্নতম কর্মসূচীর মাধ্যমে বামপন্থীরা একসূত্রে নিজেদের গ্রথিত করেছিলেন তা ছিন্ন হয়ে গেছে। যে অদৃশ্য সূত্রের বন্ধনে এখনও তাঁরা আবদ্ধ আছেন তা আর কিছুই নয়—ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য আগ্রহ মাত্র।

গুণীরা লক্ষ্য করে থাকবেন কেরল মন্ত্রিসভার পতনের পর বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন বামপন্থী দলের নেতৃবৃন্দ। কেউ কেউ সরবে বলেছেন, কেরালার প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবাংলায় দেখা দেবে। বামপন্থী কম্যুনিস্টরা প্রথমে নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা পতনের জন্য দায়ী করে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট ও আর এস পির আদ্যশ্রাদ্ধ করলেও পশ্চিমবঙ্গে ফ্রণ্ট ভেঙে যাবে এমন কথা বলেন নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক হবার পর বামপন্থী কম্যুনিস্টরা নতুন কৌশল অবলম্বন করবেন বলে মনে হয়। তাঁরা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন, পশ্চিমবঙ্গেও ফ্রন্টের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী। এ সংকট থেকে উত্তরণের কোন রাস্তা নেই। কেরলের মন্ত্রিসভা পতনের কারণ বিশ্লেষণ না করেও শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের ভাষায় বলা যায়, "কেরলে ফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পতন দুই আদর্শের দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পরিণতি।" কাজেই কেরালার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অছিলা হবে মাত্র। মূল কারণ অন্যত্র।

দেশে-বিদেশে সর্বত্রই রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে। বর্তমানের সমাজব্যবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখতেও ভয়ানকভাবে "এডজাস্টমেন্ট" করতে হয়। নতুবা "ডাইভোর্স"। সমাজজীবনে যখন এহেন অবস্থা, রাজনৈতিক জীবনেও যে তার ছায়া পড়বে তা সন্দেহাতীত। কিন্তু আজ যেভাবে যুক্তফ্রন্টগুলি ও তাদের সরকার ভেঙে পড়তে শুরু করছে তার রাজনৈতিক পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য।

আদর্শ ও তত্ত্বগত ভাবনা বা চিন্তার উপর নির্ভর করে কোথাও যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে নি। রাষ্ট্রক্ষমতা একচেটিয়াভাবে যে দলের করায়ত্ত ছিল সেই কংগ্রেসের কাছ থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এই সংযুক্ত মোর্চার আবির্ভাব ঘটেছিল একটি নিম্নতম কর্মসূচীর মাধ্যমে। মোর্চার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দলের আশা ছিল যদি ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিম্নতম কর্মসূচীকে কার্যকর করা যায় তবে দীর্ঘদিনের নিপীড়িত মানুষের দুঃখকষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হবে এবং সর্বোপরি নতুন এক গণতান্ত্রিক চেতনায় মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে। ফলে, আমজনতার রাজনৈতিক চিন্তায় পরিবর্তন আসবে এবং নতুন করে রাজনৈতিক দলসমূহের সংহতিকরণ শুরু হবে। আর এই নতুন তত্ত্বগত ভাবধারাকে মূলধন করে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের নবরূপায়ণ সহজতর হয়ে উঠবে। মূলত যুক্তফ্রন্ট গড়ার পিছনে এই ভাবধারাই অধিকতর কাজ করেছিল।

কিন্তু বর্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাতে মনে হয়, মুখে বললেও প্রায় প্রত্যেক বামপন্থী দলই যেন এই ফ্রন্টের উপযোগিতা শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করছেন। বামপন্থী কম্যুনিস্টরা ফ্রন্ট ভাঙার কারণ বলতে গিয়ে একথাও জানাতে দ্বিধা করেন নি যে, কংগ্রেসে ভাঙন ধরছে বলে ফ্রণ্টেও ভাঙন ধরছে। কি বিশ্লেষণকে ভিত্তি করে বামপন্থী কম্যুনিস্টরা এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন তা বিশেষ সন্ধানী দৃষ্টি ফেলেও বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবে মনে হয়, ইন্দিরা গান্ধীকে বামপন্থীরা যখন সমর্থন করে প্রগতিশীল সাজিয়ে ভারতের রাজনীতিতে উপস্থাপিত করেছিলেন, তখন 'সমদর্শী' এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ইন্দিরা গান্ধীই যুক্তফ্রণ্ট ভেঙে দেবেন। কারণ বামপন্থী তথা সেবা বামপন্থীদের মতেই শ্রীমতী গান্ধী যখন প্রগতিশীলতার মশালচী হয়ে পড়েছেন, তখন ফ্রন্টভুক্ত কোন দল যদি পতঙ্গের মত সেই অগ্নিশিখার দিকে ধাবিত হয় তখন সেই দলকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে আখ্যা দিয়ে গণমনে হেয় করা সহজ হবে না। জনতা তখন ঐ প্রচারকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে যে, বাপু তোমরাই ত শিঙাধ্বনি করে ইন্দিরাজীর জয়গান করেছিলে? এখন কেন উলটো রামায়ণ পড়ছো?

সেই ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমানে ফলতে শুরু করেছে। এখন যতই তত্ত্বগত বিষয় নিয়ে এসে ফ্রন্টভাঙার রাজনৈতিক ভাষ্য প্রচার করার চেষ্টা করা হোক না কেন, আসলে শ্রীমতী ইন্দিরার সমাজবাদী চিন্তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ফ্রণ্টের ভাঙন। অবশ্য এটাই একমাত্র কারণ তা নয়। আরও অনেক বিষয় আছে যা ফ্রণ্টের ভাঙন অনিবার্য করে তুলছে।

দুই কম্যুনিস্ট পার্টির আদর্শগত বিরোধও এর জন্য দায়ী। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের বিদেশ সফরান্তে প্রত্যাবর্তনের পর যে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে বলে আশা করা গিয়েছিল তা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গেছে। দুই দলের মধ্যে এখন সোজাসুজি যুদ্ধের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। শ্রীশ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গের বার বার তারবার্তাকে রাজনৈতিক ভাষ্যকারেরা "war of attrition" বলে মনে করছেন। আর বামপন্থী কম্যুনিস্ট দলের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্টরা। হওয়ারই কথা, কারণ কেরলে দুই পার্টিই যদি সমঝোতা করে থাকতে পারতো তবে অন্য বামপন্থীদের সাহায্য দরকারও হতো না সরকারকে গদীয়ান রাখার জন্য। কারণ দুই দলের সম্মিলিত শক্তি ১৩৪ জন সদস্যবিশিষ্ট আইনসভায় বর্তমানে ৭১।

আরও যে প্রশ্ন বিশেষ করে মোর্চার উপর আঘাত হানছে তা হল একত্রে থাকার মানসিকতা সৃষ্টির পরিবর্তে সহগামী এক দলের তরফ থেকে অন্য দলকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা। কেরলেও ঐ জিনিস ঘটেছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যে তা আরও ভয়াবহভাবে ঘটছে, শরিকদের বিবৃতি থেকেই প্রতিনিয়ত তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। কেরালার চেয়েও পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের সমস্যা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাব আর বামপন্থী কম্যুনিস্টদের বাংলা কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট ও ফরওয়ার্ড ব্লক সম্বন্ধে নতুন করে মূল্যায়ন যে সংকট সৃষ্টি করেছে তা আপাতদৃষ্টিতে মিটে গেছে বলে মনে হলেও ভেতরে ভেতরে যে অসন্তোষের আগুন আরও ধূমায়িত হচ্ছে, পরিষ্কারভাবে তা অনুভব করা যায়। অনেকের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গে ভাঙলো ভাঙলো আওয়াজ উঠলেই আবার জোড়াতালি লেগে যাচ্ছে যুক্তফ্রণ্টে একটি বিশেষ কারণে। সেই কারণ হচ্ছে, বামপন্থী কম্যুনিস্টদের স্ট্র্যাটেজি, অর্থাৎ ভাঙতে হলে দায়িত্ব কে নেবে এবং কোন কোন দল কোনদিকে থাকবে আন্দাজ করে নেওয়া। রাজনীতির গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গে বামকম্যুনিস্টদের সঙ্গে বর্তমানে বিধান-

সভায় সদস্যহীন আর সি পি আই, দুই-জনের সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্কার্স পার্টি ও দোদুল্যমান আর এস পি ই আছে। অন্যান্য সকল দলই প্রায় অন্য শিবিরে সমবেত হয়ে পড়েছে। বাংলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের উপর ফ্রণ্টে যে উত্তপ্ত আলোচনা হয়ে গেল তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত বলে মনে করার কোন কারণ নেই। যদিও বাংলা কংগ্রেসের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বক্তব্যে সকলেই একমত নন, তবু আইন-শৃঙ্খলা ও শরিকী সংঘর্ষের প্রশ্নে প্রায় সমস্ত দলই স্বরাষ্ট্রদপ্তরের উপর তীক্ষ্ন কটাক্ষপাত করেছেন, এবং অবিলম্বে আলোচনা করার কথা দাবী করেছেন। যত জোরের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রদপ্তরের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ঠিক প্রায় অনুরূপভাবে শিক্ষাদপ্তর সম্পর্কেও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এই দুটি দপ্তরই বামপন্থী কম্যুনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত। কাজেই দপ্তরগত বিষয়ে আলোচনা যদি আদৌ হয় তবে ফল কি দাঁড়াবে বলা কঠিন। তবে একটা বিষয় সুনিশ্চিত যে, এবার যখন বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন বসবে তখন কেরালার মতই অনেক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির অভিযোগ বিধানসভায় উঠবে। এই প্রসঙ্গে এই কথাগুলি মনে রাখা দরকার যে, কেরালায় মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ আসার ফলে অন্যান্য শরিকরা বলছেন যে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলীয় লোকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দেখতে পান নি। অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবেও নাম্বুদ্রিপাদ দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। আরও বিশদ করে বললে দাঁড়ায় শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ কেরালার নেতা হতে অসমর্থ হয়েছেন। তিনি বামপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাই রয়ে গেলেন। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ অভিযোগের জবাবে বলেছেন যে, যখন তিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলির উপর সবেমাত্র "চোখ বুলাতে" শুরু করেছিলেন তখনই মিনিফ্রণ্ট বিধানসভার অধিবেশনে এই সমস্যার সমাধানের হুমকি দিয়েছিলেন। তার জন্যই তিনি পরাজিত হলে পদত্যাগ করবেন বলে পাল্টা বক্তব্য রেখেছিলেন। যাহোক—যা হবার তাই ঘটে গেল।

যদিও পশ্চিমবঙ্গে কোন্ সময় ফ্রণ্ট ভেঙে যাবে সেটা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারছেন না, তবু কেরালার মত এখানেও নাটক অভিনীত হওয়ার আশঙ্কা সমধিক। আর সেই অঙ্ক যখন শুরু হবে রাজনীতিতে অভিজ্ঞ মহল বলছেন, নাম্বুদ্রিপাদের পন্থা অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় যদি পদাধিকারবলে শুধু মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট দলের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে নির্দেশ দেন তবে খুব কিছু বলার থাকবে কি? শুধু আশার কথা এই যে, পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট সমস্যাকে ধামাচাপা দিতে খুবই পটু। তা না হলে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ পূর্বতন খাদ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে, তাঁর দলীয় বিধানসভা সদস্যরা যে অভিযোগ এনেছিলেন তার অনুসন্ধানের জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এখনও কোন তদন্ত হয়নি কেন? আর তদন্ত হয়ে থাকলে তার ফলাফল এখনও অজ্ঞাত কেন? যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক জীবনে একটি কলঙ্ক হিসাবে সেই অভিযোগ চিহ্নিত হয়ে আছে। এটা নৈতিক দিক থেকেও মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

আরও একটু রাজনীতির গভীরে তলিয়ে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের "একঘরে" করে নতুন একটি ফ্রণ্ট গঠনের কথাও ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। কেরলে যদি সি পি এম-কে বাদ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তবে বোঝা যাবে বাতাস কোনদিকে বইতে শুরু করেছে। অনেকেই ইতিমধ্যে স্বর্গত সমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার পুরোনো নীতি অর্থাৎ "policy of equi-distant" অনুসরণ করার সময় উপস্থিত হয়েছে বলে মনে করছেন। ডঃ লোহিয়ার ঐ নীতির অর্থ ছিল "কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট" থেকে সমদূরত্বে থাকার নীতি। অনেকে এখন সেই সমদূরত্বের নীতি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেস সম্পর্কে প্রয়োগ করার উপযোগিতা দেখা দিয়েছে বলে মনে করেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নয়া যুক্তফ্রণ্টের মাধ্যমে এক বৃহৎ তৃতীয় শক্তি গড়ার উপর জোর দিচ্ছেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলছেন যে, বামপন্থী কম্যুনিস্টরা "ডিমিট্রিব সাহেবের" স্পিরিটেই যুক্তফ্রণ্ট গঠনে আগ্রহী হয়েছিলেন বলে তাঁদের কার্যকলাপ থেকে এখন তা একটি পরিচ্ছন্ন রূপ গ্রহণ করছে। কংগ্রেসের একচেটিয়া রাজনৈতিক শক্তিকে খর্ব বা খতম করার উদ্দেশ্যে যে বামপন্থী কম্যুনিস্টরা ফ্রণ্টে যোগদান করেন নি, তাঁদের অন্য শরিক দলের প্রতি আগ্রাসী নীতিই তার সাক্ষ্য বহন করে। অতএব, ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে non-congressism এর যে শ্লোগান উঠেছিল, বামপন্থীরা তাকে বর্তমানে আমল দিতে চাচ্ছেন না—ফ্রণ্ট পতনের মধ্যেই তার উত্তর নিহিত আছে।

কিন্তু এই তৃতীয় শক্তিজোটের উদ্ভাবনের প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে, ডঃ লোহিয়ার অনুগামীরাই এখনও তা গ্রহণ করতে পারছেন না। তাঁদের বক্তব্য থেকে মনে হয় ("non-congressism") করতে হলে এখনও সমস্ত বিরোধী শক্তিকে একই শিবিরে আরও কিছুদিন জোট বেঁধে থাকতে হবে। কারণ কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে যদি কোন ভুল মূল্যায়ন করা হয় তবে সামন্ততান্ত্রিক ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের শক্তিকেই দুর্বল করে দেখা হবে। আর 'ডিমিট্রিব' থিসিসের আলোকে যদি ফ্রণ্টকে দেখা হয় তবে ফ্রণ্ট ভাঙবে আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জোরদার হয়ে উঠবে। কারণ, ফ্রণ্টের মাধ্যমে যে সর্বভারতীয় ভাবমূর্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস হচ্ছিল তা যদি বিনষ্ট হয়ে যায় তবে ভারতে বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট-দেরও মনে রাখা উচিত। কেরল ও পশ্চিমবাংলাই ভারতবর্ষ নয়। আর ভারতবর্ষে খণ্ডবিপ্লবও সম্ভব নয়। একমাত্র চতুর্থ মহাযুদ্ধ যদি বাধে তখন শক্তিবর্গের জয়-পরাজয়ের উপরই ভারতের ভাগবাঁটোয়ারা সম্ভব হতে পারে। তার আগে হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

কার পাপে যুক্তফ্রণ্ট ভাঙছে, জনতা খুব সূক্ষ্ম তত্ত্বগত বিচার করে তার দোষী নির্দোষ সাব্যস্ত করবে না। যুক্তফ্রণ্ট যে আদপে টিঁকতে পারে না এই সাবধান বাণী যাঁরা উচ্চারণ করেছিলেন হতাশামগ্ন মানুষ তখন সেই "চেতাবাণীর" রোমন্থন করবে মাত্র। আর ক্ষমতা হস্তচ্যুত হওয়ার পরমুহূর্তেই বামপন্থীরা দেখতে পাবেন তাঁদের শরীরের একাংশ স্ফূলোকার হয়ে একটি রোগ মতো হয়েছিল মাত্র; দলীয় শক্তিবৃদ্ধি মোটেই ঘটেনি। কাজেই অসহিষ্ণু হয়ে, হঠকারিতার পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত কিনা, তাঁরা চিন্তা করে দেখতে পারেন।

—সমদর্শী

দেশে বিদেশে

ফেরুমানের পণরক্ষা

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক শহর বলে যার দাবী সেই চণ্ডীগড়ের স্রষ্টা বিখ্যাত স্থপতি মঁসিয়ে লে করবুজিয়ের বলেছিলেন, এই শহর এমনভাবেই তৈরী হয়েছে যাতে শহরের অধিবাসীরা 'সর্বাধিক সূর্যালোক, হাত-পা ছড়াবার জায়গা ও হট্টগোল-চীৎকার থেকে অব্যাহতি' লাভ করতে পারে। শিবালিক পর্বতশ্রেণীকে পিছনে রেখে প্রায় দশ হাজার একর পরিমিত ঢালু জমির উপর গড়ে উঠেছে দেড় লাখ মানুষের এই শহর আর আধুনিক নগর-পরিকল্পনার সকল উপকরণ দিয়ে তার নির্মাণে লে করবুজিয়েরকে সাহায্য করেছেন মঁসিয়ে পিয়ের জানেরে ম্যাকসওয়েল ফ্রাই ও তাঁর স্ত্রী জেম ড্রু। অবিভক্ত পাঞ্জাবের রাজধানী পুরাতন শহর লাহোর হারাবার জন্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাবের যে খেদ তার অনেকটাই মিটে আসছিল প্রাচীন চণ্ডী বিগ্রহের নামে চিহ্নিত এই শহরকে পেয়ে।

কিন্তু লে করবুজিয়ের কর্তৃক পরিকল্পিত এই সূর্যালোকের শহরের উপর আজ বিরোধের কৃষ্ণ মেঘ ছায়া ফেলছে।

বিরোধের ছায়া—এবং মৃত্যুর। এই শহরের জন্য নিজের প্রাণের পণ রেখেছিলেন পাঞ্জাবের অশীতিপর নেতা সর্দার দর্শন সিং ফেরুমান। একাদিক্রমে ৭৪ দিন অনশনে কাটিয়ে গত ২৭ অকটোবর তারিখে বিকালে সাড়ে তিনটায় অমৃতসরের ভিকটোরিয়া জুবিলি হাসপাতালের একটি কক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাচীন দেশসেবী ও পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য সর্দার ফেরুমান।

চণ্ডীগড় শহরকে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এটা ছিল সর্দার দর্শন সিং ফেরুমানের অন্যতম দাবী। তাঁর অন্য দুটি দাবী ছিল, যেসব পাঞ্জাবী ভাষাভাষী অঞ্চল এখন হরিয়ানা বা হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত আছে সেগুলিকে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ভাকরা-নাঙ্গল প্রকল্পটিকে পাঞ্জাবের হাতে তুলে দিতে হবে। এই দাবীগুলি আদায়ের জন্য তিনি গত ১৫ আগস্ট থেকে অনশন করছিলেন।

এই সব দাবীতে পাঞ্জাবে আন্দোলন নতুন নয়, এমন কি দাবীগুলি আদায়ের জন্য আত্মদানের সংকল্প ঘোষণাও নতুন নয়। কিন্তু সর্দার দর্শন সিং ফেরুমান চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তাঁর পণ রক্ষা করায় ঐ দাবীগুলি নতুন গুরুত্ব লাভ করেছে।

১৮৮৪ সালের ১ আগস্ট তারিখে পাঞ্জাবের এক গ্রামে সর্দার দর্শন সিংয়ের জন্ম। গ্রামের নাম অনুসারেই 'ফেরুমান' তার নামের অংশ। এক বিত্তশালী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাঁদের পরিবারে প্রচুর জমিজমা ছিল এবং মালয়ে ভাল ব্যবসায় ছিল। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে ফেরুমান সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন; কিন্তু দুবছর পরে তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। কিছুকালের মধ্যেই সর্দার দর্শন সিং ফেরুমান কংগ্রেস ও অকালী দলের কর্মী রূপে পরিচিত হন। অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের চাবি ইংরাজদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য যে আন্দোলন হয় তাতে যোগ দিয়ে তিনি এক বছরের জন্য কারাদণ্ড

অসলো (নরওয়ে) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অড হাসলে (৭২) ও অধ্যাপক এরেক বার্টন (লন্ডন) এবছর যুগ্মভাবে রসায়ন বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। সংবাদ ঘোষিত হওয়ার পর সাংবাদিকরা হাসেলের সঙ্গে দেখা করলে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করছেন (ওপরের ছবি)। অপর ছবিতে দেখা যাচ্ছে অধ্যাপক বার্টনকে (৫১)। ইনি লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্সের জৈব রসায়ন ক্রিয়া বিভাগে গবেষণা কাজে নিযুক্ত আছেন।
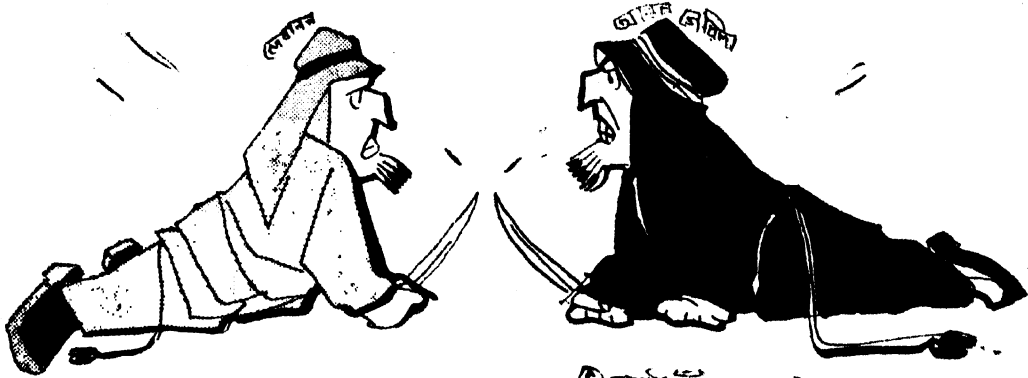
দণ্ডিত হন। সেই তাঁর প্রথম কারাবাস। পরবর্তী কালে তিনি বারবার কারাগারে গেছেন এবং তাঁর জীবনের প্রায় ২০ বছর সময় কেটেছে জেলের ভিতরে। তিনি গান্ধীজীর পিকেটিং আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, বৃটিশ সরকার কর্তৃক গদীচ্যুত নাভার মহারাজার সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, আইন অমান্য আন্দোলন করেছেন, স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁর আমলে কিষাণ আন্দোলন করেছেন। মাঝখানে কিছুদিন পিতার ব্যবসায়ে সাহায্য করার জন্য তিনি মালয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে পাঞ্জাবী জাতীয়তাবাদীদের সংগঠনে যোগ দিয়ে তিনি সেখানকার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন এবং তাঁরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে দেশে পাঠিয়ে দেন। মালয়ে অবস্থানকালেও ফেরুমান একবার অনশন করেছিলেন। অতীতে দুবার ফেরুমান অকালী দলের সভাপতি হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি অকালী দলের সংস্রব ত্যাগ করেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার প্রশ্নে অকালী দল যখন দ্বিধাবিভক্ত হল তখন ফেরুমান দল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন সম্পর্কে তিনি আর একবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ফেরুমান রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। পরে তিনি স্বতন্ত্র দলে যোগ দেন এবং গত ১ আগস্ট পর্যন্ত ঐ দলের পাঞ্জাব শাখার সভাপতি ছিলেন। ঐ তারিখেই তিনি তাঁর আমৃত্যু অনশনের সংকল্প ঘোষণা করেন। অনশন আরম্ভ করার আগে তিনি বলেছিলেন, 'শিখ যদি কোন মহত্তর লক্ষ্যের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প গ্রহণ করে তাহলে পৃথিবীতে কেউ তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারে না।'

সর্দার ফেরুমান তাঁর প্রাণ দিয়ে সংকল্প রক্ষা করে গেছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে ৭৪ দিন ধরে তিনি মৃত্যুর সংগে লড়াই করে তিনি চিকিৎসকদের অবাক করে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'উনি কেবল নিজের ইচ্ছাশক্তিতেই বেঁচে ছিলেন।' তিল তিল করে যখন তিনি অবধারিত মৃত্যুর দিকে পা বাড়াচ্ছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী গুরুনাম সিং, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলাল প্রভৃতি অনেকেই তাঁকে অনশন ত্যাগ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার নেতাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে বসে চণ্ডীগড় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার পর সাংবাদিকদের কাছে বলেন, 'ফেরুমানের দিকে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। তিনি একজন প্রবীণ ও নিষ্ঠাবান মানুষ। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি ভুল পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এমন একটা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যাতে যথাসম্ভব কম গোলযোগ ও স্বল্পতম তিক্ততা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়। যখন কেউ অনশন করেন তখন সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়।'

কি সেই সমাধান? এখন পর্যন্ত কেউ জানে না। তিন বছর যাবৎ চণ্ডীগড়ের ভবিষ্যতের প্রশ্নটি অমীমাংসিত হয়ে রয়েছে এবং এই তিন বছর ধরেই চণ্ডীগড় শহর পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে বিরোধের বৃহত্তম ক্ষেত্র হয়ে রয়েছে।

যখন থেকে ভারত সরকার পাঞ্জাবী সুবার দাবী নীতিগতভাবে মেনে নিলেন এবং ভাষার ভিত্তিতে আগেকার পাঞ্জাবকে ভেঙে দুটুকরা করার সিদ্ধান্ত করলেন তখন থেকেই চণ্ডীগড় নিয়ে বিরোধ চলছে। দুই রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করার জন্য ভারত সরকার সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রীজে সি শাহ-এর নেতৃত্বে যে সীমানা কমিশন গঠন করেন, দুর্ভাগ্যবশত তাঁরাও প্রস্তাবিত দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী খরার তহশিল সম্পর্কে একমত হতে পারলেন না। (চণ্ডীগড় শহরটি এই তহশিলেরই অন্তর্ভুক্ত)। বিচারপতি শাহ-এর সংগে একমত হয়ে কমিশনের আর একজন সদস্য শ্রীএন এম ফিলিপ বললেন যে, খরার তহশিলের একটি ক্ষুদ্র অংশ বাদে বাকী সবটাই হিন্দীভাষী এবং ঐ ক্ষুদ্র অংশটুকুকে হিমাচল প্রদেশের সংগে যুক্ত করে বাকী তহশিল হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কমিশনের অন্য সদস্য শ্রীসুবিমল দত্ত বললেন যে, চণ্ডীগড় শহর তৈরী করার কাজে শ্রমিক হিসাবে যাঁরা সাময়িকভাবে এসেছেন তাঁদের ও তাঁদের পরিবারবর্গকে এই বিষয়ে গণনার মধ্যে আনা উচিত নয়। যদি তাঁদের বাদ দেওয়া যায়

তাহলে দেখা যাবে, এই তহশিল প্রধানত পাঞ্জাবীভাষী এবং সেটি পাঞ্জাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই উচিত। তবে শ্রীদত্ত সঙ্গে সঙ্গে এই সুপারিশও করলেন যে, যেহেতু হরিয়ানায় রাজধানী হওয়ার মত উপযুক্ত শহর নেই সেহেতু আপাতত এক বছর বা দু বছর একই সঙ্গে দুই রাজ্যের রাজধানী হয়ে থাকতে পারে।

এই রিপোর্ট বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই নয়াদিল্লীতে দুই রাজ্যের তরফ থেকেই প্রবল তদ্বির আরম্ভ হয়ে গেল। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন তারিখে হরিয়ানা থেকে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল দিল্লীতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে দাবী জানালেন, শাহ কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের রিপোর্ট অনুযায়ী চণ্ডীগড় হরিয়ানাকে দেওয়া হোক। অপরপক্ষে, পাঞ্জাব থেকে তিন দল প্রতিনিধি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চণ্ডীগড়ের উপর পাঞ্জাবের দাবী জানালেন। এই তিনটির মধ্যে একটি প্রতিনিধিদলে ছিলেন অকালী দলের দুই অংশের লোক। (তখন অকালী দল সন্ত ফতে সিং ও মাস্টার তারা সিং-এর গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত ছিল)। এই প্রতিনিধিদলের যুক্তি হল, প্রথমত চণ্ডীগড়ের অধিকাংশ মানুষ পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলেন এবং দ্বিতীয়ত হরিয়ানার মত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য চণ্ডীগড়ের মত এত বড় শহরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না।

কেন্দ্রীয় সরকার তখনকার মত ব্যাপারটা চাপা দিলেন চণ্ডীগড় ও তার আশেপাশে দশ মাইল এলাকাকে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল এবং পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের যৌথ রাজধানী হিসাবে ঘোষণা করে।

১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে নূতন পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্য গঠিত হল। কিন্তু দুই রাজ্যের শুধু যে এক রাজধানী হল তাই নয়, তাদের এক রাজ্যপাল এবং এক হাইকোর্ট হল। নূতন রাজ্য গঠিত হওয়ার পরদিনই সন্ত ফতে সিং-এর সাতজন অনুগামী চণ্ডীগড় শহর ও 'অন্যান্য পাঞ্জাবীভাষী অঞ্চল' পাঞ্জাব থেকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে এবং এক রাজ্যপাল ও এক হাইকোর্টের মারফৎ দুই রাজ্যের মধ্যে একটা সাধারণ যোগসূত্র রেখে দেওয়ার প্রতিবাদে পাঞ্জাব বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করলেন। একই কারণে দুজন অকালী সদস্য পার্লামেন্ট থেকেও পদত্যাগ করলেন।

ইতিমধ্যে হরিয়ানার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা হুমকী দিলেন, 'হরিয়ানা রাজ্যের এক ইঞ্চি জমিও ছেড়ে দেওয়া হবে না এবং চণ্ডীগড়ের প্রশ্নটি যদি নতুন করে তোলা হয় তাহলে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হিন্দীভাষী অঞ্চলগুলি সম্পর্কেও আলোচনা করতে হবে।'

ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখে অকালী নেতা সন্ত ফতে সিং ও তাঁর ছয়জন অনুগামী অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে অনশন আরম্ভ করলেন। ২৬ ডিসেম্বর তারিখে এই সাতজন মন্দিরের ভিতর অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেবেন বলেও ঘোষণা করা হল। বিপদের আশঙ্কায় ২৫ ডিসেম্বর তারিখে অমৃতসরে ৪৮ ঘন্টাব্যাপী কারফিউ জারী করা হল, সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হল এবং দুই হাজারের বেশী অকালী কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল। ২৬ ডিসেম্বর তারিখে সন্ত ও তাঁর সহযোগিরা যখন আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার আয়োজন কর-ছিলেন তখন নাটকীয়ভাবে স্বর্ণমন্দিরে এসে পেঁৗছলেন লোকসভার তৎকালীন স্পীকার শ্রীহুকুম সিং। সন্ত ও অকালী দল ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সঙ্গে হুকুম সিং-য়ের আলোচনার পর ঘোষণা করা হল যে, চণ্ডীগড় ও ভাকরা বাঁধ পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের প্রশ্নটি শ্রীমতী গান্ধীর কাছে সালিশীর জন্য পেশ করা হবে এবং যেসব অঞ্চল নিয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে বিরোধ আছে সেগুলির উপর দুই পক্ষের দাবী বিবেচনা করে দেখার জন্য ভাষাবিদদের একটি কমিটি বা কমিশন গঠন করা হবে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে সন্ত ফতে সিং ও তাঁর অনুগামীরা অগ্নি-কুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া থেকে বিরত হলেন এবং অনশন ভঙ্গ করলেন।

হুকুম সিংয়ের এই মধ্যস্থতা নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক বিতর্ক হয়েছে। ভারত সরকার বলেছেন যে, শ্রীহুকুম সিংকে তাঁরা সরকারের হয়ে কোন কথা দেওয়ার জন্য অমৃতসরে পাঠান নি। সন্ত ফতে সিং বলেছেন, তাঁর দাবী 'শীঘ্র' মিটিয়ে নেওয়া হবে বলে তিনি পরিপূর্ণ ও লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। হরিয়ানার তৎ-কালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা বলেছেন যে, তিনি ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার গুরুমুখ সিং মুসাফির দুই রাজ্যের ভিতরকার সব বিরোধে শ্রীমতী গান্ধীকে সালিশ মানতে রাজী হয়েছেন। অপরপক্ষে, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সর্দার গুরুমুখ সিং মুসাফির প্রস্তাব করেন যে, চণ্ডীগড়ের প্রশ্নটি সালিশীর জন্য শ্রীমতী গান্ধীর কাছে পেশ করে অন্যান্য আঞ্চলিক বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি কমিটি বা কমিশন গঠন করা হোক। দুই পক্ষ একমত না হওয়ায় এবং ইতিমধ্যে সাধারণ নির্বাচন এসে যাওয়ায় বিষয়টি আবার চাপা পড়ল।

এই অবস্থার মধ্যেই গত আগস্ট মাসে দর্শন সিং ফেরুমান তাঁর অনশন আরম্ভ করলেন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা, দুই রাজ্যেই অনেক রাজনৈতিক ওলট-পালট হয়ে গেছে। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সন্ত ফতে সিং যখন আগুনে আত্ম-বিসর্জন দিতে যাচ্ছিলেন তখন দুই রাজ্যেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ছিল। আর ফেরুমান যখন তাঁর অনশন আরম্ভ করলেন তখন পাঞ্জাব কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং হরিয়ানা একবার সংযুক্ত বিধায়ক দলের হাতফেরতা হয়ে আবার কংগ্রেসের কাছে ফিরে এসেছে। সেবার সন্ত ফতে সিং-য়ের পিছনে ছিল অকালী দল। আর এবার কংগ্রেস পুরোপুরি ফেরুমানের পিছনে দাঁড়িয়ে সন্তকে ও তার অকালী দলকে বিব্রত করার চেষ্টা করেছে। সন্ত ফতে সিং সঙ্কল্পভ্রষ্ট হয়েছেন, এই প্রচার খুব জোর করে চালান হচ্ছে। অবশেষে গত ৯ অকটোবর সন্ত ফতে সিং আবার আত্মহুতি দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর 'সহানুভূতিশূন্য মনোভাব' তাঁকে ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসের পরিস্থিতি পুনরায় সৃষ্টি করতে বাধ্য করছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন চণ্ডীগড় সমস্যার সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে দুই রাজ্যের নেতাদের সঙ্গে কয়েক দফা বৈঠক করেছেন। কিন্তু সমস্যা যেখানকার সেখানেই রয়ে গেছে। ভারত সরকারের পক্ষে মুস্কিল এই যে, চণ্ডীগড় সম্পর্কে হরিয়ানার মনোভাবও বেশ তীব্র। ফেরুমানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাল্টা দাবী নিয়ে হরিয়ানার নেতা শ্রীউদয় সিং মানও কিছুকাল অনশন করেছিলেন। যদিও ৪৩ দিন অনশন করার পর তিনি প্রধানমন্ত্রীর আবেদনে অনশন ভঙ্গ করেছেন তাহলেও রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে চণ্ডীগড়ের উপর পাঞ্জাবের দাবী মেনে নেওয়া কঠিন। এই দাবী মেনে নেওয়া মানেই হরিয়ানার কংগ্রেস সরকার ভেঙ্গে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া। বিশাল হরিয়ানা পার্টির নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দ্র সিং ইতিমধ্যে শাসিয়ে রেখেছেন, 'হরিয়ানার প্রতি যদি অবিচার করা হয় তাহলে সেখানে দ্বিতীয় তেলেঙ্গানা হবে। হরিয়ানা দিল্লীর কাছে। অতএব আমরা কেন্দ্রকে আরও বেশী অসুবিধায় ফেলতে পারব।'

চন্ডীগড়ের ভবিষ্যৎ

চন্ডীগড়কে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে প্রবীণ শিখ নেতা দর্শন সিং ফেরুমন ৭৪দিন অনশন করে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর এই আত্মদানের তুলনা নেই। স্বভাবতই তাঁর মৃত্যুতে পাঞ্জাবের জনগণের মনে চন্ডীগড়ের জন্য দৃঢ় ও অনমনীয় সংকল্প আবার দানা বেঁধে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হুমকীর কাছে নতি স্বীকার করবেন না বলে কেন্দ্রীয় সরকার ফেরুমনের জীবনরক্ষার জন্য চন্ডীগড় সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। তা সত্ত্বেও ফেরুমনকে তাঁর সংকল্প থেকে ফেরাবার জন্য কেউ চেষ্টা করেননি। কারণ তাঁরা জানতেন যে, অনশনের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কোনোরূপ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। ফেরুমনের অমূল্য জীবন নষ্ট হল এবং তার ফলে চন্ডীগড় নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।

অকালী দলের নেতা সন্ত ফতে সিং পাঞ্জাবি সুবার জন্য আন্দোলন করে তা পেয়েছেন। তিনিও চন্ডীগড়কে পাঞ্জাবের মধ্যে রাখার পক্ষে। কিন্তু এ জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর সালিশী স্বীকার করে নিয়েছিলেন। হরিয়ানার নেতারা যদি তা প্রথমে স্বীকার করেও পরে প্রত্যাহার না করতেন তাহলে আজ পাঞ্জাব-হরিয়ানার সম্পর্ক এমন তিক্ত হত না। ফেরুমনের মৃত্যুকে কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা নিজেদের কাজে লাগাবার যে চেষ্টা করছেন সন্ত ফতে সিং তার নিন্দা করেছেন। ফেরুমনের অন্ত্যেষ্টি উপলক্ষে যে-হাঙ্গামা ঘটে তা এই ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি বলে সন্ত ফতে সিং অভিযোগ করেছেন।

ইতিমধ্যে অনশনের আরও হুমকী এসেছে। ফতে সিংকে তার নেতৃত্ব রাখতে হলে শিখ ঐতিহ্য অনুযায়ী আত্মদানের পথ বেছে নিতে হবে। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার যদি চন্ডীগড় পাঞ্জাবকে না দেন তাহলে তিনিও আত্মাহুতি দেবেন। ভারতীয় রাজনীতিতে এ এক নতুন সংকট। বহু ভাষা, বহু জাতি ও বহু ধর্ম নিয়ে ভারতবর্ষ। এদের মধ্যে সমন্বয় রাখতে না পারলে ভারতের জাতীয় কাঠামোর ঐক্য রাখা সম্ভব নয়। পাঞ্জাবিরা পাঞ্জাবি সুবা পেয়েছেন। পাঞ্জাবিদের ভাষা সংস্কৃতি ও জাতীয় বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার জন্যই এই দাবি কেন্দ্রীয় সরকারকে বিরাট আন্দোলনের মুখে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল যে, এরপর অবশিষ্ট সমস্যা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা সম্ভব হবে। চন্ডীগড়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শা-কমিটির মেজরিটি রিপোর্ট হরিয়ানারই পক্ষে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার ভয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সেই সুপারিশ কার্যকর করেননি। চন্ডীগড়কে গড়া হয়েছিল নতুন পাঞ্জাবের রাজধানী হিসাবে। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী স্থপতি কর্বুজিয়রের স্বপ্নের শহর চন্ডীগড়। ভারতবর্ষে এমন শহর দ্বিতীয় নেই। চন্ডীগড় তাই আজ সকলের গৌরবের শহর। পাঞ্জাব যে কোনোদিন আবার খণ্ডিত হবে সে চিন্তা কারু মনে আসেনি। সবাই ভেবেছিল দেশ বিভাগে একবার পাঞ্জাব রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে খণ্ডিত হয়েছে। এবার নতুন পাঞ্জাব গড়ে উঠবে সকলের মিলিত প্রযত্নে। সেই পাঞ্জাব কুড়ি বছরের মধ্যে আবার খণ্ডিত হল এবং চন্ডীগড় কার ভাগ্যে পড়বে তাই নিয়ে লেগেছে দ্বন্দ্ব। সমুদ্রমন্থনের পর লক্ষ্মীর হাতে ধরা অমৃতকুম্ভ নিয়ে এমনি কলহ সৃষ্টি হয়েছিল সুরাসুরের মধ্যে। সমুদ্রমথিত হলাহল পান করবার লোক কেউ ছিল না। একমাত্র মহাদেব ছাড়া। তিনি সেই বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। আজকের পাঞ্জাব-হরিয়ানার দ্বন্দ্বে অমৃতলোভী সবাই। কিন্তু যে-বিষ উঠেছে এই তিক্ত আন্দোলনের দ্বারা তাকে কণ্ঠে ধারণ করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রীকে।

চন্ডীগড়কে দুই রাজ্যের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায় কিনা সে প্রশ্নও বিবেচনা করতে হবে। এখন যেভাবে চন্ডীগড় আছে, কেন্দ্র শাসনাধীন তাতেই বা ক্ষতি কোথায়? স্থিরমস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখলে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার যুগ্ম কর্তৃত্বই চন্ডীগড় সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। এছাড়া অন্য যে কোনো সিদ্ধান্তই কোনো না কোনো পক্ষকে আশাহত, ক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট করবে। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার নেতাদের এই বিষয়টি আজ চিন্তা করে দেখতে হবে। কারণ একমাত্র চন্ডীগড় পেলেই পাঞ্জাবের বা হরিয়ানার পরমার্থ লাভ হবে না। পরস্পরের সহায়তা এবং সহযোগিতা ছাড়া এই দুই রাজ্য বাঁচতে পারবে না এবং এদের অনিষ্ট হলে ভারতবর্ষেরই অনিষ্ট হবে। আজ সকল রাজনৈতিক নেতাদের দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হবে।

(এক)

'স্যান্ডারসন' কাগজ কোম্পানীর ফরেস্ট অফিসারের চাকরী নিয়ে আজই এলাম এখানে। পাহাড়ের মাথায় ছোট খাপরার চালের পুরোনো আমলের বাংলো। পাশা-পাশি তিনটি ঘর। সামনে পিছনে চওড়া বারান্দা। ঘরগুলো বড় বড়। বাংলোর হাতাটাও বিরাট। চমৎকার ড্রাইভ। দুপাশে দুটো জ্যাকারান্ডা গাছ। তাছাড়া কৃষ্ণচূড়া, ক্যাসিরা নডুলাস, চেরী ইত্যাদি গাছে চারিদিক ভরা। বাঙলোর চারপাশের সীমানায় কাঁটাতার অর কাঁটা-ঝোপ।

জায়গার নাম রুমান্ডি।

ব্রজেন ঘোষ, (ঘোষদা) পৌঁছে দিয়ে গেলেন। বললেনঃ 'এই হোল তোমার ডেরা, এইখানেই থাকবে, এইখানে বসেই বাঁশ-কাটা কাজ তদারকী করবে, এইখানেই এখন থেকে তোমার ঘর-বাড়ী সব।'

বাঙলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে যেদিকেই তাকালাম শুধু পাহাড় আর পাহাড়, বন আর বন। সত্যিকথা বলতে কি, বেশ গা-ছমছম করতে লাগল। বেশী মাইনের লোভে পড়ে এই ঘন জঙ্গলে এসে পাণ্ডব-বর্জিত পাহাড়ের বেঘোরে বাঘ-ভাল্লুক ডাকাতের হাতে প্রাণটা না যায়।

ছোটবেলা থেকে কোলকাতায় মানুষ, সেখানেই পড়াশুনো শিখেছি। সেখানকার ট্রাম আর দোতলা বাসের গর্জন শুনে এবং মানুষের মেলা দেখে অভ্যস্ত আছি। কিন্তু এ এক আশ্চর্য জগতে এসে পড়লাম। এই দিনের বেলাও কোন জনমানব নেই। কেবল বাস্ত হাওয়াটা রাশ রাশ বিচিত্রবর্ণ শুকনো পাতা তাড়িয়ে নিয়ে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। সেই পাতার নাচের শব্দ ছাড়া আছে টিয়ার ঝাঁকের কর্কশ শব্দ। এই বিচ্ছিন্ন ও অসহনীয়ভাবে নির্জন জঙ্গলে কি করে যে দিন কাটবে জানি না। তার উপর এক বছরের চুক্তিতে এসেছি। কাজ করবো না বললেই হলো না, পালিয়ে গেলেই হলো না। প্রায় কান্না পেতে লাগলো।

ঘোষদা বললেন, 'তোমার কোন অসুবিধা হবে না। বাবুর্চি আছে ভাল। নাম—জুম্মান। পাহাড়ের নীচের হাটে গেছে বোধহয় তোমার খাওয়া-দাওয়ার ইন্তেজাম করতে। আর এই হচ্ছে রামধানিয়া, তোমার খিদমদগার।'

একটি অত্যন্ত সাধাসিধে লোক এসে লম্বা কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো।

ঘোষদা বললেন, 'আমি এবার চলি, তুমি চানটান করে বিশ্রাম করো, জুম্মান এই এলো বলে। খেয়েদেয়ে বেশ ভালো করে ঘুমিয়ে নিয়ে আজকের দিনটা রেস্ট নাও। কাল থেকে কাজ শুরু। এখানে যে রেঞ্জার আছে, সে ছেলেটি ভালই। তবে বড় সাংঘাতিক টাইপ।'

চমকে উঠলাম। 'মানে?'

ঘোষদা হেসে বললেন, 'না না তোমার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করবে বলে মনে হয় না। তবে ছেলেটি বড় বেপরোয়া। ওকে একটু সামলে-সুমলে চলো বাপু নইলে বিদেশে কি বিপদ সৃষ্টি করবে কে জানে? রেঞ্জারের নাম যশোবন্ত।'

বারান্দা থেকে নামতে নামতে থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'বাইরে চলাফেরা করার সময় একটু সাবধান কোরো। গরমের দিন সাপের বড় উপদ্রব।'

'সাপ ?' একেবারে কুঁকড়ে গেলাম। বাঘ, ভাল্লুককে তাও দেখা যায়, বোঝা যায়, হাতে-পায়ে হেঁটে আসে। এই ঘিন-ঘিনে বুকে-হাঁটা পিচ্ছিল কুৎসিত সরীসৃপকে দেখলেই একটা অস্বস্তি লাগে। সারা শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। সভয়ে শুধোলাম, 'কি সাপ আছে?'

ঘোষদা বললেন, 'আছেন সকলেই। শঙ্খচূড়, কালকেউটে, পাহাড়ী গহুমন ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কম যায় না। এই গরমের সময়টাতেই বেশী ভয়। ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটু সাবধানে থাকলেই হবে। ফর্সা জায়গা দেখে পা ফেলো।' এই বলে উনি গাড়িতে উঠলেন, তারপর ওঁর জীপ লাল ধুলো উড়িয়ে চলে গেলো।

ঘরগুলো বেশ বড় বড়। বিরাট বিরাট জানালা ঘরের তিনদিকে। জানালায় শিক নেই কোনো। দু-পাশে দুটি ঘর। মধ্যে বসবার ঘর-কাম-খাবার ঘর। প্রত্যেক ঘরের পেছনেই সংলগ্ন বাথরুম। বাথরুমে বেশ উঁচু কাঠের পাটাতন। বড় বাথটাব। একটি ওয়াশ বেসিন। সব দেওয়ালে একটি করে বড় জানালা আছে।

দরজা খুলে পিছনের উঠোনে গিয়ে পড়তে হয়। পিছনের উঠোনের পর জুম্মান ও রামধানিয়ার কোয়ার্টার, বাবুর্চিখানা, কাঠ ও কয়লা রাখার ঘর ইত্যাদি। উঠোনের এক-পাশে একটা বিরাট গাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে অনেকদিনের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একঝাঁক হলদে রঙা শালিক তাতে কিচির-মিচির করছে।

জানালার যা সাইজ তাতে হাতীর বাচ্চা পর্যন্ত অনায়াসে ঢুকে পড়ে আমার নেয়ারের খাটিয়াতে শুয়ে থাকতে পারে। একে তো এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে আছি, এই জানালাটাই যথেষ্ট জানা, তার উপর যদি ঘরের মধ্যে হিংস্র জানোয়ার ঢুকে পড়ার ভয় থাকে তবে তো অস্বস্তির একশেষ। এ সাইজের জানালা দিয়ে ঠিক কোন কোন জানোয়ার এবং কত সংখ্যায় প্রবেশ করতে পারে তা ইচ্ছে করলেই রামধানিয়াকে শুধোনো যেত, কিন্তু প্রথম দিনেই কোলকাতিয়া বাবুর স্বরূপ উদ্ঘাটিত যাতে না হয় সেই চেষ্টায় আপ্রাণ সতর্ক।

জুম্মান সত্যিই রাঁধে ভাল। এরকম জায়গায় খাওয়াটাকেই হয়ত হোলটাইম অকুপেশন করতে হবে। অতএব একজন যোগ্য বাবুর্চির প্রয়োজন নিতান্তই।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ইমিডিয়েট বস—ঘোষদার কথা মত একটু গড়িয়েই নিলাম। তারপর রোদের তেজ পড়লে পায়চারি করলাম বেশ কিছুক্ষণ।

বাঙলোর হাতা থেকে দূরে পাহাড়ের নীচে একটি শঙ্খিনী নদী চোখে পড়ে। ঘন জঙ্গলের মাঝে এঁকেবেঁকে চলে গেছে শুকনো শাদা মসৃণ বালির রেখা। এতদূর থেকে জল আছে কি নেই বোঝা যায় না।

রামধানিয়া বললে, নদীর নাম, 'সুহাগী'. আরো এগিয়ে গিয়ে নাকি কোয়েল নদীতে মিশেছে। গ্রীষ্মের জঙ্গলের লাল, হলদে ও সবুজ চঞ্চল প্রাণ-প্রাচুর্যের মাঝে ঐ ছোট নদীর শান্ত সমাহিত নিরুদ্বেগ শ্বেতসত্তাটি ভারী ভাল লাগছিল। কিন্তু এই আসন্ন সন্ধ্যায় একা-একা ঐ অতটা পথ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে নদীতে পৌঁছই, সে সাহস আমার ছিল না।

আলো যত পড়ে আসতে লাগল তত যেন সমস্ত বন পাহাড় বিচিত্র শব্দে, কল-কাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। কতরকম পাখির ডাক। অতটুকু টুকু পাখি যে অত জোরে জোরে ডাকতে পারে, এখানে না এলে বোধহয় জানতে পেতাম না। সব স্বর ছাপিয়ে একটি তীক্ষ্ম স্বর কেঁয়া কেঁয়া করে একেবারে বুকের মধ্যিখান অবধি এসে পৌঁছচ্ছে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে কি এক আর্তি যেন বনের বুক চিরে শেষ বিকেলের বিষন্ন আলোয় ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। রাম-

ধানিয়াকে শুধোলাম, 'ও কিসের ডাক?' কোনও পাখির ডাক নিশ্চয়ই না।' রামধানিয়া হেসে বললে, 'উ মোর হ্যয়, ঔর ক্যা বা।' 'মোর' অথবা মেজর মানে ময়ূর।

রামধানিয়া বলল, 'মোর কাফি হ্যয় হিঁয়া সাব। ঝুনকে ঝুন।' 'ঝুনকে ঝুন' মানে দলে দলে শিখলাম। ভাষাটাও একটা খুব কম বিপত্তির নয়। একসঙ্গে এতগুলো বাধা অতিক্রম করতে হলে মহাবীরের প্রয়োজন। আমার মত পঙ্গুর অসাধ্য কাজ। পৃথিবীতে যে এত পাখি আছে, আদিগন্ত এই বনে, আসন্ন সন্ধ্যায় কান পেতে না শুনলে বোধহয় জানতে পেতাম না।

অন্ধকার নেমে আসতে না আসতে ভয় ভয় করতে লাগল খুব।

বিজলী বাতি নেই। কবে হবে তারও ঠিক-ঠিকানা নেই। আগামী পাঁচিশ বছরের মধ্যে হবে বলেও মনে হয় না। ঘরে ঘরে হ্যারিকেন জ্বলে উঠল। রামধানিয়া বাইরের বারান্দায়ও একটি রেখে গেল। বললাম, 'বাইরেরটা নিয়ে যাও।'

আকাশে চাঁদ ছিল। আজই বোধহয় পূর্ণিমা। একটি হলুদ থালার মত চাঁদ পাহাড়ের মাথা বেয়ে পত্রবিরল শাল বনের পটভূমিতে গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে আকাশ বেয়ে উঠতে লাগল। নীল, নীল, নীল আকাশে। আর সেই ঘন নীলে তার হলুদে রঙ ঝরে গিয়ে অকলঙ্ক শাদা হলো। সমস্ত জঙ্গল পাহাড় হাসতে লাগলো। সেই হাসিতে একটি খেয়ালী হাওয়া ঝুরু ঝুরু করে শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে নাচতে লাগল। চাঁদনী রাতে জঙ্গল, পাহাড়, সুহাগী নদী, প্রত্যেকে এমন এক মোহময়ী রূপ নিল যে মনে হলো এরা সেই দিনের আলোর জঙ্গল-পাহাড় কি নদী নয়। এরা নতুন কেউ।

জানি না, সকলের হয় কিনা। আমার সেই প্রথমে রাতে নতুন জায়গায় একটুও ঘুম এলো না। যদিও পাহাড়ের উপর গরম তেমন কিছুই নেই, তবু জানালা বন্ধ করে ঘুমোনো গেল না। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন শুলাম, তখন নিজেকে সত্যিই বড় অসহায় বলে মনে হতে লাগলো।

সভ্যতা থেকে কতদূরে কোন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের চূড়োয় শুয়ে আছি। জানালা বেয়ে আলো এসে ঘরময় লুটোপুটি করছে। একটি 'বোগোনভেলিয়ার' লতা জানালার পাশ বেয়ে ছাদে লতিয়ে উঠেছে। রাত্রির হাওয়ার দমকে দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে লতাটা। ছায়াটা কেঁপে যাচ্ছে আমার ঘরময়। বাইরে জঙ্গলে অনেক রকম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই নিশাচর জানোয়ারদের। কোনটা কোন জানোয়ারের আওয়াজ জানি না। সমস্ত শব্দ মিলে সেই পূর্ণিমা রাতের রূপোলি শব্দ-সীমন্ত মাথার মধ্যে ঝুম ঝুম করছে। ঘরে শুয়ে শুয়েই জ্বরে জড়সড় হয়ে যাচ্ছি। অথচ বাইরের সুন্দরী প্রকৃতিতে এখন কারা চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে কৌতূহলও যে কম হচ্ছে না, তাও নয়। এ এক অভূতপূর্ব ভয়-মিশ্রিত কৌতূহল।

সারা রাত এপাশ-ওপাশ করে বোধহয় শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে থাকব।

দরজায় ধাক্কা পড়াতে যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখলাম, আমার ঘর শিশু সূর্যের কোমল আলোয় ভরে গেছে এবং আশ্চর্যের বিষয় যে জানালা দিয়ে কোন জানোয়ারই ঘরে প্রবেশ করেনি।

রামধানিয়া দরজা ধাক্কা দিচ্ছিল। দরজা খুলতেই বলল, 'রেঞ্জার সাহাব আয়া।'

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে পায়জামার ওপর পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে বাইরে এলাম। বাইরে এসে কাউকে কোথায়ও দেখতে পেলাম না, দেখলাম, একটি কুচকুচে কালো ঘোড়া কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সপ্রতিভ চোখে তাকিয়ে আছে। ঘোড়াটার গা দিয়ে কালো সাটিনের জেল্লা বেরোচ্ছে।

এদিক-ওদিক চাইতেই দেখি ওঠোনের দিক থেকে একজন কালো, দীর্ঘদেহী, ছিপছিপে সুপুরুষ এদেশীয় ভদ্রলোক আসছেন। তার পেছনে পেছনে রামধানিয়া একটি ভাঙা ঝুড়িতে কিছুর সাদার-হলুদে মেশান টোপা টোপা ফল নিয়ে আসছে।

ভদ্রলোক কাছে আসতেই নিজেই হাত তুলে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন, 'নমস্কার'। প্রতিনমস্কার জানালাম। দেখলাম রামধানিয়া ঐ ঝুড়িভর্তি ফল ঘোড়াটার মুখের সামনে ঢেলে দিল। আর ঘোড়াটা তখনি সেগুলো পরমানন্দে চিবোতে লাগলো।

আমাকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোক এবার পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'ওগুলো কি ফল জানেন?' নেতিবাচক ঘাড় নাড়লাম। উনি বললেন, 'মহুয়া।' উঠোনে যে বড় গাছটা আছে, সেটার ফল। আমি বললাম, 'গাছটা দেখে সেরকম অনুমান করেছিলাম বটে। আগে তো দেখিনি কোনোদিন। ফলও চিনতাম না।'

ভদ্রলোক হো হো করে হাসতে লাগলেন বললেন, 'স্যান্ডারসন কোম্পানীর ফরেস্ট' অফিসার মহুয়া চেনেন না। আজব বাত।'

কথাটায় বেশ অপ্রতিভ হলাম।

উনি বললেন, 'এই মহুয়াই এখানকার লোকের ধমনী বেয়ে চলে। কেন? রাতে এর বাস পাননি? সারারাত হাওয়ায় যে মিষ্টি মাতালকরা গন্ধ পেয়েছেন, তা এই মহুয়ার। সারা জঙ্গল গরমের দিনে ম' ম' করে মহুয়ার গন্ধে। এ বড়া কিমৎি জিনিস। গরুকে খাওয়ান, গরু বেগে দুধ দেবে। ঘোড়াকে খাওয়ান, ঘোড়া তেড়ে ছুটবে। মহুয়ার মদ তৈরি করে মানুষকে খাওয়ান, দেখবেন ঝেড়ে ঘুমোচ্ছে। আরো গুণ আছে, ঘোড়া থেকে নামতে গিয়ে গোড়ালি মচকে গেল তো শুখা-মহুয়া গরম করে সেঁক দিন, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে ঠিক।'

বললাম, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প হয় নাকি? আসুন বসুন।' উনি বললেন, 'একি আপনার কোলকাতা নাকি মশায়, যে মিঠি-মিঠি কথা বলে চলে যাব? অনেক মাইল ঘোড়া চেপে এসেছি। সেই সূর্যোদয়ের আগে উঠেছি ঘোড়ায়, এখানে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে আবার বিকেলে রওনা হয়ে রাতে গিয়ে পৌঁছব।'

উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'বা বা তবে তো ভালই। চমৎকার হলো। ভেরী কাইন্ড অফ ইউ।' 'ভেরী কাইন্ড অফ ইউ' কথাটায় উনি আমার দিকে এমন করে কটমটিয়ে তাকালেন যে বুঝতে তিলমাত্র কষ্ট হলো না যে এই জঙ্গলে ঐ সব মেকী ভদ্রতা অনেকদিন আগেই তামাদি হয়ে গেছে। এখানে মানুষ মানুষকে আন্তরিকতায় আপ্যায়িত করে। তোতাপাখির মত কতগুলো বাঁধা গৎ আউড়ে নয়।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, 'যাই বলুন, বাংলাটা কিন্তু আপনি চমৎকার বলেন।

যশোবন্তবাবু কিঞ্চিৎ ব্যথিত এবং অত্যন্ত অবাক হয়ে বললেন, 'আজ্ঞে? আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।' তারপর বললেন, 'আমি ত বাঙালীই হচ্ছি।'

বিস্ময়ের শেষ রইল না। প্রায় ঢোক গিলে বললাম, 'তাহলে আপনি বাঙালীই হচ্ছেন? কিন্তু যশোবন্ত নামটা তো ঠিক...'

উনি হেসে বললেন, 'আরে তাতে কি হলো? আমরা চারপুরুষ ধরে বিহারে, হাজারীবাগের বাসিন্দা। আমার নাম যশোবন্ত বোস। আমার বাবার নাম নরসিং বোস। আমার মার নাম ফুল্লকুমারী বোস, মামাবাড়ী পূর্ণিয়া জেলায়। আমার মামারাও প্রায় তিন-চারপুরুষ হলো পূর্ণিয়ায়। নাম যাই হোক আমাদের, আমরা বাঙালীই হচ্ছি।'

আমি বললাম, 'তা ত নিশ্চয়। বাঙালী ত হচ্ছেনই।'

যশোবন্তবাবু জানালেন, 'ঘোষসাহেব আমাকে বললেন, আপনার কথা। বললেন খুব বড় খানদানের ছেলে, অবস্থা-বিপাকে পড়ে বহুত-পড়ে-লিখে হয়েও এই জঙ্গলের কাজ নিয়ে এসেছেন, অথচ এর জানেন না কিছুই। তাই ভাবলাম আপনাকে একটু তালিম দিয়ে যাই।'
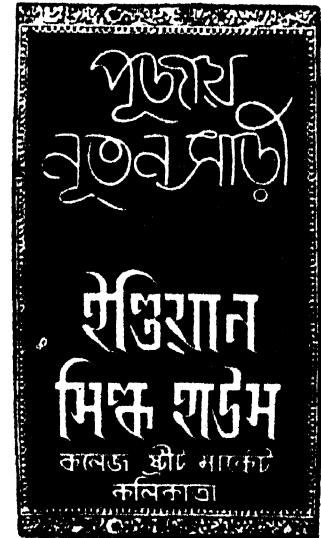
তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এখানে কোনও রক্তের সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। আমরা সকলে সকলের রিস্তাদার। একজন অন্যজনের জন্যে জান কবুল করতেও কখনও হটে না। আও দোস্ত, হাতমে হাত মিলাও।' যশোবন্তবাবু আমার হাতটি চেপে ধরলেন আন্তরিকতার সংগে। যদিও একটু ঘাবড়ে গেলাম, তবুও বললাম, 'ভালই হোল। খুব ভাল হোল। একেবারে একা-একা যে কি করে এখানে দিন কাটাতাম জানি না।' যশোবন্তবাবুর অদ্ভুত সহজ স্বভাবের গুণে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে এলাম। অবশ্য পাঁচ মিনিটের মধ্যে সদাপরিচিত কাউকে তুমি বলা যায়, এ একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যদি কেউ কোনদিন যশোবন্তকে দেখে থাকেন তবে একমাত্র তিনিই এ কথা অবলীলায় বিশ্বাস করবেন।

রামধানিয়া চা নিয়ে এলো, চেরি গাছের তলায়। চিড়ে ভাজা আর চা।

ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। এক-জোড়া বুলবুলি পাখি এসে চেরি গাছের পাতার আড়ালে বসে শিস দিচ্ছে। উপরে তাকালে দেখা যায়, শুধু নীল আর নীল। আশ্চর্য মায়া।

পাহাড়ের নীচের গ্রামের ঘুম ভেঙেছে অনেকক্ষণ। গ্রামের নামও সুহাগী; নদীর নামে নামে। ঘন জংগলের আস্তরণ ভেদ করে ধোঁয়া উঠছে এ'কেবে'কে। পে'জা তুলোর মতো। আকাশের দিকে।

পোষা মুরগীর ডাক, ছাগলের 'ব্যা' 'ব্যা' রব, মোষের গলার ঘণ্টা। কাঠ-কাটার আওয়াজ, এবং ইতস্তত নারীকণ্ঠের তর্জন ভেসে আসছে হাওয়ায়। বেশ ভালো লাগছে। আমিও একেবারে একা নই। অনেক লোকই তো আছে আশেপাশে। বেশ সপ্রাণ, সরব, জীবন্ত সকাল। বেশ ভালোই লাগছে, রাতের ভয়টা কেটে গিয়ে।

যশোবন্ত বলল যে আমার কাজ এমন কিছু কঠিন নয়। কাগজ কোম্পানীর সংগে চুক্তিবন্ধ ঠিকাদার আছেন। সেই ঠিকাদারেরা লরীবোঝাই বাঁশ কেটে কেটে বিভিন্ন স্টেশনে পাঠাবেন, সেইসব বাঁশ ঠিক সাইজ-মত হচ্ছে কিনা, সময়মত পাঠানো হচ্ছে কিনা, এইসব কাজ তদারকী করা। যশোবন্ত এখানকারই ফরেস্ট রেঞ্জার, ওর কাজ, যাতে বনবিভাগের কোনও ক্ষতি না হয়, বন-বিভাগের প্রাপ্য পাওনা ঠিকমত আদায় হচ্ছে কি হচ্ছে না, ইত্যাদি দেখা। আমার কাজ কঠিনও নয়, আহামরি আরামেরও কিছু নয়। মাঝে মাঝে জীপ নিয়ে 'কুপে' 'কুপে' ঘুরে আসা। যতদিন নিজের জীপ না আসে, ততদিন একটু কষ্ট। তাও রোজ যাবার দরকার নেই।

শুধোলাম হে'টে হে'টে জংগলে যেতে হবে। কিন্তু জংলী জানোয়ারের ভয় নেই, তো?

যশোবন্ত বলল, 'জানোয়ারের ভয় মানুষের কিছুই নেই। মানে থাকা উচিত নয়। মানুষের ভয় মানুষেরই কাছ থেকে। তবে, প্রথম প্রথম একটু সাবধানে থাকা ভালো এবং থেকোও। তবে ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া ভয় কেটে যাবে। যারা জংগল, বন, পাহাড়কে জানে না, তারাই ভয় করে মরে। একবার চিনতে পারলে ভালবাসতে পারলে, তখন আর জংগল, পাহাড় ছেড়ে যেতে মন চাইবে না। তাছাড়া আমি তোমাকে শিকার করতে শিখিয়ে দেবো। হাতে একটা বন্দুক নিয়ে বন, পাহাড় চষে বেড়াবে, দেখবে, দিল খুস হয়ে যাবে। সাচ্ মুচ্ দিল্ বড়া খুস্ হো যায়গা।'

কি কথা বলব ভেবে না পেয়ে বললাম, 'ঐ যে নীচে সুহাগী নদী দেখা যাচ্ছে, ওতে জল আছে এখন?'

যশোবন্ত বললো, 'জল আছে বৈকি, চিরচির করে বইছে এখন, তবে যখন গরম আরও জোর বাড়বে তখন উপরে জল আর দেখা যাবে না। তখন নদী অন্তঃসলিলা হবে। বালি খুঁড়লে পাওয়া যাবে, কিন্তু বাইরে দেখে বুঝতে পারবে না যে জল আছে।'

বললাম, 'কালকে রাতে চাঁদ উঠেছিল যখন, তখন নদীটাকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কত নাম না-জানা পাখি ডাকছিল রাতের জংগল থেকে। একটু ভয় করছিল যদিও, কিন্তু বেশ ভাল লাগছিল।'

'লাগবে, ভাল লাগবে বৈকি। নইলে কি আর পড়ে আছি এখানে। সময়মত প্রমোশন হলে আমি এতদিন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার হয়ে যেতাম। কিন্তু আমার স্বভাব এবং আমার এই পালামৌ প্রীতি এই দুয়ে মিলে হয় 'গারু' নয় 'লাত্' হয়ে 'জাহাল চুঙরু' কিংবা 'বেত্‌লা' এইখানেই বেধে রেখেছে। এ শালী যাদু জানে।' তারপর বলল, 'যাবে নাকি নদীটা দেখতে? চল ঘুরে আসি।'

বাঙলো থেকে পাকদণ্ডী রাস্তা বেয়ে নামতে নামতে ভাবছিলাম। যশোবন্ত ছেলেটার মধ্যে বেশ একটা 'রুডনেস্' আছে, যা তার চলনে-বলনে, ভাবভংগিতে সবসময় ফুটে ওঠে, যা এই জংগল পাহাড়ের নগ্ন পরিপ্রেক্ষিতে একটি আংগিক বিশেষ বলে মনে হয়।

যশোবন্ত শুধোলো, 'এটা কি গাছ জান?' বললাম, 'জানি না।'

'অর্জুন গাছ। এ জংগলে 'অর্জুন' এবং 'শিশু' প্রচুর আছে। তাছাড়া আছে শাল। সবচেয়ে বেশি। শালকে এখানকার লোকেরা বলে 'শাকুয়া'। তাছাড়া আরও অনেক গাছ আছে। কে'দ, পিয়ার, আসন, পন্নান, প'ইসার, গমহার, সাগুয়ান ইত্যাদি এবং নানারকমের বাঁশ সকলের নাম কি আমিই জানি? ঝোপের মধ্যে আছে পিটিস্, কুল, কেলাউন্দা এবং অন্যান্য নানা কাঁটা গাছ। ফুলের মধ্যে আছে ফুলদাওয়াই, জীরহুল, মনরঙ্গোলী, পিসাবিবি, কেরাউহা, সফেদিয়া এবং আরও কত কি। কত যে ফুল ফোটে তোমাকে কি বলব; আর কি যে মিষ্টি মিষ্টি রঙ। তাদের কি যে গন্ধ। এ জংগলে হরবকত যে হাওয়া বয় তা হামেশা খুসবুতে ভারী হয়ে থাকে। অথচ সে খুসবু একটা বিশেষ কোন ফুলের খুসবু নয়। অনেক ফুল, অনেক লতা, অনেক পাতার ঈস্বরদানী। কিছুদিন থাকো, তখন আপনিই হাওয়া নাকে এলে বুঝতে পারবে কোন ফুলের বা ফলের খুসবুতে ভারী হয়ে আছে হওয়া।'

আমরা বেশ খাড়া নামছি। এ'কেবে'কে পাথরের পর পাথরের উপর দিয়ে ঘন জংগলের ছায়ানিবিড়, সুবাসিত পথে আমরা নেমে চলেছি। পথের দুধারে ছোট ছোট লংকার মত কি কতগুলো গাঢ় লাল ফুল ফুটেছে। এমন লাল যে মাথার মধ্যে আঘাত করে। ঝন্‌ঝন্ করে স্নায়ুগুলো সব বেজে ওঠে। যশোবন্তকে শুধোতে বললে, 'এইগুলোই তো ফুলদাওয়াই।' আর ঐ যে ফিকে বেগুনি রঙের ফুলগুলো দেখছো ঐ ডানদিকে, ওগুলোর নাম 'জীরহুল'। এই গরমেই ওদের ফোটা শুরু হল। গরম যত জোর পড়বে ওরা তত বেশি ফুটবে। ওদের রঙে তত চেক্‌নাই লাগবে।

ভাল করে দেখলাম বেগুনি ফুল-গুলোকে। ছোট ছোট ঝোপ, ফুলগুলো হাওয়ায় দুলছে, হেলছে, যেন গান গাইছে, যেন খুশী, ভীষণ খুশী। রঙটা ঠিক বেগুনি বললে সম্পূর্ণ বলা হয় না, কোন কিশোরীর মিষ্টি স্বপ্নের মত রঙ, যে স্বপ্ন আচমকা ভেঙে যায়নি।

সুহাগী নদীতে পৌঁছতে, পাকদণ্ডী বেয়ে বাঙলো থেকে নামতে মিনিট কুড়ি লাগে। পৌঁছেই চোখ জুড়ালো।

কি সুন্দর নদী। ইউক্যালিপটাস গাছের গায়ের মত মসৃণ, নরম, পেলব, সুন্দর বালি। মধ্যে দিয়ে পাথরে পাথরে কলকল করে কথা কইতে কইতে একটি পাঁচ বছরের শিশুর মত ছুটে চলেছে 'সুহাগী'। কারো কথা শুনে ঘর থেকে বেরোয়নি, কারো কথায় থামবেও না ঠিক করেছে।

জলধারা যেখানে সবচেয়ে চওড়া এখন, সেখানে প্রায় ২৫/৩০ গজ হবে। একটি প্রকাণ্ড সেগুন গাছের তলায় একটি বড় কালো পাথরের স্তূপ। চমৎকার বসবার জায়গা। ছায়াশীতল, উ'চু, সেখান থেকে বসে নদীটিকে বাঁক নিতে দেখা যায়। দুপাশে গভীর জংগল। নদী চলেছে তার মাঝ দিয়ে। পথের উপরে ইতস্তত শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে।......হাওয়ায় হাওয়ায় মচমচানি তুলে এপাশে-ওপাশে গড়াগড়ি যাচ্ছে। যশোবন্ত বললে, 'এই পাথরে বসে আমি অনেক জানোয়ার শিকার করেছি।'

সুহাগী থেকে ফিরে এসে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর যেখানে কাজ হচ্ছে, সেখানে নিয়ে গেল যশোবন্ত আমাকে।

অনেকখানি বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে বাঁশ কাটা হচ্ছে। ছোট ছোট বাঁশ, সরু সরুও বটে। এক ধরনের মোটা বাঁশও আছে;

তবে খুবই কম। সে বাঁশ নাকি কাগজ বানাতে প্রয়োজন হয় না। ফরেস্ট ডিপার্ট-মেন্টের খাকী-জামা পরা লোকজন মার্কা করার হাতুড়ি হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজন কন্ট্রাকটরের জঙ্গল আজ মার্কা হচ্ছে।

যশোবন্ত নানারকম বাঁশের নাম শেখাচ্ছিল। 'ব্যাম্বুসা রোবাস্টা', ব্যাম্বুসা-অরন্ডেনাসিয়া, ড্যান্ড্রোক্যালামাস্-স্ট্রিকটাস্ ইত্যাদি। ড্যান্ড্রোক্যালামাস্ স্ট্রিকরচাসই বেশী। মোটা বাঁশ এখানে কম।

বাঁশ কাটার সময় ঠিকাদারের লোকজনই সব করে, তারাই তাদের নিজের গরজে তদরকী করে। সত্যিকথা বলতে কি তেমন কোনও কঠিন কাজই নেই। তবে যখন কোনও নতুন জঙ্গলে কাজ আরম্ভ হবে, সেইসময় আমার এবং যশোবন্তর প্রথম প্রথম কিছুদিন রোজ যেতে হবে; নইলে বাঁশের জঙ্গলে ঠিক-মত কাটা হচ্ছে কিনা, ঠিক মাপের বাঁশ, ঠিক বয়সের বাঁশ-ঝাড় নির্ধারিত হলো কিনা, এসব দেখাশোনা করা যাবে না।

এখানকার সবচেয়ে বড় ঠিকাদার মাল-দেও তেওয়ারী। খুব নাকি ভাল লোক। সমস্ত জঙ্গলে প্রচুর লরী এবং অনেক লোক খাটছে। গরমের সময় কাজ খুব, কারণ বর্ষা-কালটা কাজ বন্ধ থাকবে জঙ্গলে। রাস্তাঘাট অগম্য হয়ে উঠবে। নদীনালা ভরে যাবে। পাহাড়ী নদীর উপর বসানো কজওয়েগুলো জলে ভরে থাকবে। তখন কাজ অসম্ভব।

মালদেও বাবুর ছেলে রামদেও তেওয়ারী, ওখানে সেদিন কাজ দেখতে এসেছিল। ২৫/২৬ বছর বয়স হবে ছেলেটির। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা। বেশ শৌখিন। করিৎকর্মা, প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। অল্প-বয়সে মনে হয় কাজটা ভাল রপ্ত করেছে। কিসে দু' পয়সা আসবে তা জেনেছে।

জঙ্গল থেকে ফিরে সন্ধ্যে হবার পর যশোবন্ত ঘোড়ায় চেপে বসল। যতবার বললাম, কি দরকার রাত করে একটা পথ ঘোড়ায় চেপে গিয়ে? বিকেল বিকেল বেরিয়ে বেলা থাকতে পৌঁছে গেলেন না কেন? ততবারই ও বললো, 'মাথা খারাপ? এই গরমে কে যাবে? আর রাতেই তো মজা। চাঁদনী রাতে পাহাড় জঙ্গলে বেরিয়ে বেড়ানোর মত মজা আছে?'

আমি বললাম, 'কিসের মজা? বলছে হাতী আছে, বাইসন আছে, বাঘ আছে, জঙ্গলী মোষ আছে। যেকোন মুহূর্তে তারা সামনে পড়তে পারে না? আর আপনি বলছেন মজা আছে। এতে মজাটা কিসের?'

যশোবন্ত বলল, 'মজাটা কিসের অতশত ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না, তবে এককথায় বলতে পারি, দিল খুশ হো যাতা হুজুর।'

কথাকটি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সেই চাঁদনী রাতের মোহময় অপার্থিব-বতায় সেই রহস্যময় রাতে, আলো-ছায়ায় ভরা পাহাড়ী পথে যশোবন্ত টগবগ টগবগ করে, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ওর বাংলোয়।—'নইহারে'। (ক্রমশঃ)

বাংলা গদ্য

বাংলা গদ্যের বয়স আজ দেড়শতাধিক বর্ষ অতিক্রান্ত। এই গদ্যরীতির ক্রম-বিকাশের ধারাটি সাহিত্যের ইতিহাসে অভাবনীয়। বাংলা ভাষার আকৃতি দানের কৃতিত্ব তাঁদের বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা নয়। বিদেশী শাসক, বাঙালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর ফারসীজানা মুনসীদের দ্বারা গঠিত একটি ক্ষীণাকৃতি গোষ্ঠীর ওপর ভার পড়েছিল একটা কাজচলা গোছ ভাষা দাঁড় করানোর। পিছনে ছিল শাসক সম্প্রদায়ের উৎসাহ। সেদিনের সেই পথিকৃৎরা অসামান্য অধ্যবসায় এবং কৃতিত্বের সঙ্গে একটা ভাষার আকার দান করলেন। সরকারি কাজকর্মের প্রয়োজনে যে ভাষার উৎপত্তি আজ তা কিভাবে প্রসার লাভ করেছে তা শুধু বাঙালী লেখক ও পাঠক নয়, বাংলার বাইরেও আজ প্রচারিত। ১৮০১ খৃস্টাব্দে বাংলা গদ্য গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটে। বাঙালীর মুখের কথায় ব্যাকরণের বাঁধন দিয়ে পণ্ডিতরা একটা মহৎ ভাষা সৃষ্টি করলেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে' এই বিষয়ের একটি সহজ বিবরণ দিয়েছেন—

'ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইল, এই সঙ্গে বাঙ্গালায় নূতন সমাজের ও নূতন সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য সিবিলিয়ানদিগের উপকারার্থ লর্ড ওয়েল্‌সলি দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য আরম্ভ হইল। বাঙ্গালা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। যেরূপ শান্তি স্থাপিত হইলে সাহিত্য উৎপত্তি হইতে পারে, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও সেরূপ শান্তি রহিল না। যেরূপ অবস্থা হইলে লোক কতকটা সাহিত্যের চর্চা করিতে পারে কলিকাতা ভিন্ন আর এমন স্থান রহিল না। বাঙ্গালার অনেক রাজধানী ছিল, বিদ্যাশিক্ষার অনেক স্থান ছিল। ক্রমে সমস্ত আসিয়া কলিকাতায় মিশিতে লাগিল। বর্গীর হাঙ্গামার সময় হইতে সমস্ত বঙ্গদেশের লোক উঠিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। গঙ্গার দুই তীর ক্রমে সভ্যলোকে পূর্ণ হইতে লাগিল।

এইভাবে ক্রমশঃ কলিকাতার গঙ্গা-তীরবর্তী মানুষের মুখের ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে। এতকাল পয়ার ছন্দেই কাজ চলছিল, নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে ওঠার সঙ্গে গদ্যের প্রসার বৃদ্ধি হল। মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভব এই প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হল।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁর 'সাধুভাষা বনাম চলতি ভাষা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন—

'সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বঙ্গ ভাষার সম্বন্ধ যে অতিশয় ঘনিষ্ঠ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মতে ভাষা শব্দ ত্রিবিধ—তজ্জ, তৎসম, দেশ্য। বঙ্গ ভাষায় তজ্জ (তদ্ভব) এবং তৎসম শব্দের সংখ্যা অসংখ্য, দেশ্য শব্দের সংখ্যা অল্প, এবং বিদেশী শব্দের সংখ্যা অতি সামান্য। এ বিষয়ে ফরাসী ভাষার সহিত বঙ্গ ভাষা একজাতীয় ভাষা।...লাটিন ভাষার সহিত ফরাসী ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গ ভাষারও ঠিক একইরূপ সম্বন্ধ।' এই প্রসঙ্গে তিনি লিটন স্ট্রাচির একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। চৌধুরী মহাশয় উক্ত উদ্ধৃতিকে বঙ্গ ভাষার প্রতি প্রয়োগ করে স্বীয় যুক্তির সঙ্গে সাদৃশ্য নির্দেশ করেছেন। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত, ফরাসী ও লাটিন ভাষা জানতেন তাই তাঁর এই উক্তিকে নস্যাৎ করা সহজ নয়। বরং তাঁর এই অভিমত গ্রহণযোগ্য এবং সম্ভবপর মনে হয়।

১৮০১ খৃস্টাব্দে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' থেকে সুরু করে অতি সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় নানা বিবর্তন ঘটেছে। ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। বহু শক্তিশালী গদ্যলেখকের আবির্ভাবে এবং অজস্র পরিভাষা সৃষ্টি হওয়ায়। কোনোরূপ বিদেশী ভাষার সহায়তা না গ্রহণ করেই সহজবোধ্য ভঙ্গীতে নিছক বাংলায় ভাব প্রকাশ করা আজ আর কঠিন নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের এই রোমাঞ্চকর বিবরণ পাওয়া যাবে ডকটর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'বাংলা গদ্য রীতি'র ইতিহাস নামক সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থটিতে।

লেখক এই গ্রন্থ প্রণয়নে এক নূতন রীতির সাহায্য গ্রহণ করেছেন, তিনি ধারাবাহিকভাবে সন তারিখযুক্ত ইতিহাস বিধৃত করেননি। উদ্বোধনী অংশে 'স্টাইলের কথা' এবং 'স্টাইলের বিবর্তন' এই শিরোনামা দুটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, দুটি আলোচনার মধ্যে শেষোক্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সুলিখিত। এই দুটি প্রবন্ধে দেশী ও বিদেশী নানাবিধ তথ্য সহযোগে লেখক বাংলা গদ্যের যে স্টাইল গড়ে উঠেছে তার এক যুক্তিগ্রাহ্য বিবরণ দান করেছেন এবং সেই সূত্রে এই জাতীয় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা তাঁর পূর্বসূরী তাঁদের উক্তি ও রচনার উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনি ছাব্বিশটি বিভিন্ন অধ্যায়ে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দুটি অবজ্ঞাত লেখক (কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি এবং শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স), তারাশংকর তর্করত্ন, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি বাংলা গদ্য লেখকগণের গদ্য-রীতির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মাধ্যমেই বাংলা গদ্য-রীতির ইতিহাসের রূপ-রেখা রচিত হয়েছে। একত্রে অনেকগুলি মহৎ লেখকের রচনা প্রসঙ্গে

বিশ্লেষণমূলক আলোচনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি এবং ফুলমণি ও করুণার লেখিকা শ্রীমতী মুলেন্স সম্পর্কিত তাঁর আলোচনাটিতে আমরা আনন্দিত হয়েছি। যাঁরা অবজ্ঞাত বা বিস্মৃত তাঁদের চোখের সামনে আনা সৎ সমালোচকদের কর্তব্য।

বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যুগই সূচনা অংশ। এই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যতম প্রতিনিধি পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার বাংলা গদ্যের সার্থক নির্মাতা। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিতগণের গদ্য-রীতি ছিল সহজ এবং সরল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্মীবৃন্দ কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেননি বটে তবে তাঁরা পথ রচনা করেছেন। রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'পাণ্ডিত্য ও ভাষার গুণ' বিচার না করিয়াও শুধু রচিত পুস্তকের সংখ্যাধিক্যেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই দলের প্রধান।' আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সর্বাগ্রে সেই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। লেখক বলেছেন—'মৃত্যুঞ্জয় এই সুরসাধনার ভূমি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই কথা আমরা ভুলে যেতে পারি না।'

এরপর রামমোহন প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-'রামমোহন বঙ্গ সাহিত্যকে গ্রানিটস্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন।' এই গ্রন্থের লেখক বলেছেন যে, রামমোহন বাংলা গদ্যের 'ভারবহ সামর্থ্য পরীক্ষা করেছেন' এবং 'মৌলিক চিন্তা লিপিবদ্ধ করে গদ্যের সহনশীলতা বৃদ্ধি' করেছেন। এই উভয় উক্তিই বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলাসাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় পুরুষ। ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা রচনা রীতিরও অনেক পরিবর্তন করিয়া যান।' এই 'সংবাদ প্রভাকর' ঈশ্বর গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা ভাষার সরলীকরণ করেছেন। লেখক বলেছেন—'পরিবর্তমান মূল্যবোধ ও সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল।' তিনি কবি হিসাবেও যেমন সাধক আবার সাংবাদিক হিসাবেও তাঁর তেমনই কৃতিত্ব। ঈশ্বর গুপ্তের পরই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যুগ সূচনা। রামগতি ন্যায়রত্নের একটি গল্পে আছে কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে শাস্ত্রীয় বিচার উপলক্ষ্যে জনৈক পণ্ডিত বাংলায় বক্তব্য বিষয় রচনা করেন। 'সেই রচনা শ্রবণ করিয়া একজন অধ্যাপক অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক কহিয়াছিলেন—একি হইয়াছে! এ যে বিদ্যাসাগরীয় বাঙ্গালা হয়েছে! এ যে অনায়াসে বোঝা যায়।'

বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র প্রসন্ন ছিলেন না, এই শ্রদ্ধাহীনতার কারণ, হয়ত সমকালীনের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষা, বঙ্কিমের অবজ্ঞা তাঁর অনুগামী চেলা-চামুন্ডাদের মধ্যেও প্রসারিত হয়। সেইকালে বিদ্যাসাগরীয় বাংলা নামক বস্তুটিকে কিছু লোকে অশ্রদ্ধা করত।

বিদ্যাসাগর গদ্য রচনার আধুনিক আদর্শ এনেছিলেন ইংরেজী গদ্যের আদর্শ থেকে এই কথা বলেছেন লেখক। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আড়ষ্ট গদ্যের পর বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় প্রাণবন্যা সঞ্চার করলেন। বিদ্যাসাগর অনুবাদচর্চার মাধ্যমে ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর সচেতন মনোভংগীর ফলে বাংলা ভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য সারল্য ও সাবলীলতার লক্ষণ দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি বঙ্গ ভাষা।' বাংলা ভাষার তিনিই প্রথম যথার্থ শিল্পী। বিদ্যাসাগরের ভাষায় যে 'শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল একথা কবি অন্যত্র বলেছেন। এই গ্রন্থের লেখক বলেছেন—'বাংলা গদ্যের পরবর্তী ঐশ্বর্যের ভিত্তিভূমি বিদ্যাসাগরী গদ্য।'

স্বাভাবিক কারণেই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গের আলোচনাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। রবীন্দ্রনাথ ছেষট্টি বছর বাংলা গদ্য ভাষার চর্চা করেছেন এবং তার বর্তমান রূপকল্পের জন্য তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। লেখক বলেছেন—'রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের শিল্প-সম্ভাবনার সীমানাকে অনেকদূর বাড়িয়ে দিয়েছেন।'

এই গ্রন্থের অন্তর্গত শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গটি আমাদের যথোচিত তৃপ্তিদান করেনি। লেখকের বক্তব্য অবশ্য 'ম্যাটার অব ওপিনিয়ন' তিনি তাঁর নিজস্ব ধারণা বিধৃত করেছেন, সেই বিষয়ে কিছু বলার নেই, অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন শরৎ-চন্দ্রের গদ্য-স্টাইল সার্থক, কারণ তা খুব 'এফেকটিভ'। কিন্তু তিনি প্রবন্ধটির সূচনায় লিখেছেন—'তিনি (শরৎচন্দ্র) বুঝেছিলেন যে বাংলা দেশের সমতল ভাবালুতাপূর্ণ স্যাঁৎস্যাতে পরিবেশে 'তিনসঙ্গী'র মতো গল্প গ্রন্থ, অথবা 'গোরা', 'যোগাযোগ'-এর মত উপন্যাস-রচনা ক্ষমতার অপব্যবহার মাত্র।' এই বক্রোক্তি সমীচীন মনে করি না, কারণ 'গোরা' প্রকাশের পূর্বে শরৎচন্দ্র কলম ধরে খ্যাতি অর্জন করেছেন (তিনি নাকি চল্লিশবার গোরা পড়েছিলেন) আর যোগাযোগ যখন প্রকাশিত হয় তখন শরৎচন্দ্র প্রায় নিঃশেষিত, 'তিন সঙ্গী' ত আরো অনেক পরে প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পাঁচকড়ি, অমৃতলাল, দীনেশচন্দ্র, কেদার বন্দ্যো, মোহিতলাল, নলিনীকান্ত গুপ্ত এবং কল্লোল যুগের গদ্যলেখকরা অনুপস্থিত কেন? ধারাবাহিকত্বের প্রয়োজনে তাঁদের উপস্থিতি আবশ্যক ছিল।

লেখক যে অসামান্য পরিশ্রমে এই মূল্যবান গ্রন্থটির পরিকল্পনা ও রচনা করেছেন তার জন্য তিনি অভিনন্দনযোগ্য।

—অভয়ঙ্কর

বাংলা গদ্যের ইতিহাস (আলোচনা)—ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। ক্লাসিক প্রেস। শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম আঠারো টাকা।

সাহিত্যের খবর

প্রখ্যাত বুলগেরিয়ান লেখক কামেন কালচেভ ও মিলচো রাদেভ কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁদের গত ২৮ অকটোবর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুন্দর এক ঘরোয়া পরিবেশে 'সর্বভারতীয় কবি সম্মেলন' চা-পানে আপ্যায়িত করে। কামেন কালচেভ বলেন, "সোফিয়াতে যেভাবে আমরা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেই, এখানে এসে সেরকমভাবেই আনন্দিত হলাম।"

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই মিলচো রাদেভ বুলগেরিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধে বলেন, বুলগেরিয়ার সাহিত্যের বয়স প্রায় এক হাজার বছরের। আধুনিক বুলগেরিয়ার সাহিত্য খুবই বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর ভাষণ শেষ হলে 'সীমান্ত' ও 'বেঙ্গলি লিটারেচার' পত্রিকা দুটিতে প্রকাশিত দুটি বুলগেরিয়ান কবিতার অনুবাদ দেখান হয়। অনুবাদ দুটি পড়ে তাঁরা খুব খুশি হন। সম্মেলনের সম্পাদক আশিস সান্যাল 'বেঙ্গলি লিটারেচার' পত্রিকার দুটি সেট ও 'সীমান্ত' পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি তাঁদের উপহার দেন। পত্রিকাগুলি গ্রহণ করে রাদেভ বলেন, "তাঁদের ভারত ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু খুব একটা সম্ভব হয়নি। এখানে এসেই এই প্রথম এতগুলি বাংলা কবিতা ও গল্পের অনুবাদ একসঙ্গে পেলেন। দেশে ফিরে গিয়ে বুলগেরিয়ান ভাষায় এগুলি অনুবাদের চেষ্টা করবেন।

উপস্থিত কবিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন রাদেভ। কারণ, কালচেভ ইংরেজি জানেন না। তবে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে রাদেভ কালচেভের সঙ্গে পরামর্শ করে নিচ্ছিলেন। প্রশ্নোত্তরের পর কবিতা পাঠের আসর বসে। কবিতা পাঠ করেন মণীন্দ্র রায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, শান্তিকুমার ঘোষ, শ্যাম নিগম, রাজ আজম, নিখিলেশ গুহ, রাণা চট্টোপাধ্যায়, সৌমোন্দু গঙ্গোপাধ্যায় ও আশিস সান্যাল। প্রতিটি কবিতাই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কালচেভ মূল বুলগেরিয়ান ভাষায় একটি কবিতা পাঠ করে শোনান।

কলকাতায় অবস্থানকালে এ'রা কাজী নজরুল ইসলামের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে দেখে আসবেন। এছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়ের সঙ্গেও দেখা করবেন বলে জানা গেছে।

গত ৮—১৩ অক্টোবর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে আন্তর্জাতিক পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এবারের প্রদর্শনীতে ৬০টি দেশ যোগদান করে। ভারতবর্ষ থেকেও কয়েকটি

পুস্তক প্রতিষ্ঠান এতে যোগ দেন এবং ভারতে প্রকাশিত গ্রন্থের সবশেষ নমুনা দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। এই প্রদর্শনী চলাকালে উক্ত শহরে বামপন্থী দলগুলির উদ্যোগে আন্দোলন চলছিল। কিন্তু তাতে প্রদর্শনীর কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। এই প্রদর্শনীটি এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে।

ছোটদের জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল দেশেই বিশেষভাবে উপলব্ধ হচ্ছে। এমন কি প্রতীচ্য দেশগুলিতেও এখন এ সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা চলছে। সম্প্রতি 'মিউনিখ লাইব্রেরী'র যে ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হল, তাতে ছোটদের জন্য আরও সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয়। এই লাইব্রেরীটি এখন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ ছোটদের লাইব্রেরী। এখানে ৫০টি ভাষায় প্রকাশিত শিশুদের গ্রন্থ স্থান পেয়েছে।

জার্মানীর পুস্তকব্যবসায়ীরা প্রতি-বছরই "পিস প্রাইজ" নামে একটি পুরস্কার সাহিত্যিকদের দিয়ে থাকেন। এ বছর এই পুরস্কারটি লাভ করেন অধ্যাপক আলেক-জান্ডার মিটশেচারলিচ। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলসোফি পড়ান।

"বৃটিশ বুক ডেভলেপমেণ্ট কাউন্সিলের উদ্যোগে দশজনের একটি প্রতিনিধি দল তিন সপ্তাহের জন্য ভারত, সিংহল ও নেপাল ভ্রমণে বেরিয়েছেন। গত ২৫ অক্টোবর তাঁরা দিল্লীতে এসে পেঁৗছান। এই ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য হল, ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরেজি ভাষায় কিভাবে অনুবাদ আরো বৃদ্ধি করা হয়। তাঁরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি কে আর ভি রাওয়ের সঙ্গেও দেখা করেন। এই সাক্ষাৎ-কারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই প্রতিনিধি দলের নেতা জন এটেনবোরো বলেন, "আন্তর্জাতিক কপিরাইট বিষয়ে আলো-চনাই ছিল আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা বাস্তবসম্মত সমাধান সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।"

১৯৬৮ সালের শ্রেষ্ঠ আমেরিকান নাটক হিসেবে 'নিউইয়র্ক ড্রামা ক্রিটিক সার্কেল' কর্তৃক অভিনীত "দি গ্রেট হোয়াইট হোপ" নাটকটি নির্বাচিত হয়েছে। এই নাটকটির রচয়িতা হাওয়ার্ড স্যাকলার। নাটকটি নিগ্রো বক্সিং চ্যাম্পিয়নের উত্থান-পতনকে নিয়ে রচিত। এই নাটকটি এ ছাড়াও আরো দুটি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। এই পুরস্কার দুটি হল— "পুলিটসজার পুরস্কার" ও "এনটোয়েনিটি প্যারী পুরস্কার"। এ পর্যন্ত মাত্র তিনটি আমেরিকান নাটক এই দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছে।

এ বছরটি হল মহাত্মা গান্ধীর জন্ম-শতবার্ষিকী বৎসর। এই কারণে ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর উপর লিখিত গ্রন্থ এবং পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ডঃ শান্তি-স্বরূপ গুপ্তের লেখা 'দি ইকনমিক ফিলসফি অব মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থটি বিশেষ অনুধাবনার অপেক্ষা রাখে। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, তিনি গান্ধীর রচনাবলীর ধারা-ক্রমিক, যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। যন্ত্রের প্রতি গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন, ১৯২৪ খৃঃ পূর্ব পর্যন্ত গান্ধীজীর সম্পূর্ণ-ভাবেই যন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, যন্ত্রই একদিন পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে বেকার করে ছাড়বে। কিন্তু ১৯২৪ সালের পর থেকে তিনি এই মত পরিবর্তন করেন এবং যন্ত্রের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেন। গান্ধীজীর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আরো এমন বহু তথ্য এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। গান্ধীবাদ সম্বন্ধে যাঁরা উৎসাহী, তাঁদের গ্রন্থটি অবশ্যপাঠ্য।

ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় গল্পের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির নাম "কল ইট এ ডে"। সম্পাদনা করেছেন এম সি গ্যাব্রিয়েল ও গুইয়েন গ্যাব্রিয়েল। দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'থট' পত্রিকায় ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত ভারতীয় গল্প অনূদিত, সে রকম প্রায় ২০০টি গল্প থেকে মাত্র ২৯টি গল্প নির্বাচন করে এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বাংলা থেকে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কন্যা' গল্পটির অনুবাদ এতে স্থান পেয়েছে।

দি গ্র্যাভিটেশন অ্যাণ্ড দি ইউনিভার্স

অপূর্ব চৌধুরী ।। প্রকাশক : এন চৌধুরী ।। পোঃ অঃ জোলার ডুবরী, আলিপুরদুয়ার জংসন, জেলা জল-পাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ।। দাম ১০-৫০ টাকা।

অপূর্ব চৌধুরীর "দি গ্র্যাভিটেশন অ্যাণ্ড দি ইউনিভার্স" সার্থক বিজ্ঞানবিদের সার্থক প্রয়াস। প্রাক্‌নিউটন যুগে পৃথিবীর অভিকর্ষ এবং অভিকর্ষজ টান বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের কিভাবে আলোড়িত করেছিল এবং সেটা কতটুকু বিজ্ঞানভিত্তিক ছিল শ্রীচৌধুরী এই বই-এ যুক্তি-প্রমাণসহ তা উপস্থাপিত করেছেন। পৃথিবীর অভিকর্ষের ফল সমস্ত বস্তু এবং গ্রহরাজির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে বৈজ্ঞানিকদের তত্ত্ব এবং বিরোধীতত্ত্বের আলোচনা করে বিজ্ঞানসন্ধিৎসু ছাত্রদের সামনে অভিকর্ষ সম্পর্কে সঠিক ধারণার পথ খুলে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় অভিকর্ষের ফল হিসাবে বহু অজানা সমস্যার সমাধানের পথ বাৎলে দিয়েছেন। বিশেষ করে নিউটনের পরবর্তী যুগে মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের "আপেক্ষিক তত্ত্ব (থিওরী অব রিলেটি-ভিটি) এবং "সময় ও স্থান" তত্ত্বে (স্পেশ অ্যাণ্ড টাইম)-র সাহায্যে অভিকর্ষের সূত্রাবলীকে ব্যাখ্যা করে সাধারণ ছাত্রদের কোনপ্রকার সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি। আশা করব গ্রন্থকার বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভিন্নপ্রকার ঘটনাসমূহকে এই প্রকার বই-এর মাধ্যমে উপস্থাপিত করবেন।

●

সহস্র বর্ষের প্রেম (কবিতা)। সুশীল জানা। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম ছয় টাকা।

প্রেম যুগে যুগে কালে কালে 'তিলে তিলে নূতন হোয়'। নিত্যনূতন যে প্রেম, তার অভিব্যক্তির ইতিকথা মানুষের হৃদয়-কথার বিবর্তনেই ধরা পড়ে। মানুষ তার যৌবনের জন্মমুহূর্ত থেকেই একটি হৃদয়কে আর একটি হৃদয়ের সঙ্গে বন্দী করতে চায়। প্রেমের এই বন্ধনে আছে চিরকালের প্রেমিক যুবক-যুবতীর আনন্দ, বিরহ, দাহ, যন্ত্রণা ইত্যাদি বিবিধ বিচিত্র জটিল অনুভূতি। সংকলক শ্রীযুক্ত সুশীল জানা সেইদিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থের দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে যজু, অথর্ব বেদ, মন্ত্রব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য, রামায়ণ, মহাভারত, ক্ষেমেন্দ্র, ভাস, কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর, সুবন্ধু, বাণভট্ট, জয়দেব, পিঙ্গল, সরহ ইত্যাদির রচনার অংশবিশেষ কাব্যাকারে অনুবাদ করে সহস্রবর্ষের প্রেমধারণার অমৃতময় উপাখ্যান রচনা করেছেন। রচনা-গুলি সু-অনূদিত। গ্রন্থটির অঙ্গসৌষ্ঠব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রভাত সাইকেল স্টোর্স (উপন্যাস)। বিমল মুখোপাধ্যায়। ছাত্রশিক্ষা নিকেতন, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম তিন টাকা।

তরুণ লেখক বিমল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে মাত্র তেইশ বছর বয়সে। তাঁর ষোল বছর বয়সের রচনা এই 'প্রভাত সাইকেল স্টোর্স' উপন্যাসটি। এত অল্প-বয়সেই লেখক যে পরিণত বয়সের মতই গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন, লেখকের আলোচ্য গ্রন্থ তা প্রমাণ করে। একটি বস্তির অন্ধকার জীবনযাপনের দুঃখময় এই কাহিনী গতানুগতিক ছকে রচিত নয়। রাখাল, বাসুদেব, ছোট্কা, শোভা, অনন্ত ইত্যাদি চরিত্র নিখুঁত বাস্তব ও জীবন্ত। অকাল-মৃত্যু না হলে লেখকের রচনায় ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্য যে গৌরববোধ করত, এ গ্রন্থ তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে।

●

রিক্তের বেদন (উপন্যাস) কৃষ্ণগোপাল বসাক। দীপালি বুক হাউস, ১২।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। দাম আট টাকা।

রিক্তের বেদন উপন্যাসটি আজ থেকে দশ-বারো বছর আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। শোনা যায়, গ্রন্থটি তখন সাধারণ পাঠক মহলে যথেষ্ট সাড়া জাগায়। গ্রন্থটি তার নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। যাঁরা উপন্যাসে অশ্রুসজল দুঃখের একটানা কাহিনী ভালবাসেন, বহুবিচিত্র অতি-নাটকীয় ঘটনার ও চরিত্রের সমাবেশে যাঁরা রীতিমত রোমাঞ্চিত হতে চান, এ গ্রন্থ তাঁদের তৃপ্ত করবে। অন্ধ নায়ক রঞ্জন অবস্থাবিপাকে ছিল ভিখারী, পরে বৌদি সুজাতার স্নেহে সে জীবনে বড় হয়, একজন নামকরা সাহিত্যিকও হয়ে ওঠে, লীলার সঙ্গে তার প্রণয়ও হয়। কিন্তু তাকে শেষ পর্যন্ত বৌদিকে হারাতে হয়, জীবনে হতাশা নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। রঞ্জনের দুঃখের কাহিনীই এর মূল কথা।

●

শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ প্রসঙ্গ (প্রথম স্তবক) : ১০।১সি, শ্রীমোহন লেন। রানীনিবাস। কলকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনাথের স্মৃতিকথা, কয়েকটি ঘটনা ও উপদেশ এবং শ্রীঠাকুর সম্পর্কে কয়েকটি বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে এই পুস্তিকায়।

শারদ সংকলন

বহুরূপী (নবান্ন স্মারক সংখ্যা)—সম্পাদক চিত্তরঞ্জন ঘোষ ।। ১১-এ নাসিরুদ্দীন রোড, কলকাতা ১৭ ।। দাম: চার টাকা।

নাটক ও নাটক সম্পর্কিত আলোচনার ষাণ্মাসিক হিসেবে বহুরূপীর খ্যাতি বহু-দিনের। সমকালীন দেশী বিদেশী নাটকের মূল্যায়নে পত্রিকাটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বহুরূপীর এ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের স্মারক সংখ্যা হিসেবে। 'নবান্ন'-এর দশ পৃষ্ঠা ছবি ছাপা হয়েছে এ সংখ্যায়। এ সম্পর্কে 'পূর্বস্মৃতি' লিখেছেন সুনীল চট্টোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শোভা সেন, চিন্মোহন সেহানবীশ, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বলরাজ সাহনি, নিমাই ঘোষ, চিত্ত বন্দ্যো-পাধ্যায়, খাজা আহমদ আব্বাস, গোপাল হালদার, বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র। তা ছাড়া সমসাময়িক নাট্যকার, কবি ও সাংবা-দিকের চোখে বিভিন্ন লেখার পুনর্মুদ্রণ সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ। দুটি একাঙ্ক নাটকের পুনর্মুদ্রণও প্রকাশিত হয়েছে। যথাক্রমে বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি', মনো-রঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি', বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' ও 'জীয়ন কন্যা', সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরানী' ও সুবোধ ঘোষের 'অঞ্জনগড়'। পত্রিকাটির স্থায়ী সম্পাদক। এ সংখ্যার সম্পাদনায় চিত্তরঞ্জন ঘোষ গভীর দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে-ছেন। প্রত্যেক নাট্যকার ও নাট্যরসিকের নিকট সংখ্যাটি মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

প্লাবন—রায়গঞ্জ কলেজ বার্ষিক সংকলন, ১৩৭৬ ।। রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর।

একটি কলেজের বার্ষিক সাহিত্যপ্রয়াস হলেও রচনা-নির্বাচনে, আঙ্গিক শোভনতায় ও সুদৃশ্য প্রচ্ছদে যে-কোনো সাহিত্য পত্রিকার সমতুল মর্যাদা দাবী করতে পারে। মহাত্মা গান্ধী ও মির্জা গালিব শতবার্ষিকী উপলক্ষে দুটো প্রবন্ধ লিখেছেন শিশির মজুমদার ও কুসুম ঘোষ। অন্যান্য লেখক লেখিকাদের মধ্যে আছেন রত্নতী চক্রবর্তী, শ্যামাপ্রসাদ রায়, ছায়া সরকার, রাজকুমার বণিক, সমর চৌধুরী, পীযূষকান্তি ঘোষ, উৎপলেন্দু পাল, নবিন্দ রায়, বিনয় দাস, সুধীর সরকার, মানবেশ চৌধুরী, কৃষ্ণা দত্তচৌধুরী এবং রেণু সরকার।

কল্পবাণী—সম্পাদিকা কল্যাণী বন্দ্যো-পাধ্যায় ।। ২২ তেলিপাড়া লেন, কলকাতা ৪ ।। দাম : দু টাকা

গল্প, নাটক, কবিতা ও চিত্রসমালোচনা-সহ পত্রিকাটির বর্তমান সংখ্যাটি বেশ আকর্ষণীয়। লিখেছেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, শিবকুমার যোশী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, অম-রেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব, শৈলজা-নন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ, পার্থ ঘোষ এবং আরো অনেকে। সম্পাদকের রুচিবোধ উন্নত ধরনের।

সংবর্ত—সম্পাদক : সৌমেন ভট্টাচার্য। দর-বারী। ৩।২৩ অশোক এভিনিউ। দুর্গাপুর-৪। দাম এক টাকা।

লিখছেন—মিহির আচার্য, গোপাল হালদার, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, জ্যোতিভূষণ চাকী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, মণীন্দ্র রায়, যশোদাজীবন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ ধর, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, শিবশম্ভু পাল এবং আরো কয়েকজন।

KAVITA —সম্পাদক : সুপ্রিয়া বাগচী ডায়লগস হাউস। কলকাতা-৪৭। দাম ষাট পয়সা।

বর্তমান সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশের একটি অপ্রকাশিত কবিতা ছাপা হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, কিরণশঙ্কর সেন-গুপ্ত, সুশীল রায়, শংকরানন্দ মুখো-পাধ্যায়, কবিতা সিংহ, শংকর চট্টোপাধ্যায়, অশোক সরকার, শান্তিকুমার ঘোষ, বঙ্কিম মাহাত, পরিমল চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন কবিতা লিখেছেন। দুটি আলো-চনা আছে।

বিশ্ববার্তা (শারদ সংখ্যা : ১৩৭৬) সম্পা-দক—কালীপদ চক্রবর্তী, ৪৪।৪, গরচা রোড, কলকাতা ১৯। দাম : ১-৫০।

রচনাবৈশিষ্ট্যে 'বিশ্ববার্তা'র পুরনো সুনাম ও ঐতিহ্য পূর্ণমাত্রায় বজায় আছে। বাইশ বছরের শারদ সংখ্যায় বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছেন : রমা চৌধুরী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রনাবি, কালীপদ চট্টো-পাধ্যায়, প্রবুদ্ধ, গোপাল ভৌমিক, কুমুদ-রঞ্জন মল্লিক প্রমুখেরা। বাইশ বছরের শারদ সংখ্যায় 'পুরাতনী' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে—এই বিভাগে স্বনামধন্য লেখকদের (বিশেষ করে বিশ্ববার্তার জন্য) রচনা পুন-র্মুদ্রণ ঘটেছে।

শারদীয়া চন্দ্রভাগা—সম্পাদক রমানাথ সিংহ ।। সিউড়ী, বীরভূম ।। তিন টাকা।

আকারে আয়তনে শারদীয়া সংখ্যার মতোই হৃষ্টপুষ্ট কলেবর নিয়ে পত্রিকাটি বেরিয়েছে। স্বামী প্রণবানন্দজীর উপদেশ

শিরোধার্য করে প্রকাশ লাভ করেছে। লিখেছেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলেন্দু মিত্র, মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার মিত্র, স্বপনকুমার ঘোষ, কালিপদ কোঙার, কবিরুল ইসলাম, করুণাময় বসু, অসীম মুখোপাধায় এবং আরো অনেকে।

ত্রিবৃত্ত—সম্পাদক রণজিৎ দেব ।। ১ ত্রিবৃত্ত সরণি, কুচবিহার ।। পঞ্চাশ পয়সা।

তরুণ কবিদের কবিতা নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকের নির্বাচন সম্পর্কে পাঠকের মনে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। দু' একটা গদ্যরচনাও আছে।

কণ্ঠস্বর—সম্পাদক সত্যরঞ্জন বিশ্বাস ।। ৪৯।এল।৭ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড, কলকাতা ১১ ।। পঞ্চাশ পয়সা।

প্রচ্ছদ ভালো। কবিতা সম্পর্কে কয়েকজন কবির মতামত প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন সুর প্রমুখ নবীন প্রবীণ কয়েকজন কবি।

পথিক—সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চট্টোপাধ্যায় ।। ২৩৫ বাগমারী রোড, কলকাতা ৫৪ ।। দাম : দেড় টাকা।

প্রগতিশীল সাহিত্যের ত্রৈমাসিক। গল্প-কবিতা ও প্রবন্ধ নিবন্ধের নির্বাচনে সম্পাদক বেশ দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে পেরেছেন। এ সংখ্যায় লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত, স্বপন বসু, সত্যব্রত সেন, একলব্য চট্টরাজ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, কিশলয় সেন, কৃষ্ণা-কাবেরী চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর দে, বিষ্ণু চক্রবর্তী এং আরো কয়েকজন। পত্রিকাটিতে এ যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন একটি আশাপ্রদ বৈশিষ্ট্য।

নবাঙ্কুর সম্পাদক বিকাশচন্দ্র দাস ॥ ৩০ রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা-৫৪ ।। দাম : এক টাকা।

লিখেছেন দক্ষিণারঞ্জন বসু, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষ, জিতেন্দ্রনাথ বসু এবং আরো অনেকে। বিপ্লবী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে একটি সুন্দর আলোচনা লিখেছেন ধনঞ্জয় দাশ।

উত্তরীয়- সম্পাদক শ্যামল ধর ।। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি ।। এক টাকা।

উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটি মুদ্রণশোভনতায় পাঠকের কাছে ভালোই লাগবে। লিখেছেন শ্যামল ধর, সুনীলকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর সিনহা, দেবাশীষ চৌধুরী, দিলীপকুমার নন্দী, দীপঙ্কর ঘোষ, অতীন্দ্রিয় পাঠক প্রমুখ কয়েকজন।

বিচিত্রা—কালীপদ কোঙার ।। পলাশখোলা আদ্রা, পুরুলিয়া ।।

পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে পত্রিকা বেরোয়। কবিতাপ্রধান কাগজ। সম্পাদক নিজেও একজন কবি। স্বভাবতই কবিতার নির্বাচনে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সংখ্যায় লিখেছেন ভবানী মুখোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, শান্তি চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কবিরুল ইসলাম, শান্তিকুমার ঘোষ, রবীন সুর এবং আরো অনেকে। সকলের কাছেই ভালো লাগবে।

পুষ্পাঞ্জলি (শ্রীসারদা আশ্রম-এর শারদ সংকলন) সম্পাদিকা—অনিলা দেবী। শ্রীসারদা আশ্রম, পি-৬১৫ 'ও' ব্লক, নিউ আলিপুর, কলকাতা ৫৩। দামের উল্লেখ নেই।

সারদা মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমটি দীর্ঘকাল ধরে ধর্ম ও সমাজের সেবা করে আসছেন। আশ্রমের শারদীয় মুখপত্র পুষ্পাঞ্জলি বাংলা দেশের স্বনামধন্যা মহিলাদের রচনায় শারদ সংকলনের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। লেখিকাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছেন : আশাপূর্ণা দেবী, রমা চৌধুরী, সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, করবী বসু, চিত্রিতা দেবী, জ্যোতির্ময়ী সরকার, শিবানী বসু, মীরা গুহ, অঞ্জলি বসু, অরুন্ধতী রায় চৌধুরী, বিজয়া সেন, নমিতা রায় চৌধুরী প্রমুখেরা।

বর্তিকা-সম্পাদক : মণীশ ঘটক। গোরাবাজার। বহরমপুর। পশ্চিমবঙ্গ। দাম ষাট পয়সা।

মণীশ ঘটক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনীষীমোহন রায়, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শুকদেব গোস্বামী, দুর্গাদাস ভট্ট, উৎপল গুপ্ত, বোম্মানা বিশ্বনাথম এবং আরো অনেকে লিখেছেন

নির্মোক—সম্পাদক : কৃষ্ণপদ সমাজদার। ২৭ বিশ্বাস নাসারী লেন। কলকাতা-১০। দাম আড়াই টাকা।

উপন্যাস, গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ, কবিতায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে নির্মোকের এই বিশেষ সংখ্যাটি।

দুর্গাপুরবাণী—সম্পাদক : কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রজেক্ট প্রেস। বেনাচিতি। দুর্গাপুর ৯। দাম এক টাকা।

দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত এই পত্রিকাটির মুদ্রণপারিপাট্য এবং সম্পাদনা বেশ চোখে পড়বার মত।

একসাথে—সম্পাদক : কনক মুখোপাধ্যায়। ২ সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম দেড় টাকা।

লিখেছেন মঞ্জরী গুপ্ত, মাধুরী দাশগুপ্ত, বিমলা রণদিভে, লীলা সুন্দরায়া, অনীতা মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে।

আর্থিক প্রসঙ্গ—সম্পাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২ প্রাইভেট রোড। দমদম। কলকাতা-২৮। দাম দেড় টাকা।

অর্থনীতি এবং রাজনীতি নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন, তাঁদের কাছে এই পত্রিকাটি সমাদৃত হবে। বেশ কয়েকটি সুচিন্তিত নিবন্ধ বর্তমান সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ।

সিংহাসন—সম্পাদক : পূর্ণেন্দু ভরদ্বাজ। কাকদ্বীপ। ২৪-পরগণা। দাম : এক টাকা।

কবিতার পত্রিকা সিংহাসনে কয়েকটি সুনির্বাচিত কবিতা এবং আলোচনা আছে।

ক্রান্তি—সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৮বি, কলেজ রো। কলকাতা-৯। দাম দু টাকা।

ক্রান্তির এই বিশেষ সংখ্যাটি গান্ধী-শতবর্ষ উপলক্ষে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন নীহাররঞ্জন রায়, ত্রিদিব চৌধুরী, নির্মলকুমার বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিমানবিহারী মজুমদার, বিনয় ঘোষ, অরবিন্দ পোদ্দার, নারায়ণ চৌধুরী, মানস রায় চৌধুরী এবং আরো কয়েকজন।

স্বস্তিকা—সম্পাদক : সনৎকুমার ব্যানার্জি। ২৭।১।বি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। দাম আড়াই টাকা।

অমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়, মাধবরাও গোলওয়ালকর, প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি বাগচি, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশব চক্রবর্তী লিখেছেন প্রবন্ধ। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, চণ্ডী লাহিড়ী, সুভাষ সমাজদার, দক্ষিণারঞ্জন বসুর গল্প সংখ্যাটির বিশেষ আকর্ষণ। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাটিকা এবং আরো অনেকে লিখেছেন।

প্রাপ্তিস্বীকার

অব্যয় (২)—সংগ্রাহক : রাধানাথ মণ্ডল। পি : ১৯ দমদম পার্ক। কলকাতা-২৮। দাম পঁয়ত্রিশ পয়সা।

জোয়ার সম্পাদক : সাধনা দেবী। খড়্গপুর ট্রাফিক হাই স্কুলের পত্রিকা।

রূপসী সম্পাদক : বৃন্দাবন গোস্বামী। ৭।বি, ঘোষপুকুর লেন। কৃষ্ণনগর। নদীয়া। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

কালপ্রতিমা সম্পাদক : বাসুদেব দেব। দিঘিরপাড় বাজার। ফলতা রোড। ২৪ পরগণা। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

লাল পলাশের রঙ—সম্পাদক চিত্ত দাশ। বলরামপুর। রাজগাঁও। পুরুলিয়া। পঁচিশ পয়সা।

সংকেত—সম্পাদক : পূর্ণচন্দ্র সাহা এবং নারায়ণচন্দ্র সাহা। ৩৩।৬ মুরারীপুকুর রোড। ব্লক—৮। ফ্ল্যাট—২৩। কলকাতা ৪। দাম পঁচিশ পয়সা।

কোচবিহার সমাচার—সম্পাদক : অমলেন্দু মিত্র এবং দীপেন চন্দ্র। রূপসী কলোনী। কোচবিহার। দাম এক টাকা পঁচিশ পয়সা।

সীমান্তিক—সম্পাদক : দেবাশিস ঘোষ, বিবেকানন্দ সেনগুপ্ত এবং রণজিৎকুমার দাশ উত্তরবঙ্গ প্রেস। টেম্পল স্ট্রীট। জলপাইগুড়ি। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

বলয়—সম্পাদক : সারাফত হোসেন। বহিরা। উলুবেড়িয়া। হাওড়া। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

বুলবুল—সম্পাদক : এস এন সিরাজুল ইসলাম। ১৩।৩বি, কলিন লেন। কলকাতা-১৬। দাম পঁচাত্তর পয়সা।

স্পন্দন—সম্পাদক : শিশিরকুমার বসু। ১৯৪।১, বিধান সরণি স্ট্রীট। কলকাতা-৬। দাম দুটাকা।

অরুণিমা—সম্পাদক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাওয়ালীতলা। রাজার হাট। ২৪ পরগণা দাম আশি পয়সা

পিপাসা—সম্পাদক : বিশ্বনাথ ঘোষ এবং সামসুল আলম সরকার। ২৬ তালতলা লেন। কলকাতা-২৬। দাম নব্বই পয়সা।

বহুমুখী—সম্পাদক : স্বরাজব্রত সেনগুপ্ত। জিয়াগঞ্জ। মুর্শিদাবাদ। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পাচক—সম্পাদক সতী সেনগুপ্ত ।। ময়নাগুড়ি. জলপাইগুড়ি ।। এক টাকা।

রত্নাকর—সম্পাদক নির্মল আচার্য ।। ৭বি ধীরেন ধর সরণী, বনগাঁ ।। দাম : দু টাকা।

চন্দনা—প্রকাশক অশোককুমার মান্না ।। ৪৩।১, ভৈরব ঘটক লেন, সালকিয়া, হাওড়া । পঞ্চাশ পয়সা।

কবিকণ্ঠ—সম্পাদক অসীমকৃষ্ণ দত্ত ।। ১০।১, ইব্রাহিমপুর, কলকাতা-৩২ ।। দাম : এক টাকা।

আধুনিক সাহিত্য—রণজিৎ দেব ।। ১, ত্রিবৃত্ত সরণী, কুচবিহার। এক টাকা।

জ্যাক কেরুয়াকের মৃত্যু

গত ২১শে অক্টোবর মার্কিনদেশের ফ্লোরিডা রাজ্যের সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে জ্যাক কেরুয়াক মারা গেছেন। মৃত্যুর সময় তাঁর আয়ু ৪৭ বছরে পৌঁছেছিল।

২০ অক্টোবর থেকেই তাঁর নাকমুখ দিয়ে প্রচণ্ড রক্ত বেরোতে থাকে। সেন্ট অ্যানটনি হাসপাতালে তাঁর উপর অস্ত্রোপচার করা হয়, রক্ত বন্ধ করা যায় নি। মৃত্যু আসে ২১ ভোররাত্রে।

করুয়াকের পক্ষে এমন মৃত্যুই যেন আশা করা গিয়েছিল।

বাংলাদেশের পাঠকদের মনে থাকার কথা, ১৯৫০ নাগাদ সন ফ্রান্সিসকো আর নিউইয়র্কে একদল বাউন্ডুলে ছেলেমেয়ে মার্কিনদেশে প্রচুর হৈ-চৈ উপস্থিত করেছিল। খুব সরল করে বলা যায় তারা রীতি-বিদ্বেষী, সভ্যতাবিরোধী, আর সেই দুর্জয় শত্রুর সঙ্গে তাদের যুদ্ধ যার নাম 'এসটাব্লিশমেনট'। এদের নাম হয় 'বীট' প্রজন্ম। এই বীট প্রজন্মকে উদার অর্থে একটি আন্দোলনও বলা যায়—সাহিত্যে নাটকে চলচ্চিত্রে এরা নানাজনে ছিটকে পড়ে শেষে একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। ইজিচেয়ার-মগ্ন সান্ধ্য টেলিভিশনভোগী মধ্যবিত্ত মার্কিনী সমাজ তাদের সম্বন্ধে যত উষ্মা প্রকাশ করুক না কেন, এই বীটনিকদের একটা 'দর্শন' ছিল—এবং একথা বলতে হলে দর্শন কথাটার অর্থকে খুব একটা দুমড়ে নেবার দরকার হয় না। সে-দর্শন খুব অভাবনীয় রকমের নতুন কিছু নয়, কিন্তু তখনকার ম্যাক্‌কার্থি-শাসিত যুক্তরাষ্ট্রে এরকম একটা ব্যাপারের চাহিদা ছিল নিশ্চয়ই।

সেই বীট প্রজাতির পিতৃপুরুষ জ্যাক কেরুয়াক। সম্ভবত তিনি এখনকার হিপি-বংশেরও আদি পিতা, যদিও তিনি নিজে প্রাণপণে এই পিতৃত্ব অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন বহুবার। এইসব কুসুমসন্তানদের বংশাবলীর প্রথমে যাঁর নাম, সেই জ্যাক কেরুয়াকের রক্তক্ষরণজনিত মৃত্যু হয়েছে। পঞ্চাশ বছরের অস্বস্তিকর সীমানা তিনি ছুঁলেন না, নিজের তারুণ্য সম্বন্ধে পরবর্তী কালকে সন্দিগ্ধ হবার সুযোগ দিলেন না।

ম্যাসাচুসেট্‌স-এর লোয়েল নামে কারখানা শহরে জন্মেছিলেন কেরুয়াক—কানাডাবাসী ফরাসীর রক্ত তাঁর দেহে। জীবনের প্রায় ছেচল্লিশ বছর তাঁর লোয়েলে কাটে—'অন দ রোড'-এর লেখকের জীবনের এই তথ্যটি একটু বিস্ময়কর। এই শহরকে তাঁর একাধিক উপন্যাসে প্রসিদ্ধ করে দিয়ে গত বছর মাত্র সেনট পিটার্সবার্গে চলে আসেন কেরুয়াক। সংসারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃতীয় স্ত্রী স্টেলা (যিনি মৃত্যুর সময় কেরুয়াকের পাশে ছিলেন), আর পঙ্গু, বৃদ্ধা মা—যিনি বেঁচে রইলেন। কেরুয়াকের শব ফিরে যাবে লোয়েলে, সেখানে তাঁর সমাধি হবে।

১৯৫৭ সালে তাঁর উপন্যাস 'অন দ রোড' বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি খ্যাতনামা হয়ে পড়েন। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা ১৮, মোট ১৮টি ভাষাতে তাঁর লেখার অনুবাদ হয়েছে। 'অন দ রোড' তাঁর প্রথম উপন্যাস নয়। সে বইয়ের নাম হল 'দি টাউন অ্যান্ড দি সিটি'। সেটি বীট প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, —মামুলি বর্ণাত্মক রীতির আখ্যানরচনা। সেটি খুব কষ্ট করে লিখেছিলেন বলে মনে হয়— শেষ করতে প্রায় তিন বছর সময় নিয়েছিলেন সে বইয়ে তাঁর নামও অবশ্য 'জ্যাক' কেরুয়াক ছিল না, ছিল সামাজিক ও রীতিসম্মত 'জন' কেরুয়াক—তাতে নিয়মভঙ্গের কোনো সংকেত ছিল না। ১৯৫৭-তে জন থেকে জ্যাক-এ তাঁর উত্তরণ ঘটে, সেই 'অন দ রোড' বইয়ে। ও বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে উড়নচণ্ডী মার্কিনী তরুণ-তরুণীরা তাঁকে প্রভু ও ত্রাণকর্তা বলে অভিবাদন করে। এই গ্রন্থটি এখন হিপিযূথের গীতাস্বরূপ। অ্যালেন গিন্‌সবার্গ, গ্রেগরি করসোর সঙ্গে কেরুয়াকও বীট এবং হিপিসমবায়ের ধর্মগুরু। কেরুয়াকে ধর্মের কোনো একটি বস্তুর জন্যে নিশ্চয়ই সন্ধান ছিল—তাঁর 'দি ধর্ম বামস্' বইতে বৌদ্ধ মরমিয়াবাদ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খুব আন্তরিক জিজ্ঞাসা আছে। গত বছর তাঁর শেষ উপন্যাস বেরিয়েছে—'দি ভ্যানিটি অফ দুলোজ'; নিউইয়র্কের একটি সূত্র থেকে জানা গেল, মৃত্যুর দু হপ্তা আগে তিনি আরেকটি উপন্যাস শেষ করে গেছেন। সেটির নাম 'পিকস্', যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ থেকে উত্তরদিকে ভ্রমণরত দুটি নিগ্রো যুবকের আখ্যান। দেশ-বিদেশে তাঁর বইয়ের বিক্রির সংখ্যা মিলিয়নের উপরে পৌঁছেছে।

যাঁরা বাংলা লিট্‌ল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাসে একধরনের কামচারী গদ্য দেখে চমকে ওঠেন তাঁরা হয়তো জানেন না জ্যাক কেরুয়াকই ঐ সহজিয়া গদ্যরীতির প্রবর্তক। জেম্‌স জয়েসের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে, 'অন দ রোড' উপন্যাসে কেরুয়াকই এক ধরনের 'স্বতঃস্ফূর্ত' বা 'স্বয়ম্ভ' গদ্যরীতির অবতারণা করেন। বাংলাদেশে আমরা অনেকেই সে গদ্যের গোত্র সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলাম না, কেরুয়াকের শিষ্যপ্রশিষ্যেরাও তাঁদের গুরু সম্বন্ধে খানিকটা অন্যমনস্ক হওয়ার সময় পেয়েছিলেন।

এমন সময় সেই সুঠাম ক্রীড়াকুশল তরুণের রক্তক্ষরণে মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছোল।

পবিত্র সরকার (চিকাগো)

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার এবং স্যামুয়েল বেকেট

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

প্রতি বছরই এমনটি হয়। খানিকটা উত্তাপ-উত্তেজনা। কাগজে লেখালেখি। কেউ ক্ষোভ দুঃখ প্রকাশ করেন, কেউ আনন্দ। অবশ্য স্থায়ী হয় না বেশীদিন। দু' এক পক্ষের মধ্যেই আবার চুপচাপ। কেমন যেন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। একটা বার্ষিক উপলক্ষ্য আর কি!

এবারও প্রায় অনুরূপ অবস্থা।

গেল তেইশে, অকটোবর সুইডিশ আকাদমি ঠিক করেছেন এবার সাহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে অইরিশ সাহিত্যিক স্যামুয়েল বেকেটকে।

শুধু একটি ঘোষণাপত্র। পুরস্কার এখনও দেওয়া হয়নি। আসছে ডিসেম্বরের ১০ তারিখে সুইডেনের রাজা গুসতাফ আডলুফ আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারটি তুলে দেবেন বেকেটের হাতে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়া ঠেকানো যায়নি কোথাও। ফ্রান্স এবং আয়ারল্যাণ্ডের লোকেরা খুশী। জাতিতে আইরিশ হলেও বেকেট মূলত ফরাসী ভাষার সাহিত্যিক। তাতে ফ্রান্স গর্বিত এবং আয়ারল্যান্ড গৌরবান্বিত। মেজাজের দিক থেকে বেকেট ফরাসী, ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে আইরিশ।

স-ক্ষোভ মন্তব্য লক্ষ্য করা যায় ইঙ্গ-মার্কিন বহির্ভূত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে। বেকেটের পুরস্কার প্রাপ্তিতে কেউ অসন্তুষ্ট নন, পুরকানা বলে সুইডিশ আকাদমির ওপর অনেকে ক্ষুব্ধ। আফ্রিকা, কিউবা, আরব যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, চীন প্রভৃতি দেশ সম্পর্কে ওঁদের উদাসীনতা অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। গতবার ইয়াশুনারি কাওয়াবাতাকে পুরস্কার দিয়ে সুইডিশ আকাদমি জাপানী-দের অনেকটা ঠান্ডা করে রেখেছেন।

জনৈক প্রখ্যাত কবি ও সাংবাদিকের মন্তব্য শুনলাম সেদিন। আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন, সাহিত্য-টাহিত্য ওসব বাজে কথা। এক বছরের মধ্যে লেখা শ্রেষ্ঠ সহিত্যের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে—তাই কি ঠিক? তা হলে তো বলতে হয়, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম কাব্য 'গীতাঞ্জলি'। এতো ভালো বই বাংলা ভাষায় আর একটিও লেখা হয়নি। এমন কি রবীন্দ্রনাথও পরবর্তীকালে তার চেয়ে নিকৃষ্ট লেখাই লিখেছেন।

মিনিট খানেক নীরব থেকে বললেন, আসল কথা কি জানেন? ইংরেজী গীতাঞ্জলির জন্যে এঁরা রবিঠাকুরকে পুরস্কৃত করে চমকে দিয়েছিলেন পুবের মানুষকে। তাতে এশিয়ার গৌরব বৃদ্ধি হয়েছিল সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষাকেও কিছুটা জাতে দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার।

আরেকজন বিজ্ঞানী বললেন, পুরস্কার-টুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারটা একটু গোল-মেলে। সাহিত্যের ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম একটু বিতর্কিত। বিজ্ঞান বিষয়ে তার অবকাশ কই? পাশ্চাত্যের মতো আমাদের দেশেও দু-চারটা মৌলিক আবিষ্কার হয়েছে। প্রাণের উৎস এবং রহস্য সম্পর্কে কিছুকাল আগে শিপ্রা মুখোপাধ্যায় সার্থক গবেষণা করেছেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার তিনি পাবেন কি?

বছর ছয়েক আগে রবার্ট গ্রেভস ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর আর কারো সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে না। যেন ওটা বুড়ো সাহিত্যিকদের জন্যে একটা সান্ত্বনা পুরস্কার কিংবা সৃজনশীল সাহিত্যিকদের সমাপ্তি-স্বীকৃতি।

অবশ্য এ সবই রাগী রাগী কথাবার্তা। সাময়িক দুঃখ ক্ষোভের অভিব্যক্তি। পুরস্কারটির নগদ মূল্যও তো কম নয়! সুইডিশ মুদ্রায় ৩৭৫০০০ ক্রাউন, ডলারের হিসেবে প্রায় নব্বই হাজার ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৭৫০০০ টাকা। অর্থাৎ ঐহিক দিক থেকে একটা স্বচ্ছলতার নিশ্চয়তা এনে দিতে পারে এই পুরস্কারটি। তা ছাড়া রয়েছে উপরি-পাওনা হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি। পৃথিবীর দেশে দেশে বেতারে-টেলিভিশনে প্রচারের প্রলোভন, নানা ভাষায় তাঁর সাহিত্যের অনুবাদ, কাগজেপত্রে নানারকম আলোচনা-সমালোচনার হুড়ো-হুড়ি।

সুতরাং তাই নিয়ে যদি কিছুটা জল ঘোলা হয়, হোক। সুইডিশ আকাদমি তার কি করতে পারেন? সারা পৃথিবীর যাবতীয় বইপত্র পড়ে তো তাঁরা সত্যি সত্যিই পুরস্কার দিতে পারেন না।

স্যামুয়েল বেকেট সম্পর্কে অবশ্য কোথাও কোনো বিতর্ক নেই। ইংরেজী-ফারসী-জানা প্রায় সকলের কাছেই তিনি কমবেশী আলোচিত ও পরিচিত সাহিত্যিক। পুরস্কারে উপেক্ষিত দেশের কবি-সাহিত্যিকরা যে দুটো-চারটে বিরূপ মন্তব্য করে বসেন, তাও কেবল ঐ মনের দুঃখে।

সুইডিশ আকাদমি তাঁর রচনা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন : নাটক ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বেকেট আধুনিক মানুষের উত্তরণ-প্রয়াসের কথাই বলতে চেয়েছেন বারবার। তাঁর বলার ভঙ্গি যুগোপযোগী, স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব।

বেকেটের বয়স এখন ৬৩ বছর।

১৯০৬ সালে তাঁর জন্ম হয় ডাবলিন শহরে। বাংলাদেশে যে-বয়সে তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা দুটো চারটে গদ্যপদ্যের বই লেখেন, সেই বয়সে বেকেট তাঁর স্বদেশে অপরিচিত। ইংরেজীতে প্রথম কবিতা লেখেন ১৯৩০ সালে। তখন তাঁর বয়স ২৪ বছর।

নাটক, উপন্যাস ও কবিতার ত্রিবিধ ভূমিতে বিচরণের স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছেন তিনি। তবু নাটকেই তাঁর সর্বাধিক স্ফূর্তি এবং কবিতায় অপেক্ষাকৃত জটিল ও অস্পষ্ট। ফরাসী পাঠকের কাছে তাঁর কবিতা চাঞ্চল্যকর, বিদেশী পাঠকের দৃষ্টিতে অর্থহীন শব্দের খেলা। সমকালীন তরুণ কবিদের ওপরে তাঁর বিশেষ কোনো প্রভাব নেই বললেই চলে। কিন্তু সকলেই বিস্মিত হন তাঁর নাটক-উপন্যাসের ভাষা-ব্যবহার ও উপস্থাপন রীতির আধুনিকতায়। অনেককেই তিনি প্রাণিত ও প্রভাবিত করেছেন এ ব্যাপারে।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত দ্বিতীয় আইরিশ সাহিত্যিক তিনি। প্রথম পুরস্কার পান ডবলিউ বি ইয়েটস। সেও আজ ছেচল্লিশ বছর আগের কথা। ১৯২৩ সালে। অবশ্য এর মধ্যে আরেকজন আইরিশম্যান—অধ্যাপক ই, টি, ওয়াল্টসন—নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন পদার্থ-বিদ্যায় মৌলিক গবেষণার জন্যে, ১৯৫১ সালে।

বেকেট ফ্রান্সে বসবাস করছেন ১৯৩৮ সাল থেকে। তার আগে ১৯২৮-২৯ সালে একটি ফরাসী স্কুলে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষকতা করেছেন প্রায় দু বছর।

প্রখ্যাত আইরিশ সাহিত্যিক জেমস জয়েসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তিনি পরিচিত। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবেও কাজ করেছেন এক সময়। জয়েসের লেখা ফরাসীতে অনুবাদ করেছেন বেকেট। সম্ভবত এই অনুবাদসূত্রেই তিনি জয়েসের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হতে শুরু করেন তখন। তাঁর পরবর্তী প্রায় সমস্ত লেখাতেই জয়েসের ছায়া লক্ষ্য করা যায়।

অবশ্য 'ছায়া' ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। নাটকের ক্ষেত্রে তিনি জীবনের অসঙ্গতিকেই একটা রীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরী জয়েস নন,—আয়ানেস্কো, জাঁ জেনে, মার্টিমার, আদামভ, পিণ্টার প্রমুখ সাহিত্যিকরাই তাঁর বন্ধু এবং সাথী। জয়েসীয়ান আবহমণ্ডল থেকে সরে এসে তিনি যেখানে আশ্রয় নেন, তা হলো প্যারিসের অ্যাবসার্ড নাটকের পরিবেশ। আলবেয়ার কাম্যুকে বলা যায় এই দ্বিতীয় ভাবনার প্রধান পুরোহিত। এক ধরনের অন্তহীন ঔদাসীন্য তাঁর কেন্দ্রীয় ইমেজ।

শব্দ দিয়ে ছবি তৈরী করেন না বেকেট। প্রতিটি শব্দের যে নিজস্ব ঝংকার, ঐশ্বর্য ও অর্থ আছে, তাকেই তিনি সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে চান। তাঁর এই চেতনা অনেক সময় উদ্দেশ্যহীন দৃশ্যনির্মাণে তাঁকে সহায়তা করেছে। সম্ভবত এ জন্যেই বেকেট বলতে পারেন : আমার রচনায় কোনো 'বিষয়' নেই। কবিতা, উপন্যাস, নাটক—সবই আমার কাছে একরকম।

তাঁর প্রখ্যাত নাটক 'ওয়েটিং ফর দি গোদো' লেখা হয় ১৯৫২ সালে। বছর পাঁচেক পরে লিখলেন 'এন্দগামে' (১৯৫৭) নামে আরেকটি নাটক। এ দুটি নাটকে বেকেট মানব অস্তিত্বের রহস্যময় প্রস্থান-ভূমির ছবিই ফুটিয়ে তুলেছেন। বাস্তব জগত এখানে অস্বীকৃত।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় এস্ত্রাগন আর ভ্লাদিমির নামে তাঁর দুটো সৃষ্ট চরিত্রের সংলাপ বিনিময়। একজন বুদ্ধিসম্পন্ন, অপরজন কল্পনাবিলাসী। কিন্তু উভয়েই ভবঘুরে।

এস্ত্রাগন : 'আমি সেই ধারণার কাছা-কাছি আসতে আরম্ভ করেছি। ভ্লাদিমির তুমি যুক্তিবাদী হও।

...আমি সংগ্রামে অংশ নিয়েছি।'

এবং আজকের মানবীয় সম্পর্ক, বিশ্বাস-হীনতা সম্পর্কে গভীর দুঃখবোধ :

'কোটি কোটি বছর ধরে আমরা ভাবতে ভাবতে উনিশ শতকে এসে পৌঁছেছি। সেকালে আমরা শ্রদ্ধেয় ছিলাম।'

ভ্লাদিমিরের কল্পনা প্রবণতার মূলে আছে তাঁর ক্রিশ্চিয়ান ধর্মসংস্কার ও জন্মান্তরবাদী চেতনা। যুক্তিবাদী এস্ত্রাগন বলেন : 'আমি শুনবো না, সকল মানুষই বিশ্বাসঘাতক।' এই আশ্বাসে ভ্লাদিমির আশ্বস্ত হতে পারেন না। তিনি বলেন : 'আমরা গোদোর জন্য অপেক্ষা করে আছি।'

জনৈক সমালোচক একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন : 'গোদো বলতে আপনি কি এবং কাকে বোঝাতে চান?'

বেকেট বলেন : যদি তাই আমার জানা থাকতো তাহলে নাটকেও তাকে উপস্থিত করতাম।

অর্থাৎ গোদো কোনো রক্তমাংসের শরীর নয়, একটি রহস্যময় সত্তা সম্পর্কে ধারণা মাত্র। কেমন স্থির, বিহ্বল, মোহময় আচ্ছন্নতার শেষে লক্ষ্য করা যায় চূড়ান্ত অবক্ষয়। মানুষের অক্ষমতার কথাই বলা হয়েছে ঘটনাক্রমে: সমগ্র নাটকটিই প্রতীকী-নির্ভর। একটা আনুজ্জ্বল দুঃখবোধ ও ব্যর্থতার গ্লানিতে চরিত্রগুলি যেন নিয়তি-চালিত। এদের একমাত্র গতি অনিবার্য মৃত্যুর দিকে।

'এন্দগামে' নাটকের মধ্যে বেকেট যন্ত্রণাময়, রক্তাক্ত। নাটকীয় চরিত্রের স্বাগত সংলাপে যেন নিজের কথাই বলেন বেকেট : 'তুমি যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে শেখো, ক্লভ।'

অনেকে তাঁর 'ওয়েটিং ফর দি গোদো'কে ফরাসী নাট্যকার রেসিনের 'বেরেনিস'-এর সঙ্গে তুলনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাঁর সাহিত্যচর্চা নিবদ্ধ থাকে উপন্যাস রচনায়। ১৯৪২ সালে লিখতে শুরু করেন 'ওয়াট' নামে একটি উপন্যাস।

ব্যক্তিগত জীবনে বেকেট ছিলেন একজন ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়, সার্থক অধ্যাপক এবং কৃতি গবেষক। প্রথম জীবনে ছিলেন প্রোটেস্টান্ট, পরবর্তীকালে কোয়েকার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রক্তে খেলা করে উপনিষদের সেই প্রশ্ন : 'আমি কে?'

এই প্রশ্ন তাঁর খৃস্টীয় ধর্মবিশ্বাস থেকেও এসে থাকতে পারে। 'ব্যক্তিগত পরিচয়' সন্ধানের চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন রচনায়।

১৯৫৮ সালে লেখেন 'ক্র্যাপস লাস্ট টেপ'। একটা অদ্ভুত বই। জৈবিক উত্তেজনা ও আত্মসমর্পিত ক্র্যাপ অতীত-বর্তমান নিয়ে ক্রমশ নেমে গেছে অধঃপতনের শেষ স্তরে। অবশেষে টেপ রেকর্ডারে সে শুনতে পায় : 'যে-অন্ধকারকে এতদিন সংগ্রাম করে নিচে দাবিয়ে চেষ্টা করেছি, তাই আমার অবিভাজ্য নিত্যসঙ্গী।'

১৯৫৯ সালে লেখা 'এসবার্স'কে বলা যায় শ্মশান-নাট্য। কেমন একটা রহস্যময় ভৌতিক পরিবেশে তার চরিত্রগুলি চলা-ফেরা করে। প্রধান চরিত্রটিকে ঘিরে আবর্তিত হয় মৃতের কণ্ঠস্বর। অন্য চরিত্রগুলিও নিয়তি-নির্দেশিত পথের গোপন পথিক।

জটিল চরিত্রসৃষ্টিতে তিনি সময়কে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন ১৯৬১ সালে লেখা 'হ্যাপি-ডেজ'-এ। এখানে লক্ষ্য করা যায়, তাঁর সেই অমোঘ ভাবনার প্রতি-ফলন—মৃত্যুচেতনা।

গোটা পাশ্চাত্য-সাহিত্যে বেকেটের সঙ্গে তুলনা চলে আলবেয়ার কামু আর জেমস জয়েসের। ভাবপ্রবাহ ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনি তাঁদের অধিকতর কাছা-কাছি। অনেকে তাঁকে আয়ানেস্কোর সঙ্গে তুলনা করেন। আমার মনে হয়, এরূপ আলোচনা দুই অমিল প্রতিভার পার্থক্য নির্ণয় ছাড়া মূল্যহীন। আয়ানেস্কোর জগতের উজ্জ্বলতা বেকেটের সৃষ্টিতে নেই। আয়ানেস্কো যেখানে পাঠককে জাগ্রত করেন, বেকেট সেখানে আবিষ্ট।

বেকেটের দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'মলয়' এবং 'মালোন ডাইজ'। ১৯৬৩ সালে লেখেন 'ও দা গুড ওল্ড ডেজ'।

'মালোন' কথাটি সৃষ্টি হয়েছে দুটি শব্দ জুড়ে 'মি' এবং 'অ্যালোন'। তার মানে 'আমি একা'। বেকেটের জীবনজিজ্ঞাসার উৎসমূলে এই শব্দটির অস্তিত্ব যেন পূর্ব-নির্ধারিত। 'মালোন ডাইজ' উপন্যাসের প্রায় সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, 'মালোন' নামে রোগ-শয্যায় শায়িত একটি ছেলের উপস্থিতি। দিনের পর দিন তার শরীর ভেঙে পড়েছে। এবং অনিবার্য মৃত্যুর দিকে অগ্রসরমান।

অবশ্য তার এই মৃত্যু শুধু শারীরিক নয়, মানসিক। জীবনের মধ্যেই সে উপলব্ধি করেছে মৃত্যুর পদধ্বনি। মানুষের জন্মের মতো মৃত্যুর যেন স্বাভাবিক, বিষাদময় একটা পরিণতি।

বেকেট অবশ্য নৈরাশ্যবাদী লেখক নন। তাঁর সাহিত্যজীবনের উৎসমূলে যে বোধ ক্রিয়াশীল, তা আধুনিক মানুষেরই সংকটময় অভিব্যক্তি। আজকের মানুষ বাইরের জগতে যতটা অস্থির এবং উত্তাল—অন্তর্জগতে ততটা অসহায় এবং উদাসীন। বেকেট এই সত্যকে শুধু বাইরের দৃষ্টিতে দেখেননি, অস্তিত্বের গভীরে উপলব্ধি করেছেন। জয়েসের অনুবাদ করতে গিয়ে প্রথম 'সময়' সচেতন হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। প্রচলিত অর্থে এই সময়বোধ বস্তুনিরপেক্ষ। তিনি তাঁর সমগ্র রচনায় যে-সত্যের অনুসন্ধান করেছেন তা কোনো বিশেষ চরিত্রের বাহ্যিক অভিব্যক্তি নয়, বরং জটিলতার চিত্তভূমির রহস্য-উদ্ঘাটন। সেখানে এমন সব ঘটনা ঘটে যেখানে বাস্তবজগতের সমস্ত যুক্তি হারিয়ে যায়। সেজন্যেই পাঠক উপলব্ধি করেন, চতুর্দিকে কোমল মোহময় এক রকম আলোর আভাস—প্রতিক্ষণ যা ভেতরের দিকে টানে, আকর্ষণ করে—বাইরের ঘাতপ্রতিঘাতকে সহনীয় করে স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়।

তাঁর রচনার মধ্যে যা কিছু অ্যাবসার্ডিটি, তা ঐ একই সূত্র থেকে আগত। কোনো ঘটনাই তাঁর কাছে আকস্মিক নয়, অসঙ্গত নয়। প্রতিটি ঘটনার মধ্যবর্তী স্তর সম্পর্কেও একটা ধারণা তাঁর আছে, কিন্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানা নেই। ফলে, সেই জগতের প্রত্যাক্ষায়নে তিনি যে প্রতীক ও চিত্রকল্পের আবিষ্কার করেন, যে প্রতিমা নির্মাণ করেন। তার অবয়ব দ্বিতীয় যে-কোনো ব্যক্তির কাছেই অস্পষ্ট এবং অসম্ভব বলে মনে হয়।

এ ব্যাপারে তাঁর নিত্যসঙ্গী অংশত কাম্যু, অংশত জয়েস—পূর্বসূরী আইরিশ নাট্যকাররা নন। অনেকে অবশ্য তকে উইলিয়াম কনগ্রীভ, জর্জ ফারকোহর, অলিভার গোল্ডস্মিথ, রিচার্ড ব্রিন্সলে শেরিডন, অস্কারওয়াইল্ড, বার্নার্ড শ, ইয়েটস, আর্থার পারকি, হিউ কেলী, সীন ও' কেসি প্রমুখ নাট্যকারদের সঙ্গে সম-পংক্তিতে বিচারের প্রয়াস পান।

মনে হয় বেকেটের মানসিকতা ও নাট্য-প্রতিভার মূল্যায়নে এমনিতর পংক্তিভুক্তি বিভ্রান্তিকর। সন্দেহ নেই, ইংরেজী নাটকের ক্ষেত্রে আইরিশ নাট্যকাররা বিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন এবং পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশে তাঁরা বহু আলোচিত পুরুষ। তবু বেকেট সম্পর্কিত আলোচনায় স্বতন্ত্র মানদণ্ডের প্রয়োজন। ঐতিহ্যসূত্রে তিনি নাটকের একটা পরিণতি বোধ আইরিশ নাট্যকারদের কাছ থেকে পেয়েছেন। নিঃসন্দেহে, কিন্তু তা লালিত হয়েছে ভিন্নতর মানসিকতায়, অন্যত্র পরিমণ্ডলে। মনেকাকে আত্মসাৎ করেও বেকেট নিজস্ব ভঙ্গী ও আঙ্গিক প্রকরণে নতুন। এবং সময়ের যন্ত্রণায় আবিষ্ট। তাঁর দুঃখবোধে তীব্র জ্বালা নেই, তৃষ্ণা নেই—আছে আত্মদর্শনের সুগভীর, নিস্তেজ অভিপ্রায়। বার্নার্ড শ বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে তীব্র আঘাত করেছেন মর্মান্তিক স্যাটায়ারে, মুখোস খুলে দিয়েছেন প্রত্যেকটি ভণ্ডামি এবং অসঙ্গতির। বেকেট সেখানে নিজ সুখ অনুসন্ধানে নিষ্কণ্ঠ। ফরাসী নাট্যকারদের মধ্যে আয়ানেস্কো, জাঁ জেনে প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর মিল বরং কিছুটা দূরকল্পনায় অনুমেয়। সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকে কাম্যু, সার্ত্রে প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর যে-মিল প্রত্যক্ষ ছিল, পরবর্তীকালে তা পরোক্ষ সাদৃশ্যের বিষয় হয়ে পড়ে। কেননা, সার্ত্রে এবং কাম্যু—উভয়েই ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন।

সাহিত্য বনাম শারদীয় সাহিত্য

মূল্যায়ন?—শব্দটা উচ্চারণ করেই আঁতকে উঠেছিলাম : মূল্যায়ন আবার কাকে বলে! শারদীয়া সাহিত্যের একটা হিসেব-নিকেশ করা যায়, কে কত লিখলেন—শিরোনামে এবং পৃষ্ঠাসংখ্যায়। তার বেশি এগোলেই বিপদ। প্রচুর পড়াশোনা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপরিসীম মনোবল না থাকলে মূল্যায়ন গোছের কিছু একটা লেখা দারুণ রিস্কি ব্যাপার। কার সম্পর্কে কি লিখতে গিয়ে কি বলে বসব, তা কে জানে। অমনি চারদিক থেকে পত্রাঘাত ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি আসবে, ঠিক হলো না মশাই, খাটি কথা হলো না। কিংবা তার চাইতেও আসবে তুখোড় সমর্থন এবং প্রবল উৎসাহ।

এই মুহূর্তে আমার নিজেকে চতুর ভাবতে ইচ্ছে করছে। ঝগড়াঝাঁটির পথ এড়িয়ে হালকা চালে দু-চার কথা বলে ফেলাকে—এ ছাড়া আর কিই-বা বলা যায়? আসল কথা, এভাবে সাহিত্যের মূল্যায়ন সম্ভব নয়, মূল্যায়ন হয় না। সমগ্র দেশের সাহিত্য এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করতে হলে, যা দরকার—সেই নিরপেক্ষ, সাহসী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সমকালীন আর কজনের আছে?

প্রত্যেক বছরই পুজোর পর ছোট-বড় প্রায় প্রতিটি কাগজে 'শারদীয় সাহিত্য : একটি নিরীক্ষা' কিংবা অনুরূপ অন্য কোনো শিরোনামে দুটো-চারটে প্রবন্ধ-নিবন্ধ বেরোয়। এ বছর এখনো বেরোয়নি। বেরোবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতেও যা থাকবে (এটা আমার নিতান্তই ব্যক্তিগত ধারণা)—তা প্রবন্ধকারের পছন্দসই কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে প্রশস্তি কিংবা ক্ষোভ, এবং অন্যান্যদের সম্পর্কে ছিটেফোঁটা দুটো-চারটে ইতস্তত মন্তব্য।

এ সব ব্যাপারে আমার সবচাইতে বড়ো অসুবিধা, শারদ-সাহিত্যকে আমি সারা বছরের সৃজনশীল রচনাপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। পুজোর আগে লেখকদের মন একটু আনচান করে, ঢাউস ঢাউস কাগজে লিখতে ইচ্ছে হয় ঠিকই। কেউ কেউ বেশি পরিমাণ লেখেনও। কিন্তু সাহিত্যের মূল্যায়নে এটাই তো একমাত্র নিরিখ হতে পারে না। বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকরা কি এ সময়ে আলাদা রকমের শারদীয়া-মার্কা কিছু একটা লেখেন, না লিখতে পারেন?

যে-কোনো বড়ো রকমের সামাজিক উৎসবেরই একটা সাহিত্যিক সহযোগিতা থাকে। এটা শুধু বাংলাদেশের একক বৈশিষ্ট্য নয়, পৃথিবীর সব দেশেরই লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বড়দিন উপলক্ষে পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরোয়। ছোটদের নানারকম বই উপহার দেন বড়রা। সমগ্র উত্তর ভারতে, বিশেষ করে, হিন্দী পত্র-পত্রিকার বেরোয় দেয়ালী সংখ্যা। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলি ঈদ উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বের করেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অবশ্য এ রকম ধর্মাশ্রয়ী সামাজিক উৎসব নেই। কিন্তু সাহিত্যের উৎসব আছে সেখানেও। অক্টোবর বিপ্লব উপলক্ষে রাশিয়ায় পত্র-পত্রিকার আকার আয়তন বাড়ে, নতুন নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রজাতান্ত্রিক চীনেও অনুরূপ সাহিত্য-উৎসব হয়ে থাকে।

তবে সর্বত্র উপলক্ষ্য এক নয়। কোথাও নববর্ষ, কোথাও দোল-দুর্গোৎসব, কোথাও দেয়ালী-ঈদ, কোথাও বড়দিন কিংবা বিপ্লব-স্মরণ। কোথাও সেপ্টেম্বর, অক্টোবর কিংবা নভেম্বরে। কোথাও ডিসেম্বরে কিংবা জানুয়ারীতে। কোথাও মার্চ-এপ্রিলে। অর্থাৎ পৃথিবীময় সাহিত্যের উৎসব চলছে সারা বছর। জাতীয়তার বেড়া এখনও ভেঙে যাচ্ছে দেশে দেশে। সেজন্যেই আন্তর্জাতিকতার দিকে সামান্য মুখ-ফেরানো। কোনো দেশের সাহিত্যই তো আর নিজের দেশের পরিমণ্ডলে স্থির কিংবা আবদ্ধ নয়।

বাংলাদেশে সাহিত্যের উৎসব হয় শরৎকালে।

তার প্রধান উপলক্ষ্য দুর্গোৎসব হলেও একমাত্র কারণ নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো নয়ই। যদি তাই হতো, তা হলে বামপন্থী কাগজগুলোর কোনো শারদীয়া সংখ্যা বেরোত কিনা সন্দেহ। পুজো প্যাণ্ডেলের কাছাকাছি পুস্তক-পুস্তিকার স্টল সাজিয়ে বসতেন না মার্কসবাদে বিশ্বাসী কোনো দলের সদস্য কিংবা সমর্থকরা। নন্দন, কালান্তর, দেশহিতৈষী, পরিচয়ের শারদীয়া সংখ্যাও বেরোত না।

আসল কথা হলো, জাতীয় ভাবাবেগ। তাকে ইচ্ছে করলেই একবাক্যে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রধান বলেই শরৎকালে সাহিত্যের উৎসব হয়। অবিভক্ত বাংলাতেও তাই হতো। পূর্ব পাকিস্তানে শুনেছি এখন আর শারদীয়া সংখ্যা বড়একটা বেরোয় না। বেরোয় ঈদ সংখ্যা।

সেজন্যেই আমি 'উপলক্ষ্য' বলেছি। কোনো সাম্প্রদায়িক উৎসব সাহিত্যের লক্ষ্য হতে পারে না। হয়ওনি।

অন্যান্য বছরের মতো এবারও কমার্শিয়াল সাহিত্যপত্রের সূচনায় একটা সম্পাদকীয় ছাপা হয়েছে শরৎকাল ও শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে। তারপরেই দুর্গাপুজো সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ। অন্যান্য রচনার সঙ্গে অবশ্য এদের সম্পর্ক নেই। বাকি সবই সময়োপযোগী গল্প-কবিতা-নাটক-উপন্যাস ইত্যাদি।

অর্থাৎ সাহিত্যের ব্যাপারে শারদোৎসব উপলক্ষ্য হলেও, কদাচ লক্ষ্য নয়। তবু শারদীয়া সাহিত্যকে সম্বৎসরের সাহিত্য-প্রয়াস থেকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করে থাকি অভ্যাসবশতঃ।

পুজোর প্রায় মাসখানেক আগের কথা। অমৃত অফিস থেকে বেরিয়েই দেখা হলো প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে। তখন চাঁদা আদায়ের রসিদ হাতে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ছেলেমেয়েরা। প্যাণ্ডেল বাঁধার অর্ডার চলে গেছে ডেকরেটরের কাছে। সিনেমাসংক্রান্ত সাহিত্য-পত্রিকাগুলোর ছাপা শেষ। বাঁধাই চলছে। হয়তো বেরিয়ে যাবে দু'চার দিনের মধ্যে।

এমনি সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এবার সাহিত্যের খবরা-খবর কি? কোথায় কি লেখা হচ্ছে? কোনো চাঞ্চল্যকর সংবাদ থাকে তো বলুন।

স্মিত হাসলেন প্রফুল্ল রায়। বললেন : পুজোয় আবার আলাদা রকমের কি ব্যাপার ঘটবে বা ঘটা সম্ভব? সৃষ্টির জন্যে কোনো সময় নির্দিষ্ট করা যায় না। সাহিত্যকে সাহিত্যের দৃষ্টিতেই বিচার করতে হবে। কখনো যদি কোনো উপলক্ষে কোনো ভালো লেখা হয়ে যায়, তা হলে বুঝতে হবে এটা নেহাৎ-ই ব্যতিক্রম—আকস্মিক ঘটনা। আমার তো মনে হয় না, পুজোর সময় কেউ খুব ভালো লেখা লিখতে পারেন। অনেক সময় বহু আগেকার লেখা পুজো সংখ্যায় বেরোয়। সেগুলি পরিশ্রমী, যথার্থ ভালো লেখা। শারদীয়া সংখ্যায় বেরোয় বলেই তাকে শারদীয়া সাহিত্য বলা যায় না। কেবল, ঘটনাক্রমে ওরকম নামে চিহ্নিত হয়ে যায়।

ঠিক তার বিপরীত কথা শুনেছিলাম সুবোধ ঘোষের কাছে। সেও পুজোর প্রায় মাসখানেক আগের কথা। বললেন, পেছনে তাগাদা না থাকলে আমি লিখতে পারি না। যখন কেউ বারবার তাগাদা দিতে

থাকে, তখন আমি লিখি দ্ব'একটা গল্প কিংবা উপন্যাস। এবার লিখেছি দ্বটো উপন্যাস। গতবারও লিখেছি। কিন্তু তার আগে বেশ কয়েক বছর লিখিনি কিছুই। গল্প-উপন্যাস লিখি আমি টাকার জন্যই।

ভেবে দেখলাম, উভয়ের কথাতেই সত্য আছে। অন্বরোধের ঢেঁক গিলতে গিয়ে অনেকে অনেক বাজে লেখা লেখেন সন্দেহ নেই। কিন্তু কখনো কখনো ভালো লেখাও লিখেছেন কেউ কেউ। মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি কালেভদ্রে হয়। রসোত্তীর্ণ, আন্তরিক রচনার জন্যে তেমন পরম-মুহূর্তের আবশ্যক হয় বলে মনে হয় না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও নাকি অর্থের প্রয়োজনে অনেক ফরমায়েসী লেখা লিখতে হয়েছিল এক সময়। লেখা আরম্ভ করার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত তাই নিয়ে তাঁর মনে বিরক্তিও যে না হয়েছিল, তা নয়। কিন্তু কোনো একটি লেখায় হাত দেবার পর সে সব অনুরোধ বা ফরমায়েসের কথা ভুলে যেতেন তিনি। ফলে, তাঁর হাত দিয়ে যা বেরোত, শেষ পর্যন্ত তা কোনোদিনই কারো কাছে তুচ্ছ বা অনান্তরিক বলে মনে হয়নি।

শারদীয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাধারণত সেরূপ কোনো আকস্মিক অনুরোধ থাকে না। তারজন্যে মোটামুটি লেখক এবং সম্পাদকদের একটা পূর্ব-প্রস্তুতি থাকে। কেবল বিপদ হয় খ্যাতিমান গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের। অনেক সময় টাকার লোভে তাঁরা সাধ্যাতীত পরিমাণ লিখতে বাধ্য হন। অনুরোধও আসে নানা মহল থেকে। ঃ আপনার লেখাটা না পেলে চলবে না। পুজো সংখ্যাটাই একেবারে মার খাবে। দয়া করে যাই হোক একটা লিখে দিন।

কখনো চাপ সৃষ্টি হয় ঃ আগের বছরে আপনি লিখেছিলেন। এবারও লিখবেন বলে আমরা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েছি। না হলে একেবারে ডুবে যাবো।

এরকম অবস্থায় পড়ে লেখকরা অনেকেই নাজেহাল হন প্রায় প্রতি বছর। অনেক সময় পুরনো লেখার পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেন। দু-চার বছর আগেকার লেখা তো হামেশাই পুজো সংখ্যাগুলিতে পুনর্জন্মের ভূমিকা পালন করে। ছোট-খাট পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের একই লেখা অন্তত দু-তিনটি কাগজে মুদ্রিত হয়েছে একই বছরে। কখনো সম্পাদকদের জ্ঞাতসারে, কখনো অজ্ঞাত-সারে।

ফলে, ভালো লেখা যে সব সময় হয়ে ওঠে না—তাও ঠিক। প্রতিষ্ঠিতরা এ ব্যাপারে কিছুটা নির্মম এবং নির্লোভ হতে পারলে হয়তো নিজেদের উপকারই হতো।

তবু শারদীয়া সাহিত্যের একটা আলাদা স্বাদ আছে পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে। তার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। লেখক, পাঠক, প্রকাশক—এই তিন মহলেই বিশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় পুজোর আগে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রেস, কম্পো-জিটার, বাইন্ডার, ব্লকনির্মাতা, ডিজাইনার, শিল্পী ও কাগজবিক্রেতাদের ভবিষ্যৎ। এ'রা প্রায় সকলেই আর্থিক সম্পত্তির প্রয়ো-জনে শারদীয়া সাহিত্যের পরোক্ষ পৃষ্ঠ-পোষক। প্রত্যক্ষ ভূমিকায় এগিয়ে আসেন পাঠক সম্প্রদায়। তাঁদের আনুকূল্য না পেলে প্রকাশকদের উৎসাহে ভাটা পড়তো। উপেক্ষিত হতেন লেখক-লেখিকারা।

এ সময়ে বেশ কিছুসংখ্যক নতুন পাঠক সৃষ্টি হয়। এ'রা সারা বছর প্রায় কোনো পত্র-পত্রিকাই পড়েন না। পুজোর আগে মনটা কেমন আনচান করে, দু'একটা রঙচঙে মলাটের ঢাউস পত্রিকা কেনার লোভ হয়। ছেলেমেয়েদের জামা-কাপড়, বাটার জুতো, বউয়ের শাড়ি-সিঁদুর টয়লেটের সঙ্গে কিনে ফেলেন তেমনি ধরনের দু'একটা শারদীয়া সংখ্যা। তা ছাড়া মনের মধ্যে খেলা করে একটা ছুটি-ছুটি ভাব। হয়তো এর জন্যেও খানিকটা উপভোগের ইচ্ছে জাগে অনেকের মনে। ছোট ছেলে-মেয়েদের অনেকে উপহার দেন কোনো শিশু-বার্ষিকী কিংবা রঙিন গল্পের বই। সারা বছর যাকে দিয়ে চল্লিশ পঞ্চাশ পয়সার একটা পত্র-পত্রিকাও কেনানো সম্ভব হয় না—তিনিই হয়তো এ সময়ে চার ছ' টাকা খরচ করে ফেলেন শারদীয়া সাহিত্যের প্রয়োজনে।

তা ছাড়া আছেন আরো এক শ্রেণীর পাঠক। অস্থির এবং আকস্মিক ওদের মতিগতি। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত—এই তিন সম্প্রদায়ের আছেন এ'দের দলে। তবে সংখ্যাধিক্যে উচ্চবিত্তদেরই প্রাধান্য। পুজোর আগে কোথাও বাইরে যাবার সময় ওরা দুটো চারটে শারদীয়া সংখ্যা কিনে থাকেন ভ্রমণকারী হিসেবে। কোনো পরি-কল্পনা না নিয়েই ও'রা কাগজ কেনেন। হয়তো অনেক সময় রেল-স্টেশন কিংবা তারই কাছাকাছি কোনো স্টল থেকে মোটা আয়তনের কয়েকটা পত্র-পত্রিকা কিনে ট্রেনে চেপে বসেন বেশ খোসমেজাজে। সিনেমাসংক্রান্ত পত্রিকা হলে ছবির দিকে চোখ বোলান অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে কাগজের টাটকা গন্ধটা টেনে নেন বুকের মধ্যে। রেলের একটানা শব্দের মধ্যে মনো-টনি এলে পুনরায় চোখ বুলোন গল্প-উপন্যাসের ওপর। এমনি করে পড়া হয়ে যায় সমস্ত পত্রিকাটা। ভ্রমণশেষে তাঁদের মনে আর কোনো আগ্রহ থাকে না এ-সব পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে। তবু পাঠক এবং ক্রেতা হিসেবে এ'দের উপেক্ষা করার উপায় নেই। শারদীয়া সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠ-পোষকদের তালিকায় এ'দের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। সাহিত্যের যাঁরা স্থায়ী পাঠক তাঁদের নিয়ে পুজো সংখ্যা বের করা যায় না।

স্বভাবতই শারদীয় সাহিত্যের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো পাঠকমনোরঞ্জন। সব পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে অবশ্য একথা প্রযোজ্য নয়। অনেকের ক্ষেত্রেই সঠিক। এবং এই মনোরঞ্জনের দৃষ্টিপার্থক্য অনুসারে পত্রিকাগুলিরও চরিত্র-পার্থক্য ঘটে। লিটল ম্যাগাজিনগুলো সাধারণত এদের আওতায় পড়ে না। মোটামুটি এদের কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।—যথা—

১। দৈনিক পত্রিকার বিশেষ শারদীয় সংখ্যা। যেমন,—যুগান্তর, অমৃতবাজার পত্রিকা, বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা।

২। নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিকের পুজো সংখ্যা। যেমনঃ অমৃত, দেশ, সাপ্তাহিক বসুমতী, ধ্বনি প্রভৃতি।

৩। সিনেমাসংক্রান্ত পত্রিকা। যেমন ঃ উল্টোরথ, উত্তম, জলসা, সিনেমা জগৎ, সাজঘর প্রভৃতি।

৪। যৌনসংক্রান্ত পত্রিকা। যেমন ঃ জীবন যৌবন, সুন্দর জীবন, নরনারী প্রভৃতি।

৫। মরশুমী পত্রপত্রিকা। কেবল পুজোর সময়ই এগুলো বেরোয়। অন্য সময়ে মুখ দেখা যায় না। হয়তো একই প্রকাশক বিভিন্ন বছর বিভিন্ন নামে এ ধরনের পত্রিকা বের করে থাকেন।

৬। রহস্য-রোমাঞ্চের পত্রিকা।

৭। ছোটদের পুজো-বার্ষিকী। যেমন ঃ শিশুসাথী, কিশোর ভারতী ইত্যাদি।

৮। ছোটদের উপযোগী গল্প সংকলন। যেমন ঃ শুকতারা, আনন্দ ইত্যাদি।

৯। সেমি-কমার্শিয়্যাল বার্ষিক সংক-লন।

১০। মফস্বলের পত্র-পত্রিকার বিশেষ শারদীয়া সংকলন। অনেক সময় আকার-আয়তনে নেহাৎ তুচ্ছ করার মতো নয়। রুচি-প্রবৃত্তিতে কমার্শিয়্যাল—এই যা।

এই সব পত্র-পত্রিকার মধ্যে সিনেমা ও যৌনসংক্রান্ত পত্রিকাগুলির পুজো সংখ্যা বেরোয় সবার আগে। মহালয়ার বেশ কিছু-

কাল আগে। আসন্ন দুর্গোৎসবের নকিব হিসেবে কাজ করে এরা। বইয়ের স্টলগুলিকে আলো করে বসে। লেখক আবিষ্কার কিংবা লেখার নির্বাচন সম্পর্কে এরা প্রায়শ উদাসীন। নামী লেখকের বড় গল্পকে উপন্যাস নামে পরিবেশনের কৃতিত্ব এ'দের প্রাপ্য। পাঠকমনোরঞ্জনের ব্যাপারে সচেতন। মরশুমী পত্র-পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে এদের সহোদর। মেজাজে কিছুটা উগ্র। কোনোরকম সাহিত্যিক দায়-দায়িত্ব এদের নেই। ব্যবসা হলেই হলো। এককালীন অর্থোপার্জনের একটা উপায় হিসেবে এ'রা পুজো সংখ্যা প্রকাশ করেন।
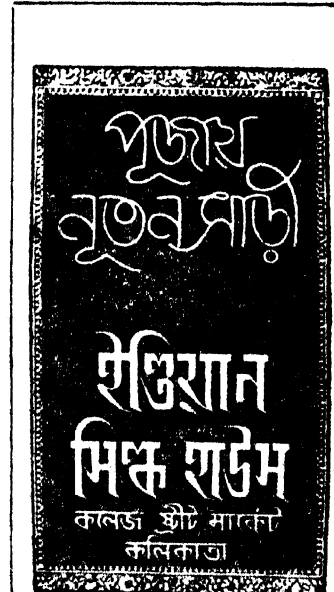
দৈনিক পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা কিংবা সাপ্তাহিক পুজো সংখ্যাগুলিতে মনোরঞ্জনের প্রয়াস থাকলেও তা পরোক্ষ, এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকে নির্দোষ। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরা এসব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। কিছুটা উন্নত রুচিবোধ নিয়েই এ'রা সাহিত্যের ব্যবসা করেন। স্বভাবতই পুজো সাহিত্যের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রক হিসেবে এ'রা কাজ করেন। প্রচার, প্রভাবের দিক থেকেও জনসাধারণের ওপর এ'দের আধিপত্য সর্বাধিক।

এ ছাড়া অনুল্লেখ্য রয়ে গেল মহিলা সম্পাদিত দু-একটি সেমি-কমার্শিয়াল কাগজ—যথা ; শ্রীমতী, ঘরনী, মহিলা ইত্যাদি। রুচিবোধের দিক থেকে ওদের আলাদা শ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না আমার। এসব পত্র পত্রিকার পেছনে রয়েছে পুরুষকর্মী ও পরিচালকের পরোক্ষ হাত।

এই ব্যবসায়ী প্রয়াসের বাইরে সর্বাধিক প্রচারিত পত্র-পত্রিকাগুলির প্রায় সব কটাই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র। দেশহিতৈষী, কালান্তর, নন্দন ও পরিচয়ের কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু বিক্রয়সংখ্যা কম নয়। এ জাতীয় পত্র-পত্রিকার পাঠক-পাঠিকারা রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও সিরিয়াস। প্রতিটি রচনা সম্পর্কে আগ্রহী। কোনো হেলাফেলার ভাব নেই। লেখক-লেখিকারাও নন-কমার্শিয়াল, আত্মপ্রত্যয়ে স্থির।

লিটল ম্যাগাজিনগুলোর সঙ্কট এবার সব চাইতে বেশী। কাগজের দাম, ব্লকের খরচা, মুদ্রণের হার সবই অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশ বেড়ে গেছে। যাঁরা এসব কাগজ বের করেন—তাঁদের আর্থিক অবস্থাটাও বোধহয় বেসামাল। তার ওপর কাজ করেছে একটা বাড়তি উপদ্রবের মতো অনীহা এবং ঔদাসীন্য। পুজোর কয়েক মাস আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল, লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা বেশ ম্রিয়মান। অনেকের কণ্ঠেই পত্রিকা বের না করবার দুঃখজনক অভিপ্রায়। প্রত্যেক বছরই যা হয়, এবার তার ব্যতিক্রম। নতুন লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের হার তেমন বাড়েনি এ বছর। সকলের মুখেই একটা আপসোসের সুর, কিন্তু প্রতিকারে উৎসাহী নন কেউ।

চরিত্রের দিক থেকে লিটল ম্যাগাজিনগুলো নানা শ্রেণীর। যথা ;

১। চেহারা-চরিত্রে রুচিশীল সম্ভ্রান্ত পত্র-পত্রিকা ; এক্ষণ, এষা, সাহিত্যপত্র, বহুরূপী, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদি।

২। ছোটগল্পের পত্রিকা ; শুকসারী, একালীন ইত্যাদি।

৩। কবিতা পত্রিকা ; সীমান্ত, একক, কবি ও কবিতা, অনুভব, কবিপত্র, অনাদিন ইত্যাদি।

৪। প্রবন্ধের পত্রিকা ; সমকালীন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী ইত্যাদি।

৫। ক্ষুদ্রতর পাশ্চিমশেলী পত্রিকা ; অগুনতি।

এদের হয়তো আরো অনেকগুলো উপবিভাগ করা যায়। যেমন ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, মঞ্চ, চলচ্চিত্র, চিকিৎসা সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা। স্বাস্থ্যসম্পর্কিত পত্র-পত্রিকাও বেরোয় দু-একটি। শারদীয়া সাহিত্যের পরিমন্ডলকে এরা বিশেষ রকমে আলোড়িত করে না কোনো সময়েই।

কিন্তু পুজোসাহিত্যের পটভূমি প্রস্তুত করে লিটল ম্যাগাজিনগুলোই। বহু নতুন মুখের সন্ধান পাওয়া যায় এসব পত্র-পত্রিকায়। কত গল্পকার ও কবির নাম। পরবর্তীকালে কমার্শিয়াল কাগজের সম্পাদকরা এ'দের আশ্রয় দেবেন হয়তো সাহিত্যের ক্ষেত্রে। সীমান্ত বাংলা থেকেও পত্র-পত্রিকা বেরিয়েছে এবার কয়েকটি। উত্তরবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা থেকেও প্রকাশিত হয়েছে। শুধু নেই, আগের বারের মতো তীব্রতর উত্তেজনা, তর্কবিতর্ক এবং মতান্তরের মনোমালিন্য।

জনৈক সাংবাদিককে সেদিন জিজ্ঞেস করলাম ; এবারকার শারদীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কি ?

স্মার্ট উত্তর দিলেন ভদ্রলোক ; উত্তেজনার অভাব।

আমার কাছে মনে হয়েছে আরো গুরুতর সমস্যা। কিছু সুলক্ষণ ও দুর্লক্ষণ, সাহিত্যিক পালা-বদলের কিছু অস্পষ্ট সংকেত। প্রচন্ড যৌনাসক্তির উৎসে ভাঁটা পড়েছে সর্বত্র। গত কয়েক বছর ধরে কবিতায় গল্পে যেমন যৌনতার বাড়াবাড়ি হচ্ছিল—এ বছরে সেই প্রবণতাটা কমতির দিকে। বড় ধরনের কমার্শিয়াল কাগজগুলো তেমন কোনো শারীরিক উত্তেজনা প্রকাশ করে নি। লিটল ম্যাগাজিনগুলো রাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশে বিশেষ উৎসাহী হয়ে পড়েছে।

কিন্তু দুর্লক্ষণ যা, তা হলো সাহিত্য-বিষয়ে আলোচনার টানাটানি। যে-কটা লিটল ম্যাগাজিন এ সময়ে বেরিয়েছে,—তাদের মধ্যে দেখেছি কবিতা, গল্প, উপন্যাসের ওপরে গদ্যরচনার অভাব। কবিতার ফর্ম টেকনিক নিয়ে কেউ বড়-একটা মাথা ঘামান নি, ক্রোধে আত্মহারা হন নি বর্তমান গল্পকারদের সমাজবিমুখতায় কিংবা উৎসাহিত হন নি কোনো নতুন কবি সাহিত্যিকের সাম্প্রতিক রচনাবলী সম্পর্কে। হওয়া উচিত ছিল, এটা সুস্থতার লক্ষণ নয়। সাহিত্যের পক্ষে এমন অবস্থা অসহনীয়।

মনে হয়, যুক্তফ্রন্ট শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর অবক্ষয়ী লেখকরা বিচলিত এবং মধ্যপন্থীরা সংশয়ে পড়েছেন। সকলেই লিখেছেন কম-বেশী—আসর জমাতে পারেন নি আগের মতো। অবশ্য এটা আমার নিতান্তই অনুমান। নাগরিক-বৈদগ্ধের গতি-প্রকৃতি সব সময় ঠাহর করা যায় না।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতার পাঠক সবচাইতে কম, কবি বেশী। গল্পের পাঠক আছে। পত্র-পত্রিকার চাহিদা ও শরীর-সজ্জায় গল্পের মূল্যবান ভূমিকা অবশ্য-স্বীকার্য। শারদীয়া সংখ্যাগুলিতে গল্প লিখে গল্পকাররা বেশ দু পয়সা কামাই করার স্কোপ পান। কিন্তু তারপরেই সে সব গল্প একসময় বিস্মৃত হতে থাকেন পাঠক। অনেক সময় লেখকও। গল্পের বইয়ের চাহিদা নেই। ছেপে লোকসান দিতে চান না প্রকাশকরা। যেন সাময়িকপত্রের চাহিদা মেটাবার জন্যে সে সব লেখা। লিটল ম্যাগাজিনের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে কবিতা এখনো অপরিহার্য। প্রকাশকরা একটু দায়িত্বশীল হলে হয়তো গল্প-কবিতারও পাঠকীয় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা সম্ভব। আমাদের দেশে তেমন প্রকাশকও বড় একটা নেই।

অনেক পাঠকের মতে, শারদীয় সাহিত্যের এই বিমোন অবস্থাটা সাময়িক। হয়তো আগামী বছরেই নতুন উত্তেজনা দেখা যাবে। শুরু হবে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের হিড়িক। একটা পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমরা সবাই। পথ এখনও স্থির হয় নি। দরজা খোলা পেলেই আবার লক্ষ্য করা যাবে বাঁধভাঙা জোয়ারের তরঙ্গ।

ভদ্রলোককে আমার বেশ আশাবাদী মনে হলো। জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও সাহিত্যের উৎসমুখ খোলা রাখা দরকার। দুর্গাপূজা বাঙালীর সাহিত্যজীবনে সেই উৎসমুখ খুলে দেয়। দ্বিতীয় কোনো উপলক্ষ্য অদূর-ভবিষ্যতে সমগ্র ভাবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে শারদীয়া সংখ্যা বেরোবে। পাঠকরা তা কিনবেন, প্রকাশকরা তৎপর হবেন। বেরোবে নানা শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা। কবিরা কবিতা লিখবেন ভুরি-ভুরি। গল্পকাররা গল্প লিখবেন সাধ্যানুসারে — কেউ কম, কেউ বেশী। প্রকাশিত হবে নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা। আঁতুড়-ঘরেই মারা যাবে তাদের অনেকগুলো এ জাতীয় দুর্ঘটনা অতীতেও ঘটতো, ভবিষ্যতেও ঘটবে। সাহিত্যের ইতিহাসে তার যোগফল বিষাদাত্মক নয়, আশাপ্রদ এবং প্রগতিশীল।

সাহিত্যের শারদোৎসব বাঙালীর সমাজ ও মানস জীবনের একটি অনিবার্য এবং অবিচ্ছিন্ন উৎসব।

—বিশেষ প্রতিনিধি

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

অহীন্দ্র চৌধুরী

অহীন্দ্র চৌধুরী
১৯২৮ খৃঃ গৃহীত ছবি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উঠলাম। উনি আমার পাশে বসলেন। গাড়ী চলতে লাগলো সোজা সার্কুলার রোডের দিকে। কোন কথা নেই, কোন রাগ নেই, কটূক্তি নয়। উনিও চুপচাপ, আমিও চুপচাপ। আমি যেন কোনো নতুন জায়গায় এসেছি এইভাবে কলকাতা শহরের বাড়ীঘর সব দেখতে দেখতে চললাম—বরাবরই ডানদিকে তাকিয়েছিলাম, বাঁদিকে আর তাকাবার সাহস হয়নি, কারণ ওদিকটায় প্রবোধবাবু বসেছিলেন। গাড়ী বাঁক নিয়ে শেয়ালদহ এলো—তারপর শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় ঘুরে ডান দিকে বেলগাছিয়ার পাশ দিয়ে যশোর রোডের দিকে চলতে লাগল। বুঝলাম গাড়ী চলেছে কোথায়—গদাইবাবুর বাগানবাড়ী।

বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ্দুর। গাড়ী গিয়ে ঢুকল ফটকের মধ্যে। এই ফোর্ড-গাড়ীখানার আওয়াজ হতো ভীষণ, আর সেই আওয়াজ শুনেই লোকজন বেরিয়ে আসত। আজ কিন্তু কেউ এলো না। মনে মনে ভাবছি—এবার এরা আমাকে এখানে জোর করে আটকে রেখে দেবে নাকি?... না, তা পারবে না—পাঁচিল আছে বটে, তবে এমন কিছু উঁচু নয় যে, টপকাতে পারবো না।

গাড়ী থেকে নেমে দুজনে প্রথমেই প্রায় একতলাসমান সিঁড়ি ভেঙে শ্বেত-পাথরের দালানটা পেরুলাম। বড়ো বড়ো থাম—ঝিলমিল আর রেলিংদেওয়া বারান্দা—তারপর ঘরগুলো। বারান্দা দিয়ে উঠে এসে আমরা একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। ছোট ঘর, সব সময় ফরাস পাতা থাকত সেখানে, তাস-টাস খেলা হতো। এখন দেখলাম দুটি ভদ্রলোক খুব একাগ্রতা-সহকারে কি কাজ করে চলেছেন। একজন গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে কি সব বলে যাচ্ছেন, আর অপরজন তাই লিখে চলেছেন মন দিয়ে মাথা নীচু করে।

প্রবোধবাবু বললেন — দেখুন কাকে ধরে এনেছি।

নিজেদের কাজে তাঁরা এত তন্ময় ছিলেন যে, প্রবোধবাবুর গলা শুনে যেন তাঁদের চমক ভাঙলো। তারপর আমাকে দেখতে পেয়ে যেন আরও চমকে গেলেন। কিন্তু তা মুহূর্তমাত্র। তারপর হাসিমুখে বলে উঠলেন—এই যে, এসেছেন? আপনাকেই তো আমরা খুঁজে মরছি।

মুখে গড়গড়ার নল-দেওয়া লোকটি হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর লেখকটি হলেন জানকীবাবু—অপরেশবাবুর 'গণেশ'।

অপরেশবাবু উৎসাহের সঙ্গে বললেন—জানেন তো মনোমোহন আমরা নিয়েছি। সেজন্য নতুন নাটক লিখছি 'শ্রীরামচন্দ্র'। আপনার ভালো পার্ট আছে মশাই—দুটো পার্ট।

বললাম—দুটো পার্ট? আমার জন্যে?

—হ্যাঁ

—করা যাবে একসঙ্গে?

—কেন যাবে না? গোড়ার দিকে দশরথ আর শেষের দিকে রাবণ।

বললাম—কিন্তু পাবলিক থিয়েটারে একসঙ্গে দুটো পার্ট?

অপরেশবাবু বললেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ—এরকম খুব হয়। মেক-আপ করে ভোল ফিরিয়ে দিতে পারবেন না?

'না'-এর উপর এমন টান দিলেন যে, আর না বলতে পারলুম না, সত্যি সত্যিই।

উনি বলে চললেন—আপনিই পারবেন মশাই—নইলে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি কেন?

প্রবোধবাবু বললেন — আর ছেলে-মানুষী না করে রাজী হয়ে যাও। আমি তো স্টার নিয়ে রয়েছি, ওটার দেখাশোনা তেমন করতে পারব না। সুতরাং মনমোহনের সবকিছু দেখা-শোনার ভার তোমাকেই নিতে হবে। অর্থাৎ তুমিই হবে ওখানকার সর্বেসর্বা।

অদ্ভুত কর্মিৎকর্মা মানুষ এই প্রবোধবাবু। আমাকে তখুনি নিয়ে ঢুকলেন হাইকোর্টে, টেম্পল চেম্বার্সে—অ্যাটর্নী দত্ত অ্যান্ড সেনের অফিসে। সেন অর্থাৎ সতীশ সেন স্বয়ং বসেছিলেন অফিসে—ওঁর পার্টনাররাও ছিল। আমাকে দেখে সতীশবাবু প্রথমটা খুবই অবাক হয়েছিলেন, কয়েক মুহূর্ত কোনো কথাই বলতে পারলেন না—তারপর বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বললেন—আসুন।

নমস্কারাদি করে গিয়ে বসলাম। প্রবোধবাবু বললেন—কাগজপত্র সব তৈরী করে রাখবেন—ও কাল এসে সই করে দিয়ে যাবে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—কাল তোমাকে আবার নিয়ে আসব—গাড়ী থেকে তুলে—থেকো যেন বাড়ীতে। বুঝলে!

মাথা নেড়ে জানালাম—আচ্ছা।

বাড়ী এসে আগাগোড়া ব্যাপারটা সব তলিয়ে দেখতে লাগলাম। এ যে কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল, কে জানে। আমি গেলাম ম্যাডানে, টাকা আনতে, সেই সময় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মুখুজ্যের সঙ্গে প্রবোধবাবুর টেলিফোনে কি কথাবার্তা হলো—যার ফলে আমার জীবনে এত বড়ো একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। এত কাণ্ডের পরেও স্টার কর্তৃপক্ষ নিজে থেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন সসম্মানে, আমাকে কোনো-রকম কৈফিয়ৎ তলব বা কটূক্তি না করে—সেইটেই সবথেকে আশ্চর্য লাগল। বিধাতার কি অদ্ভুত বিধান! আবার স্টারেই আসতে হলো শেষপর্যন্ত—তবে সর্বোচ্চ ক্ষমতায়, এই যা সান্ত্বনা। কিন্তু প্রবোধবাবু ম্যাডানের অফিসে এসে যে আমাকে পাকড়াও করলেন—তিনি খবর পেলেন কি করে?

তারপর একটু ভাবতেই মনে হল—এ নিশ্চয়ই মুখুজ্যেমশায়ের কাণ্ড। তিনিই নিশ্চয় ফোন করে দিয়েছিলেন প্রবোধবাবুকে। আমি যখন প্রথমবার ঘনশ্যামের কাছে গেলাম টাকা টাকা নেবার জন্যে, সেই সময়ই তিনি থিয়েটারে ফোন করে শুধু

বলেছিলেন ঃ এসেছে। আর উনিও কাল-বিলম্ব না করে একবারে এখানে এসে হাজির।

যাই হোক, এ একরকম ভালাই হলো। তারপর দিন যথানির্দিষ্ট প্রবোধবাবু গাড়ী নিয়ে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন দত্ত-সেনের অফিসে। আমাকে সই করতে দিলেন এক লিখিত কন্ট্রাক্ট—একেবারে তিন বছরের কন্ট্রাক্ট। সই করে দিলাম।

প্রবোধবাবু বললেন—আগের থেকে তোমার মাইনে বাড়লো — এই নাও কন্ট্রাক্টের কপিটা রেখে দাও।

এরপর আবার একটা কাগজ সই করতে দিয়ে প্রবোধবাবু বললেন—তোমার নামে মামলা ঝুলছিল তো! কিন্তু ও-পার্টি তো অর্জা পেয়েছে। তোমার ওপর যে ইন-জাংকশনটা ছিল তাও মিটে গেল। এটা তারই ডকুমেন্ট। পড়ে দেখ।

পড়ে আর দেখিনি, সই করে দিয়ে-ছিলাম। কাউকে তখন অবিশ্বাস করিনি, সকলের ওপরই নির্ভর করেছি। এই যে তখন কাগজখানা পড়ে দেখিনি, তার জন্যে আমায় যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়েছিল তিন বছর পরে। সে-কথা যথাসময়ে বলব। পরে অবশ্য ঘা খেয়ে খেয়ে এসব বিষয়ে পোক্ত হয়ে উঠেছিলাম। না হয়ে উপায় নেই—নইলে হতে হবে "unfit for profes-sionalism"

আমার মনটা বেশ নরম হয়ে গিয়ে-ছিল। এঁরা তো আমার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করলেন না—এমনকি একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা কটু কথা পর্যন্ত বললেন না। প্রবোধবাবু নিজে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সেই ঠিক আগের মতই ব্যবহার। যাবার সময় প্রবোধবাবু বলে গেলেন—কাল 'মনমোহনে' এসো—কাল থেকেই কাজ শুরু হোক। তোমাকে সব বুঝে নিতে হবে তো!

—আচ্ছা। বলে বাড়ীর ভেতর চলে গেলাম।

বাবাকে গিয়ে সব ব্যাপারটা বললাম। তিনি শুনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—যাক বাবা, নিশ্চিন্দি হওয়া গেল। আমি খুশী মন নিয়ে উঠতে যাব এমন সময় দেখি দরজার পাশ থেকে একটা ছায়া-মূর্তি যেন চকিতে সরে গেল।

বুঝলাম, এ-ছায়ামূর্তি কার? তখনকার দিনে শ্বশুরের সামনে পুত্রবধূ স্বামীর সামনে এসে কথা বললে—এটা রক্ষণশীল পরিবারের পক্ষে একটা দারুণ অভাবনীয় ব্যাপার। এমনকি চাকর-বাকরের সামনে স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে—তাও অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে এবং আস্তে আস্তে যাতে দূরের লোক না শুনতে পায়। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর যা-কিছু বাক্যালাপ সব শয়নের পূর্বে দরজায় অর্গল বন্ধ করে।

আশ্চর্য মহিলা ছিলেন আমার স্ত্রী সুধীরা। কোনদিন তাঁকে মুখ ফুটে কিছু চাইতে দেখিনি আমাকে। আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, ভক্তি করতেন, আমি রাত্রে যতক্ষণ না বাড়ী ফিরতাম ততক্ষণ তিনি জেগে বসে থাকতেন। তার জন্যে একদিনের জন্যেও তিনি কোনো-রকম অনুযোগ বা অভিযোগ করেননি। আমাদের ভালোবাসার মধ্যে উত্তাপ ছিল কিন্তু উচ্ছ্বাস ছিল না।

তাঁর চরিত্রের আর একটা বড়ো দিক ছিল যে, শ্বশুরের সঙ্গে অর্থাৎ আমার বাবার সঙ্গে তাঁর একটা অপূর্ব স্নেহের সম্পর্ক। দুজনকে দেখলে মনে হোত, বাবা যেন নতুন করে তাঁর মাকে ফিরে পেয়েছেন, আর সুধীরাও যেন তার নিজের পিতারই সেবা করছে। বাবাও যেমন শেষজীবনে সম্পূর্ণভাবে পুত্রবধূর উপর নির্ভর করে-ছিলেন, তেমনি পুত্রবধূরও শ্বশুরমহাশয়ের যাতে কোনোরকম কষ্ট না হয় তার দিকে তীক্ষ্ম সজাগ দৃষ্টি ছিল।

রাত্রে শোবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে সুধীরা বললে ঃ যাক বাবা, এতদিনে নিশ্চিন্দি হওয়া গেল।

আমি প্রশ্ন করলাম—তুমি দরজার আড়ালে থেকে সব শুনলে বুঝি?

—হ্যাঁ। কাল বাবাকে বলব কালীঘাটে গিয়ে পুজো পাঠিয়ে দিতে। মা-কালী মুখ রেখেছেন।

এই রকম সরল ও ভগবৎবিশ্বাসী ছিল তার মন।

পরের দিন মনোমোহনে যেতেই দেখি প্রবোধবাবু গেটের কাছেই সহাস্যমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

মনোমোহনের বাইরেটাই এযাবৎ দেখে এসেছি—ভিতরটা তেমন জানা নেই। বহু-দিন আগে সেই যে বান্ধব-সমাজের হয়ে 'পার্থ প্রতিজ্ঞা' (অভিমন্যু-বধ) নাটক অভিনয় করেছিলাম স্টেজ ভাড়া নিয়ে। তখন স্টেজের ভিতরটা কিরকম যেন ঘুপসী মত মনে হয়েছিল।

মনোমোহনের সামনেটা ছিল একটু উঁচু, দুদিকে দুটো সিঁড়ি উঠে গেছে। আর তাদের মাঝখানে ছিল একটা ফোয়ারা। উপর থেকে ফোয়ারার জল উপচে পড়ছে, আর নীচে সান-বাঁধানো গোলাকার জলাধারে বড়ো বড়ো লাল মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। জলের ওপর শ্বেতপদ্মের পাতা ভাসছে। মাঝে মাঝে শ্যাওলা জমে আছে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে দিয়ে মাছেদের নিঃশব্দ যাতায়াত দেখতে আমার খুব ভাল লাগত। মাঝে মাঝে অবসর মুহূর্তে ময়দার টোপ ফেলে মাছগুলিকে খাওয়াতাম। মাছগুলো বড় ছিল বলেই ধরা সহজ ছিল না—আর বোধ হয় সেইজন্যেই চুরিও যেতো না। এতো বড়ো বড়ো লাল মাছ এক পরেশ-নাথের মন্দির ছাড়া আর কোথাও নজরে পড়েনি।

মনোমোহনের সেই স্টেজ আর অডি-টোরিয়াম কবে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে গেছে বিস্তৃত চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু, যেখান দিয়ে আজ ছুটে চলেছে সবরকম যানবাহন। এই থিয়েটারের সব স্মৃতিটুকুই মুছে গেছে, শুধু জেগে আছে মনোমোহনের শিবালয়টি। এই শিবা-লয়ের উত্তর গা দিয়ে তিন ধাপের সিঁড়ি পেরিয়ে পড়তে হতো চাতালে। তারপরই ছিল দানীবাবুর ড্রেসিংরুম। ঘরজোড়া এক-খানা নীচু তক্তপোষ পড়ে রয়েছে দেখলাম —তক্তপোষের ওপর সতরঞ্চি পাতা, তার ওপর চাদর আর তাকিয়া। টেবিলে আয়না-বসানো থাকতো, ড্রেসাররা সাজিয়ে দিতো। চোখ খারাপ ছিল বলে তিনি দেখতে পেতেন না ভালো। তামাক খেতেন, এক পাশে থাকতো তামাকের সব সরঞ্জাম। এখন অবশ্য সেসব আর কিছু নেই। এখানে এখন থেকে ডিরেক্টররা বসবেন বলে স্থির হয়েছে।

দোতলায় ছিল মনোমোহনবাবুর নিজস্ব বৈঠকখানা। সমস্ত থিয়েটার-বাড়ীটা ভাড়া দিলেও উক্ত বৈঠকখানাটি কিন্তু নিজের অধিকারেই রেখেছিলেন মনোমোহনবাবু। সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাশাখেলার আসর বসাতেন তিনি। আর মাঝে মাঝে খেলার উৎসাহে সব ভুলে কেউ কেউ চিৎকার করে উঠত—'কচ্চে বারো'। তখন যে মঞ্চে প্লে চলছে সে-হুঁশ তাঁদের থাকত না। মঞ্চ-কর্মীরা বা অভিনেত্রীরা মাঝে মাঝে অসুবিধা বোধ করতেন। সময়ে সময়ে দর্শকদের কানেও সে-চিৎকার গিয়ে পৌঁছুত। হয়ত মঞ্চে কোনো একটা দারুণ নাটকীয় মুহূর্তের সময় সোল্লাস চিৎকার ভেসে এল 'কচ্চে বারো'—অমনি সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ থেকে দর্শকরা চিৎকার করে উঠতো, 'আস্তে', 'চুপ করুন', 'সাইলেন্স' প্রভৃতি। মনোমোহনবাবু নিজেও যখন থিয়েটার চালাতেন, তখনও এ-ব্যাপার চলতো।

শিশির ভাদুড়ীমশাই যখন এখানে 'মনোমোহন নাট্যমন্দির' করেছিলেন তখনো চলতো। শিশিরবাবু এ নিয়ে বহুবার অভিযোগ করা সত্ত্বেও যখন মনোমোহনবাবুর পাশাখেলা বন্ধ হল না, তখন শিশিরবাবু ওখান থেকে উঠেই গেলেন। শিশিরবাবু চলে যাওয়ার পর আর কেউ চট করে এ-থিয়েটারে আসতে চাননি। মনোমোহনবাবু নিজেও আর চালাতে পারতেন না—অবশেষে স্টারের এ আগমন।

যাই হোক, স্টেজের ওপর রিহার্শালের ব্যবস্থা হয়েছে—প্রবোধবাবু আমাকে একে-বারে সেইখানেই নিয়ে গেলেন। দানীবাবুর ঘরের পাশ দিয়ে গেলাম, তারপর অভি-নেতাদের সাজবার ঘর। সেটা পেরিয়ে স্টেজে যাবার পথ, এই পথের পাশেই মেয়েদের সাজবার ঘর। এরপর রঙ্গ

চৌবাচ্চা, কল ইত্যাদি। এ-সবের পূর্বদিকে গোটাতিনেক ছোট ছোট দোতলা বাড়ী ছিল সারি সারি। যখন শিশিরবাবু মনোমোহনে অভিনয় করতেন, তখন এরই একখানি বাড়ী সম্পূর্ণ ভাড়া নিয়ে থাকতেন বলে শুনেছিলাম। এই বাড়ীর একখানা ঘর স্টার কর্তৃপক্ষ ভাড়া নিয়েছেন প্রবোধবাবুর জন্যে। ঘরখানায় খাট পাতা আছে, টেবিল-চেয়ারও আছে।

এ তো গেল পূর্বদিকের কথা। পশ্চিম-দিকে অর্থাৎ স্টেজের ডানদিকে প্রথমেই একখানা ঘর—সিঁড়ির নীচেটা যে-রকম থাকে, সেইরকম আর কী। পার্টিশন করা—খুবই ছোট্ট ঘর—সাজবার টেবিল ছাড়া এক-খানা ইজিচেয়ার মাত্র ধরে। মেক-আপ করার পর ভালভাবে দাঁড়িয়ে পোষাক পরা যায় না, বাইরে বেরিয়ে পরতে হয়। এই ঘরটা ছিল নির্মলেন্দু লাহিড়ীর। প্রবোধ-বাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই ঘরটাই তুমি নাও।

আমি বললাম—বড্ড ছোট ঘর—একেবারে হাত-পা মেলবার জায়গা নেই।

প্রবোধবাবু বললেন—আপাততঃ এই-খানেই সাজো—তারপর আমার ঘর তো রইলই।

আমি আর কিছু বললাম না। ঘরখানার পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে একেবারে বক্‌সে চলে গেছে। নীচে জাল দেওয়া আলমারী সব রয়েছে—আর তারপরেই স্টেজ-ম্যানেজার কালীবাবুর ঘর। কালীবাবুর পুরো নামটা

ছিল—আমার যতদূর মনে পড়ে—কালীচরণ দাস। পরে ইনি চলে যেতে অন্য অভিনেতারা এসে ঘরখানা দখল করেছিলেন। এর পরে ছিল স্টোররুম, সিন-ডক ইত্যাদি। সেখানে বড়ো বড়ো ইঁদুর এসে বাসা বেঁধেছে। ইঁদুরগুলো আকৃতিতে এমনই বিরাট যে তাদের মনে হতো বেড়ালের মতো। তাড়া দিলে আমাদেরই দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসত। তারপরে ছিল বিরাট চৌবাচ্চা, তারপরে পাঁচিল। তার পিছনে একটা বড় পুকুর—তার পাশে ঘন বস্তী।

এ গেল স্টেজের উত্তরদিকের কথা, যেখানে তখন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ। পশ্চিমদিকেও ছিল বিরাট এক বস্তী। সারি সারি চালাঘর আর ছোট ছোট গলি। সবটাই প্রায় বেশ্যাপল্লী। অনেক চাটের দোকান, মদও দুর্লভ ছিল না। আমাদের সময় এইসব বস্তী ভাঙতে আরম্ভ করেছে, তবু কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। চারিদিকে সব পরিষ্কার হচ্ছে, মাঝখানে শুধু মনোমোহনের থিয়েটার-বাড়ীটি দাঁড়িয়ে আছে। এটিও ভেঙে ফেলা হতো, কিন্তু খেসারৎ হিসেবে মালিক কি পাবেন সেটা নির্ধারিত হয়নি বলে যা দেরী।

যাই হোক আমাকে স্টেজের ওপর নিয়ে দলের স্টাফের অন্যান্য সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম—আমার ড্রেসার কে হবে? কুঞ্জ এবং কানা শুকুর (তার একটা চোখ কানা ছিল বলে সবাই তাকে কানা শুকুর বলে ডাকত—যদিও এটা খুব নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক, তবু মানুষ ঐভাবে ডাকে এবং যাকে ডাকে তারও ক্রমশ সয়ে যায়)—ওরা দুজন স্টারেই রয়ে গেছে। এখানে আমার ড্রেসার-মেক-আপ যে করবে, তার নাম হল মণি মিত্র। বয়স্ক লোক, অমর দত্তমশাইয়ের আমল থেকে সে এই কাজ করছে। স্টারে ছিল মেয়েদের জন্যে—এখন এখানে এসেছে। অমরবাবুর কাছে এসেছিল অভিনয় করার জন্য শিক্ষানবীশ হয়ে—শেষপর্যন্ত হয়ে গেল ড্রেসার।

ধীরে ধীরে স্টেজে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুরানো যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—এই যে, আসুন, আসুন।

সকলকে নমস্কার জানিয়ে বসলাম। প্রবোধবাবু একটু পরে উঠে গিয়ে একটি সুদর্শন ছেলেকে ডেকে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে দেখিয়ে আমাকে বললেন—এর নাম জয়নারায়ণ মুখুজ্যে—আজ থেকে তোমার অনেক কাজ করে দিতে পারবে। এর আগে নাট্যমন্দিরে ছিল। ফাঁকিবাজ নয়—বেশ খাটিয়ে ছেলে।

ছেলেটিকে আমার ভালই লাগল। চেহারাটি সুন্দর, স্বভাবটিও নম্র।

এর কিছুক্ষণ পরেই এলেন অপরেশবাবু। 'শ্রীরামচন্দ্র' নাটক যতদূর লেখা হয়েছিল, ততদূর পড়ে শোনালেন। সকলকে পার্ট বন্টন করা হয়ে গেল। কালীবাবু ছিলেন গিরিশবাবুর আমল থেকে স্টেজ-ম্যানেজার—খুব বিচক্ষণ, ভদ্র এবং কাজের লোক। আমি যে ওখানে কি পাকশনে গেছি, তা উনি প্রথম আলাপেই বুঝে নিয়েছিলেন। আমাকে নিয়ে গিয়ে সব দেখাতে লাগলেন কি stage, illusion উনি করছেন বা করবার ইচ্ছা করেছেন। যেসব 'সিন' এঁকেছেন তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাতে লাগলেন। প্রবোধবাবু আবার বলে দিলেন—সিন-টিন যা করবেন সব অহীনকে দেখিয়ে নেবেন, এসব বিষয়ে ওর ভাল জ্ঞান আছে।

তারপর আবার স্টেজে ফিরে আসতেই অপরেশবাবু আমাকে ডেকে বললেন—বই রইলো। রিহার্সাল আপনি শুরু করে দিন। তারপর বাকীটা শেষ করে আমি এসে বসবো'খন।

তাই হলো। প্রচুর উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে কাজে লেগে পড়লুম। স্টার থেকে এলো দুর্গাদাস আর ইন্দু। ওরা আমাকে কাছে পেয়ে খুব খুশী। ইন্দু বললে—শুনলাম তুমি বাড়ী ফিরেছ, কিন্তু নানান ঝামেলায় আর দেখা করতে পারিনি।

দুর্গা বললে—আর কি, এবার পুরোদমে লেগে পড়ো।

স্টার থেকে আরও এলেন দুর্গাপ্রসন্ন বসু, নরেশ ঘোষ (গৌর), সুশীলাসুন্দরী (ছোট), আশ্চর্যময়ী, রাণীসুন্দরী প্রভৃতি।

পরদিন থেকে মহলা শুরু করে দিলাম। প্রথম প্রথম সকলেরই উৎসাহ খুব বেশী। ডিরেক্টররা সকলেই ও-থিয়েটার থেকে এখানে আসেন রিহার্সাল দেখতে। দিনের বেলা দানীবাবুর ঘরে বিশ্রাম করি, রাত্রে মহলা।

কিছুদিন পর অপরেশবাবুর বই লেখা শেষ হলো। কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধগায়ক) তখন নাট্যমন্দির ছেড়ে দিয়েছেন—তিনি এখানে চলে এলেন। তারপর ছিলেন আশ্চর্যময়ী। দুজনেই কৃতী গায়ক-গায়িকা। এই সময় এক তরুণ গায়ক এসে যোগদান করলেন। গলায় যেমন দরদ, তেমনি মিষ্টত্ব। ছেলেটির নাম হলো মৃণালকান্তি ঘোষ। এক-একদিন সে এমন দরদ দিয়ে গাইত যে অভিনয় শেষ হবার পরই সে 'ফিট' হয়ে পড়তো। সুতরাং গানের দিক থেকে আমাদের দল রীতিমত শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ালো।

আমি আগে স্টারে যেমন সমস্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতাম, এখানেও তাই করতে লাগলাম। এখানকার অডিটোরিয়ামটি একটু নীচু, স্টারের মত নয়। তবে এখানে একটা জিনিস ছিল, যেটা স্টারে ছিল না। সেটা হল বিখ্যাত নট-নটীদের বড়ো বড়ো অয়েলপেন্টিং-করা ছবি দেয়ালে সারি সারি সাজানো ছিল—সেগুলি সব কালীবাবুর হাতে আঁকা। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্র বসু প্রভৃতি। কর্পোরেশন যখন বাড়ী ভেঙে ফেলে, তখন মনোমোহনবাবু ছবিগুলি সব নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে রাখেন। ১৯২৫ সালে যখন নতুন মিনার্ভা হলো, তখন সেখানেও ছিল কুঞ্জবাবু, হাঁদুবাবু, কার্তিকবাবুর ছবি। সেগুলি পরেশবাবুর (পটল) আঁকা। এসব আজ কোথায় আছে জানি না, থাকলে তো ন্যাশনাল গ্যালারী হয়ে যায়। স্টার এত বড়ো থিয়েটার, দশ বছর চালালো, কিন্তু একটিও অয়েলপেন্টিং করায়নি। এর কারণ আর কিছু নয়, হয়তো কোনো উৎসাহী স্টেজ-ম্যানেজার ছিলেন না বলে কিংবা কর্তৃপক্ষ এদিকে মোটেই সচেতন ছিলেন না।

তখন থিয়েটার একটা প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউশন বলে মনে করা হতো—এখন আর ঠিক সে-জিনিসটি নেই। অমর দত্ত-মশাই প্রথম 'বেনিফিট নাইট' বা 'শিল্পীর সম্মান রজনী'র প্রবর্তন করেন, এখন আর তা নেই। সেই রজনীর সমুদয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ (খরচ না কেটে) সেই উদ্দিষ্ট শিল্পীকে দিয়ে দেওয়া হতো। তখন শিল্পীরা অবসর সময়ে বা যেদিন প্লে থাকতো না, সেদিন গোল হয়ে তামাক খেতে খেতে গল্পগুজব করতেন—তাঁদের বিপদে-আপদে মালিকরা এসে এঁদের পাশে দাঁড়াতেন। মনোমোহন পাঁড়েমশাই যে কতো অভিনেতাদের ধরে ধরে বিয়ে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তারা কেউ গাঁইগুঁই করলে ধমক দিয়ে বলতেন—বয়ে যাবি যে রে! কে আর আছে তোর দেখবার-শোনবার?

পুরনো স্টারের কথাই বলি—এর মালিক তখন চারজন। যে-কোনো একজনের কাছে গিয়ে কোনো শিল্পী বা মঞ্চকর্মী মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়ালেন, হাত কচলে বললেন—অমুক দিন স্যর আমার মেয়ের বিয়ে। আপনি স্যর একটু সাহায্য না করলে তো কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না।

প্রথমটা হয়ত খুব রূঢ়ভাবে তাকে হাঁকিয়ে দিলেন, কিন্তু বিবাহের আগের দিন কিংবা বিবাহের দিন প্রয়োজনীয় যাবতীয় সামগ্রী বাজার করে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন স্বয়ং হরিবাবু, অন্যতম মালিক। অনেক মালিক কন্যাকে গহনাপত্রও যৌতুক দিতেন।

একজন সামান্য কর্মচারীর পক্ষে এ কি কম ভরসার কথা! মালিক আর কর্মীর মধ্যে এই যে হৃদয়ের যোগাযোগ—একের বিপদে অন্যের এসে দাঁড়ানো—এ কি কম কথা! এইরকম হৃদয়ানুভূতির মধ্যে দিয়েই তখন গড়ে উঠেছিল তদানীন্তন নাট্য-সমাজ। আজ কোথায় সেই সম্প্রীতিবোধ, আর কোথায় সেই কর্মীর জন্য মালিকের মমত্ববোধ!

(ক্রমশঃ)

একদা এক বাঘের সহিত একটি ছাগলের দোস্তী হইয়াছিল।

দুইজনে একসঙ্গে থাকিত, খেলা-ধুলা করিত। উভয়ের দিন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দেই কাটিতেছিল।

হঠাৎ একদিন বাঘের মনে প্রচণ্ড একটা লোভ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে ভাবিল, আহা, কী নধর আর কচি ছাগলটি! ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গেই চাপা একটা হুংকার ছাড়িয়া সে ছাগলটির উপর লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু স্নায়ুর দুর্বলতা বা অন্য যে কোন কারণবশত হউক না কেন, [illegible] হইল। আছড়াইয়া তাহার ভারী শরীরটা মাটিতে পড়িয়া গেল। বুকে চোট লাগিল, যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে দুই থাবার আড়ালে সে মুখ লুকাইল। তাহার দুর্দশা দেখিয়া ছাগলটির বড় দুঃখ হইল। কাছে আসিয়া চাটিয়া-পুটিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। এমন সময় কিছুটা দূরে একটি

তোমরা খাসীর উদয় হইল। সে মুখ দিয়া একপ্রকার শব্দ নির্গত করিল। ছাগলিনী চকিতে তাহার দিকে তাকাইল। তারপর ছোট পুচ্ছটি নাড়াইতে নাড়াইতে সেই খাসীর সঙ্গে মিলিত হইল। তারপরে দুই-জনে কোথায় চলিয়া গেল।

এরকম একটা ছবি যদি কল্পনা করে নেওয়া যেতে পারে, সেটা হবে গল্পের শেষ। শুরুতে অন্যরকম ছিল। বাঘটি ছিল নির্লোভী, শান্ত, আর আপাতদৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক বিষয়ে কিছুটা বা উদাসীন। তাহার হৃদয়ে কোন যন্ত্রণা ছিল না।

ছাপকা-ছাপকা শাড়িতে ওকে বেশ দেখাচ্ছিল। পিছন দিকে টেনে বাঁধা চুল। সুপুষ্ট শরীর। চোখের কোণায় ওর হাসি লুকোনো ছিল আর তাই মাঝে-মধ্যে চলকে চলকে পড়ছিল। শাড়িটা পায়ের গোড়ালি থেকে কিয়ৎ পরিমাণ উঠে এসেছে। ঘোড়ের মত মরম, আর তেল-চিকচিকে দেখাচ্ছিল ওর পা। শাড়ির আঁচল কাঁধের ওপর উঠতে পারে নি, কোমর পেঁচিয়ে পড়ে ছিল। ওর নগ্ন বাহু দুটির ওপর দিয়ে রোদ পিছলে পড়ছিল। কাপড়ের ওপর দিয়েও বোঝা যাচ্ছিল, ওর বক্ষ উন্নত, ঋজু আর সুঠাম। ক্ষীণ কটিদেশের নিম্নে বিস্তৃত নিতম্বের অবস্থিতি।

গাছের ডালে বসে ও পেয়ারা খাচ্ছিল। ছিবড়া চারদিকে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে দিচ্ছিল। পা দোলাচ্ছিল। আর খুশীর একটা আলো ওর চোখ উপছে ঝরে-ঝরে পড়ছিল।

গাছের নীচ দিয়ে যাচ্ছিল বসন্ত। বসন্ত মৌলিক। বি-এ পরীক্ষা দিয়ে হালে গ্রামে এসেছে। কাকার কাছে। আপন কাকা নয়, সম্পর্কের। তবু সম্পর্কটা মধুর, নিবিড়। উদ্দেশ্য ছুটিটা ছবি এঁকে আর বই পড়ে কাটাবে। যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য এটাই। গৌণ-উদ্দেশ্য একটা ছিল। গ্রাম দেখা।

মাথায় কী একটা এসে পড়তেই বসন্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপর দিকে তাকাল। পাতার আড়ালে শরীর ঢাকা পড়ে গেছে। শুধু পায়ের পাতা দুটো নজরে আসছে। ইঁটের গোটা-কয়েক টুকরো নীচে পড়ে ছিল। তাই কুড়িয়ে নিয়ে তাক করে মারল। ছোট একটা শব্দ উঠল, উঃ। তারপর গাছের পাতা আর ডাল কাঁপিয়ে ঝুপ করে নীচে লাফিয়ে পড়ল সে। বসন্ত এই প্রথম ওকে দেখল। ওর নাম যমুনা।

যমুনার বুক ফুলে ফুলে উঠছিল। নাকের পাটা দুটো মাছের পাখনার মত ঈষৎ কম্পমান। বলল, 'অসভ্য!'

বসন্ত কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত। কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ কিছুটা বা প্রফুল্ল।

'কি হল?' বসন্তর মুখে মেকী বিস্ময়ের প্রলেপ মাখানো।

'কি হল! পায়ে লাগল যে!' যমুনা মুখ বিকৃত করল।

'মাথায় কী সব পড়ল, তাই।' বসন্ত পিট-পিট করে হাসছিল।

'তা বলে ইঁট মারবে?'

'এত বড় মেয়ে গাছে চড়ে?'

'চড়ে।'

'পেয়ারা খায় অলে বসে?'

'খায়।'

'ছিবড়া নীচে ছুঁড়ে মারে?'

'মারে।'

'মানুষের মাথায়?'

'মানুষ বোঝা যায় নি। অন্যরকম দেখাচ্ছিল।'

'অন্য কি?'

'গরু।' সঙ্গে সঙ্গে একটা পেয়ারা এসে মাথায় লাগল। যন্ত্রণায় শব্দ করে উঠল বসন্ত, উঃ। মাথা টিপে বসে পড়ল।

একটা হাসি পর্দায়-পর্দায় উঁচুতে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে লাগল। দূর থেকে দূরে। এক সময় মিলিয়ে গেল। বসন্ত উঠে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। যমুনা নেই। চলে গেছে। পায়ের কাছে একটা পেয়ারা পড়ে আছে। বেশ ডাঁসা-ডাঁসা মতন। ওর চিক্কণ গায়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে। চিক-চিক করছে। ও যেন হাসছে।

কাকা বলছিলেন, 'যা সোনাদীঘিটা দেখে আয়। দেশে তো আসবি না কেউ। সতুদা বেঁচে থাকতে তবু মাঝে-মাঝে আসতেন। কত সব্জীর বাগান করেছি। জলে কত মাছ। খাবার লোক নেই। সব্জী বিক্রী হয় মাঝে-মাঝে। মাছের গায়ে শ্যাওলা জমে।'

'ধর না কেন?' বসন্ত বলল।

'কে ধরবে?'

'লোক দিয়ে।'

'ধরাই মাঝে-মাঝে। উৎসবে, পার্বণে।'

'কলকাতায় চালান দিলেই হয়। আমরা মাছ-মাছ করে মরি।'

'কে এত সব করে?'

'কেন দেবুদা।'

কাকা ঠোঁট উল্টোলেন। বললেন। 'যাত্রা করবে কে তাহলে।'

'দেবুদা যাত্রা করে?'

কাকা উত্তর দিলেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। দেবুদা ওরফে দেবব্রত, কাকার একমাত্র সন্তান। কাকীমা মারা গেছেন হালে। এজমালী সম্পত্তি। কাকা আগে-আগে বিষয়-সম্পত্তি দেখতেন। ইদানীং কিছুটা উদাসীন। শোকে, শারীরিক অসুস্থতায়, মানসিক বার্ধক্যে।

দেবুদার দেখা মিলল দুপুরের দিকে। খেতে এসেছিল। বসন্তকে দেখে খুশী হল। 'ভালই হয়েছে তুই এসেছিস। একটা লোক সর্ট ছিল। কোন পার্ট-কার্ট নেই। শুধু সেজে-গুজে দাঁড়িয়ে থাকা। পারবি না?'

এমন করে বলল যে না বলা গেল না। বসন্ত রাজী হল।

'চলো দেবুদা, দীঘিটা দেখে আসি। কাকা বলছিলেন, খুব সব্জী আর মাছ।'

দূর!'

'দূর কেন?'

'শুধু খাই-খাই করেই মরল বাবা। খাওয়া-দাওয়ার পর বরং নিয়ে যাব।'

খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে দীঘি দেখতে গেল। বিশাল দীঘি। চারপাশে ঘন সবুজের বাগান। সবে শীত পড়তে শুরু করেছে। কার্তিকের শেষাশেষি। বসন্ত ঘুরে ঘুরে কপির কচি পাতা দেখছিল আর মনে-মনে ভাবছিল কচি পাতা চিবিয়ে খেলে একটুও ছিবড়া হয় না। সবটাই পেটে চলে যায়। একটা লোক ওদিকে কী করছিল। দেবুদা হাঁক ছাড়ল, 'কে রে ওখানে, উঠে আয়।'

লোকটা উঠে এল। ঠিক লোক বলা চলে না ওকে। একটা ছেলে। রোগা রোগা মতন দেখতে। মাথায় ঝাপড়া ঝাপড়া চুল। সমস্ত গা দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

দেবুদা ধমকে উঠল, 'কি করছিলি?'

'শাপলা তুলছিলাম।'

'ফের মিথ্যে কথা!'

'সত্যি বলছি।'

'মাছ ধরছিলি তুই।'

'খালি হাতে মাছ ধরা যায়?'

'তোরা সব পারিস। সত্যি করে বল।' দেবুদা ওর একটা হাত চেপে ধরল। কাছেই আশস্যাওড়ার ঝোপ ছিল। নড়ে উঠল। বেরিয়ে এল সেই মেয়েটা যে কিনা সকালে ছিবড়া ছুঁড়ে মেরেছিল। বেরিয়ে এসেই কোমরে দু হাত তুলে দাঁড়াল। ওর চোখ দিয়ে আগুন ছুটছিল। দেবুদার দিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় ধমকে উঠল, 'সামুকে মারছ কেন?' দেবুদার রাগ পালাবার পথ খুঁজছে। একটা চোরা হাসি ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। ঢোক গিলে বলল, 'মারলুম কোথায়। কেনই বা মারব। দুটো মাছ *বইতো নয়। ধরছে ধরুক।'*

মেয়েটা দেবুদাকে দেখছিল। আড়-চোখে বসন্তর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'এটি কে?'

'আমার ভাই, বসন্ত।'

'ভীষণ বোকা', বলেই খিল-খিল করে হেসে উঠল। তারপর ছেলেটার হাত ধরে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

বসন্ত জিজ্ঞেস করল, 'কে দেবুদা?'

দেবুদা অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। চমক ভাঙতে বলল, 'যমুনা, বাগদিদের মেয়ে।'

'ভীষণ দুষ্টু।' বলল বসন্ত।

'তুই চিনলি কি করে?'

'সকালে আমার মাথায় পেয়ারা ছুঁড়ে মেরেছিল।' ইচ্ছে করেই ছিবড়ার কথা চেপে গেল।

'ও এরকমই। ভীষণ দুরন্ত। অথচ সাংঘাতিক ভাল।' দেবুদার মুখে একটা মিষ্টি হাসি শর-শর করে বয়ে গেল। যমুনা যে দিক দিয়ে গিয়েছিল, সেই দিকে তাকিয়ে রইল দেবুদা।

এটা গল্পের শুরু নয়। ভূমিকা। গল্প শুরু হয়েছিল আরও অনেক পরে।

মাস-খানেক দেশে থাকার পর কলকাতায় ফিরে এল বসন্ত। বি-এ পাশ করল। চাকরি পেল। নতুন চাকরি নিয়ে মেতে উঠল। ভিন্ন বাসা নিল। সংসার ছোট।

বলতে গেলে সংসারই নয় একেবারে। এক-জনের সংসার, বাবা-মা আগেই মারা গেছেন। মামাবাড়িতেই থাকত এতদিন। জায়গার অসুবিধা। তাছাড়া বসন্ত একটা স্বপ্ন দেখেছিল। মিষ্টি স্বপ্ন। ছোট সংসার। শুধু সে আর একজন। একজন বলতে ছোটখাট মানুষটি। কাজল কালো চোখ। ছোট্ট সিঁদুরের টিপ কপালে। মাথায় আধখানা ঘোমটা। লঘু পায়ে এঘর-ওঘর ছুটোছুটি করছে। মুখে ভেজা হাসি। যা কিনা মনকে প্রলুব্ধ করে, কাছে টানে। সেই স্বপ্নের টানেই ভিন্ন বাসার ব্যবস্থা। মামা-মামী আটকাতে চেয়েছিলেন। পারেন নি।

ছোট্ট ছিমছাম বাড়ি। ঠিক কলকাতার ওপরে নয়। শহরতলীতে। দমদমে। চার দিকে উঁচু পাঁচিল। সামনে পিছনে উঠোন। পাশাপাশি দুখানা ঘর। পিছনের দিকে ছোট্ট আর একটা ঘরও রয়েছে। তার পাশে রান্নাঘর। পিছনের উঠোন পেরিয়ে বাথরুম আর পায়খানা। মাঝখানে একটা টিউব-ওয়েল। গোটা কয়েক পেঁপে গাছ। আর দেওয়ালের গা ঘেঁসে একটা পেয়ারা গাছ। মনে মনে হাসল বসন্ত। একটা দিনের কথা মনে পড়ল। ছাপকা-ছাপকা একটা শাড়ি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

একটি চাকর নিয়ে সংসার পাতল বসন্ত।

মাস কয়েকের মধ্যেই আবার দেশে যেতে হয়েছিল তাকে। কাকা লিখেছেন, তাঁর খুব অসুখ। একা-একা পড়ে আছেন। সে যেন দেখে যায় একবার। বসন্ত গিয়ে-ছিল। দেখেছিল, কাকা একা একা শুয়ে কোঁকাচ্ছেন। বসন্তকে দেখেই কেঁদে ফেললেন। বসন্ত দেবুদার কথা জানতে চাইল। বলতে বলতে কাকার শরীর ঘন-ঘন কাঁপছিল, মুখ বিকৃত হচ্ছিল। রাগে, দুঃখে, হতাশায়। বসন্তরও শুনে নিজে চমকাবার অবস্থা। কয়েক দিন হল দেবুদা বাড়ি ছাড়া। কোথায় গেছে জানিয়ে যায় নি। কেন গেছে তাও বলে নি। কিন্তু কাকা আন্দাজ করেছেন। যে দিন থেকে দেবুদা চলে গেছে, সে দিন থেকে যমুনাকেও আর পাওয়া যাচ্ছে না। বসন্তর চোখের সামনে সেই ছাপকা-ছাপকা শাড়িটা ভেসে উঠল। একটা মেয়ে কোমরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোচ্ছে, আর সেই আগুনে দেবুদার শরীরটা কুঁকড়ে পোড়া বেগুনের মত হয়ে উঠছে। সব কিছুই এক নিমেষে দেখতে পেল সে।

বসন্ত দিন কয়েক দেশে ছিল। শহর থেকে ডাক্তার আনিয়ে কাকার চিকিৎসা করাল। কাকা একটু সুস্থ হতেই জ্ঞাতি এক বুড়ির হাতে কাকাকে রেখে কলকাতায় ফিরে এল।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল। দরজার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখবার আশা বা আকাঙ্ক্ষা কোনটাই ছিল না তার। দেবুদা-ই প্রথমে কথা বলল, 'কি রে ভূত দেখলি নাকি?'

বসন্ত মনে মনে বলল 'তার চেয়েও সাংঘাতিক।' মুখে বলল, 'কখন এলে?

দেবুদা খুব শব্দ করে হাসতে লাগল। 'কখন কিরে? বল কবে! আজ প্রায় দশ দিন হয়ে গেল। যে দিন তুই দেশে গিয়ে-ছিলি—'

'জানলে কি করে আমি কোথায় গেছলাম?'

দেবুদা উত্তর দিল না। মিটি মিটি হাসতে লাগল। বসন্তর বদরু (চাকর) কথা মনে পড়ল। ও নিশ্চয় সব খবর দিয়েছে। বসন্ত বলল, 'ভালই করেছ এসেছো। কিন্তু কাকার যে খুব অসুখ করেছিল।'

'জানি।' দেবুদা নির্বিকার মুখে বলল।

'অথচ চলে এলে?'

'না এসে উপায় কি। ওকে যে একটা বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল।'

দেবুদা আঙুল তুলে সামনের দিকে দেখাল। বসন্ত দেখল বারান্দায় মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যমুনা। যদিও ওর মুখ সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছিল না, বসন্ত বুঝতে পারছিল সে মুখে হাসি মাখানো নেই। বরং একটু যেন বিরক্ত মনে হচ্ছিল যমুনাকে।

এখানেই গল্পের শুরু।

চার দিনের মাথায় দেবুদা বলল, 'কাজ যোগাড় হয়ে গেল। আর ভাবনা নেই।'

বসন্ত জিজ্ঞেস করল, 'কি কাজ?'

দেবুদা হাসতে হাসতে বলল, 'যাত্রা পার্টিতে জুটে গেলুম আর কি। আমার পার্ট শুনে অধিকারীর তো চক্ষুস্থির! এক কথাতেই একশ' টাকা মাইনে ঠিক করে ফেলল। পুজোর মরশুম। খুব বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। কাল যাচ্ছি শিলিগুড়ির ওদিকে। তারপর জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার হয়ে ফিরতে প্রায় মাস দেড়েক।'

বসন্ত চোখে সর্ষেফুল দেখল। আরও দেখল যমুনা ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর চলে গেল। বসন্ত নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ওকে নিয়ে যাচ্ছ তো!'

'পাগল! ওকে নিয়ে যাব কোথায়। ও তোর এখানে থাকবে। কেন, রাখতে পারবি না একটা মানুষকে?'

'না না তা নয়। তবে কিনা—' ওকে বিয়ে করেছ তুমি?' বসন্ত মরিয়া হয়ে বলে বসল।

'দূর!' দেবুদা আর কথা বাড়াল না। বাড়ির মধ্যে ঢুকতে-ঢুকতে আবার বলল, 'তুই ছাড়া আর কে-ই বা আছে আমার। আর যেখানে-সেখানে তো ওকে রেখে যাওয়া যায় না। কাকেই বা বিশ্বাস করা যায়, নেহাৎ আপনজন ছাড়া বল!'

'ওরা যদি থানা-পুলিশ করে?'

'তুইও যেমন! গলগ্রহ ছিল, কাঁটা নেমে গেল। তা ছাড়া ও থাকবে বাড়ির ভেতরে, খোঁজ পাবেই বা কি করে। আর এমন নয় যে আজীবনের মত তোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি। টাকা-পয়সার একটা ব্যবস্থা করে আমি-ই নিয়ে যাব।' তারপর বসন্তর একটা হাত ধরে কাঁদকাঁদ হয়ে দেবুদা বলল, 'না করিস নি লক্ষ্মী ভাইটি আমার। বাবা নির্ঘাৎ ত্যাজ্যপুত্তুর করবে। তুইও যদি ঠেলে ফেলে দিস দুটো প্রাণী কোথায় গিয়ে দাঁড়াই বল তো!'

যমুনা বসন্তর সংসারে রয়ে গেল। দেবুদা থাকতে থাকতেই চাকরটিকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। এ বিষয়ে দেবুদা আর যমুনা দুজনেই তৎপরতা দেখাল। আজ-কালকার বাজারে খাওয়া-পরা মাইনে দিয়ে একটা লোক পোষা শুধু যে অর্থহীন তাই নয়, ভয়ানক নিবুদ্ধিতা। এটুকু কাজ যমুনা খুব করে দিতে পারবে। যমুনা ঘাড় দুলিয়ে-দুলিয়ে সম্মতি জানাচ্ছিল। যাবার আগে দেবুদা বলে গেল, 'তোকে একটু কষ্ট দিলুম বসন্ত। কিন্তু কোন উপায় ছিল না, বিশ্বাস কর।' তারপর যমুনার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তোমার কোন ভয় নেই। নিজের মনে করে সংসার চালাও। আমি এলুম বলে।'

আট দিনের দিন দেবুদার চিঠি এল। লিখেছে, শিলিগুড়িতে আরও ক'টা দিন থাকতে হবে। আসর খুব জমে উঠেছে। এবার মাইনে বাড়াবার জন্যে মোচড় দেবে। তারপর দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। শেষের দিকে লিখেছে, ভুল-ত্রুটি যদি কিছু করে ফেলে যমুনা নিজ-গুণে যেন ক্ষমা করে নেয় বসন্ত। রান্না-বান্নায় হয়ত প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে, কিন্তু যমুনা সব দিক সামলে নিতে পারবে। এক জায়গায় লিখেছে, যমুনা খুব দুঃখী, আর অসম্ভব ভাল।

যমুনা যে কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে বসন্ত জানতে পারে নি। হঠাৎ ওর কথায় চমকে উঠল, 'কি লিখেছে?' এই ক' দিনের মধ্যে যমুনা একবারও সামনা-সামনি কথা বলে নি। আড়ালে-আড়ালেই কাজ করে গেছে। বসন্ত চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। যমুনা হাসতে-হাসতে বলল, 'পুরুষমানুষের এত লজ্জা কেন!'

বসন্ত চিঠিটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'পড়ে দেখ।'

'আমি তো পড়তে জানি না।'

বসন্ত চিঠি পড়ে যমুনাকে শোনাল।

পনেরো দিন হয়ে গেল দেবুদার আর চিঠি এল না। গায়ে তেল মাখতে-মাখতে যখন বসন্ত ঘন-ঘন সামনের দরজার দিকে তাকাচ্ছিল, যমুনা বলে উঠল, 'চিঠির জন্যে হা-পিত্যেস করলেই আর চিঠি আসে না।'

বসন্ত অপ্রস্তুত হল। বলল, 'কে বললে আমি চিঠির আশায় তাকিয়ে থাকি।'

'আমি সব বুঝতে পারি।'

'কি বুঝতে পার।'

'আপনি খুব ভীতু মানুষ একজন। আর—'

'আর?'

'আর আপনার খুব বিয়ের সখ।'

'যাঃ! বসন্তর মুখ লাল হয়ে উঠছিল ক্রমশ।

'নতুন রেডিও কিনেছেন।'

'রেডিও! কিনলেই বুঝি বিয়ের সখ হয়?'

'কী সুন্দর ফুল-তোলা ঢাকনা দেওয়া।'

'বাঃ, ঢাকনা না দিলে ওর গায়ে ধুলো পড়বে না!'

'বাড়ি-ঘর কত সুন্দর করে গোছানো।'

'আমি ছিমছাম থাকতে ভালবাসি।'

'এরকম লোকেদেরই বিয়ের খুব সখ থাকে।'

'সব কিছু জেনে বসে আছ তুমি।' তেল মাখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বসন্ত গামছা কাঁধে নিয়ে স্নান করতে চলে গেল। যমুনা খিল-খিল করে হেসে উঠল।

এক মাস কেটে গেল তবু দেবুদার চিঠি এল না। বসন্ত আজকাল যখন সামনের বারান্দায় বসে তেল মাখে তখন আর ঘন-ঘন দরজার দিকে তাকায় না। তাকালেও চিঠির কথা ভাবে না। যদি-বা ভাবে উদ্বিগ্ন হয় না। সেদিন যমুনা বলছিল, 'কী রকম লোক দেখেছেন। এত-দিন হয়ে গেল একটা খবর নেই।'

বসন্ত বলল, 'ঠিকানা জানা থাকলে ওদের আপিসে গিয়ে খবর নেওয়া যেত।'

যমুনা বলল, 'দরকার নেই। ইচ্ছে করে খবর না দিলে কী আর করা যাবে।'

বসন্ত রসিকতা করল, 'মুখের কথা না মনের।'

'কি মনে হয়?'

'মুখের। মনের কথা অন্যরকম।'

'কি রকম।' যমুনা ভ্রু কোঁচকাল।

'পুড়ি-পুড়ি, মরি-মরি।'

'সে আবার কী!'

'আর যে সহিতে পারি না, এ বিরহেরই যন্ত্রণা!' বলেই বসন্ত হেসে উঠল।

চোখ পাকিয়ে যমুনা বলল, 'মরণ!'

সত্যি মরণ। বসে সুখ নেই, খেয়ে সুখ নেই, ঘুমিয়ে সুখ নেই। বসন্তর যেন মরণযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। অথচ হদিস করতে পারে না, কেন। দেবুদা আসছে না, না যমুনাকে নিয়ে এই একা-একা থাকা, না নিজের কাছেই নিজেকে নিয়ে ভয়—বুঝতে পারে না। অযথা যন্ত্রণা ভোগ করে। মামাবাড়ি যায় মাঝে মাঝে' গল্প-সল্প করে। মামাত ভাই-বোনদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টার চেষ্টা চলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বড় মামাত বোনটা খুব চালু। ও বলেই বসল, 'দাদার মন উড়ু-উড়ু।'

বসন্ত ভীষণভাবে চমকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'বারে, আমি কি করে জানব তোমার মনের খবর।'

'তবে বললি কেন?'

'মনে হল তাই বললুম।'

'আমি তোমার গুরুজন।' বসন্ত ভয়ানক গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

'গুরুজনদের বুঝি মন উড়ু-উড়ু হতে নেই।' বলেই মামাত বোন ছুটে পালাল।

শনিবার দিন তাড়াতাড়ি আপিস ছুটি হয়ে গেল। তবু বাড়ি ফেরার তাড়া নেই বসন্তর। আগে হলে ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি চলে আসত। একটু শুয়ে-টুয়ে মামা বাড়ি যেত বা কোন সিনেমায়। আজকাল অকারণে-এদিক-ওদিক ঘোরে। রাস্তা দেখে, মানুষ দেখে।

যমুনা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। দরজা খুলে দিয়ে পাশে সরে দাঁড়াল। বসন্ত বুঝল যমুনা তার মুখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। বসন্ত চোখ ঘুরিয়ে নিতে যাচ্ছিল। কিন্তু অবাধ্য চোখ দুটো হঠাৎ গিয়ে যমুনার মুখের ওপর আটকে গেল। যমুনার কপালে খয়েরের টিপ। পরিপাটি করে চুল বাঁধা। একটা ডুরে-কাটা শাড়ি পরণে। সব-চেয়ে বেশী করে অবাক হল বসন্ত—যমুনা পান খেয়েছে। পানের ঠোঁটে টুস-টুস করছে যমুনার ঠোঁট। মুখে ভেজা-ভেজা হাসি।

বসন্ত চোখ সরিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

হাত-মুখ ধুয়ে চা-জলখাবার খেলে বসন্ত। জামা-কাপড় পরে বের হওয়ার তোড়জোড় করছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল। একটা ছায়া পড়ল। খুব কাছে সরে এসেছে যমুনা। একেবারে পিঠ ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে। ওর গা থেকে কী রকম একটা বুনো ফুলের গন্ধ বেরোয়, সে রকম গন্ধ পাচ্ছিল বসন্ত।

যমুনা বলল, 'কোথায় বেরনো হচ্ছে?'

'এই একটু—'

'আমিও যাব।'

বসন্ত ফিরে দাঁড়াল। যমুনা স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যমুনার চোখ কি একটু ছলছল করে উঠল, আর ঠোঁট দুটো অযথা নড়তে লাগল! কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল বসন্ত। 'কোথায় যাবে?'

'জানি না। আমি কি চিনি কিছু। এক মাসের ওপর হয়ে গেল বাড়ির বাইরে পা দিই নি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।' যমুনার কথা ভারী-ভারী শোনাচ্ছিল।

'বেশ তো চলো না। তৈরী হয়ে নাও।' বসন্ত বলল।

'আমি তৈরী।' যমুনার চোখে আলো ফুটে উঠল। ঠোঁট কাঁপা বন্ধ হল। বসন্তর নতুন করে মনে হল, যমুনার চোখে অনেক ভাষা লুকনো রয়েছে। আর ঠোঁট দুটো, কী বলবে, এরকম করে ভাবা উচিত নয় যেহেতু দেবুদা গুরুজন-স্থানীয়, আর বলতে গেলে যমুনা ওর বউয়ের মতই, তবু কিনা বসন্তর মনে হয়ে গেল, যমুনার ঠোঁটের ভেজা হাসি প্রাণে সাড়া জাগায় আর ইশারায় কাছে টানে।

ট্রাংক খুলে কাপড়ের একটা থলি বার করল বসন্ত। সঞ্চয়ী প্রকৃতির মানুষ সে। প্রতি মাসে মাইনে পেলে কিছু টাকা এই থলিতে তুলে রেখে দেয়, আর মিষ্টি স্বপ্নটা দেখে। গুনে দেখল, পুরো পাঁচশ' টাকা। একবার কী ভাবল, তারপর ধীরে ধীরে পঞ্চাশটা টাকা বার করে পকেটে পুরল।

সেদিন অনেক ঘুরল দুজনে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, ঢাকুরিয়া লেক, বড় গঙ্গা। বাড়িতে যমুনাকে আজকাল আর ছোট বলে মনে হয় না। কি রকম ভারিক্কি চালে সংসার করে। মনে হয় পাকাপোক্ত কোন গিন্নী-বান্নী মানুষ। কিন্তু ট্যাক্সিতে ঘুরতে ঘুরতে ওকে ছোট একটি মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সেই মেয়েটি যে কিনা ডালে বসে পেয়ারা খেতে-খেতে তার দিকে ছিবড়া ছুঁড়ে মেরেছিল। যা দেখছে তাতেই ওর উল্লাস। হাসছে, চেল্লাচ্ছে। এক সময় বসন্তকে ছোট একটা ধমকও দিতে হয়েছিল, 'একটু আস্তে লোকে কী ভাববে!' ঘাড় কাৎ করে তার দিকে তাকিয়েছিল যমুনা। মুচকি হেসে বলেছিল, 'কি ভাববে?' উত্তর দিতে গিয়েও কথা আটকে গেল বসন্তর। অকারণে চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।

ফিরবার পথে বসন্ত একটা দোকানে ঢুকল। মনে পড়ল, কাল দেখেছিল যমুনার সবুজ শাড়িটার একটা জায়গা ছেঁড়া। আরও মনে পড়ল, দুটোর বেশী শাড়ি পরতে দেখে নি যমুনাকে। ওর হয়ত আর শাড়ি নেই।

হলুদের ওপর রং-বেরং-এর ফুলকাটা ছাপার শাড়ি। দোকানী খুলে ধরে যমুনাকে দেখাচ্ছিল। বসন্ত জিজ্ঞেস করল, 'পছন্দ?'

যমুনা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কার জন্যে?'

বসন্ত বলল, 'আছে একজন।'

যমুনা মুচকি হাসল, ঘাড় কাৎ করে বসন্তকে দেখল, 'কে আছে, বউ?'

'বিয়ে না হতেই বউ?'

'আগে থেকেই গুছিয়ে রাখা ভাল।' যমুনা বলল।

'তাই ধরে নাও। বল পছন্দ কিনা।' বসন্ত মনে মনে হাসল।

ঘাড় অনেকটা হেলিয়ে টেনে টেনে বলল যমুনা, 'খু-ব।'

বাড়ি ফিরে শাড়িটা যখন যমুনার হাতে দিতে গেল, ও দু পা সরে গিয়ে বলল, 'আমি কোথায় রাখব। আপনার বাক্সে রেখে দিন।'

'এটা তোমার।' বসন্ত বলল।

'না না। ছি ছি। এমনিতেই কত খরচা। আজকালকার দিনে একটা লোকের খাওয়া-পরা—'

'তুমি তো সংসারের জন্যে কম করছ না যমুনা। কত কম জিনিসে আজকাল সংসার চলছে, আমার টাকা বাঁচছে। তা ছাড়া লোক রাখতে গেলে তাকে মাইনে দিতে হয়।'

তবু যমুনা এগিয়ে এল না, বসন্ত এক রকম জোর করেই ওর হাতে শাড়িটা গুঁজে দিল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর ট্রাঙ্ক খুলল বসন্ত। থলিটা বার করল। পকেট থেকে উদ্বৃত্ত টাকা গুনে দেখল। বারো টাকা আর কয়েকটা খুচরো পয়সা। থলিতে ঢুকিয়ে রাখতে যাচ্ছিল। কি মনে করে আবার পকেটে রেখে দিল। মনটা একবার খচ করে উঠল, শুধু শুধু অনেকগুলো টাকা খরচা হয়ে গেল।

বসন্ত শুয়ে ছিল। ঘরে ঢুকল যমুনা। রোজ এ সময় ও একটা কাঁচের গ্লাসে জল রেখে যায়। যমুনা বেরিয়ে যাচ্ছিল, বসন্ত ডাকল, 'যমুনা।'

যমুনা দাঁড়াল। বসন্ত বলল, 'কাল নতুন শাড়িটা পরো, অনেক রাত হল, যাও শুয়ে পড়গে।'

অনেক রাত পর্যন্ত বসন্তর ঘুম এল না। যতবার মনে করবার চেষ্টা করতে লাগল অনর্থক এতগুলো টাকা বাজে ব্যয় হয়ে গেল, ততবারই মনে হচ্ছিল যমুনার সাজবার মত কোন জিনিসই নেই। পাউডার, স্নো, ক্রীম, কিছুই না, আরও মনে হল যমুনা আজ কত কি দেখল, কত আনন্দ পেল, নতুন শাড়িটায় যমুনাকে বেশ দেখাবে। ফর্সা মানুষদের হলুদ রং খুব মানায়, আর বড় বড় ফুলগুলো যেন অনেকটা সেইরকম দেখতে, সেই যে ছাপকা-ছাপকা মতন শাড়ীটা যা একদিন যমুনা পরেছিল। ভাবতে ভাবতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল বসন্ত।

পরদিন অপিসফেরতা পাউডার স্নো আর লাল রং-এর একটা ফিতে কিনে নিয়ে এল সে। যমুনা রাগ করল। বসন্ত মজা পেল। আজকাল অনেক কিছুতেই মজা পায় বসন্ত।

আজ রবিবার। অনেকক্ষণ ধরে বাজার করল বসন্ত। রুই মাছ, লাউ, পালংশাক, বড়ি, ধনেপাতা অনেক কিছুই কিনল। বাজার দেখে খুব খুশী যমুনা। বসন্ত বলল, 'এখন যে রাগ করছ না, বলছ না, শুধু এত টাকা খরচা হয়ে গেল।'

যমুনা ঠোঁট টিপে হাসল, 'বলেছিলাম না আপনার বিয়ের খুব সখ! কীরকম গুছিয়ে বাজার করেন, ধনেপাতা, বড়ি।'

'আমার কথার উত্তর কিন্তু এটা হল না যমুনা।' বসন্ত বলল।

"কি জানি সবসময় একরকম করে মনে হয় না। আজ মনে হচ্ছে একটা টাকা খরচা করা দরকার ছিল। যে মানুষটা ছটা দিন নাকে মুখে ভাত গুঁজে বেরিয়ে যায়, একটা দিন সে ধীরে সুস্থে আরাম করে খাবে, দুপুরে শোবে, ঘুমোবে, বিকেলে বেড়াবে। এদিনটা তার পুরো ছুটি কিনা।'

যমুনা দ্রুত পায়ে রান্না ঘরে ঢুকে গেল ডাল চাপান রয়েছে উনুনে।

যমুনা রাঁধছিল। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল বসন্ত। যমুনা টের পায় নি। আপন মনে রেঁধেই চলেছে। যমুনার ঘাড়ের ওপর থেকে শাড়ি সরে গেছে। উনুনের আঁচে ঘাড় ভেজা-ভেজা দেখাচ্ছে। বসন্তর মনে হল যমুনার গ্রীবা লম্বা, আর নধর আর ভীষণ রকমের মসৃণ। সঙ্গে-সঙ্গে আরও মনে হল, এই সব গলায় একটা সোনার হার খুব মানায়। দেবুদার ওপর রাগ ধরতে লাগল। লোকটা কী অসম্ভব স্বার্থপর! যমুনার দিকে ফিরেও তাকায় নি। ওর যে ভাল শাড়ি নেই, সাজবার কোন জিনিস নেই, ওর এমন সুন্দর গলাটা যে একেবারে খালি, কিছুই নজরে আসে নি লোকটার। শুধু খাগ্রা-খাগ্রা করেই মরল।

একটু হেলে পড়ে জলের ঘটি নিতে হাত বাড়াল যমুনা। সঙ্গে-সঙ্গে পিছন ফিরে বসন্তকে দেখল। 'ওমা আপনি! ভীষণ ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম আর একটু হলে। খিদে পেয়েছে? এই হল বলে।' যমুনা আবার কাজের দিকে মন দিল।

বসন্ত দাঁড়িয়েই রইল। এক সময় বলল, 'এখানে তোমার খুব কষ্ট হয়, তাই না!'

মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিল যমুনা, 'কষ্ট কোথায়! কত আরামে আছি। দিব্যি নতুন শাড়ি, পাউডার স্নো—'

'ওরকম করে বলো না। ছিল না তাই দিলাম। তাছাড়া তুমি তো দূরের কেউ নও। খুব কাছের মানুষ।' বসন্তর কথায় যমুনা জবাব দিল না। সাঁতলানো মাছের কড়াইয়ে জল ঢালতে লাগল। বসন্ত আবার বলল, 'ওখানে থাকতে বাইরে-বাইরে ঘুরতে, গাছে চড়তে, লাফাতে, দৌড়তে। আর এখানে ছোট্ট একটা ঘরে বসে থাক সব সময়।'

যমুনা চোখ ফিরিয়ে একবার তাকাল বসন্তর দিকে। তারপর বলল, 'আমার কোন কষ্ট হয় না। বিশ্বাস করুন।' বলেই উনুনের দিকে ফিরে বসল।

বসন্ত বেঁকে বসেছিল, 'কিছুতেই আর দিতে পারবে না।'

যমুনাও ছাড়বে না। আর একটা মাছ নিতেই হবে। বলল, 'এত মাছ কে খাবে!'

বসন্ত নির্বিবাদে বলল, 'তুমি।'

যমুনা চোখ বড় করল, 'আমি কি রাক্ষুসী?'

'আর আমি বুঝি রাক্ষস।'

বলতে বলতেই বসন্তর ছড়ানো হাতের ফাঁক দিয়ে মাছের খণ্ডটা পাতের ওপর ফেলে দিল যমুনা। দিয়েই খিল-খিল করে হেসে উঠল, আগে-আগে হাসলে যমুনা মুখে আঁচল চাপা দিত। আজ দিল না। বসন্ত আবিষ্কার করল, হাসলে যমুনার গালে টোল পড়ে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল বসন্ত। ছোট একটা প্লেটে পান নিয়ে ঘরে ঢুকল যমুনা। বসন্ত উঠে বসল, 'এ কী, পান এল কোত্থেকে। আমি তো আনি নি।'

'আপনি না আনলেও অনেক কিছু আসে।'

বসন্তর মনে পড়ল সকালে যেন আপিসের চাপরাসী নরেনকে একবার দেখেছিল সে। যমুনা আসার পর থেকে প্রতি রবিবার সকালে নরেন আসে। যমুনা টুকিটাকি কাজ করিয়ে নেয় ওকে দিয়ে।

পান নিতে-নিতে বসন্ত বলল, 'পান খেলে দাঁত খারাপ হয়।'

যেতে-যেতে বলল যমুনা, 'হোক।'

'তোমার খাওয়া হয়েছে?' শুতে-শুতে বসন্ত জিজ্ঞেস করল।

'আপনি ঘুমোন।' দরজা ভেজিয়ে দিয়ে যমুনা চলে গেল।

কিছুক্ষণ শুয়েই উঠে পড়ল বসন্ত। কাপড়-জামা পরে যমুনার ঘরের সামনে এসে বলল, 'আমি বেরোচ্ছি।' যমুনা তখন বসন্তর সার্টে বোতাম লাগাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে এল, 'এই ভরদুপুরে আবার কোথায় যাবেন?'

'সিনেমার টিকিট কাটতে। চল আজ সন্ধ্যায় ছবি দেখে আসি।'

'না।'

'না কেন? সব কথাতেই তোমার না।' বসন্তর গলা একটু কর্কশ শোনাল।

'বেশ, আপনি যদি জোর করেন, যাব।' যমুনার গলা খুব শান্ত শোনাচ্ছিল।

'জোরের প্রশ্ন নয় যমুনা। তুমি আমার জন্যে এত কিছু করছ। সামান্য একটু প্রতিদান দিতে যদি মন চায়—। অথচ তুমি সব সময়েই বাধা দেবে।'

'বেশ নিয়ে আসুন, যাব।' যমুনা বসন্তর দিকে তাকিয়ে হাসল।

ছবি দেখতে-দেখতে যমুনা যেন আবার ছোট হয়ে গেল। শেষের দিকে যেখানে বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে এসে নায়িকা নায়কের বুকে আছড়ে পড়ল, হাততালি দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতে যাচ্ছিল যমুনা, তাড়াতাড়ি ওর হাত চেপে ধরল বসন্ত। আলো জ্বলে উঠল, চোখ ফিরিয়ে বসন্তর দিকে তাকাল যমুনা। একটু হাসল। তারপর নীচু গলায় বলল, 'হাত ছাড়ুন। ওরা দেখছে।' অপ্রস্তুত হয়ে হাত ছেড়ে দিল বসন্ত।

বেরিয়ে এসে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকতে যাবার মুখে যমুনা বাধা দিল।

'শুধু-শুধু পয়সা খরচা করতে হবে না।'

'তোমার খালি পয়সা-পয়সা। পয়সা দিয়ে কী হবে বল তো!' বসন্ত বলল।

যমুনা হঠাৎ বসন্তর হাত ধরে টান দিল। পরমুহূর্তেই ছেড়ে দিয়ে বলল, 'বাড়ি গিয়েই চা করে দেব। ময়দা আছে লুচি ভাজবো। চলুন।'

বসন্ত হেসে ফেলল, 'আমাকে যেন লোভ দেখাচ্ছ। আমি কি ছেলেমানুষ!'

যমুনা আড়-চোখে বসন্তর দিকে তাকাল। বলল, 'তা ছাড়া আর কি!'

তিন মাস কেটে গেল দেবুদা এল না। চিঠিও দিল না।

এর মধ্যে বসন্ত যমুনাকে নিয়ে গিয়ে আরও গোটা-কতক জিনিস কিনে এনেছে। ব্লাউজ, চপ্পল, তিনটি শাড়ি।

বসন্ত সেদিন বলছিল, 'নতুন শাড়িগুলো পর না কেন?'

যমুনা বলল, 'পুরনোগুলো আগে ছিঁড়ুক।'

'তোমার সবুজ শাড়িটা কিন্তু ছেঁড়া।'

'সেলাই করে নিয়েছি।'

'কিন্তু কেন নেবে। নতুন শাড়ি নেই তোমার?' বসন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠছিল।

যমুনা হাসল। বলল, 'আছে। পরবো। পুরনোটা আর একটু ছিঁড়ুক। শাড়ির কথা থাক। আমি লেখা-পড়া শিখব?'

বসন্ত খুশী হল। পরদিনই বাল্য-শিক্ষা, ফাস্ট'বুক, শ্লেট, চক, খাতা, পেন্সিল নিয়ে এল। আজকাল বসন্ত আর দেরী করে ফেরে না। আপিস ছুটি হতে-না-হতেই পড়ি-কি-মরি করে বাস ধরতে ছোটে। হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে নেয়। তারপর হাঁক ছাড়ে, 'যমুনা।' যমুনা এক-একদিন আপত্তি তোলে। 'এই তো এলেন। যান না একটু ঘুরে আসুন।'

বসন্ত আলস্যের ভঙ্গী দেখায়, 'কোথায় আর যাব এই সময়?'

'কেন, মামাবাড়ি।'

'সে রোববার সকালে যাব'খন। তুমি যখন রাঁধবে, তখন।'

বইপত্র নিয়ে দুজনে পড়ায় মেতে ওঠে। পড়ানোয় বসন্ত চিরদিনই ভাল। মেধাবী আর মনোযোগী ছাত্রী পেয়ে সময়ের জ্ঞান লোপ পেয়ে যায় তার। কোন-কোনদিন দশটা বেজে যায়। দেশ-বিদেশের গল্প বলে বসন্ত, বড়-বড় বই পড়ে শোনায়। জায়গায়-জায়গায় বুঝিয়ে দেয়। এক সময় হয়ত যমুনা লাফিয়ে উঠে পড়ে, 'সর্বনাশ, দশটা বেজে গেল। সারাদিন খাটুনি, রাত্রেও একটু বিশ্রাম নেই। সত্যি আমরা, মেয়েরা মা ভীষণ স্বার্থপর।' তারপর ক্ষিপ্র হাতে বসন্তর খাবার যোগাড় করতে লেগে যায়।

আরও একটা মাস কেটে গেল। দেবুদার পাত্তা নেই। দেশ থেকে কাকার চিঠি এসেছে। বসন্তকে একবার যেতে লিখেছে। জায়গা-জমি সংক্রান্ত কী সব ব্যাপার। কাকা অথর্ব মানুষ। সবদিক সামলাতে পারছেন না। বসন্ত যদি গিয়ে কয়েকটা কাজ করে দিয়ে আসে। বসন্ত জবাব দিল, এখন আপিসে খুব কাজের চাপ। ছুটি পাওয়া অসম্ভব, সামনের মাসে চেষ্টা করা যেতে পারে। যমুনা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কার চিঠি।'

'কাকা। যেতে লিখেছেন।'

'যাবেন না?'

'না।'

'কেন?'

'তুমি একলা থাকবে।'

'আমি কি ননীর পুতুল, যে গলে পড়ব।'

বসন্ত হার মানল না। হাসতে-হাসতে বলল, 'ননীর পুতুল হলে ভয় ছিল না। তালা দিয়ে বাক্সে রাখা চলত। এ পুতুলের ভয় অনেক বেশী। যে পাবে, সে-ই মুখে পুরে দেবে।'

'ইস—' যমুনা বলল।

আজকাল এ ধরনের দু-একটা ছুটকো রসিকতা বসন্ত করে। যমুনা লজ্জা পায় না। সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করে।

দেশে যাওয়া বসন্তর হয়ে ওঠে নি। কাকা আবার যেতে লিখেছিলেন। সেবারেও একই অজুহাত। ভীষণ কাজের চাপ, একটু হাল্কা হলেই ইত্যাদি, যমুনা সবই দেখল, শুনল, একটু হাসল। মুখে বলল, 'আপনি ভীষণ কুঁড়ে। একবার গেলেই হত।'

বসন্ত দার্শনিকের মত করে বলল, 'কারুর জন্যে কারুর আটকে থাকে না। তুমি দেখে নিও কাকা ঠিক ম্যানেজ করে নেবেন। আর যদি না পারেন আমি কি করব, নিজের ছেলেই বাপকে দেখল না, আমি তো পরস্য-পর।'

'সবাই সমান হয় না।' শাড়ির আঁচল দাঁতে কাটতে-কাটতে উত্তর দিল যমুনা।

'তা তো হয়ই না। কেউ-কেউ নিজের প্রিয়জনকে অপরের হাতে ফেলে দিয়ে কী রকম নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারে—' ইচ্ছে করেই দেবুদাকে ঠেস দিয়ে কথা বলছিল বসন্ত।

যমুনা হেসে ফেলল, 'পর-পর করে যে লোকটা সমানে চেঁচাচ্ছে সে কিন্তু ভাল করেই জানে সে খুব কাছের একজন মানুষ। অত্যন্ত আপনজন। ওদিকে আজ যে মামাবাড়ি নেমন্তন্ন রয়েছে সে কথা কি মনে আছে?'

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। মামাবাড়ি টালীগঞ্জের ওদিকটায়। বড় মামা আজ ফোন করে রাত্রে খেতে বলেছেন। ভাগ্যিস দূরে বাসা নিয়েছে। না হলে মামা এর মধ্যে কত দিন যে এসে হাজির হতেন।

বসন্ত বেরিয়ে যাচ্ছিল। ফিরে দাঁড়াল। যমুনা পিছন-পিছন এসে দাঁড়িয়েছে দরজা বন্ধ করবার জন্যে। সন্ধ্যা থেকেই আজ আকাশে খুব বড় একটা চাঁদ উঠেছিল। সামনেই প্রকাণ্ড একটা আম গাছ। পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে বাড়ির গোটা উঠোনটায় জাফরির বুননির মত করে তুলেছিল। যমুনার গায়ে এসেও পড়েছিল। বসন্ত অন্যমনস্ক হয়ে তা-ই দেখছিল।

যমুনা হেসে ফেলল, 'কি হল দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

'গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। তোমাকে কী রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে।'

যমুনা এবার শব্দ করে হেসে উঠল। 'এই কথা বলতে আপনি দাঁড়িয়ে পড়লেন।'

বসন্ত অপ্রস্তুত হল। 'না না তা নয়। দরজা ভাল করে বন্ধ করে রেখো। আমার গলা না শুনলে খুলো না। ভেতর থেকেই উত্তর দিও। অবিশ্যি এখন কেউ আসবে না, তবু সাবধানের মার নেই।'

ভেবেছিল যমুনা ঘাড় কাৎ করে বলবে, আচ্ছা। কিন্তু হঠাৎ বেয়াড়া একটা প্রশ্ন করে ফেলল, 'যদি জিজ্ঞেস করে আমি কে? কি বলবো।'

বসন্ত উত্তর দিতে পারল না। আপন মনে বিড়-বিড় করে বলতে লাগল, 'সত্যিই তো! কি বলবে!'

ঘাড় নাড়তে-নাড়তে যমুনা বলতে লাগল, 'সত্যি, আপনি না ভীষণ রকমের ইয়ে একজন। কী আবার বলবো! বলবো, আমি বাড়ির ঝি। গলা কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে এমন করে বলবে যেন ঠিক একজন বুড়ো মানুষ। আর দাঁড়িয়ে থাকবেন না। যান—।'

বসন্ত যেতে-যেতে একবার ফিরে তাকাল। যমুনা তখনও দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর মুখ-চোখ দেখা যাচ্ছিল না। তবু মনে হচ্ছিল যমুনা হাসছে। মনে-মনে ওর বুদ্ধির তারিফ করল বসন্ত, আর ভাবল সমস্ত উঠোনটা যে এভাবে জাফরি-কাটা হয়ে যায়, কই কোনদিন তো তার নজরে পড়ে নি।

ছ মাস কেটে গেল।

দেবুদা এল না। চিঠিও দিল না। যমুনার দিকে মাঝে-মাঝে তাকায় বসন্ত। ওর মনের কথা বুঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে ভাষা বুঝবার ক্ষমতা বসন্তর নেই। একদিন বসন্ত বলে বসল, 'তোমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই যমুনা। যে রকম লেখাপড়ায় আগ্রহ দেখছি তোমার, আমার তো মনে হয়—'

কথার মাঝখানেই যমুনা বাধা দিল, 'আমার যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে সে খবরটা কে দিল আপনাকে?'

'সে খবরটা পাচ্ছি না বলেই তো আমার দুশ্চিন্তা। এতদিন হয়ে গেল দেবুদার কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ তোমার মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই।'

মানুষের মুখ দেখেই যদি সব বোঝা যেত! যাকগে, আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই। আমি খুব সুখে আছি। তা ছাড়া আপনার দাদাটিকে চিনতেও আমার বাকী নেই। ছিটগ্রস্ত মানুষ। যখন যা খেয়াল হচ্ছে করছে। বলতে-বলতে যমুনার মুখে-চোখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফুটে উঠল।

'আজ কী গুমোট দেখছো। বৃষ্টিটা কিছুতেই এল না। অথচ মানুষগুলো সব চাতক-পাখীর মত টা-টা করে চেঁচাচ্ছে।' বসন্ত হঠাৎ বলে উঠল।

'চেঁচালেই আর কিছু বৃষ্টি আসছে না। যা চাওয়া যায়, তাই কি পাওয়া যায় সব সময়!' বসন্ত দেখল কথা বলে যমুনা তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

বসন্ত বলল, 'তা হয়ত যায়, হয়ত যায় না। কিন্তু তবু মানুষের চাওয়ার বিরাম নেই।'

যমুনা কথা বলল না। আঁচল দিয়ে মুখ ঘাড় মুছতে লাগল। আজ ভীষণ গরম পড়েছে। ভ্যাপসা গরম। দেখতে-দেখতে সমস্ত শরীর ভিজে ওঠে, মুখ আঠা-আঠা মনে হয়। যমুনা যখন ওর ঘাড় মুছছিল বসন্তর দৃষ্টি সেখানে গিয়ে আটকে গেল। যমুনার রং চিরদিন ফর্সা। কিন্তু, বসন্ত মনে-মনে ভাবল, কলকাতায় এসে যমুনা আরও ফর্সা হয়েছে, আর একটু মোটাও হয়েছে যেন। নিশ্চয়ই যমুনা খুশী মনে আছে। মনে সুখ না থাকলে মানুষের শরীর সুস্থ থাকে না। আর শরীর সুস্থ না থাকলে রং ফর্সা কিম্বা দেহ মোটা হয় না কিছুতেই।

সেই দিন আপিস থেকে ফেরার সময় মনে-মনে একটা মতলব আটল বসন্ত। গিয়েছিল বউবাজার স্ট্রীটে। সঙ্গে আপিসের আরও পাঁচ-ছজন লোক ছিল। সবাই মিলে শেষ পর্যন্ত একটা হার কিনল। দাম দুশ' পঁচিশ টাকা। সহকর্মী নিখিলেশ সরকারের বিয়ে। চাঁদা যা উঠেছে তা দিয়েই হারটা কেনা হল। আর একটা হারও পছন্দ করেছিল সবাই মিলে। মটরের মত বড়-বড় দানা দিয়ে হারটা গড়া। আলো পড়ে চিকচিক করে উঠেছিল। হার দেখতে দেখতে হঠাৎ কেন যেন বসন্তর চোখে একটা ছায়া নেমে এসেছিল। গাঢ় গলায় বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেছিল সে, 'নিখিলেশের বউ-এর রং কি ফর্সা, আর গলা বেশ নিটোল আর লম্বা?' পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রবীণ মজুমদারদা। বসন্তর গায়ে কনুই দিয়ে ছোট্ট একটা গুঁতো দিয়ে বললেন, 'শুনছ বউ-ভাতে নেমন্তন্ন। বিয়েই হচ্ছে আজ, আর তুমি কিনা জিজ্ঞেস করে বসলে বউ দেখতে কেমন। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক তো জিনিস দেওয়া নিয়ে, কার বউয়ের রং ফর্সা কিনা, গলাটা বত সব ইয়ে।' উনি দস্তুরমত বিরক্তিবোধ করলেন। পাশের ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমাদের বাজেট কত?'

'দুশ' পঁচিশ। মটর হারটার দাম বলছে চারশ' পঁয়তাল্লিশ। আর এটা বলছে দুশ' পঁচিশ।' বলে দুটো হারই মজুমদারদা'র সামনে ঠেলে দিল সে।

মজুমদারদা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দুটো হারই দেখলেন, তারপর বললেন, 'অবিশ্যি মটর হারটা অনেক ভাল দেখতে। তবু এটাও মন্দ নয়। তা ছাড়া কোটটা তো কাপড় অনুযায়ী কাটতে হবে, না কী বল হে।' বলেই বসন্তকে আবার কনুই দিয়ে গুঁতো মারলেন। বসন্ত অন্যমনস্ক ছিল। চমকে উঠে বলল, 'তা তো বটেই।'

হার কেনা হল। কিন্তু বসন্তর চিন্তা গেল না। চিন্তাটা না-ছোড় একটা ভিখিরীর মত পিছনে লেগেই রইল।

পরদিন আপিস যাবার আগে ট্রাঙ্ক খুলল বসন্ত। কাপড়ের থলিটা বার করে টাকা গুনতে বসে গেল। চারশ' পঞ্চাশ টাকা। পাঁচ টাকা ভেতরে তুলে রাখল। মনে-মনে বলল, 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি খালি করতে নেই।' তারপর সব টাকা পকেটে পুরে নিল।

দরজা খুলে দিয়ে চলে এসেছে যমুনা। দাঁড়াবার সময় নেই আজ। অন্যদিন পাশে সরে দাঁড়ায়। বসন্ত ঢুকে এলে সে-ই দরজা আটকে দেয়। আজ তাড়াহুড়ো করে ভেতরে ঢুকে গেল। বসন্ত একটু অবাক হল।

হাত-মুখ ধুতে পিছনের উঠোনে যাবার সময় দেখল যমুনা রান্নাঘরে বসে কী সব করছে। উঁকি মারতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। যমুনাই কথা বলল, 'আলুর পরটা। আজ রেডিওতে শেখাচ্ছিল। ভাবলাম—যমুনা যেন লজ্জা পেল। নিজের মনে মনেই যেন আবার বলে উঠল, 'কি জানি, কী পদের হবে!'

বসন্ত কথা বলল না, হাত-মুখ ধুয়ে এল। পরিপাটি করে চুল আঁচড়াল। তারপর গুন-গুন করে একটা গান ধরল। ঘরে ঢুকল যমুনা। ওর হাতে খাবারের থালা। টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল। বসন্ত ডাকল, 'যমুনা'। যমুনা ফিরে দাঁড়াল। বসন্ত এগিয়ে গিয়ে একটা বাক্স ওর চোখের সামনে খুলে ধরল। সোনার হারটা চিকচিক করে উঠল। যমুনা শান্ত গলায় বলল, 'আমার?'

'হ্যাঁ। নিয়ে এলাম। সুন্দর নয়?'

'খুব সুন্দর।' যমুনা বসন্তর দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'যাই চা-টা নিয়ে আসি।'

চা নিয়ে আসতে বসন্ত বলল, 'হারটা পর না যমুনা।'

যমুনা কি ভাবল। বলল, 'আজ কেউ হার পরে নাকি। সোনা-দানার জিনিস দিন ক্ষণ দেখে পরতে হয়।'

'যাঃ।'

'যাঃ কী। আপনি কিছু জানেন না। হয়ে একেবারে। সময় মত ঠিক পরবো, দেখবেন।'

বসন্তর মুখ ভার হয়ে রইল, 'এত তাড়াহুড়ো করে নিয়ে এলাম—'

'তা হোক। সব কাজ তাড়াহুড়ো করে না করাই ভাল।' যমুনা যেন তাকে সান্ত্বনা দিল। আঁচল দিয়ে ঘাড় মুছতে-মুছতে বলল, 'আবার কী গরম যে পড়েছে! অথচ একটু বৃষ্টি নেই। মানুষ-গুলো সব যে মরে যাচ্ছে, ভগবানের যেন হুঁসই নেই।' কথা বলতে বলতেই হেসে উঠল যমুনা।

শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি নামল! তুমুল বৃষ্টি। আকাশ ছাপিয়ে, গাছপালা কাঁপিয়ে, বাড়ি-ঘর-দোর ভাসিয়ে দিয়ে সেই বৃষ্টিটা ক্রমাগত ঝরতেই লাগল। বাড়ি ফিরতে গিয়ে ভিজে গেল বসন্ত। যমুনা দৌড়ে গামছা নিয়ে এল। বলল, 'শিগগির মাথা গা মুছে ফেলুন। জ্বরজারি হলেই মুস্কিল।'

'কি আর মুস্কিল। তুমি তো আছ।' বলেই বসন্ত হাসতে লাগল।

রাত্রে আজ একটু সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল। পড়তে-পড়তে যমুনা উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আজ আর পড়তে ইচ্ছে করছে না।'

বসন্ত বলল, 'এক একদিন যেন তোমার কী হয়!'

অনামনস্কভাবে যমুনা বলল, 'সবারই হয়।' তারপর বসন্তের দিকে একবার তাকিয়েই বেরিয়ে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর বসন্ত শুয়েছিল। একটা ইংরেজী বই পড়ছিল। যমুনা ঘরে ঢুকল। টেবিলের ওপর জলের গ্লাস রাখল। যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি বই?'

বইটা ওর দিকে এগিয়ে দিল বসন্ত। বলল, 'আজকাল তো পড়তে শিখেছ। পড় তো!

যমুনা বইয়ের মলাট দেখল। দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে বসন্তকে দেখছিল। যমুনা আজ চোখে কাজল পরেছে। পান খেয়েছে, পরিপাটি করে চুল বেঁধেছে। বসন্ত যখন ভাবছিল, যমুনা হয়ত আজ মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, বিকেলে বৃষ্টি একটু ধরলেই বেড়াতে যাবে, তখনই যমুনা বলে উঠল, 'বইটা ভীষণ বিশ্রী।'

বসন্ত মনে মনে [illegible] বইটার নাম নিশ্চয়ই এতক্ষণে পড়তে পেরেছে যমুনা, আর মানেটাও হয়ত বুঝতে পেরেছে 'এ নেকেড উওম্যান'; যমুনার গাল বেশ লাল হয়ে উঠেছে। আর চোখ কেমন একটু ভারী ভারী।

বসন্ত উঠে বসল। জানলার বাইরে তাকাল। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। জলের ওপর জল পড়ার শব্দ উঠছে। মনে নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে।

'দাঁড়িয়ে রইলে কেন। বসো যমুনা।' খাটের এক কোণায় যমুনা বসে পড়ল।

'ভয় লাগছে?' বসন্ত আবার বলল।

যমুনা ঘাড় নাড়ল। বসন্তর নজর সেইদিকে গেল। আলো পড়ে ওর ঘাড় চিক-চিক করছে। একটু ঘাম জমে উঠেছে। সমানে বৃষ্টি হচ্ছে, অথচ গরম গেল না।

'হারটা কবে পরবে যমুনা?'

যমুনা নখ দিয়ে বই খুঁটছিল। জবাব দিল না। যমুনার গা দিয়ে বুনো ফুলের গন্ধটা আজ জোরাল হয়ে নাকে আসছে।

হঠাৎ চারদিক আলো করে কাছে কোথায় বাজ পড়ল। আলোর একটা বন্যা ঘর ভাসিয়ে দিল। যমুনা ছিটকে এসে বসন্তর গায়ে পড়ল, দু হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। যমুনার শরীরটা বসন্তর দু' হাতের মাঝে কেঁপে উঠল, বসন্ত বলতে চাইল, ভয় নেই যমুনা। কিন্তু তার আগেই প্রচণ্ড একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন তার শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেল।

যমুনা সরে যেতে চাইল। কিন্তু পারল না। বসন্ত ওকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছে। যমুনা চোখ মেলে তাকাল। বসন্তর মুখ ক্রমশই ঝুঁকে আসছে। বসন্ত দেখল যমুনা আবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছে, আর ওর মুখে সেই ভেজা ভেজা হাসিটা নেই।

বসন্তর মুখ আরও নেমে এল। যমুনা কেঁপে উঠল। সেই মুহূর্তে যমুনার মুখের মধ্যে নিজের মুখ ডুবিয়ে দেবার একটা উন্মাদনা আচ্ছন্ন করে ফেলছিল তাকে। প্রচণ্ড একটা শব্দ উঠল। আকাশে নয়। বাইরের দরজায়।

বসন্ত দরজা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে একটা লোক ঢুকে পড়ল। দেবুদা। পিছনে কুলির মাথায় বাক্স আর বিছানা। চুলের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে দেবুদা বলল, 'ভেবেছিলুম তাক্ লাগিয়ে দেবো তোদের। হঠাৎ হুট্ করে এসে হাজির হব। এখন দেখছি নিজেই কুপোকাৎ। ভিজে একসা। তারপর এদিককার খবর সব ভাল তো!' বলেই এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। যমুনাকে দেখতে পেল না। যমুনা তখন নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে আর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছে।

দেবুদা গলা উঁচু করে বলতে লাগল, 'সাত্রা পার্টি ছেড়েছি বহুদিন আগেই। শালারা হারামির বাচ্চাসব। গেলুম সোজা আসাম। জুটে গেলুম এক ঠিকেদারের সঙ্গে। জঙ্গলে এই ক'টা মাস। বর্ষা শুরু হল। কাঠ কাটা বন্ধ। চলে এলুম। ক'টা মাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল। কোথায় যমুনা, কোথায় বসন্ত। সব ভুলেই গেলুম একেবারে—' দেবুদা খুব হাসতে লাগল। একটু থেমে আবার বলল, 'কিন্তু বৃষ্টি বলে তো আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা চলবে না। কাঠ কাটা না চলতে পারে কিন্তু চেরাইতে বাধা কোথায়। আর একটা চাকরি জুটিয়ে নিলুম। ছুটি নিয়ে এসেছি। কালকেই চলে যাব। বাড়ি ঠিক করা আছে। যমুনাকে নিয়েই যাব।

বসন্ত যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'কাল-ই।'

'হ্যাঁ যাই। দেরী হয়ে গেলে আবার যদি কিছু একটা ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে তোলে! এবার তো আর একা নয়।'

সকাল হল।

দেবুদা ট্যাক্সি ডাকতে গেছে। বাক্স বিছানা সামনের বারান্দায় টেনে নেওয়ার ঘসটানো শব্দ একটু আগেই কানে এসেছে। বৃষ্টি বন্ধ হয়নি। একটু একটু করে পড়ছে। কাল সারা রাতই বৃষ্টি হয়েছিল। জানালার দিকে মুখ করে বসে আছে বসন্ত। একটা হাত কাঁধে এসে পড়ল। দু হাত দিয়ে বসন্ত মুখ ঢেকে ফেলল।

'ছি, এরকম করতে নেই।' যমুনা জোর করে বসন্তর হাত সরাতে চাইল। 'চাবিটা দেখি।'

বসন্ত চাবি বার করে দিল।

যমুনা ট্রাঙ্ক খুলল। একটা একটা করে নতুন তিনটে শাড়ি বাক্সের ওপর রাখল। সবার ওপরে রাখল মটর-দানা হারটা। ওর গায়ে কোন আলো পড়ে নি। চিকচিক করছিল না।

যমুনা উঠে বসন্তর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ওর গা দিয়ে এখন কোন বুনো ফুলের গন্ধ বেরোচ্ছিল না। যমুনা আরও সরে এল। গায়ে গা স্পর্শ করল। যমুনার মুখ ঝুঁকে আসছে। ওর ঠোঁট বসন্তর কপালে স্পর্শ করল। ফিসফিস করে যমুনা বলল,

'বিয়ের সময় খবর দিও, আসবো। আর এই শাড়ি আর হার আমার হয়ে বউকে দিও। এগুলো তো আমারই জিনিস।'

বসন্ত মুখ তুলল। ওর চোখে জল। বাইরে ট্যাক্সির হর্ন শোনা যাচ্ছে। দেবুদা তাড়া দিচ্ছে। যমুনাকে ডাকছে। যমুনা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

এখানেই গল্পের শেষ।

কিন্তু সব শেষেরই আর একটা শেষ আছে। সূর্য অস্ত যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই দিনটা শেষ হইয়া যায় না। গাছের মাথায়, আকাশের গায়ে, নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে একটা রেশ লাগিয়া থাকে।

কালক্রমে বাঘটি যৌবন হারাইয়া প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হইল। যদিচ তাহার নখ দন্ত গলিত হইল না, ক্ষুরধার নখাগ্রে তীক্ষ্ণতা হারাইয়া ফেলিল না, তথাপি তাহার দৃষ্টির উপর একটা বিষণ্ণ ছায়া নামিয়া আসিল।

সেই ছায়াম্লান দৃষ্টি দিয়া সে কীসের আশায় আশায় সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হাইড্রোজেনের চেয়ে সহস্রগুণ লঘু মৌল

অনেকেই জানেন, প্রখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ পৃথিবী এবং পৃথিবীর বায়ু-মণ্ডলের ৯২টি মৌলকে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম অনুসারে একটি পর্যায় সারণীতে সাজিয়েছিলেন। তাঁর নামানুসারে এই সারণী মেণ্ডেলিফ পর্যায় সারণী বলে অভিহিত। এই সারণীতে হাইড্রোজেন হচ্ছে লঘুতম মৌল এবং তার ভর ১ ধরে অন্যান্য মৌলের ভর নিরূপণ করা হয়। সেই হিসাবে এই সারণীতে সবচেয়ে গুরু বা ভারী মৌল হচ্ছে ইউরেনিয়াম। হাইড্রোজেনের চেয়ে লঘুতর বা ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী মৌলের সন্ধান প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ইউরেনিয়ামের চেয়ে ভারী একাধিক মৌলের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এগুলি পর্যায় সারণীতে ইউরেনিয়াম-উত্তর মৌল নামে কথিত। অনুরূপভাবে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে হাইড্রোজেনের চেয়ে লঘুতর একাধিক মৌল সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি গবেষণাগারে এমন একটি লঘু মৌলের অস্তিত্ব সনাক্ত করা গেছে, যা হাইড্রোজেনের তুলনায় হাজার গুণ লঘু।

হাইড্রোজেন পরমাণুর গঠন সম্পর্কে আমরা জানি, তার কেন্দ্রীনে আছে একটি প্রোটন এবং বহিস্তরে আছে একটি মাত্র ইলেকট্রন। কোনো মৌলের কেন্দ্রীনে যদি প্রোটনের চেয়ে লঘুতর অথচ একই ধনাত্মক বিদ্যুৎ ধর্মবিশিষ্ট কণিকা থাকে, তা হলে সেই মৌলের পরমাণু হবে হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে লঘুতর। সাম্প্রতিককালে গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে এমন মৌলের অস্তিত্ব ধরা গেছে, যার কেন্দ্রীনে আছে ধনাত্মক মেসন বা পজিট্রন কণিকা। প্রোটন কণিকার তুলনায় পজিট্রন হচ্ছে ১৮৩৮ গুণ লঘুতর। কোনো মৌলের কেন্দ্রীনে যদি থাকে একটি পজিট্রন এবং বহিস্তরে থাকে একটি ইলেকট্রন, তাহলে সেই মৌলটি হবে হাইড্রোজেনের চেয়ে প্রায় হাজার গুণ লঘুতর। এমন একটি মৌলের সন্ধান গবেষণাগারে সত্যিই পাওয়া গেছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে 'পজিট্রনিয়াম'। বর্তমানে এই পজিট্রনিয়ামকে বিশ্বের লঘুতম মৌল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।
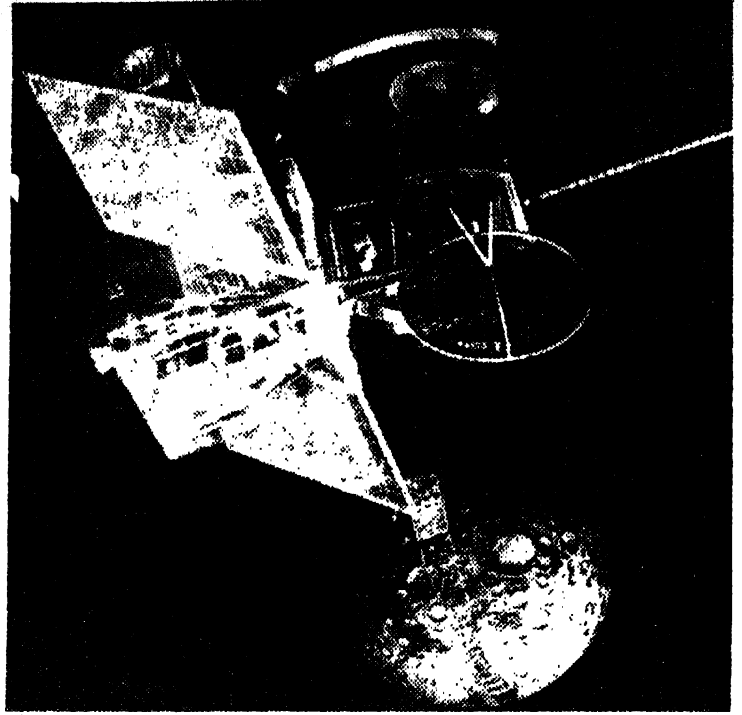
বুধগ্রহ পর্যবেক্ষণের জন্যে নির্মীয়মাণ কৃত্রিম উপগ্রহ 'মেসো।'

স্বভাবতই আমরা অনুমাণ করতে পারি, এই অস্বাভাবিক মৌলের রাসায়নিক ধর্ম হবে বিচিত্র। সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার বিজ্ঞান আকাদেমির পারমাণবিক ও বিকিরণ রসায়ন গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা এই পজিট্রনিয়ামের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন।

আমরা জানি, দুটি বিপরীত বিদ্যুৎ ধর্মবিশিষ্ট কণিকা কাছাকাছি এলে তারা পরস্পরকে বিনষ্ট করে। পজিট্রনিয়াম পরমাণুতে পজিট্রন এবং ইলেকট্রন অতি দ্রুতই পরস্পরকে সংহার করে ফেলে, সেই কারণে পজিট্রনিয়ামের জীবনকাল অতি ক্ষীণ। পজিট্রন এবং ইলেকট্রনের পরস্পর বিনাশের ফলে শক্তিকণা বিকীর্ণ হয় এবং গামা-কোয়াণ্টা হিসাবে তার পরিমাপ করা হয়। বিজ্ঞানীরা পজিট্রনিয়াম পরমাণুর ধর্ম পর্যালোচনা করে দুরকম পজিট্রনিয়াম পরমাণুর অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছেন। তাদের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, একটি ক্ষেত্রে ইলেকট্রন এবং পজিট্রন বিপরীত দিকে আবর্তিত হয়, অপর ক্ষেত্রে তারা আবর্তিত হয় একই দিকে। এই দুরকম পজিট্রনিয়াম পরমাণুকে যথাক্রমে বলা হয় প্যারা-পজিট্রনিয়াম এবং অরথো-পজিট্রনিয়াম।

আপাতদৃষ্টিতে এই পার্থক্য অতি নগণ্য বলেই মনে হয়। কিন্তু এই পার্থক্যই তাদের বিভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি করে। বায়ুশূন্য অবস্থায় অরথো-পজিট্রনিয়ামের অস্তিত্ব কাল এক সেকেণ্ডের এক কোটি ভাগের একভাগ মাত্র এবং তারপর তিনটি গামা-কোয়াণ্টা শক্তিকণা বিকীর্ণ করে তা ধ্বংস হয়ে যায়। পক্ষান্তরে প্যারা-পজিট্রনিয়ামের জীবনকাল এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের একভাগ এবং দুটি গামা-কোয়াণ্টা বিকীর্ণ করে বিনষ্ট হয়ে যায়।

রাসায়নিক বিচারে পজিট্রনিয়ামের পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুরই অনুরূপ। এই কারণে হাইড্রোজেন পরমাণুর মতো পজিট্রনিয়াম অক্সিজেন সংযোগ, প্রতি-স্থাপন বিক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে। তা ছাড়া তাদের যৎসামান্য ভরের জন্যে তাদের সঞ্চরণ-গতি হয় অত্যধিক এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের ক্ষমতাও হয় খুব বেশি। এখন কথা হল, পজিট্রনিয়ামের জীবনকাল তো ক্ষণিকমাত্র, তা হলে এই সমস্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে পর্য-বেক্ষণ করা যায়? বস্তুত, গবেষণাগারের স্বাভাবিক অবস্থায় পজিট্রনিয়ামের ঘনত্ব এক ঘন সেন্টিমিটারে একটিও পরমাণু হয় না। আমাদের ধারণার বাইরে অতি স্বল্প পরিমাণে তাদের পাওয়া যাওয়াতে কোন রাসায়নিক পদ্ধতিতে এই সমস্ত বিষয় পর্যবেক্ষণের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এক্ষেত্রে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের পরমাণু-পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। পরমাণু-পদার্থবিজ্ঞানগত পদ্ধতিতে একটি মাত্র পরমাণুরও তেজস্ক্রিয় ক্ষয় পরিমাপ করা যায়। আগেই বলা হয়েছে, পজিট্র-নিয়ামের বিনাশ একসঙ্গে একাধিক গামা-কোয়াণ্টা বিকিরণের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। বিশেষ ধরনের গণকযন্ত্রের (কাউন্টার) সাহায্যে একই সময়ে বিকীর্ণ দুটি বা তিনটি গামা-কোয়াণ্টা পরিমাপ করা যায় এবং পজিট্রনিয়ামের বিনাশ-কাল

অতি নিখুঁতভাবে প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে সোডিয়াম-২২ আইসোটোপ যদি পজিট্রনের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তা হলে পরিমাপের সম্ভাব্যতা আরও বেড়ে যায়। এই আইসোটোপের পরমাণু-কেন্দ্রীন একটি পজিট্রন বিকিরণের সঙ্গে আর একটি পজিট্রনের 'জন্মে'র সংকেত পাওয়া যায়। এরপর অপর একটি গণকযন্ত্রের দ্বারা সনাক্তীকৃত সংহার-কোয়ান্টার মাধ্যমে পজিট্রনের বিনাশ-মুহূর্ত ধরা যায়। এর ফলে পরমাণুর জীবনকালের তারতম্য নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়। যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুগুলি অংশ গ্রহণ করে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার ভিত্তি এই তথ্য থেকে পাওয়া যায়।

এইভাবে পজিট্রনিয়াম হাইড্রোজেন সদৃশ পরমাণু বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা জানি, কোন পদার্থে তেজস্ক্রিয় পরমাণুর অস্তিত্ব, সেই পদার্থ থেকে নির্গত বিশিষ্ট ধরনের বিকিরণের দ্বারা সূচিত হয়ে থাকে। পজিট্রনিয়ামের ক্ষেত্রেও এই একই কথা খাটে। সাধারণ তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে পজিট্রনিয়ামের তফাৎ হচ্ছে শুধু এই যে, বিনাশ-মুহূর্তে বিকীর্ণ পজিট্রনিয়ামের সংকেত সব সময় একই রকম হয় না। পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের ধর্মের ওপর পজিট্রনিয়ামের জীবনকাল ও বিনাশ-পদ্ধতি নির্ভর করে এবং তার দ্বারাই পজিট্রনিয়ামের বৈশিষ্ট্য জানা যায়। এরই মধ্যে পজিট্রনিয়াম পদ্ধতির অতি বিস্ময়কর ধর্মাবলী নিহিত।

এছাড়া গবেষকরা তাঁদের ইচ্ছামত পরীক্ষাকালীন অবস্থা, যথা তাপ, চাপ এবং গ্যাস, তরল ও কঠিন পদার্থের সংযুক্তি পরিবর্তন করতে পারেন। এর ফলে পজিট্রনিয়ামের সমস্ত রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ করা যায়।

এইভাবে যেসব ফলাফল পাওয়া গেছে তা অতি বিচিত্র। পজিট্রনিয়ামের অস্বাভাবিক লঘু ভরের দরুন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যেভাবে তা অংশ গ্রহণ করে অন্যান্য পরমাণু থেকে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বস্তুত, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের অণু-পরমাণুগুলিকে কিছু পরিমাণ শক্তি-বাধা অতিক্রম করতে হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে তাদের প্রভূত পরিমাণ শক্তি থাকা দরকার। এ জন্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি বেড়ে যায়: কেননা তখন অণু-পরমাণুগুলি দ্রুততর গতিতে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম বল-বিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী ইলেকট্রন বা পজিট্রনের মত অতিলঘু কণিকা শক্তি বাধা 'এড়িয়ে' তার মধ্যে দিয়ে 'গলে' যেতে পারে (যেমন পাহাড়ের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে পার হওয়া যায়)। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'টানেল এফেক্ট' বা সুড়ঙ্গ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার দরুন লঘুতম কণিকাও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় পজিট্রনিয়াম পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের গতি হচ্ছে হাজার গুণ বেশি।

স্ফোত রসায়ন ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার বহু জটিল সমস্যার সমাধানে পজিট্রনিয়াম আজ বিজ্ঞানীদের কাছে এক মস্ত বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই লঘুতম মৌলের সাহায্যে গ্যাসের মধ্যে অতি নগণ্য পরিমাণ মুক্ত পরমাণু ও উপাণু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক রসায়ন-শাস্ত্রে পজিট্রনিয়াম 'আলাদীনের প্রদীপ' হয়ে দেখা দিয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না।

ভারতে চন্দ্রজয়ীদের বিপুল সংবর্ধনা

আমেরিকার অ্যাপোলো-১১ চন্দ্রজয়ী মহাকাশচারীত্রয় নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স বিশ্ব সফরের পথে গত ২৬ অকটোবর বোম্বাই-এর বিমানবন্দরে উপস্থিত হলে বিরাট জনতা তাঁদের বিপুল সংবর্ধনা জানান। বিমানবন্দর থেকে রাজভবন পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার পথ মোটরে করে যাওয়ার সময় পথের দুধারে অপেক্ষামাণ অগণিত মানুষ তাঁদের স্বাগত জানান। বিমানবন্দরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী, বোম্বাই-এর মেয়র এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিক তাঁদের অভিনন্দিত করেন।

বোম্বাই-এর আজাদ ময়দানে চন্দ্রজয়ী অভিযাত্রীত্রয়কে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়। যে ধরনের চন্দ্রযানে করে তাঁরা চন্দ্রের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন, পৌর সংবর্ধনায় ২৩ ফুট উঁচু অনুরূপ এক মডেলের মঞ্চ নির্মাণ করা হয়।

সংবর্ধনার উত্তরে অলড্রিন বলেন: ১৯৬৯ সাল মানুষের ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ এই বছরে মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম অবতরণ করে। কলিন্স আশা প্রকাশ করেন, মহাকাশ রহস্য উদ্ঘাটনে পৃথিবীব্যাপী যে প্রয়াস চলছে তাতে ভারত, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরা একযোগে সহযোগিতা করবেন। অনুষ্ঠান শেষে আর্মস্ট্রং সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদচিহ্নের একটি ছবি মেয়রকে উপহার দেন।

বুধ গ্রহ পর্যবেক্ষণের প্রয়াস

সৌরজগতে সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী ক্ষুদ্রতম গ্রহ হচ্ছে বুধ। এই বুধগ্রহ সম্পর্কে যে সব তথ্য এতদিন আলোক ও বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা গেছে তাতে প্রকাশ বুধের ব্যাস ৪৫০০ কিলোমিটার এবং তার ভর পৃথিবীর ভরের তুলনায় ১৮ ভাগের এক-ভাগ মাত্র। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে বুধগ্রহ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের এক প্রয়াস করেছেন ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি আন্তর্জাতিক-ভাবে 'মেসো' নামে অভিহিত এবং এটি নির্মাণ করছেন পশ্চিম জার্মাণীর একদল প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৫ সালের মধ্যে মেসো অভিযানের যাত্রা সুরু হবে। এই উপগ্রহটি বুধগ্রহের কাছ দিয়ে পরিক্রমা করবে। বুধের পৃষ্ঠদেশ ও তার আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের জন্যে এতে যন্ত্রপাতি থাকবে। পৃথিবীতে সরাসরি প্রেরণের জন্যে এতে একটি টেলি-ভিশন-ক্যামেরাও থাকবে। শুধু মাত্র বুধগ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রথম প্রয়াস হবে এই মেসো অভিযান।

—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গিয়ে দেখি একেবারে সেই চীজ।

কুসমীর দেউড়িতে আমার পূর্বে দেখা ছেল। এদানি খুব দহরম-মহরম হ'তে দামোদর চৌধুরী যে কয়েকবার কুসমীতে গেল, বাবা থাকতই সঙ্গে, বার দুই আমারও সে' সৌভাগ্য; আজ্ঞে হ্যাঁ, দেউড়ির সদর অব্দি পজ্জন্ত। এ-বা গেনু ছিরু-জটের সঙ্গে, এটা সদর দিকে নয়। সমস্ত দেউড়িটে বিঘে পঞ্চাশ নিয়ে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। তার পেছন দিকটেয় একটা মামুলি গোছের দরজা আছে, দেউড়ির খিড়কি ব'লতে পারেন, জায়গাটা একটু জঙ্গুলেও। তার মধ্যে দিয়ে কতক যেন গা-ঢাকা দিয়েই দেয়ালের ভেতরে চ'লে গেনু তিনজনে। ভেতরটাও একটু জঙ্গুলেই, যেন যাওয়া-আসা কম ইদিকে। আজ্ঞে, গাটা ছমছম করচে বৈকি, এইরকম পোড়ো জায়গা, সঙ্গী দু'জন গেঁজেল, মনে মনে ভাবচি, না হয় চম্পট দিই, দেখা তো হোলই জায়গাটা। মনে হতে যে আপনিই হাতটায় টান পড়ল, জটে ধরেই ছেল, সঙ্গে সঙ্গে মুঠোটা কষে দিলে, চাপা গলায় বললে 'ভয় নেই, আমরা তো রয়েচি।'

আরও খানিকটে গিয়ে একটা ছোট দালান-বাড়ি, খান-তিনচার ঘর নিয়ে। জঙ্গুলেই, তবে এদিকটে যেন নতুন পত্তনের করা হয়েচে। সমস্তটা খোদ দেউড়ি থেকে বেশ খানিকটা তফাতে।

সামনে একফালি রক, তারপরে একটা ঘর। সিঁড়ি দে' উঠে আমরা সেই রকের ওপর গিয়ে দাঁড়ানু। এই গেচে, তারপর সঙ্গে সঙ্গে আবার ফেরা, ন্বিধেয় পড়ে একটু চুপ ক'রে দাঁইড়ো আছে দুজনে, ভেতর থেকে একজন স্ত্রীলোক জিগ্যেসলে—'কি দরকার?' সঙ্গে সঙ্গে যেন চিনে নিয়ে বললে—'ও আপনারা? তা এই তো এসেছিলেন?'

—'একটু যেন ব্যাজার ভাব।' জটে বললে—'একবার দর্শন পাব না বাবার? বিশেষ কাজ।'

'দেখি'—ব'লে ভেতরে চলে গেল স্ত্রীলোকটি। বেশ সুন্দরীই, বয়েস আঁচ করবার নিজেরই বয়েস নয় ত্যাখন আমার, তবে মনে হোল দিদিমণির চেয়ে বেশ খানিকটে বড়, এখনকার আন্দাজে তিরিশ-বত্রিশ হবে। এলো চুল, একটা লালপেড়ে শাড়ী পরা, গেরুয়ায় ছোবানো। ও আর এলনি, একটু পরে খোদ বাবাজী—হয়তো ব্যাজারই হয়েচে, দেরি দেখে তাই মনে হয়, তবে বাবাজীদের মার্কামারা মিঠে হাসি নিয়েই বেইরে এসে বললে—'কে, ছিরানন্দ? আবার হঠাৎ যে?'

ঐ নামের সঙ্গে যিনি খরচার ঐ আনন্দটুকু জুড়ে দিয়ে হাত ক'রে নিয়েচে আর কি, জানে তো বাপের টাকা আচে। ইতিমধ্যে, ওর পায়ের আওয়াজ পেতে না পেতে ধরাশায়ী হ'য়ে পড়েচে, দুজনে ওদের দেখাদেখি আম্মো।

প্রেশ্নটা শুনে ছিরু ঝোলাল পকেট থেকে বের ক'রে হাতেই রেখে ছেল, উঠে-পড়ে—একটি ভরি তিনেকের দড়ি-পাকানো গাঁজার গাঁট পায়ের কাচে রেখে দিয়ে বললে—আমি আবার খানিকটা বাড়তি ভক্তি দেখিয়ে ত্যাখনও পড়েই ছেলুম তো—পাঁজরায় একটা গুঁতো দিয়ে উঠতে ইসেরা কারে বললে, 'আজ্ঞে অধীনের বোনপো। দীক্ষে দিয়ে চরণে স্থান দিতে হবে একটু। বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, ধ'রে নিয়ে এসেচি।'

শুনতে দেরি, আমার তো কাল ঘাম ছুটে গেল দাঠাকুর। বলে কি, গাঁচিয়ে দেবে নাকি আমায় এর হাতে। ত্যাখন হাতটাও ছাড়া, মরিয়া হ'য়ে ছুটে পালাবই ভেবে খিড়কির দোরটার দিকে চেয়েচি, উনি বললে—'তা পাবে দীক্ষে, এ আর শক্ত কথা কি? তার তোর ভাগ্যনা। আজ আর নয়, পরশু তিথিমতে যোগ আচে, সকালে চান-টান করিয়ে নে'সবি।'

এগিয়ে এসে আমারও মাথায় হাত দিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ব'ললে—'হবে, হবে, একবার রাধারমণের পায়ে সঁপে দিলে সব বাউণ্ডুলেপনা ঘুচে যাবে।'

প্রেথমটা ভয়তরাস, তার পিঠোপিঠি আবার এই মিষ্টি কথা, তার ওপর, এখুনি আটকেও ফেলচে না—সব মিলিয়ে মনটা হঠাৎ উৎলে উঠে, আমি দু'-হাতে মুখ ঢেকে একেবারে হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠে তার মধ্যেই বলনু—'আমি অতি অধম, আমায় পরিত্রাণ করুন ছিচরণে স্থান দিয়ে ভবযন্ত্রণা থেকে।'

যাত্রায় শোনা দমভারি কথাগুলো তো জিভেই লেগে থাকত। বাবাজী হাতটা মাথায় বুলিয়ে বললে—'হবে, হবে, পুব্ব-জন্মের সাদনা রয়েছে।'

রাস্তায় সেই তেমাথা পর্যন্ত আর কোন কথা হোল না। নেশার ওপর দিয়ে বেশ খানিকটে বাঘাত গেল তো, ওরা যেন আঁচল দিয়ে পিদিমের মতো বাঁচো বাঁচোই এল। তারপর তেমাথায় এসে ঘ্যাখন প্রেথক হুখ, দাঁইড়ো প'ড়ে জটেই সুদোলে—'কেমন দেখলি এবার?'

বলনু—'ঘরের ছাড়া কার্ত্তিক, কটা দাঁত বাদে।'

বললে—'দাঁতের কথা তুলবিনে, খবরদার। পরশু সব বুঝে-টুঝে নিয়ে সক্কাল-বেলা চান-টান সেরে এইখেনে এসে ওপিক্ষে করবি, তুই শালা তো আবার মনের ভাবও জানতে পারিস। যা!'

প্রেথমটা আস্তে-আস্তেই কয়েক পা এগিয়ে, ঘ্যাখন ঘুরে দেখনু, ওরা মোড়ের বাঁকে আড়াল হ'য়ে গেচে, টেনে চোঁচা দৌড়, আর পারি চেপে রাখতে? আজ্ঞে, সেই বাবাজী, সেবারে ঘ্যাখন আসে, বার-দুই দেখেছিনু দামোদর চৌধুরীর দেউড়িতে নুকিয়েই, সেও তো কতকটা গোপন ব্যাপারই। ও আমায় দেখেনি। একেবারে সেই চীজ, ননী-মাখন-খাওয়া ঢলঢলে চেহারা, মাথায় ফাগুন-চোৎ মাসের পাকা তেঁতুলের মতন গোটা সাতেক জট, দাড়ি-গোঁফ সব কামানো, একেবারে নিগ্‌ঘাৎ সেই। আর বাড়িও নয়, বাবা তো সেই রেতে আসবে, আমি ছুটতে ছুটতে একেবারে সেই চৌধুরী বাড়ি। ঘ্যাখন হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছুলুম, ফটক পেরিয়েই সেরেস্তার দাসু পোদ্দারের সঙ্গে দেখা। 'কি রে, হ'য়েছে কি? এই রোদ মাথায় ক'রে ছুটে এয়েচিস্—'ভির্মি' খাবি যে!'

এয়েচি তা ঐ এক খেয়াল নিয়ে, অন্য কথা ভেবে রাখাও হয়নি, ওনার কথাটাই লুফে নিয়ে বলনু—'ঠাকুরমা ভির্মি গেচে।'

'এ্যাঁ!'—ব'লে চমকে উঠে বললে—'তুই বোস গিয়ে বারান্দায় ঠাণ্ডায়। জল-টল খাসনি এখন, সর্দিগর্মী হয়ে যাবে। আমি তোর বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।'

খানিকটে পথ পজ্জন্ত তো বাবারও ভির্মি খাওয়ার অবস্তা। ঠাকমার বয়স হয়েচে, মাঝে-মাঝে দিচ্চেই লুটিস—তারপর দেউড়ি থেকে বেশ খানিকটে যেয়ে বলনু—'ঠাকুরমার কিচু হয়নি। আমি বাবাজীকে দেখে এলুম কুসমীতে।'

সুদোলে। 'কোন বাবজী রে?'

বলনু—'সেই বোষ্টম বাবাজী। সেই যার কথা তুমি বলেছিলে—তাল্লাস নিতে।'

'কুসমীতে দেখলি, তা কোথায়?'

'দেউড়ির মধ্যেই নুকো রয়েচে।'

'তারপর?' — সুদোলে বাবা, খুব আশ্চায্যি হয়ে গেচে। আমি আরম্ভ করছিনু একটু গুচিয়েই, এই সময় পেছন থেকে বারাণসী মণ্ডলের ছই-দেওয়া বলদের গাড়িটা

পেছন থেকে এসে পড়াতে বললে—'থাক এখন, চল্ উঠে বসি। এরকম ক'রে আশ্বিনের রোদে ছুটে আসে কখনও?'

গাড়িটা এসে পড়তে থামাতে ব'লে দুজনে উঠে বসতে ব'ললে—'একটু ল্যাজ-মোড়া দিয়ে চালাতে হবে বারাণসী ভাই। খবর এনেচে—মার নাকি শরীলটে হঠাৎ খারাপ হয়েচে।'

বাড়িতে এসে আমায় জলটল খাইয়ে খানিকটা ধাতস্ত ক'রে একেবারে সদরে নিয়ে গিয়ে বসল। সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বললুম—তেমাথায় ছিরু-জটের সঙ্গে দেখা হওয়া ইস্তক যা যা হোল। শুনে বললে—'এবার তোর কাজ হ'য়ে গেচে, আর এর মধ্যে থাকবিনে মোটে। আর, এর একটি কথা বাইরে যাবে না।'

সুদোলুম — 'ব্রজঠাকরুণ আর দিদি-মণি?'

বল'লে—'একেবারে কাউকে নয়।'

ভয় পাইয়েও দিলে। বললে—'ব্রেজ-ঠাকরুণকে ঐ বিয়ের কথা বলগে না গিয়ে, তোর হাড় একদিনে মাস একদিকে করবে। তুই চুপ করে থাক্, আমি যাকে যেমন ক'রে বলবার বলব।'

বাপই তো, খুশী হয়েচে ভেতরে ভেতরে। একটু তাইয়েও দিলে, বললে, 'যা যা করেচিস্ বলেচিস্, কেরামতি আচে। যা, এবার আমি ইন-চার্জ নিচ্চি। কিন্তু ঐ যা বলনু মুখ খুলবিনে কারুর কাচে।'

বললুম—'আমার গরজটা কি?'

কিন্তু তা কি সম্ভব? অতবড় খবর পেটে নিয়ে বসে থাকব, পেট ফুলে মারা যাব না? তার ওপর কেরামতির সার্টিফিকেট পেয়েচি।

হাক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বাড়িতেই খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, দিদিমণির ওখানে গিয়ে পেঁছুতে একটু বিলম্বই হয়ে গেল। জামাইবাবু অনেকক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে বেইরে গেচে, একটানাই শুনে গেল দিদিমণি।

শেষ হলে শুধু চোখ দুটো একটু ঘুইরে ঘুইরে বললে—'মেয়েছেলে আচে একটা এর মধ্যে না?'

বললুম—'তাই তো দেখনু। কেন গো দিদিমণি?'

বললে—'না, এমনি জিজ্ঞেস করচি।'

এই সময় জামাইবাবুর ওয়েলার ঘোড়া শব্দ ক'রে সদরে এসে দাঁড়াতে উঠে পড়ে বললে—'এসে গেল। তুই যা এখন, কাল একটু সকাল সকাল আসবি, সব ভালো ক'রে শুনতে হবে। টগরকে বলে দিচ্চি কিছু না খেয়ে যাবিনে।'

ওখেন থেকে আসতে সন্ধ্যে উৎরে গেল। সিধে ব্রেজঠাকরুণের কাচেই যাচ্ছিনু, দেখি বাবা এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে দরজা দিয়ে সেঁদুল।

বাবা ইন্-চার্জ নিলে বটে, দাঠাকুর, কিন্তু দিন পনেরো পর্যন্ত আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। হয়তো বাবা নুকোয়, আগে যেমন দেউড়ি থেকে এসে নেশার ঝোঁকে বিড়বিড় ক'রে বকত—দিনের দিন কি হ'চ্চে মোটামুটি জানা যেত, ইদিকে আর সেরকমটা দেখা যায় না। এসে পেরায় শুয়েই পড়ে, এক একদিন শুধু—'আমি দেখে নেব ও হারামজাদাদের, আমার নাম শিবদাস মণ্ডল।' —এই ধরনের আপসানি।

মা ধমক দেয়, বলে—'আচ্ছা মস্ত বীর-পুরুষ, এখন ঠান্ডা হয়ে শোও গিয়ে। যাত বলি, ওদের পাকা উঠেচে, ওরা মরবেই, তুমি গরীব মানুষ, থেকো না এর মধ্যে, নিজের কাজ বাজিয়ে ঘরে এসে বোস, তা কার কথা কে শোনে?'

উদিকে য্যাতটুকু খবর পেতুম, তাতে দেখতুম—দুটো জিনিষ বেড়ে গেচে এদানি, ক্রেমেই যাচ্চেও বেড়ে; এক, দামোদর চৌধুরীর নেশা, আর কুসুমীর দেউড়িতে যাওয়া-আসা—আজ্ঞে, উভয় পক্ষেই। সেখেনে গিয়ে কতটা কি হয়, তেমন জানতে পারি না। বাবার সঙ্গে এগুনে যেমন বার কয়েক গেছলুম তেমন যদি যেতে পারতুম তো—আমিও বাপ্‌কা বেটা—আনতুমই কিছু না কিছু পুঁটুলি বেঁধে, তা বাবা তো আমায় নে' যায় না। প্রেথম তো সে চায়ই না যে আমি আর এর মধ্যে থাকি, তার ওপর, বাবাজীরও তো নজরে পড়ে যেতে পারি।

খুব নুকিয়ে রেখেচে বাবা। জানবার মধ্যে এক ব্রেজঠাকরুণ জানেই। আমি ওনার আশেপাশে একটু ঘুলঘুল করতুমই, তাই বাবাকে আরও ক'বার সেই রকম একটু গা-ঢাকা দিয়ে ওনার বাড়ী যেতে দেখনু; বেরুতেও দেখনু ক'বার। জানেই ব্রেজ-ঠাকুরুণ। কিন্তুক কেউ কিছু বলে এসতে বললে, গিয়ে দুটো কথা নিজের মন থেকে বানিয়েও বলে, কিছু কথা বের ক'রে নিলুম, এই পজ্জন্ত চলে, আপনি ওপরপড়া হয়ে ওনাকে জিগোব, এতবড় বুকের পাটা তো ছেল না। এদানি ওনার মুখটা—এমনি ভারি—আরও যেন ভারিক্কে হয়ে থাকত।

জামাইবাবু কি ওনার কাকা রায়-চৌধুরীমশাই যদি জানেই, অতদূর ওঠবার সাধ্যিই নেই আমার। বাকি থাকে দিদি-মণি। ওনার কাচেই বেশি যাওয়া-আসা আমার, কিন্তুক গেলে উনি যেমন আমার পানে চেয়ে সুদোয়, কিছু টের পেনু কিনা, যেমন ক'রে একটু ঠাট্টার হাসি হেসে এক্কেবারেই 'গবেট' ব'লে ঠাট্টা করে, তাতে বেশ বোঝা যায় সমস্তটুকু ওনার কাচেও নুকুনো হয়েচে।

তারপর আবার একদিন ওনার কাচেই সব শুনলুম।

জামাইবাবু কি একটা কাজে হুগলী গেচে, সেখানেই সেদিনটা থেকে পরের দিন কোন সময় আসবে। দিদিমণি আমায় একটু সকাল সকাল ডেকে পাঠেছেল গল্প-সল্প করবার জন্যে, যেতে বললে—'এসেচিস? বোস, অনেক খবর আচে। কিন্তু শোনবার আগে শপথ করবি, কাউকে বলবিনি। কাউকে মানে, বাইরের কাউকে, নৈলে তোর বাবা তো জানেই, সেই সব করচে-কম্মাচে। —হ্যাঁ, একটা মানুষের মতন মানুষ বটে! —আর ওছাড়া, মাসীমা, তোর জামাইবাবু, কাকাবাবু আর দিদি, মানে দামোদর চৌধুরীর বউ, এরা সবাই জানে। কথাটা এর বাইরে এখন যাবে না। পরে যাখন আপনি জানাজানি হয়ে যাবে, কে কার মুখবন্ধ করতে যাবে বল? তুই কুসুমীকে গিয়ে সেই বোস্টমবাবাজীর সঙ্গে একটা মেয়ে দেখেছিলি না? বললি, খুব সুন্দর—তুই সুদোতে আমি বললুম, তুই ছেলেমানুষ, বুঝবিনে—মিলিয়ে দ্যাখ, আমার আন্দাজ ঠিক কিনা।'

দিদিমণি হঠাৎ একটু শিউরে কেঁপে উঠে বললে—'বাবা গো! কী সব্বনাশটা যে হ'তে যাচ্ছেল স্বরূপে! —তোর জামাই-বাবুকে পজ্জন্ত জড়াচ্ছেল, মা মঙ্গলচণ্ডী রক্ষে ক'রেচেন।'

হাতদুটো জোড় ক'রে বার তিনেক কপালে ঠেকালে দিদিমণি। আমি জিজ্ঞেস করনু—'ওনাকে বিধবা-বিয়ে দিত?'

দিদিমণি যেন সেই হুজুগের দিন-গুলোর কথা মনে পড়ে গিয়ে একটু অন্য-মনস্ক হ'য়ে গিয়ে জামাইবাবুকে রুদ্দেশ্য ক'রে বললে—'দিলেই হোত, এক সময় যেমন বড্ড মাতামাতি ক'রেছিলেন বীর-পুরুষ।'

তারপরে আবার একটু নরম হ'য়ে গিয়ে বললে—'পরে কি করবার মতলব ছেল জানিনে, তবে এ যা বলচি, তা নয়। তোর সিদিনকার কথা মনে আচে নিশ্চয় সেই যে ধনঞ্জয় রায় এসেছিল, বারতিনেক, তোর জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করতে—বলে বিধবা-বিয়েটা আবার চাড়া দিয়ে তুলতে হবে। দু'বার বেশ জাপিয়েই গেল তোর জামাইবাবুকে, তারপর তিনবারের বার হঠাৎ
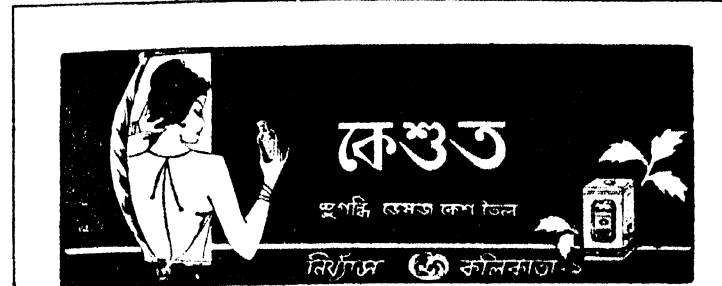
কাকাবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি একেবারে। ধন্মের কল বাতাসে নড়ে, বাহাদুরি ক'রে কাকাবাবুকে বলতে গিয়ে........'

ধন্মের কল বাতাসে নড়ার কথা শুনে আমি বলটা নেবার লোভ আর সামলাতে পারলুম না, বললুম—'আমিই কাকাবাবুর কানে তুলে দেচনু দিদিমণি, রায়মশাই ভয় পেয়ে চেপে যাচ্চে দেখে।'

আবার আশ্চর্য্যি হ'য়ে চোখদুটো বড় বড় ক'রে দিদিমণি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—'তুই বলেছিলি! তবে যে সিদিমকে বললি—ধনঞ্জয়ই কাকাবাবুকে বলে বাহাদুরি করে যে সে আবার গ্রামে বিধবা-বিয়ের ঢেউ তুলতে যাচ্চে?'

আশ্চর্য্যই হয়েচে, কিন্তু মুখে রাগের ভাব নেই দেখে আমি বললুম—'আমিই কানে তুলে দিয়েচি বললে তুমি চটে যেতে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে কাঁধে ছোট্ট একটু ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—'নেঃ, ভালোই করেছিলি। তাহলে বুঝতে হবে তোর মুখেই সিদিনে ধম্ম এসে আসন পেতেছিল। নৈলে কী সব্বনাশটা যে হোত স্বরূপে, ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সিদিন কাকাবাবু শুনে আর বাড়িতে না ঢুকে অমন ক'রে সোজা বেরিয়ে গেল—তোর জামাইবাবু ও'কে না বলেই মহালে চলে যাওয়ার জন্যেই না? —মাসীমা গিয়ে বুঝিয়ে আসতে আবার ঠান্ডাও হয়ে গেল। কিন্তু এ যা মতলব করেছেল ধনঞ্জয়, আর কি জন্মেও খুড়ো-ভাইপোয় মুখ দেখাদেখি থাকতো? না, সত্যিই ধম্ম এসে সিদিমকে তোর মুখে অদিষ্ঠান হয়েছিলেন, নৈলে সব চাপাচুপি থেকে কোথায় গিয়ে যে ঠেকে উঠত ব্যাপারটা! সবটুকু শোন, তা'হলেই বুঝতে পারবি।

গোড়া থেকে মিলিয়ে যা। কুসমীর সঙ্গে মসনের বরাবর আড়াআড়ি, মসনের কোন জমিদার ঘরের সঙ্গেই মিল নেই। চৌধুরী বাড়ির সঙ্গে আরও যেন আদায়-কাঁচকলায়। হঠাৎ চৌধুরীমশাই ঘোর বোষ্টম বনে গেল, ধনঞ্জয়ের বাপ মিত্যুঞ্জয় গিয়ে ধমঞ্জয়ের মতন একটা আকাটের সঙ্গে

ওর মেয়ের বিয়ের কথা পাড়লে—সব ঠিক-ঠাক, তোরেই বাবার বুদ্ধিতে সামলে গিয়ে কুসমীর বরযাত্রীদের সেই অনন্ত দুর্দশা—কয়েকটা লাস ফেলে রেখেই প্রাণ নিয়ে পালাতে হোল। মিলিয়ে যা। মিত্যুঞ্জয় সঙ বের ক'রলে চৌধুরী মশাইয়ের নামে। তারপরে, সে মরে যেতেই—শোনা যায় নাকি, বিয়ে দিতে এসে চোট খায়, তাতেই গেল মারা,—মারা যেতেই একেবারে মাটির মানুষ ধনঞ্জয়! ছেরাদ্দর কাচা গলায় দিয়ে গিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে, বাপের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে গেল চৌধুরী মশাইকে। কথায় বলে মাতালস্য নানা-ভঙ্গি, চৌধুরী মশাইও গেলেন গলে। কারুর কথা শোনবার লোক নয়, নিজেও একবার ভেবে দেখলেন না যে সুয্যি পশ্চিমে উঠতে পারে, তবু ধনঞ্জয়ের মতন শয়তান নিজের শয়তানি ছাড়তে পারে না। যাওয়া-আসা, গলাগলি, 'ধনু' ব'লতে মুখে নাল পড়ে চৌধুরী মশাইয়ের।

'ধনু' ইদিকে তলে তলে ঠিক নিজের মতলব চালিয়ে যাচ্ছে। ও সঙে কুলল না, এবার যা সং সাজাবে তাতে সমস্ত চৌধুরী বংশের মুখে চিরকালের জন্যে কালি লেপে দেবে। কিছু আন্দাজ করতে পারিস?'

আমি সুদোলাম, 'কি ক'রতো গা?'

বললে—'ঐ যে মেয়েটাকে এনেছেল, তুই বাবাজীর সঙ্গে দেখেছিলি, তার সঙ্গে বিয়ে দিতে যাচ্ছেল চৌধুরী মশাইয়ের। ওর দিকে তো আর বিয়ের বয়েস নেই, সোতরাং বিধবা-বিয়ে। বাবাজীর কেউ বলে নয়, ধনঞ্জয়েরই এক মাসীর বিধবা মেয়ে বলে চালিয়ে দেবে। পৃথিবীতে সবাই নিজের নিজের তালে থাকে তো। মতলবটা বাবাজীরই। কোথা থেকে জুটিয়ে এনেচে মেয়েটাকে—ওদের তো ব্যবসাই এই, চৌধুরী মশাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে তো পোয়াবারো, ঘরটা বাঁধা হ'য়ে গেল। এদিকে ধনঞ্জয় যদি মাসীর মেয়ে বলে ঐ জাত-কুল ছাড়া মেয়েটাকে গচিয়ে দিতে পারে চৌধুরী মশাইকে, তা'হলে হাজারটা সঙ বের ক'রলে যা না হবে, এক এই বিয়েতেই তার বাড়া হয়ে যাবে। আর চৌধুরী বংশকে মাথা সোজা করে সমাজে দাঁড়াতে হবে না। তবে, এমনি নয়, বিয়ে হওয়া চাই, তানা হ'লে এমনি তো কত কি হচ্ছে। থাক্, সে সব তুই ছেলেমানুষ শুনে কাজ নেই।

তা মরুকগে না। একদিকে মাতাল, এক দিকে শয়তান — একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ, এ না হ'লে তো যায়ই না। হোত তো হোত, আর দশজনের শিক্ষা হোত। কিন্তু আমাদের এর মধ্যে টানা কেন? নিজের ধান্ধা নিয়ে একপাশে প'ড়ে আচি। বলু দিকিন, এ দুর্বুদ্ধি ঢুকল কেন মাথায়?'

বললুম—'এরপর অন্য মেয়ে এনে জামাইবাবুর ঘাড়ে চাপাবে?'

দিদিমণি নাক সিঁটকে বললে — 'নেঃ সবাই নিরীহ চৌধুরী-গিন্নী কি না। ঘোঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো না? আসুক না, স্বগ্গের অপ্সরাই নিয়ে আসুক, আমিও [illegible]। তোর জামাইবাবুকে জড়াতে চাইছেল, তা'হলে একটা জোর হয় আর কি। একটা শিক্ষিত মানুষ যার নিজের স্বভাব-চরিত্রে কোনও দোষ নেই, সে যাখন এর মধ্যে আচে, তাখন লোকে ভাববে ঐ একটা নিশ্চই হিন্দু-ধম্ম রিফমেরই ব্যাপার। কাজটা নুকিয়েই হচ্চে—যদি প্রেকাশ হয়ে পড়ে তো নিজের দিকে বিধবা-পার্টির দলটাও থাকবে। সোতরাং তোর জামাইবাবুকে দাঁড় করিয়ে একটা ঘোট তোলা হোক প্রেথমে, ইদিকে তলে তলে বিয়েটা হ'য়ে যাক্।

হোতেই স্বরূপে, নিয্যাৎ হয়ে যেত, ওরা যেমন তোড়-জোড় করে নেমেছেল। কিন্তু এখনও তো চারপো কলি হয়নি যে জন'কয়েক নিরীহ লোক এই ক'রে শেষ হবে। তোর জামাইবাবু, তারপর চৌধুরী মশাই বা নয় কেন বল? —যেহেতু মাতাল হোক, নিজের ঘরেই আচে; কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, মারাই তো পড়তে বসেছেল বেচারি। তারপর আচে চৌধুরী-গিন্নী! আহা, বেচারি চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কিছু জানে না।

'হোলনি কিছু? জিজ্ঞেস করনু আমি।

দিদিমণি বললে—'ঐ তো বললুম, এখনও চন্দ্র-সুয্যি উঠচে মাথার ওপর, হলেই হোল? আপনি কেমন ধাপে ধাপে উঠে গেল দেখনা। তা যদি বললি তো শুরুতে আর শেষে তোরাই বাপ-বেটা দুজনে রয়েচিস। মিলিয়ে দেখ,—ধনঞ্জয় এল তোর জামাইবাবুকে জপাতে, পড়বি তো পড় একেবারে বাঘের মুখে! —আসল কথা চাপতে চায় দেখে তুই ফাঁস করে দিলি। — কাকাবাবু একেবারে আগুন—ভয় পেয়ে মাসীমাকে ডেকে আনলুম—মাসীমা এদিকে বিন্দাবন থেকে ছুটে এসেচে বাবাজী মসনেতে এসেচে শুনে —তোর বাবাকে লাগাক খুঁজে বের করবার জন্যে—তোর বাবা লাগালে তোকে, গোঁজেল দিয়ে গোঁজেলের পাত্তা নেওয়া—কেঁচো খুঁড়তে সাপ একেবারে! বিধবা-বিয়ের আয়োজন! কাতে কাতে গো! না, মসনের চৌধুরী মশায়ের আর কুসমীর রায় মশায়ের মাসতুতো বিধবা-বোনের সঙ্গে।

—দিলে তোর বাবা আবার সব ভেস্তে সেবারে সুধার বিয়ের মতন।'

'কি করে গা দিদিমণি?' হাঁ করে শুনতে শুনতে সুদোলাম আমি।

দিদিমণি একটু চুপ করে ভাবলে, তারপর বললে—'একেবারে নুকুনো কথা স্বরূপে। এদিকে তুই খানিকটা জানতিসই তাই বললুম—এরপর যা হয়েচে তা একেবারে কাক-কোকিলে জানতে পারে না। তোর না শোনাই ভালো। তোর বাবা তোকে কিছু আঁচ দেয়নি তো?'

বললুম—'কৈ না তো, তা'হলে তোমার সন্দুই?'

বললে — 'তা'হলেই বোঝ আমার বলাটা কি রকম হবে। আমার আবার তোর জামাইবাবুর কাছে শোনা, তোর বাবার কাছে শুনলেও বরং কথা হোত।'

আমি বলনু—'তাতে কি হয়েচে? কথা তো সেই এক।'

বললে—'একজন গুরুজন নয়?' একটু যেন লজ্জা-লজ্জা ভাব নিয়ে চেয়ে রইল আমার পানে।

আমি বলনু — 'তেমনি তুমিও তো আমার গুরুজন।'

একটু হাসি-হাসি ভাব এসে গেছল ঠোঁটে, এবার দিদিমণি একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠল। বললে—'মাথামুণ্ডু নেই, কি তক্কের ছিরি! তোমার গুরু তোমায় বলেচে তো তুমি আমার গুরু আমায় বলতে দোষ কি? আর আমার গুরু যদি মানা করে দিয়ে থাকে আমায়?'

বলনু—'তুমিও মানা করে দাও না।'

হাসির জেরটা রয়েচেই একটু সামলে নিয়ে বললে—'নাও, বোঝাও এখন ওকে! আদাড়ে তর্কে পেয়েছে, কোনমতে ছাড়বে না ছোঁড়া। দুই গুরু একরকম হল, তা বল?'

বলনু—'পতি পরমগুরু।'

এবার হাসির চোটে ঘাড়টা একেবারে উল্টে গেল দিদিমণির। বললে — 'আবার পণ্ডিতের মতন বিধান দিয়ে শাস্তরও আওড়ায় দেখো।'

এবার কিভাবে কথাটা লেগেচে মনে, একটু থেমে আসে আবার খুক-খুক করে হেসে উঠে। চোখে জল এসে গেচে হাসির চোটে। আমি হাঁদার মতো হাঁ করে বসে আছি, এমন কি হাসির কথা বলচি ভেবে, একসময় আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিলে, একটু থির হয়ে বসে থেকে বললে—'থাক্, তুই য্যাখন শুনতে ছাড়বিইনি, তাহলে শোন্, আমি পরমগুরুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবো। কিন্তু দিব্যি কর কাউকে বলবিনি। এমনি নয়, আমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করতে হবে।'

আমি হাত বাইড়েচি, পা দুটো টেনে নিয়ে বললে—'থাক হয়েচে। হ্যাঁ, কথা যা রাখবি জানিই, শেষকালে পায়ে গোদ হয়ে মরি আরকি! বেশ, তোর জামাইবাবু যেমন আমাকে আর একজনকে মাত্র বলবার অধিকার দেছে (দিদিমণি হেসে বললে)—জানেই তো তোকে বলবই, তেমনি তোকে আমি মাত্র একজনকে বলবার অধিকার দিচ্চি। নৈলে জানি, পেট ফুলে মরবি। কাকে বলবি?'

বলনু—মাসীমাকে?

বললে—'পুঁতে ফেলবে খিড়কির ডোবায়।' তুই বরং তোর জামাইবাবুকে বলিস, যার কথা তার কাচে যাবে। হ্যাঁ তবে আমি বলেচি কোনমতে বলবিনি। ভাববে, ভালোরে ভালো! এ ছোঁড়া যে আমার চেয়েও দিগ্বিজয় ক'রে বেড়াচ্চে। বেশ হবে। কখনু বলবি বলতো। এগুতে সায়েব য্যাখন ঘোড়া চড়ে বেড়াতে বেরুতেন তাখনই না তোদের গপ্প জমত—আমি এখেনে আসবার আগে।'

স্বরূপ হঠাৎ মুখটা লজ্জিতভাবে নামিয়ে নিল, বাঁশ ছুলাতে ছুলাতে। বলল—'আসল কথা দাঠাকুর, সেসব দিনে জামাইবাবুকে নিয়ে কোন কথা উঠলেই দিদিমণি এইরকম করে ফিকড়ি বের করে টেনে নিয়ে যেত; আরও বেশি করে, আমার সঙ্গে যদি হোল। কি ভালোটাই যে বাসত অনেক সুখদুখের মধ্যে দিয়ে একসঙ্গে কাটালুম বলে — নিজের আহ্লাদের ভাগ দিয়ে যে কী আহ্লাদটাই হোত ওর!'

কাপড়ের খুঁটে চোখ দুটো মুছে নিয়ে একটু চুপ করেই বসে রইল। একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল—'এই যেমন আমাকেই দেখছেন দিদিমণির কথা উঠলে, কোথা থেকে কোথায় চলে যাই, খেই হারিয়ে। হ্যাঁ কি যেন বলছিনু।'

বললাম — 'তোমার বাবা কি করে সব জেনে নিয়ে পণ্ড করে দিলে বিয়েটা—দিদিমণি সেই কথা বলতে যাচ্ছিল তোমায়।'

স্বরূপ বলল—'হ্যাঁ, তাই তো। সব বলে দিদিমণি, এবার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে গলাটা একটু নাবো এনে বললে—'কি ফিকিরে যে তোর বাবা স্বরূপে! কি করলে জানিস? ও যেমন চৌধুরী মশায়ের খাস কামরার চাকর, ঐ দিকেও তেমনি তোদের জাতেরই একটা লোক ধনঞ্জয়েরও খাস কামরার চাকর রয়েচে। পেরায় তোর বাবার সমবয়সীও। আগে হয়তো একটু জানাশোনা ছিল—তোর বাবা আবার জেতের মোড়লও, তাতে তো অন্তত জানতই, এদানি যে তোর বাবা চৌধুরী মশায়ের সঙ্গে কুসমীতে যাওয়া-আসা করত তাতে বেশ খানিকটা দহরম-মহরম হয়ে পড়ল। দুই খাস চাকরে। এরপর তোর বাবা ওকে হাত করে ফেললে আস্তে আস্তে। লোকটার নাম দ্বিজপদ। জমিদারদের খাস চাকরের একটু নেশার অব্যেস থাকেই—বোতল-ঝাড়া না একটু-আধটু পায় তাই থেকে। তা বলে কি তোর জামাইবাবুর চাকর ব্রেজেনেরও থাকবে? —টের পেলে পত্রপাঠ বিদেয় করবে না? অভ্যেস থাকে, সেখানে খোদ কর্তারও দোষ রয়েচে, যেমন চৌধুরীমশায়ের, ধনঞ্জয়ের। দ্বিজপদকে হাত করবার ঐ হোল অস্তোর তোর বাবার। ছিটে-ফোঁটায় কি হাত করা যায়? শিবনাথ বিলিতি মদের বোতলকে বোতল পাচার করে জমিয়ে বসতে লাগল দ্বিজপদর বাড়িতে গিয়ে, একটা বেশ নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে, রাত য্যাখন নিশুতি, মুজেনেরাই ক্রুবরাং হয়ে বাড়ি গেচে আর কি বাবুকে বললে, লোকটার খাঁংখোং জানাই ছেল, দিন তিনেক বসতেই কাজ হয়ে গেল। একটা কাজ হাঁসিল করতে গেচে, শিবনাথ নিজে খুব সামলে-সুমলে থাকে, এদিকে ওকে নেশায় চুরচুর করে তোলে, তাহলেই না পেটের কথা ফরফরিয়ে বেরিয়ে আসবে। বেশ কায়দা করে এগুলো শিবনাথ। পেটে একটু পড়লেই নেশাখোরদের যেদিকে মনটা ঝুঁকল সেইদিকেই একেবারে ঢলে পড়ে তো, যদি গরম হয়ে উঠল তো ধরাধামাকে সরা দেখবে, আর যদি নরমের দিকে গেল তো সংসারে কে কার?—একেবারে বাড়িঘর ছেড়ে বিরাগী হয়ে যাওয়ার দাখিল, যেমন সেবার চৌধুরীমশায়ের হয়েছেল। প্রেথম-দিন আর নয়, নেশা করিয়ে এদিক-ওদিক পাঁচটা সুখদুঃখের কথা করে কাটিয়ে দিলে কখনও হাসি, কখনও কান্না, যেদিকে ঘোরাচ্চে বেশ ঘুরচে লোকটা। তোর বাবা ধাতটা জেনে নিলে আর কি। পরের দিন গিয়ে নেশা যখন বেশ জমে এসেচে—তোর বাবার অমিশা ভাঁওতাই, সংসারের কথাটা দিয়েই আরম্ভ করলে তোর বাবা—ছেলে-মেয়ে পরিবার কেউ কিছু নয়—তেমন যদি কোন গুরু পায় তো এ অসার সংসার ছেড়ে চলে যায়—শুনেচে রায়মশাই নাকি কে একজন মহাপুরুষকে আনিয়েচেন—দ্বিজ-পদের তো খুব যোলবোলাও এখানে, সে যদি বাবাজীকে বলে-করে একবার যোগা-যোগ ঘটিয়ে দিতে পারে তো তারই সেবা-দাস হয়ে সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়ে শিবনাথ।

(ক্রমশঃ)

মানুষগড়ার ইতিকথা

কলকাতার বুকের মাঝখানে মহাত্মা গান্ধী ও মাস্টারদা একটি বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছেন, দুটি রাস্তার জংশন। আর ঠিক ঐ মোড়ের মাথায় আর একটি খাঁটি মানুষের পবিত্র স্মৃতি নামাবলীর মত গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে একাত্তর বছরের প্রাচীন একটি স্কুল। একডাকে সবাই চেনেন—মিত্র ইনস্টিটিউশন, মেন।

বিশ্বেশ্বর মিত্র যখন স্কুলটি খুলেছিলেন তখনো মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মহাত্মা হন নি বা সূর্য সেনের মাস্টারদা হওয়ারই কোন প্রশ্ন ওঠে নি। তখন বৃটিশ এম্পায়ারের দ্বিতীয় রাজধানী আমাদের এই সাধের কলকাতা। পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু শুধু নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির শত শত পীঠস্থানের কোহিনূর মণি ছিল এই শহর। রেঙ্গুন থেকে কাবুল, সারা দেশ ঝেঁটিয়ে ছেলেরা আসত পড়তে নবযুগের নালন্দা কলকাতায়। পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বস্তরের প্রয়োজনীয় শিক্ষার এত বিচিত্র ও ব্যাপক আয়োজন তখন এদেশের অন্যত্র কোথাও সুলভ ছিল না। এত আয়োজন সত্ত্বেও কিন্তু মিত্র মশায়ের মন ওঠে নি। একমাত্র ছেলে নির্মলচন্দ্রের পড়াশোনা যাতে ঠিকমত হয় তাই সে যুগের মহামূল্যমান সরকারী চাকরী দুম করে ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় এসে নিজেই একটা স্কুল খুলে বসলেন, ৫ জানুয়ারী, ১৮৯৮।

স্কুল যখন খোলেন তখন বিশ্বেশ্বরের বয়স পঁয়তাল্লিশ। থাকতেন দমদম ক্যানটনমেন্টে। ক্যান্টনমেন্টে ১৮ নম্বর স্টেশন রোডে, এখন যা নাম পাল্টে হয়েছে ৯, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, ছিল তাঁর নিজস্ব বাড়ী। অবশ্য দেশ তাঁর নদীয়া জেলার রাণাঘাট সাব-ডিভিশনে এরুলি গ্রামে। বিশ্বেশ্বরের বাবা জমিজমা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। ছেলে এফ-এ পাশ করে দমদমে অ্যামুনিশন ফ্যাকটরীতে চাকরী নিয়ে দেশ-গাঁ ছেড়ে চলে এলেন, ক্যান্টনমেন্টে। বিয়ে থা করে হয়ে উঠলেন ঘোরতর সংসারী। চাকরীর টাকা বাঁচিয়ে ও দেশের সম্পত্তির কিছু অংশ বেচে দিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ছোট ছোট দুটি একতলা বাড়ীও বানালেন। চাকরী-বাকরী করেন, জমি-বাড়ীর হদিশ নেন, এই করেই দিন কাটছিল। ইতিমধ্যে সংসারও রীতিমত বড় হয়ে উঠেছে। পর পর চার মেয়ের পর এক ছেলে। মেয়েদের বিয়ে থা দিলেন। এবার ছেলের লেখাপড়ার ব্যাপারে মন দিতে হয়। সবই বেশ স্মুথলি চলছিল। হঠাৎ মাঝপথে সব কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। স্ত্রী মারা গেলেন। দিশেহারা হয়ে পড়লেন বিশ্বেশ্বর। এতদিন সংসারের খুঁটিনাটি দায়-দায়িত্বের বোঝা যিনি বহন করে এসেছেন তাঁর অবর্তমানে সব কিছু কেমন অর্থহীন শুষ্ক বোঝার মত চেপে বসল বিশ্বেশ্বরের ঘাড়ে। সবচেয়ে অসহায় বোধ করলেন একটি বিষয়ে—মা-হারা একরত্তি ছেলেটাকে দেখবার মত পর্যন্ত কেউ নেই বাড়িতে। ওর দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে। নিজে সারাটা দিন অফিসে ব্যস্ত থাকেন। জানতেই পারেন না সারাটা দুপুর ছেলেটার কাটে কি ভাবে। অথচ স্কুলে পাঠানোর বয়স হয়েছে। ছয় পেরিয়ে সাতে পা দিয়েছে নির্মলচন্দ্র। কিন্তু দেবেন কোন স্কুলে?

ক্যান্টনমেন্টে তখন স্কুল কোথায়? স্কুল আছে কলকাতায়। কিন্তু সেখানে পড়াতে হলে নিজেকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হয়। আর যদি থাকতেই হয় তাহলে আর মিছিমিছি এতটা পথ ঠেঙিয়ে চাকরী করা কেন। অনেক হয়েছে। আর তাঁর কিই বা দরকার? ঐ তো একটি মাত্র ছেলে। যা আছে তাতে বাপ-বেটার দুবেলা দুমুঠো চলে যাবে। পঁচিশটা বছর সংসারের জোয়াল কাঁধে বয়ে বেড়িয়েছেন, অভিজ্ঞতাও কম হল না। চোখের সামনে দেখলেন কেমন এক নিমেষে তিল-তিল করে গড়ে তোলা সাধের সাতমহলা গুঁড়িয়ে ধুলোয় মিশে যায়। তাই সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে বেশী দেরী হয় নি বিশ্বেশ্বরের। রেজিগনেশন লেটার অফিসে জমা দিয়ে ছেলের হাত ধরে শিয়ালদহের ট্রেনে উঠে বসলেন।

বেনেটোলা লেনে বর্তমান গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার দোতলা অফিসবাড়ির একতলা

মিত্র ইনস্টিটিউশন (মেন)

ভাড়া নিয়ে নিজেই একটা পাঠশালা খুললেন বিশ্বেশ্বর। নিজের ছেলে ছাড়া আরো চারটি ছেলে জুটল। পাঁচজনকে নিয়েই আজ থেকে একাত্তর বছর আগে মিত্র ইনস্টিটিউশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। গোড়ায় কিছুদিন ক্যান্টনমেন্ট থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করেছেন বিশ্বেশ্বর। কিন্তু নিত্য রেলযাত্রার ধকল সহ্য হচ্ছিল না। তাই দমদমের পাট চুকিয়ে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে চলে এলেন। স্কুলের কাছেই ২১ নম্বর পটুয়াটোলা লেনে একটা দোতলা বাড়িতে এসে উঠলেন। এই বাড়িটিই দু-এক বছরের মধ্যে স্কুলের হোস্টেলে পরিণত হল। ততদিনে স্কুলের চেহারাও পাল্টেছে অনেকটা। পাঠশালা হয়ে উঠেছে রীতিমত একটা মডার্ণ স্কুল। পড়ানো হয় ক্লাশ সিকস পর্যন্ত। মির্জাপুর, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে ছেলে আসছে পড়তে। বিশ্বেশ্বরের অনুরোধে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখার্জী হয়েছেন প্রেসিডেন্ট। সেক্রেটারী স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা। হেডমাস্টার সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতীশবাবু গোড়া থেকেই এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। সতীশকুমার ও বিশ্বেশ্বরের যৌথ চেষ্টায় প্রতিষ্ঠার এক যুগের মধ্যেই স্কুল ইউনিভার্সিটির অনুমোদন পেল। তখন এটি একটি এক্সটেনডেড এম-ই স্কুল অর্থাৎ ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়ানো হয়। এনট্রান্স দিতে হলে ছেলেদের অন্য স্কুলে যেতে হবে। স্কুল আবেদন জানাল নাইন ও টেন খোলার অনুমতি প্রার্থনা করে। অ্যাপ্লিকেশন পেয়ে ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে ইনস্পেকশনে এলেন ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আলেকজান্ডার পেডলার ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সমস্ত দেখে-শুনে বেজায় খুশী দুজনে। সঙ্গে সঙ্গে আবেদন মঞ্জুর হোল। বিশ্বেশ্বরের স্কুল হাইস্কুলের অনুমোদন পেল, ১৯০৪ সাল। সেই সঙ্গে ইউনিভার্সিটি বলে দিল ১৯০৬ সালেই এই স্কুলের ছেলেরা এনট্রান্সে বসতে পারবে। হাতে মোটে দুটি বছর। স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা তখন ক্লাস এইটে পড়ছে। নিয়মমাফিক চলতে গেলে ছয় সালে তাদের ক্লাস টেনে পড়ার কথা। এনট্রান্স দেবে পরের বছর। কিন্তু বিশ্বেশ্বর বা সতীশকুমার কেউই এই সুযোগ ছাড়তে রাজী নন। তাঁরা ক্লাস এইটের কয়েকটি ছাত্র বেছে নিয়ে স্পেশাল কোচিংয়ের আয়োজন করলেন। এই ছাত্ররাই, সংখ্যায় নয়, ছয় সালে পরীক্ষায় বসল। পাশ করেছিল চারজন, একজন ফার্স্ট ডিভিসন, তিনজন সেকেন্ড ডিভিশনে। এর ঠিক পরের বছরই মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র এনট্রান্সে থার্ড হয়ে গোটা দেশকে চমকে দিল। এ বছর তেরোটি ছেলে পরীক্ষা দিয়েছিল; পাশ করেছে ন'জন, দুটি স্কলারশিপ সমেত চারটি ফার্স্ট ডিভিশন। থার্ড স্ট্যান্ড করেছিলেন সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। সুরেন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে একই বছরে এনট্রান্স পাশ করলেন নির্মলচন্দ্র, যার জন্য এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৮৯৮ থেকে ১৯০৭, মাত্র নটি বছর। এই ন বছরেই মিত্র মশায়ের পাঠশালা দেশের অন্যতম সেরা স্কুলে পরিণত হয়েছে। সেরা স্কুলের সার্টিফিকেট এমনি এমনি পায়নি মিত্র ইনস্টিটিউশন। এর জন্য বিশ্বেশ্বর ও সতীশকুমার তাঁদের সর্বস্ব পণ করেছিলেন। গোড়ায় স্কুলের টিউশন ফী ছিল অতি সামান্য। ঐ সামান্য টাকায় স্কুলের খরচ-খরচা মেটানো ছিল অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন বিশ্বেশ্বর। ক্যান্টনমেন্টের দুটি বাড়ির একটি বিক্রী করে দিলেন। হাজার আড়াই টাকা পেয়েছিলেন, সবটাই জমা দিলেন স্কুল ফাণ্ডে। প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেন্টের জন্য পেনসন বাবদ যে পঁচিশ-তিরিশ টাকা পেতেন তাতেই চলে যেত তার নিজস্ব খরচ-খরচা।

এদিকে চার সালে স্কুল যখন রেকগ-নিশন পেল তখন ছাত্রসংখ্যার চাপে পুরোনো বাড়িতে আর জায়গা হয় না। প্রায় শতখানেক ছেলে পড়ছে স্কুলে। আরো বড় বাড়ী চাই। খুঁজে পেতে বেনেটোলা লেনেই পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাড়ীটি ঠিক করা হোল। এখন বিহারী-লাল ইনস্টিটিউট অব হোম সায়েন্সের মেয়েদের হোস্টেল যে চারতলা বাড়িটিতে (লোহিয়া হাউস) রয়েছে আজ থেকে পঁয়ষট্টি বছর আগে ঐ বাড়িতে মিত্র ইনস্টিটিউশন উঠে এসেছিল। তখন বাড়ীটি ছিল দোতলা।

এই বাড়িতে আসার পরই স্কুলের টিউশন ফির হার প্রথম নিয়মিতভাবে ধার্য হল। উঁচুনীচু সব ক্লাসেরই সমান হার — মাসিক চার টাকা। সে যুগে খুব কম স্কুলেরই বেতন-হার এত চড়া ছিল।

বেতনহার চড়া হলে কি হবে, ছাত্র-সংখ্যা কমা দূরে থাক দিন দিন বাড়তে লাগল। বাড়বে নাই বা কেন? গার্জেনরা নিশ্চিন্ত বোধ করতেন বিশ্বেশ্বর-সতীশ-কুমারের হাতে ছেলেকে তুলে দিয়ে, জানতেন এদের তীক্ষ্ন নজর এড়ানো কখনো কোন ছাত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। দুজনেই ছিলেন কঠোর টাস্কমাস্টার। এই দুই স্বভাব-শিক্ষকের পায়ের তলায় বসে [illegible] প্রাথমিক পাঠগ্রহণের সৌভাগ্য [illegible] হয়েছিল তাঁদেরই জবানীতে সে যুগের মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছবিটি তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলি অটলবাবুর কথা। অটল-বিহারী বসু এ স্কুলের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। পরবর্তী জীবনে দীর্ঘদিন এই স্কুলে তিনি শিক্ষকতাও করেছেন। স্কুলের হীরকজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকায় ছোট একটি নিবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন: '...আমার পরম পূজনীয় ৺বিশ্বেশ্বর মিত্র মশাইয়ের পাঠশালায় প্রথম যেদিন ভর্তি হয়েছিলাম সেদিন বুঝিনি— আজ বুঝছি, এমন গুরু ও গুরুগৃহ মানুষের ভাগ্যে সচরাচর মেলে না। এবং সেদিক থেকে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করি। কারণ, মিত্র ইনস্টিটিউশনের মত গুরুগৃহে ৺বিশ্বেশ্বর মিত্র এবং সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত নিষ্কাম গুরুর পদতলে পাঠগ্রহণের দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।'

অটলবাবুর মত এ সৌভাগ্য আরো যাঁরা লাভ করেছিলেন তাঁদেরই অন্যতম এ যুগের ভক্ত সাধক যতীন্দ্র রামানুজ দাস, গার্হস্থ্য আশ্রমে যিনি ছিলেন প্রখ্যাত ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু। তিরিশ ও চল্লিশের যুগে ইন্দুবাবু ছিলেন স্কুলের প্রেসিডেন্ট। সত্তর বছর আগের কথা আজো তাঁর মনে আছে: 'এই বিদ্যালয়ের সহিত আমার সংযোগ ইহার স্থাপনের পর-বৎসর, ১৮৯৯ সাল হইতে। তখন আমি শিশু-শ্রেণীতে ভর্তি হই। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত দশ বৎসর এখানে শিক্ষালাভ করি। সূচনার পর হইতে এই দশ বৎসরের মধ্যে ইহা বঙ্গদেশের মধ্যে একটি প্রখ্যাত বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ইহার মূলে ছিলেন দুই মহামনীষী; প্রথম বিশ্বেশ্বর মিত্র। তিনি এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ; এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন— সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক ও পরিচালক।'

এই মনীষী শিক্ষকদ্বয়ের পঠন-পাঠনের একটি সুন্দর ছবি পেয়েছি এই স্কুলেরই বর্তমান শতাব্দীর প্রথম যুগের

ছাত্র অপূর্বমণি দত্তের 'পুরোনো পুঁথি' প্রবন্ধে। অপূর্ববাবু পড়তেন কলিকাতা ট্রেণিং একাডেমীতে। একাডেমী ছেড়ে কেন মিত্র ইনস্টিটিউশনে এসেছিলেন তার কারণ তাঁর নিজস্ব জবানীতেই পেশ করছি: ম্যাট্রিকুলেশন তখন সৃজিত হয়নি, প্রবেশিকা পরীক্ষার সঠিক ইংরেজী অনুবাদ 'এনট্রেন্স' ছিল তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ির প্রথম ধাপ। সে ধাপ যাতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারা যায় সেজন্য আসতে হোল এখানে অর্থাৎ মিত্র ইনস্টিটিউশনের ছায়া তলে।...বিশ্বেশ্বর মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্বন্ধের যোগসূত্র ছিল। একদিন বাবার সঙ্গে এসে উপস্থিত হলাম তাঁর ওখানে। 'ওখান' অর্থে যে বাড়ীতে এই স্কুলের হোস্টেল ছিল, সেই ২১ নম্বর পটুয়াটোলা লেনের বাড়ীতে। সে বাড়ীটা আজও বর্তমান আছে কিনা জানি না। বাড়ীতে ঢুকেই প্রকাণ্ড উঠান এবং সেখানে একটা বিরাট জামরুল গাছ। আজকের দিনে পটুয়াটোলা লেনের মত মূল্যবান স্থানে এতখানি জমির অপচয় আজও তার মালিক সহ্য করছেন কিনা সন্দেহ। তারপর দোতলার উপর একটা প্রকাণ্ড হলঘরে সারি সারি খাটপাতা, তারই একটার উপর আধশোয়া অবস্থায় বসে আছেন এক বিরাট গম্ভীর পুরুষ, পাশে একগাদা বই। তিনিই বিশ্বেশ্বর মিত্র। বললেন, 'খাটতে হবে ভূতের মতন। পারবি? শিখতে হবে অনেক কিছু। খালি বইয়ের বিদেয়তে হবে না। সত্যিকারের বিদ্যে শিখতে হবে।'

সত্যিকারের বিদ্যে শিখবার সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন। সেই সুযোগের কথাও বর্ণনা করেছেন অপূর্ববাবু: 'হেডমাস্টার সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তিনিও খুব গম্ভীর প্রকৃতির।...সতীশবাবু পড়াতেন ইংরাজী এবং ইতিহাস। তাঁরও পড়াবার ধরন ছিল অনন্যসাধারণ। কলিন্সের পকেট ডিক্সনারী (তখন দাম ছিল ছয় আনা মাত্র) প্রত্যেক ছাত্রকে কাছে রাখতে হোত। কোনও একটি নতুন শব্দ পাওয়া গেলেই তিনি বলতেন ডিক্সনারী দেখ। অভিধানে সাধারণত একটা শব্দের কয়েকটা অর্থ লেখা থাকে। সুতরাং ঠিক কোন অর্থটা আমাদের তখনকার প্রয়োজন মেটাবে এটা নিয়ে আলোচনা হোত। এর ফল এই হোত যে সেই শব্দটা সহজে ভোলা সম্ভব হোত না।

'ইতিহাস পড়ানোর তাঁর প্রণালী ছিল বিভিন্ন। বইখানা বন্ধ করে রেখে তিনি বলতেন গল্প—হৃদয়গ্রাহী গল্প। ইংলণ্ডের ইতিহাস কিম্বা মারাঠা অভ্যুত্থানের ইতিহাস যে অমন মনোজ্ঞ করে বলা যায় সে ধারণা আমাদের তখন ছিল না। গল্প হয়ে যাওয়ার পর যখন তাঁর পিরিয়ড শেষ হোত, তখন বলতেন, এই গল্প কাল খাতায় লিখে নিয়ে এসো। বই থেকে টুকো না বাবা নিজের যেটুকু মনে আছে নিজে লিখতে চেষ্টা করো।

'...বিশ্বেশ্বর মিত্র মহাশয় পড়াশুনা করতেন খুব বেশী। তাঁর কাছে কেউ যেতেন, তাঁকে দেখা যেতো অনেকগুলি মোটা মোটা বইয়ের মধ্যে নিমগ্ন। বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে যে সব ভাল ভাল ইংরাজী কথাগুলি পেতেন সেগুলি লিখে রাখতেন তাঁর নোটবুকে। তারপর একদিন স্কুলে এসে ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশন করতেন সেগুলি।...'টুইটম্বুর' ইংরেজী কি হবে বল দিকিন? 'বামুন গেল ঘর তো লাঙ্গল তুলে ধর'—বলতে পারিস কেউ এর ইংরেজী তরজমা? কারও পক্ষেই বলা সম্ভব হোত না। তিনি বলে দিতেন, পকেট ডিক্সনারীর শেষের পাতায় আমরা লিখে নিতাম।'

তাই যে কথা বলছিলাম টিউশন ফীর রেট যত চড়াই হোক না কেন তার চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ মূল্যবান শিক্ষকের পার্সোনাল কেয়ারটুকুর লোভ কোন অভিভাবক ছাড়তে পারেন? পারেন না বলেই দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে মিত্র স্কুলের। বেনেটোলা লেনের নতুন বাড়িতেও আর কুলোয় না। প্রায় তিনশ সোয়া তিনশ ছেলে পড়ছে স্কুলে। জায়গা সমস্যা মেটানোর জন্যই বেনেটোলা লেনের বাড়ি ছেড়ে স্কুল উঠে এল ৫৫ হ্যারিসন রোডের চারতলা ভাড়া বাড়িতে। মাসিক তিনশ টাকা ভাড়া। এসব দশ-এগারো সালের কথা। ইতিমধ্যে এনট্রান্সের চারটি ও ম্যাট্রিকের একটি ব্যাচ বেরিয়ে গেছে। পাঁচটি ব্যাচে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল একশো দুই। চুয়াত্তরজন পাশ করেছে; ফার্স্ট ডিভিশনে বত্রিশজন। তিনজন পেয়েছে স্কলারশিপ।

স্কুলের নাম হয়েছে। ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে প্রচুর। সেজন্য বড় বাড়িও ভাড়া করতে হয়েছে। স্কুল রীতিমত সুপ্রতিষ্ঠিত। ছেলে নির্মলচন্দ্র এনট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সীতে আই-এস-সি পড়ছে। অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগে আজকাল। তবে বয়স হয়েছে বিশ্বেশ্বরের। আগের মত ফি সপ্তাহে দমদম ক্যান্টনমেন্টের বাসায় ছুটে যেতে পারেন না। আর জীবনের অনেকগুলো বছর বোর্ডিংয়ে কাটিয়ে বৃদ্ধবয়সে একটু নিভৃতি-বিলাসী হয়ে উঠলেন বিশ্বম্বর। নিজের বাড়ি ভাড়া দিয়ে বোর্ডিংয়ের পাট চুকিয়ে ঐ পটুয়াটোলা লেনেই একটা বাসা ভাড়া নিলেন। জীবনের শেষ কটি বছর এই ভাড়া বাড়িতেই কেটেছে তাঁর।

২১ নম্বর থেকে ৫৭ নম্বর পটুয়াটোলা লেন, মেসবাড়ি থেকে ভাড়াবাড়ি, বাসাবদলের পালা চলেছে ধীরে-ধীরে, দশ বছর ধরে। এই সময়ে স্কুলের ঠিকানাও পাল্টেছে বার কয়েক। নতুন নতুন অনেক শিক্ষক এসেছেন স্কুলে। শ্রীশচন্দ্র রায় তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। বিশ্বেশ্বর দাশগুপ্ত অঙ্কের প্রধান শিক্ষক ও অফিস-সুপারিনটেনডেন্ট। সেই সব পুরোনো দিনের মাস্টারমশাইয়ের কথা শোনা যাক এ যুগের খ্যাতনামা অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে: "দাশগুপ্ত মশায়ের...গণিতে...অসামান্য দখল ছিল আর মানুষ হিসেবেও চমৎকার, আত্মভোলা প্রকৃতির লোক। বেশভূষায় চরম উদাসীন, মাথার চুল সর্বদাই উঁচু হয়ে থাকত আর প্রচুর চা খেতেন।" উঁচু ক্লাসে যেমন সতীশবাবু, শ্রীশবাবু, দাশগুপ্তবাবু, বিনোদবাবু, রামচন্দ্রবাবুরা অঙ্ক, ইংরেজী ইত্যাদি কঠিন কঠিন বিষয়গুলির জটিলতা দূর করে ছাত্রদের সব সমস্যার সমাধান করে দিতেন, তেমনি নীচু ক্লাসগুলিতে অতুলবাবু, কমলাপতিবাবু, জীবনবাবু, শ্রীপতিবাবু বা অমরবাবুরা তাঁদের পড়ানোর গুণে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে সব ভয় দূর করে ছেলেদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলতেন। ফল কি হত? বিমলাপ্রসাদের নিজের কথাতেই বলি: 'ফলে অতুলবাবু, অমরবাবু এবং অবনীবাবুর কাছে ইংরাজী, ননীবাবুর কাছে অঙ্ক, অধর পণ্ডিত মশায়ের কাছে বাংলা পড়ে যখন ওপর ক্লাশে উঠলুম, তখন আর এক দল শিক্ষক পাকা ভিত্তিতে ইমারৎ গড়বার সুযোগ পেতেন। ফলে, পরীক্ষার ফল খুবই ভালো হত। সরকারী বৃত্তি জুটত দু-তিনজনের ভাগ্যে কিন্তু মিত্র স্কুলের ছেলেদের শিক্ষা ও জ্ঞান গড়পড়তা হিসেবে অন্য স্কুলের 'অ্যাভারেজ'-এর চেয়ে বোধহয় ভালোই হত।'

বিমলাপ্রসাদ বিনয় করে 'বোধহয়' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। স্কুলের রেজাল্ট রেকর্ডের পাতায় একবার চোখ বুলুলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'পরীক্ষার ফল খুবই ভালো হত।' ১৯১১ থেকে ১৯২০ এই দশ বছরে মোট তিনশো তেইশটি ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে এই স্কুল থেকে। পাস দুশো একানব্বইজন। এর মধ্যে দুশো ছাপ্পান্নটি ফার্স্ট ডিভিশন। আর স্কলারসিপ পেয়েছে চৌদ্দজন। বিশেষ করে ১৯১৩ সালে এই স্কুলেরই ছাত্র ম্যাট্রিকে ফার্স্ট হয়ে প্রমাণ করল মিত্র ইনস্টিটিউশন শুধু কলকাতার নয় বাংলা দেশেরও অন্যতম সেরা স্কুল। ঐ বছর মোট তেইশটি ছেলে পরীক্ষা দেয় স্কুল থেকে। তেইশজনই পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশনে। এর মধ্যে দুজন প্লেস পেয়েছেন। প্রথম হলেন প্রমথনাথ সরকার ও তৃতীয় সতীশচন্দ্র সেন। ঐ বছরই কটক থেকে ম্যাট্রিকে সেকেণ্ড হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস।

ছেলেকে মনের মত করে মানুষ করবেন বলে পাঠশালা খুলেছিলেন বিশ্বেশ্বর। মধ্যবয়সে সরকারী চাকরীর নিশ্চিন্ত রক্ষাকবচ দূরে ছুঁড়ে ফেলে যে নিশ্চিত সংগ্রামের পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন, সে পথে তাঁর একমাত্র পাথেয় ছিল আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠা। শেষ পর্যন্ত তাই এনে দিয়েছে তাঁকে দেশজোড়া সুনাম ও খ্যাতি। ডিগ্রীর জোড়ে ছাড়াই তিনি শিক্ষাবিদ হিসাবে বিদ্যৎসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা হয়ে উঠেছে দেশের অন্যতম সেরা স্কুল। বর্তমান শতাব্দীর দেশের যুগে শহর কলকাতায় হিন্দু ও হেয়ারের পরেই মিত্র ইনস্টিটিউশনের নাম ফিরত লোকের মুখে-মুখে। সব শুনে যেছেন, দেখে গেছেন মিত্র

মশাই। দেখে গেছেন তাঁর স্কুল বড় হয়েছে, একমাত্র পুত্র নির্মলচন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জীবনে। সব দেখে-শুনে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে চোখ বুজলেন বিশ্বেশ্বর মিত্র, ১৯১৬ সাল।

বিশ্বেশ্বরের অবর্তমানে স্কুলের সম্পাদন দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিলেন নির্মলচন্দ্র। সেই ১৯১৬ সাল থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত আমৃত্যু চব্বিশ বছর নির্মলচন্দ্র ছিলেন মিত্র ইনস্টিটিউশনের সেক্রেটারী। এই চব্বিশ বছরে কত পরিবর্তন ঘটেছে স্কুলের ইতিহাসে। প্রথম বড় পরিবর্তন হল, আর একবার স্কুলের আংশিক ঠিকানা বদল। বিশ্বেশ্বর যে বছর মারা যান সে বছর স্কুলের ছাত্রসংখ্যা চারশোর কোঠা ছাড়িয়ে গেছে। হ্যারিসন রোডের চারতলা বাড়িতেও জায়গা হয় না। তাই বিশেষ করে প্রাইমারী সেকশনের জন্য সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে গোটা একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া করতে হল। প্রায় এক যুগেরও বেশী সময় সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের বাড়ী দুটিতে স্কুলের প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী সেকশনের ক্লাস বসেছে। এই সময় যে সব কৃতী ছাত্র এই স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শচীন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯১৬ সালে ম্যাট্রিকে থার্ড হন), প্রখ্যাত চিকিৎসক পি কে ঘোষ (১৯১৮ ম্যাট্রিকে নাইন্থ), অধ্যাপক বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯২১), খ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞ সৌমেন ঠাকুর, বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক মন্টু ব্যানার্জি, খ্যাতনামা সাইক্লিস্ট ও ভূপর্যটক বিমল মুখার্জি, সাহিত্যিক দেবেশচন্দ্র দাস (১৯২৭) ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক সুধাংশুকুমার বোস (১৯২৮)। ...

সুধাংশুবাবুদের ব্যাচেই মিত্র স্কুলের ছাত্র আবার স্ট্যান্ড করল ম্যাট্রিকে। সুধীরকুমার মিত্র হলেন ফোর্থ। তখন প্রায় সাত-আটশো ছাত্র পড়ছে স্কুলে। দু-দুটো বাড়িতে স্কুলের ক্লাস বসছে। বিশ-বাইশজন শিক্ষক পড়াচ্ছেন। রীতিমত জমজমাট ব্যাপার। ঠিক এমনি সময় মারা গেলেন সতীশবাবু। একটানা তিরিশ বছর এই স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব তিনি বহন করেছেন। বিশ্বেশ্বর আগেই বিদায় নিয়েছিলেন এবার চলে গেলেন সতীশবাবু। তাঁর শূন্য আসন পূর্ণ করলেন তাঁরই প্রিয় ছাত্র ও সহযোগী নির্মলচন্দ্র, ১৯২৮ সাল।

পরবর্তী বারো বছর নির্মলচন্দ্র একই সঙ্গে দুটি দায়িত্ব পালন করেছেন—সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের। প্রধান শিক্ষক হিসাবে কেমন ছিলেন নির্মলচন্দ্র যদি এই প্রশ্ন ওঠে তাহলে প্রাক্তন ছাত্রদের স্মৃতিচারণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই আমাদের। তিনি ছিলেন 'যাকে বলে গুডম্যান' তারই প্রতীক ছাত্রদের কাছে। সতীশবাবু ছিলেন রীতিমত রাশভারী গম্ভীরপ্রকৃতির মানুষ। প্রাক্তন ছাত্ররাই স্বীকার করেছেন যে, 'সমসাময়িক স্কুল-জগতে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য আর তাঁর চার পাশে প্রবল ব্যক্তিত্বের এমন একটা গণ্ডী ছিল যার মধ্যে ছাত্ররা দূরের কথা শিক্ষকেরাও প্রবেশ করতে অসহায় বোধ করতেন।' আর নির্মলচন্দ্র ছিলেন ঠিক তার উল্টো। চালচলনে স্বভাবতই গম্ভীর, রাজসিক। কিন্তু...আলাপে-আলোচনায়, ক্লাসে ও ক্লাসের বাইরে তাঁর আচরণে ও ভাষায় হাস্যরসের প্রাধান্য' বেশী করে চোখে পড়ত। নির্মলচন্দ্র ছিলেন ছাত্রদের 'অক্লান্ত উৎসাহদাতা এবং ভরসাস্থল। অনেক সমালোচককেই বলতে শুনেছি, বড্ড আসকারা দিচ্ছেন। কিন্তু এখন বুঝি এটা আসকারা নয়। আমাদের বুদ্ধিকে তিনি আহ্বান করতেন, উদ্বোধিত করতেন তার সীমাকে অগ্রাহ্য করে। মনে আছে তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, স্কুলের লাইব্রেরীতে নিয়ে গিয়ে আলমারি দেখিয়ে বললেন, নে এইবার এই সব নোবেল প্রাইজ উইনারদের নভেলগুলো এক-এক করে পড়ে ফেল। এই যে অবাধ সম্বন্ধ আমাদের দিয়েছিলেন তারই ফলে আমাদের বুদ্ধিকে একটু-একটু বিশ্বাস করতে শিখেছিলাম।'

নির্মলচন্দ্র চেয়েছিলেন ছাত্রদের আত্মবিশ্বাস জাগাতে। তাঁর মেথড ব্যর্থ হয় নি স্কুলের ফলাফলই তার প্রমাণ। তাঁর সময়ে বারো বছরে চারবার স্ট্যান্ড করেছে এই ছেলেরা। ঊনত্রিশ সালে সেকেন্ড হন কমলাক্ষ মিত্র। পরের বছর ফোর্থ হলেন ধীরেন্দ্রনাথ রায়। সাঁইত্রিশে শেখরেন্দু ব্যানার্জি হলেন নাইন্থ আর তার দু বছর পরে এইটথ স্ট্যান্ড করেন সুধীন্দ্র চৌধুরী। এ ছাড়া ছত্রিশটি কলারসীপ জুটেছে স্কুলের। শতকরা পাশের হার গড়ে আশীর বেশী ছিল প্রতিবারই। তাঁর আমলেই মিত্র কুলের ছাত্র ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মদনমোহন কুমার, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ইংরাজীর অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সংসদ সদস্য সুহৃদ মল্লিক-চৌধুরী, সাহিত্যিক প্রশান্ত চৌধুরী ও তাঁর ছোট ভাই অসামান্য সুকণ্ঠের অধিকারী রেডিওখ্যাত জয়ন্ত চৌধুরী। আর পড়েছেন নির্মলচন্দ্রের তিন ছেলে সুহাস, বিভাস ও সুভাষ।

মাত্র ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যান নির্মলচন্দ্র। ১৯৪০ সাল। বড়ছেলে সুহাস সদ্য এম-এ পাশ করে সেবারই বি-টি পরীক্ষা দিয়েছেন। নির্মলচন্দ্র তাঁর বড় ছেলেকে শিক্ষকই করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল, সুহাস বি-টি পাশ করলে তাঁকে নিজের স্কুলেই টেনে নেবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হল। নির্মলচন্দ্রের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন সুহাসচন্দ্র। বাপ-ঠাকুর্দার স্কুলের দায়িত্ব বহন করতে হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। এ দায়িত্ব ঠিক চাকরী করার দায়িত্ব নয়। একটা ঐতিহ্যের সুনাম রক্ষার ব্যাপার জড়িত এর সঙ্গে, যে ঐতিহ্যের মধ্যে তাঁর জন্ম ও বিকাশ। কতই বা বয়স তখন সুহাসচন্দ্রের। চব্বিশ কি পঁচিশ। তাঁরাই প্রাক্তন মাস্টারমশাইরা তখন স্কুলে পড়াচ্ছেন। পঞ্চাননবাবু, অটলবাবু, কৃষ্ণদয়ালবাবু, সুধীনবাবু, সন্তোষবাবু, প্রফুল্লবাবু, বঙ্কিমবাবু, সীতানাথবাবুর মত দিকপাল শিক্ষকদের সঙ্গে একযোগে পিতৃ-পিতামহের সুনাম রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেন সুহাসচন্দ্র।

মাত্র চারটি বছর। তখন যুদ্ধের সময়। বোম্বিংয়ের ভয়ে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা গেছে ভীষণভাবে কমে। চল্লিশ সালে যে স্কুলে পড়ত প্রায় এগারোশ ছাত্র চুয়াল্লিশে কমতে-কমতে রোল স্ট্রেংথ দাঁড়াল চারশোয়। তখন স্কুল বসছে বর্তমান ঠিকানায়। চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ সালে নির্মলচন্দ্রের আমলে স্কুলের প্রাইমারী সেকসন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের আস্তানা ছেড়ে আবার উঠে এসেছিল ৪৫ নম্বর বেনেটোলা লেনের লোহিয়া ভবনে। বছর ছয়েক বাদে হ্যারিসন রোড ও বেনেটোলার যৌথ পাট চুকিয়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে স্কুল উঠে আসে শোভাবাজারের দেবেদের তেমহলা বাড়িতে। মির্জাপুর স্ট্রীট, এখন সূর্য সেন স্ট্রীটের উপর এ বাড়ির বারমহল দোতলা, মাঝে তিনতলা ঠাকুরদালান। ঠাকুরদালানের পেছনে অন্দরমহল দোতলা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই বাড়ি। এই বাড়িতেই চিকাগো থেকে ফেরার পর স্বামীজীকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এই বাড়িতেই খুলেছিলেন রিপন কলেজ। মিত্র স্কুল আসবার আগে এটি ছিল সরোজনলিনী নারী শিক্ষা সদনের কর্মকেন্দ্র। পাঁচশো টাকা মাসিক ভাড়ায় স্কুল একচল্লিশ সালে এল এই বাড়িতে। এর ঠিক তিন বছর বাদে মাত্র আঠাশ বছর বয়সে মারা যান সুহাসচন্দ্র। সেই বছরই নির্মলচন্দ্রের মেজো ছেলে বিভাসচন্দ্র অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার হিসাবে জয়েন করেছেন স্কুলে। হেডমাস্টার হলেন স্কুলেরই প্রাক্তন করনিক ও শিক্ষক পঞ্চানন মণ্ডল।

১৯১১ সালে বিমলাপ্রসাদ যখন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন তখন পঞ্চাননবাবু ছিলেন স্কুলের ক্লার্ক। ক্লার্ক থেকে স্কুলের হেডমাস্টার এ যেন লগ কেবিন থেকে হোয়াইট হাউসে উঠে আসা। এই অসামান্য ঘটনাটির মূলে ছিলেন সেই আশ্চর্য মানুষটি—প্রথম প্রধান শিক্ষক সতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমলপ্রসাদ লিখেছেন 'পঞ্চাননবাবুকে আমাদের হেডমাস্টারমশাই নিজ হাতে মানুষ করেছিলেন, বলা চলে।'

আর পঞ্চাননবাবুর হাতে মানুষ হয়েছেন মিত্র ইনস্টিটিউশনের অগণিত ছাত্র। চার যুগেরও বেশী সময় পঞ্চাননবাবু জড়িত ছিলেন এই স্কুলের সঙ্গে। তাঁর চল্লিশ বছরের শিক্ষকতার সুদীর্ঘ সময়ের শেষ আটটি বছর কেটেছে স্কুলের হেডমাস্টার হিসাবে—১৯৪৪ থেকে ১৯৫২ সাল এ সময়ে তিনবার স্ট্যান্ড করেছে মিত্র স্কুলের ছেলেরা। শৈলেন্দ্রনাথ পোদ্দার

চুয়াল্লিশে হন এইটথ। সাতচল্লিশে একই স্থান দখল করেন মিত্রের ছাত্র এ যুগের বিস্মৃত-প্রায় কবি বটকৃষ্ণ দে। আর একান্ন সালে দেখ ম্যাট্রিকে নাইন্থ হন শান্তিকুমার চক্রবর্তী। এই আট বছরে পরীক্ষার্থী নশো তেষট্টিটি ছাত্রের মধ্যে পাস করে আটশো তেরোজন। ফার্স্ট ডিভিশন পায় একশ তিরিশজন ও স্কলারসিপ আটজন।

বাহান্নতে রিটায়ার করলেন পঞ্চাননবাবু। তাঁর জায়গায় হেডমাস্টার হলেন এই স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষক ও জয়েন্ট হেড-মাস্টার প্রকাশইন্দু ভট্টাচার্য। চার বছর প্রকাশবাবু হেডমাস্টার ছিলেন। ছাপ্পান্ন সালে তাঁর রিটায়ারমেন্টের পর জ্ঞানেন্দ্র-কুমার সেনগুপ্ত হলেন হেডমাস্টার। তেতাল্লিশ সালে সুহাসচন্দ্র যখন হেডমাস্টার তখন জ্ঞানবাবু সহকারী শিক্ষক হিসাবে স্কুলে জয়েন করেছিলেন। মিত্র স্কুলে আসার আগে বার বছর অন্য স্কুলে হেড-মাস্টার হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। ছাপ্পান্ন থেকে বাষট্টি, এই ছ বছর তিনি ছিলেন মিত্র স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তাঁর আমলেই ষাট সালে সায়েন্স ও হিউম্যানিটিজ দুটি স্ট্রীম নিয়ে হায়ার সেকেন্ডারী ব্যবস্থা চালু হয়। পরের বছর খোলা হল কমার্স সেকশন। বাষট্টি সালে জ্ঞানেন্দ্রকুমার অবসর নেন। সেই বছরই স্কুলের হেডমাস্টার হলেন বিশ্বেশ্বরের নাতি। নির্মলচন্দ্রের মেজো ছেলে বিভাস-চন্দ্র।

মহালয়ার দিন দুপুরে মিত্র স্কুলের বারবাড়ির দোতলায় হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে বসে কথা হচ্ছিল বিভাসবাবুর সঙ্গে। পুজোর ছুটি শুরু হয়ে গেছে। ঘরে ঘরে তালাবন্ধ। ঠাকুর দালানে কোন একটি সঙ্গীত শিক্ষায়তনের বার্ষিক পরীক্ষার মধুর আওয়াজ রাজবাড়ির পেল্লায় আধ-ভেজানো দরজার ওপর এসে আছড়ে পড়ছিল। বিভাসবাবু স্কুলের ইতিহাস বলছিলেন। লম্বা দীঘল চেহারার মানুষটি চালচলনে রীতিমত যুবক যদিও মধ্যচল্লিশ পেরিয়ে গেছেন বয়সের নিরিখে। কেমন একটা মার্জিত সৌখীনতার ছাপ সারা অবয়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী ছাড়াও খান-দুয়েক বিদেশী তকমাও সংগ্রহে আছে। অথচ স্কুলের ম্যাগাজিনে চোখ না বুলুলে মানুষটির বিদ্যার পরিধি জানা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। অনেক দেশ ঘুরেছেন মানুষটি। দেখেছেন ইংলন্ড, আমেরিকা, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, থাই-ল্যান্ড ইত্যাদি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন ব্যবস্থা আপনার সবচেয়ে মনোমত। এক মুহূর্তও না ভেবে বললেন—বৃটিশ সিসটেম। স্কুলস্তরে বৃটিশ সিসটেমই বেস্ট। আমেরিকান সিসটেম তুলনায় নিরেস। দশ মাস ইউ এস এ-তে ছিলেন। ঘুরে-ঘুরে ওদের স্কুলগুলো দেখেছেন। ভাল লাগে নি বললেন। তবে যেটা ও'কে সবচেয়ে নাড়া দিয়েছে তা হল আমেরিকান স্কুলগুলোর অসংখ্য কোর্স। একটা স্কুলে ছিয়াশীটি বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়েছেন। বললেন যে কোন তিনটি বিষয় নিয়েই ছাত্ররা পড়তে পারে, আমাদের মত চিরকেলে থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় ওদের চিবুতে হয় না। হয় না বলেই ওদের ছেলেদের মনীষায় সত্যিকারের বিকাশ হয়। বলতে-বলতে একটু থামলেন তারপর আস্তে-আস্তে আবার শুরু করলেন—আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ত। আশ্চর্য ইংরাজী লিখত। কিন্তু অঙ্কে একদম কাঁচা। এত কাঁচা যে ম্যাট্রিকই পাস করতে পারল না। অথচ এদেশ না হয়ে আমেরিকায় হলে প্রুফ রিডার হয়ে ওকে সারাটা জীবন কাটাতে হোত না।

বিভাসবাবুর কথা শুনছিলাম। খেয়াল করিনি কখন একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছে। ছেলেটি কি একটা কথা কানে কানে বলে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই বিভাসবাবু বললেন—আমার ছোট ছেলে। সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরে করব করব ভাবছিলাম চট করে ঠোঁটের ডগায় এসে গেল—আপনার ছেলে নিশ্চয়ই এই স্কুলে পড়ছে। মনে হল প্রশ্নটা করে ঠিক করিনি। ম্লান হাসির টুকরো চোখে ভেসে গেল ঐ পরিচ্ছন্ন মুখে—হেডমাস্টারের ছেলেদের বোধহয় নিজের স্কুলে পড়ানো উচিত না। আমার বড়টি পড়ে হিন্দুতে, এটি ছোট। এখনো স্কুলে ভর্তি হয় নি। বিশ্বেশ্বরের প্রপৌত্ররা তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে না পড়ে অন্য স্কুলে আজ কেন পড়ছে বিভাসবাবুর ঐ ছোট্ট উত্তরটিতেই তার ইঙ্গিত পেয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলাম।

স্কুলের আজকের খবর শোনালেন বিভাসবাবু। আজ প্রাইমারী সেকেন্ডারী মিলিয়ে সতেরশো ছাত্রছাত্রী পড়ছে মিত্র স্কুলে। প্রাইমারীতে আটশো (ছাত্র—সাড়ে পাঁচশো, ছাত্রী—আড়াইশো) ও সেকেন্ডারীতে নশো। সেকেন্ডারীর নশো ছাত্রের জন্য আছেন বিয়াল্লিশজন মাস্টারমশাই। বিয়াল্লিশজনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ্য সম্ভবত অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার রাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বিয়াল্লিশ বছর রাজেনবাবু এই স্কুলে পড়াচ্ছেন, সেই সতীশবাবুর আমল থেকে। নির্মলচন্দ্রের সহকর্মীদের মধ্যে আজও যাঁরা এই স্কুলে আছেন তাঁরা হলেন অ্যাসিস্টান্ট হেডমাস্টার পুলিনবিহারী বন্দোপাধ্যায়, অনন্তকুমার বসু, বিমলকুমার দত্ত, কমলকুমার নাগ, রবীন্দ্রনাথ দত্ত, শৈলেন্দ্রচন্দ্র দত্ত। সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বিভাসবাবু বললেন — মাস্টারমশাইদের সমবেত চেষ্টায় আজো স্কুলের ফলাফল অতীত সুনাম বজায় রেখে চলেছে। হায়ার সেকেন্ডারীর সাত বছরে সাতশো বাহাত্তরটি ছেলে এই স্কুল থেকে অ্যাপীয়ার হয়েছে। পাস করেছে—সাতশো [illegible]। এর মধ্যে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে একশো একুশজন ও নজন পেয়েছে স্কলারসিপ।

স্কুলের ফলাফলের সংখ্যাতত্ত্ব পেশ করার ফাঁকে একটি কথা বলেছিলেন বিভাস-বাবু—একাত্তর বছরের পুরোনো এই স্কুল অথচ দেখুন আমাদের নিজস্ব কোন বাড়ি নেই। আটচল্লিশ সালে একটা বিল্ডিং ফান্ড খোলা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত প্রায় দেড় লাখ টাকা তাতে জমা হয়েছে। এই বাড়ির পেছনেই এগারো কাঠা জমি পড়ে আছে। চার বছর ধরে আমরা চেষ্টা করছি ঐ জমি কেনার। কিন্তু কালেকটর অফিস চার বছরেও অ্যাসেস করে উঠতে পারল না। জিজ্ঞাসা করলাম কেন যে বাড়িতে আছেন সেটা কিনে নিতে পারেন না? হেসে জবাব দিলেন—সাতাশ কাঠা জায়গা জুড়ে এই তেমহলা বাড়ি। বাড়ির মালিক অজয়েন্দ্রকৃষ্ণ দেব যথেষ্ট কনসিডারেট। সাড়ে তিন লাখ টাকায় তিনি বেচতে রাজি আছেন। কিন্তু আমাদের তো আছে মোটে দেড় লাখ। বাকীটা কে দেবে?

সত্যিই তো কে দেবে? এদেশে এখন মৃত মহাত্মাদের পুনর্জীবনদান ব্রত পালন করা হচ্ছে বিপুল সমারোহে, তার জন্য বরাদ্দ হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। কোথায় হাজার হাজার শিশুর মাথায় শতবর্ষের প্রাচীন কুঠুরীর চুন-বালির চাঙড়া খসে খসে পড়ছে বা কোথায় একটা খেলার মাঠের অভাবে মধ্য কলকাতার আনন্দ নাড়ের দম বন্ধ হয়ে কৃকলাশ দেহে মানুষ হয়ে উঠছে এ জাতির ভবিষ্যৎ বা একটি রিডিংরুমের অভাবে হাজার আষ্টেক বইয়ের লাইব্রেরীর সুস্থ ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আমাদেরই ঘরের ছেলেরা তার হিসাব নেওয়ার মত সময় কি কারুর আছে? কৈ কেউ তো বলেন না যে, যে স্কুলগুলি এতদিন ধরে দেশ ও জাতির সেবা নীরবে করে এসেছে তাদের উপেক্ষার মর্গে নিক্ষেপ না করে নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত করা হোক? তাতে বোধহয় হাততালি জুটবে না। তাই নজরও নেই। একদিন যাঁরা এই স্কুল গড়েছিলেন নিজেদের সর্বস্ব পণ করে তাঁদের কথা আমরা ভুলে গেছি। যে ভোলে ভুলুক কোটি মন্বন্তরেও যাঁরা কোনদিনই তাঁদের শিক্ষালাভের মমতাময়ী মাকে ভুলবেন না মিত্র ইনস্টিটিউশনের সেই অগণিত ছাত্রগোষ্ঠী আজ নিশ্চয়ই তাঁর প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়াবেন। বিশ্বেশ্বর-সতীশকুমারের স্মৃতি রক্ষার যে সুন্দর সুযোগ আজ এসেছে বিশ্বাস করব সে সুযোগ তাঁরা হেলায় হারিয়ে যেতে দেবেন না।

—অরিন্দম

পরের সংখ্যায় : মিত্র ইনস্টিটিউশন (ভবানীপুর)। অনিবার্য কারণে [illegible] স্কুলের ছবি প্রকাশিত [illegible] আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

আগের ঘটনা

[কিছুদিন ধরেই ঢিল পড়ত। রাতে।

সেদিন যখন নীপা ফিরে এল কলেজ থেকে সন্ধ্যে ঘনিয়েছে। বাড়ির চাকর দুঃখহরণ ছুটিতে। স্বামী অম্বরও ঘরে নেই। নীপা বিস্মিত। চিন্তিতও বটে।

ভাবছিল পুরনো দিনের কথা। নীলাদ্রির সঙ্গে কেমন করে তার পরিচয় হল। ভালোবাসার রঙও দেখা দিল একসময়. সে সব স্মৃতি।

এমন সময়েই অম্বর ফিরে এল বাড়ি। জানাল রাতে ঢিল পড়ার ব্যাপারে থানায় ডায়েরী করে এসেছে।]

—দুই—

খুব ভোরে নীপার ঘুম ভাঙল।

বাইরে টিপ-টিপ বৃষ্টি। জলে ভেজা কাক-পক্ষীর কর্কশ চিৎকার। জানালার পর্দাটা বাতাসে পত্‌পত্‌ উড়ছে। একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস নীপার চোখে-মুখে এসে লাগল।

মাথা তুলে আকাশটাকে নীপা লক্ষ্য করল। গুরুভার কালো মেঘের এখন জীর্ণ বসনের দশা। এখানে ওখানে ছিঁড়েছে। ফুটিফাটা মেঘের ফাঁকে নীল আকাশের উঁকি-ঝুঁকি।

বিছানা ছেড়ে নীপা নামল, হাত তিন-চার ব্যবধানে দুটি খাট। অন্যটিতে অম্বর শুয়ে। মানুষটা এখন ঘুমে অচেতন। সাতটার আগে অম্বরের ঘুম ভাঙে না। ভাঙবার প্রয়োজনও নেই। সকাল নটায় ওর হাসপাতালে হাজির থাকার কথা। স্নান-টান সেরে তৈরি হয়ে নিতে ঘন্টা-দুই সময় অপর্যাপ্ত।

হাত ধুয়ে নীপা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গতকাল রাতে বেশ বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে পড়ে। এখানে সেখানে জল জমে। দমকা বাতাসে ধিঙ্গি মেয়ের মত হিলহিলে গাছ-গাছালি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। শেষ রাত্তিরে ব্যাঙের চিৎকার ঝিঁঝির সুর—সব মিলিয়ে ভুতুড়ে ঐকতান। শুনলে গা ছম্‌-ছম্‌ করে।

চায়ের পাট আরো দেরিতে। অম্বর ঘুম থেকে না উঠলে নিজের জন্য ঝামেলা করতে সে নারাজ। ভোরের দিকটা বেশ নিরিবিলি, নীপা ঘন্টাখানেক সময় সুন্দর পড়াশুনো করে। ক্লাশের নোটগুলি গোটা গোটা অক্ষরে ভালো করে লেখে। লাইব্রেরী কিংবা প্রফেসরদের কাছ থেকে চেয়ে আনা বইগুলি পড়ে। প্রয়োজনমত অংশবিশেষ নোট করে রাখে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীপা দেখল প্রফেসর অনিমেষ দত্ত হেঁটে ফিরছেন। পরনে প্যাতলুন এবং গেরুয়া রঙে-এর হাটকোট

পাঞ্জাবী। বৃষ্টি থেমেছে বলে হাতের ছাতাটা আত্মবৃক্ষের আকার নেয়নি। এত সকালে কোথায় গিয়েছিলেন উনি? হাতে কোনো জিনিসপত্র না দেখে নীপার মেয়েলী কৌতূহল কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার মত মনের আকাশে ছড়িয়ে পড়ল।

ওকে দেখে অনিমেষ দত্ত থামলেন। নীপা বলল,—'এত সকালে কোথায় গিয়েছিলেন স্যর?'

—'মর্ণিং ওয়াকে', প্রফেসর দত্ত ওর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আবার বললেন,—'খুব ভোরে উঠে বেড়িয়ে আসা আমার অভ্যেস। বৃষ্টির জন্য আজ বেরোতে দেরি হল।' সামনের দিকে তাকিয়ে প্রফেসর দত্ত আবার হাঁটতে শুরু করবেন কিনা ভাবছিলেন।

নীপা একমুখ হাসি নিয়ে বলল,—'আজ কিন্তু আপনাকে ছাড়ছিনে স্যর। অন্তত মিনিট পাঁচেকের জন্য বসে যেতে হবে। এখানেই এক কাপ চা খেয়ে নিন।'

প্রফেসর দত্ত হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে রীতিমত ব্যস্ত হলেন। বললেন,—'ভীষণ দেরি হয়ে গেছে আজ। আর বসব না, অন্য একদিন বরং আসব, কেমন?'

নীপা ক্ষুণ্ণ হল। কণ্ঠস্বরে মেয়েলী অভিমান মিশিয়ে সে বলল,—'আজ বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। দেখা হল, তাও বাড়িতে ঢুকলেন না। অন্যদিন কি আর আপনি আসবেন স্যর?'

অনিমেষ দত্ত ছাত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন। 'কেন আসব না? নিশ্চয় আসব একদিন। আর তোমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে তো আমি প্রায়ই যাই। খুব ভোরে, তখন তোমরা ঘুমিয়ে থাক।'

দু-চার পা এগিয়ে অনিমেষ আবার ফিরলেন। নীপাকে বললেন,—'আজ বিকেলে তুমি আসছ তো? মৌর্যসম্রাট অশোকের পিতৃসুলভ রাজধর্মের বিষয় সেদিন আলোচনা করলাম। আজ একটা ভালো নোট দেব তোমাকে, নিশ্চয় কাজে লাগবে তোমার।' শেষের কথাকটি প্রফেসর স্বগতোক্তির মত উচ্চারণ করলেন।

নীপার মনে পড়ল দিনটা শুক্রবার। অনিমেষ দত্তের কাছে তার পড়তে যাবার কথা। হপ্তায় দুদিন প্রফেসর দত্ত তাকে পড়ান। ইতিহাসের অধ্যাপক অনিমেষ দত্তের অধ্যাপনায় যথেষ্ট সুনাম। বিশেষ করে অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। তাঁর নোটগুলি সাফল্যের নিশ্চিত সহায়ক। অধ্যাপক দত্তের ক্লাসগুলি ভালো ছেলেরা কখনও মিস করে না।

খুব নির্বিরোধী এবং শান্ত স্বভাবের মানুষ প্রফেসর দত্ত। লম্বায় প্রায় পৌণে ছ ফুট, মেদহীন শক্ত দেহ। বয়স চল্লিশের বেশী।

মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। ছোট ছোট চিন্তিত চোখ। উপরের পাটির সামনের দাঁত দুটি নেই। কোনো দুর্ঘটনায় ভেঙে থাকবে। এখন সোনা বাঁধানো দন্তযুগল হাসলেই ঝিকমিক করে।

নীপাদের বাড়ি থেকে খানিকটা এগিয়ে রাস্তাটা বেঁকেছে, এদিকটায় একপাশে [illegible]। বড়-বাড়িগুলো ঠিক পাশা-পাশি নয়। দুটি বাড়ির মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান। পথচলতি মানুষজনের সংখ্যা কম। দুপাশে ঝোপঝাড়, কোথাও আগাছার জঙ্গল। খানিকটা এগোলেই মস্ত একটা ঘোড়ানিমের গাছের স্নিগ্ধছায়া।

পথের বাঁকে অনিমেষ দত্ত অদৃশ্য হতেই নীপা ঠোঁট উল্টিয়ে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করল। মানুষটা কেমন যেন। সবসময় নিজেকে আড়াল করে থাকতে ভালবাসেন। কর্মস্থলে খুব গম্ভীর আর চুপচাপ ভদ্রলোক। কারো সংগে তেমন বন্ধুত্ব বা মেলা-মেশা নেই। ক্লাস নেওয়া শেষ হলে একটি মিনিটও কলেজে নষ্ট করেন না। সভা-সমিতি কিংবা কোন ফাংশনে কদাচিৎ উপস্থিত হন। অধ্যাপক এবং সাধারণ ছাত্র-মহলে অসামাজিক বলে যথেষ্ট অখ্যাতি। আড়ালে কেউ কেউ ঘরকুনো পেঁচা বলেও বক্রোক্তি করে।

কিন্তু অনিমেষ দত্ত অবিচল, মেলা-মেশার ব্যাপারে উনি এতটুকু আগ্রহী নন। পেঁচকের মত কোটরে লুকিয়ে থাকতেই তাঁর অভিলাষ। কেউ মিশতে চাইলে, ওঁর সেই কাঠ-কাঠ, শক্ত-শক্ত ভঙ্গিটা আরো দৃঢ় হয়। শামুকের মত নিজেকে গুটিয়ে নেন ভদ্রলোক। কলেজের ছেলেরা প্রয়োজনে তাঁর বাড়িতে হানা দিলে রীতিমত বিরক্ত বোধ করেছেন অনিমেষ দত্ত।

মাস তিন হল নীপা ওঁর কাছে পড়ছে। প্রথম দিনের কথা নীপার মনে এল। টিউশনির প্রস্তাব শুনে কিরকম অদ্ভুত বেঁকে বসলেন ভদ্রলোক। ওজর-আপত্তি আর নানা অজুহাত। টিউশনি মানে যেন কোনো গর্হিত কাজ। এতে লিপ্ত হওয়া চলে না। ভাগ্যিস, বুদ্ধি করে অম্বরকে সংগে নিয়েছিল নীপা। নইলে একা মেয়েমানুষ, কিছুতেই সে অনিমেষ দত্তকে রাজী করাতে পারত না।

স্ত্রীর স্বপক্ষে অম্বর ওকালতি করল, 'কি জানেন স্যর, এটা হল ওর কেঁচে-গণ্ডূষ করা। সাত-আট বৎসর মা-সরস্বতীর সংগে কোন সম্পর্ক নেই। হঠাৎ খেয়াল চেপেছে পড়াশুনো করবার। তাও পাশ-কোর্সে নয়, অনার্সে পড়তে শখ। তেমন কোন সাহায্য না পেলে কিছুতেই উতরোতে পারবে না।'

অনিমেষ দত্ত তবুও বিমুখ। 'আর কাউকে দেখুন না। আমি এখানে কোনো টিউশনি করিনি, জিজ্ঞেস করে দেখবেন, এর আগে বেশ কয়েকজনকে রিফিউজ করেছি।'

মন গলাতে অম্বর ওস্তাদ। তার কথা-গুলি যেন ক্ষতের প্রলেপ। উপরওয়ালারা সেকারণেই সন্তুষ্ট। কথা বলার কিছু কৌশল জানে অম্বর। খুব আপত্তি থাকলেও তাকে এড়ানো কঠিন।

অম্বর বলল,—'আমি জানি স্যর। টাকা পয়সার উপর আপনার কোনো আসক্তি নেই। নইলে টিউশনি করতে চাইলে এই দরজার সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের কিউ পড়ত। কিন্তু আমার স্ত্রীর ব্যাপারটা একটু আলাদা। পড়াশুনো করে ছেড়ে দিয়েছিল, এতদিন ঘর-সংসার করে আবার কলেজে পড়ার শখ! আপনি রাজী না হলে ওর পক্ষে পরীক্ষা-বৈতরিণী পার হওয়া অসম্ভব।' শেষকালে মোক্ষম কথাটি যোগ করল অম্বর। স্ত্রীর দিকে বাঁকাচোখে তাকিয়ে বলল,—'ওর মতে' ইতিহাসে আপনার মতন দখল কলেজে আর কারো নেই।'

নীপার মুখমণ্ডল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দ্রুত জরিপ করে নিলেন অনিমেষ দত্ত। ঈষৎ চিন্তা করে বললেন—'ঠিক আছে, আপনি আসবেন। বিকেলের দিকে ঘণ্টাখানেক সময় আমি দিতে পারি। কিন্তু হপ্তায় দুদিন—তার বেশী নয়।'

রিকশতে করে ফিরল ওরা। পথে স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নীপা বলল,—'তুমি কিন্তু সব পারো। গররাজী মানবটাকে মত করিয়ে ছাড়লে।'

অম্বর গম্ভীর মুখ করে বলল—'আমার কথায় কিন্তু রাজী হননি ভদ্র-লোক।'

'তাহলে? মত দিলেন যে শেষে—'

অম্বর মন্তব্য করল,—'রাজী হলেন তোমার মুখপদ্ম দেখে।'

—'তার মানে?' নীপাকে এবার সন্দিগ্ধ দেখাল।

—'আহা! তুমি রাগ করছ কেন?' অম্বর হাসতে হাসতে বলল, 'অমন ঢলঢলে মুখ, ছলছল চাউনি, হপ্তায় দুদিন এই সান্নিধ্যটুকু মন্দ কি?'

নীপা ছোট্ট একটা ঠ্যালা দিল স্বামীকে। কিন্তু অম্বর সামলে নিল। রিকসতে আর একটু চেপে আয়েস করে বসল

—'যা কথার ছিরি হচ্ছে তোমার দিন-দিন। কোনো আগল নেই মুখের।'

অম্বর আগের মতই গম্ভীর হল। বলল,—'কথাটা কিন্তু আমি মিথ্যে বলিনি। শুনলে তো, ভদ্রলোক একা থাকেন, গৃহ-ভৃত্যের উপর নির্ভর। বিপত্নীক না ব্যাচেলর তা অবশ্য খুলে বলেননি। আর স্ত্রী থাকলেও তিনি কোন মুলুকে পড়ে আছেন কে জানে।'

নীপা মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল. বলল,—'অতই যদি সন্দেহ তোমার, তাহলে এই ওকালতিটুকু করবার কি প্রয়োজন ছিল? উনি তো পড়াতে চাননি।'

—'বারে! তুমি উকীল সাজিয়ে নিয়ে গেছ,—আর আমি কেস হারতে পারি?' অম্বর এবার নিজেকেই যেন তারিফ করল।

বারান্দা থেকে নীপা পড়ার ঘরে এল. বিকেলে প্রফেসর দত্তের বাড়িতে যেতে হলে প্রস্তুতির প্রয়োজন। দুটো প্রশ্নের উত্তর লিখে নিয়ে যেতে বলেছেন অনিমেষ-বাবু। কিন্তু নীপার একেবারে খেয়াল ছিল না। অবশ্য মনে থাকবার কথাও নয়। কলেজের ক্লাস, নাটকের রিহার্সাল, বন্ধু-জনের সঙ্গে গল্প-পরিহাস,—এর মধ্যে উত্তর লিখবার কথা স্মরণ ছিল না। তার উপর এই কদিন ধরে সংসারের হাঁড়ি ঠেলতে হচ্ছে সমানে। কলেজে পড়ার শখ মেটাতে নীপার ঠিক নাজেহাল উঠবার জোগাড়।

চেয়ারের উপর ভালো করে বসল নীপা। টেবিলের রেক্সিনে একটা কনুই রেখে ঝুঁকে পড়া শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করল। ঠিক মেয়ে-পাখির ডিমে বসবার ভঙ্গি। নীলাদ্রির দেওয়া সমালোচনার বইটা সামনে। হাত বাড়িয়ে নীপা সেটা টেনে নিল। অন্যমনস্কের মতো দু'চার পাতা খুলেই তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। ঠোঁট কামড়ে নীপা কিছু চিন্তা করল। আশ্চর্য! নীলাদ্রির পুরানো অভ্যেসটা এখনও গেল না। সব ব্যাপারেই তার নাটুকেপনা। বলে কয়ে কাজ করার চেয়ে সে সারপ্রাইজ দিতে বেশী ভালোবাসে। নইলে বইয়ের মধ্যে চিঠি গুঁজে দেওয়ার বদলে কথাটা নীপাকে খুলে বলতে পারত। অবশ্য গতকালের কথা একটু আলাদা। সমস্ত দিন ভীষণ ব্যস্ত ছিল নীপা। নীলাদ্রির সঙ্গে আড়ালে দুটো কথা বলবার তেমন সুযোগ আর সুবিধে ছিল কোথায়?

খামটা জামার মধ্যে লুকিয়ে নীপা বাথরুমে ঢুকল। পড়ার টেবিলে বসে পর-পুরুষের চিঠি পড়া বোকামির পরিচয়। ঘুম ভেঙে উঠে অম্বর যদি হঠাৎ পিছনে এসে দাঁড়ায়। নীপা কিছুতেই ঝুঁকি নিতে রাজী নয়।

সাদা খামটা ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করল নীপা। বাথরুমের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সেটি পড়ল। বড় নয়—ছোট চিঠি, নীলাদ্রি লিখেছে,—

নীপা,—

শনিবার সন্ধ্যেয় রূপমহল থিয়েটারে উদয়ন নাট্যগোষ্ঠীর বার্ষিকী উৎসব। আমি আজই সকালে চিঠি পেয়েছি। মনোহরদা তোমার কথা বিশেষ করে লিখেছেন। আমারও খুব ইচ্ছে বার্ষিকী উৎসবে তুমি উপস্থিত থাক। একদিন তো তুমি উদয়নের সভ্যা ছিলে। সেই দিনগুলি নিশ্চয় ভোল নি। সেদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে কত না অজুহাত সৃষ্টি করতে হত তোমাকে।

শিমুলপুর স্টেশনের প্লাটফর্মে আমি অপেক্ষা করব। দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে। তুমি নিশ্চয় এসো—প্লিজ্।

ইতি

নীলাদ্রি

চিঠি পড়া শেষ করে নীপা চিন্তিত হল। শনিবার কলকাতা যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। অম্বরকে কি বলবে সে? কোন অজুহাতে কলকাতা যাবে? হাজার হলেও সে বউ-মানুষ। দুম করে অমনি কলকাতা গেলেই হল।

থিয়েটারে পার্ট নেবার ব্যাপারে অম্বরের সঙ্গে তার প্রবল কথা কাটাকাটি। মতান্তর থেকে মনান্তর হবার উপক্রম। টাউন ক্লাবের থিয়েটারে অংশ নিতে অম্বর আপত্তি করেছিল। আজে-বাজে ছেলে-ছোকরার সঙ্গে হৈ-হুল্লোড়। এর কোনো মানে হয় না। বন্ধুবান্ধব, অফিসার মহলে একটা গুঞ্জন শুরু হতে পারে।'

কিন্তু নীপা তার কথা শোনেনি। থিয়েটার করা দোষের কেন হবে? আর অভিনয় তো কিছু ক্ষতি নয়। তাছাড়া নীপা একা নামেনি। শহরের আরো অনেক মেয়ে টাউন ক্লাবের থিয়েটারে ভিড় করেছে।

পুরো দু'দিন অম্বর তার সঙ্গে কথা বলেনি, নীপারও ভীষণ জিদ। সে ভাঙবে, তবু মচকাবে না। কেমন করে আবার ভাব হল, নীপার ঠিক মনে নেই। তবে সে জানত অম্বর কথা বলবে। পুরুষ মানুষ। কদিন দূরে দূরে থাকতে পারে।

চিঠিটা জামার মধ্যে গলিয়ে নীপা বাথরুম থেকে বেরোল। কখন বিছানা থেকে উঠে অম্বর চায়ের টেবিলে এসে বসেছে। নিশ্চয় মুখটুখ ধোয়নি। সম্ভবত এখুনি সে বাথরুমে ঢুকবে।

ঘাড় তুলে অম্বর বলল,—'কাল একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি। আজেবাজে চিন্তায় ভুলে গেলাম বলতে।'

—'কি কথা?' নীপা কৌতূহল প্রকাশ করল।

—'তোমার কাকা একটা চিঠি দিয়েছেন। গত মাসের ভাড়া আদায় করে দেড়শ টাকাও পাঠিয়েছেন। উনি লিখেছেন বাড়িটা কিনবার জন্য অনেক আগ্রহী লোক আসছে তুমি যদি রাজী থাক, তাহলে উনি কথা-বার্তা বলবেন।'

কথাটা নীপার মনে পড়ল। বাড়ি-বিক্রীর কথা একবার হয়েছিল তাদের। গতমাসে কাকা যখন পলাশপুরে বেড়িয়ে গেলেন, তখন অম্বরই কথাটা তুলল। গলি-ঘুঁজির মধ্যে অমন বাড়ি থাকা কোনো কাজের নয়। কে দেখাশুনো করে। ভাড়াটেরা কোনোদিন বাড়ি ছাড়বে বলে তার মনে হয় না। সুতরাং ও-বাড়ি প্রায় বেদখলে। বরং বাড়ি বেচে দক্ষিণ কলকাতার দিকে একটু জায়গা কিনে রাখা ভালো। পরে বাড়ি করে নেওয়া যাবে।

নীপা বলল,—'চিঠিখানা কোথায়?'

—'টাকা আর চিঠি সব অমার পকেটে রয়েছে।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে চিঠি আর টাকা নীপা খুঁজে বের করল। অম্বর যা বলেছে ঠিক। বাড়ি বিক্রীর কথা কাকা তাকে লিখেছেন। নীপা যদি রাজী হয়, তাহলে ভালো খরিদ্দার পেতে খুব অসুবিধে হবে না।

চিঠিটা হাতে নিয়ে নীপা বলল,—'কাল দুপুরে আমি কলকাতা যাব ভাবছি।'

—'হঠাৎ কলকাতা?' অম্বর প্রশ্ন করল।

—'কাকার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। কি রকম টাকাকড়ি মিলবে, তার একটা আঁচ পাওয়া দরকার। চিঠিপত্রে এসব হয় না।'

—'কখন যাবে?'

—'কাল দুপুরের দিকে বেরিয়ে পড়ব। পরশু সকালেই অবশ্য ফিরতে হবে। দুটোর পর আবার টাউন ক্লাবের ফুল রিহার্সাল।'

চা-পর্ব শেষ করে অম্বর ডাক্তারের বেশবাস পরল। জুতোর ফিতে বাঁধতে বসে নীপাকে বলল,—'আজও তোমার রিহার্সাল আছে নাকি?'

নীপা একটু হাসল। 'রোজ রোজ মহলা দিতে আমার সময় কোথায়? তা ছাড়া পড়াশুনো নেই? আজ বিকেলে তো প্রফেসর দত্তের কাছে যাবার কথা।'

—'ও!' অম্বর একটু উদাসীন সাজবার চেষ্টা করল।

নীপা এবার রান্নাঘরে ঢুকল। তার ক্লাস বারোটায়। নটা এখনও বাজেনি। কয়েক মিনিট দেরি, এবার কোমর বেঁধে নামতে হয়। নইলে ইংরেজীর ক্লাসটা ফস্কে যাবে।

দরজায় ঠক-ঠক শব্দ। নীপা উৎকর্ণ হল। কে আবার জ্বালাতে এল এখন? বিরক্তির কয়েকটি রেখা দ্রুত ফুটে উঠল তার মুখে। কলেজের ক্লাসগুলি বুঝি বরবাদ হল।

দরজা খুলে রীতিমত বিস্ময়। নায়ক দেবরাজ মিত্র দাঁড়িয়ে। পৌরাণিক যুগের কোনো সব্যসাচীর মত নীপা সাদর সম্ভাষণ জানাল,—'এ-কি! স্বয়ং দেবরাজ যে, আসুন—'

দেবরাজ একা নয়, তার পিছনে আর একজন ভদ্রলোক। নীপা লোকটিকে দেখল, গায়ের রঙ বেজায় কালো, ঠোঁট দুটো চাপ্টা, চোখের উপর মোটা বাদামী ফ্রেমের চশমা, পরণে সাদা ফুলপ্যান্ট আর সার্ট। সেগুলি সুতীর নয়, টেরিকটন কিংবা ঐ গোছের কিছু। গলায় বাঁধা সুদৃশ্য হাল্কা রঙের টাইটার উপর দু-তিন সেকেণ্ডের জন্য তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল।

দেবরাজ হাত তুলে নমস্কার করল। বলল,—'ইনি আমার ফ্রেণ্ড অবিনাশ সমাদ্দার। কলকাতার লোক,—নিশ্চয় নাম শুনেছেন?'

নীপা কিছুক্ষণ নামটা মনে করবার চেষ্টা করল। ঈষৎ হেসে বলল,—'কই ঠিক মনে আসছে না।'

অবিনাশ সমাদ্দার নিজেই মধ্যস্থতা করল। বলল,—'দেবরাজের এটা বাড়াবাড়ি মিসেস রায়। আমি এমন কিছু কেউ-কেটা নই, যে নাম শুনলেই চিনতে পারবেন।'

দেবরাজ বলল,—'হরিমতীর ঘর বইটা দেখেছেন তো? খুব হিট বই। পলাশপুরেও দু' সপ্তাহের বেশী ছিল। অবিনাশ বইটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।'

—'তাই বুঝি?' নীপা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল, বলল,—'তাহলে আপনি তো বিখ্যাত নিশ্চয়ই।'

বাইরের ঘরে নীপা ওদের বসাল। সোফা কৌচ, সবই আছে তার। কিন্তু ঘরটা আর একটু পরিষ্কার ছিমছাম থাকলে নীপার ভাল লাগত। আসলে সময়াভাব। ঘরদোরের পিছনে নজর দিতে নীপার সময় নেই।

দেবরাজ বলল,—'কাল অবিনাশ আমাদের রিহার্সাল-রুমে ছিল, আপনার অভিনয় দেখে ও একেবারে চার্মড। আমার কাছে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল।'

—'সত্যি মিসেস রায়!' অবিনাশ তারিফ করার সুরে বলল,—'আপনার মুখের এক্সপ্রেশন, সংলাপ বলার ভঙ্গি, মুভমেন্ট, সব কিছু মার্ভেলাস।'

প্রশংসা মানেই আলোর ছটা। সেই আলোতে নীপাকে উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল,—'আপনারা বসুন একটু। আমি দু-কাপ চা করে আনি।'

বাধা দিয়ে অবিনাশ বলল,—'আবার চা কেন? খামোকা আপনার কষ্ট।'

—'কষ্ট কিসের?' নীপা মিষ্টি হাসল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা হয়ে যাবে।'

চায়ের সরঞ্জাম গোছাতে নীপা রান্নাঘরে ঢুকল।

চোখ মটকে বন্ধুকে বলল, দেবরাজ,—'কি রকম বুঝছ অবিনাশ, মেয়েটা টোপ গিলবে তো?'

—'আস্তে কথা বল।' অবিনাশ ওকে সাবধান করল। গলা নামিয়ে সে বলল,—'চেহারাখানা গ্র্যাণ্ড মাইরি। কাল সন্ধ্যায় একটু ক্লান্ত আর অবসন্ন লাগছিল, এখন ঠিক তাজা রজনীগন্ধা।'

দেবরাজের চোখদুটো লোভী শৃগালের মত জ্বলছিল। সে বলল,—'মেয়েটা কিন্তু খেলোয়াড়। পলাশপুরেই ওর পিরীতির লোক আছে। সেকথা তোমাকে আগেই বলেছি।'

—'অমন সুন্দরীর পিছনে দু-একটা ভ্রমর উড়বেই। সে থাকুক। কিন্তু তোমার মত লেডি-কিলারও তো রয়েছে চাঁদ।' ও'র রেহাই নেই। ফাঁদে পড়তেই হবে।'

চা নিয়ে নীপা ফিরল।

দেবরাজ ঈষৎ হেসে বলল,—'অবিনাশ কিন্তু একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছে মিসেস রায়। অবশ্য এখনই আপনার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

—'কি প্রস্তাব আবার?'

দেবরাজ কথাটা খুলে বলল। নায়িকা-সংহার বইখানা ফিল্মে করার ইচ্ছে অবিনাশের। ঘনশ্যাম পিকচার্সের সিনিয়র পার্টনার বদ্রীদাসবাবু বই করতে রাজী। অবিনাশের ইচ্ছে নীপা রায় এতে নায়িকার রোলে থাকবেন।

প্রস্তাবটা নীপার কাছে লটারী প্রাপ্তির মত বিস্ময়কর। সে ফিল্মের হিরোইন হবে। রুপালী পর্দায় তার ছবি? অগণিত লোকে মুগ্ধ হয়ে তার অভিনয় দেখবে?

বিস্ময়ের ভাব কাটিয়ে নীপা বলল,—'আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন অবিনাশবাবু। ফিল্মের হিরোইনের কাজ কি আমাকে দিয়ে চলবে?'

অবিনাশ শব্দ করে হাসল। 'আপনি অবাক করলেন মিসেস। কাল অভিনয় তো দেখলাম। আমার ধারণা ফিল্মে আপনি নামী চিত্র-তারকা হবেন।'

নীপা নিরুত্তর।

অবিনাশ আবার বলল,—'সামনের সপ্তাহে একদিন কলকাতায় চলুন। বদ্রীদাসবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। অমন ধনী লোক, কিন্তু কি ফাইন জেন্টলম্যান দেখবেন।'

নীপা কি যেন ভাবছিল, অন্যমনস্কের মত সে বলল,—'আচ্ছা, আমি একটু ভেবে দেখি অবিনাশবাবু। পরে আপনাকে জানাব।'

দেবরাজ এগিয়ে এসে বলল,—'নিশ্চয় চিন্তা করবেন। মিস্টার রায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, তবে একটা কথা নীপা দেবী।' একটু থেমে সে তার বক্তব্য রাখল,—'সুযোগ এলে তা পায়ে ঠেলতে নেই।'

●

প্রফেসরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নীপা যখন ঘরমুখো হলো, তখন সন্ধ্যে উত্রে গেছে। পথের দুপাশে জমাট অন্ধকার। গাছ-গাছালি আর ঝোপের চারপাশে জোনাকি দলের উদ্দেশ্যহীন পথ-পরিক্রমা। আকাশে মেঘ-টেঘ সম্ভবত নেই—থাকলেও খুব কম। পোখরাজ পাথরের মত উজ্জ্বল কয়েকটি তারা নীপার চোখে পড়ল।

সমস্ত দিন মনটা খুব বিক্ষিপ্ত তার। এক একটা দিন এমনি আসে। সাগরের ঢেউয়ের মত বিস্ময়ের পর বিস্ময়। নীলাদ্রির চিঠিখানা, কলকাতায় বাড়ি-বিক্রীর কথাবার্তা এবং সবশেষে ফিলম্ ডিরেকটর অবিনাশ সমাদ্দারের সাড়া-জাগানো প্রস্তাব। নীপা কি রুপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে রাজী?

দরজায় তালা ঝুলছে। অর্থাৎ অম্বর বাড়ি ফেরেনি। কখন ফিরবে তা নীপাও বলতে পারে না।

তবু সুখবর সামনে।

নীপা একগাল হেসে এগিয়ে গেল। রঙ-চটা সুটকেশটা কোলে নিয়ে শ্রীমান সিঁড়ির উপর চুপচাপ বসে। অন্য কেউ নয়, পলাতক গৃহভৃত্যটি। দুঃখহরণ এতদিনে আবার তার দুঃখহরণ করতে এসেছে।

—'তিনদিনের ছুটি নিয়ে সাতদিন কাটিয়ে এলিরে?' নীপা সখেদে বলল।

দুঃখহরণ জবাব দিল না। মাথা নুইয়ে সব অপরাধ শির পেতে নেবার ভঙ্গি করল।

চাবি খুলে নীপা বলল,—'এই কদিনে আমার দুর্দশার একশেষ। ঘর-দোরের অবস্থা দ্যাখ,—ঝাটপাটও ভাল্যে করে পড়েনি। কিছু খেয়ে আগে ধুলো-আবর্জনা মুক্ত কর দিকি।'

●

অনেক রাতে ঘরের মধ্যে একটা অব্যক্ত আওয়াজ শুনে অম্বরের ঘুম ভেঙে গেল। টর্চ হাতে বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল সে। সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই ঘরটা আলোয় ভরে উঠল। অম্বর দেখল উপুড় হয়ে বালিসে মুখ গ'ুজে নীপা শুয়ে আছে। ভয়ার্ত পাখির মত তার শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে।

মিনিট দুই-তিন পরে নীপা স্বাভাবিক হল। চোখের দৃষ্টি অনেকটা সহজ, রক্তশূন্য মুখখানা আবার জীবন্ত মনে হচ্ছে।

অম্বর বলল,—'কি হয়েছিল তোমার? হঠাৎ ভয় পেলে কেন? বাড়িতে ঢিল পড়ছে বলে মনে হল নাকি?'

নীপা মাথা নাড়ল।

জানালার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, রাস্তার ওপারে ঝোপ-জঙ্গলের কাছে আমি যেন কাউকে দেখলাম। দৈত্যের মত লম্বা-চওড়া একটা লোক। ছায়া ছায়া শরীর। হঠাৎ কেন জানি না আমার ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে তাকিয়ে আমি স্পষ্ট দেখলাম, বুঝলে?'

অম্বর হেসে বলল,—'তোমার চোখের ভুল নীপা,—কিংবা কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ।'

চুমুক দিয়ে অল্প একটু জল খেল নীপা। তার মুখে মৃত অতীতের চিহ্ন, সে বলল,—'তুমি জান না, ঠিক এইরকম একটা ছায়ামূর্তি অনেকদিন আগে আমি একবার দেখেছি।'

—'কবে দেখেছ আবার?' অম্বর হাল্কা সুরে প্রশ্ন করল।

নীপা গভীরভাবে কিছু চিন্তা করল, স্মৃতিবোঝাই পাতালপুরীর রুদ্ধ কক্ষে হাতড়ে ফিরছিল সে। অনেকক্ষণ পরে বলল,—'আমার ছোট ভাই বীরেনকে তুমি দেখনি। মোটে দু' বছরের ছোট ছিল আমার চেয়ে। তের বছর বয়সে বীরেন আত্মহত্যা করল। রাতদুপুরে গলায় দড়ি দিয়েছিল সে—'

অম্বর অস্পষ্ট ভাবে বলল,—'হ্যাঁ, সে কথা আমি শুনেছি।'

—'তার ঠিক দু-দিন আগে শেষ রাতে আমি এমনি একটা ছায়ামূর্তি দেখেছিলাম। মিশমিশে কালো, ষণ্ডামার্কা চেহারা, আমাদের বাড়ির উল্টো দিকে একটা উঁচু তিনতলা বাড়ি, ছাদের উপর মূর্তিটা স্থির দাঁড়িয়েছিল।'

খোলা জানালার বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। নিঃশব্দ নৈশ প্রকৃতি। আকাশে দেদীপ্যমান তারাদলের বোবা দৃষ্টি। শনশনে বাতাস যেন কোনো প্রেতাত্মার হাহাকার—

হঠাৎ রাস্তার ওদিকে ঝোপ-জঙ্গলের উপর টর্চের আলো ফেলল অম্বর। তিন ব্যাটারির শক্তিশালী টর্চ। ডানা ঝটপট করে একটা পাখি কোথায় শূন্যে উধাও হল। তার পরই আবার নিঃস্তব্ধতা—কারো উপস্থিতি নজরে আসে না।

(ক্রমশঃ)

জনৈক সেবাব্রতী সাহেবের সঙ্গে

তপেন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার এক সহকর্মী একদিন আমাকে বললেন, কলকাতা শহরে এমন একজন বিদেশী আছেন যাঁর প্রতিদিনকার কাজ হচ্ছে 'ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা'। ভদ্রলোকের নাম মেজর ডাডলে গার্ডনার। নামের পুরোভাগে খেতাবের দিকে নজর দিলে স্বভাবতই মনে করিয়ে দেবে, ভদ্রলোক সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন বা আছেন এবং চালচলনও সেই ধাঁচেরই হবে। আমার বন্ধু বিশেষ বিশেষ চরিত্র ঘটনা প্রভৃতিকে ছবির মাধ্যমে ধরে রাখতে ভালোবাসেন। তাঁর কাছ থেকে মেজর গার্ডনার সম্বন্ধে শুনবার পর এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখবার ইচ্ছা আমার হল এবং এক শনিবারে তিনি যেখানে থাকেন—পূর্ব কলকাতার বেনিয়াপুকুর অঞ্চলে স্যালভেশন আর্মি কোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছলাম।

আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম, মেজর সাহেব তখন ছিলেন না কিন্তু খবর রেখে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে আসবেন। সেই অবসরে আমরা তাঁর কাজের কিছু কিছু নমুনা দেখছিলাম এবং দু-একজনকে কিছু কিছু কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। মিসেস হোসেন বলে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হল। তিনি গার্ডনার সাহেবের নেতৃত্বে নিয়মিত দুধ-বিতরণব্যবস্থার কাজকর্ম পরিচালনা করেন। এক প্রশ্নোত্তরে মিসেস হোসেন বললেন মেজর গার্ডনারকে কলকাতার বিভিন্ন বস্তি অঞ্চলে অনেকেই হয়তো দেখে থাকবেন যেখানকার বাসিন্দাদের অনেকেরই পেটের খিদে মেটাবার সামর্থ্য নেই এবং সেখানেই এই অদ্ভুত মানুষটিকে দেখা যায় গাড়ি-ভর্তি খাবার ও কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এক একটি বিশেষ পল্লী বা বস্তিতে অন্ন বিতরণ করছেন।

কিছুক্ষণ বাদে মেজর গার্ডনার এসে পৌঁছলেন। দেরি হওয়ার জন্য লজ্জিত হলেন। আমার সঙ্গী আমাকে মেজর সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শান্ত সৌম্য চেহারা মুখভর্তি দাড়ি। মাথায় একটা খেলোয়াড়দের মতো টুপি। একটা সাধারণ গেঞ্জি গায়ে—সামনের দিকটা অ্যাপ্রন দিয়ে ঢাকা—পায়ে অতিসাধারণ চপ্পল। জাতিতে ইংরেজ। ১৯১০ সালে ইংলন্ডের ছোট্ট একটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মাত্র বারো বৎসর বয়সে ক্যাডেট হিসাবে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। তারপর বহু বৎসর কেটে গেছে। পেশার তাগিদে পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে বেরিয়েছেন। দেখেই মনে হল বয়সে বৃদ্ধ হলেও তাঁর কর্মশক্তি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয়নি।

মেজর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের তাগিদে তিনি এই মানবসেবার কাজে উদ্বুদ্ধ হলেন। উত্তরে তিনি বললেন, সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি বৃটিশ বাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই তাঁর মন অভিভূত হয়েছিল যুদ্ধের ধ্বংসলীলার ফলে অগণিত মানুষের অসহ্য যন্ত্রণা নিজের চোখে দেখে। যে-সব লোকেদের একবেলা ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য পেটের ভাত জোটে না, যাদের রুদ্ধ বেদনার কোনো প্রকাশ নেই তাদের জন্য তিনি কিছু করবেন এবং এই গ্লানি থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ গ্রহণ করলেন 'ক্ষুধিতের অন্নদান সেবা'।

পেনসনের সামান্য টাকা ও অপরিসীম উৎসাহ সম্বল করে তিনি তাঁর কাজ শুরু করলেন বম্বাতে। কিন্তু বেশী দিন তিনি সেখানে তাঁর কাজ চালাতে পারলেন না। কেননা, শুধু পেনসনের টাকার উপর নির্ভর করে এই কাজ চলে না।

তাই মেজর গার্ডনার কলকাতায় স্যালভেশন আর্মি কোয়ার্টারে এসে আশ্রয় নিলেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন মানবকল্যাণব্রতী সংস্থাকে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। সাড়া পেলেন এক সেবাব্রতী সংস্থার কাছ থেকে। এই কাজে তিনি লেগে গেলেন এগারো বৎসর আগে। এই বিশাল দেশে যেখানে সর্বত্রই ক্ষুধার্তের মিছিল—সেখানে বিশেষ করে কলকাতাকেই তিনি কেন বেছে নিলেন এই প্রশ্নোত্তরে তিনি বললেন, তাঁকে বিশেষভাবে নাড়া দেয় এই দেশের বিপুল জনসংখ্যার যার একটা বৃহৎ অংশ যাদের

মেজর গার্ডনার দুধ বিতরণ করছেন। ফোটো : অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

অবর্ণনীয় দারিদ্র্য। যুদ্ধ শেষ হল। সৈন্য-দলের কাছ থেকে অবসর নিয়ে তিনি এলেন ভারতবর্ষে। তাঁর সাধ্যমতো ভারতবর্ষীয় সমাজের সবথেকে নীচের তলায় যাদের বাস, তাদের দুঃখকষ্ট মোচন আর এদের সবচেয়ে বড়ো কষ্ট যেহেতু অন্নকষ্ট, তাই গার্ডনার সাহেবের পণ হল আধপেটা কিংবা আরো কম খেয়ে যাদের দিন যায়, তাদের মুখে ভালো করে একটু ভাত দেওয়া। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ জুড়ে লক্ষ লক্ষ লোক একবেলা পেট ভরে খেতে পেলে নিজেদের ধন্য মনে করে। তাদের সকলের ক্ষুধা মেটানো কি একজন মানুষের কাজ? তাই মেজর গার্ডনার বেছে নিলেন এমন একটি অঞ্চল যেখানকার অবস্থার সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। এই অঞ্চলটি হল কলকাতা শহর ও তার আশেপাশে নানা দরিদ্র-পল্লী।

বিদেশী সাহায্য ছাড়াও তিনি পশ্চিম-বঙ্গ সরকার থেকে দৈনিক হাজার ক্ষুধার্ত নরনারীকে অন্নদান করবার অধিকার—অর্থাৎ র‍্যাশন কার্ড পেলেন। কোনো বিশেষ জাতি বা বিশেষ পল্লীর প্রতি তাঁর বিশেষ আনুগত্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে মেজর সাহেব বললেন—অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর-মনের পক্ষে যা অপরিহার্য তার অভাব এ-দেশে যা তিনি প্রত্যক্ষ করছেন—সেখানে বিশেষ জাতি বা বিশেষ সমাজের কোনো প্রশ্নই ওঠে না—প্রকৃত সকল ক্ষুধার্তের জন্যই তাঁর দ্বার খোলা।

দৈনন্দিন কাজের একটা খসড়া নিতে গিয়ে দেখলাম, তিনি তাঁর সমস্ত কাজ একটা নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রেখেছেন। সকালবেলা দুধ দেওয়ার পালা শেষ হলে বেলা ১২টা ৩০ মিনিট থেকে ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত তিনি খাদ্য বিতরণ শুরু করেন—তাদেরই যাঁরা চলাফেরা করে সেণ্টার পর্যন্ত আসতে পারেন। কিছু লোক আবার নিয়ে যান নিজ নিজ পরিবারের চলৎশক্তি-হীন লোকেদের জন্য। সেণ্টারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিশাল হল-ঘর। এক-পাশে খাদ্যসামগ্রী রাখবার স্টোর ও রান্নার জায়গা। প্রতি পরিবারকে সেণ্টারের মোহর-যুক্ত কার্ড দেওয়া আছে। তাঁদের কার্ড হিসাবের খাতার সঙ্গে মিলিয়ে প্রতিদিন মেজর সাহেব সকলকে খাদ্য বিতরণ করেন।

বেলা দেড়টার পর নিজে কিছু খেয়ে আবার বেলা দুটো নাগাদ মেজর সাহেব তাঁর দলবল-গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন পল্লীতে পল্লীতে খাদ্য বিতরণ করতে। তাঁর পল্লীর কাজ দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি সানন্দে ওঁর গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে গেলেন। আমরা দেখলাম, কী বিরাট কাজ একজন লোক কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে প্রতিদিন হাসিমুখে করে যাচ্ছেন। দু-তিন মাস করে তিনি এক-একটা পল্লীতে কাজ করেন এবং যাচাই করে দেখেন সত্যিই কার কতখানি অভাব। আমরা দেখলুম পল্লীতে গিয়ে শুধু অন্ন বিতরণ নয়, এমনকি একটা ভাঙা স্যাঁতসেতে ঘরে ঢুকে একজন অশীতি-পর বৃদ্ধাকে তিনি ওই অল্প সময়ের মধ্যে দুধ খাইয়ে দিলেন—বললেন, কিছুদিন পূর্বে এই বৃদ্ধা অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হয়ে রাস্তায় পড়ে যান। ভদ্র-মহিলাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসে যথারীতি চিকিৎসা করে তাঁকে এখানে রাখা হয়েছে। এখনো তিনি নিজে খেতে পারেন না। এমনি আরো অনেক ছোটোখাটো ঘটনা যা আমরা দৈনন্দিন লক্ষ্য করেও করছি না, কিন্তু গার্ডনার সাহেব অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে এই মানবসেবার কাজ করে যাচ্ছেন। ওঁর সঙ্গে আমরা এলাম মুমূর্ষু রোগীদের স্থান দেখতে কালীঘাটে। যদিও এই প্রতিষ্ঠানটি মাদার টেরেসার পরিচালনাধীন কিন্তু প্রতি সপ্তাহে দুবার গার্ডনার সাহেব কিছু প্রোটিন-প্রধান খাদ্য নিয়ে আসেন। যাদের দেখলে মনে হয় মৃত্যু তাদের শিয়রে অপেক্ষা করছে—কিন্তু মেজরের ভাষায় এর মধ্যেও কেউ কেউ হয়তো বেঁচে যাবে এবং সমাজের কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগ করবে।

এই কাজ করতে গিয়ে তিনি কি প্রকার ব্যবহার সাধারণত পেয়েছেন—এই প্রশ্নোত্তরে গার্ডনার সাহেব বললেন—বহু সময় তাঁকে এই কাজে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। কখনো কখনো তাঁকে শুনতে হয়েছে—বিদেশের গুপ্তচর বিভাগের লোক, ভণ্ড, অসাধু এবং আরো অনেক কটূবাক্য। এই প্রসঙ্গে তিনি একটা ঘটনার উল্লেখ করে বললেন—একবার একদল যুবে এসে তাঁকে জানাল তারা ক্ষুধার্ত—তাদের কথায় বিশ্বাস করে তিনি তাদের খাবার দিলেন—তারই সামনে ওই খাবার তারা থুথু দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। এইরকম অনেক ঘটনায় মেজর গার্ডনার মনে মনে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছেন কিন্তু তাঁর কাজ বন্ধ করেননি।

মেজর গার্ডনার যাদের সাহায্য করেন, তাদের মধ্যে এমন অনেকে আছে যারা নিতান্তই কুড়িয়ে পাওয়া। তিনি তাদের প্রতিপালন করেন—লেখাপড়া শেখান এবং একটু বড়ো হলেই কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেন উচ্চতর শিক্ষার জন্য।

প্রতিদিন যারা এই অন্নগ্রহণ করছে, তারা কি শুধুই সাহায্যের উপর চিরকাল নির্ভর করবে এই প্রশ্নোত্তরে মেজর গার্ডনার বললেন—বহু লোক এইটুকু ক্ষুধার অন্ন পেয়ে পুনরায় নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। অনেকে তাঁকে তাঁর কাজে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এসেছে—আবার অনেকে এই বিপুল জন-সমুদ্রের মধ্যে নিখোঁজ হয়েছে। প্রতি তিন মাস অন্তর মেজর গার্ডনার প্রতি পরিবারে গিয়ে তাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং সেইমতো বিধিব্যবস্থা করেন।

একজন লোকের পক্ষে এতবড়ো কাজ করা সম্ভব কিনা—সরকারী বা বে-সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা এবং সেরূপ কোনোপ্রকার বন্দোবস্ত যদি হয়, মেজর সাহেবের বর্তমান কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন হবে কিনা এবং ষাটোত্তর বয়সে এসে তিনি আর কতোদিন এই কাজে ব্রতী থাকবেন—এইপ্রকার কয়েকটি প্রশ্ন পর পর করলে তিনি উত্তরে বললেন—যে-কোনো সূত্রেই সাহায্য আসুক না কেন, তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করবেন। সৈনিক বৃত্তি নিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল—আমরণ তিনি 'সৈনিক' থাকতে চান সাধারণ মানুষের কাজে লাগবার জন্যে।

হটিয়ে দেবার আগে ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

হটিয়ে দেবার আগে একবার দেখে নিতে পারো
আমি সেই অঙ্গীকার কিনা;
হটিয়ে দেবার আগে একবার দেখে যাও এসে
আমি সেই ভালোবাসা কিনা।
সব দৃশ্য ছিন্নভিন্ন করবার আগে
ছায়ার আঁধারে যেতে যেতে
স্থির হতে পারো; অর্গলিত জানলায়
একবার এসে দেখে যাও
যে-পথে হেঁটেছো দীর্ঘকাল,
সব ছায়া বর্জনীয় কিনা।

ফিরে যেতে হবে ফের বিশ্বস্ত জগতে
সৌন্দর্যের সৃজনের ধ্বনির শব্দের
মহিমায়। যেন তুমি মুখ তুলে
তীব্র ক্ষতচিহ্নগুলো আঙুলে বুলিয়ে
নতুন দিনের আয়োজনে
হাসিমুখ। যেন ফের মাঠ থেকে মাঠে
বিশাল বাহুর আন্দোলনে
কহিষ্ণু উন্মেষ। হটিয়ে দেবার আগে
চিরন্তন ভালোবাসা মায়াবী মমতা
একবার দেখে নিতে পারো
সব তার বর্জনীয় কিনা।।

ফ্রিজ ॥

অমিত মিত্র

আমার মধ্যে তেমন কোন জ্যামিতিক শৃঙ্খলা নেই,
তা আমি জানি; বেখাপ্পা থামের ওপর
বেঢপ গোলক; তার ওপর তরমুজের মতো গোল মাথা—
সব নিয়ে একটা প্রাগৈতিহাসিক নৈরাজ্য।

ইচ্ছে করে এই অস্তিত্ব বদলাই অন্য অস্তিত্ব দিয়ে,
এই শরীর অন্য শরীর দিয়ে—যা সরল, স্বচ্ছ, সপ্রতিভ;
যেমন আমার সখের ফ্রিজ—যার জ্যামিতিক
বুকের ওপর ঝোলে ইস্পাত-হাতলের জ্যামিতিক টাই,—
এবং যার পেটের আশ্চর্য ডালা-টা খুললেই
হৃদয়, অথবা বিবেক, অথবা দ্বিতীয় সত্তা-র মতো
জ্বলে ওঠে বিশুদ্ধ আলো।

গচ্ছিত স্নায়বিক পদার্থগুলো-তে
চামচ নাড়ানো যায় না
এমন কঠিন ও ঠাণ্ডা।

খ্যাঁদা

নিখিল সেন

হ্যাঁ, নাকটা একটু খ্যাঁদা ছিল বটে। কেবল খ্যাঁদা নয়, বোঁচা, চ্যাপটাও, অনেকটা সাপের মত। চোখ দুটিও ছিল ক্ষুদে ক্ষুদে। ভুটিয়াদের মত। মুখে ঘাড়ে জমে আছে ময়লা পুরু হয়ে। গায়ের তামাটে রংটা তাই কালো দেখায় অনেকটা।

বয়স হবে বারো কি তেরো। একটু বেঁটে বলে কিছুটা কম দেখায় আরো। ঢল-ঢলে একটা হাফ-প্যান্ট কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে, ছেঁড়া আরো ঢলঢলে একটা বুশ সার্ট গায়ে দিয়ে সে যখন পাঁচ মাথার মোড়ে ডাস্টবিনটার সামনে এসে উপস্থিত হয় ধূমকেতুর মত তখন তার মূর্তি দেখে কে?

পাশে পাঞ্জাবী রেস্তোঁরা থেকে মাংসের হাড়গোড় সব কুড়িয়ে নিয়ে নর্দমার পাশে বসে সে একটা হাড় চিবুচ্ছিল। আর থেকে থেকে দু-একটা হাড় একটু চুষে নিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল নেড়ী কুকুরটার দিকে। এমন সময় পিঠের উপর পড়ল তার প্রচণ্ড এক লাথি।

'ব্যাটা, নবাব পুত্তুর, সব মাংসটা নিজে গিলতে বসেছে। ভাগ হালা, ভাগ!'

লাথি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল খ্যাঁদা এঁটো-কুটোর উপর। হাত থেকে মাংসের হাড়টা ছিটকে পড়ল নর্দমায়। সে ওটা কুড়িয়ে নিল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, ও ফুটপাথের ঢ্যাঙা রিফিউজী ছোঁড়াটা ও আবার ধমকিয়ে উঠল :

'হালা! এটা তোর বাপের বাড়ী পাইছিস। অ্যাঁ, একা-একা সবটা খাবি?'

'চুপ কর বে!' সেও সমানে গলা বাজাল। বলল : 'বাপ তুলিস না বলছি থামাকা!'

'কি আমার বাপের বেটা রে?'

জবাবে ঢ্যাঙা ছোকড়াটা খ্যাঁদার মাথাটা ঠুকে দিয়েছিল জোরে ল্যাম্প পোস্টটার সঙ্গে। চোটটা বুঝি একটু জোরেই হয়েছিল। চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল সে। হাত দিয়ে দেখল : ভুরুর উপরটা ফুলে উঠেছে এরই মধ্যে। শুধু ফোলা নয়, রক্তও ঝরছে কেটে গিয়ে। কাঁদবার সময় নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী ঢ্যাঙা ছোকড়াটা বুঝি অতখানি কেটে যাবে ভাবে নি। সেও খানিকটা ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল।

এই সুযোগ। খ্যাঁদা তার হাতের জঞ্জাল ঘাঁটা শিকটা তুলে নিয়ে পেটে ওর মেরে বসেছিল সুঁচালো দিকটা দিয়ে।

জঞ্জাল-ঘাঁটা এ শিকটাই ছিল ওর একমাত্র হাতিয়ার। ডাস্টবিন থেকে খাবার সংগ্রহ করাই ওর কাজ নয়। খাবারের জন্য তাই অবশ্য করতে হয়। নইলে ডাস্টবিন আর রাস্তা থেকে ছেঁড়া কাগজ সংগ্রহ হোল প্রধান কাজ। জীবিকা। হাতের এ শিকটা দিয়েই ডাস্টবিনের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে সে তখন ছেঁড়া কাগজ খুঁজে বেড়ায়। আর ডাস্টবিনগুলো হোল রাস্তার কুকুরদের এক্তিয়ারের মধ্যে। একটা কুকুর তো একবার তার পায়ের গোড়ালিতে কামড়েই দিয়েছিল।

সে এক রক্তারক্তি ব্যাপার। সে ছিল তখন আরো ছোট। রাস্তার এক বাবু গাড়ী করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেকদিন তাকে থাকতেও হয়েছিল সেখানে। তাই এক ভাঙা উনানের লোহার এ শিকটা শানের উপর ঘষে ঘষে ধারাল করে নিয়েছিল। কুকুর তাড়া করলেই অমনি সে সুঁচালো শিকটা বাগিয়ে ধরে প্রস্তুত হয়ে থাকে। ভয়ে ওরা আর এগোয় না।

কিন্তু এমনি এক রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে সেও ভাবেনি। ছোঁড়াটা ক্ষত স্থানে হাত রেখে চিৎকার করে উঠল:

'হালা, মোরে খুন কইর‍্যা ফেলাইছে রে, খুন কইর‍্যা ফেলাইছে।'

কাঁদতে কাঁদতে সে তখন ওখান থেকে সরে পড়েছিল। তারপর আর কোনদিন আর লড়তে আসে নি তার সঙ্গে।

* * *

সকালে খাবার দাবার কিছু একটা খেয়ে নিয়ে পিঠের উপর চটের মস্ত বড়ো থলেটা ফেলে খ্যাঁদা রোজ বেরিয়ে পড়ে। ডাস্টবিনের মধ্যে উবু হয়ে কাগজ কুড়োতে কুড়োতে কতদিন তার কত জিনিসই না চোখে পড়ে। কুড়িয়ে পায় সে কত খেলনা দুমড়ানো, হাত-পা ভাঙা কত পুতুল। ছেঁড়া জুতো, টুপী, কত কিছুই না রোজ। তার মাথার টুপিটা তো সে এমনি একদিন পেয়েছিল কুড়িয়ে। পুলিশের টুপী। পুরনো হয়েছিল। তাই বুঝি ফেলে দিয়েছিল। ঝেড়ে-মুছে সে ওটা পরে বসেছিল মাথায়। যেন এক ক্ষুদে সাহেব। পায়ের ছেঁড়া জুতোটাও সে কুড়িয়ে নিয়েছিল ডাস্টবিনের তলা থেকে।

কুড়োনো কাগজগুলো রোজই সে ওস্তাদের কাছে জমা দিয়ে আসে। ওস্তাদ তাকে আনা কয়েক পয়সা দেয়। কাগজ কম হলে কিন্তু রক্ষে নেই। বৃষ্টি বাদলা-ঝড়-ঝাপটা কোন অজুহাতই চলবে না। শুধু পয়সা বন্ধ নয়। গাঁট্টাও সমানে খেতে হবে।

বাচ্চু তো একবার চালাকি করতে গিয়েছিল ওস্তাদের সঙ্গে। ধরা পড়ে সে কি মার! সেও তার মত ছেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে এনে ওস্তাদের কাছে জমা দেয়। পুলের নীচের চাতালটা হোল ওস্তাদের ডেরা। ওস্তাদ সারা দিন গাঁজা খেয়ে পড়ে পড়ে ঘুমায়। রাত্রিবেলা 'কাজে' বেরোয়। শেকলের বাঁধা কুকুরটাকে পাহারায় রেখে যায় আস্তানায়। সন্ধ্যের দিকে পুরনো কাগজগুলো পাট করে মস্ত বড়ো গাঁট বেঁধে নিয়ে যায় ঠেলাগাড়ী বোঝাই করে। তবে কোথায় নিয়ে যায়, জানে না সে। আর ছেঁড়া এ কাগজগুলো কি যে কাজে লাগে, তাও না।

তবে শুনেছিল, এসব ছেঁড়া কাগজ দিয়ে নাকি নানা রকম পুতুল, খেলনা সব বানান হয়, এ কাগজ থেকে আবার নাকি নতুন কাগজও তৈরি করা হয়। কাগজ থেকে কাগজ।

তা কি হয়? বিশ্বেস হয় না তার। তবে কথাটা বলেছিলেন সেদিন কোট-প্যান্টলুন পরা এক বাবুলোক। বলেছিলেন তাঁর ছেলেকে। ছেলেটা অনেকটা তারই মত মাথায়। শাদা সার্ট আর হাফ-প্যান্ট পরে—লাল ফিতের মত কি একটা গলায় বেঁধে আর পিঠে বইয়ের ব্যাগ ঝুলিয়ে রাস্তার পাশে বুঝি দাঁড়িয়েছিল গাড়ীর জন্যে। সে তখন জঞ্জাল ঘেঁটে ঘেঁটে ছেঁড়া কাগজ সংগ্রহ করছিল। আর পিঠের থলেটায় তা পুরছিল। ওকে দেখে ছেলেটা বলে উঠেছিল:

'দেখেছ বাবা, ছেলেটা কি নোংরা? ডাস্টবিন থেকে কাগজ কুড়িয়ে নিচ্ছে। অসুখ করবে না?'

'হ্যাঁ, করবে বইকি" তবে এ কাজ ওর অনেকটা অভ্যেস হয়ে গেছে কিনা।' বাবা জবাব দিয়েছিলেন। ছেলেকে আরো বলেছিলেন।

'দেখো, তোমরা কাগজ ছিঁড়ে কত নষ্ট কর। ও কিন্তু সেসব কুড়িয়ে নিচ্ছে। দেখবে ও থেকে কত সুন্দর সুন্দর খেলনা, পুতুল তৈরি হবে। আবার ও কাগজ থেকে নতুন কাগজও বানান হবে।'

ছেলেটা মন দিয়ে শুনছিল। বেশ ফুট-ফুটে ছেলে। বড়লোক হবে ঠিক। বাবু তারপর তাকে ডেকেছিলেন:

'হ্যাঁ রে ছোকরা তোর নাম কি?'

বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে সে তখনও তাকিয়েছিল ছেলেটার দিকে। পায়ে চকচকে জুতো মোজা। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। বড়লোকের ছেলে কিনা। ডাস্টবিন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া নিজের ছেঁড়া জুতোটা সে ছুঁড়ে দিলে রাস্তার দিকে।

'হ্যাঁ রে, তোর নাম কি বললি না?' ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন।

'অ্যাঁ, আমার নাম? আমার নাম, হ্যাঃ হ্যাঃ!'

খ্যাঁদা দাঁত বার করে বোকার মত হাসতে লাগল, বলল: 'অ্যাজ্ঞে আমার নাম খ্যাঁদা।'

ছেলেটা তখন খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল:

'খ্যাঁদা আবার কি নাম! আসলে তুই একটা হাঁদা!'

বাবা ধমকে উঠেছিলেন ছেলেকে।

'ছিঃ খোকা, অমন করে বলতে নেই ও মনে আঘাত পাবে।'

প্যান্টের পকেটে হাত গলিয়ে একটা আধুলি তিনি তারপর বার করলেন। আর সেটা ছুঁড়ে দিলেন ওর দিকে। আধুলিখানা খ্যাঁদা লুফে নিল শূন্যেই। সত্যি, এসব ব্যাপারে তার জুড়ি কম। অভ্যস্ত সে হামেসা এমনি কত পয়সা সে লুফে নেয়। বড়লোকদের শবযাত্রার সময় এমনি কত পয়সা আর খই না রাস্তায় ছুঁড়ে দেয়।

কিন্তু বাবুর দেওয়া ওই আধুলিটা অনর্থের মূল হয়েছিল সেদিন। ওর ট্যাঁকে আধুলিটা দেখে বাচ্চু ভাগ চাইলে আর্ধেকটা। খ্যাঁদা কিন্তু রাজী হয়নি। চেঁচিয়ে উঠেছিল:

'বাবু আমায় দিয়েছে মাইরি! তোকে আবার ভাগ দেবো কেন রে।'

'দিবি নে শালা, তবে মজা দেখাচ্ছি।' বাচ্চু শাসিয়েছিল। তারপর কথাটা ওস্তাদের কানে তুলেছিল। মিথ্যে করে বলেছিল: ফেরিওয়ালার কাছে সে নাকি কাগজ বেচে দিয়েছে আর্ধেকটা।

ওস্তাদ তাই বিশ্বেস করেছিল। গালে একটা চড় মেরে আধুলিটা তারপর নিজেই গায়েব করে নিয়েছিল। শাসিয়েছিল:

'ফিন করবি তো শালা, জান লিয়ে লেব, হ্যাঁ।'

কাঁদতে কাঁদতে সে তারপর ঘুমটির নীচে তার রাত্রের আস্তানায় ফিরে গিয়েছিল। কাগজের থলেটা মাথার নীচে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে পড়েছিল একসময়।

'ওস্তাদটা শয়তান আছে।' খ্যাঁদা বিড়-বিড় করে উঠল। বাবুর দেওয়া পয়সাটা শালা কেমন গায়েব করে নিল দেখো না। এ কি তোর পকেটমারের পয়সা যে তুই সবটা মেরে দিবি? নিজেকে নিজে শুধালে খ্যাঁদা। ওই তো সেবার সন্ধ্যেবেলা লোকভর্তি বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে এক বাবুর পকেট মেরে মণিব্যাগ শুদ্ধ অতগুলো নোট এনে ওস্তাদের হাতে এনে দিয়েছিল। ওস্তাদের সেদিন খুশী দেখে কে? তাকে শূন্যে অনেকখানি ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিয়েছিল তারপর। মুখে একটা বিড়ি গুঁজে দিয়েছিল তার। বলেছিল:

'হ্যাঁ, খ্যাঁদা আমাদের এক নম্বরের গুণী আছে। তোরা দেখে লিস, ও একদিন মস্ত বড়ো ওস্তাদ হবে।'

একটা কড়কড়ে টাকা হাতে দিয়ে তার তারপর বলেছিল: 'এ নে 'গোল্ডফিলেক' কিনে খাস বাবুলোকদের মত।'

হ্যাঃ, পয়সা দিয়ে আবার কেউ সিগারেট কিনে খায় নাকি? খ্যাঁদা শুধালে নিজেকে।—বাস আর ট্রাম স্টপে একটু ঘোরাঘুরি করলে আধপোড়া কত সিগারেট কুড়িয়ে নিতে পারে

বাবুরা ট্রামে আর বাসে উঠবার আগে
র সিগারেট রাস্তায় ছুঁড়ে দেয় কত।

সেদিন দুপুরের দিকে এমনি একটা পোড়া সিগারেট রাস্তা থেকে কুড়িয়ে ছিল সে। লাইট পোস্টটায় হেলান দিয়ে বুজে তাই টানছিল সে। ঠোঁট দুটি র করে ফুঁ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছল সে আস্তে আস্তে। হঠাৎ একটা গোলে ধূমপানের মেজাজটা তার উবে গেল। তাকিয়ে দেখল: ট্রাম লাইন ধরে কারা যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে কী সব চিৎকার করতে করতে। হাতে তাদের পতাকার মত কি যেন রয়েছে আবার।

বিস্তর লোক। শবযাত্রাই হবে। কোন বড়লোক মরেছে নিশ্চয়। পয়সা আর খৈ ছড়িয়ে ঠিক মড়া নিয়ে চলেছে পোড়াতে। দু পয়সা তা হলে আজও তার কামায় হবে। পিঠের থলেটা ভাল করে গুটিয়ে নিয়ে পয়সা কুড়োবার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে রইল। কেন না, এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে। কাড়াকাড়ি, ছুটোছুটি, এমন কি পয়সা নিয়ে মারামারি পর্যন্ত ঘটে। আগে থেকে তৈরি হওয়া ভাল। থাঁদা তাই প্রস্তুত হয়ে নিল।

আরে ধ্যাৎ, এতো শবযাত্রা নয়! তবে ছেলেগুলো অমন চিৎকার করছে কেন? শুধু ছেলে নয়। মেয়েও। সামনের দিকে রয়েছে সারি সারি অনেকগুলি মেয়ে। কারো হাতে

বই খাতা। কেউ বা হাতের ব্যাগটাকে ঝুলিয়ে নিয়েছে বগলের নীচে। মুখে আওয়াজ। সব বুঝতে পারে না খ্যাঁদা।

মিছিলময় মহানগরী। কলকাতা শহরে মিছিল আর শোভাযাত্রার অভাব নেই। কত শোভাযাত্রাই না যেন্ন হয়, মাড়োয়ারীদের বিয়ের শোভাযাত্রার কত বাজনা, কত আলো—রোশনাই বেলোয়াড়ী ঝাড়ের কত বাহার। একবার তো সে এমনি একটা ঝাড় লন্ঠন কাঁধে করে সঙ্গ নিয়েছিল বর-যাত্রার। আট আনা পয়সাও কামায় করেছিল। তবে, এ কেমনতর শোভাযাত্রা? কেমনতর মিছিল? খ্যাঁদা বারবার শুধাল নিজেকে।

মিছিলের প্রথম সারিতে দুটি মেয়ে লাল শালু বাঁধা লম্বা দুটি খুঁটি কাঁধে করে চলেছে আগে-আগে। লাল শালুর উপর শাদা তুলো দিয়ে কি যেন আবার লেখাও রয়েছে। কিন্তু মিছিলের যেন আর শেষ নেই। দলে দলে কাতারে কাতারে ছেলেমেয়ে এগিয়ে চলেছে তালে তালে পা ফেলে। মুখে আওয়াজ। শূন্যে মুষ্টি ছুঁড়ে চিৎকার।

নানা চিৎকার। নানা আওয়াজ। মিছিল দেখতে রাস্তার লোক সব জড়ো হয়ে গেল। এমন কি আশেপাশের বাড়ীগুলো থেকেও লোকজন সব বেরিয়ে এল।

মিছিলের একটা ছেলে আর মেয়ের দিকে খ্যাঁদা বার বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। মেয়েটির চোখে চশমা। পরনে হলদে পেচানো শাড়ী। গায়ের রঙের সঙ্গে শাড়ীর রঙ খাপ খেয়েছে বেশ। খাসা দেখাচ্ছিল। ছেলেটাও বেশ। আঁট-সাঁট সরু চোঙা প্যান্ট। আর গায়ে বুশ-সার্ট। পাশাপাশি দুজন এগিয়ে চলেছিল মিছিলে। হাতে লাল ফেস্টুন।

ছেলেমেয়েগুলো কি চিৎকার করছে খ্যাঁদা বুঝবার চেষ্টা করছিল। পেছন থেকে একটা খোঁচা খেয়ে সে মুখ ফেরালে। দেখল ট্রাম ঘুমটির পণ্ডা কখন এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে। চোখ ঠেরে পণ্ডা বলে উঠল:

'দেখছিস!'

'চুপ কর!' ধমকিয়ে উঠল সে। '—দেখছিস না ওরা সব কালেজ গাল?'

'রাখ, রাখ, তোর কালেজ গাল!' পণ্ডা মুখ ঝামটা মারলে। '—অমন কালেজ গাল আমার ঢের দেখা আছে। ওই তো পার্কের কোণে সন্ধেবেলা অমন কত মেয়েকে তোর আমি রোজ রোজ তুলে দিয়ে আসি বাবুদের ট্যাক্সিতে। বাবুরা আমায় কত টিপস দেয়।'

পণ্ডার কথায় কান না দিয়ে খ্যাঁদা মিছিলের সঙ্গে চলতে শুরু করলে। সাইকেলে চড়ে একটা ছোকরা তার হাতে একটা হ্যান্ডবিল গুঁজে দিল। হ্যান্ডবিলে কি লেখা আছে খ্যাঁদা জানে না। সে কেবল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল হ্যান্ডবিলটার দিকে।

মিছিলের সে মেয়েটা এক সময় বলে উঠল:

'এসো না ভাই, আমাদের সঙ্গে। চলো অ্যাসেমব্লিতে।'

'না।' খ্যাঁদা মুচকি হেসে মাথা নাড়লে। তবে সেও এগিয়ে চলল ওদের মতো।

খ্যাঁদাও ওদের সঙ্গে চিৎকার করল। দু-একটা খারাপ কথাও জুড়ল নিজের ইচ্ছামত।

মিছিলের অনেকে মুখ ফিরাল ওর দিকে। খিল-খিল করে হেসে ফেললও অনেকে। চশমা-পরা সে মেয়েটিও বুঝি। মৃদু ভর্ৎসনা করে উঠল তারপর:

'ছি ভাই, মুখ খারাপ করতে নেই।'

খ্যাঁদা অত-শত বোঝে না। চলতে চলতে সেও চলল ওদের মত চিৎকার করতে করতে। এক সময় মেয়েটাকে জিগেস করল: 'ওরা সব দল বেঁধে চলেছে কোথায়?'

মেয়েটি জবাব দিল: 'অ্যাসেমব্লি হাউস।'

অ্যাসেমব্লি হাউস কি এবং কোথায় জানে না সে। লাল ঝাণ্ডা কি তাও না। ভিয়েৎনাম কোথায় তা তো নয়। ফ্যাল-ফ্যাল করে সে কেবল তাকিয়ে রইল মেয়েটার মুখের দিকে।

মিছিল এগিয়ে চলেছে। খ্যাঁদাও চলেছে এগিয়ে। সহসা মিছিলের সামনের দিকটায় কি যেন ঘটে গেল। চৌমাথায় মিছিল এসে পৌঁছলে ঢাল, লাঠি-সোটাধারী একদল পুলিশ তাদের পথ রুখে দাঁড়াল। জানিয়ে দিল শোভাযাত্রা বে-আইনী। নিষিদ্ধ শ্লোগান দেওয়া চলবে না। ছাত্র দলকে ছত্রভঙ্গ হতে হবে।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? চারদিকে বিক্ষুব্ধ কন্ঠস্বর। প্রতিবাদে মুখর। জঙ্গী মিছিল দ্বিগুণ আওয়াজ তুলল।

চারদিকে চিৎকার আর চিৎকার। বিক্ষুব্ধ জনতা। সামনে বাধা পেয়ে মিছিলের এক অংশ রাস্তার মাঝখানটায় বসে পড়ল। আর এক দল লাল ঝাণ্ডা হাতে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে এগিয়ে গেল কিছুটা। পুলিশ বাহিনী তখন মারমুখো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। সামনের দিকে ট্রাম লাইনের উপর বসে পড়া মেয়েরা বাদ গেল না। পালাবার উপায় নেই বলে চোটটা পড়ল তাদের উপরই সব চাইতে বেশী।

পেট মোটা একটা পুলিশ এসে চশমা-পরা সেই মেয়েটার হাত থেকে লাল পতাকাটি কেড়ে নিল। ফেলে দিল তাকে ধাক্কা দিয়ে। চোখের চশমা খাতা-পত্র বগলের নীচে ঝোলান ব্যাগ—সব কিছু ছিটকে পড়ল ছত্রখান হয়ে।

খ্যাঁদা ছুটে গেল মেয়েটার কাছে। বেশ বুঝি চোট পেয়েছে। মুখ থুবড়ে তখনও পড়ে আছে মেয়েটি। খ্যাঁদা গিয়ে তাকে তুলে বসাল। চোখের চশমাখানি বুটের নীচে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে একেবারে। বই-গুলি গুছাতে গিয়ে ছোট্ট কালো একটা জিনিস হঠাৎ তার নজরে পড়ল। বেশ পুরু আর ভারী। বস্তুটা কি খ্যাঁদার জানা আছে। চক্ষের নিমিষে ওটা সে তুলে নিল। আর আপনার প্যান্টের পকেটে—দিল চালান। অভ্যস্ত হাত। কেউ টেরও পেল না।

চোখে বুঝি ভাল দেখতে পায় না মেয়েটা। চশমা নেই বলে ও কেবল এদিক-ওদিক হাতড়াতে লাগল। তাকাতে লাগল ড্যাব-ড্যাব করে।

পুলিশের তাড়া খেয়ে একখানা ঝাণ্ডা বুঝি কে ফেলে গিয়েছিল কিছু দূরে। খ্যাঁদা গিয়ে সেটা কুড়িয়ে আনল। এনে হাতে দিল মেয়েটির। খাতাপত্রগুলি কুড়িয়ে দিল তার। তারপর চকচকে সেই কালো বস্তুটা পকেট থেকে বার করে ওর হাতে গুঁজে দিল। সলজ্জ একটু হেসে বলল:

'এ নাও দিদিমণি, রাস্তায় পড়ে গিছিল আমি পাকিট মারিনি।'

ব্যাগটা লুফে নিল মেয়েটি ওর হাত থেকে। খুশিতে ফেটে পড়ে বলল:

'ভাগ্যিস তুমি পেয়েছিলে ভাই। নইলে মা খুব বকুনি দিতেন। অনেক টাকা কিনা। পরীক্ষার ফি দিতে এনেছিলাম।'

হৈ-চৈ, চিৎকার—আওয়াজ কিন্তু সমানে বেড়ে চলেছে। নতুন করে চার্জ করল পুলিশের দল। মিছিলের মধ্যে ওকে দেখতে পেয়ে একটা পুলিশ তেড়ে এল। বলল:

'ভাগ ব্যাটা, ভাগ! তুই আবার কেন মরতে এসেছিস এখানে?'

লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছিল পুলিশটা। কিন্তু তার আগেই খ্যাঁদা সরে পড়ল। তারপর দে দৌড়! একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে সে এবার ফিরে তাকাল। দেখল: পুলিশের দল মিছিলের উপর নির্মম লাঠি চালিয়ে চলেছে ছত্রভঙ্গ করতে জনতাকে। এক সময় তার চোখে পড়ল: দিদিমণির বন্ধু চোঙা প্যান্ট পরা সেই ছোঁড়াটাকে বেদম প্রহার করছে একটা সার্জেন্ট। ছেলেটা রাস্তায় পড়ে গেছে। তবুও কিন্তু সার্জেন্টের বেটন ক্ষান্ত হয়নি। সমানে পিটিয়ে চলেছে।

খ্যাঁদা গলির মুখ থেকে ছুটে এল। রাস্তা থেকে এক টুকরো ইঁট কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারল সে তাক করে সার্জেন্টটাকে।

অব্যর্থ সন্ধান। 'বাপ রে!' বলে চিৎকার করে উঠল সার্জেন্টটা। নাক দিয়ে তার রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। আর একটা পুলিশও বুঝি এগিয়ে আসছিল সার্জেন্টের সাহায্যার্থে কিন্তু তার আগেই আস্ত এক টুকরো ইঁট এসে পড়ল তার মাথায়। শুধু একটা নয়। দুটো নয়। খ্যাঁদা সামনে ইঁট-পাথর বর্ষণ করে চলল। আর মুখে এক রব:

'মার মার! মারের বদলে মার দে।'

জনতার সব কটা চোখ তখন খ্যাঁদার উপর। অবাক হয়ে সবাই তখন দেখতে লাগল ওর ইঁট ছোঁড়া। ইঁট তো নয়, যেন এক-একটা বুলেট। খ্যাঁদার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অনেকে তখন প্রতিধ্বনি তুলেছে:

'মারের বদলে মার। রক্তের বদলে রক্ত!'

প্রবল ইষ্টক বর্ষণের মুখে পুলিশ বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হল। অবস্থা বেগতিক দেখে তখন অন্য পন্থার আশ্রয় নিতে হোল। প্রথমে টিয়ার গ্যাস। তারপর ফাঁকা আওয়াজ। তাও যখন বিক্ষুব্ধ জনতাকে বাগে আনতে পারল না, তখন এক ঝাঁক তপ্ত সীসা বিদ্যুৎবেগে এসে আছড়ে পড়ল মিছিলের উপর সশব্দে।

বন্দুকের আওয়াজ পেয়েই যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল্। দেখতে দেখতে জনতা ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু রাস্তার উপর পড়ে রইল হতাহত কয়েকটি দেহ।

আর গলির মোড়ে থেঁতলে যাওয়া একটি রক্ত পদ্ম।

কর্মক্ষেত্রে কতখানি মানিয়ে চলতে পারেন?

জগতকে আমরা যা কিছু দিতে পারি, [কা]জের মধ্যে দিয়েই তা দিয়ে থাকি। কাজ [এ]মন একটা জিনিস যাকে উপভোগ করতে [জা]না চাই; কাজকর্মকে ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা মনে [ক]রে কোনরকমে সহ্য করে দিন কাটানোর [ম]নোভাব মোটেই ভাল নয়। যেসব জিনিস [থে]কে আমরা জীবনের সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি [পে]য়ে থাকি, কাজকর্মকে সেগুলির মধ্যেই [এ]কটি অপরিহার্য বিষয় বলে গণ্য করা [উ]চিত।

কিন্তু কাজ সম্পর্কে যদি আপনার ভুল [ধা]রণা গড়ে উঠে থাকে, তাহলে কাজ বোঝা [হ]য়ে পড়তে পারে। কিংবা যে-কাজ আপনার [প]ছন্দ নয়, তেমন কোন কাজে ভুল করে [য]দি লেগে থাকেন, তাহলেও আপনার কম-[জী]বন হয়ে উঠতে পারে জীবনের সবচেয়ে [ক]ষ্টকর বোঝা।

নীচে যে মনোপ্রশ্নচর্চাটি দেওয়া হল, [...] সম্পর্কে আপনি আন্তরিকভাবে 'হ্যাঁ' [অ]থবা 'না' জবাব দিয়ে চলুন। সবশেষে [স]ঠিক জবাবের তালিকা মিলিয়ে দেখতে [পা]রেন কর্মক্ষেত্রে আপনি কতখানি সামঞ্জস্য [রে]খে করে চলতে শিখেছেন।

১। কখন আপনার কাজের দিনটা শেষ [হবে], তার জন্যে আপনি কি ঘন ঘন ঘড়ির [দি]কে তাকান?

২। আপনার কাজের কথা নিয়ে আপনার [বা]ড়ীতে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আপনি খুব কম আলোচনা করেন?

৩। কাজ করতে করতে আপনি কি [অ]নেক কিছু কল্পনা করেন?

৪। আপনি যদি হঠাৎ অনেক টাকা [পে]য়ে যান, তাহলে কি কাজকর্ম সব ছেড়ে [দে]ন?

৫। কাজ করতে করতে আপনি কি প্রায়ই [...] করেন?

৬। কাজের মধ্যে মনপ্রাণ দিয়ে ডুবে [যাওয়া] কি আপনি খুব কম করেন?

৭। আপনি যাদের কাজ করেন, তাদের বেশির ভাগ লোককেই কি আপনার [অপছ]ন্দ হয়?

[৮]। কাজে যেতে কি আপনার প্রায়ই [...] হয়?

[৯]। যখন অন্য কেউ অফিসে প্রোমোশন [পায়], তখন কি আপনি হতাশায় অস্থির হয়ে পড়েন এবং আপনার মেজাজ কি বিগড়ে যায়?

১০। আপনি কি কাজকর্মে নিজেকে এত বেশি এগিয়ে দেন যে, অপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়?

১১। আপনার কাজ করতে আপনি কি বেশ উদ্দীপনা বোধ করেন?

১২। সকালবেলা কাজে বেরুতে আপনার কি বেশ ভাল লাগে?

১৩। আপনি যাদের সঙ্গে কাজ করেন, তাঁদের সঙ্গে কি আপনার বনিবনা ভাল?

১৪। কাজ করতে করতে আপনি কি মাঝে মধ্যে হাসি-আনন্দ করে থাকেন?

১৫। কাজের সমস্যা এবং ঝঞ্ঝাট আপনি কি বেশ বাগে আনতে পারেন?

১৬। আপনি কি মনে করেন, আপনার কাজটি খুব দরকারী?

১৭। আপনার অফিসের কাজকর্মের কাঠামো কিভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং সেই কাঠামোর মধ্যে আপনার জন্যে নির্দিষ্ট বিশেষ কাজের অংশটুকু ঠিক কি ধরণের ভূমিকা নিয়ে আছে, তা কি আপনি বেশ বোঝেন?

১৮। আপনার অফিসের কর্তা আপনার কাজকর্মে সন্তুষ্ট বলে কি আপনি মনে করেন?

১৯। আপনি যে কাজ করছেন, তার জন্যে আপনাকে মোটামুটি ভালোই মাইনে দেওয়া হচ্ছে বলে কি আপনি সন্তুষ্ট?

২০। আপনার কাজকর্ম আরও মনের মত করে তোলার জন্যে আপনি কি সব সময়ে নানারকম উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন?

•

প্রথম দশটি প্রশ্নের উত্তরে যদি "না" গুলিতে "হ্যাঁ" জবাব দিলে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন। ১১নং থেকে ২০নং প্রশ্ন-গুলিতে "হ্যাঁ" জবাব দিলে পাঁচ পয়েন্ট করে পাবেন।

যদি ৭০ পয়েন্ট কিংবা তারও বেশি পেয়ে থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে কাজ-কর্মে মানিয়ে নিয়ে চলবার প্রচুর ক্ষমতা আপনার মধ্যে রয়েছে।

যিনি ৩০ পয়েন্টের কম পাবেন, তাঁকে এক্ষুনি কাজকর্মের প্রতি মনোভাব পাল্টাতে হবে, কিংবা সম্ভব হলে কাজটাই বদলাতে হবে।

৩০ থেকে ৭০ পয়েন্টের মধ্যে বেশির দিকে যাঁরা পয়েন্ট পাবেন, তাঁরা কর্মক্ষেত্রে মোটামুটি মানিয়ে নিয়েই চলতে পারছেন বলে ধরে নিতে হবে। আর, যাঁরা কমের দিকে পাবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই কর্মক্ষেত্রে ভাল-ভাবে কিছুই মানিয়ে চলতে পারছেন না।

এই মধ্যবর্তী পর্যায়টিতে যাঁরাই পড়-বেন, তাঁদের প্রায় সকলের পক্ষেই কাজ-কর্মে আরও আগ্রহ উৎসাহ বাড়িয়ে তুললে বেশি তৃপ্তি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। দরকার কেবল একটু উদ্যোগের।

মনের আনন্দে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে যে কোন কাজই করি, তা থেকে আমরা গভীর তৃপ্তি আহরণ করে নিতে পারি।

কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজকে আমরা কর্তব্য বলেই শুধু মনে করতে শিখেছি, তার ফলে কাজ হয়ে পড়ে বোঝা, কাজের সময় যত এগিয়ে আসে ততই যেন মন বিষাদে ভরে উঠতে থাকে।

এই কারণে কাজের প্রতি আমাদের মনো-ভাব আগে বদলানোর চেষ্টা করতে হবে। মনে করতে হবে, যা করছি ভাল লাগে বলেই করছি।

যদি সত্যি সত্যি কোন কাজ ভাল না লাগে, তাহলে জোর করে তাকে ভাল লাগাতে বলছি না। বরং কাজ ভাল না লাগলে কাজ বদলে ফেলাই ভাল। আপনার মনের মত কাজ নিশ্চয়ই এ জগতে অনেকরকমই আছে, তারই কোন একটাতে আপনি সহজেই নিজেকে লাগিয়ে দিতে পারবেন। শুধু চাই একটু চিন্তা, একটু বিশেষ উদ্যোগ।

যদি লক্ষ্য করেন, সব কাজই আপনার খারাপ লাগে, কাউকেই ভাল লাগে না, কোন কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছেন না, তাহলে বুঝতে হবে, বিষাদ মনোব্যাধি আপনাকে জড়িয়ে ধরেছে। ঘাবড়াবেন না, একজন ভাল মনো-চিকিৎসকের কাছে চলে যান, সামান্য খরচ করলেই বিষাদ মনোব্যাধির চিকিৎসা করে ফেলা আজকাল কিছুই শক্ত নয়। যত তাড়া-তাড়ি সেদিকে যত্ন নেবেন, প্রফুল্ল মন নিয়ে তৃপ্তিভরা জীবনযাপন করা আপনার কাছে ততই সহজ হয়ে আসবে।

রমেশ দত্তের

রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা

৩৩

চিত্রকল্পনা-প্রেমেন্দ্র মিত্র

রূপায়ণে-চিত্রসেন
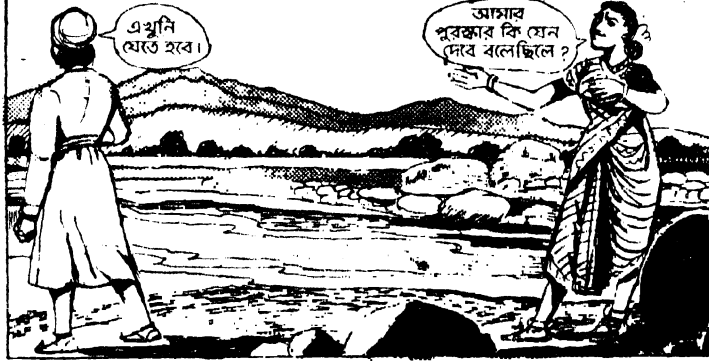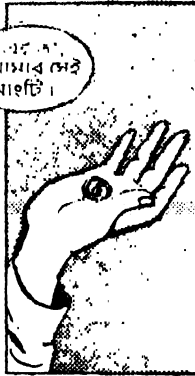
পথিকৃৎ আয়োজিত ২১.০৬০ ফুট উচ্চ বরা শিগরি শৃঙ্গ অভিযানের সফল অভিযাত্রী দল নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রসঙ্গতঃ আল্পস পর্বতের একটি শৃঙ্গে অভিযান কল্পে এ'রা প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। শৃঙ্গে আরোহণ করেন লক্ষ্মী পাল, স্বপ্না মিত্র, শীলা ঘোষ এবং জি বরালক্ষ্মী। সর্ব বামে দল নেত্রী দীপালি সিন্‌হা।

পুজোর পোশাক

পুজোয় শাড়ির বাহার দেখছিলাম। রঙ-বেরঙের কত শাড়ি। কিন্তু যে জিনিসটা ...জরে পড়ছিল না তা হলো, তাঁতের শাড়ি। ...মবয়েসী মেয়েদের এ শাড়ি তেমন পছন্দ ...য়। যাদের এ শাড়িতে মানায় তাঁরাও এদিকে ...তমন ঝোঁকেন নি। রঙচঙে তাঁরাও মেতেছেন। ...ত দিন যাচ্ছে ততই এ জিনিসটা প্রকট হচ্ছে। ...াড়ির রঙ আর পরার ঢঙে সবাই টেক্কা ...দতে চায়। দু'একদিন পুজো প্যান্ডেলে ...ুরে একই অভিজ্ঞতা। রঙে চোখ ঝলসে ...ায়—স্নিগ্ধ শান্ত রূপে আর চোখে পড়ে না।

রীতিমত খারাপ লাগছিল। হঠাৎ দেখা ...য়ে গেল পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে। আরো ...ালো লাগলো, পরণে তার তাঁতের শাড়ি। ...া দেখার জন্যে হা-পিত্যেশ হয়েছিলাম। ...গিয়ে নিজেই পরিচয়টা ঝালিয়ে নিলাম। ...ন্ধুও খুব খুশি। তাঁতের শাড়িতে ওকে ...ন্দর মানিয়েছে। ওকে টেনে নিয়ে পার্কের কোণে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়লাম।

ফেলে আসা দিনের অনেক কথা গিজ-গিজ করছে। সব ছাপিয়ে নিজের ভাবনাটাই প্রাধান্য পেল। মনে পড়ে, আমরা দুজনে ...লতি শাড়ির বিরুদ্ধে প্রায় জেহাদ ঘোষণা ...রে তাঁতের শাড়ি কিনতাম। আমাদের ...নয়ে ক্লাশের মেয়েদের মধ্যে অনেক কানা-...ুষো হতো। ঠাট্টাবিদ্রূপও অনেকে করতো। ...ক্তু আমরাও দমবার পাত্র নয়। রঙ-চঙে বাহার ছেড়ে তাঁতের শাড়ি পরেই আমরা কলেজে আসতাম। আস্তে আস্তে অনেকেই আমাদের দলে নাম লিখিয়েছিল। আজ তাদের খোঁজখবর প্রায় অজানা। রাস্তাঘাটে দু'একজনের সঙ্গে কখনোসখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে একজন আর একজনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই। আলাপ করার আর সুযোগ হয় না। আবার আলাপ করলেও ঘরকন্নার কথাই প্রাধান্য পায়। সেদিনের কলেজের পড়ুয়ারা আজ সবাই গিন্নিবান্নি। অনেকেই মা হয়েছে। তাই চট করে এসব ছেড়ে শাড়ির প্রসঙ্গ আসে না। আর শাড়ির চিন্তাটাও নেহাতই আজকের। ঠিক সেই সময়েই এই বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এবং আমাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসবের মুহূর্তে। যখন জামাকাপড়ের চিন্তা মনের অনেকখানি জুড়ে থাকে। তা বয়েস যাই হোক না কেন।

শাড়ির প্রসঙ্গ দিয়েই কথা শুরু। দুজনেই পুরনো অভ্যেসটি বজায় রেখেছি। বন্ধু দুঃখপ্রকাশ করলো, রঙচঙে বাহার আজকের বাজার মাত করেছে। আমাদের সময় থেকেই এটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু এতটা আপামর নির্বিশেষ ছিল না। এখন আর কাকে বলবো। সবাই তো একই পথের পথিক। পরের কথা কি বলবো, নিজের মেয়েদেরই আমার পথে রাখতে পারিনি। ওরা আমাকে ঠাট্টা করে বলে, সেকেলে। একদিন তাঁতের শাড়ি পরার জন্য ঠাট্টা করতো বন্ধু-বান্ধবরা। এখনও সেই ঠাট্টা। বন্ধুর বদলে মেয়েরা। ওরা বাহারে শাড়িতে খুশি। কিন্তু এ শাড়ির সৌন্দর্য ওরা বোঝে না। চুপ করেই থাকি।

বন্ধুকে এরকম দুঃখ করতে কোনদিন দেখিনি। কলেজী বন্ধুদের ইয়ার্কি-ফাজলামিকে ও প্রায় তোয়াক্কাই করতো না। সেই বন্ধু আজ নিজের মেয়েদের নিয়ে বিব্রত। আমিও হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত বোধ করি।

বন্ধুর নজর কিন্তু সেদিকে নেই। ও ততক্ষণে কথার খেই ধরে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। শুধু শাড়ি নয় পোশাক-আশাকে ইদানীং যেন একটা প্রলয় ঘটে যাচ্ছে। কেউ ওপর থেকে কমাচ্ছে আবার কেউ নিচের থেকে ওঠাচ্ছে। কেউ কেউ আবার দুদিক থেকেই। আবার শাড়িও অনেকের কাছে পরিত্যাজ্য। স্কার্ট-মিনিস্কার্টের কৃপায় অনেকেই শাড়ি ছেড়েছে। ফ্যাশানের যুগে সবাই ফ্যাশানেবল হচ্ছে। ঘুরে ঘুরে কদিন যা দেখলাম, তাতে হতাশাই সার।

বন্ধু বেমালুম চটেছে। মাথায় একই-রকম ভাবনা থাকলেও ভেবেছিলাম খোস-গল্পেই সময় কাটাবো। কিন্তু তা আর হলো না। বন্ধুকে শান্ত করার জন্য বলি,

ফ্যাশান তো আমাদের সময়েও ছিল। কয়েকজন মেয়ে [illegible] উগ্র সাজ-পোশাক করতো। [illegible] মতো তাদের [illegible] দেখতাম। তোমার মনে রাখা উচিত। সেদিনের যা ছিল বাড়াবাড়ি আজ তাই স্বাভাবিক।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বন্ধু বলে, সেদিন এদের সংখ্যা ছিল দুই কি তিন। আর আজ সবাই পাল্লা দিয়ে চলেছে। এখন কেউ কাউকে অনুকরণ করে না। প্রত্যেকেই এক একটি চলমান ফ্যাশান। আবার আমার মেয়ের কথায়ই আসি। একদিন তো মেয়ে আমাকে ধরে বসলোই, স্কার্ট আর টুপি চাই। আমি তো আকাশ থেকে পড়ি। সে আবার কি? যতদূর জানা ছিল, পশ্চিমী মেয়েরা মাথায় টুপি পরে। রোদের হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে। শীতের দেশের লোক রোদ সহ্য করতে পারে না তাই এর চল তো আমাদের দেশে ছিল না। আমাকে চিন্তান্বিত দেখে আমার মেয়ে বলে উঠলো, এই তো সেদিন একটা ফ্যাশান প্যারেডে এই পোশাকটা দেখলাম। বন্ধুরা বলছিল আমায় খুব মানাবে। তুমি কোন খবর রাখ না। না কিনে দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু এ যে কি ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তা বলে বোঝাতে পারবো না। ফ্যাশান প্যারেডের ফ্যাশান বৈচিত্র্য আমাদের সর্বনাশ করছে।

ব্লাউজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও অবাক হতে হয়। এই কিছুদিনের মধ্যে সব কিরকম বদলে গেল। লো-কাট আর স্লিভলেশের বাড়াবাড়িতে আমরা অস্থির। আঁটোসাঁটো ব্লাউজে লেপটে পরা শাড়ি শরীরকে ফুটিয়ে তোলে ঠিকই কিন্তু অন্য দিকটা ভেবে দেখে না। এর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে ভাবনা কারো নেই। পোশাকে আমাদের এই দৌরাত্ম্য বাচ্চাদেরও কিরকম বদলে দিয়েছে। তারাও মনের মতো অর্থাৎ জুতসই ছাট-কাটের জামাকাপড় চায়। নাহলেই নাকচ। দুদিন পরে অবস্থা যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আজ আর সেকথা ভাবাও চলে না।

আমি আবার এদিকটা অতখানি ভাবিনি। আমার বিবেচনায় এ ততটা ভয়ংকরও নয়। কারণ, পুরোন ফ্যাশানই ঘুরেফিরে নতুন হয়ে আসে। মনে পড়লো সেই ঘটনাটাও, মধ্যযুগীয় একটি পোশাক পরার জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজকুমারী মার্গা-রেটকে অশ্লীলতার অভিযোগে পড়তে হয়েছিল। সে নিয়ে বেশ হৈ চৈও হয়েছিল। আবার তা স্তিমিত হয়ে গেছে। পোশাক নিয়ে আমাদের দেশেও সোরগোল কম নয়। বিশেষ, পোশাকে শালীনতারক্ষা মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও আজ আর তা সম্ভব হচ্ছে না। বরং অশ্লীলতারই বিজ্ঞাপন হয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে পোশাকে নিরাবরণতা যে আরো বেড়ে যাবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। তা বলে শরীর ঢাকার নাম করে এক-গাদা জামাকাপড় পরে বেড়ানোরও কোন অর্থ হয় না। শরীর সাজাতে জামাকাপড়, ধোপার গাধা হতে যাবো কেন?

সেই চক্রের পরিক্রমাই তো চলছে। আজকের ফ্যাশান কাল অচল হচ্ছে। আমার পরশুর ফ্যাশান আজ বাজার মাত করছে। যত তাড়াতাড়ি বলা গেল তত তাড়াতাড়ি অবশ্য নয়। কিন্তু ফ্যাশানের নিয়মই এই, পুরোন নতুন হচ্ছে, নতুন পুরোন হচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বন্ধুকে বলি, ওরা যা করছে করুক। কিছুটা সংশোধনের দায়িত্ব আমরা নিশ্চয়ই নেব। কিন্তু আমাদের তাঁতের শাড়ি যে অপাংক্তেয় হয়ে যাচ্ছে সেটা ভেবে দেখেছ কি?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বন্ধু বললো, আমি আর তুমি ভেবে কতটুকু সুরাহা করতে পারবো। সবাই ভাবলে তবেই রেহাই।

আমারও তাই বক্তব্য। পোশাকে অশ্লীলতা যেমন তেমনি শাড়ি নিয়েও সকলের মাথা ঘামানো প্রয়োজন।

এলাহাবাদে পত্রিকা ভবনে লক্ষ্মী দেবীর এই প্রতিমায় পূজা হয়েছে।

সংবাদ

রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার নেশা ইদানীং বেশ জমে গেছে। এজন্য মেয়েরা দলে দলে পথে বেরিয়েছে। নানা দিকে তাঁদের লক্ষ্য। কেউ যাচ্ছেন পর্বত অভিযানে, কেউ যাচ্ছেন অন্য কোথাও। এই তো সেদিন পশ্চিমবঙ্গের পরিচালনায় একদল মহিলা পর্বতারোহী বরা শিগরি শৃঙ্গ জয় করে ফিরলেন। এটা যেমন এদের প্রথম ঘটনা নয় তেমনি শেষও নয়। এঁদের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি অসীম উৎসাহ আর আগ্রহে।

বরা শিগরি শৃঙ্গ জয়ের পর আরো একটি অভিযানের সংবাদ শোনা গেছে। তারও দিন প্রায় সমাগত। তুলনামূলক বিচারে নয়, অভিযান বৈচিত্র্যে এটিও যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক।

●

চারজন মহিলা এবার পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন দীঘা। কলকাতা থেকে যার দূরত্ব ১৫৫ মাইল। সঙ্গে তাঁরা শুধু নেবেন টর্চ এবং কিটব্যাগ। টাকাপয়সা কিছুই নেবেন না। সারাদিন পথ চলবেন। পথেই গড়ে উঠবে আত্মীয়তা। এ ভাবেই রাতের আশ্রয় জোগাড় করে নেবেন। এইভাবে পথ হেঁটে এরা ১০ নভেম্বর দীঘা পৌঁছুবেন। যাত্রা শুরু হবে ৬ নভেম্বর।

অভিযাত্রী দলের নেতা শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য রাইটার্স বিল্ডিংসে ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ক্রীড়ামন্ত্রী তাঁদের প্রচেষ্টায় অভিনন্দন জানান।

এই চার মহিলা এক্সপ্লোরারস ক্লাবের সভ্য। কিন্তু অভিযানের উদ্যোক্তা নিজেরাই। প্রসঙ্গতঃ এঁরা সকলেই অবিবাহিত।

ইডেন্ গার্ডেন্ কি কলকাতায়, বাংলাদেশে? ইডেন্ গার্ডেনের ভিতরে একপাশে যে সুরম্য প্রাসাদটি দাঁড়িয়ে আছে সেটাও কলকাতায়, বাংলাদেশে? বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি আর শিল্প প্রচারের জন্যই তার নির্মাণ? —বিশ্বাস হয় না।

এই সুরম্য প্রাসাদে ঢোকার আগে বাইরে একবার অবশ্য তা-ই মনে হতে পারে। দূর থেকে এই সুরম্য প্রাসাদের মাঝ বরাবর একবার বড়ো বড়ো নীল বাংলা হরফে দেখা যাবে—আকাশবাণী ভবন। তারপর আর না। আর বাংলা না। কোথাও না। একবারও না।

আকাশবাণী ভবনের ভিতরে ঢুকেই অমনি যেসব বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়বে তার কোনোটাতে একটি বর্ণও বাংলা নেই। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে দোতলায় আর তিনতলায় উঠে গেলেও কোথাও এক অক্ষর বাংলা দেখা যাবে না। সব হিন্দী, তার সঙ্গে ইংরেজী। যেদিকে তাকাবেন হিন্দী আর ইংরেজী। যে ঘরে ঢুকতে যাবেন, ঢোকার আগে দরজার পাশে কাঠের ফলকে হিন্দীতে আর ইংরেজীতে নাম দেখতে পাবেন। ...যেন হিন্দী রাজ্য। উপরে নিচে সর্বত্র খালি হিন্দী আর হিন্দী। সঙ্গে ইংরেজী।

নিচে স্টুডিওর ভিতরে ঢোকার পরে হিন্দী আর দেখা যাবে না, শোনা যাবে। শেখা যাবে।

হিন্দী শেখানোর জন্য এই কেন্দ্রে একটা আসর আছে—"হিন্দী শিক্ষার আসর"। না, এখন "আসর" কথাটা আর নেই—তুলে দেওয়া হয়েছে, শুধু "হিন্দী শিক্ষা" করা হয়েছে। এ সম্পর্কে একটা মজার গল্প শোনা গেছে। অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে শোনা গেছে।

একজন বড়োগোছের কর্তা এই কেন্দ্রে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। নতুন এসে পুরনো কাজকর্ম সব খতিয়ে দেখতে গিয়ে "হিন্দী শিক্ষার আসর" নামটা তাঁর চোখে পড়ল। 'হিন্দী শিক্ষা"র সঙ্গে "আসর" কথাটা তাঁর ভালো লাগল না। ভাবলেন, শিক্ষার আবার আসর কী? গানের আসর শুনেছেন, গল্পের আসর শুনেছেন—কিন্তু শিক্ষার আসর? নাঃ, মনে পড়ছে না। শিক্ষার আসর হয় না। তিনি প্রস্তাব করলেন, "হিন্দী শিক্ষার আসর" নামটা বদলে "হিন্দী শিক্ষার অনুষ্ঠান" করতে হবে।

তখন কেউ কেউ আপত্তি জানালেন—'হিন্দী শিক্ষার' সঙ্গে 'অনুষ্ঠান' কথাটা ভালো শোনায় না। সেই আপত্তি মেনে নিয়েই বোধহয় "হিন্দী শিক্ষার অনুষ্ঠান" করা হয়নি। তবে "হিন্দী শিক্ষার আসরও" আর থাকতে পারেনি। "অনুষ্ঠান" আর 'আসর' দুটোই বাদ গেছে—শুধু "হিন্দী শিক্ষা" হয়েছে। কিছুদিন থেকে বেতারজগতে "হিন্দী শিক্ষা" ছাপা হচ্ছে, বেতারে "হিন্দী শিক্ষা" বলা হচ্ছে।

থাক সে কথা। "হিন্দী শিক্ষার আসর" আগে বেশ কিছুকাল চলেছিল। তারপর ১৯৬২ সালে চীনা হামলার সময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনেকদিন বন্ধ ছিল। এখন আবার আরম্ভ হয়েছে। অনেকদিন থেকেই হয়েছে। শনিবার আর রবিবার ছাড়া সপ্তাহের আর পাঁচটা দিন সকাল সাড়ে ৮টায় কলকাতা—খ খুললেই "হিন্দী শিক্ষার আসর" শোনা যাবে। কিন্তু শোনে না কেউ। অন্তত আমার জানাশোনার মধ্যে কাউকে শুনতে দেখিনি।

অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি, "হিন্দী শিখছেন? রেডিও থেকে এত খরচপত্তর করে উৎসাহভরে যে হিন্দী শেখানো হচ্ছে, শিখছেন?"

প্রত্যেকেই বলেছেন, "না।"

আবার জিজ্ঞাসা করেছি, "আপনাদের জানাশোনার মধ্যে কেউ শিখছেন?"

সেই একই উত্তর পেয়েছি, "না।"

তাহলে কারা হিন্দী শিখছেন? হয়তো কেউ না। হয়তো গোনাগুনতি দু-চারজন। তবু হিন্দী শেখানো হচ্ছে। সপ্তাহে পাঁচদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে পৌনে ৯টা এই পনের মিনিট অসীম ধৈর্যে, প্রবল উৎসাহে, ভীষণ গাম্ভীর্যে হিন্দী শেখানো হচ্ছে।

এই হিন্দী শেখানোর জন্য "হিন্দী শিক্ষার আসরে", থুড়ি "হিন্দী শিক্ষায়" একজন ট্রেনার আছেন, দুজন পার্টিসিপ্যান্ট আছেন—একজন বালক, আর একজন বালিকা। ট্রেনার বিনাপয়সায় ট্রেনিং দিচ্ছেন না, পার্টিসিপ্যান্টরাও বিনা পয়সায় পার্টিসিপেট করছেন না—কারণ, রেডিওয় বিনা পয়সার কারবার নেই। তাহলে এই তিনজনের জন্য মাসে কত খরচ হচ্ছে? কেন হচ্ছে? কেউ যখন হিন্দী শিখছেন না (অথবা গোনাগুনতি দু-চারজন শিখছেন) তখন কেন প্রতি মাসে এতগুলো করে টাকা অপচয় করা হচ্ছে? জনসাধারণের টাকা এমন করে অপচয় করার অধিকার কে দিয়েছে বেতার কর্তৃপক্ষকে?

তাছাড়া বাংলাদেশের বাঙালী শ্রোতাদের হঠাৎ আবার হিন্দী শেখাবার প্রেরণা এল কোথা থেকে? কেন এল? হিন্দী প্রচার? হিন্দী প্রচারে বড়ো বেশি মাতামাতি করা হচ্ছে। হিন্দী প্রচারে কলকাতা কেন্দ্রকে বড়ো বেশি কাজে লাগানো হচ্ছে।

এই লাগানোর বহরটা একবার খতিয়ে দেখা যাক। কলকাতা কেন্দ্রে মোট তিনটি বিভাগ—ক, খ, গ। ক বিভাগ থেকে নিয়মিত হিন্দী অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়—"হিন্দী কারিয়ক্রম"। এই বিভাগ থেকে প্রতিদিন একটা করে হিন্দী নিউজ বুলেটিন রিলে করা হয়। এই বিভাগের মজদুরমণ্ডলী আসলে হিন্দীমণ্ডলী ছাড়া আর কিছু না, কারণ হিন্দী কথিকা, আলোচনা, সাক্ষাৎকার, গান প্রভৃতিতেই এই আসরটি পুষ্ট থাকে। এই বিভাগ থেকে প্রচারিত শিল্পী, সংবাদ বিচিত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠানেও ছলেবলেকৌশলে খানিকটা করে হিন্দী অনুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়। একথা ইতিপূর্বে বহুবার দৃষ্টান্ত সহযোগে বলা হয়েছে।

খ বিভাগে তো খাস "হিন্দী শিক্ষা"। এই বিভাগেও "হিন্দী কারিয়ক্রম" আছে, হিন্দী নিউজ বুলেটিন আছে—একটা নয়, দুটো।

গ বিভাগটিকে তো প্রায় সম্পূর্ণ হিন্দীকে উৎসর্গ করে দেওয়া হয়েছে। গ বিভাগে চলে বিবিধভারতী, বাংলাদেশের শ্রোতারা নাম দিয়েছেন হিন্দীভারতী। কারণ, এই বিভাগে প্রায় সর্বক্ষণ উচ্ছল উদ্দাম, হাল্কা চটুল হিন্দী গান বাজে। আর হিন্দী বিজ্ঞাপন শোনা যায়। এই বিভাগ থেকে হিন্দী নিউজ বুলেটিন প্রচার করা হয় একটি দুটি তিনটি নয়, পাঁচ পাঁচটি।

নিউজ বুলেটিনের সংখ্যা বিচার করলে দেখা যাবে, কলকাতা কেন্দ্র থেকে বাংলার চেয়ে হিন্দী নিউজ বুলেটিনই প্রচার করা হয় বেশি।

কলকাতা কেন্দ্রের ক, খ, গ তিনটি বিভাগ থেকেই হিন্দী বুলেটিন প্রচারিত হয়, বাংলা হয় শুধু ক আর খ থেকে। গ বিভাগে বাংলা বুলেটিনের স্থান নেই। ক বিভাগে হিন্দী বুলেটিনের সংখ্যা এক—বেলা ১টা ৪০ থেকে ১টা ৫০; খ বিভাগে দুই—সকাল ৮টা থেকে ৮টা ১৫ ও রাত ৮টা ৪৫ থেকে ৯টা; গ বিভাগে পাঁচ—সকাল ৮টা থেকে ৮টা ১৫, বেলা ১০টা ৫০ থেকে ১০টা ৫৫, ৩টে ৩৫ থেকে ৩টে ৪০, রাত ৮টা ৪৫ থেকে ৯টা ও ১০টা ৩৫ থেকে ১০টা ৪০ আর বাংলা বুলেটিন ক বিভাগে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে পৌনে ৮টা, ৯টা থেকে ৯টা ৫, বেলা ১২টা ৫০ থেকে ১টা, রাত সাড়ে ৭টা থেকে পৌনে ৮টা, ৭টা ৫০ থেকে ৮টা ও ১০টা ৫ থেকে ১০টা ১৫ (শনিবারে ৯টা ২০ থেকে ৯টা ৩০); আর খ বিভাগে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে পৌনে ৮টা, বেলা ১২টা ৫০ থেকে ১টা ও রাত সাড়ে ৭টা থেকে পৌনে ৮টা।

ক, খ, গ—এই তিনটি বিভাগে মোট হিন্দী বুলেটিনের সংখ্যা আট। অবশ্য খ বিভাগের বুলেটিন দুটি গ-বিভাগের সংগে কমন। কমন দুটি বাদ দিলে কলকাতা কেন্দ্র থেকে মোট হিন্দী বুলেটিন সংখ্যা হয় ছয়।

ক, খ, গ—এই তিনটি বিভাগের মধ্যে গ বিভাগ থেকে একটিও বাংলা বুলেটিন প্রচার করা হয় না। ক আর খ বিভাগ থেকে মোট নয়টি প্রচার করা হয়। কিন্তু খ বিভাগের তিনটি বুলেটিনই ক বিভাগের সংগে কমন। সুতরাং কমন বাদ দিয়ে কলকাতা কেন্দ্র থেকে মোট বাংলা বুলেটিনের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়।

অর্থাৎ হিন্দী বাংলা সমান সমান। কিন্তু এই সমানে কী হবে? হিন্দী বুলেটিন যে তিনটি বিভাগ থেকেই প্রচারিত হয় আর বাংলা বুলেটিন মাত্র দুটি বিভাগ থেকে। অর্থাৎ হিন্দীর ভাগে পড়ে বেশি, হিন্দী প্রাধান্য পায় বেশি।

আরও কথা আছে ঃ কলকাতা কেন্দ্রের নিজস্ব তিনটি বাংলা বুলেটিন আছে—প্রথমটি সকাল ৯টায়, দ্বিতীয়টি রাত ৭টা ৫০য়ে, ও তৃতীয়টি রাত ১০টা ৫য়ে (শনিবারে ৯টা ২০তে)। কিন্তু এই তিনটি বুলেটিনের মধ্যে একটিও খ বিভাগ থেকে প্রচারিত হয় না, সবই হয় ক বিভাগ থেকে। এমন কি, রাত ৭টা ৫০য়ের স্থানীয় সংবাদও খ বিভাগ পায় না। এতই গুরুত্বহীন স্থানীয় সংবাদ?

পশ্চিমবংগে হিন্দীভাষীর সংখ্যাই কি বেশি যে, তিনটি বিভাগ থেকেই হিন্দী সংবাদ প্রচার করতে হবে? বাংলাভাষীর সংখ্যা কি কম যে, মাত্র দুটি বিভাগ থেকে বাংলা সংবাদ শোনানো হবে? তা-ও একটি বিভাগ থেকে ছাড়া স্থানীয় সংবাদ শোনা যাবে না?

বাংলাদেশে স্থানীয় সংবাদের সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনেকের কাছে সর্বভারতীয় সংবাদের চেয়ে স্থানীয় সংবাদেরই গুরুত্ব বেশি। সর্বভারতীয় সংবাদ অন্যান্য কেন্দ্র থেকেও শোনা যায়, ইংরেজীতেও যায়—কিন্তু বাংলাদেশের সংবাদ শুনতে হলে একমাত্র কলকাতা কেন্দ্রই ভরসা। অন্য কোনো কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্থানীয় সংবাদ প্রচার করা হয় না। করার কথাও নয়। তাহলে কেন কলকাতা কেন্দ্রের সমস্ত বিভাগ থেকে স্থানীয় সংবাদ প্রচারিত হবে না। একই হিন্দী সংবাদ যখন কলকাতা কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রচারিত হতে পারে তখন বাংলা স্থানীয় সংবাদ কেন পারবে না? কেন বাংলাদেশে বাংলার চেয়ে হিন্দী বেশি প্রাধান্য পাবে?

শুধু সংবাদেই নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও হিন্দীর প্রাধান্য দেখা যায়। যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিল্লী থেকে রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী কিংবা অন্য কোনো মন্ত্রী ইংরেজী আর হিন্দী ভাষণ দেন, কলকাতা থেকে (অনেক সময় কলকাতার সমস্ত বিভাগ থেকে) ইংরেজী ভাষণের সংগে হিন্দী ভাষণও রিলে করে শোনানো হয়। এছাড়া দিল্লী থেকে প্রচারিত বিশেষ হিন্দী নিউজ আর নিউজ রীলও কলকাতা থেকে পুনঃপ্রচার করা হয়।

এই সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট-গণনার দিন দিল্লী থেকে অনেকগুলি অতিরিক্ত ইংরেজী আর হিন্দী নিউজ বুলেটিন প্রচার করা হয়েছে। কলকাতা থেকে ইংরেজীর সংগে হিন্দী বুলেটিন-গুলিও রিলে করা হয়েছে। বাংলাদেশের বাংলাভাষী শ্রোতাদের জন্য এমন একটা উৎকণ্ঠাপূর্ণ দিনে দিল্লী একটাও অতিরিক্ত বাংলা বুলেটিনের ব্যবস্থা করেনি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দিল্লীতে হিন্দীর যে প্রাধান্য আছে, কলকাতাতেও তা বিস্তার করার একটা নির্লজ্জ, উদ্ধত চেষ্টা হচ্ছে। বাংলাদেশেও হিন্দী রাজত্ব করছে, আর বাংলা করছে দাসত্ব। কিন্তু কেন? কেন বাংলা তার স্বস্থানে পরাধীন হয়ে থাকবে? কেন সে তার নিজের জায়গায় যোগ্য স্থান পাবে না? কেন বাঙালীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দী শেখানোর চেষ্টা হবে? ভারতের অন্য কোন্ কেন্দ্র থেকে বাংলা শেখানো হয়? হিন্দী রাষ্ট্রভাষা, তাই হিন্দী শেখানো হচ্ছে—এ যুক্তি কেন মানবে বাংলা-দেশের লোক? হিন্দীকে কে রাষ্ট্রভাষা করেছে? তামিলনাড়ুতে হিন্দী শেখাতে গিয়ে কি হাল হয়েছে, হিন্দীওয়ালাদের তা মনে আছে নিশ্চয়! তাঁরা কি চান বাংলাদেশেও সেই হাল হোক? নিশ্চয় না। তাহলে একটু সংযত হওয়া দরকার। বাংলা-দেশে বাংলাকেই প্রাধান্য দেওয়া দরকার। ...একটু বোঝা দরকার।

—শ্রবণক

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব

'গোল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক'বিহীন ভেনিসের ৩৩তম চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। পরিচালক কিয়ারানীর উন্নাসিকতায় তরুণরা ক্রমশই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং তার চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পেল গত বছর যখন পেসোলিনী প্রভৃতির নেতৃত্বে বিদ্রোহী পরিচালকরা তাঁদের ছবি প্রদর্শনে বাধা দিলেন। কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে ফেস্টিভ্যাল দুদিনের জন্যে বন্ধ রাখতে হয়েছিল। তাই এবার ফেস্টিভ্যালের গঠন ও পরিকল্পনায় এসেছে আমূল পরিবর্তন। কিয়ারানী পদত্যাগ করে-ছেন। এরনস্ট লোরা এবার থেকে ফেস্টি-ভ্যাল ডাইরেক্টর হলেন; এবং প্রথম বছরেই পানামা, বলিভিয়া, কিউবা, ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের ছবি প্রদর্শনের সুযোগ দিয়ে সংস্কার-মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন।

তবে ভেনিসের মত একটা বিশেব প্রাচীনতম চলচ্চিত্র উৎসবকে পুরস্কার-বিহীন করে তিনি কতখানি মর্যাদা দিলেন তা বিবেচনাসাপেক্ষ। চলচ্চিত্র উৎসব কি প্রতিযোগিতামূলক হবে না প্রতিযোগিতা বিহীন হবে সেটা বিতর্কিত। বৃটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন ডাইরেক্টর প্রখ্যাত চলচ্চিত্রবিদ জেমস্ কুইনকে এবিষয়ে মতা-মত জিজ্ঞাসা করেছিলাম, জেমস্ কুইনের মতে চলচ্চিত্র উৎসব প্রতিযোগিতামূলক হলে তার খারাপ দিকটাই বেশী চোখে পড়ে। বিশেষ করে পুরস্কার বিতরণের বেলায় প্রায়ই পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। যার ফলে অনেক সময় অপেক্ষাকৃত নিচুমানের ছবিও পুরস্কৃত হয় শিল্পসম্মত ছবিকে বঞ্চিত করে। যদিও বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞদের নিয়েই আন্তর্জাতিক জুরী গঠন হয়, তবুও তাঁরা প্রায়ই বিশেষ কোন রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবিত হন। বিশেষ করে গত দুই এক বছর ধরে তা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বার্লিন ফিল্ম ফেস্টি-ভ্যালের ডাইরেক্টর ডক্টর বাওয়ার সম্পূর্ণ অন্যমত পোষণ করেন। তাঁর মতে উৎসব যদি প্রতিযোগিতামূলক না হয় তাহলে তরুণ পরিচালকরা বিশ্বচলচ্চিত্রে পরিচিত হবে কি করে। পরীক্ষা না থাকলে যেমন পাস বা ফেলের প্রশ্ন থাকে না তেমনি প্রতি-যোগিতা না থাকলে ভাল বা খারাপের বাছবিচার থাকে না। সবাই ত আর সমান প্রতিভাবান নন এবং তার যাচাইয়ের কষ্টি-পাথর হল প্রতিযোগিতা।

এবারের ভেনিস উৎসবের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন ফেলিনী স্বয়ং ও তাঁর ছবি সেতীরকন। ফেলিনীর আবির্ভাব প্রায় পাঁচ বছর পর। দি স্পিরিট অফ জুলিয়েটার পর প্রায় পাঁচ বছর বাদে তিনি এই ছবিটি উপহার দিলেন। ফেলিনীকে নিয়ে কৌতূহলের অন্ত নেই। সারাদিন সম্মেলনে সাংবাদিকদের অজস্র প্রশ্নের জবাব তিনি হাসিমুখেই দেন। নীচে কয়েকটা উদাহরণ দিলাম ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার শেষ চিত্র মুক্তি পেয়েছে পাঁচ বছর আগে, এতদিন যে আপনি কোন ছবি করেন নি তার কি কোন বিশেষ কারণ ছিল?

ফেলিনী ঃ আমার এই নীরবতার কারণ আমার নিজের কাছেই অজ্ঞাত। শিল্পীকে অনুভূতিপ্রবণ মন নিয়ে কাজ করতে হয় এবং যদি সেই একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটে তখন তার পক্ষে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। ডি লরেনটিসের প্রযোজনায় আমি দ্য জার্নি অফ মাস্টোরনার কাজ শুরু করি কিন্তু নানা কারণে দীর্ঘকাল ছবিটির চিত্রগ্রহণ স্থগিত থাকে। ডি লরেনটিস সহানুভূতি-

শীল ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা ও চিন্তাধারার সঙ্গে বোধহয় আমার কর্ম-পদ্ধতির কোন সামঞ্জস্য নেই এবং যার ফলে আমার একাগ্রতা বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘদিন চিত্রপরিচালনায় বিরত থাকি।

প্রশ্ন : আপনার কি মনে হয় না এই চার বছর আপনার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে?

ফেলিনী : আমি তার জন্য কোন আক্ষেপ করি না। এই চার বছরে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছি যার মূল্য অনেক।

প্রশ্ন : যুদ্ধোত্তর ইতালির চলচ্চিত্র যখন নব বাস্তববাদে অনুপ্রাণিত, আপনি কি করে প্রথম ছবি থেকেই নববাস্তববাদের ঢেউ এড়িয়ে স্বকীয় চিন্তাধারা প্রয়োগ করলেন?

ফেলিনী : এই প্রশ্নের জবাব দিতে আমি মোটেই ইচ্ছুক নই।

প্রশ্ন : আপনার নতুন ছবি সম্পর্কে কিছু বলুন?

ফেলিনী : এডগার এলেন পোর কাহিনী নিয়ে একটা ছবি তুলছি। কাহিনীটি আমাকে বিশেষ করে আকর্ষণ করে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ফরাসী প্রযোজনায় আমার পরিকল্পনানুসারে কাজ করে খুব আনন্দ পাচ্ছি। প্রায় চার বছর আগে ডি লরেন্টিসের হয়ে 'লাস্ট্রাডা' করেছিলাম। কিন্তু আজ বারো বছর বাদে আমাদের পক্ষে একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। ডি লরেন্টিসের হলিউডি কর্মপদ্ধতি আমার পছন্দ হয় না। কারখানার নিয়মকানুনে ফিল্ম স্টুডিওতে চলে না, ফিল্ম একটা আর্ট এবং তার প্রকাশের জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ। আমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে ভালবাসি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাতেই চিত্রকারের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব।

প্রশ্ন : 'সেত্যিরিকন' সম্পর্কে আপনার কি মত?

ফেলিনী : '৩৯ সনে আমি এ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট প্যারোডি হিসাবে 'সেত্যিরিকন' মঞ্চস্থ করতে চেষ্টা করেছিলাম। সেই থেকেই সেত্যিরিকন চলচ্চিত্র রূপায়ণের কামনা আমার মনে ছিল। প্রাচীন রোমের পটভূমিকায় একটা ছবি করার ইচ্ছে আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। সেত্যিরিকনের কাহিনী ও পটভূমিকা আমার অন্যান্য ছবি যথা 'আই-ভেতোলোনি', 'লাস্ট্রাডা', 'লা ডলচে ভিতা', '৮½' ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সেত্যিরিকন ফেলিনীর প্রথম কস্টুম ফিল্ম। প্রাচীন রোমের রূপ, রস, ঐশ্বর্য, বিলাসিতা ছাড়াও তৎকালীন রোমান জীবনযাত্রা ও সামাজিক রীতিনীতির এক নিখুঁত চিত্ররূপ।

ভারতের ভুবন সোম এবার ভেনিস উৎসবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রবিদদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভুবন সোম পাখী শিকার করতে গিয়ে নতুন এক পৃথিবীর সন্ধান পেলেন যার স্মৃতি তাঁর অফিসজীবনের একঘেয়ে দিনগুলোকে রোমাঞ্চিত করে তুলল। বনফুল রচিত এই কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রায়ণে পরিচালক মৃণাল সেন যে সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। ছবির ক্রেডিট টাইটেল ভুলবার নয়। ডায়নামিক ফ্রেমের ব্যবহারও বোধহয় ভারতীয় চলচ্চিত্রে মৃণাল সেনই প্রথম করলেন। কাহিনী, কলাকুশলী ও শিল্পী নির্বাচনে মৃণাল সেন রীতিমত দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন। পুনা ফিল্ম ইনস্টিট্যুটের কে কে মহাজনকে মৃণাল সেনই সর্বপ্রথম কাহিনীচিত্রে সুযোগ দিলেন। কে কে মহাজন আলোকচিত্রগ্রহণে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন, ভুবন সোমের ভূমিকায় উৎপল দত্ত যথাযথ, গৌরীর চরিত্রে নবাগতা সুহাসিনী মোলে চমৎকার অভিনয় করেছেন। মনেই হয় না এটা তাঁর প্রথম ছবি। গাড়োয়ানের ছোট্ট ভূমিকায় শেখর চ্যাটার্জি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ভুবন সোম মৃণাল সেনকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। সিনেমাথিক ফ্রাঁসেজ ও বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য উৎসাহী হয়েছেন। ফ্রাংকফুর্টের আগামী এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য ছবিটি নির্বাচিত হয়েছে।

রুশ চিত্র মরনিং স্টার উৎসবের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির অন্যতম, কবি ওলগা বেরঘোলৎসের রোজনামচা অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন টালিনকিন। জারের সময়কালীন রাশিয়া—জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার অবর্ণনীয় ইতিহাস ও সমাজতন্ত্রবাদ কি করে ধীরে-ধীরে সাধারণ মানুষের ভরসা ফিরিয়ে আনল তারই কাহিনী কবি ওলগা বেরনহোলৎসের কাব্যে স্থান পেয়েছে। পরিচালক টালিনকিন কাহিনীটিকে চলচ্চিত্রে রূপদান করতে গিয়ে সোভিয়েত চলচ্চিত্রের তথাকথিত বিয়রস ফরমুলা বর্জন করে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করেছেন এবং সেটাই পরিচালক টালিনকিনের সবচেয়ে বড় সাফল্য। কাহিনীর আবেগধর্মিতা ও ঐতিহাসিক সত্যতার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে পরিচালক কখনই ভুলে যান নি যে চলচ্চিত্র একটি বিশেষ শিল্প-মাধ্যম। যার ফলে ছবিটি একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি হিসাবে অভিনন্দন পাবার যোগ্য।

ফরাসী চিত্র দাফিয়াসে অফ পাইরেট রীতিমত উপভোগ্য। পরিচালিকা নেলী কাপলারের শিল্পীমন সুস্পষ্টভাবে প্রকট।

ফ্রান্সের একটা ছোট্ট গ্রামের অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় ও গীর্জার মহামান্য পাদ্রি জনৈকা জীপসি-তনয়ার জীবন অতিষ্ট করে তুলেছিল। নিরুপায় হয়ে তরুণীটি সবাইকে শিক্ষা দেবে স্থির করে। অনেক ভেবে-চিন্তে সে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করল, সমাজের এই কলঙ্কময় স্তরে এসে সমাজের তথাকথিত মহামান্য ব্যক্তিদের উপযুক্ত শিক্ষা দিল এবং জনৈক সিনেমা-অপারেটারকে বিয়ে করে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। এ কাহিনীতে এমন কোন উপকরণ নেই যা দিয়ে দ্যাফিয়াসে অফ পাইরেটকে মহান চলচ্চিত্ররূপে অভিহিত করা যায়। কিন্তু পরিহাসপ্রবণ এই কাহিনীটিকে অতি-সুন্দরভাবে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে।

প্রখ্যাত ইতালীয় পরিচালক পেসোলিনীর 'নোর্চিলে' সবাইকে নিরাশ করেছে। গত বছর ভেনিসে প্রদর্শিত এই পরিচালকের 'থেওরেমা'র কাহিনীগত অস্বাভাবিকতা থাকলেও ছবিটির শিল্প-গুণ ছিল, যার ফলে ছবিটি বহুনিন্দিত ও বহুপ্রশংসিত হয়েছিল, কিন্তু বর্তমান চিত্রটিতে তিনি জনৈক মধ্যযুগীয় যুবকের বর্বরতা ও জনৈক আধুনিক যুবকের শূকর-প্রীতি—ঘটনা দুটির মধ্যে সমন্বয় আনতে গিয়ে যা সব কাণ্ডকারখানা করেছেন তাতে তাঁর অসুস্থ চিন্তাধারারই প্রতিফলন ঘটেছে। এত উদ্ভট, এত অসংলগ্ন কাহিনী অবলম্বনে কোন সুস্থ ছায়াছবি হতে পারে না। পেসোলিনীর রুচিহীনতা ও মনোবিকারের চূড়ান্ত এক নিদর্শন হল এই 'নোর্চিলে'।

বৃটিশ চিত্র টু জেন্টলম্যান শেয়ারিং'য়ে বর্তমান ইংলণ্ডের সাদা-কালোয় স্বচ্ছন্দ দুজন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকের মানসিক সংঘাতে দেখান হয়েছে। টেড কচেফ পরিচালিত এই চিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন রবিনস ফিলিপস, হল ফ্রেডরিক ও জুডি গেসেন। লিন্ডসে এণ্ডারসনের 'ইফ' সাংবাদিকদের একটা বিশেষ প্রদর্শনীতে দেখান হয়। ইফ কান উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছে এবং ইতিমধ্যে বহু আলোচিত হয়েছে। একটা কল্পিত ছাত্র-বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত এই কাহিনীটির চলচ্চিত্রায়ণ এণ্ডারসনের শিল্প-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

পঃ জার্মানীর ছবি কার্তিলাগ অনেকেরই ভাল লেগেছে। কাহিনীর উপস্থাপনা ও চরিত্রবিন্যাস তরুণ পরিচালক এডগার রাইৎসের মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচালক রাইৎস এবার উৎসবে উপস্থিত থাকেন নি। কারণ তিনি বলেছেন 'এক বছর আগে আমি ভেনিস উৎসবে পুরস্কার বিতরণের প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক জুরীর পদ থেকে ইস্তফা দেই।

যদিও ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ উৎসবকে পুরস্কারবিহীন করে সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু এসটাবলিসমেন্টের দমক এখনও পুরোপুরি যায় নি। ককটেল, ডিনার, ডান্সে লোকের সময় কোথায় আর্ট নিয়ে মাথা ঘামাবার। তাছাড়া শো বিজ-নেসের কর্তাব্যক্তিরা উৎসবকে কোন পরোয়াই করে না, গোপনে অর্থের আদান-প্রদানে 'প্রতিযোগিতার' সমস্যা আগে থেকেই সমাধান করে ফেলেন।

আর অন্য দিকে শিল্পীরা নিজেদের মধ্যে মাথা ফাটাফাটি করছেন চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে। 'ফেস্টিভ্যালের যদি উদ্দেশ্য হয় আর্ট ও আর্টিস্ট তবেই তার সার্থকতা এবং সে ক্ষেত্রে আমি নিজের খরচে ভেনিসে যেতে প্রস্তুত।'

বলাবাহুল্য তরুণ জার্মান পরিচালক-এর এই অভিমত অনেককেই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুনভাবে ভাবাচ্ছে। —সৈকত ভট্টাচার্য

আলোর বৃত্তে

ক্যালকাটা থিয়েটার

একটি নাটকের দৃশ্য

বাংলাদেশের মাটিতে যে জীবনের আস্বাদ, তার হাওয়ার দোলনে যে চলমানতার স্পন্দন তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা নাটক অভিনয় করে দেশের নাট্যঐতিহ্যকে স্বকীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল করে তুলতে যে সব গোষ্ঠী আজ পর্যন্ত চেষ্টা করে চলেছেন তাদের মধ্যে 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ সতেরো-আঠারো বছর ধরে একটি আদর্শেই এ'রা বিশ্বাস করে আসছেন, তা হোল; নিজেদের চারপাশে যে জীবন ও সমাজ তার পরিপূর্ণ উপলব্ধির গভীরতা পরিস্ফুট করে তুলতে হবে সব নাট্যপ্রযোজনাতেই এবং এই চেনার আলো যতো বেশী ব্যাপ্তি পাবে ততোই বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ বিশ্বের আসরে একটি স্থির প্রত্যয়ের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা পাবে। আজকের বিদেশী নাটকের প্রভাব-পুষ্ট যে নাট্যনিরীক্ষা তার পরিমণ্ডলে বাস করেও 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র শিল্পীরা দেশীয় জীবনসমস্যার সংঘাতকেই মঞ্চে মূর্ত করে তুলেছেন এবং এ ব্যাপারে এ'দের অটুট স্বাতন্ত্র্য নিশ্চয়ই নাট্যানুরাগীদের দৃষ্টি এড়াবে না।

সময়টা ছিল নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম দিকে। 'নবান্নে'র কল্লোলে অচলায়তনের এক অন্ধপ্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। নতুন অন্ন, নতুন জীবনের স্বাদ পেয়ে আমরা সবাই নিজেদের নতুন করে চিনতে পেরেছি। 'সে এক জোয়ারের কাল।' নতুন পরীক্ষার আবর্তের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটককে জীবনের আরো কাছে নিয়ে যাওয়ার আন্দোলন শুরু করেছেন 'গণনাট্য সংঘের' শিল্পীরা। চলতি পথে বাধা আসছে অনেক, কিন্তু প্রাণের নিঃসীম দুর্বারতায় কাছে সব প্রতিবন্ধকতা হার মেনেছে। এগিয়ে যাওয়ার রন্ধ্রে প্রশ্ন জাগছে 'কি নাটক, কেন নাটক' অঙ্কের চেয়ে আঙ্গিক বড়ো? তা হোলে তার সার্থকতা কোথায়? এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েই... 'ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রথম নাট্যপ্রচেষ্টা।

প্রায় আঠারো বছর আগে কলকাতার মহম্মদ আলি পার্কে সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে যে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই বিজন ভট্টাচার্যের মরাচাঁদ' নাটক নিয়ে ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রথম আবির্ভাব। নাট্যকার এই নাটকটি সম্পর্কে বলেছেনঃ 'নাট্যসম্রাজ্ঞী প্রভা দেবীর সহ-যোগিতায় উত্তরবঙ্গের অন্ধ লোকশিল্পী যাদুকর দোতরাবাদক টগর অধিকারীর জীবন-যন্ত্রণার অনুরণন ধরতে চেষ্টা করেছি 'মরাচাঁদ' নাটিকায় টগরের দোতারার ঝঙ্কার ধারণ করি এমন সাধ্য আমার ছিল না। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সেই কালাকালে শিল্প আর শিল্পীর পরিণাম ভেবে শঙ্কিত হয়েছিলাম, নিঃশব্দ হোতে হয় জেনেও।' গ্রামবাংলার বাউল-বৈরাগী আর কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের পটভূমিকায় রচিত এই নাটকটির অভিনয় 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র প্রথম আবির্ভাবকে বহু বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করে। 'মরাচাঁদ' নাটকের পর 'কলঙ্ক' অভিনীত হয় দ্বিতীয় প্রযোজনা হিসেবে। মঞ্চসফল এই নাটকটি যুদ্ধোত্তর কালের বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুর্গত জীবনের আংশিক এক ছবিকে তুলে ধরেছে। 'জীয়নকন্যা' প্রযোজনা এই পর্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

'মরাচাঁদ', 'কলঙ্ক', 'জীয়নকন্যা' নাটক প্রযোজনা করে ক্যালকাটা থিয়েটার রসিক মহলে সাড়া জাগায়। কিছু দিন পর দীর্ঘ বিস্মৃতির বিষণ্ণতা নেমে আসে গোষ্ঠীর

[...]বনে। শ্রদ্ধেয়া অভিনেত্রী প্রভা দেবীর [...]ত্যু শিল্পীদের অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত ও [...]র্ষণ করে। প্রভা দেবীর ক্যালকাটা [থি]য়েটারের কর্মধারার সঙ্গে নিবিড় যোগ [...]ল। প্রভা দেবী সম্পর্কে পরিচালক ও [...]ট্যকার শ্রীবিজন ভট্টাচার্য বলেছেন: [ক্যা]লকাটা থিয়েটারের যে কোন প্রচেষ্টায় [প্রভা] দেবীর কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ [কর]ব। প্রভা দেবীকে চিনতে পারিনি আমরা। [বাং]লাদেশ কাঁদতে ভালবাসে—তিনি থাকি [...]দে আর কাঁদিয়েই গেলেন। আমি কিন্তু [দে]খছি প্রভার একটি ত্রিনয়ন ছিল সেই [চো]খ বিদ্যুৎ ঝলকাতো। আমাদের [...]ত না পোষানোর জন্য সেই চোখ আমরা [দেখ]তে চাইনি আর তিনিও দেখান নি।'

এই শূন্যতা আর বিষণ্ণতার স্তর [অতি]ক্রম করে আবার ১৯৫৯ সালের ১৬ই [আগ]স্ট 'গোত্রান্তর' নাটক প্রযোজনা করে [ক্যা]লকাটা থিয়েটারে'র শিল্পীরা নতুন [প্রেরণ]ায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। এই নাটকটি [মঞ্চ]জাত মঞ্চ থেকে খোলা মাঠ যেখানেই [অভি]নীত হয়েছে, সেখানেই দর্শকের অভি-[নন্দ]ন এসেছে অজস্র।

এরপর অভিনীত হয় 'ছায়াপথ' নাটক। কিছুদিন এ দুটি নাটক অভিনীত হয় 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র নাট্যপ্রযোজনার [...]ন্টা একটি স্বচ্ছ ছবি তুলে ধরে।

'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র দুটি স্মরণীয় [প্রযো]জনা হোল বিজন ভট্টাচার্যের 'দেবী-গর্জন' ও 'গর্ভবতী জননী'। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিবাসী বাউরি সাঁওতাল চাষীদের যে জীবন হাসি-কান্নার আবর্তে শহরের মানুষের চেনা-জানার বাইরে প্রবাহিত তাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'দেবীগর্জন' নাটক। নাটকটির মধ্যে সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বেশ কিছুটা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। 'দেবী-গর্জন' প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬৬-র ২১শে ফেব্রুয়ারী সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে। এরপর থেকে কলকাতা ও কলকাতার বাইরের বহু জায়গায় প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি শো হয়। কলকাতার বাইরে চিত্তরঞ্জন, দুর্গাপুর প্রভৃতি জায়গায় এ নাটকের অভিনয় দর্শকদের বিমুগ্ধ করে।

'গর্ভবতী জননী' নাটকের সংঘাত গড়ে উঠেছে বাদা অঞ্চলের আদিবাসী বেদেদের অদ্ভুত জীবন নিয়ে। এরা যে জীবনের অর্থ শেকড়-বাকড়, ভেষজ ঔষধি, জড়িবুটি, তাগামাদুলি, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র সাধনার মধ্য দিয়ে খুঁজে চলে তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে নাটকে। 'এদের জন্ম-মৃত্যু প্রজনন আহার বিহার বিষয় সম্ভোগে আদিম মাতৃমন্ত্রের আহ্বান। মা-ই তো মাটি। সেই মাটি আবার গর্ভবতী জননী। কিন্তু প্রাণচৈতন্যে রাজবৈদ্য ওঝার দৌরাত্ম্যে বেদেদের সেই চৈতন্যবুদ্ধি আজ আচ্ছন্ন। তবু সবাই সন্তান, মাকে তারা ভালোবাসে, অন্ধকারেই ভালোবাসে।'...গর্ভবতী জননীর মোট পাঁচ-ছটি শো হয়েছে।

'ক্যালকাটা থিয়েটার' আজ পর্যন্ত যে কটি নাটক অভিনয় করেছে তার মধ্যে আমাদের ঐতিহ্যগত চেতনাবোধ, দেশ ও কালের সুস্পষ্ট ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই সম্পর্কে এঁরা বলেছেন: 'আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেকেও যদি না চিনতে পারি সে বড় দুঃসহ অবস্থা। এ শুধু আজ শিল্প আর শিল্পীর দায় নয়—এ দায় সবাকার। সবাইকেই আজ এর দায় ভাগ সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে।'...

সাম্প্রতিক অনুবাদ নাটক অভিনয় প্রসঙ্গে ক্যালকাটা থিয়েটারের ধারণা হোল যে আমাদের দেশেই বহু সমস্যা ও চরিত্র এখনো অপরিচিতির অন্ধকারে লুকিয়ে আছে, সেগুলোকে সবার আগে আমাদের মঞ্চের আলোয় তুলে ধরা উচিত প্রথম। আলোচনা প্রসঙ্গে বিজন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'দর্শকদের উদাসীনতা আমাদের মাঝে মাঝে বেদনা দেয়। তা না হোলে এতো কষ্ট করে থিয়েটার করি লোকে আমাদের পয়সা দেয় না। তবু আমরা নাটক করি, কেননা নাটক করলে মনে হয় আমরা বেঁচে আছি।' নাট্যকার শ্রীভট্টাচার্য এই অন্তর্সঞ্চিত ক্ষোভ আজ অনেকের মধ্যেই ভাষা পেয়েছে। নাট্য-আন্দোলনকে সুষ্ঠু পরিণতি দিতে চাইলে এই ক্ষোভকে দূর করতে হবে। এ ব্যাপারে নাট্যানুরাগীদের আরো গভীরতর ও ব্যাপক দৃষ্টি সঞ্চারিত করা প্রয়োজন।

—দিলীপ মৌলিক

জলসা

[নৃত্]য-ভারতীর রমণীয় অনুষ্ঠান

[গ]ত কয়েক সপ্তাহ সারা কলকাতা [...]নৃত্যোৎসবে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল—[...]ংশই কত্থক নৃত্য এবং এঁদের মধ্যে [...]টি তরুণ প্রতিভা বিশেষ উল্লেখের [দাবী রাখে]। নৃত্যভারতীর তরফ থেকে মহা-[জাতি] সদনে এক আকর্ষণীয় নৃত্যানুষ্ঠান [উপহা]র দিয়েছেন বাংলার প্রখ্যাত নৃত্যগুরু [প্রহ্লা]দ দাস এবং তৎপত্নী নীলিমা দাস। [অনুষ্ঠ]ান সূচনা হয় শ্রীমতী দাসের পরি-[চালনা]য় শিশু শিল্পীদের সাত-ভাই চম্পার [নৃত্য]টা দিয়ে। এ অনুষ্ঠান প্রথম থেকে [শেষ] অবধি ঔৎসুক্য ও কৌতুকে দর্শকদের [...]র মত নিবিষ্ট রেখেছে। গতানুগতিক [...]টা থেকে এর তফাৎ হোল এইখানে [...]নপ্রকাশের উপযোগী বিভিন্ন নৃত্যের [...]মণ্ডিত মিলন ছাড়াও কিছুটা [...] পাঁচে নানা ছড়াগান শিশুদের [...]ের উচ্ছলতা হাসি ও নৃত্যের সঙ্গে [...]য় পরিবেশিতব্য বিষয় এমন এক নাটকীয় রসসৃষ্টি করেছে যা পরিণত শিল্প-বোধ ছাড়া সম্ভব নয়। এই সুন্দর অনু-ষ্ঠান পরিকল্পনার কৃতিত্ব শ্রীমতী নীলিমা দাসের এবং সংগীত রচনার জন্য ধন্যবাদার্হ শ্রীসন্তোষ চন্দ্র।

এই উৎসবেই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেন প্রহ্লাদ দাসের সুযোগ্য পুত্র নৃত্যপ্রভাকর শ্রীচিত্রেশ দাস। বাংলা দেশে ইনিই একমাত্র তরুণ পুরুষ শিল্পী যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সমান অনুরাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কত্থক নৃত্যে আত্মনিয়োগ করেছেন এবং অসাধারণ কৃতি-ত্বের সঙ্গে কত্থকের শাস্ত্রসম্মত আঙ্গিকের সঙ্গে যুক্ত করেছেন মৌলিক শিল্পচিন্তা। সেদিন ইনি দেখালেন—ঠাট, আমদ, তোড়া গৎ এবং তৎকার। ঠাটের সঙ্গে কত্থকের পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠিত করেই 'আমদ'-এ কত্থকের রূপাভাস ফুটে উঠল ক্রমবিকশিত চিত্ররেখার মত। তারপরই 'তোড়া'য় তালের অঙ্গে লয় ও তেহাই-এর বিদ্যুৎঝলক এবং
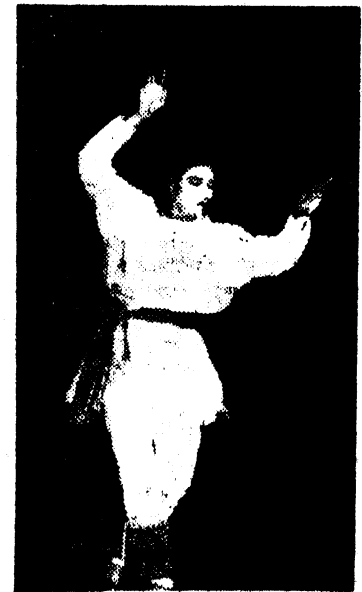
শিল্পী — চিত্রেশ দাস।

গৎ-এর চকিত প্রেক্ষণে অভিনয়, লয়, সভাভাবের চিত্তাকর্ষী সমন্বয় রীতিমত চমকপ্রদ। যে বস্তুটি তাঁর শিল্পব্যক্তিত্বের প্রকাশটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করে সেটি হলো লয়ের ওপর অসাধারণ দখল। যার জন্য তাঁর পাল্টা ঘুমরিয়া ও চক্রাধার এত উপভোগ্য। অভিনয়ের সঙ্গে একটু মনোযোগ দিলে পরিণত শিল্পীর পর্যায়ে পৌঁছতে এঁর দেরী হবে না। তৎকার-অঙ্গে এঁর নিজস্ব রচনা 'রেলচলা'র গতিতে, ট্রেন চলার শুরু থেকে শেষ অবধি নানান গতি-বৈচিত্র্য বিভিন্ন ছন্দ ও তালে জীবন্ত হয়ে ওঠে। আঙ্গিকদক্ষতার সঙ্গে আর একটু সাহিত্যবোধের অনুশীলন প্রয়োজন। এঁর সঙ্গে সংগত করেন এঁরই গুরু পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্র ও সম্প্রদায়। এছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল জয়শ্রী দত্তর মণিপুরী নৃত্য ও নার্গিস রহিমের কথাকলি অঙ্গে রঙ্গবন্দনা। এঁরা সবাই নৃত্যভারতী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে চেত্‌না তেওয়ারী

সুপরিচিত কণ্ঠসংগীত শিল্পী শ্রীমতী সোম তেওয়ারীর কন্যা চেত্‌না তেওয়ারী নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কথক নৃত্যের ধারা পরিবেশনার্থে সনফ্রান্সিসকোতে আহূত হয়েছেন। বিদেশ যাত্রার প্রাক্‌কালে লাউডান স্ট্রীটে শ্রীএস জালান আয়োজিত এক মনোরম পরিবেশে শ্রীমতী চেত্‌না তেওয়ারীর কথক নৃত্যভিত্তিক এক নৃত্যপরিকল্পনার বিস্তার সমবেত শিল্পী, দর্শক ও সাংবাদিকবৃন্দকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

শুধুমাত্র বোল, পরণ এবং অন্যান্য আঙ্গিকনির্ভর অনুষ্ঠান না করে প্রতি অঙ্গ থেকে অঙ্গবিশেষ নির্বাচন করে এবং অভিনয়কে আলম্বন বিভাবরূপে গ্রহণ করে ঠাট, ভাও, গৎ-ভাও, টুকরো, তোড়া এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে তালপ্রধান কথকের নীরসতা এক উপভোগ্য রসে পরিণত হয়।

'ভাও-বাৎলানো' অঙ্গে রবি কিচলুর গাওয়া ঠুংরির সঙ্গে রসভাবের প্রকাশও সুন্দর। গুরু রামনারায়ণ মিশ্র ও সম্প্রদায়ের সংগীত ও বোল ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে টেপ রেকর্ডধৃত হয়েছে। বিদেশে এই-ভাবেই পরিবেশিত হবে। দেহের ছন্দময় গতি, পদক্ষেপের সৌন্দর্য, শিল্পসুন্দর মঞ্চসজ্জা মুক্তাঙ্গনে ফুলের মালা দিয়ে বৃক্ষসজ্জা এক স্বপ্নময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই কাব্যময় পটভূমিকায় নৃত্য কবিতার মত সুন্দর হয়ে ওঠবারই কথা। তবে উপভোগ্যতর হতো বেশবাস আর একটু সংযত ও শালীন হলে। ভারতীয় শিল্পের প্রধান অঙ্গ এই সংযম ও গাম্ভীর্য। বিদেশে নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশনকালে একথা অবশ্য স্মরণীয়।

বিপ্লবী নিকেতনের সংগীতানুষ্ঠানে দেবব্রত বিশ্বাস।

মহাত্মা গান্ধী শতবার্ষিকী

গত ৬ই অকটোবর ২নং বালিগঞ্জ টেরাসে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে মহেন্দ্র জ্ঞানদা সমিতির উদ্যোগে গান্ধী জয়ন্তী শতবার্ষিকী উৎসব উদযাপিত হয়।

শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মহাত্মা গান্ধী অবলম্বনে স্ব-রচিত দুটি কবিতা পাঠ করে উপস্থিত সদস্য ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। এরপর শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্য ও বীণাদেবী সেনের দ্বৈত ভক্তিমূলক সংগীতের পর সমিতির সভানেত্রী কানন দেবী, কোষাধ্যক্ষা আরতি শ্রীমল, সদস্য চন্দ্রাবতী দেবী, শ্রীলতা চৌধুরাণী এবং সম্পাদিকা বীণাদেবী সেন মহাত্মাজীর সাধন-মন্ত্রস্বরূপ রামধুন সংগীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।

বিপ্লবী নিকেতনের সাহায্যার্থে সংগীতানুষ্ঠান

বিপ্লবী নিকেতনের সাহায্যার্থে মহালয়ার প্রাতে বসুশ্রীতে আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠানে সকল শিল্পীই সানন্দে এবং বিনা পারিশ্রমিকে সহযোগিতা করেন। কণ্ঠসংগীতে ছিলেন সর্বশ্রী দেবব্রত বিশ্বাস, নির্মলা মিশ্র, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুপ্রভা সরকার। সবিতাব্রত দত্ত গান ও আবৃত্তি উভয় অনুষ্ঠানেই অংশগ্রহণ করে দর্শকবৃন্দের আনন্দের কারণ হয়েছেন। হাস্যকৌতুকে ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগতে রাধাকান্ত নন্দী। এছাড়াও হিমঘ্ন রায়চৌধুরীর পরিচালনায় অরূপ শিল্পগোষ্ঠী প্রযোজিত শারদোৎসব গীতিনাট্য শারদীয় প্রাতের এক উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। কণ্ঠসংগীতে ছিলেন সর্বশ্রী হিমঘ্ন রায় চৌধুরী, কমলা বসু, সুষমা দে, রঘুবীর দাস, অভিজিৎ মজুমদার, সুবীর গাঙ্গুলী, মহাশ্বেতা ঘোষ নন্দিতা গাঙ্গুলী, সুমিতা গাঙ্গুলী দেবাস্মিতা ঘোষ। নৃত্যাংশে ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী গুইন ও রূপা মজুমদার। সংলাপে শুক্লা রায়চৌধুরী।

নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা"

গত ১৭ অকটোবর সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ আয়োজিত কলকাতা মেলা অনুষ্ঠানে সংগীতচক্রের শিল্পীগোষ্ঠী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র এক মনোজ্ঞ নৃত্যনাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন কলামন্দির রঙ্গমঞ্চে। নৃত্য ও গীত উভয়াংশেই ছিলেন রবীন্দ্র নৃত্য ও সংগীতের উজ্জ্বল তারকাবৃন্দ।

'চিত্রাঙ্গদা'র অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, বেদনা ও উপলব্ধিকে সুরে সুরে রূপময় করেছেন সুচিত্রা মিত্র। অর্জুনের প্রণয় বিক্ষোভ ও আত্মজয়ী সাধনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গম্ভীর কণ্ঠে যথাযোগ্য রূপলাভ করেছে। মদনের রূপোরস কৌতুক ও উচ্ছলতা জীবন্ত হয়ে উঠেছে ধীরেন বসুর কণ্ঠে। নৃত্যে ছিলেন জয়শ্রী লাহিড়ী (চিত্রাঙ্গদা) নরেশকুমার (অর্জুন) ধূর্জটি সেন (মদন) নৃত্য ও গীতের এই অভিনব সমারোহ সপ্তমী পুজোর সন্ধ্যাকে জমিয়ে তোলে। প্রযোজনা ও সংগীত পরিচালনায় ছিলেন ধীরেন বসু। নৃত্যনাট্য সুরু হবার আগে গান গেয়ে শোনান দেবব্রত বিশ্বাস, আবৃত্তিতে ছিলেন কাজী সব্যসাচী।

অপেশাদার সংগীত-শিল্পীদের জন্যে প্রতিযোগিতা

অপেশাদার সকল শ্রেণীর, সকল বয়সী সংগীতশিল্পীদের প্রতিভা বিকাশে অধিকতর উৎসাহ এবং ব্যাপকভাবে পরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে সোদপুরের প্রখ্যাত শিল্পী সংস্থা সারা বাংলা সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর কণ্ঠসংগীত ও গীটার এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে। প্রতিযোগিতায় নাম রেজিস্ট্রারী করার শেষ তারিখ ২০ নভেম্বর। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায় (দক্ষিণ পল্লী, সোদপুর) ও প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়ের (পূর্ব পল্লী, সোদপুর, ২৪ পরগণা) কাছে।

প্রেক্ষাগৃহ

সলিল দত্ত পরিচালিত কলঙ্কিত নায়ক চিত্রে মধুমতী। ফটো : অমৃত

...ারসোলার পাখি হবার সাধ

...াঁশের কারবারী যদু দত্ত। পাঁচজনের ...য় পড়ে সেও নেমে পড়ল নির্বাচন ...। কর্তারা তাকে লোভ দেখিয়েছেন, ...নী তরণী পার হতে পারলে তাকে মন্ত্রী করে দেবেন। সে নিজেও স্বপ্ন ...ছ, স্বয়ং ভোটেশ্বরী দেবী তাকে ... হবার বর দিয়েছেন। অতএব সে ... টাকা ছড়াতে শুরু করল প্রতিপক্ষ ...ন হালদারকে পরাজিত করবার ...। তার আশাকে দুরাশাও বলতে ...যায়; কারণ প্রতিপক্ষ সুদর্শন হালদার ... সমাজসেবী, জনহিতব্রতী; তিনি ...তে বিশ্বাসী। এই কারণে শিক্ষাব্রতী ...দের বক্সী তাঁর পক্ষে নির্বাচন পরি- ... করছেন দেশের শিক্ষিত তরুণ- ...দের নিয়ে। এমন কি, এই দলে যদু দত্তর শিক্ষিত ছেলে ... আছে প্রকাশেই ... আছেন ... বৈরাগী, যাকে সবাই ... সুদ- ...কসাই বলে অথচ যিনি অন্তরালে ...য় করছেন সুদর্শনের জয়ের পথ ... করবার জন্যে। ... কথাতেই আছে, ... জয় এবং অধর্মের পরাজয়। কাজেই ... গণনা শেষে যা ঘটল ... যদুর মর্মান্তিক।

...ঙমহল-এ বর্তমানে অভিনীত 'আমি ...হব' নাটকটির কাহিনীর এই হচ্ছে ...মুড়ো বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত সার। ... আমরা এই রঙমহলেই যাঁর রঙ্গনাট্য ...ং কালো' দেখে আনন্দে উচ্ছল হয়ে ...ম, সেই সুনীল চক্রবর্তীই এই ... মন্ত্রী হব' নাটকটির লেখক। এবং ... হচ্ছে একটি রঙ্গনাট্য; এমন রঙ্গ- ...য, যতক্ষণ এটি মঞ্চে অভিনীত হয়, ... কোনো দর্শকের পক্ষে তাঁর আসনে ...ভাবে স্থির হয়ে বসে থাকা রীতি- ...কর। আপনি হাসবেন, আর হাসবেন, ...াসবেন এবং ঐ হাসির ফাঁকে মধ্যে ... কখনও অতি সংগোপনে দু-এক ... চোখের জলও ফেলবেন অন্তর ... আবেগভরে ক্ষণিকের তরে ব্যথিত ...ঠার দরুণ। হয়ত এই আবেগভরা ...ইনজেকশান না থাকলে হাসিও একঘ...য়ে উঠতে পারত।

...লে জহর রায়ের দেমাক বেড়ে যাবে, ...না বলেও পারছি না। আমাদের ...য় জহর রায় হচ্ছেন সেই শ্রেণীর ...তা, যে শ্রেণীকে অলঙ্কৃত করে ... চার্লি চ্যাপলিন। এবং এও বলব, ... পর্যন্ত তাঁর নাট্যনৈপুণ্যের ...ঠা দেখাবার উপযোগী কোনো ...াঙলা নাটক বা চিত্রকাহিনীতে সৃষ্ট ... আলোচ্য নাটকে তাঁর যদু দত্ত দেখে হেসেছি, দারুণ হেসেছি, হেসে

স্টোপটি খেয়েছি। কিন্তু শুধুই কি হেসেছি? পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার অর্থ ও শক্তিক্ষয়ের মূর্খতা দেখে আমরা কি তার প্রতি মনে মনে সহানুভূতি প্রকাশ করিনি? শেষ দৃশ্যে যখন সে বলছে, 'আমি হেরে গেছি, আজ আমার পাশে কেউ নেই, আমি একা', তখনো কি আমরা হেসেছি? যদু দত্তের ভূমিকায় জহর রায়ের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত চলন, বলন, ভঙ্গী যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন, তাঁর রাজ্যে তিনি অনন্য।

এরই অপর দিকে আছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বিষমুখ, পয়োকুম্ভ' চরিত্রে মনে হয়, আজ তাঁর জোড়া নেই। বাইরে ধর্মদাস সুদখোর, কশাই, একটা পয়সা তার মা-বাপ, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে সে করুণার নির্ঝর। অনন্তর ছেলের অসুখ সারাতে বড়ো ডাক্তার দেখাবার সুব্যবস্থার জন্যে সে ফস করে দুশো টাকা বার করে দেয়: ইঞ্জিনীয়ারিং পাশকরা ছেলে স্বাধীন জীবিকা অর্জনের জন্যে হেয়ারকাটিং সেলুন খুলেছে দেখে তাকে উৎসাহিত করে, আর অধর্মচারী যদু দত্তের বিরুদ্ধে সুদর্শন হালদারকে জয়যুক্ত করবার জন্যে গোপনে জলের মতো অর্থব্যয় করে। চিত্তজয়ী অভিনয় করেছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মদাস চরিত্রে।

যদু দত্ত ও ধর্মদাস—এই দুটি চরিত্রকে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অপরাপর চরিত্রে সু-অভিনয় করেছেন হরিধন মুখোপাধ্যায় (পতিতপাবন), মৃণাল মুখোপাধ্যায় (বিশু), অজিত চট্টোপাধ্যায় (বেচারাম), অমরনাথ মুখোপাধ্যায় (সত্যসুন্দর), বাসবী নন্দী (ময়না), মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নন্দরাণী), সাধনা রায় চৌধুরী (মাধুরী), নন্দিতা দে (লক্ষ্মীরাণী), রত্না ঘোষাল (চকিতা ওরফে ভুতী), তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় (মলয়), ইন্দ্রজিৎ নাগ (সলিল), মানস ঘোষ (চোংদার) প্রভৃতি।

এই নাটকটিতে লক্ষণীয় হচ্ছে, কাহিনীর মেজাজ অনুযায়ী দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময়গুলিতে উপযোগী আবহসঙ্গীত সৃষ্টি। এ বিষয়ে শৈলেশ রায় প্রশংসনীয় রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। গণেশ দাসের দৃশ্যরচনাও সুপরিকল্পিত।

'আমি মন্ত্রী হব' বর্তমান কালোপযোগী রঙ্গ-জগতের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ।

চলচ্চিত্রে চুম্বন ও নগ্নতা

চলচ্চিত্রে 'চুম্বন ও নগ্নতা' বিষয়ে কয়েকশ চিঠি আমরা পেয়েছি। তার থেকে বেশ কিছু চিঠি আমরা পর পর কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা প্রকাশিত হবে না।

বাংলার লোকনৃত্যের একটি বিশেষরূপ

বাংলাদেশের সীমানার কালে কালে পরিবর্তন ঘটেছে। একদা সিংভূম, মানভূম, ধলভূম প্রভৃতি প্রতিটি জেলাই বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেদিন পর্যন্ত এই জেলাগুলি পশ্চিমবঙ্গের আওতার বাইরে ছিল। স্বাধীন ভারতে মাত্র বছর তিনেক আগে পুরুলিয়ার বেশ কিছুটা অংশ পশ্চিমবঙ্গের সীমানার মধ্যে এসেছে। এই জেলাগুলিতে যে লোকনৃত্য সাধারণের—বিশেষ করে কৃষক ও শিকারী সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে উৎকর্ষ লাভ করেছিল, তার নাম হচ্ছে 'ছৌ'। এই 'ছৌ' নৃত্য গেল ত্রিশ দশকে বিখ্যাত ইমপ্রেসেরিও হরেন ঘোষের উদ্যোগে এবং সেরাইকেলা রাজবংশের সহযোগিতায় কলকাতার নৃত্যরসিকদের গোচরে আসে এবং আনন্দ বর্ধন করে। আমাদের জানা ছিল, সেরাইকেলা এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্যেই এই 'ছৌ'-নৃত্যের রীতি-মত অনুশীলন হয়ে থাকে। কিন্তু সম্প্রতি পুরুলিয়ার 'ছৌ'-নৃত্য সংক্রান্ত একটি ষোল মিনিট স্থায়ী তথ্যচিত্র দেখে আমাদের সে ধারণা বদলে গেল। অপরাপর জায়গার মতো পুরুলিয়ার 'ছৌ'-নৃত্যও 'মুখোস' পরেই অনুষ্ঠিত হয় এবং এরও বিষয়বস্তু রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে রচিত। 'রাম-রাবণ যুদ্ধ', 'মহিষাসুর বধ', 'কার্তিক বকাসুর' যুদ্ধ প্রভৃতি নৃত্যের মধ্যে একটা বেশ বলিষ্ঠতা দৃশ্যমান। ছবিটিতে একটি যথার্থ লোক-সঙ্গীত আছে। অন্য সঙ্গীতগুলি কিন্তু শহুরে কণ্ঠনিঃসৃত এবং তথ্যচিত্রের পক্ষে আপত্তিকর। তবু বলব, সুন্দর চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার গুণে ছবিটি যথেষ্ট উপভোগ্য। ছবিটির প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে বিনোদ সরকার ও গোপাল সান্যাল।

বোম্বাই থেকে

বহু ছবির প্রখ্যাত নায়ক, পরিচালক ও প্রযোজক রাজকাপুর সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আর ছবিতে অভিনয় করবেন না। তাঁর নির্মীয়মান বিরাট ছবি 'মেরা নাম জোকার'-ই হবে তাঁর শেষ চিত্রাভিনয়। অবশ্য তাই বলে তিনি চিত্র-জগৎ থেকে বিদায় নিচ্ছেন না, বিদায় নিচ্ছেন অভিনয়-জগৎ থেকে। প্রযোজনা ও পরিচালনা তিনি যেমন করছিলেন, তেমনি করবেন। তিনি হঠাৎ কেন এই সিদ্ধান্ত নিলেন এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন যে, এখন তাঁর বয়স হয়ে গেছে, আর নায়কের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় করা সাজে না।

অবশ্য এটা ঠিক যে, তরুণ নায়ক এখন বহু এসে গেছেন হিন্দী চিত্রজগতে, যাঁরা চেহারার দিক থেকে এবং অভিনয়-ক্ষমতার দিক থেকে খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ।

বোম্বাই-এর চিত্রজগতে এখন যিনি সবচেয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন, তিনি হচ্ছেন প্রবীণ ও প্রখ্যাত চিত্রনির্মাতা বি আর চোপরা। ৪ আগস্ট তিনি 'ইত্তেফাক' ছবি শুরু করেন রাজকমল চিত্রমন্দির স্টুডিওতে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত একটানা শ্যুটিং করে ছবি শেষ করেছিলেন এবং পুজোর আগেই ছবিটি প্রদর্শিত হতে শুরু করে। ১০ অক্টোবর ছবি মুক্তি ও এতে অভিনয় করেছেন নবাগত রাজেশ খন্না, নন্দা, প্রেম চোপরা প্রভৃতি। হ্যাঁ ভাল কথা—'ইত্তেফাক' আর একটি বিষয়ে গর্ব করতে পারে, তা হল গানহীন ছবি এটা বোম্বাই চিত্রজগতে অষ্টম আশ্চর্যের সামিল। ছবিটি নাকি এমনই 'সাসপেন্স'পূর্ণ যে একেবারে প্রথম থেকে না দেখলে ছবির রস গ্রহণ করা মুস্কিল হবে—তাই যেসব চিত্র-গৃহে ছবি চলেছিল, সেখানে ছবি আরম্ভের পর আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। অভিনব—অতি অভিনব ছবি এই 'ইত্তেফাক' যার বাংলা অর্থ হল 'সহসা' বা 'দৈবক্রমে'। আবহসঙ্গীত দিয়েছেন সলিল চৌধুরী।

বোম্বাই চিত্রজগতে একটা মজার ব্যাপার হল যে, কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী যদি একটা ছবিতে নাম করল, অমনি তার বাড়ীতে চিত্রনির্মাতাদের লাইন লেগে যায়। এই ধরুন না রাজেশ খন্নার কথা। এই তো সেদিন তিনি এলেন চিত্র-জগতে—আর এর মধ্যে তাঁর হাতে কত ছবি। 'ইত্তেফাকে'র কথা তো আগেই বলেছি—এছাড়া আছে সায়রাবানুর সঙ্গে 'ছোটি বহু' (পরিচালনা: কে বি তিলক), ওয়াহিদা রেহমানের সঙ্গে 'খামোশী' (পরিচালনা: অসিত সেন), আশা পারেখের সঙ্গে 'কাটি পতঙ্গ' (পরিচালনা: শক্তি সামন্ত), শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে 'সফর' ও 'আরাধনা' (পরিচালনা: অসিত সেন ও শক্তি সামন্ত), ববিতার সঙ্গে 'ডোলী' (পরিচালনা: এ সুব্বারাও), মমতাজের সঙ্গে 'সাচ্চা ঝুটা', 'দো রাস্তে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজেশ ছাড়া সঞ্জীবকুমার, বিনোদ
ন্না, সঞ্জয়, হেমা মালিনী, ববিতা, লীনা
ন্দ্রভারকার, শশী কাপুর, জিতেন্দ্র প্রভৃতির
াতে প্রচুর ছবি।

●

প্রতি সপ্তাহেই কাপুর পরিবারের
নে রাজ-শাম্মি-শশী-রণধীর (রাজের
লে) কিছু-না-কিছু খবর থাকবেই।
দিন শশী কাপুরকে দেখা গিয়েছিল
টিং শেষে ট্রেনে করে ফিরছেন বন্ধু-
ন্ধবদের সঙ্গে একটি তৃতীয় শ্রেণীর
মরায়। তারপর একদিন দেখা গেল
নরা ফাউণ্টেনের কাছে 'সামোভার'
স্তোরাঁয় বসে চা খাচ্ছেন বন্ধু-বান্ধবদের
ঙ্গে। অবশ্য সামোভার-এ যাবার তাঁর
টা কারণ ছিল, কারণ সামোভারের
লক হলেন শ্রীমতী খান্না, যাঁর স্বামী
লন রাজবংশ খান্না। রাজবংশজী সম্প্রতি
চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে পা দিয়েছেন। তাঁর
ছবির নাম হল 'এম এস গাতা ...'
শের স্বাধীনতার জন্যে যেসব বিপ্লবী
র দিয়েছিল, তাদেরই বৈপ্লবিক অধ্যায়কে
দ্র করে। এই ছবির নায়ক হলেন শশী
পুর। এই ছবির জন্য পাঞ্জাব সরকার
ান্নাকে দশ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য
েন। কিছুদিন আগে এ-ছবির মহরৎও
 গেছে বোম্বায়ের এক স্টুডিওতে।

হ্যাঁ যা বলছিলাম শশী যে একজন
ম শ্রেণীর শিল্পী, সে-বিষয়ে তাঁর কোন
ক নেই। সর্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে
ন মেশেন অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে, যা
ান্য শিল্পীরা করতে ভয় পান খ্যাতির
হানার ভয়ে।

খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক রাম মহেশ্বরী
 নির্মীয়মান হিন্দী ছবির (যার এখনও
করণ হয়নি) সঙ্গে একখানি পাঞ্জাবী
র কাজে হাত দিয়েছেন। ছবিখানির নাম
ক নাম জাহাজ'। শিখগুরু নানকের
সম্বন্ধ ৫০০ জন্মবার্ষিকীর স্মরণোৎ-
 উৎসর্গীকৃত। এতে সমস্ত শিখ
চনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করবেন।
ীল দত্তের ভাই সোম দত্ত এতে বিশিষ্ট
কায় অভিনয় করবেন।

কে পি আত্মা এবার একটি অসাধারণ
নীর রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেছেন।
ধারণ এই হিসেবে যে, ছবিটির মধ্যে
 স্ত্রী চরিত্র নেই। সঞ্জীবকুমার এবং
কজন শিশু এই ছবির শিল্পী—এদের
ই সারা ছবি। হিন্দী ছবির রাজ্যে
নে যৌন আবেদন, সঙ্গীত এবং
শীয়ানার ছড়াছড়ি, সেখানে এ ধরনের
 কল্পনা করাটা পাগলামী ছাড়া আর
বলুন। খবরটা শুনে আপনাদের চোখ
বড়া হবে হয়ত, কিন্তু এটা খাঁটি সত্য।

রতন ভট্টাচার্য-এর 'সোহাগ রাত' হল
 সর্বশেষ ছবি। এরপর তিনি কিছুদিন
ম নিয়ে আবার নতুন ছবির কাজ শুরু
ছন। ধ্রুব চ্যাটার্জির কাহিনীতে সংলাপ
ল এচ রাহী। নায়ক-নায়িকা হল
ন্দ্র ও কমল। সুর দেবেন কল্যাণজী
ন্দজী।

সেদিন রূপতারা স্টুডিওতে গিয়ে দেখি ওখানে 'কব? কাঁহা? আর কিউ?' ছবির শ্যুটিং হচ্ছে। ফ্লোরের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম—কারণ ভেতরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সে-দৃশ্যটি এমনই সন্তর্পণে তোলা হচ্ছে যা ইউনিটের লোক ছাড়া বাইরের কাউকে দেখতে দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে নাকি ছবির আসল সাসপেন্স নষ্ট হয়ে যাবে। দৃশ্যটির শ্যুটিং শেষ হলে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রাণ এবং ববিতা। প্রাণকে জিজ্ঞেস করলাম: কি ব্যাপার? এত লুকিয়ে-চুরিয়ে কি এমন শ্যুটিং হচ্ছিল? প্রাণ ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন: শ্-শ্-শ্-শ- মাপ করবেন, বলা নিষেধ। প্রাণ সম্প্রতি লণ্ডন থেকে ফিরেছেন মনোজকুমারের 'পূরব-পশ্চিম' ছবির শ্যুটিং শেষ করে।

দীর্ঘদিন বিদেশ সফর শেষ করে সঙ্গীত-পরিচালক রবি কল্পনালোকের ৪নং ছবির সম্প্রতি দুখানি গান রেকর্ড করলেন ফেমাস ল্যাবরেটরীতে। কণ্ঠ দিলেন আশা ভোঁসলে। এই ছবির পরিচালক রাম মহেশ্বরী এবং নায়ক-নায়িকা হলেন সঞ্জয় এবং লীনা চন্দ্রভারকর।

প্রবাসী

মঞ্চাভিনয়

জনৈকের মৃত্যু, থানা থেকে আসছি, নীল রঙের ঘোড়া ও সন্দেশের পর চতুর্মুখ নাট্য-সংস্থা বের্টোল্ট ব্রেশটের 'সেন্টজোন অব দি স্টকইয়ার্ডস' অনুপ্রাণিত অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অথ মালতী বৃষভ কথা' নাটকটি গত ৩১ অকটোবর মুক্তাঙ্গনে প্রথম অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এবং দ্বিতীয় অভিনয় ৮ নভেম্বর বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে। পরবর্তীকালে নাটকটি বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হবে। এছাড়া ১৯৭০-এর মার্চের মধ্যে আরো দুটি নাটক বের্টোল্ট ব্রেশটের 'মাদার কারেজ এণ্ড হার চিলড্রেন' অনুসরণে উৎপল দত্তের 'হিম্মৎবাই' এবং আলবেয়ার কামুর 'ক্যালিগুলা' অবলম্বনে অসীম চক্রবর্তীর 'আমি একা' চতুর্মুখ প্রযোজনা করবে। আলো ও মঞ্চ পরিকল্পনার দায়িত্ব নিয়েছেন, যথাক্রমে শান্তিত মিত্র-অলোক দে এবং হিমাংশু সোম। নির্দেশনার দায়িত্ব অসীম চক্রবর্তীর ওপর ন্যস্ত।

সম্ভবত চতুর্মুখ নাট্যসংস্থাই ব্রেশটের একটা প্রতিনিধিত্বমূলক নাটক বাঙলাদেশে প্রথম মঞ্চস্থ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

সম্প্রতি ক্যারিয়ন-ম্যাককান বিজ্ঞাপন সংস্থা রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভ্যরা বনফুলের 'ভীমপলশ্রী' উপন্যাসের নাট্যরূপ পরিবেশন করেছেন 'স্টার' রঙ্গমঞ্চে। নাট্যনির্দেশনায় শম্ভু ব্যানার্জীর প্রয়াস এই প্রযোজনায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য আরোপ করতে পেরেছে।

শিল্পীরাও প্রায় সকলেই চরিত্রের সঙ্গে তাল রেখে অভিনয় করেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন দিলীপ চক্রবর্তী, আশীষ সেন, কনক মুখার্জী, নিরঞ্জন দাস, অমল ঘোষ, প্রেমাংশু ব্যানার্জী, শেখর দত্ত, কণা মজুমদার, নবীন দে, অশোক বসু, দীপক রায়, হিমানী গাঙ্গুলী, মঞ্জুলিকা ভট্টাচার্য, অজন্তা চৌধুরী, গীতা দাস।

'অজানা শিল্পী গোষ্ঠী' কিছুদিন আগে কিরণ মৈত্রের মঞ্চ সফল নাটক 'নাটক নয়' পরিবেশন করেছেন থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে। দলগত অভিনয়ের অপূর্ব সংঘবদ্ধতার মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্যকে এ'রা মঞ্চের আলোয় পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছেন। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেন অজিত রায়, বাবলু দাশগুপ্ত, শংকর সেনগুপ্ত, স্মৃতিময় নাথ, রণজিৎ ভট্টাচার্য, সুবীর গাঙ্গুলী, খোকন সমাজপতি, আশিষ চক্রবর্তী, দেবিকা ব্যানার্জি। দুলাল সাহা সার্থকতার সঙ্গে নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেন।

'বৈঠকী'র সভ্যরা তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে আকাদমি অফ ফাইন আর্টস মঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'অতএব' নাটক অভিনয় করেন। কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন মঞ্জুশ্রী বোস (দোলগোবিন্দ), মঞ্জু মল্লিক (আন্ত), লীলা মিত্র (চিতু), তৃপ্তি চ্যাটার্জী (নয়ন)।

বসুমতী রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতীয় মিলনোৎসব উপলক্ষে 'সাজাহান' নাটক মঞ্চস্থ হোল 'বিশ্বরূপায়'। বহু অভিনীত এই নাটকের রূপায়ণে শিল্পীরা প্রায় সকলেই প্রত্যাশিত সার্থকতায় পৌঁছতে পেরেছেন। এ ব্যাপারে নাট্যনির্দেশক রাসবিহারী দাসের নিষ্ঠা অভিনন্দনযোগ্য। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেন অমিতাভ অধিকারী (সাজাহান), প্রবীর চট্টোপাধ্যায় (দারা), কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুজা), অসিত মৈত্র (ঔরংজীব), অজিত ভট্টাচার্য (মোরাদ), বিনয় চক্রবর্তী (সোলেমান), নারায়ণ দে (মহম্মদ), খগেন চৌধুরী (দিলদার), সন্তোষ ভট্টাচার্য (যশোবন্ত সিংহ), সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল দাস, শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী, ধ্রুব সাহা, অনিল বেরা, মহাদেব সুর, চন্ডীচরণ ঘোষ, অর্জুন মোহান্ত, বরুণ ভট্টাচার্য, অনিন্দিতা অধিকারী, শাশ্বতী রায়, (জাহানারা), সবিতা দাস (নাদিরা), বেলা রায় (পিয়ারী), মন্দিরা দাস (জহরৎ), নমিতা গাঙ্গুলী।

নির্মল মিত্র পরিচালিত প্রথম বসন্ত চিত্রে অজয় গঙ্গোপাধ্যায় এবং অঞ্জনা ভৌমিক। ফটো ঃ অমৃত।

নাট্যচর্চায় যে সব গোষ্ঠী সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন শিল্পবোধের পরিচয় রেখে নাট্যানুরাগীদের আন্তর স্বীকৃতি অর্জন করেছে তার মধ্যে 'কথাকলি'র নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। এই সংস্থার সভ্যরা সম্প্রতি কলামন্দিরে (নীচতলায়) তিনটি ভিন্ন-স্বাদের একাংক নাটক পরিবেশন করে পূর্ব প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। নাটক তিনটির নাম 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা', 'সুতরাং টাকা' ও 'ঝোড়ো হাওয়ার রাত'। তিনটি নাটকের অভিনয়ে শিল্পীরা নিখুঁত অভিনয়প্রতিভার নজীর রেখেছেন এবং সেই সূত্রে সংঘবদ্ধ অভিনয় প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে এতটুকু বাধা পায়নি। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন—বাসবী মৈত্র, প্রকাশ পাল, প্রণব মিত্র, অজিত চ্যাটার্জী, সুজিত দত্ত, ভূপেন মিত্র, বকুল ঘোষ।

'পলতা'র 'প্রতিরূপ' নাট্যসংস্থা এবার ষষ্ঠবার্ষিক পূর্তি ও একাংক নাট্য প্রতিযোগিতাটি বিশাল আকারে করবেন বলে খবর পাওয়া গেছে। যেসব শিল্পগোষ্ঠী এ নাট্যপ্রতিযোগিতার সংগে থাকবে আগামী সভা ও গুণীজন সম্বর্ধনা। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক, 'প্রতিরূপ', পোঃ বেঙ্গল এনামেল, ২৪ পরগনা।

মুর্শিদাবাদ সংঘের শিল্পীরা তাঁদের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে সম্প্রতি রবীন্দ্র সদনে 'কস্তুরীমৃগ' নামে একটি হিন্দী নাটক পরিবেশন করেন। প্রতিটি শিল্পীর প্রাণোচ্ছল অভিনয় ও নাট্যপ্রয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। বিশেষভাবে পরিচালক শ্রীকান্তিলাল শ্রীমাল (বাবাজী), লোধরা (শ্যাম), মীনা লোধা, জ্যোতি কুঠারী (ডঃ সতীশ)-র অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও কুঠারী, বিজয়মতী জৈন, প্রদীপ লোধা, অলোক দুগর, রাজকুমারী শ্রীমাল, জয়শ্রী আগরওয়াল দর্শকদের কাছ থেকে অভিনন্দন পান।

'অংকুরে'র শিল্পীরা সম্প্রতি এ বি টি এ হলে হরিদাস বসুর দুটি একাংক—'ডাইরেকটরের শ্রাদ্ধ' ও 'জোকার' মঞ্চস্থ করেছেন। নাট্যকার স্বয়ং নির্দেশনার দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে বহন করেছেন। এন এল দাস, আরতি ঘোষ, প্রদীপ, রণজিৎ ও নাট্যনির্দেশকের অভিনয় দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। নাট্যানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দীপ চ্যাটার্জি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট রিক্রিয়েশন ক্লাব কিছুদিন আগে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'আবাদ' নাটকটি পরিবেশন করেছেন 'রঙমহলের' মঞ্চে। শ্যামসুন্দর মুখার্জির পরিচালনায় সমগ্র নাট্যানুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিবিধ সংবাদ

গত ১০ অকটোবর সাউথ ক্যালকাটা জেসিস-এর সভ্যবৃন্দ সর্বাঙ্গীণ সাফল্যের সংগে শীলা মুখোপাধ্যায়ের 'পুনর্ণব' নাটকটি স্টার মঞ্চে মঞ্চস্থ করেন। অপেশাদারী সংস্থা হলেও এদের সামগ্রিক অভিনয় ও প্রয়োগনৈপুণ্যে পেশাদারী দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পটলী নামে এক কুন্দুলে গ্রাম্য মেয়ের মার্জিত শহুরে 'সোসাইটি কুইনে' পরিবর্তন কাহিনীর মুখ্য উপজীব্য। এ-কাহিনীকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে আমাদের আশেপাশের আধুনিক সমাজের মেকিরূপের উপর যে তীব্র কশাঘাত করা হয়েছে, তা স্মরণীয়। অধ্যাপক দীপংকর চরিত্রে অভিনয় ও গানে পরিচালক - সংগীতনির্দেশক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পটলীর রূক্ষ্ম রূপটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন শ্রীমতী নাট্যকার স্বয়ং। এছাড়া অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (গাঁজাখোর), অলক বোস (বন্ধু), গোপাল বসু (ভৃত্য), পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায় (বৌদি), মায়া সেনগুপ্তা (গ্রাম্য বৃদ্ধা) বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। অন্যান্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের অন্যান্য চরিত্রগুলিকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন শ্রীরাজা বন্দোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রতীক সেন, বরুণ চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়, বীথিকা চট্টোপাধ্যায় ও চিত্রলেখা চট্টোপাধ্যায়। নাটকটি বিদেশী ভাবরসে কিছুটা পুষ্ট হলেও কোনদিক দিয়েই মৌলিকতা না হারিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে।

ইউথ পাপেট থিয়েটার আয়োজিত শিশুদের জন্য বাৎসরিক প্রতিযোগিতা যথারীতি সম্পন্ন হয়েছে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর সেন্ট লরেন্স হাইস্কুলে।

২ অকটোবর এ'রা গান্ধী শতবার্ষিকী উৎসব পালন করেন এ'দেরই 'ট্রেনিং সেন্টার'- ১৩৮ শরৎ বোস রোডে। সভাপতির ভাষণে ভবানী মুখোপাধ্যায় গান্ধীজীর আদর্শ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। এছাড়া রচনা প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারী তিনজন, গান্ধীজীর জীবনীর ওপর লেখা, তাদের রচনা পাঠ করে। সংগীতানুষ্ঠানও হয়।

ডঃ রমা চৌধুরীর সভাপতিত্বে ইউথ পাপেট থিয়েটার এবার তাদের ৬ষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করলেন—বালিগঞ্জ শিক্ষা সদনে ৪ অকটোবর সন্ধ্যায়। প্রধান অতিথি, মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডি এন সিনহা ও ডঃ চৌধুরী তাঁদের ভাষণে সংস্থার উদ্যোগ পর্বকে সাধুবাদ জানিয়ে বললেন—এই ছোট ছেলেমেয়েদের দলটি পুতুল নাচকে যে শিল্পের মধ্যে প্রাধান্য দিচ্ছেন তা দেখে তাঁরা খুশী। ভাবগানে শুরু হয়—রঙে, রসে একাকার করে সংস্থার পুতুল নাচের আসর। দু'ঘন্টাব্যাপী এই অনুষ্ঠানে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ হাসিতে আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে।

জেসিস-এর পুনর্ণব নাটকের একটি দৃশ্য।

তিন অকটোবর, সন্ধ্যা ৬টায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাব হলে—উক্ত ক্লাবের সৌজন্যে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের প্রযোজনায় ও কানাই মজুমদারের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীদের দ্বারা 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্য ও নৃত্যবিচিত্রা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন নৃত্যে চিত্রা চ্যাটার্জী, শুভ্রা চ্যাটার্জী, তন্দ্রা রায়, মায়া ভট্টাচার্য, অরুণা দে, ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তা, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সোমা ব্যানার্জী, পূর্ণিমা হালদার, শোভা ধর, সর্বাণী দাস, রিঙ্কু ভাদুড়ী, বিদুষী বাসু, শান্তি চৌধুরী, কণিকা রায়—দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থনায় ছিলেন—শ্রীবাদল রায় (লেখক) ও শ্রীমতী অনিমা রায়। উপদেষ্টারূপে ছিলেন—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন শ্রীমতী অনিতা চ্যাটার্জী। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রীমতী নমিতা ঘোষ।

পার্ক'সার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজা কমিটি আয়োজিত উৎসবে পূজা মণ্ডপে ৭ নভেম্বর (শুক্রবার) রাত্রি ৭টায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দির কর্তৃক 'শ্রীমতী' নৃত্যনাট্য (শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার জীবন আলেখ্য) উপদেষ্টা নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সংগীতে শ্রীমতী শোভনা চৌধুরী ও শ্রীবিপুল ঘোষ। প্রযোজনায়—শ্রীমতী স্বপ্না সেনগুপ্তা।

এবারের সানফ্রান্সিস্কো চলচ্চিত্রোৎসবে ভারতের পক্ষ থেকে দেখানো হচ্ছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'। ছবির প্রযোজক নেপাল দত্ত এই উৎসবে যোগ দেবার জন্যে ইতিমধ্যেই ভার ত্যাগ করেছেন।

প'চাত্তর সপ্তাহে প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে ছবিটির। বেরুটে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যে গোল টেবিল বৈঠক বসছে ২৭ অকটোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত, তাতেও বৈঠক অনুষ্ঠাতাদের অনুরোধে ছবিটি দেখাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

যে জগতে সূর্য নেই, আলো নেই, অথচ প্রাণ আছে বিস্ময় রহস্যেভরা সেই সমুদ্রতলের ফ্যানটাসটিক চিত্র কাহিনী সায়ান্স-ফিকশান সিনে ক্লাবের সদস্যারা দেখেছেন গেল ২ নভেম্বর ম্যাজেস্টিক টকীজে। ফরাসী-ইতালীয় যুগ্ম প্রযোজিত রঙীন এই অত্যাশ্চর্য ছায়াছবির নাম হচ্ছে 'ওয়ার্ল্ড উইদাউট সান'। ছবির পরিচালক 'কস্টো' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 'গোল্ডেন পাম' পুরস্কার বিজয়ী (ক্যানস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল)।

ভি এল মিত্র ইউ জি লেডি স্টুডেন্টস হলের আবাসিকরা গত ২ অকটোবর প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে বনফুলের 'কঞ্চি' অভিনয় করে। নাটকের মূলভাব ও চরিত্র-চিত্রণে মেয়েরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। সুষ্ঠ আলোকসম্পাত ও রুচিসম্মত পরিবেশের ফলে অভিনয়টি সর্বদিক দিয়েই উপভোগ্য হয়েছিল।

তপন সিংহ পরিচালিত সাগিনা মাহাতো চিত্রে দিলীপকুমার এবং সায়রাবানু
ফটো : অমৃত

মায়া/সতীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং সুমিতা সান্যাল

৪ অকটোবর নেতাজী সুভাষ হলে ২৪ পরগণা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগীয় রিক্রিয়েশন ক্লাবের বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলনী বিশেষ সাফল্যের সংগে অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য সভাপতির এবং পৌরপতি শ্রীপ্রশান্ত সুর প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ক্লাব সভাপতি ডাঃ এস আর দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠান শুরু হয় ছোট্ট মেয়ে কুমারী শুভ্রা দাশগুপ্ত ও ছোট্ট ছেলে সুদীপের মুন্সিয়ানার সংগে চমৎকারভাবে প্রদর্শিত কতকগুলি যাদুর খেলা দিয়ে। পরে ক্লাব সদস্যারা 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটক অভিনীত করেন। রূপায়ণে ক্লাব সদস্যারা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন— বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন সর্বশ্রী কালিপদ বসু, রবীন মুখোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, নবেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখেরা।

পরিবার মঙ্গল পরিকল্পনা পক্ষ উপলক্ষ করে জনগণের মনের গভীর ও দৃঢ় চেতনা আনবার জন্যে বেতার ভাষণ, ছায়াচিত্র প্রদর্শন ছাড়াও সম্প্রতি কাজে লাগান হয়েছে যাদু প্রদর্শনীকে। সম্প্রতি বাঙ্গুর হাসপাতালের চত্বরে পরিবার পরিকল্পনার ভাবধারা অবলম্বনে এই অভিনব যাদু প্রদর্শনী জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসুক্যের সৃষ্টি করে। এই অভিনব প্রদর্শনীর পরিকল্পক ২৪ পরগণার চীফ মেডিকেল অফিসার ডাঃ এস আর দাশগুপ্ত—যিনি নিজেই বিশিষ্ট সৌখীন ইন্দ্রজালবিদ হিসেবে প্রখ্যাত। এই যাদু প্রদর্শনীতে সার্থকভাবে রূপায়িত করেন প্রবীণ যাদুকর মিস্টিককুমার—খাদ্য সমস্যা, বন্ধ্যাত্ব নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে নতুন চিন্তাধারার ইঙ্গিত এই অনুষ্ঠান মারফৎ সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই অভিনব যাদু প্রদর্শনীটি আর জি কর মেডিকেল কলেজ এবং অন্যান্য স্থানে সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছে।

গত ৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় শ্যামবাজার এ ভি স্কুলে পথিকৃৎ সংস্থা 'উত্তর কলিকাতা ৯৩তম শরৎ-জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। পথিকৃৎ সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শ্রীমানিক মুখোপাধ্যায় আধুনিক পটভূমিকায় শরৎচন্দ্রের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন পথিকৃৎ সংগীতগোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দ। সভাশেষে পথিকৃৎ নাট্যসংস্থা 'বিন্দু' নাটকটি সাফল্যের সংগে মঞ্চস্থ করে।

গত ৫ অকটোবর রামমোহন লাইব্রেরী হলে কিশোর কল্যাণ পরিষদের উনবিংশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, সমাবর্তন উৎসব ও গান্ধীজন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সুসাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশংকর রায়। রবীন্দ্রসংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের 'প্রণাম গান্ধীজী, জয়তু গান্ধীজী' সংগীতের সংগে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় এবং তারপর মায়া সুহা ও গীতালি ভট্টাচার্য রবীন্দ্রসংগীত, কাবেরী কর অতুলপ্রসাদের গান ও খেয়াল, শিবানী চক্রবর্তী আগমনী গান, সজল ভট্টাচার্য ও প্রণব দাস কবিতা আবৃত্তি, শাশ্বতী শেঠ নৃত্য এবং আবদুল মজিদ গান্ধীজী সম্পর্কে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে। এই উপলক্ষে বিশিষ্ট লেখকদের রচনা সম্বলিত একটি স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর আসানসোল পলিটেকনিক প্রেক্ষাগৃহে স্থানীয় মহিলা মিলন সংঘের ৮ম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হল। সভানেতৃত্ব করেন সারা ভারত মহিলা ফেডারেশনের সহ-সভানেত্রী সুধা রায়। ফেডারেশনের সমাজসেবামূলক কর্মসূচী সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে তিনি স্থানীয় মহিলাদের কর্মোদ্যোগী হবার আহ্বান জানান। পরে সভ্যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিরকুমার সভা' মঞ্চস্থ করেন। মোটামুটি-ভাবে উত্তীর্ণ এই অভিনয়ে প্রশংসার দাবী করতে পারেন সর্বশ্রী অর্চনা সেনগুপ্তা (চন্দ্রবাবু), মাধবী হালদার (অক্ষয়), গীতা বিশ্বাস (শৈলবালা) ও আলো গোস্বামী (নৃপবালা), ডলি ঘোষের নীরবালা অভিনয়ে ও গীতে সমৃদ্ধ। সাজসজ্জাও প্রশংসাই। তিলক রায়চৌধুরীর পরিচালনার ছাপ সর্বত্র।

দর্শক

দলীপ ট্রফি

ফাইনাল খেলা

পশ্চিমাঞ্চল : ৪১২ রান (সুর্তি ১২৭, সারদেশাই ৭৯, ইন্দরজিৎ সিংজি ৫৬ এবং ফার্ণান্ডেজ নট আউট ৪৬ রান। অমরনাথ ৮৯ রানে ৩ উইকেট)

উত্তরাঞ্চল : ১৭৬ রান (লাম্বা ৬৮ রান। অশোক মানকাদ ২১ রানে ৮ উইকেট এবং উদয় যোশী ৫৫ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৫৫ রান (গানদোত্রা ৪৮ রান। যোশী ২৩ রানে ৫ উইকেট)

আমেদাবাদে সর্দার প্যাটেল স্টেডিয়ামে আয়োজিত দলীপ ট্রফি আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ৮১ রানে উত্তরাঞ্চল দলকে পরাজিত করে মোট ৬ বার দলীপ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করেছে। এখানে উল্লেখ্য, দলীপ ট্রফির ৯ বারের খেলায় পশ্চিমাঞ্চল দল ৮ বার ফাইনালে খেলে সরাসরি জয়ী হয়েছে ৫ বার এবং যুগ্ম বিজয়ী হয়েছে ১ বার (১৯৬৩-৬৪ সালে দক্ষিণাঞ্চল দলের সঙ্গে)। পশ্চিমাঞ্চল দলের অধিনায়কত্ব করেন চান্দু বোরদে এবং উত্তরাঞ্চল দলের বিষেণ সিং বেদী।

প্রথমদিনে পশ্চিমাঞ্চল দল ৫ উইকেট খুইয়ে ২৫৮ রান সংগ্রহ করেছিল। ওপেনিং ব্যাটসম্যান দিলীপ সারদেশাই সতর্কতার সঙ্গে খেলে ৭৯ রান করেন; অন্যদিকে রুসী সুর্তি বেপরোয়া হয়ে তাঁর ১২৭ রান সংগ্রহ করলেও দুবার আউট হওয়া থেকে খুব বেঁচে যান। পশ্চিমাঞ্চল দলের খেলার ভিত খুবই আলগা হয়েছিল। মাত্র ৩৯ রানের মাথায় তাদের ৩য় উইকেট পড়ে যায়। দলের এই সঙ্গীন অবস্থায় সারদেশাই এবং সুর্তি ৪র্থ উইকেটে জুটি বেঁধে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। তাঁদের ৪র্থ উইকেটের জুটিতে দলের ১৮৯ রান উঠেছিল।

দ্বিতীয় দিনে চা-পানের ৩৫ মিনিট আগে পশ্চিমাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ৪১২ রানের মাথায় শেষ হয়। দ্বিতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে উত্তরাঞ্চল দল ১ উইকেটের বিনিময়ে ৬৮ রান করেছিল।

তৃতীয় দিনে উত্তরাঞ্চল দলের ১ম ইনিংস ১৭৬ রানের মাথায় শেষ হলে তারা ২৩৬ রানের পিছনে পড়ে 'ফলো-অন' করতে বাধ্য হয় এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ২টো উইকেট খুইয়ে ৭৯ রান সংগ্রহ করে।

চতুর্থ অর্থাৎ খেলার শেষদিনে লাঞ্চের ২ মিনিট আগে উত্তরাঞ্চল দলের ২য় ইনিংস ১৫৫ রানের মাথায় শেষ হলে পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ৮১ রানে জয়ী হয়।

ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল

বিল লরীর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ভারত সফরে এসেছে। ভারত সফরে তাদের প্রথম খেলা পড়েছে পশ্চিমাঞ্চল দলের বিপক্ষে, পুণায়। বর্তমান সফরে তারা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলবে। এখানে উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষের মধ্যে ইতিপূর্বে যে পাঁচটি টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ খেলা হয়েছে তার ফলাফল: অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ৪-বার (স্বদেশে ২-বার এবং ভারতবর্ষের মাটিতে ২-বার) এবং সিরিজ অমীমাংসিত ১-বার (ভারতবর্ষের মাটিতে ১৯৬৪ সালে)। এই পাঁচটি সিরিজের ২০টি টেস্ট খেলার ফলাফল: অস্ট্রেলিয়ার জয় ১৩, ভারতবর্ষের জয় ২ এবং খেলা অমীমাংসিত ৫।

বর্তমান ভারত সফরে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলে এই ১৫ জন খেলোয়াড় আছেন:

উইলিয়াম মরিস (বিল) লরী (অধিনায়ক), গ্রাহাম ডগলাস ম্যাকেঞ্জি, এলান নেমান কনোলি, আয়ান রিচ রেডপাথ, আয়ান মাইকেল চ্যাপেল, এ্যান্ড্রু পল সিহান, জন উইলিয়াম গ্লিসন, কেভিন ডগলাস ওয়ালটার্স, এরিক ওয়াল্টার ফ্রিম্যান, হেডাল ব্রায়ান টেবার, কিথ রেমন্ড স্ট্যাকপোল, এ্যাসলি আলেকজান্ডার ম্যালেট, লরি মেইন, টেলর আরভিন এবং রেমন্ড জর্ডন।

নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ম্যাচ

পাকিস্তান : ২২০ রান (সাদিক মহম্মদ ৬৯ রান। হাওয়ার্থ ৮০ রানে ৫ এবং হ্যাডলি ২৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ২৮৩ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ইউনিস আমেদ ৬২ এবং ইন্তিখাব আলাম ৪৭ রান)

নিউজিল্যান্ড : ২৭৪ রান (হ্যাডলি ৫৬ এবং মারে ৫০ রান। নাজির ৯৯ রানে ৭ উইকেট)

ও ১১২ রান (৫ উইকেটে। বার্জেস ৪৫ রান। সাজিদ ৩৩ রানে ৫ উইকেট)।

করাচীতে নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তানের প্রথম টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি, খেলা ড্র গেছে।

প্রথম দিনের খেলায় পাকিস্তান ৯টা উইকেট খুইয়ে ১৯৯ রান সংগ্রহ করেছিল। তাদের খেলার সূচনা ভাল হলেও মাঝের দিকের নামকরা খেলোয়াড়রা সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেননি। [illegible] টেস্ট খেলোয়াড় সাদিক দলের সর্বোচ্চ ৬৯ রান করেন।

দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ২২০ রানের মাথায় শেষ হলে নিউজিল্যান্ড [illegible] ২৭৪ রান সংগ্রহ করে ৫৪ রানে অগ্রগামী হয়। নিউজিল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসের খেলায় অগ্রগামী হতে সাহায্য করেছিলেন ৮ম উইকেটের জুটি ফাস্ট বোলার হ্যাডলি এবং অফ-স্পিনার ব্রায়ান ইউল। তাঁরা ৮ম উইকেটের জুটিতে দলের ১০০ রান তুলে চরম সংকট থেকে দলকে উদ্ধার করেছিলেন। পাকিস্তানের মহম্মদ নাজির তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ৯৯ রানে ৭টা উইকেট পান। দ্বিতীয় দিনের বাকি সময়ের খেলায় পাকিস্তানের ২য় ইনিংসে যেমন কোন রান ওঠেনি, তেমনি কোন উইকেটও পড়েনি।

তৃতীয় দিনের খেলায় পাকিস্তানের ৫টা উইকেট পড়ে ১৮৬ রান দাঁড়ায়। খেলার এই অবস্থায় পাকিস্তান ১৩২ রানে অগ্রগামী হয়।

চতুর্থ দিনে পাকিস্তান তাদের ২৮৩ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। খেলার এই অবস্থায় নিউজিল্যান্ড দলের জয়লাভের জন্যে ২৩০ রানের প্রয়োজন ছিল। হাতে ১৯৩ মিনিট সময় ছিল। কিন্তু নিউজিল্যান্ড ৫ উইকেট খুইয়ে ১১২ রান তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে খেলা অমীমাংসিত থেকে যায়।

বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা

মেক্সিকোতে আগামী বছরে (১৯৭০) ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার (জুলে রিমে কাপ) শেষ পর্যায়ের খেলার আসর বসবে। এই শেষ পর্যায়ে বাছাই করা ১৬টি দেশ সমান চারভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে। তারপর প্রতি গ্রুপের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দেশকে নিয়ে নক আউট পর্যায়ের তালিকা তৈরী হবে।

এ পর্যন্ত এই ৮টি দেশ প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় চ্যাম্পিয়ান হওয়ার সূত্রে মেক্সিকোর শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে: সুইডেন (৫নং গ্রুপ), বেলজিয়াম (৬নং গ্রুপ), পশ্চিম জার্মাণী (৭নং গ্রুপ), পেরু (১০নং গ্রুপ), ব্রেজিল (১১নং গ্রুপ), উরুগুয়ে (১২নং গ্রুপ), এল স্যালভাডর (১৩নং গ্রুপ) এবং মরক্কো (১৬নং গ্রুপ)। ৯নং গ্রুপের ইংল্যান্ড এবং ১৪নং গ্রুপের মেক্সিকো সরাসরি মেক্সিকোর শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। অর্থাৎ এই দুই দেশকে শেষ লীগ পর্যায়ে খেলবার যোগ্যতা লাভের জন্যে প্রাথমিক লীগ পর্যায়ে খেলতে হয়নি। কারণ ইংল্যান্ড ১৯৬৬ সালের জুলে রিমে কাপ বিজয়ী এবং মেক্সিকো ৯ম বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা।

দাবার আসর

নৌকার মাৎ

মন্ত্রীর মাতের মতই, নৌকার মাতেও বিপক্ষের রাজাকে ছকের একেবারে শেষ ফাইলে বা র‍্যাঙ্কে নিয়ে যেতে হবে নৌকা এবং রাজার সহায়তায়। তারপর মাৎ করা খুবই সহজ।

ধরুন সাদা রাজা আছে মন্ত্রী নৌকা ১ ঘরে, সাদা নৌকা আছে রাজা নৌকা ১ ঘরে, এবং কালো রাজা আছে কালোর মন্ত্রীনৌকা ১ ঘরে। ১নং চিত্র দেখুন। এক্ষেত্রে চাল হচ্ছে সাদার, এবং কালো রাজা ছকের একের একেবারে শেষ প্রান্তে থাকার দরুন নৌকা সঙ্গে সঙ্গে কালো রাজাকে শেষ র‍্যাঙ্কে আটকে দিতে পারছে।

সাদা
১নং চিত্র

সাদা
২নং চিত্র

সুতরাং (১) **নৌকা—নৌকা ৭ : রাজা—ঘোড়া** ১।

এইবার আমরা সাদা রাজাকে কালো রাজার কাছাকাছি নিয়ে আসব। কালো রাজা যে ফাইলে আছে সাদা রাজাও সেই ফাইল ধরেই এগুবে, কিন্তু সাদা রাজা যখন ষষ্ঠ র‍্যাঙ্কে এসে পৌঁছাবে। তখন আর একে কালো রাজার ফাইলে বসানো ঠিক হবে না। তখন সাদা রাজাকে বসাতে হবে কালো রাজার পাশের ফাইলে।

সুতরাং, (২) রাজা—ঘোড়া ২ : রাজা—গজ ১ (৩) **রাজা—গজ** ৩ : রাজা—মন্ত্রী ১ (৪) **রাজা—মন্ত্রী ৪ : রাজা—রাজা** ১ (৫) রাজা—রাজ ৫ : **রাজা—গজ** ১ (৬) রাজা—রাজা ৬।

আমাদের পূর্ব মন্তব্য অনুযায়ী ষষ্ঠ র‍্যাঙ্কে সাদা রাজাকে আর কালো রাজার ফাইলে বসালাম না। ঠিক পাশের ফাইলে রাখলাম। ফলে দেখুন যদি কালো রাজা এবার রাজা—১ ঘরে ফিরে আসে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নৌকা—নৌকা ৮ মাৎ।

সুতরাং (৬)...রাজা—ঘোড়া ১ (৭) নৌকা—রাজাগজ ৭ : রাজা—নৌকা ১ (৮) **রাজা—গজ ৬ : রাজা—ঘোড়া ১ (৯) রাজা—ঘোড়া ৬ : রাজা—নৌকা** ১ (১০) নৌকা—গজ ৮ মাৎ।

কালো ৫নং চাল **রাজা—গজ** ১ না দিয়ে রাজা—মন্ত্রী ১ দিতে **পারত। এ** ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের **পূর্ব মন্তব্য অনু**-যায়ী সাদা রাজাকে **৬নং চালে মন্ত্রী ৬ ঘরে** না নিয়ে গিয়ে রাজা ৬ ঘরে নিয়ে যেতাম। আর কালো রাজা রাজা **১ ঘরে আসতে** পারছে না, কারণ তাহলে **সঙ্গে সঙ্গে নৌকা**—নৌকা আট মাৎ। সুতরাং **কালো রাজাকে মন্ত্রীনৌকা** ১ ঘরের দিকে **এগুতে হচ্ছে,** কিন্তু তাহলেও নিস্তার নেই। তখন চাল-গুলি হবে এই রকম—

(৬) রাজা—গজ ১ (৭) রাজা—মন্ত্রী **৬ : রাজা—ঘোড়া** ১ (৮) **রাজা—গজ ৬ : রাজা—নৌকা** ১ (৯) **রাজা—ঘোড়া ৬ :** রাজা—ঘোড়া ১ (১০) **নৌকা—নৌকা** ৮ মাৎ।

ছকের শেষ প্রান্তে রাজাকে বন্দী করতে পারলে কিভাবে মাৎ করা যায় তা আমরা দেখলাম। আমরা এইবার দেখব ছকের মাঝ-খানে রাজা থাকলে কিভাবে তাকে প্রান্তের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত মাৎ করা যায়।

ধরুন কালো রাজা আছে কালোর মন্ত্রী ৪ ঘরে, সাদা রাজা আছে **সাদার মন্ত্রী** ১ ঘরে এবং সাদা নৌকা আছে সাদার মন্ত্রী নৌকা **১ ঘরে। ২নং** চিত্র দেখুন। যেহেতু কালো রাজা **ছকের মাঝখানে** রয়েছে, সাদার **পক্ষে** সব চেয়ে ভাল পন্থা হোল প্রথমে সাদা রাজাকে কালো রাজার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। **অন্তখেলার** একটি প্রধান সূত্রই **হচ্ছে এইভাবে** রাজাকে যত বেশী সম্ভব ব্যবহার করা। এইবারে চালগুলো লক্ষ্য করুন।

(১) **রাজা—মন্ত্রী ২ : রাজা—রাজা** ৪ (২) **রাজা—মন্ত্রী** ৩। সাদা রাজাকে কালো রাজার একেবারে মুখোমুখি না বসিয়ে এক **পাশের ফাইলে** রাখলাম। এইবার দেখুন, **কালো** (২)...রাজা—মন্ত্রী ৪ চাল দিলে **(৩) নৌকা—নৌকা** ৫ কিস্তি হবে এবং **কালো রাজা একটি** র‍্যাঙ্ক পিছিয়ে যাবে।

সুতরাং কালো কি করবে? কালো **রাজা কালোর তৃতীয় র‍্যাঙ্কের কোন ঘরে গেলে সাদা নৌকা—নৌকা ৫ চাল দেবে এবং নিজের রাজাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাহলে বাকী রইল (২)...রাজা—গজ ৫ এবং (২)...রাজা—গজ ৪ চাল।**

ধরুন কালো (২)...**রাজা—গজ** ৫ চাল **দিল। তাহলেও সাদার চাল হোল** (৩) নৌকা—নৌকা ৫ এবং কালোর রাজা কিছুটা কমে গেল। এইবারে কালো (৩)...**রাজা—ঘোড়া** ৬ বা (৩)... ঘোড়া ৫ **হলে সাদার চাল হবে** (৪) **রাজা ৩; এবং কালোর** (৩)...রাজা... চাল হলে সাদার চাল হবে (৪) নৌকা ৪।

ধরা যাক কালো (৩)...রাজা—[illegible] চালই দিয়েছে। তাহলে (৪) নৌকা [illegible] ৫ : **রাজা—গজ** ৭ (৫) নৌকা—[illegible] কিস্তি : রাজা—ঘোড়া ৬ (৬) [illegible] রাজা ৩ : রাজা—ঘোড়া ৭ (৭) [illegible] ঘোড়া ৪ কিস্তি : রাজা—নৌকা [illegible] রাজা—গজ ৬ পাঠক লক্ষ্য করবেন [illegible] রাজা এইভাবে নৌকার পাশে এসে [illegible] ফলে শুধু যে নৌকার উপর জোর [illegible] নয়, বিপক্ষ রাজার ঘরও আটকে [illegible] এই বিষয়টি পাঠককে লক্ষ্য করতে [illegible] করি। এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে [illegible] কালো ৩ চালে মাৎ হয়ে গেল।

(৮)...রাজা—নৌকা ৭ (৯) [illegible] ঘোড়া ২ : রাজা—নৌকা ৬ এইবার চতুর্থ র‍্যাঙ্কেরই অন্য কোন ঘরে নিয়ে গিয়ে এক চাল অপেক্ষা কালোকে (১০)...রাজা—নৌকা [illegible] দিতেই হবে এবং তাহলেই (১১) নৌকা ৪ মাৎ।

এইভাবে কয়েকবার মাৎটা [illegible] করে নিলে পাঠক নিজেই [illegible] পারবেন কালোর **২নং** চাল রাজা—[illegible] হলে সাদা কিভাবে কালোকে মাৎ [illegible] পারত। এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভ্যাস করা ভালো কারণ তাহলে ধারণা আরো দৃঢ় হবে এবং কায়দামাফিক চালও বেশ [illegible] আসবে।

—গজানন

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস, ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।২, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা—৩ হইতে প্রকাশিত।